







মাসিক বসুমতি

১১ বিলাস, ১০০০

(কলরঙ)

শ্রী  
মহাদা  
দাইবুজ

হিমালয়  
—গোপাল হোস অঙ্কিত



বসিত- না হইয়া পরবর্তীকালে নামা বংশের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে সংগৃহীত হইয়াছিল এবং অনেকগুলি নামেরই ছাড় পড়িয়াছে। কাজেই বংশলতগুলি অজ্ঞাত বলা যায় না। তবে একটা কথা স্মরণযোগ্য। দেখা যায়, অনেক বৈজ্ঞানিক ষড়ঃসিদ্ধ মূলতঃ ভারতে প্রযুক্ত হইয়াছে না। ইহার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত ইয়োবোশের অর্থনীতিশাস্ত্রের অনেক মূল সূত্রের এদেশে ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেইরূপ প্রাচীন ভারতের সামাজিক ব্যবস্থার সহিত অজ দেশের সামাজিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য নাই।

ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায় যে, বিজ্ঞেরা তিনটি বৈদ, অথবা দুইটি অন্তত একটি সমগ্র অধ্যয়ন সমাপনান্তে গৃহস্থাপ্রবেশ প্রবেশ করিতেন। এই গৃহস্থাপ্রবেশ প্রবেশের সময় ২৫৩২ বৎসর ছিল। স্তত্রয়া গড়পড়তা শতাব্দে তিন পুরুষ ধরা অসঙ্গত হইবে না। এ হিসাবে যে সকল বংশে অন্তত ৩৫৩৬ পুরুষ হইয়াছে তাহা কতকটা নির্ভরযোগ্য। আবার একই সময়ে এক বংশের বিভিন্ন শাখায় কোথাও ১ পুরুষ কোথাও বা ১১ পুরুষ দেখা যায়। এই সকল ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাতীশ্রেণীর মূল পুরুষদের ৫৬টি সন্তান হয় ও বাহেঙ্গশ্রেণীর মূলপুরুষদের ১০০টি সন্তান হয়। আদিমুখের পুত্র রাজা ভূশ্ব এই ১৫৬ জন ব্রাহ্মণকে ১৫৬ খানি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভূস্বামী করিয়া দেন। তাহাতে তাহার সেই সেই গ্রামে গ্রামীন বলিয়া পরিচিত হন। এই গ্রামীন শব্দ অপভ্রংশ গাঁই (গাঞী) হয়। এই গ্রাম অনুসারে নামের সহিত উপাধি ব্যবহৃত হইত। এই কারণেই রাতীশ্রেণীর ভিতর একটা বাক্য প্রচলিত আছে—  
আছে—“পদঃপাত চাপায় গাঁই, ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।” যদিও ৫৬ গাঁইয়ের উল্লেখ আছে কিন্তু বংশলতা ও গাঁইবোধক ‘পদবী’ ৪ আমরা বসিতে পারি যে অন্তত ৫১ গাঁই ছিল। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের ১৬টি সন্তান ১৬টি বিভিন্ন গ্রাম পাণ্ডয়ার হাঙ্গের ১৬টি গাঁই উপাধি হয়।

অতঃকাল এ বিষয়ে সেরূপ চর্চা না থাকায় অনেকেরই ধারণা যে রাতীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় হইলেই বঙ্গোপাধায় হইবে। কিন্তু একমাত্র বঙ্গোপাধা গ্রামের ভূস্বামী আদি বরাহের বংশধরেরা বঙ্গোপাধা পরে বঙ্গোপাধায় বা বাঁড়য্যে। ভট্টনারায়ণের অন্তর্গত বংশধরেরা নিজ নিজ গ্রাম অনুসারে উপাধি ব্যবহার করিতেন। পরবর্তীকালে রাতীশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বাহেঙ্গভূমে গিয়া এবং বাহেঙ্গশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বাঢ়ে গিয়া বাস করিলেও তাহাদের পরিচয়ে হেণী ও আদিম গাঁইমূলক উপাধির কোনো পরিবর্তন হয় নাই। ঠাকুর বংশীয়েরা ভট্টনারায়ণের কোন্ সন্তানের বংশধর সে সম্বন্ধে ৮ প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষির নগেন্দ্রনাথ বসু ও ৮ ব্যোমকেশ হুস্তকি প্রণীত ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’ তৃতীয় খণ্ড, ব্রাহ্মণ বিবরণ, ১ম খণ্ড, ব্রাহ্মণকাণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় (২৬৮—২৬৯ পৃঃ) তে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইহাদের কুশারী গাঁই এবং ইহাদের পূর্বপুরুষ ভট্টনারায়ণের চতুর্দশ পুত্র কোয় বা দীন। ইহারা থলনাব পীঠভোগ গ্রামের গোষ্ঠীপতি কুশারী বংশীয়ের একটি শাখা। রাতীশ্রেণীর অধিকাংশ ব্রাহ্মণদের আর ইহাদেরও সামবেদ, কৌথুরী শাখা। শাণ্ডিল্য গোত্র হওয়ায় ইহাদেরও প্রবর শাণ্ডিল্য, আসিত ও দেবল।

বঙ্গাল সেন বধন কৌলীজ মর্ধাঙ্গ স্থাপন করেন তখন তিনি রাতীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কুলীন ও জ্যোতীষ এই দুই ভাগে বিভক্ত

করেন এবং জ্যোতীষদের মধ্যে সিদ্ধজ্যোতীষ, সাধ্যজ্যোতীষ ও কষ্টজ্যোতীষ এই তিনটি ভাগ হয়। বঙ্গাল সেন নব্বই লক্ষণের দ্বারা ব্রাহ্মণদের গুণানুসারে কৌলীজ-মর্ধাঙ্গ দিয়াছিলেন। ঐহাঙ্গের কোনো একটি গুণের অভাব থাকিত তাহাদের এক এক শ্রেণিতে বিভাগ করা হইত, বাহা হইতে জ্যোতীষদের শ্রেণীবিভাগ হয়। সর্বজনপরিচিত নব্বই কুললক্ষণ—

আচারো বিনয়ো বিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।

নিষ্ঠাবৃতিস্তপোদাননং নব্যা কুললক্ষণম্।

কুলাচারো আবৃত্তি শব্দের অর্থ করিতেন সমান যবে বৈবাহিক আদান-প্রদান। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই কুলীনের কৌলীন্য ভঙ্গ হইত। আমরা বধন কলেঙ্গের ছাত্র তখন তত্ত্বশাস্ত্র ও তাত্ত্বিক আচারে পণ্ডিতপ্রবর জগদীশচন্দ্র তর্কালংকার মধ্যে মধ্যে আমাদের খুশিখিতামহ পৌকুলনাথের সহিত দেখা করিতেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার মুখে একদিন শুনিয়াছিলুম যে, রাজা বঙ্গাল সেন তাত্ত্বিক ধর্ম ও আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তত্ত্বোক্ত কুলাচার ও কৌলশব্দ হইতে এই কুলীন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণেরা এই ধর্মে আধারান ও ইহার অনুষ্ঠানে হস্তশীল ছিলেন তাহাদেরই সমাজে কুলীন আখ্যায় মর্ধাঙ্গ দান করিয়াছিলেন। কুলীনের এই নয় লক্ষণের একটা গুহ্য অর্থ আছে। আমরা তাত্ত্বিকধর্ম, নীতিত না থাকায় পণ্ডিত মহাশয় সে গুহ্য অর্থ আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে অসম্মত হইলেন। কাজেই এই লোকের গুহ্য অর্থ জানিবার সৌভাগ্য আমাদের হইল না।

বঙ্গাল সেন প্রথমে নিম্নলিখিত আটগাঁই ভুক্ত সকল ব্রাহ্মণকেই কুলীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাদের বঙ্গালভুক্ত আটবর কুলীন বলে। ১। শাণ্ডিল্যগোত্র বঙ্গোপাধা গাঁই, ২। ভরদ্বাজগোত্র মুখটি গাঁই, ৩। কান্তপগোত্র চাটাতি গাঁই, ৪। সাবর্ণগোত্র গাঙ্গুলি গাঁই ও কুল গাঁই, ৫। বাহা গোত্র যোবাল গাঁই, পুতুগু গাঁই ও ও কালীলাল গাঁই। তাহার পরে তিনি পুনরায় বাচাই করিয়া গুণানুসারে প্রত্যেক গাঁই হইতে কয়েক ব্যক্তিকে কৌলীজ মর্ধাঙ্গ দেন। তাহার সংখ্যা ১১ জন। এই কয়েক ভিন্ন দৈই গাঁইভুক্ত অজ্ঞাত সকলের কৌলীজ রহিত হইয়া যায়।

পরে রাজা লক্ষণ সেন ব্রাহ্মণদের মর্ধাঙ্গ নির্ণয়ের সময় সাবর্ণ গোত্রের কুল এক বাহা গোত্রের পুতুগু ও কালীলাল গাঁইভুক্ত ব্যক্তিদের কৌলীজ মর্ধাঙ্গ রহিত করেন। ঐহাঙ্গ কৌলীজ পাইয়াছিলেন কিন্তু পরে রহিত হয়, তাহাদের বংশধরেরা বংশজ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। লক্ষণ সেন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বঙ্গোপাধা গাঁইভুক্ত ১। জাজন, ২। দেবল, ৩। বামন, ৪। মকরন্দ, ৫। মহেশ্বর, ৬। ইশান; ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখটি গাঁইভুক্ত ৭। উৎসাহ, ৮। গরুড়; কান্তপ গোত্রীয় চাটাতি গাঁইভুক্ত ১। বরুণ, ১০। হলয়ুধ, ১১। শুভ, ১২। অরবিন্দ, ১৩। বাঙ্গাল; সাবর্ণ গোত্রীয় গাঙ্গুলি গাঁইভুক্ত ১৪। শিশু; বাহা গোত্রীয় যোবাল গাঁইভুক্ত ১৫। শিরোমণি শব্দের এই পনেরো জনকে কুলীন মর্ধাঙ্গ দিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণদের গুণানুসারে বাছাই করার পরিবর্তে কৌলীজ মর্ধাঙ্গ বংশগত করিয়াছিলেন এবং কুলীন কুলমর্ধাঙ্গানুসারে কার্য করিতেন কি না তাহা লিপিবদ্ধ করিবার অল্প কয়েক জনকে ঘটিক নিবৃত্ত করিলেন। ঘটকদের ঈদিকা

ইংল্যান্ডে লক্ষ্যপূজিত কুলীন এবং ইহাদের উত্তর পুরুষই বর্তমানে কুলীনশ্রেণী বলিয়া আখ্যাত।

কয়েক শত বৎসর পূর্বে মুসলিম অধিকারে শান্তিলা-শোত্রীয় প্রাক্তন বঙ্গের বংশধর দেবীর ঘটক কুলীনদের তৎকালীন অবস্থা পটীকায় কথিত দেখিলেন যে, সকল বংশেই অল্পবিস্তর দোষ ঘটিয়াছে। ফলে 'চোয় নাই বার, কুল নাই ভার' হইয়াছে। তখন এক প্রাচীন দোষকে এক একটি গুহুে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে ১৮ মেসের হুট্ট, 'দোয়ানাং মেলকো মেলা।' কোন্ কোন্ মেসের সহিত কোন্ মেসের বৈবাহিক কার্য প্রাপ্ত তাহাও নিশ্চিত হইল। ইংল্যান্ডে দেবীর বংশ মামিলেন না তাঁহারা কোন তাগা করিয়া জির দেশে চলিয়া গেলেন; এইরূপে ঘাঘাশ্রেণী প্রাক্তনের উৎপত্তি হইল। ইংল্যান্ডে দেশে বহিলেন তাঁহারা নিম্নলিখিত অথবা দেবীর-বংশী বহিলে অতিষ্ঠ হইলেন। কুলশাস্ত্র মতে মেসবন্ধন ১৫০২ শকে (১৮০০ খৃঃ) হইয়াছিল। ইহা কেবল কুলীনদের জন্ত, শ্রোত্রীদের সহিত ইহার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। যে সকল শ্রোত্রীবংশ কেবল কুলীনদের কল্যাণ করিতেন এবং বহু কুলীনের পরিপোষক ছিলেন, তাঁহাদের দেবীরের পূর্ব হইতেই গোষ্ঠীপতি আখ্যা চলিয়া আসিতেছিল।

এই মেসবন্ধন ব্যাপার আমাদের নিকট বিশেষ জটিল বহুভাবিত বলিয়া মনে হয়। বংশে কোনোটপ দোষ থাকিলে লোকে স্বভাবত তাহা প্রকাশ করিতে কুচিত হয়। কিন্তু দেবীরের ব্যবস্থায় এই দোষের পরিচয় দিয়া নিজেদের কলমর্ষণ স্থাপিত করিতে হইত। এখন আমরা এ সকল বিষয়ে অনভ্যন্ত হওয়ার মেলকে কুলীনদের শ্রেণীবিভাগের একটি নামমাত্র এইরূপ একটি অস্পষ্ট ধারণা লইয়া থাকি। কিন্তু দেবীরের সময়ে এই মেসের অর্থ অস্পষ্ট ছিল। কোন্ মেলে কী কী দোষ বুঝায় তাহা মেসের নাম করিলে লোকে বুঝিতে পারিত। বঙ্গদেশের সর্বত্র এইরূপে সকল কুলীনকে দোষযুক্ত পরিচয় দিতে বাধ্য করিল—দেবীরের পশ্চাতে এমন কী শক্তি ছিল? কিংবদন্তী আছে যে, দেবীর কামাখ্যায় তপস্যা করিয়া এই বরলাভ করিয়া যে বাদলা সমাজে তিনি যে ব্যবস্থা চালাইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহা চালাইতে পারিবেন ও ৫০০ বৎসর সেই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সেই সময়েই অনেকে দেবীরের ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মত দেখা দিয়াছিলেন।

অনুমান হয় যে, কোনো প্রবল রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলে এইরূপ ব্যবস্থা সমস্ত দেশব্যাপী করা সম্ভবপর হইত না। যে সকল পাঠান সম্রাটগণ হিন্দু ধর্মপ্রাণ ও শ্রুতির সম্মত ব্যবস্থা সকলনের জন্য হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কে বলিতে পারে এ বিষয়ে তাঁহাদের কোনো সহায় ছিল কি না? বিশেষতঃ যখন দেখি যে মুসলমান সময়ে জাতিমালা নামে একটি কাছারী ছিল, যেখানে জাতি-ঘটিত সমস্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইত। রাজা নবাব ইংল্যান্ডের প্রথম আমলে এইরূপ জাতিমালার কাছারীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। ইংল্যান্ড এরূপ কাছারীর স্রষ্টা নয়, বঙ্গবিজয়ের পূর্বে দেশে এইরূপ কাছারী প্রচলিত আছে দেখিয়া সেই কাছারীর কাজকর্মের ব্যবস্থা করিয়াছিল মাত্র। হয়তো এইরূপ কাছারীতে প্রাক্তনদের জাতি-মর্ষণ নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে বাদশাহের নিযুক্ত কর্মচারীদের প্রধানধর দেবীর মেসবন্ধন হুট্ট করেন ও সেই মেসবন্ধন

অনুসারে পরিচয় দিতে রাজ্যদেশ সকলকে বাধ্য করে; ইহা যদিও অনুমান মাত্র। মনে হয় এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয় নাই, ঐতিহাসিকদের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাতের জন্য এখানে এই কথাই উল্লেখ করিলাম।

কায়র কালীয়েয়া সিদ্ধশ্রোত্রীয়। (বিশেষ বিবরণ হরিলাল চট্টো প্রণীত ব্রাহ্মণ ইতিহাস গ্রন্থে ৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) আমরা বঙ্গোচ্চ ব্রাহ্মণভাষা নিবাসী যখননাথ মার্ভেজের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে লিখিত কোষের বংশলতা নামক পুঁথির সাহায্যে এবং স্ক্রিম কোর্টের কয়েকটি মোকদ্দমার নথিপত্র দৃষ্টে ইংল্যান্ডে যে বংশলতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার সুজ্ঞিত এক একখণ্ড "চাকুর্য বংশ" নামে কলিকাতার বক্সার সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে, জাতিশাস্ত্র লাইব্রেরি এবং শাস্ত্রনিকতেনের বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে বক্ষিত আছে। প্রয়োজন হইলে কোচুদলী পাঠকপাঠিকা তাহা দেখিতে পারেন। ঐ বংশলতা হইতে কিছু কিছু নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কায়র অশ্বত্থন পুত্র যুটনারায়ণ হইতে ২৩শ বংশের জগন্নাথ কুশারী জায়পকানন পিত্রাভোগ হইতে যশোহর জেলার ইসফুর বা চেলোটিয়া পরগণায় শুকদেব রায়-চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া শব্দ-প্রদত্ত বারপাড়া নরেন্দ্রপুর গ্রামে বসবাস করেন। এই শুকদেব রায়চৌধুরী প্রথম পীণালী দোষগ্রস্ত হওয়ায় সামাজিক ব্যবস্থাসমূহের জগন্নাথ ও তৎবালীদগণ সিদ্ধশ্রোত্রীয় থাকি সত্ত্বেও পীণালী থাকভুক্ত হইয়া গেলেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ঐ খণ্ড দ্রষ্টব্য)। ঘটকগ্রন্থে আছে 'কার্ণাদোষ্য পীণালী'। ঘটকদের যথেষ্ট অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে যে সকল বংশ অসমর্থ ও অদক্ষ হয়, তাহাদের পীণালী দোষ স্থায়ী হইয়া যায়। নতুবা কলমগরের বাকবংশ, রায় দাখী গোণীনাথ মুখোপাধ্যায়ের বংশ এবং হলদা মতেশপুরের অনেক পীণালীদোষগ্রস্ত বংশ 'ঘটকেন মাজিত' হইয়া কুলীনবল সমাজেও গোষ্ঠীপতিত করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কাল হইতেই এই পীণালী সমাজের কল্যাণদায়ক জন্ত কুলীন ও শ্রোত্রীয় সমাজ হইতে পাতঃ সঙ্গীত হইয়া এই সমাজের বিস্তৃতি ও পুষ্টিসাধন হইয়াছে। সেই প্রাচীনকাল হইতে অজাবদি ইহা দেখা যায় যে কুলীন বা শ্রোত্রীয় সমাজ হইতে যিনি আসিয়া এ সমাজে বিবাহ করিতেন তিনি অসমাজ পরিভাগ করিয়া শব্দপ্রদত্ত গৃহ-জামাতারূপে বাস করেন।

এই জগন্নাথের বিবাহ সম্বন্ধ নীলকান্ত ভট্ট ঘটকের কারিকায় বঙ্গীয় জাতীয় ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত দিলাম—

জগন্নাথ জায়পকানন

বড়ই পণ্ডিত বিদ্বৎ

বড় বজ্রায় পুরানো কসবায় করতেন গমন।

ভীমরব ভৈরবের ভলে,

যাছে বজ্রা ভাসছে কুঁতলে,

ভট্টনারায়ণ বংশধর

জগন্নাথ, তারপর

এমন সময় বোড়ো কোথায় কালা মেঘের দরশন।

জগন্নাথ আঁজ হবেন কুঁতলো,

পবন খুলো উড়ের মতো মতো,

তাই গুড় গুড় মেঘের ডাকে,  
ক্রমে বাড়াবাড়ি চিকুর হাকে,  
জগন্নাথ পড়িয়া বিহম পাকে,  
চেঙ্গোটিয়ার কেয়াতলায় করলেন মাকে দরশন।

কেয়াতলায় কালীবাড়ির পাড়া,  
রাজবাড়িতে প'ড়ে গেল সাড়া,  
বটে বটে বটে জাটেরা কহ  
খট খট চল রাজার চর,

মড়ের মাথায় চললেন রায় আবাধিতে পঞ্চানন।

হতনেতে জগন্নাথ বশ,  
আতিথ্যের কিবা স্বপশ,  
জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ,  
রাখো মেরা বাং, চলো মেরে সাথ,  
ভোকে সোয়ার এতি খোড়ে পর  
নজ্জ দিক্ হৈ তো রাজভবন।

পুরুষোত্তম জগন্নাথ,  
চললেন শুকদেবের সাথ,—  
দেখিয়া সুন্দরী মেয়ে  
পুরুষোত্তম করলেন বিয়ে  
মুখমিষ্ট গুড় খেয়ে—

এই যে গোষ্ঠী মুখমিষ্ট জানে তা তো সর্বজন।

শুকদেব রায়চৌধুরীরা কালকুন্ডাগত কাগপগোত্রীয় রাষ্ট্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ দক্ষের পুত্র ধীরের বংশধর। রাজা ভূপূর ধীরকে দর্শনাবাদ জেলায় অবস্থিত গুড় গ্রামের ভূস্বামী করেন। তিনি ধীরগুড় নামে অভিহিত হন ও তৎবংশীয়দের গুড়গাঁও হয়। শুকদেবের এক পূর্বপুরুষ রঘুপতি আচার্য কনকদণ্ডি নামে আখ্যাত হন এবং তাঁহার বংশীয়রাও কনকদণ্ডি গুড় বলিয়া সমাজে পরিচিত ছিলেন। কিশ্বদত্তী এই যে, রঘুপতি দণ্ডিগুড়মামী হইয়াছিলেন এবং কালীতে তাঁহার বিজাবতা পরিনীতা প্রভৃতি দেখিয়া দণ্ডিরা তাহাদের নিজদের প্রেমান বলিয়া স্বীকার করেন এবং এই প্রাণাধার স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ একটি স্তবর্ণ-নির্মিত দণ্ড উপহার দেন এবং সেই হইতে তিনি কনকদণ্ডি আখ্যায় অভিহিত হন। আবার কেহ বলেন, তিনি কনকদাঁড় গ্রামে বাস করার কনকদণ্ডি আখ্যা প্রাপ্ত হন। সেই কারণে ‘গুড় গুড় মেঘের ডাকে’ এবং ‘মুখ মিষ্ট গুড় খেয়ে’ এই যে ‘গোষ্ঠী মুখ মিষ্ট জানে তা তো সর্বজন’ প্রভৃতি বক্তব্য দ্বারা গুড় গাঁওয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

‘চেঙ্গোটিয়ার কেয়াতলায় করলেন মাকে দরশন’—শুকদেব বীকলী হইবার বহুপূর্বে তাঁহার জনৈক পূর্বপুরুষ দক্ষিণানাথ রায় কোতলায় যে কালী প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল ও এখনো আছে। গুড় চৌধুরী বংশীয়েরা এখনো উক্ত কালীর

সেবাসেত। বিদেশাগত পণ্ডিতদের আশ্রয় স্থান ও অতিথি-সংকারের এই কালীবাড়িতে ব্যবস্থা ছিল। কারিকার উক্ত পুরুষোত্তম বিবাহবার্তা জগন্নাথের বিশেষণ। এই চৌধুরী বংশের কতাদের মুখমিষ্ট ও অঙ্গসৌষ্ঠবের সুখ্যাতি থাকায় পরবর্তীকাল কলিকাতার ঠাকুর বংশীয়েরা চিবসিন এই বংশ হইতে কত্যা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। জোড়াসাঁকোর নীলমণি-শাখায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিবাহ এই বংশে হইয়াছিল। পাণ্ডুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ-শাখায় দানবীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ও ওরাজা প্রমুখনাথ ঠাকুরও এই বংশের কত্যা বিবাহ করেন। এই চেঙ্গোটিয়া পরগণা হইতে কলিকাতা ঠাকুরগোষ্ঠীতে এত বহু সমাগম হইয়াছে যে যশোরকে ঠাকুর বাবুদের মাছভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই রায়চৌধুরীদের অজ্ঞাতম বংশধর লখনৌ শিল্প কলেজের ‘ঘনাম’ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীমুক্ত হিরণ্যর রায়-চৌধুরী মূর্তি শিল্পী (Sculptor) বিলাতে প্রস্তুত খোদাই ও গঠনাদি শিল্পে শিক্ষা করিয়া ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বিলাতের A. R. C. A. (Associate of the Royal College of Art) হন এবং ইহার জাতপুত্র রণজিৎ স্বরোদ যন্ত্রবান ও কৃষ্টির জ্ঞান উত্তর-ভারত অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পাণ্ডারী মন্ডলের প্রতিযোগিতায় লাভোরে পরাজিত করিয়া নিখিল ভারতের Wrestling Championship Trophy লাভ করিয়া শরীরচর্চা বিষয়ে বাড়ারীরা মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

বিবাহের পর জগন্নাথ স্বীয় সমাজ ত্যাগ করিয়া যশোহর নরেন্দ্রপুর বারপাড়া গ্রামে স্বস্তর-প্রস্তুত ভূমিতে বাসভিটা পত্তন করেন। সেইখানেই জগন্নাথের চার পুত্র হয় :—(১) প্রিয়ংকর বা সদাশিব, ইহার বংশ নাই, (২) পুরুষোত্তম বিজাবাগীশ, (৩) হরীকেশ ও (৪) মনোহর। পুরুষোত্তম বিজাবাগীশের পর তাঁহার অধস্তন বংশীয়দের মধ্যে বিজাবত্তার উপাধি না থাকায় তাঁহার কুশারী ও চক্রবর্তী উপাধি ব্যবহার করিতেন। মুসলমান সরকারে কর্ম করিয়া হরীকেশ ও মনোহর মজুমদার ও মুন্সী উপাধি গ্রহণ করেন। হরীকেশের অধস্তন বংশীয়েরা যশোহরের শাখাটিগাতির মজুমদার বংশ বলিয়া পরিচিত। মনোহরের অধস্তন বংশীয়দের এক শাখার বক্সী ও এক শাখার মজুমদার উপাধি হয়। এই মুন্সীবংশ, বক্সীবংশ এবং মজুমদার বংশ যশোহরের জগন্নাথপুর ও উত্তরপাড়ায় বসবাস করেন এবং বিভিন্ন উপাধিধারী হইলেও ঠাকুরবংশীয়দের গাঁই-গোত্রীয়-জ্ঞাতি। জগন্নাথ-পুত্র পুরুষোত্তম বিজাবাগীশের অধস্তন পঞ্চম-পুরুষ মহেশ্বর ও শুকদেবের জন্ম। মহেশ্বর-ভ্রাতৃ পঞ্চানন ও তাঁহার পিতৃব্য শুকদেব নিজদের ভাগোন্নতি জগৎ যোদ্ধা শতাব্দীর শেষ পাশ্বে গোবিন্দপুরে কল্যাণ-ঘাটের নিকটে আসিয়া আদিগঙ্গাভীরে বাস করেন। তখন আদি-গঙ্গার নাম ছিল গোবিন্দপুরের খাঁড়ি (এখনকার দিনে ‘ঢালির নালী’)।

[ক্রমশঃ।

॥ মাসিক বঙ্গুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

# প্রাচীন মিশরে হিন্দু-সভ্যতার প্রভাব

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ

বিশ্বের রাজনীতি কেন্দ্রে আজ মিশর দেশের গুরুত্ব অল্প নহে। আর্যতনের অতি কুর হইলেও শিক্ষার, সভ্যতার এবং

সাময়িক গুরুত্ব এই দেশ বিশ্বের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে সময়ে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ অজ্ঞানতার ভিমে সমাহার, সেই যুগের অতীতেও এই দেশ জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। হেরোডোটাস্ ডিওডোরাস্ প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণের লেখা হইতে প্রাচীন মিশরের বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। তাহা ছাড়া খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেও এই দেশের উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশরীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর এডলফ এরমান (Adolf Erman) এবং কৈলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর অধিনাশচন্দ্র দাস এই বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

মিশর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে করেন, সেমিটিক যুগের (Muar) অথবা আরবী মসর (Mosr) শব্দ হইতে মিশর শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যদের মতে সংস্কৃত 'মিশ্র' শব্দ হইতে এই শব্দটি আসিয়াছে। আমরা শেষোক্ত মতটিকে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

মিশরের উর্বর ভূখণ্ড বিভিন্ন দেশের কৃষকদিগকে এই দেশে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। পরবর্তী কালে ভারতীয় আধাগণ আসিয়া এই দেশে উপনিবেশ স্থাপনের পর নিজেদের উন্নত সভ্যতা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের নামেরও পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন—এইরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন দেশ হইতে আগত বিভিন্ন জাতীয় লোকের সম্মিশ্রণে যে দেশের জনসাধারণের উদ্ভব হইয়াছিল, ভারতীয় আধাগণ তাহাদের সকলের সমান মর্যাদা স্বীকার করিবার অস্বীকার সেই দেশটিকে মিশ্রদেশ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

সেমিটিক বা আরব জাতির সভ্যতা অপেক্ষা মিশরের সভ্যতা বহু পুরাতন। সুতরাং ঐ সকল জাতির প্রভাবে এই দেশের নাম পরিবর্তনের কল্পনা অপেক্ষা পূর্বোক্ত যুক্তিই অধিকতর বিচারসহ। সেমিটিক যুগের এবং আরবী মসর শব্দ সংস্কৃত মিশ্র শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে করি।

অতি প্রাচীন কালে মিশরের অধিবাসিগণ তাহাদের দেশকে 'কমিত' (Kamit) নামে অভিহিত করিত। অধ্যাপক অধিনাশচন্দ্র দাসের মতে এই 'কমিত' শব্দটি সংস্কৃত 'কুম্ভ' শব্দের অপভ্রংশ। মিশরের যুক্তিকার কুম্ভ বর্ণ দেখিয়া ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ উক্ত দেশটিকে এই নামে অভিহিত করিতেন বলিয়া অধ্যাপক দাস মনে করেন। অধ্যাপক দাসের এই অনুমান সত্য হইক আর না হউক, মিশর শব্দের মূল যে সংস্কৃত 'মিশ্র' শব্দ, এই সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

মিশরের ইংরাজী নাম 'ইজিপ্ট' (Egypt)। গ্রীকগণ এই দেশকে বলিতেন 'এজিপ্টস্'। এই এজিপ্টস্ শব্দ হইতেই ইংরাজী ইজিপ্ট শব্দটি আসিয়াছে। অধ্যাপক দাসের মতে ইহা সংস্কৃত 'আজপ্ত' শব্দের অপভ্রংশ।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা ঐতিহাসিক অধ্যাপক হীরেন (Heeren) মিশর এবং ভারতের নবকল্লাসমুহ পরীক্ষা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই উভয় দেশের লোকেরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত (Ibid, vol 1 page 77) অধ্যাপক হীরেন তাঁহার রচিত 'ঐতিহাসিক গবেষণা' (Historical Researches) গ্রন্থমালার এক স্থানে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, মিশরবাসিগণের আদিপুরুষ সম্বন্ধে গবেষণা করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিব্যক্তির দৃষ্টি ভারতবাসিগণের উপর পতিত হইবে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, 'শঙ্কর' নামক একজন নরপতির অধীনে প্রাচীন মিশরের অধিবাসিগণ পুরুন্দিকর 'পুন্ড' (Punt) নামক প্রদেশ হইতে এই দেশে আসিয়াছিলেন (Rigvedic India, by A. C. Das, Page—259) আমার মনে হয়, এত পুন্ড শব্দ সম্বন্ধে 'প্রোন্ড' শব্দের অপভ্রংশ। অর্থাৎ ভারতের এক প্রান্ত হইতে (সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত) উক্ত রাজ্যের অধীনে প্রাচীন ভারতের এক দল লোক এই দেশে আসিয়া সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। যে রাজ্যের অধীনে তাঁহার এই দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহার নামও খাটি ভারতীয়ই হইবে।

মিশরের প্রাচীন দেব-দেবীর নাম, বর্ণনা ও অর্চনা-পদ্ধতি সহিত ভারতীয় দেবদেবীগণের নাম, বর্ণনা ও অর্চনা পদ্ধতির বহু সাদৃশ্য মিল আছে। (ভারতীয়) ঈশ্বর = (মিশরীয়) ওসিরিস (Osiris)। (ভারতীয়) ঈশ্বরী = (মিশরীয়) ঈসিস (Isis)। এইরূপ হর (বা হুয়) = হোরাস (Horus)। সূর্য = সিরিয়াস (Sirius) ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থের অধিদায়ী দেবতাদের কল্পনায় ও প্রাচীন মিশরীয়গণ বৈদিক চিন্তাধারা হইতে বেশী দূরে যান নাই (Historians' History of the world, vol I, Page—280)।

'ওসিরিস' দেবের অর্চনা পদ্ধতি ভারতীয় শিবলিঙ্গের অর্চনা-পদ্ধতির অনেকটা অনুরূপ বলিয়া বুঝা যায়। শিবলিঙ্গ পূজার অনুরূপেই ওসিরিস দেবকে নিখিত লিঙ্গমধ্যে অর্চনা করা হইত। এমন কি, উক্ত 'ওসিরিস' দেবের অর্চনার প্রচলন সম্বন্ধে মিশর দেশে যে কিয়দস্তী প্রচলিত আছে, তাহাও ভারতের দক্ষিণ বিনাশ উপাখানের অনুরূপই হইবে। বিখ্যাত অভিধান এই কিয়দস্তীটি নিম্নলিখিত ভাবে লিখিত আছে। যথা—

"টাইফন নামক দেবতা মরণ পূর্বক ওসিরিসকে নষ্ট করিয়া তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন! এই অন্তঃ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভাৰ্গ্যা আইসিস দেবী সেই সমস্ত দেহখণ্ড সংগ্রহপূর্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখেন। কিন্তু তিনি লিঙ্গদেশ না পাইয়া প্রতিমূর্তি নিৰ্মাণ পূর্বক তাহার পূজা ও মহোৎসব প্রচলিত করেন।"—বিশকোষ, লিঙ্গশব্দ।

দক্ষিণ বিনাশের উপাখানে কথিত আছে যে, পতিনিশা জর্যে ঈশ্বরী সতী দেহভাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দেহ বিক্ষুব্ধ চক্ষুদ্বারা খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল, আর এখানে ওসিরিস বা সূর্য

ঈশ্বরের দেহ বিনষ্ট ও বখ্যাকৃত করার কথা বর্ণিত হইয়াছে, এইমাত্র বিশেষ।

বদিও মিশরীয়দের পূর্বপুরুষগণ এই পবিত্র ভারতভূমি হইতেই গিয়াছিলেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, তথাপি পরবর্তীকালে তাঁহাদের বংশধরগণও যে ভারতবর্ষ হইতে নব নব চিন্তাধারাসমূহ স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। হেরোডোটাস, ডিওডোরাস প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টের জন্মের সহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বে মিশরীয় নৃপতিগণ একাধিক বার ভারতবর্ষে বিজয় অভিযান চালাইয়াছিলেন। হেরোডোটাস বলিয়াছেন—খৃষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে মিশরীয়গণ দ্বিতীয় রামশেষ (Rameses) [ ইতিহাসে ইহাকে the great or মহামতি উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে ] দিগবিজয়ে বহির্গত হইয়া সিউডা, পারস্ত ও বেকট্রিয়ানা বিজয়ের পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও বিজয় অভিযান চালাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

দ্বিতীয় রামশেষের ভারত অভিযানের ফলে তদানীন্তন মিশরীয়গণ ভারতীয় চিন্তাধারার সম্পর্কে আসিয়া এক নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই রামশেষের পৃষ্ঠপোষকতায় মিশরীয় মনোবিগণ বিবিধ কাব্য, অলঙ্কার ও দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন। যাহা পূর্বে 'আসনসিয়াস-এর (অসকার) মন্দির' নামে পরিচিত ছিল, রামশেষ তাহাকে এই সময় হইতে 'রামেসিয়াম' (Ramesseum) নামে পরিচিত করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে 'সেতুবন্ধ-রামেসিয়াম' নামক পবিত্র তীর্থে সিংহল বিজিতা ভারতীয় (আর্য) নৃপতি শ্রীরামচন্দ্রকে দেবতার স্তায় পূজিত হইতে দেখিয়া এই বংশাংশি নরপতি স্বকীয় কীর্তি প্রাতিষ্ঠায় জ্ঞাত উল্লিখিত অভিনব নামকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'রামশেষ' এই উপাধিও সম্ভবতঃ ভারতীয় নৃপতি শ্রীরামচন্দ্রের নামের অন্বয়গত গৃহীত হইয়াছিল। মিশরীয় পুরাত্ত্ব পাঠে জানা যায়, মহামতি দ্বিতীয় রামশেষের প্রকৃত নাম ছিল 'সেসোস্ত্রী' (Sesostris) সিংহাসনে আরোহণ কবির পর। তিনি 'রামশেষ' (শেষরাম বা দ্বিতীয় রাম) এই উপাধি ধারণ করেন।

দ্বিতীয় রামশেষের পূর্বেও যে মিশরদেশে ভারতীয় প্রভাব বিস্তারিত ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় রামশেষের পূর্ববর্তী নৃপতি 'সেতি' (Seti) 'অবদোয' (Abydos) নামক স্থানে স্তূপপ্রসিদ্ধ দেবতা 'ওসিরিস' এর অর্চনার জ্ঞাত এক মনোরম মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেতির পূর্বে যিনি মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনিও রামশেষ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, অধ্যাপক এমমেনের মতে উক্ত প্রথম রামশেষের সিংহাসন আরোহণের কাল খৃঃ পূঃ ১৩৩৫ অব্দ। ভারতীয় সভ্যতা এবং শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তি-কলাপের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে সম্ভবতঃ প্রথম রামশেষের 'রামশেষ' এই উপাধি ধারণ সম্ভব হইত না। এতদ্ব্যতীত 'ওসিরিস' দেবের লিঙ্গপূজা এবং তৎসংক্রান্ত প্রবাদসমূহ যে ভারতীয় সভ্যতাই প্রভাবের বল, ইহা অস্বীকার কবির উপায় নাই।

এতদ্ব্যতীত আরও বহু বিবরে প্রাচীন মিশরে হিন্দু সভ্যতার

আলোক সম্প্রদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃষ্টান্তবহুপ করেকটি বিবয়ের উল্লেখ করিতেছি—

(১) ভারতের স্থপতির বেদ ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে যে ভাস্কর্য-রহস্তের উল্লেখ আছে, প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যেও তাহাতে স্তূপে বিশ্বাস দেখা যায়।

(২) প্রাচীন ভারতের লেখকগণ কোন লেখাতেই নিজদের নাম যোগ করিতেন না, ইহার অবিকল অন্বয়গত প্রাচীন মিশরের লেখাসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক অধ্যাপক এমমান ইহা লক্ষ্য করিয়া সন্নিহিত লিখিয়াছেন—

"Poetry, we see, flourished at the time of Rameses, and the manuscripts of the works have been preserved, but the names of the authors were not added."

(Historians' History of the World, vol—I, Page—147)

বঙ্গবর্ধ—আমরা দেখিতে পাই, রামশেষের সময়ে কাব্যরচনা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঐ সকল কবিতার পাণ্ডুলিপি সমূহও সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান আছে, কিন্তু কোথাও লেখকের নাম সংযোজিত হয় নাই।

(৩) গ্রীক ঐতিহাসিকগণের লিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন মিশরে পুরোহিত সম্প্রদায়ের একটি স্বতন্ত্র জাতি ছিল এবং এই জাতিই জন্মানুযায়ী বিবেচিত হইত। সময়ে সময়ে রাজবংশীয় ব্যক্তিদিগকেও পুরোহিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে দেখা যায়। সমাজের উপর পুরোহিত সম্প্রদায়ের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল, এমন কি নৃপতিগণ পর্যন্ত তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। পুরোহিত সম্প্রদায়ের পরেই সমাজে বোদ্ধ সম্প্রদায়ের স্থান ছিল। ইহাদের জাতিও জন্মানুযায়ী বিবেচিত হইত। পুরোহিত ও বোদ্ধগণ প্রভূত পরিমাণ ভূমির অধিকারী হইতেন এবং এইজন্ত তাহাদিগকে কোনরূপ রাজস্ব দিতে হইত না। অবশিষ্ট জনসাধারণ কৃষিকার্য, পশুপালন, শিল্প ও বাণিজ্যের সাহায্যে জীবিকা নিবাহ করিত এবং তাহারাষ্ট রাজ্যের প্রকৃত প্রজা হিসাবে বিবেচিত হইত। এই সম্প্রদায়ের কেহই পুরোহিত অথবা সৈনিক হইতে পারিত না।

ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার সতি মিশরের এই জাতিভেদ প্রথার প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান। কেবলমাত্র, ভারতে বৈজ্ঞ নামে একটি স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু মিশরে এই শ্রেণীর লোকদিগকে শূদ্রপর্গায় গণনা করা হইত। এতদ্ব্যতীত আর সকল বিষয়েই এই জাতিভেদ প্রথাটিকে ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার অন্বয়গত বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক এমমান এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"The Egyptians are said to have been divided into castes, similar to those of India."

(Historians' History of the World, Vol-1, page 200)।

বঙ্গবর্ধ—মিশরীয়গণও ভারতীয় জনগণের স্তায় বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ছিলেন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

(৪) মিশরীয় নরপতিগণ যেমন ভারতীয় নৃপতি শ্রীরামের নামের অমুকরণ করিতেন, তেমনি তাঁহার অস্ত্রাস্ত্র গুণাবলীর অমুকরণও তাঁহার কৃতিত্ব ছিলেন না। স্বদেশের জনসাধারণকে তাঁহার শ্রীরামের মত এক পত্ত্নব্রত পালন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

(৫) যে সময়ে মিশরের মনীষিগণ অধ্যায় আলোচনায় বিরত হইয়া বস্তুতাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাদের মনীষার ফলে সহস্র সহস্র বৎসরের ভ্রম মৃতদেহ সমূহকে অবিকৃত রাখার কৌশল আবিষ্কৃত হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিময়স্থল শিরামিড সমূহ নির্মিত হইতে লাগিল, তখন মিশরের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণ ইহাকে স্বদেশীর সভ্যতার অবনতি বলিয়া মনে করিতেন। 'প্ৰিন্সে পেনিয়ারাস' নামক প্রাচীন মিশরীয় গ্রন্থ হইতে এই বিবরণ জানা যায়।

প্রাচীন ভারতের দিকে চুটপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে সময়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চায় বিরত হইয়া নালীক (বন্দুক ও পিস্তল) মহানাস্তিক (কামান), অগ্নিচূর্ণ (বাক্স) ও অস্ত্রাস্ত্র মারাত্মক সমরোপকরণ নিগ্ৰাহে ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সনাতনপন্থী মনীষিগণ তাঁহাদের এই কার্যকে তীব্র ভাবায় নিন্দা করিতেন। তত্ত্ববিশারদ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নালীক, মহাজালীক ও অগ্নিচূর্ণের সাহায্যে যুদ্ধ করাকে যুগান্তের 'আত্মরিক যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

পরবর্তীকালে যেমন বক্ষণশীল দলের চেষ্টার ফলে বাক্স প্রভৃতি নির্ম্মাণের সূত্র (কর্মসূত্র) পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, ঠিক তেমনি মৃতদেহ অবিকৃত রাখার বিজ্ঞাটও ক্রমশঃ মিশরদেশ হইতে বিলুপ্ত হইল। ইহাকে ভারতীয় ভাবধারার প্রভাবের ফল মনে করা অসঙ্গত হইবে না। ধ্বংসাত্মক কার্য হইতে মাতৃকে বিরত করিবার জন্য ভারতীয় মনীষিগণ বাক্স নিগ্ৰাহ-বিজ্ঞা বিনষ্ট করিয়াছিলেন, আর মাতৃকে অপবাদের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মিশরদেশের মমি-নিগ্ৰাহ-বিজ্ঞা (মৃতদেহ অবিকৃত রাখার বিজ্ঞা) সেই দেশের পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিলোপিত হইয়াছিল।

(৬) প্রাচীনকালের ভারতীয়গণের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, অশেষ পুণ্যশালী মহাযোগ দেব বা নক্ষত্র লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধ্রুব, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী প্রভৃতির নক্ষত্রসভা এবং নহবের ইন্দ্রভালাভ প্রভৃতির বিবরণ প্রদর্শন করা হইতে পারে। প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যেও ঠিক অমুরূপ বিশ্বাস ছিল। হেরোডোটাস ডিওডোরাস, ডাঃ এরমান প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণে এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(৭) অস্বাভাবিকভাবে রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ 'সূর্য' দেব ছিলেন বলিয়া ভারতীয়গণ বিশ্বাস করিতেন; আর প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যেও বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহাদের রাজবংশের আদিপুরুষ দেবতা সূর বা সোল (sol)। সংস্কৃত ভাষায় 'সূর' শব্দে সূর্যকেই বুঝায়; এবং র ও ন এর উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন।

(৮) মিশরীয় বীরগণ যে সময়ে দিগ্বিক্ত ব্যাপদেশে নুতন ভাবে ভারতীয়গণের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন, তাহার পর হইতেই ভারতীয় অমুকরণে মিশরের সর্বত্র অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির নির্ম্মিত হইতে থাকে। পেট্রোনিয়াস (Petronius) নামক সুবিখ্যাত

পণ্ডিত মিশরের অসংখ্য দেবদেবীর দর্শন করিয়া আশ্চর্যবোধিত হইয়া লিখিয়াছেন—

"This country is so thickly peopled with divinities, that, it is easier to find a god than a man." (ডাঃ এরমানের প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত)।

বঙ্গার্থ—এই দেশে দেবতাপ্রাচীর এতই ঘনবসতি যে, একজন মানুষকে খুঁজিয়া বাহির করা অপেক্ষা একজন দেবতাকে খুঁজিয়া বাহির করা অধিকতর সহজ।

অমুকরণকারিগণ বাহার অমুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া, অনেক সময়ে কোন বিষয়ে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া থাকে। দেবদেবীর নির্ম্মাণ ব্যাপারে মিশরবাসিগণও তাহাই করিয়াছেন।

(৯) ভারতবর্ষে যেমন মিথিলার রাজপুত্র কুশধ্বজ প্রমুখ কোন কোন নৃপতিনন্দন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চর্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন, মিশর দেশেও তেমনি কোন কোন রাজপুত্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দেবদেবীর দেবতার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিতীয় রামশেষের জ্যেষ্ঠপুত্র 'খামুস' (Khamus) এর উল্লেখ করা হইতে পারে।

(১০) 'পেনিয়ারাস' নামক প্রাচীন মিশরীয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সমুদ্রে জাহাজ চড়িয়া যাত্রার ফলে জনৈক নাবিক ভাসিতে ভাসিতে মৃত্যুদেবতার দেশে গিয়া উপস্থিত হয়, এবং সেখানে থাকিয়া কিছুদিন তাঁহার আতিথ্য গ্রহণের পর পুনরায় একখানি স্বদেশীয় জাহাজের সাহায্যে মিশরে প্রত্যাবর্তন করে। এই উপাখ্যানটি দেখিয়া সভ্যবর্গই মনে হয় যে, ইহা কল্পোপনিষদের বর্ণিত নচিকৈতার উপাখ্যানের ছায়া অঙ্কন মাত্র।

(১১) প্রাচীন ভারতে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যেমন অমূল্যম বিবাহের প্রচলন ছিল, প্রাচীন মিশরেও তেমনি বিভিন্ন জাতির মধ্যে অমূল্যম বিবাহের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের ব্যক্তির পশুপালক সম্প্রদায়ের কন্যাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

(১২) প্রাচীন ভারতে যেমন ব্রহ্মবাদিনী নারীগণেরও উপনয়ন, বোধদায়ন প্রভৃতি সস্ত্রবর্ণের অধিকার ছিল, প্রাচীন মিশরেও তেমনি নারীদিগকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে অধিকারী হইতে দেখা যায়।

(১৩) প্রাচীন ভারতীয় আখ্যায়িকায় যেমন চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার বিজ্ঞায় অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন প্রাচীন মিশরীয়গণও তেমনি এই দুইটি বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কানীরাজ শব্দটির মত এত প্রাচীন না হইলেও মিশরের আদিরাজবংশের দ্বিতীয় নৃপতি টেটা (Teta) জীটের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে শরীর ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞা (Anatomy) সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত মিশরের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি সমস্ত ভাবে সমালোচনা করিলে ইহাও প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হিন্দুসভ্যতার প্রগাঢ় ছায়া অবলোকন করা যায়। এই সকল কথা পৃথালোচনা করিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মিশরের জনসাধারণ আমাদেরই দূরবর্তী জাতি এবং সভ্যতার বিকাশেও তাঁহার বহুলাংশে আমাদের সমশ্রেণীভূত।



# ব্রাহ্ম

## অক্ষয়কুমার দত্তের পত্রাংশ

অক্ষয়কুমার যেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুকে কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। এটী সকল পত্রের অংশ-বিশেষ ১৩১১ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। নিয়ে কয়েকটি পত্রাংশ উদ্ধৃত হইল :—

### মাতৃতত্ত্ব।

আমি শারীরিক এক প্রকার স্বস্থ আছি। কিন্তু পরমার্থাধ্যাত্মিকভাবে চরমাবস্থা উপস্থিত বোধ হইতেছে। বোধ হয়, তাঁহার স্নেহময় যুগ্মমণ্ডল আর অধিক দিন দেখিতে পাইব না। বোধ হয়, এত দিন পরে আমার একান্ত অকৃত্রিম বেহ প্রাপ্তির প্রত্যাশা উদ্ভূত হইল। যদিই তাগাই ঘটে, আপনকার রচিত, মনুষ্য, শোক-সংহারক প্রস্তাবটি পাঠ্য করিব।।—

### সহস্রচরিত।

আপনি দরিদ্র প্রজাদিগের দৃষ্ণে দুঃখিত হইয়া বেরণ ক্রন্দন করিয়াছেন, তাহাতে অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ব্যাকুল হওয়া ও ক্রন্দন করা এইমাত্র আমাদের ক্ষমতা। এ ব্যাড়া এইরূপ করিয়াই পরমায়ু ক্ষেপণ করিতে হইল।।—

### বাল্যসাধিত্যের উন্নতি।

তথাকার বাল্যসাধিত্যশালায় এক পুস্তকালয় প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে, ইহা অতি শুভসূচক বলিতে হইবে। বিশেষতঃ তদর্থে নূতন নূতন গ্রন্থ অমুদ্রিত বা রচিত হইলে বহু উপকার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বেলি সাহেব আপনার প্রতি যে সকল গ্রন্থ প্রেরণ করিবার ভারপ্রাপ্ত করিয়াছেন, তাহা লিখিতে অবশ্য বহু পরিশ্রম হইবে, কিন্তু তদ্বারা লোকের বিস্তার উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। এক্ষণে এই সকল কার্য দ্বারা ই এ দেশের স্বার্থ তিত হইতে পারে। (ইং ১৮৫১)।—

### বিবাহ বিবাহ প্রচলন।

আপনি যেদিনীপুর অঞ্চলে বিবাহ বিবাহ সম্পাদনার্থ সচেষ্ট আছেন শুনিয়া খুশী হইয়াছি। আমাকে তদ্বিষয়ের সমাচার লিখিতে আশ্রয় করিবেন না। বিভাগসময়কে মনের সহিত আশীর্বাদ করিতেও ক্রটি করিবেন না। জয়াহুস্ত! জয়াহুস্ত!

### স্ববসিকতা।

এবার অতিশয় স্নিগ্ধ হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। বৃহাস্পতি পত্র হইয়াছে, দেবরাজ ইন্ড জরী হইয়াছেন এবং ৫, ৬, ৭ বৈশাখে [১২৫৮] রজনীবোণে অপর্যাপ্ত বারিবর্ষণ দ্বারা যেদিনী স্নান হইয়াছে। ব্রহ্মকে পবাস্ত্র দেখিয়া শবনরাজও দেবরাজের সহকারী হইয়া সকল বায়ু স্থব্রু করিয়াছেন। কিন্তু বৃহাস্পতি এখানে

পবাস্ত্র হইয়া পলায়নপূর্বক দক্ষিণ দিকে [অর্থাৎ যেদিনীপুরে] গিয়া উন্নয় হয়, এই আমার শঙ্কা হইতেছে। আপনি তাহার তথ্য সংবাদ লিখিয়া বাধিত করিবেন। কিন্তু আমার নিত্য প্রার্থনা, সেখানেও ইন্দ্রদেবের জয়পতাকা উড্ডয়মানা হয় এবং অবিলম্বে আপনার শরীর স্নিগ্ধ হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হই।

আপনাকে মহারাগীর ছয়খানি অমূল্য মুখচন্দ্রমা পঠিত্যাপ হইবেক।

আপনি শারীরিক কিরূপ আছেন লিখিবেন। তনুলাম, তথ্য মাধ্যম্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিছু মন্তব্য করিবেন, যেন আপনার বাটার ত্রিসীমায় না আসিতে পারে। ভয় কি? "বিষম বিবমোষণঃ।" বোধ করি, এই অধঃপতনের নীতির উপর নির্ভর করিয়া বড় বাবু [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] আপনাকে অভয়দান দিয়া গিয়াছেন। আপনি প্রাতঃস্নান করিবেন, ফলের জল পান করিবেন, উষা ও সায়ংকালের বায়ু সেবন করিবেন, আর ঘটটিকে একটু একটু চালনা করিবেন। আর নিজে হইতে কোন মতে মাথা ঘোরাইবেন না।

### ব্রাহ্মসমাজ।

এখানে [তত্ত্বাবোধিনী] সভা ও [ব্রাহ্ম] সমাজের কার্য পূর্ববৎ চলিতেছে। গ্রন্থাধ্যক্ষের সকলেই স্ব স্ব ভাবে অবস্থিত করিতেছেন। সম্প্রতি ত্রিযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী বাবু এক জন গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছেন। সমাজে বিলম্ব লোকসমাগম হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজের বাল্যসাধিত্য প্রস্তুত হইতেছে। বড় বাবু তাহার কিঞ্চিৎ আপনার দৃষ্টার্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন কি না বলিতে পারিলাম না। এ ভাষ্য বিশিষ্টরূপ উপকার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। (জুন ১৮৫২)

তত্ত্বাবোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা কোন তারিখে উঠিয়া যাব, যদি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, অনুগ্রহপূর্বক লিখিয়া বাধিত করিবেন। আপনার একটি বক্তৃতা সংক্রান্ত মোকদ্দমাই উঠা উঠিয়া যাইবার কারণ। অতএব আপনি সহজে জানিতে পারিবেন বোধ হয়।

### উইলিয়াম কেরীর চিঠি

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই চণ্ডীচরণ এটি প্রতিষ্ঠানে বোগলান করেন। চণ্ডীচরণের নাম বিশেষ ভাবে স্বরগীর তাঁহার 'তোতা ইতিহাসের' অঙ্গ। ইহা কানির বংশপ্রণীত কানী 'তুতিনামা'র বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ করিয়া তিনি কলেজ-ক্যান্টিনের নিকট হইতে ১০০ টাকা পুস্তকের

করিয়াছিলেন। চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাস'ের পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিলের ১৬ই জাহুয়ারী ১৮০৪ তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়। এসবকে কেবীর সুপারিশ-পত্র ও কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত এইরূপ :—

Sir...Accompanying this is a translation of the Toteenama from Persian into Bengalee by one of the Pundits of this Class, Chundeechurn. I will thank you to present it to the Council of the College. It is rendered into very plain and good Bengalee, and very fit for a class book. Should the Council order him any reward for his labour, it will be gratefully received by him, and as he is a poor man will be a great help to him. W. Carey.

AGREED that the sum of one hundred Rupees be allowed to the Pundit Chundeechurn for his translation of the Toteenama in Bengalee.—Home Mis. No. 559, p. 304.

'তোতা ইতিহাস' ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৪ এবং আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

তোতা ইতিহাস।—বাংলা ভাষাতে শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্সীতে রচিত।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—১৮০৫।—

ভাষার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম সাক্ষরণের 'তোতা ইতিহাস' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৬ ষোড়শ ইতিহাস।—

চারি জন ধনবান গরিব হইয়াছিল তাহার কথা।—

বখন সূর্য্য অস্ত হইল এবং চন্দ্রাবলি হইল তখন খোজেস্তা প্রেমানলে দগ্ধ হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তোতার অগ্রে বাহিয়া কহিলেক, ওহ জামবর্ষ তোতা, তুমি প্রত্যহ জানবাক্য কতরা আমার গমন বাণ করিতেছ কিন্তু তোমার নৌতরাকোতে আমার কোন উপকার হইবে না, কেন না যে ব্যক্তি প্রেবাসক্ত হয় তাহার নৌতরচনে কি হইতে পারে অতএব আমি প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া যে রূপ দৃষ্টান্তে হইতেছি তাহা কি কহিব? তোতা কহিলেক, তখন কহী বহুলোকের বাক্য শ্রবণ করা উচিত কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া কাহা কবে, সে দুঃখ পায় এবং লজ্জিত হয়। যে মত চারি জন বন্ধুৰ মধ্যে এক জন কথা না শুনিয়া ব্যামহ পাইয়াছিল? খোজেস্তা ক্রিজাসিলেন যে, সে কিরূপ ইতিহাস তাহা কহ। তোতা কহিঃহ আবস্ত করিলেক।—

'তোতা ইতিহাস' বহুসংখ্যক প্রচারিত পুস্তক। লগুন হইতেও ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

চণ্ডীচরণ আরও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া কলেজ-কাউন্সিলের নিকট হইতে ৮০ টাকা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন—ইহা ভগবদ্গীতার পয়ার ছন্দে বঙ্গানুবাদ। ইহার পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিলের ১২ই নবেম্বর ১৮০৪ তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়; এসবকে কেবীর সুপারিশ-পত্র ও কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত এইরূপ :—

To the Council of the College of Fort William.  
Gentlemen,

In consequence of the encouragement given to literary merit by this institution Rajeeb Lochun, a Pundit in the Bengalee Department has lately composed an history of Raja Krishna Chunder Roy (late of Krishnagur) in the Bengalee Language.

Chundee Churn, another Pundit in the same Department, has, with the help of some learned Brahmuns, translated the Bhagvat Geeta into Bengalee.

I have examined these works and think them to be worthy the patronage of the College, and recommend the writers as deserving some reward for their labours.

Accompanying this I send the manuscripts of these two works, which with the translation of the Tootch numah, by Chundee Churn I recommend to be printed for the use of the Bengalee Class.

I am, Gentlemen,

Your most obedient humble servant,  
W. Carey.

College, 5th Oct. 1804

RESOLVED that 100 copies of the History of Rajah Krishna Chunder Roy in the Bengalee Language, and 100 copies of the Translation of the Tootch numah into the Bengalee Language be subscribed for by the College.

ORDERED that a fair copy of each of the foregoing works be made in order to be deposited in the Library of the College.

RESOLVED that a premium of Sicca Rupees 100 be awarded to Rajeeb Lochun Pundit for his History of Rajah Krishna Chunder Roy in the Bengalee Language. That a premium of Sicca Rupees Eighty be awarded to Chundee Churn Pundit for his translation of the Bhagbut Geeta into the Bengalee Language.—Home Mis. No. 559, pp. 384-85.

চণ্ডীচরণ-কৃত ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হয় নাই। ইহার পাণ্ডুলিপি বর্তমানে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে। ২৬শে নবেম্বর ১৮০৮ তারিখে চণ্ডীচরণ মুন্সীর মৃত্যু হয়। পরবৎসরের ২৭শে জাহুয়ারী তারিখে অন্ত্যেষ্টিক্রমে কলেজ-কাউন্সিল-অধিবেশনের কাহা-বিবরণে প্রকাশ :—Chundee Churn a

Pundit of the fixed Bengalee Establishment having died on the 26th November 1808—Anund Chunder was appointed on the 2nd December 1808 to succeed him. (Home Mis. No. 560, p. 554.)

### রামমোহন রায়ের চিঠি

রামমোহন রায় সাংবাদপত্রের স্থানীয়তাব অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সেপ্টেম্বর ১৮২০ খৃষ্টাব্দে যখন সাংবাদপত্রের জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে লাইসেন্স চেষ্টা হইবে, এই নিয়ম প্রবর্তিত হয়, তখন তিনি উদ্যোগীজন ও অসম্মানসূচক জ্ঞান করিয়া 'মিরাং-উল্-আখবার' বন্ধ করিয়া দেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বাহা লেখেন, নিয়ে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

মিরাং-উল্-আখবার

শুকবার ৪ এপ্রিল ১৮২০—(অতিরিক্ত সংখ্যা)

পূর্বেই জ্ঞানান হইয়াছিল যে, মহামাত্র গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কৌন্সিল দ্বারা একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে, বাহা ফলে অন্তঃপর এই নগরে পুলিশ আপিসে স্বাধিকারীর দ্বারা চলক না করা হইয়া ও গবর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটারীর নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশ করা হইবে না এবং ইহার পবেও পত্রিকা সম্বন্ধে অসম্মত হইলে গবর্ণর-জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এখন জ্ঞাত করা হইতেছে যে, ৩১শ মার্চ তারিখে প্রথম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় সার ফ্রান্সিস ম্যাকনটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করিয়াছেন। এই অনুমোদন কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য-সমাজে সর্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও চেষ্টার সহিত এই পত্রিকা ('মিরাং-উল্-আখবার') প্রকাশ বন্ধ করিলাম। বাধ্যতালি এই :—

প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটারীর সহিত যেসকল ইউরোপীয় ভ্রাতৃপুত্রের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পাক যথার্থই লাইসেন্স গ্রহণ অতিরিক্ত সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তিও পক্ষে দাবান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উল্লপনস্থ ব্যক্তির নিকট হাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর; এবং আমার বিবেচনায় বাহা নিষ্ঠুরোচিত, সেই কাজের জন্য নানা জাতীয় লোক পরিপূর্ণ পুলিশ আদালতের দ্বার পার হইয়াও কঠিন। কথা আছে,—

আজ কে বাসন্ত্য খুন হৈ ভিগর বস্ত্র দিত্ত

বা-উম্মেদ-ই করম-এ, খাজা, বা-দারবান মা-ফরোশ

অর্থাৎ,—যেসম্মান জনদের শত রক্তবিলুর বিনিময়ে ক্রীত, ওছে

মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে পরোক্ষানের নিকট বিক্রয় করিও না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে মহাজ্ঞ বিচারকদের সম্মুখে হেজার চলক করা সমাজ অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্ত বঙ্গীয় বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সাংবাদপত্র প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, বাহা বক্তা কালনিক স্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বেকাইনি ও গঠিত কাজ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, অগ্রহস্ত প্রার্থনার অধীতি ও চলক করিবার অসম্মানভাজন হইবার পবেও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে লোকসমাজে অপমান হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানসিক শান্তি নষ্ট হইবে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃ ভয়শীল; সত্য কথা বলিতে গিয়া তাহাকে হয়ত একপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, বাহা গবর্ণমেন্টের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলাম।

গদা-এ গোশা নশিনি। চাকি। মাখবোশ

কমুকট-মসলিহতঃ খেণ খুবোচান দানন্দ।

—চাকি। তুমি কোণেবা ভিখারী মাত্র, চূপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজ্যবাহী জ্ঞানেন।

পারস্য ও হিন্দুস্থানের যেসকল মহাজ্ঞের ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া 'মিরাং-উল্-আখবার'কে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন উপরোক্ত কারণ সকলের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাঁহাদিগকে ঘটনাবলীর সাংগম দিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, ইহাই আমার অনুরোধ; এবং ইহাও আমার অনুরোধ যে, আমি যেখানে যেভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায় তাঁহারা যেন আমার মত সামান্য ব্যক্তিকে চরুদাই তাঁহাদের দেয়ায় নিয়ত বলিয়া জ্ঞান করেন।

কেবলমাত্র পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিয়াই রামমোহন তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন নাই। এই আইন রেজিস্ট্রার হইবার পূর্বে ইহা সাংবাদপত্রের স্থানীয়তাব অপপ্রায়ক বর্জনা তিনি তাঁহার ব্যক্তি জন কলিকাতায় বঙ্গুর সহিত ইহার প্রতিবাদ করেন (৩১ মার্চ ১৮২০)। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তাঁহারা ইলিওথের নিকট এক আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন।

রামমোহন আর কোন পত্রিকা পরিচালন করেন নাই বটে, তবে মুসলিম বিষয়ক আইন বিতর্মান থাকি কালেই মাদ্রাসতুলকের জন্য আর একখানি পত্রিকার অন্ততম স্বাধিকারী হইয়াছিলেন। ইহা ১ই মে ১৮২১ তারিখের প্রকাশিত 'বেঙ্গল হেরাল্ড'।

... এমসের প্রচুদপট ...

[এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি গ্রামা-বালিকার আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রটি জীবননন্দ চট্টোপাধ্যায় গৃহীত।]



নীলকণ্ঠ

একুশ

লোক বিলাত বেত ; এখন গুলোকেও যায়। টলিউডের

কুমার আর দেবীদের দস্তর বিলাত যাওয়া নয় ; বোম্বাই  
হাওয়া বিলাত ফেরতের চেয়ে টলিউডে বোম্বাই-বরতের কদর আজ  
অনেক বেশী। বিলাত-বাহিনীর ডায়েরীর চেয়ে টলিউড থেকে বোম্বাই-  
বাহিনীর ডায়েরিয়া আজ কিয়দা মাগাজিনে অনেক উত্তেজক সম্বাদ।  
লোকে বিলাত বেত ব্যাধিটর হতে ; আই সি-এস হতে ;  
ইঞ্জিনিয়ার হতে, ডাক্তার হতে। শুধু বিলাত নয়, ইরোবোশ।  
কিবে আসত একজন জীঅরবিল হয়ে, একজন শুভাব বোস হয়ে,  
কেউ মোহনদাস হয়ে গিয়ে কিবে আসত মহাত্মা গান্ধী হয়ে, কেউ  
মতিলালের ছেলে হিসেবে বেস, কিবে আসত পৃথিবীর অদ্বৈতম শ্রেষ্ঠ  
অটোবায়োগ্রাফার হবার জঙ্ক। এরা সংখ্যায় আঙুলের অঙ্ক  
অতিক্রম করে না। বাকী অসংখ্য নগণ্যরা, অগণ্যরা বাণেশ  
পয়সা ওড়াবার জঙ্ক, ব্যক্তিগত নামে বীরবামি, প্রগতির নামে  
অতপান, শিক্ষার নামে বিলাতী বীরব নাচ, আর থাকা থাওয়ার  
খরচার নামে বারবানিতা-নয় বড় জোর গুয়েট্টেসের পেছনে খরচা  
করত। এরাই দেশের ঠাকুরের চেয়ে বিদেশের কুকুরকেও কোল  
দিত অনেক বেশী। সেদিনকার বিলাত-বাহিনী আর আজকের  
দিনের বিলাত-বাহিনীদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই কিন্তু দৃষ্টিকোণের  
কোনও পরিবর্তন হয় নি। সেদিন শুধু একদল ছিল তারা বিলাত  
না গিয়ে সাহেব হত, আজ তারা বিলাত না গিয়ে বিলাতের গল্প  
লেখে, সেই সব গল্প বাংলা দেশে প্রচুর বিক্রি হয়। ডি, এল, বায়

মিথ্যাই লিখেছিলেন বিলাত দেশটা মাটির। বিলাত দেশটা  
আজও অনেক এদেশীয়ের চোখে সোনারপার।

সেই সোনারপার দেশ থেকেও আসত লোকে মাটির ভারতবর্ষে।  
তারা হচ্ছে মিস মেয়ো। মহামানবের এই সাগরতীরে ভারত তীর্থে  
তারা ভীষণ হয়ে আসত না ; তারা আসত এখানে সেখানে  
বত নদীয়া আছে ; তার খবর বয়ে নিয়ে যেতে খবরের কাগজে।  
Drain Inspectors' report দিত মিস মেয়োরা। বিদেশিনীর  
সেই ভারত-বিবেচ, তার অর্থ আবিষ্কার করতে বেশী দূর না গেলেও  
চলে। কিন্তু একদল এদেশীয় ভাব বিলাত ঘুরে এসে আত্ম-জীবনী  
উপলব্ধ করে স্বদেশ এবং স্বজাতি নিশ্চয় যে বিভৎস রস সৃষ্টি  
করে আজও তার বহুত অনুধাবন করা অসম্ভব। এরা মিস মেয়ো  
দল নয়, এরা তার চেয়েও সাম্বাসিক। এরা আসলে মানুষের  
আকৃতিতে সারময়ের দল। এই সব সারময়েরাই চিরকাল  
দেশের ঠাকুর দেখলে পা কামড়ে দিতে এসেছে বিদেশী কুকুরের  
সম্পর্কে আসা মাত্র স্বাভাৱাত্মকভাবে গলে গিয়েছে। তাদের মিন  
হয়ে এল বলে। এখন আর বিলাত নয়, এখন বিলাতের বদলে  
বোম্বাই। বোম্বাই,—A land of glamour ; goggles ;  
gabardine & GOATS.

ভারতবর্ষের টলিউড হচ্ছে টালিগঞ্জ বাংলা দেশের ফিল্ম ষ্টুডিও ;  
ভারতবর্ষের হলিউড হচ্ছে বোম্বাইয়ের ফিল্ম ষ্টুডিও। বোম্বাই ফেরৎ  
না হলে বাংলা দেশ আজ পাঠা পাওয়া শক্ত। বিলাত-বাহিনীদের  
মধ্যে যেমন কখনও কখনও কেউ কেউ ফিরে আসত জীঅরবিল,  
শুভাব হয়ে,—বোম্বাই থেকে কেউ ফিরে আসতে চায় না ; কিবে  
আসতে বাধ্য হলে বাংলা দেশে এসে তারা অনুশ্রম হয়ে পড়ে।  
ভারতবর্ষের হলিউড বোম্বাই-হিষ্টিরিয়ার পল্লু হয় তারা চিরকালের  
মত। বাংলা দেশের ছাত্রাচারের ভগতে সমান পাল্লায় দৌড়তে  
গিয়ে তারা ছিটকে পড়ে ল্যাড়া হয়ে যায় ; তারাও বোম্বাইতে  
গিয়ে ল্যাড়া আম বনে যায় বাতাবতি ; তাৎপর্য ভাষণ-অংশ-শব্দ  
বাত ভোর হবার আগেই আমচুর হয়ে মুখ চূর্ণ করে খবর ছেলে ঘরে  
কিবে আসে। তাদের মধ্যে থেকে যেটুকু রস নেবার সেটুকু শুয়ে  
নিষে ভিবড়ে করে ফেরত পাঠিয়ে দেয় রেজিষ্ট্রি করে with  
acknowledgement due ! শাস্টুকু বার করে নেবার পর  
ছোবড়ার মন আবার টলিউডের আনাচে কানাচে দু' মারতে বাধ্য  
হয় তখন বাকী জীবনভোর তাদের বাকী থাকে শুধু দীর্ঘশ্বাস।  
বোম্বাইয়ের সঙ্গে নতুন দিল্লীর এই এক ভায়গায় ভাঙ্কর মিল।  
বাংলা দেশকে যেখানে নাহলে অচল সেখানে বাঙালিকে নাও।  
কাজ ফুরিয়ে গেলেই বার করে দাও ! নতুন দিল্লীর মন্ত্রিসভাতেও  
যা ; বোম্বাইয়ের ছাত্রাচারীদের মন্ত্রণা সভাতেও তাই !

কিন্তু এই সব বাঙালী ছাত্রাচারীদের বাবা বোম্বাইয়ের চোরাবালিতে  
পা বাড়ায় তাদের অপমৃত্যুর ইতিহাস, বালারা কি দিয়ে ভাত রাঁধেন,  
চুল বাঁধেন তার খবর ছাপা ফিল্মের খবর কাগজে বোয়োয় না ;  
বেবোয় না বলেই রকে বসে নরকগুলজার করা ছেলেছোকবার দল  
ভাবে ভিক্টোরিয়া টামিনাস পঞ্চম টিকিট কেটে অথবা টিকিট না  
কেটে একবার পৌছতে পারলেই ভিক্টরি অবজ্ঞাবাহী। বাংলা দেশ  
থেকে তারা বোম্বাই যায় হয় অশোক নয় চেমন্তকুমার হওয়া তাদের  
সবার বীধা, এই মনোভাবই বর্তমানে উজ্জীৱমান বাঙালী ফিল্ম

টায় অথবা টেকনিশিয়ানদের একমাত্র স্বপ্ন। শুনে ফুৎফুৎ শব্দ  
সেদিনকার কণ্ঠ বলতে ইচ্ছে করে স্বপ্ন বলি মধুর এমন...।

বোম্বাইওলা নয়; বোম্বাইয়ের প্রবাসী বাঙালীই এখান থেকে  
সত্ত উপস্থিত বাঙালীর সব চেয়ে বড় শত্রু ভারতবর্ষের হলিউড  
বোম্বাইয়ের ফিল্ম-ইন্ডির বিপুল সাম্রাজ্যে। হেমন্তকুমারের ইতিহাসই  
জানি। বোম্বাইতে বাতে তিনি কিছুতেই কাজ না পেয়ে, কাজ  
কোনও রকমে পেলে কাজ করতে না পেরে চলে যেতে বাধ্য হন  
তার জন্ম বোম্বাইবাসী ফিল্ম-বাঙালী করে নি এমন কোনও অজ্ঞায়  
নেই। বড়দত্ত থেকে শুরু করে মারগ উচ্চাটন মায়ের পায়ে পূজা  
পশ্চত বাকী তার। রাখে নি কিছুই। একজনকে বলতে শুনেছি  
হেমন্তের উদ্দেশ্যে: This is your last chance before the  
final kick! অর্থাৎ সেই কিং হেমন্তকুমারকে শেষ পর্যন্ত দিতে  
পারে নি কেউ। সব ক্লিক; সব ক্লিক; মিস কিং প্রতীপের করে  
বোম্বাইয়ের হলিউডে কীর্তিমান হেমন্তকুমার শুধু নিজের নয়, সমস্ত  
বাঙালীর মুখ রক্ষা করেছেন।

হেমন্তকুমারের কণ্ঠই কেবল বিশ্বের বস্ত্র নয়; মানুষটিও  
বিশ্বরক্ষক। এখনও; আজও; এই মুহূর্তে হেমন্ত যেমন ছিলেন  
তেমনি আছেন। সেই সাটের হাতা কনুই পর্যন্ত গুটানো। ধূতির  
কোঁটা হাতে দরা; পায়ে চটি। নমস্কার করবার আগেই গাড়ীর  
ট্রায়ারি-এ বসে যে কোনও পরিচিতকে আগেই অভিবাদন জানানোর  
সেই পুরানো রীতিতে পরিবর্তন আসে নি এতটুকু। আজ পর্যন্ত  
কখনও কাউকে আগে নমস্কার করতে দেখলাম না হেমন্তকে;  
হেমন্তই নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত তুলেই আগে। স্বর্ণকণ্ঠসমূহ  
হেমন্তকুমার 'সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ' এ কথা বললে অপলাপ হবে; কিন্তু  
পরিচয় যদি প্রতিভার কোনও পরিচয় হয়; হুঃসহ, দুঃসহ, দুঃখ  
বুঃ বয়ে বয়ে উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা। দিকভ্রমিতে যদি কোনও প্রমাণ  
হয় প্রতিভার তবে হেমন্ত নিঃশব্দে প্রতিভাবান। কি বিপুল  
বৈধ, দুঃখ শ্রম স্বপল করে কি আশ্চর্য আবেগের সাক্ষ্যের দীর্ঘ,  
হেমন্তই এই সাক্ষ্যের ইতিহাসের সঙ্গে যারা নেই ওতপ্রোত জড়িয়ে  
তাদের অনুগমন অসম্ভব সে অভিজ্ঞতা। ধাপে-ধাপে; হীরে-হীরে;  
শূন্য নয় শূন্য গতিতে কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছেছে পিছন  
কিরে তা'কাল অতিক্রান্ত সেই দৃষ্টের পথ আজ হেমন্তের নিজের  
কাছেই এক প্রায় হয়ে দেখা দেবে; 'কেমন করে অতিক্রম  
করে এল সেই অস্বাভাবিক পথ সে কি সত্যই নিজেই জানে তার  
উত্তর।

অত্যন্ত সয়কারের প্রায় অঙ্গ গলিতে বহু বড় বাতীতে বসে কয়েক  
বছর আগেও মনে আছে আমরা সবাই বখন নাওয়া-খাওয়া ভোলা  
আড্ডার আয়তনমিত্ত তখনও স্তম্ভ করে হেমন্ত সবে পড়েছেন  
নিশেদের কখন টের পাইনি। কিরে এসেছেন আড্ডার এক ঘণ্টা বাদে  
পনের টাকার টুশনি সেরে; টুশনির মাস্তক প্রয়োজন তার ফুরিয়েছে  
তখন; কিন্তু আড্ডার চেয়ে যে কাজ বড়ো এখিলাস তখনও তাঁর  
অসুস্থ। সেই বিখ্যাসের বলেই তিনি আমাদেরই মত আড্ডা গিয়েও  
গাড়ি ডায় পড়েন নি কখনও। এই দেখছি একদিন; আর আরেক  
দিন এই সেদিন দেখলাম সাগা ভারতে স্রষ্টাভিত্তি চিত্রগ্রহকার হেমন্ত  
এসেছেন কলকাতায় বাংলা ছবির গানে শ্রব দিতে। সকাল থেকে  
হাত দুটোর মধ্যে খরলিশি করে; শ্রব তুলিয়ে শিল্পীর কণ্ঠে; মহলা

পথ গান বেকর্ড করে শেষ রাতে দমদম থেকে উড়োজাহাজে উড়ে  
গেছেন সাপ্তা কুঞ্জে।

এ হল হেমন্তের বাটের দিক। ভিত্তিরে মানুষটি আরও  
আশ্চর্যকর। নিজের মা-বাপ-ভাইয়ের জ্ঞান হেমন্ত যা কয়েকদিন এবং  
এখনও যা রকমের বাঙালী বড় হলে তা কোনও দিন করে নি; তা  
কোনও দিন করে না। হুঃসহ বহুকে বিশ্বাস; মা-বাপ-ভাইকে  
ভাগ্য; এবং আত্মীয়-স্বজনকে পরিভাগ্য করাটী ছোট থেকে বড়  
হওয়া বাঙালীর দম্বর। দম্বর মত বড় হওয়া হেমন্তকুমার সেই  
নিয়মেই প্রমাণ হিসাবে একমাত্র ব্যতিক্রম। যরকে ভালোবাসতে  
পেরেই বেশকি ভালোবেসেছেন তিনি। তাই বোম্বাই গিয়েও তিনি  
বাঙালীই আছেন। তাঁর বাড়ীর সোতের কাছেই শুধু জানতে পারা  
সম্ভব যে ফিল্ম লাইনের ঘরছাড়া জীবন ও জীবিকা গ্রহণ করেও  
যরকে তিনি বাটের থেকে আয়তন করেছেন; চল বেছেছেন  
বজায়। শুধু লক্ষ্য নয়; লক্ষ্য-প্রতি হেমন্তের ঘরে বাঁধা। এমন  
মানুষই বড়-মানুষই হলে মানুষ; কাজে আসে। না হলে মানুষ  
শুধু বড়লোক হয়; বড়-মানুষ হয় কোথায়?

কিন্তু হেমন্তকুমার হাজার মানুষের সাক্ষ্য একা গলায় পরলেও  
তিনি একজনই; দ্বিতীয় নেই তাঁর দৃষ্টান্ত বোম্বাইয়ের বাঙালী-  
পল্লীতে। আর অশোককুমার? তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তিনি ফ্রিক  
অভিনেতা। Superman যদি বার্লিট শ'র বট ছাড়া বোম্বাইও  
অস্তিত্ব-অসম্ভব হয় তবুও বলব অশোককুমার হিটমান হলেও  
তাঁর কপাল স্বপার-হিটমান। অসম্ভব জুড়ের কুটী অশোককুমারের  
ক্ষেত্রে বাঙালী-অবাঙালী কোন বাণটি গোপে টেকে নি। ভাগ্যের  
তোপের মুখে উড়ে গেছে দুঃখাগের মিছিল। তাই দ্বিতীয়  
মহাযুদ্ধের অনেক আগে থেকে তৃতীয় মহাযুদ্ধের হুঁসুধুখী এসেও  
এসেও ভারতীয় ছায়াচিত্রকাল্যের অশোককুমার এখনও  
Evergreen Hero! তিনি হোকারের কীর্ত্তি বিজ্ঞাপন তিনি,  
[Still going strong]। আমরা চাই কাব না চাই; ভাগ্য  
চায়, তাই তাঁর জয় হুক; কাবণ সব কিছুই পরেও বা অবিদ্যমান  
যোগ্য ঘটন—তা হল তিনি বাঙালী। বাংলা ভাষা তাঁর মাতৃভাষা;  
হিন্দি তাঁর বিমাতৃভাষার তুলনায় তা যেমনই বলুন না তিনি বাঙালী।

কিন্তু বোম্বাইয়ে যেমন করেই হুক যে সব বাঙালীরা টিকে গেছেন,  
তাঁরা বাঙালীর মত বড় ঘরের শত্রু বিদেশিও এক ভীষণ শত্রু কিন্তু  
বোম্বাইওলাও নয়। এখানে ইঞ্জিনিয়ার যেমন ইঞ্জিনিয়ার হন সেই নাক  
ফিস্টেকার সাহেবদের চেয়েও বেশি; বোম্বাইর এই সব বাঙালীর তেমনই  
বাঙালী বিষয়ে বিদেশের ওপর টেকা দেয়। এরা হল বোম্বাই আর  
বেঙ্গলের সন্ধি নয়; এদের অভিসন্ধি শুধু বাঙালীরা পেছেন বহু  
হয়ে bamboo দেওয়া। তাই এরা হলো বোম্বাই প্রাস বেঙ্গল  
ইকোয়াল টু বামলোবেঙ্গলী। এরা একেবারে চিঃ। বাঙ্গলা ছবি  
রাষ্ট্রপতি পদক পেলে বোম্বাইওলা মানে; কিন্তু বামলোবেঙ্গলী  
সম্প্রদায়ের পাণ্ডুর প্রতিবাদ জানাত; মৌলিক প্রতিবাদ নয় শুধু  
কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঢুকে লিখিত প্রতিবাদ জানালে তবেই বঙ্গদেশে  
জন্ম বোম্বাইয়ের মাটিতে সার্থক মনে করে। এই সব বিশ্ববাস্যদের  
থরে থরে কোতল করা উচিত বোম্বাইতে পদার্পণ করা মাত্র এদের  
পায়ে লুটিয়ে পাড়ে বঙ্গবাসী। তারা জানে না যে বোম্বাইতে না থেতে  
পেরে বাঙালী মারা গেলে এরাই বঙ্গবাসীর চিতায় দেবে বাঁশ!

## বাইশ

ভারতীয় হলিউড, বোম্বায়ের কিয় হুডিওর তুলনায়, টলিউড, —টালিগঞ্জের হুডিওগুলি তীক্ষ্ণতর। বর্ণনা অনন্তর, বোম্বায়ের কিয়রাজ্যের আবহাওয়া এতদূর দৃষ্টিতে যে সেখানে নিঃশ্বাস নেওয়া শক্ত। এমন কোন অস্ত্রায় বা কুতুহলিত হয় না এই সব হুডিওতে; এমন কোনও বিবেক বিকল্প কাজ নেই যা বোম্বায়ের হুডিওতে করতে পারে; এমন কোনও পাপ নেই যা পুনরাবৃত্তিতে এখানে কাকর বুক কাঁপে; পা আটকায়। বিড়লাবাড়ীর রহস্য লিখে বাঙালীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়েছেন দেবজ্যোতি বর্মা; বোম্বের কিয়রাজ্যের রহস্য প্রকাশ করতে পারে যদি কেউ তাকে দিয়েও কম কাজ হবে না কিছু! অতলান্তিক পাপের পঙ্কতুণ্ডে আবাক নিমজ্জিত ছায়াবাক্যে কখনও যদি দুটি একটি পদ্ম প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি হয়ে ফুটে উঠে; যদি দুশ্চর তপশ্যায় অজুহীন অন্ধকার রাত্রে অপেক্ষা করে অবগুহাবী নূতন প্রভাতের,—তবে রাত ভোর হবার অনেক আগেই দুহাতে পদ্মকে টুকরো টুকরো করে; দুপায়ে তাকে দলে পিষে পাঁকের অতলে মিশিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয় এই দূষিত মায়ালাক। প্রয়োজন ও প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি পেয়ে পেয়ে বোম্বায়ের কিয়রাজ্যের আর টেকনিসিয়ানরা ধরাকে শুধু সরা দেখছে না; ধরাকে সত্য সত্য সবাইখানা মনে করে সুরা আর শাকী সহযোগে উড়িয়ে দিয়ে নিজে, ফুরিয়ে যাওয়ায়ও মনে করছে মহুযাভ্রমর একমাত্র সার্থকতা। বোম্বাই শহর মধ্য নিমিষ। তাই বেকারি মনের সঙ্গে বিকৃত আয়োদের বেদান্তি বোম্বাইকে চরম মারিণী অধঃপতনের প্রাক্কক্ষে পৌঁছে দিয়েছে আজ। আর এক পা এগুলেই তার অপসৃত্তা অবধারিত। এবং যেখানে গিয়ে মুখ খুঁড়ে পড়বে মমুবাঙ্ক। সেখান থেকে কোনওদিন মুখ তুলে আবার ঈর্ষাবার মত জোর আর দুপায় সে পাবে না কোনদিন। সেদিন অবশ্য সহস্র সত্যকীরণের পরেও বেশী দূর নয়। অতএব মা ভৈঃ।

বোম্বায়ের ছায়াবাক্যে পা দিচ্ছে মাথাগুলিয়ে যাবে আপনায়। এখানে আসল আর নকল; বাঁটি আর ভেজালে; মাগুয়ে আর মেয়েমাগুয়ে কোনও তফাৎ নাই। আমার চক্ষে পুরুষাংগী কোন ভেলাভেল নাই। সামোয় জর গাই! সত্যকারের সাম্য কেবলে হয়েছে কে বলে? সত্যকারের সাম্য দেখতে হলে আপনাকে যেতে হবে বোম্বায়ের কিয়রাজ্যে। কোন প্রোডিউসারের টাকা আছে; কোন প্রোডিউসারের এক পয়সা নেই; কাজ আছে আর কে বেকার; কে সত্যই ছবি করতে চায় আর কার শুধু ছবি করার নাম করে শেঠ কাঁপানোই কারবার ঘণ্ডরা বাহু লোকেরও তা বোকা শব্দ। ঐষ্টিক করে বলা অনন্তর। গাড়ী, অফিস, জামাকাপড় দেখে কে বলতে পারে কোনটা গোল্ড আর কে কেমিক্যাল গোল্ড? গোল্ড ব্লেকের টিন থেকে এরা চারমিনার টানে এমন কারুণ্যর যেন তলেগারের খাপ থেকে দাড়ি কানানোর সুর বেসলে যে অবাক হয় আসলে সেই বুড়াক; যে বার করে তার যেন এতে হজ্জার; বিশ্বয়ের; অস্বাভাবিকতার কিছুই নেই।

বোম্বায়ের চিত্ররাজ্যে নকল ও আসল চেনা এত শক্ত যে ওখানে কে হিন্দু আর কে মুসলমান নাম থেকে তা মালুম হয় না; ধর্ম

থেকেও না। তাই ভারতবর্ষের কত মুসলিম-টাকা যে পাকিস্থানে চলে যাচ্ছে হিন্দু চল্লিশামে কে তার খবর রাখে। হিন্দুস্থানে অভিনয় করে পাকিস্থানে ঘর বাড়ী বানিয়ে শ্রাম-কূল ছুই বজায় রাখার দৃষ্টান্ত হলভ নয়। কিন্তু ভাল আর অকৃত্রিম প্রকারভেদ করা শক্ত যে বোম্বাই কিয়রাজ্যে তার মোদা কারণ হচ্ছে এখানে সব ভাড়া পাওয়া যায়। কারিগার-ঘর থেকে পোষাক এবং ঘরগী পর্যন্ত ঘরগীর হিসাবে ভাড়া দেওয়া বোম্বাইয়ে সাজাতিক চাপ। তাই কারিগর, ক্রমে বসে গায়াডিন পোষাক পরতে, বিরাট গাড়ী চড়েতে এবং গোষ্ঠ দ্বন্দ্ব ফুটতে দেখে যাদের মনে হয় যে এদের টাকার অক্ষিগক্তি নেই তাদের সবটাই যে কাঁকা; সিগারেট ফুঁকে শেষ হবার আগেই ব্যবসার শিড়া ফুঁকে দিয়ে সরে পড়ার ইতিহাস যে তাদের ভাল ভাত, বাইরে থেকে তা দুদিনে বোকা সহজ নয়। কারণ ব্যবসার নাম পালটানো এদের কাছে কিছুই নয়; বাপের নাম পালটেই না আছে পুত্রের হজ্জা; না বাপের অসম্মতি।

টলিউডে প্রতারণা চলে হাজারের অঙ্কে; বোম্বায়ের হলিউডে লাখে। সাত আট লক্ষ টাকা নিয়ে যারা খেলছে আর সত্তর-আশী লক্ষ টাকা নিয়ে খেলাচ্ছে যারা বোম্বাইতে তাদের দু দলের লক্ষ্যই এক। চট্টবেতি! চট্টবেতি! বোম্বায়ের কিলমী অভিবানে এর অর্থ! এগিয়ে চল; এগিয়ে চল!—নয়; এর অর্থ: সরে পড়ো, সরে পড়ো! অল্প লোককে সারতে সারতে এবং নিজেরা সরতে সরতে সমস্ত ফিল্ম-রাজ্যকে এরা সেইখানে এনে উপস্থিত করেছে যার পরে ডারো নেই; শুধু জল! জলে-ডাঙার তাদের এই খেলা উপভোগ করে সবাই; বিশ্বাস করে না কেউ। তিন চারটি প্রযোজক ছাড়া আর সকলেরই খেলা এখানে খতম হয়ে আসছে। আসবারই কথা। তাদের উদ্বেগই হচ্ছে: খেলা খতম, পয়সা হজম। হজম অল্প সকলেই করতে পারে না। বদহজমের ধাক্কায় তখন আশেপাশের আকাশ-বাতাস নাকে ক্রমাল চাপা দিয়েও রেহাই পায় না।

প্রোডিউসাররা এই রকম বলে আর্টিষ্টরা আরও সেয়ান। বড় অভিনেতা থেকে চুনোপুটি পর্যন্ত কনট্রাক্টের ধার ধারে না; আইনের করে না তোহাফা। বড় কোনও অভিনেতার বাড়ীতে যে সব চেয়ে আগে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে, সেদিনকার মত তার ছবিতে কাজ হয়। Debt এর ধার ধারে না যেমন Debt এর ধারও না। তাই বোম্বায়ের ছোট প্রযোজকরা ভাড়া করা ট্যাক্সিতে যাওয়া করে বেড়ায় আর্টিষ্টের পেছনে; ধরতে পারলে কাজ হলো; না হলে নয়। তাই ফলে স্মৃটিং শেষ করতে একটা ছবির কাকর লাগে করেক মাস; কাকর করেক বছর। শুধু তাই কি? বোম্বায়ের প্রথম শ্রেণীর চিত্রগৃহ পর্যন্ত সারা বছরের জন্ত ভাড়া নিয়ে রেখেছে বড় বড় প্রডিউসাররা। ছোট প্রযোজকদের ছবি বিলিঙ্গ করাই তাই এক সমাধান-হলভ সমস্যা। টাকা চুরি থেকে কাহিনী চুরি; গানের কথা থেকে সুর চুরি; প্রাসাদ থেকে পুকুর চুরির পর্যায়ক্রম ইতিবৃত্তর এক কথার নাম হলো বোম্বাই কিয়ের জোচ্ছুরী।

একটি ইতিহাস শুধুমাত্র।

বোম্বায়ের পয়সা নখর অভিনেতা প্রযোজক একজন কলকাতায় চারখানা গল্প কিনলে কলোয় যুগের একজন লেখকের পরে যিনি

নিজেও চিত্র-পরিচালক হন। চারখানা গল্পের দাম ঠিক হলো বিশ হাজার টাকা। দু'হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে চলে গেলেন বোম্বাই প্রযোজক। চার খানা গল্প বেচবার পর একখানা গল্প নিয়ে আইনগত অনুবিধা দেখা দেওয়ায় বিক্রির, বলকাতার লেখক সে গল্প ফেরত চাইলেন। বোম্বাই প্রযোজক সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশ করলেন গল্পের স্বত্ব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানাতে তুললেন না যে, যে গল্পটির স্বত্ব চেড়ে দিলেন তিনি তারই দাম খরচিলেন আঠারো হাজার টাকা; আর বাকী দু'হাজার মোট তিনটি গল্পের দাম। অতএব যে দু'হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়া ছিলো তাতেই পূর্ণ মূল্য শোধ; এখন Received in full বিসিটা পাঠিয়ে দিলেই

তিনি একটি গল্পের দলিল স্বত্ব ফেরৎ পাঠাতে পাবেন বাঙালী লেখককে।

সেই বাঙালী লেখক অনেক চরিত্র খেঁটেছেন; সৃষ্টি করেছেন; এখনও করার দাবী রাখেন। কিন্তু এরকম চরিত্র বোধ হয় সৃষ্টি করা হুয়ের কথা; তাঁর অভিজ্ঞতারও অনেক বাইরে। এ চরিত্র কাল-ভঙ্গে একটি দুটি জন্মায়।

হ্যাঁ; আসল কথা বলা হয় নি। যে বাঙালী লেখককে এই ভাবে ঝুঁসিয়েছেন বোম্বাই প্রযোজক, তিনি আবার বঙ্গভাষিতে বোম্বাইওলা হলে কি হবে, জাতিতে বাঙালী যে।

[ক্রমশঃ]



জুতো পালিশ

শ্রীচীনলাল ভট্টাচার্য্য অঙ্কিত



# চরজন

কবিশেখর কালিদাস রায়

স্নেহ-বিহ্বল, বঙ্গশা-চলিত বঙ্গজননীৰ অল্পময় রূপমাধুরী বিভিন্ন কবি প্রত্যক্ষ করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে। ধনধাতো-পুষ্পে ভরা বাঙলার প্রাকৃতিক শোভা তৃপ্ত করেছে কত কবির চাতকি-চিত্তকে তা সংখ্যায় নিরূপিত হয় না। কত কবি জীবনব্যাপী উপলব্ধি করেছেন বাঙলার বিশিষ্টতম রূপকে, অন্তরের সঙ্গে তাকে করে দিয়েছেন গাঢ়ভাবে একীভূত আর সেই যুগপৎ উপলব্ধি ও অন্তরে গাঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার বিকাশ ঘটে তাঁদের কাব্যের মধ্যে দিয়ে। এই কবিরা অহমিকার জালে মজেদের ভড়িয়ে দেন নি। আত্মপ্রচারণের বেড়াভাল থেকে থাকেন শত হাত দূরে, বিময়-গুণ, নম্রতা, শিষ্টাচারের জীবন্ত প্রতিনিধি তাঁরা—এঁদেরই মধ্যে অন্যায়সে নাম করা যায় কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অমর হয়ে আছে অজয় নদী। অজয় নদীর তীর একদিন ধক্ত হয়েছিল ভয়দেবকে বুকে ধারণ করবার সৌভাগ্যে। তার তীরবর্তী কোগ্রামের বন্ধুও ধক্ত করে গেছেন সাধক কবি লোচনদাস। তাঁরই বংশে ভ্রমগ্রহণ করেছেন কবিশেখর কালিদাস রায়। কালিদাস আজ টালিগঞ্জবাসী হলেও কোগ্রাম কবিশ্রুত নয়। বর্তমান বাঙলার জীবিতজ্যেষ্ঠ কবি শ্রদ্ধাংশদ

কুসুমরজন মন্ডিককে আজও দেখা যাচ্ছে কোগ্রাম আলো করে এখনও নিত্য-নব অবদানে ভরিয়ে দিচ্ছেন দেশকে।

কোগ্রামের পর রায়ের আসেন বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কবিশেখরের জন্ম। পিতৃদেব স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ রায় কালীমবাজারের মহারাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। প্রথমে গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শুরু, পরে খাগড়া লণ্ডন স্কুল থেকে সরকারী বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বহরমপুর ব্রহ্মনাথ কলেজ থেকে বি-এ পাশ করলেন ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। এখানকার অধ্যক্ষ হুইলার সাহেবের শিক্ষার গুণে সাহিত্যের প্রতি কবির অম্লবাক্তি জন্মায়। স্কটিশচার্চ কলেজে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পড়তে পড়তে চলে যান বহরমপুর জেলার উলীপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে, সেখানে সাত বছর কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। বাড়ি স্কুলে কিছু দিন শিক্ষকতা করবার পর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ডুবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশানে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘ বাইশ বছর গৌরবের সঙ্গে আতবাহিত করে অবসর গ্রহণ করেন।

যুবক কবি কালিদাস রায়কে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অপরিণীত উৎসাহে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ কবিশেখর উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে যুব কবিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রজ্ঞা নিবেদন করেছেন জগদ্বারীণী ‘গদ্যক’-এ বিদূষিত করে। ‘লীলা লেকচারার’-এর আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। এই সময়ে বৈষ্ণব পদাবলীতে তিনি একটি সুচিন্তিত ও সাংগর্ভ ভাষণ দান করেন।

প্রায় অধঃশতাব্দী হতে চলল, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে কবিশেখরের লেখনী। আজও তার দ্বারা অশ্রাস্ত, গতিবেগ আজও প্রবল, অগ্রভূতি আজও তীব্র। ঐ সময়ে অর্ধাং তাঁর পঠদশায় ‘কুম’ নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কিশলয় পর্ণপুট, (দুই খণ্ড) বঙ্গবী, ব্রজবেণু, ঋতুমল, হৈমন্তী, আহরণ, বৈকালী, আহরণী, (নির্বাচিত কবিতা সংকলন) আহরণ (শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন), গাথাঞ্জলি (গাথা কবিতার সংকলন) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর কীত্তির স্বাক্ষর বহন করছে। এ ছাড়া তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে গীতার কাব্যানুবাদ, গীতালহরী, চিত্রে গীতগোবিন্দ, কাব্যে শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, ইন্দুমতী (বয়স্কদের কয়েক সর্গ), মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত মেঘদূতের নাম সত্যিই উল্লেখযোগ্য। গজগ্রন্থগুলির মধ্যে দুই খণ্ডে সাহিত্য-প্রসঙ্গ, তিন খণ্ডে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (এইগুলি সবই বি-এ ও এম-এ ছাত্রদের জন্যে অনুমোদিত) শব্দ সাহিত্য, পদাবলী-সাহিত্য দেখা দিয়েছে পাঠকসাধারণের সামনে। রস-রচনাতেও তাঁর সুদক্ষ লেখনীর পরিচয় পাওয়া গেছে। ‘রসকনক’ নামে তাঁর একটি হাসির গানের বইও আছে। বর্তমানে তিনি



কালিদাস রায়



আত্মস্থিতি বচনায় মর। হিন্দী অধুবাদ সহ বাঙলা কবিতার একটি সুবৃহৎ সঙ্কলন সম্পাদনা তিনি বর্তমানে শেষ করেছেন।

কবিশেষণের সাহিত্য-জীবনে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে একটি প্রতিক্রিয়া, তার নাম উল্লেখ না করলে এই রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটি রসচক্র সাহিত্য-সংসদ। শরৎচন্দ্র, শৈলজানন্দ প্রমুখ সাহিত্যিক এবং সত্যি দিহা, রমেন চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীরা নিয়মিত দেখা দিতেন এই চক্রে।

কবিশেষণের অমুদ্রিত সম্প্রতি পরলোকগত রাধেশচন্দ্র রায়ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন। কবি-পুত্র শ্রীজয়দেব রায়ের নামও মাসিক বঙ্গবতীর সন্মত-পিপাসা পাঠক-পাঠিকার কাছে অজানা নয়। কবিকল্পা সমুদ্রের পাণিগ্রহণ করেছেন আর একজন বরণ্য কবি স্বর্গীয় বটভদ্রনাথ সেনগুপ্তের এক পুত্র।

কবিশেষণের ভবিষ্যৎ অবদানগুলির আশায় আমরা অপেক্ষা করে বসিলাম।

### রেজাউল করীম

রেজাউল করীম। বিগত ৩০ বৎসর বাংলা দেশের হিন্দু মুসলমান সমাজে নামটি লোকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আসছে, তাঁর উদাত্ত ভাষণ সাম্প্রদায়িক অতৈক্যের মূলে কুঁচিয়াযাত তানতো, তাঁর তীব্র তর্ক-মতঃস্থ যুক্তিসম্পন্ন প্রবন্ধ সকল জাতীয় জীবনে আনতো মুক্তির আহবান; গ্রানিযুক্ত করতো সংস্কারাচ্ছন্ন মন, সমস্ত ভারত ছুড়ে হিন্দু মুসলমানের একা স্থাপনে বেকসুরকণ বিশিষ্ট ব্যক্তি চেষ্টা করেছেন রেজাউল করীম তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বীরভূম জেলার রামপুরহাট থেকে ৪ মাইল দূরে মারগ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা হাজী আবদুল হামিদ ছিলেন আরবী ও ফারসীতে সুপণ্ডিত।

গ্রামের মাইনর স্কুলের পড়া শেষ করে কলকাতায় ক্যালকাটা মাদ্রাসা হাই স্কুলে ভর্তি হন, সেট জেভিয়ার্সে আই, এ, পড়ার সময় দেশের ডাক এসে, সাড়া দিলেন তিনি, সমগ্র দেশ ছুড়ে বয়কট আন্দোলন। আসন্ন-স্ফূর্তিমাতে ব্যাপী বাপুজীর নন-কো-অপারেশনের প্রোত, ফাঁপিয়ে পড়লেন তিনি, মুর্শিদাবাদ জেলার সালাবে প্রতিষ্ঠা করলেন জাতীয় স্কুল।

কোনদ কংগ্রেস বয়কট প্রস্তাব প্রত্যাশ্রিত হলে আবার কলেজে প্রবেশ করেন। অতঃপর এম, এ, ল, পাশ করেন তিনি।

দেশ ছুড়ে তখন হিন্দু-মুসলমানের অতৈক্য; মুসলিম লীগ তার বিভাজিতত্বের বাধ্যতায় বস। এই সময় করীম সাহেব (এই নামেই সর্বাধিক খ্যাত) তাঁর শক্তি ও সময় নিয়োজিত করেন এর বিরুদ্ধে। জিন্না এবং লীগের স্বভাবিতত্বের অপমুক্তি ধণ্ডন করে ইনি দেখাতে লাগলেন—ভারতবাসী এক এবং অবিভাজ্য, ভাতি তিসাবে পৃথক নয়।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলনের সমর্থক, তৎকালীন বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক চেউ-এর মাঝে ও তাঁর আদর্শের সত্যকে নির্ভর্য নিশ্চয়চিত্তে গারণা করেছেন, এজন্তে আঘাতও কম আসেনি।

ফজল হক (অধুনা পূর্ণ-পাকিস্তানের গভর্নর) প্রতিষ্ঠিত নবযুগ

পত্রিকার তিনি সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কাজ শালন করেছেন। দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর মতামত তখনই সর্বশেষ প্রকাশ হয়, জাতির অর্থনীতি শিক্ষা কুসংস্কার একা সকল দিকেই জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

কিছুকাল আলিপুর ও ব্যাকশাল কোর্টে তিনি আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন, কিন্তু অনতিবিলম্বেই আইন ব্যবসায় ভুলে এবং সত্যমিথ্যার এক বিচিত্র অধ্যায় তাঁর অন্তরকে গভীর ভাবে গাঁড়িত করে। তিনি উপহাসিক করেন এ পথ তাঁর জন্তে নয়। অতঃপর বহরমপুর গার্লস কলেজে অধ্যাপনার কাজ আন্তঃনিয়োগ করেন, আজ অবধি সেট কাজেই ব্যাপ্ত।

বিপ্লবীক নিঃসন্তান করীম সাহেব বহরপুরের গোয়াবালাবে একাকী বাস করেন,—সদী অসংখ্য পুস্তক আর পরিচিত অপরিচিত অসংখ্য মানুষ। অজাতশত্রু তিনি,—সুশাস্ত্রময় এই মধুর স্বভাবের মানুষটির হার সত্যের স্রষ্টা উদ্বুদ্ধ,—তা সে যে কোনও মত ও পথ চোক না'কেন। চট করে মানুষের মন জয় করে নেবার মন্ত্র যেন তাঁর সমস্তায়।

সাংস্কৃতিক সভ্যগমিত ও সাহিত্য জগতটায় করীম সাহেবের উপস্থিতি নিরমিত,—এবার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃপক্ষ বাংলার স্বেচাঙ্গা সন্তান বারীম সাহেবের সর্বাধিনা-সভায় রেজাউল করীমকে সভাপতি হিসাবে বরণ করেছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে এখনও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। বর্তমানে 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকার' সম্পাদনার ভার তাঁর উপর লুপ্ত।

ইংরেজী ও বাংলা ভাষার প্রায় ডজনখানেক বই তিনি লিখেছেন। মোটামুটি রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় লেখা। তন্মধ্যে (১) বহুসংখ্যক ও মুসলমান সমাজ (২) করাদী বিপ্লব (৩) নয়া ভারতের ভিত্তি (৪) Pakistan examined (৫) For India and Islam ইত্যাদি

বিখ্যাত। তাঁর ইতিহাসে বিক্ষিপ্ত মূল্যবান অসংখ্য প্রবন্ধ সংকলনের অপেক্ষা রাখে।

হৃদ-ভক্তদের বহু অধিকারী এই সহজ মানুষটিকে আমাদের বর্তমান যুগ ও সমাজ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি বলেন—“ভারত বর্ষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শত বাণীবিহীন সত্য ও ভারত তহা'র মহৎ মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে, এ বিশ্বাস আমার আছে। একদিন ভারতবর্ষই



রেজাউল করীম

লগতকে আলো দান করিবে। আমার বিশ্বাস, ভারত সম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার আয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নূতন যুগের নূতন পরিবেশে এমন একটি মহৎ মনোভাব সৃষ্টি; হইবে যাহার বলে ভারতবর্ষ বিশ্বজনাত্মক ভাৱের অনেক কিছু দান করিতে পারিবে।

## শ্রীমূলীধর চট্টোপাধ্যায়

[ ছাত্রাবস্থার অশ্রুচিত্তিত কর্ণধার ]

প্রিয় প্রবন্ধ জ্ঞান যেন সহ হয় না। এই অসহ উচ্চতা মাত্রের মধ্যে ছিলে ছিলে সকার কবচে অবদান, ক্রান্তি, অক্ষরপাত। মাঝে মাঝে কোথা থেকে এক এক রাশি স্বলকা বাহ্যস আসছে আর চড়িবে শিঙে হুঁয়ো হুঁয়ো উত্তাপ। এ তেন পরিবেশে ধ্বংসের কর্ণধার একটি অটলিকার এক কোণে আমবা তিন বাহুন কন্যেত চড়েছি—প্রথম জন বাঙালীর চলচ্চিত্র জগতের কর্ণধার শ্রীমূলীধর চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় জন ভারতের একজন সুন্দর প্রচারবিদ শ্রীওল্ডেন্দ্র সাতাল তৃতীয় জন এই অধ্যক্ষ। এক অধ্যাত নগণ্য প্রাক্তন সন্তান।

আলাপ আলোচনা সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পান-ভোজন। চলচ্চিত্রের গোড়ার আমলের কথা। কেমন করে হ'ল, কার দ্বারা হল, ছাত্র-রাজ্যের কে-কি-কেন-কবে-কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে মূলীধরের নিজের কথাও। শেষেরটি অবশ্য তিনি নিজে ঘোটেই বলতে চান নি। আমাকে জোর করে বার করে নিতে চলেছে। ছাত্রছাত্রীর মধ্যেই মূলীধর নিজেকে ভুজিয়ে রাখতে চান, নিজের পৃথক সত্তা বিলীন করে নিতে চান ছাত্রছাত্রীর নব নব সৃষ্টির বেনীমূল, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিতেই ঘটক দাঁধ বিকাশ; এই তাঁর কাম্য।

মূলীধরের আনিবাস যশোভর জেলার কালীপুর গ্রামে। ১৮৮৫ সালের ১৮-১০ গুঠাংদে মূলীধরের জন্ম। পিতৃদেব ছিলেন



শ্রীমূলীধর চট্টোপাধ্যায়

অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ এবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। অগ্রজ ছিলেন ডেপুটি ম্যাগিষ্ট্রেট ও পরবর্তী জীবনে মহারাজা শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ঠাকুরের 'টেগোর রাজ এজেন্ট' এর চীফ ম্যানেজার স্বর্গীয় দাশরথি চট্টোপাধ্যায় ও তৎকাল বর্তমান ছাত্রজগতের আর একজন অশ্রুচিত্তিত পুরুষ শ্রীখণ্ডলাল চট্টোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া সরকারী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন মূলীধর। সেট জেভিয়ার্স থেকে আই-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন মূলীধর। তারপর পড়তে লাগলেন এম-এ ও আইন। এর পরই এলো এক বিরাট পরিবর্তন, ছন্দে বাঁধা জীবনকে অতিক্রম করে দেখা দিল আগামী দিনের দিবাকরের জাগরণের পূর্বাভাস। পড়া ছেড়ে দিলেন মূলীধর। মনে বাসনা হল নিজের পায়ে ঝাঁড়তে হবে, নিজের পথ নিয়ে করে নিতে চাবে, বাইরের জগতে পা দিলেন মূলীধর। যদি পড়া না ছাড়তেন আইনের সত্য-মিথ্যার বেড়ালালে চিরকালের মত ভড়িয়ে যেতেন মূলীধর, হয় তো বা ভারতের আইন জগতে আজ তিনি হতেন একজন অধিতীয় পুরুষ, সারা ভারতের আইনে হয় তো মাঝানে থাকত তাঁর প্রভাব কিন্তু ছাত্রছাত্রীর রাজ্যের একটি দিকই হয় তো শূন্য থেকে যেত মূলীধরের অদৃশ্যস্থিতিতে। মূলীধরের বিমুখতা থাকলে বাঙালীর ছবির রাজ্য কিছুতেই আজকের মত পুঁঠ হতে পারত না। আবির্ভাব হত না এত যুগান্তকারী চরিত্র, এত কণা-বুদ্বলী ও শিল্পীর আগমন, অসমাপ্ত থেকে যেত শিলা-বন্দনা।

নানা ব্যবসারে নিজেকে ভরিয়ে রেখেছিলেন মূলীধর। তারপর জে, এন, বস্তুর সাম্পর্শ্য এসে তাঁর ব্যবসারে যোগ দিলেন মূলীধর। প্রথম মহাযুদ্ধের পরিণতির ফলে সেই প্রেতীহীন পরজা বন্ধ করে দেয়। এর পরই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মূলীধর যোগ দিলেন ম্যাড্রিন কোম্পানীতে তাঁর মাসহুতো দার সম্প্রতি দেশান্তরিত বাঙালীর চলচ্চিত্র লোকের প্রতীকুলের অগ্রতম বিশেষ পুরুষ স্বর্গীয় প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাতথ্যে। এখানে তিনি ছবি পরিবেশকের জাহাশ্রয় হলেন। যারো বছর সময়ানে এই দায়িত্ব বহন করে ম্যাড্রিন ত্যাগ করলেন মূলীধর। তার পর পুত্রের নামানুসারে প্রেতীহা করলেন রোভেন ম্যাড্রিন কোম্পানীর। এঁরা তখন নিবাক ছবি পরিবেশন করতেন। কর্ণওয়ালিশ ও ক্রাউন (বর্তমানে উত্তরা ও ঈ) এর নবরূপায়ণের রূপরাতা ও পরিচালকগোষ্ঠীর হলেন অগ্রতম, এই সমর-পরিচালকগোষ্ঠীতে আর বীরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে মহারাজা প্রভোতকুমার দাশরথি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তার পর ক্রমাগতই সুবী, উচ্ছল, রূপম, নবরূপম ওরিয়েন্ট প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহগুলির পরিচালক মণ্ডলীতে যোগদান ও একটি বিশেষ স্থান অধিকার। এক কথা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করা যায় যে এতগুলি প্রেক্ষাগৃহের শীর্ষস্থানে একজন বাঙালী এ দেশের বাণিজ্যিক গৌরবই যোগবা করছে। মূলীধরের প্রথম প্রযোজিত নির্বাক চিত্র 'তত্ত্বালা।' তার পর কমলা টকীজ নামক প্রযোজক-প্রতীহীন গঠন করে রাজকুমারের নির্বাসন ও স্বাধীনতা ছবি দুটি নির্মাণ করেন। এর পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে জমগ্রহণ করল এম, পি, প্রোডাকশন্স (মায়ের প্রাণ প্রোডাকশন্স)। মায়ের প্রাণই এঁদের প্রথম ছবি। মূলীধরই ছিলেন এর একমাত্র স্বত্বাধিকারী।

তার-পর ১১৪১ খ্রীষ্টাব্দে এম. পি. একটি সমবার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। ১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সানরাইজের হল প্রতিষ্ঠা। বিখ্যাত পরিবেশক প্রতিষ্ঠান ডিল্লের প্রধান বরকতা ইনি। বি. এম. পি. এ নামক ছায়াস্রোকে বিরাট প্রতিষ্ঠানটিরও ইনিই অল্পতম স্রষ্টা (১১৪৫) ও পাঁচ বার এর সভাপতির আসন করেছেন অসঙ্কট, তাঁর এ গৌরবও লক্ষ্যবিন্দু।

বাল্কিগত জীবনে যুবসৌধর অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, সর্বলতার প্রতিশ্রুতি তিনি এবং তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ যে, যে কোন আলোচ্য বিষয় বসতি তা জটিল হক যুবসৌধর যাত্র হু' এক মিনিট সময় নেন তার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে, একটি বাপার নিয়ে দিনের পর দিনে তাই নিয়ে খুলে থাকা ও অপরকে সুলিয়ে রাখা যুবসৌধরের স্বাভাবিক চরিত্র। বর্তমানে ব্যাচাকপুর কলেজের পরিচালক-মন্ত্রণীয় অল্পতম সন্তানরূপে যুবসৌধর সেই মহাবিজ্ঞানটির উন্নতিকল্পে সচায়াতা করেছেন।

যুবসৌধরের একটি বহুদিনের ইচ্ছা শিশুদের ভিত্তে একটি ছায়াছবি নির্মাণ করা। এ জগতে আমার তাঁর যুগা উদ্বেগই ছিল ছবির মাধ্যমে সমাজ গঠন করা, সমাজের সেবা করাটী তাঁর আদর্শ। এ জগতের সমাজের যোগাযোগ দীর্ঘদিনের, সে সময়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা কিতাবী করার তিনি বলেন সত্য বলতে আমি পরামুখ নই: তবে সত্যের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিও আমার উপাত্ত, সেইজন্মে শাস্তিও আমার আশঙ্কা অপ্রিয় সত্য বলতে আমি অনিচ্ছুক। ছবির রাজ্যে আশঙ্ক যে গল্প এনেছ তাঁর কারণ সম্বন্ধে কিতাবী করার উদ্দেশ্যে—এ গল্প ঠিক ছবির রাজ্যেই গড়িয়ে এসেছে জাতীয় কীর্তনধারা থেকেই। আমার কোন কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র পয়সার লোভেই প্রয়োজকরূপে লেনা দেন তারপর ছবিনা লাগলে বড় লোককে বেধ টাকাও আর শিতে পারেন না ও সব ধান—এই সে অন্যথা নতুন লোকেরা (বাঁধা এ জগতের ছায়া বান্ধা নন) যে তুমার নিয়ে গেলেন—এতে করে সেই তুমারো অল্প তাঁদের সমভাবেই এই শিল্পের গায়েও লাগল এবং এইভাবেই এই বিরাট জগতের গোবর ক্ষুদ্র হয়। আরো একটি কারণ আছে আন্তরিকতা ও সত্যানুভূতির অভাব। এ দুটি তিনিই না থাকলে কোন বিরাটই রূপ লাভ করতে পারে না। আমার পরামর্শ প্রাপ্ত আভ্যন্তরীণ দিনে জাতীয় জীবনে দিনেমার কৃষিকা কোথার এবং কতখানি—যুবসৌধর উত্তর দেন ঠিকমত এবং সত্যতার সঙ্গে সাবগর্ভ বক্তব্য দিয়ে ভরা ছবি বন্দি করা যার সে ছবি ভাটিকে চরিত্রগঠনের প্রভূত সাধ্যক হতে পারে। আজ অবধি প্রায় পঁচাত্তরটি বিখ্যাত ছবির নির্মাণের মূল ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন যুবসৌধর। তাদের মধ্যে শেষ উক্তর, যোগাযোগ, পথ বেঁধে নিল, সান্ত নয়া বাড়ী, তুমি আর আমি, স্বপ্ন ও সাধনা, বিদ্যুৎ ভাষা, অভিজ্ঞতা, সঙ্কল্প, ইচ্ছাধারা, বানপ্রস্থ, বিজ্ঞানাগর, সহযাত্রী, প্রত্যাভর্তন, বাবলা, সন্ধাবনী, বহু পরিবার, আঁধার, কার পাশে, অগ্নিপরীক্ষা, সবার উপরে, বহু ভৈ, পুরুষ, ত্রিষায়া প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আমার এদেরই মধ্যে বিজ্ঞানাগর, বাবলা, কার পাশে, শেষ উক্তর, যোগাযোগ, বহু পরিবার, সান্ত নয়া বাড়ী প্রভৃতি ছবিস্তি এক কথায় যুবসৌধরের এক একটি মহাবীর্যম উপহার।

ছায়াস্রোকার দিনে দিনে যুবসৌধরের অবদানে নিজেদের আরো পরিতৃপ্ত বন্দন, এই কামনাই করি।

### শ্রীবল্লাল চন্দ্র

[ট্রিপিক্যাল মন্ত্র-বিশেষজ্ঞ]

“মা—গাছ—পানী—এসব ‘তব’ নিজেই আমরা আছি, এক পুত্র নয়—কয়েক পুত্র ধরেই। মাছের সঙ্গে বিশেষ করে আমার বেন একটা আত্মীয়তাই হয়ে গেছে। গৃহে মাছ পোষা এখন আর আমার কাছে মিছক কোন ‘সখ’ নয়—তার চেয়েও নিশ্চয়ই অনেক বেশী।”

কথা কহুটি শোনা গেল বাংলায় ‘ট্রিপিক্যাল’ মন্ত্র-বিশেষজ্ঞ শ্রীবল্লাল চন্দ্রের মুখে এই সেদিন।

চন্দ্রকার ভগ্নলোক! মুখে হাসি ছাড়া কথা নেই—আপায়েনে প্রতিদ্বন্দ্ব বাস্তব। দেখলেই মনে হয় একে—একটি খাঁটি বাঙালী প্রাণ। প্রায় ২৫ বছর ধরে কলকাতার মাছকে (হটম) নিয়ে এর চলেছে অব্যাহত গবেষণা। কর্মক্ষেত্রে অপরূপ দায়িত্ব পালনের সঙ্গে এইটিও তাঁর না করলেই নয়। তৎস্ব অগ্রগত, ভীক বিচারবুদ্ধি ও অপর উত্তম—এ কহুটি গুণসম্পন্ন অপরূপ সন্নিধান ঘটছে এই মানুষটির ভেতর এবং অনিবার্য ফলস্বরূপ একজন ‘ট্রিপিক্যাল’ মন্ত্র-বিজ্ঞানীর মহাপ্রসাদ দায়ী করতে পারছেন আজ তিনি অন্যায়সে।

১৮১৭ সালের জুলাই মাসে শ্রীবল্লাল চন্দ্রের জন্ম কলকাতায় (৭নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট) এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে।



যলরায় মে ট্রীটের ঐক্য পাঠশালায় (বর্তমান কমলা হাই স্কুল) তাঁর প্রথম পড়াশুনা। কলেজ-জীবনে তিনি ছিলেন বিভাসাগর কলেজের ছাত্র। ১৯২১ সালে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হলেও ছাত্রাবস্থাতেই মনস্তাৎপালনের দিকে তাঁর যৌক্তিক ঝোঁক। এর একটা কারণও ছিল বটে এবং সেইটো তাঁর নিজেরই ভাষায়—‘ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাড়ীর সকলেই একটু ‘naturalist-minded’ অর্থাৎ জীবজন্তু ও উদ্ভিদবৃত্ত অলুসীলনপ্রিয়। বাবা (৮৮বৎসর চন্দ্র) মাছ, পাখি ও পাখী নিয়ে অনেক গবেষণা করে গেছেন। আমাদের ক্ষেত্রে এইটো অনেকটা hereditary (পূর্বযাত্নকৃতিক) বলতে পারা যায়।

এইমাত্র বলা যোগ—মনস্তাৎপোষা জীবলাইলালের আবালা এতটাই মনস্তাৎপোষা বা রেখা। নবাবী আমলের কত বতীন মাহুই (old fish) স্থান পেয়েছে তাঁর সংগ্রহাগারে সেই থেকে। ছাত্রজীবনে অল্পে তিনি যেখানে গিয়ে টুটেন, মাহুর সঙ্গে সেই প্রতিষ্ঠানের আলো বোগা-বোগ কোবার? অথচ এমনই হ’ল—সেখানে থেকেই মনস্তাৎপালনের এবং মনস্তাৎ সম্পর্কে গবেষণার ক্ষুদ্র সুযোগ ও প্রেরণা তিনি পেয়ে চলেন। যুগীলাল কমলাপত নামে যে বিরাট কার্ঘ্যের একটি বিভাগীয় হেড এসিস্টেন্টের (বড় বাবু) পদে তিনি নিযুক্ত, উত্তরাই অল্পতম আশীয়ার ক্রীকলাসপৎ সিংহানিয়ার ‘ইপিক্যাল’ মাহ পোষার সখ নীর্থনিনের। সেই সবই নিরপস কথ্য ও মনস্তাৎবিলাসী উদ্ভাসকে আরও উৎসাহিত করে তুলে অনেকখানি।

মাহুর সগতে প্রাকৃতিক কী বৈচিত্র্য ও রহস্য সত্যি লুকিয়ে, সন্ধান কববার জগৎ জীবলাইলালের প্রচেষ্টার বিরতি নেই। ‘ইপিক্যাল ফিশ’ বা বতীন মাহ নিয়েই বলতে গেলে আজও তাঁর সকল খেলাধুলা, আমোদ-আনন্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯৩৭ সালেই জীবদ ইপিক্যাল মাহের জন্ত নিজেগৃহে একটি বিজ্ঞানসম্মত ‘একুইরিয়াম’ বা জলাশয় স্থাপন করেন। আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রে থেকে সাপুতী মনস্তাৎ বিবরণ গ্রহণাদি এনে সঙ্গে সঙ্গে চললো তাঁর গভীর পর্যালোচনা। আর চললো আমেরিকা, ব্রুটন, জাওয়াগী প্রভৃতি দেশের মনস্তাৎবিজ্ঞানীদের সঙ্গে পত্রালাপ ও চিন্তা-বিনিময়। ইত্যদ্যের ‘ইপিক্যাল’ মাহ সম্পর্কে বহু তথ্যপূর্ণ ও গবেষণা মূলক প্রাক্ষ তিনি লিখেছেন—বিশেষী পত্রপত্রিকাতেও বা সমাদৃত হয়েছে বিশেষ ভাবে।

‘একুইরিয়াম’ বা বিজ্ঞান অলুমোদিত মনস্তাৎগার আজকাল এসেশ্যর অনেক কুটিম্পর লোকের বাড়ীতেই দেখতে পাওয়া যায় এবং এইটো শুধু ‘গৃহশোভাই নয়, প্রকৃতির অল্পতম লীলাকেস্র ভূপেও অনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই অনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে এবং

সেবাসীরা মনে এর দ্ব্যলবোধ জাগিয়ে তুলতে ‘একুইরিয়াম’ জীবলাই লালের অবদান অনস্বীকার্য। ‘একুইরিয়াম’ রাখার বিশেষ ‘হবি’ সৃষ্টির তাগিদে ১৯৫০ সাল থেকে তিনি ক্রমাগত কয়েক বছর নিজদেশের কণ্ডওয়ালি ট্রীটের বাড়ীতে ‘ইপিক্যাল’ মনস্তাৎ বা পোষা বতীন মাহের প্রদর্শনী বাবস্থা করেন। বাংলা কেন, সমগ্র ভারতেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উজোগে এমন ধরনের সুসংগঠিত প্রদর্শনী আর কখনও হয়নি। এর পর থেকেই ‘ইপিক্যাল’ মনস্তাৎ বিখ্যার জীবদ কেবল-বিশেষে সুরমী-সমাজের যনোযোগী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং জাতীয় সংসদারও তাঁর প্রতিভা ও গুণবস্তার স্বীকৃতি নিতে এগিয়ে আসেন।

জীবলাইলালের সঙ্গে বিশিষ্ট মনস্তাৎবিজ্ঞানী ও জুলুজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায় ডিপ্টোর পরলোকগত ডাঃ এস এল হোয়ার যথেষ্ট জড়তা ছিল। ‘ইপিক্যাল’ বা বতীন মনস্তাৎ বিষয়ে উদ্ভাস যে আজকের দিনে একজন ‘অথরিটি’ (authority)—জীবোরা তা বুঝতে পেরেছিলেন সমগ্রতা নিয়ে। তারই জগৎ মনস্তাৎ বিষয়ে গবেষণার সুবিধার্থে কলকাতা মহানগরী বন্ধে একটি সরকারী মনস্তাৎ লালনাগার (‘একুইরিয়াম’) স্থাপনের যখন কথা উঠল—তখন জীবলাইলালকেই সঙ্গে নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে উজোগী হন। সরকারের দিক থেকে এ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপদান এখনও পথান্ত অবস্থা বাকী আছে কিন্তু এর জগৎ জীবদ অল্পতমের অকুণ্ঠ দাবী ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, বলা চলে না।

কুশলী সগঠক হিসাবেও জীবলাইলাল চন্দ্র প্রতিষ্ঠা অল্পন করেছেন বহুক্ষেত্রে। তাঁরই সক্রিয় উজোগে ও বলিষ্ঠ অগ্রগণিতায় ১৯৫৫ সালে পশ্চিম বঙ্গের একুয়ারিটের নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘একুয়ারিট এসোসিয়েশন অব পশ্চিম বঙ্গ’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির তিনি আজও অবধি সভাপতি এবং একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। গত ত্রুই বৎসর ধরে উক্ত সভার প্রত্যক্ষ উজোগে দক্ষিণ কলকাতায় বতীন মাহের যে বিরাট প্রদর্শনী হয়—তাতে প্রদর্শনী সাব কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনিই। এ ছাড়া বহু সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। এ বৎসরের সম্মিলিত নেতাজী জন্মোৎসব সমিতির তিনি ছিলেন সভ্য-সভাপতি। পিপলস্ জিকি এণ্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সভ্য-সভাপতি পদেও তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। সাইকেল চড়া, অস্বাভাবিক ও মোটর চালনা প্রভৃতিতেও তিনি সুরক্ষ। এমন কথ্য মাহুর ও উজোগী-পুত্র্য সহসা খুঁজে পাওয়া বৃষ্টি কঠিন।

[মাসিক বহুমতীর পক্ষ হইতে অনিলধন ভট্টাচার্য, কল্যাণাক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রতন ঘোষ লিখিত।]

## আমার কারবার

“সংসারে বারা তুই দিলে, পেল না কিছুই, বারা বকিত, বারা দুর্বল, উৎসীড়িত, মাহুর বাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় হুখমর জীবনে বারা কোন দিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, এদের বেদনাই দিলে আমার দুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মাহুরের কাছে মানুয়ের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারের ভুলসহ অবিচার। তাই আমার কারবার তুই এদের নিয়ে।”—শরৎচন্দ্র

# রাজাধি রাজাধি



উদয়ভাসু



মাটিতে পা পড়লে আগুনের হোঁরা লাগে।

ওপরে সাধা আকাশ আর নীচে কালো মাটি। বিশ্বাসহীন লুণ্ঠাভাষে আসমান-জমি মহাকালের চিত্রার মত চলছে। আগুনের বর্ষা হলুদ-লাল নয়, রৌপ্য-শুভ্র। মাটি-মাটি জ্বলিয়ে দেয় এই প্রাণের দাহনে, কোমল মাটির বন্ধ চিরে দেয়। জল শুকিয়ে যায় ইলাখায়। পুকুর আর নীধির চতুর্দিকের অস্থি-পঙ্খর দেখা দেয়। রাজ-অস্ত্র-পুংবে পুকুরের তীরে, গন্ধবাজ গাছের আড়ালে তবু এক কালি ছায়া। পাশাপাশি গাছ কয়েকটা, গন্ধবাজ ফুটেছে অজস্র। ঘন সবুজ পাতার মধ্যে থেকে সাদা ফুল উঁকি দেয়। লাল নিপড়ের আকর্ষণ সহ্য করে, দুপুরের সূর্যকে সহ্য। গন্ধ হাবায় না কেন কে জানে! গাছের তলার মাটিতে ফাট ধরেছে, মালীতে জল দেয় না চরতো, কাজে কীকি দেয়। গাছের আড়ালে নিশ্চেকে লুকিয়ে চুপিচুপি দাঁড়িয়ে আছে শিবানী। গাছ-কোমর বেঁধেছে পরনের লাড়ীর আঁচলে। শুধু মাত্র লালপাড পাংলা তাঁতের লাড়ীপানা এঁটেসেঁটে পরা। নজর ফাট-ধরা মাটিতে, পায়ে বড়ো আঁচলে শুকনো মাটি ভাঙছে। স্থান সেরেছে কখন, ভিজে চুল ছড়িয়ে দিয়েছে শিঠে। কোমর ছাপিয়ে নেমেছে বেশের বাশি। ডান হাতের মুর্যায় গন্ধবাজের একটা শক্ত ডাল। মাটি থেকে চোপ তুললো শিবানী। টোটেব কোশে হাসির ঝিলিক তুলে চোখ-ইশারায় ডাকলো যেন কাঁকে।

নিরাশা এখন এ অঞ্চল। কেউ আসে না। জন-মনিষির চিহ্ন খঁকে পাওয়া যায় না। পাখীর কিচির-মিচির ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। পুকুর-তীরে গোলা পায়বার সারি। কাঠ-কাটা বোদে জল খেতে এসেছে। আকর্ষণ জল পেয়ে একে একে উড়ে পালাবে ডানা ঝাপটে। অন্ধবে চাল-ডালের ভাণ্ডার আছে, তাই পায়বার বাসা ঘরে ঘরে।

শিবানী একবার চমকে উঠলো! পায়বার-ওড়ার পাখা-ঝাপটানি শুনে। বাম হাতের মুর্যায় ছিল বামশাখী মোহর, শিবানীর চমক লাগায় ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে। কেমন যেন আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটলো তার মুখে। গর্জন্তরা চাউনিতে আবেক বার ইশারায় ডাকলো চিবুক নাচিয়ে। ব্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, উর্ধ্বদেহ আনত করলো। এখন সেখান থেকে তুললো মোহর দু'খানি।

চোখে টাটকা কাজল। খি-মনসার গভীর কালো কাজলের দেখায় শিবানীর চোপ যেন দীর্ঘতর দেখায়। চোখের সাদা স্পষ্ট হয়। তারা দুটি চকল যেন।

নিবৃত্ত-নির্জ্ঞান। শুধু ক'টা শালিখ ডাকাডাকি করছে করবীর ডালে সজা সাজিয়ে। করবীর-শাখা হয়ে পড়ছে।

শব্দ নেই চলনের। চোখের ইজিত না পান-রাজা টোটেব ইশারা ঠিক ধরা যায় না। শিবানীর লাল অধরও কিছু চকল। কথা-ফোটায় মুখ; টকটকে লাল ওঠে যেন কত অকুট কথা নাচানোটি করছে। কেমন বিমূর্ষের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে শিবানী।

শিবানীর চোখে যেন সম্মোহন। শিবানীখ থমকে ঝাঁড়োকেই আবার একবার ডাকলো শিবানী। চিবুক বৃকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে।

—ভয় হয়, কেউ যদি দেখে কোথাও থেকে।

সত্যিই ভয়ে ভয়ে কথা বললে শিবানী। দেখলো ইদিক সিদিক। বকফুলের গাছের মগ ডাল পর্যন্ত দেখলো।

—বিড়কিতে আমি কুলুপ এঁটে দিয়ে এসেছি ভেতর থেকে।

শিবানী এখনও ভয়ে ভয়ে করতে পারে না। কথা বলে সশক্তি হয়ে। শিবানীর আপাদমস্তক দেখে নেয় একদৃষ্টিতে। দিনের উজ্জ্বল আলোয় দেখতে পেয়েছে স্বপ্নের স্তম্ভ।

গন্ধবাজের গাছের ছায়ায় বসে পড়লো শিবানী। তবু হাওরার ভিজে চুল শুকাতো দুই হাতে চুলের গোছা ধরে ছড়িয়ে দিলো শিঠ।

শিবানীখ বললে,—রাজমাতা আজ তো দানসজ্জা খুঁজেছেন। যে বা চাইছে তাই দান করছেন। রাজপুত্রিতে আজ হাসির তুফান বইছে। সকলেই খুশী।

—তুমি? হেসে হেসে বললে শিবানী।

—হাসিও খুশী। শিবানীখ কথা বলে আর দেখে যাটের দিকে। কেউ যদি আসে হঠাৎ অতর্কিতে!

—রাজমাতা কি দান করলেন? তোমার কিছু লাভ হয়েছে?

শিবানী প্রায় ফিস-ফিস শব্দে বললে। পঙ্কহীন চোখে তাকিয়ে থাকলো মুখে একটু হাসি মাখিয়ে।

শিবানীখ বললে,—আমি কিছু চাই নাই। কে দান দান ভিক্ষা চাইতে?

খিল খিল শব্দে হেসে উঠলো শিবানী। মুখে দুই হাত চাপলো তৎক্ষণাৎ। হাসি-খামিয়ে বললে,—এসো, একটা প্রণাম করি।

শিবানীখ বললে,—কেন?

সেই হেলিয়ে হাত ছোঁয়ালো শিবানী। মোহর দু'খানি মাটিতে রেখে বললে,—এই নাও বরণ। আমি তোমাকে দিলাম। কথা বলতে বলতে শিবানীখের পাদমূলের ধূলি তুলে কপালে ঠেকায় শিবানী।

আকবরী মোহর। ফার্সী ভাষায় লেখা ছিটকা সিল।

দুপুরের সূর্য আলোয় জলজলিয়ে ওঠে। শিবানী মোহর তুলে শিবানীখের হাতে ধরিয়ে দেয়। শিবানীখ সেই হাত আর ছাড়ো না। শিবানীর নরম হাত, ধীরে ধীরে নিজের হাতে।

—খিড়কিতে কুলুপ, এসেছো কোন্ পথে? চুপি চুপি বললে শশিনাথ। ভয়ে ভয়ে কথা বলছে সে।

—বাশের বেড়া ডিক্রিফেছি তোমাকে ফুল ফুলতে দেখে। ছাপ থেকে দেখতে পেয়েছি।

হাতের সাক্ষি নামিয়ে রাখলো শশিনাথ। বললে,—তোমাকে একবার দেখতে দাও। উঠে দাঁড়াও। কথার শেষে শিবানীর ধরা-হাত ধ'রে টেনে তুললো তাকে।

হাওয়া চলেছে দক্ষিণের। আঙনের ছোঁয়া বেন হাওয়ায়। শিবানীর এলোচুল উড়ছে।

রাজ-অঙ্কুর থেকে জরফরির ভেসে-আসা কীপ শব্দ শোনা যাব মধ্যে মধ্যে। রাজমাতার মৃত্যু তখনও পর্যাপ্ত দান বয়রাতি চলেছে। সোনা, রূপা আর বস্ত্র দান করছেন বিসাদবাদিনী। অক্লান্ত ভাণ্ডার না কি তাঁর। অল্প অল্পে অধিকারিনী তিনি।

—আমাকে আবার কি দেখবে! হেসে হেসে বলে শিবানী। কাজল-কালো চোখের দৃষ্টি ঝিকিয়ে বললে,—তেমন যদি রূপ থাকতো তবু।

—তোমার অনেক রূপ, সচরাচর দেখা যায় না এমনটা।

শশিনাথ মুহূর্তে তাকিয়ে আছে। কথা বলছে চুপি চুপি। কথার শেষে শিবানীর চিবুক ধ'রে তুলে ধ'রলো তার লজ্জাবাত্তা মুখ।

—তোমার পায়ে ঠাই হবে তো? না আমার আশায় বজ্রপাত হবে?

—হী, তুমি আমার হবে।

এক স্বপ্ন মিষ্টি হাসি হাসলো শিবানী। বললে,—এ তোমার মুখের কথা না মনের কথা?

—আমার অঙ্কুরের কথা। এতটুকু মিথ্যা নাই।

—চল এখান থেকে পানাই। শিবানী মিনতির স্বরে বলে। বলে,—কেউ যদি দেখতে পায় কোথাও থেকে! চল এ দিকে, বেসিকে বাশের বেড়া। কারও চোখ পড়বে না।

—ভর দাও তো হাই। কলক বটনার ভয় হয় যে!

শশিনাথ এগিয়ে চলে কথা বলতে বলতে। পায়েচলা পথ ধ'রে এগোয়। ইদিক সিদিক দেখে সাবধানী চাউনিতে।

পেছন থেকে শিবানী বললে,—তোমার মা যদি অজুমতি না দেয়, তখন?

শশিনাথ বললে,—না, তা হবে না। মাকে আমি পত্র লিখে জানিয়েছি, পাত্রী আবার গচ্ছের।

—তবে আমার সাতভাইয়ের ভাগ্য বলতে হবে।

—রাজকুমারী বিদ্বাদিনী আসছে তুমি। জানো কিছু?

—হী, আশে উদ্ধার হোক কহাই খোয়ামীর কবল থেকে। ছোটকুমার গেছে মাঙ্গারণে। দেখা থাক কি হয়।

—কুমারবাহাদুর কালীপঙ্কর বখন যাত্রা করেছেন তখন আর কোন্ চিন্তা নাই।

—এই কথা সকলেই বলে। কাঁটাগাছের বেড়ার আড়ালে ব'সে পড়লো শিবানী। বললে,—বেন ভালর ভালর কিবে আসেন, প্রার্থনা করি।

—তোমার বোঁদ পড়ে যদি অম্বরে? শশিনাথ বললে অল্প

হেসে। বললে,—কেউ যদি ডাকাডাকি করে? রাজমাতা যদি ডাক বেন এখন?

হস্তজঙ্ঘার মুখভরীতে শিবানী বললে,—ডাকলে সাড়া পাবে না। জানবে আমি পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছি। যে হাই বলুক, তোমাকে এখন ছাড়ছি না। তুমি এখন থাকবে আমার কাছে।

—কেন? চুপি চুপি শুধায় শশিনাথ।

শিবানী বললে,—আমার সঙ্গে কথা বলবে। তোমাকে যে কাছে পাওয়া যায় না।

শশিনাথ বসলো বেড়ার আড়ালে, পুকুর-তীরে। বললে,—আমারও সাধ হয় তোমার সাথে দু'দণ্ড কথা বলি। মনের আনন্দে তোমাকে দেখি। ঝানিক খেমে আবার শশিনাথ বললে,—তোমাকে দেখার জন্য আমার মন অস্থির হয়।

অহঙ্কার প্রকাশ করে না শিবানী। গলকলীন দৃষ্টিতে তারিফে থাকে। টোঁটের প্রান্তে মৃদু মৃদু হাসি ফোটার। বলে,—আমারও তাই। আমি জাতে মেয়ে, তাই মুখ ফুটে বলতে পারি না। গুমরে গুমরে মরি।

—মোহর তু'রানি থাক তোমার কাছ। শশিনাথ মোহর কিরিয়ে দিতে চায়। বলে,—আমার স্বত, থাকুক তোমার কাছে।

মাটি-ফাটা বোদ। শিবানীর গাল-গলা যামতে থাকে। বোমরের আঁচলের পাক খুলে মুখ মুহুতে থাকে চেপে চেপে। বলে,—তোমার মনটা বললে বাবে না তো? পুকুরের মন, বলা যায় না, কখন কেমন থাকে।

সলজ্জ হাসি হাসলো শশিনাথ। বললে,—তুমি ঈশ্বরজু হ'তে পারো।

বৃক্কের আঁচল সায়সায় শিবানী। দক্ষিণের হাওয়ায় আঁচল ঝিক থাকে না হয়তো। বলে,—আজ শুক্লতিথির রাতে ছাব্বো আমি এখানে। তোমার অপেক্ষায় থাকবো। আসবে তুমি তখন?

—সাহস হয় না আমার। ভয়ে ভয়ে বললে শশিনাথ। বললে,—রাজপুরীতে কত লোক। ভোড়া ছোড়া চোখকে ঝাঁক দেওয়া যায় না যে! কার কখন নজর পড়ে!

—আমি ভয় পাই না। কেমন বেন বেপবোড়ার মত বললে শিবানী। নিজের হাতখানি শশিনাথের হাতে বেগে কথা বলছে। বললে,—রাতের বেলায় এসো, সারা রাত ব'সে ব'সে কথা কইবো। তোমার কাছে গল্প শুনিবো। চাঁদের জ্যোৎস্নায় দেখবো তোমাকে।

—দেখা থাক, যদি পারি তো আসবো। যিসফিসিয়ে বললে শশিনাথ। ইদিক সিদিক নজর হেনে বললে,—লাল শাউগানা পরবে বল, তবো আমি আসতে পারি।

মৃদু হাসির সঙ্গে ঝানিক অবাক চোলে চেয়ে থাকে শিবানী। বলে,—লাল শাউতে কি মানায় আমাকে?

—হী খুব মানায়।

—তবে রাখবো তোমার কথা।

শিবানী কথা বলতে বলতে বাঁধানো ঘাটের দিকে চোখ ফেঁদে। কাক বেন সূর্য্য দেখতে পেয়ে হাসি চাপে মুখের। বলে,—এখন তবে হাই আমি। পাকশালের জালসা থেকে আমাদেও বড়ায়ী দেখছেন। আড়ি পেতেছেন।

শশিনাথের মুখ বেন বিবর্ণ হয়ে ওঠে। তার চোখের সমুখের

পৃথিবী যেন অন্ধ হয়ে যায় চকিতের মতো। শিবানী কিন্তু হাসতে থাকে খিলখিল শব্দে। হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে যায়।

বড়বাণী। ভাবতেও চমক লাগে শশিনাথের। উমারাবী বচসে দেখেছেন! অজানা ভয়ে আশঙ্কিত হয়ে ওঠে সে। বড়বাণী যদি জানিয়ে দেন বাতাসডোঁতে, যা পেয়েছেন তা যদি ব্যক্ত করেন অন্যরে! রাজাবাহাদুরের কানে যদি তুলে দেন!

—পোড়ামুখী মেয়ে, আমি সব দেখতে পেয়েছি।

শিবানী কাছে আসতেই উমারাবী হেসে হেসে বললেন। তামাসার হাসি তাঁর মুখে। সহাত্রে বললেন,—কি বলে শশিনাথ? এতক্ষণ কি কথা কইলি?

মুখে আঁচল চাপলো শিবানী। চোখ ঢাকলো। কিন্তু হাসি তার থামতে চান না যেন। খিলখিল হাসছে শিবানী।

উমারাবী ভাত চোপ ধ'রলেন শিবানীর। সজোরে চোপ ধ'রে বললেন,—চোব ধ'বেছি, চল তোর সাজা হবে আজ! রাজমাতার কাছে নিয়ে যাবো। কীস ক'রে খেবো সব।

—সোহাট বড়বাণী। তারির ছের তেনে শিবানী অনুযোগ জানায়। বলে,—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি।

—তবে বল শশিনাথ কি বললে। উমারাবী ছের করতে থাকেন নকল গাছাখোর সুরে। বললেন,—শশিনাথ রাজী আছে তোদের বিষয়ে?

মাথা নক ক'রলো শিবানী। ঝানিক থোম থেকে মাথা তুলিয়ে বললে,—হী। তার অপত্তি নেই।

—সোকে তার পছন্দ? মুখের হাসি লুকিয়ে উমারাবী বললেন।

—জানি না আমি।

—আমার কাছে লুকাতে নেই শিবানী। সত্যি কথা বলতে হয়।

বড়বাণী কৃত্রিম রাগের সঙ্গে কথা বলছেন। শিবানী এত বিপদেও কেমন যেন অচাক মানে। বড়বাণীর মুগখানি দেখতে দেখতে। নিখুঁত নিটোল মুগ, কোমরের ছাচে ঢালা। কত কাল থেকে দেখছে শিবানী, তবুও দেখার তৃপ্তি তহনি এতদিনেও। উমারাবীর মুখে অশ্রুত কমনীয়তা, মোহে যেন পরিপূর্ণ। সঙ্গক্ষে দেখলেও অতৃপ্তি আসে না।

—চোর আমি না তুমি? শিবানী এতক্ষণে যুক্তিসহ কথা বলার প্রয়াস পাায়।

—ওরে পোড়ামুখী, তোর মত বড় মুগ নয় তত বড় কথা। বড়বাণী চিবিরে চিবিরে কথা বলেন নকল রাগের সুরে। বলেন,—আমাকে চোর বলিস যে?

—তুমি যে আড়ি পেতে দেখছিলে, তাই।

হেসে ফেললেন উমারাবী। বললেন,—তা বেশ কথা, কি শাস্তি তুই দিতে চাস আমাকে?

ভেবে ভেবে শিবানী বললে,—তোমার মহলে তোমাকে বন্ধী ক'রে রাখতে চাই, যাতে আর কোথাও তোমার চোখ না যায়।

আবার হাসলেন বড়বাণী। বললেন,—আমি যাতে আর এত শূন্য থাকে আসতে না পাই, তাই!

—হী ঠিক তাই। জোরালো স্বরে বলে শিবানী। বলে,—কোথা থেকে তুমি টের পাও, বলতে পারো?

—আমার অন্তর্দৃষ্টি আছে, তা বুঝি জানিস না? আমি চোখ বন্ধ ক'রলে সব দেখতে পাই।

ঝানিক চূপ ক'রে থাকে শিবানী। কি যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বললে,—আচ্ছা বল দেখি, রাজাবাহাদুর এখন কোথায়? কি করছেন?

এক-রাশ কালো মেঘ, কোথা থেকে যেন উড়ে এসে চাঁদের রূপকে স্থান ক'রে নিয়ে যায়। তেমনি লজ্জা, অভিমান না অপমানে উমারাবীর মুখে কালো ছায়া নামে। মুখের হাসি মিলিয়ে যায় অধিকের মতো। চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। অনেক পূর্বের আকাশে দৃষ্টি রেখে বললেন,—রাজা এখন হয়তো নেশার মত্ত হয়েছেন। দরবারের গণীতে ব'সে ব'সে সুরাপান করছেন কি না কে জানে। হয়তো মুসলমানীদের সঙ্গে রসালো ব্যস্ত আছেন। হয়তো তাদের নানা অলঙ্কার পরিয়ে তাদের রূপসুখা পান করছেন।

—আর তুমি কি ক'রছো? অন্যরে লুকিয়ে থেকে সঙ্ক করছো বিবাহ বস্ত্রণা!

—উপায় কি বল। হতাশ কণ্ঠে কথা বলেন বড়বাণী। বলেন,—কে কার কথা শোনে!

শিবানী বললে,—চল তোমার মহলে যাই। এ সব কথা থাক এখন। কথা বলতে বলতে সে দালান ধ'রে এগিয়ে চলে। উমারাবীর একটি ভাত তার হাতে। শিবানী এগোর মস্তর গতিতে। বড়বাণীর মুখে ধমধমে গাছাখা। ঠাট্টা-তামাসার শাছা নেই আর। সুপ্ত ক্রোধ প্রকাশ পায় তাঁর চলনে। নিবে বাওরা তুষের আগুন হঠাৎ যেন জ্বলতে থাকে।

নবাবের মনসবদাররা এসেছে দরবারে। সঙ্গে এসেছে নবাবের আমীল-গুজার।

দরবারের দ্বারে বন্দুকধারী প্রতিহায। হুঁজুন, হুঁদিক থেকে আশা-বাওরা করছে। রাজা কানীশ্বর একমনে আপাণ আলোচনা চালিয়েছেন। তাঁর সমুখে তুলট কাগজের ভূপ। জমির নজা, কানী ভাবার লেখা পরিমাপ।

—সেনামী লক্ষ টাকা; নগর চাই। ততপের জমির বিষয়ে কথা হবে।

মুখ থেকে মুখনল নামিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন। নিজের ডান হাতের আঙুলগুলিতে চোখ বুলালেন। পকাশ বাতির স্বাক্ষ লঠন বলছে দরবারের চাঁদোয়ার। হীরার আঙটি অলঙ্কার করে সেই আলোয়। কমল হীরার শোভা দেখেন কানীশ্বর।

আমীল গুজার আর মনসবদাররা পরস্পরের দিকে একবার দেখানোই করে। কেউ কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারে না।

রাজাবাহাদুর আবার বললেন,—আমার গলামহলের প্রজারা মুসলমান নবাবের কোঁজী খাতার নাম লেখাতে পারে না। নবাবের পক্ষে তারা আত্ম ধারণ করবে, তেমন আশা দেখি না।

মনসবদাররা মনে মনে হতাশ হয়ে পড়ে। একজন বললে,—  
হজুর, তাই যদি হয় তবে তো আপনার গম্ভীরহলে পতুগীজের রাজত্ব  
হবে। তখন আর নবাবকে দুখতে পারবেন না।

—পতুগীজ রাজত্ব, মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে তুলনা হয় না।  
কালীশঙ্কর সাহায়ে বললেন। বললেন,—পতুগীজের অশিক্ষিত  
বর্ষের নয়। তাদের অর্থলিপ্সা থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মবিশেষ  
নাই!

মনসবদারদের মধ্যে থেকে আবার কথা আসে। একজন বললে,  
—হজুরের অনুমান ঠিক নয়। গঙ্গামহলের প্রজারা দেখবেন একদিন  
বিলকুল খুশান হয়ে গেছে।

—খুশানদের তবু সন্ত করতে পারি। নীতি মানে তারা,  
অজ্ঞার অর্থ্য করে না।

হাসতে হাসতে কথা বলছেন রাজাবাহাদুর। কথার শেষে মুখে  
মুগ্ধতা তুললেন। বাম হাতে গৌড়ের প্রান্ত্র পাকাত থাকলেন।  
একমুখ ঘোঁরা ছেড়ে নিয়ে বললেন,—বাই হোক গঙ্গামহলের  
প্রজাদের আশা পরিভাগ করেন।

আমীল গুজার বললে,—হজুর, জমির কথা কি স্থির  
করলেন।

রাজাবাহাদুর হুঁ কুঁচকে বললেন,—ঐ তো বললাম। সেলামী  
চাই নগর এক লক্ষ টাকা। তত্পর কথা হবে।

খানসামা আসে, সোনার থালা হাতে। সুরার পেয়লা  
সাজানো সারি সারি। থালা এগিয়ে ধরে খানসামা, একেকজনের  
সমুখে। যে বার পেয়লা তুলে নেয়। রাজাবাহাদুরের প্রতি  
সম্মান দেখিয়ে পেয়লা কপালে ঠেকার কেউ কেউ। বিড়বিড়িয়ে  
কামনা করে রাজার সৌভাগ্য, সুস্থদেহ।

কালীশঙ্করের চন্দ্র পৃথক পায়। লাল বেলাঘারী কাচের  
সুরাপাত্র। টকটকে লাল রক্ত ঘেন, টলমল করছে। আলবোলায়  
করসি রেখে লাল পাত্র তুললেন রাজাবাহাদুর।

—নবাব এই টাকা দিতে সমর্থ নয়। আমীল-গুজার কথা বলে  
মুখে পেয়লা তুলতে তুলতে।

—তবে, এই প্রদগ উপাশন করেন না আর। এখানেই  
চাপা থাক। কালীশঙ্কর কঠি তিরিয়ে নিয়ে বললেন অহুতাদের  
সুখে।

—বিবেচনা করুন রাজাবাহাদুর। শকাব্দ হাজারের অধিক না  
ওঠেন।

একজন কাননগো কথা বলে মিনতির সঙ্গে। বলে,—আপনি  
হজুর একজন রাজার মত রাজা, আপনি যদি দর কবাকবি করেন,  
আমরা কোথায় বাই!

আর এক চুচুক পাত্র শূন্য ক'রে কালীশঙ্কর বললেন—আপনার  
কথার প্রতিবাদ জানাই আমি। দর কবাকবি আপনারা  
চালিয়েছেন, আমি এক দর বলেছি। সেলামী নগর এক লক্ষ  
টাকা। অগ্রিম দেয়।

—নবাবের সামর্থ্য কুলাবে না হজুর।

আমীল-গুজার কথা বলে আর পাকা দাড়িতে হাত বুলায়।

হো হো শব্দে হেসে উঠলেন রাজাবাহাদুর। গগন-  
বিহারক হাসি হাসলেন ঘেন। হাসতে হাসতে বললেন,—আর

হাসাবেন না মিঞা সাহেবরা, বাঙালার নবাবের দপ্তরে লাখ টাকা  
মিলবে না?

—পরিহাস নয় রাজাবাহাদুর, নবাব এই টাকা সেলামী দিতে  
পারবেন না।

—তবে কত দিতে পারেন? কালীশঙ্কর প্রশ্ন করলেন  
একটোখ বন্ধ ক'রে।

আমীল গুজার বললে,—বিশ পঁচিশ হাজার তক দিতে পারা  
যাবে।

আবার হাসলেন রাজা। হো হো শব্দে হাসতে থাকলেন।  
হাসতে হাসতেই বললেন,—বিশ পঁচিশ নয়, তবে আমি যা বলি  
তাই শুনেন। মাত্র এক টাকা সেলামী দিন নবাব।

কথা শেষ হ'তে না হ'তে আবার হাসি ধরলেন রাজাবাহাদুর।  
হাসি ঘেন কিঞ্চিৎ ব্যস্তমিশ্রিত।

—তাই হবে হজুর? আপনার খুশী রাজাবাহাদুর। আপনি  
যেমন বলবেন।

—না না। এপাশে ওপাশে মাথা তুলিয়ে কালীশঙ্কর  
বললেন,—না না, তাহা হয় না। নবাবের মত একজন গণ্যমান  
আমাকে সেলামী দিবেন কেন? সেলামী আমি চাই না।  
এখন কততে ভ্রমা হবে তাই বলেন।

—বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকার কড়ার।

—ওটাকে চম্পি করুন। আর আপত্তি করবেন না।

—তথ্যস্ত তত্ত্ব। রাজাবাহাদুর, আপনার কথাই থাকবে।

শূন্য পাত্রটা ভর্তি করলেন কালীশঙ্কর। এক চুচুক খেয়ে পাত্র  
নামিয়ে রেখে করসি তুললেন মুখে। বললেন,—জমিটার নবাব কি  
কাজ করবেন?

—খাশনাখানা বানাবেন নবাব। আমীল, ফৌজদার-  
কোতোয়ালের কাজারী বসাবেন। খাজানী, সিকদার আর পায়ককে  
যব তৈয়ারী হবে।

—বেশ ভাল কথা। বললেন রাজাবাহাদুর। দরবারের শীর্ষে  
চানোয়ার চোখ রেখে বললেন,—হু কিস্তি বন্দোবস্তের টাকাটা আগা  
চাই কিয়ক।

—আলবৎ, আলবৎ।

—একসংস চাই। এক কিস্তিতে।

—আলবৎ। আগামীকাল এই টাকা দেওয়া হবে।

—ঐ, তত্পর কাগজপত্রে সই হবে। কথার শেষে মুখের  
তুললেন কালীশঙ্কর। আলবোলায় গর্জন তুললেন। তামাকে  
স্রগন্ধ ভাসালেন।

খানসামা ফলের পাত্র ধরে। রূপার গামলায় আপেল, নাসপাতি  
আঙ্গুর, শা-আলু। কেউ একটা আপেল, কেউ নাসপাতি, কে  
ক'টা আঙ্গুর আর কেউ শা-আলু তুলে নেয়।

কালীশঙ্কর আখরোট গেতে ভালবাসেন, সুরার সঙ্গে। তি  
টার নির্দিষ্ট বেকার থেকে আখরোট তুললেন। রাজার মন খে  
থেকে চঞ্চল হয়ে ওঠে ঘেন! কেমন ঘেন আনচান করতে থাকে  
চিন্তামগ্ন দেখার তাকে। তখন মনে মনে প্রার্থনা জানান,  
কালীশঙ্কর ঘেন নিবিঘ্নে ক্ষিয়ে আসে। সন্তু দেহে।

[তৃত্বত্ব:





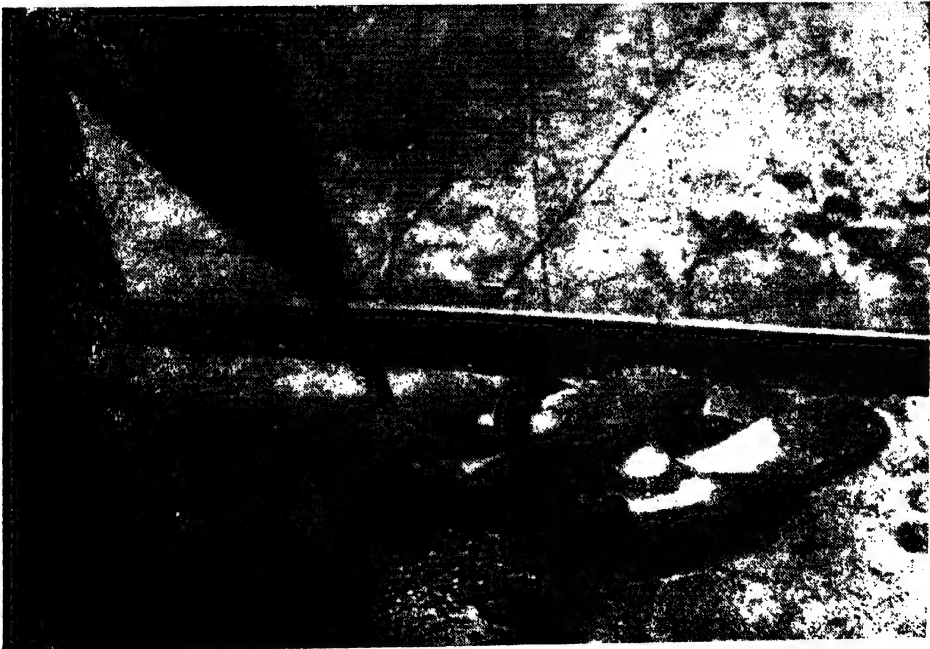
[ ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে  
নাম ধাম ঠিকানা লিখতে ভুলবেন না ]

সিঁড়িলাভ  
—বুজয় বোম



—বখীন বায়

বর্ষার দিনে





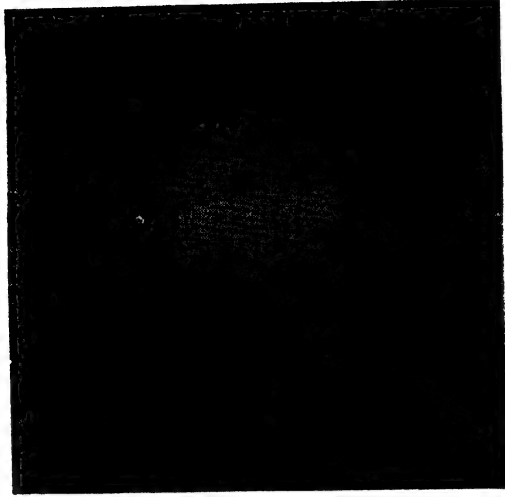


—গোবিন্দজান দাস



ভাই ভো !

ফুলের তোড়া  
—শিবনাথ পাল



ভাগ্যচক্র

—সঞ্জিৎ গোস্বামী





# স্মৃতিচিহ্ন

পরিমল গোস্বামী

দ্বিতীয় পর্ব

১

মিঠানের প্রতি আকর্ষণ ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে আসতে অনেকগুলো দোকান ভিত্তি়ে আসা সহজ ছিল না। দুই বেলা একই ভাবে বিপন্ন হয়ে শেষকালে একটি সহজ সন্ধান আবিষ্কারের চেষ্টা করলাম নতুন পথে। পাবনায় তখন চার পরশায় এক সেব দুদ। আমার সঙ্গে ছিল ঠোভ। এট দুয়ের ঘোঁসাধোগে বিকেলে এক সেব দুদ জালিয়ে ক্ষীর ক'রে খেতে লাগলাম। চা পাওয়া তখন অজ্ঞাত ছিল। পাবনায় কোনো চায়ের দোকান দেখেছি কি না মনে পড়ে না, সম্ভবত দেখিনি। ১১১৫—১৬ সালের পাবনা শহর।

কিন্তু আমার ব্যবস্থিত জলযোগের সেই নববিধান দিন সাতকের বেশি টিকিয়ে রাখতে পারলাম না। নিজ হাতে প্রতিদিনের সংসার করা আমার খাতে নেই। আমার সবই অব্যবস্থিত, এলোমেলো, ব্যতিবেদী। নিতান্ত দায়ে না পড়া স্ববিশি হিসেবের খাতায় হাত ঝুটিনি। অতএব গৃহস্থালীর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বেঁচে গেলাম। মৃদু বীতিতে হট্টেল চলত। পালা ক'রে এক এক জনকে এক এক টোল মেন্স পরিচালনার ভার নিতে হত। এক কাজটি আমার কাছে একটি বিভীষিকা বলে বোধ হত, এড়িয়ে গেলাম।

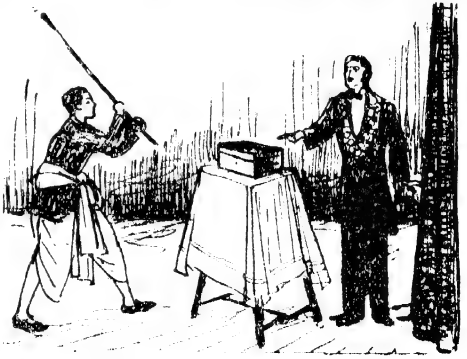
বিকলে কয়েকজনে মিলে বেড়ানো হত নিয়মিত। পদ্মাবতীকেই বেশি, কখনো বাজিতপুর ঘাটে, কখনো সার্কিট হাউসের খে সোজা, কখনো শহরের উত্তরের শড়কে। ইছামতী নদীর পায়ে রাধানগর গ্রামে তখন এডওয়ার্ড কলেজের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্। একদিন সে কলেজ-বাড়ির ভিত্তি স্থাপিত হতে দেখলাম; দ্বিরা শেষ পরীক্ষা দিয়ে চলে আসা পঞ্চম বাড়ি তৈরির কাজ ককদুর এগিয়ে গিয়েছিল।

যতদূর মনে পড়ে, টাউন হলের অঙ্গনে, গণপতি চক্রবর্তীর জিক দেখানোর আয়োজন হয়। উচ্চাঙ্গের ম্যাজিক সম্পর্কে পূর্বে কোনো ধারণা ছিল না। বেদনৌদের ভোক্তবাজি দেখেছি। ম্যাজিকে আমার ভীষণ আকর্ষণ, অতএব গণপতির ম্যাজিকে টিকিনে চুকে পড়লাম। ইলিউশন বজের খেলা দেখে বেশ

মাখায় পড়ে গিয়েছিলাম। অলৌকিকত্ব কোনো বিশ্বাস ছিল না, অথচ নিজের বুদ্ধিতে কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা নেই, এ বড়ই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। যাতুকরের রসস্থিতির ক্ষমতায় পুলকিত হচ্ছিলাম। পর পর তিন দিন দেখলাম, তবু রহস্য রহস্যই থেকে গেল। শুধু এই ভেবে সাহসলাভ করলাম যে কৌশল একটা আছেই, শুধু আমার তা জানা নেই। যারা আত্মিক ব্যাপার বলে বোঝাতে এসেছিল তাদের সঙ্গে কিছু বিরোধ হয়েছিল মনে আছে।

একটি খেলা খুব উপভোগ্য মনে হয়েছিল। যাতুকর ছোট টেবিলে ছোট একটি কাঠের বাজ রেখে খুব খানিকটা বড়তা দিয়ে নিলেন। বললেন, “এর মধ্যে মারাত্মক এক সাপ আছে, এ খেলাটা তাই খুব বিপজ্জনক। দর্শকদের মধ্যে সাহসী যদি কেউ থাকেন তবে উঠে আসুন।”

একজন সাহসী উঠে গেলেন। একথানা হাটি তাঁর হাতে দিয়ে যাতুকর বলতে লাগলেন, “আমি গুয়ান, টি, থি, বলার সঙ্গে সঙ্গে এই বাজ খুব, দেখবেন একটি প্রকাণ্ড সাপ মাথা তুলে আছে, আপনি বিদ্রূৎ গতিতে তার মাথায় এই লাঠির বাড়ি মারবেন। একটু দেরি করলে সাপের হাতে মাথা পড়তে পারেন—অতএব খুব সাবধান! মনে রাখবেন, সাপকে দেখামাত্র মারতে হবে।”—বলে যাতুকর সেই সাহসী লোকটির গায়ের চামড়ার তাঁর কোমরে জড়িয়ে বেঁধে তাঁকে



এই বাজ সাপ আছে, খুলেই তার মাথায় লাঠি মারতে হবে।

লাঠি উঁচু ক'রে ধ'রে কেমন ক'রে কাঁড়াতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। লোকটি হাজার লোকের সামনে হুঁশ কাঁক ক'রে লাঠি উঁচু ক'রে সেই বাজের সামনে কাঁড়িয়ে। সে এক অপরূপ দৃশ্য! সমস্ত দর্শক নীবে, কি পরিণাম ঘটে দেখার জন্য দম বন্ধ ক'রে ব'সে আছে। বাহুর আবার সাহসী লোকটিকে বললেন, "মনে রাখবেন, ভয় পেলে চলবে না,"—ব'লে তিনি আবার লোকটির উত্তত ভঙ্গির কাঁড়ানোকে যথাযথ সশোষণ ক'রে দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে বললেন—“কাঁপবেন না, এইবার প্রস্তুত থাকুন—ওয়ান!”

ব'লে বাহুর নিকটে কিছু কাঁপতে লাগলেন, এবং ভীত স্বরে বলতে লাগলেন, “কাঁপবেন না—ভয় নেই—টু!”

সাহসী লোকটি ততক্ষণে সত্যিই কাঁপতে আরম্ভ করেছেন। বাহুরও কাঁপছেন। তিনিই যেন বেশি ভয় পেয়েছেন। এবারে তিনি একটু দূরে সরে ভীষণ কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলেন—“এইবার আমি থ্রী বলব, ভয় পাবেন না, কাঁপবেন না।”

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সাহসী লোকটির মাথার উপর তোলা লাঠির উত্তত হাত দুখানি ভীষণ কাঁপতে আরম্ভ করেছিল। এইবার দর্শকদের দম বন্ধ করা প্রতীক্ষার তীব্রতা চরমে তুলে বাহুর ভীষণ চিৎকার ক'রে, ভীষণ কঁপে এবং পালিয়ে যাবার ভঙ্গিতে কাঁড়িয়ে, বাজের ডালা এক শঙ্কায় খুলে থা'ব'লেই তিন লাফে সরে গেলেন ওপান থেকে, লোকটি লাঠি মারতে মারতে চট্টাং খেয়ে গেলেন। বাজের মধ্যে সাপ নেই, মারবেন কার মাথায়?

“জ্যাঁ, সাপ নেই? তা হলে আপনি ভয় পাওয়াতে সব গোল-মাল হয়ে গেছে”—ব'লে বাহুর এগিয়ে এসে লাঠিখানা ফিরিয়ে নিয়ে সাহসী লোকটিকে বললেন—“আগুন ফিরে যান।”

এই ব্যাপারটা আগাগোড়াই একটি ধাড়া। সাপের ব্যাপারটা একটা ইন্টারলিউড, বিশুদ্ধ আমোদ সৃষ্টিই ছিল তার উদ্দেশ্য। আসলে ঐ ছোট বাজ থেকে শেষে এত ফুল বেরাতে লাগল যে তিনখানা টেবিলে তার জায়গা হয় না।

ম্যাজিক নিয়ে এর পর অনেক চিন্তা করেছি এবং নিজেরও বাল্যকাল থেকে কিছু কিছু তাদের ম্যাজিক শিখে বন্ধুদের কতবার চমকিয়ে দিয়েছি। অনেক ম্যাজিকই এখন দেখলে তার রহস্যটা বুঝতে পারি, কিন্তু নিশ্চিত বুঝছি যে রহস্য উল্কাটনে কোনো আনন্দ নেই। সামান্য উপকরণকে সঞ্চল ক'রে বাহুর বধন একটা কিছু গড়ে তোলেন, তখন সেই গড়ে তোলাতেই শিল্পীর পরিচয়, ভাঙতে নয়। শিল্পীর ছবি, কবির কাব্য, সবই তো ভাঙি। রঙ্গ-মঞ্চের নাটক দেখি সেও তো ভাঙি। ছবি দেখে মুগ্ধ হওয়ার বদলে যদি চোঁচিয়ে উঠে প্রচার করি ধ'রে কেলেছি; কাগজ, তুলি, আর রঙ দিয়ে এটি তৈরি হয়েছে; কাব্য পড়ে মুগ্ধ হওয়ার বদলে অসুস্থ ভাবে বলি, হ' সব বুঝতে পেরেছি—এ শব্দগুলো অভিধান থেকে সংগ্রহ ক'রে সাজানো হয়েছে—কীকি ধ'রে কেলেছি; তা হলে তাতে শিল্প বা কাব্য-ম্যাজিকের কি কিছুমাত্র ক্ষতি হয়? যে ধ'রে ফেলল, সে নিজের শুধু প্রভাবিত হয় না কি? শিশিরকুমার ভাড়াড়ি রাম দেখেছেন জেনেও কি সেই রামের দুখে আমরা দুখে পাইনি নাট্যমন্দিরে? সেই রামের গায়ে সাবান ঘ'বে শিশিরকুমার ভাড়াড়িক ধ'রে কেলার ঢোকা ক'রেছি কি?

কিন্তু এই 'ধ'বে কেল'ও সন্ধানের জিনিস হয় যদি মাথাটি

নিচু ক'রে শিক্ষার্থীর মনোভাব নিয়ে ধরতে আসা যায়। বিজ্ঞানীদের মনোভাব হচ্ছে এটি। তাঁরাও ধ'রে ফেলার দলে, কিন্তু তা নিয়ে তাঁদের দম্ব নেই, তার মধ্যে 'শো'নষ্ট করার দৃষ্টবৃত্তি নেই, বিশ্ব-ম্যাজিকের অপরিসীম বিময় ধ'ব করার দুরভিলাস নেই। বরং বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য এর বিপরীতই। তাঁরা রহস্য বস্ত ভেদ করছেন রহস্য তত বাড়ছে।

কলেজে কেমিষ্ট্রি পড়তে গিয়েই প্রথমে বিশ্ব-গঠন সম্পর্কে ধারণা কিছু স্পষ্টতর হয়, এবং এটি যে এক বিরাট ম্যাজিকের পর্যায় পড়ে এটি সহজেই মনে আসে। অ্যাটম তখনও অবিভাজ্য ছিল আকরিক অর্থে। অ্যাটম ও মোলিকিউল—পরমাণু ও অণু বস্তুসৃষ্টির পথের আদি এই ছুটি ধাপ আমাদের সম্পূর্ণ নতুন এক ভাববাক্সে উত্তীর্ণ করল। বস্তুর আদিত্যে মাত্র একটি পরমাণু কণিকা, যাকে আর ভাগ করা যায় না, এই শব্দটি তখন আমরা জানি। রাদারফোর্ড তখনো প্রোটনে এসে পৌঁছন নি। বোয়েটগেন-উমগন-বেকেলে-ক্যুরি-গোল্ডস্টাইন এবং রাদারফোর্ড-সডির গবেষণা তখনো ফিজিক্সের পাঠ্য ছেড়ে ইন্টারমিডিয়েট পাঠ্য, সার পি-সি রায় লিখিত, ইনঅরগ্যানিক কেমিষ্ট্রির পাঠ্য আসেনি। স্তবরা আমাদের কাছে (বইতে এবং অধ্যাপকের বক্তৃতায়) তখন অ্যাটমই চরম। সবার উপরে অ্যাটম সত্য তাহার উপরে নাই।

কেমিষ্ট্রি আমার জীবনে এলো একটি পরম আশীর্বাদরূপে। আমার কল্পনা উগাও হয়ে গেল বস্তুজগতের মৌমাছীন রহস্য রাজ্যে। এত বড় ম্যাজিক আর নেই। কেমিষ্ট্রির কবজালাগুলি আমার চোখে ছবির মতো ভাসতে লাগল। পি-সি রায়ের একখানি মাত্র বই, তারই মধ্যে দিয়ে বিশ্বভ্রমণের পাসপোর্ট পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে এলো লজিকের পথ। সেও আমার কাছে এক নতুন জগৎ। সিলোজিসম-এর ধাপগুলোয় কোথায় ফ্যালসি, সিদ্ধান্তে কোথায় ফ্যালসি, লজিকের রীতিতে যাচাই করছি, মাঝে মাঝে বস্তুর সাহায্য নিছি। মাঝে মাঝে কল্পনারাজ্যে হারিয়ে যাছি যতটুকু কম চিন্তা করলে পরীক্ষার ভাল ফল হয়, তা আমা দ্বারা সম্ভব ছিল না, পাঠের যে কোনো অংশ ভাল লাগবে তাকে আশ্রয় ক'রে কল্পনায় উড়ে যেতাম অনেক দূরে।

কলেজের পড়া অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার ছিল এখনে। ভা' পুরনো রিভিউ পরিবেশে আমাদের মধ্যে একটা গভীর আত্মীয়তাবে জেগেছিল, যা পরে আর কোথাও পোলায় না।

হঠাৎ আমাদের নানা বিষয়ে তর্ক প্রায় লেগে থাকত রবীন্দ্র-কাব্য তার মধ্যে একটি প্রধান বিষয়। অতুলানন্দ ও জা রবীন্দ্রনাথকে রক্ষার ভার নিয়েছিলাম। সে সব বালকোণি তর্কবিতর্ক, তার রেকর্ড থাকলে আজ নিশ্চিত বোঝা যেত রবীন্দ্রনাথ তার অপেক্ষায় ব'সে না থেকে নিজ ক্ষমতাতাই : হয়েছিলেন।

বাই হোক, এই উপলক্ষে অতুলানন্দের সঙ্গে একটা বি অস্ত্ররক্ষতা গড়ে উঠল এবং আজও সেই ১৯১৫-১৬ সালের কয়েক পাণ্ডুর বন্ধুদের মধ্যে সেই একমাত্র বন্ধু যাকে এখনও দেখতে প তার নিজস্ব প্রতিভার চোরা পথে আমি এককালে বাধা দৃষ্টি : তাকে গ্রহণকার হতে প্রলুব্ধ করেছিলাম, এবং সে পথের অনেক :

আভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর সে সেই দুই প্রভাব বর্তমান অনেকখানি কাটিয়ে উঠে আশ্রয় হয়েছিল। সে সব কথা পরে বলা যাবে বখাসময়ে।

১১১৬ সালে অনেক দিক বিবেচনা করে আমাদের রতনদিয়াতে বাস করা স্থির হল। বিধে দুই জমি নিয়ে তাতে বাড়ি উঠল। বাবা এ বিষয়ে নিশ্চয় ছিলেন। তাঁর মতে, কোথাও স্থায়ী বাস অর্থহীন। ভবিষ্যতে যাব যেখানে খুশি থাকবে, কাউকে কোথাও বেঁধে রাখা ঠিক নয়। তখনকার দিনে পাড়াগাঁয়ের লোকের নগদ টাকার অভাব, তাই জমি কিনতে চাইলে যত ইচ্ছে পাওয়া যেত। ধানের জমি খুব শস্তা ছিল। এমন অবস্থায় অল্পায়াসে প্রায় জমিদার হয়ে বসে যেত তখন। বংশ বংশ ধরে নিশ্চিন্ত কিন্তু বাবা ঠিক এরই ঘোর বিরোধী ছিলেন। বাবাবরী বৃত্তি সম্ভবত সবাইই মজাগত ছিল। এখন ভাবি, তা না হলে আজ কি হত? কোনো জমিতেই মূল প্রবেশ করানো হয়নি বলেই আজ হয়তো অস্তিত্বটুকু বজায় আছে।

বাবা পড়াশোনায় ডুবে থাকতেন। নানা ভাষা শিক্ষা তাঁর একটি নেশা ছিল। উচ্চারণ শিক্ষায় একান্ত নিষ্ঠা। ইংরেজী গান্ধত ফাসি—সব বিপুল উচ্চারণ হওয়া চাই। ম্যাট্রিক ক্লাসে তিনি আমাদের সংস্কৃত অনেক ছকের সূত্র সমেত শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এই সবই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান আনন্দ। ইংরেজী বলতেন খাটি ইংরেজের অধিকরণে।

টেট পরীক্ষা শেষে বাড়ি এসেছিলাম, ফিরে বাবার সময় গেলাম হুটে, কুটীয়া থেকে। রাজবাড়ির দুজন ও পাংশার একজন মহাপাত্রী ছিল সঙ্গে। গভাই নদী পার হয়ে সাত আট মাইল বা দারও বেশি হাটেতে হবে। যত এগিয়ে চলেছি তত দেখছি মাঠের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু আগুন আর আগুন।—কুহুম ফুলের আগুন। কুহুম ফুল এক ক্রম রক্তক ফুল, জানতাম না তার চাষ এখানে এমন ব্যাপক ভাবে। দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ শুধু এই কুহুম ফুলে ছাওয়া, কিছু কিছু রবের হলুদ ফুলের মিশ্রণও আছে। যেন লালের সঙ্গে হলুদ মশালে যেমন রং হয় কুহুম ফুলের রং তেমনি। নীল আকাশের পাঁচটা থেকে সোনালি রোদ যেন নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে সেই রঙের সমুদ্রে। চোখ ঝলসে যায় এমন তার ঔজ্জ্বল্য।—কুহুম ফুলের এমন ব্যাপক চাষ আগে দেখিনি, পরেও না। এরই মধ্যেকার গায়ে চলার পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। সেদিন রঙের রাতে এরই পাছাকাছি স্থানে এই আকাশেরই নিচে সূতার ভকুট দেখেছিলাম, মাজ সেখানে সেই একই প্রকৃতির প্রসঙ্গ অভ্যর্থনা দেখছি। মন গর উঠল।

কুটীয়া থেকে বেলা সাড়ে নটায় রওনা হয়ে বিকেলের দিকে গিয়ে পৌছলাম পাবনা শহরে। পদ্মা পার হয়েছিলাম খেয়া নাকায়।

এর পর কয়েক সপ্তাহ ধরে শুধু পড়ার পালা। আমরা কয়েক-ন মিলে বিকেলে বেড়াতে যেতাম পরীক্ষার পড়া ছেড়েও। পথের মাঝে আমগাছের নিচেই জমি খরা মুকুলে আজর। তার দিকতাপূর্ণ গন্ধে মন উদ্ভাসিত হয়ে যেত। হাজার হাজার গাছের গন্ধ অদৃশ কোকিলের গান তার অজস্র আমের মুকুলের

সেই উগ্র গন্ধ—এই পটভূমিকে টেলে “Milton! thou shouldst be living at this hour” পড়ছি চেঁচিয়ে! ওয়ার্ল্ডসওয়ার্থ ১৮০২ সালে মিলটনকে ডেকেছিলেন ইংল্যান্ডের বিশেষ প্রয়োজনে। কিন্তু তার শতাধিক বছর পরে সেদিনের সেই ১১১৭ সালের পাবনা শহরে, এক আই-এ পরীক্ষার্থী বালকের কাছে, সে ডাকের সঙ্গে পরীক্ষা পাস ভিন্ন শব্দ মেলাবার আর কি দরকার ছিল ভেবে দেখিনি। বসন্ত কালের সেই উদ্ভাসিত পরিবেশে মিলটন কেন, অতীত কালের সকল দেশের সকল কবির বেঁচে থাকার দরকার ছিল; আর কোনো কারণে নয়, শুধু পাবনা শহরের বসন্তকালের গ্রাশ নিতে আর কোকিলের ডাক শুনে।

পরীক্ষা শেষে কত বড় মুক্তি! প্রথমে বিশ্বাসই হয় না যে রাতে আর পড়তে হবে না। হঠাৎ চমকে উঠি, এখনও বসে আছি, এখনও বই খুলিনি? অবশ্য বই আমি সামান্যই খুলছি। নেট মুখস্থ করিনি কোনো দিন, সে ক্ষমতাও ছিল না। অস্ত্রের ভাষা নিজের বলে চালানো ভাল লাগত না। নিজে যেটুকু বুঝেছি মাত্র সেইটুকু লিখতে পারতাম, না বুকে কিছুই লিখতে পারিনি। কোনো রকমে পাস করার ব্যাপার।

হস্টেল থেকে চিরবিদায়। দু’দিন ভীষণ হৈ হুল্লাড় চলল। তারপর বিদায়ের আয়োজন। তখনকার দিনে ময়মনসুর শহরে উপভোগের উপায় নিজেদেরই উদ্ভাবন করে নিতে হত। তখন রিলায়েন্সন মানে ঘুম, লিবারেশন মানে হৈ হৈ চিংকার। এখন যেমন সিনেমায় বসলে একই সঙ্গে দুটো প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, তখন তা ছিল না, কারণ তখন সিনেমা ছিল না। ঘোর সেকেন্ডে ব্যাপার।

বিদায়ের আগের দিন তারাপদ সান্তালের মাথায় বায়ুর প্রকোপ দেখা দিল। সে ঘর থেকে খান দুই তন্তাপোষ টেনে বের করে উঠানে গেটের কাছে রাখল। তারপর প্রত্যেকের পায়ের হুতিন জোড়া করে জুতো এনে জড় করল তার উপর। লম্বা দড়ি টাঙিয়ে তাতে সবাই জামাকাপড় ঝোলাল। তারপর একটি টিন বাজাতে বাজাতে ‘নিলাম! নিলাম!’ বলে চোচাতে লাগল। খন্ডের জুটে গেল কিছু। তার সীঁরিয়াস। নিলামওয়ালার আপত্তি ছিল না বেচে দেওয়ায়।

আমরা চার পাঁচজন যারা ষ্ট্রিমারে গোয়ালন্দে দিকের বাড়ী, ঠিক হ’ল পরদিন সকালে রওনা হব। ঘোড়াগাড়ি এলো দুখানা। তারাপদ আমাদের সঙ্গী, তার বাড়ি বরখাপুর, তাকে নামতে হবে



যতুয়া গায়ে পাগড়ি মাথায় হ’কে টানতে টানতে চলল।

খলিলপুর (পাবনা), আমাকে নামতে হবে বেলগাছি (যশোর)। একটি ষ্টেশনের ব্যবধান। তারাপদ বলল, “আমি শহরের মধ্যে গাড়িতে উঠব না, তোমাদের গাড়ির সঙ্গে হেঁটে যাব এবং শহর ছাড়িয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠব। কি তার উদ্দেশ্য তখন বুঝিনি, একটু পরেই বোঝা গেল। সে ফতুয়া গিয়ে ধাঁটুর উপর কাগড় তুলে মাথায় পাগড়ি বেঁধে চলল হেঁটে তার লম্বা ছাঁকোটি টানতে টানতে।

তার পর ষ্টামার পদ। তারাপদ একাই জমিয়ে রাখল গল্প ক’রে গান গেয়ে। কিন্তু তার আরও একটি প্রধান ভূমিকা তখনও বাকী। এই গানেই তার শেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে সে বিদায় হয়েছিল, তারপর এখন সে কোথায়, তা আর জানি না।

যতদূর মনে পড়ে সাতবেড়ে ছেড়ে কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর আমাদের ষ্টামার গেল চড়ায় আটকে! মার্চ মাসের শেষ তখন, পদ্মার বকে তখন কত চর জেগে উঠেছে। তাদের এড়িয়ে এড়িয়ে খুব সাবধানে চলছিল ষ্টামার, কিন্তু এড়ানো গেল না। ঘণ্টা দুই পরে গন্তব্যে পৌঁছে যাব আশা করছিলাম, এমন সময় এই বিপদ! খাওয়ার চিন্তাই তখন বড় হয়ে দেখা দিল। তারাপদ বলল, কোনো চিন্তা নেই।—সে উঠে গেল বাব্বা করতে।

ফিরে এলো মিনিট দশকে পার। বলল, সব ঠিক আছে। ঠিক আছে, মানে, সারোত্তর কাছে গিয়ে সে আমাদের কয়েক জনের জন্ত খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক ক’রে এসেছে। ষ্টামারে তখন রান্না হচ্ছিল। খালানীদের জন্য এই রান্নার সোভানীর গন্ধ ষ্টামারযাত্রীর পরিচিত। ইতিপূর্বে সে গন্ধই পেয়েছি, এবারে স্বাদ পাওয়া গেল। খিচুড়ী, প্রচুর পোহাজ সংযোগে রান্না। আরও শুনে অবাক হলাম, এ জন্ত কোনো পরসাদ লাগবে না।

এক বেসা চেষ্টার পর ষ্টামার চড়ার বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। আমি বেলগাছি ঘাটে নামলাম বিকেলে। আমার সঙ্গে একটি বড় ট্রাক ছিল, তাতে বই ছিল অনেক, বেশ ভারী সে বাস। বেলগাছি ঘাটে মুটে ছিল না একটি। যাত্রীদের সাহায্যে বাসটি নিচে নামিয়েছি, কিন্তু তারপর?

একটি স্থলের জায়, যতদূর মনে পড়ে ঐ ষ্টামারেই ছিল কিংবা হয় তো বা শূন্য থেকে আবির্ভূত হল আমার প্রয়োজন। সে কাছে এগিয়ে এসে বলল, চলুন বাস আমি নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছি। আমার অসহায় অবস্থা দেখেই সে সব বুঝতে পেরেছিল। মুখগানা শান্ত এবং গভীর। বলল, বাস আমার মাথায় তুলে দিন। আমি বললাম “সে কি ক’রে হবে, বাস ভারী এবং রেলস্টেশন মাইলখানেক।” সে শুধু বলল, “আমার কষ্ট হবে না, তুলে দিন।” না দিয়ে উপায় ছিল না।

ছেলেটি সেই প্রায় আশ মণ ভারী ট্রাকটি মাথায় বয়ে বেলগাছি ষ্টেশনে এনে নামিয়ে দিল। দলবান জানাবার রীতি তখন পল্লীতে প্রচলিত হয়নি। কৃতজ্ঞতা জানাবার আর কোনোই উপায় ছিল না। তার হাতটি ধ’রে চেপে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। হয় তো পেল কিছু, হয় তো পেল না, কিন্তু সে দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে সে চলে গেল। অপরিচিত শত শত অতি সাধারণ স্থলের ছেলেদের সে এক জন, কিন্তু কি অসাধারণ। কোথায় তার বাড়ি, কি তার নাম, কিছুই মনে নেই এখন। জানবার অবকাশ পেয়েছিলাম কিনা তাও মনে পড়ে না। অথচ কি

আশ্চর্য, শ্রদীর্ঘ চল্লিশ বছরের দূরত্বে থেকেও সে আজ আমার মনের এক কোণে কত বড় একটা স্থান অধিকার ক’রে আছে।

কলেজ জীবনের গোড়াকালেই সম্ভবত, সঙ্গীতী কাগজে কিছু কিছু লিখছি মনে পড়ে। সন্দেহের অসঙ্গতি বিষয়ে মন খুব আলোড়িত হয়েছিল জাতিভেদ প’ড়ে। লেখার বিষয়-বস্তুতে নতুনত্ব ছিল না, কিন্তু তাতে যথেষ্ট উজ্জ্বল ভোগ হয়েছে। “স্থানীয় সংবাদ” এর পর, এই প্রথম আমার নিজস্ব মত, লেখার সঙ্গে যুক্ত হল।

গল্প বা উপন্যাস পাঠে আমার খুব আকর্ষণ ছিল না, আমার শুধু প্রবন্ধ পড়তে ভাল লাগত। ভারতবর্ষে প্রকাশিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লেখা প্রথম থেকেই পড়ছিলাম। এই প্রবন্ধগুলি আমার কাছে খুব ভাল লাগত। প্রাথমিক জগৎ, বাস্তব জগৎ-এর বস্তুব্য বৃত্ততে চেষ্টা করতাম খুব মন দিয়ে। কলেজেও পাঠ্য উপন্যাসখানায় খুব মনোযোগ দিইনি, আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল ষ্টীল অ্যান্ডিসনের রচনাবলি। গল্প বা উপন্যাস বিষয়ে আমার এই মনোভাব আমি বিশ্লেষণ ক’রে দেখেছি। গল্প উপন্যাসে বর্ণিত কোনো বেদনা বা আবেগময় মুহূর্ত আমাকে একটু বেশি পরিমাণে বিচলিত করত, তাই দুঃখ-বেদনার কাহিনী আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। ১৯২১—২২ সালে যখন আমার ছোট বোন মঞ্জুর বয়স প্রায় চার, সেই সময়ের একটি দৃশ্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। বাবা তাকে ‘পুতান ভূতা’ পড়ে শোনাতেন যোজ। ঐ গল্পটির প্রেক্ষিতে মঞ্জুর ভীষণ সোভ ছিল, অথচ পূর্বে কাহিনীটি সে সহ্য করতে পারত না, কেনে ক্ষেপত। শেষে সে নিজেই আবিষ্কার ক’রে নিয়েছিল, কেনে ফেলার জায়গাটায় অর্থাৎ যেখানে আছে—

“লভিয়া আরাম আমি উল্লস, তাহারে পরিল করে

নিল সে আমার কালব্যাপিতার আপনার দেহ-পরে।”

এইখান থেকে শেষ ছন্দ—“আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোহ পুতান ভূতা।” পঞ্চম যদি সে না শোনে, তা হলে আর তাকে কানতে হয় না। তাই সে, “হাবে দেশে ফিরে, মা-আকুবানিরে দেখিতে পাইবে পুন” অবদি শুনেই বাবার মুখ চেপে ধরত। দিনে দু’তিনবার এটি শুনতে হবে, এবং প্রত্যেকবার শেষ দুই মুখ চেপে ধরা চাই।

আরও একটি কবিতা সম্পর্কে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। বাবা মঞ্জুরকে একদিন বধু কবিতাটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। তখন সে গভীর হয়ে যায়। তারপর এক সময় দেখা যায় সে বিছানায় একা শুয়ে শুয়ে কানছে। অনেক জেরা ক’রে জানা গেল বধুর হৃদয়ে সে গভীরত। “একটা আলোও দেয় না তাকে?—কেন দেয় না?” বলে আবার কানতে লাগল। কবিতাটির শেষ দিকে আছে—

“দেবে না ভালবাসা দেবে না আলো।

সদাই মনে হয় আঁখার ছায়াময়

দীঘির সেই জল শীতল কালো,

তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভাল।”

বধুর এ দুঃখ শিশু মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল। আমার নিজের মনের কিছু প্রতিবিম্ব দেখেছিলাম এই দুটি ঘটনার মধ্যে। কিন্তু এ তো অনেক পরের কথা। আমি খাসময়রে নিজের সম্পর্কে অনেকখানি সত্যক হবার চেষ্টা করছিলাম খুব মনোযোগের সঙ্গে।



প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে আদর্শবাদ চুকছিল মনে। বিদ্যার তৌবক বাদ পড়েছিল, চুল খাটো ক'রে ছাঁটা, পায়ে ক্যাথিসের জুতো। এসবই প্রকৃষ্ণর প্রভাব। প্রকৃষ্ণর উপর বিবেকানন্দের প্রভাব। মাস দুই কৃচ্ছ সাধন করেছিলাম টিকট।

মনোজগতে ভাগ্যগড়ার কাজ চলছে অবিরাম।

পাবনা থেকে রতনদিয়া আসবার পর এক মাসের জ্ঞান রতনদিয়া আইনের স্থলে হেড মাস্টারের পদে নিযুক্ত হলাম। স্থায়ী হেডমাস্টার করিপর চট্টোপাধ্যায় ছুটি নিয়েছিল, তাইই স্থানে। পড়াতে আমার খুব ভাল লাগত এবং কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ বুঝিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত চুপ্তি হত না। এই আমার প্রথম চাকরি—বেতন পেলাম ত্রিংশ টাকা।

তখনকার দিনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলেই আই-এ বা আই এমসি, সেট পাস করলে ডিগ্রীর জ্ঞান পড়া, এবং তার পরেও লামখা থাকলে আইন পড়া অথবা এম-এ বা এম এমসি। এ বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন ছিল না, একেবারে স্বতঃসিদ্ধ, কেন না তখন ছাত্রদের জ্ঞান আর কোনো পথ ছিল না। অতএব ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল তখনকার দিনের শেষ লক্ষ্য। সাহিত্যে বার কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই, তাকে বিশ্বসাহিত্যের রস পান করতে হচ্ছে অনিচ্ছুক বোগী যেমন ভাবে পান পান করে হেমননি ভাবে। জীবনে কোনো উদ্দেশ্য নেই, যেমন ক'রে হোক কিছু উপাঞ্জনের ব্যবস্থা করা। আর এই জ্ঞান পড়া অনেকের কাছে বিভীষিকা ছিল। একজন চার ডাক্তারি পড়তে আরম্ভ করল, কিন্তু বছর তিনেক পরে পুলিশের চাকরি পেয়ে চলে গেল। পড়ার সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক ছিল না, শিক্ষার লক্ষ্য সাধারণের পক্ষে ছিল শুধু একখানি ডিপ্লোমা।

নিজের কথাও এই একই। কোনো অ্যাডিশন নেই, জীবনের লক্ষ্য কিছুই স্থির নেই, পাঠ শেষে সেটি ভাবা যাবে, তার আগে জীবনের কোনো প্রশ্নই নেই কারোই ছিল না। অতএব বি-এ পড়তে এলাম কলকাতায়।—সেটি ১৯১৭ সালের জুলাই মাসের প্রথম। এবং এইখান থেকে আমার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল বলে আমার বিশ্বাস।

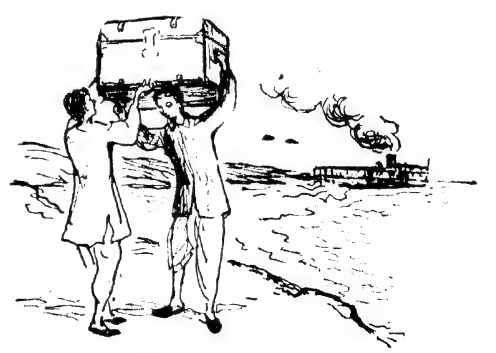
ভর্তি হতে এলাম মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। কিছুদিনের মধ্যেই এর নাম বিজ্ঞানগণ্য কলেজ হয়। এই কলেজটিকেই বেছে নিয়েছিলাম কেন তা এখন আর মনে পড়ে না, এসে কোথায় উঠেছিলাম তাও মনে পড়ে না। এরকম ছোটখাটো ছ একটি ঘটনা মনে থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। মনে করিয়ে দিলে হয়তো আমার সব জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথা বলি, এটি মনোবিজ্ঞানীদের কাজে লাগতে পারে। পাবনা কলেজের দক্ষিণ দিকের অনেকখানি জমি আমার মৃত থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিল। বড় রাস্তাটা কলকাতায় গিয়ে শেষ হয়েছে, পাবনা ইনস্টিটিউশনটি ঠিক কোন জায়গায়, ঠিক বেয়ে কলনার কলেজ পর্যন্ত এসে আর এগোতে পারি না। ঠিক দুটি বছর এইখানে ঘোরাফেরা করেছি, এর প্রত্যেকটি ইঞ্চি আমার পরিচিত ছিল। এই এলাকাটা মনে আনতে কিছুদিন লাগে, কি চেষ্টাই না করেছি, এবং না পেরে ছটফট করেছি। কিন্তু মৃত্যুর কাছে এমন পরাজয় এর কোনো অর্থ হয় না। ভীষণ

মন খাড়াপ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে হল অতুলানন্দ হকুবর্তী ছিল পাবনার স্থায়ী বাসিন্দা, তাকে জিজ্ঞাসা করি না কেন। পাবনা পথায় লেখার আগে আমার অল্পবয়সে অতুলানন্দ পাবনার বড় রাস্তাটির একটি মাথা আঁকতে আরম্ভ করতেন একটি বিদ্যায় বলকের মতো সবখানি বিমুগ্ধ এলাকা আমার মনের চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তার মধ্যে পাবনার প্রকাণ্ড খেলার মাঠটি ছিল। এই মাঠে ব'লে ফুটবল খেলার মরশুমে বড় বড় মাচাখেলা দেখেছি, পাবনা কলেজের জয়ে উল্লাসে ফেটে পড়েছি। এ মাঠের সঙ্গে অন্তরের যোগ ছিল। অথচ এমন ক'রে ভুলে গিয়েছিলাম সব। শুধু মনে পড়েনি তাই নয়, এরকম যে একটি শ্রিয় স্থান ছিল, যেখানের প্রত্যেকটি গাছ আমার পরিচিত ছিল, তার অশ্রুটি কোনো আভাসও মনে পড়েনি। সেদিন একটি মুহূর্তে সব কিংবে পেলাম। হয়তো আপনা থেকেই কোনো এক শুভ মুহূর্তে এই বিমুগ্ধ জায়গাটির অতিশ্রিয় মাঠ, পথ, গাছপালা, ডাকঘর, এম-ব্যাঙ্কমেট, পাবনা ইনস্টিটিউশন, ইচ্ছামহী নদী, তার উপরকার ব্রিজ সমস্ত স্মৃতিতে জেগে উঠল, কিংবা হয়তো কোনো দিনই আর এসে কিংবে পোতাম না। স্মৃতির এই শূন্যতা এখন বহু জায়গায় ঘটেছে। সে সব জায়গায় আলো নিবে গেছে। কখন কোনটা জলবে ঠিক নেই, কোনটা জলবে কি না তাও ঠিক নেই। তবে সেদিন একটি ছোঁয়া লেগে যখন সব দপ ক'রে জলে উঠল, তখন আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মধুর স্মৃতি বিজড়িত একটি হারিয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য প্রাপ্ত স্মৃতিতে আমার পুনর্গমন ঘটল যেন।

এই যে বিমুগ্ধ বিদ্যার ক'রে হঠাৎ এক একটি ভুলে যাওয়া মুহূর্তকে ফিরে পাওয়া, এরই কথা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বার বার স্মরণেছেন তার নানা কবিতায়। “They flash upon that inward eye”—এই কথাটির মধ্যে পাওয়া যায় এর মাধুর্য, ভুলে যাওয়া মুহূর্তগুলিকে ফিরে পাওয়ার মাধুর্য।

কলেজে ভর্তি হওয়ার দিনটি পরিষ্কার মনে আছে। ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে দেখি রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি দরকার হয়, এবং আরও ভুললাম খেলাড়ায় ভাল হলে তার আবেদন অগ্রাহ্য করা হয় না।

ফর্মে খেলার জায়গায় লিখলাম বিশেষভাবে জানি ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি। ফুটবল শেষ খেলেছি সম্ভবত ১৯০৮ সালে, সে সময়ে ডান পায়ে হাড় (টিবিয়াতে) চোট লেগে ভেঙে যাওয়ার



বাক্সটি তার মাথায় তুলে দিলাম।

মতো হয়েছিল। আখ্যাত লাগা জায়গার হাড় বানিকটা উঁচু হয়ে ছিল। ক্রিকেট খেলছি এই সময়েই গ্রাম্য ব্যাট বল দিয়ে, হকি খেলা তখনও দেখিনি। লিখে তো দিলাম, ভাবলাম যদি কখনো ডাক পড়ে, বলব, জানি কিন্তু খেলব না।

রেজিষ্ট্রেশন নম্বরটি নিয়ে হল মুশকিল, এটি সঙ্গে আমি নি। দরকার হয় খেয়াল ছিল না, অথচ দেখি হলে ভর্তি অনিশ্চিত। বুদ্ধি খুলে গেল। ভাবলাম, এখন আর তো কেউ চ্যালেঞ্জ করছে না, এখন যে-কোনো একটি নম্বর বসিয়ে দিই, পরে জানালেই হবে ভুল হয়েছিল। একটি কাল্পনিক নম্বর বসিয়ে দিলাম। সে নম্বর আজও বদলের দরকার হয় নি।

৩০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপর তলার ছিল কলেজের মেস। এই মেস-এর দোতলার বড় ঘর যেটি পথের ঠিক উপরে, সেইখানে আরও চার জন ছাত্রের সঙ্গে পেলাম একটি সীট। আমার সীটটি একেবারে পথের ধারে—ছাত্রদের পক্ষে খায়াপ, কিন্তু আমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল মনে হল। তার কারণ এত দিন থেকেছি পোলা জায়গায়, এখন হঠাৎ তার সম্পূর্ণ বিপরীতকৈ মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। তাই পথের উপরের বাসস্থানটি আমার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ বোধ হল। নদীর ধারে ব'সে বালককাল কেটেছে, আবার এসে বসলাম আর এক নদীর ধারে। এখানে মিনরাত বয়ে চলছে জীবনের স্রোত। বিছানায় ব'সে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কেটে যেত স্রোতের মতোই বেগে। আমি জানতাম আমার গৃহসীমার তাঁদের পছন্দ মতো সীটগুলো আগেই নিয়ে নিয়েছিলেন, তাঁদের অন্তঃস্বিকৃত সীটটি আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা জানতেন না এই সীটটি না পেলে আমার পক্ষে সে ঘরটি জেলখানা মনে হত।

ব'সে ব'সে চলমান জীবন-স্রোত দেখায় আমার রাস্তা ছিল না। দেখতে দেখতে হঠাৎ চেতনা হত, পথের স্রোতের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া মনকে ফিরিয়ে আনতে হত বহু ক'সে। মনের এমন এক একটি অবস্থা আশা সস্তব, যখন মন প্রকৃত থাকে, সব ভাল লাগে। খুব কচ্ছের দৃষ্টিতে স্বার্থের সাংঘাত বা অন্তঃস্বিকৃতির উদ্ভাসীনতায় যে মায়াবী অত্যন্ত বিবর্তিত, যার সম্পর্ক এভাবে পারলে আমার, সেই লোকটিকেও তখন অত্যন্ত সুন্দর মনে হয়। 'বিশেষ' থেকে মনকে এ ভাবে বিচ্ছিন্ন ক'বে নেওয়া অসম্ভব নয়। সমস্ত মায়াবীর মিলনে যে অখণ্ড একটি মানবতার সত্তা তাকে দেখতে পেলে তখন প্রত্যেকটি বিশেষ মানুষকে তার একটি অবিহার্য উপাদান ব'লে চেনা যায়।

আমার নিজের সম্পর্কেও এই কথা। সেট সে দিনের আমিকে আজ আমি এই ভাবেই দেখছি। আমি অখ্যাত একটি মানুষ, কিন্তু বিশ্বপরিভ্রমণ আমার স্থান তুচ্ছ নয়। সবার সম্পর্কেই এ কথা সত্য। অতএব আমি যে আমিই, এ জ্ঞান আমি লজ্জিত নই। আমার গর্ব শুধু এটাই যে, আমার জীবন যে স্থান ও কালের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে, সে স্থান ও কালের পুনোরা আনা অংশ হয় তো বা আমার মনেইই সৃষ্টি। প্রত্যেকটি মানুষের মনেই এই জগৎ রচনার ক্রিয়া চলেছে।

৩০ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপরে ব'সে আমি প্রত্যেকটি মানুষকে সুন্দর দেখছি। কখনো এমন কল্পনা ক'রেছি যে আমি অস্ত গ্রহ থেকে এসে সম্পূর্ণ নতুন চোখে যদি এই সব বাড়ি ঘর

মানুষকে দেখতাম তা হলে এদের কেমন লাগত। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এ কল্পনার পথে অনেক দূর এগিয়ে শেষে ভয়ে ফিরে এসেছি। চেতনা ফিরে এলে নিজেকে ফিরে পেতে দেবি হত। আমি কোথায় আছি তা বুঝতে দশ পনেরো সেকেন্ড কেটে যেত।

এ রকম চেষ্টা আর করিনি।

তখন মোটার গাড়ি খুব বেশি চলত না, মাঝে মাঝে দু'-একখানা। পথের ভিড়ও আজকের মতো নয়। কিন্তু তখনকার দিনের সেই ভিড়কেই যথেষ্ট মনে করা হত। ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যের কাছে একটি মজার গল্প শুনেছিলাম। তাঁর সঙ্গে একবার পাড়াগায়ের একটি লোক কলকাতা এসেছিল। সে শিরালদহ ষ্টেশনের বাইরে এসে পথের ভিড় দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল 'আজ কলকাতার হাট না কি?' যেচারা হাট ভিন্ন এত লোক এক সঙ্গে কখনো দেখে নি।

লক্ষ্য করলে সত্য ক'বেচিত্র। নটার পর থেকে তখন যে কেরানী-কুল ডালগৌসি স্বয়ংস্বের দিকে ছুটত, তাদের গোষাক অস্ত্র রকম ছিল। পায়ে চকচকে জুতো, ক'সে ফিতে বাঁধা। গায়ে শার্টের উপরে ওপনব্রেস্ট কোট, বোতাম আঁটা নয়। দৃষ্টিতে মালকোঁচা মায়া। এই ছিল তাদের সাধারণ সাজ। বেশ একটা স্বকীয়তা। গোষাকের এই চরিত্রের এখন বদল হয়েছে। তখনকার পথের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা ছিল প্রায় নারীবর্জিত, আধুনিকাদের দেখা মিলত না-আদৌ। একেবারে দুর্লভদর্শন। ট্রামে নয়, দোকানে নয়, কলেজে নয়, ইউনিভার্সিটিতে নয়। দৈনিক একটি দেখলেই যথেষ্ট মনে হত। কলেজের ছাত্রীরা তো শকটগ্রস্তা ছিল, তখনকার মেয়ে স্কুলের নাম 'পর্দা' স্কুল, নইলে ছাত্রী হত না। তখন যুবকদের প্রেম করতে হত বিয়ে করার পর, আপন প্রীর সঙ্গে। তখনকার বাংলা কথাসাহিত্য তাই দুর্লভ ছিল, বাবীন প্রেমের কথা উঠলে বহু পার্থক্যমহলে উত্তেজনার সৃষ্টি হত।

আমাদের মেস-এ কয়েকজন ওড়িয়া ছাত্র ছিলেন। তাঁদের নাম মনে নেই, তাঁদের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ জমেছিল। আমি তাঁদের কাছে ওড়িয়া পড়তে শিখলাম এবং তাঁদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তাঁদের তখনকার মাসিক পত্র 'উৎকল সাহিত্য' নিয়মিত পড়তাম। ওড়িয়া সমসাময়িক সাহিত্যে তখন অগ্রগতি বিশেষ কিছু হয় নি, পত্রিকাখানাও বোধ হয় পচিশ ত্রিশ পৃষ্ঠার ছিল। ছেলেদো উপযুক্ত গল্প, সেও আবার অনুবাদ, তাতে ছাপা হতে দেখেছি তখন যুগের সময়, অতএব রাজভক্তিমূলক কবিতাও থাকত। নমুন হিসেবে একটি কবিতা আমি মুদ্রণ করেছিলাম, তার কয়েকছন্দ এখনও মনে আছে।

"সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা দেখ যত্ন বর্ণে লিখা

সে ধর্ম্মার কোলে আজি লভ তে আশ্রয়,

দেখু বিশ্ব ত্রিটনর কি শক্তি অক্ষয়।"

বাংলা ভাষাও অক্ষরের সঙ্গে ওড়িয়ার অনেক মিল। আজকে দিনে ওড়িয়া সাহিত্য অনেক এগিয়েছে, উৎকল ছোট গল্প ওড়ি ভাষায় লেখা হচ্ছে।

বেশ ভাল লাগল ৩০ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। মেস-জীবনে আরভেই এত বড় একটা রাজপথের দখল পাওয়া কম কথা নয় এ যেন আমারই জীবনের রাজপথ। বহুবু মনে পড়ে এই ১১১ সালেই সাধারণ শ্রমিক সমাজে বরীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনি। বক্তৃত

জীবন ছিল 'আমার ধর্ম'। তিনি বলতে চেয়েছিলেন তাঁর বেজীবন  
চলছে, যার সম্ভাবনা এখনও শেষ হয়নি, সে জীবনের মর্ম কথা  
আগেই আবিষ্কার করে, সেবেল ঘরে, জাহ্নবীর পাঠানো ঠিক নয়।  
বহুটাটি সমসাময়িক সমালোচনার জবাবে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের  
কবি, বিলাসের কবি ইত্যাদি কথা তখন খুব শোনা যেত। এখনও  
যেহেতু হয় শোনা যায়।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর কবিতা ও নাটক থেকে পর পর অনেক  
অংশ আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। কবিরূপে কোন্ তথ্যটি তাঁর  
ভিতরে ভিতরে রূপান্তরিত হচ্ছে তারই চিহ্ন তিনি তাঁর নানা রচনা  
থেকে উদ্ধৃত করে অনেকটা নিষ্কেষেই মনের সঙ্গে বোঝাপড়া  
করিয়েছেন। সমাধি-মন্দিরে মারায়ক ভিড় হয়নি। এটি বড়ই  
আশ্চর্য লাগে।

কবিকণ্ঠে সে কি তেজোবৃন্ত আবৃত্তি। শুনতে শুনতে  
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠিলাম। আজও সে ধ্বনি কানে বিঁধে আছে।  
কি এক অদ্ভুত শক্তির প্রকাশ দেখেছিলাম কবির সমস্ত সত্তায়।

"অন্তরে নীচ দেহ

বর্ণশূন্য। তোমার প্রবল পিতৃব্রহ্ম  
ধননিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।  
করো মোরে সম্মানিত নব-বীর বেশে,  
দুঃসহ কর্তব্য ভাবে, দুঃসহ কঠোর  
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর  
কত চিরঅলঙ্কার।"...

কিংবা

"হবে হবে, হবে জয় হে দেবী, করিনে ভয়  
হব আমি জয়ী  
তোমার আহ্বান বাণী সকল করিব বাণী,  
হে মহিমাযময়ী।

তারপর বর্ষশেষ থেকে, তারপর মরণমিলন থেকে। এই কবিতাটি  
আবৃত্তির সময় সমস্ত ঘর যেন কেঁপে উঠল—

"কহ মিলনের একি রীতি এই  
ও গো মরণ, হে মোর মরণ।  
তার সমাগেই তার কিছু নেই  
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ?  
তব পিসলছবি মহাজ্ঞত  
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না?  
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট  
সে কি আগে পিছে কেহ হবে না?  
তব মশাল-আলোকে নগীত  
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরণ?  
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল  
ও গো মরণ হে মোর মরণ।"

আবৃত্তি শুনতে শুনতে সহসা সমুদ্রস্থ সমস্ত দুগ্ধ কোথায় মিলিয়ে  
শাল। ভুল হয়ে গেল হৃদয়ের বসে বড়তা শুনছি। একটা  
শরীরী কণ্ঠের যেন বিদ্রোহ-তরঙ্গের মতো সমস্ত দেহের ভিতর দিয়ে  
প্রবাহিত হয়ে চলেছে। হৃৎপিণ্ড উত্তেজনার লাফাচ্ছে; অম্লভব  
যত্নে পারছি, সেই মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে বাঁপিয়ে পড়তে পারি—

বদি আহ্বান আসে। হৃদ-ঘরে শশানের শূন্যতা। কারো মুখ  
থেকে একটি শব্দ নেই, শুধু তীর কবিকণ্ঠ ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

একই সঙ্গে অনেক বিষয়। রবীন্দ্রনাথকে দেখা আমার সেই  
প্রথম। তাঁর চুলোদগড়িতে তখন কালোর প্রাণান্ত। তাঁর  
চারপাশে কিছু বেশি পাকা। দেহ সম্পূর্ণ বদ্ধ, তার প্রায় চার বছর  
আগে কবি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তাঁকে দেখার বিষয় কাটতেই  
তো অনেক সময় লাগার কথা; সে সময় কোথায়? একই সঙ্গে দেখা  
এবং বড়তা শোনা চলছে। এ যেন মনের উপর অত্যাচার। তাঁর  
প্রত্যেকটি কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেছিলাম,  
কিন্তু পারিনি। এক এক সময় চমকে উঠি, খেয়াল হয়, কথা তো  
কানে বাজে না! রবীন্দ্রনাথ-রূপ স্বপ্ন জীবনে এই প্রথম মূর্তি ধরে  
সম্মুখে এসেছে, সেই বিষয় কাটিয়ে উঠব কি করে? শুদ্ধিতবৎ শুধু  
সেই বিরাট ব্যক্তির দিকে চেয়ে চেয়ে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছি,  
এই সেই কবি, এই সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে  
সঙ্গে যার ভাবা ও ছন্দ আমার রক্তের সঙ্গে মিশেছে। যার ছবি  
এঁকেছি পেন্সিলে, তুলিতে। সকল কথা এক সঙ্গে জেগে ওঠে,  
শুধু সবিষয়ে চেয়ে থাকি, কথা কদাচিৎ মর্মে প্রবেশ করে। এই দেখা  
এবং এই প্রথম তাঁর কণ্ঠের শোনার মূর্তি আমার জীবনের একটি  
বড় সঞ্চয় হয়ে আছে। এই কান্ডাকাতি সময়ে, কখন ঠিক মনে  
নেই আমার রবীন্দ্রনাথের একটি বড়তা শুনি রামমোহন লাইব্রেরিতে।  
বড়তার বিষয় ছিল সঙ্গীত, নাম ছিল "সঙ্গীতের সঙ্গীতি"। পরে ছাপার  
সময় এর নাম হয় সঙ্গীতের মুক্তি। কথার সঙ্গে গান গেয়ে গেয়ে  
বক্তব্যকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এ বড়তাতো ভিড় খুব মারায়ক  
রকমের হয়নি। এই দুটি জায়গাতেই লিখিত-বড়তা পাঠ করেছিলাম।

বড়তা তখন একটিও বাদ দিতাম না। বিপিনচন্দ্র পালের  
বড়তা এর আগেই শুনেছিলাম কলেজ স্বরায়। এ সময়েও অনেক  
বার শুনেছি। আন্তরিক চৌধুরী ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়তা  
অনেকবার শুনেছি। শ্রবণচন্দ্র সমাজগতি এবং পট্যকতি  
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়তা শুনেছি আরও পরে। একবার মাত্র রবীন্দ্রনাথ  
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়তা শুনেছি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে।

এই মেস-এ থাকতে সাহেবগজ-বানী প্রবেশ প্রায়ই আমার কাছে  
আসত এবং তার সঙ্গে আসত বলাইচাঁদের অল্প ভোলানাথ। সে  
খুলে পড়ত। এই ভোলানাথ কিছুদিন পরেই গল্পলেখক হয়েছিল  
এবং শ্রাবাসীর একটি গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিল। আরও  
কিছু দিন অভ্যাগতি বন্ধার রেখে  
তার পর ছেড়ে দিয়েছে। ভাল  
লিখত।

আমাদের মেস-এ একটি ছাত্র  
কলেজের মেয়েদের গাড়ি দেখে  
এসে এক দিন খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে  
উঠল, সে মফঃস্বল থেকে এসেছে,  
এই প্রথম কলেজের গাড়ি দেখল।  
এই ঘটনা থেকে তখনকার  
দিনের পথের অবস্থা অল্পমান করা  
যাবে। প্রবেশের সঙ্গে বেরিয়ে  
একদিন একটি মজার জিনিস 'আমার ধর্ম' বড়তারত রবীন্দ্রনাথ



দেখেছিলাম। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে আমাদের মেস-এর কাছে ছিল ইকনমিক জুয়েলারি, দু'জনে সেখানে গিয়েছিলাম বাইরের কারো অর্ডারি জিনিস কিনতে। খুব কমিক শোনাবে, কিন্তু তবু বলা দরকার যে, সেই ১৯১৭ সালে সেই দোকানে একটি মহিলাকে দেখেছিলাম যিনি স্বাধীন ভাবে একা সেইখানে এসেছিলেন। দ্বিবিধ কারণ এটি মনে আছে। প্রথমতঃ 'তুল' বলে দ্বিতীয়তঃ (এবং প্রধানতঃ) তাঁর অঙ্গে ছুটি ঘড়ি ছিল বলে। এরকম কখনো দেখিনি। একটি ঘড়ি হাতে, অঙ্কটি বুক, অঁচলের পিনের সঙ্গে ঝোলানো। বুকঘটি আমরা দেখছি, হাতেঘটি তিনি নিজে। এর উদ্দেশ্য ভারতে পারি নি। শুণ্ড অলঙ্কারের জন্য কেউ কি ছুটি ঘড়ি ব্যবহার করে?

কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন সায়দারজুন রায় (এস রায় নামে খ্যাত), সংস্কৃতের নোট লিখতেন এবং ক্রিকেট খেলতেন। ভাইস প্রিন্সিপাল, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (জে, আর বানার্জি)। অধ্যাপকবৃন্দ সবাই আর্য্যকরে পরিচিত ছিলেন, সেক্ষেত্র কোনো কোনো নাম এখন তুল হয়ে গেছে। এ, ডি—অচ্যুত দত্ত, এস, বি—শিশিরকুমার ভাট্টাচার্য, এম, এস, (মনি সেন), কে, বি—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কে, এন—কুঞ্জলাল নাগ; ইউ, এন—উপেন্দ্র নাগ; আর, কে, ডি (রামকৃষ্ণ বিহারদু?), পি, আর—পূর্ণ রায়; কে, জি—জীবোদ গুপ্ত; আই, বি, এস—ইন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

আমার কবিনেশন ছিল সংস্কৃত ও দর্শন। কয়েকজন অধ্যাপকের শিক্ষণবীতি স্পষ্ট মনে আছে। জ্ঞানরঞ্জন ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ। তিনি অবিরাম বক্তৃতা দিতে পারতেন। ইংরেজী রাসে বাক পড়াতেন ও দর্শনের রাসে সাইকোলজি পড়াতেন। পড়তে পড়তে কখনো কোনো উপলক্ষে নিজের কথা বলতেন। কি ভাবে তিনি গ্রীক-ল্যাটিন শিখেছিলেন, বলতেন। প্যারাজাইস লষ্ট প্রায় সব মুখস্থ করেছিলেন। তিনি বলতেন আমি স্বভাবতঃ কবি, কিন্তু দার্শনিক হয়েচে ঘটনাক্রমে। জার্মান ও ফরাসী ভাষা সম্পর্কে বলতেন 'Only a smattering of German and French.' সাইকোলজি পড়তে পড়তে একটি গল্প বললেন একদিন। তাঁর শাড়িতে রাঙে চোর ঢুকেছিল। শব্দে জেগে উঠে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে পিঙ্কসটা নিয়ে আর, চোর এসেছে।—আসলে পিঙ্কস তাঁর

কোনোদিনই ছিল না, কিন্তু চোরকে ভয় দেখানো দরকার, নইলে অনিষ্ট করবে, তাই এই উপস্থিত বুদ্ধি ঝাটোয়েছিলেন এবং তাতে সফল হয়েছিলেন। চোর পিঙ্কসের বখা শোনামাত্র পাতিয়ে গিয়েছিল। পড়াবার সময় তিনি বার বার বলতেন 'to take recourse to' কখনো লিখা না, ওটি ইংরেজী নয়—ওট' বাঙালী-ইংরেজী।—ইংরেজরা বলে 'to have recourse to'—আরও একট' বাঙালী-ইংরেজী তোমরা কখনো লিখবে না—অর্থাৎ 'class friend' লিখবে না, বলবে না। ইংরেজরা এ কথাটি জানে না, তাদের ভাষায় সহপাঠ্যকে class-mate বা class-fellow বলে। মগক্ষে হাতুড়ি পিটিয়ে এই কথাগুলি তিনি ছাত্রদের মনে গেঁথে দিতেন।

শিশিরকুমার ভাট্টাচার্য যেমন ছিলেন চোরাগর, তেমনি ছিলো পোষাকে। প্রায় প্রতিদিন নতুন সাজে আসতেন। সর্দা বেং একটা হাসিখুশি ভাব। উচ্চারণ এবং বলবার ভঙ্গি ছিল চমৎকার ভাষাতত্ত্ব পড়াতেন। রাসে এক দিন বক্তৃতা দেবার সময় দেখে একটি ছেলে ঘুমোচ্ছ। তিনি মাথা উঁচু করে বার বার তার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন আর যত্নযত্ন হাসছেন। তখন তা পাশের ছাত্র তাকে জাগিয়ে দিলে শিশিরকুমার হেসে জিজ্ঞাসা করলেন "were you sleeping?" ছেলেটি উত্তর দিল "N sir." শিশিরকুমার আরও হেসে, বললেন "Oh, I beg you pardon." কথাটি এমন ভঙ্গিতে বললেন যাতে রাসের সবাই এ সঙ্গে হেসে উঠল। এই ভাষাতত্ত্বের রাসেই এক দিন এক ছাত্র একটি অপ্রচলিত ইংরেজী শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে শিশিরকুমার তৎক্ষণাৎ "Do I look like a dictionary?" বলেই ঘোঁড়া পড়াছিলেন তেমনি পড়িয়ে যেতে লাগলেন গভীরভাবে।

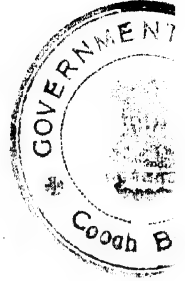
ইংরেজী টিউটোরিয়াল রাসও নিতেন তিনি মাঝে মাঝে, বি তাঁর ইংরেজী রচনা-লেখা শেখানোর প্রতি ছিল ঝাঁপে নিমগ্ন। এ দিন 'শাক্তাহান' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন আগাগোড়া। তার বললেন যা শুনলে তা সন্ধ্যা ইংরেজীতে লেখ। আরও এক 'মুদ্রিত আলোর কমল কলিকাতার বেগেছে সন্ধ্যা-আঁধার পর্ণপু ইত্যাদি সবটাই আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির নাম কলিক বললেন 'যা শুনলে তার ভাবার্থ ইংরেজীতে লেখ।' শিশিরকুমার আবৃত্তি আমার এই প্রথম শোনা। [ক্রমশঃ]

## ● মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে ( ভারতীয় মুদ্রায় )	
বার্ষিক রেজি: ডাকে.....	২৪
বাণ্যাসিক " " .....	১২
বিচ্ছিন্ন প্রতী সংখ্যা রেজি: ডাকে	
( ভারতীয় মুদ্রায় ) .....	২
চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।	

ভারতবর্ষে	
ভারতীয় মুদ্রামানে ) বার্ষিক সভাক	১৫
" বাণ্যাসিক সভাক	৭
প্রতী সংখ্যা ১।০	
বিচ্ছিন্ন প্রতী সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে.....	১৫
( পাকিস্তানে )	
বার্ষিক সভাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ.....	২
বাণ্যাসিক " " .....	১
বিচ্ছিন্ন প্রতী সংখ্যা " " .....	১

# ফেনা-বিলাস



[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের স্তন্যে যিনি আসন পেতে বসে থাকেন তাঁর নাম "মদ"।

তিনি শত্রু। মানুষের শরীরের মধ্যে ইনি একবার আবিষ্ট হলে, মানুষ আর স্তব্ধ হয়ে কিছু শোনে না, কিছু দেখে না। ১

বিজিতাশ্ব। মানবদের কাছে, সত্যযুগে, যিনি "রম" নামে বিচিত্র ছিলেন, তিনিই কলিযুগে--সব উন্মত্তে যায় বলে,--"মদ" নামে স্থান লাভ করেছেন। ২

মৌন হয়ে বসে থাকা, মুখটিকে বিশেষ ভাবে কৌচকানো, উদ্ভূত হান তুলে বসা, চক্ষুর্দ্বয়ের অকলঙ্কতা, অস্ত্র স্তম্ভিক দ্রব্যের ব্যবহার, পাখ্য মুকুট পরা--এইগুলি হচ্ছে "মদ"ের প্রাধান্য রূপ। ৩

মৌর্য-মদ, রূপ-মদ, শতাব্দ-মদ ও কুলোয়ন্ত্রি-মদ--এইগুলি ইন্ডিয়ানের মন-বন্ধক। এদের মূল হচ্ছে বিভব-মদ, অর্থাৎ সৌন্দর্যের ইচ্ছা। ৪

অতি মাত্রায় ভোগের পর এই বিভব-মদকে মনে হয়--শূন্যতার মত, বাত-যোগে ক্ষান্ত হওয়ার মত, ভূতে পাওয়ার মত, প্রথম কীপুনি দিয়ে ছর আগার মত। ৫

যিনি মৌর্য-মদে মাতাল, তিনি ঘড়ি-ঘড়ি নিজের হাতের গুলি লেখন; যিনি রূপের গর্বে ফাটছেন তিনি চলতে-কিনতে নিজের জায়া দেখেন দর্পণে; যিনি কাম-মদে বিহ্বল, তিনি রতি রতি সীলকের দিকে নমন-বাণ হানেন; কিন্তু যিনি বিভব-মদে মত্ত, তিনি অম্মাঙ্ক। ৬

ভগতে এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাদের আখ্যা দেওয়া হয় "আত্মারাম"। তিনি স্তম্ভের বসে মূর্ত্তা যান, নয়ন মুদ্রিত করে থাকেন; যেন ধ্যানে সমাহিত। তিনিই সর্বশেষ উপমান "মদ-মদ"ের। ৭

"মদ-মদ"ের কিন্তু বিকারের অন্ত নেই। গুণের লেশমাত্রও হীন নেই। তিনি কেবল মনুষ্যকে উদ্বাসন ছুঁগিয়ে ছেড়েন--বিষয়ে। তিনি বিচিত্র। নিবালম্ব হয়েও বিজয়ার মত দাপিয়ে যান সংসারে। ৮

আর এক রকমের মদ রয়েছেন, তাঁর নাম "তপস্বি-মদ"। ষষ্ঠী, কিছুই তিনি দেখতে পান না হুঁময়নে; কেবল আকাশে আকাশে দর্শন পান বিভাধরদের। "ভক্তি-মদ" এক একটি অদ্ভুত কথা করে বসেন। দেহের

অস্তিত্ব তিনি ভুলে যান। কিন্তু বৎসগণ, জেনে রেখে, প্রকৃতিটি তাঁর নিতাই থাকে চল। ৯

"শাস্ত্র-মদ" সর্বদাই যেন ক্রুদ্ধ হয়ে চোখ-রাড়িয়ে রয়েছেন। পারের যুগের তুচ্ছ কথাও তাঁর অসহ্য। তিনি শ্রমলী। মনুষ্য-নেতাদের মধ্যে তিনি মৃগির একটি ধাতু-ক্ষোভ। সৈবমোর রাজা। ১০

পুরুষদের মধ্যে যে "অধিকার-মদ"-টি বাল্যমান থাকেন, নিতাই কবাল তাঁর ভ্রুকুটি। নিলাকণ নিম্মম তাঁর তর্জন, গর্জন, বজন। কখন যে আঘাত করে বসবেন তাঁর স্থিতি নেই। তিনি সর্ব-খাদক, জ্বর রাক্ষস-বিশেষ। ১১

পুরুষদের মধ্যে যে "কুল-মদ"-টি বিবাজ করেন, তিনি কেবল পুরুষকর্মের প্রতাপের কাহিনীই শতযুগে কপটান, ভুলে যান নিজের ইতিকর্ষবাতা, নিজেকে ভাবেন সপৌরুষ ও মহাত্মানী। ১২

"শৌচ-মদ" নামে আর একটি মদ রয়েছে। নিতাই সর্বোচ্চে তিনি পূর্ণ। জনতার স্পর্শ থেকে সর্বদাই নিজেকে বাঁচির বাঁচিয়ে চলেন। সকল সময়েই ভাবেন, তিনি ছাড়া ভগতের সব কিছুই অসুচি। আকাশেও তিনি গোবরের চড়া দিতে চান। ১৩।

বৎসগণ, এই যে "মদ"-গুলির কথা বলা হলো, এদের প্রত্যেকটিরই একটি ক'লে ক'রে বিশেষ সীমা আছে। নিজের নিজের মূল দ্রব্য হচ্ছেই যিনিই তাঁর মাদ। কিন্তু এদের চোখেই প্রসিদ্ধ একটি মদ রয়েছে। তাঁর নাম নেই, তিনি বৃষ্টি। ঐ দেশ তিনি বিঘটি বিঘটি হাই তুলছেন। তিনি অসীম ভোগী। তাঁর নাম "পান-মদ"। পান্যাসক্ততার আবেশে তিনি ক্ষয় হয়ে ওঠেন। বিশ্বের তিনি যুবার পাত্র। মুষ্টিমান মতিমোহিত এক মোহ। দ্রবিক হলেও তিনি দুন্দাজ আশ্রয় গ্রহণ করে নেন মানুষের হাজার বছরের অজিত শীল। মত্তমদে যিনি হাতাল, তাঁর রাজ্য চোখে সবাই সমান। বিদ্বান, ব্রাহ্মণ, গুরু, কালী, কুতুভ, চাঁড়াল--সবাই সমান। আত্ম-পর ভেদ তিনি জানেন না।

সং-অসং-ভেদ তাঁর থাকে না--গাল যায়। ইট পাথর সোনা--তাঁর কাছে সবই সমান। যোগীর অবস্থা প্রাপ্ত হলেও, মাতাল নিজেই পড়েন নরকে।

ইনি কখনও ভেট ভেট করে কাঁদেন, কখনও হোঃ হোঃ করে হাসেন, গান গান, বিলাপ করেন, কখনও সম্বোধিত হয়ে পড়েন

মুহূর্তে মুহূর্তে ঘনঘটা ক'রে আকারে প্রকারে অদ্ভুত প্রদর্শনী করেন বিকারের। সংসারের আদর্শ ফণাধর এই মাতাল। নিজের প্রেরণীট পরের পতিকে চূষন করছেন, চোখে দেখেও মাতাল সন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন না। রক্তের মত গাঢ় লাল মধু পান ক'রেও, বুঝি না, মাতালের কেমন ক'রে আসে বৈরাগ্য।

দূরে বিসর্জন দেন বসন, বরণ করেন চুসহ বাসন। অধিক কি ... মাতাল নিজের অঞ্জলি-পাত্রে নিজের মৃত্ত ধ'রে তাতে চাঁদের ছায়া পড়লে, সেই ছায়াটিকেও পান করে বসেন। ১৪-২০

পূর্বকালে, অধিনীকুমার দু'জনের রূপায় মহাবি চাবন একদা কিরে পান তাঁর যৌবন। কৃত্তান্ত হয়ে মহাবি স্বয়ং যজ্ঞস্থান করেন, এবং সোমাই অধিনীকুমার দুজনকে আবাহন করেন পানোৎসবে।

ক্রুদ্ধ হন ইন্দ্রদেব;—এগিয়ে আসেন। তীক্ষ্ণকণ্ঠ বলেন—

“মুনি, আপনি কি জানেন না, যজ্ঞে অধিবৃগল সোমাই হলেও, বৈজ্ঞ-হিসাবে তাঁরা অপায়ক্লেয়?”

স্বয়রাজ বহু নিষেধ করলেন, কিন্তু স্বতেজঃগরিমায় অটল হয়ে রইলেন চাবন। তাঁকে যে প্রীত করতেই হবে অধিবৃগলকে! আপন কর্তব্য থেকে ভেঁট হলেম না চাবন।

ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠলেন জজ্ঞারি। তাঁর বিশাল ভুজবৃত্তে উজ্জত হয়ে উঠল বজ্র। কী ঘটে কী ঘটে! সহসা মুনীজ চাবন, জ্বলিত করে দিলেন ইন্দ্রের ভুজবৃত্ত। এবং ইন্দ্রকে বধ করবার উদ্দেশ্যে নিমেষে সৃষ্টি করে ফেললেন—দোহুস্যামান কালসর্পের মত এক চতুর্ভুজ, সহস্র যোজন বিপুল, ‘কৃত্য’-দেবীর মত ভয়াল-দর্শন, ঘোর মহাস্তর। অকস্মাৎ নানবের অবিভাব ভীত হয়ে পড়লেন বজ্রী, শরণ নিলেন চাবনের। বললেন—“দেববৈজ্ঞ দু'জনকে সোম দেওয়া হোক”।

ইন্দ্রের তপন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে ধৈর্য। করুণাসিদ্ধ মুনিও তৎক্ষণাৎ আশ্রয় দান করলেন ভীত-প্রণত মহেশ্বকে। এবং ততঃপর ঐ ঘোর ‘মদাস্তর’কে উৎসর্গ করে দিলেন—

দ্যুতে, রমণীতে, মদিরায় ও মৃগয়ায়। ২১—২৭

বৎসগণ, ক্রুদ্ধ মুনি যে প্রমাণী অন্তরটিকে নিমেষে নির্ধাণ করেছিলেন নিজের স্বরয়ে, তিনি অধুনা স্তম্ভাকারে পাশবক অবস্থায়, বদরায় করেন শরীরীদের মধ্যে। তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়:—

শ্রীমন্তদের মৌনভায়,  
হঠাৎবড়লোকদের নিশ্পন্দ দৃষ্টিতে,  
ধনিকদের ক্রুদ্ধ আঁকা মুখের বিকারে,  
বিটুদের ভুজ ছুটিতে।

তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়—

দূত ও বিধানদের জিহবায়;  
কপবান্দের দশনে, বদনে, কেশে;  
বৈজ্ঞদের গুপ্পুটে;  
গুণীদের, নিয়োগীদের, গণকদের গ্রীবায়;  
সুবীরদের স্বকৃততে;  
বনিকদের স্বদয়ে;  
শিল্পীদের হাতে;

ছাত্রদের কণ্ঠে, লিখমপথে ও অঙ্গুলিভঙ্গে,  
তরুণীদের স্তনতটে;  
প্রাক্ষেয়দের উদরে;  
পত্রবাহকদের জজ্ঞায়।

তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়—

কুঞ্জরের গণ্ডে,  
ময়ূরের পেখমে,  
মরালের গতিতে। ২৮—৩২

এরই নাম “নাম-মদ”। ইনি একটি মহাগ্রহ। অসংখ্য বিকারে মাধ্যমে স্পৃষ্ট হয়ে ওঠে এর মোহ-বন্ধন এবং ইনি নিজে ‘কেদে’ না হয়েও, নিখিল প্রাণীর সঙ্গে কাঠ হয়ে বসে থাকেন সর্বদা।  
ইতি মদ-বর্ণন নাম বহু: সর্গ:।

### সপ্তম সর্গ

মাছুষের অগ্নি কাঞ্চলোপরে প্রাণ হচ্ছেন “অধ”। এই নরকে সেই-হেন অর্থকেও, আশ্চর্য, ভরণ করেন অতি ধূর্ত গানাপজীবী তাঁদের অস্ত্র,--কণ্ঠ! কোমল, মনোহর, পবিত্রনশীল, চাঁচা-ছে কণ্ঠ। ১

পদ্মের ভাঁড়ার নিশেষে লুটে-লুটে গেয়েও আশ মেটে না গায়ক-ভুলদের। তাঁরা ছোটেন কুহল ফুলের আশ্রয় নিতে। তা তাঁরা হুল হয়ে ওঠেন না, কণ্ঠই থেকে যান। তখন আবার করতে দৌড়ন মাতঙ্গের সঙ্গে। ২

এই গায়কেরা সাক্ষাৎ যোনি-শিশাচ পৃথিবীর। ঘট, পট ইত্যাদি কাঁধে চাশিয়ে গোরেন। সঙ্গে ফেবে মূর্খ ছেলের বাব্বী চুল উড়তে থাকে বাতাসে। রাজাগাঙ্গড়ার মাথায় বুলিয়ে খান। ৩

চোর যায় চুরি করতে। কেউ যদি তখন হাঠাকার দিয়ে বেচারী চোরকেও তখন ব্রহ্মপদে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে প হয়। কিন্তু এই গায়ক-চোর প্রকাজে হাঠাকার ক'রেই লুট নেম সকলের সর্বস্ব। ৪

পা পা ধ ধ নি নি গ ম মা, ধা ধা মা মা'স মা'স গা ধা ধা  
এই বকমের স্বরপদশ্রেণী সৃষ্টি ক'রে পৃথিবী মজিয়ে নূরে ধূর্ত গায়নেরা। ৫

কুটিল বৃণীর মত কখনো ঘূরপাক খেতে খেতে গান ওঠেন। কখনও বা গাইতে গাইতে উঠে গিয়ে বেশ বদলে ৭ সে কত বকমের সাজ। আর গাইতে গাইতে মুখের সে কী কখনও আবার বহুগুণ ধ'রে মৌনী হয়েই গান গান, মর্দল থাকে হাতে। ৬

গাইতে গাইতে কখনো বা আয়ত্বগণ করে ওঠেন, ব লয় দিয়ে ওঠেন। এক এক কলি গান করেন, আর লঙ্কার গলায় সে কী স্বর-স্বরে কাককাক! থেকে থেকে নিজেই বা ওঠেন নিজে। ৭

ছাত্রের কণা জলে ফেলে দিলে মাছে যায়, তাতেও কিছু হয়; কিন্তু গায়নের পায়ে কোটি কোটি ঢাললেও, একটি হা হয় না কল। ৮

নালায় মত বিকট হা করে বসে থাকেন এই

বিধাতার বিধানে, সেই প্রাণাল-পথে বস্তুর শ্রোতে বেরিয়ে যায় মূর্খদের  
অন্ধকূপ কোথাগায়ের কৃষ্ণ ঘনরাশি। ১

গায়ন ধূর্তেরা সব সময়েই যে গীত হাসিয়ে গান করেন তা নয়,  
এই ধূর্তেরা গীতাত্মগতিক ভাবে অর্ধ-গ্রহণ করেও হাদেন। ১০

এঁরা প্রান্তঃকালে খাঁর থাকেন; গলায় দোলান হার; হাতে  
বাঁধেন কেয়ুর। মধ্যাহ্ন পান হতে না হতেই এঁরা—নয়, ভয়,  
নিরাধার, পাশায় সর্ববাস্তব। ১১

এঁদের গীতগুলি তোষামোদের জাল দিয়ে বোনা; এঁদের গীতের  
বচনগুলি শরের মত তীক্ষ্ণ; এঁদের বচনগুলির রচনাশৈলী অতি কুট,  
অতি কপট।

সঙ্গীত-নিষাদের গানের ফাঁদ পেতেই মূর্খ হরিণের মত ধনিক  
বেচারীদের হরণ করেন সর্বদা। ১২

স্বরের ঠিক নেই, পদের ঠিক নেই, রেওয়াজ দেখান গায়নেরা।  
মুহূর্তে হাতান লক্ষ লক্ষ মুদ্রা। হাতিয়েও বলেন—“দাসীর পোঁকী  
দিলেন একবার দেখো”; তুঃখিত হয়ে বিদায় নেন। ১৩

যে লক্ষ্যকে সাধুসজ্জেরা, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠেরা, প্রবীণেরা বর্জন করে  
চলেন, যিনি নিপিল শোকের নিমিত্ত, সেই লক্ষ্যের এঁরা অভিশাপ!

তঁাকেই ভোগ করেন গায়নেরা। ১৪

পূরাকালে বড় বিলম্ব করে নারদ একদা ফিরে এসেছেন  
মৌলোকে। ইন্দ্রদের তাঁকে প্রশ্ন করলেন—

“ভূপালদের খবর কি, মহীতলে?”

নারদ বললেন—“স্বরনাথ, মর্ত্যলোকে ভূপালদের স্রমজয়কার।  
অক্ষয়ন্ত তাঁদের দান। ধর্মযজ্ঞের ইয়ত্তা নেই। ঘুরতে ঘুরতে

বিলম্বলোকের ক্রী দেখে অবাক হতে হল। ইন্দ্রের উপযুক্ত ক্রী।

ভূপালদের এত বৈভব যে বরুণকে কুবেরকে এমন কি আপনাকেও

তঁারা স্পর্ধা করেন। একবার নয়, এত বার তাঁরা এত বিবিধ

যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন যে, স্বরনাথ, আপনাতঃ “শান্তমথ”

নামটি আজ উপহাস্যাম্পন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।” ১৫—১৭

নারদ মুনির বচন শুনে ত্রিঃশায় ক্ষেপ পড়লেন ইন্দ্র। ক্রোধে

বলে উঠলেন। নারদের আবার ইন্দ্র! তৎক্ষণাৎ তিনি পিশাচদের

আজ্ঞাবান করলেন—এরা—

“নরেন্দ্রদের ঐশ্বর্য হরণ কর।”—এই আদেশ সত পৃথিবীতে  
দিলেন পাঠিয়ে।

ইন্দ্রের আদেশে পিশাচসজ্জ নিপিল ভূপালদের অধিল ঐশ্বর্যের  
লুণ্ঠন ব্যাপদেশে উপনীত হলেন ভূতলে। “গীত” হল তাঁদের লুণ্ঠন-  
মন্ত্র।

অষ্ট পিশাচ আসেন ভূতলে। তাঁদের নাম যথাক্রমে—  
মায়াদাস, উষ্মদাস, বজ্রদাস, ক্ষয়দাস, কুণ্ঠদাস, পরহরদাস, প্রসিধ-  
দাস এবং বাড়বদাস।

অতি ভয়ানক তাঁরা। ঐ দেখলে ভয় হয়। ভীষণ গলা।  
পৃথিবীতে এসেই তাঁরা অতিবিকট একদল গায়ক কণ্ঠ করে  
বসলেন।

গায়কদের কুণায় দিকে দিকে ক্ষয় হয়ে যেতে লাগল ভূপালদের  
বৈভব, সর্ববাস্তব হতে লাগল মনুষ্য। যজ্ঞাত্তান বিষয়ে শিথিল  
হয়ে গেল ভূপালদের উত্তম।

মহাঘোর এই কর্ণ পিশাচের দল কর্ণহীন পথে প্রবেশ করতে  
লাগল গীতচ্ছন্দে—ভূপদের ক্ষয়ে। আকস্মিক তাঁদের ক্ষয়-  
হরণ! ১৮—২০

বৎসগণ,

সেই হেতুই বলছি, এই বিস্ময়ীদের যে ভূপাল প্রবেশাধিকার  
দান না করেন তাঁরা রাষ্ট্র, তাঁরাই একমাত্র অধীনা থাকেন নিষিদ্ধা-  
সম্পৎ যজ্ঞবতী ভূমি। ২৪

ঐ যারা দেশে বিদেশে প্রচারনতা দেখিয়ে বেড়ান, কীর্তন করে  
বেড়ান রাজমতিমা, যারা নাটক করেন, নাচেন, বাহু দেখিয়ে ধাঁধা  
লাগান, যারা নিজের সর্বস্ব বুইয়ে বাতালনার তন্ন গোলে জীবন হারণ  
করেন,—ঐশ্বর্যের শালিখাত-ক্ষেত্রে তাঁরা গুলপাল। তাঁদের হাত  
থেকে লক্ষীদেরকে বাঁচিও। ২৫

গায়নসজ্জের ঐক্যতান থেকে উপান লাভ করে এক স্রমহান  
গীত-নিষেধ শুনলে মনে হয়, লক্ষীদের যেন অস্থানে এসে উপস্থিত  
হয়েছেন, ভয়ের আবেগে কৃষ্ণ ছেড়ে কাদছেন। ২৬

ইতি গায়ন-বর্ণনা নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

[ ক্রমশঃ।

## রাত্রির রেলগাড়ী

শ্রীমজুম দাশগুপ্ত

[ Mary Elizabeth Coleridge এর ‘The Train’ কবিতার অম্বদান। ]

রতীন-সবুজ চক্ষু-দুটি জ্বলছে রাতের অন্ধকারে,

উঠছে খোঁয়া অগ্নিকণা—বাঁশীর ধ্বনি ডাকছে কাঁবে।

হোঁষায় ছিলো—হেঁষায় এলো—পালিয়ে গেলো আবার ছুটে—

খলতে পারো কোথায় বাবে রেল-গাড়ীটা বাঁধন টুটে!

রাত্রি ভেদি শানোর মত ছুটেছে কেবল ছুটেছে সে

চলার সাথে রাতের আঁধার দুই ভাগে ভাগ করছে সে।

নীরবতা মিছে ভেঙে তার এই বিরাত টিংকল।

বিজ্ঞানেরই সাধের ছেলে এই রাততে থুচ্ছ কাঁবে!

ধাকতে পেলে তুট হতো এমন জনে নিঁছে দূরে

কঠিন বাধা-দ্বন্দ্ব দিয়ে তাদের সারা স্বপ্নপূরে।

প্রেমিক এবং বন্ধুজনে আনন্দ সে দেবার তরে

তাঁদের নিয়ে বাচ্ছে ছুটে বিদেশ হতে নিজের ঘরে।



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

লাহিড়ী এক দিন আমার এসে বললে—যোগীন্দ্র সিং স্তব্ধ করলো—ভাই যোগীন্দ্র, আমাদের কাগজে আমি একটি নতুন ফিচার লিখছি : ইনসাইড ক্যালকুলা। আগের দু'টা সংখ্যায় জোড়াবাগানের উপর লিখেছি, চৌরঙ্গির উপর লিখেছি। ভারি এবার চায়না টাউনের উপর লিখবো। তুমি তো ওদিকটা জানো, আমায় নিয়ে এক দিন দেখাতে পারো ?

নিশ্চয়ই, আমি বললাম, তবে খরচাপত্তর তোমার। সে রাজী, আমিও খুশি। ক্রী লাক, ক্রী ডিনার, ক্রী ড্রিন্স—আর লাহিড়ীর বদি তেমন তেমন লখ হু, ক্রী গালস্—এমন মওকা কে ছাড়ে বলে ?

তাকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলাম আমার এক চাইনিজ বন্ধু লিয়ান কুয়ো ফান্—এর সঙ্গে। কুয়ো ফান্ ব্যবসা করে, কিসের ব্যবসা আমার ঠিক জানি না, কিছু কিছু খাঁচ কবি বটে, তবে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন মনে করি না। তার সঙ্গে আমি আর লাহিড়ী একটি জুয়ার আড্ডা দেখলাম, একটি চতুর আড্ডা দেখলাম, একটি মেরেছেলের আড্ডা দেখলাম : লাহিড়ী খুব বলি। সে ভাবলো সে চায়না টাউন সবকে অনেক কিছু জেনেছে। এক দিন সে বললে, এবার একটু সাধারণ লোক দেখবে সে। স্বাভাবিক জীবনবাহী সবকেও কিছু জানবে এবার। একদিন সে সারা দুপুর বসে বইলো চি-শিউ-চি-এর জুতোব দোকানে। তার পর বললে, একটা দুপুর কাটাবে কোনো একটা সাধারণ চীনে রেস্টুরাঁয়, যেখানে সাধারণ চীনেগা খেতে আসে, আড্ডা দিতে আসে। এখন, এসব কি আমার ভালো লাগে ? নো ড্রিন্স, নো গালস্, নো ফান্, চুপ-চাপ বসে অল্প লোকের মুখের দিকে ঠা করে তাকিয়ে থাক। আমার কি শোষায় ? বাং : হাক, ওপানে তিরেটি বাজাবের কাছেই একটি ছোটো গলির ভিতর শুশু-চুয়ান নামে একটি লোকের একটি ছোটো রেস্টুরাঁ আছে। তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে শুশু-চুয়ানকে বললাম, আমার এই বন্ধুটি খবরের কাগজের লোক। এখানে বসে একটু লাকজন দেখতে চায়। ওর বা লাগে দেবে। আর দেখো, ওর যেন কোনো অসুবিধে না হয়।

রাক, ওকে সেখানে রেখে তো আমি আমার আফিসে চলে এলাম। আর সেখানেই একটি মজার প্রায়ভেকার হোলো লাহিড়ীর, মজার বিশদে পড়লো সে। চতুর আড্ডা, জুয়ার আড্ডা, ক্রীলোকের আড্ডা

সব নিবিষ্টে ঘূরে এসে সেট পূর্বের লাহিড়ী কি না বিপদে পড়লো ভায় মাল্লু শুশু-চুয়ানের অতি সাধারণ একটি রেস্টুরাঁয়।

বলে যোগীন্দ্র সিং আবার হাসতে লাগলো। হাসতে হাসি বিহার শেষ করলো সে। আরেক বোতল বিয়ারের বর্ডার দিলো তার পর আবার আরম্ভ করলো।

—আমি লাহিড়ীর কাছে বেরকম শুনেছি, সেওকমই বলে বাঁ তোমায়। লাহিড়ী তো সেখানে বসে চা খেতে খেতে দেখা সাধারণ দু'চাব জন চীনা এসে তাদের চপ-স্ট্রিক দিয়ে সাধারণ ভ তরকারি খাচ্ছে, চপ-স্ট্রে নয়, চাও মিয়েন নয়, ফ্রাইড রাইস : শার্কস্ ফিন্ সুপ নয়, ওসব কিছু নয়,—গেনে প্রাণ্ড সিম্পল্ ক প্রাণ্ড রাইস। কয়েক জন বসে শুশু গল্প করছে, দু'একজন ফিরা আসছে মাঝে মাঝে।

লাহিড়ী বসে বসে ভাবছিলো, এই কদিন যা দেখলো তা'ি একটা জমকালো বোমাকর ফিচার কি করে লেখা যায়।

হঠাৎ একজনের ডাকে তার চমক ভুললো।

খুঁধ ফিরিয়ে দেখে শাট-প্যাট পরা একজন ভল্লোলক পরি বাজলার তাকে জিজ্ঞেস করছে, “আচ্ছা, আপনাদের সঙ্গে যে মিষ্টার ছিলেন, উনি কোথায় গেলেন ?”

“মিষ্টার নন্ত !” লাহিড়ী অবাক, “আমাদের সঙ্গে তো ও নামে ছিলো না ?”

“জিলো না ? ও, ‘তা’ হলে আমারই ভুল হয়ে থাকবে,” সেট ভল্লোলকটি চাব দিক তাকিয়ে দেখলো। খালি টেবিল একটিও। তখন লাহিড়ীকে বললো, “আচ্ছা, আমি কি হ মিনিট এখানে বসতে পার ?”

“হ্যাঁ, নিশ্চয়ই”, উত্তর দিলো লাহিড়ী।

লোকটির হাতে ছিলো একটি গ্রাটি কেস। সেটি খ টেবিলের উপরে। তার পর একটি সিগার ধরলো। চুপ-চাপ চুকট কুকলো কিছুক্ষণ।

তার পর বললো, “আমি অপেক্ষা করছি এক ভল্লোলকের : একটার সময় আসবার কথা, এখন দেড়টা প্রায় বাজে। দেখা নেই !”

লাহিড়ী উত্তর দিলো, “আজ-কাল সময় ঠিক রাখা



অস্থিবে। হোম-বাসে এত ভিড়, ঠিক মতো ওঠা যায় না। তা ছাড়া অনেক সেড়টার টাইম গিলে আড়াইটার আগে আসে না।”

এমন করে গল্প করতে শুরু করে দিলো ওরা দু'জন। লাহিড়ী খুব গল্পের লোক, এক জন কাউকে পেলেই চেনা হোক, অচেনা হোক, আলাপ জমিয়ে ফেলে। আর এ ভঙ্গলোকও দেখা গেল, গল্প করতে একটুও গরবান্নী নয়।

খানিকক্ষণ পর ভঙ্গলোক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, “বারে। দুটো বাজে যে।—মু—একটা টেলিফোন করতে পারলে হতো। এখানে তো টেলিফোন নেই। পাড়ান, আসবার সময় ওদিকে একটি ওষুণের লোকান দেখেছি। ওদের নিশ্চয়ই ফোন আছে। আচ্ছা, আমি আসছি এক্ষুণি—”

ভঙ্গলোক উঠে বেরিয়ে গেলেন। লাহিড়ী দেখলো যে, এটাচি কেসট উনি বেখে গেলেন। গা করলো না সে। ভাবলো, কোন করতে গেছে। এক্ষুণি ফিরে আসবে।

লোকানটা তখন প্রায় কাঁকা হয়ে এসেছে। শুধু এক কোণে একটু লোক বসে আছে। কিছুক্ষণ পর আরেক জন লোক এলো। অল্প লোকটির টেবিলে বসলো। দু’একটা কি বেন কথাবার্তা হোলো ওদের মধ্যে। তার পর চুপচাপ এক কাপ চা খেয়ে লোকটি চলে গেল। আগের লোকটি আরেক কাপ চা নিয়ে বসে রইলো সেই টেবিলে।

লাহিড়ী লক্ষ্য করলো যে, লোকটি মাঝে মাঝে আড়চোখে তার দিকে তাকোছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাহিড়ী একটু উষ্মি হোলো। আড়াইটে বেজ গেছে। সেই ভঙ্গলোকের দেখা নেই। এতক্ষণ কোন করছে সে?

একবার ভাবলো, মাক গে। সে যখন আসবে ভাবুক। আমার কি? আমি ঢাল যাই। তার পর ভাবলো, নাঃ, সে ঠিক হবে না। ভঙ্গলোক তাঁর ভরদার এটাচি কেসট বেখে গেছে। লোকটি ফিরে আসুক, তার পর চলে যাবে।

তিনটে যখন প্রায় বাজে, লাহিড়ী শু-শিউচুয়ানক ডাকলো। সে বসেছিলো দরজার কাছে, তার কাউটারে। সেখান থেকে উঠে লাহিড়ীর কাছে আসতে, লাহিড়ী বললো, “দেখ, একটি লোক এখানে এসে বসেছিলো, সে গেছে ওদিকে একটি ওষুণের লোকানে টেলিফোন করতে—”

“না তো”, বললো শিউচুয়ান, “ও একটি ট্যান্ডিতে চড়ে বসেছিলো। সঙ্গে আরেক জন লোক ছিলো। সে বতক্ষণ এখানে ছিলো, ট্যান্ডিও ওদিকে অপেক্ষা করেছিলো ততক্ষণ। লোকটি গিয়ে গিয়ে সেই ট্যান্ডিতে চড়েই চলে গেছে।”

লাহিড়ী অবাক! বললো, “দেখ, সে এই এটাচি কেসট এখানে বসে গেছে।”

শিউচুয়ান একবার এটাচি কেসের দিকে, একবার লাহিড়ীর দিকে তাকালো। তার পর বললো, “আমি দেখি নি।”

“মানে?”

“আমি ওই লোকটিকে এটা নিয়ে চুকতে দেখি নি।”

“তা’হলে? এটা কি আমি এনেছি নাকি, না আমি আসবার আগে এখানে ছিলো?” জিজ্ঞেস করলো লাহিড়ী।

“আপনি এনেছেন কি না তাও আমি দেখি নি”, শিউচুয়ান

উত্তর দিলো, “তবে আপনি আসবার আগে এটা আমি দেখি নি।”

লাহিড়ী বললো, “বাই হোক, এটা বেখে দাও হোমার কাছে, ও নিশ্চয়ই মনে পড়লে ফিরে আসবে। তখন এটা দিয়ে দিও।”

মাথা নাড়লো শিউচুয়ান। “জিনিসটা কার না স্কেন আমি এখানে ওটা রাখতে পারবো না।”

“তা’হলে আমি কি করবো?”

শিউচুয়ান চুপ করে রইলো একটুখানি। তার পর বললো, “আমার দাবা, আপনি ভুলে গেছেন যে, ওটা আপনার। কিংবা হয়তো এখন আপনার মনে হচ্ছে, ওটা আপনার না হলেই ভালো হয়।”

শিউচুয়ানের কথা মানে প্রথমটা বুঝতে পারলো না লাহিড়ী। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল একটি ঘটনা। কিছু দিন আগে কাগজে বেরিয়েছে। ট্রেণ এক ভঙ্গলোক আরেক জন ভঙ্গলোকের সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে নিলো। ফাষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট। বাতী শুধু ওরা দু’জন। সারাটা পথ বেশ গল্পগুস্তা করতে করতে এলো। হাওড়ায় এসে পৌঁছতে লোকটি বললো, আপনি বস্তন, আমার মালগুলো রইলো। আমি কুলি ডেকে আনি। কুলি ডাকতে সেই যে গেল আর দেখা নেই। তার পর বিরক্ত হয়ে যখন কুলি ডেকে নিজের মালগুলো নামাতে বাবে এমন সময় পুলিশ আর আবগারীর লোক এসে উপস্থিত। অল্প লোকটির বাস্ত্র বুলতে ধাঁপা বেবোলো। তখন এ লোকটিকে নিয়ে টানাটানি। সে বললো, শু মাল তার নয়। কিন্তু এরা শুনলো না তার কথা। তাকে ধরে নিয়ে গেল থানার, অনেক ছালামার পর প্রমাণিত হোলো যে এ বাস্ত্র তার নয়, গাড়িতে অল্প যে লোকটা উঠেছিলো, তার। সে চোরা আঁপা চালান দেয়। হাওড়ায় এসে যেমন সে টের পেলো আবগারী পুলিশ সন্ধান পেয়েছে যে এ গাড়িতে চোরা আঁপা আসছে এবং পাচার বেখেছে তার দিকে, সে আপিণ্ডের মায়া ত্যাগ করে সরে পড়েছে।

মনে পড়তেই যেম উঠলো লাহিড়ী। এটাচি কেসটা তুলতে গিয়ে দেখলো, না, বেশ ভারী।

হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সে।

আর এরকম ভয় পেয়েই সে ভুল করলো। তা নইলে সে দিন তার বা বুর্জো হয়েছিলো, সে একম হোতো না।

তার যখন সন্দেহ হোলো যে এখানে এরকম স্কটকেন ফেল বাওরার মধ্যে কোনো গোলমাল আছে—বাগীকার সি বলে চললো—সোজা পুলিশ ডেকে বাপারটা বুলে বললেই চুক যেতো। এটা যে তার, এরকম কোনো প্রমাণ তো নেই, মনে করবারও কারণ নেই। সে খবরের কাগজের সাব এডিটর, তার একটা পরিচয় আছে। শিউচুয়ানের লোকানে সে আমার সঙ্গে গেছে, কিছুক্ষণ আগে পঞ্চ আঁরি তার সঙ্গে ছিলাম। তা ছাড়া আমাদের দেশের পুলিশও অতো কাঁকা নয় যে ঝট করে বিশ্বাস করে নেবে যে ওই এটাচি কেস লাহিড়ীর।

কিন্তু লাহিড়ী হঠাৎ বেদম ভয় পেয়ে গেল। বললো, “না, ওটা আমার নয়। আমি নিয়ে যেতে পারবো না।”

“কি আছে ওর মধ্যে?” শিউচুয়ান জিজ্ঞেস করলো।

“আমি জানি না,” লাহিড়ী উত্তর দিলো।

“ওটা খুলে দেখা যাক,” শিউচুয়ান বললো।

কিন্তু লাহিড়ী বেরম নার্ভাস হয়ে বললো “না, না, অস্ত্রের জিনিস তুমি খুলে দেখতে যাবে কেন? আর এটা তো আমি আনিনি।”

“কে এনেছে আমি তো দেখিনি।”

“ওই লোকটাকে তো আমি চিনি না।”

“আমি কি করে জানবো সে কথা। আমি দেখেছি সে লোকটা ট্যান্সি চেপে এলো, আপনার সঙ্গে বসে গল্প করলো কিছুক্ষণ, তার পর চলে গেল সেই ট্যান্সিতেই।”

“তুমি শুকে চেনো?”

“না, তবে নানা রকম লোক আসে এখানে। আমি দেখলে একটু একটু টের পাই,” শিউচুয়ান উত্তর দিলো।

“ও কি রকম লোক।”

“আমি জানি না।”

লাহিড়ী আস্তে আস্তে উঠে পড়লো। এটাচি কেসটা কিছুতেই রেখে যেতে পারলো না। শিউচুয়ান মানবে না কিছুতেই। শুকে নিয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতে সাহস করলো না লাহিড়ী। এটাচি কেসটা নিয়ে বেরিয়ে এলো আস্তে আস্তে।

বাইরে এসে ভাবলো এটা নিয়ে এখন কি করা যায়?

এমন সময় দেখে অল্প যে লোকটি এক কোণের টেবিলে বসেছিলো সেও উঠে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

লাহিড়ী তখন আরো ঘাবড়ে গেল। তার-খারপা হোলো, এ নিশ্চয়ই আবগারীর লোক। সে তাড়াতাড়ি পা চাליয়ে দিলো বেস্টরুম স্ট্রীটের দিকে, পেছন ফিরে দেখলো সে লোকটিও আসছে তার পেছন পেছন।

আরো জোরে জোরে পা চালালো লাহিড়ী। বড়ো রাস্তায় এসে দেখে, পেছনের লোকটি তখনো গলির ভেতরে রয়েছে। কাছে এগুটি ট্যান্সি। লাহিড়ী চট করে উঠে পড়লো ট্যান্সিতে। ট্যান্সি ছেড়ে নিতে দেখে অল্প লোকটিও আরেকটি ট্যান্সিতে উঠেছে।

লাহিড়ীর মুখ তখন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে একক্ষণ তার ভুল বুঝতে পারলো। শিউচুয়ানের দোকানেই ওটা খুলে কি আছে দেখে, পুলিশ টুলিশ ডেকে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত ছিলো। কিন্তু এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখন প্রথম কাজ পেছনের লোকটিকে এড়ানো। দ্বিতীয় কাজ এটাচি কেসটাকে খুলে কী কী জানা।

এসগ্রানোডের কাছে আসতে দেখে, সবুজ আলো জ্বলেছে। লাহিড়ীর ট্যান্সি রাস্তা পেরোতে লাহিড়ী পেছন ফিরে দেখে, লাল আলো জ্বলে উঠেছে। পেছন দিকে গাড়ির ভিড় আর অল্প ট্যান্সিটাকে দেখা যাচ্ছে না।

লাহিড়ী তখন একটু নিশ্চিন্ত হোলো।

গাখাটা যদি তখন সোজা আমার অফিসে চলে আসতো—বলে গেল বোগীন্দার সি—সমস্ত ব্যাপারটা মিটিয়ে কেসো যেতো তখনই। কিন্তু লাহিড়ী সে কাজ করলো না। সে তখন ভাবছে কি করে এটাচি কেসটা খুলে কী কী জানা।

হঠাৎ তার মাথায় মতলব খেল গেল। ভাবলো, এ তো খুব সোজা, ইচ্ছে করে ভুল করে ট্যান্সিতে ফেলে গেলেই হয়।

সে গ্র্যাণ্ডের সামনে ট্যান্সি খামালো, ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়লো তাড়াতাড়ি, যেন তার ভীষণ তাড়া।

কিন্তু ভুল করে কোনো জিনিস ফেলে যাওয়া কি এতই সহজ? তখনলো, ট্যান্সি-ডাইভার তাকে ডাকছে। তাকে ফিরে তাকাতে হোলো। দেখলো এটাচি কেসটা হাতে নিয়ে লোকটি তার পেছন পেছন আসছে। নিরুপায় হয়ে সেটি নিতে হোলো।

কিছুক্ষণ পর ভাবলো, আবার চেষ্টা করে দেখা যাক। সে আরেকটি ট্যান্সি নিলো, ট্যান্সিতে চেপে কিছুক্ষণ পার্ক স্ট্রীট, ক্যামাক স্ট্রীট, থিয়েটার রোড ঘুরে, অবশেষে গ্রোবের সামনে এসে নামলো। বাজটা ইচ্ছে করে সীটের সামনে গ্রোবের উপর রেখেছিলো যাতে ডাইভারের চোখে না পড়ে। গ্রোবের সামনে এসে নামলো এই ভেবে যে ডাইভার যদি পরে টের পেয়ে ডাকেও বা, সে আর তখনবে না, সোজা ভেতরে ঢুকে, অল্প দিকে যে আরেকটি পথ আছে পাশের গলিতে বেরিয়ে যাওয়ার, সেদিক দিয়ে সরে পড়বে।

গাড়ি থেকে নামলো, ভাড়া মিটিয়ে দিলো। ডাইভারও লক্ষ্য করলো না যে এই ফ্যাকাসে-মুখ বাদী তার এটাচি কেস ফেলে গেছে ট্যান্সিতে। ভাড়া নিয়ে সে চলে গেল ট্যান্সি হাঁকিয়ে। লাহিড়ী একক্ষণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

গ্রোবের ভিতরে ঢুকলো সে। মতলব—অল্প পথ দিয়ে পাশের গলিতে বেরিয়ে, ইটতে ইটতে ওয়েলসলিতে এসে ট্রাম ধরা।

কিন্তু সে আর হোলো না। অনীতা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে লাহিড়ীর তখন খুব ভাব। আর ভেতরে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল সেই অনীতার সঙ্গে।

“সিনেমা দেখতে এলে বুঝি?” জিজ্ঞেস করলো অনীতা।

“না, এই একটু শুভন নিতে এসেছি,” লাহিড়ী উত্তর দিলো আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে।

অনীতা বললো, “আমি এসেছিলাম এ বইটি দেখা বো কিন্তু টিকিট পেলাম না। চলো কোথাও বসে চা খাওয়া যাক।”

অনীতাকে দেখলে লাহিড়ী সব কাজ ফেলে তার সঙ্গে লেপা থাকতে চায়, কিন্তু সেদিন লাহিড়ী অনীতাকে এড়াতে পারবে না। কিন্তু সে আর হয়ে উঠলো না। অনীতা তাকে সা করে বাইরে বেরিয়ে এলো। আর বেরিয়ে আসতে দেখে, সে ট্যান্সি ফিরে আসছে।

অনীতার উপর ভীষণ রাগ হোলো লাহিড়ীর। কিন্তু কি করার নেই। রাগ হোলো ট্যান্সি-ডাইভারের উপর। ওরা এ সাধুপুুষ করে ছিলো, লাহিড়ী ভাবলো। নিরুপায় হয়ে এট কেস ফেরত নিতে হোলো। আট আনা পয়সা বখশিস দি হারানো মাল ফেরত পাওয়ার জন্তে খুশি হওয়ার ভাণ কর হোলো।

অনীতা দেখতে চাইলো এটাচি কেসের মধ্যে কি আছে লাহিড়ী দেখে, আরো বিপদ। বললো, “অনীতা, কিছু মনে কে না। চা খাওয়া আর আমার হোলো না। আমার এখন ভ কাজ। কাল তোমায় ফোন করে কোথায় দেখা হবে ঠিক : নেবো। আমি এখন চলি।”

অনীতা রাগ করে চলে গেল। লাহিড়ী নিউ মার্কেটের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিনার্ভা এসে।

মিনার্ভার কাছাকাছি আসতে সে ভাবলো, আচ্ছা, এটি সিনেমার ক্লোক ক্রমে রাখলে কি রকম হয়? ওরা তো ট্যান্ড্রাইভার নয়। ওরা নিশ্চয়ই আমার পেছন পেছন ছুটে এসে এটা গচ্ছিয়ে দেবে না। আর ভিড়ের মধ্যে কখন বেরিয়ে যাবে কেউ খেয়ালও করবে না।

মিনার্ভা চুকে পড়লো সে। প্রথমে একটি ব্যালকনির টিকিট কাটলো। তার পর তত্বের গিয়ে দেখে, ক্লোকক্রম এটেন্ডেন্ট নেই। সেদিন লোক বেশী হয়নি। একজন আশায় বললে, এই এটাটি কেস আপনি সঙ্গেই রাখতে পারেন।

সেটা হাতে নিয়েই উপরে উঠে ভিতরে চুকে সে নিজের সীটে গিয়ে বসলো। প্যাসেঞ্জের পাশেই তার সীট, লোকজন বেশী নেই।

তখন তার মাথায় আরেকটি মতলব এলো। এটাটি কেসটি সীটের তলায় রেখে দিয়ে এমনি বেরিয়ে পড়লেই হয়।

একবার ভাবলো এখনই বেরিয়ে পড়ে। তার পর ভাবলো, না। চুকবার সময় লোকটি দেখেছে যে একটি এটাটি কেস নিয়ে চুকছে। সে যদি লক্ষ্য করে সে এমন গালি হাতে বেরোচ্ছে? ঘণ্টা দুয়েক পরে বেরুলেই নিরাপদ। ততক্ষণ আর লোকটার মনে নাও থাকতে পারে।

ঘণ্টা দুয়েক বাস বইখানি দেখলো অতি কষ্টে। নাচ গান ছোড়ের বই—সাধারণত লাহিড়ীর ভালেই লাগে, কিন্তু এখন একটুও উপভোগ করলো না সে।

বই শেষ হলে যখন সে চুপচাপ খালি হাতে বেরিয়ে পড়ছে, তখন চঠাৎ শুনলো পেছন থেকে কে যেন ডাকছে,—আই সে, মিঠার।

তার তিনটে সীট পরে বসেছিল একটি লোক। সে ওই শ্রেণীর পরোপকারী দর্শক যারা বেরাবার সময় সীটগুলো তুলতে তুলতে বেরোয়। লাহিড়ীর সীটটা তুলতেই সে লক্ষ্য করলো লাহিড়ীর এটাটি কেস।

যাই হোক—তাকে অনাস্থবিক ধন্ববাদ দিয়ে এটাটি কেস হাতে লাহিড়ী যখন মিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে, তখন দেখে অনীতা আর আরেকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীচে। ওরা ছাঁটার শো'এর টিকিট কিনেছে।

লাহিড়ীকে দেখে অনীতা বললো, "ও, এই তোমার ভীষণ কাজ?" সে কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই অনীতা তার বন্ধুকে নিয়ে সরে যেতে দেখান থেকে।

কিন্তু অনীতার অভিমান ভাটানোর চেষ্টা করার সময় লাহিড়ীর মনে নেই। সে রকম মজাও নেই।

সে তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। এটাটি কেসটা দূর হতেই হবে। যে কবেই হোক, কলকাতা শহরে, যেখানে লোকের এত জিনিস হারান্ধে, খোঁজা যান্ধে, চুরি হচ্ছে, হারান্ধে—সেখানে একটি সামান্য এটাটি কেস কিছুতেই হার করে হারানো যায় না?

সেদিন অনেক চেষ্টা করলো লাহিড়ী। পেবে উঠলো না হতেই।

নিউ মার্কেটের ভিতর একটি নিরিবিলা দেখে চায়ের ষ্টলের কেবিনে বসে চা আর প্যাটিস খেয়ে, টেলিভিশন নিচে এটাটি কেসটি রেখে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ওপানকার বয় কী সাধুপুঙ্খ, তাকে ডেকে এটাটি কেসটি ফিরিয়ে দিলো।

এদিক ওদিক ঘুরে একটি নিরিবিলা ডাষ্টবিন পেলো না কোথাও, সব ডাষ্টবিনের আশে-পাশেই লোকজন গিজগিজ করছে। লাহিড়ী ভাবলো, কলকাতা শহরের জনসাধারণের কচি কোথায় নেমেছে? ডাষ্টবিনের পাশেও এত ভিড়!

তারপর গেল ময়দানে। তখনো ভালো করে সন্ধ্যা হয়নি। আলো আছে চার দিকে। খুঁজে পেতে একটি নিরিবিলা জায়গা দেখে এটাটি কেসটি রেখে আবার মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো সে।

এবার তাকে পেছন থেকে যে ডাকলো, তার গলা খুব কাঁচা। পেছন ফিরে দেখে, একটি বাচ্চা স্কাউট ছুটে ছুটে তাকে ডাকছে।

মনে মনে লর্ড বেডেন পাওয়ারলকে গালাগালি দিতে দিতে সে তার হাত থেকে এটাটি কেসটি গ্রহণ করলো। ছেলেটি তাকে তিন-আঙুলের সেলিউট মেরে চলে গেল।

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে অন্ধকার হয়ে এলো। তখন ময়দানের এদিক ওদিক খুঁজে পেতে দেখে, এতক্ষণ যদিও বা নিরিবিলা ছিলো, এখন তাও নেই। সারা কলকাতার অদৃশ্য ছেলে-মেয়ের জুড়ি এদিকে ওদিকে বসে কিস-কিস করে কথা বলছে।

সে তখন ফিরে এলো চৌরঙ্গিতে। ভাবলো, কী করা যায়।

ভাগ্য তাকে নিয়ে পরিস্রাসও করলো একটুখানি। কর্পোরেশন প্রেসের ওদিকে একটি ছেলে আচমকা তার এটাটি কেসটি ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় মারলো।

কি যেন ভাবছিলো লাহিড়ী। ওটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিতেই 'চোর চোর পাকড়ো পাকড়ো' বলে চিৎকার করে উঠলো। চিৎকার করে উঠেই থেমে গেল সে। কি করলো সে! বেশ তো ছেলেটা এটাটি কেস চুরি করে পালান্ধিলো। কেন সে বোকার মতো চিৎকার করে উঠলো।

কিন্তু ক্ষতি বা হুজুর তা হয়ে গেল। কলকাতার পাব্লিক-লিপিটিড জনতা ততক্ষণে ছেলেটিকে ধরে ফেলেছে। এটাটি কেস তার হাতে আবার ফিরে এলো। সে আবার পথ চললো সেটি হাতে নিয়ে। তার মনে তখন খুব সমবেদনা ছেলেটির জঙ্কে—তার লোক ঠ্যাঙাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে যখন সে মিউজিয়াম পেরিয়ে কিড ট্রীটের মোড়ে এসে দাঁড়ালো, তখন সে আর ভাবতে পারছে না কি করবে।

এমন সময় লুপ্তিরা একটি লোক এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। কিস-কিস করে বললো, "চুকরি চাহিয়ে সাহাব? বচত আচ্ছা আচ্ছা খাপসবত গ্রাংলোইণ্ডিয়ান, বেল্লি কলেজ গার্ল, পাঞ্জাবী, নেপালী, চীনা,—"

তখন লাহিড়ীর মাথায় আরেকটি মতলব এলো। বললো, "চীনা চুকরি খায়?"

গলির ভেতর দিকে একটু অন্ধকারে একটি ফিটন গাড়ি

শাড়িয়েছিলো। সে লোকটির পেছন পেছন সেই গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

ভেবেছিলো লোকটি যখন চীনা ছুকবির খোঁজ দিচ্ছে, তাকে নিয়েও যাবে চায়না টাউনে।

কিন্তু লোকটি কোথা গিয়ে কোথা দিয়ে তাকে নিয়ে এলো ওয়েলসলি অঞ্চলের এক নোরা গলিতে।

লাহিড়ী ভেবেছিলো, ওখানে কোনো মেয়েছেলের ঘরে এটাচি কেসটি ফেলে আসবে। ওরা নিশ্চয়ই সাধুপুরুষ নয়। সে ভুল করে একটি এটাচি কেন ফেলে যাচ্ছে দেখলে নিশ্চয়ই তাকে ডেকে সেটি ফিরিয়ে দেবে না।

কিন্তু যা ভেবেছিলো তাও হলো না।

লোকটির সঙ্গে একটি জর্ণি বাতীর দোতলায় উঠে একটি আঁখা অন্ধকার ঘরে ঢুক লাহিড়ী পড়লো কয়েক জন গুপ্তার হাতে।

তার ঘড়ি গেল, কাউন্টেন পেন গেল, আঙটি গেল, টাকাকন্ঠি মানিবাগ গেল। তাতে তার মনে এমন কিছু হুঃ হুঃ হুঃ যখন সে দেখলো তার এটাচি কেসটিও ওরা নিয়ে নিলো।

কিন্তু ওদের মধ্যে একজন এটাচি কেসটি এককোণে নিয়ে গিয়ে সেটি খুলে দেখলো! দেখে একবার লাহিড়ীর দিকে তাকালো। তার পর সেটি বন্ধ করে লাহিড়ীর হাতে দিয়ে বললো, “এটি আমাদের দরকার নেই। আপনি নিয়ে যান।”

আরেক জন জিজ্ঞেস করলো, “আপনি থাকেন কোথায়?”

“সে জেনে কি হবে?” লাহিড়ী জিজ্ঞেস করলো।

“না। শুধু জানতে চাইছিলাম আপনার বাস ভাড়া কতো লাগবে। হেঁটে গেলে তো তরলিফ হবে—। আচ্ছা, সাহাব, এই এক টাকা নিয়ে যান।”

সর্ব্বথ খুঁজে এটাচি কেস হাতে নিয়ে বাড়ী রওনা হলো লাহিড়ী। খানিকটা পথ গিয়ে ভাবলো, না, এটা নিয়ে বাড়ী ফেরা ঠিক হবে না, সবাই জানতে চাইবে এর মধ্যে কি আছে। সে আরেক বিপদ।

কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? একটু ভেবে স্থির করলো, না—অফিসে ফিরে যাই! আন্ত তার রাস্তিরে ডিউটি নেই, বটে। কিন্তু ওখানে গিয়ে একটু নিবিড়ি বসে ভাবা যাবে, এটা নিয়ে কি করা যায়।

ওই এক টাকা খরচা করে সে কিছু খেয়ে নিলে একটা ছোট্টো রেস্টুরাঁয়। খরচা যা বাঁচলো তাতে ট্রামে চেপে অফিসে ফিরে এলো। অফিস থেকে সে তাদের পাড়ায় এক প্রতীবেশীর কাছে ফোন করে নিলো, যেন বাড়ীতে খবর দিয়ে দেয় সে অফিসে আছে।

তার সহকর্মী সাব-এডিটরোবো জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার, আজ তার ডিউটি নেই, সে এখানে কেন?

সে এলোমেলো হ’-চাষটি কথা বলে তাদের কোতুলক এড়িয়ে অস্ত্র গল্প কাঁদলো।

ঘড়িতে তখন সাড়ে দশটা।

কেটে গেল আরো আধ ঘণ্টা। ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের মধ্যে বসে আশস্তে আশস্তে তার সাহস ফিরে এলো। ভাবলো, সত্যিই তো। এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে। রাত একটু বেশী হলে পথঘাট নির্জন হয়ে আসবে। তখন একটি ডাষ্টবিনে ফেলে দিলেই হোলো।

এগারোটা বাজলো। ভাবলো, এবার ওটা যাক। তখন এগারোটা বশ।

ঠাৎ একজন ঘরে ঢুক বললো, “আপনি এখানে? মিষ্টায় দন্ত পুলিশকে বলছিলেন আপনি এখানে নেই। কারণ আজ আপনার নাইট ডিউটি নেই। কিন্তু ওরা নাকি আপনার বাড়ীতে খবর নিয়েছে। বাড়ীতে বললে, আপনি নাকি এখানে।”

“পুলিশ!” লাহিড়ীর মুখ শুকিয়ে গেল।

“হ্যাঁ। ওরা মিষ্টার দন্তের ঘরে বসে আছে।”

“ও, আচ্ছা, যাচ্ছি—।” এটাচি কেস হাতে নিয়ে উঠে পড়লো লাহিড়ী। সহকর্মীরা জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার? সে বললে, কি জানি কি ব্যাপার। দেখে আসি একবার।

বেরিয়ে এসে কিন্তু দন্তের ঘরে ঢুকলো না লাহিড়ী। সোজা রাস্তায় নেমে এলো।

গলিটা পেরিয়ে এসে বড়ো রাস্তায় পড়তেই একটি বাস পেয়ে গেল। তাতে উঠে পড়লো সে।

চৌরঙ্গি পেরিয়ে পাক স্ট্রীটের মোড়ে আসতেই সে বাস থেকে নেমে পড়লো। তার পর হাঁটতে কাগলো পাক স্ট্রীট ধরে। এখন চার দিক নির্জন। কোনো কাঁকা জায়গায় একটা ডাষ্টবিন পেলেই হয়।

অনেকটা পথ হেঁটে তার পর ডাইনে ক্যামাক স্ট্রীটে ঢুকলো। চারদিক নির্জন নিস্তব্ধ। একটু এগুতেই একটি ডাষ্টবিন। কাছাকাছি এসে যেই এটাচি কেসটি ফেলতে যাবে এমন সময় দেখলো ডাইনের গলির ভেতর থেকে একটি পুলিশ-ভান বেগোচ্ছ।

মনে পড়লো, আজ-কাল একটু বেশী রাস্তিরে কাঁকা জায়গায় কোনো ভদ্রবৈশী কাউকে ডাষ্টবিনে কিছু ফেলতে দেখলে পুলিশেরা খুশি হয় না। কয়েক দিন আগে কোথায় যেন কাঁকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে একটি নবজাত শিশুর মৃতদেহ শুকু।

সে তাড়াতাড়ি হেঁটে চললো। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়লো,—ভাই তো, কেন পাগলের মতো ঘুরে মরছে সে। তার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রশান্ত দাশগুপ্ত, আবগারী বিভাগের বড়ো অফিসার। তাকে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতেই হয়।

সে থাকতো বেকবাগানে। ধুকতে ধুকতে তার বাড়ী এসে উপস্থিত হলো লাহিড়ী। তখন বারোটা প্রায় বাজলো। বাড়ীতে থাকতো প্রশান্ত, তার ছোট্টো ভাই, আর একটি চাকর। ছোট্টো ভাই দরজা খুলে দিলো। এত রাস্তিরে লাহিড়ীকে দেখে সে অবাক!

বললে, “দাদা তো বাড়ি নেই। কি একটা জরুরী কেসে বেরিয়েছে সেই সন্ধ্যাবেলা।”

“বাই হোক, ফিরবে তো, আমার খুব দরকার,” বলে লাহিড়ী বসবার ঘরে গিয়ে বসে পড়লো।

প্রশান্ত যখন বাড়ী ফিরলো তখন রাত প্রায় একটা। লাহিড়ীকে দেখে সেও অবাক তোলা, জিজ্ঞেস করলো, “তুমি এত রাস্তিরে?”

“ভাই, খুব জরুরী দরকার আছে তোমার সঙ্গে। কতক্ষণ বসে আছি তোমার জন্তে।”

“হ্যা, বড়ো দেরী হয়ে গেল। বেস্টিক স্ট্রীটের ওসিকে চোরাই আপিণ্ডের বেশ একটি বড়ো চালান ধরা পড়লো। সেই ব্যাপারেই বেরিয়েছিলাম,” প্রশান্ত উত্তর দিলো।

“বেস্টিক স্ট্রীটের ওসিকে?” লাহিড়ীর মুখ শুকিয়ে গেল।

“হ্যা, একটি চীনেমানের রেক্সরায়।”—

“এ্যা—,” চমকে উঠলো লাহিড়ী।

“কেন কি চয়েছে?” প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলো।

লাহিড়ী তখন সব খুলে বললো প্রশান্তকে।

“শিউচুয়ান”এর রেক্সরায়।”—প্রশান্ত সব শুনে জিজ্ঞেস করলো।

“হ্যা, কেন?” চোখ গিলে লাহিড়ী বললো।

“তা হলে তুমিই সেই?” জিজ্ঞেস করলো প্রশান্ত।

“আমিই সেই মানে?”

প্রশান্ত হাসতে শুরু করলো। হাসতে হাসতে বললো, “এটা কেসটি একবার খুলে দেখে নিতেও পারলে না?”

“ভয়ে খুশিনি,”—উত্তর দিলো লাহিড়ী।

“আচ্ছা, এবার খুলে দেখ লো।”

লাহিড়ী আস্তে আস্তে এটাটি কেসটি খুললো। তার ভেতরে চারটে কাগজের বাস্তু ঠাসাঠাসি করে রাখা। প্রত্যেকটি খুলে দেখলো লাহিড়ী। প্রত্যেকটির ভিতর সন্দেশ।

“বুঝলে বন্ধন, প্রত্যেকটির ভিতর সন্দেশ,” বলে বোগীন্দার সি আবার হাসতে শুরু করলো।

“সন্দেশ?” আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “লাহিড়ীর সঙ্গে বসিকতা করছিলো নাকি কেউ?”

বোগীন্দার বিস্ময় খেলো হুঁ তিন চুমুক। তার পর উত্তর দিলো, “না। কেউ বসিকতা করেনি। কলকাতার হুঁজন নামজালা আগসারের একটি পাঁচ ছিলো এর মধ্যে।”

“কি বকম?”

“বুঝলে না? শিউচুয়ানের দোকানে ওই হুঁজন লোকের দেখা হওয়ার কথা ছিলো আরেক জনের সঙ্গে, যার হাত দিয়ে কিছু আপিং পাচার করে দেওয়ার কথা। ওই হুঁজনের একজন বাঙালী, আরেক জন চীনেমান। যার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিলো সেও বাঙালী, কিন্তু এদের কি বকম যেন সন্দেশ হয়েছিলো যে আবগারীর লোকেরা এই খবরটা পেয়েছে এবং নজর রাখছে দোকানটির উপর। তখন আর অল্প লোকটিকে খবর দিয়ে দত্ত জায়গায় দেখা হওয়ার ব্যবস্থা করার সময় ছিলো না। তাই জয়া ভাবলো, আবগারীর লোকের চোখে ধুলো দিতে হবে। যে বকম এটাটি কেসে ওদের আপিং পাচার করে দেওয়ার কথা, সে বকম এটাটি কেসে সন্দেশ পূরে সেটি সেখানে নিয়ে গেল, তাইদেই দলের একজনকে দেওয়ার জন্তে, যাতে আবগারীর লোক তাইই পিছু নিয়ে বেরিয়ে চলে যার সেখান থেকে, আর যথাসময়ে আসল লোকটি এসে তার হাতে আসল মালটি নিরাপদে দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু কোনো কারণে প্রথম লোকটি সময় মতো এসে পৌঁছতে পারলো না। এসেও তার দেবি করবার সময় ছিলো না। লাহিড়ীকে দেখে ওরা বুঝে গেলো যে সে ভালোমানুষ। এ পাড়ার ধবর সে বন্ধী রাখে না।

তাই একটু বুকি নিয়ে তাইই কাছে সন্দেশ-ভর্তি এটাটি কেসটা বেখে সরে পড়লো। দূরে কোথাও যার নি, কাছেই আরেক জায়গায় বসে লক্ষ্য করেছিলো। যখন দেখলো যে লাহিড়ী বেরিয়ে গেল, আর তার পিছু নিল আরেক জন লোক, লাহিড়ী রাস্তায় গিয়ে ট্যান্ড্রি নিতে সেও ট্যান্ড্রিতে চাপলো—তখন পথ পরিষ্কার ভেবে ওরা ফিরে এলো শিউচুয়ানের দোকানে। তার পর আসল লোক এসে পৌঁছতে তার হাতে তুলে দিলো আপিং-ভর্তি এটাটি কেসটি।

“তুমি কি করে জানলে এত সব কথা?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“লাহিড়ীর কাছে শুনেছি।”

“সে কি করে জানলো?”

“সে শুনেছে আবগারী বিভাগের সেই অফিসার বন্ধু প্রশান্ত দাশগুপ্তের কাছে।”

“দাশগুপ্তই বা কি করে জানলো?”

“দেখ বন্ধন,” বোগীন্দার উত্তর দিলো, “আবগারী বিভাগের লোকেরা অতো কাঁচা নয়। সহজ কাজ নয় ওদের চোখে ধুলো দেওয়া। ওই খাগলার হুঁজন যে ট্যান্ড্রিতে ঘুরছিলো, সেই ট্যান্ড্রির ডাইভার আসলে পুলিশের লোক। ওদের সন্দেশ কিনে একটি এটাটি কেসে পুরতে দেখে সে ওদের মতলবটা ঠিক ধরে ফেলেছিলো। আপিং-ভর্তি এটাটি কেসটা ওদের সঙ্গে ছিলো বলে ওদের আগেই ঘরা যেতো, কিন্তু সেটা করেনি, যার হাত দিয়ে মালটা পাচার করে দেওয়া হবে তাকেও ধরবে বলে। সে সময় মতো খবর দিয়েছিলো আবগারীর লোককে। তাই লাহিড়ী যখন শিউচুয়ানের দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লো, একজন লোক তার পিছু নিয়েছিলো এদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্তে, যাতে এরা নিরাপদ মনে করে পরে ফিরে আসে শিউচুয়ানের দোকানে। ওরা যদিও জানতো না পুলিশের লোক আঝে কয়েক জন ছিলো, সেই দোকানের আশে-পাশে। সুতরাং আসল তিন জন লোক যখন একত্র হোলো, বামাল-গুহর ধরে ফেলো হোলো ওদের সবাইকে। অফিসার দাশগুপ্ত সেই কেসের ব্যাপারেই অতো রাত অবধি বাইরে ছিলো।”

“যার যে লোকটা লাহিড়ীর পিছু নিয়েছিলো?”

সে তো লোকদেখানো। খানিকটা, এই এসপ্লানডে অবধি, ওর পেছন পেছন গিয়ে সে চলে যায় অতৃ দিকে।

“আচ্ছা, তাই হলে লাহিড়ীর অপিসে এসে পুলিশ ওর খোঁজ করছিলো কেন?”

বোগীন্দার হাসলো। বললো, “সে আরেকটি ব্যাপার। সেই যে গুণাগুণো লাহিড়ীর কাছে থেকে ওর ঘড়ি, পেন, মানিবাগ সব কেড়ে নেয়, সেদিন ওদের মধ্যে কি একটা গুণগোল বাগতে একজন ছুরির ঘায়ে লক্ষ্য হয়। পুলিশ ওর কাছে মানিবাগটি পায়; তার মধ্যে লাহিড়ীর নাম লেখা ভিত্তিটি কাড় ছিলো। তাই ওরা গিয়েছিলো লাহিড়ীর খোঁজে।

বোগীন্দার বলতে বলতে হেসে খুন। বললো, “পুলিশের কাছে পরে লাহিড়ীর কি কাকুতি-মিনতি। ওর টাকা ঘড়ি পেনের দরকার নেই, বাড়িতে বা অপিসে যেন জানতে না পারে যে সে ওরকম একটি জায়গায় গিয়েছিলো। একটি অবহিত এটাটি কেস ফেলে আসবার জন্তে যে একজন স্বেচ্ছাসিদ্ধ লোক ওরকম

পাড়ার বাবে, এ কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। বাই হোক, প্রশান্ত দাশগুপ্তের সাহায্যে সে কোনো রকমে এসব বাসেলা এড়াতে পেরেছিলো।”

“মিথ্যা ভয়ে একটা দিন তার কি অশান্তিতে কেটেছে,” আমি বললাম, “বাই হোক, অনীতা নামে সেই মেয়েটির সঙ্গে লাহিড়ীর মিটমাট হয়ে গিয়েছিলো তো?”

যোগীন্দার একটু হাসলো। কিন্তু অল্প রকম সেই হাসি। বিষণ্ণ, শূন্য।

অনেকক্ষণ কোনো উত্তর না দিয়ে সে বিয়ারের বোতলটি শেষ করলো।

তারপর বললো, “রজন, আজ দু’বোতল বিয়ার খেয়েই কি আমি একটু মাতাল হলাম না কি?”

“কেন?” আমি জিজ্ঞাস করলাম।

“তোমার আরো অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে।” একটু ধামেলা সে। কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, “না, এ আলোচনা বেশী করে লাভ নেই। লাহিড়ী আমার বন্ধু। ও আর অনীতা এখন বিয়ে করে খুব সুখে সংসার করছে। অনীতার সঙ্গে আমার আগেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো লাহিড়ী। হঠাৎ দেখি, অনীতা আমার সঙ্গে খুব আলাপ জন্মাবার চেষ্টা করছে। আমি তো জানতাম না ওদের মধ্যে একটু মন কষাকষি হয়েছে। আমি ভাবলাম, লাহিড়ী যদি অনীতাকে সামলে রাখতে না পারে সে আমার কোষ নয়। দিস ইজ এ ফ্রী কান্ট্রি। অনীতা যদি আমার সঙ্গে ঘোরাকোরা করতে চায়, কার কি বলার আছে? ইক উই হ্যাভ সাম ফান টুগেদার, ভালোই তো। আর জানোই তো আমরা এমনিতেই বাঙালী মেয়েদের খুব এডমায়ার করি। ক’দিন বেশ কাটলো। একদিন দেখি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ওখানে ওরা হাত ধরাধরি করে বসে আছে। অনীতার গলা খুব ভারী, যেন একটু কৈদেছে খানিক আগে। বলছিলো, তুমি আমার আগে কেন বলোনি, কেন খুলে বলোনি—এই প্রথম সব মিষ্টি-মিষ্টি কথা। বা ওরা বলে থাকে। আমার ওরা দেখিনি। আমি সরে গেলাম। হাসি পেসো খুব। কি রকম বোকা, সেক্টিমেণ্টাল, ওরা দু’জন। বাড়ী ফিরে এসে দেখি—এই বেরারা, আউর একটো বিয়ার লও—বাড়ী ফিরে এসে দেখি হাসি আর পাচ্ছে না। খুব মন খারাপ মনে হচ্ছে যেন। চূপ করে বসে ভাবলাম, আগে কেন জানতে পারলাম না নিজের মনকে। তারপর ভাবলাম, যাক, ভালোই হয়েছে। আমি পাঞ্জাবী, অনীতা বাঙালী। ওর মা বাবা তো রাজী হোতো না। তা ছাড়া, সে যখন সত্যি সত্যি লাহিড়ীকেই ভালবাসে, তখন আর এ কথা ভেবে কী লাভ!”

বেরারা আরেকটি বিয়ার আনলো। গলাসে বিয়ার ঢেলে যোগীন্দার আন্তে আন্তে বললো, “লাহিড়ী ওর বিরুদ্ধে নেমস্তম্ভ করেছিলো। খুতি পাঞ্জাবী পরে বিয়ের বরখাদীও গিয়েছিলাম। এখনও প্রাইভেট বাই ওদের বাড়ি; খুব ভাব ওদের সঙ্গে। ওরাও বেশ সুখে আছে।”

সেই বোতলও আন্তে আন্তে শেষ করলো যোগীন্দার সিং। বললো, “তবে রজন, আমার এমন কিছু লোকসান হয়নি। আর কিছু দিন পরেই আলাপ হোলো টিং-লিং-এর সঙ্গে। ওর ভাই ফে-জে-শিয়া-এর

সঙ্গে কিছু কিছু ব্যবসার লেন-দেন আছে। একদিন ওদের বাড়ীতে গিয়েই আলাপ হোলো। টিং-লিং অদ্ভুত মেয়ে,” জিভ দিয়ে ওপরের চোঁট, নিচের চোঁট চোটে নিলো যোগীন্দার সিং, বলে গেল, “জানোই তো, আমি খুব সিরিয়াস টাইপ-এর ছেলে নই। আমি চাই টাকা, আমি চাই ভালো ভালো মেয়ে-বন্ধু, আমি চাই ভালো বিয়ার, ভালো স্কচ, ভইস্কি—বাস, এতেই আমি সন্তুষ্ট। অনীতার জগৎ সব চাইতে ভালো লাহিড়ীরা, যারা ছোটোখাটো চাকরী করবে, ছোটো ছোটো স্ল্যাট সুখে ঘর করবে। আমি অল্প রকম। আই ওয়াট ফান্ ফান্, এ্যাণ্ড নাথিং বাট ফান্।”

যোগীন্দার উঠে দাঁড়ালো।

হাত বাড়িয়ে আমার হাত নিশ্চেষ্ট করে কবরদার করলো, বললো, “ওয়েল রজন। তুমি একটি কাউন ফেলো। তোমার আমার বেশ লাগছে। আমি ইতিমধ্যে একদিন টিং-লিং কে নিয়ে বেরোছি। তুমি আসবে নাকি? যদি আসো তো আরো একটা মেয়েকে বলবে তো জাট লী মে কীপ ইউ কাল্পেনি। গিভ মি এ রিং টু মরো, আমি ডেট সিগ্ন আপ করবো। ও-কে, বাই বাই।”

যোগীন্দার সিং যখন চলে গেল, তখন লাইট হাউস বার-এ অনেক মেয়েপুরুষের ভীড়, বাইরের পথে অনেক আলো, আর বন্ধ জানালার ওপারে অনেক দূরে নিখর নীল আকাশে লাল-নীল-সবুজ নিঙন সাইনের স্বাপসা আভাস।

যোগীন্দার যে বলেছিলো চীনে-পাড়ায় জুতো পাওয়া যায় খুব সস্তায়, সে কথা মনে ছিলো। ভাবলাম, সৌখিন দোকানে শুভা দিয়ে তৈরী করানো জুতো তো অনেক পরেছি, এবার চীনে পাড়া জুতো চেষ্টা করে দেখা যাক। যোগীন্দারের পায়ে যে জুতো দেখছি সে যদি অতো সস্তা হয় তো নিউ মার্কেট বা কলেজ স্ট্রীট বা ভবানীপুর থেকে জুতো কেনার কোনো নানাই হয় না।

এক দিন জুতোর বোজ্ঞে গাঁটছিন্নাম বেটিক স্ট্রীট ঘরে। হঠাৎ দেখি, একটি দোকানে দিলীপ বসে আছে।

আমায় দেখে সে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে। রাস্তায় নে এ পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, “দিগাড়েট আছে?”

“হ্যাঁ।”

“দে একটা, তারপর, এদিন তোর দেখা নেই কেন? এখানে কি করছিল?”

আমার বেটিক স্ট্রীট অভিযানের কারণ ব্যক্ত করলাম।

“ও, জুতো কিনবি? বেশ হো,” বললো দিলীপ, বলে কি ভাবলো। তার পর জিজ্ঞেস করলো, “কতো টাকার মধ্যে চাস?”

“এই টাকা পনেরোর মধ্যে—”

“দে আমার পোনরো টাকা—।”

“আগে জুতো তো গছন্দ করি—”

“টাকাটা আমার দে না! আমি তোকে তিরিশ টাকার দু পোনরো টাকার কিনে দেবো। টাকাটা তোর কাছে থাকে তোকে এরা পাঁচ টাকার জুতো পোনরো টাকায় ঠিকিয়ে দেবো।”

“যোগীন্দার সিং বলেছিলো—”

“যোগীন্দারের কথা বিজ্ঞানের দর্ভব্যর বাইরে বকেই করে। ও নিশ্চয়ই তোকে চিশিউ-চিং-এর দোকান থেকে কি

লেছে। ওই সিংহ-কুল-কলঙ্ক প্রবঞ্চকের কথা বার দে। সে শিউ-  
ট-এর কাছে কমিশন খায়। ওদের এখনো চিনিশ না? কমিশন  
গাড়া ওরা মানব জীবনের অন্ত কোনো জীবন-ধ্বংস ভাবছেই পারে  
না। তুই আর আমার সঙ্গে। এটি আহ-তং, তং-এর দোকান। এ  
আমার অনেক দিনের বন্ধু।”

“কেন আহ-তং, দিলীপ না? সেই যে সেদিন রাত্তিরে ট্যাংরা  
গিয়েছিলে এর বোঝে—”

“হ্যাঁ রে। সেই। এর ভাই আহ-কিম-এর সেদিন মাথা  
কেটেছিলো। আর ভেতরে আর। না, না, আগে টাকা পনেরোটা  
দে। ওদের সামনে দিলে ওরা কিংমেন করবে।”

দোকানের ভেতরে উঠে এলাম আমার দুঃজন।

বেঞ্চিক ট্রাটের চীনেমানের সাদাসিধে জুতোর দোকান।  
কোনো রকম সাজসজ্জার বাহার নেই। দিনের বেলা আলো  
হলছে। এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়াল পর্যন্ত ঝোলানো  
দড়িগুলো থেকে বলছে শরি সারি বুট জুতো, ক্যান্সেল  
জু, কাবলি আর পাম্পা। কালো চামড়ার, লাল চামড়ার,  
লাল-সাদা কবিশনশানের, সাদা সুরেডের, কালো সুরেডের,  
বানামী সুরেডের। দেওয়ালের দু’পাশে দুটো লম্বা বেঞ্চি।  
দু’দিকের ভেতর একটি বাচ্চা ছেলে টাইসাইকেল চালচ্ছে, আর  
হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে আরো বাচ্চা একটি মেয়ে। ভারী কয়সা,  
ভারী ফুটফুট মিষ্টি দেখতে, সোজা সোজা কালো কালো চুল, নাক  
তো নেই-ই, চোখ দুটোও প্রায় নেই বললেই হয়।

দরজার বসে এক প্রাণী মুসলমান—দোকানদারের এমিষ্টাণ্ট।  
পাখের লোকজনকে এক নাগাড়ে ডেকেই চলেছে—এই যে সুর, কী চাই  
বলুন না তার, প্রায় মাগনা দিচ্ছি তার, না লিবেন তো না লিবেন,  
একবার এসে দেখে লিন। ক্যা মাংসে তো ভাই সাহাব, আগ না  
জী। আইয়ে, আইয়ে সর্দারজী, বহত বিচিরা চপ্পল মিলেছে।  
মোয়ট মিষ্টার, শুভ মোকাসিন? কম ইন গ্রাণ্ড লুক, দেন বাই,  
মাগনার দিচ্ছি সুর, লিয়ে বান, লিয়ে বান,

বতো সোরগোল, সবই কিন্তু বাইরে। দোকানের ভেতর  
নিম্নর প্রশান্তি, সুর-প্রাচীর বোধ মন্দিরের মতো। কাউটারের  
ওপাশে একজন জুতোর ঝং দিচ্ছে। এক কোণে একটি মেয়ে বসে  
কেশিনে চামড়া সেলাই করছে। কাউটারের পেছনে একটি পাতলা  
পর্দা ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ। আবছা দেবা যায় তার পেছনে  
একটি মেয়ে কাঠের চিকী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

“আহ-তং! আহ-তং!” দিলীপ ঠাক ছাড়লো।

পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একজন, তার গায়ে বববে  
ফলা গেঞ্জি, পরনে ফরসা খাকি হাকপ্যাট, পায়ে কাঠের খড়ম,  
কমরে বাঁধা লঙ্গরের আধময়লা এপ্রন? এক হাতে একটি জুতো,  
অন্য হাতে জুতোর লাস। পাট করে আঁচড়ানো চুল, বববে ফরসা  
মুখে সোনালী-কিলিক-মায়া হাসি।

“আহ-তং, এ আমার বন্ধু রজন, জুতো কিনতে এসেছে।”

আহ-তং হাসি মুখে বেস্টা দেখিয়ে দিলো।

সে অন্ন কথার মাধ্যমে। গিজেস কালো পরিষ্কার বাংলাতেই,  
রকম জুতো চাই?”

“জাউন শু, ডুরাটা সোল হলেই ভালো হয়।”

“হ্যাঁ, হবে।” পায়েই দিকে তাকিয়ে মাপটা ছিঁব করে নিলো  
সে। তার পর চট করে উপর থেকে ছ’ তিন জোড়া পেড়ে নিলো।  
দু-এক জোড়া পরে দেখতে পায়েই সাইজ মতো পাওয়া গেল।

“কতো দাম?”

“আঠারো টাকা।”

“আঠারো টাকা? কী যে বলো আহ-তং! আঠারো টাকার  
শিউটিং তিন জোড়া জুতা দেয়,” দিলীপ বললো।

“শিউটিং পিচবোর্ডের জুতো দেয়। আহ-তং দেয় না। তুমি  
চায় তো আমি আঠারো টাকার আঠারো জোড়া পিচবোর্ডের জুতো  
দেবে। চামড়ার জুতা হলে আঠারো টাকার এক জোড়া।”

“আহ-তং, রজন আমার বন্ধু।”

“দিলীপ বাবু, বিজনেস ইজ বিজনেস।”

“না, আহ-তং, এ জুতো পাঁচ টাকা জোড়া।”

“বাবু কী বলছি। হি: হি:—” হাসলো আহ-তং, “আচ্ছা,  
বাবুর বন্ধু, তাই পনেরো টাকা।”

“না, পাঁচ টাকা।”

আমি দিলীপকে আন্তে আন্তে বললাম, “দিলীপ না, স্বয়ং দিলীপ,  
এটা খুব চীপ।”

“শাট আপ,” বললো দিলীপ, “আহ-তং, তুমি আমার ফ্রেণ্ড।

রজন আমার ফ্রেণ্ড। তাই এ জুতো ছ’ টাকা।”

“না বাবু, তেরো টাকার কমে হবে না।”

“দাত টাকার বেশি এক পয়সাও দেবো না।”

“আচ্ছা, বারো টাকা দিয় দিন।”

“আহ-তং, হোমার জন্ত আট টাকা। বাস।”

“আমার প্রাক্টি কোথায় বাবু?”

“কেন, পাঁচ টাকা বট, তিন টাকা প্রাক্টি—।”

“আচ্ছা, আট আনা পয়সা বেশি দিন—।”

“ঠিক আছে,” আমি বললাম। আট টাকা আট আনাও এ  
জুতো, ভাবাই যায় না।

দিলীপ একবার আমার দিকে তাকালো। তারপর পকেট  
থেকে বার করলো দশ টাকার নোট। ভাঙতিটা ফেরত নিয়ে  
আবার নিজের পকেটেই পুরলো।

তার পর আমার মুগের ভাব দেখে বললো, “তুই তো পোনরো  
টাকা খরচা করবার জন্ত রান্ধী ছিলি। এ টাকাটা আমার কমিশন  
হয় তাই হলে। তবে তুই আমার ভায়েব মতো। হোর কাছ থেকে  
মার্জিন মেরে কী হবে। এ টাকা খারবলেই নিলাম, পরে  
ফেরত পাবি।”

আহ-তং জুতো-জোড়া আরেক জন অল্পবয়সী চীনের হাতে  
দিলো। সে একজোড়া শ্রুতলি আর আঠার বোতল নিয়ে বললো।

আহ-তং বললো “দিলীপ বাবু, হোমার বন্ধু চা খাবে?”

“আলবৎ খাবে। আমিও খাবে।”

আহ-তং চীনা ভাষার পর্দার অন্তরালবর্তিনীকে কি যেন বললো।  
দেখলাম অন্তরালবর্তিনী এক কোণে একটি টোভের উপর একটি  
কেতলি চাপিয়ে দিলো।

আহ-তং একবার ভেতরে যেতে আমি দিলীপকে বললাম, “কী  
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর! এরা খুব খাটে, না?”

"হ্যা। খুব। সারা দিন খাটে।" দিলীপ উত্তর দিলে, "এখন তো দেখছিস গেলি আর হাকপাশ্ট পরে বসে আছে। সন্ধ্যার পর দেখবি দারুণের পাণ্ট আর নাইলনের হাওরাইআন শাট পরে যেটোতে সিনেমা দেখছে।"

আহ-তং ভূতাব কালি আর বৃকশ নিয়ে বেরিয়ে এলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ভাই এখন কেমন আছে, আহ-তং?"

আহ-তং একবার স্নায়ুর দিকে, একবার বিলীপের দিকে জ্বালালো।

দিলীপ বললো, "ও সেদিন ওরারের ওখানে ছিলো।"

আহ-তং বললো, "আমার ভাই ভালোই আছে। ও আমদে একটু পরে। তুমি ওরাদের চেনো নাকি?"

"আলাপ হয়েছে সেদিন।"

"ওহা খুব ভালো লোক। বুড়ো ওরাকে দেখেছো?"

"না, ওকে দেখিনি—।"

"একদিন ওকে দেখে এসো। খুব ভালো লোক। অনেক জানে। অনেক দেখেছে। ওরও বিন ছিলো।"

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো আরেক জন তরুণ চীনে। পরনে হাকপাট আর প্যাণ্ট। মাথায় ব্যাগেজ বাঁধা।

দিলীপ আলাপ করিয়ে দিলো। আহ-তং-এর ভাই আহ-কিম।

আমি বাংলায় কথা বলতে সে ইংরেজিতে বললো, "আমি বাংলা বুঝি কিন্তু বলতে পারি না। আমাদের মধ্যে শুধু 'দাই কো' (বড়না) বাংলা জানে।"

এমন সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ট্রাউজার আর জ্যাকেট-পর্য চীনে মহিলা। অতি সাধারণ চেহারা, গেরস্থবরের মেয়েদের মতো সিন্ধ।

আহ-কিম বললো, "আমার দাই-পাও।" অর্থাৎ বড়বোদি।

আহ-তং-এর বো আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমরায় একটু হাসলাম। আমাদের চা নিয়ে সে ভেতরে চলে গেল।

চায়ে চুমুক নিয়ে দেখি, ঠিক বাঙালী বাড়ির চা,—হুথ, চিনি মেশানো। শুধু একটু বেশী পাতলা।

"দেশের কি খবর," আহ-কিমকে জিজ্ঞেস করলাম।

"বেশ ভালোই।" উত্তর দিতে গিয়ে আহ-কিমের মুখ জলছল করে উঠলো।

"রক্তের খুব আগ্রহ তোমাদের সন্ধে জানবার জন্যে," দিলীপ বললো।

"জানবার বেশী কিছু নেই," আহ-তং হেসে বললো, "সারা দিন খাট, আবারো টাকার ভুতো আট টাকার বেচি, আর বা কামাই তাতেই খুশি হয়ে দিন চালাই। এমনই চলছে, এমনই চলবে।"

"জানবার অনেক আছে," আহ-কিম বললো, "আমার একটি লাগি আছে বোটক ট্রাউজ ওসিকে। ওরারদের মেয়ে মিলি আমার লোকান দেবা-শোনা করে। সে খুব ভালো মেয়ে। তবে আমার দাই-সাইর মতো অতো ভালো এখনো হয়ে উঠতে পারেনি। পরে হবে।"

আহ-কিম আর আহ-তং দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে জোরে হাসলো। আহ-তং তাদের ভাবায় টেজির কি যেন

বললো পর্দার ওপায়ে তার বোকে। তার বোয়ের হাসিও শোনা গেল।

আহ-কিম বললো, "আমার দাই-কোয় তিনটি ছেলে, দু'টি মেয়ে।"

আহ-তং বললো, "আরো একটি শীগগিরই হবে।"

দু'ভাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আরো জোরে জোরে হাসলো।

আহ-তং আমার দিকে ফিরে বললো, "এর বেশী জানাবার নেই।"

"আহ-কিম বললো," এমনি করে আমাদের প্রত্যেকের সন্ধে একটু একটু করে জানলে আমাদের সবাব সন্ধে অনেক কিছু জানবে।"

দিলীপ বললো, "সে বিন বড়নকে ফে-পাও-তং আর জু-সী-র গল্প বলছিলো।"

আহ-কিম উত্তর দিলো, "ওদের সন্ধে বলে কি হবে। ফে-পাও-তং এর ছেলে ফে-পাও-তং" এর কথা বলা, যাকে ফুকিয়েন প্রদেশের লোক এখানে ডোলেনি। ah, what a mess! ছেলের বেলার তার আত্মীয়রা তাকে কলকাতা থেকে নিয়ে গেল ব্যাংককে।

সেখানেই বড়ো হোলো সে। তার পর তার কী নাম-ডাক। তিব্বাশী খান জাঙ্কের মালিক। দক্ষিণ চীন সমুদ্রের জাহাজের ক্যাপ্টেনরা তার নাম শুনেলে খরখর করে কাঁপতো। আমর, ফুকিয়েনের সমুদ্র-তীরের লোকেরা তাকে প্রাদেশিক শাসনকর্তার চাইতেও বেশী মানতো। আর তেমন ছিলো তার ছেলে ফে-চিয়েন-চুং। বাপে ছেসেতে মিলে বিদেশী শোষকদের কতো জাহাজ লুণ্ঠ করেছে ওরা।

কিন্তু দেশের লোকের কোনো ক্ষতি কোনো দিন করেনি। আর সম্রাটের লোকেরা বিদেশী শোষকদের প্রাচীনায় বার বার তাদের ধরতে চেয়েছে, বিদেশীদের হাতে ধরিয়ে দিতে চেয়েছে। ১৮৬৮ এ ক্যাটনের দক্ষিণে এক ওলন্দাজ জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় ওদের কামানের গোলায় ডুবে যায় চিয়েন-চুং এর জাহাজ। সে দাঁতেরে তীরে গিয়ে ওঠে। আর বিদেশীদের কুকুর ক্যাটনের শাসনকর্তার লোকেরা তাকে গ্রেপ্তার করে কোতল করে, কানো বিচার না করেই।"

বলতে বলতে লাল হয়ে উঠলো আহ-কিমের মুখ। সে বলে গেল না খেমেই, "কিন্তু বহুর দুয়েক পর ১৮৮০ এ যখন ওপিয়াম ওয়ার বাধলো, বাপ তার প্রতিহিংসা ভুলে গেল। তখন দেশ বড়ো। সে তার জাঙ্ক বহর নিয়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বুটিন জাহাজ আক্রমণ করে বেড়াতে লাগলো। তার পর একদিন যুদ্ধের সময় এক বুটিন জাহাজের কামানের গোলায় যায়ে সে মারা যায়। সে খবর যেদিন সমুদ্রতীরের প্রদেশগুলোর লোকেরা শোনে, সবাই চোখের জল ফেলেছিলো তার জন্তে। এই ফে-পাও-তং" বেই বিদেশী বর্গেরা নাম দিয়েছিলো the terror of the China seas."

বলতে বলতে লাল হয়ে উঠলো আহ-কিমের মুখ। সে বলে গেল না খেমেই, "কিন্তু বহুর দুয়েক পর ১৮৮০ এ যখন ওপিয়াম ওয়ার বাধলো, বাপ তার প্রতিহিংসা ভুলে গেল। তখন দেশ বড়ো। সে তার জাঙ্ক বহর নিয়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বুটিন জাহাজ আক্রমণ করে বেড়াতে লাগলো। তার পর একদিন যুদ্ধের সময় এক বুটিন জাহাজের কামানের গোলায় যায়ে সে মারা যায়। সে খবর যেদিন সমুদ্রতীরের প্রদেশগুলোর লোকেরা শোনে, সবাই চোখের জল ফেলেছিলো তার জন্তে। এই ফে-পাও-তং" বেই বিদেশী বর্গেরা নাম দিয়েছিলো the terror of the China seas."

বলতে বলতে লাল হয়ে উঠলো আহ-কিমের মুখ। সে বলে গেল না খেমেই, "কিন্তু বহুর দুয়েক পর ১৮৮০ এ যখন ওপিয়াম ওয়ার বাধলো, বাপ তার প্রতিহিংসা ভুলে গেল। তখন দেশ বড়ো। সে তার জাঙ্ক বহর নিয়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বুটিন জাহাজ আক্রমণ করে বেড়াতে লাগলো। তার পর একদিন যুদ্ধের সময় এক বুটিন জাহাজের কামানের গোলায় যায়ে সে মারা যায়। সে খবর যেদিন সমুদ্রতীরের প্রদেশগুলোর লোকেরা শোনে, সবাই চোখের জল ফেলেছিলো তার জন্তে। এই ফে-পাও-তং" বেই বিদেশী বর্গেরা নাম দিয়েছিলো the terror of the China seas."

বলতে বলতে লাল হয়ে উঠলো আহ-কিমের মুখ। সে বলে গেল না খেমেই, "কিন্তু বহুর দুয়েক পর ১৮৮০ এ যখন ওপিয়াম ওয়ার বাধলো, বাপ তার প্রতিহিংসা ভুলে গেল। তখন দেশ বড়ো। সে তার জাঙ্ক বহর নিয়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বুটিন জাহাজ আক্রমণ করে বেড়াতে লাগলো। তার পর একদিন যুদ্ধের সময় এক বুটিন জাহাজের কামানের গোলায় যায়ে সে মারা যায়। সে খবর যেদিন সমুদ্রতীরের প্রদেশগুলোর লোকেরা শোনে, সবাই চোখের জল ফেলেছিলো তার জন্তে। এই ফে-পাও-তং" বেই বিদেশী বর্গেরা নাম দিয়েছিলো the terror of the China seas."

বলতে বলতে লাল হয়ে উঠলো আহ-কিমের মুখ। সে বলে গেল না খেমেই, "কিন্তু বহুর দুয়েক পর ১৮৮০ এ যখন ওপিয়াম ওয়ার বাধলো, বাপ তার প্রতিহিংসা ভুলে গেল। তখন দেশ বড়ো। সে তার জাঙ্ক বহর নিয়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বুটিন জাহাজ আক্রমণ করে বেড়াতে লাগলো। তার পর একদিন যুদ্ধের সময় এক বুটিন জাহাজের কামানের গোলায় যায়ে সে মারা যায়। সে খবর যেদিন সমুদ্রতীরের প্রদেশগুলোর লোকেরা শোনে, সবাই চোখের জল ফেলেছিলো তার জন্তে। এই ফে-পাও-তং" বেই বিদেশী বর্গেরা নাম দিয়েছিলো the terror of the China seas."

বলতে বলতে লাল হয়ে উঠলো আহ-কিমের মুখ। সে বলে গেল না খেমেই, "কিন্তু বহুর দুয়েক পর ১৮৮০ এ যখন ওপিয়াম ওয়ার বাধলো, বাপ তার প্রতিহিংসা ভুলে গেল। তখন দেশ বড়ো। সে তার জাঙ্ক বহর নিয়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বুটিন জাহাজ আক্রমণ করে বেড়াতে লাগলো। তার পর একদিন যুদ্ধের সময় এক বুটিন জাহাজের কামানের গোলায় যায়ে সে মারা যায়। সে খবর যেদিন সমুদ্রতীরের প্রদেশগুলোর লোকেরা শোনে, সবাই চোখের জল ফেলেছিলো তার জন্তে। এই ফে-পাও-তং" বেই বিদেশী বর্গেরা নাম দিয়েছিলো the terror of the China seas."

বলতে বলতে লাল হয়ে উঠলো আহ-কিমের মুখ। সে বলে গেল না খেমেই, "কিন্তু বহুর দুয়েক পর ১৮৮০ এ যখন ওপিয়াম ওয়ার বাধলো, বাপ তার প্রতিহিংসা ভুলে গেল। তখন দেশ বড়ো। সে তার জাঙ্ক বহর নিয়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বুটিন জাহাজ আক্রমণ করে বেড়াতে লাগলো। তার পর একদিন যুদ্ধের সময় এক বুটিন জাহাজের কামানের গোলায় যায়ে সে মারা যায়। সে খবর যেদিন সমুদ্রতীরের প্রদেশগুলোর লোকেরা শোনে, সবাই চোখের জল ফেলেছিলো তার জন্তে। এই ফে-পাও-তং" বেই বিদেশী বর্গেরা নাম দিয়েছিলো the terror of the China seas."

বলতে বলতে লাল হয়ে উঠলো আহ-কিমের মুখ। সে বলে গেল না খেমেই, "কিন্তু বহুর দুয়েক পর ১৮৮০ এ যখন ওপিয়াম ওয়ার বাধলো, বাপ তার প্রতিহিংসা ভুলে গেল। তখন দেশ বড়ো। সে তার জাঙ্ক বহর নিয়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বুটিন জাহাজ আক্রমণ করে বেড়াতে লাগলো। তার পর একদিন যুদ্ধের সময় এক বুটিন জাহাজের কামানের গোলায় যায়ে সে মারা যায়। সে খবর যেদিন সমুদ্রতীরের প্রদেশগুলোর লোকেরা শোনে, সবাই চোখের জল ফেলেছিলো তার জন্তে। এই ফে-পাও-তং" বেই বিদেশী বর্গেরা নাম দিয়েছিলো the terror of the China seas."

বলতে বলতে লাল হয়ে উঠলো আহ-কিমের মুখ। সে বলে গেল না খেমেই, "কিন্তু বহুর দুয়েক পর ১৮৮০ এ যখন ওপিয়াম ওয়ার বাধলো, বাপ তার প্রতিহিংসা ভুলে গেল। তখন দেশ বড়ো। সে তার জাঙ্ক বহর নিয়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বুটিন জাহাজ আক্রমণ করে বেড়াতে লাগলো। তার পর একদিন যুদ্ধের সময় এক বুটিন জাহাজের কামানের গোলায় যায়ে সে মারা যায়। সে খবর যেদিন সমুদ্রতীরের প্রদেশগুলোর লোকেরা শোনে, সবাই চোখের জল ফেলেছিলো তার জন্তে। এই ফে-পাও-তং" বেই বিদেশী বর্গেরা নাম দিয়েছিলো the terror of the China seas."

বলতে বলতে লাল হয়ে উঠলো আহ-কিমের মুখ। সে বলে গেল না খেমেই, "কিন্তু বহুর দুয়েক পর ১৮৮০ এ যখন ওপিয়াম ওয়ার বাধলো, বাপ তার প্রতিহিংসা ভুলে গেল। তখন দেশ বড়ো। সে তার জাঙ্ক বহর নিয়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বুটিন জাহাজ আক্রমণ করে বেড়াতে লাগলো। তার পর একদিন যুদ্ধের সময় এক বুটিন জাহাজের কামানের গোলায় যায়ে সে মারা যায়। সে খবর যেদিন সমুদ্রতীরের প্রদেশগুলোর লোকেরা শোনে, সবাই চোখের জল ফেলেছিলো তার জন্তে। এই ফে-পাও-তং" বেই বিদেশী বর্গেরা নাম দিয়েছিলো the terror of the China seas."



কি পরে বাপের মতো হয়েছিলো নাকি ?  
বিবর ভাবে মাথা নাড়লো আহ-কিম, "সে ছিলো এক  
মজনার রাঁধুনি।"

জানো ?" দিলীপ আমার দিকে তাকিয়ে বললো,  
বিবির, বার গল্প সেদিন করছিলাম—।"  
নামে বিবি আমেলিয়া সেন," বলে গেল আহ-কিম,  
আমেলিয়ার রাঁধুনি ছিলে ফে-চি-আও। আমেলিয়া বিবি  
ভীষণ ভালবাসতো। আর খুব ভালো রান্না করতো  
তাই সে আমেলিয়া বিবির খুব পেয়ারের লোক ছিলো।  
চা সেও খুব জানী লোকের কাছ। কিন্তু ফে-পাও  
ফে-চি-আও কলকাতার এক নামী বিবিজানের পেয়ারের  
গা বায় না।"

ই চি-আও তোলো ফে-হং-মিং-এর বাবা, সে কথা তুলে  
করিয়ে দিলো আহ-কিম।

মিং কে ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মিং ?" আহ-কিম-এর মুখ আবার কলমল করে উঠলো।  
মিং ছিলো এই কলকাতার চায়না টাউনের রাজা।  
তবু কিছু পরে জন্মেছিলো সে, মারা গেছে ১১-১-এ।  
শেষ পচিশটা বছর সেই ছিলো চায়না টাউনের আইন,  
নাগত, সেই ছিলো সব। ও রকম লোক আর হবে না।"

বললো, "না হলে ভালো। সবাই হোক শুধু  
আমার বোয়ের মতো, তোমার মতো, এদের মতো।  
র করবে, কুর্স্তি করবে, বিয়ে করবে, ছেলে-মেয়ে মানুষ  
য়ে হবে মরবে। বাস। এনাফ।"

। হাই-সো," বললো আহ-কিম। তখন বুঝিনি!  
মুখে শুনেছিলাম "হাই-সো" মানে "হ্যাঁ, ঠিকই।"

। হাই-সো," বললো আহ-কিম তার দাই-কো-র  
তার পর চলে গেল আমাদের দিকে ফিরে, "আর  
কি জানো ? হং-মিং-এর বাবা চি-আও ছিলো  
বা আমেলিয়া বিবির রাঁধুনি! আর হং-মিং

ছিলো আমেলিয়ার মেয়ে কলকাতার বিখ্যাত ভুন্দরী রেবেকা  
বিবির—কি বলবো ? স্বামী নয়, বিয়ে হয়নি ওদের—রেবেকা  
বিবির প্রভু। তখনকার দিনে রেবেকা বিবি আর ফে-হং-মিং-ই  
এই অঞ্চল চালাতো। ইংরেজের আইন, ইংরেজের পুলিশ  
এখানে ঢুকতো না। আর তাকে কী খাতির করতো  
ইংরেজরা। সেও ছিলো দক্ষিণ-চীন সমুদ্রের এক দস্য। তার মাথার  
উপর পুরস্কার ঘোষণা করেছিলো চীন সরকার। মালয়ে-কোন একটা  
যুদ্ধের সময় ইংরেজদের সাহায্য করে সে তাদের খুব প্রিয়পাত্র হয়।  
এতো বড়ো একজন ক্রিমিডাল আর র্যাকেটিয়ার কলকাতায় জন্মায়  
নি। আপিং, কোকেন ইত্যাদির চোরা ব্যবসায়ে যে রকম অজস্র  
টাকা বোজগার করে গেছে, তেমনি অজস্র টাকা দানও করে গেছে।"

"এই হং-মিং আর রেবেকা বিবির মেয়ে হোলো জুলিয়ান।"  
দিলীপ আমার দিকে ফিরে বললো, "তবে সে নামে তাকে কেউ চেনে  
না। কলকাতার রসিক সমাজে তার নাম জুলেখাবাদি।"

জুলেখাবাদি! পচিশ-তিনিশ বছর জাগেকার কলকাতায় সব  
চেয়ে নামকরা বাঈজী।

ওরকম ছুরি নাকি আজ-কাল আর কেউ গায় না। বড়ো বড়ো  
রাজা-মহারাজা নবাবদের বাড়িতে তো বটেই, লাট বড় লাটের  
প্রাসাদেও নাকি তার মুন্ডার আমন্ত্রণ আসতো। পুরোনো দিনে  
তার বেকর্ডের বিক্রি ছিল খুব, আজ-কাল আর পাওয়া যায় না।  
নানা রকম কিংবদন্তী ছিলো তার সম্বন্ধে, সাধারণ লোকে জানতো না  
সে কোন জাতের মেয়ে। কেউ বলতো, সে কাশ্মীরী, কেউ বলতো  
সে ইতালী, কেউ বলতো সে আর্মী। তার পর একদিন হঠাৎ সে  
চলে গেল কলকাতা ছেড়ে। কোথায় গেল কেউ জানলো না!

সেই জুলেখাবাদি? দিলীপের দিকে তাকালাম। সে একটু হাসলো।

এতক্ষণ তীব্র বেগে আমার নতুন জুতো-জোড়াটা পাশিশ  
করছিলো আহ-কিম। সেটা শেষ করে বাজ্ঞে মুড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে-  
ছে-এ আমায় এনে দিলো।

দেখলাম তার মুখ হাসিতে কলমলো, কপাল ঘামে চিক-চিক  
করছে।

[ ক্রমশঃ ]

## বৈশাখ-বন্দনা

শেফালি সেনগুপ্তা

বজ্রি ভালে মধ্যাহ্নের সূর্যের মতন  
আবস্তিত্য বর্ষে বর্ষে তব আগমন  
খ, এই ধরাভালে। পত্র-করা চৈত্রের শেষে  
আমন্ত্র অস্তিম বাতাসে—

হ নব-বরষের শুভালে তোমার গান  
হা! বাণীভরা কণ্ঠ তব চির-অন্নান।

ভাগী! নিঃশব্দ মহাযোগী,

নভা হিয়া এক কণা আশাসের লাগি,  
হ তব মুখপানে। তাহাদের বিস্ত্র চিত্ত যত

ক শক্তি মহাবীর ক্ষত্রিয়ের মতো  
বীন মস্ত্র। প্রলয়ের মত্ত কলরোলে

দ্রুত রক্ত-রক্তধরা ঈশানের কোলে  
জগে। বজ্রবে পূর্ণ করি নিখিল ভুবন,

জাগো জাগো রশমীর ভীষণ নৃতন।

এ ধরার যত হুং-পুত্র-পুত্র যত অত্যাচার,

কঠোর কঠিন হাতে তুমি তার করো সংহার।

এখানে দেখ না চেয়ে কত দৈহিক কত হতাশাস,

বক্ষিতের পীড়িতের নিবিড় বেদনায়ন নিখিল প্রয়াস

কণে কণে হতেছে সঙ্গর। কত প্রাণ ব্যর্থ হাহাকারে

ভূবিত্তেছে মরণের ঘন অন্ধকারে।

এই জরা-জীর্ণ তারে ভয় করি আলো

শুকগর্ভ মর্মসূলে জীবনের আলো।

নবীন সৃষ্টির প্রয়োজনে, হের জ্বলে বজ্রশিখা

নব-বরষের। স্বর্ণ-বর্ণ পুত সেই জ্যোতির্লিখা

মাঝে, প্রাসন্ন বত গ্রানি হয়ে অপগত,

হে বৈশাখ! আসন্ন তোমার উৎসবে ধরাভাল হোক মুখরিত।

"হ্যাঁ। খুব। সারা দিন খাটে," দিলীপ উত্তর দিলে, "এখন তো দেখছিস গেজি আর হাকপাট পরে বসে আছে। সন্ধ্যার পর দেখবি শার্কফিনের প্যাট আর নাইলনের হাওরাইআন শার্ট পরে মেট্রোতে মিনেমা দেখছে।"

আহ-তং জুতার কাগি আর বুদ্ধশ নিয়ে বেরিয়ে এলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ভাই এখন কেমন আছে, আহ-তং?"

আহ-তং একবার জাম্বার দিকে, একবার দিলীপের দিকে জ্ঞাতালো।

দিলীপ বললো, "ও সেদিন ওয়াংয়ের ওখানে ছিলো।"

আহ-তং বললো, "আমার ভাই ভালোই আছে। ও আসবে একটু পরে। তুমি ওয়াংদের চেনো নাকি?"

"জালপ হয়েছে সেদিন।"

"ওরা খুব ভালো লোক। বুদ্ধা ওয়াংকে দেখেছো?"

"না, ওকে দেখিনি—।"

"একদিন ওকে দেখে এসো। খুব ভালো লোক। অনেক জানে। অনেক দেখেছে। ওরও দিন ছিলো।"

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো আরেক জন তরুণ চীনে। পরনে হাকপাট আর প্যাট। মাথার ব্যাগুঞ্জ বাঁধা।

দিলীপ জালপ করিয়ে দিলো। আহ-তং এর ভাই আহ-কিম।

আমি বাংলায় কথা বলতে সে ইংরেজিতে বললো, "আমি বাংলা বুঝি কিন্তু বলতে পারি না। আমাদের মধ্যে শুধু 'দাই-কো' (বড়দা) বাংলা জানে।"

এমন সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ট্রাউজার আর জ্যাকেট পরা চীনে মহিলা। অতি সাধারণ চেহারা, গেরব্ববরের মেয়েদের মতো স্নিগ্ধ।

আহ-কিম বললো, "আমার দাই-সাও।" অর্থাৎ বড়বোদি।

আহ-তং এর বো আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমারাও একটু হাসলাম। আমাদের চা দিয়ে সে ভেতরে চলে গেল।

চায়ে চুম্বক দিয়ে দেখি, ঠিক বাঙালী বাড়ির চা—দুধ, চিনি মেশানো। শুধু একটু বেশী পাতলা।

"দেশের কি খবর," আহ-কিমকে জিজ্ঞেস করলাম।

"বেশ ভালোই," আহ-কিম উত্তর দিলো, "যুদ্ধ চলছে, কিন্তু খবর ভালোই।" উত্তর দিতে গিয়ে আহ-কিমের মুখ অলঙ্ঘল করে উঠলো।

"রক্তের খুব আগ্রহ তোমাদের সবুকে জানবার জগে," দিলীপ বললো।

"জানবার বেশী কিছু নেই," আহ-তং হেসে বললো, "সারা দিন খাটে, আমারা টাকার জুতা খাটে টাকার বেচি, আর বা কামাই তাতেই খুশি হয়ে দিন চালাই। এমনি চলছে, এমনিই চলবে।"

"জানবার অনেক আছে," আহ-কিম বললো, "আমার একটি লগি আছে বোটিক স্ট্রীটের ওদিকে। ওয়াংদের মেয়ে মিলি জাম্বার দোকান দেখা-শোনা করে। সে খুব ভালো মেয়ে। তবে আমার দাই-সাউর মতো অতো ভালো এখনো হয়ে উঠতে পারেনি। পরে হবে।"

আহ-কিম আর আহ-তং দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে জোরে হাসলো। আহ-তং তাদের ভাবার টেজির কি যেন

বললো পদার ওপায়ে তার বোকে। তার বোয়ের হাসিও শোনো গেল।

আহ-কিম বললো, "আমার দাই-কোর তিনটি ছেলে, দু'টি মেয়ে।"

আহ-তং বললো, "আরো একটি শীগগিরই হবে।"

দু'ভাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আরো জোরে জোরে হাসলো।

আহ-তং আমার দিকে ফিরে বললো, "এর বেশী জানাবার নেই।"

"আহ-কিম বললো," এমনি করে আমাদের প্রত্যেকের সবুকে একটু একটু করে জানলে আমাদের সবার সবুকে অনেক কিছু জানায়ে।"

দিলীপ বললো, "সে দিন বন্ধনকে ফেং-তং-তাও আর জু-লী'র গল্প বলছিলাম।"

আহ-কিম উত্তর দিলো, "ওদের সবুকে বলে কি হবে। ফেং-তং-তাও' এর ছেলে ফেং-পাও-হং' এর কথা বলো, যাকে ফুকিয়েন প্রদেশের লোক এখনো ডোলেনি। ah, what a man! ছেলে' বেলার তার আত্মীয়রা তাকে কলকাতা থেকে নিয়ে গেল ব্যাংককে। সেখানেই বড়ো হোলো সে। তার পর তার কী নাম-ডাক। তিব্বতী খান জাকের মালিক। দক্ষিণ চীন সমুদ্রের জাহাজের ক্যাপ্টেনরা তার নাম শুনেলে ধরধর করে কাঁপতো। আমহু, ফুকিয়েনের সমুদ্র-তীরের লোকেরা তাকে প্রাদেশিক শাসনকর্তার চাইতেও বেশী মানতো। আর তেমনি ছিলো তার ছেলে ফেং-চিয়েন-চু'। বাপে ছেলেতে মিলে বিদেশী শোষকদের কতো জাহাজ লুট করেছে ওরা। কিন্তু দেশের লোকের কোনো ক্ষতি কোনো দিন করেনি। আর সম্রাটের লোকেরা বিদেশী শোষকদের প্রবোচনায় বার বার তাদের ধরতে চেয়েছে, বিদেশীদের হাতে ধরিয়ে দিতে চেয়েছে। ১৮৩৮ এ ক্যান্টনের দক্ষিণে এক ওলন্দাজ জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় ওদের কামানের গোলায় ভুবে যায় চিয়েন-চু' এর জাহাজ। সে সাঁতরে তীরে গিয়ে ওঠে। আর বিদেশীদের কুকুর ক্যান্টনের শাসনকর্তার লোকেরা তাকে গ্রেপ্তার করে কোতল করে, কোনো বিচার না করেই।"

বলতে বলতে লাল হয়ে উঠলো আহ-কিমের মুখ। সে বলে গেল

না খেমেই, "কিন্তু বছর ত্রয়েক পর ১৮৪০ এ যখন ওশিয়াম ওয়াং বাগলো, বাপ তার প্রতিহিংসা ডুলে গেল। তখন দেশ বড়ো। ও তার জাকের বহর নিয়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে ব্রিটিশ জাহাজ আক্রমণ করে বেড়াতে লাগলো। তার পর একদিন যুদ্ধের সময় এক ব্রিটিশ জাহাজের কামানের গোলায় যায়ে সে মারা যায়। সে খবর যেদিন সমুদ্রতীরের প্রদেশগুলোর লোকেরা শোন, সবাই চোখের জ্ব ফেলেছিলো তার জগে। এই ফেং-পাও-হং' বেই বিদেশী বর্বরের নাম দিয়েছিলো the terror of the China seas."

"সে কোনো দিন কলকাতার আসে নি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম

"আমি যদু'র জানি আসে নি," উত্তর দিলো আহ-কিম

কিন্তু সে মারা যাওয়ার পর তার ছোটো ছেলে ফেং-চিং-আও কলকাতা চলে এসেছিলো; কারণ তাকে ধরতে পারলে চীন সরকার তাকে কোতল করতো। তার তখন খুব অল্প বয়েস। বছর বায়ো একক হবে। সমুদ্র প্রাচ্যের অজান্ত শহরগুলিও তার পক্ষে নিরাপদ ছিলো না। কারণ সে সব জায়গায় তার বাবার অনেক শত্রু। তাই ত বাবার বন্ধুরা তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। এখানে ওদের কি আত্মীয়-বন্ধন ছিলো।"

“সেও কি পরে বাপের মতো হয়েছিলো নাকি?”

“না,” বিস্ময় ভাবে মাথা নাড়লো আহ-কিম, “সে ছিলো এক ণাত বারাক্‌নামার রাঁধুনি!”

“ক’র জানো?” দিলীপ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, “মেসিয়ার বিবির, হার গল্প সেদিন করছিলো—।”

“হার নামে বিবি আমেলিয়া লেন,” বলে গেল আহ-কিম, “ই বিবি আমেলিয়ার রাঁধুনি ছিলে ফে-চি-আও। আমেলিয়া বিবি। খাবার ভীষণ ভালবাসতো। আর খুব ভালো রান্না করতো আও। তাই সে আমেলিয়া বিবির খুব পেয়ারের লোক ছিলো।

রান্না করা সেও খুব জান্নী লোকের কাছ। কিন্তু ফে-পাও-এর ছেলে ফে-চি-আও কলকাতার এক নামী বিবিজানের পেয়ারের দুনি, সে জানা যায় না।”

“কিন্তু এই চি-আও তোলা ফে-হং-মিং-এর বাবা, সে কথা ভুলে না, মনে করিয়ে দিলো আহ-তং।

“ফে-হং-মিং কে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“ফে-হং-মিং?” আহ-কিম-এর মুখ আবার ঝলমল করে উঠলো।

ফে-হং-মিং ছিলো এই কলকাতার চায়না টাউনের রাজা। গাঁট বিস্তারের কিছু পরে জন্মেছিলো সে, মাত্র গেছে ১১-১-এ। শতাব্দীর শেষ পঁচিশটা বছর সেই ছিলো চায়না টাউনের আইন, ছিলো আশ্রয়, সেই ছিলো সব। ও রকম লোক আর হবে না।

আহ-তং বললো, “না হলে ভালো। সবাই হোক শুধু হার মতো, আমার বোনের মতো, তোমার মতো, এদের মতো। বে, বোজ্জগার করবে, ফুটি করবে, বিয়ে করবে, ছেলে-মেয়ে মানুষ হবে, বড়ো হয়ে স্ত্রী হবে। বাস। এনাফ।”

“হাই-লো। হাই-লো,” বললো আহ-কিম। তখন বুঝিনি। দিলীপের মুখে শুনেছিলাম “হাই-লো” মানে “হ্যাঁ, ঠিকই।”

“হাই-লো। হাই-লো,” বললো আহ-কিম তার দাই-কো’র। শুনে। তার পর চলে গেল আমাদের দিকে ফিরে, “আর ঐ কথা কি জানো? হং-মিং-এর বাবা চি-আও ছিলো দী বারাক্‌নামা আমেলিয়া বিবির রাঁধুনি! আর হং-মিং

ছিলো আমেলিয়ার মেয়ে কলকাতার বিখ্যাত সুন্দরী রেবেকা বিবির—কি বলবো? আমি নয়, বিয়ে হয়নি ওদের—রেবেকা বিবির প্রভু। তখনকার দিনে রেবেকা বিবি আর ফে-হং-মিং-এই একল চালাতো। ইংরেজের আইন, ইংরেজের পুলিশ এখানে ঢুকতো না। আর তাকে কী খাতির করতো ইংরেজরা। সেও ছিলো দক্ষিণ-চীন সমুদ্রের এক দস্য। তার মাথার উপর পুরস্কার ঘোষণা করেছিলো চীন সরকার। মাঝে-ঝোনে একটা যুদ্ধের সময় ইংরেজদের সাহায্য করে সে তাদের খুব প্রিয়পাত্র হয়। এতো বড়ো একজন ক্রিমিনাল আর ব্যাংকটিয়ার কলকাতার জন্মার নি। আশি, কোকেন ইত্যাদির চোরা ব্যবসারে যে রকম অজ্ঞান টাকা বোজ্জগার করে গেছে, তেমনি অজ্ঞান টাকা দানও করে গেছে।”

“এই হং-মিং আর রেবেকা বিবির মেয়ে তোলা জুলিয়ানা,” দিলীপ আমার দিকে ফিরে বললো, “তবে সে নামে তাকে কেউ চেনে না। কলকাতার রসিক সমাজে তার নাম জুলেখাবাই।”

জুলেখাবাই! পঁচিশ-তিনিশ বছর আগেকার কলকাতার সব চেয়ে নামকরা বাইজী!

ওরকম ছুরি নাকি আজ-কাল আর কেউ গায় না। বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজা নবাবদের বাড়িতে তো বটেই, লাট বড় লাটের প্রাসাদেও নাকি তার মুক্তার আমন্ত্রণ আসতো। পুরোনো দিনে তার রেকর্ডের বিক্রি ছিল খুব, আজ-কাল আর পাওয়া যায় না। নানা রকম কিংবদন্তী ছিলো তার স্বপক্ষে, সাধারণ লোকে জানতো না সে কোন জাতের মেয়ে। কেউ বলতো, সে কাশ্মীরী, কেউ বলতো সে ইতালী, কেউ বলতো সে আর্মেনীয়। তার পর একদিন হঠাৎ সে চলে গেল কলকাতা ছেড়ে। কোথায় গেল কেউ জানলো না!

সেই জুলেখাবাই? দিলীপের দিকে তাকালাম। সে একটু হাসলো। এতক্ষণ তাঁর বেগে আমার নতুন ছুতো-জোড়টা পালিশ করছিলো আহ-তং। সেটা শেষ করে বাজ্ঞে মুড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে ছেকে আমার এনে দিলো।

দেখলাম তার মুখ হাসিতে ঝলমলো, কপাল ঘামে চিক-চিক করছে। [ক্রমশঃ]

## বৈশাখ-বন্দনা

শেফালি সেনগুপ্তা

করুণ-বহি ভালে মধ্যাহ্নের সূর্যের মতন  
ঋতুচক্র আবর্তিতা বর্ষে বর্ষে তব আগমন  
হে বৈশাখ, এই ধরাতলে। পত্র-বরা চৈত্রেয় শেষে  
বসন্তের আমন্ত্রণ অস্তিম বাতাসে—  
বার্তা বহি নব-বরষের শুনালে তোমার গান  
ওগো স্বন্দর! বাণীভরা কণ্ঠ তব চির-অম্লান।  
ওগো সর্বভাগী! নিঃস মহাবোগী,  
নিখিল জনতা হিয়া এক কথা আশ্বাসের লাগি,  
চেয়ে আছে তব মুখপানে। তাহাদের বিস্ত্র চিত্ত যত  
মুহুর্তে লহু শক্তি মহাবীর ক্ষত্রিয়ের মতো  
তোমার নবীন মন্ড্রে। প্রলয়ের মত্ত কলরোলে  
দিগন্তায় রক্তে রক্তে রক্তস্রাব ইশানের কোলে  
ওঠ তুমি আগে। বজ্রবে পূর্ণ করি নিখিল ভুবন,

জাগো জাগো রশ্মীর ভীষণ নতন।  
এ ধরার যত দুঃখ-পুণ্ড্র-যত অত্যাচার,  
কঠোর কঠিন হাতে তুমি তার করো সত্যার।  
এখানে দেখ না চেয়ে কত দৈব কত হতাশাস,  
বক্ষিতের পীড়িতের নিবিড় বেদনাঘন নিঃশল প্রয়াস  
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে সঞ্চয়। কত প্রাণ ব্যর্থ হাহাকারে  
ভুবিতেছে মরণের ঘন অন্ধকারে।  
এই জরা-জীর্ণ তাবের ভয় করি আলো  
শুভগর্ভ মর্মসূলে জীবনের আলো।  
নবীন সৃষ্টির প্রয়োজনে, হের অঙ্গে বজ্রশিখা  
নব-বরষের। স্বর্ণ-বর্ণ পুত সেই জ্যোতির্লিখা  
মাঝে, প্রাক্তন বত গ্রানি হয়ে অগণত,  
হে বৈশাখ! আসন্ন তোমার উৎসবে ধরাতল হোক মুখরিত।



# আমি

[ পূর্ণ প্রকাশিতের পর ]

জরাসন্ধ

স্বাধীনতার উত্তরিতে সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীকে আবার পেয়ে বলল তার  
সেই আগের দিনের হুঁটো নেশা—জাড্ডা আর তামাকপাতা।

প্রথমটার জন্যে সাধারণ ওয়ার্ডে যাওয়া দরকার, আর দ্বিতীয়টার  
জন্যে চাই বাণীবাসীর অমুগ্রহ। সে দক্ষিণ্য লাভ করতে চলে  
কিঞ্চিৎ দক্ষিণার প্রয়োজন। সেটা যোগাবার মত গোপন স্কর  
বুড়ীর তখনো শেষ হয়ে যায়নি। ইদানীং হেনার কাছে সে ঘন ঘন  
ছুটির আদার জানাত, এবং মজুরও করিয়ে নিত। আসল ব্যাপারটা  
হেনার অজানা ছিল না। মাঝে মাঝে বলত, বুড়ো হয়েছ; এবার  
ঐ বদ নেশাগুলো ছাড় তো দেখি। ফোকলা দাঁতে এক-গাল হেসে  
বুড়ী একেবারে আকাশ থেকে পড়ত—কী যে বল দিদিমণি, এই  
তোমাকে ছুঁয়ে দিবা্য করে বলছি, নেশা টোপ কবে ছেড়ে দিয়েছি।  
ওসব ছাই আর খাই না। ঐ কাপৌর মা মাছুষটা বড় ভালো।  
হুঁচকটা সুখ-দুঃখের কথা ওও কয়, আমিও কই। মনটা একটু  
ভুলে থাকে, এই আর কি!

হেনার সঙ্গে বুড়ীর বিচিত্র সম্পর্ক। যোগাযোগ মা, অথ  
অবস্থায় দিদিমণি।

আজ সে দুপুরের দিকেই বেরিয়ে পড়েছিল। একটা সেলাই  
হাতে করে নিজের মনের মধ্যে ভুবে ছিল হেনা। সমস্তটা দিন কখন  
গড়িয়ে গেছে, টের পার নি। হঠাৎ জ্বলো হাওয়া গায়ে লাগতেই  
জানালা দিয়ে দেখল, কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। বৃষ্টি আদম।  
বুড়ীর জঙ্ঘা চিন্তা হল। বৃকের দোষ এখনো কাটেনি। হঠাৎ ঠাণ্ডা  
লেগে গেলে মারাত্মক হয়ে পড়াবে। দেখতে দেখতে বড় বড় জলের  
কোঁটা পড়তে শুরু করল। ডেকে আনতে থাকে কি না ভাবছে,  
এমন সময় দরবার সাড়া পেয়ে সেদিকে না তাকিয়েই বলল হ্যাঁ, বেশ  
করে ভেঙ্গে এবার পড়ল আমি আর টানতে পারবো না বলে দিচ্ছি।

—না টানলে বাবো কোথায়?

হেনা চমকে উঠল, ও মা, তুই! বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ?

—কী করবো, তুমি তো আর খোঁজ-খবর নেবে না। তাই,  
আমিই এলাম।

—খোঁজ নিয়ে লাভ? আমার কথা তো আর শুনবি না?  
ডাক্তার এসে ফিরে গেলেন একবার। দেখা পর্বত-স্বরলি না!

—বাঃ, ভালো হয়ে গেছি যে। এই জাপ না, বলে কমলা তার  
ঈর্ষ হাত হুঁখানা তুলে ধরল।

সেদিকে আড় চোখে একবার তাকিয়ে হেনা বলল, ভালো  
হওয়ার কী একখানা নমুনা!

—যাকগে ওসব বাজে কথা, হেনার খাটের উপর বসে পড়ে বলল  
কমলা। তোমার ঐ বই থেকে একটা গল্প-টর পড়, শুনি। হেনা  
সেলাইটা জড়িয়ে রাখতে রাখতে বলল, না; আজ তোর গল্প  
শুনবো।

—আমার গল্প!

—হ্যাঁ; তোর নিজের গল্প। সেদিন যে শোনাবে বলেছিলি?

—ও—ও হ্যাঁ। ঠিকই বলেছি। সে সব কাহিনী ঠিক গল্পেরই  
মত। শুধিয়ে লিখতে পারলে তোমার ঐ নামজাদা লেখকদের  
বানানো গল্পের চেয়ে মন্দ হবে না। কিন্তু আমি তো আর একজন  
লেখিকা নই। শেষ পর্বন্ত তোমার দৈব থাকবে কি না, তাই  
ভাবছি।

—বেশ তো; পরীক্ষাটা হয়ে যাক।

অশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। অনেক দিন অনাবৃষ্টির  
পরে এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত বর্ষণ। এরই মধ্যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা  
করেছে ত্বরিত পৃথিবী। গাছপালার পাতায় পাতায় দ্রুত জ্বানের  
আনন্দ। ভিজে মাটির মিষ্টি গন্ধে চারদিক ভরপুর। জানালা  
দিয়ে একটু একটু ছাট আগছিল। কিন্তু হুঁজনের সাক্ষরই সেদিকে  
থোল নেই। অনেকক্ষণ নিশ্চলক চোখে বাগানের দিকে চেয়ে  
রইল কমলা। তারপর মুহূর্তে শুরু করল তার কাহিনী:—

বাপ-মায়ের শেষ বরষের সম্মান আমি। ভাই বোন কেউ নেই।  
হবার যখন আর আশা নেই, মা তাঁর এক বিধবা জ্ঞাতি-বোনের  
একটি মেয়েকে কাছে বেধে মানুষ করেছিলেন। আমি জন্মাবার  
আগেই আমার সেই মাসী মারা গেলেন। দিদি মার কাছেই রয়ে  
গেল। তার যখন বিয়ে হল, আমার বয়স বোধ হয় বছর ছয়েক  
হবে। ভালো করে মনেও পড়ে না। তারপরই বাবা অবসর  
নিলেন। ইচ্ছল-মাস্টার ছিলেন। সামাজ্য পুঞ্জিতে সংসার চলে  
না। তাই ছেলে পড়াতে হত। কারো বাড়ি গিয়ে পড়াতে না,  
ছেলেরাই আসত ঠর কাছে। উনি পড়াতে; আমি পাশে বসে  
থাকতাম। একটু বড় হল সকলের দেখাদেখি আমি শুরু করলাম।  
ছাত্রেরা চলে গেলে বাবা আমাকে নিয়ে বসতেন। বাবার সঙ্গে খাই,  
বাবার হাত ধরে বেড়াতে বাই, তাঁর পাশে শুয়ে গল্প শুনি।

বাপের অভাবনি সঙ্গ বোধ হয় কোনো মেয়েই পাশ না, অতটা আশ্রয়ওলা। মাকে বড় একটা কাছ পেইনি। আমার বিয়ের ভাবনার আড়ালেই যেন তার সব স্নেহ, সব আশ্রয় চাপা পড়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই আমার বাড়ন্ত গড়ন। সেটিকে দেখতেন আর আপন মনে বলতেন, পোড়ারমুখী এলি, ক'টা বছর আগে এলি না কেন? বাবার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, শরীর ভেঙে পড়ছে। আমাকে পালন করার আগেই পাচ্ছে তিনি চোখ বোজেন, এই ভয়ে মার চোখে ঘুম ছিল না।

দেখতে দেখতে আমি বড় হয়ে উঠলাম। বেশির ভাগ সময় লাড়ুতনা নিয়েই থাকি। বাবার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই আমার উপরে পড়ত, কেউ কেউ আমার সঙ্গে। একে আমার সঙ্গে প্রায়ই কেউ পেরে উঠত না। আমাকে দিয়ে গুণের হারিয়ে বাবা ভারী আমোদ পেতেন। কাউকে হয়তো একটা শব্দ শুধু দিলেন। আনিকটা চেষ্টা করে বশন পারলো না, তার খাতাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, জাখ তো কমল, তুমি পার কি না। আমি লাজেই করে দিতাম। আড়চোখে দেখতাম, ছেলেটার মুখ কালো হয়ে গেছে। খাতাটা আমার কাছে আসবে বলে কেউ কেউ আমার ইচ্ছা করে ভুল করতো। বাবা বুঝতেন না; আমি না বাবাবার ভাগ করতাম। বাব পাঠা, সে বুঝতো ভুলটুকু ঠিক রাখা যায় থা পড়ছে। বোজ বোজ ভুল বেড়েই চলত, আর সেটা লগ্নরে দেবার বাড়তি কাঙ্ক্ষটুকু আমারও নেহাৎ মন্দ লাগত না।

নীরস অন্ধের সঙ্গে একটু-আধটু সরস কাবোর আমলানীও যে না হত, তা নয়। একদিন একটি ছেলের অন্ধের খাতা দেখতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল কোবর দিকে ছোট ছোট করে লেখা—কমল, তোমার ভ্রাত্রে আমার দ্বন্দ্ব 'বিদিশ' হচ্ছে। আমি ঐ 'বিদিশ' শব্দটার নিচে একটা দাগ দিয়ে লিখে দিলাম, 'বানান ভুল'। এ সবই ছিল খেলা। কিন্তু খেলতে খেলতেই একদিন ভড়িয়ে পড়লাম। সে যেদিন এল, সেদিনের কথাটা বেশ মনে আছে। ঘরসে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। গায়ের রংটা চাপা। কিন্তু কী চমৎকার গড়ন! অনেকটা যেন তোমার মত।

হেনা হেসে উঠল, দূর; আমার মত কি রে?

কমলা একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, মানে, বর, তুমি যদি যাটা ছেলে হতে—

—ও, সেই ভ্রাত্রেই তুমি আমার গুণর এত টান?

—না দিদি, তোমার উপর টান আমার আগের ভ্রাত্রের। তা না হলে এখানে এসে হুটোতে জুটলাম কী করে?

হেনা এক কথার কোনো উত্তর দিল না। কমলার একটা হাত লম্বে তুলে নিয়ে নিজের কোলের উপর রাখল।

কমলা ফিরে গেল তার গল্পে—সব চেয়ে স্মন্দ ছিল ওর হু'খানি টানা টানা দ্রু। যেন তুলি দিয়ে আঁকা। এদিকে কিন্তু বেজায় জী লোক। হু-হু'বার ম্যাট্রিক ফেল করে বাব বাব তিন বাব বলে হুলে পড়ছেন। বাপ বড় ব্যবসায়ী। ছেলে পাশ না করলে তাঁর মান থাকে না। টিউটর হিসাবে বাবাব নাম ছিল। তাই এসে এক বকম বর্ণা দিয়ে পড়ল, পাশ করিয়ে দিতেই হবে। তখন কি জানি, তারই হাত দিয়ে আসছে আমার মরণ-বাণ! বাবাব এত হাড়া। কাউকে দেখে কখনো একটুকু সঙ্কোচ হয় নি। তারাই

বর আমাকে দেখে খেঁদে নেয়ে একসা হুটে গেছে। কিন্তু সে যেদিন প্রথম এঁধে বসল আমাদের বাড়ির ঘরে, জানালা দিয়ে একবার চোখাচোখি হতেই পা হুটো আর টেনে তুলতে পারলুম না। বুকের ভেতর দাঁ কী বড়! বাবাব ডাকাডাকিতে কোনো বকমে আড়ষ্ট হয়ে তাঁর পাশটিতে গিয়ে বসলাম। কিন্তু মাথা তুলে চাইব, সে শক্তি রইল না।

অন্ত সব বিষয়ে হু'চাটটা প্রশ্ন করে বাবা তাকে Algebra থেকে একটি অঙ্ক দিলেন। নিতান্ত সহজ অঙ্ক। খাতাটা খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সে বলল, হল না, মাস্টার মশাই! বাবা হেসে বললেন, হল না? আচ্ছা। হাত বাড়িয়ে খাতাটা নিলেন এবং এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। আমার হাত কাঁপতে লাগল। চোখের সামনে কাঁপসা হয়ে গেল অন্ধরওলা। একটা ক্রমশাও মনে পড়ল না। এত দিন পরে আমার হার হল। তার কাছে হেরে গেলাম। শুধু হয়ে গেলাম নয়, মনে মনে হার মানলাম। সেই প্রথম বুঝলাম, জীবনে হার মেনে কত দুখ।

সেই দিন থেকে বাবাব হুতুলে পড়া আমার শেষ হল। কেউ ছাড়িয়ে দেখনি। আমিই ছেড়ে এলাম। তুমি হাসছ, হেনাদি'। কিন্তু সেদিন যদি দেখতে আমার অবস্থা, তোমার নয় হত। একটু দেখবার ভ্রাত্রে, সামান্য একটা কথা শোনার ভ্রাত্রে মনের সে কী কাঁজলপনা! অথচ সামনে গিয়ে বসতে পারি না। তারও কি সেই প্রশ্ন? তা না হলে এক ঘণ্টার পড়া হঠাৎ তিন ঘণ্টার দাঁড়াল কেমন করে? কোথেকে এল এত মনোবোগ? লিখছে গ্রামারের প্রশ্ন, চোখ হুটো রয়েছে জানালায়। তার পাশ দিয়ে একাজ ও কাজে আমার বাবাব-আসবার পথ। বাবা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন। হয়তো খুশীও হয়েছিলেন মনে মনে। প্রায়ই বলতেন, সনৎ ছেলেটি বড় ভালো। এত ছেলে পড়লাম, এমন একটা প্রশ্ন আর চোখে পড়েনি। তার পর একদিন আড়িপেতে তুললাম খেতে বসে কথা হচ্ছে মার সঙ্গে। কী একটা কথার উত্তরে মা বলে উঠলেন, তুমি ক্ষেপেছ! ওরা হচ্ছে বড়লোক। ছেলে তোমার মেয়ের রূপ দেখে ভুলতে পারে, কিন্তু বাপ তোমার রূপে না পোলে ভুলবে না। সেই হিসেব করে তবে এগিয়ে।

কিন্তু হিসাব শেষ হল না। আমাদের হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট করে দিয়ে হঠাৎ একদিন তিনি বিদ্বান নিলেন। আর উঠলো না। আমাদের দফলের মধ্যে রইল গোটা কয়েক ঘণ্টাবাট বাস-প্যাটার, আমার হাতে হু'গাটা হালকা চুড়ি, গলায় একটা সূত্র হার, স্ট্রটেকসের তলার লুকিয়ে রাখা তার খানকয়েক চিঠি, হার মধ্যে উজ্জ্বল অনেক ভরসা অতি সামান্য। তবু মাকে বলে করে কিছু দিন অপেক্ষা করলাম, যদি কোনো ডাক আসে। তার পর একদিন জিনিষপত্রগুলো বিক্রি করে সামান্য ক'টা টাকা হাতে নিয়ে কলকাতায় দিদির বাসায় গিয়ে উঠলাম।

বিয়ের পর সেই গোড়ার দিকে হু-এক বার ছাড়া দিদি আমাদের বাড়িতে আর আসেনি। কামাইএর সঙ্গে বাবাব সন্তান ছিল না। আজ সব হারিয়ে বশন এসে তারই আশ্রয়ে উঠলাম, দিদির মুখ গভীর হল। আমি ছিলাম মার পেছনে। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই এমন করে তাকিয়ে রইল, যেন ভূত দেখে ভয় পেয়েছে। পালের ঘরে ঢলে গেলাম। তখনলাম, দিদি

কলছে, এখনো ঘরে পুণে রেখেছে! ওর দিকে তাকাও কেমন করে? না নিঃশ্বাস লেলে বললেন, না তাকিয়ে কী করি, বল? উনি কি আমার কথা ভনভন? জানো তো সবট। এবার এলাম তোমাদের আশ্রয়ে। বিনোদকে বলে হাত ঝাঁপগিরি পার, যেমন তেমন একটা দুটিয়ে দাও। গলা দিয়ে আমার ভাত নামে না।

—আমি আর কী বলবো? বাড়ি আসুক; ভূমিট বলে বা বলবার, বলে দিদি তার কাছে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই জামাই বাবুর গলা পেলাম। তখনই ফিরলেন। শাত্তরী একগালা কথার উত্তরে শুকনো গলায় টেনে টেনে বললেন, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু বা' দিন-কাল পড়েছে—তার পর এই তো দেখছেন, বাড়িখানা বর। আমাদেরই কুলোয় না।

—কী করবো, বাবা, বাবা! কোণে পড়ে থাকলেও আমাদের থাকতে হবে। ঐ মেয়েটাকে নিয়ে—বই, কমলা কোথায় গেলি? তোরা জামাই বাবুকে প্রণাম করলি না?

বেয়িয়ে এলাম। আমার ভগিনীপতির শুকনো মুখপানা তখন ছলছল করে উঠল। একগালা হেসে বললেন, বা' বেশ ভাগ্যটি হয়ে উঠেছে তো। কমলা! এসো, এসো, লজ্জা কি! কী বলবো দিদি, মাছের তালি যে এক ভূমিট, এই প্রথম দেখলাম। আর সেই ছুটো চোখ যেন গিলে খেতে চাইছে। এক বার চোখেই আপনার থেকে আমার চোখ নেমে এল। মাথা থেকে পা পল্লব শিউরে উঠল; ভয়ে নড়, ঘুণায়। মনে পড়ল, এ চোখ কোথায় যেন রেখেছি। হ্যাঁ, তখন আমার বয়স সবে সাত আট বছর। আমাদের বাড়ির পেছন দিকের বকীতে একটা লোক ছিল। তার নাম গণি মিঞা, অনেকগুলো মুখী ছিল তার। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলতে খেলতে ও দিকটার গোল দেখতাম, মুখের ঝড় এসেছে গণি মিঞার। ঠাণ্ডা দড়ি বেঁধে পানীভালোক নিয়ে বাড়ে নুড়ি ভরে। একটা মতটি ছিল। ভারী লক্ষ্য রেখে, আর তেমনি নাছুর হুতল। উপায় করে চলত। আমরা বলতাম বাণী। এক দিন জিহবেল কলসন, এটা বেচবে না? গণি মাথা নাড়ল। তার পর কান পল্লব তালি ভড়িয়ে বসল, দেখছে না গুঁকী, একেবারে তৈরি মনে। ওটা কি আর পেলে যায়? একটা পরব টরব আসুক, হুচারণন মাছবান ঢাকি, তার পর—বলে কী এক অদ্ভুত বদলে চোখে তাকাল সেই মুখীটার দিকে। এত দিন পরে আমার জামাই বাবুর কপালের নিচে দেখলাম সেই গণি মিঞার চোখ। বুকের মধ্যে কেমন ঢুক ঢুক করে উঠল। মার ঘমক খেয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে প্রণাম করলাম। উনি আমার কী ছুটা ঘরে একটু ফাঁকানি নিলেন। সমস্ত শরীরটা গিন-গিন করে উঠল।

কী সব বাবসা ছিল আমার ভগিনীপতির। সকালে চান্দাবার খেয়ে বেরিয়ে যান। বাবোটা-একটা ঘর আসেন। খেয়ে দেয়ে ঘুম। তার পর আবার বিকেলে বেরোন। ফিরতে সেই বাত বাবোটা। কোনো কোনো রাত্রে নাকি একবারেই ফেরেন না। থাকেন কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই দিদি ঘরে চলে গেল। আমি আসবার পর কী এই কটন বললে গেল। সকালে বেরোতে দেরি হয়। বিকেলে বেরোতেই চান না। সমর নেই, জলময় নেই। কমলা, এটা নিয়ে এসো, সেটা দিয়ে বাও। কাছে

গেলে আবার নাম করে বা আমাকে সইতে হয় মনে হলে শান্ত জামার গা পাক দিয়ে ওঠে। একলা কাছে বাওয়া এড়িয়ে চলি। কিন্তু সকলের সামনেও রেহাই নেই। এমন ভাব দেখান, যেন কচি খুঁকী আমি, আমাকে নিয়ে যা খুসী করা চল। মা দেখেও কখনো না। দিনি চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ঐ সাপের মত হাত ছুটো মুচড়ে ভেঙ্গে দিই। কিন্তু জানি, সেই সঙ্গে আমাদেরও কপাল ভাঙবে। শুধু, আমার হলে ক্ষতি ছিল না সেই সঙ্গে মারও। সে কথা ঐ লোকটার জানি আছে বলেই, আমাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিতে তার দিগা নেই। বাধা দিতে দিতে শেষটা ছত্রাস হয়ে পড়লাম। ভারতে শুরু করলাম, আমার এ দেহটা যেন বক-মাসের নয়, পাখরের। পাখরের তো কোনো বাধাশক্তি নেই, মান-অশমান, লজ্জা-সম্মদের বালাই নেই। আস্তে আস্তে আমিও যেন তেমনি পাখর হয়ে গেলাম।

একটা কথা ভেবে দেখেছি, দিদি? মেয়েমাছের এই দেহটা তার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ; একটু বড় হবার পর খেতেই একে নিয়ে তার কল্যাণের অন্ত নেই, একে নিয়ে তার পলে পলে খিলপ, পলে পলে লজ্জা। এক সামলে বাবা, আগলে বাবা, হাট্টে বাবা,—সেইটাই যেন তার সবচেয়ে বড় দায়। এর ওপরে সকলের পরদৃষ্টি, আপন, পর, মেয়ে পুঙ্কন, কার নয়? পুঙ্কনের দেহটা হল তার সম্পদ, আর মেয়েমাছের হল বোকা। তাই পুঙ্কন সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বড় কিছুই সে করে উঠতে পারল না। এই বোকা বয়ে বায়েই জীবন কেটে গেল।

এটা হবার বাপের কথা, মৃত্যু হলে প্রতিবাদ করল কেন। নিজেকে দিয়ে দেখাও। কিন্তু তার মত ঐ অবস্থায় ক'জন পড়ে?

—সে কথা ঠিক। আমার মত ভাগ্য আর ক'জনের? কিন্তু তাহলেও আমার জামাল কথাটা রয়ে গেল। ভূমি বাবের কথা বলছি, আমার বলে বাগ পড়ে না, এটা শরীরটাকে নিয়ে তাদেরও ঘুম নেই। সেও এক বকমের দায়। দেখতে গুটিয়ে রাখবার দায় নয়, ছুটিয়ে ছোলায় দায়। তাকে ঘরে মেজে, সাজিয়ে পরিবে, সাধুভাষার মাতে বস, রমণীয় জোভানী করবার কী আশ্রয় সাধনা! তার জন্যে কত আয়োজন, কত উপকরণ; তার পেছনে কত সময়, কত অর্থ, কত পরিশ্রম। বই, পুঙ্কনের তো সে বালাই নেই। তাই বলছিলাম, মেয়েমাছ জাতটাই দেহ-সর্বস্ব।

—আচ্ছা, হয়েছে। বক্তৃতা যেনে এবার নিজের কথায় এসে দিকিন।

বলে কেনা বাসিন্দে ভর দিয়ে আরাম করে বসল। কমলা উঠে গিয়ে ঘরের কোণে ঢাকা-দেওয়া কলসী থেকে এক বাটি জল গড়িয়ে গেল। তার পর আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বলল, কলসানি পাখর হয়ে গিয়েছিলাম, সেটা ভাল করে টের পেলাম, যেদিন এল আমার চরম সর্বনাশ। এমনি বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। দিদি ভাসপাতালে। সেবারটা বোধ হয় তার পাঁচ বার। আগের চারটি আগেই গেছে। কোনোটা আতুরে, কোনোটা ক'দিন পরে। মা তার জামাই-এর সঙ্গে মেয়েকে দেখতে গেছেন। সেখান থেকে আর কোথায় যেন বাবার কথা। একটা কী বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখলাম, আমার ভগিনীপতি দরজায় খিল হ'তে দিচ্ছেন। চোখে পাবতাম বৈ কি? কল হোণ

চেষ্টা তো ক'বো যেত। কিন্তু চেষ্টাই নি। যদি বল। দিতে পারবো না। শুধু এই দেহটা নয়, মনটাও গছিল। সত্যিই পাথর হয়ে গিয়েছিলাম।

দৈনিক দুখ ফুটে কিছু বলতে হয়নি। মাস দুই পরে র নিল আমার এই শরীর। দিদি এবার ফিরে এসেই ল। সেখানে বসেই মা'তে মেয়েতে কী সব পরামর্শ দিন। তার পর একদিন। রাত বোধ হয় বাগোটা আমি আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ পাশ বার জায়গাটা কঁক ঠকতেই জেগে উঠলাম। ঠিক রে ঢুকলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে বইলেন। তার পর বললেন, বিনোদকে তো অনেক বলে লাম। তোরা দিদিরও মত আছে। তুই যেন যে বসিস না।

নী জানতে চাইলাম। মা কিছুক্ষণ আমার দিকে খাস ফেলে বললেন, শেষ কালে এই ছিল তোরা উপায় কি? বিয়ে ছাড়া এখন তো আর অস্ত

মা! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। আর কোনো। নি। তার পর প্রায় সমস্ত রাত ধরে আমার গায়ে। দিতে দিতে কত কী বলেছিলেন মা, তার একটা য় ঢোকেনি।

ছিলেন। এ ছাড়া আব আমার পথ কোথায়? রাজী হয়েছেন, সেইটাই তো আমার পরম ভাগ্য, এইটুকু শুধু জানিয়ে দেওয়া। তাই হয়তো দই এমন একটা ঘটনা ঘটল, বাত করে আমাদের ল।

ছিলাম। ডাকঘরের পিওন এসে চিঠি দিয়ে চলে য় রোজই দেয়। সব জামাই বাবুর চিঠি। কেউ চিঠি লেখে না। ওদিকে আমার কোনো।। সে দিন কী মনে হল। একটা পুরানো। দিয়ে দেয়ালে রাখা। সেইটাই চিঠির বাস। ঠিকানা তুলে দেখলাম। এ কি! এ যে আমার লখা, এ-ও তো আমার ভুলবার নয়! চিঠিটা ছুটে গেলাম উপরের ঘরে। দরজা বন্ধ করে থানা। বকের ভিতরটা খড়স খড়স করছিল।। হয়। ভাঁজ খুলতেই বুকটা ভরে উঠল।

। প্রথম দিকে, এক পাতা ছুড়ে, কী করে তারই সব মস্তার কাছিনা। তার পর নতুন নো দিনের রঙিন স্বপ্ন। শেফটুকু যেন শেষ হতে করে পড়লাম,—জানো কমল, আজকের মত হানো দিন বৃষ্টি নি, তোমাকে না পেলে আমার পাবার পথে সেদিন যে-সব বাধা ছিল, আজ ই। তুমিও যে বাঁধা পড় নি, সে-সবর আমি মার মন? সেখানে একটু জায়গা পাবো তো? ছ, কবে তোমার ডাক আসবে।

ব দিলাম। লিখলাম, তোমার ডাক আসবে

বলে আমিও যে কত দিন থেকে পা বাড়িয়ে আছি, সনৎদা! বাধা পড়ি নি বটে, তবু ভয় হয়, যেখানে এসে পড়েছি, সেখান থেকে সবার সামনে দিয়ে তোমার কাছে যাবার সবল পণ্টা আমার খোলা নেই। তুমি এসো। যেমন করে পার, আমাকে বাঁচাও।

সনৎ কী বকেছিল, জানি না। ক'দিন পরেই ভাবায় চিঠি এল—অনেক দিন, অনেক সময়ে তৈরি থেকো। তৈরি হয়েই ছিলাম। গভীর রাতে সনৎ এল টাঙ্কি নিয়ে।। তর্প ভুলেই নিশকে বেরিয়ে এলাম। মার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ চোখ দুটে, জলে ভরে গেল। তাড়াতাড়ি মুখে ফেললাম। আজ তো আমার কান্ডবার দিন নয়। একবার ভেবেছিলাম, মাকে সব জানিয়ে যাবো। সনতের হাতে মেয়ে দিতে হয়তো তার আপত্তি হবে না। কিন্তু শেষ পথন্ত ভরসা হয়নি। যদি ঠাণ্ডা রাজী না হন, যদি সব পথ বন্ধ হয়ে যায়? তাই রাত্রির অন্ধকারে পাগিয়ে এলাম। সব ই জানল, কমলা কুলে কালি দিয়ে গেল, কমলা মরল। কিন্তু যে নরকে ছিলাম, তার চেয়ে মরণে কাঁপ দিয়েও স্বপ্ন। যদি বল, কলঙ্ক? যা পেলাম, তার কাছে সে কত ভুল!

সনতের পাশে বসে উঠলাম এসে তার কালীঘাটের বাসায়। সেখানে নিয়ে তুলল, বাড়ির মধ্যে সেইটাই সব চেয়ে ভাল ঘর। দামী আসবাব দিয়ে সাজানো। একবার চোখ বুজিয়েই বোকা যায় তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজনের হাতের কত বড়, তার মনের কত সাধ। দরজায় ঠাঁড়িয়ে বলল, এই তোমার ঘর। আজ শুধু তোমার। যদিও দু'জনাব না হচ্ছে, তদ্বিন এখানে আমার প্রবেশ নিষেধ। তার পর একটু হেসে গলা খাটো করে বলল, সেদিনের আর দেরি নেই।

পরদিন সত্যিই তাকে দেখতে পেলাম না। তার পরের দিনও না। অথচ দাঁড়া-শব্দ পাই। জানতে পারি বাড়িতেই আছে। ঠাকুর চাকর বি-এর হাতে এটা-ওটা পাঠাচ্ছে। শুধু আসল মানুষটির দেখা নেই। তিন দিনের দিন ডেকে পাঠিয়ে বললাম, কী বাপার বলতো? একটা বারও কি আসতে নেই?

ও হেসে বলল, একটা বাগ কেন, একশ'বার আসবাই তো আয়োজন করছি। তখন আবার বলবে, একটা বাবও কি বাইরে যেতে নেই? আমি রাগ করে বললাম, ও সব বাজে কথা। আসলে টান যেটুকু, দূরে ছিলাম বলে। হাতের কাছে পেয়ে সব চলে গেছে। সনৎ একটু কী ভাবল, তার পর বলল, শুধু হাতের কাছে থাকে পাওয়া যায়, তার বেলায় হয়তো তোমার কথা খাটে। কিন্তু আমি যে আরও অনেকখানি এগিয়ে গেছি। পেয়েছি মনের কাছে। কাজেই হারাবার ভয় নেই, আগলে রাখবারও দরকার নেই। বলে হাসতে হাসতে চলে গেল।

আসল কারণটা বুঝতে পেরেছিলাম। পাছে আমার মনের কোনো সন্দেহ জাগে, তার আশ্রয়ে আছি বলে সে তার অস্ত্রায় সুযোগ নিচ্ছে, তাই নিজেকে একেবারে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। একদিন কথায় কথায় বলেও ফেলেছিল, তোমাদের বাড়িতে যেমন ছিলে, এখানেও তোমাকে ঠিক তেমন দেখতে চাই। মনে ক'রো মাষ্টার মশাই বেঁচে আছেন। কাছাকাছি কোথায় অপেক্ষা করছেন আমাদের আশীর্বাদ করবেন বলে।

সে যদি এতখানি ভাল না হত হয়তো ঠাকাত পারতুম।

বলছে, এখনো ঘরে পুণে বেগেছ! ওর দিকে তাকাও কেমন করে? মা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, না তাকিয়ে কী করি, বল? উনি কি আমার কথা শুনতেন? জানো তো সবই। এবার এলাম তোমাদের আশ্রয়ে। বিনোদকে বলে যত শীগগির পারি, যেমন তেমন একটা জুটিয়ে দাও। গলা দিয়ে আমার ভাত নামে না।

—শামি আর কী বলবে? বাড়ি আশ্রক; তুমিই বলে যা বলবার, বলে দিদি তার কাজে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই জামাই বাবুর গলা পেলাম। তখনই স্বিরলেন। শাওড়ার একগালা কথার উত্তরে শুকনো গলায় টেনে টেনে বললেন, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু বা' দিন-কাল পড়েছে... তার পর এই তো দেখছেন, আড়াইখানা ঘর। আমাদেরই কুলোর না।

—কী করবে, বাবা, বাবাঁনার কোণে পড়ে থাকলেও আমাদের থাকতে হবে। এ মেয়েটাকে নিয়ে—কই, কমলা কোথায় গেলি? তোরা জামাই বাবুকে প্রণাম করলি মা?

বেরিয়ে এলাম। আমার ভগিনীপতির শুকনো মুখখানা হঠাৎ জলধন করে উঠল। একগাল চেসে বললেন, বাঃ বেশ ডাগরটি হয়ে উঠেছে তো কমলা! এসো, এসো, লজ্জা কি! কী বলবে দিদি, মামুয়ের হাসি যে এত কুৎসিত, এই প্রশ্নম দেখলাম। আর সেই দুটো চোখ যেন গিলে খেতে চাইছে। এক বার চেয়েই আপনাকে আমার চোখ নেমে এল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে উঠল; ভয়ে নয়, ঘৃণায়। মনে পড়ল, এ চোখ কোথায় যেন দেখেছি। হাঁ, তখন আমার বয়স সবে সাত আট বছর। আমাদের বাড়ির পেছন দিকের বস্তিতে একটা লোক ছিল। তার নাম গণি মিঞা, অনেকগুলো মুবগী ছিল তার। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলতে খেলতেও দিকটায় গেলে দেখতান, মুবগীর খন্দের এগেছে গণি মিঞার। ঠাং-এ দড়ি বেঁধে পাখীগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে হাড়ি ভরে। একটা মুবগী ছিল। ভারী চন্দর দেখতে, আর তেমনি নাচুস রুহস। টগবগ করে চলত। আমরা বলতাম রাণী। এক দিন জিজ্ঞেস করলাম, ওটা কেচবে না? গণি মিঞা নাড়ল। তার পর কান পর্যন্ত হানি ছড়িয়ে বলল, দেখছ না থুকা, একেবারে তৈরি মাল। ওটা কি আর খোঁচা যায়? একটা পরব টবর আশ্রক, দু'চারজন মাস্তাবান ডাকি, তার পর... বলে কী এক অদ্ভুত জলধলে চোখে তাকাল সেই মুবগীটার দিকে। এত দিন পরে আমার জামাই বাবুর কপালের নিচে দেখলাম সেই গণি মিঞার চোখ। বুকের মধ্যে কেমন হুক হুক করে উঠল। মার ধমক পেয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে প্রণাম করলাম। উনি আমার কাঁধ দুটো ধরে একটু ঝাঁকানি দিলেন। সমস্ত শরীরটা গিঁগিনি করে উঠল।

কী সব ব্যবসা ছিল আমার ভগিনীপতির। সকালে চা-খাবার খেয়ে বেরিয়ে যান। বারোটা-একটায় আসেন। খেয়ে মেয়ে হয়। তার পর আবার বিকেলে বেরোন। ফিরতে সেই রাত বারোটা। কোনো কোনো রাতে নাকি একেবারেই ঘেয়েন না। থাকেন কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই দিদি ঘরে চলে গেল। আমি আশবার পর তাঁর এই কটন বসলে গেল। সকালে বেরোতে দেখি হয়। বিকেলে বেরোতেই চান না। সময় নেই, সময় নেই। কমলা, এটা নিয়ে এসো, সেটা দিয়ে বাও। কাছে

গেলে আদরের নাম করে বা আমাকে সহিতে হয় মনে হলে আজও আমার গা পাক দিয়ে ওঠে। একলা কাছে যাওয়া এড়িয়ে চলি। কিন্তু সকলের সামনেও রেহাই নেই। এমন ভাব দেখান, যেন কচি থুকা আমি, আমাকে নিয়ে যা খুসী করা চলে। মা দেখেও খেয়েন না। দিদি চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ঐ সাপের মত হাত ছুটো মুচড়ে ভেঙ্গে দিই। কিন্তু জানি, সেই সঙ্গে আমাদেরও কপাল ভাঙবে। শুধু, আমার হলে ক্ষতি ছিল না সেই সঙ্গে মারও। সে কথা ঐ লোকটার জানা আছে বলেই, আমাদের অসহায় অবস্থার সুরোগ নিতে তার দ্বিধা নেই। বাধা দিতে দিতে শেষটার ক্লাস্ত হয়ে পড়লাম। ভাবতে শুরু করলাম, আমার এ দেহটা যেন রক্ত-মাংসের নয়, পাথরের। পাথরের তো কোনো বোধশক্তি নেই, মান-অপমান, লজ্জা-সম্মানের বালাই নেই। আছে আস্তে আমিও যেন তেমনি পাথর হয়ে গেলাম।

একটা কথা ভেবে দেখেছি, দিদি? মেয়েমামুয়ের এই দেহটাই তার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ; একটু বড় হবার পর থেকেই একে নিয়ে তার ভয়ভারনার অন্ত নেই, একে নিয়ে তার পদে পদে বিপদ, পদে পদে লজ্জা। একে সামলে রাখা, আগলে রাখা, বাঁচিয়ে রাখা,—সেইটাই যেন তার সবচেয়ে বড় দায়। এর ওপরে সকলের খবরদস্তি, আপন, পর, মেয়ে পুত্র-কার নয়? পুত্রদের দেহটা হল তার সম্পদ, আর মেয়েমামুয়ের হল বোঝা। তাই পৃথিবীর সেই শত্রু থেকে আস্ত পর্যন্ত বড় কিছুই সে করে উঠতে পারেন না। এই বোঝা বয়ে বয়েই জীবন কেটে গেল।

এটা তোরা রাগের কথা, মূহু হেসে প্রতিবাদ করল হেনা। নিজেকে দিয়ে দেখছিস। কিন্তু তার মত ঐ অবস্থায় ক'জন পড়ে?

—সে কথা ঠিক। আমার মত ভাগ্য স্মার ক'জনের? কিন্তু তাহলেও আমার আসল কথাটা রয়ে গেল। তুমি বাদেও কথা বলছ, আমার দলে যারা পড়ে না, এই শরীরটাকে নিয়ে তাদেরও বৃ নেই। সেও এক রকমের দায়। দেখকে গুটিয়ে রাখবার দায় নয়, কুটিয়ে তোলার দায়। তাকে যাগে মেজে, সাজিয়ে পরিয়ে, সাধুভাষার হাকে বলে, রমণীয় লোভনীয় করবার কী আশ্রাণ সাধন! তার জন্তে কত আয়োজন, কত উপকরণ; তার পেছনে কত সময় কত অর্থ, কত পরিশ্রম। কই, পুত্রদের তো সে বালাই নেই! তাই বলছিলাম, মেয়েমামুয় জাতটাই দেহ-সর্বস্ব।

—আচ্ছা, হয়েছে। বক্তৃতা রেখে এবার নিজের কথায় এসে দিকিন।

বলে হেনা বাসিন্দে ভর দিয়ে আরাম করে বসল। কমলা উঠে গিয়ে ঘরের কোণে ঢাকা-দেওয়া কলসী থেকে এক বাটি জল গড়িয়ে খেল। তার পর আবার নিজের জায়গার ফিরে এসে বলল কতখানি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম, সেটা ভাল করে টের পেলাম যেদিন এল আমার চরম সর্গনাশ। এমনি বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। দিদি হাসপাতালে। সেবারটা বোধ হয় তার পাঁচ বার। আগে চারটি আগেই গেছে। কোনোটা আতুরে, কোনোটা ক'দিন পরে মা তার জামাইএর সঙ্গে মেয়েকে দেখতে গেছেন। সেখান থেকে আর কোথায় যেন বাবার কথা। একটা কী বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখলাম, আমার ভগিনীপতি দরজায় ছিল এঁটে দিচ্ছেন। টোচতে পারতাম বৈ কি? কল হো



আর না হোক, চেষ্টা তো করা যেত। কিন্তু চেষ্টাই নি। যদি বল কেন, ঠিক উত্তর দিতে পারবো না। শুধু এই দেহটা নয়, মনটাও অসাড় হয়ে পড়েছিল। সত্যিই পাখর হয়ে গিয়েছিলাম।

মাকে বা দিদিকে খুব ফুটে কিছু বলতে হয়নি। মাস দুই পরে সে কাজের ভার নিল আমার এই শরীর। দিদি এবার ফিরে এসেই বিছানা নিয়েছিল। সেখানে বসেই মা'তে মেয়েতে কী সব পরামর্শ চলল কয়েক দিন। তার পর একদিন। রাত বোধ হয় বাগোটা একটা হবে। আমি আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ পাশ দিকতে গিয়ে মার জায়গাটা ঝাঁক ঠেকতেই জেগে উঠলাম। ঠিক তখনই মা'ও ঘরে ঢুকলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন আমার পাশটিতে। তার পর বললেন, বিদ্যাদেবকে খোঁজ অনেক বলে কয়েক রাজী করলাম। তোর দিদিরও মত আছে। তুই যেন আবার বাগড়া দিয়ে বসিস না।

ব্যাপারটা কী জানতে চাইলাম। মা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে নিশ্বাস ফেলে বললেন, শেষ কালে এই ছিল তোর রূপালো! কিন্তু উপায় কি? বিয়ে ছাড়া এখন তো আর অন্য পথ নেই, মা!

মনে আছে, মা! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। আর কোনো কথাই বলতে পারিনি। তার পর প্রায় সমস্ত রাত ধরে আমার গায়ে মাথা হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কত কী বলেছিলেন মা, তার একটা বর্ণণ আমার মাথায় ঢোকে নি!

মা ঠিকই বলেছিলেন। এ ছাড়া আর আমার পথ কোথায়? নমাই বাবু যে রাজী হয়েছেন, সেইটাই তো আমার পরম ভাগ্য, আমিও যে রাজী, এইটুকু শুধু জানিয়ে দেওয়া। তাই হয়তো দীর্ঘমুহূর্তে কিছু সকালেই এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে করে আমাদের বা বাবু লেগে গেল।

নীচে কাজ করছিলাম। ডাকঘরের পিণ্ডন এসে চিঠি দিয়ে চলে গেল। এমন প্রায় রোজই সেরে। সব জামাই বাবুর চিঠি। একে বা আমাকে কেউ চিঠি লেখে না। ওদিকে আমার কোনো কাঁড়লও ছিল না। সে দিন কী মনে হল। একটা পুরানো বস্তুর টিন পেরেক দিয়ে দেয়ালে রাখা। সেইটাই চিঠির বাস। তার ভিতর থেকে চিঠিখানা তুলে দেখলাম। একি! এ যে আমার ম। আর এ লেখা, এ-ও তো আমার ভুলবার নয়! চিঠিটা কের মধ্যে লুকিয়ে ছুটে গেলাম উকরের ঘরে। দরজা বন্ধ করে সে ফেললাম খামখান। বুকের ভিতরটা খুঁজা খুঁজা সব খুঁজা। জানি, যদি সে না হয়। ভাঁজ খুলতেই বুকটা ভরে উঠল।

মস্ত বড় চিঠি। প্রথম দিকে, এক পাতা জুড়ে, কী করে মোক খুঁজে পেল, তারই সব মজার কাহিনী। তার পর নতুন যে বলা সেই পুরানো দিনের রঙীন স্বপ্ন। শেষটুকু যেন শেষ হতে য় না। বার বার করে পড়লাম,—জানো কমল, আজকের মত মন করে আর কোনো দিন বুঝি নি, তোমাকে না পেলে আমার বে না। তোমাকে পাবার পথে সেদিন যে-সব বাধা ছিল, আজ য় কোনোটাই নেই। তুমিও যে বাধা পড় নি, সে-সবর আমি যেছি। কিন্তু তোমার মন? সেখানে একটু জাগরণ পাবো তো? ত মুহূর্তে দিন গুণি, কবে তোমার ডাক আসবে।

সেই দিনই জবাব দিলাম। লিখলাম, তোমার ডাক আসবে

বলে আমিও যে কত দিন থেকে পা বাড়িয়ে আছি, সনৎলা! বাধা পড়ি নি বটে, তবু ভয় হয়, যেখানে এসে পড়েছি, সেখান থেকে সবার সামনে দিয়ে তোমার কাছে যাবার সবল পন্থা আমার খোঁজ নেই। তুমি এসে। যেমন করে পার, আমাকে বাঁচাও।

সনৎ কী বুকেছিল, জানি না। কদিন পরেই আবার চিঠি এল—অন্যক দিন, অন্যক সময়ে তৈরি থেকে। তৈরি হয়েই ছিলাম। গভীর রাতে সনৎ এল চাকি নিয়ে। হর্ষ তুনেই নিশ্বাসে বেরিয়ে এলাম। মার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ চোখ চুট, জলো ভরে গেল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেললাম। আজ তো আমার কাদবার দিন নয়। একবার ভেবেছিলাম, মাকে সব জানিয়ে যাবো। সনতের হাতে মেয়ে দিতে হয়তো তার অপত্তি হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরসা হয়নি। যদি ওঁরা রাজী না হন, যদি সব পথ বন্ধ হয়ে যায়? তাই রাত্রির অন্ধকারে পাগিয়ে এলাম। সবাই জানল, কমলা কুলে কালি দিয়ে গেল, কমলা মরল। কিন্তু যে নরকে ছিলাম, তার চেয়ে মরণে কাঁপ দিয়েও খুশ। যদি বল, কলঙ্ক? যা পেলাম, তার কাছে সে কত তুচ্ছ!

সনতের পাশে বসে উঠলাম এসে তার কালীঘাটের বাসায়। সেখানে নিয়ে তুলল, বাড়ির মধ্যে সেইটাই সব চেয়ে ভাল ঘর। দামী আসবাব দিয়ে সাজানো। একবার চোখ বুলিয়েই বোকা বার তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজনের হাতের কত বন্ধ, তার মনের কত সাধ। দরজায় ঝাঁড়িয়ে বলল, এই তোমার ঘর। আজ শুধু তোমার। যদিও দু'জনাব না হচ্ছে, তবু এখানে আমার প্রবেশ নিষেধ। তার পর একটু হেসে গলা খাটো করে বলল, সেদিনের আর পেরি নেই।

পরদিন সত্যিই তাকে দেখতে পেলাম না। তার পরের দিনও না। অথচ সাড়া-শব্দ পাই। জানতে পারি বাড়িতেই আছে। ঠাকুর চাকর ঝি-এর হাতে এটা-ওটা পাঠাচ্ছে। শুধু আসল মাছুষটির দেখা নেই। তিন দিনের দিন ডেকে পাঠিয়ে বললাম, কী ব্যাপার বলতো? একটি বারও কি আসতে নেই?

ও হেসে বলল, একটি বার কেন, একশ'বার আসবারই তো আয়োজন করছি। তখন আবার বলবে, একটি বারও কি বাইরে যেতে নেই? আমি রাগ করে বললাম, ও সব বাজে কথা। আসলে টান বেটুকু, বুঝেছিলাম বলে। হাতের কাছে পেয়ে সব চলে গেছে। সনৎ একটু কী ভাল, তার পর বলল, শুধু হাতের কাছে থাকে পাওয়া যায়, তার বোঝার হয়তো তোমার কথা খাটে। কিন্তু আমি যে আরও অনেকখানি এগিয়ে গেছি। পেয়েছি মনের কাছে। কাজেই হারবার ভর নেই, আগলে রাখবারও দরকার নেই। বলে হাসতে হাসতে চলে গেল।

আসল কারণটা বুঝতে পেরেছিলাম। পাছ আমার মনের কোনো রক্তের ভাগে, তার আশ্রয়ে আছি বলে সে তার অন্তর্যন্ত সুযোগ নিচ্ছে, তাই নিজেকে একেবারে ঘুরে সরিয়ে নিয়েছিল। একদিন কথায় কথায় বলেও ফেলছিল, তোমাদের বাড়িতে থেমন ছিল, এখানেও তোমাকে ঠিক তেমনি দেখতে চাই। মনে ক'রো মাষ্টার মশাই বেঁচে আছেন। কাছাকাছি কোথায় অপেক্ষা করছেন আমাদের আশীর্বাদ করবেন বলে।

সে যদি এতখানি ভাল না হত হয়তো ঠকাতো পারতুম।

।। সুলীলার উচ্চকণ্ঠের সাড়া শুনেতে পেয়েছিল।  
 এসেছে বড় জমাদার, নয়তো খাটনি বুকে নিতে  
 । সিঁপাই কিংবা অন্ত কোনো কাজে আর কেউ।  
 ।। আর তুময় হয়ে গিয়েছিল নিজের কাজের মধ্যে।  
 পড়েছে কালো মেঘের মত একরাশ এলো ঢুল।  
 । দেখা যায়, স্তম্ভের গায়ে আর অস্পষ্ট আভাস।  
 গেছে হুটী পেলব বাহু; উঠেছে-নামছে, কাঁটা  
 ল। বেশবাস শিখিল, হয়তো একটু অসংবৃত।  
 জুতার শব্দ শুনেতে পেয়ে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল  
 আঁচলখানা জড়িয়ে নেবার কঁাকে চকিতে এক বার  
 এর দিকে। তার পর না পারল চোখ তুলে  
 জানাতে তার প্রয়োজন। কোন এক অননুভূত  
 য় গেল সকল অঙ্গ।

পাড়লেন, ডেকে পাঠিয়েছ, সুনলাম! কী  
 গণেট তো দেখছি দিবি পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।  
 সহজ হবার চেষ্টা করল হেনা। ঘাড়টা তুলে  
 । ফেলল, শুধু গুকে দেখতেই আসেন না কি

দবতোয়। কী বলতে চায় হেনা! একি শুধু  
 তাঁরই মনের গহনে অঙ্গুলি-নির্দেশ? ঐ কথা;  
 দবই যেন একটা নিগূঢ় অর্থ নিয়ে দেখা দিল  
 গলে দিন তাঁর অন্তরের একটি কক্ষের অর্গল।  
 তাঁর দৃষ্টি মেলে বললেন, কী বলছিলে? গুকেই  
 কি না? তার জবাব কি আজও তুমি জানতে

ভিতরটা শিউরে উঠল। অসতর্ক কর-স্পর্শে যে  
 য দিয়েছে, ভয় হল, তাকে হয়তো আর বন্ধ করা  
 বার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে। তাই, যেন  
 ন ভাবে তবল কণ্ঠে বলল, বাঃ! কী যে বলেন  
 । কি আর কারো অসুখ-বিষম্ব করতে নেই?

থাক, হেনা, বাপা দিয়ে অর্দার কণ্ঠে  
 সেই এক জনের কথা বলতে দাও, যাকে  
 কিন্তু শুধু বেসতে চাই, বললে কিছুই বলা  
 অনেক বেশী আমার লোভ, অনেক বড় আমার  
 । না—

কৃষ্ণাঙ্গ বলে উঠল হেনা। বেদনার্ত কণ্ঠের  
 ট করণ চোখ দু'টির দিকে চেয়ে ডাক্তার হঠাৎ  
 কাল বিরতির পর আবার বললেন, আমাকে

ডুলা বুঝে না। আমায় আশা, বাস করা বসাহা, তার ভাব  
 আমার কোনো দাবি নেই। তবু আমাকে বলতে হবে। আজ  
 না বললে হয়তো কোনো দিনই বলা হবে না।

—কিন্তু তার কোনো কথাই তো আপনি শোনেন নি? আপনি  
 তো জানেন না কী সে, কী তার পরিচয়, কী তার ইতিহাস।

—জানতে চাই না। তার দয়াকারও নেই। আমার কাছে  
 সে যা, তাই। এর বেশী আর কিছুই জানবার নেই।

—আর কিছু জানবার নেই?

—না। যে কথা আমার জানবার, সে তো তুমি জানো।  
 নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে রাখ। তোমার মনকে জিজ্ঞেস কর।  
 তার পর বল, কী তার উত্তর, কোথায় তার বাধা।

দরজার চৌকাঠে ভর দিয়ে হেনা দাঁড়িয়ে রইল স্পন্দনহীন মুর্তির  
 মত। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে মুহূ-কোমল শঠে ডাকলেন দেবতোয়,  
 হেনা—

—বলুন।

—চপ করে রইলে কেন? জবাব দাও। যদি আজও তোমার  
 মন তৈরি হয়ে না... আমি অপেক্ষা করবো। যত দিন বলবে,  
 তত দিন অপেক্ষা করবো। আজ শুধু তোমার শেষ-কথাটা ভেনে  
 যেতে চাই।

ডেনার হোট হু'খানা কেঁপে উঠল। বেরিয়ে এল কয়েকটি  
 অশ্রু-সিক্ত অশ্রু-শব্দ-না, না; সে হয় না; আমার কোনো  
 উপায় নেই... আমি যে—আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। ব্যথায়  
 কণ্ঠে এই ক'টি কথা বলেই সে হু'হাতে হুথ ঢেকে ঘরের ভিতর ছুটে  
 চলে গেল।

সেই দুটি ছোট 'না' ডাক্তারের বুকে এসে বিঁধল স্তম্ভিত  
 ফলার মত। বাইরের দিকে তাকালো। মনে হল এই আলোক-  
 উজ্জ্বল অপরাহ্নের বুকের ভিতর থেকে সহসা নিশিচু হয়ে গেছে  
 জীবনের চিহ্ন। কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে  
 ফিরে চললেন ফটকের দিকে।

খাটনি-ঘরের কাছাকাছি আসতেই সুলীলা বেরিয়ে এসে  
 নমস্কার করল। ডাক্তার নিঃশব্দে চোখ তুলে চাইলেন। সুলীলা  
 চমকে উঠল, একি! আপনাব কি অসুখ করেছে, ডাক্তার বাবু?

—না; বলা কী বলবে।

—বলছিলেন, কমলা বলে যে মেয়েটা আছে, তার অসুখ।  
 হেনা বলেছিল তাকে এক বার দেখিয়ে দিতে। আপনাকে বলেনি?

—কী অসুখ?

—কী জানি, কি সব পুরোনো রোগ।

—কাল দেখবো, বলে তেমনি আচ্ছন্নের মত এগিয়ে গেলেন।

[ক্রমশঃ।]

ক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন। বসুমতী ও নির্ভরযোগ্য]



অপক্লপ ও অনিন্দ্য

অপর্যাপ্ত অলকদামের শিখরে শিখরে  
স্থির অচঞ্চল যৌবনের যে  
উচ্ছসিত রূপ-তরঙ্গিমা—তারই  
মিষ্ট ব্যঞ্জনা লক্ষ্মীবিলাস—  
শতাব্দীর ঐতিহ্য-সম্পন্ন এবং  
অপরাজেয় প্রসাদিনী ।

# লক্ষ্মীবিলাস

তৈল

এম এল. বসু স্ম্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-১

লক্ষ্মীবিলাস বালি অভুলনীয়



## প্রতিপাদ্য

### আন্তরিক মুখোপাধ্যায়

৮

চহারা বললে বাছে একটু একটু করে, সেটা বেশ এখন। প্রতিরোধের এক একটা সাধা পাখা-অক্ষর স্থানে। দিনে-দিনে বাড়ছে সেগুলো। শুকনো বিনীত করা যেতকায় ক্ষীত স্তম্ভগুলো পরস্পরের একদিন, বাতাস চলাচলেরও কীক থাকবে না। অবশ্য বোঝা যায় না। ওগুলোকে এরা বলে পৃথক সত্য মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে এখন। ওর ব যে এত ভুলনা-কল্পনা এত কারিগরী, এত অসংখ্য পাখা-বন্দী হয়ে আছে, চোখে দেখেও ঠাণ্ডা করা

ঠিন এক প্রকাশের তপস্যায় বসেছে মড়াই, তার মড়াইয়ের বৃকব এক একটা অতিকার গহ্বর যেন টাল পাখা-প্রাচীরে ভরে ওঠার জন্য উদ্বুদ্ধ তাগিদ কাজ বাড়ছে। কাজের তাগিদ বাড়ছে। মাসলও ক সময় বড় কম নয়। ছোটখাট অঘটন ঘটে যাই। গোড়ায় গোড়ায় এত হয় নি। কিন্তু বেদিতে এটুকু অর্থ না দিলে নয়, এও যেন যেন দুর্ঘটনা হয়, জীবনেরও অবসান হয় তুটো-চারটে। দোষে হল সেটা পরের ব্যাপার, নথিপত্রের ব্যাপার। গন্ধার ছায়া নামে কিছুক্ষণের জ্ঞান বা কিছুদিনের আবার কাজ, আবার কাজের তাগিদ। তুমি চাও এই সৃষ্টির সঙ্গে তোমার সকল গ্রন্থির অযোগ্য বানান।

অঘটনটা অল্প একমের। যেমন ঘটে সচরাচর,

বৃষিত ক্ষত যেমন পারে গোটা একটা দেহ বিধিরে চিক ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলির চোখে তেমনি কীট বৃষি গোচর হল, এত বড় সৃষ্টি সমারোহের পূর্ব সূচকে নিম্নলি করার মত অগাধ নয় সেট অনাগত এক কালবোশে খীর শব্দ ভাগল অনেকের

বৃষে বৃষে মড়াইয়ের কাজ দেখছিল। আরও জন দুই অফিসার ছিলেন সঙ্গে। কথায় কথায় একজন অফিসার খবর দিলেন, অল্পক ব্রক-এ বড় ব্রকমের একটা ফাটল দেখা গেছে, মাটির নিচে যা আছে আছে—ওপরের এক দিক ভেঙ্গে আবার নতুন করে জুড়তে হবে। মাটির ওপর সামান্যই তোলা হয়েছে, কাজেই অস্ববিধে হবে না খুব।

তখন চিক ইঞ্জিনিয়ারের মনে খটকা লাগল কেমন। বলল, চলুন দেখে আসি।

দেখে খটকাটা বাড়ল আরো। আড়াআড়ি ফাটল একটা। অনেক কারণে হতে পারে। পঞ্চাশ-ষাট ফুট চওড়া দেয়ালের সেই ফাটলের দিকটা ভেঙ্গে আবার মেরামত করে নেওয়া কঠিন কিছু নয়। কিন্তু ভিতরটা খুঁত খুঁত করতে লাগল বাদল গাঙ্গুলির। ভাবল কিছুক্ষণ। ল্যাবরেটরী অ্যাসিষ্ট্যান্টদের ডেকে পাঠালো।

নির্দেশ মত তারপর সিমেন্ট কনক্রীট তুলে নিয়ে বখারিধি পরীক্ষা-পর্ব। ফিজিক্যাল টেষ্ট, কেমিক্যাল টেষ্ট, শ্রেসার টেষ্ট। পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাঁড়ালো আরো। মিক্চারে সিমেন্টের অংশ নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে অনেক কম। এক কীক খুঁড়তে তিন কীক বেরলো। কনক্রীট তৈরী হচ্ছে যেখানে সেখান থেকে সিমেন্টের স্ফাপন এনে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে একে একে আবার বাবতীয় পরীক্ষা করালে বাদল গাঙ্গুলি। পাথরওড়ো আর জমাট-বাঁধা সিমেন্টও মেশানো ভাতে।

মাথাটা বৃষে উঠল কেমন।

মিক্চারে সিমেন্টের পরিমাণ পরীক্ষা করার কথা নিজেদের তরফ থেকেও। মাঝে মাঝে করাও হয়। কিন্তু নিয়ম বাই হোক, এত বড় কাজে হামেশা সতর্ক নয় সেটা। বিশ্বাসের ওপরেই ছেড়ে দিতে হয় বেশির ভাগ। আর এ ধরণের অঘটন হয়ও না বড়। বিশেষ করে ঘোষ-চাকলাদারের মত এতদিনের এতবড় ফর্মকে অবিচ্ছিন্ন করারও কারণ নেই কিছু। সরকারের কাছ থেকেই সিমেন্ট কিনে বরাবর সরকারী কাজ চালিয়ে আসছে।

পায়ে পায়ে মড়াইয়ের দিকে চলল আবার বাদল গাঙ্গুলি। সঙ্গে নরেনকে ডেকে নিল।

—কী ব্যাপার? নিশ্চয় মৃতি দেখে নরেন অবাক!

—এসো। ব্রকটার কাছে এসে আঙুল দিয়ে ফাটলটা দেখিয়ে দিল।

—ফেটে গেছে? তেমন না ভেবেই নরেন বলল, তা ভালো করে একটু প্রাষ্টার করে দিলেই তো হয়।

—থামো! নিশ্চয়-মৃতি মাত্রইটা ঠাণ্ডিয়ে উঠল হঠাৎ। তারপর সংক্ষেপে বলল ব্যাপারটা।

চূপচাপ অনেকক্ষণ। পাথের তলা থেকে মাটি সরে সরে বাছে বাদল গাঙ্গুলির। অস্বাভাবিক জলজল করছে চোখের জোবা ছুটো। ওই গা-করা ফাটলটা বড় হয়ে হয়ে যেন সমস্ত মড়াই জুড়ে বসছে, আর, এত বড় ড্যাম কন্ট্রাকশন নিশ্চেষ্টে মিলিয়ে বাছে তার মধ্যে।

সব স্তনেও ব্যাপারটা অন্তর্ভুক্ত করে দেখেনি নরেন চৌধুরী। তবু নীরব সেও। এই অসহিষ্ণু বিক্ষোভের হেতু জানে। নিভের হাতে-গড়া যে সৃষ্টি-সমারোহ ভেঙ্গে গুড়িয়ে খান-খান হয়ে গেছে

একদিন, মানুষটার ভিতরের সেই কাটল মিলায়নি আজও।  
এখানকার এতবড় এই স্ট্রির কণায় কণায় একদিনের মর্মেচ্ছদী  
পরাজয়ের নিখুঁত একটা পান্টা জবাব লিখে রাখতে চায়।  
এই ক্ষমতার আয়োজন দিয়ে বিগুণ নিটোল করে ভরে তুলতে  
চায় সেদিনের সেই বার্ষিকীর ফটিলটা। ব্রেকের এই কাটল দেখে  
সেই পুথানো স্মৃতিই মুখবানান করে আসছে আবার।

—চলো, কি এমন হয়েছে, আপিসে বসে যা হয় ভেবেচিন্তে  
ঠিক করা বাবে'খন। হালকা করে দিতে চাইল নরেন চৌধুরী।

কিন্তু আপিসে কিয়ই যে ব্যবস্থা করল চিক ইঞ্জিনিয়ার তাতে  
অল্প সকলেই উতলা হয়ে পড়ল বেশি। অফিসার এবং কর্মচারীদের  
ডাকিয়ে সোজা হুকুম দিল, যোষ-চাকলানারের সমিটে দিয়ে যেখানে  
বা কাজ হচ্ছে সব বন্ধ করে দিতে। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারকে  
হলব করে পাঠালো তারপর।

অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার, অর্থাৎ, রবণার বাবা মি: চ্যাটার্জী।  
দুই টি-পাটি দিন দ্বার ঘাট করুন, ভদ্রলোক অদ্রুত আশা পোষণ  
রবেন না খুব। ওপর-অলটিংকে মনে মনে বরং সমীহই করেন একটু।

—বন্ধন। শুনেছেন সব?

মি: চ্যাটার্জী মাথা নাড়লেন, শুনেছেন?

—কি করবেন এখন?

চিন্তিত মুখে ভদ্রলোক ভাবলেন একটু। কি আর করা  
বে...গ্রাউণ্ড-ওয়ার্ক-এর কাজে লাগিয়ে দিতে বলি এ লটার  
টিরিয়াল, আর যোষ-চাকলানারকেও নোটিস্ দিই একটা, কেন  
রকম হল...।

মুখের দিকে চেয়েই বৃক্সলেন জবাব মনঃপুত হয়নি।

—কিন্তু না জানতে পারলে ওই দিয়েই আমরা ইবেকশনের  
জ করতাম, তার পরের কথা ভাবুন।

নিরুপায় মি: চ্যাটার্জী হাসলেন একটু। বললেন, কিছু কাল  
দে ক্রাক হত, মিপেরায়ের হাল্লামা লেগে থাকত...এরকম অবস্থা  
য়া উচিত নয়, কিন্তু দেখলাম তো অনেক...।

চেয়ার ছেড়ে উঠে স্বল্প পরিসর ঘরের মধ্যেই বারকতক পারচারী  
র নিল চিক ইঞ্জিনিয়ার। সামনে স্থির হয়ে ঈড়াল তারপর।  
শুধুন, হেড অফিসে ইন্টিমেশন পাঠান, আর যোষ-চাকলানারকে  
হুনি নোটিল দিন মাল তুলে নিয়ে থাক। হেড অফিস থেকে  
ট্রাকশন এলেই বলে দেবেন সাত দিনের মধ্যে গো-ডাউনও  
ল করে দিতে হবে।

ভদ্রলোক মহা কীপরে পড়লেন যেন। নরেন একটা কথাও  
নি এতক্ষণ। নির্দেশ শুনে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল সেও।  
ডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার হুঁচকানোটা প্রকাশ না করে পারলেন  
শেষ পর্যন্ত। একবারে এতটা কি ঠিক হবে...?

—যা বললাম করে পাঠিয়ে দিন, আমি সই করছি।

চেয়ারে বসে অসহিষ্ণু হাতে একটা কাইল টেনে নিল সে।  
। বাকাব্যয় না করে সোজা প্রস্থান করলেন অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ  
ফার।

নরেন তেমনি চুপচাপ বসে বইল আরো কিছুক্ষণ। হালকা  
দিল একটু। হাসলও।

—বেশ।

সাড়াশব্দ নেই।

—বলব কিছু না সরে পড়ব?

—হ...। কাইল নিষিদ্ধ।

—চিক ইঞ্জিনিয়ার না বাদল গাসুলি...তাকে বলি?

খট করে বন্ধ হয়ে গেল হাতের কাইল। সোজা তাকালো  
মুখের দিকে। খুব স্পষ্ট করে জবাব দিল, চিক ইঞ্জিনিয়ারকে।

বিকপ না হয়ে হাসিমুখেই বলল নরেন, তাহলে আর হল না  
আপাতত, পরে হবে'খন কথা—।

পরদিন গো-ডাউন-এ যত্নে চাকলানারের হাতে পড়ল  
নোটিলটা। রণবীর যোষ কাছাকাছি গেছে কোথায়। তবু  
লোক পাঠালো তাকে ডেকে নিয়ে আসতে।

এসব কামেলা পছন্দ নয় যত্নে চাকলানারের। লাভ বত  
বাড়িতে পারবে বাড়িও, সে জেতে যা করা দরকার করে, কিন্তু  
গোলযোগে পড়ার সম্ভাবনা আছে এমন কিছু কোরো না। যদিও  
অর্থে সামর্থ্যে যে পর্ষায়ে এসে ঈড়িয়েছে আজ যোষ-চাকলানার কার,  
তাতে অল্পবয়সী এক ইঞ্জিনিয়ারের এরকম চোখ রাস্তানিকে খুব একটা  
পরোয়া করে না যত্নে চাকলানারও। হু'পুক্করের ব্যবসা, সবকারী  
কাজও কম করল না আজ পর্যন্ত, এখানেও এতবড় কাজ নিয়েছে  
বাদল গাসুলির সুপারিশে নয়, হেড অফিসের দাবিগ্যে। তবু  
এসব কামেলা কে চায়। আর কিছু না হোক হুর্নাম তো একটা।  
কিন্তু যত্নে চাকলানারের পক্ষে রণবীর যোষকে সাহায্যো লক্ষ্য।  
এই সাত সপ্তাহেই কোথায় কাব পিছনে বৃহৎ ঠিক কি...।  
ব্যবসায় কুশাগ্র বৃদ্ধি, কিন্তু যা হচ্ছে দিন কে দিন, ব্যবসা করাবে  
কাকে দিয়ে!

রণবীর যোষ এলো। নোটিল পড়ল। টোয়ের কীকে  
বক্ররেখা।—ও বাবা! একেবারে বাতিল! নোটিলটা কেবল  
দিয়ে ঈড়ুর ওপর পাইপ হুকল বারকতক। ছেলে ছোকরার  
হাতে এতবড় কাজের ভার, ওরা যুষ্টিয়ের ভায়রাভাই-ই হয়ে থাকে  
প্রথম প্রথম। চলো, পিঠি চাপড়ে আসি।

প্রথম যোগাযোগে রণবীর যোষের ওপর মনে মনে প্রসন্ন ছিল  
চিক ইঞ্জিনিয়ার। তার ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসলনি কখনো। তবু  
হৃদয়তা ছিল কিছুটা।

সেটা কর্মগত।

মড়াইয়ের কাজে প্রথম দিকের বিস্তারত্বের সময় রণবীর  
যোষের সহায়তা ছিল কিছু। গোড়ার গোড়ার কুলি আমদানি।  
ব্যাপারে সাহায্য করেছে। একটা সময় গেছে যখন এত তার  
পকাশজন কুলির আবির্ভাবও শুভ হুচনা বলে ভাবত।  
যোষের কাজের অন্তর্গত নয় এটা। নয় বলেই এই স্মরণেছিল।—  
তার কর্মক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়েছে।

নিজের স্বার্থের দিক থেকে মানুষকে বাচাই কর, টোকে?  
করাব নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে রণবীর যোষের। প্রথম—সর্বনাশ!  
কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে তার স্পষ্ট বিদ্বেষণ। খুশি হতে সর্ব...? আমি  
পরিতোষণের ভক্ত নয় কে? শুধু জেনে নাও, খুশি করার  
নীতিটি কার বেলায় কি।

মড়াইয়ের এই সর্বাধিনায়কটিকে বুকে নিতে অন্তত ৭৫ হ'

ও। এছাড়া কোনরকম দুরূহ জটিলতার আবরণও  
হয়নি তাকে। সিমেন্টের সঙ্গে বালু মেশানোর মত  
জলের আদ্রত্বটুকুও নিপুণ সমতায় বেশ করে মিশিয়ে  
বিধি আদ্যার ভিত্তিটা পাকাপোক্ত হবে, এটুকুই বেশ  
নিশ্চিত ছিল রণবীর ঘোষ। কাজের বাইরে এই  
কোনরকম ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টাও করেনি সে।  
ব. জানত। দেখা হয় প্রায়ই, যে যার 'নজ' করে  
চলি উঠলে সশ্রুতিত অথচ সপ্রশংস 'চোখে কলটাক'-  
দিকে চেয়ে চেয়ে বলে, এ চোখ জ্বরীর চোখ  
এই মড়া জায়গায় প্রাণ আসছে দেটা বোঝা যাচ্ছে

থেকেই তার জ্বরীর চোখ বাদল গাঙ্গুলির সামনে  
যি প্রাণ সকারের সূচনা দেখে আসছে।

তোষামোদে নয়, এ ধরনের কর্মগত তোষণে  
তুষ্ট হত বটিক।

কাছে সবিস্ময়ে এই পিঠি চাপড়ানোর কথাই বলেছে

উণ্ডে বেরিয়ে বাদল গাঙ্গুলি মড়াই থেকে সবে উপরে  
ডুয়ে ঝাঁড়িয়ে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল জনা দুই  
সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আছেন, নরেন  
থেকে নেমে টক টক করে তাদের সামনে গিয়ে  
ঘাষ। গুড মর্নিং স্যার, গুড মর্নিং, ভালো আছেন?  
মূলি ফিরে তাকালো। চোখে চোখ রেখে সামান্য  
। কর্মচারীদের সঙ্গে কথা শেষ করে বলল, আসুন।  
এই একাধ্র নিবর্তিতায় নিচের কলটাকশনের দিকে  
দর হল রণবীর ঘোষ। ঘ্রাণে বাতাস বোঝে।  
ডা জায়গায় প্রাণ সকারের বিপুল উচ্ছ্বাস মুখে ব্যক্ত  
ফোটালে।

পনের দিকে চলেছে বাদল গাঙ্গুলি। পিছনে নরেন  
স্ট্রিটিভ অফিসার। রাস্তার পাশে দিচ্ছেন চাকলাদার  
ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে রণবীর ঘোষ  
জিনিয়ারের পাশে পাশে চলল।

। সকলে বসল। ঘোষ বাদল গাঙ্গুলির সামনে,  
চার মুহূর্তের নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়।

।।—আপনার নোটস পেলাম।—আই অ্যাম  
ব্যাট ইটস ওয়াগারফুল—আই মাষ্ট সে ইট ইজ  
এরকম শব্দ হওয়াই দরকার—

লি চেয়ে আছে। প্রতীক্ষা করছে।

যে আবার বলল, আপনি ঠিকই করেছেন, তবু  
জানেন মি: গাঙ্গুলি, সিমেন্ট তো আমরা নিজে হাতে  
কিনে নিয়ে আসি মাত্র, কি করে জানব বলুন এই  
ছ!

জবাব দিল বাদল গাঙ্গুলি। শাস্ত্রযুখে বলল,  
জ্বরীর চোখ—জ্বরীর চোখ শুধু খাঁটি চেনে না মি:  
য়ন।

ঘোষ থমকে গেল। গজায়ে হেসে উঠল তারপর।—ওয়াগারফুল।  
যাট মানছি আপনার কাছে, কিন্তু এ ভুলটা সত্যি ভুল।

—মিস্টারের যে প্রোপোরশান সিমেন্ট মেশানোর কথা, মেশানো  
হয়নি—

—নিশ্চয় হয়নি। শেষ করতে দিল না ঘোষ।—তলে আর  
আপনি পিগবেন কেন?—কথা হল, আপনারদের যেমন লোক আছে  
প্রোপোরশান যাচাই করে নেবার ক্ষমতা, অথচ দেখা হয়ে ওঠে না সব  
সময়, তেমনি আমরাও নিজেদের চোখেই দেখার কথা সব, কিন্তু আসলে  
নির্ভর করতে হয় দশ জনের ওপর। যাক, সেদিকটা ভালো করেই  
দেখছি এবার আমি।

কর্তৃপক্ষের গলদের কথাটাও পরোক্ষে শ্রবণ করিয়ে আরো ভুল  
করল।—কিন্তু আপনার সিমেন্ট এ স্টোনডাষ্ট পাওয়া গেছে—জমাট-  
বাঁধা সিমেন্টও গ্রাইণ্ড করে মেশানো হয়েছে।

—বললাম তো, এ ব্যাপারে আমাদের হাত কোথায়, সরকারের  
কাছ থেকে যেমন পাট কিনে নিয়ে আসি—

—তাহলে তাদের দায় তারা বুঝবে, আপনার আর কি! আমি  
ও দিলে, কাজ হতে দেব না।

—ব্যাপার কি জানেন, মুখে অমায়িক হাসিটুকু লেগে আছে,  
এ ভুলের দায় শেষ পর্যন্ত আমাদের কাঁধেই চাপবে, মাল বখশ  
একবার বুঝে নিয়েছি, ঠিক জিনিস পাইনি প্রমাণ করব কি করে!  
কিন্তু এতদিনের এতবড় ফার্ম আমাদের, তাদের কাছ থেকে খাঁটি  
নিয়ে আমরা গুণগোল করেছি এ তো আর আপনি বলবেন না—  
এখন কি করতে পারি তাই বলুন।

ক্রমে বৈধ্ব্যস্তি ঘটছে। তবু ফুস জবাব দিল, মাল তুলে নিয়ে  
যান, আর গো-ডাউন খালি করে দিন।

এ কথা শোনার ক্ষমতা আসেনি ঘোষ। স্তম্ভর হতাশার ভঙ্গি  
করল একটা।—এ তো মশা মারতে একেবারে কামান, থাক্গে—।  
দু'চার মুহূর্ত হেবে একটা সমাধান বার করল যেন, বলল, এ  
মাগাটা আপনি না হয় ভিত্তিটাইর কাজে লাগিয়ে দিন, এর  
পরে আমি দেখছি—

—কি আর দেখবেন? অম্বাৎ কঠিন কঠে বলল বাদল গাঙ্গুলি,  
আমাদের চরিত্রের ভিত্তিটাও ভেজাল মিশে মিশে এমন হয়েছে যে ওর  
ওপর আর পাকা কিছু টেকে না। যাক, গুণগোল তারো বাড়ার  
আগে যা বললাম তাই করুন—এদিকে হেড অফিসকে যা ইন্ট্রাকশন  
দেবার আমি দিয়েছি।

—হেড অফিস—! সপ্রতিভ ভাবটুকু আস্তে আস্তে মিলিয়ে  
গেল ঘোষের মুখ থেকে। বলল, দেখুন মি: গাঙ্গুলি, দু'পুরুষের এত-  
বড় ফার্ম আমাদের, লাখ দু'লাখ গেলেও খুব যায় আসে না, কিন্তু  
এতে গুড উইলটা বাচ্ছে—সেটা ঠিক—বুঝতেই পারছেন। হেড  
অফিসের ব্যবস্থা আমি করছি, আপনি শুধু আপনার অর্ডারটা তুলে  
নিন। একেবারে নিখুঁত আর কোন জিনিসটা হয় বলুন?

বাদল গাঙ্গুলি বলল, আপনার ওই দু' পুরুষের গুড-উইলেও  
খুঁত একটু থাকুক তাহলে। আপনি-বলতেন, মড়া জায়গায় প্রাণ  
আসছে—কিন্তু আমি নিখুঁত প্রাণই জানতে চাই, বিকল প্রাণ  
নয়।

পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল তারা। ঘরের বাকি দু'জন নির্বাক

মূর্তির মত বসে। কণ্ট্রাস্টারের চোখে-মুখে বিবেচ, বিজ্ঞপ, কৌতুক। হাতের পাইপ আঙুলে আঙুলে টেবিলে টুকল হুঁচকার।

—আর তাহলে আপাতত কোন কথা নেই?

—আপাতত নেই আর এ সংক্ষেপে পুরো নেই।

—পরের কথা ভবিষ্যতের কথা, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে সহ্যসহ্যে বলল, যো, কে আর জোর করে বলতে পারে বলুন, হতেও পারে আবার কথা, বাট ইউ আর রিয়েলি ওয়াণ্টারফুল! ভারী খুশি হলাম!

ককবকে চকচকে এক জোড়া চোখ সকলের মুখের ওপর বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল ঘর থেকে।

ভেজালকে নিখুঁত করার জন্য ওই সিমেন্টের সঙ্গে একটা অন্তত জ্যাম্ভ মাথাকে চটকে মিশিয়ে দিতে পারলে দিত।

সন্ধ্যার পর বাদল গাঙ্গুলির কোয়ার্টার থেকেই ফিরছিল নরেন। ভেবেছিল বলবে কিছু। কিছু বোঝাবে। কিন্তু সে চেষ্টা আর করেনি। মাটির কণায় আকষণ, বালুর কণায় বিচ্ছেদ। মাটির আভাস পেলে চেষ্টা করে দেখত।

অবনী বাবুর বাড়ির বাইরের ঘরে পা দিয়েই নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়ল। এরকম আশুন-গলানো কঠোর আর বড় শোনেনি।

—কেটে কুচি কুচি করে ওকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে না কেন তোমরা? সাধনা বলছে।

—কি বকচিস রে তুই পাগলি আবেল তাবো! অবনী বাবু। সাধনা বলতে যাচ্ছিল আবার কি। পায়ের শব্দে খেমে গেল। এ ঘরে এসে নরেন বাপ মেয়ে দু'জনকেই দেখল একবার। পরে দাম্ভ্যের উদ্দেশে বলল, কি ব্যাপার, হান ফেললে যে খই ফোটে! অবনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, কাকে কেটে কুচি কুচি করছে?

অবনী বাবু হেসে জবাব দিলেন, কন্ট্রাস্টের বর্ণবীর ঘোষণা।

হা হা শব্দে হেসে উঠল নরেনও। ফলে তার ওপরই রেগে গিয়ে ভঙচি কেটে উঠল সাধনা। হা হা হা হা—যেন কি একটা মজার খা হল!

মনে মনে এ সময় এমনি হালকা অবকাশ বিনোদনই চাইছিল গাং হয় নরেন। জাঁকিয়ে বসল অবনী বাবুর কাছাকাছি। বেশ, জার কথা না হয় নাই হল, থা থাক কেটে কুচি কুচি করা হল গাংটাকে, কিন্তু গঙ্গায় ভাসাবে বলছিলে, এখানে গঙ্গা পাবে দাখায়?

বাবার অলক্ষ্যে আবার বড় রকমের একটা ভেঙচি কাটতে ছিল সাধনা। কিন্তু তার আগেই অবনী বাবু বললেন, তুই বার তোর কাজে যা দেখি, খবর শুনতে দে এদিকের। নরেনকে জ্ঞাসা করলেন, কি হল, বুঝিয়ে বললে তাঁকে?

—নাঃ। বলে লাভও নেই কিছু।

—কিন্তু এ তো ভালো কথা নয়। এতবড় প্রতিগন্ডিশালী ক...কত কুলি মজুর পশ্চত তার মুখের কথায় ওঠে বসে, ফাদাদ যে বাধার...তা ছাড়া হেড অফিসের তো তার আর কম নয়।

বাধার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল সাধনা। নরেন কিছু বলার সঙ্গ সেই অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, কি যে তুমি বসো বাবা ঠিক

নেই, প্রতিগন্ডিশালী বলে বা খুশি তাই করবে! আর পাঁচজন নেই? নাকি হেড আপিসের চোখ কাগা?

নরেন এবারে নিজের মাথার ওপর এক চক্কর আঙুল ঘুরিয়ে টিপ্সনী কাটল, তোমার এই হেড আপিসের সঙ্গে সে হেড আপিসের কিছু তফাৎ আছে।

সাধনা চটে গেল। —আর আপনার হেড আপিসের সঙ্গে সে হেড আপিসের পরম মিল আছে।

একরকম রাগ করেই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নরেনের সঙ্গে সঙ্গে অবনী বাবুও হেসে উঠেছিলেন। কিন্তু হাসি খেমে গেল।...ভাবছেন কিছু। ভবলোকের এ ধরনের বিশ্বাস নরেন আগেও দেখেছে।

সেই পুরানো কথাই ভাবছেন ওভারসিয়ার অবনী বাবু। ভাবনাটা প্রকাশ করেই ফেললেন আজ। বললেন, নিজের আগ্রহে বললী হয়ে এসেছিলাম এখানে...কিন্তু প্রাইট মনে হয়, কান্টটা বোধ হয় ভালো করিনি।

কন্ট্রাস্টের বর্ণবীর ঘোষের সমস্ত আপাতত সেরে গেছে মন থেকে। নরেন চুপচাপ চেয়ে রইল তাঁর দিকে। এই জল নিয়ে বা ডাম নিয়ে এত আগ্রহ কেন সাধনার এতদিনে অনেকটাই জেনেছে। কিন্তু ভয়লোক আজ হঠাৎ এ কথা বললেন কেন বুঝে উঠল না।

এতবড় কাজের মধ্য দিয়ে ভাবনের এক ব্যর্থ অপমানকে পেরিয়ে চলছিল বাদল গাঙ্গুলি।

অনেকদিন হয়ে গেল কী? কিন্তু মাত্র সেদিন যেন।

অল্প সময়ের মধ্যে এক আটতলা ম্যানসন তুলে দেওয়ার কন্ট্রাস্ট নিয়েছে নেশন বিলডার্স লিমিটেড। এতবড় দাখি ও কোম্পানিই নিতে পারে অবলোকাক্রমে।

সেই প্রথম নিজের হাতে এতবড় কাজের ভার পেল বাদল গাঙ্গুলি। হোক বিল্ডিং জামান ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার, হোক পদস্থ কর্মচারী, হোক ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ভাবী জামাই—বাদলার ভরা জোয়ারে সেই ওর প্রথম অবগাহন আর প্রথম রোমাঞ্চ।

প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সুসম্পূর্ণ। দিনে পাঁচবার করে গিয়ে সাইট দেখে আসছে। কাজ আরম্ভ করলেই হয় এবার। করতেও হবে।

কিন্তু মনে খটকা বাঁধল একটা।

ছোট কাঁটার মত কি যেন একটা খচ খচ করতে লাগল ভিতরে ভিতরে। বিজি-স-এর ডিজাইন করেছেন স্বয়ং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। খাতিরের পাটি, খাতিরের তাগিদ। পাকা হাতের পাকা ডিজাইন। বলার নেই কারো কিছু। বাদল গাঙ্গুলিরও না। কিন্তু তার দৃষ্টিস্তার তেতু অন্ধ।

সর্বপ্রথম নরেন চৌধুরীরা কাছে সম্মেলন। বাক্য করেছিল।—কেমন যেন লাগছে হে, আগে একবার সয়েলটা চেষ্টা করে নিতে পারলে হত, ওরকম জমিতে এত বড় কন্ট্রাকশন যদি না টেকে?

সাড়ম্বরে নিজের দুই কান চাপা দিয়েছে নরেন।—সর্বনাশ! তুমি না হয় জামাই হতে চলেছ, আমার চাকরীটা খাবে? আমি বাবা এসবের মধ্যে নেই। পরে পরামর্শ দিয়েছে, উদ্ভবি ফাদার-ইন-লকে বলেই ফেল না চোখ-কান বুজে।

সেটা পেরে উঠছে না বলেই যত অসহ্য। আপিসের ছ'

এর সঙ্গে আলোচনা করল এ নিয়ে। কিন্তু সুরাহা  
কবারে নিঃসংশয় হওয়া গেল না।

ডাইরেক্টর গুকে ঘরে ডেকে পাঠালেন সেদিন।  
সব রেডি তো?

হ্যাঁ।

বাইট আনেক্টলি কাজ আরম্ভ করে দাও, পাটির  
দেখতে দেখতে কাজ শেষ করে দিতে হবে। বাট  
চল, কোথাও গলদ না থাকে।

নাড়ল। একটু ইতস্তত করে বলেই ফেলল তারপর।

এসে আমার একটু খটকা লাগছে...ওরকম  
ডিজাইন...আগে সয়েলটা অন্তত একবার টেষ্ট করে

জি ডাইরেক্টর ভূক কৌচকালেন প্রথম। হোটে  
দেখা গেল একটু। ওর দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন  
নক শিগে ফেলেছ বলেই সতের কামেলার কথা মনে  
যেট বাড—

মনে হুকান লাল হয়ে গেল। আবারও বলতে  
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ধামিয়ে দিলেন। এসব ভিন্ন।  
এই বয়...কথাটা ডিপার্টমেন্টের আরো কাকে যেন  
হি। তা কোম্পানীর একটু বিশ্বাস টিথাস আছে  
এই হুঁচোলের শাদা অভিজ্ঞতার তোমাদের ওই সব  
হয়ে আসছে। তোমার কাজের সুনাম খুব, কিন্তু  
পাতে যেও না, ও আপনি আসবে—নাও গো অ্যাহেড  
।।

বাড়রী সেখানেই ধামেন নি। বাড়ি এসে স্ত্রীর  
কথাটা। কিছুদিন হল ভারী জামাইয়ের ওপর  
ছেন মহিলা। বাদলের মা কিছুদিনের জ্ঞান দেশে  
সাংগে তাকে এ বাড়ি এসে থাকার অনুরোধ  
তিনি। আশা, ওর মা সেটা সুনলে দেশেই থেকে  
যাব। কিন্তু ভারী জামাই প্রস্তুত। একবার ভেবে  
মেয়ে বা মেয়ের বাবার কাছে ফোন চাপা থাকেনি

এভাবে গুকে মাথায় তোলার ফল ভুগতে হবে সে  
হবারই করেছেন তারপর।

করার জগ্জেই সেদিনের কড়া শাসনের খবরটা ব্যক্ত  
ড়রী। শুনে একবারে যেন হাঁ হয়ে গেলেন মিসেস  
সে হাঁ হওয়া বিষয়টুকু পঞ্চপন্থে সাজিয়ে মেয়ের  
না করে পারলেন না।

মনটা খারাপ হয়েছিল বাদলের। এরকম কটুক্তি  
হয়নি। সেদিন পাঁচটার হন' বাজতে নয়েন এসে  
ড়াল বখন, তাও ভালো লাগেনি। বয় বিরক্ত  
জ্ঞান দিনের মত পড়িমরি করে যে ছুটেছে তাও নয়।  
কথাতেই মেজাজ যেন আরো বিগড়ে গেল। চূপ-  
ড়ি চালিয়ে নীলা বলল, এরকম অবস্থা কেন মুখের,  
নি খেয়েছে বলে?

লি ঘরে বসল আস্তে আস্তে। চূপচাপ চেয়ে

আবার বলল নীলা, বেশ করেছে বকেছে, বকেবে না তো কি!  
বাবাকে পঞ্চ রাগাতে সাহস করা তুমি, বাবা ডিজাইন করে দিলেও  
নিঃসন্দেহ হতে পার না এত গুমোর তোমার—ক'দিনের ইঞ্জিনিয়ার  
হে তুমি?

খানিক চূপ করে থেকে বাদল বলল, এসব আলোচনা আমার  
ভালো লাগছে না নীলা।

—তা তো লাগবেই না। হাসি আর রাগ মেশানো কটাক্ষ।  
তোতো কথা কার আর ভালো লাগে, মুখখানা অমন হাড়িপনা  
করে বসে থাকবে না বাবে কোথাও?

সবকিছু মন থেকে ঝেড়ে ফেলেই হাড়িঝুখে হাসি ফুটিয়ে বাদল  
গাঙ্গুলি ওর দিকে মন দিতে চেষ্টা করেছিল তারপর।

কিন্তু নেশান বিগড়ান—এর ওই আটতলা ম্যানদন আর  
ওঠেনি।

তার আগেই ধামতে হয়েছে।

সমস্ত কোম্পানীর সম্মাগ দৃষ্টি পড়েছে এদিকে। ছোট বড়  
সকলের। বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের আরবির্ভাব ঘটেছে।  
তারাও মাথা নেড়ে গেছেন। একটা অক্ষুট গুজন উঠে আপিসময়।  
আটতলা বাড়ীর সঙ্কর ছ'তলায় শেষ, কে কার মুখ চাপা দেবে।  
কারো মতে কোম্পানীর গুডউইলটি গেল এবার, কারো  
বাদল গাঙ্গুলি কাঁচা ছেলে নয়—একমটা হল কেন! কারো  
জবাব, ওই প্রান আর ডিজাইনেই গোলমাল আছে শুনে রাখো,  
বিশ লাখ টাকার কনট্রাকশনে কম করে দেড়লাখ টাকা পেয়েছে  
ডিজাইন করে—অভ্যাস নেই, লোভ করতে গেছে, বেশ হয়েছে।

এই ধামার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের স্পন্দন থেমে গেছে যেন  
বাদল গাঙ্গুলির। ধমনীর রক্ত চলাচল থেমে গেছে। দিনের  
আলোর রং বুটে গেছে চোখ থেকে। রাতের নির্জনতাও যাতনা-  
মুখ। পরিত্যক্ত বাড়িটার সামনে পীড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা  
কেটে কেটে।

বাড়ি নয়, বাড়ির ককাল। মায়াব নয়, নিশ্চায় মৃতি।

বোঝাপড়ার ডাক এলো।

কৈফিয়ৎ থাকলে এতবড় বিপর্যয়ও কিছু নয়। বিপুল  
বাড়রীর কাছে অন্তত নয়। বড় জোর হুঁপাট লাগ টাকা ক্ষতি-  
পূরণ দিতে হবে কোম্পানীকে। কিন্তু বড় উঠল এই কৈফিয়ৎ  
দেওয়া এবং কৈফিয়ৎ নেওয়ার ব্যাপারেই।

সাঁউগু-প্রক ঘর তাঁর। বাইরে থেকে কিছু শোনা গেল না।  
কিছু বোঝা গেল না।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ফেটে পড়লেন, উত্তেজনার উঠে পড়ালেন  
চেয়ার ছেড়ে।—ননুশ! রিডিকুলাস! শ্রিপস্টারস!

বাদল গাঙ্গুলি নীরব, নিচল।

এক জায়গায় পীড়িয়ে এতবড় ইজিত বরদাস্ত করে উঠতে  
পারছিলেন না বিপুল বাড়রী। পায়চারী করলেন ঘরের এ মাথা  
ওমাথা। রাগে সমস্ত মুখ শাদা।—তোমাই ভবিষ্যৎ  
গড়বার জ্ঞান এতবড় দায়িত্ব দিয়েছিলাম, বদলে মুখে একেবারে  
চুনকালি দিয়েছ তুমি! কোথায় লজ্জিত হবে তা না...। কোথায়  
না ভুল হতে পারে? প্রিনথ-এ ভুল হতে পারে, কনট্রাকশনে ভুল  
হতে পারে...



—জানত এসবে কোন ভুল হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

—জানত—জানত—জান! কতটুকু জান তোমার? ক'টা মানসন তুলেছ আজ পর্যন্ত? না কি একবার ওই বাইরে ঘুরে এসেছ বলেই জ্ঞানের আর বাকি নেই কিছু?

বাদল উঠে ঝাঁড়াল চেয়ারে ছেড়ে। কোন মীমাংসা হবার নয় জানাই ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হকার দিয়ে উঠলেন আবার। সিট ডাউন প্রীজ আণ্ড লেট মি থিক।

নিজেও ঘুরে গিয়ে চেয়ারে বসলেন আবার। খানিকক্ষণ দম নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তমুখে বসলেন, এতবড় ক্ষতিপূরণ দিয়ে কোম্পানী চো আর চূপচাপ বসে থাকবে না। বোর্ড বসবে, তোমার কৈফিয়ৎ নেবে, রীতিমত বিচার করবে।... বেশ ভেবে চিন্তে আন-ফোরসিন রিকন্স-এ কিছু একটা গোলযোগ হয়ে গেছে বলে রিপোর্ট লাগে।

—তার মানে, খুব শান্ত খুব সংরত কণ্ঠে বাদল গাঙ্গুলি বলল, আমারই কোথাও ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করে নেব?

টেবিল চাপড়ে বিপুল বাড়রী বলে উঠলেন, হ্যাঁ নেবে নেবে—তোমার ওপর ছিল দায়িত্ব আর ভুলটা কি স্বীকার করবে বাইরের লোক এসে? রিপোর্ট লাগে, তারপর দেখা যাক—

নিঃশব্দ দুই বিনিময়। সমস্ত জড়তা কাটিয়ে বাদল গাঙ্গুলি আবার উঠে ঝাঁড়াল আস্তে আস্তে। স্পষ্ট জবাব দিল, কিন্তু আমি তাতে গান্ধি নই। বিভিন্নের পাশের জমি থেকে এখানে সরল টেট করে নেওয়া যেতে পারে। ওই জমিতে আর ওই ডিজাইনের ফাউন্ডেশনে এতবড় কনস্ট্রাকশন ঝাঁড়াল কি না আমার ষ্টেটমেন্ট-এ সেটাই আগে আমি পরীক্ষা করে দেখতে বলব। তাতে কোন গলদ না থাকলে বোর্ডের বিচার আমি মাথা পেতে নেব।

শান্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সহসা পাশবন্ধ দোদাঁড়-কেশরীর নিকুপার স্তম্ভতার মত ভল্লোলক হ্রয় হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সর্বাঙ্গে গলিত দাঙ্ঘ অমৃতভূতি একটা। ধাপিলে বসে থাকা সম্ভব হ'ল না আর। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে বাড়ি উঠলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিপুল বাড়রী।

...পরিত্যক্ত বাড়িটার সামনে ঝাঁড়িয়েছিল বাদল গাঙ্গুলি। সামনে যেন ওরই হাড় পাঁজরাগুলো দেখছিল চেয়ে চেয়ে। সন্ধ্যার হায়ায় দিনের আলো ধূসর হয়ে হয়ে মিলিয়ে গেল একসময়। রাস্তা, মণ্ডর গতিতে ক্ষিরে সেল।

নিধু দরজা খুলে দিল। কিছু বলতে চাইল বোধ হয়। কিন্তু লা হল না। ক'দিন ধরেই মনিবের করবের মত ধমধমে মুখ ফেলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। বাদল গাঙ্গুলি সোজা নিজের ঘরে ঢলে গেল। ধমকে ঝাঁড়াল তারপর। নীলা বসে আছে শান্ত মুখে।

ওর ওপর দিয়েও ঝড় গেছে একটা। জানা নেই, কিন্তু অহুমান দ্বা কঠিন হল না। তার অভ্যাসও পেল। নীলাই কথা বলল ধম, আশা করিনি দেখছি...

—না।...তুমি এ সময়ে?

নীলা মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক।—আগে তো যে কোন ঘরে আসতুম, এখন তাহলে সময় ধরে আসার মত কিছু একটা হচ্ছে?

জবাব না দিয়ে গায়ের কোটটা খুলে আলনায় রাখল বাদল গাঙ্গুলি। নীলা বিছানার ওপরেই বসে। খানিকটা ব্যবথানে বসল সেও।—বলবে কিছু?

নীলা তেমনি নিরীক্ষণ করছিল তাকে।—বলব কিছু, কিন্তু শুনতে হয়ত তোমার খুব ভালো লাগবে না।

ছোর করেই বাদল এবারে হাসতে চেষ্টা করল একটু। শয্যায় শরীর ছেড়ে দিল খানিকটা। হালকা জবাব দিল, তার থেকে শুনতে ভালো লাগে এমন কিছুই না হয় বোঝা।

যা বলার স্পষ্ট বলবে বলেই এসেছে নীলা। আর জানেও স্পষ্ট বলতে। কিন্তু তবু বলার আগে খুব ভালো করে দেখে নিতে চায় যেন।—বাংলায় বিরুদ্ধে বাবার দুঃসাহস তোমার হল কি করে? নিজেকে তুমি কি ভেবেছ? আজ পর্যন্ত তিনি যা করেছেন তোমার জন্ত সব ভুলতে পারলে?

—আমার জন্তে কিছু করেননি, নিরুত্তাপ জবাব, কয়েকজন তাঁর মেয়ের জন্তে...এখন দেখছেন, যা করেছেন সবই ভুল করেছেন।

—শুধু বাবা নয়, সকলেই তাই দেখছেন। অচ্যুত কণ্ঠে নীলা ঝাঁকিয়ে উঠল প্রায়, ভুল না হয় হয়েছে, ভুল মাঘেরেই হয়, কিন্তু সে দায়টা বাবার ওপর চাপাতে লজ্জা হল না তোমার? সন্দেহ হল না?

ব্যথার বিবর্ণ হয়ে গেল বাদলের সমস্ত মুখ। সামলে নিয়ে শান্ত মুখেই জবাব দিল আবার, ভুলের দায় আমি কারো ওপর চাপাতে চাইছি না নীলা, সত্যি নিজে ভুল করেছি কি না সেটুকুই বুঝে নিতে চাইছি। ওই জমিও আছে আর তোমার বাবার ডিজাইনও আছে—এ ছাড়া একবার তিনি একপাট দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিচ্ছেন না কেন? তাতে কোন গলদ না থাকলে, ভুল আমার তো বটেই।...কিন্তু তোমার বাবা তা করবেন না, কারণ, তাঁর মনে সন্দেহ আছে।

কি বলছে, খানিক চূপ করে থেকে বুঝতে চেষ্টা করল নীলা। কিন্তু বোঝা অসম্ভব। বিশেষ করে দেখানো ভালো করে কিছু বোঝাবার জন্যই এখানে আসা। উটে বেগে গেলো আরো। শান্ত বৈষ্ণটুকুও তিরোহিত হল।—বলিহারি আছা তোমার নিজের ওপর! বাবার কাজ ঠিক আছে কি না অন্য একপাট ডেকে সেটা বাচাই করতে হবে?

নিরুত্তর

—অতলত আমি বুঝি, তোমার আমার ভালোর জন্ত বাবা যা বলছেন তাই তোমার করা উচিত, আর তাই তুমি করবে, অন্তত আমার জন্তেও করবে।

—কিন্তু তোমার বাবা যা বলছেন তাই করলে যেখানে আমার নেমে আসতে হবে তাতে তোমার আমার কারোই ভালো হবে না।

—হবে হবে হবে। নীলার বৈষ্ণের বাঁধ ভেঙ্গে এসেছে। আরো সামনে ঝুঁকে এলো। বলে গেল, হয়ত তোমার দুর্নীতি হবে কিছু, হয়ত বা উন্নতিও বন্ধ থাকবে কিছুকাল, কিন্তু বাবা ঠিক আবার টেনে তুলবেন তোমায়। তার বদলে তাঁকে অপদস্থ করতে গেলে তাঁর নাগালও পাবে না তুমি, উটে সবই বাবে তোমার—তার অর্ধটা ভেবে দেখেছ?

জ্বক গুমোট একটা। একটানা। দুঃসহ।

নি। এখন দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে আরো কেউ বাবে, হুকে আর আমার সঙ্গে জুড়ে দিতে পারবে না।

বসল নীলা। তীক্ষ্ণ বাজ করে উঠল তারপর, ঘরে কাব্য করলেই তো পারো। তুমি কি ভাবো এ টেনে তোলা হয়েছে তোমার ভাবের ঘোরে বৈরেগী বকম লোকের কি খুব অভাব ছিল?

স্পষ্ট আর বোধ হয় কিছু শোনার ছিল না বাদল কে টেনে তোলা হয়েছে। ইচ্ছে তল বসে, হাস পরিয়ে টেনে থাকে তুলছ, উঠলে এবারে একটা বে। বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে একখানা হাত রাখল শুধু লা...!

হাত সরিয়ে দিয়ে কঠিন মূর্তির মত বসে রইল নীলা। আমার সম্পর্কটা এর বাইরে আর কিছু নয় তা

। এতবড় ঘা খেয়েও সেটা ভাঙবে না এমন কিছু নয়। অপমান করেছে, তাঁর মানসম্মত নষ্ট করতে বসেছে। কায় করে নাও, আবার সব ঠিক হয়ে বাবে, তাঁর লই ভানো।

...অনেকক্ষণ। একটা আচ্ছন্নতার ঘোর কাটল। হলে তোমার শেষ কথা?

হাতঘড়ি দেখে নীলা উঠে দাঁড়াল।—আচ্ছা, তোমার জবাব পাব আশা করি, গুড নাইট—

না হয়নি।

।ব নীলা পরদিনই পেয়েছিল। নীলা ঠিক নয়, পেয়েছিলেন।

যাওয়ার পব সে রাত্রিরও অবসান হয়েছিল বইকি।। দূর্বল বোঝা বহন করে নিঃশব্দে কেটেছে সে রাত।

পলে পলে। আবার সকাল হয়েছে। আবার হয়েছে। আবার আপিসে এসেছে...।

দেখেছে। যেমন চেয়েছিলেন বিপুল বাড়রী তেমন।

। আশা করে গেছে তেমন। স্টেটমেন্ট সই করে।

দস্ক পদত্যাগ পত্রও দাখিল করেছে নিজের।

। শেষ করেই ফিরে এসেছে আবার। একটা বোবা হুড় করে উঠেছে থেকে থেকে। তারপরই মনে এখানে। অনেকদিন নেই ১০০-মাসের কাছে বাবে।

ছিল তাব আগে।

সি। তেমন খুশি। আরো বেশি হাসিখুশি যেন। করে ঠেখানে পৌছে দিয়ে গেছে ওকে। অনর্গল কতক কানে গেছে, কতক বায়নি।

যেন ওঠে। কেন মা ওকেও ভালবাসত এত, সহজে চোখে পড়েছিল সেদিন।

হয়েছিল বইকি। অবাক নয়, ভয়ই পেয়েছিল। কথা জিজ্ঞাসা করেছিল ঠিক নেই।—এমনি চল এলি

কি রে ১০০-তা বেশ করেছিস...কিন্তু এরকম হঠাৎ...শরীর ভালো আছে তো? হ্যাঁ রে? এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

অন্ত হাসছিল তাও ওই কথা ১০০-তারপর আস্তে ঘিরে মা শুনেছে সব। শুনেও মন্তব্য করেনি কিছু। কিন্তু মাঘের ভিতরটা যেন দেখতে পাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে পড়ে গেছে তাঁর দিকে চেয়ে। খুশিতে বলেই ফেলেছিল। আসার দিন নরেন সারাক্ষণ সঙ্গে ছিল মা, গাড়ি ছাড়ার আগে বলল, ওদেব অতবড় অবিচার মাথা পেতে নিলে তোমার মুখের মা ডাকও আর ভালো লাগত না তোমার ওই মাঘের—গিয়ে দেখো।

শুনে মা হেসেছিল। আর নরেনের 'পরে মাঘের নীরব আশীর্বাদ' বরতে দেখেছিল হুই চোখে।—তা তো হল, কিন্তু তোমার মুখ-চোখের এ অবস্থা কেন, অতবড় চাকরীটা গেল বলে?

মিথোই অত হাসছিল। অত হাসতে চোঁটা বকছিল।

একদিন নয়। আবার একদিন ধরা পড়েছে।

বাঁচা ভেসে এসেছিল। কিন্তু বড় অভ্যস্ত বাঁচা। মুক্তিটা ঠিক মুক্তির মত লাগছিল না। নীলার ফোটা ছিল ট্রাক ভরতি। অনেক সপ্রগলভ হাসি-খুশি মুহূর্তকে বন্দি করেছিল একে একে। একা ঘরে সেগুলো বার করে বসেছিল সেদিন। ছিঁড়ছিল একটা একটা করে। ঠাণ্ডা মাথায়। শান্ত মুখে। সমনোযোগে ১০০-মানের আনাচে কানাচে ঘর ঘর করে আশার আলোয়রা। উঁকিঝুঁকি দেয় আকাজ্জক নটরা। কে জানে, সেদিনের সেই একরাতের তিলে তিলে পলে পলে দাঙ করা ভ্রম থেকে আবার তারা উঠে আসবে কি না। আবার তারা হাতছানি দেবে কি না। আবার তারা সোনার কঁাস ওর গলায় পরাবে কি না।

মা কখন এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি। মৃদু ভৎসনার চমকে উঠেছিল।—এই করে কি কিছু সুবিধে হবে?

অপ্রস্তুতের একশেষ। শেষে হেসেই ফেলেছিল। নাঃ তোমাকে লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করারও জো নেই।

পশুছিল ফোটাগুলোর দিকে খানিক চেয়ে থেকে ভারী অকৃত কথা বলেছিল মা তারপর। হ্যাঁ, এত বুঝিস আর এতকু বুঝিসনে, জর হলে গায়ে জল ঢেলে গা ঠাণ্ডা করা যায়? ও যেমন আছে থাকতে দে, আপনি সব ঠিক হয়ে বাবে। ছেলের অনেককণ আর বাকফুরণ হয়নি তার পর। চেয়েই ছিল শুধু। তার পর বলেছিল, এত বুঝি, কিন্তু তোমার মত যদি সব কিছু এত সহজ করে বুঝতাম মা...।

—থাক, খুব হয়েছে। তেমনি শানাসিধে কথা তাঁর।— কি করবি এবার ঠিক করে ফাল। কাজের মাঘুহ তুই, দিন-রাত এমন শুয়ে-বসে ভালো লাগবে কেন? কোথায় বাবি চল, আমিও না হয় হাট তোর সঙ্গে।

মড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে। মড়াই ঘোরা পাগড়গুলো দমিয়েছে। মড়াইয়ের রাত্রিও ঘুমিয়েছে। নিটোল ঘুম সর্বত্র। মাথার ওপর ওই আকাশভরা তারাগুলো ভেগে আছে শুধু। গোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে মড়াইয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গান্জুলি তাদের দেখছে চেয়ে চেয়ে ১০০-ছেলেবেলায় গল্প শুনত জীবনের শেষে নাকি ওই তারা হয়ে থাকার জীবন।

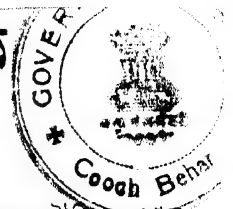
তাই যদি হয়, কোনটি তার মা?

[ ক্রমশঃ ।

# শ র ৭ - স্মৃতি র টুকিটাকি

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়



বাংলা

১৩৪৩ সালের ফাল্গুন মাসের এক অপরাহ্নে আমি আমার বরানগরের বাসার খুব কাছ, গঙ্গাতীরবর্তী একটা নির্জন স্থানে একাকী বসেছিলাম। ঠিক যে গঙ্গার শোভা দেখছিলাম, তাঁনিয়। চোখের সামনে অনেক কিছুই দেখছিলাম বটে, কিন্তু মনের চোখে কিছুই দেখছিলাম না। বোসেবোসে এলো-পাতাডি অনেক কিছুই ভাবছিলাম। ভাবনাগুলো ঝাপছাড়া; না ছিলো তার শৃঙ্খলা, না ছিলো তার পূর্ণতা। সময় কাটানোর জন্যই হয় ত নিববন্ধ বোসেছিলাম। হঠাৎ পিছনে পদধ্বনি ও তার সঙ্গে প্রশ্ন—“একলাটি এখানে বসে আছেন যে?” পিছন ফিরে দেখলাম, পরিচিত মুখ; এখানকারই একটা যুবক। এর পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাব-ভাব, কথা-বার্তা একটু অমনজ-সাপাষণ অর্থাৎ কবিতাবি ভাব। চুলগুলো কক্ষ-কক্ষ এবং সমস্ত অস্থির-বিস্তৃত; চিলা-পাজাবীটার ওপর নেহাৎ অমনোযোগের সঙ্গে একখানা শুদ্ধ চাদর বেশ কায়লা-দোরস্ত ভাবে ফেলা; পায়ে কাস্তুরার টপেটা চটি—অর্থাৎ বিজাসাগরী চটি। কথা বলবার ভঙ্গী মধুর ও মোলায়েম; কথাগুলোও বেশ সরস ও মিষ্টি এবং তা সাধারণ থেকে একটু বাইরের। এখানকার যুবক-তল একে একে কবি আখ্যা দিয়েছে, যদিও এর কোন কবিতা মুদ্রিত বা অনমুদ্রিত অবস্থায় কোনো কারো নজরে পড়েনি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে অশ্রদ্ধা না কোরে তিনি মুহু মুহু হাসির সহিত দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন—“গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছেন?”

তার মুখের দিকে চেয়ে আমিও এরূপ হাসতে হাসতে বললাম—“এখন অতুষ্ক তাঁর দক্ষিণ দৃশ্যাবলী দিয়েছেন, এখন কি আর তার হাওয়ার দিকে কান্নর মন থাকে? নাগঙ্গা নিজেই এখন ওই গড়ে দক্ষিণ দিকে চুটেছেন, দেখতে পাচ্ছেন ত?” বলা বাহুল্য, খন গঙ্গায় দক্ষিণমুখী ভাঁটার স্রোত বইছিল।

তিনি মিষ্টি হাসির সঙ্গে বললেন—“ঠিক বলছেন। এখন দৃশ্যাবলী প্রত্যেকের দৃশ্যের এসে চুটোছুটি করছেন।”

জানবল কবিতার লিঙ্গ-জ্ঞানে সচরিত হয়ে পড়লুম; বললুম—“আপনার কবিতার অগ্নি-ক্ষুদ্রিঙ্গে লিঙ্গালিঙ্গ পুড়ে একাকার হয়ে স্তম্ভগীর আসবার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে, আমাদের সে বিভাগ্য হয় নি; তাই আমাদের দোরের এসে পঁড়ান স্বয়ং স্বত্বরাজ্য বরাদ্দও হাতে নিয়ে।”

জানি না, তিনি আমার কথাগুলোর মানে বুঝতে পারলেন কি শুণ্য হাতে-হাসতে বললেন—“তুমি আশা নাকি বরানগর ক আশার লোক বোড়ের দিকে চলে যাচ্ছেন?”

“হ্যাঁ”—বলেই উঠে পড়লুম। ইনিই মাস-ভূই আগ, শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ কোরে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হবার ইচ্ছায় আমার যা চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানকার সেই ‘S’-য়ের ব্যাপারের আমি বিশেষরূপে সতর্ক হয়ে যাওয়ার ফলে, এর অমুরোখটা নরকমে তখন কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

মনটা ক’দিন ধরেই খারাপ ছিল। বিদেশে সঞ্জিহীন অবস্থা, ঠিক সেই রকমটা বোধ কছিলাম। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত

হবার আগ্রহটা দিন-দিনই মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছিল। এখানে এই একটা বছর থেকে মোটেই আর ভাল লাগছিল না। পূর্বের দিন সকালে চা খেয়েই আমি লোক বোড়ের ঐ দিকে চলে গেলুম—সুবিধামত একটা বাসার খোঁজে। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর, পেয়েও গেলুম একটা।

সুতরাং দু’-একদিন পরেই আমি বরানগরের বাসা ছেড়ে দিয়ে আবার লোক বোড়ে শরৎচন্দ্রের বাড়ীর কাছেই চলে এলুম। যেদিন এখানে উঠে এলুম, সেই দিনই রাতে সব গোছ-গাছ শেব করে সারা দিনের খাটোখাটুনির পর আত্মহাস্ত যখন বাসাদ্বার একখানা মাছুরের ওপর ঝাঁপ ছোয়ে শুয়ে পড়লুম, তখন আমার স্ত্রী বললেন—“তুয়ে পড়লে যে? বাও!”

“কোথায়?”

“বীর জঙ্গে তাড়াটাড়ি এখানে চলে এলে;—শরৎ বাবুর কাছে।”

“এত রাতে?”

“তা হোলেই বা; নইলে, রাতে ঘুমতে পারবে না হয়তো।”

অর্থাৎ আমার স্ত্রীর বরানগর থেকে আসবার ইচ্ছেটা ছিল না। তাই তাঁর কথা-এই খোঁচাটুকু সহজেই বুঝতে পারলুম। সুতরাং কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করেই শুয়ে থাকলাম এবং আমার ঝাঁপ দেহকে নবগত দক্ষিণা বাতাস কখন যে দেহাঙ্গে ঘুম পাড়িয়ে ফেললে, তা জানতে পারলুম না।

পরদিন সকালেই শরৎচন্দ্রের কাছে গেলাম। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বললাম—“দাদা, ওখানে থেকে বাসা তুলে নিয়ে আবার এইখানেই চলে এসাম।”

“আসবে যে, তা আমি জানি।”

“কি কোরে জানলেন?”

“তা বলতে পারি না; তবে, আমার মন তাই বলছিল; আর চাইছিলোও তাই। তাই জানতুম যে, তুমি আসবেই।”

এই ক’টা কথা-মধ্যে কি ছিঙ্গ জানি না এবং এই নিয়ে একটুখানি কি যে আমি ভাবলুম, তাও জানি না, কিন্তু আমার চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে গেল। শরৎচন্দ্রও ক্ষণিকের জ্ঞান যেন একটু অজ্ঞমনস্ক হয়ে পড়লেন। জানি না, বহু দিনকার কোনও অকপট, সরল এবং সরল সখাতার ভুল-বাওরা একটুখানি কথা, একরঙি বাধা, আমার ব্যাপারে তাঁর আজকের পরিণত মনের মধ্যে দীর্ঘ দিন পরে আবার নতুন করে ক্ষণিকের একটা তরঙ্গ তুলেছিল কি না। তখনকার এই ঘটনাটা আজ লিখতে বসে আমার এখনকার এই বৃদ্ধ মনের ওপর এই কথাটা বড় হোয়ে ফুটে উঠছে যে, মাছুরের অস্তুরের অস্তুরে যে প্রবৃত্ত সরল, সত্য ও পবিত্র জিনিষটি প্রথমেই সেখানে গেরস্থানী সাজিয়ে বাস করতে থাকে, তার ভবিষ্যৎ জীবনের শত কাজের চাপে, সহস্র খাত-প্রতিখাত ও কোলাহল-কলরবের মধ্যে তা কিছুতেই বিবৃত হয় না; আবৃত্তক সময়ে এক অমূল্য অবস্থায়, সে তার সেই আদিম বরখানির

কই তার সেই প্রকৃত রূপ নিয়ে উঁকি দিয়ে বাইরে কে।

দিন থেকে শরৎচন্দ্র ঘন ঘন অনুস্থ হোয়ে পড়ছিলেন মাদেব অনুবোধে তিনি কানী চলে যান। কিন্তু দিন পরেই আবার কোলকাতায় চলে আসেন। আমি কিছু দিন থেকে এলে ত' ভাল হোক; তাড়াতাড়ি চলে। দাঙ্গা ?”

হজ্ঞ কণ্ঠে শরৎচন্দ্র বললেন—“শীগ'গিরই মরে যাব, তাই এর একটা শেষ সাথ মেটাতে তাড়াতাড়ি চলে এলুম।”

পরই মরে যাবেন ? কি করে বুঝলেন ?”

আমি বুঝছি ; দেখো।”

ব্যথায় ভরে উঠলো। তবুও সেটাকে চেপে রেখে জিজ্ঞাসা করব বলে কথার আঁচ বলবেন না। যা'ক ; শেষ সাথটা

কণ চূপ করে থেকে কি ভাবলেন ; তারপর বললেন—  
বক জায়গা থেকে অনেক ‘অভিনন্দন’ আমি পেয়েছি ;  
খালি নিয়েছি, কান্নকে কিছু দিই নি। সেই জন্তে  
থেকে আমার ইচ্ছে, আমি একজনকে ‘অভিনন্দন’ দিয়ে

ল কথা। কাকে দেবেন ?”

একজনকে।” একটু থেমে আবার বললেন—“উপযুক্ত  
বো।”

দেবেন, তা যখন তিনি বললেন না, তখন বার বার  
এর অসভ্যতাটা আমি আর করলুম না। মনে মনে  
[ম, শরৎচন্দ্র নিজ হাতে অভিনন্দন দেবেন থাকে, তিনি  
পারেন ? হু-তিন জনের নাম আমার মনে হোল, ঐরা  
এর দ্বারা অভিনন্দিত হবার পক্ষে সত্যই উপযুক্ত।

অসীতিপর বয়স্ক রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের  
ই কোরে আমার মনে হোতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত  
কোরে পারলুম না—“জলধর সেন কি ?”

আরো হু'জনের নাম করলাম ; কিন্তু তিনি তাঁর ঐ  
প্রথম উত্তরটাকেই বজায় রাখলেন। এর পর আর  
বলে না ; সুতরাং নীরব হইলাম। কিন্তু মনের মধ্যে  
[ম জোয়ার-ভাটার মত কেবল আসতে-যেতে লাগলো।  
ও অভদ্রতার কাছে হার মেনে, মুখ ফুটে এর পর আর  
বায় না।

[ পরে একদিন কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে দেখা  
বললেন—“শরৎচন্দ্র আপনাকে ‘অভিনন্দন’ দেবেন।”  
বাসা করলাম—“আমাকে ?”

জিজ্ঞাসা করলুম—“আমাকে কেন ?”

পারি না। যে কারণেই হোক, শরৎচন্দ্র আপনাকে  
ন এবং আপনার লেখাও তাঁর খুব ভাল লাগে ; সেই  
নাকৈ অভিনন্দন দিতে চান।”

সক মাস পূর্বে কবিশেখর ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘রসচক্র’ ও

শরৎচন্দ্র’ নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে আমার এই  
‘অভিনন্দন’ সম্বন্ধে তিনি কিছু লিখেছেন, তার মোটামুটি কথা  
এইরূপ—“অসমঞ্জ বাবু রবীন্দ্রনাথকে তাঁর লিখিত একখানা বই  
পাঠিয়ে দেন। সেই বই পড়ে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রশংসাপূর্ণ পত্র  
দেন। তার পর অসমঞ্জ বাবু তাঁর আর একখানা উপক্ৰাস—‘মাতার  
বর্গ’—পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ ‘প্রবাসী’তে এ বইখানার খুব  
বিক্রম সমালোচনা করেন। এতে অসমঞ্জ বাবু খুবই ব্যথা পান।  
এই সূত্রেই শরৎচন্দ্র এক দিন আমাকে বলেন—‘ও বড় মন-মরা  
হোয়ে আছে, ওকে সাধুনা ও উৎসাহ দেওয়া দরকার। তোমার  
‘রসচক্র’র একটা বড় অধিবেশনের মাধ্যমে ওকে একটা অভিনন্দন  
দেবার ব্যবস্থা কর। আমি নিজেই ওকে অভিনন্দিত  
করবো।—’

—শরৎচন্দ্র এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করতে, তার কিছু দিন পরেই  
‘রসচক্র’র এক প্রকাশ অধিবেশন হয় এবং তাতে শরৎচন্দ্র অসমঞ্জ  
বাবুকে অভিনন্দিত করেন।—এই ব্যাপারে যা ব্যয় হোয়েছিল,  
শরৎচন্দ্র তার একটা মোটা অংশ দিয়েছিলেন।—ইত্যাদি।

অনেক দিনের কোন পুর্বোক্ত ব্যাপারে একটু-আপটু ভুল-ভ্রান্তি  
এবং অসামঞ্জস্য হওয়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া সেই সামান্য ভুল-  
ভ্রান্তির সঙ্গে আমার ‘অভিনন্দন’ ব্যাপারের বিশেষ কোন সম্বন্ধও  
নেই। তা'হলেও ব্যাপারটা এই যে, রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে আমি  
একখানা নয়, আমার সেই সময় পর্যন্ত প্রকাশিত ছয়খানা বই  
পাঠিয়েছিলাম ও তিনি সব বইগুলি পড়ে, অত্যধিক প্রশংসা করে  
আমায় পত্র দেন। পরের মাদেই আবার আর একখানা উপক্ৰাস  
(মাতার বর্গ) বার হ'লে, আমার প্রকাশক ওখানাও রবীন্দ্রনাথকে  
সঙ্গে-সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। সে সময় কবির দেহ-মন অত্যন্ত অস্থির ছিল।  
তখন তিনি বাবু পরিবর্তনের জন্ত দাক্ষিণীয়ে অবস্থান করছিলেন।  
ঐ অবস্থায় তিনি ‘মাতার বর্গ’ের বিক্রম সমালোচনা করে ‘প্রবাসী’তে  
পাঠিয়ে দেন। এটা ১৩৩৮ সালের কথা। এ জন্ত যদি সে-সময়ে  
আমি কিছু মনো-ব্যথা পেয়ে থেকে থাকি, তা নিরশনের জন্ত শরৎচন্দ্র  
ঐ সময়েই আমাকে সাধুনা দিতেন ; বা ছ'মাস এক বছর পরেও  
দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি আমায় ‘অভিনন্দন’ দেন ১৩৪৪ সালে,  
অর্থাৎ ছ' বছর পরে। সুতরাং কবিশেখর আমাকে অভিনন্দন  
দেবার যে-কারণটার কথা লিখেছেন, সেটা, আমার মনে হয় বার্থ  
নয়। কবি আমাকে স্নেহ করতেন। আমি তাঁকে চিরকাল  
বৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে এসেছি এবং এখনও করি,  
এবং বত দিন ঐচ্ছা, করব। কোন কারণে শ্রদ্ধা-স্পন্দ প্রবাসী-  
সম্পাদক স্বর্গতঃ রামানন্দ বাবু আমার ওপর একটু ক্ষুণ্ণ হন। ঐ  
সূত্রে সাময়িক ভাবে রবীন্দ্রনাথও হন। এটা শরৎচন্দ্র জানতেন।  
কিন্তু কবির এই ক্ষুণ্ণ ভাব জল্প দিন পরেই দূরীভূত হয়, এ সংবাদ সে  
সময় পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আমাকে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, আমাকে অভিনন্দন দেবার জন্তে শরৎচন্দ্রের এই  
প্রবল ইচ্ছার কথা সেদিন কবিশেখরের মুখে শুনে মনটা খারাপ  
হোয়ে গেল ;—সত্যই খারাপ হোয়ে গেল। ব্যাপারটা আমার পক্ষে  
যে খুবই গৌরবের, তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু এর আর একটা দিক  
ছিল। এই গৌরবলাভের পেছনে কত বড় যে একটা বিপদ আছে,  
তা ভাল ভাবেই আমি জানি। সুতরাং সেই নিশ্চিত বিপদের জন্ত

আমি ভীত হয়ে পড়লুম। আমাকে শরৎচন্দ্র 'অভিনন্দন' দিলে, কোন কোন লোকের সেটা মোটেই ভাল লাগবে না এবং আমাকে তাঁরা বিব্রনজয়ে দেখবেন। আমার লেখা রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের একটু ভাল লাগে এবং তাঁরা তাঁর প্রশংসা করেন,—এটাই অনেকে সঙ্গ করতে পারেন না এবং এতজ্ঞ তাঁদের মন অস্বস্তিকর ও শীড়গ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর ওপর, শরৎচন্দ্র যদি আমাকে অভিনন্দিত করেন, তা হলে ত কথাই নেই। এখন এ-বয়সে হলে, ও-সব গ্রাহ্যই করতাম না বা ভয়ও পেতাম না; কিন্তু তখন ও জিনিষটা আমাকে সত্যি আতঙ্কিত কোরে তুললো।

অনেক দিক দিয়ে অনেক কিছু ভেবে-চিন্তেও এর কোন উপায় বার করতে পারলুম না। শরৎচন্দ্রের দ্বারা অভিনন্দিত হওয়ার লোভটাও বড় কম নয়। কিন্তু তাকেও ছাপিয়ে যেতে লাগলো—উপরে লিখিত ওই সর্বের ভয় ও আতঙ্ক। বাই হোক, শরৎচন্দ্রকে আমি এ সন্ধিক্ষে অনেক বোঝালুম, অনেক অধ্যয়ন করলুম, কিন্তু কোনই ফল হল না। তখন দু-পাঁচজন আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবের কাছে পরামর্শ চাইলুম—কি করা যায়। তাঁরা সকলেই বললেন—“এ তো সৌভাগ্য, এতে ক্ষমত করার আছে কি?” আমার ভগিনীপতি, কালীঘাট নিবাসী বিপ্লবাত পণ্ডিত স্বর্গতঃ গুরুপদ হালদার বি, এল, দর্শনশাস্ত্রী মহাশয় একটা সঙ্কট শ্লোক শুনিয়ে বললেন—“উপাধাচক হয়ে মাজ নিতে নেই, কিন্তু তা আপনি এলে, থাকে প্রত্যাখ্যান করতে নেই।” বাকি; প্রত্যাখ্যান আর করলুম না। বিশেষতঃ এই সময়টাতে শরৎচন্দ্র যখন যখন অগ্রথ পড়ছিলেন। তাঁর ইচ্ছায়

বাধা দিয়ে তাঁর মনে বাধা দেওয়া আমি কর্তব্য বলে মনে করলুম না। বরঞ্চ মনে মনে একটা ভয় হোল যে তাঁর মুখের ঐ ‘শীগগির মরে বাবা’র কথাটা সত্য হয়েই ফলে যাবে না কি?

এই সময় একদিন তাঁর শরীরের অবস্থা জ্ঞানবার ভাঙে আমার এক ছেলেকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলুম। ছেলের হাত দিয়ে তিনি একখানা চিঠি পাঠালেন। সেটা এখানে হুবহু তুলে দিলুম।

24, Aswini Dutt Road.

Sarat Chandra Chatterjee Phone—South 84

1—5—'37

প্রিয়বরে—

অর এবং অর্শের রক্তপাত সমভাবেই চলচে, বরঞ্চ একটু বেশী বললেও অন্যায় বলা হয় না।

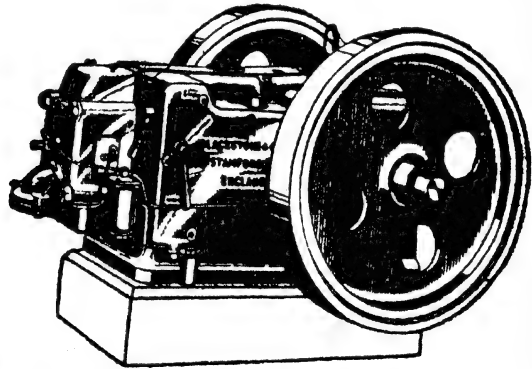
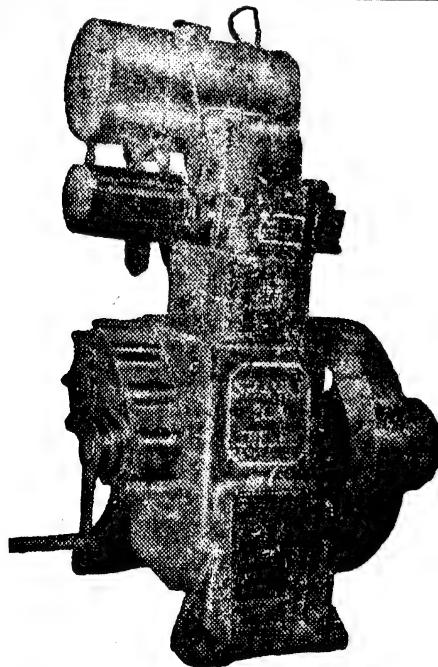
তোমার ছেলে আমার পায়ের ধূলা নিয়েছে, আশীর্বাদ করেছি।

শরৎ দা'

পুঃ—বাড়ীর সকলের অত্যন্ত অমত থাকলেও প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণের আয়োজন করি। সন্ধ্যানে ঐটিই শেষ কাজ।

শঃ

মূল চিঠিখানা 'বঙ্গলক্ষী'-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর কাছে আছে। ওর প্রতিলিপি আমার কাছে আছে। চিঠিখানা শোড়ে মনটা আমার খুবই খারাপ হয়ে গেল।



অল্প চাই, প্রাণ চাই, কুটার শিল্প ও কৃষিকাষ্য দেশের অল্প ও প্রাণ এবং আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিন, লিফ্টার, ব্লাকস্টোন ডিজেল ইঞ্জিন, লিফ্টার পাম্পিং মোট, ত্রাস্তস ডিজেল ইঞ্জিন ত্রাস্তস পাম্পিং মোট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এজেন্টস্ :—

এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১৩৮ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট, দ্বিতল কলিকাতা—১

ফোন ৪—২২-৫২৭৫

বিঃ দ্রঃ—টিম ইঞ্জিন, বয়লার, ইলেক্ট্রিক মোটর, ডারনামো, পাম্প ট্রাক্টর ও কলকারখানার খাবড়ার সরঞ্জাম বিক্রয়ের জন্য অন্তত থাকে।

ক দিন পরে 'রসচন্দ্র'র এক সভা-বন্ধু আমার বাসায় এসে গেলেন—“আর কয়েকটা দিন পরেই, ২৪ জ্যৈষ্ঠ রবিবার আপনাকে ‘অভিনন্দন’ দেবেন,” আমি তাঁকে বললাম—না দিয়ে, শরৎচন্দ্র যদি আর ক’কেও দিতেন, ভাল আমার চেয়ে বড়গুণ উপযুক্ত লোক রয়েছেন, তাঁদের দিলে—...

—আপনাকেই তাঁর দিতে ইচ্ছে, এবং ইচ্ছেটা অনেক শরৎচন্দ্র সমস্ত ব্যবস্থা করার ভার দিয়েছেন, রাধেশ দা’র রাধেশ দা’—অর্থাৎ কবিশেখর কালিদাস রায়ের কনিষ্ঠ রাধেশের সঙ্গে আমারও দেখা হোলো। রাধেশ ‘আপনার জগ্গে মুশিলাবাদী’ গরদের ‘জোড়’, রূপার ‘ট্রে’ প্রভৃতি সব কিনে ফেলেচি। শরৎদা’র ভকুম, হনিব যেন খাবার না হয়। ঘেটাকা তিনি আমাকে তাতে যদি না কুলায়, আরো যদি টাকা লাগে, তিনি বলেছেন—ইত্যাদি।

মনে একটা ক্ষীণ আশা পোষণ করতে লাগলাম, যদি ন কারণে কোনও রূপে ব্যাপারটি বন্ধ হোয়ে যায়। নতাকে জিজ্ঞাসা করি সে, কতদূর কি হোচ্ছে। আমার গুণ্ডর কারো কাছ থেকেই কিছু পাই না। সকলেই খজ এগুচ্ছে। রাধেশ বাবুর ওপর শরৎচন্দ্র ভাব দিয়েছেন, খতে হবে না। একজন বললেন—“আজ বোম্ব হয় ত্রি ছাপাতে দেওয়া হোল।”

নে বুঝলুম, আর কোন আশা-ভরসা নেই, অভিনন্দনটা নিতে পাবলুম, বেলগাছিয়াতে ‘দারকা-কানন’ নামে বাড়ীতে অভিনন্দনের আয়োজন হবে।

৮ষ্ঠ অভিনন্দনের দিন। ১লা জ্যৈষ্ঠ শরৎচন্দ্রকে একখানা আমার এক ছেলের হাত দিয়ে পাঠালাম। লিখলুম—ই কাগ অভিনন্দনের ব্যাপারটা হবে? আমাকে কি তই হবে? আপনার শরীর কেমন আছে? আমারই শে শরৎচন্দ্র লিখে দিলেন—

১৩১২, সেক বোড  
১লা জ্যৈষ্ঠ '৪৪

ion দিয়ে আজ দাদা,  
দিন কয়েক একটি মেয়ের অন্তরের লজ্জা এসেছিলেন—  
রচেন বললেন, আমার সব কাজ প্রায় বন্ধ।  
কোন সংবাদ আপনাব শরীরের অবস্থা যে কেমন  
তাঁহারও কোন সংবাদ লইতে পারি  
নি। আপনি কেমন আছেন দাদা?  
ব্যাপারেরও কোন সংবাদ পাই নি। রাধেশ  
পাতিপুকুরে কোথায় বাগান ঠিক হোয়েছে। কালই  
আমাকে ত কোন খবর দেয় নাই। আপনি কি খবর  
কাল যেতে হবে কি না কিছুই বুঝতে পারছি না।  
খবর জানেন ত জানালে সুখী হব।  
শরীর কেমন আছে তা লিখবেন। ইতি।

আপনারই  
শ্রীঅমর

অভিনন্দন সম্পর্কীয় প্রসঙ্গটার উত্তর, পাশ কাটিয়ে যে এড়িয়ে বাবার মতলব, তা বেশ বুঝতে পারলুম। পাছে, শেষ মুহূর্তে আমি বঁকে বসি, তাই সংক্ষেপে যেন জানাতে চাইলেন—“কোন সংবাদ জানিনে।”

পরদিন বেলা আন্দাজ ১টার সময়, আমি বেলগাছিয়ায় যাত্রা করলাম। আমার সঙ্গে আরও দু’চার জন কে কে গিচলেন, তা ঠিক আমার অরণ নেই। সেখানে গিয়ে দেখি, আমাদের বাবার আগেই ‘দারকা-কানন’ গুলজার; হৈ-হৈ বৈ-বৈ ব্যাপার। বহু সাহিত্য-রসিক, কবি, শিল্পী প্রভৃতির উপস্থিতিতে বাগান-বাড়ী কোলাহল-মুখর। নীচের বান্নাবাড়ীতে শ্রীমান রাধেশের তত্ত্বাবধানে আহাধ্যাদির প্রস্তুতি ব্যাপার পূর্বোক্তসাথে চলছে। রাধেশ সেখানে একখানা চেয়ার নিয়ে বেশ জুত কোরে বসে আছেন। আয়োজন প্রচুর; সুপ্রচুরও বলা যেতে পারে।

বেলা ১১টা আন্দাজ, শরৎচন্দ্র তাঁর মোটরে কোরে এসে পড়লেন। সেদিন তাঁর শরীর, গত কয়েক দিনের তুলনায় একটু ভাল থাকলেও, মোটর উপর ভাস ছিল না। এইরূপ অসুস্থ দেখে, জ্যৈষ্ঠের প্রথর বোদে এতদূর আসাটা, আমার মনকে লজ্জা এবং পীড়া দুই-ই দিল।

যাই হোক, যথাসময়ে দ্বিতলের বড় একটি হল-ঘরের মধ্যে সকলের উপস্থিতিতে একখানি আসনে আমি বসলাম এবং আমার সামনের আসনে শরৎচন্দ্র বসলেন। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অভিনন্দন-দান হবে; তার কোনরূপ ক্রটি-বিচ্যুতি হবে না। সুতরাং শাক্ত-দূষা, ফুল-চন্দন, মালা ইত্যাদি কোন বিষয়েই কোন ক্রটি রহিল না। আসনে বসবার আগে, আমার পরিহিত কাপড়-লম্বা হেড়ে, তাঁর দেওয়া গরদ পরতে গেল এবং গরদের উত্তরীয় গায়ে জড়াতে গেল। তারপর যথারীতি দান-দুর্গাদি দিয়ে তিনি আমার অভিযেক করলেন। এই সব আনুষ্ঠানিক ব্যাপার শেষ কোরে তিনি যে বাগী দ্বারা আমাকে অভিনন্দিত করেন, সেই বাগীযুক্ত অভিনন্দন পত্রখানির প্রতিলিপি এখানে দেওয়া গেল:—

“পরম শ্রদ্ধাম্পদ স্বজন

কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত অদমজ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের

শ্রীকরকমলে—

হে রসশিল্পী, তুমি তোমার শাস্ত্র-সংগত অনাড়ম্বর সাহিত্য-সাধনার দ্বারা যে অনাবিল আনন্দ দান করিয়াছ, তাহার প্রতিদান স্বরূপ আজ তোমাকে আমরা শ্রদ্ধাভরে অভিনন্দিত করিতেছি।

উপেক্ষার স্বর রোজন-হাে, দৈব-দুর্বিপাকের বন্ধা-বজ্র, দৈন্ত-দুঃখের ভূয়ার-বাস্তে কখনও তোমার চিন্তের বসন্ত-শ্রী ও জীবনের রস-প্রসুপ্ততা বিনষ্ট হয় নাই। তোমার জীবনের বহিরঙ্গের সকল রস-মাধুর্য নিঃকরণ কাল ক্রমে শোষণ করিয়া লইতেছে কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে যেখানে তোমার রসপ্রবাহের উৎস, সেখানে কালের প্রবেশাধিকার নাই। সেখানে তোমার জীবনের সকল গবল ছালা, সকল দূহতা, সকল অশ্রু, রসগায় শরিণত হইতেছে।

হে গুণি, আমাদের এই দুর্গতদেশে বাহার সাহিত্য-ভীষের বাত্মী, তাহারের অনেকই পথ ধূলিকঙ্করময়, কন্দকাণ্ড

হাস্যবর্জিত। তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বরূপ গণ্য করিয়া, আজ তোমাকে আমরা যে মর্যাদা দান করিলাম, তাহা তাপস্ফালাস্পিত, উপেক্ষা-লাঞ্ছিত, একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনারই উদ্দেশে নিবেদিত। বহুকুণ্ডেও নিবেদিত সকল আছতি যেমন হতবহ দেবতাপ্রাণের সকালে বহন করেন, তুমিও তেমনি আমাদের শ্রদ্ধাভিবাদন তোমার দুর্গম-পথের সহযোগিত্বের স্বয়ংস্বারে বহন কর।

বীহাদের পদ-মর্যাদা, পাণ্ডিত্য-খ্যাতি ও অভিজ্ঞতা-গৌরব আছে, বীহারী লক্ষীর বরপুত্র, বীহাদের আত্মকূল্যে ও অভিভাবকতায় বহলোকের স্বার্থ সিদ্ধ হয়, তাঁহাদের স্তাবকের অভাব ঘটে না। যে সকল সাহিত্যসেবীর ধন, মান, পদ-গৌরব, প্রতিষ্ঠা ও কৌশল-বল আছে, তাঁহাদের বন্দনা গাহিয়া বহু লোকই কৃতার্থ হয়। কিন্তু সাহিত্য-সাধনার ছাড়া বীহার অল্প কোন সফল নাই, বস-সাধনা ছাড়া বীহার অল্প কোন ব্রত নাই, তাঁহাকে কেহই কোন দিন মর্যাদা দান করে না। হে সর্বগৌরবতীন অনন্তব্রত রসশিল্পী, আজ তোমাকে অভিনন্দিত করিয়া আমরা অবিস্মিত সাহিত্যসেবাকেই সম্মানিত করিলাম।

হে রসলক্ষীর মালঞ্চের মাল্যকর, রসরঞ্জন্যের চরণে আমাদের আকিঞ্চন, তোমার কুটাররাজ্যের মালঞ্চবানি সকল নীনতা, সকল বিকৃতি, সকল কটকক্ষত এমনি নব নব পুষ্প সমারোহে সমাচ্ছন্ন করিয়া বহুবর্ষ ধরিয়া বেন মধুমাসকে বন্দী করিয়া রাখে। ইতি—২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ সাল।”

অভিনন্দন-বাণী পাঠ কোরে শরৎচন্দ্র অভিনন্দন-পত্রে সহি করলেন। তারপর কবিশেখরের লিকে চেয়ে বললেন—“রসচক্রের সেক্রেটারী হিসেবে তুমিও এতে স্বাক্ষর কর। কবিশেখরও সহি করলেন।

অভিনন্দন-পত্রের লেখাটা শরৎচন্দ্রের নিজের লেখা নয় বলেই মনে হয়, কারণ অভিনন্দন-পত্র লেখার মত ভাষা শরৎচন্দ্রের তেমন জায়ন্ত না থাকার কবিশেখরের ওপরই ওটা লেখার ভার পড়ে, এই রকমই শুনেছিলুম। এ রকম সমৃদ্ধ, সুন্দর ও সালস্বার শব্দসম্ভারপূর্ণ রচনা কবিশেখর কালিদাস রায়ের দ্বারাই সম্ভব। মনে মনে তাঁকে অল্পস্বল্প ভক্তবাদ জানালাম।

শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনপত্র পাঠের পর আরো অনেকেই—আমাকে সর্বাধিক কোরে কিছু কিছু বলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীমানোজ বসুর আন্তরিকতা পূর্ণ শ্রদ্ধার কথাগুলি আজ বার বারই আমার মনে পড়চে। এজন্য সেদিন সকলকে আমি বঙ্গ কথায় আমার অন্তরের

ধন্যবাদ জানিয়েছিলুম; আজ লীথ উনিশ বছর পরে, সে বিষয়ে লিখতে বসে, আবার আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাছি।

বাক। অভিনন্দনের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার বন্ধন শেষ হোয়ে গেল, তখন নীচের প্রশস্ত দালানে ভোজনোর আয়োজন শুরু হোল। লম্বা দালানে সারি সারি ছু’ পাকিতে শ’ধানেক পাতা পড়লো। মহা আনন্দ-কোলাহলের সঙ্গে প্রত্যেকে এক-একখানা পাতা অধিকার করে বসলেন। খাতের আয়োজন সুন্দর, প্রচুর ও ক্রটিশূন্য। মাছ, মাংস, পোলাও, কালিয়া, লুচি, তরকারি, দই, মিষ্টান্ন—কিছুই বাধ পড়ে নি। রাধেশ ভায়া যেখানে ‘ইন-চার্জ’, সেখানে কোন দিনই কোন ক্রটি হবার কথা নয়।

শরৎচন্দ্র অসুস্থ থাকার সত্ত্বেও সেদিন সকলের সঙ্গে আহায়ে বসলেন এবং পেট ভোরে সব কিছুই খেলেন। পূর্বেই বলেছি, তিনি দৈহিক অসুস্থতাকে গ্রাহ্য করতেন না, গ্রাহ্য করতেন—মনের আনন্দটাকে। সবাই মিলে এক সন্দের এই আনন্দ-ভোজনে তাঁর মত লোক কি আশে না নিয়ে থাকতে পারেন? ভোজনের ওজনের চেয়ে, আনন্দ-কোলাহলের ওজনটাই সেদিন ছাপিয়ে উঠেছিল।

অভিনন্দনের ব্যাপারও চুকে গেল। আমার ভ্রম হোয়েছিল যে ঐ দিনের অনিয়ম অন্যাচারে হরত শরৎচন্দ্রের শরীর আরও অসুস্থ হোয়ে পড়বে। কিন্তু তারপর থেকে রোজই আমি তাঁর খবর নিয়ে জানতে পারতুম যে তিনি ভালই আছেন।

আমার অভিনন্দনের খবরটা যাতে কোনও কাগজে না বেয়োয় তার জন্তে আমি খুব চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু তা সত্ত্বেও ছু’চারখানা কাগজে খবরটা ছাপা হোয়ে গেল। ‘সাহানা’তে বা বেয়িরেছিল। তা এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হোল।—শৈলজানন ছিলেন তখন ‘সাহানা’র সম্পাদক।

“বেলগাছিয়ায় ‘বারকা-কাননে’ রসচক্রের এক উজ্জান-মিলনের আয়োজন করিয়া গত ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার, উপভাস-সম্রাট শরৎচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ কথাসিল্পী শ্রীমসঙ্গ মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দিত করেন। এই আয়োজনটিতে সর্ব কাব্যই শরৎচন্দ্রের নির্দেশমত সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রায় সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি এই অহুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। অভিনন্দনের পর ভূবিভোজনোরও বিশেষরূপ আয়োজন হইয়াছিল।”

(‘সাহানা’—শনিবার, ২২শে মে, ১৯৩৭)

‘মাসিক বহুমতী’র সম্পাদক স্বর্গতঃ সত্যশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাঁর দৈনিক ‘বহুমতী’তে সন্বাদটা ফলাও কোরে ছাপেন। [ক্রমশঃ]

## শুভ-দিনে মাসিক বহুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবীর কাছে সামাজিকতা বন্ধ করা বেন এক দুর্নিবহ বোঝা বহনের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, মেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বাধিকীতে, নয়তো কারও কোন কৃতকার্যতায় আপনি ‘মাসিক বহুমতী’ উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধরে তার সুখি বহন করতে পারে একমাত্র

‘মাসিক বহুমতী’। এই উপহারের জন্ত সর্বত্র আবরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই থাকা। প্রথম ঠিকানার প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে বুঝী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যে-কোন জ্ঞাতব্যর অল্প লিখন—প্রচার বিজ্ঞপ্তি, মাসিক বহুমতী। কলিকাতা।



[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

হবেক যদি সম্ভব করে তুলতেই হয়—প্রায়সীকে যদি দ্বিতীয়ারূপে পেতেই হয় তবে আর বিধা নয়—সকোচ নয়.....আমার একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু, অভিভাবক, শুভাকাঙ্ক্ষী ভাগ্যদীকে অকপটে সমস্ত নিবেদন করে তাঁর সাহায্য অবগত হতদূর অকপটে তাঁর কাছে জানানো চলে—কে বুঝিয়ে দিলাম যে সি সি ছাড়া আমার চলবে না—। আমাদের বিবাহে সম্মতি না দেন তবে আমি ওকে রাখবো। তাও ঠিক করেছি বললাম।

ম্যাসিয়ে ভাগ্যদী আর তাঁর দু'টি অভিন্নহৃদয় বন্ধুর সঙ্গে রে বহু তর্ক, বিতর্ক, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার জ্ঞাত বহু শপথের পর তাঁদের কিছুটা সম্মত করতে পারলাম। শেষ হোলো ম্যাসিয়ে ভাগ্যদীই আমার হোয়ে ওর বাবার র প্রস্তাবটা তুলবেন।

ক করে সি সিকে জানাতে গেলাম—গিয়ে দেখি, মা'ই বিষন্ন মুখে বসে—হু'জনারই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। স্তম্ভিত—শেষে জিজ্ঞাসা করে জানমাম ওর দাদাকে আর করে নিয়ে গেছে—হাজতে দিয়েছে। দেনার দায়েই রিটা—আর সি সি আমার জন্তে একটা চিঠিও রেখে—বাতে আমি ওকে সাহায্য করি কিন্তু আমার অবস্থাও নয়।

মুখের রঙীন কলনায় যখন হু'জনারই মন ভরপুর সেই সির এই প্রেশুরের ঘটনাটা আমাদের হৃদয়নকেই ভারী। তার উপর আবার শুনলাম, সি সির বাবাও সেই পল্লীভবন থেকে বাড়ী ফিরছেন। তারাক্রান্ত মনেই য় নিলাম—চলে আসছি, এমন সময় সি সি আমার হাতে পাগজ গুঁজে দিয়ে পালালো। বাইরে এসে দেখি একটা চাবি—আর ভিতরে লেখা আছে ওই চাবির গায়ে বাড়ীর দরজা খুলে ওর কাছে চলে আসি। দাদার ও আমার জন্তে অপেক্ষা করবে...

অভিনয়ে কোনো বাধাই আসেনি। কিন্তু আমার ভরে যেতে লাগলো সি সির কথাগুলি শুনে। আমার দ্বা হোয়েও গ্লান হেসে সিঁটুসি বললে,—

বেশ সুস্থ শরীরে নিরাপদেই ফিরেছেন...কিন্তু জানো, তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন যেন আমি একটা ছোটো যে আর থু'কু নই এটা বুঝলে ঠর মনের কি অবস্থা হবে বার তার উপর যখন শুনবেন আমার প্রেমিকও আছে। তখন যে কি করবেন আমি ভাবতেও পারি না—

—“কি আর করতে পারবেন? আমার হাতে তোমাকে দিতে না চান তো সোজা তোমার নিয়ে পাঁচিয়ে যাবো—তার পর আর কি? ধর্মবাহকদের আশীর্বাদ থেকে তো আর বঞ্চিত হবো না...আমাদের মিলনে কোনো দিনও কেউ বাদ সাধতে পারবে না—”

—“আমিও তো তাই-ই চাই...কিন্তু বাবা?...উঃ আমার বাবা যে কি ভীষণ, তা তো তুমি জানো না...”

পরদিন সি সির মা বাবার সঙ্গে ম্যাসিয়ে ভাগ্যদীর বহুক্ষণ ধরে তর্ক আর আলোচনা হোলো—কিন্তু সবই নিখিল হোলো শেষ অবধি। এমন কি সি সির মা যতটা আশঙ্কা করতছিলেন আগে থেকে তার চেয়ে আরও খারাপই দাঁড়ালো। ওর বাবা সোজাশুজি জানিয়ে দিলেন এখনও চার বছর পরে মেয়ের বিয়ের কথা উনি ভাববেন—আর এই চার বছর ওকে কোনো কনভেডে রাখবেন। পরে প্রত্যাখ্যানটাকে একটু সহনীয় করার জন্তেই বোধ হয় বললেন—সে সময় আমার পদমর্যাদা, সম্ভলতা সব বিচার করে যদি উপযুক্ত মনে করেন, আর আমাদের ভালোবাসাও যদি তত দিন টিকে থাকে তবে তিনি মত দিতে পারবেন।

সে রাতে ছোটো চাবিটি কোনো কাজেই লাগলো না। ভিতর থেকেই দরজাটা বন্ধ করা ছিলো। একেবারে হতাশার চরম সীমায় পৌঁছলাম। ওর দাদাও জেলে...কোথা থেকে এতটুকু খবর পাবারও উপায় নেই। মরিয়া হোয়ে ভাবলাম, সোজা ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করবো—কিন্তু দরজা থেকেই পরিচারিকার কাছে শুনলাম, কেউই নেই, সকলেই পল্লীভবনে চলে গেছেন, কবে ফিরবেন কেউ জানে না।

হুর্ভাগ্য কি একা আসে? কখনও না। চরম হতাশায়, ব্যর্থতায় মনের বিক্ষোভ আর জ্বালা জ্বড়তে জ্বড়ার নেশায় মাতলাম। একটা বারও একটা দানও জিততে পারিনি...ক্রমে ক্রমে সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হোয়ে মাথার চুল অবধি দেনার দায়ে বিকিয়ে দিলাম। তখনও অবশিষ্ট ছিলো এতটুকু...পুরানো শুভার্থীদের দরজায় হাত পেতে দাঁড়ানোর মত চক্ষুলাল। হ্যাঁ একসময় আত্মহত্যা করতেনও উজ্জত হোয়েছিলাম...কিন্তু সেই হুহুর্ভট থেকে আমাদের উদ্ধার করলে আর এক ভূয়ড়ী আঁতোনিয় ক্রোসে।

### যষ্ঠ পরিচ্ছেদ

একজন লোক নাম বলেছিলো মামুংসি, তার পেশা হোলো জরুরী—কিছু দামী জহরৎ আমাকে ধারে পাঠিয়ে দেবে, এই নৃত্রে আমার সঙ্গে পরিচয় করেছিলো—আর এই নৃত্রেই আমার ঘরে অবাধ প্রবেশের অধিকারটুকুও জোগাড় করেছিলো—কিন্তু আসলে



সে ছিলো গুপ্তচর-রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগেরই কর্মচারী। কিন্তু সে পরিচয় তো প্রথমে পাটনি। সে আমার ঘরে এসে আমার বইপত্র নাড়াচাড়া করতো আর আমার সেই বাহুবিক্রার উপর লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো পড়ে মুগ্ধ ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো। আমিও নির্বোধের মত তাতেই পুলকিত হয়ে কিছু কিছু ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে আরও মুগ্ধ করার চেষ্টা করতাম। আসলে তো সবই কাকীরা খেলা—তুধু মজা দেখবার জন্মেই—

কিছু দিন পর গোয়েন্দাটা আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। এবার বললে যে, একজন পুস্তকসংগ্রাহক আছেন, তিনি তাঁর নাম জানাতে চান না—তিনি হাজার সেকুইন দিয়ে আমার পাঁচখানা পাণ্ডুলিপি কিনে নিতে চান—অবশ্য প্রথমে এক বার দেখতে চান ওগুলো পড়ে। মাহুংসি এও শপথ করলো যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওগুলি আমাকে ফিরিয়ে দেবে। কিছুমাত্র সন্দেহ না করেই রাজী হলাম। পরদিনই মাহুংসি এগুলি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল—জ্ঞেতা নাকি বলেছেন ও সব জাল। বেশ কয়েক বছর পরে জেনেছিলাম মাহুংসি ওগুলো সোজা নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিলো গোয়েন্দা বিভাগে—প্রমাণ করা হয়েছিলো আমি একজন উঁচুপরের বাহুকর।

তুর্ভাগ্যের শেষ তখনও হয়নি—আমার বিরুদ্ধে আমার ভাগ্যচক্রের চক্রান্ত তখনো চলছে। এই সময়তেই জনৈক মানাম মেমোর মাধার ঢুকলো যে তাঁর তুই ছেলেকে আমি নাকি পুরোপুরি বাস্তিফ করে তুলেছি। আমার বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ জানালেন

...অবসরপ্রাপ্ত এক বৃদ্ধ অস্বাস্থ্যবাহী সৈনিক তিনিও জানালেন তাঁর কোভ যে, আমার গুপ্তবিক্রার সাহায্যে তাঁর ভাইপোর আমি নাকি সর্বনাশ করেছি...সে একেবারে গোলায় গেছে। এ সব অভিযোগ গুরুতর হয়ে উঠলো। পবিত্র চার্চের মধ্যস্থতা মানা হলো—বখন প্রত্যেকের সাগ্রহ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে গ্রেপ্তার করা গেল না, তখন ওরা সমস্ত ব্যাপারটা সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে জানালেন। সেখানে আমার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ জমছিলো। আমি নাকি ঈশ্বর মানি না, শয়তানের পূজা করি, আমি মাংস খাই প্রতিদিন, অথচ কোনো দিন উপাসনায় যাই না। এই সবের সঙ্গে সকলের চেয়ে বিপদজনক অভিযোগ ছিলো যে আমি নাকি বিদেশী দূতাবাসগুলির সঙ্গে অসহিষ্ণুতা মেলোমেশা করি—আর রাজ্যের গুপ্ততথ্য পরিবেশন করে মোটা টাকা উপার্জন করি।

আশ্চর্য্য! এই সব অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে, অথচ এগুলির কোনোটিরই মূল এতটুকু সত্য ছিল না। অথচ এই সব অভিযোগ তুলে আমাকে সাধারণের শত্রু, রাজদ্রোহী, বিবাস্য-ঘাতকরূপে অভিযুক্ত করা হলো—একেই বলে ভাগ্য!

ইতিমধ্যে আমার শুভাধারী আমাকে দেশ ছেড়ে যেতে উপদেশ দিলেন। তখনও আমার বিচার শেষ হয়নি আলোচনা চলছে—কিন্তু তাই-ই যথেষ্ট। কারণ সে সময় ভেনিসে শান্তিতে থাকতে পারতো তুধু তারাই বাবের অস্তিত্বটুকুও গোয়েন্দা বিভাগের অজানা—কিন্তু আমারও জেদ কম ছিলো না—সত্যিই কোনো অস্তায় বধন



উৎসবের দিনে  
 কে. হোডের  
 সুবাসিত  
 প্রসাধন সামগ্রী

কে. হোড এণ্ড কোং  
 কলিকাতা-১৪

ন কেন পালাবো? তাছাড়া তখন আমি একেবারে কিছু মূল্যবান ছিলো সব বাঁধা। তবু বৃদ্ধি করে কাগজ দলিল ইত্যাদি সব একজন পুরানো বজুর জিম্মার।

ন রাতে ঘিয়েটার দেখে বাড়ী ফিরে দেখি, আমার ঘরের করে ভেঙ্গে খোলা, আর সমস্ত জিনিষপত্র ছড়ানো, সমস্ত যেন তছনছ করে রেখে গেছে। বাড়ীওয়ালীর কাছে গিয়েলা বিভাগের বড়কর্তা, একদল পুলিশ নিয়ে এসেছিলেন,। বে-আইনী মুণের বস্তা রাখা আছে ঘরে, তারই খোঁজে যদিও আমার যথাসর্ব্ব তছনছ করে খুঁজেও শুধু ঘরে গেছেন। বুঝলাম আসল উদ্দেশ্য আমার জিনিষপত্র ঘরের বস্তাটা ছলনা।—

১৭ও তাই বিশ্বাস, মুণের ব্যাপারটা ছলনা ছাড়া সংস্কারী গোয়েন্দা বিভাগে আমিও কয়েক মাস ওদের চালচলন কিছু জানি” মাসিরা ব্রাগাঙ্গী সব মাকে বিষয় গভীর ঘরে বসলেন,—“আমার একটা পাস করো। এখনি পালাও তুমি ভেনিস ছেড়ে। বাও, সেখান থেকে ফ্লোরেন্সে—আর বহু দিন না বো তোমার বিপদ কেটে গেছে তত দিন কিরো না—”

জেন্ড আর গৌয়ারহুমে পেয়ে বসলো আমাকে। কানই বুকের উপদেশে,—অমরোখে। শেষে মাসিরে ব্রাগাঙ্গী কাতর মিনতি জানালেন অন্ততঃ ঠর বাড়ীতে গিয়ে। কারণ ঠর মত সম্ভ্রান্ত, প্রতিষ্ঠাবান প্রতিপত্তিশালী গাড়ী আমার পক্ষে অনেক নিরাপদ। কিন্তু জানি না র শেষ অহুর্বাণ্টুকুও সেদিন রাগিনি, তাহলে হয়ত আমার বার বিপর্যয় ঘটতো না। মনে পড়ে শেষে উনি আমার ঝর করে কেঁদে ফেললেন। সেই দেখে আমার সমস্ত চড় দিয়ে উঠলোও নিজের জেন্ড থেকে এক পাও টলতে—কেন, কে জানে? হতাশ হোয়ে উঠে পাড়িয়ে আমাকে লজ্জা করে করণ কঠে উনি বললেন—“কে জানে হয়ত ‘খা।’ আমিও তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম, আলিঙ্গন করে রেখে বিনার নিলাম। কে জানতো ঠর সেই ভবিষ্যৎবাণী—আর দেখা হবে না ঠর সঙ্গে! ঠিক এগাবো বছর পরে গিয়েছিলেন।

দান্ত অথচ দৃঢ় মনেই বাড়ী ফিরলাম। মনে পড়ে, সা ২৫শে জুলাই, ১৭৫৫ সাল। মাসিরে ব্রাগাঙ্গীর শাহারাদির পালা সারা হোয়েছিলো—বাড়ী ফিরে সোজা গিম শযায়।

\* \* \* \*

ত্রি ভোবের আলো ফুটেছে। এমন সময় কি একটা জন্তে দেখি সর্বনাশ! পুলিশের বড়কর্তা আমার সামনে দাঁড় কঠে প্রাণ করছেন—“আপনিই কি ক্যাসানোভা?” চিন্তি জানাতেই তিনি সেই মুহূর্তে আমাকে হুকুম ঠ পড়ে কাপড়-জামা বদলে তৈরী হোয়ে নিতে আর বা দশত ঘরে আছে সমস্ত পুলিশের হাতে দিতে।

ই হুকুমজারীর অধিকার আপনি কোথা থেকে শেলেন?”

—“টাইব্যানালের আদেশ।”

আমার খোলা ডেবের উপর আমার বাবতীর কাগজপত্র, খাতা ইত্যাদি ছড়ানো। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমি বললাম—বা কিছু কাগজ দেখছেন ও-সব নিতে পারেন। একটা মন্ত বলির ভিতর সমস্ত কাগজপত্র ভরে ফেলা হোলো। তার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার পাণ্ডুলিপিগুলি কোথায়? ঠরা জানেন আমার কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি কাছেই আছে—এমন কি নামও জানেন দেখলাম—...সেই দিন সেই মুহূর্তে আমার চোখ খুললো। বুঝলাম এ-সবই মামুংসির কীতি। সেই আমাকে মিথ্যা ছলনার ভুলিয়ে গোয়েন্দা বিভাগে সমস্ত জানিয়েছে। সমস্ত পাণ্ডুলিপিগুলি পুলিশে হস্তগত করলো, এমন কি পেত্রার্ক, হোরেস থেকে শুরু করে সমস্ত বইগুলিও—তার সঙ্গে চিঠিপত্র ইত্যাদি বহু কিছু কাগজের টুকরো ছিলো যবে-...সমস্তই নিয়ে নিলে—আর আমি এই সময়টা ঠিক বহুচালিতের মত মুখ ধুয়ে পোষাক বদলে, দাড়ি কামিরে, চুল আঁচড়ে তৈরী হোয়ে নিছিলাম, একটা প্রাণ, একটা কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি।

সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হোয়ে আমি বখন পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরোলাম তখন দেখে অবাক যে, পাশের ঘরে প্রায় চল্লিশ জন পাহারাবালা আমার লক্রে রয়েছে। আমি ভাবতেও পারিনি আমাকে ধরবার লক্রে এতগুলি পুলিশ-পাহারাবারের প্রয়োজন—জন দুই হোলোই রাখানে যথেষ্ট হোতো।

বাই হোক, চার পাশে চার জন পুলিশ-বোঁকিত করে বড়কর্তা আমাকে একটা গণ্ডোলাতে তুললেন। তার পর বখন ঠর বাড়ীতে পৌঁছলাম তখন আমাকে নামিরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন এক কাপ কফি খাবার ইচ্ছা আছে কি না। আপত্তি জানালে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হোলো। আমার মনের তখন এমন অবস্থা যে, কি করে মুক্তি পাবো, বা কি ভাবে পালাতে পারবো, কিছুই ভাববার ক্ষমতা ছিল না। একটা সোফার উপর তন্দ্রাচ্ছয়ের মত পড়ে রইলাম—...মাঝে মাঝে এক একবার চমকে উঠে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হোয়ে পড়ি। প্রায় তিনটের সময় ইনসপেক্টর এসে জানালেন যে, হুকুম এসেছে আমাকে শিখোয়াতে যেতে হবে। অর্থাৎ ‘লেডস’ এ থাকতে হবে। ঐ জেলখানাটার নাম ‘লেডস’, কারণ ওর ছাতটা টালির বদলে সীসার পাত্রে মোড়া। তাই ওর নাম ‘দি লেডস’। নিঃশব্দে অহুসরণ করলাম ইনসপেক্টরকে।

গণ্ডোলাতে চড়ে অনেক অজিগলি, অনেক বাঁক নিয়ে শেষ কালে বন্দিশালার সামনে এসে ভিড়লাম। তার পর অনেক সিঁড়ি আর অনেক উঠা-নামার পর একটা সেতু পার হোলাম, এই সেতুটা ‘লোজ’র প্রাসাদের সঙ্গে বন্দিশালার সংযোগ করেছে। সেতুটাকে বলে ‘রিয়ো দি পালাংসো’। সেতুটা শেষ হোতেই মন্ত লম্বা গ্যালারি। সেটা পার হোয়ে আর একটা ঘরে এলাম। সেখানে অফিসারের পোষাকে একজন বসেছিলেন। আমাকে আপাদ-মস্তক খুঁটিয়ে দেখে হুকুম দিলেন—আপাততঃ একটা সেলে ঠিক করে বন্ধ করে রাখো।

আমাকে এবার কারারক্ষকের হাতে দেওয়া হোলো। বিরাট একটা চাবির খোলো নিয়ে সে পাড়িয়ে ছিলো। আমাকে আর

ছ'জন বন্ধীর প্রেরণায় নিয়ে সে এগোলো। প্রথমে ছোটো সিঁড়ি উঠে একটা গ্যালারি। তার পর চাবি খুলে একটা লম্বা হল, তার পর আর একটা গ্যালারি। আবার চাবি খুলে আর একটা গ্যালারি। সেটার পর আবার চাবি খুলে একটা ছোটো খুপরি। ছ'ফুট চওড়া অন্ধকার খাঁচার মত ঘর, মাথায় চেয়ে উঠতে ছোটো ঘুলঘুলির মত এতটুকু জানলা দিয়ে আলো আসে। প্রথমটা আমি ভেবেছিলাম এই বুঝি আমার কারাকক্ষ! না, তুল আমার ধারণা, কারণ এবারও একটা মস্ত চাবি বেরোলো, একটা প্রচণ্ড ভারী লোহার শিক-জাঁটা দরজা খোলা হোলো। আরও চমৎকার একটা খুপরি, সাড়ে তিন ফুট উঁচু। আর দরজার মাঝখানে আট ইঞ্চি গোল একটা গর্ত।

আমাকে বধন চুকতে বলা হোলো, তখন আমি অবাক হোয়ে দেখছিলাম, দেয়ালে একটা ঘোড়ার খুরের আকাবেবর অঙ্কিত লোহার বন্ধ। কারাবন্ধক সেটা লক্ষ্য করে বললে,—‘বুদ্ধি মশায়, ওটা কি আপনি জানতে চান না? ওটা হোলো বধন ওপরওলার কারো কানীর কহুম জান, তখন তাকে ওর সামনে একটা টুলের উপর বসানো হয়, তার পর তার মাথাটাকে এমন ভাবে পিছনে হেলিয়ে দেওয়া হয় যাতে ঐ বন্ধটা ঠিক গলার মাঝামাঝি জায়গায় থাকে, তার পর গলার একটা সিকের দড়ি বেঁধে ঐ গর্ত ছোটোর ভিতর দিয়ে

দড়িটাকে চুকিয়ে পিছনে বে চাকার মত বন্ধ, তার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। এর পর চাকাটা ধরে ঘোরানো—বত্ৰক্ষণ না প্রাণটা বেরোয়’—  
—বা: বা: চমৎকার! আমার মনে হয় ঐ চাকা ঘোরানোর মহৎ কার্যটি আপনিই সম্পাদিত করেন—দুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো আমার।

কোনো উত্তর না দিয়ে কারাবন্ধক তখন সোজা আমাকে সেই খুপরিটার ভিতর চুকিয়ে দিলে। তার পর দরজার চাবি লাগাতে লাগাতে ফুটোটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে আমি কি খেতে চাই। আমি সজোরে উত্তর দিলাম—এখনো ভেবে ঠিক করিনি। বিনা বাক্যব্যয়ে লোকটা চলে গেল—পিছনে একের পর এক দরজার সতর্ক ভাবে ভালো লাগাতে লাগতে।

এতক্ষণে আমি নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তরাখা যেন প্রচণ্ড বিস্ফোভে আর্ন্তনাদ করে উঠলো—ঐ অন্ধকার অপরিসর গর্তের মধ্যে দুখে, হতাশায়, ক্ষোভে পাগলের মত হোয়ে উঠলাম। জানলাটা দুই হাতে চেপে ধরে পাড়িয়ে রইলাম। এক ইঞ্চি পুরু লোহার জাকরীকাটা জানলা। পাঁচ ইঞ্চি চৌকো কোরে কাটা বোলোটা গর্ত তাতে। আলো একটু আসতে পারতো কিন্তু সামনের দেওয়ালের জানলার উপরই ছাঁসের মস্ত বড় বরগাটা এমন ভাবে এসে পড়েছে যে, একটু আলোর



অজস্র চিত্রকলা  
এসোরার ভাস্কর্য  
আগ্রার তাজমহল  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

**এস. সরকার এণ্ড কোং**

ফোন-৩৪-৩১৪০- হুগলী কলিকতা-১২



১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকতা-১২  
২০৮, রাসবিহারী এডিনিউ. কলিকতা-১২

— কিন্তু —

কিছুটা নিরস করিয়া কতকটা সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা যা়—এমন কোন জিনিষ বিরল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নহারী বিকৃত সস্তা জিনিষেরই বাজারে প্রাচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিত্রাচারিত কলাবৈপ্লব্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ যাতে কোন সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোনদিন অভাব ঘটে না। তাই আমাদের বিখ্যিত অলঙ্কার সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই আমরা অনুসরণ করি।

এস. সরকার এণ্ড কোং

দুঃস্থ ডেক গেছে। ঘরের ভিতর ঢেয়ে দেখলাম। বহালা, চমার ইত্যাদি কিছুই নেই, কেবল একটা টাব, আর দেওয়ালে একটা কাঠের তাক ছাড়া। তাকের উপরই আমি আমার জাবা, নতুন কোট আর স্পেনের লেশের কাজকরা সাদা খিলাম।

৭, কি অসহ্য গরম—একটু বাতাসের আশায় আবার জানলার য় দাঁড়ালাম। একটা মাত্র জায়গা যেখানে কনুই দুটোর দিয়ে একটু দাঁড়াতে পারি। কিন্তু সে স্পষ্টকুণ্ড সইলো না। দেখি, সামনের খুপরীটাতে অসংখ্য বড় বড় ইঁদুর ছুটোছুটি আমার রক্ত যেন জল হোয়ে গেলো—চিরকাল এ প্রাণীটাকে ॥ করে এসেছি। তাড়াতাড়ি কাঠের পাছাটা টেন দিয়ে বন্ধ করে দিলাম।

আটটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম জানলার ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। নিকটিক হোয়ে। সে যে কি অহুভূতি তা' প্রকাশের আমার একটুও ক্ষণ ছিল না কিন্তু অসহ্য তৃষ্ণা। মুখের মন একটা তিস্ত বাদ পাচ্ছিলাম। আরও তিনটি ঘণ্টা চাটতে আমি ক্রোধে, ক্ষোভে, বস্ত্রায় উদ্ভাস হোয়ে উঠলাম, তে লাগলাম, আর্ন্তনাদ করতে লাগলাম দেওয়ালে আর গলের মত লাধি মারতে লাগলাম। ঘণ্টাবানেক ধরে ক্ষণের মত পরিশ্রম করে হতাশায়, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে সোজা শুয়ে পড়লাম। আমার স্থির বিশ্বাস হোয়েছিলো এই বর্ষের অসভ্য গোয়েন্দা অফিসাররা আমাকে না খেতে তলে শুকিয়ে মেরে ফেলবে ঠিক করেছে। কিন্তু কি যে রাধ তা সত্যিই ভেবে পাচ্ছিলাম না, বার ফলে ছুর্ভোগ। হোতে পারি লম্পট, জুয়াড়ী, স্পাইবানী, দাঁব আমোনগুলির একটু বেনী প্রিয় কিন্তু দেশের না কাজই তো করিনি,—আইনের বিরুদ্ধে কোনো করিনি। ভারতে ভারতে আর মনে মনে শাপ করতে এক সময় ক্ষুণ্ণর আলা আর অসহ্য ক্লান্তিতে ।

ভাললো তখন চারি দিকে নিকবকালো অন্ধকার। দুই দেখতে পেলাম না, শুধু কালো কালো, আর কালো র শুয়েছিলাম। সেই একই ভাবে থেকে হাত বাড়িয়ে কট থেকে ক্রমাগত বার করতে গেলাম...

৮। আমার আঙুলগুলো গিয়ে ঠেকলো একটা বরকের চ—

খাব চুলগুলো অবশি আতকে খাড়া হোয়ে উঠলো। গুরুণ আতঙ্ক কোনো দিনও অনুভব করিনি। পুরো বোধ হয় আমার কোনো জানই ছিল না। একটু হবার মনে হোলো, আমার কল্পনা নয়তো ওটা? ডালাম, আবার হুঁবাই সেই হৃদয়েহের হিমশীতল

বোলো ভীক্ষু, ভীত্র, প্রচণ্ড আর্ন্তনাদ!

নিম্নে ভাবলাম, যখন আমি বুঝোচ্ছিলাম তখন হৃদয়েহ এনে আমার পাশে ফেল রেখে গেছে।

৯ ঘরে প্রথম ঢুকি তখন যে কিছুই ছিল না ঘরে,

সে ১৭বৎসর আমার নাকিত। আমার মনে হোলো কাউকে কাঁদা দেওয়া হোয়েছে, এটা তারই হৃদয়েহ, আর আমার ঘরে ফেলে যাবার অর্থ বোধ হয় জানিয়ে দেওয়া আমার বরাতেও ঐরকম যত্ন রয়েছে। একথা মনে হোতেই সমস্ত ভয় প্রচণ্ড রাগে পরিবর্তিত হোলো। ওদের এই বর্ষেরতার বিরুদ্ধে যেন সমস্ত দেহ-মন প্রতিবাদ জানালো—রাগের আলায় উঠে বসতে গিয়েই এক মুহূর্তে বুঝলাম আমার এত আতঙ্ক সবই সৃষ্টি করেছে আমারি বা হাতখানি। বা দিক ফিরে বা হাতখানি চেপে শোবার দক্ষ রক্ত চলাচল বন্ধ হোয়ে গিয়েছিলো আর সেই জন্য অসাড় আর ঠাণ্ডা হোয়ে উঠেছিলো হাতখানি।

সমস্ত ঘটনাটা শেষ অবশি হাত্তরসের পর্যায়ে পড়লেও আমি কিন্তু এতটুকুও কোঁতুক বোধ করিনি। বরং উন্টোটাই মনে হোয়েছিলো যে এমন ভয়ানক জীবন আমার শুরু হোলো যেখানে সত্যি ও মিথ্যের রূপে প্রকাশ পেতে পারে, অথচ বিচারশক্তি ক্রমেই হারাতে হবে—হয় অল্পভবের আশা নয় নৈরাশ্যের উদ্ভাসতা, এই দু'য়ের মাঝখানে সোজা খেতে খেতে বুদ্ধিবৃত্তি সবই হবে ক্ষান্ত...

সমস্ত রাতের পর ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে শব্দ পেলাম দূর থেকে একের পর এক তালি খোলার। শেষ অবশি দরজার পাশ থেকে কারাবন্ধকের কর্ণ কঠ শোনা গেল—‘কি খেতে চান ভাববার সময় পেয়েছিলেন তো?’

বেশ ভ্রমভাবেরই আমি চাইলাম একটু, ভাত, স্থাপ, সিদ্ধ মাংস; কিছু রুটি, মদ আর জল। লোকটা একটু অবাক হোলো দেখলাম, আমার কাছ থেকে কোনোরকম নালিশ না শুনে ও সেটাই আশা করেছিলো। আমাকে বললো যে, আমি বিছানা কিবা কোনো কিছু আসবাব চাইলাম না দেখে ও অবাক হোয়ে গেছে। কারণ আমি যদি ভেবে থাকি যে আমাকে দু'একদিনের জন্যে আনা হোয়েছে এখানে তাহলে মস্ত ভুল করবো।

—বা' দরকার মনে করেন দিতে পারেন—

—আমি আবার কোথায় ছুটবো তার জন্য? এই পেজিল আর কাগজ নিন—এতে লিখে দিন বা দরকার।

আমি জামাকাপড়, আসবাব ইত্যাদির একটা তালিকা দিলাম। আর সেই সঙ্গে আমার যে বইগুলি পুলিশ নিয়ে গিয়েছিলো সেগুলিও লিখে দিলাম।

—আহা অত তাড়া নয়, অত তাড়া নয়। ওসব বই-পত্র, কাগজ-কলম আয়না ক্ষুদ্র ওসব কাটুন—ওসব দেওয়া নে-আইনী। বরং আপনার বাবারটা কেনার জন্যে কয়েকটা টাকা দিন—

আমি ওই অভ্র বর্ষেরতার হাতে একটা সেতুইন দিলাম। লোকটা চলে গেল। পরে শুনেছিলাম আরও সাত জন বন্দী এই ‘দি জীডস্’এর সেলে রয়েছে। প্রায় দুপুরবেলা লোকটা ফিরে এলো খাবার আর আসবাবপত্র নিয়ে। একটা মাত্র হাতীর দাঁতের চামচ—কাঁটা-ছুরী দেওয়াও বাণ।

—কালকের বা দরকার সেটাই জানিয়ে দিন। কারণ, দিনে একবারের বেনী আমি আসতে পারি না। আর আপনাকে কতকগুলি শিক্ষণীয় বই পাঠানো হবে। আপনার তালিকার লেখা বইগুলি দেওয়া বাণ। সেক্রেটারীর হুকুম তাই—

# দেখুন!

# মাত্র অষ্টক

# সানলাইট সাবানই



এত সব জামাকাপড়

কাচা যায়!



**সানলাইটের ফেণার আধিক্যই এর কারন !**

ফেণার আধিক্যের দরুনই সানলাইট সাবান এত  
ক্রিয়ালীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র  
অষ্টকটি সানলাইটে কতগুলি জামাকাপড়  
কাচা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেণার দরুনই প্রতিটি  
ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে  
আশ্চর্যকর সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যের দরুনই জামাকাপড়  
বিনা আছাড়ে পরিষ্কার হয়। তার মানে আপনার  
জামাকাপড় টেকে আরও অনেক বেশী দিন।



ভারতে প্রস্তুত

**সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে**

—বেশ কথা, আমাকে একলা থাকতে দেওয়ার জন্য আমার  
হাত তাঁকে জানাবেন।

—বসতে বলছেন এখন বলবো। কিন্তু এসব ঠাটা-তামাসার  
কিছু ভালো হবে না—

ঠাটা নয়, বদমায়েশ করেদীদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার চেয়ে  
তা অনেক ভাল হোয়েছে—

—বদমায়েশ করেদী! কি বলছেন মশাই? আশ্চর্য্য!

দেব এখানে কেবল মহৎ সজ্ঞাত ভ্রমলোকদেরই রাখা হয়—

। তাঁদের বন্দী করার কারণ বিখ্যাত বিচারকই বলতে পারবেন,  
নার শাস্তি কঠোরতর করার জন্যেই আপনাকে এভাবে রাখা  
ছে আর আপনি আমার দিয়ে যত্নবান পাঠাচ্ছেন?

—ওঃ আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—

কারারক্ষক চলে যাবার পর আমি টেবিলটা টেনে এনে দরজার  
বাঁধলাম একটু আলোর আভাস পাবার জন্যে—তার পর খেতে  
ম। কয়েক চামচ স্যুপ, ছাড়া কিছুই গিলতে পারলাম না—

টিউবলিখ ঘটা উপবাসের পর কেমন বেন বমির ভাব আসছিল।  
দিনটা ইঞ্জিচেরায়ে এলিয়ে পড়ে কাটিয়ে দিলাম। নিদারুণ  
তা আমার দেহ-মন ছেয়ে ফেলেছিল। এলো রাত্রি।

খর পাটা সারা হাতেও এক হোলো না। আলো-বাতাসহীন  
পুরী—প্রতি পনের মিনিট অন্তর স্টেট মার্কার গীঞ্জার প্রচণ্ড  
নিঃস্রাব সারাক্ষণ মস্ত মস্ত ইহুরের ছুটোছুটি আর

চিনীর শব্দ...আর সবার উপর হাজার হাজার পোকা  
সর্ব্বাক্ষেণ হেঁকে ঘরেছিলো, সমস্ত গারের রক্ত বেন পাম্প  
বে নিছিল আর ঐ অসহ্য পোকার মুহূর্ত্ত দশন...আমার

শরীর আকেশন ব্রহ্ম হোলো—নিঃশ্বাস বেন বন্ধ হোয়ে আসতে  
...সমস্ত রক্ত বেন বিবাক্ত হোয়ে উঠলো...সে বে কি  
রক, নিপাক্ত তিজ্জতম অভিজ্ঞতা, সেটা অল্পভব করবার মত  
নবো আছে বলে জানি না।

৩০বেলা কারারক্ষকটি আমার এলো, সঙ্গে কয়েক জন প্রহরী—  
কটির নাম জানলাম লয়েজ। ওই প্রহরীরাই আমার  
মুহুরে-মুহুরে বিছানার করে দিলে। এক জন হাত-বুখ ধোবার

। এনেছিলো—আমি জিজ্ঞাসা করলাম সামনের ছোটো  
ত বেরোতে পারবো কি না...লয়েজ জানালো হুকুম নেই।

নর পর দিন কাটলো আশা আর নিরাশার—হতাশা আর  
—কোভে আর উদ্ভাস্ততার। প্রতি দিনই আশা করতাম,  
ল সকালেই দেখবো আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোয়েছে।

নিরাশও হতাশ কারণ যা হওয়া উচিত, যা ছাড় তা কখনও  
তে ঘটে না। অগাষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর...দীর্ঘ ভার্যাক্রান্ত  
কেটে গেল। নভেম্বরের প্রথম দিকে নিরাশার আর

মরিয়া হোয়ে ঠিক করলাম, যেখানে আমাকে জোর করে  
হোয়েছে সেখান থেকে আমি জোর করে বেরিয়ে যাবো।

একটা খেয়ালই মাথায় ঘুরতে লাগলো...সারাক্ষণ ওই একই  
তে লাগলাম।

৬ সাল। নববর্ষের দিন লয়েজ এসে ঢুকলো হাতে একটা  
কট নিয়ে। তার ভিতর রয়েছে একটা ডেসি গাউন,

ঘড়ার লাইনি দেওয়া, মস্ত ভালুকের চামড়ার ব্যাগ পা

ঢুকিয়ে বসার জন্যে আর সিঁড়ির লেপ। সেই অসহ্য শীতের দিনে  
এমন উপহার পেয়ে আনন্দে আমার চোখ কেটে জল এলো...বিশেষ

করে যখন সুনলাম, মাসে ছয়টি সেকুইন আমাকে দেওয়া হবে  
ইচ্ছামত বই কিনে পড়বার জন্য। এই উপহার এই অতুলনীয় লান

—সবই আমার পিতৃতুল্য, অকৃত্রিম বন্ধু, বৃদ্ধ বাগাদার কাছ থেকে।  
লয়েজের কাছে সুনলাম, তিনি তদন্ত কর্মচারীদের কাছে, বিচারকের

কাছে নতজাহ হোয়ে অক্ষসিক্ত চোখে প্রার্থনা করেছেন তাঁর স্নেহের  
নিদর্শনস্বরূপ এগুলি আমাকে পাঠাতে। আমার মনের অবস্থা

তখন অবর্ণনীয়। একখানি কাগজে লিখে দিলাম—‘টাইবুনাালের  
সদাশয়তার জন্য আর মাসিগে বাগাদার স্নেহের অনুমান উৎসের  
জন্য বহুবাদ জানাই।’

এক দিন ভাগ্যক্রমে অল্পমতি পোলান্ড যবের সামনের ছোটো  
খুপরীটাতে বেড়াবায়। অবশ্য অল্প সময়ের জন্য। বাই হোক,

হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে চোখে পড়লো, একটা বিশ ইঞ্চি লম্বা লোহার  
পুরু শক্ত খিল (অর্গল) পড়ে রয়েছে—চকিতে মনে হোলো, এটা

দিয়ে আশ্বর্য্যকর কাজ চালানো যেতে পারে হয়তো। তখন সেটা  
ডেসি গাউনে ঢেকে নিয়ে এলাম। অবশ্য আরও অনেক ভাড়াচোর

জিনিষপত্র ও একটা ভাড়াগোছের সিন্দুক দেখলাম। ওই লোহার  
লম্বা বডটাকে নিয়ে পড়লাম পুরো আটটি দিন ধরে...এক টুকরো

মার্বেল পাথরের উপরে ক্রমাগত ঘষে ঘষে মুখটা তীক্ষ্ণ সূঁচালো  
করে তুললাম। আটটি খাবওলা পিরামিডের আকৃতির মত হোলো

—সব কোণগুলি ক্রমেই সূঁচগ্র হোয়ে নেমে এসেছে। অবশ্য এত  
ব্যাপার বড় সহজে হয়নি। অনেক পরিশ্রম করে, তবে। একটুও

তেল নেই, খুঁততে তিজ্জিয়ে নিয়েছি পাথরটা। ডান হাতের পেশীতে  
এত ব্যথা হোয়েছিলো যে, নাড়াতে পারতাম না, হাতের চেটোতে

তো দগদগে যা...কিন্তু বহুজ্ঞে প্রস্তুত আমার শাশিত অন্তের দিকে  
যখন চাইতাম, সব বহুজ্ঞা তুল বেতাম। অবশ্য তখন ওটা নিয়ে

কি কাজে লাগাবো বুঝতে পারি নি, তবে প্রথম কর্তব্য হোলো যে,  
ওই গোয়েন্দাটা আর প্রহরীদের সন্ধানী দৃষ্টি থেকে ওটা লুকিয়ে রাখা,

সেটা বুঝেছিলাম।

একটা বেশ ভালো নিরাপদ জায়গা ঠিক করলাম ইঞ্জিচেরায়ে  
পিঠের লাগানো কুশানের ভিতরটা, সেখানে ওটা রেখে যে কী

বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলাম সেটা পরে বুঝি।

আমি নিশ্চিত জানতাম যে আমার এই ঘরখানার নীচেই  
সেই জায়গাটা বেধানে সেক্রেটারীর সঙ্গে আমার দেখা করানো

হয়েছিলো। ঘরটা রোজ সাক করা হোতো। আসল কাজ  
হোলো ঐ অন্ত্রটা দিয়ে মোঝতে গর্ত্ত করে-তার পর বিছানার

চানরটার সাহায্যে নীচের ঘরটার নেমে পড়া। আর বত্কণ না  
দরজা খোলা হয় টেবিলের নীচে লুকিয়ে থাকা। যেই কেউ

আসবে তখন আছে আমার অন্ত্র—যুক্তির পথ খুঁজে দেবে। কিন্তু  
ভাবলাম, এখন রোজ যে মোঝে খুঁড়বো তাহলে ধুলোর আর মোঝে

খোঁড়া গুড়োর স্পৃশ কোথায় লুকবো? লয়েজ আর প্রহরীরা  
তো বিছানার নীচটা রোজ পরিদর্শন করে—আমার বিশেষ করে

বলা আছে রোজ ভালো করে সাক করতে।

ভাগ করলাম দারুণ ঠাণ্ডা লাগার, আর ধূলা উড়লেই কাশি  
বাড়বে। কয়েক দিন এই ছলনাতে বেশ চললো কিন্তু ওই

গোয়েন্দা লরেন্সটা ঠিক সন্দেহ করলো কিছু... এক দিন একটা বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে এসে ঘরের প্রত্যেকটি কোণ তন্ন তন্ন করে দেখে সাফ করলো। আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। পরদিন সকালে আমি করলাম কি, আঙুলে খোঁচা দিয়ে রক্ত বের করে কুমালে লাগলাম। তারপর লরেন্স এলে বললাম যে, কাল ধূলা ওড়ার ফলে কি হয়েছে দেখুন—আমার অঙ্গুষ্ঠ বশি বেড়েছিলো, সম্ভবত গলার কোনো শিরা ছিঁড়ে গেছে—ডাক্তার ডাকা হলো, আমি আমার রোগের কারণ জানালাম, তিনি বললেন আমার কথাই ঠিক, ধূলায় মত ফুসফুসের আর শত্রু নেই, এমন কি একটি সুবক করেও দিন আগে ঠিক এই রকম কারণে মারা গেছে... সাবাস, আমি বোধ হয় ঘু ব দিয়েও এত ভালো স্বপক্ষে ওকালতী করতে পারতাম না।

আমার লাভ হলো প্রচুর, কারণ প্রহরীদের বারণ হোয়ে গেল যে আমার ঘর ঘাঁট দিয়ে সাফ করে আমাদের ঘন আর বিরক্ত না করা হয়। লরেন্স আমার কাছে বার বার কমা চাইলে, শপথ করে বললে যে আমাকে বৃশি করবার জগেই ও ঘর পরিষ্কারের দিকে অত নজর দিতো।

দীর্ঘ শীতের রাত্রি... আমাকে প্রায় উনিশটি ঘটা অন্ধকারেই কাটাতে হতো। সন্ধ্যার ঘুমটুকিটুকি আলোও একটা ছুটলে কী ভালোই না হতো? কিন্তু কোথায় পাবো? এ কথা ঠিক 'অভাবই আবিষ্কারের স্রষ্টা'—আমার একটা মাটির ভাঁড় ছিলো, তাইতো আমি ডিম রাগা করতাম, সেইটাকে হালাড তেলে ভর্তি করে লেপ ছিঁড়ে তুলে বের করে সলিতা ঠৈতরী করলাম, কিন্তু আশুন জালি কি করে? লরেন্সকে বললাম যে দাঁতের যত্নায় অঙ্গুষ্ঠ কঠ পাচ্ছি আমাকে একটু 'সিউমিস ট্রেন' (আয়েয়গিরির প্রচুর ছিন্নযুক্ত এক প্রকার পাথর) এনে দিতে হবে। স্বভাবতঃই ও বললে জিনিষটা কি তা জানেই না, তখন আমি যেন নেহাংই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, তাহলে একটা চকমকি পাথর হোলও চগবে যদি বেশ করে ভিনিগারে ভিজিয়ে রাখা যায়। ওই বোকা শরতানটা প্রায় আধ উজন আমাকে দিলে।

আমার পা-জামাতে একটা মন্ত বললস ছিলো ইম্পাতের... চকমকি, ইম্পাত সবই ছুটলো বলে বেশ গর্ব হোলো তখন। কিন্তু আরও বাকী যোগাড়ের... আগেকার পুরানো দাগ দেখিয়ে ডাক্তারকে চর্মরোগের ভাঁওতা দিয়ে কিছু গালবার পর্যন্ত আদায় করলাম নিজেই অমুখ ঠৈতরী করে নেবো বলে। যেন অমুখ ঠৈতরী জগেই চাইছে এই ভাবে এমন সোজাশুজি লরেন্সের কাছে বেশলাই চাইলাম যে ওর গকেটে যে কয়টা কাটি ছিলো ও সব কয়টাই দিয়ে দিলো। কিছু না জেবেই। এবার শেষ দরকার কিছু জিনিষের বা সহজেই অলে উঠবে। হঠাৎ মনে পড়লো আমার দর্জিসেব বলা

আছে আমার সব পোষাকের বগলের তলার কাপড়ের ভিতরে 'টাকউড' দেওয়া থাকে যেন; কারণ তাতে বাঘ শুবে নেয়। আর ওই বিশেষ ধরণের কাঠটা সহজেই অলে ওঠে জানি, সামনেই কোটাটা পড়ে রয়েছে দেখে আশায় আনন্দে বুটটা হুটল উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও জাগলো, কি জানি এটাতে হয়তো দেখনি। মাঝে মাঝে এক একটাতে তুলে বাওয়াও তো কিছু বিচিত্র নয়। আশা আর নিরাশার হুলতে হুলতে খুলে ফেললাম ভিতরটা—জয় ভগবান! এই তো রয়েছে! আর কি চাই? সব উপাধানই তো পেলাম। সে যে কী আনন্দ... সেই নিকব-বন অন্ধকারে এই প্রথম আলোর আভাস জানালাতে... যে আলো আমারি হাতের স্পষ্ট। আঃ কি তৃপ্তি আর সেই ভয়াবহ দীর্ঘ ভাবাক্রান্ত রাত্রির আক্রমণ হবে না—

যেকোটা কাঠের ছিলো। প্রায় ছটি ঘটা বোঁড়বার পর প্রায় এক ভোয়ালে-ভরা হুঁড়ো জড়ো হোলো। এক পাশে ঢেলে রাখলাম, ভাবলাম সামনের খুপরিটাতে বেড়াবার সময় সিল্কের পাশে ঢেলে দিয়ে আসবো। প্রথম তক্তাটা প্রায় ছ ইঞ্চি পুরু, সেটা গর্ত হোলো দেখি, তলার আবার একটা তক্তা। প্রায় তিনটি সপ্তাহ লাগলো আমার তিনটি তক্তার ভিতর গর্ত করতে। কিন্তু তার তলটা দেখে হতাশ হোয়ে পড়লাম। এবার দেখি মার্বেল পাথরের মোজেক... আমার বস্ত্রটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে একটু লাগও বসাতে পারলাম না। ভাবতে ভাবতে গল্প মনে পড়ে গেল হানিবল কি করে আরস পর্বতের ভিতর পথ করে বেরিয়েছিলো—পাহাড়টাকে ভিনিগারে ভিজিয়ে নরম করে নিয়ে—আমিও দিলাম ঢেলে সমস্ত ভিনিগারটা ওই গর্তটা দিয়ে। পরদিন সকালে দেখি, যে কারণেই হোক মোজেকের গাঁথনির বীধনিটা গলে গিয়ে ওপরটা কুঁকড়ে গিয়েছে। তখন আমার ওই লোহার রড দিয়ে প্রাণপণে ঘষে ঘষে গর্ত করতে পারলাম। দেখি, তলার আর একটা কাঠের তক্তা দেখা যাচ্ছে—মনে হোলো এটাই নিশ্চয়ই শেষ স্তর।

ফোন  
৩৪-৫০০২



সবকিছু সম্মত  
সুন্দর অলঙ্কার

এক মাত্র  
গাঁগি সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুত কারক

জুয়েলাপ

**কে.এল.সিংহ এণ্ড সন্স** KLS

১৬৭ বি. বহু বাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২



উঃ, মনে পড়ে তখন মনের কী অবস্থা না গিয়েছিলো—কী একাগ্র কাতর প্রার্থনার আমার প্রতিটি মুহূর্ত কাটতো! শক্তিশালী বুদ্ধিমত্তেরা হয়তো তর্ক করবেন প্রার্থনা করে লাভ কি—ও ভো ভূমি ইত্যাদি কিন্তু তাঁরা জানেন না আমার আপন অভিজ্ঞতায় আমি যা জেনেছি একাগ্র গভীর প্রার্থনার যে কী শক্তি পেয়েছিলাম বলতে পারি না—ঈশ্বরের অমুগ্রহ যদি নাটী স্বীকার করি, একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাসের মনের জোর থেকেই এ শক্তি আসে।

শেষে অগাধ আমার সব কাজ শেষ হোলো। শুধু প্রাণটুকু খসানো বাকী। ছোটো একটা ফুটো দিয়ে সেক্রেটারীর ঘরখানা এখন আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি আমার মুক্তির দিনটাও আগে থেকে ভেবে রেখেছিলাম। সেন্ট অগাস্টাইনের ভোজের উৎসব হবে সাতাশ তারিখে...এই প্রসাদেরই অল্প অংশে সমস্ত কর্মচারী এবং কর্মত্যাগীদের একটা সম্মেলন আর উৎসব হবে। এদিকটোতে কেউ থাকবে না, অতএব ঐ তারিখেই পালাবার সবচেয়ে সুবিধা...

কিন্তু কৌতুকনরী ভাগ্যদেবী আমার! পঁচিশে অগাধ আবার নামলো তাঁর কৌতুক অভিশাপের ছায়াবেশে। সেদিনের কথা ভাবলে আজও শিউরে উঠি। মনে পড়ে দুপুরের দিকে ঠাণ্ডা তালু আর ঝিল খোলার শব্দ পেলাম। লাফিয়ে উঠে পড়ে ইঞ্জিনের ঘরে বসে পড়লাম—পরমুহূর্তে ঘরে ঢুকলো লরেন্স। রীতিমত উত্তোজিত ভাবে চেঁচিয়ে বললে—‘সুসংবাদ এনেছি মশায়, সত্যিই সুসংবাদ।’

প্রথমটা ভাবলাম বুদ্ধি আমার ক্ষমার আদেশ এসেছে, তাই মুক্তি পেলাম। কিন্তু ভয়ে প্রাণ কঁপে উঠলো পাছে গর্তটা বরা পড়ে। সে ভাবটা চোখে বললাম—‘গাঁড়ান পোষাক বদলে আসছি—না, না তার দরকার নেই। আপনাকে শুধু এই নরককুণ্ডের মত ঘর থেকে অল্প ঘরে নিয়ে বাবার আদেশ এসেছে। সে ঘরখানা বড়, সব কলি কেমনো হোয়েছে, তাছাড়া বড় বড় ছোটো জানলাও আছে—সেখান থেকে প্রায় অর্ধেক ভেনিসটাই দেখতে পাবেন। ...এমন কি সোজা হোয়ে গাঁড়াতো পায়বেন এমন উঁচু ঘর—

আমার মনে হোলো মুর্ছা বাবে।—একটু তিনিগার দিন, কোনো মতে আমি বললাম, ‘আর সেক্রেটারীকে গিয়ে বলুন আমি তাঁকে আর টাইবুনালকেও বহুবাদ জানাচ্ছি এই করুণার জন্ত, কিন্তু আমি এই ঘরেই থাকবার অমুহূর্তটুকু তাঁদের কাছে ভিক্ষা চাই। আমার বেশ অভ্যাস হোয়ে গেছে। আমি বল করতে চাই না।

—আপনি কি পাগল হোলেন নাকি মশায়? কিসে আপনায় ভালো হবে বৃত্তে পাবেন না? লরেন্সের সেই অতি বিনীত গা-হালানো চিবিয়ে কথা বেন কানে গরম সোঁসে ঢালতে লাগলো—আপনাকে বলে নরক থেকে উদ্ধার করে ধার্মি নিয়ে বাঁধা হাচ্ছে আর তাইতে আশ্রয়? আহন, আহন, হুহুয় ভো পানতেই হবে। আমার হাত ধরে চলুন, বই আর জিনিষপত্র রা আমবে—

জানতাম বিমোহ করা মিথ্যা। হুচিন্ডার বৃত্তপ্রায় অবস্থা এখন, কোনো মতে ভর হাতে ধরে টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম।

দুটো সন্ধ্যা বারান্দা পেরিয়ে তিন খাপ ওঠে আবার একটা হল পেরিয়ে আরও একটা সন্ধ্যা বারান্দা পেরিয়ে আমার নতুন জায়গাটাতে পৌঁছলাম। ঘরের ভিতর অবশ্য একটা জাল দেওয়া জানলা কিছু ঢাকা বারান্দাতে ছোটো জাল ঢাকা জানলা ছিলো—তা থেকে বহুদূর প্রায় লিডো অবধি দেখা যায়। জানলা দিয়ে নরম মিষ্টি খোলা হাওয়া আসছিলো—খোলা হাওয়া তো আমার কাছে বহু দিন অপরিচিত... কত দিন বৃকভরা নিঃশ্বাস নিইনি! কিন্তু এসব কিছুই সে সময় ভালো লাগছিল না—একমাত্র সাধনা যে আমার ইঞ্জিনেরটা ইতিমধ্যেই এসে গেছে আর তারই পিঠে লুকানো আছে যন্ত্রটা। আমার বিজ্ঞানটাও এলো এবার অল্প জিনিষগুলি আনতে গিয়ে প্রহরীরা আর ফিরলো না, দুটি খণ্ডা কি অসহ্য তৃপ্তিস্তায় কাটলো...আমার সেলের দরজা অবধি গোলো রয়েছে...এব চেয়ে অস্বাভাবিক এখানে আর কি হবে? কি নিদারুণ যন্ত্রণায় আর তৃপ্তিবান মুহূর্তগুলি কাটতে লাগলো—এমন সময় মনে হোলো কে যেন দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে...পরমুহূর্তে লরেন্স এসে ঢুকলো, রাগে বিবর্ণ হোয়ে গেছে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে আর শাপশাপাস্ত করছে। চুকেই আমাকে বললে সমস্ত যন্ত্রপাতি যা কিছু আছে সব দিয়ে দিতে আর যে প্রহরী আমাকে এই সব সংগ্রহ করে এনে দিয়েছে তার নাম বলতে। আমি বললাম ওর কথা আমি কিছুই বুঝি না। তখন সন্দের লোকদের ভকুম করলে আমার দেহ তলসী করতে—আমি লাফিয়ে উঠলাম, সমস্ত জামাকাপড় নিজেই খুলে ফেলে দাঁড়িয়ে বললাম—যা করবার আছে কর...কিন্তু পংবদ্য আমাকে ছেঁবার সাহস কোরো না—

ওরা আমার বালিস বিজ্ঞান সব তত্ত্ব তত্ত্ব করে খঁজলো। ইঞ্জিনেরটারে বুশন অবধি, কিন্তু পিচনের স্প্রিংএর ভিতর খুঁজে দেখার মত বুদ্ধি ওদের ছিল না। লরেন্স বললে,—মেকের উপর কি যন্ত্র দিয়ে গর্ত খোঁড়া হোয়েছে?...জানি সহজে বলবেন না। কিন্তু আমরাও কথা বার করবার উপায় জানি—

—‘বদি সত্যিই মেকেরে গর্ত খোঁড়া থাকে...আর এই নিয়ে যদি আমাকেই প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমি সোজা বলবো আপনিই আমাকে নিজের হাতে ঐ-সব যন্ত্রপাতি এনে দিয়েছিলেন...আর সেগুলো আমি আপনাকেই আবার কিয়দে দিয়েছি—’

আমার বলার ভঙ্গীতে আর দৃঢ়তায় ও ভীতিতের মত দাঁড়িয়ে রইলো—তারপর নিরুপায় কোভে আর ক্রোধে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বেরিয়ে গেল। বাবার সময় প্রচণ্ড আক্রোশে বারান্দার জানলা দুটিও সন্দেহ বদ্ধ করে দিলে। আবার সেই করুণাস কারাকক...

সারা দিনের পর এনে দিলে পুতিগন্ধের নোংরা বামিকটা মদ, মাংস, কটি আর জল। সে আমি স্পর্শ করলেও পাকলান না। মাল্টো পর্যন্ত সম্পূর্ণ পটা। সবসময় দিন হাজি কাটলো অনিবার্য অনাহারে ডুকার আর অসহ্য পায়ের। পর্যায় আবার ঈশ্বরের দর্শনময় বাত দিয়ে ঢুকলো—আমি ঈশ্বাকর করে বলে উঠলাম—আমাকে অনাহারে আর বাসরোধ করে রাখবার হুহুয় এসেছে কি? কিন্তু আমার কোনো কথারই ও করণীয় করল না। আর আটটি দিন কাটলো একই প্রায় বাসরোধ আর উত্তপ্ত বাসরোধকারী বদ্ধ করে। এক বন্ধু লরেন্সের একজন বন্ধুকে বলে



[illegible]

পরদিন রাতেই আমাকে পালাতে হবে—এক বার ছাঁদ ফুটো করে বেরোলেই বাইরে বাবার পথ ঠিক খুঁজে নেবো। কিন্তু ঠিক দুপুর দুটোর সময় সুনতে পেলাম বাইরের সেলের দরজা খোলার শব্দ। তৎক্ষণি তিনটি টোকা দিয়ে ইশারা করলাম বাবলিকে কাজ থামাতে, শব্দ না হয়। একটু পরেই লরেন্স চুকলো ঘরে সঙ্গে প্রেইরী দুই জন আর একজন বিশাখাল পোবাকের উচ্ছ্রাল চেহারা বন্দী। হাত দুটো খুব কয়ে বাঁধা। লরেন্স আমার কাছে ক্ষমা চাইলে, এক জন দুশ্চরিত্রকে আমার একই ঘরের সঙ্গী করে দিতে হচ্ছে বলে। আমি শুধু বললাম—“টাইওয়ানালের আদেশ মনতেই হবে। আপনাকে কি পোষ—”

লোকটির সম্পত্তি একটি ছেঁড়া মাছুর। আর দিনে দশ পরসা খোরাকী। কিন্তু আমার সমস্ত মন চরম হতাশার ভেঙে পড়লো—প্রতি বারই যুক্তির মুহূর্তে এক নতুন উপদ্রব! বাই হোক, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করবার চেষ্টা করলাম। লোকটিকে আমার খাতের অংশ গ্রহণ করতে বলায় দেখলাম ও কৃতজ্ঞতায় গলে গেল। পরে লক্ষ্য করলাম আমার সেলের চতুর্দিকে চেয়ে ও কি যেন খুঁজে বড়াচ্ছে—জিজ্ঞাসা করতে বললে, ভার্জিন মেয়ার কোনো ছবি আছে কি না তাহলে ও প্রাণ দিয়ে তার কাছে প্রার্থনা জানাবে। আমি গবলাম ও হয়তো আমাকে একজন ভক্ত ইহুদী ভেবেছে। সেইটার বোগ নিয়ে দেখলাম আমি একজন গোঁড়া ক্রীস্টান—ওকে পবিত্র গার্জিনের ছবি দেখলাম বই খুলে—ও ছবির সামনে নতজাহ্নু হয়ে লা ভঙ্গ করতে লাগলো। পরে আহাবাদি সেয়ে আমার ২৭শিষ্ট রাটুকু শেষ করে দিলে—তার পরই শুরু হলো দেশার প্রলাপ আর রী। ওর অসংলগ্ন কথা থেকে বুঝলাম—গোয়েন্দা বিভাগে গুপ্ত-র কাজ করতো—অতীত বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করার এই জি।

বাবলিকে আবার খবর দিলাম ঘটনাটা জানিয়ে। আশাস গম ভেঙে পড়ার কারণ নেই, শুধু কাজটা এখন বন্ধ থাক যত দিন আবার জানাই। লোকটির নাম সোরাদাচি। ওকে দেখলাম দু'বার গরের জন্ত নিয়ে যাওয়া হলো—দু'বারই ফিরে এলো। বুঝলাম হাত থেকে সহজে নিস্তার নেই। অতএব প্রথম পন্থাটিই কাজে লাগায়। প্রথমতে ওকে পরীক্ষা করবার জন্ত দু'বারই যখন ওকে 'বানালের বিচারের জন্ত নিয়ে যাওয়া হয় একটা ছলনার উপায় করেছিলাম। দু'বারই দেখলাম ও সহজেই বিশ্বাসঘাতকতা হলো। তাই নিয়ে যেন আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে এমন ভাণ ওকে নিষ্ঠুর ভাবে শাসিত করলাম, তারপর বিদ্যানায় অনড়, ৭ নির্বাক হয়ে গুয়ে রইলাম। ইতিমধ্যে লরেন্সকে দিয়ে একটি ত্রুশ, আর দু'বোতল পবিত্র জল এনে রেখেছিলাম। আমার কিতা দেখে সোরাদাচি খেতে অভিজ্ঞ ছিলো। প্রথম আমার অবস্থা থেকে ওর ভয় হলো—বহু অমুদ্র, বিনয়, কান্নাকাতি ত লাগলো। আমি কোনো কিছুতেই কান দিলাম না। মনে তখন এক বিচিত্র হাঙ্গরসের অভিনয়ের মহড়া দিচ্ছি। সেই! বাবলিকে জানালাম—ভয় নেই, তবে আমাদের যুক্তি অতি। সতর্কতার সঙ্গে সত্যায় খুঁজে—খুব সাবধান—আজই রাতে... আমি ততক্ষণে মোটামুটি দিনকণ ঠিক করে ফেলেছিলাম। চার নভেম্বরের প্রথম তিন দিন বিচারালয় আর তদন্ত বিভাগের

সমস্ত কর্মকর্তারা ভেনিসের বাইরে চলে যান। আর এই সুযোগে এই তিন দিন রাতে লরেন্স মনের স্তবে নেশার বৃন্দ হয়ে থাকে—সবচেয়ে সুবিধা হয়েছিলো, সোরাদাচি আমাকে অসম্ভব ভয় করতে শুরু করেছিলো—ওর দৃঢ় বিশ্বাস, আমার মত সাধুর অভিলাষ সহজেই ফলবে। সেদিন সারা দিন না খেয়ে পড়েছিলো—আমি ভাবলাম ওর নির্বোধ দুর্বল মনের দুহুতাকে কাজে লাগানোর এই সুযোগ। ডাকলাম ওকে—উঠে এসে আমার পায়ে তলায় পড়ে হাউ-হাউ করে কানতে শুরু করলে। বললে, আমি ক্ষমা না করলে ওর নিশ্চিত মৃত্যু হবে। সুযোগ নিলাম অন্ধবিশ্বাসের—গভীর ঘরে বললাম,—“বসো, কিছু খাও। জানো আজ তোরে আমাদের পবিত্র দেবী ভার্জিন মেয়ার আবির্ভাব হয়েছিলো—তোমাকে ক্ষমা করতে আদেশ দিয়ে গেছেন—। তোমার বিশ্বাসঘাতকতার আমার বতবড় সর্বনাশ হতো সেই ভেবে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমার একমাত্র সান্তনা ছিলো যে, আমার অভিলাষে তিন দিনের মধ্যেই তোমাকে মরতে হবে। হঠাৎ ভোরবেলা দেবীর আবির্ভাব—আহা আমার কত জন্মের পূণ্যফল!—বা হোক দেবী বললেন, সোরাদাচির ভক্তিতে আমি ভুট্ট, ওকে ক্ষমা কর আর ওকে এই দয়ার জন্ত তোমার পুরস্কার হলো যুক্তি—আমি মাহুয়ের বেশে এক জন দেবদূতকে পাঠাচ্ছি, সে ছাত ফুটো করে তোমার ঘরে আবির্ভূত হয়ে তোমাকে উদ্ধার করবে। তুমি সোরাদাচিকেও তোমার সঙ্গে যুক্ত করতে পারো, যদি সে প্রতিজ্ঞা করে গুপ্তের বৃত্তি ছাড়ে জন্মের মতো—” এই বলে দেবী মেয়ামাতা অদৃশ্য হলেন—

মনের আনন্দ চেপে রেখে লক্ষ্য করতে লাগলাম বিশ্বাসঘাতকতার মুখের ভাব। ওর হতভম্ব ভাব দেখে আরও বিশ্বাসটাকে পাকা করবার জন্ত সমস্ত ঘরে পবিত্র জল ছিটিয়ে শুদ্ধ ভাবে বাইবেল খুলে পড়তে লাগলাম—আর ভার্জিনের ছবির সামনে মাঝে মাঝে নতজাহ্নু হয়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলাম। সমস্ত দিন জল ছাড়া কিছুই খেলান না আর সোরাদিচি সমস্ত সুরাটুকুই শেষ করলে।

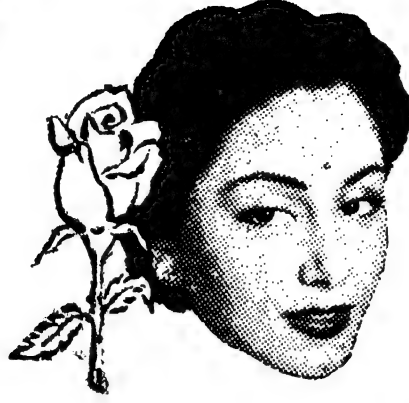
নির্দিষ্ট সময়ের বদ্যথানেক আগে আমি খুব আড়ম্বরের সঙ্গে নতজাহ্নু হয়ে প্রার্থনা করলাম। গভীরকণ্ঠে আদেশের সুরে সোরাদাচিকেও বললাম প্রার্থনার যোগ দিতে। তখন ও আদেশ পালন করলে, চোখে দেখলাম ভয়, সন্দেহ, সংশয় সব জড়ানো অদ্ভুত দৃষ্টি—মনে মনে হাসলাম দেবদূতের আবির্ভাবে সংশয়ের শেষ রেষটুকুও কেটে যাবে।

যেই শোনা গেল সুপরিচিত শব্দ দেওয়ালের ওধারে তখন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে সোরাদাচিকেও ঘাড় ধরে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দিলাম। চাঁৎকার করে বলে উঠলাম—দেবদূত! দেবদূতের আবির্ভাব হবে—স্পষ্ট সুনতে পেলাম শেষ ইটটি সরানো হলো—বালকিও নেমে গেলো।

—সারা দিন প্রার্থনা করে, চুপ করে গুয়ে থাকো দেওয়ালের দিকে মুখ করে। আর মৌনব্রত নাও, তাহলেই হবে। না, কারো সঙ্গে কোনো বাক্যালাপ করতে পারবে না। আজ সারা দিন এই ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করে। বিনা প্রতিবাদে যেন নিলো সোরাদাচি। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলো লরেন্স।

[ক্রমশঃ]

অনুবাদিকা—শান্তা বসু



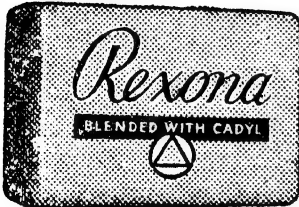
ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেঙ্কোনা

ব্যবহারে ফুটে উঠবে!

নিয়মিত রেঙ্কোনা সাবান ব্যবহার করলে  
আপনার লাবণ্য অনেক বেশি সতেজ,  
অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তার  
কারণ, একমাত্র সুগন্ধ রেঙ্কোনা সাবানেই  
আছে ক্যাডিল অর্থাৎ স্কের সৌন্দ-  
র্যের জন্যে কয়েকটি তেলের এক  
বিশেষ সংমিশ্রণ।

রেঙ্কোনা সাবানের সর্বের মত ফেণার  
রাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ  
করুন; এই সৌন্দর্য সাবানটি প্রতিদিন  
ব্যবহার করুন। রেঙ্কোনা আপনার  
স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তুলবে।



রেঙ্কোনা শোপ্রাইটারি লিমিটেড এর পক্ষে ভারতের একমাত্র

রেঙ্কোনা—একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

RP. 146-X52 BG

# অঘোর প্রবাস

(স্বগীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী)

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

## ছাত্রাংশ পরিচ্ছেদ

রোগ ও অর্থচিন্তার ভার

১৮১৩ সালের মাঘ্যেৎসবের পক্ষ ত্রয়া ক্ষেত্রয়ারী বেহার হইতে হ গমন করিতেছিলে। বাবার সময় পুঙ্খ মাছঘের সহায়তা করিয়া একাকিনী পরম জননীকে সহায় করিয়া গ্রাম্য পথে বেশে প্রার্থনা পূর্বক হরিনাম গান করিলে, ও কোন কোন গুণ গমন করিয়া নাম গান করিলে। বঙ্গনারীর পক্ষে এ অতি ব্যাপার। রাজগৃহে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৩০ কি ৪০টার উঠিয়া প্রাণেশ নাম গান হইত।

ই ক্ষেত্রয়ারী তুমি দৈনিকে শিখিয়াছিলে, “স্বামীনের সহিত ঘন হইতে ঘন হইতেছে। এবার এই ভাবপ্রবণ নারীকে বড় জননীর সম্মান রক্ষা করিব। এ বিষয়ে স্বামী সর্বদাই করেন। এবার কেবল জানিতে ও শিখিতে ইচ্ছা প্রবল। খুব ভাল ভাবে, শুদ্ধ ভাবে চলিতেছে, মন ভাল।”

ই রাজগৃহ পরিত্যাগ করিলে। বাজারে মেয়েরা হরিনাম গান না। সঙ্গার অনিত্য, সেই নাম সত্য, এ বিষয়ে মেয়েদের। শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন।

সময়ে তোমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। পরিশ্রম ও চিন্তা খুব বেশী হইত। অত বড় বিজ্ঞানসন্নিবিষ্ট স্বল্পে পড়িল, তাহার খরচ। যা অভাব হয় তোমাকেই দিতে হয়। টাকার আর কেহ ভাবেন না, বড় কেহ দেনও না। নিজের সঙ্গারের স্বীয়দের সাহায্য করা, সমাজের যে ব্যয় হইত নীরবে তাহার শে নিজে বহন করা, ইহা ছাড়া বিজ্ঞানসন্নিবিষ্ট খরচ, এ সকলই তোমাকে করিতে হইত। স্তব্ধতা তোমার। প্রায় শূন্য থাকিত। তার পর সেই যে লক্ষ্যে শরীর হাছিল, সে অস্বস্ততা সঙ্গেও কাজ করিতে বাধ্য হইলে। গায়ে বাতের মতন হইয়া শরীর ফুলিয়া উঠিত, তখন শয্যা হইতে হইত। ক্ষয়গুহের পরিশ্রমের পর নয়াটোলার বাটাতে কটু বুট লাগিয়া তোমার বিশেষ পীড়া হইল। গাতের যা গলা ফুলিল, মুখ বন্ধ হইল, কথা বন্ধ হইল। ডাক্তার। করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। একদিন এমন আমার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। অবশেষে চরের ফোঁড়া আপনি যাচিয়া গেল। আমার মন একটু হল, মনে হয় বিশ্বাস পূর্ণ মাজায় করিতে পারি নাই।

শারিয়া উঠিলে। এবারকার পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। নাম, তুমিও অনেক শিখিলে। এই পীড়ার কথা তুমি। শিখিয়া রাখিয়াছ,—“শয়ন করিয়াই এবার দুই মাস নাম। রোজ নিত্য নূতন ভাবে স্বামীন কখনও পাশে, বসিয়া মায় নাম করিতেন। চূপ করিয়া থাকিতে কিছু যত্না চূপ করিয়া থাকিতে দিত না। সময়

সময় বৈধব্য করিয়া ফেলিত। অল্প কাছকেও কিছু বলিতাম না, সময় সময় স্বামীনের উপর সন্তানবৎ আদার করিতাম; অভিমানও করিতাম, তিলেকের লজ্জা; কিন্তু তাঁহার মাতৃসম স্নেহে তখনই ভুলিয়া বাইতাম। এই সময় তাঁহাকে আমি যা বলিয়া সম্বোধন করিতাম, সন্তানের শ্রায় তাঁহার কোলে কখনও মাথা রাখিয়া জননীর স্নেহ সন্তোষ করিতাম। স্বামী যে মা হইতে পারেন তাহার প্রমাণ এইখানেই। কিছু খাইতে পারিতাম না বলিয়া রাত্ৰকণ্ঠ পূর্ণমাত্রায় শেষ করিয়া বেলা ১১টার সময় \* বাটা আসিয়া নিজে রন্ধন পূর্বক ভোজন করাইয়া দিতেন।”

তুমি ভাল হইয়া উঠিয়া কিছুকাল শয্যা শয়ন করিয়াই কাজ করিতে লাগিলে। আমার শরীর যদি ভাল থাকিত, তোমার অনেক সাহায্য করিতে পারিতাম। কিন্তু কলিক ও ডিসপেনসিয়া আমার শরীর চূর্ণ করিয়াছিল। স্তব্ধতা আমার লজ্জাও তোমাকে চিন্তা করিতে ও পরিশ্রম করিতে হইত। মধ্যে দুইবার কোনও না কোনও ব্যবস্থা করিয়া নিজের বা আমার বা কোনও সন্তানের স্বাস্থ্যের অনুরোধে মফঃস্বলে কিবা গঙ্গার ধারে চলিয়া বাইতে হইত। ইহাতে অনেকে অসন্তুষ্ট হইতেন। মাছঘের সহায়তায় না পাইলে, যে কাজ করে তাহার মনের অবস্থা যে কিরূপ হয়, তাহা তুমি এই সময় খুব বুঝিতে লাগিলে, আর ভগবানের উপর নির্ভর বাড়িতে লাগিল। বড় ক্লেশ হইলে তুমি আমাকে এবং আমি তোমাকে মনের সকল হুঃখ তাপ বলিতাম।

কতরূপ টাকার ব্যবস্থা যে তোমাকে করিতে হইত, নিয়োগদাত কয়েকখানি পত্র হইতে কিছু পরিমাণে তাহা জানা বাইতে পারে। তোমার সেই পূর্বপরিচিত পুটান-পরিবারটির সঙ্গে তোমার কিরূপ আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল, এ পত্রগুলি তাহারও নিদর্শন।

“Chandernagore 25th August 1893.

প্রিয় দিদিমণি!

আপনাকে দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমার স্বামী এই মাসের ১৭ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। এখন আমি অত্যন্ত মনের কষ্টে আছি; আমার নিকট আমার ভগিনী মিসেস চক্রবর্তী ও আমার ছোট্টা কস্তা ফুলকুমারী আছে। \* \* \* আপনি অগ্রহণ করিয়া—র জন্তে যে টাকা পাঠান তাহা এখন অগ্রহণ করিয়া আমার ঠিকানায় পাঠাইবেন। কারণ, দিদি এখন আমার নিকটে আছেন। \* \* \*—আপনার স্নেহের এলিস।”

“Chandernagore 5-9-93.

প্রিয় ভগিনী!

আপনার পত্র ও টাকা পাইয়াছি। আমি এখন এলিসের কাছে আছি ও এখানেই কিছু দিন থাকিব। এলিস ও শোকা এখন ভাল আছে। চারু ও তরুণ দুই আছে। আপনি কেমন

\* এই সময় কাছারী সকালবেলা হইত।

আছেন আমার জানাইবেন। ছেলেরা সকলে কেমন আছে? দাদাকে আমার নমস্কার জানাইবেন ও ছেলেদের ভালবাসা দিবেন।

আপনার ভগিনী বিনুবাসিনী চক্ৰবর্তী।  
"Somerset House, Chandernagore."

শ্রিয় দিদিমণি,

অনেক দিবস হইল আপনার অন্তঃকরণে কথা শুনিয়াছি, এখন আপনি কেমন আছেন লিখিয়া জানাইবেন। আর আপনাকে আমার দুঃখের বিষয় কি লিখিব। এখন চাকুর অত্যন্ত অন্তঃকরণে আমি তাকে চন্দ্রনগরে আনিয়া এখানে চিকিৎসা করাইতেছি। এসময়ে যদি টাকা পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আপনার নিকট চিরকাল বাধিত থাকিব। আপনাকে বিরক্ত করি বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। আমার বড় ইচ্ছা যে চাকুর একবার আপনাদের ওখানে চেষ্টার স্তম্ভ নিয়ে যাই। আপনি কি বড়দিনের সময় ওখানে থাকিবেন? আমাদের ছোট বোয়ের একটি মেয়ে হয়েছে। সকলে ভাল আছে। আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার সকলকে দিবেন ও আপনি লইবেন।—আপনার অধম ভগিনী B. B. Chuckerbutty."

তোমার গুণে সত্য সত্যই চাক তোমার ছেলেদের বড় ভালবাসেন। এখন ইনি একজন graduate এবং কলেজের প্রফেসর। তোমার সম্বন্ধে ইহার চিরদিনের ভালবাসার অধিকারী হইয়াছেন; তোমার গুণে তাঁহার একটি বৃষ্টান ভাই লাভ করিয়াছেন। ইহার মূল তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা।

আর একখানি পত্র এই,—“৮ই জানুয়ারী ১৮১৩। অজ্ঞত আপনার আশীর্বাদ পত্র সহ পূর্বা দশ টাকার নোট পাইলাম। আমি বোধ হয় মাথোৎসবের পরে আপনাদের প্রীতরণ দর্শন করিতে একবার যাইব। \* \* \*—বসন্ত।”

আর একখানি পত্র এই:—

“১০ই জানুয়ারী ১৮১৩। আপনাকে পূর্বে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। বকুর মাহিনা ৪ মাসের বাকী পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে ২ মাসের বেতন আপনি দিয়াছিলেন, আর ২ মাসের বেতন বাকী আছে, এবং এই মাসের মাহিনা হইল। স্তব্ধতা তিন মাসের বেতন আপনার কাছে পাইব। আপনি অন্তঃকরণে করিয়া দিতেছেন বলিয়া আমি পড়াইতে পারিতেছি।”

অনেক সময় কাহারও বিপদ আসিয়া পড়িলে তাহার সমুদায় ব্যয়ের ভার আপনার হস্তকে তুলিয়া লইতে বাধ্য হইতে। লক্ষ্য কলেজের একটি কস্তার বিন্ এইরূপ তোমার উপর পড়িয়াছিল। সে সবক্ষে মিস্ থোবর্ন তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ এই:—“লক্ষ্য, ১১-৩-১৩। শ্রিয় মিসেস্ রায়, তোমার কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম; তোমার শ্রিয়জনের নিকট হইতে ও তোমার কাৰ্য্যক্ষেত্রে হইতে তুমি যে এখনই অপসারিত হইলে না, একান্ত কৃতজ্ঞ হইতেছি। আশা করি, তোমার স্বাস্থ্যের ক্রমিক উন্নতি হইতেছে, এবং শীঘ্রই তুমি তোমার পূর্বের স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইবে। আমি—বিলের ভ্রাতৃ একটুও ব্যস্ত হই নাই; আমি নিশ্চিন্ত আছি যে সময় মত সে টাকা পাওয়া যাইবে; তুমি সে বিষয়ে চিন্তিত হও, আমি তা ইচ্ছা করি না।—ব শরীরটা ভাল ছিল না, বিশেষ গুরুতর কিছু

নয়। তার একটা পীড়ার গোড়ার যা হইয়াছিল, কিন্তু তোমার মতন তেমন খারাপ হয় নাই। এখন তো তাকে ভালই মনে হইতেছে। ঈশ্বর তোমাকে তাঁহার সেবা করিবার ভ্রাতৃ স্বস্থ ও দীর্ঘ জীবন দান করুন। আমার সমগ্র প্রার্থণ এই আকাঙ্ক্ষা, যে আমি তাঁহাকে যেমন বীণরূপে জ্ঞানিয়াছি, তুমিও যেন তেমনি জানিতে পার। তাঁহার আশীর্বাদ তুমি প্রাপ্ত হও, যদিও তাঁহাকে তুমি অজ্ঞ নামে সম্বোধন করিয়া থাক। ভালবাসা লও। তোমার বন্ধু আই থোবর্ন।”

## ত্রয়সিংগা পরিচ্ছেদ

হীরানন্দ

ব্রাহ্ম সমাজের প্রায় সকলেই ইহাকে জানেন। ইনি ১৮১৩ সালের প্রথম ভাগে নিজের কস্তাদের শিক্ষা কোথায় ভাল হয় তাহা অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলেন। অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া তোমার আশ্রমে আসিয়া সেখানেই কস্তাদের রাখিবেন স্থির করিলেন। ইনি সিন্ধী, তুমি বাঙ্গালী, কিন্তু সরল মনে তুমি ইহাকে দান্য বলিতে; আমিও ইহাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখিতাম।

সে সময়ে তোমার পরিবারে দৈনিক জীবনের বিধি ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, এ বিষয়ে আমাদের কাহারও কিছু লেখা নাই। দুঃখের বিষয়, ভাই হীরানন্দ এ সময়ে তোমার পরিবার সবক্ষে কাগজে কিছু লিখিয়াছিলেন। তাহা হইতে তখনকার দৈনিক জীবন অনেকটা বুঝা যাইবে। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ এই:—

“\* \* \* কিন্তু বাকিগণের সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় অনুষ্ঠান একটি সাধাসিদ্ধি রকমের বোজি; একটি ব্রাহ্ম মহিলা ও তাঁহার দুই কস্তা এটিকে চালাইতেছেন। মিসেস্ রায়ের স্বামী গভর্ণমেন্টের একটি

\* মূল পত্রখানি এই:—

“Lucknow 10-3-93

My dear Mrs. Ray,

I was very sorry to hear of your severe illness, and thankful that you were not taken now from your family and your work. I hope you have continued to improve and that you will ere long be in your usual health. I am not at all anxious about—’s bill. I am sure it will be settled in the course of time, and I do not wish you to be put out—has not been well but nothing serious. She had an ulcerated tooth but not so bad as yours. She seems well now. May God grant you many years of health in which to serve Him. With all my heart I wish you knew Him in the person of Jesus Christ as I do. May His grace be yours, although called by another name. With love, Your friend—I. Thoburn”

উচ্চ কার্য করিয়া থাকেন, তাঁর আর্থিক অবস্থাও ভাল। ৩৫ বৎসর বয়সে ইংরাজী স্বামিন্দ্রী উভয়ে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন, এবং আত্ম পর্যাঙ্ক উভয়ে তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া আসিতেছেন। স্বামীর পূর্ণ অমৃতমোদন প্রাপ্ত হইয়া মিসেস্ রায় কতক দূরত্বে লইয়া লক্ষ্য নগরীতে মিস্ খোবর্গের কলেজে পড়িতে গিয়াছিলেন।

কস্তুরমের মধ্যে একটির বয়স ২৪, অন্যটির অনেক কম। ছোট্টা একটি বিবাহিতা \* \* \* কিন্তু তিনি এখনও পিতামাতার কাছেই কেন ও তাঁহাদের সকল মঙ্গল অমুষ্ঠানে সাহায্য করেন। কনিষ্ঠা ছাটি একটি যুক্তাবিশেষ। কুমারী হইয়াও তিনি ছোট একটি ঘরের মতন বোর্ডিঙের শিশুগুলিকে স্বত্ব করেন, আবার বোন হইয়া মন করিয়া ভালবাসিতে হয়, আত্মবলিদান করিতে হয়, র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। মিসেস্ রায় ক্রম ইংরাজী বলিতে পারেন; নি বেশ সুশিক্ষিতা।

প্রত্যয়ে পরিবারের কস্তারা সরল ভাবে আপনাদের আপনাদের নী করে। বাপ প্রার্থনার ব্যবহার নাই; শিশুগুলির কোমল কের উপর একটিও চাপ দেওয়া হয় না। বড় বড় মেয়েদের গ্যকের উপর ছোট একটি-টি মেয়ের ভার দেওয়া হইয়াছে। নকের একখানি ছোট ডায়েরী আছে, তাহাতে সে প্রতিদিনের তা ও ক্রটি কিছু থাকিলে তাহা লিখে। মেয়েরা মিসেস্ পরিদর্শনে পরিচালিত বালিকা বিজ্ঞানরীতেই পড়ে; ত মিসেস্ রায় ও তাঁহার কস্তার মেয়েদের পড়া বলিয়া দেন। ও খাওয়া-পানীয় খরচ মাসে মাসে তাঁকার কিছু বেশী পড়ে। লিকে দেখিয়া বেশ প্রফুল্ল ও আনন্দপূর্ণ মনে হয়; উপদেশে উচ্চাদের যে পরিত্রতা, আত্মচেষ্টা ও আত্মতাগের শিক্ষা হয়, তাহা উচ্চাদের ভবিষ্যৎ জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার বলিয়া বোধ হয়। সাতের জন্ত এ বোর্ডিং খোলা হয় নাই। বর্ডারদের কাছে যা লওয়া হয়, তাতে খরচ কুলায় না। পড়ে তা মিঃ রায় পূর্ণ করিয়া দেন। তাঁর পত্নী ও কস্তাদের গায় গভীর সঙ্গমুদ্ভূতি আছে। \* \*

মূল কথাগুলি এই :—

[The Indian Spectator.—April 2, 1893.]

far the most notable institution, however, at Lucknow, is an unpretentious Boarding house, managed by a Brahmo lady and her two daughters. Mrs. Prokash Chandra Rai is the manager. She is a gentleman who holds a respectable position, and who is in well to do circumstances. At the age of 35 she and her husband took the vow of Brahmacharya, and have religiously observed it up to date. With her husband's full consent, Mrs. Rai (as I should spell 'Ray') went with her two daughters to Lucknow to study at Miss Prokash's Institution there. One of the

daughters is now 24, the other is much younger. The elder is married, but \* \* \* continues to live with her parents, and to help them in their beneficent works. The younger girl is a pearl. She is unmarried, and looks after the children in the Boarding House with a little mother's care, and sets there the example of true sisterly love and self-sacrifice. Mrs. Ray speaks English fluently, and is well read.

Early in the morning the children in her home offer their prayers in their own simple way, for no set prayers are used, and no compulsion is put upon their tender consciences. Each of the elder boarders is in charge of one or two of the younger, and each keeps a small diary in which she notes down every day her failings and backslidings if any. The boarders attend the female school conducted under Mrs. Ray's supervision, and are helped in their studies at home by her and her daughters. The whole cost of education and boarding amounts to Rs. 7 and odd per month. The children look blithe and lively and the lessons of purity, self-help and self-sacrifice, taught to them by example and precept, are likely to have an enduring influence on their after life. The Boarding House is not kept for profit; indeed, the amount charged to the boarders is much less than the actual cost. The deficit is made up by Mr. Ray who takes the deepest interest in the work of his wife and daughters."

দেখিলে? ৪ খানি ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া কি প্রশংসা পাইলে। দু'একটা কথা বুঝি একটু তাড়াতাড়ি বলিয়াছিলে, বিধান হীরানন্দ তাহাতেই তুলিয়া গেলেন, ও বলিলেন, তুমি ক্রম ইংরাজী বলিতে পার। কিন্তু কি জানি কোন মত্রে হৃদয় হইয়া বলিলেন, যে তুমি well read, অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছ। অথবা, যখন মামুষ মামুষকে ভালবাসে, তখন কোনও অপরূপতা দেখিতে পায় না; তাহাই বুঝি হীরানন্দের ব্যটিয়াছিল। তোমার ছাত্রী-নিবাসকে তুমি 'পরিবার' বলিতে, কারণ ছাত্রীদের দ্বারা পরিবার নিষ্কাশ করিবে, এই সাধই ছিল। হীরানন্দ যে ৭ টাকার কথা লিখিয়াছেন, তাহাও সকলে দিতেন না। কেহ অর্ধেক, কেহ কেহ কিছুই দিতে পারতেন না। বাহা অপরূপ থাকিত তাহা তুমিই পূর্ণ করিতে, আমার কাছেও আবেদন করিতে হইত না। খরচ পত্রের তার তোমারই মস্তকে ছিল। কখনও দেখিতে, যে সমস্ত থাকা সঙ্গেও কস্তাদের পিতা-মাতা তাহাদের ব্যয়ের জন্ত কিছু সাহায্য করিতেছেন না; তুমি কিন্তু

কাহারও কাছে চাইতে না, নীরবে সকল ব্যয়ভার বহন করিতে। কখনও কখনও অচল হইয়া উঠিত, তবু কাহারও নিকট আপনাদের দুর্ববস্থা কথ্য জানাইতে না। একদিন আহার করিতে করিতে একজন বন্ধুর কাছে তোমার অর্থাভাবের কথা বলিতেছিল। আহারান্তে নির্জনে হইলে তুমি আমাকে অনুরোধ করিলে, এবং বলিলে, “কেন বন্ধুর নিকট অভাবের কথা জানাইলে? ইহাতে যে গুণবানের নিন্দা করা হয়।” আপনার সম্মানসের বক্তৃতা করিয়া, নিজে অধাশনে দিন কাটাষ্টয়াও তুমি তোমার ছাত্রীনিবাসকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলে। ইহা দেখিয়াই হীরানন্দ তোমার পরিবারে যুদ্ধ হইলেন, এবং স্বদেশে গিয়া আপনার দুটি কক্সাই তোমার হাতে দিবার সঙ্কল্প করিলেন। যেমন সঙ্কল্প, তেমনি কার্য্য করা তাঁহার স্বভাব ছিল। কক্সা দুটি সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। কোথায় কিছু প্রদেয়, আর কোথায় বেহার, কক্সা দুটিকে এত দূরে পাঠাইতে হইবে বলিয়া সম্বোধিত হইলেন না। লাক্ষী আসিয়া তাঁহার একটি কক্সা লীড়িতা হইলেন। হীরানন্দ যৎপরোনাস্তি সেবা করিলেন; কক্সা নীরোগ হইলেন, কিন্তু পথে আসিতে আসিতে তিনি নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তোমার গৃহে আসিয়া যখন আশ্রয় হইলেন, আমি তখন বাটীতে উপস্থিত ছিলাম না। তুমি নিজেই চিকিৎসার ও সেবার আয়োজন করিলে, এবং যাত্রাতে হীরানন্দের কষ্ট না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলে। নিজ গৃহের ঘরটি স্বাস্থ্যকর ময় মনে হইবা মাত্র পরেশের স্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহার একটি ভাল ঘর চাহিয়া লইলে। হীরানন্দের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছিল; পরশ বাটী ছিলেন না। অল্প একজন ডাক্তারদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলে, “আমনি চিকিৎসার ভার লউন, যত ব্যয় হইবে আমার কাছে পাইবেন।” ডাক্তার বাবু তোমাকে জানিতেন। তোমার উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। হীরানন্দ স্থানান্তরে রহিলেন বটে, কিন্তু তোমার পরিচর্যা বাড়িল। পরিবারের, বিজ্ঞানসের, ও হীরানন্দের সেবা কার্য্য অকাতরে করিতে লাগিলে। যখন রোগ বাড়িতে লাগিল তোমার সেবাও বাড়িতে লাগিল। আহার ঔষধ তোমার হাতে খাইতে ভালবাসিতেন। শেষে মুহূর্ত্ত যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই রোগী ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শেষে দাঁত বন্ধ করিলেন। সকলে ঔষধ দিতে বিরত হইলেন। তুমি কোথায় গিয়েছিলে, গৃহে প্রবেশ মাত্র জিজ্ঞাসা করিলে, ঔষধ খাওরান হয় নাই কেন? উত্তরে জানিলে যে বোগী মুখ বন্ধ করিয়াছেন, বিশেষতঃ এখন আর ঔষধ খাওরাইয়া বিরক্ত করা কেন? তুমি বলিলে, তাও কি হয়? যতক্ষণ খাদ্য আছে, ততক্ষণ আমাদের কর্তব্য করা উচিত। ঔষধের পাত্র লইয়া হীরানন্দের মস্তকের নিকটে গেল, আর “দাদা, দাদা, ঔষধ,” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলে। শ্রবণমাত্র তিনি মুখ খুলিলেন, এবং ঔষধ পান করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি ১৩ই জুলাই ১৮১৩ মহাপ্রয়াণ করিলেন। কক্সা দুটির বিজ্ঞাপিকা বন্ধ হইল, তাঁহার সিদ্ধান্তে কিয়দা গেলেন।

চতুঃশ্রীংশ পারিচ্ছেদ

আরও ত্যাগ, আরও বিধা

পূর্বেই বলিয়াছি, এখন কর্তব্যের অমুরোধে তুমি অনেক সময় ঝিকপূরে বাঁধা থাকিতে, কর্তব্যের অমুরোধে আবার আমাকে



নিয়মিত নিম টুথ পেস্ট ব্যবহার করুন!

বাল্যকাল থেকে নিম টুথ পেস্ট ব্যবহার করলে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাঁত ও মাড়ি অটুট থাকে।

নিম টুথ পেস্ট-এ নিমের সহজাত সকল গুণাবলী সম্মিলিত তো আছেই, তাছাড়া আধুনিক দন্ত-বিজ্ঞানসম্মত শ্রেষ্ঠ উপকরণগুলির সঙ্গে এর মধ্যে ক্রোরোফিলও আছে। ইহা দন্তক্ষয়কারী জীবাণু নাশ করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে ও শ্বাস-প্রশ্বাস নির্মল ও সুরভিত করে।

অত্যাচ্ছ টুথ পেস্ট আপেক্ষা দাঁত ও মাড়ির উৎকর্ষ সাধক অধিকতর গুণাবলী সমন্বিত নিম টুথ পেস্ট নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।



দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লি., কলিকাতা-২২



সময় বাহিরে থাকিতে হইত। ইহাতে তোমার অনেক সময় ক্লেশ হইত। ইহার উপরে ত্যাগের ধর্ম পালন মনের সংগ্রামকে আরও ঘনীভূত করিয়া দিত। এক এক বার তোমার অভিশয় কঠিন বোধ হইত। তোমার দৈনিকে সে সংগ্রামের চিহ্ন অনেক স্থানে আছে, কিন্তু পশ্চাৎপদ কখনও হও নাই। আমি যখন কোনও নূতন নিয়ম বা সাধন তোমার নিকটে ধরিতাম, কখনও কখনও তোমার তাহাতে ক্লেশ পাইতে হইত। কখনও বা তোমার মনে হইত, যে আমি ইচ্ছা করিলে আরও অধিক সময় তোমার কাছে থাকিতে পারি। ইহাতে কোনও সন্দেহ ছিল না; কিন্তু আমার অভিপ্রায় কি? যে শরীর নিশ্চয়ই থাকিবে না, তাহার উপর যদি তোমার ও আমার যোগ স্থাপিত থাকিত, তাহা হইলে আজ কি হইত বল দেখি?

তোমার এই সকল সংগ্রামের ছবি তোমার দৈনিকে ও পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; প্রধানতঃ সে সকল হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

“৩০শে জুলাই ১৮৯৩। স্বর্গের সন্নি! তোমাকে নমস্কার করিতে বড় ইচ্ছা করিতেছে। তোমার মৃগা এখনও আমি বৃত্তিতে পারি নাই। তাই এত কষ্ট পাইতেছি। তা বেশ হইতেছে; এখনও দীন আছে। মার রূপা হয় তো অবশ্যই বৃত্তিতে পারিব। তবে নমস্কার করি। তুমি আমাকে আলীর্বাদ কর, আমি যেন তোমার মৃগা বৃত্তিতে পারি। আজ বিদায়। তোমার যোহা।”

“আজ ১ই জুন ১৮৯৩, ‘মনের’ নামক স্থানে আসিয়াছি। উপাসনা ভাল, মন ভাল। এই স্থানে অনেক মুসলমান গীরের গোর আছে। ১০ই জুন একটি বড় গোরস্থানে সন্ধ্যার সময় হামিসহ অনেকরূপ বসিয়া পরলোক চিন্তা করিলাম। একবার মন কল হইয়াছিল। বাহিরে সিঁড়ির উপর গায়ের চাদর রাখিয়া আসিয়াছিলাম, খুব বাতাস হইতেছিল, মনে হইতেছিল, যদি উড়িয়া যায়! অমনি চেতনা হইল, আর সে চিন্তা রহিল না, নিরাপদে নাম গরিয়া, পরলোক চিন্তা করিয়া ফিরিলাম। এই শিক্ষা হইল যে পথনের পূর্বে সংসারকে এমন করিয়া দূরে রাখিয়া আসিতে হইবে, যন ঐ সময় আমার মত কাহারও বিপদে পড়িতে না হয়। মনটা কিছু মুগ্ধও গেল, পাগলো।

“১১ই আর একজন গীরের কথা শোনা গেল। তিনি কাপড় নিতেন, তাঁতের দু’ধারে কোরাণ রাখিতেন। যখন যে দিকে সিন্ধেন, তখন একবার করিয়া কোরাণ পড়িয়া লইতেন। আজ উপাসনায় ঠিক হইল, শরীরের স্পর্শস্থ পরিচয় না রিলে সেই চিন্ময় স্মৃতি, অনন্ত যোগ হইবে না। উপাসনা খুব ভাল হইল, কিন্তু আমার মনের উপর যেন একটা কি ভার পড়িল। ৫ চেষ্টা করিলাম কিছুতে সে ভার যেন কমে না। ব্রহ্মল্যাম, মীরের শরীর স্পর্শেতেও আমার আসক্তি আছে, ছাড়িতে হবে।

“১১ই জুন, উপাসনা ভাল। আজ হইতে আমরা উভয়ে ১বার রোয়া উপাসনার স্তম্ভ ব্রতী হইলাম। মন খারাপ। ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই, ১৯ই, ২০ই, ২১ই, ২২ই, ২৩ই, ২৪ই, ২৫ই, ২৬ই, ২৭ই, ২৮ই, ২৯ই, ৩০ই, উপাসনা ভাল, মনকে ভাল করিবার স্তম্ভ উভয়ে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু পারিতেছি না। পাগলো দেখি ছাড়িতে এত

কষ্ট! ১৫ই উপাসনা ভাল, মন সেইরূপ ভার, একটু ভাল।

“১৬ই উপাসনা ভাল। রাতে স্বামীর শয়নের পূর্বের প্রার্থনা শুনিয়া মনের আশ্রয় দূর হইল। প্রাণে যেন কে আলো জ্বলিয়া দিল। এ কয় দিন যেন একখান খুব বড় কাল মেঘ আমার মনের উপর রাখা ছিল। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন মন্দ ভাব ছিল না; কিন্তু মন যেন মেঘে ঢাকা ছিল। যেমন আলো জ্বলিল, অমনি স্বামীর স্বন্ধে মাথা দিয়া অনেক চক্ষের জল পড়িল, ও কয়দিনের অনেক কথা ছিল, সকল বলিলাম। কেমনে জীবনে পূর্ণতা আসিবে, এ বিষয়ে অনেক কথা কহিয়া উভয়ে শয়ন করিলাম।

“আজ ১৭ই জুন ১৮৯৩, আজ দানাপুর আসিতেছি। পথে উপাসনা খুব ভাল, আমার গাছের তলায় বসিয়া। ঈশ্বর যেন বসন্তরূপে হইয়া আমাদের মধ্যে বাস করিতেছেন। সকল আমারই এক বস; আমাদের এই পরিবারের সকলেরই যেন এক চরিত্র হয়।

“২১শে জুন, সন্ধ্যায় স্মৃতি অন্ত হইতেছেন, তাহার ভিতর ব্রহ্মদর্শন। শয়নের সময় একবার তর্ক করিলাম। একটু পরে ব্রহ্মীয়া অনুভূত হইল, সেই জগৎ বাস্তবিত্তে ভাল বৃন্দ হইল না।

“২৩শে জুন রাত্রি ৩টার শয্যা উপাসনা, মন ভাল। অঃ প্রকাশ, যিনি আমাদের, তাঁহাকে সমস্ত দিন প্রাণের ভিতর দেখিতেছি। এই বোগ যদি থাকিত, তবেই সত্য মিলন। অভাব বোধ কম। আজ স্বামী বেহায়ে গিয়াছেন। ১২টার সময় বড় পুত্র সহ তাঁহারই স্তম্ভ ছোট উপাসনা আবার করিলাম। এখনও জননী উপর পূর্ণ নির্ভর হয় নাই, কারণ স্বামী নাই বলিয়া রাতে চোরের ভয় আসিতেছে; কিন্তু কাহাকেও বলিতেছি না। এক একবার বোধ হইতেছে যেন স্বামী আমাদের নিকটেই আছেন; ইহা ভ্রম নয় এমন বোধ হইতেছে। এইরূপে বিশ্বাস বাড়ে। রাতে সুনিদ্রা হইল, কোন চিন্তা হইল না। মা কোল পাতিলেন, সেই কোলে সকলকে লইয়া শয়ন করিলাম।”

১লা জুলাই তোমার নয়াতোলা বারীতে দোস্তার নূতন ঘর উৎসর্গ করা হইল। এ গৃহে কোনও অন্তঃস্থ আচরণ হইবে না, শারীরিক ভোগ লইয়া এ ঘরে বাস করা হইবে না, এই সঙ্কল্প লওয়া হইল। যত দিন দেহে ছিল, এ সঙ্কল্প পালন করা হইয়াছিল। তুমি ঐ নূতন গৃহকে অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিলে। আজও এ ঘরটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

১১ই অক্টোবর, রাত্রি ১১টার সময় বন্ধু খেলাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কস্তা শ্রীমতী সুকুমারী পরলোক যাত্রা করিলেন। খেলাতচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী এত ব্যস্ত করিলেন, তুমিও সাধ্যমত সেবা করিলে, কিন্তু প্রিয় কস্তা দেখে থাকিলেন না। মাতাপিতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। বাঁহার ধন তিনি কিরাইয়া লইলেন। তুমি সেই রাতে শোকাভূত মাতার সঙ্গে ছিলে। সাধ্যমত সাহায্য দিতে চেষ্টা করিলে। সুকুমারীর যথেষ্ট ব্যস্ত করিতে পার নাই বলিয়া তোমার মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। বিশেষ তাঁহাকে লইয়া প্রথমে বিজালায় আরস্ত, তাঁহার লেখাপড়া হইতেছে না বলিয়া ঐ স্মরণ লক্ষ্যে নগরীতে কালাপান। সেই সুকুমারী চলিয়া গেলেন। শোকসন্তপ্ত পিতামাতার কষ্টবিশিষ্ট শান্তি হইবে



বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া বিদেশ ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। হরিদ্বার ও লক্ষী হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে।

১৮১০ সালের ডিসেম্বর মাসের ডায়েরী পাইয়াছি। কয়েক দিনের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। “১ই ডিসেম্বর,—সাপু অবদারনাথের বার্ষিক শ্রাদ্ধ। প্রার্থনা,—আমি অবদার দাস হইয়াছি, তাই তোমার দাসত্ব করিতে পারি না। অবদার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তোমার দাসত্ব বাগাতে করিতে পারি, তুমি সেই বল দাও। ১০ই একবার বিশানের প্রতি একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম। সন্ধ্যায় সময় অনেক গোলমালের ভিতর শান্তভাবে রক্ষা হইয়াছিল। প্রার্থনা এই ছিল, যে চরিত্রে তোমাকে পাই, তোমার সম্মান হইতে পারি, সেই চরিত্র দাও। উপাসনা ভাল, কিন্তু মনটা একটু শুষ্ক ছিল। কেন একপ হইল তাহা ধরিতে পারি নাই। ঘরে তুলো ছিল, তাহাতে একটি মেয়ে আগুন লাগাইয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া একটু দৌড়ে আসিয়াছিলাম। আসিবার সময় যোগ ছিল না। পরে ভগবানকে খরণ হইল। সেই মেয়েটিকে একটু মিষ্ট করে বসিয়াছিলাম।

১১ই ডিসেম্বর। আজ মার বাৎসরিক ছিল। প্রার্থনা ছিল, চিন্ময় যোগে আরও বাড়িতে দেও। আজ একটি অনাথ পরিবারের নিকট গিয়াছিলাম। এই জ্বলোকটির সম্মান হইয়াছে, ও এই অবস্থায় অর ও বিকার হইয়াছে। যথাসাধ্য তাঁহার কিছু কাঙ্গ করে সুখী হইলাম। কিছু ছিন্ন বস্ত্রাদি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করে দিলাম। সন্ধ্যায় বাড়ী আসিয়া একটি ধনী পরিবারের নিকট গিয়া ঐ অনাথ পরিবারের গল্প করায় তাঁহারাও কিছু বস্ত্রাদি দিলেন। তাহা লইয়া ফটকে আসিয়া দেখি গাড়ী নাই, সুতরাং হাঁটয়াই বাড়ী আসিতে হইল। একবার মনে হইল, ধনী পরিবার যদি জানিতে পারেন, কি বলিবেন। কিন্তু অমনি মনে হইল, আমার তো এই কাঙ্গ। সেই জ্বলোকটির একখানি লেশের জগ্ন দুইটি বন্ধুর বাটী গিয়াছিলাম, কিন্তু একজন গ্রাস্ত করিলেন না, অগ্ন ভগিনী একটি টাকা আনিয়া দিলেন। মনটা বড় গরম হইল। তখনই যেন ভিতর হইতে কে বলিল, ভিক্ষুর আবার বিচার অভিমান কি? তখনই সে ভাব চলিয়া গেল। টাকাটি লইয়া বাটী আসিলাম; আসিয়া আহারে বসিয়াছি, একটি বন্ধু লেগের আর বাহা লাগিবে ততটুকু সাহায্য নিজেই করিলেন, আশ্চর্য্য হইলাম।”

এইরূপে যোগ, শোক, অর্ধচিন্তা, কাণ্ডভার ও ত্যাগের ক্রেশ বহন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলে। আপনি যে শুণ্ড উঠিতেছিলে, তা নয়, আমাকেও উঠিবার সাহায্য করিতেছিলে। আমাকে ভালবাসিতে বটে, আসক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইত তাহাও সত্য, তথাপি স্বীকার করি, তোমার ভালবাসা অন্ধ ভালবাসা ছিল না। ৩০শে ডিসেম্বর আহার করিবার সময় আমার অহঙ্কার হইয়াছিল, তুমি

তাহা বৃষ্টিতে পারিয়াছিলে। নিম্নে এক অত্যন্ত প্রিয় ভাষায় তুমি আমার অহঙ্কার দেখাইয়া দিলে। আমি পূর্বে নিজের দোষ বৃষ্টিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার ভালবাসার গুণে এ সংশোধন কার্য্যও অত্যন্ত মিষ্ট মনে হইল। ভালবাসা দোষ দেখিলে চূপ করিয়া থাকে না, মিষ্ট ভাষায় উপযুক্ত সময়ে দোষ ধরিয়া দিয়া প্রেমাস্পদের চরিত্র সংশোধন করিয়া উন্নতির সহায়তা করে। দোষকে তুমি কখনই উপেক্ষা করিতে না, এ বিষয়ে আমি সাক্ষী।

এ বৎসর খৃষ্টোৎসবের সময় ভগবান তোমার বিশ্বাস পরীক্ষার জন্য বিশেষ আয়োজন করিলেন। খৃষ্টোৎসবের ব্যয়ভার তুমিই বহন করিতে। কিন্তু এখন পরিবারে এতগুলি কষ্ট থাকেন, তাই পূর্বের মতন আর সব সময় হাতে টাকা থাকে না। বৎসর অনেক সময়, বিশেষতঃ মাস শেষের সময় বিশেষ টানটানি হয়। এবার খৃষ্টোৎসবে কি হইল, তাহা তোমার দৈনিক লেখা আছে।

“২৫শে ডিসেম্বর, খৃষ্টমাস, বাগানে উপাসনা। প্রায় ৫৪জন উপাসনায় উপস্থিত। তাহার ভিতর পাঁচ-ছয়টি বালক-বালিকা। এতগুলি লোক আহাির করিবেন। আজ আর কিছু নাই আহািরের। গত রজনীতে একবার মনে হইল কি হইবে? কিন্তু মার উপর নির্ভর করিয়া নিদ্রা গেলাম। সকালে ৭টা পর্য্যন্ত বিছানায়, শরীর অসুস্থ থাকায় কল্যাণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইবে? বলিলাম, সকল মেয়ে-ছেলেদের নিকট ভিক্ষা কর। দু’ পয়সা, আড়াই পয়সা, এইরূপে এক টাকা হইল। এই পয়সা দ্বারা চাউল ইত্যাদি খরচ করিয়া যাত্রা করা গেল। সেখানে গিয়া দেখি, অনেক পরিবার হইতে পুত্রি, মিঠাই, কুটি, মুড়ি ইত্যাদি আসিয়াছে। সেবু কিছু লইয়াছিলাম, কিছু অস্ত্রেরা আনিয়াছিলেন। এইরূপে খুব ভাল আহািরাদি হইল। পায়ের আসিয়াছিল। ৫৪জন আহাির করিয়া কিছু চাউল বাঁচিল এবং ৪ জনের ভাতও বাঁচিল। ঈশ্বর কথা মনে পড়িল, তিনি দুটি মাছ ও দুইখানি কটীতে কেমন করিয়া এক লোককে খাওয়াইয়াছিলেন, আর বাঁচিয়া ছিল। ফলে বিশ্বাসই মূল। সন্ধ্যায় অবশিষ্ট বাহা ছিল সকলে আহাির করিলেন। যিনি ভাণ্ডারী তিনি বলিলেন, কালিকার জগ্ন জল ও লবণ ভিন্ন কিছু নাই। বলিলাম, আজকের তো হইয়া গেল, কালকার বিষয় আজ আর ভাবিব না। কাল যেমন হয় হইবে। তাহাও তাই বলিয়া বিলয় লইলেন। ঘরে আসিবামাত্র স্বামী মহাশয় বলিলেন, তোমার বিশ্বাসের পুরস্কার লও। এই বলিয়া ৫০ টাকা দিলেন। পাইয়া অবাক হইলাম; কোথা হইতে আসিল, ভাবিয়া পাইলাম না। পরে বলিলেন, মোকামা হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই অপূর্ব্বকৃত্ত পাল এই টাকা পাঠাইয়াছেন, এই ক্ষুদ্র পরিবারের জগ্ন। মার দয়া দেখিয়া সকলের বিশ্বাস শতগুণ বাড়িল। আজ প্রার্থনা ছিল, বিশ্বাসরূপ শিশুকে যেন বড় রক্ষা করিতে পারি।

[ ক্রমশঃ।

[ বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন ]

# সেবিয়েডের দেশেদেশে

মনোজ বসু

২৩

সকালে বেরলাম ফিনল্যান্ড উপসাগর বে দিকটায়। শহরতলী।

জলা-জায়গা মাঝে মাঝে, সবুজ ক্ষেত, কাঁকা কাঁকা বাড়ি। দূর থেকে ঐ ঘন পাহাড় বলে মালুম হচ্ছে। উঁচু, পাহাড় নয়—খেলোয়াড়ার ষ্টেডিয়াম, কিরভের নামে বানিয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। চোখ জুড়িয়ে গেল—আহা-হা, সীমাহীন সমুদ্র! ফিনল্যান্ড উপসাগর। সবুজ দ্বীপ একটা—দ্বীপটা এদের নয়, ফিনল্যান্ডের এলাকায়। বড় রকমের একটা লাফ দিলেই তবে তো ফিনল্যান্ডে গিয়ে পড়া যায়। আমার বাঁহাতের দিকে অনেকটা দূরে জাহাজ গাদাগাদি হয়ে ভাসছে। বন্দর। থাসা বেড়ার জায়গা—ঘরে ঘরে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করছি। বসবার আসন ধরে ধরে নেমে গেছে ভিতর দিকে। সমতল কেন্দ্রভূমি খেলার জায়গা।

শহরে কিরে মোটরগাড়ি ছেড়ে দিলাম। পায়ে না হাঁটলে মজা পাওয়া যায় না। এরাস্তার গুরাস্তায় ঘুরি, দোকানে ঢুকে এটা-ওটা সওদা করি। যেখানে ঢুকি, সাড়া পড়ে যায়। মূখে না বলুক, চাউনিকে ঠাছর পাই। খাবার কিনে যাচ্ছে বহু লোক পথে ধাঁড়িয়ে—আমার দেশে হামেশাই যেমন দেখতে পান। তাই দেখে এলাম, মানুষ সকল জায়গায় এক। সেই একদিন মন্সায় মথেক্সিলাম। গাড়িঘোড়া অগ্নাহু করে রাস্তা পার হয়ে মায়ুষ বঁধানে ছুটেছে। বাপার কি—কোন সিনেমাষ্টার বেরিয়েছেন নাকি যথেষ্ট। অতএব ভুজ প্রাণ গাড়ির নিচে যায়ই যদি, কী করা হবে! শুধু এদেশের মানুষকে মিছামিছি দোষন আপনায়।

কেনাকাটায় কেট-পাটলুনের বিশাল উদরগুলো ভর্তি। এরাস্তা গেলি ঘরে ঘরে ছোট্টো ফিরলাম, বেশ দেরি হয়ে গেছে। নাকে খে লাগে শুধু তক্ষুণি আবার কেউ কেউ বেরবেন এদেশের বানাসতে কি ধরনের বিচারকন হয় দেখবার জন্য।

কিছুদিন থেকে এক বিদেশি সাহেবকে দেখতে পাচ্ছি। মন্সায় গেছি, তাসমন্ডেও দেখেছি একবার। হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যেও নজরে পড়ে যাবে এমন বেচন লম্বা। গুয়ারো এক ভাল-ক। সেই ভদ্রলোক আন্তোরিয়ায় এসে উঠেছেন। আমাদের শ এবং বৃটিশ আমল হলে ভারতীয় পুলিশের স্পাই পিছু নিয়েছে। আমাদের দিকে এক দৃষ্ট তাকিয়ে থাকেন ভদ্রলোক। তাকাতাকি ধন আর আসলের মধ্যে আনিনে। বিধাতাপুরুষ রূপ দিয়েছেন—সুকে কালো বং, কালোবরণ চুল—অভাগ্য বর্ণহীন সাদা-চামড়ার। দেখবেই তো তাকিয়ে তাকিয়ে। দেখে হিংসার ফেটে যাবে।

লাউঞ্জে বসে ভদ্রলোক। হঠাৎ আজ কথা বলে উঠলেন, মাপ করেন, আপনাকে এর আগে দেখেছি।

প্রশ্নিত, কিছুই আমি মনে করতে পারছিলাম।

থাকেন কোথায় আপনি? কলকাতায়? তবে কলকাতায় দেখে থাকব।

আমি জানি ভাঁওতা এটা। আসাপ জমানোর কায়দা। তর্ক না করে মেনে নিতে হয়। অস্বাচিত্তভাবে আত্ম-পরিচয় দিচ্ছে : ওয়াশিংটনে থাকি আমি। ব্যবসায় আছে। কংগ্রেসের মেম্বর। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো নেশা-বিশেষ। আমার মশায় কেউ নেমস্তম্ভ করেনি, গাঁটের পয়সায় এসেছি, পয়সা খরচ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

থাকবেন কতদিন?

থাকবার জো আছে? ছাঁটা মাস এ-রাজ্যে থাকলে ফতুর হয়ে যাব, ব্যবসা লাটে উঠবে। পনের আতিথ্যে আছেন—টের পান না, কী সাংঘাতিক খরচ এদেশে। এক্সচেঞ্জের চড়া হার—এমনি কায়দা করে রেখেছে, বিদেশের কেউ যত টাকাপয়সা নিয়ে আসুক পলকে সব কপূর হয়ে উবে যাবে। মানেটা দাঁড়াচ্ছে, বিদেশিরা আসাযাওয়া করুক এরা সেটা চায় না।

আমরাও বুঝছি। অনেকেই আমরা ট্যাভেলারস-টেকে টাকা নিয়ে এসেছি, এটা-ওটা কিনে নিয়ে যাবো। কিন্তু দর শুনে উৎসাহ একেবারে হিম। একজোড়া ছুতো দেড় হাজার কবল—হোন না আপনি রাজা রাজবল্লভ, ও ছুতোর একটা পাটিও তো ট্যাকে সইবে না আপনার। অবশু বোজগার করলে পুথিয়ে যায়—বোজগারও হাজারের মাপের। একটা ছোট্টো হাজার কবল দক্ষিণ। অত ঘোরাবুরির মধ্যেও বক্তৃতাতির ব্যাপারে সহস্রাধিক বোজগার হয়েছিল, দরাজ হাতে সেই অর্থ ব্যয় করে এলাম। রূপকথায় সেই যে আছে, তোর বউ তাকে দিয়ে খাওয়ালাম এই আমার কলা!—সেই জিনিষ আর কি!

কার্ল মার্কস ফ্যাক্টরিতে গেলাম বিকাল বেলা। টিপটিপে বৃষ্টি—বছরের এই সময়টা লেনিনগ্রাদ মুখ পুড়িয়ে থাকে। জারের আমলের ফ্যাক্টরি—পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে। অনেকখানি জায়গা, অসংখ্য যন্ত্রপাতি। আগে খালি হুতার কাপড় হত, এখন রেন তৈরির বিরাট ব্যবস্থা করেছে। নতুন কয়েকটা যন্ত্র বানিয়েছে এখানকার মিস্ত্রিরা—তার জন্ত বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হয় তাদের!

বিদায় লেনিনগ্রাদ! বিপ্লবের শতক স্মৃতি বার সর্বত্র ছড়ানো। নিপীড়িত জনগণ নতুন আত্মবিশ্বাসে ফেটে পড়ল যেখানে। নতুন সমাজব্যবস্থার সর্বপ্রথম পত্তন। রাত ১১-৪০-এর ট্রেনে চেপে যাবো ফিরছি। বিশেষ ট্রেন দিয়েছে। ইঞ্জিন জোরে ছোটায় না। শ্রিষ্ঠের দরাজ ব্যবস্থার বাঁকুনিও নেই। ট্রেনে যাচ্ছেন না তো—মনে হবে, কোন নাবাব-বাদশার শুমশহলে আরামে গদিয়ান হয়ে আছেন। কাচের আঁটা জানলার বাইরে তাকিয়ে তখনই কেবল

মালুম হবে। আমাদের ইতরসাধারণের জ্ঞে তো এই—শিতার উপরেও শিতামহ আছেন। দলের নেতা-উপনেতারা যে কামরায় বাচ্ছেন, যেখানে চুকে মনে হবে ইন্দ্রলোকের খানিকটা কেটে এনে ইঞ্জিনে জুড়ে দিয়েছে। একটা কথা সবিনয়ে নিবেদন করি। সাম্যবাদের দেশ বটে, কিন্তু নেতা ও সাধারণের মধ্যে এরা দস্তরমতো ফারাক রেখে চলেন। রেলের কামরা, হোটেলের ঘর এমন কি পথে-ঘাটে সাময়িক ব্যবস্থার মধ্যেও তফাৎটা তিলকের তরে ভুলতে দেন না।

রেডিও শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকাল ঠিক আটটায় আবার রেডিও শুরু। কেমন করে থামানো যায়, রাতে কিছুতে ধরতে পারি নি। দিন মানে আধ-মিনিটের মধ্যে কায়দা পেয়ে গেলাম। নটা—দশটা। মস্তায় পৌছতে আর পঞ্চাশ মিনিট কুরাশায় চারিদিক ভরে আছে। দিনমানে বোদ হয়, এবস্তকার ধারণা ভুলে গেছি ইদানীং। জলা জায়গা অনেক দূর ব্যাপ্ত। বড় জঙ্গল—অজস্র ফারগাছ। মাঠ আসছে মাঝে মাঝে—চরা খেত। ক্ষেতের ধারে গ্রাম। সাদা ফুল যেন মুঠি মুঠি ছড়িয়ে দিয়েছে ক্ষেতের উপর। বরফ পড়ে আছে বোধ হয়। মুবগির দল খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে। সবুজ তৃণভূমি আসে হঠাৎ ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে। হুশ-হুশ করে এক একটা ঠেঁশন পায় হয়ে যাচ্ছি। প্রাটফরম বেশির ভাগ কায়ের উঁচু পাটাতনের উপর। অত্যন্ত নাবাল অকস, অতএব মালুম পাওয়া যাচ্ছে।

সেই হোটেল মেট্রোপোল। ঘর পাঁচটে গেছে অনেকের, আমরা কর্পাল ক্রমে পুরানো ঘর পেয়ে গেলাম। নিতান্ত নইলে নয় এমন ছ'চারটে জিনিষ সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, বেশির ভাগ গাঁটরি-বাঁধা ছিল এখানে। গাঁটরি খুলে ছড়িয়ে আবার দিবা গৃহস্থালি জমিয়ে বসা গেল। কাল ৭ই নবেম্বর—সারা সোবিয়েত দেশ জুড়ে নবেম্বর-বিপ্লবের বার্ষিক উৎসব। আজকের দিনটুকু অবগত বৃথা কাটাচ্ছি না—বিকালবেলা সিনেমা, রাত্রে পুতুলনাচ। উৎসবের জন্ত চতুর্দিকে সাজ সাজ পড়ে গেছে, বাতারাতেও মুখে সমস্ত দেখা যাবে।

সপ্তাহে সপ্তাহে একরকম চটি বই বেরায়—মস্তো সহরের চুয়ালিশটা থিয়েটার ও বাবতীয় সিনেমায় কবে কোন পালা হচ্ছে, ছাপা থাকে সেই বইয়ে। তাই থেকে বুকে নেবেন; যে পালা দেখবার ইচ্ছা, বখাসময়ে সেখানে হাজিরা দিতে পারবেন। আমাদের নিয়ে হাজির করল, সে-বাড়ির একতলায় দোতলায় দুটো সিনেমা হল। নিচেঘটা ছোটদের। পালা সেই মাত্র শেষ হয়েছে, হলের ভিতর দিয়ে চললাম। শিশুরা হাততালি দিয়ে ঘোরতর খাতির জানাচ্ছে।

সিনেমা ছবি চলে বটে রাশিয়ার, তোড়জোড়ও বেশ, জনপ্রিয়তা কিন্তু থিয়েটারের মতন নয়। ছায়ার মন ভরে না, জীবন্ত মানুষদল দেখতে চায় মানুষ। আমরা অন্তত এই ধারণা। নীচে ক্রাস (creche) আছে বাচ্চাদের জন্ত; নানান রকম খেলনা, খেলা-মুলায় ভুলিয়ে রাখবার জন্ত নাস মোতারেন আছে। এইখানে বাচ্চা রেখে মায়েরা ছবি দেখতে গিয়ে বসেন। পালা ভেঙেছে, ঘরে যাবেন এইবার—খেলা

ছেড়ে ছেলে কিছুতে উঠবে না। কত রকমে মা লোভ দেখাচ্ছেন—বাড়িতে গিয়ে হেনো দেব তেনো দেব—বাচ্চা কানোও নেয় না। কাড়িয়ে কাড়িয়ে এই মজা দেখলাম স্বপ্নকাল।

পুতুলনাচ। আমেরিকায় সিনেমা-ছবি তোলার ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টাবিজ্ঞপ। পুতুলের মুখে ভাববিচার নেই, কিন্তু তড়িৎখিঁড়ি অঙ্গ-চালনায় হুবহু জীবন্ত বানিয়ে তুলেছে। ছবি তুলবেন ডিরেক্টর; সেই ছবি চালান হয়ে যাবে ইউরোপে। রেডিও শুনে বিষয়টা তাঁর মাথায় এসে গেল। টেলিফোনে তলব দিচ্ছেন সইকারীদের। সেক্রেটারি মেয়েটা ঘুমুছিল—আলুখালু ভাবে চুটে এসে টেলিফোন ধরল আধেক-বোজা চোখে। সেক্রেটারি খসখস করে বোটা নিচ্ছে ডিরেক্টর যেমন-যেমন বলছেন। মেয়েটার চোখের পাতা ঘন ঘন ওঠে পড়ে—ওটা মুজা দোষ, অথবা ব্যাধি। এর পরে লোক বাছাবাছি। নটনটনের মাগজোপ হচ্ছে—কিভাবে ঘরে ডিরেক্টর পেট মাগছেন, বুক মাগছেন। নায়ক-নায়িকা বাছাই হয়ে গেল অবশেষে—নায়িকাকে খুঁদ মালিক মশায় সঙ্গে নিয়ে এসে সুপারিশ করলেন। আবার এক কুৎসিত পুঙ্খ—ভিলেন সাজবে সে। এদিককার এক রকম হয়ে গেল। তিনটে মেয়ে একসঙ্গে খটাখটাটাইপ করে যাচ্ছে—ডিরেক্টর বলে যাচ্ছেন। একজনকে বলছেন গল্প, একজনকে সলাপ, আর একজনকে শট ডিভিশনের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। এক সঙ্গে সমস্ত। গল্পটার নাম 'কারমেন'—ক্রেমলিনকে চাপটা চারস-করে নাম দাঁড়াল।

মুটি শুরু এবারে। নায়ক নায়িকাকে চুখন করবে কিছু লম্বা সময় নিয়ে। গাছ থেকে টুপ করে একটা ফুল ধরে পড়বে, সেই সময়টা চুখনের ইতি। ফুল কখন পড়ে গেছে, ক্যামেরাম্যান ব্যস্ত হচ্ছে, এরা হুজুন কিছুতে মুখ ছাড়বে না। ডিরেক্টরের হুমকিতে শেখটা ছাড়াছাড়ি হল তো নায়িকা আয়নায় দেখে ক্ষেপে আগুন। মুখ ইনসিওর-করা, হাসির বিস্তার দাম, চুখন করতে গিয়ে দাঁত বসিয়েছে সেই মহা মূল্যবান মুখের উপর।—নায়িকা গান গাইবে—কি পরিমাণ দূর থেকে হলে কত টাকা, আগাগোলে তারও রেট বেঁধে কটু পাকি করা আছে। গুরু প্রয়োজন সিনের মধ্যে। হস্তদস্ত হয়ে খবর দিল, গুরু পাওয়া যাচ্ছে না। তবে লাগাও মহিষ। মালিক এসে পড়ল এমন সময়ে—ছকের কাগজগুলো পড়ছে। কিছু হয় নি, কিছু হয় নি—কম্মানিষ্টের নিদ্দেশ পালাগালজ আরও বেশী করে ঢোকাতে হবে। কালেকটিভ-কার্যে চাষবাস নয়, আসলে মিলিটারি ব্যাপারে। এমন সব। মালিক কাগজপত্র দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিল। যতদূর ছবি তোলা হয়েছে, সমস্ত বাতিল। গল্প গোড়া থেকে আবার বানাতে হবে।

পুতুল নাচ শেষ হলে যারা সব নাচাচ্ছিল, বাইরে এসে দাঁড়াল। পুতুল আমরা নেড়েচেড়ে দেখছি।

৭ নবেম্বর। বিপ্লবের স্মৃতি-উৎসব। এই বস্ত্র দেখবার জন্ত আমরা পর্বত-মরু পার হয়ে এত আকাশ উড়ে এসেছি। লাল পতাকা আর কান্ডে-হাতুড়ির ছবিতে চারিদিক ঢেকে দিয়েছে। রাস্তার ধারে দুটো হাত দেয়ালেও বোধ করি আজকের দিনে খালি পাবেন না।

রেড কোয়ারে অস্থান। আমাদের হোটেল-মেট্রোপোল থেকে দু-পায়ে পথ। হামেশাই যাই ও দিকটার, ক্রেমলিনের সামনে

দেখে চক্কোর মেরে আসি। আজকে সে পথ বন্ধ। শহরের বাতায় মানুষ ঐ জায়গায় জমায়ত হবে, বাইরে থেকেও বিস্তর আসছেন—যাত্রা-তর্র ষ্টাটবার তকুম নেই। গাড়ি তো চলবেই না।

খানাপিনা তাড়াতাড়ি সারা হল। দোভাষি সবগুলো এসে মেছে। ষ্টাটিয়ে নিয়ে যাবে—কোন পথে কি ভাবে, গিয়ে কোয়ারের হানও অংশ ষ্টাই নেবে, সেই সব ঠিকঠাক করছে নিজেরদের ধো। খুতি-পাজাবি পরে যাব আমি। নিচে অবস্থ আটোসাটো, রম কাপড় থাকবে। চীনের উৎসব-দিনে শিকিনে যেমনধারা রে ছিলাম। দোভাষিদের মধ্যে মীরা সকলের মাতব্বর। সে আড় নয় পড়ল : না, কক্ষণো নয়। মন্থো কী জায়গা, জান না। এই মের মধ্যে কীকা রাস্তার তিন-চার ঘণ্টা দাঁড়ালে নিউমোনিয়া জঙ্গ হবে। সে দায়িত্ব কে নিতে যাবে?

ষ্টাটিছি মস্ত বড় দল হয়ে। যেনিকে রেড-কোয়ার, তার ক ডিন্টোমুখো নিয়ে চলল। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। রাজপথ ছেড়ে ঘটা গলিতে ঢোকল। অনেকক্ষণ এমনি এ-গলি সে-গলি করে ১২ এক সময় দেখি বেসিল-ক্যাথিড্রালের পিছন দিকে এসে পড়েছি। সবেবর যাবতীয় মিছিল রেড-কোয়ার পার হয়ে এইখানে এসে ডুয়ে পড়বে।

লেনিন-মুসোলিয়ামের ডান দিকে ক্রেমলিনের দেয়াল খোঁসে লারি, সেইখানে আমাদের ষ্টাই। নানান দেশের বিস্তর মানুষ বকমারি ভাষা ও বেশভূষা। সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। তে বাধা নেই, কিন্তু বসে পড়লে কিছু নজরে আসে না। রেড কোয়ারের ওপারে আমাদের ঠিক সামনাসামনি বিরাট ষ্টাটলিকা—, অর্থাৎ সর্ববস্তুর সরকারি দোকান। বেসিল-ক্যাথিড্রালের উপরে ভিক্টোরিয়া বসিয়েছে—মিছিল এঁমুখো যাবে, ওখান থেকে ব উঠবে ভাল। স্প্রাটান বৃত্তাবোধী আজ ফুল ও পতাকার ঝানো—ফুলশাখার পালঙ্কের মতো বলমল করছে। লোকারণ্য। স্ত্র আশ্চর্য ব্যাপার, শব্দসাড়া নেই।—এই হাজার হাজার মানুষ টে যেন কুলুপ এটে দিয়েছে। কয়েক দল সৈন্ত গোর্কি বোডের দ দিয়ে এসে বিপ্লব-মিউজিকামের ওদিকটায় মাচ করে চলে এল। সর পদ-দাপ ফীণ হয়ে মিলিয়ে যায় ক্রমশ।

সময় হয়ে আসে। বসেছিলাম, উদগ্র হয়ে সকলে উঠে উঠেছে। ক'টি বাচ্চা ছেলেমেয়ে এদিকে-ওদিকে—আপেল আর গলেট আমাদের হাতে গুঁজে গুঁজে দিচ্ছে। ক্লিক-ক্লিক ফোটা ত নিতে জিজ্ঞাসা করে, কোন দেশের মানুষ গো তোমরা? বলিনের ঘড়িতে সাড়ে-নটা। শুকুতা ভেঙে দিয়ে বাস্তনা গঠে ন দিকে; আর উল্লাসের কঠ। ন'টা-পঞ্চান্ন। দূর প্রান্ত থেকে ব্রাজ ভেসে আসে—মানে বুঝি না, গভীর তীব্র তীক্ষ্ণ এক ধ্বনি। আওয়াজ সারবন্দি সৈন্ত-পুলিশের মুখে মুখে লব্বা হয়ে ছড়িয়ে। দূর-দূরান্তে।

ঠিক দশটা। কী আশ্চর্য, বাতাস উঠল এই সময়ে এক দমক, তে নিচে দূরে নিকটে পতপত করে নিশান উড়ল। লাখ লাখ। পাখী পাখনা বেড়ে উঠছে যেন। একটা জিনিষ দেখছি। ন-ষ্ট্যালিনের ছবি যত্নতর্র—মেলেনকভ তো এখানকার কর্তা ন রাগবেন, ১৯৫৪ অব্দ এখন), তাঁর ছবি দেখা যায় না কেন? কয়েক জায়গায় দিয়েছে। একলা নয়। ক্যাবিনেটের তাবং

মন্ত্রী ছবি একসঙ্গে। তাই জিজ্ঞাসা করি দোভাষিকে : লেনিন-ষ্ট্যালিন থাকলেন তো মেলেনকভ মানুষটার কি দোষ হল?

লেনিন-ষ্ট্যালিনের বিপ্লবে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ওঁরা তাই জাতীয় নেতা। ওঁদের পরে আর কেউ কখনো জাতীয় নেতা হবে না।

সাড়ে-দশটা ক্রেমলিনের ঘড়িতে। ব্যাণ্ড বেজে ওঠে। মিছিলের শুরু। সম্ভ্রিত হু-খানা মোটরে কারা হু-জন সকলের আগে—মেলেনকভ নেই ওর মধ্যে। একটি হলেন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন; অপর জন মুকালিয়েস্কো, মন্থো বিভাগীয় সৈন্তদলের কমান্ডার ইন-চীফ। দলের পর দল সৈন্ত দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ি ঘুরে ঘুরে যায় তাদের কাছে। গিয়ে অভিনন্দন জানায়। সৈন্তরাও আকাশ ফাটিয়ে পাণ্টা জবাব দিচ্ছে।

নেতার তরপর মুসোলিয়ামের ছাতে দাঁড়ালেন। বক্তৃতা হবে। সামনে দিয়ে মিছিল যাবে, সামান্য নেবেন ওখান থেকে। এসে অবধি দেখছি, মুসোলিয়াম কাড়পোছ হচ্ছে, দেয়ালে নতুন করে রং ধরাচ্ছে, কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না। আমাদেরও তাই লেনিনকে 'পুশাখা দেওয়া হয়নি এত দিনের মধ্যে। সমস্ত আজকের এই দিনটার জন্ত। দুই দল ব্যাণ্ড মার্চ করে চলল রেড-কোয়ারের দু'পাশ দিয়ে, মচমচ মচমচ জুতো বাজিয়ে বিপ্লব-মিউজিকামের ওধারে গিয়ে দাঁড়াল। সারা মাঠ নিশ্চল ছিল, কলরোল ছাপিয়ে পড়ছে এখন।

অজ্ঞোবধ-বিপ্লবের সাইট্রিশ বছর পুরল। সাততামামি বক্তৃতা করছেন—কে উনি? মেলেনকভ তো নয়। দেখা যাচ্ছে, প্রধান-মন্ত্রীকে এবার পাত্তা দিচ্ছে না। কুবিরকমীদের জয়-জয়কার। বিস্তর পণ্ডিত জায়গা উদ্ধার হয়েছে, ধারণাভীত ফসল। কাজাক-গণতন্ত্র সকলের সেরা ফসল ফলিয়েছে এবার। বৈজ্ঞানিকরাও খুব কাজ করেছেন। জল ও স্থল সৈন্ত অনেক বাড়ানো হয়েছে। লড়াইয়ের সর্বাধুনিক ব্রহ্মপাতি। দেশে দেশে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। গণতন্ত্রের শক্তি অনেক বেড়েছে এই এক বছরে। এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে অনেকজন এসেছেন। এদেশ থেকেও অনেক গিয়েছে বাইরে। বিদেশি অতিথিরা জেনেবুঝে গিয়েছেন, সত্যিকার শান্তিকামী আমরা। কিন্তু বাইরের অনেকে লড়াইয়ের পায়তারা ভাঁজছে, তাদের সামালবার জন্ত প্রতিরক্ষার কড়া ব্যবস্থা করছি। দেশব্যাপ্ত এই শাস্তির পরিবেশে যে আঘাত হানবে, তার রক্ষা থাকবে না। সেমন্তেও তৈরি আমরা।

বক্তৃতা থামতেই বজনিখোঁব। এক সঙ্গে অনেক কামান গর্জে উঠল ক্রেমলিনের ভিতর দিকে। কামান দেগে বস্তার অভিনন্দন। রেড-কোয়ারের চতুর্দিকে বড় বড় বাড়ি—কামানের আওয়াজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ধোঁয়ার ধোঁয়ার অন্ধকার।

প্যারেড এবারে। গুমের ওদিককার জনতা পদাতিক-বাহিনী আড়াল করে ফেলেছে। চলছে তো চলছেই। বিপ্লব-মিউজিকামের পিছনে এরা সব জমায়ত হয়ে আছে—মানুষের মহাসমুদ্র, এতদূর আগে ধারণার আসেনি। ঝালি-হাতের মিছিল। এদের পরে তলোয়ারধারীরা। তারপরে এক পল্টন এলো, বন্দুক কাঁধে ফেলে তারা চলছে। পরের দলের বন্দুক আকাশমুখো তুলে ধরা। মেসিনগান উঁচিয়ে আসে এবার। বাত্রিক বাহিনী—বিচিত্র চেহারা

এই শিশুটির জন্য

এক মুহূর্তও

ভাবতে হয় না



করন সে

# ল্যাকটোজেন

খেয়ে পুষ্ট



LG/P/21 B

সিলোন রেডিয়ো থেকে 'ল্যাকটোজেন' হিন্দী  
প্রোগ্রামে বীণা রায়ের কথা শুনুন।

রবিবার...রাত্রি ৭টা-৪৫ মিঃ থেকে রাত্রি ৮টা এবং  
বৃহস্পতিবার...রাত্রি ৮টা-৩০ মিঃ থেকে রাত্রি  
৮টা-৪৫ মিঃ।

৪১ মিটার ব্যাণ্ডে

21

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন

নেসল্‌স প্রডাক্টস ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ

পোর্ট ব্লক নং ৩২৬ পোর্ট ব্লক নং ৩১৫ পোর্ট ব্লক নং ১৮০

কলিকাতা

বোম্বে

মাদ্রাস

'F'

১০৮গাড়িতে

১০৮গাড়িতে

আঁকসে গাড়িগুলো গর্জন করে চলেছে, দুনিয়া নখে ছিঁড়বে বেন।  
কের মধ্যে গুরুর করে, কানে তালি লাগে। প্যারাটুপ—  
প্যারাটু নিয়ে চলেছে ট্রাকে। বিমানবাসী কামানের বাহিনী—  
বী-বোবাই সৈন্য, সেই লরী পিছনে একটা করে কামান টেনে নিয়ে  
লছে। ভারী কামান; হালকা কামান—রকমারি কামানের  
ছিল। মাইন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে লাইনবলি ট্রাকের উপর।  
কি চলেছে—গণতান্ত্রে আসে না। ভীষণ আওয়াজ।—পাথরে  
থানো রেডস্কোয়ার গুড়ো গুড়ো করবে নাকি ?

বাগু-পাটী মাঝে মাঝে চুকে পড়ে বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে  
ছে। কালিয়া-কোশার মাঝে চটনিটা বরিয়ে নেবার মতন।

পৌনে এগারো। মিলিটারি প্যারেড চুকল এতক্ষণে।  
চাকাগারী দল আসে নীল পোশাকে। বোল গণতন্ত্রের বোলটা  
লালা পতাকা সার দিয়ে আসছে। নীল পোশাকে তরুণ-তরুণীরা—  
দের পতাকার নেতাদের ছবি। সারা দেশ জুড়ে শত সহস্র  
জাগ—সেই সব দলের লোক আসেও ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে।  
মহুঘর তো সাতটা বং—আজকের উৎসবে বলমলে কত রঙের  
হার, তার কোন লেখাজোখা নেই।

জনসাধারণের মিছিল। মাথার উপরে পতাকা। একটু উপর  
কে দেখছি তো—যেদিকে তাকাই, ঝিলমিল পতাকা উড়ছে।  
র ফুল। সত্যিকার ফুল নয়—রা দেখেছিলম পিকিনের  
সবে, ঠিক দু-বছর আগে। সত্যি ফুল ক'টাই বা ফোটে  
'হাড-কাঁপানো শীতবাজো! দেবার কাগজের ফুল। দলছাড়া  
রকটা মেয়ে এদিকে এসে বিদেশি আমাদের অভিনন্দন দিয়ে  
। আকাশ-ফাতানো উল্লাসধ্বনি। ফুল দিয়ে কাস্তে-হাডুড়ি  
নিয়েছে, বানিয়েছে ফ্রেমলিন-চুড়ার তারা। এ ফুল সত্যিকারের।  
গজের অতিকায় কলসি। মার্কস ও এঙ্গেলসের দু-তিন মানুষ  
কারের ছবি। ছবি আর প্রাকার্ডের মিছিল—কতকি লেখা  
ন ধরে চলেছে, মূর্খ মানুষ পড়তে পারিনে। আনন্দ-সমুদ্রে  
গন উঠেছে। কয়েকটা বাক্স বাগ-দানার কাঁখে চেপে মিছিল  
চলেছে। ফুলের মতো চেগার, মুঠিভরা ফুল—মিষ্টি বিনবিনে  
য় জকার দিয়ে যাচ্ছে তারা।

পিছনে চলে বাই, আরও উঁচুতে উঠে সারা মিছিল ভাল  
। দেখব। আনন্দোচ্ছল জনতরঙ্গ 'অবিরাম বয়ে যাচ্ছে—  
। নেই, সীমা নেই। কাঁকা বাস্তা বয়ে এসেছিলাম, পুলিশে  
টকে রেখেছিল, মানুষ দেখে দেখে পথ করে দিচ্ছিল। স্তব্ধ  
গীর্ষ চারিদিকে। লক্ষ ধারা হঠাৎ উজ্জলিত হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

১. রঙের বিশাল বাড়ি বিপ্লব-মিউজিয়াম—তারাই এদিক-সেদিক  
ক বেরিয়ে আসছে! কুহুমগুহ্ম ও সবুজ ঘাসে ভরা একটুকু মাঠ  
সারা সোবিয়েত দেশের সব চেয়ে মূল্যবান ভূমি। কত জনে  
'ছন্দ ওর নিচে—বিপ্লবের বলি, নাম জানা নেই, গুণতি করেও  
ধনি ক'জন ছিল তারা। আর শুয়ে আছেন মুসোলিয়ামের  
গলকক্ষে কাচের আবরণের নিচে লেনিন ও ষ্ট্যালিন। শুনেতে  
ছন তাঁরা বাইরের এই কলরোল ?

ফিরে আসছি। রেডিওর একজন পিছু নিয়েছেন : লেখক  
ব আপনি—এই উৎসবের ব্যাপার রেডিওর আজ বলতে হবে।  
গায় বলবেন, আপনাদের বাংলাদেশের মানুষ শুনেবে।

ভালো রে ভালো! শহর জুড়ে দেওয়ালি, বাজিতে বাজিতে  
আকাশে আশুন ধরিয়ে দেবে, সন্ধ্যার একটা মানুষ আজ সন্ধ্যায়  
ঘরে থাকবে না। আমি সেই সময়টা বন্ধ ঘরের মধ্যে মাইকের  
সামনে ভানব-ভানব করব? ও সব হবে না মশায়! তা ছাড়া  
লিখে নেবারই বা সময় কোথা?—কাল। ভোরে উঠে লিখে ফেলব;  
বেকর্ড করে আসব তার পরে এক সময় গিয়ে।

মো-ভাবিণী মীরাও সাই দেয় : কালকের বন্ধোবস্ত কখন।  
সন্ধ্যাবেলা এঁরা দেখে শুনে বেড়াবেন। বলসই থিয়েটারে একটা ভাল  
পালা আছে—'বড়ের আলো'। টিকিট করা হয়েছে।

### বেতার-ভাষণ—মস্কো, ৭ নবেম্বর

সাতই নবেম্বর—মানুষের ইতিহাসে পরম অমরীয় সোবিয়েত-  
বিপ্লবের এই দিনটি। কোটি কোটি নিশ্চিষ্ট মানুষ মাথা তুলে  
দাঁড়াল। নতুন জগৎ গড়ে তুলবে তারা—নুতর জগৎ, শান্তির জগৎ।

এদেশে পা দিয়ে অবধি দেখতে পাচ্ছি, এই মহা-মহোৎসবের জন্ম  
সকলে দিন গুণছে। সোবিয়েত-রাষ্ট্রের নানান অঞ্চলে চক্কোর দিয়ে  
বেড়াচ্ছি—বেখানে বাই, আগামী উৎসবের তোড়জোড়। মানুষ  
হেসে নেচে তাদের সর্বোত্তম প্রাপ্তি দেশের সামনে জ্ঞাতির করবে,  
তারই সর্বব্যাপ্ত আয়োজন।

নতুন রঙ ধরাচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে, আলো আর পতাকা দিয়ে  
সাজাচ্ছে। ৬ই রাতে সারা মস্কো জুড়ে আলোর প্রাবন। ঘুরে ঘুরে  
এপথ-ওপথ হয়ে বেড়াচ্ছি। আটশ বছরের সুপ্রাচীন নগরীর বুকের  
উপর বড় বড় সড়ক, আকাশচুম্বী প্রাসাদ। শ্রবীণ সঙ্গতি আর  
নবীন জীবনোন্মাদ গলাগলি হয়ে আছে এখানে। এই রাতে বিচিত্র  
আলোর মালা পরে ভুবনমোহন রূপ ধরেছে মস্কো।

৭ই সকালবেলা কনকনে শীতের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম আমরা  
ভারতীয় দল। রেড স্কোয়ার আমাদের চোটেল মেট্রোপোলের অতি  
নিকটে। পায়চারি করতে করতে সকালবেলা অথবা সন্ধ্যার পর  
কতদিন লেনিন-স্ট্যালিনের সমাধিভবনের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি,  
আজকে কিন্তু চললাম একবারে উল্টোদিকে। পথে মানুষজন  
সামান্য—কর্মব্যস্ত জনাকীর্ণ পথ থা-খা করছে আজ। পুলিশের দল  
বাহ রচনা করে আছে মাঝে মাঝে। এমনি অনেক বাহ পার হয়ে  
হাঙ্গির হলার ফ্রেমলিনের সামনে সমাধিভবনের ডানদিকের  
গ্যালারিতে। আমাদের জায়গা এখানে, এখান থেকে উৎসব দেখব।

উৎসব দশটার শুরু। ফ্রেমলিনের বড়-ঘড়িতে সাড়ে নটা—  
আধ ঘণ্টা বাকি এখনো। চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি।  
রেডস্কোয়ারের এক প্রান্তে সুপ্রাচীন বেসিল গির্জা, অল্প প্রান্তে  
ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের লাল বাড়ি। আর সামনে স্কোয়ারের  
ওপারে শুধু অর্ধাং সর্বপ্রথম-বিপ্লবের সুবিশাল প্রাসাদ। বেসিল গির্জার  
পাশে পুরানো গোলাকার বেদী—সেকালে রাজাজ্ঞার নৃশংস ভাবে  
হাত-পা-গলা কেটে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত এর উপরে। সেই বেদী  
থিরে ফুল আর পতাকার অপকণ্ড সাজিয়েছে। লাল পতাকা  
বাতাসে উড়ছে—অগ্নিশিখার মতো দেখাচ্ছে আমাদের এখান থেকে।  
গুমের গারেও অমনি শত শত পতাকা। মোভিক্যামেরা সাজিয়েছে  
বেসিল গির্জা গুম আর মিউজিয়ামের উপরে। তিন দিক দিয়ে  
আক্রমণ—বিপুল এই উৎসব-সমারোহের বতখানি ধরে রাখা যায়।

গুমের লাগোয়া ওপারের ফুটপাথেও অগণ্য দর্শক। তাদের আড়াল করে সৈন্তবাহিনী ছবির মতো স্থির ঠাঁড়িয়ে আছে বেড-কোয়ারের প্রান্তে। বাণ্ডবাহিনীর সোনার বরণ বাজনাগুলো ঝিকঝিক করছে। একেবারে সামনের সারিতে ঠাঁড়িয়েছি, বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা বোঝানে। বিবম দানশীল হয়ে পড়েছে ছেলেমেয়েগুলো—বাড়ির লোকে আপেল-টকি-চকোলেট দিয়েছে খাওয়ার ভজ্ঞে, সমস্ত নিশেয়ে দিয়ে দিচ্ছে আমাদের। না নিলে তখন বে না—রাগ করে, জবাবদস্তি করে। অগত্যা হাত পেতে নিয়ে, আবার কঁকমতো তাদের পকেটে ফেলে দিচ্ছি। টের পেয়ে পকেট চেপে সামান্য হয়ে গেল। তখন আবার নতুন কায়া খুঁজি। এই লুকোচুরি খেলা চলছে আমাদের। ক্রিক-ক্রিক কোটো তুলছে এদিক-ওদিকে। কামানের মতো ছুটো বড় মোড়িও অক্রমণ করতে থেয়ে এসেছে এতদূর অবধি।

নটা পক্ষায়া। ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের দিক থেকে কী-এক শব্দ। সেই শব্দ সরলরেখার গতিতে সারবন্দ পুশিস ও সৈন্তদলের মুখে মুখে ছুটে বেসিস গির্জা ছাড়িয়ে আরো দূর প্রান্তে মিলিয়ে গেল। প্রস্তুত সকলে। দশটা বাজল ক্রেমলিনের ঘড়িতে। নেতার সমাধি-ভবনের অলিন্দে ঠাঁড়িয়েছেন। বাণ্ড বেজে উঠল। প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মার্শাল ব্লগানিন আর মন্তো-বিভাগের সেনাপতি মুখ্যালিয়ানকো দুই মোটরে সৈন্তবাহিনীর সামনে বড়ের বেগে অভিনন্দন দিয়ে চলছেন। তারা প্রীতি-অভিনন্দন জানানো চারিদিক নিঃশব্দ ছিল, আনন্দ উত্তাপ চল এক মুহূর্তে। দুই দল বাণ্ড এগিয়ে এল দু-দিক থেকে। বাজছে তারা সমাধি-ভবনের সামনে ঠাঁড়িয়ে। বিপুল আনন্দ-কলরব—আকাশ ফেটে যায় ব্যুধি বা।

চুপ! ব্লগানিন সজ্ঞাষণ করছেন সবজনকে। দেশজোড়া বিপুল শিশু-প্রগতি ও রুশ-সাক্ষ্য—তার পরিচয় দিলেন। বিশ্বের পতিত জমি উদ্ধার হয়েছে। রাশিগা আর কাজাকিস্তান এই দুই গণতন্ত্র নির্ধারিত সময়ের আগেই লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকদের বিপুল কর্মঠতা। স্থল, জল ও আকাশে সৈন্তদল আধুনিক যন্ত্রপাতিতে শক্তিমান। সোবিয়েত জনগণ অসীম পরিশ্রমে দেশের সর্বত্র ঐর্ঘ্য ও আনন্দ বহন করে এনেছে। গণতন্ত্রের শক্তি বেড়েছে পৃথিবীতে। শান্তির প্রচেষ্টা বহু ব্যাপক হচ্ছে। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ চলছে দেশে দেশে। এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানা কেন্দ্রের জ্ঞানী-গুরীরা দলে দলে এসে সোবিয়েত দেশের পরিচয় নিয়ে যাচ্ছেন। এদেশের অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়ে জির দেশে যাচ্ছেন। বিদেশের প্রতিনিধিরা নিমন্ত্রণে বৃষ্টি যাচ্ছেন, সোবিয়েতের মানুষ একান্ত শান্তিকামী। কিন্তু লড়াইবাজও আছে দুনিয়ায়। তারা চক্রান্ত করছে; তাই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা আমরা দৃঢ়তর করেছি। বাতে শান্তির পরিবেশ কেউ ক্ষুণ্ণ করতে না পারে—

ভাষণ শেষ হলে ক্রেমলিন থেকে কামান-নির্ঘোষ। তার যেন শব্দ নেই, সীমা নেই। প্রতি নির্ঘোষে জনতা প্রবল চিৎকারে উল্লাস জানাচ্ছে। ঘোঁরায় আছন্ন হয়ে গেল গির্জার ওদিকটা।

তার পরে সৈন্তবাহিনীর মিছিল—খালি-হাতের সৈন্ত, তরোয়ালধারী, বন্দুক কাঁধে ঠোঁপন দেওয়া, আকাশনুখো বন্দুক, সামনের দিকে উত্তম বন্দুক—। এমন চলছে দলে দলে।

যান্ত্রিকবাহিনী মোটরগাড়িতে। মেশিন-গান দিয়ে সজ্জিত মোটর, বিমান-অঙ্গী কামান মোটরে টেনে নিয়ে চলছে।

নিয়ে যাচ্ছে, মটর নিয়ে যাচ্ছে। ভারী কামান, ভারী বিমান-অঙ্গী কামান, ক্যাটারশিলার বিমান-অঙ্গী কামান, পারাভুট-বাতিনী—আওয়াজে কাঁপছে চারিদিক। দেখতে আনন্দ লাগে, আতঙ্ক লাগে, বিশ্ময়ে হতবাক হতে হয়।

বণবাহিনীর মিছিল ক্রমশ বেসিস গির্জা পার হয়ে গেল। একটু শুষ্কতা। বাতাস প্রবল হয়েছে ইতিমধ্যে। পতপত আওয়াজ করে পতাকা দুপহে গুমের শীর্ষে। বহু সহস্র নবীন প্রত্যাশা কেন্দ্রিত হয়ে যেন মর্মরিত উর্ধ্ব আকাশে।

তারপর বেলোরোডের দল। সামনে বড় বড় পতাকার মার্কস এঞ্জেল গেনিন স্তালিনের ছবি। তারপরে সোবিয়েত নায়কদের। মাওসে-ভুজের ছবিও দেখছি। সবুজ, নীল, বেগুনি, ধূসরি—কত রঙের পোশাক। রঙ্গমঙ্গ করছে চোখের সামনে, ঝিলিক দিয়ে চলে যাচ্ছে যেন সোবিয়েতের প্রকৃতি ঘোঁষনশক্তি।

জন-মাধ্যমের মিছিল তারপরে। সেই জন-সমুজের তুলনা দেব, এমন ভাষা খুঁজে পাই না। পতাকার সমুদ্র। হাতে ফুল প্রায় সকলের—কাগজের ফুল, নানা রঙের। ফুল নেড়ে আমাদের সন্ধান জানাচ্ছে। কত দেশের মানুষ এক হয়ে মিলেছি আমরা। আমি ভারতের, ডানদিকে চীনা এক মেয়ে, পিছনে পোলিশ বৃদ্ধ—। নিম্পলক বিষুদ্ধ চোখে অদৃশ্য মানবের এই বিচিত্র আনন্দলীলা দেখছি। সমাধি-ভবনের অলিন্দে স্থিরমূর্তি নায়কেরা। আর ভিতরে অনন্ত নিজায় নিবৃত্ত সেনিন ও স্তালিন। ফুল দিয়ে বানিয়েছে প্রকাণ্ড কাস্তে-হাতুড়ি, ফুলের তৈরি ক্রেমলিনের তারা। বাচ্চা কাঁধে তুলে মিছিলে বয়ে চলছে, বাচ্চাদের হাতেও ফুল। ফুলে ফুলে চারিদিক পরিব্যাপ্ত। এই হাজার হাজার মানুষ ফুল হয়ে ফুটে উঠছে আর এক দিনের বস্ত্র-পরিগ্রাণিত আশ্রয়ানের পুষ্পা ভাষার এই বেড-স্টোয়ারে।

জন-স্রোতের অন্ত নেই। সীমাহীন উল্লাস। একবার পিছনে গিয়ে উঁচু জায়গার উপর উঠে দেখলাম। অজ্ঞাত সমুদ্র বয়ে চলছে—তারই মাথার মাথায় জাহাজের চূড়ার মতো অদৃশ্য পতাকা। আর দেখলাম, বাব্বা বটে! একেবারে কাঁকা রাস্তা দিয়েই তো এসে পৌঁছেছি—দশটা বাজবার আগ পর্যন্ত এতটুকু শব্দ ছিল না কোন দিকে। কোন নিভৃত কলরে এত আনন্দ লুকিয়ে রেখেছিল—জীবন-কল্লোল সহসা নিবৃত্ত ভেঙে বিপুল প্রবাহে দম্ভিক ভাসিয়ে নিয়ে চলছে।

ফিরে চলছি হোটোলে। এবার কাঁকা পথ নয়। রাস্তা-গলি ছাপিয়ে শতধারে ছুটেছে আনন্দ। হাতে ফুল গুঞ্জে দিয়ে যাচ্ছে, লোকছাণ্ড করে যাচ্ছে কত ছেলে-বুড়ো পুরুষ-মেয়ে, কত চীনা কোরীয় আরবী জর্মন মানুষ। উপহার-পাওয়া ফুল ছ-হাত ভরতি। আমরা বাকে পাচ্ছি, সেই ফুল বিলোতে বিলোতে চলছি। গান গাইতে গাইতে চলছে দলে দলে, কাঁছে এসে আলাপ জমামোর চেষ্টা করছে। নতুন নতুন মিছিলের দল এখনও চলছে বড় রাস্তা দিয়ে। অপরাহ্ন গড়িয়ে আসে, উল্লাস-প্রবাহ চলছে তবু অবিরাম।

চরিত্র বহুর আগে গুরুত্বের ববীপ্রদাণ এদেশে এসে বলেছিলেন, ‘না এলে একঘের তীর্থদর্শন অপর্যাপ্ত থাকত।’ বহু মানবের আনন্দের পবিত্র তীর্থ সলিলে অবগাহন করে আজকে বাংলা দেশের সাহিত্যিক জাতি এনিরতের মনোবল।



# শ্রীমতী আন্তেরএর দিনপঞ্জী

[ প্রকাশিতের পর ]

তরু দত্ত

অফিসারটি বললেন, “মাদমোয়াঁজেল, ভুল হলে ত বর্ডে যেতাম; কিন্তু অস্বীকার করবার আর পথ নেই, জমিদার তাঁর ভাইকে খুন করেছেন।”

“ভাইকে খুন করেছেন?” আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। জমিদারের দিকে তাকালাম; ওর বিফারিত চোখ দুটি খাবার ঘরের টেবিলের ওপর নিবদ্ধ। নাক দাক্ষণ ফুলে উঠেছে, চোটে কঠিন নির্মমতা—কি মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ও জলে মরছে আমি পপ্ট ঝাঁট করতে পারলাম। তবু অফিসারকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এর মধ্যে নিখাত কোনও ভুল আছে।

“দয়া করে এদিকে এক বার আসবেন?” খাবার ঘরের দরজা খুলে উনি আমার ডাকলেন। গেলাম। উনি ভেতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। এ কী? উঃ বা চোখে পড়ল, জীবনে কখনো ভুলব না। গান্ধীর দেহটা টেবিলের ওপর শোয়ান। চোট ঐহং কাঁক করা; কাচের মত বহু চোখ দুটি অস্বাভাবিক ভাবে যেন তাকিয়ে আছে। জামা-কাপড় কালো রক্তে ভরা; আর ডান দিকের বুটো গুলোতে ছাঁদা হয়ে গেছে।

“এক সত্যিই ওর ভাইয়ের কীতি?” অস্ফুট স্বরে আমি বললাম।

“আজ্ঞে হ্যাঁ মাদমোয়াঁজেল।”

—“ঠিক জানেন?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ মাদমোয়াঁজেল; জমিদার নিজেকে এসে আমাদের হাতে ধরা দেন বখন আমরা টহল দিচ্ছিলাম।” সখেদে উনি জানালেন।

দরজা খুলে ছানোয়ার কাছে গেলাম। ওর হাতে হাত রাখলাম : চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। হায় রে! কি পরিবর্তনটাই না ঘটে গেছে! ভাগ্যের ছুটি চোখে যেন আগুন ছুটছে। দুই রংগের শিরা ফুলে দপদপ করছে।

“ছানোয়া,” আমি নীচু গলায় ডাকলাম, “তোমার শরীর খারাপ, চল, বাবে আমার সঙ্গে?”

অদ্ভুত ফল ফলল আমার কথায়। চট করে ও ফিরে পীড়াল; দুই খানিক কোমল হয়ে এল; এক বলক হাসি দেখা দিল। আমার বুক যেন ভেঙে চৌচির হয়ে গেল; মা গো, এত যন্ত্রণা!

“তোমার সঙ্গে? হাজার বার বাব, এখনি যাব।” ও জবাব দিল। তার পর ওর নজর পড়ল শেকল-বাঁধা হাতের দিকে। কেমন যেন উলাস অসহায় দুষ্টিতে ও তাকাতো লাগল। ভয় পেলে শিক্তরা যেমন করে, সেই ভাবে ও আর্জান করবে উঠল।

“মার্গরিং, মার্গরিং, এ কী?”

ওকে মুক্ত করে দিয়ে আমি ওর সঙ্গে পাশের ঘরে গেলাম।

নীরবে আমার কথামত ও চলতে লাগল। দরজাটা আমি বন্ধ করে দিলাম। দুই হাতে মাথা চেপে ধরে ও একটা সোফায় শুয়ে পড়ল। ওর পাশে বসে ওর দিকে চেয়ে রইলাম আমি। হায় প্রিয়! কত তোমায় ভালবাসি তুমি জান না। আমার হাতে তুলে নিলাম ওর হাত। সারা গারে যেন ছর বয়ে যাচ্ছে। দাক্ষণ গরম। আমি চুপ করে রইলাম—এমন সময় কীতসের মিষ্টি আহ্বান শুনলাম।

“কি হল রে? কই, আমার বাচ্চারা কই?”

হৃদয়ড করে ছানোয়া উঠে বসল। দরজার দিকে সবিম্বয়ে চেয়ে ও যেন কান পেতে কি শুনতে লাগল।

“মা মা গো!” ও নিজের মনেই আঙড়াতো লাগল।

খাবার ঘরের দরজা খুলল কে; তার পরই বুকফাটা এক চিংকার শুনে ছানোয়া হকচকিয়ে গেল। আবার শোনা গেল মহা আতঙ্কে ভরা সেই আর্জান, “ওরে গান্ধী, বাবা, বাচ্চা রে আমার!”

খানিকক্ষণ কাঁদা আর ফিসফাস শব্দের দাক্ষণ রোল উঠল; তার পর সব থেমে গেল হঠাৎ। উঠে গেলাম; ওই কান্নার ভয়ে সজোর চোখ দুটি বন্ধ করে ছিল ছানোয়া; আমি নড়তেই ও শিউরে উঠল। আবার নীরবে বসে রইল। আমি বেরিয়ে গেলাম। কীতস আমার দিকে ছুটে এলেন—“মার্গরিং, মা, এ আমার কি হল মা?” অন্নমা কান্নায় উনি ভেঙে পড়লেন।

“চুপ, চুপ!” আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, “পাশের ঘরেই ও রয়েছে; অবস্থা উৎকণ্ঠনক! আপনাকে ওর একান্ত প্রয়োজন।”

ঘরে ঢুকে উনি দু’হাতে আঁকড়ে ধরলেন জীবিত পুত্রকে। আমি লোকজন সমেত অফিসারকে চলে যেতে আদেশ দিলাম; ঘরে গিয়ে দেখি উনি কাঁদছেন; এত হটগোলের কোন অর্ধই ছানোয়া বুঝতে পারছে না। অবাচ-বিষয়ে মূর্খের মত তাকিয়ে আছে মায়ের দিকে। তিন তলায় কীতসের ঘরে মাছেলেকে নিয়ে গেলাম। ওখানেই ওঁদের রেখে চলে আসছিলাম; কীতস আমার হাত ছাড়লেন না।

“বাস নে!” উনি বললেন। বসে পড়লাম আমি। “ছানোয়া, এ তুই কি করলি বাপ? কেন এমন করলি ছানোয়া?” ওর আচ্ছন্ন মুখের দিকে চেয়ে উনি প্রশ্ন করলেন। সবিম্বয়ে ও তাকাল, তার পর বিরক্তির স্বরে অমুদোধ করল, “মা-মণি, বড় ঘুম; খুলে দে না মাথার এই জ্বালা!”

ওর মাথা উনি বুক টেনে নিলেন। ছানোয়া চোখ বুজল। কপালে হাত রেখে ও স্বগতোক্তি করল, “উঃ মা, বড় জ্বলেছে।” খুঁটিয়ে সব কথা ওকে জিজ্ঞাসা করতে বাচ্ছিলেন ওর মা।



আমি বাধা দিলাম। ডাক্তার ডাকতে পাঠালাম। ম'সিয়া শাঁতো অবিলম্বে এসে পড়লেন। ওঁর পেছন পেছন আমি বৈঠকখানায় গেলাম। আমার বর্ণনা উনি খুব মন দিয়ে শুনলেন। জ্বান শেষ হলে বললেন, "শুনে মনে হচ্ছে উদ্ভাদ অবস্থায়ই একাজ ও করেছে। দুইটনার কারণ কিছু জান? পূর্বাভাস?"

"না; নিশ্চয়ের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব কোন দিনই ওদের ছিল না। দু'জনাই দু'জনকে খুব ভালবাসত।"

"বগড়াখ'টি কিছু হয়েছিল?"

"না, তবে গত মাস থেকে জমিদারের হাব-ভাবে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম; কেউ সেদিকে বিশেষ নজর দেয় নি।"

কল্পনা ও রেহিমিশ্রিত নয়নে উনি আমার দিকে তাকালেন।

"তোমার বাবার কাছে খবর দিয়েছ?"

"আমি দিই নি, তবে এতক্ষণে ওঁর কানে কথাটা উঠেছে নিশ্চয়।"

অলক্ষ্য চুপ করে উনি জানতে চাইলেন, "আচ্ছা, জমিদারকে কি একবার দেখতে পারি? ওঁর অবস্থাটা ঠিক মত জানা দরকার; মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলেই একাজ ও করেছে যদি প্রমাণ করা যায়, বিচারের সময় তবে অনেক সুবিধে হবে।"

ওঁর একথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম কি লাজনাটা ওঁর কপালে লেগা আছে; ওকেই যে আমি স'পেছিলাম আমার হৃদয়, মন! ওকে আমি অন্তরের গভীরতম অম্লভূতি দিয়ে ভালবাসি। ভগবান যেন ওঁর সহায় হন।

দহাময়, চেয়ে দেখ ওঁর বিপত্তি, ক্ষমা কর ওঁর পাপ!

কৈতসের ঘরে গেলাম। ডাক্তারবাবু খুব সহজ সরে কথা শুরু করলেন, "এই যে ছানোয়া, কেমন আছ হে?"

ও তাঁর দিকে চেয়ে রইল। হাসল।

"মনে হচ্ছে ভালই।"

"নাড়ী দেখি?"

এই অল্প সময়ের মধ্যেই ওকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে নিলেন তিনি অতি মনোযোগ দিয়ে।

"আচ্ছা কোথায় বাধা লাগছে?"

"আজ্ঞে, এইখানে।" বলে ও কপাল দেখাল।

"তাই নাকি? বলতে হয়। এখন সারিয়ে দেব।"—এই জাতীয় কথাবার্তার ফাঁকে ভাল ভাবে গুছিয়ে উনি নানা প্রশ্ন করলেন। চলে বাবার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিতে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন।

"ওঁর অম্লখ খুবই বাড়াবাড়ি কি?"

মাথাটা খায়াপ হয়ে গেছে। সর্বদা ওঁর দিকে নজর রেখে, আর সম্পূর্ণ বিশ্রাম পায়, সে-ব্যবস্থা কর; আর ভুলেও এ-দুটনার উল্লেখ ওঁর কাছে কোর না। আর একটা কথা, ওঁর মামা কোথায় এখন?"

কর্ণেল সেক্রে এখন পোনে। তাঁর ঠিকানা দিলাম।

"এখনি ঠেকে টেলিগ্রাম করছি। ওঁর আসা নিতান্ত প্রয়োজন। তবে মার্গারিৎ, শরীরটার দিকে যদি নজর না দাও, ভুগতে হবে যে মা!"

উনি চলে গেলেন। বোগীর ঘরে গেলাম আমি। ছানোয়াকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওঁর তত্ত্বা আসছিল। কৈতসকে ইশারায় ডাকলাম। খুলে বললাম সব কথা। উনি নীরবে কান্ডে লাগলেন।

ছানোয়া ঘুমিয়ে পড়ল। কি অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে লাগছে ওকে! হঠাৎ ফাল-ফাল করে তাকিয়ে বকতে আরম্ভ করল, "ওই যে, আশুন! আশুন! পাগল করে দেবে! উঃ, পুড়িয়ে দিল সব!"

চট করে একটা ভিজে কুমাল নিয়ে ওঁর কপালে রাখলাম। ও তা ফেল দিল। বিকারের ঘোরে সজোরে আমার হাত চেপে ধরল। বাবা আর মা এলেন। বৈঠকখানায় গেলাম। আমায় ওঁরা নিয়ে যেতে এসেছেন। আমি ধরে বসলাম, এখানেই আমার থাকতে দেওয়া হোক। অতিকষ্টে ওঁদের মত পেলাম। মা-ও থাকবেন বলে জ্বি করতে আমি আপত্তি জানালাম।

১৭ই জামুয়ারী।—ওঁর অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। গায়ে বেশ জ্বর। গত দুই সপ্তাহ অনবরত প্রলাপ বকছে, বেহ'শ হয়ে পড়ে রয়েছে, রাতে ঘুম নেই। কি নিদ্রাক্ষণ ভোগাচ্ছি! ভগবান, একবার এদিকে ফিরে তাকাও, ভগবান! এতদিন পর ওঁর মা একটু বিশ্রাম নিতে গেছেন। আমরা এখন পালা করে ওঁর তত্ত্বা করছি। গেল মাসের ১১ তারিখ সকালে ওঁর মামা এসে পৌঁছেছেন! আমায় দেখে উনি অসম্ভব বিচলিত হয়ে আমার জড়িয়ে ধরলেন। ওঁকে আভোশান্ত কাহিনী জানালাম।


"হায় ভগবান!" উনি আপন মনে বলতে লাগলেন, "কি

ফোন : ৩৪-৪৯০২

বিবাহে যৌতুক  
দানের আনন্দ একান্তভাবে  
আপনার ; আপনাকে  
সেবা করার আনন্দ  
আমাদের।

**গিণি ভবন** মুজেন কুমারী  
মালিকার ও স্বপ্নানিধী

১০২, বহু বাজার স্ট্রীট, কলি:- ১২



ফোন : ৪-২৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬  
(বাহা সীমানা ইট এ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬)

বে করি এই অবস্থায়।"—তার পর হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, "না না, ওর বিচার—কোনও দরকার নেই ; চলে যাব এখন থেকে ওকে নিয়ে।"

ঘটনাটা ওর মনে গভীর বেধাপাত করেছে। আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরে ঘরে উনি সামলে নিচ্ছেন বুঝলাম। আমার হাত ছুটি ধরে উনি শুধালেন।

"আচ্ছা মা, ওকে তুই এখনো ভালবাসিস ?" নিরন্তর মুখে আমি তাকালাম ওর পানে। ওর পক্ষে আমার উত্তর পড়ে নিতে দেবী হল না।

"বেচারি মা আমার !" বলতে গিয়ে দু কঁোটা জল করে পড়ল ওর গাল বেয়ে।

১৮ই জাম্বুয়ারী।—কাল রাত্রে ছানোয়া বেশ ভাল ছিল। শান্তিতেই ঘুমিয়েছিল। রাত তিনটে নাগাদ বসেছিলাম ওর বিছানার ধারে। আমার কাঁধে ও হাত রাখল। আশোয়া অবস্থায় ও জানলার দিকে নির্দেশ করে কীণ কণ্ঠে বলল,—

"ওই যে দেখছ—বীণ হচ্ছন উনি যিনি মৃত, যিনি পুনরুজ্জীবিত, যিনি ভগবানের ডান দিকে বসে আছেন, আর আমাদের পক্ষ সমর্থন করে প্রার্থনা করছেন শ্রবচার।"

ও টেনে টেনে শেষের কথাগুলো বলল। তৃপ্তির হাসিতে ওর মুখ উজ্জ্বল। আমি কি বলতে গেলে ও খামিয়ে দিল, "চূপ, চূপ ! শোন, ওই শোন !"

একদৃষ্টে অত উৎকর্ষ ভাবে ও কি দেখছিল জানি না ! দিগন্তে চাঁদ আর তারার উদ্ভাস। বেশ কিছুক্ষণ পরে ও আবার ধপ করে শুয়ে পড়ল।

"সব শেষ !" করুণ কণ্ঠে ও জানান।

ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ভগবান যেন মুখ তুলে চেয়েছেন মনে হয়। ওর পাশে উনি নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। আমরা কেই বা নিজেকে নিশ্চাপ বলতে পারি ? অবিরত শুধু ঘরে বেড়াচ্ছি ভেড়ার পালের মত ; নিজের নিজের পথে আমাদের চল ছাড়া উপায় নেই ; তাই ত চিরন্তনের আদেশে বীণ টেনে নিয়েছেন আমাদের সমস্ত পাশ তাঁর নিজের অঙ্কে। ভগবান—আমাদের বিশ্ব কি সর্বদা বলছেন না, "আমি, আমিই হচ্ছে দিই তোমাদের পাপ-তাপ, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার আমার ভালবাসা,—আমি তুলে যাব তোমাদের বাবতার পাশ।"—ভগবান, ক্ষমা কর ওর পাশ, ওর প্রতি মেলে ধর তোমার বরাত্ত-পাশ, তোমার মাঝেই ওর আত্মা যেন খুঁজে পায় পরম শান্তি।

সকালে জমিগারের অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবু ত অবাক ! প্রলাপের ঘোর কেটে গেছে, তবে মাথাটা এখনো হর্বল, সামান্য বিকার আছে।

২০শে জাম্বুয়ারী। ওর বিছানার পাশে আজ সকালে বসেছিলাম। চোখ বুজে ও শুয়ে আছে দেখে ডাবলাম হুহুচ্ছে। কিন্তু একবার চোখ তুলে দেখি, স্থির নয়নে আমার দিকেই ও চেয়ে আছে। ইশারায় আমার কাছে ডাকল ও, "কি হুঃখগ্র বে দেখছিলাম। 'পান্ড' কই ? একবারও কই ও ত' আমার দেখতে এল না ?"

আমি কি বলব তেবে পেলাম না।

"এখনো ও কি আমার ওপর চটে আছে ? ডাক না ওকে, ওর সঙ্গে মিটমিট করে নিই ; যাও লক্ষ্মীটি, ওকে ডেকে আন।"

—আমি হেরিয়ে গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম মসিয়্য বেঞ্চে। ওকে একথা বলে আমি জানিলাম যে সত্যি যা ঘটেছে ওকে এখন খুলে বলা বোধ হয় ভাল।

আমরা ঘরে চুকতে ছানোয়া সখেদে বলল, "বুঝছি, ও আসতে চায় না এখনো।"

"ও আসতে পারে না বাপ !" কাঁপা গলায় ওর মামা জবাব দিলেন।

"কেন ?"

"ও যে আর বেঁচে নেই !"

"এ্যা, গান্ড' মারা গেছে ? আমার স্বপ্নই সত্যি হল ?" ও ব্যগ্র ভাবে ওর মামার দিকে বুক পড়ল, "আমি যে দেখলাম লেকের ধারে ও মরে পড়ে আছে, আর ওর চোখ উঃ, কি সে চাটুনি ! দারুণ ভাবে চেয়ে রয়েছে। আমি ওর কাছে যেতেই ওর নিশ্চিন্দ ঠোঁট ছুটোর মধ্যে থেকে কে যেন গর্জে উঠল, 'কার্যা প্রতারণ !' অসম্ভব কর্কশ ওর গলাটা শোনাল। তবে কি এসবই সত্যি ?"

"হ্যাঁ বাছা !"

"হায় রে !" বলে অমাব্যবিক চিংকার করে ও পড়ে গেল বিছানার ওপর, নিখর, অচঞ্চল। মামা তাড়াতাড়ি আঁজলা-ভরতি জল দিতে লাগলেন ওর মুখ-চোখে। খানিক বাদে চোখ মেলেই আবার সত্যে ও চোখ বুঁজল। আমাকে রোগীর কাছে বেধে উনি ডাক্তার ডাকতে গেলেন। ফের ও তাকাল, শূন্যদৃষ্টিতে ; বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ওর কপালে কালিমা যনিয়ে এল ; অব্যক্ত ভীতি ফুটে উঠল দুই চোখে। আমার হাত ধরে নীরস গলায় ও ঘোরে ঘোরে প্রার্থ করল।

"আচ্ছা, সত্যিই আমি...আমি কি...একজ্ঞ করেছি ? কেমন এমন করলাম ? কে বলল ?"—আমি চূপ করেই রইলাম।

"কই, তুমি উত্তর দিলে না ? বল, বল না, একথা কি সত্যি ?"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

গভীর স্তব্ধতা নেমে এল চারি দিকে। মুক নয়নে পরস্পরের পানে আমরা তাকিয়ে রইলাম, নিশ্চাপ মৃতির মত। মিনিট পনেরো প্রায় এই ভাবেই কাটল। এমন সময় ডাক্তার এলেন।

"বাব, তোমায় বেশ ভাবুক, দার্শনিক গোছের লেখতে লাগছে হে", উনি বসিকতা করলেন।

স্বপ্নোপ্তের মত ছানোয়া তাকিয়ে রইল। পরে বলল, "ঠাটা না ডাক্তারবাবু ; আর সময় নেই। সবই এখন পরিকার বৃদ্ধিতে পারছি।"

খানিক দম নিয়ে ও বলে চলল, "উঃ, এমন নিরপরাধ প্রাণ হরণ করবার আগেই কেন আমার মৃত্যু হল না ?"

ছ'হাতে মুখ ঢেকে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ডাক্তার আর কর্ণেল পাশের ঘরে চলে গেলেন। নিজেরই অজান্তে ওর পাশে বসে ওর চুলগুলি সবড়ে বিস্তৃত করতে লাগলাম আমি। এই অসহ্য যন্ত্রণা চোখে দেখা যায় না। ও আমার হাত সযিরে দিল।

"জাম না আমার কে ? আমি যে প্রাতঃরক্তা।" বিকৃত গলায়

# খানঃ কৃষা...

এমন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল যখন লোকে বি খাবার জন্মে ধার করতেও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিল। দুধ অমৃতের সমান আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা, দই, ক্ষীর। সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একেবারেই অপরিহার্য এ বিষয় কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আর সত্যিই ঘিধা থাকবার কোন কথাও নয়। তখন সস্তাগড়ার দিন ছিল, ভাল টাটকা খাবার অপরিখ্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। দুধের সাধ বোলে মেটাবার কথা তখন উঠতোই না।

এখন দিনকাল বদলছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুতুরভরা মাছ পরিবৃত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোসগল্প করছেন আর তাসপাসা খেলছেন—এ এখন গল্পকথায় দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আপিসে কিবা নিজের খানায় ছুটেতে হয়।

সত্যিই আজকের এই ডামাডোল আর মাণ্ডিগড়ার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি দুরূহ কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বই-খাতার খরচেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়েই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার তুলনায় ঝামেলা বেড়েছে খাটাখাটুনি ও হুশিহুশিও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আধপেটা খেয়ে থাকা নয়তো নিরুষ্ণ বা ভেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা ওষুধ পত্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টিকর স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর বর্তার,

গিন্নীঠাকুরনের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সুতরাং ঋণঃ কৃষা ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা সোজা দৃষ্টান্ত ধরা বাক। আপেল। আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজীতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে রোজ একটা করে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে ছুঁতে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ দুর্মূল্য, তাই কল্পনাই বা রোজ আপেল খেতে পারে বলুন? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোম্যাটো, যাকে আমরা বিলিতি বেগুন বলি, বা কলা—আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঘি। খাঁটি টাটকা গাওয়া ঘি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্মে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাঁটি ঘি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। ডালডায় খরচ কম আর ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী। একথা জানেন কি যে ডালডা ও খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে একই পরিমাণ ভিটামিন ‘এ’ আছে। ভিটামিন ‘এ’ শরীরের বাড়ের জন্মে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্মে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন ‘এ’ স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন ‘এ’ যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন ‘ডি’ ও দেওয়া হয়। ভিটামিন ‘ডি’ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন ‘ডি’ দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাঁটি ভেজাল তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদা শীলকরা টিনে খাঁটি ও তাজা পাবেন। এই সব কারনেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনস্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই মধ্যে কিনবেন।

ও চেঁচিয়ে উঠল।—দারুণ ব্যথায় আমি বুঝে পড়ছিলাম; কিন্তু না, এসময়ে ওকে প্রবেশ দেওয়াই আমার কর্তব্য। ওকে মরণ করাতে চেষ্টা করলাম, “আমরা করুণাময় ঈশ্বরের সন্তান।”

“হ্যা, এবার মনে পড়েছে—তুমি আমাদের ভালবাসতে, তাই না? আর মুখে যেন শুনেছি সে কথা। এখনো ভালবাস?”

“আমার সমস্ত অস্তর দিয়ে তোমার ভালবাসি। ভগবান কি আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন না?”

“আমেন!” বলে ও আমার হাতটা তুলে নিল। বলল, “ভগবান আমাদের ক্ষমা করবেন, এ বিশ্বাস আমার অটুট।” ডাক্তার ফিরে হলেন।

বুঝলে যে খন্দর, দেখে মনে এখন যত পার বিশ্বাস নাও। “ওকে ও বাধা দিল, ‘মসিয়া’ শীতো, আমি একদম সেবে উঠছি। ঐতিহাসিক বিচার শুরু হোক। আমার বিচারের দিন কবে ধার্য হয়েতে?”

“আগামী বাইশে।”

“আজ...হল...?”

“বিশ তারিখ।”

“পরশু দিন তবে?”

“হঁ।”

“বেশ। আমি প্রস্তুত।”

ডাক্তার চলে গেলে পাক্সা চার ঘণ্টা ও দিবা শান্তিতে ঘুমিয়ে নেল।

২১শে জানুয়ারী।—আজ সন্ধ্যাবেলা ফান্স রোশেল ওকে দেখতে হলেন। সেট জনের চতুর্দশ অধ্যায়টি পড়ে উনি হাঁটু গেড়ে সলেন; আমরাও বসলাম তাঁর দেখাদেখি। শুরু হল প্রার্থনা: আমাদের পাপ তিনি যেন হরণ করেন, রোগীকে করেন যেন কৃপা।

“ভগবান, তুমি, উনি ভক্তি-বিনয় করে বলে চললেন, “তুমি তাও না পাণীদের মৃত্যু হয়। তুমি চাও, তারা অমৃতপ্ত হোক, নূরুদ্দার কক্ক তাদের আত্মাকে; প্রভু, ক্ষমা কর তোমার সাহসীদাসকে; ওর অন্তঃকালে জেগেছে আত্মা,—প্রেমময়, ক্ষমা কর, পাপ কর।”

নীরবে আমরা অঙ্গ বিসজ্জন করছিলাম। পাদরী উঠে পাঁড়ালে নোয়া তাঁকে অমরোপ করল নতমুখে, “পিতা, আশীর্বাদ করুন।”

ওর মাথায় হাত রেখে মসিয়া রোশেল বললেন, “বিপদের মুহূর্তে রম প্রেমিক যেন তাঁর আস্থানে সাড়া দেন, আর তাঁর নামের বেই তুই যেন খুঁজে পাস শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।”

আজ জমিদার তার মাকে আত্মপাশ্চাৎ ঘটনাটি বলল। ওর হিনী শুরু হতে আমি বেরিয়ে বাচ্ছিলাম ঘর থেকে,—কতেন হাত র আমায় বসালেন। অতি বিষন্ন নয়নে জমিদার আমার দিকে কাল; তার পর ওর মাকে বলল, “মা, ও চলে থাক; যে ইনো তোমায় বলছি, তা হুঃখের, বড় হুঃখের; ওর শোনা উচিত ব না।”

তবু ওর মা আমায় যেতে দিলেন না।

“না ছানোয়া, ও থাক; বেচারী তাকে যে প্রাণাধিক ভালবাসে। কপালে এত দুঃখও ছিল।”

“হঁ, এসব শোনার পর প্রেম-টেম কপূরের মত উবে বাবে। তা

ছাড়া আমার ওপর ওর ধারণাই বা কেমন হবে?” স্নানমুখে ও স্বগতোক্তি করল।

তার পর শুরু হল ওর কাহিনী: “অল্প কথায় বলছি, যা ঘটেছিল।—জ্ঞানেন কোনেবকে দেখে আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম আর গাভীও, ছানোয়া সসঙ্কোচে বলল, “ওকে ভালবাসত। গাভীকে বহু বার সাবধান করে দিয়েছি, আমার পথ থেকে সরে পাঁড়াতে বলেছি, আমার খুশীমত চলতে নির্দেশ দিয়েছি। সে-কথা কোন দিন ও কানেও তোলে নি। আর জ্ঞানেন ওকেই বেশী ভালবাসত আমার চেয়ে। আমার ব্যবহার ওর মত মধুর নয়; আমার কেমন যেন ভয় করেই চলত জ্ঞানেন। আমার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব ওকে বহু বার করেছি; ও আমায় চায় নি। আমি তখন যেন অস্ত্র মাহুয,—আমি আর আমাতে ছিলাম না;—এক দিন ফুটফুটে চাঁদিনি বাতে...দেখলাম, ওরা হুঃজন বেড়াচ্ছে বাগানের সুরকি-চালা পথে।...এই অবধিই আমার মনে আছে। আর কিছু স্মরণে আসছে না। হায় রে কপাল! কেন এর আগেই মরলাম না।”

হু হাতে মুখ ঢেকে ও প্রাণ-কাড়া কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ওর মাও কাঁদছিলেন। আমি উঠে গেলাম, আমার হাতে তুলে নিলাম ছানোয়ার হাত। জানি না কেন এ রকম—পোষা কুকুর যেমন মনিবের মন খারাপ হলে তার হাত চেটে দেয়—সেই রকম ব্যবহার আমি করছিলাম। স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম ঘটনাবর্তের ধারা, তবু কিছু গ্রাহ্য করবার শক্তি আমার ছিল না। সবই চলছিল যেন স্বপ্নের খোঁর। আমায় দেখে, আমার বিবর্ণ চেহারা দেখে ছানোয়া আঁতকে উঠল; আমার মাথায় হাত রেখে বিড়-বিড় করে বলতে লাগল, “বেচারী! কি কষ্টটাই না দিলাম!”

তার পর আমার দিকে ওর মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, “মা, এই দেখ, শেষ পর্যন্ত একেও কি মেরে ফেলব না কি? কি চেহারা করেছে এই ক’দিনে দেখ ত?”

আমায় ও সঙ্গেহে অমরোপ করল, “যাও মার্গরিং, লক্ষীটি, ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর।”

শিশুর মত, বিনা বাক্যব্যয়ে আমি ওর আদেশ মেনে নিলাম। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, পথ যেন শেষ হবে না। ঘরে গিয়ে থপ করে বসে পড়লাম একটা চেয়ারে। কতক্ষণ আত্মস্থ ছিলাম জানি না, হঠাৎ দারুণ ভাবে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। চেয়ে দেখি, সামনের জানলাটা খোলা,—বাইরে তুষার পড়ছে। জানলা এঁটে দিলাম। চেয়ারে ফিরে যাবার সময় ক্রুশটার দিকে চোখ পড়ল; নতজানু হয়ে বসলাম আমার দিবা-সাথীর চরণতলে। মনে নেই কি মিনতি জানালাম, কিন্তু প্রেমের ঈশ্বর, অন্তর্ধামী—তিনিই আমার বল দিলেন। বুক-ভরা সাধনা নিয়ে উঠে পাঁড়লাম। অন্তরে পোলাম পরম শান্তি। নীচে দেখা হল, মসিয়া দেখে আর ছানোয়ার সাথে। আমার হাত ধরে কর্ণেল অভিযান জানালেন। ছানোয়া খুবই বুঝে পড়েছে। আমার সঙ্গে সুখোমুখি হতেই ওর মুখে প্রসন্ন ভাব দেখা দিল। ও আমার দিকে চেয়ে হাসল।

২৩শে জানুয়ারী।—আজ আমাদের রায় বার হবে। ওখানে

আমি বাই নি ; বাবার সামর্থ নেই। গাড়ীতে চড়ে ছানোয়া আদালতে গেল ; সঙ্গে ডাক্তার, কর্ণেল আর আমার বাবা। আশে-পাশে অল্প পুলিশ-অফিসার। দিব্যি শান্ত ভাবে ও গাড়ীতে বসে ছিল। ভগবান, ওর মঙ্গল কর।

সন্ধ্যা।—বিকেল চারটেয় ওরা ফিরেছে। কর্ণেলের অধুরোধে প্রেরণী ছানোয়াকে নিয়ে এসেছিল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের কাছ থেকে ও বিদায় নেবে বলে। আমি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলাম ; সংস্পর্শন শুরুপ্রায়। ছানোয়া বীর পায়ে এগিয়ে এল, হাসবার চেষ্টা করে আমার হাত জড়িয়ে ধরল।

“পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড !” উদাস ভাবে ও জানাল।

আমি কথা খুঁজে পেলাম না। পনেরো বছর! আত্মীয়-বন্ধুহীন অবস্থায় দিন-কটানি! এ যে সুভার সামিল। ঘটনার পর ত ওর স্বাস্থ্য প্রায় ভেঙেই গেছে !

“না গো, ছানোয়া, এদণ্ড যে বড় নির্মম !”

“কু! আমার একমাত্র দণ্ড মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয় ; রক্তের বদলে রক্ত !”—ও উত্তেজিত হয়ে পড়ছে দেখে আমি ওর হাত ধরলাম,

“চল ছানোয়া, প্রার্থনা করি গো।”—ওকে নিয়ে গেলাম প্রাসাদের উপাসনালয়ে, যেখানে শর্বা দিবেদ্বিচ্ছিনেন ওর মা। বেনীর ওপর বরাভার-মুদ্রায় হাতবাড়ান বীণার ছবিতে লেখা, “এস আমার কাছে, তোমরা, যারা বর্মহাস্ত, পর্যুদস্ত, এস, আমি লাগব করব তোমাদের দল—ভার।”

সত্যিই-বুকে আজ আমাদের যে গুরুভার, তা বয়ে বেড়ান অসম্ভব ! হাঁটু গেড়ে বসলাম ওর মায়েব পাশে ; উনি খণ করে ওর হাত চেপে ধরলেন। মুখে আমাদের ভাষা নেই ; প্রার্থনা করছিলাম অন্তরের অন্তর থেকে। ছানোয়া দাঁড়িয়ে পড়লো। নীচু গলায় অমুমতি চাইল, “মা, বাই এবার ?”

চট করে উনি টান-টান হয়ে দাঁড়ালেন, চেপে ধরলেন ওকে আকুল আগ্রহে। “না না। আমি দেব না, আমার একমাত্র সম্ভাবনকে এভাবে আমি হত্যা করতে দেব না।” উনি গর্জে উঠলেন। ভীত দৃষ্টিতে উনি কিছু খুঁজতে লাগলেন মনে হল। ওর কাঁধে ছানোয়া আলতো ভাবে একটা হাত রাখল।

“মাত্র পনেরোটা ত বছর ; দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ভগবানকে সর্বদা স্মরণে রেখ না।”—বীরে বীরে মার আলোষ থেকে ও নিজেকে মুক্ত করে নিল, সন্ধ্যাবে উনি বেনীর সামনে বসে পড়লেন।

ও বুকে পড়ে বলল, “মা-মণি, বিদায় দিব না ?”

ওর গলা জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে উনি কাদতে লাগলেন। সহস্র চুষনে ওকে অস্থির করে তুললেন।

“ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।” উনি প্রার্থনা করলেন। তারপর সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন। ভূমিদার ঘরে দাঁড়াল আমার দিকে, “আদিয়া মার্গরিং, বিদায় !”

ভাগর চোখ ছুঁটি তুলে ও প্রশ্ন করল, “নিভা তোমার প্রার্থনার ফলে বিপথগামী এই ভাইয়ের কথা স্মরণ করে করুণা-ভিক্ষা করবে ত ?”

“হ্যাঁ, আমি জবাব দিলাম। ওর মার প্রসঙ্গ তুলে জানতে

চাইল, “ওর নিঃসঙ্গ জীবনে একমাত্র সাহায্য তুমি—ওঁকে মাঝে মাঝে দেখে যাবে ত ?”

“হ্যাঁ।”

আবার ও আমার হাত জড়িয়ে ধরল।

“বে-ভালবাসা তোমার কাছে পেয়েছি, তার ঋণ ভগবান শোধ করবেন।”—বলে ও বেরিয়ে গেল। ইচ্ছা হল ছুটে বাই ওর পেছন পেছন কিন্তু দেখে আর তিলমাত্র শক্তি না থাকায় বসে রইলাম শূন্য-স্থানে। চারিদিকে ঘন অন্ধকার জড় হয়ে এল। আজ নিবে গেল আমার জীবনের সব আলো। অন্ধকারে ছোট ছেলেদের চেড়ে দিলে তারা যেমন করে, আমিও তেমনি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। বসলাম ওর মার অশ্রুসিক্ত সাঙ্গিহে। ভগবান, সাহায্য কর ভগবান ! এই দুর্বীর আঁখিরে পথ দেখাও।

১০ই এপ্রিল, ১৮৬১।—বড় কাল হল দিনপঞ্জী লেখা হয় নি।

কঠিন অস্ত্র থেকে উঠেছি। অসম্ভব ক্ষয় আর প্রলোপে ভুগলাম। বাঁচবার আশা ছিল না। ভগবানই রক্ষা করলেন এ ব্যাধী। চোখ খুলে যেদিন সূর্য দেখলাম, যেদিন দেখলাম আকাশের নীলিমা আর বাবা-মার আশাবিহীন মুখ, ভগবানকে সেদিন ধন্যবাদ জানালাম। “আমার তুমি সর্বদাই ঘিরে রেখেছ নির্বিড় করুণায় !”—আগেকার জীবন আমার কাছে আজ যত্নের মতই অশ্রু-অবাস্তব। সপ্তাহ দুয়েক হল সাক্ষাৎ ফিরে পেয়েছি। তার আগেকার কথা যা স্মরণে আছে, বলছি।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা চঠাং মনে হল আমার ঘরে এক দল লোক, যেন ফিস-ফিস করে কি আলোচনা করছে। চোখ বুজে তিলাম ; এই আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি, দুই হাতে মুখ ঢেকে কে যেন আমার বিছানার কাছে বসে কাঁদছে। চোখ আমার বন্ধ হয়ে গেল ; বাসামী ডেউখেলান চুল দেখে চিন্তে পারলাম,—কাস্তেন লফেড। প্রথম দেখা হওয়া অবধি আমার ও ভালোবেসেছে প্রাণমন ঢেলে—প্রতিদানে আমি ওকে কি দিলাম ? দিলাম শুধু বুকভরা ব্যথা। ওর প্রতি কেমন যেন সহানুভূতিতে আমার অন্তর ভরে উঠল। আমার সুভার দেবী নেই, তার আগে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব আমার ভুলের জ্ঞান। এত কথাই বারবার আমার মনে হতে লাগল। আরো কিছু দিন আগে যদি এ-ভাবে আসত, যদি রাজী হতাম ওর প্রস্তাবে ? ওর মাথায় আমি হাত রাখলাম।

“লুই আমার ক্ষমা করবে ?”

বড় দুর্বল লাগল নিজেকে,—অতি কষ্টে বার হল এই চারটে কথা। উত্তরে ও তুলে নিল আমার হাত, তার ওপর নেমে এল ওর হাঁটু। চোখ ওর জলে ভরে উঠল।

“লুই, আমি ত ব্যক্তি ; তুমি রইলে ; বাবা-মার দেখা-শোনা কোর,—ওঁদের নিজের আত্মীয় ভেবে দেখা-শোনা কোর, কেমন ?”

মনে কেমন ধারণা এল, মৃত্যু আমার সমীপবর্তী।

“বেচারি বাবা-মা ! এই বরষে ওঁদের যত্ন করার আর কেউ নেই। ওঁরা আমার এত স্নেহ করেন,—আমার অবর্তমানে না জানি কত কষ্টই না হবে ওঁদের !”

ও নীরবে থাকিয়ে রইল আমার দিকে,—দুই চোখে দৃঢ়

ব্যথার চাপ, সজোর ও ধরে বইল আমার হাত। ক্রান্ত চোখ ছুটি বন্ধ করে ফেললাম। কে আমার বুকে জড়িয়ে ধরল।

“মামণি!”

“বাবা...”

তার পর আর মনে নেই। তার তিন দিন বাড়ে জ্ঞান ফিরল। বেশ দুর্বল লাগছিল। আমার ইচ্ছামুখারী আমার ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি সেবে উঠছি দেখে মার মুখে হাসি ধরে না; আগের লালিমা ফিরে পেতে এখনও অনেক দেরী। “আজ” সকালে আমার জড়িয়ে ধরে তিনি আনন্দে, চুপে কেঁদে ফেললেন।

“মার্গো, একি চেহারা হল তোর!”

ভেতরে গুঁকি ধমক দিতে গিয়ে নিজেও কেঁদে সারা। “মাদাম”, ও বলল, “এভাবে ওর ঘরে বসে তুমি কাঁদছ দেখে ও কি নিজেকে সামলাতে পারবে? ডাক্তারবাবু না হাজার বার বলেছেন, ও যাতে উত্তেজিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে?”

মা হাসার চেষ্টা করলেন। তেরেদের মুখ একবার খুলে খামে না সহজে।

“কেন ওর ফ্যাকাসে গাল দুটো কি খারাপ লাগছে নাকি? বরং খাসা লাগছে; এ কথায় অস্বস্তি আর একজন আছে যে সার বেবে, যখন এখানে আসবে। এমন ভাবে ওকে উত্থাপ্ত করার না মাদাম; এতে ওর মন খারাপ হয় না? কাপ্তেন সাহেব আশ্রক না একবার—আজ্ঞার কথা কাকে বলে দেখিয়ে দেবে একচোট।”

বাবা এসে আমার বিছানায় বসে আমার আদর করলেন। তেরেস চল গেল; মার থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমি বাধ সাধলাম; আমি জোর করে ওকে বিদায় করতে পাঠিয়ে দিলাম; বাবাও আমার সমর্থন করলেন ভাগিাস; নতুন উনি কি যেতেন? বাবা তখন কথা পাড়লেন, “মামণি এবার তুই সেবে উঠবি। ভগবান সত্যি আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয়।”

“হ্যাঁ বাবা!”

খানিক বাদে স্বাভাবিক গলায় উনি বললেন, “জানিস মা, লুই তোকে দেখতে এসেছে?”

“হ্যাঁ বাবা; ওকে যখন বিকারের ঘোবে দেখলাম, তখন আমার মনে কেমন যেন খারগা হয়েছিল আমার মৃত্যু অবশ্যকারী।”

সবাই তাই ভেবেছিল মা; পারীতে খুড়িমার ওখানে তোর অবস্থার কথা শুনে লুই বোজা পড়িমার করে ছুটে এসেছে।”

দীর্ঘ নীরবতার পর উনি বললেন, “কি একটা কাজে ও পারী গিয়েছে; দু এক দিনের মধ্যেই এসে পড়বে।”

“আজ্ঞা বাবা, কীতের খবর কি?”

“বিশেষ সুরবিশের নয়; মাঝে মাঝে ওর মাথার গণ্ডগোল দেখা যাচ্ছে।”

“আর ও?”

“হুনারা? মারা গিয়েছে; আত্মহত্যা করেছে।”

“হায় ভগবান!” আমার মুখ থেকে বেরিয়ে হল। শুনলাম, উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় ও একদিন এই অশঙ্ক জীবনের পূর্ণজ্বল টেনে দিয়েছে। ভগবান, ওর আত্মা যেন শান্তি পায় তোমার আশ্রয়ে। এখান থেকে বন্ধুর তুলার কাছাকাছি কবরখানার বাইরে ওকে গোর দেওয়া হয়েছে। আমি, আমিও ত চেয়েছিলাম ওকে অঙ্গসংরক্ষণ করতে।

২০শে এপ্রিল। কাল আমার বৈঠকখানায় নিয়ে বাওয়া হয়েছিল; নিজেই নেমে বাড়িলাম; কিন্তু কয়েক ধাপ নেমেই বসে পড়তে হল। বাবা হী হী করে উল্লেন, “পাঁড়া খুকি, আমি তোকে নিয়ে যাবো; এখনো তুই বড় দুর্বল মা!”

আমার উনি হাত ধরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন বৈঠকখানায় সোফার উপর। মা এক গ্রাস সুরা এনে দিলেন। বাবা আমার কাছেই বসলেন; ওর কপালে আমি হাত বুলিয়ে দিতে চাগলাম; আমার অন্তরের পর থেকে ওর কপালে দেখা দিয়েছে অজস্র রেখা।— আমি অনুযোগ করলাম, “বাবা, আমার অন্তরের সময় তোমাদের খুব ভুগিয়েছি বুঝি?”

“হ্যাঁ মা, খুবই কষ্টে দিন কেটেছে আমাদের,” কাঁপা গলায় উনি জবাব দিলেন দুই হাতে আমার চেপে ধরে।

“তোমাদের ছেড়ে যেতে পারলাম কই? ভগবান আমার মনে করিয়ে দিলেন যে তোমাদের প্রতি আমার যে কত ব্যতী পালিত না হওয়া অবশি আমি নিজেকে তাঁর চরণশ্রয়ের যোগ্য করতে পারব না।”

বাবা আমার কোলের কাছে নিয়ে চুপ করে বসে বসে রইলেন।

২১শে এপ্রিল।—কাল বিকেলে লুই এসেছে; বাবা আর আমি বাইরের ঘরে বসেছিলাম, দরজা খুলে গেল, আর আদালত, কিছু বলবার আগেই ও এসে ঢুকল।

সানবে ওর হাত বাবা চেপে ধরলেন নিজের মুঠোয়।

“ঠাং বোমার মত কোথা থেকে এসে ছুটলি লুই?”

ও আমার কাছে এল; ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমি বললাম, “বাগত লুই!”

আমি এত শোণা আর ফ্যাকাসে হয়ে গেছি দেখে ও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মাকে ডাকতে গেলেন বাবা। লুই আমার হাত নিজের হাতে নিয়ে সুরু সুরু আঙুলগুলোর ওপর সম্রত হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

“কি রক্তচীন তোমার চেহারা হয়ে গেছে মার্গরিৎ!” আমার দিকে খুঁকি ও অক্ষুট কণ্ঠে বলল, “বনফুল, তোমার ওপর দিয়ে যে বিরটি বড় বয়ে গেল!”

ও আমার এত কাছে এগিয়ে এল যে ওর হাঁটু আমার কপালে অনুভব করতে পারছিলাম; হঠাৎ ও সোজা হয়ে উঠে পাড়াল, সরে গেল চিম্নীর দিকে। ওকে বেশ বিচলিত লাগল; ওর চোখ কালো হয়ে উঠল। যখন ও উত্তেজিত হয়, তখন দেখেছি ওর চোখে ওই বকম কেমন একটা অন্ধকার ভাব ঘনিয়ে আসে। মাকে নিয়ে বাবা এসে ঢুকলেন। মা লুইকে জড়িয়ে ধরলেন; অবিরল জলধারা ওর চোখে।

“ওর চেহারা কত বদলে গিয়েছে, না রে লুই?”

“হ্যাঁ, কিন্তু বসন্তকাল এলেই আভে আভে আগের স্বাস্থ্য ফিরে আসবে।”

“সত্যি না কি রে?”

“বাঃ, একথা ত সবাই জানে।” বলে ও আমার দিকে চেয়ে হাসল।

“কি ভাবছ, সপ্তাহ ধানেকের মধ্যেই লুই আর আমি ওকে খাড়া করিয়ে দেব, কি বলিস লুই?”—বাবা ঠাটা করার চেষ্টা করলেও

দেখলাম ওর চোখের কোণ চক্চক করছে। লুই এবার কিছু দিন থাকবে। সন্ধ্যাটা বেশ লাগছিল। লুই আর বাবা চিমনীর দুই কোণ বসেছিলেন। বাবার হাতে হাত দিয়ে আমি সোকার শুয়েছিলাম। কাছেই বসে মা সেলাই করছিলেন। হাত দশটা বাজতে বাবা সবাইকে শুতে যেতে বললেন। আমি উঠলাম।

“উঠ, তুই নিজে সিঁড়ি নিয়ে উঠবি কি করে?”—মা আপত্তি জানালেন।

“দেখ না,” আমি হাসলাম, “নামার সময় বাবার হাতে ভর দিয়ে কেমন অনায়াসে এলাম বল ত?”

“না না,” বাবা বাধা দিলেন, “অসম্ভব, নামার চেয়ে ওঠা অনেক কঠিন।”

একটু চেষ্টাই করি না কেন? আমি বেকে বসলাম। দশ বাপ গিয়েই দম নেবার জন্ত বসে পড়লাম, বাবা তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন, “কি যে ছেলেমানুষী করছিস, শরীর এতে খাপাপ হবে।”

“একদম না।” আমি হাসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খুবই দুর্বল লাগছিল; ইতিমধ্যে লুই এসে পড়ল।

“এই ত লুই! ও-ই তোকে উপরে নিয়ে যাবে মা!”

“না বাবা,” আমি আপত্তি জানালাম।

“হা হা,” উনি উত্তর দিলেন, “ভর নেই, ও তোকে ফেলে দেবে না, ওর গায়ে কি ছোর জানিস?”

তার আগেই লুই আমায় তুলে ধরেছে। আমার চুপি চুপি ও বলল, “মাথাটা আমার কাঁধে রাখ দেখি।”

ওর গলাটা বেন অল্প রকম শোনাল; বড় নিস্তেজ লাগছিল, ওর কথাই শুনলাম; কি অবসর যে লাগছে। চোখ বুজে দেখি মা বসে আমার হাতে জল দিচ্ছেন আর তেরেস আমার জামা-কাপড় খুলে দিচ্ছে।

“এই ত জ্ঞান ফিরে এসেছে,” ও চেঁচিয়ে উঠল।

উঠতে চেষ্টা করতেই তেরেস বাধা দিল।

“আবার কি করবি রে? বা যোলটা খাওয়ালি এবুনি।”

ওর কথা জানতেই হল। আমার একটা গরম ডেসি গাউনে ঢেকে দিয়ে ও বলল, “হাই ম’সিয়াকে ডেকে আনি।—উনি কোথায় গেলেন মালাম, জানেন?”

“ওই ত বাগানে কে ঘেন পায়চারী করছে,” বাবাম গাছটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম।

“ও ত কান্টোন সাহেব,” হেসে উত্তর দিল তেরেস।—খানিক পরেই বাবা এলেন।

“দেখছিস ত মার্গরিৎ, কি দুর্বল হয়ে পড়েছিল?”

“হ্যাঁ বাবা, কিন্তু সকালে কেমন মিথ্যা তোমার হাত ধরে নেমে গেলাম; ভেবেছিলাম নিজেই বৃষ্টি উঠতে পারব।”

জানলা দিয়ে চেয়ে উনি বললেন, “ওই ত শত্রীর মত লুই টঙ্গল দিয়ে বেড়াচ্ছে; তুই জ্ঞান হয়ে গেছিস দেখে বা ভয়টা পেয়েছিল; বেচারী। ও তোকে কত যে ভালবাসে মা।” বলে উনি আমায় আলস করলেন।

“কিছু চাই না কি মার্গো?”

“না বাবা ঘুমিয়ে পড়ল। মাকেও নিয়ে যাব; দিন-রাত তোমাদের কি আশাই যে দিচ্ছি।”

আবার আমার আলস করে উনি চলে গেলেন।

২২শে এপ্রিল।—বাগানে মা আর আমি বসেছিলাম। দূরে দেখা যাচ্ছিল বাবা আর লুইকে। ওরা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন; বাবা ওর নিজের ঘোড়ায়, লুই আমারটার। বেশ কিছু দিন হল অন্ত্যাবলিঙ্গের শিষ্টে চড়ুনি বলে ও একটু বুনো হয়ে উঠেছে। তাই লুই ওকে একটু তালিম দিতে নিয়ে গেছে, আমি সেয়ে উঠলেই যাতে অন্ত্যাবলিঙ্গকে নিয়ে বেড়াতে যেতে পারি। ওরা আন্তে আন্তে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

“লুই এবার বেশ কিছু দিন থাকবে এখানে,” মা জানালেন, “তার পাঁচ ঘাসের ছুটিতে এসেছে। ও বাড়ীতে এলে সব-কিছুর রূপ কেমন বললে বায়, কেমন যেন একটা ক্ষুতির আমেজ এসে পড়ে। আর এই সময় তোমার ক্ষুতির একান্ত দরকার।”

“ছেলেটা বড় ভাল।”

মনে এল গত বছর ওর প্রস্তাব আমি যখন প্রত্যাখ্যান করি,—বেচারী আমায় একটা কথা পৃথক বলল না; সরল ব্যবহার দিয়ে, আমুদে মেজাজ দিয়ে ও আমার একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছে সেই অতীতের অপরাধ; মার বুক চিরে একটা দর্শনাস বেরিয়ে এল।

আমি মুখ ঘুরিয়ে বসলাম, দারুণ কান্না পেতে লাগল। মা-বাবার বাসনা আমি লুইকে বিয়ে করি। আমার ত’ মনে হয় ওদের সুখী করাই আমার কর্তব্য। বড়ই দুর্গাবহার করেছি ওদের সঙ্গে, ভগবান আমায় বাঁচিয়ে দিলেন এ যাত্রা, যাতে আমি নিজের কামনা

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম  
আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”



প্রতি প্যাকেট  
২৪ টি  
বড় আকর্ষণীয়

- কলো প্রস্তুত
- স্ট্রমে সেকা
- হোসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, রুচি  
ও সর্বস্ব রক্ষা করিতে

আর্য বেকারি অ্যান্ড কনফেকশনারি  
কলিকতা - ২৯

বাসনাগুলো দাবিয়ে রেখে ওঁদের ইচ্ছামত চলতে পারি, আর এই ভাবে তাঁর আশ্রয়ের যোগ্য হয়ে উঠি, যাতে করে আমার একওয়েমির জন্ত পরিতাপ করতে পারি। ওঁরা আমার সেই দুর্ভাবতারের কোন উল্লেখ মুহূর্তের তরেও করেন না; তবু সে কথা আমার মনে পড়ে যায়। ওঁরা এত ভালবাসেন আমায়, আমার উচিত ওঁদের কোন দাবী অপরূপ না রাখা। লুইকে বরাবর আমি একটু বিশেষ চোখেই দেখেছি, আর ওকে যদি বিয়ে করি তবে ভগবান আমায় শিখিয়ে দেবেন কি ভাবে যথার্থই ওকে ভালবাসতে হবে। তিনিই আমার ভরসা।

২৮শে এপ্রিল।—লুই আমাকে আন্তরিক ভালবাসে। ওকে কথা দিয়েছি, ওর জীবনসঙ্গিনী হব আমি। গত কাল সন্ধ্যায় আমি সোকার গুয়েছিলাম, দরজার দিকে পিছন ফিরে। কার পায়ের শব্দ শুনলাম; লুই! আমার পাশে ও বসল। চিন্তাকুল ওর দৃষ্টি। আমার দিকে যখন ও চাইল, মনে হল আমার গহনতম হৃদয়ে ও যেন কিছু খুঁজছে। হৃৎস্পন্দেই চূর্ণ করে বইলাম। বাইরের ভগতের শুদ্ধতা আচ্ছন্ন করে দিল আমাদের অন্তর। ও আমার হাত ধরল; জানি ও কি বলবে। বললও তাই।

“মার্গরিৎ, অহনিশি তোমায় আমি স্মরণ করি, আমার জীবন তোমারই হাতে, আমার আর ফিরিয়ে দিও না মার্গরিৎ, আমার জীবন এ ভাবে ব্যর্থ হতে দিও না; তোমার একটি কথার অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছে আমার সন্তা; তবু তুমি রাজী হবে না?”

ওর গলা কাঁপছে, কাঁপছে ওর হাত ছুঁতে। অসম্ভব বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ওর মুখ,—আতুল আবেগে ও চেয়ে বইল আমার দিকে। সন্তপণে আমার হাত রাখলাম ওর পিঠে; ওর স্বচ্ছ চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে অকপট ভালবাসার নীপ্তি।

“হ্যাঁ লুই, তোমায় আমি বরণ করে নেব সাগরে।”—ওর সমস্ত রক্ত নেনে ছলকে উঠল সারা মুখে। আমার অতি নিকটে ও সরে এল, তবু দু’টি ওষ্ঠ নম্রে এল আমার ওষ্ঠে, বহুকণ নিবিড় প্রেমে আমরা মর বইলাম।

“মার্গরিৎ, তোমায় আমি সারা সন্তা দিয়ে ভালবাসি।”—বলে আমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে টেনে নিল। ওর প্রশস্ত বৃকে আমার মাথা রেখে অপরূপ এক স্রবের মাঝে নিঃস্ব করে দিলাম। মনে পড়ে, এমন আনন্দ পেয়েছিলাম আর এক দিন। যখন অনেক দিন আগে এক চাবানীর থোকা জলে পড়ে গিয়েছিল, আর আমি ভুবে বাচ্ছিলাম ওকে উদ্ধার করতে গিয়ে—এমন সময় জলে কাঁপিয়ে পড়ে, বাবা আমার বৃকে টেনে নিয়েছিলেন সবল দু’টি হাতে! ঘরের কোন কিছুই চোখে পড়ছিল না; বাইরে, গাছের লম্বা লম্বা ছায়াগুলো ছলছিল। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে আমরা কাটিয়ে দিলাম ওই ভাবে। তার পর ওর দিকে মুখ তুলতেই চোখে পড়ল উজ্জ্বল দু’টি চোখ; ওকে হুই হাতে জড়িয়ে ধরলাম, ওর কপালে চুম্বন দিয়ে প্রেম করলাম, “লুই, সত্যি কি তুমি আমার চাও?”

আমার দুই কাপসা হয়ে এল; উত্তরে অশ্রুভব করলাম আরো নিবিড় হয়ে উঠল ওর আল্পের।

“কিন্তু আমি কি তোমায় স্ত্রী করতে পারব? সেদিনের মার্গরিৎের কঙ্কাল ক’খানা মাত্র আজ বেঁচে আছে, লুই?”

শীর্ণ আমার হাত ছুঁতে দেখে এক বিলিক করুণ হাসি ছড়িয়ে পড়ল আমার মুখে।

“কঙ্কাল থেকেই আবার মার্গরিৎকে আমরা গড়ে তুলব; সেই হবে আমাদের সাধনা।”

বাবা এলেন; উনি কিছু বলার আগেই লুই আমার হাত নিজের হাতে রেখে উঠে ঝাঁড়াল, বলল, “বাবা আমরা দু’জনে বাগ্নমত; আপনায় আশীর্বাদ চাই।”

বাবা এগিয়ে এলেন।

“মা, ভগবান তোদের রক্ষা করুন, তোকে, তোয় সৈন্ত সঙ্গীকে!” বলে জড়িয়ে ধরলেন আমায়। “আজ সত্যি বড় আনন্দের দিন।”

“সত্যি তুমি স্ত্রী হয়েছ বাবা?”

“হ্যাঁ মা, হ্যাঁ।”

উনি ছুটে গেলেন মাকে ডেকে আনতে। তিনিও এসে আমরা জড়িয়ে ধরলেন, “মার্গো, এ আজ কি শুনলাম মা? সত্যি?”

“হ্যাঁ মা!”

“বাক্, ভগবান এত দিনে আমার প্রার্থনা শুনলেন।”

ওরা বড় স্ত্রী আজ; আমিও স্ত্রী; এত আনন্দ পাব কোন দিন ভাবিনি। ভগবানের ইচ্ছাই আমাদের নিয়ে চলুক পথ দেখিয়ে। লুই জানসা উপকে নেরে গেল বাগানে; সেখানে পাখচারা করতে করতে ও ধরাল একটা সিগার।

“তুই স্ত্রী হয়েছিস মার্গরিৎ?”

“হ্যাঁ বাবা।” আমি হাসলাম।

“বেশ মা, বড় স্বস্তি পেলাম; তুই দিন দিন যা শুকিয়ে বাচ্ছিলি, বড় ভাবনায় পড়েছিলাম; এখন তোয় সামনে কত কিছু করবার আছে দেখছিস ত’? সেই সব কর্তব্যের ডাকে, তাদেরই আশায় তুই এবার সরে উঠবি দেখি। ও আর তুই—তোদের দু’জনাতে একই বকম ভাবে গড়েছিলেন ভগবান। তুমি কি বল আরিয়েৎ?”

“হ্যাঁ গো, সে কথা আজ আর নতুন করে কি বলি? চল, ওঁদের আপন মনে কথাবার্তা বলবার সময় দিতে হবে; আমরা উঠি।”

“তাই ত, লুই বোধ হয় এককণ মনে মনে আমাদের হুণপাত করছে।” উঠে ঝাড়িয়ে বাবা ঠাটা করলেন। “তোদের এখন কত কি বলার আছে, তাই না মা-মনি?”

আমায় আলিঙ্গন করে মা আর বাবা বেরিয়ে গেলেন। সোকার আমি গুয়ে পড়লাম; চেয়ে দেখতে লাগলাম লুই বাগানে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। খানিক বাদে, ঘরে কারো গলা শোনা যাচ্ছে না দেখে, ও মুখ তুলে তাকাল, তার পর ঘরে কেউ নেই দেখে, সিগারটা ও ফেলে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল। পরস্পরের সান্নিধ্যে আমরা স্বপ্নের মধ্যে ভেসে চললাম; ও আমায় এত ভালও বাসে! খানিক চুপ করে থেকে ও জিজ্ঞাসা করল।

“আচ্ছা, কবে তা হলে ঠিক হল?”

“কি?”

“বাবা, আমাদের—” ও লাল হয়ে উঠল।

“ওহো; তা যেদিন তুমি ঠিক করবে।”

“আমি ত চাই এখনি হোক,” ও অধীর গলায় জানাল, “আচ্ছা, আগামী ১৩ই মে করলে কেমন হয়?”



# মার্গো

CMC-4 R BEN

স্বাস্থ্যের  
সময়  
মার্গো সোপ



ব্যবহার করতে ভুলবেন না

সুস্বাদু-সুন্দর মার্গো সোপের শুভ ফেনরাশি প্রতিটি  
লোমকূপের গভীরে প্রবেশ করে মালিন্য দূর করে এবং দেহে  
স্বাস্থ্য ও যৌবনের দীপ্তি এনে দেয়। পরিবারের সকলের  
ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ এই সাবান। কোমল ত্বকের পক্ষেও  
নিরাপদ।

প্রস্তুতকারক  
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ  
কলিকাতা - ২৯

“বেশ !”

“আরে দুই সপ্তাহ বাকী ; উঃ, এতগুলো দিন ! জান, করে যে তোমার আমার মত করে পাব,—ভাবতেও ভাল লাগছে !”

“বে লগ্নে তোমার আমি কথা দিয়েছি তখন থেকেই ত’ আমি তোমার, একান্ত তোমার, লুই !” আমি উত্তর দিলাম।

ও বড় খুশী হল একবার।

“জানো মার্গো, আমি ঠিক করেছি তোমার নিয়ে সোজা দক্ষিণ দেশে চলে যাবো ; এখানের এই কনকনে উত্তরে হাওয়ায় আগুতা থেকে বহু দূরে উষ্ণ কোন প্রদেশে ; সেখানে আমার জীবন-প্রশ্ন ফিরে পাবে তার পূর্ব-স্বাধীন !”

ওর মধুর কথা শুনে আমার চোখ সজল হয়ে উঠল। এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে অল্পতেই বিচলিত হই আজ-কাল। ওর শিশুর মত স্নান কপালের এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টিতে।

“কি ভাবছ বলত ?” ও হাসল।

“ভাবছি যে তোমার রূপ, তোমার মহত্ব আমার প্রকৃতির সঙ্গে কি খাপ খাবে ?”

দু’ ফোঁটা জল পড়ল ওর হাতে। কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে আমার হৃদয় আজ ভগ্নপুর ; আমার মাথা ওর বৃকে, ওর মুখ আমার কপালে। জীবনের তরী আজ বল্লর খুঁজে পেয়েছে !

এই যে—গিয়েছিলাম ‘ওর’ মাকে দেখতে ; ওর মাথার অবস্থা খুবই খারাপ ; এক দিক দিয়ে এ ভালোই হল ! তা নয়ত এত বাতানা সহ্য করা ওর পক্ষে দায় হত। কর্ণেল ওর কাছেই আছেন। আমার দেখে কীতেন্স চিনতে পারলেন ; এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করলেন।

“কি তোরা চেহারা করেছিল মা !”—এত দিন বাদে ওর গলা শুনে বিচলিত হয়ে পড়লাম। বড় কাঁরা পেল।

“তোরা কি অসুস্থ করেছিল ?”

“হ্যাঁ।”

“হ্যানোয়া তোরা এই চেহারা দেখে যে কি কষ্টই পাবে ; ও অল্প দিনের জন্তে বাইরে গিয়েছে ; কি একটা কাজে ও গিয়েছে—কোথায় গিয়েছে ?—ওহো ! মনে পড়েছে—তুল’তে ! কি নাম-বংশীন জায়গায় যে গেল ! কে জানে বাপু, নামটা শুনেলেই গা রি রি করে ; ওই বকমই। হ্যানোয়া বাইরে যাওয়া অবধি এমন ভীত হয়ে উঠেছি। গান্ধী মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যায়। সাগর রাত এমন সব দুঃশব্দ দেখি যে তারদ্বারা চোঁচাই ভয় পেয়ে,—তাই শুনে ও ছুটে আসে।”

ও এই ধরণের এলো-মেলো কথা শুনে বড় কষ্ট হল। এমন সময় কর্ণেল দেখে এলেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই উনি আমার অভিযান জানালেন। “কি দিদি, এখন শরীর কেমন ?” কীতেন্সকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন না ; বসে বসে কি যেন ভাবতে লাগলেন ; হঠাৎ আমার ধরে বসলেন, “কি মা, তোরা মুখের হাসি একদম মিলিয়ে গেছে ; ব্যাপার কি ? তোকে এত গৌমড়া দেখছি কেন ?”

হাস্যর ভাণ করে বললাম, “কই কিছু ত হয় নি !”

“কিন্তু তোরা সেই প্রোশাঙ্কল ভাব আর নেই ; ওহো, আমিই ত

তার কারণ—জাবিস না মা, ওর কিরে আসার সময় হল ; কই আমি ওর মা হয়েও তোর মত মুখ ভার করে বসে নেই দিন-রাত ?”

যাবার জন্তে উঠে ঠাঁড়ালাম ; উনি বিদায়-আলিঙ্গন দিলেন অভয়াসমত। নীচে কর্ণেলের সঙ্গে করমর্দন করার সময় উনি বলে উঠলেন, “তুমিই মার্গারিৎ, শীগগির তোর বিয়ে ? সন্তান না কি ?”

“জান্ধে হ্যাঁ।”—ওর মুখে একপ্রকার শুনে খুব লজ্জার পড়ল ; তাই মুখ নামিয়ে ছিলাম ; উনি আমার চিবুক তুলে ধরে জানতে চাইলেন, “কান্তেন্স লফেড্র-এর সাথে, তাই না ?”—কটক অবধি উনি আমার পৌছে দিতে এলেন ; বেশ চিন্তাময় লাগল ঠিক ; স্বপ্নোপাতির মত বললেন, “তুই কি একা এসেছিস মা ?”

“না, বাইরে লুই আমার জন্ত অপেক্ষা করছে।”

আমরা বেরিয়ে আসতেই লুই এগিয়ে এল ; করমর্দনের পর ওদের কথা শুরু হল। আর পাশে এসে লুই জিজ্ঞাসা করল, “তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়নি ?”

“না ; কিন্তু এখানে খানিক বসে যাই না কেন ?”

লুই ভাবল আমার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে ; একটা ওক গাছের ছায়ার বদা গেল। কর্ণেল আমার কাছেই বসলেন ; বললেন, “এখনো তুই বড় দুর্বল দেখেছি।”

লুই জানাল যে আমার খুব অসুস্থ হয়েছিলাম।

“হ্যাঁ তা ত জানি।”

“এবার দেখেবন জান্ধে জান্ধে ও কেমন সেবে ওঠে !” বলে লুই হাসল। অরম্য ওর আশা। ও আমাদের একান্তই ভালবাসে ! আমি যেন ওর প্রেমের যোগা হতে পারি, ভগবান !

কর্ণেল বিশেষ কিছু বলছিলেন না ; লুই তা লক্ষ্য করেনি। মিত হাতের ও আমার নিকে চেয়েছিল—আমাদের অনুভূতি যে মুখ-পাখার, তার স্বপ্নে ও একান্ত। একটু ভিরিয়ে নিয়ে উঠে ঠাঁড়ালাম ; যাবার সময় হল। কর্ণেল বেশ আবেগপূর্ণ ভাবে আমার বিদায় দিলেন।

“মা আমার, তুই আমাদের যে সাহায্য করেছিল, তার জন্ত ভগবান তাঁর আশীর্বে তোকে ধন্য করুন, মা !”

তারপর লুইয়ের সাথে করমর্দনের সময় বললেন, “ম’সিয়্য ওকে সুখী কর ; জীবনসঙ্গিনীরূপে যাকে তুমি পেয়েছ সে যে কত দুর্লভ তা যদি জানতে ! তুমি ওকে ভালবাস, বেশ বৃদ্ধি ; তার থেকেই বৃদ্ধি হলে হিসাবে তুমি কি বকম। জীবনে তোমাদের সাথে আর দেখা হবে কি না জানি না ; তবু এক কথা জেনে রাখ যে বৃদ্ধো এক সৈনিকের শুভেচ্ছা চিরকাল তোমাদের দু’জনকে আগলে রাখবে।”

বলেই চলে গেলেন। আমরা বাড়ী ফিরলাম। বেশ রাত হয়েছে ; বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

“এই ত, এসে গেছে !” উনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

“মা-মণি, ক্লান্ত লাগছে না ত’ ?”

আদলক আলো নিয়ে এল।

“তোকে মা বেশ অবসন্ন লাগছে।” বাবা বলে চললেন।

লুই অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। আমি হাসলাম দেখে ওরা খানিক নিশ্চিন্ত হলেন।

“তোমাদের চোখে আমি ত আজ-কাল সর্বদাই অবসন্ন হয়ে আছি !” আমি বললাম।

লুই আর বাবা সত্যি আশঙ্কিত হলেন। বাইরের ঘর থেকে আমি নিজে ঘরে চলে এলাম। পেছন পেছন এসে লুই।

“তুমি?” ও ডাকল। আমি খামচেই ও আমার জড়িয়ে ধরে কপালে একে দিল মেহচূষন। আমি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। পোবাক বললে ফেললাম; খেতে যাব। কুশের সামনে বসে ভগবানকে মন্ত্রণ করলাম। আমি সবে দাঁড়িয়েছি এমন সময় লুই দরজায় টোকা দিল।

“চল এস না!”

“আসব?”

“বেশ ত? আসবে না কেন?”—দরজা খুলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমার গোপন করবার মত আমার কি-ই বা আছে?” ও হাসল। ওকে বলিয়ে দিয়ে ওর পাশে আমি বসলাম। বুক আমার টনটন করছে অপরূপ আনন্দে: প্রার্থনা করছিলাম, লুইয়ের উপযুক্ত সহধর্মিণী যেন হই। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর সারা মুখ তৃপ্তিতে উজ্জ্বল।

“কি ভাবছ গো?”

“কি ভাবছি জান লুই, ভাবছি তোমার ভালবাসার কথা!” বলে ওর হাতে হাত রাখলাম।

“দ্রিয়তমা!” ও ডাকল, পকেট থেকে বার করল একটা ছোট বাক্স; তার মধ্যে চমৎকার একটা আন্টি; সেটা আমার আঙুলে ও পরিয়ে দিল; মাশে সামান্য বড় ঠেকল যেন।

“তাতে কি পড়বার ভয় নেই!” আমি বললাম।

কালো রেশমের মত স্বন্দর এক গাছা ফুল দেখিয়ে ও প্রশ্ন করল, “বল ত কার চুল?”

“তোমার মার?”

“উহ, তোমার!” ও হেসে বলল, “কই কবে নিয়েছ, জানি না ত?”

“জানবে কি? তোমার অন্তরের সময় নিয়েছি।”

“লুই, আমার সঙ্গে চল না; পুণ্যমরী মেরার কাছে প্রার্থনা করা যাক।”

ও উঠে এস; বেলিতে গিয়ে কুশের তলার হুঁজনে বসলাম হাত ধরাধরি করে। নির্ধাক শ্রদ্ধার ভগবানের কাছে মেলে দিলাম আমাদের স্বপ্ন; আমবা বা চাই, “তা তিনি দেবেন। আমরা উঠতেই দাঁধ আসেবে ও আমার ঘরে রাখল। জানলার কাছে তখন ভাবে খানিক কাটিয়ে আমরা খাবার ঘরে গেলাম।

১১ই মে। মার আয়োজনের অন্ত নেই। উনি বাবা, কেউই আমার কুটোটি নাড়তে দেবেন না। গিয়েছিলাম নদীর ধারে, লুইয়ের সঙ্গে। একটা গাছতলার গিয়ে বসলাম; পাশেই, বাসের ওপর লুই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

“কবে যে আমরা এক হব, দিন রাত এই ভাবনাই আমার মাথায় ঘূষছে,” বলেই ও সলজ্জ হাসি হাসল।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, “কেন লুই, কাল বাসে পরও দিন না?”

“হ্যাঁ, কিন্তু—” আমার দিকে তাকিয়ে ও বলল, “আচ্ছা, মিনটা পেছিয়ে দিলে হয় না?”

“না গো, শোহাই তোমার; তুমি বা বল আমি সবই করতে রাজী আছি; এমন কথা আর মুখে এমন না লক্ষ্যটি!”

ও আমার হস্ত চুষন করল।

এমন সময় পাশের কোণটা নড়ে উঠল। দেখি, শ্রীমতী গোসরের সঙ্গে একজন ভ্রমলোক,—অবাক হয়ে চেয়ে আছেন। লুই এক লাফে উঠে দাঁড়াল। গোসরের খিলখিল করে হাসতে লাগল।

“বড় খাণাপ সময়ে এসে পড়লাম, না কান্তেন সাহেব?” তারপর আমার বলল, “তোয় বাড়ী গিয়েছিলাম; তুই ওনলার বেরিয়ে গেছিস; অসভ্যের মত হাসতে হাসতে নীচু গলায় ও বলে ফেলল, ‘জানতাম কি ছাই কার সাথে কোথায় গিয়েছিস; তা হলে আর তোদের বাগড়া দিতে আসব কেন?’

লুই ওর চাবুকা বাসের উপর এলোপাখাড়ি মারতে লাগল অশ্রুমনস্ক ভাবে; ওর অর্ধেক ভাব দেখে গোসরের আমার হাত ধরে সহায়দ্বিতি জানাল, “কি বললে গেছিস তুই? ‘একি চেহারা হয়েছে?’

ওর সঙ্গীর নাম ম’সিয়া ভোলান—এই বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ও কানে কানে বলল, “বিরিট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; বাসের ব্যবসা আছে; টাকা-কড়িতে পাকা ইচ্ছা!”

তার পর সাদা গলার জিজ্ঞাসা করল, “শরীর খাণাপ হচ্ছেছিল বুঝি?”

“হ্যাঁ।”

“ও, তাই বল; কিছুই ত জানতাম না। পারী গিয়েছিলাম। তুই কখনো পারী বাসনি, না রে?”

“একবার গিয়েছি।”

“তুনলেন ত ম’সিয়া ভোলান? বেচারা জীবনে একবারের বেশী পারী বাসনি!”

অমায়িক হাসি হেসে ভ্রমলোক অভিযান জানিয়ে আমার বললেন, “মাপ্‌মোয়াজেল আবার যদি কখনো পারী বাস, বা কিছু সেখানে দেখায় আছে আপনাকে ব্রিগে দেখানোর ভার আমি নিলাম।”

হঠাৎ বহু কঠোর সাড়া পেলাম; আমাদের দিকেই যেন এগিয়ে আসছে।

“ওই ত।” গোসরের চেঁচিয়ে উঠল, “ওরা আসছে; সিলভী, এই যে আমরা এখানে।”

তিন জন মহিলা আর দুই ভ্রমলোক হাজির হলেন।

“এই দেখ,” একটি মহিলাকে ও ডাকল, “এইটি আমার গায়ের বন্ধু।”

তার পর আমার বলল, “আর এরা আমার পারীসিয়ান বন্ধু: শ্রীমতী কুতেভ, শ্রীমতী মারিত্ত, মাগাম কারসা।”

তারপর ভ্রমলোক দুজনের সাথে আলাপ করিয়ে দিল। এত সৌরগোল আমার সইছিল না; দাক্ষণ ইপিয়ে উঠলাম।

“কাল আমরা সবুয়ের ধারে একটি প্রেক্ষার ট্রিপে যাচ্ছি বে মার্গিরিং; তুই আসবি ত?”

“না,” আমি জবাব দিলাম।

“কেন, এমন সরাসরি হঠাৎ ‘না’ বলছিস কেন রে? চল চল, হোকো যেতেই হবে; রাজী ত?”

লুই আমার হয়ে জবাব দিল এবার, “ও অরুতেই আজকাল বড় রাস্তা হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় না বাওয়াটাই কাম্য।”

“বেশ আপনি গুর হয়ে চলুন তবে,” ওকে ধরে বলল গোসবেল।

“না মানমোয়াক্সেল, আমার পক্ষেও বাওরা সম্ভব হবে না; মাক করবেন।”

“বেশ, বেশ, কান্তেন সাহেব, আপনার রাগ এখনো পড়ে নি দেখছি! তবুও আপনাকে অনুরোধ করছি, যদি আসেন, বড় সুখী হব; আসবেন ত? না! ধন্ত একরোখা মানুষ বাপু!”

আমাদের সঙ্গে করমর্দনের পর ওরা চলে গেল; দূর থেকে ও দস্তানা-পর্যায় হাত নেড়ে আমায় বিদায় জানাল।

১২ই মে।—আজ সন্ধ্যাবেলার জানলায় ধারে বসে ছিলাম সোকার ওপর; লুই এল। আমার পাশে বসে আমায় এক হাতে জড়িয়ে ধরল; আমি গুর কাঁধে মাথা রাখলাম। গুর পাশে বসে বড় আনন্দ। এই একটি স্নায় কত যে আন্তরিকতা আর প্রেমে ভরা, আমি জানি। আরো জানি যে জীবনে সব বাধা-বিপত্তির হাত থেকেই ও আমায় আড়াল করে রাখবে। গুর কপোলে আমার কপালে, গুর হাত আমার হাতে, আমার মাথা গুর কাঁধের ওপর; আমরা নীরবে এই মুহূর্তটি উপভোগ করছিলাম। কাল আমাদের দুটি স্বপ্ন এক হবে। দুই বার ও আমায় চুমু দিল সম্ভরণে।

লুই যেতেই বাবা এলেন: লুই কোথায় জানতে চাইলেন।

“ওই ত,” আমি দেখালাম। লুই পায়চারী করছে।

ধূমপানরত। “এইমাত্র ও ত এখানেই ছিল।”

“বলু মা, তুই সুখী হবি ত?”

ওকে আমি দুই হাতে চেপে ধরে বললাম, “হ্যাঁ বাবা।”

উনি তৃপ্ত হলেন।

“লুই তোকে নীস-এ নিয়ে যেতে চাইছে।”

“হ্যাঁ, আমাকেও বলেছে।”

“তোকে ছেড়ে থাকে বড় কঠিন হবে মা!”

“বাঃ, তোমরা যেন যাবে না আমাদের সঙ্গে, তুমি আর মা?”

আমি আশ্বৰ্য হয়ে গেলাম।

আমরা পরে যাব মা! এই ঠাণ্ডা দেশ থেকে তুই যত তাড়াহুড়ি হাস ততই ভাল; দক্ষিণ দেশের ঠাণ্ডা পেলেই দেখবি কেমন সেরে উঠিস। বড় জ্বর এক মাস কি দুই মাস বাড়েই আমরা গিয়ে জুটব। যাবার আগে এখানকার সব কিছু বিলি-বাবস্থা করতে হবে ত?”

১৪ই মে।—গত কাল সন্ধ্যা-সময় আমাদের পরিণয় সম্পন্ন হয়েছে। পুঙ্কত ঠাকুর যখন গুর হাত আমার হাতে দিলেন, আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। আমি যেন আদর্শ স্ত্রী হতে পারি। গীর্জা

ছাত্রদের প্রতি বেত্র-ব্যবহার সম্পর্কে বিতর্কাসাগর

আমার মতে অপরাধের প্রকৃতি বাহাই হোক না, নাবালকদের শিক্ষায় দৈনিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্তব্য। বালকদের শিক্ষাদান কার্যে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দৈনিক শাস্তি পরিণামে অন্তঃকলঙ্ক; ইহাতে শাস্তিপ্রাপ্ত বালক না শোষণীয়রা বরং নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে আমি দৃঢ়ভাবে প্রস্তাব করিতেছি, এই নিয়ম যেন অবিলম্বে উঠাইয়া দেওয়া হয়। (১১ই জাছুয়ারী, ১৮৬৫)

থেকে যখন বের হলাম, আমাদের পথে মুঠো মুঠো ফুল হড়ান হল। হঠাৎ একটা গান আমার মনে পড়ে গেল; কোথায় যেন পড়েছিলাম:

“নবোচ্চা রূপসী যে-পথে যাবে,

ফুলে ফুলে দাঁও সে-পথে ছেয়ে;

পথে পথে ফুল, ফুটনের হাসি,

রূপসী নবোচ্চা এ পথে যাবে।”

গানের শেষটা বড় ককণ:

“পথে পথে ওঠে শোক-ক্রন্দন,

মৃত্যু রূপসী যে এ-পথে যাবে;

পথে পথে শোক, ভক্ত-অর্থ,

রূপসী মৃত্যু যে যাবে এ-পথে!”

আমারা কি এই অবস্থা হবে? ভগবান জানেন। আমাদের মঙ্গলের জ্ঞান তিনি সব করেন।

বাবা আর মা বাড়ীর সামনেই আমাদের বরণ করে নিলেন।

চারি দিকে দাক্ষণ ভীড়; বহুস্বরা উচ্চ কণ্ঠে আশীষ জানাচ্ছেন।

এঁরা সবাই আমায় অতি ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করে আসছেন।

লুইয়ের পুঙ্কতালী উদার চেহারা দেখে সবাই বড় সুখী হলেন।

বাবা আমায় আলিঙ্গন জানালেন, লুইকেও।

মা দুই হাতে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। গুর চোখে জল;

আনন্দাক্র। লুই অতি সুখী আশ্র; বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে

না। মাকে জড়িয়ে ধরল ও।

“বাবা, তোর হাতে আমাদের একমাত্র সন্তানকে সঁপে দিলাম।”

উনি বললেন, “জানি তুই ওকে কত ভালবাসিস, আর ও তোর ঘরে

গিয়ে আনন্দেই থাকবে। ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।”

তেরেস আনন্দের আতিশয্যে আমার গলা আঁকড়ে রইল, “বা

দিদি, সুখী হ।”

তারপর বলল, “কিন্তু মাদাম, স্বাস্থ্যটার দিকে একটু নজর

দিস, বুঝি বাচ্চা।”

বাস্তির আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন পুঙ্কতঠাকুর, সপরিবারে

মেয়র মশাই, সপরিবারে ডাক্তারবাবু, মাদাম গোসবেল ও তাঁর মেয়ে।

নব দম্পতীর স্বাস্থ্য-কামনায় পানপূর্ব শুভ হল। লুইয়ের মুখ

আনন্দে ঝলমল করছে। শ্রীমতী গোসবেল আমায় উত্থাপ্ত করে

ভুলল,—এ কথা ওকে আমি আগে জানাইনি কেন,—এই বলে।

“তুই ভারী দুষ্ট; এই ত গত পরত দিন দেখা হল; কানে কানে

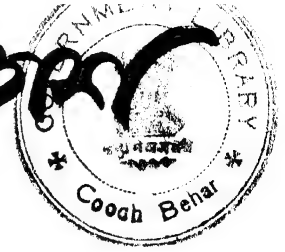
একবার বলে দিতে কি আপত্তি ছিল?”

[ ক্রমশঃ ]

অনুবাদক—পৃথ্বীশ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

# এক মুঠো আকাশ

ধনঞ্জয় বৈরাগী



সিনেমায় তেমন ভীড় ছিল না। কাজের দিন, তিনটির সময় বেশী লোক আশা করা যায় না। তবু ট্রাম-বাস্তার ওপর আর বাজারের কাছে বলে সামনে দিয়ে লোক চলাচলের বিহীন নেই। ছেলেটা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছবি দেখে, সিনেমা হলের বাইরে আঁকা লাফমারী নায়িকা, তার বিচিত্র ভঙ্গিমা। সিগারেটে জোর টান দিয়ে অনভ্যস্ত হাতের চার আঙ্গুলে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। একমুখ পান, বয়স বেশী নয়, ছাত্র হলে ম্যাট্রিক দিতে এখনও দেয়া আছে।

না দেখে পেছু হাঁটতে গিয়ে কার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ভদ্রলোক তিড়িবিড়িয়ে ওঠেন, ভারী ডেপো তো, বয়সের মান-সম্মান নেই, বাবা-কাকার গায়ে সিগারেটের ছাঁকা মিছা?

ছেলেটা ধন্তমত খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়, আমি ইচ্ছে করে লাগাইনি—

—ছি, ছি, আবার এ নিয়ে কথা, গলা টিপলে দুধ বেরায়। বাপ-মার পরস্পর করছ? দেখছেন মশাই আজ-কালকার ছোঁড়াগুলোকে? গোলায় গেছে। লেখাপড়ার বালাই নেই, বিড়ি-সিগারেট, সিনেমা, শুধু এই হচ্ছে।

দেখতে দেখতে ছোটখাট ভীড় জমে যায়, সকলেই ভদ্রলোকের পক্ষে, আজ-কালকার ছেলেদের অর্ধাচীনতা সবচেয়ে খুশি হয়ে ওঠেন।

—আপনার বরাত ভালো যে মুখে শোঁয়া ছেড়ে দেয়নি।

—জিজ্ঞেস করে দেখুন না, শুনবেন হরতো বাড়ীতে দুবেলা হাড়ি চড়ে না।

—কি খোকা, ইস্কুলটিস্কুল নেই বুঝি? এখানে কি করা হচ্ছে?

ছেলেটা উত্তর খুঁজে পায় না, সিগারেটের ছাঁকা লাগানোর অনিচ্ছাকৃত অপরাধে যে এ ধরনের অসহায় অবস্থায় পড়তে হবে তা সে কল্পনাও করেনি।

—বেশ করছে সিগারেট খাচ্ছে আপনাদের কি? একজন ছেলেটার কাছে এসিয়ে আসে।

এইটুকু দুধের ছেলে—

—এত দরদ তো এক বাটি দুধ খাওয়ার না, সে যুবোদ নেই, শুধু ঝড়ি ঝড়ি বুকনি। সিগারেট খেয়ে তো আপনাদের পরস্পর গুড়ায়নি। এস তো খোকা আমার সঙ্গে।

ছেলেটা ব্যঙ্গালিত্বের মত এই অপরিচিতের সঙ্গে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে আসে।

—সিনেমা দেখবে?

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকায়, আমার কাছে পরস্পর নেই—

—আমি দেখাব, চল।

সামনের দিকে ছুটে সিটে পাশাপাশি বসে তারা ছবি দেখে। আধুনিক বাংলা ছবি, ছোটদের জন্মে নয়।

—কি বকম লাগছে?

—ভাল, ছেলেটা আন্তে উত্তর দেয়।

ছবি শেষ হলে তারা বেরিয়ে আসে। পরমকাল, সন্ধ্যা তখনও নামেনি।

—খুব ভাল লাগল, ছবি দেখতে আমি ভীষণ ভালবাসি।

—এই সিনেমায় যে বই ইচ্ছে তুমি দেখতে পার, এখানে আমার পরস্পর লাগে না। ছেলেটার চোখ ছুটে নেচে ওঠে, তাহলে খুব মজা হয়, আপনাদের সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?

—এখানে কিবা ওই গলির মধ্যে চায়ের দোকান আছে, অনন্ত কেবিন, ওইখানে।

—আপনার নাম তো জানি না?

—কেটল।

দিন দুই পরের কথা। অনন্ত কেবিনের এক কোণে বসে কেটল চা খাচ্ছে, এ তার আজকের অভ্যাস নয়। চা খায়, কাজ করে, নিজের মনে ভাবে, কখনও গল্প করে। কেবিনের মালিক আশুদা' সদাশিব মাহুয, পরস্পর বাকী পড়লে কিছু বলেন না, একসময় চুকিয়ে দিলেই হ'ল। এ কেবিনে সব ধরনের লোক আসে, কলেজের ছাত্র, চাকুরে, বেকার, ব্যবসায়ীর থেকে শুরু করে জুয়াড়ী, এমন কি সিনেমা থিয়েটারের অভিনেতা পর্যন্ত। আসে না শুধু মেয়েরা, বোধ হয় আলাদা ব্যবস্থা নেই বলে।

কেটল নিত্যসঙ্গী প্রভাত। সে সাহিত্যিক, কাগজ-কলম নিয়ে বসে খস-খস করে লিখে যায় ফরমাশ মত গল্প, প্রবন্ধ উপভাস। কয়েক কাপ চা আর কয়েক প্যাকেট সিগারেট তার সাহিত্যের প্রেরণা বোগায়। আজও প্রভাত বসে লিখছিল।

কেটল জিজ্ঞেস করে, কি লিখছিস?

প্রভাত মুখ না তুলে উত্তর দেয়, একটা বড় গল্প, কড়া ইয়েছে, তাকে পাড়ে শোনাব।

—প্রেমের?

—দূর দূর, ও-সব প্যানপ্যানে জিনিষ আজ-কাল চলে না, একখানা বিদেশী গল্পের বাংলা রূপ দিলাম, কোন শালাকে ধরতে হবে না যে চুরি করেছি।

প্রভাত বক বক করে একটু বেশী, শুনে শুনে কেটল অভ্যাস হয়ে গেছে, অর্ধেক কথায় মন দেয় না।

কেবিনের বাইরে ভোট নিয়ে কারা ঝগড়া করছিল, হু'দলের মধ্যে বচসা আর কি। কেটল বসে তাই খানিকটা শোনে। 'আশুদা' বিড় বিড় করেন, ছোঁড়াগুলো আর ঝগড়া কবাব জায়গা পেলে না, মরতে আমাদেরই দোকানের সামনে এসে জুটল।

হয়তো আরো কিছু বলতেন, যদি না ছেলেটি তাঁর সামনে এসে পড়িত।

—কি চাই?

—কেউগা' আছেন?

আত্মনা' উত্তর দেবার আগেই কেউ হাত নেড়ে ডাকে, এই যে, এদিকে। ছেলেটি কেউর সহস্র মুখের দিকে তাকিয়ে হালসে, কাছে গিয়ে বসে পড়ে।

—আমি ভেবেছিলাম কাল তুমি আসবে।

—ইতুল ছিল যে।

—তুমি খুলে পড়?

—হ্যাঁ, যিভাভবনে।

—বটে, কোন ক্লাশে?

—খার্ড ক্লাশ।

—কি খাবে বল? চপ আনতে বলি?

ছেলেটির উত্তর দেবার আগেই কেউ কেবিনের ছোঁড়া চাকরকে হাঁক দিয়ে বলে, ওরে নিতাই, দুটো চপ দিয়ে বা।

ছোট বেকারীতে চপ আসে, সঙ্গে খানিকটা কাঁচা পেরাজ। ছেলেটি প্রাণ ভরে খায়, গল্প করে।

—মা নেই, মাঝা গেছে আমার ছোটবেলায়।

—বাবা?

—বাগা আছেন, মকঃবলে কাজ করেন ওখু বিক্রীত।

—কোলকাতার কোথায় থাকো?

—মামার বাড়ীতে।

—খুলে যেতে ভাল লাগে না?

—না, ইংরিজী, অক মাখার ঢোকে না যে।

প্রভাত কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে, আমি চলি যে কেউ, যেতে হবে।

কেউ ছেলেটির কাছে সরে আসে, কি করতে ভাল লাগে?

একটু চপ করে খেকে ছেলেটি হঠাৎ উত্তর দেয়, বেড়াতে।

নিজের ইচ্ছেমত বেখানে খুশী।

—চিড়িয়াখানা, বাগুঘর, এসব দেখেছো?

—দেখেছি ছোটবেলায়, খুব বেশী মনে নেই।

—কাল এই সময় এসো, তোমার ঘুরিয়ে আনব।

—সত্যি, ছেলেটা উৎসাহিত হয়, খুব মজা হবে তাহলে—

কেউ প্যাকেট খেকে সিগারেট বাব করে, নাও।

ছেলেটা চার দিক দেখে নেয়, আঙে আঙে জিজ্ঞেস করে, খাবো?

—খাও, এখানে কেউ কিছু বলবে না।

ছেলেটা কেউর সঙ্গে সিগারেট ধরায়।

—তোমার নাম কি?

—মা আমার নাম দিয়েছিলেন শ্রামল।

কেউ শ্রামলকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়ায়। পাখীর খাঁচা, বাঁদরের ঘর, ওরা ওটা—

—টিক মাল্লবের মত, না কেউগা'?

—আমরা তো ওই ছিলাম।

—দেখুন কি রকম সিগারেট খাচ্ছে।

দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ অলস সিগারেট ছুঁড়ে দিয়েছিলো, ওরা ওটা মিথি মৌজ করে টানতে থাকে।

ঐ দিকে তাকিয়ে থেকেই শ্রামল বলে, আপনার সিগারেটগুলো একটু অল্প রকম না?

—বেশী কড়া।

—একটা খেলেই আরেকটা খেতে ইচ্ছে করে।

কেউ হাসে, সিগারেট চাই তো পরিষ্কার করে বললেই পার।

হুজনে সিগারেট ধরায়।

নতুন সিং এসেছে, হুজার ছেড়ে পায়চারী করছে, শ্রামল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

—একেই বলে পশুবাঁজ, কি হুম্মর চেহারা।

—চল বেকিটার একটু বসি। শ্রামল কেউর পাশে গিয়ে বসে।

—মাইনের খাতা আনতে বলছিলাম, এনেছো?

—এই যে, শ্রামল খাতা এগিয়ে দেয়।

কেউ চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, তিন মাসের মাইনে দেওয়া হয়নি।

—না।

—কেন, বাড়ীতে টাকা দেয়নি?

—দিয়েছিলো, খরচা হয়ে গেছে।

কেউ একটু খেমে জিজ্ঞেস করে, ক্লাশে নাম ডাকে?

—না, কেটে দিয়েছে।

শ্রামলের গলা ভারী হয়ে আসে, তাইতো খুলে বাই না।

কেউ ডান হাতটা শ্রামলের কাঁধের ওপর রাখে, তাতে কি হয়েছে, আমি সব ঠিক করে দেবো। একটু খেমে জিজ্ঞেস করে, বা জিজ্ঞেস করব বলবে আমায়?

—কি?

—কত দিন সিগারেট খাচ্ছে?

—এক বছর।

—কে শেখালো?

—খুনো নারকোল।

—সে আবার কে?

—বামচন্দ্র, আমাদের ক্লাশের ছেলে, মাইর মশাইরা ডাকেন খুনো নারকোল বলে, তিন বছর একই ক্লাশে আছে কি না।

কেউ কথা চাপা দিয়ে বলে, চল আজ ওঠা বাক।

গল্প করে হাঁটতে হাঁটতে কতখানি পথ চলে এসেছে, শ্রামলের খেয়াল ছিল না, কালীঘাটের কাছে এসে হঠাৎ টেঁচিয়ে ওঠে, আর, এ যে অনেক দূর এসে গেছি কেউগা', ঐ তো কালীঘাটের মন্দির।

—আর হাঁটতে হবে না। এই বলে কেউ পকেট থেকে চিক্কী বাব করে শ্রামলের হাতে দেয়, চুলটা সামনের দিকে পেঁতি পেড়ে আঁচড়ে নাও, আমি এখনি আসছি।

নীচু গলায় বলে, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, তুমি আমার ছোট ভাই।

শ্রামলকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কেউ মোড়ের তিন তলা সাদা বাড়ীর ভিতর চলে যায়। প্রথমটা বুঝতে না পারলেও শ্রামল কেউর কথামতই কাজ করে। বাড়ীর দোরগোড়ায় পাড়িয়ে এদিক ওদিক তাকায়, রাঙার কত রকম লোক, প্যাসের আলোয়

নীচে আলুকাবলীওয়ালা, মোড়ের চারের দোকানে গলা-ভাল। রেডিওর গাম। ঠাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে বিরক্তি ধরে যায়।

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে সদর দরজা খুলে কেঁট ডাক দেয়, গামল এলিকে আয়। গামল এগিয়ে আসে, তাকে দেখিয়ে কেঁট বোঝাতে শুরু করে, এর কথাই এতক্ষণ বলছিলেন। আমার ছোট ভাই গামল, কি কেঁটে যে লেখাপড়া করছে, বই কেনবার পরসা জোটে না, তার উপরে দু'মাসের মাইনে বাকী, আমার অবস্থা আপনি তো জানেনই।

কর্তার হাতে গামলের মাইনের খাতা। নেড়েচেড়ে দেখে বলেন, বুঝতেই তো পারছি কিন্তু কি করব বল, সকাল থেকে লোক আসছে, কত জনকে সাহায্য করব।

কেঁট ভেঙ্গে পড়ে বলে, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে এসেছি।

—আমি এক মাসের মাইনে সাত টাকা দিয়ে দিছি।

—আর তিন টাকা, ছোটো বই-এর দাম। আপনাকে আর জালান করব না।

—না না, ঐ সাত টাকা। আর আসবে না, মনে রেখো।

কেঁট জিভ কেটে কর্তার পায়ে খুলো নেয়, আক্ষেপে না, আপনি গরীবের মা-বাপ, ভাই খুব বিপদে পড়লে ছুটে আসি। সবাই তো দুঃখের কথা বোঝে না।

টাকা নিয়ে তারা বেরিয়ে আসে। গামল চলতে চলতে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি আবার আমার খুলে পাঠাতে চান?

উত্তর না পেয়ে বলে, আমি কিছু খুলে যাবো না।

—ইচ্ছে না করে যেও না।

পানওয়ালা দোকানে ঠাঁড়িয়ে নোট ভাগিয়ে কেঁট সাড়ে তিন টাকা গামলের হাতে দিয়ে বলে, এটা তোমার।

—টাকা নিয়ে আমি কি করব?

—বা ইচ্ছে তাই করবে, এর জন্যে কাউকে হিসেব দিতে হবে না।

বাড়ীর কাছে এসে গামল কেঁটের কাঁহ থেকে বিদায় নেয়। ক্লাস্ত-ধরে বলে, কাল আসব।

দরজা খোলা ছিল। কেঁট ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে উঠে যায়। নীচে কারা এসেছে, আগুন করার প্রবৃত্তি হয় না। ঘর ঢুকে জামা খুলে পেরেক টাঙ্গিয়ে রাখে। পা না ধুয়েই বিছানায় বসে পড়ে।

একটু পরে ভাইঝি গামা ওপরে আসে।

—কাকু, তোমার খাবার নিয়ে আসি?

—নিয়ে আয়।

—হুমি নীচে আসবে না?

—নীচে, কেন?

—অনেকে এসেছে মামার বাড়ী থেকে।

—না, আমি যাবো না। পারিস তো খাবার নিয়ে আয়।

গামার বয়স দশ কি বারো হবে, চুলের মত কালো রং, ভীষণ কৌকড়া চুল, এতটুকু শ্রী নেই চেগাবায়।

বহু

## আরোগ্য হয়

প্রশ্রাবের সঙ্গে অতিরিক্ত শর্করা নির্গত হলে তাকে বহুম্র (DIABETES) বলে। এ এমনই এক সাংঘাতিক রোগ যে, এর দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। এই দুসারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিতে বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও সাময়িক ভাবে শর্করা নিঃসরণ বন্ধ থাকে। ব্যতীত, বিশেষ কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না।

এই রোগের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—অত্যধিক পিপাসা এবং ক্ষুধা, ঘন ঘন শর্করাযুক্ত প্রশ্রাব এবং চুলকানি ইত্যাদি। রোগের সঙ্গী অবস্থায় কারবান্ডল, ফোড়া, চোখে ছানি পড়া এবং অন্ত্রাঙ্গ জটিলতা দেখা দেয়।

‘ভেনাস চার্ম ট্যাবলেট’ পুরাতন য়ুনানি যতে দুর্লভ ভেষজ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ব্যবহার করে হাজার হাজার লোক মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভেনাস চার্ম ব্যবহারে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনেই প্রশ্রাবের সঙ্গে শর্করা পতন এবং ঘন ঘন প্রশ্রাব কমে যায় এবং তিন কি চার দিন পরেই আপনার রোগ অর্ধেক সেরে গেছে বলে মনে হবে। খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বিশেষ কোন বাধানিষেধ নাই। বিনামূল্যে বিশদ বিবরণ-সম্বলিত ইংরেজী পুস্তিকার জ্ঞাত লিখুন। ৫০টি বাটিকার এক শিশির দাম ৬৬০ আনা, প্যাকিং এবং ডাক মাশুল ফ্রী। নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (B. M.)

৬-এ, কানাই শীল ষ্ট্রীট, (কলুটোলা)

পোস্ট বক্স নং ৫৮৭, কলিকাতা।

কেইর কথা মত সে খাবার ওপরে নিয়ে আসে, আজ পনের বাহাঙ্গা ছিল। কেই খেতে বসে যায়—নে, তুইও যা।

—আমি খেয়েছি।

—তা কি হয়েছে, নে মাছটা খেয়ে ফেল।

কেই চট্টাৎ বলে, তুই নীচে যা, আমি এটো বাগন সব গুছিয়ে রাখবো।

শ্যামা কথা বলে না, চুপ করে বলে থাকে।

—বসে রইলি যে, যা।

—নীচে আমার ভাল লাগে না।

কেই ভাল করে শ্যামার মুখটা দেখে নিয়ে বলে, কেন কি হয়েছে যে?

শ্যামার চোখে জল ভরে আসে। কেই খাওয়া ফেলে তাকে কাছে টেনে নেয়, বোকা মেয়ে কীদন্তে আছে কখনও!

শ্যামা হুঁশিয়ে ওঠে, মামার বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা আমার কিরকম গাটা করে, বলে তোর নাম শ্যামা নয়, কালী। জিত বার করে দাঁড় করিয়ে নিলেই লাক্ষ্মা, মা-কালী।

কাল্লার তার কথা আটকে যায়।

—বড়দের কাউকে বলে দিসনি কেন?

—যাবাকে বলেছিলাম।

—কি বললে?

—বললে, টিকুই তো বলেছে, এত রাগের কি আছে, কাক লেনি এই ঢের।

কথা বলতে বলতে শ্যামা হাট-হাট করে কঁদে ফেলে, তাই শুনে রা কি রকম হাসছিলো।

কেই শ্যামার মাথার হাত বুজিয়ে দেয়, অনেকক্ষণ কঁদে শ্যামা ত্যস্ত হয়।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে খেয়াল ছিল না। নীচে থেকে ছোটদের লগ গলা শোনা যায়, মা কালী গেল কোথায়, মা কালী?

সিঁড়ি দিয়ে সবাই ওপরে উঠে আসে, শ্যামা কেটকে জড়িয়ে ধরে। ছেলের লল কেটকে লেখে থমকে দাঁড়ায়, দরজার বাইরে থেকে স্ত গলায় ডাকে, শ্যামা পেলবি আর।

কেইর কণ্ঠস্বর শ্যামা মাথা নেড়ে জানায় সে যাবে না।

—আর না, আর না, বলে এগিয়ে এসে তাদের মধ্যে এক জন মার হাত ধরে টানে। রাগে কেইর ঠোঁট কাঁপছিল, সজ্ঞারে মারে ছেলেটার গালে। জানোয়ার, বেরও এখান থেকে।

মার পেয়ে ছেলেটা মাটিতে পড়ে যায়, গালে হাত বেধে ভয়ে উঠে দাঁড়ায়। ততক্ষণে ভক্তরা কলসর করতে করতে নীচে ম গেছে, ও তাদের সাগে ধোঁগ দেয়।

শ্যামা হতভব হয়ে যায়, কেটকে এতখানি রাগতে সে আগে হনি। বিছানার কোণে গিয়ে বসে। কেই বা হাত দিয়ে দুটো চোপে ধরে।

নীচে ছেলেটার কান্না শোনা যাচ্ছে, অজ্ঞদের নালিশ, দাদার ন।

একটু বাদে উঠান থেকে দাদার ডিংকার শোনা যায়, ধায় গেল মুখপুড়, শ্যামা, শ্যামা—ঘরের তেতর থেকে চেঁচিয়ে উত্তর দেয়, ও এখন যাবে না।

—আসবে না মানে? আমি ডাকছি আসবে না? আলবাং আসবে।

—যাবে না।

—এত বড় আশ্বর্ষা, আমার কথা অমান্য করা, এই সব লিখছে তোমার কাছে। কেই আরও গলা চড়িয়ে বলে, বেশ করছে।

—আমার শ্বশুর বাড়ীর লোকের গায়ে তুমি হাত দিয়েছ কোন সাহসে?

—একশো বার দেব, ছোটলোকমি করলে।

দাদার আর বৈধা থাকে না। সিঁড়ির উপর কয়েক ধাপ উঠে পড়েন, ছোটলোক? তুমি নিজে ছোটলোক, ক' অক্ষর গোমাংস, ভাগবণ্ড, লোকায়।

সাইআপ, কেই থমকে ওঠে, বাস্কে বকো না।

—বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

—তোমার বাড়ী, নিজের পরসার করছো, কেয়াগী আবার বাড়ী করবেন। গৈত্রিক বাড়ীতে তোমার বত ভাগ আছে আমারও তত ভাগ।

—লাচ্ছা, দেখা যাবে। শ্যামা চলে যায়।

—ও এখন যাবে না।

—ও নিজের মুখে বলুক।

—আমি বলছি ও যাবে না।

—আচ্ছা দেখছি, পুলিশ ডেকে নানিয়ে আনবো। তোমার ওস্তাদি বার করছি। কেই আর কথা বলে না, দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। শ্যামা কাঁদছিল, এতক্ষণে কেইর খেয়াল হয়, কাঁদলে গলা টিপে দেব, শুয়ে পড় এখন।

ভোর রাতে বৌদি এসে দরজা ঠেলে, ঠাকুরপো?

কেই দরজা খুলে দেয়, বৌদি ভয়ে ভয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অমুমতি চায়, শ্যামাকে নিয়ে বাই।

—যাও। কেই শুকনো গলায় উত্তর দেয়।

একটু থেমে বৌদি কৈফিয়তের স্বরে বলে, তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বা মেজাজ, আমি তো ভয়ে মরি। বিশেষ করে তোমার দাদা, মাথার যদি এতটুকু ঠিক থাকে, মার পেটের ভাই, তাকে বলছে কি না—

কেই বাধা দেয়, আমার এখনও বুম কাটেনি বৌদি! তুমি বরং মেয়েটাকে নিয়ে যাও, দেখো, আবার মারখোর কোর না।

কথা শুনে বৌদি তো অবাক, কি যে বল, নিজের মেয়ে—

—থাক থাক, ঢের বক্তৃতা শুনেছি। এখন নীচে যাও।

শ্যামা বিছানা থেকে উঠে চোখ রগড়াচ্ছিল, বৌদি আর কথা না বলে তার হাত ধরে নেমে যায়। কেই আবার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে, কিন্তু আর ঘুম আসে না।

পরদিন সকালে কেই চা খেতে এলো অনন্ত কেবিনে অস্ত দিনের চেয়েও দেবীতে। আশুনা' জিজ্ঞেস করলেন—আজ এত দেবীতে যে?

—আর বলবেন না কাল আবার রগড়া—

—কি, দাদার সঙ্গে?

কেই ব্যাজার মুখে উত্তর দেয়—আর কার সঙ্গে, আশুনা' হাসেন—এ আর নতুন কি, রোজই তো লেগে আছে।

—আর ভাল লাগে না। তাইছি এবার আলাদা হয়ে যাব।



—সে তো তিন বছর থেকে ভাবছে।

—আমার আর কি। ওরাই মরবে। একতলা তো আমি ব্যবহারই করি না। উপরের একখানা ঘরে পড়ে থাকি। বাড়ী ভাগ হ'লে নিচের একখানা ঘর আমার দিতে হবে। তখন কি করে থাকবে তুমি বাবণের গুঁঠি নিয়ে?

আশুনা মাথা নাড়েন, এতই যদি তোমার সুবিধে একটা উকিল আর একটা রাজমিস্ত্রী ডেকে—

কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে—হয় না 'আশুনা' এত সহজে কিছু হয় না। ঐ যে শ্যামা—দাদার কালো মেরোটা—ওকে বাড়ীতে কেউ হুঁচোখে দেখতে পারে না, বাড়ী ভাগ করলে আমার কাছে যেতে দেবে না। কৈদে কৈদেই মরে যাবে।

আশুনা চুপ করে বান, চোঁচিয়ে বলেন, ওরে কেউ বাবুকে চা কুটি দিয়ে যা।

কেউ খবরের কাগজ নিয়ে ওপর ওপর চোখ বোলায়। বিশেষ কোন খবর নেই—মায়ুলী কথা।

আশুনা বললেন—বাই ইলেকশনের তোড়জোড় চলছে যে।

—দেখছি তো! একটু থেমে কেউ জিজ্ঞেস করে, কারা দাঁড়িয়েছে?

—চার জন। তিন জন তিন পাটির থেকে আর এক জন ইনডিপেন্ডেন্ট।

—তিনি কে?

—রাঘব বোয়াল।

—তুমিছলাম বটে রাঘব বোয়াল দাঁড়িয়েছে।

আশুনা চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন—ওর চর'রা এসেছিল। পাড়ার ছেলের চায়, ওর হস্বে খাটবার জন্তে।

—কি রকম দেখে-থাবে?

—পরস্রা আছে দাম্যমত কোরবে নিশ্চয়। আমি তোমার নাম দিয়ে দিয়েছি।

কেউ আড়মোড়া ভাঙ্গে,—যাবো একবার বিকেলের দিকে, দেখি আমার সঙ্গে পড়ে কি না।

রঘু বাঁড়ুজের বাড়ী পাড়াতেই। মোড়ের মাথায় তিনতলা বিরাট বাড়ী, দু'খানা গাড়ী, তকমা আঁটা দারবান। গেটের দু'পাশায় ইংরাজী বড় হরকে লেখা আছে, আর, বি। তাই পাড়ার লোকে নাম দিয়েছে, রাঘব বোয়াল।

আজ আর কেউকে দারবানের কাছে কৈকিয়ৎ দিতে হল না। সেলাম ঠুকতে ঠুকতে নিয়ে গেল বৈঠকখানায়। সেখানেও আপ্যায়নের কুটি নেই। রাঘব বোয়ালের তিন জন ছেলে চা সিগারেট যুগিয়ে বাচ্ছে, আঁদর জুড়ে বসে আছে পাড়ার মাঝামাঝি ছেলেরা স্বরীর, বীরেন, ভোলা আর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ। এই ঘরে তারা জুড়া হয়েছিল দাদার সময়—৪৬ সালে। তার পর এই আবার তাদের ডাক পড়েছে।

সিদ্ধাড়া-মিষ্টাণ্ড পরিবেশনের পর রাঘব বোয়াল তাঁর বক্তব্য জানালেন—আপনারা সকলেই জানেন, আমি নিজের ইচ্ছেয় এই উপনির্বাচনে দাঁড়াইনি। পাড়ার সকলের বিশেষ অনুরোধে নিজের কর্তব্য পালনের জন্ত দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু আমার তো

কোন বল নেই। বল আপনারা, আপনারা যদি ভরসা দেন তবেই নির্ভয়ে এ কাজে এগুতে পারি।

আধ ঘণ্টা ধরে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন রাঘব বোয়াল। পরের জন্ত কতখানি আত্মত্যাগ কারছেন তারই মতিমা প্রচার। অনেকে বাহবা দিল, অনেকে টুকরো মতামত প্রকাশ করলো, কিন্তু সকলেই একবাক্যে সাথ দিল, তাঁকে সাহায্য করবে বলে।

জয়ধ্বনি করে সবাই চলে গেলেও কেউ দাঁড়িয়েছিল রাঘব বোয়ালের সঙ্গে একান্তে পরামর্শ করার জন্তে।

—কেউ, তোমার ওপরই আমার সবচেয়ে ভরসা। দাদার সময় এপাড়া তো তুমিই বাঁচিয়েছিলে, কেউকে আশ্বাসিত করেন রাঘব বোয়াল।

—এত যে লোক ছুটিয়েছেন, কাজের বেলা দেখবেন সব চুটু।

—তা আর জানিনে, কিন্তু কি করব? এসব ব্যাপ্তিরে সকলকেই খুসী রাখতে হয়। মেয়ের বিয়ে দেওয়া এর চেয়ে সোজা।

কেউ মুখে খানিকটা ডালহুটি ফেলে বলে, একটা জীপ দরকার হবে।

—তা তো হবেই, আমার কারখানা থেকে আনিয়ে দেবো।

—জাইভার দরকার নেই, আমিই চালাব, শুধু পেট্রোলের একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

—ওই মোড়ের পেট্রোল পাম্প আমার গ্রাফাউট আছে, কুপন দিলেই ওরা পেট্রোল দেবে।

—কি ভাবে আমি কাজ করতে চাই ক'দিনের মধ্যেই আপনাকে জানিয়ে দেবো। আপনি আমাদের পাড়া থেকে দাঁড়িয়েছেন, আপনাকে জেতানতে না পারলে আমাদেরই লজ্জা, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন, আজ থেকে সব ভার আমরা নিলাম।

রাঘব বোয়াল বিনয়ে ভেঙ্গে পড়েন, আমি তো আগেই বলেছি ভাই, তোমাদের বসই আমার বল। আমাকে ভাগবাসো বলেই তোমরা এসেছ।

—যে ক'জন কাজের লোক এপাড়ার আছে, সকলেই আমার হাতের মুঠার মধ্যে। আজ থেকেই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। তবে সাবধান, অনেকে ধান্না দিয়ে টাকা খসাবার চেষ্টা করবে। তাদের কথাই কান দেবেন না।

পরদিন অনন্ত কেবিন কেউ এসে দেখে, শ্রামল বসে আছে।

—কি রে, এ ক'দিন আসিসনি কেন?

গ্রামলের চোখে-মুখে কেমন যেন লজ্জার ভাব, বলে, এমনি—

কেউ বসে পড়ে কাগজপত্র বার করত করত ঠিক দেয়, ওরে দু'কপা চা আর মামলেট দিয়ে যা। খাবার আসতে দেয়ী হয়। কেউ একমনে কি বেন লেখে। শ্রামল চুপ করে বসে থাকে, দেখে, আজ দিকে দু'-একজন ভরলোক রাজনীতি নিয়ে তর্ক করছেন। দোরগোড়ায় আশুনা কাশ বাজের কাছে বসে চোঁলেন। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একটা ভিথরী মেয়ে পরস্রা চাইছে।

কেউ হঠাৎ মুখ তুলে বলে, জানি তুই এতদিন আসিসনি কেন, ভাবছিলি সেদিন টাকাটা নেওয়া উচিত হয়েছে কি না, তাই না?

ধরা পড়ে গিয়ে শ্রামলের মুখ শুকিয়ে যায়।

—টাকা কি করলি?

শ্রামল সদ্যোচে বলে, পকেটে আছে।

—দূর গাথা, তুই কোন কথের নোস।

এর মধ্যে খাবার দিয়ে গিয়েছিল, শ্রামল কথার কোন উত্তর না দিয়ে যেতে শুরু করে।

আর কোন কথা হয় না। শ্রায় আপ ঘণ্টা বসে থাকার পর কেঁটা জিজ্ঞেস করে, মাইনের খাতা এনেছিল?

শ্রামল মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—যাবি?

শ্রামল ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে তাকায়।

—করে কি দেখছিল, যাবি?

—চলুন।

শ্রায় শ্রামলকে যে বাড়ীতে কেঁটা শ্রামলকে নিয়ে এসে, তারা বনেরী জমিদার। আগের মত বোলবোলা না থাকলেও অবস্থা বেশ ভালই। কিন্তু সরকার মশাই-এর সংগে কিছুতে কেঁটা কথায় শেষে ওঠে না।

—বলছি তো, আমি একটা পরশাও দেব না।

কেঁটা করণ মুখে বলে, সে আপনার যা ইচ্ছে। তবে আমরা গরীব মানুষ, ভাইটা ম্যাট্রিক পাশ করলেও কোথাও একটা কাজ চুকিয়ে দিতে পারি, দেখুন মাইনের খাতা, ক্লাশের বিপোর্ট, হু'মাসের মাইনে দিতে পারিনি।

—মিথো চেষ্টা করছ বাপু, এক দিন ছিল যখন এ বাড়ীতে হাজার হাজার কাঙালী বিনায় করা হয়েছে, আজ সে বামও নেই, সেই অবোধাও নেই।

—বড় অভাবে পড়ে ছুটে এসেছি, কিছু না হোক এক মাসের মাইনে সাত টাকা—

—সাতটা পরশা দেবারও আমার ক্ষমতা নেই।

বাস্তায় বেরিয়ে চলতে চলতে শ্রামল হঠাৎ বলে, আমার কি রকম লজ্জা করে।

—কিসের?

—এ ভাবে পরশা চাইতে।

—কি এমন মানী লোক যে লজ্জায় মাথা কাটা গেল?

শ্রামল উত্তর দেয় না, গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে কেঁটা পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে। ইংরাজী টাইপকরা, নীচে কয়েক জনের দই রয়েছে, শ্রামলের হাতে কাগজটা নিয়ে বলে, এ কাগজের লাল বাট্টাটাও যা, মাইনের খাতা, এই কাগজ, সব কিছু দেখাবি। জাখ, কিছু দেয় কি না।

শ্রামল আপত্তি করতে পারে না, ভয়ে ভয়ে লাল বাট্টার দিকে এগিয়ে যায়। সরকারের কাছে দাঁড়িয়ে কেঁটার দেওয়া চিঠিটা পড়ে। সব শব্দের মানে না জানলেও ভাবার্থ বুঝতে অগ্রবিধে হয় না। তাতে লেখা আছে, এ ছেলেটি আমাদের পরিচিত, অনাথ কিন্তু মেধাবী। আপনারা একে সাহায্য করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। নীচে কয়েক জনের নাম সই করা।

বাবু বাড়ী ছিলেন না, গিন্নী-মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন— কি চাই খোকা?

কথা বলতে গিয়ে শ্রামলের গলা আটকে যায়, কিছু বলতে পারে

না। হাতের কাগজগুলো বাড়িয়ে দেয়, —আচ্চা কি সরকার, মুখেই বল না।

—ইচ্ছলে হু'মাসের মাইনে দেওয়া হয়নি। শ্রামল খেমে যায়, হঠাৎ বলে ফেলে, আমরা বড় গরীব। এ কথা বলার সংগে সংগে ভয়ে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে, কিছুতেই ধামাতে পারে না।

গিন্নী-মা চোখের জল দেখে সিঁচিলিত হতে পড়েন, আচ্চা কানছ কেন, লেখা-পড়া লিখে নিজেকে এক মিন বোজগার করবে, মাস কাবারের সময় হাতে বেশী টাকা নেই, এখন ছুটাকা দিচ্ছি, মিসে যাও।

আঁচল থেকে টাকা খুলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেন, কোন কালে পাড়?

খার্ড ক্লাশ।

—পুরান বই এর সরকার খাতকলে বোল। আবার ছেলেরা সব তলেজে পড়ে, ইচ্ছলের বই অনেক আছে। এক দিন সকালের দিকে এসে ওদের সংগে আলাপ করে নিয়ে য়েও।

শ্রামল তাঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসে। দূরে কেঁটা দাঁড়িয়েছিল, শ্রামলের কাছে এগিয়ে আসে, কি হল?

শ্রামল দুটো এক টাকার নোট কেঁটার দিকে এগিয়ে দেয়। কেঁটা হাসে, শ্রামলের পিঠা চাপড়ে বলে, বাঃ এই তো লিখে গেছিস, তোর এক টাকা, আমার এক টাকা।

শ্রামল স্নান হাসে, হাতের নোটটার দিকে তাকায়, এই তার প্রথম বোজগার।

শ্রামলের বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হ'ল। কেঁটার কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে সে সোজা বাড়ীতে ঢোকেনি, পথে পথে অনেকজন ঘরে বেড়িয়েছে, পকেট থেকে টাকা বার করে বার বার দেখছে।

ঠৈকশানায় তক্তাপোষের ওপর শশধর বাবু চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি রে কিবতে এত রাত হ'ল?

শ্রামল চমকে ওঠে, বারাক্ এমন দিনে সে আশা করেনি। মাসের শেষের দিকে কলকাতায় বড় একটা উনি আসেন না।

তাই আশা হয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কখন এল?

—বিকেলের গাড়ীতে, শরীরটা ভাল নেই।

—তোর কিবতে এত রাত হয় কেন?

—একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দেয়, কোটিং ক্লাশ গিয়েছিলাম। শশধর বাবু উঠে বসেন, ইচ্ছলের পরে যেতে হয় বুঝি?

—গ্যা, উঁচু ক্লাশ একটু বেশী পড়তে হয়।

—কোটিং ক্লাশে আবার ফী লাগবে তো?

শ্রামল ধতমত খেয়ে বলে, না পরশা লাগবে না, কেঁটাল' আমাদের এমন পড়ান।

কথা শেষ হয় না, শ্রামলের মামা জগৎ বাবু ঘরে ঢুকলেন।

—এইতো শ্রামল এসে গেছে, তুমি মিছামিছি এতক্ষণ ভাবছিলে। জগৎ বাবু তক্তাপোষের ওপর বসে পড়েন। ভদ্রলোক বেঁটে, নেয়াপাতি ভুঁড়ি, সওদাগরী অফিসের বড়বাবু। সন্ধ্যাবেলা পান করা তাঁর অনেক দিনের অভ্যাস, আজকেও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। নেপার যৌকেই জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলি, তোর বাবা যে ভেবে ভেবে ম'ল।

গ্রামের হয়ে শশধর বাবু উত্তর দেন, কোচিং ক্লাশে পড়তে গিয়েছিল।

—ওয়ে বাবা, ইন্সুলের ক্লাশ, তার ওপর কোচিং ক্লাশ, বিত্তের জাহাজ হবি নাকি?

গ্রামল উত্তর দেয় না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। জানে সন্ধ্যার পর মামার কথার উত্তর দিয়ে লাভ নেই, উনি অনর্গল বকে বান।

—খবদার বেকী লেখাপড়া করিসনি, তাহলে অমিসের ক্লাক কি বেটারা ছাড়া আর কিছু হতে পারবি না।

কথা তাঁর বেশ জড়িয়ে আসে, আরও জোর দিয়ে বলেন, আমার বাবা ভীষণ লেখাপড়া করেছিল, ফল কি হ'ল, না ইন্সুল মাষ্টার। মাস্টারের বেকী মাইনে এক পয়সা বাড়লো না। তারপর মনে কর তোর বাবা এই শশধরনা, হাজার হোক গ্র্যাডুয়েট তো, কি হ'ল? না অস্থির ক্যানভাসার।

গ্রামল এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করে, মামা, আমি বাই, মুখ হাত পা ধুয়ে নিই—

—দাঁড়া, বা বলছি শোন, আমি আরও কম লেখাপড়া করেছি, কোন রকমে ম্যাট্রিকটা পাশ করে দিলাম, বাহোক তাই বড়বার হতে পেরেছি। তুই যদি আরও কম পড়িস তাহলে একদম বড় অফিসার হয়ে বাবি। কেউ আটকাত পারবে না।

ভেতর থেকে মাসীমা ঠাক দিলেন, এস সবাই, খাবার দেওয়া হয়েছে। গ্রামল এই সুযোগই খুঁজছিল—বাই মাসীমা, বলে সাড়া দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

গ্রামলকে বাড়ী পৌঁছে রাঘব বোয়ালের বাড়ী আসতে কেঁচর অনেক দেবী হয়ে গেল, তাঁর বড় ছেলে বললে, বাবা আপনার জন্তেই এতক্ষণ বসেছিলেন, এই মাত্র খেতে ওপরে গেছেন।

—আসতে দেবী হয়ে গেল, বড় বামেলার কাজ বুঝতেই তো পারছেন, আমি বয়স কাল আসব।

—আপনি বহন, আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করে আসছি।

কেঁচকে বেশীক্ষণ বসতে হ'ল না, রাঘব বোয়াল নিজেই নেমে এলেন।

—তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।

—না, এই এসেছি। আপনাকেই এত রাতে বিরক্ত করলাম।

—মোটাই নয়, মোটেই নয়। রাঘব বোয়াল ঘন ঘন মাথা নাড়েন। তার পর, কি খবর বল?

—আমি দল ঠিক করেছি, আমাদের ভোটের লিষ্ট দেবন, আমরা নিজেরা গিয়ে আলাপ করে আসব। বিশেষ করে বাস্তবলোতে, ভোট তো ঐখানেই বেকী পাওয়া যাবে।

—তুমি ঠিক বলেছ, ঠাণ্ডা অবস্থাপন্ন, তাঁদের ধরবার আমার লোক আছে। বাস্তবলো যদি তুমি যোগাড় করতে পার, তাহলে অনেকটা কাজ এখুঁবে।

কেঁচ বিজ্ঞের মত হাসে, তাই ত বলছি। এদের হাত করা শক্ত নয়। ভাই ভাই বলে পিঠে হাত দিয়ে বোঝাতে হবে, দু'একদিন ভাল-মন্দ খাওয়াতে হবে, এর বেকী কিছু নয়। তাছাড়া এখন ছোটখাট ক্লাবগুলোকেও হাত করতে হবে, এদের কিছু টালা দিলেই আপনার দিকে চলে আসবে।

—সে তো দিতেই হবে। চাইতেনীতে কিছু বই দেওয়া, ফুটবল ক্লাবে জার্সি, ব্যাডমিন্টন ক্লাবে রাখে আলোদেওয়া—

কেঁচ বাধা দেয়, বাস বাস। একরলে আর দেখতে হবে না। বেশি ক'টা ভোট অস্ত্র বাস্তব পড়ে। কয়েকটা জনসভার ব্যবস্থা করতে হবে তো।

—সে তোমরা যা ভাল বোঝ—

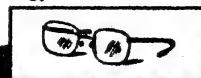
—আমি সব পাড়াতেই ব্যবস্থা করে রাখছি, সেই পাড়ার লোক দিয়েই সভা ডাকাব। তারা নিজেরা এসে বক্তৃতা দেবার জন্তে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবে। আপনি গিয়ে ছ'চারটে গরম গরম কথা বলবেন—

রাঘব বোয়াল উৎসাহিত হন, এ তোমার খুব ভাল বুদ্ধি হয়েছে, একবার বক্তৃতা দিতে উঠলে আর আমাকে পায় কে, প্রথমেই সরকারের নামে নিন্দে করতে হবে, দেশে কি রকম দুর্নীতি রয়েছে, কালো বাস্তবীদের অত্যাচার, পুলিশজুলুম। এ সব বিষয়ে খুব শক্ত শক্ত কথা আমার মুখস্থ আছে।

কেঁচ সায় দিয়ে বলে, আপনার বক্তৃতা কে না শুনেছে, যেমন ভাষা তেমনি বলবার ভঙ্গি, এ ইলেক্সানে আপনার জয় নিশ্চিত।



মাথার ব্যস্তপায় ডুগিভেছেন  
একবার চক্ষু পরীক্ষা করান না কেন?



ক্যালকাটা অপটিক্যাল  
কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড  
প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু এম.বি.

ফোন ৪-৫৫-১৭১৭

৪৫, আন্সহাফ্ট স্ট্রীট • কলিকাতা-৯

গলাটা একটু নামিয়ে বলে, কিছু টাকার দরকার, ছোঁড়া-গুলিকে হাতে রাখা চাই তো।

—কত দেবো, বেশী টাকা তো নেই, একশ' টাকায় হবে?

—অত কি হবে, টাকা পঞ্চাশ হলেই আপাতত চলে।

বাঘব বোয়াল পকেট থেকে টাকা বার করে দেন, কেউ পাঁচখানা দশ টাকার নোট নিয়ে বেগিয়ে আসে।

ভীশ-এ করে কেউ ঘরে বেড়ায়, সকাল থেকে রাত্রি। গাড়ীতে তেল কুরিয়ে আসলে পাড়ায় ফেরে, আর নতুন রাত্রি বাতীতে শোবার জেতে। ক'দিনের অবিশ্রান্ত কাজ।

বাঘব বোয়াল বলেন, কেউ কাজের লোক বটে, এই ক'দিনে চার দিক গরম করে তুলেছে।

যত্নে গাভী বলে, কেউটা চিবকাল ঘরের খেয়ে বনের মোহ তাড়াশো।

অনন্ত কেবিনের আশ' বলেন, বাক, কেউর দৌলতে পাড়ার জাবগুলো আবার চেগে উঠল। কেউ কোন কথা বলে না, নিজের ঘনে কাজ করে যায়। রাস্তার প্রায়ই দেখা যায় জনকয়েক চাঁৎকার করতে করতে চলেছে,—ভোট ফর বণ্ণ বানাস্কী। সেই সংগে কত বকমের জোখান বা কেউ ঠিক করে দিয়েছে অল্প পাটির নকল করে। যে পাড়া থেকে যে দলই বেরোক, বাঘব বোয়ালের বাড়ীর সামনে গলা কাটিয়ে চাঁৎকার করে যায়।

পাড়ায় পাড়ায় পোষ্টার লাগান হয়েছে, নানা ভাষায়, নানা বং-এ। অল্প প্রাণীদের পোষ্টারের ওপর কেউ ইচ্ছে করে নিজেদের গুলো লাগিয়ে দিয়েছে। সে নিয়ে কত জায়গায় বগড়া হয়।

—কে যশাই বণ্ণ বাঁড়জো, জীবনে নাম শুনিনি—

—শুনবেন কি করে, অন্ধকূপের মধ্যে বসে আছেন।

—কি করেছেন তিনি?

—কি করেন নি? কেউ নির্দিকার ভাবে ফিরিস্তি দিয়ে যায় বাঘব বোয়ালের গুণের।

—চটগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠন থেকে আজ পর্যন্ত যত রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন হয়েছে মায় ট্রাম ভাড়া সংগ্রাম অবধি সব ব্যাপারই তিনি নিজে চালিয়েছেন, কিন্তু নাম প্রকাশ করেন নি।

কেউর দল পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয় বাঘব বোয়াল কত বড় একজন নীরব কর্মী।

এই মধ্যে একদিন দুপুরবেলা চৌবঙ্গীর সিনেমার সামনে গাড়িয়ে কেউ ভাবছিল চুকবে কি না, এমন সময় একটা মেয়ে এসে কাছে গাঁড়ায়, বলে, আমার একটা কথা শুনবেন?

অন্তমনস্থ হয়ে কেউ জিজ্ঞাস করে, কি?

—আমার ছোট ভাই-এর বড় অস্থখ. মব-মব। এই দেখুন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন্. অস্থখ কেনার পরশা নেই।

কেউ হাসে। মেয়েটি বকণ চোখে তাকায়, টাকা চাই না, এই অস্থখ কটা কিনি দিন।

কেউ খুব আস্তে মন্তব্য করে, এখনও কাঁচা।

মেয়েটি তখনও ঘ্যান-ঘ্যান করে, তিন দিন থেকে চোটা করছি, এই এক শিশি অস্থখ একজন কিনি দিতেছিলেন, বড়ী, মিলটার, কিছুই দিতে পারিনি। ডাক্তার বলেছে আজ ওস্থ না পড়লে—

কেউ হঠাৎ বলে, বেশ, আমি তোমাদের বাড়ী যাব, যদি দেখি তোমার ভাই-এর সত্যি অস্থখ, আমি টাকা দেব।

—কত দূর কি যেতে পারবেন? টালীগঞ্জে, রেফিউজি বস্তীতে থাকি।

—ঠিক আছে, ঠিকানা দাও।

মেয়েটি ঠিকানা বলে, কেউ নোট-বুকে লিখে নেয়, জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম?

—গৌরী।

সক্কোর আগেই কেউ হাজির হয় টালীগঞ্জের উদ্বাস্ত বস্তীতে। গাড়ী থেকে নামতে দেখে তাকে জমিদার বাড়ীর পাকা দালান পার করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ভিতরের বস্তীতে। থবর পেয়ে গৌরী এগিয়ে এসে তাকে ঘরে নিয়ে যায়।

—এই নোরা জায়গায় আপনার বট হবে জেনেই আসতে বারণ করেছিলাম।

কেউ উত্তর দেয় না, গৌরীর সংগে ছোট কুঠরীর সামনে এসে গাঁড়ায়। মাটির ঘর, ওপরে টিনের চালারঘরের এক কোণে নোরা বিছানার একটা ছেলে শুয়ে আছে, প্রায় নিশ্চীল।

গৌরী ভেতরে ঢুক গিয়ে বলে, ওই আমার ভাই।

কেউ শুদ্ধিত হয়ে যায়, ক'দিন ভুগছে?

—প্রায় এক মাস।

—দেখি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন?

গৌরী এগিয়ে দেয়, তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে কেউ বলে, আমার সংগে একজনকে দাও, এখনি ওস্থ কিনি পাটিয়ে দেব।

—চলুন, আমিই যাব।

—এর কাছে কে থাকবে?

—ভগবান।

—কেউ আর কথা বলে না। গৌরী বলে, গাড়ীতে যাবার দরকার নেই, ডাক্তারখানা পাশেই আছে।

কেউ গৌরীর কথা মত ডাক্তারখানার দিকে যায়, পথে শুধু জিজ্ঞেস করে, তোমার আর কে আছে?

—ওই ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। গৌরীর চোখ ছল-ছল করে ওঠে।

—কেন?

—পাকিস্তান থেকে কলকাতা আসবার পথেই সকলকে হারিয়েছি।

ওস্থ কিনি কেউ গৌরীর হাতে দেয়, বলে, আমার ঠিকানা রেখে দাও, যদি দরকার হয় চিঠি লিখ।

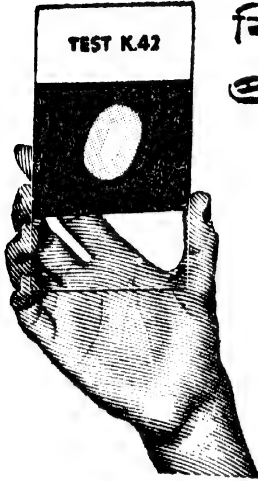
—আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো, গৌরী কেউকে প্রশ্নাম করে।

কেউ জিপ এ উঠে টাট দেয়।

# দেখুন!

দন্তক্ষয় নিবারণে

বিশেষ  
প্রতিরোধক !



## কলিনস সুপার-হোয়াইট টুথপেস্ট

আপনার হাসির চমক অটুট রাখে

- গবেষণাগারে কে৪২ নম্বর পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কলিনস সুপার-হোয়াইট (সাদা অংশ) দন্তক্ষয়ী জীবাণু (কালো অংশ) প্রতিরোধের প্রাচীর (সাদার চারদিকে ধূসর আবরণ) গড়ে তোলে।

পেপারমিট-গন্ধী সুশীতল আস্বাদ !



লক্ষ্য করুন, ক্যাপটি  
ব্যবহার করুন।

০৫ ৬৭৬ A

• জেফ্রি ম্যানাস এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড  
বেঙ্গলুরু ব্যবহারকারী



# বিবেকানন্দ শ্রোত্র

স্মরণ মিত্র

৪৪

এবার প্রশ্ন কোরি স্বামিজীর হয়ে,—  
'ঈশ্বর' বোলতে কি বোঝো বলোতো তে ?  
ভেবে জাখো কাকে তুমি বলে ভগবান ?  
কি কি গুণ তাঁর মাঝে করো সন্ধান ?  
তোমার আদর্শের সীমাটা কোথায় ?  
কল্পনা পাখা মেলে কতো দূর যায় ?  
তোমার আদর্শকে যতোই ছাড়াও,  
ঈশ্বর-বোধটাকে যতোই বাড়াও,  
দেখবে যে অবতার তাকেও ছাড়ান,  
তোমার চেতনা তাঁর পায় না নাগাল ।

কল্পনা সন্ধান পায় না বঁদের  
কেন পূজো কোরবে না বলোতো তাঁদের ?  
চাইছে! বা' তার চেয়ে বেশি যদি পাও,  
কেন তাঁকে মানবে না উত্তর দাও ?  
দেবতার গুণ যদি মাহুয়েই থাকে  
কেন তুমি ঈশ্বর বোলবে না তাঁকে ?

"Take one of these Messengers of Light ;  
Compare his character  
With the highest ideal of God  
You ever formed  
And you will find  
'That your God falls low  
And that character rises.  
You cannot even form of God

A higher ideal  
Than what  
The actually embodied  
Have practically realized,  
And laid before us  
As an example.

Is it wrong, therefore  
To worship these as God ?  
Is it a sin  
To fall at the feet of these man-Gods,  
And worship them  
As the only Divine Beings in the world ?  
If they are really...higher  
'Than all my conception of God,  
What harm  
That they should be worshipped ?

Not only is there no harm,  
But  
It is the only possible  
And positive way of worship."

৪৫

তাবোলে আমাকে কেউ জিগেস্ কোরো না।  
শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্বব্রহ্ম কি না ।  
স্বামিজী যে বোলছেন তা আমিও জানি,  
তবু বেন সায় দিতে সাহস পাইনি ।  
স্বামিজী তো পৃথিবীকে বোলছেন ভূগো,  
সেকথাটা আমরা কি মেনেছি তবুও ?

১। "জ্যোতির্বিদ্য ঈশ্বরের অগ্রদূত বীরা—তাদের যে কোনো  
একজনের চরিত্রের সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার সর্বোচ্চ ধারণার তুলনা  
কোরে জাখো । দেখবে—তোমার কল্পিত ঈশ্বর ঐ চরিত্রের তুলনায়  
অনেকাংশে হীন ; দেখবে—অবতাবের, ঈশ্বরান্বিত পুরুষের চরিত্র  
তোমার ধারণার অনেক উর্দ্ধে ।

আদর্শের সাকার বিগ্রহস্বরূপ এই সব মাহুয় ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ  
উপলব্ধি কোরে তাঁদের মহৎ জীবনের যে দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের  
সামনে ধোরে গ্যাছেন, আমরা তার চেয়ে ঈশ্বরের উচ্চতর ধারণা  
কোরতে কখনোই সক্ষম নই ।

তাই যদি হয়, তবে জিগেস কোরি, এই সব মাহুয়কে  
ভগবানবোধে পূজো করা কি অত্যাশ নাকি ? এই সব নর-দেবতাদের  
শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হোয়ে, পৃথিবীতে এঁদের ভগবানের একমাত্র সাকার  
বিগ্রহস্বরূপ মনে কোরে পূজো করাটা কি পাপ ? যদি তাঁরা সত্যিই  
আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্ত ধারণার চেয়ে আরো বড়ো হন, তবে  
তাঁদের পূজো কোরতে দোষ কি ?

দোষের স্তো নয়ই, বরং সাক্ষাৎ ঈশ্বরোপাসনা একমাত্র এই ভাবেই  
সম্ভব ।—Christ, the Messenger.

স্বামিজীতো বহু কথা বোলেছেন জানি,  
আমরা কি স্বামিজীর সব কথা মানি ?  
স্বামিজীর কথাগুলো আমাদের ভাই  
বেবাক্ কোপুচে বাওয়া চলেনাকো ভাই।

ঠাকুর 'ব্রহ্ম' কিনা আমরা কি বুঝি ?  
আমরা কি সব ছেড়ে 'ব্রহ্ম'কে বুঝি ?  
'ব্রহ্ম' যে কাকে বলে তাই বা কে জানি ?  
নিজের যেটা বুঝিনাকো কি কোরে তা মানি ?

ঠাকুরের দৃষ্টিতে স্বামিজীর ঘর  
'সপ্ত-ঋষির লোক', কিংবা সে 'নর'।  
ঠাকুরের কথা যদি মেনে নিতে হাই  
আমাদেরও অন্ততঃ ঋষি হওয়া চাই।  
না-বুঝে পড়ের কথা যেই মেনে নিব্,  
স্বামিজীর মতে তারা মহা নাস্তিক।

"A man may believe  
In all the churches in the world,  
He may carry in his head  
All the sacred books ever written,  
He may baptise himself  
In all the rivers of the earth,  
Still,  
If he has no perception of God,  
I would class him  
With the rankest atheist."\*

৪৬

ঠাকুর ও স্বামিজীকে বুঝে নিতে তাই  
আমাদের জড়ত্ব আগে বাওয়া চাই।

আমাদের জড়ত্ব কেটে বাবে যেই,  
তাঁদের দেবদুটা বুঝবো তবুই।  
ইহুর কি দেখে বলা সিংহের মান ?  
হাতীই বুঝতে পারে সিংহের দাম।

"It is the strong  
That understands strength,  
It is the elephant  
That understands the lion,  
Not the rat.  
How can we understand Jesus  
Until we are his equals ?  
It is all in the dream  
To feed five thousand  
With two loaves,  
Or to feed two with five loaves ;  
Neither is real  
And neither affects the other.  
Only grandeur appreciates grandeur,  
Only God realizes God."\*

আমরা মাহুয হোল, জেনো নিশ্চয়  
ঠাকুর-স্বামিজী তার বেশি কিছু নয়।

৪৭

বেশ কথা, ও না হয় বুঝান হাই,  
এবার এ-প্রশ্নের সমাধান চাই,—  
যরো বাঁবা অবতার মর্ত্যে আসেন,  
মাহুযের মতো বাঁবা কীদেন হাসেন,  
তাঁদের দেবদুটা যদিও বিরাট,  
তবুও মাহুযবোধে জাখাটা কি পাণ ?  
নরের অপূর্ণতা মেনেছেন যিনি  
তিনি কি মাহুয নন ? দেবুতাই তিনি ?

২। জীবামকুন্দের স্বামিজী প্রসঙ্গে বোলতেন,—

"দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধ সম্বন্ধী ; আমি দেখিছি সে 'অখণ্ডের ঘরে'র  
গায়নের একজন এবং 'সপ্তবির' একজন।"

—জীবামকুন্দের লীলাপ্রসঙ্গ (৫ম ভাগ, পৃ: ১২৭)

আবার এও বোলতেন—"জগৎপালক নারায়ণ নর ও নারায়ণ  
যায়ে যে দুই ঋষি মূর্তি পরিগ্রহ কোরে জগতের কল্যাণের জন্তে  
পুত্রা কোরেছিলেন, নরেন্দ্র সেই নরঋষির অবতার।"

—স্বামি-শিষ্য-সংবাদ (পূর্বভাগ, পৃ: ৫৮-৫৯)

৩। "এমন লোক থাকতে পারে যে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতেই  
খাসী, হুনিয়ার সমস্ত শাস্ত্র সে মাথায় বোয়ে বেড়াব্, পৃথিবীর  
সব নদীর জলে সে নিজেকে অভিষিক্ত কোরব্, তাৎপরেও যদি  
ব ইশ্বর-উপলব্ধি না থাকে, আমি তাকে চূড়ান্ত নাস্তিক বোলে  
ন কোরবো।"—Soul, God and Religion.

(complete works, vol I, page 323)

৪। "শক্তিমানই শক্তি কি, তা বুঝতে পারে। হাতীই  
সিংহকে বোকে, ইহুর নয়। আমরা যতদিন না যীশুর সম্বন্ধ  
হোচ্ছি, ততদিন আমরা যীশুকে কেমন কোরে বুঝবো বলা ?  
হু'খানা পাউকটিতে পাঁচ হাজার লোক খাওয়ানো, কিংবা পাঁচখানা  
পাউকটিতে হু'জর লোক খাওয়ানো—এ দুইই মাহার রাজ্যে।  
এদের মধ্যে কোনোটিই সত্য নয়, সত্যযা এ-দুটোর কোনোটিই  
অপরটির দ্বারা বাধিত হয় না। মহত্বই কেবল মহত্বের কন্ম বোকে,  
ভগবানই শুধু ভগবানকে উপলব্ধি কোরতে পারেন।"—Inspired  
Talks (পত্রা—১৮০)

আমরা মানুষ হোলে, অবতারদের  
মানুষ ভাবেতে তাখা নয়কো গোবের ।  
তবে যদি 'নিষ্ঠুর্ণ ব্রহ্ম'তে ভাই  
এ জীবনে কোনোদিন প্রতিষ্ঠা পাই,  
সেদিন মানুষভাব থাকবেনা আর ;  
তার আগে এটাই থাকা দরকার ।  
দরকার বলা ভুল, থাকতে হবেই ;  
এ-ব্যাপারে মানুষের হুটো পথ নেই ।

"Whenever we try to think of God  
As He is  
In His absolute perfection,  
We invariably meet  
With the most miserable failure ;  
Because  
As long as we are men,  
We cannot conceive Him  
As anything higher than man.  
The time will come  
When we shall transcend our human nature,  
And know Him as He is ;  
But as long as we are men  
We must worship Him  
In man and as a man." e

গাধাদের ভগবান, খুব সম্ভব,  
আকারেতে আর একটা বড়ো গরু ।  
তাই বোলে গাধাদের দিচ্ছি না পোষ ।  
মোষদের ভগবান প্রকাণ্ড মোষ ।  
গোনামাছ ঈশ্বর চুনো-পুটিদের ;  
ঠাকুর ও বামিকীরা—এরা আমাদের ।

"If, for instance,  
The buffaloes want to worship God,  
They will,  
In keeping with their own nature,  
See Him as a huge buffalo ;

e । "যখনই আমরা ভগবানকে নিষ্ঠুর্ণ পূর্ণরূপ বোলে ভাবতে  
হাই, তখনই আমরা মর্যাদিক ভাবে ব্যর্থ হই ; কারণ যতদিন  
আমরা মানুষ, ততদিন তাঁকে মানুষের চেয়ে বড়ো বোলে কিছুতেই  
জানতে পারবো না । অবশ্য এমন দিন আসবে, যখন আমরা  
মহুয়া প্রকৃতি অতিক্রম কোরে তাঁর স্বরূপবোধে সমর্থ হবো ; কিন্তু  
যতদিন মানুষ থাকবো, ততদিন মানুষের ভেতর এক মানুষবোধেই  
তাঁকে পূজা কোরতে হবে ।"—Bhakti-Yoga. ( পৃষ্ঠা—৯০ )

If a fish wants to worship God,  
It will have to form  
An idea of Him  
As a big fish ;  
And man has to think of Him  
As man." f

৪৮

ভক্ত একথা শুনে বড়ো ভর পান,  
ঐ বুঝি ভগবান ছোটো হোয়ে যান ।  
এ-ভয়টা অমূলক, নেই কোনো দায় ;  
ভক্তি যে কতো কম—এ তারই প্রমাণ ।  
দেবতার এতটুকু অপূর্ণতার  
কোচি-কোচি ভক্তই শুধু খাবড়ার ।  
এই সব ভক্তেরা অবতারদের  
দেবতার আবরণে ঢেকে ছেঁতানোর ।  
তাঁদের মানুষ-ভাব, সাধকের সেই  
অন্তর্দ্বার ইতিহাস নেই ।

গোপীজনবল্লভ কোন্ সাধনার  
পার্বসারখী হন—সে কথা কোথায় ?  
আচার্য শঙ্কর—তীরও ঠিক তাই,  
তিনি যে মানুষ তার কি প্রমাণ পাই ?  
দিখিল্যের ঐ কাহিনীতে তাঁর  
লৌকিক চেহারাটা খুঁজে পাওয়া যায় ।  
সাধক বীত্তরও দেখি সাধনার সেই  
লৌকিক চোঁতার ইতিহাস নেই ।  
ষাটশ বছর থেকে তিরিশ বছর  
কিভাবে কাটান তার নেইকো খবর ! ৭

নিকটই ভক্তই সদা সাবধান,  
ঐ বুঝি অবতার ছোটো হোয়ে যান ।  
তাই তারা যেতাকে ভীক প্রদায়  
সভয়ে শিকের তুলে রেখে দিতে চায় ।

f । "যদি, মোষদের ইচ্ছা হোলো ভগবানকে পূজা  
কোরতে—তাদের স্বভাব অনুযায়ী তারা ভগবানকে একটা বিরাট  
মোষ হিসেবেই দেখবে ; একটা মাছ ঈশ্বরের আরাধনা কোরতে  
চাইলে, ঈশ্বরকে তাকে একটা প্রকাণ্ড মাছ বোলেই চিন্তা কোরতে  
হবে ; আর মানুষকেও ভগবানকে মানুষ বোলেই ভাবতে হবে ।"

—Bhakti-Yoga ( পৃষ্ঠা ৯০-৯১ )

৭ । অবতারদের জীবন-ইতিহাস পোড়লে তাখা বার, সিদ্ধিলাভ  
করার পর তাঁদের যে অদ্বৈত শক্তি প্রকাশিত হোয়েছিলো—সেইকথাই  
সবিত্ত্বের আঙ্গোশা করা হোয়েছে । পূর্বসংস্কারনোকে সম্মুখে



ভক্তিশাস্ত্র মতে ঐশ্বর্যের ভাঃ,  
পরিণত ভক্তির পরিচয় নয়।  
ভক্তির প্রথমে যে ঐশ্বর্যের  
অদ্বুত মোহ থাকে কাঁচা ভক্তের,  
ভক্তিটা পাঁকা হোলে তাখে সে তখন,  
ভক্তিপাথর গুটা মহা দুঃখন।  
চতুর্ভুজের মোহ থাকেনাকো আর,  
হুটো হাত হুটো পাই ভালো লাগে তার।  
ভক্তির শেষ কথা ছোটো কোরে জাখা,  
অনৈশ্বর্যভাবে কাছে কাছে রাখা।

উৎপাটিত করবার জন্তে সাধনকালে তাঁরা যে অগুণ্ণ অন্তঃসংগ্রামে নিযুক্ত হয়েছিলেন—মামুষভাবের সেই দিকটা নিয়ে কেউই বিশেষ আলোচনা করেননি। মনে হয়, মামুষভাবের আলোচনা কোরলে পাছে তাঁরা ছোটো হোয়ে যান, পাছে নিজের কিংবা পাঠকের ভক্তির হানি হয়—এই ভয়েই তাঁরা অবতারদের মামুষভাবটি চেপে রেখে কেবল দেবভাবের আলোচনাই কোরে গ্যাছেন। ভক্তির অপরিণত অবস্থাতেই ঐশ্বর্যের দুর্বলতা জাখা যায়। ভক্তির প্রথম অবস্থাতে ভক্ত কখনো তাঁদের ঐশ্বর্য রহিত কোরে চিন্তা কোরতে পারেন না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লোকত্যাগার্থে বিশেষ বিশেষ শক্তি সঞ্চয়ের জন্তে যে অনেক সময়ে উৎকট তপস্যায় নিযুক্ত হয়েছিলেন—একথা পুঁথিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সাধনকালে তাঁর অন্তর্ভূতের বিশেষ কোনো বিবরণই পাওয়া যায় না।

ভগবান বৃদ্ধের জীবনকাহিনীতে তাঁর সংসার-বৈরাগ্য এবং দর্শনপ্রবর্তনের বতদূর বিশদ ইতিহাস পাওয়া যায়, তাঁর সাধনার ইতিহাস ততদূর পাই না। তবে অন্তঃস্থ অবতারদের যেমন কিছুই পাওয়া যায়না, সে হিসেবে বৃদ্ধের সাধক জীবনের একটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তাও রূপকের সাহায্যে তা' বর্ণিত হোয়েছে বোলে স্বাধাধভাবে তার সত্যতা স্থিরকর করা কঠিন।

আচাৰ্য শব্দবের দিগ্বিজয়কাহিনীই দেখি সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা হোয়েছে।

বাইবেলে ভগবান বীজের সাধন-ইতিহাসের প্রায় কোনো কথাই নেই। তাঁর বারো বছর বয়স পর্যন্ত ছ'একটা ঘটনা মাত্র লিপিবদ্ধ করা হোয়েছে। তারপর তাঁকে পাই আবার তিরিশ বছর বয়সে, যখন তিনি 'জনে'র কাছে অভিব্যক্তি গ্রহণ কোরে বিজন মল্লভূমিতে গিয়ে চল্লিশদিনব্যাপী ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত হন। এইখানে তাঁর অন্তর্ভূতের একটা কথা মাত্র রূপকের সাহায্যে বর্ণিত হোয়েছে। তিনি যখন ঐ মল্লভূমিতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তপস্তা কোরছিলেন, তখন এক 'শয়তান' তাঁকে এসে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে, কিন্তু বিফল হয়। তারপর মাত্র তিন বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। অতএব বারোবছর থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত তিনি কি ভাবে কাটান, বাইবেলে তার কোনো বিবরণ নেই।

ধর্মের ইতিহাসে বোধ হয় সর্বপ্রথম স্বামী সারদানন্দজীই ভগবান শ্রীশ্রীমকৃষ্ণের মামুষভাবের আলোচনা কোরে গ্যাছেন এবং বতদূর সম্ভব তাঁর স্মরণীয় সাধক-জীবনের বিস্তারিত বিবরণ রেখে গ্যাছেন।

ঐশ্বরে বস্তু বেশি হবে অমরাগ  
ঐশ্বরের প্রতি আসবে বিরাগ।  
বজ্রের গোপীরা কি হে কৃষ্ণকে কেউ  
ভগবান বুদ্ধিতে দেখেছে তুলেও ?  
ভক্তির চরমেতে খেমে যায় স্বপ্ন,  
তখন 'ব্রহ্ম' নয়, 'প্রাণবল্লভ'।  
কিংবা বশোদা, বিনি স্বরূপে তাঁর  
দ্বিবিভূতি সব দেখেছেন বীর,  
তিনিও কি বিস্ময়-বিমোহিত চোখে  
জগৎকারণ বোলে দেখেছেন ঠিক ?  
কৃষ্ণ বতাই হোন জগৎপালক,  
বশোদার কাছে তিনি ক্ষুদ্র বালক।  
আসলে ও-সব জ্ঞান ভক্তের মনে  
বিভীষিকা এনে জায়, ভালোবাসা কমে।  
পরিণত ভক্তির লক্ষণই এই,  
দেবতাকে কাছে টানে মামুষ-বোধেই।

৪৯

আপাততঃ আমাদেরই প্রয়োজনে তাই  
ঠাকুরকে মামুষের আসনে বসাই।  
স্বামিজীকে ধরা যাক 'সিমল'র ছেলে,  
তার পর জাখা যাক কি বস্তু মেলে।  
মনে হয় আমাদের দেবতা হওয়ার  
হুগ্ম রাস্তাটা তাতে সোজা হয়।

আমাদের মতো যদি না ভাবি ওদের,  
সত্যলাভের ঐ চেষ্টা তাঁদের  
মনে হবে অসত্য, নেই কোনো দাম,  
নিস্তাপুর্ণ বীরা—এ তাঁদের ভাণ।  
অনৈশ্বর্যভাবে দেখি যদি তাঁকে,  
আত্মজয়ের ঐ সংগ্রামটাকে  
'দেবতার লীলা' বোলে ভাববেনা আর,  
চেষ্টাটা বুঝা ভেবে ছাড়বেনা না হাল,  
দেবতা হওয়ার ঐ হুগ্ম পথে  
আমরাও একদিন যাবো পা বাড়াতে।

তাঁদের মামুষ ভেবে নগদ যে লাভ,  
সেটা হোলো আমাদের সচেষ্ট ভাব।  
তাই আমি স্বামিজীর সব কিছুতেই  
দেবতার আশ্রয় দিতে রাজী নই।  
তাহোলে যে বুঝবো না চেষ্টার দাম,  
বুঝবো না কেন তাঁর এত সংগ্রাম।  
আমরাও চেষ্টাক বুঝা ভেবে ঠিক  
হাল ছেড়ে দিন দিন হবো ভাসিষ্ক।

তাই বোলে বোলছিলা অবতারদের  
আলোচনা করো শুধু মানুষ-ভাবের,  
দেবত্ব ভুলে গিয়ে সর্বক্ষণ  
ভাববে মানুষ ছাড়া আর কিছু নন।  
কিংবা বোলিই যদি ক্ষতি নেই তাতে,  
আমাদেরই দেবত্ব বাধা দেবে তাকে।

ভেবেছো কি আমরাও নিতান্ত rat ?

Lion এর ছিটে-কোটা আমাদের নেই ?

ঠাকুর-স্বামিজী তাই মানুষ হোলেও

তার চেয়ে বড়ো হোতে কোনো বাধা নেই।

"What is the proof  
Of Christs and Buddhas of the world ?  
That you and I feel like them.  
That is how you and I understand  
That they were true.

Our prophet-soul :  
Is the proof of their prophet-soul,  
Your God-head  
Is the proof of god himself.  
If you are not a prophet  
There never has been  
Anything true of God.  
If you are not God  
There never was any God,  
And never will be." ৮

[ ভ্রমণঃ।

৮ "জগতে খৃষ্ট এবং বুদ্ধদের প্রমাণ কি ? না, তুমি আমিও সেইরকম অমুভব কোরে থাকি ; তাইতেই তুমি ও আমি তাঁদের সত্যতা স্বয়ংসম কোরতে পারি। আমাদের ঐশ্বরিক আত্মাই তাঁদের ঐশ্বরিক আত্মার প্রমাণ। তোমার ঈশ্বরত্বই স্বয়ং ঈশ্বরের প্রমাণ। তুমি যদি নিজে ভগবান না হও তাহোলে কোনো ঈশ্বর নেই, কখনো হবেনও না।"

—Practical Vedanta ( পৃষ্ঠা ২১ )

### নারী ও পুরুষের পরমায়ুর প্রশ্ন

পৃথিবীর সকল দেশে না হোক, অনেক দেশেই দেখা গেছে এ যাবৎ—পুরুষদের চেয়ে নারীরা বেঁচে থাকে একটু দীর্ঘদিন। বিলেতে নারী ও পুরুষের পরমায়ুর তুলনামূলক বিচারেও এই সত্যটি ধরা পড়েছে বিশেষ ভাবে। কিন্তু প্রশ্ন—এর যথার্থ কারণ কি ? নারীদের আয়ু পুরুষদের অপেক্ষা বেশী হয় কেন ? প্রশ্নটি নিয়ে গবেষণাও বিলেতী চিকিৎসা দেহ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে কম নয়। তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছেন—নারীদের গড়পড়তা আয়ু যেখানে ৭১-৭২ বছর, পুরুষদের সে ক্ষেত্রে ৬৫-৬৮ বছর। তাঁদের নিশ্চিত ধারণা—যৌনগত কারণ এবং দৈনন্দিক কাঠামোর কোথাও কোন ইতর-বিশেষ দক্ষণই এমনটি হয়ে থাকে বা হওয়া সম্ভব।

নারী ও পুরুষের পরমায়ু পার্থক্যের প্রশ্নটির মীমাংসার জন্তে বিলেতী জীববিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগণ শুধু মানুষের নয়—আরও প্রায় পঞ্চাশ রকমের প্রাণীকে চোখের উপর রেখে শেষ অবধি পরীক্ষা করেছেন। তাতে তাঁরা এইটিই দেখেছেন—পুরুষজাতীয় প্রাণীগুলোর চেয়ে স্ত্রীজাতীয় প্রাণীগুলো বাঁচে অপেক্ষাকৃত বেশী দিন। মনুষ্যজগতে নারী এবং পুরুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও চিন্তাধারার তারতম্যে যে পরমায়ুর তারতম্য হয়—উক্ত শ্রেণীর গবেষকমণ্ডলী তা স্বীকার করেন না। পরন্তু এইটি বার বারই তাঁরা জোর দিয়ে বলেন—দেহের আভ্যন্তরীণ গঠনগত কোন পার্থক্যই পরমায়ুর উল্লিখিত রূপ। পার্থক্যের জন্ত দায়ী অর্থাৎ এই একটি মৌলিক কারণেই সাধারণতঃ পুরুষদের অপেক্ষা নারীরা বাঁচবার সুযোগ পায় কিংবা বেঁচে থাকে অধিক দিন।

# খেলাধুলা

## সামাজিক পটভূমিকা ও খেলাধুলা

রাষ্ট্রায়ত্ত্বাবহৃত যুগ থেকে বর্তমান কালের সামাজিক যুগ পর্যন্ত খেলাধুলার রীতি প্রচলিত আছে আমাদের দেশে। তবে সামাজিক পটভূমিকা অনুসারে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেটাকে আমরা এক কথায় যুগোপযোগী বলে থাকি।

মহাভারতের যুগে ধর্ম ও তুর্নীর ধারণা। মন্ত্রযুদ্ধ। বালী, হনুমান, সুষাণ প্রভৃতি মন্ত্রবীররূপেই খ্যাত হয়েছিলেন।...

ঐতিহাসিক যুগে আমরা সন্ধান পেয়েছি বহু বীরের। বাংলার প্রতাপ শৌর্যবীর্য ছিলেন অতুলনীয়।

প্রাচীন কালে বিজ্ঞাপীঠে ব্যায়াম চর্চার প্রচলন ছিল। গ্রামীন ভারতের আখড়া স্থাপনের কথা নিশ্চয়ই আমরা বিখ্যাত হই নি। বার চিহ্ন আজও চ'চারটে পল্লী অঞ্চলে দেখা যায়। বিজয়া দশমী, নাগপঞ্চমী, বসন্তপঞ্চমী ও অগ্রহায়ণ উৎসব-মুখর দিনে পরীক্ষা চলতো। রাজ-রাজড়া কুস্তি করতেই আর পালোয়ান পুথতেন। এই কুস্তীর রেওয়াজ আজও উত্তর বিহার প্রদেশে প্রচলিত আছে।

এর পর এলো পরবর্তমান যুগ। 'স্বচরিত্র বৃত্তি' শাসক সম্প্রদায় শক্তি বিনষ্ট করার দিকে লক্ষ্যপাত করে, নানা আইনের বেড়াছালা জাতীয় সহিতিকে ধ্বংস করে দ্রাবড়ে আচ্ছন্ন করে রাখলো।

এর পর এলো দেশাত্মবোধের প্রেরণা।

স্বদেশী যুগে স্বরাষ্ট্রীয় বীর শহীদ। শক্তি সফরের জন্ত গুপ্ত সমিতি গঠন। লাঠি খেলা, ছুরি খেলা, কুস্তি প্রভৃতির প্রচলন হোল নিজেদের বিচার সাধন।

অসামান্য মনোবল ও অসীম শক্তির দ্বারা ভারত আবার নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের বাণী—

‘শরীরমাৎস্ব খলু ধর্মসাধনম্’

জাতি গঠনের মূল মন্ত্র। সমস্ত মালিঙ্গ দৃঢ়হস্তে মোচন করে আজ জাতিকে অগ্রসর হতে হবে।

এবার প্রশ্ন আমাদের সামাজিক পটভূমিকা।

যুগ-সন্ধিক্ষণে দৈনন্দিন জীবন-যাপন যেখানে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে সেখানে খেলাধুলার কথা চিন্তা করা মানে বিলাস। এ কথাই আজকের দিনে প্রতিটি অভিভাবক বলেন।

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে অভিভাবকরা খেলাধুলাকে অজ্ঞার বলে ভাবতেন। তাঁরা জানতেন, শুধু লেখাপড়া করে ভাল চাকরী পাওয়ার কথা। শ্রমের বিষয়, বর্তমান অভিভাবকরা ছেলের খেলাধুলা করার জন্তে বিশেষ কিছু বলেন না। তাঁরা বুঝছেন, খেলাধুলার প্রয়োজন আছে। খেলাধুলার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান জাতিগঠনের প্রয়াস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। দেশ-বিদেশে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নানান বিষয়ে দস্তাবেজক ফল পাওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে সেই সমস্ত

পদ্ধতির যদি প্রচলন করা যায়, তাহলে অর্থ ভবিষ্যতে খেলাধুলায় ভারতের স্থান দীর্ঘ হতে পারে বলে আশা করা যায়। ভারতের ছেলেমেয়েরা সঠিক সবল শরীর নিয়ে তাদের কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারবে।

পাঠশালা থেকে আরম্ভ করে স্কুল-কলেজে ক্রীড়াশীলনের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক ভাবে বাধ্য হতে হবে। শারীরিক যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন দিকে উৎসাহ দিতে হবে।

বর্তমান স্কুল-কলেজগুলির কথাই আলোচনা করা যাক। বাধ্যতামূলক ভাবে খেলাধুলার ব্যবস্থা কোন কোন স্কুলে দেখা গেলেও ফলতঃ দেখা যায় যে খেলাধুলা করার মত মাঠের একান্ত অভাব। মিশনারী স্কুল, এংলো ইণ্ডিয়ান স্কুলগুলিতে কিছু কিছু সুবিধাজনক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এগুলি দেশের একমাত্র আশা বা ভরসা স্থল নয়।...

সহরের স্কুলগুলিতে খেলাধুলার কিছু কিছু ব্যবস্থা থাকলেও তা মোটেই আশাপ্রসন্ন নয়। গ্রামের স্কুলগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। সেখানে খেলাধুলা করার মাঠ আছে কিন্তু স্থলের তহবিলে খেলাধুলা খাতে খরচ করার মত সক্ষমতা নাই। কোন কোন উৎসাহী তরুণ শিক্ষক এ দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, স্থলের মাঠে কোনরকমে একটি ফুটবল বা ভলি খেলার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। তা অত্যন্ত যুট্টিমের স্থলে।

মেয়েদের স্থলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। মেয়েদের খেলাধুলাকে এখনও আমাদের দেশে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

একটু চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাই যে, মেয়েদের স্থান ছেলের অপেক্ষা কোন অংশে কম হতে পারে না। আজকের যে মেয়েটি বালিকা, সেই মেয়েটি কালকের মা। এই ভয়ঙ্কর্য, অশিক্ষিত মায়ের কাছ থেকে স্নহ, সবল মেথারী সৈন্তান আশা করা যাবে না।

প্রাচীন যুগে মেয়েদের শক্তির আধাররূপে কল্পনা করা হতো। তাই আজকের যুগে মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে দেখা জাতীয় জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করি।

আমাদের দেশের খেলাধুলার একমাত্র কয়েকটি বেসরকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান সঞ্চালিত। কিন্তু এগুলির আর্থিক সজ্জিত অত্যন্ত সঙ্গীন। একমাত্র সভাদের টীপার উপর সঞ্চালিত করে বেঁচে আছে।

পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করলে দেখা যাবে প্রচুর প্রভেদ।

ইউরোপের প্রায় প্রতিটি ‘পাবলিক স্কুল’ খেলা মাঠে, আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ার কথা সর্বপ্রথম বলতে হয়।

ক্রীড়াবিদের মূলমন্ত্র অমুশীলন। যে বস্তু অমুশীলন করে তার যোগ্যতা বৃদ্ধি পায় তত বেশী।

খেলাধুলার যে এক মূল্যের দ্বারা সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রচলিত আছে তা প্রতিটি দেশের পক্ষে অমুসরসীয়া।

শিক্ষা এক শারীরিক শিক্ষা বাথাতামূলক। সোভিয়েট প্রতিটি মানব-শিশুতে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। শিশু গর্ভে আসার আগে আগে মাকে সচেতন করে দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য, সবল সন্তান। জন্মভূমিকে আমরা 'মা' রূপে কল্পনা করি। সোভিয়েটে সে কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এক বছরের শিশু থেকে ব্যায়াম করার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। নানান অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ বিষয়ে নানান গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে পাইওনিয়র প্রাসাদ ও পেরেটস কমিটি সংশ্লিষ্ট আছে। মনস্তত্ত্ব বিভাগের বিচক্ষণ অধ্যাপকেরা শিশু পালন বিষয়ে নানান মতামত দিয়ে থাকেন।

রাশিয়ার কিশোরগার্ডেন স্কুল সাধারণ স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় কারখানা এমন কি প্রতি ইউনিয়নে শরীর ভাল রাখার জন্য সব বকম সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এই সমস্ত শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে সোভিয়েট সরকার। শারীরিক শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা সমান ভাবে এগিয়ে চলেছে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় কালের চাপে যে সমস্ত ক্রীড়াবিদ অমুশীলন করার সময় পান না দিবা ভাগে, তাঁরা আলো আলিয়ে রাত্রেই দিকে অমুশীলন করেন। শুধু অমুশীলন নয়, সেটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সমন্বিত।

কিছুকাল ধরে দেখা দিয়েছে যে ভারতবর্ষের খেলাধুলার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের দিকে নেমে গেছে। বিশেষতঃ কলকাতার আশে-পাশের অঞ্চলগুলি থেকে তরুণ কুশলী খেলোয়াড়দের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তাই কলকাতা মাঠে ফুটবল মরশুম, হকি মরশুমে নানান প্রদেশ থেকে, খেলোয়াড়রা আইনের বেড়াঙ্কাল টপকে

আসছে। কলকাতার রাবণগুলিরও এ দিকে মোটেই দৃষ্টি নেই। তাঁরা মোটেই খেলোয়াড় তৈয়ারী করার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না, ইহা পরিতাপের বিষয়!

কলকাতার আশে-পাশের অঞ্চলে খুঁজে অনেক ভাল খেলোয়াড় এর সন্ধান পাওয়া বাবে। শুধু সে সমস্ত খেলোয়াড়রা সুযোগ এবং সুবিধার অভাবে তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ভারতের ক্রীড়ামান অবনতির ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দায়ী করা যায় পরিচালক-মণ্ডলীকে। তাঁরা কোন মূল্যবদ্ধ পরিকল্পনা না নিয়ে ক্রীড়ামানের উন্নয়নের প্রচেষ্টা করেন না। কোন বকমে জোড়া-তালি দিয়ে চালিয়ে যাওয়াটাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়িয়েছে।

শরীর গঠন ও নিখিল আনন্দ ছাড়া আনন্দের দিনে খেলাধুলার আরও একটি উপযোগিতা অবিকতর ভাবে পরিদ্রুত হয়েছে। সেটা হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদরা স্বীকার করে নিয়েছেন খেলাধুলার মাধ্যমে সৌহার্দ বৃদ্ধির পথ।

খেলাধুলার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বের অস্ত্রান্ত্র দেশগুলি দ্রুত ভাবে এগিয়ে চলেছে। তাঁর প্রধান কারণ সজীব ও সতেজ স্বাস্থ্যের অধিকারী। কিন্তু আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা যে কোন দেশের খেলোয়াড় অপেক্ষা দুর্বল। তাই সর্বপ্রথম নজর দিতে হবে স্বাস্থ্যের দিকে।

আম্র ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ খেলাধুলার গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রসর হয়েছেন। তাই মিথিল-ভারত ক্রীড়া-পরিষদ গঠিত হয়েছে। রাজকুমারী অমৃত কাউন্সিলের ক্রীড়া শিক্ষা-পরিকল্পনার বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রীড়া-শিক্ষক ও কোচ আনার ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে স্পোর্টস বোর্ড স্থাপিত হয়েছে। এ সমস্ত প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়। উৎকর্ষতা লাভের জন্য বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা দান ছাড়াও চাই রাষ্ট্রের আয়ুর্কল্য, দেশবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা ও সদিচ্ছা।

## এই বন-শীর্ষ নদী

রবীন চৌধুরী

এই বন-শীর্ষ নদী ঝাড়ভারী ধরে চলে যায়  
অন্ধকার করা কোন হিজল-তলার।

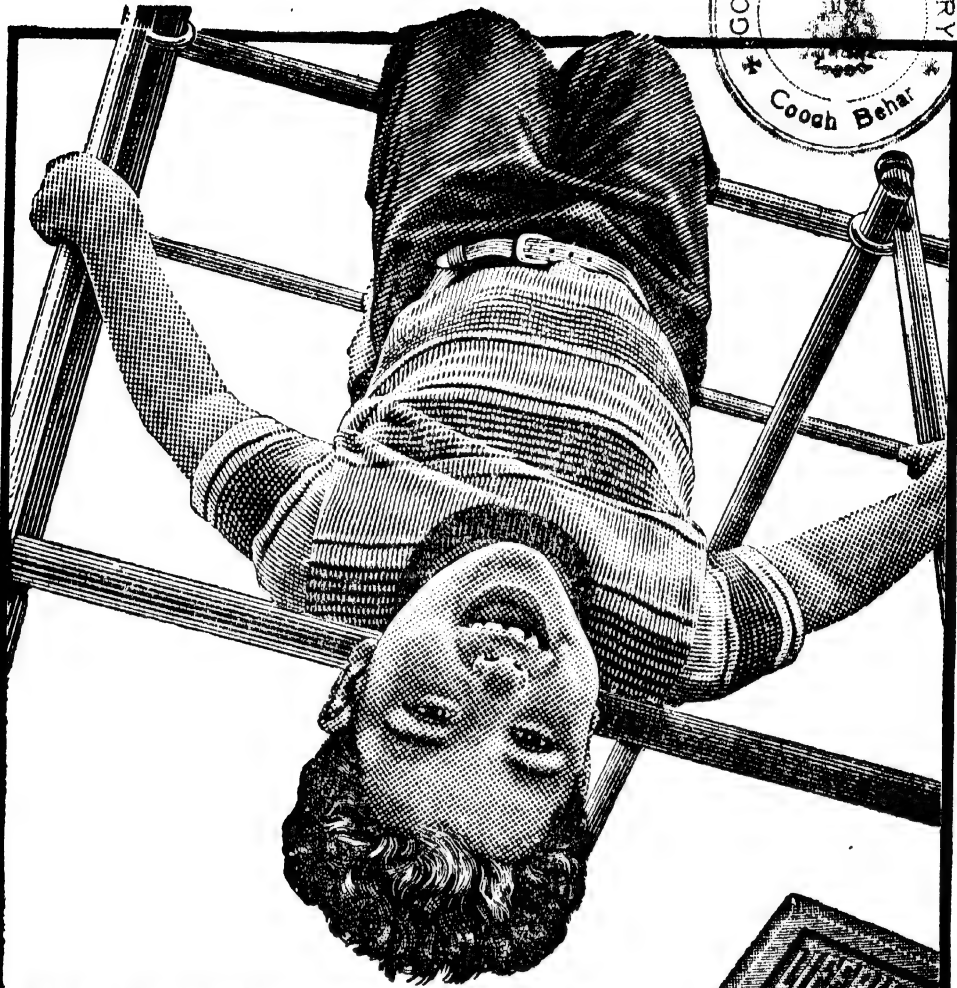
বেখানে পাখর জল-তটে  
সার সার হিজলেরা ওঠে,  
সাত তলা জ্যাংহাংর সমুদ্র-তলে  
অসংখ্য গাছ জলে :  
ফটিক মাঠের সেই মাণিকের বন  
শেত যদি মন।

মন যেতে চায়—  
মন-পবনের পাঁড়ে  
তার তীরে  
তারায় চুম্বক হয়ে জলে বেতে চায়  
সারা রাত আকাশ তলার।

পেল নাক' মন  
গহুজ বিদীর্ণ সে গল্পমোতি বন।

মন যদি বেত সেই দেশে  
অরণ্যের গন্ধ ধরে সন্ধ্যার মৌমাছি বেশে  
নক্ষত্র বীণের তল মধুসিক্ত মৌচাকে তার  
অপরায়িত আসে বেথা

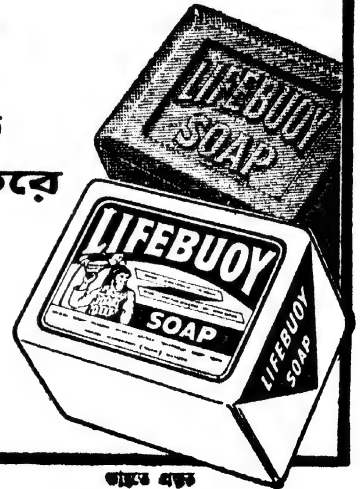
সোনালি পাখরের সার  
আর বায় মেঘারত জল-কল্যাণ  
দানব হাওরার ডাকে সচকিত অকথ্য কখন,  
অতিশ্রুত সাধু হতে অব্যর্থ অবধি  
হরে বায় হীরকের নদী।  
অরণ্যের গন্ধ ধরে সন্ধ্যার মৌমাছি বেশে  
যদি মন—যদি মন বেত সেই দেশে।



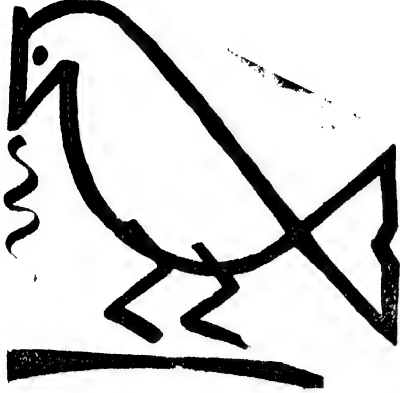
## সুস্থ ছেলেমেয়েরা নিয়মিত লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে

— এতে দৈনন্দিনের ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়।

• যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাঝেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই স্বরূপে তাজা ভাব এনে দেয়



## ছোটদের আসর



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কলকাতা শহরের এক এক বাঙা চোখে ঘরা পড়ে এক এক রূপ নিয়ে—কোথাও নানা বিচিত্র সাইনবোর্ড একটার পর একটা। নানা ধরনের দোকান—কোনো বাড়ীর সম্বন্ধেই দেখা যায় না, কোন দিক দিয়ে ওপরে ওঠে লোককে জানে। বাইরের ঘর কিংবা বৈঠকখানার পাটাই নেই কোনো ট্রামরাস্তার বাড়ীতে। প্রত্যেক বাড়ীর নীচের তলাটা দোকান। মনোহারী, ফাউন্টেন পেনের, ব্লকের, চায়ের, কাপড়ের, মুদীর, বইয়ের, জুতোর, বড়ির, সোডা-লেমনেড সরবতের, কিংবা চায়ের।

কোনো বাস্তায় প্রেস আর ডাক্তারখানা আর কবিরাজখানা, আর হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকান। কোথাও লুপি, টুপি, চুড়ি, মোরাল্লাবান কাশীর জিনিসপত্র ছড়ানো।

কোনো বাস্তায় খালি দাঁত আর চশমা পাশাপাশি। কোথাও সারি সারি গরনার দোকান। আরনালাগানো দেওয়ালে হাজার বাতির আলো ঠিকের প'ড়ে পঞ্চলতি লোকের চোখে ধাঁধা লাগায়।

মাঝে মাঝে পার্কের বেলাং, পুকুরের টলটলে জল।

বড় বড়ো বাস্তাগুলোয় একচেটিয়া মাড়োরার বাড়ী। আকাশ-হোঁরা গ্রীহীন, বোমা পড়ার যুগে বেগুলা খালি হয়ে গেছলো মালিকের দস্ত চূর্ণ করে।

সেদিনের কথা শুনেছে মীরা। ভাবতে পারে না। ভাবতে পারে

না এই বিকানীরী জয়পুরিয়া প্রাসাদগুলোর অসংখ্য ঘর কোনো দিন খালি ছিল। ভাবতে পারে না কলকাতার বাস্তা সজ্জা থেকেই অন্ধকার। সেদিন এরোপ্লেন থেকে বোম্বার উণায় ছিল না কোথায় কলকাতা। তবু সেই অন্ধকার কলকাতার বৃক্ষের ওপর জাপানী বোমা পড়েছিলো। হাতিবাগানের বাজারের টিনগুলো চৌচির হয়ে কেটে গিয়েছিলো। সমস্ত পাড়টা ধ্বংসের কৈশে উঠেছিলো অতি সাধারণ সামান্য বোমায়।

আবার কোনো দিন যুদ্ধ লাগতে পারে। আবার কোনো দিন কলকাতার উজ্জল আকাশ কালো অন্ধকারে ঢেকে যেতে পারে। কিংবা এ পক্ষের ওপক্ষের অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমায় পুরোন পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে নতুন পৃথিবী জন্মাতে পারে। কি পারে আর কি পারে না, সে কথা ভেবে মীরার মাথা খারাপ করার দরকার নেই যদিও।

চায়ের নেমস্তম্ভ এসেছে লেডি ব্যানার্জীর বাড়ী থেকে। আজ বিকসে যেতে হবে। ফোনে জানিয়েছে—চা খেতে এসো। তুমি এক কাপ চা খাওয়ার জন্যে পেট্রোল পুড়িয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয়? অনেকে এ কথা ভাববে। চা খেয়ো এখানে—মানে অনেক গভীর।

মাত্র এক কাপ চা-ই নয়। মীরা দেখেছে তাদের এ বাড়ীতে টি পাটি ব'লে যে জিনিস হয়, লনের ওপর চা-চায়খানা চেয়ারের মাধ্যম রডীন ছাড়া দিয়ে যে আয়োজন হয়, তা যে কোনো মেয়ের বিশ্বের খাওয়ার সমান।

লেডি ব্যানার্জীর বাড়ীর কটক থেকে কবিডোর পর্যন্ত মোরাম-বিহানো পথে গাড়ী চলে যেন জলের ওপর নৌকো ভেসে যাওয়া।

সকলে উষ্মকমে বসেছিলো, মীরা ছেলোমাত্মক, ভেতরের ঢুক পড়েছিলো উ কি মারতে মারতে।

তখন লেডি ব্যানার্জীর সাজ হচ্ছিলো, যেম-ডেসার মুখে রং চুলে কলপ দিয়ে ক্র এঁকে দিচ্ছিলো। লেডি ব্যানার্জীর নাতনী বি-এ পড়ছে কিন্তু মিদিমার বয়স দেখাচ্ছে পয়ত্রিশ।

সত্যি, দেখতে ভালোই লাগে।

লেডি ব্যানার্জী বললে, এসো। মীরা!

ডাকটাপ কেমন মিষ্টি।

ত্রিশ বছর ধরে কি করে লেডি ব্যানার্জীকে ঠিক এক রকম দেখতে লাগে, সবাই ভেবে অবাক হয়।

কথায় যেন মায়া-মাথানো। ধনী হোক, গরীব হোক—প্রত্যেককে ডেকে ডেকে কুশল-প্রশ্ন করা লেডি ব্যানার্জীর মাধুর্য।

গরীব অবস্থা বেশী কেউ এ আসরে আসতে পারনি। সাহিত্যিক আর শিল্পী কিছু মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে।

এ বাড়ীর ঐশ্বর্যের কাছে মীরাদের বাড়ী শূন্য। একেবারে কিছুই নয়। হয়ত কোনো রাজার বাড়ীর সঙ্গে এ বাড়ী মেলে। হার্সল মোজেকের মেঝে। তাও দেখা যায় না, সবই দামী কার্পেট ঢাকা। দশ জন বাবুজি আর দশ জন রাধুনী বাবুন মিলে আজকের চায়ের নেমস্তম্ভ খাবার তৈরী করেছে। খাবারের



ত্রিপ্রভাতকিরণ বন্ধু

পাহাড়। তোমার কাছে যেই খালা আসছে, তুলে নাও চামচ দিয়ে  
বত খুসি।

কোথার খালা আর পাখালা! তারা বোধ হয় এখানে লোভ  
সামলাতে না পেয়ে খেয়ে মরেই যেত।

বাক্সের মতন খাওয়া এখানে চলবে না। দেখাতে হবে তুমি  
কত কম খেতে পারো।

ওদের অনেক জিনিস ফেলা যাবে। হয়ত কোনো ভিখারীর  
ছেলে-মেয়েরা তখন কিছু পেতে পারে। ফটকের একেবারে বাইরে।  
রাষ্ট্র বাবু জয় হোক বলে যারা চৈতছে।

অটলিকায় প্রচুর পাবার আর বাইরে প্রচুর অভাব—এ প্রাচুর্য  
বোধ হয় এক ভারতবর্ষ। এ কথা ভেবে মীরার দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

এ কথা মনে হ'লে আর খেতে ইচ্ছে করে না। এর পরে  
ঔজ্জ্বল্য ঘরে গান হল, বাজনা হল, নাচ হল। কিন্তু গরীব  
হিন্দুস্থানের কথা একবার মনে হ'লে, আর ত কিছুই  
ভালো লাগে না। ও ভাবতে লাগলো একদিন মাত্র না খাইয়ে  
এই লেডি বানানাজী যদি করুক জন শিল্পী আর সাহিত্যিককে বাঁচার  
পথে সাহায্য করত!

মন ভার ক'রে মূল ভার ক'রে মীরা ফিরে এলো। বাড়ীতে  
এসে দেখে, কত দিন পরে মাসীমা মেসোমশাই এসেছে। মাসীমা  
নামে মামনির নিজের বোন। মেসোমশাই প্রোফেসর। ব্যারিষ্টার  
ভায়রাভাইয়ের কাছে নিত্যন্ত কাজে না পড়লে আসে না।

আজ দরকার। সঙ্গে থেকে এসে বসে আছে। ফোন  
ক'রে এলে এ বিভ্রাট ঘটত না।

চোখের বসে কি সব কথাবার্তা হল। কালকে সবাইকে  
যেতে হবে ওদের নতুন বাড়ীতে। লোক ভিড় বাড়ীতে।

নতুন বাড়ীটি লোকের কাছে। নতুন করা নয়, নতুন কেনা।  
দূরে লোকের নীল ভল, সামনে ফুলের বাগান, তিনখানা ঘরের  
একতলা ছোট বাড়ীটি কী চমৎকার সকলের আলো হাওয়ায়!

পুরীতে সী-ভিউ, দাঙ্গিলিংএ ছিল ভিউ দেখেছে, এবার  
দেখলে লোক-ভিউ। ডায়মণ্ডহারবারে কি রিভার-ভিউ হবে?  
কিন্তু রাত্রি এ বাড়ীর অন্ধ রূপ। সেই গম্বই ও গুনলো।  
পাশের ঘরে চোর চুকে একালের টালের আলমারী—যা নাকি আগুনে  
পোড়ে না, চাবি কেউ খুলতে পারে না, সেই আলমারী এগিডে গলিয়ে  
গয়নার বাস্র আর যা কিছু ছিল সর্ব্বশ্য নিয়ে গেছে। এরা শব্দ  
শব্দে জেগে উঠে গিয়ে দেখে, পাক্সামা-সার্টি বুশকোট পরা ভদ্রলোকের  
ছেলোরা সব—বিভলবাবের আওয়াজ করলো, বোমা ছুঁড়লো—হাওয়া  
হয়ে গেল।

খানায় রিপোর্ট হল, পুলিশ এলো। কোন কিনারা হল না।  
সেই চোরদের মতনই দেখতে ভদ্রলোকের ছেলোরা সিগারেট টানতে  
টানতে এসে প্রোফেসরকে জানিয়ে গেল—যারা চুরি করেছে তাদের  
মুকবি নাকি বিবট বিবট বড়লোকরা। এরা একটু তখির তলারক  
করতে পারে। কিন্তু এখন গলা শুকিয়ে গেছে মাসীমা, দশ কাপ চা  
ক'রে দিন।

চা খেতে তারা প্রায়ই আসতে লাগলো। কোনো দিন সরব  
চায়।

দামী দামী ফুলগাঁছগুলো কে উপড়ে নিয়ে যায়। ঢিল ছুঁড়ে

সাঁরীর কাঁচ ভাঙে। সারা রাত ধূপখাপ আওয়াজে একতলা বাড়ীতে  
ঘুম হয় না। তাই প্রোফেসর বাথলো একটা ফল-টেরিয়ার।

দিন কতক আওয়াজ বন্ধ হল। উপজব বন্ধ হল।

কিন্তু রক্ষাকালী পূজার চাঁদা চাইতে এসে কি কায়েদায় যে দুদাস্ত  
ফল টেরিয়ারটাকে মত্ত থেলের মধ্যে ওরা পুরে নিয়ে গেল, ওরাই  
জানো!

বেলায় এলো সেই ছেলের দল। বললে দশটা টাকা পেলে  
এনে দিতে পারে কুকুরটাকে।

খসলো দশ টাকা। মুখবন্ধ থলেতে ফিরে এলো ফল-টেরিয়ার।

ব্যারিষ্টার পরামর্শ দিলে, বাড়ীটা বিক্রি ক'রে পটোলডাওয়া ফিরে  
যাও। সেখানে পাড়ার লোক সজাগ, এখানে পাড়ার লোক কামেলায়  
যায় না। তা ছাড়া কত দূরে দূরে সব আছে।

আজ মীরা গুনলো, কলকাতায় বাঙালী ছেলেরা, লেখাপড়া  
জানা ছেলেরা খুব হোরা চালাতে শিখেছে, মদ খেয়ে মাতলামী  
করতে শিখেছে, অনেক জায়গায় পথে-ঘাটে মেয়েদের চলা বিপদ,  
নিজের জাতের ভাইয়ের সামনে দিয়ে।

মীরার একথা বিশ্বাস হয় না। গুণ্ডা মানাই ত' ছোট লোক,  
ছোট জাত, মুখখু।

ভদ্রলোক কখনো গুণ্ডা হয়? যশু হ'তে পারে। কয়েক জন  
ভদ্র পরিবারের ছেলের ইয়াকিতে একজনকে নতুন বাড়ী বেচে  
পালিয়ে যেতে হবে?

কিন্তু তাঁর মেসোমশাইকে শেষ পর্যন্ত তাই করতে হয়। মাঝে  
থেকে এক উকীল বন্ধু বাড়ী বেচার সময় হু' পক্ষের কাছ থেকে টাকা  
নিয়ে এমন গোলযোগ বাধিয়ে দিলো যে, তার হাত থেকে মুক্তি পেতে  
বেচার প্রোফেসরের অনেক বঞ্চনা হল। কী কাণ্ড সব!

বিচিত্র মহানগরী। এখানে থাকতে গেলে মারতে হবে হয়  
টাকার জোরে, নয় বৃদ্ধির জোরে।

ভালোমামুষ গোবেচারাদের জ্ঞাত কি এ শহর নয়?

তাই ওর প্রাণ শাস্ত হল ক'দিন সাগানপুর এসে। পৃথিবীর  
মধ্যে এমন নিষ্ঠুর দেশও আছে?

ছোট একটা টেশন। তার পাশে ছোট একটা খানা। বাস-  
চলার সফ্র একটা রাস্তা। তার ধারে খান তিন-চার বাড়ী। তার  
পর মাঠের পর মাঠ, পলাশবন, শালবন, মহাযাবন।

দূরে দূরে গ্রাম। দিনের বেলাতেই ঘুমন্ত। সাড়া নেই, শব্দ  
নেই। পথে লোক নেই একটুও।

শুধু শঙ্খচিল ডেকে গুঁটে, মুনিয়াপাখী টেলিগ্রাফের তারে তারে  
লাফিয়ে যায়। আকাশে সাদা মেঘ স্থির হয়ে আছে। দূরে দূরে  
কলিয়ারীর চিমনি আর কপিলক দেখা যাচ্ছে। করলা-বোকাই ইঞ্জিন  
শাফট করছে ট্রেনে।

রাস্তাটা পড়ে আছে ত পড়েই আছে। ক্যাবিনের দোতলার  
বারান্দার ধারে একটা লোক বসে আছে ত' বসেই আছে।

একদিকে আসানসোল, একদিকে কুলটি, একদিকে মাইথন, আর  
একদিকে চিত্তরঞ্জন। যেখানে লোকচলাচলের আর কাজের নাকি  
বিষয়মানেই, অথচ এগুলির এত কাছে, নিশ্চয় অসল পাণ্ডব-বর্জিত  
সাগানপুর প্রাগৈতিহাসিক যুগের মতন অন্ধকার।

চাষের জমি, ফসলের জমি বিশেষ নেই, এখানে কিছই পাণ্ডর

বায় না, জল নেই, আলো নেই, শুধু বাতাস আছে নির্মল আর পাহাড়ী—পুরুষের সব কাজে চলে যায় কলিয়ারী আর কারখানায় মেয়েরাও কিছু কিছু বিরাট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার কেন্দ্রস্থলটি স্থির হয়ে প্রতীক্ষা করে বছরের পর বছর, কবে সেখানে উৎসাহের উত্তমের চক্ষুস্তার সাদা আসবে।

যতই বা গোক, তবু মীরার প্রশ্ন জাগে, এমন গ্রামও ভারতবর্ষে আছে যেখানে উদ্ভাপনা বলে কিছু নেই। পঞ্চাশ বছর ধরে এ গ্রাম একই ভাবে আছে, একটুও উন্নতি হয় নি। না স্থূল দিয়ে, না নোকান দিয়ে, না ডাকঘর দিয়ে।

এ সব কথা শুনেও মীরার ভালো লাগলো শান্ত ছবিটি দেখে। দিগন্তলীন মাঠের ওপর উদার আকাশ নিঃশব্দ ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয়, শান্তি আসছে, মনে শান্তি আসছে—যে শান্তি পৃথিবীর কম জায়গাতেই আছে।

কলকাতা থেকে আনা খাবার আর তরী-তরকারীর ব্যবস্থা হয় ঠাকুরের হাতে রান্নাঘরে—কল্যাণ-কুটারের টালিচাকা ছোট বারান্দা থেকে পকেটো পাহাড়ের ঢেউ দেখা যায়, ছাদের ওপর উঠলে দশ-পনেরো মাইল মাঠ বাট বন গ্রাম চোখের সামনে ধরা পড়ে। ড্রয়িং রুমের ভক্তা মেকী সভ্যতার স্থান এখানে নেই, ইচ্ছে হয়, ছোটো মাঠের ওপর দিয়ে—যে মাঠ ক্রমশঃ নীচে নেমে গিয়ে আবার ওপরে উঠে গেছে, যে মাঠ সমতল বাংলার মতন একঘেয়ে নয়।

মাঝে মাঝে নজরে পড়ে রাস্তার স্বাধীনতা মেয়েদের—লেডি ব্যানাজীদের চেয়ে সৌন্দর্য্য বাসের বেশী। কোনো মেম-ডেন্সার যদি তাদের সাজাত, তাহলে তারা পরীর মতন হয়ে উঠত। চুলগুলোকে কি বকম ঘুরিয়ে কানের পাশে খোঁপা করেছে, তাতে গুঁজছে সাদা-লাল ফুল,—কলকাতার প্রায়টিকের শুকনো ফুল নয়—ছুটে চলেছে যেন বনের হরিণের মতন, হাসছে যেন কর্ণার কলধনি।

এরই ত এখানকার শোভা। মোটা খাওয়া-পরায় এত আনন্দ ওরা কোথা থেকে পায়?

রাত হয় সালানপুরে, অজস্র কলিয়ারীতে আলো ছলে ওঠে নীপারিতার মতন, মাইথন আলোর মালা পরে হাসে।

ঐ মাইথনে বাবার জন্তেই ওদের এখানে আসা। মাম্মি স্বপ্ন দেখেছে, কল্যাণেশ্বরীর পূজো দিতে হবে। কালো আকাশে অসংখ্য তারা, যে তারা কলকাতার ঘোঁরাভরা আকাশে দেখা যায় না। সব তারা নিবে যায়। শুকতারাজ জাগে।

ওদের এরার কিশোরী মোটরকারে স্ট্রীয়ারিং হইলে ফাঠ গীয়ার, নিউট্রাল, সেকেন্ড গীয়ার হ'য়ে টপ গীয়ার চলে দেওয়া হয়, গাড়ী ঝড়ের মতন এগিয়ে চলে, অস-ইণ্ডিয়া বেডিয়ো থেকে শানাই বেজে ওঠে ছোট বেতার যন্ত্র,—গাড়ী ত নয়, যেন বাতী চলেছে পীচঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে, দাঁওতাল-পল্লীর পাশ দিয়ে, পল্লীধির ধার দিয়ে, দেলুয়া হলুট পাথর হ'য়ে লাক্সারজি শিঙনে ফেলে নেমে যায়, ক্রমশঃ নেমে যায় বরাকের নদীর দিকে গড়গড়িয়ে, আবার ওঠে পাহাড়ের বুক-ঢেরা রাস্তায় কোয়ার্টার্স দুপাশে কেলে,—মাইথন বাঁধ নদীর বুক থেকে বিশতলা সমান উঁচু, তার ওপরে পাহাড়ের চূড়া বুক বীপের মতন জাগিয়ে অর্ধে অস্তল জল, ময়দানবের মতন যন্ত্রাণন কি কাজ এখানে করেছে।

ছোট একটুখানি জায়গা জুড়ে ছোট একটি সন্ন্যাসীর আশ্রম, চারিধারে দোকান-পসার, লোকালয়।

মীরায় মাম্মি বলতে লাগলো, সন্ন্যাসী আজ নেই, যেদিন তিনি ছিলেন, আমি এসেছি ঢালনা নদী পার হয়ে কাঁটা-বিছানা পাহাড়ী পথে। সেদিন সন্ন্যাসীর আশ্রমের চারিধারে কত ফল-ফুলের বাগান, কুয়ার জল কি মিষ্ট, আর চারিধারে কি নিবিড় বন!

আশ্রমের জানলার সোতার গরাদের কীক দিয়ে দেখতে পাওয়া যেত এক পাহাড়ের উঁচু শিখর, ডিনামাইট দিয়ে বা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই পাহাড়ের জঙ্গল থেকে বাঘ বেগিয়ে আসত রাত্রে। সন্ন্যাসী ছাড়া চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে আর কেউ ছিল না। কোথায় গেল সেই বন, আর কোথায় গেল সেই আশ্রম। ও পথ থেকে ফিরে ওরা মন্দিরের দিকে নেমে এলো।

মাম্মি বললে, ঐই মন্দিরে বিকেল তিনটের পর আর জনমানব থাকত না, পায়ে হেঁটে গরুর গাড়ীতে সব গ্রামের দিকে শহরের দিকে ফিরে যেত। তারপরই ছিল বাঘের ভয়, নিজন পথে ছিল ডাকাতের ভয়।

আজ এখানে দেখা, দিনের বেলাতেই ইলেক্ট্রিক আলোর সাজানো দোকান ঘর, মনে হয়, যেন কালীঘাটে এলাম। ধনশালার সারা রাত হৈ হৈ করছে রাঁচী হাজারিবাগ থেকে বারা এসেছে, রাণীগঞ্জের লোকের ফিরে যাবার তাড়া নেই, বাস শাড়িয়ে থাকবে।

দেবী আজ সকল ভয় দূর করেছেন, কিন্তু সেদিনের সেই জনহীন নদীকূলের বনপথের মন্দিরের অবাধ গাড়ীঘর কোথায় গেল? এ তো মেলার ঠাকুর দেখতে এলাম!

মীরা বলে, যতই বলে মাম্মি, সেদিন এলে ভয় করত। গরুর গাড়ীতে ফিরে যেতে হত বেশ তিনটের আগে, খমখম করত চারিদিক, আজ কোনো ভয় নেই, তাড়া নেই, নদীতে স্নান ক'রে শিচুড়ি খেয়ে অনেক রাত ক'রে ফেরা হবে।

নদীর ধারে গাছের তলায় উল্লুখ পেতে ঠাকুর রান্নার ব্যবস্থা করলো। নদীতে পাথরে আছড়ানো কর্ণার যুখে ব্যাবিষ্টার বায়চৌধুরী মিসেস বায়চৌধুরী মীরাকে নিয়ে প্রাণ ভরে স্নান সারলো। উঠতে ইচ্ছে করে না।

দুজনে যখন গরদের কাঁপড় আর শাড়ী প'রে পূজোর জিনিস নিয়ে তৈরী হল, তখন হাইকোটের জ্যাটনী উকিল আর মাক্কেলরা কেউ কেউ সে দৃশ্য দেখে অবাক—সাহেব মাহুসের এত হিন্দুয়ানী!

অনেক লোক মন্দির-প্রাঙ্গণে, বাইরের অঙ্গনে কালো কালো পাঠা সাহি-সাহি রাখা—একটার বলি দেখে আর একটার আর্তনাদ আর স্পষ্ট চোখের জল মীরাকে চঞ্চল করে তুললো, সে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। নদীর ধারে, যেখানে কর্ণার অশ্রান্ত কলকলধনি, আর বীজের ওপারে মাইথনের বাড়ীঘর বিক্ৰমিক করছে।

মীরা ভাবে, খাওয়ার জন্তে পৃথিবীতে অজস্র জীবজন্তু পাখী-পক্ষী হত্যা করা হচ্ছে প্রতিদিনই, সে হয়ত আরো নিম্নর ভাবে জবাই করা, মানে ত টুটিটা আধখানা কেটে ছেড়ে দেওয়া—কিন্তু মায়ের কাছে মার সন্তানদের ঠকাঠক কাঁপনীর মধ্যে এই বলিদান, কচি কালো পাঠাদের এই অকালমৃত্যু এর অর্থ ঠিক বৃহতে পারা যায় না!

জ্যাটম বোমের বাতাসে ভেসে যাওয়া রেণুকা দিয়ে, বিভিন্ন খাজে ভেজাল দিয়ে, মাহুসকে বঞ্চিত করে উপবাসের যুখে ঠেলে



দেওয়ার নিতান্তজন পৈশাচিক বড়বস্ত্র দিয়ে এর চোরে অনেক বেশী পাণ কাঁজ করা হচ্ছে পৃথিবীতে। জননী যেন শক্তি দেন সেই পাণ নিশ্চিহ্ন করবার।

বড়ো মন্দিরের বাইরে যেখানে চরণপদ্ম আছে ছোট মন্দিরে, যেখানে কিশোরী কণ্ঠা একদিন শাখারীর কাছে শাখা কিনে বনপনুরে দেওঘরিয়া পিতার কাছে দাম নিতে বলেছিলো—কল্যাণেশ্বরীর সেই পুরানো কাহিনী মায়ের স্থান, মায়ের ধান—মাইধনে অরণ করতে করতে প্রার্থনা করতে লাগলো মীরা—শক্তিময়ি, শক্তি দাও। [ ক্রমশঃ।

## আমার দেখা সুনির্মল বসু

### ত্রিবিদ্য সেন

সুনির্মল বসুর সঙ্গে আমার আত্মীয়তাও নেই, বন্ধুত্বও নেই, একদিনের সামান্য কিছুক্ষণের জ্ঞান ছাড়া ওঁর সঙ্গে জীবনে সাক্ষাতের কোন দাবীও করতে পারিনে। তবু যে ওঁর সম্বন্ধে লিখতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ ওঁর সঙ্গে আমার একটি আজন্মের সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ লেখকের ও পাঠকের। তিনিই 'বন' লেখক, তখন আমিই পাঠক।

সুনির্মল বসুকে আমি আমার নিত্যন্ত ছেলেবেলা থেকে এবং বলতে কি ওঁর সাহিত্য-জীবনের একেবারে গোড়া থেকেই দেখে আসছি। সেটা হবে ১৯১৯—২০ সাল, আমার বয়স তখন নয়দশ, বাংলার শিশু সাময়িকের রাজ্যে তখন সন্দেশ-এর সাম্রাজ্য চলছে। যদিও শিশু-সাময়িকই তখন এমন কিছু ছিল না, এক ছিল 'সন্দেশ' আর ছিল 'শিশু', 'প্রকৃতি' বোধ হয় তার আগেই থাকে হয়েছে। শিশুও গেছে কিংবা যাব যায়। হু-একখানা ছুটকো পুরানো শিশু এখানে সেখানে বন্ধু-বান্ধবের বাসায় ছাড়া ও কাগজ ঘামি নিজে কাউকে রাগতে দেখিনি। ছেলেবেলা মানুষ হয়েছি রামে। আমাদের পাড়ার একটি মেয়ে রামতো সন্দেশ, আর এই একটি মাত্র সন্দেশ দিয়েই আমরা পাড়ার সব ছেলেমেয়ে সাহিত্য উপভোগের জের মেটাতুম। তখনও শিশুচিন্তকে পীকার করবার মত বা তাকে সাহিত্যের আনন্দ দেবার মত যথেষ্ট বস্তু ছিল না।

সেই সময় বড়দের পত্র-পত্রিকা প্রবাসীর কি করে 'দয়া হলো, 'রা ওঁদের কাগজে ছেলেদের পাতত্যাড়ি বলে শিশুদের জ্ঞান থেকেখানি পাতা ছুড়লেন। কাজেই আমরা দুটো সম্পদ হাতে লুম এক সন্দেশ আর এক প্রবাসী। সন্দেশের রাশ-পরিবারের ায় সবাইই দান অনবত্ত গল্প, কবিতা, ছড়া প্রবন্ধ, নাটক, মণ-কাহিনী, খাঁশা আমাদের যখন একেবারে মাতিয়ে রেখেছে, য় উপরে প্রবাসীর ছেলেদের পাতত্যাড়ি আমাদের কাছে হলো য়ি ভোজনের উপরেও চাটনী-বিশেষ। সেই প্রবাসীর ছেলেদের তত্যাড়ির পৃষ্ঠায় একদিন সুনির্মল বসুর ছড়ার কবিতা লুম, 'চন্দ্র ভায়ার পদ্মা পার।' চন্দ্র একদিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখলে যে সে সাত্তরে পদ্মা নদী পার হয়ে যাচ্ছে, বন্ধু-বান্ধব তারে পিঁড়িয়ে বসছে, 'ওরে চন্দ্র, বাসনি বাসনি, ডুবে যাবি, য় আর।' চন্দ্র কিন্তু কিছুতেই ওনছে না, তখন তার মজা

লগে গেছে—পদ্মা পার সে হবেই। এমন সময় মা এসে হাত ধরেছেন ওর, ওকে ঘুম থেকে তোলাবার জ্ঞান—

.....খরল তাঁহার হাত কে ?

"ওরে বাবা কুমীর বলে ওঠেন চন্দ্র জাঁতকে—তার পড়েই—

.....জগে দেখেন লজ্জায় পার হয়েছেন পদ্মা নদী শুয়ে শুয়ে শযায়।

এইটেই সুনির্মল বসুর প্রথম প্রকাশিত লেখা, উনি নিজেই তা' বলেছেন ওঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'জীবন-খাতার কয়েক পাতা'র। ওঁর বয়স তখন কত ছিল তা' আমরা জানতুম না, আর তা' জানবার প্রয়োজনও তখন কিছুই বোধ করিনি, আমরা শুঁকে পুরোদস্তুর সাহিত্যসেবক বলেই ধরে নিয়েছিলাম। জীবন-খাতার পাতা থেকে কেনেছি, তিনি তখনও ছিলেন স্কুলের ছাত্র। ঐ ছেলেদের পাতত্যাড়িতেই ওঁর আর একটি ছড়ার কবিতা পাই—

—ক্রি ক্রি ক্রি ক্রি সব সেরে যাও না,

চড়িতেছি সাইকেল দেখিতে কি পাও না ?

যাড়ে যদি পড়ি তবে প্রাণ হবে অস্ত।

পথ মাঝে পড়ে রবে ছিরকুটে দস্ত।

জান নাকি বলেছিল মহাকবি মাইকেল,

যেও না যেও না সেখা যেখা চলে সাইকেল ? ইত্যাদি

সুকুমার রায়ের ছড়া কুমড়ে পটাশ, ভয় পেও না, বোঝাগাড়ের রাজার তখন আমাদের থানা ভরপুর, সুনির্মল বসুকে পেয়ে যেন আরও কিছু পেলুম। সুনির্মল বসুর বেশী কিছু তখনও প্রকাশিত হয়নি। কবি মানসের কবিতা তো প্রকাশিত হয়ই নি। আরও পরে পাই ওঁর কবিত্বপূর্ণ কবিতা সন্দেশের পৃষ্ঠায়। সুনির্মল বসু সম্বন্ধে আমার সেই সময়ের মনোভাব কিছু দিন পূর্বে বাংলার শিশু সাময়িক নামে একটি রচনায় উল্লেখ করেছিলাম (যুগান্তর নভেম্বর ২০,—১৯৪৫) তারই সেই অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করছি।—

"সুনির্মল বসুর সেই সময়েই হাত-খড়ি সাহিত্য জীবন আরম্ভ করেছেন মাত্র। ওর লেখা এবং ওর আঁকা ছবি দেখতে পাই সন্দেশের শেষ দিকে। ১৯২৪-২৫ সালে সুকুমার বাবু মারা যান। তার কিছুদিন পরেই ওদের সব দেনার দায়ের বিক্রী হয়ে যায়। সেই সময়েই মালিক স্বধাবিন্দু বিশ্বাস কিছুদিন সন্দেশ চালিয়েছিলেন বোধ করি বা ২৬, ২৭, ২৮ সন, তার পরেই তা বন্ধ হয়ে যায় একেবারে। সেই সময় সুনির্মল বসুর কবিতা প্রায়ই সন্দেশে বেরোতো আর ওঁর নিজের কবিতার ছবিও প্রায়ই উনি নিজেই আঁকতেন। ওঁর রসের কবিতা, খেলালী কবিতা ও ছড়া ছাড়াও উনি প্রায়ই নিছক কবি মনোবৃত্তির কবিতা লিখতেন—বিশেষ মাস বা বিশেষ ঋতু নিয়ে। বর্ষার কবিতা ছিল—

—আবার স্বপ্ন বৃক বৃক বাহল যরা গান

চৈত্রেয় কবিতা ছিল—

—চৈতী হাওয়া বইতে স্বপ্ন অনেক দিনের পর

শরত্তের কবিতা ছিল—

—ভোর হলো রে দোর খোল রে ভাই

এমন ভোরে ঘুমল পড়ে ছাই—ইত্যাদি।

গ্রামের ছেলে ছিলুম আমি, ঋতু পরিবর্তন আর প্রাকৃতিক

ভাগ আমার রক্তে রক্ত। বেশ মনে পড়ে বর্ষার সময়  
পড়তো আর সান্ত্বনার গুল একটা নালা বেয়ে হুড় হুড়  
আসতো আমাদের বাসার সামনের একটা ডোবায়ে।  
খাকলে আমাদের বাইরের ঘরে একাকী বসে পড়তুম  
‘আবার শুরু রক্ত রক্ত’, আর কাব্যের ছন্দে ছন্দে  
নি করে উঠত সেই ছেলেবেলা।

স বস্তু যদিও ছড়াকার বলেই সমধিক প্রসিদ্ধ কিন্তু  
হল এর ভিতরে একটি সুন্দর কবি, একটি সত্যিকারের  
বার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ছোট ছোট কবিতায়।  
গল্পগীতি, সাঁওতাল পরিবেশ, সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে নিয়ে  
তা আছে তা বীরাট পড়েছেন তাঁরাই জানেন। মাস বা  
তা তো আগেই উল্লেখ করেছি। ‘মাস-পরশ’র চেহারা  
ছোট, সেই ছোট মাস পরশায় ‘অন্তরী’ বলে ওঁর একটি  
হা মনে পড়ে। সেই দিন বুঝেছিলুম উনি কত বড় কবি।  
ছিল বোধ হয় আটশ পাক্তি, তার পাঁচটি পাক্তি মাত্র  
আছে কিন্তু তাঁর পরিচিত বিচারে তাই যথেষ্ট—

—অন্তরী ফুটেছে বন-কোণায়,

খোঁজ রাখে তার কোন জনায়।

... ..

তুলে তুলে যায় নিরালাতে

... ..

একদিন কবি এসে বললে,—

“ওরে ও অন্তরী মোছ আঁখি,

আমি কবি তোঁর খোঁজ রাখি।”

শ উঠে যাবার পর সুনীল বস্তুকে আমি দেখি স্কিট  
র মাস-পরশার সঙ্গে। ছোট ও বড় মাস পরশায় উনি  
বিতা, ছড়া ও ছোটদের নাটক লিখেছিলেন। নাটক মনে  
হপটে ঠাকুরা, কবিতা ‘অন্তরী’ ও সাঁওতালরা, ছড়া  
যা ‘অটল বাবুর পটল তোলা’, ‘কথক ঠাকুর মশায়ের দাড়ি  
পা বাম ভাগলের কথা মনে পড়া’, ‘কচ্ছার বাঁধা নেটে ইঁদুর’,  
পালের ছেলে ভুলস সগাই তাহার ভুলটি, কালনা  
গলে তারে হাজির হবে কুলটি’, ‘শেষজীক কুকুরে তাড়া

প্রবাদ জানে তুমি আমি কুস্তা তো আর তা’ জানে না।  
রিজা করে ঈশানের কাছে বাড়ী ফিরতে, রিজাওয়ালা বাবুকে  
ব নৈহাটিতে নিয়ে গিয়ে হাজির করা—

মনিয়ায় মন মনিয়া, রিজাওয়ালা আমার নিয়ে চলতেছিল

হন হনিয়া।

রাত, গায়ের কাপড়টা একটু ভাগ করে জড়িয়ে আরাম করে  
একটু ঘুমের ও তুল এসেছে, তার পর কতক্ষণ কেটে গেছে টের  
হঠাৎ দেখি যে, একি! গঙ্গার ধারে সব বড় বড় ঢোং পূব  
দুই উঁকি মারছে, কি ব্যাপার। ঠা ঠা করে রিজাওয়ালাকে  
ই সে বললে—কম্বর ছাড়া তুল ছাড়া কুছ কাল রাতমে আঁকি  
কাজেই—

শীতের রাতে শীত করে পৌছাব ভাই কই বাটতে,

তা না হয়ে একেবারে পৌছে গেলুম নৈহাটিতে।

মাস পরশার ফুঁই নিজেই কৈশোর কাটিয়ে উঠেছি, তার পর  
১৯৩০ সালে জীবিকার প্রয়োজনে বিদেশে যেতে হয়েছে, তাই  
সেই সময়ের পর থেকে সুনীল বস্তু কার্যকলাপের সঙ্গে আর  
বিশেষ সংযোগের অবকাশ ঘটেনি, তবু সখ্য যে একেবারে শেষ হয়ে  
যায়নি বিদেশে থেকেও বার বার তা টের পেয়েছি। অধুনা প্রকাশিত  
শিশু সাহিত্য পরিষদের ‘ছড়ার ছবিও’ আমার হাতে এসেছে। জীবন  
চক্রের ও একটা অতি তুচ্ছ ঘটনা কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এ যেন  
ভাগ্যের খেলা, সুনীল বস্তু সখ্যকে আমাকে একদিন লিখতে হবে  
বলে সে আমাকে যেন আগে থেকেই প্রস্তুত করছিল। ঐ ছড়ার  
ছবিতে ওঁর সে অবদান—

দাহুর মাথায় টাক ছিল

সেই টাকে তেল মাখছিল

বা

হাকিয়ে দিয়ে ট্যান্ডি কাল

আসছিল এক খ্যাক-শিয়াল

এ সব ছড়াগুলো মনে হয় বাংলায় চিরদিনের ছড়ার ভেতরেই  
কালে স্থান পাবে।

১৯৪০ সালে একবার কলকাতা যাঁই, তখন একদিন বর্তমান  
বস্তুকে বায়োকোপ ঘরের কাছাকাছি জায়গায় রসারোডের উপরে  
ছোট এক রেস্টোরাঁতে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় সুনীল বস্তু এক  
বস্তুকে নিয়ে সেখানে হলেন, এবং আর কোন টেবলে জায়গা না  
থাকতে ওঁরা দুজনে আমাদের দুপাশে বসলেন। বসেই বস্তু হাত  
এগিয়ে দিলেন আর সুনীল বস্তু দেখতে লাগলেন তা’। কেউ হাত  
দেখতে থাকলেই, যদি পরশা দিতে না হয়, নিজের ভবিষ্যৎটাও একটু  
হাতড়ে দেখতে চাওয়া মানুষের এক চিরন্তন দুঃখলতা। কাজেই  
আমিও সেই মুহূর্তে ভিড়ে পড়েছিলুম ওঁদের দলে। কথা হতে পারে  
যে উনিই যে সুনীল বস্তু আমি তা’ জানলুম কি করে তা’ হলে  
বলব বড় ক্ষেত্রে বড় অবস্থায় ওঁর ছবি আমার দেখা ছিল। অনেক  
দিন ধরে সম্প্রতি আমার রচনা শিশু সাময়িক প্রকাশিত হবার  
পর উনি আমার কয়েকটা ভুল শুধবে কাগজে পত্র দেন।  
সেই ব্যাপারকে অবলম্বন করে, ওঁর সঙ্গে আমার দু’খানি পত্র  
বিনিময় হয়। তাতে ঐ কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ার উনি  
আমাকে লেখেন যে, ঐ, এক সময় ওঁর হাত দেখা চর্চীর ঝাঁক  
হয়েছিল।

ওঁর সঙ্গে সেই কয়েক মিনিটের মাত্র দেখা, আর কখনো দেখা  
হয়নি। তবু এই অপরিচয়ের বন্ধক সত্ত্বেও ওঁর নানা লেখা ও নানা  
বিবৃতির মধ্য দিয়ে ওঁর চরিত্রের একটা বিশেষ বার বার আমাকে  
অভিভূত করেছে তা’ ওঁর মধুর বিনয়। জীবন-থাতার ভূমিকায় উনি  
বলেছেন—

“আমার আত্মকথা পড়ে কার কি উপকার হবে জানি না।  
কোন দিনই ভাবিনাই আমার আত্মচরিত লিখতে হবে, কোন দিন  
ইচ্ছাও ছিল না বরং আপত্তিই ছিল বরাবর।”

তারপর তিনি শু অপকথের লাভালাভের দাবি দিয়েছেন  
প্রকাশকে যিনি তাঁকে তাড়না দিয়ে এ কাজ করিয়েছেন। প্রায়  
পনেরো বৎসর আগে উনি একটি কবিতা দিয়েছিলেন বাংলার  
কয়েকটি তরুণ তরুণী সাহিত্যিকদের, ওঁরা বাংলার বর্তমান ও বিগত

বিভার কয়েকটি সঙ্কলন প্রকাশ করত চেয়েছিল। এই রাত্তো বাংলার যথেষ্ট পাঠকের চোখে এখনও পড়েনি, তাই সম্পূর্ণ তুলে দিলাম :—

ছোট কবিতা

আমার কাছে চাইলে তুমি ছোট কবিতা,  
না যদি দিই, কেমন করে ভুলবে ভবী তা'।  
না-ছোড়-বান্দা তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছি,  
এই জীবনের চলার পথে নিত্য হেরেছি।  
তোমরা যখন দাবী কর লেখার বিষয়ে  
তখন ভাবি এমন দাবী থাকবে কি সয়ে,  
কাব্যলক্ষী এলেন কবে গোপন-চারিণী,  
কবে আমি কবি হ'লাম বুঝতে পারিনি'।  
তোমরা সবাই ধ'রে কবি করলে আমাকে,  
ধরলে অনেক ভাল হতো রামা-আমাকে।  
যখন কলম ধরেছিলাম খেয়াল খুঁজিতে,  
কে জানতো সকল জনে পারব তুমিতে ?  
স্বীকার করুক নাতি করুক স্বজন জ্ঞাতিতে,  
যে করে' হোক পৌছে গেছি খানিক খ্যাতিতে।  
একটা বড় লাভ হয়েছে দেখছি খতিয়ে,  
হাজার কিশোর প্রসন্ন আশ্র আমার প্রতি হে।  
বাইরে থেকেও ঠর 'জীবন-খাতা' প্রকাশের সঙ্গে  
পড়বার আমার সুযোগ ঘটেছে। তা থেকেই  
কেন ঠর কবিতায় সাঁওতাল-জীবনের এত প্রভাব,  
দহ আমার বসাবরই ছিল।

কাজে লেখা পূর্ববর্ণিত ঠর পত্রে কলকাতা গেলে ঠর  
হরবার উনি আমন্ত্রণ জ্ঞানিয়েছিলেন। গত নভেম্বর মাসে  
কাতা ঘাট, সেই সময় একদিন ঠর সঙ্গে দেখা করবার  
। অনেক রাগি হয়ে বাতায় অর্ধেক রাত্তা থেকে ফিরে  
দিন সন্ধ্যা কাগজের স্তম্ভ থেকে জানলাম উনি  
আর কখনো ঠকে আর আমার দেখা হবে না।  
উনি চলে যাবেন এই কথাটা ভাবতেই পারিনি। আর  
কি করে, কী-ই বা এমন বয়েস হয়েছিল ঠর, মাত্র  
আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছে যেন একজন ছেলে-  
কুস্তানীর বন্ধু হারালুম। বাংলার অনেক কিশোর-  
মতই ছেলেবেলা থেকেই ঠকে ভালবেসেছি। আজও  
বলে নিজেকে শুধু সেদিনের আমার ভেতরেই দেখতে পাই,  
হ স্নানখল বসুর এই-ই পরিচয়।

## একে পাঁচ পাঁচে এক

[ হাস্য ক্রিষ্টিয়ান আণ্ডরসেনের রূপকথা ]

যে ছিলো মটরভাট।

মানে অল্প এক জন নয়, কারণ আসলে তারা ছিলো  
এক হ'লো গিয়ে খোশাটা, আর পাঁচ হ'লো ভিতরের  
খোশাটাও সবুজ, তারাও সবুজ, আর তাই তারা

ভাবতো সমস্ত পৃথিবীটাই বুরি সবুজ—ভাবটা অসম্ভবও ছিলো না।  
খোশাটা বাড়লো, বাড়লো তারাও—গোলগাল পাঁচ জন একসায়ে  
পাশাপাশি ব'সে। বাইরে যখন রোদ থাকে, খোশাটা তখন গরম  
হয়; বৃষ্টি পড়লে খোশাটা পরিষ্কার পাতলা হ'য়ে আসে। রোদ-  
মাখানো দিনহুপুরেও ভালো, ঘূটবুটে শিশুতি রাতেও ভালো; দিনে-  
দিনে তারা পাঁচ জন বড়ো হয়, আর বতোই বড়ো হয় ততোই তাদের  
ভাবনা ধরে, কিছু একটা করতে হবে তো, নইলে পৃথিবীতে জগদ  
হ'লো কেন ?

‘এখানেই চিরকাল ব'সে থাকবো নাকি আমরা ?’ সকলের মনের  
ভাবনা একদিন মুখ ফুটে প্রকাশ করলে এক জন। ব'সে থাকতে  
থাকতে শক্ত হ'য়ে গেলেই গেছি। বাইরে না জানি কতো কী  
হ'চ্ছে, একটু-একটু যেন টেরও পাচ্ছি ভিতরে ব'সে।’

মাস কেটে গেলো। হলদে হ'য়ে এলো তারা, হলদে হ'য়ে  
এলো তাদের পাতলা আবরণ।

‘সমস্ত পৃথিবী হলদে হ'য়ে যাচ্ছে’, একে অল্পকে ফিশ-ফিশ ক'রে  
বললে তারা; আর এমন কথা বলা তাদের পক্ষে অসম্ভবও ছিলো  
না।

আচমকা খোশার পড়লো একটান! কে যেন খোশাটা  
ছিঁড়ে নিলে, কার হাতের ভিতর দিয়ে যেন চ'লে গেলো, টুপ ক'রে  
পড়লো গিয়ে একটা জামার পকেটে, সেখানে আরো অনেক খোশার  
ঠেলাঠেলি ভিড়।

‘এখন আমাদের খুব ব'—একথা ভাবতেই খুব কুটি হ'লো  
তাদের মনে—এতো দিন তো এরই জগদ পথ চেয়ে আর কাল গুণে  
ব'সে ছিলো তারা।

পাঁচ জনের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোটো, সে বললে, ‘দেখা যাক  
আমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে দূরে যায়।’

যে ছিলো সবচেয়ে বড়ো, সে কেবল বললে, ‘বা হবার তাই হবে।’  
তার পর আচমকা শব্দ ক'রে ফাটলো খোশা, পাঁচ জনে তারা  
গড়িয়ে বেরিয়ে এলো রোদের ঝলমলানিতে, এসে দেখলো ছোট নরম  
একটি হাতে তারা শুয়ে—ছোটো একটি ছেলে তাদের হাতের  
মুঠায় ধ'রে আছে।

‘বাঃ, কী মজা !’ ছেলেটি বলে উঠলো। ‘এগুলো দিয়ে  
আমার গুলতির চমৎকার গুলী হবে।’ এই কথা ব'লে এক জনকে  
সে গুলতির ছিলায় উপর রাখলো, তার পর কান পন্থ টেনে দিলে  
ছুঁড়ে।

‘চললুম আমি এই বিরাট পৃথিবীতে উড়ে। জাখো, আমাকে  
ধরতে পারো কি না !’ এই ব'লে সে চ'লে গেলো।

আরেক জন বললে, ‘একেবারে ঠিক স্থানের বুকুর মধ্যে গিয়ে  
লাগবো। ঠিক আমার মনের মতো জায়গা’—ব'লে সে হাওয়া  
হ'য়ে গেলো।

‘যেখানেই গিয়ে পড়িনে কেন, খুব এক চোট ঘুমিয়ে নেবো  
প্রথমে, তার পর গড়াবো মনের সুখে’,—বললে এর পরেই দু'জন।  
গড়ালো বটে তারা, খুব ক'রে গড়িয়ে নিলে ছিলেয় লাগাবার  
আগেই, কিন্তু ছেলেটি তাদের তুলে নিয়ে আবার ছুঁড়ে মারলে।  
বেতে-বেতে তারা বললে, ‘আমরা যাবো সবচেয়ে দূরে।’

‘বা হবার তাই হবে’,—বললে শেষের জন। গুলতি থেকে

দৌলদার উপভোগ আমার রক্তে রক্তে। বেশ মনে পড়ে বর্ষার সময়  
ঝম ঝম বৃষ্টি পড়তো। আর রাস্তার ধুল একটা নালা বেয়ে হুড় হুড়  
করে নেবে আসতো। আমাদের বাসার সামনের একটা ডোবা।  
খুস ছুটি থাকলে আমাদের বাইরের ঘরে একাকী বসে পড়তুম  
সুনিখিল বন্দর 'আবার শুরু যুক যুক', আর কাবোর ছন্দে ছন্দে  
বৃষ্টি টন টন করে উঠত সেই ছেলেবেলা।

সুনিখিল বন্দর যদিও ছড়াকার বলেই সমধিক প্রসিদ্ধ কিন্তু  
আমলে ছিল ওর ভিতরে একটি স্তম্ভ কবি, একটি সত্যিকারের  
কবি, বার বার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ছোট ছোট কবিতায়।  
ওর সাঁওতালপল্লী, সাঁওতাল পরিবেশ, সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে নিয়ে  
যে সব কবিতা আছে তা গারাই পড়েছেন তাঁরাই জানেন। মাস বা  
ঋতুর কবিতা তো আগেই উল্লেখ করেছি। 'মাস-পরমা'র চেহারা  
তগন ও খুব ছোট, সেই ছোট মাস পরমা 'অন্তরী' বলে ওর একটি  
ছোট কবিতা মনে পড়ে। সেই দিন বুকেছিলুম উনি কত বড় কবি।  
কবিতাটি ছিল বোধ হয় আট দশ পংক্তি, তার পাঁচটি পংক্তি মাত্র  
আজ মনে আছে কিন্তু তাঁর কবিচিহ্ন বিচারে তাই যথেষ্ট—

—অন্তরী ফুটেছে বন-কাণায়,

যৌজ রাখে তার কোন জনায়।

... ..

হু'লে হু'লে যারা নিরালাতে

... ..

তার পর একদিন কবি এসে বলল,—

“ওরে ও অন্তরী মোহে জাঁখি,

আমি কবি তোর যৌজ রাখি।”

সন্দেশ উঠে যাবার পর সুনিখিল বন্দকে আমি দেখি ক্ষিণী  
ভাটগাঘাট মাস-পরমার সঙ্গে। ছোট ও বড় মাস পরমা উনি  
অনেক কবিতা, ছড়া ও ছোটদের নাটক লিখেছিলেন। নাটক মনে  
পড়ে 'কিপটে ঠাকুরা', কবিতা 'অন্তরী' ও 'সাঁওতালরা, ছড়া  
'সামরান', 'অটল বাবুর পটল তোলা', 'কথক ঠাকুর মশায়ের দাড়ি  
নাড়া দেখে রাম ছাগলের কথা মনে পড়া', 'কাছায় বাঁধা নেটে ইঁদুর',  
'হুলা পালের ছেলে ভুলস সলাই তাহার ভুলটি, কালনা  
বেতে বললে তারে হাজির হবে কুলটি', 'শেঠজীকে কুকুরে তাড়া  
করা'—

—প্রবাদ জানে তুমি আমি কুন্তাতো আর তা' জানে না।

বাবুতে রিক্সা করে ঠানঠানের কাছে বাড়ী ফিরতে, রিক্সাওয়ালা বাবুকে  
একেবারে নৈহাটিতে নিয়ে গিয়ে হাজির করা—

ঠানঠানায় ঠান ঠানিয়ে, রিক্সাওয়ালা আমায় নিয়ে চলতেছিল

হু'ল হু'লিয়ে।

শ্রীতের রাত, গায়ের কাপড়টা একটু ভাল করে জড়িয়ে আরাম করে  
বসেছি, একটু ঘুমেরও চুল এসেছে, তার পর কতক্ষণ কেটে গেছে টের  
পাইনি হঠাৎ দেখি যে, একি! গঙ্গার ধারে সব বড় বড় ডাঙ পুথ  
আকাশে শ্রুতি উঁকি মারছে, কি বাপার। হাঁ হাঁ করে রিক্সাওয়ালাকে  
ধামাতেই সে বলল—কতর হ্যা ভুল হ্যা কুছ কাল রাতমে আকি  
শিয়া। কাজেই—

শ্রীতের রাত শ্রুতি কবে পৌছাব ভাই কই বাটতে,

তা না হয়ে একেবারে পৌছে গেলুম নৈহাটিতে।

মাস পরমার যুগেই নিজের কৈশোর কাটিয়ে উঠেছি, তার পর  
১৯৩৩ সালে জীবিকার প্রয়োজনে বিদেশে যেতে হয়েছে, তাই  
সেই সময়ের পর থেকে সুনিখিল বন্দর কাব্যকলাপের সঙ্গে আর  
বিশেষ সাংযোগের অবকাশ ঘটেনি, তবু সখ্য যে একেবারে শেষ হয়ে  
যায়নি বিদেশে থেকেও বার বার তা টের পেয়েছি। অধুনা প্রকাশিত  
শিশু সাহিত্য পরিষদের 'ছড়ার ছবিও' আমার হাতে এসেছে। জীবন  
চক্রের ও একটা অতি তুচ্ছ ঘটনা কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এ যেন  
ভাগ্যের খেলা, সুনিখিল বন্দর সখ্যকে আমাকে একদিন লিখতে হবে  
বলে সে আমাকে যেন আগে থেকেই প্রস্তুত করছিল। ঐ ছড়ার  
ছবিতে ওর সে অবদান—

মাসের মাথার টাক ছিল

সেই টাকে তেল মাখছিল

বা

ধাকিয়ে দিয়ে ট্যান্ডি কাল

আসছিল এক খ্যাক-শিয়াল

এ সব ছড়াগুলো মনে হয় বাংলায় চিরদিনের ছড়ার ভেতরেই  
কালে স্থান পাবে।

১৯৪০ সালে একবার কলকাতা যাই, তখন একদিন বর্ডমান  
বন্দরী বায়োথোপ ঘরের কাছাকাছি জায়গায় রসারোডের উপরে  
ছোট এক রেস্টোরাঁতে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় সুনিখিল বন্দর এক  
বন্ধুকে নিয়ে সেখানে এলেন, এবং আর কোন টেবলে জায়গা না  
থাকতে ওরা দু'জনে আমারই দ্বায়ে বসলেন। বসেই বন্ধু হাত  
এগিয়ে দিলেন আর সুনিখিল বন্দর দেখতে লাগলেন তা'। কেউ হাত  
দেখতে থাকলেই, যদি গম্বা দিতে না হয়, নিজের ডব্বিবাংটাও একটু  
হাতড়ে দেখতে চাওয়া মানুষের এক চিরন্তন দুর্বলতা। কাজেই  
আমিও সেই মুহূর্তে ভিড়ে পড়েছিলুম ওদের দলে। কথা হতে পারে  
যে উনিই যে সুনিখিল বন্দর আমি তা' জানলুম কি করে তা' হলে  
বলব বড় ক্ষেত্রে বহু অবস্থায় ওর ছবি আমার দেখা ছিল। অনেক  
দিন ধরে সম্প্রতি আমার রচনা শিশু সাময়িক প্রকাশিত হবার  
পর উনি আমার কয়েকটি ভুল শুধরে কাগজে পত্র দেন।  
সেই ব্যাপারকে অবলম্বন করে, ওর সঙ্গে আমার দু'খানি পত্র  
বিনিময় হয়। তাতে ঐ কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ার উনি  
আমাকে লেখেন যে, হাঁ, এক সময় ওর হাত দেখা চর্চায় যৌক  
হয়েছিল।

ওর সঙ্গে সেই কয়েক মিনিটের মাত্র দেখা, আর কখনো দেখা  
হয়নি। তবু এই অপরিচয়ের বন্ধক সত্ত্বেও ওর নানা লেখা ও নানা  
বিবৃতির মধ্য দিয়ে ওর চরিত্রের একটা বিশেষ বার বার আমাকে  
অভিজ্ঞত করেছে তা' ওর মধুর বিনয়। জীবন-খাতার ভূমিকায় উনি  
বলেছেন—

“আমার আত্মকথা পড়ে কার কি উপকার হবে জানি না।

কোন দিনই ভাবি নাই আমার আত্মচরিত লিখতে হবে, কোন দিন  
ইচ্ছাও ছিল না বরং আপত্তিই ছিল বরাবর।”

তারপর তিনি ত অপকর্ণের লাভালাভের দাবি দিয়েছেন  
প্রকাশকে বিনির্ভায়ে তাড়না দিয়ে এ কাজ করিয়েছেন। প্রায়  
পনেরো বৎসর আগে উনি একটি কবিতা দিয়েছিলেন বাংলার  
কয়েকটি তত্ত্বগত তত্ত্বগী সাহিত্যিকদের, ওরা বাংলায় বর্ডমান ও বিগত

কবিদের কবিতার কয়েকটি সঙ্কলন প্রকাশ কর্তে চেয়েছিল। এই কবিতাটি হয়তো বাংলার যথেষ্ট পাঠকের চোখে এখনও পড়েনি, তাই তা' এখানে সম্পূর্ণ ভুলে দিলাম :—

ছোট কবিতা

আমার কাছে চাইলে তুমি ছোট কবিতা,  
না যদি দিচ্, কেমন করে ভুলবে ভাবী তা'।  
না-ছোট-বান্দা তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছি,  
এই জীবনের চলার পথে নিত্য তেরেছি।  
তোমরা যখন দাবী কর লেখার বিষয়ে  
তখন ভাবি এমন দাবী থাকবে কি সয়ে,  
ফাযলশাহী এলেন কবে গোপন-চারিগী,  
কবে আমি কবি হ'লাম বুঝতে পারিনি'।  
তোমরা সবাই ধ'রে কবি করলে আমাকে,  
ধরলে অনেক ভাল হতো রামা-স্তামাকে।  
যখন কলম ধরছিলাম খেয়াল খুশীতে,  
কে জানতো সকল জনে পারব তুঘিতে ?  
স্বীকার করুক নাহি করুক স্বজন জ্ঞাতিতে,  
যে করে' হোক পৌছে গেছি খানিক খ্যাতিতে।  
একটা বড় লাভ হয়েছে দেখছি খতিয়ে,  
হাজার কিশোর প্রসন্ন আজ আমার প্রতি হে।

বাংলার বাইরে থেকেও ঔর 'জীবন-খাতা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা' পড়বার আমার সুযোগ ঘটেছে। তা থেকেই টের পাই কেন ঔর কবিতায় সাঁওতাল-জীবনের এত প্রভাব, যদিও ও সন্দেহ আমার বরাবরই ছিল।

আমার কাছে লেখা পূর্ববর্ণিত ঔর পত্র কলকাতা গেলে ঔর সঙ্গে দেখা করবার উনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। গত নভেম্বর মাসে একবার কলকাতা বাই, সেই সময় একদিন ঔর সঙ্গে দেখা করবার জন্ত বেরিয়ে অনেক রাত্রি হয়ে বাতায় অর্দ্ধেক রাত্তা থেকে ফিরে আসি। সেদিন সন্ধ্যা কাগজের স্তম্ভ থেকে জানলাম উনি পরলোকে। আর কখনো ঔকে আর আমার দেখা হবে না। এত শীঘ্র যে উনি চলে যাবেন এই কথাটা ভাবতেই পারিনি। আর ভাববই বা কি করে, কী-ই বা এমন বয়স হয়েছিল ঔর, মাত্র ছায়ায় ত'। আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছে যেন একজন ছেলে-বেলার গুরুস্থানীয় বন্ধু হারালুম। বাংলার অনেক কিশোর-কিশোরীর মতই ছেলেবেলা থেকেই ঔকে ভালবেসেছি। আজও ঔর কথা ভাবলে নিজেকে শুধু সেদিনের আমার ভেতরেই দেখতে পাই, আমার কাছে স্মৃতিশীল বস্তুর এই-ই পরিচয়।

## একে পাঁচ পাঁচে এক

[ হাল্ফ ক্রিশ্চিয়ান আওরসেনের রূপকথা ]

এক যে ছিলো মটরভট্টি।

এক মানে অবশ্য এক জন নয়, কারণ আসলে তারা ছিলো পাঁচ জন। এক হলো গিয়ে খোশাটা, আর পাঁচ হলো ভিতরের মটরভট্টি। খোশাটাও সবুজ, তারাও সবুজ, আর তাই তারা

ভাবতো সমস্ত পৃথিবীটাই বুকি সবুজ—ভাবটা অসম্ভবও ছিলো না। খোশাটা বাড়লো, বাড়লো তারাও—গোলগাল পাঁচ জন একসায়ে পাখাপাখি ব'সে। বাইরে যখন রোদ থাকে, খোশাটা তখন গরম হয়; বুকি পড়লে খোশাটা পরিষ্কার পাখলা হ'য়ে আসে। রোদ মাঝানো দিনদুপুরেও ভালো, ঘটঘটে শিশুটি রাতেও ভালো; দিনে দিনে তারা পাঁচ জন বড়ো হয়, আর যতোই বড়ো হয় ততোই তাদের ভাবনা ধরে, কিছু একটা করতে হবে তো, নইলে পৃথিবীতে জন্ম হ'লো কেন ?

'এখানেই চিরকাল ব'সে থাকবো নাকি আমরা ?' সকলের মনের ভাবনা একদিন মুখ ফুটে প্রকাশ করলে এক জন। ব'সে থাকতে থাকতে শক্ত হ'য়ে গেলেই গেছি। বাইরে না জানি কতো কী হ'চ্ছে, একটু-একটু যেন টেরও পাচ্ছি ভিতরে ব'সে।'

মাস কেটে গেলো। হলদে হ'য়ে এলো তারা, হলদে হ'য়ে এলো তাদের পাখলা আবরণ।

'সমস্ত পৃথিবী হলদে হ'য়ে যাচ্ছে', একে অল্পকে ফিশ-ফিশ ক'রে বললে তারা; আর এমন কথা বলা তাদের পক্ষে অসম্ভবও ছিলো না।

আচমকা খোশার পড়লো একটান! কে যেন খোশাটা ছিঁড়ে নিলে, কার হাতের ভিতর দিয়ে যেন চলে গেলো, টুপ ক'রে পড়লো গিয়ে একটা জামার পকেটে, সেখানে আরো অনেক খোশার ঠেলাঠেলি ভিড়।

'এখন আমাদের খুববে'—একথা ভাবতেই খুব ফুটি হ'লো তাদের মনে—এতো দিন তো এরই জন্ত পথ চেয়ে আর কাল শুণে ব'সে ছিলো তারা।

পাঁচ জনের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোটো, সে বললে, 'দেখা থাক আমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে দূরে যায়।'

যে ছিলো সবচেয়ে বড়ো, সে কেবল বললে, 'যা হবার তাই হবে।' তার পর আচমকা শব্দ ক'রে ফাটলো খোশা, পাঁচ জনে তারা গড়িয়ে বেরিয়ে এলো রোদের বলমলানিতে, এসে দেখলো ছোট নরম একটি হাতে তারা শুয়ে—ছোটো একটি ছেলে তাদের হাতের মুঠোয় ধ'রে আছে।

'বাঃ, কী মজা!' ছেলেটি ব'লে উঠলো। 'এগুলো দিয়ে আমার গুলতির চমৎকার গুলী হবে।' এই কথা ব'লে এক জনকে সে গুলতির ছিলায় উপর রাখলো, তার পর কান পঞ্চ টেনে নিলে ছুঁড়ে।

'চললুম আমি এই বিরাট পৃথিবীতে উড়ে। জাখো, আমাকে ধরতে পারো কি না!' এই ব'লে সে চ'লে গেলো।

আরেক জন বললে, 'একেবারে ঠিক সূর্যের বুকুর মধ্যে গিয়ে লাগবো। ঠিক আমার মনের মতো জায়গা'—বলে সে হাতেরা হ'য়ে গেলো।

'যেখানেই গিয়ে পড়িনে কেন, খুব এক চোট ঘুমিয়ে নেবো প্রথমে, তার পর গড়াবো মনের স্রুখে,'—বললে এর পরেই দু'জন। গড়ালো বটে তারা, খুব ক'রে গড়িয়ে নিলে ছিলো লাগাবার আগেই, কিন্তু ছেলেটি তাদের ভুলে নিয়ে আবার ছুঁড়ে মারলে। যেতে-যেতে তারা বললে, 'আমরা বাবো সবচেয়ে দূরে।'

'যা হবার তাই হবে,'—বললে শেষের জন। গুলতি থেকে

বেয়িরে সে ছুটলো, ছুটে গিরে লাগলো একটা। কুঁড়েঘরের জানলার কপাটে।

এদিকে হয়েছে কী, সেই কপাটে ছিলো একটা ফুটো, আর সেই ফুটো নরম কাদা আর ঘাস দিয়ে আটকানো। এতো জোরে ছুটে এসে সে একেবারে আটকে গেলো সেখানটায়—নড়াচড়া একেবারে ‘নট কিচ্ছু’ হ’য়ে গেলো—না পায়ে নড়তে, না পায়ে চড়তে। তবু কিন্তু একটুও ঘাবড়ালে না সে, মনে-মনে আবার বললে, ‘বা হবার তাই হবে।’

ঘরের ভিতরে থাকে এক কাঠকুড়নি। ভয়ানক গরবি। বনে ঘুরে-ঘুরে সে কাঠ কুড়ায়, শুকনো পাতা কুড়ায়; লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বাসন মাজে, কুয়ো থেকে জল তোলে। শরীরে তার শক্তি অনেক, কাজও সে সারা দিনই করে, কিন্তু তবু তার হুঃখ ঘুর হয় না। ঘরে তার আপন বলতে আছে কেবল ছোটো, একরত্তি এক মেরে; অন্যথ্যে ভুগে-ভুগে তার একেবারে মরণদশা। পুরো এক বছর সে মড়ার মতো অসাড় বিছানায় শুয়ে আছে—এখন তার এমন অবস্থা যেন সে বাঁচবেও না মরবেও না, কেবলি ভোগাবে মাকে। কাঠকুড়নি মনে-মনে ভাবে,—‘ও বুঝি চললো ওর ছোট বোনটিরই কাছে। ছুটি মাত্র মেয়ে ছিলো আমার, তাদের খাওয়ানো-পরানো কম কষ্ট নয়। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই একজনকে বাঁচিয়ে রাখেন, টেনে নিনেন তাঁর কোলে। আরেক জনকে আমি তো চাই আমার কাছেই রাখতে, কিন্তু ওগা হু-বোন বুঝি আর আলিলা থাকবে না।

কিন্তু, কই, তবু তো মরলো না মেয়ে,—অমনি মরো-মরো হ’য়েই শুয়ে থাকলো বিছানায়, নিজেও ভুগতে থাকলো, মাকেও ভোগালো কেবল।

সমস্ত দিন সে চূপ ক’রে নিঃশ্বাসের মতো বিছানায় শুয়ে থাকে,—আর তার মা ঘোরে বাইরে-বাইরে, কাঠ কুড়ায়, পাতা কুড়ায়, জল তোলে, বাসন মাজে। তখন শীত শেষ হ’য়ে বসন্ত এসেছে; ভোর-বেলায় তার মা বধন কাজে বেরিয়ে যায়, বোদের সোনালি রঙ জানলা দিয়ে ঢোকো হ’য়ে মোকতে এসে পড়ে: ‘মেয়েটি চূপ ক’রে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে।

‘জানলার কপাটে ঐ ছোট, সবুজ গুটা কী, মা? ঐ যে, হাওয়ার নড়ছে?’

মা জানলার ধারে এগিয়ে এসে দেখলো। ‘আরে তাই তো! কী অবাক কাণ্ড! ছোটো একটা মটরশুটি যে, এখানেই শিকড় গজিয়েছে দেখছি, পাতাও গজিয়েছে দু-একটা। এই ফাটলের মধ্যে কী ক’রে ও এলো? এই তো তোমার ছোটো বাগান, মিঠুয়া ব’সে-ব’সে তাকিয়ে থাকো।’ ব’লে মা মিঠুয়ার বিছানা জানলার আরো কাছে টেনে আনলো। মা কাজে বেরিয়ে যায় তার পর, আর মিঠুয়া শুয়ে শুয়ে জাখে, মটরশুটিটা কেমন স্নানর বেড়ে উঠছে আশ্চর্য-আশ্চর্য।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় মিঠুয়া বললে, ‘মা-মণি, আমার কেবলি মনে হ’চ্ছে আমি ভালো হ’য়ে উঠবো। আজকের রোদটা বড়ো স্নানর লাগলো। আর, দেখেছো ঐ মটরশুটির কাণ্ড—কী চমৎকার বাড়ছে। আমিও অমনি হবো, মা, আমিও সেরে উঠে বাইরে বেড়াবো এই সোনালি রোদে।’

‘তা-ই যেন হয়, মিঠু, তা-ই যেন হয়।’

যুখে মা ও-কথা বললো বটে, কিন্তু মনে-মনে সে জানে যে তার মিঠুমণি আর বাঁচবে না। তবু সে কপাটের সঙ্গে একটা কাঠি বেধে দিল; বাড়ন্ত মটরশুটি লতানো সবুজ ডগা কাঠটুকু বেয়ে উঠতে পারবে। ও যেন হাওয়ার দাপটে ছিঁড়ে না পড়ে—ওকে দেখেই তো মিঠুমণি বাঁচবার কথা ভাবতে শিখেছে।

কী আশ্চর্য! মটরশুটির সেই ছোটো সবুজ লতা সত্যি-সত্যি কাঠি বেয়ে উঠলো, উঠলো উপরে, বাড়লো আশ্চর্য-আশ্চর্য, বাড়লো নতুন শাখার আনন্দে; রোজই সে একটু-একটু ক’রে বাড়ছে।

‘আরে, ফুলও যে ফুটেছে একটা!’ কাঠকুড়নি হঠাৎ একদিন বলে উঠলো। তখন থেকে তার মনে আশা হ’লো, মিঠুয়া হয়তো সত্যি-সত্যি ভালো হ’য়ে উঠবে। কদিন থেকে মিঠুয়া বেশ ভালোই আছে তো! দিবা কথাবার্তা বলে, আগের চেয়ে অনেক বেশি হাসিখুশি। কাল একবার উঠেও বসেছিলো, ব’সে-ব’সে তার ছোটো বাগানের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, সে বাগানে একটিমাত্র ছোটো চারি গাছ, এই সবুজ মটরশুটি লতা।

কয়েক দিন পরেই মিঠুয়া দস্তুরমতো এক ঘণ্টা উঠে ব’সে রইলো। বড়ো ভালো লাগলো তার রোদে পিঠ দিয়ে ব’সে থাকতে। জানলার ফুটেছে মটরশুটির যিক-বেগুনি ফুল।

মিঠুয়া মুখ বাড়িয়ে কচিকচি নরম পাতাগুলোকে চুমু খেলো। দিনটা তার মনে হলো যেন উৎসবের রঙে ছোপানো।

মা আর খুশি চাপতে না পারে ব’লে উঠলো, ‘স্বর্গের দেবতাই এই মটরশুটিকে পাঠিয়েছেন আমাদের ঘরে, তিনিই ফুটিয়েছেন এই ফুল, যাতে তুই খুশি হোস, আর তোর খুশিতে যাতে আমিও খুশি হই—ব’লে সে হাসলো বেগুনি ফুলের দিয়ে তাকিয়ে, যেন সে-ফুল স্বর্গের কোনো দেবদূত।

কিন্তু আর চার জন? তাদের খবর কী?—তবে শোনো। যে বিপুল পৃথিবীতে উড়ে চলে গিয়ে বলেছিলো, ‘জাখো আমাকে ধরতে পারো কিনা!’ সে গিয়ে পড়লো এক বাড়ির ছাতে, সেখানে পায়বাদের দানা শুকোতে দেওয়া হয়েছিলো, পড়বি তো পড় তারই মধ্যে। তার পর আর কি—পায়বায় পেটে। যে দু’জন কুড়মি ক’রে ঘূমোতে চেয়েছিলো, তাদের কবুতরেই খেয়ে ফেললো—তবু তো বা-হোক একটা কাজে লাগলো। কিন্তু তার পরের জন, যে চেয়েছিলো সূর্যের বৃকে গিরে লাগতে,—সে পড়লো গিয়ে এক নোংরা নরদমায়। অনেক দিন সে শুয়ে রইলো সেই নোংরা জলে, আর কেবলি ফুলতে থাকলো। আর, মনে মনে বললো, ‘কী স্নানর মোটা হচ্ছি আমি। শেষটার একদিন ফেটেই যাবো—কিন্তু মটরশুটির পক্ষে তো ফেটে বাওয়াটাই সবচেয়ে গৌরবের। পাঁচ জনের মধ্যে আমিই হচ্ছি শ্রেষ্ঠ।’ শুনে নরদমা বললে, ‘ঠিক কথা।’

এদিকে কুঁড়ে ঘরের জানলার তখন মিঠুয়া ঝাঁড়িয়ে, চোখে তার অশ্রুধারা আলো, গালে স্বাচ্ছন্দ্য উপচেপড়া লালিমা। পাতলা দু হাত দিয়ে মটরশুটির ফুলকে আদর করছে সে; আর বলছে, ‘দেবতার অনেক দয়া যে, তুই ফুটেছিলি।’

‘শ্রেষ্ঠ মটরশুটি, তুমি যে আমায়ই!’ নরদমা বললে।

অনুবাদক—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

## আমাদের ৬৫০০ লোকের প্রাচেষ্টা...



## শুধু আপনাদেরই জন্যে



হিন্দুস্থান লিভারি আমরা যে ৬৫০০ লোক কাজ করছি তাদের প্রত্যেকের সামনেই একটি আদর্শ রয়েছে। একথা ঠিকই যে আমরা সাবান, প্রসাধনদ্রব্য, বনস্পতি ইত্যাদি তৈরী করি, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। আমরা সদাসর্বদা সচেতন যেন এই সমস্ত জিনিষের গুণাগুণের কোন তারতম্য কখনও না ঘটে—আমরা যেন ভারতবর্ষের অসংখ্য পরিবারের বিশ্বাস অর্জন করতে পারি। আমরা চাই আপনারা আমাদের জাহুন, বিশ্বাস করুন এবং আমাদের তৈরী জিনিষপত্র ব্যবহার করুন। এই আমাদের আদর্শ।

প্রায় আশি বছর ধরে আমরা আপনার প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে এসেছি। উৎপাদন ক্ষেত্রে আমরা করেছি নিত্য নতুন প্রচেষ্টা। আমাদের মার্কেট রিসার্চ বিভাগের কন্ট্রোল হল, আপনার পছন্দ অপছন্দ, মতামত ও বিশ্বাস আপনার বৈদগ্ধ্য জীবনের অভ্যাস চাহিদা ইত্যাদির সঙ্গে যোগ রাখা এবং এই তপস্বীর ফলাফলের ওপর নির্ভর করে আমাদের উৎপাদন বিভাগ

অগ্রসর হয়। আমাদের কোরাণিটি কর্টেজ বিভাগ আমাদের প্রত্যেকটি জিনিষের ওপর (কাচা মাল অবশ্য থেকে তৈরী হওয়া পর্যন্ত) কঠিন পরীক্ষা চালান এবং নিঃসন্দেহ হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিষ বাজারে ছাড়া হয় না। আমাদের ভালভা এ্যান্ডভাইসারি সার্ভিস এবং ওয়াশিং ইনস্ট্রুমেন্ট সার্ভিস এই জিনিষগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে আপনাকে মূল্যবান উপদেশ দেন।

এই জিনিষগুলি কি? সানলাইট সাবান...লাইকবর...লাক্স...রেক্সানা...গিবস্ এন্ড, আর, টুথপেস্ট...ডালডা বনস্পতি সবই আপনার জানা শুনা নাম—আপনার বৈদগ্ধ্য জীবনের নিত্য সঙ্গী। আপনার প্রত্যেকদিন ঘর গেরস্থালীর কাজে আমাদের জিনিষগুলিই বেছে নিচ্ছেন এ আমাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু আমরা উপলব্ধি করি যে বিশ্বাস আমরা অর্জন করেছি সে বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের এবং তা আমরা করতে পারি একমাত্র আপনারদের স্বেচ্ছা জিনিষ দিয়ে—আপনাদের অর্থাৎ ক্ষেত্রদের স্বার্থকে করে।

দশের সেবায়



হিন্দুস্থান লিভার



## পঞ্চধর মিশ্র

নটীলাস একাদিক্রমে প্রায় ৬৬ দিন ভ্রমণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নৌবিভাগের পরমাণুশক্তি চালিত সাবমেরিন নটীলাসের কথা পাঠকদের কাছে আমি আগেই পরিবেশন করেছি। সে এবার ৬৬ দিন একাদিক্রমে সমুদ্রতলে বিচরণ করে জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষের দৌড়ে বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করলো। এর আগে মানুষের সৃষ্ট কোন যন্ত্রণানী একাদিক্রমে ৬৬ দিন চলবার ক্ষমতা সংগ্রহ করতে পারে নি। নটীলাসের সাফল্য, আগামী ভবিষ্যতে পরমাণুশক্তি চালিত যন্ত্রণান-সমূহের অসাধারণ উন্নতির এক মহা সম্ভাবনাপূর্ণ উদাহরণ স্থাপন করলো।

গভীর সমুদ্রে জলের চাপ এবং অন্তরীক বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে একাদিক্রমে প্রায় ১৬০০ ঘণ্টা অবস্থান করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। ইউরেনিয়াম জ্বালানী ভর্তি করা হয়েছিল মাত্র একবার, এবং এই ১৬০০ ঘণ্টার ঐ জ্বালানীর খুব সামান্য অংশই খরচ হয়েছিল। ১৬০০ ঘণ্টা চলবার জন্য ইউরেনিয়াম জ্বালানীর পরিবর্তে তেল ব্যবহার করা হলে ঐ সাবমেরিনটিতে লাগতো ১৬ লক্ষ গ্যালন তেল—যা রেল-লাইনের উপর দিয়ে বহন করতে প্রায় ১ মাইল লম্বা স্থান ছুড়ে তৈলবাহী ট্যাঙ্ক সাজাতে হতো। নটীলাস কিন্তু তার ভ্রমণে খুব কম পরিমাণ জ্বালানী খরচ করেছে, এখনও মজুদ জ্বালানীর সাহায্যে আরও বহু হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ করতে পারে। যাত্রা তার সুক্ক হয়েছিল নিউ লণ্ডনের সাবমেরিন ঘাঁটি থেকে, তারপর কেপ হর্ন, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার তুলসাগকে পরিভ্রমণ করে নিউ লণ্ডনেই ফিরে এসে আরার ব্যাপকভাবে সে উত্তরমেরু পরিভ্রমণে যাত্রা করে। নটীলাসের পরমাণু শক্তি-চালিত ইঞ্জিনটি গুয়েলিং হাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের বিজ্ঞানবিশ্ব পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেছিলেন। সমুদ্রতলেও তারা এর কার্যকলাপের উপর নজর রেখে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন।

স্থল-কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং ছোট ছোট শিল্প ও চিকিৎসা দৃষ্টান্ত পরীক্ষাগারে সাধারণ কাল্পনিকের জন্য 'আটমিকস ইন্টারন্যাশনাল' এক ধরনের ছোট ছোট স্বল্পমূল্যের 'রি-অ্যাক্টার' নির্মাণ করেছেন। 'পরীক্ষাগারের রি-অ্যাক্টার' নামক এই সরঞ্জামটি মাত্র ৮ ফুট লম্বা এবং এর ব্যাসও ৮ ফুট। অতিরিজ্ঞ কোন সংযোজন না করেও এটি যে কোন স্থলবাহী অথবা পরীক্ষাগারে স্থাপন করা যাবে। সম্পূর্ণ নির্মাণ করে কার্যকরী অবস্থার একে বসিয়ে দিতে খরচ পড়ে মাত্র আড়াই লক্ষ টাকা এবং সময় লাগে ৬ মাস।

নিখাদকর্তারা আশা করেন, এই রি-অ্যাক্টারের সহায়তায় ছোট ছোট পরীক্ষাগারে শিল্পবিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত নানাপ্রকার পরীক্ষা সহজে করা যাবে। এই সরল রি-অ্যাক্টারটি সাধারণ মানুষেরও পরমাণু শক্তি বিষয়ক নানা প্রশ্নের কৌতূহল মেটাতে সাহায্য করবে। পাঠকেরা হয়তো স্থলের জন্য এই আটমিক রি-অ্যাক্টারের ব্যবহারের কথা শুনে অবাক হয়ে বাচ্ছেন। খুবই স্বাভাবিক, আমাদের দেশে স্থলের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করে আটমিক রি-অ্যাক্টার ক্রয় করার চিন্তা অবাঞ্ছনীয় এবং অস্বাভাবিক মনে হতে পারে কিন্তু অনেক সম্পদশালী এবং ক্ষমতাশালী দেশের কর্তৃপক্ষই পরমাণু শক্তির যুগে প্রতিটি মানুষকে এই শক্তির বহুতর সঙ্গে হাতে-কলমে পরীক্ষামূলক ভাবে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। স্মরণ্য মনে হয়, বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে এবং পরীক্ষাগারে এই সহজলভ্য আটমিক রি-অ্যাক্টারটি যথেষ্ট সমাদর পাবে।

রি-অ্যাক্টারটির অন্তর্দেশে তেজস্ক্রিয় রশ্মিবিচ্ছুরণের জন্য একটি গোলাকার ইম্পাতের আধারে প্রায় ৪ গ্যালন জলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় পরিশোধিত ইউরানিয়াম সালফেট রাখা থাকে। মডিফাইড ইম্পাতের এই গোলাকার আধারটি প্রায় ৬ ইঞ্চি মোটা সীসার পাত দিয়ে আবৃত করে জলে ভরা একটা আট ফুট চৌবাচ্চার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। এই আট ফুট চৌবাচ্চাটাই মোটামুটি বাইরের আবরণ, তাই স্থান খুবই কম লাগে। রি-অ্যাক্টারটি মাত্র একজন লোকের পক্ষেই চালান সম্ভব। আটমিক ইন্টারন্যাশনালের হস্তবিভাগের বিক্রয়-অধিকর্তা ডাঃ মার্টিনের মতে, এই ছোট রি-অ্যাক্টারটির আবিষ্কার শিল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করবে।

আপনারা বর্ধাকালে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য রেশ কোট ব্যবহার করেন। সম্প্রতি ভার্জিনিয়ার কোট রেলওয়ের সৈন্য বিভাগের যন্ত্রবিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে এক বকম নতুন ধরনের রাসায়ন দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সাহায্যে রেশ কোট এবং বৃষ্টিনিরোধ বস্ত্রাদির জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, এই রাসায়ন দ্রব্য তাদের তাঁবু, বাসির বস্তা, বর্ধাতি, ইত্যাদি নানা প্রকার অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিকে বৃষ্টি, উত্তাপ এবং আর্দ্রতা থেকে বহুকাল রক্ষা করবে। গবেষণাগারে দেখা গিয়েছে, বালির বস্তা সাধারণ ভাবে অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং আর্দ্র স্থানে ব্যবহার করলে মাত্র তিন চার সপ্তাহের মধ্যেই পচে ছিঁড়ে যায়, ছত্রক নিবারণ কোন রাসায়ন দ্রব্য ব্যবহার করলে প্রায় ১ বছর এগুলি নষ্ট হয় না কিন্তু জলনিরোধ নবাবিকৃত এই রাসায়ন দ্রব্য এদের জীবনী শক্তি আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। এই বস্ত্রটি ব্যবহার করার আরেকটি সুবিধা আছে, ছত্রক নিবারণ রাসায়ন দ্রব্যাদির পরিমাণ অনেক কম দিলেও কাজ চলে যায়, ফলে খরচ অনেক কম পড়ে। খরচের কথাই কেবল মাত্র চিন্তা করলে চলবে কেন, ছত্রক নিবারণ রাসায়ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে আমাদের যৌগিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। তামা অত্যন্ত মূল্যবান মৌলিক পদার্থ, কোন দিন আমাদের সরবরাহ কম হওয়ার ভয় জাতীয় স্বার্থরক্ষার্থে এর ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ ঘটিতে পারে, তাই এর ব্যবহার কম হয় ততই মঙ্গল। বাই হোক, গত মহাযুদ্ধে এবং কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকার সৈন্য বাহিনীতে প্রায় ৫৫ কোটি টাকার বালির বস্তা ব্যবহৃত হয়েছে। স্মরণ্য নবাবিকৃত রাসায়নিক



দ্রব্যটির সাহায্যে কেবলমাত্র বালির বস্তার জীবনকাল করেক গুণ বাড়িয়েই সৈন্যবাহিনী কতো টাকার সাশ্রয় ঘটতে পারবে, তা অহুমান করে গ্রন্থ। এর পর তাঁর ইত্যাদি অজ্ঞাত দ্রব্য তো আছেই।

জলের তলার অবতরণ করার নৌবিভাগীয় শ্রেষ্ঠ স্থাপন করেছেন একজন ইংরাজ ডুবুরী। এর নাম মি: জি, ও, উকে, ইনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্রিটিশ জাহাজ 'রিফ্রেম' থেকে নরওয়ের সমুদ্রের একটি খাড়ির মধ্যে ১০৬০ ফুট অবতরণ করে এই রেকর্ড স্থাপন করেছেন। জলের তলার দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য সাধারণত: যে সব পর্যবেক্ষণ কক্ষ ব্যবহার করা হয় তাহাই সাহায্যে মি: উকে সমুদ্র-তলদেশে ১০৬০ ফুট অবতরণ করেছিলেন। আরও সাত জন ডুবুরী এই একই ভাবে প্রায় ১০৫ ফুট তলায় পৌঁছান।

রিফ্রেম জাহাজ থেকে প্রচারিত সংবাদ মারক্স জানা গিয়েছে, এই অবতরণের সময় পর্যবেক্ষণ কক্ষের তলদেশের এবং মগের দুটি আলো ডুবুরীকে পথ দেখাতে সাহায্য করেছিল। মি: উকের বিবৃতি অনুসারে জানা যায়, অবতরণের সময় কক্ষমধ্যে তিনি কোন অশ্রুবিধাই অনুভব করেননি। সিলিগুঠের সাহায্যে অল্পজেন সরবরাহও ঠিক থাকায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেরও কোন অশ্রুবিধা হয় নি। সমুদ্রের তলদেশে 'বড় বড় পাখর ছাড়া আর কিছুই ছিল না, এমন কি কোন মাছের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায় নি'। মি: উকে জলমধ্যে ১০৬০ ফুট তলায় প্রায় ১ ঘণ্টা অবতান করেছিলেন। জলের গভীরের আলোক-ওজ্জ্বল্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

### রোনাল্ড রস

ম্যালেরিয়ার জীবাণু কি ভাবে যেমধ্যে প্রবেশ করে তার আবিষ্কার এবং এই রোগের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করার ফলশ্রবণ গবেষণার জন্য তার রোনাল্ড রস চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ১৯০২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ম্যালেরিয়া রোগের কারণাকারণের গবেষণা ভারতবর্ষে পরিচালিত হয়েছিল, এবং তার রোনাল্ডের রক্তের মধ্যেও প্রচলিত হতো। ভারতীয় রক্তের একটি কৌণথারা। তাই এই বিরাট কৃতিত্বের অংশ ভারতবর্ষ দাবী করতে পারে।

ঐক একশ' বছর আগে ১৮৫৭ সালের ১৩ই মে রোনাল্ড রস কুমায়ুন পাহাড়ে আলমোড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল,—নাম জেনারেল সার কম্পবেল রস। তাঁর বাবা স্কট—মা ইংরেজ। শোনা যায়, তাঁরা তিন পুরুষে আগলো ইণ্ডিয়ান,—কোন সময় ভারতীয় রক্ত বৈবাহিক সঙ্ঘর্ষের মধ্যে দিয়ে তাঁদের পরিবারে প্রবেশ করেছিল। বাঙ্গালিকার জন্য রসকে লণ্ডনে পাঠান হয় এবং পরে তিনি সেন্ট বার্থলোমিউ হাসপাতালে চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৭৪ সালে এম, আর, সি, এম ডিপ্লোমা লাভ করে তিনি কিছুদিন লণ্ডন ও নিউইয়র্কের মধ্যে এক জাহাজে চিকিৎসকের কাজ করেন এবং পরে মাসাজ মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান করে বর্ষা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৮১ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের পরীক্ষার সপ্তদশ স্থান অধিকার করে রোনাল্ড রস এর

মিলিটারী বিভাগে চাকরী পান এবং কিছুদিন পরে ছুটি নিয়ে লণ্ডনে গিয়ে বিবাহ করেন। এই সময়েই তিনি লণ্ডনে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্রেন-এর নিকট জীবাণুবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষালাভ করেন এবং ভারত ফিরেই তাঁর দৃষ্টি পড়ে ম্যালেরিয়া রোগের উপর। ১৮৮০ সালে রোগীর রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট অথবা পরজীবী বীজাণু আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু এই বীজাণু কি ভাবে রোগীর দেহের মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় সে বিষয়ে কোন কিছুই তখন পর্যন্ত জানা যায় নি।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্যাট্রিট মানসনই রসের মাথায় চুকিয়ে দিয়েছিলেন, মশার কামড়ে হয়তো ম্যালেরিয়া হতে পারে। রস ভারতবর্ষে ফিরে এসে তাই মশা নিয়ে পড়লেন। মশা যদি রোগ ছড়িয়ে বেড়ায় তাহলে মশার মধ্যেও নিশ্চয়ই রোগের প্যারাসাইট পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষে নানা প্রকার মশা ধরে তিনি পরীক্ষা শুরু করলেন। মশা ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড় দিত আর তিনি সন্ধ্যা ছুঁচ দিয়ে সেই মশার পাকস্থলী বার করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করতেন। বাই হোক, এই ভাবে নানাপ্রকার মশার উপর পরীক্ষা চালিয়ে ১৮৯৭ সালের ২০শে আগষ্ট রোনাল্ড রস সেকেন্ডারীর হাসপাতালে এনোফিলিস মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট আবিষ্কার করলেন। এর পর এট গবেষণা তিনি সম্পূর্ণ করেন কলকাতায়। সৈন্যবিভাগের চিকিৎসকের চাকরী, বারে বারে বদলীর জন্য যথেষ্ট হুঁড়েগ রসকে ভোগ করতে হয়েছে,—গবেষণার যত্নে যথেষ্ট বিষ কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত না হয়ে অসমা উৎসাহে তাঁর পরীক্ষাকার্য চালিয়ে গেছেন। মানসন এ বিষয়ে রসকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন,—তাঁরই হস্তক্ষেপে বিলাতের কর্তারা সন্মত হন এবং রস কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে কলকাতার একটি গবেষণাগারে গবেষণা করার সুযোগ পান।

এর পর রসকে পাঠান হয় আসামে কালাছরের কারণ অনুসন্ধানের জন্য। ১৮৯১ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ কর রস লিভারপুলের স্কুলে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯১২ সালে লিভারপুল পরিত্যাগ করে তিনি কিংস কলেজ-হাসপাতালের নিরক্ষর অঞ্চলের রোগের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি সরকারের পরামর্শপাতি ছিলেন এবং ১৯১৮ সাল থেকে লণ্ডনে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। রসকে সম্মানিত করার জন্য ১৯১২ সালে রস ইনষ্টিটিউট এ্যান্ড হাসপিটাল ট্রপিক্যাল ডিসিস পুটনেতে স্থাপন করা হয় এবং ঐ স্থানেই ১৯৩২ সালে প্রায় ৭৫ বছর বয়সে সার রোনাল্ড রস পরলোক গমন করেন।

রোনাল্ড রস ১৯০২ সালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯১১ সালে তাঁকে নাইটহুডের সম্মানে ভূষিত করা হয়। এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যালেরিয়ার কারণ এবং এর সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের উপায় নির্ধারণ করেই সন্তুষ্ট হন নি; ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে প্রচারের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করেছেন। তিনি এক জন স্নেহলব্ধ ছিলেন, আত্মজীবনী এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ছাড়াও তিনি কবিতা ও কাহিনিক রচনা করে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন।

## অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

সারদা দেবীর উপদেশ ছিল কেউ যেন ভুলকে পড়ে কিছু না করে। কেন না, ভুলকে খেঁচে গেলে সবই খেঁচে যায়। যে যা চালাতে পারবে তার সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত। জপের সময়ের কোন বিশি-নিষেধ নাই বটে, কিন্তু সকাপসক্যাই জপের প্রকৃষ্ট সময়। সব সময়ে আর জপ-স্থান ক'টা লোকে করতে পারে? কাজেই ধ্যান-জপ শুরু করলেই যে কাজকর্ম হাড়ুতে হবে, তা নয়। মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজে লেগে থাকার ভাল। মনের স্বভাবই হচ্ছে যে, তাকে 'আলগা' রাখলে পাগলা হয়, ও যত রকম গোল বাধায়। এই জগতই তো নরেন নিকাম কথের পতন করেছিল। নিকাম কর্মে মন পবিত্র হয়।

জপ-স্থানে একটা নিয়মিত অভ্যাসের প্রতি মা খুব জোর দিতেন। তিনি বলতেন, নিয়মিত অভ্যাস, সময়ের স্থিরতা, ও নিষ্ঠা ছাড়া কিছুতে উন্নতি করা যায় না। কাজেই জপ-স্থানেও নিয়মাবলম্বিতা আবশ্যক, প্রথম প্রথম একটু মুখিল হতে পারে কিন্তু একটা অভ্যাস গড়ে উঠলে সবই সহজ হয়। একদিনও যেন বাদ না পড়ে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা সরকার। বাদ দেওয়া ভাল নয়। তাতে একটা অভ্যাস গড়ে উঠতে বাধা পায়। সারদা দেবীর এসব উপদেশ যে শুধু ভক্তদের জন্য ছিল, তা নয়। তিনি নিজের জীবনেও পরিপূর্ণ ভাবে নিয়ম ও শৃঙ্খলার বশবর্তী ছিলেন।

সাধক-জীবনে আগ্রহকে তিনি প্রাধান্য দিতেন বেশী। বলতেন, আগ্রহ না থাকলে যেমন কিছুই হতে চায় না। তেমনি আগ্রহের জোর থাকলে শত বাধাবিঘ্নও পথ আটকাতে পারে না। একটা উপায় হয়েছে। এই জগতই তিনি ঐকান্তিক আগ্রহ বা ইচ্ছা দেখালে দ্রুতলোকের অন্তি কালকে পঞ্চাঙ্গ বাধা বলে মনে করতেন না। মন্ত্রদ্বারের প্রধান বিচারই ছিল তাঁর আগ্রহ। তিনি বলতেন, 'মনে

ছিধা না থাকলে তত্তি-অততি কিছু করে না। শরীরের কোন অংশ ততি, আর কোন অংশই বা অততি?

সাধনপথে যদি ভক্তের তেমন আকর্ষণ হত, তবে লৌকিক আচার-বিচারকে তিনি কখনোই বাধা বলে মনে করতেন না। আবার ক্ষেত্র-বিশেষে সাধন-ভজন সবুধে এক একজনের প্রতি তাঁর এক এক উপদেশ ছিল। কারকে তিনি বেশী জপ-তপ করতে একেবারেই নিষেধ করতেন। বলতেন, "১০৮ বার গুরুমন্ত্র জপ করো, আর খুব আনন্দে খেঁকো। বাকী যা করবার তা আমিই করে দেবো।" কারকে বলতেন, বেশী করে পূজো-স্বার্জা করো। আর কারকে বলতেন, খুব বেশী করে জপ করতে আর কারকে করতে বলতেন ধ্যান।

কোন ভক্ত তাঁর কাছে বস্তুচ্যা চাইতে এসে ব্যবস্থা পেতো বিয়ে করে সংসারী হবার। আবার কখনো বা বিবাহেচ্ছু ভক্তকে তিনি নিরস্ত করে বলতেন, "সংসারপথ থেকে নিবৃত্ত হওয়াই তোমার প্রয়োজন। সংসারে তোমার কল্যাণ হবে না।" কাজেই সে পেতো ব্রহ্মচর্য। তর্ক নিয়ে তাঁকে ধামিয়ে দেওয়ার বড় একটা উপায় থাকতো না। কোন একটা যুক্তি নিয়েই তিনি ভক্তদের কল্যাণ-পথে চালনা করতেন। কাজেই অপারের কুট যুক্তি-তর্ক তাঁর কাছে পরাজয় মানতো। মূলতঃ যেকোন কেউ না ভোলে, ভাবপ্রবণতায় কেউ না রৌকে, এ বিষয়ে তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। ভক্তদের অনেকেই বাহু অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে থাকতে ভালবাসতো কিন্তু সারদা দেবী তার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না।

ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, মা তাঁর সন্তানদের পোড়ের সম্বন্ধি বুঝেই খেতে দেন। কারকে বাস, কারকে খোল, কারকে অংশল আবার খোল দেন খেতে। সারদা মায়ের ব্যবস্থায়ও তাঁর সন্তানদের প্রতি ঠিক তাই ছিল। তাঁর উপদেশ বিভিন্ন ভক্তের প্রতি বিভিন্ন প্রকারের হ'ত বলে তাদের কাছে পরম্পর-বিবোধী মনে হত বটে, কিন্তু মা যে আবার বিবেচনা করে উপদেশ দিতেন, তা তারা বুঝতো না বলেই তা তাদের মনে আসতো। তাঁর কাছে কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না।

সর্বসাধারণের প্রতি তাঁর উপদেশ থাকতো—সকলের যেন ধর্মপথে মতি থাকে, ভগবানে শ্রবণ-মনন থাকে। ভগবানকে পেতে হ'লে তাঁকে আকুল হয়ে ডাকা চাই। যে ভক্তরা প্রকৃত অধিকারী নয়, তাদের তিনি মাত্র ১০৮ বার গুরুমন্ত্র জপ করার বিধি দিতেন। বলতেন, "বেশ নিষ্ঠা করে ১০৮ বার গুরুমন্ত্র জপ করো আর খেয়ে দেয়ে আনন্দে খেঁকো, যা করবার আমিই করবো।"

নিকংসাহবাণী তাঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না। তিনি কি করে বলবেন, তোমরা বললেও করতে পারবে না? কাজেই সত্য সত্যি তিনি নিজের তাদের জন্য জপ করতেন। তিনি জানতেন, ক্রমে এই ১০৮ বার খেলেই রুচি এসে তাদের অন্তরে ভক্তিরস জেগে উঠতে পারে। তারা প্রকৃত সাধনের অধিকারী হ'তেও পারে।

সারদা দেবী অন্ত্যন্ত কোমলস্বভাবা পরমুখকাতার্য ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর কোমলতা মধুরতার আশ্রয়ে কান্নার সাধনের অলহানি হতে পারতো না। ভক্তরা জানতেন, মা তাদের জন্য জপ করেন। তারা তাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো 'মা—তুমিই যদি আমাদের জন্য জপ কর, আমাদের আর কি সরকার?' তিনি বলতেন, 'মাত্র ১০৮ বার গুরুমন্ত্র জপবে, তাও যদি না পার, তবে তোমাদেরই বাবে।'

জপের মূল্য তিনি খুবই দিতেন। কিন্তু হজুকে পড়ে প্রথম

প্রথম খুব বেশী করে স্নান করে, পরে বাতে না ছেড়ে ছুড়ে দেয়, তাই তিনি প্রথম দিকে কান্নকেই বেশী করে জপ করার বিধি দিতেন না। নিজে তিনি লক্ষ অবধি জপ করতেন। পন্থে-কুড়ি হাজার জপ না করলে, যে কিছু হয় না। আনন্দ বা শান্তি টের পাওয়া যায় না, এ তিনি অনেক ভক্তকেই বলতেন। মৌখিক জপের কোন ফল নেই, অন্তর দিয়ে মন-প্রাণ টেলে জপ দিয়ে ভগবানকে আহ্বান জানাতে হয়, তবেই মনের ময়লা কাটে, আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয়। কালে প্রেম ভক্তি সব আসে। একথাই তিনি সবাইকে বোঝাতেন।

সারদা দেবীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎকর্ষতা যে কতটা হয়েছিল, তা বোঝা যেতো যখন ঠাকুরের পণ্ডিত-ভক্তদের জটিল অধ্যাত্ম প্রশ্নের তিনি মৌমাংসাত্মক জবাব দিতেন। বিদূষী ইংরেজ মিস্ট্রী নিবেদিতা বলতেন ‘মায়ের নিকট যত কঠিন প্রশ্নই উপস্থাপিত করা হউক না কেন, তাঁহাকে কখনই ভীত হইতে বা ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই।’

স্বামী গৌরীসরানন্দ এ বিষয়ে বলেন, ‘আমি যখন ছোট ছিলাম, মাকে বড়ই ভালবাসতুম, ভক্তি-ভ্রষ্টা করতুম। হোমরা চোমরা পণ্ডিতেরা যখন এসে মাকে কি সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন করতে থাকতেন আমার বুকের ভিতর চিপ চিপ করতো। আর আমার খুব রাগও হতে থাকতো। কেন যে বাপু! স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দজী

এঁরা সব বড় বড় পণ্ডিত থাকতে এত সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন মা বেচারীকে কেন?’

দেখতুম, মা কিন্তু বেশ নির্ভীক ভাবেই তাদের যেন কি সব জবাব দিয়ে দিতেন; আর প্রশ্নকর্তাদের মুখ বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠতো। বুঝতে পারতুম, তাঁরা তাঁদের মনের মত জবাব পেয়ে বেশ খুসী হয়েছেন। তখন আমার বুকের গড়গড়ানী যেন কমতো, আর আমি ঠীক ছেড়ে বাঁচতুম। মায় প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাও দশগুণ বেড়ে যেতো, আনন্দে গর্বে বুকটা যেন ফুলে উঠতো।

ভক্তদের সঙ্গে ব্যবহারে সারদা দেবীর অন্তরদর্শিতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যেতো। যার ফলে ভক্তরা তাঁকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসেবে পূজা করতো। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাই তাঁকে অনেক ভক্তের হৃদয়ে দেবীর আসন দিয়েছিল। একবার একটি ভক্ত সারদা দেবীকে দর্শন-অন্তে কাঠকাটা রোদের মধ্যে ছপুসবেলা বাড়ী যেতে চাইলে তিনি তাকে ত্রুপুরী বিগ্রাম করে বিকেলে যেতে বলেন। ত্রুপুরে গেলে কোন কষ্ট হবে না বলে সেই ভক্তটি যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। মা তাকে বললেন, ‘মানা করছি বাচ্চা, যেও না। বৃষ্টি আসবে আর ভিজে যাবে।’ প্রশ্নের হৃদয়িকরণের দিকে আঁচল দেখিয়ে ভক্তটি হাসতে হাসতে চলে গেল। অর্থাৎ ‘মা তুমি আমার ভুলান্ন এত বোদ্ধা যে কখনো বৃষ্টি আসে?’

## মনের কথা

“এমন সুন্দর গহনা কোথায় গাড়াগে?”

“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়েছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, ভাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের কৃতিজ্ঞান, সততা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।”

# মুখার্জী জুয়েলার্স

দিগি সোনার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-কবচ  
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



কিছু দূর যেতে না যেতেই হঠাৎ এমন মেথ করে বৃষ্টি এল যে ভক্তটি ভিজতে ভিজতে দৌড়িয়ে এক চণ্ডাল-বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। তখন সে ইচ্ছামতীর দীলা বুঝতে পেরে তাঁর স্নেহ-উপারোধ অগ্রাহ্য করে হঠকামিতা কবীর ভক্ত অমৃতপ্ত হ'ল।

একবার এক ভক্তকে মা করুণা পদ্ধতি শিখাতে চান। সময়ের অত্যন্ত অল্পতা অথচ সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। বললো, 'মা, তবে কি এবার আমার আর করুণা শেখা হবে না?' মা বললেন, 'তা কেন? তুমি বরং সুরেনের কাছে শিখে নিও।' সে বললো, 'মা, সুরেন থাকে রাঁচীতে আর আমি বাচ্ছি চট্টগ্রামে। তার সঙ্গে দেখাই বা কি করে হবে? আমার এবার আর করুণা শেখা হল না।'

মা বললেন 'হবে হবে হবে।' হয়ে যাবে।' মার কথার কোন প্রত্যুত্তর না বলেও ভক্তটি নিরাশ হয়েই ভেবেছিল, তার বৃষ্টি আর শেখা হলই না। কিন্তু আশ্চর্য্য ভাবে চট্টগ্রামের পথে সীমারেই সুরেনের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল এবং সুরেন তাকে যত করে করুণা শিখিয়ে দিল।

এক ভক্ত মার কাছে দীক্ষা নিতে এল। মা তাকে দীক্ষা দেবার পর সে তাঁকে গুরুদক্ষিণা দিতে উজ্জত হলে মা এই বলে নিরস্ত করলেন যে তিনি সন্ন্যাসীদের কাছে দক্ষিণা নেন না। ভক্তটি বারে বারে তাঁকে বোঝালো, 'মা আমি তো সন্ন্যাসী নই, গৃহী। আমার কাছ থেকে দক্ষিণা নিতে তোমার আপত্তি কেন?' কিন্তু সারঙ্গ দেবীর ঐ একই কথা 'বলেছি তো। সন্ন্যাসীর দক্ষিণা নিতে নেই।' ভক্তের বিষয় ঘূলো না। মা কেন বারে বারে এই কথা বলছেন? কিছুদিন পর কিছু দেখা গেল সে সন্ন্যাস নিয়েছে।

অনেক সময় সারঙ্গ দেবী ভক্তদের মনের কথা টের পেয়ে তাদের অভিজ্ঞায় পূর্ণ করতেন। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মায়ের ভক্তরা সুযোগ সুবিধা পেলেই মায়ের সেবা করে। তাই দেখে একটি ভক্তের মনে দুঃখ হল 'আমার জীবনে কিছুই করা হ'ল না। কত ভক্তরা মায়ের সেবা করে যত্ন হয়, আমার অদৃষ্টে তাও ঘটলো না।' মার সম্মুখে দাঁড়িয়েই সে ঐ কথা ভাবছিল। এমন সময় মা তাকে আদেশ করলেন, 'বাবা এসেছ যখন ভাঁড়ার থেকে ঐ ভারী আটার হাঁড়ীটা বের করে আন তো?' তার পর সেই হাঁড়ী থেকে আন্দাজ করে আটা বের করে দিয়ে তাতে পরিমাণ মত জল দিয়ে বললেন, 'এবার বেশ করে এটা একটু মেশে দাও তো?'

এর পর সন্ধ্যার সময় ভক্তটি যখন বাবার মার দর্শন নিতে এ'ল, তিনি তাকে বললেন, 'পাটী বড় কনকন করছে, একটু টিপে দাও তো বাবা।' ভক্তটি সারা দিনে মাকে সাহায্য ও সেবার এরকম অভাবনীয় সুযোগ পেয়ে যেন নিজেকে কৃতজ্ঞতাবশত মনে করলো, আর তার স্পষ্টই মনে হ'ল মা সাক্ষ্য অন্তর্ভাবী। তার অন্তরের দুঃখ জানতে পেরেই এভাবে কৃপা করতেন।

একবার কয়েকটি ভক্ত মার দর্শন নিতে এসে রাত্রি হওয়াতে মার আশ্রয়েই রাত্রিতে থাকা স্থির করলো। তারা আশ্রমের সদর ঘরের বাবান্দার রাত্রিবোলা শুয়েছিল। শেষ রাতে ঘুম ভাঙতে তাদের একজনদের মনে হ'ল 'আহা এই নিশা-উষার সন্ধিক্ষণে মা যদি এসে একবার দর্শন দিতেন!' অপর একজন বলে উঠলো মা তো থাকেন অন্দর মহলে, তা আর কি করে সম্ভব হতে পারে?' ভক্তটি মনের

আবেগে গান গেয়ে উঠলো '৳ গো করুণাময়ি, খোল গো কুটীরদ্বার!'

গানটি শেষ না হতেই দেখা গেল বাইরের দরজাটি খুলে সত্য সত্যই করুণাময়ী মা এসে দাঁড়িয়েছেন! পুলকিত বিমিত ভক্তরা রুতাঞ্জলিৰন্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

একটি ভক্ত সাধু নাগ মশাইর জীবনী পড়েছিল। তাতে সে জানতে পারে, মা নাকি একবার সাধু নাগ মশাইকে নিজ হাতে খাইয়ে দিয়েছিলেন। এটুকু জেনে তার মনেও তাঁর ইচ্ছা হ'ল 'মা যদি আমাদের জননী হ'ন, তবে আমাদের কেন তিনি খাইয়ে দেবেন না? যথ ফুটে সে মাকে কিছুই জানালো না। সত্য সত্যই একদিন মা তাকেও নিজ হাতে খাইয়ে যত্ন করলেন। ভক্তটির আনন্দের আর সীমা রইল না।

কখনো কখনো ভক্তরা মাকে দেবার ভক্ত ঘী মিষ্টি সন্দেশ নিয়ে আসতো। অথচ মার কাছে এত ভক্তের ভীড় যে, নিজহাতে তাঁকে তা নিবেদন করা হ'ত না। আশ্রমের ভক্তদের হাতে দিয়ে আসতে হ'ত। ফিরবার পথে তাদের মনের মধ্যে একটা স্মৃতি থাকতো, কষ্ট করে আনা জিনিষ মার সেবায় লাগবে কিনা, তারা যে মার ভক্ত এনেছিল তা মা আদৌ জানতে পাবেন কি না?

তাদের সঙ্গে পুনরায় যখনই মার দেখা হ'ত তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'হ্যাঁ বাবা, সন্দেশ, ঘী তোমরাই এনেছিলে তা?' কখনো বা তাদের সম্মুখে একটি সন্দেশ হাতে নিয়ে বলতেন, 'এই দেখ গো আমার ভক্ত যে সন্দেশ এনেছিল, আমি তা খাচ্ছি।' শিষ্যদের আনন্দের আর অবধি থাকতো না।

একবার কয়েকটি ভক্ত বাসায় চলেতে চলেতে সাদা স্থলপদ্মের গাছ দেখতে পেয়ে স্থির করলো ১-৮টি পদ্ম সংগ্রহ করে মার পায়ে অঞ্জলি দেবে। সেই ভক্ত তারা ঐ শ্বেতপদ্ম সংগ্রহ করতে থাকে। এমন সময় কে একজন ছুটেতে ছুটেতে এসে বললো, 'সাদাপদ্ম ছিঁড়ে না। মা বলে পাঠিয়েছেন দেবীপুজায় শ্বেতপদ্ম লাগে না।' অথচ আশ্রম সেখান থেকে বহুদূর। ভক্তদের বিষয়ের অন্ত থাকে না। মা কি করে জানলেন?

আরেক বার একটি ভক্ত এসেছিল মায়ের কাছে দীক্ষা নিতে। দীক্ষান্তে সে মায়ের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বললো 'এখান থেকে বেলেড় মঠ দর্শন করে বাড়ী যাবো ভাবছি মা! অমুমতি দিন।'

মা তৎক্ষণাৎ তাকে বললেন, 'এবার না হয় সোজা বাড়ীতে চলে যাও বাবা, অজ্ঞ বার বেলেড়-মঠ যোয়ো।'

'মা, এতদূরে এসেও যদি বেলেড়-মঠ না দেখে ফিরে বাই, তবে আর হয় তো কখনো ঐ সুযোগ নাও পেতে পারি।'

'তাহোক বাবা! এবার তুমি বেলেড়মঠ নাই গেলে। সোজা বাড়ী গিয়ে বাবা মার সেবা কর।'

মায়ের আদেশ অমান্য করতে না পেরে ভক্তটি অগত্যা বাড়ী ফিরেই গেল। কিন্তু বাড়ী এসেই দেখতে পেল, নিজ পিতা মৃত্যুশয্যায়। সে অবাক হয়ে বেলেড় দর্শনে যেতে মার বাসবার নিষেধবাণী স্মরণ করলো। কয়েক দিনের মধ্যেই তার পিতার মৃত্যু হল। মায়ের নিষেধবাণী না শুনলে হয়তো তার পিতার সাথে তার শেষ সাক্ষ্য আর হত না।

যোগীন্দ্রমা মায়ের দ্বীভক্ত। তাকে একদিন মা প্রশ্ন করলেন 'হ্যাঁ গো! তুমি কি শুকনো বেলপাতা দিয়ে পুজো কর?'

যোগীন্দ্রমা তো প্রশ্ন শুনে অবাক! বললেন, 'তা করি। কিন্তু তুমি জানল কি করে?'

শুধু যে অন্তর্দর্শিতা, তাই নয়। মা নিজস্বই বলতেন, 'কিছুদিন তো এমন হ'ল, মনের মধ্যে বা উঠতো সত্যি সত্যিই তা উপস্থিত হতো। তা এখন ভালই হ'ক, আর মন্দই হোক। ভাবি, এইটা খাবো বা এইটা হোক, ভগবান যেন তখন তখনই তা যুটিয়ে দিতেন।'

রাধুর তখন খুব অসুস্থ। কোয়ালপাড়া একটা জঙ্গলে জায়গা। ভাবলুম, যে জঙ্গল, কোন দিন না বাঘ ভালুক বের হয়ে পড়ে। ভক্তরা আখাস দিল, কোয়ালপাড়ার মত জঙ্গলে বাঘ ভালুক কখনো আসেওনি, আসতে পারেও না। আমার ভয় অমূলক। কিন্তু ২১ দিনের মধ্যেই শোনা গেল একটি গরীব বুড়াকে নাকি ভালুকে মেরে ফেলেছে।

রাধুর অসুস্থের সময়ট আরো একবার। অসুস্থ বাড়াবাড়ি চলছে, সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে আছি। চার দিক ধমধমে নিঃশব্দ। একটুও শব্দ সহ হয় না রাধুর। বসে ভাবছি এই কিছুদিন ধরে দুটো কাক এসে কতই বিবস্ত্র করতো 'কা' 'কা' করে শব্দ করে। কিন্তু আর তাদের শব্দ কিছু শুনিনা। সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে কাক দুটি 'কা' 'কা' করে ডেকে উঠে জানিয়ে দিল 'এই তো মা আমরা রয়েছি এখানেই, কোথাও যাউনি। শুধু তোমার রাধুর ভয়েই চুপ করে রয়েছি। সাড়া দিচ্ছি না।' আমি তো অবাক!

একবার এক পশলা বৃষ্টির পর সবাই দাওয়ায় বসে। মনে হ'ল অংহা! শিহড়ের সেই পাগলটা কত কাল আসে না। বহুপাগল বটে, কিন্তু গানগুলি গায় বেশ। বলতেই এক ভক্ত বলে উঠলো 'এত রাত করে আবার তার নাম কেন কর? ধর, সে যদি এখনি এই রাতে এসে পড়ে?' বাকি তখন দশটা। এক ভক্ত বলে উঠলো 'না! না! এই বাঙ্গল এত রাত্তিরে নদী পেরিয়ে পাগলের আসার কোন সম্ভাবনাই নেই।' অথচ কথা শেষ হতে না হতেই পাগল সত্যি এসে হাজির। ব'ললে 'সাঁতের পার হয়ে এলুম।'

একবার নাকি মার খুব অসুস্থ হয়েছিল। বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। চলাচল করতেই কষ্টবোধ হ'ত। একদিন মনে মনে ভাবলেন, 'শরীরের যে অবস্থা একগাছা মোটা দেখে লাঠি পেলে ভর দিয়ে চলতাম। মুখে বলেননি কাঁককেই কিছু। সত্যি সত্যি পরদিন তার ঘরের দরজার একটি কোণে ভর করে চলার মত একগাছা মোটা লাঠি দেখা গেল। লাঠিটি বে কে এনে রেখেছে খবর করে জানা গেল না। এতে মা নিজেই বিস্মিত না হয়ে পারেননি। ভাবলেন ঠাকুরেরই সীলা! [ক্রমশঃ]

## বেদবতীর উপাখ্যান

অণিমা মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে তুলসীর উপাখ্যানে উল্লিখিত শিবভক্ত শ্রীরাঙ্গসাবণি সূর্যশাপে লক্ষ্মীভট্ট হইয়া দেবাদিদেবের শরণপায় হইলেন। শিব ঋষ্ট হইয়া সূর্য্যনিধনে উদ্ভত হইলেন। তখন নারায়ণ আনন্দা অনেক অহ্ননয়নিনয় এবং যুক্তি-তর্ক দ্বারা শিবকে

নিবস্ত্র করিলেন। তখন মহাদেব নারায়ণকে প্রশ্ন করিলেন যে, কিরূপে তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত রাঙ্গসাবণি পুনরায় লক্ষ্মীলাভ করিবে। উত্তরে নারায়ণ বলিলেন যে, রাঙ্গসাবণির বুধধ্বজ নামে একটি পুত্র হইবে, তাহার পর বুধধ্বজ জন্মলাভ করিবে। বুধধ্বজের দুই পুত্র হইবে—বৃক্ষধ্বজ ও কুশধ্বজ। কুশধ্বজের কস্তার লক্ষ্মীর অংশ জন্ম হইবে এবং তখন শাপমুক্ত হইবে।

যথাকালে বৃক্ষধ্বজ ও কুশধ্বজ জন্মগ্রহণ করিল। লক্ষ্মী দেবীর ইচ্ছায় সেই দুই ভ্রাতা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বরদিন তপস্যা করিয়াছিল। সেই তপস্যায় তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মী দেবী বরদান করেন। লক্ষ্মী দেবীর বরে তাঁহারা রাঙ্গালাভ করিয়া যখন-পুত্রে সমৃদ্ধিশালী হইয়া ওঠেন। কুশধ্বজের পত্নী মালাবতী অতিশয় পতিভ্রতা ও ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন। মালাবতীর গর্ভে কমলার অংশে বেদবতী নামে একটি কস্তা জন্মগ্রহণ করিল।

পরম আশ্চর্যের বিষয় যে, বেদবতী ভূমিষ্ঠ হইয়াই দ্রুত ব্রাক্ষর আরাধনা করিতে বনে চলিয়া গেল। সত্যজ্ঞাত কস্তার এই ভাব দর্শন করিয়া প্রত্ৰিবাসী সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার কস্তাকে নানাপ্রকারে বাধা দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কস্তা কাহারও কথা না শুনিয়া দ্রুতপে পবিত্র পুঙ্খয়ে গিয়া বিধাতার চরণপায় ধ্যান করিতে লাগিল। এইরূপ তপস্যায় বহুকাল অতিবাহিত হইল। কস্তার তত্ত্ব ঋণ হইতে ঋণতর হইল, কাঞ্চন বর্ণে কালিমা দেখা দিল এবং ইতিমধ্যে কস্তার যৌবন আনন্দা উপস্থিত হইল। তথাপি কস্তা অব্যচল ভট্ট থাকিয়া উপবাসে কঠোর তপস্যায় নিমগ্না রহিলেন। এইরূপ কঠোরতা দেখিয়া ব্রাক্ষর আসন টলিল। বিধাতা তুষ্ট হইয়া দৈববাণীর দ্বারা বেদবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে কস্তা তোমার অন্তরের ইচ্ছা প্রকাশ কর। তুমি যাহা চাহ তাহা দিব।' দৈববাণী শুনিয়া বেদবতী কহিলেন—'হে পদ্মাসন, যিনি এই জগতের নাথ, যিনি এই স্রমহান বিশ্বের আধার, তিনি যেন আমার পতি হ'ন, ইহাই আমার অন্তরের বাসনা।' বেদবতীর কথা শুনিয়া দৈববাণী কহিল—'হে কস্তা, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও তপস্বী দ্বারা পাদপদ্ম নিয়ত অন্তরে ধরিয়া আছে, তাহাকে তুমি এক্ষণে কী প্রকারে লভিবে? আমি তোমার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বরদান করিতেছি যে, জন্মান্তরে তুমি নিশ্চয়ই তাহাকে লাভ করিবে।

দৈববাণীর কথা শুনিয়া বেদবতী ক্ষুব্ধ চিত্তে দ্রুত গন্ধমাদন পর্ব্বতে চলিলেন। সে স্থানে বাইয়া তিনি অনশনে কৃষ্ণের চরণকমল হৃদয়মার্কে ধারণ করিয়া দিবস রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কস্তা বেদবতী সদা-সর্ব্বদাই এক মনপ্রাণ লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, জগৎজীবন যেন তাহার নারীরূপে তাহাকে গ্রহণ করেন। এইরূপে বেদবতী বখন ধ্যানে নিমগ্না সহসা সেই স্থানে দ্রুত দ্বাষ্টা রাবণ আনন্দা উপস্থিত হইল। রাবণকে দেখিয়া বেদবতী তৎক্ষণাৎ অতিথি সংকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অরণ্যের ফলমূল বস্ত্রপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া অতিথিকে পরিভূক্ত করিলেন। অন্তঃপর সেই স্থানে বিশ্রাম লইবার অবকাশে কস্তার মোহনরূপ দর্শন করিয়া শাপমতীর অন্তরে কাম্যবাহি প্রাণলিত হইতে লাগিল। দ্রুত দ্বাষ্টা মিষ্টভাবে বেদবতীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'হে বিমোদিনি, তুমি কাহার কস্তা? কাহার স্ত্রী? কেনই বা

একাকিনী এই নির্জন পূর্বতে বসিচ্ছ ? তে কিছুমুগি, তুমি কেন গৃহত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ ? তোমার দারুণ এই তপস্বী ত্যাগ করিয়া আমার গৃহে চল। আমি হ্রিলোক-বিজয়ী কৃষ্ণধর। এই পৃথিবীর মধ্যে তুমিই হবে আমার একমাত্র প্রিয়তমা। আমার অস্ত্রাঙ্গ রাণীগণ হবে তোমার সেবিকা মাত্র।' এই বলিয়া রাবণ মোহবশে উন্মত্তের 'শ্রায় বেদবতীকে আকর্ষণ করিতে বাইল। দুঃখাচার এই মন্ত ভাব দেখিয়া বেদবতী ক্রোধে বেতসপত্রের শ্রায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। রাবণকে সন্দোধান করিয়া দুই চক্ষুতে ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—'শোন্ শোন্, নরায়ণ রাবণ, সবলা নারীর প্রতি তোর এই অত্যাচারের ফল তুই অবিলম্বে পাইবি। ওরে পামর! অতিথিরূপে আসিলি, তোকে যে আশ্রয় অভ্যর্থনা করিলাম, তাহার কি এই ফল ? ওরে দুঃখাচার, সাবধান! আমার নিকটে একটি পদক্ষেপেও আর অগ্রসর হইবি না।' এই বলিয়া বেদবতী সরোষে লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া এক অদ্ভুত তেজোবৃন্দ উল্লিতে পাড়িয়া বহিলেন। কস্তুর ভীষণ মুগ্ধি দর্শন করিয়া রাবণ অন্তরে অবশ হইয়া রহিল। বেদবতী পুনরায় সরোষে কহিতে লাগিলেন, 'শুন রে পামর, আমি দিবানিশি মনঃপ্রাণ হরির উপর সমর্পণ করিয়া আছি। তাঁহাকে পতিরূপে লাভিবার আশায় অহনিশি তাঁহার চিন্তা করিতেছি। তুই যেমন আমায় পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিস, সেই হেতু তুই সবংশে নিধন হইবি। তোর বাণে আর কেহ রহিবে না এবং মরিয়া তুই বমালয়ে যাইবি।' এই বলিয়া বেদবতী অতি ভ্রুতমনে গঙ্গাবক্ষে জীবন ত্যাগ করিলেন। পাপমতি রাবণ স্বচক্ষে এই সকল দর্শন করিয়া তথ্য হইতে চলিয়া গেল।

কমলার অংশে জন্ম কহা বেদবতী জ্ঞানবী-সলিলে প্রাণত্যাগ করিয়া শাপবশে পুনরায় জন্ম লাভ করিলেন রাবণ নিধনের জন্ম। জনকরাজার গৃহে সীতা নাম ধরিয়া বেদবতী আসিলেন। পূর্বকৃত পুণ্যবলে কহা ভগবান রত্নপতিকে পতিরূপে লাভ করিলেন। জাতিস্মরা সতী অন্তরে সমস্ত জানিলেন এবং পূর্বকৃত বশ দুঃখ সকলই তুলিয়া গেলেন। এই ভাবে জন্মান্তরে দৈববাণী প্রদত্ত বরে বেদবতীর কঠোর তপস্বীর বলে ভগবৎপতি, বিধের আশার শাস্তশীল, অচরিত শ্রীরাঘবের পত্নীরূপে পূজকে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

## উদ্বোধন

### ঐশ্বর্য্য যোয

অম্বাচলগামী বর্ষ ভূবে গেল অতীতের অন্তল গহ্বরে, বলে গেলো, নবীনের কবো আবাহন তোমাদের ঘরে। সাজাও বরণডালা স্নেহ আর ক্রমা দিয়ে বাঁধ রাখা হাতে, মিলনের মন্ত্র আজি গ্রহণ করিবে সবে নূতন প্রভাতে। চেয়ে দেখি হায়, দিগন্ত রক্তিম করি দে-তো চলে যায়, স্মৃতির প্রেক্ষাপটে কণ্ঠময় দিন তার লিখে রেখে যায়। মৌনতায় দিয়ে গেল নীরব সাধনা করে গেল দান, এ বিরাট বিধে তার যতটুকু ছিল করিবার দান। নূতন সাধনা দিয়ে নূতন বংঘে মোরা উদ্বোধন, হিঙ্গা, ধ্বংস, গ্রানি ভুলে কবি আজ সব মিলে

মিলনের নূতন বোধন।

## বাতিস্বর

(পূর্ণ-প্রকাশিতের পর)

বারি মেবী

স্মৃতি সন্ধ্যা একবার করে আসে, বাবার পূজার ঘরে, কয়েক মিনিট নীরবে বসে থাকে তাঁর পাশে।

তারপর সারাদিন আর দেখা পাওয়া যায় না তার। সময় যে তার দিদিমার হাতে তৈরী হুকে বাঁধা। সন্ধ্যা আসে গীটারের মাষ্টার,—তারপর কলেজ,—ফিরে এসে মুখে-হাতে জল দিতে না দিতে; আসে পিয়ানো অথবা নাচের মাষ্টার। সন্ধ্যায় পড়া তৈরী।

সব শেষ করে রাতে একবার আসে, পিতার লাইব্রেরী-কক্ষে। তিনি তখন হয়তো নিবিষ্ট থাকেন—উপনিষদের মাঝে। একবার মুখ তুলে কস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন সোমনাথ—প্রশান্ত হাতের সঙ্গে সিনাক্সের বিদায় জানান।

স্মৃতি হয়তো আশা করে থাকে, বাবা, কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করবেন, আর অভিযোগ জানানবেন—

—কৈ, সারা দিন তোমাকে তো একবারও পেলাম না মা।

যেমন পূর্বে বলতেন।

কিন্তু সে-সব কিছু হয় না। সোমনাথের ভাবলেশহীন পাখরের মত মুখে কোনো অভিমান বা দুঃখের রেখাপাত পর্যন্ত নেই। যেন তাঁর চাইবার আর কিছু নেই, মনে ওঠে না কোনো বাদনার তরঙ্গ। তরঙ্গায়িত তটভূমি ফেলে বেখে, কোর ভাবশাগের গভীর অন্তলে যেন বিরাজ করছেন তিনি।

স্মৃতি এত বোঝে না! প্রাণে যেন কিসের বেদনা অমুভব করে। সহপাঠিনী ত'-একজনের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে দেখেছে সে ওরা কেমন ভাই-বোনেরা মিলে কত গল্প করে, কত হৈ হুল্লোড়ে মাতামাতি করে। ঝগড়া-মারামারিও আছে। মা-বাবার কাছে কত আদর পায়। আদ্যার কবে তাঁদের কাছে! ওদের বাড়ীগুলো যেন সজীব প্রাণচাকলো ভরপুর থাকে!

—কিন্তু তাই বোঝে কেন এর ব্যতিক্রম ঘটলো? সে যেন দিদিমার হাতের কলেব-পুতুল একটা! যে দিকে তিনি চালাচ্ছেন সে দিকে চলতে হচ্ছে তাকে। নিজের মন বলে কোনো জবাব তার থাকতে নেই? কিন্তু সত্যি তো না নয়! মন যে তার চার, ঐ রমার মত দ্রুতগণা করতে। গীতার মত প্রাণখোলা হাসি হাসতে আর শিক্ষার মত কথায় কথায় ভাই-বোনদের সঙ্গে ঝগড়া করতে; চোঁচোমেচি করে বাড়ীখানা গুলজার করতে!

তা তো হবার নয়! দিদিমা তাঁর অ্যারিস্টোকেট, চলন-বলনকে সর্বদা অমুকরণ করতে বলেন তাকে। কেমন করে সভা সমাজে চলতে হবে, দাঁত চেপে মিছি গলায় কথা বলতে হবে, ঠোঁটের কোণে সেগে থাকবে একটু হাসি, শব্দ হবে না একেবারেই; ওটা অসভ্যতা!

দিদিমার গৃহলাবদ্ধ কারাগারে যেন বন্দিনী সে! বাইরে যেমন ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য্য অন্তরে তেমনি যেন কিসের অভাব নিয়ত দংশন করে ওকে। কিসের বেদনা ওকে যেন সর্বদা সঙ্কুচিতা ম্রিয়মাণ করে রাখে। মরুভূমির মাঝে ও থাকে ওয়েশিব! কয়লাখনির নিকব-কালো আঁধারের মাঝেই যেমন মেলে অজ্ঞান হীরকের সন্ধান, স্কন্ধ গিবিগব্বের স্বর্ণাশ্রয় কুলু-কুলু ধনি,—তেমনি স্মৃতির জীবনেও আছে স্মরণ।

সোমনাথের পরম বন্ধু মহিম হালদার, একজন উঁচু দরের টিবেডোর—তাইই একমাত্র পুত্র স্ত্রী হালদার। জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন তিনি, এখন পরমাধের সন্ধান গোপীনাথ মহাশয়ের শিষ্য গ্রহণ করে কয়েক বছর হল বৃন্দাবন-বাস করছেন।

বাড়ীতে আছেন তাঁর স্ত্রী। ছোট ভাই অসীম হালদার, আর পুত্র স্ত্রী হালদার। অসীমের ওপর আর বিখ্যাত কথ্যচারীদের ওপর ব্যবসা পরিচালনার ভার দিয়ে তিনি অস্বাভাবিক সংসার ত্যাগ করেছেন।

অসীম এখনও অবিরামিত, তবে খুব চতুর ও হিসেবী। দাদার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হলেও ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে তার বেশী যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

স্বামীর তেইশ, চরিশ বছর বয়স হলেও মনে হয় এখনও সে নাবালকত্ব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। মা ও কাকার অত্যধিক আদর-যত্নে তার শিশুহুল্লভ ভাব আজও রয়ে গেছে। স্ত্রীর চেহারায় যেন একটি সুকোমল মেয়েলী ছাপ, বীর হির কিছটা বা লাডুক প্রকৃতির। মেডিকেল কলেজের ছাত্র সে, ফাইজাল পরীক্ষার আর কয়েক মাস মাত্র বাকী।

পিতার ইচ্ছায় ডাক্তারী লাইনে গেলেও সাহিত্যের প্রতি তার অসামান্য অনুরাগ। আধুনিক তরুণ কবিদের মধ্যে যে কয়েক জন বিদগ্ধ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন, স্ত্রী হালদার তাঁদেরই অন্ততম।

“পূর্বরাগ” নাম নিয়ে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থখানি প্রচুর সমালোচকের মাঝে প্রথম সংস্করণের ধাপ পেরিয়ে এখন দ্বিতীয়ে চলেছে। ছোট গল্পও তার মাঝে মাঝে হুচারাট বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার প্রকাশিত হয়।

লালকুঠিতে বাতায়ত চলেছে তার সেই বারো বছর বয়স থেকে।

স্মৃতি তখন বছর সাতকের। এখনও মনে পড়ে সেদিনের কথা।

বাবার সঙ্গে প্রথম যেদিন গিয়েছিলো সে লালকুঠিতে, স্মৃতির মা আদর করে কোলে বসিয়েছিলেন, কত কি খেতে দিয়েছিলেন, কি চমৎকার দেখতে ছিলো তাঁকে! ঠিক ঐ পটুয়ারের গড়া হুগা প্রতিমার মত। গোলাপী রঙ পরেছিলো স্মৃতি, সোনালী একমাথা কৌকড়ানো চুল বাঁধা গোলাপী রিবনের বো। ওর হাত ধরে বাগানে নিয়ে গিয়ে কত ফুল গিয়েছিলো! খরগোশ আর কত বকমের পাখী দেখিয়েছিলো। আসবার সময় কত চকোলেট বসুট দিয়েছিলো স্মৃতি। আর একখানা চমৎকার বিলিতি হবি বই। সে বইটা আজও বন্ধ করে রেখেছে স্ত্রী।

বছর চারেক পরের কথা। বড় মনে কষ্ট হয়েছিলো ওর, যেদিন লালকুঠিতে গিয়ে আর দেখতে পেলো না মিতার মাকে!

পড়ায় ঘরে চেঁচিয়ে চুপ করে বসেছিলো মিতা। স্ত্রীমাকে দেখে হুঁহাতে মুখ চাপা নিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো! স্ত্রীমাকে কঁদে ফেলেছিলো! তারপর স্মৃতির চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিলো,—কঁদো না মিতা! মা যে ভগবানের কাছে গেছেন।

—স্মৃতি জলভরা চোখ দুটো খুলে বলেছিলো,—মা'র জন্তে বড় যে মন কেমন করছে দামী দা! কেমন করে আমি একলা থাকবো! বাবা যে দিনরাত্তির বই নিয়ে থাকেন, আমি কার সঙ্গে কথা কইবো?

—স্বামী ওর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বলেছিলো,—আমি বোজ তোমার কাছে আসবো মিতা! তোমার সঙ্গে গল্প করবো! তোমার কাছে থাকবো, তাহলে তোমার ভালো লাগবে তো?

হুঁহাতে ওর গলা জড়িয়ে বুক মাথা রেখে, চোখ বুঁজেছিলো মিতা! চাপা দীর্ঘশ্বাসে ছোট বুকটা ফুলে ফুলে উঠেছিলো!

তারপর থেকে বোজ আসতো স্বামী। কলেজ থেকে ফিরে, সোজা চলে আসতো স্মৃতিদের বাড়ী। গল্প বলে, কবিতা শুনিতে ওকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো।

বেশ ছিলো ওরা দুজন। বছর দুয়েক পরেই এ বাড়ীতে এলেন স্মৃতির দিদিমা, মামা, আর ছোট মাসী! তখন বোজ আসতে কেমন লজ্জা করতো স্বামীর। ক্রমে যাওয়া-আসাতা কম হতে হতে এখন সপ্তাহে দু-তিন দিনে ঠাঁড়িয়েছে।

ঐ ছুটো তিনটে দিনেই যেন স্মৃতির জীবনে নিয়ে আসে অমৃত-প্রবাহ! তার নিয়মের অষ্টোপাশে বাঁধা নীরস প্রাণলতিকার মূলে ঐ সঞ্জীবনী স্বপ্নটুকুই একমাত্র সঞ্চল! হতাশার কুহেলিকার মাঝে উজ্জ্বল আলোকবিন্দু!

এক বছর কেটে গেছে সোমনাথ বাড়ীতে ফেরবার পর। তাঁকে আবার স্মৃতির পথে বাঁধা করতে হবে। সেদিন সকালে একখানি বিরাট বৃষ্টিভর এসে ঠাণ্ডা লালকুঠির গাড়া বারান্দার তলার। গাড়ির মালিক জানালেন,—তিনি সোমনাথ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান।

যেদারা জানালো সোমনাথকে,—তিনি আগছককে লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে আসতে বললেন।

দামী বিলাতী পোষাকে সুসজ্জিত, অতি সূক্ষ্ম একজন যুবক এলেন সোমনাথের ঘরে, সানুগলস্ দ্বারা চোখ দুটি তাঁর আবৃত।

যুক্ত করে নমস্কার জানিয়ে বললেন তিনি—আমাকে বোধ হয় চিনতে পারছেন না? আমার নাম অসীম হালদার। মহিম হালদার আমার দাদা।

—সোমনাথ মুহূর্ত্তে জবাব দিলেন—বহুদিন পরে তোমাকে দেখছি কি না, সেজন্য প্রথমে চিনতে পারিনি—বোসো—না। না! এখানে নয়, ঐ চেয়ারটাতে বোসো!—হ্যাঁ, বিলম্ব থেকে কিরলে কবে? দাদার খবর পেয়েছো তো?

—চেঁচিয়ে বসলো না অসীম,—পা মুড়ে আড়ষ্ট ভাবে কার্পেটের ওপরই বসে পড়লো। পকেট থেকে একখানি চিঠি

বার কবে বললো, বিলেত থেকে প্রায় তিন বছর হল কিরেছি। তার পর থেকেই বিষয়সম্পত্তি সব কিছু আমাকেই দেখাশোনা করতে হচ্ছে কি না। দাদা তো বেশী ভাগ সময় এখন বৃন্দাবনেই বাস করছেন। এই চিঠি দাদা আমার লিখেছেন সেটী জ্ঞাতই এলাম আপনায় কাছে। চিঠিখানি সোমনাথের হাতে দিলো অসীম।

—চিঠিখানি লিখেছেন মহিম হালদার—“সোমনাথ ত্রিবেদীর কাছে গিয়ে প্রস্তাব করে আমাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুনামের সঙ্গে স্মৃতিভার পরিণয় কার্য এবারে অসম্পন্ন করা হোক, এই আমার অন্তিম প্রায়। সুনাম ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, সেজন্য বিলম্বে আর কান্ন কি? বত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ব্যাবস্থা করা হোক উভয় পক্ষে।”

সোমনাথ চিঠিখানি পড়ে মুহূর্তে হাতের সঙ্গে জবাব দেন—আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ; ওসব ব্যাপার ঠিক বুঝি না, মহিমকে লিখে দাও, সে এসে যা করবার করে নেবে।

অসীম একটু ভেবে বললো, আমি একবার দেখতে পারি, আপনায় মেয়েটিকে?

—অবগই।

বাইরে অপেক্ষমান বেয়্যারাকে বললেন, স্মৃতিতাকে ডেকে দেবার জ্ঞান। পিতার আহ্বানে ঘরে এসে, একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখে ধমকে ঝাঁড়লো স্মৃতি। সঙ্কটিত ভাবে জিজ্ঞাসা করে—আমাকে ডেকেছো বাবা?

—হ্যাঁ মা! ইনি সুনামের কাকা অসীম, আর এইটি আমার ককা স্মৃতি। ঠেকে প্রশ্নম করো মিঠা?

স্মৃতি হেঁট হয়ে পায়ের ধূলা নিতে যায়, বাধা দিয়ে অসীম হাত ধরে বসায় ওকে নিজের পাশে।

বিচক্ষণ সমালোচকের দৃষ্টিপাত দ্বারা স্মৃতিভার সর্বাপেক্ষা লেহন করে, বাবা দিলো অসীম—চমৎকার! সুনামের উপযুক্ত হবে। লেখাপড়া, গান-বাজনা, কিছু কিছু জ্ঞান আছে তো?

—হ্যাঁ! ওর দিদিমার ব্যবস্থায় সবই চলছে। সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া গাল’স কলেজে বি. এ. পড়ছে।

—কতটুকু আদেশ করলেন সোমনাথ, অসীমের জন্তে চা আনতে।

খানিক বাদেই মায়া দেবী নিজে এলেন, নানাবিধ সুখাতপূর্ণ রূপের বেকারী হাতে নিয়ে—পেছনে বেয়্যারার হাতে ধূম্রমিত চায়ের কাপ। ছোট টিপসটিতে সব সাজিয়ে দিয়ে, পরমাশ্রিত্যের মত বললেন—চোরচুরিতে উঠে বসো বাবা, একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে। সোমনাথ পরিচয় করিয়ে দিলেন উভয়কে। অসীম হেঁট হয়ে মায়া দেবীর পদধূলি গ্রহণ করলো। বাবার সময় মায়া দেবী অসীমকে বিশেষ অমুখোষ জানালেন,—তুমি মাঝে মাঝে এলে বড়ই সুখী হবে বাবা! সুনাম তো আমাদের ঘরের ছেলে, তার কাকা তুমি, তুমিও আমাদের পরম আপন জন।

আবার নতুন যে সখ্যতা গড়ে তোলবার আয়োজন হচ্ছে, তার জন্তে তো এখন তোমাকেই আনানোশা করতে হবে।

মনে মনে স্থির করলেন,—এক দিনে বোধ করি মেয়েটায় একটা হিলে করতে পারবো!

কয়েক দিন পরে—

একটি নাইট ক্লাবের পৃথক কক্ষে, কয়েক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু সঙ্গে পানপাত্র হাতে বসেছিলো অসীম। মনে তার আলোড়িত জাগিয়েছে, স্মৃতিভার রূপ আর তার পিতার সম্পত্তি। একাধারে লক্ষ্য-সরস্বতী প্রাপ্তি যোগ ঘটলো সুনামের বরাত। একচুয়বে পাত্রটি নিশেষ করে সঙ্গেসঙ্গে টেবিলের ওপর রেখে, আপন মনে জড়িত স্বরে বলে অসীম—না! না! এ হতে পারে না, এ হতে আমি দেব না। বন্ধু নীরেন ওর কথায় হো-হো, করে হেসে ওট জড়িয়ে জড়িয়ে বলে,—

—কি হতে দেবে না বাবা? আবার বুঝি নতুন কিছুই সন্ধান মিলেছে? আর তাকে লুটে নেবার মতলব ভাঁজছো মনে মনে?

অসীম সামলে নেয় নিজে—বলে,—না! না! ও একটা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছিলাম।

নীরেন অসীমের হাতে মুহূর্তে চাপ দিয়ে বলে—কই হে তোমার উরুশীটের দশন তো এখনও মিললো না? ব্যাপার কি হে?

অসীম হাতঘড়িটি দেখলো, বাজি সাড়ে আটটা বেজে গেছে!

মনটা একটু চঞ্চল হল বৈ কি? শুকতারার আসবার কথা ছিলো, ঠিক আটটার সময়! মিনিট পাঁচেক পরেই সকলকায় অর্ধাধ্য প্রতীক্ষার অবসান ঘটালেন চিত্তভারকা শুকতারা দেবী রক্তমে আবির্ভূতা হয়ে।

মিষ্টি হাসি ঠোঁটে মাখিয়ে অসীমকে বললো—একটু দেরি করে ফেলেছি না? পেন্সা আমি তুঃখিত, বিশ্বাস করো, বেকুরে যাচ্ছি, এমন সময় এলেন হীরালাল ফেরি।

তার বইতে তিরোহিনের পাট আমি করছি কিনা সেজন্যে—বুঝতেই পারছো, বিজনেশের ব্যাপারে—বিজ্ঞপ্তি কঠে বসে অসীম—

হ্যাঁ! সেটা কিছু অন্যায় হয় নি তোমার পক্ষে! সত্যিই, ধনকুবেরের সান্নিধ্যের চেয়ে এখানকার প্রয়োজন মোটেই লোভনীয় নয় শুকতারার!

তবুও একবারে ভুলে না গিয়ে মনে করে যে এসেছো, দর্শনার্থী ক’জন যে হতো সিঁছেন বহুক্ষণ ধরে, তুমি না এলে খেসারতটা আমাকেই দিতে হত? মানে খাজবিল পঞ্চাশ-বাট চুকিয়ে আবার অন্য কোনো ক্ষুধির পেছনে হুঁপাচশো খসিয়ে তবু ওরা আমাকে রেহাই দিতো। ওরা আজ আমার গেষ্ট কি না। যা হোক তুমি খুব বাচালে আমাকে—

—তাই নাকি মিঃ হালদার? তবে তো সে টাকটা আজ আমারই প্রাপ্য, কি বলো? হেসে লুটিয়ে পড়লো শুকতারার অসীমের বুকের ওপর।

চারদিককে হো, হো, হি! হি! হাঙ্গির তুফান বইলো, বয়রা ছুটোছুটি কবলো, ডিসের পর ডিস এলো পর পর, বোতল এলো, খালি হলো।

অসীমের পকেট থেকে স্বরস্বরিয়ে টাকার রুটি পড়লো, বয়রা বার বার সেলাম হুকলো।

বাজি বারোটায় শুকতারাকে বাড়ী পৌছে দেবার পথে, —স্ব্যাবান মুক্তোর তিন নব বোধে ক্যাসানে গাঁথা...বুক

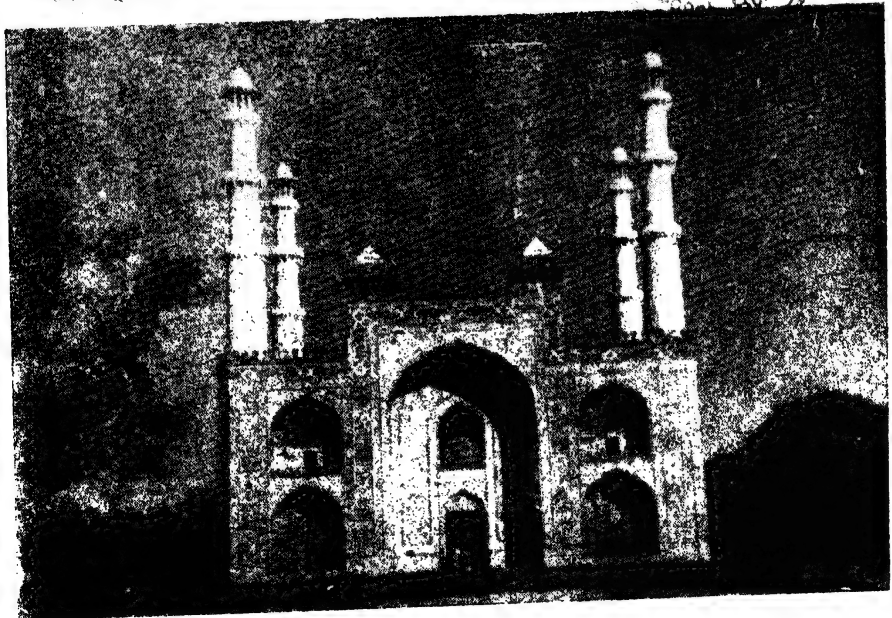
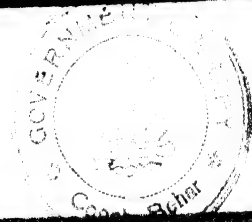




কালীমন্দির ( নিউ দিল্লী )  
—শাসন চক্রবর্তী



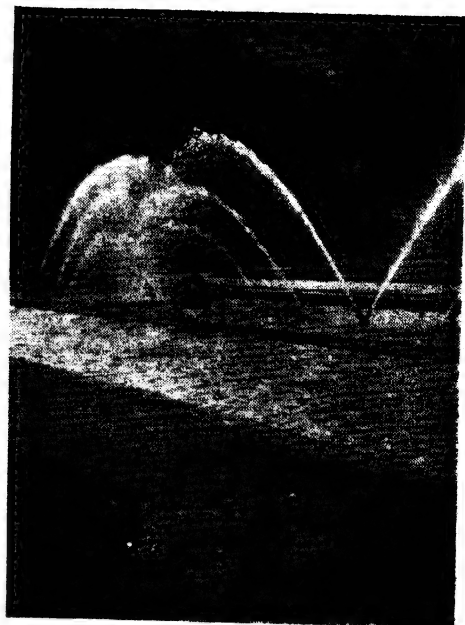
সিকান্দা ফটক ( আগ্রা )  
—অরুণাচল মুখোপাধ্যায়





দিদিমণি

—মিসেস অনুরিতি রায়



বুল্‌দাৰ্ভন গাৰ্ডেন (মাইসৌৰ)

—বৰমা ৰায়

মাছধৰা

—ভাৰা ব্ৰহ্মপাণ্ডায়





—গীতা সরকার



—সুখীন শিউ

চাঁদের হাট

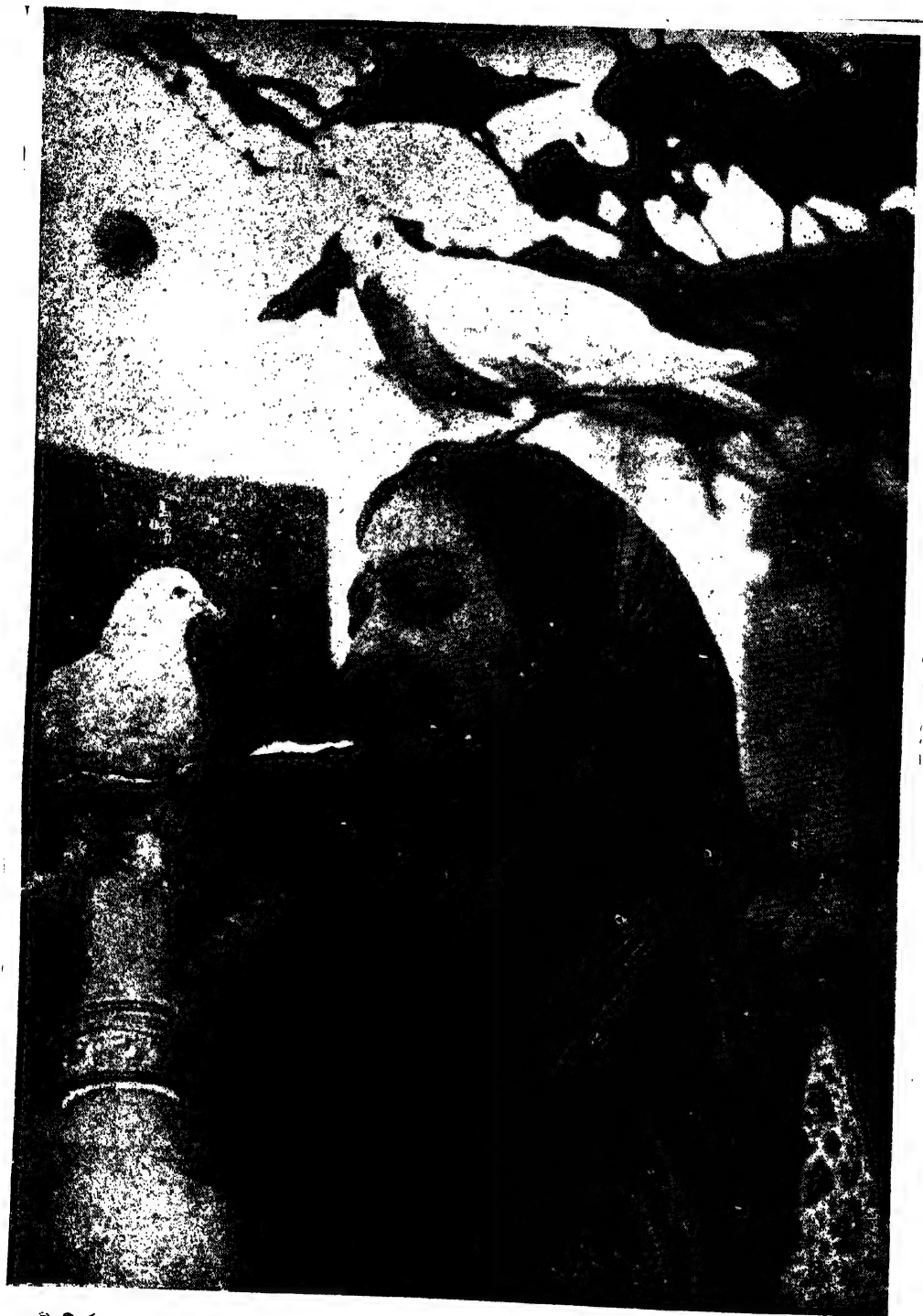


(ভার্গব)

—মামুদী চট্টোপাধ্যায়



—নীহার রায়



পক্ষীতীর্থ

—ত্রিদিব দাস

পকেট থেকে বার করে, অসীম পরিয়ে দিলো শুকতারার শুভৌল কণ্ঠে।

তারপর এ-পথে, ও-পথে, ঘুরলো গাড়ী। বারোটার কাঁটা ছুটোর ঘরে পৌছালো, শুকতারাকে তার ফ্লাটে নামিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরলো অসীম।

বিছানায় শোবার পর, একি বিড়ম্বনা! ঘুমের বংশ যেন পালিয়েছে আজ ওর চোখে ছেড়ে। চোখে আর মনে যেন কে লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে, তাই দুটোই আজ পালা দিয়ে আলিয়ে মারছে।

কি করা যায়? ও রক্ত স্রবাসের হতে পারে না, ও একমাত্র রাসায়নিক জন্তু। কিন্তু কোন্ উপায়? চলে, বলে, কৌশলে, পরিশ্রম করে, জীবন দিয়ে। অস্ত্রহস্তের প্রবল উত্তেজনার স্থির ভাবে ঘরঘর পায়চারী করতে থাকে অসীম। মনে চলতে কে যড়যন্ত্রের জালবোনা, শীকার ধরার অব্যর্থ শর সন্ধান।—কিন্তু কোনটাই মনে ধবে না। ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঘড়িতে ত্রি চারটে বাজলো, উত্তেজনার প্রকোপ কমে এসেছে। মাথা ছে, দেহ-মন অবসর। টলারমান দেহখানি ধীরে ধীরে শয্যায় লয়ে দেয় অসীম, তন্ত্রাভারে চোখ দুটো ভারি বোধ হচ্ছে।

—হঠাৎ মস্তিষ্কের বিমূঢ় অঙ্গকারে, একটি চমৎকার বুদ্ধির লী খেলে গেলো। ঠিক! ঠিক! এ-কথা তো এতদূর

মনে জাগেনি, স্রবাস তো ডাক্তারী পাশ করেছে, দানার ইচ্ছা ছিলো বিলেতে পাঠিয়ে ওকে কোনো বিবাহের স্পেশালিষ্ট তৈরী করবার।

তখন সেই বাধা দিয়ে বলেছিলো,—না দাদা! স্রবাসকে অত দূরে পাঠিয়ে কাজ নেই, এখানে বসে ডাক্তারীও করবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা দেখবে।

—কিন্তু আজ সেই ভুলটা তো সংশোধন করে নেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়! কালই দাদাকে চিঠিতে জানাবে, তাঁর কথাই ঠিক, স্রবাসের উন্নতির কথা ভাবলে, তার বিদেশে বাণিজ্য একান্ত প্রয়োজন।

হ্যাঁ। ওকে চোখের আড়াল করতে পারলে স্রমিতাকে দখল করা খুব কষ্টসাধ্য হবে না।

স্রবাস কি সন্দেহ করবে তাকে? না! কিছুতেই না! বয়সে সে মাত্র বছর চারেকের ছোট হলেও, বুদ্ধিতে সে এখনও বালক মাত্র। ওর নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিতে সে বাধ্য।

নিজের চমৎকার পরিচালনার খুসির আনন্ডে সারা শরীর বোম্বাঙ্কিত হয়ে ওঠে অসীমের। পরম তৃপ্তিতে পাশ বালিশটাকে টেনে নেয় কাছে।

জাঁখি-প্রান্তে নেমে আসে শান্তিপূর্ণ নিদ্রার জড়িমা।

[ ক্রমশঃ।

## বঙ্গাক-বিদ্যায় শ্রীমতপাপুরী দেবী

কি যেন অজানা সুরে অন্তরের অন্তঃপুরে  
ধ্বনিয়া উঠিছে এক করুণ বেদনা;  
নিত্য বার বাওয়া-আসা অন্তরে বেঁচেছে বাসা  
বুঝি তার পদধ্বনি আর শুনিব না।  
জন্ম হবে ক্লেণ রবে চিরতরে সে কী তবে  
আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক কাজে।  
সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা ভরে রব না কী তার তরে  
স্বপ্ন-স্বপ্নময় স্মৃতি-বিশৃতির মাঝে।  
বাংলার নববর্ষ জাতীয় জীবনে হর্ষ  
বুঝি আর আনিবে না প্রথম বৈশাখ।  
'শকাব্দ'র কলরবে এরে তুলে যেতে হবে,  
তুলে যেতে হবে কল্প—দেবতার ডাক।  
মাথার পিজল ভট অতিবৃদ্ধ মহাবট  
মহাতপস্বীর মত শান্ত মৌন-মুখ,  
পাঁড়িয়ে গ্রামের প্রান্তে মধ্যাহ্ন-দিনে একান্তে  
চির বিদায়ের ছবি এঁকে লবে বৃকে।  
মোর মাতা মাতামহী তাঁদের প্রপিতামহী  
কল্যাণ কামনা লয়ে নব-বর্ষ দিনে,  
কত শত যুগ ধরে গভীর ভক্তিতে ভরে  
পূজা দিয়ে গেছে হোঁধা শুচি-শুদ্ধ মনে।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গাজন-সন্ন্যাসী গানে  
মুখরিত হইয়াছে স্তব্ধ দ্বিপ্রহর;  
তুলে বাবে গ্রামবাসী উৎসব দিনের বাঁশী,  
সেই মেলা হাসি-খেলা, সেই অবসর।  
সেই নব-বৈশাখের কাল-বৈশাখীর জের  
আজও সাক্ষ্য হয়ে আছে নদীর ওপারে;  
ভেঙেছে বটের গুঁড়ি তাজিয়া অসংখ্য খুরি  
গ্রাম্য উৎসব দিনে নব বৎসরে।  
আজি কি হইবে লুপ্ত এই মোর বঙ্গ-অঙ্গ  
এরে তুলে যেতে হবে নবীনের চাপে?  
বৈশাখের সে পূর্ণাহ্ন—নববর্ষ সমারোহ  
বিশুদ্ধ হইয়া বাবে স্রবসের তাপে?  
ভাবিতে বেদনা বাজে অন্তর কলর-মাঝে  
চির-প্রতীক্ষিত মোর পহেলা বৈশাখ—  
এক বার আর আসে প্রকৃতি নিয়ম বশে  
তবু নাহি ভোলা যায় পুরাতন ডাক।  
হে বিদায়ী বৈশাখ, তোমার মঙ্গল শীঘ্র  
বাহুক কল্পের করে অন্তরীক তলে;  
আমার বঙ্গাঙ্গখানি সে চির তোমারি জানি  
অন্তরের মণিহর্যে তব বীণ ছলে।



# ফেনাকাটা

## পোশাক পরিকল্পনায় বিজ্ঞান

প্রথম মানুষ উন্নত ছিল। সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের দেহকে আবৃত্ত করবার আবশ্যিকতা অনুভব করলো। প্রথমে গাছের ছালপাতা, পশুর চামড়া প্রভৃতি দিয়েই এ কার্য সম্পন্ন হতো। তারপর বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর উপযোগী পোশাক আবিষ্কৃত হতে লাগলো, যাতে এই সকল পোশাক নীত-গ্রন্থ জল-বোদ থেকে শরীরকে রক্ষা করে আরামদায়ক হয়।

মানুষের শরীর একটি তাপ-উৎপাদক যন্ত্রবিশেষ। অবচেতন অবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে শরীর প্রায় একই তাপ বহন করে। দেহের উপবিভাগে ও হাত, পা, নাক, কান প্রভৃতি প্রান্তভাগে উত্তপ্ত রক্তপ্রবাহের পরিমাণ ও বেগ এবং নির্গত ঘাম বাষ্পীভূত হয়ে শরীরের চামড়া ঠাণ্ডা হওয়া—এই সব প্রক্রিয়াতেই প্রধানতঃ দেহের তাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের তাপ সাধারণ আয়াম অবস্থার বেশী কিংবা কম হলে আমবা বলি, গরম কিংবা ঠাণ্ডা লাগছে। অত্যধিক গরম অনুভূত হলে শরীর ত্বর্ন লাগে। যে কাজ করতে এরূপ আবহা হয় সে কাজে অনিচ্ছুক হয়। অত্যধিক শীত লাগলে শরীর কাঁপে এবং লজ্জা হয়ে যায়। এরূপ অবস্থার খুব পরিশ্রম করে শরীর গরম করবার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক।

পরিবেশের সঙ্গে তাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করে দেহের আয়াম উৎপাদন ব্যতীত ও পোশাক ব্যবহারে আরও অনেক উদ্ভেদ সিন্ধ হয়—যেমন, সামান্য আবহা থেকে রক্ষা, সামাজিক সাম্প্রতিক এবং রীতি পালন, স্নেহের শোভা-বর্নন, সৌন্দর্যতা, প্রভাবগার চর্যবেশ প্রভৃতি। তৈরীর সময় পোশাকের দাম, স্বাধিক, ওজন, নমনীয়তা ঘোষার সুবিধা এবং উপাদানের সহজ-প্রাপ্তি সখন্দে লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক। সব দিক বিবেচনা করে বিজ্ঞান-সম্মত হয়েও ক্রটি-বিরুদ্ধ হলে পোশাক অগ্রাহ্য হয়। কোন পোশাক মনোমগ্ননের পূর্বে কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করা দরকার—যেমন আবহাওয়ার ঠাণ্ডা কিংবা উত্তপ্ত করবার ক্ষমতা, দেহের স্বাস্থ্য বা তাপ উৎপাদনের সামর্থ্য, নির্দিষ্ট পরিবেশে কক্ষণ অবস্থান এবং এই সব অবস্থায় পোশাকটির কার্যকারিতা।

শরীর থেকে সব সময়ই তাপ বাইরে নির্গত হওয়া দরকার। কারণ, অত্যধিক তাপ জমা হলে শরীর ক্রান্ত হবে, এমন কি, মারাত্মক ভাবে তাপাহত হওয়াও অসম্ভব নয়। শরীর থেকে তাপ অপসারিত হবার অনেক উপায় আছে। ঠাণ্ডা পরিবেশে শরীর তাপের বিকিরণ হয়। এমন কি, রৌদ্রোজ্জ্বল গরম দিনেও দেহের

তাপ বাইরে নির্গত হতে বাধ্য পায় না। কিন্তু আবহাওয়া অত্যধিক উত্তপ্ত হলে দেহের তাপের বিকিরণ ব্যাহত হয়। দেহের অত্যধিক তাপ দূরীভূত হবার আর একটি উপায় হলো, ঘাম বাষ্পীভূত হওয়া। যখন অস্বাভাবিক উপায়ে শরীর থেকে যথেষ্ট তাপ নির্গত হয় না, তখন এই প্রথাই সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ।

খানিকটা জল উত্তপ্ত করে উষ্ণতা এক ডিগ্রি ফারেনহাইট উঠাতে যতটা তাপের দরকার, তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী তাপ শরীর থেকে শোষিত হবে একই পরিমাণ ঘাম বাষ্পীকরণে। শরীরে নিকটস্থ বায়ুর চলাচল হলেই বাষ্পীভবনের হার অনেক বেশী হয়। যে পোশাক পরলে বায়ুর চলাচল ব্যাহত হয়, সেদুপ পোশাক শরীরকে স্তম্ভ রাখবার পাঞ্জে উপযোগী নয়। চামড়ার উপর বায়ুর জলীয় বাষ্পের চাপের পরিমাণ দিয়েই ঘামের বাষ্পীভবনের হার প্রাধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়। বায়ুর চাপ যত কম হবে, বাষ্পীভবন তত দ্রুত হবে। এমন কি, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আভ্যন্তরীণ চাপেরও ষিগুণ জোরে দেহের ঘাম বাষ্পীভূত হতে পারে। আবহাওয়া যথেষ্ট শুকনো হলে কিংবা তাপ কম হলে প্রতিবেশের চাপ এক কম হতে পারে যে, ঘামের বাষ্পীভবনের হার প্রতিবেশের চাপের চেয়ে ৩০।৪০ গুণ বেশী হতে পারে। এই ক্ষেত্রে শীতকালে স্নাতস্নেত পোশাকে এক ঠাণ্ডা লাগে। আবহাওয়ার তাপ কম হলে আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ এবং দেহের চামড়া খুব শুকনো রাখা দরকার।

শীতের সময় চামড়ার নিকটস্থ বায়ুর চলাচল কম হলেই আরাম-দায়ক হয়। বায়ু একটি উৎকৃষ্ট অন্তরক। কাজেই যে পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে নিশ্চল বায়ুর স্তর থাকে, সে পোশাকও অন্তরক হয়; অর্থাৎ সেদুপ পোশাক পরলে শীতকালে গরম লাগে। গরম পোশাক মানে এই নয় যে, পোশাক থেকে তাপ শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে। এইরূপ পোশাক পরলে শরীর থেকে তাপ তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে যেতে বাধ্য পায়। এই কারণে, শরীর উত্তপ্ত থাকে। নিশ্চল বায়ুর স্তর যত মোটা হবে পোশাকের অন্তরগতাও তত বেশী হবে। প্রায় সকল শুকনো বস্ত্রের পক্ষেই এগুণ প্রযোজ্য। শুকনো তুলার বস্ত্র পশমী বস্ত্রের তুল্যই গরম হয়, যদি উভয় বস্ত্রের বুনাঁনি ও ঘনত্ব এক হয়। কিন্তু তুলার বস্ত্র ধোয়ালে পাতলা হয়ে চূড়তা এবং গরম করবার ক্ষমতা কমে যায়। অপূর পক্ষে, পশমের বস্ত্র ধোয়ালে আরও ঘন হয়, কাজেই গরম করবার গুণ বজায় থাকে। তুলা কিংবা সিন্ধের চেয়ে পশম অনেক আলগা ভাবে বোনা যায়। আলগা বুনাঁনির জন্তে পশমী বস্ত্রে যে সব রক্তের উত্তর হয় তাতে বায়ু থাকতে পারে। অল্প জাতীয় পোশাকের চেয়ে পশমী পোশাকে ঘাম শোষিত এবং বাষ্পীভূত হয় অনেক দ্রুত। এই সব

কারণে অতঃপাশ্চাত্য বস্ত্রের চেয়ে পশমী বস্ত্র পরলে শীতকালে গরম লাগে। অপর পক্ষে, গ্রীষ্মকালে শরীরের তাপ তাড়াতাড়ি বাইরে বার করে দেওয়া যায়, ততই শরীরের পক্ষে আনামদায়ক। যে সব কারণে তুলা কিংবা সিন্ধের পোশাক শীতকালে ব্যবহারের অমুপযোগী, সে সব কারণেই এ সব বস্ত্র পশমী কাপড়ের চেয়ে গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী। পশমী পোশাকের চেয়ে এ সব বস্ত্র থেকে শরীরের হাম অনেক তাড়াতাড়ি দূরীভূত হয়।

সাধারণতঃ পোশাক শরীরের তাপ বাটরে অপসারিত হতে এক বাটরের তাপ শরীরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। উজ্জল ও হালকা রঙের আবরণ বাটরের তাপ প্রতিফলিত করে। কালো রঙের দ্রব্য তাপ শোষণ করে। রোদে থাকলে মাথার কালো চুল গরম হয়ে যায় এবং মাথার খুলিকে বাটরের তাপ থেকে অনেকটা রক্ষা করে। শরীরের কালো বা কিংবা কালো পোশাক বাটরের তাপ শোষণ করে নয় বরং তাপ শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষ প্রবেশ করতে পারে না। গাণ শোষণ করবার ক্ষমতা কালো রঙের সব চেয়ে বেশী; অপর পক্ষে সাদা রঙের সব চেয়ে কম, কালোর প্রায় অর্ধেক। কালো রঙের তাপ শোষণ ক্ষমতা যদি ১০০ ধরা যায়, তাহলে অমুপাতে সাদা রঙের পরিমাণ নিম্নলিখিত সংখ্যা নির্দেশ করা যেতে পারে।

কালো	১০০
গাঢ় নীল, পাটল, সবুজ	৮৫:১০
ছাই, ধাতব	৮৫:১০
গাফি, লাল, অ্যালুমিনিয়াম,	
মুজ্জল পাটল ও নীল	৭০:৭৫
গুড়, পানীর প্রভৃতির স্রাব হালকা	৫০:৫৫
হালি	৪০:৫০

সাদা ও হালকা রঙের পোশাক অধিক তাপ প্রতিফলিত করে য কম হয় বরংই গ্রীষ্মকালে পরিধানের উপযোগী। অপর পক্ষে লো এবং গাঢ় রঙের পোশাক অত্যধিক তাপ শোষণ করে গরম, সেজন্তে শীতকালে ব্যবহারের পক্ষে আনামদায়ক। প্রথম রোদে স্তম্ভ আবহাওয়ায় ঢিলে সাদা পোশাকই সবচেয়ে উপযোগী। টুপিও যে কোন গাঢ় রং না হয়ে সাদা হলে, টুপির নিচে মাথার নিকটস্থ র তাপ অমুপাতে প্রায় কুড়ি ডিগ্রি ফারেনহাইট কম হতে পারে।

পোশাক এরূপ ভাবে পরিকল্পনা করতে হবে, যেন শীতবস্ত্র খান করলে চামড়ার নিকটস্থ বায়ুর চলাচল কম হয়। কিন্তু লেও নিশ্চিত পোশাক পরা উচিত নয়, যাতে শরীরের নিকটস্থ চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ পোশাক পরলে হাম শুকাবে না, ভিতরের বস্ত্র হামে ভিজে যাবে, বস্ত্রের অন্তরগততাও যাবে এবং শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

যে দেশে মূর্ধ্বের তেজ প্রধার, বায়ু শুকনো এবং আবহাওয়ার তাপ পতনই শরীরের চেয়ে বেশী, সেখানে হামের বাস্পীভবনই শরীর হবার একমাত্র উপায়। বায়ু শুকনো হওয়াতে জলীয় বাষ্পের কম থাকে, কাজেই হাম বাস্পীভূত হয়ে শরীর ঠাণ্ডা হবার খুব হয়। মরুভূমিতে বেহুইনেরা নিজেদের দেহকে মূর্ধ্বের তাপ হ থেকে রক্ষা করবার জন্তে হালকা রঙের মোটা আলখাল্লা শরীরের খুব কম অংশই উন্মুক্ত থাকে। এই পোশাক সূঁছে যেভাবে বাবার উপযুক্ত ছিদ্র থাকে। এরূপ পোশাকের মূহ

## প্রাণতোষ ঘটক রচিত

### বাসক সজ্জিকা

"একখানি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ প্রাণতোষ ঘটকের 'বাসকসজ্জিকা'। লেখক যদিও উপন্যাস রচনা করেই পাঠক-পাঠিকার কাছে পরিচিত হয়েছেন, তবু এই সঙ্কলন থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি প্রকৃত-পক্ষে ছোটগল্প রচনায় সিদ্ধান্ত। তাঁর গল্পের ভাষা বেশ হৃদয়গ্রাহী ও ব্যঙ্গনাময়। এবং হৃদয়ের পরিবেশন-পরিমিতর ফলে অধিকাংশ গল্পই একটি উন্নত পণ্য হয়ে পৌঁছেছে।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। মিত্র এণ্ড ঘোষ প্রকাশিত। কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

### মুক্তাভাস্ম

"There is no false idealisation, no cheap dip into smutty episodes. The work shows some planning and purpose. For it is a frank exposure of a private way of life that has no justification for its continuance and the writer has wisely left the tale to be wound up by a remorseless nemesis." —Amritabazar Patrika. প্রকাশক বঙ্গল পাবলিশার্স। দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

### \* বহুভাষা \*

"এখানি সমার্থাভিধান। ইংরেজীতে বলা হয় Synonym-এর অভিধান। বাংলা ভাষায় এ বকম অভিধান আর নেই। বীমের লেখা অভ্যাস তাদের পক্ষে এ জাতীয় একখানি সিনোনিমের অভিধান হাতের কাছে থাকলে শব্দচয়নে বড়ই সুবিধা। শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষেও খুবই প্রয়োজনীয় বই হয়েছে। প্রাণতোষ সংস্কৃত, ইংরেজী, বাংলা বহু অভিধান ও ভাষাতত্ত্বের বই খোঁজে অনেক পরিজ্ঞান করে শব্দগুলি সংকলন করেছেন। এ বইয়ের যথাযোগ্য আলব অবজই হবে।"—যুগান্তর। প্রকাশক ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ কলিকাতা-৭। মূল্য আড়াই টাকা।

### আকাশ-পাতাল

"Those who will probe deep into the antiquities of Calcutta will come across many such episodes. It is with unique delicacy, singular honesty and charming simplicity that the noted author presents in an original way an old episode—a tragic one." —Amritabazar Patrika গত কয়েক বছরে এই বিখ্যাত গ্রন্থের প্রায় চার হাজার কপি বিক্রয় হয়েছে। প্রকাশক ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ কলিকাতা-৭। মূল্য ১ম পাঁচ টাকা ও ২য় পাঁচ টাকা বারো আনা।

### কলকাতার পথঘাট

"আলোচ্য গ্রন্থের লেখক উপযুক্ত নির্ভর ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই সেই সব বিম্বতপ্রায় ঘটনাবলী আহরণ করেছেন এবং তা গ্রন্থনও করেছেন অশ্রু শিরকুশলতার সঙ্গে।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। প্রকাশক ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, কলিকাতা ৭। মূল্য তিন টাকা।



আন্দোলনেই যথেষ্ট বায়ু চলাচল হয়, কাজেই স্বাভাবিক শরীর থেকে ক্ষত বাস্পীভবনে কোন বাধা থাকে না।

শীতকালে হাত-পা ঠাণ্ডা হওয়া সত্ত্বেও খুবই অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু শরীরের এই সব প্রান্তভাগে অতিরিক্ত গরম পোশাক চাপিয়ে এ সমস্তার সমাধান করা যায় না। অত্যধিক ঠাণ্ডার দেহের উত্তাপের অপচয় বাতেনা হয়, সে কারণে প্রান্ত-ভাগে রক্ত চলাচল অনেক কমে যায়। এ অবস্থায় শরীরের ভিতর থেকে প্রান্তভাগে খুব কম তাপই পরিবাহিত হয়। দেহের ভিতর থেকেই হাত-পা গরম করার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিশ্রম করে শরীরের উত্তাপ বাড়ালে যথেষ্ট রক্ত চলাচল হয়ে হাত-পা গরম হবে। প্রায় সব অবস্থাতেই মাথা উত্তপ্ত থাকবার মত যথেষ্ট রক্ত সরবরাহ হয়। সাধারণতঃ মানুষ ভ্রম বশতঃ মনে করে যে, মাথা ও মুখ উত্তপ্ত থাকতে এদের আর কোন আবরণের দরকার নেই। কিন্তু হাত-পা ঠাণ্ডা হওয়ার দরুন এদেরই ঢাকা দরকার। বস্ত্রতঃ, শীত-কালে ঠাণ্ডা হাত-পার চেয়ে উষ্ণ মাথা থেকেই অধিকতর তাপ নির্গত হয়। শিরস্ত্রাণ অপসারিত করলে পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

যুদ্ধের সময় নানা দেশে বিভিন্ন আবহাওয়ায় সৈন্য পাঠাবার সময় পোশাক পরিকল্পনা সত্বেও অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়, প্রতিবেশ অনুযায়ী বস্ত্র তৈরী কর্তব্য। কেবল পরিকল্পনা নয়, বিভিন্ন প্রতিবেশে যাতে বস্ত্র লোকসান না হয় সে সত্বেও উপায় উদ্ভাবন করা দরকার। পশমী মোজার সূত্বে নিবারণ করবার উপায় আবিষ্কার করতে পারলেও অনেক টাকা ব্যয়গোনা যায়।

আঙুন, নানাপ্রকার গ্যাস প্রভৃতি থেকে রক্ষা করবার জন্তেও নানাপ্রকার পোশাক তৈরী হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবেশ ও অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন পোশাকের পরিকল্পনা যত বৈজ্ঞানিক উপায়ে করা যাবে, মানুষের জীবন-বাঁচা তত আরামদায়ক হবে।

—শ্রীকিশোরীশঙ্কর সেন।

## চাকরি রদবদলের সমস্যা

বর্তমান সমাজ-কাঠামোতে একটি কোন চাকরি ছুটোতেই হিমসিম খেতে যেতে হয়। বেকার-সমস্যা সর্বত্র দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এই অবস্থার নতুন করে আর একটি চাকরি মিলবে, সাধারণ ক্ষেত্রে এই আশা সন্দেহপরাহত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—যে চাকরিটি পাওয়া গেল, সর্বাবস্থায় তাতেই কি স্থায়ী থাকতে হবে শেষ অবধি?

চাকরিজীবীর ক্ষেত্রে এইটি সত্যি একটি জটিল সমস্যা যখন অপর কোন নতুন চাকরি পাওয়ার প্রশ্ন উঠে। কত যুবকের কর্তৃত্ববনেই এক-দুইবার এইরূপ সমস্যার উত্তর হওয়া বিচিত্র নয়। সহজ কথায় সমস্যাটি হল—যে চাকরিতে রয়েছি, তা আদৌ ছাড়ব কি না এবং একই সঙ্গে যে চাকরির সন্ধান এসেছে সেটি গ্রহণ নিরাপদ ও সম্ভব হবে কি-না। প্রথম দফা চাকরি খুঁজে পাওয়ার চেয়ে চাকরির এই রদবদলের প্রশ্নটি নিশ্চয়ই কম কঠিন নহে। কেন না, পুরানো কাজ ছেড়ে একটি নতুন কাজ গ্রহণের সিদ্ধান্ত, সমস্ত জীবন-ব্যাপী এর পরিণাম ভুগতে হবে, ভালই হোক, আর মন্দই হোক।

বলা হয় যে, জীবনে দারিদ্র্য যেখানে কম রয়েছে কিংবা বরস তখনও খুব বেশী হয়ে যায় নি, সেক্ষেত্রে সব রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাই চলতে পারে—একটা চাকরি ছেড়েও নতুন চাকরির খুঁকি

লওয়া যায় অনেকটা সাহস করাই। আর এ ধরনের খুঁকি নেবার প্রবৃত্তি বা আগ্রহ যদি যুবপ্রাণে না দেখা গেল, তবে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব? অবশ্য জীবনের প্রারম্ভেই সাংসারিক দায় ও দায়িত্বে যদি খুব বেশীরকম জড়িয়ে পড়তে হয়, বর্তমানকে ছেড়ে যখন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরীক্ষার চিন্তাই সম্ভব নহে—সেই অবস্থায় চাকরি রদবদলের প্রশ্ন নেহাৎ অবাস্তব। এইরূপ ক্ষেত্রে যিনি যে কাজে আছেন, আঁকড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই, নতুন সে যতই রতীন হোক, 'লোভনীয় হোক—দুঃখের হলেও তাঁর কাছে সেইটি বৃদ্ধি পরিত্যজ্য।

অনেক ক্ষেত্রেই জীবনে দুইটি সন্ধিক্ষণ এসে দেখা দেয়—যে সময় প্রত্যাশিত উন্নতির খাতিরে নতুন কোন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে উঠে। একটি সন্ধিক্ষণ হচ্ছে—বয়স যখন কম থাকে এবং মনে থাকে নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে উন্নত করার প্রতিশ্রুতি ও দৃঢ়তা। দ্বিতীয় সন্ধিক্ষণ—যখন কণ্ডজীবন প্রায় শেষ হয়ে আসছে এবং পরিবারেরও নিশ্চিত উন্নতির হয়েছে ব্যবস্থা। এইটি বয়স জোর দিয়ে বলা যায়—আর্থিক দায়িত্ব যদি খুব বেশী না হইল এবং বয়সও না পায় হয়ে গেল যৌবনের কোঠা, সেই ক্ষেত্রে একটি কাজ ছেড়ে ভাল হবে মনে করলে নতুন কোন কাজের খুঁকি নিতে আপত্তি নেই। চাকরির এই রদবদলের মুহূর্তে নিম্নোক্ত তিনটি গুরুত্বীয় মূল্য মনে রাখা বোধ হয় সমীচীন হবে:

(১) চাকরির লাইন পাশটান কিংবা নতুন কাজ গ্রহণের প্রশ্ন যখনই আসবে, কাজে যাবার পূর্বেই অবসর সময়ে জেনে নিতে হবে কোন মূহুর্তে কাজটা আসলে কি এবং কতটা উন্নতির সেখানে সম্ভাবনা। অর্থাৎ একটি কাজে ইচ্ছুক হয়ে অপর কাজেই যাবার মুহূর্তে সন্দেহ ও বিধার যেন খুব বেশী অবকাশ না থাকে, সেইটাই এখানে দাবী।

(২) মনের পূর্বোক্ত প্রস্তুতি ছাড়াও আলাচ্য অবস্থায় আর একটি জিনিষের প্রয়োজন আছে। নতুন যে চাকরির সন্ধান করা হচ্ছে সেইটি পাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে হাতের কাজটি ছেড়ে দেওয়া মোটেই সম্ভব হবে না।

(৩) এখনকার কাজের ক্ষেত্রে যিনি 'বস' বা উপরিওয়ালার, প্রয়োগ খুঁজে তাকে নতুন চাকরিতে যাবার বিষয় বলা অনেকক্ষেত্রে ভাল। কারণ সেক্ষেত্রে কণ্ডপ্রার্থীর উত্তেজিতপনায় তিনি সুরক্ষা হবেন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির সহায়ক হিসেবে তিনি তাকে যেচ্ছায় তুলে দিবেন একটি উপযুক্ত সুপারিশ পত্র।

অবশ্য একটি কথা থেকে যায় এর ভিতর—যে কাজ এখন রয়েছে সেইটি যদি মনোমত হয় এবং উন্নতির প্রয়োগ ও সম্ভাবনাও থেকে থাকে সেখানে, সেইক্ষেত্রে চাকরি রদবদলের প্রশ্ন উঠে না। যে যে কাজে সক্ষম কিংবা যে কাজের উপযোগী সে-কাজটি জুটে না যাওয়া পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতঃ ঘুরাফেরা করতেই হবে। একবার উপযুক্ত কাজ হাতে এসে গেলেই এবং কাজের অবস্থা-ব্যবস্থা ও মাস মাহিনা যদি অমূল্য হলো, তা হ'লেই আর ততখানি ভাবনা নেই। মোটের উপর, চাকরির রদবদলটাই বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে জীবনে উন্নতির প্রশ্ন এবং মনের মত ও যোগ্যতা অনুসূচক কাজ পাওয়া। অপর দিকে রদবদলের প্রশ্ন যখনই সামনে এসে পড়াবে, তখন চাই—স্থির চিন্তে চিন্তা ও কর্তব্য নির্ধারণ এবং খুঁকি নেবার যতো শক্ত মনোবল।





# বেচারা....

লতাপাতা শূণ্য বৃক্ষ যেমন দেখিতে ভাল লাগে না,  
বিবাহের ব্যাপারেও তেমনি কষ্ট যতই  
গুণবতী, স্বাস্থ্যবতী ও ফরসা রংয়ের হউক না কেন  
কেশের অপ্রাচুর্যে কপালের প্রসারতা দেখিয়া যাহারা  
কষ্ট দেখিতে আসেন, একবার দেখিয়া আর  
পুনরায় কথাবার্তা উত্থাপন করেন না।

কিন্তু একথা জোর করিয়াই বলিতে পারা যায়—  
কে, এম, পি, (K.M.P.) মার্ক খাঁটি নারিকেল তৈল  
যাহারা একবার গৃহে প্রচলন করিয়াছেন তাহারা  
একপ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েন নাই।



কে, এম, পি  
মার্ক  
খাঁটি নারিকেল তৈল  
এখন

১ পাঃ ২ পাঃ ৫ পাঃ সুদৃশ্য  
ছাপান টিনে সম্ভ্রান্ত ডিলারের  
নিকট পাওয়া যাইবে।

## পবিত্র হিন্দু অয়েল মিলস্

১, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রট,  
কলিকাতা-৭ : Phone : 34-3414



বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য

পিছুকে তীরভূমি ফেলে-আসা নদীর মতো অশ্রু অতীতকে করে যে মন থেকে প্রাণ মুছে ফেলে বসেছিল। নিজেই জানি না। দেশ ছেড়ে কোলকাতার মোহানার এসে আশ্রয় নিয়েছি; স্বাধী ব্যবস্থা প্রায় শেষ। তবে মনটা নাকি স্টেট নয় যে সব কিছু সময়ের জল বুনিতে ধুয়ে-মুছে সাক হয়ে যাবে, তাই যতোই কেন জীবনের লড়াই, ব্যস্ততার ঝড়ে বিক্ষিপ্ত থাকি না,—মাঝে মাঝে ধমকে দাঁড়ানো হুহুর্ভে, চোখের সামনে স্মৃতির রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে—দেশ গ্রাম; শৈশব থেকে পনরটা সবুজ সতেজ ভোয়ের মতো বছর। মনে পড়েছে পটুয়াখালি, আলারিয়া নদী। ক্ষণিক যদিও। তার পরই জলপ্রপাতের টানের আওতার মধ্যে আসা কুটীর মতো কামেলা, বড়োটা, পুনর্বারনের ব্যবস্থা, রঞ্জি-রোজগার, সঙ্গারের ঘুণি কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অতীত রোমন্থনের বিলাস। তলিয়ে দিয়েছে অনবসরের অতলে। তরতো এমন ভাবে আর কখনো সে সব দিনের তার পাত্র-পাত্রী নিয়ে—কারনিক পুনরুজ্জীবন চাক্ষুষ দেখার সময় পেতাম না এ জীবনে। কখনোও না। যদি না পূর্ব সঙ্গ হঠাৎ দেখা হ'য়ে যেতো হাওড়া ষ্টেশনের বাস্তবতার অপরিচ্ছন্ন জটিলার।

কতো দিন হ'য়ে গেলো; আজ থেকে পনরটা বছরের মাইলপোষ্ট গুণে গুণে উজ্জ্বল বয়ে গেলো দেখতে পাট—আর পাঁচজন পূর্ববঙ্গের ছেলের মতো বরিশালের পটুয়াখালি স্থল থেকে ম্যাট্রিকের-বেড়া ডিঙ্গিয়ে কোলকাতায় এসেছি উচ্চশিক্ষার আশায়। দেশে জমি-জমা—চাষ-বাস, সুপরি-নারকেলের ব্যবসার ওপর জ্যাঠা মশাইয়ের কবিবাজী। নির্বিশ-নিশ্চিত। মাসের প্রথম সপ্তাহেই বরাদ্দ টাকা এসে যায়। না এলে কোলকাতায় ব্যবসা-করা দেশের লোকের গদী থেকে ইচ্ছে মতো হাওলাত।

আর যেদিন এলো! দু-একজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বেজোরা'য় প্রাণভরে আহাব-নির্ধাত কর্মসূচী। এখন মনে করলে চোখে জল টল-টল ক'রে এসে পড়া সে সব সোনালী দিন ভালো লাগে, ধারাপণ। এ সব দিন যে কখনো আসবেই নয়, এমন অবস্থা যে থাকতে পারে তাই ভাবা যায়নি কখনো। আমায় বাবা ছিলেন না জানতেই পারিনি কোনো দিন, এমন জ্যাঠামশাই ছিলেন। অপূত্রক তিনি। বুক দিয়ে শুধু বিবর-লশপ্তিই রন্ধে করেন নি। আমাবের ভালোবেসে-হুম দিলের হৃদয় দতো। উনিশশো বিরাট সাল থেকে সাতজন

সাল পর্যন্ত নাকি কুগ্রহের দৃষ্টি ছিলো ভারতের ওপর। বৃদ্ধ, দুর্ভি বজা, মহামারী মড়ক আর দাঙ্গার হারবার করেছে সে দৃষ্টি—আমাদের বেলায় কিন্তু তা নয়, বিরাট সাল থেকে চিরকাল,—চিরকাল দুর্দিন। মানুষ তো তা বায়ে না।

বৃদ্ধের হিড়িকেই বলতে হবে তেভানিশ সালে আরো শিক্ষার আশা তাগ ক'রে এক সওদাগরী দপ্তরে চাকরি পেয়ে জেবেছিলো প্রতিষ্ঠা বৃষ্টি হাতের মুঠায়! কিন্তু জলে-ডোবা অবস্থায় ঝড়কুটীর মতো চাকরিকেই আঁকড়ে থাকতে হবে তখন কে জানতো! প্রথম থাকা জ্যাঠা মশাইয়ের হঠাৎ স্বংস্পন্দন বন্ধ হওয়া। দায়িত্বটা কি জিনিষ বুঝলাম।

তবু হয়তো চলে যেতো যা হোক ক'রে। হ'লো দেশভাগ, আর তার কিছুদিন পরেই সর্বনাশা পঞ্চাশের বরিশাল হত্যাকাণ্ড।

কয়েক দিনের লোহার পদা ভেদ ক'রে কোনো খবর আসা না বরিশালের বাইরে। দৈনিক কাগজে ছিটকে বেরিয়ে আসা খবরে নিজের গ্রামের হত্যাকাণ্ডের টুঙ্গ-বাদ পড়ি। চেনা-শেনা পাড়ার লোকের হত্যার সবাদে শিউরে শিউরে উঠি। সব বৃষ্টি যায়। গেলোও। অবস্থা দেখে নিজের মৃত্যুকামনাই প্রের: মনে হলো। মা জ্যাঠাইমা, ভাই-বোনদের এর কয় দেখতে হবে জীবনশযায়? লজ্জায় অপমানে পরিত্রাণ উপায় হীনতায় মিশেহারা হ'য়ে গেলাম। তবু শেষাঙ্গা ষ্টেশনের আশ্রয়প্রার্থীদের দীন ভীর্ণ অপরিচ্ছন্ন ভীড় থেকে ওদের চিনে বার করতে হলো একদিন। বৃকফাটা কারা স্তনতে হ'লো, আর হতাশ হয়ে দেখতে হ'লো—ক'দিনেই আমবা। পথের ভিথি ছাড়া কিছু নই। সমস্ত কিছু ত্যাগ ক'রে শুধু মাত্র প্রাণ নিয়ে একবস্ত্র ওরা পালিয়ে এসেছে।

চাকরিটুকু স্থল। থাকি মেসে। বুক ফেটে গেলেও প্রথম কয়েক মাস ওদের খুলিয়া ক্যাম্পে রাখতেই হ'লো সরকারী আশ্রয়ে। তার পর থেকে ভাগ্যের সঙ্গে অবিশ্রাম আপোহীন সংগ্রাম।—আজ্ঞা চলেছে।

একে দুঃখ-দুর্দশায় মানুষের সংগ্রাম-শক্তি বেড়ে যায়, তার ওপর পূর্ববঙ্গের আমবা প্রাকৃতিক নানান বিরূপতার সঙ্গে শাখত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্তেই বোধ হয় কিছুটা সহজাত সহন আর সংগ্রাম-শক্তির অধিকারী। তাই বাঁচালো। ধীরে ধীরে ভাইয়ের চাকরি হওয়ার পর কোলকাতায় বাসা করতে পারলাম একটা মাথা গোঁজার মতো। ওদিকে বেশ কিছুদিন এগুৱানু হাউস ধরা দিয়ে দিয়ে কোম্বগরের কাছে একটু জমি সাহায্য পেলাম। কিছু ঋণও। প্রাণপণ ক'রে একটা টিনের ঢালাওলা তিন ঘরের কুঁড়ে খাড়া করেছি আজ।

অফিসে খণের পাছাড়। তাতেও শেষ হয় না। এমাসে এটা কবি তো ওমাসে ওটা। কোনো মাসে কুরো, কোনো মাসে বা দরজা-জানলার রঙ। সঙ্গ সঙ্গ নিয়মিত কোলকাতার অফিস বজায়। কিন্তু স্বভাব কোথায় যাবে।

এ সবের মধ্যেও সাপের মুখে থাকা ব্যাঙের পোকা ধ'রে খাওয়ার মতো, এই অবস্থাতেও বিয়ে করে বসেছি লক্ষী ছেলের মতো। বিয়ে না, সর্বনাশ ক'রেছি বলাই ভালো বোধ হয়। সব দিক থেকে নিয় যথাবিত্ততার নাগপাশের বেড়ে নিজেকে বেঁধেছি আটপুঠে।

আগেকার দিন ভাবার সময় কই? কোথায় মনে পড়ানোর মতো মন?

কেনো দিন কখনো এমন ক'রে মনে পড়ত না, যদি না পূর্ণর সঙ্গে চাঁদ দেখা হ'য়ে যেতো হাওড়া ট্রেনের চিড়িয়াখানার জন্তুদের মতো শিল্পের শিল্পের ক'রে ভাগ ক'রে রাখা আশ্রয়প্রার্থীদের দীন-জীর্ণ অপরিস্কার ভটলায়।

আমি ওদিকে চাইতাম না। সে দুখে বৃকে মোড় দিলো আর চোখ ফেটে জল আসতে চাইতো। ব'লে প্রায় চোখ-কান বন্ধ ক'রে হাওড়া শেরালদা ট্রেনের দলা পাকানো পাকানো নোয়া চরম দুর্দশাগ্রস্ত ভটলা পার হ'য়ে যেতাম! কোন দিনও চাইতাম না।

শনিবারের বারবেলায় আর এক চরম থান্ডা ছিলো কপালে। চাইতেই হলো। কামেলা কি এক রকম? রেলের মাসিক টিকিটটা ভুলে এনে কোয়ার সময় টিকেট কেনার জন্তে খার্ড ক্লাস টিকেট-জানলার কাছে যদি না পঁড়তে হ'তো, তা হ'লে লেখাই হ'তো না এ কাহিনী আর আমার মনেও পড়তো না পুরোন করারী দিন। হয়তো ভবিষ্যৎ। জা না হ'লে এই সমস্ত হার্যাকার সংঘটিত হবেই বা কেন?

বেশ কিছু গরু মনে ক'রে মুখে-চোখে যথাসম্ভব বিরক্তির পোচ গাগিয়ে ঝাড়িয়েছিলাম টিকেট কাটতে চাওয়া জনতার আঁকাবাঁকা গাইথল-লাইনে।

—মেগো নিমাই না?

কী যেন ভাবছিলাম অজ্ঞমনঙ্ক হ'য়ে। হয়তো কুয়োর পাড় গাওয়ার কথা। চমকে উঠলাম। দমকা হাওয়ায় বইয়ের নেকগুলো পাঠা টুটে গোড়ার দিকে চলে যাওয়ার মতো এক ডাকে ধরে গেলাম যৌবন-প্রত্যাহার সোনালী সন্ধ্যা দিনে।

—নিমাই না! তাই ক', ঠিক চিনছি।

অতি পরিচিত গলা। একটু হকচকানি, বিমূঢ়তা, তারপরই গাং পরিচয়ের বিদ্যুৎ চমকে উঠতে দেখলাম আমার মুখে, নদিক দৃষ্টিতে।

—আরে, পূর্ণ?

কী আশ্চর্য! পটুবাথালির বিখ্যাত ধনী নিতাই সাহার নাতি। ঝাঝাঝা জীবন সাহার আচরে হুলাল আমার বাল্যবন্ধু প্রিন্স পূর্ণ হাকে দেখছি? ঠিক তো? আমার দোষ ছিলো না। চেনা জ নয়। গ্রামের সব থেকে সৌখিন—প্রায়-রাজপুত্র—পূর্ণ?

জীর্ণ মলিন বস্ত্রে অপরিস্কার জিরজিরে বাতায়—পূর্ণ একটা বাচ্চা লর শেখেন ঝাড়িয়ে টিকেট কাটতে চাওয়াদের কাছে ভিক্ষা ছিলো এক মুহূর্ত আগেও দেখছি। চিনতে পারিনি। পাথার গও নয়। নিজেই পরিচয় দিলো আর লজ্জিত হ'লো না পূর্ণ।

—হ রে. সেই পূর্ণ! তোর আর দোষ কি? চেন্বে পাথার গা আছে কী কিছু? সত্য। তুইও বলাইচো, সহজে চেন্বে রে নায়।

—এ কি অবস্থা তোর? কী কইরগা এ্যামন হইলো রে পূর্ণ? (বা পূর্বস্বপ্নের দেশের লোকের কাছে দেশের ভাষা বলি।) না ল, বাক-বিজ্ঞাপন পাত্র, তিরস্কৃত হই। আমার এ প্রেমের রাজন ছিলো না বুঝলাম।

আমার চাখ-হুয়ের অবস্থা দেখে পূর্ণ নিজেই নিজের কথা বলার তৈরী হ'য়ে গিয়েছিলো ওরি মধ্যে। নিচুতে গড়া-উড়া হাওয়া

থেকে দেখা ঘব-বাড়ি, গাঁছ-পালা, শহর গ্রামের মতো সমস্ত দেশের জীবনটা এক লহমায় চোখের সামনে দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে তার সমস্ত দৃশ্যপট নিয়ে স'রে স'রে চলে গেলো—।

পাঠশালা থেকে ছুট।

আলোরিয়া নদীতে ওদের নৌকর দুপু-বিকেল ক'বা থেকে, পূর্ণর বিয়ের পর অন্নপূর্ণা বৌদি, আমি আর পূর্ণর দীর্ঘ দুপুর ওদের বাড়ির শেছন দিকের পূর্ণর পড়ার ঘরে কাটানো পঞ্চম—

সম্পন্ন আর আনন্দামুভূতি মাছুষ চেপে বেখে শুখ পায় না বোধ হয়। অন্তত দেখানো চাই। তার ওপর এখনকার হিসেবে বাল্য-কালেই বিয়ে হওয়ার কি না ভাবি না, পূর্ণতার জীকে ভালোবাসার প্রদর্শনী, আমার শোহাগের সাক্ষী রাখতো আমাকে। দেখিয়ে দেখিয়ে আমার ক'রে আমাকেই লজ্জায় ফেলতো। প্রথম প্রথম লজ্জায় লাল হ'য়ে আপত্তি করতো অন্নপূর্ণা বৌদি; স'রে স'রে যেতো—। শেষে নিরুপার হ'য়েই ঘরে বাসা করা চড়ুই পাখির মতো আমাকে লজ্জা অশ্রোজ্ঞানীয় মনে ক'রে পূর্ণর কাঁধে মাথা রেখে আমার খেতো চেখে চেপে, আর সলজ্জ তৃপ্তুর হাসিতে উতুলে উঠতো।—এক লহমায় সমস্ত ভেসে ভেসে, কুটে কুটে উঠলো শ্রুতি থেকে মানসিক চোখে, জলছবির মতো—।

—কী সর্বনাশ হইলো ভাই তাম্, ভাগ হইয়া! আমাগো দেশ গায়ে আমরা বিদেশী?

পশ্চিমবঙ্গ হোমিও ষ্টেট স্ক্যালারীর ভূতপূর্ব ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বেসল হোমিওপ্যাথিক ইনস্টিটিউটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, আন্তর্জাতিক হোমিও কলেজের ভূতপূর্ব ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষা, এম. এ, এইচ-এ-বি এণ্ডিট

কয়েকখানি অতুলনীয় পুস্তক

(৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা লব্ধি)

১। শিশুরোগ চিকিৎসা।

পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ  
৫০ পৃ—৫৫০

উদরাময়, আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধতা, কলেরা প্রভৃতি পরিপাক যন্ত্রাদির পীড়া—ব্রুকাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্রের পীড়া—জ্বাৰ, হাম, বসন্ত, ডিফথেরিয়া, ছপিকক্ষ, ক্রিমি, মেনিনজাইটিস, চক্ষুরোগ প্রভৃতি সাধারণ পীড়া—স্বাভি, রিকটস্ ম্যারাসমাস প্রভৃতি শিশুদের বিশিষ্ট পীড়াসমূহের বিস্তৃত আলোচনা ও চিকিৎসা অতি স্বল্পর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ, স্বাবদপত্র ও মাসিক পত্রিকা দ্বারা উক্ত প্রশংসিত।

২। কলেরা, হাম ও বসন্ত চিকিৎসা।

১৫২ পৃ—  
২৫০

৩। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা।

পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ—  
৩৯৪ পৃ—৩৫০

Late Dr. Sarat Chandra Ghose M.D., M.R.S.L (Lond.)

"You have dealt with the diseases of females and their Homoeopathic treatment in a masterly way; the symptomatic indications of remedies are simply wonderful. Your book bears the stamp of being written by one who is a thorough master of the subject dealt with..."

প্রকাশক—গুপ্তাকার হোমিও হল, ১২২১, বোম্বাইর ট্রাট, কলি:

চমক ভাগলো পূর্ণর আত্মকাতিনীর ভূমিকায়।

একটা শালা কাগজে কলমের আঁচে দেশভাগা স্বীকৃত হ'লো। সেই আঁচে যে ছায়ায় হাজার মানুষের ফদফদ দুটোকে দুভাগ করে দেয়ার আঁচড় হ'লো তা কেউ ভেবে দেখেনি বুহন্তর স্বাধের মোহ আর মহিমায়।

—নানান বিপদ-আপদ, ক্ষয়-ক্ষতি, অপমান লাগনা সহ কটবলাও শৈতক বুঝানার লোকানন্ড আঁকডাইয়া পটুগা ছিলাম পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত। বাবারে জানাথ, তো? ঠাকুরার অতো সম্পত্তি কপূরের মুতো উড়াইয়া দিলেন মদ আর মাইয়া মাহুয়ে! তেজাতি কারবার গ্যালো। ভায়ে দোকান, তাও ছাইডুগা আইথে হ'লো। দাঙ্গায় প্রাণপণে বাইতো, কোনোক্রমে পলাই বাঁচা—। বাবা কিছু আয়ন নাই, তাঁর বন্ধিতার বাড়িতে দাঙ্গায় বলি হঠাৎ ন।

কিছু না হঠলেও দোকান, বাড়ি, জমি, বাগান, পুঁথির লটগাও ভায়ে পর্যন্তও বড়লোকটি ছিলাম রে! আর আইজ্ঞ জাথছো? জিহারা! পূর্ণর চোখ চলতল ক'রে উঠলো।

সত্যিই! আশ্চর্য! কয়েক বছর আগের দেখা এক প্রায়-রাজপুত্রক আশ্রয় ছেলের হাত ধ'রে প্রকৃতই ভিকে করতে দেখেও যতোটা আঘাত পাবার কথা, যেন পেলাম না। গা সওয়া হ'য়ে গেছে সব। কোনো পরিবর্তনই পরিবর্তন নয়। আশ্চর্য হই না কিছুতেই। সবই সম্ভব—স্বাভাবিক। সমস্ত।

—হ, তোর বাবার নাম নিহত লোকের লিষ্টিতে উঠছিলো, দেখছিলাম। তোগো কতো খোজ করছি; হমিশ পাই নাই। কোথায় ছিলি ক' দেখি?

পূর্ণ আমার পথের সকলের জানা—চরম দুর্দশা আর লাঞ্ছনার কথা শোনালো এক নিঃশ্বাসে।

—ভায়ে নিঃবিকল অবস্থায় উড়িয়ায়। সেখানে কী আমরা থাকতে পারি ভাই? কষ্টের অবধি ছিলো না। মা আর তোর বৌনানের চেহারা দেখবি চল না! কইরা দিলেও চেন্বে পারবি না।

—তার পর?

—তার পর আর কি! ভারলাম দুর্দশা আর কতো হঠাতে পারে। বাঙ্গালা জাণে বামুট। এখানে হরতো একটা বাবসা-টারঙ্গা খাড়া করতে পারবু হু বাগ পাটিলে। তাই কিংবিত একটা দলে গা ভাঙ্গাইয়া দিয়া শিহাসদার বদলে হাওড়া টেশনের নরকভোগ করতে লাগছি। এবার তোর খবর ক'; তোগো সকলে—বললাম সমস্ত।

—বা! তুই তো কাজ গুছাইয়া লইছো। বিয়ও করছো? বা! দে না ভাই একটা জমি, কিছু বাড়ি আর বাবদার লানের ব্যবস্থা কইবগা। তোর তো সব চেনা-জানা। আর তো কিছু হইব না। লাখা-গড়াগও তখন পুরা করলাম না।

পূর্ণ দুঃখ করলো।

—আয়, ওরা সব ঐ ঘেণটার মধ্যে সংসার পাতেছে।

না গেলেই ভালো করতাম। পুরোন সমস্ত ছবি ওলটপালট হ'য়ে গেলো—সমস্ত বকান ছবি। অন্নপূর্ণা বৌদি আর পূর্ণর মার চেহারা! সমস্তই চরম দারিদ্র্য বাহুগ্রস্ত। কেন পেলাম?

নোংরা, দুর্গন্ধ আর অস্বাভাবিক জটিলার প্রায় ওপর দিয়ে যেতে

যেতে থমকে পড়িলাম। পূর্ণ এগিয়ে গিয়ে ওর মাকে বলছিলো—দূর থেকে দেখলান। একটি জীর্ণ শতছিন্ন বস্ত্রাবৃত্তা স্ত্রী মহিলা তাই শুনে এদিকে চেয়েই যেন ভীষণ ভয় পেয়ে, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে বসলেন মাথায় কাপড় টেনে। কলে তাঁর অনেকখানি ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে শিশুটা অবনত হ'লো, আর কাপড়ের ছেঁড়া গর্ত নিয়ে নোংরাভট খোঁপাটা বেরিয়ে পড়ল। বলা ছিলো বকেই চিনতে ভুল হ'লো না।

অন্নপূর্ণা বৌদি! একি দেখছি?

পূর্ণর মা বেচার বাইরে এসে আমার সঙ্গে কথা বলে গেলেন। মন্দভাগা দুঃখদুর্দশার কথা। পুরোন ভড়োয়া কিকি-কিকি দিনের সঙ্গে তুলনা ক'রে ক'রে, কেঁদে কেঁদে বলে গেলেন। মাথা নিচু ক'রে শুনলাম। শেষে অনেক আশীর্বাদ ক'রে পূর্ণর মতোই কিছু বাবস্থা বন্দোবস্তের কথা বললেন।

দুঃখিন বার পেড়াপেড়ি করেও অন্নপূর্ণা বৌদিকে আনতে পারলো না পূর্ণ।

—অব শরীফা খাওয়াপ কইরেছে! আইছা, পরে জাথা করিস। পূর্ণ কৈফিয়ত তৈরী ক'রে দিলো। জানতাম উনি সহজে আসবেন না। ব্যাপারটা উপলব্ধি ক'রে, যথাসাধ্য চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাড়াহাড়ি ফেরার জন্তে উদ্বাদ হ'য়ে উঠলাম যেন। আমরা দৈনিক যাবারী, একটা ট্রেন ফসকে পনের মিনিটে দেবী হওন্ডাকে রাজস্ব শাংসার সামিল মনে ক'রে থাকি।

ট্রেনটা ফসকতে চাইলাম না। সোমবার সকালে এসে আবার দেখা করব বলে—পকেট টিপে ধ'রে দৌড়িলাম আর পাঁচ জন ডেলিপ্যাংসেজারের মতোই।

ট্রেন ছাড়িলো। আর মূল ধারে পুরোন দিনের বুট এসে গেলো, মনের মধ্যে লোকজন, রেলপথ, বাইরের বিচিত্র প্রকৃতি সমস্তকে আপদা করে দিয়ে। অনেক—অনেক দিন পরে দেশের প্রতিটি দিনের দুঃস্তর পুনর্বিন্যাস হতে থাকলো একের পর এক। যুতি সমস্ত দিনগুলোর রূপ নিয়ে দীর্ঘ লম্বায়ে হেঁটে এলো।

অনেক পুরোন দিন। জ্যাঠামশাই তখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। একদিন ডাক এলো নিতাই সাহা'র কাছ থেকে। অগাধ সম্পত্তির মালিক—দশটা গ'য়ের সব সোং ধনী নিতাই সাহা। মুদিশানা, মন্ডের দোকানের ওপর বন্ধকী তেজারতি করবার একা জ্যাঠামশাই নন। ঐকি পিছু পিছু গিয়ে দেখলাম পঞ্চায়েৎ।

গ্রামের সমস্ত তিন মাথাওলাদের ডাক দিয়েছে মুম্বু নিতাই সাহা।

জিটি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আংশোয়া অবস্থার নিতাই সাহা প্রথমেই পূর্ণ আর একজন কর্মচারীকে মাথার কাছে বিরাট সিঁদুকটা খুলতে বললেন। কে যেন জ্বরিকনের কল ঘুরিয়ে জোয়াশে আশোর স্রুতি করল। সিঁদুক ভর্তি সোনা রূপা ভড়োয়ার গয়না। নিতাই সাহা'র নির্দেশে কর্মচারীটি কোন গ্রামের কার কী গয়না কতো টাকায় বাধা আছে ঘোষণা ক'রে গেলো জালিকা মেখে দেখে। সমস্ত হিসেব দাঙ্গিল ক'রে নিতাই সাহা বলল—আপনার গেরামের মাথার জ্ঞানের আমায় পোলা উড়নচণ্ডী মাতাল। আমার দিন ফুটাইয়া আইছে। চক্ষু বোজলেই ও সমস্ত দুইয়া উড়াইয়া

সকলকে পক্ষে বসাইবে। সংসারতা ভাইসা বাতে না যায় তার জন্তই আশানাগো হিসাব কইরগা সমস্ত সম্পত্তি আর পূর্ণের জিন্মা কইরগা দিলাম। জাখফেন ঠাকুরমশায়! জাখফেন আপনাতা।

তারপরেও বুড়ো বেঁচেছিলো কিছুদিন। বড় ইচ্ছে পূর্ণর বিয়ে দবার। নাতীবোয়ের মুখ দেখে মরার শেষ বাসনা। সে সব মনঃসা কুলগো না কোমদিন। ঘর আলো করা বো নিয়ে পূর্ণ স্ত্রীয়ার টে নামল আমাদের সম্পদ। অন্নপূর্ণা বৌদি। সত্যিই অন্নপূর্ণা। ষা জলজল, পূর্ণ কি খুশি—কী খুশি! সত্যিই পূর্ণ সে সেদিন।

পূর্ণর ভাই ছিলো না। কেমন করে জানি না অন্নপূর্ণা বৌদি দিনেই আমাকে নিজের ঠাকুরপো করে নিলেন। ঊর ব্রহ্ম লোনালা আর আমায় ভক্তি ভালোবাসা একাতার। একটা দিনও বর বাড়ি না গিয়ে থাকার উপায় নেই। কোন দুপুরেই ওদের হঠাৎ ঘরে আমার অল্পপস্থিতি ক্ষমা করা হতো না। স্বামি-স্ত্রীর পর্তা বাদ সব চেয়ে আমার বনিষ্ঠ ছিলো অন্নপূর্ণা বৌদি পূর্ণর। চলে আসার সময় সে কি বিবাক-কল্প দুল! মাঝে মাঝে দফা তো ঠাকুরপো? চিঠি দেবা? আমাকে আর একবার ভালো। দেখার জন্তে আপসা চোপ মুছে ফেললো, না লুকিয়েই।

শেব দেখা সে বার পূর্ণার সময়। দাস্তার আগের বছর। তারপর শেষ' অগষ্ট মাস থেকে একটা বিবাক ঝাঁক। কোনো খবর। আমার সবাই তুং-তুদ'শা'র ঘণ্টাতে পাক খাচ্ছি, ক্রমবর্ধমান র নিরবচ্ছিন্ন পাক। কিন্তু আজ এতো দিন পরে কেন ওদের দেশলায়? কেন সদিনের শেষ দেবাটাই অক্ষয় হয়ে থাকলো মানসিক ক্লেশ আর কতো চরমে বাবে কে জানে? কাঁকাটাই! ছিলো। জলীক শব্দের মতো চাই না মনে করতে ফেল-গামের ভাবলে চোখে বল আসা—দিনগুলো। বাড়িতে এসে বললাম। দ্বী উৎসাহ না দেখালেও, মা, জ্যাঠাইমা সবাই ন—বতো কষ্টই হউক, আগে লইয়া আয়। পূর্ণতো 'না, একটা কিছুতে লাইজ্যা যাইবে। তারপর নিজগো কইরগা নিবে। আহা! রাজার পোলা'র এই তুদ'শা? ইরগা দেখু রে? একেবারে ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে না হ'লেও, র সকাল সকাল হাতা করলাম ওদের জন্তে কিছু একটা সাকল দিয়ে।

পূর্ণা বৌদির সামনে গিয়ে তাকে আবার অশ্রুস্ত করতে

ইচ্ছে করল না। ছেলের হাত ধরে ভিকি চাওয়া পূর্ব বোজ টিকেট-জানলার কাছেই গেলাম সোজা। পূর্ণ নেই। অপরাধ জেনেও যেতে হ'লে ওদের লোহার বেড়া ঘেরা জায়গাটার নিকে। সেখানেও নেই। ঠিক কাঁকা নয়, অল্প একটা নতুন সংসার। এ কী রকম হ'লো? হু—? কথখোনোই নয়!—

একটু ভেবে একজন মাতব্বর গোছেব লোককে জিজ্ঞেস করলাম,—পরন্তু যে পূর্ণ বাবুরা এখানে ছিলো, কোথায় গেলো বলতে পারেন? ঠিক ঐ জায়গাটার ছিলো ওরা!

—পূর্ণ বাবু তো? জানি। কাইল তো চটলগা গ্যালেন অরা হঠাৎ। কী জানি দাদা, অর দ্বী'র হঠাৎ কী হইলো! ক্লেপিয়া গ্যালেন! কাল্লাকাডি বগড়া কইরা উনিই ঘাইতে বইখা করতেন! ওরা নাকি খুব বড়লোক ছিলেন। এহ্ন পরন্তু নাকি ওনাগো পেরামের কার লগে দেখা হইছে, আর পূর্ণ বাবু সাতায় চাইছেন! কী কাল্লা বোডার—“ওই হুখ জানু দেখাইলা তুমি? ক্যান চাইলা? গলায় দড়ি দিমু—তমো হুখ দেখামু না ওনাগো! বেশ ছিলাম আমরা চেনা লোকের চক্ষু আড়ালে। নিমাই ঠাকুরপোই কেমন? মেগো হীন অবস্থা লইয়া মজা করতে আইছে নাকি?” কী কাল্লা, কী কমু মশায়! ছাড়লো না জাব পর্যন্ত; সেই উড়িয়ায়ই ফিরগা যাওয়াইলো ওনাগো। গরমেটের একজন অফিসার কাল সকালে আইখেই বৌদি নিজেকে দেখা কইরগা ফিরগা বাবার কথা কইলেন। বিকালে চটলগা গ্যালেন ওরা মন ভারি কইরগা! পূর্ণবাবুর অবস্থাটা বহি দেখেথেন,—

আমি আর শুনছিলাম না। জল টলটলো লাল চোপ আর তিরস্কার-মুখর অন্নপূর্ণা বৌদির মুখখানা যেন দেখতে পাচ্ছিলাম।

ভালোই করেছে। ঠিকই করেছে অন্নপূর্ণা বৌদি। যতাই পথে বসুক, মনের দিক দিয়ে ভিগিরী হয়নি সে। ধনীর হুন্ড আশ্বাসমান বোধ, উচ্চমন্ত্রতা আর দস্ত বজায় রেখে লজ্জা বাচিয়েছে সে। পূর্ণ ভেঙ্গে পড়লেও ছোটখাটো মেয়েটা সকলের মাথা ছাড়িয়ে সোজা দাড়িয়ে আছে।—

একটা নিখাস চেপে, ষ্টেশনে ছড়ানো খাঁচায় আটকে থাকে হুগক, অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের দীন-নোরা উদ্বাস্তদের জটলার মধ্যে দিয়ে এলামোলা হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুকাল আগে আসা—সমরটা পায় করে দিতে থাকলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে।

### মোটর চুরি এড়াতে হলে

নিগরীগুলোতে অনেক সময় মোটর গাড়ী চুরির সংবাদ শুনেতে যায়। কিন্তু ডাইভার বা মোটরচালক যদি আরও একটু কেন, তবে গাড়ী চুরি হয়ে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। হুড়ে বাবার সময় দেখতে হবে ভাল রকম—স্ট্রীয়ারিং ও গাড়ীর বন চাবি-আঁটা হয় মজবুত ভাবে। মোটর-চোররা নানা কন খুঁজে থাকে, সচক্ষে নিজেদের উদ্দেশ্যটি কি ভাবে হাঁসিল কন্ড গাড়ীর ইঞ্জিনটি যদি কোন অবস্থাতেই হুড়ুতকারীরা পারলো, তবে আর ভয় কিসের? গ্যারেজে বধন গাড়ী তখনও দেখতে হবে গাড়ীর প্রবেশ-দ্বারটি বেন শক্ত হাঠো বন্ধ থাকে। অপর দিকে দরজা কুলুপাবদ্ধ করা নেন নিতে হবে বিশেষ কতকগুলো কলা-কৌশল।

অশস্ত্র মোটরের সন্ধান পেতে বাতে সহায়তা হয়, সেইজন্তেও ডাইভার বা মোটরচালককে কয়েকটি কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। একটি পকেটবুক আগে-ভাগে লিখে রাখতে হবে সমস্ত গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর, ইঞ্জিনের নম্বর ইত্যাদি। গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন বইটি অবগত রাখতে হবে বাড়িতেই কোন নিরাপদ স্থানে। গাড়ী বধন বেখানোই দাঁড় করিয়ে রাখা হবে, পুলিশের দৃষ্টির ভেতর দেইটি থাকা ভাল। বিশেষ করে, বিশেষ-বিভূই-এ যদি যাওয়া হ'ল—গাড়ী কোথায় রাখা চলে, এ ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য বা পরামর্শ গ্রহণের দাবীই জোর উঠে। মোটর চুরি এড়াবার এ সকল নানা উপায়ের কথাই চিন্তা করা যায় কিংবা চিন্তা করা সমীচীন।



## শ্রীঅবিনাশ সাহা

হাঠকোটে গ্রীষ্মের ছুটি চলেছে। বিচারপতি নিবারণ বাবু সন্ধ্যার পর দক্ষিণ-খোলা ঝুল-বাগানায় বসে খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলিয়েছেন। সহসা নাতনী লীলা কোথেকে যেন ছুটে ছুটে কাছে এসে বায়না ধরে, একটা গল্প বল না দাছ ? খার্ড ক্লাসে পড়ে লীলা। বছর বায়ো বয়েস—কুটকুটে চেহারা। নিবারণ বাবু গুব কোন আদ্যারেই না বলতে পারেন না। তবু এ ক্ষেত্রে মেশ-মিশ্রিত কণ্ঠেই বলে দেন, এখন অনেক কাজ রয়েছে দিভিভাই, শোবার সময় বলবো'খন।

লীলার প্রাইভেট মাষ্টার আজ পড়াতে আসেন নি। তা ছাড়া ওরও ছুটি। কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারে না। দাড়র কাছে গল্প শুনেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নিবারণ বাবুর প্রতিবাদে পাকী প্রতিবাদ জানাল, না, কাগজ পড়া তোমার এখন হবে না। এফুণি বলতে হবে।

নিবারণ বাবু খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে বিশ্বয় প্রকাশ করেন, এফুণি।

হ্যাঁ, এফুণি! পাশের ঘর থেকে সেনট্র ছুটে এসে লীলাকে সমর্থন করে।

টিব-জারের নাতিন-নাতনী। নিবারণ বাবু আর না বলতে পারেন না। সহজেই রাজী হয়ে যান, বেশ, ভাল হয়ে তাহলে বল হু'জনে, আরম্ভ করি।

সেনট্র লীলা নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে চুপচাপ হু'খানি চেয়ারের ওপর বসে পড়ে। নিবারণ বাবু আরম্ভ করেন : খার্ড ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছি সেবার। নতুন বই-খাতা কেনা হয়ে গেছে। সরস্বতী পুজোর পর পড়াশুনোও নিয়মিত আরম্ভ হয়েছে। জয়দেব আমাদের সঙ্গে এসে ভর্তি হয়। ফ্রেজারার মাঝামাঝি। এত দেরিতে ও ভর্তি হচ্ছে দেখে আমার কিছুটা ইতবাঙ্কই হই। ভাবি, হয়তো বকটে ছেলে, পড়াশুনো করতে চায় না, বাপ-মা ধরে-বেঁচে ভর্তি করে দিচ্ছেন। কিন্তু সেই দিনই কোর্স পিরিয়ডে আমাদের ভুল ভেঙে যায়। হেড মাষ্টার মশায়, ইংরেজির ক্লাস নিতে এসে আমাদের ক্লাসের খার্ড বয় মহেশ্বকে লক্ষ্য করে বলেন, মচেন, আজ থেকে তোমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বাড়লো। শুনেছ বোধ হয়, জয়দেব নামে তোমাদের ক্লাসে খুব একটি ভাল খেলো ভর্তি হয়েছে। বৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

বেচারি মহেশ্ব! হেড মাষ্টার মশায়ের নিকট থেকে জয়দেবের গুণগণা শুনে বোধ হয় ঘাবড়ে যায়। বিধাজড়িত কণ্ঠেই শুধায়, উনি কবে থেকে ক্লাসে আসছেন স্যার ?

হেড মাষ্টার মশায়ের ওঠে কিংকি হাসি দেখা দিলেও—গ সহকায়েই উত্তর দেন, বতটা সন্তব তাড়াহাড়িই আসছে। তবে গবীর বেচারি, সব দিক গুছাতে হয়তো কিছুটা সময় নেবে।

ফুল সেদিনের মতো বখারীতি ছুটি হয়ে যায়। অ সকলেই জয়দেব সব্বন্ধে নানা বকম আলোচনা করতে ব বাড়ি ফিরি।

শনিবারের তাটবার। ছোট বড় নানা ধরনের নৌকায় ভিন গাঁয়ের মানুষ গজের তাটে আসে। জয়দেব এরকম ছাটুরে নৌকায় করেই হস্তা খানের মতো এসে বোর্ডিং-এ হয়। শনিবার বলে আমাদের ফুল ছুটি হবে কোর্স পিরিয়ড বাবার পর। কিন্তু সংবাদটা আমরা পাই সেকেন্ড পিরিয়ড আমাদের ক্লাসের মাখন গোপ একটা বই আনতে বোর্ডিং-এ গিয়ে সেই এসে সংবাদটা দেয়। জয়দেবকে দেখবার জন্য আমরা ৮ ইপিয়ে উঠি।

ফুল বধ্যাসময়ে ছুটি হয়ে যায়। বোর্ডিং ফুলের সলগুই। জন সাতেক তাড়াহাড়ি বোর্ডিং-এ এসে হাজির হই। যদিও কেউ বোর্ডিং-এ থাকি না, তবু ছুটির পর প্রতি শনিবারেই মাখনের পরে কিছুক্ষণ গল্পগুস্তব করে থাকি। সেদিনও সকল ওর ঘরটিতে এসেই বসি। জানালা দিয়ে লক্ষ্য করি, ৮ বয়সীট অপরিত্রিত একটি ছেলে সুপারিন্টেন্ডেন্টের ঘরের পাশে ওপর একাকী বসে আছে। অনুমানে বুঝে নিই, উনিই বিশ্বাস আমাদের নতুন বন্ধু। অবশ্য মাখন আমাদের ৮ সঙ্গে সঙ্গে ওকে জয়দেব বলে সনাক্ত করে।

বলিষ্ট চেহারা জয়দেবের। দূর থেকে দেখে আমাদের চেয়ে ওকে কিছুটা ডেঙাই মনে হয়। গায়ের রং রীতিমত কদম ফুলের মত ছোট ছোট করে ছাঁটা মাথা ভর্তি কক্ষ চুল ঢোলা-হাতা আধঘরলা গেকরা ব্যয়ের পাঞ্জাবি। যারা থাকে তাদের জামা-কাপড় রাখবার জন্য প্রত্যেকেরই স্ট্রাকেশন না হয় একটি ট্রাক আছে। এ ছাড়া লেপ, তোয়, বালিস সহ পুংখামুরি বিছানা তো আছেই। কিন্তু জয়দেবের বকম কিছু দেখা যায় না। ছোট একটা বোচকা হাত ও রয়েছে। সকলে মিলে জটলা করি, জয়দেব আজকে হয়তো করতে এসেছে, সমস্ত জিনিষপত্র সহ আর একদিন আসে কেউ ছুটে গিয়ে সঠিক কিছু জিগোস করতে ভরসা পায় না সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব বড় কড়া লোক। বিনা আস্থানে কাছে যাওয়া নিষেধ।

আমাদের জটলা আর বেশী দূর এগোয় না। সুপ সাহেব কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুল থেকে ফিরে আসেন। থেকে উঠি ওর পায়ের ধুলো মাখায় নিতেই উনি ও সোজা মাখনের ঘরে এসে ঢোকেন। আমরা খতমত মিলে উটে "সাবুট" করে দাঁড়াই।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব এক দিকে কড়া লোক এক দিকে বেশ বসিক ছিলেন। ঘরে ঢুকেই আমাদের না বলে মাখনকে সম্বোধন করেন মাখন, আজ থেকে ব হয়। জয়দেব তোয় ঘরেই থাকবে।

ওঁর ইকিতটা মাখন চট করে বুঝতে না পারলেও যুহ যুহ হাসতে থাকি। কারণ আমাদের চেয়ে ৮

পড়ত মাখন। কিন্তু পর পর ফেল করায় আয়রা ওকে ধরে ফেলেছি। শুনিছি, ক্লাস ফাইভ থেকে বার্ড ক্লাসে উঠতে ওর নাকি বছর ছয়েক কেটেছে। বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল। থাকেও বেশ ছিমছাম। লেখাপড়ায় বাই হোক মাখনের হৃদয় খুব প্রশস্ত। বাড়ি থেকে প্রতি শনিবারেই নানা রকমের খাবার আসে ওর জ্ঞাত। কিন্তু ও তা কখনো একা খায় না। কথায় কথায় বোড়ি-এর ঠাকুর-চাকরকে আখ-পুরানো জামা-কাপড় দিয়ে দেয়। মাসের মধ্যেই দশটা নতুন জামা-কাপড় ওর না হলেই নয়।

মাখন চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। উনি পুনরায় জের টানেন, জয়দেব খুব ভাস ছাত্র, ওর সঙ্গে থাকলে তুই নিশ্চয় পাশ করতে পারবি, বলতে বলতে বাইরের দিকে পা বাড়াতে থাকলেন আবার বুঝে দাঁড়িয়ে জয়দেবের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, এরা সকলেই তোমার সহপাঠী, আসাপা পরিচয় করে নাও। উপদেশ শেষ করে চটি জুতার আওয়াজ তুলে আসা-পথে বেরিয়ে যান উনি। মাখন লজ্জার হাত থেকে বাঁচে। আয়রাও হাঁপ ছাড়ি।

জয়দেব যেন কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারছেন না। মাখনের তত্ত্বপাথটির কাছে চপচাপ দাঁড়িয়েই আছে। যেন মাখনই ওর গার্জেন, নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছু করতে পারছেন না। কিন্তু মাখনও কেন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। কিছুতেই মুখ থুলতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত মতেনই মুখ খোলে। একটু বৃকে পড়ে সরাসরি জয়দেবকে জিজ্ঞাস করে, আজ চলে যাচ্ছেন বুঝি? বিছানা পত্র কিছুই আনেননি।

সংকেত কাটিয়ে জয়দেব উত্তর করে, না, আজ থেকেই থাকবো। এই বৈচকার মধ্যেই সব রয়েছে।

উত্তর শুনে মতেন হতবাক হয়। আয়রা সকলেই। এ ছোট একটা বৈচকার মধ্যে লেপ, হোষক, মশারি, বালিশ, জামা, কাপড়, বই, খাতা থাকা কি করে সম্ভবপর! কিন্তু কেউ আর দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করতে ভরসা পাই না।

এবার মুখ খোলে মাখন। আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠেছে। পড়ানো ছাড়া বাকী সব বিষয়েই ও উৎসাহী। জয়দেবের মুখ থেকে উত্তর শানার সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করে, তা হলে আর দাঁড়িয়ে বইলেন কেন? পাশের সিটটাই আপনার। বৈচকা খুলে বিছানাপত্র সব গুছিয়ে নিন।

জয়দেব বোধ হয় কাঁপড়ে পড়ে। মাখনের মতো বিজ্ঞান ও সাধারণ পাঠে? সামান্য দু'খানা আধময়লা কাঁথা আর ছোট একটা মাথার বালিশ মাত্র সম্বল। একখানা কাঁথা বিছোবে আর একখানা গারে দেবে। লেপ আর মশারি এ দুইয়ের কাজই চলাতে হবে ও দিয়ে। আর তো আছে স্ন্যাক-কাচা দু'খানা সাধারণ মুক্তি ও ঢোলা হাতা খদ্দের পাঞ্জাবী একটা। এ জিনিষ ও কেনম করে ওদের পাঁচ জনের সামনে বার করবে ----না না, এতে লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই। ও তো পড়েছে, I am content with what I have, be it little or much হবে আর সংকোচের কি আছে? জয়দেব বোধ হয় মনের বল ফিরে গায়। মাখনের অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে পাশের চৌকিটির ওপর বাঁচকাটা খুলে ফেলে।

মাখন সেদিকে এক নজর দেখে মনে মনে হোঁচট খায়। একজন

পড়ুয়া ছাত্র, সামান্য এই পোষাক আসাক নিয়ে কি করে বোড়ি-এ থাকবে! ওদের বাড়ির চাকর বাকেরও যে এর চাইতে ভাল বিছানাপত্র আছে! মাখন আর দ্বিতীয় বার উৎসাহ দেখতে সাহস করে না। আমাদের সকলের অবস্থাই প্রায় তাই। তবু এর ভেতরে মতেন কতকটা আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওটে! একটু সজ্জমের সঙ্গেই দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করে, মশারি আনেননি? এখানে যে বাজা মশা!

জয়দেব দাঁড়িয়ে থেকেই উত্তর দেয়, দরকার হবে না, এমনিই চলে যাবে।

বলেন কি! এক রাত্রেই মধ্যেই যে গায়েব ছাপ-চামড়া তুলে নেবে।

ও কিছু নয়, কাঁথা মুড়ি দিলেই হবে।

এখন না হয় শীত, মুখ চেপে শোবেন, গরমের সময় কি করবেন?

শীত-গ্রীষ্ম বারো মাসই আমাদের কাঁথা গায়ে দেওয়া অভ্যাস আছে।

এর পর আর মতেন এত্তে পারে না। ওরাও গরীব, সসারে অনেক কিছুই অভাব আছে। তাই বলে সাধারণ বিছানাপত্র কিংবা দু'চারটে জামা-কাপড়ের জ্ঞান কখনো ভাবতে হয় না। এত কষ্টও মান্য করতে পারে!

মা সবসময়ই সঙ্গে যেতাই আড়ি থাক, মাখনের মস্ত বড় গুণ



**ROY COUSIN & CO.**  
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA.  
OFFICIAL AGENTS FOR  
**OMEGA & TISSOT WATCHES**  
SOLE AGENTS FOR  
**COVENTRY WATCHES**

এক কথার পরকে আপন করে নেবার ক্ষমতা। তাই জয়দেব বর্ধন নিজের চৌকিটি ঝেড়ে ফুঁছে কাঁথাখানা বিছাতে বাচ্ছিল তখন ও বাধা দেয়। বজ্রজনের দরদ দিয়েই বলে, দেশ গীয়ে যা করেন—করেন, এখানে ওরকম করলে টিকতে পারবেন না। দেখছেন না নদীর ধারে বোড়ি, ঠাণ্ডাতেই মারা যাবেন।

মাখনের কথা শুনে জয়দেবের হাসি পায়। এঁরা বলছেন কি! বোড়ি তো নদী থেকে তবু অনেকটা দূরে। পাকা বাড়ি। ওরা যে চালা ঘরে—বলতে গেলে এক বকম নদীর ওপরেই বাস করে! বাড়ি থেকে নেমেই তো, গাং-এর ঘাট। জয়দেব ঈষৎ হেসেই উত্তর করে, আপনাকে ধন্যবাদ; কিন্তু আমার এতটুকু অসুবিধে হবে না।

কিন্তু মাখন খামে না। লুট থেকেই পুনরায় অল্পাধিক করে, না না, আপনাকে আমি কিছুতেই অতো কষ্ট করতে দেবো না। তুলেনে না, মাষ্টার মশার বলে গেলেন, আপনাকে ঘরেই আমার ক্লাস-বৈতরণী তরতে হবে। আপনার অসুখ-বিসুখ করলে যে আমারই ক্ষতি হবে। আজকের মতো এই 'র্যাগটা' দিয়ে কাটিয়ে দিন। কালকে আমার আর একটা মশারি খুয়ে আসছে। কাল থেকে আর কোন অসুবিধেই থাকছে না।

জয়দেব হঠাৎ এবারও আপত্তি জানাতেই যাচ্ছিল। কিন্তু মহেন বাধা দেয়, সেই ভাল জয়দেব বাবু, বিশেষ বিতুইয়ে বাড়াবাড়ি না করাই উচিত। মাখন আমাদের মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড, ওর কাছে লজ্জার কিছু নেই।

সুশান্ত একদম পথস্থ দম হয়ে ছিল। এবার সুযোগ বুঝে মহেনকে সমর্থন করে, জয়দেব বাবু, এ নিয়ে আর আপনি মিহিমিহি কথা বাতাবেন না। আর মহেন, জয়দেব বাবু বর্ধন মৌন আছেন তখন শাস্ত্রবাক্যই প্রযোজ্য—মৌন সম্মতিলক্ষণ; এখন আমাদের পেট-সকটের কি ব্যবস্থা হয়েছে তাই বল।

সুশান্ত বেশ বসিকতা জানতো। আমরা সকলেই ওর কথায় হেঁ-হেঁ করে হাসতে থাকি। এমন কি নবাগত জয়দেবও না হেসে পাবে না।

এবার আমিই ওর কথার সাহায্য দিই। হেসে হেসেই বলি, ব্যবস্থা বা কিছু তা তো চৌকির 'নীচেই' রয়েছে, টেনে 'বার' কর না।

আর কোন কথা নেই। আমার সমর্থন পেয়ে এক লম্বা সুশান্ত মাখনের চৌকির নীচ থেকে বড় বড় দুটা টিনের কৌটো টেনে বার করে। মুখ খুলেই একটার ভেতর থেকে তুন্ন-তুন্ন করে বেরতে থাকে—যি আর নলেন গুড়ের স্মিট গন্ধ। আর একটার ভেতরে রয়েছে টাটকা ভাজা কচকচে মুড়ী। আজকের হাটুরে নৌকোর বাড়ি থেকে এসেছে। সন্তোষের জলধারার মাখনের। মুড়ীর টিনটা রেখে সুশান্ত অপগটাব ভেতরে হাত গলিয়ে দেয়। কি মজা, আজ শু' মোরা মুড়ী নাড়ু-বড়িই আসেনি! এ কৌটোটার ভেতরে যে গালু ম'নরায়ের আবে একটা কৌটো রয়েছে। সুশান্ত সেটাকে টেনে বার করে ঢাকনা খুলে ফেলে। নজর পড়তেই আমরা সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠি। সরভাজা, কীরেব পুলি আর পাটিনাশটা রয়েছে একগালা। প্রত্যেকের ভাগে নেহাৎ কম পড়বে না। সুশান্ত তো ওরই ভেতরে একটা মুখে পুরে উজ্জ্বাসে কেটে

পড়ে। আমি বাধা দিই, এই রান্স, আর খাসনে বলছি। একটা কম দেওয়া হবে তোকে।

চিবোতে চিবোতে জড়িত কণ্ঠে সুশান্ত বলে, সে পরের কথা পরে দেখা যাবে। এখন তো চলুক, বলতে বলতে আরো একটা সরভাজা মুখের গহ্বরে ফেলে দেয়।

বেগতিক দেখে মহেন পাশ থেকে কৌটোটা নিজের জিয়ার টেনে নেয়।

মাখন এতে এতটুকু মন খারাপ করছে না। বরং উৎসাহেই মেতে ওঠে। মহেনকে লক্ষ্য করে বলে, মহেন আজ আর কিছু রাখতে হবে না। আমাদের নতুন বন্ধু শুভাগমন উপলক্ষে আজ পুরা ভোজই হবে। এই হরি—হরি—মহেনকে নিরস্ত করে বোর্ডিং-এর চাকর হরির উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে মাখন।

হরি চির-অনুগত মাখনের। ডাক কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে।

মাখন ওকে ডাইনিং রুম থেকে বড় দেখে একটা থালা ও চার পাঁচটা গ্লাস আনতে লুকুম করে।

হরি ছুটে যাচ্ছিল। মহেন বাধা দেয়, একটা নয় দু'টা থালা। কেন না, সুশান্তটা বা গাডল, এক সঙ্গে খেতে হলে জয়দেব বাবু কিছুতেই সুবিধে করতে পারবেন না। ওকে আলাদা দেওয়াই ভাল।

প্রস্তাবটা যুক্তিসঙ্গত হলেও মাখন রাজী হয় না। বলে, না, প্রথম দিনেই আমি ওকে ভিন্ন করে দিতে পারবো না। সুশান্তকে শায়েস্তা করবার ভার আমি তোকেই দিলাম।

হরি বখারীতি চলে যায় এবং থালা গ্লাস নিয়ে ফিরে আসে। মহেন নিজের হাতে পিঠেগুলো সাজাতে থাকে। জয়দেবকে তাড়া দেয় মাখন।

জয়দেব আড়ষ্টতা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারলেও কিছুটা সক্রিয় হয়ে ওঠে। সত্যি, খিদেও প্রচণ্ড পেয়েছে। কখন সেই কাক-শকা না ডাকতে দু'টো কেনভাত খেয়ে নৌকোর উঠেছে। লজ্জার সকলের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে না পারলেও ধীরে ধীরে পেটটা বেশ ভরেই ওঠে। প্রথমে পিঠে; পরে মুড়ী, মোরা, মুড়কী ও নলেন নারকেলি গুড়। এক সঙ্গে এতগুলো উপাদেয় খাবার জীবনে খুব কমদিনই ছুটেছে ওর।

ঘটাধানেক চলে আমাদের খাওয়া দাওয়া হাসিঠাট্টা। বিকল চারটের কাহাঙ্কাহি, সকলেই উঠে পড়ি। কেন না, সন্ধ্যা ছটার মধ্যে আমাদের সকলকেই আবার কমনরুমে সাক্ষা সন্মিলনীতে যেতে হবে। প্রতি শনিবারেই বসে সভা। দুর্গাদাস বাবু হেড মাষ্টার হয়ে আসার পর থেকেই এই রীতি চলছে। পুঁথিগত বিজ্ঞায় সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের নৈতিক এবং ব্যবহারিক মান উন্নয়ন করাই ওর উদ্দেশ্য। সভার প্রারম্ভে পাঠ হবে শ্রীমন্তগবদগীতা। দুর্গাদাস ব্রহ্ম স্বয়ং কিংবা পশুত মশার পাঠ করে শোনাবেন প্রত্যাহ এক একটি অধ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাখাও কবে যাবেন। পাঠান্তে আমাদের সকলকে সমবেত করে আবৃত্তি করতে হবে বিশ্বকণ বর্ণনের প্রোক্তটি। আমাদের মধ্য হতেই প্রথম একজন স্বর করে আবৃত্তি করবে, পরে আমরা সকলে তাকে ঠিক নামতা পড়ার মতো করে অনুসরণ করবো। গীতা পাঠ শুনেই আমরা তেমন



উৎসাহ বোধ করতাম না। কিন্তু সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে আমাদের খা ভাগ লাগতো। তার চেয়েও আমাদের বেশী আনন্দ হতো নিজেদের লেখা ছড়া, কবিতা, গল্প ও ধাঁধা শুনতে ও শোনাতে। সর্বশেষে কর্তনের মধ্য দিয়ে আসরের পরিসমাপ্তি হতো।

সেদিনের আসরে জয়দেব ছিল নতুন সভা। আমাদের আসতে কিছুটা দেরীই হয়ে যায়। গীতা পাঠ শেষ হয়ে গেছে। আবৃত্তি আরম্ভ হবে, আমরা তিন-চারজন এসে আসরে বসলাম। মনে হলো দুর্গাদাস বড় কিঞ্চিৎ বিরক্তির প্রকাশ করলেন। কেন না, তিনি কঠোর ভাবে নিয়ম এবং সময় মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। ক্রটি যা হয়ে গেছে তা নিয়ে তখন আর কিছু করার ছিল না। আমরা আবৃত্তিতে কণ্ঠ মেলাতেই তৎপর হই। হঠাৎ চোখ পড়ে জয়দেবের ওপর। দেখি, ধ্যানী বৃদ্ধের মতো চোখ বুজে বসে আছে ও। পরম বিম্বর বোধ হয় আমাদের। এর ভাবভঙ্গীতে ক্রমশঃ হাসি চেপে রাখাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। অজ্ঞাত মাষ্টার মশায়দের অবস্থাও বোধ হয় আমাদের মতোই। শুধু দুর্গাদাস বাবু ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারছেন না।

আবৃত্তি যথারীতি হয়ে যায়। এবার কর্তনের পালা। আমাদের সভাপায়ক কেশবনাথ নিয়মিত খোলে চাটি মারে। প্রতিদিনের মতো জয়ধ্বনি দিয়ে গানও শুরু করে সে। কিন্তু জয়দেব যেন খুশী হতে পারে না। নিয়তই বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকে ওর তরফ থেকে। দু'চার কলি শোনবার পর শেষটায় আর ঐয রাখতে পারে না। স্বদারের নিকট থেকে খোলাটি টেনে নিয়ে নিজেই বাজাতে থাকে। সঙ্গে প্রাণখোলা নামগান। একাই যেন একশ'। কর্তন শেষ হবার পর দুর্গাদাস বাবু ভূয়সী প্রশংসা করেন ওর।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিতে থাকে। আমরা গল্প, কবিতা, ছড়া, খেলায় উৎসাহ পেলেও জয়দেব ওর কাছে ঘেঁষে না। এ সবেই চেয়ে কর্তন আর গীতা শুনতেই ওর অস্বস্তি বোধ। দুর্গাদাস বাবু তাড়ায়—মাঝে মাঝে কিছু কিছু লিখতে বাধ্য হয় বটে, তবে আমরা তার মর্দার কিছুই উপলব্ধি করতে পারি না। গীতার শ্লোককে কেন্দ্র করেই যেন কি সব বড় বড় ন্যায় নীতির কথা।

বোডিং-এর রীতি রাত এগারোটার মধ্যে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়া। পড়া তৈরী হোক আর না-ই হোক মাখন তাই শুয়ে পড়ে। এগারোটা কেন পারলে ও দশটাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু সুপারিক্টেণ্ডর ভয়ে কোন রকমে হুঁচোখের পাতাকে টেনে রাখতে বাধ্য হয়। কিন্তু জয়দেবের ব্যাপার আলাদা। নিয়মমাত্রিক বাতি নিবিয়ে বিছানা নেয় বটে, কিন্তু ঘুমোয় না। জোড়-অঙ্গন হয়ে বিছানার ওপর চোখ বুজে বসে ঘটখানেকের ওপর বিড় বিড় করে কি সব যেন আওড়তে থাকে। হয়তো কোন ঠাকুর দেবতার নামই হবে। কেন না, থেকে থেকে হাত তুলে প্রশ্নাম করতেও দেখা যায়। তার পর বালিশের ওপর হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরো কি সব লিখে শুয়ে পড়ে।

মাখন প্রথম দিন কয়েক কিছুটা বৃষ্টিতে পারে না। কেন না, শোবার সঙ্গে সঙ্গে ও অর্চৈতন্ত। কিন্তু পরে একদিন ঘুম না আসায় হতবাক হয় ও। বেচারি কি দিন দিন পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি!

তার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই জেগে থেকে ওর পাগলামি দেখতে থাকে। অনেক দিন ভাবে, ডেকে জিজ্ঞেস করে, এ সবেই মানে কি। কিন্তু বলি বাল করেও শেষ পর্যন্ত আর বলা হয় না। বিকেলে উভয়ে বেড়াতে বার হয়। সুরোগ বৃক্ষে কথায় কথায় খোলাখুলিই প্রশ্ন করে মাখন।

উত্তরে জয়দেব ঈর্ষ হেসে বসে, আত্মশুদ্ধি করি।

বিম্মিত মাখন উত্তর শুনে অধিকতর বিম্বর বোধ করে। বলে কি জয়দেব! ওর কি মাথা খারাপ হলো! নীচু ক্লাসের ছাত্র, মনের আনন্দে খাবে, ঘুমোবে, খেলা করবে, পড়বে। এ সব বুড়োটে-পনা কেন!...

কিন্তু জয়দেব থামে না। উপদেশের সুরেই বলতে থাকে, আমার কাছে ধ্যান করবার মন্ত্র লেখা আছে। অভ্যাস করে দেখবেন, মনের জোর পাবেন—মা সরস্বতীর কৃপা হবে।

মনের জোর আর আত্মশুদ্ধির মানে না বুঝলেও মা সরস্বতীর কৃপা হবে শুনে মাখন উৎসাহ বোধ করে। ভক্তি-বিভূড়িত কণ্ঠেই অমুবোধ করে, দেবেন তো তা হলে আমাকে মন্ত্রটা লিখে, চেষ্টা করে দেখাবো।

জয়দেবের ওঠে মুহূর্ত হাসি দেখা দেয়। মাখনকে আশ্বাস দিতে দিতে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই উভয়ে বোডিং-এ কিংব আসে।

দিন কয়েক অতিবাহিত হয়, মাখন বোধ হয় সত্যি সত্যি জয়দেবের মন্ত্র-শিষ্য হয়ে পড়ে। কেন না, শোবার আগে সেও প্রায় ঘটখানেক বিছানায় ওপর বসে ধ্যান শুরু করেছে। জয়দেবের মতোই চোখ বুজে বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়তে থাকে। কিন্তু কই, কুফলশন তো ওর হয় না! চোখের সামনে যে ভেসে ওঠে কেবল গুচ্ছের খেলা-ঘূলের ছায়াছবি! মন্ত্র না ছাই, বত সব বাজে গুল! মনে মনে বিরক্তি বোধ করে মাখন। ভাবে জয়দেবকে বেশ হুঁকথা শুনিয়ে দেবে কিন্তু পারে না। মা সরস্বতীর কথা মনে হতেই ভয় হয়। ভক্তিভরেই আবার লেগে থাকে। এবার পাশ করতে না পারলে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে যে একত্রে পড়তে হবে। মাখন উঠে পড়ে লাগে।

ফল বোধ হয় কিছুটা কলে। ধ্যানে জয়দেবের মতো কুফলশন না হলেও অবিরত অভ্যাসের ফলে মানসিক চাকলা কমে আসে মাখনের। এখন এককানীন ঘটখানেক বসে পড়তে পারে ও।

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রোতে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্র্যাশন্যাল কিংস মেমোর

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

বিগত বাৎসরিক পরীক্ষার অল্প আর ইরাজী বাদে আর সব বিষয়েই পাশ করেছে। লেগে থাকলে বাৎসরিক পরীক্ষার আশা আছে। শিক্ষকগণ মাখনের আশাতীত উন্নতিতে খুশী হয়। মাখন নিজেও।

বাৎসরিক পরীক্ষার জয়দেব অঙ্কে একশ'র ভেতরে একশ' গেলেও মহেনকে পরাস্ত করতে পারে না। প্রথম স্থান মহেনই অধিকার করে। জয়দেবের এতে কোন ক্রক্ষেপ নেই। কৃষ্ণের যেমন ইচ্ছে তাই হোক। কিন্তু মাখন এ পরাজয় সহজে স্বীকার করতে রাজী নয়। জয়দেব যে রকম মেধাবী তাতে ওরই প্রথম স্থান অধিকার করা উচিত। কথাটা স্পষ্টই ও জয়দেবকে জানায়। উত্তরে জয়দেব শুধু হাসে। উদাস ভাবেই মন্তব্য বলে, প্রভুর যদি ইচ্ছে হয় হবে। ব্যস্ত হবার কি আছে।

দিন দিন জয়দেবের ওপর শ্রদ্ধা বাড়তে থাকলেও উত্তর শুনে খুশী হয় না মাখন—একথায় প্রতিবাদ করতেই ইচ্ছে করে ওর। কি সব সময় শুধু প্রভু আর প্রভু! মনের ভক্তি মনে থাক, তাই বলে মামুষ প্রতিযোগিতা করবে না নাকি!—কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাখনের মুখ দিয়ে কিছুই বেরায় না।

শ্রাবণ মাস। গরমের ছুটির পর মাত্র দিন কয়েক হল স্কুল খুলেছে। এখনো বস্তার জল সম্পূর্ণ ন্যামে। ধলেশ্বরীর ক্ষীত জল এখনো বোড়ি পুকুরের কানায় কানায়। নোকা ছাড়া কোথাও বার হবার উপায় নেই। খেলা, বেড়ানো সবই এক রকম বন্ধ আমাদের। ঘরে বসে কারাম পিটানো ছাড়া গতাস্বর নেই। সব সময়েই নিজেকে বন্দী মনে হতে থাকে। কিন্তু করার কিছু নেই। জয়দেব বাড়ি থেকে ফেরে স্কুল খোলারও কয়েক দিন পরে। এবার ওকে আরো গভীর মনে হয়। বোধ হয় মাস ছ' সাত হবে চুল ছাটেনি। বাবির চুল বাড় বেয়ে অনেকটা নেমেছে। মাখন বলে, ইলান' নাকি ও প্রায় অধিকাংশ রাত্রেই ঘুমায় না। বোড়ি নিশ্চয় হলে একাকী উঠে চুপচাপ পুকুরের ঘাটলার ওপর গিয়ে বসে থাকে। কৃষ্ণের বাঁশির সুর নাকি ওকে পাগল করে। পুকুর পাড়ের কদম গাছ থেকেই নাকি ভেসে আসে স্মৃতি সুরলহরী।

কাহিনী শুনে তো আমরা অবাক। বলে কি মাখন! শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি—তাও কি না পুকুরের ঐ কদম গাছ থেকে। সব বুজুক কি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে জয়দেব তো পাগল হয়েছেন! শেষটার মাখনও না খেপে যায়। টিপ্সনী কেটে আমিই মন্তব্য করি, বাঁশি না ছাই, বাঁচির টিকিট কাটতে হবে।

কিন্তু মাখন তাতেও দমে না। ভাবাবেগেই উত্তর করে, না রে, প্রথম প্রথম আমরাও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু শেষটার আমি ওকে পরীক্ষা করে দেখছি। আমি নিজের কানে শুনেছি বাঁশির সুর। প্রতি গুরুপক্ষেই বাজে।

বলিস কি রে! মহেন বিষয় প্রকাশ করে।

মাখন বলে, হ্যাঁ, শুধু বাঁশিই নয়। জয়দেব বলে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ওর নাকি প্রত্যক্ষ কথা হয়েছে। ও দেখেছে তাঁর ভুবন ভুলানো রূপ।

ভাবি মজা তো, আচ্ছ! দেখা যাবে একদিন, মহেন আর আমি সেদিনের মতো আলোচনা রেখে উঠে পড়ি।

সেদিন স্থান পূর্ণিমা। সকাল থেকে বিব বিব করে বৃষ্টি

পড়ছিল। আমাদের স্কুল এক নাগাড়ে তিন দিন ছুটি। বোড়ি-এর অধিকাংশ ছাত্রই বাড়ি গেছে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবও অনুপস্থিত। তবে জয়দেব নিঃশব্দ নয়। মাখন বাড়ি যায়নি। জয়দেবকে আশ্রয় ভাল করে বাঁচিয়ে দেখবে। আজ নাকি শ্রীকৃষ্ণ ওকে পূর্ণ দর্শন দেবেন। ওর হাতের ভোগ থাকেন।

জয়দেবের আজ সারা দিন উপবাস। কিন্তু কোন ক্লান্তি নেই। মনে খুশী হাওয়া বইছে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বার দর্শনের জন্ত যুগ যুগ আরাধনা করে আসছে আজ ও তাঁর পূর্ণ দর্শন পাবে। ঐ কুসুমিত কদম তরুতলে এসে দাঁড়াবেন নটবর শ্রাম। হাতে থাকবে মোহন বাঁশি গলায় তুলসীর মালা ভালে কনক কিরীট। প্রভু নিজের মুখে খেতে চেষ্টাছেন। কিন্তু কি আছে ওর যে তাই দিয়ে ভোগ সাজাবে। বিনা স্তোত্র মালা গাঁথে জয়দেব বাগান থেকে মালতী ফুল তুলে। বাজার থেকে আনে সাধ্যমতো ফল, মিষ্টি, চানা, মাখন।

সন্ধ্যায় মেঘের আবরণ চিরে চন্দ্রোদয় হয়। জয়দেব উপকরণ সাজিয়ে রেখে ধ্যান বসে। প্রভুর দর্শন না হওয়া পর্যন্ত জলটুকুও মুখে দেওয়া চলবে না। কিন্তু সে তো গভীর রাত্রে। বোড়ি-এ যদি লোক থাকতো কীর্তন করা চলতো। না না, না থেকেই বরং ভাল হয়েছে। ওরা পেছনে আগতো। সদয় জুড়ই তো প্রভুর নৃপূর বাজছে। বাহ্যিক কীর্তনের আর দরকার কি!—জয়দেব ধ্যান গন্তব্য হয়েই চুপচাপ বসে থাকে। আজ আর বিছানায় ওপরে নয়। মেঘের ওপরে—শুদ্ধাসনে।

রাত্রির মধ্য প্রহর। নিশ্চয় বোড়ি। চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে। শুঁড়ি শুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। জয়দেবের চোখে ঘুম নেই। মাখন খেয়ে দেয়ে বিছানা নিয়েছে বটে, কিন্তু ঘুমায় নি! আজ জয়দেবের সঙ্গে ওও কৃষ্ণদর্শন করবে। জয়দেবের মতোই সাগ্রেহ অপেক্ষা করছে। সহসা কদম গাছের পাতা নড়ে ওঠে। জয়দেব ধ্যানে ছিল হকচকিয়ে নড়ে ওঠে। নিম্নে ভেসে আসে সুরলহা বাঁশির সুর। জয়দেব আর স্থির থাকতে পারে না। নৈবেদ্য তাতে শোর খুল ঘাটলার দিকে রওনা হয়। বাহ্যিক হয়তো কোন চেতনাই নেই। মুখে অনুটস্বর প্রভু দেখা দাও—প্রভু দেখা দাও—

জয়দেব বেরিয়ে যায়, মাখনও বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পা টিপে টিপে ওকে অনুসরণ করে। চুপি চুপি গিয়ে ঘাটলার একপাশে বসে। জয়দেবের কোন ক্রক্ষেপই নেই। বোড়ি-এরও কেউ জেগে নেই। বাঁশি একটানা বেজে চলেছে।

বাঁশি বাজছে। জয়দেব কান পেতে তা শুনছে। যেন শ্রীমতীই যমুনার কূলে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ জয়দেব যেন আমাদের জয়দেব নয়। ভাব পাগল এক আত্মতোলা।

বেজে বেজে বাঁশি খেমে যায় এক সময়। জয়দেব নৈবেদ্যের থালা হাতে কদম গাছের নিকে ছুটে থাকে। বর্ষা ভিজে মাটি। বৃষ্টিরও কামাই নেই। পুকুর পাড় রীতিমতো পিচ্ছিল। পা হড়কে যে কোন হুহুর্তে জলে গিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ভাবপাগল জয়দেবের সেদিকে কোন হ'স নেই। চলেছে তো চলছেই। মাখনেরও আত্মপ্রকাশের কোন সুযোগ নেই। যতটা সম্ভব গা বাঁচিয়েই ও লক্ষ্য রাখছে। এমন সময় নৈববাণীর মতো সহসা ভেসে আসে প্রভুর কণ্ঠস্বর, "উত্তল হোস নে নৈবেদ্য কদম তলে রেখে চোখ বোজ। বধাসময়ে দর্শন পাবি।"

জয়দেব অমুগত ভক্তের মতো তাই করে। ভরে মাখনের গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে। লুকিয়ে এসেছে, ওকি প্রভুর তেজঃপুঞ্জ জ্যোতির সামনে চোখ খুলতে পারবে! গীতার বর্ণিত বিশ্বরূপের সেই ভয়াল মূর্তি অবিরত ভেসে ওঠে। মাখনও জয়দেবের মতোই চোখ বোজে। ভক্তবাঞ্ছা ভগবান। ভক্তের দেওয়া নৈবেদ্য খুশী মনেই গ্রহণ করবেন। হয়তো কদম গাছ থেকে নেমেই আসছিলেন উনি। সহসা দুঃস্বপ্ন শব্দ হতে থাকে। মাখন চোখ খুল দেখে ইষ্টক বর্ষণ শুক হয়েছিল। আর তা আসছে পার্শ্ববর্তী আমগাছ থেকে। জয়দেবও হয়তো চোখ খুলেছিল। প্রভুর প্রাতি অনাচার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ও ভুলে লুটিয়ে পড়ে। প্রভুর পক্ষেও আর বেশীকণ কদম গাছে টিকে থাকার সম্ভবপর হয় না। ইষ্টকের ঘায়ে লাফিয়ে পড়তেই বাধ্য হন।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের আম গাছ থেকে আরো দু'টি ছায়ামূর্তি লাফিয়ে পড়ে। মাখন সহসা কিছু বুঝে উঠতে পারে না। কদম গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লেন উনি তো স্বয়ং প্রভুই। ঐ তো গীতবাস পরনে, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ দেওয়া চূড়া, হাতে মোহন বাঁশি! কিন্তু ও পাখিও ছ'জন কে? তেড়ে এসে প্রভুর হাত চেপে ধরলে! ওরা কি কেশের চর?...

মানিকে আর বেশীকণ হাবুডু খেতে হয় না। ছায়ামূর্তি দু'জন দু'পাশ থেকে প্রভুকে চেপে টানতে টানতে মাখনের কাছে এনে হাজির করে। প্রথমটা একটু ভড়কে গেলেও মাখন স্থির হয়ে দাঁড়ায়। ছায়ামূর্তি দু'টি কাছে আসতেই বিষয়ে ফেটে পড়ে। ও মা, এ যে দেখছি মহেন আর স্রশাস্ত। আর ও তো প্রভু নয়; যাত্রার দলের সেই বয়্যাটে সন্তোষটা। আগে মনে ছিল না, পাঞ্জিটা তো সত্যি খুব ভাল বাঁশি বাজাতে পারে। জয়দেবকে তা হলে এই হতচ্ছাড়াই পাগল করেছে। ক্রোধে এক ঘূষি তুলে ক্রোধে ওঠে মাখন। মহেন স্রশাস্তও জোরসে কয়েক বা বসিয়ে দেয়। সন্তোষ হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করতে থাকে। জীবনে আর কখনো এমুখো হবে না।

ওনিকে জয়দেবকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ওরা সকলেই সন্তোষকে ছেড়ে জয়দেবের কাছে ছুটে আসে। বেচারী, সারা দিনের ক্লান্তিতে মুচ্ছার ঢলে পড়েছে। পুকুর থেকে আঁজলা করে জল এনে তাড়াতাড়ি ওর মাথায় দিতে থাকে। তিন জনে ধরাধরি করে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

ছাড়া পেয়ে সন্তোষ নৈবেদ্যের থালা নিয়ে সরে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়দেবের জ্ঞান ফিরে আসে। ঘীরে ঘীরে চোখ মেলে অক্ষুট স্বরে আওড়াতে থাকে, কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ নয়াময়।

সেই থেকে জয়দেবের পাগলামি আরো বেড়ে যায়। মাখন

অনেক করে বুঝতে চেষ্টা করে। সন্তোষের হুটুমীর কথা আগাগোড়া ওকে বলে। কিন্তু ও কিছুতেই বোঝে না। তার পবেও অনেক রাত্রে পুকুর ঘাটে গিয়েছে। বাঁশি শুনবার জন্য আঁকুল হয়ে কঁদেছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বুক চাপড়িয়েছে। আমরাও ওর জন্য চেষ্টার কট করিনি। হাসি ঠাটা করে, ভর দেখিয়ে, আমোদ প্রমোদের কথা বলে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন ওয়ুমেই ওর রোগ উপশম হয়নি। বাৎসরিক পরীক্ষা এসে পড়ে, আমরা আর বৈধ্য বাঁধতে পারি না। যে বার পড়ায় মন দিই। জয়দেব যেন দিন দিন ফাকাশে হতে যেতে থাকে। ভাল করে খায় না, ঘুমায় না, পড়াশুনো করে না। কথাটা হেড মাষ্টার মশায়ের কানে দেওয়াই হয়তো আমাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু কি জানি কেন, আমরা কেউ তা দিইনি। বাৎসরিক পরীক্ষা আরম্ভ হবার আগের দিন সহসা দেখা যায় জয়দেবের সীট খালি। চারদিক থেকে বোজাখুঁজি চলে চলে কিন্তু কোন পাতাই পাওয়া যায় না।

প্রায় বছর তিনেক কথা। আমরা সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবো। হঠাৎ একদিন হেড মাষ্টার মশায় নবীন এক সন্ধ্যাসীকে সঙ্গে করে আমাদের ক্লাসে ঢোকেন। মহেনকে লক্ষ্য করেই জিজ্ঞাস করেন, মহেন, একে চিনতে পারছো?

মাথায় গেল্লো পাগড়ি বাঁধা, পরনে আসখান্না, প্রতিভাসীপ্ত মুখাঘর। মহেন কেন আমরা কেউ ওকে চিনতে পারি না। অবশেষে উনিই হাসতে হাসতে মন্তব্য করেন, ভূতপূর্ব তোমাদের সহপাঠী জয়দেব বিশ্বাস। অধুনা কৃষ্ণানন্দ স্বামী।

স্বামীজির পরিচয় শুনে আমরা সকলেই মুহূ মুহূ হাসতে থাকি। উনিও আমাদের মতোই হাসতে থাকেন।

নিবারণ বাবু এককণ পর্শ্বস্ত একটানা বলে চলেছেন। সেন্ট্র লীলা মন্তব্যরূপে শুনছিল, একটুও বাধা দেয় নি। এবার সেন্ট্র ঢোক গিলে প্রশ্ন করে, সকালে যিনি এসেছিলেন তিনিই কি দাছ?

হ্যাঁ দাছুভাই, তিনিই আমাদের ভূতপূর্ব সহপাঠী জয়দেব বিশ্বাস। অধুনা ভারতের এক দিকপাল পণ্ডিত, নিবারণ বাবু উত্তর করেন।

উনি কেন এসেছিলেন দাছ?

উনি এখানে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে চান। বার আদর্শ হবে, অহিংসা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলো।

তুমি কি বললে?

বললেম, একাজে আমার মত আছে। আমি বখাসাধ্য সহায়তা করবো।

সেন্ট্র লীলা দু'জনেই বোম্ব হর খুব খুশী হয়। সারা পৃথিবীর মানুষ যদি হিংসা তুলে যায়, তা হলে কি সুখেই না মানুষ থাকতে পারে!

## সাহিত্য কি?

"সাহিত্যের ধর্ম, রূপ, গঠন, সীমানা, এবং তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এর আর একটা দিকের কথা প্রকৃত্তে আজও কেউ বলেন নি। সে এর প্রয়োজনের দিক,—এর কল্যাণ করার শক্তি সম্বন্ধে। এ কথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে সাহিত্যরসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন "সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূল আঘাত! এবই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উগার, তার সহিষ্ণু ক্রমশঃ মন সাহিত্যরসের নুতন স্বত্বকে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে।"—শব্দচন্দ্র



## গাজন গান

শ্রীজয়দেব রায়

রাষ্ট্রদেশের ধর্মসাক্ষরের পুত্র। পূর্বে বৌদ্ধদের অমুঠান ছিল, যুগের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাহাই এখন বুদ্ধোশিবের গাম্বনে পরিণত হইয়াছে। পূর্বে ধর্মসাক্ষরের পুত্রস্বামী ছিল নিয়ন্ত্রণীর ডোম বা বাগদৌরা, ব্রাহ্মণ্য সঙ্কায়ের দ্বারা পুত্ৰ হইয়া হিন্দু দেবতাদের মধ্যে স্থান পাওয়ার পর এখন উক্তবর্ণের হিন্দুস্বামী গাজনের বুদ্ধোশিবের পূজা করে; কিন্তু গাজনে বাহ্যিক মাতিয়া উঠে তাহার নিয়ন্ত্রণেরই লোক।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ধর্মসাক্ষ শিবের পূজার মধ্যে আত্মস্থানিক ভাবে রহিয়া গিয়াছে। গাজনের ভক্তদের ঐ সময়ে বৌদ্ধভিক্ষুদের আচার-ব্যবহার অনুসরণ করিতে হয়। দৈনিক নিষ্ঠাতন বা আত্মনিগ্রহ তাহাদের তপস্কারই অঙ্গীভূত। বৌদ্ধধর্মে স্নাত-বিচার বা অস্পৃশ্যতা নাই, ধর্মপূজার মধ্যেও স্নাতভেদ বা স্পৃশ্যপূজা ভেদ নাই। ব্রাহ্মণ পূর্বাহিত ও নীচজাতের ভক্তদের একত্র মেলামেশার কোন বাধা নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতের গাজনসন্ন্যাসীদের মধ্যে আহার-বিহারে কোন বাধা-বিচার নাই।

চম্বার যুগে গুরুবান্ধি প্রাধান্য লাভ করে, তাহার পর হইতে বাউলা দেশের গানে গুরুবন্দনা চিরায়িত প্রধায় দাঁড়াইয়া যায়। নদীয়ার গাজন-উৎসবের এই প্রকার একটি গুরুবন্দনা গান উদ্ধৃত করা হইল—

প্রণাম গুরুদেব, অবিল ভুবনে সেবা

গুরু চতুর্ভুজ সিংহ অপরূপ।

বাহার চরণ ধরি, এ ভব সংসার তরি

গুরু হন ত্রকার স্বরূপ।

(আহা) অন্ধের লোচন গুরু, ভক্ত-বাঁধা কলতক

ভহ জনার প্রতি গুরুর দয়া।

শিবের সেবক নন্দী শিবের চরণ বন্দি

আর বন্দি মা মহামায়া।

গুরু গোদাঁঠি কর দয়া দেও মোরে পদছায়া

ও বাড়া চরণ বিনে গতি নাই।

অস্ত্রিম কালে বন্দুতে লয়ে যায়,

সেবক বলিয়া প্রভু রেখে বাড়া পাথ।

গাজন-গানের বৈচিত্র্যের স্তম্ভ নানা আখ্যানিকার সন্নিবেশ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভগীরথের গঙ্গা আনিয়ন, লাউসেনের ধর্মপূজা, শিবের নৌকাবিহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পল্লী-কবিরা তাঁহাদের মনোমত নানা নূতন নূতন আখ্যানিক গাজন-গানে প্রতি বৎসর সংযোজন করিয়া চলিতেছেন।

ভগীরথের গঙ্গা আনিয়নের গল্প রামায়ণে আছে, গাজন-গানে তাহার ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ পাওয়া যায়—

ত্রকার কৌমণ্ডলে আছেন গঙ্গানারায়ণী রূপ হয়ে।

ধান করিলেন মুনীগণে শিব দিলেন তা কয়ে।

ধান করিয়া দেখিলেন যত মুনীগণে।

স্বর্ধবংশে জন্মিবে ভগীরথ গঙ্গা আনিবে সেই জনে।

ত্রকার আদেশে করিয়া গমন আইলেন শিবের পাশ।

শিবের নিকটে করিলেন স্তব বৎসর হাজার দশ।

তুমি হরিহর সর্কলের আর তোমা বিনে আর কে।

তুমি না সহিলে সকলি মজিবে বাস্তবিক হইবে শেষ।

আগুন করিয়া বসিলেন শিব যোড় করি দুই হাত।

শিবের মস্তকে ঢালিলেন গঙ্গা মুছিত হলেন ভোলানাথ।

শিবের আঁতনে তাঁহার মাথায় জল ঢালিবার সময়ে এই শ্রেণীর গান গাওয়া হয়। ভগীরথ গঙ্গা আনিয়ন করিলে তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন শিব। এসময়ে তাঁহার মস্তকে গঙ্গাজল ঢালিতে ঢালিতে সেই কথাই স্মরণ করা হয়।

গাজনের ব্রত গ্রহণের সময়ে ভক্তরা তামার অঙ্গুরীযুক্ত একটি পৈতা গলায় পরে, তাহার নাম 'উত্তরী'। অহুমান করা হয়, বৌদ্ধযুগে বিম্বত ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণের শেষ চহুরূপে এই প্রথা প্রচলিত আছে। এই সময়ে জল-গুঁড়, কীর-গুঁড়, উত্তরী-গুঁড়, অঙ্গুরী-গুঁড়, প্রভৃতি কয়েকটি আত্মস্থানিক গান গাওয়া হয়। যেমন—

মন করি প্রতি মোরা, পবন করি কাছা,

সেই কাছা পরে পুঞ্জি সমাগ দেবতা।

সেই কাছা পরে করি শিবের স্মরণ।

যত কিছু পাপ মোদের হবে ততক্ষণ।

কহেন তো সৎগুরু মহেশ্বর বরে।

উত্তরী গুঁড় করেন শ্রীভোলা মহেশ্বরে।

লাউসেন ছিলেন ধর্মযজ্ঞের আদর্শ বীর, ধর্ম ঠাকুরের বরপুত্র।  
গাজনের পটনির্মাণের গানে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে—

ভারত ভূবনে এসেন দেব পঞ্চানন।  
লাউসেনের বাড়ি ঠাকুর বলেন দরশন।  
দরশন দিলেন ঠাকুর লাউসেনের বাড়ি।  
বসিতে দিলেন রাজা কুশাপনখানি।  
পাক্ত অর্থ নিয়ে রাজা কহে স্তববাণী।  
কি কারণে আগমন আজ্ঞা হোক শুনি।  
শিব বলেন স্থান করেন উপোস খেয়াতি।  
সিংহাসন আনি দেহ পূজার অমৃতমতি।

লাউসেন প্রাচীন বাঙ্গলার আদর্শ বীর চরিত্র। ধর্মরাজের ধর্ম রাজ্য স্থাপনের জগৎ তাঁহার জন্ম।

রউপুর জেলায় ধোপী সম্প্রদায়ের কৃষকদের মধ্যে শিবের গাজন গান একটি বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নাথ যোগীদের সাধন-ভক্তনের রীতিনীতির সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের শৈবভক্তদের মিল আছে। অনুমান করা হয়, তাহারাই এই সম্প্রদায়েরই উত্তর সাধক। এই সকলের গাজন গান হঠাৎ হুগাঁও শাখা পথের সাপের একটি গান উদ্ভূত করা হইল—

আমার জাতের কথা শির হুই কলু ভাঙ্গিয়া।  
তোমার জাতের কথা কইলে লাগিবে কগড়া।  
ভাঙ্গুর আইসে, স্বস্তুর আইসে বণপারসুম তাকে।  
হাতে শাক্সা নাই ছান গোদাঁই নজ্জা পাছু তাতে।  
শাক্সা না পাইলে তবে যাব বাপের বাড়ী।  
বাপের বাড়ী যাব দুর্গা ভাইয়ের বাড়ী যাব।  
কাটনি কাটিয়া তবে হুই ছেইলাক পাণিব।

উত্তর বঙ্গের গাজন গান ও পূর্ববঙ্গের নৌলের গান সমশ্রেণীর। এই প্রকার শাখা পথানোর গান, শিব-দুর্গার বিবাদ, নারদের ঘটকালি প্রভৃতি নৌলের গানেরও বিষয়বস্তু।

গাজন উৎসবের ছয়টি অঙ্গ—ভক্তনির্মাণ, কোরী ও সংঘম, ঘটস্থাপন ও হবিষ্য, মহা হবিষ্য, উপবাস উৎসব ও নৌলাবতী পূজা এবং চড়ক।

গাজন উৎসবের প্রারম্ভিক অমুষ্ঠান শুরু হয় ২৭শ চৈত্র। ঐদিন ভক্তরা সন্ধ্যাসমুদ্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজগোত্র পরিত্যাগপূর্বক শিবগোত্রে প্রবেশ করে। ঐতিহাসিক যুগের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পুনরুত্থান হয় এই ভাবেই। ঐ দিনই তাহারি মহাচবিষ্য পালন করে।

সংক্রান্তির গাজন নৃত্যের আসবাব একটি বিরাট অমুষ্ঠান, সাগা-বাজি ধরিয়া ঐ দিন ভক্তরা শিবের আটনের চারিপাশে গান গাতিয়া নৃত্য করে। এই নৃত্যোৎসবের সঙ্গে রীতিমত সাময়িক উদ্‌দীপনা বিজড়িত—এ যেন যুদ্ধেরই মহড়া। এককালে এই সকল ভক্তদেরই পূর্বপুরুষগণ বণতান্ত্রের মতিদ্বাছিল, তাহাদের বাহুবলেই বহু ভূমামীর বহু ধনসম্পদ সুরক্ষিত হইয়াছে, বহু দরিদ্রের শেষ সখল লুপ্তিত হইয়াছে; আজ তাহাদের সেই প্রতাপ না থাকিলেও, তাহাদের রক্তে রক্তে রহিয়াছে রণোদ্দামনা।

নৃত্যের পূর্বে ‘বারপরিচার’ ও ‘বাটনী’ নামক দুইটি অমুষ্ঠান থাকে। এই অমুষ্ঠানে গাওয়া হয়—

পূর্বে পূর্বমণি সখতারায় হায়,

তিন বরুণ রাজা, তামু ভাস্কর,

ঐর চরণ সেবি কোন পদ পাই,

দেই যাব বমপুত্রী ধর্মপুত্রী ঠাই।

ধর্ম অধিকারী, কর্ম অধিকারী;

সাধুলিরে ভাই

পূর্ব দুয়ার বাটনী হ'ল পুষ্পজল পাই।

চড়ক পূজার সময়ে ভক্তরা নানাপ্রকার দৈহিক নিধাতন স্বেচ্ছায় পরিগ্রহ করে। কুমীরের পূজা, ফলস্ত অঙ্গারের উপর নৃত্য, কাঁটা বা ছুরির উপর ঝাঁপ দেওয়া, বাণ কোঁড়া, শ্মশানে বাবানো ও হাঙ্গরা বা ভূতের পূজা, বেড়াবাতেব নিধাতন, খেজুরের কাঁটার উপর শয়ন প্রভৃতি এই সূত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়। এইগুলি সবই অনাধি-প্রভাব সম্বৃত।

অমুষ্ঠানের পরিশেষে ভক্তরা শিবের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ করে—

ভাঙব চারি ত্রয়ারের কবাট,

দেখব এবার শিবের পাদচরণ।

দশেতে করিল পূজা দশগিরি রাবণ,

লোহার গুণে সেবা করে সেই পঞ্চানন।

দেবদেবন মহাদেবন গলার ডেরে পৈতা কাঁধে

চুতঃ দুয়ার মুক্ত হ'ল দেখ পঞ্চানন।

গাজনের সময়ে পল্লীর নিজস্ব দেবতাপ্রাপ্ত পূজা লাভ করেন

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে **ডোয়াকিনের**



কথা, এটা  
খুবই আভা-  
বিক, কেননা  
সবাই জানেন  
**ডোয়াকিনের**  
১৮৭৫ সাল  
থেকে দীর্ঘ-  
দিনের অভি-  
জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ ক'রে মূল্য-তালিকার  
জ্ঞান লিখুন।

**ডোয়াকিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ**

শো-রুম :—৮/২, এম্প্ল্যান্ড ইস্ট, কলিকাতা - ১

প্রত্যেক পল্লীগ্রামে নিজস্ব গ্রামাদেবতা আছেন। অনাথ আমল হইতে এই ভাবে তাঁহার গ্রামপ্রান্তের বৃক্ষমূলে কিংবা অজ্ঞ কোন নির্দিষ্ট স্থলে অধিষ্ঠিত বহিয়াছেন। কোথাও তাঁহার নাম বনভূগা, কোথাও বা বুড়োশিব।

বটগাছের পূজাও প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। পৌড়বঙ্গের প্রাচীনতম কবি গোবর্ধন আচার্যের একটি স্লোকে আছে—

অগ্নি কুগাম বটকম বৈষ্ণবশো বসতু বা লক্ষ্মীঃ।

পামরকুঠারপাতাঃ কাদরিশশৈবৈব তে রক্ষ।

এ ছাড়া গাছের সময়ে নানাপ্রকার দরজা বা কেতন পুষার প্রচলন ছিল এবং এখনও অনেক স্থানে আছে তবে তাহার দ্রুত পরিবর্তন ও রূপান্তর হইতেছে।

## রেকর্ড-পরিচয়

“হিজ মাস্টার্স ভয়েস” ও “কলম্বিয়া”র এবার চারখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে :

### হিজ মাস্টার্স ভয়েস

N 82741—শ্রীমতী সচিত্রা মিত্র “মরি সো মরি আমার” ও “আমি যে আর সইতে পারি নে”—রবীন্দ্র-সঙ্গীতির অল্পতম শ্রেষ্ঠ অর্থা।

N 82742—“একটুকু ছোঁওয়া লাগে” এবং “আমার সঙ্গে সঙ্গে কে”—গেয়েছেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত সাধিকা শ্রীমতী কবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

### কলম্বিয়া

GE 24838—কুমারী গায়ত্রী বসুর দরদী কণ্ঠে “সে কোন বনের হরিণ” ও “গোপন কথাটি রবে না গোপনে” ভাব ব্যঞ্জনাৎ অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

GE 24839—শ্রীমতী গীতা ঘটক রেকর্ড-জগতে নবাগতা হলেন সংগীত-প্রিয়দের পরিচিতা। বিশ্বকবির “ছ’জনে দেখা হল মধুসামিনীতে” ও “সখী বহে গেল বেলা”—গান দু’খানির ডালি নিয়ে শিল্পী রেকর্ড-জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন—ভাব ও স্বর মৃত হয়ে উঠেছে শিল্পীর কণ্ঠে।

## আমার কথা (২৮)

### গৌরীকন্দার ভট্টাচার্য

আধুনিক এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, বাংলা এবং হিন্দী কি উড়ু, কীর্তন, গ্রাম্যসঙ্গীত, পল্লীসঙ্গীত কিংবা জাতীয় সঙ্গীত আবার কাণ্ডালি, গীত, নাট, গল্প, ভজন, ঝপন, খেয়াল, হুঁসি—সব রকম গানে সমান পারদর্শী, গীত-রসিকদের প্রিয় গায়ক গৌরীকন্দার ভট্টাচার্য ১৯১৬ সালে চট্টগ্রামের পরাইকোড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কবিরাজ অপরর্ণচরণ ভট্টাচার্য। মাত্র

দশ মাস বয়সেই গৌরীকন্দারকে কাশীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বালক বয়স হতে বারাণসীর পবিত্র আবহাওয়ার তাঁর সঙ্গীত-সাধনা শুরু হয়। কাশীর বিখ্যাত ঝপন গাঠিয়ে হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষায় প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় আসেন এবং রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে গান শিখতে থাকেন।

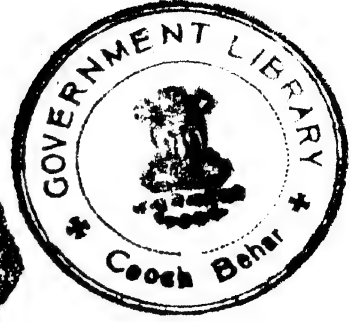
কাশীর সেন্ট্রাল কাশী ইনস্টিটিউশন এবং কলকাতার ধর্মদাস মডেল স্কুল এবং রামবিক ইনস্টিটিউশনে তিনি লেখাপড়া করেন। যখন তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন মাত্র সতের বছর বয়সে রেডিওতে গান করবার সুযোগ পান এবং ১৯৩৬ সালে কুড়ি বছর বয়সে কলকাতা রেডিওতে নিয়মিত শিল্পী হিসাবে কাজ শুরু করেন।

রেডিওতে গাওয়া গান ক্রমে বসে ছাত্রবৃন্দের অনুরোধে গাইবার সময় ধরা পড়ে তিনি বিজ্ঞালয়ে হতে বহিষ্কৃত হন, তদবধি অনন্তচিন্তে সঙ্গীতের সাধনায় নিযুক্ত থাকেন। ১৯৩৬ সালে তিনি প্রথম গান রেকর্ড করান,—১৯৩৭ সালে তা “হিন্দুস্তান” রেকর্ডে প্রকাশিত হয় এবং অচিরে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার পর বিগাল, কলম্বিয়া এবং “হিজমাস্টার্স ভয়েস” রেকর্ডেও তিনি বাংলা হিন্দি এবং উর্দু বহু প্রকারের গান দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন।

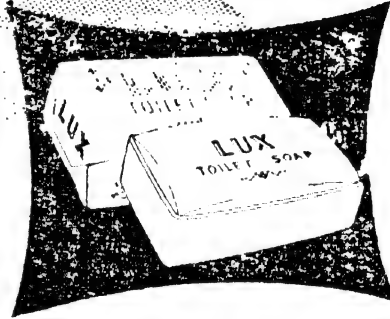
রেডিও এবং রেকর্ড ব্যতীত চলচ্চিত্রে তিনি বহু গান নেপথ্য থেকে গেয়েছেন, নিজে পদ্য আবৃত্তিও হয়েও গেয়েছেন, বহু গানের সুর দিয়েছেন, সুবপরিচালকের কাজও করেছেন—“ছাপি ফার” নামক চিত্রে তিনি প্রথম নেপথ্য সঙ্গীত করেন। পরে “চন্দ্রশেখর” “মরণের পথে” “আবতন”, “নিমাই সন্ন্যাস” প্রভৃতি ছবিতেও গান করেন। “এই তো জীবন” “শাখা সিঁদুর” “মৌচাক ছিল”, “মহাসম্পদ” “নন্দারাগীর সংসার” “এক আঁঠুর” প্রভৃতি চিত্রে সহকারী সঙ্গীত পরিচালকের কাজ এবং নেপথ্য সঙ্গীত দুই কাজই তিনি করেন। পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্ম-সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে তিনি “পরশ পাথর” চিত্রে কাজ করেন।

বর্তমানে রেকর্ড এবং চলচ্চিত্রের সংস্পর্শ একরকম ছেড়ে দিয়ে সঙ্গীতকে তিনি সাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এখনও রেডিও এবং বড় বড় জলসার গান করেন বটে, তবে আধুনিক গানের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই বেশি গেয়ে থাকেন। তিনি একজন দক্ষ সঙ্গীত শিক্ষক। বাণী বিজ্ঞাবোধি, সুর বিজ্ঞাবোধি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত শিক্ষকের কাজ করেছেন। তার ছাত্রদের মধ্যে বহু গুণী গায়ক বেঁচেয়েছেন।

নিরল্ভমান অনলস কর্মী গৌরীকন্দার সাময়িক বিভাগে ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল বিভাগে ভালো চাকুরীতে কয়েক বছর কাজ করেছিলেন। বিদ্বৎ ও স্বপ্নপাতির কাজে তাঁর দক্ষতা থাকলেও মন বসত না, ফলে তিন বছর কাজ করবার পর ফের তিনি পালিয়ে এলেন সঙ্গীতের আসরে এবং যা তাঁর নিজের মনের মতো কাজ সেই গীত সাধনাতেই ডুবে গেলেন। আজিও চলছে তাঁর অনন্ত সাধনা। তিনি কখনও আত্মপ্রচারণা চাননি, চেয়েছেন গান, শ্রাণ চলে গান গাইতে, আর তাতেই পরকণে নিশ্চয়, নিজের পেয়েছেন পরম তৃপ্তি—যা প্রকৃত গুণী শিল্পীর ধর্ম।



প্রগতি ঘোষ লাক্স টয়লেট  
সাবান পছন্দ করেন তিনি বলেন  
“এর শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতা  
প্রমাণ করে!”



প্রগতি ঘোষ গুণী শিল্পি এবং হৃদয়ী। কিন্তু তিনি জানেন যে, জনসম্প্রদায়ের তাঁকে  
ভাল লাগার জন্য তাঁর হৃদের লাগণ্যও অনেকখানি দায়ী। সেইজন্মে তিনি সব-  
চেয়ে মোলায়েম ও নিরাপদভাবে প্রতিদিন শুভ্র বিশুদ্ধ লাক্স টয়লেট সাবানের  
সাহায্যে তাঁর স্বকের যত্ন নিয়ে থাকেন।

আপনারও সেই একইভাবে স্বকের যত্ন নেওয়া উচিত। লাক্স টয়লেট সাবানের সুগন্ধ  
সব্বের মত ফেগার রাশি আপনার সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তুলুক।

লাক্স টয়লেট সাবান  
চিত্র - তারকা দেব সৌন্দর্য সাবান

# সাম্রাজ্যাত্মিক



## পরিচিতি

ঐগোপালচন্দ্র নিয়োগী

জর্ডানে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন---

জর্ডানের রাজা হোসেন গত ২৫শে এপ্রিল (১৯৫৭)

সমগ্র জর্ডানে সামরিক আটন, আত্মানের রাজপথ হইতে বিক্ষোভকারীদিগকে অপমারিত করিবার জন্য দিন-রাত্রি বাপী কারফিউ জারী করিয়াছেন, সমস্ত রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া দিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খালিদির পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া ইব্রাহিম হাসেনকে নতুন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছেন। গত এপ্রিল মাসের (১৯৫৭) তিন সপ্তাহব্যাপী যে সফল ঘটনার ক্রম পরিণতিতে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, উহা জর্ডানে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন প্রয়োগের প্রথম ফল। ২৫শে এপ্রিল জর্ডান বেতারে রাজা হোসেনের বেকর্ড-করা যে বিবৃতি প্রচার করা হয় তাহাতে বলা হইয়াছে যে, “আমি আমার সৈন্তবাহিনী ও জনগণের সমর্থন লাভ করিয়াছি।” তিনি যে জনগণের বিরুদ্ধে সমর্থন লাভ করিয়াছেন তাহা আত্মনে দিন-রাত্রি বাপী কারফিউ জারী হইতেই বুঝিতে পারা যায়। জর্ডানের রাজা যদি সত্যি জনগণের সমর্থন লাভ করিতেন তাহা হইলে কারফিউ জারীর কোন প্রয়োজন হইত না। সৈন্তবাহিনীর সমর্থন যে তিনি পাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমর্থন পাওয়ার পূর্বে জর্ডান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আবু মুওয়াহকে তিনি পদচ্যুত করেন এবং ১৭ জন সামরিক অফিসার এবং প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী নবুলসির ১১ জন সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়। জেনারেল মুওয়াহকে পদচ্যুত করার পর মেজর জেনারেল আলি হিয়াবীকে জর্ডান বাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ নিযুক্ত করা হয়। রাজা হোসেন ৬০ জন সামরিক অফিসারকে স্বৈরতান্ত্রিক ভাবে পদচ্যুত করায়, উহার প্রতিবাদে মেজর জেনারেল আলি হিয়াবীও পদত্যাগ করেন। সামরিক অফিসারদের মধ্যে যেসকল আরব ফিলিস্তানী ছিল এই ভাবে তাহাদিগকে অপমারিত করিয়া রাজা হোসেন তাহাদের স্থানে অমুগত বেহুইন অফিসার নিযুক্ত করায় সৈন্ত বাহিনীর সমর্থন পাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

আত্মানের রাজপথগুলিতে গত ২৪শে এপ্রিল যে মার্কিন-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়, রাজা হোসেনের বিবৃতিতে তাহার জন্য আন্তর্জাতিক কন্যুনিজমকে দায়ী করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক কন্যুনিজমের অজুহাতে বাধা থুণী তাহাই যে করিতে পারা যায়

জর্ডানের ঘটনাবলী তাহার আর এক দক্ষ প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিবৃতিতে তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, কয়েক জন অফিসারের দেশত্যাগই উহার প্রমাণ। জর্ডানের সঙ্কটকে রাজা হোসেন সম্পূর্ণ রূপে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, জর্ডানের ব্যাপারে বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ সহ্য করা হইবে না। কিন্তু জর্ডানবাসীদের অধুস্তের ইহা এক পরিহাস যে, আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের স্বার্থেই রাজা হোসেন জর্ডানে এই সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনকে নিয়োগ করিয়াছেন নিজের সিংহাসন রক্ষার প্রয়োজনে। বিবৃতিতে তিনি রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে জর্ডানের বাহির হইতে নির্দেশ গ্রহণের অভিযোগও উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই অভিযোগ জর্ডানের জনগণের বিরুদ্ধেই করা হইয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। গত অক্টোবর মাসের (১৯৫৬) সাধারণ নির্বাচনে জনগণ ঐহাদের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাহার বিদেশ হইতে নির্দেশ গ্রহণ করিতেছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বাহিরের নির্দেশ বলিতে রাজা হোসেন বুটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশকে বুঝান নাই, বুঝাইয়াছেন রাশিয়ার নির্দেশকে। রাশিয়া আরব রাষ্ট্রগুলিতে অল্পপ্রবেশ করিতে চেষ্টা করি অবলম্বিত করিতেছে না। কিন্তু কাথাতঃ রাশিয়া কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। রাশিয়া কর্তৃক প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা নিরোধের জন্যই আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন। জর্ডানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী নবুলসী আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন ও সামরিক চুক্তির নিন্দা করিয়াছেন। ইহার উপর তিনি এক তাহার মন্ত্রিসভা রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। রাজা হোসেন উহাকেই জর্ডানের জনগণের বিরুদ্ধে তাহার অভ্যুত্থানের সুযোগে পরিণত করিয়াছেন।

জর্ডানে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছিল তাহা আসলে রাজা হোসেনের সিংহাসন সঙ্কট। তাহার সিংহাসন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। জর্ডানের রাজসিংহাসনের রক্ষক বুটেনের অর্থ সাহায্য, বুটিশ জেনারেল গ্লাব পাশা কর্তৃক গঠিত সৈন্ত বাহিনী অর্থাৎ আরব লিজিয়ন এবং বেহুইনদের আত্মগত্য। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে অঞ্চল লইয়া ট্রান্স জর্ডান রাজ্য গঠিত হয় তাহা ছিল ৪ লক্ষ বেহুইন অধ্যুষিত। বুটেন আমীর আবদুল্লাহকে এই ট্রান্স জর্ডান অঞ্চলের অধিপতি করেন এবং বেহুইনরাও তাহার আধিপত্য মানিয়া লয়। সম্পূর্ণরূপে বুটেনের অর্থে আরব লিজিয়ন গঠিত হয় এবং বুটিশ জেনারেল গ্লাব



পাশার হাতেই ছিল প্রকৃত পক্ষে এই নতুন রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা। বৃটিশ অর্থের উপরেই এই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। বেহুইনদের রাজনৈতিক চেতনা বলিয়া কিছু নাই, গণতন্ত্রের ধার তাহারা ধরে না। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ভাবধারার মধ্যে বদ্ধিত বলিয়া আমার আবহুজ্জার প্রতি তাহাদের আত্মগত একটুকুও ক্ষুদ্র হয় নাই। এই ভাবে রাজা আবহুজ্জার রাজ্য শাসন বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছিল। অতঃপর ১৯৪৮ সালে আরম্ভ হইল আরব-ইসরাইল যুদ্ধ। এই যুদ্ধে একমাত্র ট্রান্স জর্ডানের আরব লিজিয়নই বিজয় গৌরব অর্জন করিতে এবং জর্ডান মনীর অপার পারস্থ নয় লক্ষ আরব ফেলিস্তানী অধ্যুষিত অঞ্চল দখল করিতে সমর্থ হয়। এই অঞ্চল ট্রান্স জর্ডানের অঙ্গভূত হওয়ায় উহার নতুন নামকরণ হইল জর্ডান। এই যে নয় লক্ষ ফেলিস্তানী আরব জর্ডানের নাগরিক হইল ইহারা সকলেই রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন এবং গণতন্ত্রের সমর্থক। জর্ডান রাজ সিংহাসনের সঙ্কটের সূচনা এই সময় হইতেই, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

রাজা আবহুজ্জা একজন ফেলিস্তানী আরবের হাতেই ১৯৫১ সালে নিহত হন। আবহুজ্জার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তালাল সিংহাসনের আরোহণ করেন। কিন্তু জেনারেল গ্লাব পাশার সহিত ছিল তাঁহার মনোমালিন্য। কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই পুত্র হোসেনের অধিকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হইল। এই তরুণ যুবক রাজা হোসেনই গ্লাব পাশাকে ১৯৫৬ সালে বরণান্ত করেন। তাহার দুই বৎসর পূর্বে ১৯৫৪ সালে তাঁহাকে বরণান্ত করিবার কথাবার্তা স্থির হইয়াছিল। তরুণ রাজা হোসেন প্রথমে বৃটেনের একান্ত অমুগত মিত্রই ছিলেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালে তিনি যখন প্যারীতে গিয়াছিলেন সেই সময় প্যারীস্থিত তাঁহার সামরিক এ্যাট্যাচি আবুহুওয়ারের প্রভাবে পতিত হন। আবুহুওয়ার গোড়া জাতীয়তাবাদী, জর্ডান হইতে বৃটিশ প্রভাব নিষ্কর করিতে তিনি বদ্ধপরিকর; প্যারীর হোটেল বৃটেল তাঁহার সহিত আলোচনার ফলে রাজা হোসেন জেনারেল গ্লাব পাশাকে বরণান্ত করার সিদ্ধান্ত করেন। আরব লিজিয়নের সেনাপতি মণ্ডলীর অধ্যক্ষের পদ হইতে তাঁহাকে অপসারণের কাহিনী এখানে উল্লেখ করা নিম্নোক্ত। বাগদাদ চুক্তির বিরুদ্ধে জর্ডানে প্রবল বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা এবং আরব লিজিয়নের উপর হইতে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ অপসারণের দাবীকে উপলক্ষ করিয়া ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ রাজা হোসেন বৃটিশ জেনারেল জন গ্লাব ওয়ফ গ্লাব পাশাকে পদচ্যুত করেন এবং জেনারেল আলি আবুহুওয়ার তাঁহার স্থানে সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

জেনারেল আবুহুওয়ার মিশর ও সিরিয়ার সহিত একাবদ্ধ হওয়ার পক্ষপাতী। বৃটিশের সাহায্য বর্জন করিলে ইহা ছাড়া জর্ডানের স্থায়িত্বের আর কোন পথ নাই। রাজা হোসেনের কাছে ইহা খুব ভাল লাগে নাই। তাঁহার ভাগ্যে মিশরের রাজার অবস্থা ঘটবার আশঙ্কা তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার ভাড়া ইহাদের রাজার সহিত একাবদ্ধ হওয়াই পছন্দ করেন। কিন্তু ঘটনার গতি তাঁহার সিংহাসন বিপন্নহওয়ার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। গত ২১শে অক্টোবর (১৯৫৬) জর্ডানে বেসাধারণ নির্বাচন হয় তাহাতে ইল-জর্ডান সন্ধি বাতিলের পক্ষপাতীরাই

সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই নির্বাচনের পর মিশর, সিরিয়া ও জর্ডানের সৈন্ত বাহিনীর জন্ত যৌথ কমান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। রাজা হোসেন একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে ইল-জর্ডান সন্ধি বাতিল করিতে বাধ্য হন। গত নবেম্বর মাসে (১৯৫৬) একদল সিরিয় সৈন্ত জর্ডানের মাকরাক সহরে মোতায়েন হয়। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ নবুলসী জর্ডান বাহিনীর এক অংশের সমর্থন লাভ করেন। এই অবস্থায় রাজা হোসেন যে তাঁহার সিংহাসন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবেন ইহা খুব স্বাভাবিক।

সিংহাসনের নিরাপত্তার জন্ত রাজা হোসেন কি কি পদ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন সেসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় নাই। লণ্ডন হইতে প্রেরিত ৩রা এপ্রিলের (১৯৫৬) এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রাজা হোসেন মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট কোয়টলীর নিকট যে গোপন পত্র দেন তাহা হইতেই সঙ্কটের উদ্ভব হয়। ঐ পত্রে তিনি মিঃ নসেরমান নবুলসীর প্রধান মন্ত্রীর গঠিত জর্ডান গবর্নমেন্ট কর্তৃক শাসনতন্ত্রের গুরুতর অপব্যবহার করার অভিযোগ করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের কি গুরুতর অপব্যবহার করা হইয়াছে তাহা কিছুই ঐ সংবাদে প্রকাশ নাই। কিন্তু সংবাদে ইহাও বলা হয় যে, যে কোন যুহুর্ন্তে নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইবার জন্ত রাজা হোসেন নিজের প্রাইভেট বিমান প্রস্তুত রাখিয়াছেন। তিনি নাকি তাঁহার নয় বৎসরবয়স্ক ভ্রাতার অধিকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিতেও রাজী ছিলেন। কিন্তু বামপন্থীরা প্রজাতান্ত্রিক গবর্নমেন্ট দাবী করেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ২রা এপ্রিল নবুলসী সন্ত্রাসভা সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যিনি এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কেই নিশ্চিত ছিলেন না সেই রাজা হোসেন জর্ডানের জনগণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেন কিরূপে তাহা বহুতাত্ত্বিকই রহিয়াছে। কিছু দিন পূর্বে সৌদি আরবের রাজা সৌদ ওয়াশিটন হইতে আইসেনহাওয়ার ডকটিন মন্ত্রণা নীক্ষিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, যে মাসের প্রথম ভাগে তাঁহার আত্মনা পরিদর্শনের কথাও ছিল। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ রিচার্ডাস আইসেনহাওয়ার ডকটিনের বেনাতি ফেরি করিবার জন্ত মধ্যপ্রাচ্যে বাহির হইয়াছেন। এইগুলি যে রাজা হোসেনের অধিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইরাকের নিকট তিনি তিনি কোন সাহায্য চাহিয়াছিলেন কি না তাহা অবশ্য কিছুই জানা যায় না। আন্তর্জাতিক কয়লানিজম জাতীয়তাবাদের হস্তক্ষেপে আরব রাষ্ট্রগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে, রাজা হোসেন কয়েক মাস পূর্বে হইতেই এই বুলি কপচাইতে ছিলেন। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ ফরেস্টাল (Forrestal) লেবাননের বৈকটে আসিয়া নোঙ্গর ফেলে। এই জাহাজটি পৃথিবীর বিমানবাহী জাহাজগুলির মধ্যে বৃহত্তম। জর্ডানের সঙ্কট এবং মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ 'ফরেস্টাল'ের বৈকটে উপস্থিতি একেবারেই কাকতালীয় জায়ের মত, এক কথা স্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত বিমানবাহী জাহাজের উপস্থিতির ফলে আইসেনহাওয়ার ডকটিন গ্রহণ সম্পর্কে লেবানন গবর্নমেন্টের সিদ্ধান্ত লেবানন পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

অল্পকাল পরবিশেষে সুযোগেই রাজা হোসেন প্রথম আঘাত হানেন নবুলসী মন্ত্রিসভার উপর। আশ্মান হইতে প্রেরিত ১৪ই এপ্রিলের (১৯৫৭) সন্ধ্যায় অংক বলা হইয়াছে যে, চারি দিন পূর্বে রাজার অমরোপে প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুলেমান নবুলসী পদত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজাই যে মিঃ নবুলসীকে পদচ্যুত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া রাজা হোসেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ আবদুল হালিম নিম্নরূপে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে নির্দেশ দেন। তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অসমর্থ হওয়ায়, ডাঃ হোসেন ফখরি পালিসিকে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দেওয়া হয়। তিনি ১৫ই এপ্রিল নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সমর্থ হন। রাজার সহিত আপোষের ভিত্তিতে এই নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ নবুলসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী রূপে উহাতে স্থান প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইহাতেও সমস্তার সত্যিকার কোন সমাধান হয় নাই এবং রাজা হোসেন তাঁহার সিংহাসন সঙ্কটমুক্ত হইয়াছে, ইহাও মনে করিতে পারেন নাই। গত ২১শে এপ্রিল মিঃ নবুলসী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তিনি একজন কমানিষ্ট-বিরোধী। তিনি বলেন, “আমি আমার নিজের মত করিয়া কমানিষ্টদের সহিত সংগ্রাম করিতে চাই, আইসেনহাওয়ারের পন্থায় নহে।”

আশ্মানে মোভিয়েট দূতাবাস থাকিলে তিনি কমানিষ্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবেন কিরূপে, এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ নবুলসী বলেন “আমি শুধু এটুকু বলিতে পারি যে, অস্তিত্ব কূটনৈতিক মিশন আমাদের ঘরোয়া, ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে,” ইতিপূর্বে রাজাকে হত্যা করার এক যত্নময় আবিষ্কৃত হওয়ার এবং অন্তঃপর আরব লিভিয়নের মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হওয়ার এবং রাজা হোসেন কর্তৃক তাহা দমন করার এক সন্ধান প্রকাশিত হয়। এই বিদ্রোহকে উপলক্ষ করিয়াই সেনাপতি-মণ্ডলীর অধিক আবুহুওয়ারকে এবং আরও কয়েকজন সামরিক অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়। মেজর জেনারেল আলি তিয়ারিকে সেনাপতিমণ্ডলীর অধিক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পরে তিনিও পদত্যাগ করেন। ঐ সময় ইরাকী সেনাবাহিনীর জর্ডানে প্রবেশের সংবাদ প্রকাশিত হয়। বাগদাদের সরকারী মহল হইতে ইরাকী কোয়ার্টার জর্ডানে প্রবেশের সংবাদ অস্বীকার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু পতবত্তী ঘটনাবলী হইতে উহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

মে: জে: আলি হিয়ারী পদত্যাগ করিয়া দামাস্কাসে চলিয়া যান এবং সেখানে এক বিবৃতিতে বলেন, “জর্ডান যত্নময় ব্যাপারে কয়েক জন বিদেশী কূটনীতিবিদের হাত বসিয়াছে। তাঁহাদের অভিসন্ধি হইতেছে, রাজার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী যত্নময় করিয়াছিল, ইহাও তাহার প্রমাণ করিতে চান।” বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, “সাম্রাজ্য-বাসীদের বশচক্রে জর্ডনকে বাঁধা দিতে চায় এইরূপ গণবর্মেট গঠনের চেষ্টা করা হইলে জনগণ যদি তাহার বিরোধিতা করে, তাহা হইলে সৈন্যবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছে কি না, তাহা নিরূপণের দায়িত্ব আমার উপর প্রাপ্ত করা হইয়াছিল।” তাহার এই বিবৃতি ও বহু সংখ্যক সামরিক অফিসারকে অপসারিত করা হইতে ইহা অনুমান করা যায় যে, সৈন্যবাহিনীতে রাজার একান্ত অগ্রগত অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং ইহার পর রাজা হোসেন ২৫শে এপ্রিল জর্ডানে সামরিক আইন ও আশ্মানে দিনরাতব্যাপী

কারফিউ জারী করেন এবং রাজনৈতিক দলগুলি ভাস্কিয়া ফেলিবা নির্দেশ দেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ঐ দিনেই ভূমধ্য সাগরস্থ মার্কিন বহু নৌবহর পূর্ব ভূমধ্যসাগরে মহড়া দিতে আরম্ভ করে। ইহাকে কাকতালীয় ভাষা বলিয়া মনে কারবার কোন কারণ নাই। জর্ডানের এই সঙ্কটে রাজা হোসেন সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য চাছেন কি না, তাহা জানিবার জন্য মার্কিন গণবর্মেট জর্ডানস্থ মার্কিন রাষ্ট্রবৃত্তকে নির্দেশ প্রদান করেন। রাজা হোসেন দলনিরপেক্ষ রাজনীতিক ইব্রাহিম হোসেনকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে রাজার নির্দেশ অনুসারেই চলিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ নবুলসীকেও গ্রেফতার করা হইয়াছে। জর্ডানের জনগণের বিরুদ্ধে রাজা হোসেনের জয়লাভ যে একরূপ সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারা যায়। এই জয়লাভের মধ্যে জর্ডানে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের জয়লাভও স্থচিত হইতেছে।

### মিশরের সুয়েজ-পরিকল্পনা—

সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হইয়াছে এবং সুয়েজ খাল দিয়া জাহাজ চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সুয়েজ খাল সমস্তার কোন সমাধান এখনও হয় নাই। সম্প্রতি মিশর সুয়েজ খাল পরিচালন সম্পর্কে এক আরব-লিপি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশিল্ডের নিকট পেশ করা করিয়াছে। গত ২৪শে এপ্রিল (১৯৫৭) কার্যে বেডিও হইতেও এই আরব-লিপির বিবরণ ঘোষণা করা হইয়াছে। এই আরব-লিপিতে বলা হইয়াছে যে, ১৮৮৮ সালের কনষ্টান্টিনোপল চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করাই মিশরের নীতি এবং মিশর গণবর্মেট উহা অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদও মিশর মানিয়া চলিতেছে। এই সাধারণ প্রতিশ্রুতি ব্যতীত সুয়েজ খাল পরিচালন সম্পর্কে মিশর যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছে তাহাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন।

মিশর এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, অলাপ-আলোচনা কিম্বা সালিশী ব্যতীত ১২ মাসের মধ্যে মিশর খালের মাসুল শতকরা এক ভাগের বেশী বৃদ্ধি করিবে না। কিন্তু এই ১২ মাস প্রথম বার মাস, না যে কোন বার মাস তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলা হয় নাই। এই অস্পষ্টতা যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাহা বলাই বাহুল্য। উন্নয়ন তহবিলের জন্য খালের রাজস্বের শতকরা ৫ ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিবার প্রতিশ্রুতিও মিশর দিয়াছে এবং ইহাও জানাইয়াছে যে, ১৯৪৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনাও মিশর কার্যকরী করিবে। খালের মাসুল হইতে মোট যে রাজস্ব পাওয়া যাইবে তাহার শতকরা ৫ ভাগ মিশর তাহার রয়্যালটি বাবদ রাখিবে। ইতিপূর্বে ব্যবস্থা ছিল যে, বরচ খচা বাধ দিবার পূর্বে খালের মাসুল হইতে মোট যে আয় হইত তাহার শতকরা ৭ ভাগ মিশর রয়্যালটি বাবদ পাইবে। সে তুলনায় মোট রাজস্বের শতকরা ৫ ভাগ যে অপেক্ষাকৃত বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই। খাল পরিচালন ব্যাপারে কোন রাষ্ট্রের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইতেছে কি না, তাহাও একটি বড় প্রশ্ন। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই দুই ব্যাপারে অভিব্যক্তি উপস্থিত হইলে যে ভাবে উহার

মীমাংসা করা হইবে সেসময়কে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছে। প্রথমতঃ সূয়েজ খাল কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগা উপস্থাপিত করিতে হইবে। সূয়েজ খাল কর্তৃপক্ষের মীমাংসা যদি সম্ভাব্যজনক না হয়, তবে উহার মীমাংসার জন্ত একটি কমিটি গঠন করা হইবে। এই কমিটিতে অভিযোগকারী দেশের এবং খাল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি তো থাকিবেনই, তাছাড়া উন্নয়ন পক্ষ কর্তৃক মনোনীত আরও দুইজন সালিশীও থাকিবেন। এই দুইজন সালিশী মনোনয়ন সম্পর্কে যদি কোন মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে পেশ করা হইবে। এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশ মানিতে মিশর বাধ্য থাকিবে। পদ্ধতিটি এমন যে মীমাংসা তৎক্ষণাতঃ বহু সময় সাপেক্ষ হইবে। ইতোপূর্বে উন্নয়ন পক্ষের সম্ভাব্যজনক কোন মীমাংসা হইবে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে।

মিশরের এই স্বায়কল্পনিকে আন্তর্জাতিক দলিল হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যোগে গৃহীত করা হইবে। ইতিপূর্বে বহু আন্তর্জাতিক দলিলের ভাঙোয়া বাহা ঘটনাছে তাহা মরণ করিলে সূয়েজ সম্পর্কে মিশরের পরিকল্পনাকে আন্তর্জাতিক দলিলরূপে গণ্য করার বিষয় কোন সার্বকর্তা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই প্রশ্ন বাদ দিলেও ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গত অক্টোবর মাসে সূয়েজ খাল সম্পর্কে যে ছয়টি নীতি নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হইয়াছে মিশরের উক্ত পরিকল্পনা তদনুযায়ী হয় নাই। মিশরও ইহা স্বীকার করিয়াছে যে, উক্ত ছয়টি নীতি আক্ষরিক ভাবে স্বীকৃত হয় নাই, তবে উহার মূলনীতি স্বীকৃত হইয়াছে। সূয়েজ খালকে কোনও দেশের রাজনীতির সহিত জড়িত করা চলিবে না, এই নীতি মিশরের পরিকল্পনায় নাই। ইসরাইলী জাহাজ সম্পর্কে মিশর যে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করিবে, একথা মিশর গোপন রাখে নাই। তবে মিশর এই পন্থা কবিত্তে পারে যে, ইসরাইলের জন্ত পণ্য দ্রব্য অল্প দেশের যে সকল জাহাজ বাটবোতামিশর সেগুলিকে আটক করিবে না। মিশর সূয়েজ সম্পর্কে যে পরিকল্পনা বচনা করিয়াছে তাহা পশ্চিমী শক্তিবর্গের পছন্দ হইবে বলিয়াও মনে হয় না।

### জারি মিশনের ব্যর্থতার স্তোত্রো—

নিরাপত্তা পরিষদের ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৭) প্রস্তাব অনুযায়ী মিঃ গানার জারি ভারত ও পাকিস্তান গবর্নমেন্টের সহিত আলোচনা শেষ করিয়া গত ৩০শে এপ্রিল তাহার রিপোর্ট পেশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, কান্দীর প্রশ্ন মীমাংসার কোন পন্থা বাহির করিতে তিনি সক্ষম হই নাই। মিঃ জারি বার্ষিক হইয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতকে বার্ষিক এক প্রসঙ্গ স্তোত্রো দিতেও তিনি ছাড়েন নাই। তিনি তাহার রিপোর্টে কান্দীর কমিশনের ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগস্টের প্রস্তাব ১৯৪১ সালের ৫ই জানুয়ারীর প্রস্তাব সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই উক্ত দুইটি প্রস্তাব বাধ্যকর বলিয়া স্বীকার করিয়াছে প্রথম প্রস্তাবে দ্বিবিবর্তিত এবং কান্দীর জনগণের অভিশ্রাব অনুযায়ী কাধা করিবার কথা আছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গণভোট পরিচালক সম্পর্কে। মিঃ জারি তাহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান গবর্নমেন্ট ন করেন যে, তাহার সবল বিশ্বাসে উক্ত প্রস্তাবের সর্ব

কার্যকরী করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত বাহা বলিয়াছে তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের কথা এই যে, ১৯৪৮ সালের প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তানী কোজ কান্দীর হইতে অপসারণ করা হয় নাই এবং আজান কান্দীর বাহিনীও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় নাই। কাজেই প্রস্তাবের অমাত্র অংশ কার্যকরী করার প্রশ্ন উঠে না। ১৯৪১ সালের ৫ই জানুয়ারীর প্রস্তাবও কার্যকরী করার প্রশ্ন উঠে না। দ্বিতীয়তঃ ভারতের কথা এই যে, ভারত গবর্নমেন্ট ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী আক্রমণের যে অভিযোগ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আনয়ন করিয়াছেন নিরাপত্তা পরিষদ সে সম্পর্কে নীরব। মিঃ জারি তাহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, কান্দীর কমিশনের প্রথম প্রস্তাবের প্রথম অংশ কার্যকরী করা হইয়াছে কি না তাহা নির্ধারণের জন্ত তিনি সালিশ নিযুক্তের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত রিপোর্টে দেখা যায়, পাকিস্তান অনেক বিধা-বন্দেব পর নীতিগত ভাবে সালিশের প্রস্তাব গ্রহণ করে, কিন্তু ভারত প্রশ্নগুলি সালিশীর যোগ্য বলিয়া মনে করে না।

মিঃ জারি সালিশের প্রস্তাব কোন সময় উপস্থিত করিয়াছিলেন রিপোর্ট তাহা কিছুই জানা যায় না। উক্ত প্রস্তাব ভারত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর পাকিস্তান নীতিগত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে কি না সে সম্পর্কেও রিপোর্ট নীরব। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মিঃ জারি পাক গবর্নমেন্টের সহিতই সর্বশেষ আলোচনা করেন। কতগুলি তথ্য নির্ধারণের জন্ত সালিশের প্রস্তাব করিয়া তিনি আক্রান্ত ভারত এবং আক্রমণকারী পাকিস্তান উভয়কে একই পন্থায়ভুক্ত করিয়াছেন। নিরাপত্তা পরিষদে পশ্চিমী শক্তিবর্গ কান্দীর সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন ইহা যে তদনুযায়ী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই! দ্বিতীয়তঃ মিঃ জারি কৌশলপূর্ণ উপায়ে তাহার বার্ষিকার দায়িত্ব ভারতের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সালিশ নিয়োগ সম্পর্কে তাহার প্রস্তাব পাকিস্তান গ্রহণ করায় এবং ভারত গ্রহণ না করাতাই যে তিনি বার্ষিক হইয়াছেন তাহার রিপোর্ট হইতে বিবাসীর মনে এই ধারণাই জন্মিবে। ইহা ঘাড়া তিনি পাকিস্তানের হাতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্ত নুতন অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছেন। পাকিস্তান এইবার বলিবে যে, ভারত শুধু গণভোট গ্রহণেরই বিরোধী নয়, সালিশীরও বিরোধী। পাকিস্তান যে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে ক্রটি করিবে না তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারা যায়। মিঃ জারি তাহার রিপোর্টে আরও বলিয়াছেন যে, সমস্তগুলির মোটামুটি মীমাংসার জন্ত তিনি কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু উন্নয়ন পক্ষই তাহা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রস্তাবগুলি কি তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। গণভোট সম্পর্কে এবং উহার ফলে যেসকল সমস্যা দেখা দিবে তাহার সমাধানের জন্তও নাকি তিনি কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার রিপোর্টে প্রস্তাবগুলির কোন উল্লেখ করা হয় নাই।

মিঃ জারি তাহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, সমগ্র কান্দীর প্রশ্নের সহিত পরিবর্তনশীল বাহনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রণনৈতিক প্রশ্ন সমূহ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়ায় রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সম্পর্কের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া তিনি উদ্বেগ অনুভব করিয়াছেন। ইহা ঘাড়া তিনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন

নাই। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নয়। গত ১০ বৎসর ধরিয়া কাশ্মীরের কতক অংশ পাকিস্তান যে-আইনী ভাবে দখল করিয়া রাখিয়াছে, ঐ অংশে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তাহার শাসনভাঙ্গ সমগ্র কাশ্মীরকেই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সাময়িক দিক হইতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। পাকিস্তান মার্কিন সামরিক সাহায্য পাওয়ার এই গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাকিস্তান সিংগাটো ও বাগদাদ চুক্তির সমস্ত। পাকিস্তান সামরিক সাহায্য পাঠিতেছে। এইগুলিই যে পরিবর্তনশীল অবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ জারি: নিরাপত্তা পরিষদের নিকট তাহার বাস্তবতার রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর নিরাপত্তা পরিষদ কি করে তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া রাখিবে। অনেকে মনে করেন কমনওয়েলথ সম্মেলনের পূর্বে জারি: রিপোর্ট সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা হইবে না।

### বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে বৈঠকের আশা :—

আন্তর্জাতিক আকাশ যে আবার ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাল মধ্যে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাশিয়া যেন নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং নাটোর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে তাহা গত চৈত্র মাসের (১৩৩০) মাসিক বহুমতীতে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বস্তুতঃ বারমুড়া সম্মেলনের পর হইতে ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের এই তীব্রতা সত্ত্বেও কুটনীতিবিদগণ বৃহৎ রাষ্ট্রচক্রের প্রধানদের আর একটি সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিতেছেন না। ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস করিতে হইলে যে বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানের একত্র মিলিত হওয়া প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্প্রতি এমন কি কি ঘটনা ঘটয়াছে বাগাতে সম্ভাব্য কালের মধ্যে আবার বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনা সন্দেহে আশা পোষণ করা বাইতে পারে তাহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। নিউ ইয়র্ক হইতে ২১শে এপ্রিলের (১৯৫৭) সাবাদে প্রকাশ যে, পূর্ববর্তী সম্ভাষে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার স্বাভাবিক সম্মেলনে বলিয়াছিলেন যে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছে তাহা ১৯৫৫ সালের পর সর্বাপেক্ষা আশাশ্রয়। মস্কোর রাজনৈতিক আবহাওয়া কিরূপ সেসম্বন্ধে বিস্তৃত রিপোর্ট প্রদানের ভিত্তি প্রে: আইসেনহাওয়ার মস্কোস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। অনেকে মনে করেন যে, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর চতু:শক্তি সম্মেলন সম্বন্ধে মার্কিন গবর্নমেন্টের মতের পরিবর্তন হইতে পারে। তাছাড়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যমা লইয়া বাড়বাড়ি না করিয়া স্বেচ্ছ সমস্তা সম্পর্কে বৃহৎ শক্তিবর্গ আলোচনা করিতে প্রস্তুত বলিয়াই মনে হয়। গত ২০শে এপ্রিল (১৯৫৭) মি: ডায়েস বলিয়াছেন যে, নিরস্ত্রীকরণ, ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির প্রতি ব্যবহার এবং জাতিগোকে ঐক্যবদ্ধ করণ সম্পর্কে রাশিয়া কি করিতে প্রস্তুত তাহারই উপর প্রাচ্য ও পশ্চাচ্য শক্তিবর্গের মধ্যে নতুন সম্মেলন আহ্বান করা নির্ভর করিতেছে। যদিও মি: ডায়েস এইরূপ সম্মেলন আহ্বান

সম্পর্কে সর্ব আবেদন করিয়াছেন, যদিও এই ধরনের সর্ব রাশিয়া রাজী হইবে না, তথাপি ইহা বুঝা বাইতেছে যে, বৃহৎ শক্তি-চক্রের প্রধানদের মধ্যে আলোচনার সম্ভাবনা একেবারে অসীক কল্পনা নয়।

বুটল প্রধান মন্ত্রী মি: মাকমিলনের নিকট রূপ প্রশান মন্ত্রী বুলগানিনের ব্যক্তিগত পত্রও বৃহৎ শক্তিচক্রের প্রধানদের মধ্যে সম্মেলন সম্পর্কে আশার সঞ্চার করিয়াছে। এই পত্রে রূপ প্রশান মন্ত্রী বুটল প্রধান মন্ত্রীকে মস্কোতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। মার্কিন গবর্নমেন্টের সহিত আলোচনা না করিয়া মি: মাকমিলন এই পত্রের উত্তর অবগত করেন না। মার্কিন গবর্নমেন্ট এবং ফরাসী গবর্নমেন্ট সম্মেলন করিলেই তিনি রাশিয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু বুটল ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয় তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন চাহে না, তেমনি বুটলও চায় না যে, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার একমাত্র বিকল্প বৃহৎ চতু:শক্তির মধ্যে আলোচনা। কি রাশিয়া কি পশ্চিমী শক্তিবর্গ সকলেই ইহা বুঝিতে পারিতেছে যে, এই পরমাণু অস্ত্রের যুগে হয় এক সঙ্গে বাস করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে, না হয় একসঙ্গে মৃত্যু বরণ করিতে হইবে।

লণ্ডনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ কমিটির আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি পশ্চিম জাতিগোষ্ঠীর বনে উত্তর আটলান্টিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের প্রথম সম্মেলন হইয়া গেল। শক্তিশালী হইয়া রাশিয়ার সহিত আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যেই উত্তর আটলান্টিক চুক্তি করা হইয়াছে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত বাধাই হইয়াছে। রাশিয়াও পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার অধিকারী হইয়াছে। উত্তর আটলান্টিক চুক্তির উত্তরে রাশিয়া ওয়ারশ চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। পশ্চিম জাতিগোষ্ঠী নাটোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঐক্যবদ্ধ জাতিগোষ্ঠী গঠনের আশা পূর্ব পরাহত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর পক্ষে চলিতেছে অস্ত্রসজ্জার প্রবল প্রতিযোগিতা। চলিতেছে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ। এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পরিণামও যে ভয়াবহ সে-বিষয়ে সকলেই একমত। সম্প্রতি বুটলেও হাইড্রোজেন বোমা নিখাণে উত্তোষী হইয়াছে। ক্রিষ্টমাস ছীপে বুটল সর্বপ্রথম তাহার হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাঁইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। সম্প্রতি রাশিয়াও অনেকগুলি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাঁইয়াছে। নাটোর বৈঠকের শেষে গত ৩রা মে (১৯৫৭) যে-চূড়ান্ত ইচ্ছাচার প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাহাতে বলা হইয়াছে আটলান্টিক মৈত্রীর বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ হইলে তাহার সমুখীন হওয়ার সজ্জা বাগাতে সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা অবগত করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা আধুনিক অস্ত্র পাইবার ব্যবস্থা। সর্বাপেক্ষা আধুনিক অস্ত্র যে পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমা তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তর পক্ষেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত হইলেই যে পরমাণু যুদ্ধ অবগত হইবে, ইহা অবগত মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এই আশঙ্কা যেমন উপেক্ষার বিষয় নহে, তেমনি উহার পরিণামে ব্যাপক ধ্বংস অনিবার্য।

## সবাই জামেন -

সীল করা প্যাকেট  
পাওয়া যায় ব'লে  
**ব্রুক বণ্ড চা**  
নির্ভেজালু ও একবারে  
খাঁটি থাকে

প্রতি প্যাকেট  
**ব্রুক বণ্ড চায়ে**  
অনেক বেশী কাপ  
ভালো চা  
ভেঁরী করা যায়

বাজারে  
**ব্রুক বণ্ড**  
চায়েরই কার্টি  
সব চেয়ে বেশী



এই জমোই অন্য  
যে কোন মার্কী চায়ের চেয়ে

# ব্রুক বণ্ড

# চা

বেশী লোকে খায় !



# সাহিত্য পরিষদ



## ১৩৬৩-৬৪ সালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

* কবিতা *		বুই, বুই! ১।	মনোঃ বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
কাব্যবিতান ১০১	প্রমথনাথ বিদ্যু ও তারাপান	ব্যালেরিনা ৩১	স্বপ্নাচরণ মুখোঃ	ডি, এম, লাইব্রেরী
দশনী ১১	মুখোঃ সম্পাদিত	ভুবন সোম ২১।	বনফুল	" "
দ্ব্যস্তিক ২১	স্বপ্নাচরণ দত্ত	ভুক্তজাতক ৫১	হারেশচন্দ্র শর্মচাঁদ	মিত্র ও ঘোষ
দৃষ্টির দর্পণে ১১	সৌমিত্রেশ্বর দাশগুপ্ত এম, সি, সরকার	মধুমাধবী ৫১	শ্রীলীল রায়	সত্যজিত চ্যাট্টো
মনোগন্ধা ২১	রাম বসু	মণিমাল্য ২১	লীলা মজুমদার	এশিয়া পাবলিশিং
সাগর থেকে ফেরা ৩১	বটরুৎ দে	রত্ন ও শ্রীমতী ৩১	অন্নদাশঙ্কর রায়	ডি, এম, লাইব্রেরী
সুনির্বাচিত কবিতা ৪১।	প্রমোদ্র মিত্র	লালবাদী ৫১	রমাপদ চৌধুরী	" "
হেমন্তের দিন ১১।	মোহিতলাল মজুমদার	শেষ পাণ্ডুলিপি ৩১।	বুদ্ধদেব বসু	এম, সি, সরকার
	রাজলক্ষ্মী দেবী	স্বজ্ঞাতা ২১।	সুবোধ ঘোষ	ক্যালঃ পাবলিশার্স
* উপস্থাপন *		* গল্পগ্রন্থ *		
অতিক্রান্ত ৩১।	আশাপূর্ণা দেবী	আপন প্রিয় ৩১	রমাপদ চৌধুরী	ত্রিবেণী প্রকাশন
অমৃতবাগিনী ২১	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	কড়ির বাঁশি ৩১	সজ্জাবকুমার ঘোষ	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
অন্তঃস্র ২১।	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	গল্প পঞ্চাশৎ ৮১	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোঃ	মিত্র ও ঘোষ
ইম্পাতের শাস্ত্র ১০১	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	গল্প সংগ্রহ ৩১।	নাহারায়ণ গঙ্গোঃ	" "
খোলাঘর ৪১	প্রাণতোষ ঘটক	" ৪১	প্রবোধকুমার সাক্তাল	বেঙ্গল পাবলিশার্স
গড় শ্রীখণ্ড ৮১	অমিত্রভূষণ মজুমদার	চক্ৰাটকা ২১	সত্যনাথ ভাট্টা	সাহিত্য ভবন
জলা মাঠের ফসল ৩১।	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	জীবন-যৌবন ২১	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোঃ	নবভারত
জন্মেছি এই দেশে ৪১	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	তাল বেতাল ২১।	বিভূতিভূষণ মুখোঃ	ওরিয়েন্ট বুক কোঃ
তিতাস একটি নদীর নাম ৬১	অর্ধৈত মল্লবর্ষণ	নীরল গল্প-সঞ্চয়ন ৩১।	প্রমথনাথ বিদ্যু	এম, সি, সরকার
তিন তরঙ্গ ৪১	প্রতিভা বসু	নীলতারি ইত্যাদি গল্প ৩১	পরশুরাম	ত্রিবেণী প্রকাশন
দম্পতি ৩১।	প্রভাত দেবসরকার	পলাশের নেশা ৩১	সুবোধ বোস	রীডার্স কর্নার
দেওয়াল ৪১।	বিমল কব	শ্রোমের গল্প ১১।	বিত্ত মুখোঃ সম্পাদিত	মিত্র এণ্ড ঘোষ
ধূলোমাটি ৬১	ননী ভৌমিক	বাসক-সজ্জিকা ৪১	প্রাণতোষ ঘটক	বাসন্তী বুক ষ্টল
নয়ান বো ৫১	বিভূতিভূষণ মুখোঃ	ময়ূরী ২১	বিমল কব	আভেনিউ
নাগমতী ৪১।	প্রাকুর রায়	রূপালী রেখা ৩১।	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	মিত্র ও ঘোষ
নীলাঙ্গন ৪১	সরোজ রায়চৌধুরী	জ্যেষ্ঠ গল্প ৪১।	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোঃ	গুরুদাস
পুতুলের খেলা ২১।	সমরেশ বসু	" ৪১	পৃথ্বী তট্টাচার্য	বিহার সাহিত্য ভবন
প্রাণধরের উপাখ্যান ২১	মানিক বন্দ্যোঃ	" ৪১।	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	নিউকলি
বহিঃপতঙ্গ ৩১।	শরদিন্দু বন্দ্যোঃ	বঠ জড় ২১	সমরেশ বসু	ইতিহাস আ্যাসোঃ
বালির প্রাঙ্গণ ৪১	পুলকেশ দেসরকার	সপ্তপদী ১৫।	প্রমোদ্র মিত্র	কথ্যভূত ভবন
বিচারক ২১।	ভারীশঙ্কর বন্দ্যোঃ	সরস গল্প ৪১	আশাপূর্ণা দেবী	য্যাসোঃ
বেগমবাহার লেন ৪১	বাহীন্দ্রনাথ দাস	স্বনির্বাচিত গল্প ৪১	মানিক বন্দ্যোঃ	
		" ৪১	শিবরাম চন্দ্র	

## \* রম্যরচনা \*

আজা ২৬	গোপাল হালদার	বেঙ্গল পাবলিশার্স
প্রিয়াকী ২৬	মৌলানা খাকী খান	সত্যজিত লাইব্রেরি
বসন্ত কেবিন ২৪	নীলকণ্ঠ	ষ্ট্যাণ্ডার্ড
মনে এল ৪৬	ধূর্তীপ্রসাদ মুখোঃ	নিউ এক্স
সপ্তপঞ্চ ৩৪	পরিমল গোস্বামী	মিত্র ও ঘোষ

## \* নাটক \*

আবোগ্যা নিকেতন ১৪	তারাপ্রসাদ বন্দ্যোঃ	বেঙ্গল পাবলিশার্স
একটি নায়ক ১৪	দিলীপ রায়	প্রতীতি প্রকাশনী
এরাও মানুষ ২৬	সন্তোষ সেন	ডি এম
বৃত্তরাষ্ট্র ২৬	ধনঞ্জয় বৈরাগী	আর্ট অ্যান্ড লেটার্স
পরিণীতা ১৪	দেবনারায়ণ গুপ্ত	এম সি সরকার
শেষলয় ২৬	মনোজ বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স

## \* ভ্রমণ-কাহিনী \*

এলেম নতুন দেশে ৩৬	জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ	সিগনেট
কামাল পরদেশী ৪৪	বিমল ঘোষ	মিত্রালয়
জলে ডাঙায় ৩৪	সৈয়দ মুক্ততাবা আলী	বেঙ্গল পাবলিশার্স
হুনিয়া দেখছি ৫৬	কল্যাণী প্রামাণিক	ওরিয়েন্ট বুক কোঃ
নবতান্ত্রা হিমালয় (২য় খণ্ড) ১৪	প্রবোধকুমার সান্যাল	বেঙ্গল পাবলিশার্স
৭৮ চলি ৩৬	মনোজ বসু	"
হা সোভিয়েট ৩৪	মৈত্রেয়ী দেবী	বিচিত্রা
কাঁ বাতায় ২৪	মোহনলাল গঙ্গোঃ	বেঙ্গল পাবলিশার্স
হেব বিবির দেশে ৬৬	মরেন্দ্র দেব	ডি, এম

## \* সাহিত্য ও সংস্কৃতি \*

গারিষ্টালের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যভঙ্গ ৬৪	সাধনকুমার ভট্টাচার্য	বেঙ্গল পাবলিশার্স
বিংশ শতাব্দীর বাঙালী		
বাংলা সাহিত্য ৩৬	অসিত বন্দ্যোঃ	ইণ্ডিয়ান অ্যান্ডোঃ
১৮৮ ৩৬	অন্নদাশঙ্কর রায়	ডি এম
ব্যাকৌতুক ৫৬	বিক্রমদত্ত ভট্টাচার্য	প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স
সিধি ৩৪	যোগেশচন্দ্র রায়, বিভানিধি	ওরিয়েন্ট বুক কোঃ
না ছন্দ ৩৬	সুধীভূষণ ভট্টাচার্য	এম সি সরকার
নার জাগরণ ৩৬	কাজী আবদুল ওহুদ	বিশ্বভারতী
নার পত্রসাহিত্য ৪৬	সুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
১৮ খ্রী-আচার ১৪	শ্রীহিম্মা দেবী চৌধুরাণী	বিশ্বভারতী
১ সাহিত্য ও		
সংস্কৃতি ৩৪	গোপাল হালদার	ডি এম
১ সাহিত্য		
চমা ১৪	ভোলানাথ ঘোষ	এস ব্যানার্জি
সাহিত্য পরিচয় ২৪	তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থ জগৎ	
"নাটক-প্রসঙ্গ ২৬	জীবনকৃষ্ণ শের্ট	সাহিত্য ভবন
নাথের		
৫-দর্শন ২৪	প্রবাসজীবন চৌধুরী	এ মুখার্জি
মানস ৩৪	ডাঃ অববিন্দ পোদ্দার	ইণ্ডিয়ান
পদাবলী ও		
সাধনা ৫৬	জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	ডি এম

## সংস্কৃত সাহিত্যের

ভূমিকা ৫৬

সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৬

সাহিত্য বিচিত্র ৪৬

বঙ্গদেশ ও সংস্কৃতি ২৪

স্বদেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এ মুখার্জি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ডি এম

রবীন্দ্রনাথ রায় ক্যালকাটা বুক ক্লাব

বুদ্ধদেব বসু বেঙ্গল পাবলিশার্স

\* জীবনী \*

কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ২৬ নির্মলকুমারী মহলানবিশ ডি এম

কীর্তীসি রানী ৫৬

পরমপুত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

(৪র্থ খণ্ড) ৫৬

প্রেমাবতার শ্রীগোরাঙ্গ ৬৬

বুদ্ধদেব ১৪

বুদ্ধ-প্রসঙ্গ ৪৬

ভক্ত কবীর ৫৬

ভারতের সাংক ৫৬

মীরাবাই ৪৪

মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন ৩৬

রবীন্দ্র-জীবনী

(৪র্থ খণ্ড) ১০৬

রূপকার নন্দলাল ২৪

শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার

স্বদেশী যুগ ১০৬

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

সজব ৪৪

মহাশেতা ভট্টাচার্য নিউ এক্স

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সিগনেট

গৌরগোপাল বিজ্ঞানবিনোদ কলিঃ পুস্তকালয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী

মহেশচন্দ্র ঘোষ

উপেন্দ্রকুমার দাস ওরিয়েন্ট বুক কোঃ

শঙ্করনাথ রায় রাইটার্স সিক্রেট

ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য প্রবর্তক

আন্তোভ মুখোপাধ্যায় দাশগুপ্ত প্রকাশন

প্রভাতকুমার মুখোঃ বিশ্বভারতী

শান্তিদেব ঘোষ গ্রন্থ জগৎ

গিরিজাশঙ্কর বায়চৌধুরী নবভারত

সরলাবালা সরকার বেঙ্গল পাবলিশার্স

\* স্মৃতিকথা \*

আত্মমুতি (২য় ভাগ) ৫৬

আন্দামান-বন্দী ১৪

কৈশোর-মুতি ৪৬

তখন আমি জেলে ৬৬

বিহবী জীবনের পুতি ১২৬

যখন নায়ক ছিলাম ৫৬

সজনীকান্ত দাস ডি এম লাইব্রেরী

অনন্ত ভট্টাচার্য মিত্রালয়

তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মিত্র ও ঘোষ

হিঙ্গেন গঙ্গোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান অ্যান্ডোঃ

বাহুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বীরাজ ভট্টাচার্য

## \* শিকার-কাহিনী \*

আমার শিকার-মুতি ২৬

ঠাকুরাবীর বাঘ ২৬

বনের খবর ৩৬

বিজয়কান্ত সেন বিহার সাহিত্য ভবন

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী সিগনেট

প্রমদাধর রায়

## \* ইতিহাস \*

ইতিহাসের ধারা ২৬

পৃথিবীর ইতিহাস ৬৬

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান

চর্চা ৪৬

বিশেষায় চোখে প্রাচীন

ভারত ৬৬

ভারতে ধনভিত্তিক বিকাশের

ভূমিকা ৩৬

অমিত সেন জ্ঞানলাল বুক এক্সেলি

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও

বমাকৃষ্ণ মৈত্র বেঙ্গল পাবলিশার্স

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিশ্বভারতী

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান ও লাইব্রেরি

প্রিয়তোষ মৈত্রের গ্রন্থ জগৎ

## \* সঙ্গীত \*

প্রান্তবের গান ২৮	সলিল চৌধুরী	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
বালা গানের গতিপথ ২৮	চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ডি এম লাইব্রেরী
বাংলায় গীতকার ৩০	রাজেশ্বর মিত্র	মিত্রালয়
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (২য় খণ্ড) ৭০	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	লীলামকুশ বেলান্ত্র মঠ
সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম সোপান ১৮	নীরতন বন্দ্যোপাধ্যায়	হাসতিকাক
সুরসাগর ৩০	হিমালয় বায় ও সংস্কার	সেনগুপ্ত ডি এম লাইব্রেরী
স্বরবিতান (খণ্ড ৪৭-৬৮; ৪৮-৪৯; ৪৯-৫০; ৫০-৫১; ৫১-৫২)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী

## \* ধর্ম ও দর্শন \*

জমতের সন্ধান ৬০	হরেন্দ্রকুমার দে-চৌধুরী	প্রবর্তক পাবলিশার্স
ঐবন্ধাবলী (৬ষ্ঠ খণ্ড) ২৮	স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি	ঐবন্ধ লাইব্রেরী
লোকায়ত দর্শন ১৫৮	বৌদ্ধপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	নিউ এক্স

## \* শিল্প-কথা \*

আধুনিক আলোকচিত্র ৬৮	পরিমল গোস্বামী	বিহার সাহিত্য ভবন
ধারা থেকে মার্জ ২০	দেবপ্রত্ন মুখোপাধ্যায়	সাহিত্য লাইব্রেরী
বাংলার লোকশিল্প ১০	রবীন্দ্র মজুমদার	গ্রন্থ জগৎ
ভারতের চিত্রকলা ১৫৮	অশোক মিত্র	বেঙ্গল পাবলিশার্স
মুদ্রাপে আধুনিক চিত্রকলা		
শ্রেণি ৩৮	অরেন্দ্রকুমার গঙ্গো	গ্রন্থ জগৎ
রূপবানী ৪৮	রমেশ্বর চৌধুরী	সরস্বতী গ্রন্থালয়
শিল্পচর্চা ৫৮	নন্দলাল বসু	বিশ্বভারতী

## \* পত্র-সাহিত্য \*

আধুনিক শিক্ষণ সহায়িকা ৬৮	নারায়ণচন্দ্র চন্দ	কলি: পুস্তকালয়
কলকাতার পথঘাট ৬৮	প্রাণকোষ চট্টক	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট
করে দেখ (২ খণ্ড) ১০	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
কাচ ও কাচশিল্প ১৮	হীরেন্দ্রনাথ বসু	"
নেহরু ও পরবর্ত্তনীতি ৫৮	কনাদিনাথ পাল	ওরিয়েন্ট বুক কোং
বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ ২০	সুকুমার রায়	সিগনেট
বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ৮৮	সুকুমার ভট্টাচার্য	গ্রন্থ জগৎ
বাংলার ভূমিব্যবস্থা ১০	নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য	বিশ্বভারতী
বিবাহ-তত্ত্ব ও জন্মানুষ্ঠান ২৮	ভক্তি দেন	দিগন্ত পাবলিশার্স
মনোবিজ্ঞান ৮৮	ইন্দ্রব্রজ মজুমদার	আন্তর্জাতিক বুক ষ্টল
মল্লভাগে ভারতের স্থান ৪০	সমর বসু	ডি এম
বসায় ও সভ্যতা ১০	শ্রীধররঞ্জন রায়	বিশ্বভারতী
বাণিজ্যিকানের কথা ১০	ডা: পূর্ণেন্দ্রকুমার বসু	"
রাষ্ট্রনীতি ২৮	বিশ্বিনন্দ্র পাল	মুগ্ধবাকী প্রকাশক
সদীকা ৫৮	বিজয়বিহারী ভট্টাচার্য	মিত্র ও ঘোষ

## \* শিশু-সাহিত্য \*

ঘনাদার গল্প ২৬০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট
ছবিছড়া দেশে ৮৮	বিশ্বনাথ দে	সম্পাদিত এশিয়া পাবলিশিং
ছুটিব আকাশ ১৬০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ইটলাইট
ছোটদের ছোটগল্প ১০	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	ভারতী লাইব্রেরি
ছোটদের ছোটগল্প ২৮	তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	অভ্যুদয়
" ২৮	মোহনলাল গঙ্গো	"
" ২৮	রবীন্দ্রনাথ রায়	"
" ২৮	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	"
" ২৮	শিবগাম চক্রবর্তী	"
" ২৮	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	"
" ২৮	মৌর্যমোহন মুখোপাধ্যায়	"
তারাকান্ত ২৮	নীলকণ্ঠ	এশিয়া পাবলিশিং
ছুটি ও লক্ষ্মীদের গল্প ১০	বিভূতিভূষণ মুখো	নবভারত
বাছা বাছা ১০	মৌমাছি	ঘোষ ব্রাদার্স
ভৌদ্র বাহাদুর ১০	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	সিগনেট
মাইকেল মধুসূদন ১৮	শ্রীনিবাস বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
মাকড়শের পুঁথি ৩০	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট
মিঠুয়া ১৮	সমর চট্টোপাধ্যায়	নানান
মেকপথের যাত্রিদল ১০	পরিমল গোস্বামী	রাইটস' সিগ্নিফিকেন্ট
বকমারী গল্প ১০	স্বপনবো	অভ্যুদয়
বঙ্গনা ১০	বনকুশ	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট
বান্না থেকে কান্না ১০	বুদ্ধদেব বসু	"
সুন্দরবনের চিঠি ১০	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	বিদ্যোদয় লাইব্রেরী

## \* অনুবাদ \*

অয়েল ১ম পর্গ	অয়েল ১ম পর্গ	
(আপটন সিনক্রোয়ার) ৪০	জ্যোতিষ বেদজ	মিত্রালয়
এ পেয়ার অব ব্লু আইজ (টমাস হ্যাডি) ৪০	চারুপমা বসু	মিত্র ও ঘোষ
ক্রিকেট খেলার আ-আ-কথ (ডেনহ্যাডমান) ৪৮	পরীক্ষিত	আর্ট অ্যান্ড ডেসর্স
নীল পাখি (মোটরসিক) ১৮	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	বিজ্ঞান লাইব্রেরী
বিবাহিত প্রেম (মারি টোপস) ৪৮	কল্পনা রায়	আর্ট এণ্ড লেটার্স
মহানপুরুষদের সান্নিধ্যে (শিবনাথ শাস্ত্রী) ৩০	মারা রায়	রাইটস' সিগ্নিফিকেন্ট
মা ও ছেলে (রমা বোল) ৫৮		গ্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
রোমান হলিডে ২০	ভবানী মুখোপাধ্যায়	এস. রায় এণ্ড কোং
স্পার্টাস (হাওয়ার্ড কাঠ) ৫৮	সুনীল চট্টোপাধ্যায়	গ্রন্থালয় বুক এক্সেলি
হিরোসিমা যেরে (আর কীম) ৪০	ইলা মিত্র	গ্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
হে বিদেশী ফুল ৫৮	বিষ্ণু দে	বাক





ডিটামিন যুক্ত

কোলে  
H.P.  
বিস্কুট

যাঁরা ওদের বিচার করেন

তাঁরা সকলেই পছন্দ করেন

সবসময়ে

কোলে

কোলে বিস্কুট কোম্পানী  
প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১



বিস্কুট

গুণিকর স্বাদ সন্মাদ

খিনএরারগট

মেরী

পেটিটব্যুরো

নাইস

কলেজ

টেপ্টা

ডেপ্টা

ক্রীমক্র্যাকার

কয়েন

স্পোট

জিঞ্জারনাট

হাউসহোল্ড

সল্‌টী

মার্শেলক্রীম

কাফেনয়ের

চকোলেটক্রীম

বেবীক্রীম

সণ্ট ক্র্যাকার

প্রভৃতি

আরও অনেক রকম।

# বঙ্গপট



## বাঙলা ছবি ও ১৩৬৩

১৩৬৩ সালে মোট বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে ঊনপঞ্চাশ-খানি। সেইগুলির উপর চোখ বোলালে যা দেখা বা পাওয়া যায় তাইই একটি সার মর্ম উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি।

(১) চিরকুমারসভা (১ সপ্তাহ) কাহিনী ও গান রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গীত সন্তোষ সেনগুপ্ত, আলোকচিত্র বিপ্ত চক্রবর্তী, সম্পাদনা গোবিন্দন অধিকারী, শিল্প সৌভেন সেনের তত্ত্বাবধানে পুলিন ঘোষ ও গোপী সেন, শব্দ শ্রামস্বন্দর ঘোষ, পরিচালনা দেবকীকুমার। রূপায়ণে অজিত, জহর, নীতীশ, উত্তম, ক্রোশান্ত, জীবন, তুলসী চক্র, জহর, অজিত, পঞ্চানন, ভারতী, শোভা, তপতী, যমুনা, অনিতা, অপর্ণা। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, সন্ধ্যা, পূর্ববী। (২) পরাধীন (৫ সপ্তাহ) কাহিনী ওনাথায়ণ ভট্টাচার্য, সলাপ নাথায়ণ গঙ্গো, সঙ্গীত গোপেন মল্লিক, আলোকচিত্র অনিল গুপ্ত, সম্পাদনা শিব ভট্টা, শিল্প অনিল পাল, গান প্রশর রায়, শব্দ 'বাণী দত্ত, পরিচালনা মধু বসু। রূপায়ণে অজিত, ছবি, জহর, নির্মল, যৌরেন, আদিত্য, বেচু, প্রীতি, শৈলেন, বাণী বাবু, হেম গুপ্ত, শ্রামল, অলক, সঞ্জল, মলিনা, চন্দ্রা, শোভা, সন্ধ্যাবাণী, কাবেরী, সাবিত্রী, রেখা মল্লিক, সন্ধ্যা, আশা, মনোয়ারা, শান্তা, রিজ্জা, গীতা, বুলবুল। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, আন্ননা, ছবি। (৩) একটি রাত (মূল নাম ভীমপল্লী) (৬ সপ্তাহ) কাহিনী বনকুল, চিত্রনাট্য নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত অম্বুপম ঘটক, আলোক-চিত্র বিজয় ঘোষ, সম্পাদনা বৈজনাথ চট্টো, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ জগন্নাথ চট্টো, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা চিত্ত বসু। রূপায়ণে পাহাড়ী, কমল, উত্তম, জীবন, গুরুদাস, অম্বুপ, শুভেন, ভানু, জহর, তুলসী চক্র, হরিধন, হুয়া, শিবকালী, পঞ্চানন, ছবি, মলিনা, চন্দ্রা, মেনকা, হুচিত্রা, সবিতা, করালী। নেপথ্য কণ্ঠে—সন্ধ্যা। (৪) মহাকবি গিরিশচন্দ্র (১ সপ্তাহ) কাহিনী—মধু বসু ও দেবনাথায়ণ গুপ্ত সলাপ দেবনাথায়ণ, অতি: সলাপ বিধায়ক ভট্টা, সঙ্গীত অনিল বাগচী, আলোকচিত্র অনিল গুপ্ত, সম্পাদনা কমল গাঙ্গুলী, শিল্প কান্তিক বসু, গান মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও শ্রামল গুপ্ত, শব্দ বাণী দত্ত, পরিচালনা মধু বসু, নামভূমিকায় পাহাড়ী সাজাল। রূপায়ণে অজিত,

নীতীশ, অসিত, মোহন, গুরুদাস, উৎপল, মিহির, সন্তোষ, জহর অজিতপ্রকাশ, অম্বুপ, সবিতাচন্দ্র, গঙ্গাপদ, দেবেন, ভূপেন, বলীন, অমিনাশ, আদিত্য, বিপিন, সৌরীন, প্রীপতি, পঞ্চানন, চন্দ্রশেখর, শিবকালী, শুভেন্দু, হেম গুপ্ত, প্রীতি, সঞ্জল, মলিনা, পদ্মা, সন্ধ্যাবাণী, ভারতী, শোভা, তপতী, মেনকা, পূর্ণিমা, সন্ধ্যা, চন্দ্রা। নেপথ্য কণ্ঠে—ধনঞ্জয়, মৃণাল, উৎপলা, গীতা, ছবি, অম্বুলী। (৫) অসমাপ্ত (৭ সপ্তাহ) কাহিনী বিধায়ক ভট্টা, সঙ্গীত অম্বুপম, অনিল, নচিকেতা, দুর্গা, ডাঃ ভূপেন, আলোকচিত্র অনিল গুপ্ত, নৃত্য প্রীমতী প্রিয়ম জাঙ্গাটিকা। নৃত্য নেতৃত্ব, উদয়শঙ্কর, সম্পাদনা রবীন দাস, শিল্প কান্তিক বসু, শব্দ গৌর দাস ও বাণী দত্ত, গান গৌরীপ্রসন্ন, শ্রামল, হীরেন বসু, পুলক, বিধায়ক ও হরিচরণ, পরিচালনা রতন চট্টো। রূপায়ণে ছবি, জহর, বীরাজ, পাহাড়ী, কমল, নীতীশ, অসিত, নীপক, গুরুদাস, প্রবীর, ভানু, জহর, অম্বুপ, তুলসী চক্র, সন্তোষ, হুয়া, বেচু, শান্তি, প্রীতি, নৃপতি, অম্বর বসু ও বিশ্বাস, বীরাজ, বিজু, মলিনা, সন্ধ্যাবাণী, মঞ্জু, কাবেরী, রেণুকা, বাণী গাঙ্গুলী, জহলী, প্রীতিধারা, চন্দ্রা, অম্বুলী। নেপথ্য বস্তুে আশাবাখা, শান্তাপ্রসাদ, কেরামতুল্লা রাধাকান্ত, নিখিল, সাগিকানীন, বাসুসারা। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, ধনঞ্জয়, সত্যনাথ, বিনয় অধিকারী, মৃণাল, অপরেণ, মট, ডাঃ ভূপেন, লতা, সন্ধ্যা, প্রীতিমা, আলপনা, কৃষ্ণ, বাঁশবী, বাসন্তী। (৬) শঙ্করনাথায়ণ ব্যাক (৬ সপ্তাহ) কাহিনী নিতাই ভট্টা, সঙ্গীত অম্বুপম ঘটক, আলোকচিত্র বিজয় ঘোষ, সম্পাদনা সন্তোষ গাঙ্গুলী, শিল্প সৌভেন সেন, শব্দ জগন্নাথ চট্টো, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা নীতেন লাগিড়ী। রূপায়ণে ছবি, উত্তম, বসন্ত, মিহির, সবিতাচন্দ্র, তম্বুপ, আশীষ মুখো, ডাঃ হরেন, দেবেন, ছায়া, কাবেরী, অম্বুভা, মলিনা। নেপথ্য কণ্ঠে সন্ধ্যা। (৭) শ্রামলী (১০ সপ্তাহ) কাহিনী নিরুপমা দেবী, সঙ্গীত কালিদাস সেন, সম্পাদনা অরেন্দ্র চট্টো, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ ইরানী ও সত্যেন চট্টো, গান গৌরীপ্রসন্ন ও ভূপল, আলোকচিত্র ও পরিচালনা অজয় কব। রূপায়ণে অজিত, উত্তম, আশীষ মুখো, অম্বুপ, সন্তোষ, হরিধন, তুলসী চক্র, শিবকালী, ডাঃ হরেন, অম্বর বিশ্বাস, খগেন, শ্রামল চক্র ও মলিনা, কাবেরী, অম্বুভা, মণিকা, অপর্ণা, বাণীবালা, রাজলক্ষ্মী, আশা, করালী, বেলাবাণী, সন্ধ্যা, আরতি ও কালিদাস সেন। (৮) ত্রিষা (৮ সপ্তাহ) কাহিনী স্রবোধ ঘোষ, সঙ্গীত নচিকেতা ঘোষ, আলোকচিত্র বিজুতি লাহা ও বিজয় ঘোষ, সম্পাদনা সন্তোষ গাঙ্গুলী, শিল্প সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দ বতীন দত্ত, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালক অরুণ্ড। রূপায়ণে ছবি, জহর, কমল, নীতীশ, উত্তম, নীপক, মিহির, জীবন, শুভেন, হরিধন, ডাঃ হরেন, চন্দ্রশেখর, পৌর সী, চন্দ্রা, ছায়া, শোভা, হুচিত্রা, অম্বুভা, কেতকী, নেপথ্য বস্তুে আলী আকবর। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, সন্ধ্যা, ছবি। (৯) আশা (৭ সপ্তাহ) কাহিনী বাখালচন্দ্র, সলাপ সন্ননীকান্ত, আলোকচিত্র জি. কে. মহতা, সঙ্গীত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সম্পাদনা হুলাল দত্ত, শিল্প সত্যেন রায়চৌধুরী, গান জ্ঞানপ্রকাশ ও শ্রামল গুপ্ত, শব্দ সত্যেন চট্টো, পরিচালনা হরিদাস ভট্টাচার্য। রূপায়ণে জহর, কমল, আশীষ, ক্রোশান্ত, পূর্ণেন্দু, শিশির বটব্যাল, গঙ্গাপদ, তুলসী চক্র, হুয়া, আশু, সীতল, পঞ্চানন, বেচু, নৃপতি, ডাঃ হরেন, শৈলেন, খগেন, কানন, পদ্মা, মণিকা, তৃপ্তি, স্রমনা,

১। নেপথ্য কণ্ঠে প্রব্রুত, কানন, আলপনা। (১০) মামলায় (৪ সপ্তাহ) কাহিনী শরৎচন্দ্র, চিত্রনাট্য শৈলজ্ঞানন্দ, সঙ্গীত ন চট্টো, আলোকচিত্র বিজ্ঞ চক্রবর্তী, সম্পাদনা রবীন দাস, শিল্প শঙ্ক বসু, শব্দ নৃপেন পাল, দেবেশ ঘোষ, ভূপেন ঘোষ, গান ব বায়, পরিচালনা পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণে ছবি, জহর, ত, প্রেমোত্ত, ভায়ু, তুলসী, পঞ্চানন, শিবকালী, বীরাজ, শৈলেন, , স্বধেন, বিজু, অসিতকুমার, দেবানীষ, মলিনা, সাবিত্রী, বেণুকা, গাঙ্গুলী, স্বদীপ্তা, চিত্রা, মীরা। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, শ্রামল, , আলপনা। (১১) লোচল (৩ সপ্তাহ কিন্তু ২য় দফে দীর্ঘদিন ছিল) কাহিনী আন্তোভোব মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত নির্মল ভট্টাচার্য, সাক্ষিত্র অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজয় মিত্র, সম্পাদনা তুলসী দত্ত, বটু সেন, গান অনিল ভট্টা ও শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শব্দ গৌর ও সত্যেন চট্টো। পরিচালনা অসিত সেন। রূপায়ণে পাহাড়ী, ত, নির্মল, প্রভাত, জহর, সমরকুমার, অনিল, ধগেন বায়, , অরুণভট্ট, তপস্বী, তুল্লা ও বাহু সম্রাট পি, সি, সরকার। থা কণ্ঠে ধনঞ্জয়, শ্রামল, তরুণ, মৃণাল। (১২) পাণ ও (৫ সপ্তাহ) কাহিনী মুরারি সেন, সঙ্গীত গোপেন মল্লিক ও দাসগুপ্ত, আলোকচিত্র বিমল মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনা গোবর্ধন কারী, শিল্প গৌর পোন্ধর, শব্দ হর্গাদাস মিত্র, গান প্রণব পরিচালনা বিজ্ঞ সেন। রূপায়ণে পাহাড়ী, নীতীশ, বিকাশ, ত, অজিত, আশীষ, নির্মল বসাক, শিশির মিত্র, মুরারি, ন, পঞ্চানন, নৃপতি, ডাঃ হবেন, বেচু, বীরাজ, মঞ্জু, অমৃতা, গা, শ্রামলী, মণিকা ঘোষ, জহরী। নেপথ্য কণ্ঠে অসিত, তি, গায়ত্রী, উরা। (১৩) মানবন্ধা (৪ সপ্তাহ) কাহিনী গায়ণ ভট্টাচার্য, সঙ্গীত কমল দাশগুপ্ত, আলোকচিত্রে বিজয় নে, দনা রমেশ ঘোষী, শিল্প বিজয় বসু, শব্দ বাণী দত্ত, চিত্রনাট্য প ও গান প্রণব বায়, পরিচালনা সত্যীশ দাশগুপ্ত। রূপায়ণে বীরাজ, পাহাড়ী, কমল, নির্মল, ভায়ু, তুলসী চক্র, হরিধন, ৫, বেচু, প্রীতি, ধগেন, ছবি, সবিতা, বমুনা, অশর্ণা, রাজলক্ষ্মী, কী। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, সন্ধ্যা, প্রেতিমা। (১৪) একদিন (১১ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা শঙ্কু মিত্র ও অমিত্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী, আলোকচিত্রে বাণু কর্মকার, সম্পাদনা মায়েরকার স্ত্রী সুলে, শিল্প আচরেকার, শব্দ আলাউদ্দিন, গান সলিল ও শৈলেন্দ্র, প্রযোজক ও প্রযোজনায় বাল্লকপুত্র। রূপায়ণে পাহাড়ী, প্রদীপ, গঙ্গাপদ, কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী, , নন্দাবরু, ইকতিকার, বিক্রম কপূর, মণি চট্টো, কুমার বায় , মুক্তি, স্নোলাচনা, ডেইজি এবং জীমতী নার্সিস। কণ্ঠে মাল্লা, লতা, সন্ধ্যা। (১৫) রাজপথ (১২ সপ্তাহ) কাহিনী-উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সলাপ উপেন্দ্রনাথ, থা ঘোষ, সঙ্গীত-শৈলেন্দ্র দত্তগুপ্ত ও বায়, আলোকচিত্রে ৫ দাস, সম্পাদনা সুব্রত পাল, শব্দ ক্ষেত্র ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ, গান শৈলেন্দ্র বায়, পরিচালনা গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি, জহর, বীরাজ, নীতীশ, বসন্ত, অসিত, বীরেন, পাল, শিশির, গুরুদাস, অমর মল্লিক, সন্তোষ, তুলসী, জহর, , নববীণা নৃপতি, হুয়া, কৃষ্ণধন, বীরাজ, প্রীতি, বিজয়কান্তিক, যন, স্বধেন, মনোপোপাল, আলোক, মিষ্ট, সত্যজিত, সুপ্রিয়,

মলিনা, চিত্রা, সুপ্রভা, পদ্মা, মেনকা, অমৃতা, শোভা, ভারতী, শিপ্রা, বমুনা, প্রমীলা, স্বাগতা, স্বদীপ্তা, মণিকা ঘোষ, নিতাননী, চিত্রা, শান্তা, মীরা, মনোরমা। নেপথ্য কণ্ঠে অসিত, ধনঞ্জয়, শ্রামল, তরুণ সন্ধ্যা, আলপনা, প্রেতিমা, রমা। (১৬) সূর্যমুখী (মূল নাম প্রভাতসূর্য) (৮ সপ্তাহ) কাহিনী গজেন মিত্র, অতি: সলাপ পাণ্ডুগোপাল মুখোপাধ্যায়, আলোকচিত্রে দেওভীভাই, সঙ্গীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনা কমল গাঙ্গুলী, শব্দ সত্যেন চট্টো, শিল্প গৌর পোন্ধর, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা বিকাশ বায়। রূপায়ণে ছবি, পাহাড়ী, বিকাশ, অতি, জীবন, মিহির, ভায়ু, তুলসী চক্র, হুয়া, পঞ্চানন, ধগেন, দেবেন, সৌরীন মুখোপাধ্যায়, সমরকুমার, চিত্রা, সন্ধ্যারাবী মঞ্জু, ভারতী, অশর্ণা, বাণী গাঙ্গুলী, হুয়া, বেবা, আশা, সন্ধ্যা, রিক্তা। (১৭) ছায়া সঙ্গিনী (৩ সপ্তাহ) কাহিনী ও গান গৌরীপ্রসন্ন, সঙ্গীত কালিদাস সেন ও বীরেন বায়, সম্পাদনা প্রণব মুখোপাধ্যায়, শিল্প (নাম নেই), শব্দ নৃপেন পাল, আলোকচিত্রে ও পরিচালনা—বিজ্ঞাপতি ঘোষ। রূপায়ণে ছবি, জহর, বসন্ত, বীরাজ, শান্তি, বাবুয়া, মলিনা, চিত্রা, মঞ্জু, শোভা, অমৃতা, অশর্ণা, নিতাননী, আশা, ভারা, শান্তা। নেপথ্য কণ্ঠে আলপনা, উৎপলা। (১৮) সাধক রামপ্রসাদ (৮ সপ্তাহ) কাহিনী গৌরীপ্রসাদ বসু, সঙ্গীত সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, আলোকচিত্রে দিব্যানন্দ ঘোষ, সম্পাদনা নানা বসু, শিল্প ত্রতীন ঠাকুর, শব্দ পরিভোব বসু, গান রামপ্রসাদ, পরিচালনা বাণী আশ, নাম ঠাকুর গুরুদাস। রূপায়ণে ছবি জহর, বীরাজ, মচেন্দ্র, নীতীশ, রবি, অজিত, রবীন, অতি, প্রশান্ত, শিশির মিত্র (প্রযোজক), সমীর, তুলসী, জহর, নববীণা, নৃপতি, পশুপতি, বাবুয়া, মলিনা, সুনন্দা, পদ্মা, শিখা, অশর্ণা, করালী, করুনা, গৌরী। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়। (১৯) গোবিন্দ দাস (৪ সপ্তাহ) কাহিনী নিতাই ভট্টাচার্য, আলোকচিত্রে জি, কে, মেহতা, সঙ্গীত কমল দাশগুপ্ত, সম্পাদনা বৈজ্ঞান্য চট্টো, শিল্প বিজয় বসু, শব্দ বাণী দত্ত, রঞ্জিত দত্ত, স্বধি বন্দ্যোপাধ্যায়, গান গোবিন্দ দাস, পরিচালনা—প্রফুল্ল চক্রবর্তী। রূপায়ণে ছবি, পাহাড়ী, কানু, নীতীশ, বসন্ত, সত্য, ভায়ু, জহর, অজিত, গৌর সী, নৃপতি, বেচু, প্রীতি, ময়ূখ, সমীর লাহিড়ী, মঞ্জু, সাবিত্রী, সবিতা, অশর্ণা, করালী, মীরা, পূর্ববী। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, প্রেতিমা। (২০) মনমোহন (৬ সপ্তাহ) কাহিনী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত প্রফুল্ল ভট্টা ও পরশ ধর, আলোকচিত্রে রমেন পাল, (বিশেষ দৃষ্ট প্রযোজ দাস) সম্পাদনা অরেন্দ্র চট্টো, শব্দ পরিভোব বসু, শিল্প ঐতর্যক বসু, গান সুবল দত্ত, সন্তোষ সেন, বর্ণী নন্দী, পরিচালনা অমল বসু। রূপায়ণে ছবি, পাহাড়ী, নীতীশ, অজিত, শুভেন, মিহির, গঙ্গাপল, অরুণ, বেচু, পঞ্চানন, বীরাজ, মনোপোপাল, মলিনা, সবিতা, নমিতা, শ্রামলী। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, শ্রামল, পদ্মালতা, বিনয় অধিকারী, মৃণাল, প্রেতিমা, গায়ত্রী, বাসন্তী, ডলি। (২১) গুরুবধু (৮ সপ্তাহ) কাহিনী সলিল সেনগুপ্ত, আলোকচিত্রে বিজয় ঘোষ, সঙ্গীত রাজেন সরকার, সম্পাদনা সন্তোষ গাঙ্গুলী, শিল্প সুমীর বা, শব্দজগন্নাথ চট্টো, নৃত্য বিনয় ঘোষ, গান গৌরীপ্রসন্ন। পরিচালনা—চিত্ত বসু। রূপায়ণে ছবি, উত্তম, আশীষ মুখোপাধ্যায়, শুভেন, জীবন, অরুণ, পঞ্চানন, শান্তি, মৃণাল, উজ্জল, ছবি, বিজু, চিত্রা, মালী, সবিতা, মীরা। নেপথ্য কণ্ঠে মাল্লা ও সন্ধ্যা। (২২) অপরাধিত (৬ সপ্তাহ) কাহিনী বিজুভিষ্ণু,

সঙ্গীত বিশারদ, আলোকচিত্র স্তম্ভ মিত্র, সম্পাদনা হুলাল দত্ত, শিল্প বাণী চন্দ্রগুপ্ত, শব্দ দুর্গাদাস মিত্র, পরিচালনা সত্যজিৎ রায়। রূপায়ণে কান্ধ, অরুণ, পিনাকী, কালী, রমণীরজন, চারুপ্রকাশ, সুবোধ গাঙ্গুলী, হেমন্ত, কালীচরণ, মণি, লালচাঁদ, পঞ্চানন, অনিল মুখো, তরেন্দ্রকুমার, অজয়, ভাগ্যহু পাণ্ডে, ককণা, বাণীবাহা, শান্তি হুতা, সুদীপ্তা, মীনাকী, বেবা। (২০) যুদ্ধ (২ সপ্তাহ) কাহিনী ও প্রযোজনা—অমিতা দেবী, সঙ্গীত রবীন চট্টো, আলোকচিত্র যতীন দাস, সম্পাদনা রমেশ ঘোষী, শিল্প বটু সেন, শব্দ শচীন চক্রবর্তী, গান প্রণব রায়, পরিচালনা সতীশ দাশগুপ্ত। রূপায়ণে ছবি, রবীন, অসিত, সন্তোষ, শিশির বটব্যাল, নরেশ, বীরাজ, যতীন, মলিনা, চন্দ্রা, অমিতা, শিখা, মনোরমা, শান্তা, সন্ধ্যা, তঞ্জলি। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, সতীনাথ, তরুণ, যিঞ্জন চৌধুরী, প্রমুখ ও সন্ধ্যা। (২৪) দানের মধ্যমা (১ সপ্তাহ) কাহিনী প্রভাবতী দেবী, সপ্তাহী, পরিবর্তন ও সংলাপ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আলোকচিত্র সুরেশ দাস, সঙ্গীত গোপেন মল্লিক, ববীন্দ্র সঙ্গীত যিঞ্জন চৌধুরী, সম্পাদনা বৈজনাথ বন্দ্যো, শব্দ পরিতোষ বসু, শিল্প অনিল পাল, গান প্রণব রায়, চারু মুখো ও অরুণ ভট্টা, পরিচালনা সুশীল মজুমদার। রূপায়ণে ছবি, কান্ধ, রবীন, অসিত, বীরেন, মিহির, জীবেন, বীরেশ্বর, অমর মল্লিক, ভানু, নৃপতি, ডাঃ হরেন, তারাকুমার, প্রীতি, ছায়া, সাবিত্রী, আরতি, নমিতা, তুল্লা, নিভাননী, বেথা মল্লিক, শান্তা, করালী। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, অপরেশ, উৎপলা, আলপনা, সুনন্দা মজুমদার। (২৫) মা (৫ সপ্তাহ) কাহিনী অলকা মুখোপাধ্যায়, আলোকচিত্র জি. কে. মেহতা, সঙ্গীত নির্মল ভট্টা (সহায়তায় বালসারা) সম্পাদনা হরিদাস মহলানবিশ, শিল্প সুনীতি মিত্র, শব্দ মণি বসু, গান অনিল ভট্টা যুগ্ম-পরিচালক প্রভাত মিত্র, পরিচালনা প্রভাত মুখোপাধ্যায়। রূপায়ণে অসিত, শিশির বটব্যাল, পার্থ, চন্দ্রা, অরুন্ধতী, সাবিত্রী, বিনতা, আশা, বেবা, ললিতা। নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, সুপ্রভা, উৎপলা, অরুন্ধতী। (২৬) নাগর দেশা (২ সপ্তাহ) কাহিনী সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত অরুণ খটক, আলোকচিত্র সন্তোষ গুহরায়, সম্পাদক বৈজনাথ চট্টো, শিল্প রবীন চট্টো, শব্দ শ্যামসুন্দর ও সুশীল সরকার, গান শান্তি ও পরিমল ভট্ট, সংলাপ ও পরিচালনা অমলেন্দু বসু। রূপায়ণে নীতীশ, রবীন, সত্য, অরুণ, জহর, তুলসী চক্র, নবদীপ, ছায়া, নীতল, পঞ্চানন, বাথারমণ, নারায়ণ, ছবি, পদ্মা, প্রণতি, সবিতা, বিনতা, মেনকা, করালী। নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, মিকু, সন্ধ্যা, আলপনা। (২৭) শুভলয় (৩ সপ্তাহ) কাহিনী লিলা দেবী, সংলাপ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গীত বীরেন্দ্রকিশোর (গৌরীপুর) আলোকচিত্র জি. কে. মেহতা, সম্পাদনা শ্যাম দাস ও শিব ভট্টা, শিল্প বিজয় বসু, শব্দ বাণী দত্ত, গান প্রণব রায় ও শ্যামল গুপ্ত, পরিচালনা মধু বসু। রূপায়ণে নীতীশ, নির্মল, বীরেন, নবকুমার, গুরুদাস, উৎপল, অজিতপ্রকাশ, অমর মল্লিক, তুলসী লাহিড়ী ডাঃ হরেন, নৃপতি, প্রীতি, নরেশ, বীরাজ, ছবি ঘোষাল, নরেন, মলিনা, ছায়া, শোভা, প্রণতি, তপতী, তুল্লা বুলবুল, বিজা। (২৮) টাকা-আনা-পাই (৮ সপ্তাহ) কাহিন ও পরিচালনা জ্যোতির্দয় রায়, সঙ্গীত সত্যজিৎ মজুমদার আলোক চিত্র হুম্মদ ঘোষ, সম্পাদনা অর্ধেন্দু চট্টো, শিল্প বটু সেন, শব্দ

শচীন চক্রবর্তী, গান জ্যোতির্দয় রায় ও কল্যাণ দাশগুপ্ত। রূপায়ণে ছবি, রবীন, বিকাশ, উৎপল, জীবেন, ভানু, জহর, অনিল, শৈলেন প্রেমতোষ, বাবুয়া, অরুন্ধতী, তপতী, বিনতা, বাণী গাঙ্গুলী, অলকা, গীতা, নেপথ্য কণ্ঠে সতীনাথ, সন্ধ্যা, বিনতা (২১) শিল্পী (৭ সপ্তাহ) কাহিনী নিতাই ভট্টাচার্য, আলোকচিত্র বামানন্দ সেনগুপ্ত, সঙ্গীত রবীন চট্টো, নৃত্য অনাদিপ্রসাদ, সম্পাদনা কালী রাতা, শিল্প সন্তোম রায়চৌধুরী, শব্দ সন্তোম চট্টো, গান প্রণব রায় পরিচালনা ঐশ্বর্যগামী। রূপায়ণে পাহাড়ী, কমল, উত্তম, অসিত, কালী, ভূপেন, ডাঃ হরেন, পঞ্চানন, গোকুল, সমরকুমার, মলিনা, সুরজিতা, শোভা, শিখা, গীতা ও শিল্পী রবীন সৈন্ত। (৩০) ধুলার ধরণী (২ সপ্তাহ) কাহিনী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সংলাপ বিশাঙ্ক ভট্টা, সঙ্গীত মানবেন্দ্র মুখো, আলোকচিত্র—সন্তোষ গুহরায়, সম্পাদনা শিব ভট্টা, শিল্প গৌর পোদ্দার, শব্দ গৌর দাস, গান গৌরীপ্রসন্ন ও শ্যামল গুপ্ত, পরিচালনা অর্ধেন্দু সেন। রূপায়ণে বীরাজ, পাহাড়ী, বিকাশ, অসিত, অজিত, প্রেমাস্ত, তরুণ, জহর, তুলসী চক্র, নৃপতি, নীতল, হরিমোহন, বীরাজ, প্রীতি, অমুলা, সন্ধ্যারাবী, শোভা, সবিতা, রাজলক্ষ্মী, নিভাননী, তুল্লা, নমিতা দত্ত। নেপথ্য কণ্ঠে অসিত, মানবেন্দ্র ও সন্ধ্যা। (৩১) সিঁথির সিঁড়ির (৪ সপ্তাহ) কাহিনী বিজয় গুপ্ত, আলোকচিত্র সন্তোষ গুহরায়, সঙ্গীত কালিদাস সেন, সম্পাদনা সন্তোষ গাঙ্গুলী, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ গৌর দাস, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা অর্ধেন্দু সেন। রূপায়ণে ছবি, পাহাড়ী, কমল, অসিত, বীরেন, অরুণ, রাজা, বীরেশ্বর, সন্তোষ, জহর, তুলসী চক্র, নৃপতি, হরিধন, বেচু, বীরাজ, কবি দাশগুপ্ত, মলয়, অমুলা, সন্ধ্যারাবী, সাবিত্রী, তপতী, দীপ্তি, বেণুকা, অপর্ণা, রাজলক্ষ্মী, অরুণীলা ও রবার্ট কানিংহাম (চলিউড)। নেপথ্য কণ্ঠে সতীনাথ শ্যামল, সন্ধ্যা, প্রতীমা। (৩২) চোর (৭ সপ্তাহ) কাহিনী মণি সিংহ, পরিবর্তন প্রবোধ মাঙ্গাল, আলোকচিত্র অমুলা মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত রবীন চট্টো, সম্পাদনা হরিদাস মহলানবিশ, শিল্প সৌরেন সেন, শব্দ শ্যামসুন্দর ও সুশীল সরকার, নৃত্য বালকৃষ্ণ, গান প্রণব রায়, পরিচালনা কান্তিক চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণে বিকাশ, জীবেন, প্রেমাস্ত, দিলীপ, সত্য, শিশির বটব্যাল, তুলসী, জহর, রঞ্জিত, প্রীতি, বেচু, মণি, ছবি, সুরেন, গুম, সন্ধ্যারাবী, চন্দ্রা, ইরা, গীতা, চিত্রা, আশা, মোহরমা। (৩৩) আমার বো (৫ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা খগেন রায়, আলোকচিত্র দিব্যানু ঘোষ, সঙ্গীত অরুণ সরকার ও বিনয় চট্টো, সম্পাদনা সুরকুমার মুখো, শব্দ পরিতোষ বসু, শিল্প নীলীপ সেন, গান গৌরীপ্রসন্ন ও সন্তোষ সেন। রূপায়ণে বীরাজ, কমল, বিকাশ, ভানু, জহর, তুলসী চক্র, তুল্লা, হরিধন, পদ্মপতি, যুগ্মজয়, সুরজিতা, বেণুকা, সুনন্দা, মিত্রা, আরতি দাস, রাজলক্ষ্মী, সন্ধ্যা, অমুলা, শান্তা, কলিন অলিভার। (৩৪) নবজয় (৭ সপ্তাহ) কাহিনী আশাপূর্ণা দেবী, সঙ্গীত নচিকেতা ঘোষ, আলোকচিত্র বিপ্লু চক্রবর্তী, অতি: চিত্রায়ণে জি. কে. মেহতা, বিভূষণতি ঘোষ ও বিমল মুখো: সম্পাদনা গোবর্ধন অধিকারী, শিল্প সৌরেন সেনের তত্ত্বাবধানে পূর্ণিমা ঘোষ ও গোপী সেন, শব্দ শ্যামসুন্দর ঘোষ, অজিত, গান গৌরী প্রসন্ন, পরিচালনা দেবকীকুমার। রূপায়ণে জহর, উত্তম, অজিত, ভূপেন, শিশির বটব্যাল, তুলসী লাহিড়ী, গোকুল, বিজু, বাবুয়া

লক, অক্ষত, সাবিত্রী, সবিতা, মিতা, বাণী গাঙ্গুলী, নিভাননী, শা, মনোয়মা । নেপথ্য যন্ত্রে আলী আকবর । নেপথ্য কণ্ঠে রয়, উত্তম, মানবেন্দ্র, সন্ধ্যা, ছবি । (৩৫) কাবলিওয়াল ৩ সপ্তাহ) কাহিনী রবীন্দ্রনাথ, অতি: সলাপ প্রেমেন্দ্র মিত্র, ১৩ রবিশঙ্কর, রবীন্দ্র সঙ্গীত দ্বিজেন চৌধুরী, নৃত্য মাধবী চট্টোপাধ্যায়, লোকচিত্র অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনা সুবোধ বায়, শিল্প সুনীতি মিত্র, মণি বসু ও অতুল চট্টোপাধ্যায়, গান রবীন্দ্রনাথ, পরিচালনা ন সিংহ । প্রধানংশে ছবি বিশ্বাস ও টিফু ঠাকুর । রূপায়ণে মোহন, কালী, জীবন, অতুল, কৃষ্ণন, জহর, দীপক, পারিজাত, তি, প্রীতি, মঞ্জু, শ্রাবণী, কবালী, আশা, নেপথ্য কণ্ঠে দেবানী মী, মালবিকা ও গুপ্তা । (৩৬) হারজিৎ (৫ সপ্তাহ) কাহিনী মঙ্গ মিত্র, চিত্রনাট্য ও সংলাপ পাঁচগোপাল মুখোপাধ্যায় ও প্রণব সঙ্গীত রবীন চট্টোপাধ্যায়, আলোকচিত্র বিভূতি চক্রবর্তী, সম্পাদক দ দত্ত, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ ইয়াগী, গান প্রণব বায়, সালনা মায়ু সেন । রূপায়ণে পাহাড়ী, কমল, উত্তম, বসন্ত, ন, জীবন, সন্তোষ, জয়নারায়ণ, অমুপ, তুলসী চক্র, নৃপতি, হর্য, র, বাবুয়া, মলিনা, অনিতা, স্বাগতা, সজ্জা । নেপথ্য কণ্ঠে র, শ্যামল, এ, কানন, প্রমুদ, সন্ধ্যা গায়ত্রী । (৩৭) মধুমালতী (১০ সপ্তাহ) কাহিনী প্রমথেশ বড়ুয়া, প্রযোজনা বমুনা বড়ুয়া, ধন ও সংলাপ মিতাই ভট্টা, সঙ্গীত কমল দাশগুপ্ত, লোকচিত্র সন্তোষ ঘোষ, সম্পাদনা রাসবিহারী সিংহ, শিল্প বিজয় শব্দ ইয়াগী ও শিশির চট্টোপাধ্যায়, গান প্রণব বায়, পরিচালনা নীরেন দী । রূপায়ণে জহর, নীতীশ, অতি, বসন্ত, অমর মল্লিক, শিশির কৃষ্ণচন্দ্র, ভাস্কর, নৃপতি, প্রীতি, দীপক, ইয়াগী, কাবেরী, । নেপথ্য কণ্ঠে এ কানন, প্রমুদ ও সন্ধ্যা । (৩৮) শেখ (৬ সপ্তাহ) কাহিনী ও গান কবি বিমল ঘোষ, আলোকচিত্র ভাই, সঙ্গীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনা তুলসী দত্ত, শিল্প সরকার, শব্দ শিশির চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা সুনীল মজুমদার । ৭ ছবি, পাহাড়ী, কাহ্ন, কমল, বিকাশ, বসন্ত, প্রেমাত, জীবন, জহর, নৃপতি, হর্য, প্রীতি, কৃষ্ণন, বেচু, চন্দ্রশেখর, শৈলেন, মার, হর্য, সাবিত্রী, তপসী, মিত্রা, অপরী, নমিতা, নিভাননী, শাস্তা ও বিশিষ্ট গুপ্ত । নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত ও লতা । (৩৯) । (৭ সপ্তাহ) কাহিনী শরৎচন্দ্র, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত হুগু ও বিহারক, সঙ্গীত অনিল বাগচী, সম্পাদনা কমল গাঙ্গুলী, চার্টিক বসু, শব্দ বাণী দত্ত, গান শ্যামল গুপ্ত, আলোকচিত্র ও গান অজয় কব । রূপায়ণে ছবি, দীপক, পাহাড়ী, উত্তম, অমুপ, জীবন, তুলসী, নৃপতি, শিবকালী, প্রীতি, শীতল, অসিত, শ্যামল, সজ্জা, হর্য, সন্ধ্যা, বাণী, মঞ্জু, তপসী, দীপ্তি, মলিকা ঘোষ, সন্ধ্যা, শাস্তা, রূপা । (৪০) ঘুম (৫ সপ্তাহ) মণি বর্মা, সঙ্গীত শচীন গুপ্ত, আলোকচিত্র বিভূতি চক্রবর্তী, । তুলসী দত্ত, শিল্প সুনীল সরকার, শব্দ শ্যামসুন্দর ঘোষ, লক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা প্রীতাবিশঙ্করের উপদেশনায় অরুণী । ছবি, জহর, অসিত, প্রবীর, দীপক, ভাস্কর, সন্তোষ, অমর জ্যোতির্ময়, মালকম, দীপক, বাবুয়া, সন্ধ্যা, বাণী, মঞ্জু, সবিতা, বেণুকা, রাজলক্ষ্মী, আশা । নেপথ্য কণ্ঠে সন্ধ্যা, । (৪১) বড়ুয়া (৪ সপ্তাহ) কাহিনী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ,

আলোকচিত্র বিপু চক্রবর্তী, সঙ্গীত পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শিল্প কান্তিক বসু, শব্দ রঞ্জিত দত্ত, গান প্রণব বায়, পরিচালনা নীরেন লাহিড়ী । রূপায়ণে ছবি, জহর, নীতীশ, বিকাশ, ভাস্কর, হর্য, কৃষ্ণন, প্রীতি, দীপক, গোবিন্দ, বিজু, তিলক, সরস্ব, সন্ধ্যা, বাণী, দীপ্তি, জ্ঞানদা, রমা, শাস্তা, কবালী । নেপথ্য কণ্ঠে হেমন্ত, ধনঞ্জয়, ইয়াগী, ও লতা । (৪২) সিঁহুর (৫ সপ্তাহ) কাহিনী কবেন বায়, চিত্রনাট্য নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত রবীন চট্টোপাধ্যায়, আলোকচিত্র দেওজীভাই, সম্পাদনা বৈজনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিল্প সত্যেন বায়চৌধুরী, শব্দ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, গান কবি বিমল ঘোষ, পরিচালনা সুধার মুখোপাধ্যায় । রূপায়ণে পাহাড়ী, কমল, বিকাশ, রবীন, প্রেমাত, জীবন, অমর মল্লিক, তুলসী চক্র, নৃপতি, বাণী, শীতল, শৈলেন, সন্ধ্যা, বাণী, মঞ্জু, মানসী, বেবা, রাজলক্ষ্মী, আশা, চিত্রা, অমলা । নেপথ্য কণ্ঠে—শ্যামল, সন্ধ্যা, প্রীতিমা । (৪৩) উচ্চা, কাহিনী—নীহার গুপ্ত, আলোকচিত্র—জি, কে, মেহতা, সঙ্গীত—সুনীল দাশগুপ্ত, সম্পাদনা—অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শিল্প—বটু সেন ও শিব জৈমিক, শব্দ—সুনীল সরকার, গান—গৌরীপ্রসন্ন ও কাহ্ন ঘোষ, পরিচালনা—নরেশচন্দ্র । প্রধানংশে—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় । রূপায়ণে—কমল, বীরেশ্বর, বীরেন, জীবন, অনিল, অমুপ, তুলসী লাহিড়ী, জহর, ডাঃ হরেন, দেবেন, রাধারমণ, শৈলেন, সুনন্দা, সবিতা, বমুনা, জয়প্রী, সন্ধ্যা নৃত্য লীন-লীলা । নেপথ্য কণ্ঠে ইয়াগী হোসেন ও বিলায়েৎ হোসেন । নেপথ্য কণ্ঠে সন্ধ্যা, আলপনা, গায়ত্রী । (৪৪) বাক্সি শেষে (৩ সপ্তাহ) কাহিনী মার্শিক গুহরায়, সঙ্গীত আলি আকবর, সম্পাদনা শিব ভট্টা, শব্দ ইয়াগী, শিল্প গৌর পোদ্দার, নৃত্য বিনয় ঘোষ, গান শ্যামল গুপ্ত ও বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, আলোকচিত্র ও পরিচালনা সন্তোষ গুহরায় । রূপায়ণে পাহাড়ী, রবীন, অসিত, কালী, সত্য, অমুপ, জহর, শীতল, ছবি, দেবানী, পদ্মা, সন্ধ্যা, বাণী, গাঙ্গুলী, বেণুকা, শ্যামলী, রাজলক্ষ্মী, রমা, অমলা, বিজ্ঞা । নৃত্য মায় ও সীমা । নেপথ্য কণ্ঠে নিখিল, সাগিন্দ্রকান, আশীষ, বালায়া, শিশিরকণা । নেপথ্য কণ্ঠে সতীনাথ, মানবেন্দ্র, আলপনা । (৪৫) একতারা কাহিনী প্রীতিভা বসু, সঙ্গীত অমুপম বটক, আলোকচিত্র নীরেন গুপ্ত, সম্পাদনা অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শিল্প কান্তিক বসু, শব্দ সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও হুগীদাস মিত্র, গান ও পরিচালনা নীরেন বসু । রূপায়ণে ছবি, কাহ্ন, প্রবীর, সন্তোষ, কৃষ্ণচন্দ্র, ভাস্কর, তুলসী চক্র, হরিধন, নৃপতি, বাক্সি, বেচু, শ্যামল, মলিনা, পদ্মা, সাবিত্রী, সবিতা, মেনকা, রাজলক্ষ্মী, আশা, সীমা, বুলবুল । নেপথ্য কণ্ঠে ধনঞ্জয়, শ্যামল, পাল্লালাল, মানবেন্দ্র, সন্ধ্যা, প্রীতিমা, গায়ত্রী, ছবি, আলপনা, নীলিমা, কৃষ্ণা, রাধা, বাণী । (৪৬) অমর সায়গল (১ সপ্তাহ) কাহিনী বিনয় চট্টোপাধ্যায়, আলোকচিত্র নির্মল দে, সংলাপ নটবর, সঙ্গীত পঙ্কজ, তিমির, রাইচাঁদ, অপরেজ, সম্পাদনা হরিদাস মহলানবিশ, শিল্প সুনীতি মিত্র, শব্দ (নাম নেই) পাঁচগোপাল, নীতীন বসু । নাম ভূমিকায় মুখেরী । রূপায়ণে পাহাড়ী, হাফেজী ট্যাগুন, কাপু, পদ্মা, আশুতা, জাহান, অমলীলা, রমা । (৪৭) তাপসী কাহিনী মণি বর্মা, সঙ্গীত নচিকেতা ঘোষ, আলোকচিত্র রামানন্দ সেনগুপ্ত, সম্পাদনা বৈজনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিল্প সুবোধ দাস ও মদন গুপ্ত, শব্দ নৃপেন পাল ও দেবেন ঘোষ, গান গৌরীপ্রসন্ন, পরিচালনা চিত্ত বসু । রূপায়ণে অজিত, ছবি, জহর, পাহাড়ী, কমল,

অসিত, অজিত, নীপক, বীরেন, শিশির, বটব্যাল, শুভেন, অম্বুপ, পরিমল, পঞ্চানন, নৃপতি, জীতি, বেচু, শান্তি, বিভূ, মলিনা, চন্দ্রা, সন্ধ্যারাগী, সবিতা, বনানী, বেণুকা, রেবা, আশা, কবালী, রূপা, গীতা। নেপথ্য কণ্ঠে শচীন, আল্পনা, গায়ত্রী, প্রতিমা। (৭৮) পঞ্চতপা কাহিনী আন্তোয় মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত নির্মল ভট্টাচার্য ও বালসারী, আলোকচিত্র অজয় মির, সম্পাদনা তরুণ দত্ত, শিল্প এস, রামচন্দ্র, শব্দ বাণী দত্ত, গান গ্রামস গুপ্ত, পরিচালনা অসিত সেন। রূপায়ণে পাঁচাড়ী, কমল, অসিত, প্রশান্ত, পারিজাত, অমৃত, যশাল, চন্দ্রা, পদ্মা, অরুণ্ধতী, শুভা, সীতা ও বিভাস সোম। নেপথ্য কণ্ঠে সন্ধ্যা। (৪১) আঁধারে আলো কাহিনী শরৎচন্দ্র, অতি সংলাপ সজ্জনকান্ত, সঙ্গীত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, আলোকচিত্র সিকি মজতা, সম্পাদনা তুলাল দত্ত, শব্দ বেবেশ ঘোষ, শিল্প সন্তোম রায়চৌধুরী, গান গ্রামস গুপ্ত, পরিচালনা হরিদাস ভট্টাচার্য। রূপায়ণে বিকাশ, বসন্ত, জীবন, অমর মলিক, ভাহু, তুলসী চক্র, অজিত চ্যা, পদ্মা, স্মিত্রা, যমুনা, নীলিমা। নেপথ্য কণ্ঠে মানবেন্দ্র ও সন্ধ্যা।

এ বছর যে সব নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া গেল তাঁদের মধ্যে— আশীষ মুখোপাধ্যায়, অমৃত দাশগুপ্ত, পরিমল সেন, দ্বিজু ভাওয়াল, যুগল ঘোষাল, পিনাকী সেনগুপ্ত, জীমান্ন তিলক, জীমান্ন গুপ্ত, চক্র-প্রকাশ ঘোষ, রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত, অজয় মিত্র, সুবোধ গাঙ্গুলী, জীমান্ন পার্শ্ব, বরুণ মুখোপাধ্যায়, শব্দ চট্টোপাধ্যায়, নির্মল বসাক, মলয় বিশ্বাস, উজ্জলকুমার, টিকু ঠাকুর, শুভা সেন, অলকা সেন, গীতা দে, মানসী চট্টোপাধ্যায়, সজ্জনতা দেবী, শ্রাবণী চৌধুরী, সীতা সেনগুপ্ত, কুমারী ললিতা, জ্ঞানদা কাকোতি, মীরা রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

যে সকল কৃতী শিল্পীদের বেশ কিছুদিন বাদে বাতলা ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গেল তাঁদের মধ্যে মহেন্দ্র গুপ্ত, বাধামোহন ভট্টাচার্য, অভি ভট্টাচার্য, বিপিন গুপ্ত, বৃকচন্দ্র দে, বিপিন মুখোপাধ্যায়, ভূপেন চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর সেন, দিলীপ চৌধুরী, সবিতাভ্রত দত্ত, অরিনাশ দাস, সমরকুমার, মনোগোপাল, তারাকুমার জাহুড়ি, রাধা মুখোপাধ্যায়, মালকম, জ্যোতিরকুমার, প্রেমতোষ রায়, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, মালা সিন্হা, বনানী চৌধুরী, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, মণিকা গাঙ্গুলী, অনিতা গুপ্ত, বিনতা রায়, আরতি মজুমদার, শিখারাগী বাগ, পূর্ণিমা দেবী, অমিতা দেবী, চন্দ্রা দেবী, মণিকা ঘোষ, রমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

এ বছর ধারা নতুন পরিচালকরূপে এ জগতে প্রবেশ করলেন তাঁদের নাম—শব্দ মিত্র ও অজিত মৈত্র, অমিত সেন, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বিভাপতি ঘোষ, অগ্রণী, সন্তোষ গুহরায় ও অমলেন্দু বসু।

অভিনয়শিল্পী সপ্রভা মুখোপাধ্যায়, সিধু গাঙ্গুলী, আশু বসু, সঙ্গীত পরিচালক অম্বুপম ঘটক এবং পরিচালক জ্ঞান মুখোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতি এ বছর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সাপ্তাহিক স্বাধিরের দিক দিয়ে এ বছর প্রথম স্থান লাভ করেছে কালিওয়াল ১৩ সপ্তাহ, দ্বিতীয়—একদিন রাতে ১১ সপ্তাহ এবং তৃতীয়—গ্রামলী ১০ সপ্তাহ।

পরিচালকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছবি উপহার দিয়েছেন যুগু বসু, চিত্ত বসু ও নীরেন লাহিড়ী (প্রত্যেকে তিনখানি করে)।

মোট ছবিগুলির মধ্যে সব চেয়ে বেশী ছবিতে ধারা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম তিন জন হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস (২৫) খানি, পাঁচাড়ী সাহাঙ্গাল, (২১ খানি) ও তুলসী চক্রবর্তী (১৯ খানি) এবং অভিনেত্রীদের মধ্যে মলিনা দেবী (১৬ খানি) সন্ধ্যারাগী ও সবিতা চট্টা (১৩ খানি) এবং চন্দ্রাবর্তী, পদ্মা দেবী ও আশা দেবী (১১ খানি)।

এ বছর পর্দার বৃক্কে বাথেকের তরে দেখা দিলেন যাদুসম্রাট পি-সি সরকার, বিখ্যাত শিল্পী রথীন মৈত্র, হলিউডের রবার্ট ক্যানিং ছাম ও আলোকচিত্রী বিভাস সোমকে।

এইবার আমরা এ বছরের ছবিগুলির নামোল্লেখ করে চিহ্ন দ্বারা তাঁদের শ্রেণী নির্ণয় করার চেষ্টা করে এই আলোচনা শেষ করি।

১। চিরকুমার সভা * * *	২৫। মা * *
২। পরাধীন * * *	২৬। নাগরদোলা * * *
৩। একটি রাত * * *	২৭। শুভলগ্ন * * *
৪। মহাকবি গিরিশচন্দ্র * * *	২৮। ঢাকা-আনা-পাট *
৫। অসমাপ্ত * * *	২৯। শিল্পী * *
৬। শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্ক * * *	৩০। ধূলার ধরণী * * *
৭। গ্রামলী * *	৩১। সিঁথির সিঁহুর * * *
৮। ত্রিযামা * *	৩২। চোর * *
৯। আশা * *	৩৩। আমার বোঁ * * *
১০। মামলার ফল * *	৩৪। নবজন্ম * *
১১। চলচল * *	৩৫। কালিওয়াল *
১২। পাপ ও পাপী * * *	৩৬। হারজিৎ * * *
১৩। মানবন্ধা * * *	৩৭। মধুমালতী * * *
১৪। রাজপথ * *	৩৮। শেষ পরিচয় *
১৫। একদিন রাতে * *	৩৯। বড়দিদি * *
১৬। স্বর্ঘ্যুখী * *	৪০। ঘুম * * *
১৭। ছায়া সঙ্গিনী * * *	৪১। বড় মা * * *
১৮। সাধক রামপ্রসাদ * *	৪২। সিঁহুর * *
১৯। গোবিন্দদাস * * *	৪৩। উদ্ধা * *
২০। মদনমোহন * * *	৪৪। রাত্রি শেষে * * *
২১। পুত্রবধু * *	৪৫। একতারা * * *
২২। অপরাহ্নিত * *	৪৬। অমর সাংগল * * *
২৩। যক্ষ * * *	৪৭। তাপসী * *
২৪। দানের মর্ষাদা * *	৪৮। আঁধারে আলো *

৪৯। পঞ্চতপা \*

**চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত**  
নৃত্যপটীয়সী অভিনেত্রী জয়ন্তী সেন

ঐরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমূল্যস্বত্বী সপ্তাহ চলছে। এ সপ্তাহে শিল্পীদের যোগাযোগ করা একটা দুঃসং বাপান! কিন্তু এদিকে মাসিক বহুমতীর চলচ্চিত্র সম্পর্কে মতামত লিখবার জন্য তাগিদ পাচ্ছি, কপি না দিলেই নয়। তাই এবারে ঠিক করলুম দক্ষিণ-কলকাতার কোন শিল্পীর কাছে না গিয়ে যথ্য কলকাতায় যে ক'জন শিল্পী থাকেন, তাঁদের সন্ধান করবো।

বর্তমান কালে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষিত পরিবারের যে কয়জন নৃত্যপটীয়নী অভিনেত্রী রূপালী পদ্মায় দেখা যায় তাদের মধ্যে শ্রীমতী জয়শ্রী সেন অতীততম। সাম্প্রতিক কালে মঞ্চ ও পর্দায় 'বাংলি' খ্যাতিলাভ করেছেন। নট্যরহস্যন গুপ্তর 'উদ্ধা' ছবিতে 'মাফিনের' ভূমিকায় অভিনয় করে ইনি সুনাম তে অর্জন করেছেনই, প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী বলেও সর্বত্র সমাদর লাভ করেছেন। এরই ভেতর একদিন সকালে শ্রীমতী জয়শ্রীর গৃহাভিযুগে বাত্মা করলুম। আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল। শ্রীমতী সেনের বাড়ী বুজ্জে পেতে একটু দেরী হয়ে গেল। দুটো দিন ভেবেছিলুম হয়তো শ্রীমতী সেনকে বাড়ীতে পাবো না। বাক, সরাসরি শ্রীমতী জয়শ্রীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম, উপরে উঠতেই সামনে দেখি শ্রীমতী জয়শ্রী সামান্য পোষাক পরিচয় করেছেন। আমার উদ্দেশ্যের কথা বলতেই একটু হেসে তাঁদের গুণি ক্রমে নিয়ে আমাকে বসালেন। তাঁর বসবার ঘরটিতে ঢুকেই মনে হ'লো সত্যিকারের শিল্পীর ঘর। চার দিকেই দেখতে পেলাম সাজান, সব কিছু সূক্ষ্মতার পরিচায়ক।

প্রাথমিক পরিচয় আদান-প্রদানের পরেই শুরু হলো আমাদের আলোচনা। শ্রীমতী জয়শ্রী বলতে থাকেন, ১৯৩৩ সালের 'আলাদীবে' আশুবা প্রদর্শন ছবিতে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। শ্রীবিজ্ঞ সেন এ ছবিখানি পরিচালনা করেন। তারপর অনেক ছবিতে ও বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে আসছি। যখন স্বভূমিকায় অভিনয় করেছি সে-ভূমিকাতেই আনন্দ পেয়েছি। তবে বিশেষ ভাবে যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো, নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত 'কাহ্নরী' ছবিতে ডালিয়ার ভূমিকায় এবং নরেশ মিত্র পরিচালিত 'উদ্ধা' ছবিতে মাফিনের অংশে অভিনয় করে তৃপ্তি পেয়েছি প্রচুর।

চলচ্চিত্র জগতে আপনায় যোগদানের কারণ কি এবং এ গানে আসতে প্রথম প্রেরণা আপনি কি ভাবে পান, জিজ্ঞেস করলুম আমি। শ্রীমতী জয়শ্রী সেন স্পষ্ট ভাষায় উত্তর করলেন, ছোটবেলা থেকেই অভিনয় ও নৃত্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঠিক ছিল। শুধু তাই নয়, শিশুকাল থেকে আমার স্বপ্ন ছিল হু হয়ে অভিনয় করবো, বড় হ'বো। ছোটবেলা গ্রামোফোনে গান ল সঙ্গে সঙ্গে আমি নাচতুম। আমার এই আগ্রহ দেখে আমার। আমাকে একটি গ্রামোফোন কিনে দিচ্ছিলেন। চলচ্চিত্রে ও ঙ্গ যোগদান করতে আমার মা আমাকে উৎসাহিত করেন। তিনি ট, গান ও অভিনয় ভালবাসেন। মায়ের উৎসাহ ও আগ্রহেই মি এ-সাইনে এসেছি, এ কথাটি বলতে আমার কোনই বিধা নেই। বর্তে আগ্রহপ্রকাশের পর আমার সামাজিক কি পারিবারিক বনে কোনই পরিবর্তন আসেনি, এটুকু স্পষ্ট ভাবেই আমি বলতে রি।

দৈনন্দিন কনস্টারী কথা জিজ্ঞেস করলে শ্রীমতী জয়শ্রী বললেন, বিবিত্ত ভ্রমণের মেয়েদের জীবন যে ভাবে কাটে আমার বলাতেও ব ব্যতিক্রম নাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে শিক্ষণীয় যে সকল বপুস্তক আছে তা পাঠ করি, তার পর নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম র। ব্যায়ামের শেষে চা করে আমি সকলকে পরিবেশন । ও বাবা, মা, ভাই, বোন সকলের সঙ্গে একত্র বসে চা- ার খাই। চায়ের পর শেষ হলে যেদিন স্নাটি থাকে না সেদিন

বায়াবাটার সাহায্য করি। দুপুর বেলা বই পড়ি। বিকেলে নাচ শিখতে বাই। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে সংসারের কান্দে সাহায্য করে থাকি। রাত্রিতে আবার পড়াশুনো করি। বাড়ীর মোহরা যে সকল কাজ করে আমিও সেগুলো করে থাকি প্রায় প্রত্যাহই। পুঁথি-পুস্তক পড়া সম্পর্কে ঐতিহাসিক গল্পের বই পড়তেই আমার ভাল লাগে। খেলাধুলোর মধ্যে ব্যাডমিটন খেলতে আমি ভালবাসি, তবে ফুটবল খেলা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। পত্র-পত্রিকার মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্র সিনেমা সন্ধ্যাস্ত পত্রিকাগুলি আমি নিয়মিত পাঠ করে থাকি। কবিতা লেখা আমার অভ্যাস আছে এবং মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকাগুলিতে উগা কিছু প্রকাশিতও হ'য়েছে।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো সামান্যিদে ধরণের পোষাকই আমার পছন্দ। আমি নিজে সাদা পোষাকই পছন্দ করি।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন, প্রশ্ন করলুম আমি।

শ্রীমতী জয়শ্রী সেন স্পষ্ট গলায় বললেন, চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে সচেতনতা, সূক্ষ্মতা, অভিনয়দক্ষতা, নাচগান ইত্যাদি জানা একান্ত প্রয়োজন। এর সাথে চাই উত্তম বাচনভঙ্গী। আর ভাল ছবি করতে হ'লে চাই ভাল গল্প বা কাহিনী, সূক্ষ্ম পরিচালক এবং তার সঙ্গে টিম ওয়ার্কটিও ভাল হওয়া চাই। আমার মতে শিক্ষামূলক ছবি তৈরী করতে হবে, যাতে সত্যিকারের সমাজের উন্নতি সাধিত হয়।

শিল্পীদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা ও শরীরের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যিক কি ?



শ্রীমতী জয়শ্রী সেন

শ্রীমতী জয়শ্রী দৃঢ় কর্তে উত্তর করলেন নিশ্চয়ই। বোধ হয় এর চাইতে বড় প্রয়োজন শিল্পীদের আর থাকতে পারে না। চলচ্চিত্রে বাঙ্গালী বিশেষ করে অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের আরও অধিক সংখ্যায় যোগদান করা উচিত। ভদ্র ও শিক্ষিত ঘরের ছেলেমেয়েরা এ লাইনে এলে এ শিল্পের আরও উন্নতি হবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। এ সম্পর্কে আরও একটি কথা বলতে চাই—বর্তমান যুগে চলচ্চিত্রের ক্ষমতা অপরিমিত। এঁর চাইতে শিক্ষার মাধ্যম ও প্রভাব আজকালের দিনে আর কিছুতে তেমন দেখা যায় না। সরকার এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন বা দিচ্ছেন। পুরোপুরি ভাবে সরকারী সাহায্য পেলে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে। অবশ্য এ কাষ চলতে থাকা নেই, আজ-কাল যে সকল ছবি তৈরী হচ্ছে সে ছবিগুলো সবই ভাল। দিন দিন আরও ভাল ছবি তৈরী হবে।

এ ভাবে আমার আলোচনা প্রায় শেষ পর্ধ্যায়ে এসে পৌঁছুলো। দেখলুম শ্রীমতী জয়শ্রীর এ শিল্পের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও শেখবার আগ্রহ প্রচুর। সত্যিকারের শিল্পীর যে সাধ নাই সেই সাধনাই করে চলেছেন ইনি। বয়সে নবীন হলেও এঁর চোঁটা, উত্তম ও নিষ্ঠা সত্যি প্রশংসনীয়। আমাদের আলোচনার মাধ্যমে

আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলুম তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠা এ শিল্পের প্রতি।

এ বারে আমি আমার শেষ প্রশ্নটি শ্রীমতী জয়শ্রীর কাছে তুলে ধরলুম—আপনার প্রথম জীবন কি ভাবে কাটে এবং ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে কাটাতে চান?

শ্রীমতী জয়শ্রী বলে চলেন, পূর্ব-বাঙ্গালার ঢাকা জেলার মাদিকগঞ্জে আমাদের পৈত্রিক বাড়ী কিন্তু ঢাকা সহরেই আমরা বাস করতুম। আমার বাবা ছিলেন ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক। ঢাকা কমরুল্লাহ বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে আমি পড়তুম এবং সেখান থেকেই আমি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিই। তার পর ১৯৫০ নাগে দাঙ্গার সময় আমরা কলকাতার চলে আসি এক রকম রিক্ত হস্তে বলতে পারেন। ১৯৫২ সালে আমি রেডিওতে যোগ দিই এবং অভিনয় করি। ঢাকায় থাকতেই আমি নাচ শিখি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিই। ঢাকাতে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে যোগদান করে শুনামণ্ড অর্জন করেছিলুম প্রচুর। ১৯৫৩ সালে চলচ্চিত্রে যোগ দিই এবং মঞ্চে যোগ দিই ১৯৫৪ সালে। ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না, তবে শিল্পী আমি, শিল্পের ভিতরে আত্মনিয়োগ করে সকলকে আনন্দ দিতে চাই। সত্যিকারের শিল্পী-জীবন যাপনই আমার একমাত্র কাম্য।

## কোনো এক বর্ষার রাত্রে

### অরুণাচল বনু

এখন হয়তো মেতেছে কোথাও অরণ্য :  
এই বর্ষার ধারা ঝরঝরে  
কোনো পাহাড়ের বাঁকা নির্যবে  
নেমেছে বজা, কলরোলে তার  
বাতির কানে সঙ্গীত বোনে ছল-ছল স্বর ;  
বনের চরণে দিগন্তময় বেজেছে নূপুর ।  
ভেজা-পাখি ভাগে কঠিন রাত্রি,  
চকিত হবিগী শরৎগণ হ'লো ; শিকারী বাঘের  
চোখে টিকতার কোথাও আশ্রয় ;  
মৌচাকে চপ তীর গুন-গুন,  
সাপের গোপনে বেদে ; স্তলধারা তাড়া করে বায়,  
কোথাও মহুরী পেরম তুলেছে ঝড়ের হাওয়ায়,  
অরণ্য সেলে, সেলে শ্রাম দেশ  
স্বপ্নের কেশ এলানো চ'চোখে বন-কঙ্কার—  
ভিজো-হাওয়া বেয়ে স্রবর আমার  
উড়ন্ত তাই,  
বুকে বর্ষার আরণ্য-স্বর :

পৃথিবীতে আন্ত আর কিছু নাই, আর কিছু নাই।

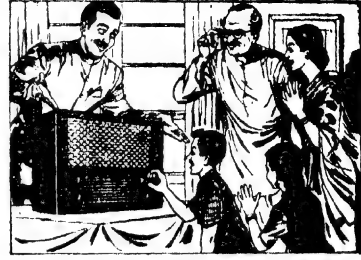


## আপনার বাড়ীর জন্যে সুন্দর একটি ন্যাশনাল-একো রেডিও কিনুন

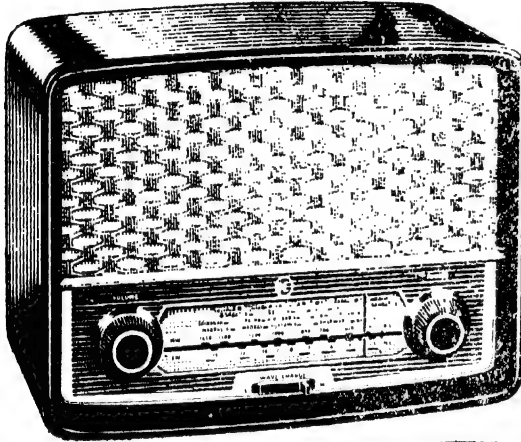
দেশের ঘরে ঘরে ন্যাশনাল-একো রেডিও গান-বাজনা ও  
আনন্দের ঢেউ এনে দিচ্ছে—আপনিও একটি ন্যাশনাল-  
একো রেডিও রেখে এই আনন্দের আসরে যোগ দিন।  
১৯৫ টাকা থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত পছন্দসই বারো  
রকমের মডেল আছে।

ন্যাশনাল-একো রেডিও

মনসুনাইজড

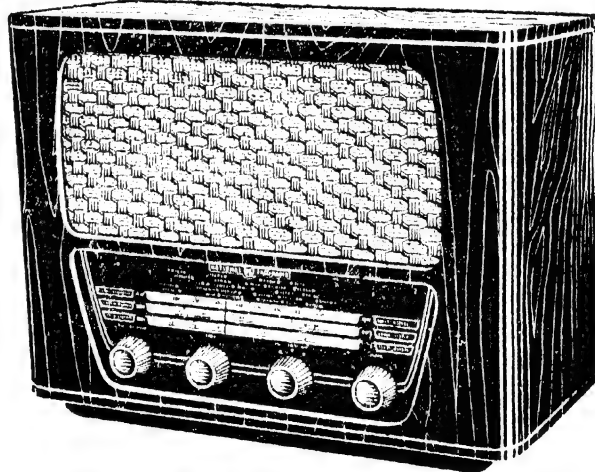


আজই ন্যাশনাল-একো বিক্রেতাকে বিনা ধরচার  
বাজিয়ে শোনাতে বলুন। এখানে সব লীট ঘাষ  
যেওয়া হলো—এর ওপর হানীর কর লাগবে।



মডেল ২৪১ : ৫ ভল্ট, এসি/ডিসি  
সেট। ৪ ভল্টের ডাই ব্যাটারী  
সেট। সমস্ত ওয়েভ ধরা যায়।  
দাম ১৯৫ টাকা

মডেল ২৭০/১ :—'নিউ কুমার'  
৫ ভল্ট, ৩ ব্যাণ্ড... পরিবর্তনযোগ্য  
টোন-কন্ট্রোল, বড় টিউনিং স্কেল,  
বড় ক্যাবিনেট। মডেল এ-২৭০/১  
এসি; মডেল ইউ-২৭০/১ এসি বা  
ডিসি। দাম ৩০০ টাকা।



GSA 4987(R)A



জেনারেল রেডিও এণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা - বোম্বাই - মাদ্রাজ - বঙ্গালোর - দিল্লী



হিন্দী—চলবে না

“সরকারী ভাবে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা না হইলেও বেসরকারী স্তরে রিপোর্টের সুপারিশের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে কিছুটা আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কমিশন ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হিন্দীকে ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষারূপে চালু করার সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু কমিশনের দুই জন সদস্য—ডাঃ পি সত্যনাথন এবং ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সুপারিশের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংরাজীকে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের পরও ভারতের সরকারী ভাষারূপে চালু রাখা উচিত। ভারতীয় সংবিধানে অবশ্য ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে চালু করার নির্দেশ ছিল—কিন্তু ডাঃ সত্যনাথন এবং ডাঃ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, প্রয়োজন হইলে সংবিধানের সংশোধন করিয়াও ইংরাজীকে সরকারী ভাষারূপে রাখা আবশ্যক। জোর করিয়া হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে চালু করার বিকল্পে শুধু দক্ষিণ-ভারতেরই নেকে, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি স্থানেও প্রবল বিক্ষোভ করিয়াছে। এই বিক্ষোভকে উপেক্ষা করিয়া কমিশনের সুপারিশ চালু করিবার চেষ্টা করিলে তিক্ততা ও বিভেদই বাড়িবে—এ সত্য ভারত সরকারের এখনো সময় থাকিতে উপলব্ধি করা উচিত।”

—দৈনিক বহুমতী।

সীমান্ত-সমস্যা

“সীমান্তবর্তী ভারতীয় এলাকায় পাকিস্তানী ছুরুগুনদের হামলা একরূপ হামেলা-সংঘটিত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। এমন দিন খুব কমই যায়—যে দিন খবরের কাগজ খুলিলে কোথাও না কোথাও দুই-একটি দস্যুতার সংবাদ চোখে না পড়ে। ১৩ই মে তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় ষ্টাক-রিপোর্টের প্রদত্ত পাকিস্তানী হামলার যে বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই ধরণের হইলেও নিম্নরূপ একটা বৈশিষ্ট্য বহন করে। বাঙ্গালী হইতে আগত একদল পাকিস্তানী ডাকাত মালদহ জেলার পরানগড় গ্রামে প্রবেশ করিয়া ঐ গ্রামেরই জৈন মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীতে হানা দেয়। উক্ত গৃহস্থটি ডাকাতদলকে লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইলে ডাকাতদল পলায়ন করে এবং পরদিন সকালে অশ্রু আর এক গ্রামের গাছতলায় দস্যুদলের দুইজন লোক ধরা পড়ে। বৃহৎ বাক্তদের মধ্যে একজন গুলীর আঘাতে আহত এবং অল্পকাল তাহার গুলিবারিত। তাহাদের

বীকারোক্তি হইতে জানা যায়, গ্রামের লোকদের সহিত ডাকাতদলের যোগাযোগ ছিল এবং কৌতুকপ্রদ আরও যে কথাটি জানা যায় তাহা হইল এই যে, আহত ডাকাতটি নাকি একজন এল এম এক ডাক্তার। অবাক কাণ্ড! একপাল লোকের মধ্যে সীলী লাগবি তো লাগ তাক করিয়া ডাক্তারের পায়ে। সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে শালাকে ধর—উপকথায় এই প্রবাদবাক্য এ ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল। এক কথা বলিতেই হইবে যে, পুলিশ দল এক্ষেত্রে বেঁড়ে এক আসামী পাকড়াইয়াছে। সামাজিক পদ-মর্যাদার বলে ডাকাত নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে গণ্য হইবার জন্ত দাবী জানাইবে।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা

মিথ্যা জেহাদ

“আল্লামা মামরিকিকে সতীয়া আবার গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে তিনি তাঁহার প্রস্তুত ‘কাশ্মীর অভিযানের’ তারিখ-ক্রমাগত বদলাইয়া উঠা সঙ্গিত রানিতেছেন দেখিয়া তাঁহারই দলের লোকেরা তাঁহাকে দল হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। কিন্তু আল্লামার অব্যবসায় অসাধারণ। তিনি নূতন ঘেঁষাসেবক সংগ্রহ করিয়া নূতন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে শিয়ালকোটের নিকটে তিনি সম্প্রতি তাঁহার ‘শিবির’ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, শিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি রেখা অতিক্রম করিয়া ‘সদেজে’ কাশ্মীরে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসী এবং স্বধর্মাবলম্বীরা তাঁহার এই পবিত্র জেহাদের মূল্য বুঝিল না। তাঁহার ‘শিবিরের’ পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের লোকেরা একদিন একযোগে আসিয়া আল্লামার ‘শিবির’ ভাঙ্গিয়া তখন চ. করিয়া দিয়াছে। অবশ্য আল্লামার ভক্তেরা নাকি আবার ‘শিবির’ রচনা করিয়াছে এবং জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচার প্রার্থনা করিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট এ বিষয়ে অগ্রসন্ধান ও বিচার করিবেন কি না সে প্রশ্ন পৃথক। কিন্তু প্রশ্ন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কাশ্মীর অভিযানের মত পবিত্র কার্যে আল্লামার দেশবাসীরা ও সমধর্মীরা সাহায্য না করিয়া বাধা দিতেছে কেন? পাকিস্তানের অনেক নেতাই তো কাশ্মীর দখলের জন্ত মাঝে মাঝে ‘জেহাদ’ ঘোষণা করেন। কেবল আল্লামার বেলায় ইহাতে দোষ কেন? স্বয়ং আল্লামা এ বিষয়ে কি বলেন?”

—যুগান্তর

সতর্কতার প্রয়োজন

“গত সপ্তাহে বেলডাঙ্গায় রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। বোমা তৈরীর যন্ত্রপাতি, ঢাকা মুসলীম জীণের রসিদ বই, দীঘায়তন পাকিস্তানী পতাকা, উত্তেজনাশূলক প্রচারপত্র, কাশ্মীর এবং মুসলিমাবাদ এক সঙ্গে আক্রমণ করার দিক্‌নির্দেশক পত্র বেলডাঙ্গা পুলিশ আধিকার কর্তে সক্ষম হয়েছে। এসম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে যে, পুলিশ সন্দেহভাজন যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছিলেন তাহা সবাই জামিনে মুক্ত আছেন। জামিনদারদের মধ্যে ধারা আছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিধান-সভার সদস্যও আছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, পশ্চিম-বাঙ্গালার বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এই সংবাদটি যেভাবে পরিবেশিত হওয়া উচিত ছিল তা মোটেই হয়নি, ফলে স্বাভাবিক এই ঘটনাটির গুরুত্ব অনেক পরিমাণে লুপ্ত হয়ে গেছে। বিগত নির্দৈনিককে উপলক্ষ্য করে এই রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

পনাত্তিক রাষ্ট্রে স্বাধীন ভাবে গোষ্ঠী গঠন করার অধিকার আছে বলেই নির্বাহীদের আগে আর সাময়িক কালে পুলিশের কড়া নজর পড়ে। সত্ত্বেও এই সব রাষ্ট্রবিরোধী কাণ্ডকলাপ কোথাও বাধা পায় না। এই অবকাশেই নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় ধীরে ধীরে একটি ক্রান্ত গড়ে উঠেছিল, আর এই ক্রান্ত বিঘট আর ব্যাপক আকার নেন্তে বেশী দেরী হয়নি। আমরা এ ঘটনার বহু আগেই সীমান্তবর্তী জেলায় রাষ্ট্রবিরোধী কাণ্ডকলাপের নানা ঘটনার কথা উল্লেখ দেখিলাম। সৌভাগ্যের কথা, নির্বাহীদের কয়েক মাস বাদেই আমাদের বক্তব্য যে মোটেই ভিত্তিহীন আর অমূলক ছিল না তা মাণিত হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বস্তবৃত্তে আরো জানতে পেরেছি, বেলডাঙ্গার অবস্থিত রাষ্ট্রবিরোধী কাণ্ডকলাপের পেছনে আরো মন অনেকের পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে যারা এই জেলার মাস্ত্র অঞ্চলে বসবাস করছেন। “চাঁদা দেবেন কেন, মুর্শিদাবাদ কিস্তানে খাওয়ার ভক্ত” এই প্রচার-পুস্তিকা ছড়িয়ে জেলার এক শেষ সম্প্রদায়ের জনসাধারণের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা না তোলা হয়েছে। যে সমস্ত রসিদ বই পুলিশের হাতে পৌঁছেছে, ই রসিদ বইয়ের সূত্র ধরে আরো অনেক অপপ্রচারকারী আর যন্ত্রকারীকে গ্রেপ্তার করা যায়, অথচ স্থানীয় পুলিশ বিভাগ এ পক্ষে এখনও সম্পূর্ণ নীরব আছেন। —জনমত (২৪ম্বর)

#### তীত সপ্তাহ উপলক্ষে

“গত এই মে হইতে ভারতবাসী তীত সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে। সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য হইতেছে তীত-জ্ঞাত বস্তুর বিক্রয় তথা ষক পরিমাণ ব্যবহারের প্রতি জন-সাধারণের মনকে আকৃষ্ট করা। ত বস্তুর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সরকারী প্রচেষ্টা আছে সত্য, কিন্তু সাধারণের সহযোগিতা ব্যতিরেকে ইহার প্রসার লাভ বনহে। জন-সাধারণ অধিক পরিমাণে তীত-জ্ঞাত বস্তু ব্যবহার হলে বহু বেকার এই শিল্পকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিবে, অর্থ উৎপাদনে য় হইবে এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক হইবে। বর্তমান য় তীত, জ্ঞাত বস্তুর খ্যাতি আছে, জেলার বাহিরে বাজার আছে, দ্রাও মথেষ্ট আছে। বর্তমানে যে ভাবে ইহা পরিচালিত তছে তাহা এই শিল্পকে জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবার পর্যাপ্ত নহে বলিয়া মনে করি। একটি দীর্ঘমেয়াদী কল্পনা গ্রহণ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে, বাজার সৃষ্টি ত হইবে এবং সেট সঙ্গে শিল্পচাতুর্য সমন্বিত বস্ত্রবয়ন দ্বারা ক্রেতা ষণ করিতে হইবে। অবশ্য ইহা সমবায়ের ভিত্তিতেই করিতে ।। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই সমবায় পদ্ধতি যেন তীত-দের স্বাধীন দান সমিতিতে পরিণত না হয়।” —বর্তমান বাণী।

#### লুণ্ঠন কেন?

“অল্পের কাড়াল, বস্তুর কাড়াল, শিল্পের কাড়াল, বাছুরের কাড়াল ঢক আজ যে ছয় বিদ্যার অবস্থায় দিন কাটাতে হইতেছে, (জ্ঞ) সরকার হইতে মোটা মোটা তুখা, ধান বাহন, প্রাসাদোপম ই ইত্যাদি বাহারা উপভোগের সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিতে পারিবেন না। এই ভারতকে হঠাৎ আমেরিকার ার্স সম্পদে সম্পন্ন করিবার খেয়ালে এক পঞ্চবার্ষিক লুণ্ঠন সহায়তা বাহারা করেন, তাঁহারা যে কেন জাতীয় অতিমানব এ দেশের কেহ চেনে না। আজ ইংরাজ রাজত্বের পরাধীনতাকে

এই স্বাধীনতা অপেক্ষা আরামদায়ক বলিয়া মনে করিতেছে। আজ দেশে যুদ্ধ নাই তবুও এই ধনরত্ন সংগ্রহের প্রবৃত্তি কেন? গোমতী-তীরে পতিত নরকপালের মত ভারতের তথা ভারতবাসীর “অপরখা কিং ভবিষ্যতি” ভাবিয়া দিশেহারা হইতে হয়।” —রূপীপুর সবাদ।

#### প্রাথমিক শিক্ষক

“পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের প্রাথমিক শিক্ষকগণ দারুণ দুর্দশার সম্মুখীন হইয়াছেন। বহু স্থানে বহু শিক্ষক নাকি নিয়মিত ভাবে বেতন পাইতেছেন না—বেতন পাইতে অথবা বহু বিলম্ব হইতেছে। ইহার সঠিক কারণ যে কি তাহা বুঝা যায় না। দুমুলা ভাতা বাবদ যে টাকা শিক্ষকগণ পাইয়া থাকেন, অনেক স্থানে তাহার কিছু অংশ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পাইয়াছেন বাকী অংশ এখনো তাঁহারা পান নাই। ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। জীবনব্যয়ের মান ক্রমশই উর্দ্ধমুখী হইতেছে। একেই তো প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকগণ স্বল্প বেতন পান—তাহার দ্বারা সংসারের সমস্ত প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয় না। তাহার উপর আবার যদি তাহা পাইতে অথবা বিলম্ব ঘটে তাহা হইলে তাঁহারা যে কিরূপ অসুবিধায় পড়েন, তাহা সহজেই অনুমেয়।”

—ভাগীরথী (কালনা)!

#### কংগ্রেস

“আজ কোথায় কংগ্রেস আর কোথায় দেশের মানুষ। মানুষ হইতে বহু দূরে সরিয়া যাওয়ায় কংগ্রেস আজ কেবল অর্থের উপর বনিয়াদ গড়িতেছে এবং ধনীদিগের কৃপা ও করুণার উপর নির্ভর করিয়া চালিত হইতেছে। কংগ্রেস-নেতার সঠিত জনগণের পরিচয় নাই এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও শোষণের কোন প্রত্যক্ষবর্তী তাহারা রাখেন না বা রাখিবার প্রয়োজন করে না। কারণ হয়ত এই যে তাহা রাখিয়া কোন লাভ নাই, এইজন্য তাহাদের করিবার কিছু নাই। দুর্নাতি, দুঃ, অশ্রায়, অবিচার, মিথ্যাচার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াও তাঁহারা কি করিতে পারেন ইহাষ্ট আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়। দরিদ্র দেশ ও নানা অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে দেশে দারিদ্র্য অতি দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। এই অবস্থায় সরকারী জাঁক জমক ও আড়ম্বর আরও বাড়িতেছে। লীনেহর তাঁহার পত্রে সরকারী জাঁকজমক আড়ম্বর, মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের লাল উর্দা-পরা চাপরাশী প্রভৃতির বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কংগ্রেসের জন সংযোগের অভাব এবং জনগণের সঠিত অল্পের মাধ্যমে ছাড়া সঞ্চ না থাকায় দেশে ধনী কংগ্রেস ও দরিদ্র জনসাধারণ এই দুইটি দল দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। বর্তমান কংগ্রেস পরিচালকগণ এই মহৎ কাৰ্য্যটি নিষ্ঠার সঠিত করিতেছেন এবং অস্ত্রাঙ্গ রাজনৈতিক দল তাহার সুযোগ লইয়া মানুষের স্বয়ং জুড়িয়া বসিয়াছে। ইহা কংগ্রেসের পক্ষে অতি অন্ত ও দেশের পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। লীনেহর তাঁহার সরকারী সহকর্মীদের সংঘত হইবার যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু বর্তমান কংগ্রেসের দুষ্টিভঙ্গি ও ইহার প্রধানদের ক্ষমতা কায়রতের মোহ দূর না হইলে সফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। লীনেহর প্রত্যেককেই সাবধান করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাতেও যদি মিথ্যা বাহু আড়ম্বর ও জাঁক জমক বন্ধ না হয় তবে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। টাকা একটা বিঘট শক্তি, ইহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু কেবল টাকার উপর ভরসা করিয়া ও তাহার দৃষ্টি দিয়া চলিয়া যাইতে

হটতে দেৱী হয় না। তাহাৰ কাৰণ এই যে, অস্বাভিচি ও নিঃস্বাৰ্থ ভাবে অৰ্ধ দান অতি অল্প লোকই কৰিহা থাকে। বাৰ্ষিকোদিত দানেৰ মধ্যমা দিতে প্ৰতিষ্ঠান বে দিন কতৃৰ হইয়া বাইবে সেদিন আকশোসেৰ আৰ সোমা থাকিবে না। ক্ৰীনেহেৰ বাহা বলিহাছেন তাগা মানিয়া চলিতে বাধ্য কৰিতে তিনি পাবেন কি না তাহা আমাৰ জানি না কিন্তু কৰ্ত্তাগণ ইহা যদি মানিয়া চলিতেন তবে ভাল ছাড়া মন্দ হইত না। আজ নেতাৰা আত্মবিলেখন কৰিলে বৃত্তিতে পাৰিতেন যে দেশ অপেক্ষা নেতাৰা উৰ্দ্ধে উঠিয়াছেন এবং দেশকে তাহাৰা নীচে টানিয়া নামাইতেছেন।” —ত্ৰিশ্ৰোতা (জলপাইগুড়ি)

### মিথ্যাৰ বাঁধ

“বাঁধেৰ পৰিকল্পনা কৰিয়াছেন কেন্দ্ৰীয় সরকারেৰ বজা নিৰোধ বিভাগ, বাঁধ নিৰ্মাণ কৰিয়াছেন ত্ৰিপুরা সরকারেৰ পুৰ্ত্ত বিভাগ। ইহাদেৰ কাহাৰও যেন বাঁধেৰ ব্যাপাৰে দায়িত্ব নাই। “বাঁধেৰ পৰিকল্পনা আমাদেৰ নয়” এই কথা বলিয়া পুৰ্ত্ত বিভাগ পাশ কাটাইহা যান, আৰ বাঁধ বাঁধেৰ পৰিকল্পনা কৰিয়াছে, “বাঁধ আমাৰ কৰি নাই” বলিয়া তাহাৰাও পাশ কাটাইহা বাইতে চান। “স্বৰণ কৰা বাইতে পাৰে যে, গত ছুন মাসেৰ বজাৰ শৰ এই দুই ডিপাৰ্টমেন্ট পৰস্পৰেৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিয়া জনসাধাৰণেৰ প্ৰতি দায়িত্ব এড়াইবাৰ চেষ্টা কৰিয়াছিল। আমাৰ এখন দেখিতেছি, জলেৰ দ্বাৰায় বাঁধ না টিকিলে গ্ৰামবাসীসহ আগৰভাৰা লোকেৰ কপালে অনেক দুৰ্দশা বহিয়াছে। বালু মাটি দিয়া বাঁধ নিৰ্মাণ কৰিয়া বজা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাকে মোটেই সমৰ্থন কৰা যায় না। যে ৰাজ্যে পাখৰ পাওয়া যায় না সেখানে কয়েক মাইল লম্বা একটা বিৰাট বাঁধ নিৰ্মাণেৰ সাহস কি ভাবে কৰা হয়, তাহাই ভাবিয়া পাওয়া যায় না। বাঁধ নিৰ্মাণ যদি প্ৰকৃতই অকৰী হইয়া পড়িয়াছিল তবে আৰও অধিক পৰিমাণ অৰ্ধব্যয় কৰিয়াই ভাল ভাবে বাঁধ নিৰ্মাণ কৰা বিধেয় ছিল। তাহা হইলে সত্তেৰ লক্ষ টাকাও একটা সংকাৰ্থে ব্যয় হইয়াছে বলিয়া মনকে প্ৰবোধ দেওয়া বাইত। সাধাৰণ বৃত্তিতে ইহাই মনে হয় যে, ভৱ বাঁধেৰ জলশ্ৰোত অপেক্ষা কয়েক ঘণ্টাৰ জন্ত সহস্বেৰ উপৰ এক হাঁটু পৰিমাণ জল অনেক ভাল ছিল। বাঁধটি যদি প্ৰকৃতই জনসাধাৰণেৰ ক্লেশেৰ কাৰণ হইয়া থাকে তবে ইহাকে সময় থাকিতে ভাঙ্গিয়া দেওয়াই কৰ্ত্তব্য। ইহাতে অল্প অৰ্ধকতিৰ আশঙ্কা আছে। থয়ৱাতী সাহায্যেৰ তুলনাৰ এই অৰ্ধকতি নিশ্চয়ই অনেক অল্প হইবে। সাধু সাবধান।” —সেবক (আপৰতলা)।

### জেলা-পাঠাগাৰ

“জেলা-পাঠাগাৰ সম্বন্ধে আমাৰ ইতিপূৰ্বে একাধিক প্ৰবন্ধ লিখিয়াছি। দুইটি জেলা-পাঠাগাৰেৰ অৰন্তম মেদিনীপুৰ সহস্বেৰ পাঠাগাৰেৰ জন্ত চোটা বছ পূৰ্বে হইতেই হইতেছে, সরকারী অৰ্ধও বহুদিন ৰিজাৰ্ড ব্যাঙ্ক আসিয়া আবদ্ধ হইয়া আছে কিন্তু বোড়ার পূৰ্বে চাবুক আসিয়াছে মাত্ৰ—একজন গ্ৰন্থাগাৰিক নিযুক্ত হইয়াছেন, জামানান গ্ৰন্থাগাৰেৰ জন্ত একখানি বড় মোটৰভ্যানও ক্ৰয় কৰা হইয়াছে। তমলুক অৰন্তম জেলা-পাঠাগাৰটিৰ জন্ত বখন দ্ৰিতল

গৃহেৰ উৰোধন উৎসব হইতে বাইতেছে, এখানে এখন ৰাজনায়াৰণ বৃত্তি-পাঠাগাৰ বনাম জেলা-পাঠাগাৰ কৰ্ত্তৃপক্ষ বাদাৰ্হবাবে বুধা সময় ব্যয় কৰিতেছেন। কাহাৰ দাবী ৰায়সম্মত সে প্ৰেছ হইয়া আমাৰ এখন আলোচনা কৰিতেছি না—আমরা শুধু এইটুকু বহিতে চাই যে, জনস্বার্থেৰ দিক হইতে বিচাৰ কৰিয়া পাঠাগাৰ-ভাৰণী সহ্য নিশ্চিত হওয়া প্ৰয়োজন।” —মেদিনীপুৰ হইতৰী।

### আৰ কত দেৱী

“সহস্বেৰ এবং গ্ৰাম্যাকল সমুখে বাম-চাউল ও শাকসজীৰ মূল্য প্ৰতিনিয়তই বৰ্ধিত হইতেছে। আশা কৰা গিৰাছিল থান-চালেৰ মূল্য কিছু হ্ৰাস পাইবে—বিস্তৃ হইল না। শুধু মাত্ৰ সহস্বেই নহে। গ্ৰাম্যাকল সমুহ হটতে প্ৰাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে বহু স্থানেই নিতা প্ৰয়োজনীয় প্ৰব্যাদিয় মূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধিহেতু অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে এবং অবস্থা আৰও বেগী শোচনীয় হইয়া উঠিবে আশঙ্কেৰ কিছু নাই। ইতিপূৰ্বে আমাৰ সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰিয়াছিলাম এবং অল্প মূল্যে চাউল সবৰাহেৰ দোকানেৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও বলিয়াছিলাম সম্প্ৰতি ফালাকাটা অঞ্চলে নিম্নাৰুণ ৰাত্তসমস্যা দেখা দিয়াছে বলি প্ৰকাশ। অবিলম্বে যদি সরকারী কণ্ঠতৎপৰতাৰ প্ৰকাশ না যাে তাহা হইলে বাস্তবিকই অবস্থা আৰও বেগী নিখুঁত হইয়া উঠিবে অবিলম্বে প্ৰয়োজনীয় চাউল সবৰাহেৰ বাবস্থা কৰা আন্তৰ্জাতিক টেট ৰিলিফেৰও প্ৰয়োজনীয়তা অস্বত্ব হইতেছে।”

—বাৰ্তা (জলপাইগুড়ি)

### শোক-সংবাদ

#### জগদীশ গুপ্ত

সাহিত্যিক কবি জগদীশ গুপ্ত গত ২২ বৈশাখ কিছু ক’ যোগভোগাঙ্কে ৭১ বছৰ বয়সে দেহত্যাগ কৰেছেন। জীবনেৰ এব সুদীৰ্ঘ অংশ সাহিত্যসেবাৰ ইনি অতিবাহিত কৰে বাস্তৱ। সাহিত্য নানা ভাবে গৌৰবাৰিত কৰে গেছেন। সাৱল্য ও আন্তৰিকতা ই তাঁৰ লেখনীৰ বৈশিষ্ট্য। তাঁৰ লেখা বহু উপন্যাস গল্পগ্ৰন্থগুলিৰ মা বৰ্ত্তি ও বিবৰ্ত্তি, শ্ৰীমতী, অসামু, সিদ্ধাৰ্থ, স্মৃতিনী, মেঘাবৃত্ত অশা মল্লিক ও মল্লিকা, লঘুগল্প, নয়ানল প্ৰভৃতিৰ নাম উল্লেখযোগ্য দাঙ্গিক বসুমতীৰ সজেও এৰ নীৰ্বিনেৰ যোগাযোগ ছিল।

### ডাঃ হেমচন্দ্ৰ ৰায়চৌধুৰী

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ প্ৰো ভায়তীয় ইতিহাস সংস্কৃতিৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক ডাঃ হেমচন্দ্ৰ ৰায়চৌ গত ২১এ বৈশাখ ৬৬ বছৰ বয়সে লোকাঙ্কুৰিত হয়েছ জাত্ৰজীবন এৰ চিবকাল গৌৰবে ভাস্বৰ ছিল। ইনি ১৯৫০ নাগপুৰে অনুষ্ঠিত নিখিল ভাৰত ইতিহাস-কংগ্ৰেছেৰ অধিবেশনে সভাপতিৰ আসন অলঙ্কৃত কৰেছিলেন। ইনি প্ৰেসিডেন্সী কলে অধ্যাপনা কৰেছিলেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ ইতিহাস বিভাগে প্ৰধান অধ্যাপকেৰ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।



গিনিগোল্ড জুয়েলারি স্টেশনারি



মৌলিকতায়  
নির্ভরতায়  
আধুনিকতায়

**এম.বি. সরকার এও সন্স**

ফোন:- ৩৪-১৭৬১ **জুয়েলারি** গ্রাম-টিলিয়াটস

১৬৭/সি ১৬৭/সি/১ মহাবাজার স্ট্রীট কলিকতা ১২

গ্রাণ্ড- বালি গল-২০০/২/সি রাসবিহারী এডিনিউ. কলিকতা-২১

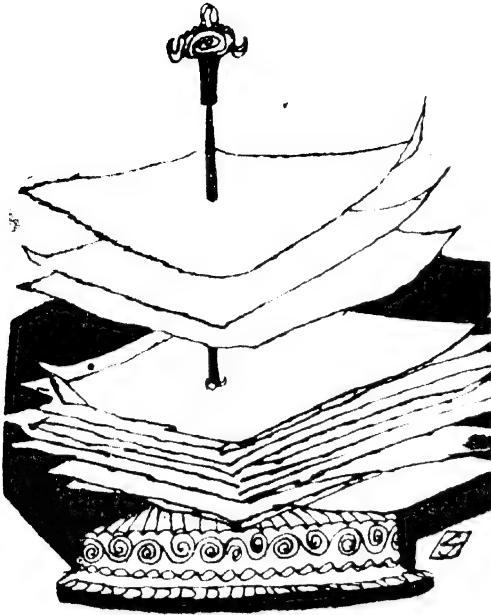
স্বাক্ষরের পুর্বাতন চিহ্নমা

১২৪, ১২৪/১, মহাবাজার স্ট্রীট, কলিকতা ১২

কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

নতুন ব্রান্ড শোরুম- ডায়মেন্ডপুর. ফোন: ডায়মেন্ডপুর-৮৫৮

## পাঠক-পাঠিকার চিঠি



তরু দস্তুর প্রতিভা

শৌর সংখ্যার পত্রিকায় তরু দস্ত সম্পর্কে সম্পাদকের মন্তব্যে আপনায় দেখা মন্তব্যটি উপক্লাসের প্রথমে সত্যি বড় স্মৃতির লাগল। বুধলায়, কোথাও থেকে বই জোগাড় করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বিখ্যাত মনীষী শ্রীমণিবিকাশ গুপ্ত বলছিলেন যে, বইটি নিশ্চয়ই অতি চম্পাণ্য গ্রন্থের সঙ্গতম। শ্রীধরবিশ্ব ১৮১৩ সাল নাগাদ যখন ভারত প্রত্যাবর্তন করেন সেই সময় বোম্বাইয়ের একটি পত্রিকায় 'বন্ধিমচন্দ্র' শীর্ষক ধারাবাহিক একটি প্রবন্ধ লেখেন। পুস্তকাকারে সেটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক থেকে তরু দস্ত সম্বন্ধে একটি যত্নসহ আপনাকে পাঠ্যসামগ্রী: এত বড় কথা শ্রীধরবিশ্ব তরু দস্ত সম্বন্ধে লিখেছিলেন,—ভাস যদি বোঝেন, এটির সদ্যবহার করতে পারেন।—“অসাধারণ এক তাকবার প্রতিভা নিয়ে জন্মালেন তরু দস্ত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশী ভাষার উপর দিয়েই সে প্রতিভার অধরা। অসাধারণ কণ্ঠে একালে তিনি অল্প বয়সেই মারা গেলেন। তিনিও শিখছিলেন গ্রীক ভাষা। ইংরেজী ভাষাতে তিনি খুবই চমৎকার লিখতেন, কিন্তু ফরাসীতেও তাঁর কম দক্ষতা ছিল না। তাঁর দেখা ফরাসী নভেল ওট সেলের সেকেরা খুব আদরের সঙ্গে পড়ত, আর তাঁর লেখা অপরূপ ফরাসী সঙ্গীত তখন জার্মানীর বিরুদ্ধে ফরাসী জাতির মনে উদ্দীপনা জোগাত। এঁদের প্রত্যেকেই প্রচুর পড়াশোনার বিষয়ে যেমন এতটা অসাধারণ ছিল, এঁদের জীবন বাপার সবাকও ছিল তাই। বাক বলে মস্ত বহরের মানুষ, এঁরা হিসেব ঠিক তাই—বা কিছু করতেন সবই বেশি বেশি মাত্রায়। এঁরা লিখেছেনও বহু বেশি, লিখেছেনও শুভ বেশি...” [শ্রীধরবিশ্বের 'বন্ধিমচন্দ্র' পুস্তক থেকে]—পৃথিবীনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীধরবিশ্ব আশ্রয়। পতিচরী।

## চার জন প্রসঙ্গে

আমি আপনাদের পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। গত কানুন (১০৬৩) সংখ্যার পত্রিকায় “চার জন” পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানী ডাঃ তরুণ সিংহ সম্পর্কে কয়েকটি ভুল তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে লক্ষ্য করলাম। প্রথমত, লুধিনী মানসিক হাসপাতাল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলা হয়েছে: “ডাঃ সিংহের পরিচয়না অমুখ্যায়ী ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো লুধিনী মানসিক হাসপাতাল।” আপনাদের অবগতির জগ্রে জানাই, লুধিনী মানসিক হাসপাতাল ১৯৫০ সালের বহুপূর্বেই ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হিসাবে ১৯৪৭-৪৯ সালে লুধিনী হাসপাতালে নিয়মিত যাওয়ার আমার স্মরণও হয়েছিলো। দ্বিতীয়ত, তিনি এই হাসপাতালের ‘অবিকর্তা’ বলে বর্ণিত হয়েছেন। ‘অবিকর্তা’ কথাটি বিশেষ পরিভাষা নয়, উনি ওখানকার সুপারিনটেন্ডেন্ট, ওখানকার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুরেন্দ্র মিত্র। পরবর্তী সংখ্যায় এই ভুলগুলি সংশোধিত হলে সুখী হ’বো। এ জাতীয় প্রমাদ সাধারণ পাঠকদের বিভ্রান্ত করে।—মায়া দেবী ৪ সুরাবদী এভিনিউ, কলিকাতা-১৭।

## পত্রিকা সমালোচনা

সুদীর্ঘ কাল ধরে আমি মাসিক বসুমতীর প্রাচীন। তবে কি জানি কেন, গত কয়েক বছর ধরে বসুমতী যেন আমার কাছে অতুলনীয় বলে প্রতিভাত হচ্ছে। আরও তো অনসংখ্য পত্র-পত্রিকা আছে কিন্তু বসুমতীর নাপাল ধরতেও তাদের অনেক দেরী। আপনারা ঠিকই বলেছেন—রাঁচী থেকে করাচী, রাণী থেকে কোরাণী সকল দরবারেই বসুমতীর সমান গতিবিধি, এক এক সংখ্যায় সাত আটখানি উপহাস বসুমতী উপহার দিয়েছেন। কত অজানা অচেনা ব্যক্তিকে অন্ধকার থেকে তুলে এনে তাঁদের প্রত্যেককে যত প্রতিভা প্রকাশ করার সুযোগ দিয়ে তাঁদের করেছেন আলোর রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। বসুমতীই ধরতে গেলে প্রতি মাসে পাঁচটি চ’টি করে নতুন নতুন লেখক উপহার দিয়ে আসছে। আপনাদের খালি একটি অমুখ্যায়ী কবি, সেট দিকে কৃপা করে দুইগুন করলে বাড়িতা হত। তার কারণ, যে কাগজে বর্তমানে বসুমতী ছাপা হচ্ছে তা মোটেই লাভ করে না স্থায়িত্ব। কিছুকাল গত হলেই তা বিবর্ণ হবে যায়।

শ্রীমতী শাস্তা বসুর বচনা আমার বেশ লাগছে, বেশ একটা আকর্ষণীয় পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর বচনার মাধ্যমে আন্তঃভাবের পকতপা ও বারোজনাতের চায়না-টাইমও আনন্দ দিচ্ছে

আপনার সম্পাদনা বাঙালি তথা ভারতের সম্পাদক মহলা: একটি বিষয়বস্তুর উদাহরণ বলে গণ্য হবে। ইতি সুপ্রিয় বোম্বাল জামসেৎপুর।

অনেক দিন ধরে আমি মাসিক বসুমতী পড়ে আসছি, লক্ষ্য করছি যে, এখন পাঠক-সাধারণ পত্রিকা সম্পর্কে মত প্রকাশ করছেন সেই দেখে আপনাকে পত্রিকা সম্পর্কে আমার মত জানাবার সাহা: সংগ্রহ করছি।

বসুমতীর প্রত্যেকটি বিভাগ যথেষ্ট পরিমাণ কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদিত হচ্ছে, এক কথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। অচিন্ত্যকুমারে পরমপুত্র শ্রীশ্রীমকুজ দীর্ঘকাল ধরে পাঠকচিত্তে জুগিয়ে গেছে অখ্যাত্য ভাবের প্রাবল্য। একটি নিবেদন শৈলভানন্দ সম্বন্ধে যখন হচ্ছে তিনি লেখেন, যখন ইচ্ছে তিনি বন্ধ করেন (অন্তঃ সাধারণ পাঠক-হিসাবে বা দেখতে পাচ্ছি) এর অর্থ কি? তাঁর লে

আমাদের ঘাবাই আছে। ভালো লাগে, কিন্তু আমাদের সেই মাস্তিক “ভাস-সাগা”কে নিয়ে শৈশবজন্ম আজ যে ছেলেখেলা বেগুনে, এর কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থই আমার জানা নেই।

মানুষ বসু মহাশয়ের বচনাগ্নি অনেকটাই তৃপ্তিলাভ করবেন। বেশ কবরবে লেখা হচ্ছে শাস্ত্রা বসু ও পৃথীন মুখোপাধ্যায়ের।

দয়া করে জানাবেন কি উদয়ভানু ও নীলকণ্ঠের প্রকৃত নামটি কি?

বসুমতীর একটি বিশেষত্ব বড়ই আনন্দ দেয় সেটি হচ্ছে যে, বসুমতীতে যত বকম বিভাগ আছে এত বকম বিভাগ বোধ হয় অন্য কোন পত্রিকাতেই নেই। সমাজের সকল স্তরেই আপনারা লাভ করেছেন অকুণ্ঠ সমাদর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকেই বসুমতীর মধ্যে খুঁজে পাবেন তাঁদের নিজেদের মনের খোরাক।

চরজন, রঙ্গপট, সাহিত্য-পরিচয় নাট্যগান-বাঁচনা, কেনাকাটা, খেলাধুলা, ইত্যাদি ইত্যাদি আরও যে সকল বিভাগ আছে, প্রত্যেকটিই যথেষ্ট পরিমাণে স্বরসগ্রাহী এবং তাৎপর্যপূর্ণ।—শোভনলাল গায়চৌধুরী ও বিনতা রায়, এলাহাবাদ।

সুন্দর সাহিত্য সস্ত্রী পরিবেশনে আপনি সতিহি অতুলনীয়! জয়সদায় তামরা খুব জালো লাগছে। ধন্যবাদ আপনাকে। অশোক রায়। ১১, মশজিদবাড়ী ট্রী, কলিকাতা-৬।

কালের গতি অতিক্রম করে যাচ্ছে, সমগ্র বিশ্ব উজ্জলিত ঢেউ এর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে তার রূপরূপ সৌন্দর্যে, সৃষ্টিকর্তার শিল্প কাকাক্য অতীব সন্দর, তেমনি “মাসিক বসুমতী” দিনের পর আমাদের সামনে ধরা পড়েছে এক যৌবন-সৌন্দর্যময়ীর কল্যাণ রূপ। পাতায় পাতায় ভরে যাচ্ছে সংলেখকদের প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। প্রসঙ্গ্য মাথানত করি ও দুঃ হতে জানাই প্রণাম সকল লেখকগোষ্ঠীকে, আর সম্পাদককে জানাই আমার প্রসঙ্গ্য প্রণাম।

“তামরা” উপন্যাস খুব ভালো লাগছে। বারীজনাথ দাসের “চায়না টাউন” এক অভিনব ধরণের লেখা, “পঞ্চতপা” ও “অজ্ঞ ও প্রত্যাহ” এর লেখককে আমার শুভেচ্ছা। অভিনন্দন জানাবেন, “অজ্ঞ ও প্রত্যাহ” পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে যাই। মনে হয় লেখক যেন সব সময় ষ্ট্রিটের চার পাশে ঘোরাঘুরি করেন। বিদেশী সাহিত্য অনুবাদ আরও বেশী করে প্রকাশ করলে ভালো হয়। মাসিক বসুমতীর দীর্ঘজীবন কামনা করি। ইতি—শ্রীমদন সরকার। শিল্পভূষণ ঘোষ লেন। মাহেশ, শ্রীহরমপুর।

এখন কখন আপনি আমাদের “সুভ নববর্ষের” মাস্তিক বসুমতীর ও অভিনন্দন এবং আপনার মধ্য দিয়ে সকল পাঠক-পাঠিকাদের জানাই আমাদের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। আমরা আপনার হৃদয় প্রচলিত পত্রিকা “মাসিক বসুমতীর” নিয়মিত পাঠিকা, এর প্রতিটি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, পত্রশুভ, আমাদের খুব ভাল লাগে, এর অন্ততম আশ্রয় “চায়না টাউন”। এই চায়না টাউনের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পাঠ দেশের কত জাননী-গুণীদের জীবনী-চিত্র। আমরা ই চায়না টাউন দেশের কোন বিহীন মহিলাদের জীবনী দেখতে চাই। অনেক দিন “মাসিক বসুমতীর” পাতায় আপনার কোন লেখা খতে পাচ্ছি না কেন? আমরা এর দীর্ঘজীবন কামনা করি ও নে দিনে আরও সুন্দর ও উজ্জলতর হোয়ে উঠুক মাসিক বসুমতী। সঁদা ঘোষ ও গায়ত্রী দত্ত। শিল্পভূষণ ঘোষ লেন, মাহেশ।

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Kindly receive Rs 15/- as subscription of “Masik Basumati.” Pritikona Sengupta C/o Santilal Sengupta, Manager, Surma valley Sand Mills. Cachar.

১৩৬৪ সালের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বারদ ১৫ টাকা পাঠালাম। বসুমতী পত্রিকার উন্নতি কামনা করি, মহাশয়ের দাশরু P. O. Titabar, Assam.

১৩৬৪ সালের মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পানহো টাকা পাঠাইলাম। Madhuri Mookherjee, 41/19 Hauzkhur Enclave, New Delhi-16.

১৩৬৪ সালের চাঁদা পাঠালাম। Renu Dasgupta 3/17/331 H. Mal Dahia Varanasi Cantt.

Sending Rs 750 for the subscription from Baisakh to Aswin. Parbati Sen, 111A/304 Ashoknagar. U. P.

মাসিক বসুমতীর স্তম্ভ ষাণ্মাসিক মূল্য পাঠাইলাম। শ্রীমতী প্রভাবতী মুখোপাধ্যায় C/o Professor N. N. Mookherjee 6220 Rakalgunj Road. Agra, U. P.

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের (বৈশাখ-চৈত্র ১৩৬৪) চাঁদা ১৫ টাকা পাঠালাম। বৈশাখ মাসখা কবিলে পাঠিয়ে। শ্রীমতী মমতা বকশী। C/o Dr. B. K. Bakshi Forest Research Institute Dehra Dun,

আমি ৪.৫১১ (M) নং গ্রাহিকা। আজ আমার বার্ষিক চাঁদা ১৫ টাকা পাঠাইলাম। শ্রীমতী ইরা ঘোষ। পো: সাহেবগঞ্জ, (এস, পি) দুমকা।

১৩৬৪ সালের গ্রাহকমূল্য স্বরূপ ১৫ টাকা পাঠালাম। নিয়মিত বসুমতী পাঠাবেন। কৃষ্ণ সায়াল। গ্রা: নং M 41229 C/o, Sri R. K. Sanyal, Executive Engineer Hydro Electric Dvn. Gorakhpur.

সামনের বছরের চাঁদা ১৫ টাকা পাঠাইলাম। শান্তি বসু। 36 Havelock Rd. Lucknow U. P.

ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম। কাল্পন ১৩৬৪ হইতে প্রাপ্ত ১৩৬৪ পর্যন্ত। মঞ্জুরী সেনগুপ্ত। C/o. Sree B. Sen Gupta, A. C. Station. Jodhpur, Rajasthan

Sending herewith my Annual subscription for Monthly Basumati Magazine. Sm. Hiran Kumari Mitta, 49, Leader Road, Allahabad.

A sum of Rs. 15/- only is remitted herewith on a/c full payment of Annual subscription of Masik Basumati. Please acknowledge receipt and send the M. Basumati regularly.—Bela Paul. C/o G. G. Paul. Accountant in B. N. Assam Rifles, Imphal, Manipur State.

Remitted herewith Rupees Seven and annas eight only as half yearly subscription of Masik Basumati. Please enlist my name.—Manashi Sinha, Mor Hospital, Nawalgarh, Rajasthan,

## অমল হোম শ্রীমত

পরিবর্তিত সংশোধিত ও চিত্রসংযোজিত দ্বিতীয় সংস্করণ

# পু রু ষো ত ম র বী ন্দ না থ

পুষ্কোত্তম রবীন্দ্রনাথ অবতার নন্দ—মহুযশের অনন্তসাধারণ প্রকাশ, মনবতার প্রথম প্রতীক। সে-মানব জতি মানব নয়, প্রাকৃতচিত্তগারী অতীতিক-কর্ম। পুষ্ক নন্দ, রূপ-বস-গন্ধ-স্পর্শ-সকাতর বৈরাগী নয়—এই ধর্মীর দুটোটি-উৎসবে ধূলিলিপ্ত বাস মাগুসের পাশে-দাঁড়ানো মানুষ—ওপোশে কে অবিচলিত, বর্ত্তো ট্রিটি, নিশা আঘাতে আত্মত, প্রোম দৈশু পরিপূর্ণ মানুষ রবীন্দ্রনাথ। 'পুষ্কোত্তম রবীন্দ্রনাথ'-এ অমল হোম কবির সেই পরিচয় দিয়েছেন। আর পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অপূর্ণ দেশাত্মবাদের সর্বো প্রকাশের—জাতিতান্ডালকাণ্ড হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁর নাটক, বাগ উপলক্ষে। কবির তিনখানি অপ্রকাশিত প্রতিতিসহ বহু চিঠিপত্র ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। দাম : টাকা ২'৭৫।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

Stories from Modern Bengal

## কাব্য-সঞ্চয়ন

## BROKEN BREAD

Translated into English by Mrs LILA RAY with an introduction by Dr. Daniel H. H. Ingalls, Chairman, Department of Sanskrit and Indian studies, Harvard University, U.S.A. and Editor, Harvard Oriental series Price Rs. 7-00

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সুবোধ ঘোষ	বুদ্ধদেব বসু
পথের দাবী ( উপন্যাস ) ৬'০০	খির বিজুরী ৩'০০	শেষ পাণ্ডুলিপি ( উপন্যাস ) ৩'২৫
পরিণীতা ( নাটক ) ১'৫০	জতুগৃহ ৩'৫০	ফসিল ২'৫০
পরশুরাম	গল্পোক্তা ( উপন্যাস ) ৪'০০	বোরোমাসের ছড়া (কবিতা) ৩'০০
নীলতারা ইত্যাদি গল্প ৩'০০	বিমল মিত্র	শ্রুতেন্দ্রনাথ মিত্র
গড়ালিকা ২'৫০	অন্তরূপ ( উপন্যাস ) ৫'৫০	অদৃশ্য ইঙ্গিত ( উপন্যাস ) ৪'০০
কঙ্কণী ২'৫০	মৃত্যুহীন প্রাণ ( উপন্যাস ) ১'৫০	সত্যীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প ২'৫০	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	জঙ্গলে ( উপন্যাস ) ৩'০০
মুন্ডরীমায়্যা ইত্যাদি গল্প ৩'০০	টনসিল ( নাটক ) ১'৫০	অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ও
রাজশেখর বসু	গণশার বিয়ে ( ) ১'৫০	প্রেমেন্দ্র মিত্র
মহাভারত ১০'০০	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	বিসর্পিল ( উপন্যাস ) ৩'০০
রামায়ণ ৬'৫০	আটগতিহাসিক ২'৫০	ছমাযুগ কবির
চলন্তিকা ( অভিধান ) ৬'৫০	দাপক চৌধুরী	সান্থী ( কবিতা ) ১'৫০
অন্নদাশঙ্কর রায়	কুমারী কল্যা ( উপন্যাস ) ৫'০০	অপ্সাধ ( কবিতা ) ২'০০
সাহিত্যে সঙ্কট ২'০০	শাখাবিষ ( উপন্যাস ) ৫'৫০	সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত
কামিনী-কাক্ষন ৩'০০	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	দূরান্তিক ( কবিতা ) ২'০০
পথে প্রবাসে ৩'৫০	এই মতভূমি ( উপন্যাস ) ৩'৫০	হরপ্রসাদ মিত্র
অসমাপিকা ( উপন্যাস ) ৩'০০	সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত	তিমিরাভিসার ( কবিতা ) ১'৫০
	কথাগুচ্ছ ( গল্প সংকলন ) ৭'০০	বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত
		আধুনিক বাংলা কবিতা ( সংকলন ) ৫'৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলিকাতা ১২





সক বসুমতী  
জা. ১০৬৪ ॥

(১৯৩৬)

বেলা শেষে  
—শ্রীমনি সিং অঙ্কিত





৩৬শ বর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪]

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

[ প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

## কথামৃত

### গুরু কি ?

“যিনি তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত-ভবিষ্যৎ বলিয়া দিয়াছিলেন।

যিনি এই সংসার-মায়ায় পায়ে লইয়া যান, যিনি কুপা করিয়া সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই বথার্থ গুরু। আগে শিষ্যেরা ‘সমিৎপাণি’ হইয়া গুরুর আশ্রমে গমন করিত। গুরু অধিকারী বলিয়া বুঝিলে তাকে দীক্ষিত করিয়া বেদপাঠ করাইতেন।

শাস্ত্রে বলে, বাঁহারা অধীতবেদবেদান্ত, বাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, বাঁহারা অপরকে অভয়ের পারে লইয়া বাইতে সম্। তাঁহারা ই বথার্থ গুরু ; তাঁহাদের পাইলেই দীক্ষিত হইবে—“নাত্র কার্যবিচারণা।” এখন উহা কেমন ঠাড়াইয়াছে জান ?—“অন্ধেনৈব নীচমানা বথাক্তাঃ।”

আত্মা কেবল অপর আত্মা হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, আর কিছু হইতেই নহে। সারা জীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি, খবর একজন বুদ্ধিজীবী হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু শেষে দেখি,

আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিও থুব হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই আধ্যাত্মিক বাক্যবিন্যাসে অল্পত নৈপুণ্য থাকিলেও কার্যের সময়—প্রকৃত ধর্মভাবে জীবনযাপন করিবার সময়—কেন এত ন্যূনতা লক্ষিত হয়, তাহার কারণ গ্রন্থযাশি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে, অপর এক আত্মার শক্তিসংকার আবশ্যক।

যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মার শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে গুরু বলে ; এবং যে ব্যক্তির আত্মার শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে শিষ্য বলে। এইরূপ শক্তিসংকার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক। আর বাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও স্রুষ্টি থাকা আবশ্যক। যেখানে এই উভয়টিই বিচরমান, সেইখানেই প্রকৃত ধর্মের অপূর্ব বিকাশ ঘটে হয়।”

—শ্রীমদ্রিবেকানন্দ



(অপ্রকাশিত)

কাজী নজরুল ইসলাম

ছ'জনাতেই সেই সাকী নিয়তির ক্রভঙ্গি চের  
এই ধরাতে তোমার আমার নাই অবসর আনন্দের।  
তবুও মোদের মাঝে আছে মদ-পিয়াল যতক্ষণ  
সেই ত ধ্রুব সত্য, সখি, পথ দেখাবে সেই মোদের।

শরাব আনো! বকে আমার খুনির তুফান দেয় যে দোল।  
স্বপ্ন-চপল ভাগ্যলক্ষ্মী জাগল জাগো ঘুম বিভোল।  
মোদের শুভদিন চলে যায় পারদসম ব্যস্ত পায়,  
যৌবনের এই বহি নিবে খোঁজে নদীর নীতল কোল।

মদ পিও আর ফুটি কর - আমার সত্য আইন এই!  
পাপ পুণ্যের খোঁজ রাখি না স্বতন্ত্র মোর ধর্ম সেই!  
ভাগ্য সাথে বিয়ের দিনে কইছ, 'দিব কি যৌতুক?'  
কইল বধু, 'খুশী থাকো, তার বড় যৌতুক সে নেই।'

মসজিদের অযোগ্য আমি, গির্জার আমি শত্রু প্রায়  
ওগো প্রভু, কোন মাটিতে করলে সৃজন এই আমায়?  
সংশয়াত্ম সাধু কিংবা ঘৃণ্য নগর-নারীর তুল  
নাই স্বর্গের আশা আমার, শাস্তি নাহি এই ধরায়।

নৃত্য-পর্য্য বর্ণাভীরে সবুজ ঘাসের ঐ ঝালর  
উন্মুখ কার চুমো যেন দেব-কুমারের ঠোঁটের পর—  
হেথায় পায় দলো না কেউ—এই যে সবুজ তৃণের ভিড়  
হয়ত কোনো গুল-বদনীর কবর-ঢাকা নীল চার।

হৃদয় যাদের অমন প্রেমের জ্যোতির্ধারায় দীপ্তিমান,  
মসজিদ মন্দির গির্জা, যথা করুক অব্যয় দান—  
প্রেমের খাতায় থাকে লেখা অমর হ'য়ে তাদের নাম,  
স্বর্গের লাভ ও নরক ভীতির উদ্ভিগ্ধ তারা মুক্তপ্রাণ।

কায়কোবাদের সিংহাসন আর কায়কাউসের রাজমুকুট,  
তৃসের রাজ্য, একছিতে এই মদের কাছে সব যে বুট!  
ধর্ম-গোঁড়ার উপাসনার কর্কশ যে প্রভাত-স্তুব  
তাহার চেয়ে অনেক মধুর প্রেমিক জনে শাস অফুট।

দোষ দেয় আর ভৎসে সবাই আমার পাণের নাম নিয়া  
আমার দেবী-প্রতিমারে পূজি তবু প্রাণ দিয়া  
মরতে যদি হয় গো আমায় শরাব-পানের মজলিশে  
স্বর্গ-নরক সমান, পাশে থাকবে শরাব আর প্রিয়া।

'রজব শাবান পবিত্র মাস' বলে গোড়া মুসলমান,  
'সাবধান, এই ছ'মাস ভাই কেউ করো না শরাব পান'  
খোদা এবং তাঁর রসুলের 'রজব' 'শাবান' এই ছ'মাস  
পান পিয়াসীর তরে তবে সৃষ্ট বৃষ্টি এ 'রমজান'?

মুসাফিরের এক রাত্রির পান্থবাস এ পৃথ্বীতল—  
রাত্রি দিবার চিত্রলেখা চম্পাতপ আঁধার-উজ্জল।  
বসল হাজার জামশেদ এ উৎসবেরই আঞ্জিনায়  
লাল বাহরাম এই আসনে ব'সে হ'ল বেদখল।

আজকে তোমার গোলাপ-বাগে ফুটল যখন রঙীন গুল  
রেখো না পান-পাত্র বেকার, উপচে পড়ুক সুখ ফজুল।  
পান ক'রে নে, সময় ভীষণ অবিস্থাসী, শত্রু ঘোর,  
হয়ত এমন ফুল-মাখানো দিন পাবি না আজকের তুল।

এই সে প্রমোদ-ভবন যথায় জলসা ছিল বাহরামের,  
হরিণ সেথায় বিহার করে, আরাম ক'রে ঘুমায় শের!  
চির-জীবন করল শিকার রাজ-শিকারী যে বাহরাম,  
মৃত্যুশিকারীর হাতে সে শিকার হ'ল হায় আখের।

নীল আকাশের নয়ন ছেপে বাদল অশ্রুজল ধরে  
না পেলে আজ এই পানীয় ফুটত না ফুল বন ভ'রে।  
চোখ জুড়াল আমার যেমন আজ এ ফোটা ফুলগুলি,  
মোর কবরে ফুটেবে যে ফুল—কে জানে হায় কার ভে

শুক্লাবাস আজ, বলে সবাই পবিত্র নাম জুম্মা যার  
হাত যেন ভাই খালি না যায়, শরাব চলুক আজ দেদার  
এক পেয়ালি শরাব যদি পান কর ভাই অল্প দিন,  
তু' পেয়ালি পান কর আজ বারের বাদসা জুম্মা বার।

এই মদিরা হাজার রূপে অরূপে এর হয় প্রকাশ,  
কভু এ হয় শ্রাণী, কভু তরু তা, ফুল-সুবাস।  
ভেবো না কেউ মুরার সাথে মুরার সারও যায় উবে,  
রূপ লোপ এর হয় অরূপে, অস্তি ইহার হয় না নাশ।

যার পরে তোর আস্থা গভীর, এই যে বৃকের বন্ধু তোর,  
মাজিত জ্ঞান চক্ষু নিয়ে দেখ এই তোর শত্রু ঘোর।  
বন্ধু বেছে নিস নে রে তোর অমাজিতের ভিড় থেকে,  
ভেজিয়ে দে ভাই অন্তরহীন অন্তরঙ্গতার এ দোর।

রে নির্বোধ ! এ টাচে-ঢালা মাটির ধরা শৃঙ্গ সব,  
রং-বেরং-এর খিলান করা এই যে আকাশ-অবাস্তব।  
এই যে মোদের হাসা-বাওয়া জীবন-মৃত্যু-পথ দিয়ে,  
একটি নিশাস ইহার আয়ু, আকাশ-কুমুমের এ টব।

হুরী বলে থ কলে কিছু—একটি হুরী, মদ খানিক,  
ঘাস-বিছানো বর্ণাভীরে, অল্পবয়েস বৈতালিক—  
এই যদি পাস স্বর্গ নামক পুরানো সেই নরকটায়,  
চাসনে যেতে স্বর্গ ইহাই স্বর্গ যদি থাকেই ঠিক।

হাতে নিয়ে পান-পিয়ালা নামাজ পড়ার মাদুর খান—  
দেখতে পেলাম ভাঁটিখানার পথ ধরে শেখসাহেব যান  
কইনু দেখে, 'ব্যাপার কি এ, এ পথে যে শেখ সাহেব।'  
কইলেন পীর, 'ফক্কিকার এ ছুনিয়া, কর শরাব পান।'

বুলবুল এক হালকা পাখায় উড়ে যেতে গুলিস্তান,  
দেখল হাসিখুশী ভরা গোলাপ লিলির ফুল-বাথান।  
আনন্দে সে উঠল গাহি, 'মিটিয়ে নে সাথ এই বেলা,  
ভোগ করতে এমন দিন আর পাখিনে তুই ফিরিয়ে প্রাণ।'

খৈয়াম ! তোর দিন তু'য়েকের এই যে দেহের শামিয়ানা—  
আত্মা নামক শাহনশাহের হেথায় ক্ষণিক আস্তানা।  
তাম্বুওয়ালা মৃত্যু আসে আত্মা যখন লন বিদায়,  
উঠিয়ে তাঁবু অগ্রে চল ; কোথায় সে যায় অজানা।

খৈয়াম—যে জ্ঞানের তাঁবু করল সেলাই আজীবন,  
অগ্নিকুণ্ডে প'ড়ে সে আজ সইছে দহন অসহন।  
তার জীবনের সূত্রগুলি মৃত্যু-কাঁচি কাটল হায়,  
ঘণার সাথে বিকায় তারে তাই নিয়তির দালালগণ।

ডাইনে বাঁয়ে দোষদর্শী সমালোচক ভয় দেখান—  
'শরাব ভীষণ খারাপ জিনিস, মদ্যপায়ীর নেইকো জ্ঞান।'  
সত্য কথাই ! যে আঙুরে নষ্ট করে ধর্মমত,  
সবার উচিত—নিঙড়ে ওরে করে উহার রক্তপান !

রহস্য শোন সেই সে লোকের আত্মা যথায় বিরাজে,  
ওরে মানব ! নিখিল সৃষ্টি লুকিয়ে আছে তোর মাঝে।  
তুই-ই মানুষ, তুই-ই পশু, দেবতা, দানব, স্বর্গদূত,  
যখন হতে চাইবি রে যা হতে পারিস তুই তা যে।

স্রষ্টা যদি মত নিত মোর—আসতাম না প্রাণান্তেও,  
এই ধরাতে এসে আবার যাবার ইচ্ছা নেই মোটেও।  
সংক্ষেপে কই, চিরতরে নাশ করতাম সমূলে  
বাওয়া-আসা জন্ম আমার ; সেও শৃঙ্গ, শৃঙ্গ এও !

এক সে উপায় আছে যদি বিশ্বে খুশী করতে চাও—  
মুসলিম খ্রীষ্টান ইহুদী সবার যশো-পাথা পাও।  
এম্মার সব শ্রদ্ধা পাবে বড় ছোট সকলকার  
তোমার নিন্দা করতে সাহস করবে না আর কেউ কোথাও।

কুগ্রহ মোর ! বলতে পারিস, করেছি তোর ক্ষতি কোন্ ?  
সত্যি বলিস, মোর পরে তুই বিরূপ এত কি কারণ।  
একটু মদের তরে এত উজ্জ্বলিত তোষামোদ,  
একটুকুরো রুটির তরে, ভিক্ষা করাস অনুরূপ।

খামুখা কথার বিষ খাসনে, মুসড়ে বাসনে নিরাশায়,  
কেরেব-বাজির এই ছুনিয়ায় তুই ধরে থাক সত্য ছায়।  
আখেরে ত দেখলি রে তুই, বিশ্ব ফাঁকা ফক্কিকার,  
তুইও মায়ার পুতুল যখন—ভয় ভাবনা যাক চুলায়।

ভাগ্যদেবি ! তোমার যত লীলা খেলায় সুপ্রকাশ  
অত্যাচারী উৎপীড়কের দাসী তুমি বারো মাস।  
মন্দকে দাও লাখ নিয়ামত ভালোকে দাও হুঃখ শোক,  
বাহাত্তরে ধরল শেষে ? না এ বুদ্ধিভ্রম বিলাস ?  
[ ক্রমশঃ ।

# “রাষ্ট্রভাষা হিন্দী—অচল”—উইলিয়াম কেরী

[ বাঙলা দেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বন্ধে হিন্দী ভাষা জোর-জুলুমের মাধ্যমে যাঁরা চাপাতে চান, তাঁরা যে ভুল পথে অগ্রসর হয়েছেন, সেই কথা বিভিন্ন প্রদেশবাসীরা বিভিন্ন আন্দোলন এবং প্রতিবাদের দ্বারা জানিয়ে দিয়েছে। তথাপি হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করতে যাঁরা উদ্যোগী, তাঁদের জন্য এক বিখ্যাত বিদেশী মনীষীর উক্তি আমরা উদ্ধৃত করছি—যাঁর নাম উইলিয়াম কেরী (১৭৬১—১৭৯৩)। মনীষী কেরী ভারতবর্ষে এসেছিলেন প্রশান্তঃ হৃদয় প্রচারের এবং শিক্ষাদানের কাজ চালাতে। উইলিয়াম কেরী তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলে গেছেন বহু পূর্বে—হিন্দী সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা হিসাবে ধার্য হ’তে পারে না।

—সম্পাদক ]

---

“Bengal, as the seat of the British Government in India, and the centre of a great part of the commerce of the East, must be treated as a country of very great importance. Its soil is fertile, its population great and the necessary intercourse subsisting between its inhabitants and those of other countries who visit the ports, is rapidly increasing. A knowledge of the language of this country must therefore be a very desirable object.

The pleasure which a person feels in being able to converse upon any subject with those who have occasion to visit him, is very great. Many of the natives of this country, who are conversant with the Europeans, are men of great respectability, well informed upon a variety of subjects both commercial and literary, and able to mix in conversation with pleasure and advantage. Indeed, husbandmen, labourers and people in the lowest stations are often able to give that information on local affairs which every friend of science would be proud to obtain.” \* \* \*

“Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the South, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Ramgor to Arakan.

It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoostanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. **This idea is very far from correct** ; for though it is admitted that persons may be found in every part of India who speak that language yet Hindoostanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India except those to the north west of Bengal which may be called Hindoostanee proper, as the French in the other countries of Europe. In all the court of justice in Bengal, and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of that particular country and seldom understand any other,...

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita that any of the other languages of India :.....four-fifths of the words in the language are pure Sungskrita, words may be compounded with such facility, and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to the copiousness. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of the most expressive and elegant language of the east."

( বঙ্গানুবাদ )

## বাঙালী জাতির পরিচয়

“বাঙ্গালায় ভারতস্থিত বৃটিশ সরকারের শাসন-কেন্দ্র রাজধানী অবস্থিত; বাঙ্গালা প্রাচ্যের সহিত অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্যেরও কেন্দ্র। এজন্ত বাঙ্গালা দেশকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া কর্তব্য। উহার ভূমি উর্বর, লোকসংখ্যা যথেষ্ট। যে-সকল দেশের অধিবাসীরা বাঙ্গালার বন্দরে যান, তাঁহাদের সহিত বাঙ্গালার অধিবাসীদের যোগাযোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ বিশেষ বাঞ্ছনীয়। যে কোন বিষয়ে লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় মহান আনন্দ লাভ করা যায়। বাঙ্গালা দেশের যে-সকল অধিবাসী ইউরোপীয়দের সহিত কথাবার্তা কহিতে পারেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সাহিত্যিক ও বাণিজ্যিক। বিবিধ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং পরস্পরের সুবিধাজনক ভাবে ও সম্ভ্রান্তের সহিত কথাবার্তা কহিতে পাটু। বাঙ্গালা দেশের কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নস্তরের লোকরাও প্রায়ই স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে এমন সব সংবাদ সরবরাহ করিতে পারে, যাহা বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন লোকদের নিকট আদরণীয়।”

## বাংলা ভাষার গুরুত্ব

“শুধু ভারত কেন, সমগ্র বিশ্বেই বাংলা আজ একটি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। সমৃদ্ধির দিক হইতে প্রাচ্যভূমিতে এই ভাষার সঙ্গে অপর কোন ভাষার বোধ করা তুলনাই হয় না। বঙ্গোপসাগর হইতে পার্বত্য ভূতান পর্যন্ত, রামগড় সীমান্ত হইতে আরাকান-সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের কোটি কোটি অধিবাসীর মাতৃভাষা হইতেছে বাংলা।

কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা—হিন্দুস্থানী কিছু জানা থাকিলেই ভারতের যে কোন এলাকায় যাইয়া কাজ সারিয়া আসা যায়। এইটি কিন্তু মোটেই ঠিক নহে। অবশ্য ইহা স্বীকৃত যে, ভারতের সকল অঞ্চলেই কিছু না কিছু হিন্দুস্থানী জানা লোক পাওয়া যায়। আবার, হিন্দুস্থানী আদৌ বুঝে না, —এমন বহু অঞ্চল এবং বহু অধিবাসী ভারতেই রহিয়াছে। সোজা কথায়, সাধারণ লোক সাধারণতঃ আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে—অপর কোন ভাষার জ্ঞান তাহাদের ভিতর কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা ভাষা বরং ভারতের অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে সংস্কৃতের কাছাকাছি। বাংলা শব্দসমষ্টির পাঁচ ভাগের চার ভাগই সংস্কৃত বলা যাইতে পারে। এই ভাষায় এত সহজে ও এত সুলভভাবে মনোপাত্ত ভাব প্রকাশ করা সম্ভবপর, প্রাচ্যের আর কোন ভাষায় বুঝি এমনটি হয় না।”

॥ মাসিক বন্ধুঘট্টা বাঙালী ভাষায় একমাত্র সর্ববাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

# স্মৃতিচিত্রণ

পরিমল গোস্বামী

## দ্বিতীয় পর্ব

২

ইংরেজী টিউটোরিয়াল ক্লাসে ববীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি, এবং তারপর বলা—এর ভার্য্য ইংরেজীতে লেখা, শিশিরকুমার ভাট্টার এ শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব এবং মনোহর। বারা ইংরেজী কবিতা পড়াতেন তাঁরাও যদি ক্লাসে এসে বার বার শুধু কবিতা এই ভাবে আবৃত্তি করতেন, কবিতার ছন্দ এবং শব্দ-ব্যাকার আমাদের কানে বার বার ধ্বনিত করতেন, তা হলে ইংরেজী কাব্য গোড়া থেকেই হয়তো সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠত। কিন্তু পড়াবার রীতি তা নয়। রীতি হচ্ছে ক্লাসে এসেই কবিতার প্রথম লাইন পড়ে তার ব্যাখ্যা শোনানো। ৪৫ মিনিটে হয় তো ৬ লাইন পড়া হল। অংশ ছুড়ে ছুড়ে বহুদিন ধরে মোট চোখাবার পরিচয়, সামগ্রিক রূপ তাতে বরা পড়ে না, সে সামগ্রিক রূপ অনেকগুলি অংশের যোগফলে তৈরি হয় না।

শিশিরকুমার ইংরেজী পাঠের নোট লিখতেন, যতদূর মনে পড়ে নোট বইতে তাঁর নাম ছাপা হত না। সেন-বাবু ছিলেন তার প্রকাশক। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট পাশাপাশি কয়েকটি প্রকাশক ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বভাবতই প্রতিযোগিতা ছিল। একদিন এক ইংরেজী প্যামফ্লেট নিয়ে বিজ্ঞাপনের কলেজের ছাত্র মহলে খুব ঠৈ চৈ শুরু হ'ল। এই প্যামফ্লেটের লেখক ছিলেন জে-এল ব্যানার্জি। তিনিও ছিলেন অল্প প্রকাশকের নোট লেখক। তিনি সেন-বাবুর প্রকাশিত ইংরেজী নোটের ভুল দেখিয়ে সেই ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। শিশিরকুমারের মহাদা ক্ষুব্ধ হওয়াতে আমরা ম্রিয়মাণ। কিন্তু বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। পাণ্টা প্যামফ্লেট বেরোল। শিশিরকুমার দেখালেন (ইংরেজী-পণ্ডিতদের প্রচুর প্রমাণ সহ) যে তাঁর শব্দ প্রয়োগে কোথায়ও ভুল হয়নি, জে-এল ব্যানার্জিই ভুল করেছেন। তখন আমরা হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম, যেন একটা বড় বৃক্ষে আমরা জিতে গেলাম। একটি মাত্র 'ভুল' প্রয়োগের কথা মনে আছে। জে-এল ব্যানার্জি বলেছিলেন sweet-scented flower

ভুল প্রয়োগ, হবে sweet smelling flower. শিশিরকুমার প্রমাণ সহ দেখিয়েছিলেন sweet-scented flower অতি নিতু' ইংরেজী, ইংরেজ সমর্থিত ইংরেজী।

শি-বাবু চোখাবার ছিলেন প্রায় ইউরোপীয়। শাদা চুল, গৌ কান্তি, গালে গোলাপী আভা। শাদা স্ট্রট প'রে এসে বে দেখাত। পড়াতেন ঠিক সাহেবী ধরনেই। ল্যান্ডডেবের 'ইমেজিনা কন্ভারসেশনস' পড়াতেন তিনি। কুঞ্জলাল নাগ পড়তে শেক্সপীয়ারের নাটক। চোখাবার কিছু শীর্ণ ছিলেন, চোখা না হ্রস্ব দেখ। তিনি ছিলেন গোড়া শেক্সপীয়ার ভক্ত। অলভলি অভিনয় করতেন মাঝে মাঝে। একদিন চান্দরে মাথা চে ম্যাকবেথের উইচ সেক্সে চেষ্টনাট চিবোলেন শব্দ করে (অর্থাৎ যে উইচ চিবোছে)। টীকাকার ভেরিটির উপর তিনি মহা খ্যা ছিলেন। ভেরিটির নোটসহ ব্রুজিট এডিশনগুলিই আমরা পড়তাম তিনি মাঝে মাঝে ভেরিটির ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর মন্তভেদ জ্ঞানি বিজ্ঞপণ্য স্তরে বলতেন, 'ভেরিট নয় যেন বেড়িটি!—শেক্সপীয়ারে পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে।'

ডাক্তার বিমলাচরণ ঘোষ (বি, সি, ঘোষ নামে প্রসিদ্ধ পড়াতেন ইংরেজী 'ডিক্সনারি' নামক একখানি বই। এই বইখানা কথা আমি প্রথম কিস্তিতে উল্লেখ করেছি নিপাডে-দর্শন সম্পর্কে এর লেখক আর, এ, গ্রেগরি। এরকম রোমাঞ্চকর বই আমি আ পড়িনি। যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা কি ভাবে নিলোভ এবং নিরহঙ্কারে মনোভাব নিয়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সেবা করে গেছেন তা কাহিনী। এমন চমৎকার ভাষায় লেখা, বিজ্ঞানীদের জীবনে রোমাঞ্চকর আশ্চর্য্যভাগের ঘটনাগুলি এমন অদ্ভুতভাবে সংকলিত এবং বিস্তৃত যে পড়তে বদলে মন আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে। অধ্যাপক বি, সি, ঘোষ এক একটা কাহিনী পড়তে পড়তে নিজেই অল্পপ্রাণ হয়ে উঠতেন। তিনি ছিলেন খুব সংযতবাক মধুর ভাষী এবং নিরহঙ্কার, আর বইতে ছিল মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবন-দর্শনের কথা তাই তাঁর ক্লাসে ব'সে কখনো মনে হ'ত যেন কোনো দার্শনিকে বক্তৃতা শুনিছি। কখনো মনে হ'ত বিজ্ঞানের ক্লাসে বিজ্ঞান পড়ছি।

আর-কেতি ছিলেন বরোবুদ্ধ। সংস্কৃত ও বাংলা পড়াতেন



তার মতো রসিক ব্যক্তি অধ্যাপকদের মধ্যে আর দেখিনি।  
বিজ্ঞানাগরের আমলের লোক। তার কাছে ছাত্ররা একেবারে  
স্বাধীন। তিনি নিজেই সবাইকে খুব প্রেরণা দিতেন, নিজে খুব  
গভীর থেকেও আর সবাইকে হাসাতেন। একদিন ক্লাসে চুকে দেখি  
বোল-বল আরম্ভ হয়ে গেছে এবং আমার নম্বরটি পাঠ হয়ে গেছে।  
আমি এসে আর-কে-ভির সামনে পাঁড়িয়ে বইলাম ডেকের সামনে  
বুকে। উদ্বেগ—সবার বোল নম্বর ডাকা শেষ হয়ে গেলে আমারটিতে  
‘প্রেক্ষেপ’ লিখিয়ে নেব। ডাকা শেষ হল, আর-কে-ভিকে আমার  
নম্বরটি বললাম। তিনি আমার মুখের দিকে তির্যক ঘুরিয়ে কয়েক  
সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে মাথাটি আমার প্রায় মুখের কাছে এগিয়ে  
এনে জিজ্ঞাসা করলেন, “বাড়ির পাশে বাড়ি না এক গলিতে বাড়ি?”  
এ প্রশ্নের ইঙ্গিত এই যে আমি নিশ্চয় অগুর প্রার্থী দিচ্ছি, কিন্তু  
যদি জ্ঞান আমি এতটা কষ্ট স্বীকার করছি, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা  
কি ভাবে গড়ে উঠছে, পাশাপাশি বাড়ি থাকার দরুন, না এক  
গলিতে বাড়ি হওয়ার দরুন।—অর্থাৎ বন্ধুত্বটা খুব গভীর না শুধু  
মুখের আলাপ। আমি বললাম, “না সার, ওটা আমার নিজেরই  
নম্বর।”

একদিন ক্লাসের মধ্যে থেকে কে একজন খুব গভীর ভাবে বলে  
উঠল, “সার, এই বড়ো বয়সে আর শাবি না।” এর উত্তরে  
আর-কে-ভি অগ্নান বদনে বললেন, “বিয়েটা হয়ে যাক আর কি,  
তারপর সব ছেড়ে দিও।” আর এক দিন একজন জিজ্ঞাসা করল,  
“লিখতে এত ভুল হয়, কি করি বলুন তো, সার?” আর-কে-ভি  
বললেন, “তবে একটি গল্প শোন। বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে একটি  
ছাত্র জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘নিভুল লেখা দেখা যায় কি করে?’ তার  
উত্তরে বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলেছিলেন, ‘খুব সহজ একটি উপায় আছে,  
সেটি অমুসরণ করলে কখনো ভুল হবে না।’ ছেলেকে আগ্রহের  
সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল ‘বলুন সে কি উপায়, আমি পরীক্ষা করে  
দেখব।’ বিজ্ঞানাগর মহাশয় বললেন, ‘কখনো লিখো না।’”

বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের এই গভীর অর্থপূর্ণ উপদেশটি আর  
কোথায়ও প্রকাশিত হয়েছে কি না জানি না, তবে আর-কে-ভি  
বলেছিলেন কথটি তিনি বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের কাছ থেকে  
শুনছিলেন।

কলেজের নতুন হস্টেলে এলাম ১৯৮০তে। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের  
উপর চার তলা বাড়ি, বাড়ির নম্বর ১৭। টাটকা নতুন বাড়িতে  
বেশ একটা ভূমি। এখানে আসার কিছু দিনের মধ্যেই ডেঙ্গুর  
সংক্রমক ভাবে আরম্ভ হল পৃথিবী জুড়ে, তার নাম হল war-fever  
বা বৃদ্ধ-অর। সেই করে আক্রান্ত হলো আমি। অত্যন্ত কষ্টদায়ক  
অর, সমস্ত গায়ে হাত পায়ে তার রক্তমা, পাশ ফিরতে লোকের  
সাহায্য দরকার হয় এমন অবস্থা। আমি অসহায় ভাবে পড়ে ছটকট  
করছি চারতলার ঘরে শুয়ে।

এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটল, যা একই সঙ্গে ট্রাজিক এবং  
কমিক। আমার সেই অত্যন্ত অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে  
বিকেলের দিকে প্রবল ভূমিকম্প আরম্ভ হ’ল, অন্তত চার তলার ঘরে  
তার ঝাঁকানি খুব জোরেই চলছিল। এমন অবস্থায় কি ভাবে যে  
কি ঘটে গেল, আমি তার জন্ত মোটেই দায়ী নই, কিন্তু যখন কিঞ্চিৎ  
লম্বিৎ ফিরে এলো তখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম, হস্টেলের বাইরে

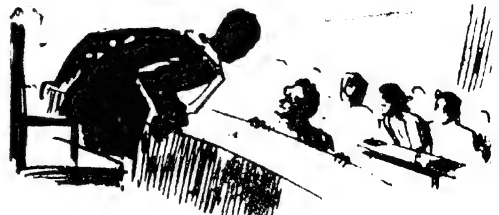
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ফুটপাথের উপর, অত্যন্ত অসহায় অবস্থায়।  
আত্মরক্ষার সহজাত প্রেরণা থেকে এ কার্য করেছি এবং চারতলা  
থেকে আর সবার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে ছুটে এসেছি, বৃকটেই পারি নি  
যে আমি অসহায়, আমি যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর, পাশ ফিরতে পারি না,  
বিজ্ঞানাগর উঠে বসতে পারি না। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।  
নিচে নামতে এক মিনিটের বেশি লাগেনি, অথচ উঠতে চল সমস্ত  
শক্তি ব্যয় করে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে এবং অজ্ঞের সাহায্য।

দেহ আর মনের সম্পর্ক বিষয়ে অল্প জানা ছিল, কিন্তু মন বিশেষ  
সময়ে দেহের সর্বময় কর্তৃত্ব নিজে পারে এবং আপন গরজে একটি  
অসমর্থ দেহকে স্বস্ত্র দেহের মতো চালনা করতে পারে, এ অভিজ্ঞতা  
সম্পূর্ণ নতুন।

বরীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পড়েছি, তিনি একবার বিজ্ঞের কামড়ে অসহ  
যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, এমন সময় তিনি মনকে বোঝালেন  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক এক ব্যক্তিকে বিচ্ছেদ কামড়িয়েছে, তাতে  
তার কষ্ট হবে কেন? এই ভাবে সত্যিই তিনি দংশন যেদনকে  
সম্পূর্ণ জয় করতে পেরেছিলেন। সত্যিই সম্পর্কে পড়েছি, অনেক  
সত্যিই দৃষ্টান্তকে সম্পূর্ণ জয় করতে পেরেছিলেন ইচ্ছাশক্তির  
সাহায্যে। সবটাই চিত্ত-নিয়ন্ত্রণের বাপা। কিন্তু আমার ঘটনায়  
সজ্ঞান নিয়ন্ত্রণের প্রায় নেই। আমার মন আপন গরজে এবং আপন  
বিচ্যবন্ধির অপেক্ষা না করে, যেতাল যেমন হৃদয়েকে আশ্রয় করে  
তাকে জীবিত করে তোলে, যেমনি ভাবে একটি অপট দেহকে  
সাময়িক ভাবে পট করে নিয়েছিল। তার যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়ে  
কার্ধ্যাচার করে নিয়েছিল এবং প্রয়োজন শেষ হতেই বধ্যপূর্ণ।  
তবু মনকে যন্ত্রণার জানিয়েছি একজ্ঞ।

নতুন হস্টেলে কয়েকটি চরিত্র স্মরণীয় হয়ে আছে। চরিত্রের  
সাক্ষাৎকার কথা আগেই বলেছি। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য চরিত্র স্মরণীয়  
চরিত্রাধ্যায়। তিনি ছিলেন বিভ্রান্তবান। তার বইয়ের খেলক  
পরিচ্ছন্ন, একখানি বই নেই। টেবিলের উপরে একখানি মাত্র  
খাতা, উপরে আয়না, চিকিৎসা এবং একটি ক্লাসিক্যালের বাক্স।  
দেখে খুবই অভিনব মনে হয়েছিল। খুব একটা ভোলা ভাঙিষ্ণ  
সম্পন্ন চেহারা। কলেজের এক নাটকে খুব ভাল অভিনয় করেছিলেন,  
কোট করেছিলেন শিরিকুমার। একদিন বিকেলে ‘চৈত্রী কাণ্ড’।  
দোতলার কয়েকজন ছাত্র স্মরণীয় বিজ্ঞ প্রিয়ের কাছে অভিযোগ  
করলেন, “স্মরণীয় বাবু ক্লাসিক্যালের বাক্সে, এতে আমাদের খুব  
অসুবিধে হচ্ছে, আমরা পড়তে পারছি না।”

বেলা তখন সাড়ে চারটে। অপরাধীর ডাক পড়ল। দেখলাম  
তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে এগিয়ে আসছেন, অপরাধীর চেহারা অগ্নে



বাড়ির পাশে বাড়ি, না এক গলিতে বাড়ি?”

নয়। তাঁকে ছাত্রদের অশ্রুবিধের কথা বলা হয়। তিনি সব শুনে প্রকোপের দিকে খুব একটা দৃষ্ট ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, “এঁরা বললেন অশ্রুবিধ হচ্ছে, আর আপনি সে কথা ভুললেন? এখন বেলা সাড়ে চারটে, এটা পড়বার সময় নয়, খেলার সময়। এখন যদি এঁরা বলেন ‘আমরা পড়ছি’ আর আপনি এঁদের প্রশ্নের দেন, তা হলে অপরাধ হবে আপনার। এ সময়ে পড়ে এঁরা স্বাস্থ্য নষ্ট করছেন, এই পাণ্ডা কাজে আপনি এঁদের প্রশ্নের দেন না, দিলে এঁদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে, এবং তার জন্ত দায়ী হবেন আপনি। এঁদের ব’লে দিন, ঘরে ব’সে থাকার সময় এটি নয়, এখন কেউ পড়ে না।”

খুব ক্রোধের সঙ্গে কথাগুলো ব’লে অপরাধী অভিজাত ভঙ্গিতে ঘরে ফিরে গেলেন। চিচাবক স্তম্ভিত! তাঁর বলবার কিছুই ছিল না। স্খাংস্ত প্রত্যেকটি কথা সত্য। ছেলেরা স্বাস্থ্য নষ্ট করে পড়ছে এটি সত্যিই অজায়। খেলার সময় পড়বে কেন? বিকেলে ঘরে বন্ধ থাকবে কেন?

অল্পকালের মধ্যেই স্খাংস্তর ঘরে ক্লারিওনেট বেজে উঠল।

স্খাংস্তর সব কথাই যুক্তিসঙ্গত, শুধু তাঁর লজ্জিক একটি ক্রটি ছিল। তিনি নিজেই সাড়ে চারটের ঘরে ব’সে স্বাস্থ্য নষ্ট করছিলেন।

এঁর সঙ্গে পরে আলাপ হয়েছিল, বেশ মধুর চরিত্র এবং একটি যোগাযোগও আবিষ্কার হয়েছিল—ইনি বনফুলের ভগিনীপতি।

ক্ষিতীশচন্দ্র সর্বাধিকারী আর এক চিন্তাকরক চরিত্র। মেদিনীপুরের ডাক্তার শচীন্দ্র সর্বাধিকারীর পুত্র, আই-এস-সিও ছাত্র। ক্ষিতীশ অল্প দিনের মধ্যেই অতুলানন্দ ও আমাকে একেবারে প্রিয়তম বন্ধু বানিয়ে ফেলল। এরকম দুর্দান্ত প্রণোদন ছেলে হঠাৎ করে ছিল কিনা জানি না, কিন্তু তার বিরাটমহান তল্লাড় প্রবৃত্তি, পাঠে অমনোযোগিতা-প্রসূত অস্বস্তিকে ভেঙে চূরে একাকার করে দিত। এর মধ্যে সব চেয়ে ভাল লাগত তার কঠোর পরিশ্রমতা। তার বক্তৃতা কাব্য না হলেও তার প্রত্যেকটি বাক্য ছিল বসন্তক। একদিন থিয়েটার থেকে ফিরতে তার একটা রাত হয়েছিল, সে আগে হঠাৎ জানিয়ে যেতে পারেনি, সেজন্ত গোট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অগত্যা ক্ষিতীশকে গোট টপকিয়ে ভিতরে আসতে হল, কিন্তু ধরা পড়ে গেল। গুরুতর কিছু নয়, কিন্তু ক্ষিতীশ পবদিন এই উপলক্ষে একটি গল্প ফেঁদে বসল। বক্তৃতার ভঙ্গিতে কাঁড়িয়ে—“ব্রহ্মধামে হঠাৎ ছিল, সেই হঠাৎলের গোট টপকিয়ে জীকৃৎ ভিতরে লাকিয়ে পড়লেন। হঠাৎলে আদ্যান ঘোষ বাস করতেন সপরিবারে, কৃষ্ণক ধরে ফেলে বললেন, ‘তোমরা ডুইউ মীন?’” ইত্যাদি করে দীর্ঘ এক কাহিনী, খুবই উপভোগ্য হয়েছিল এটি।

খাবার ঘবেও ক্ষিতীশ নিষ্ক্রিয় থাকত না। হঠাৎলের চেহারা যেমন বকরকে তরুকে, তেমনি তার খাবার ঘরের বাসনপত্র। ভারী কাঁদা খালা বাটি গেলান, সব নতুন। সব মিলিয়ে বেশ তৃপ্তির। একসঙ্গে অনেকে খেতে বসতায়। স্খাং মনে নেই। পঞ্চাশ ঘাট কিংবা বেশি। ক্ষিতীশ আমি প্রায় একসঙ্গে পাশাপাশি বসতাম। মণি যুজ্জ্ঞে ক্ষিতীশের সহপাঠী, সেও বসত আমাদের সঙ্গে। সন্ধ্যাে একদিন মাংস হত। সকালের ও বিকেলের খাবার

ঘরে ঘরে দিয়ে যেত। খাকা ও খাওয়া মিলিয়ে ১৮ টাকা মাসে বাধা বেট।

মাংস হত তুরকম, পেরোজয়ুক্ত ও পেরোজহীন—নাম বধাক্রমে আমিও নিরামিষ মাংস। মাছ বা মাংস, অথবা ডাল, পুখক বাটিতে পরিবেশন করা হ’ত। একদিন মাংস পরিবেশন করা হচ্ছিল। ঠাকুর প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছিল—আমিষ চাই কি নিরামিষ চাই। ক্ষিতীশের কাছে এলে সে এমন অশ্রমবৎ হয়ে গেল যে সে যেন আর এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাবছেই না কিছু, যা হোক একটা দিলেই হল—এই রকম ভাবটা। অথচ সবই সে লক্ষ্য করেছে, জানে তাকে পেরোজয়ুক্ত মাংস দেওয়া হয়েছে। দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে বাটিয়ুক্ত খালায় ঢেলে একটু মুখে দিয়েই ঠাকুরকে ডেকে বলল “আমিষ মাংস দিয়েছ আমাকে—ছি। ছি। এ আমি খাই না,” ব’লে সে সবটা মাংস ও যোল ঢেলে ঢেলে খালায় একপাশে সবিয়ে দিল। ঠাকুর মহা অপরাধীর মতো নিরামিষ মাংস একবাটি রেখে গেল খালায় পাশে। ক্ষিতীশ তখন সে মাংসও খালাতে ঢেলে নিয়ে ছুটিতে মিশিয়ে ভোজন সমাধা করল।

আরও এক দিনের ঘটনা। পরিপূর্ণ চিড়িমাছ রান্না হয়েছিল। ক্ষিতীশ মাছটি মুখে দিয়েই মাটিতে ফেলে দিয়ে চোঁচাতে লাগল, “ঠাকুর, পচা চিড়িটাই আমাকে দিলে?” ঠাকুর দেখল কথাটি মিথ্যা নয়, মাছ মাটিতে পড়ে আছে। সে তখন আর এক বাটি থেকে নতুন একটা মাছ ও যোল ক্ষিতীশের পাতে ঢেলে দিল। ক্ষিতীশ তখন ফেলে দেওয়া মাছটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে খেতে লাগল। দুই মিনিট বৃষ্টির অস্ত্র নেই। একদিন মাছ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিতীশ ঘুরে দরজার দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে ব’লে উঠল “আরে, জে, আর বানান্নি খাবার ঘরে।” পাশে মণি যুজ্জ্ঞে বসেছিল, সবাই দরজার দিকে তাকাতেই ক্ষিতীশ মণির বাটি থেকে তার মাছের খণ্ডটি তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করেছে। পরে একদিন ক্ষিতীশেরই কৌশলে ক্ষিতীশকে জব্দ করতে চেয়েছিল মণি, কিন্তু পারেনি। “আরে, শিশির ভাড়াড়ি এসেছেন খাবার ঘরে। বলতেই ক্ষিতীশ নিজের মাছের বাটিট ডান হাতে ঢেকে বলল, “কোথায়?” ক্ষিতীশই কি কেপমারী কৌশলের প্রথম উদ্ভাবক?

আরও কয়েক বছর পরের একটি ঘটনা বলি। বলাইচাঁদ (বনফুল) তখন সম্ভবত মেডিক্যাল কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ে। ক্ষিতীশও মেডিক্যাল কলেজে পড়ত একই সঙ্গে, কিন্তু ওদের বিশেষ পরিচয় ছিল না। আমার কাছে বলাই সম্পর্কে অনেক কথা শুনে ক্ষিতীশের প্রবল আগ্রহ হয় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে। সেটি অত্যন্ত সাধারণ এবং স্বাভাবিক ভাবেই হতে পারত, কিন্তু ক্ষিতীশের পথ আলাদা। সে তখনই আমাকে বলল, ভাই, বনফুলের কোনো একটা কবিতা জোগাড় করে দিতে পার? সেটি সম্ভবত ১১২৩ সাল। সে সময়ে তার অনেক কবিতা নানা কাগজে বেঁচেছে, একটি জোগাড় করে দেওয়া গেল। ক্ষিতীশ সেই দিনই বলাইয়ের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলল। সে ঐ কাঁবতায় একোনো একটি সুর লাগিয়ে বলাইয়ের পিছনের একটি আসনে ব’সে আপন মনে গাইতে লাগল। এইটিই আলাপের প্রথম সূত্রপাত।

ক্ষিতীশ বর্তমানে মেদিনীপুরের খ্যাতনামা ডাক্তার এবং বহু

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আরম্ভের সঙ্গে শেখ দিকের অবস্থা একটি যোগসূত্রে আছে, দীর্ঘকালের দূরত্ব ব'সে সেটি অম্লসরণ করা আমার সাধ্য নয়।

এই হঠাৎ দেখা হল রাজেন সেনের সঙ্গে। ১৯১১ সালের বিজয়ী মোহনবাগান দলের যে ফোটাগ্রাফ ক্লাস সেভেনে পড়তে নানা কাগজে দেখেছিলাম, তার মধ্যকার প্রত্যেকের চেহারা মনে গাঁথা ছিল। তারপর কান্না সালে মনে নেই বিজয় ভাণ্ডারী খেলা আমি দেখেছিলাম। আমার ১৯১১ সালের সেই বোম্বাকর বিজয়-শুভিতে শঙ্কর, গর্বেব এবং বিশ্বম্ভর আসনে এরা সবাই ছিলেন উজ্জ্বল। সেই ফোটাগ্রাফ থেকে যেন রাজেন সেন জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন সামনে। আর তাইই সঙ্গে এক ক্লাস পড়ছি, এক হঠাৎ বাস করছি! এ ঘটনা আমার কাছে খুবই আশ্চর্য মনে হয়েছিল।

রাজেন সেনের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হল। আমি সেই বঁটে লোকটির লোহার মত শক্ত পেশী দেখে অবাক হতাম, এবং তিনি আমার হাড়ের উপরকার চামড়ার আবরণ দেখে অবাক হতেন। খুব মিষ্টভাষী ছিলেন এবং খুব যত্নাশীল ছিলেন। এক দিন আরও অবাক হলাম দেখে, শ্রীশিবিকুমার ভাড়াড়ি তাঁকে রাজেননা বলে ডাকছেন। পড়াবার সময় অবশ্য শ্রীশিবিকুমারই দাদা হতেন ক্লাসের মধ্যে। বিভাসাগর কলেজের আর এক বিখ্যাত খেলোয়াড় শ্রীগোষ্ঠ পাল তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণিতে পড়েন। তিনি হঠাৎ থাকতেন না। তাঁর সঙ্গে সামান্য আলোচনা হয়েছিল। কলেজের কোনো খেলাই কখনো দেখতে বাইনি, শুধু খেলোয়াড় দেখেই খুশি।

বিকলের দিকে বেড়তে বাওয়া প্রায় নিয়মিত ছিল। অতুলানন্দের সঙ্গে একত্র বাওয়া হত বেশি। অবশ্য এই সময় আমার আবার ম্যালেরিয়ায় বড়ই কষ্ট দিতে থাকে, সেজন্য মাঝে মাঝে শুয়ে থাকতে হত। আমাদের ভ্রমণসীমা এ সময় গোলন্দারি বেশি বিস্তৃত ছিল না। এখানে এলে নানা চিত্তাকর্ষক জিনিসে মানসিক হাওয়া পরিবর্তন ঘটত সহজে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সভা প্রায় লেগেই থাকত। সেখানে সার আন্ততায় চৌধুরী অথবা গার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক বার সভাপতির পদে দেখেছি। চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর অনেক কাঁচুকর প্রোগ্রাম এখানে দেখেছি। ফলেজ দ্বারাও খোলা জায়গার সভা প্রায় লেগেই থাকত। বিনমন্ড্রে পালের বক্তৃতা খুব আকর্ষণীয় ছিল। তিনি তাঁর বক্তব্য শ্রোতার মর্মে গৌণে দিতে পারতেন। তখন মাইক্রোফোন লাউড-স্পীকার ছিল না, কিন্তু তখনকার বক্তার এসব দরকার হত না। শ্রোতার সংখ্যাও সীমাবদ্ধ ছিল সব সময়। ইনস্টিটিউটে যত স্তরকর্ষক বক্তৃতাই হোক, সর্বসাধারণের জন্য উদ্ভূত ছিল, কিন্তু সেড়ে হাইগোল হতে দেখি নি।

বিশিষ্ট পালের গলা ছিল খুব জোড়ালো। তিনি কোনো কথাই বলতেন না, প্রত্যেকটি কথা প্রয়োজন বোধে একবারের শি বলতেন। সব দিকে ঘুরে ঘুরে সব দিকের শ্রোতার তি লক্ষ্য করে বলতেন একই কথা। এ রকম বক্তৃতা আর উকে দিতে দেখিনি।

সন্ধ্যাবেলা কলেজ দ্বারা উমেশচন্দ্র বিহারী মারে মারে তা দিতেন। হিন্দুর শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করতেন যুক্তি দিয়ে।

কিন্তু সে ব্যাখ্যা সাধারণ শ্রোতার মনঃপূত হত না, সভার ভীষণ প্রতিবাদ উঠত। অতুলানন্দ ও আমি তাঁর ব্যাখ্যার নতুনত্ব খুব স্বীকৃত হয়েছিলাম। তাঁকে কলেজ দ্বারা দেখলেই শ্রোতার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেতাম। রামায়ণ মহাভারত বেদ উপনিষদ তিনি এমন মুখস্থ করেছিলেন যে তাঁর সংগৃহীত সংস্করণগুলির যেকোনো পাতা থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারতেন পৃষ্ঠার নম্বর এবং শ্লোকের নম্বর সমেত। লম্বা দাড়ি চুল, প্রায় সবটাই পাকা, বঁটে মাছুর, গায়ে গেফরা রঙের টিলে-লম্বা জামা, গেফরা রঙের ধুতি।

এক দিন সন্ধ্যায় তাঁর বক্তৃতা শুনিছি, তিনি কোনো একটি শ্লোকের লৌকিক ব্যাখ্যা করছিলেন, শ্লোকটি এখন আর মনে নেই। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে হিন্দু প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেল, এবং তাঁর গায়ে কে যেন ঢিল ছুড়তে লাগল। বিপজ্জনক অবস্থা, কেউ কেউ মাঝে মাঝে ব'লে এগিয়ে এলো। অতুলানন্দ ও আমি গিয়ে দাঁড়ালান তাঁর সামনে, এবং তাঁকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে এলাম জনতার মাঝখানে থেকে।

উমেশচন্দ্র আমাদের ছাড়লেন না, নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে, এবং কত গল্প করলেন। গল্প করতে করতে বই খুলছিলেন মাঝে মাঝে আমাদের দেখাবার জন্য। কয়েকটি আলমারি বোঝাই বই। আলমারিরও অদ্ভুত সব নাম ছিল। একটির নাম মনে পড়ে—“নৈমিষারণ্য”। নামগুলি আলমারির গায়ে লেখা। তাঁর কোনো পুত্র তখন আমেরিকার ছিলেন, তাঁর ফোটা দেখালেন—এই রকম মনে পড়ে।

পারনা হঠাৎ থাকতে আক্রমণের হাত থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম, কলকাতার হঠাৎ এসে উমেশচন্দ্র বিহারীকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম। উভয়ই “হীরা” সেই একই আমরা দুজন—অতুলানন্দ ও আমি। সৌভাগ্যের বিষয়, এর পর থেকে আর এক দিনও অন্য কাউকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিতে হয় নি, কেন না পরবর্তী ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে আমরা শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা করে আসছি।

কাছাকাছি সময়ে (১৯১৮ কি ১৯১৯ মনে পড়ছে না) বহু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা শুনলাম টিকিট কিনে। ভ্রমণীশচন্দ্র তাঁর ক্রেশোগ্রাফের ক্রিয়া দেখালেন অন্ধকার দেয়ালে একটি আলোর



কিতীশ হঠাৎলার পেট টপকাচ্ছে।

গোলক প্রতিকলিত করে। গাছ উত্তেজক খাড়ে কি ভাবে সাড়া দেয় এবং বিব দিলে কি রকম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তার ছবি দেখা গেল এর সাহায্যে। সোজাভক্তি দেখবার উপায় নেই, গাছের উত্তেজনা বা নিষ্ক্রিয়তা এক লাখ গুণ বর্ধিত করে একটি বলের মতো আলোর প্রতিকলনের সাহায্যে দেখানো। এই উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র নিজের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাস সংক্ষেপে বলেছিলেন সেদিন। পদার্থবিজ্ঞান এবং বিশেষ করে বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানে তাঁর দানের কথা উল্লেখ করেছিলেন মনে আছে। 'my galena receiver' কথাটি বার বার বলেছিলেন, এখনও কানে বাজছে। জগদীশচন্দ্রকে দেখে সেদিন শ্রুত হয়েছিলাম। বক্তৃতা শেষে তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপও করেছিলাম। এই সময় রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, শোভন সংস্করণ তার নাম। একই সঙ্গে পুরনো সংস্করণের কাব্য গ্রন্থসমূহ—(যৌবনস্বপ্ন, প্রেম, কল্পনা, বাস্তব প্রভৃতি নামে বিভক্ত) ও কৃপিকা (প্যেট্রি এডিশন) ও গজ গ্রন্থ—চারিত্র পূজা, লোক সাহিত্য প্রভৃতি পঞ্চ দু'আনা করে বিক্রি হত—আমি অনেক কিনেছিলাম, এখনও কিছু আছে।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় বসতে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। দেখলাম সবাই প্রকাশ্যেই খুলে নকল করছে। এই ব্যাপারটি আমার মফস্বলীয় দৃষ্টিতে খুব চমকপ্রদ বোধ হয়েছিল। পরীক্ষায় নকল এতকাল ছিল একটি বিভীষিকা। কল্পনার বাইরে ছিল। পাবনা শহরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছি নিম্নতর ঘরে। কোথায়ও কারা যুগ্ম একটি শব্দ নেই। পরীক্ষা একটি পবিত্র এবং নিষ্ঠার ব্যাপার বলে মনে হয়েছে এ জগৎ। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাও পাবনা শহরে দিয়েছি, সেও শ্রদ্ধাপূর্ণ মনে। তাই এ পরীক্ষায় প্রথমত মনে আঘাত লাগল, এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই সে আঘাত কাটিয়ে উঠতে বেশি দেরি হল না। পরদিন থেকে আমিও পাশের খোলা বইয়ের দিকে চাইলাম।

শুনলাম পরীক্ষার খাতা দেখা হয় না, অতএব টোকা না টোকা সমান। পরীক্ষাটা লোক দেখানো। উদ্বেগ গোড়ায় ভাল ছিল সন্দেহ নেই, কারণ পরীক্ষার নামে কিছু পড়া পড়বে ছেলেরা, এবং উত্তর লেখা অভ্যাস করবে। কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা এত যে এই উদ্বেগে তাদের নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। আজকের দিনে এর পরিবর্তন হয়েছে সম্ভবত, কিন্তু তখন শুনেছি বিভাগাগর কলেজের এটি একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পরীক্ষায় টোকা এখানে 'বার্খ-রাইট' বিবেচিত হত। অধ্যাপকেরা বাধা দিতেন না।

ক্ষীরোদ গুপ্ত দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন; অতি সদাশয় ব্যক্তি, শিশুর মতো সরল, ছেলেদের খুব ভালবাসতেন। মেট্রিকুলেশনের ক্লাস হচ্ছিল, এমন সময় পাশের মেট্রিকুলিটান স্কুলের টিকিনের ঘন্টা বাজতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হাজার খানেক ছাত্র এক সঙ্গে চিৎকার করে ক্লাস থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে। বোজ হয় এ রকম। তখন সে চিৎকার সঙ্গ করা কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখি ক্ষীরোদ গুপ্ত আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে হেসে বলছেন আহা, এতকালের রক্ত শক্তি এক সঙ্গে মুক্তি পেল। তিনি পড়ানো ভুলে এই চিৎকার উপভোগ

করতে লাগলেন চোখ বুজে—মুখে মুখ হাসি। একটা পরীক্ষার দিন তিনি গার্ড হিসেবে এলেন এবং এসে চেয়ারখানা উল্টো করে ঘুরিয়ে দরজার দিকে মুখ করে বসলেন। যতক্ষণ পরীক্ষা চল, ততক্ষণ তিনি একখানা খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন। নকলে বাধা দেবেন না জেনেই তিনি বিপরীতমুখী হয়েছিলেন গোড়া থেকে। বুকলাম টোকা এখানে একটি বনেনি অভ্যাস।

ম্যালেরিয়ার জ্বর নিয়মিত ক্লাসে বাওয়া হয়নি, নিয়মিত পড়ার উৎসাহও পাইনি, ধারাবাহিকতার মধ্যে বার বার ছেদ পড়েছে। শেষে এমন হল যে টেট পরীক্ষাই দেওয়া হল না। পরীক্ষা দিলেই পাস, অথচ বসাই হল না। আশা ছিল ফাইনাল পরীক্ষার আগে যদি ভাল থাকি তবে এরই মধ্যে বেশি পড়ে এতদিনের ক্ষতিপূরণ করে নেব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হল না। হাট্টলের একজন ডাক্তার ছিলেন, তিনি কুইনিন ও অজ্ঞাত দু'একটি সহযোগী ওষুধের বাড়ি ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু যে কারণেই হোক, তাতে জ্বর বন্ধ হল না। অবশেষে গেলাম হারিসন রোডে চাকচন্দ্র সাম্রাজ্যের কাছ। তিনি অতুলানন্দের পরিচিত ছিলেন। তিনি কুইনিন দিলেন, কিন্তু বাড়ি নয়, মিক্শার। এই মিক্শারে ক্ষত ফল হল, কিন্তু নিয়মিত চালানা সম্ভব হল না। বালাকাল থেকে ডি গুস্তের ওষুধ, এডওয়ার্ডস টনিক খেয়ে খেয়ে তিনটে ওষুধ অদৃশ্য হয়ে উঠেছিল। তাই এক শিশির আঁচটি মাত্রাও শেষ করলাম না। জ্বর আবার দেখা দিল এবং মাঝে মাঝে বাড়তে লাগল। তখন হয়তো আবার দু'তিন মাত্রা খেয়ে তাকে দমিয়ে রাখতাম।

অতুলানন্দ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্ত কবিরাজ গণনাথ সেনকে আশ্রয় করল, নানা মগজপুষ্টিকর ওষুধ খেতে লাগল, মাথায় তেল মালিশ করতে লাগল, আর পড়তে লাগল। সেন্টস্বেরের প্রকাণ্ড 'লিটারেচার' খানা প্রায় মুগ্ধ করে ফেলল। তার এক হাত মাথায় কবিরাজী তেল মালিশে ব্যস্ত, অজ্ঞ হাতে বই। আমার দু'খানা হাতই পীলের উপর। কোনো বইই পরীক্ষার আগে পড়ে শেষ করা গেল না। অতুলানন্দ সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেল। অর্থাৎ ষতটুকু কম পড়লে সে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেতে পারত, তার চেয়ে অনেক বেশি পড়ে সে ঠকে গেল, আর আমার মাত্রা প্রয়োজনীয় কম পড়ার খাপ পৰ্শ্বও উঠল না বলে আমার পাস করাটাই হল না।

পর বছর ইংরেজী ছাঁট পেপার ছেড়ে দিয়ে তিনটি পেপার নিলাম। এবারেও স্বাস্থ্য প্রতিকূল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বোঝা হাছা হওয়াতে পার হয়ে বাওয়ার কোনো অসুবিধে হয়নি। পরীক্ষা হয়েছিল সায়েন্স কলেজে। ১৯১১-এর দ্বারভাঙ্গার বাড়ির অভিজ্ঞতার সঙ্গে ১৯২০-র অভিজ্ঞতা মিলল না। এবারের কণ্ডকারখানা দেখে একেবারে স্তম্ভিত! পরীক্ষার হল, না বাজার। যার যেমন খুশি স্বাধীন ভাবে আলাপ আলোচনা করে লিখছে। ইনভিজিলেটররা পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব নিলেন। বিভাগাগর কলেজের কিছু পূর্ণ অভিজ্ঞতা না থাকলে এই কাণ্ড দেখে স্থাপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেত।

আমার খুব তাড়াতাড়ি লেখা অভ্যাস। ম্যাট্রিকুলেশনে কিংবা ইন্টারমিডিয়েটে প্রত্যেকটি পেপার—কোনোটি আধ ঘন্টা কোনোটি পয়তাল্লিশ মিনিটে শেষ। এক ঘন্টার আগে হল থেকে বেরিয়ে বাওয়া যায় না—সেজন্ত বড়ই অসুবিধে হত। আমি

যেটুকু বুদ্ধি, শুধু সেটুকুই লিখি এবং তার পরিমাণ সব সময়ই কম ।

বি-এ পরীক্ষাতেও আমাকে লেখা শেষ ক'রে থাকতে দেখে শুধু পাশের বন্ধুরা নয়, পাঁচ ছ জনের দূরত্বেরও অনেকে জোড় হাত ক'রে "দাদা ছুনখরটা একটু"—কিংবা "চাষ নখরের পয়েন্টগুলো যদি একটু সংক্ষেপে লিখে জানান"—। সাইকোলজি পরীক্ষার দিন এটি সব চেয়ে বেশি হয়েছিল। দুবের বন্ধুদের লিখে জানাতে হল, ইনভিজিডেটর তা বয়ে নিয়ে পৌছে দিয়ে এলেন। কখনো বললেন নিচে ফেল দিন। নিচে ফেল দিলে পা দিয়ে ঠেসে ঠেসে নিয়ে এগিয়ে দিলেন।

পরীক্ষার এই কমিক দিকটি কলকাতার অভিজ্ঞতাসূচী আমার কাছে প্রকট হয়। এ নিয়ে অনেক ভেবে দেখেছি। পরীক্ষার যে রীতি তাতে এই টোকার ব্যাপারটাও অনিবার্য। এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি আমি, এবং বাঙ্গা গল্পও লিখেছি একটি। গল্পটির নাম 'বাতিল পরীক্ষার কাহিনী'—প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল বছর দশেক আগে। গল্পটি "মারকে লেগে" বইতে স্থান পেয়েছে।

১৯১৯ সালে আমার সঙ্গে পাশা-কালিকাপুরের বতীন্দ্রনাথ বাগচীর কল্যাণীমতী জ্যোৎস্নার বিয়ে হয়। অভিভাবক-নির্দিষ্ট বিবাহ। বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এতে পণ বা কোনো রকম দান গ্রহণ করা হয় নি—বিবাহের যাবতীয় খরচ বাবা বহন ক'রেছিলেন।

এই বছরে আমি প্রথম ক্যামেরা কিনি। ক্যামেরা সম্পর্কে আমার মনে একটা অতি প্রবল আকর্ষণ ছিল বালাকাল থেকে। প্রথম ফোটাগ্রাফ দেখি বাবার। তাঁর অনেক ফোটাগ্রাফ। আমিও ক্লাসটুতে পড়তে প্রথম ফোটা তোলাই। সেটি ক্লাসের ছেলে ও এক জন চাচারের সঙ্গে গ্রুপ ফোটা। কত দিন ধ'রে চেয়ে চেয়ে দেখেছি—জলছবির পরেই এমন বিষয় আর কিছুতে অম্লভব করিনি। ফোটাগ্রাফের রহস্যের কথা ভেবে ভেবে কুলকিনারা পাইনি। যখনই সুযোগ পেয়েছি ফোটা তুলিয়েছি, কিন্তু কি ক'রে ছবি ওঠে তার রহস্য ভেদ করার উপায় কি? হাই স্কুলে পড়তে, ১৯১২তেই সম্ভবত, একখানা ছোট ক্যাটালগ আনাই কলকাতার হাউটন বুচারের কাছ থেকে। বইখানি ৫ ইঞ্চি X ৪ ইঞ্চি হবে, মোটা কাগজে বাঁধানো। তাতে ছোট ক্যামেরার বিজ্ঞাপন ছিল। নানা আকারের ছবির লজ্জাননা আকারের মিনিম্যেচার ক্যামেরা। ক্যামেরার ছবির পাশে পাশে সেই ক্যামেরার তোলা ছবিও একটি ক'রে ছাপা ছিল—কি আকারের ছবি ওঠে তার ধারণা জন্মানোর লজ্জা। তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট যে ক্যামেরা—তার নাম 'Ticca Watch Camera' (টিকা পকেটওয়াচ ক্যামেরা) দেখতে পকেটওয়াচের মতো, তার ছবির আকার ডাকটিকিটের আকার।

এই বইখানা ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। অনেক বছর ধ'রে তাকে বক্ষা করেছিলাম। তার এক একটি পৃষ্ঠা চোখের সামনে ধ'রে মনে মনে ক্যামেরা বাছাই করেছি, কোনটি আমার কেনা উচিত মনে মনে ভেবে ক'রেছি, কিন্তু ফোটা তোলা শিখিয়ে দেবার মতো তখন হাডিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বড় একটি ফিল্ম ক্যামেরা প্রথম স্পর্শ করি দার্জিলিঙে, ১৯১৩ সালে। আমার সেই প্রথম দার্জিলিঙ দেখার চোখেই বড় ক্যামেরায়

কি করে ফোকাস করা হয় তা দেখার সুযোগ পেলাম। যেখানে উঠেছিলাম, সেখানে কোনো এক ভদ্রলোকের একটি ক্যামেরা ছিল, তিনি সেটিকে বাইরে ট্রাইপডে ঠাঁড় করিয়ে কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে নিকটবর্তী একটি অতিকায় গোলাপ ফুলকে ফোকাস ক'রে দেখছিলেন। তাঁকে আমার অন্তরের বাসনার কথা জানাতেই তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাকে ফোকাস করার কৌশল দেখালেন। দার্জিলিঙের প্রকাণ্ড একটি গোলাপ ফুলের ছবি দেখলাম ফোকাসিং স্ক্রীনের উপর। উন্মোচন ছবি, ফুলের উঁচু মাথা নিচু দিকে। ঘরা কাচের উপর সবুজ পাতার সঙ্গে গোলাপফুলের রং কি অদ্ভুত সন্মিলন যে দেখাচ্ছিল! একটি অনাবিক্ত রহস্য-রাজ্যের এই প্রথম স্বাদ। জীবন দল্ল হল।

১৯১৭ সালে যখন ৩০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের কলেজ মেসে থাকি, সে সময় জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন আমার সহপাঠী। জ্ঞানেন্দ্রনাথ পরে ছোটদের লজ্জা কবিতা গল্প ইত্যাদি লিখে খ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর ফোটা তোলামনোর শখ ছিল বেশ। তিনি একদিন আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন কাছাকাছি কোনো গলির মধ্যে এম দত্ত ফোটাগ্রাফারের শোকে। এম দত্তের কোনো ষ্টুডিও ছিল না, বাইরের আলোতে তুলতেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের চুল ছিল কাঁকড়া এবং চেটে খেলানো। তাঁর শখ হয়েছিল সাহেবী পোষাকে ছবি তুলে। সেজন্য তিনি কলার নেকটাই এ একটি কোট কোথা থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন। দোকানে গিয়ে সেজে নিলেন এবং বাড়ি পর্যন্ত ফোটা তোলালেন। পুরো ছবি হল না, হুতির সঙ্গে কোট কলার নেকটাই আর চলবে কি করে। (মাত্রাজে চলে, ছবিতে দেখছি)।

তাঁর তোলা হলে বললেন, আপনিও কলার টাই প'রে নিন। প্রস্তাবটি মনোহর। সাহেব সাজা গেল ধার করা পোষাকে। ফোটা তোলার পর এম দত্ত (মনোমোহন দত্ত) কে বললাম প্লেটে কি ক'রে ছবি ওঠে দেখিয়ে দিন। মনোমোহন বাবু খুব অমায়িক লোক ছিলেন, আমাকে ডার্করুমে নিয়ে গেলেন এবং ডেভেলপ করা দেখালেন। তখন প্যানক্রোমেটিজম-এর জন্ম হয় নি, তখন সাধারণ প্লেটে ছবি তোলা হত, এবং সব প্লেটই কড়া লাল আলোতে নিরাপদে ডেভেলপ করা চলত।

জীবনে এই প্রথম প্লেট ডেভেলপ করা দেখলাম। প্রত্যেকটি



নকলে বাধা দেবেন না কেনেই তিনি বিপরীতদুখী হয়েছিলেন খোড়া থেকে।

ধাপ খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখলাম। ডেভেলপিং, ফিল্মিং ও তার পরে জলে অনেকক্ষণ ধোয়া। ডার্করুমের কাজ দেখা যাবে এই আশায় মনোমোহন দত্তের কাছে আমি নিজে অনেক বার ছবি তুলিয়েছি এবং বন্ধুদের নিয়ে গিয়েছি ছবি তোলাতে। এই উপলক্ষে অনেক বার ঢোকা হল ডার্করুমে। তখন পাইরো-সোডা ডেভেলপিং খুব চলত। এতে প্রেট ডেভেলপ করলে কারো চেহারার যে ছাপ উঠত, তার বাইরের লাইন অর্থাৎ চোখ কান নাক ও মুখের লাইন প্রেটে গভীর দাগ কেটে যেত। তখন পি-ওপি (প্রিণ্টিং: আউট পেপার) ও ডেভেলপিং আউট পেপার বা ব্রোমাইড পেপার— দুই-ই চলত, ক্রেতার পছন্দ যেটি। অনেকের ধারণা ছিল ব্রোমাইড কাগজে ছবি বেশি দিন স্থায়ী হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পি-ওপি প্রিন্টই দীর্ঘস্থায়ী হয়। অবশ্য ব্রোমাইড প্রিন্ট পরে সেপিয়া করলে তা প্রায় চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

বাই হোক, মনোমোহন দত্তের সংস্পর্শে এসে আমার ক্যামেরার আকর্ষণ ক্রমে বেড়ে গেল, এবং তাঁরই সাহায্যে ১৯১১ সালে হুস্পিটাল স্ট্রীটের গোপীনাথ দত্তের দোকান থেকে একটি কোয়ার্টার প্রেট ক্যামেরা কিনলাম। সেকেন্ড হাণ্ড ক্যামেরা ট্রাইপড সহ, লাম দিলাম ৪৫ টাকা। কিম্বা ও প্রেট ক্যামেরা, তিন খানা স্লাইড ছিল। ক্যামেরার ছিল অলডিস র‍্যাপিড রেঞ্জলিনিয়ার (সংক্ষেপে আর:আর) ৭-৭ লেন্স ও ধাতুনির্মিত শাটার। এ ক্যামেরায় রোল কিম্বা ও প্রেট দুই-ই চলত।

ডার্ক রুমের কাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও ক্যামেরায় আলোর তারতম্য হিসেব ক'রে এক্সপোজার দেওয়া দু'এক দিন মাত্র শিখলেই হয় না। কিন্তু উৎসাহ এমনই অদম্য ছিল যে অবিরাম ভুলের পথে গিয়েও দমিনি কখনো। ক্যামেরা কিনে নিয়েই দেশে গিয়েছিলাম, তাই দেখিয়ে দেওয়ার কেউ ছিল না। 'ট্রয়াল অ্যান্ড এরর' নীতিতে চলা ভিন্ন আর কোনো উপায় ছিল না। বাথগেট থেকে প্রেট কেমিক্যাল ইত্যাদি বেল-পার্সেলে আনিতে নিতাম। তখন অধৈর্য ছিল বেশি, তাই অর্ডার দেবার তৃতীয় দিনেই সব পাওয়া যেত বলে এখানে অর্ডার দিতাম, যদিও দাম অনেক বেশি পড়ত।

নিজ হাতে ছবি তুলছি এবং এত সহজে ছবি উঠছে এই ব্যাপারটি আমাকে অতি যাত্রায় উৎসাহিত ক'রে তুলল। দিন রাত প্রায় কোটা তোলাতেই মেতে রইলাম। কয়েকটি বিশেষ বাধা আলোয় অতি চমৎকার ফোটা উঠত। সেই বিশেষ আলোয় এক্সপোজার আবিষ্কার ক'রে নিয়েছিলাম। ফোটা সব সময়েই বোদে ভাল হত, ছায়াতে তোলায় এক্সপোজার তখনও সঠিক বুঁজে পাইনি। ছায়াতে বেশি বা কম হত। প্রেট ছিল তখন কম দ্রুত। সবই ইলফোর্ড প্রেট। হু রকম পাওয়া যেত, অর্ডিনারি ও স্পেশাল র‍্যাপিড। এই স্পেশাল র‍্যাপিডেই তুলতাম, সংক্ষেপে এর নাম ছিল এস-আর। কোডাক রোল কিম্বাও তুলতাম। বারোজ গুয়েলকামের 'ট্যাবলয়েড' মার্কা কেমিক্যাল বেশি ব্যবহার করতাম। প্রেট ও কাগজ দুইয়েরেই 'আমিডল' ব্যবহার করতাম।

পি-ওপি কাগজও অনেক ব্যবহার করেছি। দিনের আলোয় ছাপা, একটু একটু খুলে দেখা যেত কতদূর এগোচ্ছে। তার পর গোল্ড ক্লোরারাইড সলিউশনে 'টোন' করে হাইপোতে দিতে হত। ছাপার পরেই হাইপোতে দেওয়া চলত সেলেক্টোনিং পেপারে।

সব চেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে প্রিয় ছিল আমার এই কাগজটি। হু:খে: বিষয় এ কাগজ এখন আর পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞানসাগর হাট্টেলে থাকতে এ ক্যামেরায় বন্ধুদের ছবি তুলে দিয়েছি। যতই অনেক সময় ডেভেলপ করতাম; কখনো দিনে: বেলায় দরজা জানালা বন্ধ ক'রে লেপের ভিতর বসে, কখনো একটা হাঁড়ির মুখে লাল কাগজ জড়িয়ে, উপরে একটি ফুটে ক'রে, ভিতরে মোমবাতি জ্বলে সেই আলোয়। যে কোনো যরকে ফোটোগ্রাফিক ডার্করুমে পরিণত করতাম প্রায় ছো ক'রে।

একদিন ইচ্ছে হল হাট্টেলের একখানা ছবি তুলব। তখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির থেকে হাট্টেলের ভাল ছবি তোলা সম্ভব ছিল। দু'তিনজনকে গিয়ে অমুমতি চাইলাম। বললাম এখান থেকে আমাদের হাট্টেলের একখানি ছবি তুলতে চাই। কিন্তু বাদে: কাছে চাইলাম তাঁরা হয় তো অমুমতি দেবার অধিকারী নন, তাই তাঁদের মনে সন্দেহ ঢুকল, ভাবলেন সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে বললেন, না সে কি ক'রে হয় ইত্যাদি। অবস্থা সুবিধে জনক না দেখে আমি তত্বরত বন্ধুদের দিকে পিছন ফিরে একখানা ফোটা তুলে নিলাম, কাউকে জানতে দিলাম না।

ছবিখানা অতি সুন্দর হয়েছিল। তার অনেক কপি করতে হয়েছিল তখন। আমার কাছে নেই সে ছবি, বীরা নিয়েছিলেন: তাঁদের কারো কাছে থাকতেও পারে।

হুটিনতুন আকর্ষণের মাঝখানের সংকীর্ণ খাতের ভিতর দিয়ে চলা, সেজ্জাই পাঠের বোঝা কিছু কন্ডিয়ে নিতে হয়েছিল—যায়ে বলে jettison করা, তাই। ১৯২০ সালে পরীক্ষা দিয়ে চলে গেলাম সাহেবগঞ্জে, বন্ধু প্রবোধচন্দ্রের কাছে। আগে থাকতে: আমাদের আয়োজন পাকা ছিল, আমরা ওখান থেকে সক্রিয়গি মনিহারীঘাট কাটিহার পার্বত্যপুত্রের পথে দার্জিলিং রওনা হয়ে গেলাম।

সাত বছর পরে আবার দার্জিলিং!

সঙ্গে ছিল সাহেবগঞ্জের গৌর মজুমদার আর সম্ভবত ইন্দু মুখার্জে মনে করতে পারছি না ঠিক। গ্রীষ্মকালে বাংলা বা বিহারে ব'লে দার্জিলিঙের শীত করনা করা দু:সাধ্য। প্রবোধকে এক বক জোর ক'রেই শীতের পোষাক সঙ্গে নিতে রাজি করিয়েছিলাম কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙের গাড়িতে উপরে উঠতে উত্তাপে তারতম্য গাড়ির মধ্যে ব'সে অনেক সময় বোঝা যায় না, বিশেষ ক'রে আগে যদি এক বা একাধিক দিন ট্রেনে কাটিয়ে আসা যায় ক্লাস্ত অবস্থার শীত কিছু কম লাগে। তাই কার্শিয়াং ছেড়ে বত উপরে উঠছি, তত প্রবোধ জিজ্ঞাসা করছে শীত কোথায়!

আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল ঘুম। দার্জিলিঙের আগের ষ্টেশন এটি এবং দার্জিলিঙ থেকে এক হাজার ফুট বেশি উঁচু। তাই স সময়েই এখানে দার্জিলিঙ থেকে শীত একটু বেশি বোধ হয় প্রবোধচন্দ্র অমৃতাপ করছিল আমার কথায় এত সব ভারী জাম ব'য়ে আনার জ্ঞা। ঘুম ষ্টেশনে নেমেও মনে হচ্ছিল শীত কিছুই নেই। কিন্তু হু'চার পা হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি ঠাণ্ড প্রবাহ বয়ে গেল যাতে আমাদের হাড়স্থ চর্কপিয়ে তুলল সে এক অতি বিশ্রী রকমের কড়া ঠাণ্ড। আমি প্রবোধকে:

প্রশ্ন করলাম, কেমন বোধ হচ্ছে? প্রবেশ ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল আঃ কি আরাম!

এখানে উঠলাম গোরের ভগিনীপতির বাড়ীতে। খুব কাঁকা জায়গায় বাড়িটি—সর্দাদ জোর ঠাণ্ডা হাওয়া, বাইরে এলোই। আমার এবারের আসার অতিরিক্ত আকর্ষণ হচ্ছে নতুন কেনা ক্যামেরাটি। দার্জিলিংয়ের স্বপ্নের মতো কোমল এবং স্পর্শাতীত স্নান রূপটি ক্যামেরায় ধরব। এ রূপটিকে কোমল বলছি অল্প অর্থে। দার্জিলিং আমার কাছে একটি বিশেষ শহর নয়। যেখান থেকে তরাইয়ের জঙ্গল শুরু হল সেইখান থেকে আরম্ভ করে আলোছায়ার সঙ্গে, অরণ্য ও খোলা পাহাড়ের সঙ্গে, লুকাচুরি খেলতে খেলতে রেলগাড়ি যতদূর এসে শেষ হয়েছে ততখানি পথ ও তার সঙ্গে তুষারচাকা কানকজন্মা মিলিয়ে যতটা হয় ততটা। তা আমার কাছে কখনো স্পর্শযোগ্য বোধ হয় নি, একটা অদ্ভুত আয়ত্বাষ্ট্রি ধ্যানমুপেই তা আমার চেতনার মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। নীহারিকা-পুঞ্জের মতো একটি অথবা রূপ, তাই কোমল।

আমার ধারণা ছিল, এ রূপের কিছু অন্তত ক্যামেরায় ধরা পড়বে। কিন্তু পড়ল না। প্রথমত সে আমার প্রথম চেষ্টা, দ্বিতীয়ত ক্যামেরার শক্তিশীল তখন আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এক্সপোজার দিয়েছি, উন্মুক্ত ছবি হয়েছে, কিন্তু সে শুধুই পাথর, শুধুই স্ট্রাটোলাইন। সমস্ত আলোছায়া, কুয়াসা ও মেঘে গড়া অভিনবের আবগময় অল্পভূতি ক্যামেরায় ছবিতে ওঠেনি।

১৯১০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশ। সম্ভবত সেটি জুলাই মাস। অ্যামহাউট্রী টীতে বৈদ্যানে কুস্তগীনের এইচ বোসের বাড়ি, তার পাশ দিয়ে ফকিরচাঁদ মিত্র টীতে। সেইখানে একটি মেস ছিল, তার পরিচালক ছিলেন কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। যতদূর মনে পড়ে তিনিও তখন পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন। এই মেসের সন্ধান আমাকে কে দিয়েছিল তা আর এখন মনে পড়ে না, তবে এ মেসের পরিবেশটি বেশ ভালই লেগেছিল, যদিও বেশ দিন এখানে আমি থাকিনি। থাকিনি তার কারণ কিছুদিনের মধ্যেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল এবং এই আন্দোলনে আমার স্বাস্থ্যও যোগদিল।

একদিন ঠার থিয়েটারে সভা। চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি এবং গান্ধী বক্তা। বিজ্ঞপ্তি পড়ে ঠার থিয়েটারে গিয়ে আসন দখল করেছিলাম। চিত্তরঞ্জন দাশ আসতে দেরি করছেন, গান্ধীজির তো কোনো খবরই নেই, আমরা অধীর হয়ে উঠছি, এমন সময় সভার উদ্বোধনার একটি নতুন জিনিষ করলেন। তাঁরা ছাত্রসমাজ থেকে একজনকে সভাপতি করে দিলেন। এই ছাত্র শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

সাবিত্রীপ্রসন্ন তখন ফকিরচাঁদ মিত্র টীটের মেসে 'ভাবের অভিব্যক্তি' অঙ্কীলনে বিশেষ মনোযোগী, আমি তাঁর নানা মুখভঙ্গির ফোটোগ্রাফ তুলে দিছি। থিয়েটার করার তাঁর পটুৎ আছে শুনেছি, অতএব মঞ্চভাতি বা ঠেকজাইট তাঁর স্বভাবতই ছিল না। তিনি তাঁর মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে বীরসে আহ্বান জানালেন—তোমরা সব বেরিয়ে এসো স্কুল কলেজ ছেড়ে। তাঁর বক্তৃতা চলার

অবস্থায় চিত্তরঞ্জন দাশ এসে পৌঁছলেন সভায়। গান্ধীজির তখনও কোনো খবর নেই। দর্শকদের প্রধান উদ্বেগ গান্ধীজিকে দেখা। অবশেষে 'ঐ এসেছেন—ঐ এসেছেন' রূপ উত্তেজক ধনিটি শ্রোতব মতো প্রচারিত হয়ে গেল প্রেক্ষাগৃহের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

গান্ধীজির পিঠে এক ভারী চটের থলে, তার ভারে তিনি হয়ে পড়েছেন। তিনি এসেই ঘোষণা করলেন, তাঁর থলেয় রয়েছে বাঙালী মহিলাদের অলঙ্কারের দান। মহিলাদের এক সভায় তিনি এতক্ষণ বক্তৃতা করছিলেন, তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য কামনায় সবাই নিজ নিজ অলঙ্কার খুলে দিয়েছেন গান্ধীজির হাতে। গান্ধীজি মঞ্চে প্রবেশমাত্র তাঁর মুখে স্পটলাইট নিক্ষেপ করা হ'ল নাটকীয় ভঙ্গিতে। সব মিলে বেশ একটা রোমাঞ্চকর দৃশ্য। হাততালি আর হৃৎকম্পনিত প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ছে। যেন সত্যি সত্যি একটি নাটকের দৃশ্য।

আমি পাশের বন্ধুকে চূপে চূপে বলছি—'আসলে গান্ধীজী বাংলাদেশে এসে ডাক্তারি করে গেলেন।' অল্প এই জাতীয় ডাক্তারিতে গান্ধীজি ছিলেন গুস্তাদ। পরে শুনেছি গয়না প'রে গান্ধীজির সভায় মেয়েদের অনেকেই যেতে দিতেন না।

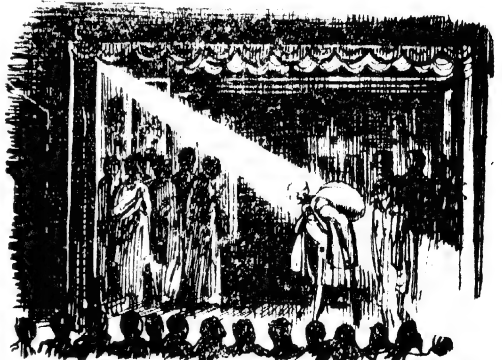
ফকিরচাঁদ মিত্র টীটের মেসে সাহিত্যিকদের আনাগোনা ছিল। 'উপাসনা' সম্পাদনা করতেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। উপাসনার কাজ এই মেসেই অনেকটা চলত। এখানকার বাসিন্দা আর দু'জন, প্রবেশ মজুমদার ও চাকচন্দ্র সরকার বর্তমানে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। প্রবেশ মজুমদার শুভবাত্রা নাটকের লেখক, ও চাক বাবু ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক।

এই মেস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব কম নয়। আমি অধিকাংশ সময় নরসিং সেন নরেন্দ্র সেন দ্বোরার হয়ে যেতাম। ইংরেজী 'এ গুপ'—এ ভাতি হয়েছিল। তখনকার দিনের একধানা খাতা অবিকার করেছি কিছুদিন হল, তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি। (আমার বোল নম্বর ছিল ১০৪, সেকশন-টু, ১৯২০)

প্রোফেসর এন, চ্যাটার্জি—ল্যাব্জুরেজ

"এম, বোম —আরিস্টোফেনিস ( দি ক্লাউডস )

"এইচ, মৈত্র —ওয়ার্ডসওয়ার্থ



গান্ধীজির পিঠে এক ভারী চটের থলে।

প্রফেসর এন, চ্যাটার্জি—ল্যাপুয়েজ  
 " পি, সি, বোথ —চসার  
 " ক্রিমজার —শেজপীয়ার  
 " জে, জি বার্নার্ড—স্পেশাল পীরিয়ড অফ পোয়েট  
 " এস, রায় —লিটারেচর অ্যান্ডো-স্ট্রাক্সন পীরিয়ড  
 " ক্রিফেন —সিলেকটেড পীরিয়ড অফ প্রোস  
 ( এসেজ অ্যাণ্ড ক্রিটিসিজম )  
 " কে বি রায় —গিবন  
 " এস, সেন —প্রোস পীরিয়ড ( ফিকশন )  
 " জে, বোথ —লিটারেচর—রেটোরেশন পীরিয়ড  
 " আর, পি মুখার্জী—মিলটন  
 এম বোথ—মনোমোহন বোথ ( অরবিদ্য বোথের স্ত্রী ), তখন  
 বেশ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, মাথায় খুব তাক শাদা চুল, হাঁওরায় সর্বা

উড়ছে, কঠোর নিষেজ, খুব কাছে না বসলে সব কথা ভাল শোনা  
 যেত না। ক্রিমজার ছিলেন কীপদেহ, দেখে কয় ব'লে বোধ হত।  
 ক্রিফেন ছিলেন খুব স্বাস্থ্যবান এবং দীর্ঘ। তিনি বড় ক'রে নোট  
 লিখিয়ে দিতেন। প্রকল্পের বোথ খুব উৎসাহী শিক্ষক ছিলেন,  
 শুধু বড়তা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন না, প্রত্যেককে পড়া জিজ্ঞাসা  
 করতেন ঠিক স্থলের শিক্ষকের মতো। কারো কাকি দেবার উপায়  
 ছিল না। তখনকার দিনের এই অধ্যাপকদের প্রায় সবার চেহারা  
 আজও স্পষ্ট মনে আছে। মনে আছে সুরাস রায় স্মরণ খুবক  
 ছিলেন, জীরমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও সন্তত তখন পচিশ ছাব্বিশ  
 বছরের যুবক এবং গৌরাঙ্গ। ক্রটনে দুটি নাম একসঙ্গে আছে,  
 জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরাস রায়।—গত ডিসেম্বর ১৯৫৬,  
 এঁরা দুজন একদিনের ব্যবধানে পরলোক গমন করেছেন।

[ ক্রমশঃ ।

## রাজধানীর পথে-পথে

উমা দেবী

ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট  
 ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের সড়ক আকাশের  
 চাপা বাতাসের  
 ঢিলে কাঁচার লুকে পড়েছে চপলমতি  
 —এক প্রজ্ঞাপতি !  
 তার হালধি পাখিতে এগনো চরতো কোনো  
 নীলপায়ের মধু মাখানো !  
 কাছীরের সুনীল হ্রদের তরঙ্গ-তরঙ্গে  
 স্বর্গাত বৌদের লোলায়িত রঙ্গে  
 সেও হয়তো কাঁপিয়েছে পাখা—অগাধ স্থখে  
 হয়তো বা ভাল হ্রদের তীরে কোনো পুঞ্জিত শাখার বৃকে !  
 তার পর ভেসে এসেছে নিশীথের অসহ অন্ধকারের তুলনা  
 ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের গলিতে  
 —অতর্কিতে  
 একটি সুরতি স্বপ্নের মত !  
 কিংবা হয়তো  
 শহরের দুঃখ-আতুর কোনো শহবস্তলীতে  
 অকস্মৎ বেজে ওঠা ঈধর-সঙ্গীতে  
 মধুর কণ্ঠের মত !  
 সে কেমন ক'রে এল এই সড়ক একমুখা বাস্তব মাঝ দিয়ে ?  
 অল্প পরিসরের এক বন্ধপ্রায় জানলার কাঁক দিয়ে—  
 অনেক লোকচক্ষুর পাহারা এড়িয়ে  
 অনেক মাঠ-ঘাট পেরিয়ে !  
 ভাবছিলাম মনে মনে কেমন ক'রে একে পথ বুঝিয়ে দিই

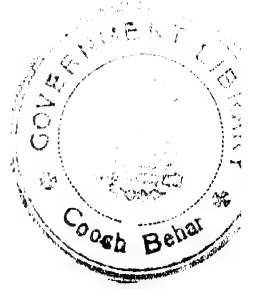
জানিয়ে দিই সেই উজ্জল নীলাকাশের স্মৃতি !—  
 হায়—হায় রে চপলমতি !  
 হঠাৎ সে বসল এসে মামলার নথি-ভরা টেবিলের উপরে  
 যেন রহস্য ভরে  
 অল্প অল্প পাখা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে  
 বলতে লাগল ঈশিয়ে ঈশিয়ে—  
 এত দিনে গেলাম খুঁজে পথ—  
 পূর্ব মনোবধ—  
 সেই কাছীরের ডাল হ্রদের সুরভি বাতাসে  
 ভর দিয়ে ভেসে এলাম কলকাতার মুক্তাকালে  
 এই এটর্নী আঙ্গিনের পরীরাজ্যের দেশে  
 অবশেষে  
 সেখানে বোপামুন্ডার চাকে  
 নিবিপাকে  
 ক্ষরিত হচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে স্বর্গের বিন্দু  
 প্রথম উদয় আভা অঙ্গে নিয়ে গলে যাচ্ছে স্তব্ধাঘ্রিত ইন্দু  
 জনদের ধমনীরাজ্যের পদ্মরাগ—আরক্ত তরল  
 আর নয়ন উজানের শুভ মুক্তাফল  
 এর ধূলায় অদৃষ্টের অপার রহস্যে স্পন্দিত  
 অনিশ্চয়ের আকস্মিকতায় অভিমুখিত  
 আর কিরে যেতে চাই না সেই পুরানো ঈশগে  
 মিঠিয়ে-যাওয়া ফাটল-ধরা পুরানো ধরণের সৌন্দর্যে  
 চুকিয়ে দিয়ে এলাম সকল সেনা—  
 তাকিয়ে দেখি প্রজ্ঞাপতির ভঙ্গিটা কিছু চেনা-চেনা !



# ববীন্দ্রায়ণ

( পূর্ণ-প্রকাশিতের পর )

৩খপেঙ্গনাথ চট্টোপাধ্যায়



পাকানন ও তরীয় পিতৃবা শুকদেব জাহাজে সরবরাহকারের ব্যবসায় অর্থসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। গোবিন্দপুরে বাস করিবার সময় প্রতিবেশী দীর্ঘবাদি শ্রোয়ী দ্বারা যে ব্রাহ্মণ বলিয়া 'ঠাকুর' আখ্যায় তাঁহারা পরিচিত হইয়াছিলেন, সেই 'ঠাকুর' আখ্যাত্তেই ইংরাজ বণিক ও কান্তেনদিগের নিকটও পরিচিত হইলেন। তাঁহারাও ইগাদিগকে 'ঠাকুর' বলিয়াই ডাকিতেন। অর্ডার দেওয়া বিল করা, সমস্তই 'ঠাকুর' নামেই হইত। এইরূপে পাকানন ও শুকদেব উভয়েরই 'ঠাকুর' উপাধিই প্রচলিত হইয়া গেল। তৎপূর্বে তাঁহাদের শাখায় 'চক্রবর্তী' উপাধি প্রচলিত ছিল। সরকারী কাগজপত্রে এবং সুপ্রসিদ্ধ বিচারালয়ের মকদ্দমার নথিতে এই 'ঠাকুর'-এর নানাবিধ রূপ দেখা যায়। বাঁহারা ইংরাজিতে ঠাকুর স্বাক্ষর করিতেন তাঁহারা তখন লিখিতেন Thakoor. শুকদেব-তনয় কৃষ্ণচরণ ও কৃষ্ণচরণের পৌত্র রামরতনের স্বাক্ষরে এবং জয়রাম-সুত দর্পনারায়ণের স্বাক্ষরে এবং রামসন্তোষ বা সন্তোষরামের পুত্র বাজারামের স্বাক্ষরে Tagoor দেখিতে পাওয়া যায়। দর্পনারায়ণের পৌত্র ও হরিমোহনের পুত্র উমানন্দনের স্বাক্ষরে Thaquore দেখা যায়। দর্পনারায়ণ ও তাঁহার অগ্রজ নীলমণির পুত্রদের ও রামরতনের পুত্রদের সময়ে Tagore স্বাক্ষর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার পর সকল শাখাতেই ইংরাজী স্বাক্ষরে Tagore রূপ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ঐক্যবান্ধ চিরদিন Tagore লিখিতেন এবং তাঁহার সমকালবর্তী সকল শাখার সকলেই তাঁহাদের উপাধির এইরূপ ইংরাজি বানান করিতেন। মাননীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর লিখিয়াছেন যে "ঠাকুরের ইহা বিশুদ্ধ ইংরাজি রূপ না হইলেও এই বানানই লিখিতে হইবে নতুবা অনেক দলিলপত্রে গোল হইবে।" এই সময় হইতেই যে সকল ব্রাহ্মণ-পরিবারের ঠাকুর উপাধি ছিল যেমন পাণ্ডুরিয়াঘাটা নদীঘাটা স্ট্রীটের (অধুনা মহবি দেবেন্দ্রনাথ বোড) ঠাকুর বংশ অথচ গৈরাণী নদ ইহাই জানাইবার জ্ঞান তাঁহাদের নিজের উপাধি লিখিতেন Thakur এই বংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মহবি দেবেন্দ্রনাথের বনিষ্ঠ বন্ধু থাকায় মহবি তাঁহাকে সখা বলিতেন এবং মহবি-পরিবারে তিনি 'সখাবাবু' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই দেবেন্দ্রনাথের পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি অফিসকুমার, এম, এ; বি, এল চিরদিন Thakur স্বাক্ষর করিতেন, তাই প্রেসিডেন্সি কলেজ ফিজিয়ার ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেক্টরে তাঁহাদের নামের এইরূপ পাখির বানান ইংরাজিতে ছাপা হইয়াছে।

আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদে শুকদেব বংশীয় চৌববাগানের মরতন ঠাকুরের একমণ্ড ভূমি সম্পত্তি ক্রয়ের কোবালায় মরতন ঠাকুর চক্রবর্তী নাম দেখিতে পাই এবং তাহা হইতে

অনুমান করা অসম্ভব হইবে না যে, পিতৃবা শুকদেবের উপাধি ভাতৃসুত্র পাকাননেরও উপাধি ছিল। পাকানন ও শুকদেব তাঁহাদের ব্যবসায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদি গঙ্গাতীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহাদের আবাস নির্মাণ করিলেন। পাকানন তাঁহার পুত্র জয়রাম ও সন্তোষরাম বা রামসন্তোষ এবং শুকদেব তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচরণকে কোম্পানীর অফিসে কর্ম করিবার উপযোগী কিছু কিছু ইংরাজি শিক্ষা দিলেন। তাহা ফলে জয়রাম ও রামসন্তোষ কলিকাতার আমীন নিযুক্ত হন এবং তাঁহারা নৃত্যদ্রুটি ও গোবিন্দপুর জরিপ করেন। পরাশরীশ্বরের পরে যখন শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ মুন্সীকে (পরে বাজা) কোম্পানী জায়গীর দিয়াছিল তখন এই আমীন ঠাকুরদের জরীপের নির্দিষ্ট সীমান্তসারে উহা প্রদত্ত হয়। শুকদেব ও পাকাননের মৃত্যুর পর জয়রাম ও রামসন্তোষ কৃষ্ণচরণের সহিত পৃথক হইয়া জানবাজারে ও তালতলায় নিজের আবাস নির্মাণ করেন। বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর তাঁহাদের এই বাড়ি আমীন ঠাকুরদের ভিটা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। যশোহর বাবপাড়ায় তাঁহাদের যে বাস ছিল তাহাকে লোকে তখন আমীন ঠাকুরদের ভিটা বলিত। জয়রাম পরে ধনসাহারে (অধুনা ধনতলা) আবাস ও বাগানবাড়ি নির্মাণ করিয়া সুপরিবারে বাস করেন এবং এইখানেই শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ, শিবমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তখন সমাঝেতে দোল-দুর্গোৎসব করিতে আরম্ভ করেন। জানবাজারে, তালতলায় তাঁহার যে সকল ভূসম্পত্তি ছিল তাহার অধিকাংশ পাণ্ডুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো উভয় বংশীয় ঠাকুরদের অধিকারে এখনো আছে। তালতলার বাজার ও হরকুমার ঠাকুর দ্বোয়ার তাহাদের অঙ্গভূমি। জয়রামের বাড়ী ও বাগান এক্ষণে ফোর্ট উইলিয়াম ট্রুর্গের অন্তর্গত। যখন সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন তখন জয়রাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নবাব ক্ষতিপূরণের টাকা দেন, বাহার কিয়দংশ জয়রামের মৃত্যুর পরে তাঁহার বংশীয়েরা পাইয়াছিলেন দেখা যায়।

জয়রামের আনন্দিরাম, নীলমণিরাম, দর্পনারায়ণ ওরফে মুকুন্দরাম ও গোবিন্দরাম নামে চার পুত্র ও সিদ্ধেশ্বরী নামে এক কন্যা হয়। জয়রাম সিদ্ধেশ্বরীর সহিত বশোহরের গোলাকচন্দ্র মজুমদারের বিবাহ দিয়া জানবাজারের ভূমিখণ্ডে একাংশে তাঁহাদের জঙ্গ একটা বাড়ী নির্মাণ করাইয়া ও তৎসংলগ্ন কিছু জমি দিয়া তাঁহাদের কলিকাতায় বসবাস করাইয়াছিলেন। আনন্দিরাম কয়েকটি কল্যাণের জঙ্গ পিতা কর্তৃক তাঁজাপুত্র হওয়ার পিতৃগৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া নৃত্যদ্রুটির পাণ্ডুরিয়াঘাটা অঞ্চলে বাস করেন। এখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রীটের যে অংশে প্রসিদ্ধ

মহামতোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন বৈষ্ণবত্বের বাড়ি, পূর্বে তাগাংক আনন্দিরাম ঠাকুরের রাস্তা বলিত। জয়রামের জীবদ্দশায় আনন্দিরামের মৃত্যু হয়। আনন্দিরামের পরিবারবর্গ কিন্তু ধনসায়ারের বাড়িতে থাকিয়া যান। জয়রামের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দরাম এবং শুকদেবের পুত্র কৃষ্ণচরণ উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের কন্ট্রাক্ট পাইয়াছিলেন। যখন বর্তমান উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের জন্ত গোবিন্দপুত্রের অনেক ভূমি গৃহীত হয় তখন আদিগঙ্গাতীরস্থ বাগভবন পরিভাগ করিয়া কৃষ্ণচরণ চৌরবাগানে অনেক ভূমি সংগ্রহ করিয়া আবাসবাটী নির্মাণ করেন। ইহার কতকংশ (৩৪, ৩৪।১, ৩৫নং মুন্সারাম বাবু ষ্ট্রীট) এখনো এই বংশীয় শ্রীমান সুনীতকুমার ঠাকুর, এম-এ; এল-এল, বি; এডভোকেট ও তাঁহার ভ্রাতাদের অধিকারে আছে। ধনতলা হইতে গড়ের মাঠের অনেক অংশ ফোর্ট উইলিয়াম পর্যন্ত ধনসায়ার বসিয়া পরিচিত ছিল। তখন কোম্পানীর কোলা ছিল বর্তমান বড় ডাকঘরের স্থানে। ধনসায়ারের বাড়ি গৃহীত হইবার পর নীলমণি এবং ভ্রাতা দর্পনারায়ণ সপরিবারে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাখুরিয়াবাটার আসিয়া বাস করেন। তখন আনন্দিরামের পরিবারবর্গ ও গোবিন্দরামের বিধবা স্ত্রী রামপ্রিয়া দেবী ইহাদের পরিবারভূক্ত ছিলেন। পাখুরিয়াবাটার আবাস-বাড়ি এবং শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহের জন্ত ঠাকুরবাড়ি নির্মিত হয় এবং গঙ্গাতীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট বৈদ্যানে মহর্ষি দেবেন্দ্র বোডের সহিত মিশিয়াছে, সেইখানে শিবমন্দির এখনো বর্তমান। নীলমণি ও দর্পনারায়ণের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, ইহা লইয়া মতভেদ দেখা যায় কিন্তু ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আনন্দিরামের বংশীয় রাধাবল্লভ জয়রাম বংশীয়দের বিরুদ্ধে সম্পত্তি পাইবার জন্ত যে মোকদ্দমা করেন, তাহাতে তাঁহাদের পুরোহিত রত্নবল্লভ ভট্টাচার্য বলেন যে, নীলমণি ও দর্পনারায়ণকে তিনি দেখিয়াছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে নীলমণি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভূমিক্রয়ের দলিলও ইহার পরিপোষক। দেখা যায় ১৭৬১ হইতে ১৭৮০ খৃঃ পর্যন্ত যে সকল সম্পত্তি ক্রীত হইয়াছে তাহা নীলমণির নামেই হইয়াছে। তাহার পরে ১৭৮৪ হইতে ১৭৯৩ পর্যন্ত দর্পনারায়ণের নামে এবং ১৭৯৩ হইতে ১৮১৬ পর্যন্ত গোপীমোহন ও লাডলিমোহন উভয় নামে ক্রীত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে যিনি যখন পরিবারের কর্তা, তখন তাঁহার নামেই সম্পত্তি খরিদ হইয়াছে। ১৭৮৪ সালে নীলমণি ভ্রাতার সহিত পৃথক হইয়া সম্পত্তিতে তাঁহার অংশের মূল্য নগদ লক্ষ টাকা এবং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারদর্শনশিলা লইয়া জোড়ার্নাকোয় আসিয়া বাস করেন ও জোড়ার্নাকোয় বাড়ি নির্মিত হয়। ১৭৯৩ খৃঃ দর্পনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রথম স্ত্রীর পুত্রদের জ্যেষ্ঠ গোপীমোহন ও দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্রদের জ্যেষ্ঠ লাডলিমোহন এই উভয় নামে সকল বোধ সম্পত্তি খরিদ হইয়াছিল। গোপীমোহনের অগ্রজ রাধামোহন ও অগ্রজ কৃষ্ণমোহন বৈষ্ণবমন্ত্র তাগ করায় বৈষ্ণব দর্পনারায়ণ তাঁহাদের ত্যাগপত্র করেন। তাঁহার পঞ্চম পুত্র প্যারীমোহন মুক ও ধির ধাকায় তাঁহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার অবশিষ্ট চার পুত্রকে দিয়াছিলেন, বাটার মধ্যে গোপীমোহন ও চরিমোহন তাঁহার প্রথম স্ত্রী তারিণী দেবীর গর্ভজাত ও লাডলিমোহন ও মোহনমোহন তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী বদনমণি দেবীর গর্ভজাত।

গোপীমোহনের বংশে তৎপ্রপৌত্র ৬মহারাজা প্রজোৎকৃমা হরিমোহনের বংশে সুরশিল্পী শ্রীমান দক্ষিণামোহন, লাডলিমোহনে বংশে রথীন্দ্রনাথ, এম, বি এবং মোহনমোহনের বংশে ৬রা প্রফুল্লনাথ সাধারণের নিকট সমধিক পরিচিত।

নীলমণি জোড়ার্নাকোয় আসিয়া বাস করিবার পর ১৭৯১ খৃঃ পরলোক গমন করেন। তিনি উড়িষ্যায় কিছুদিন আদালতে কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, যে সময় তিনি তমলুকে দেবী বর্গভীম মন্দিরের সংস্কার করাইয়া দেন। সে সময় তাঁহার স্বতন্ত্র ব্যবসায় ছিল। পরে ২৪ পরগণা আদালতের সেরেস্তাদার হইয়াছিলেন তিনি চেস্টোটিয়ার ঘোষাল বংশের কস্তা ললিতা দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার পিতৃনাম ও বাসগ্রামের নাম সংগ্রহ করিতে পাওয়া যায় নাই। নীলমণির তিন পুত্র রামলোচন, রামমণি ও রামবল্ল ও এক কস্তা কমলমণি। কমলমণির সহিত কালীঘাটের হরিশচন্দ্র হালদারের বিবাহ দিয়া স্বগৃহে গৃহজামাতা রাখিয়াছিলেন নীলমণির পুত্রদের সকলেরই স্বতন্ত্র ব্যবসায় ছিল। তাহা উপর রামমণি কলিকাতা পুলিশ অফিসে প্রধান বাজার কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার জন্ম ১৭৫১ খৃঃ। রামবল্লভ কটক আদালতের একজন কর্মচারী ছিলেন ও পরে কটকের জমিদারী ক্রয় করিয়া জমিদার হন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু। ইনি বশোহরের স্বসমাজে মজুমদার বংশে বিবাহ করেন। ইহার একমাত্র পুত্র বহুনাথের শৈশবে মৃত্যু হয়। ইহার দুই কস্তা জ্যোষ্ঠা হরসুন্দরী বা বিমোদিনী ও কনিষ্ঠা গৌরী। গৌরীর স্বামী সনাতন মুখোপাধ্যায় ও তাঁহাদের কোনো সন্তান হয় নাই। জ্যোষ্ঠা হরসুন্দরীর সহিত বীরনগরের পেলারাম বা হলধর মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। হরসুন্দরীর তিন পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও কালাচাঁদ ও একমাত্র কস্তা আনন্দময়ী। দ্বারকানাথ তাঁহার বাড়ির দক্ষিণে একটি বাড়ি খরিদ করিয়া বসবাসার্থ হরসুন্দরীকে তাহা প্রদান করেন। দ্বারকানাথের দ্বিতীয়বার ইয়োরোপ যাত্রায় ভাগিনের নবীনচন্দ্র সঙ্গী হন।

নীলমণির দ্বিতীয় পুত্র রামমণির পত্নী দক্ষিণডিহি শুকদেব বায়চৌধুরী বংশীয় রামকান্ত বায়চৌধুরীর কস্তা মেনকা দেবী। ইহারই গর্ভে কস্তা জাহ্নবী, পুত্র রাধানাথ, কস্তা রাসবিলাসী ও পুত্র দ্বারকানাথের জন্ম। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ৮মাস বয়ঃক্রমকালে দ্বারকানাথের মাতৃবিয়োগ হয়। রামমণি দ্বিতীয়গণকে বশোহর জগন্নাথপুরে শুকদেব বায়চৌধুরী-বংশীয় দুর্গামণিকে বিবাহ করেন। দুর্গামণির গর্ভে রামমণির রমানাথ নামে (পরে মহারাজা) এক পুত্র এবং লবনময়ী নামে এক কস্তা হয়। রামমণি তাঁহার সর্বজ্যোষ্ঠা সন্তান জাহ্নবী দেবীর সহিত কান্দীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়া গৃহে রাখেন। দ্বারকানাথ ইহার বাসের জন্ত সিমুলিয়ায় একটি বাড়ি করিয়া দেন। এখন ইহাদের বংশাভাব। রামমণির তৃতীয় সন্তান রাসবিলাসী দেবী। ইহার সহিত চন্দননগর বিবিরহাট নিবাসী স্ত্রীদীনন্দন করাসী সরকারের দেওয়ান রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ভোলানাথের বিবাহ হয়। ভোলানাথ গৃহজামাতা থাকেন ও পরে দণ্ডপ্রমুখ গ্রহণ করেন। ইহার দুই পুত্র মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন। চন্দ্রমোহন চিরকুমার ছিলেন ও বাঙলার প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতার প্রথম ডিষ্ট্রিক্ট বেজিষ্টার অফ স্যাসিওয়েলেন্স।

যখন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন প্রথা পরীক্ষার জন্য Justice of the Peace পদের সৃষ্টি হয়, তখন প্রথম উক্ত পদে নিযুক্ত হন মাতুল ঝারকানাথ ও ভাগিনেরথর মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন। মদনমোহন মাতুল প্রস্তুত এক খণ্ড ভূমি মাতুলজালের দক্ষিণে পাটয়া ঘোপার্জের আরো করে কথণ্ড ভূমি সংগ্রহ করিয়া তত্পরি নিজের আবাস ভবন নির্মাণ করেন। যে রাস্তায় তাঁহার বাড়ি নির্মিত হয় তাহা তাঁহার নামে মদন চট্টোপাধ্যায় লেন আখ্যা পাইয়াছে। Justice of the Peace রূপে তখন মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন বেতন পাইতেন। মদনমোহনের বর্তমান বংশধরেরা দক্ষিণ কলিকাতা ও চন্দ্রনগর নিবাসী।

রামমণি তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ কন্যা শ্রবমতীর কোষগরে এক ক্ষমিণীর ভাগিনের নবকুমার (নবকান্ত) চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ দিয়া স্বামীত্ব তাঁহাকে গৃহজ্ঞামোহন করিয়া লন। তাঁহার তিন পুত্র ও ছয় কন্যা ও তাঁহার বংশ বর্তমান।

রামমণির স্ত্রোষ্ট্র পুত্র রাধানাথ ১৭১০ খৃঃ জন্ম। তিনি কটকে পিতৃব্য রামবল্লভের সহকারিরূপে কার্য করিয়াছিলেন এবং যখন শ্রীনারায়ণের পুত্র গোপীমোহনের স্ত্রোষ্ট্রপুত্র সূর্যকুমার কলিকাতার Commercial Bank প্রতিষ্ঠা করেন তখন রাধানাথ হিসাব বিভাগের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। তৎকালে ইংল্যান্ডে কৃতবিদ্য লিঙ্গা তাঁহার খ্যাতি ছিল। ১৮০০ খৃঃ তিনি পিতার জীবদ্দশায় বসোক গমন করেন। রাধানাথ দক্ষিণভিতি শুকদেব বংশীয় রূপবান রায়চৌধুরী কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। তাঁহার কন্যা মামুল্লারী ও দুই পুত্র মথুরানাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ। উমা ও ব্রজেন্দ্রের শাভাব। মথুরানাথের দুই পুত্র জীনাথ ও শৈলেন্দ্রের মধ্যে চৌধুর বংশে একটি মাত্র বালক বর্তমান। ঝারকানাথ তাঁহার ঐচ্ছাত্ত রামলোচন কর্তৃক পাঁচ বৎসর বয়সে দত্তকপুত্র গৃহীত। এই রামলোচনও বাবসায় ঝাং ঘোপার্জনে অনেক সম্পত্তি ইয়াছিলেন। সঙ্গীত-চর্চায় তাঁহার অম্বাণ ছিল। তিনি কান্ত রায়চৌধুরী কন্যা অলকাকে বিবাহ করেন। অলকা বৈ একটি কন্যা হয় কিন্তু শৈশবেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাহার ঝারকানাথকে রামলোচন দত্তক গ্রহণ করেন। এই অলকা মনি-পত্নী মেনকার অগ্রজা এবং মহর্ষিদের আদ্যচরিতে যে নামহীর উল্লেখ আছে ইনিই তিনি। ১৮০৭ খৃঃ রামলোচনের মৃত্যু হয় তখন ঝারকানাথের বয়স ১২/১৩ বৎসর। ঝারকানাথের জনক রামমণির দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র অর্থাৎ কনাথের বৈমাত্রেয় ভাতা মহারাজা রমানাথ ঝারকানাথ কা ছয় বৎসরের কনিষ্ঠ ও তাঁহার ১৮০০ খৃঃ জন্ম। রমানাথ পুত্র কালেক্টরেটে কর্মচারীরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরে রমানাথ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার কোষাধ্যক্ষ চিত হন। প্রেসরুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত Reformer পত্রের এবং “অম্বাদিকা” নামক বাংলা সাবাৎপত্রের ইনি সম্পাদক ছিলেন। কাউন্সিলের সভ্য হইয়া কাউন্সিলে ও পরে জনগণের হিতার্থে বক্তৃতা করায় ও লেখার লোকে তাঁহাকে বহু বলিত। রমানাথের স্ত্রী দক্ষিণভিতি নিবাসী শুকদেব তারচাঁপ রায়চৌধুরী কন্যা জগদম্বা। রমানাথ কলিকাতা জালরকেও সেনেটের সভ্যরূপে সেবা করিয়াছেন ও রামমোহন

রায় বিলাত বাইবার পর্যন্ত হিন্দু রমানাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজেরও একজন অধিকারী বহু বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎকালীন কলিকাতার বেকোনো সভা সমিতিতে বক্তা বা সভাপতিরূপে তাঁহার সক্রিয় থাকিত। একজন Justice of the Peace রূপেও তিনি বহুই মিউনিসিপ্যাল কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃঃ অগ্রজ ঝারকানাথকে পৈতৃক ভবনের স্বীয় অংশ বিক্রয় করিয়া তৎসম্বৎ অর্থ ও বোপার্জিত অর্থে কল্যাণচাঁটার রতন সরকার পার্জেনে স্ট্রীটে (অধুনা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট) একটি সুবৃহৎ আবাস ভবন নির্মাণ করিয়া তথায় সাহোদর্য্য শ্রবমতীর সহিত সপরিবারে বাস করেন। রমানাথের তিন পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ, মচেন্দ্র, মনীন্দ্র ও দুই কন্যা ব্রজমল্লারী ও শ্রীমামুল্লারী। মচেন্দ্র ও মনীন্দ্রের শৈশবে মৃত্যু। ব্রজমল্লারীর সহিত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। শ্রীমামুল্লারীর বংশাভাব, ব্রজমল্লারীর বংশ এখনো বর্তমান, লেখক মাতৃকুল হইতে সেই বংশ সম্বৃত। নৃপেন্দ্রনাথের ১৮২৩ খৃঃ জন্ম। তিনি রামমোহনের বিজ্ঞানগণ ও পরে হিন্দু কলেজে মহর্ষির সহপাঠী ছিলেন ও জুনিয়ার ডিগ্রী লাভ পাইয়া ইউনিয়ান ব্যাংকে মহর্ষির সহিত পিতার সহকারীরূপে কর্ম করেন। মহর্ষি তাঁহাকে চিরদিন স্নেহ করিতেন ও তৎকালেই সভা প্রতিষ্ঠাকালে নৃপেন্দ্র তাহার অবৈতনিক সম্পাদক ১৮৩১ খৃঃ নিযুক্ত হন ও মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেইপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪৪ খৃঃ মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যু। ১৮৭৭ খৃঃ রমানাথেরও মৃত্যুর পরে কলিকাতা টাউন হলে তাঁহার মর্ম্মমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসী তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিয়াছে।

রামলোচন মৃত্যুকালে যে চরমপত্র করিয়াছিলেন তাহা ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’ ৩২২-২৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে বাহাতে তাঁহার মৃত্যুকালে ঝারকানাথ কী কী পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত চরমপত্র বা উইল এইরূপ :—

শ্রীশ্রীগণা শরণং

লক্ষ্মীজনার্দন শরণং

প্রাথমিক জীবিত ঝারকানাথ ঠাকুর চিরজীবন,

সিহিতঃ শ্রীগামলোচন ঠাকুর উইলপত্রমিদং কার্য্যকর আগ্রে আমি শারীরিক পীড়িত ভ্রাতৃত্বগড়েই ভূমি আমার পুত্র একারণ আপন জ্ঞানপূর্ণক ও বেছাগীন এই উইল করিতেছি। আমার পৈতৃক দৌলত নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর ও জায়গা ও বাড়ী ও এদবাস পোষাক তাহা পিতল কাঁদা রূপা ও সোনার বাসনদিগর সেওয়ায় গহনা পৈতৃক যে কিছু আছে ইহার তিন অংশের এক অংশ আমি পাইব দুই অংশ ভায়ারা পাইবেন পৈতৃক ও আমার দত্ত সোনা রূপার গহনার অংশ হইবেক না, বাহার-বে চিহ্নিত আছে সে তাহারই থাকিবেক। আর সংসারে খরচ ও ধর্ম্মতলার বাটদিগর বানানোতে মবলগপ্রায় আমার নিজটাকা বিখাতা বোকাড় ভায়াদিগের স্থানে আমার পাওনা আছে এবং অল্প অল্প লোকের স্থানেও যে পাওনা আছে আমার দেনা নাই এই সকল পাওনা ও পৈতৃক হস্তা ও আমার সোপাঙ্কিত দৌলত অসান রূপার বাসন ও এদবাস পোষাক ও জেলা বশোহরের মোতালাক পরগণে বিবাহিমপুত্র

ও একপদে রমানাথের বংশধরেরা বালিপক্ষ নিবাসী।

জমিদারিও শহর কলিকাতার মধ্যের খরিদা জায়গা ও গায়রহ সেওয়ার বতন বিধবার দরুণ বাড়ি আমার বোপাঞ্জিত ও পৈতৃক হিত্য যে কিছু সব তোমাকে দিলাম বতন বিধবার দরুণ বাড়ি খরিদ করিয়া তৎকালীন তোমার মাতাকে দিয়াছি এবং সন ১২১৩ সালে তোমার মাতার পুণ্যক্রিয়া অর্থে আমি তুট্ট হইয়া সিকা ১০০০০ দশ হাজার টাকা দিয়াছি, এ টাকা এবং বতন বিধবার দরুণ বাড়ি ইহার সহিত তোমার এলাকা নাই, ইহার দান বিতরণ একত্র তোমার মাতার। এখনো তুমি নাবালক, এ কারণ এই জমিদারি ও গায়রহ যে কিছু বিষয় তোমাকে দিলাম, ইহার কথ্যকার্য যাবত আমি বর্তমান থাকিব তাবত আমিই করিব আমার অবর্তমানে যাবত তুমি বয়সপ্রাপ্ত না হও তাবত পরগণাদিগের এ সকল বিষয়ের কথ্যকার্য ও সহী-দস্তখত ও বন্দোবস্ত ও হুকুম-শাকাম সকলই তোমার মাতা করিবেন তুমি প্রাপ্ত বয়স হইলে জমিদারিদগির আপন নামে হজুর লেখাইয়া এবং আপন একত্রে আনিয়া জমিদারি ও সসারের কথ্যকার্য ও জমিদারির বন্দবস্ত ও খরচপত্র ও গায়রহ তোমার মাতার অমুমতি ও পরামর্শে তুমি করিবে এবং যাবত তোমার মাতা বর্তমান থাকিবেন তাবত পরগণার মুনাফা ও গায়রহ যে কিছু আমদানির তহবিল তোমার মাতার নিকট যেমন আমি রাখিতাম, তুমিও সেই মতো রাখিবা। আমি ও তোমার মাতা যাবত বর্তমান ও বর্তমানা থাকিব ও থাকিবেন তাবত আমাদের পুণ্যক্রিয়া আদি যে কিছু খরচপত্র এই দৌলত হইতে পাইব। আমার বোপাঞ্জিত জায়গার কবালা ও বয়নামা ও গায়রহ আমার স্থানে ছিল নিম্নোক্তো তোমাকে দিলাম পৈতৃক জায়গা ও বাটাদিগের কবালা ও পাটা ও গায়রহ কগিজ রামমণি বাবুর স্থানে আছে জায়গা হিত্য চিহ্নিত মতো বুঝিয়া লইবা এতদর্থে উইলপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২১৪ সাল বারো শ চৌদ্দ সাল তারিখ ২২শে অগ্রহায়ণ—ইশাদি

ঈরামশ্রুত শ্রুৎতঃ	ঈদুর্গাপ্রসাদ শ্রুৎতঃ	ঈজগম্য শ্রুৎতঃ
সং—	সং পালপাড়া	সং চেলেটিয়া
	জেলা নদীয়া	জেলা বশোহর
জায় জায়গা বোপাঞ্জিত		পৈতৃক
জমিদারি শ্রুৎতঃ বিবাহিমপুর মোতালকে		নিজবাটী
জেলা বশোহর	১	খুঁতলা বাটী
শহর কলিকাতার মধ্য		বড়বাজারের
ডেম পিদ্বে সাহেবের দঃ জায়গা	১—১/৪	বটলার বাটী
		জানবাজারের
বামনদেব বাটীর দঃ জায়গা	১—৩	হাড়িটোলার জায়গা
কুমুদেব রায় কবিবাজের দঃ জায়গা	১—১০	ডোমটোলার জায়গা
তিসক বসাকের দঃ জায়গা	১—১১	মাহুতের দঃ জায়গা
শহর মুখোপাধ্যায়ের দঃ বাটী	১—১১	কলিঙ্গা ব্রহ্মচারীর
		দঃ জায়গা
রামকিশোর মিত্রীর দঃ জায়গা	১—১/২	পরগণা মাগুরা
		মোজো ফতপুর
রামনিধি সাহার দঃ বাটী	১—১০	ব্রহ্মসত্তর জমি
বতন বিধবার দঃ বাটী—এট্ট		মোজো কপিলেশ্বর
তোমার মাতাকে দিয়াছি	১—১/৪	ব্রহ্মসত্তর জমি

৩/৪/১১

উক্ত গ্রন্থে লিখিত যে জনক রামমণি ও পিতৃব্য রামবল্লভ বর্ত্তন থাকিলেও মাত্র ৪ বৎসরের বয়ঃক্রান্ত সন্তানের রাখনাথ তাঁং অভিভাবক হইয়াছিলেন। জনক ও পিতৃব্য উভয়েই রামলোচন নিকট স্বীকৃত থাকায় সম্পত্তির মালিক স্বাক্ষরনাথের সহিত বৈধা বিধয়ে তাঁহাদের অভিভাবক মনোনয়নে আইনগত বাধা ছিল।

[ ক্রমশঃ ]

### দেশের কাজের মূল সূত্র

তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া দেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রী সম্বন্ধে নুতন চেষ্টা প্রবর্ত্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান বাহাতে পরিচ্ছন্ন রাখ্যকর ও স্বন্দর হই তাহাদের মধ্যে সেই উদ্যোগ সঞ্চার কর, এবং বাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর। এ কার্যে ব্যাতির আশা করিও না; এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে বাধা ও অবিধান স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো ঘোষণা নাই কেবল ধৈর্য এবং প্রেম এবং নিভৃত তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পন্থা যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে বাহা বা হুঃখী তাহাদের হুঃখের ভাগ লইয়া সেই হুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।

দেশের সমস্ত কার্যই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তা মূলতঃ কয়টি নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে কয়টি এই :—

প্রথম, বর্ত্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের আ সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদের বিলুপ্ত হইতেই হই বর্ত্তমানের সেই প্রকৃতি—জোট বাধা, ব্যুহবদ্ধতা, Organization সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও বাহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আ মধ্যে যে বিশিষ্টতা, যে সুস্থালক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্বত্র পৌছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা জায়গায় পুষ্টি ও অভ জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসংস্কৃতি শিক্ষিত সমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছিন্ন ঘটতে। একাধোণ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

—রবীন্দ্র

(পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা—

বঙ্গচন্দ্রিকা, ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ

# বাপ্রশস্তি

## কবি সূকান্ত ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

“সং সঙ্গ শরণম্”

শ্রীশ্রী ১০৮ জগদ্বামী গুরুদ্বী মহারাজ সমীপেষু—

শত শত সেলাম পূর্বক নিবেদন,

পরমারাণা বাবাজী, আপনার আকস্মিক অদঃপতনে আমি বড়ই মর্মান্বিত হইলাম। ইতোমধ্যে শ্রবণ করিয়াছিলাম আপনি সজ্ঞান অবসন্ন করিয়াছেন, তখন মানস পাটে এই চিন্তাই সমুপস্থিত হইয়াছিল যে ইহা সাময়িক মত্ততা মাত্র কিন্তু অধুনা উপলব্ধি করিতেছি, আমার ভ্রম হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ইহাই অমুমিত হইতেছে যে কাহারও স্মরণপায় আপনি এত পথবর্তী হইয়াছেন। অতএব আমার ভিজ্ঞাত এই যে, বুদ্ধ পিতা এবং অসুস্থ মাতার প্রতি ঐতিক কর্তব্য সকল পদাশাতে দৃষ্টিভূত করিয়া কোন নীতিশাস্ত্রানুযায়ী পারলৌকিক চর্যাসংগতি সাধনের নিমিত্ত আপনি এক মোহমার্গ সাধনা করিতেছেন? এ ক্ষেত্রে আমার নিশ্চয়ন এই যে, অচিরে এই সং সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক, আপনার এই অস্বাভাবিকতা বর্জন করিয়া বীড় কর্তব্য করণে প্রবৃত্ত হউন। আপনার পিতামাতার নির্দেশ মত আপনার কলিকাতায় আসিয়া থাকাই আমার অভিপ্রায়। এ স্থানেও সং সঙ্গের অনটন হইবে না উপরন্তু আমার মত অসন্তের সহিত তুই চারিটা কথোপকথনের সুবিধাও মিলিবে, অবশ্য ইহা আমারই সৌভাগ্যজন্মক হইবে। যদিও আমি নিতান্তই অক্লেশে, তথাপি চিন্তা করিতে দোষ কী? আমার হুঁশিয়ারি পড়ে যে-সকল আবেগময় গোপন কথা লিখিলাম তাহার উত্তরের আশা বিসর্জন দিয়াছি, কিন্তু এ পত্রের বিস্তৃত উত্তর না পাইলে ইহাই আমার শেষ চিঠি জানিবেন। ইতি দাসহৃদয়, সেবক—শ্রীসূকান্ত।

[ এই সময়ে গ্রামে কিরে ‘ত্রিদিব’ নামে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করে সূকান্তকে একটি দার্শনিক (!) অর্থাৎ রাজনীতিবোদ্ধিত কবিতা লিখে পাঠাতে ফরমায়েন দিলে। তারপর এই চিঠি: অব ]

20 Narkeldanga Main Road,  
3. 3. 43.

প্রিয়বরেষু,

অরুণ! তোর কাছ থেকে এতো বৈচিত্র্যপূর্ণ চিঠি ইতিপূর্বে আর কখনো পাইনি। তার কারণ খিবৃত করছি। প্রথমত: চিঠিটা নৈহাট, দৌলোংপুর, ডোঙ্গাঘাট, পাঞ্জিরা এই চার জায়গায় fountain Pen, Pencil এবং কলমে লেখা বলে এতো বিচিত্র। দ্বিতীয়ত সমস্ত চিঠিটার একজন কেজো লোকের ব্যক্ততার সাদা পাওয়া গেলো। তৃতীয় কারণ, চিঠিটার অপ্রকাশিততা।

চিঠির উত্তর দিতে তোকে নিবেশ করেছিলাম, তবুও তোর চিঠি পেয়ে আশাবিত হয়ে, প’ড়ে দেখলাম চিঠিটা নেহাৎ নৈর্ঘাতিক অর্থাৎ official। যদিও সংশ্লিষ্ট সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ আছে, তবুও সেটা গৌণ মুখ্য হচ্ছে ‘ত্রিদিব’। এজ্ঞে আমি চুঃখিত হইনি, বরং কোঁতুক অনুভব করেছি। অবিশিষ্ট ধামধানাই এজ্ঞে দায়ী।

‘ত্রিদিবের’ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার আশা গভীর হ’লে বাহোহারের সংকীর্ণতা থেকে সারা বাংলা দেশেই এর পরিব্যাপ্তি ও সম্প্রসারণ দেখে। পত্রিকাটি নতুন লেখক ও শিল্পীদের প্রাণ-রসে পরিপুষ্ট ও পরিপক হ’য়ে একদিন সারা বাংলার মুখা মেটানোর জন্তে পরিবেশিত হবে—সূচনা দেখে এ অনুমান করা সম্ভবত আমার অনুরদর্শিতার পূর্ববসিত হবে না।

তুই যে আমার আন্তরিকতার দিন-দিন সন্নিহান হচ্ছিস, ক্রমশঃ তার পরিচয় পাচ্ছি। কারণ ও প্রমাণ মুখোমুখি সাক্ষাৎ হ’লে দেখাবো। তুই কেবো আসছিস এইটা জানবার জন্তে উৎসুক আছি। আর এইটাই আমার কাছে সব চেয়ে জরুরী। তুই বোধ হয় কোনো কার্য-ব্যাপদে এখানে আসছিস, তার কারণ তুই অধুনা কাজের লোক হ’য়ে পড়েছিস, কিন্তু আমি চাই বেশ কিছু সময় হাতে নিয়ে তুই আসবি।

তোর সন্তানকি দিদি আর কাকীমার সম্বন্ধে রীতিমত কৌতুহল দেখা দিয়েছে। আর কিছু পরিচয় পেলাম তোরা নৃত্য বর্ণনায়, তাঁরা যে সাহিত্য-রসিক তার নমুনা পাওয়া গেলো পঠনশ্রী থেকে।

তোদের (খুড়ি) আমাদের ‘ত্রিদিব’ সম্বন্ধে একটা বড় সত্য অনুভব করছি যে, আমাদের এই পাণ চুঃখ কষ্ট আকীর্ণ বয়সীর নগণ্য লোক কর্তব্যে ত্রিদিবের দর্শন পাচ্ছি না। আশা করি তোর সংগ লাভের পুণ্যে হয়তো পাণ স্থানল হবে, এবং তখন এক সংখ্যার দর্শনলাভও হবে।

তুই লিখেছিস, “অভাবে স্বভাব নষ্ট” (স্বভাব নষ্ট হাওয়া সবেও নিজের সম্বন্ধে একটা সত্যি কথা বলেছিস দেখে তুন্ত হলাম।) সত্যিই তোরা স্বভাবের একদ্বয় অদঃপতন হ’য়েছে যে, হুটো বাজে লেখা-তুলে দিয়ে, বহুদশে নিজের বীকারোক্তি ক’রে নিশ্চিন্ত হলি? ভালো!

আর একটা গুরুতর কথা, তুই নিজের সম্পাদক হ’য়ে কোন এক মুনীল বস্ত্রকে সম্পাদক করেছিস কেনো? তোর চেয়ে যোগ্য লোক ডোঙ্গাঘাটা তথা সাদা বাহোরে আছে না কী? এটা একটা আশা ভ্রমের কথা।

কবিতা পাঠাচ্ছি। ‘আক্ষিক’ বলে যে কবিতাটা লিখেছিলাম সেটা দিতে পারবোই ভালো হ’তো। কিন্তু সেটা এখন পাচ্ছি না,

[.\* অর্থাৎ ওর দু’টি কবিতা।—অ, ব.,]

পেলে পরে পাঠাবো, এখন অল্প একটা লেখা (দার্শনিক বা মনোভাদিক) পাঠালুম। বইয়ের লিটও পাঠালুম, তবে সংক্ষিপ্ত, বিস্তৃত পরে পাঠাবো। চিঠির উত্তরের পরিবর্তে তোকে পেতে চাই। তোদের সকলের কুশল কামনা করি। ইতি—স্বকান্ত।

আরো একটি—চিঠিখানা ৩রা মার্চ লেখা হ'লেও পোষ্ট অফিসে পয়সা নিয়ে গিয়েও নানা কারণে বিতাড়িত হয়েছিলাম দিনকয়েক। তা ছাড়া শুভলায়, তুই নাকি আবাব সফরে বেরিয়েছিস, তাই মনে হ'চ্ছে পত্রপাঠ চিঠিটা পাঠাতে না পারলেও, বিশেষ ক্ষতি হবে না। আর কবিতা যেটা পাঠালুম, সেটা প্রধানত অতিবিস্তৃত সহজবোধ্য ব'লেই আমার মতে (বোধ হয় তোর মতেও) অত্যন্ত খারাপ, সেজন্ত দুঃখ করিসনি, সবুয়ে মেওয়া কলবে। তুই আলকাল ছবি-টিবি আঁকিস আশা করি, কবিতা বোধ হয় খুব ভালো লিখছিস।—স্বকান্ত।

Swadhinata  
8E Dacres Lane, Calcutta

২৪, ৫, ৪৬

প্রিয় বসন্ত,

তোর আবেগের কারণটা ঠিক বুঝলাম না, কেমন যেন হেঁয়ালী। হেঁয়ালীকে ব্যঙ্গ ক'রবো না সহাসুড়তি জানাবো। তাও বুঝছি না। আমি খুলনা বাওয়ার প্রবেশ হারিয়েছি এক যুগুর্ভের লজ্জায়। কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী নিয়ে বাওয়ার প্রস্তাব ক'রেছিলেন, আমি হঠাৎ 'না' বলে ফেলেছিলাম। বাই হোক, তুই তাড়াতাড়ি কিরিস। তোরা চিঠির বলি এখনি যাড়ে ক'রে বেরুবে। কাটুন ভালো হ'লে পাঠাস। ভূপেনের লেখা মন্দ হয়নি। 'কবিতা' পত্রিকার এবারও তোরা আর আমার লেখা প্রকাশিত হয়নি। যেতে পারলুম না ব'লে দুঃখ করিস নি।—স্বকান্ত

স্বামী অরুণচল মহারাজ সমীপে—  
বাবাজী।

আপনি গাঁজার ঘোরে ভুল দেখিয়েছেন। আপনার "নাম-চিহ্ন" নকল করা হয় নাই। ছবিটি বিখ্যাত শিল্পী অহিনকুল মুখোপাধ্যায়ের আঁকা; নাম-চিহ্ন অনেকটা আপনার তায়-হইলেও, স্বতন্ত্র্য আছে। সুতরাং ডায়ালেকটিক্যাল আদালতের কি ভয় দেখাইতেছেন? ব্যাপারটি মেটাকিসক্স কি না তাই বুঝিতে পারেন নাই।

দ্বিনিতি : স্বকান্ত শর্মা

অহিনকুল তথ্য

স্বাধীনতা 'কিশোর-সভা'র সম্পাদক তখন স্বকান্ত। মাঝে মাঝে আমি তাতে গল্প-কবিতা চিত্রণ করতাম। প্রতি ছবিই একটি কোণার রীতি মাসিক আমার নামের আত্মকবিতা (অ) স্বাক্ষরিত থাকত। কিন্তু একবার সপ্তাহ দুই বাইরে গিয়ে থাকতে হওয়ার ওর দপ্তরে আর আমার ছবি অবশিষ্ট ছিলো না। কিন্তু সেখানে বসেই অবাধ হয়ে দেখলাম অবিকল আমার ঐ 'অ' নাম-চিহ্নিত একটি ছবি পরের রবিবারে বেশ বখা নিয়মেই বেরিয়ে এলো। বুঝতে বাকি রইলো না ব্যাপারটা স্বকান্ত এবং আমাদের অন্ততম এক শিল্পী অন্তবাসের যগ বড়বয়েই সংঘটিত হ'য়েছে!—স্ববিখ্যাত

শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রথম অক্ষরের সঙ্গে আমার নাম মেলে না; কিন্তু ঐ 'অহিনকুল' কথাটির মধ্য দিয়েই একাধারে উভয়ের নামের সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই ঘটনার কলে আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়াটুকু নিয়ে সরস কৌতুক করা গেছে। মুখোপাধ্যায়ের একটি আর্ট-প্রেট 'বহুমতী'র গত সংখ্যাতে প্রকাশিত হ'য়েছে।

ডায়ালেকটিক্যাল আদালত

স্বকান্তের জীবনে ভালোবাসার একটি চমৎকার ইতিবৃত্ত আছে যবন্ত সে প্রণয় ছিলো নিতান্তই কিশোরমূলত—প্রায় এক-স্বয়ংবোধের বলা চলে। ইংরেজিতে 'ডায়ালেকটিক' শব্দের অর্থ যবন্তের সঙ্গে 'বিকাল' জড়িত। কিন্তু বাল্যের যবন্ত অর্থে কলহ বোঝায়।—ও এক-ওর সেই পাত্রীর মধ্যকার সম্পর্কটি ছিড়ে বিরোধ-সংকুল ওর ছড়ায়-ভাষায় বেশ একটু 'মিটে-কড়া'। আঁি তাই তাকে নাম দিয়েছিলাম 'ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশন'—এ-ওতে আমাদের কিছু নিয়ে কিঞ্চিৎ মতান্তর হ'লেই ব্যাপারটি তা 'ডায়ালেকটিক্যাল আদালতে' উপস্থিত করবার ভয় দেখাতুম উপস্থিত ক্ষেত্রেও তা করা হয়েছিলো বলা বাহুল্য।

মেটাকিসক্স তত্ত্ব

আমাদের এলাকার প্রায়ই রাস্তার বেরুলে এক বড়ো মাষ্টা মশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তো। তিনি চুলদাড়ি ছাঁটছেন না নাকের ডগায় ভাড়া চশমা। গলাবন্ধ পুরানো কোট। ময়ত কাপড় হাঁটুর ওপর তোলা। পায়ে অতি পুরোনো কেডস কিন্তু বড়ো ভাল মাহুয তিনি। ঘোঁরনের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে আর বিবাহও করা হ'য়ে ওঠেনি প্রায় শিশুর মতো সরল আর পণ্ডিত মাহুয, একটু দার্শনিক প্রকৃতিরই লোকও বলা চলে। আমাদের অত্যন্ত ভালোবাসতে তিনি। আর দেখা হ'লেই তাঁর ভাষায় 'মেটাকিসক্স এ্যাং মিলিসিজম'-এ তাঁর গবেষণার সর্বাধুনিক তথ্যটি ঘটনার পর ঘট বুঝিয়ে যেতেন। আমরা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধাই করতাম। অবশ্য পিছনে যে একটু হাস্যাহাসিও করতুম না তাও নয়। স্বকান্ত তাঁর প্রসঙ্গই উল্লেখ করেছে এখানে। (অ, ব)।

20 Narkeldanga Main Road  
Calcutta, 15. 2. 43.

প্রীতিভাজনে—

আমি কিছুদিন আগে একটা বিপুল বণু চিঠিতে অল্পস্র বাহে কথা লিখে পাঠিয়েছিলাম—নেহাং চিঠি লেখার মজ্জাই। সেখান হস্তগত হ'য়েছে শুনে নির্ভয় হ'লাম। ও চিঠির উত্তর না-পাওয়া আমাদের বিচলিত করেনি, যেহেতু ঐ চিঠিটার উত্তর দেবার মতে মূল্য ছিলো না। আমার বখবর আমি এক কথার জানাচ্ছি—পরিবর্তনহীন ভাবে রাজনীতি নিয়ে কালক্ষয় ক'রছি। তোরা একটা "পত্রিকা" বার করবেছিস। ভালো কথা। কিন্তু প্রশ্ন এই: হাতের লেখা পত্রিকা বার করার মতো মনের অপরিপক্বতা তোরা আলো আছে? কথাটা নীরস হ'লেও একথা আমি বলবোই যে, এই ধরনের "খইভাজায়" এই দুদিনে কাগজও সময় নষ্ট কর

ছাড়া আর কিছুই হবে না। নিজের সবকে তোর সব চেয়ে বড়ো দায়িত্ব হচ্ছে, নিজেকে নানা ভাবে সংশ্লিষ্ট করে শিক্ত করে তোলা এবং সেই জন্তে পত্রপাঠ কলকাতার এসে বাবার সাহায্য নেওয়া। কথাটা গুরুমশাইয়ের উপদেশ অথবা বাবার নিবেদনের মত তিক্ত ও অনাবশ্যক বলে মনে হ'তে পারে, কিন্তু কথাটা সত্যি। কথাটার তাৎপর্য আমি মর্মে মর্মে অনুভব ক'রছি—এক যথাসাধ্য সে সবকে চেষ্টা ও আয়োজন ক'রছি। অতএব আমার কথাটা ভালো ক'রে ভেবে দেখবার জন্তে অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করি, মা এবং ভাই-বোন-সহ তুই ভালো আছিস, তোর প্রীতি-প্রাপ্তরা ভালো আছে, চিঠির উত্তর চাই না।

—স্বকান্ত ভট্টাচার্য\*

[\* অর্থাৎ ভালোভাবে স্থলের পড়াশুনো না করার কলে একবার ম্যাট্রিকে কেস করবার পর আবার তাইই জন্তে প্রাপণ চেষ্টার বৃত্ত আছে। এ-চিঠিটিও উপরোক্ত হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ প্রসঙ্গেই লেখা।]—অ, ব]

10 Rowdon Street  
Calcutta

বন্ধু-বৎসলো,

.....  
.....

স্বকান্ত

২৭/৬/৪৬

[স্বকান্ত তখন অসুস্থ হ'য়ে উপরোক্ত ঠিকানার কমিউনিষ্ট

পার্টির 'রেড-এন্ড' কিংবদন্তি হোমে' আছে। নানা কাজের তাড়ায় দীর্ঘদিন ওকে দেখতে যেতে পারিনি। তার পর হঠাৎ উপরের কার্ডের চিঠিটি আমার হাতে পৌঁছোলো। বলা বাহুল্য, ওই 'বন্ধু-বৎসলো' কথাটি এক বাকি চিঠিটার শুণ্ড ডায়ালের আড়ালেই—বন্ধুর প্রতি আমার এই অকর্তব্যের প্রতি হৃদয়পূর্ণ এবং চূড়ান্ত এক কটাক্ষ নিহিত আছে। অ, ব]

কলকাতা

১০/১/৪৫

অরুণ,

তোর খবর কি? এক মাস তোর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। অবিশিষ্ট দেখা-সাক্ষাৎ করাটা তোর কাছে অধুনা অবাস্তব। আমি কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে বার দুই তিন বেলচাটার গেছি তোর খোঁজে। বাই হোক, তোর খবরের জন্তে আমি কি রকম উৎসুক তা বিলাই কার্ড দেখেই আশা করি আলাজ করতে পারবি, এর পর যেন আর উত্তর দিতে দেরি করিসনি। অসুখ বিলম্ব করেনি তো? কেন না, আমি ইতিমধ্যে আর একবার অসুখে প'ড়েছিলাম। এ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্ত আমার হুশিয়ারি ও অবহেলায় সীমা নেই, যদিচ তোড়জোড় ক'রছি খুব। তাই উত্তর দিতে অবহেলা ক'রে আর হুশিয়ারি বাড়ানি। কলকাতার কবে কিয়বি? বাড়ির জন্ত সব কে কেনম আছে জানাস?\*

—স্বকান্ত

\* শ্রীঅরুণাচল বনুর সৌজতে।

## বাংলা ভাষা ও ভারতের একা

বাল্যকালে এমন আলোচনাও আমি শুনেছি যে, বাঙালী যে বলভাষার চর্চায় মন দিয়েছে এতে করে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, ভাষার শক্তি বাড়তে থাকলে তার দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করা কঠিন হয়। তখনকার দিনে বঙ্গ-সাহিত্য যদি উৎকর্ষ লাভ না করত, তবে আজকে হয়ত তার প্রতি মমতা হেঁড়ে দিয়ে আমরা নির্বিকার চিন্তে কোনো একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ করে বসতাম। কিন্তু, ভাষা জিনিষের জীবনধর্ম আছে, তাকে ছাঁচে ঢেলে কলে ফেলে ফরমাশে গড়া যায় না। তার নিরমকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ কল পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধগামী হ'লে সে বন্ধা হয়।.....

আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃকোড়ে জন্মেছি তেমনি মাতৃ-ভাষার কোড়ে আমাদের লগ্ন, এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিসীম।.....

সুতরাং প্রত্যেক দেশ বধন তার স্বকীয় ভাষাতে পূর্ণতা লাভ করবে, তখনই অস্ত্র দেশের ভাষার সঙ্গে তার সত্য সত্য প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে। ভাষার এই সহযোগিতায় প্রত্যেক জাতির সাহিত্য উজ্জলতর হয়ে প্রকাশমান হবার সুযোগ পায়।

(সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৩০)—রবীন্দ্রনাথ

# সোবিয়তের দেশেদেশে

মনোজ বসু

২৫

এখন আর লেখা হচ্ছে না নিয়ম মতো। বিরক্তি লাগে।

লেখক মামুষ—মাথ ছিল, এখানে বঁারা লেখেন, তাঁদের সঙ্গে কয়েকটা দিন মিলেমিশে হৈ-হৈ করব। কিন্তু এত দিনের মধ্যে বোগবোগ হল না। হতাশ হয়ে পড়ছি। যে দলের মধ্যে এসেছি, জন দুই-তিন ছাড়া সাহিত্যের কোন তোয়াক্কা রাখেন না কেউ। বাংলা সাহিত্যের তো নয়-ই। পিকিনে স্যানিসিমভের সঙ্গে খাতির জমেছিল—এখানে এসে শুনি, তদ্রলোক গকি ইনষ্ট্রুট অব ওয়ালড লিটারেচার নামক মন্ত বড় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর, রীতিমত ওজনদার মানুষ। মস্তোয় এত ঘোরাফেরা করছি, একই জায়গায় থেকে তবু কিছু দেখা হল না একটাবার। কত জনকে বললাম, বটেই তো, বটেই তো বলে প্রবল বাড় নাড়ে, হুকুম যেতে না যেতে তুলে বেয়ে দেয়।

দেশে ফিরবার সময় হয়ে এলো। খুব বেশি তো আর এক হপ্তা। সত্যি তো ঘর-বাড়ি বিকিয়ে দিয়ে আসি নি। ক'জনের দপ্তরমতো গৃহপীড়া দেখা দিয়েছে—শরনে, স্বপনে, বিচরণে বাড়ির কথা। চিঠি লেখা বিধম বেড়েছে, ভোকসের লোক নাজেহাল হচ্ছে খাম-টিকিটের জোগান দিতে দিতে।

ঘোরাঘুরি চলছে ঠিক নিয়ম মতো। আজ সকালে নিয়ে চলল মিউজিকটির একজিভিসনে—যার আসল নাম সোবিয়ত মিউজিয়াম অব আর্টস্। ১৯১৯ অব্দে স্থাপন।

লেনিন ও স্ট্যালিনের প্রতিমূর্তি—যেমন সর্বত্র দেখে আসছি। ১৯১৭ অব্দে বিপ্লব হ'ল—সেই বিপ্লবসৈনিকদের টুপি, ব্যাজ ও পিন্ডল। ভারি সম্মানের বস্তু এগুলো। আর দেখুন পতাকা। কাচের আড়ালে সাঁটা রয়েছে বিবর্ণ নিশ্চল, এক দিন এই পতাকা উড়িয়ে তারা জারের শীত-প্রাসাদ আক্রমণ করেছিল। সেই আক্রমণের ছবি—ফোটো তুলে রাখেন কেউ, শিল্পী রত কুশি আর কলনার এঁকেছে। দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন সর্বসাধারণ বর্ণবর্ষমেট ঘোষণা করলেন, তখনকার ফোটো ও কাগজপত্রে। অর্ডার অব দি রেড ব্যানার—লাল পতাকার নামে সৈনিকের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান—তার নমুনা রেখে দিয়েছে এখানে।

১৯১৮ অব্দে চারিদিক দিয়ে শত্রু রাষ্ট্র ঘিরে ফেলেছিল—তখনকার নানা পোষ্টার ও ছবি। ব্রিটিশ, আমেরিকা জার্মান সীমান্তে সেনা মোতায়েত করল, বিধম অত্যাচার, দেশের ভিতরেও গণগোল কাঁপিয়ে তুলেছে শত্রুরা, ঘবে-বাইরে লড়াই। তার হবের ছবি ও কাগজপত্র। ব্রিটিশ আমেরিকা জার্মানি জাপান ও ফ্রান্সের বন্দুক মেশিনগান টুপি হেলমেট ইত্যাদি কেড়েজুড়ে নিয়েছিল সেই সময়, তার কিছু কিছু আছে। আবার এই তরফের কামান, মাইন গেলিবাফ্রিনী অস্ত্রশস্ত্র, বোমা ফেলার যন্ত্র, হাতে

তৈরি পেটাই মেশিনগান। সেকালের হাতলওয়ালা বর্শা। জাপানি টুপি কেড়ে নিয়ে তাই মাথার চাপিয়ে জাপানি সেক্সে পড়েছে গেরিলারা; বিদেশি হামলা কবেছে। সেই সব টুপি দেখতে পাচ্ছি।

এক লাল সৈন্তের হাতের চামড়া তুলে নিল যেহেতু সে দলের কথা ফাঁস করে না। সেই সৈন্তের নামধাম বাবতীয় কাহিনী। কশাক টুপি, হাতবোমা, তলোয়ার, তলোয়ারের খাপ। শহীদজনের মূর্তি অনেকগুলি। একটা ব্রিটিশ সাবমেরিন এরা ডুবিয়ে দিয়েছিল, তার মডেল রেখে দিয়েছে। জলতল থেকে পরে ঐ সাবমেরিন তুলে তার মধ্যে বড়বস্ত্রের দলিলপত্র পাওয়া যায়।

১৯১৯ অব্দের তোলা সোবিয়ত বীর সেনাদের ছবি। তাদের বিভিন্ন অস্ত্রসজ্জা। প্রোপাগান্ডার ট্রেন ও জাহাজ বেকুল দেশের অনাচে কানাচে সর্বত্র। গণমাছুবদের রাজনীতির পাঠ দিতে হবে। গণ্যমান্ত নেতারা বেরিয়ে পড়েছেন গাঁয়ে গাঁয়ে। সেই সব ট্রেন ও জাহাজের মডেল।

লড়াই ছেড়ে সংগঠন এবারে। পর পর তিনটে পঞ্চাবাদী কল্লনার রূপদান হল। কত খাল কেটেছে, বাঁধ বেঁধেছে, জলগারা, বইয়ে দিয়েছে উদর মরুতে, তেল-ইস্পাতের গোপন ভাণ্ডার পাতাল খুঁড়ে বের করে ফেলেছে। ছবিতে ছবিতে তাকিয়ে দেখুন কী কাণ্ড করেছে তামাম দেশটা জুড়ে। লড়াইয়ের সবজাম ও বানান্ছে ফাঁকে ফাঁকে। তুটো পঞ্চাবাদীকীর মধ্যে বানাল চারশ রণতরী, নানান রকমের বন্দুক মেশিনগান হাউইটজার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। নাজি ফ্যাসি ও জাপান হামলা দিয়েছে রাশিয়ার উপর। আমেরিকা ও ফ্রান্সের অস্ত্র পাওয়া গেল তাদের হাতে। নিউইয়র্ক টাইমসে টম্যানের বিবৃতি; যারা জিতবে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করব আমরা—অসংখ্য পোষ্টার সে আমলের। এক দুর্গে সৈন্তেরা আটকা পড়েছে, আঁকাবঁাকা অঙ্করে কে-একজন লিখে গেছে দেহালের উপর: আত্মদান করলাম, কিন্তু দুর্গ ছাড়িনি; তারিখ—২০ জুলাই, ১৯৪১। একটুকরা টিন রেখেছে এক পাশে—গুলিতে গুলিতে শতছিন্ন।

কেড মাসে রাশিয়া রতম—এই ওদের হিসাব। হিসাব উল্টে গেল—জার্মানি ইটলে। স্ট্যালিন কমাণ্ডার-ইন-চীফ।

গাইড বলে যাচ্ছে ইংরেজি। ছবি ও জিনিসপত্রে ঘটনার পর ঘটনা দেখিয়ে যাচ্ছে। বোমাফক রূপকথার মতো শুনে যাচ্ছি। জার্মানের হাতিয়ার পত্র কেড়ে নিয়ে তাড়া করেছে তাদের। নীপার নদী পার হচ্ছে সৈন্তদল—তার এক বিরাট মডেল। নিরীহ লাঠির মধ্যে বন্দুক-রিভলভার। ছুরির মধ্যে মাইক। পিন্ডল পেশিলার মধ্যে। গুপ্তচররা এই সমস্ত নিয়ে দেশের মধ্যে ঘুরত।



১১৪৫ অব্দে পুরোপুরি জয়। জয়নির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙেচুরে পালাচ্ছে বালিন যুদ্ধে—তার সুরহং মডেল।

রাইখট্রাগের চুড়ায় যে পতাকা! এরা উড়িয়ে গিয়েছিল, সেটা পরম যত্নে এনে রেখেছে। সমস্ত শহর জলছে, তার ছবি। রাইখট্রাগের মডেল। নানা অঞ্চলের সৈন্তেরা রাইখের এখানে ওখানে যা খুশি লিখেছিল, তার ছাপ রেখে দিয়েছে। জাপানেরও হার হল, গান্ধা গান্ধা অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছে।

সোবিয়েত দুনিয়া শান্তি চায়। দেয়াল জোড়া ম্যাপের উপর আসো বসানো—বিশাল দেশের ব্যবস্তার সম্পদের পরিচয় এই ম্যাপে। দেশের মানুষ সকলে মিলে সুরে শান্তিতে এই বিপুল সম্পদ ভোগ করতে চায়। বণজয়ের পর দেশ থেকে কত উপহারের পাহাড় জমেছে! শুপাঁকৃত পতাকা!—যা সমস্ত জয় করে এসেছে, আর নিজেদের যা ছিল।

কত লোক মিউজিয়াম দেখতে এসেছে—মেয়েপুরুষ বাচ্চাবুড়ো আর ইউনিয়ন জাঁটা সৈন্ত। দেখে দেখে এলাম—গাইডেরা বকবক করে বুঝিয়ে চলেছে—এদের এই মহা ইতিহাস আপনাদের চোখের উপর ভাসবে। কত সংগ্রাম, কত বীরত্ব, কত আত্মত্যাগ! বেননার উত্তর সমুদ্র পার হয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল কূল পেয়েছে।

বিজয়োৎসব। পরাজিত পতাকাগুলো এদেশ সে দেশ থেকে বয়ে এনে প্রথমটা মুসোলিনিয়ারের সামনে রেখে দিল। লেনিন যার ভিতর শাস্ত্র ভাবে ঘুমিয়ে আছেন। দেশের সমস্ত উল্লাস ঐ স্মৃতি-মন্দিরের পাদপীঠে এসে স্থির হয়ে ঝাঁড়ায়। তার পরে এই মিউজিয়ামের সংগ্রহে রেখেছে। সমস্ত সাম্রাজ্য গোছানো। সর্বশেষ হঠাৎ দেখি, যুঁহু টিটলারের বিশাল পতাকা আর ব্যাজ মেক্সের গডাফিডি যাচ্ছে। তাকের উপর কিম্বা দেয়ালের গায়ে জায়গা হয়নি। গাইডের কঠিন সহসা গম্ভীর হয়ে উঠল, কথার আঙনের জ্বালা। আমরা শান্তি চাই; কেউ যদি পিছনে লাগতে আসে, তার মাথা এমনি করে ধুলার লুটবে।

চেকোভর্সি সুরকার। জ্ঞানীশুণীরা খুব জানেন, সাধারণের কথা বলতে পারব না। রাশিয়ার কিন্তু এই নামে সিঁচি পড়ে। মস্ত শহরের বৃক্ক মস্ত বড় স্মৃতি, ঐ নামে পার্ক। মনোরম এক হল বানিয়েছে—চেকোভর্সি কনসার্ট হল। সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়ে বসলাম। নাচের আসর; অস্ত বড় হল মাছুয়ে গমগম করছে।

রাশিয়ার বকমারি লোকনৃত্য। চোখে না দেখে নাচের কি মজা পাবেন? আঁহা-ওহো করেও লাভ নেই। আর কি হবে—নাম কটা নিয়ে নিন শুণু।

বার্ক নাচ—গ্রাম্য গোষাকে একগালা মেয়ে নাচছে। ডান হাতে নীল ক্রমাল, বাঁ হাতে বার্ক-শাখা। লাল গাউনে দুটো পা ঢেকে গেছে, ঢেকে অনেকখানি ঠেঙের উপর ছড়িয়ে আছে। হলদে ক্রমাল মাথায়। বীরে বীরে চলল। ঘুরছে, পা দেখা যায় তো—নে হল ঠেঙই পাক দিচ্ছে মেয়েগুলোকে ঘিরে। নাচ নয়—কাঠের ঐ ঠেঙের উপর ভেসে ভেসে বেড়ানো। যত সব বন্ধুয়ার নাচ দেখার পশ্চিমে—আজকের নাচ ভারি মোলায়েম। গানের রেগুলোও বড় মিষ্ট।

নাচের পর নাচ চলছে। কিতে নাচ। তিন ঘোড়ার নাচ

—ঘোড়ার ভজিতে নাচে তিনটে করে ছেলে। উত্তর-রাশিয়ার অতি প্রাচীন এক লোকনৃত্য। চৌকো নৃত্য—চারটে করে মেয়ে একসঙ্গে নাচে। মস্তো অঞ্চলের এক পুরানো নাচের সুর। জন্ম গাভের উপর মাঝির নাচ। এক মেয়ের প্রশংসাও নাচ! কসাক মেয়েদের নাচ—নাচের তাবৎ দর্শকদের সখ্যনা জানাচ্ছে, বাজনদারদের অবধি। নাগর দোলার নাচ। হাসিহাজার নাচ। এক পালা নাচ, নাম হল 'আমরা রাজহংসী'—কালো পাখরের বড় আঁটি আঙলে পরে হাত বাঁকিয়ে মেয়েগুলো কাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেন রাজহংসী, কালো পাখর হল হাঁসের চোখ; আঁহা, সরোবরে ভেসে বেড়ায় হংসীর দল। রঙের খেলা—নাচে আর সাজ-পোশাকে রঙের ঢেউ খেলো যাচ্ছে; বারবার হাততালি পড়ে, ঘুরে কিরে নাচতে হয়। রাশিয়ার পুরানো বাজনা—কত বকম তারের বস্ত্র, লেখাজোখা নেই। লোকনৃত্যের বাজনা। সোবিয়েত যুবনৃত্য ও গান—একবার দু'বার দেখে লোকের তৃপ্তি হয় না, বারবার করতে হয়।

পরদিন—১ নভেম্বর। রেড স্কোয়ার দিয়ে যত বার বাই, লোলুপ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি মুসোলিনিয়ারের দিকে। ভিতরে গিয়ে দেখব, লেনিন—ষ্ট্যালিনের কাছে গিয়ে ঝাঁড়াব। এত দিন যেতে দিত না, উৎসব ব্যাপারে ভিতরে রঙচঙ করা হচ্ছে, এমনি নেন শুনেছিলাম। উৎসব সন্তোষে আজ দোর খুল দিয়েছে। চলেছি সেখানে। পায়ে হেঁটে যাচ্ছি। প্রকাণ্ড আয়তনের শেত কুসুমস্তবক নিয়ে চলেছি।

রেড-স্কোয়ার আর রেভলুসান স্কোয়ারের মাঝখানটার ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের লাল বাড়ি। লাইন দিয়ে কাঁড়িয়েছে অর্ধশত মানুষ। মুসোলিনিয়ারের সামনে থেকে লাইনের শুরু—রেড-স্কোয়ার শেষ হয়ে ঐতিহাসিক মিউজিয়াম ছাড়িয়ে রেভলুসান স্কোয়ারের বহুদূর অবধি চলে গেছে। বাচ্চা-বুড়ো মেয়েপুরুষ সব বকম ভাঁর মধ্যে। বারো মাস তিরিশ দিন এই ব্যাপার বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ঢুকতে দেয়, কিউয়ের লেন্ন একটুকু খাটো হয় না তার ভিতর। মাথার দিক দিয়ে লাইনবান্ধি ঢুক যাচ্ছে, পিছন দিকে নতুন নতুন মানুষ ভুটছে এসে। আমরাও আসছি রেভলুসান-স্কোয়ার হয়ে ঐ পিছন দিকে। আরে সর্বনাশ! আগে যারা কাঁড়িয়ে গেছে তাদেরই শেষ হতে আজকের পাঁচটার তো কুলাবে না।

না, বিশেষ অতিথি বলে আসালা বন্দোবস্ত আমাদের ভজ। উদ্দি পরা কয়েকটা সৈন্ত আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলল কিউয়ের পাশ দিয়ে মুসোলিনিয়ারের দরজার দিকে। কুসুমস্তবক জন আটক মিলে কাঁধে বয়ে চলেছেন। লিঁও আগে আগে ছুটেছে কোটো তুলতে তুলতে।

দুয়ারে অবুয়ে এসে থমকে ঝাঁড়ানো হল। ঠিক বারেটা—পাহারা বদল হচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাহারা বদল। হুঁজন করে সৈন্ত বন্দুক হাতে কাঁড়িয়ে থাকে। দিন-রাত্রি শীত-গ্রীষ্ম-বরক সর্বকণ আছে তারা। এতটুকু নড়াচড়া নেই—অবিচল, পাখর-খোলা স্মৃতির মতো। তিনজন বন্ধুধারী ক্রেমলিনের ভিতর দিক থেকে আসছে খটখট জুতার আওয়াজ তুলে পাখর-বাঁধানো রেড-স্কোয়ারের উপর। তারা এসে ঝাঁড়াল এক হুহুত। হুঁজন উঠল গিয়ে

দরজার উপর; আগের দু-জন নেমে এসে আবার তিন জন হল। মাট' করে তিন জনে আবার ক্রেমলিনে ঢুকে পড়ল।

ফুল ভিতরে নিতে দেয় না, দরজার কাছে রাখে। ভিতরে চললাম। লাল মার্বেলে গড়া চৌকো ঘরনের বাড়ি—বাইরে থেকে ছোট মনে হয়। পরলা দিনটা খুব খারাপ লাগছিল, এমনি সামান্য এক জায়গায় লেনিন-ষ্ট্যালিনকে রেখেছে। আজকে ভিতরে এসে দেখছি, ছোট ব্যাপার নয়। বিরাট ক্রেমলিনের পাশে বলেই আরও ছোট দেখায়। চমৎকার পালিশ করা, হাত ঠেকালে পিছলে যায়। মাটির অনেক তলেও ঘর। সিঁড়ি দিয়ে নেমে নেমে ক্রমশ গর্ভগৃহে ঢুকে পড়লাম। সৈন্তের পাহারা ভিতরেও। সম্মুখে সবাই পা কেসে কেসে খাচ্ছি। নিম্নতর জুতোর শব্দ হচ্ছে না এতটুকু। শান্ত ধ্যান-সমাধিতে পরিবেশ। অবশেষে এসে পৌঁছলাম সমাধিগৃহে।

লেনিন ও ষ্ট্যালিন বহুদূর পাশাপাশি। কাচোঁরো জায়গাটুকু। কে বলবে মৃত্যু, কঠিন সংগ্রাম ও কর্মের ক্লাস্তিতে বিবর্তের হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। লেনিনের বাম দিকে ষ্ট্যালিন। লেনিনের গায়ে কালো রঙের কোট। ষ্ট্যালিনের পুরাধরম মিলিটারি পোশাক। ছবিতে যা দেখেন, অবিকল সেই চেহারা। অদৃশ্য কোথা থেকে সহসা একটু আলো পড়েছে মুখের উপর—যেমন হারা জ্যোতি ঘেরা থাকে মহা-পুরুষের মুখমণ্ডলে। ছোট ষাট মাল্লুবাট লেনিন—হাত একটু বেন বিবর্ণ হয়েছে এই তিরিশ বছরে। ষ্ট্যালিনের কাঁচায় পাকায় মেশানো গৌরবচূর্ণ। বারবার মুখে তাকাচ্ছি—যুমন্ত মাথু ব ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। দুই দোতলা তিন দিক প্রাক্ষিপণ করে আবার উঁচুতে উঠে একটু ঝাঁক ঘুরে চলেছি। পা টিপে টিপে চলা—ঘুম ভেঙে যায় যদি দৈবাৎ! গভীর শান্তিতে ঘুমোতে লাগলেন এঁরা—নিশ্চক্ষে জ্ঞাতা নিবেদন করে ভিন্ন দরজার বেরিয়ে এলাম।

শেষ নয়। আরও আছে, আর একটু এগিয়ে যাব। ষানিকটা গিয়ে বাঁয়ে ঘুরলাম। উপরে উঠে খাচ্ছি, ক্রেমলিনের দেয়ালের দিকে। একটু বাগান। তার পরে শহীদদের কবরভূমি। বিশ্রবের বলি। বীড়ের লেখা 'টেন ডেজ ডাট ওক ত ওয়াল্ড' (Ten Days that Shook The World) বইয়ে বলন্ত বর্ণনা আছে। সারা রাত্রি ধরে মাটি খুঁড়ে গর্ত বানান। শহরের নান, জায়গা থেকে নিশ্চল অন্ধকারে শব্দ এনে জমা করেছে। তার পর শব্দ সাজান খালি মাটির উপর। এক বার সাজানো হয়ে গেল তো দেহগুলোর উপর দিয়ে আর এক দফা সাজাচ্ছে। তার উপরে আবার। পাইকারি কবর—নাম ধাম জানা নেই। শুধু এই পুণ্যক্ষেত্র, মহৎ ব্রতে প্রাণ দিয়েছেন। কবর এমনি ছোটো—লম্বালম্বি অনেকটা জায়গা নিয়ে—মারো একটুখানি ঝাঁক। মন্ডো শহরের

সব চেয়ে পরিষ্কার জায়গা—মরবার পর এই জায়গায় একটুকু ঠাই পাবার জন্য সকলের ভাবি লোভ। মাঝিণ লেখক বীড়েরও কবর এখানে। আরও পাঁচ জন বড় বড় নেতায়—তাদের আবক্ষ মূর্তি কবরের উপর।

জায়গা নেই, একটু জায়গা নেই আর ওখানে। অনেক বলে গেলেন, মৃত্যুর পরে দেহ বেন দাখ করা হয়; সেই ছাই ষানিকটা এখানে ক্রেমলিনের দেয়ালের ভিতর ঢুকিয়ে রাখা হবে। অনেক আছে এমন—দেয়ালের উপর পাখরের ফলকে নাম লেখা। মাঝিম গকিরও ছাই এখানে।

মন্ডোর ভারতীয় আত্মাশি দাওয়াত পাঠিয়েছেন আমাদের সকলকে। দেশে তো কিরছেন, তার আগে মূর্তি করে খাওয়া থাক এক সঙ্গে। বর্ধমান, রায়নার স্মরণনাথ বোসকে জানেন আপনারা—সেই বে ছেলেটি আত্মাশিতে চাকরি করে। বয়স তরুণ, ভারি স্তম্ভর ছেলে। বেলাবেলি আসতে বলে দিয়েছি তাকে। দুজনে বেকব। ওদের গাড়িতে নয়—পায়ে হাঁটব ব্রতাত্ত, ট্রামে চরে বেড়াব, মোট্রায় চড়ব। মন্ডো শহর চরে বেড়াব'। তার পর বধা সময়ে আত্মাশিতে জুটে খানাপিনা করে করে সকলের সঙ্গে বাসায় ফিরব। বোস অনেক দিন আছে মন্ডোর তার সঙ্গে পথ হারাবার ভয় নেই। আমাদেরই পুরোগুরি আপন লোক সে।

এই বে ভূমি ইম্পাতের পর্দায় ঘেরা চতুর্দিক। চুটো চারটে জায়গা দেখিয়ে দেয় নিজেদের গুশি মতো। বিদেশির দিকে কড়া নজর। চলাচলের ব্যাপারে একটু হেরকেন হলে কাঁক করে টুটি টিপে কলসেন্টন-ব্যাঙ্কে নিয়ে তুলবে।

বোস একগাল হেসে বলে, তাই দেখুন। সারা বিকেল তো চকোর দিচ্ছি। নজর তুলে দেখল না একটিবার কেউ।

ঘটা তিন-চার ঘোরা-ঘুরি হয়েছে। ট্রামে চেপে খাচ্ছি—কোন তল্লাট দিয়ে কোথায় চলেছি, বোস বোধ হয় কিছু কিছু বলতে পাবে। এবারে মালুম হল, নজর আছে বই কি! সবগুলো নজরই বোধ হয় আমাদের দিকে। বাদের মুখোমুখি বসেছি, তারা সোজা তাকাচ্ছে। চোখে চোখ পড়লে নজর নামিয়ে নেব, লুপপরে আবার তাকায়। উটো দিকে বাদের মুখ, ষাড় ঝাঁকিয়ে লুকিয়ে চুকিয়ে দেখে তারা। এ তো বড় মুশকিল! সামনে তো এই ব্যাপার—পিঠের উপরটাও দুষ্টির শুলে খোঁচাখুঁচি করছে, অল্পমানে বুঝতে পারি।

বোস বলে, রূপ দেখছে আমাদের। কালো দেখতে পায় না বড় একটা—দেখছে, আর হিংসের জ্বলে মনে মনে।

[ ক্রমশঃ ]

### জনসাধারণের সাহিত্য

ভারতবর্ষে এক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে একটা ডেউ উঠিয়াছিল। ঈশ্বরের অধিকার বে কেবল জ্ঞানীগণেরই নহে এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে বে তত্ত্বময় ও বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না, কেবল সরল ভক্তির দ্বারাই আপামর চণ্ডাল সকলেই ভগবানকে লাভ করিতে পারে, এই কথাটা হঠাৎ বেন একটা নূতন আবিষ্কারের মত আসিয়া

ভারতের জনসাধারণের হৃৎসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল। সেই বৃহৎ আনন্দ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া বখন ভারিয়া উঠিয়াছিল, তখন বে সাহিত্যের প্রাধুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা জনসাধারণের এই নূতন গৌরবলাভের সাহিত্য। (সাহিত্য-সংগ্রহ—বঙ্গবর্ধন, ১৩১৪ আর্ষাৎ)

—রবীন্দ্রনাথ



[ ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে  
নাম ধাম ঠিকানা লিখতে ভুলবেন না ]

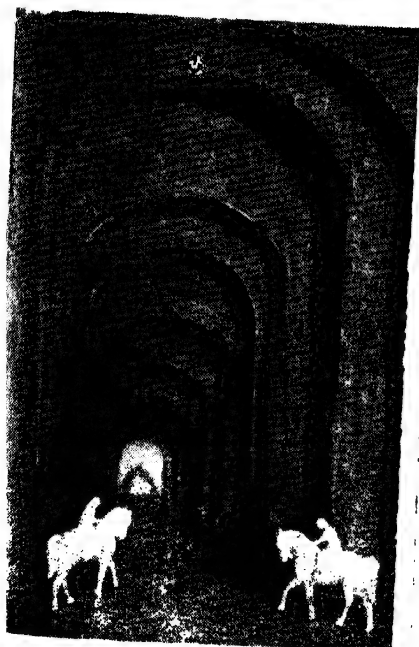
বিড়লা-মন্দির ( দিল্লী )

—মুইল হালদার



যাত্রা হ'ল গুরু

—রথীন রায়





বন্দিনী

—পারিতোষ শিল্প



বুদ্ধিমান বকর

—রামকৃষ্ণ সিংহ



চাষী

—সুকুমার দাস

### তনয়-তনয়া



—প্রদীপ বসু



—অমরেশ দাস

# চরজীবন

## ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

[ পরিচালক, নব নালন্দা মহাবিদ্যালয়, নালন্দা ]

১৩০০ সালের ২রা চৈত্র বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ী গ্রামে (পোঃ—দক্ষিণগ্রাম) মন্ডলদালয়ে সাতকড়িবাবু জন্মগ্রহণ করেন। সাতকড়িবাবুর মাতামহ ছিলেন বীরভূমের প্রধান পণ্ডিত অধ্যাপক নিমাইচন্দ্র বিজ্ঞাবিনোদ। সাতকড়িবাবুর পিতা ৮৮ব্রিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বীরভূমের রাতমা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষকতা করিতেন। পরে রামপুরহাট ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দারি করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সাতকড়িবাবুর মাতার নাম বিখ্যেবরী দেবী। সাতকড়িবাবুর পিতৃকুলে বৈবাহিক প্রবল প্রভাব দেখা যায়। তাঁহার পিতামহ ৮৮ব্রিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পুত্র হরিপ্রসাদের চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় সংসার পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মণিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'স্বামী মোক্ষদানন্দ' কালীতে দণ্ডী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন এবং রামপুরহাটের সন্নিকটস্থ তারাপীঠে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তারাপীঠের ভৈরব বামা ক্যাপা তাঁহার শিষ্য ছিলেন লিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে রামপুরহাট হাই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সাতকড়িবাবু প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সেই সময় হৈতেই ইংরাজী ও সংস্কৃত এই উভয় ভাষায়ই সাতকড়িবাবুর মন ব্যুৎপত্তি দেখা যায়। স্কুলে বার্ড ক্লাসে (বর্তমানের Class VIII) পড়িবার সময় পিতার নির্দেশে সাতকড়িবাবু গ্রে গীতা এবং অমরকোষের একের তিন অংশ কণ্ঠস্থ করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত 'অনাস' প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া সাতকড়িবাবু সংস্কৃত কলেজে হইতে বি-এ পরীক্ষায় অর্ধ হন। সাতকড়িবাবু যখন সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত অনাস পড়েন তখন ইংরাজীতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া ইংরাজীর অধ্যাপক মাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে ইংরাজীতে অনাস লইবার জন্ত বার বলেন। সাতকড়িবাবুর পিতার ইচ্ছা ছিল, পুত্র সংস্কৃতে হই পণ্ডিত হউক। পিতার ইচ্ছার প্রতি সম্মান দিবার জন্যই সাতকড়িবাবু সংস্কৃতই পড়িতে থাকেন। অনাস পড়িবার সময় সাতকড়িবাবু পাবিনি ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৯১৯ সালের কাব্যরত্নের নিকট পাবিনি ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সাতকড়িবাবু এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁর আন্ততঃ্য সাতকড়িবাবুকে হাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।

সেই সময় হইতেই চারেরা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া পাবিনি ব্যাকরণ ও অলঙ্কার অধ্যয়ন করিয়া যাঁত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় চার বৎসর সাতকড়িবাবু তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সহিত সাতকড়িবাবুর পরিচয় হয়। তাঁহারই নির্দেশে সাতকড়িবাবু নাগার্জুনের মধ্যমিক দর্শনের উপর তিব্বতী ও সংস্কৃত এই উভয় ভাষার সাহায্যে গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। ডক্টর দাশগুপ্তের নিকট সাতকড়িবাবু পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থের নিকট সাতকড়িবাবু ভাষ্যশাস্ত্র পাঠ করেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে সাতকড়িবাবু ছোট্ট আন্তিক্য দর্শন এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন আলোচনা করেন। পরে বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদ ও বৌদ্ধ জ্ঞানের উপর নিবন্ধ রচনা করিয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ইহার পূর্বে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় 'সংস্কৃত সাহিত্য পত্রিকা' 'অধ্যয়নপত্র' Calcutta Review প্রভৃতি সাময়িক পত্রিতে তিনি বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনে সাতকড়িবাবুর ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়। তিনি সংস্কৃত বিভাগের হীডার, প্রধান অধ্যাপক ও আন্ততঃ্য অধ্যাপক হন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় 'বিহার গভর্নমেন্ট তাহাদের বৌদ্ধশাস্ত্র ও পালিভাষার



সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়



শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দা রিসার্চ ইন্সটিটিউটকে (বর্তমান নাম,—নব নালন্দা মহাবিদ্যালয়) গড়িয়া তুলিবার জন্য সাতকড়িবাবুকে অগ্রবোধ করেন। সাতকড়িবাবুর স্বাস্থ্য ভাল হাটতেছিল না, তাহা হইলেও বিহার গভর্ণমেন্টের অগ্রবোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন না। এই প্রতিষ্ঠানের ভাইসেঞ্জার রূপে তিনি নতুন ভাবে কাণ্ডো যোগদান করিলেন। সেই পদেই তিনি বর্তমানে অধিষ্ঠিত আছেন।

সাতকড়িবাবু বড় প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় সিতিকর্ণ বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় আন্তোভ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু খ্যাতিমান পণ্ডিতের পদপ্রাপ্তে বসিয়া সাতকড়িবাবু অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ইহাদের স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন।

সাতকড়ি বাবু কয়েকখানি বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। The Buddhist Philosophy of Universal Flux' (1935 G. U.), The Jain Philosophy of Non-Absolutism (ভারতী মহাবিদ্যালয়ের শাস্ত্রপ্রদান জৈন লেকচার সিরিজ, 1946), প্রমাণমীমাংসা (চেমচন্দ্র)—A critic of Organ of knowledge (in collaboration with Dr. Tatia এবং The Absolutists position in Logic—এই কয়খানি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত সরকারের History of Philosophy, Eastern and Western গ্রন্থের 'Philosophy of Sankhyayoga' নামক প্রবন্ধও সাতকড়িবাবুর রচিত।

সাতকড়িবাবু সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল ভাষণ দিতে পারেন এবং সংস্কৃত কবিতা রচনায় ও তাঁহার নৈপুণ্য আছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীরবায়ের উৎসব উপলক্ষে রামপুরহাটে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি স্বরচিত অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। \*কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গীতার উপর সংস্কৃত ভাষায় তিনি বক্তৃতা দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি বহুবার সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করেন।

সাতকড়িবাবুর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁহার খ্যাতিমান ছাত্রবৃন্দ। গবেষণায় সাফল্যের পথের নির্দেশ দানে সাতকড়িবাবুর তুলনা ভারতবর্ষে নাই।

### শ্রীমদ্বৈদ্য চট্টোপাধ্যায়

[ প্রতিষ্ঠাবান বাঙ্গালী চা ব্যবসায়ী ]

সত্যতা, অধ্যবসায় ও কথনিষ্ঠা থাকলে লোক সাধারণ অবস্থা থেকে কি করে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয় তার উজ্জল সূচক হচ্ছেন বিখ্যাত চা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শ্রীমদ্বৈদ্য চট্টোপাধ্যায়। এও কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীমদ্বৈদ্য চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গালী চা ব্যবসায়ীদের মধ্যে আজ ইনি একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে আছেন। চাকুরীজীবী বাঙ্গালীদের কাছে শ্রীমদ্বৈদ্য আদর্শবল এবং ভবিষ্যৎ বাণেশবদের কাছে এর সত্যতা, কথনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অমুদ্রোয়ণীয় বস্তু হয়ে থাকবে। লক্ষ্যের তৃপ্তি লাভ করলেও শ্রীমদ্বৈদ্য বাবু অতীতের দিনগুলি বিস্মৃত হন নাই। তাই তাঁর চরিত্রের

মধ্যে কুটে উঠেছে অগুরুর মাধুর্য। অতীত দিনের কথাগুলো বলতে বলতে শ্রীমদ্বৈদ্যবাবুর চোখ সম্ভল হয়ে উঠলো দেখলুম। অমায়িক, নিরহঙ্কার, সদালাপী এ মাধুর্যটিকে দেখে সত্যিই ভাল লাগলো। পৃথিবীতে ধনবান হলে লোকে সাধারণতই একটু গরুর অহুভব করে এবং অতীত দিনের কথা সহজেই বিস্মৃত হয়, শ্রীমদ্বৈদ্যবাবুকে দেখলুম এদিকে সম্পূর্ণ পৃথক। দেব, দ্বিধা ও নারায়ণ ভক্তি তাঁর চরিত্রের মধ্যে অপর কয়েকটি গুণ দেখতে পেলুম, আর দেখতে পেলুম তাঁর ভেতর অগুরুর কথনিষ্ঠা।

কেন্দ্রীয় সরকারের নৃতন্ত্র করতাবে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালী আজ নিষ্পেষিত। এই অজ্ঞায় করতাবের প্রতিবাদে বামপন্থী নেতৃত্ব দল হরতাল আহ্বান করেছেন ৩০শে মে বৃহস্পতিবার। তাই এ দিনটিই আমি বেছে নিলুম কৃতী ব্যবসায়ী শ্রীমদ্বৈদ্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের। কাঁটায় কাঁটায় সকাল ৯ ঘটিকার শ্রীমদ্বৈদ্যবাবু বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। গিয়ে শ্রীমদ্বৈদ্যবাবুর অহুসন্ধান করতেই তিনি নীচে নেমে এলেন। আমি তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করলুম। শ্রীমদ্বৈদ্যবাবু বলতে থাকেন। "অজ্ঞাত জেন বাঙ্গালীর মত আমি ও চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রবেশ করি পারিবারিক বিপদে। কিন্তু যেদিন চাকুরী ত্যাগ করতে বাধ্য হই সেদিন আমার সম্বল ছিল মাত্র কয়েকটি টাকা। সেদিন আমি কোথাও কোন আলোকের সন্ধান পাইনি।"

১৯১১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ব্যবসায়ী শ্রীমদ্বৈদ্য চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয় এই কলিকাতা মহানগরীতেই। তাঁদের আদিবাস ২৪ পরগনা জেলার হালিসহরে। পিতা ডাঃ বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমদ্বৈদ্যবাবুর লেখাপড়া আরম্ভ হয় সর্বপ্রথম গৃহশিক্ষকের কাছে, বাড়ীতে কিছুকাল লেখাপড়ার পর তিনি বলকাতা টাউন স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের পড়া শেষ করেই তাঁকে কথকক্ষেত্রে যোগদান করতে হয়। ১৯২৮ সালে কলকাতার বামার লরী এও কোম্পানীতে চা বিভাগে unpaid apprentice হিসেবে যোগদান করেন এবং এখান থেকেই হয় তাঁর কর্মজীবনের সূত্র এবং কিছুকালের মধ্যেই তিনি এই বিভাগের ভার প্রাপ্ত হন। এই বিভাগটি বামার লরী এও কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত 'ইণ্ডিয়ান টি কোম্পানী' বলে সে সময় পরিচিত ছিল। উহার অস্তিত্ব আজ লুপ্ত।

১৯৩৬ সালে উক্ত কোম্পানী থেকে শ্রীমদ্বৈদ্যবাবুকে বিদায় নিতে হয়। কোন লোকের প্রভাবে পড়ে বামার লরীর কর্তৃপক্ষ শ্রীমদ্বৈদ্যবাবুকে কর্তৃত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। আশ্চর্যের বিষয়, উক্ত লোকটি ছিলেন শ্রীমদ্বৈদ্যবাবুর আত্মীয়। চাকুরী বাবুর পর শ্রীমদ্বৈদ্যবাবুকে কিছুদিন অসুবিধের মধ্যে কাটাতে হয়। তারপর বামার লরীর এক সাহেবের চোঁতোতাই শ্রীচট্টোপাধ্যায় ক্যারেট বোর এও কোম্পানীর under Broker নিযুক্ত হন। আশ্রয় ব্রোকার নিযুক্ত হওয়ার পরেই উক্ত কোম্পানী তাঁকে কমিশন প্রদান আরম্ভ করেন। এর পর থেকেই শ্রীমদ্বৈদ্যবাবু ধাপে ধাপে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে থাকেন।

এর পর লাগলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এ সময় ক্যারেটমোর 'এও কোম্পানীর' সব সাহেবই বিলতে চলে যায়। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সম্মুখে চায়ের ব্যবসার সমস্তদিক শেখবার সুযোগ এসে গেল এ সময়। শ্রীচট্টোপাধ্যায় এ সুযোগ গ্রহণ করতে এতটুকু বিলম্ব করলেন না।



তিনি কখনো মাফুস। কাজ যখন তাঁর দ্বারে এসে উপস্থিত হলো, তিনি তার পূর্ণ স্বযোগ গ্রহণ করে Tea market-এর সব গুচ্ছতর আয়ত্ত করে নিলেন নিজের কন্দম্বকতায়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ঐচটোপাধ্যায়ের জীবনে আবার নতুন সমস্যা দেখা দিল। এ সময় কোম্পানীর বড় সাহেব অবসর গ্রহণ করলেন। যিনি নতুন বড় সাহেব হয়ে এলেন তিনি ঐচটোপাধ্যায়ের কমিশনের হার কমিয়ে দিলেন। এই কমিশন হ্রাস করার প্রতিবাদে সুখীর বাবু Resign করলেন। এ সময় থেকেই ঐচটোপাধ্যায় শুরু করলেন স্বাধীন ভাবে চা বাবসা অর্থাৎ চাঁয়ের দালালী এবং বাবার স্রীর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। ক্রমে তিনি নিজ কন্দম্বকতায়, সততা ও অধ্যবসায়ের গুণে এবং তদানীন্তন ইউনিয়ন টি মার্কেটস্ এ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মিঃ জি. এ. বেনার প্রচেষ্টায় কালকট্টা টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশনের রেজিষ্টার্ড ব্রোকার হিসেবে প্রবেশ করেন। রেজিষ্টার্ড ব্রোকার হলেন বটে কিন্তু সুখীরবাবুর পথ সুগম হ'লো না। এখানেও নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হ'তে হলো। সে সময় চাঁয়ের বাজারে কোন বাঙ্গালী ব্রোকারকে সাহায্য করার জন্ত কেউ প্রস্তুত হ'লো না। কেন না, তখন পণ্যজ কোন বাঙ্গালী 'Registered Broker' হিসেবে সুপরিচিত ছিল না। ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ীদের চাঁয়ের বাজার একচেটিয়া ছিল। তাই সুখীর বাবুকে সংগ্রাম করতে হ'য়েছে একিক দিয়েও। এ সময়ে পি. সি. চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানীর প্রিপারেশ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের বাগানের চা দিয়ে সুখীর বাবুকে সাহায্য করেন এবং এ বাগানের চা সম্বল করেই তিনি প্রথম 'কাটাঙ্গ' প্রকাশ করেন। এর পর থেকেই ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকটি বাগান সুখীর বাবুকে তাঁদের ব্রোকার নিযুক্ত করলেন ঐচটোপাধ্যায়ের কন্দম্বকতার পরিচয় পেয়ে। ২০ বৎসর কাল চাঁয়ের বাজারে সুখীর বাবু অভিজ্ঞতা ধাকা সত্ত্বেও তাঁর চা Testing সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তার প্রধান কারণ, সাহেবরা কেবল তাদের ভেতরেই টেস্টিং Monopoly করে রেখেছিল। ঐচটোপাধ্যায়কে উহা শেখবার সুযোগ প্রদান করে নাই। এ সম্পর্কে সুখীরবাবু 'নিজেই বলছেন, "চাঁয়ের Testing সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলে কোন চা ব্যবসায়ীই সফলতা লাভ করতে পারেন না। একজ্ঞ ১৯৪৭ সালের ৫ই মে আমাকে লগুন যেতে হলো এবং লগুন থেকে একজন Tea Testing সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোক নিয়ে আসতে হলো। এ ভদ্রলোকের নাম মিঃ ডি. এন. সিনক্লেয়ার। সুখীর চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানী মিঃ সিনক্লেয়ারকে প্রথম ডিরেক্টর করে নিয়ে আসেন। এবং সুখীরবাবুও চা Testing-এ একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে সততা, অধ্যবসায় ও কন্দম্বকতার গুণে আজ চা ব্যবসায় ক্ষেত্রে এস. চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানী অন্যতম শ্রেষ্ঠ চা ব্যবসায়ী বলে সুপরিচিত। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর এ প্রতিষ্ঠানটি শাজ গর্বের বস্তু। ১৯৫২ সালে কোম্পানীর সুনাম ও কন্দম্বকতায় দৃষ্টি হয়ে বাবার স্রী এণ্ড কোম্পানী তাঁদের ছ'খানা চা বাগানের ৭ বিক্রেতার ভার সুখীর চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করেন। তারপর সুখীরবাবু ১৯৫৫ সালে পুনরায় বিলোত বান এবং ক্রিয়ার আদান কয়েকটি ইউরোপীয়ান কোম্পানীর চা বাগানের



সুখীর চট্টোপাধ্যায়

চা বিক্রয় করার ভার নিয়ে। বর্তমানে সুখীর বাবু ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত এবং চা ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সুখীরবাবু জীবনে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও জীবনে তাঁকে বহু সংগ্রাম করতে হ'য়েছে; তাঁর বাবা-মা ছেলে বেলাতেই মারা যান। বড় হ'বার একটা উদয় কামনা ছেলেবেলা থেকেই ছিল এবং সেই ইঙ্গিত লক্ষ্যে পৌছবার জন্তে তিনি নিরলস ভাবে কষ্ট করে গেছেন। জীবনের চলার পথে কোন বাধা বিঘ্নই তাঁকে কষ্ট থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তাই এ কষ্টযোগী আজ উন্নতির উচ্চ শিররে আরোহণ করতে সমর্থ হ'য়েছেন। বড় বাঙ্গালী তাঁর প্রতিষ্ঠানে কাঁধা করে তাদের পরিবার পালন করছে। ঐচটোপাধ্যায়ের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য—তিনি বাঙ্গালীকে সাহায্য করার জন্ত সর্বদাই উদুগ্ধ।

বহুবার বিলোত গেলেও ব্যক্তিগত জীবনে সুখীর বাবু নিঃদান ব্রাহ্মণ। তাঁর কলকাতার বাড়িতে প্রত্যহ নানারস সেবা হয় এবং প্রতি শনিবার ও বঙ্গবাবর তিনি নিয়মিত ভাবে কালীঘাটে কালীমায়ের দর্শন করে দানদান করেন।

ঐচটোপাধ্যায় বহু সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এবং নিয়মিত ভাবে অর্থ সাহায্য করেন।

আজও তিনি নিরলস ভাবে কষ্ট করে চলেছেন। বিভিন্ন চা বাগানের মালিকদের কি ভাবে বাগানের চা উন্নততর করা সম্ভব তৎসম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইউরোপীয়ান কোম্পানীর মালিকেরাও চা বাগানের মালিকদের চাঁয়ের উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করেছেন।

ঐচটোপাধ্যায় দীর্ঘজীবন লাভ করে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালী দেশের মুখোন্মুখ করুন, এই প্রার্থনাই আমরা ভগবানকে জানাই।

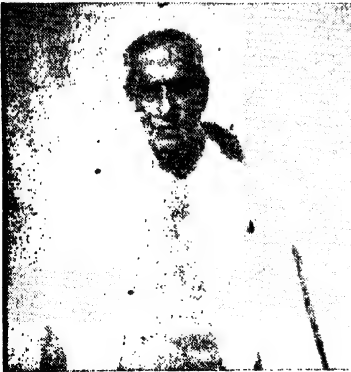
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ

[উড়িয়া-নিবাসী বিশিষ্ট আইনজীবী]

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে যে বঙ্গসংখ্যক বাঙ্গালী তদানীন্তন বৃহত্তর বঙ্গের অন্যতম অংশ উড়িষ্যা নিজে কন্দম্বক্রে গঠন ও উহার ভবিষ্যৎ রূপায়ণে সাহায্য করেন,

এ্যাডভোকেট শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ তন্মধ্যে অন্যতম। তাঁহার কর্মজীবনের প্রথমভাগেই (১৯১১ সালে) বৃহত্তর-বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া “বিহার-উড়িষ্যা” পৃথক প্রদেশরূপে গঠিত হইলে— উড়িষ্যাভাষাভাষীদের শিক্ষা, স্বাধিকার, বৃত্তি প্রভৃতি পরিবর্তনের জন্য একটি পৃথক প্রদেশ গঠিত হওয়া এবং উহার নবগঠনে উড়িষ্যা ও বাঙ্গালী বাসিন্দাদের মধ্যে যে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও মিলনাত্মক সৌহার্দ্য দৃঢ়তর হওয়া উচিত ইহা তিনি খুবই অগ্রভাব করিতেন। তাই যখন ১৯৩৭ সালে পৃথক “উড়িষ্যা-প্রদেশ” সৃষ্ট হয়, তখন উপেন্দ্রনাথ সানন্দে উহা গ্রহণ করেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার শিকড়া-কুলীন গ্রামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাসনপুত্র বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইহার জন্মভিত্তি ছিলেন। ম্যালেরিয়া আঘাতিত স্বগ্রাম হইতে ছয় বৎসর বয়সে তিনি আঁড়িয়াদহে আসেন এবং স্থানীয় উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে ১৮৯৪ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৮ সালে ইংরাজীতে ‘অনার্স’ সহ চতুর্থী কলেজ হইতে ইং-এ পাশ করিয়া রিগন ‘ল’ কলেজে ভর্তি হন। সেই সময় তিনি Executive Service পরীক্ষা দিবার মানসে জনৈক ইংরাজ-শাসকের নিকট অন্বেষণার্থে ‘সার্টিফিকেট’ প্রার্থী হন। নানারূপ অজিলায় প্রত্যাখ্যান হইলে তিনি কটকের শাসক স্যার কে. জি. গুপ্তের জামাতা সিভিলিয়ান বি. সি. সেনের নিকট হইতে উক্ত সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। তথাপি বাংলা সরকারের তৎকালীন আওতা-সেক্রেটারী (হোম) মিঃ ট্রিফেনসন (পরে বিহারের লেটসাহেব) তাঁহাকে পরীক্ষার লিখিত অমুমতি দেন নাই। পরে অল্পসময় জ্ঞানী যায় যে, দেশীয় সিভিলিয়ান প্রদত্ত সার্টিফিকেট উপেন্দ্রনাথের পক্ষে ‘অপরাধ’ স্বরূপ হইয়াছে। সরকারী চাকুরিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি তখন আইনের শেষ-পরীক্ষা দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন এবং পরবৎসর সম্মানে উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল পরে ভাগ্যান্বেষণে তিনি কটক সহরে আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। সেখানে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় তাঁহার স্বপ্নের বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীহেমচন্দ্র দে সরকারের ‘জুনিয়ার’ হিসাবে



উপেন্দ্রনাথ ঘোষ

বাল্যকরে উপস্থিত হন এবং স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করিতে থাকেন।

এইস্থানে তিনি বহু মামলা পরিচালনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমজীবনে দুইটি বিখ্যাত মামলায় তিনি আদালতী পক্ষ সমর্থন করেন এবং তজ্জন্ম ইংরাজ শাসকের বিরগভাজন হন।

প্রথমটিতে, চিত্তপ্রিয় ও ‘বাঘ যতীনের’ অন্যতম সঙ্গীদয় বৃড়াবালু নদীর নিকট চাষখণ্ড গ্রামে বৃত্ত নীরনে (১৯) ও মনোরঞ্জন (১৮) মামলায় সরকারী লোকটি উপেক্ষা করিয়া টাইব্রুকে জাতীয়তাবাদী উপেন্দ্রনাথ আদালতী পক্ষ সমর্থন করেন। উহার চেয়ারম্যান ম্যাকফারসন ও কাউন্সেল মানফ সাহেবদয় তাঁহার উপস্থাপিত বক্তব্যের উচ্চ-প্রশংসা করেন কিন্তু বিদ্রোহীদের সপক্ষে বলিয়া দুইটি বালকের কাদীর দণ্ড রোধ না হওয়ায় ব্যথা আজও উপেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে অগ্রভাব করেন। উক্ত মামলায় কলিকাতার ব্যাবিটার (কলিকাতা পৌরসভার ভূতপূর্ব মেয়র) স্বর্গীয় নিশীথ সেন (শ্রদ্ধেয়) কবি কামিনী রায় মহোদয়ার অল্পজু (পরে যোগদান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়টিতে, উপেন্দ্রনাথ কনিকার রাজা এবং ইংরাজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকর্মী (বর্তমানে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী) ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহাভাবের পক্ষাবলম্বন করেন এবং তাঁহাকে সম্মানে যুক্ত করিতে সক্ষম হন।

পাটনা হাইকোর্টে বিচারপতি থাকাকালীন ফজল আলী সাহেব (বর্তমানে আদালতের গভর্নর) নিয়-আদালতের কয়েকটি মামলায় উপেন্দ্রনাথের উপস্থাপিত বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কর্মদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ উপেন্দ্রনাথকে নিখিল-উড়িষ্যা আইনজীবী সম্মেলনে সভাপতি পদে বৃত্ত করা হয় এবং উহাতে তাঁহার প্রদত্ত ভাষণ সরকারী ও বেসরকারী মহলে উচ্চ-প্রশংসিত হয়। গত ১৯৫৩ সালে তাঁহার আইন ব্যবসায়ের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি হিসাবে উড়িষ্যার আইনজীবীরা সর্বজন্যজ্ঞী উৎসব পালন করেন।

আইনব্যবসায়ে প্রভূত বিত্ত অর্জন করা সত্ত্বেও সরলপ্রাণ উপেন্দ্রনাথ সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত রহিয়াছেন। তাঁহার গোপনদানে বহু গরীব ছাত্র আজও বিভাজ্যাস করিয়া থাকে। দৃঢ়চেতা, সঙ্কল্পনিষ্ঠ ও শৃঙ্খলাপারায়ণ উপেন্দ্রনাথ মনে করেন যে অগাধ ভগবৎবিশ্বাস ও একাগ্র-সাধনা মানবজীবনে উন্নতির মূল সোপান। তাঁহার অমায়িক ও স্রমধুর ব্যবহারে সাধারণ লোক মুগ্ধ। নানাকর্মে ব্যস্ত থাকি সত্ত্বেও স্বগ্রামের কথা তাঁহার মনে সর্বাঙ্গাগ্রক রহিয়াছে এবং বৎসরে কয়েক বার সেখানে আসিয়া থাকেন।

### শ্রীশুকুমলকান্তি ঘোষ

[ জনপ্রিয় সংবাদপত্রসেবী ]

কাঁচা যশ হরণ করে জেলাটার নাম যশোহর হয়েছিল জানি না,

তবে যশোহরের রক্ত বুক নিয়ে বাঙালার অস্বাধ্য সন্তান নিজেদের করে তুলেছিলেন যশোহর; তার সাক্ষী দেবে ইতিহাস। যশোহরের কোন এক গ্রামের সন্তান ঘোষ পরিবারের এক বধু ছিলেন নাম ছিল বীর অনুত্তমরী। এই অনুত্তমরীর নামানুসারে গ্রামটির নাম বদলে রাখা হল অনুত্তমরী। অনুত্তমরীর ঘোষবংশে দেখা

দিলেন বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার, মতিলাল, গোলাপ, প্রমুখ ভ্রাতৃবর্গ। এখান থেকেই প্রকাশিত হল অমৃতবাজার পত্রিকা। স্বনামধন্য সংবাদপত্র। সে আজ অনেক দিন আগের কথা।

হেমন্তকুমারের পৌত্র শ্রুতমলকান্তি। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তাঁর জন্ম। বছর দশ বারো যখন বয়েস ঠিক এই সময়ে ইনি এর বাবা পারিমলকান্তি বোষকে হারালেন চিরদিনের জন্যে। টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তে থাকেন শ্রুতমল। এখান থেকে পাশ করেন বি. এ। এর পর আইন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেন শ্রুতমল। ছেড়েও দিলেন। সংবাদপত্রের পরিবেশে ছেলেবেলা থেকে গড়ে উঠেছেন শ্রুতমল। তাই ছেলেবেলা থেকেই অমৃতভর করেছেন এরই হাতছানি প্রতিটি মুহূর্তে। ছেড়ে দিলেন আইন পড়া। অর্থনীতিতে এম-এ পড়তে পড়তে সেখানেও মশাপথে হ'ল ইতি। কর্মজীবনে প্রবেশ করে প্রথমে অমৃতবাজারের ক্যানভাসারের কর্মভার গ্রহণ করলেন শ্রুতমল। সেখানে তিনি ক্যানভাসার, অমৃতবাজারের স্বত্বাধিকারী গোষ্ঠীর কেউ নন ঠিক এই মনোভাবটি নিয়েই কাজে মন দিয়েছিলেন শ্রুতমল। সেই ভ্রাতৃই নিখুঁতভাবে সমস্ত কাগজি জায়গাতে আনতে পেরেছিলেন! যেদিন প্রথম কর্মজগতে পা বাড়ালেন সেদিন স্বর্ণবর্নীয় অশীর্বাদ ও অমৃতপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তাঁর জ্যামামশাই স্বর্গীয় যুগলকান্তি বোষ ও তাঁর ছোটকাকা শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক শ্রীযুগলকান্তি বোষের কাছে থেকে। শ্রুতমলের জীবনের যাত্রাপথে এদের অমৃতপ্রেরণা এক অতি মূল্যবান পাথর। দেখতে দেখতে হল যুগান্তরের প্রতিষ্ঠা, প্রথম দিন থেকে আজ অবধি যুগান্তরকে সর্বতোভাবে ইনি কবে চলছেন সেবা। আজ দায় দশ বছর ধরে ইনি পত্রিকা। সপ্তিকট নামক প্রতিষ্ঠানটির সেবায় মগ্ন। সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক আকাশমির নৃত্যনাট্য শাখার কর্মপরিসরের ইনি একজন সভ্য। কোপেনহাগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র সংহতির সাধারণ অধিবেশনে শ্রুতমল ছিলেন প্রথম ভারতীয় প্রতিনিধি (১৯৫৫)। সেখানে এর আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল—'ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় 'সংবাদপত্র পরিচালনা' প্রসঙ্গে ইনি প্রথম পত্র বোর্টারি ক্লাবের সঙ্গেও ইনি রচনার ভাব গ্রহণ করেছিলেন। ঘনিষ্ঠভাবে সন্মুক্ত। যুগান্তরের প্রথম দিনটি সন্ধ্যা বেলনে কেন অমৃতবাজারের ছেলে হয়ে আমি যুগান্তরে এত গভীরভাবে প্রবেশ করলাম জানো বলে যে ঘটনা তিনি বিবৃত করলেন তা এই প্রথম যখন যুগান্তর জগা নিল তখন তাকে লালন-পালন করতে বীরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সেদিন প্রত্যেকেই ছিলেন তরুণ। নতুন নতুন স্বপ্ন সেদিন তাঁদের চোখে, আশা ও আনন্দে ভরপুর তাঁদের স্নায়, উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ তাঁদের অন্তর, তাকগোর এই অভাবনীয় সমাবেশ থেকে দূরে সরে থাকতে পারলেন না শ্রুতমল। নিজে



শ্রুতমলকান্তি বোষ

মিশিয়ে দিলেন এর প্রোতে। সর্বাঙ্গকরণে অগ্রগমনের প্রেরণা জাগালেন তুমারকান্তি বোষ। শ্রীযোষের মতে আজকে ভারতে যে পরিমাণে জনবৃদ্ধি হচ্ছে সেই সুযোগের সর্বাঙ্গারটুকু করতে পারছেন না আজকের ব্যবসায়জগত।

সমগ্র ইয়োরোপ পরিভ্রমণ করেও শ্রুতমলকান্তির মন ভরপুর জাপানের মৃত্তিতে। এশীয় সৌন্দর্যবোধের উদাহরণ জাপান, বসন্তমির সঙ্গে জাপানমির মিল নানা জায়গায়। তাদের ছুতো খোলায়, মাহুর বিছিয়ে শোয়ায়, মন্দিরে অধঃকণ 'বৌপাছু ছোড়ার ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে বাঙালীর সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য বিজ্ঞমান। জাপানে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিখতে হয় সংবাদপত্র মুদ্রণ ও পরিচালনা কি করে হয়? সেখানে দীপশলাকা কখনও পরসা দিয়ে কিনতে হয় না, যে কোন জায়গায় তা পাওয়া যায় বিনামূল্যে। ছোট বস্ত, অথচ কি অপূর্ণ শিল্পকায তার গায়ে, রঙ ও রেখার অভিনব রূপায়ণ সুদূর দেখে যোষণা করে চলেছে ও কাকুরার দেশে সেই নাম-না-জানা শিল্পীদের কৃতিত্ব। জাপানের বৃক্ক হত বসমক, চিত্রগৃহ, পাশুশালা, নাইট ক্লাব শোভা পাচ্ছে—সংখ্যার দিক দিয়ে তার কাছে পৃথিবীর সেরা রূপশূরী পার্যোও পরাজিত।

জাপানকে কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছিলেন দুজন বিরাট বাঙালী। সেই মহান সন্তানদের মধ্যে আজ একজন মৃত্যুর আনন্দময় বন্দে নিলাময় আর একজন কোথায় সব আজ সারা বিধেই ভিজ্ঞতা। আজও জাপান তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করে চলেছে। তাঁদের প্রতি তাদের গভীর অমৃতরূপ পরিচালনা! সেই দু'জন আর কেউই নন—তাঁরা হচ্ছেন বন্দিত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও উৎসর্গিত জননায়ক সত্যচন্দ্র বসু।



# বাজায় বাজায়



উদয়ভাসু

রৌদ্রদেব বৈশাখের দীর্ঘদিন এখন শেষের দিকে।

তবুও এখনও ডুবন্ত সূর্য্যরশ্মির তরঙ্গের সঙ্গে স্পন্দ করছে মুক্তদ্বার পাকীর ভেতরে, রাজকুমারীর ঠিক কপালটিতে। যেন এক মৃত মানুষের শান্ত কপাল। বিদ্যাবাসিনী মেঘ-মুগুকে চোখ মেলে বসে আছেন নিজীব পাখাণের মত। দীর্ঘ আঁধার, কালো তারা ছুটি যেন কৃষ্ণবর্ণ হীরার মত ঝল-ঝল করছে সূর্য্য-আলোয়। মিহি আর সূক্ষ্ম ভুরুর আশে-পাশে ঢাকা-ঢাকা কেশগুচ্ছ কাঁপছে। চৌধুরীগৃহ থেকে ফেরার পথে দু'জনের একজনও কথা বলেন না একটিও। পরিচারিকারও কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আছে, জমিদারবীর মুখে আশাভঙ্গের ব্যর্থতা দেখে। পাকী এগিয়ে চলেছে মস্তুর গতিতে। দু'পাশের মাট-ঘাট শিছিয়ে পড়ছে। দিন-শেষের সোনালী রোদুর গাছের শাখাজাল ভেদ করে রাজকুমারীর চোখে এসে পড়ছে বার বার, রাজকুমারী তাই চোখ বন্ধ করলেন। যেন ঘুমিয়ে পড়লেন স্নান চোখে।

গড়-মান্দারবনের পথ-প্রান্তর বড়ই দুর্গম। খটখটে দিবালোকের পথিকজ্ঞান দল বেঁধে পথ চলে। একা কাকেরও দেখা যায় না। উপলব্ধিও আকর্ণ আকাঙ্ক্ষা পথের দুই ধারে শান্তিশব্দহীন চৌধুরী উঁকি দেয় বনাকুল থেকে। শুধু তাই নয়, তিস্ত জলোদ্যমের উৎপাত কে এড়ায়? মারণ-উটান মস্তুর গুঞ্জন শোনা যায়; সিঁকাই উপাসনা করছে স্ত্রীশবের বৃকে। হোমের আগুন জ্বলছে কোথায়, যেন আলোয়ার মত। পথপ্রান্তে তৃণশযায় তাড়ির আজড়া বসেছে। মেঘের আনন্দে উৎফুল্ল বর্ণার মত অটহাসি হাসছে এখন থেকেই। পাকী বাহকদের পদশব্দে ভয়-পাওয়া শিয়াল লেজ উঁচিয়ে ছোট্টাছুটি করছে। আবছায়ায় দেখা যায়, ওদের নীলাভ চোখের কুটিলতা। স্পষ্ট হাসি যেন দস্তুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

এক দমকা হাওয়ায় স্পষ্ট চাইলেন যেন বিদ্যাবাসিনী। ধানিক দেখে দেখে বললেন,—ভ্রাক্ষণি, পাকীর দুয়ারটা বন্ধ কর। সমুখে রাত্রি, ভুলে যাও কেন?

পরিচারিকা ভয়ানক চোখ ফিরিয়ে বললে,—রাতির নয় রাজকুমারি, যেন কালরাতির!

একটা সম্ভার হাস ফেলে বিদ্যাবাসিনী বলেন,—তা বাই হোক। জ্যোতিঃশাস্ত্র ঠিক আমাদের জানা নাই, ভবিষ্যৎ বলতে পারি না।

—আমি কিছু কিছু জানি।

পরিচারিকা বললে ভয়ানক কণ্ঠে। বললে,—চৌধুরী-গিন্নী সহজে যেহাই দেওয়ার পাত্রী নয় বো, তা ভূমি দেখে নিও।

ককটা যেন কুক্কুরের মত থাকে রাজকুমারী। পাকীর

দেওয়ালগায়ে গা এলিয়ে বসেছিলেন বিদ্যাবাসিনী, ধীরে ধীরে উঠলেন উদ্বিগ্নে। পরিচারিকার একটি হাত ধরলেন নিজের হাতে। আবার এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মৃদুকণ্ঠে,—এখন কি উপায় ভ্রাক্ষণি? কি করি, কোথায় বাই?

বশোদা কিসকিসিয়ে বললে,—দেখে নিও বো, চৌধুরী-গিন্নী ঠিক নবাবের কোতোয়ালে জামিয়ে দেবে। মাসীর চোখে আমি পতিহিংসার (প্রতিহিংসা) চাউনি দেখেছি।

পাকীর মধ্যে এখন প্রায় অন্ধকার। হার রুদ্ধ বাহকরা এগিয়ে চলেছে হনহনিয়ে। সঙ্গে ক'জন পাটকি আছে। একজন মশালটি আছে। আঁধার আরও ঘনীভূত হওয়ার পর মশাল জ্বলবে তখন।

তব্বের দল ছড়িয়ে আছে এখানে-সেখানে। কচুবনের আড়ালে আড়ালে বসে আছে উবু হয়ে। মুখে আর দেহ কালো ভূশো মেখেছে। ওং পেতে বসে আছে, যদি মিলে যায় এক-আগ জন সঙ্গীহীন মানুষ।

এক চলমান জনপিত্ত আগছে, তাই দেখে আর দেখা দেয় না কেউ। দলে ভারী, সেই ভয়ে। পাকীর বাহকরা, পাটকি, মশালটি। জোড়া জোড়া অদৃশ্য চোখের সোভাত দৃষ্টি আছড়ে আছড়ে পড়ে পাকীতে। কে যায়? কোথায় যায় এমন অবলোয়? নজাকাটা পদ্য ঢাকা পাকীর অভ্যন্তরে অবলুই নারী আছেন কেউ। কোন একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা! কুমারী কিংবা সৎবা যদি হন, নানা অলঙ্কারে নিশ্চয়ই তিনি সজ্জিত। ফসকে-বাওয়া শিকার হাতের নাগাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, চোর আর ঠেঙ্গাড়ের দল মুখ লুকাসে কচুবনের আড়ালে।

—আমি তো কেন' উপায় দেখি না বো!

পরিচারিকা অনেকক্ষণ পরে কথা বললে যেন আপনান্ন মনে। বললে,—আমি তো দশ দিক অন্ধকার দেখছি।

—আমিও তাই বশোদা! বিদ্যাবাসিনী ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন—রক্ষা পাওয়া কঠিন।

চৌধুরীগৃহী প্রথমে কেঁদেছিলেন, ককিয়েছিলেন। মেঘের দুঃখে অধীর হয়ে বুক-কপাল চাপড়েছিলেন। বিদ্যাবাসিনীর পায়ে মাথাও খুঁড়েছিলেন। আনন্দকুমারীর নিরুদ্দেশের সঠিক কারণ শেষ পর্যন্ত জানতে না পাওয়ার পর শাসনীর স্তরে কথা বলেছিলেন। দশমহাবিজ্ঞার মত একেক বার এক এক মৃতি ধরেছিলেন যেন। শেষে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন,—আনন্দকে না পাওয়া যায় ক্ষতি নেই, জমিদার কেউরামের স্ত্রী গুমখুন হবে! আমার লোক লঙ্করের অভাব নেই, অর্থবলও সামান্য নয়। আমি নবাবের এজলাসে নাগিশ পেশ করবো!

বিদ্যাবাসিনী প্রায় কম্পিতদেহে চৌধুরীগৃহ ত্যাগ করে উঠে এসেছেন। কীপক্ষে কীপক্ষে পাকীতে উঠে সংজাহীনের মত বসে পড়েছেন। চৌধুরীগীর ক্রোধের স্রব কানে বাজে বধন-তখন। বাঘিনীর মত তাঁর রূপ যেন, মনে পড়লেও ভয় হয়।

—চল' বো, সাতগাঁয়ে ফিরে বাই আমরা।

পরিচারিকা ঝানকি ভাবনার পর বললে অজুরোধের স্রবে।

মাথা দোললেন রাজকুমারী। আঁচলে মুখ হুহুতে হুহুতে বললেন,—না তা হয় না বশোদা! আমি আর সাতগাঁয়ে ফিরবো না কোন দিন। জমিদারের স্রবের বাধা হই কেন আর!

—এখানই থাকবে তবে? মান্দারগে থাকতে সাহস হয় না আমার। পরিচারিকার ভয়ানক কঠি ফিস-ফিস করে পাকীর অন্তরে। বলল,—চৌধুরীগিন্নী সহজে নিতায় দেবে না জেনো।

—মান্দারগে ত্যাগ করলেই কি পরিচাল পাওয়া যাবে, আমার তা মনে হয় না। বিদ্যাবাসিনী বললেন সন্দ্বিগ্নকণ্ঠে। কয়েক মুহূর্ত খেমে আবার বললেন,—এক চন্দ্রকান্ত ইচ্ছা করলে আমাদের রক্ষা করতে পারেন। তিনি এখন কোথায় কে জানে!

এক ঝলক তাজিলের হাসি ফুটালো মুখে। হেসে হেসে বশোদা বললে,—চন্দ্রকান্ত আমাদের রক্ষে করবে! তেমন আশা আমি করি না। আনন্দকে হারিয়ে আর কি তিনি ফিরে তাকাবেন?

কথা বলতে বলতে পরিচারিকা পাকীর ছুয়ার ঈষৎ সরিয়ে বাইরে চোখ মেললো। দিনের শুভ্রতা বুড়ে গেছে কখন। কীলো আকাশে কীটা তারা ঝল-ঝল করছে। ঝিঝ-ঝিঝ বাতাস বইছে। নারকেল গাছের পাতার আড়াল থেকে চাঁদের সোনালী উঁকি দেয়। উজ্জানের নৌকার মত পাকী এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে।

হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজকুমারী। ভয়ের পথটুকু পেরিয়ে যেতে পারলে, ভগ্নদেউলে পৌঁছতে পারলে যেন বস্তু পাওয়া যায়। বিদ্যাবাসিনী বললেন,—ব্রাহ্মণি, আর কত দূর?

ইতি-উক্তি দেখলো বশোদা। ঘনাক্ষরে চুটি চালিয়ে দিয়ে বললে,—যেদিক তাকাই সেদিকেই আবার। পথ কি চেনা যায় বো!

বিদ্যাবাসিনী বললেন,—আকাশে কি মেঘ ভ'মেছে?

পরিচারিকা উজ্জ্বল চোখ তুললো। দেখে দেখে বললে,—উঁচ, আকাশে মেঘ কোথায়! জ্যোৎস্না ফুটুটু করছে।

চোখের তারা স্থির হয়ে থাকে রাজকুমারীর। সাগ্রহে তিনি কি লক্ষ্য করছেন কে জানে। বললেন,—পথের ধারে এত আলো কেন নাচানাচি করছে? ভূত-প্রেত নয় তো?

বশোদা বললে,—তুমি আর হাসিও না বো! আলো নয়, শিয়ালের চোখ ঝলছে অন্ধকারে। পাকী চলার শব্দ পেয়ে হয়তো ভয় পেয়েছে!

একেক জোড়া হলুদ-রঙ চোখ, আলোকবিন্দুর মত সত্যিই যেন নেচে নেচে উঠছে। অলস স্রবের তাড়নায় শিকারের লক্ষ্যন করছে। গেরস্থের মোরগ যদি মিলে যায় একটা। কিবা একটু ঘুমন্ত শিত!

—চন্দ্রকান্তকে চাই, নচেৎ রক্ষা নাই আর। কেমন যেন অশ্রুকের সঙ্গে বললেন রাজকুমারী। এক-বুক শ্বাস টেনে নিয়ে বললেন,—তাকে আমাদের পক্ষে রাখতে হবে। সাদিলী মানতে হবে। কীক এখনই আমাদের চাই।

—এই রাতের বেলায় ব্রাহ্মণকে কোথায় পাবে তুমি? পরিচারিকার কথায় বিম্বয়। চোখে জিজ্ঞাসা চাউনি।

বিদ্যাবাসিনী বললেন,—তুমি দয়া করলেই তাকে পাওয়া যায়।

বৈশাখ-রাত্রির ঝিঝিরে হাওয়া চলেছে। গাছের পাতার মর্মর ভেসে আসছে। শুকপত্র উড়ছে বাতাসের সঙ্গে। পাকীর মুক্ত দ্বার, রাজকুমারীর ঘর্ষাক্ত কপালে হাওয়ার স্পর্শ লাগে। তিনি আবার কথা বললেন,—মিথ্যা! দোষারোপ কে মেনে নেয়! চুরি করলে একজন আর তার শাস্তিভোগ করবে আমরা?

—আমি কি করতে পারি বো? আমার দয়ার প্রত্যাশা কেন তাই শুনি? পরিচারিকার ভিত্তি-কাত্তর বর্ষ কীপে কীপে কথা বলে। বললে,—আমরা গরীব-গরবা, আমাদের আবার দয়া কোথা থেকে আসবে!

অল্প হাসলেন রাজকুমারী। শুক হাসি হেসে বললেন,—তুমি যদি কষ্ট কর', তবেই তাকে পাওয়া যায়।

—কি করতে হবে তাই বল'?

—আমাকে জমিদার-বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে তুই যা এই পাকীতে। বিদ্যাবাসিনী ফিস ফিস কথা বললেন, পরিচারিকার কানের কাছে মুখ এগিয়ে বললেন,—পাকীবেহারাদের পাঁচ দশ কড়ি বকশিস দিলেই—

কথা শেষ হয় না। বশোদা বললে,—তিনি যদি আমার কথাটা না আসে?

হঠাৎ এক বাশ জোয়ালো বাতাস দাপাদপি করতে করতে মাটি-বুক থেকে আকাশের দিকে ছুটলো। সামুদ্রিক তরঙ্গ-উজ্জ্বলের মত হাওয়ার ঢেউ উঠলো। গাছের শাখা কীচকীচ শব্দ তুললো। নির্জন প্রান্তর ধরে পাকীও ছুটেছে অস্বস্তি বাতাসের ঘায়। মশালটির হাতের নতুনবা অগ্নিশিখা কানের যেন শ্রণাম করতে থাকে। মশালের আলো চ'লেছে সর্বত্র। বাঁশের লাঠি ঝুঁকতে ঝুঁকতে পাইক-পেয়াদা চলেছে মশালটির পেছনে। তারপর পাকী চলেছে। পাকীর শেষে আরও ক'জন পাইক।

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ ছিলেন রাজকুমারী। কত শত চিন্তায় ডুবে ছিলেন যেন। নিজের কোমল বক্ষে হাত রাখলেন ক্ষণেক, স্পর্শে অস্বস্তি করলেন স্রবধনিন। ঘর ঘন বেজে চলেছে। স্বাসের কষ্ট হয় বিদ্যাবাসিনীর। কি এক অস্বস্তির আগায় থেকে থেকে অর্ধেক প্রকাশ পায়। কেমন যেন কষ্টের সঙ্গে কথা বললেন রাজকুমারী। অসুস্থ স্রবে বললেন,—আমায় নাম হয়ে বললে অমাত্র করবেন না।

—সোনানানা আছে কিছু কাছে?

পরিচারিকা প্রাঙ্গ করলে যেন ডাকাতনীর মত। চোখ পাঙ্কিয়ে তাকিয়ে থাকলো। জ্যোৎস্নার আলোর তার চোখের কালো তারা যেন উজ্জ্বল হয়ে আছে।

—আছে, অনামিকায় একটা অজুর আছে। মুক্তাবাসনো।

—হাত-ছাড়া করতে পারবে খুশী মনে?

—কেন? কি প্রয়োজনে?

—পাইক আর বেহারাদের দিতে হবে। লগদানগদি কিছু দিলেই কাজ হবে। কানাকড়িতে শুদের ঘন টংগ না।

—তা বটে। তোমার কথাই ঠিক।

কথা বলতে বলতে রাজকুমারী অনামিকার আঙটি খুললেন। যশোদার হাতে দিয়ে তার মুঠি বন্ধ করে দিলেন। বললেন—আমাদের দেউলে পাকী পৌছেছে, তুমি যা বলার ওদের বল’। আমি ঘরে বাই।

—একা থাকতে তোমার ভয় হবে না বোঁ? তুমিও চল না?

—পাকীতে একেই স্থানান্তর। আমি ঘরে ফিরি, একা থাকায় ভয় পাই না আমি। একাই তো আছি। ঋনিক খেমে আবার বিদ্যাবাসিনী বলেন,—দেখো, বিফল যাত্রা না হয়।

জমিনাবগুহের স্তোত্র-ফটক পরিয়ে পাকী ততক্ষণে প্রবেশ-দ্বারের কাছে। পাকী নামাতেই বিদ্যুতের শিখার মত এক পলকের মধ্যে রাজকুমারী প্রায় ছুট দিয়ে চলে গেলেন যেন। যশোদা শুধু নামলো না। বসে থাকলো যেননকার তেমনি। বললে,—চৌধুরী-গিন্নীর একটা ভকুম আছে। তামিল করতে হবে আমাকে।

পাকীরা শুধলো,—কি ভকুম?

যশোদা গভীর স্বরে কথা বলে। কেমন যেন মাগুগণের চণ্ডে। বললে,—আসমান দীঘির ঐ তীরে পাকী নিয়ে যেতে হবে, চৌধুরী-গিন্নীর চুটো গোপন কথা জানিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

—আমাদের গিন্নীমার ভকুম?

—হাঁ গো হাঁ। আনন্দকুমারীর সন্ধানে যাবো।

আর কিছু বলতে হয় না। আবার পাকী উঠলো আর চললো উত্তমে। গায়ের ঘাম মোছার ফরসৎ পায় না বাহকরা।

অন্ধরের এক চোরা দলগুলি থেকে রাজকুমারী এক চোখে দেখলেন, পাকীখানা আবার চললো। আর দেখলেন প্রাঙ্গণ-প্রাঙ্গণে জ্যোৎস্না ঝেঁঝে করছে। গাছের শীর্ষে শীর্ষে সোনার প্রলেপ। আকাশ থেকে যেন মুঠো মুঠো জ্যোৎস্না ঝরছে। চাঁদের ভয় পড়ছে সোনালী চিকণ তুলে।

কক্ষদ্বারে সোপান-শ্রেণীতে উঠলেন বিদ্যাবাসিনী। ঘনকালো অন্ধকার, শুধুমাত্র পবিত্রের ভরসায় নির্ভয়ে চললেন যেন। নিজের কক্ষে কোন রকমে পৌছানো, ততঃপর আর কোন ভয় নাই। ঘরের ভেতর থেকে অর্গল তুলে দিয়ে থাকলেই যথেষ্ট। রাজকুমারীও তাই করলেন। উজ্জ্বল দেহের বস্ত্র আলগা করলেন। কক্ষের দালান থেকে আমোদকে দেখা যায়। নদীতে চোখ রেখে ঝাঁড়ালেন বিদ্যাবাসিনী। মুক্ত বাতাস আসছে নদীর বুক থেকে। জলাহর ঠাণ্ডা বাতাস।

সোনার চাদের বিছানো নদীতে। চাঁদের আকর্ষণে কিছু যেন উজ্জ্বলিত। লক্ষ লক্ষ বাত মেলছে আকাশের দিকে। বৌবনের জ্যোয়ার এসেছে যেন আমোদবের। তাই ডাকাডাকি করছে আকাশের চাঁদকে। জ্যোয়ারের মত নদীর জল কেঁপে উঠেছে আজ। পূর্ণিমা বত নিকটে আসবে, ততই না কি উজ্জ্বল উদ্দাম হ’তে থাকবে। কুলকুল শব্দ গজ্জনের মত শোনাতে দূর থেকে। কাল-বোশধীর বড়-জলে ফৌতকায় হয়েছে যেন আমোদব। দূরে কাছে কোথায় হয়তো অশ্রান্ত বর্ষণ হয়েছে অজ্ঞকার।

যুঁই ফুলের গন্ধ আনে হাওয়া। আসমান দীঘির তীরে অজস্র যুঁই ফুটেছে সাদা বাতাসের চূর্ণ স্পর্শে। কতকাল আগের এক মধুরাত মনের কোণে স্মৃতির রেখা তুললো। অচেনা অজানা

অনাগত সেই রাতিটায় ভীষণ ভয় পেয়ে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন নাবালাকা। কিশোরী বিদ্যাবাসিনী। বাসর-রাতের হাসিঠাট্টা সমঝাতে পারেননি তখন। কুলনারীদের পরিহাস বুঝবেন তেমন দক্ষতা নেই। অস্ত্রের হাতের খেলার গুতুলের মত রাজকুমারী নিজেকে যেন বিক্রিয়ে দিয়েছিলেন। বেশ মনে পড়ে, বাসরশয্যায় যুঁই আর বেগুনফুলের ছড়াছড়ি। ঘরের কোণের হলন্ত দীপশিখাটির মত সারা রাত জাগতে পারলেন না রাজকুমারী। ভোর-রাতে ঘমে ঘুবে গেলেন। যুঁইয়ের গন্ধ বাজকুমারী অন্ধ থেকে যেতে কত কাল সময় লাগে।

কলসী থেকে এক ঘটি জল গড়ালেন বিদ্যাবাসিনী। মুখেপায়ে জল দিলেন। আর এক পাত্র গড়ালেন। পান করলেন আকর্ষণ। তারপর চকমকি ঘষে দীপ ধরালেন। আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সকল কিছু চোখে পড়লো। প্রথমে দেখলেন, তুলট কাগজের রাশি, মসীপাত্র, লেখনীদণ্ড। চন্দ্রকান্তর দেওয়া সেই জয়াজর্জ কটিনষ্ট পুঁথিখানি। মহাকাব্যের মূল লেখা আছে ঐ পুঁথিতে। একান্তই হুত্বাপ্য ও হুমুয়া।

পায়ের তলায় ভূমি কাঁপছে থেকে থেকে। ভয়ে আর ভাবনায় বুক কাঁপছে। অবস্থির কাঁটা বিঁধছে যেন বৃকে। পালাতে বসলেন বিদ্যাবাসিনী! অবসরভায়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হয় দেখ এলিয়ে দিয়ে। চিত্তা-জ্বরের জ্বালায় তাও যেন পারলেন না।

চৌধুরীকুমারী কোথায় এখন কে জানে! রাজকুমারী চোখে ভয়াবহ দৃশ্য ভাসতে থাকে। অত্যাচার আর উৎপাদনের ছবি। আনন্দকুমারী এখন বিদেশীর কবলে। তার খেয়াল-খুশী চরিতার্থের সামগ্রী। চোরাই আর লুণ্ঠের মাল।

গঙ্গানদীর এক কিনারায়, এক ভাঙ্গা ঘাটে ম্যাগলেটের তরী নৌদর বেঁধেছে। তীরের একবারে কাছাকাছি নয়, কিছু দূরে। হিংস্র জানোয়ারের ভয়। বিশেষতঃ বাঘের ভয়। ক্ষুধার জ্বালায় কত গহিনরাত্রে তীরলয় নৌকার বৃকে কাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। ঘুমন্ত যাত্রী আর মাঝিদের হু-একজনের বাড়ি কামড়ে ধরে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অন্ধকারে। ভোরের আলো ফুটেলে দেখা যায়, রক্তধারা পথ সৃষ্টি করেছে।

তাই আগভোগেই সাবধান হয় ম্যাগলেট। বজ্রা আর তীরে ভিড়ায় না। তীরের জল থেকে গজ্জন শোনা যায় বাঘের। ফেউয়ের আর্দ্রান ভাঙ্গে গঙ্গার ওপারে। ম্যাগলেটের তেলকী সিপাইরা বন্দুক ধরে বসে আছে বজ্রার ছাঁদে। বাঘ আবার সাঁতরতে পারে না কি! গভীর জল সাঁতরে নৌকা আক্রমণ করে অতর্কিতে। শিকার ধরে নিয়ে সাঁতরে পালায়। জল থেকে ডান্ডায় ওঠে, মুখে থাকে আধমরা মায়ুহ।

বাঘের গজ্জনে ভীতা আনন্দকুমারী। ম্যাগলেটকে জড়িয়ে ধরে আছে সজোরে। ম্যাগলেট তো হেসেই ধূন বৃককুমারী ভয় পাওয়া দেখে। নদীর এক প্রান্তে হাসির প্রতিক্রিয়া ভাসিয়ে অটহাসি হাসছে ম্যাগলেট। তার হাসির চাক্ষুষ বজ্রা তুলে তুলে উঠছে।

লোকমাগ্ন তিলকের সঙ্গে বধের এক হোটেলের এক সকালে জেগে উঠি। সেটা মনে হয়েছে এক সৌভাগ্যের সকাল,

সন্তা কালের স্মরণাত। হোটেলটা অবশ্য কারণ নয়, সাধারণ মাথাপি হোটেল; বধে শহরের স্তম্ভও সৌভাগ্য নয়। শেঠ নই, বধে শহর অর্থপূর্ণ আকর্ষণে কখনো টানেনি। ঐ অকস্মে পুণাই মনকে বেশী নাড়া দিয়েছে। এই যুগের মারাঠীদের কন্ঠের সাধনা পূর্ণাকৈই ঘিরে ঘন হয়ে গড়ে উঠেছে। বাগাডে, গোখলে, তিলক পুণারই লোক। আর লোকমাগ্ন তিলকের অস্তিত্বি হয়ে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে আমরা এই হোটেলের এসে উঠছি। আমরা বধে পৌছি আগের দিন দুপুরে। তিলক আসেন রাত্রে। পরের দিন সকালে তিলক বাবা ও মাকে (এবার মা-ও সঙ্গে ছিলেন) অভিবাধন জানাতে আমাদের ঘরে আসেন। আমি তিলককে প্রণাম করি। স্মরণাত নয় কি?

হোটেলটি বিশেষ করে মারাঠীদের নাম 'সদার-গৃহ'। মারাঠী অবস্থাপন বাবা—অর্থাৎ ভূমিজমা বাদে আছে তাঁদের বোধ হয় পৌরবে সদার বলে। এই রকম অভিজাতত্বের স্তম্ভই যে প্রাধানত; এই হোটেল, নামেই বোধ হয় তা বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। বধে শহরের সম্পূর্ণ মারাঠীদের ভাগ খুব বেশী বেশি। সেটা ভোগ করেন পাণীয়া, গোখা সম্প্রদায় ও গুজরাতিরা। বধে হলেও বৃত্তিতে এরা সব বণিক। মারাঠীরা মনোবৃত্তিতেও বণিক নন। কাস্ত্র-কন্ঠে বধে শহর মারাঠীরা বাবা থাকেন, সাধারণ ভাবেই তাঁরা প্রায় থাকেন। এমন কি, দেশপ্ৰসিদ্ধ ব্যবসায়জীবী এম, আর জয়করের বধের বাড়ীতেও বিভবের অস্তিত্ব দেখিনি। বাদে বধে শহরে আসতে হয় মায়ে মায়ে তাঁরা অনেক সম্ভ্রু 'সদার গৃহ'ই গঠন। এটা অনেকটা পারিবারিক হোটেলের মত। কিন্তু এর আসল অভিজাত্য তিলক এখানে গঠন বলে।

তিলক বাবাকে নিয়ে সকালেই এক আলোচনায় বসলেন। তিলকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মী নরসিং চিন্তামণি কেলকার আছেন—আরও অনেকে। আলোচনার স্তম্ভী প্রয়োজন ছিল। সমগ্রটা ১৯১৮ সালের প্রথম দিকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখনো থামেনি, তবে থামবার মুখ। তিলক সঙ্গে ভয়ের সস্তাবনা সঙ্গেও এই সময়েই বিলাত যাবেন স্থির করেছেন। সেই সলে আছেন—নরসিং চিন্তামণি কেলকার, দাদাসাহেব গণেশ, শ্রীহৃদ খাপাদে, বলরাজ গঙ্গাধর তিলক নিজে ও বিপিনচন্দ্র পাণ। বাহিরের দিক থেকে প্রয়োজন—ভালেনটাইন চিরল তাঁর "Indian Unrest" বইয়ে তিলকের রাষ্ট্র-জীবনকে যে হেয় করতে চেষ্টা করেছেন তার বিরুদ্ধে চিরলের নামে বিলাতে মানহানির মামলা জু করা। এটা নিতান্তই বাহিরের প্রয়োজন। আমার মত যুবকের মনে হয়েছিল, তুচ্ছও বটে। বিদেশী শত্রুপক্ষের নিন্দা সব সময়েই দেশসেবকের অঙ্গের ভূষণ। তার স্তম্ভ দেশের এতগুলি নাবার বণিকে নিয়ে লড়াইয়ের বিপদের মাঝে সমুদ্রপাড়ি দেবার কি এমন প্রয়োজন? কিন্তু এনিয়েই বিলাত যাওয়ার আসল প্রয়োজন দেশের স্তম্ভ—তিলকের নিজের স্তম্ভ বা তাঁর দলের স্তম্ভও নয়।

প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা; একটু খুলে বললে বোধ হয় ভাল বোঝা যাবে। ১৯১৪ সালের দুনিয়া-ভোর লড়াইয়ে ইংরেজের অবস্থা এক সময় বেশ সঙ্গিন হয়ে উঠে। তখন তাঁরা ভারতের সম্পূর্ণ আশ্রয়শাসনের আকাঙ্ক্ষা যে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত থেকেও সফল হতে পারে, আর আস্তে আস্তে এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে যে তাঁরা সক্ষমও

# বিচিত্র-ভ্রমণ

জ্ঞানাজ্ঞান পাণ

হ'তে পারেন—এমন কথা এক রকম স্পষ্ট করেই বলেন। মার্কিনপতি উড্রো উইলসনের চোদ দফার বিখ্যাত বাণী প্রায় এই সময়েই প্রচারিত হয়। তাতেও আমাদের মত পরাধীন জাতিদের অনেক আশার কথা শোনান হয়। যুদ্ধটা পূর্ণাঙ্গুরি থামার আগেই ভারতের আশ্রয়শাসন সম্বন্ধে পাকাপাকি প্রতিশ্রুতি যদি ইংরেজের কাছ থেকে আদায় করা যায়, তারই স্তম্ভ তিলক সহকর্মীদের নিয়ে বিপদের মাঝেও বিলাত যাওয়ার সঙ্কল্প করেছেন।

তিলককে ইংরেজ বোঝেনি—তিলকের চরিত্রটিজ আঁকবার সময় বিপিনচন্দ্র একথা বলেছেন। কথাটা হয়ত ঠিকই। আমাদের সময়ে দেখেছি—ইংরেজ এদেশের লোককে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। এক ভাগ, বাদে দ্বারা তাদের কোনো স্বার্থসিদ্ধি হয় বা হ'তে পারে; আর এক ভাগ, দ্বারা তাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইংরেজের স্বার্থের সহায় তিলক কখনো হ'তে পারেননি। তাই তিলককে এত অপবাদে তাঁরা ভূষিত করেছে। তিলককে ইংরেজ বুঝতে না পারলেও তিলক কিন্তু ইংরেজের প্রকৃতি ভালই বুঝেছিলেন। তিনি জানতেন, যুদ্ধের চাপে ইংরেজের ঘুরে যে সমিদ্ধি প্রকাশ পেয়েছে, যুদ্ধ থেমে গেলে—আর ইংরেজ যদি তখন জড়ীর কোঠাতে থাকে—তা আর বাস্তবে পরিণত হবে না। সেজন্য যুদ্ধ থামবার আগেই একটা ক্ষয়সালার চেষ্টা করা দরকার।

কিন্তু কেবল বিলাতে গেলেও হবে না। ইংলণ্ড ও আমেরিকা তখন, কতকটা এখনেই মত প্রায় একজোটে বাঁধা। আমেরিকার কাউকে পাঠান যার না? সে আলোচনাই তিলক, বিপিনচন্দ্র ও কেলকার করছিলেন, একসঙ্গে হয়েই সকালবেলা "সদার-গৃহে" এক ঘরে বসে। আমি পাশে ঠাঁড়িয়ে। একটু পরে বেরিয়ে এসেন বিপিনচন্দ্র তাঁর ঘরের দিকে; ডাকলেন আমাকে। আমাদের প্রায় পিছন পিছন দেখি একটা নতুন টাইপরাইটার যন্ত্রও এলো আমাদের ঘরে; সঙ্গে যাবে বলে সবে কেনা হয়েছে। আমরা বললেন—মেসিনে বসো, একটা চিঠি লিখতে হবে। চিন্তায় গম্ভীর মুখ। চিঠিটা যাবে তিলকের নামে—রবীন্দ্রনাথের কাছে। যে চিঠিটা বিপিনচন্দ্রে বলে গেলেন ও আমরা টাইপ করতে হলো, তার মন্তব্য এই—"রবীন্দ্রনাথ যদি আমেরিকায় এখন যান, রাজনীতিক কোন দলের পক্ষে নয়, রাজনীতিক কোনো কাজেও প্রত্যক্ষ ভাবে নয়। ভারতের সাধনা তাঁর বাণীতেই এ যুগে সব চেয়ে বেশী মূর্ত হয়েছে। সেই সাধনার কথা যদি মার্কিনের সমাজের কাছে তিনি নতুন করে বলেন ও সারা দুনিয়ায় যদি সেটা প্রচারিত হয়, তা ভারতের আশ্রয়শাসনের সস্তাবনা বা যুদ্ধের গতিতে জেগে উঠেছে তা অনেকটা শক্তি পেতে পারে। নেবেন কি তিনি এ ভাব?" তাঁর পাখের ও খরচের স্তম্ভ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাবার ব্যবস্থাও তিলক করলেন। বধের একজন ধনী পাণী তিলকের অত্যন্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন। নাম তাঁর এস, আর, বোমানজি। এই চিঠি ও এই টাকা নগদ রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেবার ভার তিলক দিলেন তাঁর উপর। তিলকের নির্দেশ এই চিঠি ও টাকা নিয়ে বোমানজি যেন সেই রাতেই কলিকাতা রওনা হন। রবীন্দ্রনাথ তিলককে অন্তরেই সঙ্গে লগ্না করতেন। কিন্তু রাজনীতিক

উদ্দেশ্য পেছনে রেখে রাজনীতিক কাজের জন্ত সাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থে তিনি আমেরিকা যেতে রাজী হলেন না।

ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসাবে এসময় রবীন্দ্রনাথ বার্কিনে গেলে ভাল হয়, এককল্পনা আমার মনে হয়েছিল, বিপিনচন্দ্রের তিলকের নয়। একটু ভাবলে মনে হবে এটা কল্পনাই। আর কল্পনা বাস্তবের সহজাত, মারাত্মক নয়। স্বদেশীয় নতুন প্রবাহ ধারা বাংলায় ও ভারতে এনেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রদূত। স্বদেশপ্রাণের বান আমাদের জীবনের মধ্য গাড়ে এসেছিল ১৯০৫-৬ সালে, সত্য; কিন্তু সে বান ১৯১৮-১৭ সালে অনেকখানি নেমে গেছে। ইংরেজের নিখুঁত নিষ্পেষণে ও আমাদের অন্ধতায় সে স্রোত তখন প্রায় কৃত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিলক প্রমুখের নতুন রাজনীতির সন্ধু ও অনেকটা ছিন্ন হয়ে গেছে। এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ পবোক্ষ ভাবেও যে এরকম কোন কাজের সঙ্গে যুক্ত হ'তে চাইতেন না, এটা স্বাভাবিক।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিলকের এই চিঠি ও এত টাকা অবলীলাক্রমে রবীন্দ্রনাথকে পাঠানোর মধ্যে যে মহত্ব দেখা যায় তা অস্বাভাবিক। তখনকার দিনে রাজনীতিতে বড় অঙ্কের টাকা এখনকার মত সহজে আসত না। রবীন্দ্রনাথ এই টাকা গ্রহণ করলে ও তা দিয়ে ভারতের সাধনা বাহিরে নতুন করে প্রতিষ্ঠা শেলেও তিলকের নাম তার সঙ্গে যুক্ত হত না। তিলকের এই চিঠি ও টাকার কথা সম্পূর্ণ অজানা থাকলে সাধারণের এই ছিল নির্দেশ। ভারতের এই সরুজনমালা লোকনায়ক পদ, প্রতিষ্ঠা, অর্থ সম্বন্ধে এমনই নিম্পৃহ ছিলেন। মনে হয়, এ যেন কোন অনাসক্ত সাধু জীবনের এক কাহিনী। অথচ তিলক সাধুসম্প্রদায়ের মত কুচ্ছদাশন করে এ অনাসক্ত অর্জন করেছিলেন, শুনিনি। দেশসেবা কেবল তিলককে নয়, তাঁর সহকর্মী অনেককেও এভাবে সহজ ত্যাগী হতে শিক্ষা দিয়েছিল। সত্য দেশসেবার নাকি এরকমই হয়। কিন্তু তাই যদি হয় ত দেশের সেবার আমরা এখন এত লোভাকুর ও প্রতিষ্ঠাপ্রিয় হয়ে উঠছি কি করে?

তিলক ও তাঁর সহকর্মীদের বোঝাইয়ের মহিলা-সমাজ এক অভিনব নবন। গুজরাটী এক বাণিজ্যপতির বাড়ীর সঙ্গর উদ্ভানে এই অমৃত্যুনের আয়োজন হয়। এই সভায় সব মহিলা তিলক, কেলকার, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ ৩৪ জন ও আমি ছাড়া। এরকম মহিলাদের সভা আগে দেখিনি। সভায় বেশী বক্তৃতা দি হয়েছিল বলে মনে নেই। পাণ্ডী, গুজরাটী, মালীয়া তিলকের শ্রদ্ধার দান হিসাবে একটা বড় টাকার খল লোকমাষ্ট্র তিলকের হাতে দেবার জন্তই এই সভার আয়োজন। সভার ধারা এনেছিলেন তাঁরা পরীবেষ ঘরের মেয়ে বা বৌ একথা বলব না—যনীগৃহস্থের প্রায় সব গৃহিণী বা কস্তা, শিক্ষিতা ত বটেই, স্মল্লারও। কাটকে নতুন ভালবাসলে মেয়েদের সৌন্দর্য্য নাকি বেড়ে যায়। গোবিন্দবাস তাঁর এক বিখ্যাত কবিতায় রাধার রূপের গৌরব বর্ণনা করতে গিয়ে রাধা নবজগদ্বাসিনী এ কথা বলেছেন। আমারও মনে হয়েছিল কেশের প্রতি নব অঙ্গুরণে এই সব মহিলাদের রূপ এক নতুন শোভাতে খুলে গিয়েছিল। নহিলে এত স্মল্লার তাঁদের লেগেছিল কি করে? সভা আর পরে ভাঙল। তিলক ও তাঁর সহকর্মীরা উঠে ছাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সব ঘরে পরম আত্মীয়কে বিদায়ের মুখে

বজ্রনেরা যেমন ঘেরে, সেরকম ঘিরে আঙঠে আঙঠে এঙঠে লাগলেন বেকবীর বাস্তবের দিকে। মুন্সি হ'ল আমার। যুবক বটে, কিন্তু এমন পৌরুষ সংগ্রহ করতে পারলাম না নিজের মনে, যাতে এই মহিলা-বৃত্ত ভেদ করে তিলক-বিপিনচন্দ্রের কাছে এগিয়ে যাই। বাহিরে গিয়ে তাঁরা আমার জন্ত অপেক্ষা করবেন বা কোন তরুণীকে পাঠাবেন আমার সম্মানে ভাবতে লজ্জা হ'ল। কিন্তু এঙঠ কি করে? বাবার সঙ্গে থেকে তাঁর কাজ করি; চোখে-মুখে পুত্রস্বের ছাপ বোধ হয় তখন কিছু ফুটে উঠেছিল। একটু পরে মাতৃসমা এক মহিলা ইঙ্গিতে ডেকে সঙ্গে করে দ্রুত বাহিরে নিয়ে এলেন আমাকে। তাঁর মুখে ব্রেহ ও কৌতুক-মেশানো চাপা হাসি, এত দিন পরেও চোখের উপর ভেসে উঠেছে।

বয়েতে তিলক থাকতে আসেন নি, বিপিনচন্দ্রও নন। বধে থেকে যাবেন তাঁরা মাস্ত্রাজে, মাস্ত্রাজ থেকে কলকাতা, সেখানে উঠাবেন বিলাতের জাগাজে এই বাবু। সবাই একসঙ্গে বধে চাড়লুম। মাঝে বেলাগাত্তে এক অপরাহ্নে আসত শ'ল। একটা ভাড়া মন্দিরের সামনে বড় ময়দানে সভার আয়োজন হয়েছিল। আমরা যাদের অশিক্ষিত বনি তাদেরই বিরট জনতা। শিক্ষিত স্থানীয় ধারা নিশ্চয় তাঁরা সভাতে ছিলেন, কিন্তু অশিক্ষিত সাধারণ দেশবাসীর মধ্যে তাঁরা কেবল মিশে নয় যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণ পার্থক্যে এটা হয়নি, হয়েছিল সভার যে চেতাবাটা ফুটে উঠেছিল তাতে। বক্তা তিলক একা; আর তিলকের দৃষ্টি, ভাব, ভঙ্গী সব নিবন্ধ ছিল এই তথাকথিত অশিক্ষিত জনতার উপর। আমি মারাত্মক বুদ্ধি না, কিন্তু তিলকের দেশক্রোধের ব্যাখ্যানের সম্মোহন শক্তি জনতার মুখছবিত্তে দেখতে পেলাম। জনতার মুখের দিকে তাকিয়ে বার বার মনে হচ্ছিল, দেশপ্রীতিতে বক্তা ও শ্রোতা যেন এক হয়ে গেছেন।

সবাই তিলকের সঙ্গে বিলাত যাঠিবেন না, কিন্তু বধে ছেড়ে মাস্ত্রাজগামী বেলে যখন উঠি তখন মস্ত এক দল। যেন অনেক বরষাজী একটা বড় বিয়েতে যাচ্ছি। দ্রুতগামী মেলে ট্রেনে উঠেছিলাম কি না মনে নেই, কিন্তু সারা রাত অনেক ঠেঁশনে গাড়ী থেমেছিল। এক একটা ঠেঁশনে ট্রেন থামে, আর জনতার জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রাটিকরমটা। তিলকের বিলাত যাওয়ার সহজটা যেন জনপ্রিয় কোন বাষ্ট্রনায়কের বিজয় অভিবাদন। সহকর্মীরা উম্মোহে সেরকমই মনে হয়। এই উদ্ভাসী জনতার মধ্যেও যে একটা বড় সংগঠন ছিল বুঝলাম যখন দেখলাম, প্রতি জনতার মুখের হাতে একটা কটেটাকার খলি—গ্রামবাসীর সংগৃহীত দান তিলককে দেবার চহা। তিলকের কামরায় তাঁরা টাকার খলি, ফল, ফুল, মিষ্টি রেখে যাচ্ছেন। যে কামরায় রাখছেন সে কামরায় তিলক কিন্তু নেই। একটা বেঞ্চিতে ওপাশ ক্রির একজন ববায়ান মারাত্মক গুয়ে আছেন—সামনে তাঁর ফুলের পাগড়। রাত্রের জন্ত তিনি তিলকের পাদে অভিষিক্ত হয়েছেন। জনতা তিলকের এই শাদিত প্রতিনিধিকে তিলক জেনে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য রেখে যাচ্ছে। এ না হলে সারা রাত তিলককে একবকর ভোগে যেতে হয়; তিলকের ভগ্নবাহ্যে তাঁর অমৃত্যুতা এ হতে দিতে পারেন না।

মাস্ত্রাজে পৌছিলাম। তিলক ও তাঁর দলের আমরা সকলে ঐক্যবোধে বশান্তের অতিথি। ভুবন-বিখ্যাত এই মহিলার জীবনগতি



সোজা বা সহজপথে চলেনি। স্বপ্রোক্তা নদী যেমন নিজে পথ কেটে স্বচ্ছকূটিল ভাবে সাগরে গিয়ে যেশে, প্রতীভাশালিনী এই নারীর জীবনও তেমন নানা বাধা-বিঘ্ন বড়-কষ্টের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছিল। আমরা এবার মাস্ত্রাজে যখন, তখন তাঁকে দেখি এখন বয়সী—বোধ হয় সত্তরের কাছে। কিন্তু অমরা উৎসাহ ও কর্মশক্তি। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের অধিনেত্রীর পদে তিনি বৃত্তা হ'ন। তার আগেই বোধ হয়, ১৯১৪ সালে ভারতীয় হোমরুল লীগ সংগঠন করেন। তাঁর তত্ত্বাবধায় সমিতি বা Theosophical Society'র মত হোমরুল লীগের শাখাও ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাতেও হয়, কিন্তু মনে হয় বাংলাতে তেমন প্রাণ পায়নি। বোধ অফসলও হয়; আর তার সমস্ত ভার তিলক ও তাঁর দলের উপর দেওয়া হয়। শ্রীমতী বেশান্তের কোনো কর্তব্য থাকে না। শ্রীমতী বেশান্তের সাংসারিক জ্ঞানও যে প্রশংসনীয় ছিল, এ থেকে বুঝতে পারি। তিলকের নেতৃত্বে বিশেষ করে মহারাষ্ট্র অফসল বা সম্ভব, অস্ত্র কারো দ্বারা তা সম্ভব ছিল না।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ১৯১৪ সালে কি রকম ছিল মনের সামনে তার ছবিটা তুলে ধরা থাক। ১৯১৪-৪৫ আগেই বাহিরের প্রকাশে স্বাধীনতার আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে। বাংলায়, মহারাষ্ট্রে, পঞ্জাবে, মাস্ত্রাজে—নিরদারন বা দীর্ঘ কারাবাসের পর ফিরে এসে নেতারা দেখলেন তাঁদের কাজের ক্ষেত্র সব বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। যুবকেরা অনেক প্রাণ দিয়েছে। পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে বাহিরের কাজ করার অবস্থাটা যেন আর নেই। ১৯১৪-৪৫ বিধবৃত্ত সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা বা স্বাধীনতার বন্ধনের বেধনা কিছু বেশী জেগেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও নতুন জোরে মাথা চাপা নিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। শুদ্ধতার বাস্তব ঘন মেঘের আকাশে বিভ্রান্তির ঝলকের মত বাংলায় মহারাষ্ট্রে, পঞ্জাবে ও মাস্ত্রাজে বেশ-প্রাথমিক যুবকদের আত্মবলিদানে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে নিবে যায়নি, তলায় চলে গিয়েছে মায়। তা জানিয়ে নিচ্ছে। এ অবস্থাকেই শ্রীমতী বেশান্ত তাঁর হোমরুল আন্দোলন প্রবর্তন করেন। কিন্তু তখন উচ্ছ্বাসে যাই মনে চোক না কেন, এখন বলতে পারি, এ আন্দোলন এ দেশে তেমন শিকড় গভীরায়নি। দু'টো কারণ তার মনে হয়েছে। এক, এর পিছনে সরাসরী সম্পূর্ণ মুক্তি বা স্বাধীনতার আদর্শ ছিল না, যা বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতার আন্দোলনের পিছনে ছিল। দ্বিতীয়, এ আন্দোলন ইংরেজের সঙ্গে থেকে, ইংরেজের কোন ক্ষতি না করে, আটনের মধ্যে চলে, নিজেকে বাঁচিয়ে এদেশে প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা ছিল। বাংলা এবং মহারাষ্ট্রও নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার জন্য বৈদী বচনা করতে গিয়েছিল।

তিলক ত নেই, বিপিনচন্দ্রও নিছক ভাববিলাসী ছিলেন না। গভীর মননশীলতার তাঁদের মন সমগ্রাভ্রত ছিল। যে বিপিনচন্দ্র ১৯০২—৭ সালে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য, এই বাণী প্রচার করেন, ও সব নদী যেমন সাগরে যেশে, দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা তেমন এই সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বাধেশিকতার মধ্যেই তাদের সত্য সার্থকতা খুঁজে পাবে, এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। তিনিই ১৯১১-১২ সালে নিরঙ্কুশ সংকীর্ণ জাতীয়তা অপেক্ষা ভারতের পক্ষে ইংলও, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতির সঙ্গে

সমান পদ ও প্রতিষ্ঠায় এক বৃহত্তর রাষ্ট্র-সংঘ গঠনের চেষ্টা যে প্রেরণকর—এ কথা বলতে আরম্ভ করেন। স্বপ্রতিষ্ঠা ভারতের সঙ্গে ইংলওয়ের এরূপ নতুন সংঘ গড়ে উঠতে পারলেই আমাদের ও ইংরেজের মধ্যে যে মর্যাদাসিক বিরোধ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছিল, তারও একটা মোমাংসা হ'তে পারে—একথাও তিনি বলেন। যেমন স্বদেশীর প্রথম যুগে তেমন এখানেও লোকমাত্র তিলকের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের মনের একটা গভীর মিল দেখতে পাওয়া যায়। আর এই উদারতর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার প্রসারে শ্রীমতী বেশান্তের হোমরুল আন্দোলন সহায় হ'তে পারে। এ ভাবেই মনে হয়েছে, শ্রীমতী বেশান্তের সঙ্গে তাঁদের এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সহযোগিতা গড়ে উঠে।

মাস্ত্রাজে শ্রীমতী বেশান্তের থিয়সফিক্যাল সোসাইটির আলোচনা—আড্ডিয়ায় আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়। সমুদ্রের ধারে বিস্তীর্ণ জমি নিয়ে বহু প্রতিষ্ঠান ও বহুতর অট্টালিকার সমৃদ্ধ এই আশ্রম। হোমরুল আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে এর কথ্যব্যস্ততা অনেক বেড়ে গিয়েছে। একটা বাড়ীর সোতলার মা ও আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। সারাদিন ও রাত্রে বড় অংশ বায় বাবার নানা সভা, অনুষ্ঠান ও অভিনন্দনাদির ব্যস্ততায়। বোধ হয় যে দিন সকালে মাস্ত্রাজ পৌছি সেদিনই রাত্রে আড্ডিয়ারে প্রাঙ্গণে তাঁদের প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে এক সাধারণ ভোজের ব্যবস্থা হয়। গাছের অঙ্গাণা শাখা-প্রশাখায় বোলান হয়েছে অগনিত ছোট ছোট আলো, নানা রংয়ের। আর প্রায় দু'হাজার লোক আমরা তার তলায় খেতে বসেছি। পরিবেশন হচ্ছে নিশেদ, কালের চাইতেও বেশী শৃঙ্খল। এতেন এক মায়াপূরী তৈরী হয়েছে। এমন অপূর্ণ দোল্লভ্যার পরিবেশে এত বড় ভোজসভার আয়োজন এর আগে বা পরে দেখিনি।

কংগ্রেসের নেত্রী হিসাবে (শ্রীমতী বেশান্ত ১৯১৭ সালের কংগ্রেসের অবিরেণনে নেত্রী করেন,) হোমরুল আন্দোলনের কত্রী হিসাবে মাস্ত্রাজের বিশিষ্ট নাগরিক সকলকেই শ্রীমতী বেশান্ত এই ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। এত বড় নেতৃসম্মেলন দেখার সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে, এক সঙ্গে ষাওয়া সাধারণের ভাগ্যে প্রায় কখনো ঘটে না।

মাংটি মেয়েরা বাহিরের কাজেও কত দক্ষিণ ও দক্ষ, তার এক পরিচয় আড্ডিয়ায় পাই। মায় দেখান্তনার ভার ছিল একটা মায়াটী বধুর উপর। লোকমাত্র তিলকের একজন অন্তরঙ্গ সহকর্মীর তিনি পুত্রবধূ। তিনি ও তাঁর স্বামী দু'জনেই এখানকার কোন শিক্ষায়ত্তনের কর্মী, দু'জনেই উচ্চশিক্ষিত। মায় ইচ্ছা, মাস্ত্রাজে যা দেখার আছে সব দেখেন। এই বৌটি মায় জন্ত পরদিন সকালে এক মোটরের ব্যবস্থা করেছেন। গাড়ী সকলেই আগার কথা; দেবী হচ্ছে অন্ন। মা হয়ত একটু ব্যস্তও হয়েছেন। তাই না দেখে বৌটি তরতরিয়ে নেমে গিয়ে গেটের কাছে যে শাইকেল ছিল পাকা চড়িয়ে মত তাতে চড়ে আগ্রমের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মোটর নিয়ে এলেন তখন সঙ্গে করে। উপরের বাগান থেকে মা দেখে ত অবাক। প্রচো বাগানী গৃহস্থীর যে ধরণের বীর লজ্জার নম্রুখী বৌ দেখে অজ্ঞান, এ তার একেবারে উল্টো। তবে মায় এরকম বৌও ভাল লেগেছিল নিশ্চয়। কলিকাতার অনেক বার এ গল্প

করেছিলেন। বোট ক্যাজের, মাকে নিয়ে সাপাদিন শহর ঘুরতে পারেন, এত সময় নেই। মোটরের চালক সব চেনেন, তাঁরই উপর ভার দেওয়া হ'ল মাকে সব দেখাতে। আমি মার সঙ্গে।

মাকে শহর দেখিয়ে দুপুরে বাবার এক বিশেষ মাস্তাজী বন্ধুর বাড়ীতে আমরা গা। সকালেই শহরের বিভিন্ন অংশে একাধিক সভাতে তিলক ও বাবাকে যেতে হবে শ্রীমতী বৈশাখের সঙ্গে—বিদায় অভিনন্দন নাগরিকেরা দেবেন তিলক ও তাঁর সহকর্মীদের। সময়ের যে হিসাব শ্রীমতী বৈশাখ করেছিলেন তা আর বাধা সত্ত্বে হয় নি, সাধারণের উৎসাহের আতিশয্যে। এদিকে দুপুর ত প্রায় হয়। তাঁদের এক সভায় আমরা গিয়ে পৌঁছলাম। সভা হবে ভেঙেছে। শ্রীমতী বৈশাখ তাঁর প্রকাণ্ড বোল্ডসারেস গাড়ীতে তিলক ও বিপিনচন্দ্রকে নিয়ে উঠলেন। এই দামী গাড়ী প্রকার অর্থাৎ হিসাবে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী যমুনাপাস দ্বারকাদাস তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। আরও ২৩টি সভায় তখনো তাঁদের যেতে বাকী। আমরা কি তাঁদের সঙ্গেই ঘুরবো? বাবাকে জিজ্ঞাসা করি কি করে? ভিড় ঢেলে ত এগুলি তাঁদের গাড়ীর সামনে। গাড়ী ইতিমধ্যে অল্প অল্প চলতে আরম্ভ করেছে। পাদানিতে উঠে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম—কি করব মা ও আমরা। শ্রীমতী বৈশাখের চোখ তখন পড়েছে আমার উপর। তাঁর গাড়ীতে তাঁর অতিথিদের বিবৃতি করছে এক যুবক! আমি তাঁর মুখ থেকে বেরলো নেমে বাও, নেমে বাও এখনি। ইংরেজীতে অবগত তিনি বলেন, আর তাঁর স্বাভাবিক স্রোতের ভঙ্গীতে; আমার অভিমানে ত্যাগ যেন আরও বেশী লেগেছিল। নেমে আমি গেলাম তখন। বাবা বললেন, 'আমাদের সঙ্গে চলে।' শ্রীমতী বৈশাখ অঙ্গ বোঝেননি আমি বিপিনচন্দ্রের পুত্র। তাঁদের জরিপাড় মাস্তাজী চার কিলোমিটার ইতিমধ্যে; তাঁদের মত ঝুলিয়ে দিয়েছি গায়ে; পায়ে মাস্তাজী চটি; রঙ তাঁদের মত। স্তব্ধতা শ্রীমতী বৈশাখের চোখে আমি মাস্তাজী এক যুবক। কিন্তু হই না কেন তা? কোন যুবকের প্রাণে কি এমন করে আঘাত দিতে হয়—মনের ব্যাধি ভাবলাম। আর ভাবলাম, তিলক কি বাংলার কোন নেতা কি কোন যুবককে এভাবে বলতে পারতেন?

সেদিন বিকালে এক সভা ছিল। বটটা মনে আছে এক মন্দিরের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে। মাস্তাজীর জনতা বিপিনচন্দ্রের পরিচিত। তিলক ও বিপিনচন্দ্র এসবার বক্তৃতা করেন। সভার পরে সে রাতেই আমরা কলকাতার দিকে রওয়ানা হ'ব, কথ। আমি ভেবেছিলাম সোজা বোধ হয় ট্রেনেই যেতে হবে। এরকম বড় সভায় বাবা আমার সবুজ একটা বাস্তব তখন মধ্য দেখেছি—হারিয়ে যাবে বলে নয়, হয়ত পিছিয়ে থাকবে এই ভয়ে। সেম্বত ডাঃ আকুগেল উপর ভার দেন, তিনি যেন আমাদের তাঁর সঙ্গে রাখেন। ডাঃ আকুগেল শ্রীমতী বৈশাখের শিষ্য ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। দক্ষিণগামী ট্রেনের তখনো কিছু দেরী ছিল। তিলক প্রমুখের গাড়ীর সঙ্গে দেখি যে গাড়ীতে ডাঃ আকুগেল আমাদের নিয়ে উঠলেন, সে গাড়ীও চুকল ফের আড়িয়াবে, খামলো শ্রীমতী বৈশাখের বাড়ীর নীচে। মোতলায় উঠলাম—বসবার বড় ঘর—আলমারী, টেবিল আর বই কাগজপত্র ভরা, কিন্তু অগোছালো নয়। শ্রীমতী বৈশাখ এসেই ক'খানা চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন—বিলাতে তাঁর অস্থায়ী

ও পরিচিত বন্ধুদের; তাঁরা যেন তিলককে সাহায্য করেন বটটা সম্ভব। এই সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। তিলকের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যুরোপে অনেক আগেই পৌঁছিয়েছে। কিন্তু নবজাগৃত ভারতের তিনিই যে অবিসম্বাদী নেতা, শিগ্গিত ইংরেজ সমাজের কাছে এটা ভাল করে জানান দরকার। চিরলের "Indian Unrest" বইয়ের অপপ্রচারে বিলাতে তিলকের নেতৃত্বের যে খ্যাতি হয়েছে তার প্রতীকার করা একারণেই প্রয়োজন। শ্রীমতী বৈশাখ দ্রুত চিঠিগুলি লিখে চললেন—নিজের হাতেই। আর শ্রীমতী জিনরাজদাস অতিথিদের চা পরিবেশন করতে লাগলেন। তিলককে চা দিনে শ্রীমতী বৈশাখের নিজের সোনার পেয়ালায়; অম্বরা ও আমিও চা পেলাম রূপোর পেয়ালায়। কপালের লিখন ছিল, সকালে বাঁর কটু ভাষণ শোনা, সন্ধ্যায় তাঁরই ঘরে তাঁর দেওয়া চায়ে অভিযুক্ত হওয়া। ছুটির কোনোটাতে আমি অঙ্গ প্রবৃত্ত হতে নই।

তিলকের এই সমাদর সাধারণ গ্রীতি বা অতিথ্যের ভঙ্গ বলে মনে করলে বোধ হয় ভুল বোঝা হবে। এঁদের মধ্যে দীর্ঘদিনের স্বাভাবিক কোন গ্রীতি ছিল বলে জানি না। তিলক প্রমুখের ১১-০৫-৬ সালের রাজনীতি শ্রীমতী বৈশাখের কোনো সমর্থন পায়নি। বিপিনচন্দ্রের ঐ সময়ের রাজনীতিক দৃষ্টান্তে তিনি 'প্রতিভার বিবৃতি' বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু ১১-১১-১৪ সালে শ্রীমতী বৈশাখ দেখলেন, দেশে এক নতুন শক্তি জেগেছে। এটা যে কত বড় শক্তি, তা তিলক প্রভৃতিও বোধ হয় বোঝেন নি, এমনই আশ্চর্য্য দেখা ছিল তাঁরা। বাংলায় এ শক্তি সংহত পন্থা হয়নি, দিকে দিকে এর প্রকাশ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল মাত্র। মহারাষ্ট্রের যে সংহতি তিলকের নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছিল, তা বিদেশীর শক্তিকে কেবল আঘাত করার জগ্গই। বাংলায়, মহারাষ্ট্র বা পাহাড়ে স্বদেশী যুগের সাধনায় মৃতপ্রায় আতির প্রাণে যে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল, আমাদের দেশের ইতিহাস এখনো তার হিসাব করেনি। এর সম্ভাবনা যে কত বড় শ্রীমতী বৈশাখের চোখেই বোধ হয় তা প্রথম ধরা পড়ে।

হোমরুল আন্দোলন তিনি আরম্ভ করেন ১১-১৪ সালে। কংগ্রেসের মধ্যে তিলক প্রভৃতিকে ফের টেনে আনেন ১১-১৬ সালে। মুসলমান নেতৃত্বের সঙ্গেও একটা রফার চেষ্টা হয় এসময়। এভাবে কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহ্যরে শ্রীমতী বৈশাখ এমন একটা সংহতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন, যাতে রাজনীতিক সকল শক্তি এই নতুন নেতৃত্বের হাতে আসে। শ্রীমতী বৈশাখই আমাদের রাজনীতিক জীবনে বোধ হয় প্রথম যিনি নেত্রী কামনা করেন, শুধু তাই নয়, একদায়কত্বও চান কিন্তু তিলকের নেতৃত্ব স্বতঃ গড়ে উঠেছে সাধারণের মধ্যে গত চল্লিশ বছরের উপর একনিষ্ঠ দেশ-সেবার। সেই নেতৃত্বের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, গ্রীতির বন্ধনে যুক্ত হতে চান শ্রীমতী বৈশাখ প্রথম থেকেই। তারই প্রকাশ আমরা দেখি এবারে তিলকের সমাদরে। ১১-১৭-১৮ সালে লড়াইয়ের গতিতে ভারতের আত্মশাসন লাভের সম্ভাবনা হতে উঠে, আগেই বলেছি। ইংরেজের সঙ্গে তার জগ্গ যে বন্ধ প্রয়োজন তার ভার একমাত্র লোকমাত্র তিলকের উপরেই দেওয়া যায়; শ্রীমতী বৈশাখ এটা জানতেন। তিলকের সঙ্গে সহযোগিতায় তাঁর তাই এত ঐচ্ছিক্য। শ্রীমতী বৈশাখের জীবনীতে আছে, তাঁর দৃঢ় আশ ছিল তিনি ভারতে আত্মশাসন প্রতিষ্ঠা দেখে যাবেন। আর এ

বদি এবারে সম্ভব হয় ত তিলকের সঙ্গে তাঁর নামও আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে অক্ষর মধ্যমা লাভ করবে।

শ্রীমতী বৈশাখের গৃহ থেকে দোজা বাটী আমরা এগমোর ট্রেনে; সেতুবন্ধ রামেশ্বরের গাড়ী এখান থেকেই ছাড়ে। এদিকের অনেক ট্রেনে করিডর আছে, বাংলা অঞ্চলে তা দেখিনি। ধমুকেটি ভারতের ও ট্রেনের শেষ সোমা। এখান থেকে এক ফেরা জাহাজে সমুদ্রের জল পেরিয়ে সিংহলের ভূমিতে পা দিলাম। এদিকের বেলগাটন একটু ছোট। কিন্তু সুন্দর ট্রেন, করিডরও। রাত্রে গেলাম সংলগ্ন খাবার ঘরে। অবগু পুরো বিলাতী খানা—সাধারণ হিন্দুর নিষিদ্ধ ভোজ্য-সজ্জারই বেশী। বাবা ত একেবারে এসব তখন খান না,—মা কখনো খান না। আমাদেরও সম্ভারে আটকাছিল এ খানার সব রকম খেতে। কিন্তু আটকালো না দেখলাম শঙ্কের খাপদে'র। বয়সে, বিজ্ঞায়, ব্যবহারে তিনি আমাদের নম্রতা ত ছিলেনই, বর্ণে বা ব্রাহ্মণ্যও ছিলেন উপরে। তাঁকে দেখে বুঝলাম আমাদের স্বাভাবিকের সম্ভার কত বাহিরের। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ভবভূতির উত্তরচরিত্রে আছে, রামচন্দ্রের সময়ে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অতিথির সম্মান-ভোজের আয়োজন হয়েছিল আশ্রমের স্তম্ভপুষ্টি গোবৎসের বলিদানে।

কলম্বো পৌঁছলাম পরদিন ভোরে। তিলক প্রভৃতি উঠলেন তিলকের এক অগ্রবক্ত ভক্তের বৃহৎ 'বাংলা' বাড়ীতে। বাবার সঙ্গে আমরা উঠলাম বাগার এক সিংহলী বন্ধুর বাড়ীতে। বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে বিলাতে তাঁর পরিচয়। নাম তাঁর ডাফলিউ এ ডি সিলভা, খুব বড় ধনী, একটা প্রকাণ্ড রংবের ক্ষেত বা প্লানটেশনের মালিক। মস্ত বাড়ী, নতুন করেছেন, চার দিকে খুব বড় বাগান। আর সবই খুব সুন্দর করে সাজান। বাড়ীর ঘরের পর্দা প্রভৃতিও দামী সিঁদুর। একটা বাড়ীর মধ্যে এত ঐশ্বর্য এর আগে দেখিনি। খাপদে'র এ বাড়ীতে এক সকালে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এলে এক মজার মস্তব্য করেন; বলেন—“এ বাড়ী দেখতে ভাল, থাকতে ভাল নয়; এত সাজান গোছান ও ঐশ্বর্যের মধ্যে কি মানুষ আত্মা পায়?” আত্মা কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম, বিভবের প্রাচুর্যের জন্ত অবশ্য নয়, বাড়ীর যিনি মালিক তাঁর ব্যবহারে। তাঁর নিজেই ছেলেপুলে নেই, স্বামী স্ত্রী দু'জনে। এক আত্মীয়ের ছেলেকে পালন করেন। তাঁর নামকরণ করেছেন আমাদের দেশীয় নাম—বোধ হয় শুশান্ত। বাড়ীরও নাম রেখেছেন ‘জাবতী’। সিংহল পশুগাঁজ ও গুল্মজাতের অধীনে অনেক দিন ছিল। তারা খালি দেশই দখল করেনি, সাধারণের পোষাক, পরিচ্ছদ, নাম, ধর্ম সব বদলে দিয়েছিল

নাম সব দি'কনসেকা, দি'সিলভা, ফার্মানসেজ প্রভৃতি সাধারণ মেয়েদের পোষাকও কতকটা আমাদের দেশের দো-আঁশলা গরীব মেয়েদের মত ব্যাগরা ও জ্যাকেট বা ব্লাউস। আমরা বাবার আগেই সিংহলে নতুন স্বাভাবিকতার আন্দোলনের প্রভাব এলে পড়েছিল। দেখলুম, শিক্ষিত সিংহলীরা তাঁদের পুঙ্গনতন বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপনে উৎসুক হয়েছেন। নিজেদের ছেলেমেয়েদের নাম আর বিদেশীর অক্ষরগণে রাখছেন না, বড় ঘরের মেয়েরা শাড়ী পরতে আরম্ভ করেছেন। পরাধীনতার যে নিম্নম চোরা সিংহলে দেখেছিলাম আমাদের দেশেও তা দেখিনি। আমাদের দেশ বিদেশী নিয়েছে, সম্পদ সব তা'দেই কায়রুত করেছে, মধ্যাধ্যায় আমাদের খাটো করতেও চেষ্টার ক্রটি করে না। কিন্তু এত দুর্ভাগ্যও আমাদের মনকে কখনো তা'দের দাসত্বের শিকলে বাঁধতে পারেনি। বাঁদের জন্ত এটা সম্ভব হয় নি, তাঁরা আমাদের চিরকালের প্রণয়—সিংহলে ১১১৮ সালে বার বার এক কথা মনে হয়েছে।

কলম্বো থেকে তিলক-বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি বিলাতের জাহাজে উঠবেন। কিন্তু লড়াইয়ের সময় ছাড়পত্র চাই। ছাড়পত্র দেওয়া না দেওয়া সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ছাড়পত্র আর পাওয়া যচ্ছিল না। চেষ্টা আগে থেকে নিশ্চয় হচ্ছিল; এখানে এলেও বিলাতে অনেক তার গেল, এল। সকলে এখানে বসে রইলেন আশায় আশায় বোধ হয় দশ-এগার দিন। শেষ পর্যন্ত ছাড়পত্র আর এল না। ইংরেজ সরকার নিরীহ ক'জন ভারতবাসীকে বুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে তাঁদের দেশেও যেতে অনুমতি দিতে পারলেন না। তিলক প্রভৃতির এত চেষ্টা, এত শ্রম, সাধারণের সংগৃহীত অর্থের এই খরচ আপাততঃ সব বুঝা গেল। এর পরে বুদ্ধ থেমে গেলে এঁরা বিলাতে গেলেন বটে। কিন্তু যে সম্ভাবনা ও যে পরিদৃষ্টি বুদ্ধের গতিতে জ্বলে উঠেছিল, বুদ্ধ প্রায় হঠাৎ ধামায় আর ইংরেজ ও তার মিত্রবর্গ জরী হওয়ার সে সম্ভাবনা একেবারে মিলিয়ে গেল। ভারতের আত্মশাসনের আশা, মনে হলো, আপাততঃ বোধ হয় নিবে গেল। এটা বলছি ১১১৮ সালের কথা। আর একটা বিশ্বযুদ্ধের পরে ১১৬৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পেল। কিন্তু ভাবি, এটা যদি প্রায় ত্রিশ বছর আরও আগে হ'ত, তা'হলে কি আমরা স্বাধীনতার এই রূপই পেতাম? তখনও কি দেশ ভাগ হ'ত, ঐক্যের নামে এক-নায়কত্বকেই আশ্রয় করতাম, দেশের কৃষি ও শিল্প সম্পদ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের দারিদ্র্যও কি বাড়িয়ে তুলতাম? কি জানি।

## শুভ-দিনে মাসিক বহুমতী উপহার দিন

এই অগ্রিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক দুর্নিবৃত্ত বোঝা বহনের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বাধিকীতে, নয়তো কারও কোন কৃতকাৰ্য্যতায় আপনি 'মাসিক বহুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধ'রে তার দৃষ্টি বহন করতে পারেন একমাত্র

'মাসিক বহুমতী'। এই উপহারের জন্ত স্পষ্ট আবরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে খুশী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরণের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে বেকোন জ্ঞাতব্যের জন্ত লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বহুমতী। কলিকাতা।

# জীবীশিক্ষার আদর্শ

তীহরিহর শেঠ

দীর্ঘ দিনের পর আজ এই বিজ্ঞানমন্দিরের একটি আনন্দ অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভাবে একটু যোগদানের সুযোগ পেয়ে সুখ ও তৃপ্তির কত স্মৃতিই না মনে উদয় হচ্ছে। বীরা আমাদের আজকের এই সম্মানের আসনে স্থান দিয়েছেন, এই সুযোগে তাঁদের আমি আমার অন্তঃকরণে সম্মান জানাই। তাঁদের এই ব্যবস্থা সাধু-উচ্চা-প্রণোদিত, তাতে সম্মেলনের অবকাশ না থাকলেও, মনে হয় আমাদের এই কাণ্ডের জন্ত নির্বাচনটা হয়ত তাঁদের একটু হিসাবের বাহিরে হইয়াছে।

কালের বিবর্তনে, হয়ত শিক্ষা-সংস্কৃতির একজন দীন সেবক হিসাবেই আমি আজ এই পদ গ্রহণের জন্ত নিমন্ত্রিত, আর এই শিক্ষামন্দিরের অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা ও স্রষ্টা আমার প্রধান সহায় বন্ধুর নারায়ণ বাবু, প্রধান বলে বিশেষিত হলেও আজ এখানে একজন অতিথি। আর শুধু তাহাই বা বলি কেন, পৌরপ্রধান-রূপে তাঁরই কর্তৃত্বাধীনে এই যে প্রতিষ্ঠান, এবং হয়ত বা যিনি ইহার নিয়ন্ত্রণের মালিক, আজ সেখানে তিনি অতিথি।

কয় দিন পূর্বে প্রচেষ্টা প্রধান শিক্ষয়িত্রী মহোদয়া যেদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন, ২৩শে মার্চ অনুষ্ঠানের দিন বাধ্য হয়েছি শুনেই তাঁকে সেদিন বা বলেছিলাম—বাণীন ভারতের পূণ্যভূমে আজ এই একটি চিহ্নিত স্থানে দাঁড়িয়ে যে কথা প্রথমেই মনে হয়, অপ্রাসঙ্গিক হলেও তা এখানে উল্লেখ না করে পারিচ না। ঠিক দুই শত বৎসর পূর্বে ১৭৫৭ সালের ২৩শে মার্চ পরাধীন চন্দননগরের ঠিক এই স্থানেই ব্রিটশ-ভাগ্যলক্ষ্মীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ এবং ফরাসী ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল। তারপর দীর্ঘ দুই শত বৎসরে কতই না পারিবর্তন ঘটেছে! আজ এখানে ইংরাজ নাই ফরাসী নাই। উভয় অবিভায় রাজশক্তির আজ ভারতে বিলাপ ঘটেছে। আমাদের মধ্যেও কত দিকে কত পরিবর্তন না ঘটেছে। মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা প্রসঙ্গেই বলি, একটা দিন ছিল যখন মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা সমাজে নিষিদ্ধ বিষয় ছিল। তখন লেখাপড়া শিক্ষা নষ্টকী ও পাততাদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। আজ আমাদের মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রেও যেমন ক্ষুদ্র অগ্রগমনের পথে অগ্রসর হতে চলেছে, কি বাষ্ট্রক্ষেত্রে কি সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রেও তাঁহাদের আসন ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতেছে। মনে হয় বুঝি বা অজ্ঞ সকল বিষয়ের ভুলনায় সমাজে নারী-প্রগতি বা নারী জাগরণই সর্বাঙ্গোপায়ে উদ্বেগব্যাপ্য।

একজিংশ বৎসর পূর্বে যখন এই শিক্ষামন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, সে দিন কত সাবধানে কত সংশয়ের না আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছিল। আরম্ভ হয়েছিল এই উদ্দেশ্য নিয়ে, অক্ষর পরিচয়ের পর দুই-একখানা বই পড়া শেষ করেছে এরূপ মেয়েদের নিয়ে তার বিবাহযোগ্য বয়সের মধ্যে এমন শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হবে যাতে সে উত্তর জীবনে সুনামতা, সুগৃহিণী, সুভগিনী হয়ে কাটাতে পারে। পাঠ্যাবয়ব, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি সকলের মধ্যেই নিম্ন বৈশিষ্ট্য ছিল, অজ্ঞ কোন প্রতিষ্ঠানের অমুকরণে তাহা করা হয় নাই। তখনও বালিকাদের বিবাহের বয়স অনেকটা কৈশোর সীমার মধ্যে

নিবদ্ধ ছিল। স্তত্রয়ঃ স্থলবিশেষে বিবাহিতা বালিকা, বালবিধবা প্রভৃতির শিক্ষার ব্যবস্থাও তাহার মধ্যে ছিল। বিশেষ সাক্ষ্য লাভ না হইলেও, পরে পুস্ত্রোৎপত্তির শিক্ষার আয়োজনও করা হইয়াছিল। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্ত বাহা কিছু আবশ্যক তাহার সমস্ত থাকি সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া মেয়েরা ম্যাট্রিক পাশ করে এ উদ্দেশ্যও ছিল না। কালক্রমে প্রথমকার মেয়েরা যখন শিক্ষামন্দিরের সর্বোচ্চ শ্রেণীর পড়া শেষ করিল, তাহাদের আগ্রহ ও সহবাসীরা অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। মনে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তখন শ্রীযুক্ত পি. কে. রায় ও ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞানয় পরিদর্শনে আইসেন। তাহারা আবশ্যকীয় সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলে, তখনকার ম্যাট্রিক শ্রেণীর ছাত্রীরা তাঁহাদের নিকট আশ্রয় ধরিল, যাতে আগামী পরীক্ষাতেই তাহারা উপস্থিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্ত। সে তারিখটি ২০ কি ২১শে ডিসেম্বর। তাহারা মেয়েদের অনুরোধ শুনিয়াছিলেন, বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা অনুমতি দিয়াছিলেন। সে বার পরীক্ষা দিয়াছিল তিনটি ছাত্রী, তন্মধ্যে শ্রীমতী ইন্দু ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী মায়া চট্টোপাধ্যায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তির পর যাতে ছাত্রীরা কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, সে বিষয় চেষ্টার কোম জট করা না হইলেও, যত দিন পর্যন্ত বেসরকারী কর্তৃত্বাধীনে ছিল, ইহার সকল বৈশিষ্ট্যই বর্জিত হইয়াছিল। তৎপরে সরকারের হস্তে অর্পণের পর কয়েক বৎসর কতকটা পূর্বের ব্যবস্থাদি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা হইলেও, পরে ঠিক কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহার কোন সংবাদ জানি না। প্রথম হইতে এখানে ছাত্রীদের দক্ষিণার হার ১, ১।১ ও ২ টাকা মাত্র ছিল এবং অবৈতনিক বা অর্ধবৈতনিকের কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। সরকারের হস্তে অর্পণের সময় তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে বেতনের হার দশ বৎসরের মধ্যে কোন পরিবর্তন হইবে না স্থির হয়। কিন্তু নয় বৎসর না যাইতেই তাহা দ্বিগুণ বা ততোধিক বর্দ্ধিত করিয়া অজ্ঞ সকল সরকারী বিভাগের সহিত সমান করা হয়। পাঠ্যাদি বিষয়ও এক্ষণে সাধারণ শিক্ষালয়ের সচিত সমান হওয়াই সম্ভব। যদি ইহা হইয়া থাকে তাহাই স্বাভাবিক। এজ্ঞ শিক্ষামন্দিরের বর্তমান পরিচালনার দোষারোপ করিবার বা বলিবার কিছু নাই।

অজ্ঞ সকল দিক বিবেচনা করিলে উল্লিখিতও কিছু যে না হইয়াছে তাহা নহে। প্রথম প্রথম উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী পাইতে সময় সময় বিশেষ অসুবিধা ছিল, কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিতা একজন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ও তাহার জীবনে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্তা এম-এ, বি-এ শিক্ষিকা নিয়োজিতা আছেন। আর একটি আমাদের আনন্দের কথা, শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিক্ষা ব্যতিরেকেও সঙ্গীত, রন্ধন, কাট-ছাঁট, হাতের কাপ প্রভৃতি যে সব শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিছু দিন বায়ৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার মধ্যে অধিকাংশই প্রবর্তন করায় এখানকার বৈশিষ্ট্যের অমুকুলেই হইয়াছে। আরও একটি আনন্দের কথা, সরকারী প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে multipurpose স্থলে পরিণত করা হইতেছে। বর্তমান বিভাগের মধ্যে সর্বপ্রথম

প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের এই উচ্চ ইংরাজী স্কুলটিকেই বোধ হয় এই বিভাগে সর্বপ্রথম Higher Secondary School-এ পরিণত করে সরকার। ইহার মধ্যমা যক্ষা করিয়াছেন। ইহা যারা এখানে বিবিধ বিষয় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ছাত্রীরা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবগ্রহীত এখানকার সাধারণের নিকট ধন্যবাদার্থ। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে হওয়া বাস্তবিক—প্রথম পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনার শেষে দ্বিতীয় পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে। সরকারী বিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৪৮ সালের পর ১৯৫০ সালে ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থলে ২২ হাজার হইয়াছে এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ৮৫৮৮ স্থলে ১৫৫৬ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলে আজ প্রায় সর্বত্র কি স্থল কি কলেক্টে ছেলে-মেয়েদের স্থানান্তরে শিক্ষা বিষয়ে যে একঘণিা ভোগ করিতে হইতেছে সে দিকে কর্তৃপক্ষের যে উপযুক্ত দৃষ্টি আছে তাহার পরিচয় এখন পঞ্চাশ পাওয়া যাইতেছে না। এই চন্দননগরেই যখন প্রথম এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় তখন সাধারণের নিকট কি ভাবে ইহা গৃহীত হইবে, আশাতরুণ ছাত্রী পাওয়া যাইবে কি না, এই সব মনে হইয়াছিল, আর আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও এই নগরেই চারিটি এবং তগদী চুঁচুড়ায় তিনটি মেয়েদের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বত্রই সকল শ্রেণী ছাত্রীতে পূর্ণ। বলা বাহুল্য, এই সব কয়টি বিদ্যালয়ই স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই অসুবিধার কথা স্বস্তি বর্তমানে এখানে প্রায় একটি সাধারণ প্রেমিক হইয়া পাঠাইয়াছে, তাহা মনে আসে। সরকারী ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত নবগঠিত কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে যোগ্য ফলে স্থানীয় দরদীদের হস্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকতর উন্নতি দেখিবার আশা অনেক করিয়াছিলেন। আশাততঃ তাহাদের নিরাশ হইতে হইয়াছে। এতাবৎ তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। স্তন্যায় এখন পঞ্চাশ সরকারের নিকট হইতে তাহাদের প্রতিশ্রুতি মত সুযোগ সুবিধা এবং আর্থিক সাহায্য না পাওয়াই তাহার কারণ। ইহা যদি সত্য হয় তবে এই দুঃখের কথা। অতীত কোন কোন বিদ্যালয়েও এই শিক্ষান্দীরে বহুদিন হইতে যে কতিপয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর স্থান শূন্য হইয়াছে তাহার কারণও তাই। সম্প্রতি এই অভাব পূরণের চেষ্টা হইতেছে বলিয়া স্তন্যায় যাইতেছে।

আজ এই যে ছাত্রীদের কৃত সৃষ্টিশীলতার প্রদর্শনীর উদ্বোধন, এই সব বিষয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতেই খেটে উৎসাহ লব্ধ এবং বিবিধ প্রদর্শনী হইতে বহু পদকাদি লাভ হয়েছিল। সময় পাঠ্যের সঙ্গে ছাত্রীদের হাতেব কাজ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রতি দেখিয়া সমাগত মনীষীদের মধ্যে কবিত্তক রবীন্দ্রনাথ, রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, কবি কামিনী রায়, সুর বাথ প্রভৃতি কতই না আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। সেসব মনে হ'লে আজও আনন্দ ছুরটি ভরে উঠে। আর সেই সঙ্গে পড়ে তাঁদের, বাদের চোঁও পরিজ্ঞমে এই শিক্ষামন্দিরটি গড়ে দিল, বিশেষ ভাবে তদানীন্তন প্রধান শিক্ষয়িত্রী বর্গতা

নীহারিকা মল্লিক ও কার্যনির্বাহক সমিতির সম্পাদক বর্গত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। তাঁদের উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

কালের নিয়মে আর এই পরিবর্তনের যুগে কতই না পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সে যুগের মানুষ, ঠিক যুগের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারি না। আর সেই জন্যই বহু বারে আদব-কায়দা ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দিবার উদ্দেশে ছেলেমেয়েদের সংস্কারবিচ্যুত করে কলকট প্রভৃতিতে দেওয়ার সার্থকতা ঠিক মত উপলব্ধি করতে পারি না। আমাদের মেয়েদের আমাদের সমাজ স'সানের উপযোগী করে শিক্ষা দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তখন ক্রাশে পড়াশুনা আরম্ভের পূর্বে এবং পরে নিত্য নিয়মিত দেবী বন্দনা করান হইত। মেয়েদের মনে দীন দরিসদের সেবারুনি স্মৃতি করিবার জন্ত স্ত্রীস্বর্ণপূর্ণা পূজার দিন মেয়েদের স্বহস্তে স্বন্দ ও পরিবেশন দ্বারা দরিস নারায়ণদের ভোজন করান হইত। বাসনিক খেলা-ধুলা প্রতিযোগিতার সময় খেলার সঙ্গে গৃহস্থালী কোন কোন কাজকর্মের প্রতিযোগিতাও হইত।

সময়ের গতিকে আজ আমি শিক্ষামন্দির হ'তে কিছু দূরে গিয়ে পড়েছি। বয়সের দ্বন্দ্ব আজ বিশ্বস্তি আমার উপর তার বধেই প্রভাব স্তির্য করলেও, সময় সময় কত কথাই না মনে পড়ে। এই শিক্ষামন্দিরের কলাস্টে আজও স্থানীয় ও নিকটবর্তী বহু পরিবারের আমার জন্ত দ্বার উন্মুক্ত। আমাদের সঙ্গে দেখা হলে আজও তাদের শ্রদ্ধা আমাকে অভিভূত করে। শৈশব ও কৈশোরে মানুষ যে আদর্শের মধ্যে থাকে পরবর্তী জীবনে তার প্রভাব থাকিয়াই যায়। আমার বেশ মনে আছে, শিক্ষামন্দির গড়বারের সঙ্গে অর্পণের যখন কথা উঠে, তখন তদানীন্তন ফগাদী-ভারতের গড়বার এবং তগদীর স্থল সমূহের ইনস্পেক্টর মহোদয় ইহার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার কিছুটা ঘটিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আমাদেরও যে সে সংশয় ছিল না তাহা নহে। তবে সেই সঙ্গে সরকারী কর্তৃক পরিচালনাদি অধিকতর দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভবিষ্যৎ অধিকতর উজ্জ্বল হইবে এ বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে। বিধবিদ্যালয়ের অজ্ঞানভুক্তি সহিত পাঠ্যাদি বিষয় ব্যবস্থামত অল্পসল্প করিতেই হইবে। সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই, সেখানে আদর্শ বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু আছে কি না জানি না। বাসিকাদের শিক্ষাক্ষেত্রে একটা আদর্শ থাকে একান্ত আবশ্যক বলিয়াই মনে করি। এসকল বিষয় নির্ভর করে বাঁধার শিক্ষা দিবার তাহাদের উপর। আমার বিশ্বাস, এখানকার শিক্ষয়িত্রীদের সে বিষয়ে জ্ঞানের অভাব নাই।

বহু অবাস্তব কথার আপনাদের মূল্যবান সময় অনেকটা নষ্ট করিলাম। আমি প্রথমেই বলেছি, আমাকে এই আদর্শ দেওয়াটা হয়ত একটু হিসাবের বাহিরে হয়েছে। একজন বিশেষজ্ঞের উপর এই কার্যনার অর্পিত হলে অনেক সময়েওপযোগী প্রয়োজনোপযোগী উপদেশাবলী শুনবার আপনাদের সুযোগ হ'ত। আমার এই ভাষণে কি অস্বীকৃত, কি শিক্ষয়িত্রী কি ছাত্রীসকল কেহই তৃপ্তি পেয়েছেন, তা মনে করি না। সত্য পরিচালকের কাছ থেকে এই সব পুরাতন কথা বা ইতিহাস শুনবার জন্ত কেহ আগ্রহাধিত থাকে সম্ভব নয়, কিন্তু আমার পক্ষে আমার এই সব ব্যক্তিগত স্মৃতি কথা

এমন একটু অনুষ্ঠানে মনে না এসে পারে না। পরিশেষে  
শ্রীভগবান সমীপে, বড় আদরের বড় যত্নে স্ট্রট্ট এই শিক্ষা-  
মন্দিরটির ও-আমার পরম স্নেহের ছাত্রীত্বের সর্ববিধ কল্যাণ  
কামনা করি। আর শিক্ষিকা-মণ্ডলী এখানে সকল সুবিধার মধ্যে  
একটি স্বন্দর সৌষ্ঠবসম্পন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে প্রকৃষ্ট মনে  
তাদের কর্তব্য পালনে সক্ষম হন, সেই কামনা করে আমার কথা  
শেষ করি। আর মেয়েরা, সংসারে তোমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব  
অনেক। মাত্র একটু কথা মনে রাখতে বলি—ইতিহাস, বিজ্ঞান,  
কৃষোগাদি অধ্যয়নের দ্বারা সেই সেই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ

হইলেও শিক্ষার প্রাথমিক বা মূল উদ্দেশ্য মনুষ্য লাভ করা, মানুষ  
হওয়া। মহাজ্ঞানী স্বামী বিবেকানন্দ মাতৃসমীপে মাত্র এই প্রার্থনাই  
জানাইয়াছিলেন—“মা, আমাকে মানুষ কর।” মনুষ্যত্বটো মানুষের  
শ্রেষ্ঠ কাম্য। তোমাদের সাধনাও তাহাই হওয়া সর্বাগ্রে প্রার্থনীয়।  
আমি মনে করি, মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্যে ব্যবধান বিশেষ  
নাই। \*

\* ২৩শে মার্চ ১৯৫৭ কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষামন্দিরের  
বাৎসরিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

## পলাতক শ্রীবিভূতিভূষণ বাগচী

রূপে বটে রসে বর্ণোজ্বল তোমার নিখিল,  
বাহুলা ত প্রাচ্যে ভাসা অবিচ্ছিন্ন দুঃখের মিহিল।  
বধূণ ঘনঘটা ঝড়-ঝড়ায়—  
নাই বা এবারে তুমি গেলে বাঙলায় ?

ভাসে পূর্ববঙ্গী কামগ্রাম ডাঙী কল্লীগুব,  
কালনা কটোয়া কালী বনগ্রাম ভরপূব।  
জুহু বজ্রধর, খেয়ে এলো দামোদর,  
জলকী কোপাঠি কংশবতী খরতর ;  
রপনারায়ণ-কুলে গর্জে লক যণা—  
বুড়িত বস্ত্রার শত শুণ্ডের তাড়না।

নববীণ 'সমুদ্র' পানিহাসে জ্বাল,  
নলহাটা তমসুক বেগলায় আশ-পাশ  
জল খেয়ে ধাঁসকাঁস।

এ সময়ে কোসকাতার বাস,  
হে লাংবা, শোনায় বে বিজ্ঞ উপহাস।

বজ্রা বাজারেছে তার তুলুতি নাকড়া,  
রাজা মাটির পথ, রাজা জলে গ্রামজাড়া।  
চায় বে গানের শীষ ! সবুজ ইসাবা,  
দোনানী কামনা আর রূপালী তুষারা।

গ্রামজাড়া, ঘরজাড়া !  
রায়মঙ্গল মাখাজাড়া মাতঙ্গা বেদিশ,  
নৌ ময়ূধাকী মধুমতীর হমিশ ?  
আখিরের ভরা গাঙে মথিত বেলন,  
বাঙলায় বাবে কি সেখা ডেউ তোলে অনন্ত বোলন।

মস্ত প্রবাহারা ভাগীরথী, চূর্ণি—  
মাতে তুর্গম অন্তর জলগারা চূর্ণি।  
কাতাধি অটব ভলে জগৎসম্প,  
বিকৃপ্তের বীরভূমে স্তম্ভিকম্প।  
ন'দে শান্তিপুত্র ভাসে ভাসিছে খাগড়া,  
বাসেই থেকে যাবে জ্বরির নাগরা !

তার চেয়ে বাণ আত্মীয়,  
ময়ূব-মধুব গুরুবের তীর—  
চন্দ্রনার খঞ্জনার নৃতো ভরপূব।  
যমুনাসহরী র'বে খেমে বহুদূর।  
দিনান্তে দিগন্তবাতা, রাজা খির নীর ;  
তাঁরাগড়ে, সাবিত্রী পাভাড়ে নামে নিশীথ তিমির।  
নৌলনরনা "আ"র বৌবন-চকল, সবুজের কলমল ;  
নয়নাভিগাম সে শৈলগাম,—সেখা যাবে তুমি ?  
বনহরিণীর ডাকে উচ্চকিত যে অরণ্য-ভূমি।  
সে কোন হাবানো পথ "থর" মরু প্রদারিত কোলে,  
নিয়ন্ত্রম নিগতি রাজে মহাশুলে সন্তুধিরা দোলে।  
সে নিঃসঙ্গ নীরবতা দস্তুর ভরাল ;  
আগিগন্ত বালুব আসনে ধ্যানমগ্ন মহাকাল।

তাই যাও, পড়ে থাক নিরন্তর তুঃখের মিহিল ;  
নদী নালা খন্দখানা খাল বিল বিল।

বিকৃপ্ত, কোসকাতা ন'দে শান্তিপুত্র, সে ত বহুদূর।  
শাল সেগুন জাঙ্গল,  
কুল পলাশ বকুল,  
সব প'রে জলের খাগরা।  
বাঙলায় গিয়ে কি হ'বে—  
ভিজে বাবে জ্বরির নাগরা।

# কল্যাণ-বিলাস

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

ত্ৰীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

## অষ্টম সর্গ

গাধনবের চেয়ে হেমকারেরা আরো বড় চোর; চৌধা-  
কলায় তাঁরা হোগীবিশেষ। বিস্তীর্ণ তাঁদের ধান।  
প্রচুর ঐষধাশালী হয়েও তাঁরা জগতে খেলা দেখিয়ে বেড়ান  
শূন্যতার। ১

সোনা-বহন-রাজ্যের যেটি সার-পদার্থ, যেটি সম্পদে ভূষণ,  
ও বিপদে রক্ষা, যেটিকে বলা হতে পারে পরম তেজঃ,—সেই  
সোনাকেও নিত্য চুরি করেন এই পাপের। ২

নিত্য-অশুচি চণ্ডালেরা যেমন হাংস স্পর্শ করেই নষ্টশ্রী করে  
বসেন ব্রাহ্মণকে, তেমনি হেমকারেরাও স্পর্শমাত্রই ক্রাবিত করে  
ফেলেন স্ববর্ণকে। ৩

মহুগ কট্টপাথরে ধীরে ধীরে সোনা কথতে কথতে সোনার  
পাণিটিকে কমিয়ে দেখানো ধাঁদের একটি কল্যাবিতা, বিক্রয়কালে  
খরখরে কট্টপাথরে সেই সোনার উগ্রতা দেখিয়ে লাভের কড়ি  
বাড়ানোও তাঁদেরি আর একটি কল্যাবিতা। ৪

লোক-ব্যবহার ভেদে জৌলের পাষণ এঁদের পাঁচ প্রকারের।

- কোনো পাষণ জল টানে,
- কোনো পাষণকে ওগুথ দিয়ে ঘামানো হয়,
- কোনো পাষণ মোম দিয়ে জমানো,
- কোনো পাষণ বালুকা-প্রায়,
- কোনো পাষণ গরম। ৫

এঁদের "মুখা" অর্থাৎ "মুচি" ছয় প্রকারের। যে খি-ভাঁজ  
মুচিটিকে যৌপাদি ও ঔষধের পাক হয়, তাকে বলে "খিপুট।"  
যেটিতে সোনা ফাটিয়ে গালানো হয়, তাকে বলে "ফোট-বিপাক।"

একটির নাম "স্ববর্ণ-রস-পায়িনী।"

যেটিতে সোনার রঙ বাগামী করা হয় সেটির নাম "সুতাস্র কলা।"

এবং আর এক রকমের মুচি আছে যেটি কেবল সীসে, কপূর  
ও কাচের চূর্ণ গ্রহণ-বিষয়েই মজবুৎ। ৬

সোনা-তোলায় বাটখারা এঁদের বোলো রকমের।

- (১) কোনোটি "বহু-মুখী,"
- (২) কোনোটি বিষম-পুট;
- (৩) কোনোটি "সুবিষতল" অর্থাৎ তলা ছেঁলা;
- (৪) কোনোটিতে পারদ রাখা থাকে;

(৫) কোনোটি পলপলে;

(৬) কোনোটির পাখনা ছুটি কাঠের;

(৭) কোনোটি গ্রন্থিমতী;

(৮) কোনোটিতে লাগানো থাকে মোম;

(৯) কোনোটিতে তাগা জড়ানো;

(১০) কোনোটির মুখ ঝোঁকা;

(১১) কোনোটি বাতাসে ঘোর;

(১২) কোনোটি সফ;

(১৩) কোনোটি ভারী;

(১৪) জোরে বাতাস করলেও কোনোটি আবার আঁকড়ে থাকে

সোনার গুড়ো;

(১৫) কোনোটির ভিতর কীট পোরা থাকে; ৭

(১৬) কোনোটিতে আবার কীট থাকে না। ৮

এই হেমকারদের "সুংকার"ও আবার ছ'রকমের।

- (১) ধীর;
- (২) সাবেরগ;
- (৩) মধ্যহিন্ন;
- (৪) সশক;
- (৫) পাতী;
- (৬) শিকরকারী। ৯

এঁদের "বহি" ছ'রকমের।

- (১) জালা-বলয়ী;
- (২) গুমল;
- (৩) বিফোটা;
- (৪) ডিয়ে আঁচের;
- (৫) সুলিকী;
- (৬) পূর্বদূত তাশচূর্ণের আঙন। ১০

এঁদের প্রচেষ্টা দ্বাদশ প্রকারের।

- (১) এরা প্রসন্ন করবেনই;
- (২) কথার বৈচিত্র্যের এঁদের অন্ত নেই;
- (৩) কণ্ঠের বোগ থাকতেই হবে;
- (৪) কাণড় ধরে টানটানি করবেনই;
- (৫) দিনের বেলায় অর্ক-নিরীকণ করবেনই;

- (৬) হোঃ হোঃ করে হাসা চাই ;  
 (৭) বোলতার মত খাওয়া করবেনই ;  
 (৮) তামাসা দেখতে ছুটবেনই ;  
 (৯) বার বার স্বপ্নদেব সঙ্গে বিবাদ করবেন ;  
 (১০) জলের বড়া ভাঙবেন ;  
 (১১) থেকে থেকে বাইরে দৌড়বেন ।  
 (১২) কাঁচা ঘূঁটের আলো বসিয়ে, লবণ ও ক্ষারের অম্লমিশ্রিত মিশ্রে হাতের কাঁচটির উপর নকল গিণ্টি খরাবেনই । ১১-১৩

এঁদের চুপকটিকে যদি মাটিতে কেলে রাখা হয়, তাহলেও দেখবে, সাধারণ লোহার পাত্র থেকেও এঁদের বাটখারাগুলো সেদিকে বেন মুখিয়ে দৌড়ছে, বিস্তৃত হয়েও বৃহৎ বৃহৎ স্রুপূর্ণ হয়ে উঠছে তারা । বাটখারাগুলো মোমে সঁটে যায় । সরিয়ে দেয় নিগুণ সোনার কথা । তারপরে পুরণের সময় আনন্দে কিরে আসে সোনা চুরি করতে...সব্বর । ১৪-১৫

বংশগণ,—অতীত অলঙ্কার অবস্থাতেও পারায় "পাতন" এঁরা জানেন । পাখাণ করা...এঁদের কাছে এক নিত্যসত্ত্ব সহজ ব্যাপার । সদৃশ ও বিচিত্র অলঙ্কার গড়বার সময় কেমন করে সেটিকে বদলাতে হয়, হাফা করতে হয়, তার প্রসার দেখাতে হয়, সে বিভায়া এঁরা পারদর্শী । সোনাটি হাতিয়ে নিয়ে অদ্ভুত হওয়ায় এঁরা পটু । তারপরে এক মাথা করে ফিরে দেবার কড়ার করেন । পান চড়াতে এঁরা দক্ষ । সময় নিয়ে নিয়ে সময় নষ্ট করতে এঁরা সিদ্ধ । ক্ষতিপূরণ, পালটানাবী...বিলম্ব জানেন । অনেক রকমের সংযোগ, অনেক রকমের দাঁহ এঁদের আয়ত্ত্বাধীন । এই একাদশটি কলাবিদ্যাকে ছোট করে বলা হয় "বৃত্তি" ।

এবং এঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ কলা হচ্ছে—

সমস্ত গুণিয়ে নিয়ে নিশিতে অন্তর্ধান । ১৬-১১

বিচারের ফলে হৃদয় পাওয়া যায় এই চতুঃস্থিতি কলাবিদ্যার । এ ছাড়া হেমকারদের অন্ত যে সব গুণ কলাটনপূর্ণ রয়েছে, হাজারচক্ষু ইন্দ্রদেবও সেগুলির হৃদয় জানেন না । ২০

বংশগণ, মেক-পাহাড়ের নাম শুনেছ কি? তিনি এখন অতিদূরে সরে রয়েছেন ! মহাব্যাক্রম পরিভাষা করে, এই ঘোর চোর হেমকারদের ভয়ে দূরে চলে গেছেন । কোনো ভুল নেই । ২১

পুরাকালে একদল মুখিক...স্বর্ণশিল্পের শত শত সঙ্কল্পে কোটি কোটি গুঁড়ে গুঁড়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতার করে কেলেছিল তাঁর শিখরগুলোকে । বিরাট মুখিকবাহিনী । এমন ভাবে তারা নখ দিয়ে কুরতে থাকে মেককে যে, সহসা শিখিল হয়ে যায় তাঁর মূল । তিনি অচল হয়ে পড়েন ।

এত ভাল-ভাল সোনার মাটি গুঁড়ে গুঁড়ে উপরে তুলতে থাকে মুখিক-নবর, যে ক্রমশঃ বেজার উঁচু হয়ে ওঠেন শ্রমেয়ক । উচ্চত স্বর্ণ-ধূলায় হলুদ হয়ে যায় দিগন্ত ।

অমরের দল স্বর্ণ থেকে আর্দ্রনয়নে দেখতে পান...শিখরগুলি অক্ষয়িত হয়ে গেছে ! সোনার পাহাড়ের ভটদেশে ধী করে রয়েছে বিরাট বিরাট গুঁড় । কল্পিত উপস্থিত হচ্ছে না তো !! তাঁরা বিশেষ ভয় পেয়ে ওঠেন ।

অগস্ত্য ঋষি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন সেবতাদের ।

তিনি তাঁদের কাছে সমস্ত কথা নিবেদন করে শেষে বললেন—

"সেবাসুরের সংগ্রামে যে ভ্রমর নিশাচরদের আপনারা নিহত করেছিলেন, তাঁরাই অধুনা ঐ মুখিক-রূপ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আরম্ভ করে দিরেছেন মেক-নিশাচর । তারা আপনাদের পুনর্বিধা । সুনিদের আশ্রয়ভঙ্গও তাঁরা করেছেন ।"

অগস্ত্যমুনির নিবেদন শুনে সেবতারা আর কালবিলম্ব করলেন না, ধূম দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিলেন গর্তগুলিকে । পুরেই অভিধানে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল মহা-মুখিকের দল । এবার তারা ছাই হয়ে গেল । ২২-২৮

সেই মুখিকবাহিনী এই সুবর্ণকারেরা ; পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন ধরাধামে । জন্মভাষা তাঁরা তুলতে পারেন নি । তাই রাত্রিদিন কেবল কুরে কুরে বার করেই চলেছেন...কারণকর্তৃপক্ষ । ২৯

সেই হেতুই বলছি, যখন পৃথিবীপতিদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে রাজ্য চালনা, তখন বেন তাঁরা বিব-মায়ক ও চোর-ডাকাতদের মধ্যে একমাত্র সুবর্ণকারকেই নিগ্রহ করেন...সর্বথা ও নিত্য । ৩০

ইতি সুবর্ণকারোৎপত্তিনাম অষ্টমঃ সর্গঃ ।

### নবম সর্গ

এই সমুদ্রবেশনা পৃথিবীতে, বংশগণ, প্রেতারকরা...যে মায়াজাল বিস্তার করে বেবেছেন, যেটি বিশাল । দীর্ঘেরা এই ভাবেই ভাল ফেলে ডাঙায় তোলেন নষ্টবৃত্তি মন্ত্যদের । ১ ।

যে প্রাণ মানুষের পরম ধন, সর্বস্ব ; যেটির জন্তে মানুষের এত আয়াস, এত প্রচেষ্টা ; সেই প্রাণ নিত্য বানের হাতের মুঠোর মধ্যে থাকে, তাঁরা বৈজ্ঞ । তাঁদের চিনে রাণা উচিত সকলের ।

বিরহের মত তাঁরা দুঃসহ ।

বতক্ষণ না দেহ ভয় হয়ে বাড়ে, ততক্ষণ পর্জন্ম ঐ দুর্ভ বৈজ্ঞগণ ঔষধ প্রদান করবেনই ।

দ্রোগের তপ্তদিনের মত তাঁরা উগ্র ।

তৃষ্ণার অন্ত নেই তাঁদের ।

শোষণ করে সর্বস্ব ।

ঔষধের নিত্য পরিবর্তন-মূল্য, এবং স্ব-বিজ্ঞার গবেষণা মূল্য প্রথমে তাঁরা সহস্র সহস্র নরহত্যা করেন, পশ্চাতে সিদ্ধ হন বৈজ্ঞ-রূপে । ২-৪ ।

গণৎকারদেরও বংশগণ চিনে বেধে । কেউ যদি কিছু প্রয় নিয়ে এল, দেখবে, গণকঠাকুর তখন ধীরে ধীরে রাশি-চক্রের বিজ্ঞান নিয়ে বসবেন, হরেক রকমের যন্ত্রের বিকৃতি দেখাবেন, নাটক করবেন গ্রন্থ-চিন্তার এবং তারপরে বহু পরে যদি কিছু বলতে চান, তাহলে তাঁর সেই ভাষণ হবে যৎকিঞ্চিৎ ।

চন্দ্রের সঙ্গে বিশাখার মিলন হচ্ছে গগনে, গণছেন বসে গণৎকার । কিন্তু লম্পট সর্পদের নিয়ে যবে যে চমৎকার খেলায় মেতেছেন ঘরগী, সে গণনা তাঁর আসে না । ৫-৬ ।

এক দল ভোক্তার আছেন, ধীরা প্রথম জীবনে চন উড়ন-চণ্ডী, গড়ান পোড়ান সর্বস্ব । তার পরে তিনি হয়ে ওঠেন সোনার কাড়াল । বিনাশ করতে থাকেন সেই সব বসিক-প্রবরদের, ধীদের বড়া ভক্তিভক্তি ধন । তাঁরা চিত্রকর । তুলিবাকীতে তাঁরা গুজ্জার । ৭

এক দল আছেন, ধীরা ধাতুবাদী । তাঁরা বলে যেডান—



“হেঃ হেঃ, আমার এই শতবেদীটি, এই সহস্রবেদীটি, সিদ্ধ। রসও বেরিয়েছে।” তাঁরা ঠক্। কী চেহারা তাঁদের। নয়, মলিন, ক্লম, ক্লম। ৮

আর এক প্রকার ধূর্ত আছেন। তিনি রাসায়নিক। জরাজীর্ণ। তাঁমার ঘটের সঙ্গে উপমা দেওয়া চলে তাঁর মুণ্ডের। এক-মাখা-টাক-বাবুদের ট্যাঁক সমান কেশোৎপাদনের কথা শুনিতে। অতিক্রমী তাঁরা। সব সময়েই তাঁদের ছুরাশা বন্ধক দেওয়া থাকে শব্দ-রমণীদের নয়নতারা বা আছাদী শুচিতায়। বেলপাতা পুড়িয়ে হোম করতে করতে ধূমাক্ত হন অবশেষে। ১-১০

বংশগণ, ভগতে দলে দলে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বহু ধূর্ত-রত্ন। সাসারী মাঘুর তাঁদের কাছে দৌড়, সিঁদুরি লোভে। আর সেই বস্তুর-মাঘুরের আশা ও আকাঙ্ক্ষাগুলোকে জাগিয়ে রেখে খেলা দেখান, বলেন—“বন্ধ করলে যদি আকাশ কুসুম পাওয়া যায়, তাহলে খেচরী বিজ্ঞা বলে বিজ্ঞাধর তুমি অনায়াসেই লাভ করা যেতে পারে।”

“আশা বশীকরণ বীরা ভানেন, তাঁরা তো বলেই থাকেন—মশার হাড়গুলোর মধ্যেও নানান সিঁদুরি রয়েছে।” “আরে আরে এত ভাবনা কিসের মহাশয়,—কালো ঘোড়ার নৈদি আলিয়ে অজ্ঞান করে নিন, সেই অজ্ঞান চোখে লাগান—ইন্দ্রের ভবন দেখবেন গগনে।” তাহলে কথাটি কান পেতে না হয় শুনলেন; ব্যাঙের চর্বি ব্যবহার করুন।

মাঘুরের পক্ষে অসম্ভাবমূলক হওয়া কী কথা। ইত্যাদি ভাবণে উত্তেজিত করে নিরীহ মাঘুরদের তাঁরা পাঠান নরকে। ১১-১৩

এমন এক দল প্রত্যেক আছেন, বীরা কুলবধূদের তুলিয়ে ডালিয়ে গৃহত্যাগিনী করানতে পারেন। পথে পথে নারীদের রক্ষা-দান করা তাঁদের অভ্যাস। অথচ রত্নতন্ত্র ও কামতন্ত্র-মূলক মূল মন্ত্র তাঁদের অজ্ঞাত। ১৪

এই সব ফেরিওয়ালার গুস্তরা প্রেমমত্তে দীক্ষিত নন। কনিক

মিলনের মোহ ছড়িয়ে আশ্বপাং করেন সবল মূঢ়দের অর্ধসম্পদ, এমন কি পত্নীও। তাঁরা ব্যাধের মত। ১৫

“আহা, আপনার হাতের ধনবৈখাটি! শুধু বিপুল। নয়, বিপুলতর। কিন্তু আপনার স্বামীটির—হৃদয় বড় ঢেঁকল; এই হেন বচন ছাড়াই ধূর্ত-শ্রেষ্ঠ, আর বীরে বীরে টিপতে থাকেন কুলবধূদের কমল-কোমল পাণি। ১৬

বুড়ো আঙুলটিকে জলের মধ্যে ডোবান কচ্চা, আর দেখতে থাকেন—শুনড্রম। কিন্তু আসল চোরটিকে তিনি দেখতে পান না। ইন্দ্রজালের এমনই মোহ। ১৭

মস্তুর নেই, তস্তুর নেই, ছোট একটি ধূপ জালিয়েই চাকরদের বশ কবে কেলেন ধূর্তেরা, আবোলতাবোল বলেন, মনিবদের মাথার চাঁট মেরে মজার চালান পান-ভোজন। ১৮

“নাগার্জুনের লেখা এই যুক্তিটি ধূপে জড়িয়ে কৌশলের মধ্যে রাখুন। চুরি করতে এলেই মূর্খা হবে চোর।” ইতি আশ্বাস দেন ধূর্ত, আর আঙুলে পড়ে পরের ধন। ১৯

এই কুট ধূপ-কণ্ডারের, বংশগণ, চিনে যেখা। তোমরা গল্প শুনেছ তো বন্ধুপুত্র আর চোরের?—বাতে প্রত্যেক কল হয়েছিল—দারিদ্র্য এবং রাজভল? ২০

“বণিকটি মহাধনী। পুত্রীটিকে তিনি আবার পুত্রবৎ দত্তক নিয়েছেন। বুঝেছ হে, পুত্রীটি আবার আমার অধীন।”— ইত্যাদি কথার খই ফোটে ধূর্তের মুখে, আর বীরে ভোগে আসে কস্তার অর্ধ। ২১

বংশগণ, এই যে সব প্রত্যেক ধূর্তদের কথা বলা হল তাঁদের নিরোগ করেন শত্রুরা।

সাক্ষাতিক তাঁদের ভাষা;

তাঁরা মর্ষজ,

তাঁরা হৃদয়-চোর।

মিথ্যা-বহির বা বোবা সাঝা তাঁদের কাছে;...খেলা। ২২

[ ক্রমশঃ ]

## নালন্দা

আহমদ নওয়াজ

পুরাকালের শিক্ষাগারের এই নালন্দা গীঠস্থান,  
এই নালন্দার গীঠ হলো বিশ্ববোড়া সাম্যগান।  
ছাত্র গ্রন্থন নানান দেশের বধা, কাম্বীর পেশাবার,  
চীন, জাপান, কোরিয়া, জাভা, তিব্বত এবং স্রমাত্রার।  
তাহার সাথে ছাত্র এলেন মঙ্গোলিয়ার বোখারার  
সাদা, কালো, সীত ও হলুদ মিশিয়ে হলো একাকার।  
ব্রাহ্মণ আর বুদ্ধগুণের কৃষ্টি এবং শিক্ষাসার,  
এইখানে হয় প্রচারিত প্রচেষ্টাতে পাল রাজার।  
জ্ঞানের খনি এই নালন্দা শিক্ষার্থীর পূণ্য মঠ,  
উদারতার আবাস-ভূমি মুক্ত এবং অকপট।

অবিত্যর এই নালন্দার জ্ঞানমার্গের ভাড়াভাব,  
আজও বাজে কর্তব্যে, বর্ণগুণের সেই সারাব।

সাধ্য বৈশেষিক ও জ্ঞানের বর্ধন আর তত্ত্ব পাঠ,  
এই নালন্দার বসিয়েছিল স্বর্ণগুণের স্বর্ণ-পাঠ।  
তাহার সাথে নিত্য ছিল বেদ ও উপনিষদ-বাসী,  
যাহার মাঝে লুক্কায়িত সত্য আছে চিরধনী।  
যোগ বর্ধন শিক্ষার আশার এলেন করেন সাং চিনের,  
শিলাভ্রমের কাছে পেলে শিক্ষা গুণ-তত্ত্বের।  
তখন ছিলেন শিলাভ্রম নালন্দাতে চান্দ সেদার,  
মহাজ্ঞানী সাধক পুরুষ, বঙ্গদেশের রত্নসার।  
এই নালন্দার দেশ-বিশেষের জ্ঞানশিপাত্ত পাঠক হল,  
জ্ঞান সাধনার লাভ করেছেন, মহাজ্ঞানের মহাকল।

# অঘোর প্রকাশ

( স্বগীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী )

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আর্জবন্ধু

১৮১৪ সালের মাঘ্যমাসের পর রাত্রিগৃহ যাত্রা করা হইল। এবারও পথে পথে গান ও মায় কথা বলা হইল।

বিজ্ঞানলের জন্ত ও পরিবারের জন্ত শ্রম নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল। মার্চ মাসে শ্রদ্ধের দীননাথ মজুমদার মহাশয়ের কন্যা নির্মলার সহিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বিনয়ভূষণের বিবাহ হয়। এ বিবাহে তোমাকে অনেক খাটিতে হইয়াছিল। গোপাল বাবুর তোমার বাটতেই ছিলেন। তার পর লক্ষ্মী নগরীতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষের কন্যা সরলায় সহিত শ্রদ্ধের দীন বাবু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সেখানেও তুমি গমন করিয়াছিলে। তুমি সেখানে বরযাত্রী ও কন্যায়াত্রী উভয়ই হইয়াছিলে। সেখানকার একটি ঘটনা মনে আছে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন হিন্দু ভ্রাতাকে একটি মুষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। কারণ, সকল ভ্রাতার সঙ্গে তিনি আহার করিতে পারিবেন না। তুমি তাঁহাকে দেখিলামাত্র তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিলে, এবং আশ্বাস দিয়া তাঁহার ভিন্নখানে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলে। তিনি একথা এখনও ভুলেন নাই।

ইহার পর তোমার দ্বিতীয় কন্যা সরোজিনীর বিবাহ উপস্থিত হইল। বিবাহের জন্ত আমরা চেষ্টা করি নাই, কারণ চেষ্টা করা তোমার ও আমার উভয়েরই বিশ্বাসবিরুদ্ধ ছিল। বিবাহটা আপনি এ সম্বন্ধ মিলাইয়া দিলেন। কন্যা সরোজিনীকে তুমি বৈরাগিনী করিয়া গঠন করিয়াছিলে। বেশভূষা সাজসজ্জা তাঁহার কিছুই ছিল না। তিনি যথাকেই নিজের অলঙ্কার বলিয়া জ্ঞানিতেন। বরপক্ষের অভ্যন্তরকর্ণের সঙ্গে কথাবার্তা হইবার সময় শ্রদ্ধের প্রতাপ বাবু মহাশয়ের পত্নী কন্যার ছবি পাঠাইয়া দিতে অনুবোধ করেন। একা তাঁহার ছবি তুলাইলে পাছে তাঁহার মনে কিছু আশঙ্কা হয়, তাই সে সময়ে তোমার, আমার, সুবোধের ও সরোজিনীর ছবি তোলা হইল। ভাগ্য সেদিন তোমার ছবি তোলা হইল, নতুবা তোমার একখানি ছবিও আমার কাছে থাকিত না। দেখে থাকিতে দায়ে পড়িয়া সেই একবার মাত্র কালীর ছবি লইতে দিয়াছিলে। ছবি তো তোলা হইবে, কিন্তু উপযুক্ত সাজসজ্জা করিয়া বাওয়া হয় নাই। কটোগ্রাহকার বলিলেন, সাদা কাপড়ে ছবি ভাল উঠিবে না, তাই আমার গেকরা গায়ে দিয়া সকলে ছবি তুলিলে। এইরূপে অশ্রুস্ত অবস্থার ছবি তুলিয়াছিলে বলিয়া, বিশেষতঃ কন্যাকে সাজাও নাই বলিয়া, তুমি বন্ধুজনের কাছে অনেক কথা শুনিয়াছিলে।

বরকন্যা পরস্পরকে পছন্দ করিলেন, তার পর বিবাহের আয়োজন হইল। একই বৈদীতে বসিয়া শ্রদ্ধের অমৃত বাবু ও ভাই শিবনাথ বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর কন্যার খণ্ড-খাণ্ডীর নিকট হইতে

সংবাদ পাইতে লাগিলাম যে তাঁহার পুত্রবধু পাইয়া অতিশয় সখী হইয়াছেন। ইহাতে আমাদের সুখের সীমা রহিল না।

কন্যার বিবাহের পর তুমি তোমার সেবার কার্যে আরও প্রাণ-মন ঢালিয়া দিলে। বিজ্ঞানলের ও পরিবারের নিয়মিত কাজ ব্যতীত দরিদ্র ও বিপন্নের সেবা করিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যাবুল হইলে। দুঃখ-দারিদ্র্য রোগ-শোক দেখিলে তুমি আর স্থির থাকিতে পারিতে না। এক এক সময়ে আহার নিদ্রার অবসর থাকিত না, তবু নিজে খাটিতে ও সকলকে উৎসাহিত করিতে অবহেলা কর নাই। যতই শরীর ভাঙিতে লাগিল, ততই যেন তোমার নিষ্কাম সেবা ও নিকৃষ্ট ভাব বাড়িতে লাগিল। একটা কোন বস্তুতে প্রেম আবদ্ধ না থাকিলে বা হয়, তাই তোমারই হইতে লাগিল। এদেশে নারীজীবনে যে সেবা নাই তা নয়। কিন্তু তাহা প্রায়ই স্বামী ও পরিবারের সীমার মধ্যেই বদ্ধ থাকে। তুমি যতই আসক্তির প্রাচীর ভাঙিতে লাগিলে, ততই পরের জন্ত ভাবিবার ও খাটিবার শক্তি বাড়িতে লাগিল। তোমার কাছে এ সময় যেমন বড় মানুষের বাটী, তেমনি দুঃখিনী বিধবার পর্ণকুটীর। সংবাদ পাইতেই দুঃখ দূর করিবার জন্ত দৌড়িতে। শেষে যখন এই সেবার কাজ অনেক বাড়িয়া চলিল, আমার কাছে সব সময় জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর পাইতে না। কত দিন আমার অজান্তভাবে কত রোগীর সেবা করিতে চলিয়া গিয়াছে।

একদিন রাত্রি দুইটার সময় আমার শয্যার পার্শ্বে পাড়াইয়া বলিলে, “আমি যাই।” চক্ষু খুলিয়া দেখি, তুমি আপনার মোটা সজ্জায় সজ্জিত। আমি বলিলাম, “এই শীতকালের রাত্রিতে কোথায় যাইবে?” তুমি—“বিধবা ভ্রাতৃগণের পুত্র বড়ই দীড়িত, দেখিতে যাইব।” ভ্রাতৃগণ আর কেহই নাই, একমাত্র পুত্র এক এ পাশ করিয়াছিল; সেই পুত্র স্নর রোগে এখন তখন, বায় যায়। সজ্জার সময় তুমি সেবা করিতে গিয়াছিলে। চিকিৎসার্থে পরেশ বাবুকে ডাকাইয়াছিলে। আমি এ সব কিছুই জানিতাম না। আমি নিশ্চিত হওয়ার পর, রাত্রি দশটার সময় বাটা আসিয়া আহার এবং শয়ন করিয়াছিলে। তার পর এই আমাকে প্রথম জাগাইলে। আমি—“এত রাতে কেন যাইবে?” প্রাতঃকালে যাইও।” তুমি—“বলিয়া আসিয়াছি, ডাকিলেই যাইব। অবস্থা মন্দ না হইলে ডাকিতে আসিত না।” আমি—“যেবর গাড়ী আছে, প্রস্তুত করাইয়া, তাহাতেই বাও।” তুমি—“যোড়া পরিশ্রম করিয়াছে, কোচোয়ান নিদ্রা যাইতেছে, গাড়ী প্রস্তুত করিতে অনেক বিলম্ব হইবে। ততক্ষণে হাঁটিয়া রোগীর পার্শ্বে উপস্থিত হইতে পারিব।” আমি—“তবে বাও।” অহমতি পাইবামাত্র তুমি অক্লেশে সেই ঘোষ নিশাকালে পদজ্ঞে রোগীর সেবার চলিয়া গেলে। সঙ্গে রোগীর বাটার চাকর, তার হাতে লঠন। শেষ রাত্রি হটার সময় রোগীর দেহান্ত হয়। শব গল্গাতিরে পাঠান, বহনের জন্ত ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করা, এসব তোমাকেই করিতে হইল। বিধুরা মাতার শোকে সন্তপ্ত হইয়া তুমি তাঁহাকে স্নান করাইলে, শয্যা প্রস্তুত করাইয়া দিলে, একটি

সবত পান করা হয়। বাটা আসিলে। তখন বেলা ১টা, বিজ্ঞান্যে বাইবার সময় নিকটবর্তী। উপাসনা করিয়া, একটু দুধ খাইয়া বিজ্ঞান্যে চলিয়া গেল। আহাের সময় পাইলেন না।

একদিন বিজ্ঞান্যে কাজ করিতেছে, এমন সময় তোমার পুত্রসম স্নেহভাজন ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া সংবাদ দিলেন, নিকটেই একজন অসহায় নারী প্রসবের পর কষ্ট হইয়া কষ্ট পাঠিতেছেন, সাহায্য প্রয়োজন। কামাখ্যানাথের সঙ্গে তোমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল যে, এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে তিনি তোমার সংবাদ দিবেন ও সেবার জরুরী হইয়া যাইবেন। প্রিয় কামাখ্যানাথ নিজেই লিখিতেছেন, “একদিন একটি ছাত্র মেডিকেল স্কুলে আমার বলিল যে এখানকার একজন সন্তান ধনী কোন আত্মীয় যোগে উদ্যানক কষ্ট পাঠিতেছেন। স্ত্রীলোকটির এক মাস কি দেড় মাসের একটি শিশু কষ্ট আছে, তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিবার কোনও লোক নাই, একা পথ্যাদি কিনিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। তাহার আত্মীয়-বন্ধন কেহ তাহার সংবাদ লন নাই। ছাত্রটির মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। দুঃখনিবারণের কি উপায় হইতে পারে, এই ভাবিয়া আমি গিয়া মাতৃশ্রীকুরাণীকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি আমার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ চাকরকে গাড়ী ডাকিতে বলিলেন, এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই জননাথিনী নারীর ভগ্ন কুঠিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে আসিয়াই মলমূত্র বিশিষ্ট কতকগুলি নেকড়া, বাহা গৃহের এক ধারে জড়াজড় ছিল, তাহা লইয়া কাটিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তো অবাক হইয়া গেলাম। তিনি বতকণ নেকড়াগুলি কাটিতে লাগিলেন, আমি গৃহ পরিষ্কারের জরুরী বাটা লইয়া বাট দিতে লাগিলাম। তিনি চাকরের মধ্যে নেকড়াগুলি কাটিয়া দৌড়ে শুকাইতে দিয়া আমার হাত হইতে বাটা লইয়া গৃহের সমস্ত আবজ্ঞনা পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।” গৃহটি অপরিষ্কার, এক দিকে কয়লার গুঁড়া, অপর দিকে আবজ্ঞনা। বাবুটি কয়লার ব্যবসা করিতেন, তখন নিঃশব্দ। প্রস্তুতি সন্তান লইয়া কয়লার মধ্যে পড়িয়া আছেন। দেখিবা মাত্র আপন গৃহে সংবাদ পাঠিয়া দিল। যেখান হইতে পরিষ্কার বস্ত্র, শয্যা, উপাধান চাহিয়া পাঠাইল। বখন তুমি সমাজ্ঞানী হস্তে লইয়া গৃহ পরিষ্কারে নিযুক্ত হইলে, বাবুটি আসিয়া আপত্তি করিলেন। তুমি বলিলে, “এ হাত থাকিয়া কি হইবে?” সত্য সত্যই দেখি, তোমার হস্ত সেবার জরুরী আসিয়াছিল। তুমিও তাহা বুঝিয়াছিলে। অক্ষরকণ মধ্যে গৃহ পরিষ্কার হইল, শয্যা প্রস্তুত হইল, মাতা ও শিশুর বস্ত্র পরিবর্তন করা হইল। একখানি খাটো শায়িত। হইয়া সেই নারী বলিলেন, “মা তুমি প্রাণ দান করিলে।” গৃহে গিয়া দুধ সান্ত প্রস্তুত করিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলে, ও কামাখ্যানাথকে প্রতিদিন আসিয়া চিকিৎসা করিবার ভার দিলে। সুপরিষ্কৃত সন্তানটি বখন মাতার কোলে দিলে, তখন মাতা যে হাসি হাসিলেন, তাহাই তোমার পুত্রসম। বহু দিন তিনি অশ্রুস্থ ছিলেন, প্রতিদিন দেখিতে বাইতে।

একটি বালিকা পূর্বে তোমার বিজ্ঞান্যে পড়িতেন। তিনি এখন বাহিতা। সম্প্রতি একটি সন্তান প্রসব করিয়াছেন। বিজ্ঞান্যের তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল। সে প্রত্যাগত হইয়া নিবেদন করিল। এই কস্তার পিতামাতা তাঁহে গিয়াছেন। বাটাতে কেবল কস্তার মাতা আছেন। এদিকে কস্তাটির স্ত্রীকাজ হইয়াছে। গৃহে দ্বিতীয়

নারী নাই যে সেবা করেন। শুনিবা মাত্র তুমি সেবা করিতে গমন করিলে। স্ত্রীকাজগৃহের দুর্দশা দেখিয়া তোমার বড় কষ্ট হইল। তুমি সেই দুর্গন্ধময় স্থান পরিষ্কার করিলে, প্রস্তুতি ও সন্তান বাহাতে আরামে থাকেন, তাহার আয়োজন করিতে লাগিলে। কস্তার স্বামী দেখিয়া অবাক হইলেন। গৃহ পরিষ্কার করা, সন্তান পরিষ্কার করা, শয্যা প্রস্তুত করা একসকল কার্য যেন মুহূর্ত্তমধ্যে হইয়া গেল। ডাক্তার ডাকাইল। বস্ত্রের সহিত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। সেদিন তুমি অনেক রাত্রে গৃহে ফিরিয়াছিলে। তুমি অনেক বস্ত্র করিতে লাগিলে, কিন্তু রোগ অতি কঠিন হইয়া পাড়াইল। প্রতিদিন তোমার কত ব্যয় হইতে হইত, ঠিক নাই। এত সেবা করিলে, তবু কস্তা তিন চারি দিনের বেশী জীবিত রহিলেন না। শেষ সময়ে আমিও উপস্থিত ছিলাম। রোগের বস্ত্রাচার অস্থির হইয়া কস্তা বলিলেন, “মা, আমাকে বাঁচাইতে পারিলেন না।”

তুমি বলিলে, “এখন ভগবানকে মরণ কর।” আহাঃ! বালিকা তিনি, ভগবানের বিষয় কি জানেন! ভিজ্ঞাসিলেন, “কাহাকে ডাকিব? কি বলিব?” তুমি বলিলে, “দয়াময় হরি, দয়াময় হরি, এই নাম কর।” সেই নাম করিতে করিতে কস্তা সন্ধ্যার পর দেহত্যাগ করিলেন। তখন তুমি স্বামীকে ডাকিয়া বলিলে, এখন ইহার সঙ্গতির জরুরী বাহা প্রয়োজন তাহা করা হউক। তার পর গঙ্গাতীরের শ্রাবস্ফা হইয়াছে দেখিয়া গৃহে ফিরিলে।

—বাবু হুনসেক। তিনি কাহারও সহিত আলাপ করিতে চাহিতেন না। তাহার একমাত্র পুত্রসন্তানের ডবল নিউমোনিয়া হইল। পুত্রের জননী তখন পূর্ণগর্ভা ছিলেন, তিনি সেবা করিতে অক্ষম। বন্ধুরা তোমাকে সংবাদ দিলেন। আমি তখন বাহিরে কাজ করিতে গিয়াছি। কিন্তু আমার অসুস্থতির জরুরী অপেক্ষা করা তখন সম্ভব নয়, তাই আমাকে না বলিয়াই বাইতে প্রস্তুত হইলে। ইতাবসরে আমি কিরিয়া আসিলাম। আমি তোমার সঙ্গে হুনসেক বাবুর বাটাতে গেলাম। সন্তান একটি ছোট বয়সে রহিয়াছে, দেখিবামাত্র তুমি বলিলে, ইহাকে বড় ভালবাসে লইয়া বাইতে হইবে। তাহাই হইল। বাজার হইতে জানেল জানাইলে, আপন বাটা হইতে ভাড়া তিথি চূর্ণ করা ইয়া জানাইল। পুত্রটি দিতে লাগিলে। বেলা নয়টা কি দশটার সময় বলিলে, বেলা দুইটা বাজিয়া গেল তবুও তুমি একাসনে সন্তান কোলে লইয়া সেবা করিতে লাগিলে। তারপর কস্তা হুসার এবং বিজ্ঞান্যের শিকড়িত্তি ফিরিয়া আসিলে তোমার আশ্রয় পাওয়া জরুরী হইল। বাটা আসিয়া আহাের করিয়া আবার পূর্বের মত সেবা নিযুক্ত হইলে। সন্তানের মাতা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অবাক হইয়া তোমার কাঁধকলাপ দেখিতে লাগিলেন। বাবুদের সঙ্গে আমিও অনেক বার দেখিতে গিয়াছিলাম। মনে হইল যেন তুমি আপনার সন্তান কোলে লইয়া বসিয়া আছ। তোমার পরিশ্রম দেখিয়া তোমার বাহ্যের জরুরী আমি একটু চিন্তিত হইতেছিলাম। কিন্তু হাঃ, সন্ধ্যার পূর্বেই তোমার কোল শূন্য করিয়া একা পিতামাতাকে কাঁদাইয়া সন্তান পলায়ন করিলেন। জননী বখন ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, তুমি সন্তান দিয়া বলিলে, “অধিক কাঁদিলে গর্ভস্থ শিশুর অকলাপ হইবে, এখন ভগবানের শরণাপন্ন হও।” ইহার পর হইতে সেই জননী গাড়ী করিয়া তোমার নিকট উপদেশ ও সন্তানের জরুরী বাহা আসিতেন।

তিনি যেন ঐ দিন হঠাৎ তোমার কমিষ্টা ভগিনীর মত হইয়া গেলেন।

এদিকে এইরূপ সেবা করিতে, আবার মাসিক আয়ের টাকা পরার্থে এত ব্যয় করিতে যে অনেক সময় নিজের বস্ত্র ক্রয় করিবার সঙ্গতি থাকিত না। অতি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া লোকের বাড়ী সেবা করিতেই বা কিরূপে বাইবে, এই সম্বন্ধে অনেক বার পড়িতে হইয়াছে। তোমার দৈনিক একদিন লেখা আছে, “আজ রাত্রিতে —র ভাইর পেটের খুব পীড়া থাকায় ১২টা রাত্রিতে ডাকিতে আইসে। তখন গেলাম না। ১১টার আবার ডাকিতে আইসে। তখন আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। খুব ছেঁড়া একখানি বস্ত্র পরিয়াছিলাম। সেইখানি পরিয়াই তাহাদের চাকরের সহিত তাহাদের বাটিতে গেলাম। খুব ভাল ঈশ্বরদর্শন হইল। সুস্থ/সন্তানকে একাকী লইয়া বসিয়া রহিলাম। ৪টার সময় চক্ষের সামনে আন্তে আন্তে শিশু চিরনিদ্রিত হইল। পরদিন বেলা ১টার সময় বাটা আসিয়া একাকী উপাসনা করিলাম। বড় মিষ্ট উপাসনা হইল। প্রার্থনা,—মা, সর্বদা নিত্যতা অমৃতব করিতে শিখাও।

কখনও কখনও কেহ কেহ মনে করিতেন, সেইবাবর জন্ত তুমি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান কর। কিন্তু তাহা নয়। সেই যে প্রথম ত্যাগের মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলে, সেই হইতে কখনও ভাল বস্ত্র ভাল অলঙ্কার পরিধান কর নাই। আর তা ছাড়া, কাহারও অভাব জানিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ নিজের বা কিছু থাকিত এমন কি আমার ও সন্তানদের বা কিছু থাকিত, সবই অকাতরে দান করিতে। কাজেই কিছু থাকিত না। আমি তোমার কিছু অলঙ্কার করিয়া দিই নাই। পিতৃভ্রাতৃদের যে ক'খানি গহনা ছিল, তাও সব বিক্রয় করিয়া দান করিয়াছিলে। একবার একজন লোক বেনারসী সাড়ী বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। আমার ভ্রাতৃপুত্রী বসন্ত বলিলেন, “কাকীমা, একখানি সাড়ী কেন না? নিজে না পর, সর্বোত্তমকে একখানা ক্রয় করিয়া দেও।” তুমি সকল বস্ত্রগুলি দেখিলে, কিন্তু সকলগুলিই কিরায়ীরা দিলে। বসন্ত জিদ করিতে লাগিলেন, উত্তরে তুমি বলিলে, “একখানা কিনিলে তো হবে না, আমার দশটি মেয়ে, দশখানা কিনিতে হয়।” সত্য সত্যই পরিবারের সব মেয়েদের তোমার আপনাব কস্তা মনে করিতে, তাই অসঙ্গতি নিবন্ধন আপনাব কস্তাদেরও বসন ভরণ করিয়া দিতে পার নাই। পূর্বে বধন পরের কস্তাদের আপনাব করিতে শিক্ষা কর নাই, তখন উৎসবের সময় নুতন বস্ত্র আনিতে, এবং আপনাব সন্তানদিগকে পরাইয়া দেখাই হইতে। কিন্তু বধন আপনাকে ভুলিয়া পরের মঙ্গলে নিযুক্ত হইলে, তখন উৎসবের সময় সকলের বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিতেন না বলিয়া নিজের সন্তানগুলিকেও বস্ত্রিত করিতে বাধ্য হইতে। মেয়েদেরই ভাল বস্ত্র নাই, তখন তোমার আর কোথা হইতে হইবে? তুমি তাই বেহারের ঘুঃখিনীদের মত “বুটিয়া” বস্ত্র বস্ত্র করিয়া পরিধান করিতে, এবং বড় মাহুষের মেয়েদের সঙ্গেও তাহাই পরিয়া দেখা করিতে বাইতে। সেই মোটা, বং করা, মাংসখান সেলাই করা দীর্ঘ বস্ত্র পরিয়া একদিন একজন শিক্ষিতা বম্বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে। তিনি বিলাসোৎসবের ঘরের মেয়ে। বস্ত্র দেখিয়া তিনি আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন—“এ বস্ত্র কোথায় পাইলেন?” তুমি দমিবার মেয়ে

নও, অমনি বলিয়া উঠিলে, “কেন? পরিবে? বল তো ক্রয় করি দিতে পারি। অমুক জায়গার পাওয়া যায়।”

এই বৎসরের আর একটি ঘটনা মনে পড়িল। শ্রী প্রোতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। এ হইতে ডাকগাড়ীতে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। ডাকগাড়ীতে ৭ টায় আইসে। তুমি স্বীকার করিলে, সকালে ৬টা সময় আহার প্রস্তুত করিয়া দিবে। তিনি আনন্দিত হইলেন; আহার হইবে, উপাসনা হইবে না, ইহা তোমার প্রাণে সইল না। লজ্জা ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসিলে, “৬টার আহার, তবে উপাসনা কখন হইবে?” শ্রদ্ধের মহাশয় বলিলেন, “অত সকালে কেহ আসিতে পারিবেন?” তুমি বলিলে, “আপনি বলিলেই সকালে আসিবেন,” যেন তুমিই সকলের কর্তা। হইলও তাহাই। ও সকল বাটার জী-পুকুরেরা ৫টার সময় তোমার দেবালয়ে উপস্থিত; গরম জল প্রস্তুত হইল; শ্রদ্ধের মহাশয় ৫টার পূর্বে ভ্রামন করিলেন; অধ্যোদয়ের পূর্বে উপাসনাগৃহ পূর্ণ হইল। তিনি বলিলে উহা উপাসনা কখনই করেন নাই; তোমার চেষ্টায় তাহ হইল। ৬টার সময় আহার করিলেন, ও ৬টার সময় য' করিলেন।

এই বৎসর গাজীপুরে গিয়া বুটোৎসব করা হইবে এই ই হইয়াছিল। গাজীপুরের উকীল ডাই নিত্যগোপাল রায় সকল নিমন্ত্রণ করিলেন। তোমরা প্রস্তুত হইলে। ছোট বড় সব যাব নারী। আমি ও ব্রজগোপাল তোমাদের সেবার্থে চলিলাম। সন্ধ্যা সময় আমরা আরা উপস্থিত হইলাম। সেখানকার ট্রেনে খোড় গাড়ী পাওয়া গেল না। তুমি অদম্য উৎসাহে সব মেয়েদের স লইয়া ঈটিয়াই চলিতে লাগিলে। পথ অন্ধকারে আবৃত হওয়া একটু সাবধানে চলিতে হইল। অল্প ব্রজ হইতে না হইতে সন্ধ্যা গলগোবিন্দ বাবুর বাটিতে উপস্থিত হইলাম। তিনি ও তাঁহার অনেক আশ্রয় ও বড় করিলেন। সেই রাত্রেই তোমরা শ্রী জ্ঞানচন্দ্রের বাটিতে গিয়া তাঁহার দ্বীকেও সঙ্গিনী করিলে। পরা অতি প্রত্যয়ে উপাসনা ও আহার করিয়া আরা হইতে গাজী যাত্রা হইল। তাড়ীঘাট হইতে হুখানি নৌকা করিয়া গঙ্গা ৭ হইয়া গাজীপুর পৌছিলাম। ভাই নিত্যগোপালের কতই ব' খুব বড় বাড়ী, খুব বড় মন, তোমাদের আসরের সীমা রহিল ন ২৩শে ববিবার সন্ধ্যার উপাসনা ব্রজগোপাল করিলেন। সোমব পণ্ডারি বাবার দর্শনার্থে গমন। তিনি পূর্কদিন বা' হইয়াছিলেন। তোমরা তাঁহার কুটীরের সম্মুখে বৃক্ষতলে ব' অনেক কথা কহিলে। তাহার পর গৃহে ফিিলে। ২৫শে তাঁ মধ্যে ভাই নিত্যগোপাল উপাসনা করিলেন। বড়ই ভাল লাগি' পরদিন কর্ণওয়ালিস সাহেবের সম্মি দর্শন করিয়া তার পর নি বাবু পণ্ডার পিতৃভ্রাতৃয়ে বেড়াইতে গেলে। সেদিন তুমি ৭ পুতি পরিত্যাগিলে। ভগিনীর ইচ্ছা যে সখার মত পাড়ও কাপড় পরিধান করিয়া যাও। তুমি বলিলে যে! তাহা হই বাওয়াই হইবে না। অবশেষে তোমার কথাই রহিল। বিধ বেলে গেলে, কিন্তু ভগিনীর বাটার সকলেই তোমাকে অ করিলেন। তুমি বলিলে, বস্ত্র কি সখা বিধবা হয়? তো' ধানের ক্ষুতি পরিলে বেশ দেখাইত।

## ষট্টিত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## চিন্ময় বোগ বৃদ্ধি

১৮৯৪ সালে তোমার বিতালয়ের ছাত্রীসংখ্যা আরো বাড়িল ; কাষেই খাটুনিও বাড়িল ; তার উপর বিপদের সেবার জন্ত কত আত্মনা আসিতে লাগিল, তাহাও পূর্বে বলিয়াছি। এ সকলের মধ্যে ব্যস্ত থাকিয়াও সেই চিরবাহিত খন চিন্ময় বোগের জন্ত মন পড়িয়া থাকিত। মায়ামুগ্ধ আসক্তিশূন্য হইয়া কিরূপে মার কাজ করিবে, তাহাই জন্ত সর্বদাই ব্যাকুল থাকিতে। মার কাজের থাকিত্রে তোমাকে অনেক সময় আরা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে হইত ; আমি মকঃস্থলে গেলে আর তো সঙ্গে যাইতে পারিতে না। তাই আনন্দের সহিত সংগ্রাম আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল, চিন্ময় বোগের শিখা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে এক একদিন বলিতে, “আমার ভালবাসা শেখা এখনও হয় নাই।” আপনায় প্রতি নির্ভর কখনই করিতে না ; আপনায় গুণ কখনই দেখিতে না। তাই তোমার দৈনিক তোমার নিত্য নব নব কাতর প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। একদিন লিখিয়াছ, “এখনও ভালবাসা শিখি নাই। দয়াময়ী মা, তোমার ভালবাসা শিখাও। আমার ভাল রক্ত, ভাল মাংস, হাড়ের শক্তি, সকলই দিয়া সংসারের সেবা করিলাম, ভালবাসিলাম। কিন্তু তাহার ফল এখনও দেখি শূন্য। এখন কাল রক্ত, পটা মাংস, দুর্বল হাড় করথানা দিয়া শেষ কয়টা দিন বাহা করিব, তাহা যেন তুমি গ্রাহ্য কর, ও তোমার ছেলেমেয়েরা গ্রাহ্য করেন, এই ভিক্ষা। আজি রাগ হয় নাই।” তোমার এই লেখা হইতে মনে হয়, তুমি যেন আভাস পাইতেছিলে, যে শরীর দিয়া মায়ের সেবা করিবার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। আর তাই চিন্ময় বোগের জন্ত এত লাগামিহিত হইতেছিল।

এই বৎসর একবার আমি পাটনা জেলার অন্তর্গত মিরচাইগঞ্জ নামক স্থানে গিয়াছিলাম। তখন তুমি পরে লিখিয়াছিলে, “কাষের স্রোত খুব বাড়িয়া চলিতেছে, এই সঙ্গে ক্রমশঃ বাড়িতেছে, ভয় পাইও না। মা আমাদের প্রাণ আরও প্রশস্ত করুন। শরীর তকৎ হইলেও যে বোগ কমে না, বরং পরলোকচিন্তা সহজ হয়, তবু আমার পাগল মন কেন শরীর ভালবাসে, কি জানি ? অবশ্যই কোন অভিপ্রায় আছে, বুঝি ! তা না হ’লে কেন কণিকের জন্ত আমাকে এত ফেলে দেয়। পরে আর তো সে ভাব থাকে না ; মন খুব ভাল হয়, বোগ নিকট হয়। আজ ৪টার সময় এই কথাই মনকে ব্যাকুল করিতেছিল। কে যেন বলিল, এক সময় এইরূপ শরীর আর থাকিবে না। সেই চিন্তায় মনকে কি করিল, আত্মার বোগের জন্ত প্রাণ যেন পাগল হইল। সে বোগ এখনও হয় নাই, বাহাতে শরীর দেখিলে যেমন সুখ হয় শরীর না দেখিলেও তেমনি হইবে। আজ-কাল সেই বোগের জন্ত খুব চেষ্টা করিতেছি। তোমাকে নিকটে উপস্থিত দেখিলে সকল বিষয় বলিব। এখন মায়ের কৃপাকে শুভকস্মে ঘরিতে পারিলেই হয়। কত কথা আর লিখিব, শেষ তো নাই। বোগ বাড়ুক, মা তাই করুন ; কারণ এ লেখাও তো আর থাকিবে না। মন চলে বাউক, সকল কথা বলে আশুক, এই ভাল। তুমি আর এখন মিরচাইগঞ্জে নও, এই যে আমার পাশে সত্যই আমি অন্তর্ভব করিতেছি। মা, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর, সেই বোগ দাও।”

এই সময় কোনও প্রজ্ঞা ভগিনীকে লিখিয়াছিলে, “কয় দিন নেওয়ায় খগোলের ভাই-বোন সহ খুব ভাল কাটাইলাম। কাল এখানে আসিয়াছি। আর শেষ কটা দিন নিশ্চয় থাকিবেন না। একবার আশুনাটা খুব ভাল করে খেলে দিন। আর যে বিলম্ব হয় না ; কবে কি হইবে ? খুব ধুমধাম লাগানো না। দিন যে গেল। মা এবার চরিত্র ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন। কে তাহার সেই সাধ পূর্ণ করিবে ? মাতা ও পুত্রিণী ও ভক্তগণ আমাদের উপর বড় বেশী আশা করিয়াছেন। এবার প্রজ্ঞার প্রতাপ বাবু মহাশয় ও প্রজ্ঞার অন্তত বাবু মহাশয় একই কথা বলিলেন যে, এইখানেই সেই দল হইবে, যে দলের দ্বায়ায় লোকের শাস্তি পাইবে। দিদি, এ কথা শুনিলে ভয় হয়, কিন্তু মাও ছাড়িতেছেন না। আর এক কথা শুনিলাম যে নারীর ধর্ম না হইলে ধর্ম থাকিবে না। তবে উঠুন, আর বিলম্ব করিবেন না। আমরাই যদি প্রতিবন্ধক তবে আর দেবী করা উচিত নয়।”

আর একবার আমি মকঃস্থলে গেলে আমাকে লিখিয়াছিলে, “পিকু ! তুমি এবার আশ্চর্যরূপে নিকটে বাস করিতেছ। এইরূপ নিকটে দেখিতে পাইলে আমার আর কিছু বলিবার নাই। মন খুব ভাল। কাজ বেশ করিতে পারিতেছি। লিখে আর এখন কথা শেষ হয় না। চিন্ময় কথাই ভাল। এখন তুমি জলে আমি স্থলে। — মা ভক্তিকে বলিয়াছেন, সুবোধের বাবা, মা যখন একজ্ঞ যান, কেমন বেশ দেখায়, যেন ভাই-বোনের মত। যাকে যে ভালবাসে, তার সকলই তার ভাল লাগে।” যোগেই এ প্রস্তুততা হয়। চুম্বন বিষয় এ চিন্ময় বোগ সর্বজন্য থাকে না। দুর্বল মাহুষ, জড় শরীর না পাইলে তাহার মন গুঠে না। জড়ের ভুলিয়া থাকিতে চায়। তুমিও তো মাহুষ ছিলে, তোমারও ঐ দশা হইত। বোগে বঞ্চিত হইলে তোমার কি কষ্ট হইত, নিম্নোক্ত পত্র পড়িলে বুঝা যায়। এখন ৪টা বাজিয়া ১৫ মিনিট, এই স্থল হইতে আসিলাম। সভার জন্ত প্রস্তুত হইতেছি। আজ একটি গুরুভার মাথায় লইতে যাইতেছি। কি হইবে জানি না। ফল মায়ের হাতে। তুমি এ সময় প্রার্থনা করিও ; মা আশীর্বাদ করুন। কাল গাড়ী যখন বাড়ী মুখে ফিরিল, অমনি চক্ষু দিয়া অনেকখানি জল পড়িল। আর বাধা দিলাম না। ফাঁটকের বাহিরে আসিতে আসিতে পরলোকের ছবিখানি মা হাতে লইয়া দেখা দিলেন, আর সেই ছবি দেখিতে দেখিতে সমস্ত পথ বেশ এলাম। কাল সমস্ত সময় আর আজ এ পর্যন্ত সেই ছবিখানি আমার সামনে যেন ঠাঁড়াইয়া বহিয়াছে। বেশ দিন কাটিল। আশা করি তোমারও তাই। আর আমার শরীরের জন্ত ব্যাকুলতা নাই। এখন ‘দর্শনে পৌঁছিয়াছি। এখন প্রাণ দর্শনের জন্ত ব্যাকুল হয়, এইতো এবার বুঝিতেছি।

একবার আমি গজাভীরে শুল্কর শোভাময় স্থানে একটি বাগালাতে ছিলাম। ইচ্ছা হইল, তুমিও আসিয়া সে শোভা দর্শন কর। তোমাকে লিখিলাম। উত্তরে তুমি লিখিলে, “চিরস্থায়ী ! এবার বেশ আছি। কোনও রূপে মন উল্লাস নয়। এ কাজ আমার পরিত্রাণের জন্ত। এই কয় দিনে শরীরের আসক্তি বিষয়ে অনেক উপকার দেখিতেছি। মার কৃপায় আশা করি মুক্ত হইব। এমন মন আর কখনও ছিল কি না মনে নাই। যে নির্ভর করে, তার এইরূপই হয়। আমি গেলে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাইতে হয়।

তাট ভাবিতেছি, দেখি কি হয়। যদি বাই সন্ধ্যার সময়। আহা! যদি কোন বোগাড় করিও না। বাওরার ঠিক নাই। যদি বাই, আহা! করিয়া বাইব। আশা করি, মার কোলে তুমি ভাল আছ। এবার তুমি বড় নিকট। তবে বিদায়।" পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে যদি একটা বিকৃত সমতল ভূমি পাওয়া যায়, তাহা হইলে মনে হয়, বুঝি এই শেষ, বুঝি আর উঠিতে হইবে না। যোগ-বাজের সেইরূপ এক ভূমিতে তুমি এই সময় উঠিয়াছিলে; স্তব্ধতা তোমার ঘুংখ নাই। তখন তুমি প্রিয়জনকে নিকটেই দেখিতেছিলে, আর কাঁদিলে কেন? কিন্তু অনন্তের রাজ্যে তো কাহারও কখনও নিস্তার নাই। "হইল না" একথা বলিতেই হইবে, নইলে অনন্ত উজ্জ্বল একটা কথার কথা মাত্র, যখন ঈশ্বর বোগাড়মিতে লইয়া বাইতেছেন, তখনও কত তর্ক, কত আশঙ্কা। মন কখনও কত তোলপাড় হইত তাহা এই পত্রে বুঝা যায়। "কাল গাড়ীতে আসিতে আসিতে ভাবিতেছিলাম, অমূল্য শিশুর সেবা করিতে কে দিতেছে না? আমার হাত পা কে বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন? উত্তর আসিল, 'মালিক এই হুকুম দিয়াছেন।' কোথাও কেহ নাই, অথচ এই শব্দ আসিল, অমনি মাথা হেঁট করিয়া 'বস' বলিলাম। ফুলে আসিয়া অনেক বার স্মরণ হইল। স্মরণের বেড়ার ভিতর তুমি খুব উজ্জ্বল ভাবে ছিলে। সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিয়া একবার চুপ করিয়া একাকী থাকিতে ইচ্ছা করিল। নিজের বিভ্রান্তি চুপ করিয়া লুপন করিলাম, এবং তোমাকে খুব নিকটে দেখিয়া দূরত্ব যেন ভুলিয়া গেলাম। অনেক আলাপ করিলাম। ঐ বাহা গাড়ীতে হইয়াছিল তাহা তোমার কাছে বলিলাম, ও আরো বলিলাম, আমার যে তোমার সেবা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। এইরূপে অনেক আলাপে খুব আরাম শেলাম। কিন্তু তোমার নতুন স্থানে হয় তো কষ্ট হইতেছে ইত্যাদি ভাবিয়া মনটা আবার একটু কেমন করিল; কিন্তু আমার ইচ্ছা তো কিছু নয় এই বলিয়া প্রার্থনা করিলাম। শিশু! এইরূপে আমার যে তপস্বী হইতেছে, মনে হয় তাহা কিছু কম নয়। এতই আমার জীবনকে লইয়া বাইবেহে।"

আর একবারের পত্রে এই, "কাল বেরণ দেখিলাম তাহাতে আশা বাড়িল। যেমন কাপড় পরিলাম, অমনি যেন কর্তব্যের ভিতর পড়িলাম আর আসক্তি মায়ী কোথায় চলিয়া গেল। বোধ হয় তুমি বৃত্তিতে পারিলে। যেমন করিয়া তুমি আমার মায়ী পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হও, তেমনি করিয়া তোমার মায়ী ভুলিয়া আমি অগ্রসর হইতে কাল পারিয়াছিলাম। আশা হইতেছে যে আমিও মায়ীমুক্ত হইতে পারিব। আর কি বলিব। আমার মন স্তব্ধ। আমার আর কি স্তব। মার এবং তোমার ইচ্ছা পালনই আমার স্তব। তবে এখন বিদায়।"

২০শে অক্টোবর তোমাকে আমার সঙ্গে মকঃম্বেলে চলিতে বলিলাম। কর্তব্যের জন্ত এবারও তুমি বাইতে পারিলে না। আমার মনে হইল, তবে একাকীই বাইতে হইবে। ষড়িকে তুমি লিথিয়া রাশিয়া গিয়াছ, "আমাকে সঙ্গে বাইতে অনুমোদন করায় আমি ইচ্ছা সত্ত্বেও বাইব না বলিলাম। কারণ, আমার স্তব্ধের জন্ত অনেক কর্তব্য নষ্ট হয়, অতএব কি করিয়া বাইব? গেলাম না বটে, কিন্তু মন আমার তাহারই সহিত চলিয়া গেল। আমি বেশ বুলিলাম আমার মনও গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিয়া গেলে উপরে

আসিয়া আজকার ডায়েরী লিখিলাম। প্রায় ১১ ঘণ্টা আ-  
জগিয়া থাকি। এ সময়ের মধ্যে বোধ হয় সর্বশুদ্ধ দুই কি তিন  
ঘণ্টা অঃ প্রঃ আমার মনে থাকেন না। আজ বড়ই মনটা কে-  
করিতেছে, কি জানি। মা, তুমি তাঁহাকে কোলে কর।"

১ই নভেম্বর লিখিয়াছ, "কাল সন্ধ্যার সময় উপাসনার ঘ-  
একাকী বসিয়া পরলোকের কথা ভাবিতেছিলাম। তুমি অবঃ  
ছিলে। মনে হইল যেন তুমি অনেক দূর দেশে গিয়া পড়িয়া  
তাহাই সত্য। কারণ নিকটে থাকিলে সংবাদ পেতাম  
নিজ দেশে গেলে আর তো কাগজে সংবাদ আসিবে না। তখন ত  
ভিন্ন আর সংবাদের উপায় থাকিবে না। তারটা পরিষ্কার চাই  
ব্রহ্মরূপ তার সাফ না করিলে সংবাদ দেওয়া বড় কঠিন। যে  
তার কিসে পরিষ্কার রাখি এই কথাই আজ উঠিল। এই ভাবে  
উপাসনা হইল। ইচ্ছা করিতেছে, ভিজ্ঞাসা করি কবে আসিবে  
কিন্তু করিব না, কেন না সে দেশে গেলে তো আর ঐরূপ ক-  
ব্যবহার হইবে না। যাক্ আর না, বিদায়। তোমার অধোরে।"

১২ই ডিসেম্বর লিখিয়াছ, "আজ স্বামী মহাশয় বাহিরে গেলেন  
৪টার সময় আমি আবার শয়ন করিয়া ঘরের দিকে চেয়ে দেখি-  
খালি। সহজেই মনে হইল, মাহুয় নাই। একে তো মৃত বলি-  
বলি অল্পপঙ্খিত। মৃতকে তবে আর মৃত বলিব না, অল্পপঙ্খিত  
বলিব। উপাসনায় গেলাম। যোগ যে বাড়িতেছে বেশ বুঝি-  
পারিলাম। প্রার্থনা ছিল, আত্মা দূরে গেলে যেন অল্পপঙ্খিত বা-  
আত্মা মার নিকটে গেলেও যেন অল্পপঙ্খিত বলিতে পারি  
মা তাই আজ ভিক্ষা যে, অদর্শনে যেন বলিতে পারি, অল্পপঙ্খিত  
দর্শন দাও।"

### সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পতাকা বহনের শক্তি

অনেক দিন পরে সন্ধ্যাতে শুনিলাম, "তোমার পতাকা বাহর দা-  
তাবে বহিবাবে দাও শক্তি।" ১৮১৫ সালে তোমাকে নারীজাতি  
সম্মানের পতাকা অনেক বিরোধ ও বিসম্মদের মধ্যে বহন করিয়া  
হইয়াছিল, এবং দেখিলাম সত্য সত্যই তুমি সে পতাকা বহনে  
জন্ত বলও লাভ করিয়াছিলে। শুধু এই পতাকাই নয়, এই বৎসরে  
মধ্যে তোমাকে শোকের ক্রসও বহন করিতে হইয়াছিল।

১৮১৪ সাল হইতেই তুমি মাঝে মাঝে পরলোকগত গুরুপ্রসাদ  
সেন মহাশয়ের বাটীতে বাইতে। এইরূপে তাঁহাদের সঙ্গে আত্মীয়ত  
স্থাপিত হইতেছিল। তুমি তাঁহার বৃহৎ প্রাসাদে যখন তোমার  
সেই বেহারের সাদী পরিয়া বাইতে, তোমায় বেশ দেখিতে লাগিত  
প্রথম প্রথম উহার ক্রস তোমার সঙ্গে দেখা করিতে তোমার  
বাড়ী আসিতেন না। কিন্তু তুমি তাহাতে কিছুই চম্বিত হইতে  
না। কারণ তুমি সাংসারিক ভ্রমাতায় চলিতে না, বা অজ্ঞানবুদ্ধির  
আত্মসম্মানবোধেরও ধার ধারিতে না। পরে যখন উহার  
বাড়ীর মহিলায় তোমার পরিবারকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন,  
ও যখন তোমার বিভ্রান্তির সংশ্রবে মাঝোৎসবের সময় tableau  
vivant (ট্যাবলো অভিনয়) করিবার কথা হইল, তখন উহারও  
যন যন তোমার বাড়ীতে বাতায়ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে  
উহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িয়া গেল।

এত বড় একটি ব্যাপার সম্পন্ন করিতে সক্ষম করিলে, কিন্তু তোমার নিজের তো সব জানা ছিল না যে, কি করিয়া কাকে সাজাইতে হইবে ও শিখাইতে হইবে। পরলোকগত গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধু তোমার প্রধান সহায় হইলেন। শেখান, সাজান, সব স্বন্দররূপে চলিতে লাগিল। ক্রমে তোমাদের উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। বাহারা শিখিতে লাগিল তাহাদেরও খুব উৎসাহ হইল। দেখা গেল, সাজসজ্জা, গান ও আবৃত্তি অতি সুন্দর হইবে। অবশেষে অভিনয় দেখাটবার দিন আসিল। সে দিন তোমাদের কি ব্যস্ততা, কতই উৎসাহ, কতই আনন্দ! শুধু আনন্দ নয়, ইহার সঙ্গে কিছু কিছু মানসিক উত্তেজনাও ছিল, কারণ এক শ্রেণীর লোকে ইহা পছন্দ করিতেছিলেন না। তাঁহারা তোমার উচ্চ উদ্দেশ্য বুঝিলেন না; এ সব করা বাস্তবীয় নয় বলিয়া সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

প্রথমে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গান করা হইল। তাবপর স্বর্গমুক্তিভূমিতা, বৈষ্ণবব্রহ্মপরিহিতা পদ্মাসনা লক্ষ্মী পদ্মবনে দেখা দিলেন। নেপথ্যে লক্ষ্মীর স্তব গান হইতে লাগিল। ইহার পর আবৃত্তি; তাবপর আবার যেতপদ্মবনে যেতব্রহ্মপরিহিতা বীণা-পুস্তকহস্তে সর্বস্বতী দেখা দিলেন, ওদিকে নেপথ্যে সর্বস্বতীর স্তুতিগান হইতে লাগিল। তাবপর আবৃত্তি; তাবপর ব্যাঙ্গ ও সশময় বনে লুপ্ত অকালে উদ্ভবেরে ধৌড়কেরে ধ্রুব দেখা দিলেন। নেপথ্যে সঙ্গীত হইতে লাগিল, "বিজ্ঞান কাননে সুনীতি তনয় কীদে কোথা হরি বলে, তনয়নে ধারা বয়।" তাবপর ফুলের বাগানে আসিয়া দুটি বোন, প্রকৃতির চর্য্যিতা কে? এই প্রশ্ন বিষয়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিল। তাবপর বৃক্ষমূলে পাশবন্ধ রাজকুমার প্রহ্লাদ উর্দ্ধমুখে নভঃসমুদ্র হইয়া দেখা দিলেন। নেপথ্যে প্রহ্লাদের উজ্জিস্টক সঙ্গীত হইতে লাগিল। তাবপর সঙ্গীত, "There is a happy land, far far away." তাবপর কমণ্ডলু কদ্রাকমলা গৈরিক ও ভটা চিহ্নিত "ধনু", উর্দ্ধনয়না চৈত্রজলি পুষ্পমুহূটধারিণী "ভক্তি", ও ক্রোড়ে পুস্তকধারিণী বাম হস্তে গন্তশীর্ষা চিন্তানিমগ্না "বিজ্ঞা" দর্শন দিলেন। তার পর ক্রমশ: অভিমানিনী বালিকার আবৃত্তি, বিচিত্র দেশে ছয় পদুম আবির্ভাব ও এক বালিকার অপর বালিকাকে সাধনা প্রদান, এ সকল হইয়া গেল। সর্বশেষে সঙ্গীত হইল, "না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

এই দিন সকালে ব্রাহ্মিকা সমাজ ছিল। সেখানে তোমাকে উপাসনা করিতে হইয়াছিল। তার পর সারাদিন তোমরা ট্যাবলোর জল খাটলে। বাহিরের অনেকে তো তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেনই, অবশেষে তোমার স্বমণ্ডলীভুক্ত এক ভাই বলিলেন, তোমার সকল কাজেই বাড়বাড়ি ও তোমার আচরণ বাজারের দ্রব্যের সঙ্গে তুলনীয়। সেদিন তুমি বাড়িতে আসিয়া আমার বন্ধে মাথা রাখিয়া অনেক ক্রন্দন করিলে। আমরা উভয়ে প্রার্থনা করিলাম, তার পর মনের ভার চলিয়া গেল।

শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সে বার বিশেষ হইতে প্রচার করিয়া কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন। উৎসবের দিনই তাঁর বাকিপুর ট্রেনে দিয়া মেল ট্রেনে চলিয়া যাইবার কথা। তুমি তাঁহাকে

অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলে। বিকাল ৪ টার ট্রেনে সদলবলে দানাপুরে উপস্থিত হইলে। সেখান হইতে একখানি গাড়ী মেল ট্রেনের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইবে, তাহাতে তোমরা সকলে বাকিপুর পর্য্যন্ত আসিবে, এই বন্দোবস্ত করা গেল। মেল ট্রেন দানাপুর ট্রেনে আসিবারাত্র সকলে মিলিয়া শ্রদ্ধেয় মহাশয়কে সেই গাড়ীখানিতে লইয়া আসিলেন। তাঁহার গলায় পুষ্পমালা দেওয়া হইল, পুষ্প ও স্মৃগন্ধ বুড়ি করা হইল, অভ্যর্থনাসূচক একটি কবিতা আবৃত্তি করা হইল। পরে প্রার্থনা হইল। বাকিপুর ট্রেনে গাড়ীখানি কাটিয়া দেওয়া হইল। শ্রদ্ধেয় মহাশয়কে লইয়া মেল ট্রেন চলিয়া গেল, আমরাও ট্রেন হইতে উপাসনা-মন্দিরে আসিলাম।

এই যে আমরা শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিতে গেলাম, ইহাতে অনেকে মন্দ বলিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, উৎসবের দিনে মাছুষকে বড় করা কেন? মাছুষকে, বিশেষতঃ যে উন্নতজ্ঞান বিশেষ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন তাঁহাকে, আদর করিলে যে উৎসব করা হয়, একথা ভক্তিশূন্য ব্রাহ্মসমাজ অনেক বিলম্বে বুঝিবে। যাহা হউক, এবার বেশ ধুমধামের সহিত উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। ট্যাবলো অভিনয়ের পরের দিন (২২শে জাহুয়ারী) আমাদের দৃষ্টনের আধ্যাত্মিক বিবাহোৎসবও হইয়া গেল।

এ বৎসর তোমার জন্ম নিন্দা ও সমালোচনা প্রচুর পরিমাণে অপেক্ষা করিতেছিল। এই সকল ব্যাপারের পরই রাজগৃহ হারা করিলে। পথে একখানি গাড়ী উল্টিয়া গিয়া কয়েক জন আঘাত প্রাপ্ত হন, তাই প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলাম, বৃদ্ধি আর বাওয়া হইবে না। কিন্তু বাওয়া তো হইলই, অজ্ঞানতার মত এবারও মেয়েরা পথে পথে সর্কার্ত্তন করিতে করিতে গেলেন। ইহার দৃষ্ট চিরপ্রচলিত বা নিন্দা তা হইল। তার পর বাকিপুরে ফিরিয়া আসিয়া ফুলের প্রাইজ দিবার সময়, মেয়েরা কোথায় বসিবে, কি ভাবে প্রাইজ আনিতে যাইবে, ও পদ্ম হইবে কি না, এ সব বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা ও সমালোচনা হইল। মাঝে মাঝে তোমাকে একটু উত্তেজিতও দেখিতেছিলাম।

যাগ হউক, এ সব ব্যাপার শেষ হইয়া গেল, তার পর তোমার বিভাগয়ের কাষ, পরিবারের কাষ, ও পরসেবার কাষ আবার নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল। কিন্তু এ বৎসর তোমার শরীর বড়ই ভাঙ্গিতে লাগিল। তুমি বলিতে, "ভাঙ্গা শরীর আর বসাইয়া রাখিয়া কি হইবে?" একদিনও বসাইয়া রাখিতে চাহিতে না, একদিনও নিয়মিত কাষগুলি ছাড়িতে চাহিতে না। এই ভাবে কাষ করিতেছ, এমন সময় মার্চ মাসে আর একটি ঘটনা ঘটিল। সন্ন্যাসীচরণ রায় নামক একটি বৃদ্ধ আসামে চা-বাগানে কাষ করিতেছেন। তাঁর নামে মিথ্যা চুরির মোকদ্দমা লাগান হওয়াতে তিনি হঠাৎ ভীত হইয়া চা-বাগান হইতে পালাইয়া দানাপুরে চলিয়া আসেন। এখানে তাঁহার নামে ওয়ারান্ট আসে, ধৃত হইয়া তিনি এখানকার জেলে প্রেরিত হন। তুমি জেলে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিল। তাঁহার মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত তুমিরা তোমার বিশ্বাস হইল যে তিনি নির্দোষ। তখন হইতেই তুমি তাঁর মুক্তির জন্ত উজোগ্রী হইয়া পড়িলে। তুমি তাঁর জন্ত এত ব্যস্ত হইলে যে মানুষ আপন সন্তানের জন্তও এত হয়



কি না সন্দেহ। তাঁর জন্ম অর্ধ সন্ধ্যায় করিতে লাগিলে। বধন তাঁহাকে কয়েক অবস্থায় আসাম লইয়া বাঁধিয়া হইল, তখন ব্রজগোপালকে তাঁহার সাহায্য পাঠাইয়া দিলে। ব্রজগোপাল নওগাঁতে গিয়া উকীল জীবন্ত রামমূলভ মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে উঠিলেন। তিনি অনেক যত্ন ও সাহায্য করিলেন। অবশেষে সম্যাসৌচরণ দণ্ডযুক্ত হইলেন। যতদিন না তাঁহার মুক্তি হইল, তুমি প্রতিদিন তাঁর জন্ম কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতে। প্রথমে নিম্নতর বিচারালয়ে তাঁর দেড় বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। বধন এ সংবাদ তারযোগে এখানে পৌঁছিল তখন বাগানে উপাসনা হইতেছিল। তুমি কানিয়া কানিয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা কখনই ভুলিব না। পরে বধন আবার তারযোগে মুক্তি সংবাদ আসিল, তখন তোমার আনন্দ আর ধরে না। সম্যাসৌচরণ এই নৃত্যে তোমার চিরদিনের আপনার হইয়া গেলেন। অবশেষের ভ্রায় তিনিও বেন তোমার এক পুত্র হইয়াছেন।

এদিকে তোমার পরিবার বাড়িতে লাগিল। জায় কিছু বাড়িল না। বাঁহার বাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা সে মাসের মধ্যেই দিতে, বাজারে খণ করিতে না। এ অবস্থায় সংসার চলে কিরূপে? একবার অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়া মেয়েদের কাছ হইতে তাহাদের হাত খরচের টাকা হইতে ধার লইয়াছিল। সে টাকাও তুমি নিজের তাহানের দিয়াছিলে, কিন্তু সেই নিজের প্রেমন্ত টাকা ধার লইয়াও তোমার মনে পরে অত্যন্ত অসুস্থতাপের যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল। একবার মাত্র এরূপ করিয়াছিলে, আর কখনই কর নাই। এ বৎসর তোমার বিশ্বাস আরও উজ্জ্বল হইয়াছিল। একদিন তুমি লিখিয়াছ, “আমি বেন এই পরিবারের জন্ম ভাবি না। আমার সকল ভার তুমি লও। আমার ভাই বোন আমার এই পরিবারের জন্ম ভাবিতেছেন। আজ আমার পরিবারে একটা পয়সাও ছিল না। সকালে একটি ভগিনী পুরান কাগজ বিক্রয় করিয়া ১১/০ আনা দিলেন। বৈকালে আবার একটি কস্তার বাবা ১১/০ টাকা নিজে আনিয়া দিলেন। তিনি জোড়া বস্ত্রের ও অন্যান্য খরচের বড় দরকার হইয়াছিল। এ ১২১/০ দান পাইয়া যত্ববাদ করিলাম মাকে। এইরূপে এই বৎসর মা নিজে আমার সকল অভাব পূর্ণ করিতেছেন।” এ বেশ কথ্য নয়। মাঘের বৃদ্ধিতে বাহা বুয়া যায় না, বিশ্বাসী তাহা সরল বিশ্বাসে বুঝেন। বধন পরিবার বাড়িতে লাগিল, আমি একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। তুমি বলিলে, “তাহাও কি হয়? মেয়ে আসিলে ফিরাইয়া দিব কিরূপে?” আমি আর কিছু বলিতাম না। তোমার বিশ্বাসকে অতিশয় মাত্র করিতাম। কিন্তু তোমার সহকারিত্বীগণ অনেক সময় পায়িয়া উঠিতেন না। একদিন তুমি লিখিয়াছ, “আজকাল অত্যন্ত সাংসারিক অভাব। কর্মকারিত্বীগণ অনেকে বকেন। সব হাসিয়া উড়াই, কখনও চুপ করিয়া থাকি। আশ্চর্য্য, একদিন কিছুই ছিল না। এরূপ বকুনিও হাসির পর একজন কর্মকারিত্বী নীচে হইতে হাসিতে হাসিতে ৫টা দানের টাকা পাইয়া লইয়া আসিলেন। এই টাকা পাইবার সে দিন কোন কথা ছিল না। এই টাকা দেখিয়া মাকে যত্ববাদ দিলাম। পরিবারে বিশ্বাস বাড়িল।”

২৩শে আগষ্ট রাত্রিতে তোমার কস্তা সত্যজিনীর একটি সন্তান হইল। এই প্রথম দৌহিত্র; তাহার স্মরণ যুগ্মধা তোমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কস্তার সেবা করিতে গি তুমি নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িলে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তোমার শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

এই বৎসর আসানসোলে একজন নারীর প্রতি অত্যাচ হয়। তুমি সংবাদ পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলে ন ব্যাধিটার জীবন্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে এ বিষয়ে লিখিয়াছিলে। অবশেষে ছোটলাট পত্রীকেও পত্র লিখিয়া তাঁহ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলে। লেডী ইলিয়ট মনোযোগী হওয়ার অত্যাচারীর ৫ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল।

এই বৎসর হইতে তোমার বাটীতে একটি অমুঠান প্রবর্ত করিলে। তোমার অবস্থামানে তোমার পরিবারের কস্তারা এখন ইহা পালন করিয়া থাকেন। ভাড়াভিত্তিকার দিন সব ভাইকে ডাকিলে। ভাইদের নামের প্রথম অক্ষর এক এক বানি ক্রমাৎ কোণে লেখা হইল। একদিকে ভাইয়েরা সমাদর লাভ করিব জন্ম বসিলেন, অপর দিকে ভগিনীরা সমাদর করিবার জ উপস্থিত হইলেন। ভগিনীদের পক্ষ হইতে একটি ছোট মো সকলকে কোঁটা দিলেন। সন্ধ্যা হইল, তুমি প্রার্থনা করিলে তার পর সকলকে জলযোগ করান ও নামাঙ্কিত ক্রমাল উপহা দেওয়া হইল। এ অমুঠানটি আমার অতি স্মরণ লাগিয়াছিল এখনও বাঁকপুরস্থ মণ্ডলীর এটি একটি বিশেষ শ্রিয় অমুঠান।

নবেম্বর মাসে তোমার স্বাস্থ্য আবার ভগ্ন হইয়া পড়িল কিন্তু কায় কিছুই কমালে না। এই সংগ্রামের মধ্যে তোমার জন্ম ভগবান আর একটি গুরু ভার ক্রম পাঠাইলেন। ২৫ বহন করিতে গিয়া তুমি তোমার বিশ্বাসের শক্তির পরিচ আশ্চর্য্যরূপে দান করিলে। ডিসেম্বর মাসে তোমার আদরে দৌহিত্র পাঁড়িত হইল। কস্তা সত্যজিনী কখনও এত শক্ত সেব করেন নাই, কাষেই তোমার পরিশ্রম বাড়িতে লাগিল। বন্ধুবা ব্যস্ত হইলেন, ও সাহায্য করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে উদ্ভাচর্য্য বাবু জাগিতে আসিতেন। তাঁহার পত্নীও আসিতেন, ৫ শিশুকে স্তম্ভস্থ দান করিতেন। রোগ বাড়িয়া চলিল ইহার মধ্যে মাস শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, অর্থের গুরুতর টানাটানি পড়িয়া গেল। বেজ ৪৫ টাকা ব্যয় হইতেছিল, আরো অল্প কোনও পথ ছিল না। ২৩শে ডিসেম্বর আমার অত্যন্ত চিচ্চা হইল। তুমি প্রায়ই খোকার কাছ উপরের ঘরে থাকিত। সেদিন সকাল বেলা একটু অবকাশ পাইয়া ভাঁড়ার দেখিতে গেলাম। সেখানে তোমাতে আমাতে যে কথাবার্তা হইল, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

আমি—এত খরচ হইতেছে, এখন তোমার অর্থের সঞ্চয় কিরূপ? তুমি—আছে। (পাছে চিন্তিত হই, তাই অভাব থাকিলে আমাকে জানাইতে না।)

আমি—ও আমি বুঝি না। আজ তোমার হাতে কত আছে? তুমি (একটু হাসিয়া)—এক টাকা।

আমি—কি বলিলে? ৪৫ টাকা নিত্য ব্যয়, আর আজ সকালে তোমার হাতে এক টাকা মাত্র?



তুমি আবার বিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলে—ভাবিও না, হইয়া বাইবে।

আমি—আমি বুঝিতে পারি না, তুমি কিরূপে স্থির আছ।

এই বলিতে বলিতে ঘরের বাহির হইলাম, ও চিন্তাকুল হইয়া বাবামশায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় বড় বাবামশায় কেহ ডাকিল “বাবুজী, বাবুজী।” বাহিরে গিয়া দেখি একজন পোষ্ট-পিয়ন মণিঅর্ডার লইয়া আসিয়াছে। অমুসন্ধান করিয়া জানিলাম, পরিবারের তিনটি মেয়ের জন্ত কোন অপরিচিত বন্ধু খরচ পাঠাইয়াছেন। তাহাদের জন্ত আর কখনই খরচ আসে নাই, পূর্বেও নহে, পরেও নহে। যেদিন বিশেষ অভাব সেই দিনই ৩০টি টাকা আসিয়া উপস্থিত। টাকা লইয়া তোমার হাতে দিলাম। তুমি তখন বিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কি বলিলে তাহা কি তোমার মনে আছে? তোমার না থাকিতে পারে, কিন্তু আমি কেমনে ভুলিব? তুমি এইমাত্র বলিলে, “দেখলে?” বিশ্বাসের জয় হইল, আমি হার মানিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে আমারও অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর হইল।

২৪শে ও ২৫শে খোকার রোগ খুব বাড়িল। ঘরেই পুষ্টিংসব হইতে লাগিল। ২৫শে খোকাকে ফেলিয়া উপাসনার গৃহে আসিতে পারিলে না। ২৬শে উপাসনা উপরের ঘরেই হইল। তুমি খোকাকে কোলে করিয়া উপাসনা করিলে। ২৭শে এই প্রার্থনা করিলে, আমরা যেন শিশুর রোগের মধ্যে সকলেই ক্রম বহন করিতে পারি। তুমিও এখন বুঝিলে, খোকা থাকিতে আসে নাই। বেশ

প্রভৃতি হইতে লাগিল। জামাতা জ্ঞান আগিলেন, খুব চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিছুতেই কিছু হইল না। ৪ঠা জামুয়ারী (১৮৯৬) অমর বাতী অমর ধামে চলিয়া গেল। ইতার মধ্যে ১লা জামুয়ারী পরেশের বাটতে নববর্ষের উপাসনা হইয়াছিল। সেদিন বন্দোবস্ত করিয়া তুমিও গিয়াছিলে।

এই জামুয়ারী অনেক বড় বড় গোলাপ ফুলে খোকাং সাজাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। গোলাপ ফুলের মধ্যে খোকার মুখখানিও একটি গোলাপের মত দেখাইতেছিল। অনেক দিন পূর্বে বলিয়াছিলাম, তোমাকে শ্মশান দেখাইব। তোমার খোকা আগুনে গুড়িবে, তুমি তাই দেখিতে চাহিলে। গাড়ী করিয়া তুমি যাতে গেলে। বখন দাহকার্য্য হইতেছিল, তাহার মধ্যে তুমি একবার বলিয়াছিলে, “স্বর্গাধ, অত নিষ্ঠুর কেন হও?”

এইরূপে ১৮৯৫ সাল চলিয়া গেল। তোমার জন্ত এ বৎসরটা অপিত ক্রমশঃ ভারী হইতেছিল। তুমি তাহা নিরাপত্তিতে বহনও করিতেছিলে। বাহিরের জীবনে এই ক্রম, অন্তরের জীবনেও দেহের সঙ্গে সংগ্রাম, ও আমার সঙ্গে মিলনের জন্ত আপনাকে বলিদান, এ সকল অন্তরকে শাস্ত করিতেছিল। তুমি সে সকলকে কেমন করিয়া “মায়ের হাতের বেদনার দান” বলিয়া গ্রহণ করিতেছিলে, কেমন করিয়া “জীবনে মৃত্যু বহন” করিয়া মৃত্যুকে জীবন বলিয়া আদর করিতে পারিয়াছিলে, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

[ ক্রমশঃ ]

## একপ্রশ্ন

### পীফেন স্পেণ্ডার

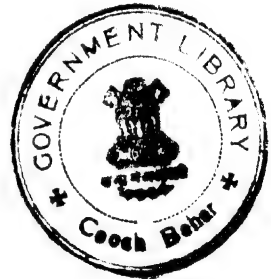
চারটে বাজার পরে ষ্টেশনের কাছে সিগজাটায় পাখা নামে, বাঁশি বাজে, কানে তালো লেগে যায় ;  
বিকট আওয়াজ করে কালো তেল-চুকচুক পিষ্টন  
নড়ে গুঁঠে, গুঁঠে নামে, তালে তালে ঘোরে ঢাকা বন্-বন্ ;  
ষ্টেশন ছাড়িয়ে ধীরে এঁকে-বঁকে একপ্রশ্ন যায়  
যোঁয়া তার শৃঙ্খের তরলিত মেঘ হয়ে আকাশ ছাপায় ।  
কত সব বাড়ি-ঘর দুই পাশে ছুট-ছুট দৌড়ায়  
কারখানা, বাতিঘর, কবরখানার ভিত্র নড়ে যায় ।

অনেক দূরের দেশে দিগন্ত মাঠ আর দীঘল,  
পাহাড়ের হাতছানি, নীলাকাশ, আর ঘন বনভল ;  
উধাও গতির স্রোতে তার-তানো খুঁটিগুলো পর পর  
উড়ে চলে—সীমাহীন বাতীর নেই কোনো অবসর ।

রাত এলে দীপ ঘেলে ছুটে চলে দূর দূর বন্দর-নগর,  
বুকে তার কুঁইরাতে স্তব্ধ চিঠির খবর,  
ফস্করাসের আলো ঐ দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের চুড়ায় ।  
পৃথিবী ছাড়িয়ে যেন ধূমকেতু হবার নেশায়

পাড়ি দেয় নৈশ রাতে, লৌহবর্ষে গুম-গুম ধ্বনি,  
এমন সঙ্গীত, আঁহা, মৌমাছি কি পাখিরের কাছের গুনি ।

অনুবাদক—দেবীদাস চট্টোপাধ্যায় ।





[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

জ্ঞানিনি না, ভিত্তিতে কি বিখ্যাসেতে সোরাধাচি আমার হুকুম বর্ণে বর্ণে তামিল করেছিলো। যতক্ষণ লেখক ঘরে ছিলো ততক্ষণ দেয়ালের ঠিকে কঁরে মুখ ঢেকে নিশ্চক্ষে পড়েছিলো। সোভাগ্য ওরও, শুধু আমার নয়—কারণ একটু এদিক-ওদিক হলে ওকে যে কী করতাম তা আমিই জানি। লেখক চলে গেলে ওকে বললাম, “আজ তুমিই দেবদূতের আবার আবির্ভাব হবে—তারা সঙ্গে কাঁচি থাকবে, তাই দিয়ে তুমি আমাদের দু’জনের দাড়ি ভালো করে কামিয়ে দেবে।” আমি আগেই জেনে নিয়েছিলাম সোরাধাচি জাতে নাশিত।

—“দেবদূতেরও দাড়ি থাকে নাকি?”

—“নিশ্চয়ই। তুমি আমাদের কামিয়ে দিলে আমরা এই প্রাসাদের ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবো। সোজা গিয়ে নামবো সেন্টমার্ক স্কোয়ারে—সেখান থেকে জাদুঘর চলে যাবো—”

সোরাধাচি চূর্ণচাপ সুনলো—কোনো কথাই কইলে না। খেতে বসেও নিশ্চক্ষে খেয়ে নিলে। আমার মন তখন এত উত্তেজিত, সত্যমুক্তির আশায় এত বিভোর যে, খাওয়া তো দূরে, ছাটি বাত দুই চোখের পাতা অবধি এক করিনি।

ঠিক সময়টিতে দেবদূতের আবির্ভাব হলো। দেওয়ালের গর্তটির মুখে যেই ফানার বালবিকে দেখা গেল সেই মুহূর্তেই সোরাধাচি তাঁকে সঠিক প্রণিপাত জানালো। বালবি নেমে পড়ে দুই হাতে আমার ভুড়িয়ে ধরলেন।

—“আপনার কাজ এবার শেষ হলো ফানার বালবি! এখন শুরু হবে আমার কাজ—”

বালবি আমাকে একজোড়া কাঁচি আর আমার সেই বিখ্যাত হাতিয়ার লোহার বড়টি ফিরিয়ে দিলেন। আমার কথা মত সোরাধাচি আমাদের দু’জনকেই বেশ সুন্দর ভাবে চেঁচে-ছুলে দিলে। আমি বালবিকে বললাম, সোরাধাচির কাছে অপেক্ষা কর্তে ইতিমধ্যে আমি একবার সমস্ত জায়গাটা পরীক্ষা করে আসবো। দেওয়ালের গর্তটা একটু ছোটো হোলোও কোনো মতে দেহটাকে গলিয়ে নিয়ে সোজা নামলাম বালবির ঘরে। সেখানে ওর সহবন্দী কাউন্ট গ্র্যাসকুইনি শুয়ে আছেন দেখলাম। সুপুরুষ, বুদ্ধ ভদ্রলোক। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এর পর আমার মতলবটা কি? আমি বুঝিয়ে বললাম, কিন্তু বুদ্ধ সন্তুষ্ট হলেন না ওর মতে আমি শুধু উত্তেজনার বশে খামখেয়ালে এত বড় বিশদের কুকি নিচ্ছি। উনি রাজী নন আমার সঙ্গে পালাতে। তবে আমার মঙ্গলের জন্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন ঠিকই। ওর ধারণা, ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে দু’জনা ডানা না গজালে মাটিতে নামা সম্ভব হতে পারে না—আমার ব্যাখ্যা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়।

ফিরে এলাম আমার সেলে। তারপর পুরো চারটি ঘণ্টা ধরে যত কষ্ট, চান্দ, ওয়াক, বিছানাকাটা, টেবিলরথ ছিলো সব সফল লম্বা ফালির মত করে কাটলাম—সেইগুলো ছুড়ে একশো গজ লম্বা দড়ির মত করলাম। তারপর কোট, সাট, মোজা এগুলো একটা ছোটো প্যাকেটের মত করে বেঁধে মিলাম। এসব কাজ হোলো সেই গর্তটা দিয়ে তিন জনে আবার এসে কাউন্ট গ্র্যাসকুইনির সেলে নামলাম। সেখানে ঘণ্টা দুই ধরে ছাদেতে আর একটা বড় গর্ত করলাম—কিন্তু সেই গর্তের ভিতর দিয়ে দেখি, বাইরে জোৎস্নায় আলোর বান ডাকছে—এমন রাতে সেন্ট মার্কস স্কোয়ারে দলে দলে সবাই বেড়াই—অতএব এত সময় ‘লেডস্’-এর ছাতে ডুটো ছায়াছবি সবার মনেই সন্দেহ জাগাবে। অপেক্ষা করতে হোলা।

কাউন্ট গ্র্যাসকুইনির কাছে ব্রিশ সেকুইন (ইতালীয় মুদ্রা) ধার চাইলাম—জাদুঘরিতে নিরাপদে পৌছবামাত্রই ফেরৎ পাঠাবো, এমন প্রতিশ্রুতিও দিলাম। কিন্তু কুপণ বৃদ্ধ কিছুতেই রাজী নয়—আমিও ছাড়বার পাত্র নই। শেষে অনেক চোখের জলে মাত্র দুটি সেকুইন দিতে রাজী হলেন—তাই-ই সই।

ফানার বালবির চরিত্রটির পরিচয় এইবার পেতে শুরু করলাম। ইতিমধ্যে প্রায় বার দশেক আমাকে শোনালেন যে, আমার কথা ঠিক নেই। আমি যে সব প্রাণ ঠিক করে রেখেছি বলেছিলাম সেখা সম্পূর্ণ মিথ্যা—আমি শুধু ভাঁওতা দিয়েছি। আগে জানলে উনি আমার সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হতেন না। ওর সঙ্গে কাউন্ট যোগ দিলেন—অবাচিত উপদেশ আমার এই অদৃশদর্শিতায়—বাণীর দেখে সোরাধাচি এতক্ষণ মুখ খোলবার সাহস গেল। হাউ হাউ করে কেঁদে আমার পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইলে ওকে মুক্তি দেবার জন্তে। ছাদের কণিশ বেয়ে ঐ পিছল পথে ওর যাওয়া একবারেই অসম্ভব—নীচের খালের জলে পড়ে ওর মৃত্যুও নাকি অবধারিত—আমি যেন দয়া করে ওকে সঙ্গে না নিই। নিকোঁপটা বৃষ্টিতেও পারল না ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমিও কত নিশ্চিন্ত কত খুসী হয়েছি। কাউন্টের কাছে থেকে কালি কলম আর কাগজ নিয়ে একটা চিঠি লিখে সোরাধাচিকে দিলাম সেক্রেটারীকে দেবার জন্তে—চিঠিটা অনেকটা এই রকম ছিলো—

আমাদের মালিক বাজ্যের বিচার বিভাগীয় অধিকর্তার একজন দৌর্যকে কারাবদ্ধ করবার জন্ত তাঁদের সমস্ত ক্ষমতাই নিষেধগ করেন। কিন্তু সেই বন্দীকে যদি সাময়িক মুক্তিও না দেওয়া হয়, সেও তার সমস্ত ক্ষমতাই নিয়োগ করে মুক্ত হতে। তাঁদের অধিকার নীতিতে—তার অধিকার প্রকৃতিতে। তাঁরা বন্দী করার সময় তার সম্মতি চাননি—তারও মুক্তি নেবার সময় তাঁদের সম্মতির প্রয়োজন নেই।

আমি ক্যানোনোভা, যে এই চিঠিটা লিখেছে, জনস্বের সমস্ত ভিত্তিতা দিয়ে, সে জানে তার আবার হয়ত বন্দী হবার সম্ভাবনা আছে—সে ক্ষেত্রে সে বিচারকদের মন্থবাস্থ্যে কাছে এই আবেদন জানাচ্ছে যে, তখন যেন তার ভাগ্যে এর চেয়ে বেশী দুঃখবস্থা না ঘটনো হয়। তার সেলের ভিতরে যাবতীয় জিনিষপত্র দোরাবাটিকে দিয়ে যাচ্ছে—তুখু বইগুলি কাউন্ট গ্রাসকুইনিকে।

মধ্যরাত্রির এক ঘট্টা আগে বিনা প্রদীপে, কাউন্ট গ্রাসকুইনির সেলে লিখিত—৩১শে অক্টোবর ১৭৫৬।

চাঁপ ঢলে পড়েছে—আর সেই বানডাক জ্যাংলার বাসি নেই। হাজার সময় হোলো। অর্ধেকটা দড়ি বালবির একটা কাঁধে আর ঠর প্যাকেটটাতে বাঁধা হোলো। আমার নিজেরও তাই। তারপর মাথায় চুপি এঁট হ'জনাই সেই ক্ষুদ্র ছিন্নপথ বেরিয়ে পড়লাম।

\* \* \* \* \*

আমি প্রথম, আমার পিছনে বালবি। আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলাম, হাতের রডটা দিয়ে সীসের পাতের খাঁজে খাঁজে ভর দিয়ে বালবিকে টানতে টানতে। তিনি ডান হাতে আমার কোমর-বন্ধনীটা সম্ভারে চেপে ছিলেন। আমার নিজের বোঝা, তার উপর লাগাম-পরানো ঘোড়ার মত ওঁকে টানছিল ঘন কুয়াশায় পিচ্ছিল সীসের পাতের কানিশ দিয়ে—সে যা অবস্থা। হঠাৎ বালবি আমাকে ধামাতে বললেন হ্যাঁচকা টান মেরে! ঐর প্যাকেট থেকে কি একটা পড়ে গেছে বোঝবার জন্তে। ইচ্ছা হোলো এক লাথিতে খালের জলে ফেলে দিই লোকটাকে—কোনো মতে নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম, দড়িগুলো ঠিক থাকলেই হোলো, এখন হারানোর জন্তে দুঃখ করে লাভ নেই—থামলেই যত্ন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বালবি আবার এগোতে শুরু করলেন। খানিকটা গিয়ে ছাদের চূড়ায় উঁচু চিপির মত দেখে হুঁজনে পালাপাশি বসলাম—মাত্র দু'শো ফিট দূরে দেখা যাচ্ছে 'দোজ'-এর প্রাঙ্গণচূড়া। পৃথিবীর কোনো সমাটই বোধ হয় এর চেয়ে অন্ধরতর প্রাসাদের কল্পনা করতে পারে না। এখানে আবার বালবি বেচারার টুপিটা গেল হাওয়ায় উড়ে। বেচারী আরও যুগড়ে পড়লো। ছাদের ঐ জায়গাটাতেই বালবিকে বসিয়ে রেখে আমি খুঁজতে গেলাম, যদি নামবার কোন পথ পাওয়া যায়। সিঁড়ির দরজা, জানলা কিম্বা ঝাইলাইট যাতে আমি দড়ির এক প্রান্ত বঁধে অপর প্রান্ত ধরে নামবার চেষ্টা করতে পারি। চার্চ পেরিয়ে নামবার জন্ত চার্চের ছাদের দিকে নজরে পড়লো—কিন্তু সেটা এত খাড়াই যে ওখানে নামতে হ'লে সলিসসমাধি অবলম্ব্যবী। জারগাটা দেখে বুঝলাম, আমরা বন্দিশালা থেকে অনেকটা এগিয়ে এসেছি ছাদ বেয়ে বেয়ে—এটা সম্ভবত: 'দোজ'ের প্রাসাদেরই অংশ। হয়ত ভোঁবের আলোয় কোনো দরজা চোখে পড়তে পারে। কারণ, আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, যদি প্রাসাদের কোনো ভূতোর নজরেও পড়ি সে তৎক্ষণাৎ আমাকে পালিয়ে যাবার স্তব্ধগাই করে দেবে—যত বড় দাগি খাসামীই হই না কেন। বিচারকের হাতে তুলে দেবে না—বিচার-বিভাগ সবার কাছেই এমন উৎকর্ষ ভীতিপ্রর আর চণ্ডা ছিলো। প্রাসাদের সবচেয়ে উঁচু ছাদের নীচেই একটা জানলা হঠাৎ চোখে পড়লো! মরিয়া হয়ে ছাদের উপর থেকে বৃকে ধৌটে ঘষে ঘষে বীরে বীরে নামতে চেষ্টা করলাম। শেষে কাছাকাছি পৌঁছে স্ব'কে পড়ে দেখলাম, ছোটো ছোটো কাচ

দিয়ে তৈরী জাকরীকাটা জানলা—তার ওধারে ঘরের মত মনে হোলো। কাচগুলো সহজেই সরানো যেত কিন্তু আমার তখনকার মনের অবস্থা এমন যে, মনে হোলো এটাই সবচেয়ে বড় বাধা। নিরাশার মন ভরে গেল—দীর্ঘ সময়ের উত্তেজনা, পরিভ্রম, ক্লান্তি, অনাহার আর তীব্র মানসিক উত্তেজনা আমার মনের সহজ ভাবটুকু সম্পূর্ণ গ্রাস করছিলো। অতি সামান্য সহজসাধ্য কাজও আমাকে ভয়-নিরাশার ভরে তুললো। এমন সময় সেট মার্কার বড়িতে ঢা: ঢা: করে রাত্রি বারোটা বাজলো—মধ্যরাত্রির সূচনা। ঐ বড়ির শব্দ হঠাৎ কেন জানি না আমার মনে আশা, আর নির্ভর আশ্বাসের চেতনা জাগিয়ে দিলো। কি এক শক্তিতে ফিরে পেলাম বিশ্বাস, আর বৃত্তা। নতুন উত্তমে হাতের রডটা দিয়ে একটা কাচ ভেঙে ফেললাম। তার পর পনেরো মিনিট ধরে কঠিন পরিভ্রমের সঙ্গে একে একে জাকরীর সব কয়টা কাচই ভেঙে ফেললাম—উত্তেজনায় খেয়ালট ছিল না যে বা হাতটা কখন কেটে গিয়ে রক্তে ভেসে যাচ্ছে!

ফিরে এলাম আমার সঙ্গী ফাদার বালবির কাছে। হায় যে কপাল! 'হার জন্তে করে মরি সেই বলে চোব'—আমাকে দেখিয়ে বালবি কুৎসিততম ভাবায় আমাকে গালাগালি দিতে শুরু করলেন, এতক্ষণ একলা বসিয়ে রাখার জন্তে। ঠিক করেছিলেন যে ভোঁবের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আবার কারাগৃহে ফিরে যাবেন। আর ভেবেছিলেন যে আমি খালের জলেই ডুবে মরেছি।

"তাই বুঝি আমাকে নিরাপদে ক্রিয়তে দেখে ঐ ভাবায় আনন্দ প্রকাশ করলেন? এখন চলুন এতক্ষণ কি করেছি দেখাবো।"

হুঁজনে মিলে ফিরে এলাম সেই ছাদের উপর জাকরীকাটা জানলার ধারে। পরামর্শ করতে লাগলাম কি করে ভিতরে নামা যায়। একজনের পক্ষে খুবই সহজ, অল্প জন দড়িটা না হয় ধরবে—কিন্তু সে নামবে কি করে? এটা কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলাম না। বালবি বলে উল্লেন,—"আমাকে আগে নামিয়ে দিন তো। তারপর আপনি কেমন করে নামবেন সে কথা চিন্তা করবার যথেষ্ট সময় পাবেন।"

স্বার্থপর ঘৃণ্য পশুটার কথায় মনে হোলো, দিই লোহার রডটা গুর বৃকে বঁধে। কিন্তু সামলে নিলাম নিজেকে, তার বদলে ওই কাঁধে বঁধে ওঁকে নামিয়ে দিলাম। দড়িটা টেনে তুলে মেপে দেখলাম প্রায় পঞ্চাশ ফিট নীচে ঘরের মেঝে। এখন আমি কি করে নামবো? জাকরীর পাতলা ত্রেমে দড়ি বাঁধলেও অত ভর সহ্যে না, ভেঙে পড়বে। ছাদের সীলার টালির উপর ইতস্তত: ঘুরতে লাগলাম, মনে মনে একটা উপায় খুঁজতে বৃজতে। ঘুরতে ঘুরতে অপর প্রান্তে গিয়ে দেখি, এক কোণে একটা বড় টবজি চূণ, বালি, জল গোলা রয়েছে, পাশে খুঁপি আর একটা মজ্জা লম্বা মই পড়ে রয়েছে। মইটা দেখেই উল্লসিত! দড়ি দিয়ে একদিকের প্রথম খাপটা বঁধে টানতে টানতে নিয়ে এলাম সেটা জানলার কাছে। জানলা দিয়ে গলাবার চেষ্টা করতে লাগলাম প্রাণপণে কিন্তু একটু গিয়েই সেটা আটকে গেল। তখন আমি বেশ করে দড়িটা দিয়ে মইটা জোর করে বাঁধলাম, তারপর সেটা জল বেরোবার নালীর পাইপের উপর ঝুলতে লাগলো। কারণ মাত্র একটুখানি জানলার ভিতর ঢুকছে, বেশী ভাগ ভারটা বাইরের দিকে—কোনোদিক

উপুড় হোয়ে শুয়ে বুক ধবে ধবে জলের মার্বেল পাথরের পাইপটা ধরলাম, তারপর সেটা ধরে পিছলে পিছলে খানিকটা নেমে এসে মইটার শেষ দিকটা ঘরতে পারলাম। শেষটা ধরে ঠেললে খানিকটা জোর হয়। প্রাণপণে ঠেলে আরও একটু ঢুক গেল মইটা। তখন আর বাইরে বুলতে লাগলাম না। বেলীর ভাগ ভারটাই ভিতরের দিকে বুক গেল। কিন্তু ঐ জোরে ঠেলার দরুণ আমি পিছলে গেলাম—ঢালু সীসের পাতের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে—ছুটো ধাঁটু আর হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলাম—নিশ্চিন্ত সূতুর দিকে এগোচ্ছি কেনেও মনের উপস্থিত বুদ্ধি হারাইনি। সমস্ত শক্তি দিয়ে মরিয়ার মত চেষ্টা করতে করতে সামলে নিলাম নিজেকে। উঠে এসে জলের পাইপটার পাশাপাশি টিং হোয়ে শুয়ে হাপরের মত নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম অস্বাভাবিক পরিশ্রমের ক্রান্তিতে। সমস্ত হাত-পায়ে ঝিল ধরে আসছিলো। শরীরটাকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে চূর্ণচাপ পড়ে রইলাম। উপায় নেই—কি নিরাশ্রয় হুঃসহ মুহূর্ত! ক্রমে ক্রমে হাত-পায়ের সাড়ি ফিরে এলো। সহজ হলো নিঃশ্বাস। উঠে পড়ে মইটার বাকীটুকুও ঠেলে দিলাম—তারপর রডটার সাহায্যে সীসার পাতের উপর দিয়ে বীরে বীরে এগিয়ে জানলাটার কাছে গেলাম। মইটা ভিতরে লম্বাশিঁ হয়ে আটকে ছিলো—এবার সহজেই সেটাকে নীচে নামাতে পারলাম—নীচে বালবি সেটা ধরে ফেললেন। আমি ওপর থেকে জামাকাপড়ের প্যাকেট, দড়ির বাগুিল সব নীচে ছুড়ে দিয়ে নিজে নেমে পড়লাম। তার পর মইটাও নীচে নামিয়ে নিলাম। কারণ, উপরে আমাদের পালানোর কোনো চিহ্নই লরেন্সের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে রাখতে চাইনি। নীচে অন্ধকার ঘরটার আমরা হুঃসহ হাত ধরাধরি করে ঘরের অবস্থানটা ঠিক করে নিতে লাগলাম। দরজার কাছে গিয়ে দেখি, লোহার ঝিল লাগানো কিন্তু তালাবদ্ধ নয়। খুলে বেরিয়ে পড়লাম। দেখি, আর একটা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছি, মাঝখানে মস্ত টেবিল চার ধারে চেয়ার সাজানো। ঘরের একটা জানলা খুলে বাইরেটা দেখলাম—নিকব কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। অগত্যা নতুন কোনো প্রচেষ্টার আশা ছেড়ে দড়ির বাগুিলটা মাথায় দিয়ে ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়লাম লম্বা হোয়ে—সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম এলো দুটি চোখে, তখন আর কোনো চিন্তার ক্ষমতাটুকুও ছিল না। পরে মুক্তি ছুটেবে না মরতে হবে সব চিন্তাই তখন সমান।

বোম্ব হর পুরো সাড়ে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম। ফানার বালবি চেঁচিয়ে বাকানি দিয়ে দিয়ে আমার ঘুম ভাঙলেন। পাঁচটা বাজছে—এখন এই অবস্থায় আমার চোখে ঘুম আসে কি করে? উনি তো ভাবতেও পারছেন না। কিন্তু আমার প্রয়োজন ছিলো—এই বিজ্ঞানের পর আবার আমার স্নায়ুগুলো সচল হলো।

—“এটা তো জেলখানা নয়। এখানে নিশ্চয়ই কোনো বেকবাব পথ পাবে।”

হুঃসহ দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম। একটা গ্যালারি পেরিয়ে ছোটো পাথরের সিঁড়ি। নেমে এসে আর একটা গ্যালারি, আরও একটা সিঁড়ি পেরিয়ে মস্ত একটা হলে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু এর দরজা কিছুতেই খোলা সম্ভব হলো না। মুস্তির মুখে এসে তখন আমার মরিয়া অবস্থা। ঠিক করলাম লোহার রডটা দিয়ে ওপরের

খোপটাতে একটা গর্ত করা। তার ভিতর দিয়ে গলে বেরোবে। তখনি ব্রহ্ম করলাম গর্ত করা। আথ বন্ধার চেষ্টায় বেশ বড় গর্ত করা গেল। কিন্তু এমন বিস্তীর্ণ ব্রহ্ম গর্ত হোলো যে গলে যাওয়া বিপজ্জনক। চারিদিকে বর্ষার মত খোঁচা-খোঁচা অসমান ভাঙ্গা গর্ত। তার উপর মেঝে থেকে পাঁচ ফুট উঠতে। বালবিকে প্রথমে উল্লসে ধরে পরে গোড়ালী ধরে কোনমতে পার করলাম। কিন্তু আমার ডবলা তো আমিই। কোনো মতে মাথা আর কাঁধটা গলিয়ে বালবিকে বললাম টানতে—যদি খোঁচা লেগে দেহটা টুকরো টুকরো হোয়ে যায় তাহলেও যেন ধামে না। এই ভাবে অবশেষে নামলাম—সর্বান্তে বহুশা নিয়ে আর পিছন থেকে উরু থেকে দরদর ধারায় রক্তের স্রোত বইয়ে।

এবার দৌড়ে গিয়ে আর একটা সিঁড়ি নেমে একবারে প্রাসাদের প্রধান সোপানের দরজার সামনে উপস্থিত হলাম। কিন্তু সেই বিরাট দরজা ভেদ করা আমার লোহার রডটির সাধ্য ছিল না। কিন্তু তার জন্য অস্থির বা চঞ্চল না হোয়ে শান্ত ভাবে বসে পড়লাম দরজার নামনে। বালবিকে বললাম আমার বতদূর সাধ্য করেছি, এখন বিধাতার ইচ্ছা। আজ প্রাসাদের বাড়িদারও আসবে কি না সন্দেহ! কারণ আজ তো ছুটির দিন। যদিই কেউ এসে দরজা খোল তখনি ছুটে পালাবার চেষ্টা করবো, অস্তব্ধায় মরে গেলেও এখান থেকে নড়ছি না।

বালবি তো বেগেই আগুন! আমাকে উদ্দাম, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বথেক গালাগাল দিতে শুরু করলেন। বালবিকে চাষার মত দেখতে হলে কি হবে—বেশভূষা ঠর ঠিকই ছিলো, কোনো পরিশ্রম তো করতে হয়নি। আর আমার অবস্থা তো দেখলে লোকের ভয় হবে—সর্বান্তে রক্তমাখা, সারাগারের চামড়া ছেঁড়ে ছাল উঠে গেছে। সমস্ত জামাকাপড় টুকরো টুকরো হোয়ে ফালির মত ঝুলছে, মোজাটা, গুয়েটেকোট, শাটগুলো শতছিন্ন অবস্থায়, আর বোঝবার মতও নেই। উরুর গভীর ক্ষত থেকে বুকিয়ে রক্ত পড়ছে!

আমি ক্রমাৎ দিয়ে বতদূর সন্তব ভঙ্গভাবে একটা ব্যাগেজ ঝাঁপলাম, উপরি উপরি গোটা দুয়েক শাট প্যাকেট থেকে বের করে পরে ফেলে সবার উপরে লেপ দেওয়া শাটটা পরলাম। নতুন একজোড়া মোজা পরে বতদূরো ক্রমাৎ ইত্যাদি প্যাকেট ভরা সম্ভব ভরে নিয়ে বাকীগুলো এক কোণে ফেলে দিলাম। হাত দিয়ে চুলগুলোকে বশাস্তবৎ বিস্তৃত করার চেষ্টা করতে করতে একটা জানালার কাছে ঝাঁড়িয়ে পাল্লা ছুটো খুলে দিলাম। খুলতেই নীচের উঠানে বার্য ছিলো তাদের হুঃ—একজনের চোখ পড়লো আমার দিকে—পড়লো অবগত বিচির নয়। সে তখনি প্রাসাদ-রক্ষকে খবর দিতে ছুটলো। ভালমাহুয় বুদ্ধি হয়ত ভাবলেন—ভুল করে আগের বাজ্রে কাউকে চাবিবদ্ধ করে ফেলেছেন—তাড়াতাড়ি চাবির গোছা নিয়ে হাজির হোলেন। আমি ওদের বনবনানি স্তনতে পাছিলাম—সিঁড়ির ধাপে ধাপে এগিয়ে আসছে। আমি বালবিকে আমার পাশ বেঁধে ঝাঁড়তে বললাম—লোহার রড হাতে নিয়ে দরজার পাশে অপেক্ষা করতে লাগলাম—ওরা দরজা খুললেই পালাবো আর যদি বাধা দেয় তবে এই লোহার রড—

বুদ্ধ বেচারী আমার চেহারা দেখে বজ্রহস্তের মত ঝাঁড়িয়ে



# নন্দীবিলাস

কেশ তৈল

এম. এল. বসু স্যাপ্রাইভেট লিঃ  
নন্দীবিলাস হাউস, কলিকাতা-১

রইলো...আমি দুকপাতও না করে অসম্ভব দ্রুতগতিতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম—ঠিক পিছনে বাসবি। কিন্তু গতি দ্রুত করলেও পালঙ্কি বেগে বকম ভাঙ ফুটে দিহিনি চলার তলোতে। সোজা প্রাঙ্গণের প্রধান ফটক পেরিয়ে সামনের ছোটো পার্ক পেরিয়ে জলের কিনারায় বাস্তার উপর গিয়ে ঝাঁড়লাম। সামনেই যে গণ্ডোলাটা পেলাম তাইতেই চড়ে বসে বললাম “আমি খুব শীগগির ফুসিনা পৌঁছাতে চাই আর একজন মাঝি বরং ডেকে নাও”—

বলা বাহুল্য, আমার সঙ্গে সেই যুগুর্ন্ত বলবিও উঠে পড়েছিলো গণ্ডোলাতে। গণ্ডোলাটা একটু এগোলে আমি মাঝিকে ডেকে বললাম যে—“আমি মত বদলেছি, আমি মেস্‌তার যেতে চাই”—

—“ভাড়া ঠিকমত পেলে আপনাদের ইংলণ্ডও পৌঁছে দিতে পারি লজ্জব!” মাঝিটা হেসে বললে।

খালটাকে এত অপরূপ স্নহের আগে কখনও মনে হয়নি—বিশেষ ‘কবে এত নির্জন যে আর একটা নৌকাও দেখা যাচ্ছে না...কি নিশ্চিন্ত তৃপ্তি! ভোরের নরম আলোয় আর মিষ্টি বাতাসে দেরি মন ছুড়িয়ে গেল। মাঝি হুটুও খুব দ্রুত বাইছিলো। সেই অন্ধকারময় কারাগৃহের নয়ককুণ্ড থেকে আবার উপর আকাশের তলার মুক্তি পেয়ে আনন্দে, ঈশ্বরের করুণায় মুগ্ধ হোয়ে আমার দুই চোখ জলে ভরে এলো...আবেগে উত্তেজনার আমি সত্যিই কঁদে ফেললাম। এতকণে আমার সঙ্গী, আমার কর্তব্যপরায়ণ বন্ধুর কর্তব্যবোধ ফিরে এসে—তিনি এসে আমি কাঁদছি ভেবে কর্তব্যবোধে সাহসনা দিতে শুরু করলেন। এই মুচ্যতায় হাসা ছাড়া আর উপায় রইলো না।

### যষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ পথের বাস্তার বিচিত্র, তিক্ত অভিজ্ঞতা সফরের পর অবশেষে ১৭৫৭ সালের ৫ই জাম্বুয়ারি প্যারিসে পৌঁছলাম। পুরানো বন্ধুরা শালকে আমাকে কাছে টেনে নিলে। প্যারিস—গৌরবময়ী প্যারিস যেন আমার পালিকা মা—অপরিস্রবের সঙ্কোচ আর আতঙ্ক কিছুই নেই এখানে। আর আমার জন্মভূমি ভেনিস? দেখানে বাবার পথ তা এখনকার মত নিজের হাতেই বন্ধ করে এসেছি।

মনে মনে ঠিক করলাম—আচার-ব্যবহারে সংযম আর দৃঢ়তা ক্রিয়েরে আনবো—আবার আমাকে ফিরে পেতে হবে যশ, মান, সন্মান আর প্রতিপত্তি...—পিছুতম বন্ধু, অভিভাবক ম্যাসিয়ে ব্রাগাঙ্কি মাসিক রাজার ক্রাউন বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন আমার জন্ত—তাই স্বজন্মতার মধ্যেই দিন কাটছিলো এখন শুধু ঈর্ষা ঘরে আরও উন্নতির চেষ্টা করতে হবে...—

আমার প্রথম কর্তব্য ঠিক করেছিলাম ভেনিসের রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা করা। কারণ, এখানে রাজসভায় তাঁর অসীম প্রতিপত্তির কথা আমি জানতাম। আর তাঁকে বতবুর টিনি, তাইতে তাঁর অমুগ্ধহ পাবো বলেই ভরসা করি।

আমার পালিয়ে আসার গল্প আমি প্রতিটি সালোতে করতাম। একদিন একটা চিঠি লিখে নিজেই সেটা সঙ্গে করে প্যালেস ব্যারবঁতে গিয়ে দিয়ে এলাম। পরদিন বেলা আটটার সময় একটা চিঠি পেলাম—সেই দিনই আমাকে ওখানে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল তাইতে।

ম্যাসিয়ে জ বার্বাস আমাকে অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন—আমার পালানোর বিবরণও শুনেছেন বলে জানালেন। আমি তাঁকে কথা দিলাম যে আমার পালানোর সমস্ত ইতিহাসটাই আমি তাঁকে লিখে দেবো। উঠে আসার সময় উনি আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে হাতে একটা একশো লুই-এর নোট হস্তে দিলেন। সেটা অবগু পোষাকের আলমারীটা ভরভাবে ভর্তি করতেই খরচ হোয়ে গেল। যাই হোক, এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁকে আমি পুরো বিবরণটা লিখে পাঠিয়ে দিলাম—সেই সঙ্গে জানালাম, ওটায় বতগুলি ইচ্ছে সংখ্যায় উনি ছাপাতে পারেন আর বিলি করতে পারেন। আর অমরোখও জানালাম, এমন সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছেও দিতে বাদেই দ্বারা আমার কিছু উপকার হোতে পারে।

সপ্তাহ তিনেক পর উনি আমাকে বললেন যে, আমার সব্বন্ধে উনি ভেনিসের রাজপুত্র ম্যাসিয়ে এরিসের সঙ্গে কথা বলেছেন। রাজপুত্র জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত ভাবে আমার উপর তাঁর কিছুমাত্র ক্রোধ বা বিরক্তি নেই...তবে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বাজী নন। কারণ, কোনো রকম গোলামালের ভিতর উনি নিজেকে জড়তে চান না। আর রাজ্যের শাসন-পরিষদের কাছে পাচ্ছে কোনো কৈফিয়ত দিতে হয় সে সব হাস্যামোদ উনি পছন্দ করেন না। ম্যাসিয়ে বার্বাস আরও জানালেন যে, আমার গল্প তিনি মাকুয়িস জ পম্পায়াব, ম্যাসিয়ে জ বুলোন্স ইত্যাদি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের কাছে করেছেন। তাঁর পরিচয়-পত্র নিয়ে গেলে তাঁরা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন সন্দেহ নাই। এখন তাঁদের সঙ্গে থেকে নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা সম্পূর্ণ আমার হাতে। আরও বললেন যে, রাজকোষে যাতে কিছু অর্থ আসে সে বিষয়ে কিছু নতুন ব্যবস্থা বা উপায়ে উদ্ভাবনা যদি করতে পারি, তবে আমার ভবিষ্যৎ স্বর্ণাঙ্কল। তবে যেন কোনো রকম জটিলতার মধ্যেই না যাই।

ম্যাসিয়ে জ বুলোন্স-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বুদ্ধ, বুদ্ধিলীলু সৌম্যমুষ্টি—প্রথম দর্শনেই মনে শক্ত জাগে। অনেক বিষয়ে আলোচনার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—“একটা ব্যাপার আছে—সে বিষয়ে আপনাদের কি বক্তব্য বলতে পারেন—অবশ্য পরে লিখেও জানাতে পারেন। ব্যাপারটা হোলো ম্যাসিয়ে প্যারিস দ্বাভাণি তাঁর সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্তে বিশ লক্ষ ফ্রাঁক মুদ্রা চান। এই টাকাটা আমাদের তুলে দিতে হবে রাজকোষে হস্তক্ষেপ না করেই।”

—“আমার কিন্তু একটা প্রাণ আছে, যাতে করে রাজাকে—”

—“কত খরচ হবে তাতে?”

—“কিছুমাত্র নয়—কেল টাকাগুলি সংগ্রহ করার যা খরচ—”

—“আপনি কি ঠিক করেছেন আমি জানি—”

—“আশ্চর্য্য। কি করে জানলেন আপনি? আমি তো কাউকেই বলিনি—”

—“বেশ তো। কাল এসে আমাদের সঙ্গে রাজে থাকবেন, ম্যাসিয়ে দ্বাভাণির সঙ্গেও এ বিষয়ে আমরা কথা বলবো।”

ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম। চলতে চলতে আপন মনেই চিন্তা করতে লাগলাম, ভাগ্যের কি অমুগ্ধ খেলা! রাজকোষে প্রয়োজন আছে জেনেই বলে আমা চেষ্টা...

বসলাম এত টাকা আমি জোগাড় করে দেবো—বিস্ময়প্রবণ চিন্তা না করে যে কোথা থেকে বা কৈমন করে দিতে পারবো। অথচ ওই পাকা ব্যবসায়ী ভ্রমলোক আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন দেখাবার জন্তে যে আমার কথা উনি আগেই ধরতে পেরেছেন। এখন উপায়? আমি ভাবলাম, প্রথমেই আমাকে যে করেই হোক জাঁচ করে নিতে হবে ড্যাভার্নি আর উনি কি ভেবে রেখেছেন, যদি নেহাংই না পারি তবে এমন বহুতরুণ হাসি মুখে টেনে নিঃশব্দে বসে থাকবো যাতে মনে হবে এ সবই তো আমার জানা ব্যাপার।

বাসায়ময়ে মাসিমে ড্যাভার্নির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলাম। আরও অনেক ভ্রমলোক উপস্থিত ছিলেন—আর কথাবার্তা বহুদূর সম্ভব একঘেয়ে স্রাবিকর গায়ে উঠেছিলো। খাওয়ার পর মাসিমে ড্যাভার্নি অঙ্গাগ্র অভ্যাগতের কাছ থেকে কিছুক্ষণের অবসর প্রার্থনা করে আমাকে আর মাসিমে ব্যালানকে অঙ্গ একটা ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে আর একজন ভ্রমলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করালেন। তারপর উঠে গিয়ে একটা বই হাতে করে নিয়ে এসে প্রথম পাঠাতি খুলে একটু হেসে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—“মাসিমে ক্যাসানোভা, এই দেখুন আপনার প্রানট”

প্রথম পাঠাতিতে দেখলাম লেখা আছে—নকইটি টিকিটের লটারী মাসে একবার করে টিকিট বিক্রী হবে—আর প্রত্যেকটি বারে পাঁচখানার বেশী টিকিট উঠবে না।—“কীকার করছি মহাশয়, আমি ঠিক এই ক্রিনিমিষ্ট ভেবেছিলাম”—

সেদিন বাকী রাতটা কাটলো, কি ভাবে লটারীর সব ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে। আর নেহাং অহঙ্কার করে বলছি না আমি যে সব সংশোধনী অথবা নতুন কোনো পদ্ধতির প্রস্তাব আনলাম প্রত্যেকটিই দফলের মতে রীতিমতে মূল্যবান বলে গৃহীত হোলো—সবার মনেই আমার সম্বন্ধে অস্বস্তি: আমার কার্যকরী ক্ষমতা সম্বন্ধে বেশ একটা উঁচু ধারণাই গড়ে উঠেছিলো। তার বিশদ বিবরণ না দিলেও শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, হিসাব পত্র আর গণনার বার্থা নির্ভুল ভাবে বিচার করার জন্য এক জন নামকরা বিশেষজ্ঞ ডাকা হোলো। আর তিনি এসে আমার প্রত্যেকটি প্রস্তাব এবং হিসাব নির্ভুল বলে স্বীকার করলেন।

মাসিমে ত্ত বার্সি আমার সঙ্গে মালাম ত্ত পম্পাধুর-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মালাম ঠিক চিনতে পারলেন, আমাকে পাঁচ বছর আগে দেখেছিলেন—তবে তৎকাল এই যে, আমার মুখে ফরাসী ভাষা শুনে তখন তাঁর ভারী মজা লাগতো, কিন্তু এখন আমার নির্ভুল পরিষ্কার উচ্চারণে তাঁর আশ্চর্য। বাই হোক, লটারীতে মালাম পম্পাধুর প্রবল উৎসাহ দেখালেন। লটারীর গানটা হোলো—প্রতি মাসে পাঁচটি করে জিতবার সংখ্যা থাকবে যথায় পাঁচখানা টিকিট জিতবে—আর যদি ছয়টি হয় তাহলে পাঁচ ভালা—ছয়ের সংখ্যাটা রাষ্ট্রের হোয়ে থাকবে। অতএব রাজা ষ্টি মাসে একশো হাজার ফ্রাউন লাভ করতে পারবেন।

লটারীর ত্রয়টি অফিসের ভার আমার উপর দেওয়া হোলো। এর লটারীর লাভ থেকে বছরে চার হাজার ফ্রাঙ্ক আমার আর দিষ্ট করা হোলো। প্রধান অফিস কর্মতর্সারীর এ খোলা রেখিলা, তার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর আমার চেয়ে অনেক বেশী

আর নির্দিষ্ট করা হোলো। কিন্তু তার জন্য আমি একটুও হিংসা করিনি। কারণ, এই ভ্রমলোকের সঙ্গেই ড্যাভার্নি তাঁর বাড়ীতে আমার পরিচয় করিয়ে দেন আর আমি জানাতাম, আসলে এই সমস্ত লটারীর প্রানটা তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত।

এইবার আমার বৃদ্ধির খেলা শুরু হোলো। আমি আমার পাঁচটা অফিসই বছরে দু'হাজার ফ্রাঙ্ক বাড়ী দিয়ে দিলাম। আর কু সেট ভেনিসে এই অফিসটি বধাসম্ভব সৌধীন মূল্যবান আর শ্রমের জিনিষে সাফল্যম। এক জন কর্মচারীও রাখলাম—শ্রমের প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত একটি ইতালীয় যুবক।

জনসাধারণকে আমার অফিসের দিকেই আকর্ষণ করবার জন্তে আমি জাপানে কাগজ বিলি করতে লাগলাম। তাতে দেখা ছিলো, আমার সই-করা টিকিট যদি জেতে তাহলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই জেতার টাকা পাওয়া যাবে। সহজেই আমার অফিসের ভীড় বাড়তেই লাগলো। প্রথম বারেই আমার অফিস থেকে চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক আর টিকিট বিক্রী হোলো তার থেকে—জিতবার পুরস্কার-স্বরূপ দিতে হোলো আঠারো হাজার ফ্রাঙ্ক। ক্রমে ক্রমে আমার অফিসটা রীতিমতে জনপ্রিয় হোয়ে উঠলো। আমার ইতালীয় কর্মচারীটিও ভাগ্য ফিরিয়ে নেবার সন্ধান পেলো।

এই সময় ভেনিসের একটি অভিজাত-বংশীয় যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হোয়েছিলো। ওর নাম কাউন্ট ডু তিরেস্তা।

এক দিন তিরেস্তা আমাকে জানালে যে, পোপের এক জন বিশ্বাসী ভ্রাতৃপুত্রবৎ মালাম লাভাভিনীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে। নামটা শুনে কৌতূহল জাগলো, রাজী হোয়ে গেলাম। তিরেস্তার সঙ্গে গেলাম—কিন্তু কোথায়ই বা শোণ আর কোথায়ই বা তার আত্মীয়া! পরিচয় হোলো উগ্র বিলাসিনী উজ্জ্বল প্রকৃতির একটি মহিলার সঙ্গে আর তার বান্ধবীর সঙ্গে। আর সেই বান্ধবী অপকণ্ড সুলভী কিশোরী বোনকির সঙ্গে। কিশোরীটির নাম মালাময়সেল খেরেসা ত্ত লা মিউর।

কিছুক্ষণ অধীন আলাপের পর মালাম লাভাভিনী এক রকম তাসের জুয়া-খেলায় প্রস্তাব করলেন। আমি রাজী হলাম না কিছুতেই—একটু এগিয়ে এসে মাদামের কিশোরী বোনকিরটিকে আগুনের ধারে একটি বসবার জায়গায় বসতে অহুরোধ জানিয়ে তার পাশে বসে পড়লাম। ওঁদের জানালাম, তাস খেলার চেয়ে গল্প করে কাটানোই আমার ভালো লাগবে। মালাম লাভাভিনী হাসতে হাসতে বললেন,—“গল্প তো করবেন—কিন্তু কোন বিষয়ে কথা বলবেন? ও তো মোটে এক মাস হোলো কনভেন্ট থেকে বেরিয়েছে?”

আমি তাঁকে আশস্ত করলাম এই বলে যে, এমন মিষ্ট মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে একটুও খারাপ লাগবে না। ওঁরা তাস খেলতে লাগলেন—আর আমি মেয়েটির সঙ্গে নানা চমকপ্রদ বিষয়ে আলাপ জমালাম। বলতে বিধা নেই—ওর মনোবল্লভে একটুও বিলম্ব ঘটেনি আমার। সমস্ত গভীর বাইরে বুদ্ধি পাওয়া কাঁচা মন—নানারকম সরস আলোচনার ওর কৌতূহল আর আগ্রহ স্বাভাবিক।

যে সব প্রসঙ্গের আলোচনা ওর অপরিণত বয়সের কাছে অপরাধ বলে গণ্য করা হোতো, সেই সব প্রসঙ্গের আলোচনার ওর কিশোরী মনের লজ্জা আর আগ্রহের ঢাণ সব মুখে অপরূপ হোয়ে ফুটে উঠতে

লাগলো। এক সময় ও উঠে গিয়ে ওর মাসীর চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো—কিন্তু সেই মুহূর্তেই ওর মাসী হাতের তাসটায় হারলেন। বোনঝিকেই অপরা, ভেবে বললেন,—“দুই মেরে পালা এখন থেকে—তুই-ই নিশ্চয়ই অপরা, তাই এবার হারলাম। আর তাছাড়া ঐ ভুললোককে একা বসিয়ে বেখে চলে এলি যে! লোকে কি বলবে? একটুও শিক্ষা সভ্যতা জানে না?”

মেয়েটি হাসতে হাসতে ফিরে এলো আমার পাশে। তার পর ফিশ-ফিশ করে বলল,—“যদি আমার মাসী জানতেন যে আপনি আমার সঙ্গে কি সব বিষয়ে গল্প করছেন—তাহলে কিন্তু চলে বাবার জন্তে দোষ দিতেন না—”

—“সত্যিই ভারী অন্তর্য হৈয়েছে। এর জন্তে আমার অমৃতপুত্র হওয়া উচিত। আচ্ছা তাহলে আমি বরং চলে যাই—কিছু মনে করবেন না তো?”

—“আপনি যদি চলে যান তাহলে মাসী ভাববেন আমি একটা আস্ত বোকা, তাই আপনি বিরক্ত হোয়ে চলে গেলেন—”

—“তাহলে তোমার ইচ্ছা যে আমি থাকি।”

—“আপনি যেতে পাবেন না—”

ফিরে এলাম। তবে সে রাতে বিদায় নেবার আগে জেনে গেলাম ওই লাখ্যময়ী কিশোরীর জন্মে গভীর প্রেমের রেখা একে দিয়েছি—আর আমার অমৃত্যুগের চিহ্ন রেখে গেলাম ওর হৃদি প্রোথিত কর-পল্লবে অক্ষর উরু চূষনে...

তিন চার দিন পর মাগাময়সেল জালা মিউর-এর কাছ থেকে আমার অফিসে একটি চিঠি এলো। চিঠিতে ও জানিয়েছে—“মোটামুটি এই কথা—” আমার মাসী ধনী কিন্তু অন্ততঃ খোয়ালী, বিলাসিনী আর দুর্নীতি-পরায়া। আমাকে পর্দানশীন করতে না পেয়ে শুধু ঘটকের মুখে প্রশংসায় মুগ্ধ হোয়ে ডানকার্কে এক ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার বিবাহের ঠিক করেছেন। তাকে আমিও বত চিনি মাসীও ততই চেনেন। আপনাকে আচ্ছা আমি বলতে চাই যে যদি সেদিন রাত্রে আপন-আলোচনার আমাকে বুঝা না করে থাকেন তবে আমি আপনার বর্ষপত্নী হোতে চাই। হ্যাঁ, আমার দেহ-মন আমি আপনার হাতেই সমর্পণ করতে চাই—পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঙ্ক সমেত—আমার মৃত্যু মায়ের যৌতুক। তাছাড়া মাসীর মৃত্যুর পরও অত টাকা আমিই পাবো।

চিঠিতে উত্তর দেবেন না। কার হাতে পড়বে জানি না। পাঁচ দিন পর মাগাম ল্যাংগুইনীর বাড়ীতে এসে মুখেই জানাবেন। পাঁচটি দিন সময় হইলো আপনার ভাববার। যদি আমাকে আপনার উপযুক্ত না মনে করেন তবে একটি অমরোথ রাখবেন—আমার কাছে আর আসবেন না—আমার সঙ্গে কোথাও দেখা হবার সম্ভাবনা থাকলে এড়িয়ে যাবেন—সত্যিই আমায়ও ভালো সহজ হবে। আমার জীবনে একমাত্র সুখ শুধু আপনার পাশে...

চিঠিখানি পড়ে ব্যথিত হলাম। চিঠির প্রতিটি লাইনে সত্যতা, সম্মান আর সবল মনের সহজ সত্য ফুটে উঠেছে—সত্যিই প্রজ্ঞা হোলো মেয়েটির উপর। কিন্তু ওই বিবাহের কথাতেই আমি শিঙ্কিয়ে এলাম। আমার মনে বিবাহের বা বিবাহিত জীবনের প্রতি কোনো রকম আসক্তি ছিল না আমি স্পষ্টই দেখতে পেতাম যে বিবাহিত জীবনের দৃশ্য বাচ্ছল্য আমার জন্তে নয়।

তাকে আমি শুধু হুংই দেবো—যে আমার কাছে করবে আত্ম নিবেদন।

চার দিন পর মাগাম ল্যাংগুইনীর বাড়ীতে ওর সঙ্গে দেখা হোলো—স্বন্দর সঙ্গে অপরূপ স্নন্দরী দেখাছিল ওকে। ওর মাসীর সামনেই আমি প্রস্তাব করলাম, ২৮শে মার্চ সকলকে মাগিএন-এর কাসী দেখবার জন্তে আমি নিয়ে যাবো। সমস্ত প্যারিস দেখবার জন্য উম্মুখ সেই ‘নটর ডাম’। আমি একটা খুব ভালো জানলা ভাড়া করে এলাম। যেখান থেকে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার দেখা যাবে। ফিরে এসে জালা মিউর এর সঙ্গে নিভুতে বসে গল্প করতে লাগলাম—আর আলাপের মধ্যে এক দুর্বল মুহূর্তে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভাবে বিবাহে সম্মতিও জানিয়ে দিলাম।

কাসীর দিন সবাইকে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গেলাম। জানলাটা বিশেষ বড় ছিলো না—তাই প্রথম সারিতে মহিলারা আর তাঁদের পিছনে আমি তিরেত্তা দাঁড়িয়ে। কিন্তু বীকার করতে বাধ্য হছি যে, সেই অমামুর্ষিক হত্যাকাণ্ড আমি দেখতে পাবিনি—সারাক্ষণ মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলাম। দুই কান প্রোথপণে চোপ রাখা সত্ত্বেও সেই হতভাগ্যের মর্দশ্মশী তীব্র করুণ আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম। ডেমিএন সন্ধ্যে সকলেই জানতো—লোকটা অন্ততঃ গোড়া প্রকৃতির আর ধর্ম অকবিশ্বাসী ছিলো। রাজাকে হত্যা করে স্বর্ণলভের আশা করতে গিয়েই বেচারার এই ফল হোলো। অবশ্য রাজার গায়ে সামান্য একটু আঁচড় কটা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি—কিন্তু শাস্তিটা হোলো হত্যা করার শাস্তিরই সামিল। সীন নদীর ঢালু পাড়ের উপর দিয়ে গড়ানো চাকায় বেঁধে দেওয়া হোলো হতভাগ্যের দেহটা। চাকায় সমস্ত শরীরটি পিষে গেল আর চারটে খোড়ার পারের আঘাতে সমস্ত দেহটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হোয়ে টুকরো টুকরো করে ছিটকে পড়তে লাগলো। আশ্চর্য্য প্যারিসের মহিলারা! এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য তাঁদের এতটুকুও বিলম্বিত করলো না!

এই ঘটনার পরই মাগাময়সেল জালা মিউর তার মাসীর সঙ্গে লা ভিলেং এ বেড়াতে গেল আমাকেও একবার বাবার জন্ত আমন্ত্রণ জানিয়ে। দিন তিনেক পর আমি দু’একদিন কাটাবো বলে গেলাম। ডানকার্কে সেই ধনী ব্যবসায়ীটিরও আসার কথা ছিলো। কিন্তু আমি থাকা অবধি তিনি এসে পৌঁছলেন না। আমি তাঁকে দেখবার জন্য আর একবার গেলাম লা ভিলেং এ। মাগাময়সেল জালা মিউরকে ধনী অতিথির সম্মানে মূল্যবান উচ্ছল পোষাকে সন্মত করে সাম্মতে দেলো—ডানকার্কে ব্যবসায়ীটিও দেখতে সন্মত আকর্ষণীয়। তাঁকে আরও একদিন বেশী থাকবার জন্য অমরোথ জানালেন মেয়েটির মাসী। জালা মিউরও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলে।

পরে যখন মাসী বোনঝিকে একান্ত ভেদে জিজ্ঞাসা করলেন—“হুঁ স্বামীর সবকিছু কি ঠিক করলি বল?” বোনঝি তখন উত্তর দিলে,—“লক্ষ্মীটি মাসী, এখনকার মত আমাকে রেহাই দাও। কাল ঐ ভুললোকের পাশে আমাকে বসিও আর কথা বলিও, তাহলেই দেখতে পাবে আমার রূপ ওর সহ হোলোও আমার কথাবার্তা ওর অসহ হোয়ে উঠবে। যখন দেখবেন আমি একেবারে একটা নিরেট বোকা তখন হরত আমাকে বিয়ে করতে চাইবেন না”—

সে রাতে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ তাস খেলে আমরা সবাই যে ঘর



ঘরে শুতে গেলাম। মিনিট পনেরো পরেই আমার দরজা খুলে গেল—  
চুকলো এসে আমার কিশোরী প্রিয়া—কিন্তু প্রতিদিনকার মত শিখিল  
রাত্রিবাস ওর পরনে নেই, সাদ্কা পোষাকে সুসজ্জিত।

—“বলো তুমি...এই বিয়েতে কি আমাকে রাজী হতে হবে?”

—“ঐ ভুললোকটিকে পছন্দ হয় তোমার?”

—“অপছন্দ হয় না।”

—“তবে রাজী হও।”

—“বেশ—তবে বিদায়। এই মুহূর্ত থেকে প্রেমের মৃত্যু হোক,  
জগে থাক শুণু বন্ধুত্বের প্রীতি”—

—“আজই রাত্রি থেকে কেন? বন্ধুত্বের শূন্য হোক কাল থেকে।  
আজ রাতে তুমি আমার প্রেমসীই থাকো।”

—“না, তা' হয় না, মরে গেলেও তা' হোতে দেবো না। আমি  
যদি অন্তের দ্বী ইই আমাকে তারই যোগ্য হোতে হবে। কে জানে  
ভবিষ্যতে হয়ত তার পাশে থেকেই মৃগ পাবো। আমাকে ছেড়ে দাও  
—আমাকে আর ধবে রেখো না—যেতে দাও—তুমি তো জানো  
আমি তোমাকে ভালবাসি”—

—“তবে ধাবার আগে একটি চুখন দিয়ে দাও”

—“না।”

—“কিন্তু তোমার চোখে জল! তুমি কাঁদছো?”

—“না-না-না, ভগবানের দোহাই এবার আমায় যেতে দাও।”

—“না, তুমি ঘরে ফিরে গিয়ে সারা রাত কেঁদে কাটাবে! কি  
করবো ভাবতে পারছি না—শোনো, কেঁদো না তুমি, থাকো আমার  
কাছে, আমিই তোমাকে বিয়ে করবো”—

—“না—আর এখন তাইতে আমি রাজী হতে পারি না”—

এই বলে প্রবল চেষ্টায় আমার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছিন্ন করে  
নিয়ে ও ছুটে চলে গেল।

পরদিন রাতে আহাবের সময় অবধি আমি রইলাম। গত রাতে  
মহাশোচনায়, লক্ষ্যায়, ক্ষোভে এক মুহূর্তের জ্ঞান ঘুমতে পারিনি।  
১১১ দিন অন্তর্মের ভাণ করে নির্জনে চূপচাপ কাটিয়ে দিলাম।  
১১১ দিনের মধ্যে তুলা মিউর এর সঙ্গে একটি বার দেখাও হোলো না,  
কিট কথ্যও বলতে পেলাম না। রাতে ধাবার টেবিলে মাদামমাসল  
র বিয়ের কথা প্রকাশ করলে...দিন আটকের মধ্যেই বিয়ে হবে,  
১১১পরি ও ডানকার চলে যাবে। আজ বুঝতে পারি সেদিন আর  
খা না করে ও ঠিকই করেছিলো।

কিন্তু সে সময় আমি যেন ওকে হারিয়ে পাগলের মত হোয়ে  
ঠিকিলাম...অহাশোচনায় আমার বুক জলে যাক্সিল। পারিসে  
যে এসে ওকে এক দীর্ঘ উচ্ছ্বাস আর আবেগ ভরা চিঠি লিখলাম।  
যে এসে অহরোধ জানিয়ে, আর কখনো যেন ওকে চিঠি না লিখি।  
যে হোলো তবে ও নিশ্চয়ই ডানকারের ওই ব্যবসায়ীর প্রেমের  
ছে—মনে হতেই ইচ্ছা হোলো ঐ ব্যবসায়ীটাকে খুন  
ত ও যেন দস্যর মত লুটে নিতে এসেছে আমার এক পরম  
দ।

ঠিক করলাম ওর বাড়ীতে যাবো...ওকে গিয়ে জানাবো ওর

ভাবী পত্নীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা। তারপর যদি ও নিরস্ত  
না হয় তাহলে ওকে ধন্যবাদে আহ্বান জানাবো। মনে মনে ঠিক  
করে দুটি শিশুর হাতে নিয়ে সত্যিই ওর বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।  
কিন্তু তখন ও ঘুমছে। অশেপা করতে লাগলাম—আধ ঘণ্টা পর ও  
ঘরে এসে চুকলো একটা ড্রেসিং-গার্ডিন গায়ে জড়িয়ে চুকে আমাকে  
দেখেই হুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে উচ্ছ্বাসিত  
আহ্বান জানালো। ওর এই আন্তরিকতার আমার ভিতরের উদ্ভূত  
পণ্ডটা অভিজ্ঞত হোয়ে পড়লো। সব ক্ষোভ, আলা শাস্ত হোয়ে  
জুড়িয়ে গেলো। আমি ঝালাম।...

এর কিছু দিন পর আমি জেনেভাতে চলে এলাম। সেখানে  
এসে বে হোটেলটাতে উঠলাম তার নাম হোটেল দা বার্লাস। মনে  
আছে সেদিন তারিখটা ছিলো ২০শে আগষ্ট ১৭৬০। ঘরের মধ্যে  
এক সময় অসল ভাবে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ চোখে পড়লো  
জানলার কাছে উপর কি যেন লেখা রয়েছে...উৎসুক হোয়ে কাছে  
যেতেই দেখি, হীরার অঙ্গভাগ কেটে কেটে লেখা—

“তুমিও জুলে যাবে হেনরিয়েটাকে”

আমার মাথার চুলগুলো অবধি খাড়া হোয়ে হোয়ে উঠলো একটা  
অসহ শিহরণ—এক বাপটার সবে গেল বিশ্বস্তির ধ্বনি—  
হেনরিয়েটার স্মৃতি আমার সমস্ত মনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মনে  
পড়লো সুদীর্ঘ তেরটি বছর আগেকার সেই দিনটি যেদিন হেনরিয়েটা  
ঐ কথাগুলি লিখে রেখে গিয়েছিলো। এই ঘরেই আমরা দুজনে  
কাটিয়েছিলাম উচ্ছ্বল মধুর ক’টি দিন। হেনরিয়েটার লক্ষ লক্ষ  
স্মৃতি আমার সমস্ত অহুত্বিত সমস্ত মনের জুড়ে ফুটে উঠলো...মানস  
নয়নে জেগে উঠলো হেনরিয়েটার তেজোময়ী; শীতুময়ী মধুর মুখখানি  
—মনের সবটুকু মাধুরী দিয়ে বাকে একদিন ভালোবেসেছিলাম আজ  
সে কোথায়? তারপর থেকে আর দেখিনি তাকে। কোথাও  
তিনি তার কথা। আজও তাকে আমি ভালবাসি—মনের  
অবচেতনে এত আবেগ এত নিবিড় অহুত্বিত আজও ওর জন্মে  
লুকিয়েছিলো। কিন্তু কি যেন হারিয়েছি আজকের আমি সেদিনের  
আমির কাছ থেকে। হয়তো সেই গভীর আদর্শবাদ। কিন্তু মনে  
হয় আজও ওর স্মৃতি আমাকে যেন অনেক দিনের হারানো কি  
ফিরিয়ে দিলে। যদি একটুও জানতাম কোথায় গেলে ওর সন্ধান  
পাবো, তবে সেই মুহূর্তেই সেখানে চলে যেতাম ওর খোঁজে।  
মানতাম না কোনো বাধা—সুদূরতাম না ওর সেই কান্তর মিনতি  
ভরা নিবেদন।

সেই দিন রাতে মাসিরে ভিলাস’-ভাঁহুর সঙ্গে গেলাম জলটেরারের  
কাছে। আমার জীবনে এও এক স্মরণীয় দিন। আমরা বধন  
পৌছলাম তখন তিনি সবে টেবিল ছেড়ে উঠছেন—তার চার পাশে  
ঘিরে আছেন বিখ্যাত লর্ড আর লেডীরা।

আমাকে বধারীতি ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোলো।

[ক্রমশঃ]

অমুবাদিকা—শান্তা বসু।

বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বন্ধুমতীর উল্লেখ করবেন]

# শ্রীমতী আভেরএর দিনপঞ্জী

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

তরু দত্ত

“কাবণ জানতাম যে তোমাদের ওখানে নিমন্ত্রণ-পত্র পৌঁছে গেছে।”

“আর তাতেই তোমার কর্তব্য শেষ হয়ে গেল?”

রাত হটার সময় শুতে গেলাম সবার অসুস্থমতি নিয়ে। বড় ক্লান্ত লাগছিল। আমাদের জন্ম আমার ঘরটা সাজান হয়েছিল; পাশের ঘরের দোরটাও খুলে দেওয়া হয়েছে, ওখানে হবে আমার বৃন্দোদয়ার। আমার কত দিনের সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে ভরা অতি-পরিচিত ঘরটার চেহারা আজ বললে গেছে; ক্রুশটা শুধু যথাস্থানে আছে। বহুকণ তার সামনে বসে রইলাম।

আজ সকালে উঠতে বেশ দেরী হল। লুই এসে ঘরে ঢুকলো, “কি, ঘুম ভাঙল?” বিক্ষারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে আছি দেখে ও হেসে বলল, “ওগো ঝুঁ, তুমি ভুলে গেলে নাকি গত রজনীর কথা?”

‘ওগো ঝুঁ’ কথাটার কি আলো ছিল জানি না, চকিতে চেয়ে দেখি সামনেই ‘আমার স্বামী’। বড় অপরূপ ওর চেহারা; আমার দুই কাঁধে হাত রেখে ও খিতমুখে চেয়ে ছিল। অসীম প্রেমে ভরা ওর চোখ আজ স্নেহময়; ধবধবে সাদা কীতগুলো উঁকি দিচ্ছে সরল হাসিতে উজল ওর চোঁচের কঁক দিয়ে; ওর ডেউখেলানো চুলে লোনা আর পারান্ন চমক। ওর গলা জড়িয়ে ধরে আমি ওর চোঁচের ওপর রাখলাম আমার চোঁচ। ও বসে পড়ল আমার পাশে, আমি ওর বুকে ঝুঁ লুকালাম, আমার কপাল থেকে ও চুলগুলো আঁকড়ে আঁকড়ে সরিয়ে দিল; ওর কাছাকাছি আরও নিবিড় হয়ে বসলাম, তাকালাম ওর দিকে সহাস্য, সানন্দ, নির্ভরশীল দৃষ্টিতে। ও আমার স্বামী, বন্ধু! ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম আমার এত সহনশীল, প্রেমাত্মক, অসুস্থগত স্বামীর হাতে অর্পণ করার দক্ষণ। এক সঙ্গে গিয়ে ক্রুশের সামনে আমরা প্রার্থনা করলাম। ও নীচে গেল; আমি-খানিক বাদে বখন নামছি সিঁড়ি দিয়ে, ও দেখি আবার ওপরে আসছে।

‘কি হল?’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

‘কিছু না, আমার ঘড়িটা ভুলে এসেছি,’ বলে টুক করে আমার জড়িয়ে ধরল।

ঘরে গিয়ে ও দরজাটা একটু কঁক করে রাখল। চার-তলার ঘর থেকে তেরেস্ নামছিল।

“এই বে দিদি, ঘুম ভেঙেছে?” ও আত্মদে-উগমগ করে উঠল, “এই ত! কেমন সুন্দর চড়ুয়ের মত স্মৃতিভরা চেহারা হয়েছে তোমার। এখনো অল্প ফ্যাকাশে ভাব বন্ধিও আছে। কেমন দিদি, আগেই বলিনি এবার লীগগির তুই সেরে উঠবি?”

আমি হাসলাম। লুই ঘর থেকে বেরিয়ে এল, “কি বলছ, ও তেরেস?”

“কান্তেন সাহেব, বলছিলাম যে মাদমোয়াজেল আপনায় যেতে না যেতেই ওর গালের গোলাপগুলো আবার ফুটেছে।”

লুই হেসে বাণা দিল, “না তেরেস ও আর এখন মাদমোয়াজেল নয়।”

“তাই ত! আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে!” বলে ও চাপড়াতে লাগল, “এবার থেকে ত ওকে মাদাম ডাকতে থকীদির বে হয়ে গেছে, ভাবতেও কেমন লাগে। না, আমার ও হয়েছে।”

লুই হাসল। আমরা খাবার ঘরে গেলাম। বাবা আছিল? বলে আমার চুমা দিলেন। মা মুহু মুহু হাসা টেবিলের ওপর একটা চিঠি আর বাজের দিকে আমার দৃষ্টি করলেন।

“আমার জন্ম?”

“হ্যাঁ মাগো, তোমার ঠাকুমা পাঠিয়েছেন,” মা জানালেন।

নানা বকম দামী পাখরের কাজ-করা সুন্দর ছুটি সোনার ছিল বাজের মধ্যে।

“আমাকে কি এত সুন্দর গয়নায় মানাবে?”

“দেখাই থাক না, পঁয়ত,” বলল লুই।

“উঁহ, আগে ওঁর চিঠিটা পড়া থাক।”

চিঠিটা আন্তরিক প্রেক্ষে উজল। আমাদের বিয়ের ঘোঁ গয়না পাঠিয়েছেন ঠাকুমা, আর লিখেছেন পারী গিয়ে ওঁবে যেন দেখে আসি একবার।

ও আর আমি বেড়াতে গেলাম। একটা চেরিগাছের ছায় ওপর বসা গেল। আমার কোলে মাথা রেখে লুই শুয়ে একটু সস্তোচের সুরে ওকে বললাম, “লুই, তোমার ম বল না?”

ও চুপ করে আছে দেখে ভাবলাম বুঝি এ প্রশ্ন ওর হয়নি।

“লুই রাগ করলে?”

আমায় আদর করে ও বলল, “কি বে বলছ, রাগ কর ওপর? কেন বল ত? ভাবছিলাম মা যদি আজ বেঁচে তবে আমার প্রাণাধিকাকে দেখে কি তৃপ্তিই না পেতো? উনি অদৃশ্য লোক থেকে আমাদের দেখছেন, আমাদের পড়ছে ওঁর আশীর্বাদ।”

“ওঁর ছবি তোমার কাছে আছে?”

“এখানে নেই; বাড়ী গিয়ে তোমায় দেখাব। ত আছে কয়েক গুছি চুল।” বলে ওর ঘড়ির চেনে ল নেকট বুলে দুই গুছি চুল দেখাল।



“তুমিও শুধি আমার মায়ের; কটা চুলগুলো আমার বাবার।”

“তোমার মার গায়ের রং বুঝি এত সুন্দর ছিল?”

“হ্যাঁ, ঠিক অতি অপূর্ণ দেখতে ছিল; আমার দেখলে অবশ্য উলটো ধারণাই হবে, ও হেসে বলল।”

আমি ওর মুখ চেপে ধরলাম।

“বাবার সঙ্গে ওর মিলন হয় অতি অল্প বয়সে, তবে তোমার মত এত কম বয়সে নয়।”

১৭ই মে। কাল আমরা চলে যাব। আজ সবই তাই ধর্মমু করছে। লুই আর বাবা দেখতে চাইছিলেন ওদের স্মৃতিতে ভাটা পড়েনি, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল বাবা খামকা এই অপচেষ্টা করছেন। মা আর আমি সেলাই করছিলাম। থেকে থেকে আমার দিকে চেয়ে উনি গোপনে চোখ মুছছিলেন। মার কত যে কষ্ট হচ্ছে! তা সঙ্গেও উনি জোর করে আমাদের পাঠাচ্ছেন—আমার শরীরের কথা ভেবে।

“তোমার যা স্বাস্থ্যের অবস্থা; অবিলম্বে চেঞ্জ ঘাওয়া দরকার। সঙ্গে তোমার স্বামী থাকবে, আমার ভাবনার কি-ই বা কারণ আছে?”—আমায় উনি উৎসাহ দিচ্ছিলেন এই বলে।

বাবাও বললেন যে, অল্পদিন বাদেই মা আর উনি আমাদের নীচে মিলিত হবেন। আমার চোখের জল দেখলে পাছে হয়ে পড়েন, তাই আমি প্রাণপণ চেষ্টা নিজে থেকে মা আমারা বিকেল ছটার এক্সপ্রেসে রওনা হব।

আমার ঘরে গিরে একা বসে কাঁদছিলাম; এই বাবা-মাকে ছেড়ে এক হাসপাতালে পক্ষে কোথাও থাকা ভাবেনা।

“সে কি খুকুদি, কাঁদছিল কেন? ক্যান্টেন সাহেব কে ভাববে বল ত? তোর এই অবস্থা দেখলে ওর কত দেখি? ও বউ! স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাবি কি পেলি!”

জল এনে ও আমার চোখ-মুখ ডাঁ

ঠিকই বলেছে। লুই বেচারি আমা

প্রাণে বাবার ব্যবস্থা করবে?

ফেললেন। তারপর আমা

দিলেন। লুইটা অব

এলে হাত ধরে ওকে

“বাবা,”

সুঁপে

সুঁ



নিয়মিত বে

ব্যবহারে

তনুপ্রী দিন

ও কমলিনী

মুখপত্র

ও সজীব

এর প্রাণ



সকল টিউন

আমায় সঙ্গেবে বৃকে ধরে শত চুমায় বাবা অভিমুক্ত করলেন।

‘বার কঠলয় হয়ে আমি অকোরে কাঁদলাম।

‘পাপা গলায় উনি বললেন, “বা মা, আর কাঁদিস না,—বড় কষ্ট আমার।” তারপর হাসার চেষ্টা করে বললেন—

“তরুণ-তরুণীর সংসারে আমাদের মত বড়ো হাবাড়ার লুত ?”—মা লুইকে আশীর্বাদ করলেন।

“সন্ত বাবা,” মার অমুরোধ ভেসে এল। বাবার দয়া অবধি ও এল। আবার আলিঙ্গন-পাতি ছেড়ে দিল।

স্নেহে রইলাম মা-বাবার দিকে ;

মিলিয়ে বাবার পূর্বকণ

ভাগ করতে লাগলাম

লি খালি লাগল।

—কিছু ছেড়ে

কামল

স্ব

ও আশ্রয় হল।

আমরা লুভ হোটলে উঠছি। এখন ভোর ছটা। বাড়ীতে আমি বরাবরই সকাল সকাল উঠতাম। সে অভ্যাস এখনো ছাড়িনি। প্রামের কথা, বাবার কথা, মার কথা মনে পড়তেই চোখ আমার জলে ভরে ওঠে। তবু আমি সুখী, বড়ই সুখী। লুই এখনো যুগছে। আমি চাই না ও দেখুক আমি কাঁদছি। মনে হচ্ছে কত দিন হল আমি চলে এসেছি ; এই ত সব গতকা আমার বাড়ী থেকে রওনা হলাম। আজ ঠাকুরমার ওখানে যাব উনি বোধ হয় জানেন না আমাদের আসার কথা, আমাদের পেনে লি খুশীটাই হবেন উনি ! বড় ভোর ছ দিন কি তিন দিন আমি এখানে থাকবো। বত ভাড়াভাড়ি সম্ভব লুই দক্ষিণ দেশে পৌছো চায়। আজ আমি ভগিনী ভেরানিকের দেওয়া ক্রুশটার সাম্ম প্রার্থনা করলাম। ওটি সর্বদাই আমার গলায় থাকে। বেচা কত অল্প বয়সেই না মারা গেলেন। ঠুর জীবনের ছাকিসটা বখতিয়ে দেখলে দুঃখের পুঞ্জিই বেশী দেখা যাবে। আজ উ শান্তিলোকের অধিবাসী Requiescat in pace ! লুইয়ের ভাঙল !

“কি গো, বড় দেহী হয়ে গেল না ?” বলে ও আমার জড়ি এবার লেখা থামাই। সারা দিনের ভ্রমণ-কল্পনা ও এ চ চায়।

ঠাকুরমার ওখানে গিয়েছিলাম। আমরা এয়ে ন উনি সোজা বাইরের দরজায় গিয়ে হাজির।

‘বাছারা !’ আনন্দে ঠুর গলা ভারী হয়ে উঠে গিয়ে ঢুকলাম, উনি আমাদের হাত ধরে

হারা সুখী হয়েছিল ত ? হ্যা : আঃ

এমন রক্তহীন চেহারা কেন রে দিদি ?

৷ ! বাবা-মার সব খবর কি ? ভাল !

নিয়ে গেলেন সোফার কাছে, “নে

ল হয়ে পড়েছিল, তাই না ?”

‘হিল হব ? এখন আমার বল

গছে।”

প্র করলেন, “তাঁই নাকি রে

খোঁয়ে দেখাতে হবে কেমন

নে বাপু ! আমার

প্রবাদ জানাতে গেলাম :

সেই আমি শুনেতে নারাজ।

ব্রেক্সটনের দাম উঠে যাবে

দের ছেলেরেলার কত গ

হদিন মিলিত হবিই !

সে কথা আমার এখন

ত বড়র পূর্ণ হল। তো :

৷ একটা ‘বঙ্গ’ নকচয়

বয়েসের মানা ছেলো

যব ভরতি। লুইয়ের হাতে ছোট একটা মালা,—ওর হৃদয়-বাণীর  
 গলায় পরিয়ে দেবে। কত রূপের, কত বর্ণের খুকিই যে ওর সামনে  
 দিয়ে আনাগোনা করল : কিন্তু মহারাজের মন কিছুতেই ভরল না।  
 সেই সময় তাকে কোলে নিয়ে তোর মা ঘরে ঢুকলেন। সেই তাদের  
 প্রথম দেখা। সাদা-পোষাকে আবলুসের মত চুলে আর কুচ-কুচে  
 কালো বড় বড় চোখে কি রূপই সেদিন খুলেছিল তোর। ওর আর  
 তব সইল না ; সটান গিয়ে তোর মাথায় মালাটা দিয়েই এক চুমু।  
 কি হাসি বোল যে উঠল দিদি ! ছোঁড়ার মা ত কানবে কি হাসবে  
 ভেবে সারা। তার পর তাকে কোলে তুলে নিয়ে জানতে চাইল ওর  
 মা,—তুই তার ছেলের বউ হবি কিনা। খুব গভীর গলায় দুচতার  
 সঙ্গে তুই জবাব দিয়েছিলি—“হঁ”।—ওর মা অতি মহামুভব  
 প্রাণোচ্ছল মেয়ে ছিল ; বেচারী আজ তাদের দেখে কি ভ্রূণটাই  
 না পেত।—বলে ঠাকুমা চোখ মুছলেন। লুই আমার হাতে চাপ  
 দিল ; আমাদের চোখাচোখি হল।

২৩শে অক্টোবর, ১৮৬১। ছয় মাস হয়ে গেল আমরা  
 নীসে সংসার পেতেছি। সমুদ্রের ধারে ছোট এই শহরটি বড়  
 ভাল লাগে। কত দিন যে আমার খাতার কিছু লেখা হয় নি  
 সময় পাই না একদম। ওর তকুম, যতক্ষণ সম্ভব  
 হাওয়ার থাকতে হবে ; আর সন্ধ্যাবেলা ত প্রায়ই  
 আগে ঘুমতে হয়। এত তাভাতাড়ি যে ঘুমিয়ে পড়ি  
 বুঝছি যে সেবে উঠছি। ভূমধ্যসাগরের বেলাড  
 যখন তখন ঘুরতে বাই। সূর্যের আলোয় নী  
 অজস্র রঙের বাহার দেখে চোখ বললে ওঠে  
 প্রায়ই ছাতের ওপর হয়। সেখান থেকে  
 সমুদ্র যে কী অপূর্ব লাগে ! দুজনে দুজনা  
 অসীম রূপের পাখারে। কখনো ক  
 পড়ি ; সবল দুটি হাতে ও অকলীলক্রমে  
 শুইয়ে দেয় গিয়ে বিজ্ঞানায় ; এত যে  
 তবু পারি না। ও বলে, এতে ওর  
 আমার ওজন নাকি ওর কাঁধের ?  
 লুই যে কত ভাল তা কি কবে  
 জীবনসাথী হয়ে নিজেকে আমি বন্ধ  
 মা কিংবা বাবার পাতা নেই  
 লেখেন। এবার লিখেছেন আমাকে  
 না ; এত আশা করেছিলাম  
 দেখা হবে।

লুইকে মাঝে মাঝে পারী যে  
 আছে এখন। বড় জোর দুই  
 গতকাল সকালে ও পারী গিয়ে  
 লিখেছে। বারণ করেছে গতর  
 আনতে। ওর ধারণা, এত  
 তবে, বাগানের দরজা অবধি  
 এ অনুমতি ও দিয়েছে ! ওকে  
 কথা যে ভাবতেই প্রতিবার আঁঠি  
 ভগবান, অসীম তোমার কল্পনা  
 ছটা বাজল, আধ ঘণ্টা

এবার খাতা বন্ধ করি, বাগানে গিয়ে ওর ভক্ত অপেক্ষা  
 করব।

২৪শে অক্টোবর।—কাল লুইকে কথাটা বলেছি।  
 খাবার পর আমরা ছাতেই ছিলাম। পারীতে কি  
 করল—সবকিছু সবিজ্ঞাবে বলছিল ও। খানিক চুপ  
 পর ওর বুকে মুখ রেখে বললাম—

“লুই, আমার মনে হয়—‘রাজ্যের রাজ’  
 সর্বাঙ্গে, ‘মনে হয় যে ঈগণির আমাণে’  
 আসছে।”

উল্লসিত ওর ওষ্ঠের সঙ্গে আ  
 আমার চোখে জগতের ক  
 বিশ্বশ্রুতি আজ নুখী  
 ওপর থেকে পাখী  
 ওদের চকল ফে  
 অপূর্ব

বেড়াব। তার পর ও বন্ধন একুশ বছরে পা দেবে, তোমার বদলে  
হবে ক্যাপ্তেন, আর তুমি, তুমি হবে মার্শাল।”

“সমস্ত ফরাসী সৈন্যবিভাগের মার্শাল, না?”

“নিশ্চয়ই! তোমার কি সাহসের অভাব?—তখন তুমিই ওকে

ধরে। ওর প্রথম বিজয় যেদিন ঘোষিত হবে, সেদিন সবাই

বন্দাবে ওর দিকে, “কে এই তরুণ বোদ্ধা!” লোকে

স্বপ্ন দেবে, “মার্শাল লফেব্র-এব ছেলে?” আর

আমাদের সম্ভাবনা!

লুই আর আমি বনে বেড়াতে

হেঁচু বোরবার পর আমাদের নির্দিষ্ট

যায় গজিয়েছে অজস্র নরম

এই কুটিরখানি প্রকৃতি

এ গোপনতম কোণে

নাশপা ছড়িয়ে

সুখে চেয়ে

শ্রুশ

“বিলক্ষণ ম’সিয়া, অবশ্য এতে মাক করার কিছুই দেখি না  
আমি আবার দিলাম।

“বন্ধবান মার্শাল, আপনি দেখছি সাক্ষ্য করণায়মী!”

“কিন্তু তোমার ছবিটা লুকোচি কোথায় ভিয়ার?”

প্রশ্ন করল।

“উহ, এখন দেখাচ্ছি না; শেষ আঁড় দেওয়াব পর দেখা

এখন খালি কাঠামোটা কাঁড় করিয়েছি।”

“তবে চল, আমাদের ওখানেই এ-বেলার পাট চুকিয়ে নিবি।”

“আমি ত একুশি রাজী, কিন্তু মাদাম কি আমার মত ভববু  
বাড়ী ঢুকতে দেবেন?”

“নে নে, ও-সব পারিসিয়ান নকুতো। এখানে অচল,” লুই।

দিল হেসে। আমিও যোগ দিলাম, “বুঝলেন ম’সিয়া, লুইয়ের

বন্ধু আছেন, প্রত্যেকেই আমরা বন্ধু,—তারা প্রত্যেকেই যোগ

মুহুর্তে আমাদের বাড়ী আসতে পারেন; কাজেই কোন ওজর থ

না মশাই!”

বাড়ীর পথ ধরলাম আমরা।

“তুই বিয়ে করলি লফেব্র, আমাকে জানানি ত?”

“হু, বছরকাল তোর সঙ্গে দেখাও হয় নি, তোকে লেখাও হ

আমাদের বিয়ে হল।”

আমায় একটা লাইন পর্যন্ত লিখে পাঠালি না হত

মাদাম, কেমন বন্ধু?” আমায় ও সাক্ষ্য

পত্নীর কিছু পরিহাসের সুরে ও বলে চলল,

“ব বেশী উত্কণ্টক কর না। কারণ বিয়ের

মত রূপে শুধে তিলোত্তমার হাতে পড়লে,

হাত রাখল।

একটা সত্যি কথা বলে ফেললি;

“নি!”—কাঁপা গলার লুই বলল

নি বন্ধু সহানুভূতির সুরে জানাল।

তার এই সুরের যে আমি :

হি।” লুইয়ের হাত ও ধরল।

গায়কের গান গাইতে বলল।

ওব গলা।” আমিও

পিয়ানোয় বসল। জানলার

ওর পাশেই একটা গাছের

ভিয়ারের প্রথম কয়েক

কিতে জেগে উঠল। জা

ম না কি! ওহো, এই

যে পথে যাবে,

সে-পথে ছেয়ে;

ফুটনের হাঙ্গি,

এ-পথে যাবে!”

না। আমাদের বিয়ের

তুই দু’বার একই গান

আমার কানে ধ্বনিত হইল,—এ কি কিছুই ইঙ্গিত? ওই ত! শেষটুকু ও গাইছে, সুন্দরী এম্বোজীকে কবরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে :—

“পথে পথে ভরে শোক-ক্রন্দন  
মৃত্যু রূপসী যে এ পথে যাবে ;  
পথে পথে শোক, অশ্রু-জ্বল,  
রূপসী মৃত্যু যে যাবে এ পথে !”

আমার বুক বাধায় টমটম করতে লাগল। সম্বোধে লুইয়ের হাত চেপে ধরলাম। ও সুখী, ভগবান; আমি, আমিও সুখী! আর কোল জুড়ে যে আসছে! ওকে বৃকের চুপ খাইয়ে কি জীবনের পথে লৌকিক কার বেতে পারবো না আমি? নয়াময়, এমন যেন কখনো না হয়; না নয়াময়, তোমার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয়—আমাদের বাসনা যেন তোমার কাক্ষের অন্তরায় না হয়!

ম'সিয়া ভিয়ার উঠল।

“ধন্যবাদ,” লুই বলল, “তোব গলাটা খাসা চাঁকো-ছোলা বেবেছিস দেখছি; কিন্তু অল্প কিছু এবার শোনা: সুন্দরী সেই পেরো মেয়ের কাচিনীটা?”

“বা! ওটা কুলে গেছি, আসামার এই গানটাই মনে ছিল এখন যেটা গাইলাম।” ও এগিয়ে এল, অক্ষুটখরে আমি ওকে ধন্যবাদ দিয়েই একটু খোলা হাওয়া খাবার অভ্যুত্থানে গিয়ে হাজির হলোমি ছাড়ে। না, না, লুইয়ের সামনে কিছুতেই এ-বাধার মুখ খুলব না। একটু পায়চারী করে বেশ শান্তি পেলাম। জানলা-গুলো বন্ধ করে দেওয়া হল, আলো এস। রাত আটটার সময় ম'সিয়া ভিয়ার উঠল। বোজ আসবে,—কথা দিয়ে গেল।

২৭শে অক্টোবর।—কাল রাতে এগারটার সময় ডায়েরী লিখছিলাম, ভয় হচ্ছিল লুই বৃষ্টি বকুনি দেয় এখনো জেগে আছি

বলে। ও নীচে গিয়ে আফিসের কি হিসেব মেলাচ্ছে। আজ যতক্ষণ ভগবানকে ডাকলাম, যেন আমাদের প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করেন। কয়েক মিনিট বাদেই লুই এল।

“এ কি এখনো লিখছ। না গো, এ ভাবে শরীর খারাপ কোর না লক্ষ্মীটি!”—তারপর আমার আদর করতে করতে বলল, “কি সুন্দর যে লাগছে তোমায়!”

আমি হাসলাম।

“কি গো, হল?” ও অধীর হয়ে উঠল।

“এই হয়ে এল।” আমি জানলাম। তারপর খাতা বন্ধ করে ওকে ভিজ্ঞাসা করলাম, “আজ্ঞা লুই, তুমি আমার সত্যি ভালবাস?”

“হ্যাঁ গো, হ্যাঁ,” ও বলল।

“আমিও তোমায় বড় ভালবাসি লুই, একথা তুমি বিশ্বাস কর?” আমার হুই চোখ জলে ভরে উঠল, শত চেষ্টায়ও চাকতে পারলাম না।

“কেন তুমি একথা বলে আমার কষ্ট দিচ্ছ?”

“আজ্ঞা, অতীতের জন্ত তুমি আমার ক্ষমা করবে?”

“ক্ষমা? কিসের জন্ত?” বলেই ও আমার বুক চেপে ধরল। তারপর আমার ক্রুরের সামনে প্রার্থনা করলাম অভ্যাস মত।

২৪ নভেম্বর।—মা-বাবার চিঠি পেয়েছি, ওরা ১ তারিখে আসছেন। এতদিন বাদে ওদের দেখব,—দিন যেন কাটছে না। ওদের জন্ত ঘর গোছাতেই সারা দিন কাটিয়ে দিলাম, জুজনের ছুটি ঘর।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ :—পৃথ্বীশ্রুনাথ মুখোপাধ্যায়

## ফড়িঙ ও বিঁঝি

(কাইস থেকে)

এই জগতের কার্য কতু ধ্বংস হবার নয় :  
সকল পাখী মুষড়ে ষখন থাকে তপন-তাপে,  
গাছের ছায়ায় লুকোর ঘবে একটা গুমোই ভাপে,  
লতার বেড়ায় বাস-ছাটানো মাঠে ফড়িঙ-চর  
ঐক্যকালের বাডায় শোভা গেয়ে অনিশ্চয়।  
আমোদ কতু মিটেবে না তার, শান্ত হ'লে বাপে  
থব আরামে জড়লীগাছের সুন্দর কোণ-কাপে ;  
(এমনি ক'রে জগৎ সে যে করছে মধুময়।)  
এই জগতের কার্য কতু ক্ষান্ত হবে না রে !  
কিঁতের বিজ্ঞান সন্ধ্যাবেলা শান্ত নীরব ঘরা,  
বিঁঝি তখন গরম টাইয়েব আওতাতে গান গায়।  
আত্মতোলা মানুষ তখন বুকের অন্ধকারে,  
ভাববে, ফড়িঙ গাইছে বৃষ্টি এমন আকুল-করা।  
গাইছে বৃষ্টি অগ্নির কোন্ উচ্চ পাহাড়-চূড়ায়।

অনুবাদ : শ্রী যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।



... ..







[পূর্ব-প্রকাশিতের পর-]

বারীন্দ্রনাথ-দাশ

যা

আ

চেষ্টা কলকাতার তখন মরে বর্ষা নেমেছে।

ভাড়িতে বসে আছি চূপ-চাপ, কোনো কাজ নেই, রাস্তার পাড়ে একটু জল। পথে লোক-চলচল নেই। দু'-একটি ট্যান্ডি কি রিক্সা চলে যাচ্ছে কখনো-সময়। রেডিও বাজছে পাশের বাড়িতে। আর শোনা যাচ্ছে মেয়েদের আড্ডার কলকোলাহল।

তেমনি এক বুটের দিন উপববেলা হঠাৎ দেখি, একটি ট্যান্ডি এসে থামলো বাড়ির সামনে।

মিনিট দুই পরে চোখের সামনে আবির্ভূত হলো দিলীপদা'। বললে, "খুসরো টাকা আছে তোমার কাছে? ট্যান্ডির ভাড়টা মিটিয়ে দে তো?"

আমি অবাক হয়ে তাকালাম দিলীপের দিকে। সে নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলো, "মনে ছিলো না যে পকেটে পয়সা নেই। ট্যান্ডিতে উঠে খেয়াল হলো। জাবলম কোথায় বাই। তোমার ভাড়টা পথে পড়লো ব'লে এখানেই এসে নামলাম।"

চাকরের হাত দিয়ে ভাড়টা নিচে পাঠিয়ে দিলাম। ট্যান্ডি চলে গেল।

"আজ বেয়োস নি?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"এই বুটিতে কোথায় বেরবো?"

"আমি কিন্তু এমন বুটিতে বাড়িতে বসে থাকতে পারি না," দিলীপ উত্তর দিলো।

আমি চূপ করে বইলাম। দিলীপ একটু অপেক্ষা করলো। আমার কিছু বলার, চূপ করে আছি দেখে একটু পরে জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় গিয়েছিলো আনিস?"

আমি চোখ তুলে তাকালাম।

"সেবা চৌধুরি হঠলে।"

"ওরা দেখা করতে দিলো রেবার সঙ্গে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ভিজিটরস' লিষ্টে নাম না থাকলে তো দেখা করতে দেয় না।"

"সে প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ, সে হঠলে ছিল না।"

"ও—বলে আমি মনে মনে একটু সোমাস্তির নিশাস ফেললাম।

দিলীপ বোঝ হয় বুঝলো। হাসলো একটুখানি। বললো, "রেবাকে হঠলে না পেয়ে আমি পেলাম সবিসম ডটচাকের বাড়ি। সেখানেই রেবার সঙ্গে দেখা হলো। এতক্ষণ ওদের

ওখানেই আড্ডা দিচ্ছিলাম। খেলামও সেখানেই। মল্লিকা খাস বায়া করে।"

আমার মুখে কি ভাব ফুটে উঠেছিলো না জানি। দিলীপ ভালো করে তাকালো আমার দিকে। তার পর আস্তে আস্তে বললো, "তোমার আস্তো ভাবনা কিসের? তোমার উচ্ছসিত প্রশংস করে এসেছি সেখানে। সবিসম, রেবা মল্লিক, সবাইকেই বুঝি এসেছি তোমার মতো ছেলে আর হয় না।"

আমি তবু কোনো উত্তর দিলাম না। দিলীপই বো হয় এবার একটু অসোয়াস্তি বোধ করলো। আস্তে আস্তে বললো, "তুই বোধ হয় জানিস না, কেন আমি ওদের ওখাটে গিয়েছিলাম?"

আমি চোখ তুলে তাকালাম।

দিলীপ বল গেল, "আজ দু'-তিন দিন ধরে শুধু ভাবছি কি করে একজনকে ভালো রাখ। চেনা মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে চেষ্টা করে কিছুই হলো না। তার কথা বাব বার আরো বেশী করে মনে পড়লো। অচেনা মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়ে দেখি তাদের তো অদৃষ্ট মনে হচ্ছেই, আর মনে হচ্ছে যেন এ ভাবে সব চেয়ে বেশী অপমান করছি তাকে, যাকে চেষ্টা করছি তুমি যাওয়ার। সুতরাং এখন মনে হচ্ছে, এমন একজন সামান্য চেনা কারো সঙ্গে একটু বৌ চেনা করে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক, যাবে অনেক চেষ্টা করেও আমার কাছে অসামান্য করে তোলা যাবে না কারণ, সে আরেক জনের কাছে এরই মধ্যে অসামান্য হয়ে আছে,— একটু ভাবতেই তোমার কথা মনে পড়লো, রেবার কথা মনে পড়লো সুতরাং রেবার বৌকে বেরিয়ে পড়লাম।"

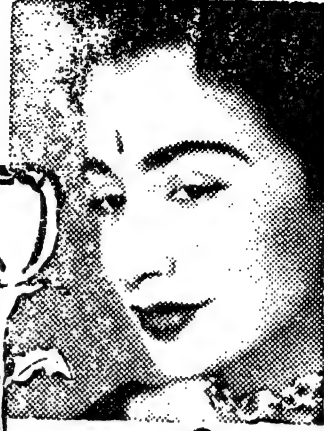
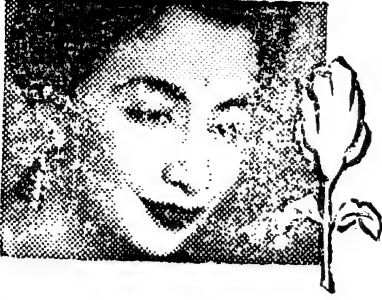
কী আবেল-তাকোঁল বকছে দিলীপদা'। জিজ্ঞেস করলাম "কি লাভ হবে এতে?"

"বিশেষ কিছুই না, দিলীপদা' উত্তর দিলো, "শুধু একটি সিনেমা দেখার আমন্ত্রণ।"

"মানে?"

"রেবা কাল আমায় একটা সিনেমা দেখাচ্ছে।"

"ও, তা'হলে, আমি বললাম, 'তুমি, সবিসম, মল্লিকা, রেবা সবাই মিলে কাল সিনেমায় যাচ্ছে।'"



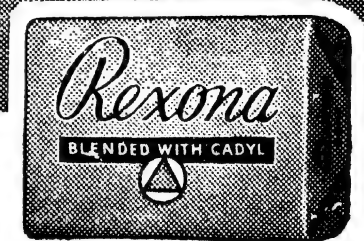
ফুলের মত...

আপনার লাভণ্য রেঞ্জনো

ব্যবহারে ফুটে উঠবে



রেঞ্জনো সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ স্বকের স্বাস্থ্যের  
জগতে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার  
স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তুলবে।



একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেঞ্জনো প্রাইভেট লি., এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

RP. 148-X62-BG

“স্বমিল আর মল্লিকা যাচ্ছে না,” দিলীপ স্নান হাসি হাসলো, “তুণ্ড আমি আর বেবা যাচ্ছি।”

বাইরে স্বমল্লিক করে আরেক পশলা বৃষ্টি নামলো। দমকা হাওয়া জানলা-দরজায় ঘা দিয়ে গেল, তোলপাড় করে তুললো জানলার পর্দা, সামনের টেবিলে একটি বইয়ের পাতাগুলো বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো, আর এলোমেলো হয়ে গেল দিলীপদা’র মাথার চুলগুলো। সামনের বাড়ির ছাতের ওপারে কালো কালো মেঘ দুঃখমুড় করে উঠলো।

“বেশ তো, দেখে এসো,” আমি হেসে বললাম, “বেবাকে তো চেনো না, ওর পাশে বসে সিনেমা দেখার মতো যন্ত্রণা আর নেই। প্রত্যেকটি কথা ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে, প্রত্যেকটি ঘটনা কেন হোলো, কি ভাবে হোলো, তার বিশদ ব্যাখ্যা করতে হবে, ও হেসে উঠলে কানে আঙুল চাপা দিতে হবে, ও চোখের জল ফেসতে স্ক্রু করলে নিজের ক্রমাগত এগিয়ে দিতে হবে। একদিন ঘুরে এসো ওর সঙ্গে। আর যেতে চাইবে না।”

দিলীপ একটু স্নান হেসে চুপ করে রইলো। তারপর বললো, “সেও ভালো। একদিন বাবো, দু’দিন বাবো, তিন দিনের দিন আর যেতে চাইবে না, মনেও কোনো আক্কেপ থাকবে না। অনেক দিন আগে একবার একজনের সঙ্গে যে রকম হয়েছিলো সে রকমটি না হলেই হোলো।”

হঠাৎ যেন মনে হোলো দিলীপদা’র উপর অজায় করছি এত কক্ষ হয়ে। খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলাম, “কার কথা বলছো? জেনী ওয়াড?”

দিলীপ চুপ করে রইলো।

মহুর হয়ে এলো বাইরের বৃষ্টি। নিস্তেজ হয়ে এলো বাদলা হাওয়া। বায়ালার অর্কিডের পাতা বেয়ে কঁটা কঁটা জল পড়ছে টুপ-টুপ করে।

“আজ্ঞা, দিলীপদা, তুমি আমার কাছে ওদের অনেকের গল্পই করেছো, কিন্তু জেনীর গল্প করে নি কোনো দিন,” আমি বললাম।

তখনো চুপ করে রইলো দিলীপদা।

তারপর আবার যখন বুশ-বুশ করে বৃষ্টি শুরু হোলো আরেক পশলা আর গুরু-গুরু মেঘ ডেকে উঠলো আবার, দিলীপ বললো আন্তে আন্তে, “আজ জেনীর গল্প করার মতোই দিন। শোন তা হলে। কিন্তু তার আগে চা চাই। হুইস্কি চলে আরো ভালো হোতো, কিন্তু তোদের সব মধ্যস্থিত ব্যাপার, ওসব তালে থাকিস না। এই বাঙালী জাতটার যে কবে উন্নতি হবে কে জানে! বাক, চাই সই। হু’ কাপ চা দিতে বলে দে’। আর কাউকে ডেকে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে দে’। খুচরো নেই তোর কাছে? ফেন, ওই, ট্যান্সির ভাড়া দিতে পাঁচটা টাকা দিলি তোর চাকরকে? ডাক তাকে, ডেকে তিন চার প্যাকেট গোজুলক এনে দিতে বলে দে’। তোদের এসব মধ্যস্থিত পাড়ার পানওয়ালাদের কাছে তো টিন পাওয়া বাবে না।”

হু’ কাপ চা এলো। তার পর তিন প্যাকেট শোভুলকও এলো।

বাইরে ঝিঝ-ঝিঝ বৃষ্টি—কিন্তু বাদলা হাওয়ার সে রকম দাপট

আর নেই। এ বাড়ি ও বাড়ির জানলায় জানলায় কি রকম যে একটু করুণ তার সাড়া।

বিকশ ঠুং-ঠুং করে গেল রাত্তা দিয়ে। স্তিমিত হয়ে এত পাশের বাড়ির রেডিও। ও-বাড়ির মেয়েদের হাসির সাড়াও আ পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই আজ্ঞা সেবে এবার হেসেলে গিা চুকেছে বোধ হয় চায়ের ব্যবস্থা করতে।

দিলীপ একটি সিগারেট ধরালো। জিজ্ঞেস করলো, “সুনবি?”

আমি চুপচাপ একটি সিগারেট ধরলাম।

“বেবার সঙ্গে আজ্ঞা দিতে গিয়েছিলাম বলে কিছু মনে করি নি তো?” দিলীপ খোঁচা ছেড়ে জিজ্ঞেস করলো।

উত্তরে একটু হেসে আমিও একমুখ খোঁচা ছাড়লাম।

দিলীপ চুপচাপ কিছুক্ষণ থাকিয়ে রইলো আমার দিকে তারপর বললো, “আজ্ঞা, শোন তা’হলে। আজ না বলে হয় তো আর কোনো দিন বলা হয়ে উঠবে না।”

আত-কিম’এর লগ্নি বেষ্টিক স্ট্রিটের এক পাশে। ছোট সাজানো-গছানো দোকান, কাউন্টারের পেছনে কাচের আলমারি নানারকম স্টেগাউন টাঙানো। কাউন্টারের পেছনে একটি চা মেয়ে বসে।

একটি ময়লা গরম স্টে বগলে নিয়ে একদিন সেখানে উ এলো দিলীপ। স্টে ডাই ক্লীম করতে দিলো, দর নিয়ে মিখ তর্ক করলো, রসিদে নিজের নাম-ঠিকানা সই করলো, তার রসিদ নিয়ে চলে গেল।

কিছু দিন পর গিয়ে সেই স্টে ফেন্সত নিয়ে এলো। তার একদিন একটি সিগারেট হাওয়াই আন শাট থুতে দিলো। পরে বার নিয়ে গেল একটি বেরনের স্টে।

সেটি দিয়ে, রসিদ নিয়ে, ঘটনাবলেক এখানে সেখানে কাটি হঠাৎ বেহাল হোলো যে তার সিগারেট-লাইটারটি ভুলে রে হটের পকেটে রয়ে গেছে। দামী লাইটার। একজনের কা উপহার পাওয়া।

তাই তক্ষুশি ছুটলো সেই লগ্নিতে, যদি স্টেটা এখনো কারখান চলে গিয়ে না থাকে, তা’ হলে লাইটারটি কেবল পা এই প্রত্যাশায়।

চুকতেই সেই তানে মেয়েটি তাকে দেখে একটু হাসলে সেইটুকু হাসিতেই বৃঁছে এলো তার চোখ দু’টো।

দিলীপ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই সে লাইটার বার করে দিলো।

সে মেয়েটিকে খজবান জানিয়ে পথে বেরিয়ে এলো। প্যাচ বার করে একটি সিগারেট ঠোঁটের কোণে সন্নিবিষ্ট করলে তারপর লাইটারটি ধরলো।

চকমকি থেকে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে সলতেটি ধরে উঠে দিলীপ একটু অবাক হয়ে আগুনের শিখার দিকে তাকাত কী বেন ভাবলো। তারপর চলে গেল।

দিম পাঁচছয় পরে দিলীপ লগ্নিতে ফিরে এলো তার বেয়ে স্টে ডেলিভারি নিতে কিন্তু রসিদ ফিরিয়ে স্টে ডেলিভারি নি সে চলে গেল না। দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করলো।

“ইয়েস, এনিথিং এলস্,” জিজ্ঞেস করলো সেই মেয়েটি।

“হ্যাঁ, বলছি,” দিলীপ বললো, “আমি এখন লাইটটারি কোর্টের পকেটে রেখেছিলাম তখন তা’তে তেল ছিলো না। এখন আমি লাইটটারি তোমার কাছে থেকে শেলাম তখন দেখি, ওটাতে তেল ভরে দেওয়া হয়েছে।”

মেয়েটি একটু হাসলো। হেসে বললো, “তা’তে কি হয়েছে?”

“বিশেষ কিছু না,” দিলীপ উত্তর দিলো, “শুধু জানতে চেয়েছিলাম যে জিনিসটা বলে না, তোমার কাজ কি সেটি জলবার ব্যবস্থা করে দেওয়া?”

মেয়েটি হেসে ফেললো। আনমনেই কি রকম বেন নিচু হয়ে গেল তার মাথা। আশ্বে আশ্বে উত্তর দিলো, “কি আমার কাজ সেটা আজ্ঞা ঠিক আমি না। তবে কি আমার কাজ ময় সেটা বলতে পারি।”

“বেশ, তাই বলা, শুনি,” দিলীপ বললো।

“লগ্নিতে কাজ করা আমার পেশা নয়,” মেয়েটি উত্তর দিলো, “আমি চোরঙ্গির একটি দোকানে সেলস্-এসিস্ট্যান্ট ছিলাম। এই দোকানে কাজ করে আমার বোন। ওর এখন অসুখ। আর আমারও হাতে কাজ নেই। তাই যে ক’দিন সে আসতে না পারে সেই কদিন আমি এখানে বসছি।”

“দোকানের মালিককে যে দেখিনি একদিনও?”

“এ সমস্যা সে থাকে না।”

একটু চুপ করে থেকে দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, “তোমার বন্ধুরা তোমায় কি বলে ডাকে?”

“জেনী,” মেয়েটি হাসলো, “আমার নাম জেনী ওয়াড।”

“তোমার বোন সেবে উঠতে আর ক’দিন বাকী?”

জেনী তার নয়ম চোখ দুটো রাখলো দিলীপের চোখের উপর। আশ্বে আশ্বে বললো, “আমার মালিকের আসবার সময় হয়েছে।”

“তাই নাকি? আচ্ছা, বাই বাই,” বলে দিলীপ কেটে পড়ল।

দিন কয়েক পর দিলীপ আবার গিয়ে উপস্থিত হলো—এবার তার নিজের স্টুট নিয়ে নয়। কারণ, অতো স্টুট তার ছিলো না। এবার সে নিয়ে গেল তার এক বন্ধুর স্টুট।

জেনী রসিক লিখতে লিখতে হেসে ফেললো। বললো, “এভাবে নিজের পরসায় পরের স্টুট কাটিয়ে দিতে সস্তা করলে হু’ দিনে মেউলে হয়ে যাবে। পরসায় যদি ওড়াতেই চাও তো অনেক রাস্তা আছে।”

দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, “ওটা যে আমার স্টুট নয় তুমি কি করে জানলে?”

“আমার এক জোড়া চোখ আছে মিটার,” উত্তর দিলো মেয়েটি।

“আমার বন্ধুরা আমায় দিলীপ বলে ডাকে,” দিলীপ বললো।

লগ্নি গালস তাদের কাঠামারের দিলীপ বলে ডাকে না।”

দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, “তোমার বোন এখানে বসতে আরম্ভ করবে কবে থেকে?”

“কাল থেকে,” হেসে উত্তর দিলো মেয়েটি, “আজ এখানে আমার শেষ দিন।”

“জাটস্ কাইন, তুমি অফ-ডিউটি কখন থেকে?”

“চারটে থেকে। তখন মালিক নিজ্ঞ এসে বসবে।”

“কাইন। শোনা,” দিলীপ বললো, “দেখ, আজকে হাটায় শোতে

আমি লাইট হাউসের দুটো টিকিট করেছি। একটি আমার কাছে আছে। আরেকটি আমি তুল করে ওই কোর্টের পকেটে রেখেছি।”

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, “তুমি কি আশা করো? পরের হপ্তায় এখন স্টুটটা নিতে আসবে তখন টিকিটখানি কিরিয়ে দেবো?”

“না,” দিলীপ উত্তর দিলো, “আমি আশা করি লগ্নি গালস তার অস্থায়ী চাকরির শেষ দিন কাঠামারের জিনিষ কিরিয়ে না দিয়ে নিজেই ব্যবহার করবে।” বলে দিলীপ আর উত্তরের জন্তে দাঁড়ালো না।

গট গট করে হেঁটে বেরিয়ে এলো লগ্নি থেকে। একবারও পেছন ফিরে তাকালো না। সোজা চলে গেল তার নিজের কাজে।

সন্ধ্যার পর লাইট হাউসে ঢুকে দিলীপ দেখে, ঠিক পাশের সীটে বসে আছে জেনী ওয়াড।

সে দিন সিনেমায় দিলীপের পাশে বসে এটা-কি ওটা-কি জিজ্ঞেস করলো না, ঘটনাও সংলাপ বুঝিয়ে দিতে বললো না, হল ফাটিয়ে হাসলো না বা নাহক-নাহিকার দৃখে দেখে চোখে ক্রমাল চাপা দিলো না বোবা চৌধুরি মতো। শুধু চুপচাপ বসে সিনেমা দেখলো।

সিনেমা শেষ হতে জেনীদের পেলে দিলীপেরা বা বলে, দিলীপ তাই বললো। বললো, “চলো কোথাও বসে খেয়ে নিই।”

জেনী সেদিন রাজী হলো না। বললো, “আজ নয় আরেক দিন।”

“এর পর দেখা হবে কোথায়?” দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

জেনী বললো, “পরশু তিনটির সময় এখানেই। সেদিন সিনেমা আমি দেখাবো।”

জেনীকে ট্রামে তুলে রেওয়ার আগে শুধু একবার দিলীপ বললো, “জেনী, এখন তুমি লগ্নিগালস মও, আমিও কাঠমার নই, সুতরাং এখন থেকে আমায় দিলীপ বলে ডাকতে পারো।”

“আচ্ছা,” বলে হেসে জেনী ট্রামে উঠে পড়লো।

দিন দুয়েক পর আবার জেনীর সঙ্গে সিনেমায় দেখা হলো। জেনী সে দিন কিছু বললো না।

তিন-চার দিন পর দিলীপ আবার গেল সেই লগ্নিতে। বোধ হয় ভেবেছিলো এবার জেনীর বোনকে একবার দেখবে। কিন্তু গিয়ে দেখলো, কাঠমারের পেছনে জেনীই বসে আছে।

কি ব্যাপার?

না, লগ্নির মালিক আফ-কিম জেনীর বোন মিনিকে বলেছে,— তোমার শরীর এখনো ঠিক সেরে ওঠেনি, তুমি এক মাস বিশ্রাম নাও। মাইনেও পুরোই পাবে। আর জেনীর হাতও তো চাকরি নেই। এই এক মাস সেও কাজ করুক এখানে। তারপর দেখা যাবে।

“খুব উদার মালিক দেখছি,” দিলীপ বললো।

“হ্যাঁ, ও আমায় খুব ভালোবাসে।” জেনী হাসতে হাসতে উত্তর দিলো।

“তাই নাকি,” বলে দিলীপ চোখ তুলে জেনীর দিকে তাকালো। বোধ হয় ক্যাকাশে পাতত হয়ে গিয়েছিলো দিলীপের মুখ, তাই জেনী মুখ ফিরিয়ে মুখ টেপে একটু হাসলো।

দিলীপ একটু তাকিয়ে দেখলো জেনীকে, তারপর কোনো কথা না বলে পেচন ফিরে দরজার দিকে হেঁটে চললো।

দিড়ির প্রথম দাপে পা পড়তেই জেনীর ডাক শুনলো শেহন থেকে, “যেও না দিলীপ, শোনো।”

“কি,” দিলীপ মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করলো।

“এখানে এসো।”

দিলীপ ফিরে গেল কাউন্টারের কাছে।

“আহ-কিম আমার কেন ভালোবাসে সেটা শুনে যাও,” জেনী বললো।

“শুন কি হবে?” শুকনো গলায় দিলীপ বললো।

“শোনোই না। আহ-কিমের সঙ্গে আমার বোন মিনির বিয়ে হবে। আমি মিনির দিদি। তাই আহ-কিম আমাকেও ভালোবাসে। কেনন ভাগ্যে আহ-কিম—তাই না,” বলে জেনী মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

হঠাৎ জেনী লক্ষ্য করলো যে, দিলীপ তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। এতক্ষণ খেয়াল হোলো যে তার চোখ দু’টি বাপসা।

জেনী মুখ নিচু করলো তাড়াতাড়ি।

দিলীপ আস্তে আস্তে বললো, “জেনী, তোমার একটা কথা বলবো ভাবছি।”

“আজ নয় দিলীপ! অজ্ঞ কোনো একদিন—”

“না, এক্ষণি।”

“এখানে নয় দিলীপ! এটা দোকান। অজ্ঞ কোথাও—”

“না, এখানেই।”

“মালিক এখনই এসে পড়বে দিলীপ!”

“মালিক তো আহ-কিম? সে যে মেয়েকে বিয়ে করবে, সেই মেয়ের দিকি তার দোকানের কাষ্টমার কি বলবে না বলবে ইজ্ঞ নানু অফ হিজ বিজনেস!”

“ওর কাষ্টমারেরা যদি দোকানের ভিতর এরকম পাগলামি করতে শুরু করে তাহলে তু’দিনেই ব্যবসা উঠে যাবে।”

“ও যাকে বিয়ে করছে তার যদি ততগুলো দিদি থাকে বতোগুলো কাষ্টমার আছে—তার দোকানের তাহলে দুদিনে হাছ করে ব্যবসা কঁপে যাবে।”

“তুমি ব্যবসার কি বোঝো দিলীপ! এখন পর্যন্ত নিজের ব্যবসা ঠাঁড় করতে পারলে না।”

“এবার আমার চার মাস সময় দাও জেনী! দেখবে, কি রকম ঠাঁড়িয়ে গেছে আমার ব্যবসা।”

“চার মাস কেন?”

“চারটা আমার লাকি নান্দার।”

“আমার লাকি নান্দার কিন্তু পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ।”

“দেখ, জেনী, এসব আত্ম-বাজে কথা বলে আমার আসল বক্তব্য থেকে তুমি আমার বিচ্যুত করছো।”

“বশ তো, কি বলছিলে বলা।”

তখন দিলীপ একটু ভাবলো। ভেবে মুখ লাল করে একটি ব্যক্তিগত খবর জানালো। তারপর পাণ্টা প্রায় করলো জেনীকে। জেনীও একটু কান লাল করে উত্তর দিলো—হ্যাঁ! তারপর দিলীপ একটু সম্বল বোঝাব করলো।

জেনী আস্তে আস্তে বললো, “সেটা এখন নয়। আরো কিছুদিন থাক। তোমার রোজগার বাড়ুক। আমিও একটা চাকরি খুঁজেপেতে নিই।”

“তখন হবে তো,” খুব উৎফুল্ল হয়ে দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

জেনী ঘাড় নাড়লো হাসিমুখে। দিলীপ খুব খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

কেটে গেল আরো কিছুদিন। সন্ধ্যাগুলো জেনীর সঙ্গে কাটাতে কাটাতে কলকাতাকে স্বর্গ মনে হোলো দিলীপের।

দিলীপ একদিন জেনীকে বলেছিলো, “জানো, আমার মা ইংরেজ।”

“উনি কি মারা গেছেন?” জেনী জিজ্ঞেস করেছিলো।

“কেন বলো তো?” দিলীপ লবাক হয়ে তাকিয়েছিলো জেনীর দিকে।

“তোমায় দেখে মনে হয়,” জেনী উত্তর দিয়েছিলো, “তোমার মা নেই। তবে আমার ভুলও হতে পারে।”

দিলীপ একটু চুপ করে থেকে বলেছিলো, “না, তুমি ঠিকই বলেছো। আমার মা নেই।”

“উনি যখন মারা যান তুমি খুব ছোটো ছিলে বুঝি?” দিলীপের পিঠে হাত রেখে জেনী জিজ্ঞেস করেছিলো।

“উনি মারা যান নি। বেঁচেই আছেন।”

“তা’হলে?” অবাক হয়েছিলো জেনী।

“আমি যখন বেশ ছোটো, তখন উনি বাবাকে ছেড়ে চলে যান। বাবা আর বিয়ে করেন নি। আমি আবার হাতে মানুষ হয়েছি।”

জেনী সেদিন আর কিছু বলতে পারেনি, শুধু চোখ চুলচুলিয়ে দিলীপের হাতখানি চেপে রেখেছিলো নিজের নরম মুঠোর মধ্যে আর সে দিনই যতোটুকু বিধা ছিলো জেনী ওরার্ডের মনে, সবটুকুই কেটে গেল। হোক না ওরা দু’জনে দুটো আলাদা জাত—দিলীপের তো জেনীকে দরকার তার জীবনে। স্মৃতির কাঁ আসে-যায়!

জেনী খবরটা প্রথম ভাঙলো তার বোন মিনির কাছে মিনি অনেকক্ষণ জেনীর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, “দেখ, সে বিদেশী। যা করবে খুব ভেবে-চিন্তা করবে।”

“আমি যা স্থির করেছি, অনেক ভেবে-চিন্তাই স্থির করেছি,” জেনী উত্তর দিলো।

ওরা কথা বলে কম, তর্ক করে না, যা বলবার দু’চার কথাই বলে, যা বুঝবার দু’চার কথায় বুঝে নেয়।

মিনি বুঝে নিলো, জেনী দিলীপকে ভালোবাসে, এবং তাকেই বিয়ে করবে। এর আর এমিক-ওমিক হবার নয়।

তখন মিনি তার দিকিকে জড়িয়ে ধরে বললো, “তুমি যদি স্ত্রুং হও, আমিও খুব স্ত্রুং হবো।”

তারপর বললো, “জানো, আহ-কিমকে যখন বিয়ে করবে স্থি করলাম, তখন তোমার কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল। এ মধ্যে আমারও বিয়ের ঠিক হয়ে গেল, অথচ তোমার চোখে লাগতে না কোনো ছেলেকে। আমি আহ-কিমের বাড়ি চলে গেলে তুমি একা থাকবে কি করে? অনেক বাস্তবের তোমার কথা ভেবে কঁদেছি, তবে লজ্জায় তোমার বলিনি। আজ যে আমার ব ভালো লাগছে, সে বলে বোঝাতে পারবো না।”

তুনে ভেনী একটি হাসলো।

তারপর মিনি জিজ্ঞেস করলো, “বড়ো কর্তা তুনেলও কিছু মনে করবে না।” হুং-চাং না হয় মাথা ঘামাবে না, কিন্তু চিয়েন-চাং?”

চিয়েন-চাংকে নিয়ে একটি অপ্রবিশে ছিলো।

বড়ো ওয়াঙ জীবনে অনেক দেখেছে, অনেক জেনেছে, যে কোনো কিছুই অত্যন্ত সহজ ভাবে নেওয়াই তার অভ্যাস।

তুনে বললে, “এ আর নতুন কথা কি? আমাদের দেশে কতো জাত এসেছে, আমাদের মধ্যে বিয়ে করে আমাদের মধ্যে মিশে গেছে। এমন কি ওই ইক্কোরা, যারা অত্যন্ত দেশে নিজেদের পৃথক সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে কয়েক শতাব্দী ধরে, আমাদের দেশে তাদেরও আমরা হজম করে ফেলেছি। এখানেও তাই হবে, কতো কিনটাস মিশে গেছে আমাদের মধ্যে, আমাদের মেয়েরা চলে গেছে ফিরিসীদের মধ্যে। আস্তে আস্তে বাঙালীদের মধ্যেও যাবে। যে দেশ যা, তাই হয়ে থাকতে হবে বই কি। বাঙালীর যদি তেমন মুরোদ থাকে হজম করে ফেলুক আমাদের, যদি নিজেদের উপর বিশ্বাস না থাকে, আল্লাহ সাক্ষ্যবাহ হলে থাকুক। আমাদের কোনো ক্ষতি নেই।”

ভেনী সেদিন খুশি হয়ে বাপকে একটি নতুন রান্না বেঁধে ধাওয়ালে।

ভেনীর ভাই হুং-চাংও এমন কিছু বিরূপতা প্রকাশ করলো না। যদিও তার মনের প্রসার বড়ো ওয়াঙের মতো নয়, তবু ঠিক সেই সময় সে প্রেম করছিলো এক ফিরিসী ললনার সঙ্গে। স্তত্রয়া বিয়ের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার সে বিরোধী। অত্যন্ত নীতিগত ভাবে।—কারণ ভেনী ওয়াঙের পছন্দ করা ছেলেটি বাঙালী তুনে তার ভালো লাগেনি। বললে,—কী এসব বাঙালীরা, বড় বৈশী কথা বলে, সরষের তেলে রান্না করে, তরকারীতে মিষ্টি দেয়, ইত্যাদি।

কিন্তু বধন তুনেল দিলীপের মা ইংরেজ, তখন সে আর আপত্তি করার কোনো কারণ খুঁজে পেলো না। বাই হোক, দিলীপ হাঙ্-ইংরেজ তো—যেমন হাঙ্-ইংরেজ হুং-চাং-এর প্রাণিনি বোঝে।

রোজীর বাং ময়লা, তবু তার পূর্বপুরুষ ইংরেজ, সে নাচতে জানে, ভালো ইংরেজি বলতে জানে। কোথায় লাগে তার কাছে চায়না টাউনের মধ্যস্থিত চীনে মেয়েরা, যারা শুধু কাঠের খড়ম পাবে খুট খুট করে চলতে জানে, গালাগাল দিয়ে ঝগড়া করতে জানে, বাদের গায়ে রান্নাঘরের গন্ধ। হ্যাঁ, হুং-চাংজন যার বটে কনভেন্টে, এবং ওরা অত্যন্ত চীনে মেয়েদের চাইতে একটু বেশী খাট, কিন্তু এগুলো ইণ্ডিয়ানদের কাছে লাগে না। ইদানীং কেউ তো কনভেন্টেও মেয়ে পাঠাতে চাইছে না। চীনেদের নিজেদের স্বপ্ন হয়েছে। ছেলেরা মেয়েরা সবাই আজ-কাল সেখানে যায়। সবই শেখে, শুধু যেটুকু থাকলে ফিরিসী মেয়েদের মতো আকর্ষণময় হয়ে ওঠা যায়, সেটুকু শেখে না।

স্তত্রয়া বড়ো ওয়াঙ তার বিয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেও পারে নি। সে কিংবদন্তী তাকারিনি নিজেদের সমাজের মেয়েদের দিকে। তার বন্ধুবান্ধব বান্ধবী সবই ফিরিসী, নয় ইক্কো নয় আম’নী আর কিছু ফিরিসী বনে বাওয়া ভারতীয়। হুং-চাং-এর পোষাকের ছোট সাম্প্রতিকতম আমেরিকান—প্যান্ট কোমরের অনেক নিচে, সুরু খুটা পোড়ালি থেকে আট ইঞ্চি উপরে। কোটে একটি

মোটো বোতাম, কাঁধ অস্তিকার বকম চওড়া, কোমর অত্যন্ত ঢোলা। চুলের সাথনেটা এ্যালবার্ট। পায়ের রদাং মোজা, গলায় সমকালো টাই, মুখে কাণ্ড-বর ইংরেজি।

স্তত্রয়া দিলীপের ধমনীতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ইংরেজ-রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে জেনে সে চট করে দিলীপকে পছন্দ করে বসলো। বললো, “একদিন এনে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও। সে আমাদের ডিনার ষ্টাণ্ড করুক, লুইজি ষ্টাণ্ড করুক, তার পর দেখা যাবে তাকে আমরা পছন্দ করি কি করি না।”

এত সহজে সে মিনি ওয়াঙের ভাবী স্বামী আত্মকিমকেও অহুমোদন করেনি। কারণ আত্মকিমের ইংরেজি খুব পরিষ্কার নয়, সে জামা-কাপড়ে খুব কেতাহবস্ত্র নয়, তার চেচোরা খুব খাট নয়, সে একজন সাধারণ দোকানদার—আর তার দাদা বৈকিঙ্ক ষ্ট্রীটের একজন সাধারণ ভুতোওড়াল, সে নিজের হাতে কাষ্টমারদের পায়ে জুতো পরিবে দেয়, যে দোকানের ভিতর হাঙ্শাপাট আর গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বসে থাকে। তার বৌদিকে তো দেখা গেছে, বছর বছর পুত্র সন্তান প্রসব করতে আর রান্নাঘরে বসে শূণ্যবের চর্বিতে তরকারি রাখতে।

বড়োরা বোঝে না। বললে চটে গিয়ে বলে, এদের কথা শোনো, পুত্র সন্তান মেয়েরা প্রসব করবে না তো কে করবে? বছর বছর না করবে তো শতাব্দীতে একটি করে করবে? আমাদের মায়েরা করেনি? আমাদের ঠাকুরমায়েরা করেনি? ওরা কি আমাদের চাইতে কোনো আশে খাওয়া ছিলো?

স্তত্রয়া মিনির বর হিসেবে আত্মকিমকে বড়ো ওয়াঙ আর অত্যন্ত আত্মীয়-বন্ধনেরা পছন্দ করে ফেললেও হুং-চাং কোনো দিন তাকে অহুমোদন করতে পারেনি।

বরং এবার বধন দেখলো, ভেনী ওয়াঙ এমন একজনকে পছন্দ করেছে যার শরীরে আছে ইংরেজ-রক্ত, তখন ভেনীকে অনেক বেশী বৃদ্ধিমান মনে হোলো মিনির চাইতে।

হুং-চাং সোজা-স্বজি বললে, “লুইজি ভাল মিশিয়েই খাও, আর সোডা মিশিয়েই খাও, লুইজি সে লুইজি।”

কিন্তু বড়ো ভাই চিয়েন-চাং চুপ করে বইলো।

“তুমি কিছু বলছো না যে লাইকো,” মিনি জিজ্ঞেস করলো।

জানলার আলশেতে পাটপ খুট-খুট করে ছাটটা ঝেড়ে ফেলে তন্দ্রালস উত্তর দিলো চিয়েন চাং, “ইণ্ডিয়ান, এঃ? কী মন্দ নয়, তবে ইণ্ডিয়ানদের চেনে না। তার বন্ধু ইংরেজ-রক্তই থাক আর জাপানী রক্তই থাক ইণ্ডিয়ানরা চিরকালই ইণ্ডিয়ান।—তবে শুধু ইণ্ডিয়ান বলেই আমি আপত্তি করার কোনো কারণ দেখি না, যেহেতু, বরং প্রায় আমাদের মতো সভ্যতাক, শুধু আমাদের মতো রাগা জানে না।—আমরা বক্তব্য এট যে, আমাদের মধ্যেই বধন ভালো ছেলে আছে, তখন তার এই অচেনা ইণ্ডিয়ানকে কেন?”

“আমাদের মধ্যেই ভালো ছেলে? তুমি কার কথা বলছো?” জিজ্ঞেস করলো বড়ো ওয়াঙ।

“কেন? কেং জে-শিয়াং? সে কি যোগ্য নয়?” বললো চিয়েন-চাং।



## পঞ্চতপা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৯

মড়াইয়ের কাজে এখন পর্যন্ত বিয় ঘটিনি কোথাও। যেমন চলছিল তেমনি চলছে। ঘোষ-চাকলাদারই এগানকার একমাত্র কনট্রাক্টর নয়। ছোটবড় আরো আছে, ছোটবড় কাজ নিয়ে আছে। একজনের বিপদে আর একজনের সুদিনের সম্ভাবনা। তবু প্রতিকূল আবর্তের ছায়া পড়ে একটা। অনাগত উৎকর্ষার মত কিছু একটা ভূধোগ যেন খিঁচিয়ে আছে। শুক থেকেই ঘোষ-চাকলাদারকে সকলে স্বতন্ত্র চোখে দেখে এসেছে বলেই হয়ত এরকম লাগছে।

বাবা বা নরেন বাবুর দুশিষ্টা সেখে সাধনা মুখে যাই বলুক, মেজাজ ঠাণ্ডা হতে ভিতরে ভিতরে একটু দমে গেল সেও। যাই হোক না কেন সূচনা শুভ নয় তো বটেই।

অনর্ধিত এক জীবনের অধারও তার পর স্তন্য একমিনি। নরেনই বলেছে। বেড়াবে বলে সচরাচর সেভাবে নয়। একজনের শোনার দরব তারও ভেতরটাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল বোধ হয় সেদিন। সাধনা তদুন্নয় হয়ে শুনেছে।

শেষ হতে নরেন নিজেই যেন থমকে গেল একটু। সারাক্ষণ সাধনা ওরই দিকে চেয়েছিল বটে, ওরই কথা শুনছিল। কিন্তু তার কথার বুনটে দেখছিল যাকে সে অল্প মামুষ। দেখছিল, চিৎ ইঞ্জিনিয়ারের খোলস থেকে বাক উদ্ঘাটন করে দেখাল, তাকে। হালকা হেসে নরেন বলল, কি হল, কেঁদে টেপে ফেলবে না কি?

নিজের শুদ্ধতার নিজেই একটু লজ্জা পেল সাধনা। বলল, না, বড় দুঃখের জীবন তো ভ্রলোকের।

—দুঃখের বলেই তো এমন একটা নিখুঁত জিনিস গড়ে উঠছে, নরেন ঠাটা করল আবারও, ওর ভেতরটা বত বলবে, লোকে ততো বেশি আলোয় আশ্বাস পাবে, মন্দ কি?

—যান, আপনি ভারী নির্ভর।

অজ্ঞমনস্কের মত নরেন ভাবল কি। পরে বলল, নির্ভর নয়, ওর জীবন থেকে নীলা গেছে ভালই হয়েছে কিন্তু একেবারে গেছে কি না ভেবেই ভয় হয় মাঝে মাঝে।

সাধনার জিজ্ঞাসা চোখে চোখ রেখে বাকিটুকুও না বলে পারল না।—মামুষটাকে বত শক্ত দেখা ততো শক্ত নয়, আমার বিশ্বাস ওই

মেয়ে সামনাসামনি এলে আবারও পারে ওর জীবনের সব কিছু ওলটপালট করে দিতে, ওর এই কাজ এই নির্ভা সব কিছু শুচনচ করে ফেলতে।

শোনা মাত্র মুখভাব বদলাতে লাগল, সাধনার। একজন গেলেও সরকারী কাজ বন্ধ থাকবে না সে কথা মনে হল না। ওলটপালট হয়ে বাওয়া এবং নিষ্ঠায় ছেদ পড়ার সঙ্গে ডামের কাজে ব্যাঘাত ঘটাব সম্ভাবনাটা এক করে দেখল কি না সেই জানে। মেয়েটার আবার সামনাসামনি আসার প্রসঙ্গ কল্পনা করে সমস্ত মুখে কঠিন ছায়া পড়ল একটা।

বর্ণবীর ঘোষের ব্যাপারটা স্থগিত আছে এখনও। কতকাল থাকবে তারও ঠিক নেই। হেড অফিস থেকে নির্দেশ আসেনি এখনো কিছু। কেন আসেনি তাও অনুমান করতে পারে বাদল গাঙ্গুলি। ঘোষ-চাকলাদার নিশ্চেষ্ট বসে নেই।

এ ব্যাপারের ফলে কাজের ধারা একটু বদলেছে বাদল গাঙ্গুলির। দিনের মধ্যে দু'তিন বার মড়াইয়ে নামে। সন্ধানী চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সব। ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে। বিশ্বাসের শাস্তিভঙ্গ হয়েছে একবার। ঘোষ-চাকলাদারকে সসংশয় কলঙ্ক আর যাই করুক, ভিতরে চির থেমে গেছে একটা।

ফলে সাধনার সঙ্গেও আজকাল দেখা হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

সাধনার ইচ্ছেও হয় সামনে গিয়ে ছুটো কথা বলে। গাছতলায় সেই লাকের পর্ষ মনে পড়তে বাড়িরে ওঠে নিজেই। রাগের মাঝায় কি বাচ্ছেতাই না বলেছিল। বড়সাহেবের প্রতি পাগল সর্দারের সেই অভিযোগ মুছে গেছে মন থেকে, ভুতুবাবুর কথাগুলোও। একটা মেয়েও কাছ থেকে অন্তর্ভুক্ত যা খেয়েও মেয়েদের ওপর ভয়লোক বীতশ্রদ্ধ হবেন না তো কি! সব শুনে ওর নিজেরই রাগ ধরে গিয়েছিল মেয়ে জাতটার ওপর।

সামনাসামনি পড়ে গেলে নমস্কার বিনিময় হয় বড় জোর। ইচ্ছে থাকলেও কাছে বঁবে লা সাধনা। পাবেও না।

কারণ সাধনাও বদলেছে।

মাসির বাড়িতে বাবার সঙ্গে ঝগড়াঝিকি করে যে মেয়ে মড়াইয়ে এসেছিল, সে বদলেছে। একটু একটু করে বদলেছে। দল জনের চোখে নিজেও দেখে বদলেছে। সেই হাসি খুশি আছে, সেই কৌতুহল প্রাচুর্য আছে, কিন্তু ভরা জোয়ারের মধ্যে চেতনার রাশটাও তেমনি সজাগ আজকাল। ওভারসিয়ারের মেয়ে সেটাই একমাত্র পরিচয় নয় এখন। স্ব-মহিমার স্বতন্ত্র, স্বস্ব-বিকশিত। নিজের পরিপূর্ণতার রহস্য নিজে জানে। ওই যে এতবড় চিৎ ইঞ্জিনিয়ার মড়াইয়ের, যা খাওয়া পাড় খাওয়া মাছুষ—দেখলেও যে না দেখার ভান করে কত সময়, কাজের কীকে কীকে তারও বিমনি! দুটি উদাহরণে আসতে দেখেছে ওর কাছ পর্যন্ত।

অজ রকমের যোগাযোগ বটল একটা সেদিন।

বিকলে মেন কোয়ারটার্স-এর দিকে ছিল সাধনা। বড় বড় কৌটার জল পড়তে লাগল হঠাৎ। অসময়ের জল। অজ্ঞমনস্ক ছিল, থমকে ঠাঁড়াল। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে দিল ছুট।

অনুভবের সব ক'টা কোয়ারটারই চেনা। একটার খুব কাছে নয় আর একটা। চকিতে জেবে নিয়ে যে দিকে এগলো, এক



**সবাই  
জানেন -**

শীলকরা প্যাকেট  
পাওয়া যায় বলে  
**ব্রুক বন্ড চা**  
নির্ভেজাল ও একেবারে  
খাঁটি থাকে

দাম্পের তুলনায়  
**ব্রুক বন্ড চায়ে**  
অনেক বেশী কাপ  
ভালো চা পাবেন

রোজ  
২৪,৯০,৪৯৬ প্যাকেট  
**ব্রুক বন্ড চা**  
লোকে কেনেন



এই জনোই  
অন্য যে কোন  
মার্কী চায়ের চেয়ে  
**ব্রুক বন্ড  
চা**

**বেশী লোকে খান !**

কোনদিন বাবে সেখানে ভাবে নি। ভদ্রলোক তো আর বাড়ি নেই এখন, শুধু নিধু আছে...।

কিন্তু জলটা চেপে এলো যেন। যতটা ভিজবে ভেবেছিল তার থেকে বেশিটা ভিজে গেল। একেবারে বাড়ির গায়ে এসে সেই চেতনার রাশে টান পড়ল আবার। না, বাবে না। আগে হলে ভাবত না, সরাসরি ঢুক পড়ত। এখন মন চাইছে বলেই বাবে না। তাছাড়া ভিজছেও একেবারে কম নয় হলই বা নিধু...।

বাড়ির গা বেঁধে দাঁড়িয়ে ছাতের আলসেয় মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করল। কি যাচ্ছে তাই জল বে বাবা! কতক্ষণে ছাড়বে ঠিক কি! ভদ্রলোক যদি এসেই পড়েন এর মধ্যে। অস্বস্তিতে আকাশ বিশ্লেষণ করতে লাগল সাধুনা।

ওদিকে মাথার ওপর স্থানাসা খুলে যে লোচটা গলা বাড়িয়েছে সে স্বয়ং নিধুরাম।

—দিমিগি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছ। এসো এসো ভিতরে এসো!

চমকে উঠেছিল সাধুনা। পরে নিশ্চয়ই বিখ্যে জিজ্ঞাসা করল, এটা তোমাদের বাড়ি না কি নিধু?

বহুবচনে প্রীত হল নিধুরাম। দৃষ্ট কণ্ঠে জবাব দিলে, হাঁ দিমিগি, আমাদের বাড়ি, আমার আর বাবুর। কিন্তু তুমি ভিজে যাচ্ছ যে, ছুটে ভিতরে চলে এসো না।

এভাবে গা বাঁচানো সম্ভব নয়। কিন্তু পা যেন আটকে আছে এখন মাটির সঙ্গে। বলল, ভিতরে বাবু...তোমার বাবু রাগ করবে না তো?

নিধু অবাক।—বিত্তিতে ভিজছ রাগ কেন করবে? আর বাবুতো এখন আশিপ ঠাণ্ডাচ্ছে—

ভিতরে প্রবেশ করে সাধুনা শাড়ির আঁচলে হাতখুঁত মুছে ফেলল। কটাকে নিধুকে দেখে নিল একবার। দিমিগি আসার আনন্দই তার চোখে মুখে। যে দিমিগিকে সকলে চেনে, সকলে জানে আর সকলে ভালোবাসে।

—দাঁড়াও, একটা তোয়ালে এনে দিই তোমাকে।

—না না, তোয়ালে কিছু দরকার নেই, সাধুনা শশব্যস্তে থামালো তাকে, এই তো একটুখানি ভিজছি মোটে।

কতটা ভিজছে নিধু তাই দেখে নিল একবার! শাড়ির আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সাধুনা সঙ্কটভুক্ত ভিতরের দিকে উঁকি দিল। নিধু বলল, সব ঘুরে ঘুরে দেখো না দিমিগি, আমি তো আছি ভয় কি।

সাধুনা মাথা নাড়ল। আশঙ্কিত হল যেন। কিন্তু এগোবার আগেই সাগ্রহে আর একটা প্রস্তাব করে বলল নিধুরাম। নিজের বা কিছু অস্ত্রের চোখ দিয়ে আশ্বাসন করে নেওয়ার বৃত্তিটা শাশ্বত। দিমিগির মত এমন সমজদার আর পাবে কোথায়। সবিনয়ে বলল, আগে আমার ঘরখানা দেখে যাও, হ্যাঁ? বাবুর ঘর থেকে আমার ঘর ঢের ভালো, দেখবে এসো, কাউকে দেখাইনে।

সানন্দে আগে তারই ঘর দেখতে চলল সাধুনা। সত্যিই দেখার মত ঘর। নিধুর নিজস্বতা আছে একটা। যেখানে বা কিছু পছন্দসই সবই ঘরে এনে পরেছে। চৌকি, হাতলভালা

চেয়ার, খবরের কাগজটাকা কেবোসিনকাঠের টেবিল। টেবিলে যাক্সের জিনিস। রঙের টাইমপীস, কাটা আয়না, রৌশা ওটা বুকশে দামী চিকণী, শস্তা ফাউন্টেন পেন, কালি, চকচকে আশপট একটা, দামী তেলের শিশি, দুটো একটা শুল্ক ফাইল পঞ্চশ। আলনায় আশময়লা কাপড় ভাষা আর ছেঁড়া টাকিশ তোয়ালে, নিচে দু'তিন জোড়া পুরানো জুতো। সামনেই দেয়ালে মহাদেবের ছবি আর তার পাশেই প্রস্তুতবসনা নারীমূর্তির বিলিতি ক্যালেন্ডার।

—বা: স্বন্দর। সাধুনা হেসেই ফেলল, এত সব তুমি কোথায় পেলো?

একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়ল নিধুরাম। জবাব দিল, পাবে আবার কোথায়, এ সব তো তারই। কিন্তু একেবারে নিশ্চিত হতে পারল না তবু। একটু সতর্ক করে রাখা ভালো। বলল আমার ঘরে এত সব আছে তুমি যেন বাবুকে কক্ষণো বোলো ন দিমিগি।

সাধুনা মাথা নেড়ে আশঙ্কিত করল তাকে, কখনোই বলবে না খুশি হয়ে নিধুরাম নিচু গলায় বলল আবার, তোমাকে তাহলে বলি দিমিগি, বাবুর তো কিছু মনে থাকে না, যখন যা ভালে কিছু নিয়ে আসে কিছুদিন গেলেই সেটা আমার হয়ে যায় যদি কখনো খোজ পড়ে বলি খুঁজে পোব'খন—বাসু, তারপ আবার মনে থাকে না, কি করে থাকবে, সারাক্ষণ তো মাথার মতো বোঁ বোঁ করে ড্যাম ঘুরছে!

দিমিগিকে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে কিছু বোধ হয় খেয়াল হল নিধুরামের। অতঃপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মনোভাবটুকু জ্ঞাপন করল, তার সার কথা, দিমিগি ভাববে চুপি, চুপি নয়, চুরি কেন হতে পারে! এমনিই নেয় সে, তেম বেশি খোজ পড়লে চুপি চুপি তো আবার ফিরিয়েই দেয়। তা ছাড়া সে তো আর বিয়ে-খাওয়া কিছু করেনি, ঘর-সংসার নেই—এ সব তো এখানেই থাকবে বরাবর, কোথায় জা বাবে।

কোনরকমে হাসি দমন করে তার কথায় সায় দিতে দিগে বাইরে এলো সাধুনা। নিধু বলল, বাবুর আসার সময় হয়ে গেছে আমি চুট করে চায়ের জল চাপিয়ে আসি।

নিধুর পালায় পড়ে এভাবে এখানে এসে পড়ার অর্থি অনেকেটা কেটেছিল। গৃহস্থামীর প্রত্যাবর্তন সম্ভাবনায় সবে বাড়তে লাগল আবার। বাইরে অঝোরে জল পড়ছে তেমনি ওর সঙ্গে আড়ি করে নেমেছে যেন। এত জলে কে বেরোয় না এই যা ভয়না। একটু ধরে এলে ও নির্দোষ আগে পালাবে এখান থেকে।

দরজার চৌকাত দাঁড়িয়ে নিধুর মনিবের ঘরে উঁকি দিল সাধুনা! অবিশ্রান্ত আগোছালা ঘরের ছিঁড়ি দেখে ওর হাসি পেয়ে গেল। যেটা যেখানে খুশি পড়ে আছে। সব ছাড়িয়ে চোখ গেল ঘরের কো টেবিলটার দিকে। টেবিলের দামী ফোটাট্যাণ্ডের ওপর।

এই কথা শুনেছিল নরেন বাবুর মুখে। ফোটাখানার কথা শুনেছিল। পায়ে পায়ে এগলো সাধুনা। বাছে দাঁড়িয়ে নিরীহ করে দেখতে লাগল। ককরকে চকচকে চেহার। স্বস্তি। সৌরী বশবাস। স্পরিফুট অভিজ্ঞতা।

এই তাহলে নীলা। সামনাসামনি এলে যে এখনো পায়ে সব ওলটপালট করে দিতে, এই কাজ এই নিষ্ঠা সব তখনই করে ফেলতে।

চেষ্টে চেষ্টে দেখছে সাধুনা।

—পায়ে বোধ হয়। নইলে এ ছবি এখনো এখানে কেন। হাতে তুলে নিল ছবিখানা। কাছে দূরে এপাশে ওপাশে ঘুরিয়ে কিরিয়ে দেখল আবার। আয়নার চোখ পড়েনি, নইলে দেখত ওর এই দেখটার মধ্যে প্রীতি ছিল না খুব।

নিধুর সাদা পোরে ফোটা বথাস্থানে রেখে দিল আবার। নিধু চুপি চুপি পড়িয়ে করিয়ে দিল, উঠি নীলা দিদিমণি, বাবুর সঙ্গে খুব ইয়ে ছিল একসময়, কি বকম সব গুণগোল হয়ে গেল, নইলে বাবুর তখন কৃতি ছিল কত।

সাধুনা জানে সবই। কিছু জাহুক বা না জাহুক নিধুর মুখে কিছু শুনতে বাওয়া বিড়ম্বনা। বেরিয়ে এসে বাইরের ঘরে বসল সে। নিধুর ভক্তলোক হওয়ার সবল্যাম-দ্বারা বিশেষ একটা অভিনায় অপর্য থেকে গেছে বলেই নীলা দিদিমণির প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। গোপনে বাসনাটা ব্যক্ত করে ফেলল সাধুনার কাছে। কাউকে যদি না বলে তো একটা কথা বলি দিদিমণি, হ্যাঁ?

কোনরকম প্রতিক্রিয়া না দিয়ে সাধুনা আবার কিছু শোনবার সহ্যবান্য শব্দিত নেড়ে তাকালো তার দিকে।

—আমাকে অমনি রূপোর খাপে বাধানো ছবি দেবে একটা দিদিমণি? টেবিলে রাখতুম—

নিবেদন শুনে দুই চক্ষু প্রথম বিস্ফারিত হয়ে উঠল সাধুনার। উজ্জ্বলিত হাসির আবেগে স্থির বসে থাকে দায় হল তার পর। এই নিয়ে ওর সামনে বসে হাসাটাও বিসদৃশ। আবেদন পেশ করে কেনেই নিধুও লজ্জায় অধোবদন। দিদিমণি অত হাসবে জানলে বসত না।

সাধুনা বলল, আমার কাছে তো নেই, পেলে দেব এখন। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার লজ্জাই জিজ্ঞাসা করল, তোমার চা হয়ে গেল?

—না, তবে জল গরম হল, এবারে খাবারটা আগে তৈরী করব, তুমি বোসো।

মনে মনে নিধুও একটু আড়াল হবার ফিকির খুঁজছিল হয়ত। ব্যস্ত হয়ে তার রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

কিন্তু দিদিমণির মত একজনকে চুপচাপ বসিয়ে রেখে কতক্ষণ আর ভালো লাগবে। তার ওপর একটা প্রানও এসে গেছে মাথায়। এবারের প্রস্তাবে নিশ্চয় খুশি হবে। সেই টিকিন ঘাবড়ায় বসলানোর ব্যাপারটা নিধু জীবনে ভুলবে না। বাবু থাকে হয়ে কেনম চেষ্টেপুটে খেয়েছিল এবং পরে জেনে ফেলে মাঝে কত অবাক হয়েছিল সে সব ফিরিস্তি দিদিমণির কাছে অনেক দিন আগেই বলা হয়ে গেছে।

গামছায় হাত মুছতে মুছতে কাছে এসে পীড়াল আবার। —দিদিমণি, নতুন খাবার কিছু তৈরী করে দেবে? দানাবাবু যেন ভাবি খুশি হবে সেবারের মত—

কোকের মাথায় এখানে এভাবে এসে আটকে পড়ার অস্বস্তিটা নেই বাড়ছিল সাধুনার। তুচ্ছ কুঁচকে জলের বহর দেখছিল। ক জন্ম করার ভজ্জেই যেন সব কিছু। বাবু কথা ভেবে এত ঠাট, এর ওপর তাকে খুশি করার এই প্রস্তাব শুনে প্রায়

বেগেই গেল। বলল, বোজ কচ্ছ তুমিই করোগে বাও, আমি এখন পারব না—তোমাদের ছাতাটাতা আছে কিছু?

হঠাৎ এই বিরাগের সুরটা কানে বাজতে থতমত খেয়ে গেল নিধু। মাথা নাড়ল, নেই—। ফিরে গেল।

ছাতা থাকলেই বা এ জলে যেত কি করে! শাদা মনে এসেছিল লোকটা, এভাবে না বললেই হত। ভাবল সাধুনা। নেমন্তন্ন করে তো আর ডেকে আনেনি, বরং এসেছে বলে খুশিতে আটখানা হয়েছে। উসখুস করতে লাগল। —নীলার মত মোটর ইকায়নি কখনো, বারনার মত এম, এ পড়েনি—কিন্তু এই একটা জাহাজ তার হাত পড়লে তেমন কিছু করে তুলতে পারে, সে আত্মা পুরোপুরি আছে। আর এটুকু পারার আকর্ষণও কম নয় ওর কাছে।

উঠল। পায়ে পায়ে নিধুর রক্তনশালার দরজায় এসে পীড়াল। কাগজে ভড়ানো বড় একটা পাউরুটি আর গোটা কতক ডিম সামনে রেখে গভীর মুখে নিধু পেরাজ কুঁচোতে বসেছে।

—কি খাবার কচ্ছ নিধু?

জবাব না দিয়ে নিধু ডিম-পাউরুটির দিকে একবার তাকালো শুধু। বড় সাহেবের আপনায় লোক প্রায়, তারও একটা মানমর্ষা আছে। নেহাত দিদিমণি বলেই ভুলেছিল আর অমন অহুরোধ করেছিল।

সাধুনা আবার জিজ্ঞাসা করল, আপিস থেকে এসে এই শুকনো ডিমকুটি খাবে তোমার বাবু?

নিধু সাক জবাব দিল, যিদের পেট চুঁই চুঁই করে তখন খাবে না তো কি।

জবাব শুনে বিমর্ষ হল সাধুনা। কিন্তু ওর দিকে চেয়ে বেশ একটু কৌতুকও অনুভব করল। —জল ছাড়ার তো কোন লক্ষণ নেই, তোমার বাবু আসবে কি করে?

—আঁটা-পুঙ্ক আছে, বিহির জল ভেতরে সেথায় না, ঠিক আসবে।

হুচার মুহূর্ত ঘরের ভেতরটা দেখে নিল চুপচাপ। তেমনি হালকা করেই বলল আবার, তোমার আছে তো দেখছি শুধু ডিম আর কুটি এ দিয়ে আবার নতুন কি করতে চাইছিলে তুমি?

জবাব না দিয়ে নিধু ঘরের কোণে তরকারির ঝুড়িটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

সাধুনা হাসল একটু। —আচ্ছা সরো, দেখি কি করতে পারি।

এতক্ষণে নিধুর কৃতি যেন ঘিরে এলো আবার। একগাল হেসে, তরকারির ঝুড়িটা টেনে আনলো। অজান্তে সরঞ্জাম হাতের কাছে গুছিয়ে দিতে লাগল। চৌকালের ওপর বসে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল তারপর।

নিধু অরসিক নয়। তার মনে হল, দু'খানি বোগা হাতের তংপর ছোঁয়া পেয়ে কিমন্ত রান্নাঘরটাই যেন নড়েচড়ে জেগে উঠেছে। তরকারি শেখ, আলু-পেঁয়াজের বস সহযোগে সেখ আলুব কাটলেট শেখ, এবারে ডিম আর কুটি একসঙ্গে করে ভেজে নামাচ্ছে। কথাবার্তা খেমে গেছে নিধুয়ারের, সব কটিরই সজ্জায় রসনা সিক্ত।

বাইরে খটাখট কড়া নাড়ার শব্দ।

নিধু ছুটল। হাত খেমে গেল সাধুনারও।

গৃহস্থামীর পল্লপণ ঘটছে। জলঝরা ওয়াটার প্রক্ষুণ্ণে নিধুর

হাতে দিল। ভিজ়ে জুতো বদলে ঘরে ঢুকল। তোয়ালে দিয়ে আঁতড়াইল। হাতমুখ মুছে ফেলে ইঞ্জিনের গা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে রইল পানিকণ। নিধু দোরগোড়ায় ঝাঁড়িয়ে।

খানিকবাদে আপিসের বেশভূষা বদলে এবং হাতমুখ ধোয়া শেষ করে আবার ইঞ্জিনের গায়ে বসল। বলল, খুব ভালো করে চা কর—

এই প্রতীক্ষায় ছিল নিঃশব্দ। নির্দেশ শোনার আগেই রান্নাঘরে এসে হাজির। সাব্বনা গুছিয়ে রেখেছে সব। একটি কথাও না বলে তার হাতে তুলে দিল। খেয়াল করে ওর মুখের দিকে তাকালে নিধুরামও ভড়কে যেত হরত। কিন্তু তার চোখ অন্ধদিকে। নিঃশব্দের ভাঙ কতটা আছে না আছে দেখে নিয়ে খাবার হাতে দ্রুত প্রস্থান করল আবার।

বোজকার মতই খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে মনিব। খাবারের ডিশে হাত বাড়াল। তার পরেই তক্তাঘটা বুঝতে পারল যেন। কাগজ কোলে নামিয়ে ভালো করে দেখল চেয়ে। তার পর অবাক হয়ে তাকালো নিধুর দিকে। কিছু অরুণ হল বোধ হয়।

নিধু প্রস্থানোত্তত।

ডাকল, এই শোন তো—

প্রত্যাগবর্তন।

—এ খাবার তুই তৈরী করেছিস না কেউ পাঠিয়েছে?

নিধু জবাব দিল এ বিজ্ঞিতে আবার পাঠাবে কেমন করে, ঘরে বসেই তৈরী করছে দিদিমণি।

—দিদিমণি!

অরুণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করল নিধু, সেই ওভারসিয়ার দিদিমণি— সেই সেবায় রান্ধার বার সঙ্গে পোলাও-কালিয়া বদল হয়ে গেছিল। বাইরে ঝাঁড়িয়ে জল ভিত্তিছিল, আমি ঘরে নিয়ে এলাম—আসতে কি চায়, বলে তোমার বাবু বাগ করবে না তো?

চায়ের সরঞ্জাম হাতে সাব্বনা সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ল। তেপানার ওপর রাখল ঠুক করে। বলল, অত জেবায় কি আছে, খেতে ভালো না লাগে সরিয়ে রেখে দিন। নিধু মামলেট আর পাউরুটি নিয়ে আস্তর, চিবোন বসে বসে।

বাক্য শুনে নিধু হতভম্ব। বাইরে জলের নকন ঘরে আলো কম মনে হচ্ছিল। আলোটা জ্বলে দিল। মনিবের মুখে রাগের চিহ্নমাত্র না দেখে আশস্ত। উটে হাসির মতই দেখল যেন। তবুনি রাগ। ঘরের কথাটা মনে পড়ে গেল তারও। তাড়াতাড়ি সেদিকেই চলল সে।

—বসন্ত। বন্ধ দরজা জানালার কোনো এক কঁক দিয়ে আলোর রেখা যদি এসেই পড়ে, সেটা উপলব্ধি না করে উপায় নেই। চাক বা না চাক ভালো লাগার আভাস লাগল মুখে।

এ বকম পরিবেশে সাব্বনার একমাত্র সোজা রান্ধা সহজ হওয়া। এই সহজ হওয়ার দায়েই সরাসরি ঘরে এসে ঢোকা। বলল, হ্যাঁ, বসবে, বাড়িতে গুদিকে বাবা কত ভাবছে।

জানাল দিয়ে বাইরের জলঝরা আকাশ নিরীক্ষণ করে বাদল গাঙ্গুলি হালকা জবাব দিল, তাহলে বাড়ি যান।

বিস্মিত নেত্র তাকালো সাব্বনা, এই বুদ্ধিতে বাব কি করে?

—তাহলে বসন্ত।

সাব্বনা সূকৌতুকে দেখল আবারও। পরে বলল আমি নাম সাব্বনা। আমাকে আপনি বসন্ত বলতে হবে না।

খেতে খেতে বাদল গাঙ্গুলি মুখ তুলে হাসল একটু।—ন জানি।

—সকলেই জানে।

অর্থাৎ সকলেই যখন জানে, তার জানাটাও এমন কিছু নয় এই নিশ্চয় অভিব্যক্তির শিচ্চনে আয়াস কতটুকু বুঝতে দি। রাজি নয় সাব্বনা। বলল, কতক্ষণে যে ঘরবে এ ছাইয়ের ঢাক জ্ঞানে, সেই কখন থেকে আটকে আছি।

নরেনবাবু হলে এই অকালবর্ষণের সুবিবেচনার কথা বখাবারের প্রশংসায় পক্ষমুখ হয়ে উঠত। আচার্যরত মাছুষটা দিক দিয়েও গেল না। ক্ষুদ্র প্রশ্ন করল, আজ এদিকে রাই ছিল বুঝি?

আবারও সেই একই কথার টোপ ফেলল সাব্বনা।—ছিং তো, আপনার ডিম-কটি চিবুনো বরাতে নেই বলেই ছিল বোধ হয়? এই নিধুর ক্ষমতা, নইলে কবে একক্ষণে ভিজ্জেই বাড়ি চলে যেতাম।

এবারও স্মৃতিটা ছোঁড়ে দিয়ে গেল বাদল গাঙ্গুলি।

তেনে শেয়ালায় চা ঢেলে নিয়ে আবার আতাবে মনঃসংযোগ করল। জানালার কাছে গিয়ে একবার আকাশটা দেখে এ সাব্বনা। তারপর ঝাঁড়িয়ে রইল তেমনি। ভুরুশৃঙ্গে ক্রোধ রেখা মিলিয়ে গেল। এক্ষণ লক্ষ্য করেনি, আগের থেকে শুকা দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। মড়াইয়ের বিগত গোলযোগের দা বোধ হয়। কিন্তু শুকনো হলেও সঙ্কল্পের কাঠিন্দ আছে তাতে আর আছে প্রায় কণ স্বাতন্ত্র্যবোধ। ভেবেছিল এই নিয়ে কথাব হবে, মড়াইয়ের ভালোমন্দ মিশে আছে তারও মনের সঙ্গে জ্ঞান দেবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভ্রান্তিক গায়েপড়া শোনাও এরকম নির্বিকার অভ্যর্থনার সাব্বনাও অভ্যস্ত নয় আজকাল।

—কি হল, বসন্তে আপত্তি আছে না কি? চায়ের পেয় রেখে বাদল গাঙ্গুলি মুখ তুলল আবার। আপনি বা তুমি দু এড়িয়ে গেল।

সাব্বনাও লক্ষ্য করল সেটুকু। ঘরের মধ্যে বসবার স্থিৎ জায়গা শব্দ্য বিছানো খাটখানা। খাটের পাশেই টেবিলের ওপর নীলার কোটো। কোটোর মধ্যে মেয়েটা একেবারে মুখোমুখি হাসছে তার দিকে চেয়ে চেয়ে। পা জবাবেই যেন সাব্বনা ঈর্ষ-ক্রোধ সহকারে দেখতে লাগল তাতে তার এই দেখাটা অমূল্য করে অল্প লোকটির নীরব চাকলা তাকিয়েও যেন উপলব্ধি করতে পারল সে।

বাদল গাঙ্গুলির দুচোখ ওর দিকেই সংবদ্ধ। ভিতরে এর নাড়াচাড়া পড়ল হঠাৎ। গুরুগভীর পদমর্দার আবারণ সচি অনেকদিনের আহত মাছুষটাই জেগে উঠল যেন। নি। কৌতুহলে ভিতরের একটা দুর্বল ক্ষত কেউ উটে পাণ্টে দেখ থাকলে যেমন লাগে তেমনি লাগছে। অস্বস্তিকর বহুগালয়ক।

হঠাৎ বেদম হাসি পেয়ে গেল সাব্বনার। হাসতে হাস খাটের কোণ ঘেঁরে বসে পড়ল এবার। মাছুষটার চোখের খারালো হয়ে উঠছে দেখেও হাসি থামে না। কিংবা হয়ত ই করেই ধামতে দিল না সেটা।

—এত হাসির কি হল? নীরস, ঠাণ্ডা প্রস্র।

সাহুনার সামলে নিতে সময় লাগল তবু। শাড়ির আঁচলে ঢোখ মুখ মুছে নিয়ে বলল, শুনলে আপনি বেগে না বান। আপনার নিধুবও ভারি সুখ এককম একখানা বকবকে ফোটো ওর টেবিলে রাখে, আমাকে বরদ্বিল যদি একটা যোগাড় টোগাড় করে দিতে পারি।

হাসির কারণ শুনে অতঃশব্দের একটা ছায়াভর মুহূর্তে অপসৃত হয়ে গেল যেন। আপসের নিম্নোক্ত। ইচ্ছে না থাকলেও যেখানে সহজ সহজ ষাট, সহজ সহজ তর, তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে মেয়েটার ছুড়ি নেই যেন হয়। মুহূ মুহূ হাসতে লাগল বাদল গাঙ্গুলি। বলল, তা তুমি ইচ্ছে করলে এর থেকে অনেক ভালো ফোটোই তো নিধু পেতে পার। বলছিল যখন দিচ্ছেই দাঁও একখানা।

বুল সাহুনা। বৃন্দে দুর্ভাগ্যতার ভান করতে হল তাকে।  
—আমি কোথেকে দেব?

—তোমার নিজের ফোটোই একখানা দিয়ে দিতে পারো...

চকিত সত্যাক সাহুনা তাকালো একবার তার দিকে। অপরিণত অজ্ঞতায় চোটে উঠে জবাব দিল, আমার ফোটোই নেই—। কি মনে পড়তে আর এক বাক্য হাসল আবার। মুখোমুখি জাঁকিয়ে বলল—জানেন, নাসিনা একবার তো আমার সাক্ষিয়ে গুছিয়ে

ফোটো তোলানোর সব ঠিকঠাক করলে। ফোটোগ্রাফারের সামনে যেই গিয়ে দাঁড়ানো, অমনি ত্তলোক সেই কালো বোমটা মাথায় দিয়ে যা শুরু করে দিলে—সোজা হোন, বেকে দাঁড়ান, মুখ তুলুন, মুখ নাবান, গভীর হোন, ওয়ান—টু—হাসুন—। আমার আগেই হাসি পেয়ে বাচ্ছিল, তার ওপর যেই না বলা হাসুন, আমি হেসে একাকার—কালো বোমটা সরিয়ে ত্তলোক এমন চেয়ে বইল—আমার হাসি আর খামলই না, একেবারে দে ছুট!

নিজের অজ্ঞাতেই ভালো লাগছে বাদল গাঙ্গুলির। কল থলে দিলে যেমন বরবরিয়ে জল পড়ে, এ মেয়েঃ হাসির উৎসে নাড়া পড়লে তেমনি বরবরিয়ে হাসি বারে।

—তোমার শশুরী কেমন আছে?

আর একদিন আর এক জায়গায় এই একই প্রশ্ন করে যে জবাব পেয়েছিল বিলক্ষণ মনে আছে। আছে বলেই আজ আবারও জিজ্ঞাসা করল।

সাহুনা বর্ষাবুই লম্বা শেল এবার। তবু বলল, ওর ওপর আপনার খুব টান দেখছি।

—যে টানা টানিয়েছিলে, টান হবে না?

আরক্ত হয়ে উঠল সাহুনা।— আমি কি জানতুম আপনি চিক ইঞ্জিনিয়ার এখনকার?

—কিন্তু—

কিছুটা নিরেস করিয়া কতকটা সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা বা যাত্র—এমন কোব জিনিষ বিবল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নস্বায়ী বিকৃত সস্তা জিনিষেরই বাজারে প্রাচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিত্রাচারিত কলাবৈপুণ্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ ষাতে কোব সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোবদিন অডার ঘটে না। তাই আমাদের নির্মিত অলঙ্কার সমূহের সৌন্দর্য সাধনে এই আদর্শই আমরা অনুসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং



অজস্র চিত্রকলা  
এলোরার ভাস্কর্য  
আগ্রার ভাস্কর্য  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

**এস, সরকার এণ্ড কোং**

ফোন-৩৪-৩১৪০-*শ্রীমতী কুমারী মণিকার-গ্রাম-গিনিমার*

১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২



২০৮, রাসবিহারী এডিনিউ-কলিকাতা-১২

—জানল কি করতে ?

—স্ট্রাট টালুট করতুম বোধ হয়।

গোক ছুটে যেতে যেভাবে ভমডি গেয়ে পড়েছিল, দুজটা মনে পড়ে গেল বাদল গাঙ্গুলির। সে কথা বলে লজ্জা না দিয়ে বলল, কিন্তু তার পরও তো অনেক বার দেখা হয়েছে, পরোয়া কর নি তো ?

অম্লান বদনে উল্টো জবাব দিল এবার। আমি পরোয়া করতে বাব কেন, আমি আপনার চাকরি করি ?

বাদল গাঙ্গুলি হাসছে।

যেবর আলায়ে বাইবের দিকটা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি কেউ। অধ্যবসায়ী ছাত্রের দুকহ কোন আঁকের ফল মিলে গেলে যেমন হয় তেমনি একটা তৃপ্তির আশ্বাসন নিয়ে সাধুনা উঠে জানালার ধারে গিয়ে জল খেমেছে কি না দেখল। জিব কামড়ে বলল, এই বা জল কখন ছেড়ে গেছে, বাবা দেবেরন, আমি চলি—

ঘাড় ফিরিয়ে বাদল গাঙ্গুলিও তাকালো বাইবের দিকে। সন্ধ্যার ঘন ছায়া নেমেছে। বলল, নিধুকে ডেকে দিই, সে সঙ্গে থাক।

অনুট হেসে উঠল সাধুনা, চাল নেই, তলোয়ার নেই নিখিরাম সন্ন্যাস—নিধুকে ডাকতে হবে না, আমি একাই স্নেহে পারব।

লবু চরণে ঘর থেকে দ্রুত নিষ্কান্ত হয়ে গেল।...বাদল গাঙ্গুলি চুপচাপ বসে। রাজিচেরা বিদ্রূহ বলকে বিবরাজ্যীদের সাড়া পেয়ে হঠাৎ সচেতন হল ঘন। এ বিদ্রুতি চায় নি, চায়ও না। চোখ দুটো আবার শুকনো খরখরে হয়ে উঠতে লাগল আগের মতই।

কিন্তু তবু ঘরের আলোটা এখন নিশ্চয় লাগছে কেমন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কোয়ার্টার থেকে সাধুনা বেরিয়ে এসে বিজয়িনীর মতই। অস্তিত্বহীন ভরপুর। কাউকে বলা বাবে না, নয়েন বাবুকেও না।...বলতে পারলে কিন্তু বেশ হত। কলের মাছুর না কি। কলের মাছুরের কলকব্জাগুলো একটু নাড়াচাড়া করে দেখে আসতে পারে বোধ হয় ইচ্ছে করলে।

কিন্তু মেন কোয়ার্টারস-এর বাগানো রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই সমস্ত নারীবিক্রম ঠাণ্ডা। কোয়ার্টার থেকে পচিশ-তেরিশ গজ দূরে রাস্তার আলোর নিচে দাঁড়িয়ে রণবীর ঘোষ কথা বলছে নিধুর সঙ্গে। মড়াইয়ের সোমসাইটি বলতে মেন কোয়ার্টারস্। দেখা এখানে সকলের সঙ্গেই হতে পারে। কিন্তু জলবরা রাস্তায় লোকজন নেই আজ, এখানে এ সময়ে নিধুর সঙ্গে কথা বলটা শুধুই যোগাযোগ নয় নিশ্চয়। সেই বারনা উৎসবের পর এই ক'মাসের মধ্যে লোকটাকে আর সামনাসামনি দেখে নি সাধুনা।

মুহুর্তে কর্তব্য স্থির করে নিল। সোজা নিধুর সামনে এসে ধমকে দাঁড়িয়ে অহুশাসনের সুরে বলল, তুমি এখানে আর শুদিকে স্নেহে সারা এতক্ষণ। আমাকে পৌছে দেবে চলা।

কিন্তু নিধুর মনে রয়েছে অন্য চিন্তা। বলে উঠল, এই বাঃ, তুমি চলে এসে দিদিমণি, তোমার খাবার যে রাস্তাঘরে ঢাকা পড়ে থাকল। আমি অপেক্ষা করে করে ভাবছিলাম...

—তুমি আসবে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকবক করবে? বখাৰ্চ বেগে উঠল সাধুনা।

নিধু হকচকিয়ে গেল। সাধুনা প্রক্ষেপ করুক বা না করুক, রণবীর ঘোষ নিজে থেকেই অমায়িক হেসে বলল, আপনার খাবার তাড়ায় বেচারীর দরদটুকু মাঠে মায়া গেল, খবর সব ভালো তো ?

জবাব না দিয়ে সাধুনা পলকের জন্ত শুধু মুখ তুলে তাকালো একবার। সেই হাসি ভিজানো বকবকে মুখ আর চকচকে চোখ। বিগত গোলযোগের আঁচ লেগেছে কোথাও মনে হয় না, একটুও বরলায়নি।

পা বাড়ানোর আগেই দ্বিতীয় দফা বাক-নিঃসরণ হল রণবীর ঘোষের।—সেই ছ'মাস আগে আমার গো-ভাউন দেখতে যাবেন বলেছিলেন, এতদিনের মধ্যে কই একবারও গেলেন না তো ?

—আপনার গো-ভাউন এখনো আছে না কি ?

বলবে ভাবে নি, বলতে চায়ও নি। মুখ দিয়ে আপনিই যেন বেরিয়ে গেল হঠাৎ। সচকিত হয়ে ডাকল, নিধু এসো—

—সারয়েক বলে আসি দিদিমণি...

—বলতে হবে না! এসো তুমি। বাঁকিয়ে উঠে সাধুনা হনহন করে এগিয়ে গেল।

রমণী বিরাগে অনভ্যন্ত নিধুরাম শরবন্তে অহুসরণ করল তাকে। মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। দিদিমণি এ রকম বলল বলে নয়, নিজের হাতে সব করে না খেয়ে চলে বলে। বেচারীর দোষ নেই। জিজ্ঞাসা করতে এসেও মনিবের ঘরের আবহাওয়া দেখে রসভঙ্গ করতে মন সরেনি। বাবুর অমন হাসিমুখ দেখে নি অনেককাল।

সামনের বাক না পেরেনো পঞ্চম সাধুনা আর এরিক ওদিক চাইতেও পারছে না। না তাকিয়েও পিছনে রণবীর ঘোষের দুই চোখ উপলব্ধি করতে পারছিল। নিধু পাশে আসতে জিজ্ঞাসা করল, লোকটা দাঁড়িয়ে আছে না তোমার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল ?

নিধু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একবার। বলল, দাঁড়িয়ে এদিকপানে চেয়ে আছেন। বাবুর সঙ্গে আজ আর দেখা করবেন না তো উনি।

সাধুনা বলল, দেখা করবেন না তো তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এত কি কথা হচ্ছিল ?

যেন সেই মনিব নিধুর। জবাবদিহি শুনে আরো বেগে গেল। নিধুর বক্তব্য, দেখা করার জন্ত লোকটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে ঠিক করেছে অত রাতে আজ আর দেখা করবেন না, আর একদিন আসবে।

—অপেক্ষা করছিল তো তুমি তোমার বাবুকে এসে খবর দাওনি কেন ?

তাই বা কি করে দেবে নিধু। লোকটা যে নিষেধ করল, সাহেব দিদিমণির সঙ্গে গল্প করছে যখন আজ আর বিরক্ত করে কাজ নেই, বাড়িতে কখন কি বকম ফুৎস থাকে সাহেবের, তাই জেনে নিচ্ছিল।

নিধুর আত্মসমর্পণে কিছুমাত্র খুশি না হয়ে নিজের মনে গল্প-গল্প করতে করতে এগেলো সাধুনা।

নিধু মিশ্রো বলে নি খুব। তা বলে নির্জলা সত্যিও বলে নি একেবারে। দিদিমণির মেনাজ দেখে চেপে গেল। নইলে কথ উঠতে আরো অনেক কথাই বলে ফেলেছে সে। দিদিমণির কথা বত বড় সাহেবই হও, দিদিমণির সামনে সব জল। প্রকারান্তরে

এ কথাটাই দুরিয়ে ধরিয়ে বলেছে বণবীর ঘোষকে। তার পর দিমিদির রান্নার প্রশংসাও করেছে বইকি। আর তাই যখন স্বয়ং সেবারের সেই 'টিপিনকার' বলে দেওয়ার মজার খবরটাই বা না বলে পারে কি করে!

কিন্তু সাহসনার মন থেকে বণবীর ঘোষ মুছে গেল একটু বাদেই। তার আগে অধ্যায়টুকুই ছুড়ে বসল আবার।—নরেন বাবু মিথ্যে বলেনি বোধ হয়। আসলে ওই মেয়েটাকে ভুলতে পারেনি বলেই একটা শোকের অহঙ্কার চোখের সামনে সর্বদা জ্বিইয়ে রাখতে চায় মানুষটা। নইলে ও ছবিটা ওভাবে ওখানে থাকত না। থাকুক, সাহসনার আপত্তি নেই। কিন্তু ইনকো এক নারী-বিষে অলছে বলে নিশ্বাসে নিশ্বাসে একজন তার দ্রুনি ছড়িয়ে সমস্ত মেয়ে জাতিটাকে কালো করে দেখাবে, সেখানেই বস আপত্তি! ওতে যেন তাদের সকলের অপমান। থেকে থেকে কেবলি মনে হতে লাগল, একটা কাজের মত কাজ হয়েছে আল। ওপর ওপর দেখতে গেলে কিছুই নয়, কি আর এমন বলে এসেছে? কিন্তু মনের কারিগরী অজান্তায়। ও যেন জানে, বলাটাই সব নয়। বলে হোক, না বলে হোক, লোকটার ওই কালোর শোক কিছুক্ষণের জন্য অন্তত ঘুরিয়ে এসেছে।

নিধুকে আগেই বিধায় দিয়েছে। বাড়ি ঢুক দেখে, বাবা চিন্তিত মুখে বর বার করছেন। দেখেই বলে উঠলেন, বড় জল দেখে বেরোস না, না কি—?

প্রশস্ত হয়েও জবাব দিল, জল এসে গেল তার আমি কি করব?

বিরস বদনে অবনী বাবু কাছে এসে হাত দিয়ে তার পা মাথা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন, ভিত্তিছে কি না।

—কেন, ভিত্তিছে?

অবনী বাবু হেসে বললেন, না, খুব বাতাহুরী—সেই থেকে ভাবছি আমি, ছিলি কোথায় তুই?

—তোমার তো কাজ না থাকলেই ভাবা, যেসো, এমিকের ব্যবস্থা দেখে আসি আগে।

সরে এলো সাহসনা। ব্যবস্থার জ্ঞান নয়, ছিল কোথায় এতক্ষণ সেটাই এড়াতে চায়। কিন্তু কেন?

এই কেনটাই ভালো লাগছে না কেন জানি। নিজের পরিবর্তন জানে, উপলব্ধি করে। আগে হলে বাবার সামনে জাঁকিয়ে বসত, বলত সব। আর বলতে পারত না। পারত না, কারণ, জলটা হঠাৎ এসেছে বটে, কিন্তু বাগল পান্সুর বাড়িতে ওর বাওরাটা আকস্মিক কিছু নয়। জলের সুযোগে ভিতরের একটা আগ্রহ ওকে ঠেলে পাঠিয়েছে।

তিন চার দিন পরে বাড়ি ঢুকই নরেন হৈ চৈ করে উঠল প্রায়, তোমার ব্যাপারখানা কি বল তো। এমন একটা অ্যাডভেঞ্চার করে এলে অথচ আমাকে বলই নি কিছু?

সোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখে যেন এক স্বলক রক্ত নেমে এলো সাহসনার। কাজের অজিলায় উঠে গিয়ে একটু বাদে ফিরে এলো আবার।—কি হয়েছে বুললাম না।

—বুললে না? সেদিনের জলে কোথায় আটকে পড়েছিলে?

—ও, এই কথা। সে আবার বলার মত কি?

বলার মত কি! জবাব শুনে নরেন আরো অবাক। যেন নিরীক্ষা বলাছে, করার মত কি।

বখাসম্বর নিশ্চিন্তা বজায় রেখে সাহসনা শাশাসিখে ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, কার কাছে শুনলেন?

—নিধুরাম দি গ্রেট।

হাঁক ছেড়ে বাঁচল। ওর কথা ভুলেই গিয়েছিল। এবারে বাগও হল বেশ। ঠেস দিয়ে বলল, নিধুরামের সঙ্গে খুব ভাব বুঝি আপনার?

—খুব। নিধু হল আমার দশ বছরের সাগরদেব।

—কান কুড়কুড় শেখ? হেসে উঠল। ঠাটা করতে গেলে নয়, প্রসঙ্গ চাপা দেবার জ্ঞান।

অ্যাডভেঞ্চারের কথাটা চাপা পড়ে গেল ঠিকই। এর পরও ও কিছু বলল না দেখেই নরেন তুলল না কথা। মনে একটা জিজ্ঞাসার আঁচড় পড়ল কি পড়ল না। বাতিক্রমটুকু উপলব্ধি করল শুধু। কিছুদিন ধরেই করছে। কথার ঝাঁক ঝাঁক ওকে লক্ষ্য করল অনেকবার।—উজ্জলতা নয়, সম্প্রতি খুশির জোয়ারটা ওর ভিতরে এসে বেয়ে আছে যেন।

ডায়েরী সকলেই বাস্তব ইদানীং। আর একটা বছর ঘুরে আসছে। কাজের গতি লক্ষ্যের নিশানায় পৌছয়নি। নতুন বছরের ছক কাটা হচ্ছে। সন্ধ্যার মিটিং বসছে বোম্বই। আরো লোকজন, আরো সাজসজ্জাম, আরো তৎপরতা বাড়ানোর জরুরী-কল্পনা।

অবনী বাবু বাড়ি ফিরতে বাত হর প্রায়ই। নরেনেরও ক'দিনের মধ্যে বেধা নেই। আগে এ ধরনের বাড়তি অবকাশে সাহসনা নিজেকে আরো বেশি করে বাইরে ছড়িয়ে দিত। কিন্তু পরপর কটা দিন বাড়ি বসেই কাটছে একরকম। বাইরের সঙ্গে নিজেকে মেলানোর অশাস্ত ভাগিদে ছেল পড়েছে। বেশ লাগছে এই ভরা ভরা অলস মুহূর্তগুলো।

—দিদিয়া!

হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন কাঁটা দিয়ে উঠল সাহসনার।

ভিতরের সাওয়ার বসে বাইরের আলোর সংবল দেখছিল চূপচাপ। উঠবে, আলো ভালবে, সন্ধ্যা দেখাবে। আঁখার ঘনিজে আসছিল, কিন্তু উঠি উঠি করেও ওঠা হচ্ছিল না। এরই মধ্যে অনতিদূরে কোথায় চাপা গলায় অতিপরিচিত ফিস ফিস ডাক শুনে সর্বাঙ্গ নিউরে উঠল। সহসা প্রোত্তের ডাক শুনল যেন।

—ই দিদিয়া!

সাহসনার সাঁচা সঙ্গে হিম শ্রোত বইছে একটা। নড়া চড়ার ক্ষমতা নেই। আকুল হয়ে বলতে চাইল, কোথায় যে, কোথায় তুই? বাহুল্য নেড়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল শুধু।

—দিদিয়া!

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল এবার। স্তম্ভরী ঘরের দিক থেকে আসছে অসুস্থ কণ্ঠস্বর। এগিয়ে গেল। আড়ষ্ট কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল তারপর। গৌরাণ ঘরের দেয়াল বেঁচে অন্ধকারে আবছা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

চাঁদমাণি।

অকুট হাস্তধ্বনি :—আমাকে কেনেতে পারিস লাই দিদিয়া ?

সান্থনা সামলে নিয়েছে খানিকটা, হুহু গলায় ডাকল, আর।

—উবাসীর বাবু কুখা ?

—নেই, আর। হাত ধরে তাকে ভিতরের দাওয়ার নিয়ে এসে আলো ফেলে দিল। তারপর আর মুখে কথা সরল না একটাও।

চাঁদমণি কিন্তু হাসছে। যেমন হাসতো আগে তেমন নয়, তবু হাসছে। সান্থনার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, তুকে একটোবার দেখতে আলাম, আরো অনেক সোন্দরপানা দেখতে লাগছে তুকে।

সোন্দারজি সান্থনা তাকাতোও পারছে না। মড়াইয়ে চাঁদমণি বলে মেয়ে ছিল একটা পাগল সর্দারের। অনেকদিন পর্যন্ত তার হুঁত আর তার কথা সকলেরই মনে হয়েছে। অস্বস্ত সান্থনার তো হয়েছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও প্রেতের প্রত্যাভর্তন যেমন কাম্য নয় তেমনি বিবম এক অবস্থিতে স্তব্ধ হয়ে রইল বেন।...কালোর ওপর আলগা কালো ছাপ পড়েছে আর একটা, চলচলে প্রাচুর্যে শুকনো টান ধরেছে, যে কালো চোখ কারণে অকারণে জ্বলতে দেখেছে কতবার তার নিচে বেন কালো দীর্ঘির ছায়া। চকচকে মুখে পক্ষা-নিধাতনের রক্ততা, আর...আর...যেয়েটা একলা নয় এখন, ওর দিকে তাকালেই সেই অনাগত সম্ভাবনাটা চোখে পড়ে।

চাঁদমণি দাওয়ার ওপরে বলল।

সান্থনা ঈড়িয়ে তেমনি। কি করবে, কি বলবে বুঝে উঠছে না। কেন এলো মেয়েটা। এলো যদি, এমন লুকিয়ে তার কাছেই এলো কেন! অকুট প্রশ্ন করল, এতদিন ছিল কোথায় তুই?

—হেলাম? হাসিতে ঈতগুলি আগের মত বকঝকিয়ে উঠল না আর।...হেলাম...কত লয়া জায়গায় হেলাম।

—তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে? সান্থনাও বলল আস্তে আস্তে।

সভয়ে চাঁদমণি কিয়ে তাকালো তার দিকে। বলল, উ দেখলে ডো ভূয়ে পুঁতে কেসাবে।

—বেশ করবে, হঠাৎ রাগে দগ করে উঠল সান্থনা, আঁশ বঁটি দিয়ে কুটবে তোকে, আমি খবর পাঠাচ্ছি তাকে।

চাঁদমণি অনেকক্ষণ শুধু চুপচাপ চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর হাসল আবার। সেই হাসি দেখে গা আবারও জ্বল গেল সান্থনার, মরার হাসি রোগ বায়নি এখনো। কিন্তু পর হুহুতে হকচকিয়ে কাঠ হয়ে গেল একেবারে। সহসা উবুড় হয়ে তার হুঁপা আঁকড়ে ধরে মাথা গুজে পড়ে রইল চাঁদমণি। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, সর্বাঙ্গ অবশ সান্থনার। আর এক পাহাড় প্রমাণ জমাট এদনা বেন কেঁদে কেঁদে তার পায়ের ওপর গলিয়ে দিচ্ছে মেয়েটা।

নীরব, নিশ্পাশ পুতুলের মত বসে আছে সান্থনা। কিন্তু ওই কান্নার স্পর্শে চোখ দুটো তারও ভিজে উঠছে বাবাবার।

নিজেরি উঠল চাঁদমণি। শান্ত হয়ে আঁচলে করে চোখ মুখ মুছে নিল অনেকক্ষণ ধরে। আবারও হাসল তার পর। বলল, দিদিয়ার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গেই দেখা করতে সাহস করেনি। দিদিয়ার ও ক্ষতি করতে চেয়েছে কতবার, তবু। ও চলে যাচ্ছে, এখন থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে, আর কোন দিন দেখা হবে না কারও সঙ্গে,

কিন্তু সকলকে একবারটি দেখতে ইচ্ছে করে খুব—সকলকে আর করে দেখবে, লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু বাবাকে দেখবে একবার, দেখে চ যাবে।

—কোথায় বাবি? কার সঙ্গে যাবে, সে প্রশ্ন আর মু এলো না।

কে জানে কোথায় যাবে। কে জানে কতদূর নিয়ে যাবে তাকে বাবাকে একবার দেখা হলেই যেখানে হোক যাবে, আজ ক'দিন ধ চোঁটা করছে তাকে লুকিয়ে দেখতে, কিন্তু মড়াইয়ে তো আর যে পাবে না, গায়ের দিকে গেলেও সকলে চিনে ফেলবে। দিদিয়া! তার বাবাকে দেখেছে? ক'দিন দেখেছে? কোথায় দেখেছে?

আবার উকু হয়ে উঠেছে সান্থনা। সেই নির্মম বিচারের মতো চোখে ভাসতে উঠল। কি না হতে পারত। নিজের জীবনের প্রা ক্রক্ষেপ না করে যে লোকটা এতবড় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা কর তার বাবাকে, তার প্রশ্নসমূহ আভাসেও জিজ্ঞাসা করল না একবার সান্থনা নীরস কণ্ঠে বলে উঠল, নিজের দেশ ছেড়ে সকলকে ছেড়ে ও জমাদার লোকটাই বেশি হল যখন, তখন আবার দরদ কিসের এত?

—কোন জমাদার? বাহাদুর? হঠাৎ চাঁদমণির চুই চোখ জ্বল! অন্ধারের মত দৃক দৃক করে জ্বল উঠল। যেমন মড়াইয়ে জ্বলত আগে চেয়ে রইল সান্থনার দিকে। শুধু ওকে নয়, ওর ভিতর দিয়ে সকলে ধারণাটাই উপলব্ধি করে নিতে চাইল বোধহয়। তার পর আস্তে আস্তে নিবে গেল আবার। শান্ত হল। ঠাণ্ডা জ্বাব দিল, বাহাদুর নয়।

সঙ্গে সঙ্গে তড়িপ্তের মত একটা ঝাঁকুনি খেল সান্থনা বাহাদুর নয়! বাহাদুর না হলে আর যে কে সেটা বুঝতে এক মুহূ দেরি হল না তার।

চাঁদমণি জানাল, সেই থেকে কলকাতায় ঘোষ বাবুর আড়ালে কাজ করছে বাহাদুর। ঘোষ বাবু অনেক টাকা দিয়েছে তাকে আরো দেবে। টাকার লোভে বাহাদুর ওকে দেশে নিয়ে যেতে রাগি হয়েছে, বলেছে বিয়ে করবে। কিন্তু বিয়ে করবে না চাঁদমণি জানে কেউ করে না...কিন্তু যেতেই যখন তবে কোথাও, ভয়-ভয় নেই আর ওর সঙ্গেই যাবে।

মুখ তুলে সান্থনা চাইতেও পারছে না আর। নির্বাক, বিমূঢ় অশোবদন। প্রোলাভনের এ আঙুন চাঁদমণির কাছে কত অমোয় সেটা মর্মে মর্মে বুঝেছে বলেই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে চাঁদমণি উঠে দাঁড়াল একসময় বলল, বাবার আগে পারলে দিদিয়ার সঙ্গে আর একবার দেখা করে যাবে।

তবু একটি কথাও বলতে পারল না সান্থনা। মুখ ফুটে একবার জিজ্ঞাসাও করতে পারল না, কোথায় যাচ্ছে এখন ও, কোথায় থাকবে।

—দিদিয়া—

ডাক শুনে এবার চমকে তাকালো ওর দিকে। কিছু একটা বলবে চাঁদমণি, স্থির নেত্রে দেখেছে তাকে, চোখ দুটো চকচক করছে প্রায় আগের মতই।

হঠাৎ অকুট কণ্ঠে একটু হেসে উঠল চাঁদমণি। বলল, দিদিয়া, আশুন তুকে আবারে ঢের ঢের সোন্দর দেখতে লাগছে। তু টুকটি সামলে চলিস, বাকুলি?



শিহনের গোল-টোকা সৰু পথ দিয়ে নিজস্ব হয়ে গেল।

সামান্য ছাপুর মত বলে আছে তেমনি। কতক্ষণ ঠিক নেই। আজ বুঝতে পারছে, অনেক কিছুই বুঝতে পারছে। কেন মড়াইয়ে রণবীর ঘোষের সঙ্গে প্রথম দিন ওকে দেখে অগ্নিদৃষ্টিতে ভষ্ম করে ফেলতে চাইছিল চাঁদমণি, বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে, কেন আশিম ঈর্ষার বাদন উৎসবে ওই মেয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছিল ওকে। আর বুঝতে পারছে, শাল মছারার খাবে কোন প্রতীক্ষার জিপ নিয়ে পাড়িয়ে থাকত রণবীর ঘোষ।

কিন্তু আজ ওর কাছেই এলো কেন চাঁদমণি? এলো কোন বিধানে? সহানুভূতির জন্তে নয়, নালিশ জানাতেও নয়। শুধু ওর বাবাকে দেখার ইচ্ছেই এসে থাকলে তাকে দেখেই কিরে যেত। এতবড় মর্মবাহী বেননা নিয়ে ওর কাছে আসত না। এসেছে শুধু এই জন্ত, এসেছে শুধু এই শেষের কথাটি বলে যেতে। এসেছে, নারীমানসোলুপ এক পুরুষ দানবের সম্মুখে ওকে সচতন করে দিয়ে যেতে।

মড়াইয়ের বাতাস পথস্ত্র হুসুহ, বিবাক্ত হয়ে উঠল যেন। কিছু ভালো লাগছে না, কিছু না। কাউকে বলবে কিছু? কি বলবে? এক এক করে দিন চার দিন কেটে গেল।

আখীর আগ্রহ। দুক দুক প্রতীক্ষা, চাঁদমণি আবার একদিন আসবে বলে গেছে। সন্ধ্যায় বাড়ি ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্ত বেরুতে পারে না। নরেন বা তার বাবা সেই সময় বাড়ি থাকলেও অস্বীর হয়ে ওঠে।

অস্থিরতা বাড়ি। হুপু হতে সোঁধা মড়াইয়ে নেমে এলো সেদিন। পাগল সর্দারের দেশা পেল না। প্রায়ই কামাই করে আজ-কাল। কিন্তু সেদিন আরো একটা লোককে দেখল না সামান্য। পাড়িয়ে পাড়িয়ে কাছে দূরে সর্বত্র খুঁজল। হোপুন। অক্সান্ত নির্মম বাস্তবিক আশ্রিতে শক্ত কঠিন পাথরে মাটির বৃক শুধু ক্ষতচিহ্ন আঁকে যে।

কিবে চলল আবার। কোনো উদ্বেগ নিয়ে আসেনি পাগল সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু অষ্টপ্রহরের বাতনার সঙ্গে একটা ভীতিও মিশে আছে কেমন।

বাড়িতেই পাওয়া গেল সর্দারকে। মাটির ঘরের মোক্দের বসে পাতার নলে তামাক খাচ্ছে। অগ্নরে হোপুনও চুপচাপ বসে।

—আই বে দিদিয়া, আর আর! মহা খুশি হয়ে পাগল সর্দার তামাক খাওয়া বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে একটা মোড়া টেনে বসতে দিল তাকে।—বন্দু দিদিয়া, আজ সোমকাল হতে তুকে ভাবতে ছেলাম, অনেকদিন দেখি লাই।

বিতায় লোকটার উপস্থিতি বরাবরই অস্বস্তির কারণ সামান্য। ও যে এসেছে সেটা যেন টেরই পায় নি লোকটা। তবু পাগল সর্দারের খুশির আপায়েন ভিতরের একটা দ্রুতের বোঝা যেন হালকা হয়ে গেল অনেক। মোড়াটা তার কাছে টেনে বসে অস্বস্তক ক্রকুটি করে বলল, বাড়ি বসে থাকলে দেখবে কি করে, কাজে বাওনি কেন আজ?

—শরীলটা আবার দেল না, স্বর আসল ভাবলম—।

—তোমার তো বোজাই স্বর আসছে আজকাল। স্বর এলে কেউ খালি গায়ে বসে থাকে? কপালে শিঠি হাত দিয়ে তার গা পরীক্ষা করল সামান্য।—কোথায় স্বর, গা তো ঠাণ্ডা পাখর! তুমি বড় শুধু শুধু কামাই কর আজকাল।

ওর হাতের এই স্পর্শ আর অমুশাসন সমস্ত বৃক দিয়ে অমুভব করে নিল সর্দার। তারপর হেসে তাকালো হোপুনের দিকে, বলল, উকেও স্বর লেগেছে, আমা সন্তে দুদিন কামাই দেল—স্বরণা! মুষ্টিটো দেখে সে দিদিয়া।

সত্যিই এবার না তাকিয়ে পারল না সামান্য, আর হেসেও ফেলল। ওর ভিতরকার ঠাণ্ডার জ্বালা হাত দূর থেকেও উপলব্ধি করা যায়। মুখ তুলে হোপুন তুলনের দিকেই তাকালো। তারপর উঠে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। প্রায় আগের মতই, কোন তারতম্য নেই।...একদিন শুধু অস্বস্তকম দেখেছিল। চাঁদমণির সঙ্গে সেই পাঠাডের নির্জনে—।

পাগল সর্দার কি বলে চলছে ঠিক যেন কানে বাজছে না, তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে সামান্য। কটা মাসে সর্দারের বয়স যেন দিগুণ বেড়ে গেছে। কালো মুখে নিশ্চিন্ত জরা নেমেছে একটা।...পাগল সর্দার বুড়িয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, চাঁদমণির খবর কিছু পেলে সর্দার? এক মুহূর্ত। সর্বাঙ্গের স্থবিরতা মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেল বৃষ্টি। অগ্নিহুতি চোখের কোঠারে লক্ষ্যভ্রষ্ট ব্যাথের ক্রুর পরিতাপ চিকচিকিয়ে উঠল। সময় লাগল সামলে নিতে। অবসাদাচ্ছন্ন, যুহ জবাব দিল তারপর, উ আক্সসীর লাম তু আর এখনে লিস না দিদিয়া—।

নাম আর নেয়নি সামান্য। বা বোঝবার ওটুকুতেই বৃক্ক নিয়েছে। বাইরের দিকে চোখ পড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বিকেলের আলো কমে আসছে। চাঁদমণি যদি আসে—। এসে যদি কির যায়! আর বসতে পারল না এক মুহূর্তও। ভিতর থেকে কিছু যেন ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

কিন্তু দিন যায়, চাঁদমণি এলো না।

হোপুন আর পাগল সর্দারের স্মৃতি কিছুতে আর বড় করে দেখতে পারছে না সামান্য। রাগ হয় ওর বাবার ওপর, কেন এতদিন বিয়ে দেয় নি। রাগ হয় হোপুনের ওপর, কেন জোর কবেই বিয়ে করেনি এতদিন। নিদারুণ ভাবে নিজের বাবার কাছে গিয়েও দাঁড়াতে পারেনি মেয়েটা। শুধু ওকে বিশ্বাস করেছে, ওর কাছে এসেছে। আশ্রয়। কিন্তু আবার এলে বলে দেবে, তোর বাবাকে দেখে কাজ নেই চাঁদমণি, তুই পালা শিগগীর, যেখানে হোক পালা। কিন্তু পালাবেই বা কোথায়, এতবড় পৃথিবীতে কোথাও আর আশ্রয় নেই—। বাতাস শকুনির ছায়া নেমেছে ওর জীবনে।

ধরকর করে ওঠে সামান্যর বৃক্কের ভিতরটা। কীপুনি ঘরে সর্বাঙ্গে। দিনে অস্বস্তি। রাতে ঘুম নেই। সেই পা-ভেজানো কাপড়ের স্পর্শ ভুলতে পারছে না কিছুতে, চোখের কোণে এসে জমছে। মন বলছে চাঁদমণি আর আসবে না। যে জন্তে এসেছিল বলে গেছে। তবু সন্ধ্যার ছায়া নামার সঙ্গে সঙ্গে উত্তলা হয়ে ওঠে। অন্ধকার গাঢ়তর হতে নিজের অজ্ঞাতে আনাচে কানাচে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এক একবার। কোথায় বুরি কালো ঘরের কালো ছায়া পড়ে একটা। উৎকর্ষ। কখন বুরি ভীতব্রজ ফিস ফিস ডাক কানে আসে চাঁদমণির, দিদিয়া! ই-দিদিয়া—।

[ কথন:।

# এক মুঠো আকাশ

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

খনঞ্জয় বৈরাগী

অনন্ত কেবিনে কেঁঠর জন্তে সকলে বসেছিল। ওকে ফিরতে দেখেই চীৎকার করে ওঠে—কেঁঠদা, সারা দিন কোথায় ছিলে, এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেছে!

—কি হয়েছে?

—আজকের মিটিং-এ একেবারে লোক হয়নি, রাঘব বোয়াল রেগে অস্থির। আজই তোমাকে দেখা করতে বলেছে।

কেঁঠ বিরক্ত হন, কেন, লোক হ'ল না কেন?

—আহা, ওর কাছেই যে 'হুম্মান মার্কীদের মিটিং ছিল, শালারা এমন বজ্জাত, মিটিং-এর পর চা খাওয়াবে বলে সবাইকে টেনে নিয়ে গেল।

আরও বিরক্ত হয়ে কেঁঠ বলে, তোরা কোন কক্ষের নোস, ওদের মাইকের তারটাও তো কেটে দিতে পারতিস?

—তুমি নেই, সাহস হল না।

—খা, এখন আসাতন করিস না, রাঘব বোয়ালকে বলে দে আমার শরীর খারাপ, কাল দেখা করব।

সবাই চলে গেলে এক কোণে কেঁঠ চূপ করে বসে থাকে। 'আন্তদা' এক বার জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, আজ এত চূপচাপ কেন?

—শরীরটা ভাল নেই আন্তদা।

অনেকক্ষণ বাদে প্রভাত এল, একটা পত্রিকা কেঁঠর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, দেখ, এবারের ইস্তা কেমন হয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেঁঠ নেড়ে-চেড়ে দেখে বলে, ভাল।

—কভারের ছবিটা দেখ, এরকম টাটকা মেয়ের ছবি দেখেছিস? এ যাই-ইউ-এ পড়তে পারে না, একেবারে হট কেক।

কেঁঠ উত্তর দেয় না, জানে প্রভাত এখনও বক-বক করবে।

—হুটাপজ বার কর, সব কটা লেখা আমাৰ। গোপেশ রায়, বীণা চ্যাটার্জী, 'ক' খ' গ', সৌমেন তালুকদার সব আমি। কিন্তু পড়ে দেখ, এক বারও বুঝতে পারিবি না যে একজনই সব লিখেছে।

—বাহাঘর বটে!

—লেখকদের একটা পরসাদা দিতে হবে না, এ না হলে আজকালকার দিনে গাজল চলবে?

প্রভাত একটু চূপ করে থেকে কেঁঠর দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলে, কি হয়েছে রে, এত গভীর কেন?

কেঁঠ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দুনিয়াটা বড় গোলমলে।

পরদিন সকালে কেঁঠ এল রাঘব বোয়ালের বাড়ী। আগে থেকেই সেখানে মিটিং চলছিল। কেঁঠকে দেখে তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, হি, হি, আর বোল না। লজ্জার এক শেষ! বক্তৃতা দিতে গিয়ে মাঠে একটা লোক নেই! আর নাকর ডগার হুম্মান

মার্কীদের কি ভীড়, ঘন ঘন জয়ধ্বনি, এত অপমান আর আত্মবলে হয়নি।

কেঁঠ কথা চাণা দেয়, আমি অসহ্য হয়ে পড়েছিলাম, তাই গোলমাল। সামনের মিটিং-এ নিশ্চয় এর শোধ তুলব। পতাকাপ পার্ক আমাদের মিটিং-এ দেখবেন কি কান্ড হয়।

রাঘব বোয়ালকে আশ্বস্ত করে কেঁঠ তার দলবল নিয়ে বপরামর্শ করতেন। পুলিশ বললে, কেঁঠদা, বলে তো এলে পরন্তু! তেঁকেণ পার্ক মিটিং করবে, কিন্তু সেদিন হুম্মান মার্কীদেরও এখানে মিটিং আছে।

—জানি, ওরা সময় দিয়েছে পাঁচটা, আমরা চারটে থেকে রা অস্ত্র দিকটা দখল করে বসব। যত লোক আসবে, দেখবি স্ত্রু-করে আমাদের দিকে চলে আসবে। ওদের মিটিং কিছুতে জমবে না।

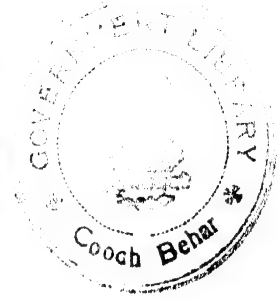
যে কথা সেই কাজ। রাতারাতি কেঁঠর দল তেঁকেণ পার্ক রাঘব বোয়ালের পোষ্টারে ছেয়ে দিল। দুপুর থেকে মাইকে সিনে গান বাজতে লাগল, দেখতে দেখতে ছোটখাট ভীড় জমে ওঠে।

কেঁঠ বলে, দেখতে হবে না, মাঠ ভরে যাবে। বেকার, ভ্যাগা আর তুল-কলেজ-পালান ছাত্রের সংখ্যা কি কম নাকি? এ তেঁকেণ পার্ক তিনখানা ভরে যাবে।

পুলিশ বলে, কিন্তু সাবধান, ওদের দলও ছেড়ে কথা কইবে শেষ পর্যন্ত মাঝামাঝি হতে পারে।

—আমি তো তাই চাই, আমরা তৈরী হয়ে এসেছি। ওরা আঁটখাট বোধে আসবে না, খুব একচোট হয়ে যাবে।

রাঘব বোয়াল বক্তৃতা দিতে এসে অবাক হয়ে গেলেন। লোকের সামনে তিনি আগে কখনও বলেন নি। কেঁঠর দা লোক মাইকে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল, সংগে সংগে ঘন ঘন করত শাখ, কাঁসর-ঘটা বেজে ওঠে। রাঘব বোয়াল আলামারী ভা বক্তৃতা শুরু করলেন। চললও কিছুক্ষণ, কিন্তু বেক্ষণ ন হুম্মান মার্কীদের অনেকে এসে পড়ে চীৎকার চোঁমাচি করে বখ থামিয়ে দিতে চায়। কেঁঠর দলও তৎপর হয়ে ওঠে। বচনা হয়ে গেল, দালা হবার উপক্রম, কয়েক মিনিটের মধ্যে জনতা ছুত হয়ে যায়। কেঁঠর দল সোড়ার খোঁজল ছুঁড়তে থাকে, বেশ কা জন জখম হল। রাঘব বোয়াল এক স্ত্রোণে বক্তৃতা থা গাড়ী চড়ে পালিয়ে গেলেন। দালার জের চলল অনেক হুম্মান মার্কীদের দল প্রথমটায় মার খেয়ে পালিয়ে গিয়ে বটে, কিন্তু আরও লোকজন নিয়ে ফিরে এসেছিল। সময় পুলিশ এসে না পড়লে রক্তারক্তি কম হত না। হা কাছে বাদের পেল, পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। :



প্রগতি ঘোষ লাক্স টয়লেট  
সাবান পছন্দ করেন তিনি বলেন  
“এর শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতা  
প্রমাণ করে।”



প্রগতি ঘোষ শুধু শিল্পী এবং সুন্দরী। কিন্তু তিনি জানেন যে, জনসাধারণের উকে  
ভাল লাগার জন্য তাঁর ত্বকের লাবণ্যও অনেকখানি দায়ী। সেইজন্মে তিনি সব-  
চেয়ে মৌলভেন ও নিরাপদভাবে প্রতিদিন শুভ্র বিশুদ্ধ লাক্স টয়লেট সাবানের  
সাহায্যে তাঁর ত্বকের যত্ন নিয়ে থাকেন।

আপনারও সেই একইভাবে ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিত। লাক্স টয়লেট সাবানের সুগন্ধ  
স্বরের মত ঘেগার রাশি আপনার সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তুলুক।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিহ্ন-তারকাযের সৌন্দর্য সাবান

হুঁশন ছাড়া কেউর দলের সকলেই পুলিশ আসার আগেই পালিয়েছিল।

কেউর ফিরলে উৎকর্ষিত রাঘব বোয়াল জিজ্ঞেস করলেন, কি হল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না! মারামারি কেন?

কেউ জবাব দিলে, হিংসে, হিংসে, তা ছাড়া আর কি! ওদের মিটিং-এ লোক হয় নি, তাই ইচ্ছে করে গোলমাল বাধাল।

—সোডার বোতল ছুঁড়ছিল কারা?

—ওরাই তৈরী হয়ে এসেছিল, ভাগ্যিস আমাদের বিশেষ কিছু লাগেনি। নিরীহ জনতার উপর অত্যাচার!

রাঘব বোয়াল বলেন, বাই বল, এত ভীড় হবে আমি আশা করি নি।

—বলছি তো নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন, আপনাদের জয় অনিবার্য।

ক'দিনই শ্রামল এসে ফিরে গেছে, কেউর সঙ্গে দেখা হয় মি। অবশ্য আজ-কাল অনন্ত কেবিনে একলা বসে থাকতে তার খারাপ লাগে না। 'আন্তদা', প্রভাত, পুলিশ অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়ে গেছে। 'আন্তদা' বলেন, 'অন্ত 'কেউদা' কেউদা' করে ছটকট কর কেন? বসে চা খাও না। একবার যে এখানে চা খেয়েছে, সে ঘুরে-ফিরে ঠিক এখানে আসবেই।

প্রভাত খেই ধরে, তা আর বলতে, 'আন্তদা'র চা না খেলে আমি তো লেখার ইন্সপিরেশনই পাই না।

শ্রামল জিজ্ঞেস করে, এখানে এত গোলমালের মধ্যে কি করে লেখেন?

প্রভাত হাসে, আমার এখানে-সেখানের বাহ-বিচার নেই, যেখানে কসিয়ে দেবে, লিখে ধাব। এই দেখ না, একটা উপদ্রাস লিখছি। মাত্র তিন দিনে প্রতখানি লেখা হয়ে গেছে আর খুব হলে সাত দিন, তিনশ' পাতার মোটা বই।

—বই-এর কি নাম?

—মধুবালা।

—সিনেমার মধুবালা?

প্রভাত হাসে, বিজ্ঞের হাসি, তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, শুধু ঐ নামটা দিয়েছি। এখন থেকে বই-এর অর্টার আসছে।

একটু চুপ করে থেকে শ্রামল জিজ্ঞেস করে, আপনি ডিটেক্টিভ বই লেখেন নি?

—অনেক, তবে নিজের নামে নয়। নাম খারাপ হয়ে যায় কিনা, তাই 'অবধূত' ছদ্মনামে লিখি।

শ্রামল বিস্মিত হয়, আপনিই অবধূত?

প্রভাতের উত্তর দেবার আগেই কেউ এসে পড়ে, এই যে শ্রামল, ক'দিনই তোরা সঙ্গে দেখা হচ্ছে না, কি খবর?

প্রভাত বলে, তোরা গিয়ে ওদিকটায় বোস কেউ, আমি ততক্ষণ আরও দু'চাপটায় লিখে নিই।

শ্রামল উঠে এসে কেউর পাশে বসে পড়ে, কেউ জিজ্ঞেস করে, চেয়ারায় বেশ চটক এসেছে দেখছি, ভালো মানুষ ভাবটা কেটে গেছে, ভাল।

শ্রামল আগের মত লজ্জা না পেয়ে বলে, আজ আমি আপনাকে খাওয়াব কেউদা'।

—খুব বড়লোক হয়েছিস বুঝি?

—এক দিনে প্রায় দশ টাকা পেয়েছি।

—বাঃ বাঃ, বাহাদুর তো!

শ্রামল উৎসাহিত হয়, প্রথম দিন যে লাভ বাড়াতে 'গিয়েছিল সেখান থেকে পুরোন বই নিয়ে এসেছি। বিক্রী করে চার সাড়ে চার টাকা পাব।

—বাড়াতে কেউ কিছু জানতে পেরেছে?

—না।

কেউ ব্যাং থেকে একটা চাঁদার খাতা বার করে শ্রামলের দি এগিয়ে দেয়।

—সরস্বতী-পূজা আসছে, খাতা নিয়ে চাঁদা জুলে বেড়ায় চেষ্টা করলে দিনে চার পাঁচ টাকা ঠিক উঠবে। হুপুরের দি বাবি, যে সময় যেয়েবা থাকে।

শ্রামল ঘাড় নেড়ে কেউর হাত থেকে খাতা নেয়, এ যে অন্য বান্ধব সমিতির চাঁদার খাতা।

—তাই তো দিলাম, এদের পূজা খুব নামকরা, চাঁদা চাইব অস্ববিধে হবে না। কিন্তু সাবধান! ওদেরই দলের কারো কা গিয়ে হাজির হোস না।

শ্রামল হেসে উত্তর দেয়, সে আমি ম্যানেজ করে নেব।

আজ 'কেউর ঘুম ভেঙ্গে যায় অশ্রু দিনের চাইতে অনেক আগে রাত্তায় ঘরানা উঠুনের ঘোঁরা ঘর ভরে গেছে। বিরক্ত হয়ে যে নীচে নেমে এসে কলতলায় মুখ বুয়ে নেয়, ডাকে, শ্রামা চা দিয়ে যা কেউকে এত আগে উঠতে দেখে বিস্মিতা শ্রামা জিজ্ঞেস করে, এ সকালে উঠে পড়েছ, কোথাও বাবে বুঝি? কেউ তাকে ভেলিয়ে বলে কোথাও বাবে বুঝি? ঘরময় যে ঘোঁয়া, সকাল বেলা জানলাগুলো ব করে দেওয়ারও সময় হয় না?

—ও মা, তাইতো! আমি একেবারে জুলে গেছি কাকু, ছি ছি কেউ খামিয়ে দিয়ে বলে, যা, চট করে এক কাপ চা নিয়ে আঃ আমায় বেরতে হবে।

কেউ ওপরে উঠে গিয়ে জামা-কাপড় পরে। জুতো-জোড়া বা ময়লা হয়েছিল, বসে পালিশ করে নেয়। একটু পরে শ্রামা চা নিয়ে আসে, সঙ্গে গরম তেলেভাজা। কেউ খেতে খেতে বলে, বা বেশ গরম তো, নে হুতো খেয়ে জাখ।

তার কথামত শ্রামা একটা বেগুন নিয়ে মুখে দেয়, উঃ, ভীষণ গরম!

শ্রামা মুখ থেকে বার করে উঃ-আঃ করতে থাকে। কেঁ হেসে ফেলে।

হঠাৎ শ্রামা জিজ্ঞেস করে, কাকু, তুমি বিয়ে করছ না?

কেউ বিস্মিত হয়, এধরণের প্রশ্ন সে আগে শ্রামার কাছে শোনেনি। জিজ্ঞেস করে, বিয়ে কেন?

—বাঃ, সবাই তো বিয়ে করে।

কেউ হাসে, এ নিয়ে কথা হচ্ছিল বুঝি?

—হ্যাঁ, কালকে।

—কে বলছিল?

—বিভূতি বাবু এ এসেছিলেন যে—

—কোন বিভূতি বাবু, ঐ হলল বাড়ীর ভাড়াটেরা?

—হ্যাঁ, শীলানি'র সংগে তোমার বিয়ের জন্তে।

—কি কথা হ'ল?

—বাবা বললেন তোমার সংগে কথা বলতে।

কেট সিগারেট ধরায়, ধাক্কা, তোর বাবার তাহলে এত দিনে বৃদ্ধি হয়েছে।

বাগ হাতে নিয়ে কেট সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়, শ্রামা টেচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কাকু, তোমার একটা চিঠি এসেছিল পেয়েছ?

—কই না!

—আমি যে তোমার কোটের পকেটে রেখেছিলাম।

—দিয়ে যা।

শ্রামা ছুটে গিয়ে কেটের হাতে চিঠি দিয়ে আসে। চিঠিটা খুলতে খুলতে কেট রাস্তায় বেরয়, গৌরীর চিঠি।

“প্রিয়পুত্র,

আপনি সেদিন আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। আমার ভাই একটু ভাল আছে। আরও পাঁচ টাকার ওষুধ কিনিতে হইবে, আপনি যদি দয়া করিয়া ঐ কয়টা টাকা দেন তো বড় উপকার হয়। আমি সকাল নয়টা হইতে প্রায় দুই-তিন ঘণ্টা ধুতলায় মোড়ে থাকি। দয়া করিয়া একবার আসিবেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। ইতি

প্রণতা গৌরী।”

চিঠি পড়ে কেট পকেট থেকে টাকা বার করে দেখে কত আছে।

কেট বরন এসপ্লানডে এসে জীপ ধামাশো। তখন প্রায় এগারোটা বাজে। অফিস বাবার ভিড় চলে গেছে তবু গাড়ী চলার বিবাম নেই। কেট গাড়ী পার্ক করে চার দিকে তাকায়, কিন্তু গৌরীকে দেখতে পায় না। অশ্রুমনস্ক হয়ে দেখছিল বই-এর ঠেলে কত লোকের ভিড় হয়েছে, রিকিউজিসের লোকানো জিনিষ বিক্রী হচ্ছে। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল ছিল না। গৌরীর ডাকে চমক ভালে।

—আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন?

—না, বেশীক্ষণ না। ভাই কেমন আছে?

—আগের চেয়ে একটু ভাল, ওষুধ কাম দিয়েছে, কিন্তু রোগীর পথি দিতে পারছি কই।

—ডাক্তার কি খেতে বলেছে?

—সব দামী দামী খাবার, ফল, দুধ, ছানা।

কেট কি বলবে ভেবে পায় না।

—এখনি আসছি, বলে গৌরী হঠাৎ এগিয়ে যায় রাস্তার মধ্যে।

কেট দেখে পুলিশের হাত দেখানোর জন্তে অনেকগুলো গাড়ী এসে পড়িয়েছে। গৌরী সেখানে গিয়ে ভিক্সে চায়। কেট সেই দিকেই তাকিয়ে থাকে। ময়লা শাড়ী, তেলের অভাবে চুলে জট পড়েছে, কি বলছে শোনা যায় না, চোখে কল্লপ প্রার্থনা। ব্যগ্র হাতে গাড়ীর দরজা খুলে দরজা, ভাইভারের ধমকে আবার হাতটা সরিয়ে নেয়। হয়ত কোন গাড়ীর কাছে কিছু পাবার আশায় আশ্রয় ভরে ছুটে যায়, পরশা পেলে দাঙার উদ্দেশ্যে শুভ কামনা জানায়, না পেলে নিরাশ হয়।

পুলিশের বাশীতে গাড়ীগুলো আবার চলতে আরম্ভ করে, গৌরী কেটের কাছে ফিরে আসে।

—কত পেলে?

গৌরী ক্লান্ত স্বরে বলে, ছ' আনা। একটু খেয়ে বলে, একটা টাকাও পুরো হল না। কেউ যে তখনতে চায় না। কেট ব্রান হাসে, তখনলোও এরা দেয় না।

কেট সে কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে এগিয়ে দেয়,—এই নাও, তোমার ভাইকে ভাল পথি দিও।

টাকা নিতে গিয়ে গৌরীর চোখে জল আসে, বলে আপনি দেবতা!

কেট শব্দ করে হেসে ওঠে, দেবতাই বটে, ওই যে আবার খেয়েছে, বেশ যদি আর কোন দেবতা পাও।

গৌরীর উত্তরের অপেক্ষা না করেই কেট গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায়।

কেট বরাবরই গাড়ী জোরে চালায়, আজও ভীড়ের মধ্যে দিয়ে হর্ষ বাজিয়ে বেশ জোরেই গাড়ী চালাচ্ছিল কিন্তু মন তার গাড়ীর দিকে ছিল না। ভাবছিল গৌরীর কথা কতখানি সত্য, হাছুরের ওপর কি গভীর বিশ্বাস, আর তুলতে পারছিল না একটা কথা, ‘আপনি দেবতা।’

এক জায়গায় ভিড় দেখে গাড়ী থামতে বাধ্য হল। সকলে ধর ধর করে চলেছে। কেটের আসার মিনিটখানেক আগে কোন ফোর্ড গাড়ী একটা দশ বাব বছরের পাড়ার ছেলেকে চাপা দিয়ে

**কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম**

**আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”**



আপনার স্বাস্থ্য, চর্চা ও সর্বত্র ব্রহ্ম করিতে

- কল্ল প্রস্তুত
- ইন্ডিয়ে সেকা
- অসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

**আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্ফেকশনারী**

কলিকতা - ২৯

চলে গেছে। কেউকে তারা অজ্ঞবোধ করে, আপনার গাড়ী করে ছেলোটাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দিন।

কেউ বলে, ওকে বরাং ট্যাঙ্কী করে নিয়ে যান, আমি ততক্ষণ কোর্ড গাড়ীটা ধরতে পারি কি না দেখি।

কেউ জোরে গাড়ী চালিয়ে দেয়, তখনতে পার পেছু থেকে বলছে সবাই, নীল রং, বড় কোর্ড, মেয়ে ঢালাচ্ছে।

রাস্তা বেশ চওড়া, জোরে ঢালাবার অসুবিধে হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দূরে কোর্ড গাড়ীটা দেখা যায়, কেউ এক্সসি-লোটোরে আরও চাপা দেয়। কোর্ড গাড়ীটাও বেশ জোরে চলেছে। অনেক বঁকে চুরে, প্রায় বালীগঞ্জের কাছে এসে গাড়ীটা বড় মোতলা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যায়। কেউ তার পেছনে গাড়ী থামিয়ে লাকির নেমে পড়ে। গাড়ীর সামনের সিটে চালকের পাশে একটি মেয়ে বসেছিল, ভয়ে তার মুখ সাধা হয়ে গেছে। পিছনে দু'তিনটি ছোট ছেলে-মেয়ে আর এক প্রৌঢ় ভ্রমলোক। কেউ কাছে এসে কর্কশ গলার জিজ্ঞাস করে, আপনারা কি মাহুয়, একটা ছেলেকে চাপা দিয়ে পালিয়ে এলেন?

প্রৌঢ় ভ্রমলোকটি গাড়ী থেকে নেমে ভয়ে ভয়ে উত্তর দেন, ঠিক পালিয়ে আসিনি।

—নয় ত কি, শরীরে এতটুকু দহামায়া নেই?

ভ্রমলোক আমতা-আমতা করেন, নতুন ড্রাইভার বুঝলেন কি না—

কেউ বেগে বলে, ড্রাইভার তো গাড়ী ঢালাচ্ছিল না, ওর ওপর লোব দিচ্ছেন কেন? গাড়ী তো উনি ঢালাচ্ছিলেন।

কেউ ইঙ্গিতে মেয়েটিকে দেখিয়ে দেয়।

মেয়েটি এবার কথা বলে, যে ছেলোট চাপা পড়েছে সে কে?

—আমার শালা।

—খুব বেশী লেগেছে?

—মরল কি বাঁচল, তা দেখবার আপনারা সময় কোথায়?

—মিথ্যা এ কথা বলছেন, আমরা তো পীড়িতে ঢেরেছিলাম, সবাই ক্ষেপে মারতে এল দেখেই তো—

—ক্ষেপে না, বিধবার সবে ধন নীলমণি ছেলে। যাক্ গে, হাসপাতালে নিয়ে গেছে, এখন দেখা যাক্।

প্রৌঢ় ভ্রমলোক তাকে থামিয়ে কথা বলেন, ছেলোটের চিকিৎসার জন্তে বত টাকা লাগে, আমরা দেবো। এ নিয়ে আর থানা-পুলিশ করবেন না। এত বড় বাড়ীর বৌ, বুঝলেন কি না—

কেউ শান্ত গলার বলে, সে তো বুঝতেই পারছি। দেখি, আমার শান্তডীকে যদি রাজী করাতে পারি। এখন আমার টাকা পঞ্চাশ দিন, আবার হাসপাতালেই বাই, কখন কি লাগে বলা তো যায় না।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। মেয়েটির কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভ্রমলোক কেউ হাতে ধরে দেন। বুঝতেই পারছি আপনার মনের অবস্থা কিন্তু বিশ্বাস করুন, ছেলোট অমন করে ছুটে এসে না পড়লে গাড়ীতে থাকা লাগতো না।

কেউ টাকাটা পকেটে রাখতে রাখতে বলে, যদি বেঁচে যায়, আপনার চিকিৎসার টাকাটা দিলেই হবে, কিন্তু হয়ে গেলে জানি না আমার শান্তডী আপনারদের হেঁড়ে দেবেন কি না।

আর কোন কথা না বলে কেউ গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে আসে। চিন্তিত মুখে ভ্রমলোক সবাইকে নিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে যান। ফটকে দরোয়ান বসেছিল, তার সামনে গাড়ী থামিয়ে কেউ এক টাকা বখশিস দেয়, দরোয়ান সেলাম করে।

—এ বুড়ো বাবু কে?

—বাড়ীর মালিক।

—এ মেয়েটি?

—মাইজী।

—অত ছোট?

—নয়া মাইজী।

—ও, দ্বিতীয় পক্ষ? কেউ ব্যাচা হাসে।

ফেরবার পথে কেউ আবার ঘটনাক্ষেপে আসে। খবর নিয়ে জানতে পারে, এ ছেলোট মোড়ের মিষ্টিওয়ালার দোকানে কাজ করে। —ধরতে পারলেন নাকি?

কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কই, পেছু-পেছু কত দূর দৌড়লাম, কোথায় যে বঁকে গেল!

পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে বলে, ধরতে পারলে গাড়ীর ধকা রকা করতাম।

কেউ সার দেয়, আমিও কি ছাড়তাম নাকি? পরে মিষ্টিওয়ালাকে বলে, আমি এসে খবর নিয়ে যাব, ছেলোট কেমন থাকে।

নতুন বাংলা মাস পড়ে গেছে, এরই মধ্যে পত্রিকা বার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রেসের গোলমালে হয়ে ওঠেনি। তাই সকাল থেকেই প্রভাত সম্পাদকের সাঙ্গে উঠে-পড়ে লেগেছে, পত্রিকা কাগজে যুড়ে তার ওপর নাম-ঠিকানা লিখেছে। গ্রাহকদের সংখ্যা বেশী না হলেও, সময় মত বই না পেলে চান্দা দেওয়া বন্ধ করে। সম্পাদক বলে, গ্রাহক তো নয় সব, খাদক। পত্রিকার দেয়ী হলেই শালাদের মেজাজ গরম। কড়া কড়া চিঠি পাঠাবে।

প্রভাত কাজ করতে করতে উত্তর দেয়, পরশা দিয়েছে, কতবে না? আমরা যখন টাকা দিয়ে লেখা নিই, তখন কি আর হেঁড়ে কথা কই? লেখককে বেঁধে ফেল গল্প লেখাই না?

—এবারের গোট আপ কেমন লাগছে?

—ওপরের ছবিটা তেমন জোর হয় নি।

সম্পাদক মুখ ব্যাকায় হতভাগা জীবনটার জন্তে। কেউ তার ছবি ছাপিয়েছে কখনও। আমি তার নাম করিয়ে দিলাম আর শালা এখন আমার কাছেই টাকা চায়।

প্রভাত বিম্মিত হয়, বল কি, জীবনও টাকা চায়?

—নয় তো আমি কুমারেশ্বরের ছবি নিই। ও ত বন্ধ ক্যামেরার ছবি তোলে।

—যাকগে-পত্রিকার মুখ তো এঁটে দেওয়া হয়েছে, ঠলে পীড়িয়ে বাবুদের আর পাতা ওলটাবার উপায় নেই। ও ঠিক কেটে যাবে।

এ-হেন নামকরা পত্রিকার আকিস। উত্তর-কলকাতার অনেক গলি-ঘুরির মধ্যে একটি ছোট কামরার, বার সন্ধান শুধু ডাকবোগেই পাওয়া সম্ভব। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটা কালিপড়া কাঠের টেবিল, আর দু'খানা নড়বড়ে চেয়ার। তাই সম্পাদক আর সহ-সম্পাদক বাচিতে মাহুর বিছিয়ে কাজে বাস্তব।

প্রভাত আড়মোড়া ভেঙ্গে বলে, এবারের গল্পটা তেমন সুবিধের হয় নি।

—সুফটা ভালই ছিল, শেষের দিকটা বুলিয়ে গেছে।

—কি করব, একেবারে সময় পাই না। চিঠি পত্তরের জবাব দেব, প্রবন্ধ লিখব তার পর অল্পবাদ করব। এদিকে গল্প উপস্থাপন সব খিচুড়ী পাকিয়ে যায়। সম্পাদক উৎসাহ দেয়, তুমি তো সব্যসাচী হে, তুমি ছাড়া কি এ কাগজ চলতো?

কাজ শেষ হতে প্রায় বারোটা বেজে গেল, প্রভাত কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসছিল, সম্পাদক বলে, বেলায়বীর সাংগে ইন্টারভিউটা তুলে বেও না।

—সে তো সোমবার দিন।

—একটা ভাল ছবি ঠেকে দিয়ে সই করিয়ে নিও, আমাদের জন্যে বিশেষ ভাবে তোলাটা লিখে দিতে হবে।

প্রভাত সাহ্য দিয়ে বলে, সে সব আমি ঠিক করে নেব। প্রায় উত্তরও আমার সব লেখা হয়ে গেছে, ঠেকে শুধু একবার শোনাতে হবে। একটু থেমে বলে, বালীগঞ্জে বাড়ি, ট্যাক্সি করে যাব, ভাড়াটা দিয়ে দিও।

—বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে ট্যাক্সি চেপে, এখান থেকে নয়।

—সে আর বলে দিতে হবে না।

হাসতে হাসতে প্রভাত বেরিয়ে আসে।

রাঘব বোয়ালের বড় গাড়ী এলে দাঁড়াল অনন্ত কেবিনের দরজায়। আন্ত বাবু হস্তপঙ্ক্ত হয়ে নেমে এলেন, কাউকে খুঁজছেন স্তার?

রাঘব বোয়ালের ছেলে পেচনের সিট থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, কেউ বাবু কোথায় ভানেন?

—দিন-দুই এদিকে আসেন।

—তাকেই যে দরকার—

আন্ত বাবু টাকে হাত বোলান, এলে বরং পাঠিয়ে দেবো।

আপনাকে বলে যাচ্ছি, ছেলেরা যারা আসবে সব আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন, বাবা সকলের সাংগে কথা বলতে চান।

—নিশ্চয়, এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আন্ত বাবু মুখ বাড়িয়ে হাঁক দেন, ভোঁদা, নরেশ, যা শীগগিরি যা, বাঁড়ুজ্জ মশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

রাঘব বোয়ালের ছেলে চলে যায়। আন্ত বাবু দোকানে উঠে এসে বিড়বিড় করেন, কেটকে নিয়ে এই জালা, মাথার যদি এতটুকু ঠিক থাকে!

ভোঁদা বলে, এ আর নতুন কি, তবু তো কেটলা' এবার একটু বেশী মন দিয়েছে।

—তোমরা আর দেবী কোর না বাপু, বাও।

—আর তো সাত দিন, রাঘব বোয়ালের পয়সায় ক'দিন নবাবী করে নিই। তার পর আর কে পুঁছেছে, আপনিই কি আর দোকানে চুকতে দেবেন?

আন্তলা' সেকথার কান দেন না। কোণের টেবিলে শ্রামল বসে ছিল, সে দিকে এগিয়ে যান। তোমার কেটলা'র কোন খবর জান না কি শ্রামল?

—না, ক'দিনই ঘরতে পারছি না, তাই তো এখানে বসে আছি।

—কিছু খাবে নাকি?

—থেকেছি। একটু থেমে বলে, আন্তলা', আপনাকে কিন্তু চান্না দিতে হবে।

—কিসের চান্না?

—সরষতী-পুজোর।

—ওরে বাবা! তোমাকে নিয়ে এ পর্যন্ত কুড়ি জন হ'ল। যা সরষতী আমায় ইচ্ছা থেকে খাটা মেয়ে তাড়িয়েছিলেন, তবু তাঁর পুজোর সময় চান্না দিতে হবে, কি আন্নার দেখ!

—সে আমি ভুলব না আন্তলা', আপনার নামে এক টাকার রসিদ কেটে রেখেছি, এই দেখুন—বলে সত্যিই রসিদ বার করে আন্তলা'র হাতে দেয়।

—তবে আর চাইছ কেন? এক টাকার খেয়ে দাম দিও না। তাহলেই আমার চান্না দেওয়া হয়ে যাবে, কি বল?

—তাতে আমি রাজী আছি। নিতাই, পাউন্ডট আর ভিন্ন দিয়ে যা।

যে প্রায় কঁাকা ছিল, তাই আন্তলা' বসে বসে শ্রামলের সাংগে গল্প করেন। বিশেষ করে নিজের জীবনের কথা, কত কষ্ট করে দোকান করেছেন, কত বকমের কাজ করেছেন, তারই বিবরণ। কথা হয়তো অনেকক্ষণ চলতো, যদি না কেউ এসে পড়ে হাঁক দিত।

—কি খবর আন্তলা', দু'দিন আপনার পাতা পাই নি যে?

—তাই বটে, চোর এসে বুড়ীকে বলছে, তুমি তো আমার ছুঁতে পারলে না!

—কেন, কি হল?

—কি আবার হোল, রাঘব বোয়াল যে লোক পাঠিয়ে পাগল করে মারছে।

কেউ বিরক্ত হয়, ও জালাতন করে মারলে, রাঘব বোয়াল আর রাঘব বোয়াল। আমায় বেন মাইনে দিয়ে চাকর রেখেছে। সব সময় হাজিরা দিতে হবে, যত সব—

—আহা, মাথা গরম করছ কেন?

শ্রামল একতক্ষেণে কথা বলে, কেটলা', আপনার সাংগে যে কথাই হচ্ছে না।

—কি করবো বল, কত দিক সামলাবো?

—আমার চান্না দিতে হবে কেটলা'—

—চান্না, কিসের?

আন্তলা' টিপ্পনী কাটেন, সরষতী-পুজোর বিজের দৌড় তো তোমার আমারই মত কিন্তু চান্না দিতে হবে।

শ্রামল আবারের স্তরে বলে, বাঃ সবাই চান্না না দিলে ভাল করে পুজো হবে কি করে?

কেটলা' বেশ মজা লাগে, জিজ্ঞেস করে, কাদের পুজো?

—অনাথ-বাঁধব সমিতির। এই দেখুন আন্তলা', প্রভাতলা', সবাইএর কাছে চান্না নিয়েছি, আপনাকে এক টাকা দিতেই হবে।

কেটলা' পকেট থেকে এক টাকা বার করে ওর হাতে দেয়, ঐ নে, থাক থাক, রসিদ পরে দিয়ে দিস, আমি চলি—

শ্রামল বাঁধা দেয়, না কেটলা', আমাদের সমিতিতে সে হবার জো নেই। টাকা নিলেই রসিদ দিতে হবে।

—তবে দাও।

শ্রামল খস-খস করে বসিদি লিখে দেয়। কেউ একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখ দুটো দুল-দুল করে ওঠে।

কেউ চলে বাবার পর শ্রামল খসখস কেবিন থেকে বেরিয়ে সোজা পার্কে এসে হাজির হল। ওদের বিজ্ঞানবনের কাছেই এই পার্ক, দু'মিনিটের রাস্তা। ফুলপালানো ছেলেদের ছোটখাট আড্ডা এখানে বোজাই বসে। আজ অশ্রু এখনও কেউ আসেনি। বায়টা বেজে গেছে, কাঁ-কাঁ করছে বোদ। পার্কের এক কোণে ঘরের বাইরে গাছতলায় খাটিয়া পেতে মালী শুয়ে আছে। অশ্রু দিকে সাধারণের বিশ্রামের জন্ত যে শাপখীধান, মাথা ঢাকা, ছোট ঘরটি রয়েছে সেখানে দু'জন ফিরিওয়াল পাশে মাল বেছে কিছুচ্ছে। শ্রামল বোজকার মত পুথিকের পেয়ারা গাছটার তলায় গিয়ে বসে। খুব আন্তে হাওয়া বইতে, চায়র বসলে বেশ আরাম লাগে। শ্রামল চিং হয়ে শুয়ে দেখছিল গাছের উঁচু ডালে ছোট ছোট পেয়ারা হয়েছে, হু-ভিনটে পানী কিচমিচ করে ঝগড়া লাগিয়েছে।

—এই বাদর, লুম্বুজিস? রেলিঙ টপকে মদন পার্কের ভেতর এসে শ্রামলকে টোলা দেয়।

শ্রামল ঠিক লুম্বুজিস, তস্তার ভাব এসেছিল, উঠে বসে বলে, দুই গাথা, বেশ আরাম লাগছিল, তুই নষ্ট করে দিলি।

—দিলি বোজ করে শুয়ে আছিস, তোর আর কি? আমাদের শালা এক মিনিটের কঁাক নেই। একবার বাইরে যেতে চাইলে মাষ্টাররা কটমট করে তাকায়। তেমনি সব ভালো মানুষ ছেলে জুটেছে, বলে, কি যে সিগারেট খেতে যাবি?

শ্রামল হাসে, বেশ হয়েছে, তুই তো আর ক্লাশ বোজ কঁাকি নিতে পারবি না, যা রাগী দালা, বেত মারবে।

মদন মুখটা গম্ভীর করে বলে, সেই তো জালা! একটা সিগারেট নাও, এখনি ক্লাসে কিরতে হবে।

শ্রামল সিগারেট বার করে মদনের হাতে দেয়, নিজেও ধরায়।

—এ সময় এলি যে, টিকিনের তো দেবী আছে।

—এক পিরিয়াড আগেই ছেলেদের উঠানে জড় করেছে, ছেড় মাষ্টার কি বক্তৃতা দেবে।

আমি সেই হু-বোগে এই দুটো নিয়ে পালিয়ে এলাম।

মদন পকেট থেকে দুটো 'ইন্সট্রুমেন্ট বক্স' বার করে শ্রামলের সামনে রাখে।

—একেবারে নতুন যে—

—নিলে কেউ পুরোন দেয়?

—কার?

—কে জানে, আমাদেরই ক্লাশের।

শ্রামল বাক্স দুটো নেড়ে-চেড়ে বলে, আজই বেড়ে দেবো।

—হু-একটা সোফান বাচিয়ে নিসু—

—তুই আর আমার শেপাস না।

মদন একমুখ বোঁয়া ছেড়ে বলে, তোর ছোটটার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিবি না?

—দেবো তো বলেছি। কেউনা এখন খুব ব্যস্ত, বোববার ভোট হয়ে থাক, তার পর একদিন—

সিগারেট শেষ হয়ে আসে, মদন জোরে টান দেয়, পালাই, দেবী হলে ধরা পড়ে যাব।

—তাহলে কখন দেখা হবে?

মদন কি যেন ভেঙে নেয়, একটা ছবি দেখবি?

—কোথায়?

—বীথিকার, 'চিচি কঁাক' খুব ভাল হয়েছে।

—আলিবার গল্প?

—না, না, এ শুধু খিস্তি ভরা।

—কে আছে?

—বেলারাগী।

—মাইবী! আমি তাহলে গোটের কাজে থাকব। ছাটার সময়।

—ঠিক আছে। সমস্ত জানিয়ে মদন আবার রেলিঙ টপকে পার্কের বাইরে চলে যায়। একদিন কেউ একেবারেই ফুরসৎ পায়নি। সামনের রবিবার ভোট দেবার দিন, এতই মধ্যে সব কিছু ব্যবস্থা তাকে করতে হয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চতুর্দিকে লোক পাঠিয়েছে, প্রত্যেক সেন্টারের কাছে নিজেরেদে অফিস খোলার ব্যবস্থা করেছে, রাঘব বোয়ালকে বলে তার বন্ধুদের কাছ থেকে অনেকগুলো গাড়ী আনিচ্ছে, প্রয়োজন মত খুঁজে খুঁজে ছেলে বোগাড় করে এনেছে, বাবা বিভিন্ন সেন্টারের ভার নিয়ে সেই দিন কাজ চালাতে পারবে। এর মধ্যে কথা-কাটাকাটি, ঝগড়া হয়েছে অনেকের সঙ্গে। বিশেষ করে পুলিন, সে তো বলেই গেল, চললাম আমি, ইহুমান মার্কাদের দলে। দেখব কোন শালা রাঘব বোয়ালকে জেতার।

কেউ টেবিলে উত্তর নিয়েছিল, কাজ করবার জন্তে সবাইকে এখানে আনানো হয়েছে। গুলতানী করবার জন্তে নয়।

পুলিন কেঁটকে ভয় করে। তাই মুখের ওপর জবাব না দিয়ে বেরিয়ে এসে অশ্রুদের কাছে বলেছিল, কেউনা'র ফুটানী দেখলি? রাঘব বোয়ালের পরসায় লবাবী করছে আর আমরা দুটো পরসায় চাইলেই বিচিয়ে ওঠে। চেনে না আমাদের, পুলিন মণ্ডল যে-সে ছোঁকরা নয়, এর পোষ আমি ঠিক তুলব।

এ নিয়ে দলের মধ্যে অনেক কথা উঠেছিল। এমন কি, রাঘব বোয়াল বলেছিলেন, কেউ, এ সময় ঝগড়াখাটি করা ভাল নয়, পুলিনকে ফিরিয়ে আন, নয় ত বল আমি নিজেই তাকে আনছি।

কেউ এতে সায় দেয়নি, কোন দরকার নেই ওকে ডাকবার। ও সব ছেলেকে শায়েস্তা করতে আমি জানি। [ক্রমশঃ]

### কালীমূর্তির ব্যাখ্যা

জগজ্জননী—ঐক্য প্রকৃতি বা কালীও বলা হয়। একটি নারী-মূর্তি একটি পুরুষ-মূর্তির উপর ঠাঁড়িয়ে আছেন—তার অর্থ, মায়ার আবরণ উন্মোচিত না হলে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি না। ব্রহ্ম স্বয়ং স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নন, তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞের।

তিনি যখন নিজেকে অভিব্যক্ত করেন তখন নিজেকে মায়ার আবরণে আবৃত করে জগজ্জননী-রূপ ধারণ করেন ও স্ত্রী-প্রাপ্তকায় বিস্তার করেন। যে পুরুষ-মূর্তি লয়নভাবে রয়েছেন তিনি শিব বা ব্রহ্ম, মায়ায়ুত হয়ে শবরূপ।—স্বামী বিবেকানন্দ।





[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

জরাসন্ধ

ডাক্তার বাবু বলছিলেন, নিজের মনকে ভিজ়েস কর, কী তার উত্তর। এত দুঃখেও হাসি পায় হেনার। নিজের মনকে কি আজও তার জানতে বাকী আছে? সে যে কত লোভী, কত অব্যব, তার আকাঙ্ক্ষার যে শেষ নেই! তাই আপনার অন্তরকে শুধু চোখ রক্তিয়ে এসেছে এত দিন। তার অসমত আকারকে এতটুকু প্রত্যয় দেয়নি। আজ মনে হচ্ছে, সব লোভ বেন তার নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর বোধ হয় নিজেকে সে ধরে রাখতে পারবে না।

স্কোল-গেটের পেটা ঘন্টার ছুটো বেজে গেল। পাশের বিছানায় যোনার মা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সে-ও তো দীর্ঘ রাত্রির সেই প্রথম প্রহর থেকে একটুখানি ঘুমের জ্বলন্ত চেষ্টা করিনি? কিন্তু ঘুম আসেনি। নিম্নলিখিত চোখের উপর কেবলই ভেসে উঠছে একখানা মুখ আর তার দু'টি ক্ষমাশীল চক্ষু—স্নেহে কল্পনার ভাব, আগ্রহে, অল্পবয়সে প্রদীপ্ত। ঐ মানুষটা কি রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরি নয়? কারাবন্দী অপরাধীর উপর মানুষের যে সহজাত ঘৃণা, স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা, সে সব কি বিধাতা তাকে একেবারেই নেননি? তিনি তো জ্ঞানন, প্রকাশ আদালতের বিচারে সে ভয়ঙ্কর অভিযোগে দণ্ডিত, জীবনের যে পথ ধরে এইখানে এসে সে ঈর্ষাল, সে পথ পঙ্কিল, কলুষময়। তার সর্বস্ব জড়ানো সেই মসী-চিহ্ন কি ঠিক ঐ উদার আয়ত চোখ দু'টিতে একবারও ধরা পড়ল না? সভ্য সমাজ বাকি আবহমান মত আন্তর্জাতিক টেনে ফেল দিল, তিনি তাকে দু'হাত ধরে তুলে নিলেন, জড়াত চাইলেন একান্ত করে, নিবিড় করে নিজের শুদ্ধ পবিত্র জীবনের সঙ্গে। প্রসন্ন-সরল হান্তে সব ঘিরা, সন্দেহ উড়িয়ে দিয়ে দৃঢ় কর্তব্য বললেন, তুমি বা আছে, সেই তোমার পরিচয়; তার বেশী আর কিছু জানতে চাই না।

কিন্তু তিনি জানতে না চাইলেও সে তো না জানিয়ে পারে না? তিনি ভুলতে চাইলেও সে তো ভোলাতে পারে না! নিজেকে তার প্রকাশ না করে উপায় নেই। হেনার ইচ্ছা হল এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে নিজেকে তাঁর পারের তুলার স্রুটিয়ে দেয়, সেই পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে বলে, হে আমার দেবতা, তুমি বাকি ভালসেছে, সে আমি নই, সে আমার এক কল্পনা-রঙীন মিথ্যা রূপ। তোমার ঐ কল্পনাময় স্বপ্নের মাথুরী মিশিয়ে তার জন্ম। সে তোমার স্রষ্টা, আমার বিধাতার স্রষ্টা নয়। হে আমার প্রিয়, তোমার কাছে বা পোলায়, সে যে কত বড় পাওয়া, তা কেবল আমিই জানি। কিন্তু এ

কথা কেমন করে ভুলি, তার একটা কণাও আমার পাওয়া নয়? সে শুধু কীকি দিয়ে ভুলিয়ে নেওয়া। আমাকে তুমি জেনে নাও। আমার অতীত, আমার বর্তমান, আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে যে পরিপূর্ণ আমি, তাকে তোমার সামনে তুলে ধরতে লাগ। তাকে বন্ধন দেখবে হয়তো মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে, যুগায় ভরে উঠবে তোমার ঐ দেবচক্ষু। বুক ভেঙ্গে গেলেও সে দুঃখ আমি সইতে পারবো। কিন্তু মিথ্যা আমি, নকল আমি দিয়ে একটা দিনের ভরেও তোমাকে ঠিকিয়েছি, সে যন্ত্রণা আমার সইবে না।

প্রবল উত্তেজনায় হেনা বিছানার উপর উঠে বসল। বার বার মাথা নেড়ে বলতে লাগল, একথা তাঁকে জানাতেই হবে। তিনি শুনতে না চাইলেও অকপটে অসঙ্কোচে মেলে ধরতে হবে তার দুঃখনিম্ন রূপ, খুলে দিতে হবে জীবনের যেটা অন্ধকার বন্ধ, বার মধ্যে জুপাকার হয়ে আছে শাপ অপরাধ আর কলঙ্কের বোঝা।

গভীর স্নানান্তে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে এল। বীরে বীরে আবার শয্যাপ্রান্তে এলিয়ে পড়ল হেনা। পশ্চিম আকাশের কোন প্রান্ত থেকে এক টুকরা চাঁদ তার একটুখানি ক্ষীণ জ্যোৎস্না পাঠিয়ে দিবেছিল খোলা জানালার পথে। সেই অপরিষ্কৃত আলোর চেয়ে দেখল আপনাকে। কেমন বেন মায়ী হল নিজের উপর। বহিত জীবনের উপর এক রক্তময় মমতা। মুহূর্ত পূর্বে যে কর্তার সংকল্প দিয়ে নিজের মনকে সে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধেছিল, তার গ্রাস্ত বেন শিথিল হয়ে এল। মনে হল, থাক না ঢাকা। জীবনের যে দিনগুলো চোখের আড়ালে পড়ে আছে, থাক না তার উপরে বিশ্বাস্তির আবরণ। কী কাজ তাকে বলে দিয়ে? কুরাশার স্নিগ্ধ মায়ী যদি মোহ রচনা করে থাকে কারো মনে, সূর্যের রক্ত আলোর তার স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে কী লাভ? সে তো ইচ্ছা করে, ছল করে কাউকে ভোলায়নি? তবু যদি কেউ ভুলে থাকে, সে ভুল নাই বা ভাঙল? তার অনাগত জীবনের সম্পদ হয়ে থাক সেই ভুলের কল।

পরদিন বন্ধন ঘুম ভাঙল, পূর্বদিকের জানালা দিয়ে খানিকটা রোদ এসে পড়েছে ঘরের মাঝখানে। বৃহৎ করে উঠে পড়তেই চোখে পড়ল পাশের ঘাটে বসে যোনার মা তার দিকে চেয়ে হাসছে। হাসতে হাসতে বলল, আজ তুমি হেরে গেছ, দিদিমণি! আমি তোমার আগে উঠছি।

হেনা লজ্জিত হয়ে বলল, আমাকে ডাকনি কেন?

—আহা; বড় বুদ্ধিছে, তাই আর ডাকাতকি করলাম না। শরীর ভালো আছে তো?

—হ্যাঁ গো-হ্যাঁ। কথার কথার এমন শরীর খারাপ করে না আমার।

বিছানা থেকে নেমে চার দিকে একবার চোখ বুজিয়ে নিয়ে বলল, সব তো বুঝলাম। আমাকেও ডাকনি, নিজেও বসে আছে গণেশ ঠাকুরের মত। এদিকে গোছগোছ সব পড়ে আছে। আজ আবার বাইরের হাসপাতালে যেতে হবে, মনে আছে তো?

—আর পারি না মা! এখানেই তো বেশ চিকিৎসা হচ্ছে। এতেই বা হয়, হবে। এই বুড়ো হাড়ে আর টানটানি সরুন।

—সর না বললে হবে কেন?

—যুব হবে। তুমি ডাক্তার বাবুকে একটু বুঝিয়ে বল। তাহলেই শুনবেন। একটু খেয়ে উদাস স্তরে বলল, তোমাদের ছুঁজনের হাতে যদি না সারে, এ রোগ স্বপ্নে গিয়েও সারবে না।

তোমাদের ছুঁজনের হাতে! হেনার বুকের মধ্যে একটা অন্ত্যস্ত কোমল জায়গায় বেন হাত পড়ল। বাথার টনটন করে উঠল সমস্ত বুকখানা। আর কোনো কথা না বলে কাপড়জামা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কলতলার দিকে।

দৃষ্টিতে স্তম্ভ হয়ে উঠলও বন্ধারোগীর সম্বন্ধে চিকিৎসকের ভাবনা সগজে ঘোচে না। উপসর্গ সব বন্ধ হয়ে গেছে। গুজন লাকিয়ে উঠছে ধাপে ধাপে। তবু ডাক্তারের হাত থেকে তার ছুটি নেই। তখনো মাঝে মাঝে গিয়ে ঝাঁড়াতে হবে রক্তনরস্থির করলে। আবার তোলা হবে আলোকচিত্র। সেই হাড়পাঁজরাগুলো আলোর সামনে তুলে ধরে সন্ধানী দৃষ্টি ফেল দেখবেন বিশেষজ্ঞ কোথায়, কোন কোণে লুকিয়ে আছে সেই সর্বনাশা পুন্ডরেক বহুসভাগুলো। আন্তে আন্তে তাঁর যুথের উপর ঘনিয়ে উঠবে গাভীরে ছায়া। তাঁর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষমান রোগীর আত্মার দিকে মুখ তুলে বলবেন,—না, আর একটা কোস নিতে হবে। তার পর প্যাড টেনে নিয়ে লিখবেন প্রেক্ষাপট আর তার সঙ্গে আর এক দফা রাজসিক খাণ্ডতালিকার পুনরুক্তি।

বুড়ীর এখন সেই পর্যায়। বিশেষজ্ঞের নির্দেশে আগুুলে চড়ে আজও তাই ছুটেতে হল বাইরের হাসপাতালে। তাকে রওনা করে দিয়ে হেনার হাতে কোনো কাজ ছিল না। শরীর কাল থেকেই রাস্তা। তার উপরে মন ভরে আছে গভীর অবসাদে। চূপ করে পড়েছিল বিছানায়।

ডাক্তার দেখা; ডাক্তার দেখা; এবার হল তো? বলতে বলতে ঘরে ঢুকল কমলা, ও মা, এমন অসময়ে শুয়ে!

হেনা একটু পাশের দিকে সরে গিয়ে বলল, কী করবো, কাজকর্ম নেই; তাই শুয়ে পড়লাম। বাসু না। কী বললেন ডাক্তার বাবু?

কমলা তার কোলের কাছটিকে বসে পড়ে বলল, কী ভীষণ ভয় হয়েছিল, জানো দিদি? কত কী হয়তো জিজ্ঞেস করবেন। কেমন করে কী উত্তর দেবো! সে সব কিচ্ছু না। খালি বললেন, কী কষ্ট হয়, বলো। আমি বললাম, গাঁটগুলোয় বাথা। বাসু। তার পর হাতটা দেখলেন, চোখের কোপটা একটু টেনে দেখলেন। বললেন, এত দিন বল নি কেন? রোগ কখনো পুখে বাথতে আছে? হুশীলা মাসীমাকে বললেন, কম্পাউণ্ডার বাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রক্ত নিতে হবে। বাবার সময় আর একবার ফিরলেন আমার দিকে, কিচ্ছু ভয় নেই; গোটা কয়েক ইন্জেকশন দিলেই সেরে যাবে। এমন মিষ্টি করে বললেন কথাগুলো! মনে হচ্ছে, অন্তর আমার আত্মক ভালো হয়ে গেছে।

হেনা হঠাৎ প্রশ্ন করল, মাসীমা কি করছে রে?

—কেন?

—কাজ আছে।

—ওর কাছে এখন আবার কী কাজ?

—বিকালের দিকে একবার আফিসে নিয়ে যেতে বলবো।

—আফিসে! খিল-খিল করে চেসে উঠল কমলা; চাকরি টাকরি পেলে নাকি কিচ্ছু? সেই যে কী নাম বাবুটির? কদিন সেজেগেজো খোঁরাচুরি করলেন। তার দণ্ডেরে বুঝি?

এবার হেনাও হেসে ফেলল। তার পর হঠাৎ গভীর হয়ে বলল, না, ঠাটা নয়; জেলের সাহেবের কাছে যেতে হবে এক বার।

কমলা বিমিত্ত হল, জেলের সাহেবের কাছে!

—হ্যাঁ। এবার বোধ হয় সত্যিই তোকে ছেড়ে চললাম, কমলা! বলে ওর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতের মধ্যে।

কমলা চমকে উঠল, ছেড়ে চললে? কোথায়?

—কোথায় আবার? আর কোনো জেলে। অবিভি ঠুঁরা যদি রাজী হন।

কমলা নিঃশ্বাস চেপে যেন আপন মনে বলল, বুঝছি। আশ্চর্য! ঐ মাহুঘের কাছ থেকেও পালাতে হয়?

—না রে; পালাচ্ছি নিজের কাছ থেকে। নিজের ওপরে আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না।

কমলা ক্লপকাল তার শুক গভীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, সেদিন বা বলছিলাম, আজও সেই কথাই বলবো। তুমি ভুল করছ, দিদি।

—কী করবো, বল, অসহিষ্ণু কঠে বলে উঠল হেনা, বিধাতা ঠেকে অত বড় ছুটো চোখ দিয়েও যখন দেখনি, আমাকে তার সুযোগ নিতে বলিস!

—না। ঠুর চোখ ফোটার জন্তে নিজেকেই শুধু ছোট করে হয়ে করে ঝাঁড় করাতে বলি তার সামনে!

—তোরাই ভুল হল, কমলা। নিজেকে আমি ছোটও করিনি, হয়েও করিনি, শুধু দেখাতে চেয়েছি নিজের যেটা সত্যিকারের রূপ।

—হ্যাঁ; অত্যন্ত খাঁটি লোকানলার যেমন তার খন্দরকে সাবধান করে দেয়, জিনিষটা দেখে-শুনে নেবেন, ঠুর। ঠকবেন না যেন।

কমলার এই জেখ-তিজ্ঞ স্বর এবার তীজ হয়ে উঠল, এক বার ভেবে দেখেছ, এমন করে কোথায় টেনে নামাচ্ছি নিজেকে, আর সেই সঙ্গে ঐ উদার সরল মাহুঘটাকে; বাবু চোখের দিকে এক বার তাকালে নিজেকে শুধু নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

—ইচ্ছে করে তো তাই দে না? কে মানা করছে? মুখ টিপে হাসল হেনা।

—সে কথা তো আগেই বলেছি। আমি যদি তুমি হোতাম, তোমার কাছে পরামর্শ চাইতে যেতাম না। না, ঠাট্টার কথা নয়, দিদি! তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়। বিভীষণ বুদ্ধিতে মানে আরো অনেক বড়। তবু মুখ ছোট বোনের একটা কথা হেসে উড়িয়ে



যুকের দুই ছাড়াগোর  
সমজ্যা থেকে  
ডামার মুক্তি দিয়েছে

# নেস্টাম

যব, গম প্রভৃতি শস্যচূর্ণের সংমিশ্রণে  
তৈরী আদর্শ শিশু-খাদ্য। নেস্টাম  
শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের পক্ষে  
অগরিহার্য উপাদানগুলো  
যথাপরিমাণে যুগিয়ে স্বাভাবিক-  
ভাবে তাকে পুষ্ট করে।

- রান্না করতে হয় না
- সহজেই মিশে
- পরিপাক যন্ত্র  
সবল করে



নেস্টাম দিয়ে পিঠে, কেক প্রভৃতি নানা উপাদেয়  
খাদ্য তৈরী করা যায়।

বিনামূল্যে পুস্তিকার জন্য লিখুন :

নেসেল্‌স্ প্রডাক্টস্ ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ

পো: অ: বক্স ৩৯৬, কলিকাতা • পো: অ: বক্স ৩১৫, বোম্বে,

পো: অ: বক্স ১৮০, মাদ্রাজ

নও না। এটা তোমার কেনা-বোচার হাট নয়। এখানে যে চাষ বৃদ্ধ নিতে পারে, সেই পায়; আর যে ফিসাবের খাতা খুলে বসে, সে ঠকে। কেন, নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারছ না? তুমি তো ওর কিছুই জানতে চাওনি, খুঁজতে চাওনি কোথায় লুকিয়ে আছে ওর ঠিক-জিক্কীর কর্ম। চোখ বুজেই তো নিরেছ। তাই সমস্ত বুক ভরে আছে। ওর বেলোতেও তাই...

বলি, খুব তো লোকচোর খাড়া হচ্ছে, এমিকে যে কম্পাউণ্ডার বাবু সেই কথোন এসে বসে আছে খুঁচ হাতে করে, বলতে বলতে স্মীলা জমাদারনী একেবারে 'মার'-মুর্ছিতে দোরগোড়ার এসে হানা দিল কমলা কীতে ভিত্তি কেটে তাড়াতাড়ি উঠে ঠাঁড়িয়ে বলল, এই যে, বাই মামীনা! বললই বেরিয়ে গেল।

কমলার এই শেষের কথাগুলোয় হেনার মনটা প্রথমে আবিষ্ট হয়ে এল। কিন্তু সে আবেশ কাটিয়ে উঠতেও বেশীক্ষণ লাগল না। কথার মোহ বড় মারাত্মক জিনিষ। মাথুয়ের সঙ্গে এত বড় প্রতারণা বোধ হয় আর কেউ করে না। সত্যকে ভুলিয়ে দিতে, প্রকৃত বস্তুর উপর থেকে দৃষ্টিকে বিমিশ্র করতে তার জোড়া নেই। হয়তো এই সব বড় বড় কথার কীর পড়ে কমলাও আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। তুলে গেছে, একদিন সও পারবনি। ওর সেই প্রথম কি-এর পরামর্শ যদি সেদিন ঠনত, সময়ের কাছে লুকিয়ে রাখত জীবনের সেই চরমতম প্রতিশাপ, আজ তাহলে স্বামি-পুত্র নিয়ে পরম সুখে সব সঙ্গার হয়ত। আপনার কাছে যে পরিচরই থাক, লোক বলত নতী-সান্নী স্বামি-সোহাগিনী। সভা সমাজের পুণ্যবতীরা ওর শ্রুতিভাগ্যকে ঈর্ষা করত। ভবিষ্যৎ জীবনের সে উজ্জল আকর্ষণ তবু ওকে নীরব থাকতে দিল না। তার কারণটা হয়তো ভেবে দেখেনি কমলা। কিন্তু কারণ অতি সহজ—ওরা যে ভালবেসেছিল। বড় বিচিত্র বস্তু এই ভালবাসা। সে অনেক দুখে সহিতে পারে, অনেক আঘাত বহিতে পারে, শুধু মিথ্যার সঙ্গে তার বিরোধ, প্রবন্ধনার সঙ্গে তার আপোষ চলে না।

কটকের কাছে দড়ি-বাঁধা ঘটাটা জোরে জোরে বাজতে লাগল। নিশ্চয়ই হোমার-ডোমরা কেউ। হয় জেলার, কিংবা কোনো ডিস্ট্রিক্ট, নয়তো স্বয়ং বড় সাহেব। কিন্তু আজ তো বড় সাহেবের ফাইল নয়। অদিনে অক্ষপে কিমেল ওয়ার্ডে সুপারের আবির্ভাব বড় রকম অবতন না হলে ঘটে না। হঠাৎ জমাদারগীর হতীজ তক্তার সমস্ত ওয়ার্ড কীপে উঠল—একটি আটেনশন্। স্মীলার সেই পেটেট মিটিটারী কমাণ্ড। এই কমাণ্ড দিতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে জমাদারগীর তিনটা স্বরগ্রাম বাবহার করে থাকে। জেলার সাহেব এলে উদার, কোনো ডিস্ট্রিক্টের বখন আসেন, সুদার, আর বড় সাহেবের বেলায় তারা। হেনার সন্দেহ হল, এটা সেই সর্বোচ্চ পদবা। ওয়ার্ডে, ওয়ার্ডকীপে বা কাছে-খারে কোথাও থাকলে এখন তাকে অস্ত্র সঙ্গের সঙ্গে উঠে ঠাঁড়িয়ে সেলাম করতে হত। আবার বসে পড়তে হত, স্মীলা যখন হাঁক দিত, আজবর। প্রথম জেলে আসবার পর জমাদার এবং জমাদারগীর যুখে এই বিচিত্র বুলি প্রত্যেক দিন শুনেও হেনা ধরতে পারেনি কথাগুলো কী এবং ভাবটা কেন সেপের। তার পর একবার শিকেষ্ট্রি না প্রেসেলন, কী একটা ব্যাপারে জন কতক বসেনী

সেইসময় জেল হয়ে গেল। তাইসেই একজন ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিল,

কথাটা হচ্ছে, স্কোয়াড, অ্যাটেনশন্ (Squad, Attention!) আরও বলেছিল—এটা নাকি হালে আমদানী। আগেকার দিনের বুলি ছিল—সরকার, সেলাম! এই মেয়েটির কাছেই প্রথম শুনেতে পায় হেনা, 'বলে মাতরম্'—এর মত এই কুখ্যাত শব্দের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে বহু দিনের বহু লাক্ষনার নিলজ্জ ইতিহাস। সে এক দিন গেছে, বখন এই 'সরকার সেলাম' আদায় করতে গিয়ে সরকারের কত বেটন দু'খণ্ড হয়ে গেছে, কত লাঠির সঙ্গে উঠে এসেছে—'তাজা মাস, বুটের ঠোঁড়ের খেয়ে ভেজেছে কত পাঞ্জরার হাড়। তবু বেয়াড়া 'বসেনী'কে শাসেস্তা করা যায় নি। তার পর হঠাৎ এক দিন সরকার হাল ছেড়ে দিলেন এবং বাতারাতি 'সরকার সেলাম'এর জায়গায় দেখা দিল এই স্কোয়াড, অ্যাটেনশন্। সব দিক রক্ষা হল। শুধু মুন্সিলে পড়ল, জেলের বত জমাদার আর জমাদারগীর দল। কটমট বিদেশী ভাষার এই বিন্দুতে কথাগুলো নানা মুখে নানা বিচিত্র আকার নিয়ে কয়েকদৈব কৌতুক যোগাতে লাগল।

হেনার কানে গেল, অনেকগুলো ছুতার শব্দ নেবু গাছের ঝোপ পার হয়ে তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি উঠে ঠাঁড়াতেই সুপার সাহেব সদলবলে সামনে এসে পড়লেন। তাকে দেখিয়ে ইংরাজিতে প্রশ্ন করলেন, এটি কে? কী করছে এখানে?

জেলর সাহেব বললেন, ওই এখানকার টি-বি কেসটা দেখাশুনা করে।

—I see; পা কীক করে, মধ্যাঙ্গ সামনের দিকে বাড়িয়ে ছোট্ট স্কু লাঠিখানা ছুতার উপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন সুপার। বাই দি বাই, That old woman is not coming back. সত্যি সত্যি বললে আমি ওখানেই ওর একটা বেড-এর ব্যবস্থা করেছি। Let this Hospital be closed down. এখানে কাউকে রাখবার দরকার নেই। জেলরের দিকে ফিরে ইস্তিতে হেনাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, Give her some hard work to do.

দলবল নিয়ে ফিরে চললেন বড় সাহেব। বাবার পথে নেব গাছগুলোর দিকে লাঠি উঠিয়ে বললেন, Looks more like a bower than a lime orchard. এসব কুজ-টুজ এখানে না থাকাই ভালো। বলে বাঁকা দৃষ্টিতে একবার তাকালেন দেবতোষের মুখের দিকে।

হু-এক জামাগীর বাউণ্ড সেরে আগিসে বাবার পর এই প্রসঙ্গেই আবার ফিরে এলেন সুপার সাহেব। বললেন, লুক হিয়ার, জেলর, কিমেল ওয়ার্ড সবক্কে আমাদের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। ওখানে বারা থাকে তারা কেউ সতী-সান্নী নয়। সেইজন্তে ওদের দৈহিক স্বাস্থ্যের চাইতে নৈতিক স্বাস্থ্যটাই বেশী লক্ষ্য করা দরকার। ওরা নিজেরা ভালো হোক না হোক বয়ে গেল, কিন্তু আমাদের যে-সব ঠাক ওদের সন্ত্রাসে আসে, তারা না বিগড়ে যায়, সেদিকে কড়া নজর দিতে হবে, আপনার কী মনে হয়?

তালুকদার অস্পষ্ট ভাবে মাথা নাড়লেন। কিন্তু তার পরেও মনিবকে উত্তরের অপেক্ষা করতে দেখে বললেন, নজর সব দিকেই রাখতে হয়। ওদের ভালো-মন্দটাও বাদ দেওয়া চলে না।

—You are right তবে আমার ঠাকের স্বাস্থ্যটাই আমি বেশী দেখি। আমার মনে হয়, সম্প্রতি সে বিষয়ে চিন্তিত হবার

কারণ ঘটছে। Don't you think so? তালুকদার বললেন, আমি তো সে রকম কিছু জানি না। সুপার বিশ্বাস প্রকাশ করলেন, বলেন কি। কাঠি এস, এ, এস, আর এঁ মেরেটাকে জড়িয়ে কোনো কথাই কি আপনার কানে আসেনি?

—তা কিছু কিছু এসেছে। এই সব ব্যাপার নিয়ে বারা মাথা ঘামায়, কান ভাবী করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। দেখতে পাচ্ছি, সেদিকে তাদের ক্রটি হয়নি।

—Oh, no, no, আপনি ভুল করছেন। বিশেষ ভাবে কারো কাছ থেকে আমি কিছু শুনিনি। তবে ওদের মধ্যে যে বেশ ধানিকটা undesirable ঘনিষ্ঠতা দেখা দিয়েছে, বাকি বলে romantic relations সে কথা বোঝ হয় মিথ্যা নয়। The Doctor must be a fool! ও হয়তো ঐ মেরেটাকে একটা হিরোয়িন টিরোয়িন ঠাউরে বসে আছে। I admit she has charms and she appears to be respectable; but after all she is a criminal!

জেলার সাহেব আর কোনো উত্তর করলেন না। মনে পড়ল, উদারপন্থী এবং অতি আধুনিক বলে তাঁর এই মনিবটির প্রসিদ্ধি আছে। সামাজিক জীবনে বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেরেদের স্থায়ী মেলামেসার তিনি পক্ষপাতী, এবং সে বিষয়ে জাতি, বর্ণ বা অগ্র সব কৃত্রিম বাধা স্বীকার করেন না। তাঁর নিজের মেয়ে সখকেও নানা রকম অপ্রীতিকর জনশ্রুতি আছে। তিনি সে সব গ্রাহ করেন না, বরং মেয়ে এবং তার পুরুষ-বন্ধুদের ধানিকটা প্রেমেরই দিয়ে থাকেন। এ-হেন ব্যক্তিও যে আজকের এই ব্যাপারে বিচলিত হয়ে উঠেছেন সেটা হঠাৎ বিস্ময় মনে হলো কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। তার কারণ, After all she is a criminal.

এই পাঁচিলঘেরা জায়গাটুকু দুনিয়া থেকে শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, সর্বপ্রকারে বিভিন্ন। এখানকার বারা বাসিন্দা, তাদের সঙ্গে বাইরের মানুষের মিল শুধু আকৃতির, শুধু দেহের কাঠামোর। তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় কোন ইষ্টুলপাঠ্য কেতাবে একদিন লেখা করেছিলেন ইংরেজ কবি লেখা কটা লাইন Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage...

বিনি উজ্জ্বল ভাবে এই তথ্য প্রচার করেছিলেন, তিনি কোনোদিন জেল-ফেরৎ করেদার সাক্ষাৎ পাননি। যদি পেতেন, তাহলে বুঝতেন, অত বড় মিথ্যা কথা আর নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের দুলভ্য প্রভেদ যদি কেউ ঘটাতে পারে, সে হচ্ছে ঐ stone walls আর Iron bars এ দুটো বস্তু ভেদ করবার মত দৃষ্টি আজ পর্যন্ত কারো চোখে দেখা যায়নি, হয়তো কোনো কালেই দেবে না।

জেলরকে নিঃশব্দে পাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বড়সাহেব মনে মনে আশঙ্কিত হলেন। অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, আপনি ভেবে দেখুন, এসব scandal আমাদের বন্ধ করতেই হবে। আপাততঃ গুদামকার হাসপাতালটা বন্ধ করে দেওয়া গেল। যদি আরো কিছু, এমন কি drastic কিছু করবার দরকার হয়, তাও করতে হবে। আচ্ছা ঐ ঘোষটাকে—

টেলিফোন উপর টেলিফোন বেঞ্জে উঠল। সাহেব রিসিভার হুলে নিলেন। সেই সুযোগে জেলরও বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে।

নিজের ঘরে এসে দেখলেন, বিশাল টেবিল জুড়ে জমে উঠেছে খাতা-পত্রের পাহাড়। পানের একটা চেয়ারে বসে আছেন দেবতাঁর। অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন না হলে এ সময়ে ডাক্তারের আসবার কথা নয়। তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে এক বার মাত্র দৃষ্টি পাত করে বললেন তালুকদার, কী হে, তোমার আবার কি দরকার পড়ল? সেই কলেরা স্কটিয়া বুথি পটল তুলবার আয়োজন করছে; সদর হাসপাতালে পাঠাতে চাও? হবে না, গার্ড একেবারে নেই, মরতে হয় তো তোমার হাতেই মরুক।

—না, না। পটল তুলবে কোন ঝুঞ্জে? সে তো দিবা চাকার হয়ে উঠছে।

—তবে কী? আবার একটা কুঠি কিংবা চিকেন পক্স জুটিয়েছ? ও সব তোমার ঐ হাসপাতালের এক কোণে রেখে দাও। cell দিতে পারবে না। সব পাগোল-ভর্তি।

—এসব ব্যাপার নিয়ে আসিনি, দাদা। এসেছি নিজের কাজে। বলে, একখানা টাইপ-করা কাগজ এগিয়ে দিলেন ডাক্তার। তালুকদার হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিয়ে বললেন, কী এটা?

—পড়লেই বুঝতে পারবেন।

ধানিকটা চোখ বুজিয়ে নিয়ে স্তান হেসে বললেন জেলর সাহেব, বুঝছি। কলেরা নয়, কুঠিও নয়। তার চেয়েও মারাত্মক কিছু।

ডাক্তার কোনো জবাব দিলেন না। উঠে পাঁড়িয়ে বললেন, এবার আমি চলি। আপনার মজেলার সব সার বেঁধে পাঁড়িয়ে আছে। আমারও অনেক কাজ বাকী।

জেলর সাহেব হঠাৎ অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তার চলতে শুরু করতেই প্রায় করলেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। তোমার এই ছুটির দরখাস্তের সঙ্গে কি আজকের ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক আছে?

—না, দাদা! ছুটির কথা কদিন থেকেই ভাবছিলাম। কাল রাত্তিরে মন স্থির করে ফেললাম। আজ সকাল থেকেই ওটা শকেটে করে ব্রুছি।

একটু পাঁড়িয়ে চেয়ারের শিঠির উপর হাত রেখে বললেন, আপ্রিকেশন তো দিলাম। এখন কত দিন বুলিয়ে রাখবেন, কে জানে? এটা পাঠানো হবে, মজুর হবে, লোক পাওয়া যাবে কি না, সেলোও সে কবে আসবে—অন্ততঃ হাসপাতালের হাট। তবে আপনি যদি একবার কতাকা বুঝিয়ে বলেন, অর্ডারের অপেক্ষা না করেই হয়তো ছেড়ে দিতে পারেন। ডাক্তার সেন তো রইলেন। দরকার হলে পুলিশ হাসপাতালের মল্লিক এসে ক'দিন ঠাাকা দিয়ে যেতে রাজী আছে। এক বার বলে দেখুন না?

তালুকদার ধানিকল্প ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমাকে আমার কয়েক দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবো।

ডাক্তার কখনো কখনো শুদ্ধ হয়ে পাঁড়িয়ে থেকে বীরে বীরে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্যানব্রুকের বোঝা নিয়ে ব্যস্ত ভাবে হুকে পড়লেন হেড ক্লার্ক।

# ওহর আধারে

## — সিদ্ধার্থ —

তীর্থসেব আবার পরিচিত পরিবেশে ফিরে আসবার পর তাঁখাচরণগুলোর কথা স্মরণ করলে কেমন যেন বিষয় লাগে। হাসি পায়, বিশ্বাস করতেও সক্ষম হয়, কবুল করা তো ঘূরের কথা। সত্যি কি অমন অকারণে ভাববিভোর হয়েছিলাম?— অমন নির্বোধের মতো কি সত্যি অবস্থাস্থিত ঈশ্বরের কাছে পূজা নিবেদন করেছিলাম? অশিক্ষিত অমাক্তিত এক পাণ্ডাই বা কেমন করে অত সহজে অতগুলো টাকা ঠকিয়ে নিতে পারল? ঐ সব যুক্তিহীন অবাস্তব কিম্বদন্তীগুলোই বা বিনা প্রতিবাদে ধৈর্য ধরে শুনে কি করে? তাঁথের তো এই আমিই গিয়েছিলাম, কিন্তু সেই আমি কি এই আমিই?

বাত্তীর কিস্তি বিশ্বাস করে যে, তাঁথের গেলে বাতীর জন্মান্তর হয়। জন্মকের এই বস্তবানী যুগ জন্মান্তর শব্দটার চট করে বিশ্বাস করা সহজ নয়, কিন্তু তাঁথের গেলে সংস্রব্রষণ সাক্ষারমুক্ত বাতীর মধ্যেও যে একটা ভাবান্তর আসে তা অনস্বীকার্য। আর মৌলিক অবস্থার সঙ্গে এই ভাবান্তরের প্রস্তুতিগত প্রভেদ অকস্মাৎ এমনই প্রবলরূপে প্রকট হয়ে ওঠে যে, আলঙ্কারিক অর্থে অন্তত জন্মান্তর শব্দটা ব্যবহার করলে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। এ-রেন পরিচিত ইন্ড্রিগ্রাহ্য বাহু জগৎ ছেড়ে অপর এক চেতনা-সর্বস্ব সন্তাগ্রাহ্য অন্তর্ভুক্তিতে প্রবেশ করা। পূর্বের যুক্তি এখানে অমৌলিক, পূর্বের সংস্রব হস্তাকর, পূর্বের বিশ্বাস ছেলেখেলা। এখানে সর্বদা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চার হয় না। ধোঁয়া দেখেই পর্বত বহুমান অল্পমান করলে অনেক সময় ভুল হয়। অথচ এই জগতেরও নিজস্ব যুক্তি আছে, বিশ্বাস তো আছেই আর তাছাড়া আছে যোগ-বিশেষ জায়-অস্তায় সব কিছু। এই জগতের পরিশ্রেক্ষিতে যে এই সব কিছুই আবার সমান যুক্তিসঙ্গত, অপর জগৎ থেকে লগ্নকালের জন্ত নিছক ভ্রমণ-মানসে এসেও তা অস্বীকার করা অসম্ভব।

এখন এই দুই জগতের মধ্যে কোনটা অধিকতর সত্য এবং কোনটা অপেক্ষাকৃত মিথ্যা, তা নিয়ে দলীয় দার্শনিকদের কখনো যুক্তি-প্রতিযুক্তির অভাব হয় নি। বিপদ শুধু আমাদের মতো আদর্শনিক ইতরজনদের—কেবল তাকে বাদের ভিজ্জাসা মেটে না—বারা ভাবনটুকু কাটাবার জন্তে একটা শাণামিরা সহজ জবাব চায়। দেহ আমাদের একটাই, সামাজিক চৌসন্ধিতে জীবন সেও একবচন, মনও সর্বত্রগামী নয়,—একোদের পৃথক-গ্রীবা হয়ে যুগপৎ দুই ভাবনেরই স্থান গ্রহণ করবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। বিপদ হয় যখন এই আমাদেরই একজন ইন্ড্রিগ্রাহ্য বাহু-জগতে লালিত-পালিত বর্জিত হয়ে, এই পরিচিত জগৎটিকেই একমাত্র জগৎ বলে বিশ্বাস করবার পরমুহূর্তের অনবধানে অকস্মাৎ অপর অজ্ঞজগতের অস্তিত্ব অনুভব করে, তার কেবল বিপরীত নয় বিবোধী যুক্তি, বিশ্বাস, জায় ইত্যাদিকে আর কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না তখন। একক জীবনটাই যেন

তখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একাদ্বিধ উপপরাধের সঙ্গে মরণ-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। চেতনসত্তা অপেক্ষা ইন্ড্রিগ্রাহ্য আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত, অতএব বতলগ্ন সজ্ঞান থাকি, বতলগ্ন আমরা ইন্ড্রিগ্রাহ্যই সমর্থন করি। কিন্তু সর্বগ্ন সজ্ঞান থাকি কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ইন্ড্রিগ্রাহ্য একটু ক্লান্ত হলেই চেতনসত্তা তখন তার অধিকার বিস্তার করতে থাকে— যুহূর্তমধ্যে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে। এই আত্মকলহে নিরপেক্ষতার অবকাশ নেই এবং অবজ্ঞাবীরূপে একবার যুহূর্তের জন্ত পক্ষ-নির্বাচনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেই অচিরকালের মধ্যে এই কলহের প্রতিক্রিয়া নিগৃহীতের বাহ্যবীরূপে পরিমূঢ় হতে শুরু করে, ব্যক্তির জীবন তখন একটা বিলম্বিত যন্ত্রণা; অজ্ঞত কোষের সমর্থন নয় সংগ্রাম-ক্ষেত্র। তখন কখনো মনে হয়, পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো? নৈবেৎ এই আবহাওয়া কতকগুলো ধারণাকে এমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি যেন? আবার কখনো ঘুণা হয় যে ইন্ড্রিগ্রাহ্য কি চিরকালই এমন মাঝে মাঝে অগণতন টেনে নেবে?—নিজের উপর কি কখনোই একটু অধিকার ওড়াবে না? জীবনের তখন কোন দিশা নেই, গতি নেই, সিদ্ধান্ত নেই, উদ্দেশ্য নেই,—একটা অস্ফোর্তন যুগ কাঠের গুঁড়ি নদীর পাকে পাকে ভেসে চলেছে, কখনো মন্দিরের ঘাটে ঠেকে, কখনো শ্মশানের ঘাটে।

আমি চতুরতর বাতী, অনেক বড়ো শঠ। উপরোক্ত গতিপথের শেষ প্রান্তে পৌছবার অনেক আগেই আমি অনেক মিছা কথা বলে অনেক অছিলা করে আবার নিজেকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি। পরিচিত পুরানো জগতে। এই প্রত্যাবর্তন হয়তো চিরস্থায়ী হবে না কিন্তু ইতিমধ্যে দুই জগতের অভিজ্ঞতার বাহ্যদুরী দেখিয়ে কিছু বাহবা লোটা যায়।

আমি হয়তো নিজেকে যতটা মনে করি আসলে ততটা চতুর নই। সেই ভাবান্তরিত জগতের সত্যেরও যুক্তির ধারা এই জগতের পাঠকের কাছে বিবৃত করার পিছনে আমার বাহবা লোটায় অভিসন্ধিটা হয়তো একান্তই আপাত। সেই জগতের কথা আমি ভুলতে পারিনি, ভুলতে পারবো না। সেই জগতের যুক্তি আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি নি হয়তো বুঝতে পারবোও না। আমার সত্তা তবু একবার তার উৎসের সন্ধান পেয়েছে এবং ক্রমাগতই সেই দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। সেই ভাবান্তরের কথা বার বার নিজের কাছে বলে, লিখে বার বার চোখের সামনে ধরে নিজেরই অজ্ঞাতসারে আমি হয়তো বাচাই করে দেখছি সেই ভাবান্তরিত অস্তিত্বের ভিত্তি;—সেই ভিত্তি সত্য কি কাল্পনিক, পরিহারযোগ্য কি অপরিহার্য, ত্যজ্য কিম্বা কাম্য। চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের পূর্বে এ হয়তো একটু আত্ম-সাহস। ইন্ড্রিগ্রাহ্য জগতের মতো ইন্ড্রিগ্রাহ্যীত জগতের কাং-কাং শব্দেও অনেক জটিল জট। অপরিচয়ের দগ্ধ এই জট মুক্ত করা অধিকতর হুঃশাখা।

প্রসঙ্গ-কথায় আমরা অনেক দূর বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছি। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল ঐ বাতীর বাকে বলে জন্মান্তর,—নামাস্তরে বাকে ভাবান্তর বলে আমরা বকা করেছি। এই ভাবান্তরের প্রস্তুতি এইবার বোঝা দরকার। কিন্তু এইটে বোঝানো বড় শক্ত। কেন না, ইন্ড্রিগ্রাহ্য অনুভূতিগুলো প্রকাশ করবার জন্তেই যে ভাবার সঠি

সে ভাষায় অতীন্দ্রিহ অমুভূতি ও যুক্তির কথা ব্যক্ত করা সহজ নয়। তবু পাঠকের সহানুভূতির উপর নির্ভর করে ছুঁটো-চাটটে উদাহরণে এই ভাবান্তরিত অবস্থার পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যায়।

কামাখ্যাবাসের দ্বিতীয় দিন ছুঁ টাকার একটা লালচে নোট হাতে ডালির দোকানের সামনে ঝাঁড়িয়েছিলাম। ছুঁ টাকার ডালিতে পুঞ্জী দেব, দোকানদারকে ছুঁ টাকার ডালি দেবার কথা বলে অপেক্ষা করতি। অল্প ছুঁ-টার জন ধরিদার বিদায়ের পর আমার পালা আসবে। হঠাৎ সন্দেহ হল, হাতের নোটটা ছুঁ টাকারই তো? এক টাকার নোট বা এমনি এক টুকরো কাগজ নয়! নোটের লালচে রঙটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম,—কিন্তু নিজের চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ছুঁ টাকার ডালি নিয়ে এই নোটটা এগিয়ে ধরলে দোকানদার যদি হেসে ওঠে হঠাৎ? হাসিটার বেশ যেন ইতিমধ্যেই বৃকের ভিতরে ছুর-ছুর করে কাঁপছিল। ভয়ে দৃষ্টি বাপসা হয়ে আসছিল, গলা শুকিয়ে কাঠ। এমন সময় আমার পালা আসতে নিজেকে জুটুট করে বললাম, দুব আজ্ঞন্তবি এসব কি ভেবে মরছি! তারপরে সেই নোট দিয়ে ছুঁ টাকার ডালি নিয়ে মন্দিরের দিকে চলে এলাম।

বস্ত্রি নিঃশ্বাস ছাড়তে পারলাম না। ওই অহেতুক ভয়টার কথা ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। খুব সবলচিত্ত বলতে বা বোঝায় তা আমি কোন দিনই নই, কিন্তু চোখের সামনে অলঙ্কার কোন একটা বিষয় সম্পর্কে এর আগে কখনো তো এমন সশয়কাতর হইনি। এর পর মন্দিরে যাবার পথে আন্তে আন্তে নতুন জগতের নতুন বৃত্তিধারা আমার দৃষ্টিগোচর হল। স্পষ্ট যেন বুঝতে পারলাম যে, ভয়টা আসলে অমূলক বা অহেতুক ছিল না। এর আগে কখনই পরসী দিয়ে কোন প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনেছি তখনই সেই পরসীর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লোভ যুক্ত হয়ে পরসী পূর্ণমূল্য পেয়েছে। বরজ্ঞকে কবিত্তে আশ্রয়িত করে যখন তার দাম দিয়েছি তখনও সেই দামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাম। কিন্তু আজকের এই ডালির ছুঁ টাকার সঙ্গে তো আমার প্রজ্ঞা যুক্ত হয়নি, বিশ্বাসও অভ্যস্ত সংশয়ের তলার তলিয়ে গেছে। অতএব আজকের এই ছুঁ টাকাকে যদি এক টাকা বলে প্রতীতি হয়ে থাকে, এমনি এক টুকরো কাগজ বলে আশঙ্কা হয়ে থাকে, তার প্রতীতি সেই আশঙ্কা তো অহেতুক নয়, অমূলকও নয়। আর এই যুক্তিকেই সেদিন আমার খুব বৃত্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছিল।

অভ্যস্ত পরিচিত জগতের সীমা ছাড়িয়ে চেতনাময় অন্তর্ভূতগতে পদার্পণ করলে এমনি মানসিক বিপর্যয় ঘটে এবং এই বিপর্যয় কেবল মানসিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, চিরায়তত এইকি অভ্যাসগুলোও নিষেধমধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। যেমন, আমার চিরকালের নাগরিক অভ্যাস হচ্ছে বেলা আটটার নিরাজ্ঞ, তার পরে পর পর ছুঁ পেয়াল। চা পানের পর সাড়ে আটটার শয্যাভোগ। অথচ কামাখ্যায় আসবার প্রথম দিন যদিও বৃমোতে বৃমোতে রাত্রি প্রায় আড়াইটে বেজে গিয়েছিল, তবুও দ্বিতীয় দিন আমার ঘুম ভাঙলো প্রত্যয়ে ঠিক চারটের। মাত্র দেড় ঘণ্টার বিশ্রাম, তবুও দেহ সম্পূর্ণ ঋজ্বীভূত, মন অবসাদযুক্ত। তার পরেও নিরাজ্ঞ প্রথমই চায়ের কথা মনে পড়ল না, মনে হোল আজ পুজো দিতে হবে, ঘান করা প্রয়োজন।

এমন ব্যতিক্রম অথচ বিনা বিম্বয়ে সব করে গেলাম, যেন এই করেই অভ্যস্ত।

তা ছাড়া কেবলমাত্র কি দৈহিক এবং মানসিক বিপর্যয়?—এক কালের যে শিক্ষা-সংস্কার, রীতি-নীতি সেসবই বা চোখের নিম্নে কোথায় ভেসে নিরুদ্ভি হয়ে যায়? নগরের রাস্তায় যেই আমি নিজেকে জগতের কেন্দ্র অনুমান করে ভুলেও কখনো গ্রীবা সোঁজা করি না—সহজ গুণ্ডে সিগারেট ধারণ করি না—সেই আমিই কি না চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে অবিশ্বাসিত ঈশ্বরের কাছে নির্বেশ মুচ গ্রাম্য পুণ্যকামীর মতো এক কঁোটা কদমাজ দূষিত জল কপালে ঠেকিয়ে ডালি হাতে পাক্রি বেঁধে পুজো দিতে গেলাম?

কামাখ্যা-মন্দিরের অভ্যস্তর ভাগটা অভ্যস্ত অন্ধকার। মন্দিরে প্রবেশ করে সোঁজা ছুঁপা গিয়েই বা দিকের অন্ধকারে সিঁড়ি নেমে গেছে। একোণ ও-কোণে দেয়ালের গর্তে ছুঁটো-একটা প্রদীপ স্থিরভাবে জ্বলছে। কিন্তু সে-জ্বালোয় মন্দিরের আকৃতি তো ঘুরেব কথা পার্শ্ববর্তী যাত্রীর মুখও দেখা যায় না। সমাচ্ছন্ন অন্ধকারে ডালি হাতে নিয়গামী সিঁড়ির ধাপে পাক্রি বেঁধে ঝাঁড়িয়ে আছি,—পালা আসলে পুজো দেব। অন্ধকারটার বিস্তার যে কতদূর পর্যন্ত তা বুঝবার উপায় নেই। যাত্রীদের উল্লেখ্যে সে-যেন সজীব হয়ে উঠেছে। বার বার এ-পাশ ও-পাশ কিরছে মাথা কুটছে যেন নিজের অন্ধকার থেকে যুক্তি চায়! ঝাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে আজ্ঞে আজ্ঞে অপ্রতিরোধ্যরূপে ঐ অন্ধকারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছি। এত কাল ধরে অস্তিম সুখের মুহূর্তে সেই অনির্দেহ শক্তি প্রতিবার বাদ পেয়েছে, জয়ের পুরস্কার হিসাবে দিয়েছে পরাজয়ের গ্রানি, সাহস্যের পর এনেছে ব্যর্থতার অবসাদ—সেই শক্তিই যেন কামাখ্যা-মন্দিরের অন্ধকারের রূপ পরিগ্রহ করে আজ সামনে এসে ঝাঁড়িয়েছে, আলিঙ্গন করতে উত্তত হয়েছে। অনেক কাল পরে একটা অভ্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ অব্যাব্য বিষয় যেন প্রায় বুঝতে পারছিলাম; এত কাল বা বুঝে এসেছি তার সব যেন নিঃশেষে তলিয়ে যাচ্ছিল।

নিজের উপর আর নির্ভর ছিল না। অলোয়ন সজীব অন্ধকারের হাতে আত্মসমর্পণ করে বীরে বীরে নীচে নেমে যাচ্ছিলাম। যেন চেতনা থেকে অবচেতনের স্তরে, সান্ত থেকে অনন্তে, প্রবাহ থেকে সাগরে। ষানিকটা নেমেই যন্ত্রপারিসর একটু জায়গা। একটা ঘৃতপ্রদীপ জ্বলছে, পুজারীরা বসে আছে, যাত্রীরা একের পর এক পুজা নিবেদন করে নির্গমনের অন্ধকার পথে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। পুজা গ্রহণের জন্ত কোন বিগ্রহ নেই, শুধু সিন্দূর-চর্চিত ছুঁটোপারাক্রিত খাতব আবরণ শক্তির প্রত্যভু স্বরূপ কাঁড় করান। সতীর দেহের যোনিদেশ পড়েছিল বলে কামাখ্যাশিঠের যুগজয়ী খ্যাতি। পুজা নিবেদনের পর পাণ্ডা যখন সেই আবরণের দেহ থেকে সিন্দূর নিয়ে কপালে টিপ পরিয়ে দিল তখন মুহূর্তের জন্ত একবার দুর্জয় বাসনা হল আবরণ সরিয়ে অভ্যস্তরের সত্য প্রত্যাক করবার। কিন্তু সেইটে নিয়ম-বিসৃদ্ধ। তাছাড়া হয়তো ষানিককারী অন্ধকারের দক্ষ, হয়তো অল্প কোন কারণে ঐ দুই অল্পস্বিকিংনা মনে জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত দেহ-মন যেন কেমন অবশ হয়ে এল। অকস্মাৎ যেন একটা দুর্দমনীয় আভ্যন্তরীণ আকর্ষণে সাধের বাস্তবিক বন্ধনগুলো শিথিল হয়ে এল। হঠাৎ



মনে হল, একটা অন্তল গভীর কুশের অন্ধকারে অপ্রতিরোধ্যরূপে তলিয়ে বাচ্ছি। পূজা সাঙ্গ হলেও সেই গভীর আবরণ ছাঁটির দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মূর্তিবৎ ঠাঁড়িয়ে বসেলাম। প্রদীপের আলোর আবরণ ছাঁটি চকচক করছিল। একটু ঠাঁড়াতে না ঠাঁড়াতেই অকস্মাৎ আবার মনে হল, আবরণ ছাঁটি বৃষ্টি বতাই উন্মোচিত হয়ে বাবে।

হয়তো চ'ত, হয়তো হ'ত না। কিন্তু আর অপেক্ষা করতে না দিয়ে পাগু আমাকে হাতে ধরে টেনে মশিরা-প্রকোষ্ঠ থেকে বের করে আনল তাড়াতাড়ি। বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল যে আমার 'ঘোর' লেগেছে কি না, আমি প্রহস্টকে এড়িয়ে নির্বোধের মতো একবার হাসলাম, বার মানে হাঁও হতে পারে নাও হতে পারে। আমার ধারণা, আমি সে দিন সত্যি জবাবই দিয়েছিলাম।

ভাবান্তরিত অবস্থার নিজের মধ্যে, নিজের সত্যের নিজেকে হারিয়ে ফেলবার এই শেখোক্ত লক্ষণটি কিন্তু একমাত্র কামাখ্যারই বৈশিষ্ট্য। ভারত-ভারতের খুব সামান্য অংশই আমার পরিক্রমণের সুযোগ হয়েছে কিন্তু এর আগে কখনই কোথায়ও গিয়ে ভীষণ-চেতনার পরিপ্লুত হয়েছি তখনই অনুভব করেছি, যেন ব্যক্তিগত সঙ্গীর্ণতার কূল ছাপিয়ে এই ব্যক্তি-মণ্ডল আমিই অসীম ভূমায় পরিব্যাপ্ত। পুরোতে কাশীতে হরিবারে তুলনাধে সর্বত্রই এক দীক্ষা পেয়েছি যে, নিজের থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে না গিলে, বা বিকলে এই যে ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক আমি—এই আমার মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত মুক্তি নেই, শান্তি নেই। কিন্তু কামাখ্যার কথা এর ব্যতিক্রম, কামাখ্যার অভিজ্ঞতা ভিন্নতর, প্রায় বিপরীত। ভক্তকে কামাখ্যা বহির্ভূতের ভূমায় ছড়িয়ে দেয় না, অন্তর্ভূতের গভীরতার নিরুদ্ধ করে। ব্যক্তির ব্যক্তিচরী ইন্দ্রিয় বা বিপুল সঙ্গে কামাখ্যার কোন বিরোধ নেই। কামাখ্যার বিচারে ব্যক্তি-চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য ইন্দ্রিয় এক বিপুলী যুক্তির সোপানব্রহ্মণ। ব্যক্তির সামাজিক সত্তা, সাম্প্রতিক সত্তা, ভৌগোলিক সত্তা, ঐতিহাসিক সত্তা, এমন কি ধর্মিক সত্তারও অন্তরালে যে নিগূঢ় সত্তা—ইন্দ্রিয়ও বিপুল উপেক্ষা বা উচ্ছিন্ন করে নয়, সে সব অতিক্রম করে সেই সত্যের আশ্রয় গ্রহণেই ব্যক্তির মুক্তি, সেই সত্যের নিমজ্জিত ব্যক্তির সিদ্ধি।

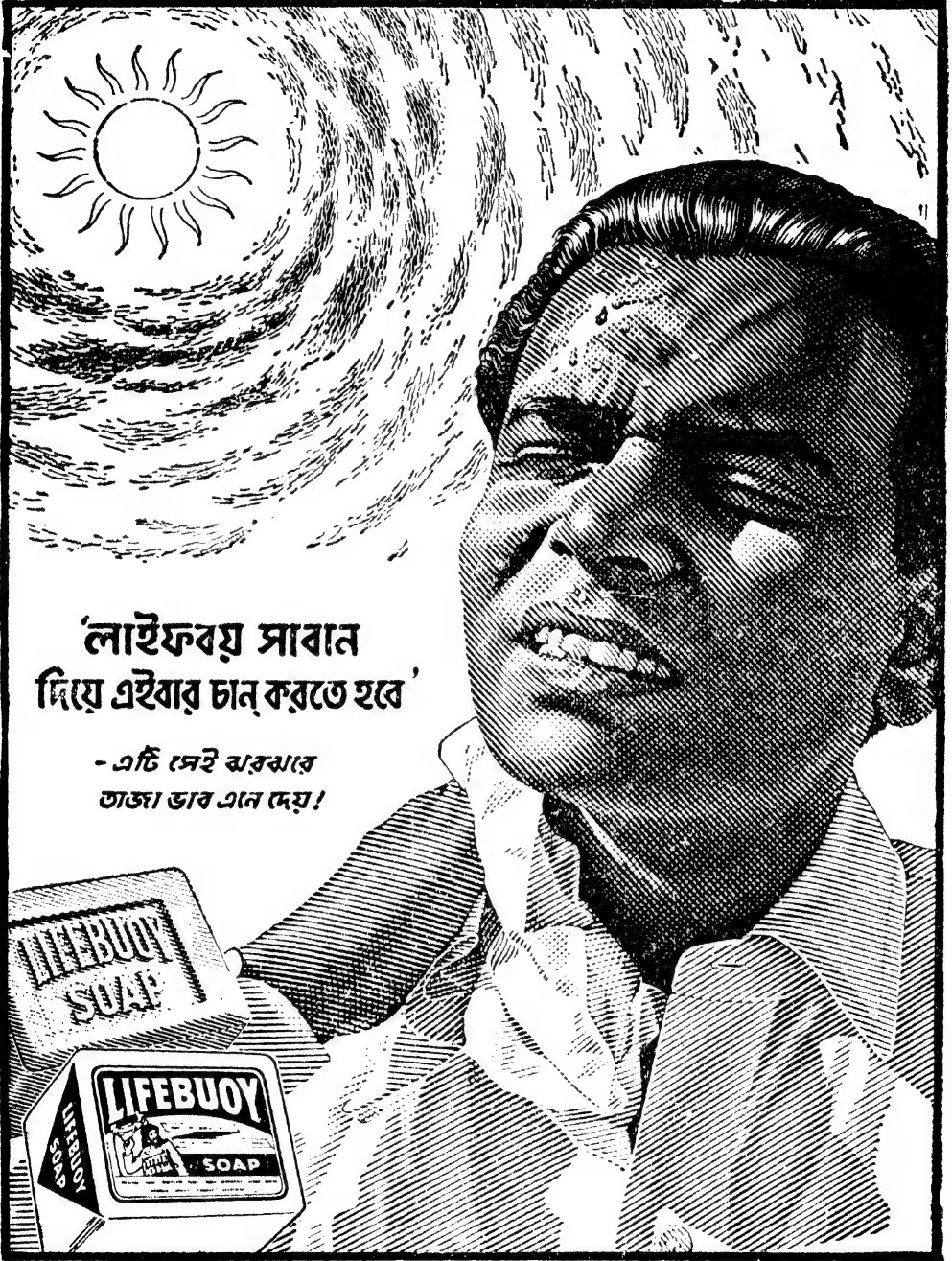
প্রাচীনতম কাল থেকে ভারতবর্ষের উপাসক-সম্প্রদায় বুখাত ছুই সাধন পদ্ধতিতে সাধনা করে আসছেন—শৈব এবং শাক্ত। এই দুই সাধন পদ্ধতির রীতিনীতি আচার-উপচার সব কিছু শুধু বিভিন্ন নয়, প্রায় পরস্পর-বিরোধী। অথচ হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বোধে জৈন ইসলাম বা খৃষ্টধর্মের যেমন যুগে যুগে সংঘর্ষ হয়েছে তেমন কোন বৈরিভাব এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কালেই দেখা যায়নি। ছুটো মনে সমান্তরাল রেখা,—দুই বর্ষ বয়স রেখে যে বার পথে চলেছে ; হয়তো অনন্তে গিয়ে মিশবে বলেই। কিন্তু অল্প কোন গুচতর যুক্তির অমুপস্থিতিতে এমন অবস্থা ইতিহাসের যুক্তি-বিরুদ্ধ যে, ছুটো পরস্পর-বিরোধী সাধন-ধারা একই দেশে একই সঙ্গে একে অপরের উপর সামন্ততম প্রভাব বিস্তার না করে সমান জনপ্রিয় থাকবে। এমন অবস্থার সত্যতা অনুসীকার, এমন অবস্থার যুক্তি কি? যুগান্তিযুগ ধরে বেসব বড়ী কাশী গেছে বা কামাখ্যার এসেছে, তারা কিন্তু এই যুক্তি খুঁজে বিভ্রান্ত হয়নি কোন দিন—হয়তো সে

যুক্তি তারা আপন আপন সত্যের কান পেতে শুনে থাকবে। কিন্তু এই যুক্তির আভাস আজ-কাল পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদেরও নজরে পড়ছে, এই বোধি-গ্রাহ্য যুক্তি অস্বীকার করা তাদের পক্ষেও প্রতিনিয়ই অধিকতর শক্ত হয়ে উঠছে। স্বাধীন ভাবে কিন্তু সর্বাংশে প্রাচ্যের অনুরূপ ব্যক্তি-চরিত্রের বেসংজ্ঞা জমাণ মনস্তত্ত্ববিদ সি, জি, হুড গ্রথিত করেছেন তার গ্রন্থবোধ্য কোন প্রতীবাদ আজ পর্যন্ত উজ্জারিত হয়নি। পাশ্চাত্যের প্রতিনিয়িত্বানীর গুণী ব্যক্তির সত্যই আজ নিঃসংশয়ে একথা স্বীকার করেন যে, জীবনকে দেখবার মূলতঃ দুটি দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের আছে। একটির নাম ঔরা স্থির করেছেন 'এক্সট্রাভার্ট', অর্থাৎ বহিঃস্থী, —আমরা আমাদের প্রাণ্য ভাবায় থাকে বলি শৈব। অপরটির পশ্চিমী নাম 'ইনট্রাভার্ট', অর্থাৎ অন্তঃস্থী,—ভারতীয়রা থাকে এত কাল শাক্ত বলে এসেছে। ছুটো সমান্তরাল রেখা—যেন গলা আর বন্ধ—যে বার পথে বেরে চলেছে ; অন্তে সেই অসীম অপার সমুদ্র—সেখানে সবাই এক।

দারিদ্র অপেক্ষাকৃত অল্প বলে এবং প্রত্যাবর্তনের পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ নয়—তদুপরি যুগের অন্তর্ভুলতায়—শৈব সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক অজ্ঞতা সত্ত্বেও সেই ধারার সঙ্গে একটা ব্যবহারিক পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে। মাঝে মাঝে শাক্ত আকর্ষণও আমরা সবাই আমাদের সত্যের অন্তরব করে থাকি ; কিন্তু সেই শক্তির আভাসই এত ভয়ঙ্কর যে তাকে একটা শক্তি বলে স্বীকার করে ভয় করবার সাহস এবং বিশ্বাস ছুই চার জন ক্ষণভঙ্গা পুরুষ ভিন্ন বড় বর্তে না। সেই আকর্ষণ বন্ধন আমাদের ধারে এসে পৌছায় আমরা তখন আর্থিক অনটন, কর্মহীনতা, বোন-অভ্যুপ্তি, রাজনৈতিক অসন্তোষ ইত্যাদি খুল এবং সমাধানবোধ্য কতকগুলো সমস্যার বালুতে উটপাখীর মতো মাথা লুকিয়ে সেই শক্তিকে অস্বীকার করি। তার আকর্ষণ বিশবধগামী করি। কিন্তু কামাখ্যার মন্দিরে শক্তিমাতার প্রকোষ্ঠে বন্দন সেই আকর্ষণ টেনে ধরে তখন আর পালাবার কোন পথ থাকে না। তখন আমাদের 'ঘোর' লাগে। সেদিন সেই ভূতল গর্ভের অন্ধকারে কুঠীরে আর কিছুকাল ঠাঁড়িয়ে থাকলে পরিণাম কী হত তা অনুমান করাও অসম্ভব। পাগু ঠাঁড়ুরের সম্ভবতঃ তা জানা ছিল,—হাত ধরে টেনে তিনি আমাকে সেই সজীব অন্ধকারের হৃদয় আলিঙ্গন থেকে তিনিয়ে বাটরে নিয়ে এলেন।

মূল-মন্দির থেকে উঠে নাট-মন্দিরে যাবার পথে একই ছাদের তলার ছোট একটা ঘর আছে। ঘরটি পাণ্ডাদের বিশ্রাম স্থানব্রহ্মণ। ঘরের চতুর্দিককার দেয়ালে হেলানো, শোয়ানো ঠাঁড় করাও অবস্থায় কচিসৌন্দর্য কমনীয়তা এবং বাস্তবতা বজ্জিত অল্প কিছুতুকিমাকার মূর্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। পাণ্ডাকথিত অর্থোক্তিক কিম্বদন্তীর সূত্রে প্রত্যেকটি মূর্তিই পৌরাণিক যুগের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত। একটা মূর্তি কেবল অর্ধাটান,—ঘটিত এরও বর্ধাৎ বয়স নিরূপণ করবার কোন বিজ্ঞানসম্মত উপায় নেই,—মূর্তিটি কোচবিহারের রাজা গুরুজ্ঞানের। খেত পাখের খোদিত ভাবলেশহীন মূর্তিটি ঘরের এক কোণে নিঃসঙ্গ ঠাঁড়িয়ে আছে। এমন ব্যক্তিহীন নিরপেক্ষ মূর্তি যে প্রথম নজরে চোখেই পড়ে না ; অথচ সেই নিরপেক্ষতা এমনই ভীষণ অলক্ষ্য মনে একটা অনশনের দাগ কেটে যায়। চিহ্নটা ক্রমে ক্রমে মতো বাড়তে থাকে, অনুরূপ ফুটে থাকে কাঁটার মতো।





L 259-X52 BQ

ভারতে প্রস্তুত

ঘরের মেঝেতে নানান আকৃতির গোলকজাতীয় একরকম বাতব্র হুড়ানো। আমাকে টেনে এনে খাস কেলবার সময় না গিয়েই পাণ্ডাঠাকুর চরিত চরণের মতো বলতে শুরু করলেন যে, এই সব বাতব্র প্রতি অমাবস্তার রাত্রিতে বাজানো হয়,—রা তখন এই বাতের তালে তালে আপন প্রকোষ্ঠে নর-নৃত্য করেন। প্রতি অমাবস্তার রাত্রিতেই এই নৃত্যানুষ্ঠান হয়।

“আপনি কখনো দেখেছেন মা'র নৃত্যানুষ্ঠান? বা কি দেখে গারপ করেই নৃত্য করেন?”

“হি, মা'র নরনৃত্য কি সন্ধানের দেখতে আছে? সে পাণের বে প্রায়শ্চিত্ত নেই!” রক্তবর্ণ নিমিলিত চক্ষু প্রসারিত করে ভৎসনা করতে গিয়েই পাণ্ডাঠাকুর যুহু হেসে এই ঠক্কত মার্জনা করলেন। “তাছাড়া সেই নৃত্য দেখবার ক্ষমতাই বা মানুষের কোথায়? হলে বলে নানান কৌশল করে নানান মুখোশ পরে সইয়ে সইয়ে মা মাঝে মাঝে সামান্য একটু আভাসে সন্ধ্যা দেন, তাতেই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে বাই। স্বরূপে তাঁকে দেখবার চেষ্টা করলে যে পাথর হয়ে বাব, মহারাষ্ট্র গুরুপ্রবক্তার মতো। সেই বীভৎস সৌন্দর্য দেখবার ক্ষমতা রক্তমাংসের মানুষের নেই।”

প্রতিভূ সমীপে অবিশ্বাস ভরে গুলোটি কু নিবেদন করতেই যে ‘বোর’ লেগেছিল তার বেশ তখনো পুরোপুরি কাটেনি, অতএব অক্ষমতার ভয়ে ভীত হবার দায় আমার ছিল না। আমি ভাবছিলাম, মা স্বয়ং যদি নরনৃত্যে সজ্জিত না হন তবে আমার পক্ষে তা দেখা কেন অবৈধ হবে? কিন্তু প্রায়টা মনে মনে শত বার মাড়াটাড়া করেও, একবার উচ্চারণ করতে আমারই কেমন সঙ্কোচ লাগছিল, চেতনার উপরিভূতের বিস্ফোট সন্ধ্যা, অজ্ঞানে যেন অস্পষ্ট বৃত্তে পারছিলিলাম এই আলঙ্কারিক নরনৃত্যের আক্ষরিক নিগূঢ় অর্থ।

ইতিমধ্যে পাণ্ডাঠাকুর একটির পর একটি মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রীতি-অমুখারী সেই সেই মূর্তির সঙ্গে সংযুক্ত কিম্বদন্তীগুলো এই পাণীর পাণমোচনার্থে বিবৃত করে তুলছিলেন। ভারতের প্রতি তীর্থেই কিম্বদন্তী দিয়ে গড়া না হলেও কিম্বদন্তী দিয়ে ঘেরা। কামাখ্যা তীর্থেও এর ব্যতিক্রম নয়। এই গল্পকথগুলো এক অতি অদ্ভুত জিনিষ। এগুলোর কাহিনী কোতুলকোদোপক নয়, বাস্তবতা প্রোতার সমবেদনা আকর্ষণ করে না, রুচিব বালাই নেই, সৌন্দর্যের লেশশূন্য, সম্ভাব্য অসম্ভাব্যতারও দায়মুক্ত—অথচ এগুলোই যুগের পর যুগ ধরে প্রতিদিন শত সহস্র বার একঘেরে বৈচিত্রহীন কাণ্ডে বিবৃত হচ্ছে; বিশ্বাস করে বা না করে লক্ষ লক্ষ বাকী এই সব গাঁজাখুরি গল্পই শুনেছে সপ্রাচুরিতে। এই গল্পগুলোর উৎসের কথা ভাববার চেষ্টা করলে বিষয় লাগে। স্তম্ভ বা বিকৃতমস্তিষ্ক কোন মানুষের পক্ষেই এমন গল্প উদ্ভাবন করা সম্ভব বলে বিশ্বাস হয় না; অথচ উদ্ভাবিত না হলে এগুলো এল কোথা থেকে?

আগেই বলেছি যে, তীর্থযাত্রা—বিশেষতঃ কামাখ্যা-পীঠের মতো নিবিষ্ট তীর্থে পদার্পণ করলে আমাদের মতো পাকাতা শিক্ষার শিক্ষিতের চেতনা কতকগুলো স্পষ্ট ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আমারও একটা চেতনা ব্যত্ ছিল পারিপার্শ্বের আলো শব্দস্বত্ব থেকে কতটা জ্ঞান আবার কিরে এসেছে ও আসছে তার হিসেব করতে।

অপর চেতনা কিছুকণ আগেকার সেই অন্ধকার অভিজ্ঞতার বার বার সত্তর্পণে ছুঁ দিয়ে বৃত্তে চেষ্টা করছিল যে, সেই অভিজ্ঞতা সত্য কি সঙ্কার? তৃতীয় চেতনা আবার এই অভিনব জগতের সঙ্গে আমার পুরাতন নাগরিক জগতের তুলনামূলক বিচারে হত ছিল। এই সব এবং আরও অল্পস্পষ্ট-অস্পষ্ট চেতনার টানা-পোড়েনে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলাম না। তা ছাড়া পাণ্ডাকথিত এই ধরণের কিম্বদন্তী কাহিনী আমার অনেক শোনা আছে—সেদিকে কর্ণপাত নিশ্চয়োজন। কিন্তু ঠাণ্ডা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা চেতনা অত্যন্ত ক্রীণ অহুত্বভিতে যেন স্পষ্ট আভ্যনাদ করতে শুরু করল। অকস্মাৎ আর কোন সন্দেহ রইল না যে, এই সব গাঁজাখুরি গল্পকথার মধ্যেই আমার অল্পস্পষ্ট পরম সত্য চিরতরে হারিয়ে ফেলেছি। কবে কোন বিস্মৃত যুগে এক অসীম শক্তিশালী ক্ষণজন্মা পুরুষ জগৎ-জন্মান্তরের সাধনার ফলস্বরূপ, এক পরম সত্য উচ্চারণ করেছিলেন। সাধাবশেষ সেই সত্য বুঝবার সাহস নেই, সাধনা নেই,—সেই সত্য উপেক্ষা করতে গেলে শ্রদ্ধা এসে বাধা দেয়;—তখন যুগের পর যুগ ধরে চলল সেই নিষ্ঠুর সত্যের চতুর্দিকে শর্করার মতো গল্পকথার প্রলেপ-মার্জনা। ক্ষণজন্মার সাধনার ফল আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিতরণযোগ্য করবার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। ক্রমে ঐতিহ্যের আধরণ সত্যের নিষ্ঠুরতা ঢাকা পড়ল। আজও যে সব সম্মিত বাকী এই ঐতিহ্যধারা অমুসরণ করে তাঁরো আসে, তারা হয়তো আপন আপন অজ্ঞতা সন্ধ্যা সেই সাধনার ফলে অমর হয়ে যায়। আমরা বার বার চাইই না করে কোন জিনিষে বিশ্বাস করি না, আমাদের কাছে সেই সত্য চিরতরে হারিয়ে গেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনির্দেহ এক স্তম্ভ ধরে কেন প্রতিজ্ঞাতি আসছিল যে, ঠিক সাধনা নয়, একটু চেষ্টা করলেই সে সত্য নিজে থেকেই বৃত্তে পারব। অথচ তখনই আবার মনে পড়ছিল, তিন দিনের মধ্যেই সেরেস্তার রাশে টান পড়বে। যদিও মনে-প্রাণে সর্কসংগী বৃত্তে পারছিলাম যে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে বসে আছি। অমন বিস্মৃত অসহায়তা আজ সত্য বা সত্ত্ব বলে বিশ্বাস করতে নিজের কাছেও কেমন যেন বাধ-বাধ লাগে।

যিনা বিরতিতে কিম্বদন্তী কথা বলতে বলতে পাণ্ডাঠাকুর একটির পর একটি মূর্তি অতিক্রম করে অবশেষে পূর্বাভাগিত মহারাষ্ট্র গুরুপ্রবক্তার মূর্তির সামনে এসে দাঁড়ালেন। মূর্তিটা তখনও তেমনি বিমূর্তের মতো দাঁড়িয়ে আছে,—তার নিরপেক্ষতার সাক্ষ্যমক ব্যঙ্গনা তখনো আমার সজ্ঞান-চেতনা স্পর্শ করে নি। কিন্তু তবু মূর্তিটার সামনে এসে দাঁড়াতেই আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিস্ফোট যেন হুহুর্ভের গুহ্র নীধর হয়ে গেল।—প্রথমটায় কিছুই বৃত্তে পারলাম না, কান শেতে খাস কড় করে শুধু শুনলাম, মহারাষ্ট্রার কল্পদাত্রী বীভৎস কাহিনী।

গুরুপ্রবক্তা ছিলেন কোচবিহারের মহারাষ্ট্র। কেবল পদাধিকারেই নন, পৌর্ধে-বীর্ধে চোহারী-চরিত্রে চলনে-বলনে অমন বোল আনা মহারাষ্ট্রা ইতিপূর্বে কখনো কোচবিহার রাজ্যের রাজ্যাসন অধিকৃত করেন নি। মহারাষ্ট্রা ছিলেন একক এবং অনন্ত।

কিন্তু ওই পর্বত; মহারাষ্ট্রা গুরুপ্রবক্তা বা তাঁর রাজত্ব সম্পর্কে পাণ্ডাঠাকুর আর কিছু বলেন না, হয়তো আর বিশেষ জ্ঞানেনও না। এই আংশিক পরিচয়ে প্রোতার ঐতিহাসিক তৃষ্ণা সত্ত্বত অনেকে

অজুগ থাকে, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষাও হয়তো মহত্তর তথ্য আছে, বার পক্ষে ঐ আংশিক পরিচয়টুকুই যথেষ্ট। তখনতে তখনতে আমার তো অন্তত মনে হ'ল যে, ঐ রাজা গুরুপন্থের সঙ্গে নিজের বেনে কোথায় একটা অস্বাভাবিকতা আছে। ঠিক আমারই মতো, প্রত্যেকের মতো, গুরুপন্থও একক এবং অনন্ত।

সিংহাসনে আরোহণ করেই মহারাজা গুরুপন্থ মনঃসন্নিবেশ করলেন রাজ্যভ্রমের সিকে। একে একে আশে-পাশের ছোট-বড়ো সব রাজ্য গুরুপন্থের বজ্রাত্মক স্বীকার করলো। সিংহাসন অধিকারের অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে এই প্রাগৈতিহ্যবাহু প্রদেশও মহারাজার বশীভূত হল। কিন্তু রাজ্যভ্রমের এই উদ্দামনা বেশি দিন স্থায়ী হল না; তার প্রধান কারণ, নিজ জন্মভূমি থেকে কখনো অধিক দিন দূরে প্রবাসী থাকার সই ত না মহারাজা গুরুপন্থের। কারণ-অকারণে তিনি রাজধানীতে ফিরে আসতেন; কখনো কোন রাজ্য সম্পূর্ণ বজ্রাত্মক স্বীকার করবার আগেই, আবার কখনো শত্রুকে সুযোগ্য দমন না করেই। অবশেষে একবার যে এলেন, তার পরে আর নতুন কোন অভিযানে আবার নাম করলেন না।

অপ্রতীত অবস্থায় আমার আবারও বেনে মনে হ'ল, অনেকটা ঠিক আমারই মতো। গুরুপন্থের সুযোগ আমার ছিল না সত্য, কিন্তু প্রথম যৌবনের নব উদ্দামনার প্রেম, স্বাদেশিকতা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবাদ, সাম্যবাদ লোকহিতৈষণা কত শত রাজ্য-ভ্রমের সে কি অন্য উৎসাহ! এক এক বার এক এক পথে বাই, কিছুদূর গিয়েই আবার ফিরে আসি; সাক্ষ্য অসাক্ষ্যের প্রতি দ্রুত পুনরায় ফিরে আসি; আবার কুন্দের কথা মরণ করিয়ে দেয়। প্রতি বারই বেনে রাজা বা বেন্দা বা পুরোহিতের ভূমিকার অভিনয়ের পর সাজসজ্জা খুসে আবার যেই আমি ঠিক সেই আমি। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তখন আবার আপন আবারে আত্মানন্দ করতে প্রত্যাগমন।

রাজ্যভ্রম পূর্ণ সমাপ্ত হতেই মহারাজা গুরুপন্থের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটল। এখন তিনি সুবিশাল কোচবিহার রাজ্যের মহারাজা—পূর্বের সখম গেল বিলাসের প্রোভে ভেসে, বাড়িচারের সংঘাতে চারিত্রিক সূচনা হল চূর্ণ-বিচূর্ণ। নর্তকীর নৃপুং নিকশে অস্ত্রের স্বনবনা স্তম্ভ হয়ে গেল। প্রজাদের

স্বধর্মবিহার প্রতি নজর রাখবার আর সময় হয় না; রাজ্য থেকে শান্তি নির্ধারিত হল, শৃঙ্খলা বিধায় নিল। যে অপরিমিত বেগে রাজ্য গুরুপন্থ এককালে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতেন এখন তার চাইতেও বিপুল বেগে ভেসে চললেন বাড়িচারের পঙ্খিল প্রোভে।

অর্থাৎ ঠিক যেমনটি ঘটবার। জীবনের সহজাত বার্ষিক আত্মনাশ চাপতে হবে, বাড়িচারের পাশবিক কোলাহলে। পরাজয়ের ক্ষত চাকতে হবে কতকগুলো আপাত স্বয়ংস্ফুট ক্ষত সর্বাঙ্গ নিজের চোখের সামনে ধরে রেখে নিজেকে শিউরে দিয়ে। এক কালের সে কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা কত কল্পনাকৃত উচ্চাভিলাষ,—হঠাৎ একদিন রাত প্রভাতে দেখা গেল সব ভিত্তিহীন, রাত্রির শেষে রত্নিন অলীক স্বপ্নও সব শেষ। জানা গেল যে আসলে কোন দিনই কোথায়ও বাচ্ছিল্য না, কোন দিন কোথায়ও আবার কোন উপায়ই নেই। যেই 'আমি'কে কেন্দ্র করে এত সব, সেই আমিও নিকষ কালো শূন্যতার মধ্যে একটা নিছক শূন্য। কোন পরিচয় নেই, কোন স্বাক্ষর নেই, কোন নাম পর্বন্ত নেই! ভরাটুটির পর অকূল পাথার সমুদ্রের মধ্যে একটা বুদবুদের মতো ভাসছি,—ফেটে গেলেই সব শেষ! এমন শূন্যতা স্বীকার করবার সাহস নেই, উপেক্ষা করবার ঔদ্ধত্য ভেঙে গেছে, অতিক্রম করবার সামর্থ্যের অভাব, সাধনা নেই বলে। অতএব অগত্যা পলায়ন,—যে দিকে চোখ যায় না সে দিকে চোখ না চায়। অতএব অগত্যা রসনা লালিত করে জীবনের ভিজত্যা বিষময়।

কিন্তু রাজ্য করা তো জল থেকে ডাঙার উঠে দাঁড়ান নয়, যে জল আর স্পর্শ না করে আপন পথে বয়ে বাবে। রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগে পার্শ্ববর্তী জনৈক পরাক্রমী রাজা কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করলেন। একটা বিলুপ্ত রাজ্যও হল না, প্রজা সৈন্তসামন্ত সবাই প্রান্তর ছিল, প্রথম সুযোগেই সবাই আত্মসমর্পণ করল। শুধু নিজের প্রাণটুকু নিয়ে মহারাজা গুরুপন্থ আপন রাজ্য থেকে পালিয়ে এলেন। পালিয়ে এলেন এই কামাখ্যারই পার্শ্ব অরণ্যে।

যেমন আমি আজ এসেছি, কিংবা উদ্ভবের মতো অগ্রপশ্চাদ্য না ভেবে বায়ে বায়ে গেছি ভারতের বিভিন্ন তীরে। যুগ্য ক্ষুদ্র পাশবিক জীবনের পাশ থেকে মুক্তি পাবার মূঢ় বার্ষ প্রয়াসে, কিন্তু মহারাজা গুরুপন্থকে যিনি রাজ্যত্যাগে বাধ্য করলেন সেই পরাক্রমীর নামই বা কী, রাজ্যই বা তার ছিল কোথায়, সে সম্পর্কে পাণ্ডাঠাকুর সম্পূর্ণ



মাথার খসড়া ড্রাগিভেটন  
একবার চক্কু পরীক্ষা করান না কেন?



ক্যালকাটা অপ্রটিক্যাল  
কো: প্রাইভেট লিমিটেড  
প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু এম.বি.

ফোন:—৫৫-১১১১; ৪৫, আমলফার্ম ফ্রীট • কলিকাতা-৯

দীর্ঘ—বেন সম্পূর্ণ উদারীন। অল্পবয়সের অবকালে আগন্তকের পক্ষে আগ্রাসীকে চেনা সহজতর হয়। অন্তত আমি তো স্পষ্ট বুঝতে পারিলাম যে এই আগ্রাসী আমার অপরিচিত নয়; আমারই সত্যের অংশ সহজাত বিরোধী,—পরাজয়ের ক্ষেত্রে যে জয়ন্তিলক জাঁকে সাক্ষ্যের উপর আনে বার্ষিকতার কালো ছায়া, মাহুবকে যে স্নাত্ত্য করে রাখে চিরকাল ক্রমেই চিরচঞ্চল চির-অস্থির বিদ্রোহী, বৌগীকে কে ভোগী করে—ভোগীকে বৌগী। এর দ্বারা নেই, ক্রমা নেই, নীতি নেই, ডালায়মক বোধটুকুও নেই। কোন দিন কারো ক্রোধ এ শক্তি ধরা দেয়নি, ডালায় একে ধরতে যাওয়া বাতুলতা।

সেই অবশেষে স্বরূপ আমার আজ কল্পনাও করতে পারি না। জনবসতিস্থান খাঁরসকুল সেই মহারথো রাজ্যহারা মহারাজা গুরুদেব নিঃসঙ্গ পাশিয়ে বেড়াতে লাগলেন। জীবন ধারণের সামান্যতম অন্তর্বিধাটুকু বার সইত না, তিনিই এখন সাপের নলর এড়িয়ে গণ্ডারের ধূসর বাটিরে যদি একটা খরগোশ হারতে পারেন তো ক্ষুধিত করেন; নচেৎ দিনের পর দিন চলে উপবাস। কোন দিন বা বাণের তুচ্ছাবশিষ্ট গোমাসে পুষ্টরক্ষা হয়। এমন সময় একদিন অনাহারে কূল অনিষ্টায় ব্লাস্ত বার্ষিকার স্কন্ধ মহারাজা গুরুদেব হতচেতন হয়ে একটা গাছের তলার গুহে পড়লেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, কোপে কাড়ে অন্ধকার দানা বেঁধে উঠছে—রাত্রির আশ্রয় খুঁজবার সময় অতিক্রান্ত প্রায়। দিনের নিবীহ জীব সব মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে; একটু পরেই হিংস্র ঋণশবের সুগঠ চোখে অন্ধকারে অল অল করে উঠবে, আকাশ কাঁদবে শব্দন শাবকের নিদ্রা আর্তনাদে। কিন্তু মহারাজা গুরুদেবের আর ভয় পাবার মতো শক্তিটুকুও অবশিষ্ট ছিল না। ঘুমে বা পাশ কাটিয়ে বা মধ্য দিয়ে পলায়নের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে; গুরুদেব দীর্ঘ খানটুকুও না ছেড়ে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন নিয়তির হাতে। মুহূর্তমধ্যে ব্লাস্ত মহারাজার সমস্ত বাইরের চেতনা লুপ্ত হল। অবশেষে রাত্রি বিপ্রহর হলে দিবা জ্যোতিতে মা আবির্ভূত হলে মহারাজার সামনে। ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ধার বন্ধ করে তিনি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন মায়ের মুখের দিকে। আন্তে আন্তে সেতে শক্তি সকার হতে থাকল; রাত্রির শেষ প্রহরে একটা মন্দির গড়ে দেবেন বলে প্রণয় করবার পর শক্তিমাতা অন্তর্হিতা হলেন। মহারাজ গুরুদেবের দেহে তখন আর স্নানির কণাটুকুও অবশিষ্ট নেই,—তৎমুহূর্তে তিনি রাজ্যভিষুখে অগ্রদর হলেন। তিন দিন তিন রাত্রি একাদিক্রমে হেঁটে আপন রাজ্যে এসে পৌঁছলেন—মায়ের কৃপায় সাত দিনের মধ্যে বাবার সিংহাসনে আরোহণের পরেই প্রতিজ্ঞাবাহারী মায়ের বন্দী নিরাপদে আবেশ গিলেন।

সেদিনের সেই কামাখ্যা-ভীর্ষের অভিজ্ঞতা লিপিতে স্কন্ধ করবার সময়ই সাংগের অস্ত ছিল না, সাক্ষাতে এখন কলম অঙ্ক হয়ে আসছে। কলমের ভাষা নিতান্তই বিজ্ঞানের ভাষা। ইন্দ্রিয়ের সব কথাও সর্বদা তার মুখে জোগায় না। আর চেতনার একেবারে প্রান্তদেশে পৌঁছে ব্যক্তির মানসিক আবেগ বধন বিকোন্ডের প্রাবল্যে সম্পূর্ণ নীর্থর হয়ে যায়—যুক্তি-অযুক্তি শালা-কালো সরল-অটল সব বধন একাকার, বধন জগতের সমস্ত পরস্পর-বিরোধী, ভাব একটা এক তানে আকাশ-বাতাস নৈশক্ষেপে ঘূর্ণিত করে ফুলে; তখনকার সেই আনন্দ সেই আবিষ্কার কথা কলমের একজার উচ্চারণ করা যায় না। জয়জয়ন্তের সমস্ত বিভিন্ন আশ্রিত

তাদের বাবতীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি মুহূর্তে এসে জড় করে ঝাঁড়িয়েছে। এক কাল ধরে এবং এক কালেরও আগে অনন্তকাল ধরে বা কিছু দেখেছি তখনই ডেবেছি, কত কিছু আশা-আদর্শ হতাশা-শোক প্রাপ্তি-বন্ধনা সব এসে জড়ো হয়েছিল এই একটি অনন্ত মুহূর্তে। একটি একটি করে স্মৃতি ধুলে বয়নশিল্পের কারিগরী দিকটা হয়তো বোঝানো বার কিন্তু তাতে লজ্জা নিবারণিত হয় না। স্মৃতি মেলে এগুলো অনন্ত কাল পরেও অনন্ত মুহূর্তে সমান হতে থাকবে। মাহুবেব ডালা মাহুবেব চাটতেও হুর্ল। ঐক্যতানের প্রতিটি তান বিচ্ছিন্ন করে তবেই ডালায় গ্রথিত করা বার কিন্তু সেই বিবরণ লত বার পাঠ করলেও ঐক্যতানের স্বরূপ তা থেকে লুপ্তহীন হয় কি?

কিন্তু এরচমার সত্য্য পাঠকমাত্রতেই যদি আশ্চর্য বলে ধরে নেবার কোন অসুবিধে না থাকতো তবে উপযুক্ত বিলাপোক্তির কোন প্রয়োজনই ঘটত না। শক্তিমাতা আবির্ভূত হলে, বর গিলেন এবং প্রণামী গিলেন,—বিধানীর কাছে এসব কথার কোন অবিখ্যাত অভিনবব নেই। কেন না, যা যে চূর্ণিত-নাশিনী সেকথা তাদের কাছে স্বতঃপ্রসূ—এই সহজ কথার নিগূঢ় গুরুত্ব উপলব্ধিতে তাদের ঐতিহ্যলব্ধ ক্ষমতা। ঐতিহ্যলব্ধ হয়ে সেক্ষমতা আমি হারিয়েছি অনেক দিন, তবুও সেদিনের সেই সাময়িক অগ্রস্তত্বভিত্তির পাণ্ডার কথা শুনেও এবং হয়তো বুঝতে আমার কণামাত্রও অসুবিধে হয়নি। দিব্যজ্যোতিতে মা আবির্ভূত হলে এবং ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ধার বন্ধ করে মহারাজা একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন মায়ের মুখের দিকে—একবার নিগূঢ় ব্যঞ্জনা আমি সেদিন এমন নিঃশব্দে বুঝেছিলাম যে, সমস্তলে নেমে এসেও অযৌক্তিক বলে তা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই, কিন্তু যে সত্যের যুক্তি কেবল অমুভূতিগ্রাহ্য তা অনস্বীকার্য হলেও ভাষায় তাকে কি করে গাঁথব? অপরকে সেসত্য বোঝাবো কেমন করে?

কিন্তু কেমন হয়, কোন একটা বিষয় নিয়ে জনবরত ভাবনা চলতে থাকলে তখন সজীব নিকীর্ষ সব কিছুই সঙ্গেই সেই বিষয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আবির্ভূত হতে থাকে, তখন সব সঙ্গীতেরই ঐ এক সুর, সব সাহিত্যেরই ঐ এক ব্যঞ্জনা। কিবা হয়তো ঐ ব্যঞ্জনার সাহিত্যই তখন চোখে পড়ে, ঐ সুরই কেবল কানে বাজে। কামাখ্যা থেকে প্রত্যাগমনের পরেও ঐ অবিখ্যাত অভিজ্ঞতার বাস্তব ভিত্তি যে কী হতে পারে মুহূর্তের জন্ত সে-চিন্তা থেকে রেহাই ছিল না। আর বেন অনেকটা দৈবযোগেই ঠিক এই সময়ে পি, ডব্লু মার্টিন রচিত এক্সপারিমেন্ট ইন ডেপ্ট গ্রন্থখানা হাতে এসে গেল—বসিও কোন কালেই আমি মনস্তত্ত্বের ছাত্র ছিলাম না। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরবর্তী অধ্যয়নের যোগসাধন করে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেবার অক্ষমতা স্বীকার না করলেও বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে সেই পরিসরের অভাব। তবে গ্রন্থখানা একবার উন্টে দেখলেই উৎসাহী পাঠকের বুঝতে বিলম্ব হবে না যে, অশিক্ষিত অমার্জিত সন্দ্বারাজের হিন্দুরা যুগান্তিযুগ ধরে শক্তিমাতা বলে বা'র পায়ে পূজা নিবেদন করে এসেছে আজকের পশ্চিমী বিপ্লবজনেরা অনেক ঘরে মাথা ঠুকে অবশেষে পথ হাতড়ে হাতড়ে সেই চরণেরই কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। বসিও তার স্বরূপ এখনো বোঝেনি, তবুও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করছে পূর্ণমাত্রায়। কেউ তাকে 'আনকনশাস' বলে ডাকেন, কেউ বলেন ব্লাস্ক ম্যাডোনা, কেউ বা শ্রেয় লিভিং মীথ।

সবাই স্বীকার করেন যে, এই শক্তি বীভৎস এবং এই শক্তি হুমকি—মামুষ বেকোন মামুষ সব মামুষ এই শক্তিরই দাস মাত্র। প্রত্যেক মামুষের এ-শক্তি চার দিকে একবার নরন মেলে চার, তার সামাজিক বন্ধন—সামাজিক রীতি-নীতি বোধ সমেত—খসিত হয়ে বার সেই যুদ্ধে। এই শক্তি ফকিরকে যেমন কখনও মধ্য রাজা করে দেয় তেমনি রাজাকে করে দেয় ফকির; দুর্বলকে এ বলশালী করে বলবানকে করে পঙ্ক। এই শক্তির এক প্রকৃষ্টিতে মামুষ পশুর দ্বারে নেমে আসে; এই শক্তি বাস্তবকে মামুষ মাত্রেই পঙ্ক। ঠোঁট আরও আবিষ্কার করেছেন যে সাহস না থাকলে বা ক্রমতার অভাব ঘটলে, অর্থাৎ আঘাত হাকে সাধনার অপ্রতুলতা বলে এসেছে এত কাল তা নিয়ে এই শক্তির সম্মুখীন হবার দুর্ভাগ্য যদি কোন দুর্বল মামুষের হয়, তবে সে পাগল হয়ে যেতে বাধ্য—সামাজিক রীতি অনুযায়ী আনন্দ্যিক অর্থে যুক্তা তার হবে। পেলেকস, পলি, পিকউটক তখন যে, স্থানসন্নি, ট্রাউডেকে স্থান ছেড়ে দিয়ে বিদায় নেবে। অপার পক্ষে যদি তার সাহস থাকে সাধনা থাকে তবে এই শক্তিকে অবিগত করে সে অসীম শক্তির অধিকারী হবে।—স্বয়ং বহীশ্রনাথ কেমন একদিন হয়েছিলেন সদর ট্রাউটের এক অতি পুণ্য প্রভাতে। কিন্তু কামাখ্যার সেদিন এসব কোন যুক্তি আমার জানা ছিল না; সেদিন আমার পুঁজি ছিল শুধু সহজাত অবিবাস আর সজ সংক্রামিত অপ্রকৃতিত্বতা। সেই সাময়িক অপ্রকৃতিত্বতারই সুযোগে আমি সেদিন নিঃসংশয় চিত্তে উপলব্ধি করেছিলাম যে, মহারাজা গুরুদেব আপন অনাহারব্রতের মার কাছ থেকে যে শক্তি লাভ করেছিলেন বলে পাণ্ডা ঠাকুর বললেন—যে শক্তির বলে সন্তরাজ্য আবার মহারাজ্য করতলগত হল—সেই শক্তির অস্তিত্ব যুক্তি প্রতীতি না হলও স্বতসিদ্ধ।

এখন নিঃসন্দেহ তো করতলগত হল, মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিও না হয় রক্ষিত হল কিন্তু যেই শক্তির আশীর্বাদে সব হল তা'র পূর্ণ পরিচয় তো জানা হল না। সেই রাজত্ব সেই ঐশ্বর্য সেই পরিজন সেই পারিষদ,—কিন্তু তবু কোন কিছুই যেন আর পূর্বকার মতো সম্ভব নয়, সত্য নয়, সুবিশুদ্ধ নয়, সুস্বচ্ছ নয়। বাইরে যেই মহারাজা ঠিক সেই মহারাজা, একটু তারতম্য ঘটেনি; কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজেকে কেমন প্রোতান্বিত বলে মনে হয় মহারাজা গুরুদেবের,—যেন কোন কিছুই সঙ্গেই আর আনন্দ্যিক কোন যোগাযোগ নেই; সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, সব কিছু ঘুরে আরম্ভের বাইরে আগ্রহের বাইরে চলে গেছে। মহারাজা গুরুদেবের মনে হয় যে নিজ রাজত্বই তিনি নির্ধারিত। এমন নিঃসঙ্গতা যে সম্ভব তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি কোন দিন। এক এক সময় ভয় হয় বৃষ্টি অপ্রকৃতিত্ব হয়ে যাচ্ছেন, এক এক সময় বড়ো অসহায়, বড়ো দুর্বল, একেবারে অর্ধহীন যুক্তিহীন বলে মনে হয় নিজেকে; কিন্তু তবু সন্তার অন্তস্তলে নিবাত নিষ্কণ প্রদীপ-শিখাটির মতো একটা উজ্জ্বল দম্ভবোধ সর্বাঙ্গপ্রতি!—ইতিমধ্যে কামাখ্যা পাণ্ডার নব-প্রতিষ্ঠিত মন্দির থেকে মাঘের নানান মহিমা-কথা রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হচ্ছিল। মা বাহিরের বাস্তব পূর্ণ করেন, দুর্গতের গতি করেন,—কামাখ্যা-মন্দিরে মা সর্বাঙ্গপ্রতি, এ কথাও রাজ্যের কানে পৌঁছল। মহারাজা একবার ভাবলেন যে মাঘের কাছ থেকে শাস্তি মেলে নেননি কিন্তু রাজকীয় দম্ভ বাদ সাধল। কবায়ত্ত সহজ

সমাদানের পথটি দম্ভ থাকার নিষ্পল নিষ্ফলি রাখে মহারাজা বিগত হুঁসতে থাকলেন। জীবন যে সীতিকাব্যের একটা পঠিত পুস্তক নয় গুরুদেব তা জানতেন; তাই অরণ্য থেকে অরণ্যান্তরে যখন অনাহার-ব্রত দেখে দিনের পর দিন অভিশপ্তের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন তখন তাতে কষ্ট হয়েছে কিন্তু এমন খাসকন্ড হয়নি, আজ আর কোন ভোগাবল্লভই অস্বাদ্য নেই—স্পৃহাও আছে—আজ শুধু মহারাজা অনেক ঘুর পর্যন্ত দেখতে পান, স্পৃহা অতিক্রম করে অনেক অনেক গভীরের অন্ধকারে আজ তার দৃষ্টি হারিয়ে গেছে। বাইরের কেউ কিছু জানতে পারে না, বুঝতে পারে না; কিন্তু ভিতরে ভিতরে মহারাজা একেক বার পাগল হয়ে যাবেন ভেবে আতঙ্কে নিউয়ে ওঠেন। আতঙ্কের আর অন্য কোন কারণ নেই, শুধু না দেখেই পাগল হয়ে যাবেন, না জেনেই বিদায় নেবেন।

শক্তি এবার স্পষ্টতই নিরতিয় বেশে আকর্ষণ করছেন এবং প্রজ্ঞাকলাপে ক্রীসংগোপ বা পাহা-স্বার্থে মনোনিবেশ করে মহারাজ্যের পক্ষে আর সে-আকর্ষণ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সম্ভব হবেই বা কী করে!—জগদ্রাজ্যের ঘরে মূলদেশে জলসিঞ্চন করে সেই বৃষ্টি শিশুকে মহীকরে পরিণত করেছি সেই নিরতি আমাদের হঠ বলেই তো আমাদের দাস নয়। যত কাল অন্ধ ছিলাম, নাবালক ছিলাম, তত কাল কোন দারিদ্ৰ ছিল না, শক্তির কথার উঠেছি বলেছি—শক্তিকে ঠাঁকি দিয়ে নিষ্ফলি নিজেকেও ভুলেছি মাঝে মাঝে। কিন্তু জীবনের রূঢ় নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার আজ চোখ ধুলে গেছে—আর সেই পূর্বকার বাধ্য-বাধকতা নেই কিন্তু নিয়তির নির্মম পথ আজ চোখের সামনে প্রসারিত। নিজীব নিরীহ নীতি-বৈষ্ণব কৃষ্ণ সামাজিক জীবনে আর-প্রত্যাগমনের পথ নেই—এখন হয় যুক্তা, নয় যুক্তি।

এমন সময় রাজ্যের কানে সংবাদ পৌঁছল যে, মা প্রতি অমাবস্তার রাতে কামাখ্যার ভূগর্ভস্থ মন্দির-প্রকোষ্ঠে নৃত্য করেন। সংবাদ শুনে মহারাজা মরীয়া হয়ে উঠলেন, কামাখ্যা পাণ্ডাও রাজ্যের তোড়জোড় ভংগণাৎ স্ক্রু হয়ে গেল। রাজ-পরিবারের পাণ্ডা অনেক বার স্থির করেও রাজ্যের সামনে কোন ক্রমেই নিরন্ত হবার অনুরোধটুকু উচ্চারণ করতে পারলেন না। সবাই যেন জানতো কী ঘটবে, সবাই যেন জানতো যে, যা ঘটবে তা অপ্রতিরোধ্য। অবশেষে অমাবস্তা রাত্রির পূর্বেই মন্দির-প্রকোষ্ঠের দরজার ছোট একটি ছিদ্র করে রাখা হল এবং রাত্রির প্রথম প্রহরে মহারাজা গুরুদেব সেই ছিদ্রে চোখ রেখে দাঁড়ালেন। রাত্রি ক্রমে গভীরতর হতে লাগল—কাড়ানাকাড়া বেজে উঠল মন্দিরের বাইরে—কামাখ্যা পাণ্ডা ধরধর কাঁপতে থাকল। ছিদ্রপথে রাজ্যের চোখের আর পাণ্ডা পড়ে না। অকস্মাৎ বাত্ব ধেয়ে গেল, কামাখ্যা পাণ্ডাও স্থির হয়ে দাঁড়াল, ব্রহ্মপুত্র স্তব্ধ। ছুটে গিয়ে সবাই দেখল, মহারাজা গুরুদেব তখনো ছিদ্রপথে চক্ষু নিবদ্ধ রেখে নীচের দাঁড়িয়ে আছেন। মহারাজা পাণ্ডা-মুগ্ধ হয়ে গেছেন। এই সেই মহারাজা ঠিক সেই অবস্থায়। একেও প্রণয় করতে হয়।

মহারাজ্যের নিরপেক্ষ মূর্তি নির্নিমেয় থাকিয়ে রইল। নতজাহ্নু হয়ে পাণ্ডাঠাকুর সেই মূর্তিকে প্রণাম করলেন, আমিও তা'র অনুসরণ করলাম। কেন না, অন্তত এ কথাই বিশ্বাস করতে আমার আর সন্দেহ নেই যে, তীর্থে এলে রাজ্যের জগদ্রাজ্য হয়। সাময়িক হাও কামাখ্যা তীর্থে আমারও হয়তো জগদ্রাজ্য হয়েছিল।



### ত্রিনির্মল চট্টোপাধ্যায়

পায়রা ওড়ান বন্ধিমের নেশা। অনেকে অনেকে কিছু করে : মদ খায়, মেয়েমানুষ পোষে, গাঁজা, গুলি, আফি অনেক রকম বিষ তিলে তিলে গলাধঃকরণ করে নীলকণ্ঠ হয়ে ওঠার প্রয়াস পায়। ও-সব দিক থেকে বন্ধিম একেবারে নির্ভেজাল, সাধা আর খাঁটি। শুধু বেলা ন'টার পর সকালের চা শেষ করে ছাদে উঠে আসে বন্ধিম। ছাদের এক দিকে কাঠের তৈরী সার সার ছোট ছোট খোপ, সেই সব খোপের ছোট ছোট দরজা তখনও বন্ধ। আগের দিন সন্ধ্যার বন্ধিম প্রত্যেকটা খোপের প্রত্যেকটা দরজা নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে যায়। দোরবন্ধ খোপগুলোর ভেতর থেকে সমস্বরে ধ্বনি ওঠে,—“বন্ধ-বন্ধ, বন্ধ-বন্ধ, বন্ধ-বন্ধ-বন্ধ।” কান পাতে বন্ধিম, কান পেতে থাকে, ছুই কান দিয়ে যেন পান করে পায়রাদের কোরাস সঙ্গীত। অদ্ভুত ডাক এই পায়রাদের, চোখ বুজে ধানিকরণ স্তনলে যেন ঝিমুনি আসে, ঢুল আসে, ঘুম পায়। এত দিন ধরে ত স্তনছে বন্ধিম এই ডাক, সেই ছোটবেলা থেকে, বাবার হাত ধরে বধন সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এসে কৌতূহলী মন নিয়ে এই ডাক স্তনত, তখন থেকেই ত এই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। মদ কোনো দিন খায়নি বন্ধিম, পয়সারী, বারনারীর অঙ্গ স্পর্শ করেনি সে, গাঁজা-বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া মস্তিষ্কে কোনো দিন আলোড়ন তোলেনি তার, স্তনরায় ও সমস্তর মর্ম বোঝে না সে; তবু আদ্যাজ করে বন্ধিম—এই যে ‘বন্ধ-বন্ধ’ ‘বন্ধ-বন্ধ’ স্তনতে স্তনতে আবেশে ছুই চোখ সহজে বুজে আসা—এ বোধ হয় সেই সমস্ত বোঁয়্যাটে তরল আর হাসল নেশার আমেজের মতই। নিশ্চিত জানে না সে, কিন্তু একদিন এই ডাক না স্তনলেই যেন মনে হয় কি যেন হারিয়েছি, কি যেন পেলাম না, কিসের থেকে যেন বঞ্চিত হলাম।

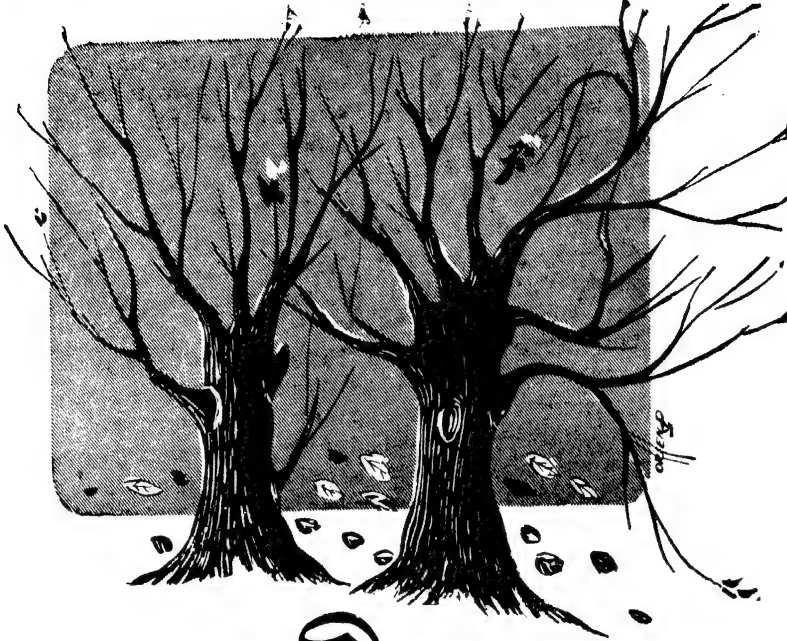
এক এক করে খোপের দরজাগুলো খুলে দেয় বন্ধিম। এক একটা দোর খোলে আর ঝটপট ঝটপট করে একজোড়া পায়রা ছাড়জোড়া সোনারঙা সকালের রক্তুরে বেরিয়ে আসে। উড়ে উড়ে বন্ধিমের ঘাড়ে মাথার বসে পায়রাগুলো—ভারী ভাল লাগে বন্ধিমের, একটুও অবস্থি বোধ হয় না। একে একে সব খোপের,

দরজাগুলো খুলে দেওয়া হলে বন্ধিম ভালো কেনা, পোষ মা-মানা পায়রাগুলোর পাখনার ঝাঁপগুলো পরীক্ষা করে, পাখনা উলটে ছুটি আলগা আঙ্গুলে ঝাঁপগুলো পায়রার মেজাজ মাক্ষিক চিলে বা কড়া করে দেয়। ইতিমধ্যে পোষমানা, পুরোনো পায়রাগুলোর বেউ কেউ আলসের উঠে বা কাশিসে নেমে যৌবন-গরিবতা বোঝায় মত সামনে বুক ঠেসে ঈষৎ ফুলে ফুলে চলে আর বন্ধিমের বাপ-দাদার আমলের নোণায় ধরা পুরোনো বাড়ির ঝরপড়া পলস্তারা বালি-স্তরকি ধুঁটে ধুঁটে যায়। কেউ কেউ উঠে যায় একটা বাঁশের মাথার দিকে চৌকাল করে চার ধুঁটির ওপর জালবেছান ‘বোয়ে’।

অনেক রকম পায়রা আছে বন্ধিমের। দেশী-বিদেশী ‘মুন্দর-কুংসিত। গোলা, কেলো গোলা, গলা কোলা, মুখখী থেকে শুরু করে লজ্জা, সিরাজ, ডোমা, গিরবাজ, টারবিন, মাক্ষিকিণ পর্যন্ত। একজোড়া পায়রার দাম যে দেড়শ-দুশ টাকা পর্যন্ত দিতে হয় বন্ধিমকে, তা কি ভানে রাগ? না সে জানে যে ঝুঁটিশার লজ্জার সঙ্গে পায়রা-জগতে অপাংক্তের কলে গোলার মিশ্রণের ফলে এমন এক নতুন জাতের সৃষ্টি হয়, যা অনায়াসে বন্ধিম বুক ফুলিয়ে সবাইকে ডেকে নেখাতে পারে। কিছুই জানে না রাগ। তার ধারণা, বছর বছর আপনি আপনি বেড়ে যায় বন্ধিমের পায়রাদের সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে, যে নিয়মে খেতে না পাওরা মানুষের ঘরে বছর বছর ডিম ছাড়ান কই মাছের মত হাড় জির,জিরে, বুক ডিগডিগে বাচ্চার সংখ্যা বেড়ে যায়। এই পায়রাদের পেছনে বন্ধিমের যে কত পরিশ্রম, কত অধ্যবসায়, কত খরচ—তার কিছুই ধারণা নেই রাগর। কত সাধনার পর, কত শিক্ষকতার পর যে একটা পায়রা শীঘ্রের প্রকার-ভেদ ধরতে পারে, বুঝতে পারে আর সেই অল্পবায়ী নিজেকে ফুলের মালার মত কিংবা ঘোঁষা চিরের মত অথবা আরো নানান কাক্সকাখোর মত আকাশে উড়ন্ত পায়রার দলের সঙ্গে ঝাপ ঝাইয়ে নিতে শেখে, ঝাপ ঝাইয়ে নিয়ে সেই নয়ন মনোহর দৃশ্যের অন্তর্গত হয়ে যেতে শেখে, তা কল্পনাও করতে পারে না রাগ। তাই সে ঠাট্টা করে বন্ধিমকে, বিদ্রূপ করে, ঠেস দিয়ে দিয়ে বন্ধিমের আচরণের নিন্দা করে।

হাসি পায় বন্ধিমের, করুণাও হয়। কি দেখেছে রাগ? কতটুকু দেখেছে? গরীব ঘরের মেয়ে রাগ, রূপের দৌলতে এই আদি কলকাতার অভিজাত পরিবারে ঠাই হয়েছে তার। আজ না হয় পরগা নেই বন্ধিমের, না হয় তিন বিঘের ওপর জায়গাজোড়া নানান মহল বাড়িখানা আজ ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে, থসে গেছে পলস্তারা, কঙ্কালের ঝাঁত ছিরকুটি হাসির মত না হয় বাড়িখানাও ইটের ঝাঁত বের করে হাসছে, না হয় আজ বাড়ির ভেতরের বড় বড় মাঠগুলো আর উঠানগুলো ধোবাদের আর গোয়ালাদের ভাড়া দিয়ে দিয়েছে বন্ধিম কাপড় শুকানোর আর গল্প-মোবের খাটাল করবার জন্ত। তাই বলে বংশমধ্যাণ্য বাবে কোথায় বন্ধিমের? বাপ-দাদার আমলের ‘রাজা’ উপাধিটা কি এতই সস্তা আর সহজলভ্য যে, আজ দু’টিখানি ভাতের অভাব হয়েছে বলেই বন্ধিম তার ‘রাজা’ উপাধি, এত দিনকার বংশমধ্যাণ্য তার পায়রা ওড়ানোর নেশা, সব কিছু ছেলেমানুষের খেলনার মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাল আমলের ডাক্তার-মোক্তার মধ্যবিস্তদের মত চাকরী ধুঁজতে বেরবে? আর চাকরী করবে কি করে বন্ধিম? সে কি পড়েছে, না পাঁস করেছে?

তবু ত আর কোনো নেশা নেই বন্ধিমের, ছোটবেলাতেও ত



## বেচারা....

লতাপাতা শূণ্য বৃক্ষ যেমন দেখিতে ভাল লাগে না,  
বিবাহের ব্যাপারেও তেমনি কষ্ট যতই  
গুণবতী, স্বাস্থ্যবতী ও ফরসা রংয়ের ইউক না কেন  
কেশের অগ্রাচর্যে কপালের প্রশ্নসারতা দেখিয়া যাহারা  
কষ্ট দেখিতে আসেন, একবার দেখিয়া আর  
পুনরায় কথাবার্তা উত্থাপন করেন না।

কিন্তু একথা জোর করিয়াই বলিতে পারা যায়—  
কে, এম, পি, (K.M.P.) মার্কা খাঁটি নারিকেল তৈল  
যাহারা একবার গৃহে প্রচলন করিয়াছেন তাহারা  
একপুঞ্জ ভট্টাল সমস্তার সম্মুখীন হয়েন নাই।



কে, এম, পি  
মার্কা

খাঁটি নারিকেল তৈল  
এখন

১ পাঃ ২ পাঃ ৫ পাঃ সুদৃশ্য  
ছাপান টিনে সম্ভ্রান্ত ডিলারের  
নিকট পাওয়া যাইবে।

পবিত্র হিন্দু অয়েল মিলস্

১, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রট,  
কলিকাতা-৭ : Phone: 34-3414



সে দেখেছে তার বাবার বড়মুহুরী চাল! শুনেছে ডিকাটারে ডিকাটারে ঠোকাটুকের মিষ্টিমধুর শব্দ। সেই গ্যাসের উজ্জল আলোর রঙীন পানীরের বলক, চিংপুর থেকে আনা সুনিয়া বাস্তবের চুম্বকী-বসানো বাসরা ওড়ান নাচ, শিলুর ওপর কুঁড়ীর মধুর স্রব-বিস্তার,—"আরে না! সাজন বা..." সে সব ত কিছুই দেখেন না, জানেন না, তখন না রাগ! আজ শুধু সামান্য কটা পায়রা দেখেই রাগের এত বাগ! না হয় সে একটা না দুটো পাসই করেছে, না হয় রূপ আছে তার—রূপ ত এ বাড়ির বউ হয়ে আসার ব্যাপারে এক অতি আবশ্যকীয় যোগ্যতা—তাই বলে সে বন্ধিমের পিতা-পিতামহর আমল থেকে চলে আসা পায়রা ওড়ান নেশাকে, এক কথার তার কানের ঐতিহ্যকে উড়িয়ে দিতে চাইবে তার প্রজাপতির পানবার মত ঠাটের সামান্য হাসির হাওয়ায়?

আর পায়রা ওড়ানোর নেশাই বা বন্ধিমের কি এমন বেশী? তার ঠাকুরদালার গল্প শুনেছে সে ছোটবেলা তার বাবার মুখে। সে কথা ভাবলে মনে হয় তার নিজের নেশা—শুধু আজকালকার লোকের মত মনের বললে চায়ের নেশার সমান। সেই পুরোনো আমলে পাঁচশ-সাতশ-হাজার টাকার একজোড়া পায়রা কিনতেন ঠাকুরদা! ভাবলে শরীরে শিহরণ লাগে বন্ধিমের। আর সেই পায়রার লড়াই আর বেস! একশ একশ পায়রা উঠত হুঁদিক থেকে হুঁদলের, লড়াই চলত হুঁদটা তিন ঘণ্টা ধরে। কোন দিকের কত পায়রা চলছে তাই হয়ে ছিটকে বেড়িয়ে গেল, তার হিসেব নিকেশ করে নিশ্চিন্ত হত জম-পসারদের। আর তেঁসে যোগদানকারী সকলের পায়রা একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হত গয়া, কান্দী, মথরা বা বুঝাবন থেকে, বার পায়রা আগে কলকাতার এসে পৌঁছত তিনি জিততেন বেসে। অনেক বার বিজয় মুকুট লাভ করেছেন বন্ধিমের ঠাকুরদা! এমনি ধারা লড়াই এ আর দৌড়াবাজীতে। কিন্তু সে সব দিন আজ কোথায়? আজ আর লোকে পায়রার সম্মান দেয় না, মধ্যাঙ্গা বোরে না। রোজ সকালে যখন সে হাতের ছোট লাটিউ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর জিতের তলার মধ্যমা আর তক্তনী দিয়ে বিচিত্র শব্দে শীঘ্র দেয় আর সেই শীঘ্রের শব্দ অহুসরণ করে ব্যোম থেকে ডানা মেলে দিয়ে পায়রার ঝাঁক মেয়েদের শূন্যে কান্নের মত আকাশের এক অংশে স্থলব স্থলব ফুল ফুটরে তোলে, তখন দুবের দুবের বাড়ির ছাদের সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। কিন্তু বন্ধিম জানে, ওরা বতই অবাক হোক না কেন, আসলে মনে মনে ওরা সবাই বন্ধিমকে অবহেলা করে, বন্ধিমের কথা উঠলেই নাক সিটকে বলে—ঐ পায়রা-ওড়ান লোকটা! ওদের ওপর বাগ হয় বন্ধিমের, কিন্তু আবার সামলে নেয় বাগ। ওদের শোব কি? নিজের বউ যেখানে ঠোঁট ঝাঁকায়, নাক সিঁটকায় কথায় কথায়, সেখানে অস্ত্র লোক যে ছুয়ে দেবে, খুলা ছুঁড়বে, হাততালি বাজাবে পেছনে, তা আর বিচিত্র কি?

বিজ্ঞপ কলক রাগু কিছু এসে-বার না বন্ধিমের। পাস-করা মেয়ে রাগু, এখরে ওকে আনাই তুল হয়েছে। আসল কথা, শেষ বরসে আজকালকার কড়া আলোর চোখ ধাঁঘিয়ে গিয়েছিল বন্ধিমের বাবার, তেবেছিলেন কোনো আধুনিককে ঘরে তুলে আজকালকার সঙ্গে পাঙ্গা দেবেন। হলে বন্ধিমকে বিয়ে দিলেন তিনি গবীরের মেয়ে রাগুর সঙ্গে, যে আসলে আজকালকার এই ইনকো যুগেরই

প্রতিনিধি। দ্বিরে ত মরলেন তিনি, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তলার খেয়ে-বাওয়া বড়মুহুরী ভেঙ্গে পড়ল সম্মুখে। পাওনাশায়র একযোগে সবকিছু হাস করল, হঠাৎ শুধু এই সাতক বাপ-কালার আমলের মিতাকার বাড়িখানা। আর এই হত বড় বাড়িখানা আগল থেকে ১৬ জেপে হঠাৎ বন্ধিম। এখানে, এখানেই বন বসল না রাগু। সে ঘরের মধ্যে থেকেও শব্দ হয়ে হঠাৎ, ঘর ভরে হঠাৎ।

কিন্তু মনে কি করে বসতে হয় জানে বন্ধিম। এ পরিবারের পূর্বপুরুষের হাত অনেক নারীকে হত্যা করেছে। সেই হত্যা বংশ-পরাশরায় বন্ধিমের দেহেও প্রবাহিত। রাগু তার কাছে একটা কড় পায়রা ছাড়া আর কিছু নয়। পায়রা কি করে পোষ হানাত হই, তা জানে বন্ধিম।

বিয়ের পূর্বের প্রথম দিককার কথা মনে পড়ে বন্ধিমের। সকালের পায়রা ওড়ানোর অল্পটান তখনো শেষ হয়নি, সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এসেছিল রাগু, সূর্যের আলার অবগাহন মান করে উজ্জল একঝাঁক উড়ন্ত পায়রা দেখে বুকি তারও ভাল লেগেছিল। একটুখানি প্রশংসামান দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সে, তারপর শুধিয়েছিল,—“কি, চান-খাওয়া করবে না আজ?”

চোখ নামিয়েছিল বন্ধিম, রাগুক দেখে বিমিত হয়েছিল একটু, তারপর আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে জিতের নীচে হঠাৎ আবার বুঝাগুলি দিয়ে দীর্ঘ বিলম্বিত করে একবার শীঘ্র ছিল সে। বুঝাকারে উড়ন্ত পায়রাগুলো হঠাৎ বৃত্ত ভেঙ্গে রূপ রূপ করে নেমে পড়ল ব্যোমের ওপর। রাগুর দিকে ফিরেছিল বন্ধিম,—“ছাদে উঠেছ যে?”

রাগুর মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখা দিয়েছিল,—“উঠেছি ত কি হয়েছে? নিজের বাড়ির ছাদেও উঠতে পারব না?”

—“না। পারবে না!” চমকে উঠেছিল বন্ধিম,—“আমাদের কানের বউদের অত বেলেলাগা চলেবে না! বুঝেছ? বাও!” সিঁড়ির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করল বন্ধিম।

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল রাগু, সিঁড়িতে পা দিয়ে এগিকে ফিরে বলেছিল,—“বেলা বারটা যে বেজে গেল! খাওয়া নাওরা করবে না?”

—“খাবার কথা!” গর্জন করে উঠেছিল বন্ধিম,—“বা—ও!”

হতভুদ্ধ করে নেমে গিয়েছিল রাগু।

সেদিনের কথা মনে আছে বন্ধিমের। রাগুরও। তারপর আর কোনো দিন ছাদে ওঠেনি সে।

সারাদিন ত ছাদেই থাকে বন্ধিম। নীচে নামে খুব কম—শুধু খাওয়া আর শোয়ার সময়। বাড়ির বাইরে যায়ই না বলতে গেলে। শুধু মাসের শেষে খোঁপা আর গোয়ালাদের কাছ থেকে ভাড়ার টাকা আদায় করতে বাইরে যায় সে। নীচেকার অন্ধকার ঘরে সারাদিন প্রায় একাই কাটাত হই রাগুক। প্রথম প্রথম কি ভয়ই না করত রাগুর! বাবা ম্যাট্রিক পাস করিয়েও বিয়ে দিলেন রাজবংশের এই মূর্খ রাজপুত্রটির সঙ্গে। যদিও অবস্থা তখন দৃষ্টিকটু রকমের পড়ন্ত অন্ধের, তবুও বাবা বলেছিলেন,—“মরাহাতীর লাম লাখ টাকা!” সে গরব না থাকলেও এখনও ওরা সাতটা উকিলকে এক হাটে কিনে আর হাটে বেচতে পারে। বাবার হিসাবে গোলামাল হয়েছিল, তিনি তার যৌবনের চোখ



সিঁদুর ওষধের যে সমাধন সমাধন কোরছিলেন, আসল কথা হলেনও তার বেশ কাউনি।

বিয়ে হল আর গোটা গৃহিণীরা যেন চোখের সামনে কপাট বন্ধ করে বিয়ে নিজেদের আড়াল করে নিল। বই পড়া বারণ এ বাড়ির বই-এর, বারণ বাড়িয়ে বেঁচেয়ে। সিনের বেশি চলে এঁরাও। শত্রু বেঁচে থাকে পথিক ভাঁড়জন পরগাড়া। বাল-সিঁদুরা আঁড়িয়াও যা ছিলেন, শত্রু চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে তারা চলে গেল সবার মুকের সম্মানে। বিরা বরিষটী তালার আড়াল। তারপর একা, একেবারে একা। কুন্তের মত বাড়িটা তার সমস্ত অন্ধকার, নিম্নরতা আর কীপ্তম লক্ষণ বীভৎসতম প্রতিলিপি নিয়ে যেন বুকের জিপের চেপে বসল রাণুর, যেন ভাঁড়তে পলা টিপে ধরে তার সম বন্ধ করে দিলে চাইল।

এই নিম্নরতা নিম্নরতা আর নিম্নরতাকে এড়ানোর ভক্তই রাণু ঘরে ঘরে বেড়াতে শুরু করেছিল। ছোট ছোট খুপকী খুপকী ঘর, ঘরের মধ্যে চাল-চাল আদম শঙ্করের বাস। ঘরের মধ্যে চুকলেই যেন আরমোডা ভেঙ্গে দেড়ে গিলে খেতে আসে, পায়েব সামান্ততম লণ্ড বিবটিতম ঘরে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। এমনি এক ঘর থেকে আর এক ঘরে চলেতে চলেতে কদিন বিকাশ দাবি সঙ্গে দাক্ষ্য হয়েছিল। ঘরের মধ্যে চুকলেই কে যেন হাত ধরেছিল তার। আরকর্ষ টেডিয়ে উঠলে গিড়েছিল সে, তখনই বিকাশ কথা বলল,—“চপা আমি আমি, রাণু।”

অবাক হয়ে গিয়েছিল রাণু,—“কুহি—কুহি কি করে । বিকাশ না?”

—“এলায়।” আরও অন্ধকারেও বিকাশের বুকের ভাঁ কেরা গিয়েছিল,—“জানলাম ত এ বাড়িতে বিয়ে চলেছে তোমা চুপি চুপি এসেছিলাম হোমার সঙ্গে দেখা করার বলে, লুপি ছিলাম এই ঘরের মধ্যে।”

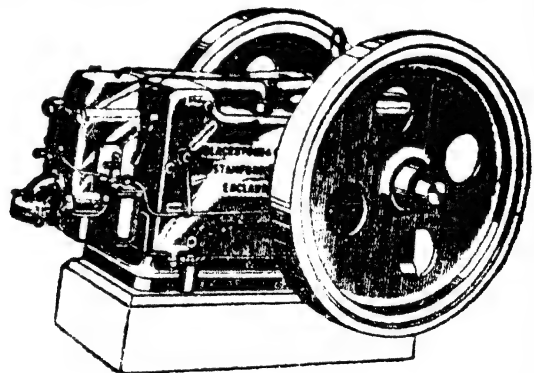
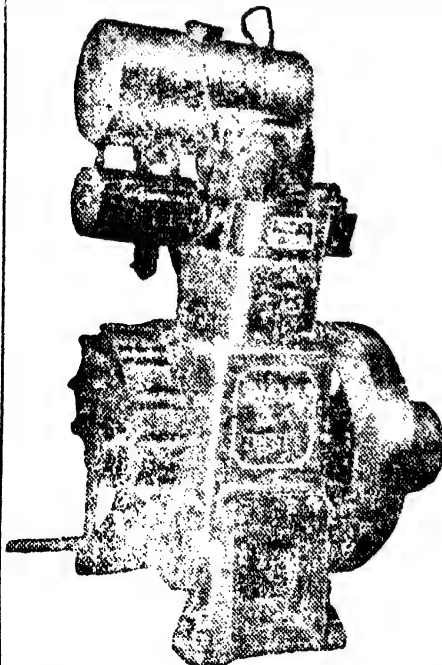
ভীষণ ভয় পেয়েছিল রাণু, হাত কিত্রে ওর বুকে ছোট্ট এক টেনা গিরে বলেছিল,—“কুহি চলে যাও বিকাশ না! চলে যা এখান থেকে।”

রাণুর হুঁ কীধের ওপর হুঁ হাত বেখে তাকিয়ে তাকিয়ে সেয়েছিল বিকাশ রাণুকে, তারপর শুধিয়েছিল,—“তাকিয়ে মিছ রাণু?”

—“না, না বিকাশ না! তাকিয়ে মিছ না তোমাকে আমি”— রাণু বলল,—“তবু লণ্ড কুহি।”

—“খাড়া। বাই—” বিকাশ এগিয়ে গিয়েছিল চুপা, তারপর গিরে বলেছিল,—“আবার কিছু আসব রাণু।”

বিকাশ চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরোক্ত বুকের চিপচিপানি খামেনি রাণুর। কিছুটা পলক, কিছুটা আতঙ্ক হুইয়ের কমিঞ্জনে এক অনায়াসিতপূর্ণ সিংহন বাত বাত পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা পরোক্ত হাতায়াত করে। বিকাশকে ভালবাসত রাণু, হাঁ, এখনও বাসে। কারণ, বিয়ের পরে বেকারণে মেয়েরা এক কালের



অল্প চাই, প্রাণ চাই, কুটার শির ও কৃষিকাষী দেশের অল্প ও প্রাণ এক আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিল, লিট্টার, ব্রাকট্রোম ডিজেল ইঞ্জিন, লিট্টার পাম্পিং সেট, আডস ডিজেল ইঞ্জিন আডস পাম্পিং সেট বিনাভে প্রস্তুত ও লীফটান্টী।

এজেন্টস্ :-

**এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং**

১৩৮ নং ক্যানিং স্ট্রীট, বিভল কলিকাতা-১

কোমঃ-২২-৫২৭৫

বিঃদ্রঃ—টিম ইঞ্জিন, বরলার, ইলেকট্রিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প ট্রাক্টর ও কলকারখানার ব্যবহার্য সরঞ্জাম বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে।

শ্রিয়জনকে তুলে গিয়ে চোখের জলের দাগের সঙ্গে সঙ্গে মনের দাগকেও মুছে ফেলে নতুন সংসার, নতুন মানুষের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, ভবত মিলে যেতে পারে—তার কিছুই ত পায়নি রাণু! তার সংসার বলতে ত এই ভাঙ্গা, অন্ধকার, ঘরে ঘরে চামচিক আর মাড়ুসার বাসা, মাঝাতার আমলের জনশূন্য, মনশূন্য বাড়ি আর স্বামী বলতে ত ঐ বোকা, মূর্থ, এককালীন সম্ভ্রান্ততার অহংকারে ডগমগ বন্ধিম, যে আঙো ছাদে বসে শীঘ্র দিয়ে পায়রা ওড়ায় আর বউকে অন্ধকার ঘরের অন্ধকারতম কোণায় আটকে রেখে বাঁশের ঐতিহ্য বহন করে চলে! কি করে সে ভুগবে বিকাশ দাঁকে, মুছে ফেলবে মন থেকে নিশিচ্ছে—যে বিকাশ দাঁ এক দিন তার শিক্ষায়, বুদ্ধিতে, কথায়, চিন্তায় উজ্জ্বল একটা নক্ষত্রের মত অচরিত চোখের সামনে, মনের আকাশে জেগে থাকত?

তবু এমনি ভাবে বিকাশ দেখা না মিলেও পায়ত। বিয়ের সময় দেখা হয়নি বিকাশের সঙ্গে। কারণ, সে তখন গভর্ণমেন্ট ষ্টাইপেন্ড নিয়ে পড়তে গিয়েছিল বিদেশে। দেখা যখন হয় নি—না হয় দেখা নাই হত কোনো দিন। অনুপস্থিত বিকাশ দাঁ'র উজ্জ্বল ভাবের মূর্তি মনের বৈশীতে বসিয়ে ভক্তির চন্দনে, প্রেমের পুষ্পে সাজিয়ে চিরকাল পূজা করে এক দিন নিশিচ্ছে এই ভুতুড়ে বাড়িতে নিম্পন্দে মরে যেতে পায়ত সে! কেন এল বিকাশদাঁ? আবার? আর যদি বা এল, কেন এমনি ভাবে এক দিন বলে বসল হাতের মধ্যে হাত নিয়ে,—“তুমি আমার সঙ্গে চল রাণু! নতুন চাকরী হচ্ছে আমার, পাঞ্জাবে পৌঁছাই হচ্ছে, কেউ জানবে না! কেন এমনি ভাবে নিজেকে ধরস করে ফেলবে? আমি তোমাকে ভালবাসি—তুমি আমাকে ভালবাস। এই কি সব চেয়ে বড় কথা নয়?”

সেনিনও রাণু কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল,—“তুমি বাও বিকাশ দাঁ! তুমি বাও!”

একটু হেসে বিকাশ বলে গিয়েছিল,—“বাচ্চি! কিন্তু আবার আসব।”

একি লোভ দেখিয়ে গেল বিকাশ? আলো, বাতাস, ফুল, পাখী, গান, হাসি, প্রেম, ভালবাসা—যার কিছু গেল না রাণু, অথচ বা কিছু পাওয়ার জগৎ তার তবু মনটা আঁকুপাঁকু করছে, বা কিছুই অভাবে তার জীবনে যত্ন নেমে আসছে তড়িৎগতি, সব কিছুই প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিকাশ এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। পৃথিবীটা আবার কড়া নেড়ে যাচ্ছে বন্ধ দোরের বাইরে থেকে—দোর খোলো, দোর খোলো! কি করে এখন রাণু?

আজকে এই সময় বিকাশ এল কেন? বেলা যখন প্রায় একটা বাজে, পায়রা ওড়ান শেষ করে বন্ধিমের নীচে নামার সময় হয়ে গেছে যখন, তখন বিকাশ না এসেই বৃষ্টি ছিল ভাল! আর এল যদি, এমন ছুতো মচমচিয়ে একেবারে শোবার ঘরে এসে না ঢুকলেও ত পায়ত সে? বিকাশ ত জানে, বন্ধিম নেমে এসে যদি দেখে বিকাশকে, মাথাধ খুন চেপে যাবে তার!

আর তাই ত ঘটল। বিকাশকে যখন টেলে দিচ্ছে রাণু দোরের বাইরে, বলছে—“তুমি চলে যাও বিকাশ দাঁ! এখুনি! ওর নামাং সময় হয়ে গেছে ছাড় থেকে!” ঠিক তখনই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল

বন্ধিম আর দোরের দাঁড়ান বিকাশকে দেখেই দপ করে অলে উঠল তার চোখ দুটো!

বিকাশও দেখেছে বন্ধিমকে। একটুখানি কাঁঠহাসি হেসে বিকাশ বলল,—“এই যে বন্ধিম বাবু, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আজ, নামই খোনা ছিল শুণু! আমি রাণুর পিসতুতো ভাই, আপনার বিয়ের সময় ফরেনে ছিলাম। আচ্ছা, চলি আজ। বেলা হয়ে গেল। আবার দেখা হবে। চলি রাণু, কেমন?” ছুতো বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল বিকাশ। কপাটের ওপাশে দাঁড়ান রাণু জ্বম বেন হিম হয়ে গেল!

ঘরে ঢুকল বন্ধিম। সাক্ষাৎ দুই ভ্রাতৃ সন্দেহের ঘোর কুটিল ছায়া। একটুখানি দেখল রাণুকে বন্ধিম, তার পর প্রেম করল,—“ও কে?”

ভাবার পথে যেন হোট খেল রাণু,—“আমার.....আমার পিসতুতো ভাই।”

—“দেখাচ্ছি, আজ তোর কোন গোটুলের পিসতুতো ভাই!” দাঁতে দাঁত ঘষে কথা ক'টা উচ্চারণ করল বন্ধিম, তার পর হাত বাড়িয়ে তাকে ওপর থেকে লম্বা আর সক্ষ একটা লোহার রড টেনে নিল সে।

—“তুমি...তুমি...মারবে আমাকে?” শীঘ্রকারধ্বনির মত কথা ক'টা বেরিয়ে এল রাণুর মুখ থেকে।

—“না!” ব্যঙ্গ রণর নিয়ে উঠল বন্ধিমের স্বর,—“পূজা করব।”

তার পর শুরু হল মার। লোহার রড দিয়ে এলোপাখাড়ী পিটোতে শুরু করল বন্ধিম—পিটে, ঘাড়ে, কপালে, বাহুতে, মাথায়। দিগবিদিক জানশূন্য হয়ে বন্ধিমের হাতের লম্বা সক্ষ আর শক্ত লোহার রড রাণুর দেহে তাণ্ডব নৃত্য করে চলল। কপাল কেটে গেল রাণুর, রক্ত গড়িয়ে নেমে চোখের দুষ্কোম্পা করে দিল তার, মাথা কেটে রক্তে ঢুল আঁঠা হয়ে গেল।

শেষে এক সময় ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত হয়েই বেন খামল বন্ধিম, রেহাই দিল রাণুকে। প্রচণ্ড বেগে ঘরের পালঙ্কের ওপর টেলে দিল তাকে। বলল,—“আবার যদি দেখি কোনো দিন, ঘরের মধ্যে নাগর নিয়ে কেলি করতে, হু'খানা করে ফেলব একেবারে!” বেরিয়ে গেল বন্ধিম, মনে তার আত্মপ্রসার; পোষ কি করে মানাতে হয় জানে সে!

পালঙ্কের ওপর শুয়ে শুয়ে কঁদল রাণু, কঁদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ফুলে ফুলে। জোরে কেঁদে কি করবে রাণু? যত জোরেই কাঁদুক সে, সে কারা এই কবর-ভূমির বাইরে যে আলো বাতাস, জীবন, আনন্দ, প্রেম-ভালবাসা ভরা পৃথিবী, সে পৃথিবীতে ত কোনো দিন পৌঁছুবে না!

কতকণ বেঁকেছিল রাণু, তা জানা নেই তার। চমকে উঠল চুলে এক স্নিগ্ধ কোমল-স্পর্শ পেয়ে। চমকে তাকিয়ে দেখল বিকাশ এসে দাঁড়িয়েছে কখন মাথার কাছে, বলছে,—“আমি জানতাম রাণু এমনি হবে, তাই আবার এলাম।”

দ্রবন্ত অঙ্গভার লুকোবার ভক্তই মুখ লুকোলো রাণু। এমনি সময় না এলেই কি চলত না বিকাশের? হাতে পায়ে পিঠে যখন প্রহার জনিত কালো কালো দাগ, রক্তে যখন সে প্রায় নেই উঠেছে,

সর্বাপেক্ষা যখন তার বিশ্রামের জীবনের গভীর বন্ধনায় সম্পৃষ্ট চিহ্ন, তখন সব কিছুই সংবাদ নিয়ে, আশা নিয়ে, প্রতিজ্ঞা নিয়ে, এমনি ভাবে মাথার কাছে এসে না পীড়ালেই কি পারত না বিকাশ ?

পরের দিনে সকালে ছাদে বসে পায়রা ওড়াচ্ছিল বন্ধু। গোলা, কলে গোলা, গলাফোলা, মুখখী, হোমা, সিরাজু, গিরবাজ, টারবিন, জ্যাকবিশ, গ্রাবার নানান ধরণের পায়রার বিচিত্র পক্ষ-বিলাস আকাশের বুক! কিন্তু আজ পায়রা ওড়াতে মন নেই বন্ধুদের। সব-সব পায়রা থেকেও যেন কোন একটা হারিয়ে গেছে চিরন্তনে; সব চেয়ে ভাল আর দামী আর সুন্দর পায়রাটাই যেন উড়ে গেছে বন্ধুদের, উড়ে গেছে চিরকালের জন্য,

ডানা মেলে দিয়েছে অবাধে, কোনো দিনও যাবে আসার আশা নেই তার।

পুরোনো দিন হলে হয়ত গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে খুঁজে বার করতে ওদেরকে বন্ধু, তারপর বাড়িতে নিয়ে এসে একবারে শেষ করে দিয়ে নিঃশব্দে পুঁতে ফেলত এই অন্ধকার বাড়ির মেঝের গভীর গর্ত করে। কিন্তু আজ আর তা করার শক্তি নেই তার, ক্ষমতা নেই, সাধ্যও নেই। আজ শুধু তাকে এই সব চেয়ে বড় পায়রা হারানোর দুঃখটাকে বুক পুষে রেখে চুপ করে পায়রা পোষ মানাতে হবে; সকালের বেলাে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীঘ্র দিয়ে দিয়ে আর ছোট লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পায়রা ওড়ান ছাড়া আর কিছুই করার নেই বন্ধুদের।

## বৃষ্টি বারে

রেখা দত্ত

বৃষ্টি বারে বৃষ্টি বারে

ঝিম ঝিম ঝিম সাগরক্ষণ। কল্লুবরে  
একা একা বসে আমি। গাঢ় অন্ধকার  
আপন আঁচলে ঢেকে নিল ত্রিসংসার।

নিঃশ্বাস স্পন্দন শূন্য স্তব্ধ দশ দিশি,  
নিঃস্পন্দ-প্রদীপ মনে জ্বলিবে সারা নিশি  
ভাবি বসে বসে—  
ভেঙেচুরে টুকরো হয়ে যায় গেছে থসে  
এ জীবন হাতে

যদি পারি কোনো মতে  
তারের স্মৃতির স্নান বেশ  
এই রাত্রে করে সমাবেশ  
জোড়া দেব।

শত চেষ্টা শেষে  
তজ্রাবিজ্ঞিত চোখে বার্ষিক ভাবাবেশে  
একটু জোড়ানো হলে পিছে চেয়ে দেখি  
পুনঃ সব গেছে ভেঙে!

মুচ-মেকি সে কি  
লক্ষ চিন্তা আসে-যায় তারি কাঁক দিয়ে  
হঠাৎ তুমিও এসে উঁকি মারো শ্রিয়ে।  
মনে ভাবি, বলে কেলি এই শুভক্ষণে, রাশি রাশি  
নির্জন গ্রহেরে, 'ভালবাসি, তোমাকেও ভালবাসি!'

'ভালবাসি' বলবার সব চেষ্টা বুঝা—  
আগে জানি নি তা।  
কাঁরা এসে

কণ্ট চেপে ধরে অটহেসে!  
সে কি লাজ?

সে কি গুই মার্জিত সমাজ  
আর পিছে কেল-আমা বত নর-নারী?

না না শুধু তারা নয় প্রেমের ভিখারী,  
তা ছাড়া অনেকে  
আরো, চেনা-জানা নেই তাই থেকে থেকে  
বলা না-বলার জল্প  
ধামা ও চলার ছন্দ  
চোখ খুলতেই  
দেখি তুমি নেই!  
বৃষ্টি-খোয়া কদমাক্ত পথে  
বিহ্বল-চকিত রথে  
চলে গেছে যেন কত দূরে!  
শ্রান্ত আমি ক্লান্ত পায়ের মিথ্যা ঘরে ঘরে  
বার্ষিক মনে এই শূন্য ঘরে কিরে আসি।

'ভালবাসি'—

ভালবাসি বলা শব্দ বড়!  
লজ্জা ভয়ে দেহ-মন অতি জড়সড়,  
বুক ফাটে তবু ভালবাসি বলা দায়।

নব নব রাত্রি-দিন আসে চলে যায়  
বৃষ্টি বারে  
অনাদি অনন্ত কাল ধরে  
তার মাঝে অন্ধকারে হু হু করে নেমে আসে ঝড়,  
হিয়া কাঁপে ধরাধর  
অজ্ঞ বারে, ঝিকিঝিকি সিক্ত গণ্ড জলে তপ্ত জাঁবি;  
মৃত্যুস্নান অন্ধকার ভেদ করে তবু চেয়ে থাকি  
শ্রিয়ে,

হয়তো আসবে তুমি প্রভাতের রাজা আজ নিশে।

বৃষ্টি বারে বৃষ্টি বারে  
ঝিম ঝিম ঝিম সাগরক্ষণ। কল্লুবরে  
একা একা বসে আমি। গাঢ় অন্ধকার  
আপন আঁচলে ঢেকে নিল ত্রিসংসার।



শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

একখানা বই থেকে নকল করার নাম চুরি। অনেকগুলো বই থেকে নকল করার নাম গবেষণা। বছর পাঁচেক আগের কথা বলছি। অনেক বই বেঁটে, অনেক মেহনত করে, ঘামের গন্ধ-যমুনা বইয়েও যখন দু'লাইন লিখতে পারলাম না, গুরু তখন ডেকে বললেন “বৎস, ওঁসব তোমার দ্বারা হবে না, এ লাইন থেকে কেটে পড়।”

কিন্তু গবেষণা করতেই হবে আমাকে। ডিগ্রীটা না পাট নেহাৎ একটা ডিপ্লোমা ত চাই-ই।

শ'পাঁচেক প্রশ্ন সম্বন্ধ করে, দিল্লী থেকে কুরুক্ষেত্র অভিযুগে রওনা দিলাম। এবার আর বই থেকে নকল নয়। মুখোমুখি প্রশ্ন করে উত্তর পুনর্বাচন সমস্তা নিয়ে প্র্যাক্টিক্যাল গবেষণা।

জায়গাটার নাম নিলোখেরি। দিল্লী থেকে আশী মাইল দূরে। কুরুক্ষেত্রের কাছেই। বাসনা ছিল ধ্বংসস্তম্ভে মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারার।

নিলোখেরিতে বহু দিন ছিলাম। বহু নবজীবনের সাথে পরিচয়ও ঘটেছিল। কিন্তু একটি দিনের ছবি আমার মনে যে রেখাপাত করেছে, আমার মনে হয়, জীবনের শেষ মুহূর্তেও সে চিত্র মুছবে না।

প্রায়ের তাড়া নিয়ে প্রতিদিন ঘরে ঘরে ঘুরতাম। সাথে থাকতেন স্থানীয় কবি বন্ধু—আমার দোভাষী।

নিলোখেরির প্রায় সবাই মূলতান প্রত্যাগত শরণার্থী। মূলতানের গ্রামের চারী-সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত পরিবার।

সেদিন গরমটা একটু বেশীই পড়েছিল। সমস্ত দিন কাজে মনোযোগ দিতে পারি নি। দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য দিগন্তে আত্মীয় ছড়িয়ে পাটে বসেছিলেন। আমার কবি বন্ধু নানকের মন্ত্রিমা আবৃত্তি করতে করতে এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার বেশী দেহী ছিল না। সাথে সাথী প্রদীপ নিয়ে চলল। চারিদিকে বাতী নেই। বড় রাস্তাগুলোতে তখনও সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলি নি।

রাস্তার বাঁকে বাঁকে দু'রক্ত ছেলেরা খেলাধুলোর মত্ত ছিল। হস্পিটাল এখিরা ছাড়িয়ে টেনশনের দিকে পড়লাম। গ্রামের বড়রা ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালছিল। আমার মনে ভেসে উঠল বাংলার নিভৃত পল্লার বিষ্ময়প্রায় দৃশ্য। তুলসীমাকে প্রদীপ-শিখারত গলবস্ত্র বন্ধ পল্লাবালার সে চিত্র সহস্র মাইল দূরে কে শিখিয়ে দিল?

জরতের গ্রামকে তখনও আমার চোমা ছিল বাকী। আমার

কবি বন্ধু যশোবন্ত বলল, “এই যে এসে পড়েছি।” কুটারের সামনে একটা গরু-বাধা। মাটার কলসী ভরা জল। পাশে ঝকঝকে গেলাস।

যশোবন্ত ভিতরে গিয়ে গৃহকর্তাকে ডেকে আনল। এখানকার সব ঘরেই ওর সমান যাতায়াত। সবাই ওকে ‘গুরুপ্রিয়’ বলেই ডাকে। যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর নাম গোবিন্দরাম।

গোবিন্দ মূলতানের অধিবাসী। পাঞ্জাবী ভাষায় মূলতানী দেহাতীর টান আছে। লম্বা-চওড়া চেহারা। মুখখানা রক্তাভ। মাথায় পাগড়ী। পরনে ছিন্ন শালওয়ার। আমাদের সহস্র কুর্গিস করে দাঁড়াল। খাটিয়াতে বসলাম।

আমার সহস্র প্রশ্নে আমি নিজেই দ্বিধাবোধ করছিলাম। হঠাৎ লোকটা আমাদের কেসে লাফ দিয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমার উদ্বেগ দেখে যশোবন্ত অভয় দিলেন, “বাবড়াবেন না, ও এখনি আসছে।”

ঝকঝকে গ্রাস ভর্তি ফেনিল দুধ নিয়ে গোবিন্দরাম হাসিমুখে এসে দাঁড়ালো।

যশোবন্ত আমার কানে কানে বলল, “দুধটুকু চোখ-কান বুজে খেয়ে কেলুন।” এই ওর আতিথেয়তা। না খেলে ওকে শব্দত, কেইজ্জতি করা হবে।

যশোবন্তের আদেশ শিরোধার্য করলাম। কাঁচা ফেনিল দুধে চুমুক দিলাম। তা ছাড়া লোকটার আন্তরিকতাও আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

প্রশ্নরাশি শেষ করে উঠছি, এমন সময়ে মিনতির সুরে গোবিন্দ বলল, “তুমি দিল্লী থেকে আসছো? তাই না?”

বললাম, “হা”—

“তাহলে রাজার সাথে বোজই দেখা হয়?”

বললাম, “কোন রাজা?”

“কেন? আমাদের মুখিয়া যে বলত রাজা দিল্লীতেই থাকে।

তাকে দেখোনি কোনো দিন?”

বললাম, “ও হরি! তুমি জানো না গোবিন্দ, সে রাজা ত কবে এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে! এখন ত তোমার আমার, আমাদের সবাই রাজা। বাকি খুশী গদীতে বসাত।”

যশোবন্ত দাড়ির কাঁকে হেসে বলল, “বল ত চাচা তোমার জন্তও একবার চোঁটা করে দেখতে পারি। সবাই পঞ্চায়েতে রায় দিলেও দিল্লীর গদীতে তুমিও বসতে পারো।”

বুদ্ধ বলল, “তোমাসা কবিস নি। তুই খাম, জ্যাঠা কোথাকার। জানিসটা কি গুনি? ইংরেজ রাজা ত চলে গেছে। তার গদীটা ত আর খালি নেই। বলি, নতুন রাজাও ত দিল্লীতেই থাকে?”

“ঠিক কথা। ঠিক কথা। তাকে কি কিছু বলতে হবে?

বল ত গোবিন্দ—”

আমার দু'খানি হাত ধরে মিনতির সুরে সজল চোখে বুদ্ধ বলল, “তুমি বলবে বাবুজী? বল তুমি বান্দশাকে বলবে?”

আমি বললাম, “তোমার সমস্তাটা তো বল আগে।”

—“আমার বিজ্ঞা।” বলেই বুদ্ধ অশ্রু সংবরণ করার বার্থ চোঁটা করল।

কিং-কর্তব্য-বিমুঢ় হয়ে আমি যশোবন্তের মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম ওর অবস্থাও সুবিধের নয়। চোখ দুটো বাষ্প-সজল।

আমি বললাম, “কি হয়েছে গোবিন্দ? বল, তোমার বিজ্ঞার কি হয়েছে। আমি নিশ্চয়ই দিল্লীতে থবর দেব। গোবিন্দ!”

—“জী!”

—“কোথায় তোমার বিজ্ঞা?”

—“বাবুজী, পেটের দায়ে তাকে বিক্রী করে দিয়েছি। ভগবান আমাকে কেন তার আগে খতম করে দিলেন না? আমার বিজ্ঞা—”

বলেই বুদ্ধ হাউ হাউ করে কানতে শুরু করল। তার অশ্রু-সাবরণের কোন পথই আমার জানা ছিল না।

বসে বসে না দেখা বিজ্ঞার চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করলাম। তরুণী যুগ্মতা, তরুণী, সখা বহু বিজ্ঞার চিত্র আমার চোখে ভেসে উঠল।

কিছু করে বিজ্ঞা? মাতা? কন্যা? বন্ধুসমী? কেমন করে জিজ্ঞাসা করি?

বুদ্ধ বলল, “মাত্র একশ টাকার লজ্জা পাবও হরিরাম আমার বিজ্ঞাকে কিনে নিয়েছে। বিশ্বাস কর বাবুজী, ছ’ মাস ধরে বোজ একবেলা খেয়ে পাঁচ কুড়ি টাকা জমিয়ে যখন হরির কাছে গেলুম বিজ্ঞাকে ফিরিয়ে আনতে বোটা পাজী বলে কি না একশো কি হে? কমসে কম পাঁচশো টাকা ফেলে বিজ্ঞাকে ফেরত নেবার কথা পাড়ো। বৈয়মান! কাম্বাক্ত, বোটার পায়ে ধরে বললাম, আমার বিজ্ঞা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। ওকে ছেড়ে দাও হরি। বিথাতা তোমার মঙ্গল করবেন। মূল্যের মতন লখা পাতগুলো বার করে বোটা বললে, “নিজের খাবার বন্দোবস্ত আগে কর চাচা! বিজ্ঞার চিন্তায় তোমার কাজ নেই।”

বাবুজী, বিজ্ঞাকে আমি মুখ দেখাতে পারি না। সে দিন কাছে গলাম আরও করতে। মুখ ফিরিয়ে নিল। দেখলাম বড় বড় চোখ দুটো তার জলে ভরে গেছে। চলে আসার পথে পিছুনে ফিরে দেখি, একাগ্র নয়নে বিজ্ঞা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে মনে বললাম, দুটো দিন সবু কর বিজ্ঞা। তাকে আমি ফিরিয়ে নেবই।

চারি দিক ঘুরে ঘুরে দিন-রাত মজুরী খেটে আরও দু’কুড়ি টাকা জোগাড় করে হরির কাছে গেলাম। হরির পায়ে টাকা কটা দিয়ে বললাম, “হরি ভাই, তুই বড়লোক। দু’কুড়ি টাকা বেশী দিচ্ছি। বিজ্ঞাকে ছেড়ে দে।” হরি তাকে ছেড়ে দিল না।

আমি তখন বললাম, “হরি, তোমার ক্ষেতে কত লোক খাটে। আমি তোমার ক্ষমিতে পুরো ছ’ মাস গতর খেটে দেব। তুই আমার

বিজ্ঞাকে ছেড়ে দে। এখানে থাকলে ও আর বাঁচবে না। বাবুজী, বোটা শরতান শুধু মুচকি হাসলো।”

বিজ্ঞাকে অনেক বুজিয়ে দেখাতে গেলাম না। সত্যি বলছি, বাবুজী, বিজ্ঞাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না।

আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, “তাই যদি হবে, তবে ওকে বিক্রী করতে গেলে কেন? তখন এ সব কথা খেয়াল হয় নি?”

গোবিন্দরাম বলল, “বিশ্বাস কর বাবুজী, একটা কানাকড়ি পকেটে ছিল না। তাতে কোন দুঃখ ছিল না। যে বিথাতা এ পেট দিয়েছেন, দুঃখ সেইবার শক্তিও তিনি কম দেন নি। আমার চিন্তা ছিল জ্ঞা বিজ্ঞাকে বাঁচানো। ওদের আমি খাবার জোগাতে পারছিলাম না। এই একশ টাকার এক পাই আমি নিজের লজ্জা খরচ করিনি। জ্ঞাকে বাইয়ে বাঁচিয়েছি। বাবুজী, তুমি রাজা হবে। দিল্লীতে থবরটা দিয়ে তুমি আমার বিজ্ঞাকে ছাড়িয়ে দাও।”

আমার পা দুটো জড়িয়ে বুদ্ধ হাপুস নয়নে অশ্রু গলা-বহুনা বইয়ে দিল।

অত্যন্ত দ্বিধার সাথে বললাম, “তোমার জ্ঞা তো তোমার সাথে আছে। তাকে বড় করছ তো?”

“জ্ঞার কি হয়েছে জানি না। দিন রিন শুকিয়ে যাচ্ছে। কেবল বোখ হয় বিজ্ঞার কথাই ভাবে। তুমি চল না বাবুজী! ভিতরে একবার চলো। দেখবে তাকে।”

কত কষ্ট করে মূলতান থেকে পায়ে হেটে ওদের নিয়ে বেঁচে এসেছি, সে দুঃখের কথা বিথাতা ছাড়া কেউ জানেন না। ঘর বাড়ী সম্পত্তি কিছুই তো আনতে পারিনি সাথে। আমার দরিদ্র জীবনে জ্ঞা বিজ্ঞা ছাড়া আর কেউ নেই। চলো না, দেখবে জ্ঞাকে।

অনেকক্ষণ থেকেই মনটা আনচান করছিল। বুদ্ধের সাথে যবের ভিতরে প্রবেশ করলাম। দু’একটা লাঙ্গল ছাড়া ঘরে বিশেষ কিছুই দেখলাম না। আমাকে টানতে টানতে একটা বলদের সামনে নিয়ে বাড়া করল। এক হাতে বলদটার গলায় হাত বুলিয়ে অল্ল হাতে তার মুখে খড় দিয়ে আদর করে বুদ্ধ বলল, “বাবুজী, এই হল জ্ঞা। বিজ্ঞাকে যদি দেখতে। সে আরও লখা। আরও কসাঁ। তার শিং দুটো সোনালী রঙের। জ্ঞা বিজ্ঞা দুজনে মিলে পাখর থেকে সোনা কলায়।” বলদটার গলা জড়িয়ে বুদ্ধ বলল, “দিল্লীতে গিয়েই বাবুজী বিজ্ঞাকে ছাড়িয়ে দেবেন। শুনহিস জ্ঞা? জ্ঞা কেমন করে তোমার দিকে তাকাচ্ছে দেখো বাবুজী, দেখো।”

গবেষণার ডিগ্রী আজও পাইনি। দুঃখ নেই তাতে। আমার ভারতবর্ষকে আমি চিনতে শিখেছি। আমি তাতেই খুঁজি।

[ মাসিক বন্ধুসমীতে প্রকাশিত নিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য ]



# বিত্তেকানন্দ

## স্টোত্র

সুমণি মিত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

(যুগ প্রয়োজন ও ঊনবিংশ শতাব্দী)

১

“বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাচ্ছুন !  
তাক্ষহং বেন সর্বাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ !  
অজ্ঞোহপি সন্নব্যয়াদ্যা ভূতানামীথরোহপি সন্ ।  
প্রকৃতিং স্বামিষ্ঠায় সন্তব্যাম্যাস্মায়য়া ।  
বদা বদা হি ধর্মস্য দ্বানির্ভবতি ভারত !  
অভ্যুপানমধর্মস্য তদাস্তানং স্বজ্ঞামাহম ।  
পরিভ্রাণায় সাধুন্যং বিনাশায় চ দ্রুততাম্ ।  
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তব্যামি যুগে যুগে ॥” ১

“নবমুদ্রি দুর্ধরো হরিনারায়ণো হৃহম্ ।  
কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নবনারায়ণবুধী ॥” ২

১। “শ্রীভগবান বোল্লেন—‘হে পরমেশ্বর অর্জুন, আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেসব জানি ; কিন্তু তুমি তা’ জানো না (তুলে গিয়েছে) আমার সেই ত্রিগুণাত্মিক শক্তিকে আজ্ঞার কোরে স্বীয় মায়ার দ্বারা আমি দেখধারণ কোরি।

হে ভারত, এখনই ধর্মের দ্বানি ও অধর্মের অভ্যুপান হয়, তখনই আমি নিজেকে স্বজন কোরি। সাধুদের রক্ষা, পাপীদের দ্রুতিনাশ এবং ধর্মস্থাপনের জন্তে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।—”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪র্থ অধ্যায়)।

২। “হে অর্জুন, তুমি দুর্ধর নর, আমি নারায়ণ হরি। আমরা সেই ‘নর-নারায়ণ’ স্ববি, কালক্রমে এই ভূবংশে অবতীর্ণ হোয়েছি।

—মহাভারত (উদযোগ পর্ব)

এখানে প্রশ্ন তোলে মন,—  
নিভাযুক্ত আত্মা ঐ ‘নর-নারায়ণ’  
আবার এলেন কেন  
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে,

যখন এদেশে  
প্রচণ্ড প্রতিভারা তুলেছিলেন ঝড়।  
মহর্ষি, কেশব সেন, বিজ্ঞানাগর  
যখন কর্ণধার বাংলাদেশের,  
তবু কেন সেই যুগে ফের  
এলেন দুর্ধর নর, স্ববি নারায়ণ ?  
ঠাকুর-স্বামিজী এই যুগে আত্মা  
কি জন্তে এলেন ?

২

আমরা সেদিন  
মদ ও মাংসের রাজ্যে  
একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন !  
দুর্জন ইংরিজী-জানা অচেতন সমাজের বৃকে  
ঝাঁকে-ঝাঁকে বোসেছিলেন।  
শতুনির মতো ঝুঁকে ঝুঁকে !  
বিশেষতঃ বাঙ্গালীর শিক্ষিত সমাজ  
পরাজুকরণ মোহে সব চেয়ে আগে,  
সবচেয়ে অস্মানবদনে,  
সবচেয়ে অসংযতভাবে  
ঘাড় ঝুঁজে পোড়েছিলেন। ঐ  
বহিমুখী বিদেশীর জালব জীবনের পাকে !

বহুকাল ধোরে  
খাটি ইংরিজী বুলি বোলো  
মাতলামি কোরেছিলেন প্রচণ্ড প্রলাপে ।  
সেলিনের সাহিত্যে সে দুঃস্বপ্নের কথা লেখা আছে,—  
‘I read English, write English  
Talk English, speechify in English,  
Think in English, Dream in English.’ ৩

“পুরাকালে ভুতে পেতো  
মদ-মাংসে পেয়েছে এককাল...  
মাতলামি কোরে কি  
‘নিমেটোদ’ ঠিক কথা বলে । ৪

৩। “আমি ইংরিজী পোড়ি, ইংরিজী লিখি, ইংরিজীতে কথা বোলি, ইংরিজীতে বক্তৃতা দি’, ইংরিজীতে চিন্তা কোরি এবং ইংরিজীতে স্বপ্ন দেখি।”—সংবাদ একাশী।

৪। সে-যুগে মদ না খেলে সমাজে কেউ শিক্ষিত বোলে স্বীকৃত হোতোনা। স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষের ভাগ্নে প্র্যাক্টিস্ট হোয়েছিলেন। কিন্তু মদ খেতোনা। ঘোষমশাই অত্যন্ত হুঃখিত হোয়ে বোসেছিলেন,—“তুই মদ খেতে শিখি না, তাকে আমি সমাজে বার কোরি কি কোরে ?”

আর ও-মিকে মিশনারীগণ  
তাগ বুঝে 'হিন্দু'কে অন্ধকার থেকে  
টেনে-হিঁচড়ে আনেন আলোকে।  
পরামুখরণে আর আত্মবিস্মরণে  
অন্ধ বাঙ্গালী বতো গাণ্ধীদের মতো  
কান দুটো খাড়া কোরে মন দিয়ে শোনে,—  
“তোমাদের দেব-দেবী, আচার বিচার  
পৈশাচিক, অনন্ত নরক ;

Crystallized immorality  
And Hinduism  
Are something.

বীত আছে ভয় নেই,  
পাণীদের পরিত্রাস্তা তিনি,  
তার পায়ে পড়ো,  
আর  
‘বাইবেল’ বৃকে চেপে  
প্রাণপণে অনুতাপ করো।”

বিশ্বয়ী জাতির গুণে অভিভূত বিজিত জাতের  
তরল মনের পাসা উর্বর ভূমিতে  
এইভাবে খেতচাষাগণ  
ধর্ম-বিষয়ে বিন মুঠো মুঠো ছড়াতে থাকেন !  
সেদিনের শিক্ষিত সমাজ  
পাত্রীদের কথাতাই ওঠে-বসে-নাচে,  
“পৈশাচিক হিন্দুধর্ম” ফেলে পত্রপাঠ  
পুঠান হোয়ে তবে বাঁচে !

৪

আরও একটা দল ছিলো  
'ডিরোজিও' জাতে, ৬  
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নামে  
অসন্তুষ্ট মদ খেয়ে মাতে !

৫। “ফটিকাকারে ঘনীভূত অশবিত্ততা আর হিন্দুধর্ম একই  
জিনিষ।”

৬। সেকালে হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা কালকাতা সহরে যে  
সমাজ-বিপ্লব শুরু করেছিলো, তার জনক হোলেন আধা-ইউরোপী  
ও আধা-ভারতীয় এই তরুণ প্রতিভাশালী শিক্ষক ‘ডিরোজিও’।  
‘ডিরোজিও’ বর্ষাধী ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছিলেন এবং ফরাসী-  
বিপ্লব-সাগর মছন কোরে ভারতের লজ্জা শুধু অমৃতই আনেননি,  
গরলও এনেছিলেন। ‘The Fakir of Janghira’ নামক  
কাব্যগ্রন্থটি তাঁর ভারত-প্রেমের একটা চূড়ান্ত নিদর্শন। ‘ডিরোজিও’  
মাত্র ২০ বছর জীবিত ছিলেন। ১৭ বছর বয়সেই এই দৃঢ়স্বয়  
প্রতিভাবান অধ্যাপক হিন্দুকলেজের ছাত্রদের নিয়ে এই নতুন

নিজেদের ধর্মবাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে  
লজ্জা ঢাকেনা এরা আর কোনোটাতে।  
ফরাসী-বিপ্লব-বিষি পোট ভোরে খেয়ে  
ঘে-ডালেতে থাকে এরা সেই ভাল কাটে !  
সম্প্রতির তীরণ আকার  
কুমীর আনবে বোলে  
একমনে কোষে খাল কাটে !

সমাজ-বিপ্লব শুরু করেন। তাঁর মূলমন্ত্র ছিলো—‘ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-  
সর্বতোভাবে উপভোগ কোরতে হবে।’ এতে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে  
বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহায়ে সত্যানুসন্ধানের একটা স্পাহা জেগেছিলো,  
সংস্কারমুক্ত বুদ্ধি দিয়ে সবকিছুকে যাচাই কোরে নেবার একটা প্রবল  
আগ্রহ দেখা দিয়েছিলো। তাঁর বৃত্তী ছাত্রদের মধ্যে বেভারের  
কুসংমাহন ব্যানার্জী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং ভারতের  
Demosthenis স্বনামধন্য শ্রীরামমোহন বাবুর নাম উল্লেখযোগ্য।  
কিছু কালক্রমে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষার বেচ্ছাচারী ছাত্রেরা ব্যক্তি-  
স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু কোরে গিলে। নিষিদ্ধ মাংস খাওয়া,  
প্রকৃত্তে স্বরাপান করা—এইসব সংসারদের কাজ বোলে বিবেচিত  
হোতে লাগলো। হিন্দুধর্মের সবকিছুকেই কুসংস্কার বোলে ধোরে  
নিয়ে মজপানকেই কুসংস্কারভঞ্নের একমাত্র উপায় মনে কোরে এরা  
মদিরা-স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলো। শুধু হিন্দুধর্মকেই নয়,  
সর্বজনীন স্বাধীনতা উপভোগ কোরতে গিয়ে শেখপদ্যন্ত এরা কোনো  
ধর্মকেই গ্রহণ কোরতে পারেনি। এদের হঠকারিতা, যেচ্ছাচারিতা  
এবং উচ্ছৃঙ্খলতা সে-যুগের সমাজের সমস্ত শ্রেণীর কাছেই অসহ্য  
হোয়ে উঠেছিলো। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের এই পৈশাচিক আচার-  
ব্যবহার দেখে রাজা রামমোহন অত্যন্ত বিচলিত হোয়েছিলেন।  
আজীবন ‘অন্ধবিশ্বাস’ের বিরুদ্ধে যিনি যুক্তর খড়্গ ধোরেছিলেন  
সেই বুদ্ধিবাদী রামমোহন শেখজীবনে হিন্দুকলেজের এই যুক্তিবাদী  
ছাত্রদের বেচ্ছাচার আর ‘অন্ধবিশ্বাস’ দেখে রীতিমতো শিউরে  
উঠেছিলেন। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন,—

“In his younger years, his mind had been  
deeply struck with the evils of believing too  
much, and against that he directed all his  
energies; but in his latter days, he began to  
feel, that there was as much, if not greater  
danger in the tendency to believe too little.  
He often deplored the existence of a party which  
had sprung up in Calcutta, composed principally  
of imprudent youngmen, some of them  
possessing talent, who had avowed themselves  
sceptics in the widest sense of the term. He  
described it as partly composed of East Indians,  
partly of the Hindu youths who, from education  
had learnt to reject their own faith without  
substituting any other, these he thought more  
debased than the most bigoted Hindu, and their  
principles the bane of all morality.”

—Biography of Raja Ram Mohan Roy,  
London.

৫

আর,

ওদের কি শেষ ?

শতাব্দী-সঞ্চিত ঐ কুসংস্কারে কান

সেদিনের মূৰ্চা-পড়া হিন্দুধর্ম তার

দুর্ভহ ওজন নিয়ে বেদ-বেদান্ত থেকে

পিছলে এসে পোড়েছিলো

রান্নাঘরে 'ভাতের হাড়িতে' !

ধর্মের রক্ষক বারা, হিন্দুধর্মটাকে

জী-আচার-বেশাচারে আঁটে-পুঁটে বেঁধে,

'জ্ঞান-মার্গ', 'ভক্তি-মার্গ', 'যোগ-মার্গ' থেকে

'ছুৎ-মার্গে' পোড়ে শ্রেয় বাবি খাচ্ছিলো !

এই ঘোর 'বামাতন্ত্রে' মূলমন্ত্র হোলো—

'আমায় ছুঁয়োনা কেউ, ছুঁলে জাত যায় !'

পাগলাগারদটাকে 'ব্রহ্মলোক' ভেবে,

দুই কিংবা ততোধিক উপপত্তী রেখে

অপরিচিতিরূপে দুচোখ রাঙায় !

৬

এমন সময়

উন্নত বলিষ্ঠ স্বচ্ছ রামমোহনের

'বেদান্তের' বেদ্বাদ্যতে

সেদিনের তত্ত্বাত্তর জাত

প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে চোখ তুলে চায় ।

৭। সে-কালের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর মতামত প্রণিধান-  
যোগ্য—“আমাদের কি আর ধর্ম ? আমাদের 'ছুৎ-মার্গ', খালি  
'আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা ।' বেসেবেশ বড় বড় মাথাগুলো  
আজ দু'হাজার বছর খালি বিচার কোরছে, ডান হাতে খাবো,  
কি বাঁহাতে, ডান দিক থেকে জল নেবো, কি বাঁদিক থেকে—তাদের  
অধোগতি হবে না তো কার হবে ?...জোর টাকা পরচ কোরে  
কান্না বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলে আর পড়চে । এই ঠাকুর  
কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন তো এই ঠাকুর  
আঁটকুড়ির বেটাদের গুটির পিণ্ডি কোরছেন—এদিকে জ্যান্ট ঠাকুর  
অন্ন বিনা, বিজা পিনা মরে যাচ্ছে । ভোগের সময় ব্রাহ্মণের জাতের  
স্পর্শে দোষ নেই—ভোগ সাঙ্গ হোলোই জ্ঞান...সাধু সন্ন্যাসী, আর  
ব্রাহ্মণ বন্দাস দেশটা উৎসর্গ দিয়েছে । দেখি দেখি চুঁবি বন্দাসি—  
এরা আবার ধর্মের প্রচারক ! পরমা নেবে, সর্বমাম কোরবে আবার  
বলে—ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা—আর কাঁষ তো ভারি—‘আলুতে  
বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তাহালো কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড বসাতলে  
যাবে ?’ ‘১৪ বার হাতে মাটি না কোরলে ১৪ পুঙ্খ নরকে যায়,  
কি ২৪ পুঙ্খ’—এই সকল দুরূহ প্রেমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোরছেন  
আজ ২ হাজার বছর ধরে । এদিকে ½ of the people are  
starving”

পত্রাবলী ( ১ম ভাগ, পৃ: ১৫৬ ও ৪৫৬ ) ।

দ্বিধিক জ্ঞানশূন্য হোয়ে

'মাস্-ম্যান', 'কেরী'-ফেরি যাতো ৮

প্রবল বেদান্ত-যুদ্ধে

একে একে হোসেন আহত ।

ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র এ

জড়পিণ্ডবৎ স্থাপু হিন্দু জাতটাকে,

একাই একশো হোয়ে রাজা একটানে

পঙ্খব্যাধ থেকে তাকে

ক'টি ধোরে বার কোরে আনে !

৭

যুগের সারথি তুমি 'ভারত-পথিক',

আধুনিক ভারতের স্রষ্টা তুমিই ।

অসীম দৃঢ়তা নিয়ে বৃদ্ধ

হৃদয় ও বুদ্ধিকে জাগ্রত রেখে

যুগের মূঢ়তা আর অন্ধতা যতো

বিদূরিত কোরে গ্যাছো তুমি ।

'সত্যদাহ' প্রথাটাকে দাহ কোরে তুমি ৯

৮। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন  
এবং লুপ্তপ্রায় উপনিষদ প্রচার এবং পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে  
আন্দোলন আরম্ভ করেন । কেবল হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই নয়,  
মিশনারী প্রচারিত অসার মতবাদের বিরুদ্ধেও তিনি লেখনী ধারণ  
করেন । কলে প্রাচীন-পন্থী হিন্দুসমাজ এবং খৃষ্টান মিশনারী—  
দু'পক্ষই বিশেষ ভাবে বিচলিত হন । ১৮২১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম  
আডাম নামে একজন খৃষ্টান মিশনারী খৃষ্টীয় ত্রিবিবাদ পরিত্যাগ  
কোরে রামমোহনের একেশ্বরবাদ গ্রহণ করেন । এই ব্যাপার নিয়ে  
মিশনারী মহলে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হোয়েছিলো । দ্বিধিক  
জ্ঞানশূন্য হোয়ে ম্যাস্-ম্যান, কেরী প্রভৃতি জীৱানপুত্রের মিশনারীরা  
বেদান্তদর্শনকে আক্রমণ কোরলেন । রামমোহন দৃঢ়চিত্ত তাঁদের  
অবৈজ্ঞানিক মতামতগুলো একে একে খণ্ডন কোরতে লাগলেন ।  
এই বিখ্যাত বেদান্ত-যুদ্ধ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা । একদিকে  
হিন্দুদের শতাব্দীসঞ্চিত কুসংস্কার, আর একদিকে মিশনারীদের  
আক্রমণ—দু'য়েরই বিরুদ্ধে রামমোহনকে একাই দৃঢ়চিত্তে এবং  
বীরভাবে সংগ্রাম কোরতে হোয়েছে ।

৯। 'সত্যদাহ' প্রথা বৃটিশ সরকার বদল করেন । এ ব্যাপারে  
স্বামিজীর মতামত প্রণিধানযোগ্য ।

"The great Hindu reformer, Raja Rammohan Roy, was a wonderful example of unselfish work. He devoted his whole life to helping India. It was he who stopped the burning of widows. It is usually believed that this reform was due entirely to the English ; but it was Raja Ram Mohan Roy who started the agitation against the custom and succeeded in obtaining the support of the Government in suppressing



‘জাতিভেদ’, ‘শ্রেণীভেদ’ ভেঙ্গে  
অমিতবিক্রমে  
নোয়া সমাজটাকে  
একা হাতে সাঁক কোরে গ্যাছো ।  
বিবি স্বার নিষেধের দড়া-দড়ি ছিঁড়ে  
‘কালাপানি’ পার হোয়ে  
দেশটাকে সচল কোরেছো ।

স্বামিজী তো ঠিকই বোলেছেন,—  
“One of the great causes  
Of India’s misery and downfall  
Has been  
That she narrowed herself,  
Went into her shell  
As the Oyster does,

“Until he began the movement, the English  
ad done nothing.”—Inspired Talks (Comp.  
orks. Vol VII 84) স্বরেন বানার্জীও এতে সাং দিয়েছেন,  
Without him the law could never have been  
assed.”

And refused to give her Jewels  
And her treasures  
To the other races of mankind,  
Refused to give life-giving truths  
To thirsting nations  
Outside the Aryanfold

That has been the one great cause,  
That we did not go out,  
That we did not compare notes with  
other nations,—  
That has been the one great cause  
Of our downfall,  
And every one of you knows  
That that little stir,  
The little life that you see in India  
Begins from the day  
When Raja Ram Mohan Roy  
Broke through the walls of that  
exclusiveness.

## সুস্থ-সবল দাঁত ও মাড়ি

সক্রিয় রেমবোর্ফিল সংযুক্ত

কিন্মায়কর সবুজ কলিনসটুথপেস্ট

- \* দাঁত পরিষ্কার ও ঝকঝকে করে
- \* মাড়ি সুস্থ রাখে
- \* দন্তক্ষয়ী জীবাণু তাড়ায়
- \* মুখের দুর্গন্ধ দূর করে

জেক্সি ম্যানাস  
এণ্ড কোম্পানী  
প্রাইভেট লিমিটেড

GK 3027



ফেনার জেনোই

‘কলিনস’-এর বিশেষত্ব ।

Since that day,  
History in India  
Has taken another turn,  
And now  
It is growing with accelerated motion." ১০

তুমি বা' কোরেছো রাজা,  
তার তুলনায়  
বা' করেনি—সেটা কিছু নয়।  
গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি এনে,  
জাতীয় শিক্ষাটাকে বিজ্ঞানে টেনে,  
আমাদের ক্ষীণ প্রায়ুটাকে  
সাম্প্রতিক যোগ্যক তুলেছো !

হিন্দু ও মুসলিম—দু'য়েরই যখন  
একোর শিখিলতা ঘটেছে চরম,  
তোমার ঐক্যবোধে তার  
মধুর মিলন-সেতু গড়েছো তুমিই,  
সমবার ধর্মের সত্যতা কোরেছো প্রচার।

জন্মেরা হি'হু-ভাটটাকে  
বেদান্তে চুবিয়ে তুমি  
য'বে-যেছে তার  
লুপ্ত শোলা কোরেছো উদ্ধার। ১১

১০। "ভারতের পতন এবং দুঃখ দারিদ্র্যের অন্ততম প্রধান কারণ—ভারত নিজের কর্মক্ষেত্রে সঙ্কুচিত কোরেছিলো, শাসকের মতো দরজায় খিল দিয়ে বোসেছিলো, আর ছাড়া অজ্ঞাত সত্যপিপাসু জাতের কাছে নিজে বহুভাণ্ডার—জীবনপ্রদ সত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেনি। আমাদের পতনের অন্ততম প্রধান কারণ, আমরা বিদেশে গিয়ে অজ্ঞাত জাতির সঙ্গে আমাদের তুলনা করে দেখিনি, আর আপনারা সবাই জানেন, যেদিন থেকে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্গীপতার বেড়া ভাঙলেন, সেই দিন থেকেই—আজ ভারতের সর্বত্র যে একটু প্রাণ-স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হচ্ছে—তার সূত্র।"

—Lectures From Colombo to Almora  
(Page—244)

১১। রামমোহন প্রসঙ্গে 'হামিলা' সিস্টার নিবেদিতাকে বোলেছিলেন—তার বাক্যের প্রধান সুর হচ্ছে তিনটে,—

"...his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu.

In all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Ram Mohan Roy had mapped out."

—Notes of some wanderings  
with the Swami Vivekananda

by  
Sister Nivedita

সাতচর্চ হবে থাক,  
সেদিনের হিন্দুর দল  
তেড়ে কামড়াতে এসে  
অবিশ্রান্ত কোরেছে চিংকার ! ১২

তুমি নির্ধাত  
John the Baptist,  
"...The voice of one  
Crying in the wilderness,  
Make straight  
The way of the Lord..."

ভবিষ্যতের দিকে ঢেয়ে  
কেন বোললে না খুলে তুমি,—  
"...There standeth one among you  
Whom Ye know not ;  
He it is,  
Who coming after me  
Is preferred before me,..." ১৩

তা-সে-যাই-হোক,  
শতাব্দীর ব্যবধানে  
আমাদের আজ  
একখণ্টা চুকেছে মাথায়—  
অবতার আসার আগেই  
দাঙ্গা দীপ্তি নিয়ে  
খ্যাতি হাতে আসে অগ্রদূত !

[ক্রমশঃ।

১২। প্রাচীন হিন্দুসমাজ সমুদয়কে পুড়িয়ে মারবার অভিযোগ হারিয়ে রামমোহনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। তার বাধাকাঙ্ক্ষের দল এইবার তাঁর মূর্তিপূজা অস্বীকার এবং বেদান্ত আলোচনাকে প্রতিবাদ কোরতে লাগলেন। এই বাগ্মন্যবাদের মধ্যে দেশপ্রেম কতোখানি ছিলো জানি না, তবে কুকুচি এবং ঈর্ষার পরিমাণ নিতান্ত কম ছিলো না।

১৩। বাইবেলে 'St. John'এ খৃষ্টের অগ্রদূত 'John the Baptist' এর কথা লেখা আছে। জুয়েরা তাঁকে তাদের শাস্ত্রোক্ত অবতার ভেবে যখন ক্রন্দ কোরেছিলেন,—“Who art thou ?” তখন John উত্তর দিয়েছিলেন,—“I am not the Christ.” —“What then ?...what sayest thou of thyself ?”

তার উত্তরে John বোলেছিলেন—“I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord...But there standeth one among you, whom Ye know not ; He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose.”

# হে উদ্দায় পশ্চিম বাতাস

( পি, বি, শেলীর 'Ode to the West Wind' কবিতার অনুবাদ )

( ১ )

হে উদ্দায় পশ্চিম বাতাস, তুমি মর্ত্তমান শরতের বাস,  
তোমারই অদৃশ্য উপস্থিতি থেকে যত পত্রদল  
বিতাড়িত, ঐক্সজালিকের থেকে যেমন ভূতেরা উর্দ্ধ্বাস।

শীতাল এবং কৃক, মলিন, এবং অরতপ্ত ও পাটল,  
মহামারী-কবলিত সখ্যাহীন তারা ; আর তুমি,  
তাদের সারথী করে অন্ধকার শীতের শয্যা মতাবল।

সপক বীজেরা, শুয়ে অঁকড়িয়ে ঠাণ্ডা নিম্নভূমি,  
প্রতিটি শবের মত কবরে আবদ্ধ হয়ে থাকে, যতক্ষণ  
তোমার বাসন্তী নীল ভগ্নী না বাজার নিজে চুমি'

সিঁড়া তার স্বপ্নময় পৃথিবীতে, করে সম্পূরণ  
( মধুর কোরকগুলি মেঘের মতন নিয়ে চরিয়ে হাঁওয়ার )  
জীবন্ত রঙ ও গন্ধে সমতল, পর্বত গহন :

হে উদ্দায়-সত্তা, সর্বদেশে তুমি বাও ;  
ধ্বংসকারী এবং বধক তুমি, শোনো, শুনে বাও !

( ২ )

তোমারই প্রবাহে ঢালু, শক্ত আকাশের সঞ্চালনে,  
খণ্ড-ছিন্ন মেঘপুঞ্জ, পৃথিবীর বিসীর্ণ পাতার মত করে,  
আকাশ ও সমুদ্রের থেকে, যেন গ্রন্থিল শাখার আন্দোলনে।  
বুড়ি ও বজ্রের ওরা দেবদূত ; প্রসারিত থাকে ধরে-ধরে  
যে তোমার বায়বীয় তরঙ্গ, স্ত্রনীল বৃকে তার,  
যেমন উজ্জল কেশ উদ্দোংকিপ্ত মাথার উপরে।

ভরাবহ প্রচণ্ডার, এমন কি দিগন্ত-রেখার  
অংশটি প্রান্তের থেকে মধ্য-আকাশের উচ্চমান  
আসন্ন বড়ের কেশরাশ। তুমি শোকগীতি তার।  
যে-বর্ষ যুগযুগ, তার এই রাত্রি প্রত্যাসন্ন বার লগ্নমান  
বিশাল সমাবিশীর্ণ গড়বে গযুক্ত তার, তাও  
করবে খিলাম সব তোমার বাস্পীয়শক্তি হয়ে একতান,  
তারই নীরব শূন্য থেকে কুসুম্বুটি, বহি আর করকাও  
ঝরে যাবে ; ওগো তুমি শোনো, শুনে বাও !

( ৩ )

তুমিই জাগালে গ্রীষ্ম-স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা  
নীল ভূমধ্যসাগর, সে যেখানে থাকতো শায়িত,  
তাকে ঘৃণাভাতো কুণ্ডলীকৃত ফটিক শ্রোতেরা,  
'যেরী' উপসাগরে আগ্নেয়শিলা-নির্মিত বীপের সন্নিহিত,  
এবং দেখতো ঘূমে প্রাচীন প্রাসাদ হর্যাবলী  
তরঙ্গের তীব্রতার দিনে আন্দোলিত,  
স্ত্রনীল শৈবালে, ফুলে আচ্ছন্ন সকলই  
কী স্বন্দর, অল্পজুতি মুর্চ্ছাহত সে চিত্র চিত্রণে।  
তোমার পথের জন্তে আটলান্টিক সমতায় বলী,

জলরাও নিজেদের লীর্ণ করে, আবর্তের গর্ভে, বহু নিচে  
সমুদ্র-শৈবাল আর কদম্বাক্ত বন, ভয়ে তাও  
সাগরের নীরস পাতায়, তারা জানে কী যে

তোমার গর্জন, আর সহসাই ভরে পাণ্ড গাও,  
কাঁপে, আর নিজেদের নষ্ট করে : ওগো শুনে বাও !

( ৪ )

আমি হলে যত পত্র, তুমি টেনে নিতে ;  
ক্রতগামী মেঘ হয়ে তোমার সাথেই যদি হতাম উচ্চীন ;  
অথবা একক ডেউ, কৈশে উঠে তোমার শক্তিতে,

শেতাম কিছুটা অংশ ক্ষমতার প্রভাবের, অল্পই স্বাধীন  
তোমার অপেক্ষা, হে দুর্দমনী ! এমন কি যদি  
হতাম শৈশবকালে আমি বা ছিলাম, আর আমি অর্ধাচীন,

হতাম তোমার সঙ্গী ভ্রমণের—আকাশ পরিধি ;  
এবং তখন যদি তোমার আকাশগতি অতিক্রমণ  
করার কচিং স্বপ্ন মনে হতো, বিরত হতাম সে অবধি

এ-প্রচেষ্টা থেকে যা তোমার সঙ্গে প্রার্থনার তীব্র প্রয়োজন।  
ওগো তুলে নাও আমাকে তরঙ্গ, পাঁতা, অথবা মেঘের মত !  
জীবনের কাঁটাবনে পড়ি আমি ! দেখে হয় শোণিত করণ !

সময়ের গুরুভাবে শৃঙ্খলিত এবং আনত  
তোমারই মতন একজন : দুর্দম এবং ক্রত, এবং উদ্ভূত।

( ৫ )

আমাকে তোমার বীণা করে নাও, এমন কি বনের মতন ;  
কী বা হবে তারই মত করে যদি আমার পাতারা বৃহৎ-বৃহৎ !  
উচ্চকিত তোমার বিপুল তান-লয়-সম্মেলন

উভয়ের থেকে নেবে, গভীর শায়ন কোনো স্তর,  
যা দুঃখেও মধুস্রাবী। হও তুমি তে সত্তা ভীষণ,  
আমার জীবন ! আর তুমি হও উত্তেজক আমার স্বায় !

আমার নিশ্চাপ চিন্তাগুলি বিধে করে। বিসর্জন  
বিসীর্ণ পাতার মত নুতন জন্মকে দিতে গতি !  
আর এই কবিতার এ-মন্ড্রেই করে সমর্পণ

জলন্ত চূরীর থেকে যেন ভস্ম, স্ক্লিঙ্ক-সংহতি,  
আমার বাক্যের রাশি, মাদ্রবের মাঝে, গুচ্ছময় !  
আমার ওঠের থেকে অজাগ্রত পৃথিবীর প্রতি

ভবিষ্যৎবাণীর শব্দ বাজাও ! হে বায়ু বরাভর,  
নীত যদি আসে তবে বসন্ত কি বহু দূরে রয় ?

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়



বায়োকমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কি নামে ডাকব? সাধারণ  
করবে? উদ্ভিদজগতই আমাদের বাতের প্রাণপাত্তি ইত্য  
আমাদের দেহের উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় সব বস্তু প্রদানকারী সব প্রকার  
উদ্ভিদের মধ্যেই হুড়িয়ে রয়েছে। বায়োকমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর  
সাহায্যে আমরা উদ্ভিদজগত থেকে প্রয়োজনীয় বাত উদ্ধার করে  
নিনতে সক্ষম হবো। সব বস্তু উদ্ভিদ আমাদের প্রাণের জন্যে পবিত্র না,  
কারণ তাদের মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন ইত্যাদির সঙ্গে  
আরও বহুপ্রকার বস্তু একত্রে ভাবে মিশে রয়েছে—যা মানবজাতিকে  
পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়। যে বস্তুটি আমাদের পরিপাক শক্তির  
সঙ্গে শক্ততা করছে আলান ভাবে হয়তো তা মানুষের অল্পকাল  
কাজে লাগতে পারে। কিন্তু মজারি দেখুন,—এক লস্ক মিশে  
পাকার জন্যে ছুটি বস্তুকেই আমাদের পরিচাণ করতে হতে  
পাশ করা যায়, বায়োকমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে এসব  
থক করে কাজে লাগান যাবে। যান অথবা তুলোর এতো আদর  
না? তার কারণ অতি সহজেই এদের উদ্ভিদে অত্যন্ত অল্প  
থকে পৃথক করে কাজে লাগান যায়। বাসের মধ্যে প্রচুর পাণ্ডুল  
কা সবও অত্যন্ত পদার্থের উপস্থিতির জন্যে এর বাতমূল্য খুবই  
ন, গম বা তুলোর মতো। এর প্রয়োজনীয় অংশটিকে পৃথক করে  
ওরা যায় না। তাই এর পরিমাণ অপব্যাপ্ত হতো। সন্তো মানুষ একে  
পানুবি কাজে লাগাতে পারছে না। বাসের থেকে বাতশক্তি  
য অল্প ভাবে সংগ্রহ করে। পরে বোড়া ইত্যাদি প্রাণী  
বার, বাসের বাতশক্তি তাদের দেহে পরিবর্তনের মধ্যে  
গিয়ে জমা হয় প্রোটিনরূপে, সেই প্রোটিন মানুষ বাত  
বে কাজে লাগায়। প্রাণীর চতুরর এক বাসের মধ্যে নিয়ে  
যে আশা পাশ ঐ বাতশক্তি। অনেক বিজ্ঞানীর মতেই  
ন-দেহের বাতমূল্য এই অপব্যাপ্ত অশচর ছাড়া আর কিছুই  
না। উদ্ভিদের যে অংশ পৃথক করা সম্ভব হলে মানুষ ব্যবহার করতে  
তো তার মাত্র শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ প্রাণিদেহের মধ্যে

[illegible]

বিজ্ঞানী পুটনামের, 'ক্রিষাৎ কালের শক্তি' নামক পুস্তকে আমরা কয়েকটি চমৎকার তথ্যের সন্ধান পাই। সেই বইটির তিনি ১৮০০ সালে সাহা জগতে আলানী ব্যবহারের বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। তখন আলানী ব্যবহারে ভারতবর্ষ বহুত অগ্রগামী ছিল এবং ব্যবস্তুত আলানীর প্রধান আল অধিকার করে থাকতো অনেক কার্টুটো আর তুকনো গাছপালা। আজকের দিনেও সম্ভব হলে ঠিক এই ভাবে পৃথিবীর সর্বত্রই তুকনো গাছপালা আলানী চ্চিষাৎ ব্যবহারের পক্ষে পুটনাম দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছেন, এবং বাংলা কল্যাণ অঙ্গার হয় যেথ, আলানী পরিবহনের সমস্তা মেটে এবং কৃষিক্ষেত্রের তুকনো জঙ্গলের চাষিরা বৃদ্ধি পাওয়ার কলে কৃষকদের কিছু আর্থিক লাভ হয়। সাহা জগতেই

যখন এই অবস্থা, তখন ভারতবর্ষের কথাটা একবার চিন্তা করে দেখুন :—পাঠা বায় বাস থেকে ভৈরবী হয়ে প্রোটিন, সেই প্রোটিন ভারতবাসীকে বাঁচা জোগাবে। এই শিল্প আন্দোলনকে উদ্ভিসের যে তত্ত্বেরা জন্ম দাঁকবে পড়ে তা দেখে ভালানী। কেবল সাধারণ কবাই নয়—ভালানী হিসাবে এই তত্ত্বেরা উদ্ভিস-সেতের দৃষ্টি পূর্যই বোধী।

### উইলিয়াম হেনরী ড্র্যাপ

১৮৩২ সালের ২রা জুলাই ইংল্যান্ডে, ক্যাথল্যান্সের কয়েটওয়ার্ডে, বিখ্যাত বিজ্ঞানী উইলিয়াম হেনরী ড্র্যাপ এর জন্ম হয়। মাতা সান্ত ব্রুদার বহলে তাঁর মাতৃশিক্ষণ হয় এবং তাকে সিন্সট্রার সাধারণের একটি গ্রামার স্কুলে ভেতাপনা। সেখান থেকে পাঠ্যের ভেতয়া হয়। এর পর তিনি কিস উইলিয়াম কলেজে ভর্তি হন এবং এখানেই পদিক-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ জন্মায়। ১৮৫১ সালে, ১৯ বছর বয়সে ড্র্যাপ কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন এবং পদিক-বিজ্ঞানের টীটপস্ লাভ করেন। ট্রিনিটি কলেজে তিনি কৃত্রিম আলোর সম্বন্ধে গবেষণা করেন, এবং এখানেই পদার্থবিজ্ঞান বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডে. ডে. টেমসের বড়তা সম্বন্ধে (লোকনা) তাঁর হয়।

১৮৮৭ সালে প্রথম অক্সিফোর্ড থেকে ড্র্যাপের ডাক হলো। যখন তখন তাঁর মাতা বৈদ্যক বড়, তিনি অক্সিফোর্ডে বিখ্যাতদের পদার্থ ও পদিক বিজ্ঞান অধ্যাপনার পর ড্র্যাপ করবার জন্ম আত্মান পেলেন। ১৮৮৮ সালে ড্র্যাপ এই পদে যোগদান করেন, এবং তাঁর প্রথম ভৌতবর্ষ পদার্থের আন্তর হয় এই অক্সিফোর্ডেই। ভৌতবর্ষ প্রায় বৈদ্যক বড় সময় তিনি এই পদিক-অক্সিফোর্ডেই অতিবাহিত করেন, এখানে তিনি তেজস্ক্রিয়তার উপর গবেষণা করেছিলেন। গবেষণার ফলাফল অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর নামে লগা। যিশু চর্চিয়ে গিল : ১৯০৬ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির সন্ত মিলিটিক হেলেন।

আবার ইংল্যান্ড : ১৯০৮ সালে তিনি লিডস্ বিখ্যাতদের ক্যামব্রিজ অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করার জন্ম লন্ডন বিখ্যাতদের থেকে আত্মান হলো। এই পর গ্রহণ তিনি করলেন বটে,

কিন্তু গবেষণার মনোপ্রকার সমস্ত গবেষণার জন্ম নৌবিজ্ঞানের কাজে ১৯১১ সালের আগস্ট তিনি লন্ডন বিখ্যাতদের যোগদান করতে পারেন নি। প্রথম মহাসুদ্ধের সময় তিনি সরকারকে আকিরা এবং গবেষণা বোর্ডের একজন সন্ত হিসাবে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেছিলেন। ১৯২০ সালে বিজ্ঞানী ড্র্যাপ রয়েল ইনস্টিটিউশন অব গ্রেট ব্রিটেনের সিবেরীয় নিবৃত্ত হন। পৃথিবী-বিজ্ঞান ভৌতীকাতাতে গবেষণার পর পদিক এবং তাঁর লাভে আসে এক তাঁরই পরিচালনার পদার্থের পুটাল অথবা কৃত্রিমের বিষয়ের গবেষণার এই প্রতিষ্ঠানের স্তম্ভে নতুন করে লগা। যিশু চর্চিয়ে পড়ে।

আগুন প্রতিভারলে এই বিজ্ঞানী লগা ভৌতবর্ষ অল্প সময় লাভ করে পেলেন। এক্ষেত্রে, যা তখন-স্বর্ষ সাধারণ পদার্থের কৃত্রিমের কাঠামোর পরিচয় এবং তাঁর মধ্যে গবেষণা সম্বন্ধে অর্থহিত নির্ণয়ের গবেষণার বিষয় অবস্থানের জন্ম ১৯১২ সালে বিজ্ঞানী উইলিয়াম হেনরী ড্র্যাপ, তাঁর পুত্র উইলিয়াম কলেজ ড্র্যাপের সঙ্গে একত্রে পদার্থ-বিজ্ঞান মেডেল পদার্থ লাভ করেন। বিজ্ঞানী ড্র্যাপ ১৯২০ সালে প্রায় উপাধির কৃত্রিম হন। প্রায় ১০টি ব্রিটিশ এবং বিদেশী পদার্থবিজ্ঞান, বিখ্যাত এই বিজ্ঞানীকে ভর্তিই উপাধি দিয়ে মিলেদের সম্মানিত করেন। প্রায় উইলিয়াম হেনরী ড্র্যাপ ১৯২৪ সালে রয়েল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯২০ সাল পর্যন্ত এই পদ তিনি অলুত করেন। ১৯২৮-১৯২৯ সালে তিনি ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন অব বি আন্তর্জাতিকের জন্ম গবেষণার সভাপতির পদে অলুত করেছিলেন।

বিজ্ঞানী প্রায় উইলিয়াম হেনরী ড্র্যাপের বিজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বি উৎসাহ ছিল। বিজ্ঞান গবেষণা-পরিচয়, যিশু সম্বন্ধে অলুত যিশু তিনি করেই বড়তা লিখেছিলেন। সন্তসন্ততির বিজ্ঞান সাহিত্যে বিজ্ঞানের দৃষ্টি পূর্যই বোধী। প্রায় হেনরী ড্র্যাপের চর্চা করেই পুঙ্ক এবং সাধারণ একত্রে বড়তা হলো। The world of sound (1920), the Universe of light (1933), Concerning the nature of Thing (1925).

“যে পথ কঠিন, যে পথ ভর্তিক-স্বল্প, সেই পথে যাত্রার জন্ম প্রকৃত হইয়াছি। আজ যাত্রারতে এখনো যোষের পদ্বিন শোনা যায় নাই বলিয়া সমস্তটাকে যেন খেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিজ্ঞান চর্চিক হইতে থাকে, বড় কলিক হইয়া উঠে, তবে তোমরা কিরিতো না, হাংগের বজ্রকৃত্ত ভর করিয়া তোমাদের পৌকরতে জগৎ-সমকে অন্দানিত করিতো না। যাত্রার সন্তাননা জানিয়াই চলিতে হইবে, হুংকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। অতি বিবেচকের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্বল করিতো না। যখন বিবর্তার কড় আসে, তখন সন্তত বেশ আসে না, কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে, তাহা ভাল-বন্ধ লাভকতি হইই নইয়া আসে।”

—বরীজনাথ

# শ র ৭ - স্মৃতি র টুকিটাকি

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বর্ষাকাল। শেষ শ্রাবণের এক মেঘ-মেতুর দিন। পূর্বরাত্রিতে প্রায় সাগরকণ্ঠী বৃষ্টি হোয়ে গেছে, কখনো বম-বম, কখনো বা কির-ঝির। আজ সকাল থেকে বর্ষণ থেমে গেছে বটে, কিন্তু কোপালে-মেঘ ভরা সারা আকাশটা গভীরভাব ধারণ কোরে আছে। তা সন্নিবে সূর্য্যাকুর একটাবারের জ্বলন্ত উকি দিতে পারেন নি। সারাদিনটাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। স্নানাহার সেরে, বেশ ছুত কোরেই শুয়ে পড়লুম। মনে করলুম, আজকের এই বাতলা দিনে ভাল কোরে এক চোট ঘুম দোবো। সকলকে বলে রাখলুম—“বেলা তিনটের আগে আমাকে কেউ তুলো না। জীবনে অনেক বর্ষাকাল আসবে, কিন্তু আজকের দিনের মত, ছুত কোরে ঘুমোবার মত দিন হয় ত কখনো না-ও আসতে পারে।”

ঘুম কিন্তু এলো না। মনের মধ্যে আমার গ্রামের এইরূপ কতদিনের বর্ষার ছবি ফুটে উঠে, মনকে কেবলি সেইদিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। ইট কাঠ পাথরের তৈরী সহরের আবহ গুণাম-ঘরের মধ্যে বস্তার মত পোড় খেকে, গ্রামের সেই অপরূপ বর্ষা-সৌন্দর্য কেমন কোরে বোঝা যাবে! সে মাধুর্য ও সৌন্দর্যের তুলনা নেই। ভাষায় তা ব্যক্ত করতে বাওয়া বাতুলতা। মাঠের ধারে বাড়ী। চিল কোঠার স্নানালয় বোসে, এই রকম শ্রাবণ বর্ষার রূপ দেখা। জীবনে সে দৃশ্য ভোলবার নয়। সমস্ত পৃথিবী ছায়াঘন আঁধারে ছেয়ে আসচে, মাঠ-ঘাট-বাড়ী-ঘর-দুয়ার, কানন-প্রান্তর—সবের ওপর যেন মহাপ্রলয় নেবে আসচে। সারা আকাশব্যাপী নিশ্চল কালো মেঘের সঞ্চার, যেন কোন এক নির্দিষ্ট ক্ষণের প্রতীক্ষায় থম্‌থম্‌ ভাব ধোরে আছে। সেই সব দৃশ্য, সেই সব ছবিই মনের ওপর ফুটে উঠে, মনকে চকল কোরে তুলতে লাগলো, ঘুম কিছুতেই হোল না। স্মৃতরাং উঠে পড়লুম।

কোন একটা কাগজের লেখার জন্তে জোর তাগিদ ছিল; ভাবলুম ওইটে লিখলে হয়, কিন্তু লেখার দিকে কিছুতেই মন বসাতে পারলুম না। অনেকের মত, আমি বখন তখন লিখতে পারতুম না। লেখার ভাবে মন বখন কানায়-কানায় ভরে উঠতো, তা তখন ভোর বেলাই হোক, দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যাই হোক, রাত্রিই হোক বা গভীর রাত্রিই হোক, সেই সময়টিতেই আমি লিখতে পারতুম ও লিখতে বসতুম। স্মৃতরাং ধারা-শ্রাবণের সেই বর্ষণহীন আঁধার মধ্যাহ্নে লেখার দিকে মন গেল না। কি করা যায়! কোথায়ই বা যাওয়া যায়? এমন দিনটা ঘরের মধ্যে নিষ্কমার মত কাটাতেও মন সরচে না। স্মৃতরাং ছাঁটাটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু যাই কোথায়? ‘মোদার দোড় মসজিদ পর্যন্ত’। চললুম শরৎচন্দ্রের ওখানে। আমিও যেমন নিষ্কমী, তিনিও তরুণ, তাই দু’জনে মেলে ভাল।

শরৎচন্দ্র ওপর থেকে বোধ হয় আমাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই নেবে এলেন। জিজ্ঞাসা করলুম—“আমার দেখতে পেয়ে বোধ হয় নেবে এলেন, দাদা!” শরৎচন্দ্র বললেন—“না। তোমার

ত দেখতে পাই নি, এমনই নেমে এলাম। আজকের weather কি রকম বদ্ব্যন্ত দেখছে।”

“Weather বদ্ব্যন্ত নয় দাদা, মনটাই আমাদের এই শহরে ইঞ্জিন-কারখানায় থেকে বদ্ব্যন্ত হোয়ে ঝাড়িয়েছে। বরসকালে আর স্থান-বিশেষে এই weatherই মনের মধ্যে কোন এক চন্দ্রর স্বপ্নলোকের অন্ধকারময়ী মায়া বুলিয়ে দিয়ে যেত; নয় কি, বলুন।”

শরৎচন্দ্র কিছু বললেন না, তার বদলে জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি ‘—’য় কবে যাচ্ছ?”

“সেখানে এখন আর যাব না।”

“যেয়ো না। অত বড়লোকের বাড়ী যাওয়া ভাল নয়। যাও কেন?”

“বড়লোক বলে যাই না। যাই—আন্তরিক ভালবাসার টানে। তাঁদের ধনদৌলত, টাকা পয়সা আমাকে তাঁদের ওখানে নিয়ে যায় না; আমার প্রতি তাঁদের ঐকান্তিক প্রীতি-ভালবাসা আর প্রজ্ঞাই তাঁদের ওখানে আমাকে আকর্ষণ করে। হৃদয়ের বদলে হৃদয় না গিলে যে পাগ হবে, দাদা! বলুন হ্যাঁ কি না।”

কিন্তু শরৎচন্দ্র কিছু বললেন না, চুপ কোরে বইলেন। তাঁর এই নীরবতা আমার কথার সমর্থনই জানিয়ে দিল।

শরৎচন্দ্র ইহানীঃ ধনীদেব সান্ত্রব এড়িয়ে যেতে চাইতেন, তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা তিনি পছন্দ করতেন না, বিশেষত যেখানে ধনের মহমিকা থাকতো, সেখানে ত নয়ই। কারো ধনদৌলত বা ঠাকাকড়ি কখনই তাঁর ওপর মোহ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অবশ্য কৈশোর যৌবনের অপরিণত বয়সে তিনি অনেক ধনীর সঙ্গে মিশতেন, অনেক ধনীগৃহে তাঁর যাতায়াত ছিল। ভাগলপুরের মজুমদার বাড়ী ও স্বর্গত নফর ডট মশাইয়ের বাড়ীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁরা ধনবান গৃহস্থ ছিলেন। ওখানকার বড় জমিদার ‘লাল’ পরিবার ও মজুমদারদের মহাদেব সাহু প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর খুব ভাবসাব ছিলো ও তাঁদের গৃহে তাঁর যাতায়াত ছিল। মিটার এস, লাল, মিটার টি, লাল প্রভৃতি তখনকার নাম-করা ধনী। মি: টি, লালের (হিলকধারী লাল) সম্পত্তি কোলকাতা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। মিস্ গিবনস্ নামী এক ইউরোপীয় মহিলার মাধ্যমে মি: টি, লালের সঙ্গে এককালে আমার আলাপ ও ভাবসাব হোয়েছিল। মিস্ গিবনস্ মিটার টি, লালের কোলকাতায় গৃহ-সম্পত্তি দেখা-শোনা করতেন। তিনি কখনো কোলকাতায় কখনো ভাগলপুরে থাকতেন। মিস্ গিবনস্ মাঝে-মাঝেই ভাগলপুরের ‘দই’ এনে আমাকে উপহারস্বরূপ দিতেন। তাঁর কাছ থেকেই ‘লাল’-পরিবারের ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্যের কথা শুনতাম। পরবর্তীকালে শুনেছি, এঁদের বাড়ীতে শরৎচন্দ্রেরও যাতায়াত ছিল। মহাদেব সাহুও অর্ধশালী লোক ছিলেন। খুব সম্ভব এঁদেরই কাছকে নিয়ে ‘শ্রীকান্তের’ ‘সুয়ার সাহেব’ চরিত্র অঙ্কিত। আমার জিন্দগিরি হবসে এক সময় আমি ভাগলপুরে

বর্ণিত মুকুন্দদেব যুগোপাধ্যায়ের গৃহে কিছুদিনের ভ্রম ছিলাম। মুকুন্দদেব বাবু ৮ভূবের যুগোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ও সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা অম্বরূপা দেবীর পিতা। তিনি সে সময় তখনকার সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ওধানকার নফর ভট্ট মশায় ও ছিলেন অবসর-প্রাপ্ত সবজ্ঞ। এই দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট ভাব-ভালবাসা ছিল। সেজন্য ওখানে থাকি কাল আমিও করতকার নফর ভট্ট মশায়ের গৃহে গিয়েছি। বোধ হয়, আমার বয়স তখন বোল-সতেরো, সে সময় শরৎচন্দ্রের বয়স ঐ হিসাবে হবে—কুড়ি-একুশ। ভাগলপুরে তাঁদের যে সাহিত্য আসর ছিল তার সঙ্গে নফর ভট্ট মশায়ের পুত্র শ্রীবিভূতি ভট্ট মশায়ের ভালরকম যোগ ছিল। ঐ সুরেই ভট্ট পরিবারের গৃহে তাঁর খুবই বাতায়ত ছিল।

এই সাহিত্য আসরের আমলেই শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গল্প 'মন্দির' কলকাতার পুস্তকালয়ের প্রথম স্থানের অধিকারী হোয়ে সে বছর সাহিত্য-প্রসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে সময় আমি কানীতে ছিলাম। তখন সাহিত্যের 'স'-ও জানতাম না। কিন্তু, গল্পটা পড়ে মুগ্ধ হোয়ে বাই। আমার কানীর অল্পতম বন্ধু বর্তমানে 'শান্তিনিকেতনের' শ্রীকৃষ্ণমোহন সেনকে গল্পটার কথা বলি ও তাঁকে পড়তে দি। তিনিও পড়ে চমৎকৃত হন। গল্প লেখককে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। গয়ের শেষে লেখকের নাম ছিল—শ্রীশ্রবেননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙ্গালী টোলা, ভাগলপুর, কিংবা T. N. Jubilee College, ভাগলপুর; আমার ঠিক শ্রবণ হয় না। প্রায় ৩০ বছর আগেকার কথা, স্মৃতিবাগ সামান্য তুল-ভাষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। এই স্মৃতি আরও একটা কথা বলে রাখি। 'শরৎমুদ্রিত টুকটাকী—' প্রায় সমাপ্তির পথে এল। এতে আমার লিখিত কোন বিষয়ের বা বিষয়বাদের কেউ যদি কোন প্রতিবাদ করেন, আমার দিক থেকে সে প্রতিবাদের কোন উত্তরের আশা যেন তিনি না করেন। আমার সে নীরবতার কারণ হবে—প্রতিবাদকে তাচ্ছল্য বা অবহেলা নয়, আমার অক্ষমতা।

বই হোক, পাবে বগল শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার মেলা-মেশা ভাব-সাব হয়, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, 'মন্দির' গল্পটা তিনি বেনাঘাটে দিয়েছিলেন কেন? তার উত্তরে বলেছিলেন—“নিজের লেখার ওপর তখন মোটেই বিশ্বাস ছিল না। তাই আশা করতে পারি নি যে ওটা অন্ততঃ লাঠি প্রাইজেরও যোগ্য বিবেচিত হবে কি না। আর সেই না-হওয়ায় বাখাটা সরাসরি সোজা বুক এসে বাতে না লাগে, স্বরেনকে হোয়ে যাতে আঘাতে আসে, তাই স্বরেনের নামেই দিয়েছিলাম।”

কানীতে 'মন্দির' গল্পটা দেখবার ও পড়বার পরই আমি ওধান থেকে ভাগলপুরে বাই বা যেতে বাধ্য হই। সেও শরৎচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ উল্লিখিত সাধু-সন্ন্যাসীর ব্যাপারের মত। তবে শ্রীকৃষ্ণের সাধু ছিল নকল, গিন্টি করা টিন, আর আমার গোল খাটা টানে-পাত সোনা, পবিত্র ও স্বর্গীয় দীপ্তিতে দীপ্তিমান। ভগবদ্বিখ্যাত কানীর শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামির্ষা কিছুদিন আগে 'দেহ বন্ধা' করেচেন তাঁর সেই পবিত্র ও মহান আসনে অধিষ্ঠিত তখন তাঁরই প্রধান চোলা—শ্রীমৎ মৈথিলানন্দ স্বামির্ষী। এক পুণ্যপ্রভাতে তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম।

সেই প্রথম দর্শনের দিনে, কি হোল জানি না। জানি না—আমার মত অতি সাধারণ এক কিশোরের মনের সঙ্গে আর এক সর্বলোক-পুজিত, পুণ্য-স্রোতির মহান পুরুষের মনের সঙ্গে সেদিন কিসের একটা অদৃশ আকর্ষণের সৃষ্টি হয়ে গেল। এবং যার ফলে তাঁর কাছে আমি প্রায় প্রত্যাহই একটি বারের ভ্রম না গিয়ে পারতুম না এবং তিনিও আমাকে একটি দিনও না বাইরে ছাড়তেন না। পরলোকগত ভাস্করানন্দ স্বামির্ষীর উল্লস মর্মর মূর্তি ও তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির স্থান দেখবার জন্যে অনেক সাহেব-মেম আসতেন। ইংরাজীতে স্বামির্ষীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী, ও তাঁর বহু অনুবাদী ইউরোপীয় ভক্তের নামাটিকানা সম্বলিত মুদ্রিত পুস্তক থাকতো, আমি তা সকলকে এক একখানা দিতাম ও তাঁদের কথা প্রেম আশ্রয়ী বৃত্তে নিয়ে, আমার বোল বহুরী বিস্তার হোয়ে কোনও বকমে সে সবার উত্তর দিতুম।

স্বামির্ষীর অনেক বড় বড় বাঙ্গালী শিষ্য ছিলেন। কতিং কখনো তাঁদের চিঠি লেখবার দরকার হোল, আমাকে দিয়েই তা লেখাতেন। মৈথিলানন্দজীর মৈথিল ভাষা ছাড়া, বাংলা ত দ্বয়ের কথা, ভাল তিনিও জানতেন না; আর আমি বাংলা ছাড়া আর কিছু তেমন জানতুম না! আমাদের দু'জনের মধ্যে বন্ধন কথা হোত, তখন তিনি যদি যেতেন পুরে, ত আমি সেতুম—পশ্চিমে। কিন্তু—দু'জনেরই গতি ঘুরে এসে এক ভায়গার যেত মিলে; অর্থাৎ বৃত্তে কাকুরই কিছু আটকাতো না।

ভাগলপুরে মুকুন্দদেব বাবুর এক কস্তার মারাত্মক অসুখ করেছিল। স্বামির্ষী আমাকে ভাগলপুরে তাঁর কাছে পাঠিয়ে গিয়েন; বলে গিয়েন—কোন চিন্তা নেই, মেয়ে সেয়ে যাবে। ঠিক তই হোল। আমি বাবার কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর কস্তা আরোগ্য চোলে। ভাগলপুরে থাকাকালীন, শ্রীযুক্ত নফর ভট্ট মশায়ের বশীভূতও আমি যেতুম। শরৎচন্দ্র ঐ সময়ে আসতেন। ভট্ট-পরিবার ওধানকার মধ্যে সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। কিন্তু তখনকার ঘনীঘন মনোভাবের অনেক প্রভেদ দেখা যায়। প্রভেদ যে কি এই এবং কোথায়, তা না বললেও বৃত্তে আটকায় না। বর্তমান কালে প্রভেদটুকুর অস্ত্রই শরৎচন্দ্র ইদানিং ঘনীঘন সঙ্গর এড়িয়ে যেতে চাইতেন এবং আমাকেও সেই উপদেশ দিতেন।

উপদেশ ছলে চুটে। কথা তিনি আমাকে তুমিয়ে প্রায়ই বলতেন। একটি হুচে, 'শতং বদ, মা লিখ।' আর যিঠাইটি হচ্ছে—'তর্ক কোরো না।' একক্ষেত্রীর লোকদের তর্ক করবার স্পৃহা এত উদ্ভাব যে, সঙ্গর মুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ সম্বন্ধে, তাঁরা পেছু হটে চান না। ব্রিটিশ আমলের গোড়ায় লিক I. C. S.রা—বিশেষতঃ এ দেশীয় I. C. S.রা একবার যদি ভুলক্রমে বলে ফেলতেন যে 'স্বর্ঘ পশ্চিমে উদয় হয়', সে কথা আর 'তিনি কিছুতেই ওটাতেন না। সূর্যোদয়ের কাল যদি তাঁকে 'হাতেনাতো' দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, সূর্য পূর্বেই উঠে, তবু তিনি তা স্বীকার করবেন না, বলবেন—'আজ হয়ত পূর্বে উঠে, কিন্তু সূর্য পশ্চিমেই ওঠে বোঝ।' স্মৃতিবাগ এত তর্ক নয়, এ হোল গৌ। অতএব তর্ক কিছুতেই করবে না। উঠে অনাবৃত্তক একটা মনোবাখা নিয়ে জোয়ার ফিরে আসতে হবে।" শরৎচন্দ্রের এই কথাটা যে খুবই সত্যি তা আমার বহু বিষয়ে বহু অভিজ্ঞতাপূর্ণ স্মরণীয় সামাজিক ও

সাংসারিক জীবনে বরাবরই লক্ষ্য করে এসেছি। কতকটা এই জন্মেই লিখতে বাধ্য হয়েছি যে—‘আমার লিখিত শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই টুকটিকারি অংশবিশেষের ভবিষ্যতে কোন প্রতিবাদের উত্তর দিতে আমি একান্তই অক্ষম, আমার কাছ থেকে কেউ তা আশা করবেন না।’

আমাকে ‘অভিনন্দন’ দেবার প্রায় চার মাস পরে আমার ‘৩১শে ভাদ্র’—এর্থাৎ শরৎচন্দ্রের জন্মদিন এসে পড়লো। এবার ‘অসমঞ্জ বাবুর রেডিয়োর’ কোলকাতা শাখার কর্মকর্তারা, তাঁদের ১নং গাসটিন প্লেসের বাড়ীতে ‘শরৎ-শর্বরী’ নামে তাঁর জন্ম-বার্ষিকীর উৎসব আয়োজন করেন। তখন কে জানতো যে এই উৎসবই তাঁর শেষ জন্মদিন উৎসব! এ দিনের কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানে সবিস্তারে লিখলাম।

পূর্বেই আমি বলেছি যে, এ দিনের উৎসবে, বেতার কর্তৃপক্ষ আমাকেও আমন্ত্রণ করেছিলেন এবং ৩১শে ভাদ্রের সকালে, শরৎচন্দ্র আমাকে খুব পাঠানেন যে, আমি যেন সন্ধ্যার পূর্বে তাঁর ওখানে বাই; সেখান থেকে একসঙ্গে রেডিও অফিসে যাব। তাই হোল। সন্ধ্যার কিছু আগেই আমি শরৎচন্দ্রের বাড়ী গেলাম ও সেখান থেকে তাঁর গাড়ীতে ১নং গাসটিন প্লেসের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। আমাদের সঙ্গে কবিশেখর কালিদাস রায়ও ছিলেন। পথে, চৌরঙ্গী থেকে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবকোণ্ড আমাদের গাড়ীতে তুলে নিয়ে, গণ্ডা ভর্তি করা হোল,—একথা পূর্বে লিখেছি।

‘কোলকাতা বেতার’ স্ট্রির সুর থেকেই, তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দিনের পর দিন এখানে আমাদের আনন্দের বান বয়েছে। বেতার যমুনার কুলে-কুলে নেপেনের (নৃপেন্দ্র নাথ মজুমদার) মধুর বাঁশীর স্বর সর্বদাই ভেসে বেড়াতো। রাইচাঁদ বড়াল, রঞ্জিত রায়, প্রফুল্লবালা—এরা প্রথম যুগের বেডিওর অবিচ্ছেদ্য অংশ। ‘রেডিয়োর’ এই সময়কার ষ্টেশন-ডিরেক্টর ছিলেন—মিষ্টার ষ্টেপলটন। সম্ভবতঃ তিনি জাতিতে Scotch ছিলেন। শরৎচন্দ্র Irish ও Scotchদের খুব পছন্দ করতেন। বেতার অফিসে শরৎচন্দ্রের জন্মদিন, উপলক্ষে তাঁর স্মরণনা ব্যাপারে Mr. Steppleton-দের আগ্রহপূর্ণ সমর্থন, সম্মতি ব্যবস্থাপনা ছিল।

এই Steppleton সাহেবই একদিন বলেন যে, মহারাজা কুমার প্রতাপকুমার ঠাকুর ‘রেডিয়ো’তে আমার ‘জমা-খরচ’ের অভিনয় শুনে, একবার আমাকে দেখবার জন্য খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। আমি ‘মহাভাণ্ডকুমারের বাসনা পরিভূতিস্ত জন্ত, তাঁর বি, টি, বোডহু ‘Emerald Bower’-য়ে একদিন যাব বলে স্থির করেছিলুম; কিন্তু শরৎচন্দ্র আমাকে ধমক দিয়ে যেতে নিষেধ করেন। স্মরণীয় যাই নি।

‘জমা-খরচ’ প্রকাশনার সহিত বেতারে উপস্থাপনা কয়েক রাত ধরেই অভিনীত হয়েছিল। বোধে থেকে প্রকাশিত ‘Indian Radio Times’ নামক পাক্ষিক পত্রে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় এর প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছায় ও আদেশে, তার ‘কাটিং’ গুলি আমি সবচেয়ে রেখে দিতাম।

বছর তিন-চার আগে ‘বেতার-জগৎ’-য়ের ছুবিদী সংখ্যায় বেতারের প্রথম অভিনীত নাটক সম্বন্ধে নৃপেন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন—‘অসমঞ্জ বাবুর ‘জমা-খরচ’ সর্বপ্রথম বেতারে অভিনীত হয় এবং আমিই ছিলাম—তাঁর ‘অধিকারী’-ইত্যাদি। কিন্তু এই সংখ্যাতেই আর একজন—‘যাক’, এ সমস্ত নিছক আমার ব্যক্তিগত কথা এ ক্ষেত্রে না লেখাই ভাল। যা বলছিলাম, তাই বলি—

সন্ধ্যার পরই আমরা রেডিও অফিসে গিয়ে পৌঁছলাম। কোলকাতার বহু গণ্য-মান্য লোক। বহু সাহিত্যিক ও কবি সেদিনকার অহুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেদিনের উৎসব সম্বন্ধে, ১৫ই আশ্বিন, ১৩৪৪—তারিখের ‘বেতার জগৎ’-এ যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল। তা’এখানে উদ্ধৃত কোর দেওয়া হোল।

#### আমাদের কথা

শরৎ-শর্বরী—

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর। শুক্রবারের সাঙ্ক্য অহুষ্ঠানে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে ‘শরৎ-শর্বরী’র অধিবেশন অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে সূচসম্পন্ন হয়ে গেছে। এই অধিবেশনে নাট্যের মহারাজা কালিদাসবাহুর মহারাজা, রায়বাহাদুর জলধর সেন, রায়বাহাদুর এন. কে. সেন, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, কাজি নজফুল ইসলাম, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নারায়ণ দেব, শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ যুগোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হয়ে অহুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য বলেছিলেন অতি সক্ষেপে ও অত্যন্ত প্রাণশ্রী ভাষায়। স্বয়ং শরৎচন্দ্র ও সমাগত স্ত্রী ব্যক্তিত্ব খুবই ধূনী হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র রচিত ‘সত্য’ গল্পের নাট্যরূপ ও অভিনয়-দর্শনে। ছোটদের বৈঠকের পক্ষ থেকে কুমারী গীতিকা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সঙ্গীতটি গীত হয়েছিল।

#### গান

মন্সিরেতে আদন পেতে

রেখেছি মোরা তব পূজার লাগি।

সুখা পরশে এই নব বরষে

ধন মানি তব স্বপ্না মাগি।

বাণীর বেউলে তুমি আনিলে যে সুর।

মধু-মুহুর্তে সারা দেশ ভরষু,

পেয়েছে ভাবা প্রাণে জেগেছে আশা।

পূতাশ চিত আঁজি উঠিছে জাগি।

অনেক দিচ্ছে তবু তোমার কাছে,

কাঁতাল পরাণ আরো আতো হে বাচে,

সবায় সনে আছ সবায় মনে

সবায় সাথে সুখ-দুখ ভাগি।

[ কম্পঃ : ]



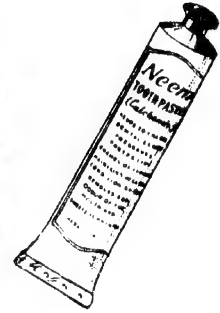
# এ ছটির তুলনা নেই



নিম টুথ পেষ্ট দিয়ে দাঁত মাজা আর স্নানে  
মার্গো সোপ ব্যবহার নিত্য প্রয়োজনীয়। নিম  
টুথ পেষ্ট আর মার্গো সোপ দুটি জিনিসেই নিমের  
বিষাপহারক, জীবাণুনাশক ও নির্মলকর গুণ  
আছে। এ দুটি জিনিসই উপকারী ও প্রীতিপদ।

নিমের গুণসম্বিত জিনিস ব্যবহার করা  
মানেই স্বাস্থ্যকর অভ্যাস।

## নিম টুথ পেষ্ট



## মার্গো সোপ



চিঠি লিখলে বিনামূল্যে  
“প্রসাধনী” পুস্তিকা  
পাঠান হয়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা-২৯

## ছোটদের আসর



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

গ্রামটির নাম পাহাড়তলী। ছোট পাহাড়, সবুজ ঘাসে ঢাকা, একছুটে একেবারে ওপরে উঠে যাওয়া যায়, চূড়ার ওপর বটগাছের তলায়—যেখানে উঠে অনেক দূর পর্যন্ত—দশ মাইল ত হবেই—মাঠ ঘাট বন নজরে পড়ে—নজরে পড়ে ভৈরব, বেন্দুয়া আর সালানপুরের সাগা সাগা বাড়ীগুলো পর্যন্ত—সেই পাহাড়ের নীচে শাল পলাশ শিমুল গাছের ছায়ায় পাহাড়তলী গ্রাম—সামুদ্রি পোষ্ট অফিস। বনবিভাগ, বনজমাতি, আলকুশ। কলিয়ারী ওপরের বটগাছের ছায়ায় ঝাড়িয়ে দেখা যায়। একটা পাহাড়ী নদী গেছে, বাড়া-রাঙা পথে সাঁকো সৃষ্টি করেছে। এই ছোট বিগবিরে নদীর জল রেল লাইনের বীজ দিতে হয়েছে। চঠাৎ বর্ষায় এ যে ফুলে-ফেঁপে ওঠে, নিয়ে আসে দূরের পাহাড় থেকে গঙ্গার মতন লাল জল। দু'বারে মাঠ ছাপিয়ে নদী বয়ে যায়।

পাহাড়ের ধারে ধারে গরু চরছে। রাখাল ছেলে বেণু বাজার, বাসের নিয়ে কত কবিতা, কত গান তৈরী হয়েছে। এখন প্রায় দুপুর—রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ে—

মধ্য দিনে যবে গান

বন্ধ করে পাখী,

হে রাখাল, বেণু তব

বাঁজাও একাকী কী মিষ্টি স্বর।



ত্রিপ্রভাতকিরণ বসু

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে মীরা শুনেছিলো।

রবীন্দ্র জয়ন্তী। কলকাতা শহর তোলপাড় হয়ে যায় সব্বভৌ পুজোর মতন। ছেলে বুড়ো মেয়েরা—আবালবৃদ্ধবনিতা যেন পাগল হ'য়ে ওঠে, মাতাল হয়ে ওঠে—রবীন্দ্র জয়ন্তীর উৎসবে। কয়েকটি জায়গায় সে গেছে, আরো কত জায়গায় কথা শুনেছে—দূর দূর গ্রামে গ্রামে, কত নদীর এপারে ওপারে কত ঠেঁশনের ধাক্কা, কত গঞ্জের ঘাটে—রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তীর উৎসব। রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি প্রতিযোগিতার কত বিচারক—রবীন্দ্রনাট্য অভিনয়ে নৃত্য-সংগীতে কত শিল্পীর প্রয়োজন—কত সভাপতি, কত প্রধান অতিথি, কত স্বন্দর স্বন্দর নিমন্ত্রণ পত্রে কাব্যময় ভাষা—সেই পৌরোহিত্যটা কিন্তু সকলেই পৌরোহিত্য করবে—অসামান্য কবির জন্তে কী অসাধারণ উদারনা—পুরীতে থাকতেও কিছুই টের পায়নি। সেখানে সহস্র শুধু গজ্জন করে, সমস্ত দিন সমস্ত রাত অশ্রান্ত। সহস্রকে বাদ দিয়ে কোনো চিন্তা কোনো কল্পনা মনে আসতে পায় না।

আরে, মীয়ার মন কোথায় চলে গেছিলো! পাহাড়তলী গ্রামের দিকে চেয়ে বটগাছের গুড়ির ওপর ব'সে সে ভাবছে—রবীন্দ্র জয়ন্তীর কথা দেশে দেশে, ভাবছে পুরী সমুদ্রের কথা, তার শৈশবের নিত্যসঙ্গী যে ছিল! এদিকে ডাডিকে না বলে যে সে পাইলট ইঞ্জিনে চড়ে এত দূর চলে এসেছে, ডাডির ভাবনা হওয়া আশ্চর্য নয়। যদিও বাসনা তাকে দেখেছে, সে কি মনে ক'রে বলবে? শাফিৎ ইঞ্জিনের পাশে ঝাড়িয়ে ও যখন ডাইভারকে বললে—এ ইঞ্জিন কোথায় যাবে? ডাইভার বললে—কয়লা আনতে,—ও বললে কখন ফিরবে? সে বললে দু'ঘণ্টার মধ্যে। তখন ত'ও ইঞ্জিনে উঠে পড়লো।

বাঙালী যুবক, সাধা পোষাক তার কালীতে কালো হয়ে গেছে, এত সুন্দর স্মৃতিপরা মেয়েকে ইঞ্জিনের তেল-ময়লার মধ্যে ঝাঁড়াতে দেখে ব্যস্ত হ'য়ে গেল—বললে, কোথায় বসতে দিই আপনাকে? সবই যে কালীমাথা! তখন মীরা হেসে বললে, আমি ঝাড়িয়েই যাব। আপনি কি করে গাড়ী চালান দেখি।

এত সহজ ইঞ্জিন চালানো? একটা ঢাকা মতন জিনিস ঘুরিয়ে দিলেই গাড়ী চলেবে? একটা তারের মতন জিনিস টানলেই এমন সিঁট দেবে? যে কানে তাল লাগে যায়? এ তো মীরাও পারে। কিন্তু সিমেন্টের চুল্লী থেকে গণগণে কয়লার জাঁক, এ কতোক্ষণ সহ করা যায়? আর ডানদিকের ছোট ফোকে চেঁপে রেখে গাড়ী

চালানো সেই পথে, যে পথে গরু ভেড়া ছাগলের সঙ্গে মানুষের দল চলেছে, লাইনটাই যেন বাস্তব!—এ কি সহজ নাকি? আর এই তো লাইন, কেউ কোনো হতুই নেয় না। এর ওপর দিয়ে কি ক'রে এত কয়লা নিয়ে এতগুলো মালগাড়ী চলে? কোনােদিন তো উল্টে পড়ে না! ইঞ্জিন খামে, যেখানে লাইনের ধারে কয়লা সাজানো আছে সাইডিং। মাঠের মধ্যে ম্যানেক্সারের কোয়ার্টার, জানলায় ম্যানেক্সারের বৌ মেয়ে হয়তো ঝাড়িয়ে আছে। কী নিশ্চিন চাষি ধার, কলী আর কামিনরা যখন তাদের ধাওড়ায়

কিবে বাবে, তখন এখানে কে আছে? রাতে যখন চার দিক  
অন্ধকার, তখন এখানে কে আছে? ডাকাত পড়ে তো কে বাঁচাবে?  
এ যেন নির্বাসন! এ যেন বনবাস! ভাঙে তো ও পাগড়তলী  
সাইজিং-এ নেমে পড়ে পাগড় গিয়ে উঠেছিলো, রূপনারায়ণপুরের  
কেবল ফাট্টরী, চিত্তরঞ্জন কাবখানার আলো যেখান থেকে সন্ধ্যাবেলা  
ঐকীপমাগার মতন দেখা যায়। যেমন দেখা যায় সালায়পুর থেকে  
কুলটির আলোর হার, মাইথনের আলোর সাতনরী।

কলকাতার বড় ঘরের এই ছোট মেয়েটিকে সামলাতে গিয়ে  
বাতালী ছোকা ডাইভার খতমত খেয়ে গেছিলো, অনেক উঁচু থেকে  
নীচে নামিয়ে দেবার সময়ে বলেছিলো, দেখবেন, শাশের রডটা  
ধরবেন। 'হাতটা ধরবেন' বলতে পাবেনি, কারণ ওর হাতময় কালী,  
সীতারামপুরে বাতীতে গিয়ে সাবান ঘেঁষে স্নান করতে হবে।  
বাড়ীর সামনেই ইঞ্জিন খেমেছিলো, মাসগাড়ীগুলো বাস্তা পার ক'রে  
কাড়িয়ে আছে। মীরা ছুটে গিয়ে বাড়ী থেকে একটা বক্বাক চুবি-  
আঁকা টকির বাস্ক নিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে ওর হাতে দিলো, বললে,  
আপনার ছেলে-মেয়েকে দেবেন।

সে স্নান তেলে বললে—আমার ছেলে-মেয়ে নেই।

স্ত্রী তো আছেন?

তা-ও নেই।

হাতলে আপনি বাবেন। আপনি কি টকি ভালোবাসেন না?  
ইঞ্জিন চালাতে চালাতে কি আপনার দু-একটা টকি মুখে দিতে  
ইচ্ছে করে না?

কিছু এর তো অনেক নাম! কেন মিছে নষ্ট করছেন?

অনেক নাম? আমারও অনেক আছে—এ কথা মীরা বলতে  
পারলো না, বললে, আপনার হাতে যে ঘড়িটা আছে, ওটারও তো  
অনেক নাম বলেই আমি জানি।

এ কথাটা বললে এইটি বোঝাতো যে, তোমাকেও আমি তুচ্ছ  
মনে করি না, যে-তুমি খুব দামী ঘড়ি কিনে পরতে পারো।

কী ওড়া নতুন বাস্তা আসছে, লক্ষ লক্ষ একর ধানক্ষেতের ওপর  
দিয়ে আসানসোল থেকে চিত্তরঞ্জন জুড়ে দেবার জন্তে। নির্জ্বল  
নিম্বন্ধ গ্রাম সালায়পুরের বৃকর ওপর দিয়ে রাঙ্গপথ তৈরী হচ্ছে  
দেশ বিদেশের পণ্যবাণী আর যাত্রীবাহী গাড়ীর কোলাহল সমস্ত  
আলস্য চূর্ণ করতে, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে যে অটোমায়ন,  
তার মাটির পাঁচিল ভেঙে আছেছে ইম্প্যাক্টের জয়যাত্রা। তবু কবি  
বলেছেন—বস্ত্রকরবী খেতকরবী ফুটেব মাঠের প্রান্তে, সিক্তির  
ইলেক্ট্রিকের তার যেখান দিয়ে কলকাতা গেছে।

কলকাতা—!

বাগিগঞ্জের এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা—

দাদখানি চাল

মুস্তরির ভাল

চিনিপাতা দৈ।

ডুটো পাকা বেল

সরিষার তেল

ডিম-ভরা কৈ।

বাজবে এই আনতে গিয়ে মুখস্থ করতে করতে হেলেটি পথে  
ঘড়ি ওড়ানো ইত্যাদি দেখে সব তুলে বাবে—দোকানে গিয়ে বলবেন—

দাদখানি বেল,

মুস্তরির তেল

সরিষার কৈ।

চিনিপাতা চাল

ডুটো পাকা ভাল

ডিম-ভরা দৈ।

মীরা এখানে নাম দিলো—

বোলোর নীচে যার বয়স, সেই যোগ দিতে পারে। ও বললে—  
ড্যাডি, ভারী মজার কবিতাটা! বাসা কবিতার এত মজাও ছিল—  
তোমরা এখন ছোট ছিলে!

ড্যাডি বললে—ওটা ইংরেজী কবিতা থেকে বেমানুষ নেওয়া—  
স্বীকার করা হয় নি। ইংরেজী কবিতাটার নাম হচ্ছে Going on  
an errand.

ড্যাডির কাছে এত খবরও থাকে! মীরা বলে, ড্যাডি, আমাদের  
রবীন্দ্রনাথ আশী বছর বেঁচে ছিলেন—আর ওদের লেখকরা?

ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর টেনিসন যা দীর্ঘজীবী! নইলে কীটস ত্রিশ  
বছর, শেলি ত্রিশ বছর, বায়রণ ছত্রিশ বছর, লুই ব্লিন্ডেনসন চুয়াল্লিশ  
বছর, শেক্সপীয়ার বাহান্ন বছর। আমাদের দেশে পরমহংসদেব,  
মাইকেল মধুসূদন, কেশবচন্দ্র সেন সাতচল্লিশ, দেশবন্ধু, আন্তোয়  
চুয়ান, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিয়াল্লিশ, স্বামী বিবেকানন্দ উনচল্লিশ,  
নটা ভাষায় এম-এ হবিনাথ দে বত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন।  
শঙ্করাচার্য বত্রিশ আর আলেকজান্ডার দি গ্রেট আটাল বছরে মারা  
যান। কত অল্প বয়সে তাঁরা কত কাজ ক'রে গেছেন! আর  
মাত্র উনিশ বছরের বালক সিগাজমোলা ইংরেজের হাতে মারা গেল,  
ঐ বয়সেই কত কুর্কিষ্ট, কত সাহসের পরিচয় সে দিয়ে গেছে!

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম হল মীরা। পদক নিয়ে বাড়ী  
এলো। বড়োলোকের ক্লাব নয়, সন্ধ্যার পাতলা মেডেল নিয়েছে  
তারা—নেহাংই তারা মার্ক!

মীরার মন খাবাপ।

মীরার মা'মি বললে সম্মানটাই বড়ো। ভিনিসটা নয়।  
তুমি কি জানো ভিক্টোরিয়া ক্রশ সোনার নয়, রূপোর নয়, নিতান্তই  
ব্রোঞ্জের, তবু তার সম্মান সোনার চেয়ে বেশী।

কি ক'রে হল?

১৮৫৪ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ রাশিয়ানরা পালায় অনেক কামান  
ফেলে। ইংরেজ সেগুলি নিয়ে আসে। জাঁদগেল জেনারালরা কত  
কি পুরস্কার পেলে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া বললে সেই সব অধ্যাত  
সৈনিকরা কি পাবে, যারা কত সাহসের পরিচয় দিয়েছে যারা না  
থাকলে যুদ্ধ জয়ই হত না? তখন স্থির হল ঐ ব্রোঞ্জের কামানগুলো  
ভেঙে ক্রুশচিহ্ন তৈরী করা হবে, রাণীর নামে নাম হবে ভিক্টোরিয়া  
ক্রুশ—তারাই পাবে বাদের ত্যাগের আর সাহসের তুলনা নেই।  
১৯১৪ সালের যুদ্ধে পাজ্যেবের খোলাদ খাঁ ভিনিস পেয়েছিলো ভিনিস  
পেয়ে রাণীর সঙ্গে সে ডিনার খেতে বসতে পেরেছিলো।  
সে ত ব্রোঞ্জের। তবু তো তোমার পদকে বানিকটা রূপো  
আছে।

কাগিটার থেকে মা'মির দাদা এসেছে, তাকে মামাবাবু নয়,  
আব্বল বলতে হবে। সাহেব মাহুয। সীওতালদের মধ্যে থাকেন,

সব সময়ে পাঁজর পাবে। খুঁটি পরতে পারেন না। লুজি পরটা কিন্তু পছন্দ করেন না।

আজল এনেছে গোলাপ কার্শাটারের বাগান থেকে—মাক্স রোজ, ডামাস্ক রোজ, উড রোজ—বাকি কাঁচগোলাপ বলে, আর ওয়াইন্ড রোজ, বুনো গোলাপ।

গোলাপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেল আঙ্কলের কাছে। পুষ্পরেণুক pollen বলে। এমন যে স্তম্ভের গোলাপ ফুল তাতে নাকি মধু মোটে নেই। কত বনের ফুলে মধু থাকে, আর ছনিয়ার সেরা ফুলে মধু নেই! মৌমাছিরা পুষ্পরেণু খেয়েই খুঁসি হয়।

কার্শাটার মীরা দেখেনি, চৌখের সামনে ভেসে ওঠে, বাঁজামাটির দেশে গোলাপের বাগান, কত রং-বস্ত্রের গোলাপ সায়ে সায়ে ফুটে আছে, গোলাপ বাগান আলো ক'রে নার্সারি চ'লে গেছে বিহার পর বিহার, কয়েক একর দূরে পাহাড়ের চূড়া, খাটছে কালো পাথরের চেনারা সাঁওতাল তার সাঁওতালী মেয়েরা—কার্শাটার।

যেমন টাইবার নদীর তীরে বোম ভাবতে ভালো লাগে, তেমনি, সাঁওতাল পরগণায় কার্শাটার ভাবতে ভালো লাগে বাসিগঞ্জের বেনি পার্ক থেকে।

আঙ্কলের একটা ক্লিম ক্যামেরা আছে,, তাতে নড়া-ছবি তোলা যায়। একদিন সেই ছবি তোলার ব্যবস্থা হল।

বটানিক্যাল গার্ডেনে ধিলের ধারে রাস্তা হল, খাওয়া হল, পরিবেশন হল, বিরাট বটগাছের মাঝখানে যেখানে আসল গুঁড়িটা ম'রে গেছে, বাশের গাছগুলো একদিন বারা খুঁসি হয়ে নেমেছিলো, আজ বাইরেটা পাহাড়ের মতন ক'রে সাজিয়ে রেখেছে, সেই খোলা কাঁকা জায়গায় ওরা গিয়ে ঝাঁড়ালো, ঝাঁড়ালো গলার ধারে যেখানে জীমার চ'লে যাচ্ছে ঢেউ তুলে, গলা ব'য়ে যাচ্ছে গঙ্গাসাগরের দিকে, আর সমস্ত ফিস্কাটা ডেভেলাপ হ'য়ে প্রিন্ট হ'য়ে বখন এলো, তখন সাধা পর্দার গায়ে ফুটে উঠলো সেই একটি দিনের কাণ্ড কারখানা চলছিলো। আশ্চর্য মনে হয়!

ড্যাডি অল্প লোককেও আশ্চর্য্য করবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে আঙ্করে মেয়ের খাতিরে। এলো নতুন ক্যামেরা, এলো প্রোজেক্টর, এলো স্ক্রীন। শিখে নিতেও দেবী হল না।

কিন্তু দেখবে কারা? কোথায় সেই উৎসুক ছেলে-মেয়ের দল? এ বাড়ীতে যে সব ছোটরা আসে, তারা তো বড়োদের মতন নাক সিঁটকেই আছে। কোনো কিছুতে অবাক হওয়া তাদের বাহন। তাদের বলতেই হবে, এ ছাড়া এমন কী! ও তো ভারী! কিন্তু এই বাংলাদেশেই—এই কলকাতা সহরেই এমন অনেক ছেলেমেয়ে আছে, ছেলেমেয়েদের মা-বাপ-পিসিমা-দিদিমাগণ আছে, বাবা অবাক হয়ে যাবে নিজেদের চলা-ফেরার ছবি পর্দার বুকে ফুটে উঠছে দেখে। তারা তো গল্প হ'য়ে যাবে।

তাদের পাঁবে কোথার মীরা? সেই সরল প্রশ্নের উজ্জ্বল এখানে কি ক'রে দেখা যাবে এই সাহেবী কারখানার বাড়ীতে?

বাগবাজারের বাড়ীতে সে দেখেছে, একদিন একটা ঝি ঝগড়া করছে, তাকে ঝি বলে ডাকা হয়েছে বলে, আর তাকে তুই বলা হয়েছে।

সে কিনা কমলায় মা, তাকে সবাই তুমি বলে, আর এ বাড়ীতে—ঝি, তুই?

কাজ করবুনি, এখন আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, তুমিও যে, আমিও সে। বাসন ঝাঁজি বলে কি ছোটনোক হয়ে গেছ?

কোমরে হাত দিয়ে ছোটলোকের এত চোখরাজনী?

আর তাকেই শেবটা সাধাসাধনা ক'রে রাখা হল, পৌষমাস, এ মাসে বেতে নেই, রাগ কোরো না।

কুড়িটাকা মাইনে ছুবেলা হাতীর খোঁরাক, তবু এত খোসামোদ করতে হবে?

ওদের রাঁধুনি বলছিলো—কাম ছেড়ে দিখু।

অগত্যা অল্প লোক জানা হয়েছিলো। তখন সে বলে যায় না।

মেয়েছেলের কী কাণ্ড!

ঝিও তো তাই করলো, মাঘ মাস পড়তে যেই নতুন চাকর এলো, তাকে বললে, তুমি আমার চাকরীটি খেতে এলে? এক ছেলে নিয়ে ঘর করো, তোমার কি প্রশ্ন ভয় নেই?

তখন একজন গিন্নী বললে ঝ্যাঁটা মেরে বিদেয় কর মুখপুড়িকে। লোক দেখলেই বেন কেঁচো, অল্প সময়ে কালকেউটে। দূর হ, ঢের ঝি মিলবে তোমার মতন। ঝি তখন কারা ছুড়ে দিলো নেচে-কুঁদে।

আমাকে মেয়েছে—ঝ্যাঁটা মেরেছে! খেই খেই নাচ।

এ বাড়ীতে ও সব কুকর্মেদ্য দক্ষবজ্র চলবে না।

রামবতন বলে লোকটা একদিন মীরাকে বলেছিলো—চা যদি জুড়িয়ে গিয়ে থাকে, হিটারে গরম ক'রে নাও, আমি আবার চা করতে পারব না—ড্যাডি শুনতে পেয়ে তদ্বিধি হিসাব ক'রে টাকা দিয়ে বললে—এই দণ্ডে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। মনিবের সঙ্গে কথা বলতে শোখানি?

সে বলেছিলো—ভজুর, কতর হয়ে গেছে

একটি কথা নয়। বাইরে সোজা চলে যাও।

ড্যাডি বলে—পা আর মাথা এক হয় না। জুতো সোনার হ'লেও পায়ে থাকে। অশিক্ষিত ছোট জাত কি ক'রে সম্মান পাবে শিক্ষিত বড়ো জাতের সঙ্গে? কোনো বর্ণব্র্ধ পণ্ডিত কখনো বলেননি যে এমন হ'তে পারে।

আবার ঢাকুরিয়া লোক। বহুই গরম পড়ুক কলকাতায় সন্ধ্যার পর দক্ষিণ থেকে যে হাওয়া আসে লোকের জলের ওপর দিয়ে—হু হু হু, প্রশ্ন তা জুড়িয়ে দেবে। ওরিকে থাক না—১১০—১১১—১১২ ডিগ্রী।

মামুনি জেটে শাড়ী নিয়ে বাসের ওপর শুয়ে পড়লো। মীরার শিক্ক নরম দুর্দীপালের ছোঁয়া পেলো। মামুনি বললে—এইজতেই পশ্চিমের গরম দেশের লোক সন্ধ্যা হলে কোথায় জল ধুঁজে বেড়ায়। একটা ডোবার ধারে গেলেও মাঠের পরম হাওয়া ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে।

ওরিকে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে গল্প শুনেছে। কার কাছে? সেই লেখক—ছড়াতে-পড়াতে বার লেখা।

আচ্ছা, আপনাব বয়স কত? একজন ভারিভি গোছের লোক প্রশ্ন করে—বার ঝাঁঝার চুল সাধা, খোঁচাখোঁচা দাড়ি-গোঁচ সাধা, কানের ওপর গোঁড়া-গোঁড়া চুল সাধা।

কেন বলুন ত?—লেখকের প্রশ্ন।

আমার বয়স পঞ্চাশও নয়, জন্মার সাধা চিহ্ন আমার সাধা গায়ে। আপনাব বয়সও নিশ্চয় এর চেয়ে কম নয়—লেখাই ত পড়ছি আজ

খ্রিষ্ট-পর্যন্ত বহু—অথচ চুল দিবা কাঁচা, মুখখানিও কচি, গলার  
স্বরও ছেলেমানুষের মতন কোমল। কি ক'রে এমন হয়?

হয় মনের জন্তে। মনে কোনো পাঁচ ঢুকতে না দিলেই চেহারা  
কোমলতা থাকে। মনটাকে রাখতে হয় কৈশোরের দিনে। পৃথিবী  
দেখে অবাক হ'তে হবে।

তাই বুকি কখনো হয়? তা কি ক'রে সম্ভব হবে? আর  
আপনি ঘুরিয়ে বলতে চান, আমার মনে পাঁচ আছে তাই চেহারা  
পাকিরে গেছে?

—তা নইলে এরকম চোয়াড়ে হ'য়ে বাবেন কেন? আর  
গায়ে প'ড়ে বগড়াই বা করতে বাবেন কেন? বসুন তো এই  
ছেলেদের নিয়ে। করুন ত গল্প।

হ্যাঁ, আমার যেন আর কাজ নেই! আমি তো আপনার  
মতন নিকমাই নই?

এও তো একটা কাজ—ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেওয়া।  
বসুন এদের নিয়ে।

ছেলেরা মেয়েরা তখন আপত্তি জুড়েছে, না না, আপনি বলুন—  
কি হল সেই টুনটুনি পাখীর? রাজাও তাকে পেটের মধ্যে পুরে  
ফেলেছে। তারপর কি হল?

রাজা একটা ঢেঁকুর তুলেছে—হেউ, আর টুনটুনি পাখী পেট  
থেকে বেরিয়ে ফুড়ুক ক'রে উড়ে গেল!

যারা শুনছিলো, তারা হৈ-হৈ ক'রে উঠলো—বললে তারপর?  
তারপর?

শিশুমন যে হারিয়ে ফেলেছে, সে আর শীড়ালো না, ব'লে গেল  
বত সব গাঞ্জ। পেটের মধ্যে পাখী গেলো কখনো ঢেঁকুরের সঙ্গে  
বেরিয়ে আসতে পারে? পারে উড়ে যেতে? একি সার্কাসের  
লাল মাছ যে জলের সঙ্গে গিলে ফেলে আবার কুলকুচো ক'রে  
একটি একটি জ্যাঙ্ক বার ক'রে দেবে? এ হল টুনটুনি পাখী,  
যাকে আশ্রয় গেলো বায় না!

হুগের সবুজ জল হাওয়ার কাঁপছে, কাঁপছে বিজলী বাতির  
যেখা হাজারি ডেউএর সঙ্গে। আসছে বড়, বাচ্ছে ট্রেন। চানচুর  
ভাঙ্গা চা—না বাসাম—ঘুম আসে। মনে পড়ে যায়—পুরীতে ফেলে  
এসেছে 'রাজার ছেলে' কি জানি কার লেখা, প্রথম পাঠটা ছিঁড়ে  
গেছে, রাজার ছেলে প্রশান্ত, তার বন্ধু অরীহ হুজনে দেশে দেশে  
পুরে কত কী কাণ্ড! কিছুতে ভুলতে পারা যায় না গল্পটা!

তারের বাড়ীতে আসে কোথাকার কুমার বাহাদুর, সেও ছোট  
বেলায় পড়েছে রাজার ছেলে বলে, আমার জীবন একবারে বদলে  
গেছে রাজার ছেলে প'ড়ে। ট্রেট যখন গভর্মেন্ট নিয়ে নিলে  
তখন তাই আমার একটুও কষ্ট হল না। আগে থেকেই আমি  
প্রাসাদ ছেড়ে আমার দৌতলা বাড়ীতে চ'লে এসেছি, আর কাপড়ের  
কল হু-হুটা ক'রে ফেলেছি।

সুজ্ঞ বাসের বিছানায় দক্ষিণ হাওয়ার রাজার ছেলের পালাকের  
মলমলের বিছানার কথা মনে হয়। নটার সময়ে ড্যাডি গাড়ী  
নিয়ে এসে ডাকডাকি করে, একি অসভ্যের মতন বাসের ওপর  
শোয়া? চার ধারে লোকজন থোরা-কোরা করছে। তোমাদের  
কি সবই অদ্ভুত?

বড্ডো রাস্তা লাগছিলো, মাঝি বললো।

চিরদিন কখনো সমান যায় না বলে একটা কথা আছে।  
বিনামেয়ে বজ্রাঘাত হলো একটা কথা আছে। আকাশে মেঘ  
নেই, অথচ বাজ পড়লো।

মীরা সেই বকম একটা কথা শুনলো।

মাম্মির ছেলে হবে।

মানে মীরার একটি ভাই আসছে।

তাই হওয়া তো আনন্দেরই। কোন বোনের না আনন্দ হয়  
তাই হ'লে?

কিন্তু এখানে আর একটা জিনিস ভাবতে হবে।  
এদের ছেলে হয়নি ব'লেই না মীরাকে এনেছে? ছেলে হয়নি  
ব'লেই না এখানকার সমস্ত ঐশ্বর্য মীরার? ধন-দৌলত,  
বাড়ীঘর সাং?

সত্যি যদি নিজের ভাই হত, না হয় তার সঙ্গে সমান-সমান  
ভাগ হ'ত, তাতে দুঃখ ছিল না। কিন্তু মীরা তো সত্যি এ বাড়ীর  
কেউই নয়?

এদের নিজের ছেলে কিংবা মেয়ে এলে মীরার কোনো দয়াকরই  
হবে না।

তাকে হঠাৎ ফিরে যেতে হবে তার গরীব বাপের দুঃখের সঙ্গাসে,  
নয়ত রাজার ফুটপাথে হাত-পাতা ভিখারীদের দলে।

যে ভবিষ্যৎ তার স্থির হ'য়ে গেছিলো—সেই ভবিষ্যৎ হ'য়ে গেল  
অনিশ্চিত।

ড্যাডির মুখ গভীর।

মাম্মির মুখ আরো গভীর।

নবদীপ থেকে কাঁধের পিঁয়সা এসে বললেন—নাথনি কি ভয়  
পেয়ে গেলি?

মীরার চোখে এবার জল এসে গেল—যে জল বাধা মানল  
না, বসে পড়ল বর-বর-বর। অসহায় মেয়েটিকে চিরিয়ে  
খাওয়ার জন্তে যেন নির্ভর পৃথিবী অপেক্ষা করছে রূপকথার  
রাক্ষসীর মতন। সমস্ত জগৎ জুড়ে যেন কনকন-কনকন আওয়াজ!  
যবে যবে ছেলেমেয়ে ভয়ে অঁতাকে ওঠে। আকাশে হাজার হাজার  
শকুনি!

আজ মীরার বাড়ীতে গেলে হরত আশ্রয় হবে না। সংসার  
সংসার অভাবের তাড়নায় আরো হরত ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠেছে। হালা  
পালায়ই হয়ত দুবেলা পেট ভ'রে ভাত খুটছে না।

বড়ে হ'য়ে গেছে মীরা মাথার। এবার তার বিয়ের ভাবনা।  
যে সমস্ত তার ভালোবাসার জিনিস ছিল—তাও আজ ভালো  
লাগছে না। মাথার ওপরের ছাদ উড়ে গেছে। পায়ের তলা থেকে  
মাটি স'রে গেছে।

মীরার নিজেরই মনে হল, আসলে মীরা বিধাতার খেলায় পুতুল!  
যেন ঘুম ভেঙে গেল দুঃখের দেখে।

ফুলের বন মিলিয়ে গিয়ে মরুভূমির বালি উড়ছে—সাহারা  
মরুভূমি—সারা ইয়োরোপের চেয়ে বড়ো। ওয়েসিস,—মরুভূমির  
ধারে ধারে ডাকাত দল থাকে, লুট করে পথিকের সর্ব্ব, যে বরীচিকা  
দেখে দেখে ছুটে ছুটে স্ত্রীর তুফার রাস্তা হ'য়ে শেষ পর্যন্ত গগণে  
বালির ওপর বৃথ খুঁড়ে পড়ে প্রাণ হারালো। যবে ভায় খবর  
গেল না, সাহারা মরুভূমির বালি তাকে চাপা দিলো।

মেকরপুরের ভেতর খাঁড় ঠাঁণ্ডা হ'য়ে আসে। সে কি! লছে কুম্ভক পাহাড়ের দিকে মাইলের পর মাইল, বরফ পায় হ'ল মেকর দেশের হরিণ পখাঙ বোঝানে যায় না, সালা ভালুক আসে না। গাছ নেই, বাস নেই, ফুল নেই, ফল নেই, পখ নেই, ঘাট নেই, গ্রাম নেই, বর নেই, আকাশে পাখী নেই, মাটিতে মাঘুঘ নেই— শুধু দুর্ভেদ কুয়াসা, সালা বরফ আর কনকনে ঠাঁণ্ডা। খাত নেই, পানীয় নেই, বল নেই, ভরসা নেই, আশা নেই, সাধনা নেই, শুধু আছে ভয় আর ক্লান্তি। দিগন্তবিহীন দক্ষিণ মেক, আড়ষ্ট পা বোঝানে চলে না, ভারী বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না।

এদের বাড়ীতে উৎসব। আত্মীয়-স্বজনের নিত্য আনাগোনা।

কত কামনার কত ভরসার ছেলে আসছে নিঃসন্ধান রায়চৌধুরী পরিবারে—লক্ষ লক্ষ টাকা বাদের ব্যাঙ্কে—ভোগ করবার লোক খুঁজছিলো বারা।

হাথের মেয়ে মীরার উড়ে এসে জুড়ে বসে কেউই পছন্দ করছিলো না। সবাই আত্ম সমান খুশি বাচ্চা মেয়ের সর্কনাশের সন্ধানবায়।

সালামপুরের সাঁওতাল মেয়ের মতন খোঁপায় ফুল গুঁজে, ক'সে কোমর বেঁধে ও যদি চলে যেতে পারত কয়লাখনির কাজে প্রজাপতির মতন নাচতে নাচতে, আর ফিরে আসতে পারত গান গেয়ে গেয়ে— তেমনি নিটোল স্বাভা নিয়ে, তেমনি প্রাণের উচ্ছলতায়! ভাবনা-বিহীন সাঁওতাল মেয়ে!

শাস্ত্রাঙ্ক দেখেছে-সুমনেছে বোশারে, সে কত আদরে ছিল, কলকাতার মেয়ে। আজ সব হারিয়ে দশটা-পাঁচটা চাকরী করছে লক্ষ পুরুষের ভিড়ে, ট্রামে-বাসে দাঁড়িয়ে গিয়ে। মীরার অবস্থা অত বিত্তে নেই। [ ক্রমশঃ ]

## স্বর্গজয়ের বিড়ম্বনা

( একটি দিনেমার রূপকথা )

হাল ক্রিশ্চিয়ান এ্যাণ্ডারসন

অনেক, অনেক দিন আগে ছিলো এক দেশ। সে-দেশের রাজ্য ছিলো পানোর মতো লোভ। তাঁর রাজ্য ছিলো বেশ বড়ো, কিন্তু তাতে তাঁর মন উঠতো না। তিনি চাইতেন যে, তিনিই সারা পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট হবেন। আর, সেই উদ্দেশ্যেই, রাজ্যমশাই সৈন্তসামন্ত লোক-লব্ধ তীর-ধনুক বশল ইত্যাদি নিয়ে প্রতিবছরই দেশ জয় করতে বেরোতেন। তাঁর শিবির পড়তো যেখানে, সেখানেই তাঁর কোঁজ সব-কিছু ধ্বংস করতো, তাদের নিষ্ঠুর, লোভে-ধাক্কানো, শির-অঁকা খাবা থেকে কিছুই বেহাই পেতো না। যে দেশ জয় করতে যেতেন, সেই দেশের লতগাছমল মাঠের উপর দিয়ে সেই রাজ্য তাঁর পটল চালিয়ে নিয়ে যেতেন, আর তাদের পায়ে চাপে সব ফসল, সোনালি ফসল, নষ্ট হ'য়ে যেতো। তাঁর দক্ষ দেশের লোকদের অনেক কাল ধরে না-খেয়ে থাকতে হতো। রাজ্যমশাই যে দেশ জয় করতেন, সে-দেশের কেবল যে ফসলই নষ্ট করতেন, তা নয়। দেশের উপর দিয়ে যাবার সময় সব গরিব লোকদের কুঁড়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন। এই সব ঘরবাড়ির আগুন হ'ল ক'রে আকাশ পখাঙ উঠতো, আর আশে-পাশের সব গাছপালা আগুনের আঁচে ঝলসে যেতো, পুড়ে যেতো। বিশেষ গেলে

কেউ যে ফসল খেয়ে থাকবে, তাঁরও কোনো উপায় থাকতো না। সবাই থাকে না খেয়ে মরে, সেই জন্তই এই ছিলো তাঁর নির্দর কন্দি! ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ে কোলে ক'রে আগুন-লাগা বাড়ি থেকে সব মেয়েপুরুষ এসে আশ্রয় নিতো সেই সব ঝলসানো গাছতলায়। বর্ষার দিনে প্রবল বৃষ্টির জলে, আর শীতকালের ঠাঁণ্ডা, কনকনে, পাঁজরায়-ছুরি-চালানো হাওয়ায়, অনাহারে, অনিদ্রায়, ভয়ে তাদের যে কী অবস্থা হ'তো, তা কল্পনা করতে গেলেই শরীর শিউরে উঠতে চায়। লড়াইয়ের গল্প প'ড়ে আমরা মোটেই বুঝতে পারিনে, যে-দেশ হারলো, সে-দেশের উপর দিয়ে দুর্দশার রথের চাকা কী ভাবে গড়িয়ে যায়!

রাজ্যমশাই তাঁর কোঁজ নিয়ে যাবার সময় অনেক বার ঐ সব কল্পন, বুক-কাটা! দুঃখে মলিন দৃষ্টি দেখেছেন, কিন্তু অস্ত্র সবাই সে-সব দৃষ্ট দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠলেও তাঁর খুবই ভালো লাগতো ও সব দেখতে। রাজ্যমশাই দেখতেন, তাঁর চোখের স্তম্ভুখ দেশের সব লোক ঘরছাড়া হয়ে শীতে বা বর্ষায় না-খেতে পেয়ে কষ্ট পাচ্ছে ও মারা যাচ্ছে, হু-তিনি মনে করতেন যে, তিনি ঠিকই করছেন, অস্ত্রায় কিছু করছেন না। রাজ্যের পরাক্রম আর সৈন্তবল ছিলো অনেক, কিন্তু তাঁর যুদ্ধ-জয়ের ফল কেবল হ'তো এই রকম ধ্বংস আর দারুণ দুর্ভিক্ষ।

দিনের পর দিন যায়, রাজ্যমশাইয়ের ক্ষমতা কেবল বেড়েই চলে। একের পর এক সকল দেশ আসতে থাকলো তাঁর দখলে। তাঁর নাম শুনে লোকে আশে-পাশের দেশের লোকেরা ভয়ে খরখর ক'রে কাঁপতো, ছেলেরা চুই-মি করলে মায়েরা তাদের ভয় দেখাতেন তাঁর কথা ব'লে। এমন কি, যে-সব ডানপিটে ছেলেরা তাদের মা-বাবার কথা শুনতো না, তারা পথস্তু ভয়ে শিরশিরিয়ে কাঁপতো তাঁর নাম শুনে।

যে-সব দেশ রাজ্যমশাই দখল করতেন, সে-সব দেশ থেকে অস্ত্র-ধনসম্পত্তি তিনি লুণ্ঠরাজ ক'রে নিয়ে আসতেন। এর দক্ষণ তাঁর রাজধানীর সম্পদ ক্রমশই বেড়ে চললো। পৃথিবীতে অতো সমৃদ্ধ নগরী তখন আর কোনোখানে ছিলো না। রাজ্যমশাই যতোই তাঁর অধীন সব দেশ থেকে অস্ত্র-টাকা-কড়ি পেতে লাগলেন, ততোই সে-সব দিয়ে রাজধানীতে অনেক ভালো-ভালো মন্দির, রাস্তা, বাগান, প্রাসাদ প্রভৃতি তৈরি করতে লাগলেন। রাজধানীর লোকেরা দেখতো, তাদের দেশের সম্পদ আর ঐশ্বর্য দিন-দিন কেবলি বেড়ে যাচ্ছে, আর তাই দেখে তারা সবাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো : 'ও! খুব শক্তিশালী রাজ্য তো!' তারারূপন এমন ভাবে ঐ দুর্দান্ত রাজ্যের ক্ষমতার প্রশংসা করতো, তখন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো না যে, অস্ত্র সব অধীন দেশের লোকদের কী রকম দুর্দশার বিনিময়ে তাদের দেশ ঐ-রকম সুলভ ক'রে গাছানো হ'চ্ছে।

আর রাজ্যমশাইও তাঁর অলে সোনা রূপো হীরা-জহরৎ চুনি-পালা দেখে ভাবতেন, 'সত্যিই তো, আমার তো তবে সাংঘাতিক ক্ষমতা! কিন্তু আমার আরো চাই, আরো বাড়তে হবে আমার ঐশ্বর্য, পৃথিবীর সকলের চেয়ে অনেকগুণ বেশি ধনী আমার হ'তে হবে।' এই ভেবে আত্ম-আত্ম পৃথিবীর সকল রাজ্যকে তিনি হারিয়ে দিলেন, আর তাদের সমস্ত ধনরত্ন নিজের রাজ্যে ব'রে আনালেন। অধীন দেশের রাজারা হলো তাঁর সামন্তের মতো;

প্রতি বছরই তারা তাঁর চিত্র ধনদৌলত নিয়ে আসতো। রাজা-মশাই উঁচু সোনার সিংহাসনে বসে থাকতেন, তাঁর পবিত্র মাথায় বলমল করতো চুনি-পাখা-বসানো সোনার মুকুট, আর সেই সব পরাজিত বাজারী ঠাঁট গেড়ে তাঁকে অভিবাদন করতো।

একদিন রাজামশাইয়ের খুব শগ ত'লো যে, দেশে-দেশে, ঘরে-ঘরে তাঁর নিজের পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। যেই তিনি হুকুম দিলেন, অমনি অজস্র শিল্পী তাঁর মূর্তি গড়তে শুরু করে দিলে। এক মাসের মধ্যেই হাজার-হাজার শ্রেতপাথরের মূর্তি তৈরি হয়ে গেলো। রাস্তার ধারে, বাগানের মধ্যে, বড়ো-বড়ো প্রাসাদের ভিতরে তাঁর মূর্তি বসানো হ'তে লাগলো। তারপর একদিন রাজামশাই তাঁর কয়েকটি পাথরের মূর্তি একটি বড়ো গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে সরোলেন। উদ্ভঙ্গ, ঐ হস্তিগুলা দেশের সব বড়ো-বড়ো দেউলের মধ্যে বসাবেন। দেউলে গিয়ে রাজামশাই পুরুতলের বললেন : 'আমি চাই যে, সব মন্দিরেই আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়। আর এ-ও আমি চাই যে, দেবতার পূজার সঙ্গে সঙ্গে আমারও যেন পূজা হয়।'

পুরুতরা সকলে করজোড়ে বললেন : 'সম্রাট! আমরা স্বীকার করি যে, আপনার ক্ষমতার কোনো সীমা নেই, সাধ্য আপনার সীমাহীন! কিন্তু একথা তো ঠিক যে, স্বর্গের দেবতারা আপনার চেয়ে ঢের বেশি শক্তি ধরেন। আমরা আপনার আদেশ পালন করতে ভয় পাচ্ছি, কারণ, তা-হ'লে দেবতারা আমাদের শাস্তি দেবেন। সুতরাং সম্রাট! আমাদের কোনো ক্রটি না নিয়ে এই দুরূহ ইচ্ছার হাত থেকে আমাদের রোগটি দিন।'

পুরুতদের সেই উত্তর শুনে রাজামশাই বললেন : 'বেশ, আমি স্বর্গের দেবতাদেরও পরাস্ত করবো। দেবতাদের ভয় করবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে আপনারা খুব ভালো কাজ করেছেন।'

স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, তাই রাজামশাইয়ের নির্দেশ অনুসারে খুব তোড়জোড় শুরু হ'য়ে গেলো চার দিকে। উক্ত রাজার অহঙ্কার প্রস্তুত হ'তে লাগলো তুঘল যুদ্ধের জন্য। তখনো উড়োজাহাজ বেগোয়নি, কাঁচ তাঁর হুকুম-মতো অজস্র টাকা খরচ করে একটা প্রকাণ্ড জাহাজ তৈরি হ'লো; সেই জাহাজের উপর সাজানো হ'লো হাজার-হাজার তাঁর-ধনুক ঢাল-তলোয়ার বর্শা-বল্লম; আর ঠিক হ'লো, রাজামশাই তাঁর পদটন নিয়ে সেই জাহাজের মধ্যেই থাকবেন। তারপর প্রায় দশ হাজার ঈগল বেঁধে দেয়া হ'লো সেই জাহাজের সঙ্গে, কারণ, জাহাজটি তো ওড়া চাই!

নির্দিষ্ট দিনে সৈন্তসামন্ত স্তম্ভপন্ন নিয়ে, ঈগল-পাখীরা সেই জাহাজটা নিয়ে আকাশে উড়লো! ক্রমশ পৃথিবী থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো জাহাজটা; খানিক পরেই পৃথিবীর সব জিনিশ দেখাতে লাগলো পৃথুলের দেশের মতো ছোটো-ছোটো; তারপর উড়তে-উড়তে জাহাজটা এতো উপরে উঠলো যে; সেখান থেকে পৃথিবীর কিছুই আর দেখা গেলো না।

জাহাজটা যখন নীল আকাশে অনেক উঁচুতে উঠলো, রাজামশাই চার পাশে দেবদেবের চলাফেরা করতে দেখলেন। তাদের দেখেই রাজামশাই হুকুম দিলেন তাঁর ছুঁড়তে। হাজার হাজার ধনুক থেকে অনর্গল বাশি-বাশি তাঁর ছোঁড়া হ'তে লাগলো, কিন্তু রাজা অবাক হ'য়ে দেখলেন যে, একটাও দেবদেবের গায়ে লাগছে না, বরং

সেই সব তাঁর কেমন করে যেন ফিরে এসে তাঁরই সৈন্তদের গায়ে লাগছে, আর তারা এক-এক করে মরছে। বেগতিক দেখে নিজেরই একটা ধনুক তুলে নিলেন হাতে, খুব ভালো করে লক্ষ্য স্থির করলেন, তারপর ছুঁড়লেন এক দেবদেবের দিকে। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, তাঁরটা দেবদেবের গায়ে লাগলো, কিন্তু তবু সে মরলো না। কেবল তাঁর গা থেকে ছুঁকোটা রক্ত পড়লো জাহাজের উপর, আর সেই ছুঁকোটা রক্ত পড়তেই মনে হ'লো, কেউ যেন সেই জাহাজটার উপর হাজার মণ বোঝা চাপিয়ে দিলো। তাঁর দক্ষণ ঈগলেরা আর জাহাজের ভার বহিতে পারলো না। ভারের চোটে তাদের ডানা ভেঙে গেলো, আর হত করে জাহাজটা শূন্য থেকে মাটিতে পড়তে লাগলো।

অতো উঁচু থেকে পড়তেও তো সময় লাগে। সেই সময়টুকুর মধ্যে রাজামশাইয়ের হুঁশ খা কিছু কিছু কম হ'লো না। হাতেরা উখাল-পাখাল হ'য়ে উঠলো যেন হঠাৎ, নাগরদোলায় মতো পাক খেতে লাগলো জাহাজটা, টলতে লাগলো চরকিবাঞ্জির মতো, রাজার মাথার উপরে হাওরায় বোঁ-বোঁ করে আওয়াজ হ'তে থাকলো, তাঁর অনেক সৈন্তকে ঝড়ে যে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেলো, তা কেউ বুঝতেও পারলো না; আর কতকগুলো বড়ো-বড়ো সন্তানের কঁকড়ার মতো কী সব ভানোয়ার হুশ-হুশ করে উড়ে এসে রাজামশাইকে আর তাঁর সৈন্তদের কামড়ে একেবারে বসন্ত করে দিলে।

তারপর, রাজামশাইয়ের বরাত জোরে, কি দেবতাদের কাছে তাঁর আরো শাস্তি তোলা ছিলো বলেই কিনা জানিনে,—জাহাজটা এসে পড়লো ভুলে। যদি মাটিতে বা পাহাড়ের উপরে পড়তো, তবে জাহাজটা তো চুম্বার হ'য়ে যেতোই, রাজামশাইও তা-হ'লে গুড়ো হ'য়ে যেতেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর স্বর্গের রাজা হওগা বেরিয়ে যেতো। এতো শাস্তি শেষেও রাজামশাই মরলেন না; ক্ষতবিক্ষত শরীরে বাড়ি ফিরে এলেন : ঠিক করলেন, থেকেই হোক, স্বর্গ ভয় করা তাঁর চাই-ই। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় যখন তাঁর আহত শরীর সেরে গেলো, তখন তিনি ফের দেবতাদের সঙ্গে লড়াইয়ের উজ্জাগ করতে লাগলেন।

এবারে একটা উড়োজাহাজের জায়গায় তৈরি হ'লো একশো উড়োজাহাজ। আর সেই সব উড়োজাহাজ আকাশে উড়িয়ে নিয়ে বাবার জন্ত কতো যে ঈগল পোষা হ'লো, তার আর কোনো লেখাজোখা নেই। লড়াইয়ের জন্ত অস্ত্রশস্ত্রও তৈরি হ'লো প্রচুর। পৃথিবীর সব দেশ থেকে তাঁর চিত্র সৈন্তসামন্ত এলো। যুদ্ধের শুরু রাজামশাই এতো বিরট আয়োজন করেছিলেন যে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধ এতো সৈন্য ও অতো বশদ জোগাড় করা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি।

সৈন্তেরা সব জাহাজে উঠছে,—তখনো জাহাজ ছাড়তে কিছুক্ষণ দেরি আছে, চার দিকে ভয়ানক শোরগোল আর ব্যস্ততা। যুদ্ধের বাজনা বাজছে তুঘল আওয়াজ,—এমন সময়ে স্বর্গের দেবতারা একবার বড়ো-বড়ো মশা রাজামশাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্ত পৃথিবীতে পাড়িয়ে দিলেন। সেই মশাগুলির এমন বিধি যে, তাদের কামড়ে সাপের চোবলের মতো হস্তাণ্ড হয়, আর মানুষ পাগলের মতো অস্থির হ'য়ে চার দিকে চটোচটি করতে থাকে। রাজামশাই

কেবল জাহাজে উঠতে বাবেন, এমন সময় সেই মশার ঝাঁক এসে ঠাঁকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করলো।

রাজা খাপ থেকে রূপালি তলোয়ার বার করে মশাদের মারবার জন্য এদিক-ওদিক চালাতে লাগলেন, কিন্তু একটি মশাও মরলো না। ওদিকে রাজা মশাটাদের সারা শরীর মশার কামড়ে ভীষণ হালু করতে লাগলো। পাগলের মতো নাচতে থাকলেন রাজা, কিন্তু তবু মশারা ঠাঁকে রেহাই দিলো না। তখন রাজা হুকুম দিলেন : ‘তাড়াতাড়ি আমাকে একটা মশারি দিয়ে ঢেকে দাও, আর মশাদের উপর তীর ছোঁড়ো।’

তার হুকুম শুনে সৈন্তরা সব হো-হো করে হেসে উঠলো। তারা ভাবলে, ‘মশা মারতে আবার তীর ছুঁড়বো কি! রাজামশাই নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন।’ করেক জন অবশ্য তক্ষুণি ছুটে গিয়ে কোথেকে একটা মশারি নিয়ে এসে রাজামশাইকে ঢেকে দিলে, কিন্তু তবু কোনখান দিয়ে একটা মশা মশারির ভিতরে ঠাঁকে এমনি ভাবে কামড়ালো যে, জলুনির চোটে মশারি ছেড়ে তিনি পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

তার সৈন্তসামন্তরা এই কাণ্ড দেখে ভাবতে লাগলো, গুরুমহাচার্য ঝাঁক মশা যদি দেবতারা তাদের দিকে পাঠিয়ে দেয় তো মহা মুশকিল হবে; সেইজন্য তারা সবাই বৈকে বসলো, তারা যুদ্ধ বাবে না। তবু যদি রাজামশাই বেশি গীড়াগীড়ি করেন তো তারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। রাজাও তাঁর সব সৈন্ত ও দেশের লোকের সামনে সামান্য কয়েকটি মশার কাছে লালনায় এমনি লজ্জিত আর অশ্রুভিত্ত হ’লেন যে, ভুলেও ভবিষ্যতে তিনি আর কোনো দিন স্বর্গজয়ের হুঁসিঙ্গা প্রকাশ করেন নি।

অনুবাদক : মানবশ্রেণী বন্দ্যোপাধ্যায়

## রাশিয়ার রূপকথা

(বয়স তার সাত)

শ্রীচন্দ্রসুন্দর দেব

তারাই হুই ভাই। একজন ধনী, আরেক জন গরীব। ধনীর আছে রাজী ঘোড়া, গরীবের আছে মাদী ঘোড়া। এক দিন তারাই কেঁদাতে বেরুল। নিম্ন নিম্ন বাহনে চড়ে হুই ভাই পাশাপাশি চলল। চলতে চলতে রাত হল। একটা গাছের তলায় তারা রাত কাটাল।

ধনী লোকটির ঘোড়া ছাড়া গাড়িও ছিল সঙ্গে। গাড়িতে করে তার খাবার-দাবার আর বিছানাপত্র গিয়েছিল।

রাত্রিবেলা গরীব লোকটির মাদী ঘোড়ার একটি বাচ্চা হল। বাচ্চাটি গড়িয়ে গড়িয়ে ধনীর গাড়ির তলায় এসে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালবেলা ধনী গরীবকে ডেকে বলল, দেখেছো? হে, আমার গাড়িটা কি শুল্লর বাচ্চা দিয়েছে!

গরীব ধনীর কথার অবাক হয়ে বলল, ‘সে কি কথা, গাড়ি আবার বাচ্চা দেবে কি করে? বাচ্চা দিয়েছে আমার মাদী ঘোড়া।’

ধনী একথাবার আপত্তি জানিয়ে বলল, ‘বাচ্চা যদি তোমার মাদীর হবে, তাহলে সে আমার গাড়ির নীচে আসবে কেন?’

এমনি করে কথা-কাটাকাটি করতে করতে তারা শেষ পর্যন্ত আশালতের আশ্রয় নিল।

ধনী ঘুম দিয়ে উকিল হাকিমের মুখ বন্ধ করল। গরীবের সখল রইল শুধু সত্যি কথা। ব্যাপারটা আশালত থেকে রাজার কাছে গেল।

রাজা তাদের দু’জনকে ডেকে চারটি প্রশ্ন দিলেন :

এক—সব চাইতে শক্তিশালী কে, আর কে সব চাইতে তাড়াতাড়ি ছুটেতে পারে?

হুই—সবার চাইতে স্নেহ কার বেশি?

তিন—সব চেয়ে নরম জিনিস কি?

চার—সবার চাইতে মা’ঘের প্রিয় কি?

প্রশ্নগুলি বলে রাজা তাদের তিন দিনের সময় দিলেন। চতুর্থ দিন সকাল বেলাই তারা যেন উত্তর খুঁবে নিয়ে রাজদরবারে হাজির থাকে।

ধনী লোকটি চতুর। তার মনে পড়ল একজন চেনাশোনা লোককে। সে তখনই তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন চারটির উত্তর জানতে চাইল। বার কাছে গেল, সেও খুব চালাক লোক। চটপট সে উত্তর বলে যেতে লাগল।

এক—সবচেয়ে শক্তিশালী আমার পাটকিলে রঙের ঘোড়া। তার গায়ে চাবুক ছুঁইয়েছে কি সে বাতাসের আগে ছুটেতে শুরু করবে।

হুই—স্নেহ মানে স্নেহপদার্থ, মানে চর্বি। ঐ জাখো না আমার হু’ বছরের শূণ্ডের বাচ্চাটার গায়ে কত চর্বি। শুটো এমনি মোটা যে, চার পায়ের উপর শরীরের ভর রেখে গাঁড়িতেই পাবে না।

তিন—পালকের বিছানার চাইতে নরম আর কিছু আছে বলে ত জানিনে।

চার—আমার নাতি ইভানুস্কার চাইতে প্রিয় আর কি থাকতে পারে? তাখোই না, কি শুল্লর সে দেখতে—যেন দেবদূত নেমে এসেছেন।

ধনী প্রশ্নের উত্তর শুনে নিয়ে আনন্দে লাগতে লাগতে ফিরে এসে রাজার কাছে হাজির হবার আয়োজন করতে লাগল।

এদিকে গরীব লোকটি ঘরের এক কোণায় বসে কাঁদতে লাগল। রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে তার যে প্রশ্ন নেবেন রাজামশাই। সে যদি বৈকে না থাকে, তাহলে কোথায় গাঁড়াবে তার সাত বছরের মা-হারি মেয়ে!

মেয়ে তাকে দেখে ফেলল হঠাৎ। বলল সে বাবাকে, ‘এমন কাঁদছ কেন বাবা?’

গরীব বাবা বলল, ‘মা, রাজা আমাকে চারটি প্রশ্ন দিয়েছেন। সেগুলির উত্তর আমি খুঁজে পাচ্ছি নে।’

মেয়ে বলল, ‘বলো না আমাকে, রাজা কি প্রশ্ন দিয়েছে?’

বাবা বলল, একে একে চারটি প্রশ্নের কথা, তার সাত বছরের মেয়েকে।

মেয়ে প্রশ্ন শুনে বলল, ‘এ তো খুব সহজ প্রশ্ন বাবা! আমিই এগুলির উত্তর তোমাকে বলে দিচ্ছি, শোনো—’

এক—সবচেয়ে বলশালী হচ্ছে বাতাস, বাতাসের চাইতে তাড়াতাড়ি আর কেউ ছুটেতে পারে না।

হুই—সব চেয়ে স্নেহ বেশি হচ্ছে পৃথিবীর। যত জীবজন্তু, গাছপালা—প্রাণী সবাইকেই পৃথিবী অপার স্নেহে পালন করছে; থাইয়ে পরিয়ে বাড়িয়ে তুলছে।



তিন—সব চেয়ে নরম হচ্ছে মাছের বাহ। মাছের শত নরম শব্দ্যার তরুণ মাথার নীচে বাহুখানি বিস্তরে দিলে আরাম বোধ করে।

চার—সবার চাইতে শ্রিয় মাছের ঘুম। ছুখ-বাতনা যোগ-শোক সব কিছুই শান্তি হয় ঘুম বধন হুতোম ভরে আসে। এমন নয়দীঘু মাছের আর কিছু নেই।

চতুর্থ দিনে আবার দুই ভাই একসঙ্গে হয়ে এসে হাজির হল রাজ-দরবারে। রাজা প্রথম ধনিকে প্রশ্নের উত্তর শুধালেন। ধনীর উত্তর শুনে রাজা কিছুক্ষণ চূপ করে রইলেন। তারপর গরীবকে শুধালেন। গরীব একে একে প্রশ্ন চারটির উত্তর দিলে পর রাজা বললেন, “এই উত্তরগুলি কি তুমি নিজে নিজেই তৈরি করবে—না, আর কারও সাহায্য নিয়েছ?”

গরীব লোক কখনও মিথ্যা কথা বলেনি। এবারও সে সত্যি কথাই বলল। বলল—“আমার সাত বছরের মেয়ের কাছ থেকে প্রশ্নগুলির উত্তর জেনে নিয়েছি।”

রাজা শুনে অবাক হয়ে বললেন, “তোমার এত ছোট্টো মেয়ের এত বড় বুদ্ধি তাহলে এক কাজ করো তো, এই নিয়ে বাও আমার কিছু রেশমের সূতো, এ দিয়ে তোমার মেয়ে যেন আমাকে একটি সুললিত তোয়ালে তৈরি করে দেয়।”

গরীব লোকটি রাজার দেওয়া রেশমের সূতো নিয়ে বাড়ি এসে এক কোণায় বসে রইল বিষণ্ণ মনে।

মেয়ে এসে বাবাকে বলল, “কেন এমন দুখ কালো করে বসে আছ বাবা? বাবা তখন বলে সব কথা বলল।

মেয়ে বাবার কথা শুনে বলল, “এর জন্তে তুমি জ্ঞাত আবার ভাবছ? এই বলে সে তখনই কাঁটার ভিতর থেকে কাঠের টুকরোটা খুলে নিয়ে বাবার হাতে দিয়ে বলল, “বাও, এগুলি রাজার কাছে, গিয়ে তাকে বলো যে এই কাঠের টুকরোটা দিয়ে উনি যেন একটা তাঁতের মাকু তৈরি করিয়ে দেন আমাকে। ঠাঁর ভালো কাঠমিষ্টি আছে।”

গরীব লোকটির হাতে রাজা কাঠের টুকরো পেয়ে ভাকতে লাগলেন সেই ছোট্ট মেয়ের কথা, বার বার মোটে সাত।

পরক্ষণেই দেখলো দেড়শো হাঁসের ডিম নিয়ে এসে লোকটির হাতে দিয়ে রাজা বললেন, “এগুলো নিয়ে তোমার মেয়েকে দাঁও আর বলে—কালকের মধ্যে আমাকে যেন দেড়শো হাঁসের বাচ্চা পাঠিয়ে দেয়।”

গরীব লোকটি রাজার দেওয়া দেড়শো ডিম নিয়ে এসে বাড়িতে এক কোণায় বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। আজ তাকে অন্তত দিনের চাইতেও চিন্তাকুল দেখাচ্ছিল।

তার মেয়ে এসে তাকে ‘বাবা’ বলে ডাকতেই সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলল—“হায় যে আমার পাড়াকপালী মেয়ে, এবার রাজা যে বিশপে ফেলছে তার থেকে আর বাঁচতে পারবি নে।”

মেয়ে বাবার মুখে রাজার হুকুম শুনে আর রাজার দেওয়া ডিমগুলি নিল। ডিমগুলি দিয়ে সে তখনই নানারকমের খাবার তৈরি করতে লাগল।

তার পর বাবাকে বলল, “বাও বাবা রাজার কাছে, গিয়ে বলো, হাঁসের বাচ্চাগুলির জন্ত আজকেই যেন জমিতে চাষ দিয়ে নীবার বানান, আজকের মধ্যেই সেই নীবারগুলির কচি ডগা তুলতে হবে—আর সেগুলি খেয়ে বাচ্চাগুলি বাঁচবে। বাও, এখনই গিয়ে রাজাকে বলো।”

রাজা গরীব লোকটির কথা শুনে বলল, “তোমার মেয়ের বড়ি এত বুদ্ধি, তাহলে তাকে গিয়ে পাঠিয়ে দাঁও কাল খুব সকালবেলা আমার কাছে। কিন্তু একটা কথা—সে যেন পায়ে হেঁটে না আসে, সে যেন ঘোড়ায়ও না চড়ে আর তার পরনে যেন কিছু না থাকে, তাই বলে সে যেন ভ্রাটো হয়ে না আসে। আর যেন বেথো—সে যেন আমার জন্ত কোনো উপহার না আনে—তাই বলে একেবারে খালি হাত যেন তার না থাকে।”

রাজার এই অদ্ভুত সব ইচ্ছে শুনে গরীব লোকটি হতাশ হয়ে পড়ল। বাড়িতে গিয়ে পা দিতেই মেয়ে এসে তার দুখ থেকে সকল কথা কেড়ে নিয়ে বাবাকে সাহস দিয়ে বলল, কিছু ভয় নেই বাবা। শিকারীদের কাছে বাও, আর আমার জন্ত একটা জাদু খরগোশ আর একটা তিত্তির কিনে নিয়ে এসো।

পরের দিন মেয়ে ঘুম থেকে উঠেই পরনের পোষাক খুলে ফেলল। একটা মাছ-ধরার জাল দিয়ে শরীরটা ঢাকল। তিত্তিরটাকে হাতে নিল আর খরগোশটার পিঠে চড়ে বসল। খরগোশটা ছুটে চলল রাজবাড়ির দিকে।

রাজবাড়ির কটকেই রাজার সঙ্গে দেখা হল। সেই গরীব লোকের সাত বছরের মেয়ে। মেয়ে মাথা হুলিয়ে রাজাকে অভিবাদন করল। তার পর বলল, “এই নিন আপনার উপহার”, বলে তিত্তিরটাকে ছেড়ে দিল।

রাজা পাখিটার দিকে হাত বাড়ালেন কিন্তু ধরতে পারলেন না। পাখিটা শাঁ করে আকাশে উড়ে গেল।

রাজা এতে বিরক্ত না হয়ে বললেন, “সাবাস মেয়ে! ঠিক ঠিক যেমনটি বলেছিলাম, তেমনটি তুমি করলে, সাবাস।

রাজা কিছুক্ষণ চূপচাপ থেকে আবার বললেন, “আচ্ছা, তোমার বাবা-তো বড় গরীব, তুমি আমার বলতে পারো, তোমাদের খাওয়া-পারায় ব্যবস্থা কি করে হয়?”

সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে রাজার প্রশ্ন শুনে এতটুকু বিচলিত হল না। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল। “আমার বাবার আবার ভাবনা কিসের। শুকনো ডাঙার তিন মাছ ধরতে পারেন। মাছ ধরবার জন্ত কখনও তাঁকে নদীতে যেতে হয় না, জালও বাইতে হয় না। ডাঙা থেকেই বাবা এত বেশি মাছ ধরেন যে আমি সে সব মাছ আমার জামার আঙিনে গুরে বাড়ি নিয়ে আসি। সেই মাছ দিয়ে আমি খুব সুখোচক মূশ তৈরি করি। আমি খাই। বাবা খান। আপনি যদি একবার খান, তাহলে তার কথা জীবনে ভুলবেন না।”

রাজা হো হো করে হেসে উঠে বললেন, “ওরে অবোধ, বোকা মেয়ে, কী সব তুই বলছিস? মাছ কি কখনও ডাঙার থাকে? মাছ যে জলের জীব, সে কথা কে না জানে?”

সাত বছরের মেয়ে তখন গলার জোরে টেঁচিয়ে বলল, “ওগো বুদ্ধিমান রাজা, কাঠের গাড়ির পেটে আবার কোথায় রক্তমাংসের ঘোড়ার বাচ্চা জন্মায়? মাদী ঘোড়ার পেটেই যে বাচ্চা থাকতে পারে, সে কথা কে না জানে?”

রাজা এবার সাত বছরের মেয়ের কাছে জ্বল হলেন। গরীব লোকটিকে ডেকে তিনি তার ঘোড়ার বাচ্চাটা কিরিয়ে দিলেন।



নীলকণ্ঠ

বাইশ

মের পুত্র। মেল আর ফিমেল বলে বোঝায়ের ফিমেরাজে।  
আলাগা আলাগা শ্রেণী নেই। কে যে মেল আর কে ফিমেল;  
জামা-কাপড়, হাবভাব, বৃত্তি অথবা প্রবৃত্তি কিছু দিয়েই তা  
ঠাহর করার হিম্মতের দরকার। মেল আর ফিমেল নেই;  
তার বললে আছে ব্র্যাক মেল। যেমন নাকি হগসাহেবের বাজার;  
বহু বাবুর বাজার; চাঁৎপুরের নতুন বাজার; বৈঠকখানার বাজার,—  
এ সব সনাতন কলকাতাতেই আজও টিকে আছে। বোঝায়ের  
ফিমেরাজে এরা প্রাগৈতিহাসিক হয়েছে বহুদিন। তার পরিবর্তে  
একমাত্র যে বাজার আলো করে আছে দশ দিক,—তার নাম কালো  
বাজার। ব্র্যাক মেল আর ব্র্যাক মার্কেটিং। প্রথমটা চালু আছে  
বহুদিন, দ্বিতীয়টির গোড়াপত্তন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে। ব্র্যাক  
এক হোয়াইটে বোঝায়ের ফিমেরাজের ব্রু-জেষ্টের নকল লিপিবদ্ধ  
করা সম্পূর্ণ অস্থায়ী মন্ডিকে অসম্ভব। কারণ বোঝাই হবিঙলাদের  
মুখ কেবলমাত্র ব্র্যাক নয়। তার আসল বং ব্রু-ব্র্যাক। সোসাইটি  
ব্রুদের জীর্ণস্থান ভারতবর্ষের হলিউড বোঝায়ের ফিমেরাজে তাই  
তথু ভারতে আর কি হয়, বোঝায়ের ছাগা ভারতে থাকে বলে ফিল্মি  
ইন্ডিয়ায় বেআইনী মদ এক হার সঙ্গে নিষিদ্ধ আমোদ, কোনটারই  
অভাব নেই; ব্র্যাক মার্কেটের কুশর। ব্র্যাকমেলের কৃতিত্ব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উপলক্ষে ভাবহাবের মাটিতে বিষবৃক্ষের যে  
মার্কিনী চারা পুড়ে গেল কোটি কোটি এ্যামেরিকান ডলার তা  
ভারতবর্ষের অজ্ঞাত জাংগলর এখনও চারার আকারে থাকলে  
কি হবে? বেচারী বোঝাই। বিঘের চারা বোঝায়ের ফিল্মি  
ছবিরার কুল কুল লতার পত্রবৎ এখন চায় শ' কিলো স্থপরিপাক।

এই ফিল্মি ইন্ডিয়ায় সব চেয়ে বড় ফিম ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপনের  
শিখড়ির আড়াল থেকে ব্র্যাক মেলের তীর ছুঁড়ে সারা জীবন,  
বাড়ী করে, গাড়ী করে তারপর সেই কাগজেই ঘোষণা করা যে,  
যে প্রমাণ করতে পারবে যে সম্পাদক ব্র্যাকমেলায় তাকে হাজার  
হাজার টাকা পুতুকার দেওয়া হবে।—এমন বৃক্কের পাটা বোঝায়ের  
ফিমেরাজেই সম্ভব। শোনা যায় আমাদের এখানে বহুকাল  
আগে এক প্রবীণ সাংবাদিক দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয়র কলমে  
প্রত্যহ গালাগাল করতেন একটি ছোট প্রতিষ্ঠানকে। তারপর  
সেই প্রতিষ্ঠানটি এই প্রবীণ সাংবাদিকের কলম বন্ধ করার উদ্দেশ্যে  
কিছু টাকা দিয়ে যায় গোপনে। তারপর আবার পরের দিন প্রচণ্ড  
গালাগালি কাগজে প্রকাশিত হতে গৌড়ে আসে প্রতিষ্ঠানের  
লোক। কি ব্যাপার? কিছু না। সাংবাদিক বলেন: টাকা  
নিতে পারি অভাব; কিন্তু তার জন্ম সাংবাদিক আদর্শ বিসর্জন  
দিতে পারি না ত। বৃক্ক একবার। এটা আদর্শ না হুয়ারোগ্য  
অর্শ?—কে বলবে।

বোঝায়ের ফিমেরাজে যারা পদার্পণ করেছে একবার তাদের  
নবকর্ষণন হয়ে গেছে ভীষ্মদশাতেই। যুধিষ্ঠির যেমন সশরীরে  
স্বর্গে গিয়েছিলেন, তেমনি সশরীরে নরকে যেতে হলে বোঝায়ের  
ফিম ইন্ডিয়াতে যেতে হবে আপনাকে। ইংরেজ যেমন আমাদের  
ক্রীন্দন করেছে, মাতৃভাষা ভুলিয়েছে, স্বদেশ ও সংস্কৃতি  
করিয়েছে বিস্মৃত, তেমনই বোঝাই ফিম ভারতের জমিতে পয়সা  
করছে জারজ মার্কিন সংস্কৃতি। চটল পায়ে তালি পড়ান সুরকে  
সজীত বলে। হাওয়াইয়ান অথবা বুশ সাট। তার সঙ্গে ট্রাউজার  
আর পায়ে শ্লিশার। না জন্ম না মাতৃদেহ এই পোষাককে একমাত্র  
পরিধেয় বলে। বাস্তায়, পার্কে, প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে, ট্যাক্সিতে  
পুলবে এক নারীতে মিলে জড়াভি কবাকে প্রণয় বলে। না শুধু  
ইংরাজি, না বিগুড রাষ্ট্রভাষা; ছুরের অজাবে এ্যামেরিকান  
স্ল্যাংগকেই একমাত্র হিউমান ল্যাংগুয়েজ বলে চালুবার সম্পূর্ণ  
কৃতিত্ব বোঝাই ছবির। আর সেট বোঝেট ছবি যে সেটে গ্রাস  
করছে কালচারের কলকাতাকে তাকে স্বাধীন ভারত রসাতলে  
যেতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করার থাকবে না প্রয়োজন।  
কলকাতাও আজ সংস্কৃতি বলতে বুঝে সিনেমা। পাঠ্য বলতে  
সিনেমার কাগজ। এ্যাটম আর হাইড্রোজেন। ছাত্রদায়রার অস্ত্রের  
বিকল্পে শান্তির স্বপক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহের অনেক আগে নির্মূল করা  
দরকার এই জাতীয় ছবি। এবং এই বজ্রাতীত ফিম পত্রিকাগুলিকে।  
এখানেই সার্বজনীন চুক্তির মুষ্টিমেয়দের সব চেয়ে জোরালো  
অবস্থিতি। সেবাসগনে সম্মান টিক সময়ে প্রসব না হলে ডাক্তাররা  
পর্বজ আজকাল সন্দেহ করে যে সেই দীর্ঘস্থিতি কোনও  
প্রাকৃতিক কারণ নয়। হরত নবজাতক ভূমিষ্ঠ হবার আগেই;  
মাতৃগর্ভে থাকতে থাকতে ইহাতে পেয়েছে কোনও সিনেমার  
কাগজ; হরত সেই কাগজে ছাপা জনপ্রিয়তম লেখকের সার্বকর্তম  
সাহিত্য সৃষ্টি, 'বখা-সংবাদ' পড়তে পড়তে বিস্মৃত হয়েছে সময়ে ভয়  
নিত। সিনেমা' ভুলিয়েছে বাণ-মায়ের নাম; আর সিনেমার  
কাগজ ভোলালে মহুবা-জন্ম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই এই বোঝাই হাওরা ভারতবর্ষের  
ওপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে। বেলেচাপনা; বেজাঙ্কলপনা;  
বেজাঙ্কলপনার অভিশাপ বলা ভুলেছে বোঝাই মার্কা ছবিতেই প্রথম।



২৫,০০০ মাইল চলা মানে শোটা পৃথিবীটাকে একবার ঘুরে আসার চাইতেও বেশী! জীবনের এই সুদীর্ঘ পথে যে পা বাড়ালে তার প্রচুর কর্মশক্তি চাই—সেই শক্তি যোগাবে বনস্পতির রাসা খাবার, যা দিয়ে রাসার পরসারও সম্ভব হয়।

## ২৫,০০০ মাইল পাড়ি দিতে হবে!

বনস্পতি বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় কর্মশক্তি যোগায়

আপনার খোঁকাবাবু রোজ যদি এক মাইল ক'রেও হাঁটে তাহলে সারা জীবনে তাকে ২৫,০০০ মাইলের ওপর হাঁটতে হবে। বাতে সে জীবনের পথে ভালোভাবে পা বাড়াতে পারে, এগিয়ে যাবার শক্তি পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার ভার আপনায়।

খাত থেকে কর্মশক্তি

কর্মশক্তি আসে খাত থেকে, বিশেষ ক'রে মেহ-প্রধান খাত—শক্তি যোগাতে বার জুড়ি নেই। শক্তি যোগানো ছাড়াও মেহপদার্থ ভিটামিন এ ও ডি স্বল্প করতে ও রোগের বিরুদ্ধে লড়াইতে সাহায্য করে। বাড়ীর সবাই ছাবারেরই বাতে সেক্ষাতীর উপাদান থাকে তার জন্য

গিন্নীরা বনস্পতি দিয়ে রাসা করেন—বনস্পতি পুষ্টিকর ও পরসার সম্ভব করে।

আপনি নিজেই পরীক্ষা ক'রে দেখুন

নিজে পরখ করলেই বুঝবেন, বনস্পতি আপনার বাড়ীর কত বড় বন্ধু! আজ থেকেই বাড়ীর রাসাবাদ্য বনস্পতি দিয়ে করুন। দেখবেন, বাড়ীর সবাই খেয়ে কেমন খুশি হয়, আর খাট উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যবহারে সময়ের কত সাশ্রয়, কত তৃপ্তির সঙ্গে সবাইকে খাওয়ানো যায়। এও মনে রাখবেন, প্রতি আউল বনস্পতি ১০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট খাদ্যকর 'এ' ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

## বনস্পতি

### বাড়ীর গিন্নীদের পরমবন্ধু!



প্রচারক : বনস্পতি মালিক্যকচারাঙ্গ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া

সেই 'অ'-এ অজগর আসছে তেড়ে! 'খিড়কি'-দরজা দিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে বার সম্ভ্রমণ প্রবেশ সতর্ক হবার কোনও সুযোগই দেয় নি তাকে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর মানসিক বিকৃতির দুধ কলা দিয়ে পুবেচ্ছি আমরা; তাই উত্ততকণা এই অজগরের শর্টা আমরাই। আস্তে আস্তে এই কিলমের দ্বিধিত হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের সমস্ত স্তরে; এর নাগালের বাইরে আছে আজও বারা তারা সংখ্যায় নগণ্য। সত্যকারের মাইনরিটি মুসলমান-ক্রীশ্চান অথবা পাসিরা নয় হিন্দুহানে। স্বাধীন ভারতবর্ষে তারাই সত্যকারের একমাত্র মাইনরিটি বারা স্বাধীন চিন্তা করবার এখনও রেখেছে স্পর্ধা। কলকাতার রাস্তাপথে হোলির দিনে unholy উৎসব প্রত্যক্ষ করবার অভিজ্ঞতা এখনও আমাদের মন থেকে মুছে যায়নি। খবরের কাগজে এখনও পর্বন্ত প্রত্যাহ আমাদের পড়তে হচ্ছে: 'প্রম্পত্ত কঠিন হওয়ায় ছাত্রদের একযোগে পরীক্ষাকেন্দ্রে তাগ।' আমরা এ খবরও সেই সঙ্গে রাখি যে বেলা তিনটের স্থলে থাকে বত হলে-তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় থাকে কোনও নতুন ছবির ম্যাটিনি প্লা-স্টে! এবং একথাও ত মিথ্যা নয় যে পাড়ার পাড়ার পূজা উপলক্ষে জলদার নামে আমরা লাউডস্পীকার বোগে বার জয়ধ্বনি দিতে বাধ্য হই তার সঙ্গে আর বারই বত কলহুজ বোগ থাক পূজার সঙ্গে বা কোনও শুভ, দুঃ অঘুষ্ঠানের সঙ্গে তার বিস্মমাত্র সংযোগ থাকতেই পারে না; আর? আর বাড়িতে পারিবারিক সম্বন্ধ বাবা-মায়ের সঙ্গে ছেলেমেয়ের কোথায় এসে ঠাঁড়িয়েছে সে কথার উল্লেখ না থাকাই বোধ করি বাস্তবী? কিন্তু একদিনে স্থয়নি এসব; একটু-একটু করে হয়েছে। এবং শিথিল হয়ে আসা; ঘূর্ণধারা সমাজের সেই আগাপাশতলার সম্ভারে শেষ থাকা দিচ্ছে এই সব বোঝারের আসল এবং অন্তর্য বোঝারের নকল বোঝাই মার্কা ছবি!

বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কথঞ্চিৎ নাম হলেই বোঝাই পাড়ি দিচ্ছে। বদনাম হলে বাধ্য হচ্ছে। নিউ থিয়েটার্স-গুণের বারা এবং বারা পরবর্তী হুজুগের কুপার বড় পরিচালক, কি সুরকার, অথবা আলোক চিত্রকর; অভিনেতা-নেত্রী ত বটেই বন্ধে বারার জন্ত ব্যস্ত। না। ব্যস্ত নয়; জলের জন্ত চাতক যেমন; তৃষ্ণার্ত। বাংলা ছবিতে নাম হয়; হিন্দী ছবিতে বদনাম। কিন্তু বাংলা ছবিতে টাকা হয় না; হিন্দী ছবিতে টাকা হয়। এই যুক্তিতে কেউ কেউ বলতে চান, বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রী যদি টাকার জন্ত বোঝাই বান তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে? পারে। ইংরেজরাই ভ্রমজ জাহাজ পরিচালনা করে প্রথম; মায়েরা নয়। কিন্তু এরা সেই মুখের চেয়েও অধম; কারণ মুখেরা ভ্রমজ জাহাজ পরিচালনা করে মাত্র; আর বাংলা ছবির কুশীলব এবং কলাকুশলীরা শুধু বাংলা দেশ ত্যাগ করেই বেহাই দেয় না। তাগ করে থাকে; আবার বাংলা ছবির হাল ফিরে গেলেই; অথবা বোঝাইতে যথেষ্টও অতিরিক্ত নাভেহাল হলে এই পোড়া বকেই প্রত্যাবর্তন করতে না হয় লজ্জিত; না করে ধিরা। শুধু সেকারণে নয়। টাকা,—মস্ত বড় প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু দেশের দার্ষ শূন্য করেও নয়। একটা ভুলনা দিলেই সহজ হয়ে বস্তব্য। ইটবেঙ্গল ক্লাব এবারের বেটন কাপ বিজয়ী; তাতে বাঙালীর

দৌরব কোথায়? একজন-আজ্ঞান মাত্র বাঙালী ইটবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। কুটবলেও তাই। দেশ বিদেশের পেশাদার খেলোয়াড় নিয়ে এসে শুধু ইটবেঙ্গল নয়; ইটবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং ঠক বাহুতে পাঁ উজাড়।—কে নয়? এতে বাঙালী খেলোয়াড় তৈরী হচ্ছে কোথায়? আমরা একসময়ে ক্রিকেটে রক্ত ঐকি জিততাম সাতজন সাহেব খেলোয়াড় সম্বল করে এগার জনের মধ্যে তাতে রক্ত ঐকি জিততাম বটে কিন্তু বীর পুণ্য নামে এই ঐকি সেই অবিস্মরণীয় রক্ত হাসতেন নিশ্চয়ই; যে হাসি আসলে কান্নাই! আরেক রূপ।

বাংলা দেশের ছবি আজ বেথানে এসে পৌছেছে তার জয় বাদের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব সর্বাধিক সেই সব ব্যক্তিত্ব যদি কেবলমাত্র টাকার জন্ত সবাই বোঝাই চলে বান তাতে স্বদেশ ও সংস্কৃতি তাদের অকৃতজ্ঞ বলে সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা দারী করতে পারে বৈকি! টাকার প্রয়োজন সকলের আছে। ছায়াছবি-কর্মীর থাকবে তাতে আর বাই থাক দোষের কিছু নেই। কিন্তু টাকার জন্ত লোককে চুরি করবে, এতে যেমন না আছে আইনের, না বিবেকের সম্মতি, তেমনি শুধু মাত্র টাকার জন্ত নিজের দেশের প্রগতি ব্যাহত হবে জেনেও প্রবাসে পাড়ি দেওয়ার আইনের না থাক মনুষ্যত্ববোধের বিশেষ আপত্তি থাকতে বাধ্য। এ ছাড়াও আপত্তির আরও কারণ আছে। আরও অকাট্য যুক্তি আছে আমাদের বস্তব্যের সম্বন্ধে। বোঝাইতে ছবির পৃথিবী টাকার; কেবলমাত্র টাকারই। টাকা ছাড়া আর কোনও রকম আদর্শের এতটুকু বাংলাই থাকলেও আমরা বাঙালীর বোঝাই কিলমে বোগদান করার আপত্তির পরিবর্তে জানাতাম অভিনন্দন। কিন্তু বোঝাইকে জানি; অনেক বেশি জানি বোঝাই ছবির প্রয়োজনকদের। শুধু তা-ও নয়। বোঝাই প্রয়োজনকদের; কুশীলবদের; কলাকুশলীদের মনোবৃত্তির চেহারাটা দেখতে পাই খোলাচোখেই চিকিৎসকদের এক্স-রে চোখের চেয়ে অনেক অস্তঃপুর পশ্চত। সে মনোবৃত্তি বাঙালী বিধেবে বিকৃত। বোঝাই বলে নয়; সমস্ত অবাঙালীরই জাতকোণ বাঙালীর বিরুদ্ধে; পুঞ্জীভূত আকারে বোঝারের কিছু টুঁউঙেতেও সম্ভ্রাত। বাঙালীকে দিয়ে ছাড়া সেকাজ আর কাউকে দিয়ে অসম্ভব, সেই কাজই কেবলমাত্র বাঙালীকে ডাকে। কাজ ফুরালেই বিদায় দাও। বোঝারের ফিল্মবাজে যে ক'জন বাঙালী ধোপে টিকেছেন, অনেক আছড়েও তাঁদের লক্ষা দফারফা করা যায় নি বলেই তাঁরা বোঝারে বতখানি বাঙালী তার চেয়ে অনেক বেশি অবাঙালী হতে বাধ্য হয়ে তবে টিকেন। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা বলছি না। উজ্জল ব্যতিক্রম আছে এবং থাকবে। কিন্তু ব্যতিক্রম ত' নিয়মেরই প্রমাণ স্মৃতি করে মাত্র।

বোঝাই ছবিগুলার বস্তবিধেবের পেছনে যা কাজ করে তা-ও ওই টাকা। টাকা অনেক বেশি রোজগারের মহিমায় বোঝাই শিরী এবং কুশলীরা বাঙালীর চেয়ে নিজদের অনেক বড় মনে করে। না মনে করে উপায় কি! শুণের চেয়ে ভাগ্যার; বিজ্ঞার চেয়ে অর্ধের; ভ্রাক্ষণের চেয়ে বণিকের প্রতাপিত্তি বিশ্বসমাজ জুড়েই বেথানে বেশি সেখানে অশিক্ষিত ছবিগুলার। যে টাকার উত্তাপে বঞ্চিক্ষ গরম হবে এতে অথাক হবার এমন কি আছে? আজকের পৃথিবীতে বারা সভ্যতার অঙ্গে শিল্পের বিজ্ঞানের চিন্তার অলঙ্কার পরাবার স্পর্ধা

রাখে এখনও, তারা নয়। বড় জ্ঞাত বলে গণ্য আজ তারা, চরম অসত্যতার বারা মূর্ত প্রতীক; বাসের হাতে আছে হাইড্রোজেন আর এ্যাটম বোমা। এই বেখানে শতাব্দীর সত্যকারের রূপ, সেই শতাব্দীতে সত্যতার অভিশাপ বারা, চলচ্চিত্রকারী,—শেটে বোমা মারলে বাসের 'ক' বোমার না, তারা যে ভূমিকে ঐশ্যপাসার জ্ঞান করবে, তাতে আমরা বতই বিচলিত বোধ করি শূন্যপ্রাধান পৃথিবীতে অর্থের কল্যাণে সমর্থ সেই সব শতাব্দীর নিজেদের হৃদয়ে ততই অবিচলিত থাকবে। তাদের অচলারতনে তাই বা দিতে হবে। সুস্থ, শুভ, প্রগতির বা; অজ্ঞ ও প্রতাহ; প্রতিবুদ্ধিতে দিয়ে যেতে হবে সজ্ঞার আঘাত।

মাসিক বহুমতীতে যারাবাহিক প্রকাশিত অজ্ঞ ও প্রতাহ'র কোন একটি কিস্তিতে আমার মনে নেই, আমার একটি মন্তব্যে বিচলিত হয়ে বহুমতীর কোনও অমুদ্রাঙ্গী পাঠিকা এক পত্রাঘাত করেন সম্পাদককে। সেই পত্রটি আমি দেখেছি। আমার যে মন্তব্য তিনি আপত্তিকর বলে জানিয়েছেন সেটি প্রত্যাহার করেও তার পুনরুক্তি করার থেকে বিরত হইলাম। বিরত হইলাম কারণ পুনরুক্তিতে পুনর্বার তিনি আঘাত পেতে পারেন। কাউকে ব্যক্তিগত আঘাত করা আমার 'অজ্ঞ ও প্রতাহ'র চরম উদ্দেশ্য নয়, তার পরিবর্তে সকলকে ঘুম থেকে জাগানোই আমার লক্ষ্য; আমার একমাত্র করণীয়।

আমার মন্তব্যটির টীকাটিরই সহযোগে প্রবিস্তৃত ব্যাখ্যা বসি করা বার তাহলে মোক্ষ মানে ঠাঁড়াবে তার এই যে, আমি বলতে চেয়েছিলাম মাত্র এইটুকু: অজ্ঞ ও প্রতাহে বাসের কথা আমি বলছি তারা 'ত' এতে কর্পণাত করবে না কোনও দিন, কারণ চোরা না শুনে ধর্ম্যে কাহিনী; কিন্তু তাদের বাদ দিলাম বারা অজ্ঞ ও প্রতাহ রপালী পদ্যই এদের সজ্ঞারজনক অবদান প্রত্যাহ করছেন, সেই দর্শকদের কানেও কিছু তুলে লাভ নেই বোধ হয়। কারণ দর্শকদেরও; বাংলা হিলি ছবির দর্শকদেরও আপাততঃ মুকবির বলে মনে করা; মেনে নেওয়া ছাড়া গতাস্তর নেই। মুক এবং বহির না হলে বাংলা ছবি বা হিলি ছবি শুণু নয়, বত হুঙ্কতি আজ পশ্চিমবঙ্গে অমুষ্টিত হচ্ছে, তা হতে পারত না।

নিশ্চিন্দ বিকৃত মনোবৃত্তির বসদ বারা দিনের পর দিন উপস্থিত করছে রপালী পদ্যের তিনটে-ছটা নটায় বুক কুলিয়ে, তারা কাদের ভরসা একাজ করছে? দর্শকরা এক আত্মজন নয়, লক্ষ লক্ষ দর্শক লক্ষ্যভট বলেই আজ বোমাই মার্ক। বাংলা ও হিলি ছবির জয়-জয়কার। জানি। পৃথিবীতে বিকৃত বই এক ছবি বহ বিকৃত, তার কারণ একদল লোক সব যুগে থাকবেই বারা এর বাঁধা খন্ডে। কিন্তু তাদের কণ্ঠ যদি এত সোচ্চার হয় যে সেই হরায় সুস্থর কণ্ঠের থেকে বার চিরকালের মত অজ্ঞত, তাহলে তার পারিষ কেবল মাত্র ছবিওলাদের ওপর বর্ষায় না; বারা ছবি দেখে নিয়মিত তারাও এর অজ্ঞ কিছুটা দারী হতে বাধ্য। মাসিক বহুমতীর অমুদ্রাঙ্গী সেই নিয়মিত পাঠিকা এর অবাব দিন।

এবং প্রতিবাদের অভাবই যে পথের পাঁচালীর পথেও এখনও

বোমাই মার্ক। বাংলা-হিলি ছবির অমুদ্রাঙ্গী অব্যাহত, একথা অস্বীকার করে লাভ কার? অজ্ঞ হলে কি সত্যই প্রলয় বন্ধ থাকে? অনেকে মনে করেন প্রতিবাদ করে লাভ কি? কে তখন? লাভ আছে। অজ্ঞাদের প্রতিবাদ না করা আরেক গুরুতর অজ্ঞতার। অজ্ঞাদের কথা আছে; কিন্তু প্রতিবাদ না করার যে অজ্ঞতার—সে হল কথার অস্বাভাব্য অপব্যবহার। হুঁচকারজনক যদি এর প্রতিবাদ করে; যদি প্রতিজ্ঞা করে এ জাতীয় ছবি তারা দেখবে না; বা অজ্ঞদের দেখায় বাধা দেবে তাতেও টনক নড়বে। তাতেও চৈতন্যের সঞ্চার হবে অমুদ্রাঙ্গীর পায়ের।

খবরকাগজের কথা তুলে লাভ নেই। সম্বাদপত্র আজ বিজ্ঞাপনের পায়ের বিকৃত। সেই কারণে স্বাধীন মতামত সম্বাদপত্রের পৃষ্ঠার প্রায়শই বিকৃত। সেখানে সচিহ্ন ছবির বিরুদ্ধে মুখ খোলবার আগেই বিজ্ঞাপনের হুঙ্কতে কাগজগুলোর মুখবন্দ। তাই সমালোচনার অপেক্ষার না থেকে মুষ্টিমেয় দর্শক বারা বর্ষাই ভাঙে ছবি দেখতে চান। তাঁরাই প্রথম প্রতিবাদের পথিকৃৎ হন! তাঁদের সেই প্রতিবাদের ধ্বনি বতই কণ হক আজ, এই কণ প্রতিবাদের ধ্বনি বেদিন কণ থেকে কণে প্রতিধ্বনি করে কিরবে, সেদিন ঘুরবে বাংলা ছবির মোড়। তার আগে নয়। সেই আগামী কালকে এগিয়ে নিয়ে আসার জজই অজ্ঞ ও প্রতাহ'র অজ্ঞ কোনও সার্বকতার লেখকের আত্মভূমি নেই।

প্রতিবাদের অভাব নাহলে ছবির প্রোবাজক একথা বলতে কিছুতেই সাহস করত না যে যে ছবিই পরসা দেবে সেই ছবিই শুণু ছবি। এবং নোয়া, অসার, অপলার্থ ছবিতে বহন পরসা বেশি, তখন বেশি করে সেই ছবিই আমরা তৈরী করব। বাংলা ছবির দর্শকদের পক্ষে প্রোবাজকদের এ মন্তব্য অপমান, অসম্মানজনক। কিন্তু এর পুরোটা না হক, খানিকটা যে সত্য, কোনও দর্শকই কি তা অস্বীকার করতে পারবেন? আমার মন্তব্যে বিরপ, মাসিক বহুমতীর অমুদ্রাঙ্গী সেই পাঠিকাই কি পারবেন! না। পারবেন না। পারবেন না বলেই, তাঁকেও আহ্বান জানাচ্ছি যে খারাপ ছবি, খারাপ বইএর বহ বিকৃতের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ সজ্ঞামে অবতীর্ণ। তিনি একা না দেখলে, একা না পড়লেই শুণু কাজ হবে, এমন নয়, আরও পাঁচজনকে নিয়ে ঠাঁড়াতে হবে এর বিরুদ্ধে। আর পাঁচজনকে দিয়েও বলাতে হবে: বাজে ছবি দেখানো বন্ধ কর। শুণু কালেভদ্রে; পার্কে, হলে, বকুতা মঞ্চে বললেই হবে না। অজ্ঞ ও প্রতাহ যোজাই বলতে হবে: বাজে ছবি দেখানো বন্ধ কর। বাজে ছবি দেখা দর্শকরা সেদিন বন্ধ করবে, বাজে ছবি দেখানো মাত্র সেদিনই বন্ধ হবে। সেদিন আমার মত, বহুমতীর সেই অমুদ্রাঙ্গী পাঠিকারও নিশ্চয় এ বিশ্বাস আছে, সেদিন আর ঘুবে নয়। পথের পাঁচালী এখনও একটি। সেদিন একটির পর একটি, একটি মশালের আভন থেকে জলে উঠবে আরেকটি মশাল। পথের পাঁচালীর অনেক আগে বীশের কেল্লা; পথের পাঁচালীর পর অপরাজিত; চলাচল, পকতপা, কাবুলিওরালা এবং টাকা-আনা-পাই কি তারই প্রমাণ নয়?

[ক্রমশঃ।

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

শ্রীমালতী গুহ-স্বায়

ছোটবেলা থেকে মা'র কতকগুলি অলৌকিক কর্মের কথাও জানা যায়। তাঁর কোন কষ্টকর কাজ বা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই অলৌকিক ভাবে তিনি সাহায্য পেতেন। কিন্তু সে সাহায্য কি করে হ'ত, কে যে করতো, তাঁর কোন নিরূপণ হ'ত না। রহস্যবৃত্ত থাকতো।

ছোট অবস্থা থেকেই মা সাপসাপিক কাজে নিজের হাতে সাহায্য করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এ আমবা গুলেছি। পক্ষযন্ত্র স্নান-বাস কাটতে তাঁকে পুকুরে গলাজলে ডুবতে হত। বাস কেটে তুলে আনতে এই বয়সে তাঁর যথেষ্ট পরিশ্রম ও কষ্ট হত। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন তাঁরই বয়সী ছোট একটি মেয়ে বাসগুলি কেটে কেটে তাঁর হাতে তুলে দিতে আর তিনি বেশ সহজেই সেগুলি ঘাটে তুলে রাখতেন। তাঁর কাজ যেন অর্ধেক হাড়া হয়ে যেতো। কে যে মেয়েটি তাঁকে এমন অভাবনীয় ভাবে সাহায্য করতো, তাঁর আর কোন ধর পাওয়া যেতো না।

মা বধন প্রথম জীবনে কামারপুকুরে থাকতেন, তাঁর বাতের দিকেই তাঁকে খিড়কীর সরঞ্জাম দিয়ে স্নান করে আসতে হত। একা-একা এভাবে পুকুরে গিয়ে স্নান করতে তাঁর বীতিমতো ভয়-ভয় করতো। পরদিন থেকেই দেখতে পেলেন কোথা থেকে আটটি ছীলোক তাঁর স্নানের ঠিক সময়টাতেই তাঁদের খিড়কীর সরঞ্জাম দিয়ে তাঁরই 'সাথে সাথে' চলেতো। আগে চার জন পিছে চার জন এ ভাবে তাঁরা হাকে যথো যথেষ্ট পুকুর পর্যন্ত যেতো। আবার স্নানান্তে কলসী ধীয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরতো। এরকম আশ্চর্য ভাবে সৰ্ব্বী পেয়ে মার আর মাসে বাঙালী-আসার কোন ভয় থাকতো না। অচিরে এই সখিনীরা যে কে, তাঁর কোন পরিচয় আর পাওয়া যায় নি।

দক্ষিণেশ্বর বাবার পথে করে বেড়ান তরে বধন মা বাঙালী এক

চিহ্নে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখনো কালো হাত একটি বুড়ী ঘেঁষে এসে তাঁর পায়-মাথার হাত বুলায়ে তাঁকে আশ্রয় করে দিয়েছিল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল 'আমি তোমার যেন হই।' পরদিন ঘুম থেকে উঠে সত্যই মা দেখেন সেই মেয়েটিও নেই, তাঁর অশ্রুধারা আর নেই।

আবার চলা শুরু করলেন স্নান দেখে—পা চলে না। তবুও এই পথে কোন হানবাহনের চিহ্নমাত্র নেই। কয়েকই চলেতে লাগলেন বীরে বীরে ছেটেই। হঠাৎ দেখা গেল তাঁরই হিকে একটি পাখী আসছে। এমন অভাবনীয় ব্যাপার বড় একটা হয় না। মা ভাবলেন, কালকের হাতে দেখা সেই কালো মেয়েটিই নিশ্চয় এ পাখীর ব্যবস্থা করেছে, নইলে এখানে আর পাখী আসবে কোথেকে? এমনি ভয়বশে ঘটনা মা'র জীবনে অনেক বারই ঘটেছে। কিন্তু এ নিয়ে তিনি কোন বিন বিশেষ কোন আশোচনা করেন নি।

সারদা দেবী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কাজে ও ব্যবহারে সোবাপরায়ণতা ও হৃদয় পরিচয় পাওয়া যেতো। অস্ত্রটিও তাঁর অতি নৈপুণ্য হ'তে কোমল ও দুঃখকাতর ছিল। ছাত্রের সময় একবার তাঁদের বাড়ীতে গরুর দুঃখবোধে বিচুড়ী খাওয়ানো হ'য়েছিলো। মার বহুয় ছুকে তখন তাঁর বয়স। তিনি সকলের খাওয়া দেখতেন। পরম পরম বিচুড়ী পাতে নিয়ে খুশি গরুরা বধন যেতে বসতো তিনি দৌড়ে গিয়ে পাখা নিয়ে তাদের পরম বিচুড়ী ঠাণ্ডা করে দিতেন। জায়েন আঃ! কত কিসে পেয়েছে! পরম বিচুড়ী ঠাণ্ডা না করে হলে আর কি করে? হয় ক'সর বয়সের এই ছোট বয়স থেকে তাঁর কোমল ও সহৃদয়তা-এর অন্তরের পরিচয় পাওয়া যেতো।

সারদা দেবীর বিচ্যাব্যুৎসব কুসুমী প্রাণের ঠাকুর সিজ্ঞেও করতেন। তিনি বলতেন, ও বাহ এমন না হ'ত, তবে আমার সিঁড়ির পথে অন্তরায় হ'ত। একবার নাকি পাণিধাটির উপরে ঠাকুরকে ভক্তদের সাথে যেতে হ'য়েছিল। সেই কালে যথোপযথ হাড়া সামাজিক জীবনে কত একটা বৈচিত্র্য ছিল না। কাজেই ঠাকুর যাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন তিনিও যেতে চান কি না?

প্রশ্নের স্বকম দেখে সারদা দেবী হুতুতে পারলেন তাঁর বাতের সন্ত নয়। কেন না, ঠাকুর তো তাঁকে সঙ্গে বাবার অন্ত ঠাকুর হ'তে বসেননি, তিনি যেতে চান কি না এ প্রশ্নমাত্র করেছেন। ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হত, সারদা দেবীকে সঙ্গে নেবেন তবে এই ভয়বশে এর কখনোই আশঙ্কা না। সাথে বাবার আদেশ বা আশ্বাস জানাতেন। অল্পবয়সে সবও যে না ছিল তাও নয়। কিন্তু বুদ্ধি করে নিজেকে বধন করলেন তিনি। গেলেন না।

ঠাকুর কিন্তু পরে বলেছিলেন 'সারদা মা গিয়ে খুব বুদ্ধিমতী পরিচয় দিয়েছে নইলে সোকে কতো হুস-হুসী এসেছে।'

প্রাঙ্গণের স্নানব্য চিহ্নসমালয়ে বধন যিনিই হনো ব্যক্তিগত গুণ নিতে আসতেন, ভক্তবা স্নানত যোব ককত। একদিন একটি ভক্ত এসে মা'র উপবেশ চাইলেন স্নানব্য উত্তরায় তো পাই-যে-ভক্ত, বনীরা ও যে গুণ নিতে আসে কি করবে?।

মা কলসেন, সর্গীকরে কতই স্নানব্য চিহ্নসমালয়ে, তা জেনেও যে বনীরা ক'সর চাইতে পারে, যে পর্যন্ত অনটন না জীব দিয়েই বেক। কেন না, কেনও বীরা ভিত্তি চান তাঁরা যে বন ও কুপাই পায়।

মাড়োয়ারী ভক্তটি বধন ঠাকুরকে স্নান চাকার টাকার দিতে এসে

প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাঁধ কাছে এই অবস্থায় পছন্দ রাখার প্রস্তাব করেছিল, তখন টাকটাকী হুজি ও চুড়তার সঙ্গে তিনি কিরিয়ে গিয়েছিলেন, তাতেও ঠাঁকুর পূর্ব সম্বন্ধ হয়েছিলেন তাঁর হুজিমা ও নিসোর্গিতা এবং চাষিকৃত চুড়তার পরিচয়।

সারল্য দেবীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাঁকে শিখিয়েছিল সত্যায়নকৃত হতে। আর এই সত্যায়নের তেজস্বীভাবিতিক তিনি ভাবতে পেরেছিলেন বলেই হুজির আলোর সম্মান পেয়েছিলেন। সত্যায়নের বেলাতনকৃতি তো মানুষকে অন্ধ করে, কোন আলোর সম্মান পেতে দেয় না।

ভক্তরা তীর্থযাত্রার প্রয়োগ শেষে কাল-অকালের বাহু-বাহাই করলে তিনি বলতেন 'কালের কাছ (বুড়) বহন কাল যা অকাল নেই, তখন পূর্ব কাতে কোন কাল অকালক টানবে? সত্যায়নের প্রয়োগ করবে। বাবে বাবে আসে না।' ভক্তদের কত ভট্টল সত্যায়নক সমস্ত। যে তিনি হুজি গিরে সরল সহজ বোঝানো করে দিতেন তার ঠিক নেই। তাঁর সত্যায়নক হলের সম্পর্কে যে ভেটী আসতো তাইই সত্যায়নের বেলাল জেলে পড়তো। সকলকে তিনি নিতীক হতে উপদেশ দিতেন। সত্যায়ন আলো করে নিসোর্গিতা হতে পারলেই তা জর করা যায়, এই ছিল তাঁর মত।

কত দেশ-দেশান্তর থেকে বিখ্যাত ভিত্তি ভাষাতারী লোকেরা তাঁর

কাছে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করতে আসতেন। সারল্য দেবীকে কখনোই তা পেতে দেখা যায়নি। দ্বিবি হাসিমুখে তাঁদের তিনি অভ্যর্থনা করতেন। ভাষার ভক্ত কোন দিন তাঁর আটকাই নি, নিজের অজ্ঞের গিরেই তাঁদের অজ্ঞের ভাষা তিনি বাক নিহেন।

নিম্নাঙ্কিতও তাঁর কাছ সম্মান ছিল। কোনটা বহন করতেন তিনি যেমন এগিয়ে যেতেন না আবার অজ্ঞটা জেলে করতেন তেহনি পিছিয়ে যেতেন না। আতীত-অতন ভাষা নিপুণ হতেও তিনি যেমন অকাল থাকতেন, বাহী বিবেকানন্দ প্রকৃতি বিশ্ববাবা জানী ভক্তদের বাহা দেবীজানে পুজিত হতেও ঠিক তেহনিই অবিস্মিত থাকতেন। সবই ছিল তাঁর প্রাণে ঠাঁকুরের লীলা। নিজের প্রাণা বসে কিছুই তিনি গ্রহণ করতেন না।

তাঁর মধ্যে তপস্বীভাবিত প্রকাশ অনুভব করেই তাঁর সমুখে যেতে বাহী সারল্যনন্দ প্রকৃতি বিশিষ্ট ঠাঁকুরের সম্মানদের পূর্বীক ভক্তি-অজ্ঞার আবরণে বহন করে বীণাতো। দুর্গাপূজার সময় ঠাঁকুরের মানসপুত্র বাহী জ্ঞাননন্দ তাঁকে দেবীভাবে কর্তন করতেন। অজ্ঞাত বহু বীণপুত্র ভক্তরা যাকে চতীজনে পূজা করতেন। ১০৮টি বকপদ গিরে তাঁকে কর্তন করে তাঁকে দেবীজনে সমুখে বেলেই চতীপদ করতেন।

## মনের কথা

"এমন সুন্দর গাছলী কোথায় পড়ালে?"  
"আমার সব গমনে মুখার্জী জুয়েলার্স  
গিরেছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই,  
মনের মত হয়েচে,—এসেও পৌছেচে  
ঠিক সময়। এঁদের কচিকান, সজতা ও  
গাছিকবোবে আমরা সবাই পুসী হয়েছি।"

# মুখার্জী জুয়েলার্স

দিলি সলসে গরল গিরীজা ও চুড়-ভক্তকৃতি  
বহুবাজার মাফেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮৩০





কত যে অপণিত ভক্ত সারঙ্গ দেবীর চরণ-পূজা করতো তার কোন সীমাসীমা ছিল না। নারায়ণী কাত্যারনীর জানে কেহ বা সর্ক সন্মুখেই তাঁকে পূজা করতো। আর শুধু কি তাই? ভক্তরা যে তাঁর প্রতি তাদের অসীম শ্রদ্ধা কি করে তাঁকে নিবেদন করবে, তা প্রকাশের যেন উপায় খুঁজে পেতো না। তাঁর পাড়ীর বোঁড়া খুলে নিজেবাই বোঁড়ার বদলে পাড়ী টেনে নিয়ে যেতো। কেউ বা তাঁর চলার পথটি ফুলে ফুলে ঢেকে দিত। এরকম বেবস্ত্রভ সন্মান শ্রদ্ধা পেরেও কিন্তু সারঙ্গা দেবীকে এক দিনের তরে বিচলিত হতে দেখা যায়নি। এমন ভাবে তিনি এসব শ্রদ্ধা নিবেদন গ্রহণ করতেন যেন ঐশীঠাকুরকেই ভক্তরা সন্মান দেখাচ্ছে, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। কোন চিত্তবৈকল্য এ ভক্তই তাঁকে স্পর্শ করতে পারতো না।

বৃষদ্বাস্তব থেকে যে ভাবে মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে, তাঁর শিষ্যও গ্রহণ করে আত্মপূজা বীকার করেছে, তা দেখে মনে হয় যেন পাছাড়, পুরুত ও পথের দুর্ভিক্ষা বাধা অতিক্রম করে নানা নম্র নদী বৃষ্টি এসে সমুদ্রের বৃকে আশ্রয় খুঁজেছে।

‘ম’ ও ‘কু’ বলে তাঁর কাছে কিছু ছিল না। বিশেষগামীর প্রতিও তাঁর অনন্ত কল্পনা ছিল। কিন্তু তাই বলে কাকর কোন অভ্যাসকে কোন দিনই প্রেরণ দেননি তিনি। তাঁর সং ও পূর্ণ আদর্শ এসে অপর্যায় হইয়াছে, ডাকাতরা পর্য্যন্ত সাধু হয়েছে। তিনি ছিলেন পরশমণি। তাঁর সম্পর্কে সব যেন সোনার হয়ে যেতো। অকিঞ্চিৎকর বিশ্বাস ভ্রমাতা, পুণ্যবানের পুণ্যজ্ঞানাকাক্সা শতগুণে বৃদ্ধি পেতো। এ সারঙ্গা দেবীর কথা বর্ণনা করা সাধারণ মনুষ্যসাধ্য নয়।

বঙ্গীয় গিরিশ ঘোষ বামকুকভক্ত ছিলেন। সারঙ্গা দেবীকে তিনি শুধু ঠাকুরের বিবাহিতা বর্ণপত্নী ছাড়া অন্য কোন বস্তুই প্রাধান্য দিতে রাজী ছিলেন না। কয়েক জন ভক্তের সঙ্গে একবার তিনি জয়রামবাটী যান। যেখানে তিনি মাকে প্রথম দর্শন করেন। মাকে দেখে তিনি চমকে ওঠেন। তাঁর এরকম ভাবান্তর দেখে ভক্তরা তাঁকে প্রশ্ন করে। তিনি বলেন ‘মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ তো, যখন তিনিই আমার দর্শন দিয়েছেন কি না?’

সারঙ্গা দেবীকে প্রশ্ন করে ভক্তরা জানতে পারে যে, তিনি যখন গিরিশ ঘোষকে সত্যই দর্শন দিয়েছেন। গিরিশ বাবু একথা শুনে ভক্তদের কাছে তাঁর দীর্ঘকাল আগে দেখা স্বপ্নভ্রাতৃটি বর্ণনা করেন।

উনিশ বৎসর বয়সে না কি তাঁর এক বার কটন অস্ত্রধ করে। প্রাণের কোন আশা ছিল না। অসহ্য ব্যথায় তিনি ছটকট করতেন। সে সময় এক দিন তিনি যখন এক অপরিচিন্তা ভ্রাতৃবৎসরী দেবীমূর্তি দর্শন করেন। তিনি তাঁকে সম্মুখে বলেন, ‘গিরিশ, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তা তেজো না তুমি সেবে বাবে।’ এই বলে পুরী বস্ত্রাখের প্রসাদের মত তাঁকে কিছু খেতে দেন। সেই খেয়ে পরদিন থেকেই তিনি সেবে উঠতে থাকেন। সেই সময় তিনি সারঙ্গা দেবীকে দেখা হইবে থাকুক তাঁর কোন হবিও দেখেন নি, তাই চিনতে পারেন নি। জেবেছিলেন অতি শৈশবে তাঁর মা বাবা নিয়েছেন, তিনিই বৃষ্টি সন্ধানের কষ্ট লাভ করার জন্য যখন ঐ চকরা দিয়েছেন। এক দিন পর আজ সারঙ্গা দেবীকে চাকুরী দর্শন হইবে স্বপ্নমুখী বৃষ্টির সঙ্গে তাঁর অপূর্ণ সাধুত লগ্না করে কুচিত

হয়েছেন। ইনিই যে তিনি এ বিষয়ে সম্মতমান হই। সেই থেকে গিরিশচন্দ্র মায়ের পুণ্যভিত্ত ভক্ত; ঠাকুর ও সারঙ্গা দেবীকে অভিন্ন জানসম্পন্ন।

সারঙ্গা দেবীর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি যখন কুলের মত নরম ছিলেন, তেমনই প্রয়োজনে বজ্রের মত কঠিনও হতে পারতেন। লক্ষ্মীসুন্দার নরহার ও শিউড়ার তিনি ছিলেন পক্ষীমুখ। আবার বেজবাহার কুতহার ও সংসারসে ছিলেন হস্তপুত বর্মী। একাধারে এই কুশলময় সুখ ও বজ্রদুঃখ ভাব দুই কম নারীতেই দেখা যায়।

জয়রামবাটীতে প্রাণেই যখন ইংলান্ড যোনা দেওয়া। ঠাকুর যখন সেখানে যেতেন প্রয়োজনেও হারিতে একা বৈত হতে সাহস পেতেন না। কিন্তু সারঙ্গা দেবী লুপন হাতে লজ্জা কুলে বাটবে এসে ঠাকুরকে ডাকতেন ‘কি গো?’ আমি পাড়িয়েছি, তুমি এসো। তোমার ভয় নাই। তোমার কিছুই হার না। বাবে বাউ তো আমাকেই ধাবে। এসব কথা শুনে কি মনে হয়, মা আমাকে পক্ষীর মেরে। অবলা সন্তান ভরচকিতা প্রমোদন?

প্রথম যখন ঠাকুরের মাথা খাবার চরহীর সবাক পেরে মা হকিগেবরে আসেন, লক্ষ্যত হয়ে শিঁড়ার পাচার ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। কিন্তু কী অপূর্ণ বৃষ্টিময় ও অকল সাহসে তিনি পিতৃসন্ধান করে লজ্জার আশ্রয় ত্রিকা করেছিলেন, সে এক বিষয়। ডাকাতের মন ভিত্তি গিয়েছিল। লজ্জা তো জীত আর্ন্তনাত ওনতেই চির অভ্যস্ত। তাতে তাবের মন ভেঙে না যব সে আর্ন্তনাত উপেক্ষা করেই তারা তাবের লুপন ও চরহাবৃষ্টি চরিতার্থ করে। তাইই তাবের দেখা। কিন্তু সারঙ্গা দেবীর মনুর কাঠে পিতৃসন্ধান লক্ষ্যকে তার বৃষ্টি ভুলিয়ে ছিল। তার অন্তর যেন আমূল সন্ধানিত হইল। বাৎসল্যসে। সারঙ্গা দেবীকে সন্ধান জানে মাতৃজ্ঞানে নিশাপথে বন্ধা করে বঙ্গীর কাছে শৌভ্র দেওহাকেই পরম কণ্ঠবা মনে করলো সে।

কামারপুত্র থাকে কালে এক উদার ভক্ত একবার মাকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিল। আত্মরক্ষার্থে তিনি প্রথমে পালাতে গিয়ে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকেন। কিন্তু যখন পাগলের সঙ্গে দৌড়ে গেলে উঠলেন না, তখন তাকে হাতা দিয়ে মাটিতে ফেলে ধাপ্টা গিরে তার বৃকে চেপে ধরে তাকে ক্রমাগত চক হারিতে মারতে নিজের হাত লাগ করে ফেলেন। আর পাগল হাঁকতে থাকে। আত্মনিক হুগের প্রগতিসম্পন্ন হইয়োরের দ্বারা এ বকম অপূর্ণ সাহসে আত্মরক্ষা সম্ভব কি?

সারঙ্গা দেবীর মধ্যে অনন্তসাধারণ এতগুলি মহৎ গুণের সমিষ্টাংশ ছিল, বা মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস না জাগিয়ে পারে না। তাঁকে বৃকতে হলে শুধু আত্মনিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে দেখলে চলে না। সেই একশ বছর আগের সামাজিক জীবন বাপন, সমাজে নারীর স্থান, বিচার করে দেখতে হয়।

জাতিভেদের বজ্রদুঃখের দ্বারা ভিকিরে সেদিনে কাকর চলচলঃ কোন রাজ্য ছিল না। সামাজ্য চুক্তি-বিচুক্তিতেই জাতিচ্যুত সমাজচ্যুত একঘরে হয়ে থাকতে হ’ত মানুষকে। সারঙ্গা দেবী কিন্তু সমাজের এই সব দারী অপেক্ষা রাখিয়ে রাখিয়ে যে অন্তরে দারী, তাকেই প্রাধান্য দিতেন বৈদী। নির্ভয়ে তিনি তাঁর সম্ভাবমুখ



মন নিয়ে সমাজ চলান করতেন সমাজের অনুষ্ঠিত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। ভূমিদানী নিবেদিতা, ভূমিদানী ক্রীষ্টন, ভূমিদানী-সেবিকা, সাধা ওমি বুল প্রভৃতি জি জাতীয় লোকের সঙ্গে তিনি যেমন আচরণ করে নিষ্পত্তন, একত্র বেতন, একত্র ভোজন, তাঁদের একেবারে নিতান্ত আপন করে গ্রহণ করতেন, তাঁদের তাঁর বলিষ্ট মনের দখল পরিচয় পাওয়া যেতো।

সারল দেবী ছিলেন অত্যন্ত উদারচেতা ও কলহপ্রিয়। এই নিম্নোক্তরা, বিজ্ঞানীরা, সমাজসেবার অসংখ্য নারীদের সাধ তাঁর এই অস্বাভাবিক থেকে যোগ্য হার তিনি কি বহু নারী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। নারীর স্বতন্ত্রত্ব স্বাধীন ওপট্টকট তিনি যেন সত্য জানিয়েছিলেন এই বিশ্বেদীনদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ প্রেরণ ও প্রীতি প্রকাশের দ্বাা দিয়ে।

সারল দেবী প্রাচীন যুগের ভারতীয়া নারী। নারীর সম্মানিততা ও আত্মা তিনি বিশ্বের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সে তবু নারীর শ্রমের ও কৌশলতা সবার চোখের ভিতর। তিনি কল্যাণের জগৎকে তিনি নারীর এই সম্মানিততা ও আত্মা প্রতিবন্ধক হাতে তেজস্বীর পক্ষপাতী ছিলেন না। সেবাশ্রমের প্রয়োজন বিচারে তিনি বিশ্বের উদারমতাবলম্বিনী ছিলেন। তাঁর সমাজস্বক দীর্ঘ জীবনের পরিচয় পোরে ভূমিদানী নিবেদিতা অনেক সময় লেখেন যা যে পুণ্যস্থান যুগের সেরা কামা নৃপন যুগের প্রভা, তা বুঝার কোন উপায় নেই।

সুশিক্ষার প্রসার ও প্রচারণার তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহের অল্প ছিল না। তিনি বলতেন, 'বিজ্ঞান অস্বিক্রম হু হু'। একটি ঘরে সেবাশ্রমী শিশুরে কলকলের উপকার করে, এ কি কম কথা?' নিবেদিতার বিজ্ঞান পরিচালনা ব্যাপারে সে ভক্তির তাঁর অকৃত্রিম উৎসাহ। শ্রীমতী যুগের মাতৃস্বরাষ্ট্রকুল ঘরে পাঠ্যের ব্যক্তি হইত না। মেয়েদের সেবাশ্রম শিক্ষা করা যে কত প্রয়োজন যা তাদের তা বুঝতেন। অথচ সেট সমগ্রটায় মেয়েরাই মেয়েদের শিক্ষাশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইংরেজী সেবাশ্রমী শিশুরে মেয়েরা বিবাহ ও ভাগ্যভীনা হয়, এই ছিল তাঁদের ধারণা। অথচ সারল দেবীকে বেশি নিবেদিতা যুগের ভারী বুদ্ধির ভিত্তি কি বাস্তবতা।

গুরুশিক্ষারি হয়ে মেয়েরা উপাধীন করবে, এ ভাবনকার দিনে বড়ই সম্মান বিদ্য ছিল। মেয়েরা বিজ্ঞান করবে স্বাধীনতার পথ করবে, সারল দেবীর চোখে তা একেবারেই মেয়েকে বলে মনে হইত না। ভাগ্যভাগ্যে নারী হবার শিক্ষা নিতেও তিনি মেয়েদের উৎসাহ দিতেন। 'সেবারতট যে সেহা জ্ঞান আর ঠাকুরের সেরা কাজ। একজন শিশুরে নিলে কত স্নেহের উপকার হবে।' ঘোর অবহেলা-প্রথার যুগে নারীর জগৎও নারী জগৎকে যে তিনি কিংবদন্তী ছিলেন, তা তাঁর এই ধারণার মধ্যস্থতনলেই যোগ্য হয়। নারীজগৎ যে তবু শিক্ষার, বুদ্ধির ও প্ৰত্যক্ষপাশেরই ভিত্তি

হানতো না। মেয়েদের বা ঠাকুরদের ভিত্তি মনে মেয়েরা বিদ্যাকে অনিন্দিত হইত, তাদের তিনি দ্বন্দ্বী-মনে আশীর্বাদ করতেন। সবার শিক্ষা, নৈতিক চরিত্র গঠন ও জীবনে সেবার আত্মকল্য মননের প্রবান লক্ষ্য থাকে উচিত, এই ছিল তাঁর মত।

সেবাশ্রমী শিশুদের সারল দেবীর নিজেও দুই আঙ্গুর ছিল কিন্তু প্রবোধ-প্রতিবা করে উঠতে পারেন নি বিশ্বের। কাজেই মেয়েরা যাতে সেট প্রবোধ-প্রতিবা পায়, তার জন্য তাঁর উৎসাহের অল্প ছিল না। সুকিমে সুকিমে তিনি বই পড়তে চেষ্টা করতেন, ঠাকুরের জ্ঞান জগৎ তাঁর বই কেটে নিয়ে যাব লিখ। জাতশ্রী লক্ষ্য যেতো পঠনশ্রীর পড়তে। তার কাজেই তিনি চুপি চুপি একটু একটু পড়া জেনে নিতেন।

কল্যাণশ্রমের স্বতন্ত্রতা। সেখানে পঠন কাজ ও পঠন চক্রের মধ্যেই স্থানা করে উঠতে পারেন নি কিন্তু বিশ্বের শিশুদের, কিন্তু সেকর উৎসাহ জাগান নি। কল্যাণশ্রমের এসে যুগকল-ব্যবহার একটি মেয়েকে কাজে তিনি মাঝে মাঝে পড়া জেনে নিতেন। সে মেয়েটি প্রাচীন জ্ঞান করত এনে মাঝে সাহায্য করত। যেদিন করেই তিনি সাহায্য, হস্তান্তরত দিদি পড়তে শিখিয়েছেন। সেবার সমগ্রায় সমগ্র করা কষ্টের ছিল বলে বিশ্বের শিশুরে সেখানে নি।

ই সমগ্রটায় বিশ্বের স্বতন্ত্রত্বের দ্বারা সেবাশ্রমী শিশুর আগ্রহ তেজা যেতো না। যদিও সেট দিনে একজন কল্যাণশ্রমী সেরা অমাতী লগে। উদারচেতন নিবেদিতা যুগের মেয়েদের কাছে মাঝে মাঝে দু-চারটি টাকাকী কথাও জানিয়ে চাইতেন তিনি।

'আরহা এমন বাড়ী থাকে'—এই টাকাকী কি? 'বাড়ী গিয়ে কি পারে?' টাকাকীতে কি বলবে? এসবের উত্তর শুনে বড় দ্বন্দ্বী হতেন তিনি। উল্লেখ্য উল্লেখ্য তিনি বলতেন, 'ওলেন থেকে স্নেহের-স্নেহের কত আসবে, ভাল করে কথা বলতে হবে। কাজেই তোমরা একটু ভাল করে টাকাকী-টাকাকী শিখ নিও বাপু।' এর থেকে মনে হইত না কি যে, তাঁর বুদ্ধিমত্তা অসামান্য ছিল।



সম্রাট সম্রাট  
সুন্দর অলঙ্কার

এক মাত্র  
মিনি সোনার  
লিখিত গল্পনা  
প্রস্তুত করবে

জুয়েলাস  
কে.এল.সিংহ এণ্ড সন্স

১৫৭ বি. ব্রহ্ম বাজার স্ট্রীট • কলিকাতা ১২



[illegible]

তিথিতে সেই মুকতলে বাহ্যত সাদ্যার দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছিবার কু  
 সময়ে উপবেশন করিয়া সভায় যোগে হইল—সেখানে সেখানে  
 ভীষণ যেহ নিপুল ছিব হইল, সুখ অশ্রু কোমল উদ্ভাসিত হইল,  
 সেই জ্যোতি পুর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাবার্য স্নিগ্ধ মিলিত হইয়া  
 সমস্ত জগৎ প্রাণিত করিল, তিনি বোধিজ্ঞান লাভ করিলেন  
 নহুৎ হইলেন। জন্ম, জরা, মরণ বস্তুর অন্তর্যন্তিক। জন্ম  
 করিলেন। আবিষ্কার করিলেন মানবের দুঃখ-দুঃস্বপ্ন উপায়,  
 আবিষ্কার করিলেন দুঃখের কারণ। তিনি বলিলেন, দুঃখই সকল  
 দুঃখের মূল কারণ। বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া সুখ-মতীভিকার  
 পদ্মভাবকই দুঃখের অন্তর্নিহিত মূল্য। পদ্মক বেদন অন্তরে  
 ধাবিত হইয়া কাম প্রাণত হই বাহুবৎ বাসনাভূত অন্তরে ভ্রষ্টাই  
 ধাবিত হয়; মৃত মানব বুঝিতে পারে না বাসনাই যোগ এক এই  
 যোগই অবিভা; ইত্যন্তে আবহ হইয়া বাহুবৎ একের পর এক  
 নানাবিধ কৃষ্ণার আবর্তনে পতিত হইয়া বাসনা তেজু জিবার  
 প্রতিভা। তবিত পরিণামে নরী প্রোক্তের অবিহার সঠিক মত  
 জন্ম-মৃত্যুর কালভুক্ত আবর্তিত হইয়া যেন জগৎ করে। তিনি  
 দুঃখের তেজু ও ভীষণ প্রভাব নিরোধের উপায় “চতুর্ভাষিকার”  
 আবিষ্কার করিলেন এক যোগে। করিলেন—মানবের মনই দুঃখের উৎস,  
 সকল বস্তু দুঃখের তেজু কৃষ্ণ মন হইতেই উদ্ভূত। তাই বস্তু-বস্তু  
 প্রথম বাক্যই হইল—“মনো দুঃখা সমা বস্তু মনো” (মনো বস্তুমহা)  
 মনকে জানাই প্রথম ও প্রথম কর্তব্য, মনকে বাসনাভীন পরিষ্কার  
 না করিতে পারিলে মানবের মুক্তি নাই এবং প্রত্যেক মায়ারের দ্বী



উৎসবের দিনে

ক. হাডের

মুবাচিত  
প্রমাণিত মাছগু

ক. হাড ১৩ কোড  
৩০০০০০০০



# দেখুন! মাত্র অর্ধেক মানলাইট সাবানেই

এত সব জামাকাপড়  
কাটা যায়!



কেনার আধিক্যের বস্তুই মানলাইট সাবান এক  
ক্রিয়ামূল। আপনি যখন অর্ধেক হয়ে থাকেন তবু  
অর্ধেকটী মানলাইটে কতগুলি জামাকাপড়  
কাটা যায়!

মানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেনার বস্তুই প্রতিটি  
কমলার কথা হয় হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে অর্ধেক  
আপনার কলসা এবং উজল!

মানলাইটের ফেনার আধিক্যের বস্তুই জামাকাপড়  
বিনা আহুত পুষ্টি হয়। তার বানে আপনার  
জামাকাপড় থেকে আরও অনেক বেশি মিল।



জামাকাপড়

**মানলাইট** জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

তলার একলাই থাকতো। অনিল অবশ্য নিচের তলার ছিলো, তার দ্বীও ছিলো, তবে তাদের ভাবনাবার ছিলো অল্প রকমের—তারও তখন, নিজের ভুলের মাসুল দিয়ে যাচ্ছে। এই সময় তার একমাত্র দলী ছিলো আমি। মাঝে মাঝে বাগানে ওদের অর্কিড হাউসের ভেতরে সন্মিতা ডেকে নিয়ে যেতো আমাকে। কথা বেশী বলতো না, চুপ করে বসে যেন কি ভাবতো।

একদিন সে আমাকে বলেছিলো—জানো দাদা, বংশের পূর্বপুরুষদের অঙ্গায়ের প্রায়শ্চিত্ত না কি পরবর্তীদের করতে হয়।

আমি হেসে বলেছিলাম,—তা কখনও হয়? একজনের পাপের দণ্ড আরেক জন ভোগ করবে কেন?—

—হায়! এটো দেখ না আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি। চমকে উঠেছিলাম,—

তুমি কি বলছো মিতা?

—ঠিকই বলছি ভাই! এই যে অর্কিড হাউসটা দেখছো এ ভারি অদ্ভুত!

মাঝে মাঝে গুড়-গুড় শব্দ হয় এর তলায়, ঘরটা কৈশে ওঠে। গাছপালাগুলো যেন শিরশির ফিসফিস করে কথা কয়, আর মনে হয় মাটির অনেক তলায় কার চাপা করা যেন গুমবে ওঠে।

আমি একদিন ভারি ভয় পেয়ে ছুটে বেরুছি অর্কিড হাউস থেকে, আমাদের বুড়ো মাদী রামভজন সিং বললো,—খুকি দিদি, কি হয়েছে, ভয় লেগেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ রাম সিং! ঘরটা যেন কাঁপছে, যেন কি রকম আওয়াজ!

রামভজন সিং কোক্সা মাড়ি বার করে হাসে—। আমার হাত ধরে বাগানে পাথরের বেদিটার ওপর বসিয়ে বললো, তুমি অনেক কাল ধরে ঘটছে দিদিমনি, ওতে ভয় পেয়ো না! আমি যখন এ বাড়ীতে এসেছি, তখন তোমার বাবা জন্মায়নি!

তোমার ঠাকুরদাদার সঙ্গে কত খেলা করেছি, কি দিল্ ছিলো ছোটো বাবুর,—আহা,—কেন যে এমন বেকাঁস কাজটা করতে গেলেন? জীবনটাই চলে গেলো।

—কৌচাচ খুঁটে চোখ মুক্তে মুক্তে সে বলে গেলো কত কথা! তুমি শুনেবে দাদা? তাহলে ডাকি ওকে।

সন্মিতাও ডাকে, অর্কিড হাউসের ভেতর খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে কাঁড়ায় রামভজন সিং।

লতাপাতার ছাউনির কাঁকে কাঁকে স্নান চাদের আলো এসে পড়ছিলো, ওর ধপধপে শাদা চুল-দাড়ির ওপর। ওর সামনে খুঁকে পড়া জরাভারাক্সা দেখানি কালো আলোয়ানে ঢেকে সে বললো আমাদের সামনে, ফোয়ারার জলের পাশে!

খুক খুক করে কাশতে কাশতে বললো,—কি খুক দিদি, বুড়োটাকে ডাকলে কেন বলো?

সন্মিতা বললো,—সেই সেদিন, এই অর্কিড হাউসটার কথা, আমাদের পূর্ব পুরুষদের বাগার বা বলেছিলে তুমি আমাকে, সেই কথাগুলো আজ আবার বলো না, ভজন দাদা!

—সব কথা কি মনে আছে দিদিমনি? বরস কি কম হলো? ছোটবাবু আর আমি এক বয়সী ছিলাম কি না—এ বাড়ীতে এসেছি সে কি আজকের কথা? তখন তোমার দাদু বছর বারো-তেরো বয়সের আর আমারও ঐ রকমই হবে!

আমার বাবা ছিলেন এখানকার দরোয়ানদের সর্দার। মন্ডবড় পালোয়ান ছিলেন আমার বাপ-দাদা! ঐ যে দেখছো লতা-পাতার কুজবন, আগে ওখানে ছিলো পালোয়ানদের আখড়া!

কত কুস্তিগীর আসতো,—তোমার বাবার ঠাকুরদাদা রামনাথ ত্রিবেদী ছিলেন তখনকার দিনের একজন দেশমাত্র লোক।

বাড়ীলো ব্যবসায়ী তখন এদেশে খুবই কম। ঐর ছিলো, চিনি, লোহা, সিমেন্ট, নানা রকমের ব্যবসা! কল্লীর বরপুত্র ছিলেন তিনি! যেন, যেন, এ বাড়ী তখন গমগম করতো।

নিকট আর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়, দাস, দানী, সরকার, আমলা, অতিথি, অভ্যাগতের লালকুঠি সর্ষা পরিপূর্ণ। তার ওপর বারো মাসে, তের পার্বণ। অতিথ্যকরিকর কখনও বিমুখ হতো না। সবাই বলতো, সাক্ষাৎ মহেশ্বর আর অন্নপূর্ণা এ বাড়ীর কর্তাব্যবহার গিন্নীমা!

রামজীর কৃপায় কর্তাব্যবহার তখন মহালের পর মহাল খরید করতেন। কোম্পানীর সঙ্গেও খুব খাতির ছিলো, কত সায়েব স্বেবা, লাট, বিবির আসতো এ বাড়ীতে। কত বাড়লঠান জলতো! আতসবাজি পুড়তো! ডিল্লি, লাহোর, বোম্বাই থেকে আসতো নাচওয়ালী।

—তারপর গভর্নমেন্ট যখন কর্তাব্যবহারে রাজাবাহাদুর খেতাব দিলেন, তখন এ বাড়ীতে এক মাস ধরে পরব চলেছিলো।

গরীব দুঃখীর জন্তে ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন স্বামীমা, মেঠাই মোণ্ডায় আমাদের অর্কিড ঘরে গিয়েছিলো। বাড়ীর সব লোকজন গিনি, মোহর, পুরোনো কন্বচারী দরোয়ান সব মোহরমালা বর্ষাশর পেয়েছিলো। সে এক দিন গেছে!

কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়েছিলো রামভজন সিং। চোখ বুজু খানিকটা চুপ করে থাকে, বুঝি বা তার মনের পদ্যায় কুটে ওঠে হারানো অতীতের জমকালো দিনের ছবিগুলো।

দু'হাতে চোখ মুছে আবার আরম্ভ করে রামভজন সিং। তোমার ঠাকুরদাদা কুমার সাহেব ইন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর বাপ-মার মত হলেন না।

তখনকার দিনে বড়লোকের ছেলের সর্বনাশ করবার জন্তে চারিদিকে মোসাহেবের দল ঘুরব্ব করতো; এমনি একটি খায়াপ দল সর্বনাশ করলো আমার কুমার সাহেবের!

ছেলেকে শোষণাবার জন্তে রাজাবাবু—লক্ষী প্রতিমার মত বোঁ ঘরে নিয়ে এলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, ঐ দুই গ্রহদের হাত থেকে ছোট বাবু রেহাই পেলেন না!

তোমার ঠাকুরা বৌরাণী কমলা দেবী আহা কি সতীলক্ষ্মী ছিলেন গো! বলছি সে কথা পরে। তোমার বাবা যখন জন্মালেন—এই তো সেদিনের কথা, রাজবংশের কুলপ্রদীপ যেদিন জলে উঠলো আঁতুড় ঘরে আবার রাজবাড়ীতে আমোদ আছাদের পুষ্পবুটী হতে লাগলো।

সকলে ভেবেছিলো এবারে কুমার সাহেব ঘরমুখো হবেন, কিন্তু হায়, হল তার বিপরীত।

খোঁকাবাবু যখন বছরখানেকের তখন রাজা বাবু একদিন হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে একদিন বেহঁস হয়ে পড়লেন! কত

গাভার ওষুধ, ভীবনটা ফিরলো বটে, কিন্তু পক্ষাঘাতে একেবারে শুল হয়ে বিছানায় রইলেন।

এইবারে এলো ত্রিবেণী বাড়ীর চব্বম সর্দারশের দিন।

কুমার সায়েব, বাড়ীতেই তাঁর কুসঙ্গীদের নিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন। দিনরাত গান-বাঁজন!। মদের ঢেঁট খেলতে লাগলো ঐ হলঘরে।

নিতিয় নতুন মেয়েমাছুর ষোণাড় করে আনতো মোসাহেবের দল। কত ভদ্র ঘরের মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করেছে ওরা, পাগের শ্রোত বইতে লাগলো লাল কুঠিতে।

আগ বিছানায় শুয়ে, চোখের জল যুছতেন আমার দেবতা। রাগীমা, বাড়ীঘর ছেড়ে দিয়ে দিনরাত থাকতেন রাজা বাবুর বিছানার পাশে। আর ঐ ঠাকুর ঘরটিতে।

সোনারচাঁদ খোকা বাবুক কোলে নিয়ে চোখের জল ফেলে অন্ধরে একা দিন কাটাতেন বৌরাণী! ছুঁতিন বছরের মধ্যে সেনার দায়ে, লাটের কিস্তি না দিতে পারায়, পর পর অনেকগুলি মহাল নিলামে বিক্রি হয়ে গেলো।

কুমার সায়েবের তখনও ভঁস হলো না—ভঁস হল আরো, আরো কয়েক মাস পরে—

সুকুহর সুনছিলাম আমার, সেই রাজ-পরিবারের ধ্বংসের ইতিহাস।

চাঁদের আলো পাতার জাঁক দিয়ে সূর্য রূপের জ্বালির মত ছড়িয়ে পড়েছিলো, রামভঞ্জন সিং এর সর্বস্ব সাধা চুল-নাড়িগুলো চক্ চক্ করে উঠছিলো। পৌচকানো কালো মুখখানা যেন মনে হচ্ছিলো, মহেঞ্জদারোর ভয়ভূষণ থেকে অবিকৃত একখানি প্রাগৈতিহাসিক মুখ। পাশে ফোয়ারার জলের বির-বির শব্দ মাঝে মাঝে তু-একটা পানীর ডানা বাটানোর আওয়াজ অকিঞ্চিৎকর হাউসের নীরবতাকে যেন কেমন অলৌকিক রহস্যপূর্ণ করে তুলেছিলো।

বুড়ো বসে বসে বোধ হয় ঝিমোচ্ছিলো।

স্মৃতি ডাকলো, ভজনদা! ও ভজনদা! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? চমকে ওঠে ভজন সিং। কে? ছোট বাবু?

না, না, ঐ দেখ, বয়সটা কি কম হল দিদি? সেই কবে এসেছিলাম এ বাড়ীতে।

হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন?—সেই নেপালী মেয়েটার কথা না?

—ফকুয়ার ভেতর থেকে দোকপাপাতা বার করে হাতে দলে খৈনি প্রদত্ত করে মুখে ফেলে দিলো ভজন সিং। তার পর আবার বলতে আরম্ভ করলো—

এক দিন একটা ভারি ঝুপসরং নেপালী মেয়েকে চুরি করে এনে ইয়ারের দল ঐ এক তলার কোণের ঘরটার তালাবন্ধ করে রেখেছিলো।

রাত্রো যখন মেয়েটাকে বার করবার জন্তে তালো খুললেন কুমার সাহেব,—তাকে দেখে অঁতকে উঠে চিংকার করে শিঁছিয়ে এলেন—

মেয়েটা টানাপাথার সঙ্গে পরনের কাপড় বেঁধে তাতে গলায় কাঁস লাগিয়ে বুলছে।

চূপ! চূপ! বাড়ীতুই সকলকার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। রাতারাতি এই গাছঘরের তলায় গর্ত খুঁজে লাশ পুতে ফেলে হুকোয়াস বুন দেওয়া হল। বাইরের হাস্যামো কিছুর না বটে, তবে কুমার সায়েবের মনটা যেন গেলো একেবারে বদলে। মদ মেয়েমাছুর সব বন্ধ হল, ইয়ার-বন্ধীদের বিদায় নিলেন। বার-বাড়ি ফেলে অন্ধরে বাস করতে লাগলেন।

সর্বস্ব যেন কেমন ভয়ে ভয়ে থাকতেন তিনি। ল্যাগো গাড়ী করে সন্ধ্যা-সকাল গভীর ধারে যদি একটু হাওয়া খেতে বেরতেন, মনে হত ছোট ছোট জলজলে চোখওয়ালা ছুঁচার জন নেপালী যেন ঔর আশে-পাশে ঘোরাফেরা করছে। ঔর দিকে চেয়ে যেন কি সব বলাবলি করছে। ছোট কাগগের টুকরো এক দিন দলো পাকিয়ে ঔর গাড়ীতে কে ছুঁড়ে মারলো।—তাঁতে লেখা ছিলো, ইজ্জতের বললে ইজ্জত—জ্ঞানের বললে জ্ঞান দিতে হবে।

এর পর ছোট বাবু আর বেরতেন না বাড়ী থেকে, একটা বিষম জ্বাল যেন ঔকে গ্রাস করতে লাগলো। ঘুমের ঘোরে কি সব বিড়ি বিড়ি করে বাকেন

চিংকার করে ওঠেন,—ঐ এলো,—ঐ খুন করলে, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

বৌরাণী ভয় পেয়ে, রাগীমাকে বললেন সব কথা। রাগীমা ভাবলেন বোধ হয় ছেলের মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে।

বড় বড় ডাক্তার এলো!—স্তায় পরীক্ষা করে কোনো ব্যাধির লক্ষণ খুঁজে পেলেন না!

সাহাব গোলমাল! ক্ষুষ্টি আমাদের দরকার, এ ঘরটা বদল করে অল্প ঘরে শোবার ব্যবস্থা করা উচিত! মানে পরিবেশটা কিছু অদল-বদল করলে মনটার পরিবর্তন হতে পারে!

অনেক দিন পরে আবার ইয়ার বকসীয়া এলো, বাগানের দিকে একতলার ঐ কোণের ঘরে তাঁর শোবার ব্যবস্থা হল।

স্বরাব পাঠে চুসুক দিয়ে মনের ত্রাসভাব যেন অনেকটা কমে এসেছে।

মন শ্রোণ খুলে ক্ষুষ্টি করলেন ছোটাবু!

অনেক দিন বাদে শান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে ছোটাবাবু খানসামার চিংকার শুনে বাড়ীর সকলে ছুটে গেলো ছোটাবাবুর ঘরে।

বন্ধুদের নেশার ঘোর ছুটে যায়, সকলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, একসাথে সকলে চেঁচিয়ে ওঠে—

—গালচের ওপর চিং হয়ে পড়ে আছেন কুমার সাহেব! লাল রেশমী ক্রমাল দিয়ে শক্ত করে মুখ তার কাঁস দিয়ে বাঁধা! বুক বসানো একটা চক্কে ভোজালী!

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-  
সার জগ্য পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাতে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্র্যাশন্যাল কিংব্র সেণ্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

—গালচের ওপর গড়িয়ে পড়া রক্তগুলো চাপ বেঁধে কালো হয়ে গেছে। বিক্ষাণিত চোখ থেকে আন্তরিক যেন ঠিকরে পড়ছে।

—হত্যাকাণ্ডের সন্ধান মিললো না। সম্মানিত ঘরের ছেলের লাশ, কাটা ছেঁড়া হলো না।

বাশি বাশি কুল ঢেকে দেওয়া হল কুমার বাহাদুরের দেহটাকে। মা অঙ্গপূর্ণা একমাত্র নয়নের মণির মাথাটি নিজেব কোলে তুলে নিয়ে বসেছিলেন। দুচোখে গড়িয়ে পড়ছিলো গলা-বয়নার ধারা। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে অকুট স্বরে কি আশীর্বাদ করছিলেন, পরমেশ্বরের কাছে স্নেহের হুলালের আত্মার শান্তি ভিক্ষা চাইছিলেন!

—রাজাবাহাদুরের অক্ষম দেহটা বহন করে নিয়ে এলো দু'জন ভূতা। তাঁর শীর্ণ হাতখানি পুত্রের মাথার রেখে ডাকলেন, আমার মা কমলা কই? তাকে আর আমার দাদুভাইকে ডেকে আনো তো। তোমার বাবাকে কোলে করে নিয়ে এলাম আমি।

—কিন্তু বৌরাণীর দেখা কোথাও পাওয়া গেলো না। অনেক বৌজার্ঘ্যের পর ঠাকুরঘরে পাওয়া গেলো তাঁকে। কিন্তু তখন দেহে তাঁর প্রাণ ছিলো না। বিধি বেয়ে সকল আলা জুড়িয়েছেন সত্যলক্ষ্মী মা আমার।

মহাসমারোহে জাঁকজমকের সঙ্গে বিদায় নিলেন বাড়ীর লক্ষ্মীনারায়ণ। কুলরমণীরা মায়ের পায়ে সিঁদুর ঢেলে দিয়ে সেই সিঁদুর ঘুঁটা ঘুঁটা তুলে নিতে লাগলেন নিজদের কৌটায়। ষে, বাতাসা, টাকা, সিকি, গিনি, মোহর ওদের যাত্রাপথের হুঁধারে ছড়ানো হলো বাশি বাশি। লালকুটির আলো নিবে গেলো।

দীর হল রামভদ্রন সিং।

তার কেটরিগত চোখ দুটো দিয়ে অনর্গল ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছিলো, কৌটার খুঁটি দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলতে লাগলো।

রাজাবাবু এ খান্কা সামলাতে পারলেন না, দু'মাসের মাথায় তিনিও স্বর্গে চলে গেলেন। এই বিশাল পুরীতে রইলেন একা রাণীমা। ঐ পাঁচবছরের শিশু তোমার বাবাকে বুক করে।

—আজ্ঞার-স্বজন সকলে চলে গেলো বাড়ী ছেড়ে। দু'-একটি পরগণা তখনও বা ছিলো, রাণীমা বিক্রি করে দিলেন।

সরকার আমলা সকলকে বিদায় দিলেন! খালি পুরোনো বিধানী লোক আমরা কয়েক জন রইলাম।

থোকা বাবু ক্রমে বড় হতে লাগলো। তাঁকে তিনি বাড়ী থেকে একবারেই বেরুতে দিতেন না; বাড়ীতেই লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

থোকা বাবু মা মা ছিলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁকে রাণীমা বাড়ীতে রাখলেন, সাত ছোটবেলা থেকে থোকা বাবুর সংশ্লিষ্ট হয়।

নিজে তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করতেন, তার সঙ্গে থোকা বাবুকেও পালন করাতেন।

মাছ মাস এ বাড়ীতে তখন নিবিষ্ট ছিলো। থোকা বাবুর বখন আধারো বছর বয়স তখন তাঁর বিয়ে দিলেন রাণীমা। কারণ তাঁর শরীর খুব খারাপ হচ্ছিলো,—সে-জন্তে তাড়াতাড়ি নাতির বিয়ে দিলেন।

তার পনের দিন সন্ধ্যার চাঁদে গ্রহণ লেগেছে, রাণীমা সারা দিন উপোস থেকে সন্ধ্যার গন্ধান্ন করত গিয়ে ঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। গন্ধার জোয়ার এসেছে তখন, কোমর পর্যন্ত ছিলো তাঁর

জলে ডোবানো, সেই অবস্থায় শিঙিতে পড়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গে পুরোনো ঝি ছিলো, তার চিংকারে সকলে ছুটে এসে তাঁকে ধরাধরি করে তুলে এনে ঘাটের ওপর শোয়ালো, কিন্তু জীবন তাঁর তখন দেহ ছেড়ে চলে গেছে। 'পূণ্যবতী জননীকে আমার, মা গঙ্গা! স্বয়ং কোলে তুলে নিয়েছেন।'

মিঃ বাহুর কথার মাঝে ছেদ টানতে হলো। কারণ জরুরী প্রয়োজনে বাইরে এক ভ্রমলোক এসেছেন তাঁর কাছে—তাঁকে সেজ্ঞা উঠে যেতে হল।

মিসেস বাবু সেখানে বসে উল বুনছিলেন। আমার দিকে চেয়ে হাতমুখে বললেন,—এখনও যে একটু বাকি আছে ভাই, সেটুকু আমিও বলতে পারি আপনাকে। তবে ঠাঁর মত স্তম্ভর ভাষায় হয়তো পারবো না।

—আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসে বললাম—তা! হলে বাকিটুকু আপনাকে কছেই শুনি ভাই,—যেমন ভাবেই বলুন না কেন, ভালো আমার লাগবেই—একথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

—আমি তখন খুব ছোট, সেজ্ঞা সব ঘটনা ঠিক মনে নেই—তবে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটনি বছর দশেকের মধ্যে।

সোমনাথ বাবুর ঠাকুমা মারা যাওয়ারতে তিনি মনে যেন বড় বেশী আঘাত পেয়েছিলেন। কারণ ছোটবেলা থেকে সঙ্গী মাখী কেউ ছিলো না তাঁর। ঐ ঠাকুমা আর মামাই ছিলেন তাঁর মা, বাপ ভাই বন্ধু সবই।—তিনি বড় একটা কাকুর সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। প্রফেসরি করতেন আর বাকী সময়টা লাইব্রেরীতে পড়া শোনার কাটাতে। তাঁর মামা চলে গেলেন কালীতে। মাকে মাঝে, হুঁচাব জন সাধু সন্ন্যাসী দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি অনাগোপ করতেন—তাঁর কাছে। গোপীদাস মহারাজ তাঁদের অগ্রতম স্রষ্টামের বাবা মহিম হালদার ছিলেন তাঁরই শিষ্য।

স্মৃতির স্বপন বছর এগারো বয়স সেই সময় তাঁর মা দ্বিতী সন্তান প্রসব করে মারা গেলেন। ছেলোটো রইলো না।

এইভাবে সোমনাথ বাবুর মনে দেখা দিলো পূর্ণ বৈরাগ্য।

এই প্রফেসরিকার জীবনের অর্থ অমূল্যদান করার জন্ত তিনি ছাড়লেন প্রফেসরি।

দিন-রাত ঐ লাইব্রেরি ঘরের কপাট বন্ধ করে গভীর চিন্তায় ম থাকতেন।

হুঁ'বছর পরে এলেন গোপীদাস মহারাজ। কয়েক দিন তিনি বা করলেন ঐ বন্ধককে। তাঁর কাছেই বোধ হয় সোমনাথ বাবু জীবনে কিছু মানে খুঁজে পেলেন।

বাস্তব ভাবে একদিন তাঁর স্বপ্নদালয়ে গিয়ে হাজির হলেন।

শত চেষ্টাতেও বাকি ঘরের বার করা সম্ভব হয়নি, তাঁকে ঠা আসতে দেখে সকলে অবাক বনে গিয়েছিলেন।

—তিনি, হুঁচাব কথায় স্বপ্নমাতাকে বললেন।

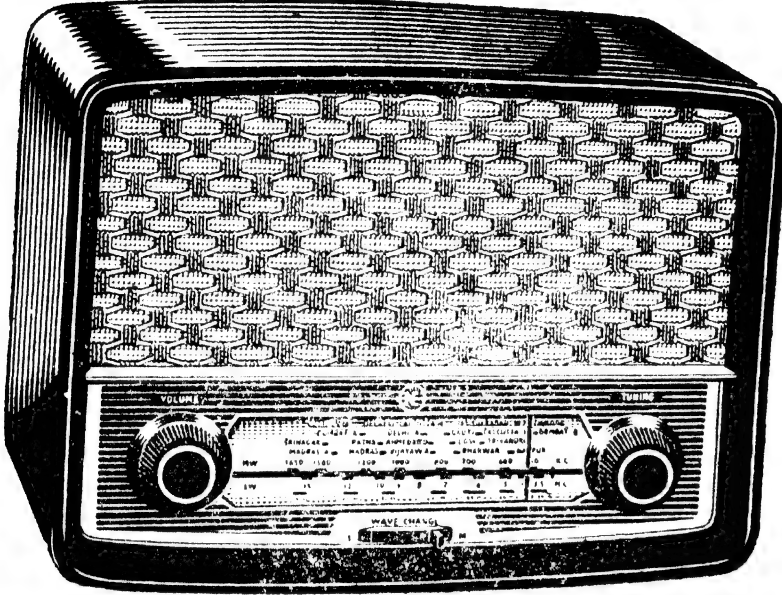
—তীর্থ ভ্রমণে যাবেন, বাড়ীতে স্মৃতিতাকে দেখবার শোনাও তো কেউ নেই, যদি ঠাঁর গিয়ে তাঁর লালকুটিতে বাস করেন এবং সম ভার গ্রহণ করেন—তবে তিনি তীর্থ গমন করবেন আগামী কল্য।

তাঁর নির্দেশ মতই কাজ করলেন তাঁর স্বপ্নমাতা। আর ঐ তীর্থ গমন, পরে সন্ন্যাস গ্রহণের এই ঘটনাটুকু ইতিহাস আম জানা আছে।

[ ক্রমশঃ ]



দামের তুলনায় সেবা রেডিও !



## ন্যাশনাল-একো

মডেল ২৪১ মাত্র ১৯৫ টাকায়

- ★ এই শ্রেণীর রেডিওর মধ্যে একমাত্র এতেই ১৯, ২৫, ৩১, ৪১, ৪৯, ৬০ ও ৮০-৯০ মিটার পাবেন
- ★ মস্ত বড় স্পীকার
- ★ সুবহুৎ ও সুদৃশ্য ব্যাকলাইট কেবিনেট
- ★ এসি, ডিসি অথবা ড্রাই ব্যাটারীতে চলে



আজই ন্যাশনাল-একো বিক্রেতাকে বাজিয়ে শোনাতে বলুন—খরচ লাগবে না !  
এখানে নিট দাম দেওয়া হল ; স্থানীয় কর আলাদা।

জেনারেল রেডিও এণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিঃ,  
কলিকাতা — বোম্বাই — মাদ্রাজ — বাঙ্গালোর — দিল্লী





টাকাইয়া দিয়াছেন। স্বর্গপ্রচারক বাহার, স্বর্গ বা স্বর্গরাজ্যের পথ কোন দিকে, তাহা নির্দেশ করিবার জন্য দেশে দেশে বিজ্ঞাপন দিতেছেন।

আর দেখুন, মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং কত স্থানে, কত বকমে, কত বিজ্ঞাপন দিয়া রাখিয়াছেন। আকাশে নীল কাগজের উপর, হীরকের অক্ষরে, প্রতি যাত্রিতে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা কি দেখিতে পান না? আপনাদিগ স্বর্গাক্ষরে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথাই শুনিয়াছেন। কিন্তু দেখুন, সমুদায় আকাশে, হীরক অক্ষরে কে বিজ্ঞাপন দিয়া রাখিয়াছেন? ঐ বিজ্ঞাপন কি প্রকাশ করিতেছে? অযুত-বৃন্দ ভগৎ—অনন্ত বাপ্তি, জ্যোতির্ষমতা, সুনিয়ম—মধুর মহীয়ান বিখ্যাপী অভীর সঙ্গীত। বলিহারি এই বিজ্ঞাপনের! আকাশে কেন, জগতে যে দিকে চান, সে দিকেই বিজ্ঞাপন—সমুদায় সৃষ্টি বিজ্ঞাপন—ভলদক্ষরে অসংখ্য অনীম, অনন্ত, অবিনশ্বর, সত্য দিবানিশি প্রচার করিতেছে!

—জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়

## জনপ্রিয়তার যাচাই

সুনাম বা জনপ্রিয়তা এমনি ভিনিস—বা ঘরের মনোহারী আয়নার ধরা পড়ে না, এর পরিচয় বা পরিমাপের জন্যে তাকাতো হয় সমাজদর্পণের দিকে। প্রতিবেশীর আমার সম্পর্কে কি ভাবছেন, বীদের সঙ্গে দৈনন্দিন কাজ-করাবার বা চলাকোণ, তাঁরা সত্যি আমার পছন্দ করেন কি না এবং করলেও কতখানি—এইখানেই তো জনপ্রিয়তার যাচাই।

সাধারণতঃ আমরা নিজেকে কেহই ছোট করে দেখতে চাইনে—নিজের কোন ক্রটি বা অক্ষমতা নিজে থেকে সহসা মেনে নেওয়া আমাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় নয়। পরন্তু এইটুকু ভাবতে আমরা তেমন বিধা করি না—প্রত্যেকেই আমরা মোটামুটি নিখুঁত, আমাদের মান ও মর্যাদা সামান্য কোথায়? আমাদের বেশীর ভাগেরই ক্ষেত্রে এইটি আত্ম-প্রবন্ধনা না হলেও, আত্মসম্বলি ছাড়া কিছুই নয়। সুনাম বা জনপ্রিয়তা যাচাই করতে চাইলে এই মাপকাঠি ধরে নিরে থাকলে নিতান্ত ভুল করা হবে।

মাছুষ মানুষকে কখন ভালোবাসে, কেন ভালোবাসে? অথবা স্থায়ী সুনাম বা জনপ্রিয়তা নির্ভর করে কিসের উপর? প্রথম কথাই বহুদূর সম্ভব ভালো মাছুষ হতে হবে; আশাবাদী, বিচারবুদ্ধিশূন্য, সাহসী, কর্তৃত্বপূর্ণ ও দরদী মাছুষ না হলে নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা—অহংকার বা মাদকতা, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব বা সঙ্কীর্ণতা এই জ্ঞেয় বদভ্যাসে পেয়ে বসলে কখনই চলবে না। বিজ্ঞা, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও অধিকারে বতই কেন না বড় হওয়া গেল, ভাবতে হবে নিজেকে সাধারণেরই এক জন—নিতান্ত আলাদা কিছু নয়। বৈষয়িক আচরণে সততা ও সারল্য, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার ভাব যেন আটুট থাকে—এইদিকেও নজর রাখতে হবে সব সময় কড়া।

এ তো গেল একদিকের ব্যাপার—অপর দিকে, নিজেকে নিজে বড় না ভাবলেও মনে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে—আমি কখনই পেছনে পড়ে থাকবো না, নিজেকে হেয় বা হীন প্রতিপন্ন করবো না কোন অবস্থাতেই। অহংকারের প্রেরণ না তুললেও ব্যক্তিগত ও অগ্রগামিতা চাই সকল ভালো কাজে—সকল প্রয়োজনের মুহূর্তে। এইভাবে একটি স্বচ্ছ, সুন্দর ও বলিষ্ঠ জীবনযাত্রার পথ বেছে নিলে সুনাম বা জনপ্রিয়তা এসে জুটবে আপনি—এর বাচাইএর জন্যে এতটুকু আর ভাবতে হবে না।

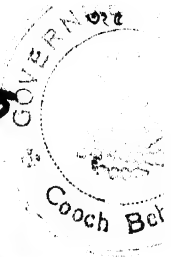
## ভারতে ম্যাংগানিজ উৎপাদন

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ম্যাংগানিজ একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় প্রথম শ্রেণীর ধাতু হিসাবে গণ্য। লৌহ ও ইস্পাত মজবুত করতে, এনামেল ব্লক ও ব্রিচি পাউডার তৈয়ারী ব্যাপারে, রসায়ন-শিল্প ও কাচ-শিল্পের ক্ষেত্রে এই খনিজ পদার্থের ব্যবহার আজ খুবই ব্যাপক।

লৌহ, কয়লা, ক্রোমিয়াম, অর্ড ও থোরিয়ামের ছাড়া ম্যাংগানিজেরও সত্যি প্রচুর যোগান রয়েছে ভারতে। বলতে কি, সেদিন পর্যন্তও ম্যাংগানিজ উৎপাদনে এই দেশ শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। এক্ষণে উৎপাদনের দিক হ'তে ভারত তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও ভারতের উৎপাদনের পরিমাণ বিশ্বের মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ। ভারতের মধ্যে আবার মধ্যপ্রদেশেই এই খনিজ পদার্থ বা ধাতুর উৎপাদন সবচেয়ে বেশী। তার পরই নাম করতে হয় মাদ্রাজ রাজ্যের। বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে ম্যাংগানিজ পাওয়া যায়। অপর দিকে বিভিন্ন খনিজ ত্রয়া উৎপাদনের মধ্যে ভারতের ম্যাংগানিজ উৎপাদনের স্থান দ্বিতীয়।

ভারতের খনিসম্ভার সাম্প্রতিক একটি হিসাব—ভারতে ম্যাংগানিজ পিণ্ড আছে প্রায় ১১ কোটি ২০ লক্ষ টন। তন্মধ্যে একমাত্র মধ্যপ্রদেশেই রয়েছে প্রায় ১০ কোটি টন ম্যাংগানিজ পিণ্ড। ভারতে যে ম্যাংগানিজ পাওয়া যায়, তা' সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এখান থেকে বিপুল পরিমাণ ম্যাংগানিজ বিদেশে রপ্তানী হয়ে যায়। ১৯৫৫ সালে ভারতের খনিসম্ভার হ'তে ১৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫০৮ টন ম্যাংগানিজ পিণ্ড উত্তোলন করা হয়। ১৯৫৪ সালে উত্তোলন করা হয় ১৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৮ টন ম্যাংগানিজ পিণ্ড। ভারত থেকে ১৯৫৫ সালে যে ম্যাংগানিজ পিণ্ড রপ্তানী হয়, উহার পরিমাণ ছিল প্রায় ৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভারতের ২০ লক্ষ টন ম্যাংগানিজ পিণ্ড উত্তোলন নির্ধারিত আছে। এই পরিকল্পনার রপ্তানীর যে বরাদ্দ স্থিরীকৃত হয়েছে, উহার পরিমাণ ১৫ লক্ষ টন। এই রপ্তানী খাতে ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে আসছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

গিনিগোল্ড জুয়েলারি শ্বেশালিষ্ট



মৌলিকতায়  
নির্ভরতায়  
আধুনিকতায়

এম.বি. সরকার এও সন্স

ফোন:- ৩৪-১৭৬১ *জুয়েলার্স* গ্রাম-টিলিয়াকৈস

১৬৭/সি ১৬৭/সি/১ বহুভাঙ্গার স্ট্রীট কলিকাতা ১২

গ্রাণ্ড-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ. কলিকাতা-২১

শোভামের পুরাতন চিয়গা

১২৪, ১২৪/১, বহুভাঙ্গার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

নতুন ব্রান্ড শোভাম - ডায়মেন্ডপুর ফোন: ডায়মেন্ডপুর-৮৫৮

# খেলাধুলা

কলকাতা মাঠে খেলাধুলা একটু মন্থর গতিতে চলেছে। কারণ, ইনফ্লুয়েন্জা বা ফ্লু কবলে পড়েছেন অনেকে। এ অধীনও তার হাত থেকে রেহাই পায়নি।

দীর্ঘ দিন সংবাদের উপর কোন আলোচনা হয়নি, তাই এবারে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

এবারে বর্ণিত প্রতিযোগিতায় ফাইনাল খেলায় বোম্বাই দল বিজয়ী হয়েছে। বোম্বাই ইতিপূর্বে আট বার এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে। ফাইনালে এবার বোম্বাই দল সার্ভিসেস দলকে এক ইনিংস ও ৩৮ রাণে পরাজিত করেছে। খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কেচ নিয়ে দেওয়া হইল।

সার্ভিসেস—১ম ইনিংস—১১১ (গাদকারী ৫০, কঙ্কর ৫০, এস, ওয়াই বেগে ২১, উম্মিগড় ৩৫ রাণে ৪, বিলে ২৩ রাণে ৩ ও গার্ড ২৩ রাণে ২ উইকেট)

বোম্বাই—১ম ইনিংস—৩৫১ (গুইটাই ডিক্লেয়ার্ড) ওয়াইকে বিলে ১৩২, তামানে ৬৬, মন্ট্রী ৬২, কামাথ ৩৮, জগদীশন ৫১ রাণে ৩ উইঃ সুরেন্দ্রনাথ ৫০ রাণে ২ ও দানী ৪৭ রাণে ২ উইকেট লাভ করেন।

সার্ভিসেস—২য় ইনিংস—১৫০ (গাদকারী ৪০, দানী ৩৬ গবেশন ২৭, পাঞ্জাবী ৫৭ রাণে ৫, উম্মিগড় ৫৭ রাণে ৫ ও হারদিকার ১ রাণে ১ উইকেট)

(বোম্বাই এক ইনিংস ও ৩৮ রাণে বিজয়ী)

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এবারে বিজয়ের সম্মান অর্জন করেছে রেল দল। রেল দল সমেত ভারতের প্রায় সকল রাজ্যে স্বাধীনশক্তিমতী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। দুঃখের বিষয়, বিশ্ববিজয়ী হকি খেলার মান আজ নিম্নশূন্য।

ভারতীয় রেল দল ও বোম্বাইএর মধ্যে যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় তাতে কিছুটা উন্নত ধরনের খেলা দেখার সৌভাগ্য দর্শককুলের হয়েছিল বলা যায়। তীব্র উত্তেজনা এবং আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের মধ্য দিয়ে খেলাটি নিশ্চিন্ত হয় ২—১ গোলে। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় রেল দলের ইহাই দ্বিতীয় সাফল্য। ১১৩০ সালে রেল দল প্রথম বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

মোহনবাগান দল অপরাধিতের জয়ন্তিলক পরে এবারও হকি লীগের চ্যাম্পিয়ান সিপ লাভ করেছে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, মোহনবাগান দল উপর্যুপরি তিন বার অপরাধিত থেকে হকি লীগের চ্যাম্পিয়ান অর্জন সত্যি মোহনবাগানের খেলাধুলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আর এবার বাগাস' হয়েছে ইষ্টবেঙ্গল দল।

এবার নিয়ে মোহনবাগান দল ৬বার লীগ বিজয়ীর সম্মান অর্জন করলো।

এবারে বাইটন কাপ লাভ করেছে ইষ্টবেঙ্গল দল। ফাইনালে মহামেডান স্পোর্টিং দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। দীর্ঘদিন পরে কলকাতার দুইটি দল বাইটন কাপের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় খেলার মাঠে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শক্তিশালী ফুটবল দল হিসাবে এত দিন ইষ্টবেঙ্গল দলের পরিচয় ছিল। ক্রমে ক্রমে সে সীমারেখা অতিক্রম করে ইষ্টবেঙ্গল দল গ্র্যাণ্ডেলটিক্স স্পোর্টিং সীইস্থানীয়, এক কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ বছরই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব সর্বপ্রথম বাইটন কাপ লাভ করলো। এ বছর বাইটন কাপের খেলার মোট ৩০টি দল অংশ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে বাংলার বাইরের দল ছিল আটটি। শক্তিশালী দল হিসাবে একমাত্র উত্তর প্রদেশ ছাড়া, টাটা স্পোর্টিং, পাঞ্জাব, সার্ভিসেস প্রমুখ শক্তিশালী দলগুলি এবারের বাইটন কাপের খেলার যোগদান করেনি। বাইটন কাপের প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি তিনবার হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল ১—০ গোলে পরাজিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মোহনবাগান দল লীগের খেলায় মহামেডান দলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে। বাই হোক, বাইটন কাপের সংগে সংগে হকি খেলার উপর বহনিক পড়ল।

কলকাতায় ফুটবল লীগের খেলা শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছু দিন। লীগ পারার দৌড়ে রাজস্থান দল ১৪টি দলের মধ্যে এখন অপরাধিতের সম্মান নিয়ে পিড়িয়ে আছে।

মরুমতের প্রথম চ্যারিটি খেলায় মহামেডান স্পোর্টিং-এর কাছে ইষ্টবেঙ্গল দলের পরাজয় যেমন মহামেডান দলকে লীগ বিজয়ের পথ কিছুটা প্রশস্ত করে দিয়েছে, অপর পক্ষে ইষ্টবেঙ্গল দল বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়ল। এই খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দল প্রথমার্ধে কোণঠাসা করে রাখলেও শেষ পর্যন্ত মহামেডান দলের কাছে ১—০ গোলে পরাজয় বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই দিন মহামেডান দলের অধিনায়ক সালাম ও ইষ্টবেঙ্গল দলের নবাবগত খেলোয়াড় রাম-বাহাদুরের ক্রীড়ানৈপুণ্য চোখে পড়ে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, আই, এফ, কর্তৃপক্ষ ইনফ্লুয়েন্জার মোহাই দিয়ে খেলা বন্ধ রাখেন। ঠিক এই প্রকার অজুহাতে খেলাধুলা বন্ধ রাখা ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। এখা পিছনে নাকি কোন হুজুভিসিকি আছে বলে শোনা যাচ্ছে। জানি না, এর কতটুকু সত্য এবং মিথ্যা।

এবারের প্রথম ডিভিশনে উন্নীত হাওড়া ইউনিয়ন দল মোটোটি খেলছেন। সূচনা ভাল হলেও হাওড়া ইউনিয়ন দলের খেলার তেমন ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখা যায়নি। অজ্ঞাতের খ্যাতিমান দল ভার পূর্ব-ব্রনায় অজুহা খেলুক, এটাই ক্রীড়ামোদীর আশা করেন।

# সাহিত্য পরিচয়

## গ্রন্থকার ও পাঠক

গ্রন্থকার ও পাঠকে সখ্য কি? এতদ্বয়ের সখ্য বৃত্তিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই গ্রন্থকার ও পাঠক শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। গ্রন্থকার শব্দের অর্থ 'যিনি গ্রন্থন করেন'। গ্রন্থকার কি গ্রন্থন করেন? এতদ্বত্তরে বলা যায় যে, তিনি শব্দসমূহ গ্রন্থন করেন। মালী যেমন মালা গ্রন্থন করে, গ্রন্থকারও সেইরূপ শব্দসমূহ গ্রন্থন করেন। শব্দসমূহ চিন্তার প্রতীক বা বাচন। যে শব্দে মনের কোন চিন্তা প্রকাশ করে না, সেই শব্দ অর্থহীন। গ্রন্থকার শব্দসমূহ গ্রন্থিত করিয়া বস্তুতঃ চিন্তাসমূহই গ্রন্থিত করিয়া থাকেন। আর পাঠক শব্দের অর্থ 'যিনি পাঠ করেন,' পাঠ করার অর্থ কি? ইহার অর্থ শুধু কতকগুলি অক্ষর দর্শন বা উচ্চারণ করা নয়। পাঠ করার প্রকৃতার্থ অর্থবোধ সহ অক্ষর-সমূহের দর্শন কিংবা উচ্চারণ, বা অর্থবোধসহ অক্ষর সমূহের বুগপং দর্শন ও উচ্চারণ। অর্থবোধই পার্থক্যের মূল উদ্দেশ্য। যে পাঠে অর্থবোধ নাই, সে পাঠ পাঠই নয়, উচ্চা কেবল কতকগুলি শব্দের উচ্চারণ বা কতকগুলি অক্ষরের দর্শন মাত্র। অর্থবোধের অর্থ—পাঠক কর্তৃক গ্রন্থকারলিখিত ভাষা হৃদয়ঙ্গম করা, গ্রন্থকারের মনোগত ভাবে ভাষাচিত্র হওয়া বা তাঁহার চিন্তাধারি চিন্তা করা। এইরূপে গ্রন্থকার ও পাঠকের সখ্য দুইটি সঙ্গীর পরস্পর সখ্যরূপে প্রতিপন্ন হয়, গ্রন্থকার যেন কিছু বলিতেছেন, আর পাঠক যেন তাগা শ্রবণ করিতেছেন। তখন তাগাদের সখ্য বস্তু ও প্রোক্তার সখ্যরূপে বর্ণিত হইতে পারে। আর গ্রন্থকার যখন কোন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন, তখন গ্রন্থকার তন উপদেষ্টা, আর পাঠক তন উপদীষ্ট, সেইজন্য আমরা তাঁহাদের তৎকালীন সখ্য ওকশিষ্য-সখ্য-রূপে অভিহিত করিতে পারি। পাঠক যদি কোন গ্রন্থ বৃত্তিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে গ্রন্থকারের ভাবে অঙ্গপ্রাণিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই তিনি গ্রন্থকারের উক্তি সম্যক বৃত্তিতে পারিবেন। নতুবা তিনি গ্রন্থকারের লেখার ভ্রান্তার্থ করিয়া ফেলিবেন। সেইজন্য কোন গ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বৃত্তিতে হইবে, পশ্চাৎ ইহার উৎকর্ষাপকর্ষের সমালোচনা করা হইতে পারে, নতুবা পাঠক এই গ্রন্থের অপব্যাখ্যা করিয়া ফেলিবেন, তাহাতে তিনিই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবেন।

আমরা ইতিপূর্বে গ্রন্থকার ও পাঠকের সখ্য দুইটি সঙ্গীর সখ্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে সকলে চিন্তাকর্ষকরূপে তাঁহাদের বক্তব্য বলিতে পারেন না। কেহ হয়ত

সবস ভাষার তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারেন, আবার কেহ হয়ত নীরস কিংবা ভটিল ভাষার তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারেন। সেইরূপ কোন গ্রন্থকারের ভাষা হয়ত সবস, সরল ও সতেজ হয়, আবার কোন গ্রন্থকারের ভাষা হয়ত নীরস ও ভটিল হয়, ইহা গ্রন্থকারের স্বীয় ভাব প্রকাশের ভঙ্গির উপর নির্ভর করে; ভাষার সবসতা কিংবা নীরসতা আবার বিষয়ের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। কোন গভীর তত্ত্বের বিষয়ে লিখিতে হইলে ভাষা সাধারণতঃ গভীর ও ভটিল হইয়া পড়ে, আবার নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি তরল ভাবের গ্রন্থ লিখিতে ভাষা সাধারণতঃ সবস হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া গভীর তত্ত্বপূর্ণ লেখার ভাষা যে সবস হইতে পারে না, এমন কোন নিয়ম নাই। আমরা দৃষ্টান্তরূপে শব্দচর্চা-বিরচিত চণ্ডিকা-স্তোত্রের উল্লেখ করিতে পারি। এই স্তোত্র গভীর তত্ত্ব-প্রকাশক, অথচ ইহার ভাষা বেশ সরল ও সবস। এ সম্পর্কে আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতে পারে। মোটের উপর, এ কথা বলিয়া লওয়া হইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞান সম্বলিত লেখার ভাব গভীর ও ভটিল হয়। ইহার প্রমাণ আমরা দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে পাইয়া থাকি। ঐ গ্রন্থ সমূহ নানা যুক্তিভালে বিতর্পিত, আর ঐ যুক্তিভাল তরল শব্দে গঠিত। সাধারণ লোক ঐ সকল যুক্তিভাল ভেদ করিয়া সার গ্রহণে সমর্থ হয় না। সাধারণ লোক যেমন তরল মস্তিষ্ক, সে ঐরূপ তরল ভাবাপন্ন নাটক কিংবা উপন্যাস পড়িয়াই আনন্দ পাইয়া থাকে। ঐ তরল দর্শন, বিজ্ঞান, বাস্তবীতি, ধর্ম ও গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রের গ্রন্থকারদের পাঠকের সংখ্যা খুব কম থাকে। পক্ষান্তরে, কাব্য, ইতিহাস, পুৰাণ ইত্যাদি বিষয়ের গ্রন্থকারদের পাঠকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বৈধী হইয়া থাকে। যে বাঙা বোক, পাঠকবর্গের সংখ্যাধিকা হাওয়া গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের উৎকর্ষাপকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরেজীতে একটি কথা আছে যে, Like will draw like. (সমান সমানেই মিশন হয়)। এই নিয়মামুসারে পাঠক যে প্রকৃতির, সে সেই প্রকৃতির গ্রন্থকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর গ্রন্থকার যে প্রকৃতির, সে সেই প্রকৃতির পাঠকবর্গকে আকর্ষণ করে।

গ্রন্থকার ও পাঠকের সখ্য সখ্য লিখিতে হইয়া আমাদের মনে হয়, গ্রন্থকার যেন দাতা, আর পাঠক যেন গ্রহীতা,—গ্রন্থকার পাঠককে চিন্তাধারি দান করেন, আর পাঠক ঐ চিন্তাধারি গ্রহণ করেন, কিন্তু সকল গ্রন্থকার মুখে চিন্তাধারি দান করিয়া হইতে



পারেন না। কোন গ্রন্থকার হয়ত ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে শায়িত থাকেন, আবার কোন গ্রন্থকার হয়ত দারিদ্র্যের নিম্পেষণে লাহিত হইলেন। কোন গ্রন্থকার হয়ত জীবদশাতেই প্রভূত বশঃ, প্রতিপত্তি ও অর্থ লাভ করেন, আবার কভারও ভাগ্যে হয়ত মৃত্যুর পর ঐ সকল বা উহাদের একতম ছুটে বা ছুটে না! বাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের সতিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা জানেন ‘কবিজীবনী’ (‘Lives of Poets’) লেখক ডাক্তার জনসন (Dr. Johnson) ও অম্ব কবি মিটন (Milton) জীবদশায় কিরূপ অর্থকষ্ট পাইয়াছিলেন। বশঃ ও প্রতিপত্তি এই উভয় গ্রন্থকারই জীবদশায় যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে অর্থাভাবে বহু কষ্ট সছ করিতে হইয়াছিল। আনাদের বাংলা ভাষার অমর কবি মাইকেলের জীবনও গ্রন্থকারদের দুঃখ-দারিদ্র্য ভোগের দৃষ্টান্তস্থল নহে কি? কবির মাইকেল জীবনে যে কত কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া সুবিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার (মাইকেলের) মৃত্যুপলকে রচিত ‘ব ব কবিতার খেদ’ করিয়া শিখিয়াছেন,—

“হায়, মা ভারতি, চিরদিন তোয়  
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?  
যে জন সেবিবে ও পদবুগল  
সেই সে দরিদ্র হবে।” (হেমচন্দ্র)  
“কিংবা কটকিত হায়! যে বিধি করিল  
গোলাপ কমল;  
সে বিধি পায়ল মনে দহিতে সুকবিগণে  
কবি-ধম্মতে বিল দারিদ্র্য-অনল।”

(নবীন সেন)

ইংরেজীতে এই ভাবে একটি গাথা আছে, তাহা এই,—Most wretched men are craddled into poetry wrong, what they learn by suffering they teach in song- অর্থাৎ ভাগ্যহীন লোকেরাই ভুল বশত কবিতার চর্চা করিয়া থাকে আর তাহারা দুঃখ-কষ্টে বাহা শিখে, তাহাই তাহারা সঙ্গীতাকারে শিক্ষা দিয়া যায়। এই উক্তি কেবল কবিরের প্রতি প্রযোজ্য নয়। মোটের উপর, বাঁহারা ভারতীয় সেবা করেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেন, তাঁহাদিগকেই অনেক দুঃখ-কষ্ট, নানা বাধা-বিপত্তি ভোগ করিতে হয়। গ্রন্থকারগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্যের উপাসক, তাই তাঁহাদিগকেও অনেক সময় দুঃখ-শেষ ভোগ করিতে হয়; কিন্তু ইহা নিয়ম নয় যে, গ্রন্থকার মাত্রই দুঃখ-কষ্ট পাইবে। গ্রন্থ প্রণয়ন ও দুঃখ প্রাপ্তির সঙ্গে এমন কোন নিত্যসম্বন্ধ নাই যে, একটির বিজ্ঞানমতো অপরটিকে সূচিত করে। গ্রন্থকার যে জীবদশায়ই প্রভূত ধনসম্পত্তি ও যশের অধিকারী হইতে পারেন, তাহার বসন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রভূত বশঃ, সম্মান ও অর্থলাভ করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ও ‘সীতার বনবাস’, ‘শকুন্তলা’ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রভূত বশঃ, সম্মান ও অর্থলাভ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতে পারে। সসারে সুখ-দুঃখ ভাগ্যায়ত্ত। ইহাতে গ্রন্থকার বা অগ্রন্থকারের কোন কথা নাই। তবে বাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের

চর্চা করেন, তাঁহারা পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দ্যের প্রতি যেন একটু উদাসীন থাকেন। এই হেতু ঐ সকল জিনিষ তাঁহাদের ভাগ্যে যেন একটু কমই ছুটে। তবে অদৃষ্টে সুখ থাকিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করিয়াও সুখ হইতে পারে,—গ্রন্থকারও সুখী হইতে পারেন। এখানে প্রশ্ন এই যে, গ্রন্থকার যদি নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াও পাঠককে তাঁহার চিন্তাশাশি উপহার দিয়া বাইতে পারেন, তবে পাঠকের গ্রন্থকারের প্রতি কোন কর্তব্য আছে কি? ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, গ্রন্থকার যেমন পাঠককে চিন্তাশাশি দান করেন, পাঠকও তেমন গ্রন্থকারকে গ্রন্থের মূল্যায়নরূপে অর্থদান করেন, সকল পাঠকই মূল্য দিয়া গ্রন্থ ক্রয় করিলে বহু লোকে বিনামূল্যে ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকে। গ্রন্থাগারে কোন একখানা গ্রন্থ থাকিলে বহু পাঠক সেই গ্রন্থাধ্যয়নে উপকৃত হইতে পারে। কোন কোন গ্রন্থাগারে পাঠকগণকে কিছু কিছু াদা দিতে হয়, তাহা গ্রন্থকারের চিন্তাশাশির তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কারণ চিন্তা বা ভাব দানের সঙ্গ অর্থদানের তুলনাই হইতে পারে না, ততোধিক ঐ সামান্য অর্থদানের। এতদ্ব্যতীত কোন গ্রন্থাগারে পাঠকগণ বিনা খরচেই গ্রন্থাধ্যয়ন করিতে পারেন, যেমন কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ও অস্ট্রা গ্রন্থাগারে। সেরূপ ক্ষেত্রে পাঠক গ্রন্থকারকে তাঁহার চিন্তাশাশির বিনিময়ে কি দিতে পারেন? তিনি দিতে পারেন তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা। পাঠক যদি গ্রন্থকারের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কিছুমাত্র উপকৃত হন, তবেই গ্রন্থকার নিজকে কৃতার্থ মনে করেন। মোটের উপর, গ্রন্থকারের দান সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, তাই পাঠক গ্রন্থকারের নিকট চিরদিন গ্রীহীতা বা স্বামী থাকেন, আর গ্রন্থকার পাঠকের নিকট চিরদিন দাতাই থাকেন।

সকল গ্রন্থই পাঠকবর্গের সমাদর লাভ করিতে পারে না, আবার সকল গ্রন্থ সমান সমাদরও লাভ করে না। কোন কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থ কেবল সাময়িক ভাবে সমাদর লাভ করে, পরে হয়ত উহা অনাদৃত হইয়া বিশ্বস্তির গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, কোন কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থ চিরদিনই সমাদরপ্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের গ্রন্থ বদেষে সমাদরপ্রাপ্ত হয়ই, এমন কি বিদেশেও সমাদর লাভ করে। এ সকল গ্রন্থকার বাস্তবিকই ভাগ্যবান। বাস্কো, ব্যাস, হোমর, ভার্জিল, কালিদাস, দাঙ্ক, নিউটন, শেক্সপীয়ার ও মিটন প্রভৃতি বাস্তবিকই ভাগ্যবান গ্রন্থকার। এ সকল গ্রন্থকার দেশ-কালের অতীত,—তাঁহারা সর্বদেশে সর্বকালেই পুজিত হইবেন।

পাঠকের উপর গ্রন্থকারের একটি স্বাধীন প্রভাব আছে। কেহ যেন মনে না করেন যে, গ্রন্থপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থকার ও পাঠকের সম্বন্ধ ফুরাইয়া যায়। এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রাম্যশূন্য। কারণ গ্রন্থকার একটিমাত্র কথা দ্বারা পাঠকের মনে এরূপ গভীর ভাবের সঞ্চার করিতে পারেন, বাহা বাবজীবন স্থায়ী হইতে পারে। গ্রন্থকার ও পাঠকের সম্বন্ধ যদি গ্রন্থপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ফুরাইয়া যায়, তবে গ্রন্থাধ্যয়ন করিয়া লাভ কি? আমরা গ্রন্থাধ্যয়ন করি, উহা হইতে কোন স্থায়ী কলা লাভ করিবার জন্ত,—যেমন আমাদের চরিত্র গঠনের জন্ত, অথবা এমন কোন জ্ঞানলাভের জন্ত, বাহা চিরন্তন জীবনপথে আমাদিগকে সাহায্য করিবে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থই যে আমাদের মনের উপর স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া বাইতে পারে, এমন কথা নয়, তবে এ কথাও অস্বীকার করা হইতে



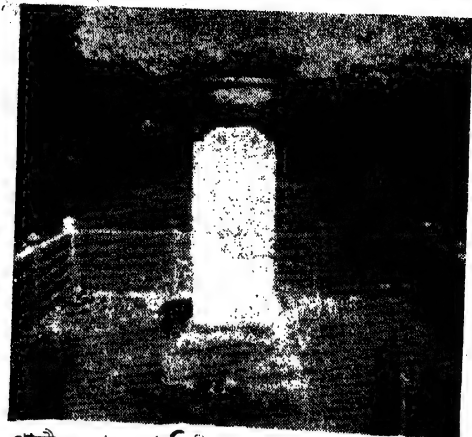


... এ সালের প্রচুদপট ...

এই সংখ্যার প্রেক্ষে একটি গ্রাম্যমেয়ের আলোকচিত্র মুদ্রিত  
হয়েছে। [চিত্রটি আয়ামকিস্কর সিংহ গৃহীত।]

বৃকপয়া (বিড়লা মন্দির) দিল্লী

—এস. এন. সরকার



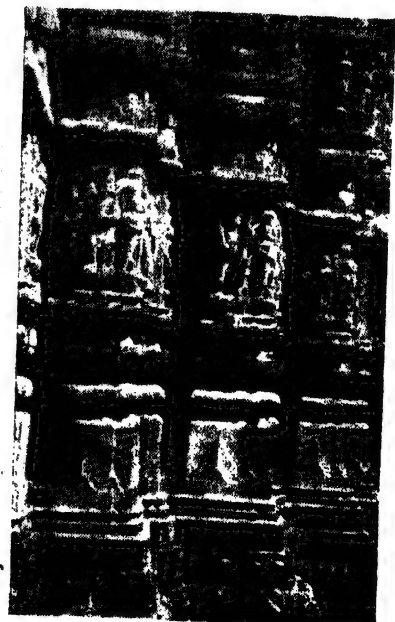
গোকুল-হত্যাস্থল (দিল্লী)

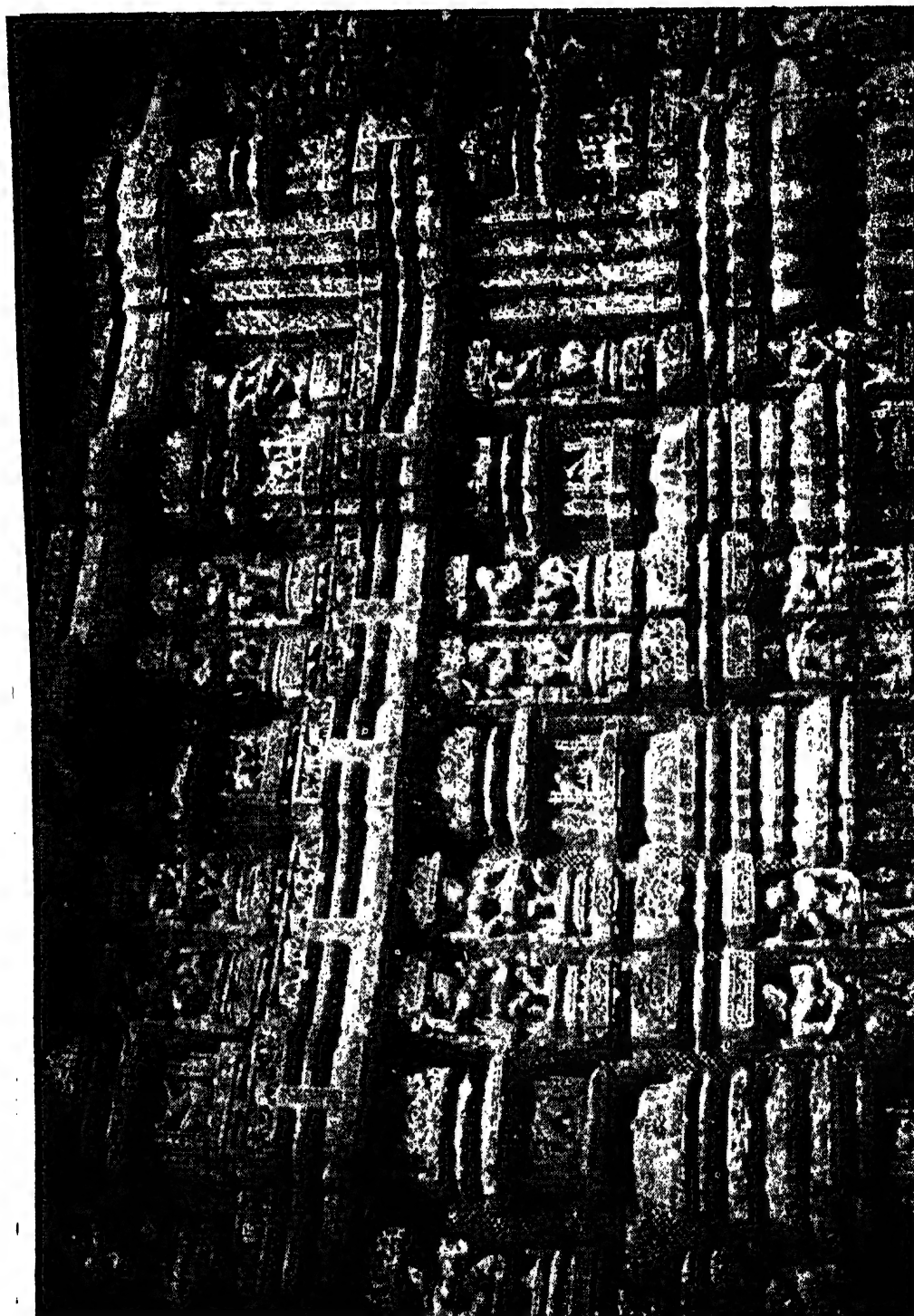
—কলাপাঞ্চ বন্দোপাধ্যায়

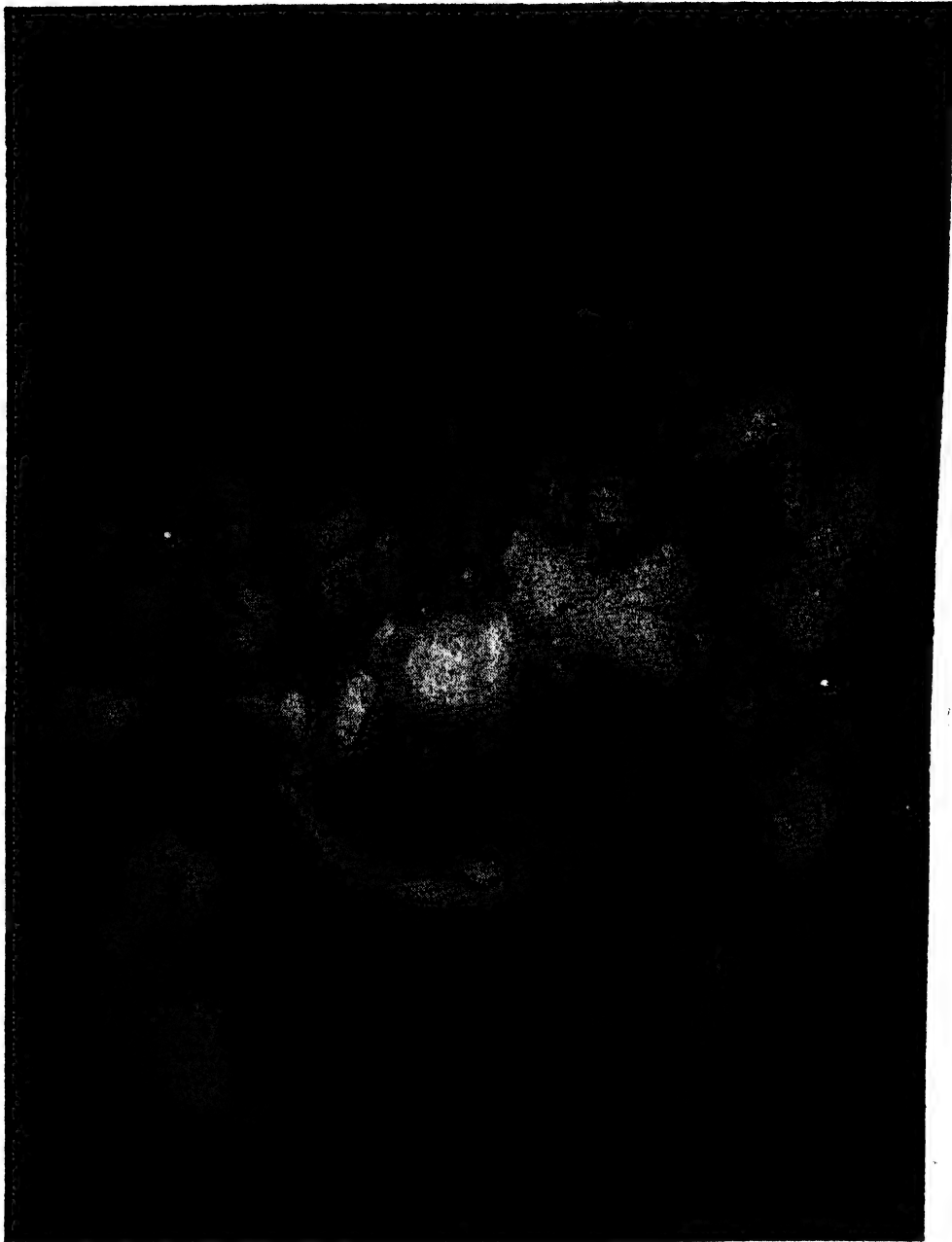


জগদীশ মন্দিরগাত্র (উদয়পুর)

—যতীন্দ্রনাথ পাল







সাজঘর

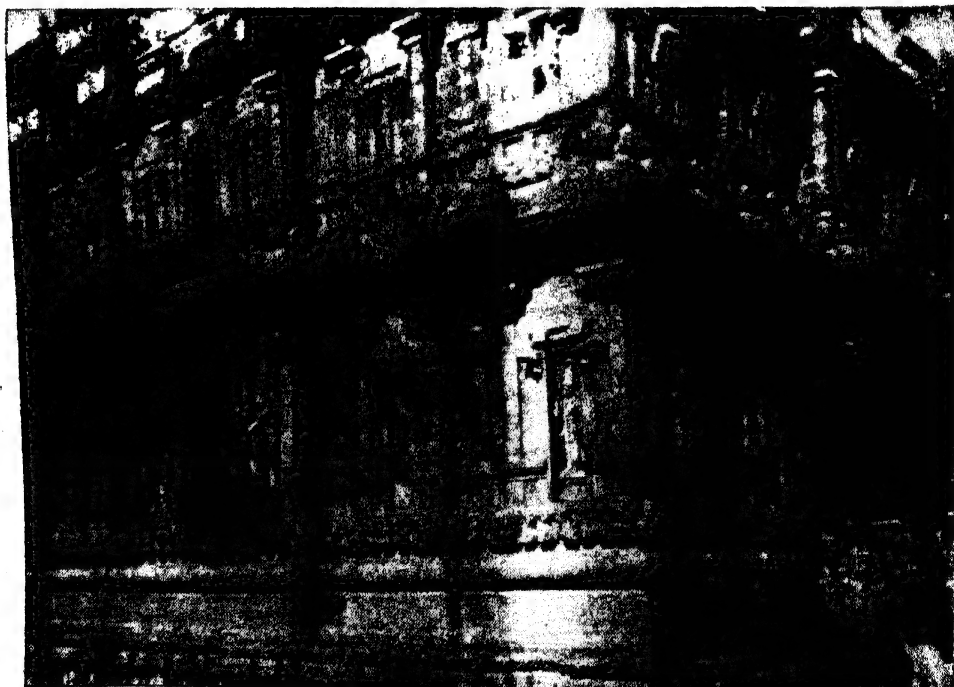
—দীর্ঘদিন অধিকাংশ

ঘরকল্লা  
—বগলিৎ সোম



তাঞ্জোর মন্দির

—বৌদ্ধনাথ চট্টোপাধ্যায়





বাইটাস' সিগিউকট। ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১০।  
মূল্য তিন টাকা আট আনা।

### গ্রন্থবার্তা

বিশ্বেশ্বর সেরা সেরা গ্রন্থগুলির সারাংশ সংকলিত করে 'গ্রন্থবার্তা' নাম দেওয়া হয়েছে। আজকের দিনে পৃথিবীর সাহিত্য কোন পথে তার গতি পরিচালিত করছে, সে সবক্ষে একটি সুস্পষ্ট ধারণা এর থেকে জন্মাতে পারে। বিভিন্ন লেখক-লেখিকা সহজেও যথাযোগ্য আলোচনা এখানে পরিবেশিত হয়েছে। সংকলকের চেনশক্তি প্রশংসার যোগ্য। তাঁর সংকলক এককেন্দ্রিক নয়। বহুমুখী। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব আত্মজীবনী সকল বিষয়ক রচনাই সংকলক শীলভ্রম এখানে সমান কৃতিত্বের সঙ্গে পরিবেশন করে গেছেন। রচনার উৎকর্ষতা স্থানে স্থানে পাঠকচিৎকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। এ ধরণের গ্রন্থ নিশ্চয়ই পাঠকমহলে সাড়া জাগাবে, এ আশা আমরা রাখি, এই প্রসঙ্গে সংকলকের প্রকৃত নাম প্রকাশের কৌতুহল আমরা চোপ রাখতে পারছি না। তাঁর নাম শ্রীজিতরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১০ বি কলেজ রোড শান্তি লাইব্রেরী থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম চার টাকা মাত্র।

### ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য

বাঙালী জাতি ও তার সাহিত্য উভয়েরই একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল আজ থেকে দেড়শ বছর আগে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর উদ্যোগে। যে শতাব্দী বাঙলার শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি নব জাগরণ জীবনবোধ নতুন ভাবে গড়ে দিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী যখন সব চোপ মেলে প্রত্যক্ষ করছে পৃথিবীর আলো ঠিক সেই সময়ই বাঙালীর জীবনবোধ এক নতুন চেতনায় রূপ নিচ্ছে, তার স্রবণ সব থেকে বেশী রূপ নিয়েছিল তৎকালীন সাহিত্যে। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন যেমন পরিশ্রম সাপেক্ষ তেমনিই প্রশংসার যোগ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে সেই সংকীর্ণটি সম্পাদন করেছেন। বাঙালীর মানসিক জীবনের এই ইতিকথার বহু প্রশংসার হয় তাই ভবিষ্যতের পক্ষে মহল। কারণ অতীতের প্রতি বিমর্শন আজকের দিনে এক বৈশিষ্ট্যের আকার ধারণ করেছে। এই গ্রন্থটির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি। ১৩ হাবিসন রোডস্থ ইণ্ডিয়ান যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ থেকে শ্রীজিতরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম তিন টাকা মাত্র।

### মেরুপথের যাত্রী দল

বাঙলার কিশোরদের জগতে আজ বোম্বাঙ্ক বা শিহরণ প্রাকৃতিক গ্রন্থগুলি খুব সাড়া তুলেছে। কিন্তু সেগুলি নিভাস্তই অসারতায় ডরা। শ্রীপরিমল গোস্বামীর এই গ্রন্থখানি আরই ব্যতিক্রম সানন্দে ঘোষণা করছে। ভবিষ্যতের নাগরিকদের জীবন ডরা যে তৃষ্ণার প্রয়োজন লেখক তা সম্যক উপলব্ধি করেছেন, কৈশোরে মানুষের অঙ্গসন্ধির স্পৃহাব হয় প্রথম উদ্বেগ, ভবিষ্যতে তাই তাকে টেনে নিয়ে যায় সমৃদ্ধির সিংহদ্বারে। কিশোর মনে অব্যবহৃত বীজ বপন করেছেন লেখক এই গ্রন্থখানির মাধ্যমে। সত্যিকারের শিহরণ

মহিষের মনকে গঠন পথে সহায়তা করে প্রকৃত। লেখক এখানকার বক্তব্য পরিবেশনে সম্পূর্ণরূপে সার্থক হতে পেরেছেন বলে বনেওয়া যায়। ৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীটস্থ বাইটাস' সিগিউকট প্রাইভেট লিঃ থেকে শ্রীমুখী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম—দেড় টাকা মাত্র।

### নেহরু ও পররাষ্ট্র নীতি

একথা আজ অস্বীকার করার উপায় কোন মতেই নেই যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আচার্য জওহরলাল নেহরুর মত বাস্তববাদী পুরুষ সারা পৃথিবীর মধ্যে আর দ্বিতীয় জন নেই। আজকের সমস্ত সমূল পৃথিবীতে, যেখানে সর্বত্র হতাশা, লোভ আর বিনষ্টির স্পন্দ হাতছানি সেই রোক্তমান্য বিষয়ের বৃকে নেহরুজীর একটি মন্তব্য যথেষ্ট মূল্য বহন করে। সারা বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিকা নেহরুজীর ব্যক্তিগতপূর্ণ নেতৃত্ব আজ একটি সম্পদ-বিশেষ। ভারতব আজ লাভ করেছে স্বাধীনতা, প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর স্বয়ং তা পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারতপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সহ অজিত, সহযোগিতা সহামুদ্রুতি স্বয়ং করে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির প্রভাব আজ বিশ্বে বৃকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন শান্তির স্তম্ভম উপাসক শ্রীনেহরু। গ্রন্থটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়। লেখক—শ্রীঅনাদিনাথ পাল, ১ গ্রামাচরণ ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীকৃষ্ণান কুমার প্রামাণিক। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

### মাটিঘেঁষা মানুষ

বাঙলার কথাশিল্পজগতে একটি অলোকোজল আসনের অধিকারী স্বর্গীয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অসমাপ্ত একটি কাহিনীর সম্পূর্ণতার পূর্ণচ্ছন্দ টেনেছেন কৃত সাহিত্যিক স্রবীজ্ঞন মুখোপাধ্যায়। মাসিক বঙ্গমতীর পাঠক পাঠিকারা এই গ্রন্থের কিয়দংশের সঙ্গে পরিচিত। নিপীড়িত মানবায় জন্তে ক্রন্দনে, জীবনের নবতর চেতনার সন্ধানে, অন্তরে মূল সত্যের বোধচিত্ত উদ্ঘাটিত গ্রন্থটি আকর্ষণীয়। নারীজীবনের বিচিত্র স্পন্দন ও তত্ত্বুভূতি সার্থক রূপায়ণ লেখনী দ্বারা এই মধ্যাদা বুদ্ধি করে। ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ডি.এম. লাইব্রেরী থেকে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

### নাভাস্তা ও তাঁর বঙ্গুদের অভিযান

বঙ্গ দেশের সাহিত্য এত কাল বলতে গেলে বাঙলা দেশের শিশুদের কাছে অজাতই ছিল, কিন্তু এবারে সে বাঙালী ছোট ছোট পাঠক-পাঠিকার সাথেও পাতাতে চাইছে মিতালি, দুটি দেশের সাহিত্য পরস্পর পরস্পরকে ভরিয়ে তুলতে চাইছে আন্তরিক ওত আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে। শিশুদের ভগ্নে এই গ্রন্থটি মূল রচনা করেছেন নিকোলাই নদোব। রাশিয়ার সাহিত্য ক্ষেত্রে এই উনপঞ্চাশ বছরের সাহিত্যিকের প্রবল প্রভাব বহু অতিক্রম করে করতে সমর্থ হয়েছে তাঁর রচনা। সহজ, প্রাচুর্য ও ছন্দোময় ভাষা বাদের জন্তে লেখা তাদের অন্তরের বৈজ্ঞানিক অধিকার করবে এর বক্তব্য। মনোময় ভঙ্গীতে লেখা এর কাহিনী সকলকেই দেবে

পরিভূষিত। অল্পবাক্যে **শ্রীজয়ন্তকুমার** (মূল রূপ থেকে) ও কৃষ্ণবৈষ্ণব সঙ্গ সফল হয়েছেন বলা যায়। ৬৪-এ ২মতলা ট্রাট্‌ছ ইন্টার ট্রাডিং কোম্পানী থেকে **শ্রীদেবীপ্রসাদ** মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম তিন টাকা মাত্র।

#### রক্তরাগ

সামাজিক শ্রীদেবী প্রকাশের 'রক্তরাগ' গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। দেবশ দাশ ইত্যপূর্বে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়ে বাঙালি সাহিত্যকে ক্রমাগত পুষ্ট করে এসেছেন। তাঁর এই গ্রন্থটিও যথেষ্ট মূল্য বহন করে। সাময়িক পটভূমিকায় এর কাহিনীর সারমর্ম হয়েছে বর্ণিত। সাময়িক জীবন সম্বন্ধে বর্তমান দিনে আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আলোকপাত করার সবিশেষ প্রয়োজন। সাময়িক জীবনেও যে স্বভাৱ-ভাষা হাসি-কান্নার জোয়ার চলে, লেখনী দ্বারা তার প্রকাশ দেবশ বাবুর অনিপুণ কৃতিত্বেরই ঘোষণা করে। একদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র বর্তমানে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি আচার্য রাজেন্দ্র-প্রসাদের স্বাক্ষরসহ বাঙালয় লেখা ডুমিকাটি গ্রন্থটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। ১৩ হারিসন বোড্‌ছ ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম চার টাকা মাত্র।

#### ননীগোপালের বিয়ে

নৌকর্য বিচিত্রিত "ননীগোপালের বিয়ে" দীর্ঘদিন বাদে বাংলা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ হাসির উপজ্ঞানের অভাব দূর করবে। মাসিক বঙ্গবন্ধুর পাঠক-পাঠিকাদের প্রিয় লেখক নৌকর্যের প্রথম আকর্ষক আত্মপ্রকাশ মাসিক বঙ্গবন্ধুর পাতাতেই "চিত্র ও বিচিত্র" মাধ্যমে। বর্তমানে তাঁর আরেকটি ধারাবাহিক রচনা মাসিক বঙ্গবন্ধুতেই চলেছে : অজ্ঞ ও প্রত্যয়। ননীগোপালের বিয়ে শেষ বা ব্যঙ্গমুখী ব্যাঙ্গবের বই নয়। নির্বল হাসির, পরিচ্ছন্ন কৌতুকের, কথার চেয়ে বেশী সূচ্যেপাশালা; ওড্রাউস-টাইপের হাসির উপজ্ঞাস। হাসির এবং ভালোবাসার যুগলং আদি ও অনাদির স্নেহ যুগল গঙ্গা-যমুনায় গর্ভস্থ থেকে কান্দরই আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রকাশক : সাহিত্য ভবন। দাম : দু'টাকা বারো আনা।

#### মধ্যবিন্ত

দেশের মধ্যে বিরাট অংশ জুড়ে আছেন মধ্যবিন্ত সম্প্রদায়; দেশ ও দেশ বলতে তারাই। কিন্তু তাবাই আজ সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। অভাব আর্থ অনটন তাদের নিতাসঙ্গী, অবাচ্ছল্যই যেন তাদের স্বাভাবিক-প্রদর্শক। এদের হাসি-কান্না, আবেগ-অশ্রুত্বের কোন মূল্যই তথাকথিতদের কাছে পাওয়া যায় না। সে সব আর্থগার ওয়াল এত মোটা যে এদের আবেগের বার্ষতা বরণ করেই কিরে আসে। অন্তর দিয়ে তা উপলব্ধি করে সেই সত্যই এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন বনজুল। যমুনা, কুতুম্ব, ললিতা, নকুল, সহস্রব, শিবাজী, পরিতোষ প্রতিটি চরিত্র যথেষ্ট মূল্য বহন করে। ১৩ হারিসন বোড্‌ছ ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম দু'টাকা মাত্র।

#### অঘটন আজো ঘটে

তথাকথিত বিজ্ঞান আজ যত প্রসারই লাভ করুক, যত অসম্ভবই সম্ভব হোক, তার কৃপায় ভারতের সনাতন যুগ থেকে যে অলৌকিক

কালে কালে বহমান হয়ে এসেছে, তার মহিমার কাছে বিজ্ঞানের গরিমার কোন স্থানই নেই। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে বিরাট শক্তি লগতকে তার প্রতিবুদ্ধতের স্বাভাবিক পরিচালিত করছে সে রহস্য বিজ্ঞান ধরতে পারে না বলেই তার উপর নিজেই মহিমাকে সে তুলে ধরতে চায় কিন্তু সেখানেও সে পরাজিত। লোকচিত্তে কখন অগোচরে যে অলৌকিকতার মহিমা প্রভাব বিস্তার করে ফেলে তা বোধ হয় বুঝেও বোঝা যায় না। এই সত্যকে কেন্দ্র করে 'অঘটন আজো ঘটে'র কাহিনী বর্ণিত। কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে সেই ঐশ্বরিক অলৌকিকতার অস্তিত্ব বীকার করে সেই উদ্দেশ্যে প্রাণম জানিয়েছেন লেখক। বর্ণনার অস্পষ্ট ভঙ্গী, লেখনীর সজীবতা পাঠকচিত্তে প্রভূত আনন্দ দেবে। কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে দিলীপকুমার যে যুক্তির প্রতীতি করেছেন, তাতে করে তাঁর নৈয়ামিক প্রতিভার পরিচয় আরও গভীর ভাবে ফুটে ওঠে। ১৩ হারিসন বোড্‌ছ ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম সাড়ে চার টাকা।

#### প্রাণ-পঙ্গা

বাস্তব ও কাব্যার্থের সমন্বয় প্রাণ-পঙ্গা স্নলেখক অবিনাশ সাহার একখানি সার্থক উপজ্ঞাস বলা চলে। বৃহৎ উপজ্ঞাসের যে সকল গুণ থাকে উচিত এই বইটিতে তা সবই আছে। পটভূমিকা পূর্ববাঙালার গ্রাম নদী বন। নিশির পাগলকরা বাঁশের বাঁধী ঘরে থাকতে দেখে না ময়নাকে। মুখোমুখি বসে হুঁজনে, চুপি-করা ধাবার ধায় আর মনের আনন্দে গান গায়, দৌড়বীপ দেয় মাঠঘর। একজন কল্লভনকে পাতার মুহূর্ত পরিচয় দেয়। ময়নার ধোঁপায় ওঠে কাশকুল। ছোটবেলার খেলার সাথী জীবনসাথী হয়ে পাশে এসে শাঁড়ায় একদিন। লেখকের ভাষা, বর্ণনা এবং চরিত্রসৃষ্টি বেশ স্নদয়গ্রাহী। বইখানি সকল পাঠকের কাছেই সমাদৃত হবে। ছাপা, বাঁধা ও প্রচ্ছদপট উচ্চাঙ্গের। প্রকাশ মহল। ৬ বঙ্গিম চাটাজী ট্রাট্‌ছ কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

#### চীন থেকে ভারত

পৃথিবীর বহু দেশ থেকে পর্যটক এসেছেন এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। হিউয়েন চোয়াং এসেছিলেন চীন থেকে ভারতে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সুপণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য হিউয়েন চোয়াং এর লিখিত বিবরণীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে আমার অভিনন্দন জানান। এই অতিথ্যাত চৈনিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পৃথিবীর অসংখ্য ভাষায় ইতিপূর্বেই অনূদিত হয়েছে। ভারতীয় ভাষার মধ্যে এই প্রথম ভাষান্তর হয়েছে বাঙালী। হিউয়েন চোয়াং ধর্মসন্ধানী ছিলেন, ভারতে বৌদ্ধধর্মের কঠিকলাপ দেখে তিনি বিমোহে লুপ্ত হয়েছেন বলে বারে। চীনা পর্যটকের সেই কঠকর তীর্থ পরিভ্রমণ বৌদ্ধত্ব সংগ্রহের প্রচেষ্টা লক্ষ্যগায়। হিউয়েন চোয়াং ইতিপূর্বেই তথ্য জানাতে কোথাও কোথাও ভুল করলেও, তাঁর বিবরণে পর্যটকের সহিষ্ণুতা আর অধ্যবসায় পরিদৃষ্ট। এই বিবরণ আমাদের কাছে সত্যি এক মূল্যবান দলিলস্বরূপ। গ্রন্থখানির ছাপা, বাঁধা ও প্রচ্ছদ প্রথম শ্রেণীর। শিল্পী হৈমন্তী সেনের অঁকা প্রচ্ছদচিত্র অভিনবদের দাবী করতে পারে। কলিকাতা পুস্তকালয়। ৩, ডামাচরণ দে ট্রাট্‌ছ, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

# ব্যক্তিত্বে রামেন্দ্রশুন্দর

শ্রীঅকয়েন্দুরায়ণ রায়

জামার গিদিয়া অর্থাৎ রামেন্দ্রশুন্দর ত্রিবেদীর মাকে আমরা ডাকতাম পদ্মা-মা নামে। একদিন গল্পছলে জিজ্ঞেস করলাম—পদ্মা-মা! আমার বড় মামার ছেলেবেলা থেকে কী খুব বুদ্ধি ছিল? তখন থেকে কী মামার পড়ার খুব মন ছিল?

—বখন পাঁচ বছর বয়স রামের, হাতে খড়ি নিলাম। তখন তার কথা ভাল হয়ে যুথ থেকে বাব হয়নি। কাপড় ভাল করে পরতে দেখিনি। তখন তার বাবার বললেন—আর এক বছর থাক, তার পর পড়া ধরায়ো। হ' বছর বয়সে তার বাবা তাকে পড়াতে আরম্ভ করলেন। ঠিক দু দিনেই প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ শেষ করলে। আশ্চর্য্য হয়ে রামের বাবা বললেন—এ ছেলে জ্ঞাতিম্বর! আগে জন্মে সব শেষ করে এসেছে। তখন খুশী দেখে কে আমাদের!

বাড়ীতে তখন ঐ একটা ছেলে রাম। তার তখন খুব আদর। বাবা ছেলেকে পড়িয়ে এসে বলতেন—ও ছেলেকে ত আর আমরা পড়াতে পারি না। ও ছেলে জিজ্ঞেস করছে—“ম” কে “যো” বলছেন। মরণ এর উচ্চারণ মারণ। মরণ বলবো কেন বুঝিয়ে বলুন!! কী উত্তর দেবো জেব পাই না। অন্নপা পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞেস করেও কোন উত্তর পেলো না ছেলে।

তখন তার বাবার চম্বী ক'রে দিলেন রামা নবরঙ্গনারায়ণ ইকুলে। অন্নপা পণ্ডিতের হাত দিয়ে বলে দিলেন এর উপর নজর রাখবেন।

সাত-আট বছর বখন রামের, তখন ইতিহাস পড়াতে লাগলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য সে সব বীর প্রাণ দিয়েছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁদের কথা বলতেন। রাম তখন যেন গিলে খেতো। রাম তার বাবা উঠতে চাইলে উঠতে দিতো না। বলতো—আরও বলুন! তার বাবা কখন কখন জিজ্ঞেস ক'রে বুঝে নিতেন ছেলের মনে আছে কিনা। খুশী হতেন ছেলের বলা শুনে।

আমরা কোন কোন দিন পির দেখতাম, রামের বাবার ছেলে পড়ান। সে যেন একটা কী ডক্টর! হাত নড়ছে বাবার জোরে জোরে। সমস্ত শরীর দিয়ে খাম বেরুচ্ছে। ছেলের চোখে জল। আমবাও তখনতে তখনতে অস্থির হয়ে উঠতাম। ছেলে অর-পারে ইকুল এসে কাঁপছে। অন্নপা পণ্ডিত জিজ্ঞেস করলেন—তুমি অর-গারে কেন রাম? উত্তর এলো ও এখনি ছেড়ে বাবে পণ্ডিত মশায়। তখনই ধরে এনে আমাকে দিয়ে গেলেন। আমি বললাম—রাম অর-গারে ইকুল যায়? তখন রাম বা বললে শুনে হেসে বাঁচিলে। ঠিক যেন বুড়ো—আমি নতুন বাটির ঘাস কাটবো না কি? একটু আর শুয়ে থাকবো কেন? হাজার বাবারা বললেও শোনে না, ইকুল বাবেই।

খুব গল্প বয়সে রাম আঁক কবতো খুব ভাল। পদ্মা-মা জিজ্ঞেস ক'রলেন—হা রে। আঁকের সঙ্গে আর একটা কী পড়া হয়? বললো জ্যামিতি। ঐ জ্যামিতিতে পণ্ডিত দিকেও হারিয়ে দিতো।

পণ্ডিতরা এসে বাবুদের কাছে গল্প করতেন। রাম জানতে পারলে পণ্ডিতদের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে ব'লতো—আমার বিত্তা ত আপনাদের কাছেই। এই বকম শুদ্ধ কথা শুনে তার বাবারা হেসে খুন।

রামের বাবা জ্যোতিষী বিজ্ঞায় বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ঠিক সন্ধ্যা লাগলেই মাহুরের উপর ব'সে বুঝাতে লাগতেন। আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে—ঐ দেখ ছায়াপথ। ঐ উত্তর দিকে আছে প্রব নক্ষত্র। ঐ এখানে সন্ধ্যা তারা উঠে। আর সব মনে পড়ছে না ভাই! যা দেখিয়ে দিতেন একটা যদি তুল চ'কো রামের। সেই দেখে তার বাবার খুশী কতো।

কখন কখন ছেলের বাবা শিক্ষা দিতেন—কখন চুরি ক'রে ভাল করে, পাশ করবার চেষ্টা করবে না। মন দিয়ে পড়বে। পড়ার সময় কখন কাঁকি দেবে না, তাহলে নিজেই কাঁকি পড়বে। এ সব কথা রাম মনোযোগ দিয়ে শুনতো।

একদিন রামের বাবা ছেলেকে সন্ধ্যালের দিকে খেলা করতে দেখে ভাবলেন—এবার ছেলের সব শেষ। এতো মনে করলাম কতো ভাল হবে!! তুংহ ক'রে ছেলেকে বললেন—এই সময় কী খেলার রাম? আমি তোমার উপর অনেক ভরসা ক'রেছিলাম। রাম কাঁড়িয়ে থাকলো চুপটি ক'রে। মুখে কোন কথা নাই। তখনই রাম বাবার পায়ে উপর পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলো, বাবা! আপনি পরীক্ষা নিয়ে দেখুন পড়া শেষ ক'র গিয়েছি কি না। তখনই বাবা পরীক্ষা নিয়ে জানলেন, ছেলে সত্যি পড়া ক'রে খেলে বেড়াচ্ছে। তখন তার বাবা খুশী হ'য়ে ন বছরের ছেলের কাছে নিজে ক্ষমা চাইলেন। আর বাবে কোথা! রাম বাবার পায়ে উপর প'ড়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো—আর ব'লে চ'ললো বাবা! আপনি ক্ষমা কথা তুলিয়ে নেন। কী করেন, বাবাকে তখন রামকে কোল তুলে নিয়ে ব'লতে হলো—তুলিয়ে নিলাম বাবা! সেই কথা এসে বলেন রামের বাবা আর হাসেন। এতো কম বয়সে ছেলেদের এমন বুড়ামি কথা কখনো শুনেছো!

আর কিছুদিন পরে মেকেজি সার্জে এসেন জেমা ইকুলে পরীক্ষা নিতে। তিনি এসে ক্লাসে জিজ্ঞেস ক'রলেন, কোন উত্তর পান না। তখন রামকে প্রশ্ন করলেন—গজাম কোথা বল ত থোকা? রাম উত্তর দিলো—মাত্রাজ প্রদেশের একটা জেলা। তার প্রশ্নান সহরের নাম কী?—বহরমপুর। তখন প্রশ্ন ক'রলেন সাহেব তোমাদের এই বহরমপুর আর ঐ বহরমপুর তফাৎ কী? তখন রাম বললে—আমাদের বহরমপুর মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান সহর আর ভটা হাজাজে। সাহেব খুশী হ'য়ে রামের পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন। বাব বাব প্রশংসা করে বলেন—তোমার মত একটা ছেলেও আমাদের চোখে পড়েনি। তুমি খুব মন দিয়ে পড়বে থোকা! সারা ভারতের মধ্যে একজন হবে।

রামকে দেখে মনে হ'তো আলা-ভুলো। তার কাছার ঠিক নাই। কিন্তু তার বই-পুস্তর ঠিক হানে থাকতো, একটু যদি নড়চড় থাকে।



## খানঃ কৃষ্ণা...

এমন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল যখন লোকে ঘি খাবার জন্তে ধার করতেও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অজ্ঞ কারণ ছিল। দুধ অমৃতের সমান আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা, দই, কীর। সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একেবারেই অপরিহার্য এ বিষয় কারো কোন বিধা ছিলনা। আর সত্যিই বিধা থাকবার কোন কথাও নয়। তখন সত্তাগড়ার দিন ছিল, ডাল টাটকা খাবার অপরিহার্য পরিমাণে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। দুধের সাধ যোলে মেটাবার কথা তখন উঠতোই না।

এখন দিনকাল বদলছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ পরিবৃত্ত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোসগল্প করছেন আর ভাসপাসা খেলছেন—এ এখন গল্পকথার দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আগিসে কিঞ্চি নিজের ধান্নায় ছুটতে হয়।

সত্যিই আজকের এই ডামাডোল আর মাগ্নিগণ্ডার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি হুহুহু কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বই-খাতার খরচেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়েই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার তুলনায় খামেলা বেড়েছে খাটখাটুনি ও হুশিহুশিও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আধপেটা খেয়ে থাকা নয়তো নিকৃষ্ট বা ভেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা ওষুধ পত্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টির স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর কর্তার,

গিরীঠাকুরদের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সুতরাং কখন কখন ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা সোজা দৃষ্টান্ত ধরা বাক। আপেল। আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজীতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে যোজ্ঞ একটা করে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে ঘরে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ জুম্বা, তাই কখনেই বা রোজ আপেল খেতে পারে বলা? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোমাটো, বাকো আমরা বিলিভী বেগুন বালি, বা কলা—আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঘি। খাঁটি টাটকা গাওয়া ঘি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্তে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাঁটি ঘি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। ডালডায় খরচ কম আর ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী। একথা জানুন কি যে ডালডা ও খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে একই পরিমাণ ভিটামিন 'এ' আছে। ভিটামিন 'এ' শরীরের বাড়ের জন্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্তে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন 'এ' স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন 'এ' যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন 'ডি' ও দেওয়া হয়। ভিটামিন 'ডি' ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন 'ডি' দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাঁটি ভেজাল তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদা শীলকরা টিনে খাঁটি ও তাজা পাবেন। এই সব কারনেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনস্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই টিন দেখে কিনবেন।

কেউ হাত দিয়ে এবার ওবারে রাখলে রক্তে নাই। কেঁদে আকুল। কেউ বিয়ে দুটো চারটে পয়সা দিতো বামকে, আমার কাছে বেখে দিতো। হিসাব তার ঠিক ঠিক রাখতো। দু পয়সা তা থেকে খরচ ক'রলে অনেক বলে ছেলেকে বুঝাতে হ'তো।

মামার খেলার কোন সখ ছিল কি না পদ্ম-মা? জিজ্ঞেস করতেই বললেন—ছেলেদের মত দৌঁদৌঁড়ি ক'রতে কখন পারতো না। ব'সে ব'সে মাটিতে দাগ কেটে—বাঘবন্দী না হয় ছক্কা পজা খেলতো। বাবারা বলতেন—ও সব খেলা ভাল নয় ছেলের। আমাদের দিয়ে বলাবার চেষ্টা ক'রতেন। বললে শুনতো না রাম। এই শুনে তার বা নিজে একদিন ব'ললেন। সেই থেকে বাঘবন্দী খেলা করতে আমি জীবনে দেখিনি। তোমরা বড় হয়ে ত দেখেছো তাস খেলতে তোমাদের মায়েরদের সাথে, জিতলে কী খুদী! যেন ছেলেমাছ। এ তো তোমাদের নিজের চোখে দেখা।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার রাম প্রথম হয়ে পাশ ক'রলো। সে কী ধুম তখন বাড়ীতে। ছেলের বাবা ও ছোট-বাবা অনেক ভুল্ললোক ও রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে নতুন বাড়ীতে এনে খাওয়ালেন। রাজা এসেই ছেলেকে ভাল করে দেখে বললেন—বাসুসাহেব! তোমার এই ছোটটি আমার ভ্রাতা রাখিবে। এর বিয়ে দেবো ইন্দুর সঙ্গে। রাজার ছোট কস্তুর নাম ইন্দুপ্রভা। ছেলের বাবা বললেন—এ তো আমার ভাগ্যের কথা। এতো বড় মুকুটি আর কোথায় পাবে? আমাদের বাড়ীর সামনে যে ফুলবাগান আছে, এটা ক'রেছে আমার ছেলে রাম আর তার ছোট-বাবা উপেন্দ্র বাবু। দু'জনে বসে কত পরামর্শ। তার ছোট-বাবা ত বলতো রামের পরামর্শ নিয়েই ত বাগান তুলেছি। কেও জল দেবার না থাকলে ছোট বালকটি করে সে নিজেই ছোট হাতে জল তুলেছে! কখন বলছে ছোট-বাবা, এবার কামিনী গাছ ছ'টিতে হবে। তখন দেখেছি সত্যি এত দিন কাটা উচিত ছিল।

পদ্ম-মা! মামা রাত-দিনই পড়তেন? না জীবন্ত নিয়ে কখন কখন থাকতেন? হেসে পদ্ম-মা তুষার আরক্ত করলেন—রাম বাড়ীতে ঢুকলে, দুটো রাজহাঁস বাড়ীতে ছিল ডাকতে লাগলো। যেন তারা কতো রামের বন্ধু। সকলকে পায়ে কামড়ে ধরতো। কেবল তার সঙ্গে খেলা করতো। দুটো ভাত হাতে করে কেবল দিতো। আমরা নবাবের সময় শিবা ভোগ দিতে গেলে রাম পিছু পিছু সঙ্গে যেতো, হাঁ করে চেয়ে দেখতো কখন শিবা-মা এসে খাবে। তখন জিজ্ঞেস করতো বুড়ার মত—শেখালকে তোমরা শিবা-মা বল কেন? কী উত্তর দেবো ভেবে পেতাম না। হাসির কথা বলি শোন—একটা কুকুরের নাম দিয়েছিল রাম কালটা। নিজে দুখ না খেয়ে সেই কালটাকে খাওয়াতো। তার মুখে চুমো খেতো রাম। দেখে তার বাবারা হুঃখ ক'রে বলতেন—হাঁ রাম! তোমার ঐ কুকুরটা কী ভাই? নিত্য গিয়ে রামকে রেখে আসতো! ইহুলে আবার নিয়ে আসবার সময়ও কালটার ঠিক জানা ছিল। কী আশ্চর্য! রাম শিক্ষা দিয়ে বলতো—কালটা

কখন ভাত খাবি না হেসেলে ঢুক। নিত্য রান করে এসে ভাত খাবে, বেশ! শুনতো ও রামের কথা। একদিনও হেসেলে মারেনি। নিত্য রান ক'রে এসে ভাত খেতো। সেই কালটা মলে কী রামের হুঃখ! দুদিন ছেলে ভাত ছ'লো না, ইহুলে গেল না। তার পর রাম ব'ললে—আমি আর জীবনে কুকুর পুষবো না। সেই থেকে কিন্তু কুকুর আর পোষেনি রাম।

বাড়ীতে ইংরাজী কয়েক দিন পড়িয়ে কান্দীর ইহুলে ভর্তি ক'রে দিলেন রামকে। তার বাবারা হেড মাষ্টারের হাতে দিয়ে বললেন—ছেলেকে দিয়ে গেলাম একটু দেখবেন। সে বার রাম ভাল ইংরাজী জানতো না বলে দ্বিতীয় হলো, তখন আমাদের নতুন বাড়ীতে মরা কাল্লা—ছেলে বলল, এবার দেখবেন, আমি কখন আর সেকেও হবো না।

তার পর থেকেই পড়া কেমন জিনিষ দেখিয়ে দিলো রাম। দিন নাই রাত নাই পড়া। ভালুকের বাজি হচ্ছে, কতো ছেলে হাজির সদর আঙনেন্তে। তখন রাম পাঠে নিরত। বাবারা থিয়েটারের বিহার্সাল দিচ্ছেন। ঘর-বাড়ী শুষ্ক-শুকন করছে বাজনার আওয়াজে, ছেলের খেয়াল নাই, ঘরে ব'সে কেবল পড়া। সেদিন বাবাদের থিয়েটার, ছোট-বাবা ছেলেকে নিমন্ত্রণ করলো রামকে তবে রাম সেখানে উপস্থিত হলো। একদিন তার বাবা গিয়ে দেখেন কী বই পড়ছে ছেলে। দেখে অবাক! বত সব কঠিন বই সাহেবদের তখন থেকে রাম আর দ্বিতীয় হয় নি। সে বরাবর প্রথম হয়ে উঠেছে।

রাজা আর থাকতে না পেরে নিজের ছোট মেয়ে ইন্দুপ্রভা সঙ্গে বিয়ে দিলেন রামের। বৌমা এসেই দেখলো আর এ রাক্ষসে মারা গেল। তিনি মরবার সময় ব'লে গেলেন—আঁ একজনকে দিয়ে গেলাম। তখন রামের বয়স চোদ্দ বছর হেডমাষ্টার বলেছিলেন—এবার ছেলের মাথা খাওয়া গেল আর পড়া হবে, না ছাই হবে। প্রথম শ্রেণীতে উঠে রামের চক্ষু স্থির! তার বাবা মারা গেলেন। তিঁ শুধু বাবা নন তার, বন্ধু তার; খুব আশনার জন তার, খেলা সাথী। রাম একেবারে ভেঙে পড়লো। পড়া ছেড়ে দিয়ে রিম হা ব'সলো। তখন কতো বোঝায় তার ছোট-বাবা উপেন্দ্র বাবু ছেলে কি বোঝে! তখন উপেন্দ্র বাবু ছেলের মাথার হাত বুলি ব'লতে আরক্ত করলেন—দেখ বাবা! তোমার বাবা ব'লে গেয়ে তুমি ভাল হয়ে পাশ করবে, মাছুষ হবে। সে কথা মনে আছে ও আজ স্বর্গ থেকে তিনি সব দেখছেন। তুমি না পড়লে তি কীদবেন। তুমি তাঁর ছেলে হয়ে তাঁকে কষ্ট দেবে!! তখন র যেন ঘুম থেকে উঠলো। সব জড়তা বেড়ে আবার পড়তে আ করলো সেই আগেকার দিনের মত। সে বার পরীক্ষা দিয়ে সা চেয়ে ভাল হলো। বৃত্তি পেলা সাকলের চেয়ে বেশী।

রামের চোখে জল। সেই দেখে বাড়ী শুদ্ধ সকলে বে উঠলো। হয় তো মনে পড়েছে বাবার কথা! [ ক্রমশ





## রাগসঙ্গীতে সময়

### শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীতের সঙ্গে সময়ের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শিল্পীগণ সচেতন। তাহা সঙ্গীত-শাস্ত্র গ্রন্থগুলি দেখিলেই বুঝা যায়। 'সঙ্গীত' শব্দে এক্ষেত্রে আমরা কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত উল্লেখ করিব। শিল্পীর উপলব্ধিই শাস্ত্রকার শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কাজেই এই উপলব্ধির মূলে কোন বাস্তব তত্ত্ব নিহিত আছে কি না তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। কোন ওস্তাদ গায়ক অথবা বাদককে যদি ভিজ্ঞান করা যায় "প্রাতঃকালে কেন বেলাগ রাগ গাওয়া হয় না বা যায় না—অথবা সাংকালেই বা কেন ভৈরবী গাওয়া হয় না?" তাহার উত্তরে তিনি হয়তো বলিবেন—(১) "শাস্ত্রের বিধান নাই," অথবা (২) "শাস্ত্রের বিধান মাত্র আমরা মানিয়া চলি, কারণ বলিতে পারি না"—অথবা (৩) অত্যধিক পৌড়াপীড়ি করিলে হয়তো বলিবেন (৪) "ও সব শাস্ত্রের মর্ম আপনারা বুঝবেন না।" কোন কোন ওস্তাদকে আমি বলিতে শুনিয়াছি—"কেন গাওয়া বাইবে না, নিশ্চয়ই যায়। আমি ও সব শাস্ত্রের বিধান মানি না।" কলিকাতার কোন বিশিষ্ট (রাগ) সঙ্গীতজ্ঞ আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "কেন গাওয়া বাইবে না? যায়। প্রাচীন কালে শাস্ত্রকারগণ অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ছিলেন, তাই ওই সকল কাল্পনিক নিয়মে সঙ্গীতকে শৃঙ্খলিত করিয়া গিয়াছেন। সাংকালে কেন ভৈরবী গাওয়া বাইবে না, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।"

বুঝিলাম যে শাস্ত্রের অকুক্ষণ নব্যোপাখ্যায়ের মতই তাঁহার মত। কখনো ভাবিয়া দেখিবার মত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, একই ব্যক্তি প্রভাতকালে "ভৈরবী" রাগে তাঁহার যে কৃতিত্ব দেখে ইতে পারিবেন, সাংকালে তাহা কেন যে পারিবেন না; অথবা রাগ আশাহুরূপ অথবা অবিক মনোরঞ্জন হইবে না—তাঁহারই বা কি কারণ থাকিতে পারে? অথচ শাস্ত্রকারগণের মতও উপেক্ষণীয় নহে। বাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণমোহনই যদি রাগের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে আমরা বলিব যে স উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হওয়া সম্ভব। শাস্ত্রেও নিয়মের প্রতিক্রম উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। নারদ-সংহিতার আছে—'বলকৃষ্ণো নৃপাঞ্জয়া কালদোষো ন বিদুতে।' নাঃ সঃ অর্থাৎ বলকৃষ্ণমতে এবং বাজার আজায় কালদোষ থাকে না।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কোন সময়েই যে কোন রাগ গাওয়া অথবা বাজানো বাইবে। এই জন্মট যোগ হয় নিয়মালঙ্ঘনকারী গায়ক বাদক অসময়ে কোন রাগ গাহিতে বা বাজাইতে হইলে শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সেই রাগ গাহিবার বা বাজাইবার অনুযোজ্য করিতে বলেন। তাহাতে দোষ দণ্ডিত হয়, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। সঙ্গীত-মকরন্দে নারদ অসময়ে কোন রাগ গাওয়াকে ক্ষতিকর (পাপ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"এবং কালবিধি জ্ঞাতা গায়েৎ যঃ স মুখী ভবেৎ।

রাগা বেলো প্রগানেন রাগাণাং হিংসকো ভবেৎ।

যঃ পূর্ণাতি স পরিত্রী আয়ুঃ প্রাপি সর্বদা। সঃ যঃ

এইরূপ কালবিধি জানিয়া যিনি গান করেন তিনি মুখী হন। নির্দেশিত ব্যতীত অন্য সময়ে কোন রাগ গাহিলে রাগগুলি হিংসাপ্রবণ হয়, এবং বাঁহারা শ্রোতা তাঁহাদের আয়ু নাশ হয়। এরূপ একটা অভিশাপের ভয় নারদ কেন দেখাইলেন তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

সঙ্গীতনির্ণয় রচয়িতার মতে দেশভেদে কালনিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইতে পারে।

"এবং বহুবিধচার্য্যগণ-কাল সমীকৃতঃ।

যস্মিন দেশে যথা শিষ্টৈর্গীতং বিজ্ঞস্তথাচার্য্যঃ। সঃ নিঃ

পণ্ডিতগণের দ্বারা এইরূপ বহুবিধ গানের সময় বর্ণিত হইয়াছে। বিজ্ঞব্যক্তির যে দেশে গীতের যে রীতি তাহাই পালন করা উচিত।

রাগতত্ত্ববিগ্ণবর্তী লোচন বা (দ্বারভাঙ্গা) এ বিষয়ে তাঁহার উপলব্ধি—বাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসনযোগ্য। তাঁহার মূল তথ্য আমরা পরে আলোচনা করিব। গায়ন-বাদনের কালনিয়মের ব্যতিক্রমের উল্লেখ তিনি বলিয়াছেন :—

দশদণ্ডং পরং রাত্রৌ সর্বথা গানমীকৃতম্।

রত্নভূমৌ নৃপাঞ্জয়াঃ কালদোষো ন বিজ্ঞতে। রাঃ ভঃ

দ্বিতীয় চরণটি নারদসংহিতার—ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। লোচনের মতে দশ দণ্ড রাত্রি অতীত হইলে যে কোন রাগ অথবা গান গাওয়া বাইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য খুব সম্ভব ইহাই হইবে যে, জ্যোতিষ-শাস্ত্র মতামুসারে শুক্রই সঙ্গীতকারী গ্রহ এবং রাত্রি দশ দণ্ড হইতে শুক্রের অধিকৃত সময় অর্থাৎ তৎকালে শুক্রের প্রভাব বলবতী হয় এবং যে কোন রাগই গাওয়া অথবা বাজানো গায়ক-বাদকের পক্ষে সহজসাধ্য হয় এবং আশাহুরূপ মনোরঞ্জনকও হয়।

অথবা ইহাও সম্ভব যে, এই সময়ে নৈশ-নিদ্ৰাকৃত সঙ্গীতচার বিশেষ সহায়ক।

কতকগুলি শব্দের (নাদ) সাহায্যে বিশেষ বিশেষ স্বর রচনার দ্বারা শ্রোতৃমনের একটি বিশেষ ভাবকে জাগাইয়া তোলাই শিল্পীর কাম্য। নানাবিধ ও অভিনব শব্দব্যঞ্জনার সাহায্যে শ্রোতৃচিন্তকে অভিজুত করাই সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে সময়ের সাহায্য প্রয়োজন—এ কথাই বা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? কারণ, প্রভাত কালের মনোভাব ও সায়ংকালের মনোভাব একরূপ হয় না—হইতেও পারে না। সারারাত্রি ব্যাপী বিশ্রামের শেষে প্রভাতে মনে যে শান্ত, উদার গভীর ভাব বিরাজ করে, কৰ্ণক্লান্ত দিব্যাসনে ঠিক সেইরূপ মনোভাব থাকে সম্ভব নহে।

সকলেই হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, রাগসঙ্গীতের শব্দরচনার রাগ যেন কিছু বলিতে চায়। এইরূপ একটি গূঢ়ভাব স্বর-রচনায় নিহিত থাকে। সৃষ্টির আদিকাল হইতেই মানবে মানবে, মানবে মানবীতে, মানবে প্রকৃতিতে—একটি চিরন্তন যোগাযোগ চলিয়া আসিতেছে। সঙ্গীতের উদ্দেশ্য শব্দের সাহায্যে তাহারই আভাস মানব-মনে জাগাইয়া তোলা। এইরূপ দেখা যায় যে, মাত্র কয়েকটি স্বরের মোড়েই কোন্ এক অজ্ঞাত জনমের স্মৃতি যেন মনকে আলোড়িত করিয়া দেয় তাহাকে স্থান ও কাল (Time and Space) সীমার বাহিরে কোন্ এক অজ্ঞাত স্বপ্নময় জগতের আভাস দেয়।

রাগসঙ্গীত ব্যবহারের সময়, ঋতু ইত্যাদির নিয়ম যে নিতান্তই ভিত্তিহীন তাহা আমরা স্বীকার করি না। বসন্তকালে ‘দেব’ অথবা মন্দির গাহিলে কি ভাল লাগে না? লাগে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু বর্ষা ঋতুতে গাহিলে মন বেরূপ বিবশ, বিহ্বল হয়, তেমনটি বোধ হয় অল্প ঋতুতে হয় না। কারণ শিল্পীর নিজেরই আশ্রয় ভাবটি ফুটাইয়া তুলিতে বিলম্ব হয়। শাস্ত্রকারগণ শিল্পীর অজ্ঞিত উপলক্ষ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, পূর্ববর্তী কালের শিল্পিগণের কলাকৌশল সহজেই সিদ্ধিলাভ করত পারে এবং রাগাভিব্যক্তি উত্তরোত্তর সহজসাধ্য হয়। সায়ংকালে ভৈরবী গাহিলে যে ভাল লাগে না তাহা নহে, কিন্তু রাগ যে মনোভাবটি জাগাইয়া তুলিতে চাহে সেই প্রচেষ্টা বোধ হয় সম্যক সফল হয় না। সুমার্জিত স্মৃতি কঠোরের সাহায্যে গাহিলে অথবা দীর্ঘ অভ্যাসের অভিজ্ঞতার বাজাইলে যে কোন রাগই যে কোন সময়ে মনোরঞ্জক করা সম্ভব। কিন্তু রাগের, ‘আত্মকাহিনী’টি খুব সম্ভবতঃ রাগের বলা হয় না। ভাল লাগাই যদি মাত্র কাম্য হয়—তাহা হইলে সময়ের দিকে দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন সুগায়ক-বাদকের পক্ষে অতি অল্পই থাকে। কিন্তু রাগ যে নিজের আত্মকথা শুনাইয়া মনোরঞ্জন করিতে চাহে—তাহাতে সুসময়ের প্রয়োজন—একথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? অর্থাৎ যে কোন সময়েই যে কোন রাগ কুশল শিল্পীর পরিচালনার মনোরঞ্জক হইতে পারে কিন্তু পূর্ণভাবটি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলিয়াছেন, “ইস শাস্ত্র নিয়মক আশ্রয় ইতনা হী সমকনা চাহিয়ে কি নিয়মিত রাগ নিয়মিত সময় পর আপনা আপনা প্রভাব অধিক সম্ভাব্যপ্রদ রীতি সে ব্যক্ত কর্তে

হৈ।” এই শাস্ত্র-নিয়মের তাৎপর্য এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, নিয়মিত সময়ে গাহিলে অথবা বাজাইলে রাগ আপনা হইতেই সম্ভাব্যজনক ভাবে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। অল্প সময়ে রাগের সূত্র প্রকাশের জন্য শিল্পিগণকে কিঞ্চিৎ প্রচেষ্টার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

পক্ষান্তরে, রাগ গাহিবার যে সময় নির্দেশিত হইয়াছে তাহা মানিয়া চলিতে গেলেও নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, রাত্রিকালেই অধিকাংশ সঙ্গীতচর্চার ব্যবস্থা হয়, সময়ের নিয়ম মানিয়া চলিলে অল্প সময়ের রাগগুলির আলোচনা ও চর্চা সম্ভব হয় না। বাঁহারা আসরে গান গাহিয়া বোলগার করেন, তাঁহাদেরও অল্পকক্ষ হইয়া রাগ গাহিতে হয় বলিয়া রাগের সময়-নিয়ম পালন করা সম্ভব হয় না। হয়তো অপরাহ্নে আসর বলিলে ‘মালকৌশ’ বাহা তৃতীয় প্রহর রাতে গাহিবার সময় নির্দেশিত হইয়াছে, গাহিতে অসুযোগ করা হইল। শিল্পীর পক্ষে সে অসুযোগ উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। কারণ জনপ্রিয়তা তাঁহার ব্যংসয়ের পক্ষে উৎসাহক করা সম্ভব হয় না। কারণ শাস্ত্রকর্তাগণ বিশেষ চিন্তা করিয়া রাজ্যজায় নিয়ম লঙ্ঘন করা বাইবে বলিয়া নিয়ম কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়াছেন। রাজ্যজায় কালকাল বিচারের প্রয়োজন নাই—অর্থাৎ তাহা না করিলে না খাইয়া মরিতে হইবে।

রাগসঙ্গীতে সময়ের যে বিধি-নিয়ম বন্ধ করা হইয়াছে তাহার ভিত্তি কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সে বিষয়ে রাগতত্ত্ববিদগণ রচয়িতা লোচন পণ্ডিত এমন একটি তথ্য আমাদের দিয়াছেন বাঁহারা অল্প সঙ্গীত জগৎ চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তাহা এই—

“বধাকালে সমারন্ধং গীতং ভবতি বন্ধকম্”

অন্তঃ স্বরস্বনিয়মায় রাগেহপি নিয়মঃ কৃতঃ। রাঃ তঃ

বধাসময়ে—অর্থাৎ শাস্ত্র নির্দেশিত সময়ে আবদ্ধ করিলে গীত অধিক মনোরঞ্জক হয়—কারণ স্বরের ব্যবহারের নিয়মামুসারেই রাগ গাহিবার সময় নির্দেশিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন্ রাগে যে স্বরগুলি (বানী, সম্বাদী, বিবাদী, অম্ববাদী) ব্যবহৃত হ তাহাদের অল্প অর্থাৎ অল্প ব্যবহার এবং বহুস্বরের অর্থাৎ বহুল ব্যবহারে উপর ভিত্তি করিয়া সেই রাগ গাহিবার সময় স্থির করা হইয়াছে পণ্ডিতের (লোচন) বলিবার উদ্দেশ্য খুব সম্ভবতঃ এই যে, সব সময়ে সব স্বরের বহুল ব্যবহার ভাল লাগে না ও আশাহুরূপ মনোরঞ্জক হয় না। দিন ও রাত্রির বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ স্বরে ব্যবহার অন্ত্যন্ত স্বাভাবিক হয় এবং সেই স্বরগুলির ব্যবহারে তথ্য হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। বিশেষ বিশেষ ভাব ও রসের অভিব্যক্তি অল্প বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই শব্দগুলি কোন নির্দিষ্ট নিয়মে রচনা করিয়া রাগরূপ সৃষ্টি করা হইয়াছে দেখা যায় এ নিয়মে রচনা প্রকাশের সময়ে একটি ভাবের অথবা রসের অল্পভূমি সেই জ্ঞাত রাগ প্রকাশের সময়ে একটি ভাবের অথবা রসের অল্পভূমি শিল্পী এবং শোভা উভয়েরই মনকে আচ্ছন্ন করে। কাজেই এই ৩ বা ভাবামুদ্রিত শাবিক স্বরূপ উপযুক্ত সময়ের উপরে নির্ভরশীল মনে করানিতান্ত্য অমৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

অধনঃ বা বাউক, স্বরের ব্যবহারের অল্প ও বহু অবলম্বনে রাগ প্রকারে রাগ গাহিবার সময় পার্থক্য করা হইয়াছে। মধ্যবজ্জ (সা দেবী সঙ্গীতে সর্বাধিকারী) প্রহল থাকে—এই জ্ঞাত সময়ের সহি

তাহার বিশেষ কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না। স্বরসম্পদকে দুই সমান অংশে ভাগ করিলে পূর্বাঙ্গ সা, রে, গা, মা ও উত্তরাঙ্গ পা, ধা, নি, সা এইরূপ দুইটি সমান চতুঃস্বরিক অবয়ব হয়। ইহাতে পঞ্চমের কার্য ও সাধারণতঃ বড় ভ্রমের মতই দেখা যায়। তথাপি অজ্ঞাত স্বরের বেগে পঞ্চম ও নানা প্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদক হয়। সাধারণ নিয়মে কোন রাগের বাদীস্বরকেই বহুত্ব দেওয়া হয়। থাকে—অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অধিক বার গাওয়া হয়। কিন্তু কৃশল ও অভিজ্ঞ শিল্পী রাগের প্রত্যেক স্বরকেই সমভাবে মণ্ডল (বাড়াইয়া) করিয়া থাকেন—তাহাতে রাগরূপের কোনরূপ অসঙ্গতি দেখা যায় না—উপরন্তু আবির্ভাব তিরোভাবাদি নানাবিধ বৈচিত্র্যাদায়ক নিয়মের সূত্র ব্যবহার হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা মালকৌশ রাগ লইতেছি। এই রাগে সর্বসম্মত ‘মধ্যম’ বাদী ও বড় সধাদী। কিন্তু গুণী শিল্পী সা, গা, মা, ধা, নি প্রত্যেক স্বরের উপরেই স্রাস করিয়া অভিনব কৌশলে রাগরূপ চুটাইয়া তোলে, এবং মধ্যমের অভিব্যক্তি ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। তবে ইহা সম্ভব যে, রাগের মুখ্য অঙ্গ বাদীস্বরকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইয়া থাকে। এই জ্ঞান বাদীস্বরের সহিত সময়ের অথবা সময়ের প্রভাব অনুসারে বাদীস্বরের নির্বাচন নিত্যন্ত অসঙ্গত না হইতেও পারে। শাস্ত্রের নির্দেশে বাদীস্বর ব্যতীত রাগের অজ্ঞাত মুখ্য স্বরগুলিকেও ক্ষণকালের জন্য বাদীত্ব দেওয়া হয় তাহাকে ‘পর্যায়রাশি’ বলে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে অশ্রু বা বাদীত্ব দেওয়া হয়।

বড় জ্ঞান মধ্যম ও পঞ্চম (পৃথিবীর) সর্বসঙ্গীতেই সমব্যবধানে অবস্থিত এই স্বরগুলি নিজেরা খুব বেশী বৈচিত্র্যাদায়ক না হইলেও সপ্তকান্ত অজ্ঞাত স্বরের সঙ্গতিতে বিবিধ অনুপ্রম, রক্তিদায়ক রচনার সহায়তা করে অবশিষ্ট স্বরগুলি অর্থাৎ রে, গা, ধা, নি, উচ্চনীচতায় (pitch) এ পরিবর্তনশীল বলিয়া মার্গদর্শক স্বর নামে অভিহিত হয়। এই মার্গদর্শক স্বরগুলির উচ্চনীচতার পরিবর্তন সময়ের উপর নির্ভরশীল বলিয়া মনে হয়। প্রচলিত রাগগুলির স্বর রচনা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন স্বর একটি বিশেষ সময়ে অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়। যেমন প্রাতঃকালে, বধন মন-ভাব শান্ত গভীর, ধীর থাকে তখন স্বভাব ও ধৈর্যের ব্যবহার সেই ভাবস্বরূপে বিশেষ সহায়তা করে এবং যে সকল রাগে এই দুইটি স্বর প্রবল থাকে তাহাই প্রাতঃকালে গাওয়া হয়। অথবা দিবসের প্রথম ভাগের রাগগুলিতে স্বভাব ধৈর্য প্রবল এবং গাঙ্কার নিবাস অশেপাকৃত দুর্বল রাখা হয়। ঠিক তজ্জন রাত্রির প্রথম প্রহরের রাগে গাঙ্কার নিবাস প্রবল ও স্বভাব, ধৈর্য অশেপাকৃত দুর্বল লক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত বেহুলে ধৈর্য প্রবল, কিয়ৎপরিমাণে নিবাসের বাহুল্য এবং বেহুলে স্বভাব প্রবল সেখানে কিঞ্চিৎ গাঙ্কারের বাহুল্য বৃত্ত: হইতেই আসিয়া পড়ে। প্রশান্ত গাঙ্কার্যের জ্ঞান স্বভাবের প্রয়োজন হয় বলিয়া শাস্ত্র ও গভীর প্রকৃতির রাগগুলিতে গাঙ্কার ও নিবাস বহুল থাকিলেও স্বভাবের বিশিষ্ট ব্যবহার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ শুদ্ধ মধ্যম দিবসের প্রথম ভাগে ও তীব্র মধ্যম সাংকালে অধিক ব্যবহৃত হয় দেখা যায়। দিবসের দ্বিতীয় ভাগ আসন্ন হইতেই কিছু তীব্র মধ্যমের ব্যবহার ও রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইতেই শুদ্ধ মধ্যমের ব্যবহার রক্তিদায়ক হয়।

রাগসঙ্গীতে রে, গা, ধা, নি এই স্বর চতুষ্টয়ের উচ্চনীচতার পরিবর্তন—সময়ের পরিবর্তনের সহিত একটি রহস্যজনক সম্বন্ধে

আবদ্ধ। যেমন ঠিক বিশ্রামে গাঙ্কার ও ধৈর্য বর্জিত বৃন্দাবনী সারং গাওয়া হয়। সূর্যোদয়ের পশ্চিমে হেলিতে আরম্ভ করিলে খুব নীচ কোমল গাঙ্কারে পীলু আরম্ভ হয়। বিশ্রামে গাঙ্কার পরিত্যক্ত ছিল। পীলুর পরেই আরও একটু উচ্চকোমল গাঙ্কারে ভীমপল্লী, ধানেশী পটনীর ইত্যাদি গাওয়া হয়। ইহার ঠিক পরেই আরও একটু উচ্চকোমল গাঙ্কারে মূলতানী—তখন সূর্যোদয়ের ভগ্নমগ লাল মূর্তি। সূর্যোদয়ের থাকিতে থাকিতেই শুদ্ধগাঙ্কার লইয়া পূর্বী আসিয়া অজ্ঞাত উদাস ভাবে কর্মজ্ঞান দিবসের অবসান ঘোষণা করিল। বীরে সন্ধা নামিয়া আসিল—কোমল স্বভাবের উচ্চতা আর একটু বাড়িয়া এবং তীব্রমধ্যমকে প্রবল করিয়া একটি গভীর মধুর অথচ যেন বেদনামুক্ত মনোভাব লইয়া পূরিয়া কিছুকণের জন্য আসন গ্রহণ করিল। ক্রমে সন্ধ্যার আভাস রাত্রির নিস্তরকার বিন্দীন হইতে লাগিল ও শুদ্ধ স্বভাব ও গাঙ্কার লইয়া ইমন অথবা কল্যাণের আবির্ভাব হইল।

এই রূপেই রাগ গাঠিবার নিয়ম স্বরের ব্যবহারের নিয়মের উপরে নির্ভর করে দেখা যায়। দিব্যরাত্রির যে কোন সময়েই গাওয়া হউক না কেন—ভীমপল্লী অথবা ধানেশীতে কোমল গাঙ্কার ঠিক উপযুক্ত উচ্চতায় লাগাইতে পারিলে নিশ্চয়ই অপরাহ্নের আভাস দিবে। “দাহুবা ব্লাই রে বদরিয়া” যে কোন ‘কৃত্তেই গাওয়া হউক না কেন, যদি গাঙ্কার ঠিক লাগানো হয় তাহা হইলে নিঃশব্দে বর্ষাকৃতুর আভাসে ও আমেজে মনকে আচ্ছন্ন করিবে।

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা  
খুবই স্বাস্থ্য-  
বিক, কেননা  
সবাই জানেন  
ডোয়ার্কিনের  
১৮৭৫ সাল  
থেকে দীর্ঘ-  
দিনের অভিজ্ঞ-  
জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার  
জ্ঞান লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লঃ

শো-রুম :—৮/২, এলগ্যান্ড ইস্ট, কলিকাতা - ১



କୌଣସି ସେବାସେବି । ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରବଣକାରୀ ବାଣୀ ।  
 ସଂଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରାମ ଶକ୍ତିକରଣ ବସ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ  
 କରଣେ ସଂଗ୍ରାମକାରୀ । ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀ. ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ, ମା  
 ସଂଗ୍ରାମକାରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ।

চিত্রপুত্রী • লিঙ্গম • জমোকা  
 ( লিঙ্গপুর ) ( জমোকা ) ( লিঙ্গপুর )  
 পারিকাত • যোজমায়া • চন্দ্রা  
 ( পারিকাত ) ( যোজমায়া ) ( চন্দ্রা )  
 শিকুয়া • শিবলী • মৈত্রী মৈত্রী  
 ( শিকুয়া ) ( শিবলী ) ( মৈত্রী )  
 শিবলী • শিবলী • মৈত্রী  
 ( শিবলী ) ( শিবলী ) ( মৈত্রী )  
 শিবলী • শিবলী • মৈত্রী  
 ( শিবলী ) ( শিবলী ) ( মৈত্রী )

## রাজার-রাজার

[ ২০৮ পৃষ্ঠার পর ]

জানলা থেকে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়ছে বজ্রবার মতো। গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি এসে নৌকার আশ-পাশে আছড়ে পড়ছে। কলকলিয়ে হাসছে যেন রাতের গঙ্গা। বেলিকে দু'চোখ বার শুধু জল আর জল। অন্ধকারে নদীর অস্ত্র তীর যেন অস্তিত্ব হারিয়েছে।

মরণপথের বাড়ীর মত চৌধুরাণীর মুখখানি রক্ত আর বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, চাঁদের আলোর স্পষ্ট দেখতে পায় ম্যাালেট। ভয় পেয়েছে, তাই হয়তো থেকে থেকে কঁপে উঠছে দেহলতা। ম্যাালেটের বাহুবন্ধনে বাঁধা ভবু।

—সাহেব, আমার বড় ভয় করছে।

কীণ কণ্ঠে কথা বললে আনন্দকুমারী। সেতাবে যেন এক অতি করুণ স্বর বাজলে।

চিবুক তুলে ধরলো ম্যাালেট। চৌধুরাণীর ভীক মুখ দেখতে দেখতে আবার হেসে ফেললো। বললে—ভয় নাই।

আনন্দকুমারী বললে,—বজ্রা এখানে থাকবে না। আমার ভয় করবে।

—ভয় নাই। ম্যাালেট আবার বললে হাসতে হাসতে। বজ্রার ভেতরে এক কোণে কি দেখিয়ে বললে,—ভয় কেন? বলুক আছে হামাদের।

কে কার কথা শোনে! আবার বাঘের গর্জন শোনা যায়। কেউ ডাকছে অবিদ্যায়। বস্ত্র জঙ্ঘমের বৃকে কম্পান লেগে গেছে। শিয়ালের পাল ছুটছে বাঘের ভয়ে। দূরে কোথায় ঢাক পিটছে কারা। বাঘ বেঁচিয়েছে, তাই জানিয়ে দেওয়া হয়। গেরস্থকে সাবধান করা হয়।

—বজ্রার দড়ি খুলতে বল' সাহেব! দোহাই।

আসন্ন মৃত্যুকে এড়ানোর জন্যই যেন কথাগুলি বললে আনন্দকুমারী। ভয়ে তার কণ্ঠ তকিয়ে গেছে। ঠকঠকিয়ে কঁপে উঠছে। হাত দু'টি যেন বরফ-ঠাণ্ডা।

বজ্রার এক প্রান্তে তোলা-উড়ান হলছে বাত। আগুনের আভা ছড়িয়ে। সাহেবের রাগা চেপেছে। সিপাইরা রাগার কাজে লেগেছে। দুধের পায়ে দুধ ফুটে টগবগিয়ে। খাঁটি গোছের স্বগন্ধ বইছে হাওয়ায়। দুধ নামলেই সজী সিন্ধ হবে। তারপর মাছ ভাজার পালা। একটা ভেটকী মাছ কিনেছে ম্যাালেট, হাট-বাজার থেকে। এক কুড়ি আশ কিনেছে।

গঙ্গার বৃকে ঠাণ্ডা বাতাস চলছে। চৌধুরাণীর আলুলায়িত রক্ত কেশের বাশি উড়ছে। চুলে চিক্কী পড় না কত দিন। এক কৌটা তেলও নয়। আনন্দকুমারীর এলোচুল তাই যেন কালো রঙ হারিয়ে সোনালী হয়ে উঠেছে। তার মাথার পর পর কয়েকটা চুমা খায় ম্যাালেট। আরও কাছে টেনে নেয় তাকে। বলে,—কোথায় বাবে বজ্রা?

ম্যাালেট মাঝে মাঝে সেনী ভাষায় কথা বলে। স্পষ্ট বাড়লা ভাষা বলে। ম্যাালেট ল্যাটিন, ইংরাজী, ফরাসী আর স্পেনের ভাষা জানে। কথা বাড়লা ভাষাও দিনে দিনে রপ্ত করছে। শুনে শুনে

শিখছে। যেটা জানে সেটা আওড়ায় যখন তখন। ল্যাটিন আর ইংরাজীর সঙ্গে বাড়লা ভাষার যোগসূত্র খোঁজে মনে মনে।

আনন্দকুমারী বললে,—এখানে থাকবো না আমি। কিছুতে নয়। আরও এগিয়ে চল'।

ম্যাালেট মিষ্টি হেসে বললে,—পটু'গীজ পাইরেটদের ভয় আছে ক্যানলে লুকিয়ে আছে ওরা। বজ্রা দেখলেই হামাদের এ্যাটা করবে। তখন আমরা মারা যাবো। বাঘ একা এ্যাটাক কা পাইরেট আসবে দল বেঁধে।

শিউরে শিউরে উঠলো চৌধুরাণীর শুক চোখের তারা। হু তার কথা ফুটলো না। ম্যাালেটের মুখপানে তাকিয়ে থাকলো উ পাখীর মত।

ম্যাালেট আবার হেসে হেসে বললে,—পটু'গীজরা হামা মারবে না ধরবে না। আনন্দকুমারীকে ওরা ছাড়বে না। কিড্'জ করবে।

চৌধুরাণীর ভয়ানক চোখ বন্ধ হয়ে যায় সহসা। নিজের মুখখ সে ম্যাালেটের বৃকে চেপে ধরে। সাদা মলমলের পাতলা ম্যাালেটের গারে। জিনের সাদা পায়জামা। সার্টির বোম খোলা। ম্যাালেটের বৃকে রূপার চেনে বাঁধা ছোট লকেট। শো ক্রশ, বীণের কাঠামো। চাঁদের আলোর সেই স্মৃতিচিহ্ন চির্ক করছে।

মুখ লুকিয়ে চুপি চুপি কথা বলে চৌধুরাণী। বললে,—সাত তুমিও তাই ক'রোছো। ইংরাজের সঙ্গে পটু'গীজের ত কোথায়?

এক বলক লজ্জা নামলো ম্যাালেটের শুভলাল মুখে। সহসা বললে,—বাই আই লাভ ইউ। আমি তোমাকে ভালবাসি। ওয়াই ইউ। আমি তোমাকে চাই।

নিশ্চুপ থেমে থাকলো আনন্দকুমারী। কতকণ কে জা ম্যাালেটের বৃকে কান পেতে শুনলো যেন তার অন্তরের ক ভালবাসার কথা শুনে মনে মনে কি যেন ডাবতে থাকলো। বস্ত্রটুকু পেয়েছে, তার হিসাব ক'বতে থাকলো যেন। কত দিয়েছে ম্যাালেট। ক'দিন আহার জুগিয়েছে। পরনের বস্ত্র দিয়ে ক'খানা। কত ভাল ভাল কথা শুনিয়েছে। বাজনা শুনিয়ে কাব্য আওড়েছে। চৌধুরাণী একেক সময়ে বুঝেছে, শুধু যে দখলের স্বখে নয়, ম্যাালেট যেন তাকে পেয়ে এক স্বর্গস্থল পেয়েছে—যাতে দেওয়া আর নেওয়ার পাখির আনন্দের লেশ নেই। দেশ থাকতে অনেক কুড়ি আর ফুল দেখেছে ম্যাা সাজানো কাননে বীথিতে ফুটে উঠতে দেখেছে। কিন্তু কো এক বিদেশ-বিড়ুইয়ে একটি বনফুল দেখতে পেয়ে অবহেলা ক পারলো না যেন। তাই তুলে নিয়ে রেখেছে বৃকের 'পরে।

—আমার শেষ পর্যন্ত কি গতি হবে সাহেব?

চৌধুরাণী কথা বললে হঠাৎ। হিসাব ক'বে কি বুঝলো কে ক পরিণাম জানতে চাইলো কেমন ভাড়া মনে। চোখ তুলে তাকাত চোখে যেন নেশার ঘোর। বললে,—ঘরে-বাইরে যোঁবাও যোঁ আমার ঠাই মিলবে না। মরণ ছাড়া আর গতি কি! কথার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ম্যাালেটের লোমশ বৃকে। তারপর আ বললে,—আমাকে ক'লে দিয়ে পালিয়ে যাবে তো?



—না, না। নেভার।

কথার আত্মবিক্রম মাথিরে বললে ম্যাগেট। শিবিলা বাঁধন কঠিন ক'রলো। চোখে কাতর দৃষ্টি ফুটিয়ে বললে,—আমি তোমাকে ছাড়বো না। নেভার ইন মাই লাইফ।

—সত্যি কথা? পুরুষকে বিশ্বাস নাই। চরকাক্ত আমাকে বিশেষ ফেলে পালিয়ে যায়।

—হাঁ, সত্য কথা। মেঘীর নামে বলছি। কালীর নামে বলছি। মাধার গডেশ, কালী।

—তোমার কে আছে?

—কেউ নাই হামার। কালীর ছিলেন, সেও মারা গেল।

—বোঁ নেই? জী নেই?

—না। টু মি হামার জী।

—দেশ কোথায়?

—ইংল্যান্ডে।

সব কিছু বেন জানা হয়ে গেছে চৌধুরাণীর। আবার স্বপ্ন নীরব হয়। চূপচাপ থাকে। মন্থর শ্বাস ফেলে একেকটা। বজ্রার আনন্ডে-কানন্ডে জলের ঢেউ আহুতানোর শব্দ শ্রুতি হয়ে ওঠে। চৌধুরাণীর উদ্ভক্ত কেশবালিতে হাতের কোমল পশম মূল্যায় ম্যাগেট।

—আমার মা আছে। বাবা আছেন।

অনেকরূপ খেমে থাকার পর আবার কথা বললে আনন্দকুমারী। ম্যাগেট সহানুভূতির সঙ্গে বলে,—হামি জানি।

চাঁদের ছায়া খেলছে নদীর জলে, সোজাগুজি। ছায়াপথ স্রষ্টা হয়েছেন বেন। জলের প্রোতে বিকিরিত কাঁপছে। ঐ সোনালী বিলিমিলিতে চোখ রেখে কথা বলছে ম্যাগেট।

—মাকে দেখতে ইচ্ছা হয়। কেমন আছে কে জানে?

চৌধুরাণী কেমন বেন কষ্টকাতর হয়ে কথা বলছে। বৈরাগী ভঙ্গিতে। বললে,—বাবা হেথায় নাই, স্ত্রীতাসুটি গোবিন্দপুরে গেছেন।

এবার নীরব হয় ম্যাগেট। সে কেবল শুনে যায় চৌধুরাণীর কথা। তার বেন কোন কিছু বক্তব্য নেই।

—আমার বজ্রার গমনা ছিল আমার গায়ের। তোমার সিপাই আর মাঝিরা, সাহেব সেসব লুটেপুটে নিয়েছে। ধানিক খেমে আবার বললে চৌধুরাণী,—বা গেছে তা বাক। আমি আর ফেরৎ চাই না। মায়ের সিন্দুক আমার আরও অনেক গরনা-অলঙ্কার আছে।

ম্যাগেটের মুখে কথা নেই। সার্টের আঙিনে কপালের ঘাম মুছলো একবার। চাঁদের বিলিমিলি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজের বুকে চোখ নামালো। চৌধুরাণী মুখ উঁচিয়ে বললে,—কোথায় নিয়ে চললে আমাকে?

—টুওয়ার্ডস স্ত্রীতাসুটি গোবিন্দপুর। ম্যাগেট বললে কেমন বেন গভীর হয়ে। বললে,—আই উইল গো টু মাই ওয়ার্কিং সেক্টার।

হঠাৎ বেন তুলে উঠলো বজ্রাখানা। জলের ঢেউয়ে টলমলিয়ে উঠলো। ম্যাগেট দেখলো আরও একখানি বজ্রা কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। আসছে এই দিকেই, তীরের কাছে। হয়তো নোঙর বাঁধবে।

ম্যাগেটের চোখে সভয় চাউনি। চোর, চুরি ক'রয়েছে, তাই তার ভয় পাওয়া। হয়তো বামাল সমেত প্রেক্ষাপ্ত করতে আসছে কারা। ম্যাগেট দেখে নেয় বনুকটা কোথায়!

মাঝি-সদার মুখে হ'কো খ'রে কথা বলে পরিহাসের সুরে। বললে,—সাহেব, বজ্রাখানা দেখো একবার। চক্ষু জুড়িয়ে যাবে।

ম্যাগেটের লক্ষ্য চলন্ত বজ্রার সঙ্গে সঙ্গে চলে। সাগ্রহে দেখে বজ্রার গতিবিধি; অনেক মাঝি-মাদ্রা বজ্রার দুই মুখে। বজ্রার ঘরে সারি সারি গবাক। ছাদে খোঁতগুড় বিছানা-তাকিয়া। মশাল জ্বলছে ছাদের মাথায়, স্রুউচ বাঁলের শীর্ষে। সেই আলোর দেখা যায় নৌকাপাড়ের নানা রঙের চিত্র-বিচিত্র। বজ্রাখানি ব্যাখ্যাত্মী।

আর বেন স্থির থাকতে পারে না ম্যাগেট। বাহপাশ আলসা হয়ে যায় ধীরে ধীরে।

বজ্রা এখনও পোহুলামান। জলের স্বাভাবিক ধারা বেন হঠাৎ ব্যাহত হয়েছে। চৌধুরাণীও মাঝি-সদারের কথা শুনে চোখ ফিরিয়ে দেখছে। উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আনন্দকুমারীর হাত ধরে তাকে বসিয়ে ম্যাগেট ঘরের বাইরে ধার মাখা নামিয়ে। চুরি করেছে ম্যাগেট, তাই হয়তো ভয় হয়েছে।

চোখের বেন পলক পড়ে না। চৌধুরাণীর লক্ষ্যে ধরা পড়ে ঐ

ফোন : ৩৪-৪৯০৭

Gv

বিবাহে যৌতুক  
দানের আনন্দ একান্তভাবে  
আপনার ; আপনাকে  
সেবা করার আনন্দ  
আমাদের।

**গিণি ভবন** সৃজন কুমারী  
মাগিকার ও সন্মানসী

১০২, বহু বাজার স্ট্রীট, কলি:- ১২

জাঃ ১-২৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬  
( রাজা পীতাম্বর স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল )

কি-সবাব জলে নাবলো। এক বহু জন। কারো-কি-বাব  
 পকে বাধা দিতে চাইলোও। দুখ কুটে বলতে পারলো না কিছু।

ଜାଣେ ଆଜ୍ଞାତ ମୋ ବାସ ବାସିନୀର ଗଳ୍ପର ଏହିପରି ଲକ୍ଷ  
 ଜାନକଦାସର ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣେ ।

সেই ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু তার চেয়ে বেশি একটা কুটিল  
কুটিল আছে। তাঁদের যিনি যিনি থেকে কোন দিক দিয়ে প্রকাশ  
করার আশা করত। কেননা যেন নিরাপত্তা হওয়ার পর তাপা  
কিন্তু অন্যভাবে আসে। এক পাশে নিরাপত্তা হওয়ার পর আরেক  
দিকে কুটিল।

কিন্তু তাকেই ঘন ঘন। যেই তাকেই। কিন্তু তীব্রতায়  
কিন্তু নেই। তার নেই। বজ্রা আর সেই দাবী দেখে যখন  
কিছু ঝড়ের দিকে যে আসে। লাল অগ্নি লাল করে দিতে।  
এ পাশে পড়ে না। পাশে-পাশে বজ্র  
কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে।

আলা-উল্লহ আসছে। সত্যের আর বিবির বজ্র  
এই বজ্রের। মত তাকার লক্ষ তাকার লক্ষণ।  
সত্যের জেলের দিক পড়ে।

—তোমার সত্যের না কি মিথ্যে? হুঁ-তাহবানা  
বাক। সত্যের হুঁ-তাহবানা আসে।  
একজন নিশাট কথা বললে আসলেই সত্যের  
। একজন। বেকারী নাথিকের দিকে পেল।  
আসলেই না কি মিথ্যে বললে না। একবার তপু  
ম তোমার সত্যের নিশাটের। সত্যের না  
কিন্তু তাকে আর কীভাবে না নিশাট, উল্লহের  
পেল।

—তীব্রতায়। তার দিকের। তার দিকের  
সি।

আসলেই কথা বললে বাসিত করে। বেকারী  
। বললে আসলেই দিকের।  
কিন্তু আর বাকের বেশি। কখন আসে না  
। হুঁ-তাহবানা কুটিলে থাকে।

—তীব্রতায়।  
বাকের বজ্রের লক্ষণ পড়ে আসলে।  
তার দিকের আর নিশাটের। পর্বত তাকে উল্লহ  
সত্যের পলা করে।

আসলেই দিকের হুঁ-তাহবানা। একজন। অত্যন্ত  
কুটিল বলে—কি? আবার?

—তার দিকের। আসলেই কুটিলে করে  
পেল। বজ্রের বেকারী করে।

—কি তাই আবার? তীব্রতায় কথা বললে  
কিন্তু বজ্রা কুটিলে আসলেই তাকে আসে। সত্যের  
কিন্তু থাকে।

বেকারী আবার উল্লহের বেকারী আসলে। বললে  
কুটিলে থাকে।

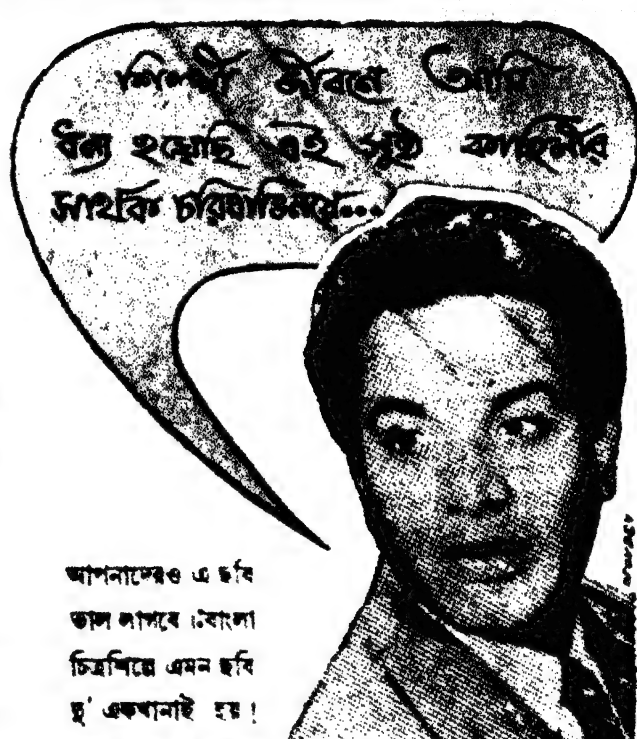
এ পাশে ও পাশে দাবী কুটিলে আসলেই আসলে।  
আসলেই দিকের। হুঁ-তাহবানা আর কুটিলে কুটিলে।  
কিন্তু সত্যের বেকারী আসলে। বেকারী হুঁ-তাহবানা আসে  
পেল আসলে।

তীব্রতায় কুটিল করে কুটিলে কুটিলে আসলে।  
কিন্তু তাকে আসে। কুটিলে কুটিলে কুটিলে।

—কুটিলে, যেই কোন কথা কুটিলে না। দাবী করার  
বজ্রের দাবীর থেকে কথা বললে। আসলে—কুটিলে দাবীর দাবী  
কললে না।

—তোমার থেকে আসলেই তাকে কললে না?  
তীব্রতায় এর কললে কুটিলে করে। তাকে দাঁড়িয়ে আসলে  
দাবী তোমার।

—কি তা বেকারী। আবারের অত্যন্ত দাবী নয়। কুটিলে  
দাবীর দাবী থেকে আসলে।



আপনারাও এ ভবি  
তাল লাসের বাংলা  
চিত্রশিল্পে এমন ছবি  
হুঁ একজনাই হয়!

# তাপ্রের ঘর

অট্টমসে.সাবিত্রী.সবিতা.রবীন্দ্র.চন্দ্রাবতী.জয়ন্ত  
শ্রীচন্দ্রনা.মঙ্গল চন্দ্রাবতী সঞ্জিত.হেমন্ত কুমার

সংগঠনের প্রকাশিত হইতেছে!

রাধা • পূর্ণ • প্রাচী

—কোথায় যাবে ?

—যাবে হুজুরগী গড়-মান্দারগে ।

মাঝি কথা শুনে একটা কেমন যেন স্বস্তির শ্বাস ফেললো চৌধুরাগী । মুখে হঠাৎ এক স্বলক হাসি ফুটিয়ে ব'সে পড়লো ম্যালোটের কাছাকাছি । গা ঘেঁষে ব'সলো । হেসে হেসে বললে,— সায়েবের রাগ তো দেখছি খুব ! আমার যে ভয় করে রাগ দেখলে ।

ম্যালোট জলের বৃকে লম্বান বিলিমিলি দেখছে তো দেখছেই । চৌধুরাগীর দিকে আর যেন কখনও ফিরে তাকাবে না । রাগ না অভিমানের গা-চর্খা তার চোখে-মুখে । দ্বিতীয় পাত্র মুখে তুলেছে ম্যালোট । পান ওরেছে কয়েক চুমুক । হঠাৎ সন্ধ্যার লাগি খেয়েও যেন কেমন স্থির হয়ে আছে ।

গড়-মান্দারগ ! চৌধুরাগীর মুখের হাসি কৃত্রিম । মনে মনে কি যেন আঁচতে থাকে সে । নকল হাসি হেসে আর একটু ঘেঁষে বসে । তার কোমলদেহ অমৃভব করে উকঠা । ম্যালোটের রাগের গরম হয়তো । চোখে-মুখে হাসি মাখিয়ে ম্যালোটের হাত থেকে পাত্র কেড়ে নেয় আনন্দকুমারী । টলমল করছে সোনা-বড়ের ছইকি । নিজের হাতে ম্যালোটের মুখের কাছে এগিয়ে ধরে চৌধুরাগী । কি কারণে কে যেন হঠাৎ যেন অদ্ভুত লাশুরীর ডাব দেখায় । নিজের মুখ তুলে ধরে ম্যালোটের মুখের কাছে ।

বাইরে জোৎস্না আর অন্ধকারে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে । কে কাকে হারাতে পারে । সিপাই আর মাঝিরা কি এক দৃশ্য

দেখতে পায় বজ্রার তেতরে । কি লজ্জাহীনা ঐ বেনের মেয়ে ! তারা চোখ ফিরিয়ে নেয় অন্ধ দিকে ।

সুখাপানের লোভে ম্যালোট আবার হাসলো মুখের গাভীর্ষা ঘুচিয়ে । নেশার প্রথম উগ্রতার কেমন যেন আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে । কতক্ষণ অতীত হয়ে যায়, কথা বলার অবকাশ পায় না চৌধুরাগী । যখন মুক্তি পায় তখন বলে,—খুশী হয়েছে সায়েব ? মাথা হুলিয়ে ম্যালোট বলে নেতিবাচক ইঙ্গিত করে । মিটি হাসি ম্যালোটের মুখে ।

আবার মুখ তুলে ধ'রলো আনন্দকুমারী । কি এক আবেশে চোখ দু'টি বন্ধ করলো । ম্যালোটের হাতের বলিষ্ঠ আঙুল ক'টা চৌধুরাগীর পিঠে যেন কামড়ে ধরে । কত কোমলদেহ, তবুও এতটুকু আপত্তি জানায় না আনন্দকুমারী ।

বাঘের গর্জন তেমে আসে অনেক দূর থেকে । খেয়াল নেই কারও । হঠাৎ নেশায় যেন বিভোর হয়ে আছে ম্যালোট ।

নিজেকে মুক্ত করে আনন্দকুমারী । বলে,—ছেড়ে দাও এখন । সিপাইরা সব ঘোরাফেরা করছে যে !

কিস-কিন কথা, তবু অমাত্র করতে পারে না ম্যালোট । চৌধুরাগীকে ছেড়ে পানের পাত্র মুখে তুললো খুশী মনে ।

এক রাশ হেসে আনন্দকুমারী বললে,—দেখি, আকাশের চাঁদ এখন কোথায় । কথা বলতে বলতে উঠে পাড়ালো সে লম্বা পা ফেলে ফেল তিন কদমে ঘরের বাইরে চলে গেল আকাশের এরিক সেমিক দেখতে থাকলো ।

মাঝি আর সিপাইরা সারাদিনের ক্রান্তিতে এখন শান্ত হে আছে । এখানে সেখানে ব'সে আছে দলে দলে । খোসগল্প করছে

হঠাৎ কি এক শব্দ চমকে উঠলো সকলে । এমন কি ম্যালোট পর্যন্ত । তার হাত থেকে পানপাত্র খ'সে পড়লো । মাঝিরে দলে হৈ হৈ পড়লো । সিপাইরা ছোট্টাছুটি করতে থাকে ।

ঘরের বাইরে এসে এখান ওখান তাকিয়ে ম্যালোট দেখতে আনন্দকুমারী নেই । অতর্কিতে জলে ঝাঁপ দিয়েছে সে । হুঁম মাঝিও ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে । কোথায় গেল সায়েবের বিবি ম্যালোটও কিপ হয়ে উঠলো ।

জল আর জল । সাঁতরে চলেছে হ'জন মাঝি, যদি একব ভেসে ওঠে । দেখা যায় দেহের কোন অংশ । আনন্দকুমারী লাড়ীর আঁচল কিবা তার মাথার কালো কেশ ।

চৌধুরাগী ভুব-সাঁতারে এগিয়ে বার ছুটন্ত সাপের মত ; যেদি বজরাখানা পাড়িয়ে আছে সেই দিকে সাঁতারায় । স্তোত্রাটী-গোবিন্দ থেকে গড়-মান্দারগের দিকে বাবে-বজরা, তবে আর দ্বিধা কেন ম্যালোটের কষ্ট চাউনি আহত হয় নদীর জলে । চৌধুরা চিহ্ন দেখা যায় না কোথাও । ম্যালোটের তর্জন গর্জনে সিং আর মাঝিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে ।

চৌধুরাগীর ভুব-সাঁতার কারও চোখে পড়ে না । চাঁ আলোর একবার শুধু তার একখানি শুভ্র হাত ভেসে উঠতে যায় । জলের আবর্তে আবার কোথায় হারিয়ে যায় চৌধুরা চাঁদের ছায়া খেলেছে জলে । সোনালী বিলিমিলি নয়, ঐ

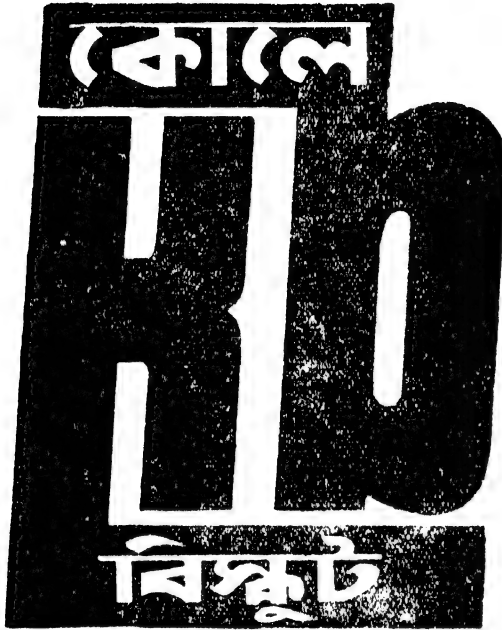


**ROY COUSIN & CO.**  
DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA.  
OFFICIAL AGENTS FOR  
**OMEGA & TISSOT WATCHES**  
SOLE AGENTS FOR  
**COVENTRY WATCHES**



ডিটামিন যুক্ত

কোলে



বিস্কুট

যাঁরা শিশুর বিচার করেন

তাঁরা সকলেই পছন্দ করেন

মহাসময়ে

কোলে

কোলে বিস্কুট কোম্পানী  
প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১



বিস্কুট

পুষ্টিকর স্বাদু সম্ভার

খিন এরারগট

মেরী

পেটিট ব্যারো

নাইস

কলেজ

টেস্টা

ডেন্টা

ক্রীম ক্র্যাকার

কয়েন

স্পোট

জিঞ্জারনাট

হাউসহোল্ড

সল্‌টী

বার্ভেলক্রীম

কাফেময়ের

চকোলেটক্রীম

বেবীক্রীম

সণ্ট ক্র্যাকার

প্রভৃতি

আরও অনেক রকম।

# রঙ্গপট



## বেলা ভাড়ার খেলা

শ্রী ৬২৮২২র অমর রচনার অক্ষর ভাষার থেকে বচন্য বক্তব্য  
দিয়ে পরবর্তী কালে এত যে কাহিনী গড়ে উঠেছে তার ইহুতা  
নেই। খেলা ভাড়ার খেলা ভারত একটি সাধারণ মাত্র। সামাজিক  
ছবি। একটি নারীকে কেন্দ্র করে আর একটি নারী ও একটি পুরুষের  
গল্প। জমিদার-নন্দন বিনয় বালাকালে খেলার হলে একদিন সন্নি  
গুস্তারার সঙ্গে করে ফেলেছিল মালা বঙ্গ। স্বাত্রারসের সীত-  
শিক্তের ঘরে গুস্তার। বচকাল পরে শতবাসী বিনয়ের সঙ্গে  
বন্ধন অশিতার বিনয়ের ঠিক, সেই সময়ে ঘটনাচক্রে গুস্তারার কথা  
তার কানে ওঠে। সে জানতে পারে, গুস্তারার সঙ্গে এক বৃদ্ধ  
গোজবরের বিবাহের ঠিক হওয়ার সে ভয়ে নিকঙ্কিতা এবং অনেকের  
বাগশ। সে বর্তমানে বিনয়েরই আশ্রিত। এ পরেই ঘটনাপ্রবাহে  
অভিনেত্রী মেঘনা দেবীর সঙ্গে হয় বিনয়ের পরিচয়। জানা যায়  
মেঘনাই গুস্তার। বিনয়ের জীবনের স্রোত যায় ঘুরে।  
গুস্তারাকে নতুন করে পাবার ক্ষেত্রে সে পাগল হয়ে ওঠে।  
গুস্তারার...বাগ দেয়। সে বিনয়ের বশমগাদার দিকে  
দৃষ্টি রেখে বিবাহবন্ধন থেকে নিজের সরে যায় এবং নিজের  
থেকে অশিতার সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে দিয়ে নিজের বধাসর্ব্ব অশিতার  
নামে লিখে দিয়ে সে গ্রহণ করে বিবাহ।

এই হল কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রত্যেক ছবিতেই দর্শকদের  
সাময়িক আনন্দ দেবার জন্যে কিছু হাস্যরসের অবতারণা করতে  
হয়। কাহিনীটির মধ্যে থেকেই আশাবাদের বোঝে নেওয়া হয়  
হাস্যরসের জন্যে। এ ছবিতে সাময়িক পাত্রের কাঁধলয়কে বেছে  
নেওয়া হয়েছে হাস্যরসের কেন্দ্ররূপে এবং কেন্দ্রবিন্দুরূপে দেখানো  
হয়েছে বিভাগীর সম্পাদক-রূপকে। এই মনোবৃত্তি যেমনই কথক  
তেনমই লজ্জাকর। জনগণের অন্তরের বাণী একত্রীকৃত করে ধারা  
হাজারের মধ্যে ছড়িয়ে দেন, মাছুয়ে মাছুয়ে যোগস্থলের মিলন-সেতু  
ধারা, সেই সাময়িক-পত্রসেবীদের প্রতি এই কচিবিগহিত ব্যঙ্গ  
গুরু অজায় নয়, অপরাধও। সাময়িক-পত্র-সেবীদের বাড়লার এই সব  
পরিচালকের দল যে চোখে ইচ্ছে দেখুন, তাদের কাছে নিজেকে  
আকর্ষণ অস্বীকার করতে চান করুন, তবে এই সজা চিরদিনই ঝেঁ  
খাকবে যে হুড়ি ও মিছুরির দণ্ড কখনও এক হয় না। যে বা সে

তা। শত ব্যঙ্গ ও বিক্রোপ সে আসন টানো যায় না। ছবি  
প্রথম থেকেই পরিচালনা ঐতিপূর্ণ। নৌকা থেকে গুস্তার  
নাফল যে ফেলটিকে নিয়ে, সেই ফেলটি কোথায় গেল? কিছু  
সঙ্গ মেয়েটিকে দেখতে মানায় কি? পরিচালকের চোখ তো আছে।  
বিনয়ের প্রভাব বন্ধন গুস্তারার অন্তর স্পর্শ করেছে তখনও তার  
পরিধানে দিশ-কাটা ভাষার মত আপত্তিকর বেন্দুবা কেন? ঐশনে  
গুস্তারাকে পৌছোতে বিনয় এল আর যে অশিতাকে নিজের বধাসর্ব্ব  
সে দিয়ে এলো, তাকে ঠেলে দেয়া গেল না কেন? অশিতার মা  
স্বল্পহীনা হতে পারেন তবে তার বাবা তো শ্রেষ্ঠল বলেই দেখে  
এসেছি। তিনিই বা নিকঙ্কিতা মেয়ের খোঁজ করলেন না কেন?  
চির প্রহরের কাজে শ্রমীর বস্ত্র প্রদোষাই। অভিনয়ে একটি ছোট  
ভূমিকায় সকলকে অতিক্রম করে গেছেন অসামান্য অভিনেতা ছবি  
বিবাস। শ্রমিত্রা দেবী মনে ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।  
বসন্ত চৌধুরীর অভিনয় ঘুর একটা বেলাপাত করে না। অজিত  
বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, হরুপকুমার  
ও চন্দ্রা দেবী অভিনয় প্রাণ স্পর্শ করে। নবাগতা শ্রমাল  
চট্টোপাধ্যায়কে ভালো লাগবে, ভবিষ্যৎ সস্তায়নাপূর্ণ। এ ছাড়া  
কমল মিত্র, মোহন ঘোষাল, (ছবি প্রচার বিভাগ বড় চমৎকার  
ব্যবহার করেছেন এই শিল্পীটির সঙ্গে) পদ্মা দেবী, অর্ণা দেবী, বিজু  
ও গীতা মু-অভিনয়ই করেছে। এরা ছাড়াও ভূমিকালিপিতে  
আছেন, ভাষ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হরর বায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি  
চট্টোপাধ্যায় প্রাম লাভা, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, ধনি বন্দ্যোপাধ্যায়,  
প্রীতি মজুমদার, বেচু সিং, মধু বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায় ও  
বাজুজী। সবচেয়ে দুর্ব্বিহ ও বিরক্তিকর অভিনয় করেছেন  
সবিশা চট্টোপাধ্যায়।

## নতুন প্রভাত

বিকাল রাতের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবার তাঁর লেখনীর  
সঙ্গেও পরিচিত হলেন দর্শক-সাধারণ। এক অভিনয় দৃষ্টান্ত নিয়ে  
বিকাল রাত এমন করেছেন এর কাহিনী। কতকগুলি রোগীকে  
কেন্দ্র করে এক ডাক্তার ও তার চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের গল্প।  
আছে জনসেবার শ্রমজান প্রচার, তারই সাথে জুড়ে আছে প্রেম,  
স্বাচ্ছন্দ্য, মিলন, বিহোগ। রোগীর অন্তরের অন্তর্ভুক্তি, ভাব ও তার  
বিশিষ্টকাল কৃত্যে তুলতে সক্ষম হয়েছেন বিকাল রাত। রোগীর  
অসহায়তার প্রতি তার সমবেদনা এখানে সুপরিচ্ছিন্ন। বাড়ল  
ছবির কাহিনীর মধ্যে গতাগতিগততা ভেদ করে নতুন নতুন  
পঙ্খের যে নিদেপ পাওয়া যাচ্ছে, সেই নব বার্তাবাহীদের মধ্যে নতুন  
প্রভাতেরও স্থান হবে নিশ্চিত। ডাক্তার অলি ঘোষের  
চিকিৎসাশ্রমে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ, দারিদ্র্যের নিশ্চেষ্ট  
গুণ্যাত্র আশার আলোয় যে ক্রসওয়ার্ড নিয়ে পাগল, অন্ধগকে, বো-  
পাগলা লোক অথচ জীব সাধারণ ঠাটকে যে গভীর ভাবে গ্রহণ  
করে, রমাকে, সীতাকে, ডাক্তারের অন্তরে যে মেলাতে চায় অন্তর,  
আনন্দকে, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা একটি কিশোর বালক সব কিছুর উপর  
যে বলতে চায় যে দুনিয়ার টাকার উপরেও আছে, অনেক কিছু আছে  
স্নেহ-মায়ামমতা-হাসি-গান-কবিতা। পাখির শোক হৃৎ জয়ের  
হৃৎ জয় প্রতিমুখি তার জনক-জননীকে। সোমেশ্বরকে, সবদিক  
দিয়ে একটি কুতী ছেলে একটি অসম্ভব বা খেয়ে যে তাই

ভিলে জিলে এগিয়ে যায় কবের দিকে, তারই যেন ব্যক্তিকণ।  
 ডাক্তার বানার্জীকে, চাত্রবসিক ও স্বপ্নবান এক চিকিৎসকে,  
 সীতাকে, ডাক্তারশিষ্য বমেশের প্রেহসী অথচ সীতা চার  
 ডাক্তারকে, পণ্ডে ডাক্তারটিকে কাক আকর্ষণীয় তার থেকে  
 উদ্ধার করে তার ভুল ভেঙে দেয়, ডাক্তার চার বমাকে,  
 বমা চার সোমেশ্বরকে, শরণও। ডাক্তার নিম্ন থেকে যায়  
 জীবসেবার মহান তপস্বী। চব্বিতে ডাঃ বানার্জীকে জিলে  
 এই বকম চাত্রবসের অবতারণা করে চব্বিটির মধ্যাঙ্গ। স্মরণ করা চয়েছে  
 বলে মনে হয়। প্রিয়তমের গুরুকে প্রেম নিবেদন কি বকম যেন  
 বিসদৃশ লাগে। অকণ ও আশার মধ্যে কি ভুল বোঝাবুঝি লাভ  
 করল চিবদ্বারিহ? চব্বির আকর্ষণ ও শেষ অপর্যায়সম্মিত পরিবেশে  
 স্মৃতি চয়েছে। অনিল গুপ্তের চিত্র প্রদর্শন চমৎকার অভিনয়ে ছোট একটি  
 চব্বিতে অপর্যায়বলনকীল ও স্মৃতি অভিনয় করে গেছেন চব্বি শিলা  
 ও অপর্যায় দেবী। পুরবিভাগের বেঙ্গল মরে মরে বাজছে অথচ সমস্ত  
 হুং টার পায়ে নিবেদন করার সেই চুচতা, অপর্যায় ভাবে কুটিল  
 কুলেছেন এরা। অত্যন্ত গাঢ়সঙ্গ অথচ বাতাবিক অভিনয়  
 করেছেন বিকাশ রায়। আশাশুভ লক্ষ্মির পরিচয় লিয়েছেন ভাস্কর  
 বন্দ্যোপাধ্যায়, তাসি ও কাল। তিনি একাগারে গেলন পরিবেশন  
 করে। ক্রমগতভাবে সমস্তা তাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছেন, আবার  
 দলিত শিক্কের ততোধিক দলিত পরিবারবহুর অসহ্য কান্ড  
 অবস্থার ইঙ্গিত সঙ্কলন চকু সঙ্কলন করে কুলেছেন। অনেক দিন  
 বাদে দেখা দিয়ে প্রাণমাতানে অভিনয় করে গেছেন নীলেন

ভট্টাচার্য। চব্বির নায়ক না চলবে চব্বির প্রাণ তিনি।  
 নির্মূল ভাবে কুটিলে কুলেছেন নিজের চব্বিটি। অল্প  
 সুযোগে বমোট পরিচয় কুটিল দেখিয়েছেন বারবার অসামান্য  
 অভিনয়ী সানিহী চট্টোপাধ্যায়। পাহাড়ী সাজান, অসিতবরণ,  
 বরীম মজুমদার, সজারায়ী, তপসী মোহন অভিনয় ও অল্প স্পর্শ  
 করে। এরা ছাড়া চললে আতন কুলন হুংপাশায়া, শ্রীতি  
 মজুমদার, কবি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাগত। চকবতী, শুভা দাস, সীতা  
 সেনগুপ্ত, সজা দেবী ও মারা ভট্টাচার্য।

### কুশা

বিষয়পার নবতম নাট্য 'কুশা'। সমস্তাঙ্গল বাস্পাকর  
 আকর্ষণ পৃথিবীতে ভাবনের একটি বিশাল আশ জুড়ে আত  
 প্রতীকমান চলে উঠছে এক বিশালানী কুশা। কুশ আতন থেকে আত  
 ভা বিশালভের দিকে এগিয়ে চলেছে। পোটর কুশ থেকে যে প্রেতের  
 উদ্ধার, তার পরিণতি গিরে ভাড়াছ বাচার কুশা। বিদ্যাক ভট্টাচার্য  
 এই নাটকে একটি শৃঙ্খল ও জোড়ালো বস্তুর পেশ করেছেন।  
 বর্তমান যুগের সমস্তোপযোগী নাটক হিসাবে কুশার নাট্যমূল্য বমোট।  
 নাটকটি অপর্যায় লাভ করেছে প্রচ্ছন্ন নটেশ্বর নরেন্দ্রচন্দ্র  
 সুপরিচালনা। নরেন্দ্রচন্দ্র শ্রুতি-স্পর্শ প্রভাবে এক বিশিষ্টতা  
 লাভে সমর্থ হয়েছে এই নাটকখানি। মাতৃবের সঙ্গে মাতৃবের যে  
 রক্তের টান অথবা মাপসত্ত্বের উপরে, সেই বস্তবাই প্রচার করা  
 চয়েছে। অধ্যাপক চব্বিট অপর্যায় সঙ্কলন দিয়ে মোড়া চাবুক

পৃথিবীটা কি কেবল টাকার পেছনেই ঘুরছে?  
 স্নেহ, মায়ী, মমতা বলতে কি আর কিছুই নেই!!



বসুশ্রী : বীণা : ও শঙ্করভট্টাচার্য  
 (শীতলাপ নিয়ন্ত্রিত)

ব্যবহার করা হয়েছে এই চরিত্রে। আজ ঠুনকো আভিজাত্যের তাসের ঘর আঁকড়ে থাকার চেয়ে বেঁচে থাকার বে বিরাট আহ্বান ঘরে ঘরে শোনা যাচ্ছে সেই পটভূমিকার রচিত এই নাটকটির আবেদন সকলকে আকর্ষণ করুক, এই কামনা করি। অভিনয়ে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন কামু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া বসন্ত চৌধুরী, তরুণকুমার, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বিজু ভাওয়াল, সন্তোষ সিংহ, নবদীপ হালদার, মণি শ্রীমানী, জয়শ্রী সেন, সুরভা সেন প্রভৃতিও সহঅভিনয় করেছেন। শান্তি গুপ্তা ও তপতী ঘোষ দরদ দিয়ে নিজেদের চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

## রক্তপট প্রসঙ্গে

চিত্রায়োদীপের কাছে অশোককুমারের সুযোগ্য অমুজ কিশোরকুমারের নাম আর অজানা নেই। বোঝাইয়ে আজ ধীরে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করছেন, নিঃশব্দে তাঁদের মধ্যে কিশোরের নাম উল্লেখ করা যায়। প্রতিভাবান অভিনেতা কিশোরকুমার এবারে বাঙালির একটি ছবি প্রযোজনা করবেন। পরিচালনা করবেন

কাহিনীকার কমল মজুমদার। ছবিটির নাম লুকোচুরি। সঙ্গীতের ভার পেয়েছেন হেমন্তকুমার। রূপায়ণে থাকছেন কিশোর নিজের এবং অমুপকুমার, বিপিন গুপ্ত, ভাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, মালী সিনহা, কমলা মুখোপাধ্যায়, সতী, সীতা, পূরবী ও রাজলক্ষী (বড়)।... প্রখ্যাত সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় বায়ের আগামী অবদান কাঁচামিটে। সুন্দর ঘোষ যোরাচ্ছেন ক্যামেরার হাতল। অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস, রবীন মজুমদার, অমুপকুমার, জীবন বসু, ভাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নবদীপ হালদার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, বিনতা রায়, নীলিমা দাস, শুভা দাস প্রভৃতি।... 'পথে হল দেবী' ছবিটি সম্পূর্ণ রঙীন প্রথম বাঙালি ছবি। রূপায়ণে উত্তম-সুচিত্রা সহযোগে থাকছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সাত্তাল, অমুপকুমার, মিহির ভট্টাচার্য, জহর রায়, শ্যাম লাহা, চন্দ্রাবতী, শোভা সেন, ভারতী দেবী, চিত্রিতা মণ্ডল প্রমুখ কৃতী শিল্পীগণ। কাহিনীটি রচনা করেছেন প্রখ্যাতা লেখিকা প্রতিভা বসু।... বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন করে মা লক্ষ্মী ছবিটি পরিচালনা করছেন হরি ভঞ্জ। রূপ দিচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, গঙ্গাধর বসু, মলিনা দেবী, সন্ধ্যারাণী, জয়শ্রী সেন ও শিবা বাগ প্রভৃতি।

## মানবদেহের অভ্যন্তরে

বাইরে থেকে মানুষের দেহ কাঠামোটি নিশ্চয়ই যথেষ্ট অস্বাভাবিক। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে যে বস্তাদি ও উপাদান রয়েছে সে সকলের খবর আমাদের ক'জনরাই বা জানা? তখন সে আশ্চর্য্য ঠেকবে—মানব-শরীরে যে জলীয় অংশ রয়েছে, তার গড়পড়তা পরিমাণ প্রায় ১০ গ্যালন। 'ফ্যাট' বা চর্বিজাতীয় উপাদান বা রয়েছে, ওতে সাবানের প্রায় সাতটি 'বার' তৈরী সম্ভবপর। 'কার্বন' গড়পড়তা বা আছে, কমপক্ষে ১ হাজার সেড পেন্সিল তৈরী করা চলতে পারে তা' দিয়ে। দেহের অন্তঃস্থ 'ক্যালসিয়াম' এর পরিমাণও এত বেশী যে, ওতে দুই সহস্রাবিক দেশলাই তৈরী সম্ভব।

এইটি হ'ল উপাদানের পরিমাণের দিক থেকে একটি বুঝবার মতো হিসেব। সংখ্যার দিক থেকে হিসেব তুললে আরও অবাক হয়ে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই। মানুষ-শরীরের একটি অপরিহার্য উপাদান রক্ত—একথা সকলেই জানা। কিন্তু ক'জনরা জানা আছে—নরদেহে অল্পিয়েন আহরণ উপযোগী যে লাল রক্তকণিকা রয়েছে, উহার সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি? এগুলোকে যদি কোন সমতলক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে ওরা প্রায় ৩৩ শত বর্গগজ স্থান জুড়ে ফেলবে। মেরুদণ্ড ও হাড়ের কাঠামোর উপরই মানবদেহ ঠাঁড়িয়ে—কিন্তু ছোট-বড় হাড়ের সংখ্যা কি একটি দুটি? লৈশবাহ্বার এক একটি দেহ-কাঠামোতে হাড় থাকে অসংখ্য: ২৭০টি। তার পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো হাড় আপনি

জুড়ে যায় এবং এর ফলে সংখ্যা স্বভাবতই কিছুটা কমে আসে। তখনও অবশ্য প্রায় ২০৬টি হাড় খুঁজে পাওয়া যাবে প্রা' মানুষ-শরীরে। হাড়গুলো একে অপর থেকে ঠিক আলাদা আলাদা নয়—দড়ির মত একটি জিনিস, যাকে বলা হয় সংযোজক তন্তু দিয়ে এদের একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত।

এখন মানুষের স্নায়ু-স্পন্দনের সংখ্যাটা একবার তুলিয়ে নে যাক। সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে স্পন্দন হয় ৭০-৭২ বার। এই হিসেবে একটি মানুষ যদি ৭২ বছর বেঁচে থাকতে পারা তবে কম পক্ষে তার স্নায়ু-স্পন্দন হবে ২১০ কোটি বার। অপর দি এই স্পন্দনের কঁকে মানুষের শিরা-উপশিরাযে যে রক্ত সঞ্চা' হবে, তার পরিমাণ প্রায় ২৭ কোটি পাইন্ট। মানুষের মা' কত সংখ্যক চুল আছে, এর সঠিক হিসেব কখনই প্রায় হয়। একটি হিসেবে অবশ্য দাবী করা হয়েছে—মাথার চুল এক ২০ হাজার থেকে এক লক্ষ ৪০ হাজারের মধ্যে। মানুষের কতটা করে বাড়ি, খতিয়ে দেখা হয়েছে সেইটিও। আলুলের বৃদ্ধি পায় বছরে দেড় ইঞ্চি করে এবং এর অর্ধই হচ্ছে এবং মানুষের জীবনে হাতের নখ যদি কখনই কণ্ঠিত না হ'ল, তবে। নখ বেড়ে হবে ৭ ফুট ১ ইঞ্চি। এমনকি করে আরও কত হি বা গবেষণাই চলতে পারে মানব দেহের বহুপাতি নিয়ে, বা' অর্থা' হয়ে বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।



## পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা কেন ?

“এই বৎসর আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ৪৬’২ এবং আই-এসসি পরীক্ষায় শতকরা ৪১’৩ জন পাশ করিয়াছে। অর্থাৎ পাশের অপেক্ষা ফেলের সংখ্যা অধিক। এরূপ হবার কারণ কি? এতগুলি ছাত্র-ছাত্রীর একটি বৎসর নষ্ট হইল, তাহাদের অভিভাবকদের এত অর্থদণ্ড গেল কেন? এই বৎসর প্রায়গত যে কঠিন হইয়াছে, এরূপ অভিযোগ ছাত্রেরাও করে নাই। শোনা যাইতেছে যে, ইংরেজীর জন্য এত অধিক সংখ্যক ছাত্র ফেল করিয়াছে। অধিকাংশ পরীক্ষকের মত এই যে, ছাত্রেরা ইংরেজী ভাল করিয়া বোঝে না এবং ইংরেজী ভাষায় নিষ্পন্ন মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু কলেক্টে প্রায় সব বিষয়ই ইংরেজীতে পড়ান হয় এবং অধিকাংশ ছাত্র ইংরেজীতে উত্তর লেখে। ফলে ক্লাসে কি পড়ান হয়, তাহাও তাহারা বোঝে না এবং কি উত্তর লিখিতেছে তাহাও তাহারা জানে না। এই ভাবে বৎসরের পর বৎসর ছাত্রেরা ফেল করিয়া চলিয়াছে। এ সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার মান উন্নত না করিলে কলেক্টের শিক্ষার মান উন্নত হইতে পারে না এবং পাশের হারও বাড়িতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ, স্কুলে ছাত্রেরা মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা করিয়াছে, তাহা কলেক্টে আসিয়া ইংরেজীতে পড়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে অনেকটা সফল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।”

—দৈনিক বঙ্গমতী।

## আবহ সংবাদ

কিন্তু একটি বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে। ভারতের আবহাওয়া অফিসগুলির কর্মপদ্ধতি এবং যন্ত্রোপকরণের মধ্যে আধুনিকতম সৌষ্ঠবের অভাব নাই তো? উন্নত দেশগুলিতে আবহ বিভাগ দেশের কৃষির প্রতি বিশেষ দায়িত্বশীলতা বহন করে। আবহ বিভাগের প্রচারিত তথ্যের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া সেই সব দেশের কৃষিকার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, আবহ বিভাগের সহযোগিতায় কৃষিকার্য সূত্রতর ভাবে পরিচালিত হইবার সুযোগ পায়। তাহা ছাড়া, বাণিজ্য এবং শিল্পগত উদ্ভোগের সহিত আবহ বিভাগের সংগৃহীত, অল্পমিত ও প্রচারিত তথ্যের অন্তঃসঙ্গ সম্পর্ক আছে। আবহবিদ বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতিগত যেসব তথ্য প্রচার করেন, তাহাই অগ্নে বাখিয়া পোনের নৌ-চলচল, বিমান চলচল এবং জাহাজের সমুদ্রযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তুনিয়াহি, ১৯৪২ সালের অক্টোবরে সমুদ্রের বে জলোচ্ছ্বসে মেরিনীপুর ভয়াবহ ভাবে প্রাবিত হইয়াছিল, সেই জলোচ্ছ্বাসের আসন্নতার ইঙ্গিত এবং সতর্কতার নোটিশ যথাসময়ে প্রচারিত হইবার সুযোগ পায় নাই। যথাসময়ে সেই ‘পূর্বাভাস’ প্রচারিত হইলে অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচিত। আবহ বৈজ্ঞানিকদিগের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ভারতেরই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই অভিযোগ করা যায় না যে, আবহ বিজ্ঞানের গুরুত্ব এবং আবহ পর্যবেক্ষণাগারগুলির উন্নতি সাধনের গুরুত্ব সম্বন্ধে দেশের সরকার সচেতন নহেন। কিন্তু সচেতনতা সত্ত্বেও একেত্র বিশেষ কোন উন্নয়নের উদ্ভোগ হইয়াছে কি না জানি



না। আবহাওয়া অফিসগুলির কাজ সেই পুরাতন গতানুগতিক পদ্ধতিতেই চলিতেছে কি? আবহ বিজ্ঞানের আধুনিকতম বীজিনীতি ও পদ্ধতিসমূহ ভারতের আবহ বিভাগের কর্মক্ষেত্রে প্রচলিত হইয়াছে কি? প্রশ্নটি এই কারণে উত্থাপন করিতে হইতেছে যে, পঞ্চবাষিকী উন্নয়নে অগ্রসর ভারতের কৃষি, শিল্প, বাহ্য ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে যথোচিত সূত্র আবহ তথ্যের প্রয়োজন বিশেষ গুরুত্ব লইয়া দেখা দিয়াছে।

## বাস্তবতার সমস্যা

“অন্ত শনিবার অপরাহ্নে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া উদ্বাস্ত পুনর্বাসতির প্রশ্নটি আর একবার আন্তর্জাতিক বাচাইয়া দেখিবেন এবং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসিত মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না তথ্য উপস্থিত থাকিবেন, এ সংবাদে সবাই প্রীত হইবেন। সাধারণ নির্বাচনের পর এই প্রথম কংগ্রেসের সরকারী ও বেসরকারী মহল একত্র মিলিত হইতেছেন, সুতরাং সবাই এই আশাই করিবেন যে, আলোচ্য সম্মেলনে যে সব অসুস্থিস্থিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তাহা একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করিবে। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্ত পুনর্বাসিত সমস্যাটির সার্বক ও সম্ভোয়জনক সমাধান আজ পর্যন্ত হইতে পারে নাই, ইহা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে বাস্তবিকই বিশেষ উদ্বেগজনক। বলাই বাহুল্য, আজ পর্যন্ত এই খাতে অর্থও ব্যয় হইয়াছে প্রচুর, প্রয়াস প্রচেষ্টাও কম হয় নাই, কিন্তু উদ্বাস্তদের বৃহত্তর অংশকেই এখনো স্থিতিশীল গৃহস্থে পরিণত করা যায় নাই বা সমাজজীবনের পক্ষে উপযোগী করিয়াও তোলা যায় নাই। এই কাজ কি ভাবে ত্বরান্বিত ও সূত্ররূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, আলোচ্য সম্মেলনে আশা করিলে সম্বন্ধে বাস্তবতাসম্মত উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিবেন। তাই সে নিদিষ্ট বাসস্থান, অল্পকাল আবেষ্টনী ও ব্যবসায়ী হওয়ার মতো জীবিকা, এই তিন দিকের সমীকরণের উপরই পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসতির সফলতা নির্ভর করে। ক্যাম্পে রাখিয়া থররাতি সাহায্যের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখা, অথবা পরিকল্পনাহীন ভাবে বাংলার বাহিরে পাঠানোর দ্বারা যে জটিলতাই বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা সকলেরই অভিজ্ঞতা। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সার্বক ও বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের পথ বাহির করুন, ইহাই আমরা আন্তরিক ভাবে কামনা করি।”

—যুগান্তর।

# বহুমুত্র আরোগ্য হয়

প্রস্রাবের সঙ্গে অতিরিক্ত শর্করা নির্গত হলে তাকে বহুমুত্র (DIABETES) বলে। এ এমনই এক সাংঘাতিক রোগ যে, এর দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। এই দুঃস্বপ্নরোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিতে বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও সাময়িক ভাবে শর্করা নিঃসরণ বন্ধ থাকে। ব্যতীত, বিশেষ কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না।

এই রোগের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—অত্যধিক পিপাসা এবং ক্ষুধা, ঘন ঘন শর্করাযুক্ত প্রস্রাব এবং চুলকানি ইত্যাদি। রোগের সক্রীণ অবস্থায় কারবাছল, ক্ষোভা, চোখে ছানি পড়া এবং অন্ত্রাঙ্গ জটিলতা দেখা দেয়।

‘ভেনাস চার্ম ট্যাবলেট’ পুরাতন য়ুনানি যতে দুর্লভ ভেষজ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ব্যবহার করে হাজার হাজার লোক মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভেনাস চার্ম ব্যবহারে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনেই প্রস্রাবের সঙ্গে শর্করা পতন এবং ঘন ঘন প্রস্রাব কমে যায় এবং তিন কি চার দিন পরেই আপনার রোগ অর্ধেক সেরে গেছে বলে মনে হবে। খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বিশেষ কোন বাধানিষেধ নাই। বিনামূল্যে বিশদ বিবরণ-সম্বলিত ইংরেজী পুস্তিকার জন্ত লিখুন। ৫০ টি বটিকার এক শিশির দাম ৬৫০ আনা, প্যাকিং এবং ডাক মাণ্ডল ফ্রী। নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

**ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (B. M.)**

৬-এ, কানাই শীল স্ট্রীট, (কলুটোলা)

পোস্ট বক্স নং ৫৮৭, কলিকাতা।

## ডাকঘরের ছন্দে

“ইদানিং পোষ্ট অফিসগুলিতে ডাকের চিঠিপত্রও টেলিগ্রামাদি বিলির কার্যে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। এই সমলুক সহরেই দেখি, আজ্ঞের টেলিগ্রাম কাল পৌছিতেছে, চিঠিপত্র বেলা ১২টার পূর্বে পাওয়া ভাগ্যের কথা, সময়ে সময়ে তাহা পাটতে বিকাল ৪টা ৫টাও হইয়া যায়। তাহাতেও আবার রামের চিঠি শ্রামের কাছে এবং শ্রামের চিঠি যদুর নিকট যাওয়াও বিচিত্র নহে। সহরেই যদি এই অনিয়ম চলে তবে মফঃস্বলের দুঃবস্থা সহজেই অনুমেয়। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় ডাক বিভাগে আর সে আগের নিয়মানুসঙ্গিতা বা কণ্ঠনিষ্ঠা নাই। সেদিন যুগান্তরেও দেখা গেল যে কলিকাতার বিখ্যাত জেনারেল পোষ্ট অফিসে বোজ লটলে জানা যায় তাহাদের যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী নাই। নতুন নতুন যাহাদের কাজে লাগানো হইয়াছে তাহাদেরও যথোপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা বা কণ্ঠনিষ্ঠার অভাব রহিয়াছে। কল চিঠি বাছাই ইত্যাদিতে বিলম্ব হয়। তারপর কাহারও অসুস্থ-বিশৃঙ্খল হইলে ত আর কথাই নাই। দুই জনের কাজ এক জনকে করিতে হয়, তখন অসুবিধা চরমে উঠে, এবং জনসাধারণও তাহার জন্ত ফলভোগ করে। সরকার দিন দিন পোষ্ট অফিসের সংখ্যা বাড়াইয়া বাহাদুরী লইতে চান। কিন্তু কাজের মান বাড়ানো দূর থাক অল্পতঃ পূর্বমান বজায় রাখার দিকে দৃষ্টি কোথায়? এই সব বিশৃঙ্খলার জন্ত কর্তৃপক্ষও কম দায়ী নহেন। সরকার খাম, টিকিট, রেজিস্ট্রী প্রভৃতি সব বিষয়েই দর বাড়াইয়া চলিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত কাজ না দেওয়ার জন্ত মানুষের যে অসুবিধা ও ক্ষতি হয় তাহার কৈফিয়ৎ কি?”

—প্রদীপ (তমলুক)।

## পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ১৯৭৭-৭৮র বাজেট রাজ্যের পরিকল্পনা বাবদে ১৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা পাইবার কথা কিন্তু বাস্তবে ১২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা পাওয়া বাইবে, ইহার ফলে আরও ৪ কোটির ঘাটতি পড়িবে। পশ্চিমবঙ্গীয়াবাসীর উপর মোট ৮।০ কোটি টাকার মত নতুন কর চাপিবে। কারণ ডাঃ রায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বখাযোগ্য গুরুত্ব ও দৃঢ়তার সাথে রাজ্যের দাবী পেশ করেন নাই। বরং জনগণকে আধিক্যের বৃদ্ধ সাধনের মাধ্যমে উপদেশ দিয়া নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষকে ত্যাগের জন্ত প্ররোচিত হইতে ও সারা দেশের খ্যাতিতে পশ্চিম বাংলার স্বাধীনতাগণ করার জন্ত প্ররোচিত হইতে আহ্বান করিয়া ডাঃ রায় কেন্দ্রীয় নিকট বাংলার দাবীকে দুর্বল করিয়াছেন। সাবা পশ্চিম বাংলাকে যিনি এই সে দিনও বিহারভুক্ত করার অপচেষ্টা করিয়াছেন তাহার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। জনগণকে আজ পশ্চিম বাংলার চরম খাণ্ডসকটের দ্বারে বসিয়া দেশী ঘনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে বিশ্লেষণ করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যে কোন প্রকারে আপাত মধুর ব্যবস্থার আড়ালে জনগণকে আধিক্যের নিপীড়নের পথ পাইলে ইহারা তাহা গ্রহণ কুণ্ঠিত হইবে না।”

—বীরভূম।

## অদ্বুত মনোবৃত্তি

“রঘুনাথগঞ্জ ষ্টেজ কমিটির গঞ্জিত প্রায় দুই হাজার টাকা প্রস্তাবিত জরীপূর মহকুমা হাসপাতাল ফণ্ডে দান করা সম্পর্কে স্থানীয় মহকুমা শাসকের এক প্রস্তাব বিবেচনার জন্য গত ২রা জুন উক্ত ষ্টেজ কমিটির এক সভা ম্যাকলি পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা গুনিয়া বিখিত হইলাম যে, ষ্টেজ কমিটির কতিপয় সদস্যের আপত্তির জন্য মহকুমা শাসক মহাশয় শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হন। মহকুমা শাসক উক্ত কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং সভাপতির আসন হইতে যথার্থি কৌন প্রস্তাব পেশ করা হইলে ইহা সেই কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার নজির ইহাই বোধ হয় সর্বপ্রথম। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, বাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তন্মধ্যে উক্ত ষ্টেজ কমিটির সম্পাদক মহাশয় অন্যতম এবং তিনি এই শহরের একজন বিশিষ্ট ডাক্তার। এ সম্বন্ধে অল্প আলোচনার প্রবৃত্তি হইবার পূর্বে এই ষ্টেজ কমিটির সাক্ষিপ্ত ইতিহাস কিছু বলা প্রয়োজন। প্রায় ১২।১৩ বৎসর পূর্বে তদানীন্তন মহকুমা শাসক শ্রী বাজিচাঁদ রহমানের উজোগে এই ষ্টেজ কমিটি গঠিত হয় এবং তাঁহারই উজোগে প্রায় ৩০০০ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়। এই টাকার অধিকাংশই জোগান দেন এই মহকুমার পঞ্জীবাসিগণ। এই টাকা প্রথমে স্থানীয় ডাক্তারের জন্য না বাপিয়া জমা রাখা হয় তপনীয়ভুক্ত নহে এমন একটি স্থানীয় ব্যাঙ্কে। পরে এই ব্যাঙ্কটি ফেল হইলে কমিটির প্রায় ছয় শত টাকা ধোঁয়া যায়। বাঁহা হউক, ইহার মধ্যে কিছু পরে খরচ করিয়া কয়েক কার্য জমি খরিদ করা হয় এবং বাকী টাকা দীর্ঘদিন ধরিয়া স্থানীয় ডাক্তারের আমানত পড়িয়া থাকে। কমিটি আজ পর্যন্ত গঞ্জিত টাকা সদ্যবাহারের কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই বা ইহাদের কোন কল্যাণের লক্ষণও দেখা যায় নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ষ্টেজ কমিটির যে টাকা দীর্ঘদিনের মধ্যে কোন কাজে লাগান সম্ভব হয় নাই বা অল্প ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করার কোন সম্ভব কারণ নাই সে টাকাটা যদি আপাতত হাসপাতাল ফণ্ডে দেওয়া হইত তাহা হইলে এই শহর তথা এই মহকুমার একটি বড় অভাব দূর হইত। জনগণের অর্থ জনকল্যাণে ব্যয়িত হইলেই তাহার সার্থকতা, অনন্ত কাল ব্যাঙ্কে আমানত রাখায় ইহার কোন সার্থকতা নাই।”

—ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)

## দুর্গাপুরের দুর্গতি

“দুর্গাপুরের লোহার কারখানার পত্তনের জন্য বহুব্যক্তির জমি ও ভীটা হারাইতে হইয়াছে। এখনও তাহাদের জন্য সরকার বিশেষ কিছুই ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমাদের অনুরোধ, সরকার ঐ সমস্ত লোকের মধ্য হইতে কারখানার জন্য উপযুক্ত লোককে, অল্প বাইরের লোক লইবার পূর্বে; যেন কাজ পাইবার, প্রথম সুযোগ দেন। তাহা হইলে ঐ সমস্ত দরিদ্র ব্যক্তির প্রোদাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে এবং স্থানীয় বেকার সমস্যাও কিছু সমাধান হইবে।”

—আসানসোল হিঠবী।

## কৃষ্ণমাচারীর বদান্ধতা

“দুর্দান্ত জমিদার যেমন প্রজার রক্ত-নিড়ানো টাকায় খলি ভর্তি করিয়া দুই-এক টাকা বখশিস ছুড়িয়া প্রজাবাংল্য দেখায় কৃষ্ণমাচারীর ট্যান প্রস্তাবের পরিবর্তন সেই রকমের। মধ্যবিত্ত ও গরীবের কাঁদের বোকা ঠিকই রহিল। আমরা আগেই বলিয়াছিলাম, ট্যান প্রস্তাবের নড়চড় বিশেষ হইবে না, পোষ্টকার্ডের দাম ঠিক রাখিলে এনভেলোপের দাম বাড়িবে। হইয়াছেও তাহাই। ইন্স্যুর এনভেলোপের মূল্য ১৫ নয়। পইসা হইয়াছে—পুয়ানো ৮ পরসারও বেশী। বেলে বাঁহীভাড়া প্রথম ১৫ মাইল পর্যন্ত বাড়িবে না, অর্থাৎ জেলা বা মহকুমা সহরে বাহাদের কালেক্টরে ট্রেনে বাতায়িত করিতে হয় তাহাদের বেশীর ভাগই এই সুবিধা পাইবে না। ইনকাম ট্যান তিন হাজার টাকায়ই ঠিক রহিল, তবে ছেলেমেয়ে থাকিলে ৩০০ টাকা হইতে ৬০০ টাকা পর্যন্ত আয়কর হইতে বাদ যাইবে। কৃষ্ণমাচারী চাও কফির উপর বর্ধিত শুল্ক প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং নতুন কোম্পানীওয়ালাদের পাঁচ বৎসরের জন্য সম্পত্তিকর হইতে রেহা দিয়াছেন—ইহাতে উপরতলার লোকদের লাভ হইবে। মোটামুটি ৭৮ কোটি টাকা ট্যান হইতে মাত্র ৫ কোটি টাকা ট্যান কমাইতে কৃষ্ণমাচারী রাজী হইয়াছেন। কংগ্রেসী এম-পিদের হৈঁচৈও বন্ধ হইয়াছে, জহরলাল এক ধমকে ভাণ্ডারের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া স্পাইট বলিয়া নিষাচ্ছেন, প্রান বাঁচাইবার জন্য ট্যানের ষ্টীম-বোলার চালানো বন্ধ হইবেই না, বরং বাহাতে বেশী ট্যান দিয়া দেশের লোক হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারে যে, প্রান চলিতেছে তাহাওঁর ব্যবস্থা করা হইবে। অপচয় ও দুর্নীতি বন্ধ করিয়া, নবাবী চাল একটু কমাইয়া যে অনেক টাকা বাঁচানো যায়, দুই-এক টাকা ট্যান কমিলেও যে গরীবেরা একটু সোয়াস্তি পায় তাহা বুঝিবার ইচ্ছা পর্যন্ত তাঁহার নাই।”

—যুগবাকী।

## শুধু অবহেলা

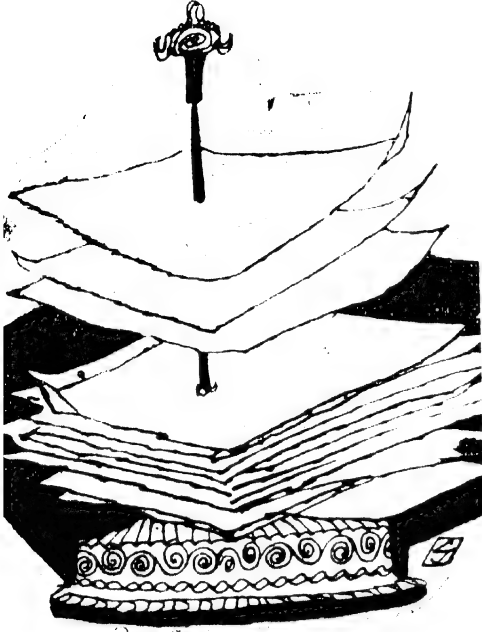
“স্থানীয় শহরের অব্যবহৃত রাস্তাগুলি সংস্কার করিবার অভিপ্রায়ে স্থানীয় পৌরসভার পরিচালক-মণ্ডলী বিভিন্ন স্থানে খোঁজা ফেলিয়া রাখিয়াছেন। শহরের জনসাধারণ ভাবিয়াছিল যে তাঁহারা বুঝি শীঘ্রই রাস্তা সংস্কারের কার্য আরম্ভ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের নিষ্ক্রিয়তা জনগণকে হতাশ করিয়াছে। রাস্তার ধারে ধারে যে খোঁজাগুলি পড়িয়া আছে সেগুলি লইয়া শহরের অপরিতত্ত্ব বালকেরা বালক-সুলভ চাপল্যে ইষ্টক নিক্ষেপ ক্রীড়ায় আনন্দ অনুভব করিতেছে। এই ভাবে খোঁজাগুলির অপব্যয় খটাইবার যে কি কারণ তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর! আশা করি, পৌরসভার কর্তৃপক্ষ আগু রাস্তাগুলি সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া অবধা অপচয় নিবারণ করিতে মনোযোগী হইবেন।

—ভাগীরথী, (কালনা)।

## সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রট, “বঙ্গবন্ধু” মোটারী মেশিনে শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## পাঠক-পাঠিকার চিঠি



মূলী রুজ

চৈত্রের বসুমতীতে শ্রীযুত সুবীরকান্ত গুপ্ত শ্রীযুত অশোক সিংহের 'সংশোধনের' সংশোধন' করেছেন।

অশোক বাবু 'মূলী' লিখেছেন, আর সুবীর বাবু বলছেন লেখা উচিক 'মূলী' ( 'হু'তে উকার হু'জনাট দীর্ঘ দিয়েছেন কিন্তু সেটা ছাপার ভুলও হতে পারে। কারণ pour-এর ou-এর মত moulin-র ou দীর্ঘ নয়, হ্রস্ব—এটা অবশ্য এখানে অবাস্তব )। সুবীর বাবু ফরাসী ভাষার অধ্যাপক, তাই একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারতেন অশোক বাবু মূলী লিখেছেন কেন? তাঁর মনে মনে ভয় ছিল (এবং সেটা কিছু অসঙ্গত নয়) মূলী লিখলে বাঙলা ভাষার রীতি অনুযায়ী লোকে পড়বে, 'মূলী'। যে বকম আমরা 'কজা', 'বজার' স্থলে 'ক-নুনা' 'ব-নুনা' পড়ি অর্থাৎ য ফলা থাকার দরুন তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনকে দ্বিগুণ করি। এই কারণেই অনেকে রমী (Romain) লেখেন 'রমী' না লিখে; যদিও ফরাসীতে Romain (রোমবাসী, কিংবা সাহিত্যিক Romain) এবং Roman (উপাধাস) দুইই আছে, এবং প্রকৃত পক্ষে একটা হবে রমী এবং অজ্ঞাটা রমী। কিন্তু এই দ্বিগুণ উচ্চারণের ভয়ে বহু গুলী রমী (রলী) লিখছেন—রমী রলী না লিখে। Moulin-কে বরঞ্চ মূলী উচ্চারণ করা ভালো, কিন্তু (মূলী থেকে) মূলী'। উচ্চারণ করলে আসল উচ্চারণ থেকে আমরা অনেক দূরে চলে যাই।

Henri-এর বেলাও অশোক বাবু ভয় ছিল আরি লিখলে বাঙালী 'আঁ'টাকে তার ভাষার উচ্চারণের পদ্ধতি অনুযায়ী বড় বেশী দীর্ঘ করে ফেলবে এবং ফরাসীতে ঐ জায়গাটার 'en'-টি অতিশয় হ্রস্ব, প্রায় 'le'-এর 'e'-র মত (ফরাসীতে 'e' হ্রস্বের

দু বকম উচ্চারণ—হ্রস্ব দীর্ঘ নয়, সে তো আছেই—একটা মুখ-গহবরের সাইনের দ্বিতীয়টা পিছনের এবং Henri শব্দের enটা পিছনের অনুনাসিক e)। অবশ্য অশোক বাবু চিন্তা করলে ভালো করতেন যে 'আঁ'র লিখলে বাঙালী তার ভাষার শ্রদ্ধা অনুযায়ী উচ্চারণ করে বসবে ওঁরি (যেমন 'কলি' হয় 'কোলি', 'বলি' হয় 'বোলি') এবং সেটা ফরাসীর আসল উচ্চারণ থেকে এত দূরে চলে যাবে যে তার চেয়ে 'আঁরি' ভালো।

কাজেই এসব (সুবীর বাবুর অভিমত অনুযায়ী) 'ভুল' নয়, উনিশ-বিশের তফাৎ। কারণ, তিনি নিজেই চব্বম সত্যটি বলে দিয়েছেন—'সব ফরাসী শব্দের যথার্থ উচ্চারণ বাঙালার লেখা সম্ভব নয়।' 'ত্যাঁবুরা' বেলাও তাই হয়েছে। 'tam'-এর am এত হ্রস্ব, একেবারে Henri-র 'en'-এর মত যে অশোক বাবু এখানে ক্যা (য ফলা ও আকার) দিয়েছেন। আর সুবীর বাবুর 'ত্যাঁবুরা' বাঙালার উচ্চারিত হয়ে যাবে 'ত্যাঁবুরা'!—খামখা একটা ফালতো 'র' এসে যাবে। (উভয়েই 'বু' দিয়েছেন হ্রস্ব; ওটা কি 'বু' দীর্ঘ হবে না?)

কিন্তু R-এর উচ্চারণ সম্বন্ধে সুবীর বাবু যা বলেছেন সে বিষয়ে আমার মনে কিঞ্চিৎ গৌঁকা আছে। 'ত্যাঁ' R উচ্চারণ করে গলার ভেতর থেকে, জিভ থেকে নয়—তা হলে শ্রদ্ধা—জিভ কেটে ফেললে কি ফরাসী R তখনো বলা যাবে? আর বাঙালীর গলা বন্ধ করে দিলে কি সে শুদ্ধ জিভে জোরে বাঙলা R বলতে পারবে। কিঞ্চিৎ, 'আ' এক 'রা' দুটোই তো 'গলা থেকে' বেরয়—তফাৎ তবে কোথায়?

অপরঞ্চ, দক্ষিণ ফ্রান্সের লোক আমাদের 'ব'-র মতই R উচ্চারণ করে—তবে আমাদের মত অতখানি 'টিউল' করে না। প্যারিসের লোক কি ভাবে করে? 'জিভ থেকে নয়' 'গলার ভেতর থেকে' বললেই যদি মুশকিল আসান হয়ে যেত তবে তো কোনো কথাই ছিল না।

সর্বশেষে বজ্রবা, 'লো'-তে 'একার' ও 'ব' ফলার সম্বন্ধে বাঙালী কি উচ্চারণ করতে কি যে করবে, তার ঠিক নেই; কারণ বাঙলাতে এ সম্বন্ধ থাকলেও আমাদের চোখে পড়ে নি।

—সৈয়দ মুজতবা আলী

### স্বামী বিবেকানন্দ ও দিব্যভারত

গত মাস সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে "স্বামী বিবেকানন্দ ও দিব্যভারত" প্রবন্ধটিতে শ্রীমন্ত্যগোপাল রায় মহাশয় যে মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন—সমগ্রদেয় এক স্থানে বলেছেন—"বুদ্ধ হইতে শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত সকলেই অনেকাংশে শ্রীকৃষ্ণের বিপরীতধর্মী অর্থাৎ antithesis, স্বামীজী এই বিপরীত ভাব বিদূষিত করিয়া একটা সমন্বয় (Synthesis) আনিলেন।—কথাটা সমর্থনযোগ্য নয়। বরং শ্রীকৃষ্ণ-পরবর্তী বুদ্ধ শংকর চৈতন্য প্রভৃতি অবতার প্রতিম মতাপেক্ষবগণ শ্রীকৃষ্ণই বিভিন্ন ভাবে—বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ বলা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের ত্যাগ-বৈরাগ্য, শংকরের জ্ঞান ও শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রেম যেন পূর্ণ মহিমায় প্রকট হোয়েছিল বস্তুতঃ, এরা সবাই ছিলেন সমন্বয়-ধর্মী। প্রকৃত ধর্মের আদর্শই এই সমন্বয়। ধর্মই সকল যুগে সকল ভাব-সংঘাত বা বৈপরীত্যকে (antithesis) একাদর্শে সমন্বিত করে। শ্রীকৃষ্ণ-শংকর-শ্রীচৈতন্য

এই সময়ের আদর্শ রূপায়িত। শ্রীমদ্ভক্ত-বিবেকানন্দে এই সময়ই মহাসময়ের পরিপূর্ণ। তাই স্বামীজী শ্রীমদ্ভক্তকে “অবতার-বরিতার” বলে ঘোষণা করেছেন। লেখক অল্পত্র শ্রীবৃদ্ধ শংকর ও শ্রীচৈতন্য স্বাক্ষরে যে নেতিবাদের (negativism) কথা বলেছেন এটাও ঠিক বলা চলে না। এঁরা কেউই নেতিবাদের প্রচারক ছিলেন না। বরং এঁরা সবাই ছিলেন ইতিবাদেই প্রচারক। শ্রীবৃদ্ধের নির্বাণ-বাদ, শংকরের ব্রহ্মবাদ, শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ মূলতঃ একই প্রচারণা—একই মহা হওয়ার বাণী।

গীতায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে “ব্রহ্মনির্বাণে”র কথা বলেছেন—উহাই শ্রীবৃদ্ধের নির্বাণ, শংকরের ব্রহ্ম, ও শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদভেদ দর্শন। শ্রীবৃদ্ধের নির্বাণ বস্তুতঃ নাস্তিবাচক (annihilation) নয়। শংকরের মাদ্ভাববাদও নিছক ভ্রান্তি (illusion) বা অধ্যাস (projection) নয়। উহা ব্রহ্মবাদেই অভিনব রূপে সংস্থাপন মাত্র। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মও নেতিবাদমূলক নয় বরং ইতিবাদ-মূলক। কারণ বৈষ্ণবের বৈরাগ্যের আদর্শই কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণপ্রেম কখনও নেতিবাদের সমর্থক নয়। বৈরাগ্যের তাৎপর্য বাগ-বিহীনতা। প্রবৃত্তির বাগবন্ধনে বঞ্চিত না হওয়াই প্রকৃত বৈরাগ্য। উহা কখনই (negativism) নয়।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, শ্রীবৃদ্ধ শংকর ও শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহা-পুরুষগণের লীলাবদানের পরে তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের দ্বারা এই নেতিবাদ প্রচারিত হয়। বার ফলে বৃদ্ধের নির্বাণ, শংকরের মাদ্ভাব, শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি একটা বিরাট বিকৃতি এনে দিল জনসাধারণের মনে ও মগজে। ধর্মের নামে, প্রেমভক্তির নামে স্ত্রীবাঁতা, জড়তায় হুবে গেল সারা দেশ। ইতিবাদের পরিবর্তে নেতিবাদই হোয়ে উঠল প্রবল। এ ক্ষত দারী শ্রীবৃদ্ধ, শ্রীচৈতন্য-অগ্রগামী অগণিত শিষ্য বা ভক্তের দল। এ স্বাক্ষরে লেখক বার মহাশয় নতুন কিছু জানালে স্তব্ধ হবেন। শ্রীহরিশ্রয় যুগী, গোঃ জগতাই।

### কিনতে চাই

১৩৬২ সালের বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত মাসিক বহুমতী।—দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩ নং লক্ষ্মীনারায়ণ বৃথাঞ্জী রোড। কলিকাতা ৬।

১৩৬৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা চাই।—সমীর দে। ২৭ সি বিডন রো। কলিকাতা ৬।

১৩৬২ সালের বৈশাখ ও ১৩৬৩ সালের প্রাবণ সংখ্যা চাই।—অমিয়া সেন। ৭৭, নতুন চট্ট। ঝাঁকুড়া।

১৩৬৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা চাই।—আশরাফ সিদ্দিকী। ৩৭, দেওয়ান বাজার রোড। ঢাকা। পাকিস্তান।

১৩৫৫ সালের বৈশাখ থেকে প্রাবণ, পৌষ, এবং চৈত্র। ১৩৫৬র ফাল্গুন, ১৩৫৮র ফাল্গুন, এবং ১৩৫৯র আষাঢ় এবং ফাল্গুন।—সন্তোষ পাল। Chengmari Tea Estate. Daldheng P. O.

### বেচেতে চাই

১৩৫৭ সাল থেকে ১৩৬২ সাল পর্যন্ত পত্রিকার পুরা সেট। ইলা বখাক্রমে ছয়, নয় এবং বারো টাকা। এক সঙ্গে লইলে ছয়

টাকা দাম কম হইবে। ননীলাল দত্ত। ৬০, কৈবর্ত পাড়া লেন। শালিখা। হাওড়া।

১৩৬০ সালের আষাঢ় ও ভাদ্র ছাড়া সবগুলি সংখ্যা। মূল্য প্রতি সংখ্যা এক টাকা। জিঃ শিঃতে পাঠানো যাবে। গোপালচন্দ্র পাল। গান্ধীপুর। হাওড়া।

১৩৪৭ হইতে ১৩৬১ সাল পর্যন্ত পত্রিকা বেচেতে চাই। পুষ্পলতা বানার্জী। ৪৩ চিন্তামণি দে রোড। হাওড়া।

### গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

আমার প্রিয় পত্রিকার জন্য এক বৎসরের চাদা পাঠাইলাম। অল্পগ্রহ পূর্বক বৈশাখ সংখ্যা সম্বর পাঠাইবেন। ইতি—মারা দেবী। Garganda Tea Estate. Ramjhora (Dooars).

Remitting Rs 15/- only being the amount of yearly subscription for the year 1364 B. S. please send the paper regularly and oblige.—Nilima Bose. C/o, B. M. Bose. Asst. Manager, Halmari T. E.

১৩৬৪ সালের গ্রাহকমূল্য পাঠাইলাম। নিয়মিত ভাবে মাসিক বহুমতী পাঠাইয়া বাবিত করিবেন। ইতি—Sm. Rajlakeshmi Kar. 8, Goode Road. Darjeeling.

১৩৬৪ সালের মাসিক বহুমতীর চাদা বাবদ ১৫ টাকা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া বৈশাখ মাস হইতে উপরিউক্ত ঠিকানায় বহুমতী পাঠাইয়া বাবিত করিবেন।—বাণী দায়। 35/B, Nizamuddin West, New Delhi—13.

Rs 15/- being the subscription of M. Basumati for the current year is remitted herewith. I shall be glad if you would enlist my name for this year also and arrange to send the subsequent copy of the ‘Basumati’ at an early date.—Lila Lahiri. Coal Survey Station. Bilaspur P. O. M. P.

মাসিক বহুমতীর গ্রাহিকা হওয়ার জন্য ছয় মাসের চাদা ভাঙে পাঠাইলাম। পত্রিকা সম্বর পাঠাইবেন।—রাজলক্ষী মুখোপাধ্যায়। C/o, Ramranjan Mukherjee. Dept of Ins. Govt of India. Simla Hills.

আমি আপনাদের মাসিক বহুমতীর একজন গ্রাহিকা হিসাবে ছয় মাসের বহুমতীর জন্য অগ্রিম সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীশঙ্করলাক্ষ্মী দেবী। Po. Jagannj, Murshidabad.

১৫ টাকা পাঠালাম। ১৩৬৪ সালের মাসিক বহুমতীর জন্য। অবিলম্বে পত্রিকা পাঠাবেন।—Devrani Choudhuri, 26, Wakdewadi Poona 5.

Being subscription for the year commencing 1st Baisakh to 31st Chaitra. Please start issuing the magazine regularly.—Mrs. Gita Banerjee, 15/95, Civil Lines. Kanpur.

বহুমতীর জন্য ৭০ টাকা পাঠাইলাম। নানা কারণে দেবী হইয়া গেল। আশা করি বই সম্বর পাইব।—অমিত্রা দাশগুপ্ত। Quinton Road, Shillong (Assam).

জাতীয় সংগ্রামের অগ্রিকল্প কাহিনী  
॥ মণি বাগচির ॥

## মিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস

॥ বহু চিত্র ও মানচিত্র পরিশোভিত ॥

দাম পাঁচ টাকা

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : কলিকাতা-১২

.....

‘অক্ষপুঞ্জ’ ও ‘কঙ্কহারী’ প্রণেতা

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

গৃহাগতা

২১

১৯৫৬ সনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

অন্তরায়

(উপন্যাস)

২১

প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়,

১১৪২ বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬

আমেরিকার বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ও  
বাইওকেমিক ঔষধ

প্রতি ড্রাম ১১০ ৩।০ আনা, পাইকারগণকে উচ্চ কষিপন দেওয়া হয়। আমাদের নিকট চিকিৎসা সাক্ষরীয় পুস্তকাধি ও বাবতীয় সহজায়ক হস্ত মুদ্রা পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। বাবতীয় গীড়া, শ্রাবকিক সৌর্যল্য, অক্ষা, অনিহা, অর, অর্জী প্রভৃতি বাবতীয় ঝটিল রোগের চিকিৎসা বিচক্ষণতার সহিত করা হয়। অক্ষাঞ্চল রোগীদিগকে ডাকযোগে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসক ও পরিচালক—  
ডাঃ কে, সি, দে এল-এম-এক, এইচ-এম-বি (পোস্ট মেডেলিট), ভূতপূর্ণ হাউস ফিজিসিয়ান ক্যাবেল হাসপাতাল ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এও হাসপাতালের চিকিৎসক।  
অনুগ্রহ করিয়া অর্ডারের সহিত কিছু অগ্রিম পাঠাইবেন।

জ্ঞানিম্যান হোমিও হল ১৮৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬(ম)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারগণ প্রশংসিত—

নিজে নিজে ইংরেজী লিখিবার—বলিবার—শিখিবার সর্বজন-  
সুপরিচিত—স্বনাম-প্রসিদ্ধ উপদ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত  
একমাত্র চূড়ান্ত গ্রন্থ

## রাজভাষা

আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীসঙ্গতভাবে পরিবর্তিত—পরিবর্তিত।

বাংলা-ইংরেজী সংস্করণ—১১০ টাকা

হিন্দি-ইংরেজী সংস্করণ—১, উর্দু-ইংরেজী সংস্করণ—১

বহুভাষী সাহিত্য মন্দির : ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

● ● নতুন বেরোল ● ●

উপন্যাস

পথের প্রিয়া

২১

আধারের আলো

২১

মুখীন দত্ত

পরিচয়

১১০

নব জাবন

৩১

বিজয় ভট্টাচার্য

ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

শিশু-সাহিত্য

প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য

১১০

গল্প গাথা

১১

স্বপনকুমার

চিত্তরঞ্জন স্মর

(কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত)

মোহন লাইব্রেরী—৩৫এ, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডাঃ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্যের

পৈত্রিক ভিটা...৩১০

বাকের ঘুঞ্চে (২য় সং) ২১০

আমীর আল (৩য় সং) ২১

জয়ন্তী ২১০

বন্দীর বাজবী (২য় সং) ২১০

মিস্ত্রির মেয়ে (২য় সং) ২১০

দক্ষ্যর পশ্চাতে (২য় সং) ১১০

কাঁটাফুল ২১

বুড়ীর বটতলার ডাকাতি ১১০

ছন্দে শঙ্কুস্তলা ৩১

নারী কি শুধু আমীর ? ১১

সাহিত্য-কোণ, ৪৪/সি বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৩

উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক পুস্তক

ডাঃ জে, এম, মিত্র প্রণীত

মডার্ন

কম্পারেটিভ মেট্রিয়ার মেডিকা

গৃহস্থ, শিক্ষার্থী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের পক্ষে বিশেষ  
উপযোগী। সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয় ও হোমিও ফার্মাসীতে

পাওয়া যায়। মূল্য ১২১। ডাঃ মাঃ ২১।

মডার্ন হোমিওপ্যাথিক কলেজ

২১৩ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারগণ প্রশংসিত—  
নিজে নিজে ইংরেজী লিখিবার—বলিবার—শিখিবার সর্বজন-  
সুপরিচিত—স্বনাম-প্রসিদ্ধ উপদ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত  
একমাত্র চূড়ান্ত গ্রন্থ

## আরব্য রজনী

একাধিক সহস্র রজনীর প্রমোদ-লহরী।

অনুবাদ-সাহিত্যে অমর-কীর্তি—রহতলীয়ার সর্বজনপ্রমোদন বাহুবল—  
চিরপ্রিয় প্রবীণ ঔপন্যাসিক নীলেন্দ্রকুমার বার অনুদিত।

চিত্রের পর চিত্রে বায়বোপ প্রদর্শিত—সুসজ্জিত চিত্র-এলবামে সৌন্দর্য-  
জ্যোৎস্না উজ্জ্বলিত—অনুপম রূপসজ্জায় সশোভিত রাজাবিরাজ সংস্করণ।  
মূল্য ১০১ টাকা।



॥ मासिक वसुधा ॥

आषाढ, १९७४

इति-वार्ता

—हरिवर प्रताप







# মাসিক বসুমতী

৩৬শ বর্ষ—আষাঢ়, ১৩৬৪]

। স্থাপিত ১৩২৯ ।

[ প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

## কথামৃত

সকল উপাসনার সার এই—সুস্ফুট হওয়া ও অপরের কল্যাণ-সাধন। যিনি দরিদ্র, দুর্বল, রোগী সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই বর্ষাৰ্শ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্তকমাত্র। যে ব্যক্তি জাতিধর্মনির্বিশেষে একটু দরিদ্র ব্যক্তিকেও সেবা করে, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।

যিনি পিতাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সম্ভানগণের সেবা অগ্রে করিতে হইবে। যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সম্ভানগণের সেবা সর্বাগ্রে করিতে হইবে—অগ্রে জগন্তের জীবগণের সেবা করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বাঁহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাও ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ দাস; অতএব এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিবে।

আমি তোমাদিগকে আবার বলিতেছি, তোমাদিগকে সুস্ফুট হইতে হইবে এক যে কেহ তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়,

যথাযথ তাহার সেবা করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে পরের সেবা শুভ কর। এই সংকল্পবলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব বহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন। তিনি সকলেরই স্তন্যে বিরাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা আমাদের মূর্তি দেখিতে পাই না। আমাদের স্বরূপ দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও পাপের ময়লা বহিয়াছে।

গেকরা কাপড় ভোগের জন্ত নহে, মহাকাব্যের নিশান—কারমনোবাক্যে 'জগদ্ধিতার' দিতে হইবে। পড়িয়াছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব', আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারা তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।

আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, আমি মানুষকে বিশ্বাস করি; দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্ত নহকে বাইতে প্রস্তুত হওয়া আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি।

—দ্বামী বিবেকানন্দ।

# সংস্কৃতি ও বাঙ্গালী

ঐদেবব্রত সেন

আমাদের ব্যবহারিক সভ্যতা একটা বিখ্যাত প্রযুক্তি ধরা পড়ে।

এক দিকে মহত্ত্বের আকর্ষণ—আর, অন্য দিকে ক্ষুদ্রতার নিকট আশ্রয়সম্পর্প। বহু আলোচনা অন্তে বিপ্লবসমাজ একথা মেনে নিয়েছেন যে, আমাদের স্বভাবের মধ্যে নিবস্তুর এই দু'ধারার দ্বন্দ্ব চলছে। প্রতীতির কোন এক মনোবীর ভাষায় The world is the vale of soul-making,—অর্থাৎ, নানা বিবোধের মধ্য দিয়ে মানুষের সকল প্রয়াসের আসল লক্ষ্য নিজের পূর্ণতম বিকাশের দিকে সে বিকাশের ভারী স্বরূপ নিয়ে অনিশ্চিত মন্তব্যে কোন লাভ নেই। সময়ের ধারা বয়ে চলেছে; তারই বৃক্ চলছে বিবর্তনের খেলা; এই বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, নিজে ক্রমশঃ জীবনের রূপে রূপায়িত করবার ভ্রম নানা কর্ম ও চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছে মানুষ। সে নিজের ভেতরকার অপ্রয়োজনীয়ের সংস্কার করে চলেছে,—যা একান্ত প্রয়োজনীয় তাকে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে। এমনি করে স্বভাবের সংস্কার করতে গিয়ে যা কিছু গ'ড়ে উঠেছে, তারই নাম 'সংস্কৃতি'। প্রকৃতির খেলা লক্ষ্য করলে এটা বেশ বোঝা যায় যে, পরিবর্তন ছাড়া সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্ভব নয়। বাইরের জগৎ বহু ভাবে একথা আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সেখানে একটা বিপুল চলমান শক্তির প্রকাশ চলছে চিরকাল। প্রকৃতি তার আকারহীন বিপুল বাষ্পস্রাব্যতা থেকে চলতে চলতে আজ মানুষের এসে পৌঁছেছে। এই চলা এখানেই শেষ হবার নয়। কিন্তু এই অবিরাম চলার লক্ষ্য একটা সার্বিক অভিব্যক্তির দিকে।

মানুষের মন প্রকৃতিরই অংশস্বরূপ—তাই তাকে বলি অন্তঃপ্রকৃতি (Internal Nature)। সেই ভেতরের রাজ্যও বিবর্তনের খেলা থেকে অব্যাহতি পায়নি। নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সেই মনোরাশ্যও গ'ড়ে উঠেছে নানা সভ্যতা কটি ও সংস্কৃতিবোধ। রূপান্তরের মূল অর্থ হ'ল ভাঙ্গা-গড়ার লীলা। এই লীলার আনন্দে মানুষ যোগ দিয়েছে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে। বাকি সে গড়েছে, তাকেই আবার ভেঙে চূষকার করেছে। কিন্তু, কেন এই খেলা? উত্তরে বলব,—একটা সার্বিক বিকাশের প্রয়োজন। তাই, প্রকৃত সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে প্রগতির কোন বিবোধ ত' নেই-ই,—বরঞ্চ, তারা অতি নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ।

বহুখুষি ঘটনার আবর্তে পড়েও যে স্বরূপটি গ'ড়ে ওঠে তারই নাম স্বাভাব্য। নানা ভেদের মধ্যেও একটা অভেদ রূপ গ'ড়ে ওঠে সেখানে। ব্যক্তিগত জীবনে তার নাম 'চরিত্র',—আর সমষ্টিগত জীবনে তাই-ই 'সংস্কৃতি' নামে অভিহিত হয়।

এছাড়া, আরও একটা দিক আছে। রাষ্ট্রনীতি পড়ে আমরা জেনেছি যে, কি অপরিণত অবস্থা থেকে এবং কত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানবসমাজ বর্তমান জীবনের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে। এই চলমান ধারাবাহিক জীবন-রংগের মূল নায়ক মানুষ নিজেই। যে শক্তি প্রকৃতির মধ্য নিছক বাহ্যিক (Mechanical) হ'য়ে ছিল,—মানুষের জীবনে তাই একান্ত ভাবে আশ্রিত স্বাধীনতা লাভ করল।

সভ্যতা চলল এগিয়ে; সংগে সংগে বিভিন্ন দেশ ও সমাজ-জীবন গ'ড়ে উঠল। এমনি কয়েকি দেখা দিল নানা রাষ্ট্র ও জাতির একটা প্রবহমান ধারা। তারা বিভিন্ন,—কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। ভূগোলের চতুঃসীমায় তারা ধীরে ধীরে বাঁধা পড়ল। বাতাস আর মাটি বদলের সংগে সংগে ভেতরের বৈচিত্র্যও ফুট উঠল। কারণ, মাটির রসেই মনের রস প্রবর্তিত হয়। বাই হোক, ক্রমশঃ এই বিভিন্নতা উকট প্রাধাত্য লাভ করল। ফলে, মানুষ তার মূল ঐক্যের (Common Heritage) কথাও বিস্মৃত হয়ে গেল। প্রসংগতঃ, একথা বলে রাখি যে, এ ভুলের মাশুল আদায় শুরু হ'য়ে গিয়েছে;—তারই প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্ব জুড়ে সংঘটিত, মানুষের স্বকৃত আত্মঘাতী সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধ্যে।

বস্তুতঃ, অবিস্মরণ ভাল বা মন্দ—কোনটাই সম্ভব নয়। কালের বিবর্তনের সংগে সংগে সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। ফলে দেখা গেল, যে রসধারা বহু জনমানসে ছড়িয়েছিল—তা নানা প্রদেশের সীমায় আবদ্ধ হ'য়ে স্বতন্ত্র ও বিশেষ হ'য়ে উঠল। ছোট ছোট জায়গায় সীমাবদ্ধ হবার ফলে প্রত্যেক জাতি তাদের নিজস্বের সংস্কৃতিকে আপন খুসীতে গ'ড়ে তোলবার দিকে মনোনিবেশ করতে সমর্থ হোল। নানা সংস্কৃতির এই মহাতীর্থযাত্রায় 'বঙ্গসংস্কৃতি' নামে একটা বিশিষ্ট ভাবধারা গ'ড়ে উঠল। এই বাঙ্গালী জাতি ও তার সংস্কৃতির আদি পরিচয়টি কি? ঐতিহাসিকের ভাষায়—"গঙ্গা-করতোয়া-লৌহিত্য-বিবোধ, সাগর-পর্বতস্থ রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সমতট এই চতুর্ভূজপদসম্বন্ধ বাংলা দেশে প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী অভ্যাস পর্যন্ত কত বিভিন্ন জন, কত বিভিন্ন রক্ত ও সাংস্কৃতিক ধারা বহন করিয়া আনিয়াছে—এবং একে একে ধীরে ধীরে কোথায় কে কি ভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহার সঠিক হিসাব মনে রাখতে নাই। সজাগ চিত্তের ও ক্রিয়ালীল মননের রচিত কোনও ইতিহাস তাহার হিসাব নাই একথা সত্য, কিন্তু মানুষ তাহার রক্ত ও দেহ গঠনে, ভাষায় ও সভ্যতার বাস্তব উপাদানে এবং মানসিক সংস্কৃতিতে তাহা গোপন করিতে পারে নাই।" (বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,—শ্রীনিহাররঞ্জন রায়)। কালের প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে এ মাটিতে একটা স্বতন্ত্র জনসমাজ তার স্বকীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। সেই সমষ্টিপ্রাণের গতি আজও সামনের দিকে নিরন্তর-প্রসারিত। ইতিহাসের পাতায় একথা বহু বার লেখা হয়ে গেয়েছে যে, অজ্ঞ যে কোন জাতির ক্রায় বাঙালীর সংস্কৃতির মানস-দুর্গে বহু বার আঘাত লেগেছে। তাত্ত সামাজিক জীবনের বন্ধনগুলো চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। অনেক কিছু পুরানো নিশ্চিহ্ন হয়েছে,—আর তারই ভগ্নস্থূপের উপর নতুনতর জীবনের সৌধ গ'ড়ে উঠেছে। দুঃখ ও বিরূপতাকে বাঙালী এড়িয়ে যেতে চায়নি। তার জীবনধর্মে এমন একটা হৃদমণীর বীজ আছে, যার প্রেরণায় সে দুঃসহকে করেছে সহনীয়, প্রতিকূলকে করেছে অহুঙ্কল। নানা দুঃখ ও সংগ্রামের প্রচণ্ড আঘাত বাঙালীকে সত্যের প্রবেশ-দ্বার পৌঁছে দিয়েছে।

আমার মনে হয় যে, বাঙ্গালীর মানস গঠনটি একটু স্বতন্ত্র ও অপরূপ। তার মনোবর্ধ একান্ত ভাবে নমনীয়, এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে এই নমনীয়তার মধ্যেই বাঙ্গালীচিন্তার এমন একটি দৃঢ়তা গড়ে উঠেছিল, যা আপন বৈশিষ্ট্য প্রোক্ষল। এখন এই নমনীয়তার কথাই বলি। ইতিহাসের আবর্তকে এই “গংগা-করতোয়া-লৌহিত্য-বিধৌত-রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সমভূমি” প্রদেশে বার বার নতুন জন, ধর্ম ও সংস্কৃতির আঘাত লেগেছে,—আজও লাগছে। কিন্তু সেই তদিনে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনচর্যা তার অন্তরের স্বাতন্ত্র্যগুণে কালের আবর্তন-প্রবাহে মগ্ন হয়ে গিয়েছে। তখন মনে হয়েছে, বুরি বা বাঙ্গালী গেল—তার চর্যা ও সংস্কৃতির বিলোপ ঘটলো। কিন্তু তা হবার নয়। এ জাতি তার অন্তরস্থিত দুর্জয় শক্তি ও অনমনীয় সাহসের বলে কিছু কালের মধ্যে নবতর উৎসাহে সবার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এটি একটি বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য যে, চরিত্রের এই দৃঢ়তা ও সঙ্গীর্ণী মনোবৃত্তির প্রবলতর প্রকাশ ঘটেছে এক এক জন মহামানবের আবির্ভাবে, সমাজ ও ব্যক্তির জীবন পরস্পর-নির্ভরশীল, এটি আধুনিক সমাজ দর্শনের একটি বহু ঘোষিত সত্য। এ সত্যটি বাঙ্গালীর জীবনেও বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এমনি নবজাগরণের যুগে অসংখ্য মহাপ্রাণ আবির্ভূত হয়েছেন জাতির জীবনে; তারা এই দুর্দশাগ্রস্ত, বিপথগস্ত, মৃতপ্রায় সমাজকে আশ্রয় আনিয়েছেন নতুনতর জীবন-চর্চার পুনরুজ্জীবন উৎসবে, তখন জাতির মগ্নচৈতন্য (Subliminal Consciousness) থেকে তার ক্ষম-অসম্মতের ঐতিহ্য, তার সুদীর্ঘ অতীত, একই সংগে, একই প্রেরণায় তড়িৎ-শিখার মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। বহু বার এই নবজাগরণের শব্দধ্বনি শুনেছি বাঙ্গলা দেশে। জাতির চিত্তাক্রান্ত এসে দাঁড়িয়েছেন কত মহামানব; তাঁদের কর্ম-জীবনে, স্বপ্ন-মননে, একটা লুপ্তপ্রায় জনমানসের আত্ম-পরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী ঘোষিত হয়েছে। সে ঘটনাবলীর তারিখ সমন্বিত বিচারের ভার রইলো ঐতিহাসিকের উপর। এ ধরণের যুগের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে ক্রীষ্ণবিন্দু তাঁর *The Human Cycle* নামক পুস্তকে বলেছেন—

“Then there arrives a period when the gulf between the convention and the truth becomes intolerable and the men of intellectual power arise...who rejecting robustly or fiercely or with the calm light of reason symbol and type and convention strike at the walls of the prison-house

and seek by the individual reason, moral sense or emotional desire the truth that society has lost or buried in its whitened sepulchres. It is then that the individualistic age of religion and thought and society is created; the Age of Revolt, Age of Reason, Progress, Freedom has begun.” (P. 13).

ব্যক্তিজীবনের চরম প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙ্গালীর আত্মজীবন জাতীয়তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো; তারই সঙ্গে বাঙ্গালী বিশ্ব-ভাটুরের মধ্যে দীক্ষালাভ করল। এই সময়ের প্রতিফলন দেখতে পাই উনিশ শতকের বাঙ্গালী মহাপুরুষদের জীবনে ও বাণীতে। এই সব মহামানবের আবির্ভাবও নিতান্ত আকস্মিক নয়। এর পেছনে রয়েছে কার্য-কারণ নিয়মের অলঙ্ঘনীয় শাসন। জাতির বহুকালের দাখনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে জাতির অসংখ্যপ্রাণ যে সাধনা করে, তারই বলিষ্ঠ একীভূত রূপায়ণ ঘটে এক একটা বিশেষ মানুষের মধ্যে। জাতির বহুকালের অপ্রকাশিত বেদনা প্রকাশিত হয় নানা মহামানবের জীবনে। একথা অস্ব যে কোন জাতির জীবন বাঙ্গালীর সম্বন্ধেও সত্য। বৃহৎ জমলাভের ভগ্না বৃহত্তম বেদনার প্রয়োজন। আজ-কাল অনেক আক্ষেপ করে বলে থাকেন যে, কই,—বাঙ্গালী দেশে এত দলের মধ্যেও এমন কোন নেতা আছেন কি, যিনি এই বিপথগস্ত জাতিকে একটি সুনির্দিষ্ট কল্যাণময় ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারেন? তার উত্তরে আমি বলব যে, এই দুর্দশা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কারণ জাতির মনে আজ কোনও বেদনাবোধ নেই। ইংরেজ-শাসিত ভারতে এবং আরও একটু পেছিয়ে বলা যায়, মুসলমান-শাসিত দেশে মানুষের মনে যে স্রুতীত বেদনা ও স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল, তারই ফলে অগণ্য মহামানবের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। জাতি বঞ্চিত অচেতন হয়ে থাকে, তখন তার আত্মজীবনের মানস-গুর্গে আঘাত লাগে; সে আঘাত যত প্রচণ্ড হয়, আবির্ভাবের বিরটিতও তত সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। এটি ঐতিহাসিক সত্য, আজ নানা দলীয় চাপে পাড়ে বাঙ্গালী খুঁজে পাচ্ছে না কোন সুযোগো নেতাকে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে এ কথাও মনে হয় যে, এ জাতির অনুসন্ধান করবার তাগিদও বুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের সকলকেই সেই নবজাগরণের কাজে অগ্রসর হতে হবে; কেন না, এ হ’ল জাতীয় দায়িত্ব। এই বেদনাবোধ-জাগ্রত করবার একমাত্র উপায় হ’ল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতিকে তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

“একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের ‘সঙ্গীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে, অথচ সেই সুরগুলো স্বাধীন। এ সুরগুলিকে কোনো রাগ-কৌলীভের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সবক্ষে ভুল হয় না—স্পষ্ট বোকা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলাতী সুর নয়।”

“সুবেশের প্রত্যেক গান একটি বিশেষ ব্যক্তি সে আপনায় মধ্যে প্রধানতঃ আত্মমর্যাদাই প্রকাশ করে। ভারতে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ জাতীয়, সে আপনায় মধ্যে জাতিমর্যাদাই প্রকাশ করে।”

—রবীন্দ্রনাথ

# তীর্থগোষ্ঠীর ভাষা-সমস্বর

শ্রীআদিত্যপ্রভনন্দ কাব্যতীর্থ

বহু ঐতিহাসিকের মতে আৰ্যগণের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য-এশিয়া, সেখানে বংশবৃদ্ধি ও ব্রহ্ম-পরিভ্রমে জীবনোপায়ের অসুবিধার জন্য তাহারা পশ্চিম ও দক্ষিণে স্রজলা ভলগা, ডন, দানিউব, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী-বিধৌত শস্যভূমল ইউরোপীয় দেশসমূহ ও তুরস্ক, ইরান ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি এশিয়ার দেশসমূহে গিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সেই স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পৈতৃক বাসভূমিতে তাহাদের যে মাতৃভাষা ছিল, বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ায়, ধীরে ধীরে তাহাদের পরিবর্তন হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিল। তাহাদের নব নব রূপে যদিও তাহাদিগকে পরস্পরের জ্ঞাতি বলিয়াও চিনিতে পারা গেল না—তবুও যুদ্ধ, গভীর ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ভাষাবিদগণের দৃষ্টিকে তাহারা বঞ্চিত করিতে পারিল না। তাই আজ ভাষাবিদগণ তাহাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষের একত্ব আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। তাহারা বর্তমান ইংরাজী ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষার জনক ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতির সহিত ভাষাতত্ত্বীয় প্রাণন ভাষাগুলির উৎপত্তির উৎস সংস্কৃতের, আবার আরবি, পার্সী প্রভৃতিরও কি কি সাদৃশ্য আছে—তাহার কিছু কিছু নির্ধারণ করিয়াছেন।

নিম্নে ইংরাজীর কতকগুলি বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের সহিত সংস্কৃতের কতকগুলি শব্দ ও ধাতুর কি কি সাদৃশ্য আছে—তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

Webster এর অভিধানে ইহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও বিশেষ্য ও ক্রিয়া, সেই প্রাচীন যুগে একরূপই ছিল—কালক্রমে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটয়াছে। ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, আরবি প্রভৃতি ভাষার মূল ধাতু ও শব্দের সহিত সংস্কৃতের এই সাদৃশ্য বহুভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অমূল্যদানে ক্রমে নির্ণীত হইবার আশা করা যাইতে পারে।

গম্ ও কৃ ধাতুর ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষাগুলির মূলের ২৪টি দৃষ্টান্ত ওয়েবস্টার হইতে প্রদর্শিত হইল।

ক্রিয়া	বিশেষ্য প্রভৃতি
সংস্কৃত	ইংরাজী
গম্ } গাও }	Go
	Saxon-gan
	German-gehen
	Dun-gaer
	Swedish-ga
	Dutch-gaan
	Busaqwe-gan
কৃ (কৃত) কৃ	Do
কৃ (করা) Saxon-Don	
	Dutch-Doen
	German-Thun
Russian-Deya (Dayw)	
	পিতর, পিতৃ
	মাতর, মাতৃ
	ভ্রাতর, ভ্রাতৃ
	ত্রি (তিন)
	ষষ্ (ছয়)
	অষ্টন্ (আট)
	নবন্ (নয়)
	তে (তাহারা)
	পূর্ব
	অগ্র, আগে
	কল
	Father
	Mother
	Brother
	Three
	Six
	Eight
	Nine
	They
	Prior
	Ago
	Fruit

ক্রিয়া	ইংরাজী	ক্রিয়া	ইংরাজী
সংস্কৃত	ইংরাজী	সংস্কৃত	ইংরাজী
অর্চ, অর্হ	Worship	অদ }	Eat
অর্জ	Earn	অশ }	Lick
অট	Wonder	লিহ	Kiss
জট, কট	Clot	নিস্ }	Sleep
কট	Rob	সীও }	
মদ, মদি	Mad,	বস্ }	
	Become Mad	পা }	Protect
	Endeavour	পৃ }	
	Stop	পল }	
অভ্, ঈত্	Praise	ভু }	Be
পনচ্, উগ্রী	Weave	বিদ্ }	
পুগী }	Purify	জন্ }	Born
পুং }		ষিবু }	Sew
সেব্, জীব	Serve	খ্রীচ্, খ্রিস্টা	Please
শল্, বস্ }	Live		Sweat
কৃশ, ক্রন্দ্ }	Fall	শম্ }	Calm
	Vomit	দম্ }	Tame
	Cry	তৃব্, (become)	Thirsty
মেধ	Meet	কৃষ্, কৃড্ }	Kill
চিবু	Wear	দনভ }	Deceive
মাস্ত }		ইষ }	Wish
মা }	Measure	মৃগ্ }	Seek
মাত্, বধ্ }	Bind	ভাজ্ }	Devide
কিং }	Cure	ক্রট্, চুট্ }	Cut
শান্ }	Sharpen	কৃৎ, কুট্ }	
শিত্ }		মৃদ, মিশ্র	Mix

## EXTEMPORARY SONG.

I

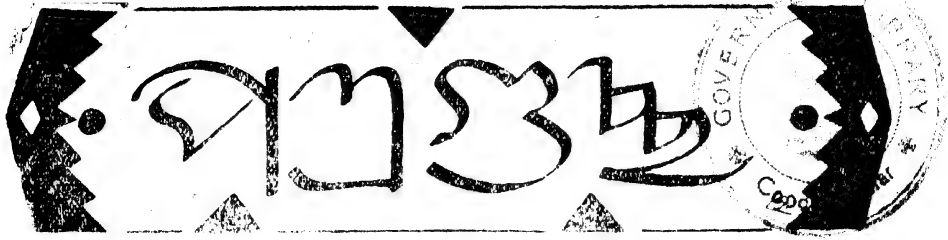
I sigh for Albion's distant shore,  
Its valleys green,—its mountains high ;—  
Tho' friends, relations I have none  
In that far clime,—yet oh ! I sigh  
To cross the vast Atlantic wave  
For glory or a nameless grave !

II

My father, mother, sister all  
Do love me and I love them too,  
Yet oft the tear-drops rush and fall  
From my sad eyes like winter's dew.  
And oh ! I sigh for Albion's strand  
As if she were my native land !

KIDDERPORE, 1841.

—Madhusudan Dutt.



## কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

১

২৬ মে ১৮৯১

প্রিয়বরেব্,

কলিকাতা

বলেন্দ্রনাথ ও আমার পুত্র রবীর রোগপর্যটনের জন্য আমাকে হঠাৎ কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে—প্রায় পনেরো দিন এখানেই কাটিয়াছে, আরও দিন পাঁচ সাত কাটিতে পারে। নিজেও সুস্থ নহি।

এদিকে অকালবর্ষা নামিয়াছে—ঠিক শ্রাবণ মাসের মত। ইহাতে আমার কোন আগন্তি ছিল না, শকা হয় পাছে প্রকৃতি শ্রাবণ মাসে কঁাকি দিয়া বসেন। শাক্সিলিওও যদি এখনকার অন্তরূপ বর্ষায় প্রোজুর হইয়া থাকে তবে আপনার সৌভাগ্য আমি ইচ্ছা করি না। পাহাড়ের বর্ষা আমাদের বাঙ্গালীর কান্নার মত একঘেয়ে এবং অবিশ্রাম। তবু একবার আপনারদের শৈলনীদের মধ্যে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু অবকাশ এবং পাখা না থাকায় সে দুরাশা মনে স্থান দিই না। বোগতাপের মধ্যে লেপাণড়া বন্ধ আছে—স্বযোগের অপেক্ষা করিতেছি—এক একবার ডাবি স্বযোগও হইত আমার অপেক্ষা করিতেছে—জোর করিয়া মনটাকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একবার লিখিত বসিলেই হয়—কিন্তু সেট জোরটুকু সম্প্রতি পাটতেছি না।

কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে—যেমন করিয়া হোক তাহাদের একটা গতি করিতে হইবে—তাহারা আমার কল্পনায়ের মত—পাল্লিকের সহিত তাহাদের পরিণয় সাধন করিতে না পারিলে তাহারা অরক্ষণীয় হইয়া উঠিবে—কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধেও বালাবিবাহটা ভাল নয়—উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত ইহাদের বলবৎ ও উপদ্রব আমাকে সহ্য করিতেই হইবে। শরীর আজ পীড়িত আছে—এখানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। ১৩০৬

আপনার  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১৮ জুন ১৮৯১

শিলাইদহ,

কুমারখালি

E. B. S. Ry.

প্রিয়বরেব্,

দাঙ্গিলিওর ঠিকানায় আমি আপনার পত্রের উত্তর দিয়াছিলাম, পাইয়াছেন কি জানি না। আপনার পত্রে দাঙ্গিলিও হাড়া

আর কোন প্রকার বিশেষ ঠিকানা লিখিত ছিল না। এ পত্র কলিকাতার ঠিকানায় লিখিলাম।

যেকোন প্রবল বর্ষা পড়িয়াছে, এখন বোধ করি নদীনির্ধর ও সঙ্গে সঙ্গে বহুতর ভূখণ্ড শিলাবণ্ড পাহাড় ছাড়িয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে—আপনারা কি শিমুরদেশেই অটল হইয়া থাকিবেন? যদি নামেন ত এই পথ। নদীর পথটা কি অসুদূর করিতে পারেন না? এখন আকাশ মেঘে, নদী জলে এবং পৃথিবী শস্তে পরিপূর্ণ। ঘরের বাহির হওয়া শক্ত কিন্তু 'জানাল' আছে কি করিতে? আপনারদের বাইসিক্ল চলিবার মত একটা পথ গড়িয়া লওয়া গেছে।

আত্মীয়দের পীড়া লইয়া প্রায় এক মাস কলিকাতায় ছিলাম—সম্প্রতি কিরিয়া আসিয়া আপনারদের সেই অর্ধশ্রুত গল্পটিতে হাত দিয়াছি। মাসিক পত্রিকার তাড়া নাই—আপন মনে আন্তে আস্তে লিখি। কোন একদিন সাহায্যে আপনারদের সেই কোণের ঘরে বসিয়া বোধ করি পড়িয়া শুনাইবার অবকাশ পাইব। ইতি ৪ই আষাঢ়। ১৩০৬

আপনার  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪ জুন ১৮৯১

শিলাইদহ

কুমারখালি

১০ই আষাঢ় ১৩০৬

প্রিয়বরেব্—

আপনার পত্রখানি পড়িয়া আমি বিশেষ সাধনা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। স্তম্ভনিন্দার প্রতি উদাসীন থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করি, কৃতকাণ্ড হইতে পারি না বলিয়া বশাসম্ভব দূরে থাকি; কিন্তু সংসারকে কঁাকি দেওয়া চলে না; প্রেমদাসের একটা গানে আছে :—

বৃথা শোচ কিছু কাম ন আওয়ে—

ভোগ বিনা নাহি মিটনা।

বৃথা পোক করিয়া কোন ফল হয় না—যাহা ভোগ করিবার তাহা না করিয়া এড়াইবার যো নাই। কিন্তু ছুঃখের মধ্যে পরম সুখ এই যে, বন্ধুদের স্নেহে স্বস্থ নিজে বেনদার নিকট অগ্রসর হইতে দেখি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কৃপণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ কুথিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—দশ বারো জন লোক অহর্নিশ তাহাদের ডালা সাঁক করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাঠা আনার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে—লবেল স্নান-আহার নিজে পরিচালা করিয়া কীটসেবার নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশ বার করিয়া টানাটানি করে—প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। ইংরেজ জাতি কেন যে সকল বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া তাহার প্রত্যেক কারণ দেখিতেছি। উহাদের শক্তি চালনা করিবার জন্ত বিধাতা উনপঞ্চাশ বায়ু নিযুক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ উহাদের মধ্যে বোঝাই এত আছে যে কাঁচ করিতে পারে না। এখন যদি আমাদের কীটশালায় একবার আসিতে পারিতেন তবে একটা দৃষ্ট দেখিতে পাইতেন। বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কোন এক সময় ছুটি শাইল এদিককার কথা শ্রবণ করিবেন।

আমার চাব-বানের কাজও মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভূটীর বীজ আনাইয়াছিলাম—তাহার গাছগুলো দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। মাস্তাজি সন্ধি দান রোপণ করাইয়াছি, তাহাতেও কোন অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না। বিজ্ঞানশালাবাসী সোমবারে সস্ত্রীক আমার শত্রুকর্তৃ পর্ষাবক্ষণ করিতে আসিবেন।

আপনারা উভয় আমাদের আন্তরিক প্রীতি-অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

৪  
১৭ সেপ্টেম্বর [ ১৯০০ ]

ও

শিলাইদহ  
কুমারখালি  
নদীয়া

শ্রীর বন্ধু,

চুপচাপ বসে একথানা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে ওলটাচ্ছিলুম এমন সময় চিঠিখানি পেয়ে মৃত ভেকের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের স্ফোর হ'য়ে খুব থড়কড় ক'রে উঠেছি। লোকেনকে, স্নরেনকে আপনার চিঠিখানা দেখাবার জন্তে ছটকট করচি, কিন্তু তারা দু'রে, আন্তাই তাদের লিখে পাঠাতে হবে। যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিন। কাউকে রেয়াৎ করবেন না—যে ইতভাগা surrender না করবে, লর্ড রবার্টসের মত নির্ধম চিত্তে তাদের পুরাতন ঘর দুয়ার তর্কানলে জালিয়ে দেবেন—আপনি এক সৈন্ত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সৈন্ত-সম্প্রদায় গেঁথে যে-রকম ব্যাং রচনা করেচেন তাতো প্রিটোবিয়ায় ফ্রিটাস করতে পারবেন ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারপরে আপনি জয় ক'রে এসে আপনার সেই বিজয়গৌরব আমরা বাঙ্গালীরা মিলে ভাগ ক'রে নেব—আপনি কি কলেন তা বোঝবার কিছু দরকার হবে না, না বুদ্ধি, না অর্জ, না সময় কিছুই খরচ করতে হবে না, কেবল টাইমস পত্রে ইংরেজের মুখ থেকে বাহবা শোনবামাত্র সেই বাহবা আমরা লুফে নেব। তখন আমাদের দেশীয় কোন বিখ্যাত কাগজে বলবে, আমরা বড় কম লোক নই; অস্ত্র কাগজে বলবে, আমরা বিভ্রান্তে নব নব তথ্য আবিষ্কার করচি;—এদিকে আপনার জন্তে কারো সিকি পয়সার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু যখন জগৎ থেকে বশের ফসল ঘরে আনবেন তখন আপনি আমাদের;—

চাষের বেলা আপনি একা, লাভের বেলা আমরা সবাই; অতএব আপনি জরী হ'লে আপনার চেয়ে আমাদেরই জিব।

আপনি 'ক' বিন্দুতে কম্পমান, আমি 'খ' বিন্দুতে দিব্য নিশ্চেষ্ট নিকষিণ হ'য়ে ব'সে আছি—আমার চারিদিকে আমন ধান এবং আখের ক্ষেত আসন্ন শরতের শিশিরাক্ত বাতাসে দোহুলমান। শুনে আশ্চর্য্য হবেন, একথানা Sketch book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁকচি। বলা বাহুল্য, সে ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্তে তৈরী করচিনে, এবং কোন দেশের ত্রাশস্ত্রাশ গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যান্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন—এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ণ মেহ জন্মে তেমনি যে বিজ্ঞাতা ভাল আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা করলুম, এবারে বোল আনা কুৎসিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করবার একটা মন্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী রবার চালাতে হচ্ছে, সুতরাং ঐ রবার চালানটাই অধিক অভ্যাস হ'য়ে যাচ্ছে—অতএব মৃত র্যাফেল তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরে থাকতে পারেন—আমার দ্বারা তাঁর বশের কোন লাঘব হবে না।

লোকেন আসন্ন পূজার ছুটিতে আমাকে তার ভ্রমণের সহচর ক'রে সিমলা-শিখরে টানবার জন্তে চেষ্টা করুতে—কিন্তু আমি নড়চিনে। ঋষিরা যখন পূর্ব-শিখরে তপস্বী করুতে যেতেন তখন সে এক সময় ছিল—কিন্তু এখন যে গিরিশৃঙ্গে শান্তি নেই সে কথা আপনার অগোচর নেই। আশা করি, দাঙ্কলিঙের সেই পথে-পাওয়া বন্ধুটিকে ভোলেননি। আমি আমার পদ্মা-তীরের কলহংস-মুখর বালুতটে শায়দস্ত্রীর শুভ শুভ সমাগম প্রতীক্ষা করচি। বোধ করি, মনে আছে, আপনি আমাকে একটি ভ্রমণ-সঙ্গ-দানে প্রতিশ্রুত আছেন, কান্দীয়ে হোক, উড়িয়ায় হোক, ত্রিবাঙ্কুরে হোক, আপনার সঙ্গে ভ্রমণ ক'রে আপনার জীবনচরিত্রের একটা অধ্যায়ের মধ্যে কীকি দিয়ে স্থান পেতে ইচ্ছে করি। আশা করি, বঞ্চিত ক'রবেন না—সেই ভবিষ্যৎ কোন একটা ছুটির জন্তে পাথের সঞ্চয় ক'রে রাখচি। গৃহিণী আমার অনতিদূরে একটা কেদারায় ব'সে আমাকে স্নানাহারের জন্তে অত্যন্ত তাগিদ করচেন—বেলাও হয়েছে। অতএব স্বর্ণকালের জন্তে মাজনা করবেন—আমার অধিক দেবী হবে না।

লোকেন আমার যে কাব্য-চয়ন প্রকাশ প্রবৃত্ত ছিল মাঝখানে বিলাতে গিয়ে তার উত্তম কিছু যেন ক'মে এসেছে। সে যদি কিছু না মনে করে তা'হলে আমি নিজেই এ কাজে হাত দিতে পারি আমি ছবি আঁকচি শুনে যদি আশ্চর্য্য হন ত লোকেন কবিতা লিখতে ব'সে গেছে শুনে বোধ হয় কম আশ্চর্য্য হবে না। তার এতই দুরবস্থা হয়েছে! বেচারাকে শেষ কালে কবিতা লেখালে! ওমার খায়্যেমের বাঙ্গালী পত্নীমুখ্য করচে। দুই-একটা নমুনা দেখলে তার মনের অবস্থা কতকটা বুঝতে পারবেন:—

মৃদু তোরা, ত্যজি' সুখ স্বর্গস্বপ্ন-আশে

ধাবিসু হুজির তরে অন্ধ কারাবাসে।

সুখ পাবি ব'লে ফেল রাখিসু পাওনা,

ছাড়ি না নগর আমি বাহা হাতে দ্রাসে!

এই সমস্ত কবিতার লোকের মূলধন হুঁক দিয়ে ব্যবসা চালাবার প্রস্পেক্টস্ জারি করেছে—সুদ চায় না, লাভ চায় না, বা কিছু জমা আছে সব উড়িয়ে দিতে চায়—আমি এ ব্যবসায়ের শেষার কিনতে প্রস্তুত নই।

আপনার গ্রামকল্যাণ আর্থ্যা সরল, বিভাগ্যবের কাছে সম্প্রতি সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেছেন। শিক্ষা-প্রবাসীটি আমার রচিত। খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করছেন—পণ্ডিতমশায় এমন বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে ভারী খুশীতে আছেন। আমি তাঁকে পূর্বেই আশ্বাস দিয়েছি, আমার পক্ষিত মতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তাহ'লে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষার অধিকার জন্মাবে। তাঁর সংস্কৃত-চর্চায় আমি ভারি আনন্দিত হয়েছি। আমাদের বর্তমান শিক্ষিত মেয়েদের অতিমাত্রায় ইংরেজী চর্চায় সামঞ্জস্য রক্ষার জন্তে সংস্কৃত শেখাটা একান্ত দরকার হয়েছে।

মশায়, আপনার জন্তে পূর্বীর জমিট ঠেকিয়ে রাখতে পারব বলে আশা হচ্ছে না, তার প্রতি ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি পড়ছে। কর্তা আমাকে লিখেছেন, পুরী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের আমার ঐ ভূখণ্ডটুকুতে ভারি প্রয়োজন হয়েছে। জোর বার মূল্যক তার যদি সত্য হয় তা'হলে ও জমিটুকু রক্ষা হবে না। আপনি যদি এখানে থাকতে থাকতেই বাড়ী আরম্ভ ক'রে দিতে পারতেন তাহ'লে ও লোকটা দাবী করতে পারত না।

আজকের দিনটা ঝোড়ো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে হঠাৎ মুহলধারে বৃষ্টি হ'য়ে যাচ্ছে—মাঝে মাঝে বাতাসের দমকা এসে জানলা-দরজাগুলো দুধাড ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। এই বড়-বৃষ্টি-বাসলে বেশ একটি ছুটির ভাব এনেছে—সেই কর্ণপরাশর পশ্চিম দেশে এই ভাবটা ঠিক অমুভব করতে পারবেন না। একে ত সমুদ্রের মধ্যে সাত দিন কাজ করিলে—তার পরে আবার যেদিন একটু বাদলা হয়, বা শরতের মৌল গুঠ, বা দক্ষিণের হাওয়া বয়, সেদিন আরও বেশী ছুটি নিতে ইচ্ছে হয়। আমি ঘরের দরজা খুলে শাদিগুলো বন্ধ ক'রে বাসে আছি—ঝরঝর শব্দে প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়ছে।

পত্রোত্তর দানের বিশ্বাস হ'তে যদি নিষ্কৃতি পেতে ইচ্ছা করেন তাহ'লে আর্থ্যায় শরণাপন্ন হবেন—তিনি যদি আপনার হ'য়ে উত্তর দেন তাহ'লে আমার কোন নালিশ থাকবে না। তাঁকে আমার সার্ব অভিবাদন জানাবেন। আপনি যে কাজে গেছেন তার প্রত্যেক টুকরো ধরতুকু পথান্ত আমার কাছে পরম উপদেশ, এটুকু মনে রাখবেন। কে কি বলছে, কি লিখে, কি হচ্ছে সমস্ত আভ্যোপান্ত জানবার জন্তে দৃঢ় হ'য়ে আছি। ইতি এলা আশ্বিন [১৩০৭]

আপনার  
শ্রীবীজনাথ ঠাকুর

৫

[অক্টোবর বা নভেম্বর ১১০০]

বঙ্গ,

সীজার যে নৌকায় চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে? মহৎ কর্ম আপনাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আপনাকে অতি শীঘ্র সাহায্য উঠিতে হইবে।

আমার একটি ভ্রাতৃশ্রী সাংঘাতিক গীড়ার আক্রান্ত বলিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়াছি—প্রায় আট বাজি বুমাইতে অবসর পাই

নাই। তাই আজ মাথার ঠিক নাই—শরীর অবসন্ন। কাল হইতে তাহার বিপদ কাটিয়াছে বলিয়া আশ্বাস পাইয়াছি; এখন নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। মনে করিয়াছি, দুই-চারি দিন বোলপুর শান্তিনিকেতনে বাইব।

আমার সমস্ত ছোট গল্প একত্র ছাপিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে। প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় আপনাকে পাঠাইতে পারি নাই। এক্ষণে, আপনার প্রস্তাব উপলক্ষে প্রথম খণ্ডই পাঠাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডই অধিকাংশ ভাল গল্প বাহির হইবে। প্রথম খণ্ডে তর্জমার ব্যোয় গল্প বোধ হয় নিয় কয়েকটি হইতে পারে:—পোষ্টমাষ্টার, কন্ডাল, নিশীথে, কাবুলিওয়ালা এবং প্রতিবেশিনী। কিন্তু Mrs. Knight-এর রচনানৈপুণ্যের প্রতি আমার বড় একটা আস্থা নাই।

ত্রিপুরার মহারাজকে আপনার সমস্ত খবরই আমি পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার কার্যের সহায়তার জন্ত তাঁহার পুর্নপ্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিলাতে কাজ লওয়া সম্বন্ধ কি স্থির করিলেন? এ সম্বন্ধে আমার মত পূর্বেই বলিয়াছি—আপনি বিধিমাত্র করিলেন না। আপনার সকলতার পক্ষে যদি আপনার স্বদেশও অন্তরায় হয় তবে তাহাকেও ক্ষুদ্র মনে বিদায় দিতে হইবে।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। একান্ত মনে প্রার্থনা করি, সুস্থ হইয়া উঠুন।

আপনার চিরন্তন  
শ্রীবীজনাথ ঠাকুর

৬

২০ নভেম্বর ১১০০

ও

কলিকাতা

বঙ্গ,

কিছুকাল থেকে সাংসারিক নানা কাজে আমাকে কলকাতায় বন্ধ থাকতে হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় আমার সুখ নেই। পূর্বে এখানে বসন আসতুম তোমাদের ওখানেই সর্ব প্রথমে ছুটে যেতুম, এবারে সেবকম আগ্রহের সঙ্গে কোনখানে যাবার নেই। আজ প্রভাতেই তোমার চিঠিখানি পেয়ে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল—তোমার সেই ছোট ঘরটি থেকে তোমার আলাপগুণন যেমন আমি স্নদয়ে পূর্ণ করে নিয়ে আসতুম নিজেকে আজও সেই বকম পূর্ণ বোধ করছি। এক এক সময় সাংসারিক নানা বড়োত স্নদয় অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, কাজ করবার শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তোমার সঙ্গে আলাপ করে এলে কর্তব্যের গৌরব পুনরীক নিজের অন্তরের মধ্যে অমুভব করতে পারি—সময়ের সমস্ত জটিল বাধা তুচ্ছ করবার মত বল মনের মধ্যে সঞ্চার করি। তোমার চিঠিতেও আজ অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্তও আমার সাংসারিক বন্ধন লঘু হল।

ত্রিপুরার মহারাজ এখন কলকাতায়। তোমার সকলতার তিনি যে কি বকম আশ্রয়িক আনন্দ অমুভব করেন তা তোমাকে আর কি বলব! বাস্তবিক তিনি যে স্নদয়ের সঙ্গে তোমাকে

এতই তিনি বিশেষরূপে আমার জন্য আকর্ষণ করেছেন। আমি তোমার চিঠি নিয়ে ভীষ ওখানে বাব—তিনি খুব খুশি হলেন। তুমি তাঁকে অরুচি হল যে চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন এমন উৎকর্ষ হয়েছিলেন। কোনকালে তোমাকে সহায়তা করবার জন্তে তিনি যেন ব্যগ্র হয়ে আছেন।

লোকেরকে আমার গল্প তজ্জ্বার জন্তে ধরেছি—কিন্তু সে নিতান্ত কুঁড়ে এবং নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাসহীন। সেই জন্তে তাকে কোন কাজে প্রবৃত্ত করতে পারিনি। সে এখন আমার কার্যনির্বাহনে যত্ন আছে। তার সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করেছি—তার অনেকগুলি সখের কবিতা এই Selection থেকে নির্বাসিত করে বইটাকে সর্বসাধারণের গ্রন্থাবলীতে করে তোলা গেছে—এখনো হুই এক জায়গায় একটু আটক কটক লুকিয়ে আছে—সে আর পাওয়া পেল না।

আমি আজকাল নানা গোলমালের মধ্যে “নৈবেদ্য” বলে এক একটি কবিতা প্রত্যহ আমার কোন এক অবসরে লিখে ফেলি আমার অন্তর্ভাবনাকে নিবেদন করে দিই। আমার জীবনের সমস্ত কৃত কর্মের সমস্ত চিত্তিত সত্যের সমস্ত চুঃখ-সুখের কেন্দ্রস্থলে যিনি এর নিশ্চল ভাবে বিরাজ করছেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত অণু পরমাণু সমস্ত বিরাট জগৎমণ্ডলের যিনি একটিমাত্র ঐক্যব্দ—ঐশ্বর্য আছে নিশ্চয়ই গোপনে প্রত্যহ জীবনের একটি একটি মিনি সমর্পণ করে দিচ্ছি। সে দিনগুলিকে যদি কখনো ঘরা পরিপূর্ণ করে দিতে পারতুম তাহলেই ভাল হত কিন্তু অন্তত তাকে পরশুটে ফুলের মত একটি করে গান সাজিয়ে আমার জীবনের নদীর ঘাটে সেই সমুদ্রের উদ্দেশে ভাসিয়ে দিতেও সুখ আছে। ঈশ্বরই এগুলো ছাপতে দেবে—বোধ হয় তুমি ইংলেণ্ডে থাকতে থাকতেই পাবে। কিন্তু সেখানকার কথ-কোলাহলের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের নিশ্চয় দেবালয়ের এই গানগুলি ঠিক সুরে বাজবে কি না জানি নে—এর আনন্দ এবং বিধান এবং শাস্তি সেখানে কি রকম শোনায়ে?

মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হবে এলুম—তাকে তোমার চিঠি শোনালুম—তিনি ভারি খুশি হলেন। আচ্ছা, তুমি এসেলে খেতেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে খাটান করে দিতে পারি নে? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাকটা পাও সেটা যদি আমরা পুরিয়ে দিতে না পারি তা হলে আমাদের দিচ্। কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করবে? পারে বন্ধন জড়িয়ে পড়ে পড়ে লাঞ্ছনা সম্বন্ধ করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন? আমরা তোমাকে হুজি দিতে ইচ্ছা করি—সেটা সাধন করা আমাদের পক্ষে যে দুঃস্বপ্ন হবে তা আমি মনে করি নে। তুমি কি বল?

অনেক দিন বিরহী আছি—শিলাইগড়ের নীড়টির জন্তে প্রাণ কঁপতে। ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩০৭

তোমার  
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ ডিসেম্বর [ ১৯০০ ]

বন্ধু,

পীড়িত জিহ্বা বলিয়া কিছুদিন শব্দ বন্ধ ছিল। সম্প্রতি

নাটকের অভিনয় হইবে; আমি বৃশ্চিক সাজিব, সেইজন্য সঙ্গীতসমাজের অধুরোধে পত্রিয়া শিলাইগড়ের বিষয় বীকায় করিয়া এই পাবনপুরীর বন্ধনে বসা বিবাহি। যত পার তোমার বহর আমাকে পাঠাইবে—তার দর বিবরণের জন্ত আমি কৃতজ্ঞ—কোন কথা সামান্য জ্ঞান করিয়া বাব গিয়া না। তোমার কবিতাগুলির মহাজোড়ের কথাটুকু হইতেও আমি বঞ্চিত হইতে চাই না। গ্রিবেকী তোমার নবপ্রকাশিত পুস্তিকা হইতে একটা প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন—এ সম্বন্ধ আলোচনার জন্ত তাঁহার সহিত একবার দেখা করিব।

আমার গল্পের বিতরণ বৎসর দিন চলকের মধ্যেই বাতিল হইয়া থাকিবে। দুই বৎসর তোমার চতুঃপদ হইলে নির্বাসিত করিবার সুবিধা হইবে। আমার বচনা-লব্ধিক তুমি জগৎসমক্ষে বাতিল করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছ—কিন্তু তাহার বাস্তব-ভাব্য-বস্তুখানি টানিয়া লইলে প্রৌণবীর মত সত্যসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সত্যিভাবে ঐ বড় হুজি—ভাষার অধঃপুরু আশ্রয়-পরিচ্ছদের কাজ সে যে ভাবে প্রকাশমান রাখিবে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাব্যত্ব উপস্থিত হয়। ঐখানে তোমাদের জিৎ—জ্ঞান ভাষার অপেক্ষা যেমন করিয়া থাকে না, তাহা ভাষার কাছে আপাদমস্তক বিকাইয়া আছে।

গুরুশ্রী যদি তোমাকে দুটি দিতে সম্মত না হয়, তুমি কি যিনি যেতেন দুটি লইতে অপিকারী নও? যদি সে সম্মত না থাকে তবে তোমার সেই কতিপয়বৎসর জন্ত আমরা বিশেষ ধৈর্য করিতে পারি। যেমন করিয়া হোক, তোমার কাব্য অসম্পন্ন রাখিয়া দিয়া আসিবে না। তুমি তোমার কবিতা কতি করিও না, বাতালে তোমার অধঃ কতি না হয় সে ভাব আমি লইব।

আমার গল্পের অধঃপদ ছাপাইয়া কিছু যে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না—যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন লাভ রাখিতে চাই না—তুমি বাগকে খুশি দিয়া।

বিসম্মত নাটকের বিচারদাল আমাকে তাগিত করিতেছে—অতএব বিদায়। ইতি ১২ই ডিঃ [ ডিসেম্বর ১৯০০ ]

তোমার

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ

৮

[ ডিসেম্বর শেষ ১৯০০ ]

বা জাহাজীর প্রথম ১৯০১ ]

বন্ধু,

আমাকে তুমি কি এক সম্পূর্ণ পুস্তকখান্ড বাগদাৎ দণ্ড করিয়াছ? প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের কি পঞ্চাঙ্গ আলোচনা হইয়াছে তাহার বিস্ম-বিসর্গও জানি না। গ্রিবেকী সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy) সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ তাঁহার “প্রাকৃতিক” নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন—সেই গ্রন্থ তোমাকে পাঠাইয়া দিব। অত বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোথাও কিছু দেখিয়াছি বলিয়া মনেই পড়ে না। কিছু দিন যোগজ্ঞানে কাটাওয়া দিয়াছি। তাহার পর শাস্ত্রনিকেরা তখন উৎসবের জন্ত এক বহুতা লিখিতে হইল—তাঁহার



সমীচ-সম্মুখে বিলম্বিত নাটকের অভিনয়ের বিলম্বিতাল কেওরা মেল—  
আমাকে বসুপতি সাজিতে হইয়াছিল—সমস্ত বকটে বিস্তৃত  
ছিল।

বিলম্বিতের অভিনয় যখন হইতেছিল তুমি তখন সাত সত্বর  
পারে কি করিতেছিলে? উপস্থিত থাকিলে তুমি খসি হইতে—  
আমিও হইতাম, কলা বাহলা।

কত লক্ষা তাঁহার পাণ্ডুলিপি তোমাকে পাঠাইবার জন্য আহার  
হস্তে জিয়াছেন। কোন পণ্ডিতওয়ালাকে কিংবা একবার বাচাই  
করিয়া লইতে চান—নিজস্বায় জনক কথা—হইলে বলিতে কুণ্ডিত  
হইত না। তাঁহার মতে উঠা কিছু জটিল ও বাহলায় হইয়া  
থাকিতে পারে, কিন্তু বৈধা পরিয়া বেশিলে ইহার মধ্যে নূন  
পদার্থ মেল। অসম্ভব নহে। যদি কেউ ইহাকে [সফল] করিবার  
জন্য কোন [উচ্চ] জ্ঞান] করেন তাহা তিনি নিরোধ্যা করিয়া  
লইবেন। অথবা কেউ যদি ইহার মধ্যেটা রাখিয়া কিছু পরিবর্তন  
করিয়া চাপাইতে উদ্ভূত হন, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট।

এবার শিলাইগুড়ি করিয়া পড়ার চরে বোট আহার লইব  
বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি। এখন ঐতের দিনে পড়া তাহার  
তীরে আমার অভ্যর্থনার জন্য শুভ কলস বিড়াইয়া অপেক্ষা  
করিতেছে—কসু করিয়া তুমি একবার বেড়াইয়া বাইতে থাকিলে  
যেন হইত।

তোমার হবি

পূ—বঙ্গবন্ধু এই খাতার কোন নকল নাই।

১

জানুয়ারি ১৯০১

৬

২৬,

অসময়ে ভারতবর্ষে ছিলিলে পাছে তোমার কর্মসমীচা সম্বন্ধে  
ব্যাপ্য হইতে এ আশঙ্কা আমি বৃহ করিতে পারিতেছি না।  
সকল প্রকারেই তাপ বীকার করিয়া তোমাকে তোমার কথ  
সম্প্রদ করিতে হইবে। যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তোমার দ্বারা যথো  
পাশিত হইতেছে তাহাকে বিশ্বাস্যের সোচ্য করিতে হইবে।  
তোমার কাজে আমাদের আর্থ—সুতরাং সেই কাব্য সমাধার বায়  
আমাদেরই বহনীয়। তুমি অসময়ে তোমার কথ অসম্পন্ন  
রাখিয়া কিরিতো না—আমার ত এই পরামর্শ।

এখনো বোধ হয় ডাক্তারের হাতে বহিয়াছে—আমার এই চিঠি  
যখন পৌছিতে, আশা করি, ততদিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ  
করিয়া উঠিয়াছে। আমার একান্ত মনের প্রার্থনা এই যে, তোমার  
শ্রমত নুতন জ্ঞান লাভের দ্বারা নব পতাকার আরম্ভ ভাগ অশ্রুণ  
উৎসাহ লাভ করুক।

তোমার হবি

১০.

ম ১৯০১

৬

১৬,

অনেক দিন তোমার পত্র পাই নাই, আমিও লিখি নাই। তুমি

তাঁহার কারণ অতি কৃত্রিম অথচ বিশৃঙ্খল। নানা সাময়িক স  
বিজ্ঞিত হইয়া আমি অত্যন্ত পীড়িত চিত্তে আছি—কোন ক  
মনের অবসার থাকিয়া কেনিরা সেবা-পত্রের মন লিতে চাই—কি  
কমলি সেই হোক্কা।

শরীফটা কিছু দ্রিষ্ট হওয়ার সম্ভ্রতি মহারাষ্ট্রের সঙ্গে সাজি  
আসিয়াছি। তাঁহার আতিথ্য ও প্রকৃতির উত্তরার শরীর ও ম  
দ্বারা লাভ করিব প্রত্যাশা করিতেছি। কিন্তু অধিক দিন থাকি  
সম্ভাবনা নাই। কেন নাই, সে সবটা তোমাকে কেজা যাক।

বেলায় বিবাহ এই মাসেই স্থির হইয়াছে। আর তিন সপ  
মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি এমন হতভাগ্য, আমার কোন ক  
বিবাহ উপস্থিত থাকিবেন না; তুমি বিলাতে, সোকেন তথৈ  
মহারাষ্ট্র সেসময় বোধ করি আশ্রয়ভাগ, নাট্যের নীলসিঁড়ি  
আমার পক্ষে এই প্রথম বড় কাজ—কিন্তু তোমাদের অভাবে আর  
উৎসব নিয়মান হইবে।

কিন্তু তুমি এমন কোনও তারহীন বিদ্যাবান এখনো কি প্রম  
কর নাই বাহা অকলম করিয়া বন্ধুর আনন্দ-উৎসবে প্রসন্ন হইয়া  
বিকীর্ণ করিতে পার? নবকল্পিতকে আশীর্বাদ করিয়া।

তোমাকে একটি কাজের ভার দিতে চাই। বুঝাচ্ছেন জ্ঞান জি  
হইতে একটি ভাল শিক্ষক নিয়োগ করিয়া পাঠাইতে হইবে। বুঝ  
ত্রিপুরা হইতে বুঝে থাকিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শাসনাধীন শিক্ষা  
করিবেন। শিক্ষকটি বিজ্ঞানবিদ হইলেই ভাল হয়। এখন তত  
লক্ষ্যে কত লইতে তুমি সতর্ক বোধ করিবে, আমি জানি; কি  
তবু তোমাকে লইতে হইবে। অবশ্য, তুমি বাহাকে ভাল মনে করি  
বাছিয়া লিবে ভারতবর্ষের কলহাওরার গুণে দুই দিনেই সে মন হই।  
পাঁচাইতে পায়ে—মহারাষ্ট্রা সেক্ষেপ তোমাকে কোমো করিবেন না  
বর্তমানে তুমি বাহাকে বেগ্য এক ভাল মনে করিবে, যিনি বুঝাচ্ছে  
কথাচিত সাধমে রাখিতে পারিবেন, অথচ অন্যতর উদ্ভেদ হইকে  
না এমন একটি লোক বেচিয়া, তাহার বেতন প্রকৃতি কিরণ হইকে  
পারে জানিয়া লিখিবে।

স্বচ্ছন্দ কাপজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহা  
সম্প্রদ্যক করিয়াছে। মহারাষ্ট্রও এই পত্রটিকে আমার হান  
করিয়াছেন। কতাকে বিলায় লিয়া এই পত্রের প্রতি মন দিতে  
হইবে।

তোমাকে বেলায় হাতে কণি-করা একখানি কবিতার খাতা  
পাঠাইয়াছি, নিশ্চয় পাইয়াছ।

বহুজাতকে আমার নববর্ধে সাগর অভিবাধন জানাইবে।  
তুলিলায়, তিনি অল্পখণ্ডি বৃষ্টিতে প্রবাসী বাঙ্গালীকে হাছের কোল  
ভাত খাওয়াইয়া পুণ্য লাভ করিতেছেন—তাঁহার হাছের কোল এখনও  
ভুলি নাই।

তোমার হবি

পুনশ্চ—মহারাষ্ট্র আমার তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে  
কিবেয় করিয়া আহ্বোধ করিলেন—তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহ—  
তোমাকে পীড়াপীড়ি করিয়া বসিতে চাহেন। শিক্ষকটির বাসস্থান  
ও আহ্বায়িকের খবর নিজে হইতে লাগিবে না। কুচবিহার বন্দে,  
বেতন পাঁচ শত হইতে আরম্ভ করিয়া আট শত পর্যন্ত হওয়াই  
নিয়ম। যদি তার চেয়ে অধিক দিতে হয় ও নিশ্চিষ্ট সময় বাধি

এতেই তিনি বিশেষরূপে আমার স্তব্ধ আকর্ষণ করতেন। আজ তোমার চিঠি নিয়ে তাঁর ওখানে যাব—তিনি খুব খুশি হবেন। তুমি তাঁকে অল্পদিন হল যে চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন এমন উৎকল হইয়াছিল। কোনরূপে তোমাকে সহায়তা করবার জন্যে তিনি যেন ব্যগ্র হয়ে আছেন।

লোকেনকে আমার গল্প তজ্জমার জন্তে ধরেছি—কিন্তু সে নিতান্ত কুঁড়ে এবং নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাসহীন। সেই জন্তে তাকে কোন কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারিনি। সে এখন আমার কাবানির্কীচনে ব্যস্ত আছে। তার সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করেছি—তার অনেকগুলি সপের কবিতা এই Selection থেকে নির্কীর্ণিত করে বইটাকে সর্সাদাধারণের গ্রন্থবোগা করে তোলা গেছে—এখনো দুই এক জায়গায় একটু বাঁধু কটক লুকিয়ে আছে—সে আর শারা গেল না।

আমি আজকাল নানা গোলমালের মধ্যে “নৈবেদ্য” বলে এক একটি কবিতা প্রত্যহ আমার কোন এক অবসরে লিখে ফেলে আমার অন্তঃস্বামীকে নিবেদন করে দিই। আমার জীবনের সমস্ত কৃত কণ্ঠের সমস্ত চিত্তিত সংকল্পের সমস্ত দুঃখ-স্বপ্নের কেন্দ্রস্থলে যিনি ঐক্য নিশ্চল ভাবে বিরাজ করতেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত অশু পরমাণু সমস্ত বিরাট ভগ্নসমুদয়ের যিনি একটিমাত্র ঐক্যহীন—তাঁর কাছে নিঃস্বপ্নে গোপনে প্রত্যহ জীবনের একটি একটি দিন সমর্পণ করে দিচ্ছি। সে দিনগুলিকে যদি কণ্ঠের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিতে পারতুম তাহলেই ভাল হত কিন্তু অল্পত তাতে পত্রপুটে ফুলের মত একটি করে গান সাজিয়ে আমার জীবনের নদীর ঘাটে সেই সমুদ্রের উদ্দেশে ভাসিয়ে দিয়েও সুখ আছে। শীত্রেই এগুলো ছাপতে দেব—বোধ হয় তুমি ইংলেণ্ড থাকতে থাকতেই পাবে। কিন্তু সেখানকার কণ্ঠ কোলাহলের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের নিঃস্বপ্ন দেবালয়ের এই গানগুলি ঠিক সুরে বাজবে কি না জানি নে—এর আনন্দ এবং বিবাদ এবং শান্তি সেখানে কি রকম শোনায়ে?

মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এলুম—তাকে তোমার চিঠি শোনালুম—তিনি ভারি খুশি হলেন। আচ্ছা, তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারি নে? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পুরিয়ে দিতে না পারি তা হলে আমাদের বিধি। কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করবে? পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে পদে লাজনা সহ করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করি—সেটা সাধন করা আমাদের পক্ষে যে দুঃস্বপ্ন হবে তা আমি মনে করি নে। তুমি কি বল?

অনেক দিন বিরহী আছি—শিলাইনহের নীড়টির জন্তে প্রাণ কীটচে। এই অগ্রহায়ণ ১৩০৭

তোমার  
শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ ডিসেম্বর [ ১১০০ ]

ও

বহু,

পীড়িত হিলাম বলিয়া কিছুদিন পক্ষ বদ্ধ ছিল। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া পূর্বপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। বিদ্রোহ

নাটকের অভিনয় হইবে; আমি রত্নশক্তি সাজিব, সেইজন্য সঙ্গীতসমাজের অমুরোধে পড়িয়া শিলাইনহের বিরহ স্বীকার করিয়া এই পাবাপনুরী বন্ধনে ধরা দিয়াছি। বত পায় তোমার খবর আমাকে পাঠাইবে—তন্ন তন্ন বিবরণের জন্য আমি ক্ষুধাতুর—কোন কথা সামান্য জ্ঞান করিয়া বাদ দিয়ে না। তোমার কীটিকাহিনীর মহাভোজের কথাটুকু হইতেও আমি বঞ্চিত হইতে চাই না। ত্রিবেদী তোমার নবপ্রকাশিত পুস্তিকা হইতে একটা প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন—এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তাহার সহিত একবার দেখা করিব।

আমার গল্পের দ্বিতীয় খণ্ড আর দিন দশকের মধ্যেই বাহির হইয়া যাইবে। দুই খণ্ড তোমার হস্তগত হইলে নির্কীচন করিবার সুবিধা হইবে। আমার রচনা-লক্ষ্যকে তুমি ভগ্ন-সমক্ষে বাহির করিতে উজ্জত হইয়াছ—কিন্তু তাহার বাস্তব-ভাবা-বস্ত্তথানি টানিয়া লইলে দ্রৌণদীর মত সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুক্লিল—ভাবার অন্তঃপুরে আত্মীয়-পরিজনের কাছে সে যে ভাবে প্রকাশমান বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ঐখানে তোমাদের জিৎ—জ্ঞান ভাষার অপেক্ষা তেমন করিয়া বাধে না, ভাব ভাষার কাছে আপাদমস্তক বিকাইয়া আছে।

গভর্ণমেন্ট যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয়, তুমি কি বিনা বেতনে ছুটি লইতে অধিকারী নও? যদি সে সম্মত না থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি। যেমন করিয়া হোক, তোমার কাৰ্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরায়া আসিও না। তুমি তোমার কণ্ঠের ক্ষতি করিও না, বাহাতে তোমার অধের ক্ষতি না হয় সে ভাব আমি লইব।

আমার গল্পের অমুদ্রা ছাপাইয়া কিছু বে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না—যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন দাবী রাখিতে চাই না—তুমি বাহাকে খুশি দিয়া।

বিদ্রোহ নাটকের বিহারীল আমাকে তাগিদ করিতেছে—অতএব বিদায়। ইতি ১২ই ডিঃ [ ডিসেম্বর ১১০০ ]

তোমার  
শ্রীবীন্দ্রনাথ

[ ডিসেম্বরের শেষ ১১০০ ]

বা জাহ্নুয়ারীর প্রথম ১১০১

বহু,

আমাকে তুমি কি এক দিগ্গজ পুণ্ডিতব্রজ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ? প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের কি পর্যন্ত আলোচনা হইয়াছে তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানি না। ত্রিবেদী সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy) সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ তাহার “প্রকৃতি” নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন—সেই গ্রন্থ তোমাকে পাঠাইয়া দিব। অন্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোথাও কিছু দেখিয়াছি বলিয়া মনেই পড়ে না। কিছু দিন যোগভোগে কাটাইয়া দিয়াছি। তাহার পর শান্তিনিকেতনের উৎসবের জন্য এক বহুতা লিখিতে হইল—তাহার পরে ভারতীয় জ্ঞান “তিরিকুমার সভা” লিখিতে হইল—তাহার পরে

সঙ্গীত-সমাজে বিসর্জন নাটকের অভিনয়ের বিহাসাল দেওয়া গেল—  
আমাকে রত্নপতি সাজিতে হইয়াছিল—সমস্ত যত্নে রিত্রত  
ছিলাম।

বিসর্জনের অভিনয় যখন হইতেছিল তুমি তখন সাত সমুদ্র  
পারে কি করিতেছিলে? উপস্থিত থাকিলে তুমি খুসী হইতে—  
আমিও হইতাম, বলা বাহুল্য।

বড় দাণ্ডা তাঁহার পাণ্ডুলিপি তোমাকে পাঠাইবার জন্য আমার  
হস্তে দিয়াছেন। কোন গণিতওয়ালাকে দিয়া একবার যাচাই  
করিয়া লইতে চান—নিরুপসাহ জনক কথা হইলে বলিতে কুণ্ঠিত  
হইও না। তাঁহার মতে ইহা কিছু ভুল ও বাহুল্যময় হইয়া  
থাকিতে পারে, কিন্তু খৈয়্য ধরিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে নতুন  
পদার্থ মেলা অসম্ভব নহে। যদি কেহ ইহাকে [সহজ] করিবার  
জন্য কোন [ইচ্ছা জ্ঞাপন] করেন তাহা তিনি শিরোধার্য্য করিয়া  
লইবেন। অথবা কেহ যদি ইহার মর্ম্মটা রাখিয়া কিছু পরিবর্তন  
করিয়া ছাপাইতে ইচ্ছুক হন, তিনি তাহাতে সম্মত।

এবার শিলাইদহে ফিরিয়া পদ্মার চরে বাটে আশ্রয় লইব  
বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি। এখন সীতের দিনে পদ্মা তাহার  
তীরে আমার অভ্যর্থনার জন্য শুভ কদাস বিছাইয়া অপেক্ষা  
করিতেছে—কসু করিয়া তুমি একবার বেড়াইয়া যাইতে পারিলে  
বেশ হইত।

তোমার রবি

পুঃ—বড়দানার এই খাতার কোন নকল নাই।

১

জামুয়ারি ১১০১

৪

বন্ধু,

অসময়ে ভারতবর্ষে ফিরিলে পাছে তোমার কর্তব্যসমাধা সম্বন্ধে  
ব্যাঘাত ঘটে এ আশঙ্কা আমি দূর করিতে পারিতেছি না।  
নকস প্রকারেই ভাগ্য স্বীকার করিয়া তোমাকে তোমার কর্তব্য  
সম্পন্ন করিতে হইবে। যে বৈজ্ঞানিক রস্মি তোমার মাথার মধ্যে  
স্পন্দিত হইতেছে তাহাকে বিশ্বাস্যতার গোচর করিতে হইবে।  
তোমার কাজে আমাদের স্বার্থ—সুতরাং সেই কার্য্য সমাধার ব্যয়  
আমাদেরই বহনীয়। তুমি অসময়ে তোমার কর্তব্য অসম্পন্ন  
রাখিয়া কিরিয়ো না—আমার ত এই পরামর্শ।

এখনো বোধ হয় ডাক্তারের হাতে রহিয়াছে—আমার এই চিঠি  
যখন পৌছিতে, আশা করি, ততদিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ  
করিয়া উঠিয়াছ। আমার একান্ত মনের প্রার্থনা এই যে, তোমার  
প্রস্তুত নতুন জ্ঞান লাভের দ্বারা নব শতাব্দীর আরম্ভ ভাগ অপরূপ  
উজ্জ্বলতা লাভ করুক।

তোমার রবি

১০

মে ১১০১

৪

বন্ধু,

অনেক দিন তোমার পত্র পাই নাই, আমিও লিখি নাই। তুমি  
লেখ নাই তাহার ভাল জবাবদিহি আছে—আমি যে লিখি নাই

তাহার কারণ অতি ক্ষুদ্র অথচ বিপুল। নানা সাংসারিক সঙ্কটে  
বিজড়িত হইয়া আমি অত্যন্ত পীড়িত চিত্তে আছি—কোন রকমে  
মনের অবসাদ খাড়িয়া ফেলিয়া লেখা-পড়ার মন দিতে চাই—কিন্তু  
কমলি নেই ছোড়তা।

শরীরটা কিছু ঠিক হওয়ায় সম্প্রতি মহারাজের সঙ্গে দাঙ্কিলিতে  
আসিয়াছি। তাহার আতিথেয় ও প্রকৃতির শুক্লবার শরীর ও মনের  
স্বাস্থ্য লাভ করিব প্রত্যাশা করিতেছি। কিন্তু অধিক দিন থাকিবার  
সম্ভাবনা নাই। কেন নাই, সে খবরটা তোমাকে দেওয়া যাক।

বেলার বিবাহ এই মাসেই স্থির হইয়াছে। আর তিন সপ্তাহ  
মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি এমনি হতভাগ্য, আমার কোন বন্ধুই  
বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন না; তুমি বিলাতে, লোকেন তথৈবচ,  
মহারাজ সেসময় বোধ করি আগরতলায়, নাটোর নীলগিরিতে।  
আমার গৃহে এই প্রথম বড় কাজ—কিন্তু তোমাদের অভাবে আমার  
উৎসব নিরানন্দ হইবে।

কিন্তু তুমি এমন কোনও তারহীন বিদ্যাদ্যান এখনো কি প্রস্তুত  
কর নাই বাহা অবলম্বন করিয়া বন্ধুর আনন্দ-উৎসবে প্রসন্ন মঙ্গলহাস্ত  
বিকীর্ণ করতে পার? নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করিয়া।

তোমাকে একটি কাজের ভার দিতে চাই। যুবরাজের জন্য বিলাত  
হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে। যুবরাজ  
ত্রিপুরা হইতে পূর্বে থাকিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শাসনাধীনে শিক্ষালাভ  
করিবেন। শিক্ষকটি বিজ্ঞানবিৎ হইলেই ভাল হয়। এরূপ গুরুতর  
দায়িত্ব স্বন্ধে লইতে তুমি সঙ্কেত বোধ করিবে, আমি জানি; কিন্তু  
তবু তোমাকে লইতে হইবে। অবশ্য, তুমি বাহ্যিক ভাল মনে করিয়া  
বাছিয়া দিবে ভারতবর্ষের জলহাওয়ার গুণে দুই দিনেই সে মন্দ হইয়া  
পাঁড়াইতে পারে—মহারাজা সেজন্য তোমাকে দোষী করিবেন না।  
বর্তমানে তুমি বাহ্যিক বোণ্য এক ভাল মনে করিবে, বিনি যুবরাজকে  
যথোচিত সাহায্যে রাখিতে পারিবেন, অথচ অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত হইবেন  
না এমন একটি লোক দেখিয়া, তাহার বেতন প্রভৃতি কিরূপ হইতে  
পারে জানিয়া লিখিবে।

বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার  
সম্পাদক করিয়াছে। মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান  
করিয়াছেন। কতকো বিদায় দিয়া এই পত্রের প্রতি মন দিতে  
হইবে।

তোমাকে বেলার হাতে কপি-করা একখানি কবিতার খাতা  
পাঠাইয়াছি, নিশ্চয় পাইয়াছ।

বন্ধুজামাকে আমার নববর্ষের সাধন অভিবাধন জানাইবে।  
তুনিলাম, তিনি অল্পপূর্ণা মূর্তিতে প্রবাসী বাঙ্গালীকে মাছের খোল  
ভাত খাওয়াইরা পুণ্য লাভ করিতেছেন—তাঁহার মাছের খোল এখনও  
ভুলি নাই।

তোমার রবি

পুনশ্চ—মহারাজ আবার তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে  
বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন—তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন—  
তোমাকে পীড়াপীড়ি করিয়া থরিতে চাহেন। শিক্ষকটির বাসস্থান  
ও আহারাদির খরচ নিজে হইতে লাগিবে না। কুচবিহার বলেন,  
বেতন পাঁচ শত হইতে আরম্ভ করিয়া আট শত পর্য্যন্ত হওয়াই  
নিয়ম। যদি তার চেয়ে অধিক দিতে হয় ও নির্দিষ্ট সময় বাধি  
দিতে হয়, তাহাও চলিতে পারিবে।

১১

ও

২১ মে ১৯০১

শিলাইদহ

২১শে মে

১৯০১

বন্ধু,

অনেক দিন থেকে তোমার চিঠির জন্তে প্রত্যাশিত হয়ে ছিলুম। আজ পেয়ে খুব খুশি হলুম। পাছে তোমার কাজের লেশমাত্র ক্ষতি হয় সেই জন্তে আমি তোমাকে কখন তাগিদ করিনি।

পৃথিবীকে সর্বত্র চিম্টি কাটবার যে উপায় তুমি বের করেছ সেইটে পড়ে গর্ব অল্পভব করা গেল। এতদিন জড় পদার্থ আমাদের বিধিমেতে পীড়ন করে আসছিলেন এবারে তোমার কল্যাণে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারব। তাদের দেবার চিম্টি কাট আর বিব খাওয়াও—ওগুলোকে কোনমতে ছেড়োনা। এখন থেকে আললতে যদি অপরাধী জড় পদার্থের বিচার হয় তাহলে বিচারক তাদের চিম্টি দণ্ড বিধান কর্তে পারবে।

যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাকতে হয় তুমি তারই জন্তে প্রস্তুত হোয়ো। অনর্থক ভারতবর্ষের বজ্রাঘাতের মধ্যে এসে কাছ নষ্ট কোরোনা। তুমি আমাকে একটু বিভারিত করে লিখো এই ৫-৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার কাছে লেশমাত্র সন্ধান কোরো না। বৎসবে তোমাকে কত পরিমাণে গিলে তুমি বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি নিতে পার আমাকে লিখো। যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত হিতে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তুমি আমাকে খোঁসলা করে লিখো!

লোকেন যাত্রা করে বেরিয়ে পড়েছে। এতদিনে সে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করেছে। তার প্রতি আমার ঈর্ষা হচ্ছে। আমার জারি ইচ্ছা করছে আমরা জন দুইতিনে মিলে তোমার ওখানে মাছের কোল খেয়ে আগুনের কাছে ঘরের কোণে বসে দুই তিনের জন্তে জমিয়ে বসি। আর একবার আমি লোকেনের সঙ্গে লগুনে গিয়েছিলুম—তখন তোমরা কেউ সেখানে ছিলেনা—আমি দুদিন থেকেই নিতান্ত বিকার সহকারে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছিলুম। কিন্তু তোমার যদি বিলাতে পাঁচ ছ বৎসর থাকা হয় তাহলে কি একবার সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে না? আশা করছি দেখা হবে। হয়ত কোন দিন তোমার দরজায় ঠক্কড় শব্দে ঘা পড়বে।

বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। নানা হাঙ্গামে আমি মন

নিতে পারি নি—অনেক তুলচুক থেকে গেছে। আমার একটা কবিতা এমন বিকৃত হয়ে গেছে তার মানেই বোঝা যায় না। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।

তোমার রবি

৪ জুন [ ১৯০১ ]

১২  
বন্ধু,

ও

ধাতোহং কৃতকৃত্যোহং! তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি প্রাতঃকাল হইতে নতুন লোকে বিচরণ করিতেছি। যে ঈশ্বর তোমার দ্বারা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে আমার স্তবকে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। কোন দিক্ দিয়া তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অজ্ঞ আমি তাহার অকণাভামণ্ডিত পথ দেখিতেছি। তোমার নিকট পূজা প্রেরণ করিবার জগ্ন আমার অন্তঃকরণ উন্মূখ হইয়া আছে—বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর! তোমার গুরু হউক। তোমাতে আমাদের দেশ জয়ী হউক! নব্য ভারতের প্রথম স্বধিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখার নূতন হোমায়ি প্রজ্বলিত কর।

তোমাকে বারবার মিনতি করিতেছি—অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর—নৈতোর সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিকিঞ্চ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও কীকিঞ্চিৎ দেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।

বেলার বিবাহের আর ১০।১১ দিন বাকি আছে। তোমার জয়সংবাদে আমার সেই উৎসব দ্বিগুণতর উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। আমার সভার মধ্যে তুমি তোমার অদৃষ্ট কিরণের আলোক আলিয়া দিয়াছ। অনেক বজ্রাঘাতের মধ্যে পড়িয়াছিলাম—আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। আমার একান্ত হৃৎ-রহিল তোমার জয়ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকিতে এবং তোমার জয়লাভের পরে তোমার হস্তস্পর্শ করিতে পারিলাম না।

তোমার ক্ষুদ্র বন্ধু মীরাণকে তোমার জয়সংবাদ দিলাম, সে কিছুই বুঝিল না। বখন বুঝিবার বয়স হইবে তখন মরণ করিয়া খুসী হইবে।

এইবার বিবাহের আয়োজনে মন দেইগে। ইতি—২১শে জ্যৈষ্ঠ। [ ১৮০৮ ] \*

তোমার

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ

\* বিশ্বভারতীয় সৌজন্তে।

## আবাড়ের মেঘকে

শ্রীপ্রজ্ঞেশকুমার রায়

বাগত হে মৃন্ময় আবাড়ের মেঘ!

বাগত হে মৃন্ময় আবাড়ের মেঘ!

দর্শ চোখে মোহাজন দাও, একে দাও—

অলকার পাখে নাও, সঙ্গে করে নাও।

বাগত হে ঘননীল আবাড়ের মেঘ!

দাও আশা, দাও ভাষা, দাও প্রাণাবেগ।

দূর করে নিদাশের দাহ হৃৎসহ,—

দাও অক্ষ, দাও গীতি, ওগো বাবিরহ!

বন্ধ ভরে দাও কেরা-কদম্বের ডাঁপ—

করনারে দাও পাখা, মুতে দাও প্রাণ।

# স্মৃতিচিত্রণ

পরিমল গোস্বামী

ষষ্ঠীয় পর্ব

৩

ফুটবল মিত্র ট্রাষ্টের মেসেই প্রথম কাকি নজরুল ইসলামকে দেখলাম। যুবক নজরুল, প্রাণেচ্ছলতায় ভেঙে পড়ছেন, তাঁর কন্ননার হাটুই তখন অকাপচরী। কবিতা আবৃত্তি করলেন। বল বীর, বল উন্নত মম শিঃ! উদ্দীপনা জাগার ভীক মনে। গালভানির মতো তিনি যেন, যে যুবশক্তি যুত ব্যাটের মতো পড়ে আছে, তার মধ্যে বিদ্যুত্তরঙ্গ চালনা করতে এসেছেন তাঁর বিদ্যাজ্ঞানন বস্ত্র নিয়ে।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। আবৃত্তির পর তিনি কীর্তন গান গাইলেন একথানা। তাঁর কণ্ঠের উচ্চগ্রাম মেস-ঘর অতিক্রম করে আমহাট্ট ট্রাষ্টের বাড়িঘরগুলোকে ধাক্কা মারতে লাগল। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম দুজনের দিকে।

কবিশ্রব কালিদাস রায় আসতেন লেখার ফাইল নিয়ে, বাইরে থেকে। তিনি উপাসনা কাগজে মাসিকপত্র সমালোচনা করতেন, তাঁর জন্ম ঐ কাগজে একটি পৃথক বিভাগ ছিল। সাবিত্রীপ্রসন্ন ছিলেন সহকারী সম্পাদক। আরও একজন সহকারী—কিরণকুমার রায়। ১৯২০ সালে কিরণ খার্ড ইয়ারে পড়ত ইংরেজীতে অনাসসহ।

কিরণের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়েছিল তখন থেকেই, আজও তা অক্ষুর আছে। কিরণচরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অবিকার্য বিধয়েই নিজের মত প্রকাশ করা, এবং সে মতটি একটি মাত্র ইংরেজী শব্দ—trash। অনেক কিছুই কিরণের কাছে ট্রাশ। মনে মনে জানতাম ঠিকই বলছে, কিন্তু অত অল্প বয়সে এ রকম মত প্রকাশ করবে কেন সে, এর পরিণাম কি, ভেবে ভয় হত। শেষ পর্যন্ত আশঙ্কিত পরিণামই ঘটছে, সে সব পরে বলা যাবে।

একটি কবিতা লিখেছিলাম, সঙ্গক্ষেত্রে সেটি কবিশ্রবের হাতে দিলাম। তিনি সেটি উপাসনাতে ছেপেছিলেন। কবিতা যে কেন লিখেছিলাম জানি না, ওটি হয়তো বাঙালীঘের বৈশিষ্ট্য। কবির ছিল মনে মনে, নীরব এবং অন্তঃস্থ। নীরব কবিকে সঙ্গারে কবি বলে স্বীকার করা হয় না। অবশ্য কবিরূপে তারা স্বীকৃতি না পেলেও মুখের কবিরের প্রধান অনুরাগী তাই। পৃথিবীতে কবিরের

কাব্যে এ বাবং বারী হৃদয় হয়েছ এং কাব্যকে জনপ্রিয় করেছে তারা সবাই নীরব কবি।

“একাকী পায়কের নহে তো গান

গাহিতে হবে দুইজনে

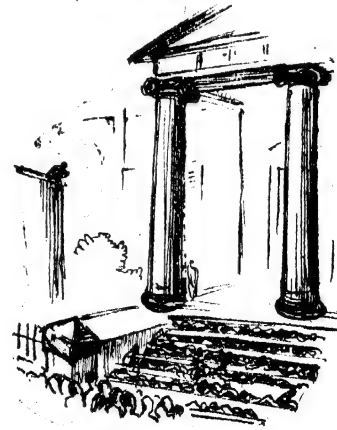
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা

আর একজন গাবে মনে।”

এর ব্যতিক্রম একমাত্র সমবেত সঙ্গীতে, যেখানে, ‘গাহিবে দশজনে খুলিয়া গলা, কেহই গাহিবে না মনে।’

উপাসনার এ সময় আমার একটি প্রবন্ধও ছাপা হয়, (স্বাঃ, ১৩২৭)। প্রবন্ধের নাম ‘আমাদের চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা।’—প্রবন্ধটি আজ থেকে ৩৭ বছর আগের লেখা। তবু হয় তো আজকের আমার কিছু চিহ্ন ওর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। ঐ প্রবন্ধে লিখছি—

“কোনো একটি বস্তুর রূপ বর্ণনা করিতে গেলে আমরা ভাবার আশ্রয় লই, কিংবা রেখায় ও বর্ণে তাহা ফুটাইয়া তুলি। চোখে যেটুকু দেখি শুধু সেইটুকুই যদি প্রকাশ করি তাহা হইলে সে প্রকাশ



বিধবিত্তালয়ে শিকটিকা

অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যে রূপটুকু চোখের নিকট অব্যক্ত অথচ জনগণের মধ্যে ব্যক্ত সেটুকুর প্রকাশ না করা পর্যন্ত আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। এখন কথা উঠিয়াছে চিত্রশিল্পে আমরা প্রকৃতিপন্থী হইব কি কল্পনাপন্থী হইব; বাহা চোখে দেখিতে পাই কেবল তাহাই আঁকিব না কল্পনার রং ফসাইয়া তাহাকে ভিন্ন পথে চালাইব। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়—সমগ্রাণি মোটেই জটিল নহে। চিত্রশিল্পে প্রকৃতিকে অনুসরণ করার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে আমাদের অঙ্কিত চিত্র একটি বাস্তব চিত্র তো হইবেই তাহা ছাড়াও কিছু বেশি হইবে। বস্তু বিপুল অবস্থায় শুধু দেখের সুখা নিবৃত্ত করিতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা যখন মনের সুখা নিবৃত্ত করিতে চাই তখন আমরা তাহার বিপুলতা বজায় রাখিতে পারি না; সঙ্গে কিছু বাহ্যিক কিছু আভ্যন্তর এবং কিছু অলঙ্কার যোগ করিয়াই থাকি।...চোখে দেখা রূপের বর্ণনা বেশি করিতে হয় না, কারণ চোখে আমরা সামান্য অংশই দেখিতে পাই; কিন্তু অন্তরের চোখে বাহা দেখি তাহা অতি বৃহৎ। তাই শব্দটিরই হউক, বর্ণ বা বৈখ্যটিরই হউক, কল্পনার রূপ বস্তু বেশি দিতে পারিব ততই সেগুলি বেশি সুন্দর হইবে।”

চিত্রশিল্প নিয়ে এখনও মাঝে মাঝে লিখি। আজ বুঝতে পারি যে অর্ধে একথা লিখেছিলাম আমার মনের মধ্যে সে অর্ধের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের মূল আছেন রবীন্দ্রনাথ। সে কথা পরে বলছি।

বিভূতিভূষণ ভট্ট আসতেন এই মেসে। তাঁর একথানা কোটোগ্রাফ তুলে দিয়েছিলাম, আজও মনে আছে সে ছবিখানার কথা। আরও একখানি ছবি তুলেছিলাম বার কপি থাকলে আজ তার বড়ই আদর হত। দিনেট হাউসের সিঁড়িতে ছাত্ররা শুয়ে আছে, ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না কাউকে। প্রবেশ করতে হলে তাদের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। আমি আমার কোয়ার্টার গ্রেট ক্যামেরাটি নিয়ে পাশের একটি ফটকের উপরে উঠে ছবি তুলেছিলাম। আন্ততঃ্য বিলজি তখন ছিল না। কোটোগ্রাফখানা নির্ভুল এক্সপোজারে চমৎকার হয়েছিল।

এই মেসে থাকতে আর একটি কৌতুকর ঘটনা ঘটে। আমি একদিন একখানা ছবি আঁকি। ছবিটি রবীন্দ্রনাথের মৃতিকে আশ্রয় ক’রে আঁকা। একখানা প্রোক্সিস কোটোগ্রাফ থেকে কপাল ও নাকমুখের রেখাটি নিয়ে সেই রেখাটি শাদা রেখে বাকী অংশ সব কালো ক’রে দেওয়া। মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকারে হুগের ঐ অংশে শুধু আলো পড়েছে। যেন অন্ধকার ভেদ ক’রে কবি জ্যোতির্ঘরের দিকে মাথা তুলেছেন। ভাবটি তাঁর কবিতা থেকেই নেওয়া।

কবি জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় তখন প্রভাতী নামক ছোট একখানা মাসিকপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে পত্রিকার আমার একটি বচনও ছাপা হয়েছিল, কি এখন আর মনে নেই। এই পত্রিকার জ্ঞানেন্দ্রনাথের ব্রিজ অফ সাইন্স কবিতার অনুবাদ ছাপা হয়। তিনি এই মেসে আসতেন। যে দিন ছবিখানা আঁকি তার পরদিন তিনি এসেছিলেন। তিনি ছবিখানা দেখে বললেন ওখানা প্রভাতীতে ছাপবেন। মোটা কাগজে আঁকা ছবি, জড়িয়ে মোটা বোর্ডের সিলিণ্ডারে ঢুকিয়ে তাঁকে দিয়ে দিলাম। তখন বেলা নটা

কি দশটা। আধঘণ্টা পরে জানবাবু হস্তমস্ত হয়ে ফিরে এলেন আমার কাছে এবং এসে প্রায় কৈদে ফেলেন আর কি। তিনি দোজানুজি কিছুতেই বলতে চান না, শেষে লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত ভাবে বললেন ঘরে গিয়ে দেখি, প্যাকিংএর কোঁড়াটা হাতে আছে, ভিতরে ছবি নেই, কোঁড়া থেকে পাঁখে কোঁথায় পাড়ে গেছে। শেষে আমিই তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করলাম।

বেলা বারোটা আশ্রাজ্জ সময়ে খাবার ঘরে কয়েকজন ‘সহোদর’-এর কাছে ঘটনাটা বর্ণনা করছিলাম। শক্তিপদ নামক এক বন্ধু বললেন মেসের চাকর এক ওড়িয়ার দোকান থেকে তাঁর জল পান কিনে এনেছে, সেই পান জড়ানো আছে রবি ঠাকুরের একখানা ছবি দিয়ে। খাওয়া শেষে দেখি—ঘটনা সত্য। পানের রং মাথা সেই কাগজখানায় আমায়ই ছবি। তবে পান উল্টো পিঠে জড়ানো ছিল, তাই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়নি। ছবিখানা দুমড়ে গিয়েছিল, কিন্তু অনেক কৌশলে তাকে চোপে চোপে ঠিক করে তার উপর আবার তুলি বুলিয়ে ঠিক ক’রে ফেললাম।

কথাটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল, এবং সে ছবি অবশেষে সবাই দেখলেন। যেন জীবন্ত কবি একটি বড় দুর্ঘটনা থেকে সম্প্রতি কোনোবাকমে বেঁচে ফিরে এসেছেন। কিরণকুমার বলল, ও ছবি উপাসনার ছাপা হবে। নানা কারণে ছবির দাম বেড়ে গিয়েছিল। উপাসনাতোই অবশেষে সে ছবি ছাপা হল পৃথক প্লেটে, ছবির নিচে ক্যাপশন রইল ‘সমস্ত তিমির ভেদ কর দেখিতে হইবে উর্ধ্ব শির— এক-পূর্ণ জ্যোতির্ঘরে অনন্ত ভূবনে।’

জানবাবু একদিন বিম্মিত হয়ে দেখে গেলেন সে ছবি এবং পুনরায় অমুতাপ ক’রে চলে গেলেন।

কিন্তু এ ছবির কাহিনী এখানেই শেষ নয়। এ ছবির যে কি দাম তা রবীন্দ্রনাথই একদিন কীস ক’রে দিয়েছিলেন।

এই মেসে থাকতে এক বিশিষ্ট বন্ধুর জন্ত কনে দেখার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম। বাইরে থেকে হঠাৎ গিয়ে কোনো মেয়েকে দেখে পছন্দ হল বা পছন্দ হল না বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার মতে গৌণভাবে জেনে শুনে শুধু বিয়ের কথা পাকা করতেই বাওয়া ভাল। এ বিষয়ে আমার এমন একটি মনোভাব আছে যাকে দুর্বলতা নাম দেওয়া যেতে পারে হয় তো, কিন্তু আজও এ দুর্বলতা আমার কাটেনি। বিয়ের ব্যাপারে পছন্দ অপছন্দ ছাড়া প্রায় কেনা-বেচা ভাষায় পরিণত হয়েছে, ওতে মেয়েদের অপমান করা হয় এই আমার ধারণা। বাই হোক, তবু আমাকে যেতে হল নানা কারণে। যেতে হল সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত। সঙ্গে কিরণকুমার, সাবিন্দ্রপ্রসন্ন এবং আরও একজন কে ছিলেন মনে নেই। হুটি বোন একত্র সঙ্গে এসে বলল, সম্ভাবিত খন্দেরদের কাছে। দুজনে একসঙ্গে ব’সে সেতারে একই গং বাজাল। কত খাতির পেলাম। কলকাতা ফিরে এসে অভিযানের নেতা বললেন বড় মেয়েটির সম্পর্কে মত দিতে হবে। ফুরমার্ক ১০০। দশটি ভাগে ভাগ করা হল মেয়েটিকে। চুল ১০, বুথ ১০, চোখ ১০, দেহ-সৌন্দর্য ১০, কণ্ঠস্বর ১০, ইত্যাদি। আমরা বারা বারা দেখেছি সবাই পৃথকভাবে নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে হবে মার্ক-দিয়ে। আমাদের হাতে মোট মার্ক উঠেছিল ৮০। কিন্তু অন্তরা মার্ক কম গিলেন, ভোটের জোর হল তাঁদের। তাঁরা যে কেন কম গিলেন তা আমার বুঝির অগম্য ছিল।

বিখ্যাতলায় ও মেন্স ছেড়ে গেলাম দেশে। স্বাস্থ্য ক্রমশ খারাপের দিকে। এর উপর দেশে ব্যাপক ভাবে মহামারী দেখা দিল। আমরা বাড়িস্থক সবাই চলে গেলাম ভাগলপুরে ১৯২১ সালে। প্রবোধ ছিল সেখানে, তার সাহায্যে আগেই বাড়ি ভাড়া করে রাখা হয়েছিল।

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের চেউ তখন সর্বত্র ভেঙে পড়ছে। খুব একটা উত্তেজনার ভাব। আমার স্বাস্থ্য কোনো দিনই কোনো আন্দোলনের উপযুক্ত ছিল না, সেজন্য আমি এ বিষয়ে ছিলাম অনেকখানি উদাসীন। ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির 'চরকার স্বরাজ' প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে ভিন্ন মত প্রচার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত আমার যুক্তিবাদী মনে খুব সাদা দিয়েছিল।

আমার বোন সরলা তখন ছিল চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী উমিলা দেবী প্রতিষ্ঠিত নারীকর্মশালার নামক শিক্ষারতনে। বাড়িটি ছিল রূপচাঁদ মুখোজ্ঞে ষ্ট্রীটে। এখানে ইংরেজী, হিন্দি, অঙ্ক ও চরকার সূতো কাটা শেখানো হত। স্রষ্ট্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে মুখার্জী) ও চারুলতা বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে বায়চৌধুরী) এখানে ছাত্রী ছিলেন। ভাগলপুর থেকে দেশে ফেরার পথে আমরা সবাই মিলে একবেলার ভক্ত এখানে এসে উঠলাম। আসবার সময় সরলা কর্মশালারের এক চরকা আমাদের কাছে বিক্রি করল। এই সম্পূর্ণ বদেদী জিনিসটি বাড়ি পর্ষন্ত পৌছেছিল ঠিকই, কিন্তু সন্দের একটি বিদেশী জিনিস গাড়ির ভিতর থেকে চুরি হয়ে গেল।

চুরি হল আমার ক্যামেরাটি। একটি অ্যাট্যাশে কেস-এ ক্যামেরা ও অনেকগুলো চিঠি ছিল, সবশুদ্ধ গেল। বিজ্ঞাসাগর হাট্টলে থাকতে রবীন্দ্রনাথকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। অকারণে গিঠি। শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তখন কিছু ভেবেছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতিকে শ্রদ্ধা জ্ঞানিয়েছিলাম। কি লিখেছিলাম ঠিক মনে পড়ে না এবং সে-চিঠির কোনো উত্তর আমি আদৌ আশা করি নি এবং উত্তর পাওয়া যে আদৌ সম্ভব তাও কল্পনা করি নি, অথচ লেখার কয়েকদিনের মধ্যেই তার এক উত্তর এলো, খামে-লেখা মাত্র তিন লাইন। চিঠিখানা মুখস্থ আছে।

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দ লাভ করেছি। আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে, বাংলা দেশ থেকে আজ পর্ষন্ত আমি কোনো সাহায্য বা সহায়ত্ব পাই নি। ইতি—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯১৮ সালে লেখা, কিন্তু তারিখটি আমার মনে নেই। এই চিঠিখানাও ক্যামেরার সঙ্গে চুরি হয়ে গেল। চিঠিখানিতে একটি বেনারস্বর স্বর আছে। চিঠি লেখার মুহূর্তে মনে হয় তো কোনো প্রচ্ছন্ন বেনারস্বর ছিল। কবি মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়তেন সাময়িক ভাবে। তখনই কিছু ছায়া পড়েছে এ চিঠিতে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমার সামান্য একখানা চিঠির উত্তরে তিনি আমার প্রতি অনেকখানি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, এ আমার কাছে একবারে কল্পনাতীত ছিল। এতে কবির মানসিক ঔপার্ধের একটি পরিচয় আমার কাছে উদ্ঘাটিত হল, যা আমি ভুলতে পারি নি কখনো।

এ চিঠিখানা হারিয়ে যাওয়ারতে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল।

মূল্যবান জিনিসগুলো হারিয়ে শুধু চরকা নিয়ে বাড়িতে ফিরলাম। চরকা আমিও কেটেছিলাম, শুধু মেয়েদের দেখাতে যে ও-কাঁজটা রেলেরাই ভাল পারে। আধ সের পরিমাণ সূতো। আমার হাতে বেরিয়েছিল। সে সূতো কোনো তাঁত পর্ষন্ত পৌছয় নি। পৌছতে হলে সম্ভবত আমাকে কলকাতা আসতে হত কিংব। ১৯২১ সালের ঘটনা। এর ২৬ বছর পরে যে স্বাধীনতা এলো, তারই কি সেটি প্রথম সূত্রপাত ?

আক্ষরিক অর্থে চরকা কেটেছিলাম কয়েক বছর পরে, উল্লে পাঠাবার আগে। খাই হোক, বাড়িতে চূপচাপ ব'সে থাকতে থাকতে মানসিক অর্ধেক বাড়তে লাগল। পড়াশোনা হোক বা অল্প কোনো বিজ্ঞা হোক, তার সাহায্যে উপার্জন করতে হবে, এ চিন্তা মনে এলোও ভাল লাগত না। অল্পত এ সময়ে বা এর পরেও অনেক দিন এদিক দিয়ে কিছু ভাবি নি। একটা দায়িত্বহীন অলসপদ্ধিতা, বার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ক্রমে নবগঠিত বিশ্বভারতীয় দিকে আকর্ষণটা বেশি বোধ করতে লাগলাম। সেখানে থেকে, চিত্তাক্রম শিবব, এই ভাবে চিঠি লিখে সব আয়োজন পাকা ক'রে ফেললাম, সম্ভবত টাকাও আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বগনা হবার আগে একখানা চিঠি গেলাম নৈহাটি রেল-পুলিসের কাছে থেকে। আমার ব্যাগটি সেখানে জমা আছে, পুলিসে সেটি কুড়িয়ে পেয়েছে রেলের ধারে। শান্তিনিকেতনে বাবার পথে সেটি উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেলাম নৈহাটি রেল পুলিসের ঘর থেকে। তার ভিতরে কিছুই ছিল না। পরে হঠাৎ খেয়াল হল পুলিস জানল কি ক'রে যে ওটি আমার ব্যাগ! নিশ্চয় ওর ভিতরের চিঠি থেকে। কিন্তু আমি বখন ব্যাগ পেয়েছি তখন তাতে একখানিও চিঠি ছিল না। অপ্রয়োজনীয় বোধে চিঠিগুলো সব ফেল দিয়ে থাকবে, কিন্তু কেন? শুধু একটি ভাড়া কেস সংগ্রহের ভক্ত আমার ডাক পড়ল, অথচ যা আমার কাছে বর্ধারূপে মূল্যবান তা কেলে দেওয়া হল। পরে এ সব উল্লেখ ক'রে রেল পুলিসকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে থেকে, কিন্তু তার কোনো জবাবই পাইনি।

শান্তিনিকেতনে এসে পৌছিলাম সন্ধ্যাবেলা। আজন্ম গেলাম লাইব্রেরি ঘরের ঘোতলার আরও অনেকের সঙ্গে। এখানকার খোলা আবহাওয়ায় এবং নতুন পরিবেশে স্বাস্থ্যলাভ করব এই বকম একটা আশা জাগল মনে। কিন্তু ঘটল বিপরীত। ভোরবেলা



সাহেবগঞ্জে কনে দেখা

ঠাণ্ডা জলে হান ক'রে সর্দিকাসি ভাঙত হয়ে গেল এবং শুধু আলুর তরকারি আর ডাল খেয়ে পাকস্থলীর দুঃশা ঘটল। চোখা পীড়াল বন্ধারোগীর মতো, এবং সপ্তাহে দু'তিন দিন অল্পত হাসপাতালের বিশেষ পথ্য খেতে লাগলাম ডাক্তারের ব্যবস্থায়। মাঝে-মাঝে কাসি এত বেশি হতে লাগল যে নিজেরই সন্ধ্যাচ'ত করো সঙ্গে মন খুলে আলাপ করতে।

আমি যে ঘরে ছিলাম সেখানে আজকের স্নরগীরদের মধ্যে আমার নিকটতম শ্রমচার্য রাত কাটাতেন সৈয়দ মুজতবা আলী ও ঐনুল চন্দ। দু'জনেই আজ কথাশিল্পীরূপে প্রসিদ্ধ। তখনও তাই ছিলেন। ক্রমাগত কথা বলে আসর জমিয়ে রাখতেন। কথাশিল্পী আজ অল্প বিশেষ অর্থে। একজনের প্রকাশ কাগজে কলমে, আর একজনের প্রকাশ রাস্তায় আসরে। আর ছিলেন অনাদি দস্তিদার ও শিল্পী হরিপদ রায়।

শান্তিনিকেতনে বাবার কয়েক দিনের মধ্যেই দেখলাম গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিক। দেখলাম তাঁর সেই প্রসিদ্ধ বাজের খেলা ও অস্ত্রাস্ত্র আত্মবলিক ছোটখাটো সব খেলা। এই আসরে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন কিছুকাল। এক বাহুকর আর এক বাহুকরের সামনে ব'লে আছেন। সমস্ত পরিবেশটি বেশ উপভোগ্য হয়ে হয়েছিল। ইলিউশন বজের খেলা আরম্ভ হবার আগে বাজটি সম্ভাব্য মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও অনেকে বেশ ভালভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন।

এই খেলাটির একটু বর্ণনা আবশ্যক। এটি বড় একটি কার্টের হাজ। গণপতি চক্রবর্তীর হুথানা হাত পিছমোড়া ক'রে বাঁধা হ'ল। হুথানা পাও কয়ে বাঁধা হ'ল। তার পর তাঁকে একটি খলেতে গুয়ে, থলের মুখ বেঁধে সেই বাজ্রে পোরা হল। তার পর সেই বাজটি দড়ি দিয়ে চারদিক থেকে বাঁধা হল এবং তালো বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। তার পর সামনে একটি কালো পর্দা বুলিয়ে দিতে না দিতে বাহুকরের হুথানা হাত পর্দা জের ক'রে বেরিয়ে বঁটা বাজাতে লাগল। হাত হুথানা স'রে গেল, পর্দাও সরিয়ে দেওয়া হল, দেখা গেল বাজ আগের তোহাই বন্ধ আছে। তার পর বাজের উপরে তবলা বাধা হল এবং পর্দা বুলিয়ে দেওয়া হল। ব'লে দেওয়া হল বাঁধ বে তাল তনতে হুজ, আদেশ ককন। কেউ বললেন চোতাল, কেউ বললেন থামার। পর পর দুটি তালই তবলার বাজল। পর্দা স'রে গেল, বাজ পূর্ববৎ। দাবার পর্দার তেকে দেওয়া হল, এবারে বাহুকর নিজে বেরিয়ে এলেন পর্দার আড়াল থেকে। বলা হল আপনারা কেউ কোনো চিহ্ন পাগিয়ে দিন এঁর গায়ে। কেউ আঁটি পরিয়ে দিল, কেউ চশমা পরিয়ে দিল। বাহুকর পর্দার আড়ালে দাবার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হল এবং দর্শকদের মধ্যে থেকে উৎসাহীরা গিয়ে দড়ি লে, তালো খুলে, বাজের ঢাকনা তুলে মুখ বাঁধা খলেটি বাইরে তুলে ধানলেন। সেটি খুলে দেখা গেল বাহুকর দর্শকদের দেওয়া চশমা ও মাটি পরা অবস্থায় এবং পূর্ববৎ পিছমোড়া ও পা-বাঁধা অবস্থায় থলের মধ্যে রয়েছেন।

তখনকার দিনে এই খেলাটির খুব প্রসিদ্ধি ছিল। এর পর টুয়ে আমি অজ্ঞাবধি কারো ম্যাজিকই দেখিনি। অতএব এ দেখার উপভোগ্য দৃষ্টিটি আজও আছে।

ছিলেন তাঁর ভাই, জীবেদুলাহ বিলী, বর্তমানে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইসচ্যাঙ্কলের পি, এ, তিনি খুব সহনশীলতার সঙ্গে আমাকে গুণানকার ভূগোলের সঙ্গে বংশাণু পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথমখনাথের সঙ্গে দূরত্ব ছিল অল্পট পয়ে তাঁর খুব কাছে এলাম, এগারো বারো বছর পরে। এর বকম ঘটনা আরও একজনের সম্পর্কে ঘটেছে। বিভাসাগর কলোজ একই সঙ্গে একই সেকশনে দুটি বছর পড়েছি শ্রমদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, কিন্তু পরে যখন পনেরো বছর অন্তে তার সঙ্গে দেখা হল, তখন নতুন ক'রে পরিচয় হল এবং বহুৎ গাঢ় হল। আমরা পূর্বে পরস্পর কাউকে দেখেছি মনে পড়ল না।

শান্তিনিকেতনে কিঞ্চিৎ দূরত্ব প্রায় সবার সঙ্গেই ছিল এবং প্রধানত তা বাজের জন্ত। সৈয়দ মুজতবা আলী (তখন ছিলেন মুজতাবা) ও ঐনুলকুমার চন্দ অবিরাম কথা বলতে পারতেন ব'লে, এবং তাঁদের সঙ্গে প্রায় পাশাপাশি রাত কাটাতে হত ব'লে, আক্ষরিক অর্থে তাঁদের সঙ্গে দূরত্ব হুচে গিয়েছিল। আলী হিন্দি এবং উর্দু ক্রমত লিখতে পারতেন। সোজা দিক থেকে এবং বিপরীত দিক থেকে। আমার একখানা খাতায় তাঁর হাতে আমার নাম ইয়েজী, বাংলা, হিন্দি এবং উর্দুতে সোজা এবং উল্টো ক'রে লেখা, এখনও রয়ে গেছে।

কলাভবনে ভর্তি হয়েছিলাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ক্লাসগুলো নিতেন তার কোনোটিই বাদ দিইনি। গুথানে গিয়ে একদিন বিকলের মিকে তাঁর কাছে গেলাম; তিনি একা ছিলেন সেই মুহূর্তে। আমার পরিচয় দিলাম। তিনি খুব খুশি হলেন যে আমি এখন কলাভবনে ভর্তি হয়েছি। তাঁর সঙ্গে আলাপে সকল সম্ভাচ কেটে গেল। এই আমার প্রথম কথা বলা তাঁর সঙ্গে। তিনি এমন আশ্চর্য সহাতুড়তি এবং মেহের সঙ্গে কথা বললেন যাতে শুধু সম্ভাচ কাটা নয়, কিঞ্চিৎ সাহসীও হয়ে উঠলাম এবং আমার আঁকা উপাসনার প্রকাশিত সেই ছবিখানি, (যা আমি চানদের নিচে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম) তাঁকে দেখালাম।

মনে হল ছবিখানি দেখে তাঁর যেন কিঞ্চিৎ স্রুকুন ঘটল। তিনি তার উপরে চোখ বুলিয়েই সেখানি আমাকে ধরৎ দিলেন এবং কয়েক সেকণ্ড চূপ ক'রে থেকে বলতে লাগলেন, তুমি যে ছবি এঁকেছ তার প্রধান লক্ষ্য আমার চেহারা, অর্থাৎ ছবিতে কতখানি আমার চেহারা সঙ্গে মেলাতে পার, এবং তার পর নিচে একটি নাম বসিয়ে দিয়েছ। একে আমি ছবি বলব না। কবিতার যে কথা দিয়ে ছবির ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টেছ সেই ভাবটা যদি তোমাকে প্রেরণা দিত তা হলে চেহারার সঙ্গে ছবি মেলাবার ইচ্ছটা অবাস্তব হত। তোমার উচিত ছিল কল্পনার আশ্রয় নেওয়া, ফোটোগ্রাফের আশ্রয় নয়। ছবির যেটি মূল প্রেরণা সেটি হচ্ছে একটি ইমোশন। সেই ইমোশনের সঙ্গে যদি আমাকেই এক ক'রে দেখার কথা মনে হয়ে থাকে তা হলে তোমার ছবির চেহারা অল্প বকম হত। তোমার সকল চেষ্টা এ ছবিতে শেষ হয়েছে চেহারা মেলাবার কাজে। তাই এটি তুমি বা দেখাতে চেষ্টেছ তা হয় নি। হয়েছে স্পাইলাইট ফেলা একখানি ফোটোগ্রাফ। তার অর্থ এই যে, ক্যামেরার ঠিক এই বকম একখানা ছবি তৈরি করা কঠিন হত না।



আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে আপনার চোরাব সঙ্গে মেলাবার কোনো ব্যবহারই ছিল না ?

না।—বসি দৈবাৎ মিলত, কতি হত না, কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রে মেলাবার জন্ত আঁকলে তা ক্রিয়েশন হয় না।

কথটা হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলাম। আমি উপাসনা কাগজের প্রবেশে আটের যে অর্থ বোঝাতে চেয়েছি—তা কি আমার মনে সুবধানি ধরা পড়েনি ? স্পষ্টই বোঝা গেল পড়েনি। বা লিখেছি, বাস্তবকে আশ্রয় ক'বে কল্পনার বিস্তারের কথা, আমার মনে তার একটি সীমাবদ্ধ অর্থমাত্র প্রকাশিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার আত্মগোচর ধূলিসাৎ হল। তিনি আমার মনে আটের এমন একটি ব্যাখ্যা স্পষ্ট ক'রে তুললেন যা আমার বচনায় কল্পিত হয়নি। তিনি প্রায় আশ্চর্য্যকর ভাবে আট সম্পর্কে বলেছিলেন এবং আমার কাছে তখন তা সম্পূর্ণ নতুন মনে হয়েছিল। কথাগুলো আমাকে অনেক চিন্তা ক'রে আত্মহু হতে হয়েছিল, কারণ আট সম্পর্কে এ রকম বৈপ্লবিক ধারণা আমার ছিল না। আট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছে শেলাম প্রথম দীক্ষা, এটি একটি মরণীয় ঘটনা। এর পর বিভিন্ন মাসিকে (চৈত্র ১৩৩৬, ১১৩১) 'আটের অর্থ' নামক যে প্রবন্ধটি লিখিত তা সে দিন রবীন্দ্রনাথ আমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন তারই উপর ভিত্তি ক'রে লেখা। এই প্রবন্ধে আটের অর্থের (অর্থাৎ আমার পাওয়া নতুন অর্থের) পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের চিরশিল্পকেই বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম। কারণ ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজে চিরশিল্পী হয়েছেন। অতএব আমার এই কাণ্ডটিকে সম্ভবত গুরু-মারা বিস্তা বলা চলে।

নবাগত আমাকে রবীন্দ্রনাথ এমন অদ্ভুত সহায়ত্বের সঙ্গে এত কথা বললেন, এ আমার কাছে তখন আশাতীত বোধ হয়েছিল, এবং শুধু তাই নয়, মনে হয়েছিল একটা যেন আমার প্রাণা নয়, যেন তাঁর মূল্যবান সময়ের ও সঙ্গরহতার উপর আমি মৃত্যু বশত: অত্যাচার করলাম। রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছের দৃষ্টিতে দেখার অভ্যস্ত না হলে এ রকম হওয়া স্বাভাবিক। তিনি যে বহু বিচিত্র দায়িত্ব এক সঙ্গে পালন ক'রে যেতে পারেন একথা আমার পক্ষে বাইরে থেকে বিশ্বাস করা শক্ত ছিল, বিশেষ ক'রে যখন তিনি ক্লাসে ব'সে পড়াচ্ছেন বা কারো সঙ্গে কৌতুক করছেন, তখন একথা কখনো মনে আসেনি যে তিনি হয় তো তার পাঁচমিনিট আগে কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রনৈতিক বা অস্ত্র-কোনা আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান চিন্তা করছিলেন।

মন্ত্রলানের শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নন্দলাল এখানে আছেন এটি আমাদের সৌভাগ্য। বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হও, তা হলেই বুঝতে পারবে তিনি কত বড় আর্টিষ্ট, ক্লাইভ বেলের আর্ট ইকথানা পড়, তা হলে তোমার উপকার হবে।

একদিন শোনার 'হিম টু ইনটেলেকচুয়াল বিউটি' নামক কবিতাটি পড়লেন। ইংরেজী কবিতা তিনি বাংলার ব্যাখ্যা করতেন। ব্যাখ্যা তাকে বলা যায় না, এক কাব্যের সমস্তরস যেন আর এক কাব্য রচনা। পড়াতে পড়াতে ইউরোপের ফুলের কথা উঠল। বললেন অনেকের ধারণা আমাদের দেশেই ফুলের শোভা বেশি, কিন্তু তা ঠিক নয়। ইউরোপে তিনি ফুলের যে শোভা দেখেছেন—বিশীর্ণ

ক্ষেত্র জুড়ে তা অপূর্ণ সুন্দর, সে শোভা আমরা এদেশে ব'সে কল্পনা করতে পারি না।

বাংলা ভাষায় ইংরেজী কাব্যের স্বাদ অনুভব করা এবং তা রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে, এ অভিজ্ঞতা নতুন, তাই খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। লক্ষ্য করতাম, নবাগত বিদেশী ছাত্ররা অস্বস্তি বোধ করতেন বাংলা বুঝতে না পেরে, কিন্তু কবির সে সিকে খেয়াল নেই। কিংবা খেয়াল ছিল বলেই বাংলার বোঝাতেন। কারণ তাঁরা কবির কাছে পড়বেন ব'লেই এসেছেন, অতএব বাংলা শেখার জন্ত উঠে পড়ে লাগতেন, এবং শিখেও কলতেন খুব দ্রুত। আমি তো একজনকে বাঙালী মনে ক'রে আলাপ করছিলাম, তার পর তনুলাম ছাত্রটি সিংহলী। একজন সিংহলী ছাত্র আমার কাছেও আসতেন বাংলা শিখতে।

জাপানী এক যুবক পণ্ডিত এসেছিলেন, নামটি মনে নেই। তাঁর কাছে শুনেছিলাম তিনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে থেকে ইউরোপে যাবেন। ভাড়া ভাড়া ইংরেজীতে কথা বলতেন। হুচার দিনের মধ্যেই বাঙালী রীতি কিছু শিখে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সব কথা মনে রাখতে পারতেন না। খাবার ঘরে আমরা পাশাপাশি খাচ্ছিলাম। এমন সময় তাঁর নতুন পরিচিত একজন সেখানে আসতেই ভাতের থালা থেকে হাত তুলে দু হাত জোড় ক'রে তাঁকে নমস্কার জানালেন। আমি খুব সহজ ভাষায় একটি একটি কথা পৃথক ভাবে উচ্চারণ ক'রে বুঝিয়ে দিলাম, ঠিক যেমন একটি ছোট ছেলেকে বোঝায় তেমনি ক'রে; বললাম খাবার সময় এ কাজ করতে নেই, ওটা আমাদের রীতি নয়, আমরা সবাই এখানকার বাসিন্দা, তাই সকলে হোক বা যখন হোক আমাদের যখন প্রথম দেখা হবে তখন নমস্কার জানাব, কিন্তু সেটি কখনো খেতে খেতে নয়। তিনি আমার কথা বুঝলেন এবং বললেন ইয়েস ইয়েস। কিন্তু কি পরিমাণ বুঝলেন, সেটি আমি বুঝলাম কয়েক বৃহত্ত পরেই। তাঁর আর একজন নব পরিচিত ছাত্র খাবার ঘরে আসতেই নিবিড় সকল প্রেক্ষাগৃহেই পুনরুদ্বীত হল। অর্থাৎ খুব থেকে ডান হাত বেরিয়ে বা হাতের সঙ্গে যুক্ত হল তবু 'নমস্কার' ব'লে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

পাতে ডাল ও আলুর তরকারী ছিল। প্রথমত তিনি শুধু



রবীন্দ্রনাথের 'নাইট অল'

ভাত খাচ্ছিলেন, একটু একটু ডালও খাচ্ছিলেন, কিন্তু পরে একটুকরো আলু ছুখে দিয়ে ভেরি হট ভেরি হট (ভেলি হং ভেলি হং) বলতে বলতে উঠে পড়লেন। চেয়ে দেখি নাক ও চোখ দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে। সেদিন আর তাঁর খাওয়া হল না। আমিও কম বাল খাই, এবং আমার মতোও সেটি কম বালই ছিল।

খাবার বট্টা বাজলে খালা-বাটি নিয়ে ছোট্টা একটু কমিক দ্রিক আছে। ব্যাপারটি আমার কাছে খুব মজার মনে হত। বট্টা বাজার সঙ্গে খাবার জন্ত ছুটে আসার অভ্যাস তৈরি ক'বে দেওয়ার পরীক্ষা কতক দিয়েই বেশি হয়েছে। মাঝে মাঝে এটি দরকার কাজের সুবিধার জন্ত।

সেপ্টেম্বর (১৯২১) মাসের রাজিবেলা রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ক্লাস নিয়েছিলেন জাপানী কবিতা পড়বার জন্ত। ডিউস লঠনের আলোর ব'সে পড়াতেন ছাত্তের খোলা হাওয়ায়। আমরা মোট রশ বারো জনের বেশি নয় তাঁকে ঘিরে ব'সে যেতাম। জাপানী 'হাইকাই' নামক 'লিরিক এপিগ্রাম' কবিকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল। কবিতাগুলি এক লাইন, দু' লাইন, তিন লাইন বা চার লাইনের। তিনি এই জাতীয় কবিতা পড়ে এমনই বিম্বিত হয়েছিলেন যে তাঁর সে বিষয় তিনি আমাদের মনে বতকণ না সঞ্চারিত করতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁর তৃপ্তি নেই। এরকম উচ্ছ্বসিত অনাবিল প্রশংসার হেতু হাইকাই কবিতাগুলির গঠন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাওয়া বাবে। অল্প কথা, অনাড়ম্বর প্রকাশ, কিন্তু এক একটি কবিতার ইঙ্গিত হঠাৎ এমন গভীরতা এবং ব্যাপ্তির দিকে ছড়িয়ে পড়েছে যে মনকে প্রবল ভাবে ধাক্কা মেরে যায়। রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে বীজমন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন মনে আছে। তিনি বলেছিলেন এই কবিতার জন্ম নিতান্তই কৌতূহল থেকে, হঠাৎ কৌতূহল, উদ্বেগমূলক নয়, একটি benevolent curiosity কিন্তু তারপর তুলির ছোঁয়া (কবিতা তুলিতেই লেখা) লাগা মাত্র তা profundity of sympathy-তে অর্থাৎ সেই কৌতূহল একটি অতি গভীর সংবেদনে রূপান্তরিত।

যেমন, একটি এক লাইনের হাইকাই—‘শ্রান্ত বাহক চেরি ফুল দেখতে পার না।’

কবি বললেন, দেখ মাছবের ছুখে বেঘনায় মূলে না পৌঁছেলে এমন ক'বে এ কথাটি বলা যেত না। এ দৃষ্টান্তটি হচ্ছে vital comprehension of human suffering-এর।

আর একটি কবিতা—‘ঘরের কাছে একটি পাইন’—ইটারনিটির পথের মাইলষ্টোনের মতো। প্রাণের অল্পবৃত্তির vision আছে এতে। আর একটি কবিতা—

They spread their beauty  
and we watch them—  
and the flowers turn and  
fade—and—

এইটুকু মাত্র। কত বড় সঙ্কেত রেখে গেল, ইঙ্গিতের শেষ হ'লনা কোথায়ও। মন চিরদিন নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে ‘এক’এর পরে কি। জীবনের সত্যের সন্ধি।

আর একটি অল্পত সুন্দর কবিতা, এটি one of the most beautiful—

The world of dew is  
alas ! a world of dew  
and none-the-less—

এখানেও ইঙ্গিত চিরদিনের। ষাণিকটা পেশিমিত্তিক, এবং এপিকিউরিয়ানিস্দের ভাব। এই world of dew এর মানে হচ্ছে অনিত্য জগৎ।

চমকপ্রদ সুন্দর এই সব কাব্য-বীজমন্ত্র। কবি একটি কথা খুব জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। কথটি জাপানী জনসাধারণের সৌন্দর্য ও রসবোধের সম্পর্কে। তিনি বললেন এই হাইকাই কবিতা এমন রিফাইনড এবং এর রস এত ঘনীভূত যে হঠাৎ মনে হবে অল্প সংখ্যক লোকই এর মর্মগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় বিষয় যে জাপানী জনসাধারণ এর ভোক্তা। তুলির এক টানে যে সব ছবি আঁকা হয় সে সম্পর্কেও তাই। একটা জাতি যে এমন কচিসম্পন্ন হতে পারে তা তিনি আগে ভাবতে পারেননি।

কথায় কথায় জাপানী মেয়েদের কথা উঠল একদিন। তিনি গাঁটধরে স্রবণ করলেন তাঁর বিদায় মুহূর্তের কথা। সে সময় মেয়েরা এমন কেঁদেছিল যে তা মনকে স্পর্শ না ক'রে পারেনি। একজন বিদেশী অভিধির প্রতি তাদের এই মমত বোধ কবির কাছে সুন্দর লেগেছিল।

এই নাইট ছিলে রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিশিষ্ট কৌতুকশ্রিয়তারও দেখা মিলত। একদিনের একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে। ছাতে ক্লাস বসত একটামাত্র ডিউস লঠনের আলোয়। আমি বসতাম কবির ডান হাতের কাছে, একখানি খাতা নিয়ে, কিছু নোট নিতাম। হাইকাই সম্পর্কে এতক্ষণ যে কথাগুলি লিখলাম তা সেদিনের একখানি মাত্র পাতায় লেখা নোট থেকে। অজান্তে অনেক কথা বা আর একখাতায় লেখা ছিল, তা হারিয়ে গেছে।

লঠনের আলো বেশি দূরে যেত না, কবির কণ্ঠও একদিন কিছু ক্ষীণ ছিল। তাঁর ইচ্ছে আমার সবাই তাঁর খুব কাছে বসি। লঠনটা থাকত ছোট্ট একটা টুলের উপর। কাছেই বসেছিলাম সবাই, কিন্তু আমাদের মাঝেকার একজন ছাত্র কবির লক্ষ্য এড়াতে পারলেন না। তিনি বেশ একটু দূরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। পড়াতে পড়াতে কবি একবার মাত্র চোখ তুলে বললেন, “অসিত, ঘুমোনার তো আরও ভাল জায়গা ছিল।”

এই স্নেহের লক্ষ্যবস্ত হচ্চেন শিল্পশিক্ষক অসিতকুমার হালদার। এর পর তাঁকে এগিয়ে আসতেই হ'ল।

অরবিন্দমোহন বসু একদিন তাঁর জারমানির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। বছর দশেক বিদেশ থেকে তাঁর বাংলা উচ্চারণে টান ধ'রেছিল। অ্যানডুজ সাহেব একদিন আমাদের সবাইকে ডেকে গান্ধীজির অসহযোগ নীতি সম্পর্কে কিছু বললেন। তিনি তখন সত তাঁর কাছ থেকে ফিরেছেন।

সন্তোষ মজুমদার একদিন রাতে আমাদের ঘরে ব'সে তাঁর জীবনের পূর্বকথা কিছু শোনালেন। তাঁর সঙ্গে অল্পদিনের আলাপেই

মনখোলা লোক স্বাধীন। তিনি বললেন সম্রাসবাদ তাঁকে ভীষণ আকর্ষণ করছিল। তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেবেন মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলেন, এমন সময় গুরুদেবের আদেশ এলো আমেরিকার যেতে হবে। সেখানে না গেলে এতদিন তাঁকে আশ্রমানে থাকতে হত।

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী আর এক মধুর চরিত্র। দুব কালের ব্যবধানেও সেই অল্পকালের পরিচয়, অশ্রুপট, তবু মনের একটি কোণে চিহ্ন এঁকে গেছে। ভাল লেগেছিল, শুধু এই স্মৃতিটুকু রয়ে গেছে। তাঁর ঘোড়ার অঙ্গের মতো একটুখানি শঙ্কশীর্ষ যেন অনেকদিনের অব্যবহৃত যন্ত্রণ বেকর্ডখানার উপর আজ নীডলএর কাজ করছে।

আশ্রমের এক প্রান্তে এক প্রাচীন ঋষি বাস করতেন। আত্মভোলা, ঋষিভুলত শুক এবং ক্ষীণ। পাখী ও কাঠবিড়ালিদের সঙ্গে তাঁর ভাব। দর্শনশাস্ত্র অমূল্যলেনে বিরাম নেই। অমূল্যলেনে রাস্তা বোধ হল, কিছু রিক্রিয়েশন দরকার, কিছু খেলা দরকার। দর্শন অমূল্যলেনে ছেড়ে খেলায় মাতলেন। কি সাংঘাতিক খেলা! শুনে চমকে উঠতে হয়। সোঁট উচ গণিতের খেলা। পড়াশোনার রাস্তা কীভাবে অন্ধ করা! এ শুধু রিক্রিয়েশনের পক্ষেই সম্ভব। শুধু তাই নয়, শাস্ত্র অমূল্যলেনে কোথায়ও এসে ব্যাখ্যা আটকে গেল, ব্যাখ্যা দরকার। তখনই আপন বিকশ'নায় চোপে হান্ডা কয়েকগাহা বেশমী দাড়ি ওড়াতে ওড়াতে ছুটলেন পণ্ডিত বিরুদ্ধের শাস্ত্রীর কাছে। এমন মানুষ আর দ্বিতীয় দেখলাম না। রিক্রিয়েশন সম্পর্কে দেশে বসেই আলোচনা হয়নি কেন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা হয়নি আজও। তাঁর পরিচয় বাংলাদেশে প্রচার হওয়ার প্রয়োজন আছে।

জগদানন্দ রায়, ক্ষিত্যিমাংস সেন এঁদের পরিচয় পেলাম ঋণশোধ নাটকে। সে নাটকের কথা ভোলবার নয়। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কয়েকটি গান গেয়েছিলেন। 'সারা নিশি ছিলেম শুয়ে,' 'কেন যে মন ভোলে' 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই, যে রয় মনে,' 'আজি শরণ তপনে প্রভাত স্বপনে' ইত্যাদি।

আচার্য নন্দলাল বসুর শিক্ষাপদ্ধতি খুব সহজ ও সরল ছিল, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার এবং অক্লান্তকর্মী। কি ভাবে আঁকলে আরও ভাল হবে, তা আঁকা ছবির উপর বা পাশে দ্বিতীয়বার একে দেখিয়ে দিতেন। তাঁর হাতের পেনসিলে আঁকা ছবি আমাদের কাছে হ'—একখানা এখনও আছে। আমার আঁকার পাশে তাঁর আঁকা।

শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকেই বর্ষা হ'—একটি গান খুব শুনেতে পেতাম যেখানে—সেখানে। কঠে বা এসবাজে বাজছে। একটি—'আমার দিন ফুরালো, ব্যাভুল বাদল সাঁকে,' অথবা 'বাদল মেঘে মালল বাজে'। 'ও গো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়া তরীর মাঝি' গানটিও শুধন খুব গাওয়া হচ্ছিল। এই সব গানের মূলে এমন একটি বেননার গভীরতা ছিল বা আমার মনকে অত্যন্ত উতলা করে তুলত। মনে সব সময় এই সব কথা ও মূর গুঞ্জরণ করে ফিরত। কিছু ভাল লাগত না। এক এক সময় মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠত। বিকেলের দিকে একা বেরিয়ে যেতাম বহু দূরে, নির্জন কোনো স্থানে। কখনো বেলেদে ধারে গিয়ে বসতাম। বেলেদে হুঁধারে কিকে গৈরিক মাটির পাখাড় বেন। হুঁধারের

উঁচু দেয়ালের মাঝখান দিয়ে রেল চলে গেছে। ১৯১৩ সালে এই পাথে সাহেবগঞ্জ যেতে যে আনন্দশিহরণ অনুভব করেছিলাম তাই বেনে আবার কিংবা আসত মনে। কখনো চলে যেতাম কোণাই নদীর ধারে—বহু দূরে। দিগন্তব্যাপী সেই বিভীর্ণ বাসু জমিতে আমার কোথায়ও আর আড়াল নেই, সমস্ত উন্মুক্ত পরিমণ্ডল বেন আমার নিষাদের সঙ্গে এসে রক্তে মিশছে। শান্তিনিকেতনের আবেষ্টনেই কেমন বেন একটা বেননার মূর। উৎসব চলছে, প্রাণোচ্ছলতার শেষ নেই, কিন্তু তবু আমি তাঁর মাঝখানে একা। বাইরে বেরিয়ে এসে উদ্বেগহীন ভাবে হুঁ চার মাইল হাঁটার পর মন শান্ত হত অনেক সময়।

বীরভূমের নিসর্গ সৃষ্টির মধ্যে বেশ একটা অভিনবও আছে, আমার খুব ভাল লাগত। আশৈশব যে প্রকৃতির কোলে মানুষ, বীরভূমের প্রকৃতি তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই আমার চোখে তা ছবির মতো লাগত। এ মৃগ প্রকৃতিই চিত্রহর্মী। সবুজ এখানে অনেক কম। এক একটা উঁচু জমিতে তাল গাছের ভিড়—অল্পসংখ্যক তাল গাছ। এর বেশ একটা চরিত্র আছে। পূর্ববাংলার নদী বাদ দিলে বাকী মৃগ চরিত্রহীন। কোণাঝড়ে ঢাকা সমতল মাঠের পুনরাবৃত্তি, বড় একঘেয়ে। বেন গ্রাম্যতা—কোণে হঠ। অনেক সময় মন বন্ধ হয়ে আসে। শুধু নদী পূর্ব বাংলায় মৃগকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রাকৃতিক মৃগে কিছু বলিষ্ঠতা থাকে। নিত্যন্ত দরকার। বীরভূমের নামে ও মৃগ সেই বলিষ্ঠতার পরিচয় আছে; তৎপরি কিছু ক্লান্তও আছে। সব মিলিয়ে চিত্তাকর্ষক। এই সব গানের আনন্দ—বেননার মূরের সঙ্গে একান্ত নিষ্ঠাবান রবীন্দ্র-মূরভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধুর স্মৃতিটি মনের আর্ন্তপৃষ্ঠ জড়িয়ে আছে।

শান্তিনিকেতনে বর্ষা কেটে গিয়ে এলো শরৎ। 'ঋণশোধ' নাটকের রিহাস'লে সমবেত কঠে 'আজ আমাদের ছুটি' অথবা 'ওগো শেকালি বনের মনের কামনা' ধ্বনিত হয়ে উঠল। আমার মনের উপরকার বোঝাটাও নেমে গেল। শরৎকালের সঙ্গে পল্লী-বাংলার পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ এবং সে এক মধুর ঘনিষ্ঠতা। এই কালের সঙ্গে, একই সঙ্গে বাংলা দেশের বহু আনন্দময় স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তার উপর আবার শরতের সমস্ত অন্তরাঙ্গাটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে গানে আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন। বর্ষার বেননাভরা ভাষাটি মুহূর্তে কেটে গেল, এলো ঋণশোধের পালা। সামনে ছুটির আনন্দ। ঋণশোধ নাটকের প্রান্ত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

অভিনয়ের আগের দিন। সর্বত্র বেশ একটা ঢাকলা। বিকেলের দিকে আমি একটি খুব কৌতুককর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। লাইব্রেরি ঘরের সামনের দিকে শালবীথির পারে কোনো একটা স্থানে



বীরভূমের প্রকৃতি

প্রথম সন্দেহ কি আলোচনা করতে করতে কবি এগিয়ে চলেছেন।  
তোষে-মুখে বেশ একটা উদ্বেগের ছায়া। আমিও ঘটনাক্রমে সেখানে  
উপস্থিত ছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম বাইরে থেকে আসা  
ছা-তিন জন ভ্রমলোক দ্রুত সে দিকে আসছেন। কবির সে দিকে  
লক্ষ্য ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ভাবে তাঁদের সম্মুখীন হলেন।  
তাঁরা পর পর কবিকে প্রশংসা করে তাঁর মুখের দিকে শ্রদ্ধা-দৃষ্টিতে  
ঢেয়ে রইলেন। বলা বাহুল্য, কবি খুবই বিপন্ন বোধ করতে  
লাগলেন। এক জন আগন্তুক বলে উঠলেন, আমরা আপনাকে  
সেখতে এলাম।

কবি ইতিমধ্যেই আত্মোদ্ধারের পথ খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন।  
তিনি মুখে আরও ব্যস্ততা ফুটিয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন

এক ভ্রমলোকদের বলতে লাগলেন বেশ, আপনারা দেখুন সব  
দূরে—

তার পর হঠাৎ বা-পাশে মুখ ঘুরিয়ে রবী, রবী বলে ডাকতে  
ডাকতে দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। রবীন্দ্রনাথকে দেখা  
গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে এত দূরে যে কবির কণ্ঠ তত দূরে পৌঁছবার  
কথা নয় এবং তিনি যত দ্রুতই পা চালান রবীন্দ্রনাথকে ধরে  
কেন্দ্র ও তখন সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ ভিন্ন তখন আর কোনো  
উপায়ও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ভাবে হয় তো তাঁর  
পিতাকে অনেক সংকটের হাত থেকে বাঁচিয়ে থাকবেন, কিন্তু সে  
দিন নিজ চোখে দেখলাম রবীন্দ্র নাথ নামক একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট পুত্রসহ  
কবি পিতাকে আশ্চর্যরকমে বাঁচিয়ে দিল। [ক্রমশঃ]

## এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং

শ্রীমদেবব্রত বোষ

“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব কিছুই অদ্বৈত”—পৃথিবীর সর্বোচ্চ  
অটালিকা নিউইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং দেখে বিদেশী  
দর্শক মাত্রই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে এই কথাটি বলে থাকেন।

মানুষের হাতে-গড়া এই বিস্ময়কর আকাশচোঁয়া বাড়ীটি ১৪১০  
ফিট উঁচু ও ১০২ তলা। নিউইয়র্কের অভিজাত পল্লী বিকল্প  
একটিনিউ ওয়ার্ল্ডফোর্স ট্রাটের মধ্যে প্রায় দুই একর জায়গা জুড়ে  
কাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীটি গড়ে তুলতে যে পরিমাণ মাল-মশলা ও  
অর্থব্যয় হয়েছে তার অঙ্ক শুনে অনেকেরই হয়ত মাথা ঘুরে যাবে।  
কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব কিছুই সম্ভব।

নিউইয়র্কের বিখ্যাত স্থপতি উইলিয়াম এক ল্যাথ সর্বপ্রথম এই  
আকাশচোঁয়া বাড়ীটির পরিকল্পনা করেন এবং তিনিই দীর্ঘদিন ধরে  
পরিশ্রম করে বাড়ীটির নকশা তৈরী করে দেন। তারপর মুখ্যবাস্তুরকার  
মিঃ ব্রীড ও মিঃ হারমান নকশাটিকে পনেরো বার পুনঃস্থপত্যরূপে  
পরীক্ষা করে তবে বাড়ীটি তৈরী করতে অনুমতি দেন।

১৯৩০ সালের অক্টোবর মাস থেকে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর  
কাজ শুরু হয়। বাড়ীটি গড়ে তুলতে ৬০,০০০ টন ইস্পাত,  
১০,০০,০০০ ইট ও ৩০১৪৬০০০ টাকা খরচ হয়েছিল। এ ছাড়া  
চূণ, সুরকী, পাথর, সিমেন্ট খরচ হয়েছিল হাজার টন। কে  
তার হিসেব রাখে! ১৯৩১ সালের মে মাসে বাড়ীটি তৈরী  
শেষ হয়।

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এ ৬৪০০ জানলা, ৩২০০ মাইল টেলিফোন-  
টেলিগ্রাফের তার, ৫০ মাইল প্রাণি পাইপ ও ২১৫৮০০ বর্গ ফিট  
মেঝে আছে। তিনশো পরিচারিকা সর্বদা বাড়ীটিকে পরিষ্কার

পরিষ্কার করে রাখে এবং নীচে থেকে উপর-তলা পর্যন্ত সিঁড়ির সংখ্যা  
১৮৬০টি। বাড়ীটির বিভিন্ন দোকান ও অফিসে নিযুক্ত কর্মচারীর  
সংখ্যা প্রায় ১৮০০০। এদের গুঠানামার জঙ্গ ৭৪টি লিফট  
আছে। তাছাড়া কয়েকটি এক্সপ্রেস লিফটও আছে। এগুলির  
সাহায্যে দেড় মিনিটেরও কম সময়ে একেবারে উপর-তলার পৌঁছে  
বাওয়া যায়।

উপর থেকে সহরের দৃশ্য দেখার জঙ্গ ৮৬তলায় একটি অবজারভেশন  
প্লাটফর্ম আছে। এখান থেকে চারিদিকে প্রায় পঞ্চাশ-  
মাইল দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত দেখা যায়। দক্ষিণা দিলে জনসাধারণ  
এখানে কাঁড়িয়ে নিউইয়র্ক সহরের দৃশ্য দেখতে পারেন। টিকিটের  
হার মাথা-পিছু ভারতীয় মুদ্রায় সাড়ে ছয় টাকার মত। প্রতি বছর  
৫০০,০০০ দর্শক এই অবজারভেশন প্লাটফর্মে কাঁড়িয়ে নিউইয়র্কের  
দৃশ্য দেখার জঙ্গ এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এ বেড়াতে আসেন। এদের  
কাছ থেকে দর্শনী বাবদ কর্তৃপক্ষের বছরে ৩২৫০০০ টাকা আয়  
হয়। তার উইনস্টন চার্চিল কার্ডিনাল ইউজিনিও প্যাসিসি  
(ভ্যাটিকানের পোপ), ডিউক অব উইগেসর ও ডাক্তার আলবার্ট  
আইনস্টাইন প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীরাও এখানে কাঁড়িয়ে নিউইয়র্ক  
সহরের দৃশ্য দেখে গেছেন।

আমেরিকার বিশিষ্ট বাস্তব-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বলেছেন—  
ভবিষ্যতে আণবিক অথবা হাইড্রোজেন বোমার আঘাতে বাড়ীখানি  
ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলে এর আয়ুষ্কাল এক হাজার বছরেরও বেশী।  
মার্কিন ধনকুবের মিঃ হেনরী ফ্রাউন এই বিস্ময়কর আকাশচোঁয়া  
বাড়ীটির মালিক।





## ত্রীনীরদরজন দাশগুপ্ত

[ 'স্বশাস্ত্র সা' প্রকাশিত হবার পর বহুবাক্যব অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তার পর কি হল? বলেছিলাম—সে খবর এখনও পাইনি। এক দিন আমার স্বনামধন্য বন্ধু ৮বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—'স্বশাস্ত্র সা'র পরের খবরটা দশ জনকে জানিয়ে দিলে ভালই হয়। সন্ধান করবার অনুপ্রেরণা পেলাম। যতটুকু বা জেনেছি 'নৌশাড়া' উপন্যাসে লেখা হয়েছে। 'নৌশাড়া' উপন্যাসে দেখা যায়—'স্বশাস্ত্র সা'র পৌত্র বিকাশ এখন থেকে ডাক্তারী পাশ করে অতিরিক্ত পড়াশুনা করার জন্য জী ও শিশুপুত্রকে এদেশে রেখে বিলেত রওনা হয়ে গেল, আর ফিরল না। বিহতে তার ভাবনাটা কোথা দিয়ে কি ভাবে গিরে শেষ পর্যন্ত কোথায় ঠিকিয়েছিল সেইটাই 'সিন্ধুপারে' উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু। বিকাশই স্ত্রীধর্ম চিঠি লিখে তার আদরের ছোটবোন 'নৌশাড়া'র ব্লাকে অকপটে সব দিচ্ছে জানিয়ে। —লেখক ]

### বিকাশের চিঠি

প্রথম পর্ব  
এক

সেন্ট জন হোটেল।  
সলিহল : ইংলণ্ড।

কল্যাণীয়াস্ব আমার রেহের স্নেহের ব্লা—

তোমার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি সে কথা বলাই বাহুল্য। তুমি যে এত দিন পরে মনে করে আমাকে চিঠি লিখেছে সেইটাই আমার মনের দিক দিয়ে তোমার চিঠির সব চেয়ে বড় কথা। দাশের চিঠি কত কখনও পাই। তোমার চিঠি বহুদিনের মধ্যে পেরেছি বলে মনে হয় না।

চিঠিতে যা জানতে চেয়েছো তার জবাব আমি দেখো। কিন্তু এক কথার জবাবটি সর্লস্করী হব না। তাই তোমার চিঠি পেয়ে অনেক দিন ভেবেছি। শেষ পর্যন্ত আমার কাজ থেকে কিছু দিনের ছুটি নিয়ে আমার বাড়ী এবং সাক্ষারী ছেড়ে নিরবিচ্ছিন্ন উপরোক্ত হোটেলটিতে এসে বাস করছি তোমাকে চিঠিলেখার জন্য। এই দূর বিশেষ ডাক্তারি করি—বিশেষ কর্তব্যস্ব আমার জীবন। তাই সব ছেড়ে এরকম পালিয়ে না এসে তোমাকে এ চিঠি লেখা হত না।

অথচ এ চিঠি লেখার বিশেষ প্রয়োজনও হয়েছে। আমার একমাত্র পুত্র বরুণকুমার বিশেষ সাক্ষারী স্কুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে, খুলনার কাছাকাছি এক গ্রামাঞ্চলে অধ্যাপকের কাজ করে—এ খবরটা অবশ্য আমি আগেই শুনেছিলাম। এখন তুমি লিখেছ, সে এদেশে এসে অল্পকোর্ড বা কামরিকের অতিরিক্ত পড়াশুনা করার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে, তার আসা উচিত কি না সেই বিষয় তুমি আমার মতামত চেয়ে পাঠিয়েছ। লিখেছ 'প্রায় চার বছর হতে চলল সে এম. এ. পাশ করেছে, কিন্তু এত দিন কিছুতেই বিবাহ করতে ব্যস্ত হয়নি। আমিও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ প্রস্তাবে কোনও দিনই জোর দিই নি। কেন না, বরুণের চরিত্রে এমনই একটা বাতাবিক

মাধুর্য্য আছে যে আমার কোনও ইচ্ছা বা অনিচ্ছা স্বভাবতঃ মেনে নিয়েই সে যেন তৃপ্তি পায়, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বস্তি পায় না মনে। তাই জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার ইচ্ছা চালিয়ে তার চরিত্রের এই স্বাভাবিক মাধুর্য্যটুকু আমি ক্ষুণ্ণ করতে চাই নি। আজ যখন সে স্পষ্ট ভাবে বিলেত যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা জানিয়েছে তখনই আমি বুঝতে পেরেছি কেন সে এত দিন বিবাহ করতে ব্যস্ত হয় নি। বিবাহিত স্ত্রীকে রেখে বিলেত যেতে তার মন সার দেহমি কখনও এবং বিলেত যাওয়ার ইচ্ছাটি বরাবরই সে মনে পোষণ করে এসেছে। আজ এখন আমি কি বলি—হ্যাঁ সমস্তর পড়েছি। এ ক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত জানিয়ে। কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা করার দায়িত্বও এখন আমার নয়। সে দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যতা আমি অনেক দিন হারিয়েছি। সে বিষয় মীমাংসা করার দায়িত্ব ত' এখন সম্পূর্ণ তোমারই। বুড়ির দিক দিয়ে, জীবনের অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে সে দায়িত্ব নেওয়ার শক্তি তুমি পেরেছ আমি জানি। জীবনের নানা বকম ব্যস্ত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তুমি উত্তীর্ণ হয়ে এসিয়ে গিয়েছ। আজ তুমি মাধবপুরের বাণীর আগনে স্প্রতিষ্ঠিত—নিজেরই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং চরিত্রের মহিমায়। বরুণকুমারের ভবিষ্যৎ জীবনব্যক্তার পথ তুমিই ত দেখিয়ে দেবে।

বরুণকুমার অবশ্য আমার পুত্র কিন্তু সেইটাই তার সব চেয়ে বড় গরিচর নয়। ছেলেবেলাই সে বাপকে হারিয়েছে, মাকেও হারিয়েছে। তোমাকে আশ্রয় করেই সে বড় হয়ে উঠেছে—তোমারই আদর্শে সজীবিত হয়ে। তার মনের গতিতে সঠিক খবর তোমার চাইতে কেউ ত বেশী জানে না। শুধু তাই নয়, আমাদের বংশের একমাত্র পুত্র বরুণকুমার, মাধবপুরের অত বড় জমিদারীর উত্তরাধিকারী সে। এসব খবরের তাৎপর্য্য তোমার চাইতে বেশী কে বোকে? বিশেষতঃ আমাদের সকলের মাধার উপর দাশ এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর মতন লোক জগতে খুব বেশী পাওয়া যায় না। তাঁকেও সব দিক বিবেচনা করে দেখতে বলা।

এক কথার তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এইখানেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তবুও সব কথা বলা হল না। আমার মনে হয়,

যে প্রের তুমি তুলেছ সেই দিক দিয়ে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, বঙ্গবন্ধুস্যবের জীবনের ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশ করবার দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বে আমার জীবনটাও সর্বাঙ্গিক দিয়ে সর্বাঙ্গীন ভাবে জোয়ার দেখে নেওয়া উচিত। তা হলেই তোমার এ দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যতার আর কোনও সন্দেহ থাকবে না। তুমি লিখেছ, “বঙ্গবন্ধু বিলেত বাওয়ার দাঙ্গার বিশেষ মত নেই, দাঙ্গার ইচ্ছে বঙ্গবন্ধু আইন পাশ করিয়ে হাইকোর্টের উকিল করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তা মোটেই ইচ্ছে নয়। বঙ্গবন্ধু বিলেত বাওয়ার ইচ্ছার মধ্যে তার হারিয়ে-বাওয়া বাপকে আবার খুঁজে পাওয়ার প্রবল বাসনা যে মধ্যে মধ্যে লুকিয়ে আছে—সেটুকু আমার দৃষ্টি এড়ায় নি।” সে দিক দিয়েও আমার এ চিঠি লেখার বিশেষ প্রয়োজন। যদি তাকে বিলেত পাঠাও, এ চিঠি পড়ে বাপকে খুঁজে বার করার পথ তার সহজই হবে। রবিন চণা আড়াল দিয়ে সে আমাকে দেখবে—মামি তা একেবারেই চাই না। তা ছাড়া এদিক দিয়ে আরও একটা বড় কথা আছে। পিতার জীবনের অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী ত পুত্র। সে অভিজ্ঞতাকে অন্ধকারে ঢেকে রেখে তার থেকে পুত্রকে বঞ্চিত করা, আমার মতে শুণ্ড অজ্ঞার নয়—পাপ। বাপের অভিজ্ঞতার আলোতে পুত্র জীবনের পথ খুঁজে পাবে সেইটাই জীবনযাত্রার ধর্ম। পুত্রের প্রতি, আমার জীবনে আমি অন্ততঃ সেইটুকু কর্তব্য করে যেতে চাই। তাই পারিলে এলাম কথঞ্চিৎ জীবনের আবহাওয়া ছেড়ে ঘনতরুণেরা নিবিবিধি এই হোটেলটিতে।

দাঙ্গার অমতের কারণ বোঝা ত মোটেই কঠিন নয়। অমত ত হবেই। ভাইকে হারিয়েছেন। বাঙ্গার একমাত্র দুগলকে হারাতে আর রাজী নন। শুণ্ড দাঙ্গার দিক দিয়ে কেন, তোমারও মনের দিক দিয়ে সে ভয় যে নেই—এমন কথা জোর করে বলতে পারি কৈ? আমি জানি, আমি তোমাদের সকলেরই নিশ্চিন্তাভঞ্জন এক তার বখেই কারণও আছে। আশৈশব নিজের সংসার ও সমাজ সমস্ত চুল সাফী প্রেমণা দ্বী ও শিশুপুত্রকে বিনা অপরাধে অনার্যাসে বঞ্জন করে যে লোক দুই বিশেষে গিয়ে নতুন জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তার স্বপক্ষে যুক্তির দিক দিয়ে কোনও কথা খুঁজে পাওয়া যায় না—সেটা আমি বুঝি। বিশেষতঃ বধন সেই সাফী দ্বী অথবা মানসিক উৎপীড়ন ও নিশঙ্ক অপমান বোঝে বোঝে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয় তখন তাকে কেউই কমা করে না, পাখও বলেই অতিহিত করে—সেটুকুও আমি জানি। অথচ এই দিক দিয়ে সারাজীবন আমি আমার প্রাণের কোণে একটা বেদনা বহন করে নিয়ে চলেছি—সে কথাটা ত কেউ জানে না। এই দুই বিশেষে জীবনের পথে চলতে চলতে হঠাৎ মাঝে মাঝে সোনালী সূর্য্যের অঙ্গণ আলোর দিকে চেয়ে কিংবা গভীর রাতে দুঃস্বপ্ন বাতাসে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে সেই বেদনার চমকে উঠে গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে একটু স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছি—সে কথাও কেবল আমারই জানা। অনেক খুঁজেছি। কিন্তু এ বেদনার প্রলেপ আমি আজও খুঁজে পাইনি। কখনও বা ইচ্ছে হয়েছে তোমাকে একখানা চিঠি লিখি। মনে হয়েছে শুণ্ড তোমারই মনে হরত বা এই বাখাটুকুর সাদা একটু পেতেও পারি। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই মিলিয়ে গেছে, লেখার অন্তপ্রেরণা পাইনি।

এমন সময় তোমার পাঠানো ‘রশান্ত সা’র আত্মজীবনী হাতে এলো। প্রাথমিক দিয়ে দিন-রাত বসে বইখানি পড়লাম। শেষ করে বারে বারে পুঙ্খনীর পিতামহের চরণে প্রশ্রয় করে বলেছি ‘হে পিতামহ! তোমার জীবনে কল্পের তীক্ষ্ণ লীলার তুমি পুণ্যলোক। তোমাকে প্রশ্রয় করে থাও হই।’ একটু বেন সাধনাও পেলাম অন্তরের নিষ্ঠুর বেনদার।

কেন জানি না, ‘রশান্ত সা’ পড়ে আবার তোমাকে বিস্তারিত একখানা চিঠিতে আমার জীবনের কাহিনী জানিয়ে দেবার বাসনা মনে জেগেছিল। স্ট্রীর আদি লীলার অন্তপ্রেরণা রশান্তর ভাষা বুক এসে লেগেছিল—তাই তিনি অন্তবড় গ্রন্থ লেখার অন্তপ্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু আমি পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে অন্তপ্রেরণা পেলাম না। মনের বাসনা মনেই গেল রয়ে। কিংবা হরত তখনও আমার জীবনের কাহিনী সম্পূর্ণ হয় নি—তাই বোধ হয় অন্তপ্রেরণা জাগে নি মনে। অথবা চিঠি লেখার প্রয়োজনের দিক দিয়ে তখনও বিশেষ কোনও তাগিদ পাইনি মনে। কিন্তু আজ আমার জীবনের কাহিনী শেষ হয়েছে, তাই বোধ হয় তোমার চিঠি পেয়ে চিঠিরই প্রয়োজনে মনে প্রবল অন্তপ্রেরণা জেগেছে। আজ সময় হয়েছে—আমার জীবনের সমস্ত কাহিনী তোমাকে জানানোর।

তুল বুঝা না। আমি বিচারপ্রার্থী নই। বিচারে নিরপরাধী প্রমাণিত হওয়ার বাসনাও এ চিঠি লিখছি না। পুঙ্খনীর পিতামহ ‘রশান্ত সা’ মহা-সমাজের আশ্রয়তে অবিচার পেয়ে তাঁরই বড় আলোর গহ্বর কাছে সুরিচার চেয়েছিলেন। আমার বিচারের ভার হইল ভবিষ্যতের গর্ভে তোলা।

## তুই

প্রথম যেদিন ইংলণ্ডে এলাম—তখন আমার তরুণ যৌবন। আজ মনে হচ্ছে, সে বেন কতকাল আগেকার আর এক জন্মের কথা। আজ যে আমি প্রৌঢ়েরও সীমা ছাড়িয়ে বার্ধক্যের সীমানার পা দিয়েছি। শুনে বিম্বিত হবে না নিশ্চয় যে, আজ আমার মাথায় আর একটিও কাঁচা চুল নেই। তবে একমাথা চুল আজও—টাক পড়নি। সেই ছেলেবেলার যেমন দেখেছিলেন—সেই বকমই মাথার একপাশে দীর্ঘ কেটে চুলগুলোকে পিছন দিকে টেনে জাঁচড়ে দি। ছেলেবেলার তোমরা সকলেই আমাকে সুপুরুষ বলত—আমার স্মৃতি মনে আছে। আজ এসেছে এ বয়সেও সবাই আমাকে সুপুরুষই বলে—এ কথা শুনে তুমি নিশ্চয়ই খুশী হবে। তবে ছেলে বয়সে তোকে চণা ছিল না—এখন সব সময়ই তোকে চণা—বিনা চণাময় দেখতে পাই না বললেও চলে। গানের বং তোমাদের দেশের মাগকাঠিতে আজও কস! বং এ দেশের জল-হাওয়ার একটা লালচে আভার আরও বেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে এ দেশের লোকের পাশে আমি কালো। কিন্তু শুনে আশ্চর্য্য হবে যে, আমার এই বং এরা ত ঘৃণা করেই না, বং কেউ কেউ হিংসাও করে—আমার গানের বং পেলে তারা বেন বেঁচে যায়। ইচ্ছে করে রোদে পড়িয়ে গানের বংকে ঘন লাল করে তোলায় জ্ঞান এদের শুকন-শুকনীর মধ্যে কারো কারো কি সাধনা। অথচ তোমাদের দেশে রোদ বাঁচিয়ে, নানারকম জীষ মেখে কালো বংকে একটু উজ্জ্বল করে তোলায় দিকে তরুণদের অনেকেরই চোঁয় ক্রটি নেই।

যা পায়, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না—এইটাই বৌবনের একটি বিশেষত্ব। তা কি এদেশে কি ওদেশে। বোধ হয় জীবনে প্রগতির দরজা খোলা রাখার ভগবানের এ এক কৌশল। বার্তাকার কথা অব্যক্ত বক্তব্য। বার্তাকো মন অবশ্য হয়ে আসে। তখন নিজের মনের মধ্যে নিজেই একটা ঠাই তৈরী করে নেয়—নিশ্চল বিশ্রামের আশায়।

বাই হোক, নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যাবেলা লণ্ডন সহরে এসে প্রথম পদার্পণ করেছিলাম—ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে। এসে পৌঁছবার কথা ছিল রাত ৮টার, কিন্তু এসে পৌঁছলাম সন্ধ্যা সাড়ে ছটার। তার একটু কারণও ছিল। ফ্রান্স থেকে ইংলিশ উপসাগর জাহাজ পাড়ি দিয়ে কোকটোনে এসে বেশল্যাম বে, লণ্ডন নিয়ে বাওয়ার জন্ত আমাদের ট্রেন প্র্যাটফর্থে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সঙ্গে আমার আটশে বন্ধু চন্দ্রনাথও ছিল। প্র্যাটফোর্থে রেল-কর্মচারী আমাদের দু'জনকে হুটি কামরায় দিল তুলে।

কিন্তু তখন আমাদের দু'জনরই বা মনের অবস্থা, কেউ কাউকে ছাড়তে রাজী নয়; চন্দ্রনাথের কামরায় জায়গা ছিল, তাই আমি রেল-কর্মচারীর আদেশ অমান্য করে চন্দ্রনাথের কামরায় গিয়ে উঠে বসলাম।

চন্দ্রনাথকে তোমার নিশ্চয় মনে আছে? ছেলেবেলার সে অনেক সময় আমাদের বাড়ীতে গিয়েছে আমার সঙ্গে গল্প করার জন্ত—বেশেছ তাকে নিশ্চয়ই। দোহার গড়ন, স্তূর্ণশন চেহারা—গায়ের বর্ণ গৌর। মাথায় কালো চুল—মাঝখান দিয়ে পরিণামি করে আঁচড়ানো। পোষাক-পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্নতার ভিতর দিয়ে সূক্ষ্মচির পরিচয় পাওয়া যায়। কথা-বার্তার ব্যবহারে ধরণ-ধারনে একটা মাজিত বিশিষ্টতার আভাস সেই বরসেই পেয়েছিলাম—সেটাই আমাকে কিশোর ভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার—কথা বলে অত আনন্দ আমার অন্ত বহু-বাহুবন্দের আর কারো কাছে পাই নি। কোনও কথা বলতে না বলতে তার নিগূঢ় মর্মটি ঠিক বুঝে নেয় এবং উত্তরে ঠিক সাড়া দেয় মনে। এই দু'বিশেষে ক্রমে তার মনের সঙ্গে আমার পরিচয় আরও নিবিড় হয়েছিল—সে কথা ক্রমে বলব। চন্দ্রনাথ এখন কোথায়, কেমন আছে জানি না। অনেক দিন তার সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়েছি এবং সেটা আমার জীবনের কতই পর্যায়েরই তোলা আছে। তবুও ছিলাম, পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যে সে বিশিষ্ট নামজাদা অধ্যাপক হয়েছিল—সেই পর্য্যন্ত।

ফোকটোন ষ্টেশনে কেন যে আমরা দু'জন দু'জনকে ছাড়তে পারি নি—তারও একটু ইতিহাস আছে। সেইটুকু বলি। যথ থেকে জাহাজ ছাড়ল বেলা ৩:৩০ আনন্দ। জাহাজ ছাড়ার পর অনেকক্ষণ আমি ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ছিলাম। জাহাজ চলার পাড় নীল জলের চেউগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে সাদা ফেনার—একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে তাই দেখছিলাম। আজকেও স্পষ্ট মনে আছে—চেউগুলির ডালা-পড়ার মধ্যে সে-সমরটা আমি আমার মনের বা হোক একটা অবলম্বন যেন খুঁজে নিতে চেয়েছিলাম—ক্রমে মনটা এতই আকুল হয়ে উঠেছিল। জাহাজ ক্রমে দূরে চলছে, আরও দূরে আরও—আমার দেশ, আমার বা কিছু মনের আশ্রয়

সমস্ত থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে—আমি যেন আর সইতে পারছিলাম না। ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল। দূর দিগন্তে মাঝে মাঝে তোমাদের সকলের মুখমণ্ডল আমার চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠেছিল—সেই তোমাদের কাছে শেষ বিদায়ের সময় যেমন দেখেছিলাম—সেই তোমার ব্যাখড়া সহজ হুটো চোখ, সেই সুধার ছল ছল চোখ হুটির সলজ্জ কাতর চাহনি। কিন্তু হায় রে, তার মধ্যে মনের কোনও অবলম্বন পাওয়া ত বুঝের কথা, মনটা আরও যেন পাগল চরে দিশাহারা হয়ে উঠল। বিরাট সমুদ্রের বিশাল চেউগুলি ক্রমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—তখন কানে বাজতে লাগল সমুদ্রের একটা প্রবল গর্জন, যেন আমারই মনের আর্দ্রতার তীব্র প্রতিধ্বনি। আমি যে হারিয়ে গেলাম, আমি যে হারিয়ে গেলাম—এই বিশাল বিশ্ব অন্ধারের মধ্যে আমার দেশের মাটির সঙ্গে আমার যোগসূত্রটি গেল ছিঁড়ে। কোনও বকমে টলতে টলতে নিজের কেবিনে গিয়ে বিছানার তরে পড়লাম—সে রাতে আর কিছু পাই নি।

১৭/১৮ দিন জাহাজে ছিলাম—এই হারিয়ে বাওয়া মনোভাবটা আমার ত বারইনি বরং উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। তার উপর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খালি জল জল আর জল—জল দেখে দেখে আমার ক্রমে যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আমার দেশের মাটির কথা ছেড়েই দিচ্ছি—এই পৃথিবীর বুকের একটু মাটি কোথায়ও দেখতে পেলো আমি যেন হাঁক ছেড়ে বাঁচি। সে যে কি মনের অবস্থা বলা, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। ধরকীর মাটির সঙ্গে আমাদের গহন মনের যে কি নিগূঢ় যোগ—সেটা মাটির উপর সব সময় দাঁড়িয়ে তোমরা টের পাও না।

বাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের মার্সেলস-এ নেমে হাঁক রেড়ে বাঁচলাম—কিন্তু হারিয়ে বাওয়া দিশাহারা মনোভাবটি তখনও গেল না আমার। মাটিতে পা গিয়েছি, কিন্তু এ মাটি ত আমার মাটি নয়। এর সঙ্গে আমার প্রাণের কোথাও কোনও যোগ নেই। এ মাটির রস টেনে নিয়ে সজীবিত হয়ে ওঠার শক্তি পেলাম না। তাই নীরস মনের নিসাকরণ অবসারে চন্দ্রনাথকে অমন করে আঁকড়ে ধরেছিলাম—একদণ্ডও তাকে ছাড়তে রাজী নই—কতকটা যেন বৃহস্পতি বোস্ত্রির নিঃশাস-প্রশ্বাসের অন্ত্রিচ্ছনের মত। তাই কোকটোনের রেল-কর্মচারীর কথা ম্যানি।

নভেম্বর মাসের যে সন্ধ্যায় লণ্ডন সহরে এসে প্রথম পদার্পণ করেছিলাম—সে সন্ধ্যাটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে আমার জীবনে। কেন, ক্রমে সেটা বুঝতে পারবে। আমরা দু'জন ট্রেনের কামরায় উঠে বসার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন দিল ছেড়ে। একটু অবাক হলাম। আমার হিসেব মত ট্রেন ছাড়তে তখনও প্রায় দু'কটা বাকী। চন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে শুখোলাম, “একি হল! এরই মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিলে যে?”

চন্দ্রনাথ বললে, “কি জানি, তোমার হিসেবে ভুল ছিল বোধ হয়।” কিন্তু মন সে কথাই সার দিল না। কেন না, আমার যাত্রাপথের প্রত্যেক পদক্ষেপটি জাহাজ এবং ট্রেনের বই দেখে আমার—ইংরেজীতে বাকি বলে Travelling Agents—তারা লিখে ঠিক করে দিয়েছিল। পকেট থেকে সেই কাগজখানি বার করে দেখলাম—আমার ত ভুল হয়নি।



ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথ ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখছিল। হঠাৎ শুভাগ, "তোমাকে প্রথম অনেক পিছনের একটা কামরার বসিয়েছিল না?"

বললাম, "হ্যাঁ"।

বললে, "ঠিক হয়েছে। ট্রেনটা দুই ভাগে ছিল। প্রথম অংশটি ছেড়ে দিয়েছে, শেষের অংশটি তোমার হিসেব মত প্রায় বটা। দুয়েক পরেই ছাড়বে। তাই তোমাকে সেই দিকে উঠিয়েছিল।"

কাচ জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম—কথাটা ঠিক। আমাদের কামরার পিছনে মাত্র আর একখানি গাড়ী রয়েছে। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। তারও কারণ বলি।

স্বপ্নে যাব বলে আমার এক বন্ধু ছিল—নাম শুনেছ, তাকে দেখিনি কখনও। নাম শুনেছ তার কারণ, এটা নিশ্চয়ই শুনেছিল যে বিলম্বিত যাত্রা করার আগে তাকেই আমি টেলিগ্রাম করেছিলাম—ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং আমার থাকার জগা একটা ঘর ঠিক করে রাখতে। সে আমি রওয়ানা হবার বছরখানেক আগে থেকে, বিলম্বিত এসে ব্যারিষ্টারী পড়ছিল। তাকে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌছবার সময় দিয়েছিলাম রাত ৮টা। কিন্তু আগের ট্রেনে উঠে বসেছি—হিসেব মত লগুনে পৌছতে ৩০টার বেশী হয় না।

চন্দ্রনাথকে সব কথা খুলে বলে শুধোলাম "কি হবে?"

চন্দ্রনাথ বলল "কি আর হবে? যা হয় একটা করে নেওয়া যাবে। নেহাৎ নিরুপায় হই ত ষ্টেশনেই বসে থাকব, হতক্ষণ না সুরেশ আসে।"

চূপ করে রইলাম। আসল মনের কথাটি চন্দ্রনাথকে বলতে লজ্জা হ'ল। এই দু'র জনো বিশেষ, যেখানে কোনও দিক দিয়েই মনের একটুকু অবলম্বন খুঁজে পাচ্ছি না, সুরেশই যেন আমার মনের একমাত্র আশ্রয়। আমি যে ইতিমধ্যে কতবার স্বপ্নে যাবের মুখখানি মনে করে, পরমাশ্রয়ী ভাবে তাকেই মনে মনে আঁকড়ে ধরেছিলাম, চন্দ্রনাথ ত তা জানে না। যদিও তোমাকে জানাতে এখন আর কোনও বাধা নাই যে দেশে থাকতে সুরেশকে কোনও দিনই আমি বিশেষ পছন্দ করিনি—তার সঙ্গে মনের মিল আমার হয়নি কখনও। সব সময়ই মনে হয়েছে—মনটা তার অন্ধকারে গলিগথে চলতেই ভালবাসে—আলোর সোজা রাস্তা সে যেন চলে এড়িয়ে।

যাই হোক, চন্দ্রনাথের কথা শুনে ষ্টেশনেই সুরেশের জন্ত অপেক্ষা করব—এই রকম একটা সিদ্ধান্ত মনে মনে করে নিয়ে থানিকটা স্থিতি পেলাম। ক্রমে ট্রেন এসে পাঁড়াল ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে। প্রাটেক্স পা দিয়ে মনে হল—এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু আমরা দু'জনেই যেন খালি বাস্তুব, আর সবই যেন স্বপ্ন।

চন্দ্রনাথ শুভাগ "কি করবে?"

বললাম "সুরেশের জন্ত অপেক্ষা করা যাক। কোথাও গিয়ে বসা যার না?"

চন্দ্রনাথ বলল "কিন্তু এই ঠাণ্ডার দু'ঘণ্টার ওপর বসে থাকলে ত মরে যাবে।"

সত্যই অসম্ভব শীত। এ রকম শীত জীবনে কখনও দেখিনি।

গায়ে গরম স্ফটিক, তার উপর গুত্তারকোট, মাথায় টুপি—তবুও যেন হাড়ের ভিতর থেকে শীত কঁপে কঁপে উঠছে। পাড়িয়ে থাকা অসম্ভব।

চন্দ্রনাথ বলল "তোমার জন্ত সুরেশ ২২নং ক্রমওয়েল রোডে ইণ্ডিয়া হাউসে আরগা ঠিক করে রেখেছে না?"

বললাম "ঠিক করেছে বলে ত লেখে নি। প্রথমটা এসে সেইখানেই দু'একদিন থাকবার ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করবে—এই রকম একটা কি চিঠিতে লিখেছিল। সে চিঠি ত আমার টেলিগ্রাম করবার আগেই পেয়েছিলাম।"

চন্দ্রনাথ একটু ভেবে বলল, "চল, এক কাজ করা যাক। ট্যাঙ্কি করে চল বাই ইণ্ডিয়া হাউসে। সেটা ত আমাদেরই মতন ভারতবর্ষের ছেলের প্রথম এসে ওঠার জগতই তৈরী হয়েছে। আরগা পেয়ে যাবে।"

বললাম "কিন্তু সুরেশের সঙ্গে দেখা হবে কি করে?"

চন্দ্রনাথ বলল "এসে তোমাকে না পেলে ইণ্ডিয়া হাউসে কাল সকালে সে নিশ্চয়ই খবর নেবে।"

সত্যিই ঐ সীতে ষ্টেশনে আর পাঁড়াল সম্ভব হচ্ছে না। অথচ কোথায় যে গিয়ে একটু গরমে অপেক্ষা করব—তাও জানি না। নিজের ইচ্ছাশক্তির জোর তখন আমার একেবারেই নেই। চন্দ্রনাথের কথায় সাহায্য দিয়ে বললাম "তাই চল।" মনে মনে ভেবে নিলাম ইণ্ডিয়া হাউসে গিয়ে, একটা আন্তানা ঠিক করে—ট্যাঙ্কি করে না হয় ফিরে আবার ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আসব, সুরেশের সঙ্গে দেখা করতে।

জিনিষ-পত্র নিয়ে চললাম ট্যাঙ্কি করে দু'জনে—ট্যাঙ্কি ডাইভারকে বলে নিলাম—২২ নং ক্রমওয়েল রোড। লগুন সহরের বুকুর উপর দিয়ে চলল আমাদের ট্যাঙ্কি—সেই লগুন সহর, যার কত কথা ছেলেবেলা থেকে শুনেছি। কাচ জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম—রাতেও অন্ধকারে কুয়াশাচ্ছন্ন অথচ সেই অন্ধকারের বৃক হাজার আলো ঘলছে চারিদিকে। মনে হল—এ যেন একটা সহস্রচকু বিরাট গৈল্ডা, হাঁ করে ক্রমেই আমাদের গ্রাস করে নিচ্ছে তার বিশাল উদরে।

চন্দ্রনাথকে শুধোলাম "তোমার থাকার আরগা তুমি কিছু ঠিক করে আসিনি কেন?"

বলল "জান ত আমার আসা হঠাৎ ঠিক হল। আমারও তেমন জানাশোনা কেউ এদেশে নেই। মেজলা তার এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছেন—এই ইণ্ডিয়া হাউসেই আমার জন্ত ঘর ঠিক করে রাখতে। তিনি কিছু করেছেন কিনা জানি না।"

বললাম "চল, ইণ্ডিয়া হাউসে গেলেই বা হয় বোকা যাবে।"

কিন্তু রাস্তা যেন আর জুরায় না। ট্যাঙ্কি চলেছে ত চলছেই। মন তখন কোনও রকম একটা আশ্রয় পাওয়ার জন্য পাগলের মতন ছুটেছে। ট্যাঙ্কি তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারবে কেন?

বাই হোক, শেষ পর্যন্ত ট্যাঙ্কি এসে পাঁড়াল—২২নং ক্রমওয়েল রোডের সামনে। ফুটপাথের উপরেই বাড়ী—কয়েক বাপ সিঁড়ি উঠে গিরছে ফুটপাথ থেকে—দুখানো বেঞ্চি দেওয়া। দুহানে উঠে গিয়ে সদর দরজায় থাকা মিলাব। একটি মহিলা দরজাটি ঝবং খুলে মুখ বার করে জিজ্ঞাসা করলে "কাঁকে চাই?"



বললাম “আমরা সোজা ভারতবর্ষ থেকে আসছি।—এখানে থাকার জায়গা হবে কি না?”

দরজা খুলে মহিলাটি বললে—“ভিতরে আসুন।”

ভিতরে গিয়ে ঈড়ালাম একটি অপ্রশস্ত বারান্দা মতন জায়গার—হুপাশে ঘর, সামনে একটু দূরে সোজা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলার। মহিলাটি সেখানে ঈড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—“কি নাম?”

আমাদের নাম বললাম। বললে, “একটু অপেক্ষা করুন—আমি খবর নিচ্ছি।” এই বলে পাশের একটি ঘরে চলে গেল। একটু পরে কিং এঙ্গে বললে, “মি: চৌধুরী কার নাম?” আমি বললাম “আমার।” বললে “আপনার জন্ম ঘর আছে কি? (চন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে) “আপনার জন্ম কোনও স্থান ত নেই! কোনও খবর ত আপনার পাইনি আমরা।” তাড়াতাড়ি বললাম—“ঐ একটা ঘরেই হুজনে কোনও রকমে ব্যবস্থা করে নেব। আজ রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে বা হয় করব।”

মহিলাটি একটু হেসে বললে, “তা হয় না। একজন্যই খালি বিছানা—হুজনের ব্যবস্থা হবে না।”

চন্দ্রনাথের দিকে তাকালাম। সে তখন আমার কোটের হাতটা জোর করে চেপে ধরেছে। চুপি চুপি বললে, “আমাকে ছেড়োনা কিন্তু।” বুঝলাম তারও মনের অবস্থা আসলে আমার চাইতে বিশেষ কিছু ভাল নয়।

বললাম “আমরা দুজনে যে একসঙ্গে থাকতে চাই। বললে, “তাহলে অন্তত চেষ্টা করুন।”

তখন চন্দ্রনাথ বলল “অন্ত কোথার হুজনে অন্তত: আজ রাতটার মতন জায়গা পেতে পারি বলে দিতে পারেন?”

বললে “হ্যাঁ। তিন জায়গার নাম ও ঠিকানা আপনাদের লিখে দিচ্ছি। কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন—নিশ্চয়ই।”

এই বলে আবার পাশের ঘরে গেল চলে। একটু পরেই একটি কাগজে তিনটি ঠিকানা লিখে বাইরে এলো। চন্দ্রনাথ হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল। আমাকে বললে “চল।” আমি যন্ত্র-চালিত পুতুলের মত চন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে চললাম। হুপা এগিয়ে চন্দ্রনাথ হঠাৎ কিরে মহিলাটিকে বললে, “অনেক ধন্যবাদ।”

মহিলাটি হেসে একটু মাথা দোলাল, মুখেও কি যেন একটা বলল—ঠিক বুঝতে পারলাম না। যদিও বিশেষ করে লিখে এনেছিলাম যে এদেশে কথার কথার ধন্যবাদ দিতে হয়। তবুও আমি ধন্যবাদ দিতে ভুলেই গেলাম।

আবার চলল আমাদের ট্যাক্সি লগুন সহরের বুকের উপর এদিক ওদিক নানা রাস্তা দিয়ে। কখনও অতিরিক্ত আলোতে উজ্জ্বল প্রাণ্ড রাস্তা—হুদিকে বড় বড় অটালিকা। কখনও বা অপ্রশস্ত রাস্তা—হুদিকে ঠিক একই ধরণের ছোট ছোট বাড়ি। সেই কুয়াশাছন্ন অন্ধকারে আমাদের পাশে ঈড়ান ক্ষীণ আলোতে যেটুকু দেখা যাচ্ছে সবই যেন অবাস্তব, অস্পষ্ট। অনেক ঘুরে ঘুরে ক্রমে আমাদের ট্যাক্সি এলে ঈড়াল—গাওঁয়ার ষ্ট্রীটে, সেক্সপীরার হাটে। এইটেই মহিলাটির দেওয়া প্রথম ঠিকানা।

গাওঁয়ার ষ্ট্রীটে সেক্সপীরার হাট লগুন-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের

বিশেষ পরিচিত স্থান, কিন্তু আমরা দুজনে এর বিষয়ে কিছুই জানতাম না। লগুন ভারতীয় ছাত্রদের মেলামেশার এটি একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল—এক কথায় থাকে বলে জ্ঞাব। কিছু কিছু ভারতীয় ছাত্রদের থাকবারও ব্যবস্থা ছিল এখানে। ভারতীয় খাত অর্থাৎ ডাল ভাত কটা চাপাটা মাংসের কারী ইত্যাদি এখানে বেশ সস্তায় খেতে পাওয়া যেত এবং অনেক দূর দূর থেকে ভারতীয় ছাত্ররা মাঝে মাঝে এখানে ভারতীয় খাত খেতে এসে জুটত এবং পরে আমিও হয়েছিলাম তাদের মধ্যে একজন। স্থানটিকে আমি যে কোনও দিনই বিশেষ পছন্দ করেছি, এমন কথা বলতে পারব না। কিন্তু কখনও কখনও ভারতীয় খাতের লোভ আমাকে টেনে নিয়ে যেত সেখানে।

সেক্সপীরার হাটের বাড়ীখানি লগুনের অল্প অল্প সাধারণ বাড়ীগুলির চেয়ে একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। একতলা বাংলা ধরণের বাড়ী—ছাপটি টালির না কাঠের ঠিক মনে নেই। সামনেই বেশ বড় ছড়ান কাচ আঁটা বসবার ঘর—রাস্তা থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। আমি ট্যাক্সি থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। রাস্তার দিকে বড় সদর দরজাটি সম্পূর্ণ খোলা।

আমার মনের উত্তাপ তখন খুব কম মাত্রারই ছিল। কিন্তু বা দেখছিলাম তাতে আমার মনের মাত্রা প্রায় শূন্যতে গিয়ে নাযল। এক ঘর ছড়ান বিদেশী শোবার পরা ভারতীয় ছাত্র—কেউ বা বসে গল্প করছে, কেউ বা একটু বৈকিয়ে ঈড়ানো, চেরারের উপর তুলে দিয়েছে পা। চুলগুলি প্রায় সকলেরই পিছন দিকে টেনে আঁচড়ানো—কারও মুখে পাইপ, কারও হোটে সিগারেট একটু বৈকিয়ে লাগানো। হো-হো হাসি ও তাদের মুখের বাঁকা-বাঁকা বিদেশী কথাবার্তা—ঘর ভরা তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে বাইরে যেটুকু কানে এলো—কেমন যেন বিকৃত মনে হল।

চন্দ্রনাথকে বললাম “আমি আর নামব না। তুমি নেমে খবর নাও।”

চন্দ্রনাথ “আচ্ছা” বলে নেমে গেল। ঋনিকমণ চুপচাপ গাড়ীতে বসে রইলাম—কিছু দূরে ঘরের মধ্যে ভারতীয়দের গতি-বিধি ধরণ ধারণ চোখের সামনে সিনেমার ছবির মত ভাসতে লাগল—সেই দিকেই রইলাম চেয়ে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ বাইরে থেকে এসে আমাদের গাড়ীর পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকে যান; কেউ কেউ বা বেরিয়ে যাচ্ছে ঘরের ভেতর থেকে। কিন্তু বেশীর ভাগই একা নয়—বললে জড়ান পাশে চলেছে মেম সাহেব।

চন্দ্রনাথ কিরে এল। এসে বাইরে ঈড়িয়ে পকেট থেকে কাগজ বার করে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে কি একটা বলে দিল—কাচ আঁটা ভিতর থেকে ঠিক স্তন্যতে পোলায় না। বুঝলাম—পরের ঠিকানা।

ভিতরে উঠে এসে বলল “বাবা! বাঁচা গেল।” শুভোলায় “কি হল?”

বললে “জারে কেউ ভাল করে কথাই বলতে চায় না। এ বলে—ও দিকে যান। ও বলে—ঐ দিকে খবর নাও। সকলের চোখেই কেমন যেন তাকিলা ভরা বাঁচা চাহনি।”

শুভোলায় “শেষ পর্যন্ত জায়গা আছে কি না খবরই পেলে না?”

বললে—“যে যেমসাহেবের হাতে সব ব্যবস্থা করার ভার—

তিনি এখন নেই। তবে সুনলাম নাকি জায়গা নেই। থাকলেও থাকতাম না ওখানে।”

ট্যাক্সি চলেছে। সুনলাম “কোথায় বাচ্ছি এখন?” বললে “বেঙ্কফোর্ড স্ট্রীটে। লিকলন হল হোটেলে।”

জায়গা ওখানে না পাওয়াতে মনে মনে আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

ক্রমে ট্যাক্সি এসে পাঁড়াল—লিকলন হল হোটেলের সামনে। খানিকটা ২২নং ক্রমওয়ার্ল রোডের মতনই বাড়ীখানি—ফুটপাথ থেকে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে, ছ’পাশে বেলা দেওয়া। বাইরের দিকে জানালা দরজা সবই বন্ধ—ভিতরে যে মানুষ আছে বোঝা যায় না। ছ’জনে নেমে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে সদর দরজায় থাকা দিলাম। সদর দরজার পাশেই পিতলের উপর কালো হরকে বড় বড় করে লেখা—লিকলন হল হোটেল। বাড়ীর নম্বরটাও চোখে পড়ল—২৭।

একটি কীপাকী দীর্ঘ মহিলা এসে দরজা খুলে আমাদের দিকে চাইলেন।

চন্দ্রনাথ বলল, “এখানে কি আমাদের থাকবার স্থান হবে? আমরা ছ’জনে একসঙ্গে থাকতে চাই।”

বললে “ভিতরে আসুন।” ভিতরে চুকলাম—সেই ক্রমওয়ার্ল রোডের পাঁচটে বাড়ীটা। তৈরী—অর্ধাং লম্বা অপ্রশস্ত বারান্দা। মতন একটা জায়গা, ছ’পাশে ঘর এবং কিছু দূরে সামনে দোতলায় উঠার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। পরে অবশ্য দেখেছিলাম—বেশী ভাগ লগ্নের সাধারণ বসবাসের বাড়ীগুলিই এই রকম।

মহিলাটি বললেন “হ্যাঁ—দোতলায় ছুজনের থাকবার মতন একটা ঘর আছে। চলুন দেখবেন।”

কথাটা শুনেই একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস আহার বুক ছাপিয়ে বেরল, আমি নিজের টের পাওয়ার আগেই। চন্দ্রনাথ একটু বেন হেসে আমার মুখের দিকে চাইল। [ ক্রমশঃ ]

### বিলেতে ধূমপানের বহর

ধূমপান অর্ধাং সিগার-সিগারেট খাওয়ার বহর বুটেনে বেড়েই চলেছে দিন দিন। সেখানকার অনেক ধূমপারী কুসকৃৎসের ক্যানসারে ভুগছে এবং গবেষণায় প্রমাণিতও হয়েছে যে, ধূমপানের সঙ্গে কুসকৃৎসের ক্যানসারজনিত ক্ষতের সম্পর্ক খুব নিবিড়। কিন্তু তাই বল ধূমপানের মাত্রা বা হার কমে যায়নি সেখানে এতটুকু, পরস্তু সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে দেখা গেছে—এইটুকুই বাড়তির দিকে।

১৯৫৪-৫৫ সাল অর্ধাং বছর তিন আগেকার একটি সরকারী হিসেব। বিলেতের শুক ও আংগারী বিভাগীয় কমিশনারের রিপোর্টেই জানা গেছে, টুবাকো (তামাক) থেকে আলোচ্য বর্ষের জাহুয়ারী মানে যে রাজস্ব সংগৃহীত হয়, তার পরিমাণ ৬৫ কোটি পাউণ্ড। এর পূর্ববর্তী বছরটিতে অর্ধাং ১৯৫৩-৫৪ সালে এই ঋতেই সংগৃহীত রাজস্ব অপেক্ষা উক্ত রাজস্ব ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী। বুটেনে ধূমপানের বহর বাড়ছে বই যে কমছে না, এই থেকে এর একটি সহজ অনুমান চলে।

শুধু বুটেনেই কেন, পৃথিবীর মোটামুটি প্রায় সকল দেশেই ধূমপানের মাত্রা তথা ধূমপারীর সংখ্যা আগে থেকে বেড়েছে, অন্ততঃ কমেনি কোথাও। তবে বুটেনে নারীদের ভেতরও এই অভ্যাসের প্রচলন অনেক দেশের তুলনায় অত্যন্ত বেশী। অবশ্য রাষ্ট্রীয় সরকারের দিক থেকে এতে প্রত্যক্ষ কিছু কতি বা লোকসান নেই। পক্ষান্তরে বরং বলা চলে—এইটি তাঁদের আয়ের একটি মস্ত বড় সূত্র এবং সম্ভবতঃ সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র। ধূমপানের বহর বা মাত্রা বতাই বাড়বে, রাজস্ব বৃদ্ধিও হবে সেই অনুপাতেই।

# চরজান

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন

[ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ডুচপুর্ন অধ্যাপক এবং  
বর্তমানে ঐ কলেজের ইয়ারিটাস প্রফেসর ]

অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানের যশোহর জেলার অন্তর্গত ঝিনাইদহ মহকুমার রায়গ্রাম নামক এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বগৃহ হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্তী স্থানীয় বগাচ জমিদারের প্রতিষ্ঠিত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত নলডাঙ্গা ভূষণ উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি তাঁহার মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন। পরে তিনি যশোহর জেলা স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ভবিষ্যৎ জীবনে শ্রীসেন রসায়নশাস্ত্র ও ধাতুবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিলেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি সাস্তুত বিষয়ক পক্ষে যশোহর জেলার ছাত্রদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়া নীতলাভক্ষরী বহু সুরবর্ণপদক লাভ করেন। ইহার পর শ্রীসেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১৪ সালে তথা হইতে রসায়নশাস্ত্রে অনার্স সহ বি. এস. সি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে রাথবাহাদুর জীনাথ পাল সুরবর্ণপদক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উড স্কারশিপ এবং রাথবাহাদুর অন্ততনাথ মিত্র পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর তিনি ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এম্‌সি ডিগ্রী লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রী লাভের পর তিনি ভার বাসবিহারী ঘোষ স্নাতকোত্তর বৃত্তি পাইয়া বিজ্ঞান কলেজে অচ্যর্ক্য প্রফেসরসহ রায়ের পরিচালনায় ১৯১৭ সাল হইতে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত দুই বৎসরকাল গবেষণা কার্য করেন।

১৯১৯এর শেষভাগেই তাঁহার কর্মজীবন শুরু হয়। এই সময় শ্রীসেন মেসার্স আর. জি. হচিসম কোম্পানিতে তাঁহাদের প্রধান রাসায়নিকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি তিন বৎসর এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুনামের সহিত কার্য করিবার পর তৎকালীন দেশপ্রিয়ক বিজ্ঞানসাহাী শিল্পপতিগোষ্ঠী টাটা কর্তৃপক্ষের তৎপ্রত্যাী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি জে. এন. টাটা স্কারশিপ প্রাপ্ত হইয়া উচ্চতর বিজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণের উদ্দেশে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে শ্রীসেন ধাতুবিজ্ঞান উচ্চতর জ্ঞানলাভের জন্ত ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজীর অধীন রয়াল স্কুল অব মাইল্‌স এ যোগদান করেন। দুই বৎসর পর তিনি এ. আর. এস. এম ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত এক বৎসর শ্রীসেন মিডলসবরো সহরে অবস্থিত ডারমান লভ এণ্ড কোম্পানীর ওকলাম ব্রিটানীয়া আয়রণ এণ্ড স্টীল ওয়ার্কসএ কাজ করেন এবং ১৯২৫ সালের শেষভাগে ভারত সরকারের টোরস বিভাগের ইনসপেকটরের অধীনে একজন

ক্লাশ ওয়ান অফিসাররূপে যোগদান করেন। এই পদে তিনি অল্প দিন অধিষ্ঠিত থাকিলেও সেই অল্পকালের মধ্যেই তিনি টোরস বিভাগের মেটালোগ্রাফি ল্যাবরেটরীতে একটি নতুন ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করেন এবং রেলওয়ে সংক্রান্ত ধাতুপ্রব্যাদির অকাল ভগ্নপ্রবণতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান পরিচালনা করেন। ইহার পর ১৯২৭ সালে শ্রীসেন শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ধাতু এবং রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই কলেজের খনিবিজ্ঞান বিভাগের ভারও কিছুকালের জন্ত ইহার উপর গৃহ্য হয়। পরে অল্প খানবাসে ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ মাইনস্‌ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিবপুর কলেজের ঐ বিভাগটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৩৬ সালে শ্রীসেন ধাতুবিজ্ঞান শিক্ষাদান এবং ধাতব শিল্প (Metallurgical Industries) প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করিবার জন্ত গ্রেট ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষ প্রেরিত হন এবং আট মাস ঐ দুই দেশে অবস্থান করিয়া জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন



শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন

করিয়া ক্রীসেন গ্রেটব্রুটেন এবং জার্মানিতে অধিক্ত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শাতুবিজ্ঞা শিক্ষণ ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং শাতুবিজ্ঞার একটি ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া শিবপুরের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের নিকট পেশ করেন। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড মনে-প্রাণে কলেজের শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি কামনা করিতেন। তিনি অতিশয় উৎসাহিত হইয়া ক্রীসেনকে সেই পরিকল্পনাটি লইয়া সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দরবারে উপস্থিত হইবার উপদেশ দেন।

সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার পরিকল্পনা অমুমোদন করায় ১৯৩১ সালে শাতুবিজ্ঞায় ৩ বৎসরের বি. মেট, ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তিত হয়। পরে ১৯৪৫ সালে অবশ্য এই কোর্স ৪ বৎসরের কোর্সে পরিণত হয় এবং ইহাতে উত্তীর্ণ তত্ত্বগোরা মেটালজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংএ বি. ই., ডিগ্রী লাভ করিয়া থাকেন। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে ক্রীসেন ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই বৎসরই বাংলা সরকার উচ্চতর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির রিপোর্টে অনতিবিলম্বে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষাদান ব্যবস্থার সম্প্রদারণ এবং উন্নতিসাধন করিবার সুপারিশ করা হয়। সরকার সেই সকল সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং ক্রীসেনের উপর সেই সকল সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, ভর্তি হইবার যোগ্যতার পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ম-কানুনের খণ্ডা প্রস্তুত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনার্থ পেশ করিবার নির্দেশ দেন। সেই সকল নিয়ম-কানুন ১৯৪৬ সালের ২১শে জুন সিনেট কর্তৃক অমুমোদিত হয়, কিন্তু সিন্ডিকেট প্রথম এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে এই সকল নিয়ম-কানুনগুলিকে পশ্চাত্বর্তী ১৯৪৫ সালের ২২শে অক্টোবর (with retrospective effect) হইতেই চালু করিবার নির্দেশ দেন। ক্রীসেনের নির্মল বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি ঐ সকল নিয়ম-কানুনের মধ্যে সম্যক্রূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

শিবপুরের অধ্যক্ষতার সংগে সংগে তিনি ডাইরেক্টর জেনারেল অফ এয়ার ক্রাফটের অধীনস্থ টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ হিসাবেও কাজ করেন। ভারতীয় এয়ারকোর্সের লাইট মেকানিক্সবিগের ট্রেনিংএর ব্যাপারেও ক্রীসেনের উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, তিনি বাংলা ও বিহারের শনিবিজ্ঞা বিষয়ক অ্যাডভাইসারী বোর্ড, প্রীডাস সার্ভে এগজামিনেশন বোর্ড এবং স্কুল কাইন্ড্রাল এগজামিনেশন (বিজ্ঞান বিভাগ) বোর্ডের কর্তৃপক্ষ (Secretary) হিসাবে প্রশংসনীয় কার্য করিয়াছেন। ক্রীসেন স্বদেশ ও বিদেশে যে সকল বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সংগে গুণঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন এবং অবসর গ্রহণের পর এখনও আছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠকদিগের ঐচ্ছানুসৃত বটাইতে পাবে। আমরা তাঁহার কর্তৃত্ববনের ব্যাপকতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি মাত্র। ১৯২৪ সালে ক্রীসেন গ্রেটব্রুটেন এবং আয়ারল্যান্ডের “ইনস্টিটিউট অব কেমিস্ট্রি” অ্যাসোসিয়েটে এবং ১৯৩৭ সালে ঐ প্রতিষ্ঠানের কোলোশিপের সম্মান অর্জন করেন। ইহা ছাড়া তিনি ভারতীয় ‘Chemical Society’র ফেলো লণ্ডনের ইনস্টিটিউশন অব মাইনিং এণ্ড মেটালজি অ্যাসোসিয়েটেড সভ্য

ছিলেন (১৯৩৪—৪১)। তিনি ১৯৪১ হইতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ভারতের স্মিথসনিয়ান মাইনিং এণ্ড মেটালজিক্যাল ইনস্টিটিউশনের সভ্য ছিলেন। ১৯৪৫ সাল হইতে ইনি ভারতের “ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স” নাম প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইয়া আছেন। ইনি “ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স” নামক স্থপরিচিৎ প্রতিষ্ঠানের কাউন্সিলের অগ্রতম সভ্য। তিনি সর্বভারতীয় কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন ও সর্বভারতীয় বোর্ড অব টেকনিক্যাল ট্রাডিজ ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড মেটালজি প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন এবং ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সের পরীক্ষা গ্রহণ কমিটি এবং ক্যালকাতা টেকনিক্যাল স্কুলের গভর্নিং বডির সভ্য ছিলেন। ১৯৪৫ হইতে ১৯৫১ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। তিনি কয়েকবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকালটির ডীন মনোনীত হন এবং সিন্ডিকেটের সভ্য হিসাবে কাজ করেন। সিন্ডিকেটের সভ্য থাকাকালে তিনি ইহার ওয়ার্কস কমিটি, স্কুল কমিটি এবং ফাইনাল কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি এক বৎসরের জ্ঞাত ভূবিজ্ঞা শিক্ষা বোর্ডের এবং কয়েক বৎসরের জ্ঞাত ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি মনোনীত হন। তিনি বেন্সল ট্যানিং (Tanning) ইনস্টিটিউট ও ইনস্টিটিউট অব জুট টেকনোলজির গভর্নিং বডির মেম্বর এবং কাউন্সিল অব পোর্ট গ্র্যাডুয়েট টিচিং ইন সায়েন্সএর সভ্য ছিলেন।

ক্রীসেনের মৌলিক গবেষণামূলক কাজ খুব বেশী নাই। তবে তাঁহার যে দুইটি মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লণ্ডনের কোমিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক রিপোর্টে স্থান লাভ করিয়াছিল। ১৯৪২ সালে কান্টনামে বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে সম্মেলন হয় তাহাতে তিনি “Struntum of Metals” এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং বিজ্ঞান-কংগ্রেসের উত্তোক্তাদের নিকট শাতুবিজ্ঞাকে বিজ্ঞানের অগ্রতম শাখা হিসাবে গণ্য করিবার আবেদন জানান। ইহার ফলে শাতু এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে যুক্তভাবে একটি “সেকশনাল সাবজেক্ট” রূপে গণ্য করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৪১ সালে তিনি বেন্সল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি যে প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন তাহার স্বীকৃতিস্বরূপ গভর্নমেন্ট তাঁহাকে এমারিটাস অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। ইনি শিবপুর কলেজের দ্বিতীয় ভারতীয় এবং প্রথম বাঙ্গালী অধ্যক্ষ।

### অধ্যক্ষ ত্রিচিন্তামণি ফর

[ সরকারী চাক ও কাক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও  
বিখ্যাত চিত্র ও প্রস্তরশিল্পী ]

বুদ্ধগর্ভা ভারতের সুমহান ঐতিহ্যের রক্ষাধারী আলােকিত করেছেন বিশ্বের আকাশ তার দিকপাল সন্ধানগণের কল্যাণে।  
দীর্ঘ দিন বিদেশে কালাতিপাত করেও নিজের দেশীয় স্বাভাবিক বীর্য পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন উপরন্তু নিজেদের ভাবধারায় অপূরক করেছেন অল্পপ্রাপিত, সেই বরষীর সন্ধানগণের সঙ্গে অনার্যাসে উল্লং

করা যেতে পারে সরকারী চাকর ও কারু মহাবিদ্যালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ চিত্র ও প্রস্তরশিল্পী বাউলার গৌরব ক্রিতিস্ফামণি করেব নাম।

শিল্পের দিকে অগ্রবাহ্য তাঁর জীবনের উদ্যোগ থেকে। পড়াশুনায় মন না বাসলেই পিতৃবরে শিল্পী জীবপনিনাথ কর অঙ্কনের দিকে অগ্রপ্রাণিত করতেন। বাবার কাছে পেয়েছেন অপরিমিত উৎসাহ। তা ছাড়া মুংশিল্পীদের কার্কেও সহায়তা করতেন সেই সময় থেকেই। এমনই করেই শিল্পকলার অমোঘ আহ্বান বরণ করে নেন চিত্তামণি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র-স্মৃতি বিজড়িত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ অরিয়েন্টাল আর্টস-এ যোগদান করেন। নিজের কৃতিত্বে ও মেধায় সেখানে উচ্চ ক্লাসেই স্থান পান। এখানে যেটো তরো মাস ছাত্র হিসাবে ছিলেন। ভারতীয় ধারায় চিত্রাঙ্কনে একে সেদিন শিক্ষা দিচ্ছেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীকৃষ্ণনাথ মজুমদার। কাঠ ও প্রস্তর খোদাই করা সম্বন্ধে পাঠ নিলেন উড়িষ্যার শঙ্কর মুংশিল্পী গিরিধারী মহাপাত্রের কাছ থেকে। এদিকে প্রবেশিকা পরীক্ষায়ও হয়েছেন উত্তীর্ণ। রিপন (বর্তমান সরস্বতীনাথ) মহাবিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন আই-এ। আত্মনিয়োগ করলেন বাণিজ্যিক শিল্প সাধনায়। তারপর টাকীতে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ, সেখান থেকে তিনি ওদলী হলেন সিউড়ীর বীরভূম জেলা বিদ্যালয়েও নিজের মনোমত বিভাগটি পেলেন। অঙ্কন শিক্ষক হলেন চিত্তামণি কর। ইতিমধ্যে চিত্তামণির শিল্পীখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। রঙ ও রেখার আঁচড়ে কাটাতে থাকেন অস্ত্রের ভাব ও ভাষা, নীরস পাথরের মধ্যে আনেন গালিত্য, লাগবা, দীপ্তি। শিল্পপ্রাণ মহারাজা প্রজোক্তকুমার গাঙ্গুরের প্রতিষ্ঠিত স্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর প্রশ্রয়ী থেকে গাড়ে চার শ' টাকায় এর একখানি ছবি কিনে নিয়ে গেলেন উপর্য উপরলোকগত বিজোৎসারী মহারাজা বাহাদুর। তারপর লণ্ডন যাত্রা। সেখানেও প্রভূত সমাদর পেল এই অঙ্কিত ছবিগুলি। স্ট্রীর মাধ্যমে স্রষ্টা পেলেন স্বাধীন। লণ্ডন থেকে এসেন প্যারীতে, এখানে তাঁর প্রতিটি স্মৃতি কেটেছে শ্রম ও সাধনার মধ্যে দিয়ে, অপরিমিত নিষ্ঠায় তিনি দিনের পর দিন যে পরিমাণ পরিশ্রম করে গেলেন তারই সমষ্টি বোঝা দিয়েছে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সাক্ষ্যরূপে, এখানে সকালে নটা থেকে বাবেটা স্যাকাডেমী ডা'ল গ্রাউন্ডের টির কাজ শিখেছেন, দুটো থেকে পাঁচটা প্রস্তর খোদাই শিখেছেন বর্ষীয় শিল্পী ভিক্টর জোভানেন্সীর ষ্টুডিওতে, ছটা থেকে সাহটা ধারণ করেছেন ইন্সটিটিউট অফ আর্ট স্যাণ্ড আরকোলজিতে, দ্বাদশী ভাষা শিক্ষা করেছেন রাত আটটা থেকে দশটা অবধি। এই চল তাঁর দৈনন্দিন বহুশ্রী। যুদ্ধের মরণ-দাম্যাস বাজার সঙ্গ সঙ্গেই করে এসেন ভারতবর্ষে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। ১৯২২ খৃঃ এ দিল্লীতে গিয়ে একটি ষ্টুডিও খুললেন। শিক্ষা প্রণালয় থেকে দিল্লী পলিটেকনিক আর্টস সেকশনে ভাস্কর্য শাখার ভার পেলেন (১৯৪৩)। ১৯৪৪-৪৫ খৃঃ অঙ্কনে ও বার্ষিক ওয়ানম্যান শো'র অর্জন করলেন প্রভূত প্রসিদ্ধি। ১৯৪৬ ষ্টাদে আবার লণ্ডন যাত্রা। সেখানেও নির্মাণ করলেন একটি ডিও। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল ব্রিটিশ ফালপচারাল সোসাইটির ভা নির্বাচিত হলেন। সমগ্র এশিয়ার মধ্যে ইনিই একে প্রতিষ্ঠানের

প্রথম ও আজ পর্যন্ত একমাত্র সভ্য। ১৯৪৮-এর অলিম্পিকে স্পোর্ট-ইন-আর্ট-এর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভাস্কর্য বিজ্ঞান জয় গ্রেট ব্রুটনের পক্ষ থেকে রৌপ্যপদক ও ডিপ্লোমা পান। রয়্যাল স্যাকাডেমির প্রদর্শনীগুলিতে ইনি একজন নিয়মিত প্রদর্শক ছিলেন (১৯৪১-৪৬)। লণ্ডনের একটি শিল্প সংরক্ষণ শালার পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় শিল্পী চিত্তামণি কর (১৯৫০-৫৩)। লণ্ডনে চার বার ও প্যারীতে দু'বার ইনি 'ওয়ান-ম্যান-শো' করে এসেছেন। লণ্ডন ও প্যারী ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, আষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি স্থানে বহু ব্যক্তিগত ও সাধারণ সংগ্রহশালার শোভা পাচ্ছে এর শিল্প সৃষ্টিগুলি। ক্লাসিকাল ইণ্ডিয়ান ফালপচার' ও 'ইণ্ডিয়ান মটাল ফালপচার' নামক দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেও সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫৩ ও ৫৪ খৃষ্টাব্দে তিন মাসের জন্তে দু'বার ভারতে ফিরে আসেন। এই সময়ে শ্রীলঙ্কা, ডি, বিড়লার ইচ্ছাক্রমে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রেসিডেন্টের একটি এগারো ফুট জোঞ্জের প্রতিমূর্তি নির্মাণের ভার নেন। ১৯৫৫ খৃঃ সেটিকে আট মাসে সম্পূর্ণ করেন। ভারতের প্রধান তিসাব পরীক্ষকের আবার সামনে দেখালে নটা '৬-৪' বাস বিত্মিক ফালপচার প্যানেলের নির্মাণ ভার গ্রহণ করলেন ভারত সরকারের কাছ থেকে। এই উপলক্ষে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে একেবারে প্রত্যাবর্তন করলেন ও সেই বছরই আগষ্ট মাসে সরকারী ও চাকরকার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন চিত্তামণি কর।

দীর্ঘদিন বিদেশে কাটিয়েছেন, ভারতীয় ভাবধারায় শিল্প সৃষ্টি করে সেখানে অর্জন করেছেন প্রভূত যশ, ইনি বলেন যে আমাদের প্রাচীন শিল্প সেখানে অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে তারা রীতিমত চর্চা করে। স্বাধীনদেশে শিল্পের যতটা অগ্রগমন হওয়া দরকার অধ্যক্ষ করের মতে ভারতে তা যেটাই হচ্ছে



চিত্তামণি কর

না। ভবিষ্যৎ শিল্পীদের প্রতি আপনাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশ কি, ভিজ্ঞান কি, অধ্যয়ন করার কঠোর কাছ থেকে উত্তর আসে যে নতুন শিল্পীদের নিজস্বের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত থাকতে হবে অথবা তাই বলে পুরাকালকে আশ্রয় নকল করতে বলি না— তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে নতুন যুগেরই ছবি থাকবে তবে তা দেখেই যেন বোঝা যায় যে শিল্পী কোন সেশাভ্যন্তর। এইভাবে ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রত্যেক শিল্পীর অবশ্য কর্তব্য। জীবনে বহু শিল্প-সাধকের সংস্পর্শে নিবিড়ভাবে এসেছেন অধ্যয়ন কর বাসের মধ্যে উল্লেখ করা যায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ, রৈবিক, ভুভেনেন্সি প্রমুখ এর শিক্ষকবর্গের ও তৎসহ ব্রাহ্মী, ভেনিসিউ, এপটাইন প্রমুখ স্বনামধন্য শিল্প সাধকদের নাম।

ভারতের বিশেষ করে বাঙালার গৌরব অধ্যয়ন চিন্তামণি করের দ্বারা সারা বিশ্বে আরও পরিব্যাপ্ত হোক, বিশ্ববাসীকে ভারতীয় শিল্প বোধে উদ্বুদ্ধ করুক, বিশ্বজন মানসে ভারতের শিল্প নতুন চেতনার সঞ্চার করুক, এই কামনাই করি।

### শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

[ প্রখ্যাত কবি ও 'যুগান্তর'-সম্পাদক ]

শ্রীশ্যাম শোভন বাঙালার পরম কোমল মৃত্তিকার পুত্র হয়েছেন বাঙালার অসংখ্য কবি সন্তান, সেই পুত্রকে বিকাশের পথে সাহায্যতা করেছে বাঙালার অনন্দরমহলের রূপ-রস-মাধুরীর অবর্ণনীয় বৈচিত্র্য। এই রূপসাগরে অবগাহন করে কবিকুল তাই থেকে আহরণ করেন অমৃত, সেই অমৃত তাঁরা পরিবেশন করেন ঘরে ঘরে কাব্যের মাধ্যমে। বাঙালার ঠিক এই রকমই এক শোভা স্রবমায় ভরা



শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

গ্রামে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করলেন স্বনামধন্য সাংবাদিক ও স্রুতিবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। কবিরপুর জেলার মালারীপুর মহকুমাত্তর্গত ছয়গাঁও গ্রামে। নদীতীরে মাছুলালয়ে। পিতৃদেব স্বর্গীয় কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়। ইংরাজী কাব্য সাহিত্যে অগণিত, পরম বিজ্ঞানসাহী। মায়ের কাছে প্রথম পাঠগ্রহণ। তারপর পাঠশালায় প্রবেশ। এদিকে গ্রাম্য প্রকৃতি বিশেষ করে গৃহ সন্নিকটস্থ নদী ছেলেবেলা থেকে হাতছানি দেয় বিবেকানন্দকে। নদীর গতিবেগে অভিভূত করে তোলে বালককে, তাঁর উত্তাল উদ্‌দামতার মধ্যে মনে মনে বালক নিজেকে দেয় মিশিয়ে, ভবিষ্যৎ-জীবনের কবি বিবেকানন্দের কবিত্বের মধ্যে বা তাঁর নিজের জীবনেও যে অশান্ত গতিবেগে ধরা পড়ে তার উৎসই হচ্ছে এই নদী-তট। গ্রামের মহিলাদের রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে শোনান বিবেকানন্দ। পাঠশালায় পর মধ্য ইংরাজী বিভাগের তারপর রুদ্রগড় উচ্চ ইংরাজী বিভাগে অধ্যয়ন। লেখা আরম্ভ হয়েছে তার আগেই। বিভাগের থেকে হাতে লেখা পত্রিকা বের হ'লে তাতে গল্প-প্রবন্ধ কবিতা এই তিন বিভাগেই দেখা দিলেন বিবেকানন্দ। নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধের অনুরূপে একদিন রচনা করলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ কাব্য। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ এল। বাঙালার স্বাধীনতাত্ত্বিক ইতিহাসের একটি স্মরণীয় বৎসর। পরাবীন্দ্র দেশের নেতারা সম্ভবতঃ হয়ে উঠেছেন, দেশের মুক্তি আন্দোলনে উৎসাহিত করছেন সকলকে তাঁপিয়ে পড়তে, স্রুত পল্লীগ্রামেও সে ডাক পৌঁছোল, ফলে বিবেকানন্দের অধ্যয়ন বাহ্যত হ'ল কিছুকালের জন্তে। এরপর একবার কলকাতায় ঘুরে যান বিবেকানন্দ। এখানে এসে দৈনিক বসুমতী ও অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতি আকৃষ্ট হন ও গ্রাহক হয়ে যান। কবিতা রচনা তখন পূর্বোদ্যমে চলছে। প্রথম কবিতা বেরোল 'উদ্বোধন'এ দ্বিতীয় 'মাসিক বসুমতী'তে। মাসিক বসুমতী তখন সবে চোখ মেলে চেয়েছে। পূজনীয় স্বর্গীয় সত্যশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে মাসিক বসুমতী ধীরে ধীরে বৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলবার রাস্তা খুঁজছে। মাসিক বসুমতীর সঙ্গে এই যে সংযোগ স্থাপিত হ'ল বিবেকানন্দের তা আজও অক্ষুণ্ণ। শুধু তাই নয়, বিবেকানন্দের জীবনের অনেক স্মরণীয় ঘটনাত্ত্বিক কেন্দ্র করে লেখা কবিতাগুলি এখানেই প্রকাশিত হয়েছে, তা ছাড়া তখন একরকম নিয়মিত ভাবেই এখানে কবিতা পরিবেশন করতেন বিবেকানন্দ। এদিকে বাংলা ও সংস্কৃতে 'লেটার' নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিবেকানন্দ। ছাত্রজীবন বরাবরই গৌরবমণ্ডিত ছিল। কলেজে পড়ার ইচ্ছা থাকাতা স্বাভাবিকই। কিন্তু কোন কারণে কলেজে পড়া আর হয়ে উঠল না, কর্মজীবনের অমোঘ আকর্ষণ সরিয়ে রাখতে পারলেন না—কিন্তু অধ্যয়ন তাঁর শেব হ'ল না, তার বিরাম নেই, পৃথিবীর বিখ্যাত সাহিত্যগ্রন্থগুলি বিখ্যাত সন্ধানদের জীবনকাহিনীগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে তলিয়ে গেলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। কলেজে পাঠগ্রহণে উদ্দেশ্যে ইনি যখন চুঁচুড়ায় পদার্পণ করেন, সেই সময়ে নজরুল ইসলামের সঙ্গে এর হয় পরিচয়। নজরুলের সঙ্গে এর পরবর্তী জীবনের গভীর সৌহার্দ্য অনেকেরই স্মরণিত। উদীয়মান কবিকে নজরুল আখ্যা দিলেন 'মর্গি ষ্টার'।

বিবেকানন্দের কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়।

আনন্দবাজারেও তখন শিশুযাত্র। নির্ভীক সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের চেষ্টায় ও মাখনলাল সেনের সমর্থনে একজন অত্যাধুনিক শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করলেন বিবেকানন্দ (১৯২৫ খৃঃ)। অনেক দিন পরে প্রথম পারিশ্রমিক লাভ করলেন পচিশ টাকা। তার পর মেথার ও নিষ্ঠার এবং সত্যতার বারো বছরের মধ্যে তিনি সহস্রসম্পাদকের পদে সম্মানিত হলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি ও বিপ্লবের গ্রন্থগুলি ব্যাপক ভাবে সংগ্রহ করতে লাগলেন। সম্পাদকীয় রচনায় আন্তর্জাতিক বিষয়ক রচনাদির প্রথম প্রবর্তন ইনিই করলেন। দীর্ঘাকার প্রবন্ধগুলিই ধীরে ধীরে আজ রবিবাসরীর বিভাগরূপে পরিণত হয়েছে। আনন্দবাজারের দোল সংখ্যা ও পূজা সংখ্যার সম্পাদনভার ইনি একাধিক বার গ্রহণ করেছেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে 'যুগান্তর'এর প্রতিষ্ঠা হ'ল। বিবেকানন্দ বোগদান করলেন যুগান্তরে। সমস্ত পরিকল্পনাটি তাঁর স্থষ্টি। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিক থেকে ইনি সম্পাদনভার গ্রহণ করলেন, আজও তিনি গৌরবের সঙ্গে এই পদে সম্মানিত। প্রথম জীবনে বিদ্রোহমূলক কবিতা লেখার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা বিভাগের কুনজরেও থাকতে হয়েছিল প্রায় পনেরো-ষোলো বছর। শতাব্দীর সঙ্গীত, বিপ্লবী নায়িকা ও জীবনযুদ্ধ গ্রন্থের তাঁর কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর বহনকারী। তা ছাড়া জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী, ক্লশ-জার্মান সংগ্রাম, সোভিয়েট মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি স্বীকৃত গ্রন্থগুলিতে তাঁর বিশ্ব রাজনীতি তথা সমরনীতি সবচেয়ে দক্ষতা ধরা পড়েছে।

বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে ইনি ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত এবং ১৯৫৫ থেকে ইনি পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সঙ্ঘের সভাপতি। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম চীন ভ্রমণের আমন্ত্রণ পান কিন্তু তা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে হেলসিঙ্কি যাত্রা করেন ও সেই সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়া ভ্রমণ করেন। ঐ বছরেই এপ্রিল মাসে বার্মার অস্থিষ্ঠ নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ঐ বছরের শেষার্ধ্বে 'মাস্ত্রাজে' অস্থিষ্ঠ নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সমাজ সংস্কৃতি শাখার সভাপতিরূপে দেখা দায় একে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র সংস্থা বর্তমানে বিশ্বের সংবাদ জগৎ নিয়ে গবেষণায় মত্ত। এদের বাৎসরিক সম্মেলনে আমন্ত্রণক্রমে যুগান্তরের প্রতিনিধিত্ব করলেন বিবেকানন্দ (১৯৫৭ খৃঃ)।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সাংবাদিকতার স্থান কোথায়? আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বিবেকানন্দ উত্তর দেন—কল্যাণেশ্বরের দিকে তাকা অনেক উন্নত মনীষার ক্ষেত্রে ভারত বিশেষতঃ বাঙ্গালার কাছে তাদের স্থান অনেক নীচে। সাহিত্য ও সাংবাদিকতা এই দ্বিবিধ জীবন বহুকাল একযোগে বাপন করে এসেছেন কবি সাংবাদিক বিবেকানন্দ। আমার প্রশ্ন এই যে দুয়ের মধ্যে সংযোগ কতখানি? উত্তর আসে অচ্ছেদ্য। সাহিত্যে রীতিমত দক্ষতা না থাকলে সাংবাদিকতার সাক্ষ্যলাভ করা যায় না। ইতিহাসে দেখুন ধীরে ধীরে সার্থকনামা সম্পাদক তাঁরাই কৃতী সাহিত্যসেবী। তাই সাংবাদিকতার মধ্যেও তাঁদের সেই পরম মোহনীয় শিল্পীমনই বার বার ধরা দেয় এবং যেখানে তা দেয় না সেইখানেই তাঁদের ব্যর্থতা।

## ডক্টর শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কল্লের অধ্যক্ষ]

জীবনের প্রতিষ্ঠাশিখরে ধীরে ধীরে আরোহণ করেছেন ইতিহাসের সোপানমালাকে আশ্রয় করে, ইতিহাসের মাধুর্যময় আলোকের করণাধারায় ধীরে নিজেদের স্নাত করেছেন সর্বতোভাবে, ইতিহাসের বহুমূল্য কোষাগার থেকে মহার্ঘ রত্ন আহরণ করে সেইগুলি দিয়ে ধীরে ধীরে দিয়েছেন শিক্ষার্থী ছাত্রদের ও শিক্ষাধিনী ছাত্রীদের, সেই বরণীয় ঐতিহাসিককূলে ডক্টর অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরও যে একটি বিশেষ আসন আছে সংরক্ষিত, এ অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসচর্চা, সাংবাদিকতা ও শিক্ষাদান এই তিন বিরাট ত্রয়ের মধ্যে অনিলচন্দ্রের জীবন ও জীবনীর পরিপূর্ণ বিকাশ।

নোয়াখালীর একটি স্থলের শিক্ষক ৮তমেরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র অনিলচন্দ্র নোয়াখালীতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৮ই অগাঠ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বালিগাঁও গ্রামে ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়দের আদিবাস। আরিয়ল গ্রামের (ঢাকা জেলা) স্বর্ণময়ী হাই স্কুলে অধ্যয়ন করেন অনিলচন্দ্র। নোয়াখালীর অরুণচন্দ্র হাই স্কুল থেকে সরকারী বৃত্তি নিয়ে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। ছাত্রজীবন অনিলচন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর, কেবলমাত্র স্বাধীনতা সার্থকতা, সাক্ষ্য, বিজয়ের আশ্বাস।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ফকী কলেজ থেকে আই-এ পাশ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে হলেন প্রথম জন। সরকারী বৃত্তি সহ গেলেন বঙ্কিমচন্দ্র পদক ও বিশ্বেশ্বরলাল বৃত্তি। প্রেসিডেন্সী



শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন অনিলচন্দ্র (১৯৩০)। এবারও সরকারী বৃত্তিলাভ। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর প্রথমজন হয়ে স্বর্ণপদক ও পুরস্কার নিয়ে এম. এ. পরীক্ষাতেও হলেন উত্তীর্ণ। রাণাঠার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে মৌর্য টা মডেল ও প্রেমচাঁদ রাণাঠার স্বলারশিপ লাভ (১৯৪০-৪২)। আসাম ও এক্সপেন্সের ইতিহাস সবক্ষে গবেষণা করে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ইনি দর্শনশাস্ত্রে 'ডক্টরেট' লাভ করেন। এ ছাড়াও যথা মারাঠার ইতিহাস, রাজপুত ইতিহাস, আসাম ও ব্রহ্মের ইতিহাস, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও আফগান সমস্তার ইতিহাস, ভারতের শাসনতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়সমূহ অবলম্বন করে গবেষণার মধ্যে অনিলচন্দ্র অতিবাহিত করেছেন জীবনের অনেকগুলি দিন।

সিটি কলেজ ও সুরপুরিয়া কলেজে কয়েক বৎসর ইতিহাসের পাঠ দিয়েছেন। ত্রিপুরা জেলার শ্রীকাইল কলেজের অধ্যক্ষও ছিলেন এক বছর। বর্তমানে মহারাষ্ট্রা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষরূপে ইনি সমালীন (১৯৭০ থেকে)। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্ব্যাক্টরতার বিভাগের ইতিহাসের অধ্যাপকের আসনও এর দ্বারা অলঙ্কৃত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকও ছিলেন বছর তিনেক।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত অমৃতবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত হয়েছে এর দ্বারা। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, ফ্যাকাল্টি ও বহু কমিটির ও কয়েকটি জুল-কলেজের পরিচালক সমিতির ইনি সভ্য। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সঙ্গে এর সম্পর্ক অনিবিড়। আজীবন সভ্যরূপে কোম্পানিকল্পে, শাখা সভাপতিরূপে, এই কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯৫৫) সভাপতি সমিতির সম্পাদকরূপে নানা ভাবে এই কংগ্রেসকে সেবা করেছেন অনিলচন্দ্র। বর্তমানে ইনি কার্ঘ্যকরী সমিতির সভ্য ও এই কংগ্রেস সান্ধিষ্ট ভারত ইতিহাস প্রকাশনী সমিতির সম্পাদক। ভারতীয় সরকারের ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের ইনি একজন সভ্য। প্রায় পঁচিশখানি গ্রন্থ অনিলচন্দ্র রচনা করেছেন তাদের মধ্যে গেলোয়া প্রথম মাঘব রাত, রাজপুত ঠাউস, রাজপুত চেষ্টা স্যাপ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ইষ্টার্ন ফ্রাণ্ডিসার অফ বটাল ইণ্ডিয়া, গ্যানেফ্রেন্স অফ বমা, ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল ডকুমেন্টস (৩ খণ্ড) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উত্তর নরেন্দ্রকৃত্য দিহের সঙ্গে সহযোগিতার এর লেখা ভারতীয় ইতিহাস রঙ্গ ভাবার রূপলাভ করেছে। এ ছাড়াও ইতিহাস বিষয়ক বাঙলা ভাষার ইনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অনিলচন্দ্রের ইতিহাসে অমূল্য একারই নয়। এর তিন ভাইও ইতিহাসে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এর তরুণ পুত্র অমলেন্দুর নামও অনেকের কাছে অজানা নয়। অমলেন্দুর

হারাজীবনও যশ-সৌরভে ভরপুর। প্রবেশিকার বিত্তীয়, আই-এতে প্রথম, অনার্স সহ বি. এতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হান অধিকার করে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেছেন এক প্রমাণ করেছেন যে তিনিও যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। বর্তমানে ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়লিয়ল কলেজের ছাত্র।

অনেক কৃতী শিক্ষাপ্রদাতার সম্পর্কে এসেছেন অনিলচন্দ্র। তাঁদের মধ্যে কে, জ্যাকেরিয়া, চেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর দ্বিতীয় আভ ও অনিলচন্দ্রের জন্মের অমলিন। টাংরাজী ভাষাতেও প্রচুর যোগ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (চমচন্দ্র মতিবিন কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) শিক্ষালান পদ্ধতিও অনিলচন্দ্রের অন্তরে স্পর্শ করে। জিজ্ঞাস কংগ্রেসিয়াম যে কীর্তি শিক্ষাভঙ্গিতে অতিবাহিত করে কি অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন—এক কথাই উল্লেখ দিয়েছিলেন যে পনেরো বছর আগেও যে একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সত্যযোজিত্য এ জগতে ছিল আজ তা যেন লোপ পেতে বসেছে। অধ্যক্ষ অনিলচন্দ্রকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব কি জিজ্ঞাসা করি—উত্তর হল—অধ্যক্ষকে ছাত্রদের মনের মধ্যে সঙ্গীত প্রাণ! আনতে হবে যে তিনি একজন শিক্ষক তবেই তাদের সঙ্গে অন্তরের সাংযোগ গড়ে উঠবে, প্রজ্ঞাভক্তি-ভালবাসা আসবে তাদের তরুণ থেকে। অধ্যক্ষ যদি শুধুমাত্র অফিসাররূপেই তাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত হন তবে কিছুতেই তাদের সঙ্গে প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে এও ঠিক, অধ্যক্ষকে শুধুমাত্র শিক্ষক হয়ে থাকতেই চলে না, কলেজের নানাবিধাঙ্গ নিয়ে তাঁকে মাথা ঘামাতে হয়। এই বিষয়ে পশ্চিম বাঙলার শিক্ষা-জগতের আজকের দিনের একজন বিরাট পুরুষ উক্তি করেছেন "দি প্রিন্সিপালস্ আর সিটি অফ ভলক্যানোস্।" অধ্যক্ষের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীর সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত জিজ্ঞাসা করায় অনিলচন্দ্র বলেন যে—এক প্রত্যেক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে আলোচনার দ্বারা পাশ্চাত্যিক ভাবের আদান প্রদান হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়—কিন্তু সাংঘাতিকতার জগৎ সকলের সঙ্গে তা হওয়া অসম্ভব। সেই জগৎ বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী যেখানে সেখানেই অধ্যক্ষের সঙ্গে তাদের নিবিড় সাংযোগের পরিপূর্ণ সুযোগ। ইতিহাসিক অনিলচন্দ্রকে প্রশ্ন করি—আজকের দিনের সারা ভারতব্যাপী ইতিহাস-জগতের স্তররূপে আগনি কোন্ কোন্ ইতিহাসিকের নাম করতে চান? অনিলচন্দ্রের অভিমতে আজকের দিনের ভারতব্যাপী স্রেষ্ঠতম ইতিহাসিকদের মধ্যে প্রথম তিনজন হলেন ডাঃ স্যার যদুনাথ সরকার, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ও ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। এ বিষয়ে সর্বিশেষ লক্ষণীয় যে যে তিনজনের নাম ভারতব্যাপী স্রেষ্ঠ ইতিহাসিকরূপে অনিলচন্দ্র উল্লেখ করলেন, তাঁরা তিনজনেই বাঙালী, বাঙলাদেশের ছেলে। যদুপ্রসন্ন বঙ্গজনের কীর্তিমান সন্ধান।

"যে পথেই হ'ক, আর যে ভাবেই হ'ক, দেশ বিভাগ রহিত হতেই হবে; ঐক্যসাধন করতেই হবে এবং ঐক্যলাভ হবেই।"

—শ্রী অরবিন্দ



# রাজাঘর রাজাঘর

উদয়ভাসু

মুখের মত একেবারে সীতের চলেছে অকৃত  
আনন্দকুসারী।

অকৃত জোয়ার আলো কখনও দেখা যায় তার শুভ দু'খানি  
হাত, কখনও মাথার কুকেশন, কখনও লাড়ীর আঁচল বা তার  
বহুশ্রান্ত। বহু চন্দ্রালোকে ম্যাগেট দেখতে পায় কাপসা চোখে,  
তার প্রিয়সঙ্গিনী বলে তেঁসে চলেছে। জোয়ার আঁচল হয়ে বন্ধুটা  
হাতে তুলে নিয়েছে কখন, কিন্তু হাত আর উঠলো না যেন।  
একটা বৃক-বঙ্গা ঝগড়া চললো ম্যাগেট। সাঁটের বোতাম বুল  
কল্প বৃকখানা উন্মুক্ত করলো। চোখের দৃষ্টি হেসে না তুলে দেখেছে  
নিজেই সে বোঝে না। চোখে হাত কচলায়। মাঝির হল চিত্রাশিতের  
মত শীতের আঁচে। তবু পাওয়া যায় তার। বলে কাঁপ দেবে কিন্তু  
ম্যাগেটের মুখে কোন কথা নেই, চতবাক যেন। বাঁচা থেকে পাখী  
পালিয়েছে, চলে গেছে হাতের নাপালের বাইরে। পুত্র বজ্রাক্ষের  
বিকে একবার কাঁধে দৃষ্টিতে দেখলো ম্যাগেট। তারপর বীরে বীরে  
যাবে চুকে বসে পড়লো নিজের জায়গায়। ডিকেটারটা হাতে  
তুলে নিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকলো কতকাল।

ঘরের খাটো সরঞ্জাম দেখা গেল মাঝি-সদার। নিম্নকণ্ঠে বললে,  
—তবু, গোলা-বাকল আর এতগুলো বন্ধু থাকতে শিকার পালিয়ে  
যাবে চোখে খুলে গিয়ে?

ম্যাগেট নিম্নকণ্ঠে। অভিমানে যেন শুভ হয়ে আছে। চোখের  
পলক পড়ছে না। মুখে নিরাশার কালাছায়া কুটেছে। তবুও  
অশ্রুট কীপ হাসলো ম্যাগেট। ডিকেটার মুখে তুলে ঢকঢকিয়ে  
পান করলো খানিকটা, তুফা মিটাতে। জোঁর আর উত্তেজনার তার  
কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। মাঝির কথা যেন কানে ওঠে না। ম্যাগেট  
হয়তো জানে, ভালবাসার তবু জোঁর-জুসুম অচল। শক্তির প্রয়োগে  
সেই যদিও কারও পাওয়া যায়, ভালবাসার খনি মনটা পাওয়া যায়  
না। সাহেবের আশার আলো যেন চিরদিনের মত নিবে গেছে।  
প্রেমের কঠোর ছিঁড়ে গেল অতকিতে।

মাঝি-সদার দেখতে পায় তার মনিব পান করছে অভি-মাত্রায়।  
এই অসংখ্যের পরিণাম তার অজানা নয়। দেখতে দেখতে  
এখনই জ্ঞান হারাবে, আর বসতে বা গাঁড়িতে পারবে না! জ্ঞান  
ফিরতে ফিরতে হয়তো আকাশ ফর্সা হয়ে যাবে।

—হুজু এত থাকেন না উপরি-উপরি।

মাঝি-সদার যেন আর থাকতে পারে না, দেখতে পারে না  
চোখে। কথাগুলি বলে একান্ত আপন অনের মত।

কি এক আক্রোশে ডিকেটার নামিয়ে রেখে উঠে পড়লো

ম্যাগেট। টলটল পথকাঁপে ঘরের ইটিক সিঁড়িক দেখতে যে  
চরায় চলে উঠলো সমস্ত। কি যেন খুঁজতে থাকে চাসতে চাসে  
আনন্দকুসারীর পরনের বহু আর সাজসজ্জার উপকরণ বলে দু  
কেনতে থাকে। মাঝির হল এই চুপ দেখতে দেখতে অবাক হয়ে  
—সাহেবের মাথাটা বিগড় গেছে না কি? মন্তব্য কাট  
একজন মাঝি।

অবাকজন বললে,—মনে লাগা পেরেছে, হাও বা তাই।

কিছুই রাখলো না ম্যাগেট। দৃষ্টির চিহ্নগুলি একে একে  
ভাসিয়ে দিয়ে আবার বললো নিজের জায়গায়। বাজসন্ত্রটা পলায়  
এক পাশে সরিয়ে দিয়েছে। বহুটা একবার কড়ার তুলে কতি  
উঠছে হাতের মৈশিক জোঁর।

—এক গেছে আর এক আসবে। মাঝি-সদার সাধনা দেওয়া  
মুখে কথা বললে সাহেবের গুনিয়ে। বললে,—বাড়ির দেয়  
মেয়েমানুষের অভাব হবে না। অমন শুল্কী ঢের ঢের মিলবে।

নদীর জলে, লবমান চন্দ্রালোকিত দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে  
ডিকেটারটা আবার তুলে নিয়েছে কখন। নদীর জলকল্লো  
বজ্রা তুলে তুলে উঠছে। ঘন ঘন বাস কেটে ম্যাগেট। রাগে  
আবেগে তার উদ্ভবক আরও যেন ক্ষীত হয়ে উঠছে থেকে থেকে।  
সদার-মাঝির সঙ্গে চোখাচোখি হ'লেই চোখের ইশারায় ডাকলো।

বজ্রার কণ্ঠে তৈলদীপ জ্বলছে এককালে। সাহেবের নীলাভ-  
চোখের আঁকান দেখতে পেরে কক্ষমধ্যে ঢুকলো মাঝি।

ম্যাগেট মুহু হাসির সঙ্গে বললে,—বজ্রা চালাও।

—কোথায় যাবে সাহেব এই মাত্রাতে? মাঝি যেন কিঞ্চিৎ  
বিম্বের সঙ্গে কথা বললো। বললে,—পুটু গীতের হাতে পড়লে কেউ  
বাঁকে পারবে না। খালের বাঁধে লুকিয়ে থাকে তারা।

—ভয় নাই কিছু! কেমন যেন অশঙ্কিত সঙ্গে বললে ম্যাগেট।  
বললে,—হামাকের বন্ধু আছে। ভয় কেন? নোভর খুলে বল।

অগত্যা মাঝি-সদার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কুক্ষমনে। এত  
সাধের বিজ্ঞান আর কপালে সজ্জা হয় না। সাহায্যিনী হাল টেনে  
টেনে মাঝির হল দ্রুত হয়ে আছে। তোলা-উঠুন খেল ভাত  
তরকারী চাপিয়েছে। সাহেবের স্তম্ভ রান্না চোপেছে।

হাওয়া যেন বিষ ছড়িয়ে দেয় শরীরে। তাই আর এখানে থাকতে  
চায় না ম্যাগেট। যেন বাস রোধ হ'তে থাকে অপমান আর  
অভিমান। রাগিত কত নিয়ন্ত্রণ, তবুও উত্তেজনার কপাল বেধে  
উঠছে। পরাজয় মানতে আপত্তি নেই, কিন্তু ঠকতে রাজী নয়  
ম্যাগেট।

সাঁতারে পাকাপাকি চৌধুরাণী। কতদিন পাড়ার সঙ্গিনীদের





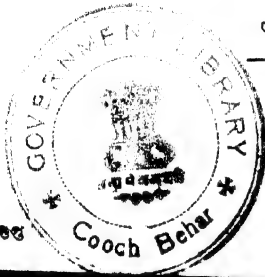
ছবি পাঠানোর সময় ছবির পেছনে নাম, ধাম ও  
বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না ]

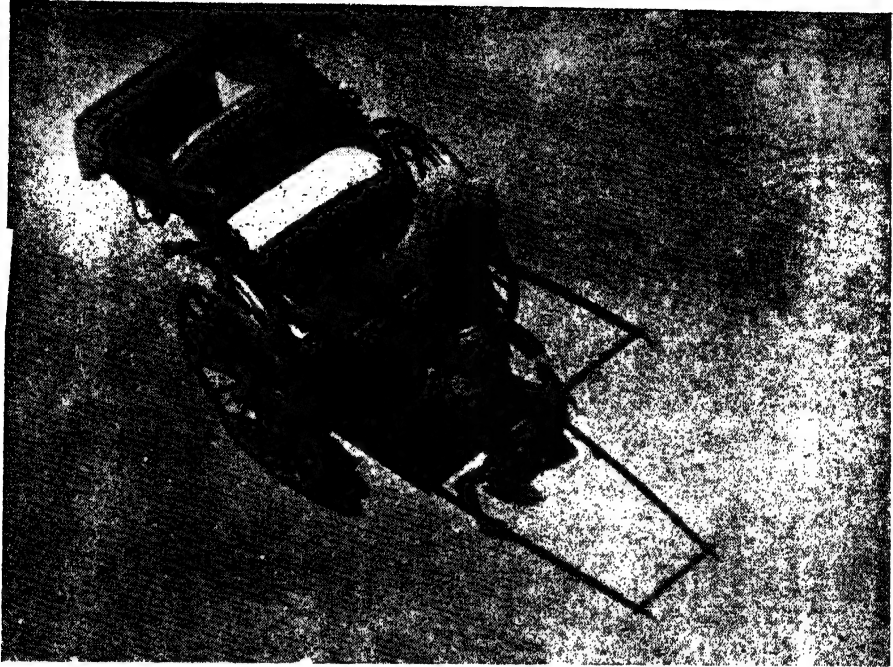
প্রতীক্ষা

—রবীন রায়

নর্তকী

—রতন লালগুপ্ত



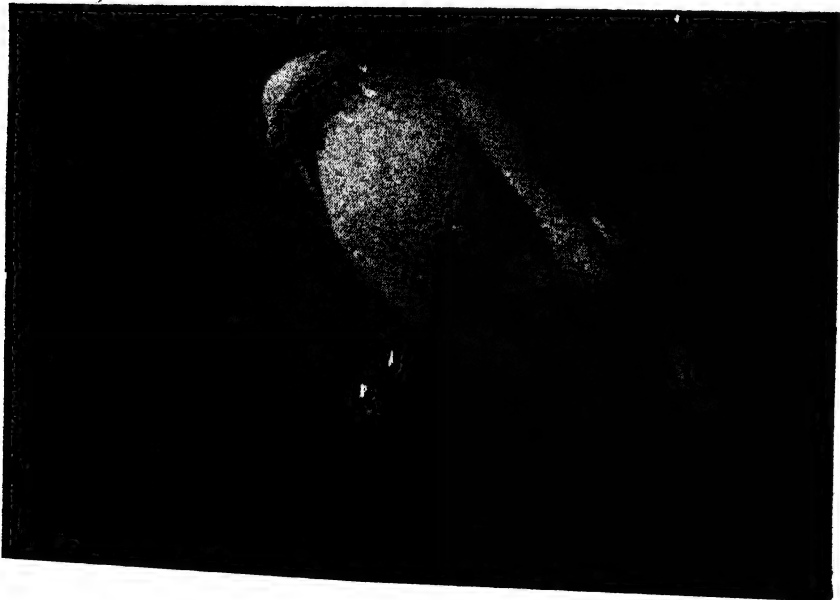


রিক্সাওয়ালা

—বিবেকজ্যোতি মিত্র

সাবীহারা

—এন. কে. মিত্র





জলস।

—মাদুরী হাট্টাচার্য



স্মৃতি  
—সোপাল ঘোষ





বিবিসাহেবা

—ইডিও সাংবিজা

হঠাৎ সেদিন দেখলাম, এক কর্মরত কুস্তকার  
করছে চূর্ণ মাটির ঢেলা ঘট তৈরীর খাল দেদার।  
দিব্য দৃষ্টি দিয়ে এ সব যেই দেখলাম, কইল মন,  
নূতন ঘট এ করছে সৃজন মাটিতে মোর বাপদাদার।

আমার সাকী জানে মানুষ আমি কোন জাতের,  
চাবি আছে তার আঁচলে আমার বুকের মুখ দুখের।  
যেমন মেজাজ মিইয়ে আসে পেলাস ভ'রে দেয় সে মদ  
এক লহমায় বদলে গিয়ে দূত হয়ে যাই দেবলোকের।

মউজ্জ চলুক! লেখার যা তা লিখল ভাগ্যে কালকে তোর  
ভুলেও কেহ পুছল না কি থাকতে পারে তোর ওজর!  
ভদ্রতারও অমুমতি কেউ নিল না, অমনি ব্যস  
ঠিকঠাক সব হয়ে গেল ভুপবি কেমন জীবন-তোর!

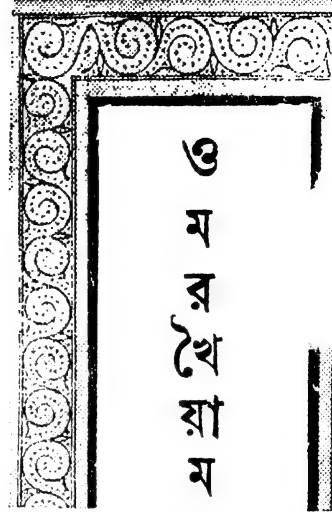
রার সোরাহি এই মানুষ, আত্মা শরাব তার ভিতর,  
ত তাতার বাঁশরী আর তেজ যেন সেই বাঁশীর স্বর।  
য়াম! তুই জানিস কি এই মাটির মানুষ  
কোন জিনিস?  
য়াল-খুশীর ফানুস এ ভাই, ভিতরে তার প্রদীপ কর।

মি চাহি—শ্রুতি আবার সৃজন করুন শ্রেষ্ঠতর  
ক'শ ভুবন এই এখনই, এই সে আমার আখির পর।  
ই সাথে চাই সৃষ্টিখাতায় দিক কেটে সে আমার নাম,  
ংবা আমার যা প্রয়োজন তা মিটাবার দিক সে বর।

আমার দয়ার পিয়ালা প্রভু উপচে পড়ুক আমার পর,  
তা ক্ষুধার অন্ন পেতে না যেন হয় পাততে কর।  
আমার মদে মস্ত কর, আমার 'আমি'র পাই সীমা,  
থে যেন শির না ছুখায়, হে ছুখ-হরণ অতঃপর।

র রে, তোর জলছে হৃদয় হয়ত নরকেই জ্বলি,  
হার বহি-মহোৎসবে হয়ত হবি অঞ্জলি।  
দায় দয়া শিখাতে যাস সেই সে তুই, কি হুঃসাহস!  
ই শিখাবার কে, তাঁহারে শিখাতে যাস কি বলি?

হাই! বৃণায় ফিরিয়ে না মুখ  
দেখে শরাব-খোর গৌয়ার,  
দেও সাধু সজ্জনেরই সঙ্গে কাটে কাল তোমার।  
গাব পিত্ত, কারণ শরাব পান কর আর না-ই কর,  
প্যে ধার্য থাকলে নরক যায় না পাওয়া স্বর্গ আর।



(অপ্রকাশিত)  
কাজী নজরুল ইসলাম

বহু ছিলেন।  
সের এ পদে  
দোলনে তিনি  
এ সালে তিনি  
Carr Tagore

গমনগরে চিনির  
হানে অপহ  
রকটে উদার  
ঠাকুর (পরে  
ডিরেক্টার  
হালোলনে  
ও  
হ

খ্যাতির মুকুট পরলে হেথায় নিন্দা-গানির পাঁক হা  
বলবে বড়যন্ত্রকারী রোস যদি পোরস্থানে।  
'খিজির' হও আর 'ইলিয়াস' হও;  
সব-সে-আচ্ছা এই ধরায়  
জানতে চাস নে কারেও তুই আর তোরেও  
কেহ না জানে।

শরাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে, সাকী, হেথায় এলাম ফের।  
ভোবা কর'ও পাইনে রেহাই হাত হ'তে  
ভাই এই পাপের।  
'নূহ' আর তাঁর প্লাবন-কথা শুনিয়ো নাকো আর, সাকী,  
তার চেয়ে মদ-প্লাবন এনে ডুবাও ব্যথা মোর বুকের।

যেমনি পাবি মণ ছুই মদ—যেখানে হোক যদিই পা'স  
অমনি পানোদ্যন্ত ওরে, সে মদপ্রোতে ডুবে যাস!  
যেমনি খাওয়া অমনি হ'বি আমার মত মুক্ত প্রাণ,  
ভেসে যাবে রাশ-ভারি তোর স্বাধির মত দাড়ি রাশ।

যতক্ষণ এ হাতের কাছে আছে অটেল লাল শরাব  
গেহুঁর রুটি, পরম পরম মটন চপ ও এই কাবাব,  
আর লালারুখ প্রিয়া আমার কুটীর-শয়ন-সজ্জিনী,  
কোথায় লাগে শাহান শাহের দৌলত এ বে-হিসাব।

বিড় মেঘে মগ্ন আছে মুখ তোমার,  
কয়ে পড়ে ভুবন-মোহন দীপ্তি তার ।  
কি মহিমার নিজের কাছেই, হে বিরাট,  
তুমি তোমার অভিনয় লীলার ।

মলা, উপনিবেশ আনন্দের,  
তাঁহার চেয়ে মহৎ চের ।  
যে যদি বাঁধতে পার একটি প্রাণ  
হরার চেয়েও অধিক পুণ্য এর ।

রাষ্ট্রনায়ে দেখে সে এক শেখজী কন—  
সুরার কর দাসীপণা সর্বখন ।  
যা মনে হয়, তাই আমি', কয় বারনারী,  
তুমি কি তাই,  
তোমায় দেখে কয় যা মন' ?

তোমায় আমায় গড়বে কুঁজো কুম্ভকার,  
প্রিয়া ! পার হবার সে আগেই মৃত্যু-  
খিড়কি-দ্বার—

পাত্রে ব্যথার শাস্তি ঢালো—এই সোরাহির লাল সুরা,  
এক পেয়ালা তুমি পিও, আমায় দিও পেয়ালা আর ।

রূপ-মাধুরীর মাথায় তোমার য'দিন পারলো প্রিয়া,  
তোমার প্রেমিক বঁধুর ব্যথা হরণ কর প্রেম দিয়া ।

রূপ-লাবণীর সম্ভার এই রইবে না সে চিরকাল,  
ফিরবে না আর তোমার কাছে যায় যদি বিদায় নিয়া ।

মুক্তিকা-লীন হবার আগে নিয়তির নিষ্ঠুর করে  
বেঁচে নে তুই, মৃত্যু-পাত্র আসছে রে ঐ তোর তরে ।  
হেথায় কিছু যোগাড় ক'রে নে রে,  
হোথায় কেউ সে নাই,  
তাদের তরে—শূণ্য হাতে যায় যাহারা সেই ঘরে ।

আঁধার অন্তরীক্ষে বুনে যখন রূপার পা'ড় প্রভাত  
পাখীর বিলাপ ধ্বনি কেন শুনি তখন অকস্মাৎ ?  
তারা যেন দেখতে বলে উজ্জল প্রাতের আশিতে—  
ছন্নছাড়া তোর জীবনের কাটল কেমন একটি রাত ।

আমার কাছে শোন উপদেশ—কাউকে কভু বলিস নে  
মিথ্যা ধরায় কাউকে প্রাণের বন্ধু মেনে চলিস নে ।  
দুঃখ-ব্যথায় টলিস নে, তুই, খুঁজিস নে তার প্রতিবেশ,  
চাসনে ব্যথার সমব্যথী, শির উচু রাখ, চলিস নে !

নাস্তিক আর কাফের বলি তোমরা লয়ে আমার নাম  
কুৎসা গ্রানির পক্ষিল শ্রোত বহাও হেথা অবিশ্রাম ।  
অস্বীকার তা করব না যা ভুল ক'বে যাই, কিন্তু ভাই,  
কুৎসিত এই গালি দিয়েই তোমরা যাবে স্বর্গধাম ?

### মুক্তির সাধনা

..... বন্দীদশা শুধু তো কারাগারটার মধ্যে নয়। মানুষের  
অধিকার সংরক্ষণ করাই তো বন্ধন। সম্মানের খর্বতার মতো  
কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষের সেই সামাজিক কারাগারকে  
আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেছি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি  
পাবো কি করে? যারা মুক্তি দেয়, তারাই তো মুক্ত হয়।

ভারতবর্ষ আজ মুক্তির সাধনায় জেগে উঠল। পণ কয়লাম,  
ত্রিদিন বিদেশী শাসনে মানুষকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর  
স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময়ে দেখিয়ে দিলেন, কোথায়  
আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহবরগুলো। আজ ভারতে যারা  
মুক্তিসাধনার তাপস, তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে,  
বাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেছি। যারা ছোট হয়ে ছিল,  
তারাই আজ বড়োকে করেছে অকুতর্ষ। তুচ্ছ বলে বাদের আমরা  
মেরেচি, তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মায় মারচে।

—ববীন্দ্রনাথ



# রবীন্দ্রায়ণ

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

৮খণ্ডেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পিতামহ দ্বারকানাথ

১২০১ সালে ১৭১৪ খৃঃ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম। নরেন্দ্রপুর শাহর নিবাসী রামতন্ত্র রাঘচৌধুরীর কন্যা নিগবতী দেবীর সহিত দ্বারকানাথের বিবাহ হয়। দ্বারকানাথের পাঁচ পুত্র : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্র ( ৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু ), গিরীন্দ্রনাথ ( ৩৫ বৎসরে মৃত্যু ), ভূপেন্দ্র ( ১৩ বৎসরে মৃত্যু ) ও নগেন্দ্রনাথ ( নিঃসন্তান, ২১ বৎসরে মৃত্যু )। ১৭৮৪ খৃঃ নীলমণি তৃতীয় অল্প বয়সে মৃত্যুর পরে পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীটের প্রাচীন বাস হইতে পৃথক হইয়া জোড়াসাঁকোর ( পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন ) বাস পত্তন করিয়াছিলেন এবং বাড়িতে সমাবেশে দুগোৎসব, গ্রামা, জগদ্ধাত্রী ও সবস্তুপূজার প্রবর্তন করেন এবং গৃহদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দন জিউর প্রতিষ্ঠা করেন। যে শালগ্রাম শিলা আজিও অবনীন্দ্রনাথের গৃহে পূজিত হইতেছেন। জোড়াসাঁকোর ( পরে ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন ) এই বাড়ীকে পারিবারিক চলতি কথায় 'বড়বাড়ী' বলা হয় এবং পার্শ্বস্থ যে বাড়ীতে দ্বারকানাথের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বাস করিতেন ও বাহা ৫ সংখ্যক ভবন, সম্ভ্রুতি বিকীত হইয়া গিয়াছে, বাহা দ্বারকানাথ নির্মাণ করান ও বাহা তাঁহার বৈঠকখানা বাড়ী ছিল, তাহাকে চলতি ব্যবহারে আত্মীয়রা 'বৈঠকখানা বাড়ী' বলিয়া অভিহিত করিতেন। মহর্ষি ও তাঁহার ভ্রাতা গিরীন্দ্র-পরিবারে এরূপ একান্ত ছিল যে স্বপ্নপ্রায়ঃ বিজ্ঞেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

ভাতে বধা সত্য হেম মাতে বধা বীর  
গুণজ্যোতি হরে বধা মনের তিমির  
নব শোভা ধরে বধা সোম আর রবি  
সেই দেব-নিকৈতন আলা করে কবি।

ইহার দার্শনিক বাখ্যা ছাড়াও অপর বাখ্যাটিতে পাই সহোদর সত্যেন্দ্র, হেমেন্দ্র, বীরেন্দ্র, জ্যোতিরেন্দ্র, সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্রের নামের সন্নিহিত ও পিতা দেবেন্দ্রনাথের নিকতনের উল্লেখের সহিত পিতৃব্য পুত্র গুণেন্দ্রেরও নামোল্লেখ।

দ্বারকানাথ স্বীয় বুদ্ধিবলে কর্ণজীবনে প্রবেশ করিয়া, ব্যাংক রিটালনায় ও বহুবিধ ব্যবসারে প্রভূত খনশালী হন ও তৎকালীন লিখাতার একজন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাবান নাগরিক ছিলেন। পিতৃব্য বাহা ও জর্জের দ্বারা নিকট তিনি আরবী ও ফারসী গাণ শিখা করেন এবং চিৎপুর বোডে শেরবাওর্গের স্কুলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি তাঁহার পিতৃব্য রামলাচন কর্তৃক দত্তক দীত হইয়াছিলেন এবং অল্পবয়সেই তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যু হয়।

যুগপুত্র রাজা রামমোহন রায় তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। দ্বারকানাথ লণ্ডন-এজেন্টের দেওয়ান ও পরে কাষ্টমসের ঐ পদে নিযুক্ত হন। সত্যীদাহ প্রথা বহিত করিবার আন্দোলনে তিনি রামমোহনকে সর্বাঙ্গ-করণে সমর্থন করেন। ১৮৩৪ সালে তিনি উপরোক্ত সরকারী দেওয়ানের পদ ত্যাগ করেন ও Carr Tagore & Co প্রতিষ্ঠা করিয়া রাণীগঞ্জে কয়লার খনি, রামনগরে চিনির কল ও শিলাইগুহে ও বঙ্গদেশের অপর কয়েক স্থানে অপর কয়েকটি ফ্যাক্টারি পরিচালনা করেন। তদ্ব্যতীত কয়েকটিতে তাঁহার স্থানান্তরিত হন তাঁহার বৈমাত্রেয় অল্প বয়সে মৃত্যুর পরে ( পরে মহারাজা )। দ্বারকানাথ ইউনিয়ন ব্যাংকেরও অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন ও উক্ত পদে ইচ্ছা দিয়া পরবর্তী ১১ বৎসর জন-আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায়, লংবালুজের স্বাধীনতার পক্ষে, ব্রাহ্ম স্যাক্টের বিরোধিতায় দ্বারকানাথের অবদান সামান্য নহে। তাঁহার বেলগাছিয়ার উত্তানে তৎকালীন জ্ঞানীশ্রীমতের তিনি প্রায়ই সঞ্চর্ন করিতেন। এই উত্তান পরে মহর্ষি Carr Tagore Co. উট্টিয়া বাগেরাতে বিক্রয় করিয়া দেন পাইকপাড়ার রাজাকে, বাহা এখনো তাঁহাদের কন্যারদের অধিকারে আছে। দ্বারকানাথ প্রথম ভারতীয় Justice of the Peace ও পরে এই পদ তাঁহার দুই ভাগিনের মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি জনকেই প্রাপ্ত হন। দ্বারকানাথ দুই বার বিলাত গিয়াছিলেন ও তথায় নানা প্রতিষ্ঠানাদিতে বক্তৃতা দান করায় ও দেশে অবস্থানকালে বহুজন নানা উৎসবদির অহুষ্ঠান করিতেন সেতুপ তথ্যও উৎসবদির অহুষ্ঠান করার তাহাকে সে দেশের অভিজ্ঞাত সমাজ "প্রিন্স" বা স্বরাজ বলিতেন। তিনি মহিমাষিত মদাদার সে দেশে অবস্থান করিতেন ও তদ্বৎ রাজা রাণী, ডিউকগণ ও তাঁহাদের পরিবারবৃন্দ প্রভৃতির সহিত এবং ইতালি, স্পেন প্রভৃতি দেশে অবস্থানকালে তথাকারও রাজা, রাণীদের সহিত একত্রে আহারাদিতে প্রায়ই মিলিত হইতেন। তাঁহার দুইবার ইয়োমোপ ব্যায়র একবার তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও একবার তাঁহার কনিষ্ঠ ভাগিনের চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। দ্বারকানাথ প্রথম বার ফিল্ড বান ১৮৪২এর জাহ্নসারিতে ও দ্বিতীয়বার বা শেষবার ১৮৪৫এর মার্চে এবং তথায় বৎসবাবিক কাল অবস্থান করিবার পর ১৮৪৬এর ১লা অগাস্ট ইংল্যান্ডেই দেহবন্ধ করেন।

### পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র ফলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১২৪০ সালের ফাল্গুন মাসে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে যশোহরের (পরে খুলনা জেলার) অন্তর্গত দক্ষিণডিহি গ্রামের রামনারায়ণ রায়-চৌধুরী কস্তা শাক্তবরী বা সারদা দেবীকে দেবেন্দ্রনাথ বিবাহ করেন। সারদা দেবীর ১২০২ সালে জন্ম ও ১২৮১ সালে লোকান্তর ঘটে। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক অমলিনকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ১১৩ পৃষ্ঠায় আছে যে মহর্ষি তাঁহার পত্নীবিয়োগ সন্থকে উল্লেখ করেন তাঁহার বিবাহকালে নববধূর বয়স ছয় বৎসর ছিল। অল্প বয়সে পরিণয় হইলেও বয়স সন্থকে কিছু ভুল আছে। আমরা মহর্ষিদেবের পিসুতুতো ভগিনী কালীদাসী দেবীর মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার প্রাত্যহিক তাঁহার সমবয়সী ছিলেন এবং তাঁহার নিজের বিবাহ মহর্ষির বিবাহের এক বৎসর পরে হয়, তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর। বিবাহ পূর্বস্ত তিনি তাঁহার মাতামহ রামমণি ঠাকুরের পরিবারভুক্ত হইয়া মহর্ষির সহিত এক বাড়িতে বাস করিতেন। স্তবরাং কবিজননীর বিবাহকালীন বয়স ছিল আট, মহর্ষির তখন সতের।

আমাদের প্রাপ্তিমাত্র মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের খরচের খাতাও ইহাও শোষকতা করে। তাঁহার সন্থকে উল্লেখ 'মহর্ষির আত্মজীবনীতে' আছে। মদনমোহন তাঁহার দ্বৈজ পিসীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তাঁহার অপেক্ষা বারো বৎসরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন। মদনমোহন নিজের উপার্জনের যে স্বল্প হিসাব রাখিতেন তাহাতে দেখা যায় লৌকিকতা হিসাবে মাতাঠাকুরাণী দেবেন্দ্রের বধূকে আশীর্বাদের বৌতুক দেন ২৪এ ফাল্গুন ১২৪০ ইং ১৮০৪ ও পরে ৫ই আশ্বিন ১২৪৫ সেপ্টেম্বর ১৮০৮ দেবেন্দ্রের বধূর সাধের জন্ত মিঠাই প্রেরণ করত হয়।

মহর্ষির প্রথম সন্তান কস্তার জন্ম ১৮০৮ খৃঃ (অকালে মৃত), প্রথম পুত্র দার্শনিক ও কবি বিজ্ঞেন্দ্রনাথ জন্ম বৃষাব ২৭এ চৈত্র ১২৪৬ ইং ৮ই এপ্রিল ১৮৪০, দ্বিতীয় পুত্র প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান লেখক সত্যেন্দ্রনাথ জন্ম ১৮৪২, তৃতীয় পুত্র ব্যারামবীর হেমেন্দ্রনাথ, তৎপরে জন্মগ্রহণ করেন অজ্ঞাত পুত্রকষ্টাগণ বীরেন্দ্র, সৌদামিনী, সঙ্গীত ও সাহিত্যশিল্পী জ্যোতিব্রজনাথ, স্নকুমারী, পুশোজ (অকালে মৃত), শরৎকুমারী, সাহিত্যসম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী, বর্ণকুমারী, সোমেন্দ্রনাথ (চিরকুমার), অষ্টমপুত্র রবীন্দ্রনাথ ও যুগেন্দ্রনাথ (অকালে মৃত)।

উপরোক্ত স্নকুমারী দেবীর সহিত হেমেন্দ্রনাথ যুগোপাধ্যায়ের বিবাহের অমৃতাচীর একটি ইংরাজি অনুবাদ চার্লস ডিকেনস্ সম্পাদিত "All The Year Round" পত্রিকায় ৫ই এপ্রিল ১৮৬২ তারিখে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক জগদলবিদ্যাসী ঠাকুর বংশের আত্মীয় ও শিল্পী অসিতকুমার হালদারের পিতামহ বাথালদাস হালদার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহাই এই পরিবারে প্রথম ব্রাহ্মমতে বিবাহ। মহর্ষি ইতিপূর্বেই আনন্দচন্দ্র বোশাবাঈশ্বর প্রমুখ চারিজন ব্রাহ্মকে কাশীতে পাঠাইয়া চারি বৎসে কৃতবিদ্য করিয়া আনেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের

আচার্যপদে বৃত্ত হন। মহর্ষি উপাসনায় বেদগান অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। সমাজে দেশীয় সংগীত-যন্ত্রের সহিত উপাসনাকালে বিষ্ণু চক্রবর্তীর গান হইত। ব্রাহ্মধর্ম দীক্ষা গ্রহণান্তে মহর্ষি প্রত্যয়ে সপরিবারে শয্যা ত্যাগ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পটবস্ত্রপরিহিত হইয়া দালানে একত্র হইতেন। মহর্ষি সঙ্গীত বেদীতে বসিতেন এবং পুরুষেরা এক পার্শ্বে ও মহিলারা অপর পার্শ্বে বসিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন। দৈনিক উপাসনায় মহর্ষির বৈদিকমন্ত্র প্রধান অবলম্বন ছিল। তৎপরে ব্রহ্মসংগীত গীত হইত। ব্রহ্ম সংগীত রচনা তিনি নিজে তো করিতেনই, বিজ্ঞেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথও রচনা করিতেন। পূর্বে প্রাচীনপন্থী ভারতীয় সংগীতবিদেরা হারমোনিয়ামকে স্ননজর দেখিতেন না। মহর্ষির নির্দেশে বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সংগীতে হারমোনিয়ামের সঙ্গত প্রচলন করিবার চেষ্টা করিয়া কথঞ্চিৎ সফলকাম হন। পরে প্রথম ভারতীয় উক্তর অক্ষ মিউজিক সংগীতনায়ক রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রমোদকুমারের ঐকান্তিক চেষ্টায় বাঙলা গানে হারমোনিয়াম (তখন হারমনি মুট বলা হইত) যন্ত্রের ব্যবহার বহুল প্রচার লাভ করে ও সাধারণে প্রচলিত হয়।

ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষায় গায়ত্রী মন্ত্র একমনে জপ ও ধ্যান-ধারণার সাহায্যে সাধনা করিতে মহর্ষি উপদেশ দিতেন। তাঁহার গায়ত্রীতে দৃঢ় বিশ্বাস ও অস্থা আজীবন ছিল। পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম ধর্মের বীজ চতুষ্টয়ও আবিষ্কৃত হয় ও তদ্বারা দীক্ষাপ্রথা চলিল। 'কৃত্রিম যন্তে দক্ষিণঃ সূর্যঃ, তেন মাং পাত্তি নিত্যং' মন্ত্র লইয়া প্রার্থনাস্বরূপ গঠিত হইতে লাগিল ও সব শেষে 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ' বলিয়া উপাসনা সমাপ্ত হইত।

উপাসকের মমত্ববাধাই তাহার রক্ষাকবচ। বিশ্বজননী জগৎ-মঙ্গলকারণ্য বতই ব্যাপৃত থাকুন না কেন, আমার তিনি ভিন্ন কেহ নাই।

দদাসি দুঃখম্ যদি কালী নিতাম্,

তাজ্জনি নাহং তব পাদপদ্মম্।

সন্তাড়িতাক্ষেচ্ছিন্দো জনতা,

অঙ্কঃ জনতা হি সমাপ্তেশ্বরীম্।

—মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

ভগবৎবিশ্বাস ছাড়াও মহর্ষির চারিত্রিক অসংখ্য গুণের মধ্যে একটির উল্লেখ এখানে করিতেছি—যাহাতে তাঁহার বিরাট হৃদয়ের ও মানসিক শক্তির পরিচয় মিলিবে। যদিও এ-ঘটনা অনেকেরই বিদিত তথাপি লিখিলাম। প্রাকৃত ঘনশালী পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর জ্ঞানী যায় যে তাঁহার শেষ জীবনে বিদেশে অবস্থান করায় দেশে ব্যবসায়িক আয়-আদায়ের চেষ্টা না হওয়ায় বহু টাকা ঋণ হয় ও তাহা শোধের পরিবারে অনেকে মহর্ষিকে সম্পত্তি বেনামী করিতে বলেন কিন্তু শেষবন্ধু চিত্তরঞ্জনর মতো মহর্ষি তাহা না করিয়া পাণ্ডনাদারদের বলেন যে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার পরিচালনাধীনে লইয়া বিক্রয় করা প্রয়োজন হইলে তাহা করিয়া মহর্ষিকে যেন পিতৃঋণমুক্ত করেন। তাঁহার এই মহাহৃদবতার পাণ্ডনাদারেরা মুগ্ধ হইয়া তাহা না করিয়া কিয়ৎংশ বিক্রয়ের প্রস্তাব করিয়া 'কিন্তুবন্দীতে ঋণ শোধ করিতে বলেন ও ধীরে ধীরে ঋণ শোধ হইয়া যায়।

১৮৫৬ হইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত একটা যুগসন্ধি। বাঙলাদেশে সমাজে এবং সাহিত্যে নানা পরিবর্তন দেখা যায়। ১৮৫৪ সালে লর্ড ড্যালহাউসির প্রস্তাবে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্তা (Lieutenant Governor) নিযুক্ত হইলেন। ইহাকে ছোটলাট এবং গভর্ণর জেনারেলকে সেই সময় হইতে বড়লাট বলা হইত। সার ফ্রেডরিক হাঙ্গিডে বাঙলার প্রথম ছোটলাট। ইহার পূর্বে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা সংক্রান্ত সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্য গভর্ণর জেনারেলের তত্ত্বাবধানে নিজস্ব বিভাগে সম্পাদিত হইত; একজন ডেপুটি গভর্ণর তাঁহার উপদেশ মতো তাঁহার কাৰ্যে সহায়তা করিতেন। ড্যালহাউসি দেখিলেন সর্ববিধ কার্য সুসম্পন্ন হইতেছে না। একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা যেভাবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া এই প্রদেশের শৃঙ্খলা ও সর্ববিধ উন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন তাহা অল্প-অবসর বড়লাটের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তিনি বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে এ বিষয়ে সমস্ত অবস্থা বিশদভাবে জানাইলেন। ফলে ১৮৫৩ সালে চাটারি রিনিউএর সময় তাঁহার প্রস্তাবিত ছোটলাট নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইল ও স্থির হইল যে তিনি স্বতন্ত্র ভাবে নিজের দায়িত্বে কাৰ্য করিতে পারিবেন, কেবল কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় বড়লাটের অনুমোদন-সাপেক্ষ রহিল।

সত্ত্ব বিধবার মৃত্যু নিবারণের জন্ত রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের আশ্রয় চেষ্টায় ১৮২১ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক আইন করিয়া সঙ্গীদগত প্রথা রহিত করেন। ইহার প্রায় ২০।২২ বর্ষ পরে বিধবার দুঃখময় জীবন দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিশেষ ব্যথিত করে। তিনি বিধবা বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ করিলেন ও ইহার সিদ্ধতা শাস্ত্রীয় বচনে প্রমাণ করিলেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ কয়েকজন দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। গোড়া সমাজের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও সরকার বিধবা বিবাহ আইন প্রচারে যোগ্য করিলেন যে হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ করিলে সে বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু তাহার পূর্ব স্বামীর সম্পত্তিতে কোনোরূপ দাবীদারী থাকিবে না। ১৮৫৬ সালে Hindu Widow Remarriage Act আইন প্রচারিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত দ্বিতীয় সমাজ সংস্কারের আন্দোলন বহুবিবাহ নিবারণ সন্ধে কোনোরূপ আইন করা সরকার আবশ্যক বোধ করিলেন না। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হওয়ার তাহা আপনা হইতে রহিত হইয়া গিয়াছে।

এই সময়ে কলিকাতায় স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন প্রস্তত হয় এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের (পরে কমিউনিসিটার), বাহাদের তখন নাম ছিল Justice of the Peace, শহরের সোমাস্তর্গত ভূসম্পত্তির উপরে অতিরিক্ত টাক্স বসাইবার ও সেই অর্থ স্বাধীন ভাবে ব্যয় করিয়া কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি, ডেনেজ, বিদ্যুৎ পানীয় জল ও আলোক প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার অধিকার দেওয়া হইল। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির কার্য ছোটলাটের কর্তৃত্বাধীনে রহিল এবং ১৮৫৬ সালে কতিপয় আইনের দ্বারা তিন জন বৈতনিক কমিশনার ও একজন চেয়ারম্যান লইয়া একটি মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠিত হয়।

তাঁহাদের কর্পোরেশন আখ্যা দিয়া তাঁহাদের হস্তে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সকল টাকা ও নগর সংক্রান্ত সর্ববিধ কার্যের ভার সরকার হস্তান্তরিত করেন। ১৮৫১ সালে কলিকাতায় খোলা নদমার পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ পাইপের দ্বারা ডেন প্রস্তুত আরম্ভ হয় ও তাহা সম্পূর্ণ করিতে ১৬ বৎসর লাগে। বহুবর্ষ পরে নিরাপদে লোক চলাচলের জন্ত পাদপথ বা ফুটপাথ নির্মিত হয় এবং ইহারও ব্যবস্থার স্তত্রপাত এই সময়েই।

১৮৬০ সালে বাঙলাদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাবিরোধে ঘটায় নীল সন্ধে সর্ববিষয়ে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করিবার জন্ত এক কমিশন বসে ও ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী আইনের দ্বারা নীলকরদের সম্বত করিবার চেষ্টা হয়। চাট্রপ্রজার অবস্থার উন্নতির জন্ত উপদেশ ও বিধি-ব্যবস্থা সম্বলিত চাট্রপ্রজার অধিকারপত্র বা Charter ঘোষিত হয় ও তদনুযায়ী কার্য শুরু হইল। এই প্রজাবিরোধি জমিদারের অনেক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া দিল। এই বৎসরেই দেশের জনসাধারণের জন্ত নিয়মিত শিক্ষার বিস্তারের ভার সরকার হাতে লইলেন। এই সন্ধের ডেসপ্যাটকে শিক্ষা বিষয়ে অধিকারপত্র বা চার্টার বলা হইত। এই ডেসপ্যাট অনুসারে সরকারের তত্ত্বাবধানে দেশে নিয়মিত প্রাইমারি শিক্ষার জন্ত নরম্যাল স্কুল স্থাপিত হইল এবং বঙ্গভাষা শিক্ষার জন্ত ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষা ও পরীক্ষান্তে অভিজ্ঞানপত্র বা সার্টিফিকেট দিবার ব্যবস্থা হইল। ইহার অঙ্গনি পরেই উক্ত প্রাইমারি বা মাইনার পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। এই সময়েই ডাক-ব্যবস্থার সুশৃঙ্খলার জন্ত মূলভ মূল্যে ডাকটিকিটের ও পোষ্টকার্ডের প্রচলন আরম্ভ। ইহার পূর্বে বিভিন্ন প্রদেশের দূরত্ব অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ডাকখরচা সরকারে জমা দিলে চিঠিপত্র সরকারী ডাকে প্রেরিত হইত। এখন নিয়ম হইল যে বিলাতের দূরত্ব একই মূল্যের ডাকটিকিটে ভারতে সর্বত্র পত্রাদি প্রেরিত হইবে। প্রেরিত পত্রের ওজনের উপরে ডাকটিকিটের মূল্যের তারতম্যের ব্যবস্থা হইল। দূরত্ব তখন আর গণ্যের মধ্যে থাকিল না। এই ব্যয় নির্বাহের জন্ত জমিদারদের উপর ডাক-খাজনা (Cess) বসান হইল।

১৮৬০ সালে সকল ভারতীয় প্রজাকে একই দণ্ডবিধির অধীন করিবার জন্ত অপরাধের শ্রেণীবিভাগ ও দণ্ডের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি-আইন (Indian Penal Code) বিধিবদ্ধ হইল। একদিকে দণ্ডবিধির দ্বারা যেমন প্রজার শাস্তিবিধান হইল, অপরদিকে তেমন ভারতীয় প্রজাকে সম্মানের দ্বারা পুরস্কৃত করিবার জন্ত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অম্মত্যানুসারে ১৮৬১ সালে ভারত-নক্ষত্র (Star of India) অর্ডারের উপাধির সৃষ্টি হইল। মহারাণী রাজ্যভার গ্রহণের পর এই ভাবে হুটের দমন ও শিষ্টের পালনের ব্যবস্থা করিলেন এবং পরে ভারতীয়রা উপরোক্ত অর্ডারের ও অস্ত্রান্ত পুরাতন ব্রিটিশ অর্ডারের উপাধিতে ও আরো পরে পুরাতন নাইট ব্যাচিলার উপাধি-ভ্রংশে বিভূষিত হইতে লাগিলেন। আর বংশাধিকৃত নাইট বা ব্যারনেট উপাধি প্রথম লাভ করিলেন বোম্বাইয়ের এক দানবীর কোটিপতি ব্যবসায়ী বাহা অনেক পরে আরো একজন বোম্বাইয়েরই কোটিপতি ব্যবসায়ী লাভ করেন।

প্রাদেশিক স্থানীয় কার্য সুনির্বাহের জন্ত ও প্রেতি প্রদেশের উপযোগী স্বতন্ত্র আইন-পরিষদ গঠন করিবার ব্যবস্থার কালে প্রথম

বক্সীর ব্যবস্থাপক সভা ১৮৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রমাক্রান্ত রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজনকে উক্ত সভার সভ্য মনোনীত করা হয়। উপরোক্ত ঠাকুর অফ ইন্ডিয়া অর্ডারের Companion শ্রেণীর উপাধিতে বাঁহারা প্রথম ভূষিত হইয়াছিলেন প্রসন্নকুমার ও রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। রাধাকান্ত পরে উক্ত অর্ডারের নাইট কমান্ডার শ্রেণীতে প্রথম ভারতবাসী উন্নীত হন।

কলিকাতার লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত পানীয় জলের অভাব দিন দিন বাড়িতেছিল। পুষ্করিণী ও খারাপ কূপের অস্বাস্থ্যকর জল সাধারণ লোকে পানাদি সকল কার্যেই ব্যবহার করিত; বিতশালী সম্প্রদায় প্রতি বৎসর মাঘ মাসে গঙ্গাজল সংগ্রহ করিয়া নির্মাল্যাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া এক বৎসরের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। দারকানাথের সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে এই ব্যবস্থাই ছিল। কলিকাতা সহরে শোধিত জল (Filtered water) বাহাতে সহজপ্রাপ্য হয় তাহার জন্য ১৮৬১ সালে আলোচন আরম্ভ হয়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ ১৮৬৩ সালে এই বিষয়ে মনোবোশী হইলেন। তাঁহাদের ইঞ্জিনিয়ার কাম্পুয়ের সমুদয় গলা হইতে নলদ্বারা কলিকাতায় জল আনাইবার প্রস্তাব করিলেন। গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে ইহাতে আশঙ্কি হইল। তাঁহার বলেন যে কলিকাতার সন্নিকটস্থ প্রদেশের জল পরীক্ষার অন্তত দোষবীর দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের মতে ব্যারাকপুরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরস্থ কোনো স্থান হইতে জল লওয়া উচিত হইবে না। তখন ব্যারাকপুরের এক ফ্রেস উত্তরে পলতার গঙ্গাজল সঞ্চয় করিয়া শোধন করিবার জন্য কয়েকটি শোধন পুষ্করিণী (Filters and Reservoirs) প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেইখান হইতে পাইপের দ্বারা কলিকাতায় জল সরবরাহের প্রস্তাব হয়। এই পলতার অপর পারে গঙ্গার পশ্চিমকূলে পলতা ঘাট, গোবিন্দ গ্রামের অন্তর্গত। ব্রীটেন্সের জয়শালীন এইস্থানে অবস্থান ভুক্ত এই স্থানটি গৌরহাটি প্রাচীন আখ্যা পায়, অপভ্রংশে গোবিন্দ বলিয়া পরিচিত। ইহার সন্নিকটে চাঁপনানীতে (একশ্রেণে বৈষ্ণবী বেল টেশন ও মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার) ভাগীরথীতীরে একটি স্নানের ঘাট আছে। তাহা তারকেশ্বর তীর্থযাত্রীদের নিকট নিমাইতীর্থের ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ ও তথ্যর স্মারক বৈষ্ণব তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। এই ঘাটের উত্তরে কিয়দূরে আত্মকানন ঘেরা একটি স্নানর বাগান-বাড়ী ১১-২ সাল অবধি ছিল। ইহাকে পলতার বাগান বলিত, এক্ষণে ড্যানল্যান্ডসি ও স্যান্ডার্স জুট মিলে রূপান্তরিত। ইহা পূর্বে ঠাকুর-বাবুদের গোবিন্দ বা পলতার বাগান বলিয়া তাঁহাদের পরিবারে উল্লিখিত হইত। 'মহর্ষির আত্মজীবনীতে' এখানে ২৩ বার নবমীতে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের উজান-মিলনের প্রসঙ্গে বাগানবাড়ীটি উল্লিখিত। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে' যে তাঁহার শ্রুতভৃত্যতাই খোলাপ্রাণ হাতোজ্ঞস সৌখীন 'গুণানার' (অবনীন্দ্র-জনক গুণেন্দ্রনাথ) উল্লেখ আছে, তাঁহার অকাল মৃত্যু (১৮৮১) তাঁহার এই সাধের বাগানে হইয়াছিল। ১৮৮৫ সালে ছোটলাট পলতা হইতে পানীয় জল সরবরাহের প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। ১৮৮৬ সালে কলিকাতার অজ্ঞাত বাড়ীর ভাড়া দেবেশ-পরিবারবর্গ তাঁহাদের

বাড়ীর দোতলায় ও তেতলায় কলের জলের ব্যবহারে আনন্দিত ও পরিতুষ্ট হইতে লাগিলেন। ভাই গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার কলের জলে বৌত নাগরিক কবি। পত্নীর সহিত বনিষ্ট পরিচার যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করিয়াছেন তাহা পরবর্তী-কালের ও তাহা তাঁহার ঘোষণা। এই নদী-মাতৃক দেশে নৌকাদ্রম্যে রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সহিত অন্তরঙ্গতা স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। পরবর্তীকালে উদ্ভিত শব্দে চটোপাধ্যায় প্রমুখ নব্য সাহিত্যিকদের পক্ষে গ্রাম্যজীবন হইতে বনিষ্টভাবে অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যরচনার উপাদান আহরণ করা গ্রামের লোক বলিয়া সহজ হইয়াছে।

১৮৪০ সাল হইতে যে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-কল্পনা চলিতেছিল, ১৮৫৭ সালে তাহা কার্যে পরিণত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও বহুনাথ বসু এন্টাল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। পরে বঙ্কিমচন্দ্র ও বহুনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হন, বাহা সর্বজনবিস্মিত। পরে কবি হেমচন্দ্র ও কৃষ্ণকমল আইন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া একজন উকিল ও অপর জন অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ভারতীয়দের জ্ঞানচর্চার সুযোগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মনিয়োগের প্রসারবুদ্ধিকল্পে নানারূপ ব্যবস্থা তৎকালীন বিলাতি পার্লামেন্ট হইতেও কিছু কিছু করা হইত। ভারতকে কেবল অর্থশোষণের বস্তুরূপে ব্যবহার করিতে তখনকার কয়েক জন ইংরাজপ্রধানের অভিপ্রায়ে বাধিত। তাঁহার বলিতেন, ভারতীয়দের জ্ঞান ও জাগতিক ব্যবহারের সুশৃঙ্খল যদি সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে তাহা ঘোরতর লজ্জার কথা। এই কারণে ১৮৫০ সালের চার্টার রিনিউএর সময় স্থির হইয়াছিল যে, ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত আবশ্যক। এই চার্টারেই ব্যবস্থা হয় যে, ভারতীয়েরা বিলাতে গিয়া সিলিস সাভিস পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার ভারতের বিচার বিভাগে ও প্রাদেশিক শাসন বিভাগে ইংরাজ কর্মচারীদের সহিত সমভাবে নিযুক্ত হইবেন। এই সময়েই ইন্ডোলি অর্থাৎ আইনের কর্তৃমণ্ডলী ভারতীয়দের বিলাতে আইন অধ্যয়ন করিয়া ব্যারিষ্টার হইবার অধিকার ঘোষণা করেন। ফলে প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার হইলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন। তিনি হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র পরীক্ষায় ১৮৪১ সালে বৃত্তি পাইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া বিলাত যান ও ব্যারিষ্টার হইয়া কিরিয়া আসিয়া যেতা: ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলা দেবীকে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়া পুনরায় বিলাত যান। তথ্যর তিনি আইন ব্যবসারে আত্মনিয়োগ করেন ও পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু আইনের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। বিলাতে 'বৈষ্ণবানা' নামীয় নিজের বাড়ীতে তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাস করেন। তাঁহার প্রথম পক্ষে হিন্দু মতে বিবাহিতা পত্নী বালানন্দরী দেবী ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের একমাত্র পুত্র প্রহলাদকুমার অকাল পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সিলিস সাভিস পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম ভারতীয়দের রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণনগরের দেওয়ান বামলোচন ঘোষের পুত্র ব্যারিষ্টার মনোমোহন ১৮৬০ সালে বিলাত যাত্রা করেন ও

তথায় জ্ঞানেন্দ্রমোহনের তথ্যবাহানে ছিলেন। সত্যেন্দ্র ১৮৯৭ সালে বৃত্তি পাইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতে দুই বৎসর ইয়োরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ১৮৯৪ সালে প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ানরূপে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মাইকেল মধুসূদন তখন বিলাতে। তিনি নিরুদ্বিগ্ন চতুঃশপদী কবিতায় সত্যেন্দ্রকে অভিনন্দিত করিলেন। বাঙলা কবিতায় সনেটের প্রবর্তন এবং সনেটের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে অভিনন্দন উভয়ই মধুসূদনের অবিনশ্বর কীর্তি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরপুরে সশরীরে শ্রবকুলপতি

অজুন, স্বকাজ স্বাধা সাধি পূণ্যবলে

কিরিলা কাননবাসে; তুমি হে তেমতি

বাও স্বখে ফিরি এবে ভারত মণ্ডলে,

মনোজ্ঞান আশালতা তব কলবতী!—

ধ্বজ ভাগ্য, হে সুভাগ, তব ভবৎসলে!—

শুভকণ্ঠে গর্তে তোরা ধরিলা যে সতী,

তিতিবেন বিনি, বৎস নয়নের জলে

(স্নেহাসার!) হবে রক্তে বাসুকণ ধরি

জননব, দূর বঙ্গ বহিবে সখ্যে

এ তোমার কীর্তিবাহী। বাও দ্রুতে, তব,

নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে।

অদৃশ রক্ষার্থে সঙ্গে বাবেন শুল্করী

বঙ্গলক্ষী। বাও, কবি আশীর্বাদ করে।—

মনোমোহন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াও নির্দিষ্ট বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যারিষ্টার হইয়া কিরিলেন।

[কমণ:]

## জ্বর

কৃষ্ণ ধর

কালি সারা রাত ভীষণ জ্বরে আমার শরীর পুড়েছে,  
উত্তাপে আমার দেহ অবশ, স্তব্ধ মৌমাছির মতো  
নেশায় হুঁদ। সারা রাত ধরে জ্বরের মোচাকের  
কোষে কোষে কারা যেন বেদনার মধু রেখে গেছে,  
আর আমি সে বাধায় বার বার শিউরে উঠছি।  
জানালার ধারে বাতাবী লেবুর গাছে বৌবনবতী  
নারীর স্তনের মতো ছুটো লেবু সারারাত  
জ্যোৎস্নার খেলছে। আমি যতাবার তাকিয়েছি  
হাওয়া এসে পাতায় আড়াল দিয়ে তার লজ্জা  
দিয়েছে ঢেকে। দূরে কৃষ্ণচূড়ার ডালে  
ধলো ধলো আগুনের ফুলকি। আমি আর  
তাকাতে পারি না। আমার কেমন জ্বনি ভয় করে।  
এই ডাক-বাংলোর একা একা ভীষণ জ্বরে  
ধুঁকে ধুঁকে কেমন জ্বনি ভীত চকিত হ'য়ে গেছি,  
শর-বৈধা হরিশের মতো।

ভোর তখনও হয়নি। ঝিঝ ঝিঝ হাওয়া

শিরীষ গাছে বৃষ্টির বাজিয়ে চলে গেল।

বরক-গলা পাহাড়ী নদীর স্রোতের মতো ঠাণ্ডা

এক বলক হাওয়া এসে আমার জানালার দাঁড়াল।

আমার উত্তাপ গেল কমে। আমি চোখ বুজলাম।

সারারাত্রি জ্বরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে এবার

যেন আমার স্তব্ধ মৌমাছির মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার মনে হল:

নিচে ঢালু জমি পেরিয়ে সেই সবুজ উপত্যকার

মতো জায়গাটার উজ্জ্বল জলে পা ডুবিয়ে যেন

আমি গিয়ে বসেছি। আমার পাশে এসে

বসল কমলালেবুর মতো মুখ সেই খাসিয়া

মেয়েটি বাকে আমি কোথায় দেখেছি

এখন আর মনে পড়ছে না।

আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না,  
কমলালেবুর মতো মুখ এই মেয়েটাকে।  
ভুট্টার দানার মতো তার ছোট গোল গোল  
দাঁতের পাটি; কী আশ্চর্য ভঙ্গিতে ও হাসছিল  
আর আমার সারা গায়ে দিচ্ছিল উজ্জ্বল জল।  
আমি ওর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন  
বিহ্বল হয়ে গেলাম।

ও এতো কাছ, তবু ছুঁতে পারি না।

মনে হয় ও হেসে একটা পুশির স্বর্ণার মতো

ঢলে পড়ল আমার গায়। দমকা হাওয়া

আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

আমি সখ্যের মতো ওর দিকে তাকাই,

ও ব্যাধিনীর মতো চোখের শায়কে আমাকে

ঝিঝে ঘুরে পাড়িয়ে থাকে।

উজ্জ্বল জলে কতোক্ষণ এমন স্নান করছি

মনে নেই। জলের কোঁটা গায়ে পড়তেই

আমার ঘুম ভাঙ্গল।

ভোরের দিকে জ্বর এক পলশা বৃষ্টি।

তার কোঁটাগুলো গোল বুকের মতো দানা

বঁধে আছে বাতাবী লেবু ছোটো গায়।

এখনি নাহারকাটিয়ার আকাশে সূর্য উঠবে।

আর শিরীষগাছের পাতায় আটকানো ভোর

বেলাকার বৃষ্টির কোঁটায় এই নিঃসঙ্গ নৈশবেদর

জগৎ প্রতিনিবন্ধিত হবে।

আর আমি দক্ষিণ নায়কের মতো,

আমার তাপদগ্ধ স্তব্ধ নিয়ে,

এই শব্দ গন্ধ আর চেতনার জগৎকে

ভালবাসবা নতুন করে, নারীর প্রেমে, বৌবনের জাহ্নুতে

আর কৃষ্ণচূড়ার লাল নিমন্ত্রণে।

# সোবিয়তের দেশে দেশে

মনোজ বসু

২৬

শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে—কেউ বিটু কেউ নই—কিঞ্চিৎ  
বাগাবাগি আছে আমার। শিকিনের শান্তি-সম্মেলনে  
খানিকটা তড়প এসেছিলাম। সম্মেলনের শান্তি-অফিসে এই অবাদে দু’  
মেয়ে এলে কেমন হয়? ইচ্ছা মাঝেই গাড়িতে পুরে পলকের মধ্যে  
তথায় হাজির করে দিল। সঙ্গে কুকুম্বামী—আমার শিকিনের  
সহযাত্রী, সিনেমার মাস্টার। শান্তির করে বসালেন ঠরা। প্রশ্ন :  
শান্তির কাজ কর্ম কেমন খারা চলছে ভারতে? এবং উত্তর নিজেরাই  
দিলে : নেহরুর দেশ, বিশ্ব শান্তির আদর্শ তোমাদের—আন্দোলন  
খুব জোরদার নিশ্চয় ওখানে। আমরা জোরে জোরে বাড় নাড়ি :  
হী হী—অত্র সম্মেলন নাশি।

পলিতকেশা এক বৃদ্ধা ঠাহর করে করে দেখছেন। কীপ দৃষ্টি  
নিরে লোকে যেমন পুঁথি পড়ে। হঠাৎ উঠে গিয়ে তাকে উপর  
থেকে লম্বা-চওড়া এক বই নামিয়ে ফসকস করে অনেকগুলো পাতা  
উটালেন। তার পরে মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বাস—  
ব্যাপার জানি। বইটার চেহারায় মালুম হয়েছে—শিকিন  
শান্তি সম্মেলনের বুলেটিন। চার ভাষার আছে—ওটা হল রুশ।  
আমার কাছে আছে ইংরেজি। আর বানিয়েছে চীনা স্প্যানিশে।  
অন্যকে ও তুলে দিয়েছিল সেই আসরে। ছবি নিয়েছিল বড়তার  
সময়—ঐ কতোবে ছবি সহ বড়তা ছাপা হয়ে আছে। ছবি তো  
সব বজারই রয়েছে—দুশ দেখুন তা হলে বুড়োমাস্ত্রের  
আঁহা-মরি প্রাণকাজ চেহারায় নয় যে এক নজরে ছবি দেখে অমনি  
হিসায় লাগ কেটে রয়েছে। অথচ বই খুঁজে খুঁজে ছবির সঙ্গে  
মিলিয়ে নাম বাতলে তবে ছাড়লেন।

শরীর বেজুত লাগছে, হুপুং থেকে শুয়ে পড়ে আছি। হীরেন  
মুখুজ্জ মশার বললেন, সে হয় না, সাহিত্য নিয়ে যাদের নাড়াচাড়া  
তারা তো বাবোই। হিন্দির ব্যাপার বধন, যে ক’জন বাঙালি  
আছি সকলেরই বাওয়া উচিত।

হিন্দি সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকাশ গুপ্ত  
বলছেন—ভোক্সের ডাকে এসেছি, ভোক্স হল সাংস্কৃতিক  
প্রতিষ্ঠান, ভারত সোবিয়তের জানাশোনা ও ভালবাসা আরও ঘনিষ্ঠ  
হবে এই আশায় ডেকে এনে এত শান্তির বন্ধ ও ধরচণ্ড করছেন,  
এসেছি বধন বার যেটুকু বিত্তে, জাহির করে যেতে হবে। আমাদের  
আছে কাল বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধ—আমার ও হীরেন মুখুজ্জ মশায়ের।  
এবং জীমতা মদন বলছেন পাঞ্জাবি রূপকথা সম্বন্ধে। প্রকাশ গুপ্ত  
হলেন এলাহাবাদ দ্বানিভাসিটির অধ্যাপক। মাষ্টার মাস্টার, বলার  
অভাসতো থাকবেই—কিন্তু পরমার্শ্ব ব্যাপার, ভিত্তি এবং চাকরি  
প্রাপ্তির পবেও পড়াশুনা ভয়লোক রীতিমতো বজায় রেখেছেন।

তা নিয়ে লাভ হল অনেক, সত্যি বলছি। আনাড়ি মাস্টার  
অনেক কিছু শিখে নিলাম ঘটানোর মতো। রুশ শ্রোতারও  
শতকণ্ঠে তারিফ করলেন। আমাদের নিয়ে প্রথম এই গুণী-জানীর  
আসর। ক্রীশ্ণ দলের বোল আনা মান রেখেছেন।

পরের সকালে রেডিও অফিসে আমাদের ক’জনকে ডেকেছে।  
সোবিয়তে এত দিন যোরাঘুরি হল, কেমন লাগল বলে যান এইবার।  
মুখের কথা বেকর্ড করে নিচ্ছে, সময় মতো পরে শোনাবে। প্রশ্ন  
করছেন বিনয়, আমরা ভাবব দিচ্ছি। তার পরে কিছু আলোচনা  
সকলে মিলে। আমার আবার আলোচনা একটু কাজ—গল্প বেকর্ড  
করা। বিনয় চারটে গল্প পছন্দ করে দিয়েছেন, সেগুলো পড়তে  
হবে। আজকে বন্ধুর হয় হোক, বা বাকি থাকে কাল-পরন্তু দেখা  
যাবে।

বাইশ-চব্বিশ বছরের এক তরুণীকে দেখছি, কাজে নিমগ্ন।  
আঁড়চোখে চায় এক একবার, মিটিমিটি হাসে। বিনয় পরিচয়  
করিয়ে দেন : ভাল্লা ইসোরবোভা—রেডিও বাংলা বিভাগের মেয়ে,  
বালা বাংলা শিখেছে।

ভাল্লা রাডা হয়ে ওঠে লজ্জায় : না না, বাংলা আমি কিছু  
জানি না।

লাজুক ভাব বাংলা লাগে ওদেশের মেয়ের মুখে। খুনসুটি করি,  
নানা কথা জিজ্ঞাসা করি বাংলায়—কেমন ভাবব দেয় দেখি। বাড়  
নিচু করে দুটো-একটা কথা বলে, আর হাসে। আর বলে, বাংলা  
আমি একেবারে জানি না।

বরিস কাপুশ্বিন—সুপ্রী এক বুবা রেডিওর ঐ বাংলা বিভাগে  
অনুবাদের কাজ করে। ভাল্লা বাংলা হরফে নাম লিখল আমার  
খাতায়, বরিসও লিখল। গল্পে গল্পে আমাদের খিয়েটার-জগন্তের  
মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথা উঠল। সে আমলে ভারতীয়  
গণনাট্যের এক প্রধান গুণী বিনয়; আর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছিলেন  
দলের সভাপতি। মস্তোয় বেড়ানোর সময় এক সাহেব ছেলে হঠাৎ  
এসে তাঁকে বলল। আপনাকে রাহু ডাকিতে ইচ্ছা করি। মহর্ষি  
হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। বিনয়কে শুধাই, কে ছেলেটি খবর রাখেন  
কিছু? আছে সে এখন মস্তোয়!

বরিস বলে, আমি তো সেই।

আবিষ্কার রীতিমতো। দেশে গিয়ে বলা বাবে, মহর্ষির নাস্তিকে  
দেখছি।

ভাল্লাকে বললাম, আমার বাংলা দেশের পাড়ারগায়ে লাজুক মেয়ে  
দেখে থাকি। অবিকল তোমারই মতো।

ভাল্লা চুপি চুপি বলে, আপনি দাদা, আমি বোন আপনার।

ভাই পেয়েছি রাহুতাকে, বোনও এই পেয়ে গেলাম। দেশে

ফেরবার ১টা দিন আগে। আমার শিষ্ট শাস্ত্র সঙ্গী বোনই বটে।  
এ এক সকাল বেলা দেখে এলাম, আলাপ পরিচয় হল। মন্ডোর  
তাকে আর পাই নি। আর কোনদিন দেখব না জীবনে। কিন্তু  
সুব্রহ্মণ্যসিনী তার লজ্জানন্ত হাসিভরা মুখ নিয়ে চিরকাল আমার  
আপনজন হয়ে রইল।

ভগ্নবৃত্ত এসে উপস্থিত। তত করে গাড়ি ছুটিয়ে এসেছে মন্ডোর  
রাজপথে। সেটা চোখে দেখিনি বটে, কিন্তু তটো-তিনটে সিঁড়ি দুপথাপ  
একসঙ্গে টপকানো দেখে বরফ বোঝা যায়। এসে অবধি চোঁটা করছি,  
নিজ গোষ্ঠীর ভিতর বসে ছোটো সুখ-ভয়ের কথা কইব, সেই সূচিন বহু  
সমাগত। যুনিয়ান অব রাইটার নামে জোয়ালো সমিতি—  
মন্ডোর লেখককুল এখানে যোলাকাতের জন্ত বসে আছেন। চলুন,  
চলুন—

কী মুশকিল, আগে একটু খবরাখবর দেয়! ওঠ ছুঁড়ি তোঁর  
বিরে, একেমন কথা?

আগে থেকেই নাকি ব্যবস্থা, কালকেই খবর দেবার কথা।  
কিন্তু যার উপরে তার ইত্যাদি ইত্যাদি।

একতলা বাড়ি, মস্ত বড় কম্পাউণ্ড। লেখক মশায়রা গাড়ি  
চোপে আসছেন, গাড়িতে বেরুচ্ছেন। পঁচিশ-ত্রিশটা গাড়ি সর্বস্বপ  
উঠানে। সমিতির কতগুলো ঘর আর কত বরফের বিভাগ, গণে  
পারবেন না।

এক ঘরে নিয়ে গেল। লম্বা টেবিল ঘিরে বসেছি—আমাদের  
তরফের এবং ঐ তরফের। অনেক লেখক পলিতকেশ অশ্রুতিপূর  
একজন বীরেন্দ্রনাথের কথা তুললেন। বীরেন্দ্রনাথ রাশিয়ান গেলেন,  
বিপ্লবের ধমক তখনো কাটেনি। নানান অভাব-অসুবিধা, খাবার  
দাবার পাওয়া যায় না। কিন্তু মুশকিল কাটিয়ে উঠবার জন্ত  
প্রাণপণ চোঁটা চলেছে। বীরেন্দ্রনাথকে রাখা হয়েছে শহরতলীর এক  
বাড়ি। লোকজনের কামেলা কম, নিরিবিলি আছেন।

সেই লেখক বলতে লাগলেন, বিপ্লবের আগেও তাঁর কবিতায়  
অনুবাদ হয়েছিল এদেশে, আমরা তাঁর নাম জানতাম, লেখাও  
পড়েছি। একদিনের কথা মনে পড়ে। পনেরজন লেখক মোটমাট  
বসেছি একসঙ্গে। টেগোর প্রাস্তদেশে। বাতায়ন দেখছি ঠাক,  
দেখে দেখে আশ মেটে না। মনে হল প্রফেট। তাঁর মুখ দাড়ি  
পোশাক সব মিলিয়ে অপরূপ মনে হচ্ছিল। মৃদুস্বরে কথা বলছেন।  
সব চোরে আশ্রয় সঙ্গীতের মতো সেই কণ্ঠ। দু ঘণ্টা ধরে চলল।  
আমাদের ভয় হচ্ছে, স্নান হয়ে পড়বেন তিনি। কিছু না। মন্ডো  
তখন বড় একটা গ্রামের মতো। এই বৃহৎ দেশের এইটুকু রাজধানী  
—তিনি কিন্তু হতাপ হননি। মন্ডোব লোকের খুব প্রশংসা করতেন।  
গেলিনগ্রাভে বাবার কথা, কিন্তু শরীরের জন্ত ঘটে উঠল না।

ভারি এক মজা হল সেই সময়। বৃহৎ বলতে বলতে হেসে  
উঠলেন। কেমন করে বটে গেছে, গির্জার পাদরিকে লুকিয়ে রেখেছি  
ঐ বাড়িতে। টেগোরের দাড়ি ও লম্বা পোশাক দেখে ভেবেছে ঐ  
বরফ। বিপ্লবের বেশ আছে তখনো, পাদরি-পুকুতের উপর লোকের  
বাগ। বড়লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুরানো ব্যবস্থা কিরিয়ে  
আবার চোঁটায় ছিল তারা। একদিন হামলা দিয়ে এসে পড়ল।  
আমরা বোঝাই, মস্ত বড় কবি—ভারত থেকে এসেছেন, মহামায়া  
অতিথি। তখন বাল, দেখতে দাঁও আমাদের ভাল করে। টেগোর

উপরের বারান্দায় এলেন। সকাল বেলা, রোদে চারিদিক ভরে গেছে,  
তারি মধ্যে ঐ স্তম্ভ সৌম্য দীপ্ত রেখ এসে পাড়ালেন। বৃহৎ জনতার  
জয়ধ্বনি উঠল। তখন আমার ঐ এক উপসর্গ—রোজ এসে ভিড়  
করে: টেগোরকে দেখব। কবি বারান্দার বেরিয়ে আসেন, দেখে  
পরিতপ্ত হয়ে মানুষ কিরে যায়।

‘রাশিয়ান চিঠির’ কথা তুললাম আমি। সেই আশা সার্থক  
হয়েছিল। কী আশ্চর্য স্মরণ ভাবে এই দেশ ও আপনাদের কথা  
লিখে গেছেন! বইটার ইংরেজি অনুবাদ হয়েছিল, কিন্তু তখনতে পাই  
বিলান্তে প্রচার বন্ধ। আপনাদের রাশিয়ান অনুবাদ নেই?

তাঁরা প্রায় আকাশ থেকে পড়েন: না—নেই তো সে বইয়ের  
অনুবাদ। পড়ি নি আমরা।

আমার কাছে আছে এক কপি। আমার নিজের কয়েকটা  
বই আপনাদের জন্ত এনছি, সেই সঙ্গে ওটাও দিয়ে যাব।

নিশ্চয় দেবেন। আমরা অনুবাদ করে নেবো।

কাগজে দেখছি, ‘রাশিয়ান চিঠির’ কপি অনুবাদ হয়েছে।  
আমার সেই কপি থেকে হয়েছে কি না জানিনে।

এইবারে সেই লোকের নিজের কথা: ১৯২০ অব্দে কাবুল  
গিয়েছিলাম কূটনৈতিক কাজে। ভারতীয় কাগজ পড়তাম।  
বুটলের সঙ্গে খুব লড়াই তখন জোয়ার। সেই সময় পেশোয়ার  
যাবার খুব চোঁটা করেছিলাম। আমি ফরাসি বলতাম। আমার  
বলেছিল, ভাইসরয়ের অফিস বর্তমান সিমলার কাছে, তোমাদের  
যেতে দেবে না। আমি বলেছিলাম, আর কদিন থাকতে পারে,  
তাই দেখ। চলে গেলে তার পরে যাব। হয়েছেও তাই—  
তারা চলে গেছে। কিন্তু আমি বড় বুড়ো হয়ে পড়েছি, আর  
কোথাও যাবার ক্ষমতা নেই। মনে মনে ভারত ঘুরি এখন।  
ভারতকে খুঁজে বেড়াই নানা বইয়ের মধ্যে। ভারত অসুবিধা।  
ভারতের অনেক—অনেক বইয়ের বর্জ্য হওয়া দরকার।

সত্য একটা বই বেরিয়েছে—‘ভারত ও পাকিস্তানের ছোট গল্প’।  
বইটা নেড়েচেড়ে দেখি। একজনকে বলি, ছুটিটা পড় তো, কার  
কার গল্প নিয়েছে তুমি। বঙ্গদেশের আছে গোটা চার-পাঁচ,  
কুমিল্লা, মুলুকাঙ্গ ওঁদের সব আছে। অজানা নামও অনেক।  
আমাদের বাংলাদেশের শুধু একজন—ভানী ভট্টাচার্য। তিনি  
বাংলায় লেখেন না, থাকেনও না বাংলা দেশে।

কী মশায়রা, বাংলার উপরে বিতৃষ্ণা কেন? বাংলা ছোট গল্প  
ভুবনের যে কোন দেশের সঙ্গে টুকর দিতে পারে। তার একটারও  
ঠাই হল না?

আমাদের আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও ঠাই-ঠাই করে সাহায্য দিয়েছেন।  
ওঁরা লজ্জিত হয়েছেন। বলেন, জানতে পারিনে, খবর-বাদ  
পাইনে তেমন কিছু। আপনাদের তরফ থেকেও সাহায্য পাইনি  
এ তাবৎ। বরফ এমনও মনে হয়েছে, টেগোরের অত বড় সাহিত্যের  
ধারা কি একেবারে শুকিয়ে গেল?

বাঙালি লেখকদের কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হতে বলি। আমাদের  
প্রচার নেই। তুমিরা ছোট হয়ে গেছে। আপনাদের সাধনার ধন  
শুধু স্বদেশের কটা মানুষের মধ্যে আটক থাকবে কেন? বাইরে  
ছড়িয়ে দিন। বরফ ও গিলির দিকে নজর তুলে দেখুন না একটু।  
সামান্য সফল নিয়ে কত জনে কী ঢাকই না বাজাচ্ছেন! [ ক্রমশঃ ]



# প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য

বিমলকুমার দত্ত



বুদ্ধের পাদপূজা : অমরাবতী

ভারতীয় ভাস্কর্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ভারতের ইতিহাসের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি। ভাস্কর্য ইতিহাসের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ভারতের রাজনৈতিক উত্থান-পতন কাহিনী, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্মবিশ্বব্রতের গতি ও প্রকৃতি এবং জনচৈতন্যের ক্রম বিবর্তন ও আশা-নিরাশার চিত্রাবলী সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত।

ভাস্কর্য শিল্প জাতীয় চিত্র-বিকাশের প্রকাশ। ভারতীয় ভাস্কর্য-ধারার সহিত পরিচিত হইতে হইলে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও আদর্শের সহিত সম্পূর্ণ পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। সাধারণ শিল্প-বিচারের মাপকাঠিতে ভারতশিল্পকে বিচার না করিয়া বহির্দেশের সাধ্যমে চিত্রবৃত্তি, সভ্যতার ও আধ্যাত্মিক সভ্য প্রকাশে সার্থক হইয়াছে কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বহির্দেশের সাধ্যমে অন্তর্দেশের সত্য ও সার্থক রূপ প্রকাশই ভারতশিল্পের আদর্শ।

পাঞ্চাবে হারাবা, সিদ্ধপ্রদেশে মহেন্দ্রগড়ো ও উত্তর-ভারতের অজান্ত স্থানে ভারতের সর্বপ্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের বয়স আনুমানিক পাঁচ হাজার বৎসর। প্রাপ্ত নিদর্শনাদির মধ্যে মহেন্দ্রগড়োতে আবিষ্কৃত বাতুনির্মিত মৃত্যুরত। নারী ও শঙ্কুবিশিষ্ট নাসাগ্রদৃষ্টি যুক্ত আবক্ষ পুরুষ-মূর্তি এবং হারাবার মৃত্যুবিহীন প্রস্তর-নির্মিত মূর্তিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাক-আর্য শিল্পের এই সকল নিদর্শন হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে যুগে ভাস্কর্য শিল্পের স্বর ও মান বিশেষ উন্নত ধরনের ছিল এবং বহুদিনের চেষ্টা ও সাধনার ফলে বীরে বীরে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল নিদর্শন ব্যতীত উপরোক্ত স্থান সমূহে যে অসংখ্য বিভিন্ন আকারের কলক (কীল) ও পোড়ামাটির ছবিমূর্তি সকল পাওয়া

গিয়াছে, তদ্বারা তদানীন্তন সামাজিক ও ধর্মিক সহকীয় আচার ব্যবহারের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

আর্যগণ ভারতে বৈদিক সভ্যতার পতন করেন এবং সম্ভবত তাঁহারা ১৫০০ খৃঃপূর্বাব্দে মধ্য-এশিয়া হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। বাণ্যব আর্যদিগের আক্রমণ ও সিদ্ধনদীর গতি পরিবর্তনের ফলে ভারতের অসভ্য অনা সভ্যতার কেন্দ্র সকল বীরে বীরে স্তান হইয়া পড়ে। দুর্ভিক্ষ, লক্ষ্যবদ্ধ ও ক্ষিপ্রেগতি বিশিষ্ট ইহাদের ভক্ত (অথ ব্যবহ করার দক্ষ) আর্যগণ স্রমভা ও শাস্ত্র জাবিড়গণকে পরা করিতে সক্ষম হন।

সময়ের সাধনই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। মূলতঃ, চতুর্দিক ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি আর্যদিগের দান কিন্তু পরবর্তী হিন্দুসভ্যতা বা জীবনে ও তাৎকালিক আর্য-অনার্য চিন্তাধারার মিশ্রণের ফল পুনর্জন্মবাদ, প্রতিমাপূজা, ভক্তিবাদ, যোগসাধনা প্রভৃতি হিন্দু বৈশিষ্ট্যাদি পূর্বাপরি অনার্য সভ্যতার দান।

ক্রমশঃ আর্য-অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতে বোলটি পৃথক রাজ্য গড়িয়া ওঠে এবং ৩২০ খৃঃপূর্বাব্দ পর্যন্ত এই রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আত্মকলহ চলিতে থাকে। মে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে (৩২০ খৃঃপূঃ) প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম মৌর্যরাজ অশোকের হইতে রাজধর্মরূপে পরিগণিত হইয়া বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে।

মৌর্য এবং ইহার পরবর্তী ক্ষুদ্র ও কাব্যগুণে (১৮৫-২৯ খৃঃ) যে সকল ভাস্কর্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, বুদ্ধমূর্তির অল্প তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যীয়। বৌদ্ধধর্মের মূলকথা হইতেছে ভূগহা বা ভূকাকে এবং উহার পরিবর্তক ইন্দ্রদত্ত সৌন্দর্যবিল



পার্বি তোগলালসাকে নিবারণ করা। ইহার ফলে দেহকান্তিময় শিল্পকলা সাধনা ও বর্জিত হয়।

ভারতে আধ্যাত্মিকতার কাল হইতে মৌর্য্যশিল্পের বিকাশকাল পর্যন্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষ ভাবে রেখাপাত করে, তন্মধ্যে ৫১৬ খৃঃপূর্বাব্দে পারস্য-সম্রাট দরায়ুসের এবং ৩২৬ খৃঃপূঃ গ্রীক-সম্রাট আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিকাশ ও বিবর্তনধারা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও সংঘর্ষবিকাশের প্রভাব ভারতীয় ভাস্কর্য্য-শিল্পের ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করিয়া নূতন নূতন রূপে রূপান্তরিত হইতে সাহায্য করে।

মৌর্য্যযুগের ভাস্কর্য্যধারার যে সকল নিদর্শন অপর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বৃহদাকার বক্ষ-বক্ষী এবং শতমুর্ত্তিসি প্রাণা। নিবারণক্ষে প্রাপ্ত বক্ষীমূর্ত্তিটির সহজ দৈহিক লীলায়িত ভঙ্গি, অঙ্গলিভঙ্গ এবং সরল সজীবতা ও সারনাথের সিংহমূর্ত্তির নিখুঁত গঠন, ক্ষীণ শিবা-উপশিবা ও শৈলীসমূহ, কেনর বিজ্ঞানের আলাংকারিক দাস্তবাহুগত ভাব প্রকাশে পরিকূট। এই সকল মূর্ত্তির সজীবতা, বাস্তবতা ও সূত্রিক মনোভা মৌর্য্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অজ্ঞাত বক্ষ-বক্ষী ও শতমূর্ত্তি ( যেমন বেশনগরের বক্ষী, পাটনার বক্ষ, সৌরায়নন্দন গড়ের সিংহমূর্ত্তি ইত্যাদি ) আকারে বিরাট হইলেও পুঙ্গ, গতি ও প্রাণহীন। মৌর্য্য-শৈলীশিল্প প্রকাশ মধ্যে এই দুইটি ধারা সহজেই অমিশ্রণ করা যায়।

পারস্য ও গ্রীক দেশীয় শিল্পধারার প্রভাব মৌর্য্যশিল্পকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে একথা সত্য, কিন্তু তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতীয় ভাস্কর্য্যধারার অব্যাহত গতি ও ছন্দের উপরেই মৌর্য্যশিল্পের মূল ভিত্তি।

মৌর্য্য-পরবর্তী যুগে অঙ্গ ও কাং সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রচার ঘটে। অঙ্গ ও কাং রাজগণের উদারতার জন্য বৌদ্ধ শিল্পক্ষেত্রে অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত থাকে। সীতা, ভারত, বুদ্ধগয়া, উদয়গিরি খণ্ডগিরি ও দক্ষিণ-ভারতে ডেকী নামক স্থানে এই যুগের শিল্প নিদর্শনাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এ যুগের শিল্পধারা মৌর্য্যযুগের ধারার গতি ও প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণ পৃথক। মৌর্য্যযুগের ভারত এ যুগের শিল্পে সে সজীবতা ও সরল ছন্দের আব সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত অবিকারিত শিল্প নিদর্শন পরিপ্রেক্ষিতে রচনার অভাবে গভীরহীনতা, কাল ও স্থানের অসঙ্গতি, ভাবলেশহীন মুখাকৃতি ও ছন্দহীনতার দোষে দুই কিস্তি জীবন্ত, বুদ্ধগয়া কল-ফুল প্রভৃতির শিল্পরূপ আদিম সৌন্দর্য্য, সজীবতা ও সারল্যের জন্য খ্যাত। ভারত ও সীতার বৈদিকাগাজে ক্ষোদিত জাতক-কাহিনীগুলির মধ্যে ছন্দ, অঙ্গবৃত্তা, মহাকপি, শ্রামা, জেতবন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এ যুগে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতীক চিহ্ন দ্বারা ( যেমন ছত্র, ত্রিভুজ, সিংহাসন, পাচ্ছা, ধর্মচক্র ইত্যাদি ) রূপায়িত। দোহন ও মিশ্রমূর্ত্তির প্রচলন অঙ্গ-কাং শিল্পে বিবিধ ভাবে প্রকাশিত।

খৃষ্টাব্দের শুরু হইতে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা যায়। মগধের প্রভাব-প্রতিপত্তি ম্লান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতে কুষাণ ও দক্ষিণে যুদ্ধ বা সীতবাহন সাম্রাজ্য প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করে।



শ্রাব্যমূল্য মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ : মহাজোমড়ো

কুষাণগণ মূলতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের এক দুর্ধর্ষ বাণ্যবর সম্প্রদায়। জাগ্য পরিবর্তনের আশায় তাঁহারা ভারতে প্রবেশ করেন এবং বীরে বীরে মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধীশ্বর হইয়া বসেন। কুষাণরাজবংশের মধ্যে সম্রাট কণিষ্কের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।



অশোকস্তম্ভের বৃক্ষমূর্ত্তি : বামপুরোয়া

সম্রাট কণিষের সময় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক নতুন রূপ পরিগ্রহণ করে। হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায় বিভক্ত হইয়া পড়ার দরুন বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ হীনবল হইয়া গড়িতেছিল। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক সম্রাট কণিষ জালালাবাদে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের এক সভা আহ্বান করেন এবং উক্ত সভায় মহাযান মতবাদ স্বীকৃত হওয়ার বৌদ্ধধর্ম পুনরায় নবশক্তি ও প্রেরণা লাভ করে। শিল্পের দিক দিয়া মহাযান মতবাদ প্রবর্তন এক নবযুগের সূচক। কারণ, হীনযান মতে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ ও প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মহাযানীকরণের মধ্যে বিভিন্নরূপে বুদ্ধের মূর্তির নানা ভাবে প্রকাশ করিবার এক গভীর উদ্দেশ্য দেখা যায় এবং সেই কারণে স্নাতক ভাবে এ যুগে বুদ্ধের মূর্তির ব্যাপক প্রকাশ ঘটিয়া থাকে।

এ যুগের শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে পশ্চিমে গান্ধার, মধ্যভারতে মথুরা এবং পশ্চিমে অমরাবতী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগের কারখানায় তৈয়ারী করার মত অক-কুখান যুগে উপযুক্ত শিল্পকেন্দ্রসমূহে অসংখ্য বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর ও অন্যান্য মূর্তি তৈয়ারী হয়।

প্রাচীন কালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পেশোয়ার জিলা গান্ধার অঞ্চল নামে খ্যাত ছিল। খ্রীস্টাব্দে অতীত কাল হইতে এই অঞ্চলটি ভারত, পারস্য ও গ্রীক সভ্যতার মিলন ক্ষেত্র। ইহার ফলে এই অঞ্চলে যে কিরিকী শিল্প গড়িয়া ওঠে তাহা গান্ধার শিল্প নামে খ্যাত। গান্ধার শিল্প সভ্যতঃ ২য় খৃঃ-পূঃ কাল হইতে আরম্ভ হয় এবং প্রায় ৫০০ বৎসর ধরিয়া গ্রীক ও রোমান শৈলী শিল্পের আদর্শ ও ভারতীয় ভাবধারা অসংখ্য বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির

মূর্তি এই অঞ্চলে তৈয়ারী হয়। বহির্দেশের নিখুঁত প্রকাশ চোঁটার আধিক্য বশতঃ ভারতের ধ্যানমগ্ন অন্তর্মুখী ব্যক্তির গান্ধার শিল্পে আদৌ বিকশিত হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে গান্ধারেই প্রথম বুদ্ধমূর্তির সূচনা হয়, কিন্তু এ কথা সত্য নহে। মথুরা ও গান্ধারে একই সময় বুদ্ধমূর্তি আত্মপ্রকাশ করে।

গান্ধারের ভ্রায় মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া এ যুগে যে শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া ওঠে তাহা মথুরা শিল্প নামে খ্যাত। মথুরা কেন্দ্রের তৈয়ারী অসংখ্য লাল পাথরের বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। দেব-দেবীর মূর্তিগুলি গান্ধারের মূর্তির মত মাটিকার ভাবের আধিক্যে ভরপুর না হইলেও ভারতীয় ভাবধারার সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি নহে। দেব-দেবীর মূর্তি ব্যতীত সামাজিক চিত্র সকল জীবনের বাস্তব্য গতি ও লাস্তময় ভাবের প্রকাশে সার্থক ও সম্পূর্ণ। লক কুখান রাজাদিগের প্রস্তর-নির্মিত প্রতিমূর্তি সকল এ যুগের বিশেষ লক্ষণ।

পশ্চিম-ভারতের কুফা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত অমরাবতীর শিল্পে সত্যি ভারত-শিল্পের অমরাবতী। সাদা মার্বেল পাথরের তৈয়ারী অমরাবতী ও নাগার্জুনী কোত্তার ভূপের গায়ে ক্ষোদিত যে সকল মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা শৈলীশিল্পের মান অমরাবতী মথুরা ও গান্ধার শিল্প হইতে উন্নত ধরণের এবং মোহিনী শক্তি ও বাগ্যাত্মক ভাবের প্রভাবে আচ্ছন্ন। অমরাবতী ও নাগার্জুনী কোত্তার স্তম্ভমূর্তিগুলি অপূর্ণ সরস মোহিনী শক্তির লাস্তময় প্রকাশ। এই অঞ্চলের প্রথম যুগের শিল্প ডেকী শিল্প নামে পরিচিত এবং ইহা সীতা ও ভারতের সমসাময়িক।

চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে (৩২০ খ্রীষ্টাব্দ) মগধে গুপ্তরাজ-বংশের অভ্যুদয় এক শ্রবণীয় ঘটনা। গুপ্তযুগে ধর্ম, সাহিত্য, চাকরলা, বিজ্ঞান ও সমাজ-জীবনের যে সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিকাশ ঘটে তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীন, ত্রক্ষদেশ, ইন্দোচীন, মালয় ও পূর্ব উপদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ সকল স্থাপিত হয় এবং ধর্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য ইত্যাদির আদান-প্রদান দ্বারা এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা গড়িয়া ওঠে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ গুপ্তযুগে এশিয়ার সাংস্কৃতি ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র পরিগণিত হয়।

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পূর্বপ্রতিষ্ঠা শ্রুত হইলেও বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রোত তখনও অব্যাহত। সে কারণ এই যুগে বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-শিল্পের প্রসার ঘটে।

যখন প্রাচীন জ্ঞানমার্গ ও বৌদ্ধ নীতিমার্গ প্রবল ছিল, তখন সাধকগণের মধ্যে বাহ্যার নিয়ন্ত্রণকারী, তাহারাই কেবল ধর্মতত্ত্বের তৃপ্তিসাধনের জন্য শিল্পের আশ্রয় লইত। কুখান ও গুপ্তযুগে ভক্তির প্রচার শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধের বিশেষ সহায়তা করে এবং এই ভক্তিমুখ্যতার সাকার ধ্যান ও পূজাকে সাধক সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে পৌছাইয়া উচ্চাঙ্গ শিল্পের অভ্যুদয় সাধন করে। এ যুগের শিল্পই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিভিন্ন যুগে শিল্প যে সকল অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা গুপ্তযুগের ভক্তিমুখ্যতার প্রাবল্যে, ধ্যানের গভীর রসে ও বর্ধ্যবতায় এবং সংবনের স্বস্থির বন্ধন-ভায়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শুল্কর ও সম্পূর্ণ মানব-দেহের মধ্য দিয়া দেহাত্মিক ভাব প্রকাশ চোঁটার এই যুগের শিল্পীরা সার্থক হন।



পৌত্তম্যবদ্ধ : গান্ধার



# আঘোর প্রকাশ



( স্বর্গীয়া দেবী আঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী )

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

“তোমার হাতের বেদনার দান”

তোমাকে নিজে মীমাংসা করিয়া অনেক সময় কাঁচ করিতে হইত। কাঁচ করিতে হইলেই তো তুলণ্ড হইয়া থাকে।

তুলণ্ড হইতে লাগিল। জ্ঞানের তারতম্য ছিল বলিয়া। তোমাকে আমাকে একটু অমিলও হইতে লাগিল। তখন মনে হইত, দু'জন্য মধ্যে এক জনার আমিও একেবারে চলিয়া গেলে তবে সামঞ্জস্য হইবে। তোমার ২১শে মে ১৮১৫ তারিখের দৈনিক ইতার প্রকাশ। “আজ সকাল হইতে মনটা বড় চিন্তাযুক্ত। এই প্রায় হইতেছিল, আমি কি ধারণা হইয়া গিয়াছি? আজ কয় সপ্তাহ হইতে মনে বড় ঝড় চলিতেছে। আজ তাই এই কথা মনে হইল। দহাময়ী মা উপাসনায় বলিয়া দিলেন, ‘তোমাকে ১০ বৎসর বয়সের সময় যে ধন দিয়াছিলাম, সেই ধন হারাইয়াছে। আমিও হারাইয়া চির অধীন থাকিবে বলিয়াছিলে,— এখন তুমি স্বাধীন হইয়া সকল কাঁচ কর। মত হইয়াছে তোমার, বিচার কর তুমি, এই শুভ্র এত ঝড় বহিতেছে।’ বুকলাম কারণ! প্রার্থনা আজ এই হইল, ‘আমিও ধুঁয়ায় আমাকে ঘিরিয়াছে। মা আমাকে আমিও হতে বাঁচাও, আবার আমাকে অধীন কর। মনে বড় বিচার উঠিতেছে। সপ্তাহ যেন সকল বিষয়ে বিচার আসে, আর মন অশান্ত হয়।’ ৩০শে মে লিখিয়াছে, “আমার মনে বড়ই ঝড় চলিতেছে; কিছুই পরিষ্কার হইতেছে না। আমি কি কাহারও ধর্মের বাণী হইতেছি? কেন আমার মন এমন ব্যাকুল? চিন্তা এত প্রবল যে শরীর স্থল হইতে পারিতেছে না। কি করি মা, বল।”

তোমা-ও যে অবস্থা আমারও তাই হইয়াছিল। আমার ডায়েরী দেখ। “ঘোরীর সঙ্গে এত অমিল হয় কেন? আমিও ঘায় নাই বলিয়া। মনে কেন এত অশান্তি হয়? ইহার কারণ কি বুঝিতে পারি না। সেই বুঝিবার ক্ষমতা দাও। ঘোরীর সঙ্গে বৈরাগ্য বিষয়ে অনেক কথা হইল। একেবারে সমুদয় অর্পণ করিতে না পারিলে নির্বাপন হয় না। নির্বাপন না হইলে মিলন কিরূপে হইবে? যেন সর্বদা দিতে পারি। সন্ধ্যার সময় মিলনের বিষয় অনেক কথা হইল। শরীরের মিলন তো আমি চাই না। তাহা সহজ। আত্মার মিলন দাও।” দু'জন্যর একই মত, একই সুর, একই অভাব। ভালবাসা ছিল, মিলন ছিল, কিন্তু কি যেন একটা অভাব যেন এক বাঁহনা বাজিতেছে না, একটু একটু বেসুর হইতেছে, যেতাল বাজিতেছে। লোক বলিত, খুব মিলন ইহাদের মধ্যে। আমি যখন বিহটা রাজ্যকার্যে চলিলাম, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে আসিলে। এত নিকটে, কিন্তু মাঝখানে যেন এক একটা পাহাড় রহিয়া গেল।

তোমরা ১লা জুনের দৈনিক লেখা আছে, “কাল সন্ধ্যার সময় উভয়ে মিলন বিষয়ে অনেক কথা হইল। আজ সকালে ৩০ টার সময় উপাসনা হইল। খুব ভাল উপাসনা, প্রার্থনা মিলন বিষয়ে।

আত্মার মিলন বাহাতে হয় সেই পর্ব-সেবাইয়া দেও।” আমার ডায়েরীও তাই বলিতেছে, “অতি মিষ্ট উপাসনা। বিপুল বর্ষমান অথচ এমন ভাল উপাসনা। আমার প্রার্থনা, ঘোরীর সঙ্গে মিল অত্যাশঙ্কক। ইহাতে যদি জ্ঞান তুলিয়া বাইতে হয়, প্রেম লুপ্ত হইতে যদি হয়, তাহাও করা আবশ্যক। মা! তুমি আমার সকল কাঁচিয়া লও।”

কুসু কুসু বিষয়ে দু'জনে মতভেদ হওয়াতেই বড় কষ্ট পাইতাম। তখন তুমি স্বাধীন ভাবে কাঁচ করিতে আরম্ভ করিয়াছ; স্বাধীন ভাবে কাঁচ করিতে গেলে মতভেদ অনিবার্য। কিন্তু তখন এরূপ হইলে হইত অনেকই মনে বড় তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। সত্য সত্যই মনে হয়, এই সময়ে আমাদের বতটা আমিষবিহীন হওয়া উচিত ছিল, তাহা আমরা হইতে পারি নাই। পরস্পরকে স্বাধীনতা দিতে হইলে আমিষবিনাশ ভিন্ন আর পথ নাই।

জুলাই মাসে মসৌড়ি গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দু'জন বেশ ভাল ছিলাম। দু'জনে একত্র মিলিয়া সামান্য কোনও কাঁচ করিতে পারিলেও কেমন পবিত্র আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা সেখানে গিয়া দেখিলাম। মসৌড়ির আমবাগানে দু'জনে একত্রে গেলাম। একত্রে আমি পাড়িলাম। আমি বলিলাম, “তুমি গাছ চড়িতে পার?” তুমি বলিলে, “হা পারি। কিন্তু কিছু মন্দ নয় তো?” আমি বলিলাম, “না; চড়।” তার পর তুমি গাছে চড়িলে। আমার বড় আশ্চর্য লইল।

এইরূপে কখনও মতভেদের ভক্ত কষ্ট, কখনও বা একত্রে কাঁচ করিয়া আনন্দ, এই ভাবে এই বৎসর চলিতে লাগিল। দু'জনের মধ্যে কষ্টের কয়েকটা স্থায়ী কারণও ছিল। তোমার জ্ঞানের অন্ত্যাবলম্ব: তুমি সব সময় মনের ক্লেদ থাকিতে। যদি আমি কখনও কোনও বন্ধুর সঙ্গে ইংরাজিতে আলাপ করিয়া তুমি হইতাম, অমনি তুমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া বাইতে ও বলিতে, “দু'জনের বিজ্ঞা সমান না হইলে বিবাহ হওয়া উচিত নয়।” আমি যদি কাহারও সহিত আলাপে বা প্রেসঙ্গে অনেক সময় কাটাইতাম, ও যদি তোমার মনে হইত যে, তোমার প্রাণ্য সময় বা মনোযোগ আমি অপূরণক দিতেছি, তাহাতে তোমার মনে বড় কষ্ট উপস্থিত হইত। একবার পঞ্জাব হইতে আগত একটা ধর্মপ্রাণ ভাইকে (মঙ্গল দেওজীকে) পাইয়া আমি তাঁহার সঙ্গে কয়েক দিন অনেক সময় কাটাইয়াছিলাম। ইহাতে তুমি অসুখী হইয়াছিল। শরীরের সর্বদা ত্যাগের সাগ্রহণও তোমার পক্ষে অভিশয় কঠিন হইতেছিল। আমার ইচ্ছা হইত যে, আমার শরীরের প্রতি তোমার কিছুই টান না থাকে; তাই প্রস্তাব করিলাম যে, একেবারে পরস্পরের শরীর স্পর্শ করিব না। তুমি ইহাতে অসুখী হইয়াছিলে। যখনই মনে করিতে যে, আমার শরীরের জন্ত তোমার বতটা টান আছে, তোমার শরীরের জন্ত আমার ততটা নাই, তখন তোমার মনে অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইত।

এ সকল সংগ্রাম অন্তরেই থাকিত ; এ সকলের জন্ত বাহিরের কোনও কাজে বাধা উপস্থিত হইত না। কিন্তু এ সকলের জন্ত তোমার ভগ্ন শরীর আরও ভগ্ন হইয়া বাইতে লাগিল। লোকে আমাকে কত মন্দ বলিতে লাগিল যে আমি তোমাকে অতিরিক্ত খাটাইয়া তোমার শরীর নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি, কিন্তু তুমি কোনও কাজ ছাড়িতে চাহিতে না। কারণ, বতর্কণ মায়ের সেবার জন্ত উৎসাহ প্রেরিত থাকিত ততক্ষণ এ সকল সংগ্রাম মনকে অধিকার করিতে পাইত না। যখনই বাড়ীতে কোনও অতিথি আসিতেন, কিংবা তোমাকে পরসেবার জন্ত অন্তরে বাড়ীতে বাইতে হইত, তখনই তোমার মুখ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইত।

এ বৎসর তোমার সর্বাঙ্গের অধিক যত্নস্বরূপ দিন গিয়াছে ৪১। আগষ্ট। এই দিনের দৈনিকে লিখিয়াছি, “মা, আমি জানিতাম, আমার কখনও পরীক্ষায় ধরিবে না, সুখ ভিন্ন দুঃখ কখনও আমাকে ছুঁইবে না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, মামুষের পক্ষে তাহা।” অসম্ভব। আমাকে পরীক্ষায় ঘিরেছে। আমি ভয় পাইব না। চিরদিন এ পরীক্ষা থাকিবে না। আশীর্বাদ কর, তোমার হাতের পরীক্ষা বাগ আমার মঙ্গলের জন্ত এসেছে, আমি যেন আদর করিতে পারি। আমাকে বৈধা লাগে, আশীর্বাদ কর। আজ রবিবার, সন্ধ্যার উপাসনা দামুর বাটীতে ছিল। বিকালবেলা প্রায় ৩টার সময় স্বামীর সঙ্গে বাটা করিয়া আসিলাম। একটু বিশ্রামের পর ভাল কথা বলিতে বলিলাম। আজ কয়দিন কয়মাস, বিশেষ আজ সকাল হইতে মনটা যেন কেমন করিতেছিল। আজ ৩৪ বার তাহা স্বামীকে জানাইয়াছি। এবারও তাই জানাইয়া ভাল কথা বলিতে বলায় তিনি বলিলেন, ‘পরের বিচার করা উচিত নয়।’ আমি অন্তরে বিচার না করিয়া এই পরিবার কেমন করিয়া চালাইতে পারি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেক কথা হইল। পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমার উপাসনা, জীবন, কি নেচ হইয়াছে?” উত্তর—“বুঝিতে পারি না; কিন্তু দৌড়ে বাইতে চাহিতেছি, কিন্তু বাধা পাইতেছি।” আমার আর তোমার সহিত চলে না দেখিতেছি। এই কথা শুনিয়া আমার বেকি অবস্থা হইল ঈশ্বর ভিন্ন নিশ্চর কেহ তাহা বুঝিতে পারিবে না। একটু পরে ক্ষমা চাহিলাম। স্বামী হাসিয়া বলিলেন, “কোনও দোষ তো মনে হয় না।” বড়ই বাতনা হইতে লাগিল। একটু পরে আবার বলিলাম, “আমি কি তোমার প্রেমের পথের বাধা হইতেছি?” উত্তর—“একটু বই কি?” তখন মাথাটা যেন ঘুরিয়া চক্ষু অন্ধকার দেখিয়া চক্ষু জল পড়িতে লাগিল। উত্তরে চুপ করিয়া ঈড়াইয়া রহিলাম। পরে বলিলাম, “তুমি সমাজে যাও।” তিনি গেলেন, আমি গেলাম না। আজ যে কণাটা স্বামীর মুখে শুনিলাম, এই তাবট আজ কয়মাস হইতে একটু বুঝিতেছিলাম। যাহাই হউক, আজ আমার কি ভয়ানক ঘন পরীক্ষা। আজ প্রায় ত্রিংশ বৎসর একত্র বাস। বাহার সঙ্গে চলিব বলিয়া মা, বাপ, ভাই, বোন, দেশ, আহা, পরিচ্ছদ, পুথিবীর সকল বিষয় হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছি, আজ সেই মুখে আমার এই অবনতির কথা শুনিয়া মনে হয় সেই সময় একটু জ্ঞানহার্য হইয়াছিলাম। আর তো কোনও উপায় নাই। সকল দুঃখের কথা বাহার নিকট বলিয়া শান্তি পাইতাম। তাহার মুখে যখন এই কথা শুনিলাম, তখন সেই অগতির গতির নিকট গিয়া এক বক

টাইকার করিয়া কানিয়া প্রার্থনা করিলাম। বুঝিলাম, তিনি বলেন নাই; মা আমার শাসন করিলেন। এখন বাড়ি ১১টা, আজ ঘুম নাই। মন ব্রহ্মে বাস করিতেছে। তবে বিজ্ঞানায় বাই।

৬ই আগষ্ট তারিখে “মুনের” নামক গ্রাম হইতে তোমাকে লিখিয়াছিলাম, “মাতৃকন্ডা, মায়ের ভালবাসা লইয়া ভবের হাটে, মেলার গোলমালে বর্গীর প্রেম দ্বারা সামান্য মোটা জিনিষ ক্রয় করিয়া আসিতেছ। তাহার মধ্যে অধিকাংশ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, আর আসিবে না। বর্গীর প্রেম দ্বারা আমার শরীরও মন ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু আত্মা কিনিতে পার নাই। আত্মা তবে বিরূপ ক্রয় করা বাইবে? তাহার একমাত্র উপায়,—ব্রহ্মকে লাভ কর, আমার চিরস্থায়ী আত্মাকে লাভ করিবে। এতদিন যে আত্মা ক্রয় করা হয় নাই সে দেখে তোমার নয়, আমারই দেখ। পুঙ্কেই যদি তোমাকে বলিতাম, তাহা হইলে এ বৎসরে তোমার এত ক্লেশ হইত না। বাহা হউক, এখনও অনেক প্রেম অবশিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা ব্রহ্ম পরব্রহ্মকে লাভ করা অসম্ভব নয়। এস, তাহারই চেষ্টায় নিযুক্ত থাকি। অনেক সময় বাহাতে তাহাকে স্মরণ হয় এমন কথা বলিব। তাহারই কথা, তাহারই সেবার, দিবানিশি ভুলে থাকি। “মুনের” এ বিষয়ে খুব সহায়। নির্জন মন্দির মসজিদ সর্বদা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কবে বাড়ী গেলে এইরূপ ভাব মনে উদয় হইবে। এখানকার মনের অবস্থা খুব ভাল। ভগবান তোমাকে এই সুখ ঈর্ষ হীন দান করুন, এই আমার দুই প্রার্থনা ও সন্ধ্যার প্রার্থনা। তোমার উপর অনেক নির্ভর করিতেছে। তুমি উত্তরে লিখিলে, “ব্রহ্মপুত্র, তোমার আশীর্বাদপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া আপনাকে ব্রহ্ম মনে করিলাম। কারণ আমি ব্রহ্মপুত্র। তোমার আশীর্বাদ পূর্ণ হউক, মাকে আমি পাঠ, তোমার আশীর্বাদ ক্রয় করি, মা ঈর্ষ এই করুন। কারণ, আমার যে আর কোন কাজ হবে না যদি তোমার আত্মাকে ক্রয় করিতে না পারি। আমার জন্ত সর্বদা প্রার্থনা করিও। আশা করি তুমি মার কোল ভরেই আছ। তোমার মন ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। মুখে হয়, আমি অনেক সময় তোমার এই সুখের ব্যাখ্যা হই, নিজের স্বামীর জন্ত। মা আশীর্বাদ করুন, আমার এই রোগ যেন না থাকে। কেমন করিয়া গৃহে ব্রহ্মকে রাখি, তুমি বাহির হইতে আসিয়া গৃহে ব্রহ্মদর্শন করিয়া শান্তি লাভ করিতে পার, এ বিষয়েও কিছু বলিও। আমার শরীর যেন ভাল; আর সব ভাল। এখন আমি জীবন্ত জ্যেষ্ঠ হইয়া এই দুঃকাল লিখিলাম। আমার চাচিদিকে গমন বন্ধ। তাহাতে আমার মায়ের আদরের ২৫টি ছোট জীবন-ধন, মধ্যে আমি। বাহা করি প্রতিদিন তাহা সত্য হউক; ব্রহ্ম নিয়োজিত হউক।

ইহার পর তোমার শরীর ধারণ হইতে লাগিল। তখন পত্র লিখিয়াছিলাম, “তোমার সুখ হইলেই আমার সুখ। মা চিন্তার কারণে যুক্ত করুন, আর কিছু চাই না। আমার জন্ত ভাবিও না। যতদিন থাকিবার ও কায করিবার দরকার ততদিন আমি নিশ্চয় এদেশে থাকিব। আর সকলে ভাল। মন বেশ আছে। সর্বদা তোমার নিকট থাকি। অনেক আলাপ করি, সুখী হই। বই নাই। মা অতি নিকটে সর্বদা থাকেন।”

আর একদিন লিখিলে, “যখন কায আসে তখন যেন বাধা

হইতে বলও আসে। আমি আশ্চর্য হই যে আমি কেমন করিয়া এত পারি। আমার জন্ত প্রার্থনা করিও, আরও তোমার উপস্থিত হইয়া যেন মরিতে পারি। তোমার সহিত এমন একটা যোগ হইয়াছে, সে যোগে এমন একটা মরণ আছে, বাহা কোন সময় মনকে পরিত্যাগ করে না। অশীর্ষক কর, ত্র্যম্বক সহিত সেইরূপ যোগ হউক। ভক্তিপূর্ণ ভালবাসা লও। তোমার স্মরণ পত্রখানি পাইয়া বিলাম, একদিন আর আমার জন্ত এ পত্রও আসিবে না। বেশ প্রস্তুত।” আর একদিন লিখিয়াছে, “এখন শয়ান হইতেই তোমার কথা ভাবিতেছিলাম, শরীর না থাকার মনের কি হয়, যখন শরীর আর আমার নিকট আসিবে না তখন কি হয়। হইবে। শরীরে বা কত মিষ্টতা, আত্মাতেই বা কত মিষ্টতা ই অমৃতত্ব করিতেছিলাম। আত্মাকে শরীরের মত স্পর্শ করিতে পারিতেছিলাম; সেই স্নেহ অমৃতত্ব করিতেছিলাম। একটা থাকিলে আর একটার জন্ত মনটা বড় চান, তাই ভাবছিলাম। তখন তুমি এখন কি করিতেছ তাই ভাবিলাম।” ২২শে আগষ্ট লিখিয়াছে, “বেশ হইয়াছে। শরীরটা অসুস্থ বলিয়া তোমার সহিত ত যেনী থাকিতে পারিতেছি; শরীর ভাল থাকিলে এ স্মৃতি আর ত না। শয়ন করিয়া তোমার বিষয় কতই ভাবি। মা খুব লবঙ্গের বলিয়া চাটাই দেওয়ালযুক্ত স্থানেও এ অবসর বিদ্যেছেন। মি গল্পার কুলে বসিয়া কত স্মৃতি হইতেছে, আমি পাছে বঞ্চিত হই, ই আমাকেও শয়ান অবস্থার রাবিয়া খুব স্মৃতি করিতেছেন। হু! ফেল উঠিতে ভাল লাগে না। আজ চটীর সময় তোমার পত্র হইলাম। একবার মন পত্র চাটাইতেছিল, অমন গমক দিতেই চূপ দিল। তুমি স্নেহে দিন কাটাইতেছ, এতে আমার মন কত স্মৃতি কত নিশ্চিন্ত, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। অবশ্যই না। তোমার ঘন হইলেই আমার ঐশ্বর্য বাড়িবে। সত্য না? আমার মন ভাল। অনেক সহিয়া আসিয়াছে। এবার কি আমি ইবার সময় মুখ ভার করিয়াছি? বোধ হয় না। এইরূপে তো হবে? আমার ভালবাসাপূর্ণ ভক্তি লও।” আর একদিন লিখিয়াছে, “পিকু, আমার জন্ত ভাবিও না। আমি ভাল আছি। ই স্নেহে থাকিয়াই পরলোক যে বিধপ হইবে তাহার পূর্ণাভাস হইতেছি। মার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। তবে আজ বিদায়।” ২৩শে আগষ্ট লিখিয়াছিল, “কুলে আশ্রিতাব সময় তোমার মিষ্ট তামাধা পত্রখানি পাইয়া স্মৃতি হইল। আমার শরীরও মন স। মরণের বেড়া পূর্ণাংগে কিছু ঘন হইয়া আসিয়াছে। আমার দুর্বলতার জন্ত তুমি প্রার্থনা করিও। শেষ নিঃশ্বাস যেন বি নামে ফেলিতে পারি, এই আশীর্ষক কর।” আর একদিন লিখিয়াছে, “আশীর্ষক কর, চিরকাল যেন তোমার মুখাংগে আসিয়া স্নেহ চলিতে পারি। তোমার সহিত চলিতে চলিতে যদি ই লোক ছাড়িতে হয়, আমার স্বর্গ হইবে। ১০ বৎসর বয়সে এ ব্রত মাজননী অজ্ঞানিতরূপে আমাকে দিয়াছিলেন, সে ত যেন আমার উদ্ধারপান হয়। পিকু, তুমি অসুস্থই জান, আমি যাব কোন আশা রাখি না। একটু লোক আপনাকে হারাইয়া এমন করিয়া অন্তের সহিত যার নামে মিশিতে পারে, এই আমার প্রার্থনা। মা কবে সেদিন দেবেন! তাহাই জন্ত এত বহন করা। ঘন উদ্বেগ তুলিয়া বাই, তখন শরীর মন ঝাঙ হইয়া পড়ে। মনে

হয় যেন আর চলে না। আবার যিনি চিরদিন আশা দেন তাহার দ্বারা চালিত হইয়া আমি বল পাই। বাক্য, তুমি যে এত স্নেহে দিন কাটাইতেছ, গুনে বড়ই মুখ হইতেছে। তোমার স্নেহ আমার স্নেহ। মা বুঝি চান না যে তোমার শারীরিক স্নেহ হয়, তোমার সঙ্গে আমার শারীরিক সন্ধ থাকে, তাই হয়তো এইরূপ ঘটনা করিতেছেন। এক ঘটনার পথে থাকিয়াও তুমি আমার শারীরিক কোন অবস্থা বুঝিতেছ না। মন বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে, চিন্ময় যোগের জন্ত। একটা কিছু না হইলে মন শান্ত হইতেছে না। কাল এটা হইতে রাত্রি ১টা পর্যন্ত তোমাকে দেখিবার জন্ত বড়ই প্রাণ কেমন করিতেছিল, কেন তা জানি না। পর পাইলে বুঝিলাম, ঐ সময় তুমিও আমাকে মরণ করিতেছিলে। অজ্ঞানিত রূপে হুটি আত্মা হুটি আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাই ওরূপ হইতেছিল বুঝি।”

দেবি, আমার জন্ত তোমার মুখাংগে চিরকালই ছিল, এখনও আছে। আমার সঙ্গে চলিবার আকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল ছিল। সত্য সত্যই আমার সঙ্গে চলিবার জন্ত দৌড়তে। প্রথম জীবনে অনেক কাল বুধা গিয়াছে বলিয়া শেষ জীবনে এত দৌড়িতে হইত। ১০ বৎসরের সময় হইতে এই মিলন ব্রত লইয়াছিল, একদিনও সে ব্রত ভঙ্গ করা নাই। আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। ক্ষণেকের জন্ত উদ্বেগ তুলিলে মিলন ভাঙিত, আবার স্বর্গের সন্ধানপান করিয়া আপনায় ব্রত রক্ষা করিতে। শরীরের যোগ পূর্বেই কমিয়াছিল, এখন শান্ত মনে তাহার স্থানে আন্তর যোগ স্থাপন করিতে লাগিল।

২৪শে অক্টোবর লিখিয়াছে, “কাল তুমি গাড়ীতে কি বিষয় ভাবিলে, এক গুণানে গিয়াই বা কি বিষয় ভাবিলে, শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি সমস্ত গাড়ী তোমার অনাসক্তির কথাই ভাবিলাম। বাটা আশিয়া শয়ন করিয়া ঐ কথা ভাবিলাম। যদি তোমার শরীর ছাড়িয়া এ দেশে থাকিতে হয়, কি ভাবে কিরূপে থাকিব তাই ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা গেল।”

৬ই নভেম্বর তোমার শরীর বড়ই ভাঙিয়া পড়িল। তোমাকে লইয়া দানাপুরে আসিলাম। তার পর দিন মনসুদপুরের গঙ্গাতীরের বটীর বাগানে হুই জনা উপাসনা করিলাম। অবশ্যই তোমার মনে আছে। কেমন বিড়ুতি শূণ্য উপাসনা, ক্ষেত্র ভলের সঙ্গে কেবলমাত্র স্বরূপগুলি উচ্চারণ করা; এ উপাসনা তোমারও খুব ভাল লাগিল। এমন উপাসনা কখনও শুনি নাই। সন্ধ্যার সময় আবার তোমার সঙ্গে সঙ্গাশ। ৮ই নভেম্বর ছর লইয়া আবার উপাসনার গেলে। বিড়ুতিশূণ্য উপাসনা হইয়াছিল, তুমিও খুব স্মৃতি হইয়াছিলে।

সবোক্তিনীর খোঁকা তোমার কাছে পরলোক আরও উজ্জল করিয়া দিয়া গেলেন। তোমার মৈনিকে লেখা আছে, “অজ্ঞ প্রিয় খোকার শেষ উপাসনা হইল। প্রার্থনা হইল, শিশু আমার জন্ত হইয়াছেন। পরলোকের নিকট করিয়া দিয়া গেলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে দ্বারা সন্ধ হয় নাই তাহাও বুঝাইয়া দিয়া গেলেন। আমি তাহার নিকট শ্মশী হইলাম।” আর একদিন প্রার্থনা করিয়াছিলে, “খোকা যেমন সূর্য দেখিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন, আমার তো সেদৃশ তোমাকে দেখে হয় না।

সেইরূপ বাহাঙে হয়, তাই কর।" সরোজিনীকে কলিকাতায় পাঠাইবার সময় প্রার্থনা করিলে, "মা তুমি সত্যের ছেলে হয়ে কোলে উঠে যাও। চিন্ময় খোশাকে যেন আমরা সর্বদা দেখিতে পাই।"

### উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আপন আলয় যুখে

১৮৯৬ সালের মাঘোৎসবের ভক্ত কিরুণে প্রস্তুত হইতেছিলে, তাহা তোমার ২২শে জামুয়ারীর দৈনিক পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। তুমি লিখিয়াছ, "তাই যোনের নিকট পাপ স্বীকার না করিলে, তাঁহারা এক বৎসরের অপরাধ ক্ষমা না করিলে, উৎসবে মা দেখা দিবেন না। কিন্তু ছোট বড় সকলের নিকট পাশের ভক্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা বড় বঠিন, তাই বল ভিক্ষা করিলাম। উপাসনা হইতে উঠিয়া সকলকে পার ধরিয়া ক্ষমা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা হইল।" উৎসবের ভক্ত প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় সাগর পাটিলে যে কোনও প্রতিবন্ধক বশতঃ খগোলের ভাইবোনেরা উৎসবে আসিতে পারিবেন না। তুমি লিখিলে, "খগোল ছাড়িয়া উৎসব করিতে কি ক্রেশ, তুমি জান। বাহারা প্রতিবন্ধক তাহাদের অমৃত্যুতাপ দেও।" ২৬শে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব? স্থান—সমাজ মন্দিরের প্রাঙ্গণ। এবার হাতে পরয়া ছিল না, তাই সকলের উপাসনার পর তুমি ভিক্ষা করিলে। দু'টি ছোট ছোট মেয়ে আর নিজের তুমি গৈরিক বস্ত্রে আবৃত হইয়া উৎসব-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া একটি প্রার্থনা করিলে। স্বয়ংস্পর্শী প্রার্থনা। অমন প্রার্থনা আর তোমার যুখে শুনিয়াছি কি না সন্দেহ। অমন রূপ ২৩ বার দেখিয়াছি মাত্র। ভিক্ষুণী হইয়াই ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলে, স্তব্ধতা তোমার সেই বেশ অতি সুন্দর মনে হইতে লাগিল। শরীরের রূপ তো বিশেষ কিছু ছিল না, স্বর্ণের ভাব তোমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়াছিল। সেই ভাব তখন ফুটিয়া পড়িতেছিল, সুন্দর ব্রহ্মরূপে তুমি নিমগ্ন হইয়াছিলে। নারী যদি এই রূপ লইয়া সর্বত্র বিচরণ করেন, পৃথিবীতে আর পাশ ভিত্তিতে পারে না। হাতে ভিক্ষার কুলিও সেইরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল। কেহ বা সিংহ, কেহ বা পয়সা দান করিলেন। উপাসনার পর প্রাঙ্গণের এক পাশে আমাকে ডাকিয়া হাতে সোনার বালা দেখাইলেন। যখন তুমি অলঙ্কার ও কেশভাগ করিয়া সম্মাসিনী হও, তার পর একদিন আমি বলিয়াছিলাম, "সকলই তো হইল, এখন আবার কেশ রাখ।" তুমি বলিয়াছিলে, "আর কেশ বড় করিতে পারিব না, বড় ভার বোধ হয়।" আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, "তবে অলঙ্কার পর।" তুমি তখন বলিয়াছিলে, "আজ্ঞা, একদিন পরিব।" আজ উপযুক্ত সময়ে, ভিখারীণী বেশধারণের অব্যবহিত পরে তোমার সে অঙ্গীকার পূর্ণ করিলে। ভিক্ষার প্রস্তুত হইল, আনন্দে সকলে আহার করিলেন। তারপর তোমার শেষ আনন্দবাজার করিলে। দোকানগুলি বেশ চলিল। নিয়ম করিয়াছিল যে প্রত্যেক বস্ত্র মূল্য নির্দিষ্ট থাকিবে; পরস্পর কেনা-বেচা করিবে কিন্তু মূল্য চাহিতে পারিবে না। পান ও সরবৎ বেচিয়া অনেক লাভ হইয়াছিল, তাহা হইতে সব খরচ কুলাইয়া যা কিছু ভুল-ভাঙি হইয়াছিল তাহাও শোধ হইল। ২৭শে জামুয়ারী আত্মিক বিবাহের উৎসব। এই দিনে রাজগৃহে তোমার আর আমার আত্মার বিবাহ হইয়াছিল। বাৎসরিক

ব্যাপার মনের মাছুষের সঙ্গে একত্রে করিবে, তাই খগোল গেলে। সমস্ত রাত্রি ভাল কথাবার্তা কটিয়া গেল।

ইহার পর রাজগৃহে বাত্মা হইল। তুমি বলিলে "রাত্রীর স্মরণে ভক্ত প্রাণ, মন, অর্ধ সব যেন দিতে পারি, পশ্চাতে থাকিয়া। রাজগৃহে গিয়া দুই প্রহরে বেড়াইতে বাইতে। রাত্রিতে একাকী ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান তোমার বড়ই ভাল লাগিল। পরে আমিও গিয়া স্নান করিলাম। যেন এই শেষ স্নান; সেই নির্মল জল, পূর্ণিমার পর চতুর্থীর চন্দ্রের কিরণ বিতক্ত জলে পড়িয়াছে; পাতাড় নীরব; এমন স্থানে মানুষের বান্দ-বিসম্বাদ হইতে বিদায় লইয়া ঈশ্বরের ভাবে পূর্ণ হইয়া সীতকালের রাতে স্নান,—ইহা সভ্যগণের বিষয়। তাই তুমি লিখিয়াছিলে, "উপযুক্ত ভালবাসার নিষ্ঠুর সন্তোষ।" সেই জলেই তুমি প্রার্থনা করিলে, "বাহা দ্বারা তোমাকে পাইয়াছি, কিছু কিছু শিখিয়াছি, তাঁকে যেন ভক্তি করিতে পারি।" ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধের অমৃত বাবু মহাশয় সম্বালের উপাসনা তোমাকেই করিতে বলিলেন। তুমি অপ্রস্তুত, তবুও তুমু মাথা পাতিয়া লইলে। তুমি অধিকার পাইয়া আবার আমাদের সকলকে এক এক স্বরূপে আরাধনা করিতে বলিলে। আমরা তিন জন তিন স্বরূপে আরাধনা করিলাম, বাকি সকল স্বরূপ তুমিই করিলে। খুব ভাল হইল।

রাজগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ফেব্রুয়ারী মাসে আমার সঙ্গে একবার বিহটা গিয়াছিল। বিহটা হইতে শরীর ও মন ভাল করিয়া ফিরিলে। তোমার দৈনিক লিখিয়াছ, "আজ বিহটা হইতে আসিলাম। দুইবার উপাসনা আজও হইয়াছে। খুব ভাল হইল। শান্তী পুত্রের কাছে অনেক দুখে করিলেন,—আমি তাঁর কিছু করিতে পারি না। তাঁহার ধর্মও এক প্রতিবন্ধক। আমি পারি না বলিয়া স্বামীর একটু ক্রেশ হয়।" তবু তুমি তাঁহার সকল আদর্শের সহ্য করিতে। অজ্ঞাত থাকিলে তুমি বাধা দিতে, ও বলিতে, "হাভার হউক, আমাদের মত মাহের-আর বেহ করিতে পারিবে না।" তোমার অন্তর্ধানের পর তিনি এই কথাগুলি উল্লেখ করিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ৩৪ বার উপাসনা হইল। আমার শরীরটা ভাল ছিল না, তুমি সামাজিক-উপাসনা গৃহেই করিলে। ২০ জন ছোট-বড় মেয়ে ভোগ দিলেন। খুব ভাল উপাসনা। রোগীর শয্যার পাশে বসিয়া উপাসনা করিলে রোগীর বিশেষ সেবা করা হয়। এ সেবায় যেন কেহ বঞ্চিত না হয়।

এই সময়ে তোমাকে যেমন নিয়মিত গুরুতর শ্রম করিতে হইতেছিল, তেমন মানসিক অনেক সংগ্রামও বহন করিতে হইতেছিল। সে কথা আগামী পরিচ্ছেদে বলিব। আমার মনে হয়, তোমার শরীর এ সময়ে এত অপটু হইয়া গিয়াছিল যে এত শ্রম ও এত সংগ্রাম বহন তার পক্ষে অসম্ভবযুক্ত। অজ্ঞের সংগ্রাম সহিষা ভক্তও স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। বাহিরের কার্যভার বহনের ভক্তও স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। তোমার স্বাস্থ্য ইহার পূর্বেই ভিতরে ভিতরে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

মার্চ মাসে বোর্স্টন সাহেব চীফ সেক্রেটারী হইয়া কলিকাতায় বাইতেছিলেন। বাইবার পূর্বে তোমার প্রিয় মেয়েদের বিদ্যালয় দেখিতে আসিলেন। এক ঘণ্টা ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন জেলী পরীক্ষা

করিলেন। মিঃ ডি, এন্‌ মল্লিক ছিলেন, আমিও ছিলাম, এক কোণে ভূমিও তোমার অপূর্ণ গোয়ালিনীর সাদী পরিয়া ঝাঁড়াইয়াছিল। সাহেব আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিলেন না; তোমার কাছে গিয়া বলিলেন, “বিজ্ঞালয় দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বিলাতে এবং ভারতবর্ষে এ সকল কাষ কুমারী কিংবা বিধবাবাই করিয়া থাকেন। স্বামী পুত্র লইয়া এত কাষ হাতে লইয়াছেন, এমন আর দেখিতে পাই না।” তুমি বলিলে, মহারানীর প্রতিনিধি হইয়া আপনি যে আমাদের এই সামান্য বিজ্ঞালয় পরীক্ষার জন্য এত সময় দিলেন ও সন্তুষ্ট হইলেন, ইহাতেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।” এই কথা বলিয়াই এক প্রণাম করিলে। সেই পাদরী সাহেবের শেক-হাও করার পর হইতে সাবধান হইয়াছিলে বলিয়া দূর হইতেই প্রণাম করিলে; সাহেবও নমস্কার করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

৮ই মার্চ মেয়েদের স্কুলের প্রাইজ হইল। সকলের নিয়ন্ত্রণ হইয়াছিল। ষাঁহাদের চরিত্র খুব ভাল নয়, তাঁহারাও আসিয়াছিলেন, এই জন্য অনেক চটিলেন। একটি বালিকা আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতেও অনেকের আপত্তি। তুমি কিন্তু ইহাতে দমিলে না। তুমি লিখিলে, “বতই বকুন কাছ কিন্তু ছাড়িব না, এই প্রতিজ্ঞা।” এই দুই ব্যাপারে তোমাকে যে পরিশ্রম করিতে হইল, তাহাতে শরীর আরও ভাঙ্গিয়া গেল।

৩১শে মার্চের দৈনিকে লিখিয়াছ, “আজ স্কুল কমিটিতে কথা হইল, গবর্ণমেন্টকে বলা হইবে স্কুল হাতে লইতে। আজ গাড়ীর বরচের জন্য গবর্ণমেন্ট (special grant) ১৬৮ টাকা দিলেন। স্কুল বখন আরম্ভ করিয়াছিল তখন লিটে ৫টি মেয়ে। কেবল প্রার্থনা ভরসা ছিল। আজ সেই প্রার্থনার ফলে স্কুলে প্রায় ৪০টি মেয়ে। অপরিচিত বাবুয়া আসিয়া কাব্যভার লইয়াছেন; আমাদের অবসর দিতে চান; টাকা অনেক; এখন স্কুল ধনী। এ সকলই প্রার্থনার ফল। তাই বলি, মা আমার আরও প্রার্থনাইল কর, আরও বিধানী কর। এই ভিক্ষা চাই, পরিবারকেও বিধানী কর।”

৫ই এপ্রিল ১৮১৬ আমাদের প্রিয় ব্রজগোপাল সসার ত্যাগ ও প্রচারক ব্রত গ্রহণ করিলেন। তোমার উপাসনা-পুঁহে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। তুমি ও আমি আশীর্বাদ করিলাম।

২০শে এপ্রিল কথার কথার জীমান্‌ সুবোধচন্দ্রের বিবাহের কথা উঠিল। তুমি বলিলে, বিলাতে যাইবার পূর্বে যদি সুবোধ বিবাহ করিতে চাহেন, তাহা হইলে বারণ করিবে। কি আশ্চর্য! কোথাও কিছু নাই, টাকার সঙ্গতি নাই, অচ্চ মনে মনে তুমি ঠিক করিয়াছ, সুবোধ বিলাত যাইবে। বিধানী লোক আদ্যমানেতে বানায় ঘর! দেবি, তোমার সে সাধও পূর্ণ হইয়াছে।

২৭শে এপ্রিল জীযুক্ত উমাচরণ মেনের কন্ডার কলেজ হইল। সকলে সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। তুমিও সেবা করিতে লাগিলে। একদিকে উমাচরণ বাবুর কন্ডার পীড়া, অঙ্কদিকে ডাই বিহারীলাল ঘোষের কন্ডা হেমের সহিত মিঃ ডি, এন্‌ মল্লিকের বিবাহ স্থির হইল। এ কন্ডার বিবাহের ভার তুমিই গ্রহণ করিয়াছিলে। ১৫ই মে কন্ডার আইবুড়াভাত ও বরও কন্ডার দীক্ষা সম্পন্ন হইল। তাঁর পরদিন বিবাহ। সেদিন সন্ধ্যার সময় ময়রা আসিয়া বলিল, তাহার পীড়া হইয়াছে, সে লুচি প্রস্তুত করিতে

পারিবে না। তখন অল্প বন্দোবস্ত করার আর সময় নাই। আমার চিরদিনের মতীর কাছে মজ্জা চাঙ্গিলাম। মতী বলিলেন, “ভাবিও না, আমরাই করিব।” উপস্থিত মেয়েদের সাধা-সাধনা করিলে; কিন্তু বিবাহ-সভা ত্যাগ করিয়া কে লুচি ভাজিতে আশ্রয়ের নিকট ছই ঘণ্টা বসিয়া থাকে? অবশেষে কি করিবে, তৃত্যাকে উদ্ভূত প্রস্তুত করিতে বলিলে, এবং নিজেই ভাজিতে আরম্ভ করিলে। দুই শত লোকের জন্য লুচি প্রস্তুত করা সহজ নয়, কিন্তু তোমার উৎসাহ অদম্য। বিবাহ শেষ হইতে না হইতে লুচি প্রস্তুত হইল, কেহ জানিতেও পারিল না কেমনে, কোথা হইতে অথবা কে প্রস্তুত করিল।

রেজিষ্ট্রেশন শেষ হইতে না হইতে একটু কষ্টের ব্যাপার ঘটিল। সে বিষয় তোমার দৈনিক হইতে উদ্ভূত করিয়া দিতেছি। “ভাস্কর বাবুর বাটীতে আজ (১৬ই মে) হেমের বিবাহ। মেয়েদের আমাদের জন্য সাহেব জামাতার হাতে সিন্দূর দিয়া কন্ডাকে পরাতে বাওয়া হয়। শ্রদ্ধেয়—বাবু—বাবুর উত্তেজনার অধীর হইয়া নারীদের অপমানসূচক ধমক দিয়া জামাতাকে বাহিরে লইয়া যান। বলেন, সিন্দূর পরান কুসংস্কার। আমার শান্তিভঙ্গ হইল। আমি রাগ করিলাম, কারণ আমার জীবনে নারীকে নির্যাস্ত্রহীন হইয়া দিবার জন্য প্রাণপণ। বলিলাম, আপনারা আমার সিন্দূরের মত অনেক কুসংস্কার করিলেন। এই ঘটনার বৃষ্টিলায়, এখনও নারীর স্থানের অনেক দেরী। এই বিষয়—বাবুকে বলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু মন গরম ছিল বলিয়া স্বামীর বারণ করিলেন; আর বলা হইল না।” সেদিনকার কথা আজিও আমার মনে জাগিতেছে। বখন সভায় সকল কথা বলিবে বলিয়া আমার অনুমতি চাহিলে, তখন তোমার মুখ লাল এবং উত্তেজিত। যদি তুমি সভায় কিছু বলিতে, তাহা হইলে তার ফল ভাল হইতে না। তাই আমি বলিলাম, ‘গোলা ধা ডালো’, আর তুমি সেই তপ্তগোলা হস্তম করিয়া ফেলিলে। তখনি কথা উঠিল বৌ-ভাত কবে হইবে। বিবাহের পরদিনই বৌ-ভাত হইলে উপযুগপরি পরিশ্রমে তোমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে, আমি তাই আপত্তি করিলাম। তুমি বলিলে, বিলম্ব করিলে মল্লিক সাহেবের অনেক খরচ বাড়িবে। পরদিনেই করা উচিত। আপনাকে হারাইয়া পরের মঙ্গলে জীবন দেওয়া তোমার পক্ষে সহজ হইয়া গিয়াছিল। তোমারই জয় হইল, স্থির হইল পরদিন বৌ-ভাত হইবে।

বিবাহ-রাত্রির সকল ব্যাপারের বর্ণনা এখনও ফুরায় নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আহ্বানের পর তুমি জানিতে পারিলে যে, উমাচরণ বাবু কিংবা তাঁহার স্ত্রী বিবাহে আসেন নাই। তৎক্ষণাৎ খালায় খাবার সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলে। কিন্তু গাড়ী পাঠান হয় নাই বলিয়া তিনি আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছিলেন, সুতরাং খাতাদি ফেঁত পাঠাইলেন ও পত্র লিখিলেন, বতক্ষণ এ অপমানের পূর্ণ কৈফিয়ৎ না পান, বিবাহের সামগ্রী লইবেন না। কোন বাটীতে গাড়ী পাঠান হয় নাই, সুতরাং এ বিষয়ে তোমার কোন অপরাধ ছিল না। বাহা ইউক, রাত্রি ১১টার সময় তোমাকে লইয়া হাট্টা নিজ বাটীতে চলিলাম। পশ্চিমধ্যে উমাচরণ বাবুর বাটী; তখনও তাঁহার শয়ন করেন নাই। দেখিলামাত্র তুমি বলিয়া উঠিলে, ‘ঝাঁড়াও, আমি একটা মজা করিয়া



আসি।" এই বলিয়াই আর অপেক্ষা না করিয়া উমাচরণ বাবু গৃহে প্রবেশ করিলে। অপমানের কোনও কথা উল্লেখ করিলে না। পীড়িত কন্ঠার জ্ঞাত রাতি ভাগরণের কি ব্যবস্থা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে। তিনি বলিলেন, "আজ তো আর কোনও বন্দোবস্ত নাই, খোকার মাতা ও আমি রাতি ভাগরণ করিব।" ষাট দিন রাতি ভাগরণের জ্ঞাত আসিতেন, তাঁরা আজ সকলেই বিবাহে গিয়াছেন। যদি ছু' ঘণ্টার জ্ঞাত কেহ থাকিতেন, তাহা হইলে সহজ হইত।" তুমি—"আমাকে বিশ্বাস করিয়া ছু' ঘণ্টা সেবা করিতে দিন।" তিনি—"আপনাকে পাইলে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।" তুমি বলিলে, "খোকার মাকে শয়ন করিতে বলুন, কন্ঠার নিকট আমি জাগিতছি।" বাহিরে আসিয়া আমাকে গৃহে বাইতে বলিলে। তুমি ধূলা পায়েই রোগীস শযাপার্শ্বে সেবা করিতে বলিলে। সারা দিনের এত পরিশ্রমের পরও সে রাতিতে দুইটার পূর্বে বাটা গিয়া শয়ন করিতে পারিলে না।

১১ই মে বৌভাত হইল। তোমার দৈনিক লেখা আছে, "আজ হেমের বাটাতে সকলের নিমন্ত্রণ। আমি, হেম, জামাতা, প্রকাশ এক পাড়ীতে বাইতেছিলাম। জামাতা গত রজনীর কথা তুলিয়া অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আমার ভুল হইয়াছে। আগে সকল তত্ত্ব জানিলে আমি সিন্দুর দিতাম। আজ দিব।" আমি বলিলাম, "আর দিতে হইবে না; কারণ কাল মেয়েদের আনন্দ-বর্ধনের জ্ঞাত বলিয়াছিলাম। আমি নিজে প্রায় ৩০ বৎসর সিন্দুর ছাড়িয়া দিয়াছি, বিধবা সাজিয়া থাকি। এ অবস্থায় যখন আমাকে কুসন্দ্বারপন্ন মনে করা হইল, তখন আমি আর সে বিষয়ে আলোচনা করিব না। কিন্তু নারীর অপমানের জ্ঞাত এখনও আমার মন অপমানিত। যদি একজন ইউরোপীয়ান নারী হইতেন, তবে কখনও এ ব্যবহার হইত না। যাক্।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে মল্লিক সাহেবের বাঙ্গালায় উপস্থিত হইল। মেয়েরা পূর্বেই গিয়াছিলেন। কথা ছিল, ১টার উপাসনা আরম্ভ হইবে ও ১১টার আহ্বার হইবে। বাবুর সন্দেহ করিতেছিলেন যে, ইহা হইয়া উঠিবে কি না। তুমি কিন্তু নির্ভর। ৮টা উঠুন খালিলে, একেবারে ৮ স্থানে রান্না আরম্ভ হইল। সকাল ৮টা হইতে ১টার মধ্যে সমুদ্র রান্না প্রস্তুত করিয়া উপাসনা বসিবারাত্র তুমি যোগ দিলে। ১১টার কিঞ্চিৎ পরেই গরম পোলাও সকলের পাতে পড়িল। ধরাধামে তোমার এই শেষ রন্ধন, এই শেষ বৌভাত ষাণ্ডয়ান হইয়া গেল।

এই পরিশ্রমের পর তোমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তোমাকে লইয়া খগোল যাত্রা করিলাম। সেখানে কেবল উপাসনা ও ভাল কথা হইবে, বিড়ম্ব বায়তে তোমার শরীর সুস্থ হইবে, এই আশা। Canalএর ধারে একটি বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিতে লাগিলে। সকালে সন্ধ্যায় বেড়ান হইত, যখন অবকাশ হইত ভাল কথা বলিতে। ২১শে ও ২২শে মে বটী বাবুর ও খেলাত বাবুর বাটাতে উপাসনা করিয়া ২৩শে বাকিপুর ফিরিলে। ২৪শে মে বাকিপুরে ব্রাহ্মসমাজের সাধ্বসম্রিক হইল। ২৫শে মে যোকাবার ভাইবোনেরদের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলে। আর দেখে খগোল ও যোকাবার বাঙরা হইল না। এবারকার সাধ্ব কিছু ব্যস্ততাবের পরিচয় দিয়াছিল। যখন কেহ অনেক

দূরদেশে যাত্রার উত্তোগ করে, তখনকার দেখা-সাফাৎ ব্যস্ততায়ই পরিচয় দেয়।

## চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

যতুছারামের উপত্যকা

খোকা যেন তোমার জীবনের উপর পরলোকের ছায়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিল। ১৮১৬ সালের যে কয়েক মাস তুমি দেখে ছিলে, সেহের সহিত সংগ্রাম করিতে করিয়াছিলে, তাহা এই পরিচ্ছেদে বলিতেছি। শরীর তোমাকে হুষ্টি দিবার পূর্বে আর একবার যেন শেষ দেখা দিয়া গেল; আর একবার তোমার দৃষ্টির সম্মুখে নিবিড় অন্ধকার রচনা করিল।

১৫ই জাহ্নয়ারী আমার সঙ্গে তুমি নাসারীগঞ্জে গিয়াছিলে। সে সময়ে দেখিয়াছিলাম, একত্র অবস্থান সত্ত্বেও শরীরের অধিকার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আমার দৈনিক লিখিয়াছিলাম, "আজি বাগানে উপাসনা খুব ভাল হইল। নির্বাণ এখনও লাভ হয় নাই। শরীরের অভাব এখনও আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। শরীরের ভোগের জ্ঞাত এখনও মন ব্যাকুল হয়। কেন তাহা হইবে? "রী" নামে অধোরকে ডাকিলাম, বড় মিষ্ট লাগিল। পবিত্র ভাব রক্ষা বিষয়ে "রী" সাহায্য করিলেন।" ১১শে ফেব্রুয়ারী তুমি আমার সঙ্গে ক্ষতুহা গেলে। সে-দিনকার দৈনিক এইরূপ লিখিয়াছিলে—"আজও ২ বার উপাসনা চলিতেছে। প্রার্থনা আরও দর্শন উজ্জ্বল কর। তোমার সন্তানকে দেখি, তোমাকে আরও ভাল করিয়া দেখি, এই সংসারেই তুমি দেখা দেও।" ঐ দিন সন্ধ্যার সময় তোমাকে লইয়া বেড়াইতে গেলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক কথা হইল। অনেক সময় নিঃশব্দ পাইলে এইরূপ বেড়াইতে ভালবাসিতে ও অনেক কথা বলিতে ও শুনিতে। তোমার কোন দোষ থাকিলে তাহাও তখন বলিতাম। তাই দৈনিক লিখিয়াছি, "শরীরে এখনও মায়া আছে। এ দোষ গেলে স্বামীই সুখী হন।"

ইহার পর ২৫শে ফেব্রুয়ারী আমি এই ব্রত লইয়াছিলাম, যে কোনও কারণেই তোমার শরীর স্পর্শ করিব না। তাহাতেও যদি ভালবাসা থাকে তবেই বৃথিব যে স্বামী ভালবাসা হইয়াছে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই বৃথিতে পারিলাম যে তোমার শরীর এমন ভয় হইয়াছে যে এখন এ ব্রত রক্ষা করা কঠিন হইবে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী তোমার পেটে একটা ব্যথা হইল। সে দিনের বিষয় তোমার দৈনিক লিখিয়াছি, "আজ পেটে বড় বেদনা উঠিয়াছিল। স্বামী সন্তানদের ডাকিয়া সাহায্য করিতে বলিলেন, তাহা নিলাম না। কারণ সংসারে স্মৃতে দুঃখে একজনের সাহায্যই নেব বলেছিলাম। তাই যদি ভগবান মানা করিলেন তবে তিনি ছাড়া আর কাহারও সাহায্য নেব না। ১১টা পর্যন্ত যন্ত্রণার পর নিজা আসিল। মায়ার পড়িবার ভয়ে স্বামী সন্তান করিলেন না।" কেহ যদি আমার দৈনিক পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন, সজ্ঞতন হইয়াও সে রাতিতে আমি অচেতন পাখরের মত পড়িয়াছিলাম। যে ব্রত লইয়াছিলাম, যদি তোমার সেবা ও আদর করিতাম, তাহা হইলে সে ব্রত ভাঙ্গিয়া বাইত। স্পর্শ করিব না অথচ নিকটে থাকিব, আমার কপালে সেই সাধন পড়িয়াছিল। তুমিও ক্ষুঃ হইলে, আমিও নিরাশ্রয়ের মত চারিদিকে



পূর্বেরই বলিয়াছি, ২৭শে মে আমি বিহারে হাই.ও ২৯শে  
কিম্বা আসিয়া দেখি, তোমার একটু ঘর হইয়াছে। আসিবার  
পরেই ছোট উপাসনা হইল। ছোট হইল বটে, কিন্তু তোমার মিত্র  
লাগিল। দিনের বেলায় বিশ্রাম করিলে, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বে আর  
ছির থাকিতে পারিলে না। সেবাই তোমার নিকট বিশ্রাম বোধ  
হইত। সন্ধ্যার পর ককণার মাতার সঙ্গে দেখা করিলে।  
শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্রের মেয়ে গীড়িত, তাহাকে দেখিয়া আসিলে।  
অশ্রুধর শরীরেও আপনার নিত্যকর্ম করিয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন  
করিলে। রাত্রে বেশ ঘর ফুটিল। ৩০শে মে প্রাতঃকালে ঘর  
গারে নিচের ঘরে উপাসনা করিতে গেলে। খাঁটি বিবাসের জন্য  
প্রার্থনা করিলে। সেই দিন বুঝিলাম তোমার মহাপ্রয়াণ অন্ত্যস্ত  
নিকটে। আমি প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। তুমি আমি বোঝাই  
ঝেড়ীতে বাইব, ছির ছিল; পাথের সঙ্গ্রহ হইয়াছিল; বোঝাই  
সহরে একটি ছোট বাড়ীও ঠিক হইয়াছিল, দুটিও পাইয়াছিলাম, কিন্তু  
বিধাতার বিধান ভিন্ন প্রকার।

১লা জুন তোমার বড় ষোড়। বিক্রয় করিয়া কেলিলাম। ঐ ষোড়া বিতালনের অস্ত্র ক্রয় করিয়াছিলে। নিজের অর্থে ষোড়া কিনিয়া তিন বৎসর ধরিয়া স্থলের গাড়ী চালাইলে। তোমার যোগ বুদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমার বাহিরে কাষে বাওরা হইল না। ২রা জুন রাত্রিতে একাকী সেবা করিলাম। আমারও শরীর অপটু; দুই বার পড়িয়া গেলাম। মোকামা হইতে কড়া মসারকে আনান হইল।

৩রা জুন দুই প্রহরে তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। প্রথমে পায়েব আঙ্গুলে বাতের ব্যাধার মত ব্যথা হইয়াছিল। তারপর ঐ ব্যথা বুক পর্যন্ত আসিয়া খাস বন্ধ হইতে আরম্ভ হইল। সকলে বলিতে লাগিল Endocarditis হইয়াছে। জ্বপিশেণ্ডের নিদ্রাশ নাকি কুলিয়াছিল। নিঃশ্বাস কেলিতে মাঝে মাঝে এত কষ্ট বোধ হইতেছিল যে প্রত্যেক আক্রমণে আমাদের মনে হইতেছিল বৃষ্টি এইবার প্রাণ বায়। দুই প্রহরের পর একবার প্রবল প্রকোপ হওয়াতে তুমিও মনে করিলে, এই শেষ। দেহত্যাগে পাছে কাহারও ক্ষতি হয়, এই ভয়ে সেই কষ্টের সময়ও আমার পানে তাকাইয়া বলিলে, “নসরুর হিসাবে গোল, আর কোথাও গোল নাই,—বসু।” সংসারের হিসাবপত্রের বিষয়ে এই শেষ কথা বলিলে। পরে বধন উঁহাদের বিল আসিল হিসাব পরিষ্কার করিতে গিয়া বৃষ্টিলাম, তোমার কথাই ঠিক। বিলের হিসাব কাটিতে হইল। “বসু” কথাটির কত অর্থ! পৃথিবীর দেনা-পাওনা ফুরাইল। আর টাকা-কড়ির হিসাব রাখিতে হইবে না, এই শেষ হইল।

প্রথম হইতেই বন্ধুরা সাহায্য করিতে লাগিলেন, রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন মহাশয় প্রথান ভার লইলেন। সেই বিবাহের রাত্রিতে তোমার ব্যবহার তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। দুজন পুত্র ও একজন নারী দিব্যরাত্রি পরিভ্রম করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর ধনীরাও এত বড় পান কি না সন্দেহ। শীড়ার সময় কত লোলা হইল, তাহা বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছিল। উমাচরণ বাবুর সঙ্গে তোমার বিশেষ সখ্য হইয়াছিল। তাঁহার লেখাগুলি শীড়ার ইতিহাসের একটি বিশেষ অঙ্গ। নিঃশ্বাস বন্ধ হইলে তোমাকে ধরিয়া উঠাইতে হইতেছিল। পরিচারিকাগণ একবার কার্যান্তরে অঙ্গ ঘরে গিয়াছেন, এমন সময় নিঃশ্বাস বন্ধের ফিট উপস্থিত। তুমি “উঠাও, উঠাও” বলিতে লাগিলে। তুমি নারী, উমাচরণ বাবু একমাত্র পুত্র গৃহে। কিরূপে ধরিয়া উঠাইবেন, ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তুমি তখনই তাঁহার সঙ্কট বৃষ্টিতে পারিলে, এবং বলিলে, “এইরূপে কি সেবা করিবেন? আপনি যে আমার বাবা!” যেমন বলা, অমনি তিনি ধরিয়া উঠাইলেন। কি আশ্চর্য্য! এমন যন্ত্রণার সময়ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গেল না। যা বলিলে কার্যোদ্ধার হয়, তাহাই বলিলে।

৫ই জুন রোগ পরীক্ষার অস্ত্র ডাক্তার হুর্বা বাবুকে ডাক হইল। তিনি বলিলেন, “রিউম্যাটিজম অব দি হাট।” কাহার চিকিৎসা হইবে এ কথা উঠিলে জুমি পরেশের উপর ভাব দিলে; আমিও তোমার মতে মত দিলাম। কিন্তু ময়েদের মধ্যে কেহ কেহ আপত্তি করিতে লাগিলেন। তুমি দৃঢ়ভাবে বলিলে, “বদি বাঁচিতে হয় দাদার হাতে বাঁচিব, বদি মরিতে হয় দাদার হাতে মরিব।” চিকিৎসকের হাতে কিরূপে আত্মসমর্পণ করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলে।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক স্থির করিয়াছিলে। বধন একবার স্থির হইল, বধন একবার “ডাক্তার ভাই” বলিয়া স্বীকার করিলে, বিধানীর মত শেষ পর্যন্ত অটল রহিলে। একবারও চিকিৎসার প্রণালী কিংবা ঔষধ স্বীকার কর নাই। বর্ধনিষ্ঠ চিকিৎসক বধন বর্ধনপরায়ণ হইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন তখন তাহার অপূর্ব্ব শ্রী হয়। তুমি পরেশের মধ্যে এই বর্ধনভাবের অবতারণা বৃষ্টিতে পারিতে, তাই তাঁহার প্রতি এত অটল ভক্তি। স্তব্রা তাঁহারই চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

জুন মাসের গরম, তার উপর আমাদের বাড়ীর উপরের একহারা ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ দিকে তোমার রূপরোগ, কাষেই তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইতে লাগিল। পরেশ তোমাকে তাঁহার বাজলার লইয়া বাইতে চাহিলেন। এই প্রস্তাবে তোমার সম্মতি হইল না। আপনার বাটীর স্তুতি তোমার বন্ধজীবনের সঙ্গে জড়িত, সহসা সে স্থান ছাড়িতে চাহিলে না। বদি মরিতে হয় তাহা হইলে আপনার গৃহে দেহত্যাগ করাই ভাল, এই তোমার মনের ভাব।

তোমার আগর তিরোভাব তুমি বৃষ্টিতে পারিতেছিলে, নহিলে ৭ই জুন রাত্রি দুই প্রহরে কেন বলিলে, “সব গোপন কচেন, আমি কিছু ভাল নাই।” সহরের লোককা তোমার শীড়ার কথা জানিলেন। ১৫ই জুন গুরুপ্রসাদ বাবু ও লোকনাথ বাবু তোমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ১০ই জুন রোগ খুব বাড়িল। পরেশ সমস্ত রাত্রি জাগিলেন। রোগের লক্ষণ দেখিয়া তিনি গৃহান্তরে বসিয়া বলিতেছিলেন, “বদি এবার উদ্ধার হন, অকস্মাৎ হইয়া থাকিতে হইবে।” তোমার কানে একটু আওয়াজ গিয়াছিল; তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, “দাদা কি বলিতেছেন?” অগত্যা আমি বলিলাম, “তুমি বলিলে, ‘কবে বাঁচিয়া থাকার আবশ্যক কি?’ তোমার চক্ষে জীবন ও সেবা এক হইয়াছিল। পঙ্গু হইয়া পড়িয়া থাক। তোমার পক্ষে অসম্ভব মনে হইত।

১১ই জুনের ভোরবেলা পরেশ তোমার কষ্ট দেখিয়া আবার তাঁহার গৃহে লইয়া বাটবার অল্পবোধ করিলেন। তাঁহার অল্পবোধে এইবার তুমি পরাণ হইলে। বধন বাইতেই হইবে তখন অসার গৃহালুপাণ রাখিয়া ফল কি? তুমি স্বীকার করিলে। তোমার সম্মতি পাইবামাত্র আমি গৃহান্তরে পরেশকে বলিতে বাইতেছিলাম, এমন সময় তুমি আমাকে ডাকিয়া বলিলে, “বোস, বোস, তোমার মত কি?” এমন যন্ত্রণার সময়ও আমার মত জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিলে না। অতি প্রত্যবে পালকী করিয়া তোমাকে পরেশের বাটিতে লইয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মি: মল্লিক ছিলেন, অস্ত্রাঙ্গ বন্ধুরাও ছিলেন। গুরুপ্রসাদ বাবু তাঁহার বাটীও দিতে চাহিয়াছিলেন। পরেশের বাটিতে সর্বোৎকৃষ্ট পশ্চিমের ঘরে তোমার স্থান হইল। নতুন নতুন সেবক উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তোমার ইচ্ছামুসারে তোমার নিম্ন বাটিতে সেবকদিগের আহার হইত, আর তাঁহার পালা করিয়া দিবানিশি তোমার সেবার নিযুক্ত থাকিতেন।

১১ই সমস্ত দিন ভালই গেল। রোগের কষ্ট ছিল না। ছটকটানি, ব্রুকের ব্যাধা, শিটের ব্যাধা কিছুই ছিল না। এত নিদ্রা হইল যে সেবকদিগের অধিক স্নেহ হইল না। আমিও নিদ্রা বাইতে পারিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে হাতস্থখ হইয়া তোমার লগ্যাপায়ে

বসিয়া উপাসনা করিলাম। অঙ্গরূপস্থায়ী উপাসনা; বাহ্যতে তোমার কষ্ট না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি ছিল, তুমিও শান্ত ছিলে। ১২ই জুনও তুমি বিশ্বাসের জ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছিলে। রাত্রে নিজা হইয়াছিল, অর ১০২ পর্যন্ত উঠিয়াছিল, শেষ রাত্রে ছটকট করিয়াছিল। অপরাত্নে বন্ধু ডাক্তার নৃত্যগোপাল বাবু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, রোগীর অবস্থা মন্দ নয়।

১৩ই জুন প্রাতে তোমার শয্যার পার্শ্বে উপাসনা করিলাম, তুমি আমার বিশ্বাসের জ্ঞান প্রার্থনা করিলে। সন্ধ্যার সময় শ্রীমান্ হুস্মান সিং সেবাধী হইয়া তোমার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন; তুমি আমাকে ডাকিলে ও বলিলে, “বদি তাঁহাকে সেবা করিতে না দেও, তাঁহার রক্ত হইবে। একটা কিছু কর।” তোমার রোগের রক্ত ভুলিয়া গেল; হুস্মান সিংহের রক্ত না হয় এই চিন্তা প্রবল হইল। শুশ্রূষার জ্ঞান আর অধিক লোকের প্রয়োজন ছিল না, তাই তাঁহাকে বেদনা আনিতে মিঠাপুর পাঠাইলাম। শ্রীমান্ শ্রীশঙ্করের সন্তানের অর চাড়িতেছে না; আমাকে ডাকিয়া বলিলে, “আমাদের উপরের ঘর তাহাকে চাড়িয়া দাও।” ইহার পূর্বেই তাঁহার আমাদের উপরের ঘরে আসিয়াছেন, শুনিয়া অত্যন্ত সখী হইলে। যেন হাস্য হইতে একটা মহা বোঝা নামিয়া গেল। শেষরাত্রে তোমার রোগ বন্ধি পাইল। আমার পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হইতে লাগিল। কত চক্ষের জল পড়িল।

১৩ই জুন রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিটের সময় তুমি বলিলে, “মায়ের কাছ যাব, আর দেহী করতে পারছি না। সুবোধ, অসত্য পথে দেও না। তোমাদের জ্ঞান কিছু রেখে গেলাম না; এই সত্য নিও। আমার জ্ঞান কেন না। দেণ আমি কাঁদছি না। সেদিন চোখে জল এসেছিল বলে এক কয় দিন দেহী চল।”

১৪ই রবিবার আবার উপাসনার যোগ দিলে, কিন্তু আজ বহুলা তোমায় শান্ত থাকিতে দিল না। প্রার্থনা যেমন ভেমনই করিলে। বসন্ত তোমার কষ্ট বাড়িতে লাগিল, ততই যেন আমার কাঁটার মুকুট বড় বড় কাঁটাযুক্ত হইয়া বিদ্ধ হইতে লাগিল; যেন আর সহ করা যায় না। রবিবার সমাজের উপাসনা করিতে যাইতে হইবে; তোমার নিকট অহুমতি চাহিলাম, তুমি বিদায় দিলে, আর বলিলে, “অবশ্যই যাইবে।” শুধু আমাকে নয়, মোকামার দিকিকেও সমাজে যাইতে বলিলে। বলিলে, “বদি আপনি সমাজে না যান তাহা হইলে আপনার হাতে ঔষধ খাইব না।”

১৫ই জুন তোমার বাক্সের দিন। ঐ দিনের প্রভাতে হইবার পূর্বে (রাত্রি ৩টা ১৫ মিনিটের সময়) তুমি বলিলে, বন্ধী বাবু! কে তুমি, সুবোধ? জিজ্ঞাসা কর বন্ধী বাবুকে, ৪টার গাড়ী চলে গেছে? আমার অন্তর আর সারবে না। আমি তো কোথাও যাব না। কোথায় যাব? সংসার আমার যত্নের জিনিস। ও মেনীর বাবা (বন্ধী বাবু) ও সুকুমারীর বাবা (খেলাত বাবু), তোমরা নহি অন্তে হো কি চার বজ্জেকে গাড়িতে যাব। কে তুমি? যদি? ১৫ই প্রত্যয়ে যখন ভাই খেলাতচন্দ্র আসিলেন, তাঁহার আগমনের কথা বলিলাম তুমি বলিলে, “কেন? আমি তো এই মাত্র খগালে গিয়াছিলাম। এই তো দেখা করিয়া আসিলাম।”

বেলা ৭টার সময় উপাসনা করিতে তোমার শয্যার পার্শ্বে সকলে একত্রিত হইলেন। তুমি তোমাকে ঘুরাইয়া দিতে বলিলে, বাহ্যতে সকলকে দেখিতে পাও। তোমার ইচ্ছামত তোমাকে শোয়ান হইল। তুমি পৃথিবীতে শেষ প্রার্থনা করিলে, “যেন বিশ্বাসের শেষ পরিচয় দিয়া বাইতে পারি।” প্রার্থনা ছোট, কিন্তু বেশ স্পষ্টভাবে বলিলে। সকলেই নাকী ক্ষীণ দেখিয়া মনে সন্দেহ হইতেছিল। তখন সকলে আফিস হইত। আফিসে বাইবার পূর্বে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম, তুমি বলিলে আচ্ছা। আমায় চক্ষু জল দেখিয়া তুমি বলিলে, “কাঁদছ?” এই এক কথায় অনেক কথা বলা হইল। বিয়োগে তো কিছু নয়; তুমি আমার কাছ কাছেই থাকিবে; ইচ্ছা হইলেই দেখিতে পাইব, তবে কাঁদিব কেন? আমিও তোমার কথা শুনিলাম; চক্ষের জল পুঁছিয়া ফেলিলাম, ও যাজ্ঞকার্য্য করিতে গেলাম।

ভূই প্রহরের পূর্বেই তুমি সকলকে আহ্বান করিয়া আসিতে বলিলে। লতু ও পাঁড়েরাইন ও আর সকলকে ডাকাইয়া আসিলে। হুস্মানকে ডাকিয়া তাঁহার জোড়ে নিজ মস্তক রাখিলে, যেন আপনার সকল ভার তাঁহাকে অর্পণ করিলে। হুস্মানও তোমার অপিত ভার আচ্ছাদন বহন করিয়া গেলেন। ভাই পরেশ বাহিরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন; প্রায় একটার সময় বাড়ী আসিয়াই প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কেমন আছেন?” তখন বোধ হয় তোমার শেষ বাতনা উপস্থিত হইয়াছে; তবু তুমি বলিলে, “এখন বলিব না, আহ্বান করিয়া আসুন, তারপর বলিব।” কি অপূর্বের দিকে দৃষ্টি! ১১টার সময় আমি ঔষধ দিলাম, তুমি পান করিলে। তারপরই ডাক্তার সূর্য্য বাবু আসিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, “ঔষধ দেওয়া বুঝ।” কেহ নাম করে না দেখিয়া আমিই মাতৃসন্তোষ পাঠ করিতে লাগিলাম; আর সকলে যোগ দিলেন। মনে হইল তুমিও যোগ দিতেছিলে। যেন গুহ্ম নড়িতেছিল। ২-১২ মিনিটে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিল।

উত্তর-পশ্চিমের কুঠরীতে তোমার দেহ রাখা হইল। চতুর্দিকে আমরা বসিয়া উপাসনা করিলাম। সুবোধ ও হুস্মানও প্রার্থনা করিলেন। তারপর তোমার দেহের কটো লওয়া হইল। তোমার দেহ নয়াটোলার বাড়ীতে আনয়ন করা গেল। পত্নীর বস্তু দরিত্র লোক (অধিকাংশই দ্রোণালোক) তোমার দেহকে ফিরিয়া হার হার করিতে লাগিল। উপাসনার ঘরের কাছে নামাইয়া আবার প্রার্থনা করা হইল। তারপর ৪টার সময় দেহ তীর্থস্থ করা হইল। সঙ্গে অনেক ভক্তলোক গিয়াছিলেন। হুস্মান ও লতুও গিয়াছিলেন। তোমার শেষশয্যা শ্রুত হইল। তোমার এই পুরাতন বন্ধু ও সেবক তোমার দেহের শেষকার্য্য করিল। তোমার জ্ঞান প্রার্থনা করিয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া অর্চনাপন করিলাম। রাত্রি ১টার সময় আমরা গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

পৃথিবীর জীবন এইরূপে শেষ হইল। কিন্তু তোমার অমর আত্মা নিশ্চয়ই নিষ্ক্রিয় নহে। এখান হইতে বে প্রেম, নিঃস্বার্থ ভাল ও পরহিতকামনা অর্জন করিয়াছিলে, অমরভাবে তাহার বড়ই প্রয়োজন, তাই তুমি সে সকলে সুসজ্জিত হইয়া চলিয়া গেলে।



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

—“মাসিয়ে ত ভলতেরার আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের দিন—গত বিশ বছর ধরে আমি আপনাদের শিষ্য গ্রহণ করেছি, আজ গুরু চাক্ষুশ দর্শনে, তাঁকে প্রজ্ঞালি নিবেদন করতে পেরে আমি খুশি”—

—“এই শিষ্যত্বের পরমায়ু আরও বিশ বছর স্থায়ী হোক—আশা করি, তারপর আমার গুরুদক্ষিণাটা থেকে বঞ্চিত হবো না—”

—“সর্বান্তঃকরণে সম্মত—অবশ্য যদি তত দিন আমার জন্মে অপেক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন”—

আমাদের এই ভলতেরার বাকচাতুরীতে সকলেই হেসে উঠলেন। আমি কিন্তু একটুও অপ্রস্তুত ছিলাম না। কারণ ভলতেরার সঙ্গে এই ধরনের আলাপই আমি আশা করছিলাম। ভলতেরার আমাকে এবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যখন ভেনিসের লোক তখন কাউন্ট আলগারোত্তিকে চিনি কি না ?

—“সাত বছর আগে যখন পাড়রাত্তে ছিলাম চিন্তাম। আর ঠর মধ্যে একটি জিনিষ আমাকে মুগ্ধ করেছিলো—সেটি হলো আপনার প্রতি ঠর অসীম প্রজ্ঞা—”

—“আমাকে বড় বড়ানো—উনি যে সকলের শ্রদ্ধেয় সেটা নিশ্চয়ই বিশেষ একজনের প্রতি ঠর প্রজ্ঞা আর প্রশংসার লজ্জা নয়।”

—“ঠিক ওই কারণেই উনি নাম করেছেন। নিউটনের প্রতি প্রগাঢ় প্রজ্ঞা প্রশংসা আর প্রশংসা করেই উনি প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।”

—“আচ্ছা ইতালীয়রা ঠর রচনাশৈলী পছন্দ করে ?”

—“না, কারণ বিভিন্ন ভাষার রচনাশৈলীর প্রভাব আর আধিক্য ঠর রচনা পূর্ণ।”

—“কিন্তু ইতালীর সাহিত্যে ফরাসী সাহিত্যের ভাব আর প্রকাশভঙ্গীর তো অভাব দেখি না—”

—“হ্যাঁ আমাদের সাহিত্যকে ওইতেই নষ্ট করেছে। যেমন ফরাসী ভাষার মধ্যেও ইতালী আর জার্মান সাহিত্যের প্রভাব আর তাদের রচনাশৈলীর অনুকরণ খুব বেশী দেখি, এমন কি মাসিয়ে ত ভলতেরারও যদি এমন ভাবে লেখেন তাহলেও সেটা উপভোগ্য হবে না একটুও—”

—“ঠিকই বলেছেন। সাহিত্যের সব চেয়ে বড় জিনিষ হলো ভাষার পবিত্রতা। আচ্ছা জানতে পারি কি, কোন ধরনের সাহিত্যে আপনি আত্মনিয়োগ করেছেন ?”

—“বিশেষ কোনটিতেই নয়। কিন্তু আমি প্রচুর পড়ি অধ্যয়ন করি মানুষের চরিত্রের স্বরূপ জানতে আর ব্যস্ত।

—“হ্যাঁ এ ভাবেও শেখা যায়—তবে বইয়ের প্রয়োজন সব বেশী। অবশ্য সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ইতিহাসের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয়।”

—“ঠিক, যদি অবশ্য ইতিহাস মিথ্যা না বলে, তাছাড়া ইতিহাস থাকে বিবস্ত্রিকর একঘেয়েমি, রসপিপাসু চিত্তকে তৃপ্তি দেবার ক্ষমতা তার নেই—অথচ বাস্তবের মত দেশ থেকে বিদেশে...পথ খোঁজে বিপথে চলতে চলতেই তো দেখা যায় বিচিত্র এ বিশ্বমাঝে বৈচিত্র্য লীলা বয়ে যায়...”

—“আপনি বুকি কবিতার অমুগ্ধাঙ্গী ?...”

—“শুধু অমুগ্ধাঙ্গ ? কবিতায় আমার সম্ভার বিলোপ...”

—“আপনি কি অনেক সনেট লিখেছেন ?”

—“গোটা বারো সনেট প্রকৃত রসোত্তীর্ণ বলে স্বীকার করি আর হাজার দুই তিন শুধু লিখেছি আর পরমুহুর্তে ভুলেছি—”

—“আপনাদের অর্থাৎ ইতালীয়দের সনেটের উপর একটা দারুণ ঝোঁক দেখা যায়...তবুও সনেটের ঐ নির্দিষ্ট লাইনে অনুশাসনের বন্ধনেও কবিতাগুলি যেন অবধা বিলম্বিত লয়ে চলে থাকে। আমাদের ভাষার দোষেই বোধ হয় একটাও ভালো সনেট আমাদের ভাষায় নেই—”

—“ভাষার দোষ ছাড়াও ফরাসী সাহিত্যিক প্রতিভারাও যে কিছুটা দারী। কারণ তাঁদের ধারণা, ভাবধারার বিস্তৃতিই কাব্যে গতি ব্যাহত করে তাকে নিশ্চল করে তোলে...”

—“আপনি কি তা মনে করেন না ?”

—“নাক করবেন, আমার মতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হলো ভাবধারার নির্দীপন। কবিতার রস-সৌন্দর্য্য নির্ভর করে কোন ভাব বা কোন চিন্তার আধারে তার প্রকাশ তারই ভিত্তিক...”

—“আপনার সবচেয়ে প্রিয় ইতালীয় কবি কে ?”

—“আরিয়োস্তা। আমি যে তাঁকে আর সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসি, একথা বলতে পারি না—কারণ একমাত্র উনিই আমার প্রিয় কবি—ঠর সামনে আর সব কবিই দূর, নিশ্চল। বছর পনেরো আগে ঠর সবুকে অপরূপ লেখা পড়ে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে আপনি যখন ঠর সমস্ত লেখা পড়বেন তখন আপনি বাধ্য হবেন আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভাবে বদলাতে...”

—“হ্যাঁ, আমি তখন ‘অবরসী’ ছিলাম, আপনাদের ভাষা সবুকে আমার জ্ঞানও ছিলো ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। তখন অস্ত্রের বধেই প্রভাব আমার উপর পড়ে। আর তাইতেই অনুপ্রাণিত হয়ে

জামি যে সমালোচনা লিখি...সেটা সে সময় আমার লেখা বলে মনে করলেও আসলে সেটা ছিলো তাদেরই কথার আর মতের প্রতিধ্বনি। এখন কিন্তু আপনার আরিয়োস্ত আমায়ও প্রিয় করি—

—“আঃ, ম্যাসিগে ভলতেয়ার হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম আপনার কথায়! কিন্তু এবার কৃপা করে আপনার ঐ সব রচনাগুলি বাতিল করে দিন না—যাতে অন্তত একটা প্রতিভাকে তুচ্ছ উপহাস আর বিক্রপ করে গেছেন—”

—“কোনো চিন্তা নেই, তারা সব একঘরে হয়েছে। এবার আমার একটা আবৃত্তি শুনুন, তাহলেই বুঝবেন...”

এই বলে ভলতেয়ার চতুর্ধিক আঁখি পঙ্কবিংশ সর্গ থেকে দুটি স্তব্ধ অংশ আবৃত্তি করে গেলেন, একটি অক্ষরও বাদ না দিয়ে— শেষ হোতে না হোতে আমি উচ্ছ্বসিত হোয়ে চীৎকার করে উঠলাম এই বলে যে, সারা ইতালীর এই অনবজ্ঞ আবৃত্তি শোনা উচিত ছিলো। প্রশংসাপ্রিয় ভলতেয়ার থনী হোয়ে ঠর রচিত কয়েকটি অংশের অনুবাদ আমাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন পরদিন।

ভলতেয়ারের ভাতুস্পুত্রী মাদাম দেনিস উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর কাকা কবির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পঙ্কজিক কয়টি আবৃত্তি করেছেন কি না।

—“হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠ বলা যায়, শ্রেষ্ঠতম বলা যায় না...”

—“আপনার মতে কোন পঙ্কজিকগুলি শ্রেষ্ঠতম?”—ভলতেয়ারের প্রশ্ন।

—“এম্বোবিশ সঙ্গীতের শেষ পঙ্কজিকগুলি। যেখানে তিনি বর্ণনা করছেন কেমন করে বোঙ্গা! পাগল হোয়ে গেল...সঙ্গীর আদিগুণ থেকে স্বাক্ষর এই অনবজ্ঞ পঙ্কজিকগুলির তুলনায় কিছু রচিত হয়নি।”

—“ম্যাসিগে কাদানোভা, এটি আমাদের আবৃত্তি করে শোনাবেন কি?” মাদাম দেনিসের অনুরণ।

করলাম আবৃত্তি। যখন শেষ হোলো দেখি, সবার চোখেই জল টলমল করছে...অবহুত ক্রন্দনের বেগ সকলকেই সামলাতে হোচ্ছে...ভলতেয়ার ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন উচ্ছ্বসিত আবেগে।

—“আশ্চর্য্য! বোল্লার এই সঙ্গীতকে বোম তার প্রাণ্য স্থান দেয় না!” মাদামের বিস্ময় কণ্ঠস্বর।

—“বোম কখনও একে তাচ্ছিল্য করেনি”—ভলতেয়ার বললেন, “দশম লিও গোড়োই তাই বোম বাতিল করে দিতেন বারাই এই রচনার বিপক্ষ সমালোচনা করতে যেত। তাছাড়া রীতিমত প্রোব-প্রতিপত্তিশালী দৃষ্টান্ত সম্মানিত ব্যক্তি আরিয়োস্ত সর্বদা আগলে রাখতেন। তাঁদের সাহায্য আর আশ্রয় না পেলে ঠেকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হোতো...”

এইবার উপস্থিত কোনো ভদ্রলোকের প্রস্তাবে ঠর বাড়ীতে একটা আবৃত্তি অল্পধনের কথা উঠলো। ভলতেয়ার আমাকে তাইতে অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন, জানালেন, তাহলে তিনি নিজেও অংশ গ্রহণ করবেন। আমি সবিনয়ে আমার অক্ষমতা জানালাম, কারণ পরদিনই আমি চলে যাছি। ভলতেয়ার আমার পরদিন চলে যাবার কথায় কানই দিলেন না—

—“আপনি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন না আমার কথা শুনে এসেছিলেন?”

—“বলতে নিশ্চয়ই, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হোলো আমার সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে...”

—“তাহলে অন্তত: আরও তিন দিন থাকুন। প্রতিদিন আমার কাছে আপনার নিমন্ত্রণ রইলো...আহারপর্বের সঙ্গে সঙ্গে চলবে আমাদের আলাপ-আলোচনা...”

অবীকার করতে পারলাম না, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাত্রে মত বিদায় নিলাম।

পরদিন সকালে ভলতেয়ারের সঙ্গে আহারপর্বের সময়, ভলতেয়ার ডেনিসের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বার বার কৌতূহল প্রকাশ করতে লাগলেন কিন্তু ঐ প্রশ্ন উত্থাপনে আমার একান্ত অনিচ্ছা দেখে আর প্রশ্ন করলেন না। আমার হাত ধর বাগানে বেড়াবার জগ্রে উঠে এলেন। বাগানের এক প্রান্ত দিয়ে বোন নদী বয়ে চলেছে। নানা ধরণের আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমরা শেষে বাড়ীতে এলাম। ঠর সঙ্গে ঐ শোবার ঘর অবধি আমি গেলাম। ভলতেয়ার মাথার পরচুলটা খুলে টুলী মাথায় দিলেন। সহজেই ঠাণ্ডা লাগতো বলে উনি কখনও মাথা খালি রাখতেন না। একটা দেওয়াল খুলে ফেললেন—দেখলাম, তার ভিতর প্রায় শ’খানেক মোটা মোটা কাগজপত্রের দিম্বা।

—“ওসবগুলো কি জানেন? প্রায় হাজার পঞ্চাশেক চিঠি। ওগুলোর প্রত্যেকটার উত্তর কিন্তু আমি দিয়েছি”—

—“আপনার উত্তরগুলোর প্রতিলিপি রেখেছেন তো?”

—“আমার কল্পচাতীর উপরই ওসব রাখার ভার দেওয়া আছে।”

—“আমি যথেষ্ট প্রকাশক আর পুস্তক-বিক্রেতাকে জানি, বার ওই অমূল্য সম্পদ পেলে যোগ্য দক্ষিণা দিতে এখনই প্রস্তুত—”

—“হ্যাঁ, কিন্তু ওদের থেকে সাবধান! যদি আপনি কোনো বই বা রচনা প্রকাশ করতে চান—আর বিশেষ করে আপনি যদি অখ্যাতনামা হন, তাহলেই সর্বনাশ! দেখবেন, তখন সব প্রকাশকেরাই ডাকাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর।”

—“যত দিন না বান্ধিক্য পা দিছি তত দিন ওই সব ভদ্রমহোদয়দের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই।”

—“তাহলে ওরাই হবে আপনার বান্ধিক্যের চাবুক।”

তারপর আমরা আবার সালোতে ফিরে এলাম। সেখানে প্রায় দুটি ঘণ্টা ধরে ভলতেয়ারের আশ্চর্য্য নিপুণ বাগবৈদ্যক আর উদ্বেগশালিনী প্রতিভার পরিচয় সমস্ত শ্রোতাদেরই মুগ্ধ করে রাখলে—যদিও তার সঙ্গে ছিলো তাঁর স্বভাবজাত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি বা কাউকেই পরোয়া করতো না। কিন্তু ওর মিষ্ট হাসির আড়ালে সব প্রেব, আর বিক্রপ ঢাকা পড়ে যেতো।

ভলতেয়ারের বাড়ীতে ছিলো সবার অব্যাহত ধার। তেমন আহার্য্যের পরিবেশনও ছিলো উদার মুক্তহস্তের পরিচয়। তখন ঠর বয়স হবে ছেয়টি বছর আর বাৎসরিক আয় একশো বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক। জ্বরব ছিলো, ভলতেয়ার ওর প্রকাশকদের ঠকিয়ে নিয়ে থনী হোয়েছেন—কিন্তু আসলে তার সম্পূর্ণ বিপরীতই ঘটতো। প্রকাশকরাই ঠাকে ঠকাতো। অবজ্ঞা তার ভ্রাতা দারী ওর খ্যাতি মোহ। খ্যাতির প্রতি দুর্বলতা ওকে এমন পেয়ে বসেছিলো :

উনি অনেক সময় প্রকাশকদের শুধু এই সন্তেই বই দিতেন যে, সেগুলি ছাপা হবে আর ভালোভাবে চালু করা হবে। মাত্র তিন দিন ঠর সাপ্লিখে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম, তার মধ্যেও ঠর এই উদারতার পরিচয় আমি পেয়েছি। 'প্রিন্সেস অ্যান্ড দ্য ফ্যান্টাস্টিক' বলে একটি অশ্রুপূর্ণ উপন্যাস উনি ওই ভাবে প্রকাশককে দিয়ে দেন। বইখানি মাত্র তিন দিনের মধ্যে শেষ করেছিলেন।

রায়ে আহাের সময় মাদাম দেবিস ছিলেন। ভলন্তেরার অল্পস্থিত। কিন্তু তাঁর অল্পস্থিতের সব ক্রটি উনি একাই হরণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরও মাজ্জিত কৃতি, সাধারণ জ্ঞান আর সৌন্দর্য্যবোধের কিছু অভাব ছিল না। ম্যাসিয়েত ভলন্তেরার বেশ দেহোত্তে ফিরলেন, হাতে একখানা চিঠি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি মার্ফুইস আলবার্গাতিকে চিনি কি না। আমি বললাম, পরিচয় না থাকলেও নামে চিনি।'

—'তিনি আমাকে 'গলদোনি'র কয়েকটি নাটক, কিছু সঙ্গীত আর একটি রচনার অল্পবাদ উপহার পাঠিয়েছেন, আর বলে পাঠিয়েছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন—'

—'নিশ্চিন্ত থাকুন, তিনি আসবেন না, অত বোকা তিনি নন।'

—'মানে? আমার সঙ্গে দেখা করাটা বোকামির লক্ষণ? আপনি এই বলতে চান?'

—'না, আমি শুধু বলতে চাই যে, এতে করে কত বড় কুকি যে তাঁকে নিতে হবে, সেটুকু বোঝবার মত জ্ঞান তাঁর আছে। কারণ বইটি আসেন, তবে সেই মুহূর্তেই আপনি টের পেয়ে যাবেন তাঁর বুদ্ধির দৌড় কতখানি—আর আপনারও ধারণা ভেঙে যাবে—'

—'আচ্ছা, গলদোনি 'ডিউক অফ পাবমার' কবি বলে জাহির করেন কেন?'

—'বোধ হয় প্রমাণ করতে যে আর পাঁচজনের মত তাঁরও চরিত্রে একটা দুর্বল দিক আছে।'

'উনি তো নিজেকে একজন ব্যারিষ্টারও বলেন—আসলে কোনোটাই নন। কয়েকটি বেশ ভালো মিলনাস্তক নাটক অবশ্য তিনি লিখেছেন, আর কিছু না। সমাজেও বিশেষ নাম করতে পারেন নি...'

—'আমি শুনেছি ঠর অবস্থা ভালো নয়, উনি নাকি ভেনিস ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু ভয় পাচ্ছেন থিয়েটারের ম্যানেজারদের চোটে। সেখানে ঠর নাটকগুলি অভিনীত হয় কিনা...'

—'একবার শুঁকে একটা বৃত্তি দেবার কথা ওঠে। কিন্তু আবার সেটা চাপা পড়ে যায়। কারণ, সবাই আশঙ্কা করেন যে, একটা অনিশ্চিত আর হোলে হয়ত আর উনি লিখতে চাইবেন না...'

—'হুম! হোমারকেও একবার বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা নাকচ করে দেওয়া হয়। পাছে অক্ষমাত্রেই বৃত্তি চেয়ে বসে বলে...'

সেদিনটা ঠর সাপ্লিখে উজ্জল আর শরয়ী হোয়েই রইলো। পরদিনও অমনি উজ্জল একটি দিনের প্রত্যাশায় পেলাম ভলন্তেরার কাছে। কিন্তু হুর্ভাগ্য আমার, সেদিন সেই বিরাট প্রতিভাকে দেখলাম তাঁর নিকটতম মানসিক অবস্থায়। জানি না, কোন অজ্ঞাত কারণে সেদিন ঠর মেজাজ যেমন খিটখিটে, কলহপ্রিয়, কথাবার্তা তেমনি তিক্ত আর প্রেব-বিজ্ঞপে ভরা। যদিও জানতেন সেদিন আমার বিদায়ের দিন, তা সত্ত্বেও আমাকে দেখে তিক্ত হাসি

হেসে বললেন—'মার্সিনের বইটা উপহারের জগে নিয়েছেন হয়তো ভালো মনেই। কিন্তু তার জগে ধন্যবাদ দিতে আমি অক্ষম কারণ পুরো চারটি ঘণ্টা আমার ওর পিছনে নষ্ট হোয়েছে।'

আমি প্রাণপণে নিজেকে স্মৃত রেখে উত্তর দিলাম, হয়ত আমি ভালো না লাগলেও একদিন আমার মতের সঙ্গে মিল হোতে পারে সামান্য কথায় উঠলো তর্কের বড়। কথায় কথায় আমি প্রেবিল'কে আমার শিক্ষক বলে অভিহিত করতে ভলন্তেরার জিজ্ঞাসা করলেন—'প্রেবিল! জানতে পারি কি, কোন্ সুবাদে তাঁকে শিক্ষক বলছেন আপনার?'

—'তিনি আমাকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন দু'টি বছর ধরে—আর তারই কৃতজ্ঞতাধরূপ আমি তাঁর একটি রচনা ইতালী: 'আলেক্সান্দ্রাইন' ছন্দে অনুবাদ করেছিলাম—আর আমিই প্রথম ইতালীয় বার এই ছন্দে রচনার সাহস ছিলো...'

—'প্রথম! মাফ করবেন, প্রথম হবার সম্মান ছুটেছিলো আমার বন্ধু পিয়ের মার্তেল্লাইর বরাতে...'

—'হুংবিত, আপনার কথার প্রতিবাদ করতে তোলা বলে...'

—'কিন্তু তাঁর রচনা আমার কাছে আছে। বোলোনাত্রে ছাপা হোয়েছিলো...'

—'হ্যাঁ, কিন্তু 'আলেক্সান্দ্রাইন' ছন্দে লেখা নয়। তাঁর কবিতাগুলির চোদ্দটি করে চরণ, আর একটি পুঞ্জিঙ্গ একটি দ্বীলিঙ্গ। এই ভাবে পর পর চরণগুলির রচনাও তিনি করেন নি। অবশ্য, তিনি নিজেকে ভেবেছিলেন যে, তিনি ওই ছন্দেই লিখেছেন, তাই ঠর ভূমিকা পড়ে আমি হাসি চাপতে পারি নি। সম্ভবতঃ আপনি সেটা পড়েন নি...'

—'পড়ি নি! কি বলছেন আপনি? ভূমিকা পড়াটাই আমার নেশা। তাতে তো তিনি জোর করেই লিখেছেন...'

—'হ্যাঁ, সেটাই তো মজার ব্যাপার...আপনাদের কাব্যগুলিকে কখনও বায়েটি চরণ আর কখনও তেরটি চরণ ব্যবহার হয়। অথচ মার্তেল্লাই সবই চোদ্দ চরণের। অতএব হয় তিনি কালো, নয় তাঁর ছন্দজ্ঞান খুবই কম।'

—'আপনি বুকি আমাদের কবিতার ছন্দের প্রত্যেকটি নিয়ম-কাছন কাছন ভাবে অনুসরণ করেন?'

—'হ্যাঁ, যত কঠিনই হোক না কেন?'

—'আচ্ছা প্রেবিল'র রচনার যে অনুবাদ করেছেন তার কোনো অংশ কি আবৃত্তি করে শোনাতে পারেন? অবশ্য যদি আপনার অনুব্রি না হয়। কারণ আমার খুব ইচ্ছা আপনার অনুবাদ আর ছন্দ শুনতে...'

আমি দশ বছর আগে প্রেবিল'র কাছে যে অংশটি আবৃত্তি করেছিলাম সেই অংশটিরই পুনরাবৃত্তি করলাম। এতক্ষণে ভলন্তেরার মুখে খুশীর আলোর আভাস দেখা দিল। শেষ হতে নিজেও ঠর স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন—সেটি তখনও ছাপা হয়নি...কিন্তু অশ্রুপূর্ণ, অনবত্ত সেই রচনা। যদি সেই খুশীর বেশটুকু রেখেই সেদিন বিদায় নিতাম তবে সব দিক থেকেই ভালো হোতো। কিন্তু কেন যে আবার 'হোরেস'এর লেখার সমালোচনার মধ্যে নিজেকে জড়ালাম জানি না! সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ আর তর্কের বড় খুশীর সেই মুহূর্ত আলোড়িতও নিবে গেলো। দুটি

প্রতিপক্ষের মধ্যে শুধু যুক্তিতর্কের আর বিতর্কের বড় বইতে লামজা। এলো নিত্যন্ত অবাস্থিত প্রদল সব...দেশ, শাসনতন্ত্র স্বাধীনতা সব কিছুই...

—“আপনি কি ভাবেন তেমনি আপনারা স্বাধীন জীবন বাপন করেন?”—ডলভেরার কূট প্রশ্ন।

—“একটি অভিজাত শাসনতন্ত্রের অধীনে বতটা স্বাধীনতা ভোগ করা বার ততটা করি বৈ কি। বলছি না যে আমরা ইংল্যান্ডের মত স্বাধীন—তবুও বলবো আমরা কৃপ্ত, আমরা বৃন্দা...”

—“এমন কি যখন ‘লেডস্’এ বন্দী ছিলেন তখনও...” ষিকমিকিয়ে উঠলো শাপিত বিক্রম।

—“আমার কারাবাস একটা বড়লোকের ফল আমি জানি...কিন্তু এটাও ঠিক যে আমি আমার স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছিলাম। মাঝে মাঝে আমার একথাও মনে হয়, কোনো রকম বিচারের ব্যবস্থা না করেই শাসনকর্তারা আমাকে বন্দী করে উচিত কাজই করেছিলেন...”

—“কিন্তু আপনি তো পালিয়েছিলেন?”

—“শাসনতন্ত্রও যেমন তার অধিকার নিয়ে আছে, আমিও তেমনি আমার অধিকার পাটিয়েছি...”

—“সাবাস! কিন্তু তাতে তো ভেনিসে কেউই স্বাধীন হোতে পারে না?”

—“হয়ত নয়। কিন্তু নিজেকে স্বাধীন ভাবলেই তো স্বাধীন হওয়া যায়...”

—“আপনার একধাংর আমার কোনো আস্থা নেই। অভিজাত-প্রশাস, এমন কি শাসন বিভাগের অধিকর্তাবাও তো আপনাদের শে স্বাধীন নন। কারণ তাঁরাও তো অল্পমতিপত্র ছাড়া কোথাও যশ করতে অবধি পারেন না—”

—“ঠিক, কিন্তু এটাও তো তাঁদেরই গড়া আইনের অমুশাসনে রা খেছাবন্দী...”

—“ভালো কথা, ছুনিয়ার সব জায়গাতেই জনসাধারণকে নিজেদের আইন গড়বার সুবিধা দেওয়া হোক...”

সাহিত্য প্রদল বহুক্ষণ চাপা পড়ে গেছে। এই কূট তর্কের জালে রাস্তা হোয়ে হুজনেই চূপ করে রইলাম। তারপর ডলভেরার বিক্রাম নেবার জন্তে উঠে গেল আমি ঢলে এলাম অশান্ত, বিবুদ্ধ মন নিয়ে। নিজের উপরই বিরক্ত হোয়ে উঠলাম কেন এই বিখ্যাত সাহিত্যিক, অসাধারণ, বুদ্ধিজীবী, বিরাট প্রতিভাকে যুক্তিতর্কের যুদ্ধক্ষেত্রে নামালাম। অবশ্য সারা মন জুড়ে একটা ভীত বিবেকের লাই অনিরীকণ ভাবে অলছিলো, তাই পুরো লমটি বছর ধরে ডলভেরার প্রতিটি লেখার নির্মম সমালোচনা করেছি। অবশ্য আজ তার লজ্জা আমি অমৃতপ্ত। কিন্তু পরে সেই সব লেখা বাতিল করতে গিয়ে বার বার পড়ে দেখেছি—অনেক জায়গায় অনেক বিষয়ে আমার সমালোচনার কোনো জটাই দশতে পাইনি। তবুও বলবো, আমার আরও সংবত হওয়া উচিত ছিলো।

সারা রাত বসে লিখে রাখলাম আমাদের কথোপকথন—বা সব জুড়ে করলে একটা বিরাট গ্রন্থ হোতে পারতো। কিন্তু আশ্চর্যের

পাতায় তার হু-একটি টুকরোই রেখে দিলাম। পর দিনই বাত্মা করলাম দক্ষিণের পক্ষে...

### নবম পরিচ্ছেদ

বৃহতে বৃহতে নীল জোনো হোয়ে এলাম কোয়েলে। এখানে এসে হোষ্টো একটি রাস্তা ভাড়া করলাম। জায়গাটি বড় সুন্দর বেছে নিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে একটা গাড়ী কিনে কোচম্যান আর সহিসও রাখলাম হু’জন। তার পর আরও কিছু খুঁটিনাটি ব্যবস্থাও সেয়ে নিতে দেরী হোলো না। এক দিন অপেরা দেখতে গেলাম। এমন জায়গায় আমার আসন নিয়েছিলাম যেখান থেকে প্রত্যেকটি অভিনেত্রীকে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কে জানতো সেখানে আমার জন্তে এমন বিষয় অপেক্ষা কর রয়েছে।

প্রথম গায়িকাটি যেই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ, অমনি আমারও সর্বোচ্চ রোমাঙ্কের শিহরণ...এ তো টেরেসা...সেই টেরেসা বাক কতো... কতো দিন আগে পেয়েছিলাম। আর পেয়েই হাবিয়েছিলাম। সে কী আশ্চর্য! ১৭৪৪ সালে ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়...আর কি অভিনব সেই পরিচয়! কিশোরীর আত্মপরিচয় কিশোরের বেশে। সঙ্গীদেরও ছয়পরিচয় আর সহোদরের রূপে। কিন্তু বেলিনোর ছয়বেশের আড়ালে কিশোরীর কমনীয়তা আমার দৃষ্টিকে কীকি নিতে পারেনি। আর ওর সঙ্গ পরিচয়ের রহস্যভরা অবগুণ্ঠনখানি তুলে ধরতে গিল্ল আমাদের হৃদয় বিনিময়েও কোনো কীক ছিল না। আর বোবনের সেই প্রথম সঙ্গিকণে আমাদের অভিনব প্রশ্ন পরিপরেই সমাপ্তি লাভ করতো...সেই শপথই তো আমরা নিয়েছিলাম নির্জন বিহ্বল মুহূর্তগুলিতে...কিন্তু কোতুকমরী ভাগ্যদেবীর পরিহাসে আমি হল্যাম পিসাদোতে বন্দী আর প্রতীকারতা টেরেসা পেলো ডিউক অফ কারোপিনানোর আশ্রয় তাঁর রঙ্গমঞ্চের গায়িকা হোয়ে...

তার পর হু’জনের মাঝখানে অসীর্ণ সতেবোটি বছরের ব্যবধান। স্মৃতির কোন ঘণিকোঠার স্কন্ধযে বন্ধিনী দিনগুলি ছাড়া গেয়ে ছুটে এলো বৃষ্টি...মনে পড়লো টেরেসার শেষ চিঠিখানির উত্তর আশ্রয় দেওয়া হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য, এই অসীর্ণ সতেবোটি বছর ডকে কি কোথাও স্পর্শ করেনি? জেমস সতেজ, তেমনি কমনীর তেমনি লাভল্যা চলচল অপরূপ দেহকান্তি...আর তেমনি মাথুখে পূর্ণ বিকশিত।

গানের শেষের দিকে হঠাৎ চোখ পড়লো টেরেসার আমার দিকে। স্পষ্ট দেখলাম, হু’টি আঁখিতারার জলে উঠলো পরিচয়ের ছাতি। গানটি শেষ হওয়া অবধি অপরূপ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো আমার দিকে। এক বারও দৃষ্টি কোরলো না...মঞ্চ ছেড়ে বাবার সময় হাতের পাখাখানি দিয়ে চকিত ইশারায় জামিয়ে গেল আছান।

আসন ছেড়ে উঠে পড়লাম...বক্ষস্পন্দন স্রুত থেকে স্রুতস্তর। রঙ্গমঞ্চের শিহনে গিয়ে দেখি, সিঁড়ির মাথায় ঠাঁড়িয়ে আমার টেরেসা। এগিয়ে গেলাম। হুখোহুখি ঠাঁড়াল্যাম হু’জন...সিঁড়িতে সম্মোহিতের মতো। জানি না ক’টি মুহূর্ত কাটলো। শেষে আন্তে আন্তে ওর হাতখপ্পনি ধরে আমি বৃকের উপর চেপে ধরলাম।

—“কিছু অন্তে পাক্কা? বৃকের জিহবটায় কি হচ্ছে, পাক্কা



—প্রথম বেই তোমাকে দেখলাম, মনে হোলো এখনি বৃষ্টি মুছিত হোয়ে পড়বে। হুঁচকা আজই রাতে আমার আবার অস্ত্র জায়গায় নিমন্ত্রণ...কিন্তু আজ তো সারা রাত দু'টি চোখের পাতার নুন নামবে না...তাদের জায়গা তুমি যে আগেই অধিকার করে বসে আছে। কাল ভোরবেলা এসো আমার কাছে, বলা আসবে? কোথায় থাকো তুমি? এখানে কি নাম তোমার? কত দিন এসেছো? কত দিন থাকবে আর? বিয়ে কোরেছো? ওঃ ওঃ, সময় হোয়ে আসছে...ছাই-এর নিমন্ত্রণ...ঈশ্বর ওরা ডাকতে আসছে বৃষ্টি? বিদায়...বিদায়...কাল কিন্তু মনে...

মিলিয়ে গেল কঠোর...স্বস্ত হোয়ে গেল অজস্র প্রেমের বড়। প্রকৃতিস্থ হোতে কিছু সময় লাগলো। বৈ কি। ফিরে এলাম নিজের আসনে। এতক্ষণে খেয়াল হোলো ওর নাম-ধাম কোনো পরিচয়ই তো নেওয়া হয়নি। আমন্ত্রণ যে জানালে কিন্তু ঠিকানা কোথায়?

আমার পাশেই বসেছিলেন একটি সুবেশ তরুণ...আমি মুহূর্তে তাকেই প্রেম করলাম এ গায়িকা-অভিনেত্রীটির পরিচয় যদি বলতে পারেন?

—আপনি বৃষ্টি মোরেলে নবাগত? তিনি প্রশ্ন করলেন।

—সেবোমাত্র এসেছি বলতে পারেন—

—ওঃ, তবে আপনার অজ্ঞতা ক্ষমা করা যেতে পারে। তাহলে তুমি ওই ভদ্রমহিলার আর আমার নাম একই; কারণ উনি আমার স্ত্রী। আর এই অশ্বের নাম হোলো সিরিয়ো পালেসি—

আমি অভিযান জানালাম, কিন্তু কোথায় থাকেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস হোলো না—আমার ভাব্যতা সন্দেহ তাহলে সন্দেহ জাগতে পারে, টেরেসা তাহলে এই মন্দের তরুণটিকে বিয়ে করেছে? আর আশ্চর্য, সবাইকে ছেড়ে আমিও ঠিক একেই প্রেম করলাম!

অপেরা দেখে ফিরে আসবার সময় ওখানকারই একটি পরিচারককে ডেকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, মাত্র দশ মাস হোলো টেরেসার বিয়ে হয়েছে। আর ওর স্বামী ঘোঁরা বেকার শুধু নয় বিটহীনও বটে; তবে টেরেসার অর্থসম্পদ দু'জনার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু অর্থসম্পদ নয়, মানমর্যাদাও কিছু কম নেই টেরেসার।

উবার আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হোলাম আমার ঘোবনের উবারালোকে, যে প্রথম মাধুর্য্যের রঙের পরশ বুলিয়েছিল আমার মনে; তারই দরজায়! এক জন বৃদ্ধা পরিচারিকা এসে দরজা খুলে অভিযান জানিয়ে বললে, আমিই মাসিয়ে ক্যাসানোভা কি না, কারণ তাঁরই অপেক্ষার কর্তা রয়েছেন।

বাড়ীর ভিতর ঢুকতেই টেরেসার তরুণ স্বামীটি বেরিয়ে এলেন, পরনে ডেসি: পাউন, মাথায় রাত্রির টুপি। আমাকে স্বাগত জানিয়ে বিনয়ের সঙ্গে আগন গ্রহণ করতে অগ্ররোধ করলেন। জানালেন ওর স্ত্রী এখনি আসবেন, তার পর আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে বললেন,—কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, আপনিই নিশ্চয়ই কাল আমার স্ত্রীর নাম জানতে চেয়েছিলেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি বহুদিন ওকে দেখিনি, আর ওর বিয়ে হোয়ে গেছে তাও জানতাম না। আমার দোষভাগ্য যে, ওর স্বামীর কাছেই আমি কাল প্রেম করেছিলাম।

আমাদের দু'জনার বন্ধুত্বের বন্ধনে আপনাকেও জড়াতে পারলে ধন্য হবো...অবশ্য আপনার সম্মতি থাকলে...

টেরেসা এসে ঢুকলো। দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে দু'টি প্রেমরী: মতই আমরা উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গনে পরস্পরকে বন্দী করলাম। কয়েক মুহূর্ত মাত্র...টেরেসা ওর স্বামীকে বসতে বলে দুই হাতে আমাকে টানতে টানতে সোকার উপর ওর পাশে নিয়ে বসালে...তার পা: উচ্ছ্বসিত কাঁদায় জেতে পড়লো...আমারও চোখ অশ্রুসজ্জল—

প্রথম উচ্ছ্বাসের বেগ একটু কমে এলে দু'জনাই চোখ গিয়ে পড়লো বেচারী স্বামীটির উপর...আমাদের খেয়ালই ছিল না ও উপস্থিতি...আর বেচারার হতভম্ব, মুগ্ধ দেখে দু'জনাই হেসে উঠলো এক সঙ্গে। কিন্তু টেরেসা জানতো, ওই পোষমানা বেচারী জীবটি: কেমন করে মানিয়ে নিতে হয়—

—ও হো: পালেসি! ভুলেই গিয়েছিলাম তোমাকে বলতে, এ যে ভদ্রলোকটিকে সামনে বৈছেই ইনি আমার বাবার মতো...বা বাবার চেয়েও বেশী বলতে পারি। অভিভাবকের মত, বন্ধুর মত রক্ষাকর্তার মত ইনি যে আমার কত উপকার করেছেন তুঁ জানো না...আমি সবকিছুইই জগতই এর কাছে অগী, উ: ি আনন্দের দিন আজ...দীর্ঘ দশটি বছর এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা ছিলাম।

বাবার সঙ্গে তুলনা দেওয়ার সে বেচারার চোখ দু'টি গোল গো হয়ে উঠলো...কারণ টেরেসা যদিও আজ নিখুঁত সৌন্দর্য্য অ আটট ঘোবনকে এতটুকু ম্লান হোতে দেখনি তাহলেও মাত্র দু'বছরে ছোটো আমার চেয়ে। তবু হাল ধরেই চললাম—

—ঠিকই বলেছে, আপনার টেরেসা শুধু আমার মেয়েই ন সহোদরার প্রীতি বন্ধুর ভালোবাসা সবই ওর কাছে পেয়েছি। সাধারণ মেয়ে নয়, ও একটি অমূল্য সম্পদ'তার উপর আপনার ঠ...এটুকু এক নিশ্বাসে বলেই আমি টেরেসার দিকে ফিরে বললাম: "কিন্তু তোমার শেষ চিঠিটার উত্তর আমি আজও দিইনি কারণ..."

—আমি জানি তুমি 'লেডম' এ বন্দী ছিলে। ভিয়েন থাকতে তোমার পালিয়ে আসার আশ্চর্য্য গল্প শুনেছিলাম তার পর প্যারিসে আর হলোগো তোমার খবর পেয়েছি মাত্র সম্প্রতি আমি তোমার কোনো খোঁজ পাইনি কো ন্যহও পাইনি, যেখান থেকে খোঁজ পাবো। গত দশটি ব কেমন করে কেটেছে সেই সব গল্প তোমার কাছে করবো তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। বাই বলো এখন ি আমি সুখী। আমার প্রিয়তম পালেসি, ওকে আ ভালোবাসি, পালেসিও আমাকে ভালোবাসে। মাত্র কয়েক : আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমার আশা আছে ও যেমন আমার বন্ধু তেমনই এক দিন পালেসিরও বন্ধু হে উঠবে...

এই কথায় আমি উঠে গিয়ে পালেসিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে করলাম। আর বেচারী পালেসি—স্ত্রীর শিড়সম, ভাড়সম বন্ধু সন্তবত: প্রায়রীসম এই নবপরিচিকে কি ভাবে গ্রহণ করবে ও বুঝে ওঠা বাস্তবিকই ওর পক্ষে দুরূহ ছিলো। ওর দু' দেখে আমারই হাসি চেপে রাখা দায় হোয়েছিলো। কিছু কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত ঠাড়িয়ে থেকে অতি কষ্টে স্বাভাবিক হ





# নর্মিনীবিলাস

কেশ তৈল

\*  
এম. এল. বসন্ত স্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ  
নর্মিনীবিলাস হাউস, কলিকাতা-১

—“প্রথম যেই তোমাকে দেখলাম, মনে হোলো এখনি বৃষ্টি মুক্তি হোয়ে পড়বে। হুঁত্যা আজই রাতে আমার আবার অস্ত্র আয়গায় নিমন্ত্রণ...কিন্তু আজ তো সারা রাত দু’টি চোখের পাতায় ঘুম নামবে না...তাদের ভায়গা তুমি যে আগেই অধিকার করে বসে আছো। কাল ভোরবেলা এলো আমার কাছে, বলো আসবে? কোথায় থাকো তুমি? এখানে কি নাম তোমার? কত দিন এসেছো? কত দিন থাকবে আর? বিয়ে কোরেছো? ওঃ ওঃ, সময় হোয়ে আসছে...ছাই-এর নিমন্ত্রণ...ঈশ্বর ডাকতে আসছে বৃষ্টি? বিদায়...বিদায়...কাল কিন্তু মনে...”

মিলিয়ে গেল কঠোর...শব্দ হোয়ে গেল অজ্ঞান প্রাণের বড়। প্রকৃতিস্থ হোতে কিছু সময় লাগলো। বৈ কি। ফিরে এলাম নিজের আসনে। এতক্ষণ খেলায় হোলো ওর নাম-খাম কোনো পরিচয়ই তো নেওয়া হয়নি। আমন্ত্রণ যে জানালো কিন্তু ঠিকানা কোথায়?

আমার পাশেই বসেছিলেন একটি সুবেশ তরুণ...আমি মৃদুস্বরে তাকেই প্রশ্ন করলাম এ গায়িকা-অভিনেত্রীটির পরিচয় যদি বলতে পারেন?

—“আপনি বৃষ্টি কোরেলে নবাগত?” তিনি প্রশ্ন করলেন।

—“সবমাত্রা এসেছি বলতে পারেন—”

—“ওঃ, তবে আপনার অজ্ঞতা ক্ষমা করা যেতে পারে। তাহলে শুধু ওই ভয়মহিলার আর আমার নাম একই; কারণ উনি আমার স্ত্রী। আর এই অধমের নাম হোলো সিরিজো পালেসি”—

আমি অভিযান জানালাম, কিন্তু কোথায় থাকেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস হোলো না—আমার ভাবাত সবক্ষে তাহলে সম্ভব জাগতে পারে, টেরেসা তাহলে এই শূন্য তরুণটিকে বিয়ে করেছে? আর আশ্চর্য, সবাইকে ছেড়ে আমিও ঠিক একেই প্রেম করলাম।

অপেরা দেখে ফিরে আসবার সময় ওখানকারই একটি পরিচারককে ডেকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, মাত্র দশ মাস হোলো টেরেসার বিয়ে হয়েছে। আর ওর স্বামী বোচো বেকার শুণু নয় বিওহীনও বটে; তবে টেরেসার অর্ধসম্পদ দু’জনার পক্ষে যথেষ্ট। শুণু অর্ধসম্পদ নয়, মানমণ্ডাও কিছু কম নেই টেরেসার।

উবার আলো ফোটোর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হোলাম আমার যৌবনের উবালাকে, যে প্রথম মাধুর্যের রঙের পরশ বুলিয়েছিল আমার মনে; তারই দরজায়! এক জন বৃদ্ধা পরিচারিকা এসে দরজা খুলে অভিযান জানিয়ে বললে, আমিই মাসিয়ে ক্যাসানোভা কি না, কারণ তাঁরই অপেক্ষার কর্তা রয়েছেন।

বাড়ীর ভিতর ঢুকতেই টেরেসার তরুণ স্বামীটি বেরিয়ে এলেন, পরনে ডেনিম পাইন্ট, মাথার রাতির টুপি। আমাকে স্বাগত জানিয়ে বিনয়ের সঙ্গে আসন গ্রহণ করতে অগ্রবোধ করলেন। জানালেন ওঁর স্ত্রী এখন আসবেন, তার পর আমার দিকে এক দৃষ্ট চেয়ে বললেন,—“কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, আপনিই নিশ্চয়ই কাল আমার স্ত্রীর নাম জানতে চেয়েছিলেন।”

—“হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি বহুদিন ওকে দেখিনি, আর ওর বিয়ে হোয়ে গেছে তাও জানতাম না। আমার সোভাগা যে, ওর স্বামীর কাছেই আমি কাল প্রেম করেছিলাম।

আমাদের দু’জন্যর বন্ধুত্বের বন্ধনে আপনাকেও জড়তে পারলে ধন্য হবো...অবশ্য আপনার সম্মতি থাকলে...”

টেরেসা এসে ঢুকলো। দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে দু’টি প্রেমস্রীর মতই আমরা উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গনে পরস্পরকে বন্দী করলাম। কয়েক মুহূর্ত মাত্র...টেরেসা ওর স্বামীকে বসতে বলে দুই হাতে আমাকে টানতে টানতে সোফার উপর ওর পাশে নিয়ে বসালে...তার পর উচ্ছ্বসিত কান্নায় জেতে পড়লো...আমারও চোখ অঙ্গুসঙ্গল—

প্রথম উদ্ভাসের বেগ একটু কমে এলে দু’জন্যরই চোখ গিয়ে পড়লো বেচারী স্বামীটির উপর...আমাদের খেরালই ছিল না ওর উপস্থিতি...আর বেচারার হতভব, মূর্তি দেখে দু’জন্যই হেসে উঠলাম এক সঙ্গে। কিন্তু টেরেসা জানতে, ওই শোষমানা বোচো স্ত্রীটিকে কেমন করে মানিয়ে নিতে হয়—

—“ও হোঃ পালেসি! ভুলেই গিয়েছিলাম তোমাকে বলতে, এই যে ভুললোকটিকে সামনে দেখেছো ইনি আমার বাবার মতো...বাবা বাবার চেয়েও বেশী বলতে পারি। অভিভাবকের মত, বন্ধুর মত, রক্ষাকর্তার মত ইনি যে আমার কত উপকার করেছেন তুমি জানো না...আমি সবকিছুই জন্তেই এঁর কাছে স্বীকৃতি, উঃ কি আনন্দের দিন আজ...দীর্ঘ দশটি বছর এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় ছিলাম।”

বাবার সঙ্গে তুলনা দেওয়ার সে বেচারার চোখ দু’টি গোল গোল হয়ে উঠলো...কারণ টেরেসা যদিও আজ নিখুঁত সৌন্দর্য আর অটুট যৌবনকে এতটুকু হ্রাস হোতে দেখেনি তাহলেও মাত্র দু’বছরের ছোটো আমার চেয়ে। তবু হাল ধরেই চললাম—

—“ঠিকই বলেছে, আপনার টেরেসা শুধু আমার মেয়েই নয়, সহোদরার স্ত্রী বন্ধুর ভালোবাসা সবই ওর কাছে পেয়েছি। ও সাধারণ মেয়ে নয়, ও একটি অমূল্য সম্পদ’তার উপর আপনার স্ত্রী...এইটুকু এক নিঃশ্বাসে বলেই আমি টেরেসার দিকে ফিরে বললাম—“কিন্তু তোমার শেষ চিঠিটার উত্তর আমি আজও দিইনি কারণ...”

—“আমি জানি তুমি ‘লেডম’ এ বন্দী ছিলে। ভিয়েনায় থাকতে তোমার পালিয়ে আসার আশ্চর্য গল্প শুনেছিলাম। তার পর প্যারিসে আর হল্যাণ্ডে তোমার খবর পেয়েছি। মাত্র সম্প্রতি আমি তোমার কোনো খোঁজ পাইনি কোনো পুরণ পাইনি, যেখান থেকে খোঁজ পাবো। গত দশটি বছর কেমন করে কেটেছে সেই সব গল্প তোমার কাছে করবো...তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। বাই বলা এখন কিন্তু আমি স্থবী। আমার প্রিয়তম পালেসি, ওকে আমি ভালোবাসি, পালেসিও আমাকে ভালোবাসে। মাত্র কয়েক মাস আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমার আশা আছে তুমি যেমন আমার বন্ধু তেমনই এক দিন পালেসিরও বন্ধু হোয়ে উঠবে...”

এই কথার আমি উঠে গিয়ে পালেসিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করলাম। আর বেচারী পালেসি—স্ত্রীর পিতৃসম, ভ্রাতৃসম বন্ধুসম সম্ভবতঃ প্রায়সীম এই নবপরিচিতকে কি ভাবে গ্রহণ করবে সেটা বুঝে ওঠা বাস্তবিকই ওর পক্ষে দুঃকর ছিলো। ওর দুঃদশা দেখে আমারই হাসি চেপে রাখা দায় হোয়েছিলো। কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত ঠাঁড়িয়ে থেকে অতি কষ্টে স্বাভাবিক হবার



# নন্দীবিলাস

কেশ তৈল

এম. এল. বসুমতী কোং প্রাইভেট লিঃ  
নন্দীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

টোকা করে আমাকে ওদের সঙ্গে এক পিরামা চকোলেট খাবার জন্ত অমুদ্রাধা জনিলে—আর পরক্ষণেই ভিতরে ঢলে গেল তার ব্যবহার করতে—বদিও আমার বিশ্বাস, নিজেকে একটু সামলে নিভেই গেল।

আমরা একা হোতেই টেরেসা হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে মনের উচ্ছ্বাসিত আবেগে বলে উঠলো—

—“প্রিয় আমার, প্রিয়তম আমার—জীবনের প্রথম প্রেমের স্বপ্ন আমার—আমাকে বুকে টেনে নাও—আরও আরও নিবিড় করে এতটুকু যেন ফাঁক না থাকে। আমি কি ভুলতে পারি? হৃদয়ে প্রথম প্রেমের স্পন্দন তো তুমি জাগিয়েছিলে—কৈশোরের স্বপ্নভরা রঙিন মায়াকে তো তুমিই রূপ দিয়েছিলে—আজ একটি বৃহত্তর জগৎ ফিরে গেতে দাও সেই কেলে-আসা মধুর কণ্ঠস্বর একটি কথা। কাল থেকে সহোদরার প্রীতি নিয়ে সবার সামনে তোমার স্নেহের দাবী করবো—কিন্তু সে কাল, আজ নয়। আজ শুধু তুমি থাকো আমার সেই চিরকিশোর প্রিয়তম—

না, না বকনা আমি করিনি—আমি ভালোবাসি আমার স্বামীকে, সত্যিই ভালোবাসি। তাকে আমি বকনা করিনি—করবো না। কিন্তু তোমার স্বপ্ন যে শুধু শুধুতেই হবে—আমার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন। তারপর—তারপর ভুলে যাবো সব—শুধু মনে রাখবো আমি বিবাহিতা—আর তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের অক্ষর বন্ধন। ও কি?—তোমার মুখ অত দান কেন?”

—“সেদিন আমি বন্দী ছিলাম—সেই সতেরো বছর আগে—তাই যুক্ত বিতঙ্গীকে ধরে রাখিনি। আর আজ আমি যখন যুক্ত তখন দেখি বন-বিতঙ্গী হোয়েছে যেচ্ছাবন্দিনী—অনেক দেবী হোয়েছে আমার। কিন্তু আজ তোমার ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ—বলো আমাকে তোমার কি ইচ্ছা? তোমার স্বামীর কাছে পূর্বকথার কোনো উল্লেখই যেন না করি তাই না?”

—“তাই-ই। পালসি আমার পূর্বজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সকলেই যা জানে তা’ ছাড়া যেন পলসিই আমি মাত্র দশ বছরে এসে অর্ধ, সম্পদ, ধাত্তি অর্জন করি। এ বকনা নির্দোষ নয় কি? বলো, কার কতটুকু ক্ষতি হবে এটুকু জলনার? অথচ এক জনের জীবনে এ-যে অনেকখানি। সবাই জানে আমার বয়স চকিশ—আমি তাই-ই বলেছি। বলো তো আমাকে কি অনেক বেশী বয়স দেখায় তার চেয়ে?”

—“একটুও না—বদিও আমি জানি তোমার বজ্রি বয়স বয়স।”

—“একথা আমাকে মগেই থাক্। কিন্তু ঠিক কবে বলো আমাকে চরিত্রের মত দেখায় কি?”

—“তার চেয়ে আরও অনেক কম দেখায়।”

—“আচ্ছা, ক্যাসানোতা এবার বলো তোমার কথা। তোমার টাকার দরকার আছে? এক দিন তুমি যা দিয়েছিলে আজ তা ফিরিয়ে দেবার মতো ক্ষমতা আমার হোয়েছে—হ্যাঁ প্রদত্ত। আমার হাজার পঞ্চাশেক টাকা আছে আর প্রায় সমান দামের হীরে আছে—একটুও সঞ্চয় করো না—ঈঙ্গিগিরি বলো, চকোলেট খাবার সময় হোয়ে এলো কে—”

আমি উত্তরে শুধু আর এক বার শুকে আমার বাহুভোরে বন্দী করতে বাচ্ছিলার এমন সময় চকোলেট এসে পড়লো। ওর স্বামী প্রথমে, আর পিছনে পরিচারিকার হাতে রূপার ট্রেতে তিনটি পেয়লা। খেতে খেতে আমরা তিন জনেই নানা রকম গল্প করতে লাগলাম। পালসি এবার আনকটা বৃচ্ছল আর সপ্রতিভ। কৌতুকভরা স্বরে পালসি বলল, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই যে আগন্তুকটির সঙ্গে দেখা সেই কাল রাত্রে থিয়েটারে ওরই কাছে ওর জ্বর পরিচয় চেয়েছিলো। তাই ও আশ্চর্য হোয়ে গিয়েছিলো খুবই। কিন্তু ওর ভদ্র মন আর সংবত ব্যবহার ইঙ্গিতও প্রায় তুললে না, কবে, কখন, কোথায় কেমন করে ওর জ্বর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে।

পালসির বয়স তেইশ বছর মাত্র—কিন্তু অপূর্ণ ওর লাগিতা আর অতি শোভন ওর কেশবিলাস—হ্যাঁ পুরুষের পক্ষে সৌন্দর্যটা একটু মাত্রাছাড়াই বলতে হবে। আর ওর বৃচ্ছল ব্যবহার আর চকস আমোদপ্রিয় স্বভাবের জন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে ভালো লাগলো—ভারী ভালো লাগলো।

প্রায় দশটা পাগান একে একে অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের আগমন শুরু হোলো রিহার্সালের জন্তে। আমি লক্ষ্য করলাম টেরেসার সহজ সুন্দর ব্যবহার প্রত্যেকের সঙ্গে—কথচ স্বাভাবিক মধ্য।

তুঁজন অভিনেত্রী শেষ অবধি থেকে গেলেন। টেরেসার কাছে তাঁদের আহ্বানের নিমন্ত্রণ। তার মধ্যে লা কন্টিনেন্সি নামে অভিনেত্রীটি আশ্চর্য সুন্দরী—কিন্তু তখন আমার সমস্ত মন টেরেসাতে আচ্ছন্ন। আর কারো দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার মত অবস্থাই ছিল না আমার।

আহ্বানের শেষে এক জন মঠবাসী এসে উপস্থিত হোলেন আমাদের আসরে। তাঁর নাম আবে গামা। শুঁকে আমি চিন্তাময় রোমে থাকতে। উনিও আমাকে দেখেই চিনতে পেরে এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর কাছ থেকে পুরানো বন্ধুদের সব খবর শুনে লাগলাম—কিন্তু হঠাৎ আমার সমস্ত মনটা চমকে উঠলো একটি ছেলেকে দেখে। বছর পনেরো বয়সের একটি ছেলে ঘরে ঢুকে সকলকে অভিযান জানিয়ে এগিয়ে এয়ে টেবেসাকে চুম্বন করলো। একমাত্র আমিই ছেলেটির কাছে অপরিচিত। কিন্তু আশ্চর্য আমি একাই হইনি। টেরেসা তখনই ওকে আমার সামনে এনে বললো।

—“এটি আমার ভাই।”

টেরেসার ভাই! অথচ আমার জীবন্ত প্রতিকৃতি—এতটুকু পার্থক্য নেই—কৈশোরের কমবয়সীটুকু ছাড়া। তখন বুঝলাম, তখন জানলাম ওকে—প্রকৃতির স্বাম্যধরালীপনার এর চেয়ে চরম আর কি হতে পারে?

আমার মনে হোলো আমাজন তুঁজনীর প্রথম পরিচয়ের এতগুলি সাক্ষী টেরেসা না রাখলেই ভালো করতো। আমি বত বার ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলাম তত বারই ও আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। আর সেই কিশোরটি এমন একাধা তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো যে টেরেসা ওকে কি বলছে তা ওর কানেও গেল না। আর যরও স্বাভাবিক এক বার আমার মুখে আর এক বার ঐ কিশোরটির মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। যে কোনো লোক মাথায় এক কৌটা বুদ্ধি থাকলেই ঘরে কেলেতে পারবে কিশোরটির বাপ মায়ের পরিচয়।

কথাবার্তা ওর অকি মাজিত আর সব চেয়ে বড় কথা হোলো ও খা কইতে জানে। তাছাড়া কি শোভন ভদ্র ব্যবহার! ওর মা ললে সজ্জিত ওর একমাত্র সঙ্গী।

—“তুমি ওর ‘হার্পিসিক্ট’ বাজনা শুনো...সত্যিই শোনবার ত। যদিও ও আমার চেয়ে আট বছরের ছোটো তবুও অনেক লো বাজায় আমার চেয়ে।”

সত্যি কঠিন সমস্তার হাত এড়িয়ে যেতে মেয়েরা যত সহজে পারে পুরুষরা কিছুতেই পারে না।

সবাই বিদায় নেবার পর ঘরে টেরেসাকে একলা দেখে অভিনন্দন। নালাম, অমন সুকুমার দর্শন সহোদরের জন্তে।

—“ও তো তোমারই...আর আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ। ন আছে ডিউক অর কার্লোপিনানোর কথা? তিনিই ওকে মুগ করেছেন। মনে পড়ছে তোমার ‘রিমিনি’ থেকে যিনি আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর আশ্রয়ে? ছেলে জন্মাবার পরই ওকে রোটাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নয়টি বছর ও সেখানে ছিলো। উক ওকে সিজার ফিলিপ ল্যান্ডি এই নামে দীক্ষিত করেন। বরাবরই আমাকে বড় বোনের মতই জানে। কিন্তু আমার ছদয়ে ষ্ট আশার ক্ষীণ আলো আমি নিবতে দিইনি...আমাদের আবার ৥ হবে আবার মিলবে তুমি আর আমি...আর তখন তুমি তোমার পানকে স্বীকার করে তার জননীকে দেবে সহস্বস্তিগীর সম্মান।”

—“কিন্তু এখন তো তুমিই সে পক্ষ বন্ধ করেছো টেরেসা?”

—“হায় রে, আমরাি ছুঁতগা ছাড়া কি বলি? ডিউকের মৃত্যুর বখান আমি নেপল্‌সে আসি তখনও আমি বিস্তবান। আর মার ছেলেও বিশ হাজার টাকার মালিক। আমার আর পালেসির কোনো সম্ভাবনা না হয় তবে আমার বা কিছু সবই ওর—”

আমাকে টেরেসা ওর শোবার ঘরে নিয়ে গেল। আসমারী

খুলে দেখালে হীরা মুক্তা আরও নানা মূল্যবান রত্ন, তাছাড়া প্রচুর রূপার বাসন।

—“সিজারিনাকে আমার দাঁও টেরেসা—ওকে আমি ছনিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।”

—“না, না, না, অস্ত কিছু বলো, আর কিছু চাইও, আমার ছেলেকে নিয়ে নিও না। জানো, ভয়ে আমি কোনো দিন ওকে ভালো করে চুমা খাইনি। আচ্ছা বলো তো ভেনিসের লোক কি মনে করবে যদি জাখে ক্যাসানোভা আবার কিশোর হোয়ে ফিরে এসেছে...”

—“তুমি কি ভেনিসে বাবে ঠিক করেছো?”

—“হ্যাঁ, আর তুমি?”

—“বোম তার পরে নেপল্‌স।”

আমার জীবনে এক চরম সুখের দিন। আমার সিজারিনা...ছদয়ের অনেকখানি জায়গা ভুড়ে নিলো সে আপন স্বভাকে...শুধু সম্ভবান্নেহে নয়। ওর দুইমুণ্ডেরা স্বভাবে, ওর সরল কৌতুকের উচ্চ মধুর হাসিতে—ওর এক বলক দর্শন-হাওয়ার মত উজ্জ্বল প্রাণের খুশীতে...ও যে কী মায়ী লড়ালো জানি না।

ওর ‘হার্পিসিক্ট’ বাজিয়ে মজার গান শোনানো কখনও ভুলবো না—যরশুদ্ধ লোকের হাসতে হাসতে দমবন্ধ হবার যোগাড়। আর টেরেসার দৃষ্টি শুধু আমার দিকে এক বার আর সিজারের দিকে এক বার...কি ভাবভরা তম্বর দৃষ্টি! অথচ ওরই মধ্যে দেখছি যনিষ্ঠ্যহোয়ে বসে পালেসিকে মিটি করে আদর করে বলছে—“বাদের সবচেয়ে ভালোবাসি তাদের সারিগেয়র চেয়ে স্বর্গস্থলও বড় নয়...”

বিচিত্রকুণ্ঠী! কিন্তু ওর হলমার ব্যথা আমি বুঝি।

[ক্রমশঃ।

—অনুবাদিকা শান্তা বসু।

## গতকাল : আজ

অর্ণব সেন

গতকাল ভোরে ছিল বৃষ্টির আকাশ

রূপালী বস্তার মতো বৃষ্টির দিন

প্রাত্যহিক মন ছিল নেশার রঙিন

আহা, জল লেগে কাল কি সবুজ হয়েছিল বাস!

কাল বৃষ্টি জলে ভিজে তুমি ছিলে কিছুটা রক্তিম

ভিজে চুল, ভিজে মন, প্রীবাটি বক্সিম,

কি কথা কালকে ছিল এখন বলো না

কাল তো বললে না।

আজকে সকাল এলো অন্ধকার চোখের মতন

আকাশে পাখিরা নেই চুপচাপ ঘন ঝাউঘন,

ঘুম নেই, ঘুম নেই, সাগরিকা মনে

কি পাবে এখানে এই—এই ঝাউঘনে?

তোমার অবুঝ চোখে বা ছিল গহন

বলো তা আমার আজ চুপি চুপি এই ঝাউঘনে;

কি কথা বলবে বলো এইখানে চোখ মেলে বাসে

বিগত ভোয়ের স্বপ্ন এখনি কি স্থান হয়ে আসে?

মহাকবি ক্ষেমেস্তের

# কলো-বিলাস

[ পূর্ণপ্রকাশিতের পর ]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

যে-সব বারান্নাদের মুচকি হাসিতে ছাই করে, যে সব গণিকারা পূজাপাঠে মন দিয়েছেন, এবং যেসব শ্রমণারা বৃন্দা, তাঁরা কুলজীদের খন ও শীল হরণ করেই...চরেন। ২০

এক দল ধূর্ত রয়েছেন, বীদের কাজ জড়ভরত নায়ক হয়ে বেড়ানো। তাঁদের বাণী,—

“বিধবাটি তরুণী হে; সম্পত্তিও বিস্তার। আশনার মতই একটি দিব্য প্রেমিক তাঁর প্রাণের কামনা।”

ততঃপর ধূর্ত ভক্ষণ করেন তাঁর সর্বস্ব। ২৪

এক দল ধূর্ত রয়েছেন তাঁরা কাকশিল্পী। প্রত্যাহ বেতন নিয়ে কাজ করেন। কমে বিদ্ব-ঘটানোই তাঁদের বিলাস। তাঁদের বলে... “কাল-চোর।” ২৫

এক দল ডাকসাইটে জোকোর আছেন, বীদের ব্যবসায় ক্ষেত্র হচ্ছে বিদেশ। তাঁরা পাশা পাতেন, নানান রকমের গণনা করেন, তার পরেই দেখান স্ননিপুণ হাত সাবাই। ২৬

এক দল ধূর্ত আছেন, তাঁদের প্রাহুর্ভাব হয় ভোজনের জন্তেই। মদ, পাশা, বেতা...এই পথেই বহু ব্যয় ঘটিয়েছেন। তাঁদের বলা হয় “গৃহচোর।” সাধারণতঃ তাঁর বহুজন গৃহদাস। ২৭

আর বঙ্গগণ, জেনে রেখে—যিনি বলে বেড়ান—  
“শাস্ত্রগুলো কৃত্রিম, অসত্য; কেউ কি কখনো সাক্ষ্য পরলোক দেখেছে?”

তিনি একটি শঙ্কাহীন নিরঙ্কুশ মন্ত-মাতঙ্গ। ২৮

আর এক দল মাছুষ আছেন, তাঁদের নাম “লাভ-চোর।” এঁরা মহাপণ্ডিত। সন্ধানে করেন সেই সব মাছুষদের, বীদের বেশী লাভের লোভটি অত্যধিক। অদৃশ লাভের লোভ দেখিয়ে, তাঁদের দিয়ে ঋণ করান; আর তার পরেই চুরি করেন ঋণ-ঘন। ২৯

“ভ্রাতৃ-চোর” নামীয় আর এক দল ধূর্ত আছেন। তাঁদের আখ্যা হচ্ছে “ভট্ট।” তাঁরা জর-ঘন-ঘন-ঘন। সর্বদাই সর্বদ-ভূক। বিচার-গৃহ-সমূহের মাঝখানে বাড়বায়ির মত আসেন। ৩০

“স্বধ-চোর” নামীয় আর এক দল ধূর্ত আছেন। তাঁরা সুদ্রব। ঐশ্বর্য-পদের তাঁরা ভ্রমর; বিপদের দুঃসহ বাতাস বইলেই তাঁরা মুখ উলটিয়ে বসে থাকেন। লক্ষ্মীর লতাই কেবল তাঁদের আহ্বান জানান। ৩১

“কর্ণ-চোর”—নামীয় আর এক দল ধূর্ত আছেন। এক লাখ হাসির কথা আওড়ে কর্ণ-রথ বিধান করেন তাঁরা। এমন সব

কাজের কথা ফলিয়ে বলেন, যার সবটুকুই অপূর্ণ, করনাতোও যার ধারণা করা অসম্ভব। ৩২

“স্থিতি-চোর”—নামীয় আর এক দল ধূর্ত আছেন। চতুর তাঁদের বচন। দোষগুলোরও গুণ গেয়ে তাঁরা শ্রদ্ধা উৎপাদন করে ফেলেন দোষগুলোর প্রতি। সে এক অভিনব সৃষ্টি! আচারের বাংলাই তাঁদের নেই। ৩৩

“গুণ-চোর” নামীয় আর এক দল পথম ধূর্ত আছেন। বিপুল স্বত্ব-সহকারে তাঁরা পরের গুণগুলিকে চোকে ফেলেন, নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রচার করেন নিজের গুণ, সম্মোহিত করে ফেলেন মূঢ়দের সরল হৃদয়। ৩৪

আর এক দল ধূর্ত আছেন। তাঁদের বলা হয় “বৃত্তি-চোর।” প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে তাঁদের বেশী সময় লাগে না। দ্বিষ্ট অল্প কেউ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠছে দেখলেই হিংসের তাঁরা যেটে পড়েনা পরের ভালো তাঁদের নয় না। খলতার বৈচিত্র্য দেখিয়ে তাঁরা অল্পট উপায়ে তাঁদের নাশ করেন। ৩৫

আর এক দল ধূর্ত আছেন, লম্ব দম বা ডক্তির বাংলাই তাঁদের নেই; অথচ তাঁরা দেখান, যেন কতই না তাঁরা পালন করছেন তাঁর ব্রত। প্রতিপত্তির জোরেই তাঁরা হঠিয়ে দেন সাধু-সঙ্কল্পদের তাঁদের বলা হয় “কীর্তি-চোর।” ৩৬

“দেশ-চোর” নামীয় আর এক দল ধূর্ত আছেন। তাঁদের মুখে অহরহঃ সুনতে পাওয়া যায় দেশ-দেশান্তরের রম্যাক্তিরম্য বর্ণনা;—

“ওঃ, সেখানে মশায়, কী ভোগ-বিলাস!

উঃ, কী না ঘটছে সেখানে!”

কথায় ভুলিয়ে তাঁরা পত্তর মতন বিদেশে চালান করেন দেশের মাছুষদের। ৩৭

এমন ধূর্তও আছেন, যারা হাসি-খুশীর ভিতর দিয়ে অথবা অনেক রকমের সৌখিন পাণ্ডিত্য দেখিয়ে অথবা নর-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে, পরের বাড়ি সৈন্য কাটিয়ে দেন আনন্দে। তাঁরা “প্রকৃতিব্যাপার চোর।” ৩৮

আর আছেন “বিতের” দল। নিজের বহু বৈভব তাঁরা খেয়ে ওড়ান। তারপর পরের বৈভব কী করে কমান্তে হয়, ওড়াতে হয়, ক্ষয় করতে হয়, সেই ব্যবসারে তাঁরা দীক্ষালাভ করেন। হরদম তাঁদের মুখে লগে থাকে বেশাগৃহের তৃপ্তি। তাঁরা চিত্তনীর পদার্থ। ৩৯

আর এক দল ধূর্ত আছেন, তাঁরা নিঃস্পাহ-নিরোগী। অতি-চিন্তার আড়ম্বর দেখিয়ে তাঁরা বিত্ত গ্রহণ করেন না; আগে ভাগেই বিকার কঁদে বসেন। এঁরা নিরমসলিলের মাহ। সর্বথা বিহাৰ্ণ। ৪০

কিরিওহালা পাশ। ঘরে ঘরে তাঁরা পণ্য নিয়ে বেড়ান। তে ক'রে বা দেন, তা কেবল হুঁকো কাচ। ৪১

ধাঁরা ছন্দাঘুৰ্ত্তী, থানার ফেলে দিলেও ধাঁরা সাধুবাদ করতে পড়েন না, বৎসগণ, জেনে রেখো, তাঁরা মধুর বিষবৎ; অন্তরে প্রবেশ রে হরণ করেন সর্বদা। ৪২

আর রাজদাসেরা ধূর্ত। তাঁরা বিজনে সেবকদের ডেকে নিয়ে লেন—

“রাজা আপনাদের উপর প্রসন্ন, আপনাদের গুণগান রছিলেন।” তারপরেই লোঠেন। ৪৩

“মহাশয়, স্বপ্নে আমাকে দর্শন দিয়েছেন লক্ষ্মী দেবী। পদ্ম ফুল ার হাতে। দেখলেম, দেবী প্রবেশ করলেন আপনার গৃহে।”

“মহাশয়, মাসাবধি আমি উপবাস বয়েছি। তুষ্টি হয়ে স্বী দেবী আদর করে আমায় বললেন—“যা রে আমার ভক্তের কাছে, সেই তোকে সব দেবে।” ইত্যাদি স্বপ্নতত্ত্বে ভুলিয়ে সরল মুখের গৃহে গৃহে, কত ধূর্তই না নেচে বেড়ান! ৪৪

রাজধানীতে বিপ্লব বেগছে বা নগরোদয় বজ্র হাছে বা বাগোৎসবে ভিড়ে ভিড়;...শত্রু হলেও সেখানে উপস্থিত হয়ে যান বৈদ্য ধূর্তের দল। একটাই মাত্র তাঁদের উদ্দেশ্য;...লুট করে ওয়া-হওয়া। ৪৫

কতকগুলি বিপণ্য প্রকারের মানুষ আছেন। বৎসগণ, তাঁদের সাবধান!—

(১) বন্ধুবান্ধবের মনের আসর বসেছে, অঞ্চ দেখবে, তাঁরা সম্পন্ন করছেন না।

(২) রাত জাগার দল।

(৩) ভাবে বিভোর হবার দল।

(৪) সেবার সোভে যেন তাঁরা মুখ বাড়িয়েই আছেন; কিছু কিছু করবার জগে যেন সঙ্গপ্রস্তুত।

(৫) তাঁরা কথা বললে উত্তর বেন না; যদিই বা দিলেন অস্পষ্ট নায় তাঁদের গগন গুঞ্জন।

(৬) চক্ষু-লজ্জাহীনের দল।

(৭) তাঁরা উচ্চাসে ক্ষণে ক্ষণে ঘন ঘন কাঁপেন এঁরা সেই চোর। ৪৬-৪৭

আর সাবধান তাঁদের, ধাঁরা—

(১) প্রার্থনা করেন পরিতৃষ্টির প্রার্থনা;

(২) ঘন ঘন তোলেন সগর্ভ গর্জন; এবং—

(৩) ধাঁরা ঘোর অপলাপকারী। এঁরা পাশ। শব্দার এঁরা দর। ৪৮

চোখের সামনে থেকেও চোখের আড়ালের কাজগুলি যিনি ঘন;

ধাঁরা কাছে করা-না-করা, সত্যি-মিথ্যা সব সমান;

ব'লেও যিনি বলেন, ‘না এমন কিছু তো আমি বলি নাই’;

ব্যবহার ধাঁরা নির্বিকার;

পুরুষদের মধ্যে তিনি পরম ভর-স্থান। ৪৯

মিন্মিনে নকল মুগ্ধ-মুগ্ধ ভাব নিয়ে, মেয়েলি-চণ্ডে কথা কইতে কইতে, মেয়েদের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে করতে, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ধাঁরা বশুর মত ঘুরে বেড়ান, তাঁরা সাক্ষাৎ কামদেব,...কিন্তু গৃহে ধূর্ত। ৫০

এমন মহাঘাও দেখতে পাবে,...সরুদাই ধাঁরা মাথাটি নীচু, চুটি নীচু; বৈভব থাকলেও গীত ময়লা, কাপড় ময়লা; বসে বসে ভাঁড়ারঘরের হিসাবপত্র লিখছেনই তো লিখছেন। ভেবে তখ তো বৎসগণ, এমন মহাঘা ভাঁড়ারঘরের ইন্দ্র কি না? ৫১

যে মানুষ প্রীত-বেক্তার ভবনে গৃহদাস হয়ে সাবাটি দিন কাটান, অঞ্চ নিজের ঘরের কথার পক্ষমুখ...সেহেন মহাঘাটিকে চিনে রেখে। তিনি চর। সমস্ত আত্মা দিয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করাই বিষয়। ৫২

নিম্ননীর কাজ, বহু দণ্ডার্থ কাজ...তাতোও যিনি বেবাক ঠকান; জীবিকা-নাশের ভয় দেখিয়ে যিনি ব্যবস্থা করেন নিজের ভোজনের;

তাঁর কথা আর বোলো না। তাঁর দয়ার রাশিচক্রও স্থির হয়ে যায়। ৫৩

যা কিছু গোপনীয় সমস্তই ভালো ক'রে দেখে নিয়ে এক অতি সহজে তার সমস্ত রহস্য জেনে নিয়ে, সেই মুঢ়কেই ধূর্ত আবার শিলে কোটেন। ৫৪

রাজবিরুদ্ধ কোনো ভ্রবা, বা জালমুদ্রা, বা কুট দলিলাদি বা অন্য কিছু ঘরে ফেলে দিয়ে ধূর্ত সরে পড়েন অন্তর্য অলঙ্কো। তার ফল ফলে। ধনীরা নিপাত যায়। ৫৫

মানুষ ক্ষুদ্রই হোক বা ক্ষীণই হোক...যদি একবার সে ঘনের আশ্রয় পায়, বা ঘরে যদি তার অর্থাগম হয়, তাহলে দেখবে, তার হাতে যেন আপনা হতেই উদয় হয়েছে অস্ত্র বিব বা পাশ। তিনি ধম হয়ে ওঠেন। ৫৬

লজ্জা যে নায়কের গন, অথবা যিনি কুলীন, অথবা ধাঁরা শুদ্ধতা সীল ও মর্যাদা, বহু সম্মানিত প্রায়ই দেখা যায়, সগর্ভ নারীদের সহায়তায় তাঁকে মেয়েমানুষ বানিয়ে ফেলেছেন ধূর্তেরা। ৫৭

আকৃষ্ণার দেখা যায়,...স্বামীরা প্রবাসে গেছেন,—আর ধূর্তেরা লুণ্ঠন মুগ্ধা বধূদের,...মেকী প্রণয়-বজ্রের নির্মম মুদ্রা দেখিয়ে, অথবা না দেখিয়ে। ৫৮

জনবহুল স্থানে ধূর্তেরা অঙ্গে অভরণ চড়িয়ে, ভববেশে, হেলাভয়ে ঘুরে বেড়ান, এবং অচঞ্চল-হস্তে হরণ করেন সকলের ধন। কেউ যদি দেখে ফেলেন, অমনি হাস, অন্তর্য...লাভ। ৫৯

ধূর্ত দেশান্তরে যান, সাড়ম্বরে ঘর জাঁকিয়ে বসেন। বিশ্বাস ক'রে লোকে তাঁর হাতে পছিত বেগে যায় লক্ষ লক্ষ টাকা। ক্ষীণ হয়ে ওঠেন ধূর্ত, পূর্ণ হয় তাঁর গৃহ, পূর্ণ হয় কুন্ত। তারপর বহুর ঘূর্তে না ঘূর্তেই, ধূর্ত দেন শিটান। ৬০

আবার কোথাও দেখবে, এই ধূর্তগণ শত্রুদ্রব্য রাজপুত্র সঙ্গে বসে গেছেন। কী তাঁদের পরিচয় পরিচয় মিহিন ধূতি! বর্ণালঙ্কারের কী ঘনঘটা অঙ্গে! সস্ত্রমভরে লোকজন এসে দাঁড়াচ্ছে, আর তিনি পূজা কুড়োচ্ছেন ঘরে ঘরে। ৬১

ধর, কোথাও উৎসর্গ-করা দেশবৃষভ বা পুণ্যছাগল ছাড়া রয়েছে। ধূর্তেরা কি করবেন জানে! সেগুলোকে বিক্রী করে দেবেন।

আর এমনও ঘূর্ণি আছেন যারা সেগুলোকে কিনবেন, দুখে পাচবেন,  
আনন্দে লাফাবেন। অর্থ লাভ হয়েছে তো! ৬২

মহাশয়-ব্যক্তিদের ঐশ্বর্য যে ধূর্ত কৃষ্ণ দ্বারা পরিত্যাগ করে চলে  
যান, বিস্ত্র হলেও সেই ধূর্তকেই, --আহুয়ে দিয়ে যায় বিস্ত্র, সভয়ে  
স্বপ্নে। ৬৩

নিঃসার তুর্কানাথ লেখাপড়া ক'রে দিয়ে ধূর্ত গুছিয়ে কেলেন  
রাশি রাশি পণ্য। তারপরে তিনিও বেরলেন দেশে-বিদেশে,  
আর ধনিকরাও তলিয়ে গেলেন হাজারে হাজারে। ৬৪

বিশেষে বখান বাস করেন, তখন প্রচার করে দেন, গয়া-গঙ্গা  
ইত্যাদি ভীষণাক্রম্য তিনি চলেছেন। মৃতবন্ধুদের নামে পুজো  
দিতে তৈজসপত্রে, অর্থ ইত্যাদি হাতে নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত  
হয়ে যান মুচেরা। এবং ধূর্ত সেগুলিকে গ্রহণ করেন। ৬৫

কোথাও লেখবে পণ্য-রমণী শ্রবণের ধুম পাড়িয়ে দিয়েছেন  
মুখদের, আর চুরি করছেন তাঁদের গায়ের মহামূল্য পোষাক।  
তাঁরই হাতে আবার দেখবে, অচল রূপেরা গুঞ্জে দিয়ে ঠকিয়ে  
নিশিপালন করে গেলেন ধূর্ত। ৬৬

কোথাও দেখবে, বোবা বা কালা কোনো বণিককে মালখানায় পূরে  
যেখে, ধূর্ত লহমার সরিয়ে কেললেন তাঁর বহুমূল্য আদর্শ মাল। ৬৭।

কিঞ্চিৎ পরিচয়,  
কিঞ্চিৎ প্রগলভতা,

কিঞ্চিৎ কল্পনা,  
কিঞ্চিৎ কলহ,  
কিঞ্চিৎ মায়গা—

এইগুলিকেই সাক্ষী করে বিশ্বজয় করেন সর্বজ্ঞ ধান্নাধার। ৬৮

যেকী বড়লোক তিনি সাজেন;  
পেটে পুঁথির বিস্তে, অথচ বচনে বরান জ্ঞান;  
বানানোর তিনি বীর;  
চপল একটি চতুর্মুখ।

এই তোলা ধূর্তের প্রকাশ। ৬৯

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে কীপাতে কীপাতে সজ্জতে তিনি সকলকে  
জানিয়ে দেন--এখন যে যার ঘরে বিদায় হও। তার পরো  
মহাধূর্তটি চলে গঠেন খেজাচারী, দিগন্তরে অন্তর্ধান হন--মহা  
দূর্জিত। ৭০

গুরুজনদের সামনেও অবশ্যে ধূর্ত বলে যান "একশ বছরের পুরো  
একটি মাত্র আমসকী খেয়ে শ্রীপদত থেকে আমি এসেছি। আমি  
শ্রবণ হচ্ছে শুভ-সুচনা।" ৭১

বংশগণ, তোমাদের কাছে সংক্ষেপে আজ আমি বর্ণনা করলু  
চৌবটিটি মায়। কে জানে, লাখ লাখ কত রয়েছে ধান্না-মহাধার  
মায়। ৭২

ইতি কলাবিলাসে নানা-ধূর্ত-বর্ণনঃ নাম নবমঃ সর্গঃ।

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )

## পালতে মাদার

### শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য

কষ্টকর্মের লতাগুয়ের চূড়ে  
কে তুমি উঠেছ ফুটে?  
প্রভাত-অরুণ বর্ণ তোমার সুরে,  
ধুলার ধরণী রূপটৈবভব লুটে;  
তোমারে চিনেছি পালতে মাদার অরি।  
দিব্যাক্সনা, রূপসী-মহিমময়ী।

তুমি স্বরগের পারিজাত মন্দার,  
ধুলার ধরায় কেন অভিনায় তব?  
নন্দনরাণী শচীর কঠহার,  
কা'র অভিলাশে কষ্টকবোনি লত?  
মম মালক ধস্ত করেছ তুমি,  
ধস্ত ধরায় সমীর তোমারে তুমি'।

শাখার শিখরে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটি'  
রক্তাশ্রবা, রক্তাঙ্গিনী বালা,  
কোকনদকুচি দল দিয়ে ভরি মুঠি  
ফাস্তনে আজি বিস্ত্র করিছ ডালা  
সারাদিন কেন তরুতলে বাও বরি।  
উভঙ্গা হ'রেছ কা'র কথা মরি' মরি'!

অজের বিলাপে ভরি গেছে ত্রিভুবন,  
অমৃত করেছে বিবের বৃষ্টি হায়।  
রাজাধিরাজের হরিয়া বৃকের ঘন,  
কোন্ বেদনায় অন্তর তব হায়?  
যে ভূমে পড়েছে লুটায় ইন্দুমতী,  
এসেছ কি তা'র জুড়াতে হৃদয় সতি?

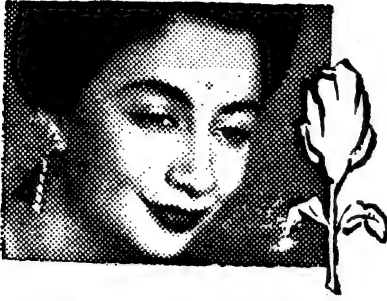
কষ্টকর্মের আছিল শরনতল,  
মরমী অমরী ছাড়ি এলে অমরায়,  
দুখের বহ্নিহনে দীপ্ত দল  
আজও হেরি রাঙা মরি সেই বেদনায়।  
অগ্নি পারিজাত, অগ্নি মন্দার মোর,  
ইন্দু-মরশে অপরাধ কিবা তোর?

কুটিল নিয়তি করেছে কুটিল লীলা,  
তুমি দরদীয়া স্বরগ ভোগি এলে;  
কষ্টক পুরে কুন্তলাধনলীলা,  
কুসুমযাত্রা দলগুলি দিলে মেলে।  
দুখের এ ভূমি, কঠিন ধরণীতল,  
এ নহে তোমার বেগো আবাস স্থল।

অগ্নি পারিজাত, অগ্নি মন্দারবালা!

মম কঠোর লত সজীভমালা।





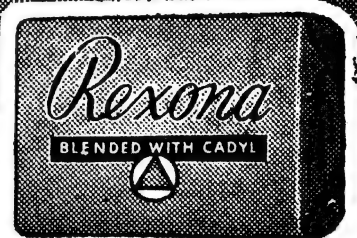
ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেখোনা

ব্যবহারে ফুটে উঠবে



রেখোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ স্বকের স্বাস্থ্যের  
জগে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার  
স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তুলবে।



একমাত্র ক্যাডিলমুক্ত সাবান

রেখোনা প্রাইভেট লিমিটেড, এম. পুর্ন, ভারতে প্রস্তুত

R.P. 149-X52-23



## পঞ্চম পর্বে

ভোব মুখোপাখ্যায়

১০

কনুইটির বোব-চাকলাদার যেমনটি আশা করেছিল, তেমনটি হল না।

ক্রমশ ভিতরে ভিতরে একটু উতলা হতে থাকল তারা। রণবীর বোব না হোক বিজেন চাকলাদার বটেই। সপ্তাহে দু'তিনবার পালা করে হেড আপিসে আনাগোনা করছে। আখ্যাস পাচ্ছে না এমন নয়। কিন্তু সেটা খুব জোঝালো লাগছে না এখন। চড়া মাস্তুলে এমন নিশ্চিন্ত আখ্যাস সর্বত্র মেলে। হেড আপিস থেকে লেখালেখি চলছে। এখান থেকেও জবাব যাচ্ছে। এই মাহুলি আপিসিচালের রীতি জানে।

নিরুপায় বিস্মিত আর অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা। এ ছাড়া পথও নেই আর। ইচ্ছে করলেই একটা সোরগোল ফেলতে পারে তারা, হেঙুলেস্ত করতে পারে। কিন্তু তাতে করে যে জালে জড়িয়েছে, সেটা আরো জটিল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। যা খেতে অভ্যস্ত নয় বলেই প্রথমে গর্জে উঠেছিল। কিন্তু তুলিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল একটু। অনবধানে ওই যা স্মরণবাহী হতে পারে। কারণ সন্দেশের দ্বারা কনুইটির বাতিল করাটাই শেষ অস্ত্র নয় চীক ইঞ্জিনিয়ারের হাতে। অপরূপ চলে তাকে ঘাঁটতে গেলে যে ব্যবস্থার এগোতে পারে সে, তার রাস্তা সোজামুজি গায়দের দিকে।

অবশ্য এ ধরনের ভাবনা শুধু বিজেন চাকলাদারেরই। রণবীর বোব অত ভাবে না। ভেক্সালের দায় তারও জানা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে টাকার বাহুও জানা আছে। তা ছাড়া গো-ডাউনে এখনো আর ভেক্সাল নিয়ে বসে নেই সে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী চৌকস হলে গো-ডাউনে পাহারা বসাতো সর্বাঙ্গে। তবু চুপ করে আছে সে-ও। কারণ, ব্লকের সেই কটিলটাও এখনো ঠাঁ করেই আছে তেমনি। চালে ভুল হলে ওটা বা গ্রাস করেছে, তার থেকে অনেক বেশি উগরে দিতে পারে।

গো-ডাউনে বাবু পাহাড়, পাথর-কুঁচির পাহাড় আর সিমেন্ট বস্তার পাহাড়গুলো যেন নিঃশব্দ অনাবরণের বোঝা বইছে একটা। বিরাট অপচয়ের সম্ভাবনার স্তূভ। বোঝা নিঃশব্দ ছাড়ছে বেন। সর্বত্র পরিত্যক্ত শূন্য অহুভূতি একটা। কর্মতৎপর সাদৃশ্য নেই কোথাও। রণবীর বোব সেখানে এসে পাঁড়ার একসময়। দুর্ভাগ্য ক্রোধে লেহের প্রতি বন্ধ ভরাট হতে থাকে।

চিঠি পড়ছে। কলকাতার আড়ত থেকে চিঠি। নতুন বারতা কিছু নেই। হেড আপিসের প্রীতিবদ্ধ শুভাশুখ্যারীদের নির্দেশ, চীক ইঞ্জিনিয়ার নরম না হলে তদবীর তদারক করে বিশেষ অবধি হচ্ছে না। অতএব, ইত্যাদি।

অস্বস্তি কটুকু করে বসে বসে পাইপ টানতে লাগল। তেলতেলে মুখে লাগতে আভা। বিজেন চাকলাদারও চিঠি পড়ে ভুল কৌতুকালো। চিঠিখানা আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল তার সামনে।

পাইপ মুখে রণবীর ঘোষ অনেকটা যেন নিজের মনেই বলল, চীক ইঞ্জিনিয়ারকে নরম করার পরামর্শ দিয়েছে।

বিস্তৃত মুখে বিজেন চাকলাদার জবাব দিল, তা তো দিয়েছে, কিন্তু লোকটা যে নিরেট পাথর একখানা, তাকে নরম করবেন কি করে?

ঠিক কানে গেল না বোধ হয়। অথবা শুনেও শুনল না। ঘোষ ভাবছে কিছু। আর পাইপ টানছে। অনেকক্ষণ বাদে বলল, কিন্তু সেরকম চেষ্টাও তো করিনি।

লোকটার এ ধরনের ভাব-ব্যতিক্রম চেনে বিজেন চাকলাদার। মগজে নতুন কিছু মতলব এসেছে বা আসছে। ও মগজের প্রতি আস্থাও প্রচুর। অবশ্য যদি সেটা নারী-বিবর্তিত পথে চলে। মুশকিল আসানের জগৎ পেল বেন।

নিজের অজ্ঞাতে চিঠিটা দুই হাতের চোঁটের তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে রণবীর ঘোষ। তালগোল পাকিয়ে চলেছে আরো। অন্তঃক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ। সামনে দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি আটকে আছে স্থাপুর মত। চোখ পড়ল। নিশানা করল। ছুঁড়ে মারল ঠক করে। চাপ করে শব্দ হল একটা। টিকটিকিটা মাটিতে পড়ল। গান্ধী লাগেনি, আচমকা আক্কেল হয়ে খাবা ফসকেছে। সেই এক কথাই বলল আবার রণবীর ঘোষ, সেরকম চেষ্টাও তো করিনি আমরা তাকে নরম করার, করেছি?

জবাবের প্রত্যাশায় নয়। নিজের মনেই পর্যালোচনা করেছে কিছু। ভুল হয়েছে বই কি। সুপারিশ করতে গিয়েও উপেক্ষা দেখিয়ে এসেছিল। নতুন হরনি বহঃ একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে এসেছে। গোড়ায় গোড়ায় হত না এমন ভুল। ভিতরের লজ্জা বিনয়ের আঁচে তরল করে নিতে পারত রথন তখন। মর্মান্বয় শিখরে বসে ডায়ের ওই অল্পবয়সী ওপর অল্যাটিকে প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধান না দিয়ে ভুল করেছে। নইলে ফন্দিফিকির জানে বই কি। পাথর নরম করারও ফন্দিফিকির জানে।

এবারে মনভিজ্ঞানো আবেদন নয় আর। নিরভিমান সমর্পণ। সেও লক্ষ্যস্থলে নয় সরাসরি। মাটি চুইয়ে শিকড়ে পৌছানো মত এই সমর্পণের ধারাও চীক ইঞ্জিনিয়ারের দরবারে পেশ করা নয়ন চৌধুরীর মারক। বলল, কিসির আসামীও নিজের হয়ে ছুঁটো কথা বলতে পার, আমরা কি তাও শাব না?

বিস্তৃত বোধ করল নরেন চৌধুরী। মাসের পর মাস এরকম নিরুপদ্রবে কেটে যাবে ভাবেনি। উতলা ভারটা একেবারে যায়। তবু। বহু জ্বলের নিচে থানিকটা গকিলতা জমে থাকার মত এ অনাবিল কর্মস্রোতের তলার তলার একটা গোলযোগের আশঙ্ক্যে ভিত্তিও আছে সেই থেকে। কখন বুঝি বুঝিয়ে ওঠে। কিন্তু তা বললে ক'মাসের এই শাস্ত প্রতীক্ষা আর তারপর এই নতি স্বীকার।

একটা আশা করেনি নরেন চৌধুরী। আশা করেনি বলই আবেদনও স্বাধীন পৌছুল।

সময় অনেক ভোলায়। কোন রকম বাধা না পেয়ে চি

ইঞ্জিনিয়ারের সেই রুচতা গেছে। তা'ছাড়া মেজাজও অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আজকাল। জবাব দিল, কিন্তু আমি আর কি করতে পারি বলে ?

নরেন বলল, কি বলতে চার স্তম্ভে বাধা কি। গোড়ার দিকে লোকটা উপকারই করেছিল। এ ব্যাপারে শান্তিও মাথোঁ হয়েছে—এবশ্য কিছু করা সম্ভব হলে করবে, নয় তো সেটাই বুঝিয়ে বলে দেবে।...তার ভিতরে কি আছে বাইরে থেকে বোঝা শক্ত, দেখই না কি বলে।

বালু গাঙ্গুলি আপত্তি করেনি আর। দিনস্থির করে নরেন রপরীর ঘোষকে জানিয়ে দিল।

স্তম্ভে মনে মনে আর একদফা কটুকুি বর্ধন করল রপরীর ঘোষ নিজের উদ্দেশ্যে। ফুল দস্তুর বশে মিথোই এই কটা মাস এভাবে নষ্ট। যেখানে মাটি তেতে আছে সেখানে জল না ঢেলে ছুটল কি না ঠাণ্ডা হেড আপিসকে আরো ঠাণ্ডা করতে !

দিনে দিনে খুশির মাত্রা বাড়ছে নরেন চৌধুরীর। নিজেরই ভিতরে কোথায় যেন অনেকদিন ধরে একটা খুশির আলো বেলে বসে যাচ্ছে সে। মনের অনাচে কানোচে সর্বত্র খুশির ঝলক। বাগে থু সেই খুশি প্রাণীপের নিচুটুকু। সেখানে কি যেন এক আত্ম হাঁপারি সশয়।

কিন্তু মাহুঘটাই ভিন্ন ধাতুতে গড়া। ভাবনশূন্য উচ্চ রপূর। যেদিকে তাকালে সশয় সেদিকে তাকিও না। টি ক লগটির প্রতীক্ষা করে শুধু।

গোড়ায় গোড়ায় কি মড়াই ভালো লেগেছিল এত। ওয়ার প্রত্যাশিতর মত এমন পাখা মেলেছে মন ? কিন্তু এখন ভালো লাগার মাত্রাটা প্রায় দুর্বল হয়ে ওঠে। এইয়ের ওধারে ধূসর পাগড়ের কোল ঘেঁষে যখন কে শুক হয় ভালো লাগা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গার কর্মস্রোতে মিশে থাকে সেই ভবান্তরিত নীপনা। থিকলে যখন গলানো সূর্যের রক্ত হাড়ী মেঘের ফাটলে ফাটলে, ওর ভালো লাগার সতে টাও ভারী মেলে যেন। তারপরে ভালো লাগে মর মড়াইয়ের বাতাস আর মড়াইয়ের সমাহিত ইচ্ছের তুমখিনী বাজি।

যে লগের প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা, তার আভাস নকটা। অস্বস্ত সেই রকমই ধারণা। চোখে বর্তন লক্ষ্য করেছে একটুখানি। করছেও। প্রাথমিক সর্বস্বের বারনা উৎসবের নেমন্তন্ন রাখতে তার পক্ষে পাগড়ের ওপর সেই পাখরটার একদিন। চেতনার আলোয় হঠাৎ থমকে বর্তন। তারপর থেকে একটু যেন ব্যবধান। ালে বাথছে, একটু যেন আগলে রাখছে। নরেন বাথার ভান করে। নিজেকে দেখছে দেখুক ব সূচনা।

—কি ব্যাপার! দিক-বিদিক ভুলে অমন ছন কোথায় ?

সন্ধ্যার বড় পাখরটার আড়ালে ডাল দিয়ে পাগড়ের দেয়াল খোঁ করছিল। পাখরটার পাশ ক' দেখতে পারিনি।

ব্যবস্থা হেসে উঠল। এগিয়ে এলো। সে চোখে কোঁড়ুক কোথায় এভা

ব্যবস্থা লাগেনি

হাতা অল

৩

চলুন তাহলে, সাধুনাকে একদিন  
কয়েক পা এগিয়েই ধেয়ে গেল  
নি, আপনি যান—

ইচ্ছে বোল আনা, কিন্তু  
শব্দনে আবার বাধাত  
যেন মনে। আচ্ছা!

ছেলেমানুষ  
য নিঃশাস

তার।

লের

ই

বরণা ছুঁচার মুহূর্ত নীরবে নিরীক্ষণ করল তাকে। কি ক'ছিত  
এসময় বাড়ি বসে?

তার চোখে চোখ রেখেই হাড়া হেসে সাধুনা জবাব দিল  
গোয়ালঘরে ছিলাম।

—গোয়ালঘর! চশমার ওধারে দুই চোখ বড় বড় দেখালে  
বরণার। বেধানে গৌর থাকে? তোমার আছে? সাগ্রহে একেবারে  
উঠে দাঁড়াল সে, চলো তো দেখি।

এবারে বিশ্ববের পালা সাধুনার। হাত ধরেই টেনে আবার  
বসালো তাকে। আচ্ছা দেখবেন'ধন পরে, বসুন। আসার সঙ্গে  
সঙ্গে ওখানে আপনাকে নিয়ে ডোকালে বাবার কাছে বসুনি খেয়ে  
মরতে হবে।

আগ্রহটুকু এভাবে অগ্রাহ হতে বরণা বড় নিঃশাস ফেলল একটা।  
বাবাকে বুঝি ভয় করো খুব?

সাধুনা হেসে মাথা নাড়ল, খুঁট-ব। পাশের ঘরের দিকে  
তাকালো একবার। কানে গেলে হু'জনেই হেসে উঠবে।

চশমার ওধারে বরণার চোখে হাসির ছটা কমে আসছে। দেখতে  
চেয়ে চেয়ে।—সেই কবে দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে, আর আজ  
সেই যে দাঁড়তালদের কি উৎসব দেখতে গিয়েছিলে তোমরা—বনে  
পরে নদীর পারে দেখা হল মনে নেই?

সাধুনা জবাব দিল না। মনে আছে। আর তার পরেও  
ওকে না দেখুক, ও দেখেছে। বণবীর ঘোষের ভিগে চড়ে  
থতে দেখেছে আরো অনেকবার, ভুতুসাবুর লোকানের কোণে  
খিসাখিসি বসে গল্পগুজব করতে দেখেছে কলকাতার সেই  
কলেজের মাষ্টারের সঙ্গে—ওর মা বাকি বোকা ভাবে, অথচ  
বরণার মতে আসলে ভালো বালুই বোকা দেখায়।

কে বরণা তেমনি নিরীক্ষণ করছে তাকে। কিছু একটা  
মতট।—সেই তখন যা দেখেছিলাম তার থেকে আরো  
দূর লাগছে এখন তোমাকে। অসুট হাতে তরণা  
র কাছে ঘেঁষে বসল তার।

যেও চাসতে পারল না সাধুনা। দিন কতক  
এই কথাই বলেছিল। কিন্তু সেদিন অন্তত তার  
ও প্রশংসাই সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু এ যেন ঠিক  
কটা যেন পুরুষ চোখে বাচাইয়ের চুই। বিদ্রোহ  
এ বসতে পারলে একটু সরে বসত সাধুনা।

শুধু করল আবার। নানান কথা। অবস্থা  
ভেবেছে আসবে, কি রকম বিচ্ছিন্ন লাগে  
করে সময় কাটায় সকাল দুপুর বিকেল রাতি  
তার জন্ত, ইত্যাদি।

নড়ে না সাধুনা। এই কীকে দেখে নিচ্ছে সে?  
দেখতে চাইছে। চান্দমণির মুখে যা দেখেছিল।  
ন দেখেছিল। এরকম কৌতুহল নিজের কাছেই  
থাকত। তবু কৌতুহল।

শাস ফেলল। চান্দমণি হতজ্ঞাড়ীটা প্রসাধনপা

র দেখছ কি?

নড়ে চড়ে বসে সাধনা তেমনি জবাব দিল, দেখছি কোথায়, তুমি তো—আপনি এসময় এসেন কোথেকে?

জবাব না দিয়ে করণা হঠাৎ সামনের দিকে খুঁকে হাঁক দিল, নরেন বাবু, ও নরেন বাবু!

নরেন এসে পাঁড়িতে বলল, ওখানে ক'ছেন কি এখানে বসুন। সরে বসে মাছের জায়গা করে দিল। সাধনা জিজ্ঞাসা করছে এসময় কোথেকে এলাম, অর্থাৎ আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটল কি করে। বলব নাকি?

সাধনা ফাল্গুন করে চেয়ে হইল তার দিকে। মাছের যোগাঙ্গন হয়ে নরেন হাডা জবাব দিতে বাজিল কি। কিন্তু তার আগেই আবার এক বসক 'হেসে করণা বলল, জানে, নিয়ে আসতে কি চায় আমাকে, নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে পড়ে তবে এসেছি।

আবার সেই শালাটে উচ্ছলতা করণার চোখে মুখে। নরেন বলল, এ বসক সত্যবাদিনীর দেখা পেলে যুগিষ্ঠির মহারাজ হয়ত একেবারে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে তুলতেন।

মুখে বিসম ভাষা ফেল করণা তাকালো তার দিকে। বলল, কলকাতায় দাশর্য বাড়ির চাকরটার নাম বে যুগিষ্ঠির!

সাধনা শুধু এবার হাসল অনেকক্ষণ ধাব। সেই প্রথম দিন তার মাসের সঙ্গে দেখে ভালো লেগেছিল। আর এই এখন লাগল। মাতৃখানের সত্যকিছু সব মুছে গেলে আরো ভালো লাগত।

আতিথেরতার কথাও মরণ হল এতক্ষণে। ওঁর উপক্রম করতে করণা বাহা দিল, ও কি, বাছ কোথায়?

—আপনাকে চা করে দিই একটু।

—বোসো! ধমকে উঠল প্রায়। তারপরই মনে পড়ল যোগ হয় কিছু। বলল, চা খেতে যাব কেন, তোমার রাগার বা প্রশংসা তুমি, ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হব একদিন, দেখো।

ঈশ্বর বিষয়ে সাধনা নরেনের দিকে তাকালো একবার। কিন্তু নরেনও বথার্থই কোন দিন একে বলেনি কিছু। সেই জিজ্ঞাসা করল, প্রশংসাটা কার কাছে শুনলেন?

—লোকের অভাব! এই মড়াইশুধু লোক তো ওর ভক্ত, মেয়েটা বাহু জানে—। বাহু জানে কি না সেটাই যেন নিরীক্ষণ করে দেখল একটু। পরে বলল, এর মধ্যে সেরা ভক্ত হ'লেন।

নরেন জিজ্ঞাসা নেড়ে চেয়ে হইল। সাধনা আশঙ্কার হুক হুক।

করণা বলল, একজন ভুতুবাঁবু আর একজন নিধুরাম।

নরেন হেসে উঠল। সাধনাও হালকা নিশ্বাস ফেল বাঁচল। করণা বলে গেল ভুতুবাঁবু মা-লক্ষ্মী বলতে অজান, নতুন কোন মখে চা খেতে গেলে আগে মা-লক্ষ্মীর পাঁচালি শুনতে হবে তবে চা গাবে। আর শুনিকে নিধু বলে, এমন রাগার রাগা, খেয়ে তার ঈশ্বরীয় বাবু শুধু কাবু।

গানিত্রা হুই চোখ আলতো করে নরেনের মুখের ওপর বুলিয়ে দিল একপ্রহ। কিন্তু নরেন খেরাল করেনি। নিজের আগেচরে থিনার সঙ্গেই দৃষ্টি বিনিময় ঘটল তার। চকিতে অত্মদিকে মুখ ফালো সাধনা। বিরক্ত এবং আরক্ত।

ওদিক থেকে অবনীবাঁবু এসে পাঁড়িতে সামনে। করণা বলল, এমন হাট বসিয়ে দিয়েছি আমবা দেখুন। তার পরেই সোজা উঠে

পাঁড়াল একেবারে।—আপনার সঙ্গে আলাপই হল না, আমা বাড়ি পৌঁছে দেবেন চালুন—গল্প করতে করতে যাব।

—বেশ তো, বেশ তো।

—বেশ তো না, এখুনি যাব, রাত হয়ে গেল।

তাড়া খেয়ে অবনীবাঁবু জামা বদলাবার জন্ত ঘরে গেলে আবার। করণার হুঁচোখ যেন খলখলিয়ে তেলে উঠল নরেনের মুখের ওপর। তার অর্ধ শুণু প্রোঞ্জল নয়, অস্বস্তিকরও।

সাধনাও লক্ষ্য করল সেটুকু। না করলে অস্বাভাবিক লাগত; কিছু। করল বলেই বাবাকে এভাবে টেনে নিয়ে বাগুরার পিছা হুল বসিকতার আভাস পেল। এতক্ষণের ভালো লাগাটুকুর ও যেন কালির ছিটে পড়ল একপ্রহ। বিরক্তিতে মুখ লাল হয়ে উঠ সাধনার।

অবনীবাঁবুকে নিয়ে করণা চলে গেল। আর বাবার আগে ওয়ে দুজন্যর মাঝে বেশ খানিকটা অস্বস্তি ছড়িয়ে দিয়ে গেল। সহজতা ভাগিলে নরেনের পকেট থেকে সিগারেট বেরলো, দিশালজা বেরলো, হাতীর পীতের কানকাঠি বেরলো, নাকস্থ্য দিয়ে সিগারেটে ঘোঁরা বেরলো আর সবশেষে কর্প-পট তোয়াজ-মূলত গলা দিবে সেই পেটেট লক্ষ্য বার হল গোচাক্ষতক।

সাধনা চেয়েছিল দরজার দিকে। যে দরজা দিয়ে তার বাব আবার করণা বেরিয়ে গেল। মুখ না ক্রিয়ের ক্রান্তি করে বলল অজুত!

—আমি? না ওই যে গেল! নরেনের মুখে উৎকর্ষা কাককাই।

সাধনা হেসে ফেল তাকালো তার দিকে। দুজনেই, নইলে। আপনার সঙ্গে এসে জুটল কি করে?

—বসাত। দোষনিঃশাস।

—মেয়েটার মাথায় ছিট আছে।

—তা আছে। নরেন সায় দিল, ও এক ধরনের বোগ, বিধা বোগ।

শোনামাত্র আবার অত্মদিকে চোখ ফেরালো সাধনা। লাভ হয়ে উঠেছে, নিজেই বুঝেছে।

নরেন অস্বাক। ঠিক তামাসা করে বলেনি। যেটুকু বলেছে তাও স্পষ্ট নয় খুব। কিন্তু করণার বোগের স্বরূপ সাধনাও যে বথার্থই উপলব্ধি করে বসে আছে, একবারও ভাবেনি।

মনে মনে কি জানি কেন আবার সেই অকারণ খুশির স্পর্শ লাগল মনে। কিন্তু আর মনস্তত্ত্ব নিয়ে ধাঁটাছুটি দিকে এগলো না। করণা প্রশংসা সবসরি বামাচাণা দিল।—যেতে হাও ওসব—সুখবর ছিল, মেয়েটার পাশায় পড়ে তোমার বাবাকে বলা হল না।

জিজ্ঞাসা নেড়ে তাকালো সাধনা।

—চিক ইজিনিয়ারের সঙ্গে যোগ-চাকলাঘরের এবার একটা ফরসলা হতে পারে বোধ হয়, ব্যংগা করে এলাম।

—কি ব্যংগা? ঠাণ্ডা প্রশ্ন।

করণার ঘোষের আবেদন এবং বাহল গাভুরির কাছে সুপারিশের বৃত্তান্ত জানালা।

অকস্মাৎ দশ করে বলে উঠল যেন একমুঠো নিষ্কল্যাপ ছাই।—কেন, কেন আপনি সর্গারি করে এ ব্যবস্থা করতে গেলেন? কে

আপনাকে করতে বলেছিল? ডেকে ছুটো মিষ্টি কথা বলল, আর গলে জল হয়ে অমনি ছুটলেন স্থপারিশ করতে?

নরেন হতভম্ব। এমন আর দেখেনি। কি হল?

উত্তেজনার অধর নংশন করে রইল সাধনা। নরেনের বিষয়ের শেষ নেই। কি ব্যাপার? পাছে কিছু গোলমাল হয়, সেই ভেতাই তো—

মেজাজ চড়লো আরো।—ওঃ, একটা লোক এতবড় কাজের মধ্যে গোলমাল করে তো একেবারে উন্টে দেবে সব—সেই ভয়েই গেলেন আপনারা! আর ওদিকে বুক ফুলিয়ে বা খুশি করে বেড়াবে সে। কতবড় পাজি ও লোকটা জানেন? পাগল সর্দারের ওই মেয়েটাকে পর্যন্ত একেবারে—

রাগে স্কোভে লজ্জার শেষ করতে পারল না। অন্তরিক বাড়া গৌজ করে বসে রইল।

বিবল বিষয়ে নরেনের মুখে কথা নেই আর। মড়াইয়ের বুক থেকে এক ভরাপ্রাণ কালো মেয়ের অন্তর্ধান হঠাৎ একটা স্থল যন্ত্রের পরমা ঠেলে একেবারে চোখের সামনে তীব্র তীক্ষ্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

শুণু তাই নয়। সাধনা জানল কি করে? সর্দার বলেছে? মন বলছে, না। ওদের বলার রীতি এরকম নয়। বললে সরাসরি রণবীর ঘোষকেই বলত। আর সেই বলার মড়াইয়ের পাজরে আসের কীপুনি জাগত।

রাগ কমে আসছে সাধনার। অবস্থি বাড়ছে। এ নীরবতা শুধু বিষমহত নয়। জিজ্ঞাসা-মুখরও। কিন্তু মাছুষটার বিবেচনার প্রশংসা না করে পারল না। আভাসেও কোন প্রসঙ্গের ঘাঝা বিস্তর করল না ওকে। বিড়ম্বনাটুকু উপলব্ধি করেই যেন উঠে চলে গেল এক সময়।

রাগ গেছে। উত্তেজনা কমেছে। পুরুষ সম্মিথানজনিত সঙ্কটও নেই। চূপচাপ ধানিক বসে থেকে বড় করে একটা নিঃশ্বাস কেলেল সাধনা। কিন্তু খুব আরামের নয় বেন। তলার তলায় একটা অস্ত্রার বোম জগছে। অকারণে এত কথা বলল, এত কথা শোনালো। ভরলোক যা করছে বা করতে গেছে সবটাই ভালোর জন্তে। তা ছাড়া ভিতরের এসব ব্যাপার জানতও না। কিন্তু রাগের মাধ্যম কি বলতে কি না বলে বলল!

শুণু অমৃত্যু নয়। একটুখানি আশঙ্কও। ওর কথা শুনে সব আবার নাকচ করে দেবে না তো! জানাখানি হবে না তো কিছু? ভায়ের কাছে নতুন কিছু বিভ্রান্তি বাথবে না তো আবার? জেলে-মাছুষির জন্ত নিজের উপরেই মর্মান্বিক ক্রুদ্ধ হল সাধনা। তবে গোলযোগের আশঙ্কাতা থাকল না বেশিক্ষণ। নরেনবারু না হয়ে আর কেউ হলে ভাবত ১০০ বাবল গাঙ্গুলি হলেও নিশ্চিন্ত হতে পারত না।

স্বয়ং চিক ইঞ্জিনিয়ারের কোয়ার্টারে এক নাটকীয় প্রেহসন ঘটে গেল সেদিন।

যেদিন রণবীর ঘোষ এলো নিজের হয়ে সওয়াল করতে। ভেজালের ফটল ছুড়তে।

নরেনকে সঙ্গে থাকতে বলেছিল বাবল গাঙ্গুলি। সময় মত

আসেনি সে। যখনও করিয়ে দেয়নি কিছু। তাই প্রতিদিনের মত সকালের রাউণ্ডের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিল। আর আডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের প্রতীক্ষা করছিল। কি একটা কাজে তাঁরই আসার কথা।

নরেন চৌধুরী ভোলেনি। কিন্তু তার আগ্রহ স্তিমিত। ডামের বার্ষিক আপসের প্রয়াস। সে প্রয়োজনই আছেই। তবু...। রণবীর ঘোষকে ভালই জানত। ভালই জানে। তবু...। এক জনের স্কোভ আর বেদনা আর কখনো এমন করে স্পর্শ করেনি তাকে। তাই নিরুৎসাহ। আবার এরপর ও লোকটার সংশ্রবে আসতেও বিতৃষ্ণ। বা করেছে ভালোর জন্ত করেছে। ভালো জেবে করেছে। এর পর আর দায়িত্ব সে বৃক।

কিন্তু মন বলছে তারও উপস্থিত থাকি প্রয়োজন। বাবল গাঙ্গুলির রাগ জানে। কি থেকে কি হয় আবার ঠিক কি। তা ছাড়া নিজে মুখে থাকতে বলেছিল ওকে। যদি দেখল। বেশ দরি হয়ে গেছে। তবু বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে রণবীর ঘোষ এসেছে ঘড়ির কাঁটা ধরে। হাতে অবিকল বইয়ের আকারের বোতাম-আঁটা চকচক কালো লেদারকেন একটা। চামড়া মোড়ানো সৌখিন বড় ডায়েরির মত। যিভেন চাকলাদারকে জদরে জিপে বসিয়ে রেখে সহাত্তে সাড়া দিল, শুভ মনিঃ শ্রব, ভিতরে আসব?

আপিস সক্রান্ত কাগজপত্র উন্টে দেখছিল বাবল গাঙ্গুলি। মুখ তুলে তাকালো। মনে পড়ল। আজই আসার কথা বটে। যদি দেখল। সম্ভবত নরেনের আসার কথা ভেবেই।

—আসুন।

—নমস্কার, ভালো আছেন বেশ?

—হ্যাঁ, বহন।

রণবীর ঘোষ বলল। তেমনি হাসিখুশি, তেমনি সপ্রতিভ।—আপনি বেস্কজিলেন নাকি?

—হ্যাঁ, আজই আপনি আসবেন খোশাল ছিল না, নরেন বাবুরও আসার কথা ছিল, আসেন নি...।

হুর্ভাগ্যজনিত একটা বিষয় ছায়া নামল ঘোষের মুখে। পরে হাসল অল্প একটু।—বরাত। বাক, আপনার শরণার্থী বটেই, তবু আজ আমি কিন্তু কোন ব্যবসার তাগিদে আসিনি আপনার কাছে। বাবল গাঙ্গুলি নীরব, জিজ্ঞাস্ত।

কি ভাবে ব্যস্ত করবে মনের কথাটা রণবীর ঘোষ ঠিক করে উঠতে পারছে না বেন। স্বীকৃতির বাসনার সঙ্গে অনভ্যাসজনিত সঙ্কট মিশলে যেমন হয়। সলজ্ঞ হাসি। বলল, এসেছি এক রকম প্রার্থের তাগিদে...বড় আকর্ষণ ভারী বিচিত্র ব্যাপার!

বলতে না পারলে কটু শোনাতে। বিরক্তির কারণ হত। কিন্তু রণবীর ঘোষ নিগুণ কথক।

অল্প দিকে গাভীঘের ব্যতিক্রম ঘটল না খুব। শুধু বিষয়ের আভাস একটু।—আপনি কি বলবেন বলুন।

—কত কি বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু কি যে বলি, ইটু ইজ, অল্‌ সো ওরাগারফুল। মুখের ভাব নয় শুধু, গলার স্বর পঙ্খ বদলে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে কাচের শাসির ভিতর দিতে দুই মড়াইয়ের দিকে চেয়ে রইল অশ্রুণাল। ফিরে এলো আবার।

বড় করে নিখোঁস ফেলল একটা। বলল চেয়ারে। হাসল একটু।

—আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ গাল্জি, কি যে হল সেদিন থেকে নিজেই বুঝতে পারছি না। এতবড় এক লোকসান, তার থেকেও বড় জিনিস, এতবড় একটা দুর্নাম কাঁখে চাপলে অনেক কিছুই করার কথা আমাদের—আর কিছু না হোক, বড়দের একটা গোলমাল অন্তত পাকিয়ে তুলতে বুদ্ধি পাবি। হেসে চোখে চোখ রাখল, আরো মুহূ, আরো শাশাসিদে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, কিন্তু মন বলছে, তার থেকে অনেক বড় পারা হবে সোজা-সুজি আপনার কাছে এসে প্রাণ খুলে হার স্বীকার করা। এ লাভটুকুর কাছে এই লোকসান কিছুই নয়।

দুঃস্থ নয়, প্রার্থীর দৈন্তও নয়, আহত মর্যাদার অভিযুক্ত। চিক ইন্ডিনিয়ারের ঋণ গাভী তরল হয়ে এলো। এরকম সমর্পণে বিব্রত বোধ করতে লাগল প্রায়।

যে নরেন চৌধুরীর পরগণ। বাদল গাল্জি ঘড়ির দিকে তাকালে একবার। ঘোর দু'হাত তুলে নমস্কার জানালো। হেসে বলল, আপনি কিন্তু অনেক লেট।

ঠাণ্ডা চোখে নরেন একবার শুধু তাকালো। প্রতি-নমস্কার না, কিছু না। এতটা চেয়ার টেনে শরীর ছেড়ে দিয়ে বলল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে চেয়ারের কাঁখে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে ধীরে স্বস্তে সিগারেট ধরালো একটা। বন্ধুর দিকে না চেয়েই গম্ভীর প্রশ্ন করল, বেরোতে দেরি আছে না কি তোমার?

—না। তার অমন নিশ্চয় হাবভাব দেখে বাদল গাল্জি ঘবাকই হল একটু। আর তেমনি বিমিত্ত রণবীর ঘোষ। প্রয়োজনে এর শরণাপন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু তাবলে এ লোকটাকে ঠিকের মধ্যে আনেনি কখনো। বন্ধু কটাক্ষে দেখল দুই একবার। চেয়ারের কাঁখে মাথা রেখে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে সিগারেটের ধারা ছাড়ছে, যেন ঘরে বিতীয় মাল্লব নেই কেউ।

আগের কথা প্রসঙ্গে এবারে বাদল গাল্জি সদর কণ্ঠে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই মিঃ ঘোষ, সিমেন্টের উপায়ে যা করেছি বাধ্য হয়েই করেছি—কিন্তু সত্যি এরকম যে যদি ভাবতে পারেন তাহলে তো আনন্দের কথা।

উৎকল মুখে ঘোষ জবাব দিল, ভাবতে পারতুম না কখনো, ধন শিখেছি। আপনি শিখিয়েছেন। পরিবেশ যেন তারই রিস্তাধীন। —ওই ভেজালের অপকাণ্ডটি যেই করে থাক, দারিদ্র্য নি সব আমার, দারীও আমিই বই কি।—আমি—আমার মত রো পাঁচজন... এতকাল সবাই পার পেয়ে আসছে তেমন ক কৈফিয়তের তলব পড়েনি বলে—পড়লে ব্যাঙের ছাতার মতই —

শেষ না করে অস্ফুট কণ্ঠে হেসে উঠল। চকিতে নরেনকে দেখে ন আবার। তেমনি নির্বিকার মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। তের দ্বিধা কাটিয়ে হালকা বিনয়ে বলল আবার, বাক কাজের র আর আপনাদের বিরক্ত করব না...

হাতের লেদার কেসটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল, এটা দয়া করে ধ দিন, অবসর মত খুলে দেখবেন একটু—

নিপুণ ভক্তিতে দুর্গাপাও ঘাবল হন। আরো অনেকটাই

নয়ম হয়ে এসেছিল বাদল গাল্জি। এবারে বিমিত্ত হল। কেসটা উন্ট পাণ্টে দেখে ভিজ্ঞাসা করল, এতে কি আছে?

ও বোই-মি-বিশ্বয় খুব চেয়ে ঘোষ। সফোচ বিনয় হাসি। যেমনটি দরকার। বলল, ও কিছু নয়, আমার জবানবন্দি...

—কিন্তু এ দেখে আমি কি করব?

—কিছু না, কিছু না—আপনাদের মনে দাগ ফেলতে পারে এমন কিছু নয়। শুধু আমার নিজের মনের সাধনা একটু... নইলে আপনাদের কাছে ওর আর কি দাম... এতবড় এক অভিজ্ঞতার মূল্য স্বীকার না করলে, বাক, সময় মত শুধু দেখে রাখবেন একটু—

তৃতীয় লোকটির বেষাগা নীরবতা প্রায় অসাহ্য্যের কারণ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর উত্তোপ করল ঘোষ।

বাদল গাল্জি বলল, কিন্তু এখন আর এসব দেখে আমি কি করব?

অবিমিশ্র প্রশংসাত্মক দুই চোখে ঘোষ যেন সিক্ত করল তাকে দু'চাঁর মুহূর্ত্ত—উই আর রিয়েলি ওয়াণ্ডারফুল! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কিছু আপনাকে করতে হবে না। ওই সিমেন্টের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর পর যেদিন আপনি বলবেন সেদিনই আপনার সামনে ওই গুদোম ভরা সিমেন্ট আমি মড়াইয়ের ভলে ঢালব। আগেই ঢালতুম, পাছে আপনার অবিশ্বাস হয় সেই জন্য অপেক্ষা করছি। হাসল। যদিও ওতে আর ভেজাল নেই এক কথাও, তবু যে শান্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব।

বাদল গাল্জি বিব্রত আবারও। নরেনের দিকে চোখ ফেরাল। চোখাচোখি হল বটে। কিন্তু তেমনি নিরুৎসুক। কোন আভাস নেই। একটু থেমে বলল, ও সিমেন্ট এখন যেমন আছে থাক, জেবে দেখি

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেহের অগুতে অগুতে আচমকা এক বিদ্যুৎ শিহরণ। সবগে চেয়ার ছেড়ে একবারে পাড়িয়ে উঠল বাদল গাল্জি। দুই চোখে ভয়ানক বিভীষিকা।

কথা বলতে বলতে বইয়ের আকারের লেদার কেসএর বোতাম টেনে খুলেছে। তার ভিতরে রণবীর ঘোষের জবানবন্দি। খাতাপত্র নয় কিছু।

তিন তাড়া নাট। সব একশ' টাকার। তিরিশ হাজার...

দেহের সব রক্ত মুখে এসে জমাট বাঁধতে লাগল। নরেন চৌধুরীও বিদ্যুৎ-স্পর্শের মতই উত্তেজিত। বিষয়ে তারও দু'চোখ বিক্ষাণিত।

এক বিষয় খুব যেন অন্ধকূল মনে হচ্ছে না রণবীর ঘোষের। আনাড়ীদের রকম সকল অস্বস্তিকর।

নির্বাক বিমূঢ় বিষয়ের ঘোর কটল বাদল গাল্জির। লেদার কেস হাতে তাকালো নরেনের দিকে। নরেনের দু'চোখও তার মুখের ওপরেই সবস্ব। বাদল গাল্জি ওর দিকে চেয়েই আছে। দেখছে। অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে যেন। সহসা তার এই দেখটুকু উপলব্ধি করল নরেন চৌধুরী। আপসের সুপারিশ সেই করেছিল। আর এতক্ষণ তার বসে থাকাকাটাও চোখে বিকৃত সংস্কার আগিয়েছে। এবারে এক স্বীকৃতি খেয়ে সচেতন হল সেও।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘোষের মুখোমুখি।

সে দাঁড়ানোর মধ্যে ছিল বোধ হয় কিছু। কারণ নিজের অজ্ঞাতে ঘোষও উঠে দাঁড়াল।

হাত বাড়িয়ে নরেন বাসল গাঙ্গুলির হাত থেকে চামড়ার কেসটা নিল। নোটের তাড়া ক'টা দেখল। চামড়ার কেস থেকে খুলে নিল সেগুলি। খুব মোলোয়েম গলায় বলল, আপনায় অভিজ্ঞতার মূল্য—যে অভিজ্ঞতার টাকার ভেজালে ভেজাল সিমেন্ট খাটি হয়ে যায়, কেমন?

এমন পরিস্থিতি কল্পনা করেনি রণবীর ঘোষ। এ সাক্ষাত ব্যবস্থার পিছনে একটা অর্থই জানে। একটা অর্থই জেনে অভ্যস্ত। কিন্তু খবের যে এদিকে এত কাঁচা বোথেনি। রণবীর ঘোষও না, যিঞ্জন চাকলাদারও না।

আরো বৃহৎ আরো মোলোয়েম ব্যঙ্গের মত শোনালো নরেনের কণ্ঠস্বর। এককাল সবাই আপনানার পার পেয়ে আসছেন তেমন শক্ত কৈফিয়তের তলব পড়েনি বলে, হ—?

বাসল গাঙ্গুলি নির্বাক দাঁড়াল।

ঘোষ সামলে নিয়েছে কিছুটা। পরিস্থিতি উপলব্ধির বলে যিনয়ের সুখোঁস খসেছে। নয় রুততার ছাপ সেখানে।

নিম্ন বিক্রপ-ছটায় নরেন যেন হাসছে।—কিন্তু কৈফিয়ৎ যারা তলব করে তাদের জ্ঞাত আলোদা। আপনায় এ জবাববন্দী তারা দেবে না—খবের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে এমনি করে—আর এমনি করে—আর এমনি করে!

তিনবার তিন তাড়া নোট এবং চতুর্থবার চামড়ার কেস। হুঁহাতে মুখ বাঁচিয়ে ঘোষ একেবারে ঘরের বাইরে এসে পড়ল। জিপ থেকে ছুটে এলো যিঞ্জন চাকলাদার। নিধু আড়ালে ছিল। আর আড়ালে থাকা সম্ভব হল না! ওদিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন কখন।

চিত্তার্শিত সকলে।

ঘোষ-চাকলাদারের জিপ চলে গেছে অনেকদূর। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। নিধু আড়াল নিয়েছে আবার। ঘরের মধ্যে গুম হয়ে বসে আছে নরেন চৌধুরী।

আর বাসল গাঙ্গুলি? তার বাড়িতে, তার ঘরে, তার সামনে এরকমটা হবার কথা নয়। কিন্তু তারও সন্দেহ করার কথা নয় নরেন চৌধুরীকে। টাকা দেখে তাইতো করেছিল। আড়ে আড়ে দেখেছে বাসল গাঙ্গুলি। ছেলোবেলা থেকে বিপরীতই দেখে এসেছে। এরকম আর দেখেনি কখনো। দেখবে ভাবেওনি ১০০ বাগ চণ্ডাল। কিন্তু মনে হচ্ছিল জায়গা বিশেষে অসম্ভব।

হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে নরেনের সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল। সিগারেট বরাল। কিন্তু ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলো না তবু। জানালার ভিতর দিয়ে দূরে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে নিশ্চল মূর্তির মত। হুঁচকার শব্দ দেখল। প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করল। পরে নিজের সিগারেট টোটে খুলিয়ে অজ্ঞাত হাতে নিয়ে বৃহৎ একটা খোঁচা দিল তার কাঁধে।

এবারে নরেন চৌধুরী ফিরে তাকালো। বাসল গাঙ্গুলি নীরবে অজ্ঞ সিগারেটটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে। চোখে চোখ রেখে

নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়। হাত বাড়িয়ে নরেন চৌধুরী তার হাত থেকে সিগারেট নিল। বৃহৎ, নিশ্চেষ্ট।

ছোট মড়াইয়ে ঘটনাটা চাপা থাকল না।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার তাঁর স্ত্রী এবং অন্তরঙ্গ দু'চারজন সহকর্মীকে বললেন। মিসেস চ্যাটার্জী ফিস ফিস করলেন সমর্থনদায় গিল্লিদের কাছে। বেশ খোলাখুলি ভাবেই কানাকাণি শুরু হল একটা। বিষয়-কটকিত নিধুবাম সেদিনই হৃপ্পে সবিস্তারে পল্লবিত করতে বসল দিমিদির কাছে।—লরেন বাবুর কাণ্ড সর্বাঙ্গে এখানে বলবে না তো কোথায় বলবে! এই বলে বেড়ানো স্বভাবের জগৎ ইদানীং সাধুনা মোটেই সম্ভব ছিল না ওর ওপর। কিন্তু তলল যা, দুই চক্ষু বিদ্যারিত।

অবীর প্রতীক তারপর। কিন্তু লোকটার আর পাতা নেই পর পর ক'দিন। বাবার মুখেও শাদামাটা ঘটনাটাই তুলেছে শুধু। রণবীর ঘোষ ঘুঘু দিতে এসেছিল আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি নরেন চৌধুরী, ইত্যাদি। এই মেজাজ ঠিক রাখতে না পারার পিছনে আরো যে কারণ, সে শুধু সাধুনাই জানে। ভ্রল্লোককে সেদিন ওভাবে বলার জগৎ মনে মনে অনেক অনুতাপ করেছে। কিন্তু এই কাণ্ড ঘটবে কে জানত। ভাবল, বাবাকেই জিজ্ঞাসা করবে ভ্রল্লোকের দেখা নেই কেন ক'দিন ধরে। কিন্তু বলি বলি করেও হল না বলা। ছোঁকরা চাকরটাকে পাঠিয়ে খবর দেবে ভেবেছিল। তাও পেরে উঠল না।

ওর এই আগ্রহটুকুই অদৃশ্য বাধার মত।

প্রথম দেখে নিজের চোখ দুটোকেই সহসা যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না সাধুনা।

রণবীর ঘোষের জিপ উপরে উঠে গেল হস করে। একটা বড় পাখরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসেছিল সাধুনা।

ওকে কি দেখেছে? বোধ হয় না। দেখলে নীল চশমা খাড় করাটাই। তার পাশে বসে আর একজন। বিচিত্র একজন।

হোপুন...

চড়াই-উৎরাইয়ের পথে এ এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপার নয়। জিপে হোক, ট্রাকে হোক হরদম নামতে-উঠতে দেখা যায় ওদেরও। বিশেষ করে উপরে ওঠার সময়। জায়গা থাকলে সহাসরি চোপে বসে তারা। সন্ধ্যার বলাই নেই কোনো, মাঝপথেও ডেকে ধামায়, বাবু টুকচি তুলে লে না কেনে—

কিন্তু সাধুনার চোখে রণবীর ঘোষের পাশে হোপুন...প্রায় ঝাঁকুনি লাগার মতই অপ্রত্যাশিত।

হোপুনের স্বভাব বদলানো একটা কালো পাখরের বং বদলানোর মতই। ভাবা যায় না। লোকটার সবচেয়ে নিজের অজ্ঞাতে সাধুনার তেমন একটা ছাপ পড়েছিল মনে। কিন্তু দিন কতক আগেও কেমন একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিল। লক্ষ্য করা ঠিক নয়, উপলব্ধি করা। পর পর দু'দিন।

প্রথম মড়াইয়ে। সেদিনও মাটি কাটছিল হোপুন। সহস্রাঙ্গ লজ্জা, সহস্রের মতই। এরই মধ্যে তৎক্ষণাৎ কোথায়, সে শুধু সাধুনার দূরে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছে অনেক দিন। সেদিনও করছিল একিক-ওদিক চেয়ে পাগল সদায়কে না দেখে ওর কাছেই থো



করতে এসেছিল তার পর।—সদ্যরকে দেখেচি নে, সে কাজে আসে নি?

কোদাল খেমে গিয়েছিল। মাটি কাটার ঝোঁকে আনত নেহ আছে আছে টান হয়েছিল। শ্রান্ত দেহপঙ্খের ভরাট করে বাতাস টেনেছিল হাপরের মত। তার পর জবাব না দিয়ে নিশ্চলক চেয়েছিল তার দিকে। ধতমত খেয়ে সাধুনা আবার জিজ্ঞাসা করেছে, সদ্যর ভালো আছে তো?

এবারও মুখে জবাব দেয়নি কিছু, একটা হাত তুলে আঙুল দিয়ে দূরের এক দিকে দেখিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, ওই দিকে আছে সদ্যর। কিন্তু চোখের পাতা পড়ে নি একবারও, আশ্চর্যবিশ্বস্তের মত হাতটা আপনি উঠেছিল যেন।

তাড়াতাড়ি ওর কাছ থেকে দু' মশ পা সরে বেঁচেছিল সাধুনা। সদ্যরকে দরকার নেই কিছু। দেখেনি বলেই খোঁজ করেছিল। যেখানে আছে জানল, সেও কাছাকাছি নয়। হোপুন কাজ শুরু করেছিল আবার। কিন্তু একটু বাদেই মাটি কাটার সেই হিংস্র তমস্রতায় ছেদ পড়তে দেখেছিল সাধুনা। একাধিকবার। তার পর সম্পূর্ণ। কোদাল-হাতে হোপুন চূপচাপ ঝাঁড়িয়ে দেখেছিল ওকে। সেই প্রথম ব্যতিক্রম। সাধুনা অবাক। আর কখনো এমন হয় নি। ওর নির্বিকার নিশ্চল হওয়া এতটুকু ফাটল দেখে নি কখনো। প্রথম ভেবেছিল কিছু বলতে চায় বুঝি।—কিন্তু তা নয়। ওকে দেখার মধ্য দিয়ে হুই নিশ্চলক কালো চোখ যেন কোন দূরে সমাহিত।

ইচ্ছে হচ্ছিল সামনে এসে ঝাঁড়ায় আবার। জিজ্ঞাসা করে কিছু বলবে কি না। ভরসা পায় নি। এই এক কালো মানুষের প্রতি সঙ্গমের শেষ নেই। দিনে দিনে সেটা বেড়েছে। পাগল সদ্যরকে আপন জন মনে করে। চাঁদমণির আকর্ষণও সেই প্রথম থেকেই। সেই সুবাদে এই লোকটার সঙ্গেও একটা সহজ সংযোগ অবাঞ্ছিত ছিল না। কিন্তু ওর সান্নিধ্যে সহজ হতে পারল না কোন দিন। সেদিনও পায়ে পায়ে প্রস্থানই করেছিল।

কিন্তু ওর সেই নীরব আচরণ ভালেনি।

দ্বিতীয়বারের ব্যতিক্রম এষ কিছুদিন পরে। সন্ধ্যার, অর্থাৎ গাছনার গোকর অপরাহ্ন বোম্বুনের সেই নিবিড়বিল পরিবেশে। ছাকরা চাকর সব গরু কিরিয়ে নিয়ে গেছে। সাধুনাও উঠবে উঠবে ঘবছিল। মড়াইয়ের ওধারে পাহাড়ের উপর ঠিক তেমনি একটা স্রব ঘেঘের দিকে চোখ আটকে গিয়েছিল। পড়তি সুধের গলানো সানায় ঠাণ্ডা লম্বাট কালোর বর্ণছটা।

বিষম চমক তারপর। বিশ তিরিশ হাত দূরে হোপুন। চাঁদের শেষে ঘরে চলেছিল সম্ভবত। ওকে দেখে ঝাঁড়িয়ে গেছে। ঘন এসেছে, কখন ঝাঁড়িয়েছে সাধুনা লক্ষ্য করেনি। এ পথেও গাহাড় পেরিয়ে গাঁয়ে বাওয়া চলে। তবু এ সাক্ষাৎ শুধুই যোগাযোগ নে হয় না সাধুনার। তাহলে আর কোনদিন অন্তত চোখে পড়ত।

...তেমনি নিশ্চল, নিশ্চলক চাউনি...তেমনি দূর বিশ্বস্তির থে উঠাও।

চূপচাপ থাকা বিড়ম্বনা। অসচ্ছন্দ্যের বোঝা ঠেলে সাধুনা উঠে সে জিজ্ঞাসা করল, আমায় কিছু বলবে হোপুন?

ঠাণ্ডা যেন আশ্রয় হল মানুষটা। চোখ থেকে দূরের ঘোর কেটে

গেল। পাবাশ মুখে চেতনার সাড়া জাগল। সঙ্গে সঙ্গে রুঢ় কঠোর ছাপ পড়ল একটা। সেই চিরাচরিত নিশ্চল হতা নয়।

তারপর চলে গেল।

বিমূঢ় বিষয় কাটতে সময় লেগেছিল সেদিনও। পরে মনে হয়েছে, এ বিকল্পতা হয়ত চাঁদমণির স্মৃতি বিজড়িত। চাঁদমণির রাগ ছিল সাধুনার ওপর, ওটুকুই জানে। পরের খবর তো জানে না। জানানো সম্ভব নয়। হলে বলে দিত।

বিগত ওই দুদিনের ঘটনা মন থেকে মোছে নি। সদ্যরের কথা ভাবতে গেলে একটা বোঝা শূন্যতার নিশীড়ন। চাঁদমণির কথা ভাবতে গেলে বুকের ভিতরে এক অব্যক্ত টনটনানি। কিন্তু হোপুনের কথা ভাবতে গেলে এক নিটোল শুকুতা, সে শুকুতার পিছনে নারীর অপরাধ... তাই সজোচ, তাই ভরও একটু।

তবু এমন নয়, যা কোন অনাগত সংস্রবের ছায়া ফেলে মনে। অথবা, বিভ্রমের মুগুরে অতর্কিত যা বসিয়ে দেয় একটা। কিন্তু আজ দিনে দুপুরে জিপে রণবীর খোবের পাশে ওই জম্বাট বাধা কালো স্মৃতি দেখে তাই হল যেন। সহসা স্থান কাল ভুল হয়ে গেল। বিভ্রান্তি আর কেমন যেন অস্বপ্ন। নীলচশমার পাশে ওই কালো স্মৃতি, নিষ্ঠুরতার পাশে কালো ত্রাসের মতই।

অতিকার গহবরের পাশ থেকে ডাম্পার মাটির স্তূপ বয়ে নিয়ে চলে দিয়ে আসছে যেখানে দরকার। বুলডোজার ঠেলে ঠেলে সমান করে দিচ্ছে সে মাটি। আর মাটি কাটছে অর্ধ-কাটার। সাধুনা ক্রনেছিল, নতুন মডেলের বিশাল বিশাল হুঁতিনটে মাটিকাটা যন্ত্র এসেচে আরো। সে নাকি এক ভয়ানক ব্যাপার!

শোনামাত্র সবুর সরনি আর।

অনেক দূরে একদিকে চলেছে সেই মাটিকাটা যন্ত্র। ভয়ানক ব্যাপারই বটে। হিংস্র গর্জনে সেই যন্ত্রদানবের অস্ত্র বিভীষিকা। স্তরে স্তরে শুকনো কঠিন মাটি চেঁছে নিয়ে আসছে, খুলে নিয়ে আসছে অবলীলাক্রমে। মাটির বুক কুয়ে নিমেষের মধ্যে এক একটা গাড়ি হোকাই করে ফেলেছে। নিঃশব্দ আর্তনাদে মাটির বাঁধন আলগা হয়ে খুলে আসছে। ট্রাকের গহবরে মাটি পড়ছে না যেন ধরণী আপনাকে উজাড় করে অঞ্জলি দিচ্ছে অজস্রধারে।

অদূরে একজায়গায় বসে তমস্র হয়ে দেখছে সাধুনা। বহুবুধর, স্বপ্নবুধর। দেখছে আর নিজের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে কোথায়। ধূ ধূ অতীতের ওধারে। এর পাশাপাশি আর এক যুগের আর এক মানুষদের সেই চোঁটার ছবি। বুড়ী ঠাকুরার চোখের জল সূর্য-ভেজানো, টোটকা পণ্ডিতদের মন্ত্রবাণে মেঘ জমানো, চানী প্রতিবেশীদের বাগবন্ধ ক্রিয়াকলাপ। সাধুনা কাপসা দেখেছে সব কিছু। চোখের কোল টলমল।

তমস্রতায় ছেদ পড়ে গেল। অগ্রস্রস্তের একশেষ। পাঁচসাত হাত দূরে ঝাঁড়িয়ে চিৎক ইঞ্জিনিয়ার।

—কি ব্যাপার, এ ভাবে বসে?

মুখ বুজিয়ে নিতে হল চট করে। বাহুতে চোখ বগড়ে নিল তাড়াতাড়ি। হেসে উঠে ঝাঁড়াল তারপর। হালকা জবাব দিল, আপনাব ওই যন্ত্রগুলির কেরামতি দেখছিলাম, বাবারে বাবা, এক একটা যেন মাটিগেলা রান্ধশ।

একিটায় এই যন্ত্রেই কাজ দেখতে এসেছিল বাবল পান্থলিও। কিন্তু সেখানে এমন এক দৃশ্যও দেখেও গিয়েনি। তদারক করে ফিরে বাবে বাবে করেছে না গাড়িরে পায়েনি। এমন বিস্মৃতি-বিশ্নী বৃত্তি আর দেখেনি। এখন আর তার চিরুয়ার নেই। বহা বিপত্তি এক সচেতন মূখরতার ভগ্নপূ। স্বপ্নপূর্বের কৃত্তা মনের কোথাও জমা হয়ে থাকল তবু।

পাশাপাশি আসছে। এভাবে এই লোকের সামান্য বহা পড়বে সামান্য স্বপ্নেও ভাবেনি।

কিছু একটা বোমাকর সত্যও এখানেই তালিক। আর কেমন এক অকারণ বৃশির বিড়ম্বনা। নিজপার, তাই বেগবোরা। প্রায় প্রগলভা।

—ডাশাণ্ডাল্যাত দেখাছে যেন শুকনো ভাটার মত এক একটা কল্পণ। নতুন আর্থকাতারের মাথার ট্র্যাংগি হাতে দ্বিধা মত বসে আছে ওই যে ট্র্যাংগিয়ার শোকাটা—বুঝানা। দেখলে মনে হয় জন্ম জন্ম ধরে কালের মত শুধু এই করে আসছে। কীকা মড়াইরে পাশা বুকগুলোকে উঁচু থেকে বেগবের তীব্র মত মনে হয় অনেক সময়। আর্থ ডামের ওই গুহিকটায় কিছুক্ষণ চরে থাকলে বদা হাতীর শিরের মত লাসে দেখতে। অনর্গল উপমা আর অনর্গল হাসি সামান্য।

সেমিন বেমন আজও তেমনি। মড়াইরের সর্গানিয়ক তো গরু কি! ও পরোয়া করে না। অজ্ঞত দেখতে চার বে পরোয়া করে না। অস্বস্তিতে সেমে উঠেছে ভিতরে ভিতরে। উঠলেই বা। বাইরে আট্ট সত্ব। দ্বিগুণ সহজ।

বাবল পান্থলি দেখছে। হালকা লাসছে। ভালো লাসছে। জিজ্ঞাসা করল, সেমিন আমার বাড়ি থেকে ওভাবে চলে এসে যে?

ঠিক বুকে উঠল না। কি ভাবে চলে এলায়?

—আবার টাবার তৈরী করে বাওরালে, তারপর নিজে না খেয়ে চলে এসে—নিধু দুঃখ করছিল।

চেসে উঠল সামান্য।—আর নিধুর মনিব?

—নিধুর মনিবও।

আবার সেই বৃশির বিড়ম্বনা। ফলে আবার সেট বৃশির উচ্ছলতা। সামান্য বড় করে নিশ্বাস ফেলল একটা। আটা, ময়ে বাই ময়ে বাই, নিধুর দুঃখ তার ওপর আবার নিধুর মনিবের দুঃখ—একবারে জোড়াকুমীর কাটা। আর একমিনি গিয়ে বেঁচে গিয়ে আসব?

হাসছে বাবল পান্থলিও। নিজের অজ্ঞাতে হাসছে। বলল, মিলে তো ভালই, নিধুর হাজার কথা মনে হলেই পায়ে আর আসে। তুমি এত ভালো বাঁধতে শিখলে কি করে?

পতীর মুখে সামান্য জবাব দিল, ইজিনিয়ার গিয়ে গ্রানি করিয়ে, ফ্রাক্টসম্যান গিয়ে ছক আঁকিয়ে, ওয়ারসিয়ার গিয়ে সাবতে করিয়ে, ককটাইর গিয়ে—। নিজের মূখরতার নিজেই লজ্জা পেল একটু।

ফিলে বার দুই অজ্ঞতঃ মড়াইরে উঠল গিয়ে দেখা যায় চিক ইজিনিয়ারকে। নিশ্বাসে আসে কখন, নীচেই পর্যবেক্ষণ করে, সকলের মধ্য গিয়েই সকলের পাশ কাটিয়ে যায় আবার। কিন্তু আজ বারী কেবল বা দেখছে তারা তবু কিছু উপলব্ধি করছে। জোয়াট হুয়া পড়েনি কোন। বিরেলী পাতীরের মূখর নেই।

মড়াইরের উপর থেকে দেখছে আর একজন। বদীর ঘোরে ফিলে ময়ে ক'বার দুইগতিতে তার জিপ ট্রান্সায়া মড়াইর নেই। অকারণে। কোতে আর আকোলে। লাহনার কত বার কোদার ভাঙনার। ক্রন্তসতির মাথার খাঁচ করে খেয়ে খেল জিপটা। এত উঁচু থেকেও মড়াইরের গলবে কোথ পড়েছে কিছু দুই বৃত্তি। একজনের পাতীরে আসল।

খুঁতে শিখনের আসল থেকে বাতলাকুলার হাত দিল। কি কাজে লাসে এটা এখানে? এখন না চোক, অসল লাসে মড়াইরে নিজের এলাকার বসে দ্বিগতিয়া পেল। যেন দুনি বার দুনি। কাজের কীক কীক কোথ উঠল ওটা। কোথ কোথ একজনের কহত কালিক।

চোখ থেকে নীল চশমা নামল। বাতলাকুলার উঠল। বাতলাকুলার। দ্বিগতি-বদী দুই বৃত্তি। চিক ইজিনিয়ার আর সামান্য নারী আর লুভ আর প্রলম্বতা।

কটন কোথ পলক পড়ে না। বতকণ কোথ যায়। সামান্য বিজির চল ওয়া। বাতলাকুলারের আঙতা থেকে একজনকে হাতের চর এবার। অকুই বৃত্তির মত সত্য লুভকে ভাঙিয়ে পড়লে। নারী প্রাচীর সামনে এগিয়ে আসছে কখন।

উঠে আসছে। কালি আসছে। প্রায় হাতের কালি এনে। তবু বদীর ঘোরে জানে খবর কাছ নেই। চোখ থেকে শব্দী সামান্য কাছের ঘোরে কোত বাবে।

—এমনকি টাঙাল। জিপটা কোথেকে এল গিলেছে। মিলেই কহায়ে কোথ টান করে। জোবাচাশি চল বাতলাকুলারের কিতাব ফিরে কহকে বুকুট। মড়াইর সামান্য বদীর ঘোরে। সেল দুই ঘোরে।

এর পরে কি হবে জানা আছে। ওই বীক শেহরোল আসল দেখা বাবে উঠে আসছে। উঠে আসবে। তারপর মদাসি বীক পড়বে ওই লোকটায়। তবু বাবুর লোকটায়।

বাবুর মত জিপ বসে প্রতীক কহত লাসল। মড়াইরে মিহাফ দ্বিগতিতে তার। বোকাপড়া হয়ে পেতে ফিলে চাকলাপায়ে সজে। এখানে তার এ চালচলন আর বাতলাকুলারের বাসিন্দা পাটনার। শাই জানিয়েছে। কলকাতার আঙতা নিয়ে কহতে চরে তাকে। আর কোত অকিন থেকে এনেকারাবির বাবুর কহতে চরে। মড়াইরে শুধু ফিলে চাকলাকাল থাকবে।

নাচ কোল। দেখা যাচ্ছে। বা কোথেকিল তাই। বিজির দ্বিগতি। কবিক থিরা। তারপর তবু বাবুর লোকটায়।

বদীর ঘোরে চকচকে মুখে হাসির আকাল। তবু বাবুর বাতলাকুলার।

সেমিন জিজ্ঞাসা করছিল তবু বাবুরকে। সেই জন্মের দিন সামান্য চিক ইজিনিয়ারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার সামান্যসামান্য পড়েছিল বখন। তারপর শো-ভাইন দেখতে আসল আকোলের কহায়ে মেয়েটা বা কলেছিল জোলেনি। তবু সেমিন অহা কত হায়েই অসল চরনি তত। পরে হালকা আকালে জিজ্ঞাসা করছিল তবু বাবুরকে। কায় বহাতে কুছে? বাবল পান্থলি? মনে জোবুই?

তবু বাবুর এত জানে আর উঁচু জানে না। আর চাক জি কেটে যায়। কিন্তু সেমিনের সে জোবাক পোকা বদীর ঘোরে



তাড়া তাড়া নোট দিয়ে এমন পিটুনি জ্বয়েতক দেখেনি। বাবা চিন্তিত হয়েছেন, কি ভাবে শোধ নিতে চেষ্টা করবে ওই কনষ্ট্রাক্টর ঠিক কি। সে চিন্তা সাধনাকেও স্পর্শ করেনি এমন নয়। কেমন মনে হয়েছে, তার জন্তেই এতটা হয়েছে। হঠাৎ আবার জিপে বণবীর ঘোষের পাশে হোপনের মূর্তি স্মরণ হতেই ভয়ের ছায়া নামল মুখে।

নরেন এসে দাঁড়াল। মোড়া টেনে দাঁড়ায় বসল, যেমন বসে। সহজাত হালকাভাবেই বলল, আমার আবার তাড়া নেই কিছু, খেয়ে এসছি।

সাব্বনা সর্কোভকে তাকালো তার দিকে। বলল, নতুন নতুন লাগছে শুনতে।

—যে ভাবে তাকান, মনে হচ্ছে নতুন নতুন লাগছে দেখতেও।

—লাগচেই তো। আপনার আবার এক রাগ জানতুম না।

কোন প্রসঙ্গে বলছে বুঝেই নরেন হাসতে লাগল তার দিকে চেয়ে। এ ছাড়া আমার আর বা কিছু সব জেনে ফেলছে বোধ হয়?

নিরুপায় হয়ে তেমে ফেলল সাব্বনা, খুব কট কট করে কথা শোনাচ্ছেন যে—এ কদিন আসেন নি কেন?

অনেকবার স্থির করেছিল, দেখা হলে বলবে, সেদিন গুরুত্বম বলাটা তার অস্তায় হয়েছে খুব। বলে উঠতে পারল না। কিন্তু বা বলল, নরেনের কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছলো বোধ হয়। নিশ্চয় মুখে জবাব দিল, না এসে দেখছিলাম পেয়ারা পাঠাও কি না, আশা নেই লেখে শেষে চলে এলাম।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সাব্বনা। সেখানেই বসল। চেষ্টা করেও হালকা কথা কিছু মুখে জোগালো না। বাইরের দিকে মুখ ফেরাতে হল। ভ্রমলোকের কথাবার্তার ধরণ-ধারণ শ্রবণের ঠেকছে না।

প্রসঙ্গ বদলে নরেনই জিজ্ঞাসা করে বসল আবার, মড়াইয়ে বাদল গাঙ্গুলির সঙ্গে খুব গল্প করছিলে দেখলাম—

প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ একেবারে ধকমত খেয়ে গেল সাব্বনা। সচকিত বর্ণাঙ্কর। নরেনের চোখ এড়ালো না কিছুই। চেয়েই আছে। হাসছে একটু একটু।

হালকা বিষয়ে সাব্বনা পান্টা প্রসঙ্গ করল, ও মা, আপনি আবার কোপে কোপে কেলেন?

—পা-ঢাকা দিয়ে তো আর ব্রহ্মিলে না, সব জায়গা থেকেই দেখা গেছে ...তা কি কথা হল?

আবার লাল হয়ে উঠছিল সাব্বনা, শেষের প্রশ্নটার আল্পস নিয়ে বাচল। ছদ্মগাষ্ঠীয়ে বলল, কথা হল আমি খুব ভালো বাঁচি, আর নিধুর রাগার কথা মনে হলে গায়ে একেবারে স্নায় আসে। আচ্ছা কেন্দ্র আপনাদের চিকিৎসিনিয়ার—এক টাকা মাইনে পায়, দেখে শুনে একজন বাঁধুনী রাখলেই হয়।

শুণি টপ্পন নয়। নিজে এ বিস্তার পটু বলে করুণাও। নিধুর রাগার বহর স্বচক্ষে দেখেছে।

সঙ্গে সঙ্গে নরেন ঠাটা করল, তা পছন্দ মত বাঁধুনীর খোঁজে যদি এ বাড়ির দিকেই চোখ দেয়, তাহলে?

—যাও, আপনি বাচ্ছেতাই লোক। ক্রুটিটি সম্বোধ আরজ হয়ে উঠল। এ কথাই জবাবে এই ভ্রমলোক এরকম ঠাট্টাই করবে স্তেনেও বলা। তবু বিকলে মড়াইয়ের অমুভূতিটুকু নিজের অজ্ঞাতে মিষ্ট আনন্দের মত যেন ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে আছে। সেই খুশিটুকুই প্রকাশ পেল আবারও। হাসিখুশি মুখেই জিজ্ঞাসা করল, ভ্রমলোককে সবাই এত ভয় করে কেন বলুন তো? ক'দিন তো কথা বলে দেখলাম, মেজাজপত্র দিবি ঠাণ্ডা।

নরেন চূপচাপ চেয়েছিল। মুচকি তেমে বলল, তোমাকে সে মেজাজ দেখাতে বাবে কেন?

—অজ্ঞ লোককে? হালকা আগ্রহ।

—অজ্ঞ লোককেও মেজাজ ঠিক দেখানো না, তবে কাজের বাইরে নিজের মনে একা থাকতে থাকতে এমন হয়েছে যে ভরসা করে কেউ বড় বোঁঝে না কাছে।

বলায় মধ্যে আত্মবিক্রমের স্পর্শ ছিল কোথায়! নারীশল্লত একটুখানি বেগনার ছায়া পড়ল মুখে। কিছু না ভেবেই জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ভ্রমলোকের আপন বলতে আর কেউ কোথাও নেই, না?

আবার হাসতে লাগল নরেন চৌধুরী। নিশেধ হাসি আর সর্কোভিক নিরীকণ। সাব্বনা বিব্রত বোধ করতে লাগল কেমন। বেশ খানিকক্ষণ চূপচাপ থেকে নরেন শানাসিতে জবাব দিল, আচ্ছা, তেমন কেউই আছে, তবে ভ্রমলোক সেটা এখনো টিক জানে না বোধ হয়।

এক বলক বন্ধু উঠে আসছে সাব্বনার মুখে। সেটা টের পেতেই জিজ্ঞাসা বিষয়ের ভান করতে হল বধ্যাসহব। কিন্তু সেও তার কতক্ষণ। ভ্রমলোকের চোখে-মুখে গা-আলানো হাসি।

উঠে চট করে রান্নাঘরে চলে গেল। সেদিকে চোখ রেখে নরেন তেমনি হাসছে মুহু-মুহু।

সাব্বনার সামলে নিতে সময় লাগল বেশ একটু। ওই ভাবে না তাকালে আর ওই ভাবে না হাসলে সেও রাগ দেখাতে পারত বা বাতোক কিছু বলতে পারত। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে করতেও হবে সে বকম কিছু বা বলতে হবে। কিন্তু আদ্যনা ছাড়াও নিজের মুখের অবস্থা অনুমান করতে পারছে।

চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। শুল্লদীর ছোঁকা চারক উত্তন ধরিয়ে রেখে গেছে। বেশ লক্ষ করে কেটলি ধুয়ে চায়ের ভল চড়ালো। শাড়ীর আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলো তারপর। বিবৃৎ পরকণে।

নরেন চৌধুরী চলে গেছে।

প্রথ পায়ের মেন কোয়াটারস-এর দিকে চলেছে নরেন চৌধুরী। অনেকটা নিশ্চিন্তের মত। অজ্ঞ-অজ্ঞ হাসিটুকু মুখে লেগে আছে তেমনি ...হাসি ঠিক নয়। তবু হাসি বই কি।

মুন্ডির মত দাঁড়ায় বসে আছে সাব্বনা। রান্নাঘরে কেটলির জল ফুটে উঠন নিবন্ধে, খেয়াল নেই। [ ক্রমশঃ ]

[ মাসিক বন্ধুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য ]

# আমি

[ পুষ্করকাশিতের পর ]

জরাসন্ধ

যে তাকিয়াটাকে আশ্রয় করে এতক্ষণ কাঁত হয়ে ছিলেন, এবার তারই উপর সঠান শুয়ে পড়ে তালুকদার বললেন, তার পর ? কী বলতেন তোমার মাষ্টার মশাই ?

নেবেতোর বসে ছিলেন পাশেই একটা কাম্পাচেয়ারে। উঠে পড়ে বললেন, ঠাঁড়ান, আপনাদের সিগারেট নিয়ে আসি।

—আর তোমার ঐ বনমালীকে বল আর এক কাপ চা দিতে। দাঁড়া, ও যে একজন গুস্তার চাকর, সেটা সব চামচে নাড়া দেখতেই যোগ্য যায়। এালুসনটা বুকেল না তো ? ডাক্তার তিজাত্র চোখে তাকালেন। তালুকদার বললেন, যখন হিন্দু হাট্টলে হিলাম, অগ্ন্যস্তর Ward Servant ছিল বাকী। একটি নতুন কাঠি ইয়ারের ডেলে বন্ধুর কাছে তাকে চাকর বলে উল্লেখ করেছিল। দাঁড়া তো ভীষণ শায়া। সরকারী চাকরি করে। চাকর বললে বরদাস্ত করার কেন ? তাকে ঠাঁড়া করলেন আমাদের মহীতোষ সা। ডেকে এনে বসলেন, ওরে মুখা, চাকর মানে চাকর নয়। ওটা মজবুত কথা। চা করাতি, ইতি চাকর। তোর মত চা করে কে ?

দেহতোষ হাসতে হাসতে বললেন, গরুটা বনমালীকে শোনাতে হবে, দেখছি।

—সে কালও করো না। এখন যাড়ে চড়ে আছে। এর পরে মাথার ঠাঁয়ে। মাইনে দাও কত ?

—যখন বা পারি। কোনো হিসেব-শুভ নেই।

—ওকে আমি Kidnap করবো ঠিক করেছি।

—বন্ধে কখন, দাঁড়া। তাহলে আমার চলেবে কেমন করে ?

—ঐ লক্ষীছাড়াটাই কি চিরকাল ঢালাবে নাকি ? লক্ষী একটি জোটাতে হবে না ?

—কোনো দরকার নেই। এই বেশ আছি। বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

আজ সকালেই দেহতোষের ছুটি মজুর হয়ে গেছে। সন্ধ্যা থেকে তার এই শোবার ঘরেই আত্মনা নিয়েছেন তালুকদার। বটা এই কোণ দিয়ে কেটে গেছে কেউ টের পাননি। আজকার বন্ধা লখতোষ। উনি শুধু মাঝে মাঝে হু-একটা সন্ধিপ্ত প্রব্রের ভুব্রি ামিয়ে তার অন্তরের গহন থেকে সাগ্রহ করছিলেন বা কোনো দিন কউ পায়নি। ডাক্তার সিগারেট নিয়ে ফিরে এলে তালুকদারও

তার পুরানো প্রবেশ ফিরে গেলেন, এবার বল তোমার সেই পাগলা মাষ্টারের কাহিনী।

ডাক্তার তার সেই কাম্পাচেয়ারটা আবার দখল করে বললেন, আমার ওপরে ঠাঁর একটু বিশেষ টান ছিল, যদিও আমিই বোয় ছা সব চেয়ে বেশী ছালাতন করতাম। মাঝে মাঝে আমাকে বেড়ায়ে নিয়ে যেতেন, আমাদের সেই মহকুমা স্তর থেকে অনেকখানি কুচে কোনো কীকা মাঠে, কিংবা নদীর ধারে। কত কী বলতেন একটা কথা প্রায়ই শুনতাম তাঁর মুখে—এই যে দেখছিস মাঠ যা গাছপালা নদীনালা, যাদের আমরা বলি বিধ প্রকৃতি, মানুষও হা একটা আশ। এদের মত সে-ও নতুন করে জন্ম নিচ্ছে প্রতিদিন ঐ আকাশের বা যেমন বললার, কেন বললার কেউ জানে না, কেই প্রশ্ন করে না, তেমনি মানুষেরও বা বললার, তার মন বললার কিন্তু আমরা সে কথা মানতে চাই না। তর্কের বেলায় মানিয়ে কাজের বেলায় মানি না। জোর করে বলি, অমুকে এ বকর হতে পারে না তুমুকে একথা বলতে পারে না। অথচ দুটোই এক, একই বিষয়ের সৃষ্টি। তুষেব মধ্যে একই লীলা একই বৈচিত্র্যের খেলা। কাল বাতে বড় উঠেছিল বলে, আজকের উহার হাসি কে। বন্ধ থাকে না ? তেমনি যে মানুষ কাল একজনের বৃকে ছুরি বসিয়েছিল, আজ সে আর একজনকে বৃকে জড়িয়ে ধরতে পারে। কালকার 'আমি'র সঙ্গে আজকার 'আমি'র অনেক তফাৎ। কালকের বীভৎস রূপ যদি সত্যি হয়, আজকের এই মোহন রূপও মিথ্যা নয়। গভীর আবেগের সঙ্গে এই সব কথা যখন বলতেন মাষ্টার মশাই, মনে হত, এ সব শুধু কথা নয়, তাঁর মনের কোনো প্রত্যাক সত্য বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তাকে যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি। তারপর আবার ভুলে যেতাম। অল্প সন্ধ্যের মত আমিও বলতাম, পাগলা মাষ্টার। কিন্তু তার পাগলামির ভূত যে বরাবর আমার ঘাড়ে চেপে ছিল, বহুকাল পরে সেটা টের পেলাম, যখন এলাম আপনাব এই জেলখানায়। দেখলাম খুনী, ডাকাত, পকেটমার, জোক্তোর, গুণ্ডা বলে বাদের চিরদিন ভর করে এসেছি। যুগ করেছি সমস্ত অন্তর দিয়ে, তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কোথায় ? তারাই তো খুনী হলে হাসে, হুংব পেলে কাঁদে, উপকার করলে কৃতজ্ঞ হয়, ভালবাসলে সাড়া দেয়, অপমানে হুঁক হয়। আমার হাসপাতালের কালডু কটিক বাগদী একটা বাজা

মেয়ের গলা টিপে মেরেছিল, এক ভরি একটা সোনার হারের জন্তে। সেদিন জমাদানের ছোট মেয়েটার কোড়া অপারেশন দেখে কেঁদেই অস্থির। ছুটে গিয়ে কার কাছ থেকে একটা কমলা লেবু এনে শুজে দিল মেয়েটার হাতে। সেই মুহূর্তে যে চোখ দুটো তার দেখলাম, সে তো খুনীর চোখ নয় ?

দেবতায়ের কণ্ঠ বাঁধে বাঁধে মিলিয়ে গেল। তালুকদার কোনো সাড়া দিলেন না। কয়েক মিনিট বিরতির পর আবার বললেন, ডাক্তার, আমার সে জ্বালা মাঠার আজ আর নেই। কিন্তু তার সেই চোখ দুটো আমার চোখের ওপর ভাসছে। সেই চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে আমি এই কয়েকদিনে দেখতে চেষ্টা করি। হঠাৎ মনে পড়ে, কাল রাতে বড় উঠেছিল বলে, আজকার উবার হাসি তো বন্ধ হয় না !

এবার তালুকদারের সাড়া পাওয়া গেল। চোখ বুজে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, But after all they are criminals. ডাক্তারের মুখে মুহূর্তে হাসি ফুটে উঠল, criminal বৈ কি ? জেল বন্দন এসেছে।

—Exactly বিধানার উপর উঠে বসলেন তালুকদার, তার পর বললেন, জেলের বাইরে যে বিশাল দুনিয়া, যেখানে এটুকুই ওদের একমাত্র পরিচয়। জেল থেকে বেরিয়ে বন্দন যাবে, তখনও তারা কেবল মাত্র ex-convicts। কিন্তু সে কথা আজ তোমার মাথায় ঢুকবে না। তোমার কাঁধে ভার করে আছে পাগলা মাঠারের ভূত। চোখের দুইই বদলে গেছে। তুমি দেখছ, হেনা মিত্র বলে যে সর্বনাশী এক দিন এক জনকে বিধ খাইয়েছিল, আজ আর এক জনের জন্তে সে বয়ে এনেছে অমৃত। কিন্তু এই বিষকণ্ঠা যেদিন এই পাঁচিলের বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে, আর সারা সন্ধ্যার কাছের বিবদুষ্টি ছাড়া আর কিছুই পাবে না, তখন যদি ওকে দেখতে পাও, ওর হাতের এই সুখার ভাঙটা তোমার নজরে পড়বে তো, ভায়া ?

—আজ আর এসব কথা কেন, দাদা ? মুহূর্তে কল্পনায় বসলেন দেবতায়। যে অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে, পাতা উলটে আবার যেখানে কিরে গিয়ে কী লাভ ?

—ভুল করলে দেবতায়। দার্শনিকরা বলেন, জীবনটা হচ্ছে বার বার পড়া উপক্ৰান্ত। তার কোনো অধ্যায়ই কোনো কালে শেষ হয় না। তা ছাড়া আমি তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেটা 'বদির' কথা। যে-ভূমি আমার সামনে বসে বক বক করছে, তার কথা নয়।

—ও 'বদির' কথা ? তাহলে বলবো, আপনাদের প্রেমের উত্তর আপনি নিজেই দিয়েছেন। যে-মাহুজ এক বার অমৃতের স্বাদ পেয়েছে, সে অমর। বিষ তাকে কোনো দিন নশ্পর করবে না।

—দাদা, ও-সব রূপক ছেড়ে সাদা কথাই এসো। বন্দন দেখবে, এই একটা মাহুজের জন্তে মুখ কিরিয়ে চলে গেলেন তোমার আত্মীয়-পরিজন, আর আমাদের ভ্রজ সমাজ তার দরজাটা বেশ করে এঁটে বন্ধ করে দিলেন তোমার মুখের উপর, তখন ?

দেবতায় হেসে ফেললেন, জানতে চাইছেন, তখন কী করতাম ? আর বাই করি, বীরা মুখ কেবলেন, তাঁদের মুখ দেখবার জন্তে ছটকট করতাম না, আর, যেদরজা বন্ধ হল তাও খোলবার জন্তে চানচানি

করতাম না। কিন্তু ও-সব বদিকটি আজ একবারেই অবাস্তব ওগুলো আজ থাক।

বেশ রাত হয়েছিল। তালুকদার বিছানা থেকে নেমে লাঠিখান হাতে নিয়ে বললেন, তুমি তাহলে সত্যিই চলেছ ডাক্তার ?

দেবতায় মাথা নত করলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

—কোথার যাবে ঠিক করলে ?

ডাক্তার মাথা তুলে বললেন, ঠিক কিছুই করিনি। ভাবছি, কিছু দিন ঘুরবো।

ছ'পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন তালুকদার। প্রশ্ন করলেন, দাদা, ওর সবকিছু কিছুই কোনো দিন জানতে চাওনি ?

—জেনেছিলাম, যেটুকু আমার প্রয়োজন।

—কী সেটুকু ?

—কোনোখানে ওর কোনো বাঁধন নেই।

—আমার মনে হয়, বাঁধন না থাকলেও হয়তো কোনো বাধা আছে, বা আমার জানি না।

—জেনেও কিছু লাভ নেই দাদা ! তার শেষ উত্তর শেষে গেছি।

—এই দাখ ; আবার আমাকে দর্শনশাস্ত্র জাওড়াতে হল। সংসারে শেষ বলে কিছু আছে কি ?

ডাক্তারের কাছ থেকে এ প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

বড় বড় জেলের বড় জমাদারের একাধিক 'রাইটার' থাকে।

অনেকটা প্রাইভেট সেক্রেটারীর মত। কয়েকটা হলেও তারা লেখাপড়া জানা মাস্তুর কয়েক। কোন নব্বের কত আসামী বন্ধ হবে ; কত গেল, কত এস ; কোন কোন খাটনিতে লোক চাই, কোথায় হাঁটাই দরকার ; নতুন যারা আসছে, তাদের 'কাম পাশ' বা কাজ বন্টন, এই সব এবং এ ছাড়া দৈনন্দিন কারা-পরিচালনার আরো অসংখ্য খুঁটিনাটি ব্যাপার হিসাব পত্র রাখা এবং জমাদারকে সাহায্য করাই হচ্ছে তার রাইটারদের কাজ। তাদের হাতে ক্ষমতাও প্রচুর। যারা খাটনি-বদল চায়, গম-পেশা থেকে ফুলবাগান, 'চৌকা' থেকে 'ঝাড়ুদকা', কিংবা 'রাষ্টাচারি' ( Road-repairing ) থেকে 'বাতি কমান' ( Lamp-lighting ) রাইটার বাবুর সুপারিশ ছাড়া তাদের গতি নেই। সাধারণ কয়েদী থেকে 'পাহারা', কিংবা 'পাহারা' থেকে 'মেট' পদে যার প্রোমোশন দরকার, তাকেও প্রথমটা গিয়ে দাঁড়াতে হবে এই রাইটারের কাছে। কারা-শাসন-তন্ত্রে বড় জমাদারের যে প্রতিষ্ঠা, তার অনেকখানি নির্ভর করে উপযুক্ত রাইটারের উপর।

সুশীলা বড় জমাদার নয়, জেনারেল ফাটকের জমাদারী। তার রাজ্যটা নেহাৎ ক্ষুদ্র, কাজকর্মও ক্ষুদ্রতর, তবু রাইটারের আকাঙ্ক্ষা তার অনেক দিনের। মহাবল সিং-এর মত দু'-তিনটা না হোক, অন্ততঃ একটি লেখাপড়া জানা অনুরাগ মেরে তার পায়ের কাছটিতে কবল বিছিয়ে বসবে, আর তার নির্দেশমত লিখে থাকে অনুরকে 'ফাটা-দরজি' ( ছেঁড়া জামাকাপড় মেরামতের কাজ ) থেকে ভালটাকি, তরুকে ঘাস-ছেঁড়া থেকে চালঝাড়া— এটুকু না হলে তার মর্মান্ব রক্ষা হয় না। কিন্তু এমনি কপাল, লেখাপড়া জানে, এরকম কটা মেয়েই বা জেলে আসে ? কাল-ভ্রমে যদি বা এসে পড়ে তার মনের কথাটা কেউ বোঝে না। হেনা যেদিন এল,

তাকে দেখে, তার চালচলন কথাবার্তা লক্ষ্য করে সশীলার সেই লুপ্ত আঁখি আবার জেগে উঠল। মনে মনে স্থির করে কেলেস, একে আর কোনো কাজ করতে দেবে না; এবং একমাত্র পদ হবে স্ত্রীমাল্যবীর রাইটার। কিন্তু হেনাও তার অন্তরের কথাটা ধরতে পারল না। প্রজ্ঞাবটা একরকম হেসেই উড়িয়ে দিল, আপনায় ঐটুকু কাজ করতে আর কতক্ষণ লাগবে, মাসীমা? খাটনি বুঝিয়ে নিয়ে এসে ওটা আমি দু'মিনিটে করে দেবো। সশীলা ক্রুদ্ধ হল। কাজ তার চলে গেল ঠিকই। কিন্তু রাইটার তো হল না। যে ডাল ভাজে, বতই লিখুক, তাকে কেউ রাইটার বলবে না।

কিছু দিন পরে ডাল-খাটনি থেকে হেনা চলে গেল টি-বি ওয়ার্ডে। তার পর বড় সাড়েবর ভক্ত্যুমে, সে কাজ বখন তার বন্ধ হয়ে গেল, ওকে এবার কোথায় দেওয়া যায়, ভাবতে গিয়ে সশীলার মনের কোণে হঠাৎ নতুন করে দেখা দিল সেই রাইটারের স্বপ্ন। হেনাকে ডেকে নিয়ে বলল, তোমার খাটানি-খয়ে বেতে হবে না। ক'টা দিন জিরিয়ে নে। তার পর আমার এই কাজটাজুগুলো একটু আখুটু দেখা-শুনা করবি। আমি জেলের বাবুকে বলে সব ঠিকঠাক করে দেবো। হেনা এবার বৃদ্ধল সবই। কিন্তু সায় দিতে পারল না। মনের কোণে ছুঁয়ে গেল একটুখানি বাখার স্পর্শ। বলল, সে হয় না মাসীমা! আগে যা করতাম, তাই করবো। জেলের বাবুকে এ নিয়ে আপনি আর কিছু বলতে বাধেন না। সশীলারও শেষ পর্যন্ত মনে হল, এর কথাটা ঠিক। এই সামান্য ব্যাপারে বড় সাহেব পর্যন্ত বখন মাথা ঘামাচ্ছেন, তখন তার মত লোকের নাক গলানো উচিত হবে না। কর্তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

অনেক দিন পরে আবার বখন বাঁতার পাশে গিয়ে বসল হেনা, এখন রাণীবালায় ডিউটি। দু'তিনটি মেয়ের সঙ্গে তার একটুখানিীরব হাসির আপন-প্রলান অনেকের অজ্ঞান্যে হলেও হেনার চোখ ডাল না। অনভ্যাসের ফলে ওকে একটু ঘন ঘন হাত বদলাতে ছিল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, কঠে বেশ খানিকটা দরদলে বসল রাণীবালা, তোমার যদি কষ্ট হয়, রেখে দাও না। কীটা ওরা কেউ করে দেবে।

হেনা সজ্ঞ সুরেই বলল না, না। কষ্ট হবে কেন?

—তুমি 'না' বললে কি হয়, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি। টি ভাবছিলাম, ডাক্তার বাবুকে বলে তোমার খাটনিটা মাপ দিয়ে দেবো।

কয়েকটি মেয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠল। কমলার কাজ ল না। সে বসেছিল দরজায় টেগান দিয়ে। হঠাৎ বলে গেল, দরকার হলে সেটা ও নিজেই বলতে পারবে। আপনাকে যি কষ্ট করতে হবে না।

—তোমাকে তো আমি কিছু বলিনি বাছা, বন্ধার নিয়ে ল রাণীবালা, তোমার এত জল্পনি কিসের?

কমলা কী একটা উত্তর দিতে বাচ্ছিল। তার আগেই হেনার ঠাশোনা গেল চাপা ভংসনার সুর—কমলা! আর কোনো কথা বলে সে উঠে চলে গেল। ঘরের আবহাওয়াটা কেন্দ্রীয় মধ্যমতে লাগল।

বেলা গড়িয়ে গেছে। সবারই লক্ষ্য তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে জটুকু সেয়ে কেলে। এমন সময়ে দরজার বাইরে শোনা গেল

রাণীবালায় গলা, এই যে নিস্তারিণী, কী খবর? নিস্তারিণীকে মেয়েরাও চেনে। ওর নাম ফালতু জমাদাংগী। হাজতী-মেয়েদের যেদিন মামলার তারিখ থাকে, সেদিন ওর ডাক পড়ে তাদের কোর্টে নিয়ে যাওয়া এবং সন্ধ্যাবেলা আবার পৌঁছে দেবার জন্তে। তাছাড়া কোনো মেয়ে বখন সদর হাসপাতালে যায় কিংবা চালান হয়ে যায় অন্ত জেলে, তখনও সঙ্গে যায় নিস্তারিণী।

রাণীবালায় প্রশ্নের জবাবে বলল, এই তো, এলাম। একটা চিঠি আছে।

—চিঠি! কার চিঠি?

—হেনা কার নাম?

—ঐ তো হেনা। কোপেকে এল চিঠি?

—হাসপাতাল থেকে।

হেনার হাত দুটো হঠাৎ অচল হয়ে গেল। মাথা না তুলেও বুঝতে পারল, চার দিকে সবগুলো না হোক, অন্ততঃ কয়েকটা মুখ চাপা হাসিতে ফেটে পড়ছে। রাণীবালা তাড়া দিয়ে উঠল, নাও না চিঠিখানা। ডাক্তার বাবু দিয়েছে বুঝি?

—না, না। ডাক্তার বাবু নয়, বলল নিস্তারিণী। দিচ্ছে ঐ বুড়ী, কি নাম বেন!

—মোনার মা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ মোনার মা।

—ও, তুমি বুঝি ঐটাকে নিয়ে আছ?

—আর বল কেন, দিদি! এরকম একটা ঘ্যান-ঘ্যানে বুড়ী জন্মে কখনো দেখিনি।

হেনার ঘেন ঘাম নিয়ে আর ছেড়ে গেল। উঠে এসে চিঠিটা নিল নিস্তারিণীর হাত থেকে। চিঠি মানে ছেঁড়া এক টুকরা কাগজ। আঁকাবাঁকা অক্ষরে পেল্লিল দিয়ে লেখা। কোনো রুগীকে দিয়ে লিখিয়েছে বোধ হয়। দু'টি মাত্র লাইন—'দিদিমনি, ডাক্তার বাবুকে বলে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এখানে থাকলে আমি মরে বাবো।' হেনার চোখ দুটো ছল-ছল করে উঠল। এই বঙ্গাব্যগ্রস্ত বুড়ীটাকে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তার মনটা যে কখন জড়িয়ে পড়েছিল, এত দিন টের পায়নি। কিন্তু বুড়ী যে ওকে কতখানি ভালবাসে, শুধু ভালবাসে নয়, কতখানি ভয়স। করে, নির্ভর করে ওর উপর, তার পরিচয় অনেক বার পেয়েছে। তাই জেলের বাইরে গিয়েও সেই জেলেই আবার ফিরে আসবার জন্তে ছটফট করছে। সেখানকার নির্যমিত চিকিৎসা, সুন্দর নার্সদের সেবা-যত্ন সব ফেলে ডাক্তার বাবু আর দিদিমণির কাছেই তার প্রাণটা পড়ে আছে। ওখান থেকে উদ্ধার পাবার আর কোনো পথ চোখে পড়েনি। এক টুকরা কাগজ পাঠিয়ে শরণ নিয়েছে সেই দিদিমণির, যে তারই মত কিংবা তার চেয়েও অসহায়।

—ও মেয়ে, গিয়ে কী বলবো বুড়ীটাকে? নিস্তারিণীর ডাক শুনে হঠাৎ ঘেন ঘ্যান ভেঙে ভেঙে উঠল হেনা। নিস্তারিণী বলে চলল, যাওয়া নেই, লাওয়া নেই। খালি এক কথা—আমাকে দিদিমণির কাছে নিয়ে চল।

হেনা বলল, আমি তো ওকে চিঠি দিচ্ছে পায়ি না। আপনি বুঝিয়ে বলবেন, ওখানে থাকলেই শীগগির শীগগির ভাল হয়ে বাবে।

ভালা হলেই ওরা এখানে পাহিরে দেবেন। আর বলবেন, যাওয়া যাওয়া ছেড়ে দিলে আমি ভীষণ বাগ করবো।

পরদিন বিকালবেলা। সুশীলার আসওয়া কবা চারটা সাড়ে চারটায়। এল প্রায় সন্ধ্যায় কাছাকাছি। বিকালিক খাবার যাওয়া সেবে তেনা একা-এক। যেটা কাছটায় বসেছিল সুশীলাকে দেখে বলল, আজ এত দেরি কে মাসীমা?

—মিটি-এ গিয়েছিলো। সুশীলার চোখোখুশে বিস্ময়ভর চিহ্ন।

—মিটি-এ। কোথায় মিটি?

—কলখানায় বড় মাঠে।

৬ —কলখানায় আবার মিটি হয় না কি?

—মামিও তো কাই জানতাম। কলখানায় এ সব কাণ্ড আমার তিন কুলে কেউ শোনে নি, কেহা তো পূরবে কথা। আজ দেখে এলাম নিজেই চোখে।

তেনাও কৌতূহল বেড়ে গেল। কাছে এগিয়ে এসে বলল, কিসের মিটি মাসীমা?

সুশীলা যেন মনে মনে সেই দুকটা খবর করে গেল, আমায়ের ভাকার বাবু চলে যাচ্ছেন, কয়েকটা তাকে বিনয় দিয়ে গেল। একটু যেম আবার বলল, যাউজরি লোক। উনি বসে আসছেন ঠিক সন্ধ্যায়। পাশে বসেছেন কলের বাবু। আর সব লোকেরাও রয়েছে একে একে এসে মালা দিয়ে যাচ্ছে তাঁর পলায়, সেলার করছে। কেউ পায়ে চাক দিয়ে প্রণাম করছে। সব দেখে এলাম। বাইল বন্ধ কলখানায় আছি। কত বাবু কলখানায়। কত কলের, ভাকার বলি হয়েছে, ছুটি নিয়ে গেছে। বাবু! মিলে অফিসে বসে চাট খাটবেছে কাউকে কাউকে। কিয় এ বকম কয়েকটা মেলা কোনো দিন হয়নি।

তেনা আর কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু চেয়ে বসল কবে ঐ আমগাছটার নিকে।

সুশীলা আবার শুরু করল, কী শুন্য বক্তৃতা দিলেন, এক বার যদি তুমতিস?

হেনা হাসল মুহু হাসি থা, আমায় আর কাজ কী। কলের যাঠ বক্তৃতা শুনেই বাই। কী বলছেন?

—সে সব কি আমি ছাউ বুঝি? কিন্তু ভাবী ভালা লাগছিল। কয়েকগুলায় কী কারা। সকলের মুখে এক কথা, এরকম বাবু আর হবে না।

লক্ষ্যবাহা দাঁটা বেজে উঠল। জমানার আসছে লক্ষ্য-আপ-এর উত্তাপ করতে। সুশীলা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বহননী জমানারগী ঠিকই বলেছে। কলের কোনো অফিসার চলে যাচ্ছেন বলি চাবে, কিংবা ছুটি নিয়ে, আর কয়েকটা নিকে তাকে বিলার অভিনন্দন, এরকম ঘটনা ছিল নিতাছট অভ্যর্থনায়। শাসক এবং শাসিতের যে সম্বন্ধ, তার মধ্যে দ্বন্দ্ববৃত্তির স্থান নেই।

এক পক্ষ হতুম করবে, আর এক পক্ষ তাহিল করবে, তার বেশী আর কিছু নয়। কারো বেলায় কোনো বাস্তবিক যদি ঘটত, হতুমের বর ভেদ করে সেবা দিত অস্তবের যোগসূত্র, কর্তৃপক্ষ বিচলিত হতেন। কয়েকটা বাকে প্রীতির চক্রে দেখে, তার উপরে পড়ত সরকারের

কারো-মরাল জনপ্রিয় হওয়াটা কতই এর জরুরীয়। আমায়ের এমন চাকরির দিক দিয়েই আমায় ছিল না। বন্ধুত্বের জন্যে। তাই প্রায় বাস্তবিক প্রায় কালের যে শত্রুতায় মীথের জামনের কাছ এবং বাস্তবিকিক প্রকাশের ক্ষমতা না। কয়েকসংকে নিয়ে গিয়ে এক বালক কলখানায় করে এসে এ কলের কয়েকটা। কলের সব লোকের সমস্ত প্রাণমিথি কলের সাহায্যে কাক দিয়ে জানাল, কলখানায় একে-একে ভাকার বাবুকে কলের অস্থানের লক্ষ্য কলখানায় দেওয়াতো উপর সাধারণ কলের জমানার কলখানায় অফিসার ছিল না। এই বাস্তবিকিক সাহায্যে হতুম করত করে সেখানে চুল করা হত। এ বিষয়েই ছিল আমায় ছিল না। তাই বহাণের লক্ষ্য দিয়েই তিনি কয়েকটা কলের প্রশাসকের কাছ গিয়ে কলখানায়।

সকাল সাড়ে সাতটা হয়ে গেলেন। প্রায় এই কাছাকাছি উপলব্ধ করে কলের ডিসিট্রিনে যে কলম ব্যবহৃত, এই কাছাকাছি পরিবর্তিত। হঠাৎ যেন হঠাৎ এ প্রত্যাহার একটা মোহামুখি ভাব। তিনি একটা বার লক্ষ্য মীথি বাক্য অব্যাহিত মনে করে প্রত্যাহার সাহায্যে লক্ষ্য, লক্ষ্যই ভাব। হঠাৎ করে সেবে কলখানায়। এর সাহায্যে চাটের কোণে একটু কুণ হাসি কুণ উঠল। কলখানায় কীর বললেন, ঐ লীভারের জানিয়ে দিন, পেরে গেলেন accept করলাম। কোথাকলেন হতে গেছে না। তার শাস্তি পেরে গেলি করবু। কলখানায় হামিদের হামে কলখানায় লক্ষ্য কুণ বললেন, তাকে কিয় হবে কলখানায়।

—হামে। কল কুণ জানিয়ে চাটলেন হামে।

—আমনি বাক্য মনে করবেন প্রাচলক, কলখানায় কলখানায় লক্ষ্য দিয়ে চাট হামে কলখানায়। কলের মিটি বাক্য হামে কলখানায় আমায়ের মুখ হামে কলখানায়।

প্রশ্নের তিকি নয় হলেন। কিছুকণ চিন্তা করে মনে তাগলে পেরে ঐ কলখানায় হতে কলখানায়, হামে ignore হামে আমায়ের উচ্চ। হামে তাই কলখানায়।

প্রত্যাহা মিটি হল। বিভিন্ন কলখানায় থেকে কয়েকটা এসে গেল বের বসে পড়ল আমায় উপর। কলের সাহায্যে এক লক্ষ্যই লক্ষ্য করলেন বাবু। বাস্তবিকিক বললেন কলখানায়, তার লক্ষ্য লক্ষ্যকির আমায় বইলেন কলের সাহায্যে। লক্ষ্যই লক্ষ্যই একটা লিখে হল। বন্ধুত্বের মধ্য থেকে কেউ কেউ উচ্চ হামে বলতে চেষ্টা করল কলের অনভ্যাত্ত কীটা ভাবায়। বা বলি হল, তাই চেয়ে অনেক বেশী বইল না-বলা। লক্ষ্যই উচ্চ লিখেন কলখানায় বললেন, আমায় বক্তৃতার মত আমি ঠিক কলখানায় লোক নই। হামে এসে পড়েছিল। হামেই আমায় চলে বাড়ি। এই কলখানায় আমায় চিরদিন মনে থাকবে।

কলখানায় চাকরির পাবার কারিগরী উল্লেখ করে বললেন, বা ভর হয়েছিল মনে মনে। বহন না জর তার চেয়ে অনেক বেশী লক্ষ্য। লোক বলবে কলের ভাকার। হি: হি: আমায় বক্তৃতে পারছি, এখানে না এসে ভাবনের একটা বড় দিক আমায় কাছে অস্তবাক থেকে বেক। বাইবের হাসপাতালে ভাকার করে গিয়ে দেখেছি, বাস্তবিকিক হামে। এখানে এসে কলখানায় বাস্তবিক





—তা আপনি দিতে পারবেন না। গিলেও লাভ নেই।  
একটা পুস্কু চাই, তা না হলে ওজলা কাছে লাগবে না।

—তবে কী ভোমার কাজ লাগবে গনি?

—একটা আলো আর একটা খাতা।

সুশীলার মুখ গভীর হল। হারিকেনের সখা নিশিঃ। প্রতিটি লষ্ঠনের জন্ম যে তেলের বরাদ্দ আছে, ঐতকালে হুঁচটাক আর পরমকালে সেড় হুটাক, তার বেলান্তেও হিসাবের কড়াকড়ি। একটা কালতু আলো চাইতে হলে উপযুক্ত কারণ চর্চাতে হবে ওলারী-বাবুর সেরেস্তার; এবং প্রচুর তৈলমর্দন করেও এক হুটাক তৈল সগ্রহ অসম্ভব ব্যাপার। অথচ এই সামান্য বিষয়ে হার বীকার করলে এক বড় জেলের জমাদারীর মান থাকে না। বিশেষ করে, যে কোনো দিন কিছু চায় না, সেবে দিতে গেলেও হাত গুটিয়ে নেয়, তার এই আকাংক্ষাটুকু না রাখতে পারলে মনই বা বুঝ মানে কেমন করে? আকাশ-পাতাল ভাবতে ভারতে এক বলক বিদ্যুৎ-শিখার মত হাসপাতালের লঠনটা সুশীলার চোখের উপর ভেসে উঠল, এবং তারি আলোর মুখের গভীরটাও এক নিমেষে কেটে গেল। ভাঙ্কিলের পুরে বলে উঠল, আলোর ভক্তে ভাবনা কি? জমাদার হলে মনে করান, হাসপাতালে যে বাতিটা পড়ে আছে, বের করে দেবো।

হেনা আশ্চর্য হতে পারলো না। বলল, কিন্তু, ওটা যদি ঠোরা কেবত চান? হাসপাতাল কো বন্ধ হয়ে গেছে।

—আরে না, না। দেহত অমনি চাইলেই হল?

মুখে ভরসা দিল বাট। কিন্তু সে বিষয়ে উৎসাহ সুশীলার মনেও কম ছিল না। তবু, আপাততঃ সমাধান একটা হয়ে গেল। গোল বাখল ঐ হুঁমবরে। জেলসুপার কয়েদী বিশেষ খাতা কিনবার অমুমতি দিতে পারেন। সরকারী খরচে নয়, কয়েদীর নিজের পরিশ্রম। হেনার তো কোনো টাকা-পয়সা জমা নেই। বাইরে থেকে একটা খাতা যদি তার কোনো আপনাব জন জেলা-পেটে দিয়ে যায়, তাহলেও বাধা ছিল না। কিন্তু তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। আইন বিচারে প্রকাজ ভাবে আফিস-মারফৎ এই সামান্য জিনিষটাও সুশীলার পক্ষে দেখেও সম্ভব নয়, বরিও শুধু খাতা কেন, আরো অনেক কিছু তার এই একান্ত মেহের পাড়ীটির হাতে দেবার জন্তে সে ব্যাকুল। হেনা তার আপনাব জন' নয়, তার হেফাজতে রাখা একজন কয়েদী মাত্র। তার সঙ্গে এই বিশেষ

বসিষ্ঠতা কর্তৃপক্ষ বুনজরে কেবলেন না। বিশেষ করে হয় সাদা এবং আরো ক'জন বাবু যে এই ঘোরেটির উপর এসে মন, সে তবু আজ আর কারো অজানা নেই। নিজের এই অসত্য অক্ষমতা অনুভব করে সুশীলার মুখখানা কণক হয়ে উঠল। হেনার দিক দিয়ে অনেকটা বেন সাধনার পুরে বলল, খাতা দিয়ে কী করবি? হই-টই আছে, তাই পড়।

এই সাধনার আড়ালে আসল অবস্থাটা বুঝতে পেরে হেনারও সন্তোষের অবধি ছিল না। তাই সুশীলার উত্তরে বেশ বানিকটা উৎসাহ দেখিয়ে বলে উঠল, তাই ভালো। হই-টই যখন এসে দেয়ন মাঝে মাঝে। খাতা এখন থাক। আলোটাই আমার হই লরকার ছিল।

খাতা উপলব্ধ করে এই চলনাটুকু হুঁজনের কারো ব্যাট্ট গোপন হইল না এবং হেনার অতিরিক্ত খুসির পুর আর এক জনের বুকে গিয়ে বিঁধল। হুটো দিন সমস্ত কাজ-কর্ম চলা-কোয়ার মতো তার মনের একটা কোণ জুড়ে হইল একখানা কালো মেঘ। সে মেঘ নেমে গেল কুতূহল দিন ভোর বেল। এখন তার চুঁচুত লম্বা চালরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা ঘোটা বিধানের খাতা এবং যেদিকে তাকিয়ে হেনার মুখে ভেসে উঠল সত্যিকার খুসির আলো। পরকণ্ঠেই গভীর হয়ে বলল, এটা ভালো করেনি মাসীমা। ওরা যদি জানতে পারে?

—হ্যাঁ, জানতে পেরে তো আমার সব করবে!

—তা ছাড়া, এতে জেলের ছাপ নেই, বড় সান্তবের সই নেই তালসি করতে এলই তো কেড়ে নিয়ে যাবে। আমার শক্তি হবে, সেজন্ত ভর করি না, কিন্তু আপনাকেও পড়তে হবে কত কী কৈকিরন্তের মায়ে। সে ভাবনা সুশীলার মনেও কম ছিল না। একটু কি ভেবে নিয়ে বলল, এক সময়ে দিস খাতাখানা। লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে কেবাণীবাবুকে বলে করে যদি একটা নীল দিয়ে আনতে পারি, দেখবো।

ইস্ এ'খাতা আমি নিলাম আর কি! জেলমাছুয়ের মত মাখার একটা কাঁকানি নিয়ে বলে উঠল হেনা। যদি আর কিগিয়ে না দেয়। আপস্ক না তালসি। বলে আঁচলের তলার লুকিয়ে কেলল খাতাখানা।

[ ক্রমশঃ ]

## শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্রিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক হৃদয়বহ বোধ্য বহনের সামিল হয়ে পড়িয়েছে। অথচ মাছুয়ের সঙ্গে মাছুয়ের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বাহিকিতে, মরতো কারও কোন কৃতকার্যতার আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী'। এই উপহারের জন্ম স্মৃতি আবারপের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই থালাস। প্রাপ্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদেব। আমাদেব পাঠক-পাঠিকা জেনে খুশী হবেন, সম্ভ্রান্ত বেশ কয়েক শত এই বরণের প্রাহক-প্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সখা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে বেকোন জ্ঞাতব্যের জন্ম লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।



বিশ্বের পর থেকে  
এ-পর্ষন্ত  
এঁকে ৭,৩০০ বার  
স্নান করতে  
হয়েছে

প্রত্যেক বুদ্ধিমত্তা গৃহিণীই জানেন,  
বনস্পতির রাসা খেতে শুধু, কর্মক্ষম  
যোগ্য অথচ এতে খরচ কম পড়ে।

ঘরকন্নার বাস্তব বউ ও মায়াদের বনস্পতির প্রতি অসীম  
কৃতজ্ঞতা, কেননা বনস্পতির জন্যই তাঁরা কম খরচায়  
পুষ্টিকর খাবার রাখতে পারেন।

বাড়ীর গিরীর দায়িত্ব কত—ভ্রমেরা রান্নাশালা, ঘরদোর পরিষ্কার  
রাখা, আবার ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা দেওয়া—সবই  
উঁকে করতে হয়। সারাদিন এভাবে খেতেও সবাইকে হাসিমুখে  
আদর যত্ন করতে হলে তাঁর প্রচুর কর্মক্ষমতার প্রয়োজন।

প্রত্যেক গিহীনই পরম বন্ধু

বুদ্ধিমত্তা গিহীন জানেন যে দৈনিক খাবার থেকেই তাঁরা বেশির  
ভাগ কর্মক্ষমতা পান। তাই তাঁরা প্রচুর পরিমাণে স্নেহপদার্থ  
দিয়ে ঘরের খাবার তৈরীর দিকে নজর রাখেন। কেননা

স্নেহপদার্থ ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' হকেন সহায়তা করে, রক্ত  
ও ক্ষুধা-বিস্তার করে দেহেতে পৌঁছে। এবং সত্যিকার কর্মক্ষমতা  
যোগ্য। গিহীরা অনেকই বনস্পতি দিয়ে রান্নার পক্ষপাতী।  
তাঁরা জানেন, বনস্পতি খাঁটি ও পুষ্টিকর এবং এর প্রতি আউন্সে  
৭০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'এ' রয়েছে। এতে খরচ  
কম। পরপর স্নান করলে হলে অল্পে অল্পে স্বাস্থ্যপ্রদ ভিটামিন  
খাদ্যের চাহিদাও পাওয়া যায়। এভাবেই বনস্পতি গিহীদের  
পরমবন্ধু হ'লে পরিচিত—আর আপনও সেইভাবেই সবরকম  
রান্নাশালায় এই খাঁটি উদ্ভিদেই স্নেহ ব্যয় করার করেন।

বনস্পতি  
গৃহিণীদের পরমবন্ধু

প্রচারক : বনস্পতি মাধ্যম্যাকচারার্স এসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া



# এক মুঠো আকাশ

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

আঁধার সেই বহু-প্রাকৃতিক বিবিধ। জোর থেকে উঠে  
কেঁটের দল কাজ শুরু করেছে। আগের দিনের নির্দেশ মত  
হুলেরা এক এক সেটায় জমা হয়। বেঁট জীর্ণ-করা-বুঁরে বেড়ায়,  
জাতিক এগুচ্ছে কি মা বেঁথে।

—তোমাদের এখানে পচিল জম হচ্ছে এসেছে ?

এদের মোড়ল মিটাই উত্তর দেয়, হুঁজুন ছাড়া আর সবাই  
এসেছে। জোটার-লিষ্টের 'ইনচার্জ' করেছি অতীতকে, ও হুঁজুনকে  
নিষে এখানে দলবে।

—জোটারদের বিসিত করবে কারা ?

—সত্যান আর বিত্ত, জোটার 'স্লিপ' ওরাই তাতে ধরিয়ে দেবে।

—গাড়ী বিখারী লোকের হাতে দিও, জোটার আনতে গিয়ে  
না লেকে বেড়িয়ে আসে। দরকারী কথার মধ্যেই সত্যান এক কোণ  
থেকে চোঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেঁট দা', খাবার আসবে কখন, চা-  
সিগারেটে তো আর পেট ভরবে না ?

—এরই মধ্যে কিসে পেরে গেল ? এখনও তো কোন কাজই  
করিসু নি।

—টিফিনের আগেই কিছু খাবার আসা চাই, মাংস থাকবে তো ?

—ভুট কি বির-বাড়ী পেয়েছিস নাকি ? তবে লুচি আলুর  
দমের ভাল ব্যবছাই আছে।

ভোট দেবার জন্তে বারা মুখিয়ে ছিলেন, সেটার খুলতে না খুলতে  
হুঁহুড় করে ভেতরে চলে যান। সে কিন্তু বৈশীকণের জন্তে নয়,  
আজ্ঞে আন্তে ভীড় পাতলা হয়ে আসে।

কেঁট বলে—প্রথম চোটে শেখানো-পড়ানো লোকরা চলে গেছে।  
এখন আর নিজের গরজে কেউ আসবে না, সাধাসাধি করে আনতে  
হবে।

কেঁটের কথাই ঠিক। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোটারতার  
দুখাও বাড়তে থাকে। সব সেটারেই প্রাণীদের আফিসে  
জোটারতার জমায়েৎ হয়ে চা, সিগারেট পান করেন। ভলেন্টারিরা  
ধাতির করে বলে, মনে রাখবেন স্যার, অমুক মার্কা বাক্সে—  
হুঁহুড়কে হেঁ হেঁ করে হাসেন, তা না হলে এই বোদ্ধেরে কষ্ট করে  
মাসি ? দেখি এক গ্রাস ঠাণ্ডা সরবৎ—

তিনটি গ্রাস এক সঙ্গে এগিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে পান, সিগারেট।  
হুঁহুড়কে সব ক'টির সম্ভাবহার করে উঠে পড়ান। তাঁকে অমুশ্রাবিত  
দরবার-জন্তে ভলেন্টারিরা সমবেত করে কানে তালি লাগিয়ে  
সংস্কার করে, ভোট দর রহু ব্যানাজী—

হুঁহুড়কে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন, ডান হাত বাড়িয়ে  
নর্কিস্কার করে বলেন, কোর ভাড়াটা। ফেড় টাকা।

—ভোট দিয়ে আশ্রন, আমাদের লোক গিয়ে ছেড়ে আসবে।

—ফিরে এসে তখন তো আর চিনতে পারবেন না। ভাড়াটা

আগে থেকে নিয়ে নেওড়াই ভাল। অগত্যা নগর বিদায় করতে  
হয়। আরেক খিলি পান মুখে দিয়ে হুঁহুড়লোক ভোট দেবার জন্তে  
এগিয়ে যান।

বেশ কয়েকটি সেটায় হুঁহুড়মান মার্কারদের সঙ্গে ঝগড়া লেগে গেল  
রাঘব বোয়ালের দলের। জটিল জোটারতার রাঘব বোয়ালের  
আফিস থেকে চা সিগারেট খেয়ে আবার বৃষ্টি হুঁহুড়মান মার্কারদের  
ক্যাম্পে লুচি-সন্দেশ উড়িয়েছে। বাসু, আর রাঘব কোথা, তাকে  
কেঁজ করেই গোলমালের পুরপাত। ফলে অনেক নিরীচ  
জোটারতার জমা ছিঁড়ল, মেয়েদের মধ্যে অনেক ভোট না দিয়ে  
বাড়ী চলে গেল, হুঁহুড়দের অসম্মান জনক চাংকারে পাড়ার লোক  
দরজা-আনলা বন্ধ করতে বাধ্য হল।

কেঁটের হেড আফিসে খবর আসে, ওদের এক সেটার থেকে  
জোটার-লিষ্ট চুরি হয়ে গেছে। সংগে সংগে কেঁট সেখানে ছুটে যায়।

—কি করে চুরি হ'ল ?

বিত্ত বৃষ্টিতে বলার চেষ্টা করে, আমরা কি করে জানব কেঁটদা',  
খানিক আগে পুলিশ এসেছিল—

কেঁট রাগে ফেটে পড়ে, পুলিশ, ডাম্‌ রাস্কেল। তাকে কে  
চুকতে দিলে ?

—তার যে এ মতলব, কি করে বুঝব ? এসে বলল বড় তেঁটা  
পেয়েছে, এক গ্রাস জল খাওয়া। জিজ্ঞেস করলাম, কেন, হুঁহুড়মান  
মার্কারা জল নিচ্ছেন না বৃষ্টি ? ক্ষিত কেটে বললে, ছি, ছি,  
কেঁটদার সংগে ঝগড়া হয়েছে বলে ঐ হুঁহুড়মানদের দলে বাব ?

—সবালে কি করে ?

—ট্যান্ডি থেকে ক'জন লোক নামলেন, আমি বেরিয়ে নামিয়ে  
আনতে গেছি, ইতিমধ্যে পুলিশ কখন বেরিয়ে গেল। আমি ফিরে  
এসে আর জোটার-লিষ্ট খুঁজে পাই না।

কেঁট টোট কামড়ায়, তোমরা যেমনি গাধা, পুলিশটা তেমনি  
শরতান !

সে সেটারে রাঘব বোয়ালের দল জোটার-লিষ্টের অভাবে আর  
বিশেষ কাজ করতে পারে না। রাঘব বোয়াল মনঃক্লান্ত হয়ে বলেন,  
তখনই বলেছিলাম কেঁট, পুলিশের সংগে ঝগড়া করা উচিত হয়নি।

রাঘব বোয়ালের কথা যে কতখানি সত্যি তা আরও বেশী করে  
প্রমাণ হল এক 'মিল এরিয়ার'। কেঁট সেখানে নিশ্চিত হয়েছিল  
অজ্ঞাত: শতকরা আশীটা ভোট রাঘব বোয়াল পাবেই। সেই জন্তেই  
সেদিকে আজ কেঁট বিশেষ নজর দেয়নি। কিন্তু পরিদর্শনে এসে সে  
অবাক হয়ে গেল।

বিগিন বলল, সর্বনাশ হয়েছে কেঁটদা'।

—কি ব্যাপার ?

—এখানে কেউ ভোটই দিতে পারছে না।

—নামে ?

—কোথা থেকে এক দল লোক এসে দাঁড়িয়ে গেছে ! পাশোয়ান চোচারা, ভীড় করে আছে । ভোট দিতে যাচ্ছেও না, কাউকে যেতেও দিচ্ছে না ।

—এ আবার কি রসিকতা, পুলিশ কি করছে ?

—পুলিশ তো রয়েছে, ওরা বলছে, আমরা এমিকার লোক, সবাই হুজুমানজীকে ভোট দেবো, নেতার জেতে অপেক্ষা করছি ।

বিরক্ত হয়ে কেউ সেপ্টেম্বর দিকে এগিয়ে যায়, কথা মিথ্যে নয় । এক দল লম্বা-চওড়া লোক গোটের সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে, হাঙ্গের অরীল মস্তব্যে ও অন্ত্য ব্যবহারে কেউ ত্রিশীমানায় হাচ্ছে না ।

এক সময় বিশিষ্ট চুপি-চুপি বলে, খবর শেলাম কেউ'না', এ-ও না কি পুলিশের কাজ ।

কেউ চোখ তুলে তাকায় ।

—ও জানত এখানে আমরা সব চেয়ে বেশী ভোট পাব । তাই হুমান মার্কান্ডেব দলে গিয়ে এই কাণ্ডটি করিয়েছে ।

এর পর আর কেউকে দেখা যায় নি । শুধু সেই দিন নয়, এর পরদিনও । এর মধ্যে কত জন অনন্ত কেবিনে এসে কেউ'র দাঁক করেছে, নিরীকার আন্ত'না' বলেছেন, তার খবর জানি না !

কিন্তু পুলিশের লোক এসে বখন তার সন্ধান করলে, তিনি খি বড় বড় করে জিজ্ঞেস কর'গন, ব্যাপার কি বলুন তো ?

—গুণ্ডামীর চার্জ ।

—কোথায় ?

—পুলিশ মণ্ডল নামে একটি ছেলে থাকে এই পাড়ায়, চেনেন না ?

—চিনি বই কি ।

তাকে ইলেকশানের দিন রাত্রিবেলা কারা বাস্তায় মেয়ে-পা ভেঙ্গে দিয়েছে ।

—কি সর্বনাশ !

আন্ত'না' যদিও বিশ্বয় প্রকাশ করলেন, কিন্তু তার মুখ দেখেই যা গেল এ খবরটি তাঁর অজানা ছিল না ।

—বাদের সন্দেহ হয় বলে পুলিশ বাবু নাম দিয়েছেন, কেউ দাস'র মধ্যে এক জন । পুলিশ ইন্সপেক্টর বলে যেতেই আন্ত'বাবু'র থেকে বেরিয়ে কেউ'র বাড়ীর দিকে গেলেন ।

যথাসময়ে টাকসী থেকে নেমে প্রভাত দরজার বেল টিপতেই, গাণীর চাকর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি ছায়ামক আসছেন ?

—হ্যাঁ ।

—ভেতরে আসুন । দরজা বন্ধ করে প্রভাতকে ভেতরের থানায় বসিয়ে দেয় । এ ঘর প্রভাতের অপরিচিত নয়, ও বেলারাণীর সংগে এইখানে এসে আলাপ করে গেছে । বপজের বাহুল্য না থাকলেও ঘরটি পরিষ্কার করে সাজান ।

কাগজপত্র বার করে নেড়ে চেড়ে দেখে । জানে, বেলারাণীর

নামতে বখারীতি আধ ঘণ্টা দেবী হবে । ইতিমধ্যে চাকরটি চা দিয়ে গেল ।

অল্প দিনের চেয়ে আজ বেলারাণী একটু আগের নামে । একমুখ চেয়ে ছাত তুলে নমস্কার করে বলে, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে যেগছি, সেজ্ঞে মাপ করবেন ।

প্রভাত উঠে দাঁড়িয়েছিল, বললে না না, আজ আপনি মোটেই বেশী সময় নেন নি । তার ওপর আপনার ভূতটি অতিথি সংকারে বেশ পটু ।

—সে আমার ভাগ্য ।

কিছুক্ষণ টুকরো আলোচনার পর প্রভাত আসল কথা পাড়ে, আপনি আমাদের আগের সংখ্যা দুটো পেয়েছেন নিশ্চয় ?

—হ্যাঁ পেয়েছি ।

—বিশিষ্ট তারকারা প্রস্তোত্তর দিয়েছেন, দেখেছেন বোধ হয় ?

—বেশ সুন্দর হয়েছে, ওঁরা কি নিজেবাই—

—পাগল হয়েছেন, সব আমার লেখা । এবার আপনার নামে প্রস্তোত্তরগুলো যাবে ।

—লিখে এনেছেন, দেখি ?

প্রভাত কয়েকটি কাগজ এগিয়ে দেয়, বেলারাণী ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে বলে, প্রস্তগুলি তো বেশ ইন্টারেস্টিং, আপনার কাগজের পাঠকরা দেখছি—প্রভাত হেসে বাধা দেয়, এ প্রস্ত সবই আমার, পাঠকরা কি আর এত বৃদ্ধমান ?

—তার মানে, ওরা কি কোন প্রস্তই করে না ?

—করে, তবে আমরা তার কোন উত্তর দিই না । উপরে লেখা থাকে দেখবেন, আমাদের কাছে এত চিঠি এসেছে যে, সব ক'টির উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না ।

—এতগুলো নাম-ঠিকানা দিয়েছেন—

—এ কি কম মেহনতের কাজ, এমন ঠিকানা দিতে হবে যাতে না কেউ পরে গোলমাল করে ।

বেলারাণী হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে, এটি বড় সুন্দর লিখেছেন, প্রস্ত...আপনি মাধায় কি তেল মাখেন ? উত্তর...জবাকুসুম, মহাভূক্তবাজ, ক্যাটর অয়েল মিশিয়ে তাতে তিন ফোটা ইভনিং ইন প্যারিস দিই ।

—কোন পাঠিকা এটি পরীক্ষা করে দেখলে কি হবে জানি না !

বেলারাণী হেসে বলে, আমার যে বব'চুল তা কি তারা খবর রাখে না ভাবেন ? প্রভাত কথার মোড় ফেরায়, নীচের দিকে মিষ্ট খাওয়ার প্রস্তটি দেখুন, বেলারাণী পড়ে, প্রস্ত...রসগোল্লা না সন্দেশ, কি খেতে ভালবাসেন ? উত্তর...পরীক্ষার খাতায় সন্দেশ, তবে কেউ পাঠালে রসগোল্লা পছন্দ করি । সত্যি কিন্তু প্রভাত বাবু আমি রসগোল্লা খেতে ভালবাসি ।

এ ধরনের প্রস্তোত্তর নিয়ে হাসাহাসি চলে । প্রভাত একসময় জিজ্ঞেস করে, আপনার যে প্রেডিউনার হবার কথা ছিল, বন্ধুব এগুলো ?

—এখনও পাকাপাকি হয়নি ।

—হলে আমার মনে রাখবেন কিন্তু ।

—সে আর বলতে হবে না, বই'তুললেই আপনাকে দিয়ে সিনেরিও লেখাবো । নতুন কিছু লিখেছেন নাকি ?

—কি জানি বাবা, লোকটা তো কখনও খারাপ ছিল না ?

—বুড়ি দেবার লোক জুড়েছে বোধ হয়।

শামল আর কথা না বাড়িয়ে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। মদনের পড়ায় আসতে তার বেশী সময় লাগে না, ট্রাম থেকে নেমে দু' মিনিটের ইটো পথ। গলির মোড়ে ফুটপাথের ওপর বসে মদনরা আড্ডা মারছিল, শামলকে দেখে ইংক দেয়,—এই শামল, এ দিকে—

শামল ওদের মধ্যে গিয়ে বসে, সকলেই প্রায় তার পরিচিত। এখানে এসে কত দিন সে আড্ডা মেতে গেছে, মদন এর নাম দিয়েছে আড্ডা-সভ্য। নামকরণ যে খুবই সঙ্গত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিন তলা বাড়ীর নীচে বড় ফুটপাথ, তারই একাংশ আড্ডাসভ্যের আসর বসে। এক তলায় বেশন আফিসের গুদাম বলে সারাক্ষণই ফুটপাথে ছুঁ-তিনটে ঠেলা গাড়ী থাকে। প্রয়োজন মত তেলের ঠেলাগাড়ীর মাটি কোঁষা অংশটায় বসে, কেউ বা তার পাশের পাথরটায়, কখনও ফুটপাথেই কাগজ শেতে। সামনেই পানির দোকান। বড় বাড়ীর নীচে বলে অনেককণ ছায়া থাকে। প্রথম দিন এসে শামল তাকিয় করে বলেছিল, বাঃ বেশ খান্না জায়গা! কাকুর বাড়ী নয়, দোকান নয়, সরকারী ফুটপাথ, যে কেউ এসে আড্ডা দিতে পারে, কারো কিছু বলার নেই।

মদন হেসে বলেছিল, শুধু এই, সামনের বাড়ীটা দেখেছিল? ছোট বাবাশা, ওখানে বা আছে—

—কি রে, কি? শামল চারি দিকে তাকায়।

—চিড়িয়া।

—মাইরি?

—এক উকিল থাকে, তাঁর পাঁচ মেয়ে। বড় ছ'জনের বিয়ে ইয়ে গেছে। সেজ মেয়েটির সংগে আমাদের মমুদা—

মমুদা শামলের অচেনা নয়। মদনের সংগে অনেক বার দেখেছে, স্কুলের চোহারা। ফর্সা রং, টানা তুত, গানও বেশ ভাল করে, বিশেষ করে সিনেমার গান।

প্রথম দিন মদনের কথা শুনে শামল খুব অবাক হয়েছিল। এ বিষয়ে আরও শোনার জন্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ক্রমে গা-সওয়া হয়ে গেছে। কত দিন দেখেছে মমুদা এই আড্ডা-সভ্যে বসে গান গায় আর মেয়েটি বাবাশায় এসে পাড়ায়। শামলের প্রথম প্রথম চোখ তুলে তাকাতো লজ্জা করত। পরে দেখেছিলো, মেয়েটি ডানাকাটা পুরী কিছু নয়, সাধারণ মেয়েই। বয়স ছাড়া আর কিছু আকর্ষণীয় আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মমুদা যে মেয়েটির জন্যে পাগল এ বিষয়ে কাকুর সন্দেহ নেই। আজও সবাইকে বলছিল, আমার মনের কথা তোমরা বুঝবে না ভাই!

ভোলা উৎসাহ দিয়ে বলে, বা হোক হস্ত-নৈস্ত কিছু হবে কেলুন, মমুদা, আমার আপনায় পেছনে ঠিক আছি।

—এ সব ব্যাপারে গায়ের জোর চলে না যে ভাই!

—নশিতার বাবাকে একটা চিঠি লিখেই দেখুন না।

মমুদা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, কোন লাভ নেই, হেমন্ত বাবু আমাকে ছ'টোখে দেখতে পারেন না। ওমা'কেই বা দোষ দেব কি, পাঁচ হিসেবে আমি সত্যিই তাঁর মেয়ের যোগ্য নই।

—কেন, অযোগ্য কিসের? ক'টা ছেলে আপনায় মত গান করতে পারে?

মদন খেঁই ধরে, আর এমন রোমিও মার্কো চেহারা'ই বা কোথায় পাবে? ওর বড় জামাইটি তো একটা হোলদ কুৎকুৎ।

—আপনি তো মন্ত্রণের মত ভাগ্যবশু নন, রীতিমত দশটা পাঁচটা অফিস করেন।

মমুদা উঠে পড়ে, কোরাণীর আবার আফিস, চলি ভাই।

ভোলা চুই করে হাত বাড়িয়ে দেয় সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়ে বান মমুদা।

মমুদা সিগারেট, বেশলাই দুটোই ওর হাতে দিয়ে সুর ভাঁজের ভাঁজতে বাড়ীর দিকে চলে যায়।

শামল প্রথম কথা বলে, পাগলা!

ভোলা সিগারেট ধরিয়ে বলে, বাই বল বাটি প্রেমিক, ভেজাত মেই।

মদন হাই তোলে, আজ কিন্তু তেমন জমলো না। এমন দুটি দিনে না মমুদার ছ'-একটা কড়া গান, না সামনের বাড়ীর নীল শাড়ী গায়েল জিজ্ঞেস করে, মদন, বেকুবি মাকি?

—চল।

ছ'জনে উঠে পড়ে। চলতে চলতে কেউর বিষয়ে আলোচনা হয় মদন জিজ্ঞেস করে,—কেউনা'কে খানায় হবে নিয়ে গেল?

—সে তো, চলিখ বটীর জন্তে, আশুলা' গিয়ে জামিনে খাল্য করে এনেছে।

—কোট্টে কেস হবে তো?

—হবে, কিন্তু প্রমাণ পাবে না। সেদিন বানদের সংগে ছি বাক্সে, তারা সাক্ষী দেবে।

—আমার সংগে কবে আলাশ করিয়ে দিবি?

—দেই কথাই বলতে এলাম, তাকে নিয়ে ঢালীগঞ্জের বস্তী যেতে বলছে।

—কেন, সেখানে কি হবে?

—কেউবার' ব্যাপার কি বোঝা যায়, বলল কে এক জন মর-হ হয়তো আশান নিয়ে যেতে হবে। নিশ্চয় কোন পীও মারবে।

মদন হাই বলে, সে দোকানদারটা আবার এসেছিল। ও টাকা না দিলে চলবে না, বলছে বাড়ীতে বলে দেবে।

শামল পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বার করে মদন হাতে দেয়।

—কোথায় পেলি?

—আমার পকেট থেকে।

—সাবাস, আজ না পেলে দুঃখিলে হত। চল, বুড়াকে ও টাকাটা দিয়ে আসি।

[ ক্রমশঃ ]

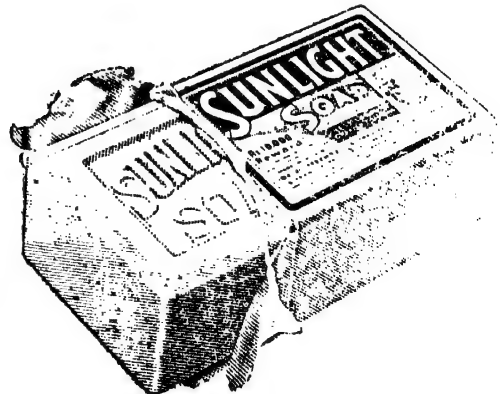
“সিন্ধুপান্নানাদেব পত্র দেওয়ার সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করবেন।”

**দেখুন!** অন্ধেকটি সানলাইট সাবানেই  
এসব কাচা হয়েছে!



সানলাইটের ফেণার আধিক্যই এর কারণ!

সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়জামা  
সাদা ও উজ্জ্বল হয়।





# ব্যক্তিত্বে বামেন্দ্রচন্দ্র

শ্রী অজয়েন্দ্রনাথ রায়

২

এবার কলকাতার পড়বার পালা। উপেন্দ্র বাবু—বামের ছোট বাবা বললেন—এ ছেলেকে ছেড়ে একা আমি থাকতে পারবো না। আমার সপরিবারে নিয়ে বামকে পাশ করিয়ে তবে আনবো। তখনতে পেরে বামের বস্ত্র হালকা ডেকে বললেন উপেন্দ্র বাবুকে, তোমাদের বিষয় দেখবে কে? তোমাদের দার আছে দেখে কে? তোমার বাঙাটা হবে না। ছেলেকে ভর্তি ক'রে দিয়ে এসো—বাজার কথা বাবুদের কাছে বেরবাকা।

তখন বাবা দু'খানা পাখী ক'রে দিয়ে সাঁইখিয়া পাঠিয়ে দিলেন। তখন কলকাতা বাঙাটা সোজা ছিল না। যেতে হলে সাঁইখিয়া ছাড়া ঠোঁট নাই। বামেন্দ্র বাবু উঠলেন গিয়ে কলকাতায়। যে ছেলে আজ পাড়াগাঁ থেকে প্রথম হয়ে আসচে কলকাতায়, তাঁকে দেখবার জন্য ভীড় ক'রে এলো ডাল ডাল ছাত্র। অবিনাশ বাবু বললেন—তাঁরে! তুই মফঃস্বলের ছেলে হয়ে আমাদের ঘুরে চুক কালি দিলি! জানকী বাবুও এ ধরনের ঠাট্টা করেন। উপেন্দ্র বাবুর এই সব কথা শুনে আনন্দ হবে না। রাম কৌণ ধরলো আমি বিভাগ্যগরের আশীর্বাদ না নিয়ে কলকাতা ভর্তি হবে না। তখন উপেন্দ্র বাবু বললেন—এ কথা উত্তর লিখে পারবো না। এ আমাদের কণ্ঠের ছেলেরই কথা। আমার সাথে একটু পরিচয় ছিল বটে, তবে হয় তো চিনতেই পারবেন না।

এক দিন বেলা আটটার সময় বিভাগ্যগরের কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি নানা কাজে ব্যস্ত। ছেলে দার তার কাঁধকে লেগেই চিনতে পারলেন। আমাকে কী চিনতে পেরেছেন? বলতেই উত্তর দিলেন—আমি ত আপনাদের মত জমিদার নই; এক বাঘ দেখলে আমাদের ভুল হয় না। বামেন্দ্রের পরিচয় তখন খুঁজি খুঁজি না বিভাগ্যগরের। তিনি বললেন—আমার নিজেরই একরকম প্রতিষ্ঠা করা কান্দীর ঈদুল। জানো রাম? তোমার বাবা কাকার পরীক্ষা নিয়েছি আমি নিজে। তোমার লাহুর সাথে আমার পরিচয় ছিল। তোমাদের বাড়ী গিয়েছি, খেয়ে এসেছি। তোমার বাবা কাকার ব্রাহ্মণ ভোজন করতে জানেন। তোমাকে আশীর্বাদ করছি রাম, তুমি মাছুষ হও।

রাম তখন বিভাগ্যগরের পায়ে ধুলো নিয়ে ভাগ্যগঙ্গা ভাবে আশীর্বাদ চাইলে তখন বিভাগ্যগরের মাথার হাত নিয়ে বললেন—তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, মনে রাখবে কখনও শাসকের স্নানে কোন কাজ নেবে না। তখন বামের মন ভরে উঠলো। যেন কে বামের আত্মার সাদা দিলো। মনে হলো বামের, হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ দেখে এলাম। খুব খুশী হয়ে বাড়ী এলো।

প্রথম কলকাতা ঘেরে খুব ইংরাজি দর্শন পড়তে লাগলেন রাম বাবু। এতো পড়া তার কথা নাই। রাত দুটো থেকে গেছে খেয়াল নাই। তার বন্ধুরা এসে বলতেন—রাম, তুই নিজের পরীক্ষার পড়া পড়বি কখন? রাম উত্তর দিতেন—তা' দিন কতক দেখে

তাই। রাম ত অসাধারণ বুদ্ধিমান। কিন্তু সে বাবু বাম দ্বিতীয় হয়ে গেল। অনেক দিন পর বামের মনে পড়লো বাবার কথা তাঁর কাছে কী কথা বলেছিলেন তাও মনে পড়লো। তখন থেকে আরম্ভ করলেন বিজ্ঞান পড়তে। তখন দর্শনশাস্ত্র আর খুলেও দেখেন না। প্রথম হয়ে সে বাবু পাশ করলেন। তাঁর কাগজ দেখে তাঁদের পরীক্ষক পেডলার সাহেব এতো খুশী হ'লেন বলার না। তিনি বলেছিলেন, আমি এ পর্যন্ত বস্ত্র বসায়ের কাগজ লেখেছি তার মধ্যে এইখানি out of the way the heat." কিছুক্ষণ পরে আবার দুঃস্বপ্নের সঙ্গে বলিয়াছিলেন out of the way the heat. তিনিই বললেন বামকে—তুমি এম. এ. ও প্রেমচাঁদ পরীক্ষার মত প্রস্তুত হও।

এম. এ. পরীক্ষারও প্রথম হয়ে পাশ করলেন। তার পর প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দেবার সময় রাম বাবুর পড়া দেখে সকল ছাত্রই চতুর্ভুজ। সমস্ত রাত কেটে থাকে, ঘুম নাই। সচলপ্রাণীরা বলে—এতো পড়লে মাথা ধাওয়া তাঁর বাবু এ রাম। কে লেখেন তা কথা—রাম বলে আমাকে অবিনাশের মত ছেলের সাথে পরীক্ষা দিতে হবে মনে রেখো। কিছুদিন পর দেখা গেল ছেলের কথাটী ঠিক হলো। রাম বাবুর মাথার কোষ হলো। একটু পড়তে গেলোই অজ্ঞান হ'য়ে বান। ডাক্তাররা এসে বললেন তোমাকে এখন বিশ্রাম নিতে হ'বে। চার মাস শুয়ে থাকতে হলো রাম বাবুকে ঠিক পরীক্ষা দেবার আগেই। তখন তিনি বাড়ীতে লিখলেন—আমি এবার পরীক্ষা দিতে পারবো না। তখনই বস্ত্র নিয়ে পাঠালেন—তুমি পাশ না করতে পারলে পরীক্ষা দাও।

কী করেন? অসুখী পরীক্ষা দিতে গেলেন। দুটো প্রহর লিখে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন পরীক্ষা-গুচোই। ব'লতে লাগলেন—আমি পাশ ক'রতে পারবো না। কেন বস্ত্রমশায় আমাকে জেদ ক'রে পাঠালেন। দুখে রাম বাবু বিভাগ্যগর চালা গিলেন। প্রফেশার এসে জানিয়ে বাম—অভয়নাথ! পাখর মত তুমি লেখনি। তুমি ওটো কথা কও। ভাল লাগছে না দেখা তাঁর; মনে করেন—আমাকে স্তোক দেবার জন্য বললেন। পরে পেডলার সাহেব এসে যখন প্রকৃত সন্ধান দিলেন তখন রাম উঠে বললেন। সাহেব বললেন—তোমার মত দেখা কখনও কোন ছেলের আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি আমার। তুমি যেটার উত্তর না দিয়েচি মনে করে লিখেচো সেটার উত্তর আরও চমৎকার হয়েছে। তুমি বাড়ীতে থবর নাও, আট হাজার টাকাই পুঙ্খানুপুঙ্খ পেয়েচো প্রেমচাঁদে প্রথম হ'য়ে পাশ করবে।

হংকশাৎ বামেন্দ্র বাবু তাঁর করলেন বাড়ীতে—আমি ও অবিনাশ পাশ করেচি প্রথম হয়েই। দুজনেই বৃত্তি পেয়েচি আট হাজার ক'রে।

বাবা নবেন্দ্রনাথ ইরাকী জানতেন না। তাঁর কাছাবিড়ে সামান্য রকম ইরাকী-জানা কুইরাকী একজন ছিলেন। তিনি পড়ে



বলেন—রাম কেল ক'রেচে। অবিনাশ পাশ করেচে। ওদেই রাজা দখারত হলেন। কী তুলই করেচি জাহাজকে পরীক্ষা দেবার অন্তিমটি দিয়ে!

এমন সময় বসন্ত বাবু—রাম বাবু পিসেমশায় কান্দি ইংরাজী ইংল থেকে এসে উপস্থিত। তিনি তার না পেয়েই বললেন—পাখাটাকে ডাকো। তা' টেলিগ্রাম ক'রে কেও কলের খবর দেয়। তার পর বললেন—রাম অবিনাশ দু'জনেই পাশ করেচে। দু'জনেই আট হাজার টাকা করে বৃত্তি পেয়েচে।

তখন রাজবাড়িতে খুব মেধে কে। জেহো-কাকীতে এমন লোক ছিলেন না যিনি ঠাকুরালের প্রসাদ না পেয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট পরীক্ষার পর লিখেছেন আলেকজান্ডার সেভাল—এক জন ছেলে প্রেসিডেন্ট পরীক্ষা সিরিজাল কিছু তার মধ্যে দু'জন বৃত্তি পেয়ে প্রথম হয়েচে। তার মধ্যে রামেন্দ্রচন্দ্র এমন সুন্দর বসন্তের শাস্ত্র পরীক্ষা সিরিয়ে, এমন খাতা আর কোন ছাত্রের এ যাবৎ আমার চোখে পড়েনি।

পাশ করেই দু' বছর বেতন না নিয়েই প্রেসিডেন্ট কলেজের ছাত্রপারের কাজ করেছিলেন।

তিনি পুত্রস্বর্গ সময় রামেন্দ্রচন্দ্রের পুরস্কার হয়। বহু আত্মবিশ্বাসে মনুষ্য জাতি নিয়ে থাকতে বলে লক্ষ্য তিনি জেনেল নিজে পারবেন না। বারে থাকতে পুত্রস্বর্গ হয়েছিল, তখনও নেওয়া সম্ভাব্য হত না রামেন্দ্রচন্দ্রের। কিছু দিন পরেই ছেলে মারা গেল। তখন দুঃখ করতে লেখকেন অনেক। ছেলে চাট বাড়ির কত সময় আসতে চেয়ে

আমার কাছে। আমি নিতিনি কেদল লক্ষ্য। আম আবার সেই ছেলে চাটলাম। আর হুজো আমার পুত্র সন্তান হয়ে না। আশ্চর্য কথা ছিল রামেন্দ্রচন্দ্রের। যে কথা বের হ'তো তাঁর দুখ থেকে তা' টিকই হ'তো। আর পুত্র সন্তান হয়নি তার।

পাশ ও অবৈতনিক কাজ করার পরই দু'বছর পুত্রস্বর্গ পেতে রাজা ছিলেন। প্রথম লেখকেন কর্তব্যাবার একটা উইল প্রভেট নেওয়া হয়নি। সম্পত্তির অনেক টাকা ধার। আরও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। নিজের ও স্বত্বস্বত্বা ভাইরা বাবালক সব একত্রে আছে। কয়েক জন বাবালের বহু কলসন—তোমার নিজের পাওনা টাকা একমালি করে শুকচা কেন? তখন তিনি তাঁলের লিখে চেয়ে বললেন—চিনে থাকলাম আপনাসকলকে।

১৯১৮ সাল, রামেন্দ্রের মৃত্যুর মারা গেলেন। শোকে দু'বছর হয়ে বাড়িতে কিছু দিন থাকলেন। অনেক এসে কলসে লাগলেন—সব বোঝা তুমি জানি। তোমার মত ছেলে কখনও কীত? তখনই উত্তর দিয়েছেন—আমার বোম আছে বলেই ত কীত। কোন পুত্রস্বর্গকে কীতের লেখা? আমি ত ছাড়া রাম। জেহো কলসে অবতারকে কীতের লোমনি। উইল এক কত সম্পত্তি তিনকড়ি কেবীকে দিয়ে ত্রুণস্বর্গের নিশেদ মত লেখাও করে লিখেন বিষয়। বসন্ত শোম ছিলেন নিজের পরীক্ষার পাওনা টাকা হ'তেই।

ডাক পড়িলে রামেন্দ্রচন্দ্রের ভগিনীপতিদের তরক হ'তে। চার ভগিনী আছে জেহো রাজবাড়িতে। ভগিনীপতিরাও প্রায় তাঁর সমবয়স্ক। পিতৃহীন হয়ে বিলাপ করতে চান রামেন্দ্র বাবুকে সামনে রেখে।

# সমুজ্জ্বল মুখশ্রী

নিয়মিত "বোরোলীন"  
ব্যবহারে আপনার  
তরুণী দিন দিন উজ্জ্বল  
ও কমলীয় হয়ে উঠবে।  
মুখশ্রীর কোমলতা  
ও সজীবতা বজায় থাকবে  
এক প্রাণ পর্শী স্নিগ্ধ সুবাস  
আপনার মনে আবেগময়  
আনন্দভূতি এনে দেবে।

পরিবেশক:- জি. দত্ত, এও কো  
১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

সকল ঔষদার্থ ও ঔষধানলে পাওয়া যায়

রাজা রামেন্দ্রসুন্দর কতো উপকারী ছিলেন ভেবে তিনি তার গ্রহণ করলেন। দিন নাই রাত্রি নাই সর্বদা রামেন্দ্রসুন্দর তৎপর বিষয় কাজে। তাঁর কেমনে বড় বড় চাবি আয়রণ সেফের ও সিল্কের। রামেন্দ্র বাবু তখন বলতেন প্রায়ই, তোমাদেরই ভাঞ্জে আমাকে এই বোঝা টানতে হচ্ছে। বিভাগের বিষয়ে ডাক পড়তেই রামেন্দ্রবাবু হাজির। গুব লক্ষ্য রাখেন যেন কোন বিষয়ে কারও একটু অনায়াস না হয়।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যা খেলে দেখেন, একটা ড়হারে সোনার চামির জিনিষে বোঝাই। তখন ভগিনীপতিরা বললেন—রাম বাবু! দেখছো না আজ টুপি ভাগ হচ্ছে, এটা শেষ হ'তে দাঁও। ওটা আর এক দিন হলেই হ'বে। সেদিন সোনা-চামি ভাগ করা হ'লো না।

কী করেন আবার আর এক দিন আসতে হলো রামেন্দ্র বাবুকে সোনা-চামির ভাগের জ্ঞাত। এসে দেখেন, সোনা-চামির জিনিষ নামমাত্র পড়ে রয়েছে। তখন দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ফুল ভগিনীপতি বললেন—যাপার কী রাম বাবু? রামেন্দ্রসুন্দর উত্তরে বললেন—তাই ত দেখছি ফুল ছড়ব। তখন অজ্ঞ ভগিনীপতিরা বললেন—রাম বাবুর কাছে চাবি আছে, আমরা কী চুরি করতে গিয়েছি? হাজার মানা করলেও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বললেন হাতু করে।—আমি কি বুরি না রাম বাবু! আমরা 'দাখে একটা তোমার ভগিনীর বিয়ে নিলেও' আমার শরিকদের বাড়ীতে আর তিন বোনের বিয়ে দিয়েছি।

হাজার ঠাটা করে বললেও রামেন্দ্র বাবুর চৈতন্ত হলো। এতো ব'লে-কয়েও আর রামেন্দ্র বাবুকে চাবি নেওয়া করতে পারেন নি। তাঁর সেই এক কথা—আমি নিজেকে কখন কীকি দিতে পারি না। রহস্যমূলে ফুল ছড়ব বা ব'লেছেন, মিথ্যা না। আমিই দেখতে গেলে চুরি ক'রেছি।

তার পর দরখাস্ত ক'রলেন গভর্নমেন্ট এডুকেশনাল বিভাগে একটা চাকরী করবার জ্ঞাত। মাহিনাও বেশী সাবাব পেয়েছেন। ভিক্টোরিয়ার নিকট দরখাস্ত দিয়ে আস্থান পেয়েছেন ইন্টারভিউ-এর জ্ঞাত। এমন সময় শিয়ন এসে হাত পেতে বকশিস চাইলো। অবাক হয়ে রামেন্দ্র বাবু প্রস্ত করলেন—কেন? উত্তরে দারোয়ান বললো—গভর্নমেন্টের ঘরে যেতে হ'লে দিতে হয়।

তখনই মনে পড়ে গেল বিজ্ঞাসাগরের কথা। উঠে বললেন—সাহেবের ডাক পড়লে বলবে, তিনি আপনাদের দেওয়া কাজ নেনেন না। দারোয়ান তাকিয়ে দেখলো লোকটিকে। পাঁচছয় শত টাকার চাকরী ছেড়ে যায় সেই মাল্লবটিকে।

রামেন্দ্র বাবু প্রায়ই বলতেন—আমাদের শিক্ষা সেই দিনই সম্পূর্ণ হ'বে, যেদিন পূর্বের জ্ঞাত আমাদের প্রশ্ন কীভাবে। আশ্চর্য্য ছেড়ে পূর্বের জ্ঞাত ভাবতে শিক্ষা বা।

এই ভাব দেখে হীরেন্দ্র বাবু ব'লেছিলেন—জাতির জীবনে আমরা সেই দিনই জরী হইব, যখন চরিত্র বলে রামেন্দ্রসুন্দরের মত হইতে আরম্ভ করিব।

রামেন্দ্র বাবু বিজ্ঞানের উন্নতি দেখতে চান নি, দর্শনশাস্ত্রের কিছু দেখিয়ে নাম নিতে চান নি, কেবল বেছে নিরেছিলেন স্বদেশের উন্নতির কাজ। সেই জ্ঞাত অধ্যাপক বোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখে গেছেন—হাজারখানা বই লিখে বা নাম হয় রামেন্দ্র বাবু সেই

কিটাই দেখে গেছেন। রামেন্দ্র বাবুর কথার দোছোট ছিল—নিজে ভাল বা বুঝে কখনও অপরাধ বোঝাতে যাবে না। সেই জ্ঞাত অধ্যাপক বিশিনবিহারী গুপ্ত লিখে গেছেন—রামেন্দ্র বাবুকে আমরা পেলান বজাবাতের মধ্যে। যখন তিনি বলতে আরম্ভ করলেন তখন বোগ-শয্যায়। বস দিন ভাল ছিলেন আয়ত্ত করেই গেলেন। তিনি কোন শাস্ত্র হজম না করে বলতেন না। কখন রামেন্দ্র বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলে বুঝিয়ে দিতেন বাংলা ভাষায়। এমন কি, যখন পড়াতেন কলেজে তখন জান থাকতো না। জ্ঞানের খটা বেছে গেছে কে দেখে কে শোনে সে সব কথা। তখন পড়িয়েই চলছেন। ছেলেরাও শুনেছে আগ্রহ বরে।

তিনি প্রায়ই বলতেন—যদি পারি আমার মাতৃভাষাবেট তোলাবো। ঐ ভাষায় প্রথম আমি মা বলে থেকেছি। দেখি যদি পারি আমার মাতৃভাষাকে বাহন করবো সব কিছু শিক্ষায়।

একদিন হেসে বলছেন বিশ্ববিকি—আমার দৌহিত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলাম—জয়গোপাল, মণি! তোরা ভারতের চৌকি কি বন্ তো। তারা কাঁড়িয়ে বইলো নির্বাক। তখন জিজ্ঞেস করলাম ভারতের চতুর্নামা বলতে পারো? তখনও মিকুস্তব। যখন বললাম—ভারতের বাইনভারি। তখন জলের মত মুগস্থ বলে গেল। জাশ-বঁটি দিয়ে কাটতে হয় না পণ্ডিত মশায়দিকে। বারী বুঝিয়ে না দিয়ে মুগস্থ করান।

বিশ্ববিকি গভীর গলায় বললেন—তা হলে রামেন্দ্রসুন্দর হাজার হাজারে ভাষাতে হয়।

তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হলে মুক দর্শক রামেন্দ্রসুন্দর। যেন কিছুই বোঝেন না ত্রিবেনী মশায়। হাজার জিজ্ঞাসা করলেও তাঁর কাছে উত্তর পাওয়া যায় না।

কান্দী মহকুমার ভার নিয়ে আছেন তখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। পুঞ্জার ছুটিতে রামেন্দ্র বাবু বাড়ী গিয়েই জানতে পারলেন, রায় মহাশয় এখানে আছেন। ভগিনীপতি পূর্ণেন্দ্রনাথায়ণ-এর সঙ্গে রামেন্দ্র বাবু গেলেন ডি, এল, রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। অর বয়স হলেও তখন রামেন্দ্র বাবুর সব চুল পেকে গেছে। স্ববিরের ভাব এসেছে শরীরে। পরিচয় দিতেই চমকে উঠে বললেন—হবে না কেন ভিতরের জ্ঞানও যে পরিষ্কৃত হয়েছে। রামেন্দ্র বাবুকে পেরে ভাবাবেশে অনেক প্রস্ত করলেন। রামেন্দ্র বাবুর উত্তর শুধু হাসি দিয়ে। কতো কথা জিজ্ঞেস করেন ডি, এল, রায়। সেই হাসি। ডি, এল, রায় তাঁর বন্ধুকে একগানি চিঠি লিখেছেন তাই লিখলাম—এখন কান্দিতে থাকার মধ্যে আছেন স্ববির-প্রায় বৃদ্ধ সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেনী মহাশয়। সেদিন অশ্রুগ্রহ করিয়া আমরা এখানে আসিয়াছিলাম। আলাপ হইল। বহুদিন পর এক জন নামজ্ঞানী বিবান ব্যক্তির সঙ্গে পাইয়া নানা প্রশ্ন জুলিয়া তাঁর সহিত তর্ক করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে জ্ঞানগর্ভ গভীর মুখ হইতে বাক্যের পরিবর্তে অধিকাংশ সময়ে মুহু হস্ত অর্থাৎ দর্শনকৌমুদীর স্মরণ মাত্র হইতে থাকিল। স্তম্ভর্য্য আমরাও না মিটিল আশা না পুিল সাথ; তর্ক হইল না। অলো দত্ত অণুট। বড় বীর মাল্লবট। কতকটা নির্বোধ-এর মত কাণ্ডজ্ঞানহীন হইলেও বিভার একটা জাহাজ, তর্ক যখন করেন না বুঝিলাম বেরসিক। আমাকে যখন বাড়ী নিয়া গিয়া পাওয়াইলেন, অতএব বুঝিলাম উদারমনা মহাজন।

সে বার পুজোর ছুটিতে তাঁর বকুরা দেখেন তাদের রাম বাবুকে বড় খুশী। অনেকে প্রশ্ন করলেন—আপনাকে বড় খুশী দেখাচ্ছে কেন? তখন রাম বাবু শুরু করলেন—আমার আকাঙ্ক্ষা! এতদিন দিনে ফলবতী হতে চলেছে। কী আকাঙ্ক্ষা আপনার? জিজ্ঞাসা করতেই প্রহর দ্বয়ে আরম্ভ করলেন বলতে—আমার বরাবরকার আকাঙ্ক্ষা ছিল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলাকে গড়া। আমাদের বাঙ্গালীর চেহারা কিরিয়ে আনতে গেলে চাই এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে গেলে আহার ফিরে আসবে ভাবধারা। সেই স্বপ্নমন্দিরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। এর নাম দিয়েছে সাহিত্য পরিষৎ। যেখানে সমবেত হবেন ভারতের মনীষিগণ। তাঁরা জাগিয়ে তুলবেন শুধু বাংলাকে নয়, ভারতকেও।

তখন ভাবগম্ভীর রামেন্দ্রচন্দ্রের বঁলে চলেছেন শুক ভাষায়। জিজ্ঞেস করলেন উপেন্দ্র বাবু—কুচিহ্নার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল—তোমার দান কী আছে এতে?

হেসে বললেন রামেন্দ্র বাবু—আমার এই জন্মে গর্ব যে এটা একটা মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠান বললেও চলে। মুর্শিদাবাদের স্বনামধন্য মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জমির উপর সাহিত্য পরিষদ মন্দির স্থাপিত। মুর্শিদাবাদের আর এক স্বনামধন্য মহারাজা বৌগীন্দ্র-নাথায়ণের টাকাতে মন্দিরটির বিদ্যমান গঠিত। আরও একটা কথা বলি মুর্শিদাবাদের শ্রীনাথ পাল মণায়ণের টাকাতে এই মন্দিরটি মণ্ডর-মণ্ডিত হয়েছে। সবচেয়ে আনন্দের কথা, আপনার এই অধম একজন মুর্শিদাবাদেরই অধিবাসী এর সম্পাদক। তখন হাসির বোল উঠলো। আচ্ছা অধম লোক আপনি মুর্শিদাবাদের!

লালগোলার মহারাজা বৌগীন্দ্রনাথায়ণ এখন তাঁর নাতি বীরেন্দ্র-নাথায়ণকে সমর্পণ করে গেলেন রামেন্দ্রচন্দ্রের হাতে, বঁলে গেলেন মাহুয় করবার জন্ত আপনার মত পণ্ডিতের হাতে দিয়ে গেলাম।

রামেন্দ্রচন্দ্রের সান্নিধ্যচক্ষে সে ভাব নিলেন। বললেন আমারও যে নাতি পোকা। মহারাজ বললেন—বাসাটা একটু বড় করতে হবে, আমার লোকজনও আসতে পারে। রামেন্দ্র বাবু বললেন—আমি একজন গরীব শিক্ষক আমার এইটুকুই প্রয়োজন ছিল। এখন আপনার মত বড় পাখী আসতে গেলে বড় খাঁচারও প্রয়োজন।

ইতস্ততঃ করে মহারাজা জানবার চেষ্টা করলেন—এর জন্ত কিছু কী দিতে হবে আপনাকে? তখন উচ্চ হাস শুনে গেলেন রামেন্দ্র বাবু। বললেন—আমাকে! আমার নাতির ভাব নেওয়ার জন্ত! তখন লজ্জিত হয়ে মহারাজা নিজের তুল বুঝতে পারলেন। মহারাজাকে লজ্জা-নিবারণ জন্ত বললেন জিবেদী মশায়—আমার কতগুলো অভ্যাস খাওয়া আছে। কখন কখন ডিকের বুলি নিয়ে ঝাঁড়ানো আপনার কাছে। অবশ্য নিজের জন্ত নয়। শুনে মহারাজা গম্ভীর ভাবে বললেন—বুঝছি, দেশের কাজের জন্ত ডিকের

বুলি হাতে আপনার মত লোক পাওয়া ত ভাগ্যের কথা মশায়! রামেন্দ্র বাবুর তখন খুশী ধরে না।

যখনই জানতে পেরেছেন মহারাজা, রামেন্দ্র বাবু চিন্তিত আছেন সাহিত্য পরিষদের ঘর তৈয়ারী নিয়ে, তখনই মুক্তহস্তে রামেন্দ্র বাবুর অভাব মোচন করেছেন। যখন শুনেছেন স্থায়ী ভাণ্ডারের জন্ত রামেন্দ্র বাবু চিন্তা করছেন তখনই পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছেন স্থায়ী ভাণ্ডারে। যখন শুনেছেন রামেন্দ্র বাবু চিন্তা করছেন বিজ্ঞানাগর লাইব্রেরীর জন্ত। তখন মুক্তহস্তে সেই লাইব্রেরী দান করেছেন যত টাকাই লাগুক মহারাজার। এই ভাবে রামেন্দ্রচন্দ্রের স্বর্ণ শোধ করবার জন্ত আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন মহারাজা।

মহারাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার একটা ইতিহাস আছে। রামেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্য পরিষদের ক্ষুদ্রাঙ্গী সাহিত্যিকদেরকে বললেন—আপনারা সকলে একত্রিত হয়ে বলুন মহারাজাকে, আমাদের সাহিত্য পরিষৎ অভাবী দরিদ্র, আপনি কিছু সাহায্য করুন। দেখা যাক কী তিনি দেন।

তখনই সকলে একটা মিটিং করার স্থির করলেন। সহরের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু সুখী একত্রিত হয়ে কলকাতার একটা বিরাট মিটিং-এ মহারাজা বাহাদুরকে অভিনন্দিত করলেন। এমন কী সেদিনের সুবীজনের চাপে সভামণ্ডপ ভেঙে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছিল। এমন সুখী সমাগম তখনকার কালে কেউ দেখতে পার নি। তাঁরা মহারাজাকে মালা-চন্দন দিয়ে বরণ করে নিলেন। দুর্গা দিয়ে দশের পক্ষ হতে আশীর্বাদ করা হলো।

মহারাজা তখন বললেন রামেন্দ্র বাবুকে দিয়ে—আমি স্থায়ী ভাণ্ডারে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চাই। অতীতে এই কথা কানে যাওয়াতে সমস্ত ভদ্রমণ্ডলীর খুশী দেখে কে! খুশী ধরে সভামণ্ডপ ভেঙে পড়ে আর কী! বহুকাঠ উত্তেজনা কমলে সুখী সম্মানে হস্তাব করলেন, মহারাজকে বহন করে নিয়ে যাবার খোলা গাড়ীতে। মহারাজা কিন্তু সম্মত হলেন না—আপনাদের মত বিদ্বান লোকেরা গাড়ী টেনে নিয়ে যাবেন আমাকে গাড়ীতে বসিয়ে, এমন সভা আমি সাহসে পারবো না। মহারাজকে প্রায় বলতে শোনা যেতো টাকা থাকলে ত'হয় না মশায়। দান করিয়ে দেবার মত ক্ষম করে দেবার পাত্রও দরকার।

নিজের বন্ধুদের মধ্যে কেউ যদি বলতেন—রামেন্দ্র বাবু আপনারকে অনেক ধরত করিয়ে দেন। তখন বলতেন মহারাজা—আমার কলিজা যে দিয়ে রেখেছি রামেন্দ্র বাবুর কাছে। বীরেন্দ্রনাথায়ণ একমাত্র নাতি যে মহারাজের, তখন পাশ না করতে পারলেও বাঙলার মধ্যে একজন নামকরা সাহিত্যিক। রামেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্য লাভেই তাঁর সাহিত্য সাধনায় আগ্রহ জন্মেছিল।

[ক্রমশঃ।

॥ মাসিক বন্ধুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

# শব্দ - স্মৃতি র টুকিটাকি

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অসমঙ্গ মুখোশাখ্যায়

কৌলকাভা বেতাবের সেদিনকার 'শব্দ-শব্দী' সভার বাহা

উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই শব্দচন্দ্রের লীধজীবন কামনা কোরে কিছু কিছু বক্তৃতা দান করেন। সকলেরই ভাবনা-ধুব আন্তরিকতাপূর্ণ হয়েছিল। সকলের বলা শেষ হলে, শব্দচন্দ্র তাঁদের বক্তব্য নিয়ে, অল্প কথার কিছু বলেন। তাঁর লীধজীবন প্রার্থনা সবচেয়ে তিনি যা বলেছিলেন তার মোটামুটি কথা এই যে, লীধজীবন বাইরে থেকে সাধারণতঃ দেখতে ভাল হ'লেও, সব সময়ে ও সব ক্ষেত্রে উচ্চ কামা নয়। বহিঃস্থ, শক্তি ও কর্মশক্তি অটুট থাকে; বেশ, সমাজ ও লোকসেবা করবার ক্ষমতা থাকে, কোনও সিকে কোনও অশান্তি না থাকে, তবেই লীধজীবন কাম্য। কিন্তু মানসিক অশান্তি ও নৈতিক অসুস্থতার দ্বারা গিয়ে যে লীধজীবন—তেন্ন লীধজীবনকে তিনি তাগোয় অভিশপ্তাত বলেই মনে করেন। ব্যাপীকৃত হ'য়ে কর্মশক্তি হারিয়ে তিনি একদিনও বাচতে চান না...ইত্যাদি।

ভাষণের বেতার কর্তৃপক্ষ থেকে কটো ভোলবার আয়োজন হয়। কটো ভোলা হয়, একখানা শব্দচন্দ্রের আর একখানা সবচেয়ে অভ্যাসভর। এই হ'খানা কটো থেকে ব্রক করে, 'বেতার ভগ্ন'এ ছাপা হয়েছিল। শব্দচন্দ্রের কটোখানা বেশ ভাল হয় নি। গুলু কটোখানাত সামনের ক'জনেরই ভাল উঠছিল। একবারে সামনে এসেছিলাম আমি এবং নাটোবের মহারাজা, কামিনীবাজারের মহারাজা, জলধর সেন প্রভৃতি হ'চায় জন। 'বেতার ভগ্ন'এ ছাপিত এই ক'জনেরই ভাল উঠছিল। 'বেতার ভগ্ন'এ ছাপা এই ছবি দু'টো 'টুকিটাকি'র গত সখ্যায় ছেপে দেবার জন্য আমি পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু এ প্রেরিত ছবি থেকে ভাল ব্রক হয়ে না বলে আমার ছবি হ'খানা ফেরৎ পাঠানো হয়। 'টুকিটাকি' সম্বন্ধতঃ বক্তব্য বইয়ের আকারে প্রকাশিত হবে। তাইতে এই ছবি হ'খানা যদি কোন বকমে সিতে পারা যায়, তার জন্য চেষ্টা করবো।

পরদিন সকালে বধন শব্দচন্দ্রের কাছে সেলাম তখন তাঁর প্রথম কথা হোল—'আমার সব প্রান উটে পেল রে।' একখানা চেয়ারে বসে আমি তাঁর হুখের সিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। চেয়ে দেখবার উদ্দেশ্য, হুখভাব দেখে, তিনি কেমন আছেন সেইটে বোঝবার চেষ্টা। শব্দচন্দ্র বললেন—'কই, কিছু জিজ্ঞাসা করছ না রে?'

"কি জিজ্ঞাসা করবো?"

"এ যে বললুম, 'সব প্রান উটে পেল'—ওই বিষয়ে?"

"কেন প্রানটা উটে পেল, বাবা? আপনায় 'প্রান'এব ত' সীমা নেই? কিসের প্রান?"

"আহা-হা! আসল জিনিসটা, যা এত দিন মনে-মনে ছোকে এসেছি—সেবানন্দপুরে বাতী কোরে তোমাকে আমাকে হ'জনে থাকবার ব্যবস্থাটা। ওটা আর হোয়ে উঠলো না। বড় জোরে

আমি অগ্রসর মনে একটু বমকের প্রবে বললাম—'চূপ তখন হ', বাজে কথা বলবেন না।'

শব্দচন্দ্র পতীর হোয়ে বললেন—'বাজে কথা বোটেই নয়; লেবে নিয়ো।'

এর পর থেকেই মন-মন তাঁর পতীর বাবাশপ হোতে লাগলো। মনে মনে আমার একটু ভব জোল, তাঁর হুখের কথাটাও সভা জোরে লেখা লেবে না কি?

চটায় জানা গেল, তিনি অতিমহাজান অশ্রু কোরে পাঠান এবং শ্রুতকল্পনার পত্রোপাখ্যায়কে তাঁর কাছে আনিয়ে রেখেছেন। খুব আশ্চর্যের সময় প্রথমে বাবুকেই তিনি নিজের পালে রাখেন। প্রথমে বাবু শব্দচন্দ্রের তবুই যে বাবুল সম্পর্কীয় ছিলেন, তা তা'নে তিনি ছিলেন তাঁর আবাল্যের সচচর, তাঁর প্রিয়তম শিষ্য, তাঁর পরম বন্ধু। শব্দচন্দ্র সব কাজেই তাঁকে ডাকতেন, তাঁকে চাইতেন, তাঁর পরামর্শ ও সাহায্য নিতেন।

তাঁর 'নারসিং কোর'এ বাবার তরেক দিন আগে আমি তাঁর লেখতে দেখেছি। তখন তিনি নীচে একেবারেই নামেন না। প্রথমে বাবু সবাই তাঁর কাছে থাকেন। তখন শব্দচন্দ্র কখনো সেরেই কোথা-সাক্ষ্য করেন না। ভাঙাফলের সেইরূপই মিলেছিল। তবে খুব বরকারী কাজের জন্তে কেউ যদি আসতেন হ' প্রথমে বাবুই মারফত ওপর থেকে শব্দচন্দ্র সব হলে পাঠাতেন।

একম অবস্থায় আমিও বেতার না। না সেলের বরটা আমি পেতাম। আমার যে ছেলেকে তিনি খুব ভালবাসতেন, তাকে হোজ পাঠিয়ে বরটা আনতুম। সেদিন সেই ছেলেটি হাটী না থাকায় তারদুখ, আমিই গিয়ে প্রথমে বাবুই কাছে থেকে বরটা জেনে আসি। সেলাম। বাবার যে গিয়েছি, একটা মদুর গির্জা উচ্চল আনন্দময় আলোর মধ্যে গিয়ে ঠাকুরেছি, বসেছি, গল্প-গাফা করেছি। সেদিন যেন গিয়ে ঠাকুরালাম—একটা অন্ধকারতা, আনন্দমুগ, স্থানে। সেই ঘর, সেই দেয়, সেই ছালান, সেই সামনেরকার ছোট বাগান—করেক দিন আগে পর্যন্ত যে সবের মধ্যে ছিল একটা প্রাপ্তপূর্ণ উৎসাহ ও হাদুখোয় আশ, একটা সত্য, একটা শ্রব—আজ সেবানকার সেই সবের ভেতর যেন প্রাপ্তপূর্ণতায় একটা নিকলন হাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

মনটা যেন কি বকর হোয়ে গেল।

বোয়াকের পৈঠায় উঠতে গিয়ে, ঠাকুরদুখ। সেবানকার ঘর বাতাস আমাকে যেন পেছনে ঠেলে ফিরায়ে দিতে চাইলে।

ফিরে হাট।

তাও পারলুম না। বোয়াকের ওপর উঠে কলিং-কলটা টিপে দরলুম। শব্দ তখনই প্রথমে বাবু নীচে নেমে এসেন ও সাহায্য বা লিলেন তা বোটেই ভাল বলে মনে হোল না। শুধু বাবু আমাকে নীচের ঘরে বসিয়ে আবার ওপরে শব্দচন্দ্রকে থব্ব দিতে গেলেন। একটু পরেই নেমে এসে বললেন—'শব্দ আসছে।'

নামের বাক্য করুন। খবরলায়, যেন নীচে না নামেন; বাক্য জানি।

“না, সে শুনেই না। আপনি এসেছেন তখন, ও কিছুতেই না এসে পাবেন না।”

“কিছুতেই তা হবে না; আমি চলে যাবি।” বলেই আমি উঠে পাড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গেই সিঁকিতে চুটি জুতার দল হতে লাগলো।

শ্রবণে বাবু বললেন—“কেন্দ্রের ত?”

কিছু আর বলবার পেলুম না।

অত্যাধিক অসুখ অবস্থার মধ্যেও যেন নিজীবের মত যখন যখন এসে দাঁড় সেই নিভা: বাতাস! আমার কোলারটার ওপর চলে পড়লেন। আমি ঠিকই বুঝেছিলাম। বহুদূর। তিনি একটু দূর কোর থেকে বললেন—“তোমার কোলকে লিখে বসে লিখেছিলুম, তোমাকে আসবার জন্যে।” তাই, তুমি এসেছ তুমিই এসুম।

“কেন হলেন? আশাটা মোটেই ভাল হয়নি।”

“আমি না তা। মোটেই আমি নীচে নামি না; শ্রবণকে জিজ্ঞাস করি কেন।”

কি আর বলবার থাকে। ঠিক যেন অগাধ বহুদূর, ঠিক শারীরিক অসুস্থতার ঝামেলা কখনো কোন বাবা বাবা? ঠিক বুঝে বসাই ফোন—“বহুত ত এক দিন হয়েই, তার জন্যে আর হয়ে কি।” তাকে সাবধানতার ছোড়া দিয়ে কখনো আটকে রাখা যায় না।

যেন বাসন্তে চলে—এ আর কেউ নয়—“ঈশ্বর”।

উদ্ভাসের প্রিয় শিখা—“ঈশ্বর”।

শ্রবণে বাবু এখনো জীবিত আছেন, তাই এই দিনের কথাগুলো বাক্য সিঁকলায়; নতুবা লিখকুম না।

জীবিত অবস্থায় পর্যন্তই যেন এই দিনের কোনো আমার শেষ কথা। অকৃত কতবার হাতাধৃত্তিতে আমি ঠিকই প্রায় প্রতিদিনই দেখি। জীবনে অনেক আত্মীয়, অনেক দ্বিতীয়, অনেক বন্ধুকে হারিয়েছি, কিন্তু পর্যন্তই যেন এমন পরমাত্মীয়, এমন পরম বন্ধু এমন পরম কল্যাণীক যে অত্যাধিক অসুখে এমন ভাবে হঠাৎ হঠাৎ হোল, এটা আমার চরম দুর্ভাগ্য।

যাও গো। এমন হঠাৎই যে তুমি পাশের বাসে, তা তখন সিন হতেও তাহিলি। হলেছিল হটে যে, তোমার দুটী বাকী বৈশিষ্ট্যই বেতে উঠবে, তাই কানী থেকে ভাড়াভাড়া চলে এসে। তখন বুঝতে পারিনি যে তোমার বুকের সেই কথা আমি যথাস্থিত ভাবেই সত্য করে বাবে। কি কোরে যে তুমি সেটা জানতে পারেছিলে, তা জানি না। এখন বুঝতে পারছি, তুমি যেমন কোয়েই থাক ত জান ত পেয়েছিলে। বাই হোক, ভবিষ্যত। যা, তা হবেই। তুমি যখন কাছ থেকে এই প্রার্থনা করি, তুমি কোন্ পেছ, বৈশিষ্ট্যই যেন সেখানে গিয়ে আমার তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পারি।

• ‘টুকটুক’র এই কথাটা পূর্বেই লেখা হয়েছিল। সে সময় শ্রবণে বাবু জীবিত ছিলেন ও কোলকাতার দক্ষিণাংশ ‘বতালার’ বাস করছিলেন। বুকের বিষয় যে, কয়েক দাস পূর্বে ঠিক ভাগা-বিভাগ ঠিকও পর্যন্তই পড়ে গিয়ে নিজেই।

—লেখক।

‘পর্যন্ত’র টুকটুক’ পড়ে, কেউ কেউ ‘বতাল’ উপন্যাসখানার বিষয়ে আরো-একটু বিশদ ভাবে জানতে চেয়েছেন। তাঁদের অনুরোধ মত লিখছি যে, বর্তমানে কোলকাতার বাসোপাধায় কানী থেকে দুই-কলের একখানা দ্বাদশিক পত্রিকা বাক্য করছেন অবস্থা তার সম্পর্কিত ছিলেন। পত্রিকাখানির নাম ছিল—‘প্রবাস-ভাষা’। পর্যন্তের এক বাস কানী সঙ্গে বাসোপাধায় বতালর ঠিকই যেন কলেন, ‘প্রবাস-ভাষা’র ‘জন্ম’ একটা উপন্যাস ঠিকই লিখে লিখেই হবে। পর্যন্তের কোল বাবুর বাবাবাব অনুরোধ প্রকৃত না পেরে, ‘বতাল’ কানী নাম দিয়ে একটা উপন্যাস কলেন ও তার প্রথম পরিচ্ছেদ লিখে কোল বাবুকে দেন। ‘প্রবাস-ভাষা’তে ঐ প্রথম পরিচ্ছেদটা ছাপা হয়। তারপর পর্যন্তের কানী থেকে কোলকাতার চলে আসেন এবং ‘প্রবাস-ভাষা’তে ‘বতাল’ কানীও বাক্য হোয়ে যায়। এর বহুবচনক পেরে, কানীর অকৃত্য দ্বাদশিক ‘উদ্ভাস’র সম্পাদক, শ্রবণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘বতাল’র কানী প্রকাশ করেন যে, বতালের সম্প্রদায়ের বাবা ঐ সম্পূর্ণ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করা হোক এক সেটা লজ্জাবাহিক ভাবে ঠিক ‘উদ্ভাস’তে প্রকাশিত হোক। শ্রবণচন্দ্র এতদেব আমদের সম্বন্ধে দুটী বাক্য কলেন। আরো পর্যন্তের বিষয়ে বলতে তিনি শ্রবণচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন শ্রবণে চোল, বাসোপাধায় উপন্যাসের মত, আরো আটপন জন মিলে লিখে গল্পটার শেষ করলো। গল্পের চুটি কি হবে তা সকলে একসঙ্গে মিলে ঠিক করতে পারেন না, বা সে বিষয়ে পরামর্শের মধ্যে কেউ কোন আলোচনা বা পরামর্শ করতে পারেন না। পর্যন্তের লিখিত প্রথম পরিচ্ছেদের পর, বিতরণ পরিচ্ছেদ থেকে লেখবার তার পড়ে আমার ওপর। কিছু আমার হাতে তখন দ্বাদশিক বহুবচীর ‘জন্ম’ দুই কলী একটা লেখার কাজ থাকায়, ঐশ্বর্যজনক বাসোপাধায়কে গিয়ে বিতরণ পরিচ্ছেদটা লিখিয়ে মেবার প্রকাশ করি। হাতে আমাকে বাক্য হয় যে, সে তার আপনাকেই লিখে হবে। সে সময় ঐশ্বর্যজনক কলীবাট হালকাবাক্য। হোতে, বটুক পালের একখানা বতাল বাক্যতেন। আমি তার কানী লিখে এখিয়ে বাক্যত তিনি সম্মত হলেন ও দিন দুইয়ের ভেতরই বিতরণ পরিচ্ছেদটা লিখে গিলেন। কিছু তখনো আমার হাতেই সেই কাজ শেষ না হওয়াতে, কলিমেব কলিমেব বাসে বাসোপাধায়, বতাল: জগদীশ ওত ও বতাল পরিচ্ছেদটা লেখেন। তার পর আমি লিখি, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। আমার পর জীবনে শেষ লেখেন সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ ও ঐশ্বর্যবাট বাকী লেখেন—নবম পরিচ্ছেদ। ৯ম হটেই চৌথ পরিচ্ছেদ লিখিত হয়—সত্যাকৃত্যর বাসোপাধায় বাবা। পর থেকে উনিশ পরিচ্ছেদ জীবনোক্ত বস্তু লেখা। তার পর বিংশতি চৌদুতী লেখেন—বিশ থেকে বাইশ পরিচ্ছেদ। তাগোপন্যর লেখেন—দুইশ, চল্লিশ ও পঁচিশ পরিচ্ছেদ। হাতিল থেকে আটশ পরিচ্ছেদ লেখেন—হাতিকারজন বাসোপাধায়। সব শেষে তাকার নবংশের সেনগুপ্ত শেষ হিনট পরিচ্ছেদ লিখে—উপন্যাসখানি সমাপ্ত করেন। বোটা একত্রিংশ পরিচ্ছেদে বইখানি শেষ হয়।

‘বতাল’ উপন্যাস সম্পর্কে আর এক জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি আমাদের ‘বতাল’ সাহিত্য সভার একজন বিশিষ্ট সম্প্রদায়—বহুবচন বাসোপাধায়। বইখানার তিনি কিছু না

সিখলেও, ওর প্রকাশ ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ, উত্তম ও সাহায্য খুব বেশী ছিল। তিনি আন্তঃতাব কলেজের একজন পুরাতন ও প্রাণী অধ্যাপক ও এক সময়কার 'বঙ্গবাণী' মাসিকের (বা স্বর্ণতঃ গ্রাম্যপ্রশাসন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে, তাঁদের বাড়ী থেকেই বার তোল) কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচক। শরৎচন্দ্রের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। 'বঙ্গবাণী' কে শরৎচন্দ্র অধ্যক্ষ পদস্থ করতেন ও তাতে তিনি নিয়মিত ভাবে লিখতেন। তাঁর 'মহেশ' ও 'পঞ্চম দারী' এই 'বঙ্গবাণী'তেই প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র যখন সামন্তবেড়ে থাকতেন, তখন 'বঙ্গবাণী'র জন্ত তাঁর সেনার কাপি আনতে কুমুদ বসু প্রতি মাসেই অস্ত্রঃ পক্ষে একবার করেও সামন্তবেড়ে যেতেন। শরৎচন্দ্র যেমন আমাকে 'আফি' ধরিয়ে পেছেন, তেমনি কুমুদ বাবুকেও ধরাবার জন্তে খুব চেষ্টা করেছিলেন। 'আফি' ধবার বিপক্ষে কুমুদ বাবু স্বতঃক্ৰমে আপত্তি তুলেছিলেন, শরৎচন্দ্র তা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। শেষকালে যখন কুমুদ বাবু বলেছিলেন যে, 'আফি' খেলে প্রচুর দুঃখ পেতে হয়, দুঃখের পরনা তাঁর নেই, তাতে শরৎচন্দ্র কুমুদ বাবুকেও বলেছিলেন যে, তাঁর একধানা বইয়ের কাপি-রাইট তিনি কুমুদ বাবুর নামেও লিখে দেবেন, সেই পরনায় তিনি দুঃখ পাবেন। কিন্তু এততেও শরৎচন্দ্র কুমুদ বাবুকে রাজী করতে পারেননি। নৈসর্গিক জগতে উত্তরের মধ্যে সর্গজনবিস্মিত প্রণয় ও বস্তুদের বাঁধন থাকলেও এবং শরৎচন্দ্র শক্তিতে ও শোভায় অতুলনীয় হ'লেও, এক্ষেত্রে কুমুদের নিকট তাঁর এই অজরোহা কিছুতেই রক্ষিত হোল না। কুমুদ বাবুকে আমার মত তিনি 'আফি' হরতে পারলেন না। পরে শরৎচন্দ্র আমাকে এ বিষয়ে বলেছিলেন—'কুমুদ আফি ধরলে ভাল করতো; ওর ঐ মারাত্মক রক্তের ডিম্পোপশিয়ার হাত থেকে ও বাঁচতো। ও বৌগটার পক্ষে 'আফি' একটা মগা ওষুণ। পশ্চিমী চিকিৎসা-শাস্ত্রে 'আফি'কে সূক্ষ্মভাবে ব্রুতে ও ধরতে পারে নি, 'আফি'য়ের ওপর ওপর মোটা-মুটি গুণাগুণ তারা বুঝেছে। স্ববিশেষ আর্দ্রবে এই সূক্ষ্মত্ব অবিকৃত ও প্রকাশিত হয়েছে।' পরবর্তী-কালে শরৎচন্দ্রের এই কথামূল্যের বাধ্যবাধ্য আমি জানতে পারি। স্থলবিশেষে এই জিনিষটি বিবের কাজ করে, আবার স্থলবিশেষে এ অমৃতের মত উপকার দান করে: আমাদের এদেশে ৬০-৬৫ বছর বয়সের সময় দৈনিক অল্প মাত্রায় খেলে, বৃদ্ধ বয়সের অনেকগুলো রোগের হাত থেকে এড়ানো যায় ও নীরঞ্জী হওয়া যায়।

স্বর্ণতঃ কেন্দ্রবিন্দু বন্দোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যখন তাঁর জন্মস্থান দক্ষিণপথে আসেন, তখন আমিও দক্ষিণপথে বাস করতাম। শরৎচন্দ্র সর্বদা তাঁর সঙ্গে আমার বহু কথা হয়। 'আফি' সর্বদাও অনেক কথা হয়। তিনি নিজের 'আফি' ব্যবহার করতেন। সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ৮০; তিনি বললেন—'আমি যে এ বয়সেও নীরোগ ও কর্মক্ষম আছি, সেটা 'আফি'য়ের গৌলতে। এই জন্তেই আমাদের দেশে বৃদ্ধ বয়সে এই জিনিষটা প্রায় ঘরে ঘরেই প্রচলিত ছিল এবং সেই সব বৃদ্ধবৃদ্ধারা নীরোগ ও কর্মী দেখে ৮০, ৯০, ১০০ বছর পর্যন্ত বাঁচতেন। কিন্তু ইংরেজদের ডাক্তারীতে কিছুতেই 'আফি'য়ের স্বপক্ষে এই গুণের কথা স্বীকৃত হবে না।' আমি ইচ্ছা করেই 'আফি'য়ের বিপক্ষে অনেক পথ নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করি। এরূপ শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও করতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে

হোল। তবে, শরৎচন্দ্র যেমন বলতেন, কেন্দ্রবিন্দু বাবুও তাই বললেন যে, ৬০-এর আগে 'আফি' খাওয়া কর্তব্য নয় কিংবা খুব বেশী মাত্রায় ব্যবহার করাও ঠিক নয়। মোটের ওপর আয়ুর্বেদে বর্ণিত নিয়মে ও জিনিষ ব্যবহার করলে, অমৃতের তায় ফল দিয়ে থাকে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, ডাক্তারেরা বাই বলুন না কেন। শরৎচন্দ্র নিত্য 'আফি' ব্যবহার করতেন, তবুও অসময়ে মারা গেলেন। এর মন্ত একটা কারণ ছিল। তিনি শরীরের ওপর যেকোন অনিয়ম অত্যাচার চিরকাল কোরে এসেছেন, তাতে তাঁর অকালমৃত্যু মোটেই আশ্চর্যের নয়। বেঁচে থাকার ওপর তাঁর বিন্দুমাত্র বৌদ্ধ ছিল না। তিনি অনেক দিন আমার কাছে বলেছেন—'দেখ, এখন বেঁচে থাকাটা লোকসানের সামিল। কি কোরে মরা যায় বল দেখি!'

আমি বলতাম—'কেন দাদা, মরে লাভটা কি?'

'লাভই ত খোল আনা। আবার নতুন জন্ম, আবার সেই মধুর ছেলেবেলা, ছেলেবেলা, আবার জীবনের সব চেয়ে মধুরময় সময়—কিশোর বয়স, সেই কিশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণ—আজ্ঞা-হা! কী স্নন্দর! কী চমৎকার!'—বসতে বসতে শরৎচন্দ্র যেন আত্মগোচর হয়ে যেতেন। তাঁর অস্ত্রের অস্ত্রান্তরে হঠাৎ যেন নীকান্ত রূপ নিয়ে ফুটে উঠতো, আর সেই সঙ্গে বায়োকেপের ছবি মত পর্দায় পর্দায় হরত বা ফুটে উঠতো—ভাগলপুরের সেই গঙ্গা, গঙ্গার প্রবল প্রোতোবেগ ইন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথের ডিলি, বুনোঝাড়ের বন, মাছচুরি; তার সঙ্গে ফুটে উঠতো—তার অন্নদা দিদি, আর অন্নদা দিদির সেই নির্মম সাপুড়ে 'আমি'। আরো কত কি! বাক, বা বলছিলাম—বলি।

'রসচক্র' উপন্যাস সর্বদা এর আগে আমি বলেছি যে সমস্ত বইখানা পাড়ে আমার নিজের তেমন ভালো লাগেনি। এ কথা মানে এই নয় যে, বীরা বীরা আমরা এতে লিখেছি, সবায় লেখ খাওয়া হয়েছে। লেখা সকলেরই খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু প্রই সর্বদা পূর্বে সকলে মিলে যুক্তি-পরামর্শ না কোরে, অনির্দিষ্ট ভাবে অগ্রসর হওয়ার ফলে যেমন হয়, তাই হয়েছে। আলাদা আলাদা ভাবে, প্রত্যেকের লেখা অতি স্নন্দর হয়েছে—এ কথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে এবং চোরেছেও তাই। শরৎচন্দ্রও 'রসচক্র' সর্বদা আমাকে বলেন—'বই ত বেশ ভালই হয়েছে, তোমাদের সবাইকে আমি এ জন্তে ধন্যবাদ দিচ্ছি; সবাইকে জানিয়ে।'

'কিন্তু' হবার পক্ষে 'রসচক্র' ভাল বই। যে বই শরৎচন্দ্র, নরেন্দ্রচন্দ্র, তারানন্দ, শৈলজানক প্রভৃতির লেখনী-স্পর্শে জন্মগ্রহণ করেছে, সে বইয়ের ছবি যে সকলেরই খুব প্রিয় ও আকর্ষণীয় হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বইখানার ছবি কতবার জন্তে কোন কোন কিম্বদন্তি কোম্পানী থেকে প্রস্তাবও এসেছিল, কিন্তু আমাদের সকলের ইচ্ছা, কোন ভাল এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান যদি 'রসচক্র'র ছবি করেন, তাঁদের আমরা আমাদের সহিত উড়া দিব। বইখানি বাজারে নিঃশেষপ্রায় হোলেও, এক-জাখ কাপি আমাদের কাছে আছে; কোন প্রতিষ্ঠান কিম্বদন্তি কোম্পানী আমাদের কাছে এল এলে আমরা তাঁদের বই দিতে পারব। 'রসচক্র'র বহু পাঠক-পাঠিকা এর চিত্রাভিনয়ের ব্যবসায় জন্ত আমাদের অত্যাধিক জানিয়ে

আসছেন; এবং এটাও ঠিক যে 'বসন্ত' ফিমা হোলে, ফিমা প্রকৃতির দেব পক্ষে তা নিশ্চয়ই লাভজনক হবে।

ফিমের কথাই আর একটা কথা মনে পড়ছে। একদিন সকলে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছি, কথায়-কথায় তিনি বললেন—“তোমার গল্পের ভেতর অনেকগুলোর বেশ ভাল ফিমা হোতে পারে, যদি প্রট একটু-আধটু বাড়িয়ে দিতে পার।” আমি বললাম—“আমার বই ফিমা করার জন্তে আমি কারো কাছে বাই নি, যাবও না। কোন প্রতিষ্ঠান যদি আমার কাছে এসে প্রস্তাব করেন, তা হলে আমি আনন্দেই সে প্রস্তাবে রাজি হ'ব।” একটু চুপ করে থেকে আমি বললুম—“এমবেশ বড়ুরা তাঁর 'হুক্তির' ছবি শেষ কোরে একদিন আমার কাছে এসে, আমার একখানা বই খুব আগ্রহ কোরে চেয়েছিলেন। আমি খুব আনন্দের সঙ্গে তাতে রাজি হয়েছিলুম। কথা হয়েছিল, তিনি 'হুক্তির' ছবি কোরে খুবই সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছেন। দেবদত্ত কিছুদিন জাহাজে ইয়োরোপ ঘুরে আসবেন; ফিরে এসেই আমার একখানা বই ফিমা তোলাবার ব্যবস্থা করবেন।”

“হোল না কেমন?”

“তিনি বহু থেকে জাহাজে ওঁরবার দু'চার দিন পরেই, এখানে তাঁর জীবন ইচ্ছা মুক্তা হোল। শেষে এই খবর পেয়েই তিনি ফিমা

এলেন। তারপর সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল; আমিও আর ও-সম্বন্ধে কোন চেষ্টা করি নি।”

“আচ্ছা, তুমি রবীন্দ্রনাথকে তোমার কি কি বই পাঠিয়েছিলে?”  
“পথের দৃতি,” ‘বদনা ডাক্তার,’ ‘জী,’ ‘মুক্তাবারি,’ ‘জমা-খরচ’ আর বোধ হয় ‘বাঁধার উত্তর’।”

“কবির চিঠিখানা যত কোরে রেখে দিয়ে; ওর নাম অনেক হে।”

রবীন্দ্রনাথ আমাকে যে চিঠি দিয়াছিলেন, তার মোটামুটি কথা এতরূপ ছিল:—“মনে করেছিলুম, আপনার বইগুলোতে একটু-একটু উঁকি দিয়েই দুটি নেব, কিন্তু পড়া আরম্ভ কোবে, সব শেষ না কোবে পারি নি, তাতে আমার কাজের বিশেষ ক্ষতি হোয়েছে। লেখার আপন ওস্তাদ। আপনার লেখা প্রত্যেক পথেই চলে; চলে খুব সহজেই। \* \* \* কল্পকে অতি কল্প করার ইচ্ছা, কোন কোন জায়গায় র: চড়িয়েছেন একটু বেশী; তা হোলেও তা ত্যাগ-বীকা অষ্টাবধ হয়নি যে, তাতে আরাম শোনা। \* \* ইত্যাদি। আমার বইগুলোর ওপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসাত্মক অতিমত শ্রবণের জন্তে সবচেয়ে বেশী ধন্য হোয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। প্রকৃত বন্ধু এইরূপই হয়। আমার সব বই গড়ে স্বর্গত: ডাক্তার মুন্সেরীমোহন দাস দু'খানা দীর্ঘ পত্র লিখে আমার যে অভিনন্দিত করেছিলেন এবং গ্রামাশ্রমাদ, এন, সি, চ্যাটার্জি,

—কিন্তু—

কিছুটা নিরাস করিয়া কতকটা সম্ভা মূল্যে বিক্রয় করা না যান—এমন কোব জিনিষ বিরল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নস্বাদী নিকৃষ্ট সম্ভা জিনিষেরই বাজারে প্রাচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিত্রাচারিত কলাবৈপ্লব্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ হাতে কোব সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সংকল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের সমাদরের কোবদিন অভাব ঘটে না। তাই আমাদের নির্মিত অলঙ্কার সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই আমরা অবসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং



অজস্র চিত্রকলা  
এলোরার ভাস্কর্য  
আগ্রার তাজমহল  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

এস, সরকার এণ্ড কোং

ফোন-৬৪-৩১৪০- হুগলী-কলিকতা-১১



১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকতা-১২

গ্রাফ:

২০৮, রাসবিহারী এডিনিউ • কলিকতা-১২

চাৰ বন্ধোপাধ্যায়, সুব্রহ্মনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি যে উচ্চ প্রশংসা করতেন, তাতে আমার অত্যন্ত অধিকাংশ বন্ধুরা ভেতর ভেতর একটা অস্বস্তির ভাব যে পোষণ করতেন সেটা আমি বুঝতে পারতুম। কিন্তু শরৎচন্দ্র এতে খুবই আনন্দিত হ'তেন। তিনি ছিলেন আমার প্রকৃত বন্ধু।

আজ তাঁকে হারিয়ে আমি যেন নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছি। তাই তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই আমি একরকম সাহিত্য-আসর থেকে সবে ঠাঁড়িয়েছিলাম। তবে প্রবল নেশার মত যে তিনিই স্বপ্নের আঁটে-পুটে জড়িত হোয়ে গেছলো, হার থেকে একেবারে মুক্ত হোতে পারিনি। সেই জন্মেই মাঝে মাঝে একটু-আণ্টু না লিখে পারিনি এবং সেই জন্মেই কতক স্থণীব্যক্তির বিশেষ অল্পবোধে—‘শরৎ-স্মৃতির টুকি-টাকি’ লিপিতে বর্ণেছিলাম। বসলেও আর আগের মত হয় না; মুক্তবেণী আর যুক্ত হয় না। তাই এখনকার লেখার মধ্যে থেকে বাদ—শত্বেক ভুল, সহস্র ভ্রুটি, অসংখ্য অসতর্কতার ছাপ। এর জন্ত তাই গোড়াতেই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রেখেছি। আজ আমার সৃষ্টিকর্তা যে পথে আমার ঠেলে দিয়েছেন, শরৎচন্দ্র জীবিত থাকলে আজ হু'জনে একসাথে বুক ফুলিয়ে, নির্ভয়ে, বিনা বাধার সেই চিব-মহান, চিব-উজ্জ্বল পথে অগ্রসর হোতে পারতাম। বন্ধু অনেকেই ছিলেন, অনেকেই আছেন, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই আজ নিজেদের সঙ্গার-স্বাভ্য নিয়ে ব্যস্ত; আমার মত লোকের বন্ধুত্ব তাঁদের কোন দিক দিয়ে কোনরূপ লাভ হবার আশা নেই। তাই আজ ঐ শ্রেণীর কোন বন্ধুর বাড়ী বদ্বি বাই, তা তিনি মনে মনে জসদ্বষ্টই হ'ন। বাড়ীতে থাকি সাংঘও হয়ন্ত, কাককে দিয়ে বলে পাঠান যে তিনি বাড়ী নেই; কিংবা হু'মিনিটের জন্তে একবার এসে, জঙ্গরী কাজের অছিল্য দেখিয়ে, অতি ভক্ততার সহিত চলে যান। স্মৃত্যায় কারো কাছে আর বাইও না, বাওয়া উচিতও না।

সাহিত্যক্ষেত্র হোতে নিজেকে একরকম বিচ্ছিন্ন করেই একান্তে পড়ে আছি; বর্তমান সাহিত্যের কোন খবরই বড়

একটা বাধি না। শুনতে পাই, কেউ কেউ বলেন যে বর্তমানে কথাসাহিত্য উন্নতির চরম সীমায় উঠেছে; আবার কেউ কেউ খুব অল্পদূর সঙ্গে ওকথা'র বিশরীত বলে থাকেন। কিছুই বুঝি না। তবে এটা বুঝি যে, সাহিত্যক্ষেত্র আজ বিভিন্ন দলে ভাগ্যভাগী। দল অবন্ত চিরকাণ্ডই ছিল, কিন্তু ঠিক এভাবেব গোড়া হলীর ভাব ছিল না। একজনের উৎকৃষ্ট রচনা, অল্প দল কিছুতেই গ্রহণ করবে না, আগার খুব নিবৃষ্ট রচনাও সেই দলে আদরের সহিত গৃহীত হোয় তার প্রশংসা-প্রচারে তাঁরা আকাশ-বাতাস ঝাপিয়ে তুলবেন—এই ধরনের নানা কথা শুনতে পাই। কি ঠিক, কি বেঠিক তা বুঝতে পারি না, বোঝবার আবগক নেই বোলে, সে চেষ্টাও করি না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বালা-সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি হোক; তাই দেখতে দেখতে, যে পথে পা পাড়িয়েছি সেই পথে যেন তাড়াতাড়ি যেতে পারি। পথের শেষে দেখানে শরৎচন্দ্র আমার অপেক্ষায় বসে আছেন।

দাদা সো! যেখানে তুমি গেছ, সেখানে বাবার জন্তে পা বাড়িয়ে আছি। ঈগুগিরই সেখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হব। সেখানে আবার আমরা এমন সাহিত্যিক জোট বাঁধবো, যাতে পরস্পরের মধ্যে হিংসা থাকবে না, হেব থাকবে না, পরস্পরভাতা থাকবে না, যেখানে মিথ্যা অভিমান-অহংকার থাকবে না, মুখ মধু মনে বিব থাকবে না, অর্ধের অহমিকা থাকবে না। সেখানে থাকবে সত্য, প্রীতি, সরলতা, স্বদয়ে হৃদয়ে প্রেরিত বিনিময়, স্বাধীর প্রেমের আদান-প্রদান। সেখানে আমরা সত্যকার পবিত্র ও অনাবিল সাহিত্য-সাধনা কোরে, সেই মহা-সাহিত্যিকের প্রীতি ও কল্পনা যেন আমাদের লাভ করতে সমর্থ হই, যা অনন্তকাল পর্যন্ত সেখানকার আকাশে-আকাশে, বাতাসে-বাতাসে, ফুল-ফুলে, ওক্স-লতায়, পল্লবে-পাতায়, বনে-উপবনে, প্রান্তরে-কাষায় চিরসঞ্চারিত হোয়ে সজীবিত থাকবে। তাই আজ তোমার স্মৃতি-বৈবর্তের মধ্যে, তোমাকে স্মরণ করবার সঙ্গে-সঙ্গে, সেই দুনিয়ার মালীকে, বিখ-ব্রহ্মাণ্ডের রাজাধিরাজ, মহা-সাহিত্যিক ও কবিস্বৈরীর চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে, তোমার স্মৃতির এই ‘টুকি-টাকি’তে সমাপ্তিও রেখা টেনে দিলাম।

শেষ

## তুমি এসেছিলে

শ্রীমদ্বৈষ্ণৱী সেনগুপ্ত

জামার ঘরের কপাটে কে যেন টোকা দিয়ে গেল সুখ  
ধূপছায়া রাত বখন কেটেছে, উরাস হাওয়ার বখন মিশেছে  
কিরি কিরি আর খুক খুক বন-বিটপীর আণ,  
কে যেন তখন টোকা দিয়ে গেল আমার দুয়ারে শুধু।  
আকাশ বখন অরণ-চুম্বার হয়নিকো মোটে লাল—  
সাগর-বলাকা ওড়েনি বখন সূর্য-শুক হর,  
তটিনী বখন সাগরের কানে করেছিলো কিছু কথা,  
তখন কে যেন দুয়ার-বাহিরে রেখে গেল নীরবতা।

তুমার মতো বখন জ্যোৎস্না বাইরে ছড়িয়ে ছিল,  
একটি সোনাকি বখন সেখানে বিজীর রবে মিশে,  
নিজ-নাথ বখন আঁধারে পালক গুটায় নিল,  
আমার দুয়ারে তখনই মধুর আওয়াজ তুলিল কিসে!  
প্রাণ বখন অক্ষত ছিল কামনার রাগিণীতে  
অনেক ইচ্ছা তোমাকে পাওয়ার না পাওয়ার সঙ্গীতে  
পূর্ণ বখন। তখন কে যেন সুখ শুন্ শুন্ গানে  
টোকা দিয়ে গেল আমার দুয়ারে, ডাক দিয়ে গেল শুধু।



এই শিশুটির জন্য  
এক মুহূর্তও  
ভাবতে হয় না



করন সে

**ল্যাকটোজেন**  
থোয়ে পুষ্ট



LG/P/21

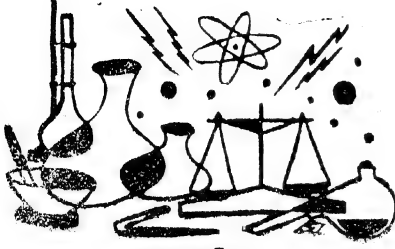
সিলোন রেডিয়ে থেকে 'ল্যাকটোজেন' হিলী  
প্রোগ্রামে বীণা রায়ের কথা শুন।  
রবিবার...রাত্রি ৭টা-৪৫ মি: থেকে রাত্রি ৮টা এবং  
বৃহস্পতিবার...রাত্রি ৮টা-৩০ মি: থেকে রাত্রি  
৮টা-৪৫ মি:।

৪১ মিটার ব্যাণ্ডে

21

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন  
নেসল্‌স প্রডাক্টস (ইণ্ডিয়া) লি:  
পোষ্ট বক্স নং ৩২০ পোষ্ট বক্স নং ৩১৫ পোষ্ট বক্স নং ১৮০  
কলিকাতা বোম্বে মাড্রাজ

# বিজ্ঞানবার্তা



পঞ্চদশ মিজা

হয় কিংবা কেবল শিল্প প্রতিষ্ঠান চলে না, শিল্পের উন্নতির জন্য উপযুক্ত বায়ুবেশও প্রয়োজন। শিল্পের উৎকর্ষতা, উন্নতির পথ নির্দেশ করবে মানুষ—যদি চালাবে মানুষ, তাই উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন শিল্পক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী। ছেলে ছবি আঁকতে ভালবাসে; আপন মনে সে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, খুঁজি মতো খেঁচ করে। বাবা তাকে এক দিন জোর করে বয়সপাতির কারখানায় চাকরীতে ঢুকিয়ে দিলেন। ছবি আঁকলে তো পেট ভরবে না—অতএব হাতুড়ী নাও। শিল্পী হিসাবে ছোটোটি হয়তো খুবই উন্নতি করতে পারতো—কারখানার মেহনতী কর্মী হিসাবে সে একেবারেই অচল। তবু তাকে দিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে, ফলে লোকটির এবং তার সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠান এই উভয়েরই ক্ষতি হচ্ছে। এক কথায় বৃহৎ অর্থে ক্ষতি হচ্ছে সমগ্র দেশের। কেবলমাত্র কর্মী নয়, উচ্চপদস্থ অফিসার এবং পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচিত করার সময়ও এনিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মানসিক পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়ার সঙ্গে যিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতে আসছেন, তাঁর মনের মিল আছে কি না।

দেশ-বিদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্তমান কালে সাধারণ কর্মীদের এক দায়িত্বপূর্ণ অফিসারদের মানসিক পরীক্ষার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র মানসিক পরীক্ষা নয়, বরং অফিসারের দায়িত্ব নিতে যাবেন তাঁদের পৃথক ভাবে ব্যবসা ও শিল্প পরিচালনা বিষয়ে শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করা উচিত। ঠিক কি ভাবে শিল্পের জ্ঞান প্রয়োজনীয় মানুষ সংগ্রহ এবং তৈরী করে নেওয়া যায়,—ইংলণ্ডের বিজ্ঞান ও শিল্প-গবেষণা পরিষদ তা নির্ণয় করতে উজ্জাগী হয়েছেন। শিল্পক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মীর সঙ্গে উৎপাদনের হার একসূত্রে বাঁধা; তাই অত্যন্ত শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা করতেও পরিষদ এসেছেন এগিয়ে। গবেষণার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে 'ক্যান্সাল ইনস্টিটিউট অফ ইনডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি' নামক প্রতিষ্ঠানের উপর। গবেষণার ব্যয় নির্বাহের জ্ঞান শিল্প ও বিজ্ঞান-গবেষণা পরিষদের কাছে তাঁরা আগামী তিন বছরের জ্ঞান, বছরে লক্ষাধিক টাকা সাহায্য পাবেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন আবহাওয়ার মানুষ নিজেকে কাজের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে এবং নতুন পদ্ধতি ও চিন্তাধারা গ্রহণ করতে পারে, তা নির্ণয়কল্পেই প্রধানতঃ এই গবেষণা পরিচালিত করা হবে।

কিঞ্জার কোম্পানী আবিষ্কার করেছেন 'সিগমামাইসিন'; ওয়াশিংটনে সম্প্রতি অ্যাণ্টিবায়োটিকের উপর যে আন্তর্জাতিক

আলোচনাচক্র বসেছিল, তাতে এই ঔষধটি অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছে। টেট্রাসাইক্লিন এবং ওলিমানডোমাইসিন নামক দু'টি অ্যাণ্টিবায়োটিকের সমন্বয়ে প্রস্তুত সিগমামাইসিন চিকিৎসা-জগতে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে। আপনারা জানেন, বেশী অ্যাণ্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হলে মানবদেহে অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতার উদ্ভব হয়। ফলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও এই ঔষধে সফল পাওয়া যায় না। আবার কোন কোন প্রাণিদেহে অ্যাণ্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ সঞ্চারিত করে দেওয়া যায়,—একে এক রকম অ্যালার্জিক বলা যেতে পারে। সিগমামাইসিন দেহের অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অ্যাণ্টিবায়োটিক তীব্র নিষাদময় করতে সক্ষম, তাই চিকিৎসা-জগতে এই ঔষধের আবিষ্কারের গুরুত্ব খুবই বেশী।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, কোন রোগে, বিশেষ কোন ঔষধ একা নিষাদময় হতে না পারলেও অনেক সময়ই অপর ক্ষমতা কোন ঔষধের সহিত একযোগে ব্যবহার করায় খুবই সফল দেয়। অ্যাণ্টিবায়োটিক ঔষধের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ সিগমুণ্ড উইনটন, নব্যবিজ্ঞান সিগমামাইসিনের কার্যকারিতার প্রাথমিক করে বলেন যে, চিকিৎসাক্ষেত্রে শতকরা ১৬ ভাগ রোগীই অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতার হাত থেকে এই ঔষধ ব্যবহার করে আরোগ্য লাভ করতে পারে। তিনি আরও জানান যে, কয়েকটি সাংঘাতিক যৌন রোগ এবং নিরক্ষীয় অঙ্গুলের রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সিগমামাইসিন অত্যন্ত সফল দেয়। ফ্লোরিডার চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ১৮১ জন রোগীর উপর এই ঔষধ প্রয়োগ করেছিলেন; তাঁর মতে এই ঔষধের ব্যবহার অত্যন্ত নিরাপদ, সফলেই এই ঔষধ প্রয়োগ সহ্য করতে পারে এবং অনেক ঔষধালোকজ্ঞান জাতীয় জীবাণুর আক্রমণে যেখানে অত্যন্ত ঔষধ কার্যকরী হয় না, সেখানেও এ ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রসূ। অগাধ চিকিৎসকদের বিবৃতি থেকে জানা যায়, দেহমধ্যস্থ বহুপ্রকার রোগ, ক্ষত প্রভৃতিতে এই মিশ্র ঔষধ বিশেষ সফলপ্রায়ক।

আবিষ্কার হলেন কিঞ্জার কোম্পানীর বিজ্ঞানীরা, তাঁরা কি দাবী করছেন শুধু। তাঁদের মতে 'সিগমামাইসিন' এর জীবাণুনাশক এবং রোগনিবারণকারী ক্ষমতার পরিধি সবচেয়ে বেশী। যে সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা নানা প্রকার অ্যাণ্টিবায়োটিকস ব্যবহার করেন, সেখানে নিরাপদে এই ঔষধ ব্যবহার করা চলেবে। যে-সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ পেনিসিলিন ব্যবহার করেন, সেই সব রোগীর উপরেও সিগমামাইসিন ব্যবহার করা যাবে।

সম্প্রতি অস্থিতি ওয়াশিংটনের অ্যাণ্টিবায়োটিক বিষয়ের আলোচনাচক্রে সিগমামাইসিনের পরে আর একটি ঔষধ বিষয়েও চিকিৎসকেরা যথেষ্ট মনোযোগ দেন। এই অ্যাণ্টিবায়োটিকটির নাম রিসট্রিসিটিন,—এই ঔষধটি বিভিন্ন জীবাণুর বৃদ্ধি মন্দীভূত করে দিতে পারে। অর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভারসিটি স্কুলের বিজ্ঞানী ডাঃ বোমানস্কি এবং কলম্বিয়া জেনারেল হাসপাতালের ডাঃ লিমসন এই নতুন ঔষধটি ১৬ জন নিউমোনিয়া, ব্রুসেলিটিস ইত্যাদি রোগীর উপর পরীক্ষা করেছেন। আলোচনাচক্রে উপস্থিত বিজ্ঞানীরা এই

বিজ্ঞানীভাষ্যের পরীক্ষামূলক চিকিৎসার ফলাফল বিচার বিবেচনায় করেন।

পি এ ১৩২ নামক আর একটি নবাবিকৃত আণ্টিবায়োটিকের বিষয়েও বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেন। অনেকের মতেই উক্তির প্যাথোজেনিক ফলাফল রোগ সমূহ পি এ ১৩২ খুবই কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে। মানবদেহের পক্ষে উত্তেজক হওয়ার জ্ঞান মনে হয় যাহায্যের বোগচিকিৎসায় এই বস্তুট ব্যবহার করা যাবে না! আমেরিকান সায়েন্সায়ড কোম্পানীর ১২ জন বিজ্ঞানী এক সঙ্গে ত্রাবতবর্ষের মাত্রা থেকে প্রাপ্ত আর একটি নতুন আণ্টিবায়োটিকের কথা ঘোষণা করেন। এই নতুন আণ্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধটির নাম 'নিউক্লিওসিডিন'। বিজ্ঞানীরা জানান যে, এই ঔষধটি গ্রাম গণ্ডেটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ এই উভয় প্রকার জীবাণু বিকশেই কার্যকরী। তাঁরা মনে করেন, বন্ধারোগের চিকিৎসায় নতুন আণ্টিবায়োটিক নিউক্লিওসিডিন বিশেষ কার্যকরী হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, হিস্টো'সিটিনেরও গ্রাম গণ্ডেটিভ জীবাণু এবং বন্ধার জীবাণু বিনাশের অসাধারণ ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করা গছে।

### অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন

বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীর জীবনকহিনী আজ আলোচনা যাবে, মাত্র ২ বছর আগ ১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল ই বিববিধাত বিজ্ঞানী ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

আলবার্ট আইনষ্টাইন ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ জার্মানিতে উলম অঞ্চলে একটি ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দুঃসময়ে প্রথম দিকে শিক্ষক মহাপন্থদের কাছে পড়াশোনা করে পরিচিত হলেও অল্প বয়সেই তিনি কঠিন ক্যালকুলাস অ্যানালিটিচ্যাল জিওমেট্রি শেষ করে ফেলেছিলেন। প্রবর্তী জীবনের শিক্ষা স্টুইজারল্যান্ডে পাবার পর অবশেষে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ ফিলজফি উপাধি লাভ করেন। প্রথম কর্মজীবন তাঁর আরম্ভ হয় পেটেন্ট অফিসে। এই সময়েই তিনি তাঁর জগদ্বিখ্যাত আপেক্ষিকতা উপর গবেষণা শুরু করেন এবং চাকরী করতে ঢোকা মাত্র ৬ বছর পরেই ১৯০৫ সালে এই তত্ত্বের উপর তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই একটি মাত্র গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশের পর সঙ্গেই বিজ্ঞানী হিসাবে আইনষ্টাইনের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার, আপেক্ষিকতত্ত্বের সাধারণতাবাদের উপর বিজ্ঞানী মহলে আলোচনা ও সমালোচনার স্রোত কনা। এই সময় আইনষ্টাইন নিজেই বলেছিলেন,—“আমার মতবাদ যদি সঠিক প্রমাণিত হয়, তাহলে জার্মানি আমাকে ধর্মগীর এক মহামানব বলে এবং ফরাসীরা বলে আমি সমগ্র ধর্ম নাগরিক, কিন্তু যদি ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে জার্মানি আমাকে ইহুদী এবং ফরাসীরা বলে আমি জার্মানি।”

বাই হোক, অবিলম্বেই বিশ্ব বিজ্ঞানী মহলে বিজ্ঞানচর্চা পর্বাট আইনষ্টাইন তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি পেলেন, বিজ্ঞানের

পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্ত ১৯২১ সালে পদার্থবিজ্ঞান তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাঁর আপেক্ষিকতত্ত্ব। এর মাধ্যমে তিনি পদার্থের পরিমাপ, আকর্ষণ, স্থান এবং কালের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই বিখ্যাততত্ত্বের সর্বক্ষেত্রেই যে স্থান ও কালের বিরাট প্রভাব আছে, একথা তিনিই ঘোষণা করেন। আইনষ্টাইনই জানান যে, পদার্থের সঙ্গে শক্তির কোন প্রভেদ নেই,—পদার্থ হলো জমাটবাঁধা শক্তি। মাত্র আধ পাউণ্ড পদার্থকে যদি শক্তিতে রূপ করা যায়, তাহলে তার পরিমাণ ৭০ লক্ষ টন টি, এন, টি এর বিস্ফোরণের সমান হবে। বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন জানান, আলোর যে বেগ তাহলে পদার্থগত পরিমাপ আছে এবং আলোকও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আকর্ষণ করে। শেষ বয়সে বিজ্ঞানচর্চা আর একটি যুগান্তকারী মতবাদ প্রচারে মনোনিবেশ করেছিলেন,—এর নাম “দি ইউনিফায়ড থিওরি।” এই মতবাদের মাধ্যমে বিজ্ঞানী দেখতে চাইছিলেন তারা, গ্রহ, বিদ্যুৎ, আলো ইত্যাদি বিখ্যাততত্ত্বের সবকিছুই একটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলে। তাঁর এই সমস্ত গবেষণাই পরিচালিত হয়েছিল মজ্জিকরণ গবেষণাগারে—সম্বল ছিল মাত্র কাগজ আর পেন্সিল। কাগজ-পেন্সিলের মাধ্যমে যে সব তথ্য বিজ্ঞানচর্চা বহুদিন আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন,—আজকের দিনে গবেষণাগারে তা পরীক্ষিত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সর্বকালের স্রোতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে পরিগণিত হলেও ১৯৩৩ সালে ইহুদী বিতাড়নের সময় বিজ্ঞানচর্চা আইনষ্টাইনকে জার্মানী পরিত্যাগ করতে হয়। সামান্য অর্থ সম্বল করে তিনি ফ্রান্স ও বেলজিয়াম হয়ে ইংলণ্ডে আসেন এবং এখান থেকেই আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার আশ্রয় পান। ১৯৩৩ সালে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন এবং প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে “ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডী”র আজীবন অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে বিজ্ঞানচর্চা আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমেরিকার প্রিন্সটনেই বসবাস করেছিলেন।

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন ছিলেন আপনভোলা স্ববিরল মানুষ। কোন কিছুতেই খেয়াল নেই,—মানের সাবান দিয়ে লাড়ি কামাঠেন আর বেণ্টের অভাবে কোমরে বাঁধা থাকতো একটা চোঁড়া টাই। অত্যন্ত সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন তিনি যাপন করতেন। ১৯০১ সালে তিনি সিলভা মরিক নামক এক জন বিজ্ঞান-কর্মীকে বিবাহ করেন, ১৯১৬ সালে তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। ১৯১৭ সালেই তিনি তাঁর সম্পর্কে বোন এলসা আইনষ্টাইনকে বিবাহ করেন। এলসা মারা যান ১৯৩৬ সালে। বিজ্ঞানচর্চার দুটি পুত্র, একজন আলবার্ট জুনিয়র এবং অপর জন এডওয়ার্ড। উভয়েই তাঁর প্রথম ছাত্র গর্ভজাত সন্তান।

বিজ্ঞানচর্চা আইনষ্টাইন যুগান্তকারী মহামানব। বর্তমান বিজ্ঞানকালে তিনিই পরিচালিত করতেন; তাই একে বলা হয় আইনষ্টাইনের যুগ। সর্বকালের বিজ্ঞানীদের মধ্যে নিউটন আর আইনষ্টাইনকে শ্রেষ্ঠতম বলা হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে পৃথিবী সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠতম অসাধারণ সন্তানকে হারিয়েছে।

# শ্রীমতী আর্ভের এর দিনপঞ্জী

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

তরু দত্ত

লুই পই-পই করে বারণ করল নিজে নিজে এসব যেন না করি; কিন্তু আমার নিরঙ্কর সন্তব নয় দেখে নিজেই ও লেগে গেল আমার সঙ্গে। বাবা-মা আসছেন বলে তাকেও বড় উৎসুক লাগল।

ম'সিয়া ভিয়ার এসেছিল; তাকে জানালাম যে সন্তাহাখানের মতোই মা-বাবা আসছেন।

“এমন মেয়ের মাকে দেখে খত্ব হবে মাদাম! না-জানি কত মহৎ ঐর চরিত্র।” ও বলল।

“বা: ভিয়ার, নারী মহলে তুই কথার খই কোটাতে ওস্তাদ দেখছি।” লুই ঠাটা করল।

“উহ! কথার কথা নয় লুই, আমার মনের কথাই বলছি ভাই, এটুকু মিথ্যা নয়।”

সকলে খাওয়ার পর নিম্ন মত বেড়াতে গেলাম জাকো-গিগিরি ওখানে। আঙ্গি বড় ভক্তমহিলার বয়স; দেখা-শোনার কেউ নেই। আমার উনি বড় স্নেহ করেন আর আমি যেতেই আত্মবিশ্বাস জ্ঞান।

“পূণ্যবতী, ভগবান তোর মঙ্গল করুন।” নানা কথাবার্তা হয় ঐর সঙ্গে। প্রাইই ওর ভক্তে ভাল কল, কিংবা ভাল মদ, নয়ত পেয়ালা খানেক স্থপ নিয়ে বাই। উনি একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। আঙ্গি ওর ওখানে বধন, বাড়ি, লুই আর ভিয়ারের সঙ্গে দেখা। লুই হেসে প্রায় করল।

“কাদের বাড়ীর বউ গো? একা সাত সকালে বাও কোথায়?”

“আমি জাকো-গিগিরি ওখানে বাড়ি লুই।”

“আমিও যাব, চল ভিয়ার।” বুড়ীর বাড়ীতে তিন জনেই গিয়ে হাজির হলাম। দু'জন ভক্তলোককে বাড়ীতে আগতে দেখে ভক্তমহিলা দক্ষিণ বিব্রত হয়ে পড়লেন। আমি তখন ‘জানালাম যে আমার বামী ও তাঁর বন্ধু এসেছেন, উনি লুইয়ের হাত ধরলেন।

“তাই বলি বাছা! তুমিই আমার বউমার শোয়ামী? অসহায় এই বিধবাকে ও যেভাবে সেবা করছে, ভগবান ‘সেবিত্ত’ তাকে পুরস্কৃত করবেন, এই বিশ্বাস আমার অন্তরে বদ্ধবুল।” সন্তোহে উনি লুইকে বললেন, “স্নেহ বিভাগে কাজ কর? বেশ। আমার জোসেফও ওখানেই কাজ করত; বেচারী। আমার একমাত্র ছেলে! ক্রিমিয়া থেকে আর ফিরল না। এই ওর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন আমার ঘর আলো করে আছে।” উনি ইশারার দেখালেন দেওয়ালে ঝুলনো একটা মিলিটারী পোষাক।

“ওর সাহস ছিল অসাধারণ।—ওর দেহ থেকে কি পাওয়া গিয়েছিল জানি? মারী বোলন-এর দেওয়া একটা লকেট আর আমার একটা চিঠি।” বুড়ী চোখ মুছলেন।

ও এখন মাদাম তুদ্যা বুঝলে,—মারীর কথা বলছি। ক মাসেনার ধনী হোটেলওয়ালকে ও বিয়ে করল। জোসেফ, যে ঐ ভালই বাসত তাকে। যুদ্ধের শেষেই ওদের বিয়ে হবে ঠিক ছিল। মারী মেয়ে বড় ভাল; মাঝে মাঝে এখনো আমার দেখা-শোনা করে। ওর স্বামীকে ধরে ও আমার এই বাড়ীটা কিনে দিচ্ছে। ধরে ওর ছুটি সন্তান; আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ জননী। বেচারী জোসেফ!” বহুক্ষণ এ জাতীয় গল্প চললো। আমরা চলে যখন আগছি, উনি লুইয়ের হাত ধরে বললেন, “আচ্ছা বাবা, ভগবান নাকি বিধবাদের প্রার্থনা শুনতে পান? তা যদি সত্যি হয়, যে ক’টা দিন বেঁচে আছি আমি তোমার আর আমার বউমার মঙ্গল কামনায় রোজ তাকে স্মরণ করব।”

এই নভেম্বর।—মা আর বাবা এসেছেন। লুই আর আমি দরজায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। পাচটা নাগাদ একটা ফিটন এসে থাকল; আমরা দৌড়ে গেলাম। বাবাই প্রথমে আমাদের দেখতে পেলেন।

“এই যে মার্গারিৎ, উনি চোঁচিয়ে উঠলেন, “বেশ দেখতে লাগছে ত তোকে।”

মা তাড়াতাড়ি নেমে এসে আমাকে আর লুইকে বুকে চেঁচ ধরলেন। আনন্দে দুই চোখে তাঁর অবিরল ধারাতে জল কয়ে লাগল। বাবা যে কত বার আমার চুমা খেলেন!

“বাবা, কত কাল বাবে যে তোমাদের দেখছি!”

“এখানে ভাল লাগছে ত মার্গারিৎ?”

“হ্যাঁ বাবা, খুব ভাল জায়গা।”

এই সব আলোচনার মধ্যে লুই এসে জুটল; “কি বড়ো বড়ো তুমি?” হেসে ও প্রায় করল।

“বাবাকে বলছিলাম যে জায়গাটা বড় চমৎকার।”

ও চুপ করে থাকলেও ওর মুখের চোখ দু’টি জ্বলজ্বল করছিল।

“চল, ভেতরে যাওয়া থাক,” ও ডাকল, বেশ ঠাণ্ডা লাগছে মার্গারিৎ, আর বাইরে থাক। উচিত হবে না।”

মাকে ওর ঘরে নিয়ে গেলাম; সোফায় বসে আমার মুঁ উনি দুই হাতে চেঁচ ধরলেন। মনে পড়ল, এভাবে একদিন আদর করতেন প্রুয়ার ভেদের কীতেন। দু’কোঁটা জল নেমে এল আমার চোখ দিয়ে; অশ্রুশোচনা? না, মোটেই না, কাঁধে মুখে আমার হাসি ছিল। মা আমার শিশুস্বপ্ন করলেন।

“মার্গো, শুক বুই এখন ভালবাসি ত?”

“হ্যাঁ মা।”

“জগতে সবার চেয়ে বেশী?”

“হ্যাঁ মা।”

মা হাসলেন; চেয়ে রইলেন আমার দিকে। "চল মার্গো, ভগবানকে আজ বস্ত্রদান জানাই তাঁর অসীম করুণার জন্য।"

"হ্যাঁ মা, চল।"

বিশ্ব-তারকের চরণ-তলে নতজাহ্ন হয়ে বসলাম আমরা।—তারপর যখন বৈঠকখানায় গেলাম, দেখলাম লুই একা বসে আছে আগুনের ধারে (আজকাল বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে); পেছন থেকে গিয়ে ওর পিঠে হাত রাখতেই ও চমকে উঠল; আমার দিকে তাকাল; ওর কটা চুল আর প্রশস্ত রূপাল আগুনের সামনে চক্‌চক করছিল; দুই চোখে ওর মুখের আমেজ। ওকে বৃকে ধরে জানতে চাইলাম, "একা বসে যে? বাবা কই?"

"ওপরে, ওঁর ঘরে আছেন।"

উঠে পাড়িয়ে ও আমার ওর শুল্ক স্থানে বসিয়ে দিয়ে বলল, "আগুনের ধারে একটু জিরিয়ে নাও গো; বেশ স্নান হয়ে পড়েছ!" আমার পাশেই ও বসল। আমরা কতক্ষণ যে ওভাবে কাটলাম জানি না, হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল; মিস্সা ভিয়ার ঢুকল। তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হয়ে তাড়াহাড়ি চলে বাচ্ছিল।

"খায় রে!" লুই হেসে ডাকল ওকে; তারপর যেমন ভাবে বসেছিল, সেট ভাবেই ও ভিয়ারকে হাত ধরে বসাল আমাদের কাছে।

ভিয়ার বলল যে, বাবা এসেছেন তখন ও এসেছে তাঁর সাথে আলাপ করতে।

"কিন্তু লক্ষ্য, তোর কি শরীর খারাপ নাকি?"

"আমার? কোন চুখে? একটু আরাম করছি রে। জানলি, যখন ওর কোলে মাথা রেখে শুই আর ওর হাত চুষে ভেসে চল আমার ওপর দিয়ে, তখন আমি বাস্তবিক জিরিয়ে কেলি যেন।"

এমন সময় বাবা এলেন। লুই চটপট উঠে ওঁকে একটা কেদারা এগিয়ে দিল। ওঁর সঙ্গে ভিয়ারের আলাপ করিয়ে দিলাম; মা না আসা অবধি বহু গল্পই হল। তারপর আমরা খেতে গেলাম।

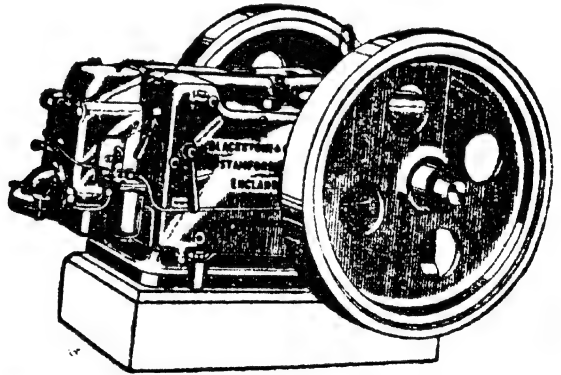
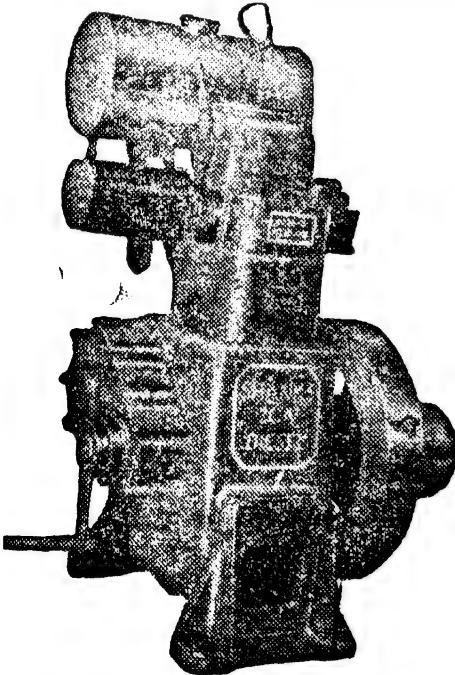
১৮ই নভেম্বর। আগামী পরশা ডিসেম্বর আমরা নীপ থেকে চলে যাব। কিছু দিন পারীতে কাটিয়ে আমরা কিরে বাব আমাদের জীবনের বহু স্মৃতি-বিজড়িত বুটানিতে। আমার ইচ্ছে, আমাদের সন্তান ওখানেই ডুর্মিষ্ট হোক, লুইও তাই চায়। বৈঠকখানায় চিম্নীয় পাশে মা আর আমি এক দিন সন্ধ্যাবেলা বসেছিলাম। লুই আর বাবা বেরিয়েছেন। বুটানির গল্প হচ্ছিল। কীতস কেমন আছেন, আমি জানতে চাইলাম।

"মাথার অবস্থা খুবই খারাপ।" মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"ওর ভাই ওখানেই আছেন?"

"হ্যাঁ মিলিটারীর কাছ ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বোনের লেখাপোনা করছেন তিনি।"

নানা স্মৃতি একের পর এক কিরে আসছিল। হঠাৎ মা আমার প্রশ্ন করলেন, "মাগরিব, তুই এবার মা হচ্ছিস, তাই না?"—আমিও



অর চাই, প্রাণ চাই, কুটার শিল্প ও কৃষিকাৰ্য্য দেশের অর ও প্রাণ এক আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিন, লিষ্টার, ব্রাকস্টোন ডিজেল ইঞ্জিন, লিষ্টার পাম্পিং সেট, স্তান্ডার্ড ডিজেল ইঞ্জিন স্তান্ডার্ড পাম্পিং সেট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এজেন্টস :-

এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১৩৮ মং ক্যানিং ষ্ট্রিট, হিডল কলিকাতা-১

ফোন ১-২২-৫২৭৫

বিঃদ্রঃ—ইউ ইঞ্জিন, বরলার, ইলেক্ট্রিক মোটর, ভারনামো, পাম্প ট্রাক্টর ও কলকারখানার বাষ্পীয় সরঞ্জাম বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে।

ওর মত আড়ষ্ট গলায় উত্তর দিলাম, “হ্যাঁ মা!”—নীরব আশীর্বাদে উনি আমার বুক টেনে নিয়ে জানতে চাইলেন, “কত মাস হল রে?”

“জানি না ত!”—তুনে মা হাসলেন।

“ওর প্রয়োজনীয় যা কিছু সব তৈরী রেখেছিস?”

আমি মাকে নিয়ে গেলাম আমাদের ঘরে। একে একে দেখলাম লুই আর আমি যা যা কিনেছিলাম ভারী পুত্রের জন্ত। মা ডম্বার খুলে বলে উঠলেন, “এই ছোট বুট-জোড়া কি কাজে লাগবে রে? এই ভেলভেটের খুদে মিলিটারী টুপি, মিলিটারী পোখাক? এসব কি করেছিস মার্গারিৎ? হুঁ, এটা বরং দরকার লাগবে,” বলে এক প্যাকেট লিনেন বার করলেন, “কিন্তু এত অল্প কি হবে? বেশ আমিই ওর কাঁধা-কোলেটের বস্ত্রোবস্ত্র করব, তুই ভাবিস না।”

“হ্যাঁ মা,” আমি হাসলাম, “সেই ভাল, আমি ত এসবের কিছুই জানি না।”—এমন সময় নীচে বাবার আর লুইয়ের গলা শোনা গেল। সিঁড়িতে লুইয়ের সঙ্গে দেখা। মা ওর সঙ্গে করমর্দন করে নেমে গেলেন। লুই আমার দিকে ফিরে জানতে চাইল, “কি বাপার গো?”

“উনি জানতে পেরেছেন যে আমাদের ঘরে নতুন অতিথি আসছে। কি করে জানলেন বল ত?”

“এতে আর অবাক হবার কি আছে?” ও হাসল।

“ওহো তুমিই বুঝি বলছে?”

“না গো!” বলে ও আমার নিয়ে গেল আমাদের ঘরের মধ্যে।

“লুই, মা বলছিলেন ফেরারী নাগাদ ও জন্মাবে, সত্যি?”

“হ্যাঁ গো, সবই ভগবানের মজি।”

“কিন্তু লুই—” একটু থেমে আমি বললাম।

“ওসময় কিন্তু আমি বুটানিতে থাকতে চাই।”

জানি না আমার গলা কীপে উঠল কি না, কারণ জাসম্যার সেই করুণ গানটা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। চট করে লুই মুখ তুলেই আমার জড়িয়ে ধরল।

“এতে আর বলার কি আছে গো? তোমার মার চেয়ে ত এ সময়ে আর কেউ ভাল ভাবে তোমার শুশ্রূষা করতে পারবে না।”

বাবার কানেও মা কথাটা তুলেছেন বুঝলাম; বাবার সময় তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, “ভগবান তোদের রক্ষা করুন মা, তাকে, লুইকে, তোদের ভারী সন্তানকে।”

খানিক বাসে লুই এল। বড় আনন্দে কেটে গেল সন্ধ্যাটা।

২০শে নভেম্বর।—আজ আমার সবাই ম’সিয় ভিয়ারের ঠিকিও দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের সেই ছবিটা ও দেখাল; এখনো শেষ হয়নি; তবু অতি অপূর্ণ লাগল। আমি এক কোণে বসে আছি লুইয়ের দিকে মুখ নামিয়ে, আর ও শুয়ে আছে ঘাসের ওপর, আমার কোলে মাথা রেখে। এক হাতে ও ধরে আছে আমার বুকের লকেটটা; ওর মুখে মুহূর্ত হাসি; আমার মুখ বেন একটু গভীর, তবু আশার মাথুরে ময়। ছবিটার নাম দিয়েছে: ‘প্রেমের স্বপ্ন’।—বাবার অত্যন্ত ভাল লাগল, মার ত কথাই নেই। লুইয়ের বড় শঙ্কল হয়েছে ছবিটা, আমরাও। কাল সকালে ম’সিয় ভিয়ার পারী চলে বাচ্ছে। আজ আমাদের এখানেই ও খেল; বিদায় নিয়ে গেল।

২০শে নভেম্বর।—লুই আর আমি জাকো-গিরিকে বিদায় জানিয়ে এলাম। আমরা দেশে যাচ্ছি শুনে বড়ই হুংরিত হলেন উনি। ওর ঘরে ঢুকে দেখি, একহারী চেহারার এক ভদ্রমহিলা বসে; আমাদের অভিযান জানিয়ে উনি দুটো চেয়ার এগিয়ে দিলেন। ইনিই মাদাম তুত্‌র্জ, বনাম মারী বোলেন।

“মা, তুই কাল চলে যাবি?” অতি কাতর স্বরে বললেন জাকো-গিদি। “তোরা সুখী হ, এই প্রার্থনাই ম্যার জাকো তোদের জন্যে দিন-রাত করবে রে।”

ওর কাছ থেকে আগার সময় চুপি চুপি দুটো গিনি নিয়ে এলাম ওর হাতে। মারী বোলেন আমাদের পৌছে দিলেন দরজা অবধি।

১০ই ডিসেম্বর, ১৮৬১। এখনো আমরা পারীতেই আছি, তবে পরত দিন দেশে যাব। এক নাগাড়ে বেশী রাস্তা যাই, লুই তা চায় না, পাছে আমার কষ্ট হয়। সর্বদা ওর সতর্ক দৃষ্টি—তিনি আমার ভাল হয়। কাল ঠাকুমা আমাদের এখানে এসেছিলেন। প্রতিদিন বিকেলেই উনি আসেন, গাড়ীতে চড়ে বেড়াতে যান আমাদের সঙ্গে; যোজ সকালে আমি যাই ওর ওখানে। আমরা উনি বড় ভালবাসেন। কাল আমাদের সঙ্গে মা যেতে না পারায় উনি, লুই, আমি তিন জনই শুধু বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাবা গিয়েছিলেন ওর বন্ধুর বাড়ী। বুলোজি বাগানে ঠাকুমা আমাদের হৃজনকে গাড়ী থেকে নামতে বললেন। ঘটানাকৈ ওখানে হাঁটার পর লুই আমার গাড়ীতে উঠতে ইচ্ছিত করল।

“কি গো, রাস্তা লাগছে না ত?” উৎকণ্ঠিত ভাবে ও জিজ্ঞাসা করল।

“কি যে বলিস,” ঠাকুমা ঠাটা করলেন, “আমি থুপুয়ে বড়ী, দিব্যি তাক্সা আছি, আর ও কি না রাস্তা হয়ে পড়বে?”

“কিন্তু এ অবস্থায় ওর বেশী হাঁটাখাটি করা ভাল নয়,” ওর পেছন পেছন গাড়ীতে ঢুকে লুই বলল। ঠাকুমা কয়েক মিনিট কি ভাবলেন, তার পর আমার দিকে তাকালেন, “ওহো, এতক্ষণে তীচ করছি। তাই নাকি রে?”

আমি লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলাম।

“এই ত তোঁর গাল দুটো কেমন টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছে বাছা, আমার বাহাতরনে না পেলেকি এত দেরী লাগত বুঝতে!” বলে উনি আদর করলেন।

“ভাবতেও যেমন লাগে যে তুই আজ মা হতে চললি, আর আমি, আমি এখনো আইবুড় রয়ে গেলাম! বলি খুদে শরতানটা আসছে কেবে?”

“বোধ হয় ফেব্রুয়ারী মাসে, ঠাকুমা।”

“আর ত মোটে ক’দিন!” উনি উল্লাসে অনীর হয়ে উঠলেন, “তাই বলি তোঁর এমন চেহারা হয়েছে কেন; যোল বছরে যিরে হওয়ার এই এক বায়েলা বাপু; সন্তোষোতে পা দিতে না দিতে কোলে একটা ট্যা ট্যা করবে। কিন্তু তুই আমার প্রণাম করি না ত?”

ওর বাসনা পূর্ণ করলাম।

“অগাধ সম্পত্তির মালিক হবে যে তোঁর ছেলটা; দেখিস, আগের মাখাটা খাস না বেন।”

বাড়ী না বাওয়া অবধি এই কথাই হচ্ছিল।

৩০শে ডিসেম্বর। বুটানি। দেশে ফিরে যে কী ভাল লাগছে! যে দিন পৌঁছলাম, বরফ পড়ছিল। একটা প্রকাণ্ড সালা চার বুড়ি দিয়ে প্রকৃতি উপভোগ করছিলেন ষোণ্ডার বজ্র-আনন্দ; চার দিক বলমল করছিল। ভাল পশমী কাপড় লুই আমার সারা গা সবচেয়ে ঢেকে দিল; বাবা বললেন টুপিটা মুখ অবধি টেনে আনতে। আমাদের গাড়ী অপেক্ষা করছিল; উঠে বসতেই যো: ছুটো টকাটক টকাটক করে দৌড় দিল। তেবের বাড়ী পাঠার দিচ্ছিল। আমাদের প্রতীক্ষায় ছিল। আমার দেখে কি ওর আদরের ঘটা, "এই ত দিদি, ফিরে এলি ঘরের মেয়ে ঘরে।"

লুই ওকে অভিবাধন জানাল; আমরা খাবার ঘরে গিয়ে চুকলাম; ওখানে শুকনো আঙুরলতাব গনগনে আঙুর সারস আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। তেবের আমার গরম জামা, জুতো ধুলে দিল; ওগুলো ছুঁবার ভরে গিয়েছিল। মা ওর ঘরে গেলেন। এত দিন বাদে সবাই বাড়ীতে সজ্জ হয়েছি, ঠাঁর মুখে হাসি ঘরে না। লুই আর বাবা গেলেন পোষাক বদলাতে। আমার শুকনো জামাকাপড় ধুয়ে তেবের আমার পা চিমনির ধারে তুলে দিল। ওকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম; ও বাগা দিল।

"তুই এসেছিস থুফুদি, আজ আমার বড় আনন্দের দিন, দেখছিল না, তোর জন্তে ভেবে ভেবে আমি কত বুড়ো হয়ে গেছি? কিন্তু তাকে দেখে এখন মনে হচ্ছে দশ বছর আমার কমে গেছে

একদিনে; থুদে ম'সিয়া যে আসছেন, তাঁর উপযুক্ত দাই হবার মত শক্তি এখনো রাখি। তোমার আমি দাই ছিলাম না? তোর মায়ের? আর এবার তোর ছেলের দাই হব।"

ওর কথাগুলো শুনে শুনে গারে কাঁটা দিয়ে উঠছিল ভাবের অমুভূতিতে। আমাদের ছেলে। আমার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চিন্তা আল ওকে ঘিরে; লুইয়েরও সেই দশা। মা ওর জন্তে কাঁধা-কোলট তৈরী করছেন। লুই নীসু গিয়েছে; সপ্তাহ খানেক ওখানে থাকতে হবে। অন্তত: দুই মাসের ছুটি নিয়ে ফিরবে। বড় স্তম্ভর ভাবে খ্রীষ্টমাস কাটল। সকাল আটটার পূর্বাতে গিয়েছিলাম। সারা গ্রাম ওখানে ভেঙ্গে পড়েছিল। সবাই আমার সঙ্গে করমর্দন করলে, সবাই গারে পড়ে দু-দশটা ভাল কথা শোনাল। কৃষ্ণজতার নত স্বপ্নের আমি বসলাম গিরে বেদীর সামনে। দেলনায় পোয়ান নবজাত বস্তুকে প্রণাম করলাম। ভারতে লাগলাম, আমার সম্বানের কথা। মা, মেবী, আমার পথ দেখাও, আমার বল দাও, প্রাণে আমার শক্তি দাও, আমি যেন আদর্শ জননী হতে পারি। লুই ছিল আমার পাশে; ওর ভাবনা আর আমার ভাবনা একই বাতে বয়ে চলেছিল।

ম'সিয়া ভালপোয়ান আর তাঁর জী ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। রূপ পুরুষলভ পাড়ীর্থে আমার সঙ্গে করমর্দন করল। হলেন আমার দেখে লজ্জার কথাই বলছিল না; ওর মায়ের আড়ালে আড়ালে দ্রুছিল; শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওর আগের



সুনিপুণ  
স্বর্ণশিল্পী  
ও  
মনিকার  
.....  
**গিনি  
ম্যানসন**  
.....

জুয়েলার্স

প্রধান কার্যালয় :-

২২৬, রাসবিহারী এডেনিউ, কলিঃ-১৯

গ্রাম—"গিনিম্যান" • ফোন—৪৬-১৪৭২

শাখাসমূহঃ

বহুবাবু বাজার, ভবানীপুর

১নং হিন্দুস্থান হাট, বালীগঞ্জ, ফোন : ৪৬-১৪২৫

বাচালতা বন্ধেতে দেখি হল না। ছোট গিরেরের দিকে হাত বাড়তেই হুম করে ও চলে এস।

কাল গিরেহিলাম কঁতসকে দেখতে; সঙ্গে ছিল লুই। ও আমাদের বার্ষিক করে দিল, বেন অর্ধেক নিজেই দুর্বল না করে ফেলি। এক গিরে ওর ঘরে ঢুকলাম। ছানোরার পুরনো চাকর হস্তমস্ত হয়ে ছুটে এস।

"মামজেল আর্ভের।"—ও আমার বৈঠকখানার নিয়ে গেল। কঁতস একটা সোকার শুয়েছিলেন। চিসনীর খাং বসেছিলেন কর্ণেল। উনি কাগজ পড়ছিলেন; আমার প্রথমে দেখতেই পান নি। কিন্তু আমার দেখে কঁতস বড়মড় করে ওঠাতে উনি ফিরে তাকালেন।

"ছানোরা যেখানে আছে, সেই দেশ থেকে ও ফিরেছে; বল মা, ছানোরার খবর কি?" কঁতস ধরে বসলেন; হেসে আমার হাত ছুঁতে ধরলেন। আমার বুক কেটে বাচ্ছে না।—আচ্ছা, ওকি ওর ভাইকে খুন করেনি?" ফিস্ ফিস্ করে আমার উনি প্রশ্ন করলেন। কর্ণেল ওকে সোকার শুইয়ে দিলেন। উনি হাসলেন। ওর কথামত তরে বইলেন। চুপি চুপি কর্ণেল আমার জানালেন যে বিন দিন অবস্থা খাশাশের দিকেই বাচ্ছে।

"এই ক'দিন আগে ত দেখে গিরেহিস ওকে; আর এখন দেখ, কি যোগা আর বুড়ী হয়ে গেছে এর মধ্যে।" কর্ণেল বললেন।

"হ্যাঁ, তাই ত দেখছি।" ওকে দেখে আমার চোখে জল এস।

"তুই জানলে আছিস ত মা?" কর্ণেল জিজ্ঞাসা করলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" ওর দিকে চোখ তুলে উত্তর দিলাম।

খানিক কথা-বার্তার পর উঠলাম, কঁতস অভ্যাস মত আলিঙ্গন জানালেন। কর্ণেল পাড়ী অবধি এলেন, লুইয়ের সঙ্গে ক্রমদর্শন করলেন।

"ম'সিয়া, ও তোমার পেয়ে সুখী হয়েছে; ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই সর্বান্তঃকরণে। ওইই সুখী হওয়া সাজে।"

মানমোয়াজেল গোসরেল আমাদের এখানে দেখিন এসেছিল। সঙ্গে ছিলেন আর একটি ভরলোক। ছুটে এসে ও আমার জড়িয়ে ধরল; তার পর সন্ধ্যার পরিচয় দিল, "ইনি হচ্ছেন ম'সিয়া লাকোন্ত, মার্গারিৎ, আবার ভবিষ্যৎ স্বামী; দেখলি ত, তোর মত ঢাকাঢুকি আমার স্বভাব নয়।" বলে সে কি হাসি।

"বুখলি, ব্যাঙার। টাকার কুমার।"

সহাত ম'সিয়া লাকোন্তের দিকে আমি স্বাক্ষরে গোসরেল বলে চলল, উনি আমার হাড়ে হাড়ে চিনেছেন; জানেন, ওকে আমি কত ভালবাসি আর সোনা-শনার প্রতি আমার টান কত। তাই না বিশার?"

হেসে উনি উত্তর দিলেন; "বস্ত ওরওঁস, বলিহারি তোমার প্রথম বৃষ্টি।"

গোসরেল একটু গভীর ভাবে জানতে চাইল, "আচ্ছা মার্গারিৎ, তোর শরীর কি এখনও সারে নি? এলে দেখলাম তুই সোকার শুয়ে আছিস।"

একটু মুখিলে পড়লাম, "না, ভালই ত আছি।"

"ম'সিয়া লাকোন্ত কই? ওর নাম বিরোধি কুঁড় সৈনিক।"

—নীল-এ গিরেহেন।"

"ওহো, ওর রেজিমেন্ট বৃষ্টি এখন ওখানে।"

"হ্যাঁ।"

"মিলিটারীকে বির্য করার অন্তরিতে কত দেখেছিস ত?" বাড়ীতে অতি অল্প সময়ই ওরা কাটাতে পারে; তা ছাড়া যুদ্ধের সময় ত..."

"এখন ত" আর যুদ্ধ নেই কোথাও, আর কোথাও লাগার সম্ভাবনাও ত দেখি না।" আমি উত্তেজিত হয়ে বাধা দিলাম। তার পর গর্বের সুরে বললাম, "সৈনিকের কর্তব্যই ত হল দেশের বিপদে এগিয়ে বাওয়া; সব ধর্মের ওপর তার ধর্ম হচ্ছে স্বদেশ-প্রেম।"

"দেখলে ত বিশার, কি ভাবে স্বামিকে পাখার আড়ালে ঢেকে রেখেছে। কবে ফিরছে ম'সিয়া লাকোন্ত?"

"সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই। আশা করছি দুই-তিন মাস ছুটি নিচ্ছে।"

"ওঃ, সন্ধ্যার পাশে বসে কাটাবার জন্ত? আশা করি বেচারার ছুটি মজুর হোক।"

বাবার আগে গোসরেল ওর বির্যেতে বাবার জন্ত নেমজ্জর করে গেল, "আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারি, বুখলি মার্গারিৎ? আশা চাই-ই।"

"হ্যাঁ, যদি যেতে পারি।"

"তার মানে: যদি স্বামী যেতে দেখ? বেশ, তোর স্বামীর নামেও চিঠি পাঠাব; একটু চেপে ধরলেই রাজী হয়ে যাবে, বুখলি। তোর ঐ গোলাপী ওঠের একটা স্পন্দই ওকে কাত করতে যথেষ্ট।"

৮ই জানুয়ারি, ১৮৩২। নতুন বছর শুরু হয়েছে। লুই ফিরেছে আজ। পকেটে তিন মাসের ছুটির অনুমতি। কত দিন বাদে বেন ওকে দেখলাম। বাবা আমার নড়াচড়া করতে দেন নি; তাই আপন মনে ঝাঁড়িয়েছিলাম বাইরের ঘরের দরজার। বহু প্রথমে লুইকে দেখতে শেলাম,—ঘোড়ার চড়ে আসছে। তবুও করে ও দাঁড়ি বেরে উঠে এস; আমি মুখ ঢাকলাম ওর বুক। বহুক্ষণ ওই ভাবে ছিলাম, এমন সময় বাবা এসে গেলেন।

"বাইশ বছরেই কি কেউ এমন প্রোমে পড়ে?" হেসে উনি বলতে লুই ওর দিকে তাকিয়েই বড় অপ্রস্তুত হল। ওর সঙ্গে ক্রমদর্শন করল; বাবা ওর কপালে একে দিলেন রেহচূষন।

"বা বাবা, তোর ওপর ভারি সন্তুষ্ট হয়েছি; ছুটি মজুর হল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তিন মাসের ছুটি।"

বাবা বাইরে গেলেন; লুই ঢুকল আমাদের ঘরে, ময় জামা-কাপড় বদলাতে; আমি ওকে অঙ্গস্বর্ণ করলাম।

"বুঝলে গো, আমাদের ওপরওরাল কর্ণেল লোকটি বড় ভাল আমার দিকে সবে এসে ও বলল, 'ওর কাছে ছুটি চাইতেই উ কারণ জানতে চাইলেন। পারিবারিক ব্যাপারে ছুটির প্রয়ো পোনামাত্র উনি তদুনি ব্যবস্থা করে দিলেন।"

ওকে মানমোয়াজেল গোসরেলের নিমন্ত্রণের কথা জানাতে হাসল।

"তোমার পক্ষে ত' তখন যাওয়া অসম্ভব: আমাদের সেই অব কাণে তখন যে আমাদের ঘরে বাতি জলবার সময়, না গে বলে আমার আকুল চুমার ভবে দিল।

১১ই জানুয়ারি, ১৮৩২। পূর্ব রাত্রে বড় খারাপ দেখছি। বহুক্ষণ করে উঠে জড়িয়ে বইলাম আমার ব



দিকে। চিৎকারী অস্পষ্ট আলো এসে ওর মুখে পড়েছে। কি প্রাণান্তিতেই ও ঘুমিয়ে আছে। আমার চোখ থেকে দুই কঁোটা জল বয়ে পড়ল; হায় ভগবান! সত্যি কি তবে আমার চলে যেতে হবে এই পৃথিবী থেকে? আমার স্নেহের প্রভাত সব হয়েছে শুক, আর এই মধ্যে তলব আসবে? সম্পূর্ণে স্পর্শ করলাম ওর কপাল, “কি গো, কি বলছ?” বলে ঘুমের ঘোরেই ও আমার বন্দী করল স্নেহাতুর বাহুপাশে। ওর বুকে বুক দিয়ে বহুক্ষণ ভেগে রইলাম। উঃ, একি হৃৎস্পন্দ!

কাল রাত লুটকে স্বপ্নটা বললাম। রাত তখন দশটা হবে; কাপড়-জামা বদলে জানলার কাছে অপেক্ষা করছিলাম লুটের জন্ত। বাইরে সব কিছু নানা ধবধব করছে স্নান জ্যোৎস্নায়। খানিক পরেই লুট এল। আমি উঠে পাঁড়লাম; পরস্পরের সান্নিধ্যে আমরা চেয়ে রইলাম বাইরের দিকে। গাছ থেকে এক এক করে বয়ে পড়ছে শুকনো পাতা, টুপ টুপ করে টোকা দিয়ে বাজছে আমাদের জানলার কাছে, প্রজ্ঞাপতির মত হাডা পাখার কোথার উধাও হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, “লুট, আবার বদন আসবে গাছে গাছে লব্ধের জোয়ার, আমার তখন আর তোমার পাশে পাবে না; আমি তখন শীতল ঘাসের তলার চিরবিশ্রামে থাকবো ময়।”

“ভগবান, এ-বাখা বেন সতে নে হর, ঐতু।” ওর মুখ দিয়ে কথা ক’টি বেরিয়ে এল। দারুণ আবেগে ও আমাদের ঘিরে ধরল সমস্ত অঙ্গ দিয়ে। তার পর আমার গুনিয়ে একটু ঠাট্টার সুরেই বলল, “কি যে সব আজ-বাক্যে চিন্তা তোমার! তোমার স্বাস্থ্য ধারাপ হয়ে গিয়েছিল, ডেলের মা হতে গিয়েছে—এই সব কথা বুঝি রাত-দিন ভাবছ? গেল সন্তোহে আমি এখানে ছিলাম না, সেই অল্পপঙ্খিতর কীকে ছোট মাথাটি একেবারে হৃৎপিঙ্কার আঁতুড়ঘর করে তুলেছ।”

“তুমি হরত ঠিকই বলেছ লুট, কিন্তু কাল রাত্তে বা স্বপ্ন দেখেছি,—জের আমি আকুল হয়ে উঠেছি।”

“আচ্ছা বিপদ, আমাকে ভেঙে তুললে না কেন? এই অবস্থার কখনও মনে ভর পুনে রাখতে হয়?”

“তুমি এমন নিশ্চিন্ত মনে ঘুঝছিলে, ডাকতে মারা হল। আমি তোমার গা ঘেঁষে শুলাম, তুমি আমার টেনে নিলে তোমার বুক, আদর করে কি বেন বললে; তাতেই আমি অনেকটা স্বস্তি পেলাম।”

“আচ্ছা, তোমার স্বপ্নটা শোনাই যাক”, চপল কণ্ঠে ও বলল, “তোমার মত সাহসী মেয়ের মনে ভর বধন চুকেছে, মনে হয় অতি ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছ স্বপ্নের ঘোরে?”

“স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি একা শুয়ে আছি, এমন সময় কে বেন টোকা দিল পাশের জানলার; বুঝ ভেঙে আমি উঠতে পারছি না, এত অবসন্ন লাগল, এমন সময় বেন বাবার গলা শুনলাম, দরজা খুললাম, দেখি কেউ নেই। বাইরের ঘরে গেলাম, তোমার দেখতে পাবো ভেবে। দরজা খুলে চুকে দেখি তুমি পাঁড়িয়ে আছ জানলার ধারে, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে। আমি গেলাম, জড়িয়ে ধরলাম, তোমার, তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না ভেবে যেমন চোখ তুলেছি, দেখি, কই তোমার মুখ! মৃত্যু নিজে পাঁড়িয়ে আছে!—তখন আমার বুঝ ভেঙে গেল।”

লুট আগা-গোড়া মনে দিয়ে শুনল। শেষ হওযামাত্র হেসে বলে উঠল, “দেখ গো, ভাল করে চেয়ে দেখ এখন আমার, আমার মত লাগছে না কি।”

“থেক!” আমি জবাব দিলাম। ওর অপূর্ব চোয়ার, আশা আর স্নেহে ভরা চোখ, অসীম ভালবাসা ভরা হাসি আর আনন্দোচ্ছল মুখ দেখে আমার ভর সব উবে গেল। আমি ওর মুখে মুখ রেখে আপন মনে বলে উঠলাম,—

“তোমার নয়ন উমিবে হেথার

তারকা-সম,

তাহারি বসি উজ্জলবে প্রিয়

স্বপ্ন মম।”

ও হাসল, “মার্গরিথ, আমার উদ্দেশ্যেই বলছ না কি?” বলে আমাদের ওর বুক টেনে নিল। তার পর একটু গভীর গলায় বলল, “আচ্ছা, মার্গরিথ, কোন প্রাণি তুমি ভাবতে পার যে আমাদের এই সমস্ত সাজানো সঙ্গাথ থেকে ভগবান তোমার সন্নিবে নেবেন? না মার্গরিথ, একথা মনে রেখ যে ভগবান এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না।”

আমি চুপ করে রইলাম। কে জানে? ভগবান যা করেন তা আমাদের মঙ্গলেরই জন্ত, বাইরে থেকে সব সময় তা সন্ধানী না হতেও পারে। [ক্রমশঃ।

অম্ববাদ :—পৃথ্বীস্রনাথ মুখোপাধ্যায়



মাথার ব্যস্ততার কুসিঁতেছেন  
একবার চক্ষু পরীক্ষা করান না কেন?



ক্যালকুলা অপটিক্যাল

কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড

প্রতিষ্ঠান: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু এমবি

ফোন :—৫৫-১১১৭

৪৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট • কলিকাতা-৯

## অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



শ্রীশারদা দেবী

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

ত্যাগের অভাবই সংসারে সকল অশান্তির মূল।

সসারীরা তা বোঝেন না। ভোগের শিক্কে ভুগার্ত হয়েই শুধু ছোটো। তাই পৃথিবীতে এত সংঘাত। ত্যাগের পথই যে শান্তির পথ, তা সারদা দেবী নিজ জীবনে আচরণ করেই দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর জীবনকে আমরা উপাহরণ হিসাবে পেতে পারি। সব কিছু বিলিয়ে দিয়েই তিনি সব কিছু পেয়ে দেব-মানবী হতে পেরেছিলেন। সাংসারিক দৃষ্টিতে লোকে যা-ই ভাবুক না কেন, তাঁকে হারাতে কিছুই হয়নি।

শারীরিক স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, খাওয়া, চলা, বলা কিছুই যেন সারদা দেবীর নিজের জন্ত ছিল না। এমন কি, অবসর সময়ের চিন্তা-ভাবনাটুকুও অপরকে ঘিরে হ'ত। জগতের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল সর্বদা নিঃস্বার্থ হয়ে কর্মে ব্যাপ্ত থাকতে। কর্ম দিয়েই পূর্ণবয়স্কৃত কর্মকলের ক্ষর হয়। তিনি বলতেন, 'সর্বদা আত্মদোষোদ্ধারী হও, তবেই প্রকৃত শান্তির পথ খুঁজে পাবে। মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। মানব-বেহকে ঈশ্বরের মন্দির ভেঙে পবিত্র রাখতে চেষ্টা করা মানুষের পরম ধর্ম। অন্তরেই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তবে সে অন্তর অশুদ্ধ বা কলুষিত হলে চলে না। শুদ্ধ পবিত্র হওয়া চাই।'

এই নিঃস্বার্থ প্রেম ও সেবাত্রস্ত গ্রহণ করতে গিয়ে সারদা দেবীকে যে কতখানি নিঃস্বার্থ হতে হয়েছিল, তার সম্যক ধারণা করাও আমাদের সাধারণ মানুষদের সম্ভব নয়। পরের সেবা আর পরোপকার দিয়েই সারদা দেবীর জীবন শুরু আর তাতেই তার জীবনের অবসান। আত্মপরের কোন গভী আমরা সারদা দেবীর মধ্যে দেখতে পাই না। তাঁর সম্পর্কে যেই এসেছে, তাকেই তিনি অতি আপন ভাবে গ্রহণ করেছেন।

সারদা দেবীর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল অনলস কর্ম, ও

পরবর্তী জীবনে তাঁর নিজেরও ভক্ত-সন্তানদের জন্ত দিবারাত্রি কত যে পরিশ্রম তাঁকে করতে হ'ত, তা সারদা দেবীর জীবন-কাহিনী সত্যকে অল্পবিস্তর পরিচয়ও বীর আছে, তাঁর অজানা নেই। আর তাঁর ত্যাগের কাহিনীর বর্ণনা যদিও মনুষ্যসাধ্য নয়, তবু অত্যন্ত ছোট একটি ঘটনা থেকেই তাঁর সমস্ত জীবনের ত্যাগমাদুর্ঘ্য ধরা পড়ে।

দক্ষিণেশ্বরে যখন সারদা দেবী ঠাকুরের কাছে আসেন, ঠাকুরই তাঁর ইষ্টদেব, জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। তাঁকে সেবা করা, বড় করা, আপন হাতে বাঁধা করে কাছে বসিয়ে তাঁকে ষাওয়ানোই তাঁর সর্বাপেক্ষা আনন্দ ও তৃপ্তিকর কাজ ছিল। খেতে বসে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হ'লে খেতে পারতেন না। তাঁকে অভুক্ত থাকতে হ'ত। সারদা দেবী তাই কাছে বসে পাখা দিয়ে হাওয়া করে নান্না কথায় ঠাকুরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়াতেন। এটাই ছিল তাঁর এক মাত্র সময়, যখন তিনি স্বামীর একান্ত সান্নিধ্য পেতেন। অপর সময় ভক্তরা তাঁকে এমন যত্নে রাখতেন যে, সারদা দেবী তাঁর দর্শনও পেতেন না।

এক দিন একটি দ্বী-ভক্ত এসে সারদা দেবীকে বললেন, 'মা, আপনি ভাতের খালা দিন, ঠাকুরকে আমি খাওয়াবো।' এরকম ক্ষেত্রে একান্ত পতিভ্রতা স্ত্রীর অন্তরে কি ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক, তা আমরা সহজে অনুমান করতে পারি। সারদা দেবীর এই একটি মাত্র তৃপ্তি, একটি মাত্র পরম আনন্দকর কাজ। কিন্তু দ্বীভক্তটির আন্তরিক ইচ্ছাকে উপেক্ষা করতে তিনি পারলেন না। তুলে দিলেন ভাতের খালা তার হাতে।

সে সময় নারীরা কোন কাজের অছিলা ভিন্ন স্বামীর কাছে যেতে সক্ষমত বাগ করতো। আর তাছাড়া সারদা দেবী ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীল। দ্বীভক্তটি ভাত নিয়ে চলে গেল ঠাকুরকে খাওয়াতে। তিনি বসেই রইলেন। কাছে বসে স্বামীর ষাওয়াটুকুও দেখতে পারলেন না। এর পর থেকে প্রতি দিনই ঐ দ্বীভক্তটি ঠাকুরকে খাওয়াতে লাগলেন। যুগ ফুটে সারদা দেবী নিজের দাবী বা আকাঙ্ক্ষাটুকু জানাতে পারলেন না। অথচ কত কষ্টই না তাঁর হয়েছিল।

ক্রমে তো এমন হ'ল, যে পকাশ-যাট গজের ব্যবধানে থেকেও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস স্বামিরদর্শনটুকু থেকেও তাঁকে বঞ্চিত থাকতে হ'ত। ঠাকুরের সমস্ত কাজই ভক্তরা করে দেয়, কাজেই তাঁর আর ঠাকুরের কাছে বাবা-ব সময় কোথায়? এ যে একটি অমুখ্য দ্বী, ভক্তিমতী ভক্তের পক্ষে কত বড় ত্যাগ, তা আমরা ধারণা করতেও পারি না।

দক্ষিণেশ্বরে কত নাচ-গান হয়, ঠাকুরের কত ভাবসমাদি হয়, দূরদূরান্তর থেকে লোকেরা দেখতে আসে। সারদা দেবী সেই দক্ষিণেশ্বরে থেকেও দেখতে পান না। তিনি তাই নহবৎখানার বেড়ার মধ্যে একটা ফুটো করে তার মধ্য দিয়েই চেষ্টা করেন দেখতে। সাথে সাথে ভাবেন আর্হা! ভক্তরা কত ভাগ্য করে এসেছে। সব সময় তাঁর কাছে কাছে থাকে, তাঁর দর্শন ও স্পর্শ পায়। আমি যদি এমন ভক্ত হয়ে জন্মাতুম এ ভাগ্য আমারও হতে পারতো।

আবার নিজের মনেই ভাবতেন, 'আমি কি আর তেমন পূণ্য করে জন্মেছি যে, এমন দেবদুর্লভ স্বামীর নিত্যদর্শন, নিত্যসান্নিধ্য পাবো আর তাঁকে নিত্য সেবা করে গুণ হবো?'

সারদা দেবী যদি স্বামীর প্রতি নিজ পত্নীত্বের অধিব্য

বিশ্বায়ত্ত দাবী জানাতেন, তবে কি সর্বান্তে তাঁর দাবী বিবেচিত হ'ত না? কিন্তু এক দিনের অল্পে তাঁর কথাবার্তা বা ব্যবহারে তিনি তা প্রকাশ করেন নি। নিজে থেকে বলিয়ে দিতে তিনি এসেছেন, কুড়িয়ে নেবেন কেন?

সকলের মতে মত মিলিয়ে সকলের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে থাকতে তিনি অভ্যস্ত হয়েছিলেন। ত্যাগই তাঁর জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। কাজেই ব্যক্তিগত কোন দুঃখই কোন দিন তাঁকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। সর্ব অবস্থাকে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার এমন এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর।

সাংসারিক আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলে তিনি বলতেন, হয়তো শিরশ্রুজ্ঞা করতে গিয়ে কীটীভূত বেলপাতা দিয়েই মহাদেবের পূজা করেছিলুম, তার জন্য এ জন্মে এ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। বার জন্ম তিনি কষ্ট পেতেন তার প্রতি কোন অভিমান ছিল না তাঁর। অপরের দোষই দেখতে পেতেন না তিনি।

ঠাকুরের ভাবিতাবছার অসংখ্য ভক্ত-পরিবৃত হয়ে থাকায়, সারদা দেবী ঠাকুরকে একান্ত ভাবে কখনই পাননি বটে, কিন্তু ঠাকুরের দেহাবসানের পর তিনি তাঁকে সর্বসময়ের জন্য পেতেন।

ঠাকুর যেন সত্যি সত্যি ঘর বদলে তাঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যেখানে সারদা দেবী সর্বদাই তাঁর দর্শন, স্পর্শন, সান্নিধ্য, আদেশ, উপদেশ, ঠিক যেন দেহধারী স্বামীর মতই পেতেন। এমন কি, শোনা যায় ঠাকুর নাকি তাঁর কাছ থেকে আশ্রয় করে, কখনো কখনো খিচুড়ি পর্যন্ত চেয়ে খেতেন।

ঠাকুরের দেহাবসানের পর মা তাঁর প্রথম জীবন্ত দর্শন পান নিজ বৈধব্যবেশ ধারণকালে। ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে বলেন, 'আমি আর কোথায় গেছি গো! এ-ঘর থেকে তো শুধু ও-ঘর।' বাস্তবিকই সারদা দেবীর এ অমূল্য ভিত্তি তাঁর দেহাবসান কাল পর্যন্ত ছিল। সেজন্মই তিনি সর্ব লাল পাড়ের শাড়ি ও হাতে হুঁগাছা বালা পরতেন। শোনা যায়, সখ্যার লক্ষণ হিসাবে মাথার পিঠন দিকে সিঁদুর ও ধারণ করতেন। শুধু তাই নয়, সেই থেকে স্বামীকে তিনি নিত্য ভোগ রান্না করে খাওয়াতেন। নিজ হাতে তাঁর ছবি সাজাতেন, ঘুম পাড়াতেন, জাগাতেন। সব কিছুতেই তিনি যেন ঠাকুরের জীবন্ত সান্নিধ্য পেতেন।

ঠাকুরকে যখন তিনি ভোগ নিবেদন করতেন, তার মধ্য দিয়েই দেখা যেতো তিনি ঠাকুরের উপস্থিতি বা সান্নিধ্য কতটা অনুভব করতেন। 'কৈ গো! এসো, তোমার খাবার দিচ্ছি।' কখনো

## মনের কথা

"এমন স্নানর গহনা কোথায় গড়ালে?"

"আমার সব গহনা সুখার্জী জুয়েলার্স দিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের কচিচ্ছান, সততা ও দারিদ্র্যবোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।"

# সুখার্জী জুয়েলার্স

দিগি লোয়ার মহলা নির্মাল ও রত্ন - ভবন  
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



বলতেন, 'আজ কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি করে খেতে হবে, আমি কিন্তু জগন্নাথী-পুজা দেখতে বাবে।'

এরকম সহজ ভাবে আত্মত্যাগ তিনি যে কোন পটের ঠাকুরকে জাকতেন, তা মনে হ'ত না। জীবিতকালে স্বামীকে যে ভাবে আত্মত্যাগ করতেন, তাই-ই যেন গ্রহণ করিয়ে দিত।

পূর্বাতে জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে কাপড়ের নীচে লুকিয়ে নেওয়া ঠাকুরের ছবিকে তিনি জগন্নাথ দর্শন করিয়েছিলেন। জীবিতকালে ঠাকুরের জগন্নাথ দর্শন হয়নি। নিজে সেই জগন্নাথকে একা কি করে দর্শন করবেন?

এক দিন দুপুরবেলা সারদা দেবী দেখতে পান ঠাকুর সারা ঘরঘর পাঁয়চারী করে বেড়াচ্ছেন। তা দেখে, সারদা দেবী চমকে ওঠেন, 'এ কি! বিজ্ঞানের সময় যে! তুমি এখনো শোওনি?' ঠাকুরের ছবির কাছে এগিয়ে দেখেন, ছবি-ভিত্তি লাল ভেঁরো পিপড়ের সারি। কারণ বুঝতে তাঁর দেবী হয় না। একটি ভক্ত সেদিন ঠাকুরের আসন ফুল দিয়ে সাজিয়েছিল। হয়তো ফুল না বেছেই দিয়ে থাকবে!

সারদা দেবী ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করেই বুঝতে পারতেন ঠাকুর তা গ্রহণ করেছেন কি না। গ্রহণ না করলে তাঁর কি ব্যস্ততা। ঠাকুরের কাছে বসে কত অন্তরন বিনয়। তিনি জানতে পারতেন অপরিচিত বাড়ীতে ঠাকুরের ভোগ নিবেদন হয়েছে। গৃহস্থবাড়ীতে ঠাকুর অত্যন্ত থাকলে তাদের পাছে অকস্মাৎ হয়, বুঝে তিনি অজ্ঞানত্ব করে ঠাকুরকে একটু পারেন্স খাওয়াতেন। নিজেও পারেন্স ছাড়া আর কিছু বুঝে দিতেন না। স্বামীর লজ্জা ভোগ রাগা হয়েছে। তিনিই খেলেন না, সারদা দেবী কি করে থাকেন? কখনো যদি ঠাকুর না খেতেন তিনিও অত্যন্ত থাকতেন।

ঠাকুর তখনো জীবিত। কাশীপুর বাগানে উগানশক্তি-রহিত অম্লহ। সারদা দেবী ছিলেন অজ্ঞ ঘরে। সেখান থেকে তিনি দেখতে পান, ঠাকুর নিজ ঘর থেকে বের হয়ে দৌড়ে কাঁথার ঘর পেলেন। বিশিষ্ট সারদা দেবী ঠাকুরের ঘরে এসে দেখতে পান সত্যি সত্যিই ঠাকুর বিছানার নেই। তাই দেখে তিনি চমৎকৃত হন। ঠাকুরকে পাণ ফিরিয়ে না দিলে নড়তে পারেন না। তিনি কোন মন্তব্যে স্তম্ভ মাছুষের মত দৌড়ে বাগানের দিকে গেলেন? এ কি করে বিচ্যাস করা যায়?

ঠাকুরকে পরে একথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানতে পারেন, নরেন প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত বাগানে খেজুরের রস খেতে গিয়েছে, সেই খেজুর গাছের নীচে মস্ত একটা গোখরো সাপ দেখতে পেয়ে তিনি তাদের বাঁচাবার লজ্জা এক দৌড়ে সাপটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এলেন। সারদা দেবী ঠাকুরের জীবদ্দশায়ই তাঁর স্তম্ভশরীরের ক্রিয়ায় দর্শন করতেন, বা সাধারণ চকুতে কেউ দেখতে পেত না। কাজেই দেহাবসানের পর তাঁর জীবন্ত সারিধ্য বা দর্শন পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

ঠাকুরের দেহাবসানের পর যখন সারদা দেবী কামাণ্ডুকুরে ছিলেন, এত দিনের অভ্যস্ত গঙ্গানানের অভাবে তাঁর বড় কষ্ট হত। এক দিন তাঁর গঙ্গানানের খুব ইচ্ছা হয়। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন ঠাকুর যেন পারে হেঁটে আসছেন, এবং তাঁর পিছনে পিছনে আসছে সব ভক্তরা। ঠাকুরের পারের কাছে অলসে মস্ত মস্ত টেউ।

সারদা দেবী ছুটে গিয়ে ঠাকুরঘরের পাশের একটা গাছ থেকে হুটু হুটু ফুল তুলে সেই জলে অর্ঘ্য দিতে লাগলেন। তুলে গেলেন, এখানে গঙ্গা থাকার কথা নয়। সব যখন মিলিয়ে গেল তখন বুঝতে পারলেন ঠাকুর এভাবে তাঁকে অলৌকিক দর্শন দিয়ে জানিয়ে গেলেন যে তাঁর জন্মস্থান গঙ্গার মতই পবিত্র। এখানে থেকে গঙ্গানান করতে না পারলে দুঃখের কোন কারণ নাই।

নীলাশ্বর সুখাঙ্কুরী বাড়ীতে থাকাকালে আরো একবার মার এরকম দর্শন হয়। তিনি দেখতে পান, ঠাকুর যেন গঙ্গার নামলেন আর তাঁর দেহ যেন গ'লে গঙ্গার জলে মিশে গেল। সেই জল স্বামী বিবেকানন্দ নিজে হাতে ক'রে কোটি কোটি লোকের মাথার ছিটিয়ে দিয়ে 'জয় রামকৃষ্ণের জয়' বলতে লাগলেন। সেই থেকে অনেক দিন পর্যন্ত গঙ্গাকে আরো পবিত্র মনে করে সারদা দেবী গঙ্গার নেমে স্নান করতে পারতেন না। উত্তরকালে তাঁর এই দর্শন যে বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছিল, তা আমরা সবাই জানি। সাধনলভ্য স্তম্ভগুণী সারদা দেবীর দ্বিগুণ বলেই তিনি ঐশ্বর্যের ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্ণাভাস পেতেন।

পরমহংসদেবের অলৌকিক ক্ষমতার কথা আমরা অনেক কিছুই শুনেছি। যখন তখন একটু স্পর্শ করেই তিনি অনেক ভক্তদের মনের ইচ্ছার মোড় ঘুরিয়ে দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত শক্তিশালী মানুষের জীবনে আমরা এ প্রয়োগ দেখেছি। সারদা দেবীরও শোনা যায় এ ধরনের বিস্মৃতি প্রকাশের ক্ষমতা ছিল। যদিও শারীরিক ও আধ্যাত্মিক দুই শক্তিরই এতে অপচয় হয় তেমন বিশেষ কারণ ব্যতীত তিনি তা প্রয়োগ করতেন না। তবে প্রয়োজন বোধে তিনি তাঁর ভক্তদের মধ্যে কয়েক জনকে নিজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তা আমরা জানি।

ঠাকুরের শেষ জীবনে যে দুর্বলোপা কষ্টকর ব্যাধি তাঁর দেহে আশ্রয় করেছিল, সেই সম্বন্ধে সকলেইই ধারণা যে, যখন তখন অগণিত ভক্তদের পাশের ভোগ ক্ষয় করতে গিয়ে নিজের মধ্যে তা টেনে নিয়েছিলেন বলেই তাঁর পবিত্র দেহে ঐ ব্যাধি আপা সত্ত্ব হয়েছিল। কণ্ঠের একটা ফল থাকেই। কণ্ঠকারীকে যদি বের নিজ শক্তিবলে কলভোগ করতে না দেয়, তবে সে কণ্ঠফল কণ্ঠকারীকে আশ্রয় না করে নাকশকারীতে বর্তায়। ঠাকুরের আয়ুষ্কাল কমাও এ রোগভোগের একমাত্র কারণই। নিজ শক্তি ক্ষয় করে ভক্তদের হৃদোগের অবসান করা।

একটিমাত্র ঘটনাকে আমরা এ বিবাদের সমর্থনে দেখাতে পারি। কত ঘটনা যে আরো আছে তার তো যেন অজ্ঞই নেই। মথুর বাবুর দ্বী যখন দুর্বলোপা ব্যাধিতে মৃত্যুশয্যায়, তখন তিনি এক দিন এসে ঠাকুরের পারে কেঁদে পড়লেন। দ্বী না বাঁচলে তাঁর ভবিষ্যতী যায়। ঠাকুর একটু স্থির হয়ে জাবলেন, তার পর বললেন, 'যাও, দেখ গিয়ে ভাল হয়ে গেছে।'

মথুর বাবু বাড়ী ফিরে সত্যি দেখেন, দ্বীর রোগের আশঙ্কা পরিবর্তন। তিনি ছুটে এলেন ঠাকুরের পারে কৃতজ্ঞতা জানাতে ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'রোগ আর কাঁথার গেছে? (নিজেকে দেখিয়ে) এই দেখে টেনে এনেছি।'

মায়ের বুকেও এক বার স্বামী বিবেকানন্দের প্রায়ের উত্তরে দ্বিগুণ এই ধরনের কথা শোনা গিয়েছিল। বিবেকানন্দ সারদা দেবীকে এক

প্রশ্ন করেছিলেন, ‘মা, আমার ঠাকুরের সম্ভান হয়েও কান্দীরের একটা ফকিরের অভিশাপ আমার উপর এমনি করে ফলে গেল, আর ঠাকুর আমাদের রক্ষা করতে পারলেন না?’

উত্তরে তিনি বলছিলেন, ‘সে তো বাবা একই কথা! তোমার দেহেও বা, তাঁর দেহেও তাই-ই। ভক্তের প্রতি অবিচার নিয়ে গ্রহণ করলেই ভগবান ভক্তকে মুক্তি দিতে পারেন, নতুবা প্রাণকর্মে ফল বা সাধুবাণ্য না ফলে যাবে কোথায়? ঠাকুর তো কিছু নষ্ট করতে আসেন নি? সব রক্ষা করতেই এসেছিলেন।’

অনেকে আবার খোলাখুলি সারনা দেবীকে প্রশ্নও করতো, ‘মা, ঠাকুরের পবিত্র দেহে এত কষ্টকর ব্যাধি কেন?’

মা তাদের উত্তরে বলতেন, ‘দরুলের পাশ যে তিনি নিজের দেহে টেনে নিতেন। নইলে কি ও-সব দেহে ব্যাধি হয়?’

ভক্তদের কথঞ্চল নিয়ে গ্রহণ করে ঠাকুর তাঁদের মুক্ত করতেন, একথা মেনে নিলেও তাঁর দীর্ঘ রোগভোগের মধ্যে পৃথিবীর যে একটা মহাকল্যাণ উদ্বেগ সাধিত হয়েছিল, একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

জীবিতকালে আপন জীবনানন্দ দিয়ে মরদেহে কি করে ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব, তার তিনি অপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। আপন সাধন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যে, সর্ববর্ষ-সময়ই হিন্দুধর্মের আদর্শ। তার মধ্যে কিছু তাত্ত্ব্য গ্রাহ্য নাই।

তা ছাড়া দীর্ঘ বোগভোগকালে তাঁর শয্যাশাশ্র্বে উদযুক্তদের ভক্তদের তিনি একজ হবার সুযোগ দিয়েছিলেন অপূর্ণ ভ্রাতৃ-বন্ধনের মৃদু বনিয়াদ গড়তে। আর শুধু তাই-ই নয়, অবগুষ্ঠনবতী স্ত্রী সারনার অবগুষ্ঠন ঘূঁচির এক দিনের চাওয়া একটি সম্ভানের জায়গার এতগুলি সম্ভানের জননী করে ও সেই সম্ভানের সম্মুখে তাঁর স্নেহময়ী কল্যাণময়ী জননীরূপটি উদ্ঘাটিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। [ক্রমশঃ।

## ভালো লাগা যুহুত

অল্পপূর্ণা গোস্বামী

ভালো লাগা যুহুত আমার

আনন্দ-মন যুহুত

যতঃকৃত

না হ’তে, গুণন না উঠতে,

স্বরের জাল বিভার না করতে,

ছিঁড়ে বার, টুকুরা হ’য়ে সেতাবের তার।

যশিল যুহুত আমার।

পাইনে কারও নিবিড় আলিঙ্গন

ফকির আলিঙ্গন

বিদারী সূর্যের রতিন আলোর মত

শুধু ছুঁয়ে বার মন।

কী মধুর, কী পরম কল

ওরা চলে যায়

একে রেখে যায়

রেখে দিয়ে যায়

ভালোবাসার মরণ সম্ভার।

ভালো লাগা যুহুত আমার।

ওরা হাঁটে—

চিত্তবজ্ঞান এভেনিউর ফুটপ্যাথে

কেউ বার বাসে, কেউ ঘরের মোটরে

ক্রমশঃ ওরা অপসংস্রমান,

লাল পূর্ব অভয়ান

বড় বড় সৌখণ্ডিল মাথার ওপরে।

গোম্বলি-অন্ধকার ঘনিরে আসে

চিত্তবজ্ঞান এভেনিউর আকাশে

যন ছায়া কেলে

মনের অন্তলে

আমি মুক, নিখর, অভিভূত—

জমাট বাঁধা বরফের মত

পাঁড়িয়ে থাকি আমার কেবিনের জানালার পাশে।

কতটুকু সময়ের সাক্ষাৎকার,

কী মধুর যুহুত আমার।

জমাট বাঁধা বরফ কখন যেন গলতে শুরু করে,

চমকে উঠি আমি রজনীগন্ধার সুবাসে

অস্তবস পরশে

যে রজনীগন্ধা রয়েছে আমার টেবিলের পুশপাথারে।

ঐতি হোঁসানো উপহার

রজনীগন্ধার বাড়

সন্ধ্যা বাতাসে, মন্দির হয়ে আসে

মাধুর্যের উপচার

ভালো লাগা যুহুত আমার।

## বাতিঘর

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

বিগাতি পায়গাছ-ঘেরা আলির ওপর পুশিত লতার ছাউনি ঢাকা, ছোট অকিড ছাউনিটির ভেতর যেত পাখরের বেদিটার ওপর বসেছিলো স্মৃতিতা আর অলম। সামনেই খেচ প্রভুর নিমিত্ত হুস-মিথুনের ঠোঁট বেয়ে কব কব করে খরে পড়ছে কীণ জলধারা। পাশের ঘোপে খেলা করছিলো একপাল খরগোশ।

প্রত্যেক মেঘবুজ সোনালী প্রভাত। ঘন-নীল আকাশে নৈজা ফুলের বজ্রার মত হালকা মেঘের দল আপন খুশিতে ছুটোছুটি করছিলো, ঐ খরগোশগুলোর মত।

স্বপ্নাম অপলক দৃষ্টি মেলে এসেছিলো সেই দিকে। ওর হাতখানা ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে স্মৃতিতা, অত অবাক চোখে কি দেখছে নানীলা?!

যুহু দৃষ্টি তার কির আসে স্মৃতিতার বুকের ওপর।

—কি দেখছিলাম?—দেখছিলাম কি অতুরন্ত সৌন্দর্য ছড়ানো রয়েছে অগ্ন জুড়ে। কোন অনীম সৌন্দর্যশালী শিল্পী যেন অজ্ঞে

বলে বুঠো বুঠো বিভিন্ন সৌন্দর্য্যধারা ছড়িয়ে দিচ্ছেন ধবধবী বৃক্, দিনের পর দিন। এ দেওয়ার বিরাম নেই, শেষও নেই।

বিশ্বের ভেত্রে চোখ দুটি বিক্ষাণিত করে বলে অমিতা, —আজ্ঞা দামীলা! তোমার মত প্রকর করে এই পৃথিবীটাকে আমি কেন দেখতে পাই না? এ সৌন্দর্য্য বৃষ্টি সবার জন্যে নয়?

—হ্যাঁ মিটা! এ সবারই জন্ত। —তবে একে আচ্ছন্ন করে নিতে হয়। ষাট-প্রতিষাক্ত, অশ্ব-হুংখ, চাওরা-পাওয়া সবার উদ্দেশ্যে এমন একটা সাম্য সৌন্দর্য্য বিবাজ্য করছে, বাক্যে স্রবণে বরণ করে নিলে আর কোনো ক্ষোভ থাকে না।

ব্রহ্মাণ্ড দুটি চোখ মেলে চাইলো অশ্রাম অমিতার পানে। সে চোখে ছিলো না কোনো কামনার বন্ধি। ছিলো প্রেম-অনুরাগের নিষ্ঠা ছাড়া। একটা বৃহৎ নিঃশ্বাস কেলে বললো অমিতা—তোমার মত যদি মন আমিও পেতাম দামীলা! অমনি বৃষ্টির আলোর মনটাকে তরিয়ে নিতে পারতাম তাতলে...

—তাহলে কি হত মিটা? কিসের অভাব তোমার মনে? কেন মানব-সারের অবগাহন করতে সঙ্কোচ তোমার মিতু?

—জানি না দামীলা! কেন আমার এমন হয়! বৈদ্যনাথ কণ্ঠে বলে অমিতা।

—ওর একখানি হাত নিজের বুঠোর মধ্যে তুলে নেয় সুরাম, অপর হাতে দেয় একখানি নীলম-এর কাগজ—বলে, পড়ো ষ্টো—

—বৃষ্টির আলো বৃষ্টি এবারে লাগলো ওর চোখে-মুখে। হরিবীর মত চকল কাগজ-কালো চোখ দুটি নাচিয়ে বললো—নতুন কবিতা? তবে লিখলে?

—পড়ছি দেখো না,—হাতখানিতে বৃহৎ চাপ দিয়ে বলে সুরাম।

—তুমি পড়ো দামীলা! তোমার মুখে কবিতা শুনে যে আমার বক্স ভালো লাগে। নিজে পড়লে অতটা ভালো লাগে না।

—তাই না কি? আমার গলার যে এত মধু আছে তা তো আমার জানা ছিলো না, তাগিয়াস তুমি বললে মিটা!

কৃত্রিম কোপের সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নেয় মিটা। মুখ কিরিয়ে বলে; অভিমানভরে বলে—থাক পড়তে তোমার হবে না!

নিজেকে ভারি অপরাধী বোধ করে সুরাম। ওর সামনে গিয়ে মাটিতে বিছানো কাঁকরের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। অমিতার হাত দুটি ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—

—দামীর কমা করে মিটা! পরিহাস করতে গিয়ে আঘাত করেছে তোমার মনে। দাও কবিতাটা আমি পড়ে শোনাই তোমাকে। কতখানি চলে যাবে—কত বিন শোনাতে পারবে না তোমার কবিতা। আমার সমস্ত কাব্যকুসুমগুলো সেখানে হরতো কুঁড়িতেই করে যাবে। তুমি ভো কাহ্নে থাকবে না, কে কোঁটাবে তাদের!

—হার! সাধনা গিতে গিয়ে নারীচরিত্র-অনভিজ্ঞ পুরুষ তার প্রিয়তমার আসর প্রিয়-বিচ্ছেদ বেদনা—ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অজস্র নিদারুণ ব্যাক্যবাণ বিদ্ধ করে বসলো।

দু'হাতে মুখ ঢেকে আঁচল কারায় তেতে পড়লো অমিতা। অশ্রু ভরুলতাপানি তার কারায় জোয়ারে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো।

—কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার করুণ চোখে তার পানে দামিক চেয়ে রইলো সুরাম,—তার পরে দু'হাতে টেনে নিলো তাকে নিজের গুপ্তের ওপর।

সম্মুখে ওর মাথার হাত বুলোতে বুলোতে বলে—তুমি যদি অমন করে কাঁদো, তবে আমি সেই অশ্রুর পথে ক্রমশ করে বাঁবে মিটা? সত্যিই যে তোমাকে কেলে বেতে মন আমার একেবারেই চাইছে না—কেবল বাবা, আর কাকার আলোশেই যেতে হচ্ছে তুমি যদি এত কাতর হয়ে পড়ো, তবে থাক আমার বাওরা।

অমিতা সামলে নেয় নিজেকে। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলে—না। না। দামীলা! তোমার উত্তরির পথে আমি কখনই বাধা হবে না। তুমি যাও।

—তার পর জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বলে, মাত্র তিনটে বছর কো,—ও দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তুমিও কিয়ৎ এত দেখবে আমি কত কি শিখেছি,—তোমার পাশে দাঁড়াবার বাগ্যাত অজ্ঞান করতে হবে তো? বাবার সঙ্গে দেখা করবে বলছিলে না? যাও তুমি বাবার লাইব্রেরী-ঘরে,—আমি এখানেই রইলাম। দেখা করে আবার এখানে এসো।

সুরাম বিমর্ষ চিত্তে অকিড-হাউস থেকে বেরিয়ে যায়। অমিতা উল্লসকে ডাক দেয়—ভজনলা, ও-ভজনলা!

—বুড়ো মালী তার ঘর থেকে কালো-শাখার ফেঁক-কাটা চামরখানি মুড়ি দিয়ে এসে ভিজ্ঞেস করে—কি গো বুকুনি! বুড়োটাকে আঁধার কি দরকার পড়লো?

—বড্ড দরকার ভজনলা! তোমার সাজিটা আর দু'চ'খোঁটো এক বার দাও না?

একহুঁকোঁকাল হাসি হেসে বলে দামিকজন সিং—ও, এই কথা! আনছি গো দিদি!

ধপধপ করে দ্রুত গমনে যায় ভজন সিং। এনে দেয় অমিতার ক্রমাদেশী বস্ত্র।

—সাজিতে রাশি রাশি ফুল তোলে অমিতা। একা পায়ে না। মালী-দালাও ওর সঙ্গে ছুটোছুটি করে ফুল তোলে।

গোলাপ, বুই, পদ্মরাজ, কদম্বা, আর তার সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের সবুজমী ফুল সাজিটা তরিয়ে নিয়ে গিয়ে বসে অকিড-হাউসের ভেতরে।

আর বটা পরে সেখানে কিং এলো সুরাম। অমিতাকে বসে থাকতে দেখে ব্যথিত কণ্ঠে বললো,—সেই কখন থেকে একলা বসে আছ মিতু? ওঠো, এবারে ভেতরে যাও।

—বাঃ! কবিতাটা শোনাবে না?

—সত্যিই তো। দাও কাগজখানা।

—কাগজটা ওর হাতে দেয় অমিতা।

—গভীর ভাবাবেগপূর্ণ কণ্ঠে কবিতাটা পাঠ করে সুরাম।

—তোমার তরে রইলো আমার সকল আয়োজন,

আমার সকল চাওয়া

হৃদয় ভরে পাওয়া।

রাত্রি-দিনের কাব্য আমার—প্রোবে উল্লস মন।

তোমার তরে রইলো মিটা, সকল আয়োজন।

দূরের পথে, নিলেম সাথে তোমার মালাখানি,

বহু তোমার পানের সুরে,

জন্ম আমার নিলেম ওরে,

পাখের মোর রইলো সাথে তোমার প্রেমমণি।

কথিত। পড়ার শেষে উঠে পাঁড়ালো মিতা। সাজির ওপরে চাপা-  
বেওয়া কলার পাঁতাটি সঘিরে সজ-সমাগ্ন কুলের মালা ছড়টি বার  
করে পথিরে দেয় স্রদামের গলায়। মিষ্ট হাসির সঙ্গে বলে—  
কথিতার পুথখায়।

সঙ্গশস্যে বৃষ্টি মেলে মালাটি লেখে স্রদাম। তার পর নিবিড়  
অনুাগভরে বাহুপাশে আবদ্ধ করে, স্রমিতাকে বকের কাছে টেনে  
নেয়। কম্পিত বক্তির ওঠে একে দেয় প্রথম চুম্বনবেশ। গভীর  
ভাবসাগরের অন্তলতলে, তলিরে বার দুটি প্রেমবিম্ব তরুণ  
আত্মা। কেটে বার করেকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত্ত।

প্রাচ্যাত্মিক নিয়মবন্ধা করবার জন্ত সেদিনও বাজে এসেছিলো  
স্রমিতা পিতার কক্ষে। ধূপ, ধূনা, অঙ্কুর পবিত্র গন্ধে ঘরের বাতাস  
সুগন্ধিত। স্রমিতার বড় ভালো লাগে এ গন্ধটা। এ ঘরে এসে  
মনের ওয়েদটি ভাবটা যেন অনেকটা ভালো হয়ে যায়।

—ভবুও বাবার কাছে সে বসে না। সন্ধ্যাট ভরে, তফাতে  
বসে,—পিতার শুচিত্তে সান্নিধ্য থেকে নিজেকে পৃথক রাখে।  
অল্প দিন সোমনাথ বিশেষ কথা বলেন না। কিন্তু সেদিন  
স্রমিতাকে নিজের পাশে বসতে আদেশ করলেন।

একটু বিষয় লাগে বৈ কি ?

কত দিন বে মনটা তার দালালিত হয়ে উঠেছে পিতার একটু  
সেফ-পারশ পাবার জন্ত। তাগো তা মেলেনি এত দিনও।  
আলমের উত্তেজনাও বকের ভেতরটা কেমন টিপ-টিপ করতে থাকে।

সোমনাথ কতবার মাথার ঘীরে ঘীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে  
বললেন—মিঠু যা। আমি ছির করেছি কালাই হরিষার বওনা  
হবে।—বাসনা ছিলো, তোমাংয়ের পবিত্র-কার্ণাটা সমাধা করে যাবো,  
কিন্তু সর্বনিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা অন্তরঙ্গ।

স্রদামের ফিরতে বছর তিনেক বিলম্ব হবে, আমারও কিছুকাল  
নিষ্কলবাসের প্রয়োজন হয়েছে।

—তুমিও চলে যাবে বাবা ?

মুহুরে কথা ক'টি বলে পিতার মুখপানে বিহ্বল ভাবে চেয়ে  
থাকে স্রমিতা। ভাবলেশহীন পাখরে পড়' সে মুখে কোনো ভাবান্তরের  
সেখাপাত পর্যাক্ত দেখা গেলো না। সোমনাথের বৃষ্টি স্রমিতার ওপর  
ছিলো না।

যদি তা থাকতো, তবে তাঁর নির্বিকার চিত্তগায়রে মেয়ের  
আলোড়ন হরতো দেখা দিতো, অথবা সেই আশঙ্কাতই তাঁর বৃষ্টি  
বইলো অন্যের পানে নিবন্ধ।

পাখরের চৌকির ওপর থেকে একখানি বই তুলে তিনি কতবার  
হাতে ধিলেন।

স্রমিতা বইখানির পাতা উটে নামটি পড়লো, ভ্রমভ্রাসবত !

অনুবাদ করেছেন, সৌপ্তিক মহাবাহু। প্রথম পৃষ্ঠার পিতার  
হস্তলিপি হ'লুহ।

"জীবনে যদি কখনও আসে অন্ধকার,

এর মাঝে কোরো আলোর অনুসন্ধান।" [ কবিতা



উৎসবের দিনে

ক. হোড়ের

খুরামিত

প্রমোদন সামগ্রী

ক. হোড় এও কোং

কলিকতা-১০



## সুদানের পথে লীলা মজুমদার এম-এ,

“সব ঠাই ঘোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর ঘরি খুঁজিয়া  
দেশ দেশে ঘোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব খুঁজিয়া।”  
সেই দেশ হবে যে আফ্রিকা, যাকে কবির বলেছেন—  
“কল্প সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে  
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা—  
বাংলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়  
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।”

মনের কোথাও জাগেনি কোনও দিন। একে তো ঘরকুণো  
বাঙ্গালী মেয়ে—ফরি মিঠা মিঠা বুলি পড়তেই শুধু ভালবাসি—  
বাস্তব জীবনে মনে নিতে হবে তাই ভাবিওনি কোনও দিন সত্যি  
—কিন্তু আলোর কৃপণতা যেখানে বেশী সেখানেই বাহির হ’তে এনে  
দেখাতে হয় আলোর প্রয়োজনীয়তা—তাই সুদূর সুদান হ’তে  
অল্পবয়সে গেল ভারত সরকারের নিকট কয়েক জন ইঞ্জিনিয়ারের  
জন্ম নূতন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশের ক্রমোন্নতির পথে সাহায্য করে।  
ইংরাজদের বিদায় জানিয়ে আমন্ত্রণ করা হোল ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের  
তাদেরই স্থানে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক ইঞ্জিনিয়ার চাকুরের সঙ্গে বিয়ে  
হয়েছিল আমার এবং তার পর হ’তে গতাত্ত্বগতিক ভাবেই মধ্যম  
সহরের এক জায়গা হ’তে আরেক জায়গায় ঘুর বেমাচ্ছিলুম।  
হঠাৎ এলো সরকারের আমন্ত্রণ-পত্র। তবে বাবার নয় দরখাস্ত  
পেশ করবার। সুদান! নামটিও তখন ভাল কোরে পরিচিত  
ছিল না। একে তো ম্যাট্রিকের পর ভূগোলের সাথে প্রায়  
সকল সম্পর্কই চুক গিয়েছিল—তার উপরে একে আফ্রিকা,  
ভায় আবার সুদান! মনেরও খুব বেশী দোষ নেই। বা হোক  
স্বামী তো দরখাস্ত কোরে দিলেন। ক’বে যে দিলেন বাস, তার  
পরে আর কোনও খবরখবর নেই। কা কত পরিবেশনা—  
দিন চলে মাস এলো, মাসের পর মাসও চলে যাচ্ছে, এমনি  
ভাবেই এমনি সময়ে হঠাৎ এলো আবার ইন্টারভিউর জন্ত ডাক।  
তাড়াহুড়ো করে চললুম কোলকাতাতে, সেখানে আসবে সুদান  
সরকারের প্রতিনিধিবর্গ হ’ল সুদানী উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

এলুম কোলকাতাতে—আকস্মিক আগমনের কারণ শুনে সবার  
কাহ হ’তেই প্রায় এলো বখারীতি প্রচুর আপত্তি, এসব দেখে শুনে  
আমিও গেলুম একদম বাবড়। ঘরকুণো ভাবটা কিছুটা হয়তো  
কমেছিল—কোলকাতার বাইরে থেকে এবং কিছুটা স্নপ্তের  
পিরমাসী সম্পর্কে এসে কিন্তু আবার সবার মাঝে এসে সবার  
সঙ্গে সুখ মিলিয়ে আমার মনও তুলে দিল বিদ্রোহ, কিন্তু মনের  
বিদ্রোহ মনেই রইলো।

ইন্টারভিউ সাপ কোরে তিনি বখন ফিরে এলেন, মনে  
হোল খুবী। একট ফোঁসারা সঙ্গে কোরে বয়ে এনেছেন অর্থাৎ  
সব-কিছুই প্রায় ঠিক শুধু কন্সট্রাক্ট সইট করা বাকী। বাড়ীর  
আবহাওয়া হোয়ে গেলো খুবখম, কাকর অন্তরই সায় দিতে  
চাইছে না—অনেক কোরে একাই বোঝালেন সবাইকে—ইঞ্জিনিয়ার  
যে প্রয়োজন হোলে স্ববক্তাও হোয়ে উঠতে পারেন, তার

প্রমাণ গেলুম হাতে-নাতে। সবাই হোলেন কিছু কিছু রাজী  
অথবা রাজী হ’তে বাধ্য হোলেন জানি না—অবশেষে অল্পমতি পাওয়া  
গেল সবাকার স্নপ্ত সুদানের পথে পাড়ি দেবার।

দিন স্থির হোল ১১শে ডিসেম্বর ১৯৫৫—হোয়ে যাচ্ছে পৌষ মাস,  
আবার নূতন কোরে আপত্তি উঠলো বাড়ীতে—এটারও দেখলুম  
সুদান কোরেই ব্যবস্থা হোয়ে গেলো অর্থাৎ পিতৃমাতৃহানী  
গুরুজনদের সম্ভাব্য বিধানের জন্তে তিন দিন আগে হতে বাড়ী  
কোরে থাক।—আমার অবস্থা অনেকটা যেন “বিদ্রোহের” বিজ্ঞানসম  
মতন কোনও মহামত নেবার বালাই নেই—হু” তরফে ঠিক কোরে  
বা বললেন করবার জন্ত তাই হোল আমার করণীয়, কিন্তু মন  
যেন কিছুতে মানছে না—উৎসাহও যে কাকর কাছ হ’তে পাইনি  
তা নয়—বখন পেয়েছি তখন কিছুটা হয়তো উৎসাহিতও হোয়েছি—  
কিন্তু আবার যে কে সেই—যত দিন এগুতে লাগলো মন যেন ততই  
পিছোতে শুরু কললো—ইউরোপ বা অমেরিকা হোলে কি হোত  
জানি না কিন্তু এ যে সুদান! নিগোদের দেশ—বাদের কথা মনে  
হোলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে ছোট ছোট কুড়ে বাড়ী  
চুল অনাবৃত অশ্লীষ কালো দেহ, শুধু গাছের পাতার আবরণ  
একটুখানি পরিধান—হাতে বর্শা, মাথায় পাখীর পালক গোঁজা, মুখে  
মোছারী মোছারী গানের স্বর একটানে চলিয়ে নেচে নেচে চলে  
কিসের অভিধানে কে জানে! ও-সব দেশে মেয়ে আছে কি?  
আছে নিশ্চয়ই; তবে আমাদের চোখে সবই মনে হয় একই রকম—  
আবরণ কি ছেলে কি মেয়ে কাকর বিশেষ নেই। তাই হয়তো  
বৈষম্যটুকু মনে করতে সরমে বাধে। সভ্যদেশীর কোনও মেয়ে কি  
নেই ও-সব দেশে! তারা কি পারে নিরাপদে পথ চলতে ওখানে!

উত্তর সব চিন্তা এসে জড়ো হচ্ছিল মনে। ভারতেরই পার্শ্বস্থ নয়  
ওরাও এগিয়ে গেছে অনেকটাই সভ্যতার পথে। আলোর ছটা এ  
গেছে ওদেরও দেহে মনে প্রাণে। তাব জন্মই গভীর আগ্রহ নিয়ে  
এগিয়ে এসেছে ভারতের কাছে ক্রমবর্ধমান সভ্যতার দিকে এগিয়ে  
যাবার পথে সাহায্যের আশায়। বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত সব কি  
উপযোগী অভ্যর্থনা এসে যেতে পারে ওদের দেশে; মন যেন কিছুতো  
মানতে চাইছিল না। তাই দালা বখন ভরসা দিয়ে বললেন  
ইংরেজরা যেখানে বছরের পর বছর থেকেছে সেখানে, সকলো  
নিরাপদে অন্ততঃ নিশ্চিন্তই থাকতে পারবে—ইংরেজদের প্রা  
কৃত শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস আমাদের। এরকম জোয়ালো কথা শু  
যেন মনটা কিছুটা ধাতস্থ হোল।

এলো অবশেষে স্নপ্তর ১১শে ডিসেম্বর। মাঝে মাঝে এমনি হ  
দিন যে কি কোরে চলে যেতে থাকে টের পারারও অবসর থাকে না—  
আসছে আসছে কোরে সত্যি এসে গেলো বাবার দিনটি—ত  
হতেই সবার মন ভার হোয়েছিল—হু—এক পশলা বৃষ্টিও যে  
হচ্ছিল তা নয়—কর উপরে অভিমান কোরে জানি না সবাই  
ছেড়ে কোন দূর দেশে পাড়ি দিচ্ছি মনে কোরে মনটা কে  
কেনে উঠছিল—বিকসন এটার ছিল প্রেন ছাড়বার নিকট সময়  
তার ভেতরে হঠাৎ খবর এলো এয়ার ইন্ডিয়ায় অফিস হ’ল  
বিকেল এটার পরিসর্তু প্রেন বেলা ২টার সময় দমদম বিমান  
ছেড়ে চলে যাবে বাক্স উদ্দেশে—ওখানেই অপেক্ষা করছে ভার  
আন্তর্জাতিক বিমান আমাদের নিয়ে যাবার জন্তে। সুদানের



আফ্রিকার প্রথম বন্দর কার্যক্রমে যত্নসহকারে সময় ছিল মাত্র বাঁকী। কোনও মতে নাওয়া-খাওয়া সেরে একদম রওনা হলুম সবাই মিলে দমদম বিমানঘাটী অভিমুখে—কি যে তখন মনের অবস্থা শুধু অন্তর্দ্বন্দ্বী জানতেন। গিয়ে দেখলুম, তখনও আছে কিছুটা সময় হাতে—কাঠামু পরীক্ষা হবে বসন্তে—তবুও রক্ষে! আরও কিছুটা সময় তাহলে থাকতে পারবো আত্মীয় পরিজনদের মাঝে বসে—চুপচাপ বসে আছে সবার সঙ্গে—হঠাৎ ঘোষিত হোল মাইকে, বসে-বাঁটার বিমান অভিমুখে যাত্রা করবার জন্ত—আরও দু'টি বাঙ্গালী পরিবার ও একজন ব্যালেকের বাঙ্গালী ড্রল্লোকও ছিলেন সন্ধানের পথে যাত্রী—মনের অবস্থা আমাদের তিনটি মেয়ের একই রকম—মলিন মুখে সবার কাছ হ'তে বিদায় নিয়ে চললুম বিমান সন্নিকটে—মনে হচ্ছিল আমাদের যেন সবার কাছ হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোন সূর্য দেশে পৃথিবীর কোন অজানা প্রান্তে!

বসে বাঁটার পথে ঘটনাক্রমে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল নাগপুরে—ইচ্ছে হচ্ছিল থেকে বসি ওখানে, পরে জ্ঞান কোনও উপায়ে ফিরে যাবো কোলকাতার অভিমুখে কিন্তু কাঁধে: করলুম না কিছুই, শুধু বীরে বীরে গিয়ে উল্লমু আবার স্বপ্নানে—যেতে যেতে সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিণত হোল—জানি না গিয়ে যত দূরই তাকাচ্ছি নীচে জমিটুকু কতটা চাড়া কিছুই যেন আর নজরে পড়ছিল না। নদী নানা পর্বত কত কি দৃশ্যে পূর্ণ হোলে যাচ্ছিলুম, দেখবার উপায় ছিল না কিছুই—শবে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম—কিছুক্ষণ বসে একটি গুজন শব্দ শুনে আশেপাশে তাকিয়ে দেখি, সহস্রাবীরা নীচের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন—সবার দেখাযেই আমিও রক্ষে পড়লুম নীচের দিকে—বা বে! এ যে আকাশকে নীচে দেখতে পাচ্ছি তার উজ্জল তারকাগুলি সহ কিন্তু তা তো আর হাতে পাবে না—এ তবে কি! এই কি তবে সুশোভিতা আলোক-মাগার সম্ভ্রান্তা বসে নগরী? বামী গভীর মনোযোগ সহকারে শব্দের কাগজ পড়ছিলেন—ডেকে তাড়াতাড়ি দেখালুম, কোনও সৌন্দর্যই একা দেখে ভূপ্তি পাওয়া যায় না—উনিও বুঝি চমৎকৃত হোলেন দেখে—বাসের প্রেনে বাতায়ত অভ্যাস হোয়ে গেছে তাদের গোখে এ সৌন্দর্য হয় তো কিছুই নয়—কিন্তু আকাশপথে বিচরণ আমার এই প্রথম—তাই এই সৌন্দর্যটুকু যেন আমার গোখে অভিনব হোয়ে দেখা দিল—আর মনে হচ্ছিল আসবার আগে বামীর কল্পনার জালে বোনা নিত্য নূতন দেশের নূতন সৌন্দর্য সত্যিই বোধ হয় আমাদের চমৎকৃত কোরে দেবে—যুগিয়ে দেবে ভূপ্তির প্রলেপে আমার সকল বেদনা, পেছনে ফেলা আসা আত্মীয় পরিজনদের জন্ত—বা হোক, কয়েকটি যুগপকের পর প্রেন এসে তো গাছ হোল বসে বন্দরে—রাত তখন দশটা—এত রাতেও কি যোগ্য—কি বিরাট হৈ চৈ—আমাদের ছিল তাড়া—ভাল করে দেখবারও উপায় নেই, দু' বাকীর ভেতরে আবার রওনা হ'তে হবে কারো অভিমুখে আমাদের এয়ার ইন্ডিয়া! টারমিনাল নাগপুর কন্ট্রোলরুম।

যাত্রাতি কাঠামু সারা হোল, সঙ্গে ছিল শুধু এক বড় স্ট্রাকশন। বাগ—আবত্করী সব কিছুই ছিল তাতে—বাকী আর সব কিছুই লান কোরে দেওয়া হোয়েছিল জাহাজে পোটস্‌ডান অভিমুখে। ॥ হোক, তার পরে সবার সঙ্গে বীরে বীরে চলতে লাগলুম ময়দানের

দিকে, যেখানে বিরাটকার প্রেন ঠাঁড়িয়ে আছে, তার বিপুল বণু নিয়ে—এগোবো কি, ওর দিকেই শুধু ঘুরে ঘুরে চোখ বাড়ছিল বত এগোচ্ছি ততই যেন উঁচু ও বিরাট মনে হচ্ছিল। মাঝবগুলোকে কত ছোটই না মনে হচ্ছিল—ওর সন্নিকটে বত্র-বিশারদের দল বারা উঠেছিল ওর শিরের ওপরে কলকল সব পরীক্ষার জন্তে সবাই তখন বীরে বীরে নেমে আসছিল, সব কিছু আমাদের যেন আলাদিনের প্রদীপের দৈত্যের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, ওর মুখের ভেতরে পুরে কত সাত সযুজ তেরো নদীর পায়ে যেতে হবে আমাদের। সত্যিই তো নিয়ে যাবে, না, পাখের মাঝে ওর মুখ হ'তে কোনও হালকা বা তিমি মাছের মুখে ফেলে দেবে কে জানে? বা হোক, গিয়ে তো আশ্রয় নিলুম ওর ভেতরে, ভেতরেও দেখছি এলাহী ব্যাপার, আলোয় আলোময় সব কিছুই, সূক্ষ্ম ও সুসজ্জিত, বসবার ও শোবার উপযোগী সূক্ষ্ম আয়তনীয় আসন, বাতীর সবার রকম স্বপ্ন স্বপ্নে দেখবার জন্তে আছে সবশা এয়ার হোটেল, সব-কিছুই অভিনব মনে হয় প্রথম দর্শনে। খাবার পাট আগের প্রেনেই সারা হোয়েছিল, ওখানে শুধু ঘোমটার পালা, কিন্তু যুগ কোথায় তখন! শেষবারের মতন ভারতের শেষ বন্দরকে প্রাণভরে দেখে নেবার জন্ত হুঁচোখ বুলে জানি না গিয়ে তাকিয়ে রইলুম বাইরের দিকে—হঠাৎ দেখলুম আমাদের সামনে জলে উঠলো দুখানা সাক্ষাতিক আলো দুখপান নিবেশ ও 'বেন্ট ঝাঁঝ'র সঙ্কেত জানিয়ে অর্ধাং প্রেন এখনি ডুবি ছেড়ে শূন্যের পথে উড়বে, সত্যি তাহলে চললুম ভারতভূমি ছেড়ে কত দিনের জন্তে কে জানে, মন যেন কিছুতেই সহজ ভাবে মানতে পারছিল না, তা বড় বেসী ভারপ্রবণ বোধ হয় আমার—বাঙ্গালী মেয়েরা তাই প্রতিদেই পাই মন হ'তে বাধা, প্রতি পলে জাগে শশর—প্রতিবুদ্ধিতে আসে চোখে জল নিজ পরিজনদের ছেড়ে বাবার আশঙ্কায়—ভিন্ন দেশীয় মেয়েরাও ছিল যাত্রী, তাদের কোনও ভাবান্তরই দেখা যাচ্ছিল না। আমাদের মতন অথচ প্রেন যেই শব্দ কোরে ছুটোছুটি শুরু কোরে দিল ওড়বার জন্তে, আমাদের মনও যেন তোলপাড় শুরু কোরে দিল নেমে পড়বার জন্ত কিন্তু এ শিঞ্জর ভেঙ্গে বেরোবার সাধ্য আর নেই, তখন শুধু এর চলার সাথে সমান তালে মনটাকে চালিয়ে যেতে হবে সমুদ্র পানে।

ভাবতে ভাবতে ঘুরিয়ে পড়েছিলুম কখন জানি না। যুগ জেলে দেখি সমস্ত কামরাটি সুষুপ্তিভেগ-মগন, নীধর নীধর। চারিবার শুধু প্রেন চলেছে হু হু শব্দ কোরে আরব সাগরের উপর দিয়ে। প্রেনের ইঞ্জিনের তলা হ'তে আগুনের বলক বেরোচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে আর নীচের দিকে তাকালে কিছুই দেখবার উপায় নেই, সমস্ত নীচটা মনে হচ্ছিল কুরাশার ঢাকা—সময় দেখবার জন্তে বাড়ির দিকে তাকালুম—ও কি! বাড়ি চলেছে তো? শশর জেগে উঠলো মনে—তাড়াতাড়ি কানর কাছ ধরলুম—বা! টিক্ টিক্ শব্দ কোরে চলেছে তো সত্যি—কি ব্যাপার। আমার বাড়িতে সাতটা হোয়ে গেলে—বাইরের দিকে তাকালুম আবার ভাল করে, কোথাও সূর্য্যামায় এতটুকু বশও দেখতে পাওয়া যায় কি না—কোথাও কিছু নেই শুধু কুরাশার অন্ধকারাচ্ছন্ন চারি দিক। হঠাৎ কানে এলো পাশের সারির বসবার আসন হ'তে কে যেন বলে উঠলেন—কি বোদি! বড় ঝাঁঝার পড়ে গেছেন, বাড়ি আর প্রকৃতির চোরা

বৈষম্য নিয়ে, না ? চমকে তাকিয়ে দেখি, আমাদের সহযাত্রী বাচেলার ইঞ্জিনিয়ার ভ্রমলোক—ভারী মিতকে, বীকার করতে হোল মানর কন্ডকে—ভরসা যদি কোনও সুরাহা মিলে—মুখিল আসান হোল সত্যি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভূগোল একদম ভুল বসে আছি সে খোঁচটুকুনও ইজম করতে খোয়াস হোল—তখন হোল যে আমরা চলছি পশ্চিমের দিকে—পূব গগনকে আলোকিত কোরে তবুই খুঁধাদের দেখা দেবেন পশ্চিম-এর পাশে, তাই প্রকৃতির আবহাওয়ার সঙ্গে ভারতের সময়ের পাঞ্জিলুম না কোনও ঐক্য—স্বপ্নের হোল অবদান, শান্ত হোল মন তখন ।

ঘীরে ঘীরে সিটের গায়ে দেহ এলিয়ে ভাবতে লাগলুম কোলকাতার সকলকার কথা, সবাই কি কছে না কছে এখন—ওখানে নিশ্চয়ই সকলকার দৈনন্দিন জীবনের কার্যখারা শুরু হোয়ে গেছে—যে ঘুপি হাওয়া ভুলেছিলাম কয়েকটা দিনের ভক্ত আত্মীয়-পরিজনদের কাছে, এখন তার অবদান হওয়ায় সবাই ঘীরে ঘীরে আবার ফিরে যাবেন নিজদের দৈনন্দিন জীবনের কণ্ঠস্বর ভেতরে । তবু নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ারা হোতে পারবেন না স্থির—হাত দিন না আগবে সন্ধান হ'তে আমাদের পৌঁছুবার খবর নিয়ে আসা ভরসা তখন !

আমার ভাবনার স্রোতে ভেসে চলার কীকৈ সহযাত্রীরা সকলেই যে স্বপ্নের দেশ হ'তে বাস্তব জগতে ফিরে এসেছিলেন টের পাইনি কিছুই—বানীর আস্থানে চমকে উঠে দেখি, সত্যি সবাই যে প্রাতঃকৃত্য সাগরে তৎপর হোয়ে উঠেছেন—আমার হরনি কিছুই তখনও—ভারতে ভারতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম না তো ? যা হোক চেষ্টা কোরে সবার কীকৈ এক বার আমিও সেবে এলুম—আমার বাঙ্গালী সহযাত্রীরা খুবই ব্যস্ত দেখলুম শিশুদের ভরহ কোরে তুলতে—প্রাতঃরাশ এসে আবার উপস্থিত হবে, তার আগেই প্রস্তুত হবার তোড়জোড় চলছে—বাচ্চারা সারা বর ছুড়ে ছুটোছুটি করছিল, ওদেরই বা দোষ কি ! ঘরের বাঁধনে কতকগুলি আর স্থির হোয় থাকা যায়—মাঝে মাঝে এয়ার হোটেস্ট মিস্ট্রি মিস্ট্রি কথোতে ভুলিয়ে মাস্টারের কাছে এনে দিচ্ছিল—বেশ ভাল লাগছিল শিশুদের কল-কাকলীতে মুখরিত পরিবেশটি—বানী-জ্ঞানালার ধারে বসে প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন—হঠাৎ আমাকে বলে উঠলেন । 'দেখো, দেখো—কি স্নন্দর ! আমাদের কাকনজ্ঞাকে হার মানায় ।' সচকিত হোয়ে বাইরের দিক তাকিয়ে যে দৃষ্ট আমি দেখলুম আমার জীবনে দ্বিতীয় বার সে দৃষ্ট দেখবার সুযোগ হবে কি না জানি না—চারি ধারে কুরাশার চিহ্নমাত্র নেই—সারা সকাল বোদে স্বপ্নময় করছিল । পূবে দিগন্তের গায়ে চল গেছে কত যে পাহাড়ের সারি, গণনা নেই তার !

'পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে, শূন্য আর ধরাভালে মস্ত বাঁধে ছন্দে আর মিলে, বন্যেরে করার মান শরতের বোঁদের সোনালী'—পাহাড়ের চূড়া দেখবার উপায় নেই, সমস্ত চূড়া বরফাবৃত । তার উপরে সকালবেলাকার সূর্যের আলো পড়ে মনে হচ্ছিল বেন কত হীরা হুন্টা মার্ফিকের হুটা শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুহুটা পাহাড়ের চূড়াতে এসে আমাদের সকলকে চমৎকৃত করে দিচ্ছিল । কখনও বা মনে হচ্ছিল পর্তুগাজ তার হীরকখচিত ঐশ্বর্যমণ্ডিত রুহুট মাথার দিয়ে সগৌরবে পাড়িয়ে আছেন দিগন্তের পার ।

ভাব বেধানে গভীর, ভাবা দেখানে দুক—যে সৌন্দর্য আমি

মধ্যে মধ্যে উপলব্ধি করেছি, তার প্রকাশ করবার মতন ভাষা আমার নেই, যেটুকুও ছিল তাও যেন শুক হয়ে গিয়েছে ভাবের আত্মহারা । কতকগুলি যে এ সৌন্দর্য উপভোগ করেছি আমরা তার হিসেব নিকেশ রাখিনি কোনও, খোয়াস হোল যখন বিমান-চালকের কাছে হ'তে খবর এলো কারোতে আবহাওয়া খারাপের দরখ আমাদের প্লেন গতি পরিবর্তন কোরে যাচ্ছে বেকটের অভিমুখে, প্লেন চলছে আরবদেশের হাজার হাজার ফিট উপর দিয়ে, ষটাব্যানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবো আমরা বেকট । বেকট ! সৌন্দর্যের তালিকাতে যে বেকটের নাম শুনে এসেছিলাম এত দিন, স্নন্দর দেশে যাচ্ছি তার জাতাই কি পক্ষে যেতে এত সৌন্দর্যের সমারোহ ? সহরটি না জানি কত বিস্তার মাথানো সৌন্দর্য নিয়ে দেখা দেবে আমাদের চোখে, ভাবতেও পারি না ।

বেকট সহরটি সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশেই যে অবস্থিত, নামবার আগেই পরিচয় পেলুম তার, একধারে তার সাগর অঙ্গধারে বিস্তার পাহাড়ের সারি, মাঝখানে বেকট সন্দর । প্লেন এসে পাঁড়াল পর আমরা ঘীরে ঘীরে সবাই নেমে বিশ্রামাগারের দিকে চলতে লাগলুম, বিরাট আয়তন নিয়ে বিমানঘাটটি অবস্থিত, শুধু বিরাটই নয়, সৌন্দর্যমণ্ডিতও বটে । চারি ধারে ফুলের সমারোহ । ফুলবাগানে গাছ আছে বোলে মনেই হয় না । শুধু মনে হয় খরে খরে বেন নানান রং-বেরায়ে ফুল সাজানো । কালো বকবক তক্তকে প্লেন পাঁড়াবার সমস্ত জায়গাটি । তার থেকে চলে গেছে তেমন মস্তর কালো পথ আমাদের বিশ্রামঘরের দিকে নিয়ে যাবার ভক্ত । শুধু বর বললে ভুল হবে, বিরাট একটি বাড়ী, দোতলা কি তেতলা বোম্বার উপায় নেই । পাহাড়ের বাড়ী কোথাও উঁচু কোথাও বা নিচু, শুধু আমরাই নই, আরো হু'টি প্লেনের বাড়ীও দেখলুম এসে রয়েছে ওখানে । পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীরা তাদের উজ্জল গায়ের রং ও বেশভূষা দিয়ে পরিবেশটাকে যেন আরও স্নন্দর আরও উজ্জল কোরে তুলিচ্ছিল । সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছিল বৃষ্টি বা হলিউডের কোন এক বিনিমিত ছবি দেখছি ।

কারো পৌঁছুতে দুপুর হোয়ে যাবার সম্ভাবনা বোলেই কি না জানি না—বাড়ীরা সবাই দেখলুম নিজের নিজের পাসপোর্ট জমা দিয়ে রিক্রসমেট রুমের দিকে অগ্রসর হোল, আমরাও চললুম সেই সঙ্গে, তারই বা কি স্নন্দর পরিবেশ, উপরতলার চার ধার কাচ দিয়ে ঘেরা মস্ত বড় একটি হলঘরের রয়েছে সাজানো চেয়ার টেবিলের সারি । টেবিলের উপরে কাচের পাত্র পূর্ণ কোরে রয়েছে জলের পরিবর্তে মোসাম্বির রস—ফলের চাইতে জলের নাম বেশী ওখানে—তাই তুফা মোটাবার ভক্তে রয়েছে রসের পাত্র—কিন্তু আমরা হলুম স্নন্দর স্নন্দর বাংলা অধিবাসী—জল চাই আমাদের প্রতি পদে—বাধ্য হোয়ে তাই চাইতে হোল—খাওয়ার তগিবি আমাদের বিশেষ কাকরই ছিল না—শুধু এটা গুটা নাড়াচাড়া কোরে কিছুকণ কাচের মাধ্যমে বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করলুম বসে বসে—ভারী ভাল লাগছিল পরিবেশটি ।

আমার এক সহযাত্রী প্রস্তাব করলেন, সহরটি দেখতে গেলে কেমন হয় ? সানন্দে সবাই রাজী হলুম এ প্রস্তাবে—কিন্তু কতকগুলি আমাদের থাকতে হবে এখানে—বাইরে যাবার অসম্ভবতা হবে কি না, জানবার জতে যাওয়া হোল এবার ইতিমধ্যে কাউন্সিলে । ফুৎরে

# গিনিগোস্ত জুয়েলারি জেমশালিস্ট



মৌলিকতায়  
নির্ভরতায়  
আধুনিকতায়

## এম.বি. সরকার এণ্ড সন্স

ফোন:- ৩৪-১৭৬১ **জুয়েলার্স** গ্রাম-টিলিয়াকুস

১৬৭/সি ১৬৭/সি/১ বহুবাজার স্ট্রীট কলিকতা ১২

ব্রাঞ্চ- বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকতা-২১

শোকুমের পুরাতন চিয়ানা

১২৪, ১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকতা ১২

কেবলমাত্র রবির খোলা থাকে

নতুন ব্রাঞ্চ শোকুম - ডামসেদপুর ফোন: ডামসেদপুর-৮৫৮

বিষয়, অল্পমোদন হোল না ওদের তরফ হ'তে। প্লেন কখন ছেড়ে চলে যাবে স্থিরতা নেই তার কোনও, কারবারে আবহাওয়া প্লেন চলবার উপযোগী হবার খবর এলেই আমাদের অভিধান স্বক হবে কারো অভিযুখে—কাজেই বিফল মনোৰথ হোয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ানুম সবাই—কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বক স্বক তকতক কচ্ছে! বন্দরটি বেশিকৈ তাকাই সেদিকই যেন অপক্লপ হোয়ে দেখা দেয় আমাদের কাছে—স্বাক হোয়ে দেখছিলাম তাই আর মনে হচ্ছিল গতকালও এমনি সময়ে প্রিয় পরিজনদের কত নিকটে ছিলাম আর আশ কত দূরে এক আন্তর্জাতিক পরিবেশের ভেতরে রয়েছি—এ বকম ঘটে ভাবিওনি কোনও দিন। তাই মনে হয় সহস্র দিনের মাঝে এ দিনখানি হবে স্বস্তি চিহ্নন।

কারো বাত্না করলুম যখন, আমাদের ঘড়িতে ভারতের সময় অম্বারী দুপুর এগে গেছে—বীরে বীরে বেরুকে বিদায় জানিয়ে আমরা গিয়ে বসলুম স্বস্থানে। প্লেন সশব্দে ভূমি ছেড়ে পাড়ি দিল সাগরের উপর দিয়ে আকাশপথে—দু'ঘণ্টার ভেতরেই কারো পৌছে যাবে—সাগরের ওপর দিয়েই যেতে হবে প্রায় সাগরী রাস্তা—বীরে বীরে সাগর হ'তে কত উঁচুতে আমরা উঠে গেছি—নীচের দিকে তাকালে ডেউয়ের বাত-প্রতিবাত আর দেখা বাচ্ছিল না—শুধু মনে হচ্ছিল নীচে—বহু নীচে সাধা বগবে বরফের টুকরো সারি সারি জমাট বেঁধে রয়েছে—অভিনিবেশ সহকারে তাকালে দেখা বাচ্ছিল বীরে বীরে সেগুলো আবার মিলিয়েও বাচ্ছিল—সাগরের কোনও প্রতাপই চোখে পড়ছিল না, আমাদের আলোউদ্দিনের প্রদীপের দৈত্যের ভয়াবহ শব্দ শুনে সাগরও যেন মনে হচ্ছিল শান্ত হোয়ে গেছে অনেক!

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার নিজের চোখও যেন শান্ত হোয়ে আসছিল বীরে বীরে—ইচ্ছে হচ্ছিল কিছুকণ সিতের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ দুটো বৃজ্ব বিজ্রাম নিই—কিন্তু সৌন্দর্য্যপিয়ারী মন ভা মেনে নিতে রাজী হোল না—যদি কোনও নতুন সৌন্দর্য্য হ'তে বঞ্চিত হোয়ে বাই আবার? অগত্যা সঙ্গে কোরে নিয়ে আসা একখানা বাংলা বই খুলে বসলুম। কিছুটা সময় বই এর প্রসি, কিছুটা সময় আবার বাইরের প্রতি দৃষ্টি রেখে কিছুকণ চললো এই ভাবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বখ দেখা ও কলা বেচা একসঙ্গে করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হোল না—কখন হ'তে বইটি আমার মনের ও চোখের সমগ্র একাগ্রতা টেনে নিয়েছে ওর দিকে, টেরও পাইনি তা; সামনের সারি হতে যখন বিমানচালকের বিমানের গতি, উচ্চতা ও কার্যোতে পৌঁছবার সময় ইত্যাদি নিয়ে বিবরণ এলো হাতে—খেরাল হোল তখন। আর কিছুকণের মধ্যেই নাকি কার্যোতে পৌঁছে যাবো আমরা—তাড়াতিড়ি আবার নীচে তাকালুম কিন্তু তখন বাচ্ছিলুম আমরা মেঘের উপর দিয়ে, আশেপাশে নীচে সমগ্র মেঘ আর মেঘ—উপর দিকে তাকিয়ে দেখি পরিষ্কার নীল আকাশে—তার নীচে এখানে ওখানে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ঘূরে বেড়াচ্ছে—এই মেঘের ভেতর দিয়েই পথ কোরে নামবে আমাদের প্লেন—কারো যেন আশনাক মেঘের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে, কিছুতেই দেখা দেবে না বা নামতে দেবে না যিকোনো ওর বৃকে—মেঘের মধ্য দিয়ে বাচ্ছিলুম দেখে ভয়ও হচ্ছিল আবার পুলক জাগছিল। মনে মনে হচ্ছিল যেন কি

গেছি আমাদের সেই পূর্বকোর যুগে—পাড়ি দিয়েছি পুশক যুগে কোরে মেঘের বাজাতে—শুধু দুঃখ—সে যুগের পুশক যুগ হোত না কোনও দুর্ঘটনা, এ যুগে সেটা আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তাই মেঘের রাজ্য পার হোয়ে বতকণ না পৌঁছুবো আমাদের এ যুগের মিশরের মাটিতে, ভয়ও কাটবে না মন হতে।

বা হোক, মানে মানে তো গিয়ে নামলুম কার্যোতে—আসবার আগে কত আলাপ আলোচনার কেন্দ্র ছিল এই কার্যো—কি দেখবো কি জানি না দেখবো। প্রাচীন সভ্যতার সীলভূমি এই কার্যো নগরীতে—প্রথমতঃ এয়ার পোর্টটি দেখেই মনটা গেল দমে। একটি আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটি আরেকটু উন্নত ও সুস্ত্রী হওয়া অন্ততঃ উচিত ছিল মনে হয়, কিংবা বেকটের মৃত্যিতে মনটা ভরপুর ছিল বোলেও বোধ হয় ওর পাশে আর কাউকে সে বকম পছন্দ হচ্ছিল না—কিন্তু আমার সঙ্গিনীদেরও দেখলুম তাই মত—মনের এই অবস্থার কাকরই আর ভাল লাগছিল না বিমানঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে—বিমানঘাঁটিটি তখন আবার সংস্কার করা হচ্ছিল, তার জন্তেই যেন আরও গোলামেলে ও অল্পের লাগছিল সব কিছু আমাদের কাছে।

পাসপোর্ট, সহরে প্রবেশ করবার ও থাকবার অল্পমতিপর আদার ইত্যাদির হাঙ্গামার কেটে গেলো বেশ খানিকটা সময়। সব কিছু সেয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি, সুদান সরকারের তরফ হ'তে একজন সুদানী ভ্রমলোক অপেক্ষা করছেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্ত—সুদানী যখন তখন তো নিশ্চয়ই নিগ্রে! কিন্তু নিগ্রেদের যে ছবি মনে আঁকা ছিল এ তো সে বকম মোটেও নয়। বঃ অবস্থি খুবই কালো, চুলও সব কুঁকড়ে কুঁকড়ে রয়েছে কিন্তু আর সব কিছু তো আমাদেরই মতন। পোষাকেও দিবা বিলাতী ভাবাপন্ন, কথাবার্তাতেও ভারী ভদ্র। কার্যো এয়ার পোর্ট দেখে মনটি দমে গিয়েছিল যেমনি, ভ্রমলোকের সাথে পরিচিত হোয়ে সুদানীদের স্বক্কে যে ভয় ভাবনা ছিল মনে তা কেটে বাওয়ার ভেতমনি আবার উৎসাহিত হোয়ে উঠলো। একটা দিন কার্যোতে থাকবার ও পরদিন সকালের প্লেনে খারটুমে যাত্রা করবার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন, এখন শুধু হোটেলের দিকে বাবার অপেক্ষা—বেশ খুশী একটি হোঁরা লাগলো মনে। কার্যো সহরটি ঘুরে দেখবার অবকাশ হোল দেখে সবাই বেশ প্রফুল্ল মনেই চললুম বিমান কোম্পানীর গাড়ীতে কোরে হোটেল অভিমুখে।

কার্যোতে আমাদের যে হোটেল থাকবার ব্যবস্থা করা হোয়েছিল, সেটা বিমানঘাঁটি হ'তে বেশ খানিকটা দূরে—শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল বোলে বাবার পক্ষেই আমাদের শহরের বেশ খানিকটা দেখা হোয়ে গেলো—রাস্তাগুলো মন্ত চওড়া—মাথখান দিয়ে চলে গেছে ট্রামের লাইন এঁকে বৈকে—তার দু'ধারে মোটার চালাবার রাস্তা—ফুটপাথগুলো ভারী সুন্দর—সবুজ মঞ্চলের মতন সবুজ বাসে বিছানো, তার মাঝে মাঝে আবার ফুলের কেয়ারী—ছোট ছোট নানা রংয়ের ফুল ফুটেছিল তাতে। বেতে বেতে পথে ফুলের সমাবেশ দেখতে পেলুম অনেক জায়গাতেই—পথিকের চোখে নয়নাভিরাম কোরে তুলবার ভারী সুন্দর প্রয়াস—মিশর শুধু সুন্দর নয় সুস্টি সম্পন্নও বটে—বাড়ীগুলোও বা কি সুন্দর, ভেতমনি তার রংয়ের সমাবেশ,

তেমনি গঠন-নৈপুণ্য—পাখরের তৈরী বাড়ীগুলো মনে হোল সব—হবে নাই বা কেন। পিরামিডের দেশ এই কার্যের—ঐর্ষ্যা ও শিল্পকলায় কেন্দ্রভূমি—তাই এখা শিল্পচাতুর্য্য মনপ্রাণ যুক্ত হোয়ে বাবে বেশী কথা কি আর। বিমানবাঁটিটি শুধু দেখলুম এর ব্যতিক্রম, অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য। হোটেলের পৌছে কিন্তু আর ভর সইছিল না—ভাবছিলুম শুধু বখান নিশ্চিষ্ট ঘরটিতে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম করবো, বিশেষতঃ আমার সহযাত্রিনীরা বাচ্চাদের সামলে নিয়ে চলেতে বেশ কাতিল হোয়ে পড়েছিলেন—বখান ঘরে গেলুম সত্যি ভারী ঢাল লাগলো মনে—ঘরটিও ছিল ভারী সুন্দর—আরাম উপভোগ্য বংবার প্রয়োজনীয় সবকিছুই ছিল তাতে—কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সন্ধ্যা সন্দের ঘরে খুব ভাল কোরে স্নানটা সেয়ে নিলুম আগে—ভারী আরাম ও তৃপ্তি লাগছিল মনে—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম বামী আবার প্রতীক কোরে বোসে আছে নতুন নির্মল ধারার শরীর ও মন স্তিমিত্ব কোরে তুলবার জন্তে—তারপরে যোগব্রহ্ম পোষাকে সজ্জিত হোয়ে নিলুম খাবার ঘরে খাবার ভাও—উনিও দেখলুম বেশ তাড়াতাড়ির সহিত কোরে এলেন স্নান—নিশ্চয়ই তাহলে ক্ষিদে তপিয়ে। বামীর তৈরী হবার অবসরটুকুনে যোন কোরে জেনে নিলুম সহযাত্রী যাত্রিনীরা সবাই প্রস্তুত হোয়েছেন কিনা—বাচ্চাদের ঘরেই খাওয়ানো সাক কোরে সবাই চলছিলেন খাবার উদ্দেশ্যে—সহযাত্রী দেওরটির ঘর হ'তে কিন্তু কোনও সাড়াই পেলুম না, হয় তো খাবার ঘরেও গিয়েই অপেক্ষা করছে সকলকার জন্তে।

সত্যিই তাই—মস্ত বড় টেবিলের একটি আসন দখল কোরে খাবার ঘরের ম্যানেজারের সঙ্গে বেশ গল্প গমিয়ে তুলেছেন—আশে-পাশের টেবিলগুলো প্রায় খালিই ছিল—আমরাই বোধ হয় সর্বশেষ খাবার ঘরের অতিথি—মেহু এলো আমাদের কাছে অনুমোদনের জন্তে কিন্তু সারা তালিকা খুঁজেও পেলুম না আমাদের প্রিয় ভাত ও মাছের বোল—ইংলিশ হোটেল, তাই সবই প্রায় ইংলিশ খানা—জাঙ্গা সদ্ধ নরমতা কাঁচা—খেতে হবে পাটকট সহকারে—কি কি আনবার জন্তে বলেছিলেন এখন আর মনে নেই, শুধু মনে আছে আমাদের তিনটি বাঙ্গালী মেয়ের আধপেটা খেয়েই ফিরে আসতে হোয়েছিল ঘরে।

ক্রি ক্রি—ক্রি—ঘুম-জড়ানো চোখে বিসিভার তুলে ধরতেই শুনেতে পেলাম তাড়াতাড়ি তৈরী হোয়ে নেবার জন্তে জোর তাগাদা—ওরে বাবা! এর মধ্যে চারটে বেজে গেলো! তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম—বেতে হবে পিরামিড দর্শনে, তাই তাড়াতাড়ি সব কিছু সেবে দ্বিতীয় বার ক্রি ক্রি করবার আগে বগনা হোলুম নীচের উদ্দেশ্যে। গিয়ে দেখি, আমাদের গ্রুপের ভেতরে সিনিয়র ভ্রমলোক (মিস্টার সাহেব) ম্যানেজারকে মধ্যস্থ রেখে হু'খানা ট্যাক্স ঠিক করেছেন, ম্যানেজারের সঙ্গে ট্যাক্সিগালকের কি কথা হোল জানি না—হু'খানা ট্যাক্সিট শেষে ঠিক হোল পিরামিড ও সমস্ত শহর ঘুরে দেখাবার জন্তে। হুগা হুগা যরণ কোরে বগনা হলুম, একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে নিলুম—কে বুঝিয়ে দেবে সবকিছু ঠঠবোয় ইতিবৃত্ত। আমাদের ডাইভারকে দিয়েও হয়তো হোতে পারতো সে কাজ কিন্তু আরহী ভাষা ভদের তখন যে ছিল আমাদের কাছে 'ইচির মিচির' ছাড়া আর কিছু নয় কিন্তু এখনও কি খুব রপ্ত করতে পেরেছি? মালী বা চাকরের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তো বরফত পানি তা বা শুকনো খটখটে ভাবা।

যা হোক, গাড়ী হু'খানা তো এগুতে লাগলো বীরে বীরে, যাতে সব কিছুই বেশ ভাল কোরে দেখতে দেখতে যেতে পারি—সবচাইতে বাড়ীগুলোই যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী। নীল নদের ধার দিয়ে এ যাত্রা চল গেছে পিরামিডের দিকে। নদীর ওপারে দেখা যাচ্ছিল নানান বকম নাম না জানা শতের ক্ষেত—নীল নদের কল্যাণে শতসত্তার পরিপূর্ণ কার্যের শহর ছোট ছোট গাছগুলোকে হেলিয়ে ছুলিয়ে বেশ স্তম্ভর মিঠে মিঠে হাওয়া বইছিল। বিকেলটিতে ডিসেম্বর হোলে কি হবে, ভারী আবহামায়ক মনে হচ্ছিল হাওয়াটি। এক দিকে প্রকৃতির অনবদ্য অবদান অপর দিকে মানুষের তৈরী অশুর্ক শিল্পচাতুর্য্যের সমাবেশ—তাইই ভেতর দিয়ে সবকিছু উপভোগ করতে করতে আমরা চলেছিলাম পৃথিবী বিখ্যাত পিরামিড দর্শনে।

পিরামিড নদীর এপারে নয়, ওপারে। তাই সেতু পার হোয়ে যেতে হোল ওপারে। দূর হ'তেই দেখা যাচ্ছিল মিশরের প্রাচীন সভ্যতা ও ঐর্ষ্যের প্রতীক পিরামিডের সুউচ্চ শিখর—কি বিরাট তার আয়তন, যেমনি দৈর্ঘ্যে তেমনি প্রস্থে, মাথা উঁচু কোরে দেখতে দেখতে বাধা ধরে যায় যেন—দেখতেই হাক পবিশ্রম হয় তৈরী হ'তে সেটা কত লক্ষ লোকের না জানি পরিশ্রম-সাধন ছিল! কিন্তু কি এমন প্রয়োজনীয়তা ছিল এর? ফারাওদের খেলাচ চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছু কি? বাজ জন্তেই হোক, আজ বিশেষ দরবারে প্রাধান্য আশ্রয় সমূহের ভিতরে মিশরের পিরামিড একটি অস্তিত্ব আশ্রয়—কত দূর দূরান্তর হ'তে দর্শকের দল ছুটে আসে শ্রদ্ধাপূত চিত্তে শুধু একটিবার দেখবার জন্তে—ঐতিহাসিকদের কথা তো ছেড়েই নিলুম—দিনের পর দিন তারা কাটিয়ে নিতে পারে এই পিরামিডের গবেষণার পিছনে—ভিতরে নাকি দেখবার আছে এর অনেক কিছুই কিন্তু কি কারণে যেন সম্ভব হোল না আমাদের পাঙ্ক—মনে মনে কিন্তু আমি খুশীই হোয়েছিলাম—মোটো উৎসাহ ছিল না মনে, তার চাইতে মনে হচ্ছিল নীল নদের ধারে বসে কায়রোর দিকে তাকিয়ে থাকলে মনটা তৃপ্ত হোত বেশী—বিরাট পিরামিডের বিরাট সৌন্দর্য্য আমার মনে আগাচ্ছিল শুধু এক প্রাথমিক দৃষ্টি, আর কিছু নয়—সাধারণের চোখে হয়তো এর সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে না, তাই এতদিনকার জল্পনা জল্পনার আধার পিরামিডের সৌন্দর্য্য ভাগ্যে পাতেনি আমার মনে কোনও আনন্দ—শুধুই যেন ছিল হতা ও বিষয়।

পিরামিডের কাছে বিশার দিয়ে আমাদের চলা শুরু হোল এবার শহরের দিকে, তবে অল্প পথ দিয়ে যেতে যেতে একটি মস্ত বড় ঝোড়ারা নিয়ে ঘেরানো একটি জায়গাতে—আমাদের গাড়ী দাঁড়ালো—ঝোড়ারা তো নয়, যেন শুধুই লাল নীল নানান বর্ণের বাহারের ছটা—চারদারে এরকম নানান বকমের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হোতে থাকার ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল দূর হ'তে—আমরা সকলেই নেমে বেশ ভাল কোরে দেখলুম—গাড়ী হতে নেমে যেন কার্যরার আরেক অভিনব মৃতিও দেখতে পেলুম—বুলগেরিয়ার আগমনে কোলকাতা শহরের এক আলোকমালার সজ্জিত বেশ দেখে এসেছিলাম—মনে ভাসছিল সে ছবি—এখানেও দেখছি তেমনি নানা রংবেরংয়ের আলোর সাজে সজ্জিত বেশ—তবে কি কার্যরাতও সাজ সাধ সব সাজা পাড়ে গেছে তেমনি কোনও সম্মানিত অতিথির আগমন সম্ভাবনার? পথপ্রদর্শক আমাদের সে তুল ভেঙ্গে দিল—সমস্ত শহরটি প্রাতি রাতেই এমনি আলোকমালার সজ্জিত বেশ ধারণ করে, বিশেষ তার কারণ নেই

কোনও—তবে দুই হাতে যে সব দর্শকের দল ছুটে আসে কারবোর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করবার জন্ত, তাদের চোখে নিজেকে আরও সুন্দর—আবার অভিনব কোবে তুলবার জন্তই হয়তো এই আলোর সমারোহে সমারূঢ় থাকে সুন্দরী কারবো নগরী।

গাড়ীতে উঠে ঠিক হোল আবার নামা হবে না, শুধু গাড়ীতে কোরে ঘুরে ঘুরে দেখা হবে—তথ্য! হোটেলের যে ফিরে যাবার প্রস্তাব তখন ভাগিয়া—কত রাস্তার উপর দিয়ে কত কি দেখতে দেখতে গেলুম। পথপ্রদর্শক সঙ্গে সঙ্গে বলে যাচ্ছিল সবাকার নাম থাম পবিত্রের কিন্তু আমার মন ছিল না মোটেও তাতে—যা সুন্দর, যা মধুর—যা দেখে মনপ্রাণ হবে তৃপ্ত তার দিকেই শুধু আমার দৃষ্টি—কি হবে তার পেছনের নাম গোর কশপরিচয় জেনে—একটি শহর কত সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হোতে পারে তাই শুধু দেখছিলাম ছানয়ন ভাবে। কিন্তু একটি প্রশ্ন মাঝে মাঝে মনকে নাড়া দিয়ে উঠছিল, পারলুম না আর তাকে দাবিয়ে রাখতে—সকল শহরেই তো যেমনি থাকে নতনের অস্তিত্ব তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পুরাতনের অবস্থিতিও কিছু না কিছু থেকে যায়—এতদিনকার পুরোনো শহর, নিশ্চয়ই আছে এবং ছোট ছোট বিজিগলি ও বস্তির সারি কিন্তু কোথাও আমাদের চোখে পড়লো না তো সে সব। গাড়ীতে ছিলেন সঙ্গ স্বামী ও এক মজুমদার ভ্রমলোক পরিবার নিয়ে—কথাটা শুনে তেমনই উল্লসন, যেন কত হাসির কথা এটা—এখানে নাকি কোনও কিছুই অসুন্দর বা চোখের গীড়াময়ক ভোয়ে থাকতে পারে না—নিতি নতন সজ্জরণ ও পরিবর্তনের ফলে এদের যা মলিন ও অসুন্দর ছিল—তাই নাকি তোরোতে এখন সৌন্দর্য্যে রূপান্তরিত। মন মানতে চাইলো না তা—হোতেই পারে না তা—নিশ্চয়ই পথপ্রদর্শক আমাদের কাছ হতে আড়াল কোরে রাখবার চক্র নিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়নি সে পথে আমাদের দেশের পথপ্রদর্শকও কি নিয়ে যেতো কোনও বিদেশী দর্শককে দেখাবার জন্ত চিংপুর বা বড়বাজারের কোনও রাস্তাতে? বা হোক, বেশী বাক্যব্যয় কোরে সময় নষ্ট করবার ইচ্ছে হোল না আর—চুপটি কোরে শুধুই দেখতে লাগলুম যা কিছু পড়ছে পথে যেতে যেতে।

হোটেলের যখন কিরলুম, তখন 'খাবার সময়' হোয়ে গেছে, অর্থাৎ তখনও চা খাওয়া হয় নি—খেলটি ছিল না একদম—ঠিক হোল চা খেতে, তার পর কিছুক্ষণ বসে না হয় রাতের খাওয়া হবে। চা খেতে খেতে বেশ গল্প-গুজবও চললো খানিকটা, 'জঁজন' সহযাত্রীরা চলে গেলেন যার, বাচ্চাদের ব্যবস্থা করবার জন্তে। আমরা রাস্তার ধারের লবিতে বসে দেখতে লাগলুম রাস্তার লোক চলাচল ও যানবাহনের আনাগোনা—কতক্ষণ বসেছিলাম এমনি ভাবে, খেয়াল ছিল না। সস্ত্রীদের পুনরায়গমনে সচেতন হোয়ে উঠলুম, ওখান হ'তেই খাবারের উদ্দেশ্যে চললুম। এবারে দেখলুম, খাবার-ঘর নানা অতিথির আগমনে সরগম—মিষ্টি মিষ্টি বান্ধনা বাজছে একটু দূরে। এক কোণ হ'তে নানান বর্ণের ফুলের তোড়া শোভা পাচ্ছে—সব টেবিলেতেই জোবালো আলোতে আলোকিত ঘরটি। সব কিছুই সমাবেশে ঘরানা মায়াপুরী বলে ভ্রম হচ্ছিল, যেন সব জায়গাতেই কি কারবোর জাঁকজমক ও আলোর সমারোহ। বা হোক, পাওয়া তো হোল একদল, খাওয়ার চাইতে সত্যি বলতে কি পরিবেশই

কত সুন্দর ও সুন্দরীরা আদর্শ-বাচ্চ, হাতে-পাতে ঘরনানাকে আমোদিত করে তুলছে—কেউ কেউ শুধু 'ড্রিক' কোবেই চলে বাচ্ছে আবার বাইরে। 'ড্রিক' করাতা ওদের কাছে যেমন আমাদের কাছে জল পান করা, শুধু আমাদের টেবিলটি ছাড়া আর সর্বত্রই হচ্ছিল প্রচুর এর সবরস। দেখতে বেশ লাগছিল, সব কিছু মিলে কিন্তু বেশীকণ বসবার জো নেই, কাল সকালেই আবার রওনা হতে হবে স্থানীয় রাজধানী খারটুম অভিমুখে—তাই পরদিন ভোর ৫টাতে প্রান্তরাশের ব্যবস্থার কথা বলে আমরা যে বার ঘরে চললুম শুভরাত্রি জানিয়ে।

আগে আগে ছায়ায় ভেতর দিয়ে আমাদের গাড়ী চলছে বিমানঘাঁটি অভিমুখে—পথে যেতে আরেকটি হোটেল হতে গেলুম ইস্কুলের ছাত্রী কয়েকটি, ভারী সুন্দর দেখতে ও সঙ্গে তাদের একজন মিস্ট্রিস চলছে খাটুমে। ছুটি উপলক্ষে প্রিয়-পরিজনদের কাছ, মিস্ট্রিস অবিরত সঙ্গে যাচ্ছিল শুধু এয়ার-পোট অবধি ৬দের বাত্মাখে বিদায় ভানাবার জন্ত। ভাগা ভাগা ইংরিজিতে ভারী টিটি কোরে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, মেশবার জন্ত 'হ' পক্ষই আগ্রহীল কিন্তু মাকখানে বরোহে ভাষার ব্যবধান—ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই মনে ভাব আদান-প্রদানের।

এয়ার-পোট বধ্যসময়ে পৌঁছবার বেশ খানিকক্ষণ পরে আমাদের যাত্রা হোল সূর্য খারটুম অভিমুখে—এবার আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নয়, মরুভূমির সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে যেতে হবে। সে যে কি ভোগ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করছি তা তার জন্তই বোধ হয় যথেষ্ট স্থানের সীমাবোধের বিশ্রামের জন্ত একটি বিমানঘাঁটি। ওয়াদীহালকা তার নাম—শুধুমাত্র একটি ঘর, আশেপাশে ছায়া আর নেই কোনও ভনবসতির চিহ্ন। জানি না, এ দেশে কেউ বাস করে কি না আর করলেও কি তাদের উপজীবিকা। শুধু বালি আর বালি—চারি দিকে ধূধু বরছে মরুভূমি, কোনও দিন এখানে বৃষ্টি হয় না, এই নাকি এই জায়গাটির বিশেষত্ব। সহজেই তা হোলে বুঝতে পারা যায়, জায়গাটির মাহাত্ম্য। তাই সবুজের অভিধান নেই এর ধাবেকাজে কোথাও। সমস্ত দেহ-মন যেন আকুল হোয়ে উঠছিল একটুখানি ধরিত্রীর সবুজ গ্রামলিমা রূপ দেখবার জন্ত, কিন্তু কোথায় পাবে তা?

কিমান্দ্যমতঃপথম। ওয়াদী হালকা পান হোয়ে খাবার কিছু পর হ'তেই স্থানীয়র জন্ত এক মাধুর্য্যমণ্ডিত মৃষ্টি—সাহারা প্রান্তরে কোনও প্রান্তরই আর বিস্তার করতে পারেনি তখন স্থানের বুক—উত্তর প্রান্তে বহি বা কিছু থেকে থাকে মধ্য বা দক্ষিণ প্রান্তে মোটেও নেই বলা চলে—নীল নদের আশীষাবারি সূর্য সেখানে—এক পাশে নীল নদকে রেখে আমাদের গ্লেন চলছিল খারটুমের দিকে—নীল নদের আশে-পাশে সর্বত্র সবুজের সমাবেশ—দেখে রেখে যেন আর চোখের ডুকা মেটে না—শ্যামল বাজলার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল আমাদের সে দৃশ্য—সমস্ত মনপ্রাণ যেন উগুধ হোয়ে উঠেছিল এ দৃশ্য দেখবার জন্ত। এত শীগগির তো দুবের কথা, দেখতেই আর পাবে কিনা সে বিষয়েই যথেষ্ট আশঙ্কা জাগছিল মনে। ওয়াদী হালকা থেকে দেখে তখন আবার শঙ্কা জাগলো মনে। আমাদের গন্তব্যস্থল কেমন হবে আবার কে জানে। মরুভূমির দেশে তো দেখছি কিছুই ঠিক নেই। এই শুকনো খটখটে ধূধু বরছে বালির দেশ, আবার কিছু দূরেই

শান্ত বিধু সূক্ত গ্রামল ভূমি! ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম এক গ্রীক ভ্রমলোককে (যাবসায় উপলক্ষে স্থলানেই বসতি) আমাদের জায়গাটির নাম কোরে কেমন হোতে পারে তার আবহাওয়া ও পরিবেশ—উত্তর শুনে তো হতবাক আমি—সমগ্র স্থলানের ভেতরে নাকি ওটি সব চাইতে মনোরম স্থান এবং সবুজের দেশ (Green land of Sudan) বলা হয় স্থলানের।

বিকেল তিনটে নাগার আমরা গিয়ে পৌঁছলুম খারটুম বিমান-ঘাঁটিতে—স্থলান সরকারের Chief Hydrologist ছিলেন একজন ভারতীয় Mr. Rajadaksha অবিভি তিনি এখন আবার কির গেছেন ভারতেই Mr Rajadaksha এবং স্থলান সরকারের তরফ হ'তে আরেক জন স্থলানী ভ্রমলোক উপস্থিত ছিলেন আমাদের বিসিভ করবার জন্তে। নেমেই একজন ভারতীয়কে দেখতে পেয়ে খুব ভাল লাগলো মনটা—উনিও এত দিন বাবে একসঙ্গে বেশ করেক জন ভারতীয়কে দেখতে পেয়ে ভারী খুশী, উত্তরেই খুব সমায়ের সঙ্গে গ্রহণ করলেন আমাদের। তারপর বখারীতি নিয়ম কাছনের বাগা-বিশপ্তি উত্তীর্ণ হোয়ে বওনা হোলুম অবশেষে ওদেরই জানীত গাড়ী কোরে আমাদের জন্তে নির্দিষ্ট হোটেল অভিমুখে।

খারটুমে নেমেই 'স্থলানের পথের সমাপ্তির-বেশা টেনে দেওয়া উচিত ছিল বোধ হয় কিন্তু আমাদের প্রকৃত গন্তব্যস্থলে বাবার পূর্বে রাজধানীতে দু'টো দিনের অবস্থান কালের শুধু একটি ঘটনার উল্লেখ করেই আমরা এ বাস্তবপথের কাহিনীর বহনিকা টেনে দেবো আমি।

পৌঁছবার পয়ের দিন সকালে স্বামী ও ব্যাটলার ভ্রমলোক সক্রবতী (মাসখানেক হোল অবিভি ব্যাটলার নাম বুচে গেছে) বেরোলেন traveller's cheque ভাঙ্গাবার জন্তে ব্যাঙ্কের ইচ্ছা—Mr. Rajadaksha অথবা Indian Embassy'র সাহায্য ইচ্ছা হোলেই নিতে পারতেন কিন্তু সামান্য এ কারণে গদের সাহায্য আর চাইলেম না, বা হোক ওদের সঙ্গে আমিও ললুম এই সুযোগে খারটুমও একটু বেশ বোরা হোয়ে বাবে মনে করে। বাস্তা-ঘাট একেবারেই অপরিচিত শুধু নয়, ব্যাঙ্ক সহরের কান দিকে অবস্থিত তারও কোনও নির্দেশ জানা নেই আমাদের। গান্নি নেবারও ভরসা নেই, যদি কোনও কারণে ব্যাঙ্ক বন্ধ কে থাকে অথবা Cheque ভাঙ্গানো না বায় বুকিলে পড়তে হবে হোলে—হাতে নেই একটিও স্থলানী মুদ্রা—বেতে হবে তাহোলে তার নেই Embassy অথবা Mr. Rajadaksha'র কাছে সাধ্য প্রত্যাশার।

তিন ঘন্টা হাটে স্ক্র করলুম—যেতে যেতে পথের ধারে একটি শ বড় বকমের লোকানের সামনে দেখলুম হু'ল ভ্রমলোক (গ্রীক বা উপসিয়ান) কথা বলছেন গাড়ীতে—National Bank of Egypt এর পথের নির্দেশটুকু একটু পাখার আশায় ওদের কাছে

গিয়ে জিজ্ঞেস করা হোল—প্রথমে চাইলেন বোঝাতে কিন্তু তারপরে আমাদের না জানার ভাবা বুঝতে পেয়ে কি না জানি না নিজেই বললেন তাদের ভেতর একজন আমাদের পথ দেখিয়ে দেবার জন্ত—পথ হ'তে একটি হেলি ট্যান্ডিও ডেকে নিলেন আমাদের কিছু বলবার অবসর না দিয়েই—পাড়িতে যেতেও বেশ খানিকটা সময় লাগলো আমাদের ব্যাঙ্কে পৌঁছতে।

Bankএ দেখলুম ভ্রমলোক বেশ পরিচিত সকলকার সঙ্গেই—যাবসায় উপলক্ষে বহুদিন ধরে বসবাস এখানে, এটুকু শু শুনেছিলাম ভ্রমলোকের স্বপক্ষে—ব্যাঙ্কের কাজও সুন্দর ভাবে সবকিছু সমাধান হোল ভ্রমলোকের সাহায্যে এবং বেশ অল্প সময়ের ভেতরেই—তারপর ব্যাঙ্ক হতে কোথায় আমরা যেতে চাই জানতে চাইলেন—আমাদের পরবর্তী বাবার কাছগা ছিল Indian liason Offices এর বাড়ীতে—কিন্তু ভ্রমলোকের অমূল্য সময় এ রকম কোরে নষ্ট করবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না—তাই অনেক বক্তব্য জানিয়ে আমরা নিজেরাই যেতে পারবো এবারে জানালুম—কিন্তু Liason Offices এর বাড়ীতেও এই প্রথম আমাদের দাওয়া কেনে নিয়ে হরতো বুঝতে পারলেন সে পথও আমাদের একেবারেই অপরিচিত। কিন্তু টাকা ছিল তখন আমাদের সঙ্গে, তাই আমরা ভরসা পাচ্ছিলুম যেতে যেতে—আমাদের সকল আপত্তি হাসিমুখে মেনে নিয়ে আবার চললেন আমাদের নিয়ে গিয়াসন অফিসের বাড়ী অভিমুখে—ভ্রমলোকের অবাচিত এই রকম সাহায্যে ও অমারিক ব্যবহারে আমরা ভারী মোহিত হোয়ে গিয়েছিলাম—শুধু তাই নয়, পথব্যস্থানে পৌঁছে উনি নিজেই এবারে বিদায় চাইলেন এই বোলে, এ স্থানের ধারে কাছে ট্যান্ডি মোটেও মিলতে চায় না, তাই আমাদের প্রথম থেকে নিয়ে বাস্তা ও আসার গাড়ীটি কোরেই কির বেতে চান উনি স্বস্থানে—কিন্তু তা কি কোরে হয় ট্যান্ডির সকল পাওনা যে আমাদেরই চুকিয়ে দেওয়া উচিত—ভ্রমলোক এ থেকেও নিরস্ত কোরে দিলেন আমার হু'ল সন্ধীকে তার নীরব হাসি ও বিনীত আপত্তিতে, এ এমন একটি ব্যাপার খুব বেশী জোরও করা চলে না এতে—বাধ্য হয়ে কান্ড হোলেন সন্ধী হু'লন, ট্যান্ডির ভাড়াটা কিছুই নয় কিন্তু এ উপলক্ষে একজন বিদেশী ভ্রমলোকের যে উদারতা ও মধুর ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হোলুম আমরা চিরকাল তা থেকে বাবে আমাদের যুতির মণিকোঠায়। কত ভাবনা চিন্তা ও কত কশর নিয়ে এসেছিলাম এবাসে—তাই ভ্রমলোককে নিয়ে বখন ট্যান্ডি দ্ব হ'তে দ্বাভরে মিলিয়ে যেতে লাগলো তখন শুধু কবিরের কথাগুলো কানে বাজছিল, "আছে আছে প্রেম ধূলার ধূলার, আশা আছে নিখিলে। মিথ্যার ঘেরা ছোট কণাটির তুচ্ছ কবিতা দেখিলে।" এবাস কোথাও শহিরে, শহিরে জনমে জনমে মরণে। বাহা হই আমি তাই হয়ে রব সে গৌরবের চরণে।"

... এ সমস্র প্রচুদপট ...

এই সখ্যার প্রাঙ্কে দিলওয়ারা মণিরে বেক-প্রভবে  
বোধিত একটি ভক্তের আলোক-চিত্র মুদ্রিত হয়েছ। চিত্রটি  
ঐহিরি পক্ষোপাখ্যার দ্বারীত।





[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

ফেং চেন্‌শিয়াংএর সঙ্গে ওয়াংদের আলাপ খুব বেশী দিনের নয়।

বছর খানেক আগে একদিন সন্ধ্যাবেলা চিয়েং-চাং হঠাৎ এনে হাজির করেছিলো চেন্‌শিয়াংকে।

জেনী তখন রান্নাঘরে। মিনি সবে মাত্র ফিরে এসেছে লণ্ডির পোকান থেকে। বুড়ো ওয়াং একটি দীর্ঘ দিবানিদ্ৰা শেষ করে উঠেছে কিছুক্ষণ আগে।

ওয়াংদের পরিবার এমনি খুব সাদাসিধে। অবস্থা বৃদ্ধল হলেও নিজেদের চলাফেরা আদব-কায়দায় সাধারণ চীনা পরিবারের সমস্ত শ্রমাই বজায় রেখেছে। সম্প্রতি ছেলে-মেয়েরা ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া শিখলেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কোনো কিরীসীরানা ঢোকেনি তাদের বাড়িতে।

কিন্তু বুড়ো ছেলে চিয়েং-চাং বংলাতে সুরু করেছিলো সম্প্রতি। দেখা গেল, হলিউডের ছবি দেখতে দেখতে তার ইংরেজি কথাবার্তা একটু আমেরিকান ঢঙের হয়ে যাচ্ছে, তার চীনে কথার মধ্যে অনেক আমেরিকান বুকনি, গলায় ভুমকালো টাই, কিংবা গায়ের উগ্র রঙীন হাওয়াইআন শাট।

এ সব বর্বরদের দেশে বসবাস করার কোনো মানেই হয় না, সে বলতে সুরু করলো, “দেশ বলতে আমেরিকা। ওদের দেশে কী ক্রীডম।”

“সেখানে গিয়ে থাকলেই পারো,” জেনী একদিন হেসে বলেছিলো।

“স্বরণ পেলেই চলে যাবো,” উত্তর দিয়েছিলো চিয়েন-চাং, “হয়তো স্বরণ পেয়েও যাবো শীগগিরই।”

জেনী অবাক হয়েছিলো। সে বলেছিলো হাকা ভাবে এক তাতে চিয়েং-চাং এতটা গুরুত্ব আরোপ করবে ভাবতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিলো, “সত্যি সত্যি?”

চিয়েন-চাংএর হাসি দেখে বুড়ো ওয়াংও একটু চিন্তিত হয়েছিলো। জিজ্ঞেস করেছিলো, “স্বরণ পাবে মানে? স্বরণের চেষ্টা করছো নাকি?”

ছেলে উত্তর দিলো, “চেষ্টা তো করছি বেশ কিছু দিন থেকে। এখন যোগাযোগ একটু হয়েছে। আমার এক বন্ধর একজন

আমেরিকান বন্ধু আছে। সে এখানে কনস্ট্রাক্টে চাকরি করে। তার বাবার মস্তো বড়ো ফার্ম নিউ ইয়র্কে। সে তার বাবাকে লিখেছে, আমার একটা ব্যবস্থা যদি করতে পারে। ওর বাবার চিঠি পেলেই পাসপোর্টের জ্ঞে প্রণয়ি করবো। তিনা পেতে কোনো অশ্রুবিধাই হবে না।”

বুড়ো ওয়াং কোনো উত্তর দেয়নি।

মিনি শুধু হেসে বলেছিলো, “ওখানে গিয়ে একটি হলিউডের ঠাঁয় বিয়ে করতে ভুলো না।”

“করবোই তো,” বলেছিলো চিয়েং-চাং, “আমাদের এখানকার মেয়েদের চাইতে ওরা অনেক ভালো। তোমরা না জানো কথা বলতে, না জানো চলাফেরা করতে, না জানো মিশতে। আর ওদের মেয়েদের দেখ! কী সহজ ভাবে নেয় জীবনটাকে। তোমরা জানো রান্না করতে, ছেলেমেয়ের মা হতে। আর কিছু জানো না।”

“রান্না করতে, ছেলেমেয়ের মা হতে যে জানে,” বুড়ো ওয়াং আন্তে আন্তে উত্তর দিয়েছিলো, “সে মেয়ে সবই জানে।”

সে কথার উত্তর না দিয়ে চিয়েন চাং বলেছিলো, “জীবনে কিছু করতে চাও তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো, বাইরে চলে যাও, যে দেশ বড়ো হয়ে যাচ্ছে সেখানে যাও।”

“আমাদের দেশও তো বড়ো হচ্ছে, সেখানে গেলেই হয়,” মিনি বলেছিলো।

চীনে তখন গৃহযুদ্ধ সবে মাত্র শেষ হয়েছে, কায়ম হয়েছে নতুন সাম্রাজ্য।

চিয়েনচাং হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো, “বড়ো হচ্ছে! সেই ধারণা নিয়েই থাকো।”

জেনী, মিনি আর বুড়ো ওয়াং মর্মান্ত হোলো, কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।

শুধু ছোটো ভাই অং-চাং বললো, “তোমরা যে যেখানে যাব বাও, আমি কলকাতা ছেড়ে নড়ছি না। আমার এখানেই বেশ ভালো লাগে।”

জেনী মিনি একটু হাসলো, কারণ অং-চাংএর সঙ্গে সম্প্রতি ভাব হয়েছে ওয়েলসলির এবং ফিরলী মেয়ের সঙ্গে। স্মৃত্যায় কলকাতা শহরতল্য তার ইদানীং স্বর্ণ বলেই মনে হচ্ছে।



# মাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব সময় লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

খেলাধুলা করা আহার পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধুলাই বলুন বা কাজকর্মই বলুন ধুলোময়লার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধুলোময়লায় থাকে রোগের বীজাণু যার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের নানারকম ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে এবং স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে।

লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করলে আপনার ক্রান্তি দূর হয়ে যাবে; আপনি আবার তাজা বরষার বোধ করবেন। প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন।



চিয়েন-চাং বললো, “আমার বন্ধুকে একদিন এখানে নিয়ে আসবো। আলাপ করিয়ে দেবো সবাই সঙ্গে।”

“সেই আমেরিকান?” বুড়ো ওয়াং জিজ্ঞেস করলো।

“না, এ আমাদেরই লোক। এর নাম কেং চেং-শিয়াং।”

“কে? কোন কে? ট্যাংবার?”

“না, না, এখানকার লোক সে নয়। সে আগে থাকতো নানকিং-এ। ব্যাঙ্ক অফ চায়নার বড়ো চাকরি করতো। যুদ্ধের পর ও দেশ ছেড়ে ফরমোসায় চলে আসে। সেখান থেকে এখন কলকাতার চলে এসেছে। এখানে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা করে।”

তখন জেনী মিনি একটু গম্ভীর হোলো।

“ওদের অনেক পয়সা,” চিয়েন-চাং বলে চললো, “ওর স্বর্গীয় বাবা এককাল ব্যাঙ্ক অফ চায়নার ডিরেক্টর ছিলো। ওরা ক্যান্টনের কেং।”

“ক্যান্টনের কেং?” বুড়ো ওয়াং আন্তে আন্তে মাথা নাড়লো।

দেশ না গেলোও, দেশের অনেক খবর সে রাখে। ক্যান্টনের কেং-রা খুব অভিজাত বংশ।

“সে এখানে কি করতে এসেছে?” বুড়ো ওয়াং জিজ্ঞেস করলো।

“বললাম তো, ব্যবসা করতে এসেছে।”

“ব্যবসা ফরমোসায় বসে করলেই পারতো।”

“ওর ইচ্ছে হয়েছে, কলকাতার এসেছে। তোমাদের অন্তো মাথাব্যাথা কেন?” বিরক্ত হয়ে বললো চিয়েন-চাং।

“ওর সঙ্গে তোমার বন্ধু হোলো কি করে?”

“ওর অফিসে একটা কোর্টশান চাইতে গিয়েছিলাম। সেখানে ভাব হোলো। সে আমার লাকে ডাকলো। সেখানে বন্ধু হোলো। তারপর ওর বাড়িতেও গেছি। ওর একটি বোন আছে। নাম টিং-লিং। খুব শিক্ষিত, কালচারড, একমপ্রিশড। স্মল্লর দেখতে!”

“ও, এই ব্যাপার?” জেনী আর মিনি হাসলো।

কিছু বুড়ো ওয়াং আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, “চিয়েন, আমরা ওয়াং, খুব সাধারণ লোক। ওরা কেং। কেদের সঙ্গে ওয়াংদের বন্ধু হয় না। আমি তো কোন দিনই শুনিনি, দেখিওনি।”

“বেশ তো, এবার দেখবে,” চিয়েন-চাং উত্তর দিলো।

“আগে যা হুয়নি, এখন কি তা হবে?”

“ওল্ড বয়, এটা ডিমক্রেসির যুগ, আর কেং চেং-শিয়াং পাক্কা ডিমক্র্যাট। ডিমক্রেসি ওর হস্তে রক্তে এমন ভাবে মিশে গেছে যে কন্যুনিদের দেশ সে কিছুতেই থাকতে রাজী হোলো না। ও বলে, ও বছরখানেক পরে আমেরিকা চলে যাবে। ওর বোন টিং-লিং তো আমেরিকার বড়ো হয়েছে। কিছুদিনের জন্ত এখানে এসেছে। আবার চলে যাবে।”

জেনী আর মিনি আবার হুপ টিপে হাসলো।

বুড়ো ওয়াং আন্তে আন্তে বললো, “দেখ চিয়েন, তোমার এসব কথাবার্তা আমার ভাল লাগছে না। আমরা এদেশে থেকেছি, বড়ো হয়েছি; এখানে থর করেছি; খুব দরকার না পড়লে যাবের ছেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া আমি ভালো মনে করি না। দেশের অবস্থা এখন খুব গোলমালে, তোমাকে সেখানেও যেতে বলছি না। তবে আমেরিকাও আমাদের নিজের দেশ নয়, তাই এখানে থাকার সন্ধান

থাকলে এসব ছেড়ে সেখানে যাও, তাই আমি চাই না। যদি যেতে হয় স্নং-চাং যাবে। তুমি বড়ো ছেলে। তুমি বাড়ীতে থাকবে। তোমাকে তোমার বোনদের বিয়ে দিতে হবে। আমি বড়ো হয়েছি। আমার সেখাশোনা করতে হবে। আর তোমাকে বিয়েও করতে হবে। ওয়াং বংশ টিকিয়ে রাখতে হবে। পুত্র-পুত্রদের আত্মাদের পরিতুষ্ট রাখতে হবে।—

“বিয়ে?” চিয়েন-চাং হেসে উঠলো, “এখন? অসম্ভব। আমার পছন্দ হবে এরকম মেয়ে এদেশে নেই। ইয়া, একটা দুটো যে দেখা যায় না, তবে ওরা ঠিক এদেশের বাসিন্দা নয়।—

জেনী আর মিনি হেসে ফেললো।

বুড়ো ওয়াং গম্ভীর হয়ে বলে গেল, “দেখ, তুমি যদি টিং-লিং-এর কথা ভেবে থাকো তো আমি বলবো তুমি একটি আত্মশ্রমক। কেং-এর কোনো দিন ওয়াং-দের বিয়ে করে না। তার উপর টিং-লিং আমেরিকার বড়ো হওয়া মেয়ে। তবে সে যদি সত্যি সত্যি তোমার বিয়ে করতে রাজী হয়, তা’হলে আমি বলবো সেটা ভালো কাজ হবে না। তা’তে তুমি অন্তরী হবে, আমি অন্তরী হবো। তোমার ভাই-বোনরা অন্তরী হবে।”

“কেন?” লাল হয়ে জিজ্ঞেস করলো চিয়েন-চাং।

বুড়ো ওয়াং উত্তর দিলো, “টিং-লিং তোমার বোনদের মতো রাগা করতে পারবে না, ওদের মতো ষাটতে পারবে না, কষ্ট সহ করতে পারবে না। তার উপর শুনেছি, এসব বিদেশী বনে যাওয়া মেয়েরা বেশী ছেলে-মেয়ে হওয়া পছন্দ করে না। সেটা ওরা কপের পক্ষে খুব বাঞ্ছনীয় নয়। পূর্ণপুরুষের আত্মারা তাতে অসন্তুষ্ট হবেন।”

চিয়েন চাং হাসতে লাগলো। বুড়ো ওয়াং-এর কথা শুনে। বললো, “তোমরা তোমাদের পুরানো ধারণা নিয়েই আছো। সময়টা যে বললে যাচ্ছে, তোমাদের সে খেয়াল নেই?”

“সময়টা যে বললে যাচ্ছে সে খেয়াল আমার খুবই আছে, কিন্তু কতগুলো জিনিস যে বলার না, চিরকাল বা চলে আসছে, ভবিষ্যতেও তাই চলতে থাকবে, সে খেয়াল নেই তোমার মতো অর্থাচিনের।”

“যেমন?” ভুরু কুঁচকালো চিয়েন-চাং।

“তুমি কি বলতে চাও,” বুড়ো ওয়াং জিজ্ঞেস করলো, “সময় বললে যাচ্ছে বলে মেয়েরা আর রাগা করবে না? তুমি কি বলতে চাও মেয়েরা আর ছেলে-মেয়ের মা হবে না?”

“বুড়োদের সঙ্গে তর্ক করা বুঝা,” উত্তর দিলো চিয়েন-চাং, “আমাদের কথা তোমরা বুঝবে না, তোমাদের কথা আমরা বুঝবে না।”

বুড়ো ওয়াং আর কোনো কথা বললো না। আন্তে আন্তে উঠা চলে গেল সেখান থেকে।

মিনি বললো, “কেন তর্ক করে বাবার মনে কষ্ট দাও? চুপ মাপ শুনে গেলেই পারো।”

“উনি যদি নিজে ইচ্ছে করেই কষ্ট পান, আমি কি করতে পারি।”

জেনী জিজ্ঞেস করলো, “আচ্ছা দাই-কো, একটা কথা বলবে?”

“কি কথা?”

“তুমি কি টিং-লিং-এর প্রেমে পড়েছো?”

“না, ঠিক তা” নয়,” চিয়েন-চাং উত্তর দিলো, “আমরা এমনি বন্ধু, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।”

“বেশ তো। কিন্তু, তুমি যদি কোনো দিন ওকে বিয়ে করতে চাও, সে কি রাজী হবে?”

চিয়েন-চাং একটু মাথা চুলকালো, তার পর বললো, “দেখ, ও যদি রাজী হয়ও বা, আমি রাজী হবো না। তার আগে আমার অনেক টাকা দরকার। আর সে টাকা এসেছে হবে না। তাই ঠিক করেছি আমেরিকা যাযো। ওয়াশিংটন যাবে। আর আমেরিকা হোলো ডিমক্রেসি। আমার বাবা কি আর ওর বাবা কে, ও সব প্রশ্ন ওদেশে ওঠে না। আমার টাকা থাকলেই হোলো। তা হলেই আর বিয়ে করার কোনো অসুবিধে হবে না।”

“ও, মিনি আস্তে আস্তে বললো, “ও, তাহলে তোমার টাকার জন্তে বিয়ে করবে।”

“তোমাদের মন অত্যন্ত ছোটো,” চিয়েন-চাং চটে গিয়ে উত্তর দিলো, “সে কথা কে বলেছে? আমি কতকগুলো প্র্যাকটিক্যাল সুবিধে অসুবিধের কথা বললাম মাত্র।”

“থাক, থাক, আর চটচটি করতে হবে না,” জেনী মাঝখানে পড়ে বললো।

“ওদের কাউকে তো তোমরা চোখেও দেখনি,” বললো চিয়েন-চাং, আগে ওদের নিয়ে আসি আমাদের বাড়ি, তারপর বা হোক একটা কিছু খাওয়া করে নিও।”

“টিং-লিংকেও নিয়ে আসবে?” মিনি জিজ্ঞেস করলো।

“না, টিং-লিংকে নয়। আগে চেং-শিয়াংকে নিয়ে আসি। একটু বাওয়া-আসা অন্তরঙ্গতা স্রু হোক। তারপর টিং-লিংও আসবে।”

“কবে আনবে?”

“আনবো ইতিমধ্যে একদিন।”

“আগে থেকে বলে রেখো কিন্তু—”

কিন্তু আগে থেকে কিছু বলে রাখলো না ওয়াং চিয়েন-চাং।

হঠাৎ একদিন সকালে এনে হাজির করলো ফেং চেং-শিয়াংকে, মিনি তখন সবে কাছ থেকে ফিরেছে, হাত-বুখও ঘোয়নি, মুখটা তার ঘামে চিক-চিক করছে।

জেনী রাগাধরে ব্যস্ত। তার কোমরে জড়ানো এপ্রনটি আঘ-ময়লা।

বুড়ো ওয়াং জানলার ধারে বসে বাইরের পৃথিবীকে অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করছে।

এমন সময় চিয়েন-চাং এলো। সঙ্গে এলো চেং-শিয়াং।

প্রথম আলাপ করিয়ে দেওয়া হোলো বুড়ো ওয়াং-এর সঙ্গে।

কিন্তু চীন দেশ ছেড়ে এসে কাঁচ-তাও করতে ভুলে গেছে ফেং চেং-শিয়াং। সে একটু নড় করে বললো, “গ্লাড টু মীট ইউ।”

বুড়ো ওয়াং প্রশান্ত ভাবে উত্তর দিলো, তার অভিধিকে “তুমি এসেছো বলে আমিও খুব খুশী হয়েছি। ফেং-বংশের এক যোগ্য ব্যক্তির আগমনে ওয়াং পরিবারের এই ক্ষুদ্র গৃহস্থানি ধন হোলো। ওই চেয়ারখানি বিশিষ্ট অভিধিদের জন্তে। তুমি সেখানে বসে আমাকে কৃতার্থ করো।”

বিশুদ্ধ চৈনিক আপ্যায়নে ফেং চেং-শিয়াং একটু বেন অপ্রস্তুত হোলো। একটু ‘বাও’ করে চূপচাপ নিঃশব্দ চেয়ারটিতে বসে পড়লো।

“তোমার ভাই-বোনদের ডাকো,” চিয়েন-চাংকে বললো বুড়ো ওয়াং, “ওরা এসে আমাদের সম্মানিত অভিধির পরিচয় করুক।”

বাপের অতিরিক্ত সৌজতে চিয়েন-চাং-এর শরীর জলে গেল। কিন্তু কোনো বিরক্তি প্রকাশ না করে রাগাধরের দরজার গিয়ে জেনীকে ডেকে বললো, “জেনী, মিষ্টার ফেং এসেছেন—”

জেনী তেমনিই বেরিয়ে এলো, এমন কি কোমরের এপ্রনখানিও না ছেড়েই। জেনীর পেছনে পেছনে এলো মিনি, তার সেই চিক-চিক মুখ নিয়ে।

অল্প স্বল্প থেকে বেরিয়ে এলো স্রং-চাং। চিয়েন-চাং চেং-শিয়াং-এর সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দিলো।

চেং-শিয়াং তার স্বভাবসুলভ পাশ্চাত্য সৌজন্য প্রকাশ করলো।

মিনির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো সে। স্বর্ণ দেহের উপর কর্মকাজ দিনান্তের স্নান মুখখানি তার ভালো লাগলো না। সে চোখ ফিরিয়ে তাকালো জেনীর দিকে।

জেনীর দেহের গঠন খুব মজবুত, সুঠাম। উন্নতের জাঁচে লাল মুখখানি বেশ চলাচল, কর্মশীল। তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখলো চেং-শিয়াং।

জেনী তাকিয়ে দেখলো চেং-শিয়াং-এর চোখের দিকে। দেখলো—সেই চোখ, যে চোখ নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চীনের অভিজাত জমিদারেরা তাকিয়েছে কর্মচকল সুঠাম কৃষক-স্ববত্তীর দিকে।

জেনী একটু হাসলো। ছুরির ধার মিশিয়ে দিলো সেই হাসিতে। শুধু জেনী বুঝলো আর চেং-শিয়াং বুঝলো। আর কেউ লক্ষ্য করলো না।

এক বৃহত্তর জন্তে লাল হয়ে উঠলো চেং-শিয়াং-এর কান। সঙ্গে সঙ্গেই সামলো নিয়ে খুব সহজ ভাবে বললো, “চিয়েন-চাং আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দিত হলাম। আশা করি আমরাও খুব বন্ধু হবে।”

“হ্যাঁ, আশা আমরাও করি,” জেনীও উত্তর দিলো খুব সহজ ভাবে।

“এখন একটু চা খাওয়া বাক,” বললো চিয়েন-চাং।

“হ্যাঁ, চা এখনই এসে যাবে,” জেনী বললো।

“শুধু চা, আর কিছু নয়,” বলে উঠলো চেং-শিয়াং, “আমার অন্ত প্রস্তাব আছে।”

সবাই তাকালো তার দিকে।

“আজ চিয়েন-চাং আর তার ভাই-বোনেরা আমার অভিধি। আমরা আজ ভিনার বাবো বাইরে কোথাও।”

সেদিন থেকে ফেং চেং-শিয়াং-এর গতিবিধি স্রু হোলো ওয়াং-এর বাড়িতে। স্রং-চাং-এর সঙ্গেও খুব সম্মত হয়ে গেল। মিনিও যেন হোলো লোকটা মশ নয়। শুধু জেনী পছন্দ করলো তার এই আসা-বাওয়া। তবে মুখে সে কিছুই বললো না। বরং খুবই ভয় ব্যবহার করতো চেং-শিয়াং-এর সঙ্গে।

কিছু দিন পর এক দিন টিং-লিংকেও নিয়ে এলো চেং-শিয়াং। প্রথমটা তার পোশাক-প্রসাধন স্বর্ণ-বর্ণের ভালো না লাগলেও

তার মিষ্টি ব্যবহারে বুড়ো ওয়াং যেন গলতে শুরু করলো একটু একটু করে।

বললো, “বতোই আমেরিকার থাকুক, পাশ্চাত্য-ভাষাপন্ন হোক, চীনা মেয়ে চীনা মেয়েই থাকবে। আমাদের ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি এত প্রাচীন যে, এদের এসব নতুন ভাষায়া উপর উপরই থেকে যায়, যনের গভীরে চুকতে পারে না।”

জেনী মিনি ভাবলো, টিং-লিং নাই বা হোলো আমাদের মতন, আমাদের দাই-কো যদি তাকে বিয়ে করে সুখী হয়, আমরা মানা করতে যাবো কেন? তা’ ছাড়া দাই-কো আমেরিকা বখন বাবেই ঠিক করেছে, সেখানে গিয়ে আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করার চাইতে টিং-লিংকে বিয়ে করা অনেক ভালো। আর বাই হোক, ওয়াংদের যত্নে বিদেশী রক্তের ভেজাল থাকবে না।”

জেনী, মিনি আর টিং-লিং ভেমনটা অজ্ঞান হতে পারলো না অতো বাওয়া সবেও, তবে একটা সহজ সত্তার গড়ে উঠলো তাদের মাঝে।

চো-শিয়াংকেও দেখা গেল, খুব ভাল ব্যবহারই করছে জেনীর সঙ্গে। তার সেই অস্বাভাবিক কামনা-দহন চাউনি সে ওই প্রথম দিনই দিয়েছিলো,—তার পুনরায়ুতি আর কোনো দিনই হয় নি।

সুতরাং এরাও বেতে শুরু করলো টিং-লিং চো-শিয়াংদের সাহেব-পাড়ার ল্যাটে। চো-শিয়াং কয়েক বার পাটি দিয়েছিলো তার বাড়িতে। সেখানে গিয়ে আরেক ধরনের দ্রুতলয় সমাজ-জীবনের পরিচয় লাভ করেছিলো জেনী আর মিনি। তা’ ছাড়া হুই পরিবারের ভাই-বোনেরা মিলে মাঝে মাঝে বাইরে বেরোতো, এখানে ওখানে সেখানে।

একবার মিনি নিয়ে এসেছিলো আহ-কিমকে, চিয়েন-চাং-এর লাগতি সবেও। কিন্তু চো-শিয়াংকে দেখে আহ-কিম গভীর হয়ে গেল।

আহ-কিমকে দেখে ভুরু কুঁকিত করলো চো-শিয়াং।

“ও কে?” চো-শিয়াং জিজ্ঞেস করলো চিয়েন-চাংকে।

“আমার বোন যেখানে চাকরি করে, সেই কার্যের মালিক,” বললো চিয়েন-চাং, তার পর একটু হেসে জুড়ে দিলো, “এবং ভাবী স্বামী।”

তুনে চুপ করে রইলো চো-শিয়াং।

“এই লোকটি কে? আহ-কিম জিজ্ঞেস করেছিলো মনিকে।

“ওই যে টিং-লিং মেয়েটি, যাকে বিয়ে করবে আমাদের দাই-কো, তার বড়ো ভাই।”

তুনে আর কোনো কথা বললো না আহ-কিম। তার পর

সারটা রূপ আহ-কিম আর চো-শিয়াং কেউ কারো দিকে তাকালোও না, কথাও বললো না।

সবাই চলে যাওয়ার পর চিয়েন-চাং মনিকে বললো, “আমি আগেই বলেছিলাম আহ-কিমকে ডেকে না। ওকে চো-শিয়াং-এর ভালো লাগবে না। এখন দেখলে তো?”

“কেন? কি হয়েছে?” জিজ্ঞেস করলো স্তং-চাং।

“সবাই জানে আহ-কিম মাও-সে-তুর সমর্থক আর চো-শিয়াং দেশ ছেড়ে ফরমোসায় চলে এসেছিলো। এরা কেউ কাজকে সহ করতে পারে না।

“এটা কলকাতা,” উত্তর দিলো মিনি, “এবং বাড়িটা আমাদের।”

“বাই হোক, যেদিন এখানে ফেরা আসবে সেদিন আহ-কিমকে ডেকে না।”

সেদিন থেকে মিনিও মেলামেশা বন্ধ করলো চো-শিয়াং-এর সঙ্গে। ও একা এলে আসতোই না ওর সামনে। শুধু টিং-লিং এলে, বেরিয়ে এসে একটু গল্প করতো তার সঙ্গে পারিবারিক সৌজন্য বজায় রাখবার জন্তে।

জেনীও ফেং-দের সঙ্গে বেরোনা বন্ধ করেছিলো। তবে চো-শিয়াং এলে এমনি বসে গল্প করতো, চা খাওয়াতো, ভাবতো, বাই হোক, টিং-লিংকে দাই-কো বিয়ে করবে, সুতরাং এটুকু না করলে কি করে চলে! আহ-কিমকে মিনি বিয়ে করবে, তাই সে চো-শিয়াংকে না হয় এড়িয়ে চলে। ওদের রাজনীতি নিয়ে ওরা থাকুক। আমরা কি? সবাই যে বার মতন সুখী হলোই আমি খুশি।”

চো-শিয়াং সাধারণত চিয়েন-চাং-এর সঙ্গে আসতো, কিংবা যে সময় চিয়েন-চাং বাড়ি থাকতো শুধু সে সময়ই আসতো।

একদিন এলো বখন চিয়েন-চাং বাড়ি নেই, স্তং-চাং নেই, মিনিও ফেরনি তার লুপি থেকে, বুড়ো ওয়াং ভেতরে ঘুমোচ্ছে। জেনী একটু অবাক হোলো।

জেনীর বিষয় চো-শিয়াং অজ্ঞান বন করলো। বললো, “জেনী, আজ শুধু তোমার কাছে আসবো বলোই এ রকম সময় এসেছি।”

বললো, “জেনী, আজ শুধু তোমার কাছে আসবো বলোই এ রকম সময় এসেছি।”

“শুধু আমার কাছে? কেন?” জেনী জিজ্ঞেস করলো।

“একটা কথা ছিলো তোমার সঙ্গে।”

“আমার সঙ্গে? কি কথা?”

চো-শিয়াং তার মোনার বাঁধানে দাঁতে একটুখানি হাসির ঝিলিক খেলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “জেনী, আমার বিয়ে করবে?” [ ক্রমশঃ।

## উত্তরণ

### শ্রীসান্না সরকার

গোধূলির ছায়াস্ত্রান বপুস্তরা বাতে

সকল মূলতানে গেয়েছি সে গান

বিরহের কবচগুণে তুনিবে সে সুখ

আকাশের বৃক যদি পেতে দাও কান।

অক্লান্ত নিশীথের শূন্য গৃহপানে

ধার মোর স্নানগতি, কল-শব্দহীন

শিশিরের গুঞ্জরণে ছেয়ে আসে হার

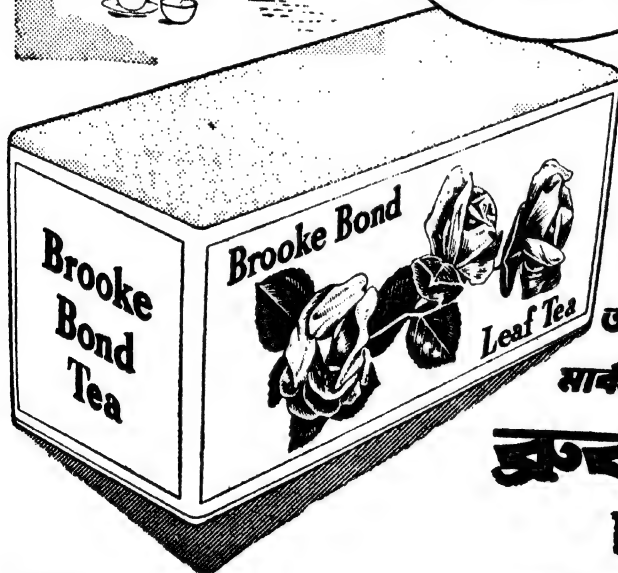
সত্তার অন্তিম গান—বেদনায় স্তোণ।

রাত্রির নদীজলে ভেসে যাক তবে

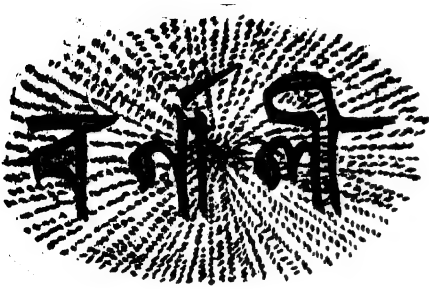
বিরহের প্রহরের আকাশ-প্রদীপ

বিশ্রুতির বনতলে নিঃশব্দ ভায়ে

ব্যবে যাক বজ্রের গন্ধভরা নীপ।



এই জাতাই  
অন্য যে কোন  
মার্ক চায়ের চেয়ে  
**ব্রুক বণ্ড  
চা**  
বেশী লোকে খান !



## মূলোখা দাশগুপ্তা

পরীক্ষা শেষে ব্যস্তির নিষাণ ফেলতে না ফেলতে ফলাফলের যে দুর্ভাবনা আর অশান্তি ভোগ আরম্ভ হয়েছিলো, সে ভোগের শেষ হয়ে গেছে পাশের খবর শেষে। তার ওপর শুধু ভালো সম্বন্ধই নয়, ছিন্ন হয়ে গেছে বিয়ের দিন—মৌরীর মন নির্জন মাঠের একক সর্বে ফুলটির মতো খুশীর বিরকিরে বাতাসে ছলছিলো।

বর্তমানে ও গর বসবার জায়গা করেছে বাড়ীর চিলেকোঠায়—বেধানে বসে দু'দিন আগেও কেবল পিট টান করে পরীক্ষার পড়া তৈরী করেছে। আজ আর টান হয়ে এমন একটানা পড়বার দরকার নেই। তাই সে আনিরে নিয়েছে একটা ক্যাথিসের ইঞ্জিচেরার। এতে গা ঢেলে বসে ও গল্প উপভাস পড়ে—নয়তো তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। ভাবে কত কি—বার আরম্ভ আছে কিন্তু শেষ নেই। ছোট বোন মজু অবস্থি ওর এই আয়াস ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে তাকে গুরুতর মেরে বলে, ঠাংরেজী সাহিত্যের মোটা মোটা বই বোপাড় করেছে, দেখ না কত! পড়বে তো নাই-ই আর পড়লেও বুঝবে ছাই। চলছে তো শুধু বসে কসে বিয়ের কথা ভাবা।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। একে বয়সটা স্বপ্ন দেখাও। তার উত্তর দিয়ে—মনটা কখনও ওর স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসছে, কখন চাইছে গান গেয়ে উঠতে। সে দিন মৌরী ওর চিলেকোঠায় ইঞ্জিচেরার বসে চোখ বুজে গানই গাইছিলো—

‘দিনে দিনে কঠিন হলো কখন বুকের তল  
ডেবেছিলেম স্বপ্নে না আর আমার চোখের জল,

হঠাৎ দেখা পথের মাঝে

কান্না তখন খামে না যে—’

—‘এই দিদি, তুই এখন ও গান গাচ্ছিস যে?’

—‘কেন কি হয়েছে তাতে?’ ভ্রকুটকে ছোট বোনের দিকে তাকাল মৌরী।

—‘বিয়ে ঠিক হয়ে বাবার পর কেউ ও গান গায়? আর যদি গায় তো তার বিয়ে শুকুণি ভেঙ্গে যায়।’

—‘গানটার অপরাধ?’

—‘হঠাৎ দেখা পথের মাঝে কান্না তখন খামে না যে—’ মা গো, কী ভীষণ গান! তোর বয় এখন এ গান শুনে বিয়ে জেদ দেবে। পরে শুনে সমস্ত জীবন তোর দিকে আড়নয়নে তাকিয়ে থাকবে—আর পথে তুই পরিচিত, অপরিচিত বার দিকে বন্ধুণি তাকাবি, তোর চোখে জল বুঝবে। ‘কেটেছে একলা বিয়ের বেলো আকাশ-কুসুম চয়নে’ এছাড়া কনের মুখে গান মানায়?’

মৌরী উঠে গাড়ির বোনের লম্বা চুলে কয়েক টান দিয়ে বলল,—‘বেশ তো ছিলাম আমরা ক’তাই-বোন। শেষকালে তোর মত একটা অতি ফাগিল মেয়ে হবার কি প্রয়োজন ছিল?’

—‘আমি তোমাদের প্রয়োজনে নয়, জন্মেছি বিশ্বের প্রয়োজনে। গার্গী, মৈত্রের পর বন্ধা ভারত এই প্রথম আবার একটা কতাসন্ধান উপহার দিয়েছেন মাতা ধরিত্রীকে। কিন্তু সে কথা তো বলে বিশ্বাস করান বাবে না, কয়েক দেখাতে হবে।’

‘আচ্ছা বাপারটা কি?’ বৌদি এসে গাড়ীলেন সামনে—‘তুমি সেই থেকে ছাদে বসে আছ, পাতা নেই—মজুকে তোমায় ডাকতে পাঠালেন পিসিমা—তারও দেখা নেই। আজ সন্ধ্যার বাস্তব জন্মে মেয়ে দেখতে যেতে হবে না?’

‘এমন একটা কথা ভুলে বসেছিলাম কমা নেই।’ মৌরী ছুটল নিচে। এসে ঢুকল একেবারে ছোড়না বাস্তব ঘরে।—‘এই ছোড়না, ইটি, কাশি কমেছে তো? তোমার জন্মে মেয়ে দেখতে বাচ্ছি, দেখো বেজবাব মুখে আবার হ্যাঁচো দিয়ে বসো না।’

বাস্তবের অলঙ্কারের সৃষ্টি-কাশি নিয়ে বিছানার শুয়ে বই পড়ছিল। হাত দিয়ে নিজেই পাশটা দেখিয়ে বললো—‘শোন, বোস এখানে। কথা আছে।’

—‘সময় নেই। খুব চটপট সার।’ হাতে জড়িয়ে বোঁপা বাঁধতে বাঁধতে মৌরী গিয়ে বসল বাস্তবের খাটের উপর। ‘কি কথা, খুব ভালো করে দেখব এই তো?’

—‘ঠিক উল্টো! একেবারেই মানা করছি যেতে।’

—‘কেন?’ আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলো মৌরী।

—‘আচ্ছা, হাতের বইটা বন্ধ করে উঠে বসল বাস্তব—‘এই যে তোর এমন আয়োজন করে মানা-পিসির সঙ্গে দল বেঁধে মেয়ে দেখতে গিয়ে বসি, লজ্জা করে না তোদের?’ লেখাপড়া শিখেছিস, কঠিবোধের গরু কবির, কিন্তু তোর কি? নিজে তো বার চোখ, নির্বিকার চিন্তে গিয়ে বসল সভার মাঝে। আবার চলছিস আরেক জনকে দেখতে।’

—‘মিথো কথা। ককণা সভায়-টভায় বসিনি। আমি চা-খাবার সাজিয়ে শুঁদের ডেকেছি। সবাই এসে বসলে, সামনে উপস্থিত থেকে খাবার তদারক করেছে। কথা ভিজ্জাস করলে জবাব দিয়েছি, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তা মহিলায় বা সঙ্গ-সর্বদা বাড়ী-ঘরে, হোটেল-রেস্টোরাঁয় করে থাকেন। বিকার ঘটবে কেন?’

—‘তুই জানতিস নে দেখতে এসেছে তোকে?’

—‘এই কথা। এ সম্বন্ধ নামটাতে তোমার আপত্তি? না, আমার অবস্থি তেমন কোন সংস্কার নেই।’

—‘ঠাট্টা নয়, ও ভাবে পুতুলের মতো সাজিয়ে এনে দেখানোতে অসম্মান হয় মেয়েদের।’

—‘বেশ, মৌরী বেন তর্ক করবার জন্ম ওড়িয়ে বসলো—‘তবে মজুদের বিয়ে হবে কি করে?’

—‘আসা-বাওয়া, আলাপ, পরিচয়।’

—‘বাঁচা গেল। একেবারে দেখাশোনা-বর্জিত নয়। তবে এমন দু’এক ঘটনার দেখায় তোমাদের হচ্ছে না। আরো সময় চাই। তা বেশ, হলো আসা-বাওয়া, হলো আলাপ-পরিচয়। তারপর?’

—‘তারপর ভালো লাগলে বিয়ে।’

—‘না লাগলে?’

—‘হবে না।’

—‘অর্থাৎ কেটে পড়বে?’

মুখচোখের এমন ভঙ্গি করে কথাটা মৌরী বলল যে, বাস্তবের হাঙ্গামে ফেলল। বললো—‘পরে কাটাকাটি হওয়ার চাইতে, আগে কেটে পড়া অনেক ভাল।’

‘তোমাদের মেলামেশার বিষয়ে প্রবর্তার কাটাকাটি হয় না—নিশ্চয়তা দিতে পারো?’

—‘না, তা অবশিষ্ট পারিনি।’

—‘পায়লে একুশি হাতে হাত মিলাতাম। কিন্তু তা বন্ধ নয়, তখন বেশী দেখার লাভটাকে—প্রয়োজনটাই বা কোথায়। তবু চলনে বলনে রূপে বৃদ্ধিতে দিনের পর দিন ভালো লাগিয়ে তোমাদের আকর্ষণ করতে হবে? রকম করে, তার চাইতে এই আমার মনে ভালো।’

‘এটা ছুই পক্ষের কথাই হচ্ছে—ভালো লাগা-না-লাগাটা চূড়েরই।’

—‘আমাদের চলতি ব্যাপারটা কি একজনের মতে, আর একজনের গলায় দড়ি দিয়ে হয় না কি?’

—‘তোদের যে ভাবে দেখতে বাছ, ছেলের যে কেউ সে ভাবে দেখতে গিয়ে বসে?’

—‘প্রয়োজন নেই। তোমাদের চেহারাটা নিত্যন্ত সাপ, ব্যাঙ জাতীয় না হলেই হলো। প্রয়োজন জান গুণ আর-বায়ের হিসেব দেখা—সেটা তো সামনে বসিয়ে দেখবার জিনিষ নয়, বোঝা-খবরের। সে বোঝা-খবর নেওয়া হয় বৈ কি। বাছাই কি শুধু মেরেই হয়? আমার বিশটা সম্বন্ধ কি বাবা এক নাক কুঁচকে ভেসে দেননি?’

মজু এসে ঘরে ঢুকলো—‘না দিদি—তোকে নিয়ে পারা গেল না। ছাদ থেকে টেনে নামালাম, আবার এখানে এসে তর্কে যেতেছিস? ছোট শিসিমা পর্যন্ত এসে গেছেন, আর আমরা এখানে তিরীই হইনি। আজ বাবা রকম রাখবেন না।’

মৌরী দৌড়লো স্নানের ঘরে।

মেয়ে দেখে দিদির কানের কাছে মুখ নিয়ে মজু বলল—‘ও বাবা, এ কি মাছুষ না প্রতিমা বে দিদি?’

মৌরী মাথা নাড়ল। ‘বা বলেছিল। প্রতিমাই। কিন্তু মাটির নয়, প্রাণ আছে। এ মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে ঠিক করতে হবে ছোড়নার।’

বিপরীত জাতের গৃহে শিসিমাই কর্তা। তিনি নাকে চশমা ঝুটে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখে সজ্জা চিন্তে মত্তব্য করলেন, ‘হ্যাঁ, এ ময়ে আমার বাস্তব কাছে লক্ষ্যের মতো মানাবে। ছোট শিসিমা গর মতামত সহজে বলে বসেন না। তিনি মনে করেন তাতেই ঠিক বাড়ে।’

উষ্ণ মেয়ের মার মুখে দেখা দিল খুশীর কৃতার্থ হাসি। বলেন—‘আপনাদের পছন্দ হয়েছে, আমার মেয়ের ভাগ্য। এস ছিল না আপনাদের ঘরে কথা তুলি। কিন্তু কর্তা বললেন, ‘কিছু চায় না গো, চায় শুধু মাত্র একটি স্বপ্নারী মেয়ে। তা

উগ্ৰবাস সব দিকে বঙ্কিত করলেও মেয়ের রূপটুকু দিয়েছেন। তুমি চিঠি লিখে লাও মেয়ে দেখে যেতে। তারপর আমাদের বরাত।’

একল মজু উঠে গিয়ে বলল মেয়েটির কাছ ঘেঁসে। চুপি চুপি বললো—‘বড় ভালো লেগেছে ভাই তোমাকে। একুশি ইচ্ছে করছে বাড়ী নিয়ে যেতে। জান, চীন দেশে নাকি কনে পছন্দ হলেই স্বতন্ত্র করে নিয়ে বাওনার রীতি। এ নিয়মটাই এখন আমার নিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে।’ আবার তক্ষুণি মৌরীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো—‘কিন্তু তোর বেলো নয়।’

বাড়ী ফিরে ছুবোন তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল উপরে। শাড়ী-কাপড়গুচ্ছ মেখেতে বসে পড়ে বললো—‘না ছোড়না, পছন্দ হলো না।’

—‘আছে তো লিখিতে ল’খানেক। সব ক’টি বাড়ীর চাশিমিই খসল না করে হবেও না।’

—‘না গো ছোড়না, এমন কতক ল’কন, লাগেও মিলবে না।’

স্বয়ং মৌরী ফুলের মতো মাথা লোলল মজু।

—‘একবারে এমন ভীষণ।’

—‘হ্যাঁ, মাথা ঘুরে বাবে চেহারা দেখলে! আমাদের তো গুাই

গিয়েছিল।’

বাস্তব গভীর ভাবে বললো—‘মেয়েরা যখন অজ্ঞ কোন মেয়ের রূপের প্রশংসা করে তখন বুঝতে হবে, সে মেয়ে যে বলছে তার চাইতে অবগুই দেখতে ধারাপ।’

মজু হাত ছোড় করে কপালে ঠেকালো—‘হে মা কালী, তাই যেন হয়। পাঁচ ছোড়া পাঁচ দেবো। একসঙ্গে এত রক্ত দেখে যদি ভয়ে কিংবা আনন্দাতিশয়ো মূর্ছা বাও, চিন্তা নেই—ঘরে ডাক্তার জামাই আসছে। আর তোমার চিকিৎসা দিয়ে ব্যবসায় বউনি করতে পারলে, বনবনে পলার তার আটকায় কে?’

উঠে পাড়িয়ে মৌরী হেসে বলল—‘বাই বাবাকে ধবর বলে আসি গো।’ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পাড়ালো মজুও। ছুবোনকে একসঙ্গে উঠে পাড়াতে দেখে বাস্তব বললো—‘তোরা কি ছোড়া-বাঁধা? এক জনের সঙ্গে আর একজন উঠে পাড়ালি? বাস না।’

হাসিতে কেটে পড়ল ছুবোন। ‘কি শুনেতে চাও বেলো না? আচ্ছা পাড়াও আসছি আমরা বাবার কাছ থেকে হয়ে।’

পরের দিন। বেলো তখন দশটা। বৌদি এলো ব্যস্ত পায় ধবর নিয়ে—‘কী গঙ্গির বসবার ঘরে বাও বাস্তব! তোমাদের বড়না, বাবা কেউ বাড়ী নেই। একা ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি ছোটটিকে।’

—‘ছেলেটি? কে সে ছেলে?’ জিজ্ঞাসা করল বাস্তব।

চোখ-মুখ বোরালেন বৌদি। ‘কে, তা কি আমিই প্রশ্নে বুঝে উঠতে পারি। গা খুতে বাবার আগে গেছি বসবার ঘরটা একটু গুছিয়ে রেখে আসতে। ও মা, দেখি কে যেন দরজার পাড়িয়ে ইতস্ততঃ করছে। জানতে চাইলাম, কাকে চাই? এগিয়ে এসে বললো—‘লক্ষ্মী থেকে এসেছি। আমার নাম স্বপ্নান, কলকাতা আসতে হলো—বাবা বললেন একবার এখান হয়ে যেতে।’

লাফিয়ে উঠল মজু—‘তোর ভাবী বর দিদি! বাবা এবার ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছে, হার্ট, লাস মজবুদ কিনা দেখতে, মা গো—’ হেসে লুটিয়ে পড়ল সে।

বাস্তব হইতে উঠে দাঁড়ালো। আর মৌরী দাঁড়িয়ে রইল একটা বুক টিপ-টিপ নিয়ে।

বৌদি বললেন—‘আজই লক্ষ্যে চলে যাচ্ছে বাজারের ট্রেনে। বলছে, বেশীকণ বসতে পারবে না। তুমি চট করে তৈরী হয়ে নাও মৌরী! আমি বাচ্ছি শিশিমাঝে খবরটা দিতে।’ বৌদি চলে গেলেন।

গায়ে পাঞ্জাবী চাপাতে চাপাতে বাস্তব বললো—‘আর কি, বাও। আবার সেজেগুজে দাঁড়াও গিয়ে সাং হয়ে।’

—‘আমাকে যেতে হবে কেন? আমার দেখতে এসেছে, এমন কথা তো বলেনি।’

আকাশের দিকে তাকালো মঞ্জু—‘পুর পাগল! তোকে দেখতে আসবে কেন? বাপ ছেলেকে আমাদের ঘরের আসবাব দেখতে পাঠিয়েছেন।’

—‘আসবাবই তো তোরা। বিজ্ঞে ঠোট বাঁকালো বাস্তব। নিত্যদিন বাড়িপাট আর বসামাজার জোঁসুল তুলে খরিদারের চোখ ভোলাবার জন্ত বদে থাকছিস।’

—‘এই ছোড়গা, কথা বাড়িও না বলছি। শেবে পালাবার পথ পাবে না।’

—‘পালাবার পথ পাবে না।’

—‘হ্যাঁ পাবে না। জবাব দেবার মতো কথা মিলবে না।’

—‘এমনি সব ধারালো উত্তর রয়েছে। বেশ—রইল তোলা। দেখা যাবে কে কার হাতে বর হয় আজ। আর দেয়ী করলে ভুললোকটির আমাদের ভয়তাবোধ সবচেয়ে প্রথম দিনই একটা সন্ধেই এসে যাবে। আমি নীচে বাচ্ছি। তোরা তৈরী হয়ে আয়।’

এগিয়ে এল মৌরী। ‘দাঁড়াও ছোড়গা, আমি তোমার সঙ্গেই আসছি।’

—‘এই ভাবে?’

—‘হ্যাঁ।’

মঞ্জু বলে উঠলো—‘কেন এ ভাবে যাবে না? এর ভেতর ও বুঝি বার দু’তিনেক আয়নার দেখে নেয়নি এই অগোছালো চেহারার ওকে এখন বা হুসার লাগছে, প্রসাধন করলে তার সিকিও লাগবে না।’

—‘তোকেও বেশ লাগছে। এ ভাবেই বাবি, না সাজতে হবে?’

—‘তোর বর এসেছে, তুই সাজলি’নে আমি সাজবো। তোরা চাইতে চেঁচারাটা আমার চেয়ে ভালো—সে খেয়াল আছে? একটা সমস্তার স্ট্রি হতে কতক্ষণ।’

—‘ওর সঙ্গে পারবিনে মৌরী। চল শীগির।’ বাস্তব বোনদের নিয়ে চুকলো গিয়ে বসবার ঘরে।

সুদর্শন বসে বসে একটা বই-এর পাতা ওন্টাচ্ছিল। ওদের দেখে বই রেখে উঠে দাঁড়াল। বাস্তব নমস্কার জানিয়ে, একা বসিয়ে রাখবার জন্তে চাইল মাণ। তারপর ছুবোনকে দিল পরিচয় করিয়ে। নমস্কার-বিনিময় করে আসন গ্রহণ করল সবাই। গল্প জমে উঠতে লাগল বাস্তব সঙ্গে সুদর্শনের। মৌরী বসে রইল খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আর মঞ্জু বসে রইল একটা অস্বাভাবিক গভীর মুখ করে। যে জিনিসে বর বেগ, তাকে

আটকাবার জন্তে প্রয়োজন হয় তত বেশী ওজনের চাপ। মঞ্জুকে দেখেও মনে হচ্ছিল ভীষণ একটা হাসির ঘেশের মুখ চেপে রাখছে ও এই রকম অস্বাভাবিক ওজনের গাভীর্য দিয়ে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—‘আপনার ঘোঁষে মাছের দর কত?’

—‘মাছের দর।’ আশ্চর্য হয়ে চোখ তুলে সুদর্শন প্রথমে মঞ্জুর দিকে, তারপর মৌরীর দিকে তাকালো।

মঞ্জু সুদর্শনই নয়, বিষয়ে চোখ বড় করল বাস্তব, মৌরীও।

—‘হ্যাঁ মাছের দর।’ তেমনি গভীর মুখ মঞ্জুর।

যেকিলে কলেজে পড়া ছেলে সুদর্শন সে-ও হকচকিয়ে গেল। সবিনয়ে বললো—‘মাছের দর বলতে পারবো না।’

—‘কেন?’ ভারী বিস্মিত মঞ্জু।

—‘আমি বাজার করিনে।’

—‘তবু?’

—‘হঠাৎ চাকর চলে গেলে কি করেন?’

হেসে কেলল বাস্তব। ‘একি হচ্ছে মঞ্জু?’

—‘বা: বতই লেখাপড়া ককক ঠেকা পক্ষের জন্তে মেয়েদের যেমন কিছু মেয়েলীকাজ জেনে রাখতেই হয়—ছেলেদেরও তেমনি কিছু জানা উচিত—নইলে সংসার অচল হয়ে ওঠার মতো বাহির অচল হয়ে ওঠে না।’

এবার হাসল সুদর্শন। —‘তেমন দিনে হোটলে যাব।’

শিশিমাঝ ডাকে বেরিয়ে এসে বাঁচল মৌরী। বৌদির দিকে তাকিয়ে বলল—‘কি দুর্দান্ত মেয়ে বে বাবা।’

—‘কেন কি করেছে আমি?’

—‘আর কি কি করবার ইচ্ছে ছিল আপনার?’

—‘বার জন্তে চুরি করি সেট বলে চোর।’ ছোড়গাটা সামনে কথা বলে চলেছে বেন ভুললোক ওকে দেখতে, ওর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। দিলাম কথার মোড় ঘুরিয়ে এদিকে তাকাবার ব্যবস্থা করে—‘আমারই দোষ হ’ল?’

—‘না কিছু না।’ জান বৌদি, জিজ্ঞাসা করে কি না ‘মাছের দর কত?’

গালে হাত মিলেন বৌদি।

—‘তবে কি জিজ্ঞাসা করব? রবীন্দ্র সাহিত্য পড়ছেন? কবিতা কেমন লাগে? চিত্রতারকারের কে আপনার প্রিয়? আছে! তুমিই বল বৌদি, তার চাইতে বাজার দর প্রশ্নটা ভাল নয়?’

—‘খুব ভালো। কিন্তু পাত্র নেপথ্যে কেমন, তাই বল এবার।’ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন বৌদি।

—‘অপূর্ণ। ভারী মিষ্টি দেখতে। ছোড়গার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কি মিষ্টি মিষ্টি হাসছিলেন। মাখার চুলগুলি যে বাতাসে উড়ছিল তাই বা কি মিষ্টি। তুই অমন করে তাকচ্ছিস কেন দিদি? একদিন তুই তোরা এক বন্ধুর বর দেখে এসে এক ডজন লিপি বসেছিলি, আমি শুণে রেখেছি।’

—‘ঐ যে শিশিমাঝ বলল, তাকে পুলিশ দিয়ে সামলাতে হবে, সত্যি তাই।’

—‘কে জানে, শিশিমাঝার বাণী না জানি আমার জীবনের ভবিষ্যৎ বাণী।’ একটা টানা দীর্ঘশ্বাস কেতল মঞ্জু।

কিন্তু বেটীয়ে ধাবার কথা ছিল সে ট্রেনে সুদর্শনকে যেতে দিলেন





সুমিত্রা দেবী বলেন “লাক্স টয়লেট  
সাবানের শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতার পরিচয় দেয়।”

সুমিত্রা দেবী দুইবার বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক  
“বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী” নির্বাচিত হয়েছেন। এই তাঁর গুণের  
নিঃসন্দেহ প্রমাণ। কিন্তু তবুও শুধু প্রতিভা নয়, তাঁর আছে হকোমল  
সৌন্দর্য, লাবণ্য, যার জন্তে তিনি নানারকম চরিত্রে সার্থকতার সঙ্গে  
অভিনয় করতে পারেন।

এই লাবণ্য সুমিত্রা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষা করেন  
বিশুদ্ধ এবং শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে। ত্বকের যত্ন নিয়ে।  
এই বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সরের মত মোলায়েম এবং  
সুগন্ধ কোয়ার সাহায্যে আপনারও ত্বকের যত্ন নিন।



লা ক্স ট য় লে ট সা বা ন  
চি ত্র ত্ভা র কা দে র সৌন্দর্য সা বা ন।

সর্বস্বীন সৌন্দর্যের জন্তে—  
বড় সাইজ কিনে খরচ বাঁচান।

LTS. ৫২৪-X৫২ BG

না মৌরীর বাবাই। বললেন—‘এমন ছুটোছুটি করে বাবার দয়াকর কি? একদিন দেরি করলে কি খুব অসুবিধে হবে?’

—‘তুমি নয়।’

—‘তবে আর কি। আজ এখানেই থেকে যাও।’

সন্ধ্যাবেলা বেল একটা ভয়ানক আসর বসেছিল। কে যে কখন এক এক করে উঠে গেছে—মৌরী লক্ষ্য করেনি। চঠাং খেয়াল হলো, মজু উঠে গাড়িয়েছে। আর ও চলে বাতরা মানে স্তম্ভন আরও একেবারে একা পড়া। মজুর হাত চোখে ধরল মৌরী—‘তুই আবার কোথায় চললি?’

—‘রায়াঘরে। নয়তো নিজের ঘরে। নয়তো তোর তেতলার চিলেকোঠায়।’

ধমক দিল মৌরী—‘বোস বলছি।’

—‘এক পেছাটা চা সম্ভব হবে?’ স্তম্ভন মজুর দিকে চাইল।

—‘ওয়েল ম্যানেকড। তা এ বাড়ীতে আপনাদের জন্ত আজ অসম্ভব বলে কোন কথা নেই।’

মজু চলে গেল। স্তম্ভন কামাল দিয়ে মুখ বুলল। যদি এমন ভারী কোচ না হয়ে বসবার স্থানটা হালকাভাণ্ডার কিছু হতো, তবে সে নিশ্চয়ই সেটা টেনে মৌরীর কাছে এগিয়ে আনত। একটু খুঁকে বসে বললো—‘ভাবছি, বাবাকে গিয়ে মাথা ঠুকে একটা মন্ত প্রণাম করব।’

—‘কেন?’

—‘আনন্দে, কৃতজ্ঞতায়, তাঁর নির্বাকতায় মুগ্ধ হয়ে। কিন্তু আমাদের কি রকম লাগল জানতে চাইলেও আপনি তো নিশ্চয়ই মুখ খুলবেন না?’

চুপ করে রইল মৌরী।

—‘কি, বলবেন না তো?’

—‘এই সময়টুকুর ভেতর কি আর একজনকে চেনা যায়?’

—‘এইটুকু সময়! ভোর দশটা থেকে আটটা—পরিচয়ের প্রায় চকির ঘটনা হয়ে গেল যে।’

তবু চুপ করে রইল মৌরী।

—‘আরো সময় চাই। বেশ! বর্তমানে যতটুকু গেছে, তাই বলুন না হয়?’

—‘পোষাক ভালো, চেহারা মন্দ নয়, ডুইংকম আলাপে দখল আছে।’

হেসে ফেললো স্তম্ভন।—‘ডুইংকমের পাশের ঘরের সান্ধ্যটার জন্তেই তবে আর সব জানা তোলা রইল।’

স্তম্ভনের দৃষ্টি, তার কথা, গলার স্বর সব মিলিয়ে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে মৌরী। এবার ওঠা ভালো কিন্তু যেই মৌরী উঠে গাড়িয়ে বললো ‘আসছি।’ অমনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে গাড়াল স্তম্ভনও।

ওদের দুজনকে নিতৃত আলাপের সুযোগ দিতেই যে সবাই চলে গেলেন, এটা স্তম্ভন ঠিকই বুঝেছিল। কিন্তু সুযোগটা সে কিছু নিয়ে কেমন বেকসই। আচমকা কাছে টেনে আনল মৌরীকে। এত অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটা মৌরীর কাছে যে, প্রথমে কিছু বুঝে উঠতেই পারলো না সে। তারপর স্তম্ভন বখন ওকে ছেড়ে দিয়ে ফের গিয়ে কোঁচ বসল, তখন হয় ও পাখর হয়ে গেছে, নয় গেছে

যে। নইলে ছাড়া পেতেও ও অমন স্থির দৃষ্টিতে স্তম্ভনের দিকে তাকিয়ে গাড়িয়ে থাকবে কেন?

মৌরীর এ দৃষ্টি সঙ্গে পরিচয় ছিল না স্তম্ভনের। সে ভেবেছিল ছাড়া পাওয়া যায় ছুটে পালাবে মৌরী লজ্জায়। এমন স্থির দৃষ্টিতে যে ওরই দিকে তাকিয়ে গাড়িয়ে থাকবে, বা কোন মেয়ে তা থাকতে পারে—এ পর্যন্ত স্তম্ভনের জীবনে সে অভিজ্ঞতা হয়নি। অবস্থাটা হয়ে গাড়ালো উঠো অর্থাৎ ওরই ছুটে পালাবার মতো। একেবারে এতটুকু হয়ে গেল সে। হাত জোড় করে কমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে যেন বলতে বাচ্ছিল সে সময় প্রচার হাতে পাবো, সেদিন আমি জিজ্ঞাসা করব কোথায় অপরাধ—আজ কমা চাইছি—

চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো মজু।—‘একি! হাত জোড় করে কি প্রার্থনা করছেন?’ স্তম্ভনের হাতে চা দিয়ে মৌরীর দিকে তাকতে গিয়ে মজু দেখল, এহঁই ভেতর কখন যেন সে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

বীর পার একটি একটি করে সিঁড়ি ভেঙ্গে তেতলার চিলেকোঠায় উঠে এসে ইজিচেয়ারটার উপর শুক হয়ে বসে রইল মৌরী। শুক হয়ে রইল ওর শরীরের সমস্ত রক্তকণিকা। অস্ত্র কোথাও এ অবস্থার ওরা শরীরময় মাতাল-নৃত্য জুড়ে দেয়। কিন্তু যে শরীর বাস করে, তাকে ওরা ভালো করেই চেনে। সেখানে মাতলামী করবে তেমন সাহস ওরা রাখে না।

কিন্তু সত্যি কি এতটা বিচলিত হবার মতো কারণ কিছু ঘটেছে?

কারণটা বাইরে খুঁজলে মিলবে না। অধঃপাতি চালাতে হবে ভেতরের দিকে। মাটির সামান্য কম্পনেও বিশ্ব-সংসার কঁপে ওঠে। কারণ নাড়াটা দেয় সে বিশ্বের মূল ভিত্তি ধরে। স্তম্ভনও নাড়াটা দিয়ে ফেলেছে মৌরীর চারিত্রিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। একটা অতি উঁচু সুরে বাঁধা মন মৌরীর—প্রায় কালিক মানের। সঙ্গীত-জগতের মতোই এমন মানেরও সময়দার মেলা ভার। ওর সঙ্গে কারু বন্ধু গড়ে ওঠে না আর গড়ে উঠলেও ভাঙতে সময় লাগে না। বয়সখণ্ডে ওদের কথা ওদের মতি যেদিকে গতি নেয়, মৌরী মুখ কেরার সে দিক থেকে। নতুন বিষয়ে হয়ে আসা বাস্তবীদের নিয়ে কৌতুহলে কেউ মাত্রা ছাড়ালে মুখের প্রতিটি রেখায় প্রকাশ করে বসে, এম বিরাগ বা আত্মমর্ধ্যাদায় আবৃত করে। মনে মনে অপমানিত বোধ করে ওরা। বন্ধ হয়ে যায় বন্ধুদের মনের দরজা। এই একই দরজাই ওদের মনের কাছে। সেটা বন্ধ হলে আর কোন পথ পা না মৌরী ভেতরে ঢোকবার। মন খারাপ করে এসে ঘরে বসে শুনে পায় বন্ধুর মন্তব্য করছে, অতি আনন্দোৎসাহিত মেয়ে ও। শুনে হাসি পায় মৌরীর। একটি রোম্যান্টিক মন পাওয়া জগতে বত দুলত তার ভেতর একটিও বোধ্য হয় ওদের নেই। তাই অপপ্ররোগে এমন নিঃসঙ্কোচ।

এমন মেয়ের মন পাওয়া কঠিন—সে সবচেয়ে অবহিত ছিলেন বাড়ীর সবাই। তাই আগে থেকেই ওর মনটা তৈরী করে রাখার কাজে লেগে গিয়েছিলেন তাঁরা। পাত্রের বিজ্ঞা-বুদ্ধি-ব্যস্তি-ঐশ্বর্যের বাণ এমন নিপুণতার সঙ্গে এক একটি করে নিক্ষেপ করে চলেছিলেন, যেন মৌরী মুখ কেরাবার পথ না পায়। যখন ও-পক্ষ থেকে পছন্দ হবার খবর এলো, তখন সবাই মিলে এমন কাণ্ড জুড়ে

দিলেন, যেন অপ্রত্যাশিত নয়, অবলম্বনীয় কিছু ঘটতে থাকে। বন্ধু দেখতে বা সাহস ছিল না তা চলেছে সত্য হতে।

ভয়ে ভয়ে এসে বোনকে জিজ্ঞাসা করেছিল মৌরী—‘কি করি বল ত?’

নিজের দুচোখ বন্ধ করে দেখিয়ে বিল মজু—‘একেবারে এমনি করে দুচোখ সঁটে বন্ধ করে বসে থাক।’

—‘চোখ বন্ধ করে বসে থাকব?’

—‘হ্যাঁ। আর খুবির সেই শুভদৃষ্টির সময়ে। এর আগে নয়।

সাহিত্যরথী মহাশয়দের মানসপুত্রদের জন্ত বসে বসে মালা গাঁথিস—মিলবে? তোমার দ্বারা আপন স্বামী নির্বাচন জীবনেও হবে না। তোকে বিয়ে করতে হলে বীদের নির্বাচনে করতে হবে, তাঁরা যখন এমন চাঁদ পাওয়া ভাব করছেন, তখন তুমি চোখ বুজে বসে থাক।’

তাই থাকবে ঠিক করেছিল মৌরী। ছিলও তাই। সুদর্শন না এলে ও চোখ খুলত সত্যি শুভদৃষ্টির সময়েই। তাই যখন বৌদি এসে বললেন সুদর্শন এসেছে, তখন ওর বুকটা যে এমন চিপ চিপ শুক করেছিল তার কারণটাও এই—বদি ভালো না লাগে। বদি মন বৈকে বসে! কি দেখে বৈকে, কেন বৈকে, সবার কাছে যা তুচ্ছ মনে হবে বা কিছুই মনে হবে না তেমনি কারণে ওর মন কেন এমন বিরুদ্ধ হয়ে উঠবে, যে শত চেষ্টা করেও আর মুখ ফেরাতে পারবে না। নিজেও বলার মতো কোন কারণ হয়ত বের করে উঠতে পারবে না—কিন্তু—তা হলে কি হলো। যা হবার তা হয়ে গেছে। সুদর্শনকে ওর ভালো লাগেনি। ওর হৃদয় রচিবোধে ওর হৃদয় মাত্রাবোধে হয়ত সে এর ভেতর বহু বার আঘাত করে ফেলেছে। কিন্তু আলাপে পরিচয়ে যখন ভালো লাগল সুদর্শনকে, যন্ত্রির নিশ্বাস ফেলল মৌরী। রূপে সে কমল নয়। কিন্তু তার চেতনায় যা আছে তা রূপের চাইতেও মূল্যবান। একটা স্থির আত্মবিশ্বাস। এমন চেতনার ডাক্তার দরজায় এসে দাঁড়ালেই বৌদি মনের বল ফিরে পায়। ডাক্তারের আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন বৌদির মুখে গিয়ে পড়ে, তার বিশ্বাসও বাড়িয়ে তোলে। মৌরী দেখল, কথা বলতে সুদর্শন জানে কিন্তু তবু সে সংযত-বাক। এই বাক-সংযম তার প্রকৃতিগত না অভ্যাসকে স্বভাবে ঝাঁড় করিয়েছে আপন ব্যবসার অন্ধ হিসাবে, ও অবশিষ্ট তা বুঝে উঠতে পারেনি—তা যাই হোক, একটা মানুষকে ভালো লাগার পক্ষে এটা ওর কাছে একটা মস্ত গুণ। তাই অসাধারণ সাধন হয়ে গিয়েছিল। মৌরীর ভালো লাগে গিয়েছিল সুদর্শনকে। যত বার ওর দিকে তাকিয়ে সুদর্শন কথা বলেছে বা হেসেছে এমন একটা অপরিচিত অশ্রুভক্তির স্রোত ওর শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে যে, মৌরী বিম্বিত না হয়ে পারেনি। কিন্তু সব কিছুর উপর নিজ হাতে যেন ছুরি চালিয়ে দিল সুদর্শন। পরিণতি লাভের জন্ত যে সম্পর্ক যতটুকু সময় চায়, যে ঘটনার জন্ত যতটুকু প্রস্তুতি কাল প্রয়োজন, সেটুকু দিতে অবসর না মানা—এ অসীলতা।

দিনটা অসহ্য গরম। পরিমাণ বস্ত্রের পারদ ক’দিন ধরেই গিয়ে ঠেকেছে আট নয় ছাড়িয়ে। সন্ধ্যার দিকে বস্ত্রের পারদ নেমে এলেও গরমটা ধরে রাখা ইট, কাঠ, দেওয়াল। অন্ধ দিন বাতাস থাকে, আচ্ছা তাও নেই। একেবারে নমবন্ধ ভাব। নমবন্ধ হয়ে আসছিল মৌরীরও। বদিও কিছুকণ আগে এর উল্টো মনোভাবটাই কাজ করছিল ওর মনে—বিশ্ব এখন মনে হ’তে লাগল কোথাও কিছু ভালো লাগার মত নেই। আকাশটা অতি বেশী নীল। তারাতুলো অতি বেশী জলজলে। চাঁদটা যেমন কাছে, তেমনি বিস্তীর্ণকমের বড়। রং ব্যবহারে সংযম নেই কোথাও। অতি কাঁচা শিল্পীর হাতের কাজ।

গলির ওপরের আদমগাছটা তার শুভ্রিট মাত্র গলিতে বেধে সমস্ত শরীরটা নিয়ে এসে বঁকে পড়েছে ওদের ছাদে। মজু বলে—‘ও ‘কাক’ নয়’ হয়ে থাকতে চায় না। সেই গাছটা এখন কেঁপে উঠেছে বৈশাখী আমে। রং ধরা শুক হ’লো বলে। সোজা হয়ে বসল মৌরী। আচ্ছা গাছগুলো যদি হঠাৎ হঠাৎ ভূইকোড় হয়ে বেরিয়ে এসে এক এক মাথা পাকাকল নিয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে ঝাঁড়াত? প্রকৃতি অজ্ঞান, অজ্ঞান হ’তেন ঠিকই কিন্তু তার শিল্পী নাম হুত। পাতা খোলা, পাপড়ি মেলা, ফুল ফোটা, ফুলের ফল হয়ে ওঠা তার কাঁচা বর্ণ রং ধরা—এর একটা স্তম্ভও সে জোর ক’রে এগুতে চায় না, এমন হৃদয় শিল্পীমুদ্রিত তার! ভালোবাসায়ও এমনি একটা ধাপে ধাপে পরিণতি আছে—সেও সময় চায় পাতা খোলার পাপড়ি মেলায়। শিল্পিমনের অশ্রুভুক্তিকাল ওতো সেটাই। শুধু ফলে লক্ষ্য তো লোভীর! কিন্তু তার জন্তও তো সময় দিতে হয়। উপভোগ করতে না জানলেও অপেক্ষা করতে জানতে হয়। মৌরীর মনে হয়, অনেকটা রমা পঞ্চ সুদর্শন ওকে হেঁচড়ে নিয়ে এল। পঞ্চ, সব কিছুতেই এই পথটাই তো সবচেয়ে মূল্যবান। পথের সাধনায় এক টুকরো ছড়ি ওঠে ভগবান হয়ে। নইলে ঘরে বসে যে পাখরের টুকরোটাকে মানুষ ছুড়ি বলে ফেলে দেয়; চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে, মরুপ্রান্তরের আঙনে ঢালা পথে পা ফেলে, হিমালয়ের বরফ ঠেলে—অনাহারে অন্ধার হয়ে কত দুঃখের পথ অতিক্রম করে—সে ছড়িকেই বুকে চেপে ধরে, মানুষ ভগবান বলে। পথের সাধনায় আপন অন্তরটাই হয়ে ওঠে শুধন ভাদের পরিভ্রমণী। চোখ বুজলে সেখানেই তারা ভগবানকে দেখতে পায়। কি ভগবানের ক্ষেত্রে কি ভালোবাসার ক্ষেত্রে, এ প্রশ্নটিটাই কি পূণ্য নয়? এই প্রশ্নটিটাই কি প্রেম নয়?

শুধু এই নয়, এই ঘটনার ভেতর দিয়ে মৌরী যেন সুদর্শনের চরিত্রের অনেক দূর পর্যায় দেখে নিল। একটি মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে তার টোট স্পর্শ করবার কাঁচা অবস্থা সে পায় হয়ে এসেছে। অভ্যস্ত—এতে অতি অভ্যস্ত সুদর্শন। হাত দিয়ে চোখ ঢাকল মৌরী। তারাতারা আকাশটাকে যদি টেনে নামানো সম্ভব হ’তো, তবে বুকি সেটা দিয়েই মুখ ঢাকত মৌরী।

[ ক্রমশঃ।





সিরাজুল হক

তেলকালিমাখা হাতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাড়ি

চুকল অশোক। বেলা তখন প্রায় দুটো। দুঃসহ কুখা বায়টার পর হতেই শুরু হয়; কুখা ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতে পারে কিন্তু কজি-বোজগারে নিঃশব্দমুখিত! চলে কৈ? নির্দিষ্ট সময়ে স্নান-আহার সব দিন হয় না। কোন দিন সাড়ে বার, কোন দিন একটা-দেড়টা, আবার কাজের চাপে আড়াইটা তিনটেও হয়ে বার এক একদিন। আজ যেসিন ষ্টাট দেওয়া হয়েছিল সকাল ছ'টার। গোড়া গাড়ী থান আমদানী; বেলা দেড়টা পর্যন্ত যেসিনটার গোড়ানি ঘসুখানি সমানে চলছে। বাস্তব দিকে তীক্ষ্ণ নজর পাটনার মতিয়র রহমানের। মতিয়র পৌনে বারটার পর আর কিছুতেই যেসিন চালু রাখতে চায় না; এই নিয়ে অশোকের সঙ্গে প্রায়ই তার কথাকাটাকাটি। মতিয়র বলে থাকে, টালবাহানা কেউ ঘুচাতে পারবে না রে! বাঙালীর এটি শেষ বিধিলিপি। থান আমদানী হবেই, তাই বলে সময়ে নাওয়া-খাওয়া না করে অসময়ে বাঁহাটা মাটি করবি? ভিটামিনের ডেক্সিমেট্রী শতকরা নব্বই জনের। দুধ মাছ দেশ থেকে একরকম উঠে গেল। 'সি-এ চারি। সরষের তেলে শিরাচুল কাঁটার নিধাস। চা-এ চামড়ার গুঁড়ো। ভেজাল আর ভেজাল; ভেজাল ছাড়া খাবার নাই, পানীয় নাই। মাছষ বাঁচবে কি করে? পরমাণু বাড়বে কিসে? অকালে গীত ভাঙছে। চুল পাকছে। পাড়ার পাড়ার বন্ধা, হাঁপানি। তার উপর বাবা এই হাসকিন যেসিন নিয়ে ধন্যধন্য; খুলেগুঁড়ো হরমম নাক দিয়ে পেটে চুকছে, ফুসফুস আঘাত হানছে। উঁহ, বাস্তব দিকে খুবই খেয়াল রাখতে হবে, নইলে সবই বিকল। কল চালাবে কে?

মতিয়র অভিশয়োক্তি করে নাই। গত বছর অশোক পুরো ছ'বছর ভুগছে। চিকিৎসার টাকাও কম খরচ হয়নি। কিন্তু তবুও বাহ্যরকার নিয়ম-কানুনগুলো সব সময় মেনে চলা যায়

না। যে পেশা পাঁচ জনের সহায়ত্বের উপর অনেকটা নির্ভর করে, যেটা একটা ব্যবসাইই সামিল, সেখানে স্বাধীন কর্মশ্রুতি চলেবে কি করে? অশোক এ কথাটা কিছুতেই পাটনার মতিয়র রহমানকে বোঝাতে পারে না। আর একটি ব্যক্তিও ভরানক আবু। সে হল রমা। রমার অগন্তোষ বা অগ্ন্যবগোটা শাডী-স্নো-পাউডারের স্বাধীনতা সববাহের নয়। স্বামীকে অভ্যস্ত বেখে সে বুখে আহাির তুলতে পারে না অথচ অন্তঃসত্তা রমার গর্ভস্থ রূপ তাতে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই অশোকের বাড়ি প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই রমা প্রায় কঁদে কেলেল। অশোক কয়েক সেকেন্ড অপরাধীর মত ঠাঁড়িয়ে থেকে পরম প্রীতিভরে পত্নীর হাত ছ'খানি নিজের মূর্তীর মধ্যে নিয়ে বলল—আজ থেকে তোমার কাছে আমি শপথ করছি রমা, আর কোনো দিন আমি এতো দেয়ী করব না। বারোটার আগেই আমি চালু যেসিনও বন্ধ করে এসে নেয়ে-খেয়ে বাব, কেমন?

রমা উল্লাসে অজ্ঞ আঁচলে মুছে স্বামীর হাতখোঁওয়া জল, লাইফবর সাবান ও গামছা আনতে সেখানে হতে চলে গেল। রমার গমন-পথে তাকিয়ে পরিশ্রান্ত অশোকের আজ অনেক কথাই মনে পড়ে বাচ্ছে পর পর। অনেক খোঁজ-খবর আর বাচাই করে বাবা যেসিন রমাকে খবর বট করে নিয়ে এলেন; সেদিন বাবার সমবয়সীরা বলেছিলেন—ভায়া বেলস্মী সরস্বতী দুটোকেই ঘরে এনে তুললে তে! যেমন ছেলে, তেননি বউ; এ একেবারে রাষ্ট্রঘোষক।

সত্যই রমা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। সেদিনের সেই লক্ষ্মী সরস্বতীর আজ এক ছিবি! আজ কে বলবে এ সেই রমা? প্রতিমা বিশিষ্টতার পর জল থেকে তুলে আনা খড়ের কাঠামোর মত রমার রমা সেখ থেকে সব কিছু শিল্পসম্ভার অঙ্কিত হয়ে বিস্তৃত্য হাহাকার করছে। রমাকে দেখলে আজ আর চেনাই যায় না, অথচ কি-ই বা এমন বয়স! কাঁটা বছরই বা বিয়ে হয়েছে! চল বছর আগে অশোক এম, এর ছাত্র, রমা বি, এস সির। পূর্ববাগ বা রোমান্সের প্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে তার। একলা পরিণয়-বাটে এসে লাগেনি। অশোক জমিদারপুত্র, কোলকাতায় পড়াশুনে করছিল। রমাও জমিদারকন্যা, কোলকাতার কলেজে পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার বাবা। অশোক রমা কেউ কাউকে চিনতো না। উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। ছেলেমেয়ের তত্ত্বতবাস করে উভয় অভিভাবক একই ট্রেনের একই বগির বেঁকেতে পাশাপাশি বসে দেশে কিংবদন্তি, চার ঘণ্টার জাতির ভিতর দু'জনের অভিভাবক আলাপনের মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি এমনি আকর্ষণ হয়েছিলেন যে, চিরস্থায়ী রক্তের সম্পর্ক স্থাপন করতে পাত্রপাত্রী চোখে দেখার পূর্বেই শুধু কানে শুনে এক রকম পাকা কথা দিয়ে দিয়েছিলেন।

বিয়ে হয়েছিল। অশোক এম, এ আর রমা বি, এস সি পাশ করে কলকাতার হোর্টেল রেড়ে এসে দেশের বাড়িতে দাম্পত্য জীবন শুরু করল। জমিদারী ছিল, আর বেশ কয়েক হাজার টাকা, পাকা বাড়ী, নারের-গোমস্তা-পায়দা-পাইক-চাকর-চাকরাণী, সবার উপরে মাখার উপর বাবা। জীবনটা ছিল খুবই হাসক আর রঙীন, পাখা মেলে নীলাকাশে উড়ে চলবার মত।

ভূমিকম্প হল না বটে কিন্তু সব ভূমিসংগ হয়ে গেল বৈ কি! বাচ্ছে, বাবে, বাবে না, এই করতে করতে এক দিন জমিদারী প্রাণ

রহিত হয়ে গেল। সেই সঙ্গে নাইব, গোমস্তা, প্যারল, পাইক আপনা আপনি বরখাস্ত হল। বাবা গতানুগত্য হলেন। সিন্ধু খুলে দেখা গেল, সেটা সব সময় চাঁবি বেওয়া থাকলেও ঝাঁক। অশোক ও রমার হাড্ডা জীবন হঠাৎ দুর্ভাগ্য হয়ে পড়ল। সেদিনের চক-মিলানো ভূমিদারবাড়ী, লতাপাতা অশোভিত তোরণদ্বার, কাছারী-ঘর, নাট মন্দির সবই আছে কিন্তু তার প্রতি ইটে সমারোহের যে প্রতিধ্বনি তুলত, তা আজ গভীর বিষণ্ণতার মৌন, নিম্নত্ব, অপাত্তের। দূব-দূবস্তের মহাল থেকে প্রজ্ঞার আসক্ত। কাছারী-ঘরের মধ্যে প্রজ্ঞার আশ্রিত প্রসিদ্ধাতের স্বাক্ষর আজও বহন করছে কিন্তু ভূমিদারী প্রথা রহিত হওয়ার পর প্রজ্ঞার প্রণাম্যবনত মাখাগুলো যেন লৌহনির্মিত কৃত্তব-মিনারের মত আকাশ ফুঁড়ে উন্নত শির হয়ে পড়ল। সেখান হতে ভূমিদার-বাড়ীটাকে আজ খুবই দূর, খুবই করুণার স্থান বলে মনে হয়। এই ক্ষুদ্রতার মধ্যে রমা এক এক সময় হাঁপিয়ে উঠে, ভয়ও করে তার। রমা অল্পবয়সে করে—ওগো, তুমি তো বাইরে পাঁচটা লোকজন নিয়ে থাকো, আমি কি করে থাকি বল তো এই ক্ষুদ্র পুরীতে? দুপুরবেলায় তেতলার ঘর শুতে গিয়ে গা আমার হুমছম করে। না বাপু, এখানে আমি থাকতে পারব না; এ নিম্নবাস তুলে নিয়ে অন্য কোথাও বাই চলে।

অশোক বলে—জনতাকে আমরা যুগ-যুগান্তর হয়ে ধূরে সহিয়ে বেবেছিলাম বলেই তো আজ নিম্নবাস অপাত্তের হয়ে থাকতে হচ্ছে রমা! অজ্ঞতা, মূর্ততা, অজ্ঞা ও শোষণের অযোগ্য নিয়ে মানুষের

তথু সেলামই কুড়িয়েছি; ভাই বলে কোলে ধাঁই নিই নি তাদের। মানবসেহের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তক আর ললিটমেশ আমাদের পদধ্বনিত অপমানিত ও কলঙ্কিত হয়েছে রমা! নবরূপী নারায়ণের সেই অপমান, তিনি কি ক্ষমা করবেন আমাদের? তাঁর ক্রোধের থেকে নিজস্ব পাবার ক্ষমতা ইতো আজ নিম্নবাস করতে হবে এখানে। সে কথা ভুলে গেলে তো চলবে না আমাদের? তবে হ্যাঁ, তোমারই বা ভয় করার কি আছে? সেদিন চাঁদপুরের বোই নীচাকর্ণের কাছ থেকে যে মাহুলিখানা নিলে, সেটাতে কোন কাজ হচ্ছে না বৃষ্টি? ভূত-প্রেত, ডান-জাকিনী 'তো তোমার দেহের ত্রিণীমানার ভিত্তিয়ার কথা নয়, তবে বাড়ীটার চতুঃসীমা বন্ধ করতে হবে বৈ কি!

কথাটা শেষ করে অশোক নিজেই চলে ফেলে। রমা কৃত্রিম ক্রোশ প্রকাশ করে বলে—তোমার সব কথাতেই 'জোক'। আমি কি মিথ্যে বলছি? তুমি একদিন দুপুরবেলায় তেতলার ঘরে একা-একা শুয়ে দেখ না, ভয় করে কি না।

অশোক কঠোর হঠাৎ গাঢ় প্রত্যাহার এনে উত্তর দেয়—তুমি যা বলে তার এক বস্তুও মিথ্যে নয় রমা, সে বিশ্বাস তোমার উপর আমার আছে। কথা হল এই যে, ভূত-প্রেতগুলো বড়ই বাবু আর আত্মশ্রিয়। পাঁচ বাড়ী ঝাঁক দেখলে আর কথা নেই। কোন সময় অলক্ষ্যে ঢুকে পড়ে ভাঁকিয়ে বসে, লাগালাগি করে দিন-দুপুরে। চর্পচোখে দেখতে গেলে তো কথাই ছিল না। লাঠি-সোঁটা দিয়ে ঠেড়িয়ে দূর করা যেত; তা এখন সম্ভব নয়, এখন

## বেশীর ডাগ প্রসূতিকেই পিউরিটি বার্লি দেওয়া হয় কেন?

কারণ পিউরিটি বার্লি

- ১) সন্তান প্রসবের পর প্রয়োজনীয় পুষ্টি যুগিয়ে মায়ের দুধ বাড়তে সাহায্য করে।
- ২) একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী ব'লে এতে ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট বার্লিশস্তের পুষ্টিবর্ধক গুণ সবটুকু বজায় থাকে।
- ৩) স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সীল করা কোটোয় প্যাক করা ব'লে খাঁটি ও টাটকা থাকে—নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।

## পিউরিটি

ভারতে এই বার্লির চাহিদাই সবচেয়ে বেশী

বিনামূল্যে

“মায়াদের জানবার কথা”

পুস্তিকাটির জন্য লিখুন :—অ্যাটলান্টিস (ইন্সট) লিমিটেড (ইংল্যান্ড ও সংশ্লিষ্ট)  
ডিপার্টমেন্ট, এক বিপি-১, শো: বক্স ৬৬৪, কলিকাতা-১



BY-1

PTV 272

বোঁটমী ঠাকুরকে দিয়ে গোটা বাড়ীর চৌহদ্দিতে গাড়ী-চার মাহুলি পুঁতে দিলে কেমন হয়? তত্ত্বজ্ঞির মত আর শক্তি আছে? সব কুশোকাং হয়ে যাবে। তাই-ই করব রমা! এই শূন্য পূরীতে একা বখন আমাদের থাকতে হবে তখন নিরাপদ পথ হল বোঁটমী ঠাকুরের তাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন মাহুলি ধারণ।

স্বামীর পরিহাস-উজ্জ্বলে রমা মোটেই উৎসাহ বোধ করল না। বিমিত্ত কণ্ঠে বলে—তুমি কি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস কর না?

করি। অশোক উত্তর দেয়—শ্রীমতী মনোমত দেবী যদি সায়েন্সের ছাত্রী হয়ে ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে, তা হলে তাতে অশোক বন্দোপাধ্যায়ের শোক করা মোটেই শোভা পায় না। করি, খুব করি।

রমা আর তর্কে প্রবৃত্ত হয় না। স্বামীকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ গা, বখন আমাদের জমিদারী ছিল, মহাল হতে প্রজারা আসত বাতনা দিতে, নজর দিতে, বাবাকে প্রণাম করতে; গনগম করত কাছাগী-ঘর। নায়েব, গোমস্তা, পাখালা, শটিক, চাকর-চাকরাণী সবাই জমিদারী বাগানের সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেল এখান থেকে। পরোনো মনিব বলে কেউ তো থাকল না এক-আধ বছর এ বাড়ীতে?

আবার হাসলে রমা! অশোক প্রত্যুত্তর করে—নিমক খেলেই কি সকলের কাছ থেকে তার প্রতিধান পাওয়া যায় রমা? তা'ছাড়া মোঁচাক মধু না থাকলে মৌমাছির গুজনধনি তো শোনা যায় না! এ তো স্বাভাবিক-সম্মত কথা।

রমা পূর্বকথার স্মরণে পুনরায় জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ গা, প্রজারা তোমায় চিনতে পারে তো? রাজা-ঘাটে হঠাৎ দেখা হলে প্রণাম করে, পায়ের ধূলা নেয়? এত দিন তাদের জমিদার ছিল বলে সন্মোচ-সমীহ করে? 'বাবু' বলে সম্বোধন করতে ভুলে যায় না তো তারা?

কী সব প্রশ্নাবলি বকে যাচ্ছে রমা? অশোক রমাকে ধামিয়ে দিয়ে বলে—পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক বন্দোপাধ্যায়কে প্রজারা চিনতে পারবে না, এ কি বলছ তুমি? খুবই পারে। জমিদার-বাড়ীর জাতকর্ম থেকে শুরু করে জমিদার-নন্দনদের জীবনের প্রতিটি খাপ আর তার অমুঠানে অর্ধ-উপচার যে প্রজাদের ঘর থেকে এসেছে তারা চিনবে না তো চিনবে কে? তাদের সেদিনের খোকন বাবুর অঙ্গপ্রাশনে যে অল্পমুষ্টি আমার কচি অথরোষ্ঠী স্পর্শ করেছিল, সে তো তাদেরই ভ্রমজাত তত্ত্বলব্ধি তৈরী রমা? সোনার থালায় সজ্জিত অল্পমুষ্টির আড়ালে যাদের দান-হস্তের নীরব কল্যাণ কামনা ছিল, তারা কি ভুলতে পারে কখন? যে খোকন বাবুর উপনয়নে বিবাহের ভোজকাজে প্রজারাই স্ট্রিচিতে জুগিয়েছে পুরুষের মাছ, কলসী-ভরা দুধ, দই, ভাঁড়-ভর্তি ঘি, গামলা-ছাপানো ছানাবড়া-বসগোলা, বস্তাবন্দী চিড়ে-মুড়ি, সফ্র চাঙ্গ, সেই খোকন বাবুকে বাস্তবধাতো দেখা হলে তারা পাশ কাটিয়ে চলে যাবে? রাজা-প্রজা সম্পর্কের চাইতে স্বরূপ-রাজ্যের সম্পর্ক যে আরও বড় রমা! তুমি তো জান এম, এ পাশ কবে বিয়ে হওয়ার পর বাবা বখন আমাকে জমিদারী দেখাতনার কাজে তালিম দিতে লাগলেন, কাছারীতে বসে থাকতাম, প্রজারা মহাল থেকে এসে আত্মমিনত হয়ে

প্রণাম করত, পায়ের ধূলা নিতে; তাদের আহুগতানমিত মূর্তি আজও আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। সেদিন নিজেকে চরম পূজনীয় ও অভিজাত বলে মনে করেছি। আজও অভ্যাস বশত: প্রজারা অত্যন্তের জমিদার বলে প্রণাম করলে, পায়ের ধূলা নিতে এলে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হয় রমা! মনে হয়, তারা পরিহাস করছে না তো? কী এমন স্বকৃতি—সদাচার—সদগুষ্ঠান করেছি, যাব জ-জ্ঞ আজও তারা ভক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে 'বাবু' বলে সম্বোধন করবে? বিজ্ঞানমন্দির—হাসপাতাল—ধর্মশালা—চতুষ্পাঠী—প্রজার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের অর্থেই এসব প্রতিষ্ঠান বাংলার জমিদাররা করেছেন রমা কিন্তু তবুও প্রজারা জমিদারের নামেই নান্দীপাঠ করে আসছে। তাদের অর্থে এই সব লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে তারা ভুলেও কোন দিন চিন্তা করে দেখেনি, এসবের প্রকৃত নির্মাণকারী ও প্রতিষ্ঠাতা কে? অপরকে প্রবকনা করে এরা অমর হতে চায়নি; যুগ যুগ ধরে তৎ দান করে গেছে নীরবে অস্মান বঙ্গের। এমন এরা আত্মবিস্মৃত মহীয়ান মাছুর! কিন্তু তবুও বাংলার জমিদারকুল এত দিন কি কম নিখ্যাতন চালিয়েছে প্রজাদের উপর?

আমার বাবাও তাঁদেরই একজন ছিলেন। জমিদারের হৃদয়হীন শোষণ অত্যাচার অবিচারে প্রাণান্ত হয়ে যখনই তারা মৃত্যির পথ খুঁজছে তখনই তাদেরকে দমন করতে কত হীন যড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে জমিদাররা, যার অলিখিত ইতিহাস আজ নীমাইন, ঘুণাব্যঞ্জক। গুপ্ত ডাকাতিদল গঠন, অব্যাহত প্রজা শাস্তা করতে লাঠিয়াল শোষণ, গোপনে রাত্রির অন্ধকারে প্রজার ঘরে অগ্নিসংযোগ, জাল হাওনাট তৈরী; চক্রবৃদ্ধি হায়ে স্তন, শরণার্থীকে স্বপ্নের দারে প্রজাকে বাপ-দাদার ভিটেমাটি থেকে চিরতরে উৎখাত। অকাল বিধবার মধ্যাহ্নাহানি করতেও এরা পিছপা হয়নি সময় ও ক্ষেত্রবিশেষে। সেই সব দুর্দম ও পাপের বিবে বিবে বাংলার মাটি, বাংলার জল-বায়ু আকাশ-বাতাস সব বিযাক্ত নীল হয়ে গিয়েছিল। মাছুষ-বাসের অব্যাহত হয়ে উঠেছিল শ্রীমোহনের দেশ। কিন্তু কী আশ্চর্যের বিষয় রমা, জমিদারী প্রথা রহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার প্রজাকুল সমস্ত গরল গলাগতকরণ করে যেন নীলকণ্ঠ রূপ ধারণ করল! কোন বিচার তাদের দেখা গেল না; স্থির-শাস্ত সৌম্যভাবে জমিদারের পূর্বকৃত অপরাধ মুহুর্তের মধ্যে স্মরণে এলে তারা মারমুখো হল না; প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে নিজের হাতে বিচারভার নিল না। শ্রীচৈতন্যের দেশে ক্ষমাই ধর্ম-আদর্শ; প্রেমদান সেখানে শাস্ত রমা! কাজেই তোমার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অবূলক। প্রজা প্রজাই আছে আজও। নাই জমিদার। জমিদারীহারা দল আজ প্রজার ঘাড়ে এক নতুন পোষাশ্রুণী। কতকটা ভিখারীও বৈ কি?

অশোকের সব কথাগুলো এতক্ষণ পর্যন্ত রমা সহিষ্ণুতা সহকারে শুনে বাচ্ছিল। প্রতিবাদ করে বলল—জমিদারী প্রথা বিলোপ হওয়ার জমিদারশ্রেণী আজ ভিখারীর পথ্যারে নেমে এসেছে। আমরাও কি তাই হবে?

—হ্যাঁ, রমা! অশোক বলে—আশ্চর্য্যে হচ্ছে তুমি? ভিক্ষার সাজা কি শুধু ঝোলা-মালা নিয়ে ঘরে ঘরে যাচঞা করা?

মহুয্যকে খর্ব করবে, প্রমদেবতাকে কাঁকি দিয়ে অপরের অঙ্গে এত কাল বারো উদরপুষ্টি করে আসছিল, আজ তা' হঠাৎ বন্ধ হয়ে বাঙার মরাকাল! শুরু করেছে। ক্ষতিপূরণ দাও, চাকরী দাও, জীবিকার উপায় খুঁজে পাচ্ছি না, কি খেয়ে বাঁচব, কি করে এত কালের মান-ইজ্জত বাঁচাব, এই ধ্বংসের আরো কত আশ্চর্য্যাদা বিহীন আবেদন-নিবেদন। এ সব কি ভিক্ষারই সামিল নয় রমা? অক্ষমই অপরের করুণার উপর নির্ভরশীল হয়, সম্মত তো হয় না?

—আমিও তো একজন জমিদার-ঘরের মেয়ে, বউ। রমা বাধা-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে—আমাদের জীবনের আশ্বাসের এই গ্রানি কি মুছে ফেলা যায় না?

—যায়। অশোক যেন অবচেতন অবস্থায় “যায়” এই শব্দটি উচ্চারণ করে মনের গভীরে কি একটা বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করছিল। পুনরাবৃত্তি করে বলে—যায়। ঐ ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যেই যায়। কিন্তু সে ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে গ্রানি নাই, নাই হীনতাবোধ, মহুয্যকে খর্ব করার প্রেরাস; আছে দেবত্ব, আছে পরমার্থ লাভ। আড়াই হাজার বছর পূর্বে কপিলাবস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহ ঘন ঐশ্বর্য্য শোষণ শাসন রাজস্ব সর্ব্ব অভিমান ত্যাগ করে মানব-জীবনকে গ্রানিমুক্ত করতে যে পথ নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, সেই মাননীয় আজ আমাদেরকে গ্রানি ও পাণমুক্ত করতে পারে রমা! তাগ ও সাম্যের সেই মহিমাষিত উদার অনুভূতি যদি আজ আমাদের থাকত, আলমুদ্র হিমাচল যদি তার আড়াই হাজার বছরের পুরানো আশ্রয় বাণী কান পেতে নতুন করে শুনত আজ, তাহলে বংশ-প্রজা হ্র-স্বরণকারী সব সম্পর্কের তিক্ততা অনিশ্চয়তা হতাশা নিরাশার অবসান ঘটত রমা!

রমা স্বামীর সুসঙ্গত মুক্তি, নীতিবাক্য, উচ্চ পর্যায়ে আসলোনা নিজের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দিয়ে বাচাই করে আকুলকণ্ঠে বলে—ইচ্ছাময় ইচ্ছা করলে সবই করতে পারেন!

## তুই

অশোক ও মতিস্বর পরস্পর সহপাঠী। গ্রাম্য পাঠশালা থেকে বি. এ. পর্য্যন্ত। অশোক আরও দুটো বছর বেশী পড়ে এম. এ. ডিগ্রী নেয়। মতিস্বর বি. এ. পাশ করে চাকুরীতে ঢুকে প্রবাসবাসী হয়। দু'জনের গ্রামের ব্যবধান মাত্র এক মাইল। একই রাস্তা দিয়ে বই বগলে হাইস্কুলে পড়তে যেত। একটি খেলার মাঠেই হারজীবনে ফুটবল নিয়ে ছুটোছুটি করেছে। পুজো পার্কে পরস্পর নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে সেটা অপরাধ বলে গণ্য হত। তা'ছাড়া আম জাম বনকুল বৈচিত্র্য কতবেল প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী খৈরবন থেকে সংগ্রহ করে ফুল-ফিরিতি পথে দু'গলক সহযোগে ভক্ষণ করা এক বকম মনোমি বিলাস ছিল। অশোকের মা দু'জনের বন্ধু দেখে পলকিত হয়ে বলতেন—আমার অশোক ও মতি যেন জগাই-মাধাই।

মতিস্বর ডিগ্রী কেটে বলত—সে কি মাসীমা, আমি যে মূলমানের ছেলে। অশোক অগাই হতে পারে, আমি কী করে মাধাই হতে পারি বলুন তো?

—কেন পারবি না? মাসীমা রেহসিন্দ হাসি হেসে প্রশংসা প্রীতিতে বলতেন—তোরা মা যদি আমার বোন হয় আর সেই স্পর্কে আমি যদি তোরা মাসীমা হলম; তা হলে তুই মাধাই

হ'স না বোকা? হিসেব করে তাকা। এই বুঝি লেখাপড়া শিখছে তোমরা?

—লেখাপড়া বলতে মাসীমা কী বুঝতেন তা জানা যায় নাই, তবে মাসীমার মাধাই সর্ব্বশেষ বি. এ. পাশ করে দেশে সরকারী চাকরী করতে করতে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে পূর্ববঙ্গের প্রান্তিক জেলা সুদূর চট্টগ্রামে ‘অপসন’ দিয়ে চলে যায়। কয়েক বছর সেখানে থাকার পর চাকরীতে ইজ্জত দিয়ে একটি অল্পত অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল। স্থল সাব-ইন্সপেক্টরের পোষ্ট, সামাজিক সম্মানও আছে, বেকারপ্রাপ্তি যুগের মূল চাকরী নষ্ট, ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এলে কেন? কেউ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় মতিস্বর—পরগছা আলোকলতার মত আর কত দিন শূন্যে দোল খাওয়া যায় বলো? শত চেষ্টা করেও পরের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারলাম না। পরের রাষ্ট্রে চেয়ার-টবিগে বসে কলম চালানোর চেয়ে নিজের জন্মভূমিতে ধান ভেনে খাওয়া লাখ গুণের ইজ্জত। তাই পালিয়ে এলাম চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে। ভাল করিনি বলছ?

প্রত্যুত্তর হয়—‘জননী জন্মভূমি শ্রুগাঁদপি গরীহনী।’

মতিস্বর বলে—জন্মভূমির মরীহনী রূপের কল্পনা এর চাইতে আর বেশী কী হতে পারে বল? সেই দেশের বাপ-পিতামহ বাস্তবীভে, স্থান-পৌরস্থানের পুণ্যমাটির স্পর্শ থেকে বরা মাহুয্যকে দেশান্তরে বেতে বাধ্য করে রাজনীতির নোহাই দিয়ে, তারা মাহুয্য নয়; জগতের কোন ভাষার অভিধানে এমন কোন শব্দ নাই যা দিয়ে তাদেরকে অভিহিত করি।

অশোক যে কথাটি বলে থাকে সেটাও মিথ্যা নয়—“Politics is the agitation of many for the gain of a few.” অতীতের বাট বছরের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহ্য থেকে কি এই কথাটাই প্রতিপন্ন হয় না মতি? তবে বুধা খেদ করছিস কেন? কার উপর দোষারোপ করবি বল?

মতিস্বর বিস্মিত কণ্ঠে বলে—কোটি কোটি মাহুয্যের জীবন-মরণের প্রশ্ন, আহা-বিহার, শিক্ষা-সংস্কৃতি এক কথায় মানব-জীবনের সুস্থ ও সুন্দর বিকাশধারা যে নীতির সঙ্গে জড়িত, তা যদি স্বর্গীয় গণ্ডিবদ্ধ হয়, তাহলে মানব-জীবনের কী সার্থকতা থাকতে পারে অশোক?

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-সার জ্ঞান পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাতে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিওর সেন্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১১



অশোক এ বিষয়ে আর উপযুক্ত উত্তর না দিয়ে বলে—খাক্সে ও-সব কথা, ধান ভানতে শিখের গান। মেসিনটা ক'দিন থেকে একটু ডিস-অর্ডার চলছে। কাল ধান ভানা সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে কয়েকটা পাটস খুলে দেখতে হবে কি হয়েছে কলটার।

বলতে গেলে পরিকল্পনাটা প্রাধান্যতঃ মতিয়র রহমানেই। বিদেশে চাকরি ছেড়ে চলে এসে মতিয়র এক বকম অঁধে জলে পড়ল। মাগসী-গণ্ডার দিন। মধ্যাহ্নের সংসার, আজ শত অভাব অভিযোগ, সমস্তার কটকিত; তত্পরি যোগ্যতাসুসারে কর্মসংস্থান নাই। বিস্তর সাধ্যসাধনা, তবির তদারকর পর সরকারী বেসরকারী বা হোক একটা কিছু যোগাড় হলে তাকে বজায় রাখতে অনিচ্ছা সম্বন্ধে হীনমস্ততার পরিচয় দিতে হয়। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর অশোকও ভয়ানক অস্থবিধার পড়ল; কিছু একটা না করলে দিন চলার দিন আর নাই। যুগটা স্পষ্ট পরিবর্তনের যুগ; অশোক মর্মে মধ্যে উপলব্ধি করল এই বাস্তবতাই। অশোক এম-এ। মতিয়র বি-এ। উভয়েরই শৈক্ষিক যোগ্যতা উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিশ্বরাজনীতি নিয়ে বার মাথা ঘামায়, দু'-একটা সমস্তার সমাধানও বের করতে পারে অন্যায়সে তার। আজ নিজেকে ভরণপোষণ জীবিকানির্ভরতার উপায় নিয়ে গলদঘর্ম। স্বীম, কাপিটাল, প্রফিট এও লস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বহু ডিসকাসন, গবেষণা হয় কিন্তু কোনটাই সাফল্য হয় না। অশোক অভিযত প্রকাশ করে—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্যে। ব্যবসা-বাণিজ্য এই ধর কাপড়, মগিহারী কিংবা মুমিনখানার দোকান খুললে কেমন হয়?

মতিয়র গররাজী। বলে—দারুণ ডিস-অর্ডার হতে হবে, নইলে মার্কেটে কমপিস্ট করতে পারব না।

—আচ্ছা এ-সব বিলম্বনে তোর যদি মত না হয় তা হলে কটেক ইনভেস্ট এই ধর হোসিয়রী, উইজি, কারপেনটারি, মিথি।

—চলবে না। কঠিনবে বেন রাজ্যের প্রত্যয় জমা করে মতিয়র বলে—পূর্ববঙ্গের বাস্তহারা এসে বেহ'স হয়ে হোসিয়রী চালাচ্ছে।

—উইজি?

—নাগে ইঁটিনে নিতে হবে। মাকু ঠেলাঠেলির ব্যাপার। শেসেল চাই, নইলে স্তুতো ছিঁড়বে।

—কারপেনটারি?

—পাড়াগায়ের লোক কে কটা চেয়ার-টেবিলে বসে? দুয়ের-জানলা লাঙল-জোরাল স্থানীয় মিস্ত্রীতে বা তৈরী করে তাই-ই কেনবার খদের থাকে না সব সময়।

—মিথি?

—নেহাই—লোহা—হাতুড়ি—হাপর—চারটেকই একসঙ্গে সামলাতে হবে। মতিয়র বলে—উহঁ ও-সব পারবি না। আগুনের ভাতে ভাতে বলসিয়ে বাবি।

—এটা নয়, ওটা হবে না, তবে কচু করবি? অশোক কতকটা বিরক্তি হয়ে মস্তব্যটা করে।

মতিয়র চিন্তামগ্ন।

অশোক খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে কতকটা আহার্য ভাব নিয়ে পুনরায় বলে—আচ্ছা, একটা এগ্রিকালচার কার্য করলে কেমন হয় বল দিকিন?

—এটা জমিক অত্যাচারের সু। মতিয়র বিজোড়িত মত

প্রকাশ করে—চাষবাসের কাজ হল অমানবিক পরিশ্রমের কাজ; তা' ছাড়া নিজে কোদাল কাউড়া লাগল জমিতে না চালাতে পারলে শুধু দিনমজুরদের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে কাশ চলবে না।

—বা হোক, এ বিষয়ে একটা কনক্লুসনে আসা চাই তো? অশোক বলে—না শুধু রিসার্চ আর স্বীম। বা হয় একটা ট্রিক কর ভাই।

ট্রিক যেটা হল, সেটা একটা হাসকিন মেসিন কিনে ধানভানা। মেসিনটার আসত দাম ও খরচ খরচা নিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পড়ল। প্রতি মণ ধানের ভানাই বেট মোটামোটি আট আনা ফেললে দশ হাজার মণ ধান ভানতে হবে মেশিনের দাম ও আন্তঃযন্ত্রিক খরচের টাকটা তুলতে। তার পরে লাভাভাব। হিসাব কষে দেখতে গিয়ে অশোকের মাথা ঘুরে যায়। বলে—সর্বনাশ, দশ—দশ হাজার মণ ধান ভানতে হবে রে? ক' বছর লাগবে তার ট্রিক নাই!

আন্তঃযন্ত্রাসের উপর মতিয়রের অগাধ জ্ঞান। শক্তিত হবার কি আছে? মেসিনটা তো হাটের পণ্যস্রব্য আলু কচু পটল নয় যে, সময়ে কাজে না লাগলে পচে-খসে যাবে। হু' বছরের জাগরায় না হয় তিন বছর হাগবে দশ হাজার মণ ধান ভানতে, তার পরে তো প্রকৃতি আছেই। প্রতি মণে আট আনা।

ভবিষ্যৎ লাভের অঙ্কটা বিদ্যুতের বিলিক দিয়ে বায় মতিয়রের আশার আকাশে।

দেড় বছরের মধ্যে পাঁচ পাঁচ দফা মেসিন বিগড়ে যে লোকসান হল তার পরিমাণ প্রায় বার তের শো টাকা। বেশ চলছে মেসিন। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। মেকানিক এলো; তন্ন তন্ন করে দেখল কলকল্লা, বলল, ইনজেকটর বিকল। সেটা যদি মেয়ামত হল তো মাস দুই পর 'গডবর্ন'। 'গডবর্ন', যদি সারাই হয় তো ক্যুয়েল পাশ্প। ক্যুয়েল পাশ্প কেজো করে দু'চার মাস চলার পর হঠাৎ বিকল হয়ে পড়ে পিস্টন। অশোক বললে—মেসিনারী মাত্রই বিধি। তাছাড়া জীবনটাই বাস্তবিক হয়ে যাচ্ছে যে দিন দিন। এমনি করে বহুদানবের পারে আমাদের সমস্ত উদ্ভাবনী শক্তি বিসর্জন দিয়ে তার দাসত্বদাসে পরিণত হবি? মনুষ্যত্বের প্রাণীও আত্মশক্তি-সম্পন্ন। বহুদানবকে কেন্দ্র করে আকাশ-মাটি-জল ডান। মেলে, চলে ফিরে, সঁতার কেটে চরে খুঁটে খায়। আর, আমরা মানুষ! হারিয়ে যেল আমাদের সমগ্র সত্তা বহুদানবের কাছে। না—না—এ ভারত ঐতিহ্যের পরিপন্থী মতি; এ দেশী আমাদের ছাড়তেই হবে।

মুহূর্বিশেষে অশোকের কথাগুলো মতিয়র শুনে বাহিল অশোকের মুখের পানে চেয়ে মতিয়রের মনে হল, হাজার হাজার বছর অতীতকালের গর্ভ হতে কে যেন একটি মানুষ এসিয়ে আসা মাটির পৃথিবীর দিকে। সমস্তাভূত, শাস্ত, সৌম্যমুখি, হাতে তা কসলের করমান। মতিয়র পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে বলে—বেশ, তা হল অশোক! কল আজ হতে চিরদিনের জন্য বন্ধ কবলাম।

—হ্যাঁ, তাই করে ভাই। অশোক বলে—সব সমস্তার সমাধা করেছে যে মাটি সেই মাটিমায়ের কাছেই চলো ফিরে বাই মতি সেই অল্পপূর্ণা বহুদানব বৃক।

—এগ্রিকালচার কার্যের কথা বলছ?

—অশোক প্রশান্তকণ্ঠে উত্তর দেয়—হ্যাঁ। মাটি মা—জমি—লাঙল—কদল।





ভিটামিন মুক্ত

কোলে

**RP**

বিস্কুট

যাঁরা ওদের বিচার করেন

উঁরা সকলেই পছন্দ করেন

সবসময়

কোলে

বিস্কুট

কোলে বিস্কুট কোম্পানী  
প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১



পুষ্টিকর স্বাদু সম্ভার

খনিএরাকট

মেরী

পেটিটবুত্রো

নাইস

কলেজ

টেপ্টা

ডেপ্টা

ক্রীমক্র্যাকার

কয়েন

স্পোট

জিঞ্জারনাট

হাউসহোল্ড

সল্ টী

যার্ভেলক্রীম

কাফেনয়ের

চকোলেটক্রীম

বেবীক্রীম

সণ্ট ক্র্যাকার

প্রস্তুতি

আরও অনেক রকম।

## ম্যাগিফিলি বাজেট



কি জন্মে যে ওর বাপ-মা ওর নাম দানী রেখেছিলেন, তা আমার কল্পনারও অগোচর! যদি দানী নামের সঙ্গে দানের কোন নিকট-সম্বন্ধ থাকে, তাহলে নামটা সম্পূর্ণ অর্থহীন ছিলো। বন্ধুদের খাতিরেরও যে পরসী বায়-করতে কুণ্ঠিত, সে যে কাউকে খেছার এক পরসী দান করবে, এটা অসম্ভব।

অফিসের ম্যাগিফিলি ছুটির সময় কত দিন ওকে চপ প্রভৃতি খাইয়েছি—ও অল্পানবনে খেয়েওছে কিন্তু একদিনও তার প্রভৃতিতে আমাকে বা অন্য কাউকে দানী খাওয়ায় নি। তাই এখন সে একদিন পরসী তারিখে ছুটির পর আমার তার সঙ্গে করে যেতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো তখন কিছু অসুবিধা-ধাক্কা সত্ত্বেও কোঁতুলই জরী হলো। হয়ত এই কোঁতুলের খেসারত হিসাবে সারা রাত লীলার নিঃশব্দ বাক্যবাণ আমার সহ্য করতে হবে। কারণ তাকে নিয়ে আজ প্রথম শোতে সিনেমা হাবার কথা ছিলো।

“মিছামিছি বাস কপ্পনিকে পরসী না দিয়ে পানবানের আশ্রয় নিয়ে গল্প করতে করতে বাঙরাই ভালো, কি বলো?” দানী প্রস্তাব করলো। আমি মোটেই হাঁটতে পারি না কিন্তু আজ দানীর কোন কথাতেই না বললাম না। কিন্তু না বললেই ভাল হ’তো, কারণ, দানীর বাড়ী গৈরো লোকের তথাকথিত “পোটাচ পুখ” মাত্র ঘুরে এবং এখন আমার তার বাড়ী পৌছালাম তখন আর আমাতে আমি নেই। রাস্তার দানী শুধু তার জ্বরী কথাই বলতে লাগলো, কাজেই বলা বাহুল্য, তার অর্ধেক কথাও আমার কানে বায় নি। তবে যেটুকু গেল তাতে বুঝতে পারলাম যে, তার জ্বরী বন্ধনে জ্যোপদী, বিজ্ঞান লীলাবতী এবং সরলতার শিল্প (অবশ্য দানীর মতে সরলতা মানে সাজসজ্জাবিবুদ্ধতা)। বিশ্বিন্দুক দানীর মুখে প্রশংসা পাচ্ছে এ-হেন লোককে দেখবার ইচ্ছা আমার পথপ্রান্তিকে অনেক পরিমাণে লঘু করে আনলো।

বখন দানীর ঘরে পৌছালাম, তখন ঘরে ঘরে সাদ্ধাশ্রীণ জলে উঠেছে। কড়া নাড়তে দানীর জ্বরী রাগী এসে দরজা খুলে দিলো। আমার মুখে প্রশান্তির চিহ্ন, দানী বোধ হয় মনে মনে একটু অপ্রসন্ন হলো আর ‘বললো’ ‘কেটে আসলে সাদ্ধাশ্রীণ হয় আর পরসীও বাড়ে। আর ভোমরা দারা খুব কম হাঁটো তাদের খিদেও পার।

রাগীর হাতের “শঙ্করপারা” খেলে তোমার মুখের রুচি ফিরে যাবে আর হাঁটোও নিরর্থক হয় নি মনে হবে।”

প্রথম পরিচয়ের আড়ম্বরটা কাটতে বেশী সময় লাগলো না। কথাবার্তার রাগী বেশ চতুর বলই মনে হোল; তবে তার সরলতা অর্থাৎ সাজসজ্জাহীনতা কতকটা খেছার এবং কতকটা দানীর প্ররোচনায়, সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমরা বখন কথা-বার্তার মগ্ন তখন দানী ছোট ছোট কাগজের পুঁটলি করছিলো। তার জ্বরীও মুখের সঙ্গে হাত চলছিলো। প্রথমে আমি ওদিকে তত নজর দিইনি। মনে করেছিলাম অল্প খরচে সময় কাটানোর এ এক নতুন ফিকির হবে। কিন্তু বখন দানী প্রত্যেক পুঁটলীর মধ্যে কিছু কিছু পরসী রাখতে লাগলো এবং কালী দিয়ে পুঁটলিগুলির উপরে কিছু লিখতে লাগলো তখন আমার কোঁতুল অদম্য হয়ে উঠলো। আমি দানীর দুর্বলতা জানিতাম, লোকচার কাড়বার সুযোগ কখনও সে উপেক্ষা করতো না। তাই চূপ করেই রইলাম এই ভেবে যে, দানী আপনিই বলবে, কেন সে পুঁটলি বানাচ্ছে এবং তার উপযোগিতাই বাকি।

কিছুক্ষণ পরেই তার মুখ খুললো, “তুমি প্রায় আমার মতন মাইনে পাও এবং আমিই সঙ্গে চাকরীতে চুকছো। যে রকম বাজে খরচ করে হাতে বোধ হয় কিছুই রাখতে পারো নি। অথচ দেখ আমি আর বহুর পাঁচেকের মধ্যে একটা ছোট বাড়ী করবার মত পরসী জমিয়ে ফেলবো। এখন অবশ্য মজার আছে। কিন্তু বুড়ো বয়সের জন্ত বা অসময়ের জন্ত সঞ্চয় না করলে পরে পত্তাবো।” গৌরচন্দ্রিকা সেরে দানী কিছুটা দম নিয়ে নিলো। বুড়লাম এবারে রহস্ত প্রকাশ হবে। “আমাদের আয় এখন সীমাবদ্ধ তখন ব্যয়ের অঙ্ক বাড়ে মাত্রা ছেড়ে না যায় বরঞ্চ উল্টে কিছু টাকা প্রতি মাসে আমাদের হাতে উদ্ভূত থাকে তাই আমি অনেক দিন ধরে একটা উপায় অবলম্বন করেছি। কাগজের পুঁটলি করে এক একটা পুঁটলীতে এক একটা দরকারী খরচ বাবদ টাকা রেখে দি এবং সাধ্যমত সেই টাকার সেই খরচ চালাতে চেষ্টা করি। কোন খাতে বেশী খরচ হ’লে প্রায়ই অল্প কোন খাতের বাঁচা টাকার থেকে তা পূরণ হয়। যেমন ধর দাড়ি কামানোর পুঁটলীতে ২০ টাকা, কিং পুঁটলীতে ২০ টাকা রাখি। এই রকম ভাবে সমস্ত খরচের জন্ত টাকা তুলে রেখেও আমার মাসে মাসে ৪০০ টাকা বাঁচে।

রাগী অবশ্য ইতিমধ্যে উঠে গিয়েছিলো। খানিকক্ষণের মধ্যেই চা এবং “শঙ্করপারা” এল এবং খিদে জন্মেই হোক বা দানীর সাহচর্যের গুণেই হোক, বেশ রুচির সঙ্গেই সেগুলোর সম্যবহার করলাম। এই রকমে আরও কিছুক্ষণ কাটলো। তারপর আমি হুঁজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তার বেরিয়ে পড়লাম। আমার অবচেতন মনেও যে পরসী জমাবার গুটি বাসা বীধছিলো তার প্রমাণ পেলাম ঘরে গিয়ে। লীলা মুখ গুমোট করে দরজা খুলে দিলো। সেদিকে কোন ক্রক্কেপ না করে বললাম, “বিকালের ললখাবারের জন্ত রসগোল্লা সিদ্ধাড়া প্রভৃতির দরকার কি! আজ দানীর বাড়ীতে “শঙ্করপারা” বা খেলায় সিদ্ধাড়া তার কাছে কোথায় লাগে। আসল কথা, খিদে পেলে যা খাও তাই মুখে অমৃত লাগে—আর কাউ হিসাবে পরসীও বাঁচে। আমি মনে করছি, বোধ অফিস থেকে কেটেই বাড়ী

ফিরবো আর জলখাবার সিনেমা প্রকৃতি বাজে খরচগুলো  
খাশাখা কয়িরে ফেলবো। এই করে দানীটা বেশ পরমা  
জমিয়ে ফেলেছে, আমরাই বা পারবো না কেন ?

লীলা তবুও চুপ করে রইলো এবং নিঃশব্দে আমার জলখাবার  
নিরে এলো। আমি শুধু চাঁর কাপটা নিয়ে বললাম, “আর কিছু  
আমি খাব না, দানীর বাড়ীতে খেয়েছি।” তার পর আমিও  
বিভিন্ন কাগজের পুঁটলীতে বিভিন্ন খরচের পরমা তুলে রাখলাম।  
দশ টাকা সিনেমা, হোটেল প্রভৃতির জন্মে আলাদা রাখলাম।

রাত-ভোর লীলা মুখ খুললো না, তবে সে কথা বলতে স্বভাবতই  
ভালবাসে ; তাই সকালেই আমাদের মিটমাট হয়ে গেলো। অবশ্য  
একটু দুঃখের সঙ্গেই সে আমার পরমা জমানোর নতুন কিকিরে  
সহযোগিতা করতে সম্মত হলো। কারণ, সিনেমা দেখার সখ ওর  
বিলম্বণ থাকার দরুন সেই খাতে পরমা অপরাপ্ত রাখা হয়েছে  
বলে ওর অভিযোগ।

দিন কতক বেশ চললো। অকসেস দানী ছাড়া আমি বড় একটা  
কাজের সঙ্গে মিশি না, কাজেই হোটেলের বাজে খরচ হয় না।  
দানীও আমার বংলাতে পেরেছে দেখে খুব খুসী, একদিন গিয়ে দেখি,  
আমাদের পুরানো টাইপিষ্ট কেট ছুটিতে গেছে এবং সেই আরগায়  
এসেছে একটা চটপটে কেশাধরন্ত মেয়ে, নাম নলিনী, ক্রমশঃ  
আমাদের আলাপও হলো। দানী আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে  
সতর্ক করে দিলো, যেন আমি নলিনীর সঙ্গে বেশী দহরম মহরম  
না করি।

দুপুরবেলার চা খাবার ছুটির সময় অবনী নলিনীকে বললো,  
“চলুন চা খেয়ে আসি।”

“আপনিও চলুন না” নলিনী আমাকে অনুরোধ করলো।  
দিন কতক বন্ধ করার পর পুরানো অভ্যাসটা মাথা চাড়া দেওয়াতেই

হোক, বা একজন মহিলার প্রথম অনুরোধ এড়াবার অক্ষমতাতেই  
হোক, আমিও ভিজে বেড়ালটির মত তারের অনুরণণ করলাম।  
খাওয়াটা চা নিয়ে ব্রহ্ম হোলো বটে, তবে আহুসজিক আরও  
অনেক কিছু এলো এবং শেষ পর্যন্ত বিলটা টাকা পাঁচেক অবধি  
গেলো।

ইচ্ছা করেই হোক বা আমার দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক, বিল  
শোধ করতে গিয়ে অবনীর মুখ চুপ হয়ে গেলো। “পাসটা  
জানতে ভুলে গেছি” কাতর মুখে সে বললো। অগত্যা আমাকেই  
বিলটা শোধ করতে হ’লো। অবনী অবশ্য বললো বটে, তোমাকে  
পরে দিয়ে দেবো, কিন্তু আমি জানি, সে আর দেবে না বা দিলেও  
আমি নোব না।

আমি শুকনো মনে (বাইরে কাষ্ট-হাসি বজায় রেখে) আবার  
কাজে কেরং গেলাম। এক হস্তার মেহনত এক ঘণ্টায় গেলো,  
বাড়ী কিরে ভাবলাম, স্ত্রীকে বঞ্চিত করে অপরকে (তা তিনি মজিলা-  
বন্ধুই হোন) হোটলে বা সিনেমায় নিয়ে যাওয়া অনুরূচিত। পরমা  
জমানো আমার দ্বারা হবে না। আমার প্রকৃতিই অন্তরূপ, তার  
চেয়ে খরচ করে দাম্পত্য-জীবন বাতে মুখে কাটাতে পারি, তার চেষ্টা  
করাই ভালো। লীলাকে বললাম, চল আজ “প্রকৃতিতে” একটা  
ভাল সিনেমা আছে দেখে আসি।

এক সপ্তার মেঘ কেটে গিয়ে লীলার মুখে আবার বন্ধুর দেখা  
দিলো। \*

অনুবাদিকা—অনুরাধা তত্ত্বাচার্য্য।

\* “সুগন্ধা” দিবানী-সংখ্যায় প্রকাশিত V. V. Bokil-এর  
একটি মারামি গল্পের ছায়াবলখনে।

## তমনো মা জ্যোতির্ময়

তপতী মুখোপাধ্যায়

অন্তর-মাঝে চেননারূপিণী হৃদয়গগনা জননী মৌর,

এত কশাঘাত মানব জীবনে তবু মোহ-মুম ভাঙ্গে না তোর।

বাহিরের বত মোহ উপচার অন্তর-মাঝে চক্র বচি,

জয়ের বাঁধনে সচস্রপাক বাঁধিয়া বেঁধেছে কেমনে বাঁচি ?

সে উপকরণ নহে তো জননি আমাদেই কৌনও স্বপ্নলীলা,

তোমারই সে কোন প্রায় মুহূর্ত্ত মেলিয়াছে এই খেলার মেলা।

তুমিই সিঁদাছে খেলিবার ভরে নবীন খেলনা হাতেতে তুলি।

কঠোর পাঠেতে কেমনে আঞ্জিক ধন দিব যা গো তাহারে তুলি ?

একই স্বপ্নে কমল বস্ত্র বরাভর আর খড়্গ সাথে,

এক হাতে তুমি বিলাও মাধুরী শাসন তোমার অস্ত্র হাতে।

যে আসিলে ভরা কঠোর মিলন অনন্ত বা মা তোমাকে দেখি,

চুবল ভীক কোমল স্বপ্নে কেমনে তাহারে জাগিয়ে রাখি ?

কঠিন কারার প্রাচীরবন্ধা জননি, তুমি কি মুক্তি চাও ?

কমলতা তোমার আমাতে দানিয়া আপনি শক্তি বৃদ্ধি লও।

স্বপ্নে আমার বত মালিন্ত বেলনা আমাতে রক্তকরা,

তোমার পায়েতে জ্বরাকণ কোটে নাও তুলে নাও দুঃখেরা।

অসুপূর্ণতারি অসম্পূর্ণ অর্থে তোমার কল্লুর নামনি,

চিন্তে আমার আনীত শক্তি নীকার টীকা দাও মা আসি।

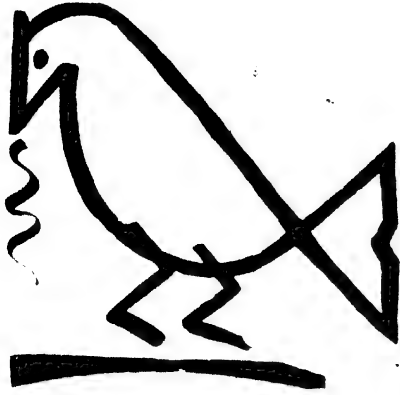
তোমারই নীকা লভি সে যত্রে জাগার তোমারে ও মনোরমা,

চিন্তের ঐষ সহস্রোপরি শিব সাথে হও পূর্ণতমা।

সে মিলন হ’তে আগিবে অমৃত আনন্দরূপ রসের গারা,

ভ্রাত হব যা গো তাহারই বাঁধার মোর বরা হবে মধুকরা।

## ছোটদের আসর



(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ফুলের মেহলতা দি' গল্প বলেছিলো—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন গরীবঘরের ছেলে। কষ্ট করে বড়োজলে-বোদ্ধুরে হাঁটতে হাঁটতে পাঠশালায় পড়তে যেতেন। একদিন—তখন গরম কাল, ছেলে এলো যেমে নেয়ে বাড়ীতে। তার বইয়ের তাড়ার সঙ্গে কার একটা পেন্সিল এসেছে—লক্ষ্য হ'ল ছেলের মা'র। মা বললে ছেলেকে—কার পেন্সিল রে? ছেলের খেয়াল হল, বললে, আমার পাশে যে বসে, তার। ভুলে চ'লে এসেছে। কাল কেবল দোব।

মা বললে, কাল নয়। আজই।

ছেলে বলে কাঁদো-কাঁদো হয়ে—তার বাড়ী যে অনেক দূর। এখন বড়ো ক্লিবে পেয়েছে।

ছেলের ঠাকুমা বলে, আহা, বড়ো ক্লিবে পেয়েছে ছেলেটার। আজ খেতে বসুক। কাল পাঠশালা বাবার সময় পেন্সিল সঙ্গে ক'রে নিয়ে বাবে বোমা।

ছেলের মা'র গলার স্বর গভীর।

কাল ব'লে কোনো কাজ হয় না মা! যা করবার আজই করতে হবে। ছেলে আজই দিয়ে আসুক। এসে থাকে।

ছেলেকে যেতে হল। এখনকার ছেলে হ'লে বলত, তার দাদার

সঙ্গে পথে দেখা হল, তার হাতে দিয়েছি। আরো কত কি কথা বানিয়ে বলতে পারত, না গিয়ে।

কিন্তু সে অস্ত্র ছেলে ত নয়! গুরুদাস বাঁড়ুঘো, যে গরীবের ছেলে থেকে হাইকোটের বড়ো উকীল থেকে বড়ো জজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হ'তে পেরেছিলেন।

আর একজন ঈশ্বরচন্দ্র। বেঁধে-বেঁধে সকলকে খাইয়ে পড়তে যায়। আলোহীন ঘরে পড়া হয় না, বাইরে বকে ব'লে গ্যাসের আলোয় বই পড়ে। বাপের মোটে মশ টাকা মাইনে। সেই ছেলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর হ'য়ে দেশের একজন হলেন। মাকে পাঠায় ছেলে, শীতের গরম কাপড়। মা দেয় দান ক'রে।

আরো অনেকের যে শীতের কাপড় নেই, অস্ত্র মা'ও নয়, বিভাসাগরের মা, নিজের গরম কাপড় গায়ে দিয়ে আরাম করে কি ক'রে?

শেষ অবধি ছেলে বলে, যার যার দরকার—সকলের নাম দাও, তাদের হয়ে যাবার পর বাকি যেখানা থাকবে, সেইখানা তোমার।

গরীবের ছেলে বিভাসাগর, গরীবের বন্ধু দয়ার সাগর হলো।

আর শুনেছিলাম আর একটি গরীব ছেলের কথা। সে ছেলেটি বিদেশী।

ছেলেটির সখ ছিল জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনীখানা পড়ে। কিন্তু সে বইয়ের দাম অনেক। পরমা কোথায় পাবে যে সেই বই কিনবে?

গ্রামের এক বড়োলোকের লাইব্রেরীতে সেই বই আছে শুনেছে। তাকে গিয়ে ধরলো বইখানা পড়তে দেবার জন্তে। পড়বার জন্তে পেলো বইখানা।

পড়ে সে মন দিয়ে। পড়ে পড়ে আশ মেটে না। কত মস্ত লোক জর্জ ওয়াশিংটন, তার কথা বার বার পড়েও আবার পড়তে ইচ্ছে করে গোড়া থেকে।

ইতিমধ্যে একদিন বড় এলো, জল পড়লো। ছেলেটির ভাড়াঘরের চাল দিয়ে জল পড়ে দামী বইখানা শুধু ভিলে গেল না, নষ্ট হ'য়ে গেল।

তখন ছেলেটি সেই বড়োলোকের কাছে গিয়ে বললে—আপনার বইয়ের অনেক দাম। বইটা নষ্ট হয়ে গেছে, আমি যে আবার কিনে দিতে পারব, এমন পরমা আমার নেই। আপনার জমির কাছে আমি খাটব, কোনো মজুরি না নিয়ে। যেদিন বইয়ের দাম উঠবে—সেদিন আমার ছুটি।

এমনি ক'রে খেটে খেটে সত্যি সত্যি সে বইয়ের দাম শোধ করলো।

আর সেই ছেলে—সেই গরীবের ছেলেটিই একদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হল—জর্জ ওয়াশিংটন, যে প্রেসিডেন্ট। নাম তার আব্রাহাম লিঙ্কন।

দেশে দেশে যুগে যুগে গরীবের ছেলেরাই অসাধ্য সাধন করেছে।

সোনার ছিম্বক মুখে দিয়ে বারা জয়লাভ—তাদের মধ্যে থেকে বড় লোক মরণীর হয়েছ তার চেয়ে বেশী লোক



প্রীতভাতকিরণ বসু

এসেছে সেই দল থেকে—জাঁতুড়ঘরে বাদেই হেঁড়া কাঁথাও জোটেনি।

কিন্তু এইটাই মস্ত সাধনা নয়। 'দারিস্ত্রাদোবো গুণাশিনাশী' বলেও একটা কথা সে শুনেছে। গরীব যে, তার গুণেরও আদর হয় না।

গরীব সে দেখেছে। পুথির ভিখারীদের মধ্যে নয়, তারাও খেতে পায়। দেখেছে পুরীতে।

অন্ধর মাঠারের বাড়ী। মাঠারের বৌ-এর শাড়ীটা এমন হেঁড়া যে দরজার সামনে এসে দাঁড়ানো যায় না। শিঠটা সমস্ত দেখা যাচ্ছে। একটি ছেলে ঘরের মধ্যে একটানা কেঁদে যাচ্ছে। মা গো, কিদে পাচ্ছে।

সকাল থেকে মা নিজেরও কিছু খায়নি, ছেলের মুখেও কিছু নিতে পারেনি। বাপ বেরিয়ে গেছে খাবারের চেষ্টায়। সে-ও ফেরেনি।

মীরার কাছে কতকগুলো কলা ছিল, কিনে নিয়ে যাচ্ছিলো। ৮।১ বছরের ছেলে কি আগ্রহ করে খেলো! ৮।২ বছরের ছেলে কিধের জন্তে কীদে, কি করণ সে দুঃ!

আর দেখেছিলো এক সাহেব-মেমকে। তারা ফিরিশী, রং যদিও সাহেবের মতন। স্বাধীনতার পর তাদের অবস্থা এমন খারাপ হল যে দিন চলে না।

সারা দিন কিছু না খেয়েও স্বামি-স্ত্রী বিকেলবেলা বাইরে চেয়ার টেনে হুজনে মুখামুখি বসত। সারা দিন তারা টাকার চেষ্টা করত। কোনো দিন ছুঁত, বেশীর ভাগ দিনই ছুঁত না।

কিন্তু বিকেলবেলা—পেটে কিছু না পড়লেও বাইরে চেয়ার টেনে মুখামুখি বসে এক দিনের জন্তেও বাপ বেত না।

মীরা এক দিন তাদের কিছু ঝিঞ্জে দিয়ে এসেছিলো, তার বাচ্চা মেয়ের কাছে গল্প শুনেছিলো, সেই ঝিঞ্জে-ভাতে ভাত তারা তিন জনে খুব তৃপ্তি করে খেয়েছিলো।

তার পর তারা কোথায় চলে গেল! মেয়ের নাম বেবী। সে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। না খেতে পেয়ে তার চোখের কোল বসে গিয়ে কি বিশ্রী দেখতে হয়েছিলো!

সেই বেবী স্বাধীনতার পর কোথায় গেল, সে কথা মীরার জানতে ইচ্ছে করে।

অন্ত দারিস্ত্রোর মধ্যেও বেবীর মনে একটু জাঁক ছিল যে সে সাহেবের মেয়ে, স্বাধীন দেশের মেয়ে—মীরার মতন পরাধীন নয়। যদিও তার মা ছিল ভারতবর্ষের গুঠান—ইংলণ্ডের মেয়ে নয়।

মীরার বন্ধন স্বাধীন হ'য়ে গেল, তখন বেবীর আর তার মায়ের বনের ভাব কেমন বদলালো তার জানতে ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক।

অমন দারিস্ত্রো তারা পায় হ'ল কি ক'রে, তাও জানার আগ্রহ জাগে।

কাঁথির পিসিমা ওর কথা ভাবছিলেন আর কেউ না ভাবুক।

উনি বললেন—চল, এই বেলা কাশী যুয়ে আসি। এখানে তো কেউ তোকে দেখছে না।

সত্যি, কেউ ওকে দেখছে না। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়ার কটি শব্দ হচ্ছে না। স্থলে আসা-রাওনাও হয়। কিন্তু কাকুর আর ওর কথা যেন মনে থাকে না। কিংবা মনে থাকে একটু বেশী

ক'রেই। ও যেন এক সমস্তা হ'য়ে উঠেছে। কি করা যায়, যেহেতাকে নিতে, কি করা যায়?

ড্যাডির মুখ গভীর। সিগারেটের পর সিগারেট পুড়ছে। নানারকমের আসবাব হাইয়ে-হাইয়ে ভরে উঠেছে। কাচের আয়নার মধ্যে যে সোনালী চাকার সোনালী রথ ছুটেছে, তার মধ্যে বাড়ি—চাকার চাকার টক্-টক্ ক'রে ঘুরে যাচ্ছে কাঁটা, বেজে যাচ্ছে, একটা-দুটো-তিনটে, ছুটির দিনের বেলা গড়িয়ে যায়—ড্যাডির ভাবনা কমে না।

কাণের বাড়ি থেকে খাঁচার দরজা খুলে কোকিল বেরিয়ে এসে ডাক দেয়, কুহ, কুহ, কুহ, কুহ, চারটে বাজলো জানায়—খাঁচার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, জামিন বাড়ির লখা পেণ্ডলাম ঢুলতে থাকে, চা, চিনি, দুধের ট্রে নিয়ে বয় আসে—মামমি ড্যাডি মীরাকে নিয়ে চা খায়, কাকুর মুখে কোনো কথা নেই।

হাসি নেই, ঠাট্টা নেই, কুশল-শ্রদ্ধ নেই। কত দিন পরে এ বাড়ীর বাশধর যদি আসে—মীরার আর কি দরকার?

শোবার ঘরে ড্যাডি বলে, থাক না, ও তার খেলার সাথী হ'য়ে থাকবে।

মামমি বলে—আবার কাজ করবে।

অনেকগুলো স্ট্রেট পড়ার শব্দ হয় বাবুর্চিখানায়—ভাললো বুঝি কতকগুলো ডিশ?

তাই মীরা বন্ধন জানালো, কাঁথির পিসিমার সঙ্গে কাশী যাবে, কেউ শ্রদ্ধও করলো না, স্থলের পড়ার কি হবে। ওরা হুজনেই যেন খুঁসি হল।

স'রে যাক্ দিন কতকের জন্তে সামনে থেকে মেহেটা। কাঁথির পিসিমা এই ত এখন বোবা।

ছেলে আসুছে সমস্ত বাড়ী দশল করতে। ঘর থেকে ঘরে সে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবে।

সমাজের লোক দিনকতক জিগ্যেস করবে—কোথায় সেই মীরা, উজ্জল ভবিষ্যৎ যার ছিল, চেহারা, অভিনয়ে, বুদ্ধিতে প্রতিভার?

কোথায় সেই লাভলি মেয়েটি, মিষ্টি হার হাসি, মিষ্টি হার চোখ দুটি, মিষ্টি হার মুখখানা?

খার্ড ক্লাস গাড়ী। গরীব আর মধ্যবিত্তদের মেয়েরা চলেছে। বেনারস এক্সপ্রেস ছাড়বার সময় কামরার কামরার 'জয় বিশ্বনাথ' শোনা গেল।

যে বোট জামতাড়ায় যাচ্ছে, তার বাপ-মা-ভাই কীদে কীদে চলে গেল। স্বামীর সঙ্গে চলেছে হাওয়া বদলাতে। অনেক দিন অন্তরে ভুগছে। 'স্বামী এখন অফিস থেকে টাকা ধার ক'রে জীকে নিয়ে যাচ্ছে চোখে। সেই গল্প সে বলতে বলতে চললো। স্বামীর কথা বলতে বলতে তার চোখে জল এলো। সামান্য মাইনে। দেনার ভূবে আছে, তবু জীকে বাঁচাতে চায়—এই কালো যোগা জীকে। চন্দননগরে গাড়ী থামতে এসে জিগ্যেস ক'রে গেল—কষ্ট হচ্ছে না তো?

কোনো কষ্ট নেই। তুমি উঠ পড়ো। গাড়ী ছেড়ে দেবে। তোমার অত খোঁজ নিতে হবে না। এঁরা আছেন।

আমরা আছি গো—মালা ঠক্কু করত করত এক বৃদ্ধি বললে ওয়ার থেকে। আমরা দেখব—বললে সে।

তার ছেলে খেতে দেবে না। তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে কাশী বাও। মাসে পাঁচ টাকা পাঠাব। সেই ছেলেকে মাছব করেছে পরের বাড়িতে বাঁধুনীবৃত্তি করে। ছেলের এখন হুশো টাকা মাইনে। মাকে আর দরকার নেই।

বৌমা গরীব হলেও বনেদী ঘরের মেয়ে। বলেছিলো—মায়ের জন্তে পৃথিবী দেখছ। সেই মাকে অপমান? সংসারে শাস্তি থাকবে কি করে? আমার ছেলেপুলে ভালো থাকবে কি করে মায়ের চোখের জল পড়লে?

ছেলে বলেছিলো, এর নাম তুমি এম-এ পাশ? এখনো এত কলংকার? মাকে তাড়িয়ে দিয়ে কত লোক মূখে আছে।

বৌমা বলেছিলো—আমি বিবাস করি না।

তবু সে আটকাতে পারেনি। ছেলে মুখ্য কি না। রাগ না চণ্ডাল তার।

গাড়িতে কতকগুলি মেথরাগী উঠেছিলো। সকলের গা বেঁচে তারা বসতে চায়। বলে, আমরা কি পয়সা দিইনি? আমাদের কি বিনাটিকিস?

তারার খুঁত ফেলছিলো। গাড়ী নোংরা করছিলো। আর বলছিলো—আমাদের যদি বেয়া করে—পুলিশ ডেকে দোব? নতুন আইন হয়েছে।

অন্ধকারে কখন বোটি জামতাড়ায় নেমে গেছে, মেথরাগীরা নেমে গেছে কোন্ ঠেগে—মীরা কিছু টের পায়নি। সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। মোগলসরাইরে গোলমালে সে জাগলো। ভোরবেলা মালবীর ব্রীজ বন পাড়ী উঠেছে—প্রথম দেখা গেল নীল গজার দক্ষিণ কূলে—আধখানা চাদের মতন অলংঘ্য মন্দির-চুড়ার শহর—বেনারস। সবাই প্রশংসা করে, ও-ও করে—বাড়ী-বাড়ী-বাড়ী—মন্দির-মন্দির-মন্দির—বকুমক বকুমক করছে—একটি আওয়াজ নেই—সকালবেলায় শান্ত আকাশের নীচে প্রথম সোনালী রোদে লক্ষ লক্ষ লোক ভরা, লক্ষ লক্ষ বছরের পুরানো মহাভার্ত—বারাণসী। কত পুণ্য, কত পাপ, কত ধর্ম, কত আরতি, কত স্মৃতি, কত কাহিনী ব্রীজ থেকে কতক্ষণ ধরে দেখা যাচ্ছে—কাশী-কাশী-কাশী।

তার পর স্তব্ধ হল সবুজ কসলের ক্ষেত—বার কপি বেগুন কড়াইগুটি কোনো দিন ফুরায় না। হাবিরে গেল কাশী শহর, ঘুরে ব'রে গেল পুণ্যভার্ত। ক্যাপ্টেনরেক্ট ঠেশন থেকে সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে কপ, কপ, কপ, কপ। সাধা বোড়ার টাল্লা চড়ে কত বাগান কত বাজার কত দোকান কত মহড়া পার হ'য়ে গোখুলিয়া হয়ে দশাখমে পৌঁছলো তারা—বাঙালীটোলার চারতলা বাড়ীর ওপরের ঘরে পাখরের জানলার দাঁড়িয়ে এপার গজা ওপার গজা দেখে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকতে হয়। বাটে বাটে মাছব মান করছে, খাল ভরা ফুল নিয়ে পুজো দিতে যাচ্ছে, নৌখো চলেছে জলে, ভার্সিবাড়ী চলেছে পথে—সংসার ছেড়ে কাশীতে কেন শাস্তি পেতে আসে লোকে—কতকটা যেন বৃত্তে পারে মীরা। স্থান করে বিশ্বনাথের মন্দিরের পথে ওরা চলে।

মোড়ের ওপরেই ধক-ধক খাবার সাজানো রয়েছে—হিডের কচুরি ভাজা হচ্ছে, স্নগছে চারিদিক ভরে গেছে—তার সঙ্গে চোঁড়শের তরকারী, সে নাকি অপূর্ণ! রয়েছে কাঁসার থালায়—চাপ চাপ সরঙা মালাই, কলকাতার এ জিনিস কে চোখে দেখতে পার?

কিন্তু উপায় নেই। পুজোর আগে খাবার কথা মনে করায় পাশ। পাখর-বাঁধানো সড়ক গলি, দুপাশে পাখরের বাড়ী উঠে গেছে চারতলা পাঁচতলা—নীচে দু'পাশে দিনেবেলায় ইলেকট্রিক আলোর সাজানো দোকান। কাশীর কার্ঠের খেলনা, চক্চকে বস্ত্র চোখে ধাঁধা লাগে, কাশীর গরদ, বেনারসী চেলি, চোলি সাচ্চা জরীর কাজ বিক্রমিক করে। কাশীর স্তম্ভি জন্ম পান স্তম্ভা ধূপ স্নগছে পথ ভরে গেছে। কাশীর জামান সিলতার শেতলের দোকান বকুমক বকুমক করছে—সঙ্গে সঙ্গে নাম লিখে দিচ্ছে। 'কাশীর স্মৃতির' তলার মাটির পুতুলের দোকান, টিপের দোকান, দোকানের শেষ নেই, পথেরও শেষ নেই, বাড়ীরও শেষ নেই, সারা ভারতবর্ষের মেয়েপুরুষ বাড়ী, তার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গরু রাঙা জুড়ে আসছে। মাছবজন ছিটকি ছিটকে পড়ছে, গরু চলে যাচ্ছে গজীর হয়ে হুঁ মেতে, খাড়া মেতে, তারপর কেবলই ফুলের দোকান, রাশি রাশি ফুল, সাধা লাল হলুদ গোলাপী, ফুলের পাহাড় যেন, তারপর ঢা ঢা ঘটাধনি ভারত-বিখ্যাত বিশ্বনাথ! ভারত-বিখ্যাত অন্নপূর্ণা! টাকার অবধি নেই, উৎসবের শেষ নেই, কাশী আসা সার্থক।

সন্ধ্যায় কাশীর ঘাটে ঘাটে বেদ উপনিষদ ব্যাখ্যা, সঙ্গীত, কথকতা রামায়ণ পাঠ—সে আবহাওয়াই যেন আলাদা—সে আবহাওয়া সারা হিন্দুধানে কোথাও নেই, ফিরে যায় মন কত শতাব্দী আগে।

কাশী মীরা সকল মুখে ভুলিয়ে দিলো। মায়ের মতন। বন্ধুর মতন।

পথে পথে একলা সে ঘুরে বেড়ায়। কাঁধের পিসিমা বলে দিয়েছিলেন, দশাখমে গোখুলিয়ার কাছে কাছে থাকবে। গলি দিয়ে গলি দিয়ে কেবার হরিশ্চন্দ্র বাট পর্যন্ত যেতে পারো, গাড়ী-বোড়ার ভয় নেই, অস্ত্র কোনো ভয় নেই।

কিন্তু ও চলে গেছলো মানমন্দিরের খোঁজে গজার ধার দিয়ে অস্ত্র দিকে। সন্ধ্যা হয়ে গেছলো, পথ চিনতে পারেনি। কাশীর মধ্যে কাশীর গুণ্ডার হাতে পড়েছিলো। তাদের হাতে ছিলো চক্চকে ছোরা। তারা চোঁচাতে বাধন করেছিলো।

তবু ও চেঁচিয়েছিলো। ওর চাঁৎকার শুনে যে এলো তার চেহারার পাংলা, রোগা! কিন্তু তাকে দেখেই গুণ্ডারা সেলাম করে স'রে গেছলো।

আলাপ হয়েছিলো। তার নাম বাবা। বাঙালীটোলার বাঙালী তরুণ বাবাকে কাশীর সব লোক মানে, সর্দার বলে স্বীকার করে।

তার সঙ্গে থাকে রিতভাষার। হাতবোমা সে অন্যায়সে ছোঁড়ে। সাহসে অধিষ্ঠার। তবু একটা খুবের ব্যাপারে পুলিশ তাকে খুঁজছিলো ভুল করেই। বাবা নির্দোষ হলেও ডুব দিয়েছিলো সাত দিন। বাবাকে ধরবার জন্তে কী চেষ্টা চলছিলো। মীরা ভবে কাঁটা হয়েছিলো।

বাবা তার ভীষনে ছাপ দিয়েছে। বাবাকে পুজো করা যায়। হু-সাহসী ছেলে বাবা।

বাবা একদিন ধরা পড়লো। সেদিন মীরা কেঁদেছিলো। ক'দিনের পরিচয়ে কোনো মাছবের জন্তে এমন কাঁরা পায় সে জানত না।

কিন্তু বাবা ছাড়া গেলো। বাবার দলবল রোগীর সেবা, মশিকদিকার শব নিয়ে বাঙা আর হারানোকে খুঁজে আনবার জন্তে সব সময় তৈরী।

অহল্যাবাই ঘাটে বিকেল নেমেছে কাশীর গঙ্গার নীল জলে সোনালী আঁবির ছড়িয়ে। ওপারে শুল্ক বালুচর, জোয়ারের জনাবের ক্ষেত সবুজ হয়ে আছে গোলাপী আকাশের নীচে। বাঘা বললো, মীরা, তুমি নাকি বড়লোকের ঘরে মাহুঘ হচ্ছিলে, এখন গরীব হ'য়ে বাবে ব'লে ভয় পাচ্ছ?

কে বললে আপনাকে বাঘা?

শিমিয়ার মুখে শুনলুম কিছ তুমি খাঁচার পাখী দেখেছ?

কেন দেখব না?

খাঁচার পাখী এখন খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে উড়ে যায়, সে কি কোনো ভাবনা ভাবে? সে কি আর কিরে আসে কাকিন দানা, হললে ছাড়া কিংবা ভিজে ছোলার লোভে? নিরাপদ আশ্রয়ে? ডাকলেও সে ফেরে না। সে গাছে গাছে বড়ে জলে কাটিয়ে দেয়—বনে বনে উড়ে বেড়ায়। তার ভাবনা কে ভাবে? ভগবান! সেই পাখীর মতন মন নিয়ে তুমি পৃথিবীর মাটিতে বেরিয়ে এসো, তোমার জায়গা ঠিক করাই আছে। শান্ত বাঁরা লিখে গেছেন, ঠায়া বোকা ছিলেন না। তাঁরা কি তোমার-আমার মতন বুঝে?

নিশ্চয়ই না।

তাঁরা ভগবানের সন্ধে সব জেনে তবে লিখেছেন। তোমার যদি দেখবার চোখ থাকে—তুমিও দেখতে পাবে, সমস্ত বিপদ সমস্ত অকল্যাণ থেকে আমাদের মতন কে আমাদের বাঁচাচ্ছেন প্রতিদিন প্রতিমুহুর্তে।

সূর্য্য হুবে গেল। ঘাটে ঘাটে বিদ্যুৎ আলো জ্বলে উঠলো। জলে প্রদীপমালা ভাসলো। কত লোক নান করতে এলো সাধা দিনের পর। জলে আলো কাঁপছে, ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, এমন সময়ে নান করলে শবীর ত নিশ্চরই নিম্ন হর, রাত্রের ঘুমটা হয় চমৎকার।

বাঘা বললে, আমার গুরুদেবের কাছে গেলে অনেক প্রশ্নের জবাব পাবে। চলো কাল সকালে। সকালে নয়, খুব ভোরে।

তখনো কাশী শহর জাগেনি, ওরা নৌকায় চড়লো। পাথরে ধাঁধানো ঘাট একের পর আর। নামগুলো কি মনে থাকে? মীর-ঘাট অহল্যাবাই, দশাধর, মণিকরিকা, সিঁছিয়া ঘাট, পঞ্চপলা, রামঘাট, গাইঘাট, গৌঘাট, রাজঘাট—তারপর ব্রীজের ধামের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে বরুণাঘাট, যেখানে কাঁড়ালে ওলিকে অসিঘাট পর্যন্ত দেখা যায় অর্দ্ধচন্দ্রের মতন বারাপসীর গঙ্গার ফুল ব'লে। বেলীমাধবের একটা ক্ষত্রী কলকাতার মহুমেদের মতন ঘোড়ানো সিঁড়ি আর বায়ান্না নিয়ে জেগে আছে আকাশে মাথা তুলে। আরেকটা কবে শ'ড়ে গেছে।

ভিনতলার সমান সিঁড়ি ভাঙতে হয় বরুণাঘাটে। ওপরে আদিনাথের মন্দির দর্শন করে ওরা বেরিয়ে এসে এক আজ্ঞা পেলে গঙ্গার তীরে।

ভিনধানা কামরার একটি ছোট বাড়ী, নানা ফুল-কলের গাছ, লতাপাতার ঢাকা। সেখানে এক ভক্তলোক—সোনার চন্দা চোখে, পাড়ি-গৌর কামানো শান্ত মুক্তি—কাগজ পড়ছিলেন।

বাঘা বললে—গুরুদেব, আপনাদের কাছে মীরকে নিয়ে এলুম। এর বিশ্বাস হচ্ছে না ভগবান আছেন।

গুরুদেব বললেন, নাই বা হল। তুমি জোর করে বিশ্বাস করতে চাইছ কেন?

বা যে, ভগবানে বিশ্বাস না করলেও মনে জোর পাবে কেন? ভগবানে বিশ্বাস না করলেই মনে বেশী জোর পাওয়া যায়। আমি সংপথে আছি, আমার কোনো ক্ষতি হবে না; হ'তে পারে না, কেন না আমি কাকুর ক্ষতি করিনি, আমিই ভগবান—এই ধারণাটিই সব চেয়ে ভালো।

কথাটা মীরার খুব ভালো লাগলো।

গুরুদেব বললেন—তুমি পৃথিবীতে এসেছ একটি বিশেষ কাজে। সেইট খুঁজে বার করো। প্রত্যেকেই এসেছে একটা বিশেষ কাজে নিয়ে। সকলে বুঝতে পারে না, সকলে পথ পায় না। যে পায়, তার নাম হয় নেতাজী, তার নাম এডিশন। বার্না পায়, তাদের নাম হয় বীসাস, বুদ্ধদেব, খ্রীষ্টোত্তম, নিউটন, র্যাফেল, বোমারোলা, রবীন্দ্রনাথ, মালবীয়া, বক্সেলার। বাঁরা তোমার মুখের অঙ্গ, পং কাপড়, বোগের ওষুধ তৈরী ক'রে দিচ্ছে, তারাও পথ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ এঁদের সন্ধে বলেছেন—ওরা কাজ করে। ওরা সার্থক।

বাড়ীর মধ্যে করেকটি ছেলে-মেয়ে ছলোড় তুলেছিলো। কত চড়া, কত না গান!—

শোন বে গুরু

শোন বে খোকা

নাচ দেখাবে

শূর্ণপাখা।

কৃষ্ণকর্ণ

দিল্লি হুম।

হুম ভাড়াবার

লাগলো হুম।

চিত্রকূটের পাহাড় যেতান অমাবস্তার রাত্তে লক্ষণ ভাই যদি আমার থাকত সাথে সাথে।

নেব ফুল নেব ফুল নেবু'নেব গুল।

নেব ফুল নেব ফুল নও তুমি মল।

ছোট খোকা পড়ে অ—অ।

শেখনি সে কথা করো ॥

বক্ বক্ বক্ বক্

য়েল বাছে।

কিরবিয়ে ননী,

গুরু জল ধাচ্ছে।

আওরাজ শুনে ভেতরে ঢুক দেখে মীরা, এক পাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সবুজ বাসে ঢাকা আভিনায় নেচে হৈ হৈ করছে। তারা কাউকে ভয় করে না।

পৃথিবীতে এদের কেউ ছিল না। এদের আঁবর করবার কেউ নেই। এরা পেয়েছে এখানে পরম আশ্রয়।

বাঘাটার মুখে মীরা শুনলো—এখানে থেকে বাঁরা বড়ো হ'য়ে গেছে, তারা কামার, কুমার, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, টেলিফোন, ইলেক্ট্রিসিটি, কারখানা, ফুল, মায় বইবাঁধানোর কাজ দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

যখন তারা কাজ করতে লাগলো তখন দেশের জন্ত, যেকিষ্টেট, অধ্যাপক, কত লোকের দুটি পড়লো এদিকে। সাহায্য আসতে লাগলো চারি দিক থেকে।

তবু বাঙালী নয়, সব প্রদেশের লোকের কাছ থেকে সাহায্য এলো। এখানকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেমন সব দেশের ছেলেমেয়ে আছে।

এখানে কিন্তু সকলকে বাংলা বলতে হয়, বাংলা পড়তে হয়, বাংলা শিখতে হয়—কারণ এ নিয়ে তো কোনো তর্ক নেই যে স্বাধীনতার বাংলা হিন্দুস্থানের সব চেয়ে অগ্রসর ভাষা। সব চেয়ে সুন্দর।

কোনো বাড়িতে কোনো উৎসব হ'লে ঘেরেরা নিজের হাতে খাবার এনে এখানকার সকলকে খাইয়ে যায়।

নৈশে বার নীচে প্রকাণ্ড কারখানায়—মাছের গড়ার কারখানায়, যেখানে লেখা আছে—

অনাথ ছেলেবেলায় কোলে নিবি

জননীরা আর তোরা সব।

মাতৃহারা মা যদি না পায়,

তবে আজ কিসের উৎসব?

মীরা দেখলো—আর একটা ঘরে লেখা আছে সোনালী অক্ষরে—

আমাদের এ ধরনী বড়ো ভালো লাগে

ভালোবাসা যদি থাকে হৃদে।

কত শান্তি আসে, প্রাণে কি আনন্দ আসে

ভালোবাসা যদি থাকে হৃদে।

গুরুদের বললেন, এখানে দুমি আজ খেয়ে বাঁবে মীরা।

ভাগিন পিসিমাকে বলে এসেছিলো বেলা হ'তে পাবে, মইসে তিনি কি ভাবতে পারেন!

চলো একটু বেড়িয়ে আসি, বলে উনি মীরাকে নিয়ে বন্ধুর জীর খ'রে চললেন। টলসে নীল জল, এদিকটা অনেক কাঁকা—মীরা বললো—বেশ ত ভায়গাটা!

শিকরোল আরো ভালো লাগবে তোমার—সাহেবী প্যাটার্ণের বাগানগুলি বাগানের মাঝখানে। অত দূর যেতে পারবে?

পারব।

ইতিমধ্যে ফট করে গেল মীরার স্মরণাল ছিঁড়ে। এক পাটি গল। আরেক পাটি প'রে ত হাঁটা যায় না, ছুটোই হাতে নিলো।

পথের ধারে গাছের তলায় একটি বুচি বসেছিলো। একটা কীসিতে বধেব হাতু আর ছোলায় হাতু মিশিয়ে বন্ধন নদীর জল দিয়ে আর কাঁচা লুকা দিয়ে সে তার সকালের খাওয়া সেবে নিচ্ছে।

মীরা জুতোটা দেখাতে সে বললো—ছুইয়ে পরগা লেগা মাইজী?

গুরুদের বললেন—একে পরগা।

হার মীরাবাম! বলে সে হাসলো। মজবুত ক'রে সেলাই ক'রে দিলে।

ধানিক দূর গিয়ে মীরা বললো, দেখুন গুরুদেব, আমার কাছে যদি পরগা থাকত, ওকে আমি ছ' আনা দিচ্তুম।

আমিও তাই শেব। তোমার মন পরীক্ষা করবার জন্তে

—সত্যি করে মীরা হ'লে এমন দলো নাহক হয়।

বুচি কিন্তু নিজেই চায় না, তার শেষে বার, এ কি ঠাট্টা তার সঙ্গে।

গুরুদের জোর ক'রে বেন—সেও জাইয়া ব'লে। তার পর বললেন—বুচির মতন এত উপকারী অথচ এত ভয় বন্ধু আমাদেব আর নেই। সব দেশেই বুচিরা কত ভালো। এই ভয়ে ওদের পরগা দিয়ে যেমন ভুলি পাওয়া যায় এমন আর কাউকে দিয়ে হয় না। তোমার পায়েব জুতো হাতে ক'রে ওরা সাক্ষিয়ে দেবে, ওদের ছাড়া তোমাদেব চলবে না, তবু ওদের সঙ্গে তোমরা সব করবে, আর বলবে চামার। ডেনমার্ক এক বুচির ছেলে হল ছাল ক্রিস্টিয়ান অ্যাগ্‌স্টার্ন। লেখা-পড়া শিখলো না কিন্তু এত বড় শিশুসাহিত্যিক হল যে সারা ইউরোপে তাকে নিয়ে মাতামাতি। আমাদেব দেশে দেখো কোনো লেখা ভালো লেগেছে এ কথা ছেলেবাও জানায় না, তাদের অজিতাবকরাও না। বাংলাদেশের প্রথম শিশু মাসিক 'সখা' বার ক'রে বুক প্রেমলাচরণ সেন আচার্যের মধ্যে বেগে ভূগে মাতা সেলেন, বার নামে শ্রুতি-মন্দির গুয়া উচিত, তার নাম কেউ মনে করে না। আর ছাল অ্যাগ্‌স্টার্ন যখন লন্ডনে গিয়ে পৌঁছলো, তখন রাজার রাজার ছেলেমেয়ের মছিলে মনে হল বুচি কোন দেশের রাজার শোভাযাত্রা চলছে! শিশুসাহিত্যের গভীরনদীকে যে ভরীবধ প্রেমলাচরণ সেন বাংলার মাটিতে নিয়ে এলো—তার হল সখা। চিকিৎসা হল না।

আরামের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ব'লে মীরা খেলো। হঠাৎ ছুট বাজার খাবার সময় একটুও গোল করলো না।

হুপুবে সব মন দিয়ে পড়াশুনা করলো। বড়োরা হাতের কাজে গেল। বিকেলে ছুটোছুটি খেলো। সংকেলো গল্প।

প্যাচা কেন লক্ষীর বাহন, এত জীবন্ত থাকতে? গোলাভরা বান ইঁদুর নষ্ট করে, পেঁচা তাদের খায়। তাই পেঁচার মতন দুখ বলে খোঁা করলেও ছুবেব মতন লাল লক্ষীপেঁচা মা লক্ষীর আগরের বাহন।

শ্রীরামের মন্দির কোথায়? লাক্ষ্মীভো কাবেরী নদীর তীরে।

৪২৮ বিধা জমি, সাঁতটা পাঁচিল, প্রথম পাঁচিল ৩০০০ ফুট লম্বা ২৫০০ ফুট চওড়া। প্রবেশ-পথের ওপর যে পাথরের পৌপুরম, তাই এখানকার ডেবতলা বাড়ীর প্রধান উঁচু। মূর্তি নারায়ণের—সমুদ্রের ওপর অনন্তনাগে লম্বা—লম্ব হাত লম্বা নীল পাখরের তৈরী, পাথর কাছে লম্বী। এত বিরাট মন্দির তৈরী করতে হাট বছর লেগেছিলো, সেই কারিগরই বা কি রকম?

হাসির গল্পও হল—এক ভ্রাক্ষণের তিন জামাই ছিল, দু'জন পণ্ডিত, ছোটটি বুর্বা। একদিন অনেক পণ্ডিত লোক বাড়ীতে এসেছে, তাই ছোট জামাইকে তার স্বী খাটের তলায় লুকিয়ে রেখেছে, কি বলতে কি ব'লে কেলেবে। সংকটে কথাবার্তা হচ্ছিলো, অনেকক্ষণ ধ'রে ছোট জামাই গুনলো। অংক চা শুনে মনে করলো বাংলা কথার সঙ্গে অলুখার যোগ করলেই সংকট হয়। তাই সে তেড়ে খেড়ে বেরিয়ে এসে বলে ফেললো—

অলুখার মিলেঃ যদিঃ সমস্কৃতঃ হয়,

তবে কেনঃ ছোটঃ জামাইঃ খাটেরঃ তলাঃ ঘরঃ?

ছেলেমেয়েরা ছেলে লুটিয়ে পড়লো।

অলুখার গল্পের বক্তে দৌতো চলেছে। আকাশে অলুখা তারি



যেন আলপনা আঁকা রয়েছে অকৃত বাতকের হাতে। কুলে কুলে অগাধ বাড়ীতে কান্না যেন আলোর দেওয়ালীর প্রাণীশালায় সাজানো। অকৃত মৃত!

সারা রাত ধরে এমন চলতে ভালো লাগে। হেনশাকের সাজানো ডাঙি রুমের পুতুলকীর্তন থেকে মুক্তি পেয়ে এ যেন আকাশের পাখীর উড়ে যাওয়া।

মারিদের সঙ্গে বাখালাও ঠাঁড় টানছে। খেজার, আনন্দে। তাদের সঙ্গে এমন চিন্তা জায়া বলছে যে, কে বলবে ও হালান্না!

আগ্রহ ওর ভালো লেগেছে। কিন্তু ভাবভরা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মীরার মনে চ'তে লাগলো—ভালো লেগেছে, এ কথা জেলসে বুঝ ফুটে যেন বলতে নেই।

আমরা উপভাস পড়ি গিনের পর গিন। চরিত্র আগ্রহ ক'রেই পড়ি। কিন্তু কক্ষণে জানাট না, ভালো লাগছে, আমাদের ভালো লাগছে।

ভালো লাগার জন্যে যিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করেন, তাঁকে আগ্রহ ক'রেই আমরা আনন্দ পাঠি, যেমন ট্রামে চ'ড়ে অনেক দূর গিয়ে টিকিট কাঁকি দিয়ে নেমে পড়াকে আমরা বাতাসের মনে করি।

ভাট হাল ক্রিস্টিয়ান আগাসন এ দেশে জন্মের না। 'মাকুরমার মূর্খির লোককে আমরা প্রণয় করতে শিখি না। মীরার নিজের মনে বলে—আমাদের কি ক'রে ভালো হবে?

[ ক্রমশঃ ]

## আমাদের মনের মানুষ

দেবদত্তা রায়

হাটিকোট।

বিশেষ জরুরী মারদার তনানী চলছে। বিচারদানে গভীরবুধে বসে আছেন বিচারপতি, তাঁর দুই টেবিলের 'পরে কাগজে ভক্ত, কিন্তু বেণ বোকা বাজে, দুই কান তাঁর উল্লস আগ্রহে উন্মুখ হয়ে আছে জেয়ার জবাব তনবার ভক্ত। জুরীরা বসে আছেন চিন্তিত গভীর বুধে, সামনের দিকে সর্ব্ব ক'রে পড়ে তাঁরাও তাকিয়ে আছেন সেই দিকে, আর মনের পাতায় তুলে নিচ্ছেন একের কথাবার্তার নিখুঁত বেকর্ড।

বাদীপক্ষের জেরা...

জেরা করছেন একজন দৃঢ়চেহা বহুবুধ সজ্ঞা-দর্শন ভ্রলোক। আমালতপুত্রের সমস্ত লোক মধ্যে মধ্যে বিমিত নেত্রপাত করছেন তাঁর সঠাম সৌম্য মুখগুলের পানে। তাঁর গভীর বুখাভাসে, তাঁর ভাবসে, তাঁর দুইপাতের মধ্যে কি যেন একটা ছিল, লোককে বা অজান্তসারে আকর্ষণ করে আনত তাঁর দিকে। সেদিন সেই আমালতের উপস্থিত জনতারও মনে হচ্ছিল, এর মধ্যে একটা আশ্চর্য্য শক্তি আছে, তাঁর প্রতিটি কথায় প্রত্যেক ভদ্রীতে বসে বসে পড়ছে সেই শক্তির আভিজাত্য।

এমন সবরে আমালতের চাপরাশি এসে তাঁকে সেলাম করলে। জেয়ার বাধা পেয়ে কিয়ে তাকিয়ে ঈষৎ বিরক্তিরে তিনি বললেন, কী!

চাপরাশি সম্বোধিত ভাবে সম্বোধে একথানা টেলিগ্রাম তাঁর দিকে অগ্রসর করে দিলে।

টেলিগ্রামখানা পড়তে পড়তে তাঁর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু সে মাত্র এক পলকের ভক্ত।

পরব্রহ্মেট টেলিগ্রামখানা হুড়ে পকেটে ফেল তিনি আবার আরম্ভ করলেন জেরা, এবং নিজের প্রতিভা-প্রাণও বাগ্জাল বিজ্ঞানের মধ্যে অগ্রদক্ষের মধ্যেই নিজেকে ফেললেন হারিয়ে।

আমালত দেখ হ'ল। সকলেই উঠবার উপক্রম করছে। বিচারকের কাছে গিয়ে পীড়ালেন অভিভাভদর্শন ব্যক্তিটি।

বিচারক সম্বোধি ক'রে বললেন, "ভাল হয়েছ, চমৎকার হয়েছে আপনার জেরা। আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি, ওজারে জেরা না করলে মারদারটার কিনারা কগাই শক্ত হত। কাল তাহলে যি—"

বাধা দিয়ে সেই বহুভাবী ভ্রলোক বললেন, "কাল আমি আসতে পারব না টিওর অন্যর, মারদারটা দুয়েক দিন মূলতবী রাখলে ভাল হয়।" বিচারকের হাতে তিনি কুলে দিলেন টেলিগ্রামখানা।

বিচারক ভক্ত হয়ে গেলেন।

টেলিগ্রামে লেখা ছিল, "Your wife expired last night."

"আপনার স্ত্রী কাল রাতে মারা গেছেন।"

ইনি ছিলেন সর্দার বহুভাবী প্যাটেল।

প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুসংবাদও থাকে কর্তব্য কাজে এতটুকু বিচলিত করতে পারে না, অসৌম্য বৈধবীর অভিজাত্যসম্পন্ন ইনিই সেই আমার দেশের মনের মানুষ। এই অটল বৈধবা ও বিপুল কথনিষ্ঠার পতাকা উড়িয়ে তিনি গভীর্জীর পাশে এসে ভক্তের জাতীয়-সংগ্রামের পুরোভাগে পিড়িয়ে তাকে সাক্ষ্যের পথে অগ্রসর করে এনেছেন। চিন্তভরে আজকে আমরা তাঁকে স্বরণ করি।

আজকের যুগে আমাদের যে চাই এমন অনেক অনেক সর্দার প্যাটেল... কর্তব্যে অবিচলিত, নিষ্ঠার চূড়।

ব্যক্তিগত অহুভুতির উল্লোকচাচারী।

আজকের বিশ্বেষদের মধ্যেই চরিত্র লুকিয়ে আছে ভাবীযুগের সেই "সৌহমানব।" তাঁদের স্বরণ করেই বহুমতীর পাতায় তুলে ধরলুম তাঁর মহান্ন আদর্শ।

প্রশাস প্যাটেল !!

## সোনার পাখী

[ বিদেশী তথ্যকথা ]

ঐতিহ্যবাহিন বিশ্বাস

এক রাজার একটা সুন্দর বাগান ছিল। আর সেই বাগানের আপেল গাছে আপেল ধরত—সোনার আপেল। ঐ আপেলগুলো পাকলে রোজই একবার করে গোশা হত। আপেল পাকার সময় হলোঁড়া বোজাই একটা করে আপেল কমে যেত—এটাই হল আশ্চর্য্যের বিষয়! রাজামশাই কিন্তু এ ব্যাপার তনে বেগে আনন হয়ে যেতেন। আপেল কমে যাবার কথা শুনেই যিনি মালীকে আদেশ দিলেন, যাতে সবসময় হাত ধরে আপেল গাছ পাহারা দেওয়া হয়। মালী তাঁর

জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই পাঠাল পাহারাবার হিসেবে। কিন্তু রাত প্রায় বারটা নাগাদ সে ঘুমিয়ে পড়ল গাছের নীচে। সকালবেলায় জেগে দেখে, গাছের আশেপাশে একটা কমে গেছে। পরদিন মালী মেন্ন পুত্রকে পাঠাল পাহারা দেবার জন্তে। কিন্তু এই একই ব্যাপার—মধ্যরাত্রে সেও ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে আশেপাশে গুলে দেখে সে, আশ্রমও একটা কমেছে। তার পর মালীর কনিষ্ঠ পুত্রের পালা। সেও প্রস্তুত হয়ে ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের বেলায়ও এই একই ব্যাপার ঘটবে জেনে সে তাকে পাঠাতে রাজী হ'ল না। কিন্তু অবশেষে সে রাজী হ'ল। কনিষ্ঠ পুত্র প্রেরিত হ'ল সোনার আশেপাশে গাছটা পাহারা দেবার জন্তে। সমস্ত রাতের মধ্যে ওর এতটুকু ঘুম এল না। বধন বারটা হ'ল, তখন সে বাতাসের মধ্যে একটা হুঁ হুঁ আওয়াজ শুনতে পেল। তার পর একটা সোনার পাখী উড়ে এল এবং পরে বধন সে ঠোঁট দিয়ে আশেপাশের গাটায় কামড় দিয়েছে অমনি মালী-পুত্র ছুড়ল তীর। তীরটা পাখীটার কোন ক্ষতি করতে পারল না। কেবল মাত্র পাখীর লেজ থেকে একটা সোনার পালক বসে পড়ল এবং তারপরেই সে উড়ে চলল—আকাশের পানে। সকাল হতে মালী সোনার পালকটা নিয়ে গিয়ে হাঙ্গির হল রাজার কাছে। রাজা ভাবলেন সভাসদসংকলিত। সকলেই পালকটা দেখে বললেন—এটা রাজ্যের যে কোন অমূল্য সম্পদের চেয়েও মূল্যবান। রাজা বললেন—একটা পালক দিয়ে আমার কিছুই হবে না। গোটা পাখীটাই চাই।

সোনার পাখীটাকে খুব সহজেই পাওয়া বাবে—এই ভেবে মালীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বেরিয়ে পড়ল। কিছুদূর গিয়েই সে একটা ছোট বনের কাছে হাঙ্গির হল। এবং বনের পাশেই একটা বৈকুণ্ঠালকে দেখতে পেল। তাই সে বহুদূর তার ধক্ক উঁচু করে বলল বৈকুণ্ঠালটাকে মারবার জন্তে। ব্যাপার দেখে বৈকুণ্ঠাল বলল—তুমি আমাকে মের না। তোমাকে আমি সাহায্য করব। তুমি কি উদ্দেশ্যে বেরিয়েছ তুমি জানি। সোনার পাখী চাই ত তোমার? আজ সকাল তুমি একটা গায়ে পৌঁছবে। বধন তুমি ওখানে পৌঁছবে তখন দু'টা পাখশালা ঘুঁঝুঘুঁ দেখতে পাবে। ওর মধ্যে একটা খুব সুন্দর দেখতে। আরামপ্রদও বটে। ওটাতে তুমি ঢুকবে না। বাত কাটাবার জন্তে ওর বিপরীত দিকের নোয়া পাখশালায় থাকবে, বুলে ত?

কিন্তু সে ভাবল—আচ্ছা ব্যাপার ত! এই বুনা বৈকুণ্ঠাল বাটা কি করে জানল এসব? তাই এবার সে তাঁর ছুঁড়ল। কিন্তু ব্যর্থ হল। তাঁর ওর গায়ে লাগল না। বনের মধ্যে পালিয়ে গেল বৈকুণ্ঠাল। তারপর মালী-পুত্র হেঁটে চলল। বৈকুণ্ঠাল-কথিত গ্রামে সে পৌঁছল এবং ওখানেই ওর সন্ধ্যা হ'ল। দু'টা পাখশালাও সে দেখতে পেল। ওর মধ্যের একটাতে খুব নাচ, গান আর হস্যা হচ্ছে। এবং বিপরীত দিকেরটা নোয়া আর স্থির। কোন সাড়শব্দ নেই ওর ভেতর থেকে। আমি নিশ্চয়ই খুব নিকোঁদ প্রতীপদ হব—যদি এই নোয়া বাড়ীটাকে প্রবেশ করি, এই চমৎকার বাড়ীটা তেঁতে। এই ভেবে সে ভাল পাখশালাতেই প্রবেশ করল। ইচ্ছে মত পান-আহার সারল। তারপর পাখীর কথা, এমন কি বাড়ীর কথাও সে ভুলে গেল।

অনেক দিন পর জ্যেষ্ঠ পুত্রের কোন খবর না পাওয়ার দেখে পুত্র

প্রেরিত হল—সোনার পাখীর খোঁজে এবারও এই এক ব্যাপার ঘটল। বৈকুণ্ঠালের সাক্ষ্য এবং পরামর্শ সে পেল। কিন্তু বধন সে এই পাখশালায় নিকটবর্তী হল, তখন জানালা দিয়ে দেখল যে, বড়লা ওর মধ্যে বেশ মজা করছে। বড়লাও ভেতর থেকে মেন্ন ভাইকে দেখে ডেকে নিয়ে গেল। বৈকুণ্ঠালের কথা ভুলে গেল। ওর মধ্যে গিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে সেও বড়লার মত পাখী এবং বাড়ীর কথা ভুলে গেল।

তার পর আবার অনেক দিন কেটে গেল। মালীর কনিষ্ঠ পুত্র এবার সোনার পাখীটাকে খোঁজবার জন্তে প্রস্তুত হ'ল। কিন্তু মালী পুত্রের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল হওয়ায় অনেক দিন ধরে ওর কথাই কান দেয় নি। তা ছাড়া পুত্র অনেক বিপদ হতে পারে—যার জন্তে সে কনিষ্ঠ পুত্রকে ছাড়তে রাজী হয়নি। বাগা হোক, অবশেষে সে রাজী হল। বেরিয়ে পড়ল কনিষ্ঠ পুত্র। দু'দশবার মত বনের কাছে যেতেই ওর সাথেও বৈকুণ্ঠালের দেখা হল। এবং সেও পরামর্শ দিল একে। দশবার মত সে বৈকুণ্ঠালের প্রাণ নাশের কোন চেষ্টা করল না বরং বৈকুণ্ঠালের প্রতি বিশেষ সম্মতি হল। বৈকুণ্ঠালও সন্তুষ্ট হয়ে বলল—তুমি আমার লেজের ওপর বস। তা হলেই খুব দ্রুত যেতে পারবে। সেও বলল—বৈকুণ্ঠাল এত জোরে যে উদ্ভূত লাগল যে বাতাসের মধ্যে শোঁ-শোঁ শব্দ হতে লাগল। এবং ওদের কানেও সে শব্দ বিঁথতে লাগল।

বধন তারা এই গ্রামে পৌঁছল, তখন মালী-পুত্র পাখশালা দু'টা দেখতে গেল। অজ্ঞ কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করে সে নোয়া পাখশালাটিতে ঢুক পড়ল এবং বাতটা ওখানেই কাটিয়ে গেল। সকাল বেলায় আবার সে বৈকুণ্ঠালের সাক্ষ্য পেল। এবং সে আবার পরামর্শ দিল। বলল—তুমি সোজা চলে বাবে—যতক্ষণ না একটা দুর্গে পৌঁছাও। ওর সামনেই তুমি দেখাবে সৈন্ধ্যা যুদ্ধে তার নাকের গোঁ গোঁ শব্দ করছে। ও-সব খেয়াল না করে সোজা দুর্গের মধ্যে চলে গেলে একটা ঘরে পৌঁছবে—যেখানে সোনার পাখী রয়েছে—একটা কাঠের খাঁচার ভেতর। ওর পাশেই একটা সোনার খাঁচা রয়েছে। তুমি নোয়া কাঠের খাঁচা থেকে পাখীটা বের করে সোনার খাঁচার বাথবার চেষ্টা করো না।

বৈকুণ্ঠাল লেজ সোজা করল এবং মালী-পুত্র ওর ওপর চড়ে বসল এবং শোঁ-শোঁ শব্দ করে চলল।

অবশেষে দুর্গের কাছে গিয়ে সে বৈকুণ্ঠালের কথা মত সব দৃষ্ট দেখতে গেল। সোজা চলে গিয়ে সে হাঙ্গির হল যেখানে খাঁচার ভেতর সোনার পাখীটা রয়েছে। তার নীচেই রয়েছে সোনার খাঁচাটা। আর ওর মধ্যেই রয়েছে আগের হাবান সোনার আশেপাশ তিনটে। বা পাখী আগে চুরি করে এনেছিল রাজার বাগান থেকে। তখন সে ভাবল—আচ্ছা, এই নোয়া খাঁচা থেকে যদি সে পাখীটাকে বের করে আনে, তাহলে খুব মজার ব্যাপার হতে পারে। তারপর সে নোয়া কাঠের খাঁচার দরজা খুলে পাখীটাকে সোনার খাঁচার বাথল। কিন্তু পাখীটা এমন চমৎকার করে উঠল যে, সব সৈন্ধ্যা জেগে গেল ঘুম থেকে। এবং ওরা মালী-পুত্রকে ধরে নিয়ে গেল—রাজার কাছে করেই হিসেবে। পরদিন সকাল ওর বিচারের জন্তে সভা বসল। সকলেই বললেন যত্নাধিকার্য্য কথা। তবে যদি সে সোনার খোঁজা—যে বাতাসের মত দ্রুত

ছুটে পাবে, তাকে এনে দিতে পাবে, তাহলে যুদ্ধাদও ত হবেই না বরং সেনার পাখীটা এমনিতেই পাবে।

আবার মালী-পুত্র বাজা শুরু করল। সে খুব চিড়িত হয়ে পড়ল এবং খুব আশাহীনও হল। কিন্তু একটু পরেই খেঁকশিয়ালের সাথে দেখা।—আমার কথা না শুনে তোমার কি রকম অবস্থা হয়েছে দেখ। তবুও আমি বলব কি করে সেনার ঘোড়াটা তুমি পাবে। বলল খেঁকশিয়াল। সোজা গেলে তুমি একটা দুর্গ দেখতে পাবে। ওর মধ্যে সোজা চলে গেলে একটা আন্তাবল দেখাবে—বেধানে সেনার ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পাশেই ঘোড়ার সহিস ঘুমিয়ে আছে এবং নাক ডাকাচ্ছে। আস্তে আস্তে চামড়ার জিন্টা তুমি নেবে—সেনারটা নয়।

আবার সে খেঁকশিয়ালের লেজের উপর বসল এবং শোঁ-শোঁ বেগে চলল। ঠিকমত গিয়ে সে দেখল—সহিস সেনার জিনের ওপর হাত দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু বধন সে ঘোড়ার দিকে তাকাল তখন ডাবল—এ ঘোড়ার পক্ষে চামড়ার জিনটা খুব ঝাড়াপ দেখাবে। এবং খুব লজ্জার বিষয় হবে। এই ভেবে বধন সে সেনার জিনটা নিল তক্ষুণি—সহিস জেগে উঠে চাঁচকার ছাড়ল—আর সমস্ত প্রেহরীরা জেগে উঠল এবং ওকে কয়েদী হিসেবে ধরে নিয়ে গেল—বাজার কাছে বিচারের জ্ঞত। রাজা বললেন—যুদ্ধাদওই তোমাকে বেওয়া হবে—তবে তুমি যদি অল্পক রাজ্যের সুলতানী রাজকন্তাকে এনে দিতে পার, তাহলে সেনার ঘোড়া এবং সেনার পাখীটা তোমার নিম্নের সম্পদ হিসেবে দেওয়া হবে।

তখন সে আবার চলা শুরু করল। এবং হঠাৎ খেঁকশিয়ালের সাথে দেখা হল। আমার কথা শোননি কেন? যদি তুমি ওনতে তাহলে পাখী এবং ঘোড়া উভয়ই পেতে। বাচ্ তবুও আমি তোমাকে পরামর্শ দেব। তুমি সোজা চলে গেলে সাক্যাবলার একটা দুর্গে পৌঁছাবে। ওর মধ্যে তুমি চুকে রাজকন্তার স্নানাগারের কাছে যাবে। রাত বারটার সময় রাজকন্তা স্নানাগারে যাবে। তখন তোমার সাথে ওর সাক্ষাৎ হবে। সাক্ষাৎ হতেই তুমি ওকে প্রণাম করবে। রাজকন্তা তোমার সাথে আসতে চাইবে। কিন্তু তার আগেই ওর পিতা-মাতার সাথে একবার সাক্ষাৎ করতে যাবে। তুমি ওকে যেতে দেবে না।—বলল খেঁকশিয়াল। অতঃপর মালী-পুত্র খেঁকশিয়ালের লেজের ওপর বসল এবং সাক্ষাৎ নাগাদ দুর্গের কাছে পৌঁছল। খেঁকশিয়ালের কথামত মালী-পুত্র রাজকন্তার স্নানাগারের কাছে দাঁড়িয়ে বইল এবং রাত বারটার সময় রাজকন্তার সাক্ষাৎ পেল। এবং প্রণাম কৃত। রাজকন্তাও ওর কথাবাহারী ওর সাথে আগতে চাইল বটে, কিন্তু আসবার আগে পিতামাতার সাথে একবার সাক্ষাৎ করতে চাইল। কারণ, ওর কোন বোজ-খবর না পেলে পিতা-মাতা কেনে আকুল হবেন। মালী-পুত্র ঘোটেই রাজী হল না। কিন্তু রাজকন্তা কীমতে কীমতে ওর পায়ের ওপর পড়ল। রাজকন্তার বাপার দেখে সে ওর পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করতে অনুমতি দিল। কিন্তু যে দুহুড়ে রাজকন্তা ওর পিতার শরনকক্ষে হাজির হল, তখনই সমস্ত প্রেহরী জেগে উঠল এবং বন্দী করে রাখল।

অতঃপর সে রাজার সমুখে নীত হল। রাজা নিকটবর্তী একটা পাহাড় দেখিয়ে বললেন—তুমি আট দিন ধরে এটা খুঁড়ে সমস্ত

ভূমিতে পরিণত করে কেলেতে পারলে রাজকন্তা পাবে এবং যুদ্ধাদও হবে না।

পাহাড়টা সত্যিই খুব বড় ছিল। কি করে ও খুঁড়ে সবটা? সাত দিন ধরে খুঁড়ে দেখে পাহাড়ের খুব অল্পাংশটুকুও খুঁড়েতে পারেনি সে। আর একদিন মাত্র বাকী। তাই সে মহা ভাবনার মধ্যে পড়ে গেল। সাত দিনের দিন খেঁকশিয়াল এসে হাজির। এসেই বলল—বাও তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ। গিরে ঘুমাও। আমি সব কাজটা করে দিচ্ছি।

বধন সন্ধ্যাবেলার মালী-পুত্র জেগে উঠল তখন দেখল যে, পাহাড়ের চিহ্নটা মাত্র নেই। তাই সে ভাড়াভাড়ি রাজাকে গিয়ে খবর দিল।

রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজকন্তাকে ওর হাতে দিলেন। খেঁকশিয়াল তখন বলল—আমরা এখন ঘোড়া পাখী সবই পাবে। মালী-পুত্র বলল—কি করে পাবে?

খেঁকশিয়াল বলল—তুমি যদি আমার কথা শোন তাহলে সব কাজ সীগগিরি সমাধা হয়ে যাবে। বধন তুমি রাজার কাছে যাবে তখন তোমার জিজ্ঞেস করবেন—কই রাজকন্তা কোথায়? তুমি বলবে—এইখানেই। তখন তিনি খুবই আনন্দিত হবেন। আর সেনার ঘোড়াটা তোমার দেবেন। তুমি ঘোড়ার চড়ে বসবে। আর এই স্থান পরিত্যাগ করার আগে তুমি রাজাকে সন্ধ্যাব জনাবে এবং অবশেষে রাজকন্তার সাথে করমর্দন করবে এবং করমর্দন করার সময়েই রাজকন্তার হাত ধরে ওকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে নিয়ে দেবে ছুট। বত জোরে পাবে তত জোরে পালিয়ে আসবে।

খেঁকশিয়ালের কথা মত রাজকন্তাকে নিয়ে আসা হল ছিনিয়ে। আবার সে বলল—তুমি বধন পাখীর দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করবে, তখন আমি রাজকন্তাকে নিয়ে দুর্গের বাইরে থাকব। তুমি ঘোড়ার চড়া অবস্থায় রাজার সাথে কথা কইবে। বধন তিনি সেনার পাখীটা দেবেন—তখন তুমি ঘোড়ার চড়াবস্থায় পাখীটাকে হাতে নিয়ে দেখবে খাঁটি সেনার কি না। তারপর রাজা একটু অন্তমনস্ক হলেই পালিয়ে আসবে ঘোড়া আর পাখী নিয়ে।

সব কাজ খেঁকশিয়ালের কথা মত সমাধা হয়ে গেল। পাখী নিয়ে রাজকন্তাকে ঘোড়ার চড়িয়ে আবার ওরা চলতে শুরু করল। খেঁকশিয়ালও চলল। একটু পরে খেঁকশিয়াল মালী-পুত্রের কাছে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করে বলল—তুমি দয়া করে আমার পা এবং মাথা কেটে ফেল।

মালী-পুত্র কি এতে রাজী হবে? যে ওকে এত সাহায্য করেছে তাকে কি করে হত্যা করবে? তাই সে গরবান্নি হল। খেঁকশিয়াল আবার পরামর্শ দিল। বলল—তুমি ছোটো কাছ থেকে সর্বদা বিরত থাকবে। প্রথমতঃ, কাউকে কান্দী থেকে দূরত্ব করতে যাবে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন নদীর পাড়ে বিশ্রাম করতে বসবে না। তা হলেই বিপদ। আরও বলল—হে, যুবক! আমার এই কথা ছুটো বন্ধে করতে তোমার কোন কষ্ট হবে না। তারপর সে বিদায় নিল।

তারপর মালী-পুত্র রাজকন্তাকে নিয়ে সেই গ্রামের মধ্যে এসে পড়ল। বেধানে পাহালা হুটো বিপরীতদুবি ছিল এবং তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ঘরে দেখিল। ওখানে পৌঁছতেই খুব পোলাদাল

শোন। গেল। ভাল করে খোঁজ নিয়ে জানল যে—চুট্টা লোককে কীসী দেওয়া হচ্ছে। নিকটে দেখে—সে ত একবারে অবাক হয়ে গেল। কারণ ঐ লোক চুট্টা আর কেউ নয়—ওর সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাষয়। বার। এর মধ্যে দম্ভাতে পরিণত হয়েছিল। সে লোকদের কাছে ভিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, ওদের বাঁচাবার কি কোন পথ নেই?—না। বতকশ না ওরা সব টাকা-পয়সা ফেরৎ দিচ্ছে ততক্ষণ ছেড়ে দেওয়া হবে না।

সে ওদের সব টাকা মিটিয়ে দিল এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাষয়কে মুক্ত করল। এবং তারা সবাই একসাথে দেশে ফিরে চলল।

যে স্থানটিতে অর্থাৎ বনের পাশে ওদের সাথে খেকশিয়ালের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, তার পাশেই একটা নদী ছিল। ওখানে পৌঁছতেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাষয় বলে উঠল—নদীর ধারে কিছুক্ষণের জঙ্গ বিজ্ঞান করে নেওয়া যাক এবং পানি আহাৰ সমাপ্ত করা হোক।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা খেকশিয়ালের কথা তুলে গিয়ে বলল—হ্যাঁ, এখানেই বিজ্ঞান করা হোক। এই বলে সেও নদীর ধারে গিয়ে বসল। সে এখন চুপচাপ বসে ছিল তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাষয় পেছন দিক দিয়ে গিয়ে ওকে চ্যাম্পোলা করে নদীর মধ্যে ফেল দিল। তারপর ওরা দু'ভাই রাজকত্তা, ঘোড়া আর পাখী নিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে রাজ্যকে বলল—এই সমস্তই আমরা আমাদের নিজেদের শক্তি দ্বারা অর্জন করেছি।

খুব আনন্দের ধ্বনি পড়ে গেল সমস্ত রাজ্যে। কিন্তু ঘোড়া আহাৰ বন্ধ করল। পাখী আর গান করল না এবং রাজকত্তা দু'শিরে কুঁশিরে কীদন্তে লাগল।

ওদিকে ত ছোট ভাইকে ওরা নদীর ভেতরে ফেল দিয়ে গেছে। জাগিয়া ওখানে বেশী জঙ্গ ছিল না। কিন্তু ওর শরীরে ভীষণ আঘাত লেগেছিল। কয়েকটা হাড়ও ভেঙে গেছিল। নদীর তীরটা ভীষণ কর্কশাঙ্ক থাকার সে বাঁচবার বা শুকনো জায়গায় ওঠার কোন পথ পাচ্ছিল না। অতঃপর সেই খেকশিয়াল হাজির হল। এবং তার কথা না শোনার জন্তে খুব বহুনি দিল। কারণ তার কথা শুনল ত বিপদ হত না। সে খেকশিয়ালের লেজ ধরল। আর একটা ভাল জায়গায় নিয়ে তাকে বহু করে তুলল।

তার পর খেকশিয়াল বলল—যদি তোমার ভাইরা তোমাকে ঐ রাজ্যে দেখতে পার তাহলে হত্যা করবে। তাই খেকশিয়ালের পরামর্শ অনুযায়ী বিবিধ বেশে সে তার রাজ্যের রাজ্যর কাছে গিয়ে হাজির হল। রাজপ্রাসাদে ওকে প্রবেশ করতে দেখেই ঘোড়া আহাৰ বন্ধ করল। পাখী স্বমধুর স্বরে সঙ্গীত শুরু করল। এবং ভাইদের চক্রান্তের কথা বলল। রাজাও—রাজকত্তাকে ওর কাছে ফিরিয়ে নিলেন। এবং ওদের দুজনকে খুব করে শাস্তি দিলেন। এবং রাজ্যের মুক্তার পর সেই-ই রাজ্যের রাজ্যপদে অভিষিক্ত হল।

অনেক দিন পরে মালী কনিষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ নতুন রাজা বেখানে খেকশিয়ালের সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল—সেই বনের ধারে বেড়াতে গেল। পুরোন খেকশিয়ালের সাথে ওর আবার সাক্ষাৎ হল।

সে আবার ওকে তার মাথা এবং পা কেটে ফেলতে বলল অবশেষে নতুন রাজা ওর কথা মত মাথা ও পা কেটে ফেলল, ও মুহূর্তের মধ্যে সে খেকশিয়াল থেকে মাথায় পরিবর্তিত হল এবং রাজকত্তার ভাষণে পরিণত হল। যাকে রাজকত্তা অনেক আগে হারিয়েছিল।

## ইয়োরোপী টিপ

বাহুকর এ, সি, সরকার

কুহ্ম-টিপ, কাজলের টিপ, চন্দ্র টিপও ভালো, সিন্ধু টিপ কপালে গৃহিণী ঘর মোর করে আলো। টিপ সহি দিয়ে বহু কাজ চলে, টিপ-টিপ পড়ে বৃষ্টি, বাসর-ঘরেতে নতুন বধূর টিপ-টিপ করে চুষ্টি। টিপ-টিপ করে সন্ধ্যার তারা বজ্রনীর অবসানে, টিপ-টিপ সাজে সোজে বড়বাবু হাওয়া খান ময়লানে। নশ্টির টিপ নাকে পড়ে দাদা, বৃষ্টির জট খোলে, যেসের ঘোড়ার টিপ দিয়ে গিয়ে কারও বা পকেট ফোলে। কিন্তু যে দাদা, ইয়োরোপী টিপ স্পী বাধা তার সাথে, সাবধান হয়ে না চলে। যদি বা ফল পাবে হাতে হাতে। উঠিতে বসিতে ঘরে ও বাইরে সবখানে টিপ ভাই, পার্কেতে গিয়ে বসবে একটু সেখানেও ছাড়া নাই। যেক্ষণ পরে সবসাময় হাত বাড়াইবে মালী, উপড় হস্ত না করে। যদি বা খেতে হবে গালাগালি। সিনেমায় যাবে? বেশ ভালো কথা টিকিট নাও না কিনে, গেট-কিপারকে টিপ দাও আগে তবে দেবে সিট চিনে। ইক্সারভাল 'টয়লেটে' যাবে সেখানেও টিপ চাই, স্মাট-টাই-পুরা যেক্ষণ রয়েছে কেমনে এড়াতে ভাই? ট্যান্সিতে চেপে বেড়াবে সহরে, মিটারে উঠবে ভাড়া, 'সোফার সাহেব,' সেও টিপ চায় মিটারে পাওনা ছাড়া। হোটেলতে বাও সেখানেও টিপ টিপে ভরা এই দেশটা, টিপ এড়ানোর টিপ কিছু দাও, দেখি করে শেষ চেষ্টা। \*

\* গত বছর ইয়োরোপী সফরকালে স্বনামধন্য বাহুকর এ. সি. সরকার স্বরচিত এই কবিতাটি আমার কাছে পাঠান। প্রকাশে জন্ত কবিতাটিকে ফাইলে রেখে দেবার কয়েক দিন পরে খুলে নে সাদা কাগজ পড়ে আছে—লেখার চিহ্ন মাত্র নাই। কেলে না নি কাগজটিকে ফাইলের মধ্যেই রেখে দিই। অজ্ঞ কিছু দিন গু ফাইল খুলে দেখলাম সাদা কাগজের বুক লেখা কুটে উঠেছে পাছে এ লেখা আবার ম্যাজিকের মত উড়ে যায়, সেই ভয়ে সঙ্গে স তা প্রেসে পাঠিয়ে দিলাম। কবিতাটিতে বাহুকর এ, সি, সরকার স্বর্গ, রসজ্ঞান ও কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে।—সম্পাদক

“আগত যুগ, ভারতের তার স্বপ্নে লইয়া বজ্রজননী  
উঠিতেছেন।”

ঐ অমরবিন্দ

কামিস  
মূলকারণ দূর  
করুন



সিরোলিন  
খান



নিরাপদ  
পারিবারিক  
ঔষধ

সিরোলিন কেবল যে কাশি  
'খামিয়ে দেয়' তা নয়—  
কাশির মূলকারণ হুটে-  
জীবানুগুলিকেও ধ্বংস করে।

# খেলা খেলা

ক'লকাতা মাঠে ফুটবল খেলা বেশ জমে উঠছে এক রকম।

তবে এবারের খেলায় তেমন বিশেষ কোন উন্নতি ফুটবল-মানের দেখা যায়নি। মহামেডান স্পোর্টিং, রাজস্থান এবং ইষ্টবেঙ্গল দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছে। গত বারের লীগ চ্যাম্পিয়ান রাজস্থান লীগ পাত্রার দোঁড়ে বেশ পিছিয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে প্রায় অনেক দলই প্রথমবারের খেলা শেষ করে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা খেলতে শুরু করে দিয়েছে। এবারের চ্যাম্পিয়ান-সিপের পাঞ্জাব ত্রিদলীয় প্রতিযোগিতা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তবে লীগের ফিঃতি খেলায় মোহনবাগান দল ত'দের শক্তির পরিচয় দিতে চেষ্টা করছে। মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং দলের কিরতি মাঠের খেলাটি ১—১ গোলে সম্মানসিদ্ধ হয়েছে। এ খেলায় মোহনবাগান দলের জয়লাভ করা সম্ভাবনাই অধিক ছিল।

মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের চ্যারিটি খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দল ১০ মিনিটের সময় একটি মাত্র গোল করে এবং এ গোলেই খেলাটির মীমাংসা হয়। প্রথম দশ মিনিট ইষ্টবেঙ্গল দল আধিপত্য বিস্তার করে থাকলেও মোহনবাগান দল আস্তে আস্তে খেলায় আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফরয়ার্দের ব্যর্থতার জন্ত গোল করা সম্ভব হয়নি।

রাজস্থান ও মহামেডান দলের খেলাটিতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাষ পাওয়া যায়। রাজস্থান দল খেলা আরম্ভ হওয়ার দুই মিনিটের মধ্যে একটি গোল দেয়। আবার পরবর্তী পাঁচ মিনিটের মধ্যে মহামেডান দল গোলটি পরিশোধ করে। এর পর দু'দলই আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চালালেও কোন দলই গোল করতে সমর্থ হয়নি।

লীগের নিচের সিকের দলগুলির মধ্যে হাওড়া ইউনিয়ন, বালী প্রতিভা প্রমুখ দলগুলি তাদের শক্তি অমুহুরী আশাশ্রুতপ খেলছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

## ষ্টেডিয়াম প্রসঙ্গে

ফুটবল মরশুমের কলকাতা দর্শককুলের হ্রস্বস্থায় চরম অবস্থা দেখলেই ষ্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা অস্বত্ব্য করে। এ বিষয়ে নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি বছরেই বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাংবাদিকরা আলোচনা করেছেন। সাময়িক ভাবে ষ্টেডিয়ামের কথা উঠেই আবার সেটা চাপা পড়ে যায়।

সম্ভাব্যের পরলোকগত মহারাজা সর্বপ্রথম কলকাতায় ষ্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। ইদানীং কালের বারিডা ও শিক্ষামন্ত্রী কুশতিভূষণ মজুমদার মহাশয়ের ষ্টেডিয়াম নির্মাণকল্পে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু আজও তা পরিকল্পনার মধ্যেই রয়ে গেছে।

ষ্টেডিয়াম নির্মাণের স্থান নির্বাচন একটি সমস্যা। কোন সময়ে ইডেন উত্থান ব্যাণ্ড ট্যাণ্ড, এলেনবোরো কোর্স, ইডেন উত্থানের

কখনও কালিকাটা ফাটমস পুলিশ ক্লাবের মাঠ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত পরিকল্পনা—পরিকল্পনাতেই রয়ে গেছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইডেন উত্থানের ক্রিকেট মা সমস্ত জাশানা ক্রিকেট ক্লাবের সম্পত্তি পুলিশী ব্যবস্থার দখল করা পর ষ্টেডিয়াম নির্মাণের কিঞ্চিৎ আশা দেখা দিলেও কতখানি কার্যকরী হবে, তা সঠিক ভাবে কিছু বলা বাছা না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কলকাতা ষ্টেডিয়াম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। ইডেন উত্থানে ষ্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে, পশ্চিমা বাঙালার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ডিমাণ্ড এ্যাক্সন কমিটি কনভেনর শ্রীয়েন দেয় কাছে যে চিঠি দেন, তাতে অনেক আশা আলো দেখা দিয়েছে।

এখন প্রশ্ন। আমাদের ডাঃ রায় সত্যই কি এ বিষয়ে আগ্রহী বিধান সভায় ইতিপূর্বে ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করেন ডাঃ রায় প্রতিবারই বলেছেন যে, সরকার ষ্টেডিয়াম নির্মাণের ব্যাঘাত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হ'ল না কেন? স্বতন্ত্র মনে হয়, এ বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। কলকাতায় স্পোর্টস বিল পাশ হয়েছে কিন্তু তার কাজ একটুও অগ্রসর হয়নি।

হঠাৎ ইডেন উত্থান এ ভাবে দখল খানিকটা বিষয়ের স্মৃতি করেছে।

ইডেন উত্থান ঐতিহাসিক ক্রিকেট মাঠে কমোজিট ষ্টেডিয়াম করা হলে কিন্তু আপত্তি আছে। কমোজিট ষ্টেডিয়াম গঠিত হলে কি ফুটবল, কি ক্রিকেট কোনটির উপরই সুবিচার হবে না ফুটবল মরশুমের পর কত মাঠকে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করবে যে সময়ের প্রয়োজন তা মোটেই হাতে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে বালুবিহীন ইডেন উত্থানকে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করতে প্রচুর সময় লাগবে।

ক্রিকেট মাঠে ফুটবল খেলা যায় কিন্তু ফুটবল মাঠে ক্রিকেট খেলা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

একশ' বছরের ঐতিহাসিক ক্রিকেট মাঠ বিখ্যের মধ্যে দ্বিতীয় আধুনিক ক্রিকেট মাঠকে ফুটবল মাঠে পরিণত করাও সম্ভব হয় না। ষ্টেডিয়াম না থাকলেও ক্রিকেট মাঠ হিসেবে ইডেন উত্থানের যথেষ্ট সুযোগ আছে। দেশ-বিদেশের দলী ও কুই খেলোয়াড়রা এই মাঠে খেলে গেছেন। তারা মাঠের অসুস্থ প্রশংসা করেছেন। বিখ্যের ক্রিকেট দরবারে ইডেন উত্থানের যে আভিজাত্য তাকে স্মরণ করার কোন রকম বৌদ্ধিকতা নেই।

কলকাতায় মাঠের অভাব নেই। ইডেন উত্থানকে বাদ দিলে



গই না কি ?

—কল্লু বালক

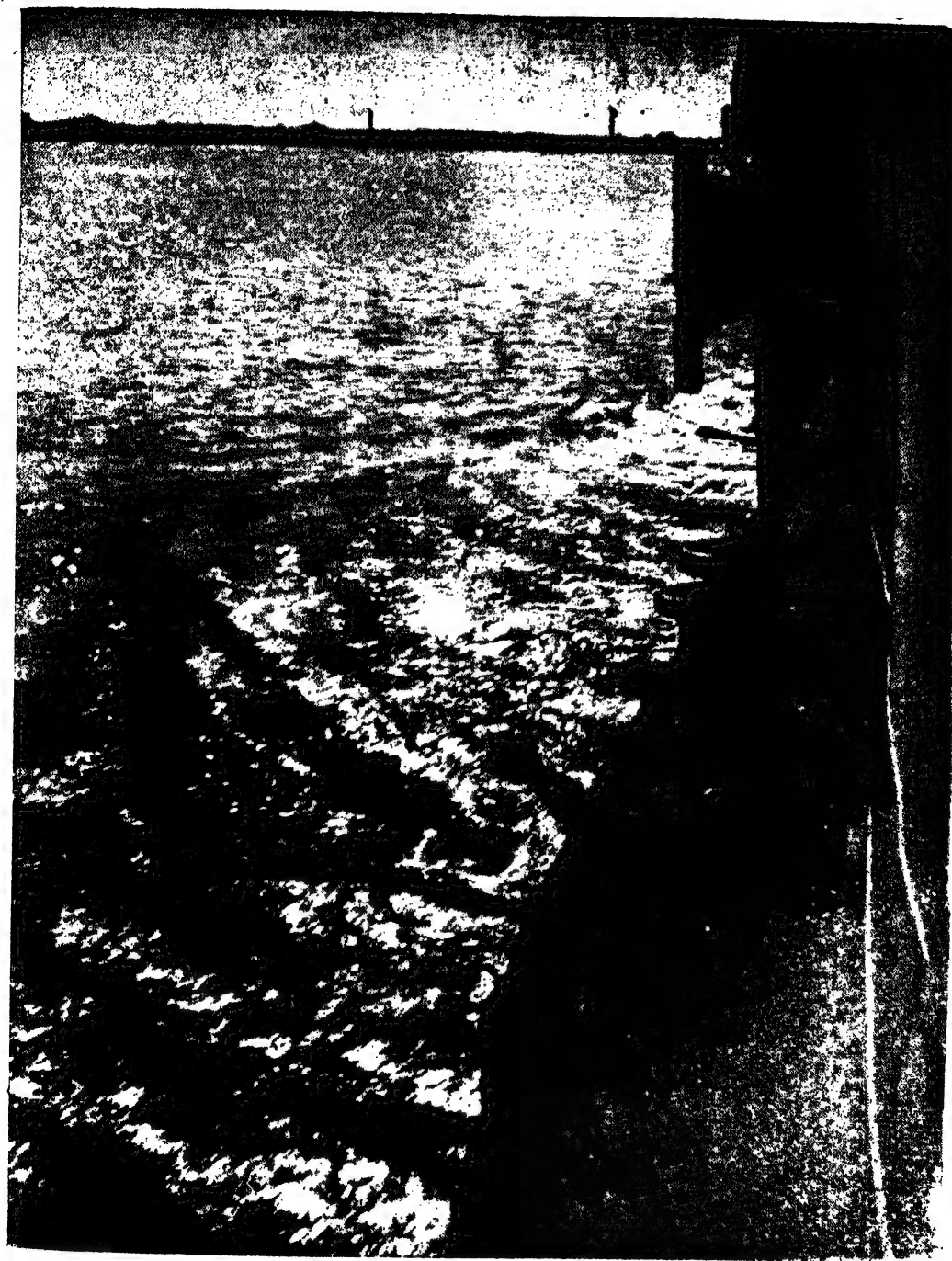
আনোবতি

বিজয়ে শিকার।



—কামাকিদ্দার চৌপাখার





জলযান

—অক্টোবর ভৌমিক



চিপোর হাঁ

—কবী মিত্র

ব্রজ কলকাতা মাঠে পূর্বক ষ্টেডিয়াম চাই। এবং সে ষ্টেডিয়াম বেশ বড় আকারের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

### ক্রিকেট

বার্মিংহামের 'এজ-বাষ্টন' মাঠে ইংলও ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট খেলা সমাপিত ভাবে শেষ হয়েছে। যেনো রামধীনের মারাত্মক বোলিং এবং শিখ, ওরেল, ওয়ালকট ও সেবাসের প্রশংসনীয় ব্যাটিং ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের জয়লাভের পথকে সুগম করে দিলেও পিটার মে, কলিন কাউন্টের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং এবং লক এবং লেকারের বোলিং শেষ পর্যন্ত খেলাটি সমাপিত ভাবে শেষ হয়।

ইংলও ১ম ইনিংস—১৮৬ (রিচার্ডসন ৪৭, মে ৩০, ট.ম্যান নট আউট ২১, ইনসোল ২০, রামধীন ৪১, রাণে ৭ উই গিলক্রিট ৭৪ রাণে ২ উইঃ)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—১ম ইনিংস—৪৭৪ (শিখ ১৬১, ওয়ালকট ১০, ওরেল ৮১, ক্রি. সেবাস ৫০, আর কানহাই ৪২, ভার্ডাড ২৪, লেকার ১১১ রাণে ৪ উইঃ; ট্যাখাম ১১৪ রাণে ৩ উইঃ; ট.ম্যান ৯১ রাণে ২ উইঃ)।

ইংলও—২য় ইনিংস—৫৮০ (উইঃ ডিঃ) মে নট আউট ২০৫, কাউন্ট ১৫৪, রোজ ৪২, রিচার্ডসন ৩৪, ইভাল ২১, রামধীন ১৭১ রাণে উইঃ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—২য় ইনিংস—১২ (৭ উইঃ) (ইভাল উইকম ৩০; লক ৩১ রাণে ৩ উইঃ; ট.ম্যান ৭ রাণে ২ উইঃ; লেকার ১৩ রাণে ২ উইঃ)।

### [সমাপিত]

লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার ইংলও এক ইনিংস ও ৩৩ রাণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে পরাজিত করেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের এ পরাজয় কিডস্‌ম্যানদের বার্ষিকতা ও তারই সংগে ব্যাটসম্যানদের বার্ষিকতা বিশেষ করে চোখে পড়ে।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ২১৭ রাণে পিছিয়ে থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ব্যাটিং শুরু করে এবং দিনের শেষে ৪৫ রাণে সংগ্রহ করল। এডামস ও সোয়াগ'ছাড়া কেউই প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা দেখাতে পারলেন না। ২৩১ রাণে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়ায় এক ইনিংস ও ৩৬ রাণে পরাজিত হল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—১ম ইনিংস—১২৭ (আর কানহাই ৩৪, শিখ ২৫, বেলী ৪৪ রাণে ৭ উইঃ; ট.ম্যান ৩০ রাণে ২ উইঃ)।

ইংলও—১ম ইনিংস—৪২৪৪ (কাউন্ট ১৫২, ইভাল, ০'৮২, রিচার্ডসন ৭৬, ট.ম্যান নট আউট ৩৬, রোজ ৩২, গিলক্রিট ১১৫ রাণে ৪ উইঃ; ওরেল ১১৪ রাণে ২ উইঃ; সেবাস ২৮ রাণে ২ উইঃ)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—২য় ইনিংস—২৩১ (উইজ ১০, সেবাস ৬৬, স্টাইন আসগার আলী ২৭, ওয়ালকট ২১, বেলী ৫৪ রাণে ৪ উইঃ; ট্যাখাম ৭১ রাণে ৩ উইঃ; ট.ম্যান ৭৩ রাণে ২ উইঃ)

[ইংলও ১ ইনিংস ৩৬ রাণে বিজয়ী]

### টুকরো খবর

বেকারী পি, চক্রবর্তী বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় একটি শা পিচালনা করার আয়তন পেয়েছেন। এ সংবাদ চক্রবর্তীর নিজের পক্ষে ও কলিকাতা বেকারীজ এসোসিয়েশন তথা ভারতের পক্ষে গৌরবের কথা।

ভারত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত নিদিষ্ট, তথাপি ভারতের কাছ থেকে খেলা পিচালনার জন্য সাহায্য চাওয়া ভারতীয় বেকারীর বোধ্যতার পরিচায়ক। বহিরাগত দ্বত দলই কলকাতায় লক করে গেছেন, তাঁরা খেলার পিচালনার ক্ষুদ্রী প্রশংসা করেছেন। শ্রী চক্রবর্তীর এ সম্মানে প্রতিটি ভারতবাদী গৌরবান্বিত।

ভারতের টেনিস পটায়নী মিস বিতা জেতার একজন ভার্মা পিরানো-বাদকের সঙ্গে গত ১৮ই এপ্রিল বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেও বিতা টেনিস খেলার সম্পর্ক ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত করেছেন। ব্যাডেন জায়েব সত্যা হিসাবে তিনি বিভিন্ন টেনিস খেলায় অংশ গ্রহণ করবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, বিতার স্বামী রলফ জাল হুলাইর একজন পিরানো-বাদক হলেও তাঁরও টেনিসে সুদৃঢ় হাত আছে। দাম্পত্য জীবন সুখের হোক, এই কামনাই করি।

ইংলণ্ডের ক্রীড়ামান ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেনিস কমটন প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ইংলণ্ডের ক্রীড়াক্ষেত্রে কমটন জনপ্রিয় খেলোয়াড়। একাধারে কুটবল ও অপর দিকে ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে এতখানি গৌরব অর্জন কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি!



**ROY COUSIN & CO.**

4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA.

OFFICIAL AGENTS FOR

**OMEGA & TISSOT WATCHES**

SOLE AGENTS FOR

**COVENTRY WATCHES**



## অধরের লিপস্টিক

**লিপস্টিকের সঠিক প্রয়োগ** আপনার সৌন্দর্য বহনীয় করে তুলবে, কিন্তু এর অপপ্রয়োগে তেমন সৌন্দর্যের হানি হতে পারে। যদি আপনার স্বামী কিংবা পুত্র-বন্ধু সাধারণ মানুষ হন, তাহলে তাঁদের কাছে লিপস্টিক ব্যবহারের নিষিদ্ধ। অন্যতে অন্যতে আপনার হস্ততা যেন হবে, তাঁরা লিপস্টিক আগে পছন্দ করেন না। কিন্তু তা সত্য নয়। সুলভ এবং পরিচায় থাকলে যে কোন মানুষই উচ্ছল লাল অধর পছন্দ করেন। অনেক সময়ে দেখা যায়, গ্রিক গোটের ওপর একটি লিপস্টিক অত্যন্ত অধরের সঙ্গে লাগানো আছে, আর কচি বা অল্প কিছু খেতে গিয়ে তাও অল্প হয়ে পড়ে। এমনকি করে লিপস্টিক ব্যবহারেই ঠিকের আশঙ্কি।

যদি লিপস্টিক সুলভ করে ব্যবহার করতে না পারেন এবং যদি এর রং স্বামী না হয়, তাহলে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু তা কতদূর কী করে? আমরা সেই বিষয়েই এখন আলোচনা করব।

## লিপস্টিকের সঠিক প্রয়োগের নিয়ম

অন্ত সমস্ত প্রসঙ্গের কাজ সেবে লিপস্টিক ব্যবহার করবেন। লিপস্টিক ব্যবহার করবার আগে খুব সাবধানে মুখের সমস্ত foundation make-up (এক প্রকার তরল প্রসাধন ব্রণ। পাউডার, ক্রিম, লিপস্টিক বা অল্প কোন প্রসাধন ব্রণ ব্যবহারের পূর্বে এ বস্তু ব্যবহার করতে হয়) ব্যবহার করুন। বিশেষ করে গোটের লাগাবার উপর জোর দিন, যাতে ওখানকার বন্ধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা না দেখায়। তারপর দেখতে হবে আপনার অধর খুব শুষ্ক কি না। এর ক্ষত আপনি কমনীয় পাউডার ব্যবহার করতে পারেন।

এবার লিপস্টিক ব্রাশ দিয়ে লিপস্টিকের ওপর ঘন এবং ওতে লিপস্টিক ভরিয়ে নিন। গোটের দেবার সময় প্রয়োজন মত বা ভরে নেবেন হ্রাস। সব সময় এগিয়ে গিয়ে বা সেবেন। সোজা লিপস্টিক থেকে এমন ভাবে নেবেন না যাতে ঠিকটা ভেঙ্গে যায়।

আপনার বাতাবিক অধর বেধা ঘরে উপরের গোটটি আগে রং করুন। প্রথমে একদিকের কাজ শেষ করুন এবং পরে অন্য দিক আরম্ভ করবেন, দেখবেন যাতে দুদিকেই সমান দেখায়। এবার নীচে আত্মন এবং গোটের সীমারেখা ব্রাশ দিয়ে অথবা একেবারে টিউব থেকে রং নিয়ে ভরিয়ে দিন। মুখের প্রান্ত ভাগ পর্যন্ত রং সেবেন। ফলে ববন হাসবেন, তখন সমগ্র অধর অত্যন্ত উচ্ছল দেখাবে। প্রথম প্রথম ধীরা লিপস্টিক ব্যবহার করেন এবং এমন কি ধীরা এ বিষয়ে পটু, তাঁরাও

যাবে যাবে পোলশাল করে কেনেন এবং অধরের সীমারেখাটি নষ্ট করে কেনেন। কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই একেবারে সেটে বাধ্য আপন যে যাকটা একটি নষ্ট হয়ে সেখান থেকে অপ্রয়োজনীয় লিপস্টিক টিউব কেনুন এবং এ গোটো পাউডার কিন। লিপস্টিক বেধার পর চমকিত হয়ে যেনে বাত্মন, যাতে গোটো বেশ বেশ যায়। তার পর গোটো কাগজ দিয়ে জায়গাটি বেশ করে মুছে ফেলুন।

## যথার্থ অধররেখা

লিপস্টিক বেধার পর নিজেকে খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করুন। নিজে নিজে কথা বলুন, হাসুন, নিজের গোট গোটো লিখে একটো তৈরী করুন। যদি আপনার মনে হয় কাজ এবং বিজ্ঞান—সব সময়ে আপনাকে সুলভ দেখাবে এবং সেখান অত্যন্ত আলোর সাথে আপন অধরের একটি সামান্য আঁচে, তাহলে জানবেন, যে অধরটি আপনি তৈরী করেছেন তা যথার্থ। কিন্তু গোট গোটো যদি খুব বা বড় দেখায়, কিংবা একটি স্থল পড়ে, তাহলে এর কতদূর প্রতিবেদক আছে।

যদি আপনার গোট আপনায় মুখের তুলনার খুব ছোট এবং সচ হয়, তাহলে আপনার বাতাবিক অধরবেধার সমান্তরালে সমগ্র অধর চিত্রটি বর্ধিত করুন। যদি তা খুব বড় হয়, তাহলে foundation make up আর পাউডার দিয়ে বাতাবিক অধরবেধা টাটকন। এটি আগের মতই বাতাবিক বেধার সামান্তরালে থাকবে, কিন্তু কোঁ তিতরের দিকে। যদি নিজের গোট একটি স্থল পড়ে, তাহলে অধর চিত্র নিচেই গোটের মাঝখান থেকে আরম্ভ করুন এবং স্থল পড়া লাইনগুলোর মাঝ দিয়ে একটি নতুন সোজা লাইন হুঁসিকের মত পথান্ত নিয়ে যান।

আপনার লিপস্টিক ব্রাশ আর লিপস্টিক একজন প্রসাধনশিল্পী মত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করুন। আর ক্রমাপ্ত অত্যন্তে আশা সত্যিকার শিল্পীর মতই এর ব্যবহার করতে পারবেন।

—ঐশ্বর্যোপ বোদী (লাক্‌সে)

## চলচ্চিত্রশিল্প ও বুটেন

বিশেষ ধরণের সাহায্য ব্যবস্থা ছাড়া বুটেনের কিছু ইগাটী বুটিন চলচ্চিত্রশিল্পের পক্ষে পাড়িয়ে থাকা বাতাবিক অধরবেধা কী হতো। কতকগুলো ব্যবস্থা সম্পর্কে সেখানে বেশী রকম কথাই হয়ে থাকে—এর বুখা লক্ষ্য বলতে কিছুটা মধ্যাণ আর বাই বিদেশী বুখা লক্ষ্য।

বুটানী-বাশিঅ থেকে বুটেনের এই শিল্পীতে যে আর

পারে, তার মোট পরিমাণ হবে প্রায় ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু তার চেয়েও বেশী আর হস্ত সম্ভব—আমলাদিত কিং বাফ তলার ব্যয় ধাতিবে।

বুটন কিংবিজ্ঞকে সাহায্যের একটি সংচেষ্টে বলিষ্ঠ পদ্য হচ্ছে 'কোটা' বা বহাদ্র বাবু। সেখানকার সিনেমা-ভবনগুলোতে কী বিজ্ঞানো কি পরিমাণ দেখাতে হবে—যেবে যেওনা আছে সেটাই। মালোটা বাবুজির লক্ষ্য কিন্তু অধিক সম্ভার বুটন কিং তৈরীর জন্য উৎসাহ দেওয়া নয়, পরন্তু আপন থেকে তৈরী তথ্যগুলো যাতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রদর্শিত হ'তে পারে—তারই নিশ্চয়তা বিধান। এর নিশ্চয়ের কাজ আরও থেকে ছবির সুকল্লাত পর্যায় সমস্ত গণ্যগণ্য প্রায় ১৮ বাল। এই ভিত্তিতে প্রতি বছরই নিম্নোক্তমানের নিশ্চিত ছাড়াছবিগুলোর ব্যয় নিশ্চয়ন করে দেওয়া সম্ভবপর।

বুটনে ছাড়াছবি সম্ভার প্রেরণন সম্পর্কে যাতে নিশ্চয়তা থাকে, এই উদ্দেশ্যে এক সিক 'কোটা' বা বহাদ্র বাবু চাণু বেমন আছে, অপর সিক 'নেপজাল কিং কিং' কর্পোরেশন কিংজালার নিয়মে সাহায্য করে চলছেন। প্রতিটি সিনেই সে সাহায্য পাবে, এমন নিশ্চি কোন কথা নেই। সাধারণত সে সকল ক্ষেত্রেই অর্ধ সাহায্য করা হয়, যেখানে প্রয়োজক হ'লে বড়ট ডিট্রিবিউটার লোকের কাছ থেকে আপন ভাণ্ডারে ছবি ডিট্রিবিউশনের প্যারাবিটি আনতে পারেন। প্যারাবিটি দেওয়া হলেও তাই এই মধ্যে—ছবি নিয়োগ বাণ্ডের লক্ষ্যকা ৭০ ভাগ ডিট্রিবিউশন কোম্পানী বসন করতে প্রস্তুত থাকবেন, যে কোন সংস্থার। বাণ্ডার থেকে শেষ অবধি হাজার হটি সেই পরিমাণ না ৫১ হলে, তবে এই প্যারাবিটি মধ্যম বন্ধা করতে হবে। বাণ্ডের মনশিষ্টাণ্ডের লক্ষ্যকা ৩০ ভাগের কম প্রয়োজক বা ছবিনিয়োগ কোম্পানীই হারী থাকেন। অথবা একটা মোটা আপ সিনে লাক্স কর্পোরেশনকেই বসন করতে হয়।

এবার নেপজাল কিং কর্পোরেশন অত্রি তেমন ক'জন প্রযোজকেই অর্ধ সাহায্য করতে পারতেন, বাইরের পুত্র থেকে অর্ধ সাহায্য বাণ্ডের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। কিন্তু একশে তুন আইন ব্যবস্থা হচ্ছে—যাতে করে এই ধরনের কড়াকড়ি বিলুপ্ত হ'বে।

তিগার অল্পস্বান করে দেখা গেছে—১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এর বছর কাল মধ্যে কিং কিংজাল কর্পোরেশন ১৫২টি টিপ কিং বা ছাড়াছবির নিয়োগে অর্ধ সাহায্য করেছে। এই ১৫২টি কিংয়ের মধ্যে ৩৭টি ক্ষেত্রেই সুনাফা অর্জিত গেছে। উক্ত ছবিগুলো অত্রি একই সময়ে বুটন কিং প্রডাকশন কাও থেকেও সাহায্য পায়। কিং কর্পোরেশন যে গণ্য যোগান, বুটন বাণিজ্য-বার্ডের সম্ভারত কৃত অত্রি অর্ধই ইটের সুর। মোটের উপর বুটনে চলচ্চিত্র-শিল্পকে ধাতিবে বাধবার প্রে, একে আরও বড় করবার লক্ষ্য থেকে সরকারী পন্থায় বহুবিধ ঠাঁ অবলম্বিত ও পদ্য অল্পস্বত হয়ে আসছে সেই থেকেই।

### এ দেশের তাঁতশিল্প

তাঁতশিল্প শুণু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের অজ্ঞতম প্রাধান তাঁতশিল্প। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তাঁতশিল্পের

অবদান অসীকার্য করবার উপায় নেই। ইতিগাসেই দেখা যায়—অতীত ভারত কই পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত, তাঁত-শিল্পজাত পণ্যের ব্যবসার থেকে। ইংরেজ শাসনে শিষ্ট হয়ে এই শিল্প পিছিয়ে পড়েছিল বহুদূর—কিন্তু একশে দেশ অর্থনৈতিক নাপপাণ থেকে মুক্ত হওয়ার এর পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলছে এবং এইটি নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত ছিল।

একটা জিনিস প্রথমেই লক্ষ্য করবার—আজিকার ভারতেও অজ্ঞত যে কোন শিল্পের চেয়ে তাঁতশিল্পে নিযুক্ত শিল্পী ও কারিগরের সংখ্যা বেশী। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য-সচিব জিনিয়ানস কাম্বিনেশ্যন য়তে এই শিল্পের মাফকতে দেশের ৩০ লক্ষাধিক ব্যক্তির কর্মস্বান হচ্ছে। অপর একটি হিসাবে জানা যায়—সমগ্র ভারতে ২৯ লক্ষ তাঁতে নিযুক্ত শিল্পী ও কারিগরের সংখ্যা হবে প্রায় ৮৭ লক্ষ। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই তাঁতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজারের কম হবে না এবং কর্মীর সংখ্যাও হবে প্রায় ৪ লক্ষ। বাংলায় যে সকল তাঁত চাণু—সম্পূর্ণা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। উচ্চশিত ১ লক্ষ ৩০ হাজার তাঁতের মধ্যে ১ লক্ষ ১৫ হাজারই হচ্ছে ঐকৃতিক তাঁত, অর্থাৎগুলো অর্ধব্যক্তিগ ও হস্তচালিত তাঁত।

সরকার থেকে লারী করা হচ্ছে—তাঁতশিল্প দেশের বহু চাচিলার লক্ষ্যকা প্রায় ২৫ ভাগ মিটবে থেকে। বহুকালের সন্ত প্রতিযোগিতা সংগে এই ব্যবস্থার দ্বায়ে বহু উৎসাহ হয় ১৯৫৫ সালে ১৪৭ কোটি ৩০ লক্ষ পণ্ড এবং ১৯৫৬ সালে ১৫৪ কোটি ১০ লক্ষ পণ্ড। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৬ সালে তাঁত বহু উৎসাহনের পরিমাণ ১৫ কোটি পণ্ডের উপর এবং তার মূল্য প্রায় ১২ কোটি টাকা।

বিশেষী মুদ্রাও ভারত অর্জন করে চলছে এই শিল্প মাফক ফরমই বেশী পরিমাণে। ১৯৫৬ সালে ভারত থেকে রপ্তানীকৃত তাঁত বস্ত্রের পরিমাণ—৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৮৬ হাজার পণ্ড। এতে ভারত ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার সমমুদ্রার মুদ্রা অর্জন করেছে। ১৯৫৬ সালে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল—৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। মাকিং সুকল্লাত, বুটন, শিহল, মাদার, লুশান প্রভৃতি দেশে ভারতীয় তাঁতবস্ত্র বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তন্মধ্যে শিহলেই তাঁতবস্ত্র রপ্তানি হয় তুলনামূলক হারে সবচেয়ে বেশী। জাপানী, অষ্ট্রেলিয়া, যুগোস্লাভেনিকিয়া, পূর্ব-আফ্রিকা, যাক প্রভৃতি রাষ্ট্রও ভারতীয় তাঁতজাত পণ্যের দ্বারী বাণ্ডার পাওজার চেষ্টা চলছে।

বর্তমান বহুদূর এই কুটীরশিল্পি এখনও অস্বাভ সমস্বাস্থ্য হরনি। এর সমস্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে—পন্থাপ্ত সুরে! সংবহা এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত বহুগাতি। এদিকে জাতীয় সরকারের মনোযোগী ধৃষ্ট পড়ে নি, লে কথ বলা চল না। পরন্তু দ্বিতীয় পক্ষাধিক পরিবর্তনায় এই তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারী সাহায্য বরাদ্দ হয়েছে ৫১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই শিল্পের উন্নয়নের দাবীতে পুনর্গঠিত পশ্চিমবঙ্গের লজ্ঞও পরিবর্তন কমিশন প্রায় ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। উক্ত অর্থের সম্ভাবহার বদী হয়, তবে এদেশে তাঁতশিল্পের দ্রুত অগ্রগতি না হয়ে পাবে না।



নীলকণ্ঠ  
তেইশ

B. N. G. S.—এই ইংরাজি আড্ডাকে হুজিৎ বে সাঙ্কেতিক বাংলা বাক্য, তার পাঠ উদ্ধার করা শক্ত নয় অনেকের পক্ষেই। বিলাত না গিয়ে সাহেব। বিলাত ফেরত বাঙালীদের অনেকেরই মোসাহেবীর প্রবৃত্তি কেটে যায়। কেটে গিয়ে উদ্বোধন হয় স্বাধীন মনোবৃত্তির। বিলাত দেশটা যে মাটির, সোনা-রূপার নয়, এ বিশ্বাস দৃঢ় হতে ডি, এল, রায়ের হাসির গানই যথেষ্ট নয়; তার জন্ত বিলাতের মাটিতে একবার পা দিতেই হয়। বিলাত না গিয়ে সাহেব বারা, তারা বিলাতের মাটিতে পৌছতে না পারার কারণেই কিন্তু ভয়কর। এদের সব্বক্ষেই গল্প আছে। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত গাল-গপপো। উনবিংশ শতাব্দীতে বিলাত গিয়ে এং বিলাত না গিয়ে সাহেব, দু'দলই ছিল উগ্র মোসাহেব। ইংরাজি ধ্যান, ইংরাজি জ্ঞান এমন কি ইংরাজিতে অজ্ঞান হতে পারলেও তারা নিজেদের কৃতার্থ মনে করত। মদ না খেলে এং গোমাস ভক্ষণ না করলে তাদের ধারণা নয় শুণ; বহুমূল বিশ্বাস ছিল যে ভালো ইংরাজি বলা অসম্ভব। এইরকম দুজন ইংরাজ হতে বহুশরিকর বাঙালী ভোটেলে গেছে গরুর মাংস খেয়ে সাহেব হ'তে। অনেক রাতে 'হোটেল' বাতরার গোমাস মেসেনি। বাস নয় কেবলমাত্র, নাড়িভূঁড়ি, হাড়, লেজ, শিং, কিসমত না মিলতে শেষ পর্যন্ত তারা খানিকটা গোবরের অর্ডার দিয়েছে। গোবরে শুণ পুষের নয়, গরুর এক সেই কারণে ইংরাজির গন্ধ আছে যে।

এই বিলাত না গিয়ে সাহেবদের বললে তাদের বংশধরেরা আজ টলিউডের ভেতরে না ঢুকে ফিল্ম ঈশ্ব হযেছে। তা'রাই ভরাব।

তা'রাই বিবাহ করেছে কলকাতার হাওরা। এদের দেখতে পাবেন উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম কলকাতার তিন, চার পাঁচ হাজার মোড়ে সাইকেলী, কফিহাউসে সিগারেটের আঙনে আলো করে বসে দশ দিক। যুখে মিথিবরী হাসি: ছবিলা আজ যেতে বললে তাঁর কাছে; জানিস। বিমল রায়ের ছবিতে লোক খুঁজছিল, এ লম্বাকে দেখবার পর লোক বোঁজার হালামা থেকে রেহাই পেয়ে গেছে। দেবকী বোস বললেন বোঁঝাই না যেতে, কি করব তাই ভাবতি। যে বলল সে উঠে যেতে না যেতে তার জারগা মিল যে সে মজ্জা করল: গুল! সেরে গুল! আমি বলছি, ছবিলা গুলে পেখেই মি, দেখলে আমাকে অস্ত্রত একবার জিজ্ঞেস করত। এদের মধ্যে কেউ কেউ এক আধবার ছবিতে জীড়ের দৃষ্টে কীত বার করে যেসেছে। কেউ কখনও বলছে এক-আখটা। আখা, তিনপোতা যাত্রীদের মত এখা আখা, তিনপোতা একটর। এখাই হচ্ছে সাইকেলীতে এই ফিল্ম পাগলদের হিবে।

মদের বললে রাতে মদের মতই মজা সেই অংমোল, ঠাটের বললে আজ সেই বহুরই নাম বাট চক তার আসল পরিচয়, সিনেমা। এরা সিনেমা ছাড়া দেখে না; সিনেমার কাগজ ছাড়া পড়ে না; টিভির আনন্ড কানাচ ছাড়া খোরে না। এদের ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন, রূপালী পদ। যদি আটি বেচে, কাবুলীর কাছে ধার করে। তিনটে ছটা নটাশ রূপালী পদ। এদের স্বেমনি করে টানে মদ যেমন করে মাতালকে, আফি যেমন করে আফিখোরে। অভিনয় ক্ষমতার প্রয়োজন নেই, বিদ্যাবুদ্ধি অনাবশ্যক, শুণ একটা চান্স, একটা চান্সের অপেক্ষা শুণ। এদের মধ্যে সবাই যে অভিনয়-পাগল কেবল, তা নয়। কেউ কেউ অবার টেকনিশিয়ান হয়ে চায়। সিনেমার টেকনিশিয়ান। ক্যামেরাম্যান, সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার, ফিল্ম এডিটর, নাহলে নিজেদেরপক্ষে পবিচালকের সতকাণী। এদের সংখ্যা অল্প কম। বেশির ভাগেরই স্বপ্ন; দুর্গালাস, আশোককুমার, ছবি বিখ্যাস, পাচাড়ী সাক্তাল। এরা অল্প নীলীধ হারির মীল স্বপ্ন। মিথ্যাবাদ হচ্ছে অল্প সেই এক—উত্তমকুমার।

ফুলের ছেলেনিলে বার ম্যাটিনী শোতে ফুল পালিয়ে কিতৈ ফিল্ম প্রেক্ষাগৃহের সামনে, তারা টাকাতা পাচ্ছ কোথায়? তারা বই বিক্রী করে, ফুলের মাইনে না গিয়ে জোগাচ্ছ এট টাকা। হাংস উসকানি দিচ্ছে ফিল্মের কাগজ। মেয়েছেলের ছবি ছেপে, ফিস্টারের অলীক জীবনের আরব্যোপকাস রচনা করে অগুট হাতে ফিল্ম-পত্রিকাগুলি নিজেরদের ভবিষ্যৎ জুগুয়ায় অনেক আগেই নষ্ট করছে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎশীহেরা ভেবে ভেবে কুলকিনারা পাবে না উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা বিশ শতাব্দীর মধ্যপাশে আসতে না আসতেই কি করে এতদূর ক্রীব হয়ে গেল। আগামী কালের সেই প্রায়ের উত্তর হুজিৎ বইল এখানে।

কিন্তু তাঁর এসেছে কি একদিক থেকে? না। তাঁর আসছে চতুর্দিক থেকে। যেদিক লক্ষ্য করার কারণ পাভরা বায়নি এমন তাঁর আসছে সেদিক থেকেই। ফুল সেমিকাইডালের (ফুল কাইগাল এরা বসে বটে, কিন্তু গুঠে না আর, প্রতি বছরেই বসে একবার)। ছেলেরা জ্ঞানপাশী। তারা বাখে তারা কি করছে। তাই তাদের জন্ত হুং হলও, হুং করে লাভ নেই। কিন্তু নতুন হুঙ্গ এসেই রূপালী পদ্য বাক্য বাক্য ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ছবি করার হুণ।

এর চেয়ে অভাব, এর চেয়ে ভয়াবহ আর কিছু বটা অসম্ভব। এর চেয়ে বড় ঘটনা, দুর্ঘটনা অকল্পের। রূপালী পর্দার বাতাসের আশ্রয় অভিনয়কে টিকিট কেটে হাজারো হাততালিতে অভিনয়িত করেই দর্শকদের কর্তব্য শেষ। কিন্তু রূপালী পর্দার অন্তরালে এই সব বাতাসের জীবনে কি বিপ্লব ঘটে যায় এর ফলে আমরা কি কোনদিন তার খবর রাখি? রাখার প্রয়োজন মনে করি একবারও? না। কহি না, কারণ তারা আমাদের কেউ নয়। কিন্তু কহি না বলে যেন জ্বলে না বাই যে আমরা যে ঘরে বাস করছি তাও তাদের ঘর। বাতাসের গেটে সেখানে এসে পৌঁছতেও দেয়ী নেই বেশি।

এই সব বাতাসা, কেউ জ্বলে পড়ে, কাঁদে হাতেখড়ি হয়েছে হত কেবল মাত্র। এদের পর্দার ওপর অভিনয় কখনও কখনও এত দূর বিশ্বদর প্রতিক্রিয়া পরিচয়ে প্রায়শ্বে হতবাক হতে হয় আবলম্বকবনিতাকে। বালক অথবা বালিকা ভণী তাই বিশ্বদর করে যখন তখন আমরা বতাই চার মানি, বলি: একি গো বিষয়। কিন্তু বিষয় এর এক শিকে। অজ দিক যে কত দূর বেদনার, ভয়ের, অথবা দুঃখের আমরা যদি জানতাম তাহলে শুধু তাত্ত্বিক করেই কাঁদ নিষ্কাশ্য হতাম কি না প্রেক্ষাগৃহ থেকে বলা শক্ত। আলোকের সুগর রূপালী পর্দাতেও বালক-বালিকার সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। তাহলেও অভিজ্ঞ করেছে অভিনয় পারদমতায়। কিন্তু সে ঘটনা কালেভদ্রে, মৌল টাসে একবার, ইংরেজিতে বাক বলে once in a blue moon, ঘটত। তা নিয়ে মাথা ব্যথা করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আজ কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নিষিদ্ধ হ্রিতেও কুশীলবদের তালিকার অপ্রাপ্ত বয়স্কদের আবির্ভাব অপ্রচুর নয়। সেই হচ্ছে ভয়ের কথা; ভয়ঙ্কর কথা হচ্ছে সেই। হাতেখড়ি হবার আগেই যারা খড়ি মাথতে বাধা হয় যুগে তারা একদিন চূর্ণকালি মাথতেও যে পেছপাও হবে না, সে এমন আর বেশি কথা কি?

এই সব বাতাসের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ

সম্পর্কে একটি বিশদ ভাবে আলোচনা করে দেখা বাক অন্তঃপর। এদের মধ্যে যে সব যুগ-তাবতিকা আছে তাদেরই বর্তমান সবচেয়ে দৃষ্টিত এবং ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। এরা প্রে করে অভিনয়িত হবার পর যখন ক্লাসে এসে আর সব ছেলেদের ঈর্ষার পাত্র হয়, তখন ঈর্ষার কারণটা কিন্তু বাস্তবতা হইত হয়ে দাঁড়ায় না। বিজ্ঞা, বুদ্ধি, পরিপ্রসঙ্গে ঈর্ষা করা এক বস্তু আর সিনেমাটারকে ঈর্ষা করা সম্পূর্ণ অজ বিষয়। অজ সব উৎসাহোত্তরা তখনই পড়ার বই ফেলে ফিগের কাগজ মেলে ধরে। তখন থেকেই তাদের জীবনে আদর্শ হিসাবে মুদ্রিত হয়ে যায় বিভাগস্বরের নয়, পাছাডী সাভালের যুগ। কি হবে পড়াশুনো করে? সেই ত' পাল-বাবার মত কেহাণীসিধী করে সারা জীবন সাসয়ের বোঝা বয়ে যুগ ধুয়ে পড়ে মরা একদিন। তার চেয়ে পাট খুঁধ করা কত 'বোম্বার্ড'র, কত আশার, কত আরাধনার।

তাদেরই একজনকে বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়ে তারা চেয়ে চেয়ে দেখে। তার যুগে গল্প শোনে টলিউডে। কিছু সত্য, কিছু বানানো। কিছু অলীক, কিছু অলৌকিক। যুগ চলে যায় চোখ থেকে, দিবাশ্রম দেখে জেপে জেপে। বার্ষিক পরীক্ষার বদলে বন্ধুর ভোর 'পরী'-কল্পনার বিতোর বালক টিকিট না কেটে চড়ে বসে বোম্বাট অথবা হাভ্রাজ মেলে। বরা পড়ে মাঝপথে খবর কাগজের ফেডলাইন হয়; মাথা ঘুরে যায় আমাদের।

আর যে বাতাসটি বাস্তবতাটি কিম্বদাঁত হয়, তাহা? তার অবস্থা আরও দুঃসহ। নিয় মধ্যবিত্ত ঘর থেকে টুডির গাড়ীতে করে একদিন সে বেবোয়, কির আসে দিবিদর করে। দুহুর্ন্তে বিবাহ হয়ে যায় ঘরের ভালভাত। বাশমাকে মনে হয় শক্ত। পরিবেশকে জব্ব। সিনেমাকে সত্য মনে করে, জীবনকে সিনেমা। তারপর টাকা পায় যেদিন সেদিন থেকেই ঘরকে সরা মনে করে। তারই টাকার সংসার চলছে বোঝে যেদিন, সেদিন থেকেই সংসার অচল হয়। সবাই বোকার এখন এই টাকা, বত বড় হবে তত টাকাও বড় আছে। বাতাসা লম্বা হওয়া মাত্রই বাতিল হয় টলিউড থেকে। শুধু টলিউড নয়, সংসার থেকেই বাতিল হয়ে বাকী জীবন ঘরকে সরা বেবোর পরিবর্তে সরাইখানার সিঁড়িতে বসে দেখে না সেজে গড়াগড়ি যায় আজীবন। তাদের খবর খবরকাগজে ছাপা হয় না।

এছাড়াও তাঁর আসছে আরও একদিক থেকে। বাক কঁকে আসছে। এখন বাতের কথা বলছি, তারা বাত না, তারা বাতাব মা। মা-বোন-বউ-কি-এরাও সিনেমা বলতে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গানের ভাষায় বাক বলে গিয়ে ignorant অর্থাৎ অজ্ঞান। সবচেয়ে মারাত্মক, সবচেয়ে সর্বনাশে, সব চেয়ে সর্বনাশকর বিভ্রান্তি হল এই। হোসেন মন টিকছে না আর মেয়েদের। মায়েরেরও না। অতাবে যারা আসছে তাদের


ফোন : ৩৪-৪৯০২

Gv

বিবাহে যৌতুক  
দানের আনন্দ একান্তভাবে  
আপনার; আপনাকে  
সেবা করার আনন্দ  
আমাদের।

**গিণি ভবন** পূজনীয় কুশলী  
মাসিকার ও সঙ্গীতশিল্পী

১০২, বহু বাজার স্ট্রীট, কলি:- ১২



জাঙ্ক ১-২৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৩  
'ফ্রোজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল'



কথা নয়; স্বভাবে আসছে যারা তাদের সংখ্যাও কম কিসে? বিদ্যুতের বেগে পড়েছেন টলিউডে। স্বামী কর্ণহলে, স্ত্রী রত্নহলে, ছেলেমেয়েরা বিরাট স্টাট বাড়ীতে লিকট-ম্যানের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে মাহুত হচ্ছে। বিদ্যুতের কথা বাদ দিই; সব বেশে, সব কালেই স্নায়বিকের ম্যাডাম বোভারী আছে এবং থাকবে। ভয় তাদের নিয়ে নয়। ভয়, মধ্যবিত্ত ঘরের বউবাও মজছে। রাণা যজ্ঞহিলেন কুকের বাঁশী শুনে। এয়ুগের তরুণীরাও পাগল হয়েছে সিনেমার ডাক শুনে; পাবলিসিটির সিটি শুনে। ঘর রাণা ঘরে না আয়। ঘরে ঘরে অভাব আছে হাঁ-করে। যেখানে নেই সেখানেও হাঘোরে স্বভাব টানছে মধ্যবিত্ত ঘরের বউদের রপালী পর্দায় নারিক। সাজতে। পর্দা নীলীন ছিল মেয়েরা একদিন। এককম ছিলো তারা। আজ তারা রপালী পর্দা নীলীন হতে আরম্ভ করেছে। এখন আর এ যৌবন-জলতরঙ্গ দেখাবে কে?

এর পরেও দিক আছে তীর এসে বৈধার। এবার বাদের কথা বলছি তারা দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য। এরা, এই সব মেয়েরা টলিউডে জায়গা না পেয়ে এমের খিয়েটের দশটা টাকার ভক্ত গিয়ে হাজির হচ্ছে যে কোনও দলের দরজায়। ঠাঁয়ে; তার পর ঠাঁয়ে। ড্যালহউসী কোয়ার ছুড়ে স্কোয়ার পর, অথবা শনিবার অফিস ছুটির পর অফিসের ঘরে বসেই বিহার্সাল দিচ্ছে। এ বিহার্সাল খিয়েটারের নয়; অভিনয়ের নাম করে এ হচ্ছে বঙ্কতির মহড়া। খিয়েটারে বিহার্সাল দেওয়াটা বড় কথা নয়, কে কাকে নিয়ে বাড়ী পৌছে দেবে আনবে তাই নিয়েই নাটক। ড্যালহউসী কোয়ারের অফিস-পাড়ার মধ্যে স্কক হয়ে গেছে এই পোষ্ট অফিস সীলারঙ্গ। এখন সেখানে আটকে না থেকে পাড়ার পাড়ার ছড়িয়ে পড়েছে গর বিজ্ঞান। মহলা দেওয়া চলছেই সন্ধ্যা হতে না হতেই, কোথাও না কোথাও। দেখলে মনে হবে সাক্ষতির অস্থান আয়োজন করতে সারা দেশটাই বোম্ব হর রাতারাতি জেগে উঠছে। না! সাক্ষতি চর্চা নয়;

চুক্তির দুর্গোৎসব এগুলি। বিকৃতির দোলবাঁতা। সার্বজনীন Rogueদের ছোঁয়াতে রোগের জীবাণু ডিপো একেকটি।

আগে যে সব অভিনয় পাগলদের কথা লিখেছি তাদের জটাই কবির বক্তব্য: প্রেমের কান পাতা ভুবনে, কে কোথা ঘরা পড়ে কে জানে। এ প্রেম প্রেমিকের নয়, প্রতারকের। তারা এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাইনবোর্ড ঝোলায়। কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়: ছায়াছবিতে অভিনয়ের জন্য তৎক্ষণাত্ কলী চাই। বিজ্ঞাপনে রাখব- বোয়াল ঘরা পড়ে না। ঘরা পড়ে চুনা-পুঁটি। জয়েস টেট, ক্যামেরা টেট ইত্যাদির নাম করে দফার দফার দফারফা হয় চুনা-পুঁটিরা। তৎক্ষণা পাশ নাকের বগলে নরুণ। তৎক্ষণাদের যা বার তার বগলে কিছু পেরেই, কোন কতিপুংগেই, কোন কালে কোন মেয়েই কত আর বাবার নয়। শুধু বাবার হারা তারা রাতারাতি সাইনবোর্ড পালাটে চলে গেছে আবার নূতন ঠিকানায়। পড়ে থাকে তাই বাবা ঘরেও নেই, পারেও নেই। সেই, যে জন আছে মাঝখানে।

### চরিত্র

এ সব কথা যেতে দেওয়া হাক আপাতত। সমুদ্র মন্থনে শুধু গরল উদ্ধার করে লাভ নেই। বরং এই এক কথা, একঘেয়ে কথা শুনতে শুনতে অস্ত্র ও প্রহাচ, বিরক্তির উদ্ভেক হওয়া আশঙ্ক্যের নয়। তার বগলে এখন পরিবেশন করা হাক চানাদুর। এখন টাটকা আছে; এখনই করা হাক। চানাদুর অথবা ঘুঘনি দানা বাসি ভাল আর কেউ খাবে না। এখন এতকণ বাদেও কথা বলছি তারা নয় করনায় বোগক্রান্ত। যদিও টলিউড করনায় স্বর্ণাঙ্ক, তবু সেখানে করনাতীত বাস্তব কাণ্ডও ঘটে বই কি কিছু কিছু। সেই বকম একটি বাস্তব চরিত্রের অবতারণা করা হাক অন্তঃপর। তার নাম দেওয়া হাক, করনাতীত ভট্টাচার্য।

যার কথা বলছি সে সত্য সত্যই করনাতীত এক অভিজ্ঞত। টলিউডের করনাজ্ঞাও এখনও তাকে অতিক্রম করতে পারে

নি কেউ। যার কথা বলছি তার আসল নাম জানার জন্য কৌতূহলী হওয়ার এটুকুও কারণ নেই। নিরর্থক। কারণ, উত্তমকুমার ছবি চালায়; উত্তমকুমারকে চালায় উত্তমকুমার-অবশ্য চিত্র-পরিচালকরা। যার কথা বলছি সেই করনাতীত চালায় পরিচালকদের। পরিচালকদের, কাহিনীকারদের, প্রযোজন হল প্রেক্ষাগৃহের মালিককে। মার পাবলিশিটি অফিসারকে নির্দেশ দেয় লিখুন! পণ্ডিতমত ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রণীত। পাবলিশিটি অফিসার যদি পণ্ডিতমত না লিখে, শুধু পণ্ডিত লেখে, তাহলে তাকে অকর্মণ্য মনে করে জবাব দেয়। পণ্ডিত শুনতে কত হাসকা! আর পণ্ডিতমত? কত গভীর জোতনা ব্যঙ্গক বাক্য!

করনাতীত যদি টলিউডের লোক



ফোন  
৩৪-৫০০২

**সবরুচি সম্মত  
সুনন্দর অলঙ্কার**

এক মাত্র  
জিনি সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুত কারক

**জুয়েলাঙ্গ**

**কে.এল.সিংহ এণ্ড সন্স**

১৬৭ বি. বহু বাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২



হয়ে ইনসুরেন্সের লোক হত কি কারখানার মালিক হত, তাহলে তাকে নিয়ে তৈরী হত খবরকাগজের সম্পাদকীয়। চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক উৎসবে তার মুখ থেকে শুনে খুবী হত সবাই তার সেক্রেটারীর লেখা বক্তৃতা। হঠাৎ কালে মন্ত্রী হত সে। সার্বক মর্যদা মুক্তির আবেগ উদ্ভোচিত হত মৃত্যুর পূর্বেই। রাস্তার নাম হত তার নামে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারশিপ আকর্ষণীয় হত তার পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। ছাত্রাচারিত্রের প্রযোজক হওয়ার ফলে এসব কিছুই জোটেনি কল্পনাতীতের কপালে। না জুটুক। সেখানে রাজতীকা পরিবে নিয়েছে তবু অর্থ আবে সামর্থ্য। জীবনযুদ্ধে অর্যুত হতে বাধ্য হয় নি তার। সেই বা কম কি!

কম সে নয়, কল্পনাতীতের অতীত যাবা জানে, তার জানে। কত হৃদয় পথ পেরিয়ে, কত কোশল, বৈধ, বুদ্ধি এবং ভাগ্য ভরসা করে আজ সে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে পৌঁছোচ, কল্পনাতীত রাজনৈতিক নেতা অথবা মার্কেট নয় বলেই তা বাইরের লোকের কাছে বন্ধপুত্রক। আট টাকা মাইনের প্রোডাকশন বহু ছিল সে একদিন হুঁটিওতে। কাজ ছিল মেয়েদের গাঢ়ী করে আনা এবং বাড়ী পৌঁছে দেওয়া। মেয়ে মানে,—বস্ত্রচল করা কোনও উৎসাহী নয়; নয় কোনও ভারত বিখ্যাত ফিল্ম ঠার। মেয়ে মানে ফ্রাউডসিনে মুখ দেখানো মাসের স্তূপ, লক্ষ্য হলে যাবা গলির মোড়ে ল্যান্সপোষ্টের তলার ঠাঁড়ায়। মেয়ে নয়, স্ট্রীলেকের প্যাবডি। নারীর ভীষণ ব্যক্তি।

সেইখানে অরম্ভ। সেইখানে শেষ নয়। মেয়েগুলো তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে নি। করবে অসম্মান করতে পারে নি লাইনচ্যুত। এই লাইনেই বড় হবে, এই ছিল প্রেক্ষিত্য। নিঃশব্দ অরম্ভ থেকে অর্ধে সিদ্ধ হয়েছিল কল্পনাতীত। সামর্থ্যে সিদ্ধার্থ। আজও সাংগামবিমূহ নয় সে। নারী, মজ অথবা আড়ম্বা কোনটাইটে আজও মজে নি দুশোমজার রাজ্যে এই টিলিউডে। শিষ্টান ফিরে তাকালে মনে পড়বে সেদিনকার কথা। পূর্ণ বিচ্ছেটার থেকে টেলিফোন করেছেন বর্গত: সুবিখ্যাত গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য। কল্পনাতীত টেলিফোন ধরে ভিজ্ঞেস করেছেন: কে কথা বলেছেন। অজয় ভট্টাচার্য রেগে বলেছেন; আমি অজয় ভট্টাচার্য; আপনি কে?

—আজ্ঞে, আমি শুধু ভট্টাচার্য,—অথবা নিয়েছে কল্পনাতীত। কল্পনাতীতের এই উত্তরে নীরব হয়েছেন গীতিকার। পরে বলেছেন: লোকটা করে ধারে।

এই পরিহাসবোধে আজও সম্পূর্ণ পরিচাণ করেনি কল্পনাতীতকে। একজন ক্যামেরাম্যানকে কল্পনাতীত অতি বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করার, বেশ নড়েচড়ে বসে, প্রতিশ্রুত করার কথো কথো জিজ্ঞেস করেছে: প্রভু! আমার প্রতি আবার এত সদয় কেন? করে থাকিলাম। এবারে বোধ হয় মারা পড়ব! কল্পনাতীত তক্ষুণি করেই বলে: হিঃ! হিঃ! কি যে বল! তোমরা টেকনিশিয়ানরা সামাজিক চীজ! বাঁচতে না পারো, ডোবাতে পার যে কোনও ছবি। টেকনিশিয়ান দেখলে আমি ডগাই। দূর থেকে নমস্কার করি। এমন কি কোনও গর্ভবতী গন্ধ বসি নমস্কারে পাড়ে তাকেও প্রশংসা করি সাষ্টাঙ্গে। গর্ভবতীজ্ঞান নয়। বসি তার পেটের তক্তের কোনও টেকনিশিয়ান ভূমিষ্ঠ হবার অপেক্ষায় থেকে থাকে। কে জানে!

[ক্রমশ:]

## প্রাণতোষ ঘটক রচিত

### মুক্তাভাস

"There is no false idealisation, no cheap dip into smutty episodes. The work shows some planning and purpose. For it is a frank exposure of a private way of life that has no justification for its continuance and the writer has wisely left the tale to be wound up by a remorseless nemesis." —Amritabazar Patrika. প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

### কলকাতার পথঘাট

"আলোচ্য গ্রন্থের লেখক উপস্থিত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই সেই সব বিমতপ্রায় ঘটনাবলী আহরণ করেছেন এবং তা গ্রন্থনও করেছেন অপর শিল্পকৌশলতার সঙ্গে।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লি., কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা।

### বাসকসজ্জিকা

"একখানি উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ প্রাণতোষ ঘটকের 'বাসকসজ্জিকা'। লেখক যদিও উপস্থাপন বচন করেই পর্যাক-পর্যাকার কাছে পরিচিত হয়েছেন, তবু এই সংস্করণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে ছোটগল্প রচনার সিদ্ধান্ত। তাঁর গল্পের ভাষা বেশ স্নগদগ্রন্থী ও বাস্তবায়ন। এবং সূত্ররসের পরিবেশন-পরিমিতির ফলে অধিকাংশ গল্পই একটি উন্নত পথেই পৌঁছেছে।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। মিস্র এণ্ড কোম্পানি প্রকাশিত। কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

### \* রত্নমালা \*

"এখানি সমার্থাভিধান। ইংরেজিতে বলা হয় Synonym-এর অভিধান। বাংলা ভাষায় এর কল্প অভিধান আর নেই। বীজের লেখা অভিধান তাদের পক্ষে এ ভাষায় একখানি সিনোনাইমের অভিধান হাতের কাছে থাকলে শব্দচয়নে বড়ই সুবিধা। শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষেও খুবই প্রয়োজনীয় বই হয়েছে। প্রাণতোষ সঙ্কট, ইংবেজী, বাংলা বহু অভিধান ও ভাষাতত্ত্বের বই খেঁটে অনেক পরিশ্রম করে শব্দগুলি সংকলন করেছেন। এ বইয়ের বধ্যযোগ্য আদর অবশ্যই হবে।"—বুগাভার। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লি.; কলিকাতা-৭। মূল্য আড়াই টাকা।

### আকাশ-পাতাল

"Those who will probe deep into the antiquities of Calcutta will come across many such episodes. It is with unique delicacy, singular honesty and charming simplicity that the noted author presents in an original way an old episode—a tragic one." —Amritabazar Patrika

গত কয়েক বছরে এই বিখ্যাত গ্রন্থের প্রায় চার হাজার কপি বিক্রয় হয়েছে। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লি.; কলিকাতা-৭। মূল্য ১ম পাঁচ টাকা ও ২য় পাঁচ টাকা বারো আনা।



## জারি গান

শ্রীজয়দেব রায়

জারি গান ও গাজীর গান, এক শ্রেণীর গোষ্ঠীসঙ্গীত। জারি সম্পূর্ণ ভাবে ইসলামী ধর্মসঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে, হিন্দু কবি ও গায়করা এ গানে অংশ গ্রহণ না করিলেও পল্লীবাসের মুসলমান গ্রহস্থের সঙ্গে হিন্দু গ্রহস্থরাও জারি গানের রঙ্গগ্রাহী জ্ঞাত। হজরত ইমান হোসেন ও হাসানের কারবালা ট্রাজেডিকে অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ এই শ্রেণীর গান রচিত হয়—

হানেক বলে, আর মোর কোলে জয়নাল বাছাধন;  
ওরে যে না পথে দিচ্ছিলে দুই ভাই জোড়ের ভাই এমাম হোছেন।  
সেই না পথে বাবো যে আমি, করো আমায় গোর কাফন।  
ভাই ভাই ব'লে ডাকছে হানেক আর কি প্রাণের ভাই আছে।  
যে বলের বল করলেম যে জয়নাল, সে বল ভেঙেছে;  
জহর গুলে আন রে জয়নাল জহর খেয়ে যাই মরে।

স্বভাবতঃ জারি গানের সুর অতি কল্পণ; কাহিনী-সূত্র জ্ঞান না থাকলেও কেবল মাত্র সুরের আবেদনেই চকু অক্ষপঞ্জল হইয়া উঠে। 'জারি'র অর্থ 'ই বোদন'।

মুন্সী মনসুর উদ্দীন বলিয়াছেন—

"জারি গান বাংলার মুসলমানদের চিরপ্রিয় কল্পণাত্মক গান। জারি গানের মত ব্যথার সুর অল্প কোন গানে ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। অত্যাচার, অবিচারের বিক্ষেপে, অজ্ঞার বিক্ষেপে, নিষ্ঠুরতার বিক্ষিপ্ত এমন তীব্র ভাবে অল্প কোন পল্লীগানে ঘুচু করা হয় নাই।"

জারি গানের সুর বেশ গভীর; উদ্দীপনাময় ও ভাবাত্মক শব্দগুলিই সাধারণতঃ এই গানে ব্যবহৃত হয়—

খোদা খোদা আল্লার কিরা দোস্ত মোহাম্মদ,  
অজুদে মজুদে সাই, দমে কিয়ামত।  
বিসমোলাতে বিস্ত হর কিছ কাহে দয়ামর;  
কোরাণ কর নামাজ বোজা, বেহস্ত বাবার রাস্তা সোজা,  
হজরতে কর নামাও বোঝা কর এবালত।

জারি গানের গীতিকবিতাটি কীর্তনেই অমূল্যরূপে রচিত। এই গানে রামায়ণ গানের ভায়ে একজন-মুসলমানের পায়ে নুপুর পরিয়া ও হাতে চামর ব্যঞ্জন করিয়া গান ধরে, বাকী সকলে কতকটা মাচের ভঙ্গীতে অজ্ঞার পদ্ধত-পদ্ধত বুরা ধরিতে ধরিতে তাহাকে অমূল্য করে।

জারি গানের সুরটি মুসলমান চাহী গ্রহবাসীদের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত। কবির গান ও পাঁচালী গানের ভায়ে জারি গানের মধ্যেও কতকটি তুচ্ছ ভাগ করা আছে—বন্দনা, মাদিয়া বা কথা, প্রভাতী ও খেউড়।—

বন্দনা—পরথম আল্লার নাম সাব বরলাম বল ঘুবেতে।

আর না হইব মানব জন্মম এই জন্মম গেলে।

(আরে ভাই রে) পরধমে বন্দনা কবি প্রকৃৎ নিরঞ্জন।

বীহার কোদিত্তে পয়দা এ তিন ভুবন।

তারপরে বন্দনা কবি নবিকীর চরণ।

বীহার পিয়ারে পয়দা এ তিন ভুবন।

আমি সব জায়ে বন্দনা কবি সভাজনের পাও।

বার দৌলতে আজ এখন হাতু চিড়া পাও।

সভা কইরা বইছুন বত হিন্দু মুছলমান।

আপনারে জনারে আমারে অখমের ছালাম।

কথা—আরে ও ভাই রে হোছেন,

কারবালাতে তুমি যাইও না।

কারবালাতে বেদীন আছে দীন তো মানে না।

কাকি তু কারবালায় নিয়া পানি দিবা না।

দোহার—মরি, হায় হায় হায়।

খেউড়—মূলগায়ক—আমার এই গানের যে করবেন হেলা।

কত শত ছুঃখ পাইবেন শুভে বাবার বেলা।

দোহার—ওহো, ব্যাশ, ব্যাশ।

প্রভাতী—কি বি দ্রাহী পরিত্রাধি বাপ রে ও বাপ মলম মলম।

কি তামাসা সকল চাষা, ভেবেছিলো রাজা হলেম।

হাতে শেলা, কাঁখে লাঠি, লাটে বত খটিবাটি।

মানা খায়ে, আল্লার জাতি, ভয়ে ভীক অবাক হলেম।

দেশের বত হিন্দুর ভয়, তারা কি আর আছে ভয়।

আমাদের দেখামাত্র নজর আর বাজার সেলাম।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ে কোন মুসলমান জারি গায়ক উপরিউক্ত গানটি রচনা করিয়াছিলেন। প্রভাতী পথাৎ এই শ্রেণীর সমন্বয়পযোগী ও আত্মচৈতন্য গান গাওয়া হয়। কিং জারি গানের আলম অংশ হইল মাদিয়া ও ধর্মবুদ্ধ। মহরমের কক কাহিনী, পয়গম্বরের জীবনী, ইসলাম ধর্ম স্থাপনে কাফেরদের সাং বিভিন্ন লড়াই প্রভৃতি অবলম্বনেই এই অঙ্গের জারি গানের রচনা।

অনেক জারি গানের মধ্যে যাত্রা গানের জায় নাটকীয়তা ও সঙ্গাপণও বহিরাঙ্ক। কাসেম ধর্মযুদ্ধে চলিতেছে, তাহার নব পরিণীতা পত্নী সাকিনা তাকে বিরত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সাকিনা—বিয়ের কালে যুদ্ধে যেতে গো, কেন আবিড়ন।

হে, অনাখিনি ক'রে মোরে বিবাহ বাসরে,

কোন প্রাণে প্রাণনাথ চলেত সমরে তে।

কাসেম—হো, মহাকর্ষবোর তরে শু'বে সাকিনা।

চলেছি এ ঘোর সমরে কৈন ন', কৈন না রে।

সাকিনা—যেও না, যেও না নাথ আমারে ছাড়িয়া।

(ধর্ম) যুদ্ধে যেতে ছিল সাধ, কেন করিলে বিদ্যা তে...

হে, উনয় অন্তে একই সাথে কে দেখেছে কুখায়?

বিদ্যার ঘরে স্ত্রী বেখে স্বামী যুদ্ধে যায় হে।

কাসেম—রণে যদি না বাট পিয়া ভাসবের দিনে।

কামনে দেখাব মুখ বাবাভীর সামনে হে।

সাকিনা—যাও হে বীরেন্দ্র কীদে বার মিয়াখানে।

তুবাও এলিদের নাম ছেঁড়া তরী জলে হে।

কাসেম—হৃদয়ে আবার দেখা হবে হাসরের দিনে

বিরত বিচ্ছেদ ছালায় নাই গো সেখানে হে।

সাকিনা—তুমি যেথা, দাসী তথা জেন গো নিশ্চয়।

আসন্নয় সীমায় যোবাবে ধরায় তে।

সাকিনার অন্তরে কাসেম আকর্ণ করিয়া বলিতেছে—“রণে ভুল দিলে প্রাণের দিনে আমি কি কৈকিত্য দেবো?”

সাকিনা তখন কাসেমকে সঙ্গমাসরে বধাযাত্রায় “সাজাইয়া দিল। এ যেন মহাভারতের উত্তরা-অভিমুখ্য পালায়ই ইসলামী সংস্করণ। আরও করুণতর হইয়া উঠিয়াছে জারি গানে, যখন কাসেমের স্ত্রীতে সাকিনা আকুল স্বরে পতির রক্তাক্ত মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়া বোদন করিয়া গাহিতে থাকে—

হা রে ও আমার প্রাণনাথ, এস এস এস প্রাণ ছদিবাসরে  
কে রঙ্গিল সোমার তরুণো খোন খোয়ানি আবিরে (ভারে)।

ধর ধর গো পিয়া এসছি প্রাণ পিতিমা

বুকে বিনছা বিধের চিত্ত দেখ লজরে

অঘোর ঘোরে ঘুম দিল গো (হা হা) সাকিনা লো

তোব ঘরে (হা রে)।

এস এস গুগো বর, যত তোমার বাসর ঘর

আমিও লইব শয্যা তোমায় ঘরে।

পাঁড়াও পাঁড়াও নাথ গো—(আমি) রক্তচেলি লই পরে।

এস তবে প্রেমসী চল বাসরে বসি

রক্তজবার শয্যাপাতি গায় তিমিরে

নিবিড়ে ঘুমাব ধৌহ গো (উঠব) বাসিবিয়ার হাসরে।

বলা বাহুল্য, সাকিনার অশ্রু পুরুষেরাষ্ট গায়, তবে এই বংশট করুণতর করিয়া প্রকাশ করিবার লজ সাধারণতঃ বালকদের চেষ্টেই তাহা আরোপ করা হয়। বঙ্গবধু বেহলার আকুল কন্দনই যেন সাকিনার কণ্ঠে ধনিয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গভা অকলে প্রচলিত জারি গানে বেহলার উপাখ্যানও জড়িত আছে—

আমার গান শুনে প্রাণ বাচে না ভাই,

ও মোর ছায়েকদিন কইছে তাই

কোখায় যারে গানের যোগাড় পাই।

আমার মনে বড় ব্যথা ছিলো পায়ান গারে সাথ মিটাই।

(আরে) দুই হাতে দুই খজরী বাজাই।

আরে বয়্যতি সংকথা কও,

বয়্যতি কও বেউলার কথা,

কি হ'লো বয়্যতি বলে চাঁদ সভায়।

জারি গানের গায়কদের নাম ‘বয়্যতি’।

জারির কথক মূলতঃ গীতরীতিটি বাঙলার সকল শ্রেণীর মুসলমান কবিদের মধ্যেই সবিশেষ প্রচলিত আছে। চক্ৰিশ পরগণা জেলায় এক অখ্যাত জারি কবিগায়ক মহম্মদ গোলাম আকবর রচিত নিম্নের গানটিতে চাষের গুণকীর্তন করিয়াছেন—

সোনার মাঠ সোনার চাট সোনার শস্ত-প্রাণ।

এ সোনা উদ্ধারে কত গেছে সোনার প্রাণ।

আমরা গায়ের চাষী দল আমরা দেশের বল।

নব যুগের বলরাম সব কাঁখে লব হল।

নব যুদ্ধ হবে ভাই রে এ বাঙলার মাঠে।

বাক্সে মোদের গণবাক্স বাক্সে বাঙলার হাটে।

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে **ডোয়ার্কিনের**



কথা, এটা

ধুবই আভা-

বিক, কেননা

সবাই জানেন

ডোয়ার্কিনের

১৮৭৫ সাল

থেকে দীর্ঘ-

দিনের অস্তি-

জতার কলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ ক'রে মূল্য-তালিকার

জ্ঞত লিখুন।

**ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ**

শো-রুম :—৮/২, এস্ট্যান্ডাড ইন্সট, কলিকাতা - ১

জাতি গানের সুরে কোন বৈশিষ্ট্য নাই, এ গান কতকটা আবৃত্তি-  
প্রবণ, রূপরাশিগিরি আশ্রয়ে এ গান গীতও হয় না।

#### গাজীর গান

গাজীর গানেরও মূল বিষয়বস্তু ইসলামী ধর্মপ্রচারকদের কাহিনী।  
ট্রান্সজেন্ডেন্ট বড় গাজী বাঁও কুতুবুদ্দেবতা কালু বারের কাহিনীও  
দক্ষিণ-বঙ্গের গাজীর গানের আসরে পাওয়া হয়।

দক্ষিণ বার ও বড় গাজী বাঁও মুন্সের কাহিনীতে গাজীরই সর্বদা  
জয়লাভ হয়—

তখন, বিষম রাগে গাজীর মূর্তি হৈল ভয়ঙ্কর ;

মুন্সেতে চলিল গাজী হামের বোশের।

তখন মাগমাযি কাটাকাটি (খাচাইবা কে ?)

চইল হানাহানি ;

নয়নুও মাছ হইল, কবির হইল পানি !

( গাজী উপায় করবা কি ? )

কিন্তু যে সকল গান আসরের বাহিরে পাওয়া হয় সেগুলিতে  
পশ্চিমবঙ্গের মুন্সিল আসান গানের ভায়ে গৃহস্থ সঙ্গারের নানা কর্তব্য  
কর্মের ক্রিয়াক্রমে দেওয়া হয়। নিম্নের গাজী গানটি ইসলামী নীতি-  
কথার কীর্তন—

আল্লাহ হকুম ভাই সাব হুনিয়া ভরি।

ওরে খোদার শোভা মহম্মদ করিল জাযি।

বহুং বহুং পেগাম্বর হুনিয়াতে পরদা হইল।

আল্লাহ কুনকতে মক্তার মহম্মদ জমিল।

মহম্মদ মদিনা পরে বাসলা হয়েছিল।

বাশ্বার গয়রাফিরতে কোরাণ বানাইল।

কালামলা পড় ভাই যে গোছল করিয়া।

জুখার দেমাজ পড় সকলে মিলিয়া।

গাজীর গানের এই চারণ সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের ঐতিহাসিক  
ভীষ্মমোহন রায় বলিয়াছেন—

“পূর্ববঙ্গে সর্বত্র এক সময়ে গাজীর গীতের প্রচলন ছিল। হিন্দু  
রাজ্যবিশেষ গুণগরিমা বৈরূপ চারণ ও ভাটমুখে দিগন্তব্যাপ্ত হইত  
স্বর্ণ প্রামেয় মুসলমান অধিপতি প্রভৃতিদিগের সেই রূপ সীতি  
আকারে গৃহে গৃহে তনানোর রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল।”

মুন্সিল-আশানের গানের উপজীব্য সত্যপীরের কাহিনী। হিন্দু  
ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রোক্তারা এই শ্রেণীর গান ভক্তিশ্রবণত  
চিন্তে তুলিয়া থাকে—

মুন্সিল-আশান কর দয়াল সত্যপীর।

কলিকাতায় বিধিবশুর্বে সত্যপীরের থান।

হিন্দু মুসলমান মিলে সিলি করে দান।

হিন্দু ব'লে নারায়ণ, মোরা ব'লে গীর  
জাতের বিচার নাই ক'রে খায় শিল্পী স্বীর।

কৃষ্ণ যে সবাইকে চেনে, কৃষ্ণকে চেনে কে ?

মরিয়া হইয়া তেনার নাম জপে যে।

যেই আশাটি ক'রে আপনি পীরকে দিচ্ছেন দান,

—

## আমার কথা ( ৩০ )

### প্রতাপনারায়ণ মিত্র

২৪ পরগণা জেলার মিত্র পাড়ার মিত্রবংশীয় বঙ্গীয়  
অন্নদাপ্রসাদ মিত্রের পুত্র সুখ্যাত সঙ্গীতবিদ প্রতাপনারায়ণ মিত্র  
১৩১০ সালের আশ্বিন মাসে ( ১৯০৩ খৃঃ ) জন্মগ্রহণ করেন।  
অন্নদাপ্রসাদ বঙ্গীয় মুদ্রারিমাচন গুপ্তের শিষ্য ছিলেন, ছেলেবেলা  
থেকেই সঙ্গীতের প্রতি প্রতাপনারায়ণের আকর্ষণ হয় পরিলক্ষিত।  
বাবার কাছে ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক বঙ্গীয় অতুলচন্দ্র বসুর কাছে  
সঙ্গীতে শিক্ষালাভ করেন। আঁঠুরো বছর বঙ্গীয় তুলন্ত ভট্টাচার্যের  
কাছে যুক্ত শেখেন। এক্ষণে বঙ্গদেশে ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডিনিয়ারি  
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী পুঠি বিভাগে প্রবেশ করেন এ আগামী  
বছর সম্মানের সঙ্গে অবসর গ্রহণ করবেন। ক্রমশঃ খেয়াল উঠা,  
সেতার, তবলা, বঁহোদ প্রভৃতি বিষয়ে ধীরে ধীরে তিনি শিক্ষালাভ  
করেছেন তাঁদের মধ্যে বোঙ্গীন বঙ্গোপাধ্যায়, কে. জি. চেকনা, ভোট  
হামলাস মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র মিত্র, বৃন্দ মিত্র, বীরেন বসু, কালী পাল,  
যুক্তাক আলী বা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এলাহাবাদ  
বিবরণীভালয়ে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীতসম্মিলনী থেকে পর পর ত্রৈবছর  
( ১৯৩০-৩৪ ) প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন ও ১৯৩৪ খৃঃ নিখিল বঙ্গ  
সঙ্গীত প্রতিযোগিতাতেও প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে আন্তঃমহাবিদ্যালয় সঙ্গীত  
প্রতিযোগিতার, নিখিল ভারত ডাক ও তার বিভাগীয় সঙ্গীত  
প্রতিযোগিতার ও নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব



প্রতাপনারায়ণ মিত্র

বিচারক ছিলেন প্রতাপনারায়ণ, শেষেরটির কাংক্ষণী সমিতিরও ইনি একজন সভ্য ছিলেন কিছু কাল। আকাশবাণীর ইনি একজন শিল্পী ও বিচারক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য নিবারণ সমিতিরও (সঙ্গীত বিভাগীয়) ইনি একজন সভ্য। বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গের নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীত আকাশবাণীর একজন শিক্ষাবিদ। এ ছাড়া 'বহু ভট্ট', 'পথের পাঁচালী,' 'অপবাসিত' প্রভৃতি ছায়াচিত্রেও ইনি মুখ্য ব্যক্তিরূপে নেপথ্য থেকে।

## রেকর্ড-পরিচয়

### ট্রিজ মাষ্টার্স ভয়েস

বর্তমান রেকর্ডের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বরঃ রাষ্ট্রীয় বড়ালের পরিচালনার 'নীলাচলে মহাপ্রভু' চিত্রের গানগুলি গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ইবিধানি সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে।

কিছু তার আগে বলা সরকার, জীমতী কণিকা দেবীর (বন্দ্যোপাধ্যায়) গাওয়া হু'ধানি মীতাব ভজন 'সখিরি ঘেরি নি'ত' এবং 'গোবিন্দ ক'ত মিলে লিয়া'। কণিকা দেবীর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অমুখ্যগণের কাছে তাঁর এই ভজন আরো ভালো লাগবে। রেকর্ড নম্বর—N 82122.

কুমারী পূরবী কস্তুর গাওয়া 'ওই গোপালি বধূর সি'খিতে' এবং 'কে জাগে আঁখ শেষ প্রহরে' হু'ধানি নতুন আধুনিক গান। —N 82749.

### কলম্বিয়া

ঐতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হু'ধানি চমৎকার আধুনিক গেয়েছেন—'কর কুম কুম কুম' এক 'শাওন এল ওই।' দ্বিতীয় গানধানি কবি বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচনা। —GE 24844.

### চিত্রগীতি

'নীলাচলে মহাপ্রভু' চিত্রের গান—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'জান বিকল সাধু' এক 'জগদ্বাণ জগদ্বদু'—N 76056. জীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—'কি রূপ হেঁচু' এক 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়'—GE 30364 নীলাচলে রচনা রাখবার মত গান।

ঐতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—'গ্রাম অভিসারে' এবং 'বদু, আমি আজি কালি করি'—GE 30365 আর হুটি অবিস্মরণীয় গান।

### যন্ত্রগীতি

বংশীধর দাস ও কার্তিকচন্দ্র ঘোষ 'সি, আই, ডি' আর 'জোরি জোরি' চিত্রের হুটি গানের সুর, বাঁশী ও কার্তিকচন্দ্র ব্যক্তিরূপে চমৎকার।

## মালতীর ঘুম

### জসীম উদ্দীন

গহন রাতি ঘুমায় মালতী নিবিড় শান্তি ভরে,  
শিখিল তাহার কবরী হইতে হু'-একটি চুল ওড়ে।  
পাতার পাতার টুব টুব টুব নীহারের কিসকিস,  
সই সই সই কোন পাখী ডাকি' ফোলায় নীরব নিশ।  
বাতের ফুলের গন্ধে মাতাল উতল শীতল বার,  
বনের শাখায় আসে আর বার মুকুল নীরব পার।  
দূর বনপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শত জোনাকীর পরী,  
হুটির তাহার প্রেরণি যে করে সাহায্যত বরি।  
গহন আঁধারে ঘুমায় মালতী আঁহা মরি মরি মরি,  
হু-পদ্ম না নিশী-পদ্ম ও নিশী-বী সবসী ভরি।  
কেশের আঁধারে কর্ণ-কুণ্ডলে অলিছে কুম্ভক। হুটি,  
হু-বাক বিজলী ঘুমায় এখন বসন মেঘেরে গুটি।  
বন্ধের 'পরে' হুটি হাত মেলা, তাহাতে সোনার চুড়ি,  
অলিছে পুঞ্জর প্রদীপ বেন বা দেহ-মন্দির জুড়ি।  
মুহু নিশাসে অলিছে হুইটি বৃণাল কমল বৃকে,  
বেন বা হুইটি স্বর্ণভক্ত উঠিয়াছে দেবলোকে।  
আকাশ মেলিয়া শত তারা আঁধি যেমাইছে ওই রূপ,  
পাতার পাতায় কিস্কিন্সু বহু'বার চূপ চূপ।

জারি গানের সুরে কোন বৈশিষ্ট্য নাই, এ গান কতকটা আবৃত্তি-  
প্রবণ, রাগরাগিণীর আশ্রয়ে এ গান গীতও হয় না।

### গাজীর গান

গাজীর গানেরও মূল বিষয়বস্তু ইসলামী ধর্মপ্রচারকদের কাহিনী।  
বাজ্রদেবতা বড় গাজী থা ও কুড়ীরদেবতা কালু রায়ের কাহিনীও  
দক্ষিণ-বঙ্গের গাজীর গানের আসরে গাওয়া হয়।

দক্ষিণ দ্বার ও বড় গাজী থার যুদ্ধের কাহিনীতে গাজীরই সর্বদা  
জয়লাভ হয়—

তখন, বিষয় রাগে গাজীর মূর্তি হৈল ভয়ঙ্কর ;  
যুদ্ধেতে চলিলা গাজী হামের দোসর ।  
তখন মারামারি কাটাকাটি ( ঠাকাহাঁবা কে ? )  
চইল হানাহানি ;  
নরমুণ্ড মাছ হইল, কখির হইল পানি ।  
( গাজী উপায় করবা কি ? )

কিন্তু যে সকল গান আসরের বাহিরে গাওয়া হয় সেগুলিতে  
পশ্চিমবঙ্গের মুন্সিপ আদান গানের ছায় গৃহস্থ সংসারের নানা কর্তব্য  
কর্মের কিরিয়াজ দেওয়া হয়। নিম্নের গাজী গানটি ইসলামী নীতি-  
কথার কীর্তন—

আজার হকুম ভাই সাব দুনিয়া ভরি ।  
ওরে খোদার দোস্ত মহম্মদ করিল জারি ।  
বহুৎ বহুৎ পেগাম্বর দুনিয়াতে পয়দা হইল ।  
আজার কুরকতে মক্কার মহম্মদ জমিল ।  
মহম্মদ মদিনা পরে বাবশা হয়েছিল ।  
বাম্বার খরবাকিরতে কোরাণ বানাইল ।  
কাল্লামল্লা পড় ভাই রে গোছল করিয়া ।  
জুম্মার নেমাজ পড় সকলে মিলিয়া ।

গাজীর গানের এই চারণ সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের ঐতিহাসিক  
তাজমোহন রায় বলিয়াছেন—

“পূর্ববঙ্গে সর্বত্র এক সময়ে গাজীর গীতের প্রচলন ছিল। হিন্দু  
রাজ্যসিংগের গুণগরিমা বেকপ চারণ ও ভাটযুগে দিগন্তব্যাপ্ত হইত  
সুবর্ণ গ্রামের মুসলমান অবিপতি প্রভৃতিদিগের সেই রূপ গীতি  
আকারে গৃহে গৃহে শুনারো রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল।”

মুন্সিপ-আদানের গানের উপজীব্য সত্যসীলের কাহিনী। হিন্দু  
ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রোতারাই এই শ্রেণীর গান ভক্তিশ্রবণ  
চিতে শুনিয়া থাকে—

মুন্সিপ-আদান কর দয়াল সত্যপীর ।  
কলিকাতার খিদিরপুরে সত্যপীরের থান ।  
হিন্দু মুসলমান মিলে সিম্মি করে দান ।  
হিন্দু ব'লে নারায়ণ, মোল্লা ব'লে পীর  
জাতের বিচার নাই ক'রে খায় সিন্দী কীর ।  
কৃষ্ণ যে সবাইকে চেনে, কৃষ্ণকে চেনে কে ?  
মরিয়া হইয়া তেনার নাম অপে যে ।  
যেই আশাটি ক'রে আপনি পীরকে দিচ্ছেন দান,  
সেই আশাটি পূরণ করেন সত্যনারায়ণ ।

## আমার কথা ( ৩০ )

### প্রতাপনারায়ণ মিত্র

২৪ পরগণা জেলার মিত্র পাড়ার মিত্রবংশীয় স্বর্গীয়  
অন্নদাপ্রসাদ মিত্রের পুত্র সুখ্যাত সঙ্গীতবিদ প্রতাপনারায়ণ মিত্র  
১৩১০ সালের আশ্বিন মাসে ( ১৯০৩ খৃঃ ) জন্মগ্রহণ করেন।  
অন্নদাপ্রসাদ স্বর্গীয় মুহারিমোহন গুপ্তের শিষ্য ছিলেন, ছেলেবেলা  
থেকেই সঙ্গীতের প্রতি প্রতাপনারায়ণের আকর্ষণ হয় পরিলক্ষিত।  
বাবার কাছে ও বিত্তালয়ের শিক্ষক স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র বসুর কাছে  
সঙ্গীতে শিক্ষালাভ করেন। আচার্য্য বহুর স্বর্গীয় দুর্লভ ভট্টাচার্য্যের  
কাছে বৃন্দ শেখেন। এদিকে বথাসময়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং  
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী পুর্ষ বিভাগে প্রবেশ করেন ও আগামী  
বছর সম্মানের সঙ্গে অবসর গ্রহণ করবেন। ঋণদ, খেয়াল, টঙ্কা,  
সেতার, তবলা, স্ববোদ প্রভৃতি বিষয়ে ঝাঁদের কাছে ইনি শিক্ষালাভ  
করেছেন তাঁদের মধ্যে যোগীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কে, জি, ঢেকনা, ছোট  
রামদাস মিশ্র, গৌরীশঙ্কর মিশ্র, বৃন্দ মিশ্র, ধীরেন বসু, কালী পাশ,  
মুস্তাক আলী থা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এলাহাবাদ  
বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মিলনী থেকে পর পর দু'বছর  
( ১৯৩৩-৩৪ ) প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন ও ১৯৩৪ খৃঃ নিখিল বঙ্গ  
সঙ্গীত প্রতিযোগিতাতেও প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে আন্তঃমহাবিদ্যালয় সঙ্গীত  
প্রতিযোগিতার, নিখিল ভারত ডাক ও তার বিভাগীয় সঙ্গীত  
প্রতিযোগিতার ও নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার অল্পতম



প্রতাপনারায়ণ মিত্র

বিচারক ছিলেন প্রতাপনারায়ণ, শেষেরটির কার্যকরী সমিতিরও ইনি একজন সভ্য ছিলেন কিছু কাল। আকাশবাণীর ইনি একজন শিল্পী ও বিচারক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্ধারণ সমিতিরও (সঙ্গীত বিভাগীয়) ইনি একজন সভ্য। বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গের নৃত্যনাট্য-সঙ্গীত আকাদেমীর একজন শিক্ষাদাতা। এ ছাড়া 'বহু ভট্ট', 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' প্রভৃতি ছায়াচিত্রেও ইনি মৃদঙ্গ বাজিয়েছেন নেপথ্য থেকে।

## রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

বর্তমান রেকর্ডের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বয়ং রাইচাঁদ বড়ালের পরিচালনায় "নীলাচলে মহাপ্রভু" চিত্রের গানগুলি গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রমীলা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছবিখানি সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে।

কিন্তু তার আগে বলা দরকার, শ্রীমতী কণিকা দেবীর (বন্দ্যোপাধ্যায়) গাওয়া হুঁখানি মৌর্য ভজন "সখিরি মেরি নি'দ" এবং "গোবিন্দ কবছ" মিলে পিয়া"। কণিকা দেবীর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুরাগীদের কাছে তাঁর এই ভজন আরো ভালো লাগবে। রেকর্ড নম্বর—N 82122.

কুমারী পূর্ববী দত্তের গাওয়া "ওই গোখুলি বধুর সিঁথিতে" এবং "কে জাগে আজ শেষ প্রহরে" হুঁখানি নতুন আধুনিক গান। —N 82749.

## কলহিয়া

শ্রীতন্ত্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হুঁখানি চমৎকার আধুনিক গেয়েছেন—"কুম কুম কুম কুম" এবং "শাওন এল ওই।" দ্বিতীয় গানখানি কবি রতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচনা। —GE 24844.

## চিত্রগীতি

"নীলাচলে মহাপ্রভু" চিত্রের গান—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "জান বিফল সাধু" এবং "জগন্নাথ জগৎধকু"—N 76056. শ্রীমতী প্রমীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—"কি রূপ হেঁচু" এবং "মাথব বহুত মিনতি কবি তোর"—GE 30364 দীর্ঘকাল যেন রাখবার মত গান।

শ্রীতন্ত্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—"তাম অভিসারে" এবং "বহু, আমি আজি কালি করি"—GE 30365 আর দুটি অবিস্মরণীয় গান।

## যন্ত্রগীতি

বংশীধর রায় ও কান্টিকচন্দ্র ঘোষ "সি, আই, ডি" আর "চোরি চোরি" চিত্রের দুটি গানের সুর, বাঁশী ও কান্টতরঙ্গে বাজিয়েছেন চমৎকার!

## মালতীর ঘুম

জসীম উদ্দীন

গহন রাত্রি ঘুমায় মালতী নিবিড় শান্তি ভরে,  
শিথিল তাহার কবরী হইতে দু'-একটি চুল ওড়ে।  
পাতায় পাতায় টুব টুব নীহারের কিসকিন,  
সই সই সই কোন পাখী ডাকি' দোলায় নীরব দিশ।  
রাতের কুলের গন্ধে মাতাল উত্তল শীতল বায়,  
বনের শাখায় আসে আর বায় মুহুর নীরব পায়।  
দূর বনপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শত জোনাকীর পরী,  
কুটির তাহার প্রদক্ষিণ যে করে সারারাত ঘরি।  
গহন আঁধারে ঘুমায় মালতী আঁধা মরি মরি মরি,  
হুখ-পদ্ম না নিশী-পদ্ম ও নিশীথী সরসী ভরি।  
কেশের আঁধারে কর্ণ-কুহরে অলিছে কুমকো ছুটি,  
হু-বাহু বিজলী ঘুমায় এখন বসন মেঘেরে লুটি।  
বক্ষের 'পরে ছুটি হাত মেলা, তাহাতে সোনার চুড়ি,  
অলিছে গুজার প্রদীপ বেন বা দেহ-মন্দির জুড়ি'।  
মুহু নিশাসে অলিছে দুইটি বৃগল কমল বৃকে,  
বেন বা দুইটি স্বর্ণভক্ত উঠিয়াছে বেবলোকে।  
আকাশ মেলিয়া শত তারা আঁধি ঘেড়াইছে ওই রূপ,  
পাতায় পাতায় কিস্কিন্-কিস্কিন্ বহে'বার চূপ চূপ।



# বিবেকানন্দ স্টোত্র

স্মৃণি মিত্র

৯

বধন বাংলাদেশ শাস্ত্র-বিমূৰ্খ,  
হঠাৎ বড়ের মতো এসে  
মৃত বেদ-আলোচনা  
জাগ্রত করেছে। এ-দেশে।  
তাই বোলে তুমি  
বেদের আবর্জনা করোনি গ্রহণ,  
রাখাকান্ত ধারা অম্লযারী  
বিকৃত ব্যাখ্যাসহ  
শাস্ত্রকে করোনি স্বীকার,  
কিংবা আবার  
ডিবোজ্ঞা-পন্থায়  
বর্জন করোনি কোি বেদ,  
কলাগ-বুদ্ধিকে জাগ্রত কোরে  
দূর করে দিয়ে গ্যাছে।  
বিশ্বাস ও যুক্তির ভেদ।  
তুমিই আবার  
শাস্ত্র ও সমাজকে এক বোলে মেনে  
অভিনব ব্যাখ্যায়  
শাস্ত্রকে কোরেছো প্রচার।  
তুমিই প্রথম  
শাস্ত্র ও যুক্তির  
কোরে গ্যাছো রাখী-বন্ধন। ১

কিন্তু বাই বোলে,  
তবু তুমি অজান্ত নও;  
নইলে কি হিন্দু-নীতি অবহেলা কোরে  
খৃষ্টানী ধর্ম-নীতি  
বেমালুম কোলে তুলে নাও? ২

When we look to the traditions of ancient nations, we often find them at variance with each other. And when discouraged by this circumstance we appeal to reason as a surer guide, we soon find how incompetent it is alone to conduct us to the object of our pursuit. We often find that instead of facilitating our endeavours or clearing up our perplexities, it only serves to generate an universal doubt incompatible with principles on which our comfort and happiness mainly depend. The best method perhaps is neither to give ourselves up exclusively to the guidance of the one or the other, but by a proper use of the lights furnished by both endeavour to improve our intellectual and mental faculties."

—Raja Ram Mohan Roy

২। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রামমোহন অষ্টেতবাদ প্রচার কোরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু অষ্টেতবাদে নীতিবাদের ভিত্তিটা স্বদৃঢ় কোরে যেতে পারেননি। তিনি খৃষ্টান নীতিবাদকে শব্দবের অষ্টেতবাদের সঙ্গে মিশ্রিত কোরে খৃষ্টান-ধর্ম-নীতির প্রাধান্য দিয়ে গ্যাছেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বোলে গ্যাছেন, খৃষ্টান-ধর্মের নীতিবাদ পৃথিবীর অজ্ঞাত ধর্মের নীতিবাদের চেয়ে নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির পক্ষে বেশী উপযোগী।—

—"The Doctrines of Christ are more conducive to moral principles and better adopted for the use of national beings than any other which have come to my knowledge." আবার অজ্ঞত বোলেছেন,—  
"The moral precepts of Jesus are something most extraordinary." আবার বোলেছেন,—  
"Genuine Christianity is more conducive to the moral, Social and Political Progress of a People than any other known creed." এই সব পড়ে-শুনলে মনে হয়, রাজার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব থাকে সন্দেহও তিনি পাশ্চাত্য-প্রভা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত কোরতে পারেননি। তাছাড়া তিনি খৃষ্টান-ধর্মের 'পাপবাদ' বিশ্বাস কোরতেন এবং খৃষ্টান-ধর্ম নীতি অম্লযারী মানসিক প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন বোধ কোরতেন এই সব ক্ষেত্রে তিনি অষ্টেত বোদ্ধা-বান্দী নন, কেন না বেদাৎ পাপবোধের কোনো স্থানই নেই।

১। "I have often lamented that in our general researches into theological truth, we are subject to the conflict of so many obstacles.



## খানঃ কৃষা...

এমন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল যখন লোকে যি খাবার জন্তে ধার করতেও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অত্র কারণ ছিল। দ্রুপ অমৃতের সমান আর সেই দ্রুপ থেকে তৈরী যি, মাখন, ছানা, দই, ক্ষীর। সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একবারেই অপরিহার্য এ বিষয় কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আর সত্যিই দ্বিধা থাকবার কোন কথাও নয়। তখন সত্তাগণ্ডার দিন ছিল, ভাল টাটকা খাবার অপরিপাণ্ড পরিমাণে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। হুধের সাধ ঘোলে মেটাবার কথা তখন উঠতোই না।

এখন দিনকাল বদলছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুতুরভরা মাছ পরিবৃত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বদ্ধবান্ধবদের সঙ্গে খোসগল্প করছেন আর তালপাসা খেলছেন—এ এখন গল্পকথার দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আপিসে কিবা নিজের ধান্নায় ছুটতে হয়।

সত্যিই আজকের এই ডামাডোল আর মালিগণ্ডার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি দুরূহ কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বই-খাতার খরচেই হিমসিম বেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়েই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার তুলনায় ঝামেলা বেড়েছে খাটখাটুনি ও হুশিচুশিও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আধপেটা খেয়ে থাকা নয়তো নিকুট বা ডেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা ওষুধ পত্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টিকর স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর কর্তার,

HVM. 209A-X55 B0

গিন্নীঠাকুরনের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সুতরাং ঝপু কৃষা ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা সোজা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আপেল। আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজীতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে রোগ একটা করে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে ঘরে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ চুম্বলী, তাই কখনেই বা রোগ আপেল খেতে পারে বলা? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোম্যাটো, যাকে আমরা বিলিতি বেগুন বলি, বা কলা—আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে যি। খাঁটি টাটকা গাওয়া যি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্তে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাঁটি যি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বল্পমানে ও নিশ্চিত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। ডালডায় খরচ কম আর ডালডা যি এর মতোই উপকারী। একথা জানেন কি যে ডালডা ও খাঁটি গাওয়া যি একই পরিমাণ ভিটামিন ‘এ’ আছে। ভিটামিন ‘এ’ শরীরের বাড়ের জন্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্তে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন ‘এ’ স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন ‘এ’ যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন ‘ডি’ ও দেওয়া হয়। ভিটামিন ‘ডি’ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন ‘ডি’ দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাঁটি ডেবজ তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদা শীলকরা টিনে খাঁটি ও তাজা পাবেন। এই সব কারনেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনস্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই টিন দেখে কিনবেন।

পরেব পোষাকী জামা  
আমাদের জাতীয় জীবনে  
সমস্ত পথতে পেল কেন ?  
বেলাত্নকে ভিত্তি কোরে  
বর্মমত পড়ে',  
বস পাখো পাখীদের সাথে বৃদ্ধ করে—  
সে তো বাতাসুতী,  
তাই বোলে তুমি  
ভিন্ন ভাবের কুলে কেন  
ভিন্ন ভাবের মালা পরাও ?  
বিজাতীয় শিকার পাঞ্জায় পড়ে  
আমাদের ভাষাটাকে কেন  
হঠাৎ শিকতে তুলে রাখাও ?  
পশ্চিমী শিকার প্রাণীসীতা প্রচলন কোরে  
দেশকে এগিয়ে প্যাঙ্কা ট্রিকট,  
তবু এটা ভেবে ভাবো কি—  
ঈশ্বরী ভাষাতেই নিতে হবে তাকে ?  
হঠাৎ ছাড়তে হবে  
চিরভাষ্য এই বাতাবিক শিশু ভাষাটাকে ?

কাটলেই যেতে হবে বোলে  
ছুকি-কাটা, ও-দু-টা কি কাটা-ই ?  
থিকে কি মেটেনা তাতে  
আমি যদি শুধু তাতে  
বাবু তোরে বোসে সেটা খাই ?  
বাবু শিশু যেটে তাতে,  
সহজেই পেটে ঢুক যায় ।  
ছুকি-কাটা চামড়ের  
অভ্রাস না থাকতে  
পেটে যেতে দেবী তোরে যায় ।

সব কিছু নেনা তো কটেই,  
তবে সেটা তাতে তুলে  
সামাজিক, চিরকালে  
আমাদের দিল্লী কারদার । ৩

কিন্তু স্বামিজীর বেশস্তবাসে ঘটান-ঘরের নীতিবাদ হাথা  
পলায় নি ; বরং তিনি অধঃস্তবাসে ওপরেই নীতিবাদের ভিত্তিটা  
সুদৃঢ় কোরে ঘটান-নীতিবাদের ভিত্তিকে আকরণ করেছেন । এ  
কেন্দ্রে তিনি রামমোহনের চেয়ে অনেক বেশি আশ্চর্য ।

৩। স্বামী প্রজ্ঞানন্দে 'ভারতের সাধনা' নামক গ্রন্থের কৃষিকার  
স্বামিজীর গুরুতাই স্বামী সাধনানন্দকে লিখেছেন,—“স্বামিনীরা  
বাক্য রামমোহন বাবাকে দীর্ঘ ত্রুণ্ডিতর ভারতে প্রথম আগ্রহ  
ব্যক্তি বলিয়া অনেক নির্দেশ করিয়া থাকেন—একথা অনেকাংশে  
সত্য হইলেও তিনিও যে আপনাকে এই পান্ডিত্য বোধ হইতে সম্পূর্ণ  
দূরে রাখিতে পারিয়াছিলেন তাতা বোধ হয় না । বেশে বাবীন চিত্তায়

১১

ভাবনায় তুমি  
জ্ঞানের ভিত্তিটাকে  
সবাইকে কেন টেনে আনো ?  
কেন কলে গুরু হেবা-হেবা ?  
দৃষ্টি-পূজার প্রতি  
তোমার এ বিবেক কেন ?

'Idol worship,—  
Source of prejudice'র জুড়ি  
আর কিছু নেনা নাকো দৃষ্টি ?  
ও কি শুধু...Induces  
The violation of  
Every humane  
And social feeling,—  
And moral debasement  
Of a race...  
'Impure, absurd, puerile'র জুড়ি  
'Prejudice' চাও  
আর কিছু তারিফ প্রতীক ?

সেই পুনঃ প্রচারিত কথিত, পান্ডিত্য শিকারদল  
ভাষার প্রবর্তনরূপ যে উপায় তিনি অবলম্বন করিয়া  
উদ্ধাতে উদ্ধার অনাধার 'ভাষাবীকার'টির কথা সহ্য হইবে  
যে উদ্ধার অন্তরে পান্ডিত্যভাষাপ্রাধান্যের পরিচয়ক তাহা  
অভূমিত হইবে । বিদ্যাপ্রতিভাসম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দ আম  
বাংলায় বলিয়াছিলেন,—“হাঃ! রামমোহন ঈশ্বরীভাষার  
বীকারপূর্ণক বিদ্যালয়সমূহে উদ্ধার প্রচলন করায় যি  
নিপতিত হইয়াছিলেন, অন্ততঃ পঞ্চদশ বৎসরের গুরু  
যেহটাকে সিদ্ধাইয়া দেওয়া হইয়াছে ; ঐরূপ না করিয়া  
তিনি সাক্ষত ভাষার প্রচলন রাখিতেন এবং তা  
বিজ্ঞানাদি বিজ্ঞা ও প্রচলনাদি চিত্তাসমূহ এই ভাষায়  
করিয়া প্রবাহনো প্রকাশ পূর্ণক বিদ্যালয়সমূহে পঠন  
করাইতেন, তাতা হইলে অতি দীর্ঘই কেশমর এই  
প্রচার সাধিত হইয়া সমস্ত জাতিটা উন্নতির পথে  
হইত ।”

স্বামিজীর এই কথা তখন দৃষ্টিতে না পারিলেও এখনও  
যে, 'যে প্রাণী অবলম্বনে দেশের লোক মুক্তন ভাব ও সা  
বতকাল অভ্যস্ত হইয়াছিল, ঈশ্বরীভাষার প্রচলনে সেই  
এককালে দৃঢ়পরিহৃত হওয়ার দেশের জনসাধারণের এই সকল  
সত্যগ্রহণে অনর্থক অনেক বিলম্ব হইয়াছে ও হইতেছে ।...’  
যেহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া ভারতের জাতীয়তায় বর্ণা  
নির্ণয় ও প্রকাশ করিতে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম  
হইয়াছিলেন ।”



তাঁই যদি তেবে থাকে বাজা,  
কুমি কি কর 'প্রভুভিত্ত' ?

১২

বহিও বোলেতো কুমি  
নিম্ন আশাচের

প্রভুকের আছে প্রয়োজন,

তবু কুমি মন থেকে

প্রভুকোপাসনাটাকে

কোনোদিন করানি প্রভব

সহাটকে একমতে

এক বাধা-বধা পাখে

টেনে আনি সমুদ্রপথ ?

তোমার হাতে বা পদে

অপারের হাতে সেটা

হয়তো অকল্যাণকর ?

কুমি কি জানো না বাজা,

বিভিন্নতাই তোমার

বিশেষ প্রাণ-স্বভাব ?

তবে কুমি তুমি বাজা

স্বপ্ন অতুলায়

স্বাধীনতার স্বাধীন-বাচন

বাহ্যবাহন প্রকৃতি ও গোমক বৃত্তিপুত্রের সঙ্গে চিত্র  
কাজে দুজন কোরে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে,  
Idolatry practised by the Greeks and Romans  
certainly just as impure, absurd and puerile  
as of the present Hindus, yet the former  
by no means, so destructive of the comforts  
of, or injurious to the texture of Society,  
as the latter."

—A Second Defence of the Monotheistical  
tem of the Vedas.

দেউলপূজার কুমিকার লিখেছেন,—

"Idol worship,—the source of prejudice and  
eritation and of total destruction of moral  
principles."

ঈশ্বরানুষ্ঠানের কুমিকার লিখেছেন,—"Fatal system of  
latry induces the violation of every humane  
social feeling,—and moral debasement of a  
e who, I cannot help thinking, are capable of  
ter things..."

এই ভিত্তি সন্দেহ বোলেছেন,—"As Luther's design  
to destroy Popery, the corruption of  
ristianity, by simply resuscitating genuine  
Christianity as revealed in the New Testa-  
nt, so his ( Ram Mohan Roy's ) mission was  
to destroy popular Pauranic Idolatry, the  
rruption of Hinduism, by resuscitating genuine  
Hinduism as propounded in the ancient  
Vedas."

—The Brhmo Samaj, or Theism in India by  
Shab Ch. Sen.

১৩

"...Different natures  
Require different methods  
Your methods of coming to me  
May not be my method,  
Possibly  
It might hurt me,  
Such an idea as that  
There is but one way for everyb  
Is injurious,  
Meaningless,  
And entirely to be avoided.

Woe unto the world  
When everyone  
Is of the same religious opinion  
And takes to the same path.  
Then  
All religions and all thoughts,  
Will be destroyed.  
Variety  
Is the very soul of life  
When it dies out entirely  
Creation will die.

...How can they preach of love  
Who cannot bear another man  
To follow  
A different path from their own ?  
If that is love,  
What is hatred ?"

১৪

স্বাধীনতার বাধা নিম্ন আশাচ

তাদের প্রভুক-পুত্র কোরোত্তা বিচার

১. "বিলি প্রভুত্বের পক্ষে বিলি সানপ্রদাণী প্রয়োজন।  
কুমি যে প্রদাণীতে টেবল লাত কোরে, সেটা হতে আমার পক্ষে  
খাটবে না, হতেও তাতে আমার কতিপই হতে পারে। সকলকে  
এক পাখে কোরে হবে—এ কথাই কোনো অর্থ নেই, বলা কঠিনকর,  
সুতরাং এই মতবাদকে সব প্রকারে এড়িয়ে যেতে হবে। যদি  
কখনো পৃথিবীর সমস্ত লোক একবাক্যবাক্যই কোরে একটা নিষ্কি  
পাখে চলে, তবে সেটা হুজুরের বিঘ্ন বোলেতে হবে। তাহোক  
লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি এবং প্রকৃত মতবাদের প্রকাবে নই কোরে  
হাবে। তেই কোরে আমার জীবনব্যবহার মূল মন্ত। এই ভে  
যদি সম্পূর্ণভাবে চোলে যায়, তাহোকল সঠিকই লোশ পাবে।

অন্ত লোকের ভিন্ন পথ অনুসরণ কোরিলে, যেটা সচু কোরিতে  
পারে না, সে আশাচ প্রেমের কথা বলে কি কোরে! এই যদি প্রেম  
হয়, তবে বিষের কাকে বলে!"

—Lectures From Colombo to Almora. (Page  
33-34)

২. রাজা রামমোহনোদয় যত "অজ্ঞানীর মনস্থিতির নিমিত্ত  
বাহ্যপুত্রাণি করনা করা গিয়াছে।" পুণ্য সম্প্রদায় তিনি বলেন,—  
"পুণ্যাদি পাত্র সর্বা বোজাভাষ্যে অতীতির আকারে যথিক

মূর্তি-পূজার প্রতি এই যে তোমার  
কৃপণ, অমুগ্রহ—এও অবিচার।  
তুমি যে সত্য নও প্রমাণটা তারি,—  
ঐরামকৃষ্ণদেব-প্রতীক পূজারী।  
এমন বৃকের পাটা বলো আছে কার,  
যে তাঁকে বোলবে—তিনি তুচ্ছ আধার ?  
মূর্তিকে পূজা কোরে তাখোনি যে ছাই,  
তাই এত বৃদ্ধির মিথো বড়াই !  
মূর্তিকে ধোরে যদি ব্রহ্মেতে যেতে,  
তাহোলে কি একথাটা তুমি বোলে যেতে ?  
তোমার ঐ-মতবাদে সত্যতা নেই,  
স্বামিজীর প্রতিবাদ সেই কারণেই।—

"It has become  
A trite saying,  
That idolatry is wrong,  
And every man  
Swallows it  
Without questioning.

I once thought so,  
And to pay penalty of that  
I had to learn my lesson  
Sitting at the feet of a man  
Who realised everything  
Through idols ;  
I allude  
To Ramkrishna Paramahansa." ৭

অতএব তোমার ঐ মতবাদটার  
ঠাকুরই তো জীবন্ত প্রতিবাদ তার।

"If  
Such Ramkrishna Paramahansas  
Are produced

Through idol-worship,  
What will you have—  
The reformers creed  
Or  
Any number of idols ?  
I want an answer  
Take  
A thousand idols more  
If you can produce  
Ramkrishna Paramahansas  
Through idol-worship,  
And  
May God speed you !  
Produce such noble natures  
By any means you can.

Yet idolatry is condemned !  
Why ?  
Nobody knows.  
Because  
Some hundreds of years ago  
Some man of Jewish blood  
Happened to condemn it ?  
That is,  
He happened to condemn  
Everybody else's idol  
Except his own.  
...If God  
Comes in the form of a dove,  
It is holy.  
But  
If he comes  
In the form of a Cow  
It is heathen superstition ;  
Condemn it !  
That is  
How the world goes." ৮

তোমাদের মতবাদটার  
সত্যতা থাকলেও  
স্বামিজীর তাই আক্ষেপ ! [ ৫ ]

কহেন। পুরাণে অধিক এই যে, মল্লবৃদ্ধি লোক অতীন্দ্রিয় নিরাশ্রয়  
পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া সম্যক প্রকারে পরমার্থ  
সাধন বিনা ভ্রমক্ষেপ করিবে কিংবা তুচ্ছ প্রবৃত্ত হইবে, অতএব  
নিরলম্বন হইতে ও তুচ্ছ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরকে  
মহুয়াদি আকারে ও যে যে ছোট্ট মনুষ্যাদির সর্বনাশ গ্রহ হয়, তদ্বিশিষ্ট  
করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।" পুরাণের মূর্তিপূজাকে রাজা অশাজীৱ  
বোলে বর্ণনা করেন নি বটে, কিন্তু তিনি পৌরাণিক যুগের  
বিকাশটাকে স্বীকার করেন নি ; তাই পুরাণ কথিত মূর্তিপূজাকে  
নিম্ন অধিকারীর যোগ্য বোলে তার একটা সন্ধ্যা স্থান নির্দেশ কোরে  
গ্যাছেন মার।

৭। "আজকাল এটা চলিত কথার ঝাঁড়িয়েছে, আর সকলেই  
বিনা আপত্তিতে এটা স্বীকার কোরে থাকেন যে, পৌত্তলিকতা দোষ।  
আমিও এক সময়ে এর রকম ভাবতাম, আর তার শাস্তিস্বরূপ আমাকে  
এমন এক ব্যক্তির পদতলে বোসে শিক্ষালাভ কোরতে হোয়েছে,  
যিনি পুতুল-পূজা থেকেই সব কিছু পেয়েছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ  
পরমহংসদেবের কথা বোলছি।"

—My Plan of Campaign.

৮। "যদি পুতুল-পূজা কোরে এইরকম রামকৃষ্ণ পর  
অদ্ভূত হয়, তবে তোমরা কি চাও ?—সংস্কারকদের ত  
পুতুল-পূজা ? আমি এর একটা জবাব চাই। যদি পুত  
দ্বারা এইরকম পরমহংসদের সৃষ্টি কোরতে পারো, তবে  
হাজারটা পুতুলের পূজা করো। সিদ্ধিগতা তোমাদের যি  
যে কোনো উপায়েই হোক এই রকম মহাত্মাদের সৃষ্টি ক  
তবুও লোকে মূর্তি-পূজাকে গাল দেয়। কেন ?  
জানেনা। কারণ কয়েক হাজার বছর আগে জটনৈক দ্বা  
একটি লোক মূর্তি-পূজাকে নিষেধ কোরেছিলেন বোলে  
তিনি নিজের পুতুল ছাড়া আর সকলের পুতুল  
কোরেছিলেন। ঐ-ঈশ্বর যদি একটা ঘনু পাখীর রূপ ধো  
তাহোলে সেটি মহাপবিত্র, কিন্তু তিনি যদি গাভীর  
আসেন, তাহোলেই সেটা হিন্দুদের কুসংস্কার। ওটা অধঃপ  
হুনিয়ার ভাবই এই।"

—My plan of C.



## বাংলা সাহিত্যে নতুন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার এবং ভারত গভর্নমেন্ট সাহিত্য বিষয়ক নানা রকম পুরস্কারের ব্যবস্থা করে আসছেন। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা গভর্নমেন্ট 'বীরেন্দ্র পুরস্কার'-এর আয়োজন করেছেন। দিল্লী থেকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ আকাদেমী পুরস্কার আছে। তদ্ব্যতীত দিল্লী থেকে সর্বভারতীয় ভাষার শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতগুলি স্বতন্ত্র পুরস্কারও দেওয়া হয়ে থাকে। এই সকল পুরস্কার সাহিত্যক্ষেত্রের পাশ্বে সাহিত্যিকদের যে বঞ্চেই উৎসাহিত করছে সে বঞ্চে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তবুও এই সকল সাহিত্য-পুরস্কার সমগ্র দেশের পক্ষে যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তা হচ্ছেই অস্বমেয়। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এর নিতান্ত সহজেই নজরে পড়ে। একমাত্র আমেরিকার বুক-স্টোরে বিভিন্ন বিষয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ৪-টি বড় বড় প্রাইজ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত আছে আমেরিকার খ্যাত 'পুলিটজার' পুরস্কার। এই পুরস্কার প্রতি বৎসর বারম্বর ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে ১৫টি করে দেওয়া হয়ে থাকে।

কয়েক দিন পূর্বে নববর্ষ উপলক্ষে দক্ষিণ-কলিকাতার কলেজ টিউটর বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক মেসার্স এম. সি. সরকার অ্যান্ড কোম্পানীর অধ্যক্ষ ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সুবীরচন্দ্র সরকার একটি সাহিত্য বিষয়ের ব্যবস্থা করেন। এটি এঁদের একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান। শিকাতার প্রবীণ ও নবীন প্রায় সকল সাহিত্যিকরাই এই আসরে গঠিত ছিলেন। রাজশেখর বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রমোদ্র মিত্র, বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণাশঙ্কর বসু প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন ও নিবন্ধ পাঠ করেন। বক্তৃতাশ্রমের পরে এই সাহিত্য-পুরস্কারের কথা উত্থাপন করে লেন যে, ক্রমে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্রি ক্রি পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বাংলা দেশে এইরূপ কোন ব্যবস্থার নিদর্শন খা যায় না। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকী বসারী প্রবন্ধ 'নরসিং দাস প্রাইজ' নামক একটি হাজার কায় পুরস্কার প্রতি বৎসর বাংলা-সাহিত্যের লেখকদের দিবে কেন। কুণ্ডের বিষয়, এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাংলা

দেশে নেই, ধারা বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসুস্থ কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন!

বাস্তবিক পক্ষে কথাগুলি যে কতদূর সত্য তা আজ আমরা সকলেই অনুভব করতে সক্ষম। সকল বিষয়েই যে আমাদের গভর্নমেন্টের সুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে তার কোন সন্দেহ কারণ দেখা যায় না। ইতিপূর্বে যে কতগুলি আমেরিকার সাহিত্য-পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার একটিও গভর্নমেন্ট প্রদত্ত নয়—নোবেল প্রাইজের মধ্যেও তো সরকারের কোন দান নেই!

জানন্দের বিষয়, অরুণাশঙ্করের এই আক্ষেপের পর, কলিকাতার দুইটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের মালিক, ধারা এই আসরেই উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা প্রতি বৎসর এক একজনে দু'হাজার টাকা করে চার হাজার টাকার (জ্যেষ্ঠ গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে) চারটি সাহিত্য-পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেন। দুইটি পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'বৃন্দাবন' এবং অপর দুটি পুরস্কার দেন 'জানন্দ বাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান টাইমস'। এই চারটি পুরস্কার ব্যতীত আরও দুটি পুরস্কার উক্ত সভায়ই ঘোষিত হয়। একটি পাঁচ শত টাকার পুরস্কার প্রতি বৎসর শিশু-পত্রিকা 'মোচাক'-এর তরফ থেকে শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে; অপরটি মাসিক পত্রিকা 'উন্মেষ'-এর তরফ থেকে, প্রতি বৎসর পুজার সময় প্রকাশিত জ্যেষ্ঠ কবিতার ক্ষেত্রে পাঁচ শত টাকা।

বর্তমান বৎসরের প্রায়ক্ষেত্রে এই পুরস্কার ঘোষণা বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় ঘটনা বলা যেতে পারে। আমরা আশা করি, এ থেকে আরও বহু সাহিত্য-পুরস্কারের উদ্ভব হবে এবং বহু প্রকাশক ও প্রতিষ্ঠান এ সম্বন্ধে অনুপ্রাণিত হবেন।

বর্তমান বৎসরে ধারা এই পুরস্কারগুলি ঘোষণা করেছেন, তাঁদের স্বাধীনভাবে এই পুরস্কারগুলি বিতরণের একটি গুরু দায়িত্ব আছে। পুরস্কারগুলি কোন কোন বিষয়ে হবে, কারা এর বিচারক হবেন, কি ধরণের নিয়ম-কানূনের মধ্যে পুরস্কার বিতরিত হবে, ইত্যাদি নানা বিষয় সম্বন্ধে জানবার ক্ষেত্রে আমরাও যেমন উৎসাহিত হয়ে আছি, তেমনি জনসাধারণেরও কৌতূহলের অবধি নেই। আশা করি, এ সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট পত্রিকার নথিই আমরা অবগত হব।

# উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক বই

## পুরনো বই

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে, রাজসাহিত্যের যে একটি বিশেষ আসন নিহিত, এ কথা আজ নতুন করে বলবার নয়। বঙ্গ সাহিত্যের এই বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা ১৪৮৭ গজিয়ে ওঠা নয়—আজকের দিনের তার আদিগন্ত খ্যাতির পিছনে আছে অনেক কালের সাধনার দীর্ঘ ইতিহাস। অতীতের অনেক সাহিত্য-পথবাজারী নিদারুণ পরিশ্রম। পূর্বচারণের অকৃত্রিম সাধনা। বাঙালি সাহিত্যের অতীত দিনের রূপ, তার স্বপ্ন-কোণল, তার পঠন-চাতুর্ঘ্য যেমনই পৌরবসর তেমনই বৈশিষ্ট্যবান। তখনকার দিনের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। আলোচনার সঙ্গেই সমভাবে স্থান পেয়েছে লেখকের মূল রচনার দীর্ঘ উদ্ভৃতি। প্রতাপাদিত্য চরিত্র, কুলীনকুলসর্গব, নবাবু বিলাস, কতোম পাটার নকশা, গোড়ীর ব্যাকরণ, বোম্বে বিকাশ, তোতা ইতিহাস, বিজ্ঞানকল্পত্রয়, নরশো রূপেরা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আবার নতুন করে স্থায়িত্ব লাভ করুক, এই কামনা। সমগ্র গ্রন্থটিতে ব্রীনিবিল সেনের পরিভ্রমের ছাপ পাওয়া যায়, আমরা তাঁর সাক্ষ্য কামনা করি।—২ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা—১২ থেকে এ, মুখার্জী স্ট্রাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীঅধিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দাম চার টাকা মাত্র।

## কর্মযোগ

উনিশশো পাঁচ সালের বাঙালি দেশের স্বতন্ত্রতা দিনগুলিতে বাঙালীর জীবনযাত্রার যে দলীলদলের প্রত্যয় বিস্তার লাভ করেছে। তাঁদেরই অন্ততম মহান্না অধিনীকুমার দত্তকে স্মরণ করি অধ্যা সঙ্গ। অধিনীকুমারের অনেকগুলি গ্রন্থের মধ্যে ‘কর্মযোগ’ গ্রন্থটি তাঁর শেষ রচনার স্বাক্ষর বহনকারী। আধ্যাত্মিক রচনা অধিনীকুমারের লেখনী শক্তিগর্ভা। যান্ত্র-প্রতিষাংতে ভরা হাজারে ঘটনার অতিবাহিত হয় আমাদের জীবন কিন্তু এই জৈব বাজা চরম উৎকর্ষতা মহান্নুক্তিতে। সেই যুক্তির চাবিকাটি নিহিত আ নিষ্কাম কর্মযোগে। নিষ্কাম কর্মযোগ হাড়া যুক্তির ‘নান্যঃ পর বিজ্ঞেতে অয়নার’। গীতার আলোচনার এই গ্রন্থ পুষ্ট। জোরাত ব্যাখ্যা দ্বারা অধিনীকুমার তাঁর মহাবাহুল্যিক স্রষ্ট কয়েকজন সঙ্গারবাজার পরেই যে বিরাট জিজ্ঞাসা লুকিয়ে আছে সকল মধ্যেই, তাইই সমাধানের পথনির্দেশ পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। ব সাহিত্য সঙ্গর, ১০ জামাচরণ দে স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছে শ্রীঅমির বসু। দাম দু’টাকা মাত্র।

## পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

বহু গুণীজ্ঞানী-জনসঙ্গলাভ-গুণা বসিক পুত্র অমল হো রবীন্দ্রনাথেরও সারিখলাভ করেছে নানা ভাবে, নিবিড় ভাবে স করেছেন তাঁর সঙ্গে। সে কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখার তি বিধার্ঘ্য অবিকারী। এই গ্রন্থের মধ্যে রবীন্দ্র-চরিত্রের নানা দি কাহিনী, আলোচনা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। পরিচ্ছ গুলির নাম থেকে পাঠকের এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। নামর্গি বধ্যাক্রমে এইরূপ—পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, কেরাণী রবীন্দ্রনাথ জালিদানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠি, শবৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি চিঠি ও সাপ্তাহিক বই সমালোচনা প্রথম সংস্করণ স্বল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়া পরিবর্তিত আকারে বিস্তারিত সম্বরণ প্রকাশিত হ’ল। কবি কয়েকখানি মূল্যবান চিত্রও সংযোজিত হয়েছে এই সম্বরণে ছাপা উচ্চাঙ্গের এবং সাজসজ্জা দেখে বিস্তারিত প্রকাশিত গ্র ব’লে ভ্রম হয়। গ্রন্থখানি রবীন্দ্র ভক্তদের বহু নতুনদের আশ্রয় দা সুখী করবে। প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভে লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ২৫।

## মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের বহিষ্ঠ সম্পর্কে আগার সোতা বীদের হয়েছে মৈত্রের দেবী তাঁদের অন্ততম। বিভিন্ন দৃষ্টিক থেকে কবিগুরুকে দেখলে দেখা যায় তিনি নানারূপেই প্রতীয়মান এই গ্রন্থে কালের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্ট করে তুলেছেন মৈত্রে দেবী। চিরবিদ্যারের করেক বছর আগে কবিগুরু মংপুতে করেছিলে পলাপণ। এই সময়েই লেখিকা রবীন্দ্রনাথকে আরও নিবিড়তা দেখার সুযোগ পেয়েছেন। মংপুতে থাকাকালীন কবিগুরু দৈনন্দি আচার ব্যবহার-সঙ্গাল এই গ্রন্থের উপজীব্য। কবিসঙ্গার মধ্যে একটি শাশ্বত মানবসঙ্গাৎও বিশেষ স্থান ছিল সেই রূপটিকেই হু

কাল নরম  
মসুন  
কেশের  
জন্ম



কেএমপি  
ব্র্যাণ্ড  
নারিকেল তৈল



পার্বিত্রি হিন্দু অয়েল মিলস  
১ মেছুয়া বাজার স্ট্রীট-কলিকাতা-৭

তুলতে মৈত্রী দেবী ভৎসন। স্নেহের বিষয়, এখানে তিনি সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছেন। প্রতিটি স্বীকৃতিস্বরূপ তথা সাহিত্যপ্রিয় পাঠক-পাঠিকার কাছে এই গ্রন্থের বোণা সমাধার হোক। ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা—ও থেকে প্রজ্ঞা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীতরুণ বোম্ব। দাম হ' টাকা মাত্র।

### SNAKE BITE

সর্পাঘাতের ভীততা সৰ্ব্বত্র কাউকেই নতুন করে বোঝাবার কিছু নেই। অতীতের পৌরাণিক যুগ থেকে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক যুগ পর্যন্ত রীতিমত একটি আতঙ্কের আসন অবিকার করে আছে এই সর্প-বংশন। এই সর্প-বংশনের প্রতিকার কি ভাবে সম্ভব, তাইই একটি সুবিস্তৃত আলোচনা পরিবেশিত হয়েছে উপরোক্ত গ্রন্থটিতে। সর্প-বংশন এবং তার চিকিৎসা সৰ্ব্বত্র অনেক খুঁটিনাটি তথা গ্রন্থটির শোভাবর্ধন করেছে। বাঙালার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থের ব্যাপকপুস্তক সমাধার ঘটক, এই কামনা করি। লেখক ও প্রকাশক—শ্রী পি, ব্যানার্জী, মিহিঙ্গাম, (বিহার)। দাম—পাঁচ টাকা।

### স্বাধীনতার আবোল-তাবোল

নির্ণয় হ'লো বছরের পরাবীনতা অতিক্রম করে ভারত লাভ করেছে স্বাধীনতার আশার। শত শত সন্তানের আশ্বাসসর্গ সফল হ'ল, লক্ষ লক্ষ মানবের পরাবীনতার বিরুদ্ধে অভিযান সার্থক হ'ল, বিপ্লবের দরবারে মন্ত্রণার অঙ্গুরের আবরণও হ'ল কলসবতী কিংবা এই স্বাধীনতা তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিল না। নিখুঁত হ'ল না তার রূপ, অনেক কিছু অভাব বরং গেল সেই রূপায়ণে। স্বাধীনতা আসার সঙ্গে আর বাসেও আসার প্রয়োজন অদৃশ্য তারা এল না, সেই সবাই এখানে লেখকের আলোচনা। বাসের অভাবে স্বাধীনতা আজ নিজের মর্যাদা হারিয়েছে বহু পরিমাণে, সেই সংক্রান্ত আলোচনাটি এ গ্রন্থের উপজীব্য। কোটি কোটি লোকের জীবন-মরণের প্রশ্ন যেখানে নিহিত সেখানে সেই সংক্রান্ত আলোচনাগুলো একটু গভীর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্বাধীনতাকে আবোল-তাবোল আখ্যাটা না দিলেই যেন ভালো হত। ভবুও গ্রন্থটি বখোঁ মূল্য বহন করে এক যে অভাব লেখককে বিচলিত করেছে, সেই অভাব আজ ঘরে ঘরেই

বিভ্রম। দেশের সত্যিকারের উন্নতিকল্পে লেখক বা আশা করেন তা সম্পূর্ণরূপে কলসবতী হোক, এই কামনাই করি। লেখক—সুনীলকুমার গুহ। পি ৫২১ হালা বসন্ত বায় বোড, কলকাতা-২১ থেকে লেখক নিজেই প্রকাশ করেছেন। দাম চার টাকা মাত্র।

### বনভূমি

বাঙালী সাহিত্যের অগ্রদূতের পাঠক-পাঠিকার কাছে বিমল করে নাম আজ আর কারো অজানা নেই। জোয়ালো বস্ত্রবোর দ্বারা সংসাহিত্য সৃষ্টি করে বিমল কর আজ নিজের আসন দৃঢ় করে নিয়েছেন। পূর্ব মধ্য প্রদেশের একটি ছোট রেলওয়ে ষ্টেশনকে মুখ্যত কেন্দ্র করে বনভূমির পটভূমি বসিত। আগাগোড়া বচনাটি বিচিত্র ভাষার লেখা। পূর্ণশব্দ-বনলতার চরিত্র সত্যিই প্রত্যেকটি পাঠকের মনে জাগার কল্পনা। সমস্ত লাম্পটা, দুরাচার ছাড়াও পূর্ণশব্দের মধ্যে আছে একটি সুস্থ মানবতা, সেইটাই মূল্য হয়ে ওঠে এক-এক সময়ে। হেমন্ত বাবু চরিত্র অপরূপ দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন বিমল কর। এই চরিত্রটি সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার প্রতীক। ১৭৭ এ আগার সাকুলার বোড হ'ল রিবেলী প্রকাশন থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীকানাইলাল সরকার। দাম তিন টাকা।

### সংকলিতা

অনেকগুলি নানা ধরনের কবিতার সংকলন। বিভিন্ন বিদেশী কবির অমূল্যকবিতাও আছে কতগুলি। গ্রন্থকার মণ্ডন চট্টোপাধ্যায় কীর্ত্তিন নানা মাসিক সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রিকার মধ্যে যে রস ছড়িয়ে এসেছেন, এই গ্রন্থখানির দ্বারা কায়রসশিপাস পাঠক তা একত্রে পেয়ে যুগি হবেন। অবিকাল কবিতার মধ্যেই কবির হৃদয়ধূঁষা ভাববৈচিত্র্য ও অন্তর্দৃষ্টি লক্ষণীয়। ছাপা, বাণী ও কাগর উত্তমের এবং প্রচ্ছদপটে পরিকল্পনাও উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানির নামকরণ করেছেন, শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক—এম, সি, সরকার আণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা ১২। মূল্য ৪/-

## সে মেয়ে ছিল তো সবই

হালডার লাল্লেনস

সে মেয়ে ছিল তো সবই—যা তোমার ভালবাসা আর অশেষ্য, যা কিছু পাওয়ার ক্ষমতা ব্যাকুলতা, অগণনা তোমার মনের। তুমি তাকে শুনিবেছ হৃদয়ে গান তোমার সকল মনোবায় শিখিয়েছ হে স্তবর, সব কিছু শ্রদ্ধা-সম্মানের।

এক তাসেরই নিয়ে আমরা দু'জনে বেঁচেছিলাম নিশাপাণ  
যে সত্যের—থও, ছিন্ন পৃথিবীকে বাঁধে সমবায়;  
কপজীবী আমোদের নাটকের থেকে  
আনন্দের পবিত্রমধুর প্রত্যাবার।

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

আমি যে পেয়েছি পুঁজে তোমার মনের মণিকোঠার লুকানো  
সত্যের এবং পূর্বদৃষ্টির কোরকগুলি ঠিক;  
এ পাখির জীবনের এবং জ্যোতির  
যা কিছু হু-উত্থম—ভায়েই প্রতীক।

# রঙ্গপট



## তাসের ঘর

বিশ্ববিখ্যাত গঠনশীলার পরিপূর্ণতা ময়ূষ্য সৃষ্টিতে ও তাসের বখাযোগ্য স্থানে সাহায্যনেই সেই সৃষ্ট-বৈচিত্রের বিকাশ। বাক্য বোধানটিতে মানায় তাকে ঠিক সেইখানটিতেই তিনি বসিয়েছেন। কিন্তু মানুষের চিত্ত চিরদিনই অপূর্ণ। চাওয়ার নেশা তার ভাঙে না কোন দিন। সকল সময়েই সে ভাবে যে 'ওর জীবনযাত্রার মত আমারটি হলে ভাল হত'। ইচ্ছা তার পূর্ণ হয়— পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারে যে পরমশিতার উপর কলম চালানো গুরুত্ব ছাড়া কিছুই নয়। এই সত্যের ছায়া গ্রহণ করে অজয় ও বিনয় নামক দু'টি যুবককে কেন্দ্র করে বাসবিহারী লাল রচনা করেছেন 'তাসের ঘর'-এর কাহিনী। প্রথম জন বৈভব-বিমণ্ডিত, প্রচুর বিস্তারিত, বিস্তারিত জন বিস্তারিত, নিঃস্ব, মৃদু-অভিলাষী। একটি বড় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশে দেখা হয়ে গেল দু'জনে, দু'জনের মধ্যে বিনিময় হ'ল পারস্পরিক জীবনযাত্রার। এর প্রধান সহায়ক হ'ল উভয়ের মধ্যে আকৃতির অসুত সৌন্দর্য্য অর্থাৎ অসুত হয়ে গেল



'পথে হ'ল দেবী' (প্রথম পূর্ণাঙ্গ পেভাকলারে তোলা বাঙালি ছবি)  
একটি দৃশ্যে ছবি খিলা ও সুরিলা সেন

বিনয় ও বিনয় হয়ে গেল অজয়। তারপর নানা ঘটনার সমাবেশ হান্তরস পরিবেশন। শেষে বিনয়ের দ্বারা উভয়ের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন। অজয়কে ভালবাসত বেবা, কিন্তু অজয় তার ডাকে সাড়া দেয় নি, তাকে মন দিল বিনয়, অসম্মার বেলাতেও তাই— সে চেয়েছিল বিনয়কে কিন্তু বিনয় তাকে চায় নি, তাকে চাইল অজয়। কথা হচ্ছে যে, প্রথমেই প্রায় জাগে যে এই কাহিনী বাস্তবতার সমর্থন পায় কি না। বস্তুতঃ পক্ষে ঠিক হবছ চেহারার মিল কি পাওয়া যায়, সৌন্দর্য্য থাকে? এককে দেখে অজয় বলে ভ্রমও হয় কিন্তু তাই বলে দিনের পর দিন একজন আরেকজন সঙ্গে কাজ চালায় কি করে? তবে অজয় ও বিনয়ের পারস্পরিক অন্তরঙ্গ নিযুক্তভাবে ছবিতে ফুটে উঠছে এবং কাহিনীর সাফল্যতা হয়েছে অনেকখানি সহায়ক। হেমন্তকুমারের কণ্ঠে পাওয়া প্রখ্যাত কবি বিমল বোমের লেখা 'শূন্য ডানা মেল, পাখীরা উড়ে গেলে, নিখুম চরাচরে তোমারে খুঁজে মরি।' গানটি একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অভিনয়ে বৈত ডুমিকার অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন উত্তমকুমার; এক সঙ্গে দু'টি বিভিন্ন ধরণের চরিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অথচ একটির মধ্যে আরেকটির ছাপ পড়ে নি। এইখানেই তাঁর সমধিক কৃতিত্ব। মিথুর কলম-কাতর অসহায় চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে সবিভী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়-নৈপুণ্যে। আদর্শের পায়ে নিবেদিত প্রকাশ্য কর্তব্যনিষ্ঠ অথচ কোমল রূপটি দর্শকমনে রেখাপাত করতে সমর্থ হয় রবীন্দ্র মজুমদারের অভিনয় দক্ষতার। দেবদাসীর অভিব্যক্তিহীন অভিনয় ঠিক বুদ্ধি করা তোতা পাখীর উজ্জ্বল মত। ২২৪ চক্রবর্তী পরিচালিত এই ছবিটিতে সবিভী চট্টোপাধ্যায় যেন ভূমি করে একটুখানি ভাল অভিনয় করে ফেলেছেন, তাঁর মত অভিনেত্রী যেটুকু ভাল অভিনয় করতে পারেন সেটুকুই আশার কথা। প্রাণন কবি, তাঁর অভিনয়ের যেটুকু উন্নতির স্বরূপাত হ'ল তাসের ঘর সেটুকুই যেন ক্রমশঃ বীরে বীরে বর্ধিত আকারে পরিণত হয়। জহ গঙ্গোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, ডাঃ হুসেন, মাঃ তিলক চন্দ্রা দেবী, অপরী দেবী, বাণী গঙ্গোপাধ্যায় স্ব স্ব ভূমিকায় স্বঅভিনয় করেছেন। এঁরা ছাড়া রূপায়ণে আছেন নবাবগতা শেখার নায়ক, স্বরূপ যুগোপাধ্যায়, শৈলেন যুগোপাধ্যায়, শ' চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, মণি শ্রীমানী, প্রেমতোষ রা ও শ্যামপুত্র খানার ও, সি শ্রীঅনিল সরকার প্রভৃতি তাসের ঘর ছবিটির মূল নাম ছিল 'বিনিময়'। নাম বোধ হয় ঠিকই ছিল, কেন যে বদলানো হল বোঝা গেল না ছবির একেবারে শেষের দিকটি কিন্তু পরিচালক সহজভাবে বোধগম্য করে উপস্থাপিত করতে পারেন নি। আর এক সহজ করে এঁ জায়গাটি দেখালে ভালো হোত।

## নীলাচলে মহাপ্রভু

ছবির নামকরণেই বোঝা যায় যে, কাহিনীর পটভূমি বাঙালি নর, দুই নীলাচল অর্থাৎ উৎকল এবং কাহিনী নায়ক স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য। সোয়া চারপ' বা আসের কথা। যেদিন বর্ণবৈবর্ম্যে নীলাচল ভরপুর, ব্রাহ্মণ আদ্যের বেদিন ব্রাহ্মণের অঙ্গ, অজ্ঞাতারে পীড়নে নৃত্য ন অজ্ঞাতনের প্রাণ অধিক্ত, সেই সববে সময়েই বাণী বহন ব



বাঙলা থেকে নীলচলে পলপর্ণ করলেন নবদীপঞ্জে চীঠেতজ। তাঁর চরণপ্রান্তে সেদিন গরমানেই ঠাই পেল সর্বহারার দল। মহারাজা বণকজ্ঞে, মহামন্ত্রী চক্রান্ত করে মহারাজকে নিহত করে মুক্ত সিংহাসনে নিজে বসতে চান। জীবন্ত জগন্নাথকে দেখে তাঁর চরণে আকুলনিবেদন করে থকা হল দেবদাসী, বিনি মহামন্ত্রী দ্বারা নির্যাত্তিতা হয়েছিলেন গৌরাঙ্গকে অস্ত্র উপায়ে পরিতুষ্ট করে লোক সমক্ষে তাঁকে হের করতে। তাঁর ব্যর্থতা দেখে মহামন্ত্রী তাঁকে বধন চরম দণ্ড দিতে উপস্থিত, সেই সময়ে নাটকীয় ভাবে মহারাজার আবির্ভাব ও সকল দুর্বোপের সমাপ্তি। মহারাজাও চৈতন্তের প্রতি অবিখ্যাসী বইলেন, শেষে বধগাত্রার দিন মহারাজ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করলেন চৈতন্তের চরণে। এর পর মগপ্রভুর স্বদেশে আগমন, মাতা-পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। পুনর্বার নীলচলে গমন ও অসীমের মধ্যে বিলোমমান হওন। ভক্ত দর্শকের চিত্ত এ ছবি অধিকার করবে সন্দেহ নেই। সমগ্র উৎকলবাসীর মহাপ্রভুকে বরণ করে নেওয়া বাঙালীর প্রাণে নতুন করে পঞ্চ চলার প্রেরণা জোগাবে। বিবৃত অত্যন্তক বর্ধমানের বৃক জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা সকল সময়ে প্রাণসার যোগ্য। পরিচালনার খুঁচ চোখে পাড়ে প্রথমার্শে জগন্নাথের মন্দিরে চৈতন্ত অষ্টচৈতন্ত হয়ে পড়ার আগের সুহৃৎ অবধি দেখা গেল মন্দিরের অভ্যন্তর একেবারে নির্জন অথচ তিনি পড়ার পরমুহূর্তেই যে গালা-গালা লোক বাগা দিতে এগিয়ে এল তার কি দেওয়াল ভেদ করে এসে? কুঠমোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলুম তেউ মহাধ্বজলকার পর্বত দিয়েছেন, ভেবে দেখুন এ কি সম্ভব? বৃঠরোগীকে বধন নিরোগ করলেন গৌরাঙ্গ, সেই সংবাদ সার্বভৌমের কাছে পৌছল না কেন? চৈতন্তের যে শোভাবাত্রায় সার্বভৌম পর্বত অংশগ্রহণ করলেন সেই শোভাবাত্রায় মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ ভক্ত গৌপীনাথ অল্পপাঙ্কিত কেন? মহারাজা প্রতাপরুদ্রের মাধার মুকুট অমন সুসলমান নবাবদের মত কেন? মহামন্ত্রী বিজ্ঞাথের রাড়ি দেখে তাঁকে নীলচলবাসীর পরিবর্তে শিখ বলে মনে হয়। অভিনয়ে অপূর্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন নবাবগত নট অসীমকুমার। সমগ্র চিত্রশিল্পির গৌরব বর্ধন করেছে তাঁর ভাবগভীর শান্ত সযত শঠী অভিনয়। প্রথম আবির্ভাবেই দর্শকচিত্ত বিপুলভাবে নাড়া দিয়ে গেলেন অসীমকুমার। তাঁর ভবিষ্যতের কল্যাণ কামনা করি। যৎসামান্য আবির্ভাবে ঈশানকে জীবন্ত করে তুলেছেন কান্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, বীরেশ্বর সেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন ঘোষ, মলিনা দেবী, শিখা বাগ স্ব ভূমিকাগুলি শ্রষ্ঠ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'সুমিত্রা দেবী' ও দীপ্তি রায় দু'জনেই চরিত্র দুটির বর্ধার রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন, এদের অভিনয় পরিতৃপ্তি দেয়। বার্ষ হয়েছেন পদ্মা দেবী ও সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথমদিক অভিনয়ে মহারাজীর পরিবর্তে মনোহারিণী বলে মনে হয়, রাণীর ব্যক্তিত্ব এতটুকু তার মধ্যে নেই, রাজার অগাধ্য অল্পহুঁহুতারই একজন বলে তাঁকে মনে হয়। থিতোরায় অভিনয় সম্পূর্ণরূপে জড় ও আড়ষ্ট ও অভিব্যক্তহীন। এখনও তাঁর রীতিমত সাধনায় দরকার। কুচক্রীর রূপটি শ্যাম ভট্টাচার্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে এ কথা অস্বীকার করা

যায় না; তবে মাঝে মাঝে তাঁর সেই 'টেন-টেনে' কথা বলা দর্শকচিত্তে রীতিমত বিরক্ত উৎপাদন করে। এরা ছাড়া রূপায়ণে আছেন হরিমোহন বসু, কৃষ্ণধন মুখো, হরিধন মুখো, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টো, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ, সমীর মজুমদার, পারিজাত বসু, প্রেমতোষ বার, শৈলেন মুখো, প্রীমান তিলক, জাননা কাকোতি, আয়তি দাশ, স্বকৃতি সেনগুপ্ত ইত্যাদি।

### সূরের পরশে

একটি থিয়েটারকে কেন্দ্র করে গল্প। স্বনামধন্য অভিনেতা পরশ বার মৃত্যুকালে তাঁর 'নাট্যজী' থিয়েটারের ভার দিয়ে বান তাঁর মেয়ে মনোবাকে। ঘটনাটিকে মনোবাকে হাফে অবতীর্ণ হ'তে হয় ও পরে নাট্যকার কল্যাণ সেনের সঙ্গে নানা বিরোধের মধ্যে দিয়ে প্রেম গড়ে ওঠে শেষে সর্বস্ব ত্যাগ করে কল্যাণের জীবনে নিজেকে মিলিয়ে দেয়। এই হ'ল গল্প। একটি দুর্বল গল্প ও নিরেশ পরিচালনা ছবিটিকে বার্ষ করে দিয়েছে। ভালকানার মত পরিচালনার বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কয়েকটি দেওয়া থাক। মন্ত্রশক্তির অভিনয়ে বাণীকে দিয়ে যে পচ্ছিন্ন পগানো হয়েছে ও যে ভাবে নাট্যনো হয়েছে তাতে করে সন্দেহ হয় যে 'মন্ত্রশক্তি'র কাহিনীটি এদের জানা আছে কি না। 'সূরের পরশ' নাটকটির মঞ্চাভিনয়ের বস্তুগুলি অংশ দেখানো হ'ল তা অস্বাভাবিক নয় কি? ছবিতে বস্তু দুটিনাটি দৃষ্ট দেখানো যায় মাকে তা কিছুতেই যায় না—কবির দণ্ডাজা থেকে মুক্তি পর্বত খুব জোর তিনটি দৃষ্ট দেখানো যেতে পারে, তার বেশী কিছুতেই নয়। সাধারণতঃ একটি থিয়েটার সাড়ে নটা নাগাদ ভাঙে, তার সাজসজ্জাদি খুলতে ও হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হ'তে আরও অন্ততঃ মিনিট পনেরো সময় যায়, এখানেই শোণে দশটা; এ ছবির নায়ক তখনও যে কি করে দশটার ট্রোপে বিদেশবাত্রার আশা রাখে সেইটাই ভাববার কথা। থিয়েটারটি দেখলুম 'প্রমীলা রাজ', অভিনীত নাটকটিতে পর্বত।



প্রতিভা বহুদর্শী 'পঞ্চ হ'ল দেবী'র একটি দৃষ্টে উত্তম, অচিহ্ন,

প্রচার—স্ববীয়েজ সাতাল

সব থেকে চোখে লাগে যে মুহূর্তপাখার পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সেই সত্যের অপলাপনা। যে সত্যকে বজায় রাখতে সহস্র বাধা সম্মুখে মনোবা নিজে অভিনেত্রী হ'ল, সেই মনোবা মুহূর্তের আবেগে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে ভিন্ন জীবন গ্রহণ করে বসল এবং রীতিমত সে সবে গেল মঞ্চজগত থেকে। এমনও হতে পারত যে মনোবা সবে গেল বটে ভবে যে মৃত পিতার থিয়েটারটিকে চালু রেখে গেল কিন্তু এ ধারণার মূর্ত প্রতিবাদ কাহিনীর বক্তব্য। আমরা দেখতে পেয়েছি যে মনোবাই থিয়েটারের প্রাণ। সে চলে গেলেই থিয়েটার নিশ্চয়। রা সবই বুঝতে পারলেন অচট মেয়ে কোথায় যাচ্ছে একবার প্রশ্ন পূর্ব করলেন না। তিনি কি একজন ষোণিত্রী যে সব কিছু গণনার আগে থাকতে জেনেছিলেন? আদর্শবাদী সাহিত্যিককে এখানে যে ভাবে দেখানো হয়েছে ও যে সংলাপ তাঁকে দেওয়া হয়েছে এ জিনিষ প্রায় তেরো বছর আগের 'উদয়ের পথেরই' একরকম অল্পকরণ বললে ভুল হয় না। অভিনয়শে উত্তমকুমার ভাল অভিনয়ই করেছেন, ছবির প্রায় মধ্যাংশে তাঁর আবির্ভাব আর ধরতে গেলে তাঁর আসার পর থেকেই যেন ছবিটি কিছুটা আকৃষ্ট করে দর্শক সাধারণকে। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সাতাল, নীতীপ মুখো, কালী বন্দ্যো, অম্বকুমার, জীবন বসু, সত্য বন্দ্যো, সলিল দত্ত, জীমান্ন বাবুয়া, অর্পণা দেবী, যমুনা সিং প্রত্যেকেরই অভিনয় বর্ষাধ চরিত্রাভিনয়ই হয়েছে; তবে মালা সিন্ধা মনোবার রূপটি ছুটিয়ে তুলতে পারেন নি, দর্শককে মোটেই আকৃষ্ট করে না তাঁর কৃত্রিমতাপূর্ণ অভিনয়। অবশ্য ছানে ছানে তাঁর অভিনয় অত্যন্ত সাবলীল হয়েছে স্বীকার করতেই হবে, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মনে হচ্ছে যে তিনি কায়দা-কসরতের দিকেই অধিকমাত্রায় বস্তুশীল। 'পূর্ববধূ'র মালা সিন্ধার কাছে, আমরা এ জিনিষ আশা করি নি।

## রূপট প্রসঙ্গে

চলচিত্র ও পঙ্কতপার মাধ্যমে দর্শক সাধারণ আন্তরিক মুখোপাখ্যায় ও অসিত সেনের প্রতিভার পেয়েছে আশ্বাস। এঁদের আগামী অবদান 'জীবনভূষণ'। সঙ্গীত পরিচালনার ভার পেয়েছেন ডক্টর জুপেন হাজারিকা। রূপায়ণে দেখা বাবে পাহাড়ী সাতাল, বিকাশ রায়, উত্তমকুমার, সুনন্দা দেবী ও সুরজিত সেনকে।

### ‘মুখোশে’র নিবেদন—

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

বহুজন প্রশংসিত সামাজিক নাটক

## ধৃতরাষ্ট্র

আগষ্ট মাসের প্রতি শনিবার

সন্ধ্যা—৮.৩০ মি:

### থিয়েটার সেন্টার

৩১এ, চক্রবেড়িয়া রোড, সাউথ কলিকাতা—২৫

ফোন : ৪৭-৩৫৫৫

প্রবেশ মূল্য—৫০, ৩৫০, ২৫০, ১২৫

জয়াসক্দের 'লৌহকপাট' বাউলার বিদগ্ধমহলে একটি আদৃত গ্রন্থ এটি পরিচালনা করছেন খ্যতিমান পরিচালক তপন সিংহ। অভিনয়ে মালা সিন্ধা সহ দেখা বাবে ছবি বিশ্বাস, কল্ল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীগণকে। ...তত্ত্ব সাহিত্যিক অনিলবরণ ঘোষের 'বসন্তবাহার'কে চিত্রিত্ব দিচ্ছেন অভিনেতা-পরিচালক বিকাশ রায়। সঙ্গীতে সমৃদ্ধ এ চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনার ভার পেয়েছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীতে আর গ্রহণ করবেন ভারতবর্ষে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ, আমীর খাঁ হীরাবাদি বরকেকার, কণ্ঠস্বরাভাষ, সাগিন্দ্রান, শান্তাপ্রসাদ, মাণিক বর্মা, প্রমুখ বন্দ্যো, মানবেন্দ্র মুখো, এ কানন, সন্ধ্যা মুখো, কবির বন্দ্যো প্রভৃতি। পদ্য দেখা বাবে পাহাড়ী সাতাল, নীতী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরী, নীলক মুখোপাধ্যায় জীবন বসু, বিগত দিনের খ্যতিমান অভিনেতা প্রতাপ মুখোপাধ্যায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিজী চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দা দেবী, অর্পণা দেবী নবাসতা জীলা চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা দাস, মারা ভট্টাচার্য এ যোশনকুমারী প্রমুখ শিল্পীদের। ...মশি ঘোষ ও সুরজিত অমল দত্ত পরিচালনার চিত্রায়িত হচ্ছে কড়ি ও কোমল। জুপেন হাজারিক সঙ্গীত পরিচালনার এই ছবিতে দেখা বাবে ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, রবীন্দ্র মজুমদার, প্রবীন্দ্রকুমার, জীবন বসু, প্রতাপ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রী চৌধুরী, ভারতী দেবী, সবিজী চট্টোপাধ্যায়, কম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীদের। ...জনপ্রিয় তারকা উত্তমকুমার বর্তমানে প্রযোজক। তাঁর প্রথম প্রযোজিত ছবি 'হারানো সবার কাহিনী' রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বর্ষাক্রমে নৃপেন্দ্র ও হেমন্তকুমার। অজয় করের পরিচালনার এই ছবিতে আরও পেয়েছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সাতাল, বিকাশ রায়, উত্তমকুমার নীলক মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রা দেবী, সুরজিত সেন, কাজলী ওহ প্রভৃতি প্রযোজনার ক্ষেত্রে উত্তমকুমার সাফল্য লাভ করুন ও তাঁর ব চিত্রজগৎ আরও উপভূক্ত হোক, এই কামনা করি।

## চলচিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

### সৌন্দর্যময়ী অভিনেত্রী সুমিত্রা দেবী

তুমি বাংলা নয়, বাংলার বহির্জগতকেও একই সঙ্গে বি করেছেন সৌন্দর্যময়ী কুশলী অভিনেত্রী সুমিত্রা দেবী। একটি মাত্র অভিবাহিত হয়েছে তিনি চিত্রজগতে এসেছেন কিন্তু অভি প্রতিভা ও অভিনয়-দক্ষতার কী বিশিষ্ট ছাপই না রাখতে পার এয়ই ভেতর। রূপশীল পরিবারে তাঁর জন্ম—রূপশীল পরিবে তাঁর বাংলাবনের শিক্ষা ও দীক্ষা। স্বাভাবিক অবস্থায় নি এ লাইনে আসবেন এ বোধ হয় কল্পনার বিষয়ও ছিল না। 'জীমতী' সুমিত্রার যিচ্ছাহী মন—চলিত সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা—এ ছিল বলেই এ লাইনে আসতে তিনি বাধা পেলেন আর এসে যখন পড়লেন তখন দেখা গেল তিনি প্রথম যে একজন সার্বিক শিল্পী, বাংলার চলচিত্রজগত তাঁকে পেয়ে লাভবান হয়েছে অনেকখানি।

শিল্পীদের মতামত জানতে গিয়ে বহু শিল্পীর সম্পর্কে এ

এ বাবৎ, নোভুন নোভুন অভিজ্ঞতাও লাভ করেছি প্রচুর। শিল্প-চাকুর্য ও অভিনয়ে ধীরে ধীরে সমাজের চিত্তবিনোদন করে থাকেন দিনের পর দিন, তাঁদের জীবন-বৈচিত্র্য, রূপালী পর্দার বাইরে যেখানে তাঁরা আমার আগুনাই মত বস্তুমানের মাস্তুল, সেই কাহিনী পাঠক-পাঠিকারের সামনে উপস্থাপিত করে আসছি কত কাল থেকেই। এবারে বাংলার অস্তিত্বা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী স্মিত্রা দেবী মতামত সংগ্রহ করে পরিবেশনের তাগিদ অনুভব করলুম প্রত্যক্ষ আসাপ মালোচনার মাধ্যমে।

বালীগঞ্জের কেয়াতলা লেনের একটি প্রকাণ্ড ফ্লাট বাড়ী। শ্রীমতী কানন দেবী ও তাঁর স্বামী বন্ধুর স্বনামধন্য পরিচালক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্যের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন আগ-ভাগেই স্মিত্রা দেবী এখানেই থাকেন। কলকাতার দক্ষিণ গ্রোয়ের একটি মিনে বধ্যাক্ত কলেবরে হাজির হলুম দেখানে। চার তলার ফ্লাটে যেখানে শ্রীমতী স্মিত্রা থাকেন, ঐ স্থানে তাঁর ডইংরুমে আমাকে নিয়ে বসান হলো। চমৎকার ঘরখানি—চারদিকেই দেখতে পেলুম শিল্পীদের নানা নিদর্শন ছড়িয়ে। কবিত্ব রবীন্দ্রনাথের একখানি বৃহৎ আলোখা ঘরখানির শোভা বৃদ্ধি করেছে অনেকখানি, পরিবেশকেও করে তুলেছে বেশ মিলিত শান্ত ও সমাহিত। ভাবলুম, মালোচনার ক্ষেত্রে প্রণয় হ'লে আছে এইখানে আপনা থেকেই।

“১৯৪৪ সালে নিউ থিয়েটার্স-এর হিলি ছবি ‘মেরি বহিন’ এবং বাংলা ছবি ‘সন্ধি’—এ দুখানি ছবিতে আমি প্রথম আত্মপ্রকাশ করি। তারপর এক বছরের মধ্যে বহু ছবিতে এবং বহু বিশিষ্ট ভূমিকার আমার অভিনয় চলে আসছে। ‘বানী’ ছবিতে সৌদামিনী ‘সাহেব বিবি গোলাম’ এ পটেশ্বরী বৌ ঠাকুরাণী এবং ‘জীথারে আলো’ ছবিতে নারিকার ভূমিকার অভিনয় করে আমি তৃপ্তি পেয়েছি তুমতামূলক ভাবে অনেক বেশী। এর বিশেষ কারণ জটিল চরিত্রে রূপশ্রমই সাধারণতঃ আমার আনন্দ। একটি ছোট হিলি ছবিরও নংম করবো আমি যেমন ‘মশাল’ ও ‘ময়ূরগন্ধ’ (বোম্বাইয়ের ছবি) যেগুলোতে অভিনয় করতে যেয়ে আমার তৃপ্তি বা আনন্দ কম হয়নি। এক্ষেত্রে সেই একই কারণ—অভিনয়ের জড় মনের মত কাহিনী ও চরিত্র খঁজে পাওয়া। বলতে কি, যে চরিত্রের ভেতর সাধাত হযেছে অর্থ্যাৎ গেলনা ও আনন্দ, আলো ও জীথারের রয়েছে সন্নিবেশ, বিশেষতঃ যাতে থাকবে একটা বিরোধের মনোভাব, সেখানেই বেন আমি মানানসই, ঐকান্তিক ও সুন্দর। কাজেই সে চরিত্রগুলোতে অভিনয় করতে আমার মোটেই কষ্ট হয় না, পরন্তু মনে আনন্দ ও তৃপ্তি পাই আমি প্রচুর।”

বীরে বীরে বললেন আমার শ্রীমতী স্মিত্রা দেবী এ কথাগুলো আলোচনার সূত্রপাতেই। এর পর আমি করেকটি প্রশ্ন রাখলুম তাঁর কাছে, আমি তুমি, তিনি চললেন বলে।

একটু ছোট প্রশ্ন আমার—চলচ্চিত্র-জগতে আপনার বোগদানের কারণ কি?

—এ লাইনে কেন এগুম, সে কথা আজ আর বলে লাভ কি? তবে এটুকু বলতে পারি, চলচ্চিত্রে আমি বোগদান করবো, এ বাৎশা আমার কোর দিনই ছিল না। ঘরে নিন, নিজক ব্যক্তিগত কারণেই এ লাইনে এসে পড়ছি আমি। আমাদের Familyতে আমিই first এর সেরা জরি আমিই last. একটা কথা না হয়ে

পারবো না, হয়তো বা এইটাই আমাকে এ লাইনে আসতে প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে, ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের উপর একটা সহজাত টান ছিল আমার। মনে পড়ছে, পুজোর সময় আমাদের বাড়িতে অভিনয় হ'তো প্রতি বারই এবং সে অভিনয় আমার মনের উপর অলঙ্কিতে কী প্রভাব বিস্তার করতো! সিনেমা-জগতে আসবার কথা তখন মনে উঠে নি বটে কিন্তু অভিনয়ের একটা নেশা আমাকে বেন ক্রমেই পেয়ে বসে। তুলে এখন পড়ছি তখনই অভিনয় করবার আমি স্ববেগে পেলুম—এবং আর ছুই-একবার সাহায্যের জন্তে অভিনয় করেছি অবত, সে সকল অভিনয় শুধু মেয়েরাই করেছিল। Confidence ছিল মনে বরাবরই—অভিনয় করতে আমি পারবো, কখনই ব্যর্থ প্রমাণিত হবে না।

সামাজিক ও পারিবারিক প্রশ্নের কথা যদি তোলেন, তা হ'লে বলবো, শ্রীমতী স্মিত্রা বলতে থাকেন বেশ সহজ গলায়, ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর প্রথমটায় সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে প্রচণ্ড সংঘাত এসেছিল আমার। বাড়ীর দিক থেকেই আপত্তি ও বাধা দেখা দিয়েছিল অত্যন্ত বড় হ'য়ে কিন্তু আমার মনে কোন প্রশ্ন বা আপত্তি তখনও ছিল না, আজও নেই। সামাজিক ও পারিবারিক দিক থেকেও এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, কোথাও আমি অনাদৃত নই।

—সাধারণতঃ আপনার দৈনন্দিন কর্মসূচী কি এবং বিশেষ hobbyই বা কি আছে? বীর কণ্ঠে স্মিত্রা দেবী বলেন—বোধহেতু এখন থাকি, ভোরবেলাই উঠে পড়ি বুম থেকে, তারপর চা খেয়ে ঘান বসতে বাই—মান শেষে চলে হয় তো আমার



স্মিত্রা দেবী

নাচ দেখা। ইজিপ্তে যেদিন কাজ থাকলো সেদিন সেখানে চলে যাই, আর যেদিন স্ট্রাটিক থাকলো না সেদিন প্রায় সারাদিনই বাড়ীর কাজ-কর্ম দেখি। বিকেলের দিকে হয়তো বেড়াতে বেরিয়ে পড়লুম, ক্রাবে গেলুম খেলা-খেলোও করলুম। ব্যক্তিগত বাড়ী ফিরে এসে কিছুকণ চললো পড়াশুনো বা সংসারের কাজ-কর্ম দেখা। হবি বলতে, গার্ডেনিং, ট্রাভেলিং, ট্যাম্প জমান, রকমারি coin সংগ্রহ—এ ৩৪টি আমার আছে এক এগুলো করে আমি আনন্দ পাই। যখন খেলি, টেবিল টেনিস খেলতেই আমার ভাল লাগে। Swimming করি outing এর দিকেও আমার কৌক কম নয়। আর একটি হবি আমার ছবি তোলা, ছবি তুলতে সত্যি আমার ভাল লাগে।

শ্রীমতী সুমিত্রার বলা তখনও শেষ হয়নি, বললেন তিনি—পড়া-শুনোর অভ্যাসটা এখনও রয়েছে কি না যদি বলতে হয়, বলবো—এটিও প্রায় আমার একটি হবি, কাজেই ছাড়তে পারিনি। এ অভ্যাসটি আভও। সাহিত্য ও Drama এপেলেই আমি পড়ে থাকি। আধুনিক নামকরা সাহিত্যিক ও নাট্যকারদের রচনা মোটামুটি ভালই লাগে আমার। বর্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে বাগ্যবর ও সৈয়দ হুজুতবা আলি সাহেবের লেখা আমার ভাল লাগে। সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলোর আমি একজন নিয়মিত পাঠিক। ‘মাসিক বহুমতী’ আমার বেশ ভাল লাগে। এর প্রধান কারণ এর ভেতরে ভাল ভাল গল্প ও অদ্ভুত উৎকৃষ্ট রচনা থাকে যা পড়তে বের মনের আনন্দ হয়।

পৌষক-পরিচ্ছদ সবকিছু আপনার নিজস্ব মতামত কি?

সুমিত্রা দেবী উত্তর করলেন—সব তারার—পৌষক-পরিচ্ছদ simple হওয়াই ভাল, তবে সেটা artistic হতে হবে। সোজা কথার সব কিছুই ভেতরই একটা সামঞ্জস্য থাকে। ড্রেস বটটা light colour এর উপর হবে, ততই বোধ করি ভাল।

এর পর চলচ্চিত্র শিল্প সজ্জাত বিশেষ আলোচনার আমন্ত্রণ করে এলুম। এবারে আমার প্রশ্ন—চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি গুণ না থাকলে নয়?

সর্বপ্রথমেই বলতে হয়, চলচ্চিত্রে শিল্পী হিসেবে যোগ দিতে হলে আর্ট সবকিছু sense অবিস্তি চাই। proportion ধার ভেতর আছে, দক্ষশিল্পী তিনি হবেনই। বলা বাহুল্য, এ লাইনে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য একরূপ অপরিহার্যগুণেই চাই ভাল চেহারা, সুকণ্ঠ, অভিনয়-প্রতিভা এবং সেই সঙ্গে general instinct.

ভাল ছবির জন্য কি চাই বা কি না হলেই নয়, জিজ্ঞেস করলে আমি না বলে পারবো না, শ্রীমতী সুমিত্রা জোর গলায় বলে চলেন, প্রথমেই চাই ভাল বই—অর্থাৎ ভাল গল্প বা কাহিনী। তার পরেই চাই treatment, ভাল টিম ওয়ার্ক ও নিখুঁত অভিনয়। সর্বোপরি থাকতে হবে পর্যাপ্ত finance বাজে production কখনই hamper না করে। এ সবগুলোর দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে ছবি তৈরী করতে গেলে ছবি ভাল না হয়েই পারবে না, এটুকু আমি বলবো।

ধামতে যেরকম সুমিত্রা দেবী দেখলুম থাকলেন না। বললেন—আর একটি কথা আমি না বলে পারবো না, সে হলো শিল্পের

স্বাস্থ্য সম্পর্কে। স্বাস্থ্য যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই প্রথম সম্পদ বলেই নেই কিন্তু চলচ্চিত্রশিল্পীদের পক্ষে এটি আরও কিছু বেশী স্বাস্থ্য যেখানে ভেঙ্গে পেল, শিল্পীর সেখানেই নৃত্য। বলতে বি শিল্পীদের বেলায় স্বাস্থ্য জিনিষটা খুবই urgent অর্থাৎ এটা দুঃখের যে বাংলা দেশের মেয়েরা এদিকে ততটা ধ্যান দেন না।

চলচ্চিত্রে বাংলাদেশী—বিশেষ করে অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারে ছেলেমেয়েদের যোগদান সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত মতামত কি?

শ্রীমতী সুমিত্রার কণ্ঠে দৃঢ় জবাব—শিক্ষিত অভিজাত পরিবারে ছেলেমেয়েদের এ লাইনে আসতে বাধা কোথায়? আমি তো দেখিনি অদ্ভুত বৃত্তির মত এইটিও একটি গ্রহণযোগ্য বৃত্তি বলেই কথা বিধান। চলচ্চিত্রে শিল্প হিসেবে উন্নীত করতে হলে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদেরই এ লাইনে চাই। বাংলাদেশী ছেলেমেয়েদের প্রসঙ্গে এই একই কথা প্রযোজ্য। এ লাইনে এদের আরও অধিক সংখ্যা থাকা উচিত, একথাই আমি বলবো।

নিজের আয়ের প্রসঙ্গ তুলতে বেরে সুমিত্রা দেবী কোনরূপ জড় না রেখেই বললেন—১৯৪৪ সালে নিউ থিয়েটার্স এ যখন আ যোগ দিই, তখন আমার মাসমাইনে ধার্য হয় আড়াইশো টাকা অর্থাৎ এক মাস যেতে না যেতেই নিউ থিয়েটার্স-এর কর্ণধার সন্ধানী শ্রী বি, এন সরকার সেটা বাড়িয়ে পাঁচশো টাকা করে দেন। ত তাই নয়, আমাকে বোনাসও দেওয়া হলো। এভাবে কোন ছবিতে বেশী পেরেছি বা কোন ছবিতে কম—ঠিক খতিয়ে দেখি নি তবে মনে হয়, বাগ্যাইরের হিন্দি ছবি ‘ভক্ত খুড়ক’ এবং বাগ্য ছবি ‘পথের দাবী’তেই সব চাইতে বেশী টাকা পেরেছি। ১ চাইতে কম টাকা হয় তো শেষ থাকবে বাংলা ‘সিন্ধি’ ছবিতে—কম বলতে প্রায় ৩ হাজার টাকা।

এর পর আমি জানতে চাইলুম সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের ভা কোথায়? এ সবকিছু আপনার নিজস্ব ধারণা বা মতামত কি?

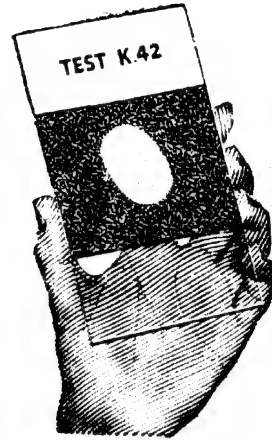
—চলচ্চিত্র একটি বিরাট শিল্প তো বটেই পর্যন্ত এটি এক চমৎকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সমাজ-জীবনের উপর এর প্রভাব অপরিণীম। এর মাধ্যমে সমাজকে উন্নত করা চলে বহুদূর অবধি আমি তো বলবো এটি একটি Powerful medium of teaching.

প্রয়োজনের পালা প্রায় শেষ হ’লে এলো। এর ভেতর বুঝে আমার কিছুমাত্র অববিধে হলো না—শ্রীমতী সুমিত্রা চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। দেখলুম, সিনেমা-জগৎ সম্প্রচার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কয়েকজন তিনি এক ক’বছরের ভেতর—চি করবারও অধিকার রাখেন না যে, কি করে এ শিল্পের উৎসর্গ সা হব, এ লাইনের উন্নতি হবে। একদিন যদি আমরা সুমি দেবীকে শিল্পীর পর্যায় অতিক্রম করে প্রযোজিকা হিসেবে দেখি, দেখতে পাই, তবে বিন্দুমাত্র বিমিত্র হবো না। বরং এ আশাই রাখা পারি পরিবার যে, শিল্পী ও অভিনেত্রীরা তিন-বেশন বনামগ প্রযোজিকার নয়া কৃষিকান্তেও তেমনি হ’তে পারবেন সাধারণ শ্রীমতী সুমিত্রা বেলে কিয়দাংশিষ্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক বহু-শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন কয়েক বারই। শ্রেষ্ঠা প্রযোজিকারূপেও আমরা তাঁকে দেখতে পাবো, এটি নিশ্চয়ই অতিরিক্ত চাওয়া নয়।

# দেখুন!



দন্তক্ষয় নিবারণে  
বিশেষ  
প্রতিরোধক !

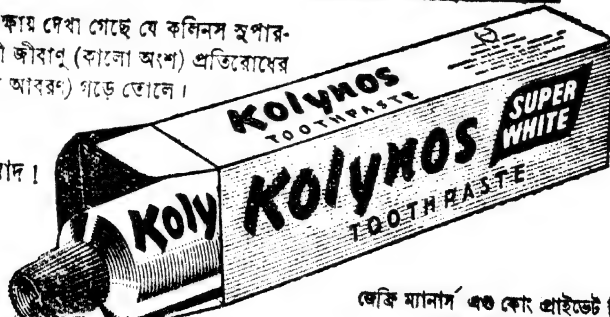


## কলিনস সুপার-হোয়াইট টুথপেস্ট

আপনার হাসির চমক অটুট রাখে

- গবেষণাগারে কে৪২ নম্বর পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কলিনস সুপার-হোয়াইট (সাদা অংশ) দন্তক্ষয়ী জীবাণু (কালো অংশ) প্রতিরোধের প্রাচীর (সাদার চারদিকে ধূসর আবরণ) গড়ে তোলে।

পেপারমিটে-গন্ধী সুশীতল আশ্বাদ।



লক্ষ্য করুন, ক্যাপটি  
ধরবার কত সুবিধে!

CK 4774 A

জেক্স ম্যানার্স এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড  
রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী

## রাজার-রাজার

[ ৩৮৪ পৃষ্ঠার পর ]

ম্যালেট ভালগা জানিয়েছিল নরম সুরে, চৌধুরাণীর দেহটাকে আত্মরিক চেয়েছিল। এ খাঁচার অধিকারী যদি নরদানব হয়!

আনন্দকুমারী ভবিষ্যৎ জানতে চায় না। রাবণের হাতে মৃত্যু! অপেক্ষা রামের হাতে মরণ না কি অনেক সুখের, অনেক আনন্দের।

বজ্রার অধিকারীও দেখতে পেরেছেন অপ্সারানিশিতা মন্ত-কঙ্কাকে। ছাদের ফরাসে লাল ভেলভেটের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তবুও তিনি নিশ্চিন্তার বসেছিলেন, বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত হলেন না।

একজন তাঁবোদার সেবার রত ছিল। দেহ মর্দন করার কাজে। পদসেবার দাম একজন কাছে ছিল। তাকেই ফিসফিসিয়ে বললেন,—হয়তো ভাগ্যবিড়ম্বিতা, আশ্রয়প্রার্থিনী। কি প্রার্থনা জানায় শুনা চাই।

জগমোহন লেটেলের বুকে হস্ত সিংহ জাগলো যেন। বজ্রার ছাদ থেকে নৌকার তীরে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঝাঁপ দেওয়ার পূর্বস্বহৃতে বললে,—কুমারবাহাদুর, আপনায় অহুমানই বর্ষা! দেখি কি বলে।

জন্মে বুক দুবছরিয়ে ওঠে। আনন্দকুমারী ক'বার শিউরে শিউরে উঠলো। ক'হাত শিউরে ঝাঁড়ালো।

জগমোহন বললে,—ঠাকরুণ, আপনি কে? এই জন্মের স্থানে এমন অসময়ে?

অবর ধরথরিয়ে কৈশে ওঠে। ভিক্ষে চোখে অন্ধর আভাস দেখা যায়। আনন্দকুমারী সাবগুঠনে নতুনুণী। নিলজ্ঞতার আশ্র-প্রকাশ যেন না হয়। আনন্দ ভীতিকম্পিতকণ্ঠে বললে,—উদ্ধারপ্রার্থী আমি। আমাকে উদ্ধার করতে হবে। একজন ইংরেজ আমাকে—

—জী! কৃত্রিম জাঁতকে উঠলো জগমোহন। সহাস্তে। বললে—ঘর কোথায়? দেশ কোথায়? কি জাতের মেয়ে?

নতমাথা তোলেন না চৌধুরাণী। গুঠনের আড়াল থেকে কথা বললে,—ঘর মান্দারগে। আমি একজন বণিককন্যা। শিতার নাম গোপীমোহন চৌধুরী।

আনন্দের উজ্জ্বলে অটহাসি ধ'রলো জগমোহন। তীরের জললে তার সজ্জার হাসির প্রতিধ্বনি ভাসলো। হাসতে হাসতে বললে—ঠাকরুণ, মিঁড়ি বেয়ে বজ্রার ওঠ, তার পর দেখা বাবে। খানিক খেমে আবার বললে,—আমরাও ঐ মান্দারগে চ'লেছি।

জগমোহন সোংসাছে আগে আগে চললে। তার ছায়া জন্মে জন্মে অল্পমরণ করলো চৌধুরাণী। আশার আলো দেখলো যেন জরাডুবিব পর। তবুও এখনও ভয় ভয় করছে। বজ্রার উঠতে পা চলেছে না যেন। দেহ কীপছে ধরথরিয়ে।

—কুমার বাহাদুর আছেন বজ্রার। মাহুকের ধবো দেখতা তিনি। জগমোহন মিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললো।

আনন্দকুমারী কথা বলে না আর। সে বা বলতে চায় তা যে বলা হয়েছে। আশ্রয়কা পাওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছে, আর কি বক্তব্য নেই। সহসা চোখে পড়লো বজ্রার ঘবে ভূশীকৃত অল্পশত্রু শেষ পর্যন্ত ডাকাতবলের হাতে বেছোয় নিজে ধরা দিলো! না কি চৌধুরাণী!

সিন্ধবাস, ঠাণ্ডা হাওয়ার শীতের স্পর্শ লাগে। ভয়ের সঙ্কো পা ছুটি কৈশে কৈশে ওঠে। ভবিষ্যৎ কেউ জানতে পায়ে না, জানে এখনও কত বিপন্ন বরণ করতে হবে!

জগমোহন আবার কথা বলে খুশীর হাসি হাসতে 'হাসতে বললে,—ঠাকরুণ, তোমার কোন' ভয় নাই। আমাকে কুমারবাহাদুর তোমাকে আশ্রয় দেবেন। এই বস্তুতথান (বস্তু গিয়ে তুমি ভিক্ষে কাপড়টা ছেড়ে দাও। ভয় পাও কেন মিথো। ঘরের ভিতরে বাও, কেউ সেখান নাই।

হলুদ রঙে ছোপানো একখানি নতুন কাপড় আনন্দকুমারী হাতে দেয় জগমোহন। বজ্রার ঘরের দরজা দেখিয়ে দেয়।

কুমারবাহাদুর চোখের ইশারায় কাছে ডাকলেন জগমোহনকে চুপি চুপি বললেন,—কাদের মেয়ে? কি বলতে চায়? অভিনয় নাই তো কিছু?

এক ঝলক হেসে নেয় জগমোহন। হাসি চেপে বললে, মান্দারগের এক বেশের মেয়ে। ইংরেজ ঘ'রে নিয়ে কোথায় চলবে মেয়েটা নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে এসেছে।

প্রশংসার হাসি হাসলেন কানীশঙ্কর। বললে,—বেশের মেয়ে বুদ্ধির তারিক করতে হয় তবে।

—হী হজুর! দেখে মনে হয় বেশ ঢালাকচতুর। জগমে হেসে হেসে বলে। বললে,—ধূর্ত ইংরেজদের চোখে মুলো দিয়ে যখন। মেয়েটা হজুর থাকে বলে আপনায় পরমাপ্রসন্ন।

কানীশঙ্কর বললেন,—খেতে পরতে দাও এখন। মাংস কিরতে চায় না কি?

—হী মান্দারগে কিরতে চায়। জগমোহন ফিসফিস কথা ব'ব্ব আবার নামালেন কুমারবাহাদুর। বললেন বিদ্যাবানিনীকে জানে না কি? জমিদার কুমারামের নাম?

—শুধাই নাই হজুর এ সব কথা। বলেন তো গিয়ে বলি।

মাথা দোললেন কানীশঙ্কর। বললেন,—না না এখন। এই সকল কথা এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা সমীচীন হবে আচ্ছতুক সন্দেহ করবে।

—তবে হজুর আমি বোপ বুকে কোপ মারবো। আশ্রয়প্রত্যয়ের সঙ্গে বললে জগমোহন। বললে,—খাইয়ে দ তারপর আমি শুণাবো।

বজ্রার জানলা থেকে চৌধুরাণী দেখতে পায়, ম্যালেটের অনেক ঘুরে এগিয়ে গেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলে আনন্দকুমারীর বুকের ওপর থেকে যেন এক গুরুভার পায়ব যাচ্ছে।

হাতের কন্ন গুণতে গুণতে কথা বলছিলেন কুমারবাহাদুর। হ গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন। মন্ত্রজপের সঙ্গে সঙ্গে কথা বললেন, ধামালেন না।

—মা ঠাকরুণ!

বজ্রার দুয়ারে দেখা দেয় জগমোহন। একান্ত নিকটজনের মত ঘনিষ্ঠ সুরে ডাকে। বলে,—মিঠাই খেয়ে জল খাও এখন।

—হ্যাঁ তাই দাও। দুধায় আমি কাতর। তোমাদের কত দয়।

কীলকঠের কথা আসে ঘর থেকে। চৌধুরাণী ঘরের এক কোণে আত্মপোষন করছে। দুখ দেখানোর মত যেন দুখ নেই। কত পাশ করেছে! ইচ্ছার হোক অনিচ্ছার হোক দেখা হয়েছে তার। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া আর রক্ষা নেই। নিজের দেহটার প্রতি কেমন যেন বিরাগ হয় তার। এই দেহ নিয়ে খেলা করেছে মালোট। ছোঁয়াছুরি করেছে মনের আনন্দে। গঙ্গায় ডুব দিয়েছে আনন্দকুমারী, মনটা তবু কেন পবিত্র হয় না কে জানে?

মিঠাই আর জলের পাত্র এগিয়ে দেয় জগমোহন। বলে,—খেয়ে-দেয়ে দু'দণ্ড জিরেন নাও। কুমারবাহাদুর যখন আশ্রয় দিয়েছেন তখন আর চিন্তা কি! ঘরের মেরেকে ঘরে কিরিয়ে দেওয়া হবে।

—কুমারবাহাদুরকে আমার সহস্র প্রণাম জানাও। তিনিই আমার রক্ষাকর্তা।

চৌধুরাণী কাঁপা কাঁপা সুরে যেন প্রেচ্ছর ব্যথা। বুকভরা শ্বাস টেনে আবার বললে,—তোমাদের মাশারণে বাওয়ার কারণ কি? সেখানে কোথায় বাওয়া হবে?

জগমোহন মনে মনে খুশী হয়। শব্দহীন হাসি হাসে। বলে,—সে কথা ঠাকরুণ পরে বলবো, তুমি এখন মিষ্টিজল খেয়ে ঠাণ্ডা হও। কেমন যেন দুঃখের হাসি হাসলো চৌধুরাণী। অতীত ঘটনার ছবি দেখতে পার সে। কি দুর্ভিক্ষ সেই দুর্ভিক্ষলি। মালোটের দুঃসাহসের সমুচিত শাস্তি কে দেবে? ক্রোধের আতিশয্যে মথো মথো অধর দলন করে আনন্দকুমারী।

নদীর তীরে চুন্নী জলছে কয়েকটা। ভাতের হাঁড়ি চেপেছে মাঝদের। কুমারবাহাদুরের বাতের আহ্বার তৈরী হয়। মশালের আলা আর চুন্নীর আন্তনে গঙ্গার তীরভূমির একাংশ আলোকিত হয়ে আছে।

—জগমোহন!

গম্ভীর কণ্ঠের ডাক আসে বজ্রার ছাদ থেকে। কানীশকরের কণ্ঠ যেন গুল্ল-গভীর।

আনন্দকুমারী কান পাতেলো কথা শুনে। বজ্রার অধিকারী কি বলেন কে জানে। ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়। কুমারবাহাদুরকে এখনও চোখের সমুখে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় নি। তিনি কেমন ধরনের মানুষ কে জানে!

—ডাকছেন কুমারবাহাদুর?

আছান শুনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে জগমোহন। সাড়া দেয় বজ্রার পাটাতনে পাড়িয়ে।

কানীশকর বললেন,—কাছে এসো, একটা গোশন কথা আছে।

চৌধুরাণী চমকে চমকে ওঠে। কুমারবাহাদুরের বক্তব্য কি, ন ডাকাডাকি করছেন—ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে যেন। অজানা শব্দ আনন্দকুমারী রুদ্ধশ্বাসে বসে থাকে। মিঠাই আর খাওয়া না। মুখে ওঠে না। সজাগ সজাগ অপেক্ষা করতে হয়।

জগমোহনকে কাছে পেয়ে কানীশকর কিসকিস কথা বললেন। বললেন,—পরজীকে সঙ্গে ল'য়ে বাওয়া অন্তায় হবে না কি? লোকে যদি আমার চরিত্রে দোষ দেয়? কুখ্যা রটনা হবে না তো?

হো হো শব্দ হেসে উঠলো জগমোহন। বললে,—হজুর, লোকে আড়লে রাজা-বারাণসকেও গালমন্দ করে, বারণ থাক আর না থাক। লোকের কথার মূল্য কি?

—তবে বশিককন্ডাকে ছাদে পাঠাও। আমি তার সহ ক'টা কথা কহি।

কানীশকরের মুখে অমূলক আশঙ্কা ফুটেছে। কথার সুর যেন রহস্তময়।

—সাবধানে কথা বলবেন হজুর! পারেন তো আমাদের রাজকুমারীর খোঁজটা একবার জানবেন।

জগমোহন কিসকিসিয়ে কথা বলে। বললে,—আমি তাকে পাঠাই।

—আর একটা কথা বলি। সর্দার-মারিকিও শুধাও দেখি মাশারণ আর কতদূর?

কুমারবাহাদুরের শেষের কথার যেন ঈষৎ অবৈধ্য প্রকাশ পায়। জিজ্ঞাসা চোখে তাকিয়ে থাকেন।

—হজুর আমিই বলি, রাতভোর বজরা চালিয়ে সেই ভোর নাগার পৌছানো যায়।

—তোমার অহুমান ঠিক?

—হ্যাঁ হজুর, বিশ্বাস করতে পারেন।

কথা বলতে বলতে জগমোহন বজ্রার ঘরে অদৃশ্য হয়। তার চলাকোর বজরা হেলছে হুলাছে।

ঘরে তৈলদীপ জলছে এক কোণে। চৌধুরাণী যেন রুদ্ধশ্বাসে ব'সে আছে। কুমারবাহাদুরের কষ্টের শুনে ভ্রু ভ্রু করে। আনন্দকুমারী সভয়ে বললে,—তোমাদের কুমারবাহাদুর কি বিপত্ত হয়েছেন আমার জন্ত?

জগমোহন সহাস্তে বললে,—কৈ নৈ। হজুর আপনাকে ডাকছেন। আলাপ করবেন।

ভিত্তিকম্পন আসে যেন। হাত আর পা অবশ হয়ে পড়ে। বক হুক হুক করে। মুখে কোন কথা আসে না। বিক্ষারিত চোখে তাকিয়ে থাকে চৌধুরাণী।

—ভয় করছে না কি? বললে জগমোহন।

অন্ন হাসি ফুটলো আনন্দকুমারীর মুখে। বললে,—না ঠিক ভয় নয়, তবে ভয়ও বটে। তোমাদের কুমারবাহাদুর মানুষ কেমন তাই শুনি?

—মাটির মানুষ। আকাশের দেবতার সঙ্গে কোন তুলনা নাই তাঁর।

—গড় মাশারণে চলেছেন কি কাজে?

—হজুরের মুখেই শুনা যাবে। তাঁকে শুধাও কেন বা বলতে চাও।

—তা পারবো না। সাহস হয় না যে।

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো চৌধুরাণী। হৃদয় বড় হোপানো হৃতির পাভলা বস্ত্র তার পরিধানে।



কিরে দেখলেন না কুমারবাহাদুর। জ্যোৎস্নাবল আকাশ দেখছেন তিনি। কাপড়ের খসখসানি শুনে বুঝলেন বেশের মেয়ে এসেছে। চৌধুরাণী কবাসের এক পাশে ব'সলো সন্তর্পণে।

জগমোহন বললে,—হজুর, তিনি এসেছেন।

কথার কর্ণপাত করলেন না কানীশঙ্কর। আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু ফিরিয়ে একবার দেখলেন মাত্র। বললেন, তোমার নাম কি?

—আমার নাম আনন্দকুমারী।

—পিতার নাম কি? তিনি কি করেন?

—গৌপীমোহন চৌধুরী। বাণিজ্যকর্ম করেন।

আনন্দের পিতার নাম শুনে কুমারবাহাদুর খানিক শুক হয়ে থাকলেন। তারপর বললেন,—তঁার নাম আমি শুনেছি। গোবিন্দপুরের ইংরেজের কুঠীতে তিনি মাল-মসলা সরবরাহ করেন। আমি কুঠীর নামের তালিকার তঁার নাম দেখেছি।

—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই দেখেছেন।

চৌধুরাণী একত্রে সহজ স্বরে কথা বলে। তবুও যেন তার হাবে ভাবে ভয়ানকতা। কণ্ঠ কম্পমান।

—তবে তোমার এই ছুতোগ কেন? কুমারবাহাদুর সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

চৌধুরাণী মাথা নত করে। বলে,—আমার ছুতোগ।

কানীশঙ্কর বললেন,—মান্দারনে কত কালের বাস?

—মনতে পাই তিন পুরুষের বসবাস আমাদের। বজ্রাকল পাকাতো পাকাতো কথা বলে আনন্দকুমারী।

হঠাৎ গাভীরা অবলম্বন করলেন কুমারবাহাদুর। নিশ্চুপ ব'সে থাকলেন কতক্ষণ। কি এক গভীর চিন্তায় যেন মগ্ন হয়ে পড়লেন।

চৌধুরাণী আড় নয়নে দেখে একেবারে। কুমারবাহাদুরের অনিন্দ্য আকৃতি দেখতে দেখতে বিমিত্রা হয়। পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহ—যেমন বর্ণ তেমন গঠন। পুরাণে বর্ণিত রাজচিহ্ন যেন শরীরে।

একবার চারি চক্ষুর দৃষ্টি বিনিময় হয়। আবার চোখ নামিয়ে নেয় চৌধুরাণী। এক লক্ষ্যে দেখে নেয়, কুমারের মুখাবরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যেন মূর্তিমান।

হঠাৎ আবার কথা বললেন কানীশঙ্কর। বললেন,—জমিদার কুমারের নাম কি জানা আছে? কুমারের গৃহ আছে মান্দারনে। যদিও কুমারাম নিজে সপ্তগ্রামে বাস করেন।

—হ্যাঁ আমি জানি। জমিদারপত্নী আমার বন্ধু। সস্ত্রাতি পরিচয় হয়েছে। তার নাম কি বিদ্যাবাসিনী?

সানন্দে বললেন কানীশঙ্কর,—হ্যাঁ, নামটা ঠিক। ঐ তার নাম।

—বিদ্যাবাসিনী মায়ুষটায় তুলনা হয় না। এত কষ্টভোগ, তবু তার মুখ থেকে হাসি মিলায় না। আনন্দকুমারী চোখ তুলে কথা বলতে যেন সাহসী হয় না। বলে,—বন্দিনী হয়ে আছে সে। আপনি কুমারামকে কি পুত্র জানেন? শুনতে পাই কুমারাম না কি অবিরেচক, অভ্যাচারী।

নীরব হলেন কানীশঙ্কর। মনে মনে প্রশ্নর হাসি হাসলেন। আকাশে চোখ তুলে একঘুটে চেয়ে থাকলেন কতক্ষণ। তারপর বললেন,—কুমারাম আমার পরিচিত। মিথ্যা কথা শুন নাই।

কুমারাম একটা অমায়ুষ। বীরকণ্ঠে কথা বলতে বলতে হঠাৎ স্বপ্ন সপ্তমে উঠলো। কুমারবাহাদুর ডাকলেন,—জগমোহন।

নদীর বুক থেকে তারের জলসে এই ডাকের প্রতিধ্বনি ভাসলো। জগমোহন আর সাড়া দেয় না, এসে হাজির হয় বজরা হুলিয়ে। বলে,—ডাকাচ্ছেন হজুর?

আরও কিংবদন্ত নীরব থাকলেন কানীশঙ্কর। কি যেন ভাবতে ভাবতে বললেন,—বাতের আহার প্রস্তুতের বিলম্ব কত জগমোহন?

—আর এক দণ্ড হজুর। ভাত ফুটছে। মাংসটা আরও কিছুক্ষণ ফুটেবে।

—সদাঁর-মাঝি!

উচ্চস্বরে ডাকলেন কুমারবাহাদুর। আবার প্রতিধ্বনি ভাসলো তারের জলসে।

বজ্রার শেষ প্রান্তে বসেছিল সদাঁর। মাঝি আর মাজাদে দলপতি সে, তাই উচ্চাসনে বসে। সাড়া দেয়, বলে,—হাভি: আহি।

—কোথায় তুমি? দেখতে পাই না কেন?

মুহূর্তের মধ্যে মাঝি-সদাঁর এসে উপস্থিত হয়। তিনটে সেলা টুকে বলে,—কিছু বলবেন কুমারবাহাদুর?

কানীশঙ্কর কি যেন নিশ্চয় করলেন অন্তর্কিতে। তৎক্ষণা লুকে নেয় মাঝি-সদাঁর। একটা শালুর খলি। এক খলি টাকা নবাবের ট্যাংকশালে তৈরী।

—এখনই মান্দারনে যাত্রা করবো। তোমরা তৈয়ার হও।

কেমন যেন হকুমের স্বরে বললেন কুমারবাহাদুর। ল ভেলভেটের তাকিয়া কোলে টেনে নিয়ে স্থির হয়ে বসলেন জগমোহন কাছেই ছিল। তার উদ্দেশ্যে বললেন,—চুলীতে টাট কাঠ দেও জগমোহন। মাংসটা যেন সুস্বাদু হয়।

গোবিন্দভোগ চালের ভাত আর কচি পাটার মাংস। ক আর ক্ষীর। বাতাসে এক মিশ্রিত সুগন্ধের ভার। ভাত, মাংস আর ক্ষীর চেপেছে উজ্জ্বল। মাটি খুঁড়ে চুলী বানানো হয়েছে।

কি এক স্তম্ভমুখে যেন মাঝিরা দৃকল হয়ে ওঠে। সদাঁর-মাঝি কি এক মস্ত দেয় যেন তাদের কানে কানে আর দেখায় হা লাল শালুর খলি। মাঝিদের ব্যস্ততায় সাড়া পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে দোলনার মত দুলতে থাকে বজরা।

রাতি গভীর। গঙ্গার উত্তরপ্রান্তে চোখ মেলে মাঝি-সদাঁর বতদ্ব্য দৃষ্টি যায় চোখে পড়ে সোনালী নদী—চক্রাকারে বৈকে গো নগনানগনি টাকার কাছে দৃংখ কিছু নয়, কিছু নয়।

সদাঁর মাঝি বললে,—জগমোহন, তোমার হাঁড়ি ক বজ্রার তুলে নাও। বজরা ছাড়বে এখনই। নোঙর খোলা এখনই।

বজ্রার ছাদে দুই জোড়া চোখ বিষম আর আনন্দে প্রায় হয়ে আছে। আনন্দকুমারীর মুখখানি হঠাৎ যেন চোখে প লাভণ্যে চল চল মুখশ্রী দেখতে দেখতে কুমারবাহাদুর যেন বি বিমিত্র হয়েছেন। দুই যুগল অঁধির দৃষ্টিমিলন আকাশে: আর তারারা হাড়া আর কেউ দেখতে পায় না।



## পুনর্বাসন না গ্রহণ ?

“কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার উদ্ভাস্তদের অত্যধিক ভীড় হওয়ার কেন্দ্রীয় সরকার এই সকল রাজ্যের শিবিরে বা আশ্রমে পূর্ববঙ্গ হইতে নবাপত্ত উদ্ভাস্তদের গ্রহণ করা হইবে না এবং আর কোনরূপ সাহায্য দেওয়া হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারত স্বাধীন হইবার পর হইতেই এই উদ্ভাস্ত সমতা সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। বহু অর্থব্যয় হইয়াছে, বহু উদ্ভাস্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু আজও ইহার কোন স্তূর্ষ সমাধান হইল না। একজন উদ্ভাস্তরও যে সম্পূর্ণরূপে পুনর্বাসন হইয়াছে, একথা বলা বাইতেছে না। আমাদের মনে হয়, এসমস্যার সমাধান নাই। এই সমতা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাবাই, বাঁহারা দেশ বিভাগে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কথায় বলে ‘সন্তার তিন অবস্থা’। সন্তার স্বাধীনতা লাভ করিতে গিয়া যে মূল্য দিতে হইতেছে তাহাতে নৈতিক এবং আর্থিক উভয় দিক দিয়াই ভারত আজ প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং বোধ হয় চিরদিনই বেগারত দিতে হইবে। এক এক সময় মনে হয়, জিয়ার দুই জাতিত্ব মানিয়া লইতেই ভাল হইত। তাহাতে বোধ হয় একটা ক্ষতি হইত না। তবে সকল রকমেই যখন তুল-ভাঙি হইয়া গিয়াছে, তখন হাল ছাড়িলে চলিবে না। পুনর্বাসন করিতেই হইবে। সেই সূত্রে উদ্ভাস্তদের মানসিক অবস্থার দিকেও নজর দিতে হইবে। যে কোন পরিবেশে জোর করিয়া ঠেলিয়া দেওয়ার পুনর্বাসন বলে না।”

—দৈনিক বঙ্গমতী।

## খেলাভাকার খেলা

“কলিকাতা ময়দানে ফুটবল খেলা উপলক্ষে যে লক্ষ্যজনক মাণিট ও গুণগোল দেখা দেয়, তাহা শাস্তিকামী সহরবাসী মাত্রকেই উদ্ভিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। অবিলম্বে বন্ধে একদা এই শ্রোয় ঘটনা ঘটত। বহুদিন পরে আবার তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া শুধু অনভিজ্ঞের নয়, ইহার পরিণামও আশঙ্কাজনক। কাজেই গভর্নমেন্ট ও জনসাধারণ উভয়েরই বিষয়টি সযত্নে সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া দরকার। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে অধ্যাপক নির্বণ ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেন মহামেডান শোটিং, ইটবেঙ্গল, রাজস্থান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ও আকলিক নামাঙ্কিত ক্লাবের অস্তিত্ব থাকার ফলেই অনেক সময় দম্ভ রোবায়েরি ও পাঞ্জাপালি দেখা দেয় এবং তাহা হইতেই শেষ পর্যন্ত অত্যাচারীরা হান্সায়া সৃষ্টি করিয়া বলে। স্তরায় এই শ্রীয়া নামকরণ বজায় রাখা ঠিক কি না গভর্নমেন্ট সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, নাম পরিবর্তনের দ্বারা কিছু সুফল হইতে পারে, কিন্তু আসল পরিবর্তন দরকার মনোবৃত্তির। খেলায়ই মানসিকতার জিনিষ—তাহার প্রতিবন্ধিতা আনন্দের প্রতিবন্ধিতা। তাহা যেখানে হিংসা, অজ্ঞানতা ও মাণিটের পৃথকিত। সেখানে বৃষ্টিতে হইবে পিছনে সেই স্তম্ভ মনোভাবটি নাই, যা খেলায়ই আদর্শরূপে সর্বদা স্বীকৃত। সেই মনোভাব কেবলমাত্র আদ্যের অঙ্গবদলেই রূপান্তরিত হইবে কি?”

—যুগান্তর।

## পুরুষ ও নারী—এক

“নারী শ্রমিক ও পুরুষ শ্রমিক একই হারে সমান বেতন পাইবে না



সদ্য অভিযোগ করিয়াছেন, দাজিলিং ও জলপাইগুড়িতে শ্রমিকের বেতন নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, পুরুষ শ্রমিককে যে বেতন দেওয়া হয়, নারী শ্রমিককে সেই হারে বেতন দেওয়া হয় না। প্রমমন্ত্রী জীআবহুস সান্তার উত্তরে বলেন যে, পুরুষ শ্রমিক অপেক্ষা নারী শ্রমিক কাজ কম করে। তার পর পুরুষ শ্রমিক ও নারী শ্রমিককে যে সমান হারে বেতন দিতে হইবে, এমন কথাও ভারতীয় সংবিধানে পরিষ্কার লেখা নেই। এইরূপ জবাব দিয়া মন্ত্রী জীআবহুস সান্তার বক্তব্য: একটু বিপাকেই পড়িয়াছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখন দেওঘর ব্যবস্থা অন্তত: আমাদের আইন সভার নাই। বিধান সভার সদস্য নারী ও পুরুষ সদস্যগণ সকলেই সমান হারে বেতন পাইয়া থাকেন। এখানে নারী ও পুরুষের সমানাবিকার স্বীকৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেখানের বৈষম্যের কথা উল্লিখিত প্রশ্নে তোলা হইয়াছে, সেই বৈষম্য বস্তত:ই আছে। সেখানে নারী ও পুরুষ শ্রমিক কেন সমান হারে বেতন পাইবে না? এই প্রশ্ন কিন্তু রহিয়াই গিয়াছে।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

## চরম নৃশংসতা

“ভারত গবর্নমেন্ট প্রচার করিতেছেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্ভাস্ত আগমন সম্প্রতি হ্রাস পাইয়াছে। এর আসল কারণ নীচের সংবাদ হইতে বুঝা যাইবে। কবিমগজের (কাছাড়) “যুগশক্তি” পত্রিকার ঢাকার প্রতিনিধি লিখিতেছেন—“ঢাকা, ১৫ই জুন। এক লক্ষ একষট্টি হাজার পরিবারের (প্রায় ৭ লক্ষ লোকের) বাস্তবতাপের আবেদনপত্র ঢাকাতে ভারতীয় ভিসা অফিসে দাখিল করা আছে। কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এখন আর মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দিতে চাহিতেছেন না। ইহাতে পূর্ববঙ্গের হিন্দুয়া আজ অসহায় বোধ করিতেছেন। ভারত সরকার ঢাকাতে ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারকে এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ যে, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করার ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি করিতে হইবে। অনেক হিন্দু বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি বিক্রয় করিয়া ভারতীয় হাই কমিশন অফিসে আবেদনপত্র পাঠাইয়াও কোন সাড়া পাইতেছেন না। কলে তাহারা আজ মৃত্যুপথের বাতী। পূর্বের ভার মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিলে প্রতি মাসে গড়ে ৩০,০০০ হাজার হিন্দু পাকিস্তান ত্যাগ করিত। হিন্দুদের জমিজমা জবরদখল, বর্জন

নারী অপহরণ, হিন্দুর বাড়ীতে ডাকাতি, হিন্দুর জমির ধান কাটরা নেওয়া, হিন্দুর ঘেরেরে বলপূর্বক ছিনাইয়া নেওয়া প্রভৃতি কারণে হিন্দুগণ বাস্তবায়ন করিতে উদ্বীণ হইয়া পড়িতেছেন। মাইনিগিট মিনিষ্টার জীমনোরজন ধর এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারিতেছেন না। হিন্দুরা যিঃ ধরকে আজ আর তাহাদের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করে না। ভারত সরকার ভারত বিভাগের পূর্বকালীন প্রতিক্রিয়া বিম্বত হইয়া মাইগ্রেশন ব্যাপারে নানারূপ কড়াকড়ি করিয়া পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের অবস্থার অবস্থার কেলিয়াছেন। সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে যে হিন্দু পরিবার ভারতের কোনও স্থানে গিয়া বসবাস করিতে চাহেন, সেই অঞ্চলের লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান অথবা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট হইতে সার্টিফিকেট এই মর্মে নিতে হইতেছে যে, তিনি ভারতে গিয়া ভারত সরকারের "বোরা" (Burden) হইবেন না। আর বাহারা ভারত সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হইবেন বলিয়া আবেদনপত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা আদৌ মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাইবে না। নেহরু গবর্ণমেন্টের এই নৃশংসতার তুলনার অক্ষরুপ ও জাতিগোষ্ঠীনাগের ইত্যা নিতান্ত ছেলখেলা মনে হইবে। ঐ দুই ঘটনা প্রবল উত্তেজনার মুখে ঘটয়াছিল। কিন্তু এবে লক্ষ লক্ষ অবস্থার নরনারীর সুপরিচালিত জীবন্ত সমাধি।

—মুগবাণী (কলিকাতা)।

### অবাহেলিত সহর

"প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামের যে উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার সার্থক রূপায়ণে বাংলার গ্রামের বর্ধেৎ সুসংযুক্ত অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সহরগুলিতে সেরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতির কোনও চিহ্ন তো দেখা যায়ই না উপরন্তু আসানসোলের মত গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিল্পাঞ্চলীয় সহরটি ক্রমাগত জনবৃদ্ধির চাপে ও নিত্য নতুন ছোট বড় দোকান ও বাসগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধিতে অলিগলি হইতে সদর পর্যন্ত বিধি অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। বাস্তবঘাট, কলের জল বাজার প্রভৃতি প্রত্যেকের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অপরিহার্য ব্যবস্থাগতলিক এক একটি অব্যবস্থার দৃষ্টান্তহল বলা বাইতে পারে। ইহা ব্যতীত শিশুদের ও বড়দের জন্ম অত্যাবশ্যকীয় পার্ক পাঠাগার প্রভৃতির কোনও অভাব নাই বলাই সমীচীন হইবে। আজকাল শিশুদের চতুর্ধ শ্রেণী হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিষয়ের পুস্তকে গৃহ নির্মাণে স্থান নির্ধারণ হইতে গৃহের শয়ন ঘর, পাঠশালা, পায়খানা প্রত্যেকটি ঘর কতটা ঘুরে কোনদিকে কতটা আলো-বাতাস যুক্ত হইবে, ও কৃতিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু জানিতে ইচ্ছা হয়, শৌর্য প্রতিক্রিয়ার বাহারা গৃহ নির্মাণের নক্সা অঙ্কন করেন তাহাদের এ বিষয়ে কোনও জ্ঞান বা কর্তব্য আছে কি না? পূর্বের পুরাতন বাড়িগুলি তো বর্ধেৎ ভাবে উঠিয়াছে, তাহা লইয়া বলার কিছু নাই—কিন্তু এই কয়েক বৎসরের মধ্যেও এমন অনেক বাড়ি, বিরাট অটালিকা বা কুঠুরী তৈয়ারী হইয়াছে, যাঁহা দেখিয়া মনে হয় যে সহরের সৌন্দর্য অথবা সেই গৃহবাসীদের

স্বাস্থ্য কোনটির প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই এই সব প্রাচীন অঙ্কনোৎপাদিত হইয়াছে।"

—আসানসোল হিঠেং

### রামরাজ্যের সুবিশা

"ভারত সরকার সম্প্রতি এক নির্দেশ জারী করিয়া সর্বত্র কয়লার দাম টন-প্রতি দেড় টাকা বাড়াইয়া দিয়াছেন। সন্ত কালের মধ্যে এই লইয়া তিন বার কয়লার মূল্য বৃদ্ধি করা হই ইতিপূর্বে গত বৎসর জুলাই মাসে টন-প্রতি তিন টাকা হইতে স তিন টাকা, ইহার পর ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে টন-প্রতি আনা বাড়ান হয়। বর্তমানের এই বৃদ্ধি তৃতীয়বারের দ্বা দ্বিতীয় ইহা বোঝার উপর শাকের জাঁট! আমাদের (পণ্যমূল্য যে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা যেমন অস্বীকার কতি উপায় নাই তেমনি ইহারই অবশুসত্ত্বাবী পরিণতিতে আজ সর: পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও টলটলায়মান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছা কিন্তু কার্যতঃ সরকার এমন সব ব্যবস্থা করিতেছেন, যাঁহাতে এ পুষ্টিপতি ও শিল্পপতিরা আজ এইভাবেই দেশকে হা খাওয়াইতেছে।"

—বীরভূম বা

### শোক-সংবাদ

#### চুণীবালা দেবী

গিরিশ-যুগের স্বনামধন্য অভিনেত্রী চুণীবালা দেবী গত ১৯৫৪ চৈত্র ৮- বহর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। সাধারণ র থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে ইনি অবসর গ্রহণ করেন। তা দীর্ঘকাল পর ১৯৫৪ বৃঃ 'পঞ্চের পাঁচালী'তে অভিনয়ের ভার করেন ও অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেন। চলচ্চিত্রের প্রথম ইনি বহু ছবিতে অংশ গ্রহণ করেন। 'পঞ্চের পাঁচালী'তে ৩ করে বিশ্বের বহু দেশের প্রশংসা অর্জনে ইনি সমর্থ হন।

#### প্রভুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে অকৃতম উৎসর্গিত প্রাণ নেতা প্রভুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গত ২০শে আষাঢ় ৬৪ বছর দেহত্যাগ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই ইনি স্বাধীনতা আন্দে সঙ্গে জড়িত ছিলেন ও জীবনের একটি বিরাট অংশ কা অতিবাহিত করেন। ইনি ঢাকা থেকে এম, এল, সি, ডি হন এবং ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

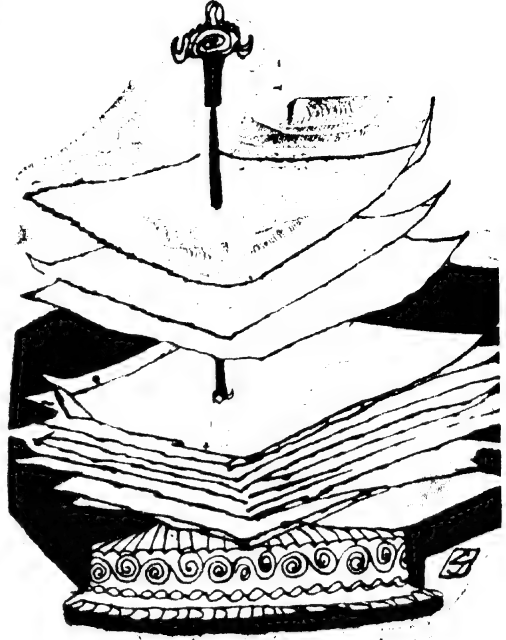
#### নলিনীকান্ত সেন

ফরিদপুরের প্রবীণতম উকীল ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রায় নলিনীকান্ত সেন গত ২৩শে আষাঢ় ৮৭ বছর বয়সে দে যাত্রা করেছেন। আইনে এর প্রগতি পাশ্চাত্য সর্ধজনবিদ্যা ও বহু জটিল মামলার সমস্ত সমাধানে নিজের স্বস্তি বৃদ্ধি দেন। ইনি ফরিদপুরে সরকারী উকীলও নিযুক্ত হন ও গুঠাঙ্গে সরকারী কার্যভার থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর মধ্যে প্রথমবঙ্গের ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল ও র্যার কমিশনারী প্রশংসকুমার সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

### সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৯৫৪ বহরবঙ্গের টাট, "বহুমতী মোটরী প্রেস" প্রকাশিত।

‘মাসিক বহুমতী’র গত জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ সংখ্যার প্রকাশিত ইজ্ঞানোন্নয়ন পালের ‘বিচিত্র ভ্রমণ’ শীর্ষক কৌতুহলোদ্দীপক ও রূপাঠা রচনাটির জন্য আপনারা ধন্যবাদার্থী। লেখক মহোদয় ২০১ ঠাঁর বর্ষ অনুল্লেখ্যে যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেছেন—তারই বিপরীতরূপে রবীন্দ্রনাথের এ প্রসঙ্গে মতবাদ আমি উদ্ধারযোগ্য মনে করি। আসোচ্য ঘটনাটির সন আমার অজ্ঞাত, কিন্তু কবি ১৯২৪ সনে একটি রচনায় এই ব্যাপারটিকে যত্ন করেছেন, কৌতুহলী পাঠকের জ্ঞাতার্থে সেটি উদ্ধৃত হ’ল : একটি কথা আমার মনে পড়ছে। তখন লোকমাড় তিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক দূতের বোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ব’লে পাঠিয়েছিলেন আমাকে যুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে নন-কাম্পারেশন আরম্ভ হয়নি বটে কিন্তু পোলিটিকাল আন্দোলনের তৃপ্তি বইছে। আমি বললুম, রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে বোগ দিয়ে আমি যুরোপে যেতে পারব না। তিনি ব’লে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চটায় থাকি এ তাঁর অভিপ্রায়-বিসঙ্গত। ভারতবর্ষের যে বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সম্ভব—এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি।—আমি জ্ঞানভূম, জনসাধারণ তিলককে পোলিটিকাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারিনি। তার পরে বোম্বাই সহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, ‘রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন—এর চেষ্টা বড়ো আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশাই করিনি।’ আমি বুঝতে পারলুম, তিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন সে কাজের অবিকার তাঁর ছিল—সেই অবিকার যত্ন অবিকার। (পশ্চিমবঙ্গীর ডায়ারি : ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ : বাক্য)। লেখকের মতে ১৯০৫-৬ সালে যে স্বদেশপ্রেমের বান এসেছিল ১৯১৬-১৭ সালে তা’ অনেকখানি নেমে গেছে এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিলক প্রথমে নতুন রাজনীতির সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে বলেই রবীন্দ্রনাথ এরকম কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চাননি—এই মত প্রকাশে তুলে ব্যবহার অবকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের ‘স্বপ্ন’ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন—তার প্রমাণ অসংখ্য আন্দোলন প্রভৃতি রাষ্ট্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে রয়েছে। হয়ত কখনো তাঁকে একতারা ফেলে দিয়ে ভেরি নিতে হয়েছিল, চুটতে হয়েছিল খর মধ্যাহ্নের তাপে জর-পরাঙ্করের আবের্ভনের মধ্য দিয়ে—কিন্তু, সে তার স্বভাব-সঙ্গত নয়, তাইই কথার : ‘স্বপ্নের সময় প্রবর্তার্যকে দেখা যায় না ব’লে সিক্কিম হয়। এক এক সময়ে বাহিরে কন্ডোলে উদ্ভাস্ত হয়ে স্বপ্নের বাণী স্পষ্ট করে শোনা যায় না।’ কারণ, ‘ডিমক্কেসির যুগে... কর্তব্যের জন্মাবহতা’ এবং ‘প্রয়োজনের আসরের সর-গরমের মধ্যে’ ‘টাকার পক্ষে এ সময়টা স্থলময়, কিন্তু বীণাকাবের পক্ষে নয়।’ আমার মনে হয়, লেখকের কথার ‘রবীন্দ্রনাথ এই টাকা গ্রহণ করলে ও তা দিয়ে ভারতের সাধনা বাহিরে নতুন করে প্রতিষ্ঠা-কলো’ তাঁর স্বভাবজ্ঞতার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেতাম না। এই পরিবেশে আজ তাত্কালিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে কবির ভূমিকার নতুন মূল্যায়ন করাই সম্ভব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তিলকের



সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ হস্ততা ছিল, শ্রীঅমল হোম তার বিবরণ দিয়েছেন (দ্রঃ বলরাজ গঙ্গাধর তিলক অমল হোম : বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রাণ-আধিন ১৩৬৩)। রবীন্দ্রনাথের ‘জ্যোতির্বাণী’ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিলকের গীতা-ভাবের বঙ্গাভাব করেন। পাণ্ডবর। রামময় বোড। কলিকাতা—২৫

ওমরের জন্মকাল

দৈনিক বহুমতীর সাহিত্য সভায় প্রকাশিত সৈয়দ হুজুতবা আলি সাহেবের ‘নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম’ নামে সুশিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করে আনন্দ লাভ করলাম। আলি সাহেব এক জারগার লিখেছেন, ওমর খৈয়ামের জন্ম ও মৃত্যু-সন জানা যায় না। কিন্তু আমরা জানি ওমরের জন্ম ৪১০ হিজরাকে অর্থাৎ ১০১৯ খ্রষ্টাব্দে। ওমরের মৃত্যু-সনটি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতভেদ দেখা যায়। সাধারণ্যে তাঁর মৃত্যু-সাল ৫১৭ হিজরাকে (১১২৩-২৪ খ্রঃ) এইরূপ প্রচারিত। কিন্তু পাত্র ভায়া ও সাহিত্যের ইতিহাসকার অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউন বলেন, ওমরের মৃত্যু ১১৫০-৩৫ খ্রষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ ১১৩৫ খ্রষ্টাব্দের অবিকৃত নিকটবর্তী সময়ে ঘটে থাকবে। আর তিনি ওমরের তিন বছর যে গল্পটি বলেছিলেন তা নিছক গল্প—ইতিহাস নয়। এ বিষয়ে আমি তাঁকে অনুশ্রবণে নন্দী লিখিত বঙ্গভাষার একমাত্র ওমরের জীবনী ‘ওমর খৈয়াম’ এইটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।—দীপঙ্কর নন্দী। কলিকাতা-৩৬

মূল্যায়ন

সৈয়দ হুজুতবা আলীর সমালোচনা পড়লাম। আমি ‘মূল্যায়ন’ লেখেছিলাম তিনি সংশোধন করেছেন ‘মূল্যায়ন’ তাঁর মতে ‘মূল্যায়ন’

লিখলে বাঙালী পাঠকরা পড়বেন—‘মূল্য’।’ প্রথম তাহলে Roman আর Romain লিখতে হলে দুটোই কি একই রকম লিখতে হবে—‘রমা’? আর Roman-এ ‘রমা’ লিখলে বাঙালী পাঠকরা ‘র’কে ‘রমা’-র ‘র’-র মত উচ্চারণ করতে পারেন মুক্ততবা আলী তা ভেবে বেগেছেন? ‘রোমা’ লিখতে কি আপত্তি? মুক্ততবা আলীর theory অনুযায়ী Matinকে লিখতে হবে, ‘মাতী’, Vilainকে ‘ভিলী’, Parfumকে ‘পারফা’, mainকে ‘মী’। মুক্ততবা আলী কি বলেন? তাই ত? তিনি বলছেন যে ফরাসীতে Romain এবং Roman দুইই আছে—এক প্রকৃত পক্ষে একটা হবে রমা’ এবং অষ্টটা রমা’। তাঁর উক্তি এবং যুক্তি পরিষ্কার নয়—anomolous, Henri সম্বন্ধে আমার যুক্তিবক্ট মেনে নিয়েছেন। Le সম্বন্ধে বলতে চাই আসল উচ্চারণ খেতে ‘ল্য’ অথবা ‘ল্য’র দ্রুত মাথা সহজ কথা নয়। ‘একর’ ও ‘ক’কলার সময়ের কোন শব্দ মুক্ততবা আলীর চোখে পড়েনি। কেন, ‘ভোঠ’, কথাটি বাংলা ভাষায় ‘হরিজনের’ মত? ফরাসীরা যে ইংরেজদের মত R উচ্চারণ করেন না তা এখানে Kinder garden এর ভারতীয় শিশুরাও জানে। তাদের নামের R গুলো বধন ফরাসী শিক্ষকরা বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করেন তখন তাঁরা বেশ কোঁতুক বোধ করেন। ফরাসীরা বধন ইংরেজীতে কথাবার্তা বলেন তখন তাঁরা যে ফরাসী তা বোঝা যায় বিশেষ করে R এবং T’র উচ্চারণ শুনে। মুক্ততবা আলী কি তা লক্ষ্য করেন নি? বিতর্ক উচ্চারণের জন্য কতগুলো বিশেষ গান, বিশেষ শব্দ ফরাসী শিক্ষকরা গোড়াতে শেখান বা articulation এর দিক দিয়ে চমৎকার। অসলে আলী নাহেব কখনও articulate করেন নি, করলে বাজে পি হাস করতেন না। প্রথম বধন ফরাসী লিখি তখন আমাদের ফরাসী শিক্ষিকা বিশেষ করে R এবং U-এর উচ্চারণের প্রতি আমাদের ঘৃণী আকর্ষণ করতেন। ফরাসীতে ও-হটির উচ্চারণ সবচেয়ে শক্ত। শুধু বন্ধি হ্রস্ব কেন, ক্রান্তের বিভিন্ন অংশের লোক এখানে আছেন; এমন কি প্যারিসেরও। শুইজারল্যান্ডেরও কিছু ফরাসী-ভাষাভাষী আছেন। তাঁদের উচ্চারণ বিভিন্ন ধরনের এবং কেউ কেউ R-কে বেঞ্জী Roll করে বলেন, আবার কেউ কম করে বলেন কিন্তু তাই বলে তাদের কেউই R-কে ইংরেজী R অথবা বাংলা ‘র’-এর মত উচ্চারণ করেন না। এত বড় একটা Contrast মুক্ততবা আলীর কানে ধরা পড়েনি—আশ্চর্যের বিষয়! শ্রীহরীকান্ত গুপ্ত (শ্রীঅবিশ্বাস্য আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়)।

### গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

বর্তমান বৎসরের মূল্য পাঠাইলাম। দেবী হওয়ার অন্ত্যন্ত হুম্বিত। বৈশাখ হইতে সকল সংখ্যা সম্বর পাঠাইবেন। শ্রীমতী ছায়া বসু। কার্ণাণ বোড কলিকাতা।

আপনাকে অন্ত M. O. যোগে ৭১০ মাসিক বসুমতীর ছ’ মাসের সডাক চালা বাবদ পাঠাইলাম। পত্রিকা পাঠাইয়া বাখিত করিবেন। বাসন্তী দেবী, Didwana.

The Monthly Basumati which please continue sending from the Baisak number—Mlv. B. U. Ahmed. Thaligram T. E. Assam.

মাসিক বসুমতীর বসুম ছয় মাসের ৭১ চালা পাঠাইলাম। বৈশাখ সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইবেন, বাকী ছয় মাসের চালা ভাগষ্ট মা পাঠাইয়া দিব।—শোভনা ঘোষ। 146, Gunjipar Jabbulpore, M. P.

অন্ত ১৫ টাকা পাঠাইলাম আরও এক বৎসরের জন্য। প্রাণি সংবাদ জানাইবেন।—নমিতা দে, ধুবড়ি ঘাট। কাছাড়।

জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আগামী ছয় মাসের মাসিক বসুমতী ছ’মাসের সডাক মূল্য মোট ৭১০ পাঠাইতেছি। নয় কপি এই সব সংখ্যার পত্রিকা নিচের ঠিকানায় পাঠাইয়া বা করিবেন।—শ্রীমতী অমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চণ্ডী ও বোড। কলিকাতা।

বাৎসরিক চালা বাবদ সডাক ৭১০ পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সং দিবেন।—শ্রীশান্তিহারা মোদক। Goari Bazar, Nadia.

I am sending herewith Rs. 7’50 as half-year subscription for the “Monthly Basumati,” Kind send me “Monthly Basumati” 1364 B,S,—Nili Bhan, Karol Bag, New Delhi.

১৩৬৪ সালের গ্রাহকমূল্য স্বরূপ ১৫ টাকা পাঠাইলাম। ১২ চইতে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাবেন। Sm. Nihai Roy, Delhi.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চালা পাঠাইলাম। এই বৎসর আমাকে পত্রিকার গ্রাহিকা করিয়া লইবেন।—বৈষ্ণবী মুখা Pratapgunj, Baroda.

বার্ষিক মূল্য ১৫ টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ ও ১১ মাসিক বসুমতী আমার ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রতিভা। 33 B Russa Road Cal—26.

আমি আপনাদের পূর্বানো গ্রাহক ছিলাম না, সেজন্য কোনো গ্রাহক নম্বর নাই। অসুগ্রহ করিয়া আমাকে নতুন সম্ভার্যভুক্ত করিয়া ‘মাসিক বসুমতী’ পাঠাইবেন। বাণী ভট্টাচার্য। Haw Bagha, Jabbulpore.

মাসিক বসুমতী পত্রিকা রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানোর স্ব করলে বাখিত হইবে। রেজেষ্ট্রী খরচ সহ পত্রিকার ১ বৎসর: ২১০ টাকা পাঠাইলাম।—শোভা মিত্র। Hill Co Dhanbad.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা তালিকাভুক্ত হ’তে ইচ্ছা এই উদ্দেশ্যে ছ’মাসের আগ্রিম চালা বাবদ ৭১০ পাঠাইলাম ক’রে কাস্তন সংখ্যা থেকে আশঙ্ক করে প্রতি মাসের বসুমতী লিখিত ঠিকানাতে পাঠাবেন এবং আমার নাম গ্রাহিকা তালি করে নেবেন।—গায়ত্রী দেবী। C/o, S. K. Bhattach Accountant Patna Electric Supply Co. Mangles Road, Patna.

॥ मासिक पत्रमती ॥  
श्रीवर्ग, १९७८

दे ओ या न । ति व





# মাসিক বসুমতী

৩৬শ বর্ষ—প্রাবণ, ১৩৬৪]

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

[ প্রথম ঞ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

## কথামৃত

মানব-সমাজ ক্রমাগত চারিটি বর্ষ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (কৃত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈজ্ঞ), এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেক বর্ষে দোষ-গুণ উভয়ই বর্তমান। পুরোহিত শাসনে বশজাত ভিত্তিতে যোর সঙ্কীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁহাদের ও তাঁহাদের বংশধরগণের অধিকাররক্ষার জন্য চারি দিকে বেড়া দেওয়া থাকে—তাঁহারা ব্যতীত বাকী শিখিবার কাহারও অধিকার নাই, বিজ্ঞানদানেরও কাহারও অধিকার নাই। এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ, বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করিতে হয় বলিয়া পুরোহিতগণ যনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন।

কৃত্রিয়শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অভ্যাসপূর্ণ, কিন্তু কৃত্রিয়েরা এত সহ্যামনা নহেন। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার সমোৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

তারপর বৈজ্ঞানিক যুগ। এর ভিতরে ভিতরে শরীর-নিষেধণ বৈজ্ঞানিকশাসনকারী ক্ষমতা, অথচ বাহিরে প্রশান্তভাব—বড়ই ভয়াবহ! যুগের স্রবীণ এই যে, বৈজ্ঞানিকের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পুরোহিত যুগের পুণ্ড্রীকৃত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। কৃত্রিয়যুগে পুণ্ড্রীকৃত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। কৃত্রিয়যুগে পুণ্ড্রীকৃত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। কৃত্রিয়যুগে পুণ্ড্রীকৃত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে।

সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হইবে। এ যুগের স্রবীণ হইবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক স্বথস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হইবে, কিন্তু অস্রবীণ এই যে, হৃদয় সভ্যতার অবনতি ঘটিবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়িবে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইবে।

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যায়, যাহাতে ব্রাহ্মণ-যুগের জ্ঞান, কৃত্রিয়ের সভ্যতা, বৈজ্ঞের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকিবে অথচ এদের দোষগুলি থাকিবে না, তাহা হইলে তাহা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হইবে। কিন্তু এ কি সম্ভবপর? প্রত্যুত, প্রথম তিনটির পালা শেষ হইয়াছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসিবেই আসিবে—উহা কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

আমাদের নিজস্বের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা। আমি মানসক্ষে দেখিতেছি, ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া এই বিবাদ-বিমুক্ত জেলপূর্বক মহামহিমায় ও অপরাধের শক্তিতে আগিয়া উঠিতেছেন।

—হামী বিবেকানন্দ।

# কোথায় চলেছি

নরেন্দ্র দাশগুপ্ত

ক্ষুধা হস্তান্তরিত হইবার পর ভারতের ঠাঁকি ব্যালাস ছিল সত্তরে শ' কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের ঐ অর্থই বোধ হয় আমাদের মাথা খারাপ করিয়া দিল। ধনী অর্গাটান পুত্রের ছায় আকাশ-কুসুম গড়িতে লাগিলাম আমরা। দুই শত বৎসরের ঘাটিতি বিশ বৎসরে শূন্য করিবার জন্ত বন্ধপরিকর হইলাম। বিজ্ঞানের সাহায্যে ইউরোপ আমেরিকা দুই শত বৎসরে যাচা করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাই আমরা বিশ বৎসরে সম্পন্ন করিবার জন্ত পাগল হইলাম।

অর্থ পয়ের ঘরে, কল-কব্জা আমদানী করিতে হইবে পরদেশ হইতে।

ইহা সুবিদিত যে, লম্বী টাকা আদায় করিবার জন্ত মহাজনকেই খাতকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। প্রাপ্য আছে বলিয়াই পাওরা যায় না। নালিশ করিয়া ডিগ্রী করিলেও কিস্তি-বন্দীর ব্যবস্থা হইয়া থাকে। দুই কিস্তি দিয়া চার কিস্তি খেলাপ করা বিরল তা নছেই, বরং উচ্চাই রীতি।

অতরাং পরহস্তগত ধনের উপর নির্ভর করিতে হইলে আকাশেই দৌধ নির্মিত হয়, বাস্তব পৃথিবীতে ইমারত গঠন করা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

অর্থ সমাগম হইলেও সময় মত যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইবে কি না তাহা কে বলিতে পারে? বিদেশীর উচ্চ দিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে কি না তাহাই বা নিশ্চিত করিয়া বলিবে কে? দিবার ইচ্ছা থাকিলেও নিজের এবং আত্মীয়-স্বজনের চাহিদা মিটাইয়া অপরকে দিবার মত কি পরিমাণ উৎসৃত থাকিবে, তাহারই বা ঠিক কি? উৎসৃত থাকিলেই বা সহজে দিবে কেন?

কারখানার যদি তাহাদের স্বার্থ না থাকে, তবে অপরকে মাল-মদলা সহবরাহ করিয়া স্বাবলম্বী অথবা অতিরিক্ত শক্তিশালী করিয়া কি তাহারা আপন পায়ে কুঠার মাখিবে? খাল কাটিয়া আপন আঙ্গিনায় কুমীর চুকাইবার প্রবৃত্তি ইউরোপ আমেরিকার মত উন্নত দেশে কাহার আছে?

ভারতের ভূগর্ভস্থ রত্নের সন্ধান আমরা জানি, আর দুই শত বৎসর এখানে রাজ্য করিয়া ইংরেজ জানে না, ইহা মনে করা বাতুলতা।

তাঁহাদের মস্তিষ্কের যে অভাব নাই তাহার বহু প্রমাণ ইউরোপ আমেরিকা পাইয়াছে। ভারতের জনবলও তাহাদের অবিস্মৃত নহে। শান্তিতে বাস করিয়া কল-কারখানা গড়িয়া তুলিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত যে পশ্চিম এমং পূর্ব-পশ্চিমকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে, সে সম্বন্ধে দূর বিদেশীর কোন সংশয় থাকিবার কথা নহে।

কিন্তু দূরদৃষ্টির অভাবে ক্ষমতা হস্তগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম এবং অনতিবিলম্বে অগাধ সলিলে নিমজ্জিত হইলাম।

বিদেশী তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের চক্রান্তে শাওর পঞ্চাশ কোটি টাকার পরিকল্পনার ব্যয় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া দেড় শর কোটিতে পৌঁছিল, তথাপি পরিকল্পনা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

সারের কারখানা তৈয়ারী হইল, সারও প্রস্তুত হইল কিন্তু উৎস্র কবিবার সামর্থ্য কৃষকের আজও হইল না।

নদীর বাঁধ হইল বজা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচের উদ্দেশ্যে। ঝাঞ্জে জলের মূল্য দিবার অর্থ নাই এদেশের লোকের। কোথা অনাবৃষ্টিতে ফসল জন্মিল না, কোথাও প্রাচ্যে দেশ ডুবাই দিল।

বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইল। জনসাধারণ উহার দ্বারা উপকৃত হ' না, হইল কল-কারখানার মালিক; বেকার হইল কিছু মজুর, উ' হইল কিছু গৃহস্থ। কোথায় বিদ্যুৎ-চালিত কুটিরশিল্প? প কোথায় যে কলের পাখার হাওয়া খায়রা শ্রান্তি অপনয়ন কা পল্লীবাসী? কিংবা বিাক্ত গ্যাস উৎপাদক কেরোসিনের হাত হ' মুক্ত হইয়া বিজলী বাতির আলোর আনন্দ উপভোগ করিবে?

সত্তরে শত কোটির ঠাঁকি ব্যালাস এখন পাঁচ শত কো টাঁড়াইয়াছে, দিগন্ত এখনও বহু দূরে।

শাসকবর্গ আবেদন (!) করেন কোমরের কাপড় আরও র্ পরিবার। কাপড় কোথায়, আঁটিয়া পরিবে? - আঁট কাপড়ে কি দুই কাজ চলে? কোমরে বাঁধিতে হইল কি নিবাণ করা যায়?

নেতাদের লজ্জার বালাই না থাকিলেও জনসাধারণ ত্রৈলোক্য স্বামী হইতে পারে নাই।

কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জন দিয়া দেশ বিভাগে রাজি হইয়া স্ব ভিক্ষা পাইলাম, কুচক্রীর খেলা চলিতে থাকিল। শাহি চিরতরে ভারত-মহাসাগরে নিমজ্জিত হইল। বিবাদ কাম না, তবুও আত্মরক্ষা করিতে প্রাধান্ত।

বিশেষ হইতে মুক্তের যে সামগ্রী আসিতেছে বিপদের সা কার্যকর হইবে কি না কে জানে! ইতিহাসে দেখা যায়, বিরুদ্ধে লড়িবার সময় রণজিৎ সিংহের বিলাতী বন্দুক ফুঁ বীর কেশরীকে পরাজয় বরণ করিতে হইল।

হু-হুটি মহাসমরের অনলের মাঝখানে থাকিয়া বি ক্ষুদ্র স্বইজারল্যাও নিরাপদে থাকিল তাহা কি আমরা বুঝি করি? কতখানি তাহার সামরিক শক্তি, তাহার সন্ধান থাকি?

আমার সমরসম্ভার অগ্রতুল হইলে আবার আমি পরাং এই আশঙ্কায় চিন্তার স্বাধীনতা বিসর্জন দিলাম। চো দেখিলাম, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বেলজিয়াম আক্রান্ত হইতেই বিশ্ব গেল; অতিদুর্লভ সত্তোজাত মিশরের উপর চড়াও করিতেই তৈলমস্তক টাক ফাটাইয়া নির্যাস তীতি প্রদর্শন করিয়া যু মুদ্র বন্ধ করিয়া দিল সেবিষয়ে নেতা। তথাপি ভরসা পা

ভারতের মত এত বড় দেশে, ইহার অগণিত অধিব করিয়া কোন নির্বোধ আপনাদি চিরশত্রুকে সাহায ভারতকে আক্রমণ করিয়া কোন অর্গাটান আপনাদি ' আহবান করিয়া নিজের সর্বনাশ করিবে? আফাল করিয়া থাকে, কথা মত কাজ হয় কটা?

জ্ঞাতির শক্তি তাহার গোলা-বাক্রদের উপর ততটা



না, যতটা করে তাহার জাতীয় সহায়তার উপর। চল্লিশ কোটি অধ্যুষিত এই দেশকে আক্রমণ করিবে কোন মূর্খ তাহার আপন কবর খনন করিতে? যদি এই চল্লিশ কোটির মনের মিল থাকে। কিন্তু মনের কি সে মিল আছে?

১৯৪৭ সালে এই দেশবাসী নেহরুর হস্তে একটি শাস্তিকামী সম্ভবতঃ জাতি অর্পণ করিয়াছিল। দশ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্বেই রাজ্যে রাজ্যে বিবান-বিসংবাদ এইরূপ ঝাঁড়াইল যে, সূচ্যগ্র মেদিনীর জন্ত একে আগ্রের মস্তক ফাটা হইতে বিনুমাত্র বিধাবোধ করিল না।

কুক্ষণে প্রদেশের নাম পরিবর্তন করিয়া রাজ্য রাখা হইয়াছিল। ইহারা যেন পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্য!

কেন এমন হইল, কে চিন্তা করে? বাঁহাদের হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত তাঁহারা কী মনে করেন কে জানে!

সংবিধান রচনার সময় একটি ধারা নিবদ্ধ হইয়াছিল, বাহার বলে ইচ্ছা করিলে ভারতের অন্তর্ভুক্ত যে কোন রাজ্য পনেরো বৎসর পরে ইউনিয়ন হইতে পৃথক হইয়া যাইতে পারিত। সংবিধান গৃহীত হইবার সময় ঐ ধারাটি বর্জন করা হয়।

সোবিয়েৎ রাশিয়ার সংবিধান দৃষ্টেই ঐ ধারা লেখা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঐ ধারাটি সোবিয়েৎ সংবিধান হইতে বর্জন করিবার চিন্তা আজও তাহাদের মনে উদ্ভিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, এবং এখন পর্যন্ত সোবিয়েতের কোন ইউনিট ঐ ক্ষমতার সুযোগ লইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

কোন আশঙ্কায় অথবা কোন উদ্দেশ্যে আমাদের গণপরিষদ নবতের সংবিধান ভূমিষ্ট হইবার পূর্বেই ঐ ধারাটি বর্জন করিলেন? পরিষাতে উত্তর সুযোগ লইয়া কেহ বাহির হইয়া যাইবে সন্দেহ করিয়া কি? অথবা কোন প্রবল সাংখ্যগরিষ্ঠ অঞ্চলের দুর্বল হুল অঞ্চলকে একসূত্রপটে করিবার দুর্ভাগ্যবশতঃ?

একত্র থাকিবার সুবিধা স্বদয়সম করিলে পৃথক হইয়া যাইবার কে আশঙ্কা থাকিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা দুষ্কর। কিন্তু যদি একত্র থাকিয়া অন্তর্বিধা, পক্ষপাতিত্ব, অরহেলা অথবা নির্ধাতন ভাগ করিতে হয় তাহা হইলে পৃথক হইয়া যাইবার ইচ্ছা স্বভাবতঃই প্রবল হইয়া উঠে।

কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া, যতই সম্মানযোগ্য সে কাগজ ইউক, কি ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন লোককে লইয়া ঘর করা যায়? নারায়ণ ঠাকুর করিয়া মন্ত্র পড়িয়া, এমন কি জাগ্রত দেবতা আইন আদালত য় করিয়াও ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামিন্দ্রকে একত্র ঘর করান সম্ভব। হাজার বাধা সত্ত্বেও একদিন তাহারা ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। ভারতের বর্তমান অবস্থা হইতে এরূপ আশঙ্কাই মনে জাগিয়া কে।

ইতিহাসের দোহাই পাড়িয়া বলা হয় যে, যখনই নিজস্বের তত্ত্ব বিবাদ করিয়া ভারত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখনই সে পরাধীন হইয়াছে। ইহা সত্য।

পশ্চাত্তরে ইহাও মিথ্যা নহে যে, যত বার ভারতকে সহত করা যাচ্ছে তত বারই সে অনতিবিলম্বে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাঠান এবং মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস উল্লেখ করা যাইতে পারে।

যুগে যুগে কেন এইরূপ হইয়াছে? যত দিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শক্তি প্রবল রহিয়াছে মাত্র তত দিন পর্যন্তই ভারত সম্ভবতঃ রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইলেই সুযোগ বুঝিয়া সকলে কেন্দ্রের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়াছে।

রাজচক্রবর্তীদের বেলার বাহা সম্ভব হইয়াছে, বৃগতি বিহীন গণতন্ত্র তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

গণতন্ত্রের বিভিন্ন আশের প্রতিনিধি হইতে নির্বাচন করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা হইয়া থাকে। এই মন্ত্রিমণ্ডলীর উপরই রাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্ত্রিমণ্ডলী সাধারণতঃ সাংখ্যগরিষ্ঠ দল হইতেই নির্বাচিত হয়। ইহারা মাত্র তত দিন পর্যন্ত ইহাদের দলের আত্মগত্যা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, যত দিন তাঁহাদের নিজ নিজ প্রদেশের স্বার্থ গুরুতররূপে ক্ষুণ্ণ না হয়। কিন্তু যদি ক্রমাগত এই সকল অঞ্চল কেন্দ্রের সুবিচার হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই অঞ্চলীয় মন্ত্রীর পক্ষে একাগ্রচিত্তে দলের তথা কেন্দ্রের স্বার্থ অহুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয় না। এই তাহে দল দুর্বল হয়, এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী তথা কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।

কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইলে প্রদেশের সুবিধা মত সংবিধান পরিবর্তনের চেষ্টা অনিবার্য হইয়া পড়ে। উহাতে অকৃতকার্য হইলে সংবিধান-বিরোধী চেষ্টা যে হইবে না, তাহা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাক যুক্তিসঙ্গত নহে।

ভারত আজ দুর্ভাগ্যক্রমে যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে যদি কোন রাজ্যের কোন প্রতিনিধি সংবিধান পরিবর্তন করিয়া রাজ্যকে ইউনিয়ন হইতে বাহির হইবার অধিকার দানের আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। এই মনোভাবের জন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীই দায়ী হইবেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রকাশ্যে অভিযোগ করিতে পারেন যে, বিশেষ বিশেষ রাজ্য কেন্দ্র হইতে সুবিচার পাইতেছে না, তাহা হইলে ঐ রাজ্যের অধিবাসীর মনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, তাহা কি বুঝিতে কষ্ট হয়?

বেথানে সব দিক দিয়া নিজের অনুবিধা, এমন কি ক্ষতি স্বীকার করিয়া অপরের সঙ্গে ঘর করিতে হয়, সেখানে প্রণয় কত দিন থাকিতে পারে?

মানুষের বুদ্ধি ও হুঁহুঙ্কি উভয়ই দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশী দিন আর তাহাকে বোকা বানাইয়া রাখা যাইবে না।

পৃথক হইলে কি বিপদ, তাহা বুঝিতে গিয়া বলা হয় যে, প্রবল রাষ্ট্রের কাছে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতার কোনই মূল্য নাই। একবার সত্যতা সম্বন্ধে বখেট সন্দেহ আছে। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে বর্তমান কালে সারা পৃথিবী ছুটিয়া আসে তাহার সাহায্যের জন্ত। যদিও দরদ আপেক্ষা শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যই প্রবল। যুদ্ধ যদি বাধে, তাহা হইলেও বর্তমান শতাব্দীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে যে, শেখ পর্যন্ত ক্ষুদ্র আক্রান্ত রাজ্য স্বাধীনতা তো হারায়ই না, বরং আক্রমণকারী বৃহৎ শক্তি অপেক্ষা বহু কম সময়ের মধ্যে সে তাহার অবস্থার পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয়।

ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যুদ্ধের পর পদনলিত নিষ্পেষিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তাহাদের পুরাতন স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে এবং ধীরে ধীরে উন্নতির সোপান আরোহণ করিতেছে।

ভারতের অংশ সমূহের পক্ষে যে অগ্ররূপ হইবে, তাহা অমুমান করিবার কি কোন কারণ আছে? আর একটি যুক্তি দেখান হইয়া থাকে যে, পৃথক হইয়া গেলে অর্থনৈতিক বিপর্ষয় অনিবার্য।

কোন কোন অংশের পক্ষে এই প্রকার আশঙ্কা অমূলক না হইলেও সকল অংশের পক্ষে ইহা সত্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুই রাজ্যই কৃষি, বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ; লোকবলও ইহাদের মধ্যেই আছে। অধিকন্তু ইহারা উভয়ই সমুদ্র-উপকূলবর্তী। পশ্চিমবঙ্গে একটি বৃহৎ বন্দর বর্তমান, আর একটির স্থানেরও অভাব নাই। উড়িষ্যায় কোন বন্দর না থাকিলেও স্থানের অভাব নাই। সুতরাং কৃষি-শিল্প এবং বাণিজ্য লইয়া ইহাদের পক্ষে সমৃদ্ধিশালী হইবার কোন বাধা আছে বলিয়া সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়?

এই সকল বিবেচনা করিয়া সময় থাকিতে সতর্ক হইবার আবশ্যকতা যে কৃত অধিক, তাহা কি বলিবার প্রয়োজন আছে?

একত্রে থাকিতে হইলে পদবন্দারের সুবিধা অসুবিধার উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। শুধু নিজের আঁঠার আনা দেখিলে চলিবে কেন?

ভারতের উন্নয়ন সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু বলা হইয়াছে। আরও কিছু না বলিলে ত্রুটি থাকিয়া যার বলিয়া ঐ প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন করিতে বাধ্য হইলাম।

উন্নতির চিন্তার সময় আমাদের চক্ষু এবং মন উভয়ই পশ্চিম গোষ্ঠাষে নিবদ্ধ থাকে। দৃষ্টিশক্তি চিন্তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। তুলিয়া বাই আমরা যে, আমাদের কৃষ্টি এবং আদর্শ স্বতন্ত্র এবং পৃথক।

প্রতীচী চার আরও ভাল খাতি, আরও স্বন্দর বেশভূষা, আরও চাকচিক্যময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা। প্রাচ্যের আদর্শ সাধারণ খাতি এবং সম্ভব বেশভূষা। পশ্চিম চার উদ্দেশ্য আরও উদ্দেশ্য উদ্ভিত; পূর্ব চাহে ঘরে বসিয়া তাহার অন্তরের চিন্তার প্রসার, যে পবিত্র উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া রক্তে বিলীন না হইয়া যায়।

পাশ্চাত্য আদর্শের অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি হইতেছে দুর্দোষ, দীর্ঘা ধ্বংস, বিবাদ ও পরস্পাপহরণ এবং বোমমার্গে দিগ্বিজয়ের অভিলাষে উদ্ধার মত অনিবার্য ধ্বংস, প্রাচ্যের আদর্শ মানুষকে পৌছাইয়া দেয় কল্যাণময়ের পরম শাস্তিময় রাজ্যে।

কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যে উন্নতির আশার আমরা উদ্ভূত হইয়াছি, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পৃথিবীর সংস্কৃতির দূত প্রেরণ করিয়া আমাদের সনাতন কালচাতুরের যে গর্ব প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছি, সে গর্ব আর কত দিন করিতে পারিব?

বিজ্ঞাতীয় কৃষ্টির আবর্জনা আনিয়া ঘর ভর্তি করিয়া, নিজের দেশের স্বন্দর বাহা কিছু সব ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছি। কৃষককে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মিলের মজুর করিয়া বস্ত্র পশুর পর্ধ্যরে ফেলিলাম, শাস্তির সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিলাম; স্বজনশীল শিল্পী হইল অমুকরণকারী টেকনিসিয়ান, দার্শনিক প্রকৃত করিবে মারণাস্ত্র!

কথিত আছে যে, ফারাডে যখন ইলেক্ট্রিসিটি আবিষ্কার করিয়া মনের আনন্দে বিভোর, তখন কোন মন্ত্রী তাহাকে বারবার প্রশ্ন করিতে থাকেন উহার দ্বারা কি কাজ হইবে। উহার উত্তরে বিরক্তির সহিত ঐ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন, 'অস্বস্ত পক্ষে উহার উপর তুমি ট্যান্স বসাইতে পারিবে'।

বৈজ্ঞানিকের কথা মিথ্যা হয় নাই। সত্যই মানুষ একদিন উহার উপর ট্যান্স বসাইল; কিন্তু সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন যে মনোবী তাহার অন্তরের আনন্দ কে বুঝিল?

সব জিনিষ অর্থের মাপকাঠি দিয়া মাপা যায় না। কৃষ্টি এমনই একটা জিনিষ, বাহা পৃথিবীর কোন মাপকাঠির নাগালের মধ্যে নহে।

ভারতের বৈশিষ্ট্যই তাহার কৃষ্টি; উহাই বোধ হয় তাহার দীর্ঘ জীবনের মূল কারণ। কত জাতি আসিল, কত গেল, ভারত আবহমান কাল ধরিয়া চলিতেছে। পশ্চিমের বিজ্ঞান আসিয়া ভারতের জ্ঞানকে নির্ধাসিত করিলে কিসের জোরে ভারত বাঁচিবে? শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিয়া অথবা নটরাজের নৃত্য নাচিয়া কি তাহাকে রক্ষা করা যাইবে?

## লোকটি যাহাকে হত্যা করিয়াছিল

(Thomas Hardy লিখিত 'The Man He Killed' কবিতার অনুবাদ)

যদি তার সাথে দেখা হতো কোন পুরান অভিযিশালাত,  
পিয়াল পিয়াল মদিরা উজাড় করিতাম বসে তু'জনাতে।  
পলাতক-রূপে যুঝেযুঝি দৌড়ে দেখা হ'ল সমরঙ্গনে,  
দৌড়ে দৌড়া প্রতি গুলী ছুঁড়ে দিলুম, মারিছু তাহারে সেইখান।  
সমরঙ্গনে বিপক্ষ দলে পাইছু তাহারে সমুখে—  
সে মোর শত্রু জানি নিশ্চয়, তাই তো মারিছু তাহাকে।  
হার, মোর মন বুঝে না সঠিক শত্রু সে মোর কে বলে,  
আমারই মতন হয়তো সে-জন না ভেবে চুকেছে সেনাদলে।

পেটের তাড়ন বিক্রী করেছে বাহা কিছু ছিল সম্বল;  
আমারই মতন ছিল সে বেকার, তাই তো চুকেছে সেনাদল।  
শান্তির কালে তার সাথে যদি মদের দোকানে দেখা হ'ত,  
টাকা-কড়ি কিছু লিভাম তাহারে, করতাম থানাপিনা কত।  
যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হ'ল ব'লে তারেই মারিছু গুলীতে,  
স্থান কাল-ভেদে একই মানুষের বিপরীত ভাব হিয়াতে।  
যুদ্ধ বড়ই অদ্ভুত বটে, যুদ্ধ বড়ই ভয়ঙ্কর—  
যুদ্ধ করেছে মানুষের প্রাণ নিটর, ক্রুর, হোরতর।

অনুবাদক—শ্রীমালকৃষ্ণ নাথ।

# বিপ্লবী ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত

## অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৯৫৪ ইং অক্টোবর ৪ঠা জামুয়াবীর অমৃতবাজার পত্রিকায় জাঙ্গানীর হামবুর্গে অবস্থিত ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের 'ইনভেস্টমেন্ট এডভাইজার টু জাঙ্গাণ ফাইন্যান্সিয়াল' শ্রীজামমুন্দরলাল গুপ্ত এক পত্র প্রকাশ করেন, তাহার শিরোনাম ছিল, 'এ্যাসেস জ্রম হামবুর্গ' তাহার মর্থ ছিল, বিপ্লবী ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৯৪৬ ইং অক্টোবর ১৮ই ডিসেম্বর হামবুর্গের একটা হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তাঁহার দেহাবশেষ যেন মাতৃভূমির ধূলিরাশির সঙ্গে মিশিয়া যায়।

ডক্টর দাশগুপ্ত যে শেষ জীবনে দারুণ অর্থাভাবে মর্মান্তিক অবস্থায় দিনাতিপাত করিয়াছিলেন, তাহারও দক্ষিণ্ত বিবরণ তিনি প্রকাশ করেন।

আমরা বথাকালে এই বিপ্লবী-বীরের জীবন-প্রদীপ নির্দীপিত হওয়ার সংশয় পাই নাই। দারুণ অর্থাভাবের সংবাদও অবগত হই নাই, স্তব্ধতা তৎক্ষণাৎ উক্ত পত্র পাঠ করিয়া অবশ্যই হইলাম। তিনি ছিলেন আমাদের সহকর্মী, সহপাঠী, আমার স্বদেশবাসী এক একই মত ও পথের পথিক। অর্থাভাবের সংবাদ পাইলে অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করা অসম্ভব হইত না। স্তব্ধতা তাঁহার শোক বন্ধ বিদীর্ণ হইল। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন স্বদেশী যুগে উদ্যম কর্মী, অগ্রিমন্ত্রের সাধক। পরে জাঙ্গানীতে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্র ও যুবকগণের হিতাকাঙ্ক্ষা এবং সর্বকালের সহায়ক ছিলেন।

### পরিচিতি।

ত্রিপুরা জেলার জিন্দাপুর গামে প্রসিদ্ধ চা—কৃষি ও শিল্পবিদ মহেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্তের চতুর্থ পুত্র ছিলেন তিনি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণও বৃত্তী বিভাগী এবং তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার একটি ভাগিনেরী প্রখ্যাতা বিপ্লবী নারী-কর্মী শ্রীমতী চৌধুরী কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ট্রিভেল হত্যার অপরাধে শ্রীমতী শান্তি ঘোষ সহ দীর্ঘকাল কারাকক্ষে আবদ্ধ ছিলেন। ১৮৮০ অক্টোবর ১লা আগস্ট জ্ঞানেন্দ্রের জন্ম হয়।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র স্বদেশী যুগের প্রারম্ভেই একজন বিপুল উৎসাহী দেশকামিগণে কুমিল্লা সহরে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি জিলা স্কুলে সর্বজন্ম-প্রশাসিত তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৬ অক্টোবর এপ্রিল মাসে বরিশাল কনফারেন্স ভ্রমণের পর বাণেশ্বর বিপিনচন্দ্র পাল যখন শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীউল্লাসকর দত্ত প্রমুখ একদল উগ্র দেশকামিসহ স্বদেশী প্রচার ও জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কুমিল্লায় গমন করেন, বিপিনচন্দ্র প্রত্যহ স্থানীয় দেশকামিগণ সহ সারের দ্বারে ভিহা করিয়া জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তখন প্রভাত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রকে বিপিনচন্দ্রের দলের পুরোভাগে দেখা যাইত। তিন মাস পর, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রবর্তিত প্রথম বৎসরের এন্ট্রান্স এবং ইণ্ডিয়ানিউজিটে পরীক্ষার সমুদায় পঞ্চম মান ও সপ্তম মান পরীক্ষা গৃহীত হয়। তিনি পঞ্চম মান পরীক্ষা দ্বিগুণ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমতঃ বোম্বাইয়ের 'দি এ্যাসোসিয়েশন' বন্ধ 'দি কালিউরেশন অব সারেল' বিজ্ঞান শিক্ষার ত্রুটি হন। কিন্তু ছয় মাস পরই তাঁহার উচ্চল প্রতিভার পরিচয় পাইয়া—জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীরাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (পরে ডক্টর) সাগ্রহে তাঁহাকে কলেজ কোর্সে ভর্তি করিয়া লইলেন। এখানেই তাঁহার দীক্ষা হইল বৈপ্লবিক মন্ত্রে—গুরু গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ দে এম-এ, বি-এস-সি।

### সোনার বাংলা

এক শুভ প্রভাতে ডাক্ষণবাড়িয়া সহরে আমরা আসিয়া দেখিলাম, বৃহদাকার স্বরঞ্জিত প্রাচীরপত্র সহর ঢাকিয়া গিয়াছে। পত্রটি ছিল এইরূপ :—

### সোনার বাংলা!

..... লোক মরিতে প্রস্তুত, তোমরাও প্রস্তুত হও!

ভিতরে উদ্ভাসিত ভাবের ছিল ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিবোল্পার, এবং মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক হওয়ার আহ্বান।

আমরা স্কুল বর্জিত করিয়া স্বদেশী প্রচারে বিব্রত, তখনও মুক্তি-সংগ্রামের কথা ভাবি নাই, প্রাচীরপত্র পাঠে স্তম্ভে উৎসাহ-অনল প্রদীপ্ত হইল।

কয়েক মাস পরে দাশগুপ্তের নিকট অবগত হইলাম, তিনি তাঁহার দুই জন সহকর্মীসহ প্রাচীরপত্র একই রাতে চাঁদপুর, কুমিল্লা এবং ডাক্ষণবাড়িয়া সহরের দেয়ালে দেয়ালে আঁটিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অস্বস্তম সহকর্মী নবীনচন্দ্র লোধও পরে আমাদের এই তথ্য জ্ঞাপন করেন। প্রাচীরপত্র ছিল কলিকাতার আত্মোন্নতি সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত।

### বিপ্লব-মন্ত্রের প্রচার।

১৯০৬—১ পর্যন্ত দাশগুপ্ত যমুনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কবিমগঞ্জ এবং ত্রিপুরা জেলার সহর ও বড় বড় গ্রামে তাঁহার গুরু মহেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের নির্দেশে বিপ্লব-মন্ত্রের প্রচার করেন, স্বল্প অধ্যাপক গোদায় আমাদের চুটী, কালীকঙ্ক, বিজ্ঞানকূট, ইব্রাহিমপুর প্রভৃতি গ্রামেও গমন করেন। স্থানে স্থানে অত্যাগাহী কর্মীগণের মধ্যে দু-একটি রিজলবারও বিতরণ করেন।

### জাঙ্গানী যাত্রা

১৯০৮ অব্দে মণিকতলায় বোমার বাগান আবিষ্কৃত হয়, তৎপরেই বিপ্লবী এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী যুবকগণের অন্তরে জাগিয়া উঠে বোমা প্রস্তুতের এবং প্রবেশের বিধান আয়ত্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র উদীপ্ত হইলেন জাঙ্গানীতে বাইরা রসায়নশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতের বিজ্ঞা অর্জন করার দুনিবার আকাঙ্ক্ষায়। তিনি 'দি এ্যাসোসিয়েশন' কর 'দি এ্যডভান্সমেন্ট অব সায়েন্টফিক এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন অব ইণ্ডিয়ানস্'এর সম্পাদক বোসেন্দ্রচন্দ্র বোব মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। বোব মহাশয় তাঁহার লগুন পর্যন্ত বাতায়নভেদে

পাথের দিতে প্রস্তুত হইলেন। তৎপরে বঙ্গাব্দের মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হইতে মাসিক পচিশ টাকা বৃত্তি দুই বৎসর পাওয়ার স্বীকৃতি পাইয়াই উৎসাহিত হইলেন এবং দার-কজ্জ করিয়া ১৯১০ অব্দের আগষ্ট মাসে “গোলকুণ্ডা” জাহাজে চাপিয়া লণ্ডন চলিয়া গেলেন।

### বালিনে দাশগুপ্ত

বালিনে পৌছিয়া তিনি শীতের সেসনে ভর্তি হইতে পারিলেন না। কারণ, জাতীয় বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট ভর্তির পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। এ বিষয়ে দৃঢ় ভাবে আন্দোলন করিয়া অবশেষে ১৯১০-এর গ্রীষ্ম সেসনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন।

তাহারই আন্দোলনের ফলে জাতীয় বিদ্যালয় এবং সায়েন্স এসোসিয়েশনের সার্টিফিকেট জাঙ্গাণীর সর্বপ্রকার বিদ্যালয়ে ভর্তির পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইল।

আমি এবং বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (পরে ডক্টর এবং রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ) ১৯১০-এ বালিনে পৌছিয়া তাহার সাহায্য এবং সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইলাম। সর্বরই লক্ষ্য করিলাম, তাহার টেবিলের উপরে ম্যাজাম ভিকাজীকর্মা সম্পাদিত—“বন্দে মাতরম্”, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত—“তলোয়ার” জামাজী কৃষ্ণধ্বার “ইণ্ডিয়ান সোসিয়ালিজম” এবং অগ্ন্যস্ত্র বহুবিধ বৈপ্লবিক ইস্তাহার ও পুস্তকাদি রহিয়াছে। সর্বরই আমাদের নামেও জীসাদারকর সংকলিত—“ভারত-স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস” এবং কিছু সংখ্যক পত্রিকাদি আসিল। আমরা উপলব্ধি করিলাম, প্যারিস বালিনে লোকচক্ষের আড়ালে এক যোগসূত্র রহিয়াছে।

### অস্ত্রসংগ্রহের বোঝা

দাশগুপ্ত এক দিন কথাছলে বলিলেন, তিনি কলিকাতায় জীপ্রভাসচন্দ্র দেবকে লিখিয়াছেন, জাঙ্গাণ গভর্নমেন্ট বেচ্ছাসৈনিকগণের ব্যবস্থাত প্রায় নূতন-রাইফেল সত্তা দরে বিদেশে চালান দেয়, তিনিও আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, তাহার দিতে প্রস্তুত কিন্তু ডেসিভারী জাঙ্গাণীতেই নিতে হইবে। তার পর দেখাইলেন, একথানা পোষ্টকার্ডে মুদ্রিত রাইফেলের চিত্র।

প্রায় দুই মাস পরে আমার একজন জাঙ্গাণ সহপাঠী বন্ধু হার আর্গার্ট মিটাগ আমার কক্ষে বসিয়া আমাকে জাঙ্গাণ ভাষা শিক্ষাদান এবং ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণকালে সহসা দাশগুপ্ত হইতে আনীত “ইন্টার ভ্রাশনেল হিষ্টরী অব দি রিভোলিউশনারী একটিভিটি” নামক গ্রন্থের প্রথম অংশ খুলিয়া দেখিলেন। সহসা উক্ত চিত্র দেখিয়া কাঁপিয়া উঠেন। তিনি বলেন ইহা ত তাহাদের মিলিটারী রাইফেল, তাহার চিত্র আমার নিকটে কেন? নানা ভাবে কথা বলিয়াও আমি তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে পুস্তকের ভিতরে যে এই চিত্র ছিল তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু তাহার মুখ কাল হইল—এক সন্ধ্যাবেলার পুলিশ আসিয়া এ বিষয়ে বহুবিধ প্রশ্ন করিলেন; পরদিন দাশগুপ্তকেও পুলিশ প্রশ্ন করে কিন্তু তাহা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

তিনি কলিকাতায় পত্র দিয়েছিলেন আন্দোলন সমিতির উত্তাপে দীপ্ত বোদ্ধ একটা সোহা-সকর এবং সিমেন্টের বোকার খুলিতে।

তিনি জাঙ্গাণী হইতে পাইপ পাঠাইবেন, তাহারই কতকগুলির মধ্যে থাকিবে রাইফেল, সিমেন্টের পিপার মধ্যে বুলেট, পিস্তল এবং রিভলবার। ব্যবসা চলিবে লোকসান দিয়া। কলিকাতা হইতে উত্তর গেল—“ব্যবস্থা করিতেছি”।

### হেগ আদালতে সাভারকরের বিচার

হেগ আদালতে জীসাদারকরের ইতিহাসখ্যাত বিচারের জন্ত প্যারিস ও বালিনে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহাতে দাশগুপ্তের কৃতিত্বও কম ছিল না। তিনি রাইখসটাগের কতিপয় সদস্য (সোসিয়েলিষ্ট এবং প্রোগ্রেসিভ পিপলস পার্টির সভ্য) দ্বারা গভর্নমেন্টকে এ বিষয়ে আন্দোলন চালানিবার পরামর্শ দেন, অর্থ সংগ্রহেও তাহার শক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা গর্ব অনুভব করি। যদিও উক্ত বিষয়ে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ডক্টর চক্রবর্তী এবং আমার উৎসাহ অদম্য ছিল তথাপি তাহার বুদ্ধির প্রাণখ্যা আমাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল। এ বিষয়ে ১৯১২ ইং অব্দের ১২ই অক্টোবরের “যুগান্তর সাময়িকী”তে প্রকাশিত আমার সংকলিত “হেগ আদালতে সাভারকর ব্যাপার” শীর্ষক প্রবন্ধে সকল তথ্য বিবৃতি ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

### বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব

১৯১৩ অব্দের মার্চ মাসে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র “কলিত রসায়নে” ডক্টরেট উপাধি লাভ করিলেন। তার পরই তাহার অধ্যাপক ডক্টর উল্ফমান অমুরোধপত্র লইয়া সুইজারল্যান্ডের বাসেলে গেলেন এবং তথায় প্রসিদ্ধ “রসে ব্রাণ্ড” ক্যামিকেলস প্রস্তুতকারক “হোফম্যান ল্যা রসে” কোম্পানীর “উবারডিনেন” ফ্যাক্টরিতে গবেষক রাসায়নিক পদে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষণার পরই সুইজারল্যান্ড নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল, সুতরাং জাঙ্গাণীতে অবস্থিত ফ্যাক্টরিতে বাসলে হইতে প্রত্যহ বাতায়ত করার বিষয় ঘটিল, কারণ উত্তর দেশের মধ্যে রাইন নদীর উপরের সেতুপথ বন্ধ হইল, রেল-বাসও অনিদিষ্ট কালের জন্ত স্থগিত রহিল। এ জন্ত তিনি ছুটি পাইলেন।

### ভারত উদ্ধার উত্তাপে সহযোগিতা

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র আগষ্ট মাসের ১৮ই তারিখে জাঙ্গাণ পররাষ্ট্র দপ্তরে এক পত্র দিয়া ভারতে বিপ্লব বাধাইবার উত্তোগ করার জন্ত সাহায্য ও সহযোগিতা চাহিলেন কিন্তু উত্তর পাইলেন না। অপর একজন বিপ্লবী সি পদ্মনাভম পিলাই জুরিখে থাকিতেন, তিনি তথায় ‘প্রো-ইণ্ডিয়ান সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং “প্রো-ইণ্ডিয়ান” নামক মাসিক পত্রিকা জাঙ্গাণ ভাষায় প্রকাশ করিতেছিলেন। আমরা তাহাকে জানিতাম, তাহার কার্যে প্রীত ছিলাম। তিনিও জ্ঞানেন্দ্রকে না জানাইয়া পররাষ্ট্র দপ্তরে এক পত্র লিখেন, কিন্তু উত্তর পান নাই।

৩রা সেপ্টেম্বর আমাদের অমুরোধে পররাষ্ট্র দপ্তর উক্ত দুই জনকেই আমরা বালিনে বিপ্লব সংঘটনের কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এ সুবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া তাহাদের সহরে অবস্থিত জাঙ্গাণ কন্সাল হইতে অর্থ লইয়া বালিনে চলিয়া আসিতে পত্র দেন। জ্ঞানেন্দ্র অর্থ না লইয়া নিষ্কর্যেই এক পিলাই অর্থ লইয়া বালিনে আসিয়া উপস্থিত

হন। কিন্তু উভয়েই যদি আমাদের বন্ধু ছিলেন, বার্লিনে পৌঁছিয়া পররাষ্ট্র দপ্তরের দরবার করিতে গেলেন, কেন পত্রের জবাব মিলিল না ইত্যাদি। পরে ব্যারন ওপেনহাইমের অমুরোধে আমাদের সঙ্গেই যোগদান করিলেন।

### ডক্টর মুলার

দাশগুপ্ত ব্যারনকে অমুরোধ করেন, তাঁহার বন্ধু এবং আমার পরিচিত চীনভাষাবিদ ডক্টর মুলারকে বুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনিয়া তাঁহাদের (পররাষ্ট্র দপ্তরের) এবং আমাদের দলের মধ্যে লিগেসন অফিসার ভাবে রক্ষা করার জন্ত। এই সকল তথ্য ১৩৫১ অব্দের পূজা সংখ্যা “বহুমুখীতে” আমার লিখিত “বার্লিনে ভারত উদ্ধার উত্তোগ” শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

মুলারের আগমন, তাঁহার বাটাতে আমাদের “ভারতবন্ধু জাৰ্গান সমিতি”র কাৰ্যালয় স্থাপন, স্পাণ্ডাও বিফোরক কারখানায় বিফোরক প্রস্তুত শিকা ইত্যাদি আমার বিভিন্ন প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

দাশগুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়াই তাঁহার সর্ব বিষয়ে কৰ্ম্মনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ব্যারন ওপেনহাইম, ডক্টর মুলার প্রমুখ ব্যক্তিগণের এবং সমিতির প্রেসিডেন্ট—হান্সবুর্গ আমেরিকা স্ট্রিমার লাইনের জেনারেল ম্যানেজার ভারতবন্ধু এবং ইংরাজ ফরাসীর যোঁরতর শত্রু ছাত্র আলবার্ট পলিনের প্রশংসাজ্ঞান হইলেন।

### হেলপোলাও যাত্রা

সিদ্ধি পারসী ছাত্র বিপুল উংসাহী এবং দুঃস্থ সাহসী দাদা বানজী কেরসাম্প এবং দাশগুপ্ত উভয়েই ছিলেন সর্ব কার্যে অংশীদার। পড়ার জন্ত উৎকর্ষিত, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান শেখ ছিল—অত্যন্ত একজেনী এবং পরমত-অসহিষ্ণু। এ জন্ত দলের সঙ্গে কার্য করার অনুপযোগী। কেরসাম্প হইতে দাশগুপ্ত অধিকতর জেনী ছিলেন, উভয়ে দাবী করিলেন তাঁহাদিগকে সামুদ্রিক মাইন প্রস্তুত শিকার সুযোগ দিতে হইবে। যদিও ওরা সেক্টরের যে সব সস্ত্রী আমার ব্যারন ওপেনহাইমের নিকট দিয়াছিল, ইহাও তন্মধ্যে একটি ছিল, তথাপি লেডী অফিসার হার ফন ফিসার যখন ইহা কয়েক মাস মধ্যে আরম্ভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন, তখন আমরা এ বিষয়ে নীরব হই। সেক্টরের মাসের ১৬ই তারিখ উক্ত দুই সহকর্মী এজন্ত গীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, নানা প্রকারে বুঝাইয়া নিরস্ত করা যখন অসম্ভব হইল তখন ব্যারন ওপেনহাইম, ডক্টর মুলার ও ফিসার পরদিনই তাঁহাদিগকে হেলপোলাও যাত্রা করিবার সুযোগ দিলেন।

ক্রিড্ডিথ্র্যাডক রেশনে প্রথম শ্রেণীর কামরায় তাঁহাদিগকে তুলিয়া দিবার কালে চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর হুকতাকর এবং আমি বলিলাম, বুঝা যাইতেছেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় দাশগুপ্ত সহস্রে বলিলেন, “ভয় নেই, চার মাস মধ্যেই বঙ্গোপসাগরে ব্রিটিশ ও মিত্র শক্তির স্ট্রিমার ডুবিয়ে দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করবো।”

তৃতীয় দিনেই হেলপোলাও হইতে কোন কেরসাম্প চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন—“ভাণ্ড কবে দেবে তখন মনে হল, ঈজ শিকা লাভ

করা অসম্ভব। উক্ত পশু, পাখিবিদ্যা এবং মেকানিক্সে অগ্রচূর জ্ঞান না থাকলে মোটেই সম্ভব নয়। স্তব্ধা কিংবা বাবার অমুমতি চাই।” ব্যারন আপিসে নির্দেশ দিলেন হেলপোলাও ম্যারিন ট্যাকনিকেল ইনস্টিটিউটে তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতে। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া হেলপোলাওয়ের রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিলেন, তাহা সুবিস্তৃত, স্তব্ধা এখানে প্রকাশ করিতে বিরত रहিলাম।

### সুইজারল্যান্ড যাত্রা

১৯১৪ অব্দের ১লা অক্টোবর দুই জন সহকর্মী সহ আমি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করি, নবেম্বরের মধ্যভাগে আমার পল্লী নিবাসে যোগ্য হইতে লিখিত দাশগুপ্তের এক পত্রে অবগত হই, তিনি আমানানী-রস্তানী ব্যবসায় হাত দিয়াছেন এবং জেনোয়া বন্দর হইতে মালপুর প্রেরণ করার জন্ত তথায় বাইতেছেন।

“আমানানী-রস্তানী” অর্থ অল্পপত্র ভারত উপকূলে প্রেরণের চেষ্টা। ১৯১৬ অব্দে সুইজ গভর্নমেন্টের শাসনানী পাইয়া তাঁহাকে নিরপেক্ষ সুইজারল্যান্ড ত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে ঐ ব্যবসা চালাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকুরীও করিলেন, এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি সুইডেনের ষ্টকহলম চলিয়া যান। তার পর বিশেষ কিছু অবগত হই নাই।

১৯১৯ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার (বার্লিন হইতে লিখিত এক পত্র) পাইয়া অবগত হইলাম, তিনি এবং ডক্টর মুলার এক সঙ্গে ডক্টর জে. সি. দাশগুপ্ত এণ্ড কো. নামে আমানানী-রস্তানীর ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি হামবুর্গে যাইয়া একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন এবং কিছু কিছু বাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত ও রস্তানী ব্যবসা আরম্ভ করেন।

### দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে নেতাজীর সহযোগিতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন বার্লিনে থাকিয়া চরুশক্তির সহায়তার ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করার উত্তোগ করেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিলেন বলিয়া ১৯৪৫ অব্দেই সংবাদ পাইয়াছিলাম কিন্তু তার পর আর কোনো সংবাদ পাই নাই। বিদেশে যেখানে অর্থীভাবে দুঃস্থ বঙ্গী ভোগ করিয়া তিনি হামবুর্গের একটি হাসপাতালে দেহত্যাগ করিলেন, তার পূর্বে আমরা সংবাদ পাইলে প্রচুর না ইউক কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রেরণ করিয়া যদি আরও একটি বছর তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতাম, তবে ভারত স্বাধীন হইয়াছে ইহা জানিয়া তিনি পুলকিত হইতেন। ১৯০৫ হইতে ১৯৪৫ পর্যন্ত তিনি যে কল্পনা করিয়াছিলেন, যাহার জন্ত শক্তি অর্থ এবং আবুক্য করিয়াছিলেন তাহা সার্থক মনে করিতেন। ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার শোনার বাল্য, তাঁহার গোমতা-তিতাস-মেঘনা-বিরোধিতা ত্রিপুরার বন্ধে জিনোদপুর গ্রামে বাইয়া জীবন ধরা করিতে পারিতেন। সংগ্রাম, স্বদেশ এবং বাঙ্গালী জাতির কল্যাণের জন্ত যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, বিভিন্ন পরিকল্পনা ছিল, তাহা আংশিক ভাবে পূর্ণ করিয়াও তিনি গাহিতে পারিতেন—

“সার্থক জন্ম আমার

জন্মেছি এই দেশে।”



# স্মৃতিচিহ্ন



পরিমল গোস্বামী

দ্বিতীয় পর্ব

৪

ঋণশোধ নাটকের পঞ্চাংগট রূপে নন্দলাল বসু একখানা দৃশ্য একেছিলেন। একটু দূর থেকে দেখলে মনে হবে সবুজের সমুদ্রে শাদা ফেনার ডেউ। এই ছবিখানা আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল। শিল্পীর কাছ থেকেই একটুখানি ব্যাখ্যা পেয়ে হঠাৎ যেন আর্টের উদ্দেশ্য বিষয়ে আরও খানিকটা অস্পষ্টতার কুয়াসা আমার মনে থেকে কেটে গেল। শরৎকালের আনন্দ আবেগের প্রকাশ এ-ছাড়া আর কি হতে পারত ভেবেই পেলাম না। শরৎকালে মাঠে মাঠে সবুজের সমুদ্রে কাশফুলের ডেউই তো এত দিন বাংলাদেশের প্রান্তরে প্রান্তরে দেখে এসেছি। একটি একটি পৃথক গাছ একে তার রূপ রেওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশের যে শরৎ দৃশ্য মনকে নাড়া দেয় তা কোনো বিশেষ একটি জিনিস নয়। সে যেন শত কণ্ঠের ঐক্যতান। তা থেকে কোনো একটি সুরকে বেছে বেব করতে গেলে সমগ্র রূপের উপর আঘাত হানার হয়। ইংরেজদের শিল্পশাস্ত্রেও Spoiling the forest with too many trees নামক একটি নিন্দাবাক্য প্রচলিত আছে। অর্থাৎ কিছু ভিন্ন হলও মূল কথাটি এক।

আচার্য নন্দলালের আঁকা এই একখানা মাত্র দৃশ্য আমার জীবনে একটি নতুন আবিষ্কার। কারণ বাংলার শরৎকালের ভাবরূপের প্রকাশ রবীন্দ্র কাব্যে স্ফূর্তিরূপে পয়েন্টে উঠছে বলা যেতে পারে। নন্দলালের ছবিতে দেখলাম তার অব্যবহিত দৃশ্যরূপ। মেঘে মেঘে বিভ্রাৎ-তরঙ্গ প্রবাহের বহু আয়োজন, বিশেষ মুহূর্তে যেমন একটি আগুনের রেখাময় বলকে প্রকাশিত হয়, এ ছবিটিও আমার মনে তেমনি শরৎ আকাশের একটি বিভ্রাৎ-রেখাময় প্রকাশ বলেই প্রতিভাত হয়েছিল।

ঋণশোধ পালা অভিনয় যে রাতে শেষ হল, সম্ভবত সেই রাত্রেই রওনা হয়েছিলাম শান্তিনিকেতন থেকে। আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীনিবাসবিনোদ (নিত্যানন্দবিনোদ) গোস্বামী।

আর ফিরিনি সেখানে ছাত্ররূপে। স্বাস্থ্য এমন ভেঙে পড়েছিল যে মনে একটা হতাশার ভাব না এসে পারেনি। আমার সমস্ত উত্তমের মধ্যে বার বার স্বাস্থ্য এসে বাধা দিয়েছে।

শান্তিনিকেতনে তখন খাওয়া ছিল আলুর তরকারী, ডাল ও দই বা দুধ। এরকম গেয়ে যে-কোনো সুস্থ লোক সুস্থতর হয়, কিন্তু এই খাওয়া স্বভাবত রুগ্ন আমি রুগ্নতর হয়ে পড়লাম। এমোনি হাইড্রোক্সাইড ইনজেকশন তখন খুব ডাক্তারজন-প্রিয় ছিল, কিন্তু তার সাধ্য কি ডাঙাকে জোড়া দেয়? “ডাঙারে জোড়া দেবে সে কিসের মস্তুরে?”

বাড়িতে ফিরে উৎসাহহীন ভাবে বসে রইলাম। শান্তিনিকেতন থেকে বিদায়ের কালে ঋণশোধ পালা দেখে এসেছিলাম, কিন্তু শান্তিনিকেতনের ঋণশোধের পালা আর ফিরে এলো না আমার জীবনে।

শান্তিনিকেতনে আর ফেরা হবে না এ চিন্তা আমার কাছে বেদনাময় ছিল। মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম বলা চলে। সম্ভবত গানের সুরে সুরে সমস্ত শান্তিনিকেতন পরিমণ্ডলের সঙ্গে আমি বাঁধা পড়েছিলাম। গান আমি গাই না। নীরব কবির মতোই আমি হয়তো নীরব গায়ক—অর্থাৎ কবিও নই, গায়কও নই, কিন্তু ও দুয়ের প্রভাব আমার জীবনে একটু বেশি।

রবীন্দ্র সঙ্গীত এমন ভাবে বাইরে কোথায়ও শুনি নি তার আগে। যেটুকু শুনেছি তা যৎসামান্য। বিভাসাগর কলেজ হট্টলে তৎকালে প্রচলিত দু-চারটি গান ছ’-এক জনের মুখে শুনেছি, তার অধিকাংশই প্রার্থনা সঙ্গীত। ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীট বিমলকৃষ্ণ ঘোষ গাইত মাঝে মাঝে। তখনকার দিনের প্রচলিত গান অমল ধবল পাগল লেগেছে, মহারাজ একি সাজে, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার, আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, তোমার অনীমে, তোমারি রাগিণী জীবন কুজে, মন্দিরে মম, মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, রাজপুত্রোত্তে রাজার বাণী, শুণু তোমার বাণী নয় গো, প্রভৃতি গান চলত বেশি। আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি, আজি বারি ঝরে—প্রভৃতি প্রকৃতি সঙ্গীতও তখন চলতি ছিল।

মাঝে মাঝে এ সব গান শুনেছি শৌখিন গায়কের অপটু কণ্ঠে পরবর্তী কালের বৈচিত্র্য এবং বহু মার্জিত কণ্ঠে পাওয়া মোহবিজারী দৌলন্দ্য তাতে ছিল না। এ স্বাদ প্রথম পেলাম। শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায়।

এখান থেকে চলে আসবার সময় এই সঙ্গীতময় আবহাওয়া যেটুকু বেশ বহন ক’রে নিয়ে এলাম তার কিয়দ তখন বুঝতে পারিনি।

কিন্তু পরে যোঝা গেল তা আমার সমস্ত সত্যের ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ধারা সঙ্গীত মনে করেন না, তাঁদের সঙ্গে আমার বিতর্কই সেই। রুচি বিষয়ে স্বাধীনতা থাকা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রকাব্য কাব্য নয়, এমন কথা অনেক ভুললোক তো এক কালে বলতেন। তাঁরা অনেকে পণ্ডিত ছিলেন। এবং অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিও বলতেন রবীন্দ্রনাথের ছন্দের কান নেই। এ নিয়ে অনেক কাল ধরেই বাগবিতণ্ডা চলেছিল এবং রবীন্দ্রছন্দের ব্যাখ্যায় আমার পিতাও যোগ দিয়েছিলেন (ভারত) ১৯০১, 'বঙ্গভাষা' ১৯০১)। আমি পরে এ সব সেখা পড়েছি। কিন্তু এতে প্রতিপক্ষের মত বদলায় নি।

ধারা কাব্য ভাববাদের এরা সঙ্গীত ভাববাদের তাঁদের কাব্য-সঙ্গীত ভাল না লাগবার তেজ নেই। বাংলাদেশে প্রচুর কাব্য-সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে এবং সে সব নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কথায় যে কি কথার-অন্তীত-আবেদন, তা কেবল কথার বাহুরই আমাদের সম্বরণ করতে পারেন। যথার্থ কথার যথার্থ সুরের বাচনে আমাদের মনে এসে পৌঁছয় সহজে। এর এমনই ক্ষমতা যে এত সাধারণ অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে অনায়াসে একটি যোগ ঘটে যায়, আমরা এক অনির্ঘটনীর আনন্দলোকের সঙ্গে সেই মুহূর্তে 'কমিউন' করতে থাকি। সঙ্গীতের এই 'কথা' সঙ্গীতের প্রধান কথা নয়। এ 'কথা' ভাবের সমার্থক। প্রকৃত সঙ্গীত কথা বড় নয়, ভাবটা বড়। রবীন্দ্র সঙ্গীতও কথা তার পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত করে ভাবের পরিবর্ত। কথা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও ভাবের গভীরতায় পৌঁছানা সম্ভব। শুধু সুর, বিস্তৃত বস্ত্র-সঙ্গীতের আবেদন, প্রোফাউণ্ড হতে পারে। যেমন দুজন প্রেমিকের মধ্যে গভীরতম ভাবের আদান প্রদান হতে পারে সম্পূর্ণ নীরব থেকে, শুধু হাতে হাত বেগে। কিন্তু প্রেম প্রকাশের এই নীরব রীতিই যদি একমাত্র রীতি হত তা হলে প্রেম বেশি দিন টিকত না সম্ভবত।

ভারতীয় অনেক রাগই প্রোফাউণ্ড। আশ্চর্য সৃষ্টি। সামান্য কথার আশ্রয়ে, অনেক সময় অর্থহীন কথার আশ্রয়ে, তা দাঁড়ায়। কাব্য কথা সেখানে অবাস্তব।

রবীন্দ্র সঙ্গীত এ থেকে স্বতন্ত্র, যদিও সম্পূর্ণ নয়। এখানে কাব্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা এত বেশি যে কাব্যকেই সুরের ভিতর দিয়ে অধিকতর প্রোফাউণ্ড করা হয়েছে। এতে বৈচিত্র্য আপনা থেকেই বেড়ে গেছে। কম্পোজার রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত সুরের আশ্রয়েই তাঁর গানের কথা গানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে মিশে গেছে। এর কোথায়ও তুলনা হয় না। অধিকাংশ ভারতীয় রাগের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত তার অলঙ্কার-সর্বস্বতা-বর্জিত সরল সঙ্গ আবেদন নিয়ে। সুরের অতি অলঙ্করণ এতে চলে না। সরলতাও যে আটের একটি বিশিষ্ট ধর্ম সেটি আধুনিকযুগে স্বীকার্য। এটি মানলে এবং বিশ্বাস করলে তবেই এদিকে আকর্ষণ বাড়তে পারে। অবশ্য তা শিক্ষাদাপেক্ষ। সুরের সঙ্গে সুরের মিশ্রণ মানা সহজ, কিন্তু সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের তৃতীয় আর একটি মিশ্রণকে, আর একটি সৃষ্টি বলে মানা, অতি-অলঙ্কার প্রিয়দের পক্ষে সম্ভবত কঠিন।

ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের পরিবেশে বাল্যকাল কেটেছে। তার মূলা আমার কাছে কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের

আবেদন আমার কাছে সম্পূর্ণ পৃথক। ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত যেমন যে-কোনো কণ্ঠে শুধু সঙ্গীত ব্যাকরণ টিক রেখে চললেই হ'ল, রবীন্দ্র-সঙ্গীত তা হয় না। এইখানে এর আর এক বৈশিষ্ট্য। যে সব রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার ভাল লাগে, উপযুক্ত কণ্ঠে গীত সে সবের ভিতর দিয়ে আমি অনেক গভীর বেদনার গভীর সান্ধনা লাভ করেছি; কত দূর কত কাছে এসে পড়েছে; অসীমের মধ্যে আমার সকল সীমার বিলুপ্তি ঘটেছে, কোনো দিন যা পাওয়া সম্ভব মনে হয়নি, তা পেয়েছি; বেঁচে থাকার নতুন সার্থকতা লাভ করেছি, অনেক মানসিক মৃত্যুর পরে জগাস্থর লাভ করেছি।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেশি ভালবাসি একান্তে শুনে, আসরে নয়। সেজন্য শ্রীমতী কণিকা, শ্রীমতী সুরচিয়ার উপর চাপ পড়েছে মাঝে মাঝে। কণিকার কণ্ঠ একদিন শুনলাম প্রমোদপুর আত্মীয় সঙ্গে, আমাব বরে বসে। তিনি আমাদের বুড়ো না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি তাঁর দুর্বলতা আমার চেয়েও বেশি। তিনি সেদিন কণিকার কণ্ঠে 'রূপে তোমার জোলাব না' শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। আর কেউ না থাকলে বুড়োদার সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা আলোচনা করে অথবা তা থেকে কাব্যংশ পড়ে এক একটি বেল কাটিয়েছি।

কথায় কথায় ১৯৭৬ পর্যন্ত ঘুরে যাওয়া গেল। ইতিমধ্যে ১৯২২ অনেক ঘটনা নিয়ে অপেক্ষা করে বসে আছে।

আমাদের সেশের বাড়িতে এই সময় এমন একটি সৌকর্য্য আবির্ভাব ঘটে থাকে নিয়ে কয়েকটি দিন বেশ উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল।

আমার এক আত্মীয়্যার সঙ্গী হিসেবে কলকাতা থেকে নরেন নাগ নামক এক ব্যক্তি আসেন। আত্মীয়্যার বাবেন পদ্মা নলীর ওপারে পাবনা জেলার একটি গ্রামে। মারপথে আমাদের বাড়িতে ছ'এক দিনের বিশ্রাম।

এই নরেন নাগের চেহারাটি খুব মজ্জিত নয়। কেমন যেন একটি সাধারণ অশিক্ষিতের মতন চালচলন। পাতলা চেহারা, তামাটে রং, বাড়ের দিকে চুল চাছা, কপালে একগোছা চুল খুলে পড়েছে। মুখে পান এবং বিড়ি। ঘাই হোক, তাঁর সঙ্গে মৌখিক একটি কি দুটি কথা বলেই আমার কর্তব্য শেষ করেছি। বাড়ি থেকে একটুদূর বেরিয়েছিলাম। দশটার ফিরে এসে শুনি মেয়েদের মহলে হাত দেখা ও টেটিকা ওখু ব্যবস্থা করা নিয়ে তিনি বড়ই ব্যস্ত। আমি শুনে বেশ একটু বিবস্ত্র বোধ করলাম।



নরেন নাগের গণ্ডকাবি



কিন্তু বাইরের মেয়েদের মুখে ছড়িয়ে পড়ল যে গণৎকার এসেছেন, ওষুধও ব'লে সেন। হুজুর শুনে প্রথম চুটে এসে হরেন্দ্রকুমার রায়। তখন সে শাস্তিনিকেতনের কাজ ছেড়ে এসেছে। অতি-সাধুভাষী জ্ঞান সে বিবেক বাচিয়ে কোথায়ও বেশি দিন কাজ করতে পারে না। যখন নিজেকে বাঁচাবার প্রয়োজন উদ্র হয় তেঁও তখনই কাজের সন্ধান বেগায়, এবং কাজ পেলে কিছুদিন পরেই ছেড়ে দেয়।

সে এসে নরেন নাগকে ধ'রে বসল কয়েকটি টোটকা ওষুধ লিখে দিতে হবে। কাগজ পেলিস নিয়ে বসল সে। নরেন নাগ ওষুধ বলে যেতে লাগলেন। বসলেন অজীর্ণের ওষুধ লিখুন। সেটি লেখা হলে সর্দিকাসির ওষুধ লিখুন—এই ভাবে চার পাঁচটি টোটকা লেখা হয়ে গেলে তিনি অস্থখের নাম বাদ নিয়ে বসলেন এইবার আপনার অস্থখেরটি লিখুন ব'লে একটি টোটকার নাম বসলেন এবং সেটি লেখা হ'লে বসলেন, উপরে লিখুন অর্শ।

হরেন অর্শ ভূগছিল এবং নরেন ও হরেন পদস্পর্শ সম্পূর্ণ অপরিসিত। অতএব আমি একটু ধাঁধার পড়ে গেলাম।

হরেনই দ্রুত প্রচার করল কথাটা, এবং দ্রুত ভিড় বাড়তে লাগল আমাদের বাড়িতে। প্রফুল্লর পিতা যোগেন্দ্রকুমার এলেন। তাঁর পাশে ব'সে দেখলাম নরেন নাগ তাঁর মেরুদণ্ড বরাবর একবার হাত বুলিয়ে বসলেন আপনার অস্থখ সব লিখুন। যোগেন্দ্রকুমার নিজে ডাক্তার, লিখলেন সব। প্রত্যেকটি মিলে গেল। তিনি আমার চেয়েও সন্দেহ ব্যতিক্রম ছিলেন, কিন্তু তিনিও যখন বিম্বিত হলেন, তখন আমি রীতিমতো ভাবতে শুরু করেছি। এর পর থেকে নরেন নাগ প্রত্যেকের হাত ধ'রে তার মনের কথা এবং বাবস্তীয় খবর বলতে লাগলেন। ক্রমে আমাদের বাড়ি প্রায় পীঠস্থান হয়ে উঠল।

নরেন নাগের একটি পদ্ধতি কিন্তু আমার কাছে খুব সন্দেহজনক মনে হল। সেটি তাঁর লিখিত প্রব্রের উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি। লিখিত প্রশ্ন ভাঁজ করা অবস্থায় প্রশ্নকারীর হাতের মুঠায় থাকে, তারপর সেই ভাঁজকরা কাগজখণ্ড নরেন নাগ নিজে চেয়ে নিয়ে তাঁর হাতের মধ্যে রাখেন এবং ছ' একটি প্রক্রিয়া করেন, তাতে কেন্দ্রবর্তনক উপায়ে প্রশ্নগুলো তাঁর জ্ঞান হয়ে যায়। তার উত্তর দেওয়া শেষ হ'লে প্রশ্নকারীর মুঠার মধ্যে কোনো টাটকা ফুলের টুকরো পাওয়া যায়। এই ফুলের টুকরো মাতুলিতে পুরে ব্যবহার করতে বলা হয়।

কিন্তু এটি যে একটি উচ্চাঙ্গের ম্যাজিক এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ রইল না। সবই ভোক্তবাজি। কিন্তু অজুটির কোনো ভৌতিক ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পেলাম না। সেটি সত্যি আমার বুদ্ধির অজীভ।

তিন মাইল দূর থেকে শশী মালাকর এলো। এসে ভিড় ঠেলে নরেন নাগের কাছে গিয়ে বসল, "বাবু আমার একটি কথা আছে।" নরেন নাগ বসলেন "কি কথা বল।" শশী বসল কথাটা তার বোঁ সম্পর্কে। "বোঁকে ডাক।" শশী বসল, "বাবু বোঁ তো আসেনি।" তখন নরেন নাগ বসলেন, "তার ব্যবহারের কোনো জিনিস নিয়ে এসো, শাড়ী আনলেই হবে।"

শশী মালাকর চলে গেল।

বিজয়লাল লোকের পর লোক, জীবিরাম ধারায় আসছে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হল তিনটের। খেয়ে উঠেও বিরাম নেই। শশী কিরে এলো বিকেলে। বোঁ-এর শাড়ী নিয়ে এসেছে। নরেন নাগ ভাঁজ করা শাড়ীখানা দু'হাতের মুঠায় চেপে ধরেই বসলেন, "তোমার বোঁ পাগল।"

ঘটনাটা আমরা জানতাম না। শশী স্বীকার করল, দুর্দান্ত পাগল। তার পর নরেন নাগ পাগল সারার ব্যবস্থাপত্র লিখলেন।

কাগজে লেখা প্রশ্নোত্তর চমকিল শুধুই সাক্ষর লোকের সঙ্গে, তাদের সংখ্যার চেয়ে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। সুতরাং হাত ধ'রে অথবা পিঠে হাত বুলায়েই বলাতে হচ্ছিল অধিকাংশ স্থলে। আমি আর সব ভুলে খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম কোথায়ও কোনো কাকি আছে কি না। কারো সম্পর্কে কিছু বলা, অতি সাধারণ ভাবে স্বার্থবোধক ভাষায় হলে সে বকম গণনাবিজ্ঞার কোনো দামই নেই। কিন্তু নরেন নাগের এ পদ্ধতিতে কোথায়ও কোনো ক্রটি খুঁজে পেলাম না। কারণ সবার ক্ষেত্রেই তাদের সব চেয়ে জরুরি কথাগুলোই তিনি বলতে লাগলেন। অনেকেই তা শুনে চমকে যাচ্ছিলেন।

নরেন নাগের চরিত্রের আর একটি দিক আছে। সর্বদা তাঁর সঙ্গে লেগে থেকে সেটি প্রথম দিনই আবিষ্কার করেছিলাম। সেটি হচ্ছে তাঁর ধার্মার দিক। অকারণ মিছে কথা বলা। গণৎকার রূপে একটি পয়সা নেওয়া গুরুত্ব নিয়েছে আছে, অথচ অল্প ভাবে ধান্না দিয়ে দু' আনা এক আনা নেওয়ার মধ্যে আমি কোনো ভুল দেখিনি। ভেবেছি, যে বিদ্বা তিনি জ্ঞানেন, তাতে তিনি সহজে ধনী হতে পারতেন, কিন্তু তার বিবরণে এই দু'-চার আনার ধান্না নিতান্তই অসঙ্গত।

চন্দনা নদীর পারে বোয়ালিয়া গ্রামের প্রাচীন সাতা পরিবারের ধারণা তাঁদের পূর্বপুরুষ অনেক টাকা মাটিতে পুঁতে রেখে গেছেন, কিন্তু প্রকাণ্ড স্থান জুড়ে বাড়ি, তার কোন অংশে তা আছে তা তাঁরা জ্ঞানেন না। এখন একমাত্র ভরসা নরেন নাগ। একদিন সন্ধ্যায় বেড়িয়ে এসে শুনি আমার মামা বাড়ির বড় একটি ঘরে তাঁরা সব এসে নরেন নাগের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। পরামর্শের বিষয়টিও তখনই শুনলাম।

গুণে বলে দেওয়ার ক্ষমতা যে নরেন নাগের অসাধারণ, এ বিষয়ে আমি প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। অতএব কোথায় টাকা পোঁতা আছে সেটি বলা আর এমন কঠিন কি। অর্থাৎ আমার বিচার বুদ্ধির একটি অংশ ইতিমধ্যেই নরেন নাগের ক্ষমতার কাছে পরাজিত হয়েছে।

গুপ্তধনের সন্ধান দেওয়া হচ্ছে শুনেই আমার মনে হল বিনা শর্তে দেওয়া উচিত নয়। প্রাপ্ত টাকার একটি বিশেষ অংশ স্থানীয় স্কুলে দান করলে তবেই সন্ধান দেওয়া হবে, এ রকম একটা শর্ত ক'রে নেওয়া দরকার। কিন্তু এ কথাটা এখন তাঁকে বলি কি উপায়ে। ছুটে গেলাম মামা বাড়িতে। গিয়ে দেখি বিরাট আসর। তার মধ্যে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে বলাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হল। আমি চোখ মুখের ভাব এমন করলাম যেন কিছুই জানি না এখানে কি হচ্ছে, এমনি ভাবে নিতান্ত হাঙ্গা ভাবে নরেন নাগকে বললাম—"নরেন বাবু, সামান্য একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে একটু উঠবেন?"



নরেন নাগ বললেন—“এখন তো ওটা সম্ভব নয়, দেখছেন তো চেয়ে।” ব’লেই তিনি আমার ডান হাতখানা ধপ করে ধরে সেকেন্ড তিনেক কাঁপাতে লাগলেন। তার পর হাত ছেড়ে দিয়ে পেলিলের সাহায্যে একটুকরো কাগজে গোপনে আমাকে লিখে জানানলেন—“পরিমল বাবু, আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমি শর্ত না করে এঁদের আগেই কিছু বলব না।”

এই কথাটিই তাঁকে বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার হাতের ভিতর দিয়ে তা তাঁর মনে পৌঁছল কি করে তা আমি জানি না।

একদিকে এই ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে—অস্ত্রদিকের ছ এক আনার খাঙ্গা, ক্ষমার চোখেই দেখলাম।

আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা বলি। চন্দনা নদীর পাড়ে মোহনপুর গ্রামের ঘোষদেব বাড়িতে নরেন নাগকে নিয়ে ষাণ্ডা হয়েছে ছপ্পরে। এসিকে আমাদের বাড়ির জনতা ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছে, তাদের অর্ধেক বাড়ি, ঘন্টা দুইয়ের মধ্যে কিরে আসার কথা, কিন্তু চার ঘন্টা পার হয়ে গেল।

আমি অগত্যা নিজে গেলাম তাঁকে ধরে আনতে। গিয়ে এক রকম জোর করে তাঁকে কেড়ে নিয়ে এলাম অল্লর মতল থেকে। বাইরে আসতেই এক মুসলমান যুবক হস্তমস্ত হয়ে নরেন নাগের গতিরোধ করে দাঁড়াল, বলল, “বাবু, আমার কথাটা একটু বলে যেতেই হবে।” নরেন নাগ বললেন এখন আর সময় নেই। আমিও তাই বললাম। তখন সে প্রায় কঁদে ফেলল। নরেন নাগ তার হাতখানা চেপে ধরে একটু কাঁপিয়ে বললেন “ও! তোমার বৌ ধরে পাড়ছে—এত মিয়ে?” ব’লে দুহাতে একটা পরিমাণ দেখালেন। যুবক বলল “ঐ বাবু। এখন কি করি?”

নরেন নাগ বললেন “এনায়েৎ—

যুবক বলল, “ঐ বাবু, সে শালাও আসত।”

নরেন নাগ যুবককে আশ্বস্ত করলেন, “ভর নেই, বৌ আবার ফিরে আসবে।”

কোনো দিক দিয়েই ভেবে পেলাম না এটি কি করে সম্ভব। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছি—বলেন না ঠিক কিছু। কামাখ্যায় শেখা বলেন। কিন্তু সেখানেই শেখা হোক, এ রকম ক্ষমতা মানুষের কি করে লাভ হয় এ এক মহা রহস্য, আজও আমি এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না।

কলকাতায় তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল সম্ভবত এর তিন চার বছর পরে। কিরণকুমার ছিল আমার সঙ্গে সেদিন, এসপ্লানেডে ট্রামে উঠতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা। তাঁর ঠিকানা নিলাম। কিরণ ও আমি একদিন গোলাম তাঁর কাছে, চিৎপুর রোডের কাছে কোনো ঠিকানায়। দেখা হল, কিরণের হাত ধরে তার বিষয়ে কিছু বলতে যেতেই গলা থেকে অনেকখানি রক্ত বমন করলেন মেথের উপর। উদ্বেগে সিঁচ হ’ল না। বললেন ওটি তাঁর সাধনার ফলে ঘটেছে। কি সাধনার ফলে জানি না। ঘরে দারিদ্র্যের চিহ্ন, অপরিচ্ছন্ন চারদিক। কিন্তু এ রক্ত কিসের রক্ত? পেটের না ফুসফুসের? —একটু ভীত ভাবে উঠে এলাম; নরেন নাগের সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

নরেন নাগের ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ারতে আমার একটা লাভ হয়েছিল। আগে যে সব জিনিস হয় না ধারণা ছিল, এব

তা জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতাম, এর পর থেকে সে জোর কমে গেল। শুধু এ বিষয়ে নয়, সব বিষয়ে। আমি যা সত্য বলে জানি, তার বাইরে সত্য থাকতেও পারে এমন একটা মানোভাব গড়ে উঠল ক্রমে। অর্থাৎ মনের এক গৌড়ামি থেকে আর এক গৌড়ামিতে ষাণ্ডাটাই হচ্ছে মনের স্বভাব। এর মাঝামাঝি আরও একটি পথ আছে বলে ক্রমে বিশ্বাস হল—এব সে পথই নিরাপত্তা এটিও বুললাম। তাই আজও এটা হয় না, বা ওটা অসম্ভব, এমন কথা বলতে আটকায়। বলি হতেও পারে, জানি না, তবে আমার নিজের এই বিশ্বাস, বা আমি নিজে এর বেশি ভাবতেও পারি না।

আমার অবিস্ময়ে আর কিছু কর্তব্যও নেই, শুধু বাড়িতে বসে আছি এটি আমার কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিকর বোধ হচ্ছিল। পড়াশোনার পথে চলব না মনে মনে স্থির করেছিলাম, কিন্তু তা না করলে ব্যবসা করা উচিত। সে সময় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ মনে মনে খুব বড় হয়ে উঠছিল। চাকরি করব না, ব্যবসা করব। কিন্তু কিসের? সেইটি ঠিক হয়ে গেলেই নিশ্চিত। মাসের পর মাস বায় বিষয় নির্বাচন হয় না।

বাবা ইতিপূর্বে আমার চলার পথে কখনো বাধা দেননি, এইবার তাঁর ইচ্ছাটা প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন। তিনি বললেন কিছু না ভেবে আগে এম-এ ডিগ্রীটা নাও, তারপর যা হয় ভেবে।

পড়াশোনার বিরুদ্ধে মনটা প্রায় স্থির করেই কলেজি, এমন সময় এ প্রস্তাবটা হঠাৎ ধারণা লাগল। মনে মনে ডিগ্রীর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি পাড়া করেছি। আমার আদর্শ প্রফুল্লচন্দ্র, আমি বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার হতে দেব না এই পণ। তাই বললাম, এম-এ পাস করে লাভ কি? আমি ব্যবসা করব। প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শের কথাটাও প্রকাশ করলাম। বাবা বললেন, প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং অনেকগুলো ডিগ্রীর অধিকারী, তাই ডিগ্রীর মোহ তাঁর নেই, তুমিও এম-এ পাস কর, তারপর যা হয় করো, ডিগ্রীর বিরুদ্ধে তোমার যুক্তি তখন শোনা যাবে।



শান্তিনিকেতনে শরভের ছুটির গানের কবি রবীন্দ্রনাথ

প্রমুখতম যে নিজে ভাল ভাল ডিগ্রীর অধিকারী হয়ে তবে ডিগ্রীর বিরুদ্ধে বাঙালী যুবকদের মন ডাঙাচ্ছেন এ সত্যটি হঠাৎ চমক লাগল। এ রকম যুক্তি মনে আসেনি। এ পথে ভাবতে গিয়ে অনেক দূর চলে এসলাম। যে ব্যক্তি ডিগ্রীধারী, ডিগ্রীর বিরুদ্ধে বলার অধিকার তাঁর থাকবে না তো কার থাকবে? যিনি মন্তপান করেন, মদের বিরুদ্ধে তাঁর কথাই গ্রাহ্য, যিনি চা পান করেন, চা পান না বিব পান বলার অধিকার তাঁরই। অতএব এম-এ ডিগ্রী খারাপ কি না, এম-এ পাস না করে আমি বুঝব কি করে। রাজি হয়ে গেলাম বাবার প্রস্তাবে। তা ভিন্ন বাবার ইচ্ছা এই প্রথম পালন করব ভেবে মনে প্রশস্ত হল।

অর্থাৎ এম-এ ক্লাসেই আবার ভর্তি হব। ইংরেজী বই অধিকাংশই কেনা ছিল, অতএব ইংরেজীতে ভর্তি হওয়াই মোটামুটি ঠিক করলাম। কিন্তু নতুন করেই যখন পড়তে হবে তখন নতুন কোনো বিষয়ে নিলে কেমন হয় এ প্রশ্নও জাগল মনে। নানা বিষয়ে আকর্ষণ অনুভব করি মনে মনে। যে জিনিস বাড়ি বঁসে নিজে নিজে পড়া অস্ববিধানক, এ রকম একটি বিষয় পড়ার কথাও ভাবলাম। মনশ্চক্রে প্রথম ভেসে উঠল আনখুপোলজি। বিষয়টি নতুন, এবং আমার কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক বোধ হল এবং দু-তিন দিন নানা ভাবে চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত এই বিষয়টিই পড়ার ঠিক করে ফেললাম। ইংরেজী যেটুকু পড়েছি তাতে ঘরে বঁসে বাকী বই নিশ্চয় পড়তে পারব কিন্তু কোনো বিজ্ঞানের সকল অঙ্গ নিজে নিজে পড়ার অস্ববিধে। অতএব আনখুপোলজি।

ঢাকা নিয়ে চলে এসলাম কলকাতায়, পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হব—স্বলীর্ণ আড়াই বছর পরে।

সব ঠিক, এমন সময় যাকে বলে 'মান প্রপোজেন্স, গড ডিস্পোজেন্স'—মাত্র য়া আয়োজন করে, ঈশ্বর তা ভেঙে দেন, তাই



এম্পায়ার খিয়েটোরে বিসর্জন অভিনয়ে জয়সিংহ ও অপর্ণা

ঘটল। মালদহের ঈশ্বরলাল কুণ্ড ছিল আমার পূর্ব সহপাঠী, তার সঙ্গে দেখা হতেই সে ঘরে বসল, ভর্তি হয়ে টাকা ও সময় নষ্ট করার দরকার নেই। তিন মাস পরে পরীক্ষা, বি-এ পাসের পর তিন বছর হয়ে গেল, অতএব নন-কলিজিয়েট হয়ে পরীক্ষা দেওয়ার বাধা নেই।

ঈশ্বরলাল উকিল হওয়ার জন্ত আইন পড়ছিল, তার ঐ সঙ্গে একটি এম-এ ডিগ্রীর দরকার ছিল। সেজ্ঞা সে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ দেওয়ার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিল। আমারও ডিগ্রী নেবারই প্রয়োজন ছিল কিন্তু তবু আমি এ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয়ে বললাম—সে একবারে অসম্ভব, আমি আনখুপোলজির জন্ত তৈরি হয়ে এসেছি। ঈশ্বরলাল বলল, সে খুব ভাল কথা, সেজ্ঞা আগামী বছর ভর্তি হলেও চলবে, আগে বিনা খবচে বাংলার পাস করে নাও, বই সব আমার, একসঙ্গে পড়া যাবে।

ঈশ্বর ম্যাটানের ভূমিকায় নেমে আমাকে ক্রমাগত বোকাতে লাগল, তার নিজের একবেলার পড়া নষ্ট করে। এবং শেষ পর্যন্ত ভজিয়ে ফেলল। মাত্র তিন মাস সময় এবং বাংলার সঙ্গে অতিরিক্ত তিনটি ভাষা নতুন করে শিখতে হবে! কিন্তু এ বিষয়ে সে আমাকে কিছু ভাবতেই দিল না আর। সে থাকত বিভাসাগর হষ্ট্রেল সম্ভবতঃ তখন প্রফেস্টে রূপে বাস করত, ঠিক মনে নেই। কিন্তু আমি কোথায় থাকব সে হল এক সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে কোনো পিজি হষ্ট্রেল থাকা চলত হয় তো, কিন্তু এ অবস্থায় কি করা যায়। বিভাসাগর হষ্ট্রেল ঈশ্বরলালের গেষ্ট হয়ে থাকা তখন চলল না, সীট খালি ছিল না। দিনের বেলা হষ্ট্রেল কাটানো যায়, কিন্তু রাত্রি বাস তখন স্থানীভাবে সম্ভব ছিল না।

তখন মনে পড়ল হরেন্দ্রকুমারের কথা। সে এতদিনে বদীন্দ্রনাথের কাজে এসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে সে বদীন্দ্রনাথের বাড়িতে থেকে তাঁর বাজারের কাজ করে। তার কাছে গিয়েছি দু-একবার, সে বলল এখানে যথেষ্ট জায়গা আছে তুমি থাকতে পার। বদীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করতই তিনি সহজে সম্মতি দিলেন। ৬ নং হারকানাথ ঠাকুর লেনের ঠিকানা—বিশ্ববিখ্যাত ঠিকানা। সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতই বাঁয়ের দিকের ঘর। বড় ইঞ্জি-চেয়ার ছিল একখানা সে ঘরে। সেইখানায় আমি ঘুমোতাম। খাটে থাকত হরেন্দ্রকুমার।

দিনের বেলা হষ্ট্রেল গিয়ে পড়তাম, রাত্রে ঘিরে শুধু ঘুমোনা নয়, পড়তেও হত কিছু, যতটা পারা যায়। ক্রমে পড়া ভাল লাগতে লাগল। পাঠ্য বইয়ের অনেকগুলির ইতিহাস মূল্য হ্রদয়ঙ্গম করতে লাগলাম। এত অল্প সময়ে তিনটি নতুন ভাষাসহ এতগুলো বই পড়ে আটটি পেপারে পরীক্ষা দিতে হবে, সেজ্ঞা মনোযোগকে চাবুক মেঝে, চোখের-পাশ-ঢাকা গাড়িতানা ঘোড়ার মতো narrow angle করে নিলাম—মনের দৃষ্টি যাতে ইতশ্চেষ্টে বিক্ষিপ্ত না হয়।

এই বাড়িতেই কিছুদিনের মধ্যে এম্পায়ারে অভিনীত বিসর্জন নাটকের বিহাসীল শুরু হল। অভিনয় হয়েছিল অগষ্টের (১৯২৩) কোনো তারিখে। বিহাসীল চলত আমার মাথার উপরে কোনো ঘরে। দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাকসে হষ্ট্রেল যেতাম, সব দিন খাওয়া ঘটত না। বিহাসীলের আভ্যন্তরে মধ্যেও মনোযোগ খুব বেশি বিক্ষিপ্ত হয়নি, কেননা ততদিনে পড়ায় সম্পূর্ণ ছুবে গিয়েছি। মাঝে মাঝে মানসিক ক্লম বিরামের

মুহুর্তে,—এবং যখন রিহার্সালের সম্মিলিত ধ্বনি আর শোনা যায় না,—তখন কবিকণ্ঠের একছত্র দুছত্র গানের স্বর ভাঁজ প্রায় স্তন্যেতে পেতাম। এই ভাবে তিনি মনে আসা সুরের আভাসকে রূপায়িত করতেন এবং তার সঙ্গে কথা জুড়ে গান রচনা করতেন। এক একটা সুর গাইছেন, পছন্দ হচ্ছে না, আবার কিছু বদলিয়ে গাইছেন। এইভাবে চলত সর্বকণ। মাঝে মাঝে গলাটা পরিষ্কার করে নিতেন, তার আওয়াজও খুব জোর ছিল।

ক্রমে বিসর্জনের অভিনয় এবং আমার পরীক্ষা, হুই-ই আসন্ন হয়ে এলো। ভীষণ লোভ অভিনয় দেখব, অথচ তখন নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। দেখব না-ই ঠিক করলাম। মনকে যাকে বলে একবারে বের ফেলা, তাই করলাম।

তারপর অভিনয়ের দিন এলো, বিকেলে সবাই এম্পায়াব থিয়েটারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাচ্ছেন—সবই লক্ষ্য করছি। ঠিক এমনি সময় পূর্ণ প্রতিজ্ঞা ভূমিকম্পে টলতে লাগল। আবার প্রস্ন জাগল দেখব কি দেখব না। না দেখলে মস্ত বড় একটা অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হব, দেখলে কম করেও দিন সাতেক লাগবে এর প্রভাব কাটাতে। নটিকগানি ভাল ভাবে পড়া ছিল, তাই জানাতাম তার অভিনয়রূপ আমাকে কি ভাবে বিচলিত করবে। তাই ভয়।

কলকাতার থিয়েটার দেখছি প্রথম আসবার পর থেকেই। ১৯১২ কিংবা ১৩ থেকে। বাংলাকালে প্রথম বলিদান নাটক দেখেছি বেশ মনে আছে। দানাবাবু ছালামচাঁদ সেজেছিলেন। গির্গিশ যোষের অভিনয় আমি দেখিনি। ছাত্রাবস্থায় কোনো অভিনয়ই বাদ যাবনি। নিয়মিত সিনেমা দেখেছি ১৯২২ থেকে।

বলা চলে, অভিনয় দেখার কৌতুকাৎ একটু বেশি মাত্রাতেই ছিল। তাই প্রতিজ্ঞা বন্ধা করা আর হল না। সবাই চলে যাওয়ার পর কবি যখন গাড়িতে উঠে পড়েছেন তখন হঠাৎ মনে হল না দেখলে অমৃতাপের আর অস্ত থাকবে না। দিশাহারা হয়ে কবিকেই অধটানের মতো জিজ্ঞাসা করে বসলাম এখন টিকিট পাওয়া বাবে কি না। তিনি বললেন আমি তো ঠিক বলতে পারব না, তুমি চলে যাও থিয়েটারে, সেখানে গিয়ে, খোঁজ কর। আমি তখন বিভাস্ত। প্রতিজ্ঞা হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার আনন্দের প্রথম ইনস্পিরেশনটাই নির্বৃদ্ধিতার প্রকাশ।

কালবিলম্ব না করে ছুটে গেলাম এম্পায়াব থিয়েটারে এবং বিসর্জন দেখলাম। বা ভয় করেছিলাম তাই হল। এমন শ্রদ্ধা এবং ভূপ্তি নিয়ে অভিনয় আমি কমই দেখেছি। বা পাব আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি পেলাম। সবটা অভিনয় আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের জয়সিংহ আর দিনেন্দ্রনাথের রূপান্তর। তার উপর সাহানা দেবীর অতগুলি গান—এম-এ প্যাঁদাপুস্তকগুলিকে লক্ষ্যায় সমুচিত করল।

রাজসিংহ বেশী রবীন্দ্রনাথকে দেখে যৌবনের রবীন্দ্রনাথকে কল্পনা করছিলাম। অপর্ণার সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের সময়ে জয়সিংহের উক্তি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির ভিতর দিয়ে তা দীর্ঘ মনে হয়নি। শেষ দুখ বোমাধকর। বিচলিত হয়েছিলাম। সে বয়সে অনেক কিছুতেই বিচলিত হওয়ার জন্ম প্রস্তুত ছিলাম।

নির্দিষ্ট কয়েক মাসের বিরামতীন পড়ায় এই একটি ছেদ পড়ল,

এবং তা ছাড়াও এক বছর কিয়েতে দেশে যেতে হয়েছিল। ফলে পড়া আরম্ভ করতে হল আবার নতুন উত্তমে। দিনে রাতে মোট প্রায় ১৬ ঘণ্টা।

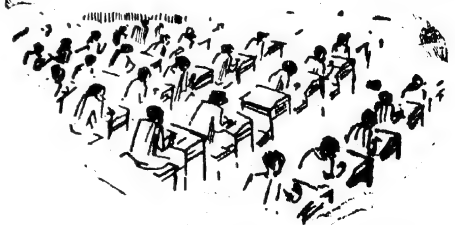
এরই মধ্যে একটি পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে হল। বাবা পারসিক ভাষা শেখার পর সাদির পন্দনামা ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি পাণ্ডুলিপিখানা আমার কাছে পাঠিয়ে লিখেছিলেন, তার কথা যেন 'রবিবাবু'কে শ্রবণ করিয়ে দিই এবং তার এই নতুন উত্তমের কথা তাঁকে বলি।

একদিন সন্ধ্যোগে পেলাম দেখা করার। দোতলায় তিনি তখন একা ছিলেন। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন বাবার সম্পর্কে। আগেই বলেছি বাবা পোতাজিঙ্গা স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন—এক পোতাজিঙ্গা ছিল সাহজাদপুর থানায়। এই সাহজাদপুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা নতুন করে বলবার দরকার নেই। এত অঞ্চলের ভূগোল সম্পর্কে তিনি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন। ছেড়োগার নদীর অবস্থা এখন কেমন, বর্ধার কেমন সব ডুবে যায়, এ সব বেশ কৌতুহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছিলেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তাঁর জীবনের অনেকখানি অংশ এই স্থানের সঙ্গে বাঁধা আছে, তাই এই কৌতুহল। আমার পিতার কথা বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করলেন, এবং তিনি সে দিন তাঁকে শান্তিনিকেতনে ইংরেজী পড়বার ভাব দিতে চেয়েছিলেন সে প্রসঙ্গ আমি গত মাঘ মাসের কিত্তিতে উল্লেখ করেছি।

পন্দনামা বইয়ের বাংলায় কি নাম দেওয়া যায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি পাণ্ডুলিপির কয়েকখানা পাতা উন্টে-উন্টে দেখে নিলেন একটুখানি, এবং বললেন, একে নীতিপত্র বলতে পার। বই ছাপা হয়েছিল ১৯২৫ সালে। ঐ নামই রাখা হয়েছিল।

এর পর বিষয়বস্তায় এম-এ পড়ার ধরন সম্পর্কে কথা উঠল। কি কি বই পড়া হয় এবং কেমন ভাবে হয়, তাও তিনি একে একে জেনে নিলেন। তিনি একখানি বিশেষ বইয়ের কথা শুনে এমন বিচলিত হয়ে উঠলেন যে আমার নিজেকে সে সময় অত্যন্ত অপরাধী মনে হতে লাগল। তিনি ছুবার জিজ্ঞাসা করলেন—এ বই এম-এ তে পড়ানো হয়?—মনে হল যেন বলতে বলতে মুখচোখ একটু লাল হয়ে উঠল, (ক্রেমে কিংবা লঙ্জায়, জানি না) তবে তখনই সামলে নিলেন এবং আগের মতোই শান্তভাবে বলতে লাগলেন, স্কুলের পরীক্ষার সঙ্গে তোমাদের এম-এ পরীক্ষার কোনোই পার্থক্য নেই। নোট মুখস্থ করে এম-এ পাস করা যায় শুনে অবাক হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একদিন অল্প এক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে একই বকম বিচলিত হতে দেখেছি মনে পড়ল। সেটি ১৯৩৭ সালে



দক্ষিণ থেকে দ্বিতীয় সারিতে ইণ্ডিয়ান ভানিকলার পরীক্ষার্থী-বন্ধ

চন্দনগরে কবির হাউস বোর্ডের মধ্যে। শ্রীঅমল হোম আর আমি সেখানে ছিলাম, অল্প কেউ তখনও এসে পৌছন নি। কোনো একটি বিশেষ রচনা সম্পর্কে তিনি সে সময় কোভ প্রকাশ করেছিলেন। সাহিত্যিক শাস্তিভঙ্গ হবে আশঙ্কায় কোনোটিরই নাম প্রকাশ করা গেল না।

অবশেষে এম-এ পরীক্ষা এসে পড়ল। কয়েকদিনের জ্ঞান বিজ্ঞানসাগর হাট্টলে একটি সীট সংগ্রহ করা গেল। তাতে বেশ সুবিধে হল। হাট্টলে আসার সময়টুকু বেঁচে গেল।

আমাদের সময়ে বাংলা পরীক্ষার যে আটটি পেপার ছিল সেই আটটি পেপারের প্রত্যেকটিই ইংরেজীতে লেখা চলত খুশি মতো। বাংলাতে লিখতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। আমি সাতটি পেপার ইংরেজীতে লিখেছিলাম। বাংলায় পরীক্ষার্থী খুব বেশি ছিল না। সিনেট হলে প্রথম যিনি বসেছেন, আর সবাই তাঁর পর পর পিছনে। সম্ভবত ইণ্ডিয়ান ভার্ণাকুলার সব এক সঙ্গে। আমাদের বা পাশে ইংরেজী পরীক্ষার্থীরাও ঠিক ঐ ভাবে। একে বলা হয় single file বা Indian file। পরীক্ষা-গৃহে আচার্য ব্রজেননাথ শীলকে আমাদের পাশ দিয়ে কয়েক দিন যেতে দেখেছি।

আমাদের ফাইলের অগ্রভাগে ছাত্রাঙ্গাদ মুণোপাধ্যায়। আমি—একজন বাদে সর্বশেষ। অর্থাৎ আমার পিছনে মাত্র একজন, কিন্তু

আমার সমুখের সীটটি শূন্য, পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত। ফিসফাস চলেছিল মল্ল নয়, কিন্তু আমার কোনোই উপায় ছিল না, আমার সমুখস্থ আসন শূন্য। পিছনে যিনি ছিলেন তিনি নির্বিকার। বরধ তিনি কিছু অসুবিধের সৃষ্টি করেছিলেন অল্পভাবে। আমার বা পাশের ইংরেজীর ছেলেরা কেউ কেউ চাপা গলায় আমার কাছে ছ একটা শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছেন। কিন্তু সব চেয়ে অসুবিধে ঘটতে লাগলেন আমার পিছনের পরীক্ষার্থী। তিনি মিনিট পনেরো লিখেই গুন্ গুন্ করে স্বর ভাজতে লাগলেন প্রত্যহ। তিন দিন সহ্য করে চতুর্থ দিন তাঁকে বললাম, আপনি তো মশায় খুব ক্ষমতাবান পুস্তক, গান গাইতে গাইতে লিখতে পারেন।

তিনি বললেন, আমি তো লিখি না।

সে কেমন কথা?

বললেন, আমি ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষার্থী, কিন্তু আমার লেখবার কিছুই নেই।

কেন?

পড়াশোনা আদৌ করি নি, ক্রাসে একমাত্র পরীক্ষার্থী আমি। অধ্যাপকের অনুরোধে পরীক্ষা দিছি।

অতঃপর তিনি বা বললেন, তা তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক এবং তাঁর অধ্যাপকের পক্ষে করুণ। সে কথা প্রকাশ করে বলবার নয়।

[দ্রমশ:]

### কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

সূর্য্য রজনী প্রভাতপ্রায় বোধ হইতেছে। মহাভ্রম অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত যে স্রুত অতীতের ঘনাক্ষার ভেদে অসমর্থ, তথা হইতে এক অপূর্ণবাণী যেন ঐতিহ্যগোচর হইতেছে। জ্ঞান ভক্তি কর্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতি শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মুহু অথচ দূত অভ্যন্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ণ রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উচ্চাশ্রিত, ততই যেন উচ্চা গভীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাসে পর্যন্ত প্রাণসঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অক্ষ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না, কুস্তকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙিতেছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

# পত্র



## কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

১৩

৩ জুলাই ১৯০১

৪

বন্ধু

আমার কল্পার প্রতি তোমার আশীর্বাদসহ সন্দের উপহারখানি পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। তোমার হস্তাক্ষরসহ এই গ্রন্থখানি বেলা উপযুক্ত আদর করিয়া পড়িবে ও রাখিবে সন্দেহ নাই। আমার জামাতাটি মনের মত হইয়াছে। সাধারণ বাঙালির ছেলের মত নয়। সজ্জবাব, বিনয়া অথচ দৃঢ়চিত্র, পড়াশুনা ও বুদ্ধিচর্চায় অসামান্যতা আছে—আর একটি মহৎগুণ এই দেখিলাম, বেলাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। এইবার শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া গিয়া বেলাকে মজ্জফরপুরে তাহার স্বামিগৃহে পৌছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।

লোকেন বিলাতে গিয়া এমন মাতিয়া আছে যে, আমাকে কিবা বেলাকে একটা ছত্র চিঠিও লিখিল না। তোমার সঙ্গে কি তাহার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ?

আমি সাহসে ভর করিয়া ইলেকট্রিকান প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রাণের বঙ্গদর্শনের জগৎ তোমার নব আবিষ্কার সঙ্গকে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রথমে জগদানন্দকে লিখিতে দিয়াছিলাম—পছন্দ না হওয়াতে নিজেই লিখিলাম। ভুলচুক থাকার সম্ভাবনা আছে—দেখিয়া তুমি মনে মনে হাসিবে।

আমাদের বঙ্গদর্শনে যেটুকু আভাস দিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় বৈজ্ঞানিক হিসাবে যথার্থ হয় নাই—তখন ইলেকট্রিকান দেখিতে পাই নাই।

তুমি আরো কিছুকাল বিলাতে থাকিয়া যাইবার কিঞ্চৎ ব্যবস্থা করিয়াছ খবর দিলে না কেন? আমি সে কথা জানিতে উৎসুক হইয়া আছি। অজ্ঞাত সভায় তোমার মত প্রচার কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাও জানিবার জগৎ আমাদের মন উৎকণ্ঠিত। জ্ঞাননি ও আমেরিকায় যাইবার কোন প্রকার সন্যোগ করিতে পারিবে না কি? তুমি যদি দীর্ঘকাল যুরোপে থাক তবে যেমন করিয়া হোক একবার সেখানে গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঘুং বর্ষা পড়িয়াছে।

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৪

৩ জুলাই [ ১৯০১ ]

৪

বন্ধু

তোমার কণ্ঠ কেন সম্পূর্ণ সফল না হইবে? বাধা যতই গুরুতর উৎকৃষ্ট তুমি যে-ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহা সমাধা না করিয়া তোমার

নিম্জিত নাই; সেজ্জ যে কোন প্রকার ত্যাগ-স্বীকার প্রয়োজন তাহা তোমাকে করিতে হইবে। এ কথা তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও অস্বীকারে বলিতে পারিতাম না। বলিতে পারিতাম না যে, দারিদ্র্য, অর্থ-সঙ্কট সাময়িক অবনতি গ্রহণ কর। আমি নিজে হইলে হয়ত পারিতাম না—কিন্তু তোমাকে আমি নিজের চেয়ে বড় দেখি বলিয়াই তোমার কাছে দাবীর সীমা নাই। তুমি যাহা আবিষ্কার করিতেছ ও করিবে তাহাতে জগতের যে-শিক্ষা লাভ হইবে, কর্তব্যের অম্লবোধে যে-দুঃখভার গ্রহণ করিবে তাহাতে তাহার চেয়ে কম শিক্ষা দিবে না। আমাদের মত বিষয়পারায়ণ সাধারণী, নিষ্ঠাবিহীন, ক্ষুদ্র লোকদের পক্ষে এই দুঃখভার, এই শিক্ষা একান্তই আবশ্যক হইয়াছে।...তুমি যদি ফার্সে না পাও তবে একবার এখানে আসিও। যথাসাধ্য ভাল বন্দোবস্ত করিয়া একেবারে যাত্রা করিয়া বন্ধুকে বাহির হইবে। ইচ্ছা ছাড়া আর কি পরামর্শ দিতে পারি? একবার দেখা পাইলে বড় আনন্দিত হইব—না যদি পাট, তবু তুমি তোমার কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছ এই খবর পাইলে আর কিছুই চাই না। তোমার উপরে আমার একান্ত নির্ভর আছে—বর্তমান যুরোপ তোমাকে গ্রহণ করিল কি না তাহা লইয়া আমি অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইতেছি না—তুমি যাহা দেখিতে পাইয়াছ তাহা বৈজ্ঞানিক মাত্রা-মবীচিকা নহে তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র, দ্বিধামাত্র নাই। তোমার উদ্ভাবিত সত্য একদিন বৈজ্ঞানিক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে—সেদিনের জগৎ ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে পারিবে।

ইতিমধ্যে তুমি একবার জাওয়াগি বা আমেরিকায় যাইতে পারিলে বেশ হইত। এবারে না হয় আর একবার চেষ্টা দেখিতে হইবে।

কল্যাক ইতিমধ্যে স্বামিগৃহে রাখিয়া আসিলাম। পথের মধ্যে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া আরাম লাভ করিয়াছি। সেখানে একটা নিষ্কলন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি। হুই একজন ত্যাগ-স্বীকারী ব্রহ্মচারী অধ্যাপকের সন্ধান ফিরিতেছি।

তোমার রবি

১৫

( অগষ্ট ১৯০১ )

৪

বন্ধু

আজ রমেশবাবুর চিঠি পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। তোমার প্রতি, সন্তোষা স্বদেশের প্রতি, তাঁহার সন্দের অম্লবোধে

আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। আমার সেই এক কথা। বিলাতে থাকিয়া তুমাকে স্বাধীন ভাবে কৰ্ম সমাধা করিতে হইবে। একবার কেবল দুই তিন মাসের জঙ্গ দেশে ফিরিয়া এসো—তোমার সঙ্গে একবার সকল কথা পরিষ্কাররূপে আলোচনা করিয়া লইতে চাই।

তোমার স্পন্দন-রেখার খাতাখানি পাইয়া অনেকটা পরিষ্কার ধারণা হইল। বঙ্গবর্ধনে এইগুলি খোদাইয়া ছাপাইবার ইচ্ছা আছে।

তোমার সঙ্গে শীঘ্র দেখা হইবার সম্ভাবনার কল্পনা করিয়া আগ্রহাশ্রিত হইয়া আছি। তোমার রবি

১৬

[ অগষ্ট ১৯০১ ]

বন্ধু,

তোমার ছবি আজ পাইয়া বড় খুসী হইলাম। ভারি সুন্দর ছবি হইয়াছে—এ ছবি আমার লিখিবার ঘর বিভূষিত করিয়া থাকিবে। কিছু দিন পূর্বে সাহিত্যে তোমার ছবি ছাপিবার জঙ্গ সমাজপতি তোমার কোটো চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আমাদের শিলাইদহের গুণ ছাড়া তোমার ছবি আমার কাছে ছিল না। সেটা তেমন ভাল না, কিন্তু অগত্যা সেইটাই সমাজপতিকে দিতে হইয়াছে। তোমার এ ছবিখানি চাহিলেও আমি দিতাম না—কারণ, চুরি করিকে অনেক ভুললোক সন্দেহ বোধ করেন বটে, কিন্তু জিনিষ ধার লইয়া ফিরাইয়া না দেওয়াকে তাঁহার অপহরণের নামাস্তর বলিয়া জ্ঞানেন না। তোমার প্রেরিত আশা ছবিখানিও ভাবে পূর্ণ। ভারতবর্ষীয় আশার সন্তুষ্টি বোনার মধ্যে কোন্ তারটা অবশিষ্ট আছে? ধর্ম, না, কৰ্ম; ধ্যান, না, ভ্রান; বিজ্ঞা, না, উদ্ভ্রম?

শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিজ্ঞানীয় খুলিবার জঙ্গ বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না—ধনা দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিজ্ঞা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একজো পাওয়া যায় না। স্বার্থ-চেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোন মহৎ কার্য্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারও মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজি বিজ্ঞার আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্ণযোগী করিতে পারিল না কেন? মহারাষ্ট্র দেশে ত তিলক ও পরজপে আছে, আমাদের এখানে সে-রকম ত্যাগী অথচ কর্ম্মী নাই কেন? ছেলোবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতার আমদিগকে জট করিতেছে—দারিদ্র্য্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্তে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে। তুমি যদি ইতিমধ্যে একবার এখানে আসে তবে তোমাকে লইয়া আমরা এই কাজটি পূর্তন করিতে হইবে।

বিংশ শতাব্দীতে নৈবেত্তের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তোমাকে পাঠাই। নৈবেত্তকে আমি আমার অস্ত্রাঙ্ক বইয়ের মত দেখি না। লোকে যদি বলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বা ভাল হয় নাই তবে তাহাতে আমার স্বপ্ন স্পর্শ করে না। নৈবেত্ত বাঁহাকে দিয়াছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তবে করিবেন—আমি উহা হইতে লোকজ্ঞতি বা লোকমিস্ত্রর কোন দাবীই রাখি না।

সেদিন সরস্বতী নামক এক হিন্দি কাগজে দেখিলাম, আমার “মুক্তির উপায়” নামক ছোট গল্পটি তজ্জমা করিয়াছে। হিন্দিতে পড়িতে বেশ লাগিল—রস কিছুই নষ্ট হয় নাই।

একটা খবর তোমাদের দেওয়া হয় নাই। হঠাৎ আমার মধ্যম কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে। একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব—আমি বলিলাম, কর। যেদিন কথা, তার তিন দিন পরে বিবাহ সমাধা হইয়া গেল। এখন ছেলেটি তাহার আঙ্গোপ্যাঙ্গি ডিগ্রীর উপর হোমিওপ্যাথিক চূড়া চড়াইবার জঙ্গ আমেরিকা বণ্ডন হইতেছে। বেশী দিন সেখানে থাকিতে হইবে না। ছেলেটি ভাল বিনয়ী, কৃতী।

ভয় নাই—তোমার বন্ধুটিকে তোমার প্রাতীক্ষায় রাখিব। ফা করিয়া তাহাকে হস্তান্তর করিব না।

তোমার রবি

১৭

[ সেপ্টেম্বর ১৯০১ ]

বন্ধু,

আজ মিস্ নোবলের চিঠিতে তোমার কথা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। আমরা এখন বোকপুবে শান্তিনিকেতনে বা করিতেছি। তুমি এখানে কখনো আস নাই। জায়গাটি বড় রমণীয়। আলোকে আকাশে বাতাসে আনন্দে শান্তিতে যেন পরিপূর্ণ। এখানকার আকাশে চলিবার-ফিরিবার সময় নিরন্তর যেন একটি মঙ্গলের স্পর্শ অনুভব করি। এখানে জীবন বহন করা নিতান্তই সহজ ও সরল। কলিকাতার আবহাওয়ার মধ্যে আমার আর কিছুতেই ফিরিতে ইচ্ছা করে না। এখানে নিরন্তর, নিঃশব্দ, ধ্যান ও প্রেমের নিজের জীবনকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিবার জঙ্গ অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে। পূর্বেই লিখিয়াছি, এখানে একটি বাড়ি বিজ্ঞানীয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পোষ্য মাস হইতে খোলা হইবে। গুটীদশকে ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নিখিল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টা আছি।

ত্রিপুরার মহারাজ কাল আমার কাছে একটি কর্ণচারী পাঠাইয়াছেন। তোমার সখ্যে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আর দিন দশ-বারো পরে ত্রিপুরায় গিয়া মহারাজের সঙ্গে দেখা করিব। তোমার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাশ্রুতি মহারাজ আমার হৃদয় বিগুণ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেণীর লোকের পক্ষে একরূপ বিনোদ গুণগ্রাহিতা অত্যন্ত বিরল।

এখন ত তুমি প্রবাসেই থাকিয়া গেলে। দীর্ঘকাল তোমার বিচ্ছেদ বহন করিতে হইবে। বিলাতে ঘাইবার লোভ এখন আমার মনে নাই—কিন্তু একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্তা করিয়া আসিবার জঙ্গ মন প্রায়ই বাগ্ন হয়। তোমার সাধুর্লার বোন্ডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নীচের তলার নাছুর কোলের আশ্রয়দান সর্বদাই মনে পড়ে। এখন যদি ভারতবর্ষে থাকিতে তবে কিছু দিনের জঙ্গ তোমাকে শান্তিনিকেতনে রাখিয়া নিবিড় আনন্দ লাভ করিতাম। যদি কোন সুযোগ পাই একবার তুমি থাকিতে থাকিতে ইংলণ্ডে ঘাইবার চেষ্টা করিব। তোমার বন্ধু যে আমাকে এমন প্রবল ও গভীরভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পরে জানিতাম না।

তোমার রবি

১৮

[অক্টোবর বা মভেম্বর] ১১০১

আগস্টলা

কার্তিক ১৩০৮

ও

বন্ধু,

আমি তোমার কাছেই বিপর্যয় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েক দিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাঙ্গা ত জানই—সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি কিছুই বোধ হয় দুই-এক মাসের মধ্যেই তোমাকে লক্ষ্য চাক্ষুষ টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো লক্ষ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইত্যাদি বোধ করি তুমি বর্তমান সপ্তাহ হইতে আপাততঃ উত্তরাণ হইতে পারিবে। প্রাসাদে নিষ্কারণ প্রকৃতি বহু শায়সায় কার্যে সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি যেহেতু প্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে তিনি আমার স্বয়ং আরো দূরতরকণে আকর্ষণ করিয়াছেন—স্বাভাবিক উদ্যোগের এমন উচ্ছল আদর্শ আমি আর দেখি নাই। তুমি অবশ্যই হইতে নিজেকে রক্ষা কর। ফলস্বত্ব করিতে তোমার যতটো বিলম্ব হউক আমাদের শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক প্রীতি সর্বদাই বৈধব্য-সঙ্কারে তোমার পার্শ্বে হইয়া থাকিবে। তোমাকে আমরা লেশমাত্র তাড়া দিতেছি না; যাহাতে কথ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্ত তুমি যথোচিত বিলম্ব করিতে পার আমরা তাহারই সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি—আমাদের প্রতি সেই আস্থা তুমি দূর রাখিও। তোমার কাছে আমরা আরো কত দাবী করিব? তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জগুই যদি আমরা বুতজ্ঞ না হইতে পারি তবে আমাদিগকে শিক্। তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারি না। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাঙ্গা কহটুকু এবং তাহার মূল্যই বা কি? এটুকু দিয়া তোমার উপরে দাবী চালাইতে পারি না। তোমাকে হৃদয়ের গভীর প্রীতি ছাড়া আর কিছুই দিই নাই জানিবে, সে প্রীতি বৈধব্য ধরিতে জানে এবং প্রীতি ছাড়া কিছুই ফিরাই চাচে না। মহারাজের সম্বন্ধে এটুকু নিশ্চয় জানিও তিনি তোমাকে স্বণী করিবার জন্ত অর্থসাহায্য করেন নাই, তিনি তোমার স্বর্ণ পরিশোধ করিতেছেন। যিনি তোমাকে প্রতিভা দান করিয়াছেন তিনিই তোমাকে উত্তম ও আশা প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিভাকে সার্থক করুন।

তোমার

১১

রবি

[এপ্রিল ১১-০২]

ও

বন্ধু,

তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই কিন্তু কত দিন যে তোমাকে লইয়া কাটা হইয়াছে, হৃদয়ের অন্তরঙ্গ প্রদেশে তোমাকে অনুভব করিয়াছি তাঙ্গা বলিতে পারি না। আজ তোমার জয় সন্বাদ পাইয়া নরমেঘগঞ্জনপুলকিত মস্তুরের মত আমায় হৃদয় নৃত্য করিতেছে। মাতঙ্গ মদের বোতলের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত যেমন পান কবে তোমার চিঠির ভিতর হইতে আমি সমস্ত মত্ততাটুকু একেবারে

উপভূক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। বহু বিলম্বে তোমার জয় হইলেও আমি হতাশাস হইতাম না—তবু নগদ পাণ্ডার প্রবল আনন্দ।

গত কাল প্যারিসে তোমার বলিবার কথা ছিল—নিশ্চয় সেখানে তোমার জয় হইয়াছে—তোমার সেই বহুতাসভার আমাদের হৃদয় উপস্থিত ছিল।

যুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিও—তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিও না। গারিবাল্ডি যেমন জয়ী হইয়া বণক্কে হইতে কবিক্কে আসিয়া হাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অল্পকালো জয়-তোরনের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের গভীর নিষ্কলিতার মধ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে—তখন তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে, তুমি কাঁধাকেও খুঁজিবে না—তখন তোমার কাছ আসিতে ভারতবর্ষের কাছে সকলে মাথা মত করিবে—বিশেষী হৃদয়কে ডাকিবার জগৎ বিশেষের প্যানে প্রাসাদে বসে করিলে চলিবে না—মাঠের মধ্যে ধূঁটার মধ্যে যুগচন্দ্রে যে বসিবে সেই তোমাকে পাইবে। ভারতবর্ষের দাপিতকে এমন প্রবল ভোজে জরী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কাহারো হাতে দেন নাই—তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন ব্রহ্ম পথিরা সভাতে প্রাতিশ্রুতি করিয়া কাগার বসন পরিয়া তোমার যন্তৃত্ত লইয়া বিপুলজ্ঞায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে—সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন স্বর্ণগণ তোমার জয়ধ্বজ উত্তারণ করিবার জন্ত সেদিনকার পূণ্য সমীপে এবং নির্মল সূর্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শুল্ক প্রান্তর এবং উদার আকাশ তুঘিত বন্ধের স্নায় বাতুল প্রসারিত বাতর স্নায় সেই দিনের জন্ত অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের কুদ্র শক্তি অনুসারে আমরাও সেই দিনের জন্ত তপস্বী করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের রাজা যে কেহ হউন, আমাদের আকাশ, আমাদের দিগন্তবিশীর্ণ মাঠ কে কাড়িয়া লইবে? আমাদের জ্ঞানের অবকাশ, আমাদের ধানের অবকাশ, আমাদের দারিদ্র্যের অবকাশ হইতে আমাদিগকে কে বঞ্চিত করিতে পারিবে? আমাদের দেশে যে পরমা মুক্তির অচল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—তাঙ্গা স্তম্ভ, তাঙ্গা নির্ঝাঁক, তাঙ্গা দীন, তাঙ্গা দিগম্বর, তাঙ্গা শাস্ত—তাহাকে বলীর বাহু ও ক্ষমতাসালীর স্পর্শ স্পর্শ করিতে পারে না—ইহাই চিন্তের মধ্যে স্থির নিশ্চয়রূপে জানিয়া শান্ত মনে সন্তোষের সচিৎ প্রসঙ্গ মুখে ইহাই বিরলভূষণ বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। বিশেষী কটাক্ষ আর ক্রক্ষেপ করিব না—তাহার ধিক্কার আর কর্ণপাত করিব না—তাহার কাছ হইতে যে বর্ষের রচয় বসনভূষণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম তাহা তপোবনের দ্বারে আবজ্ঞনার মত ফেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিব।

পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রমবৃত্ত হইতে কালিদাসের শিরীন পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।

তোমার রবি

২০

[মে ১১-০২]

ও

বন্ধু,

ঈশ্বর তোমার ললাটে বিজয়তিলক অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন—তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ

হইতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা দাঁধ ? বেথানে থাক এবং যেমন করিয়াই হউক, উল্লাসে হউক, বাধায় হউক, নৈরাশ্রে হউক, তুমি নিজেকেও বার্থ করিতে পার না। যিনি ভিতরে থাকিয়া তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার সমস্ত জীবনকে সফলতার দিকে লইয়া গেছেন তাঁহার কর্তৃক হঠাৎ মাথখানে নিরর্থক করিবে কে ? নীজাবের নৌকা কখন ডুবে না। নিরাসক্ত ভারতবর্ষের অবিচলিত স্থৈর্য তোমাকে তোমার কর্তব্যে মগ্নে অনায়াসে রাখা করুক। কোন ক্ষুদ্র আকর্ষণ, কোন ইচ্ছার চাক্ষুষ তোমাকে তোমার মনঃ ব্রত হইতে ঝট না করুক। ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে। তুমি এখানে আসিয়া তপস্বী হইয়া নিভৃত্তে তোমার শিষ্যদিগকে জ্ঞানের দুর্গম দুর্গের গোপন পথ সন্ধান করিতে শিখাইয়া দিবে, এই আমি আশা করিয়া আছি। পড়া মুগ্ধ কহানো, পাশ করানো তোমার কাজ নহে—যে-অগ্নি তুমি পাইয়াছ তাহা তুমি স্নেহে লইয়া বাইতে পারিবে না—তাহা ভারতবর্ষের হৃদয়াগারে স্থায়ী করিয়া বাইতে হইবে; যিদেবী আমাদের জ্ঞানের অগ্নি যেটুকু দেয়, তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী দোয়া দিয়া থাকে—তাহাতে যে কেবল আমাদের অন্ধকার বাড়ে তাহা নহে, আমাদের অন্ধতাও বাড়িয়া যায়—আমাদের দুটি পীড়িত হয়। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি—আর কোন পথ ভারতবর্ষের পথ নহে—তপস্তার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাতারে মনে নাই—আর একবার আমাদের গুরু বেনৌতে আরোহণ করিতে হইবে—নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রান্তরের বটজায়ায় সেই বেনৌ-অধিরোহণে তোমাকে সহায়তা করিতে হইবে। সৈন্যসামন্ত, ঐশ্বর্য, সম্পদ, বাহিনী, ব্যবসায়, কিছুই আমাকে বিচলিত করে না। আমি নাটের মাঝখানে বসিয়া সেই প্রাচীন পরিচিত বেনৌর স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহা শূন্য বহিয়াছে, আমরা শিশুর মত তাহার মাটি ভাঙিয়া পুতুল গড়িয়া খেলা করিতেছি।

তোমার রবি

২১

২০ জুন ১৯০২

ও

৬ই আশাঢ় ১৩০১

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

২২

আবার আসিয়াছে—কিন্তু আবার সেই চিরন্তন মন ঘনঘটা এবার এখনো দেখা দিল না। আমরা সেই ভক্ত হাঁ করিয়া চাতিয়া আছি। এখানে চারি দিকে অব্যবহিত প্রান্তর—কোথাও দৃষ্টিই কোন বাধা নাই—মেঘের লীলাঙ্গল এমন আর নাই—এইখানেই জয়দেব বিপুলকুলে তমালবনে বর্ষা রাত্রির বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। এখান হইতে জয়দেবের জন্মভূমি ছয় কোশ—চণ্ডীদাসের জন্মভূমিও অধিক দূর নহে। এই জয়গায় ঘন বর্ষার সময় এক বার তোমাকে প্রেততার করিতে পারিলে চমৎকার হয়। এক এক সময় বিদ্যুতের মত আমরা

লিখি, হাসি হাসি করিয়া বেড়াই, দেশ উদ্ধার করিবার ফিকির করি—এ সমস্তই বাজে কাজ। জীবনটা ইহাতে কেবল খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। প্রেমই নিস্তা, শান্তিই চিরন্তন। দুঃখ এই যে, মানুষকে দৈনিক ক্ষোভ সাময়িক অশান্তি কাটাটয়া এই নিস্তা পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এমনি করিতে করিতেই জীবনটা কাটিয়া যায়—তখন কোথায় তুমি কোথায় আমি। সম্পূর্ণতা কেবল মর্যাদিকার মত আগে আগে চলে তাহার পথের আর শেষ নাই। এমন করিয়া কে আমাদেরকে কেবল টানিয়া চলিয়াছে ? এক একবার ইচ্ছা করে বিদ্রোহ করি—সব কাজকর্ম ফেলিয়া মুখোমুখি করিয়া বসি—জন্মটাকে পূর্ণ করিয়া তুলি। কিন্তু পথের আহ্বান যখন আসে তখন লক্ষ্যছাড়া আর বসিয়া থাকিতে পারে না—আবার দৌড় আবার দৌড়! একটা পাকের মধ্যে পড়িয়া গেছি। সমস্ত বিজ্ঞানগণ্টা একটা পাক—কেবল ঘুরিতেছে—ঘোরাই যেন তাহার পরিণাম—মানবলোকও একটা পাক—কেবল ঘুরিয়া চলিতেছে, তাহার পরিণাম কোথায় ? এই জগত ভগবান বৃক্ষ ব্যাকুল হইয়া এই পাক হইতে কোন মতে বাহির হইবার জন্ত এত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমস্ত মানুষ বাহির না হইলে একজনের বাহির হইবার জো নাই। জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই মানুষ-দুর্গীতে ঘুরিয়া মরিতে হয়। আমাদের বিজ্ঞানের মতে আকাশের এক জায়গায় পাক পাইয়া জগৎ অগণ্য গুহ্যতার অন্ধকার উঠিয়াছে—কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ বলে না ? এই পাকের মধ্যে অগণ্য চক্র—নক্ষত্রচক্র, দৌরচক্র, প্রচক্র, জীবনচক্র—এই পাকের বাহিরেই স্থির শান্তি। প্রাণটা সেইখানকার জন্ত দুই হাত বাড়ায়, কিন্তু ভীষণ জগতের টান তাহাকে আপনার অনন্ত বর্ণায় বার বার টানিয়া লয়। প্রেমে যেন এই পাকের মধ্যেও একটুখানি স্থিতি ও পরিপূর্ণতার আভাস পাওয়া যায়। দুইটি সদয় মুখোমুখি করিয়া বসিলে জগৎজ্বরের ঘর্ষণক কিছুকালের জন্ত যেন শোনা যায় না—তখন লালস্রুতি শ্রুতঃপে পাপপুণ্য জয়পরাজয়ের তোলাপাড়া কিছুকালের জন্ত তুলিয়া থাকা যায়। কিন্তু তোমার বিজ্ঞান নিখিজয়যাত্রার সময় এত সকল কবির কন্দন ঠিক নহে, এখন ভ্রমভর্য্য বাতুল বাত, এখন হৃদয়ের কথা হৃদয়ের মধ্যেই থাক।

তুমি জর্জরি আমেরিকায় তোমার জয়পতাকা নিখাত করিয়া আসিও। তাড়াতাড়ি করিয়া না। আমি বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব—তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। এখন আমরা হোনাকে কাছে ডাকিব না। আগে তোমার কাজ সারিয়া আইস—তাহার পরে দীর্ঘ সন্ধ্যায় প্রদীপ জালিয়া কেদারা টানিয়া বসা যাইবে।

আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে একটি ভাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিখিবার জন্ত আসিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল। সে বেশ আমাদের আপনার লোক হইয়া আসিয়াছে। তোমার বন্ধু মীরা প্রত্যহ তাহাকে এক পেয়ালা ফুল দিয়া বশ করিয়া লইয়াছে। তাহার কাছ হইতে দুটো একটা করিয়া ভাপানী কথাও শিখিয়া লইতেছে। ইহা যদি তোমার আশঙ্কা বিষয় বলিয়া মনে হয় তবে ইহার বখাবিহিত প্রতিকার করিও।\*

তোমার রবি



# সোবিয়তের দেশে দেশে

মনোজ বসু



যত বড় জাঁদবেল মানুষই হোন, সোবিয়ত দেশ খোড়াই কেয়া করবে যতক্ষণ না কোন কর্মিক সাথ পিছন থেকে আপনাকে ঠেলে দিচ্ছে। একদার থাক্তির নেই—এক গলার অনেকের কথা বলুন, তার স্তনবে। যত বকম পেশা থাকতে পারে, সব পেশার লোক এক এক যুনিয়ন গড়ে বসে আছে। তারাই আসল। যুনিয়নগুলোকে হাত করে নিম্ন, সারা সোবিয়ত দেশ তবে আপনার মুঠের ভিতর।

যুনিয়নের মত বড় অফিসে চলেছি দুপুরের খানাপিনার পর। মস্কো শহরের সীমানা বৈসে নতুন যুনিভাসিট-পাড়ার, লেনিন পাতাড়ের দিকে। নামটা গোলমালে—অল যুনিয়ানস সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্রেড-যুনিয়ানস (All Unions' Central Council of Trade Unions)। উঠান পা দিয়েই চোখের মণি গর্ত থেকে ঠিকরে সেরুবার জোগাড়। সমক্ষে একজনে বলে ও উঠলেন, ওর বাবা, এই হল ট্রেড-যুনিয়ানের বাড়ি—রাষ্ট্রপতি-ভবন নয়? যুনিয়ন-অফিস বলতে আমরা বুঝি, নিচু-ছাত বটগুটে অঙ্ককার ভাপসা গন্ধ-ওটা ঘরের মধ্যে হাতল-ভাটা খান দুই চেয়ার ও নড়দড়ে টেবিল। চেয়ার ও মেজের উপরে মানুষ কয়েকটি এরা লোমস দৃষ্টি আরম্ভ। আবার এখানে কী কাণ্ড।

চাবতলার উঠে গেলান লিকটে। নামান বিভাগ—অশস্ত্র ঘর। বকবক তকতক করছে। আসবাবপত্র একেবারে হাল ফাসানের—বসে বসে কাজ করাব মতো যতখানি স্তম্ভ নিতে পারা যায়। সকল ব্যবস্থা করে রেখেছে।

সোবিয়ত ট্রেড-যুনিয়ন জনসাধারণেরও সস্তা। বেকার নেই, সক্ষম মানুষ মাসেই কাজ পেয়েছে—যে কেউ তাদের মেসার হতে পারে। কারখানায় কর্মিক, অফিসের কেরানি, কারিগরি ও উচ্চ ক্লাসের ছাত্র—সবাই। ভাতিদারের বাচ্চুনিচাব নেই। ইঙ্কুলের মাষ্টার, খনির শ্রমিক, বইয়ের লেখক, গাড়ির ডাইভার—সকলের আলাদা আলাদা যুনিয়ন, ইচ্ছে করলে যে কেউ মেসার হতে পারেন নিজ নিজ যুনিয়নের।

সমস্ত যুনিয়ন থেকে মেসার বাচ্চাই করে নিয়ে আবার এক সস্তা গড়ে, তার নাম স্ত্রীম ট্রেড-যুনিয়ন। শুদেব ভিতরে ভোট নিয়ে হয় সেন্ট্রাল-কাউন্সিল। সকলের বেশি ক্ষমতা এই কাউন্সিলের—তারই ট্রেড-যুনিয়ানের মধ্যে যোগাযোগ সাধন হল এদের বড় কাজ।

সরকারি ও আধা-সরকারি ব্যবসায়ী ইলেকসন ট্রেড-যুনিয়নগুলোর বিস্তার প্রভাব। অশস্ত্র মেসার। কর্মিকদের ভাতভালের ব্যবস্থা করেই দায়খালাস নয়, কড়া নজর থাকে, কর্মিকরা বাতে বোল আন নাশ্ব হতে জীবন কাটা—শুধুমাত্র কাজের যন্ত্র না হয়ে ওঠে। এই কাউন্সিলের ব্যবস্থার সাড়ে ন' হাজার সংস্কৃতি-ভবন (Palace of

Culture) চলেছে। তা ছাড়া ছোটখাট ক্লাব-ওগণিতে পাড়বে সাতানব্বই হাজার। কর্মিক ও তার পরিবারের হরেক বকম খেলাধুলা পড়াশুনা ও স্ক্রুতিফর্তির ব্যবস্থা। ক্লাবে এসে তারা ছবি আঁকে, ফোটা তোলে, দরজির কাজ শেখে, তাস-দাবা খেলে, থিয়েটার করে, সিনেমা দেখে। শ্রুতীজ্ঞানীরা এসে শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বক্তৃতা দিয়ে যান। প্রতি ক্লাবের সঙ্গেই শিশুকেন্দ্র—ছেলেপুলেদের শিক্ষা শরীর-চর্চা ও আমোদের ব্যবস্থা সেখানে। তেরো হাজার লাইব্রেরি চালায় কাউন্সিল। তাছাড়া সরকারি ও স্থান-কলেজের লাইব্রেরি আলাদা তো আছেই। লড়াইয়ের সময় হিটলারের দল বিস্তার জাগ্রা দখল করে নিয়েছিল, অনেক লাইব্রেরি পুড়িয়ে দিয়েছে তখন।

লড়াইয়ে বাড়ি ভেঙে চুরমার করেছিল, এখন সেদার বাড়ি বানাজ্জ মানুষের বসবাসের জগ্গ। যার যেমন দরকার, ঘরবাড়ি ঠিক করে দেওয়ার কাজও ট্রেড-যুনিয়নের। মাইনে-করা যুনিয়নের ডাক্তার—কর্মিকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যুক্ত করে বোগী দেখে বেড়ায়। যুনিয়নের ইনস্পেক্টর—পাকা লোক দেখে দেখে এই কাজ দেয়—কড়া চোখে তদারক করে বেড়ান, কর্মিকদের স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটছে কিনা কোথাও। প্রায় হাতে-মাথা-কাটার ক্ষমতা ঈদেব-দরকার হলে ফাইটির কাজকর্ম থামিয়ে দিয়ে মামলা আনতে পারেন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। দোষত্রুটি সামলানোর জগ্গ এমন কি সরাসরি নিজ হাতে নিয়ে নিতেও পারেন। কর্মিকরা গোলমাল না করে, সেটাও দেখেন ওরা; গণগোল জমে ওঁদের আগেলোগ মিটমাটের ব্যবস্থা করেন যুনিয়ানের লোক ও কর্মকর্তাদের লোক এক জাগরণ এনে বসিয়ে। ওভারটাইম কাজ করবার নিয়ম নেই। কিন্তু জুজুরি বাপায়ে কখনো কখনো বিশেষ তরুণ। আসে তখনও ইনস্পেক্টর নজর রাখবেন, কর্মিকদের শরীর খাপস না হয়ে পড়ে। পেশান পায় সকল কর্মিক—পুঙ্খের বাট আর মেয়ের পথার বসে হল। কয়লার খনিতে যারা কাজ করে তাদের পেশান অনেক আগে। পেশান পেলেই যে কাজ ছাড়বেন, তার কোন মানে নেই। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে চাকরি চালিয়ে যথাবীতি মাইনে নেবেন, আবার পেশানের টাকাও আসবে।

অক্ষমতার পেশান আছে। শরীর হঠাৎ অগুট, হয়ে পড়লে পাখে বসতে হবে না। হাসাব-পোষাবের দায়বদ্ধি থাকলে পুরো মাইনে পাবেন কাজকর্ম না করলেও। অন্যথা মাইনের চার ভাগের তিন ভাগ। ভারী কাজ করতে পাবছেন না কিন্তু হালকা কাজের শক্তি আছে এমন এমন অবস্থায় মাইনের অর্ধেক দেবে; বাকিটা আপনি থেটেবুটে জোজগার করুন। চাকরি পঁচিশ বছর পুরলে মাষ্টারমশায়রা পেশান পাবে—শক্তি থাকলে চাকরিও চালিয়ে যাবেন পেশানের সঙ্গে। সন্তান-প্রসবের সময় মেয়ে-কর্মিকরা ব্যবসায়

খরচখরচা পায়। এবং সাত্ত্বান্তর দিনের ছুটি— কোন কর্মকের ধন শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে; তার লজ্জা বলকারক নামি খাতি চাই। কিবা একটা ছেলে ধন পড়াভ্যাস কৃতি দেখিয়েছে, বৃত্তি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। যুনিয়ান আল্লা ফাও জমিয়ে রেখেছে এই সব বাড়তি ব্যবস্থার জন্ম।

শ্রমের হাজার আনিটোরিয়াম ও বিশ্রামস্থান আছে ইউনিয়ন জেলার তাঁরে। পাহাড়ের উপরে সমুদ্রের কিনারে ভাল ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গা। কর্মকরা সেখানে ছুফত থাকতে পায়। একমাস থাকবে—তার মধ্যে কারখানার ছুটি মেসে আঠারো দিনের; সোদাস ইনসুরেন্স ফাও থেকে বাকি ষাটো দিনের মাইনে দিয়ে দেয়। কর্মীদের বাস্তা ও আনন্দের লক্ষ্য নানাবিধম চেষ্টা—তার ফলে উৎসাহের বেড়ে সমৃদ্ধি উৎপন্ন হচ্ছে। জিনিষপত্রের দাম কমছে দিনকে দিন, আর কর্মকের মাইনে বাড়ছে। কর্মকের পরিবার খুব বড় হলে সেখানে বিশেষ ভাড়া। ছেলেপুলের মধ্যে খুল-কলেজ ও যুনিভার্সিটির ভাড়া থাকলেও বেশি টাকা। জাতীয় জায়ের পুরোপুরি সমস্ত ভাগ জনসাধারণের কাছে বিতরণ আসবে, এই হল আর্থিক ব্যবস্থা ওদেশ।

যুনিয়নের চালা মাইনের শতকরা এক ভাগ। ছাত্রের বৃত্তিরও অমনি শতকরা এক ভাগ দেয়; বৃত্তি না গেলে পঞ্চাশ কোপেক। কর্মীদের মধ্যে মেম্বার শতকরা নিরানব্বই; ছাত্রদের মধ্যে নব্বই।

ধর্মঘটের কথা কখনো তো শুনিতে আপনাদের দেশে। কড়া আইন আছে নাকি?

কার বিপক্ষে করবে বলুন ধর্মঘট? মালিক বলে আল্লা কোন দল নেই নিজেরাই সব। ধর্মঘট নিজেরে বিরুদ্ধে? সোবিয়ত দেশটাই হল এক সুবৃহৎ পরিবার। কত রকম সমস্তা গুঠে, তেমনি সমাধানও করে নেয় নিজেরা বৃহসম্মত করে। চাকরি যাওয়া খুব কঠিন এদেশে; অতি-বড় অপরাধ করলে কালে ভেঙে চাকরি যায়। শোষণ না থাকায় তিক্ততার কারণ ঘটে না কোন সময়।

ছুটলাম ওখান থেকে শতরের ভিতর দিকে। আর দুটো-তিনটে দিন—এর মধ্যে বহুদূর দেখে নেওয়া যায়। মস্তবড় প্রতিষ্ঠান—গার্ক ইনষ্টিটিউট অব ওয়ালড লিটারেচার। ডিরেক্টর হলেন আনিসিমভ, চীনে ষাঁচ সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সোবিয়ত-দলের নেতা হয়ে চীনে গিয়েছিলেন। সে কথা মনে আছে কি আর এত দিন পরে—বিধা ভরে সোভিয়েতের মারফতে শুধাসামি: মনে পড়ে আবছা রকমের কিছু? গড়গড় করে একগাদা জবাব দিয়ে চললেন, সোভিয়েতী ইংরেজি করে দিল: মনে পড়বে না কি, সাতাইয়ে বহুতার কমপিটিন হল তোমার সঙ্গে। জিত তোমারই—সাততালির চোটে কানের পর্দা ছেঁড়ে তোমার বহুতার পরে। আমি নানা করে উঠি: আজ্ঞে না, ভাষা মিথ্যা বলা হচ্ছে। তোমার বহুতার এমন সাততালি, আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে গিয়ে বুড়ির তোড়ে স্ট্রীসঙ্গার লণ্ডভণ্ড করে দিল। ‘চীন দেখে এলাম’ বইয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা আছে। প্যাকেজকে আমিও তখন ভারতীয় দলের কর্তা হয়ে পড়েছি। কিন্তু আপোনাগোনা বানানো নিতান্তই কাগজে-লেখা বক্তৃতা—বাহাদুরি কারো নেই। না আমার, না আনিসিমভের।

আনিসিমভ তারপরে হিড়হিড় করে টোমে নিয়ে চললেন: মনে নেই যে বলছ, দেখে যাও এদিকে এসে।—এসো।

অগুস্তি বইয়ের তাক। একটার সামনে ঝাঁড় করাছেন। পিকিনে একগাদা বই দিয়েছিলাম। তার একটাও অজ্ঞা কোথাও দিয়েছেন বলে তো মনে হয় না। নিজের ইনষ্টিটিউটে গাজিয়ে রেখেছেন। রেখেছেন কেমন জায়গায় ভাবতে পারেন? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। বাংলার লেখক আমরা তাহলে মোটামুটি দু-জন—রবীন্দ্রনাথ এবং এই অমম। আপনারা দুখ-ছাট করেন, আর এত দূরে কী পশার জমিয়ে আছি ভাবুন একবার। যার হিসাবর সঙ্গে পুড়ে মরুন। ইতিমধ্যে অনেক দিন কেটেছে আরও অনেক নিশ্চয় জুটে পড়েছেন সেখানে। দেশ দিবা ছিলাম নিমালার কবিগুরু পরশ্রুত, এখন ডিড় ক্রমে গেছে।

গার্কির নামে প্রতিটি—গার্ক-সম্পর্কীয় বস্তু-কিছু এই এক জায়গায় এসে দাঁড়ছে। হরেক পাণ্ডুলিপি একটা ঘরে—তানাল নেই ভারী দরজা, কেদার ডবল পুর। হাতের কাছে টুকরোটাকরা যে কাগজ পেয়েছেন তার উপরে গার্কি কলম চালিয়েছেন। আবার চওড়া মাজিনে গোটা গোটা অক্ষরের পাণ্ডুলিপিও দেখছি। পরের পাণ্ডুলিপিও যত্ন করে দেখে কাটকুট করে দিতেন—এমনি শত শত রয়েছে। চিঠিপত্রের সংগ্রহ—চেকভকে লেখা চিঠি, চেকভ যে সব উত্তর দিয়েছেন; বিপ্লবী শ্রামজী কৃষকমীর চিঠি, ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ইউরোপের এখান-ওখান থেকে শ্রামজী চিঠি দিতেন গার্কিকে।

গার্কির জিনিষপত্র শুধু নয়—সাহিত্যের গবেষণাগার। জাতবেজাত ভুলে দুনিয়ার তাবৎ সাহিত্য এই আখড়ায় জমায়েত হবে—গার্কির সেই মনোবাসনা। ইনষ্টিটিউট অব ওয়ালড লিটারেচার নামকরণটা গার্কিরই। বিশ্বভারতীয় আদর্শ নির্ধারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ‘যত্র ভবত্যেক নীড়ম্’—এখানেও সেই এক বস্তু। ত্রিবিধ ভঙ্গীতে গার্কির যাবতীয় বই বেকছে এই বছরের মধ্যেই। আর এক ভঙ্গীতে হবে গার্কির চিঠি। তিন লাগ করে ছাপাছ আপাতত।

ইংরেজি-সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়েছে বৃহৎ পাঁচ ভলুমে। ফরাসি ও জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসও তৈরি হচ্ছে। সোবিয়তে যতগুলো ভাষা চলিত, প্রতিটি ভাষা এ সাহিত্য নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, প্রতিটি সাহিত্যের ইতিহাস লিখছে। বেশি নজব অবশ্য রুশ-ভাষা সম্পর্কে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশের পুরাণো রূপকথাও নিয়ে জোর গবেষণা চলছে সম্প্রতি।

( ২৭ )

ক্রেমলিনে চলছি। কত শত বার গেছি সামনে দিয়ে, আজকে ভিতরে যাব। রেড-স্কোয়ারের সামনে সদর গেট—ইতর লোক আমাদের ঐ পথে ঢুকতে মানা। বিস্তর কড়াকড়ি। ভিতরে ঢুকলে সর্বত্র চলাফেরা করতে দেবে না। সেনিন যেখানে থাকতেন, তার আমলের কর্তারা থাকেন যেমিকটার—দূর থেকে নজর তুলে যা দেখতে পান। অনেকটা পথ ঘুরে মধ্যে-নদীর ধারে এসে পড়েছি। ক্রেমলিন নদীর উপরে, নদীর কিনারে ছোটখাট এরা দুর্গ। তখন কেউ ভেবেছে, এত বিশাল হয়ে উঠবে কালক্রমে—এত বাড়ির, এমন নামডাক!

সাত পাহাড়ের উপর মন্ডো শহর। যে পাহাড় তার মন্ডো সকলের উঁচু, ক্রেমলিন দেখানো। শহর পত্তনের একবারে পোড়ার ক্রেমলিন তাকে ঘিরে দোকানপাট ব্যাপারবাদিজা ও লোকবসতিতে শহর ক্রমশ জন্মে উঠল। ছোট এক দুর্গ—বারবার চোরা পালটে আজকে অভিনব ও বিরাটকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোবিয়েত-সরকারের মূল ঘাঁটি; যত কিছু শলাপবামর্শ বিচার-বিবেচনা এখানে বসে হয়। ভারি ভারি রাজনীতিক সভা এখানে—আমাদের পণ্ডিতজীকে নিয়েও হয়েছে। টানা উঁচু পাঁচিল বিশ্বর ঘরবাড়ি মাথা তুলে আছে, ভিতরে আকাশ-ছোঁওয়া বড় বড় গির্জা, পাঁচিলের উপর থেকে লম্বা লম্বা চূড়া উঠে গেছে চূড়ায় লাল-তারার—এই হল ক্রেমলিন। মন্ডো শহর, তারং সোবিয়েত দেশ এবং নিখিল ভূমি দুই তুলনাক্রমে আছে রতনময় ক্রেমলিনের শিকে। বিরাট স্থাপত্য—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর বড় হয়েছে।

বড় বড় শিল্পীর মূল্যবান অস্ত্র ছবি—আর বড় বিচিত্র শিল্প-ভাণ্ডার, ঐতিহাসিক বস্তুর বিপুল সংগ্রহ। ক্রেমলিনের ভিতরে অক্সফোর্ড প্যাসাটা—এ দেশের প্রাচীনতম মিউজিয়াম। তাগং ক্রশশিল্পের, বিকাশ ও ক্রমোন্নতি এই একটা জায়গা থেকে মালুম হবে।—ধাতব ও কৃষ্টিশিল্প, হাতের কাজ, কাঠের কাজ, সোনাকপোর কাজ বিশেষ করে।

ঐতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের সঙ্গে শিল্পবীতির কত রবদল হয়েছে, নিত্যন্ত উদাসীন লোকেরও নজরে না পড়ে উপায় নেই। এগারো শতক থেকে এই বিশ শতক—সাম্রাজ্য বহুরের ধারাবহতা ছবির মতন দেখানো। রাজ্য-রাজপুত্র রাজবৎ-রাজকন্যা সামন্ত-সেনানীদের দাবতায় বিলাসদ্রব্য ও শিল্পসম্পত্তি সোবিয়েত আমলে এইখানে এনে জমা করেছে।

পিটার দা গ্রেটের তৈরি এই মিউজিয়াম। অস্থগার এক নিকে জার ও সেনানী-সামন্তর। সোল কিসোগাম ওজনের ভারী অস্ত্রও আছে। বকমারি শিরস্ত্রাণ। বক্ষোদ্রব্য মণিমুক্তাধিত। বিচিত্র কাককর্কের বন্দক—সোল শতকের। তলোয়ার—পিটার দা গ্রেট ভারতীয় তলোয়ার ও ছোরা ব্যবহার করতেন, সেগুলো। তলোয়ারের বিচিত্র খাপ। নানা বকম মুস্তের বাজনা সেকালকার। বোড়ার বর্ম, মাথার বর্ম। পনের-সোল শতকের বাসনাকোশন। সোনার খালা। সোনা ও রূপার হরেক পাঠ, নাম বলতে পারব না। একটা পাঠে সোনার ওজন পাঁচ দেব হলে অস্ত্রত। হাতের ঝাঁতের কোটা। সোনা ও মণিমুক্তাধিত কোটা। ঘড়িই বা কত বকমের; কাঠের ঘড়ি—প্রিটুকু মার ধাতুর। আর এক ঘড়ি—আকারে বিশাল; মণিমণিকো বৌদের আভা বোরায়; ঘটা বাজলে ঈগল পাখি মুক্তা কেসে দেয় মুখ থেকে; দরজা খুলে যায়; যে কাঁটা বাজল, সেই অক্ষর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। পিটার দা গ্রেটের মস্তপাত্র, পোশাক। মণিমুক্তা-গাঁথা কত বকমের পোশাক—একটা পোশাকের ওজন প্রায় ত্রিশ দেব, এই গায়ে নিয়ে চলাফেরা করতেন। সোনার তৈরি মস্তবড় বাইবেল-কেস। বাইবেলের খাপ একটা-ছোট নয়, অনেক। রাজমুকুট, অভিব্যেকের জিনিসপত্র। হাতের ঝাঁতের সিংহাসন; মণিমুক্তা-বিজড়িত সিংহাসন। পিটারের খাপ বোমানভের সিংহাসন—চারটে হাতি, চতুর্দিকে, আর বিশ্বর কাককাধ। সিংহাসনটা তৈরি হয়েছিল ভারতে, পার্শ্বের বণিকেরা এনে উপহার দিলেন।

বোড়ার রাজকীয় সাজ, বোড়ার গায়ে দেবার পালকের কবল। সতের ও আঠার শতকের বোড়ার-টানা গাড়ি—স্নানা জায়গা থেকে উপঢাব এসেছিল এসব। শীতে বরফের উপর দিয়ে নিয়ে বাবার স্নেজগাড়ি। রাণী এলিজাবেথের শীতকালের গাড়ি—বাইশ বোড়ায় টানত, পিটারবার্গ থেকে মন্ডো পৌঁছতে লাগত তিন দিন। দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের গাড়ি, ফ্রান্সে তৈরি, দরাজ ভাবে স্ত্রী দেওয়ার দ্রুপ গাড়ি তুলতে তুলতে চলে।

সারা বেসাম্র দেখে শেষ করতে পারি নে। কত আর টুকব? স্নাক্ত হয়ে এক সময়ে হাল ছেড়ে দিহত হয়।

বলেছি তো, ক্রেমলিনের ভিতরে খাসা খাসা গির্জা। খল জার-জারিনা ঈদের ছেলপুলে উজির-নাজির পুজত-পাড়া ধর্মকর্ম করতেন—অতএব অস্ত্রের বাহুরের ক্যাথিড্রাল ক্রুশের যীশু ও মা মেগীর নামে। উপপেনম্বি ক্যাথিড্রালের ১৪৭১ অর্কে পত্তন। বলগোভেনশ-নেম্বি ১৪৪১ অর্কে এবং আর্ক এঙ্গেল ১৫০১ অর্কে বানানো। এদের স্থাপত্য ও দেয়াল-ছবিগুলোর একবার নজর বুগিরে তাক্কব হয়ে আসুন। আর্ক এঙ্গেলের সতের শতক আশর্গ ছবিগুলো অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, শিল্পের খেটেখাটে উদ্ধারকর্ম প্রায় শেষ করে এনেছেন।

তারপরে দেখুন ঢালাইয়ের কাজকর্ম। জারের কামান—কাঁসার কাছাকাছি একরকম মিশ্রধাতুতে তৈরি (১৫৩৬ অর্কে)। কারুকার্যে ভরা, বিরাট চোরা, ওজনে চূড়ান্ত টন। পাঁচ মিটার চৌত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা। বড় বড় শেল পাঁচশ মিটার অবধি যেতে পারে। তাতারের আক্রমণ ঠেকাবার জন্য বানানো। কিন্তু শেষ অবধি এ কামান ব্যবহারের দরকার হয়নি।

পৃথিবীর সাত আশ্বষের একটা আগে লেগেছি চীনের মস্তাচাঁচর। আর একটা এই এখানে—দৈত্যাকার ঘটা। সেড স্নল হয় মিটার বাট সেন্টিমিটার, ওজন দু-শ টন। হুমিয়ার এর ছড়ি নেই। জারের ঘটা—গ্রানাইট বেলীর উপর বেখেছ, উপরে জারের ছবি। রূপা-তামা ইত্যাদি নানান ধাতু মিশিয়ে তৈরি। কারিগরের নাম আইভান মোটোবিন ও তার ছেলে মিনাইল। ১৭৩৩-৩৫ অর্কে এখানে এই ক্রেমলিনের ভিতরে তৈরি। ঢালাই হয়ে গেলে ঘামাজার জন্ম ফ্রেমের উপর তোলা হল। সেখান কাজকর্ম চলতে লাগল। ১৭৩৭ অর্কে মন্ডোয় ভাস্কর্য অগ্রিকাগ। ঘটা আঠার বিঘা গরম হল; কাঠের ফ্রেমও পুড়ে ছুটি। ঘটা পড়ল গিয়ে এক নালার মধ্যে—মন্ডো-নদীর জলে ভরাট সেই নাল। গরমে-ঠাণ্ডায় ঘটা ফেটে চোচির। একটা টুকরো আলান হয়ে পড়ল, তার ওজন সাড়ে এগারো টন। পুরো একশ বছর এ নালায় পড়েছিল, ১৮৩১ অর্কে তুলে নিয়ে পাথরের বেনি গেঁথে তার উপর বেখেছ। টুকরোটা পাশে।

আজকে আমার বহুমত। বিলাসবেলা, ভোঁকস অফিসে। সাম্প্রতিক দলের সঙ্গে এসেছি—বোরাকো এক খানাপিনা করে গেলেই হল না, টাক্স দিয়ে বাও। সাম্প্রতিক বচন শোনাও কিছু। তাতে ডবাই নাকি? গণতন্ত্রর যুগে সাহিত্যিক হয়ে আগডম-খাগডম

লিখলে শুধু চলে না, বলতেও হয় সেরাম। জেগেছিলাম, বলব, আধুনিক বাংলা উপভাস নিয়ে। গতিক বুধে বিবর পালটেছি—‘গণজীবনে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব’।

কেন বলছি। বাংলা সাহিত্য নিয়ে আপনারা ভাঁক করেন। ভাঁক করবার বকই বটে। বহু সাধনের জীবনসাধনার মহাসাহিত্য গড়ে উঠেছে। খবর রাখেন, বাহিরের কেউ আপনাদের পৌছে না? এই রাশিয়াতেই দেখলেন গল্প-সংকলনের ব্যাপারে। ভারত-পাকিস্তানের গল্প বাছাই হল, তার মধ্যে বাংলা ভাষার একটি গল্প নেই—বাঙালির আছে মাত্র একটি, ভবানী ভট্টাচার্যের। ওদানকার সাহিত্য-দিকপালদেরই প্রশ্ন: ঠাকুরের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যও মরে গেছে নাকি? বৃথুন। মুশকিল হয়েছে, বাংলার কেউ ইংরেজিতে লেখেন না। লিখতেই বা যাবেন কেন? এমন স্বচ্ছ নমনীয় ভাষা আমাদের, মনের গুত ভাববল ভাষায় একে অবধা প্রকাশ করতে পারি। হচ্ছেও তাই। আর ওদিকে দেখুন, কৃত্তবাসী-চতুর্থ শ্রেণীর লেখকেরাও শুধুমাত্র ইংরেজি লেখার গুণে আন্তর্জাতিক বাজারে কেটেবিল হয়ে বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম। শুধু এই সোবিয়েত দেশের ব্যাপার নয়, তামাম ইউরোপে চক্কোর দিয়ে এসেছি—অল্প পরে কা কথা, শরৎচন্দ্রের নামটাও জানেন না ইয়া-ইয়া সাহিত্য-দুবন্ধেরা। দুনিয়া আজ ছোট হয়ে একেবারে ঘরের উঠানে এসে বসল—সেদিকে চোখ-কান বুঁজে থাকবেন কত দিন?

তা খোলাখুলিই বলি, বন্ধুতার এই যে নতুন বিষয়টা নিয়েছি, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ যেন চোখ-রাঙানি এর ভিতর। বাপু হে, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা বলে থাক, দাওয়াত দিয়ে এনে যত্নসঞ্চার করছ সেই বাবনে—কিন্তু বাঙালি জাতের মন পাবে না বাংলা-সাহিত্যের অবহেলা করে। যদি। বাঙালির বড় গর্ব তার সাহিত্য নিয়ে। প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে বাঙালি, পৃথিবীর কোন তল্লাটে বা কপনে ঘটেনি।

গণজীবনে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব—পৃথিবীর একটা ইতিহাস ঠাঁড় করানো কঠিন ব্যাপার। বিস্তার কাঠখড় পোড়ানো আরম্ভক। দূর বিদেশে যোরাব্রির মধ্যে অবসর কোথায় তেমন? আর বন্ধুতার প্রয়োজনে ফরমাস মতো বইপত্র কে এনে দেবে জুটিয়ে? শ্রোতারও সব সেরা মানুষ এখানকার। তবে সুবিধা আছে। জ্ঞানীশুণী তাঁরা যতই হোন, বাংলা সাহিত্যের কিছু জানেন না—নীরঞ্জন অন্ধকার দুষ্টির সামনে। অতএব স্রীমুখে বা উচ্চারণ করব তাই তো বেদবাক্য ওঁদের কাছে। আপনাদের সামনে হলে—ওরে বাবা, কপাল ঘাম দেখা দিত, উ-ওঁী করতাম বিশ বার—কাঠগড়ায় যেন খুঁচি আসামি। মক্কা শহরে কিসের পরোয়া? ভাগ্যক্রমে পাণ্ডিত্য দেখবার একটুকু মওকা এসে গেছে, আপনারা উচ্চবাচ্য করবেন না এই নিয়ে।

একেবারে গোড়া ধরে শুরু করা গেল—চর্চাপত্র থেকে, বাংলা সাহিত্যের বা প্রথম নিদর্শন। সাধনার এক বিশেষ ধারা নিয়ে কবিতা—সে ধারা গণসমাজেই। গণমানুষের অগণ্য জীবনচিত্র—জাল ফেলে মাছ-ধরা, হরিণ-শিকার, ডোম-চণ্ডাল-শবরের ঘববাড়ি, অম্মবাগ-বিরাগ গীতিকাব্যের মধ্যে বিজলী-চমক দিচ্ছে।

— — — — — বাস্তবাত্মিক বিপর্যয় সন্দেহ নেই, কিন্তু

ধারা শাসন করতেন, কমতা হারিয়ে তাঁরা সাধারণের মধ্যে নেমে এসেন। সংস্কৃত সাহিত্য এতাবধি ঠাঁড় শ্রেণীর একটোটা ছিল, সেই সাহিত্য লৌকিক রূপ পেতে লাগল। রামায়ণ-ভাগবত-বাংলা সাহিত্য তার ফলে লাভবান হয়েছে। সমাজের মাধ্যম থেকে মহাভারত সর্বাবধা সহজ রূপ নিয়ে হাটে মাঠে বাটে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল; উন্নত সংস্কৃতির ফটক খুলে গেল গণমানুষের সামনে। তেমনি আবার বিস্তার লৌকিক ধর্ম ও লৌকিক আখ্যান মাজিত সাহিত্যিক রূপ পেয়ে গেল বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্যে। মানুষের কথাই ভরা এই কাব্যগুলা। দেবতারও আচ্ছন্ন বটে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নিত্যন্ত ঘরোয়া সম্পর্ক তাদের। দ্বায়র সঙ্গে কোমল, আধিপত্য-বিস্তারের জগৎ ছলাকলা, পেটের দায়ে অতি সাধারণ বৃত্তি-গ্রহণ—মঙ্গল-কাব্যে মানুষ-দেবতায় ভেদ নেই।

দীন-চণ্ডীদাসের পদ আবৃত্তি করা গেল—‘ভনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।’ মানুষের উপর কেউ নেই, দেবতারও নন—মানুষের মহিমা ঘোষণা করলেন বাংলার কবি। কৃত্তবাসী রামায়ণ বাম্পীকির সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ মাত্র নয়, বাংলার কবির মনের বড় রাঙানো অনুপম সৃষ্টি। অনেক উপাখ্যান আছে, বাম্পীকির রামায়ণে যার নামগন্ধ নেই। অযোধ্যা আমাদের বাংলা দেশেরই কোন এক জনপদ—রাম-লক্ষ্মণ-সীতা যেন বাঙালি তরুণ ছেলেমেয়ে। জনজীবনে কৃত্তবাসী রামায়ণের বিশেষ প্রভাব। বাংলার কুমারী মেয়ে এমনি করছে, সোতার মতন সতী হই, রামের মতন পতি পাওঁ। কথের মতন স্বস্তর পাই, লক্ষণের মতন দেবর পাই—

মওকা পেয়েছি, সহজে ছেড়ে দেব ওদের? বস্তুর বাগাড়ম্বর করে তো চৈতন্যগুণে পৌছানো গেল। নবীন গণতান্ত্রিকতার প্রাণন বাংলা সাহিত্যে। চিরকালের কবিতা অতীতকেই মনোহর করে আঁকেন, এবং কিন্তু পুরাণের বহুনির্মিত পাপময় কলিযুগকে প্রণাম জানালেন—‘প্রথম কলিযুগ সর্বযুগ সার।’ সকল মানুষেরই অমর মূল্য স্বীকার করা হল—‘মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কল-ভজ’।

মাইকেল মধুসূদনের প্রায় সমস্ত বই লেখনি লাইব্রেরিতে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙালি কবিদের মধ্যে মাইকেলকে জানে এরা। বোধ করি শুধুমাত্র তাঁকেই। মাইকেল ধরে নবীন বাংলা সাহিত্যের কথা শুরু করলাম। বাংলা-সাহিত্য কালের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে, সেই জন্তে এই সাহিত্য জনমনে এমন জীবন্ত। তখনকা দিনের সামাজিক ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লবের অতুল প্রভাব—মাইকেল সাহিত্য-কর্মেও তার প্রেরণা দেখতে পাচ্ছি। ‘মেঘনাদবধে’ ক’ রামায়ণের কাহিনী কালের ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছেন—পুরাণ নৈতিক মান একেবারে পালটে গেল। অন্যাকারী ঐশ্বর্যশালী বা কবির কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। ‘বীরঙ্গনা কাব্যের’ নায়িকা চিরকালের বীতভীতি যেন নিতে পারছে না—বিরোধি তার। কাব্যের বিরুদ্ধেও বিরোধের ছাপ। পুরানো পর্বা পয়ারগ্রন্থি ছেঁদন করে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মাইকেল কাব্যলক্ষ্যর শ্রু যোচন করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র। যুরোপীয় সংস্কৃতি আমাদের চোখ ধাঁড়িয়ে দিয়ে বঙ্কিমের সাহিত্যে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা। ভারতের সা পাদপীঠে যুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা—বঙ্কিম-সাহিত্যের

হল মর্যকথা। 'আনন্দমঠ' নামে উপজ্ঞানের একটা গান 'বন্দে মাতরম্'। বিপ্লবভূমি এই রাশিয়ার হাজার হাজার তরুণ-তরুণী প্রাণ দিয়েছে মানুষের মুক্তি-সাধনায়। আমার তরুণবর্ষেও তেমনি বৃষ্টিশ্রী সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জঁগ। বিশেষ করে বাংলা দেশে। ফুলের মতো বাংলার ছেলেমেয়েরা কারাগারে বীপাস্ত্রের নির্বাসনে কাঁদার মধ্যে গুলির মুখে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করে মস্তের মহিমা দান করলেন তারা। 'বন্দে মাতরম্' সর্বভারতের জাতীয় মহাসঙ্গীত হয়ে উঠল।

বাংলার প্রথম কৃষক-অভ্যুত্থান নীল-বিদ্রোহে। শেত শোষক দলের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র চাষীরা রক্ত ঝাঁড়াল। নীলবন্ধু এই নিয়ে নাটক লিখলেন—নীলকর্ণণ। আন্দোলন বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হল এই নাটকে। নীলকর্ণের অত্যাচার দেশবিশেষে ছড়িয়ে পড়ল। শেষ অবধি বাবসা গুটিয়ে দেশে পালাতে হল নীলকর্ণদের।

রবীন্দ্রনাথের স্মরণে চু-চাঁচ কথায় কি বলা যায়? তাঁর সৃষ্টি দেশের সর্গীর্ণ গণ্ডিতে আটক হয়ে থাকেনি, বিশ্বমানের সঙ্গে তিনি জাতীয় মানসের আত্মীয়তা সাধন করলেন। বিপ্লবের নয়ান দূর বলে কিছু নেই আজ দুনিয়ায়। সব মানুষের মধ্যে চেনা-পরিচয়, রক্তনীতি অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সম্পর্কে সকলের যোগাযোগ। এই বিশ্বজনীনতার এক বিচিত্র উপলক্ষি এনে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। দেশে দেশে পরিভ্রমণ করে তিনি ভারতের চিরন্তন সৌন্দর্য ও শাস্ত্রব্যবস্থা প্রচার করলেন।

শরৎচন্দ্র ও নজরুল ইসলামের কথা বলে ইতি করা গেল। বহুতা বড় হয়ে যাচ্ছে, তা ছাড়া আব এগুলো বিপদ আছে। বইটাই কিছু নেই জাতের কাছে—ভ্রম বশে মর্যতা বা ব্রহ্মা বিষ্ণু কারো নাম বান পড়ে গেল। টের পেলে খেয়ে ফেলবেন তাঁরা আনন্দ। উপলক্ষ্যের এসে পড়েছি: বাংলা দেশ আজ পণ্ডিত, নানা সমস্যায় জর্জর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। তবু কিছু বঙ্গের উত্তর খণ্ডের জনজীবনে বাংলা সাহিত্যের অকুল প্রভাব। বাঙালির কাছে অল্পের মতোই বাংলা সাহিত্যের আবগুক। বঙ্গভাষীর সংখ্যা ভারতের মধ্যে অনেক কম হয়ে গেছে কিন্তু বাংলা বইয়ের বিক্রি ভারতীয় কোন ভাষার চেয়ে কম নয়। কলম মাত্র উপজীবিকা অনেক লেখকের; পাঠকেরাই তাঁদের পোষণ করেন।

নিজের বুক টুকে বলি, দেখছেন এই অধীনকে। পাঠকেরাই থাকেন নয়ান। চেষ্টা করুন কি মনে হয়—যুব খাবার খাওয়ান না তারা, কি বলেন?

হাসির তোড়ে ঘর ফেটে যায়। কিংবা গায়ে-পাতের আঁচ

কি না, সেটা দেখির পাঠকের মহিমা-কীর্তন হল। গোপা ডিগড়িগে লেবকও আছেন—ঐ আসরে তারা থাকলে মৃণালি হয়ে পড়ত।

পাকিস্তানের কথা উঠল। বাংলার তিন ভাগের দু'ভাগ পাকিস্তানে। রাজনৈতিক ঝগড়া মাটি আলদা করে দিচ্ছে, মানুষকে পারেনি। পূর্ব-পাকিস্তানের পুণ্যদিন একুশে কেন্দ্রযারি। বাংলা ভাষার জগৎ তরুণেরা প্রাণ দিলেন, রক্তের অক্ষরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁদের ভালবাসা লিখে গেলেন। দেশে দেশে স্বাধীনতা ও ধর্মের জগৎ বহু জনে প্রাণ দান করেছেন। কিন্তু বাংলা চাই বলতে বলতে মাতৃভাষার জগৎ প্রাণ দেওয়া প্রথম এই পূর্ব-বাংলার দেখা গেল। সকল বাঙালির তাঁরা শ্রদ্ধা।

মোটামুটি এই হল বক্তব্য। সেই যে আমার ডাই—প্লাত্‌ক ডানিয়েলচুক—কণ্ঠে তর্জমা করে বৃষ্টিয়ে দিল। আপনারা হলে কত দুঃখ-ছাই করতেন—ওরা কি ব্যুল খোদার মালুম—কীকি দিয়ে কিছু তারিখ কুড়িয়ে নেওরা গেল। আমার পরে হীবেন মুখোজ মশায়—তিনিও বাংলা সাহিত্য নিয়ে বললেন। তিনি ছিলেন না, অজ্ঞ কোন কাজে বেবিবেছিলেন, বহুতা শেষ হবার মুখে এসে পড়লেন। ছিলেন না ভাগ্যিস—পণ্ডিত মানুষ, অতুলন বক্তা, তাঁর সামনে কথাই সবত না মুখ দিয়ে। কামারের কাছে সূঁচ চুঁরি চলে না। কোন সভায় একদিন বলেছিলাম বাংলা সাহিত্য দুনিয়ার এক সেরা সাহিত্য। হীবেননাথ চুপি চুপি সমঝে দিলেন, দুনিয়া অবধি টানেন কেন, বড় বাড়াবাড়ি, গোটা ভারত ধরেই না হয় বলুন। আমি বলি, গন্তিক দেখাছেন—দুনিয়ায় কেউ তো পোছে না আমাদের। সাহিত্যকে আকাশে তুলে দিয়ে চলে যাই—ওরা খানিকটা বাদসাদ দিয়ে নিচ্ছে, বহু দিন ধরে নামতে নামতে আকাশ থেকে ক্রমশ ধরালোকে পৌছাবে। এখনকার মতো পাতালের তলে আশা করি মুখ খুঁড়ে পড়বে না আবাব। হীবেননাথ আমাকে ধরেছেন, কাঁপিয়েছি খুব আতঙ্কেও। শুরু করলেন তাই নিয়ে: আমার বন্ধু বোস মশায় ভালবাসার উজ্জ্বল বাড়িয়ে বলেছেন হয়তো—তা হলেও বঙ্গ সাহিত্য—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইংরেজিতে বললেন। সে বহুতা টুকে আনি নি, টোকা অসম্ভব। অপকণ্ঠ বাচনভঙ্গি, খরস্রোতে ছুটে চলেছে। লেখার তারকিছুই বোকা যায় না—কানে সুনতে হয়, চোখের উপর দেখতে হয়। সেই অপকণ্ঠের দূর বিশেষের অজ্ঞাত পরিবেশে দুই বাঙালি ৭১মরা প্রাণ ভরে বাংলা সাহিত্যের গুণগান করলাম। [ক্রমশ:]

"জীবন মহাশ্রী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নান। বৈচিত্র্যে মৃতিমান করে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিশ্বতর অন্ধকারে অদৃশ্য, তবুও বহু শত আছে বা প্রত্যক্ষ, ইতিহাসে বা উজ্জ্বল। জীবনের এই গুটিকাবা যদি সাহিত্যে ধোঁয়াচিহ্ন নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে, তবেই তা অক্ষর হয়ে থাকে।"

—রবীন্দ্রনাথ

# চরজন

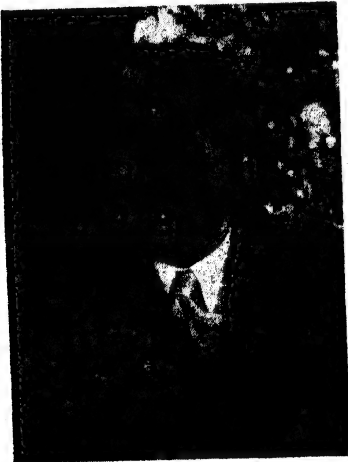
ডক্টর শমুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ মহামান্য বিচারধিকরণের তৃত্বপূর্ণ বিচারপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃত্বপূর্ণ উপাচার্য ]

আইনের ক্ষেত্রে গৌরবের সঙ্গে ফসল ফলিয়েও শিক্ষার উর্বর ভূমিতেও সমান গৌরবের সঙ্গে পড়েছে ধানের তুষ্ট পদচিহ্ন। সেই অমরীয় সম্মাননের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ ভাবে মনে পড়ে বধ্য—শ্রীর হরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীর আততোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, ডাঃ স্তানাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই ক'টি নামের সঙ্গে আর একজন কীর্তমান পুঙ্খবহ নামও অনায়াসে যুক্ত করা যায়। আইনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভাবে সিদ্ধান্তদানে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রচেষ্টায় যিনি সর্বসাধারণের প্রজ্ঞা আকর্ষণের অধিকারী—তার নাম শমুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

বীরভূম জেলার কিরণতর গ্রামে শমুনাথের জন্ম। স্বীয় মাতামহ স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সরকার (গঙ্গোপাধ্যায়) মহাশয়ের নামান্বিত বিদ্যালয়ে করেন প্রথম পাঠগ্রহণ। এর পর আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে তাঁকে পাওয়া যায়, তারই মধ্যে একটির প্রধান শিক্ষক ছিলেন শমুনাথেরই পিতৃদেব স্বর্গীয় বিলুলাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। পালামৌ জেলা স্কুল থেকে ১১-৭ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রাল পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে এলেন মহাবিদ্যালয়ের পাঠের সঙ্গে পরিচিত হতে। প্রথমে পড়তে থাকেন ডাক কলেজে (স্ট্রিট

চার্চস কলেজ), তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজে। যেখান থেকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পিয়ার মাথামেটিকল্‌স প্রথম শ্রেণীর প্রথম জন হয়ে এম-এ পরীক্ষায় হলেন সম্মানে উত্তীর্ণ। তার পর স্কট হ'ল কর্ম-জীবনের। আমচার্ট্র ট্রাট অফসে একটি ছোট বিদ্যালয় ছিল সেদিন। সেই বিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষাদানের ভার পেলেন শমুনাথ মাসিক পনেরো টাকা বেতনের বিনিময়ে। এই সঙ্গেই স্ট্রিট চার্চস কলেজে অঙ্কশাস্ত্রের বক্তার পদ গ্রহণ করেন তিন মাসের জঙ্কে, পরে আরও একটি বছর তাঁকে সেই পদে থাকতে হয়। এই সময়ে তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডক্টর ওয়ার্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শমুনাথ। অধ্যক্ষ তাঁকে সিনিয়র প্রফেসরদের নিয়োগপত্র দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার পরেই এডিনবরা থেকে ঐ পদে নিযুক্ত হয়ে এক ভ্রমোন্মত্তের আগমন ঘটে। পদত্যাগপত্র পেশ করে শমুনাথ চলে গেলেন বর্ধমান আইন-ব্যবসায় আইননিয়োগ করতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে (এরই মধ্যে আইন পরীক্ষাতেও শমুনাথ সম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন)। কিন্তু বর্ধমান শমুনাথকে ধরে রাখতে পারল না, সেখানকার পরিবেশ শমুনাথের মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারল না। চলে এলেন কলকাতায়। হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করলেন, সেই সঙ্গেই মাসিক একশো পচিশ টাকা বেতনে রিপণ কলেজে গণিতশাস্ত্রের বক্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁকে ইলাহাও যেতে হয় প্রতি কাউন্সিলের সঙ্গে যুক্ত একটি মামলার ব্যাপারে। সেইখানে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ হন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জামুয়াড়ী মাসে কলকাতা হাইকোর্টের একজন ব্যারিষ্টার বলে গণ্য হন। রিপণ কলেজও তাঁকে আইনের অধ্যাপকের নিয়োগপত্র দেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপকের দায়িত্ব ভার থেকে অব্যাহতি নেন শমুনাথ। ব্যারিষ্টারের চাপে তিনি বাধ্য হন অধ্যাপনা ছাড়তে, নয় তো অধ্যাপক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী। পশার চমৎকার জমতে থাকে আইনজ্ঞ হিসেবে প্ৰাতি তাঁর ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়ছে দূর থেকে দূরান্তর। এ'র জেরা করার অসুত জমতা আবৃষ্ট করেছিল ব' বিচারককে। সংখ্যাতীত আইনজ্ঞদের। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিচারধিকরণের বিচারপতিরূপে একলা বোধিত হল শমুনাথের নাম। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গৌরবোজ্জ্বল কর্মসূচির আসনে অধিষ্ঠিত হলেন বিচারপতি শমুনাথ উপাচার্য হিসাবে নানা দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষার সা' করে গেছেন শমুনাথ। তাঁর অবসর গ্রহণোপলক্ষে তাঁর প্র অপরিদায় অমুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন ডাঃ রাধাবিনোদ পাল স্বর্গীয় ... মেখনাদ সাহা। এগারো জন উপাচার্যের অধ



কাজ করে শত্ননাথ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র শোব (ভূতপূর্ব পৌরপাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও বর্তমান অস্থায়ী উপাচার্য) বলেছেন যে শত্ননাথের কর্ম-সাফল্য কাদের থেকে কম নয় বরং বেশী। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ইনি সম্মানজনক এল-এল-ডি উপাধি লাভ করেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। উপাচার্যের প্রাপ্য মাসিক আড়াই হাজার টাকা বেতনের একটি কপার্ডও শত্ননাথ গ্রহণ করেন নি, যত দিন তিনি এই পদে সমাদীন ছিলেন। শত্ননাথের নিজস্ব গ্রন্থাগার একটি ছিল। প্রায় লক্ষ টাকা মূল্যের। সেই সমগ্র গ্রন্থাগারটি তিনি উপহার দিয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল লিগ্যাল এড সোসাইটিকে। ভারত সরকার থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিন লক্ষ টাকা সাহায্য পেতেন। উপাচার্য শত্ননাথের প্রচেষ্টায় তার অল্প দিন থেকে খোলেয় পরিণত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকোষের বিভাগগুলির পরিবর্ধন ও উন্নতি-সাধনের প্রচেষ্টা তাঁর জনৈক পূর্বসূরীর দ্বারা সাধিত হয়েছিল কিন্তু সেই প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ সফলতা দেখা গেল শত্ননাথ যখন উপাচার্যের আসনে সমাদীন। ঐ বিভাগগুলির বর্তমান রূপের জন্তে দায়ী শত্ননাথ।

ভারতবর্ষের আইনবিদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ডক্টর বাধারিন্দো পাল শত্ননাথের অবসর গ্রহণ পসন্দে তাঁর উদ্দেশ্য বলেছেন—“This retirement will indeed be a great loss to the cause of higher education in West Bengal. For the last few years he was our centre of hope, not because of his being the centre of power in the University, but because of his wisdom. It will indeed be doing an ill-service to the reputation of an eminent lawyer, a splendid judge and an erudite Vice-Chancellor if I make any attempt here to make an estimate of the breadth of Dr. Banerjee's intelligent outlook and practical wisdom. He was indeed a lawyer who had mastered the technical learning of the law without being mastered by it.”

বিচারপতির আসন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর শত্ননাথকে পাঁচ গেল ইনকাম-ট্যাক্স ট্রাস্টবানালের একজন সদস্যরূপে। প্রথম কোর্টের ইন্সপেক্টর প্রাসঙ্গিক আইন সমূহ অচল ঘোষিত প্রায় এই ট্রাস্টবানালের অস্তিত্বও শেষ হয়। স্বরেন্দ্রনাথ কলকাতার ঐ নিবাহক সমিতির সভাপতিরূপেও ইনি কয়েক বছর অধিষ্ঠিত হন। ইনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমাজ কল্যাণ সমিতি ও বঙ্গীয় দৈনন্দিনিক সংস্কারও একজন সভা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যবিধান দায়ও ইনি একজন মনোনীত সদস্য (এম-এল-সি)।

শত্ননাথের সহধর্মিণী শ্রীমুক্তা স্বয়মাময়ী দেবীর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। নিরন্তরকারিতা ও ধর্মায়ুশীলনের জন্তে ইনিও সকলের আকাঙ্ক্ষণে সমর্থী হয়েছেন।

অসাধারণ মেধা ও প্রচুর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে জীবনের সিঁড়িট তিনি ধাপে ধাপে উঠে এসে আজ পরিপূর্ণ সাফল্যের মধ্যে

অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছেন। মেধা ও পরিশ্রম তাঁকে দিয়েছে সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথ নির্দেশ। অধ্যবসায় ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে নিয়ে গেছে প্রগতির মধুময় পথে। মানবতায় ও সহায়ত্বভিত্তিতে পরিপূর্ণ তাঁর অন্তর। গত বছর যখন স্বগ্রামে পদার্পণ করেন শত্ননাথ তখন তাঁর স্বধর্ম-সাভায় আশে-পাশের গ্রাম মিলিয়ে প্রায় পনেরো হাজার লোকের উপস্থিতি ঘটেছিল সেখানে। শত্ননাথের সহায়ত্বভিত্তিক জনস্বায়ের স্বীকৃতি তার মধ্যেই নিহিত নেই কি?

সমাজ-কল্যাণ সমিতির সভারূপে গত বছরের অগাষ্ট মাসে ইনি বোম্বাই ও পুণার সমাজকল্যাণ কেন্দ্রগুলিতে বোবা, কালা, বিকলাঙ্গ, কৃৎরাদিগ্রস্ত প্রমুখ অসহায় নরনারীর প্রতি পরিচর্যাগুলি পরিদর্শন করেন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঙলার অন্তর্গত এলাকাগুলিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে শত্ননাথকে এক রিপোর্ট পেশ করতে অনুরোধ করেছেন। এই রিপোর্ট প্রস্তুত হয়েছে এবং অল্পকালের মধ্যেই যথাস্থানে প্রেরিত হবে। ইনি প্রথমে একটি কৃষি, পশু-চিকিৎসা ও গাছপাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক মহাবিদ্যালয়ের প্রবর্তন সমর্থন করেছেন, অবশ্য এর পরে আরও কয়েকটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

দরদী শত্ননাথের অপরিমিত দান দেশের ভবিষ্যৎ লক্ষ লক্ষ নাগরিকের উপকারে আসছে, তাঁর একক দানে গড়ে উঠছে অনেকের ভবিষ্যৎ, অনেকের আশাহত জীবনে উজ্জ্বলতার ছোঁয়া লাগছে তাঁর অবদানে, তাই দিচ্ছে গড়ে উঠছে তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার বিজয়তোরণ, খোদিত হচ্ছে সাফল্যের প্রস্তর, ফলক, আকাঙ্ক্ষাকে আলিঙ্গন করছে সিঁধির গৌরব-মীনার।

### শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য

[বিশিষ্ট দার্শনিক ও ভারতীয় লোকসভার সদস্য]

বেদ, বিজ্ঞা ও বিনয়—এই তিন ‘ব’ দিয়ে বার হুই সেও আর এক ‘ব’, তা হচ্ছে ব্রাহ্মণ। জগতের মঙ্গল তাঁদের কামনা, মানুষের কল্যাণ কামনাই তাঁদের ভ্রত, বিশ্বমানবাত্মার হিতসাধনেই তাঁদের আনন্দ। বাঙলার এই পূজনীয় ব্রাহ্মণকুলের গৌরবাধার পরম নিষ্ঠাবান পণ্ডিত পরলোকগত কালীকিঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের আদি নিবাস ফরিদপুর জেলায়। কালীকিঙ্করের যখন আঠারো বছর বয়স সেই সময় তিনি কলকাতায় এসে বসতি শুরু করেন। বেলগাড়ী তখন ছিল না—পায়ে হেঁটেই কলকাতায় আসেন কালীকিঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত।

১৯০১ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতাতেই কালীকিঙ্করের পুত্র চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরাধিকার-স্বত্বই হোক বা যে কোন কারণেই হোক, পিতার বিভাষ্যবলি পরিপূর্ণভাবে দেখা দিল পুত্রের মধ্যে। প্রথমে পাঠশালায় তারপর বৈরাগ্যরূপ-কেশরী শিবনারায়ণ শিরোমণির টোলে, তারপর বাঙলার প্রথম বোর্ডিং স্কুল এরিয়ান ইন্সটিটিউশানে (বর্তমানে সারদাচরণ এরিয়ান) পাঠগ্রহণ করে ১৯১৭ সালে উত্তীর্ণ হলেন প্রবেশিক



পরীক্ষায়। টোলে শিক্ষাগ্রহণ কালে চপলাকান্ত যুগ্ম করে ফেলেন সমগ্র অমরকোষ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ্যকালীন চপলাকান্তের সম্যক পরিচয় হয়েছে কুমারসম্বর ও উত্তরবামচরিতের সঙ্গে। প্রবেশিকা পরীক্ষাতেই আয়ত্তে এনেছেন বামীকির রামায়ণকে। কলেজ-জীবনে পাবিনি সর্বক্ষেপে পাঠ্য নেন পণ্ডিত চন্দ্রিকানন্দ মিশ্রের কাছে।

১৯২১ সাল। বি-এ পাড়ছেন চপলাকান্ত। পরাধীনতার জালা হৃৎকর মনন বিধচ্ছে সাঁরা দেশের গায়ে। সেদিন সেই জালা নিবারণ করতে সব ঢেয়ে আগ্রহ নিয়ে এসেছিল দেশের তরুণ সম্প্রদায়। তাকোবের মূর্ত প্রতীক এ যুগের অভিমত সত্যচন্দ্র তখন জয় করেছেন দেশের চিত্ত, জাতীয় ভাগ্যাকাশে সেদিন পরিপূর্ণ দীপ্তিতে জ্বলছেন কবি-বর বরীন্দ্রনাথ, অস্তুরের পুঞ্জীভূত সৌন্দর্য দিয়ে ভারতমাতার মহিমায় রূপ-কল্পনায় বিভোর হয়ে আছেন সাহিত্যচর্চা অবনীন্দ্রনাথ, পদগম্বী ইংরেজদের স্বভাবশূলভ অসৌজন্যতার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে তাদের বিব্রত করে চলেছেন পুরুষসিঁহ আশুতোষ, পরম প্রাচুর্যের সীমিত বেড়াভাল ভেদ করে স্বতী-পুত্র-কল্লার হাত ধরে নিখিল মানবের পাশে এসে দাঁড়ানেন যুগ-কণ্ঠ দেশবন্ধু চিত্তবজ্র, সাংবাদিকতায় ধারা-সৃষ্টি করেছেন প্রান্তঃস্বরণীয় সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এই ১৯২১ সাল। স্বাধীনতা-যুদ্ধের একটি স্বরণীয় বৎসর, ঠিক এমনই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে আবির্ভাব হল এক ব্যক্তির। তাঁর নাম স্বর্গীয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সাহিত্য ক্ষেত্রের এক জন যশস্বী পুরুষ স্বর্গত গান্ধীর আহ্বান থেকে চপলাকান্তও বাহতে পারলেন না নিজেকে দূরে সরিয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। পাঠ গ্রহণের হ'ল সাময়িক বিরতি। ১৯২২ সালে দেহরক্ষা করলেন পণ্ডিত কালীকিঙ্কর। এই সময় পূর্ববঙ্গের বহু জেলা পরিভ্রমণ করেন চপলাকান্ত। বাঙলাদেশের মাটিতে মাটিতে ছড়িয়ে আছে মোহনীর মাধুর্য, বাঙলার আকাশ-বাতাস-জল-স্থল-ললনা প্রত্যেকের মধ্যেই পুঞ্জীভূত রয়েছে স্বর্গীয় সৌন্দর্য, বাঙলার প্রতিটি ধূলিকণায় মাখানো আছে পরম ভট্টারকদের পবিত্র পদরঙ্গ। বাঙলাদেশ দেখতে লাগলেন তাইই উত্তরকালের এক যশ-মণ্ডিত পুর চপলাকান্ত।

১৯২৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন চপলাকান্ত, এ দিকে সাংবাদিক জীবনে রও হয়েছে স্বরূপাত। ১৯২৫ সালে ফরোয়ার্ড পত্রিকায় শিক্ষাবীণা হিসেবে যোগ দিয়েছেন চপলাকান্ত। ১৯৩০ সালে আইন পরীক্ষায় ও ১৯৪১ সালে বাঙলায় এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন চপলাকান্ত। এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করলেন চপলাকান্ত। আইন ব্যবসায় শুরু করার প্রথমাবস্থাতেই তাতে ছেদ



চপলাকান্ত ভট্টাচার্য

পড়লো। মালব্যজীর অধিনায়কত্বে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিলেন চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। ১৯৩৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন চপলাকান্ত। সে সময় আনন্দবাজার সম্পাদন করতেন আদর্শ সাংবাদিক স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ মুকুমদার মহোদয়। ১৯৪৪ সালে চপলাকান্তের নাম ঘোষিত হল আনন্দবাজারের সম্পাদকরূপে। এ ছাড়া 'নিউ এরা' নামক একটি ইংরাজী সাপ্তাহিকও চপলাকান্ত সম্পাদনা করেছেন কিছু কাল।

সংস্কৃতভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ পূর্বাভূতই বিবৃত করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার মূল ধারা—চপলাকান্ত তাঁদেরই অন্ততম, প্রভূত পরিশ্রম করে তিনি আনয়ন করেছেন তাঁর বর্তমানের রূপ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ও সিন্ডিকেটের ইনি একজন সদস্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন তাঁর অক্ষয় কীতি এখানকার সাংবাদিকতার বিভাগটিকে একটি পৃথক ফ্যাকাল্টিতে পরিণত করার প্রচেষ্টা। এই সাধু প্রচেষ্টার পূর্বকল্যাণ নবগঠিত সিনেটের দ্বারা সম্ভব হবে। এই বিভাগটির প্রথম অবস্থা থেকেই চপলাকান্ত এর সঙ্গে যুক্ত।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারকল্পে পৃথিবীর বহু স্থান পরিভ্রমণ করেছেন চপলাকান্ত। জার্মানি, ফ্রান্স, মিশর, গ্রেট ব্রিটেন, স্ট্রাজবুর্গ, ইটালী, কানাডা ও এশিয়ার জাম, কুয়েজ, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন চপলাকান্ত। গন্ধকার হিসাবেও তাঁর খ্যাতি সুপরিচিন্ত। কংগ্রেস ইন এজলিউশান, কংগ্রেস সংগঠন বাঙলার দান, ইংরাজীতে রাতরিক বোয়ানদে বিচার, ভ্রমণ কাহিনী দক্ষিণ-ভারতে এবং কাব্যগ্রন্থ শেষ বসন্তে প্রমুখ গ্রন্থগুলির রচয়িতা তিনি। স্ট্রাজবুর্গের ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ইনি যুক্ত, নয়াদিল্লীর নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক-সম্মেলন নিখিল ভারত বাঁটোজীবী সম্মেলন, ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদ, বোম্বাইয়ের আন্তর্জাতিক সংস্কৃত পরিষদ পাটনার নিখিল ভারত দেবভাষা পরিষদ, কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি কার্যনির্বাহক সমিতির ইনি একজন সভ্য, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের ইনি সম্পাদক। কলকাতার ভারতীয় সাংবাদিক সম্মেলনের ইনি সভাপতি। কবিত্ব প্রতিষ্ঠিত ববিবাসনের সঙ্গেও এঁর সংযোগ বিদ্যমান। বর্তমান বছরে ভারতীয় লোকসভার সভ্যরূপে নির্বাচিত হয়েছেন চপলাকান্ত। পৃথিবীর নানা স্থানে ঘুরে চপলাকান্ত অমূল্য করেছেন যে ভারতের সাংবাদিকতা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে বিদেশের দরবারে। আমরা গুদের থেকে ছোট ভো নই-ই ক বড়ই। আমি জিজ্ঞাসা করি, পেশা হিসাবে যারা সাংবাদিকতায় গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে কি কি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়, অভি সাংবাদিক চপলাকান্ত জানান যে, দায়িত্ববোধ ও বিচারবুদ্ধি এজগতে সর্বাঙ্গের কাম্য বস্তু, তা বাদেই আছে তাদের আগমনই এজগতে পক্ষে কল্যাণকর। স্বাধীন ভারতে সাংবাদিকতার যতটা উন্নয়ন হওয়া উচিত চপলাকান্তের অভিমতে তা মোটেই হয় নি।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে, কর্মব্যস্ত চপলাকান্তের সম্মি আগমন হতে থাকে দর্শনার্থীদের, আর স্বার্থপরের মত তাঁকে আঁরা রাখা যায় না। নব্রত্নতার প্রতিমূর্তি, মুহূর্তব্যয় চপলাকান্তের ব বিদ্যা গ্রহণ করি। এসে দাঁড়াই প্রশস্ত রাজপথে, এক-পা, ১



করে শুরু করি যাত্রা, সব কিছু পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে থাকি আমার গন্তব্য অভিমুখে।

### শ্রীমনীশ ঘটক (যুবনাথ)

[স্থানদত্ত কবি ও সাহিত্য-শিল্পী]

জীবন সম্পর্কে নির্বিচারে ঔদাসীঘাট শিল্পকে বে-পরোয়া করে।

ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের তেলাফেলার অন্ত থাকে না। প্রতিভার প্রদীপে তেল-সলতের প্রাচুর্য সত্ত্বেও শিল্পীর চিরন্তন খেরালীপনায় নিজেকে নিশেপে শিখাচীন করে, বঞ্চিত হয় কাল ও সমাজ। শিল্পিজীবনে এইটিই বোধ হয় চরম ট্রাজেডি।

এই ট্রাজেডির অন্তস্ত স্বাক্ষর যুবনাথে।

আকস্মিক সাহিত্যের আকাশে তাঁর আবির্ভাব, বিদ্রোহের বীকা তলোয়ার হাতে। অথচ পপিচালনার সংঘর্ষে দৃঢ়তা, আবার আকস্মিকতার ছড়াছড়ি তাঁর জীবনে।

বাংলা সাহিত্যে তখন প্রবল আলোড়ন। প্রবল ববিরশ্মির প্রভাবমুক্ত হবার সীমান্টন বাসনা নিয়ে একদল তরুণ স্বকণ্ঠের তপসায় বসে। ধর্ম ও আচারের পৃথক হয়ে ও স্বভাবে এক ছিলেন অনেকটা ইয়াং বেঙ্গলের উত্তরাধারী। যুবনাথ এদের একজন।

যুবনাথ সাহিত্যে চর্যনাম—আসল নাম মনীশ ঘটক। ১৯০২ খৃঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি পাবনা জেলার নতুন ভোবঙ্গা গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা স্বরেশচন্দ্র ঘটক ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সহকারী কর্মব্যাপদেশে তাঁকে ঘুরতে হয়েছে সমিভুক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায়। কেশব পিতার সঙ্গে সঙ্গেই কাটে। পদ্মা-যমুনা-মেঘনা-কর্ণজলীর পারে তাঁর পাতেছে তাদের ছাউনি। খাল বিল নদী নালায় ভরা গামল পূর্ববঙ্গ ও কক শুক তাপদগ্ন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই মনীশ বাবু তলোয়ার থেকে ঘরে বেড়িয়েছেন—এর মধ্যে কোনটির প্রভাব তাঁর কবি প্রতিভার উল্লেখের কারণ ও সহায়ক সেটা বলা তুসোধ্য। কারণ তাঁর সামাজিক কার্যজীবনের মূল স্তর বিদ্রোহের বজ্রদাং ভরা। বা কিছু অসহায় অসহ্য বা নিছক বকনা ও অশোভন দাঁততা—তাঁর নির্মম বীকা তলোয়ারের সে সব রক্ষা পায়নি। অথচ আস্তে আস্তে এক অনির্ধননায় প্রেমের সুর। যা বাস্তবকে স্বপ্নের করে, শোভন করে, ধ্বংস করে। যা বিকৃত ক্রিষ্ট ও হতচেতন মনে জীবনের বলিষ্ঠ আশা আকাঙ্ক্ষা তৈরিক। স্তব্ধতা কল্পনায় তিনি বারি-বর-বর শ্রাবণ মঘের অভিসারী—বাজনার রৌদ্রদগ্ন আকাশের মতো নির্মম। প্রগলভ মগানুভার প্রশ্রয় আদৌ তিনি দেননি। কল্পনা ও বাজনার এই উপরীতমুখী সমন্বয় ঘটেছে তাঁর কাব্যে ও জীবনে।

১৯১৯ সালে চট্টগ্রাম থেকে মাস্ট্রিক পাশ করে কোলকাতা প্রিন্সিপেলী কলেজে ভর্তি হন। এখানে সেখানে থেকে বি-এ পাশ করেন। এই সময় থেকেই তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু। সহযোগী বিজয় সেনগুপ্ত সহ ১৯২৩-২৪ সালে মনীশ বাবু কল্লোলগোষ্ঠীর গঠিত হন। এখানে যুবনাথ ছয়নাম গ্রহণ করেন।

যুগান্ত কবি হিসেবেই মনীশ বাবুর পরিচয়। যদিও তাঁর “ভূখা বাসন” নামক ছোট গল্প তৎকালীন পাঠক সমাজের প্রকৃত অভিনন্দন লাভ করেছিল এবং সিগনেট প্রেস সংকলিত Modern Bengali short stories গ্রন্থের গল্প স্থান পেয়েছে। তবুও মনীশ বাবু

নিজেকে কবি হিসেবে পরিচিত করতে চান। ১৯৩৫-৪০ পর্যন্ত প্রধানত তাঁর একটানা কাব্য পরিক্রমা। এই সময় ‘বিশ্বভারতী’ ‘কবিতা’ ‘প্রবাসী’ ‘পরিচয়’ প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি লেখকগোষ্ঠীর একজন।

‘অজিত চক্রবর্তী’ এবং ‘বোধাই প্রবাসী’ ইকনমিক উইকলির সম্পাদক শ্রীশচীন চৌধুরীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ফলে তাঁরা মনীশ বাবুকে কাব্যচর্চায় প্রবৃত্ত করেন। পরবর্তী কালে শ্রীযুদ্ধদেব বসু ও শ্রীতর্পান দত্তের উৎসাহ ও উদ্বোধনায় তাঁর কাব্যজীবনের বিকাশ শুরু হয়। ১৯৪০-এ শ্রীমন্টলাল বসু অঙ্কিত নামচিত্রসহ তাঁর প্রথম কবিতার বই শিলালিপি প্রকাশিত হয়।

শিলালিপি প্রেমের কবিতার সমৃদ্ধ। ববীন্দ্রনাথের ‘বাংলা কাব্য পরিচয়’ সিগনেটের ‘বাংলা কবিতার সংকলন’ বুদ্ধদেব বসুর ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’ আবু সয়াদ আইয়ুব সংকলিত পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা ইত্যাদি গ্রন্থে মনীশ বাবুর কবিতা স্থান পেয়েছে, ১৯৫৫-এর মাসিক বঙ্গমতীতে তাঁর কাব্য জীবনের অত্যন্ত দুটি কবিতা ‘বেয়ালিশ ইঞ্চি ছাতি’র তলায় ‘বেয়ালিশ হাজার জানোয়ার’ ও ‘ওদিকে আন্দামানে’ প্রকাশিত হবার পর—কাব্যচর্চায় ছেদ পড়ে।

১৯২৭ খৃঃ আরম্ভের বিশাগে তাঁর কর্মজীবন শুরু। চাকুরি জীবনে তিনি ছিলেন নিরাসক্ত। স্বভাবের গভীরে সূত্র বিদ্রোহী সত্তা তাঁর কর্মজীবনকে ব্যক্তিহীন নির্যাসিত তত্তে দেরনি।

পারিবারিক জীবনটিও তাঁর শিল্প ও সাহিত্যের পরিবেশে নিষ্কল। নৈনন্দিন জীবনের ঘরে-বাইরে তার ছোঁয়ায় সম্পৃষ্ট—এ বিষয়ে বহু



শ্রীমনীশ ঘটক

শিল্পীর চেয়ে তিনি ভাগ্যবান। সহধর্মিণী ধর্মপ্রদেবী জয়শ্রীমুগের স্নেহবিকা। জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য অধুনা বহু সাহিত্যের অন্ততম লেখিকা। দ্বিতীয় কন্যা শাখতী মিতুল ঘটক নামে Eve's weekly (বোধচি) কাগজের শিল্প নির্দেশিকা ; সফল মঞ্চ ও চিত্রনাট্যের রচয়িতা বিজ্ঞান ভট্টাচার্য তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা।

চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণান্তে মনোশ বাবু বর্তমানে বহরমপুরের নিভৃত কুটিরের বসবাস করছেন। প্রবন্ধ-পাঠ্যসূচ্য ; অথচ লেখার বিষয়ে দক্ষণ ওদাসীজ্ঞ। হয়তো প্রচণ্ড আত্মবিশ্লেষণই তাঁর নিয়মিত রচনার আসল প্রতিবন্ধক। এ প্রশ্ন দীর্ঘকায় স্পৃহকৃষ মনোশ বাবুর সলাট মাঝে মাঝে বেথায়িত করে।

সাময়িক প্রত্যাচ্য যুবনাস্থের সাহিত্যচর্চায় পূর্ণহৃদে পড়েন। কাব্যলক্ষীর স্বরবাক্যের আজও তাঁকে আকুল করে তোলে। আবার বঙ্গ-সাহিত্যের রাজপথে যোড়সওয়াবের ভূমিকায় চাবুক হাতে তাকে দেখা যাবে—এই বহু প্রত্যাশিত আশ্বাসই তিনি দিয়েছেন,—আবার তিনি বলবেন :—

কশাও চাবুক কশাও ঘোড়সওয়ার

হাতে থাক খোলা ভাঙ্গা সে তলোয়ার।

বিজলী-ঝলক বলসাক ইম্পাতে।

পুড়ে ছিঁড়ে যাক কালোরাত সাথে সাথে।

সবল পেশী কি গাতিয়া ওড়ে না গাথা।

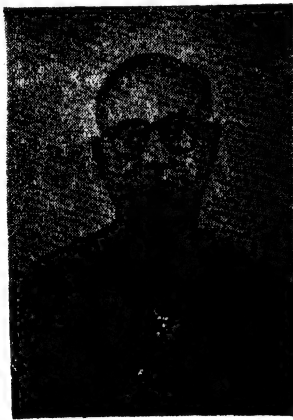
আঙুন জ্বলে না শুক আঁখির কোণে

কলিজার খুঁনে ফোয়ারার হাঁহাকার ?

### জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

[ সমাজসেবী ও বেন্টিং-শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা ]

১৮৮১ সালে জীলাহিড়ী হুগলী জিলার অগ্রতম মহকুমা সহর শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বৎসর বয়সে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রীরামপুর কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠনের ব্যবস্থা না থাকায় তিনি বহরমপুরে আসিয়া স্থানীয় কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান হইতে রসায়ন-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এস-সি পাশ করেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে এম. এস সি ক্লাসে বোগদান করেন এবং ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণিতে পড়িবার সময় বিপ্লবী দলের নির্দেশে ১৯১০ সালে তাঁহাকে আমেরিকা যাত্রা করিতে হয়। পথিমধ্যে জাপানে শ্রীরামবিহারী বহু প্রমুখ সদস্যদের সহিত তিনি



জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

কিছুকাল অতিবাহিত করেন। আমেরিকা মহাদেশে পৌছাইয়া তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলস্থ ভারতীয় বিপ্লবী-সম্মত প্রসিদ্ধ “গদর পার্টি”র নেতাদের সহিত সংযোগ-স্থাপনা করেন এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। ১৯১৩ সালে এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করিয়া যখন তিনি উক্ত শিক্ষা-নিকেতনে রসায়নশাস্ত্রে গবেষণামূলক কার্যে লিপ্ত ছিলেন, তখন অর্থাৎ ১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম মহাসমরের ক্রমতাণ্ডব আবিস্ত হইয়া যায়। এই সুযোগে ভারতে বিদেশী শাসকদের চরম আঘাত হানিবার জগ্ন স্বদেশে ও বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবী দলের সদস্যরা প্রস্তুত হইতেছিলেন। সেই সময় ইউরোপীয় শাখার নির্দেশে জিতেন্দ্রনাথকে জাখানী অভিযুগে যাত্রা করিতে হয়। বালিনে উপস্থিত হইয়া তিনি নিজেকে পশ্চিম-আফ্রিকাবাসী জাখান নাগরিকরূপে পরিচয় দেন এবং পূর্বে ব্যবস্থামুখ্যার “ধর্মসাম্বন্ধ কার্যে বিক্ষোভক দ্রব্যের ব্যবহার-বিধি ও প্রয়োগ-কৌশল” নিপুণতার সহিত আয়ত্ত করিতে থাকেন। কয়েক মাস পরে জাখান সরকারের সাহায্যে গোপনে আমেরিকা হইতে দুইখানি অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ জাহাজ ভারতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দলের নির্দেশে জীলাহিড়ী স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কুণাত তিন আটনে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। ইতিমধ্যে সরকার পাঠিয়া ইংরাজ সরকার একটি জাহাজ জাহাজ আটক করেন এবং অপরাট হইতে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বালেশ্বরের সমীকটে অস্ত্রশস্ত্র নামাইবার সময় বিপ্লবীদলের সহিত সরকার পক্ষের এক ঐতিহাসিক সংঘর্ষ হয়। উহাতে বিখ্যাত বিপ্লবী চিত্তপ্রিয় ঘটনাঙ্গলে নিহত হন, দলনেতা ‘বাঘদতীন’ সামাজিকরূপে আহত হন এবং মনোরঞ্জন ও নীরেন ধৃত হন। সুপ্রচেষ্টার এইরূপ বিপর্যয় এবং চার জন সহকর্মীর এইরূপ পরিণতি কারাভাঙনের অবস্থিত ভয়ঙ্কর জিতেন্দ্রনাথকে অতিশয় বিচলিত করিয়া তোলে। যুদ্ধ শেষে ১৯১৬ সালে জীলাহিড়ী মুক্ত হইয়া আসেন। তৎপরে তিনি বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং উহার মাধ্যমে বিদেশী শাসন ও শোষণ বন্ধের জগ্ন ব্যাকুল হইয়া উঠেন। বিদেশী দ্রব্য বয়কট উপলক্ষ্যে তখন ভারতবর্ষে নব নব শিল্প প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছিল। অল্পসঙ্কিস্ত জিতেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে শিল্পায়নের অপরিহার্য অঙ্গ বেন্টিং এর প্রচুর চাহিদা বিদেশ হইতে আমদানীর মাধ্যমে মিটান হইয়া থাকে। ফলে, দরিদ্র দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা বাহিরে চলিয়া যায়। তজ্জগ্ন রাসায়নিক জিতেন্দ্রনাথ স্বচেষ্টায় শ্রীরামপুরে ভারতের প্রথম বেন্টিং শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদেশী ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। উহা পরিচালনায় বহু বাধা বিপত্তি আসা সত্ত্বেও দৃঢ়চেতা জিতেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক অধ্যবসায় বর্তমানে উহা বাংলা তথা ভারতের নিজস্ব শিল্প বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এবং প্রায় দেড় হাজার পরিবার প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর “ভারত-ছাড়” আন্দোলনে জড়িত সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হইলে জিতেন্দ্রনাথ উহা প্রতিবাদ করেন। ফলে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে স্বগৃহে অন্তরী করিয়া রাখেন। ১৯৪৫ সালে মুক্ত হইয়া তিনি পুনরায় বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্রীরামপুর কেন্দ্র হইতে বিধান সভায় এবং ১৯৫৭ সালে উহার লোকসভা কেন্দ্র হইতে এম. পি নির্বাচিত হন।

# রাজার রাজার

উদয়ভানু

উপলবাস্তিণী গঙ্গার জলকল্লোলের একটা অক্ষুট শব্দ যেন কখন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁদের জঙ্গলে অবিশ্রান্ত খিঁঝি ডেকে চলেছে। পূর্ব শুকতিথির জ্যোৎস্না-আলোয় জঙ্গলের দুর্ভেজ আঁধার ঘোচে না। অবগাঢ়া পত্র উজ্জ্বল চোখ সহসা আলোর ঝিলিক তুলে অদৃশ্য হয়ে যায়। থানিক আগে ঢেঁড়া পিঠেছে তাঁদের বাসিন্দারা : কাছাকাছি কোথায় হয়তো বাঘের ভয় দেখা দিয়েছে। কেউ ডাকাব সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁড়া পিঠে পিঠে গ্রামের মানুষকে সাবধাননা নিশানা শোনানো হয়েছে। রাত্রি গভীর হওয়ার ফেউয়ের ঢাক থেমেছে এখন। বাঘ পানিয়েছে বনের মধ্যে।

বাঘ না বাঘিনা! কুমারবাহাদুরের সমস্ত মনটা মাঝে মাঝে বিকিণ্ড হয়ে ওঠে; চোপের রাশ আগগা হয় থেকে থেকে। প্রাথম দেখায় যেন দেখতে পেরেছেন কাশীশঙ্কর, এ মেয়ের মুখে যেন সমাজ্যীর লক্ষণ। এই ঘোর বিপদের রাত্রেও তাঁর চোখে যেন ভয় বা আশঙ্কার চিহ্ন নেই।

—সন্দার, দেবী কত আর?

কথার স্বরে ভ্রমকি দিলেন কুমারবাহাদুর। সারা বজ্রার লোকজন সমুদ্র হয়ে উঠলো সহসা। সব্ব সমুদ্র হয় না কাশীশঙ্করের। মুখ থেকে কথা খসলে আর যেন স্থির থাকতে পারেন না। বজ্রার শয়ক গতি, তাঁর থেকে মধ্যগঙ্গার ভাসতে ভাসতে একটি প্রহর হয়তো উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। সন্দক অস্বাভাবী কুমারবাহাদুর, বিদ্রোহের মত দততম বেগে ঘোড়া ছোঁটাতে পারেন। হঠাৎ যেন এক দৈবপ্রেরণায় তিনি চঞ্চল হয়েছেন অতিমাত্রায়, তাঁর পেশীবহল দীর্ঘক্ষেত্র স্থায়ী জোয়ার নাচতে থাকে যেন। কি এক পণরফার কাঠি ফুটেছে স্বপ্ন চিবুক। মাঝে মাঝেই চিবুক স্পর্শ করছেন। চিন্তায় আকুল চোখে রহস্যময় চাউনি ফুটে আছে।

বজ্রার কাঠের পাটাতনে খটাখট আঘাতের শব্দ ওঠে। হাল আর দাঁড় তোলাপাড়া করছে মাঝিরা। সন্দারও চেঁচিয়ে উঠলো। বললে,—দেবী নাই হজুর!

হলুদ-ছোপানো কাণড়ে মানিয়েছে বটে আনন্দকুমারীকে। মাথায় সামান্য ঘোমটা দিয়ে কাপড়ের আঁচল এঁটোমেঁটে কোমরে জড়িয়েছে। ভিজ় চুলের বোঝা এলিয়ে দিয়েছে পিঠে। ডুব-সাঁতারের কণ্ঠ এখনও যেন থেকে থেকে হাঁকিয়ে উঠছে।

পানের ডাববটা ঠেলে এগিয়ে দিলেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—ইচ্ছা হয়তো দু'টা একটা পান—

কথা অসমাপ্ত থেকে যায়। আয়েসের হাসি হেসে দু'টা

তাম্বুলমাথা পান মুখে দেয় চৌধুরাণী। বলে,—মহাশয়ের আসল পরিচয়টা শুনা হয় নাই এখনও।

মশালের আলোর আর একবার দেখলেন কাশীশঙ্কর। চৌধুরাণীর মুখখানি দেখতে দেখতে বললেন,—আমি তেমন কেউ খ্যাতিমান নই। পরিচয়টা আপাতত গোপন থাক।

এক খলি ঢাকা পেয়েছে মাকি-সন্দার। হাতে হাতে পেয়েছে শালুর খলি, ভারী ওজনের। রাতের আবেশে তজ্জা-নামা চোখে ঘুমের বদলে উৎফুল্লতা ফুটেছে। ঘুমন্ত মাকিসের লাথি মেঝে মেঝে ঠেলে তুলছে। বারা ক্রান্তি আর ঘুমের ঘোরে উঠতে চায় না, তাদের চোখের সামনে লাল শালুর খলি ধরছে।

জগমোহন সের্গেস মুখ উচিয়ে বলল,—কুমারবাহাদুর, মাসটা সিদ্ধ হ'তে আরও একটুকু বিলম্ব হবে।

তিনটি চুল্লীতে ভাত, ক্ষীর আর মাস ঢেপেছে। কাঠের আগুন জ্বলছে সেলিহান শিখা ছড়িয়ে। গন্ধে গন্ধে আসেপাশে শিরাজের দল এসে জুটেছে। ঘোপের মধ্যে লুকিয়ে গৌক চাটছে সোভে সোভে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—একটা আটসেরী ছাপ সিদ্ধ হ'তে রাত্রি কাবার হবে না কি? চুল্লীতে টাটকা কাঠ দেও। ভাত আর দুধটা নেমেছে কি বলতে পারো?

—এখনই নামবে হজুর! জগমোহন সের্গেসও কথা বলে ভয়ে ভয়ে। মালিককে দেখলে তার সকল শক্তি যেন উবে বার দেহ থেকে। এত দাপট কোথায় অদৃশ্য হয়।

—যাও যাও, চুল্লীতে টাটকা কাঠ দেও। কথা বলতে বলতে আসন ছেড়ে উঠে পাঁড়ালেন কুমারবাহাদুর। বজ্রার ছাদে পায়চারী করতে থাকেন। আনন্দকুমারীর উদ্দেশে বললেন,—তোমার পিতার সঙ্গে কোথায় দেখা হয় বলতে পারো?

কয়েক মুহূর্ত স্থির ব'সে থেকে চৌধুরাণী। সময়ে মিহি কণ্ঠে বললে,—কি প্রয়োজন জানতে পারি কি?

আপন মনে হাসতে থাকেন কাশীশঙ্কর। তাঁর মনে কি এক ভাবের উদয় হয় যেন। পায়চারী ধামিয়ে হাসি লুকিয়ে বললেন,—বিশ্বের ভয় নাই কিছু, প্রয়োজন আমার ব্যক্তিগত।

মুখের পাণ আর তাম্বুল বিবাদ লেগেছিল যেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথাটি শুনে স্বস্তির বাস ফেললো আনন্দকুমারী। বললে,—বাবামশাই স্বতাছুটি থেকে ফিরে আসেন তো দেখা হবে।

অল্প হাসির জের টেনে কাশীশঙ্কর বললেন,—ব্যবসার নেমেছি আমি। চৌধুরীমশাই যদি কিংকিং কৃপাদায়ী বর্ষণ করেন তো আমাদের মত মাত্রম বন্ধ হাব চায়।

নরসিং হাঙ্গি হাঙ্গি চৌধুরী। আনত চোখে বললে,—  
আপনার রাজা বাদশাহ, আপনারদের কাছে বাবামশাই তো নেহাং  
নগম্।

চৌধুরী হাঙ্গি চাপলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—তন্তু-সিংহাসন  
নাই তথাপি রাজা বাদশাহ !

আনন্দকুমারী বললে,—মহাশয় যদি পরিচয় গোপন করেন আমি  
আর কি বলতে পারি ? বিদ্যাবাসিনী শুনেছি রাজার মেয়ে।  
আপনি তো রাজকন্যার সহোদর ?

করিন গাঙ্গীরের সঙ্গে মুখে তজ্জনী চেপে কাশীশঙ্কর বললেন,—  
চুপ ! কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। মান্দারগের বাসিন্দা আমার  
পরিচয় জ্ঞাত হ'লে কার্য উদ্ধার হবে না। কথা বলতে বলতে  
খানিক থেমে আমার বললেন,—চৌধুরীর মেয়ে, তোমাকে একটা  
কাজে নিযুক্ত করতে চাই।

যুক্তকর বৃক ঠেকিয়ে চৌধুরী বললে,—ভকুম করন জাঁহাপনা।  
সামর্থ্য যদি কুলায় আমি পেছপাও হবো না।

—না না, পরিচয় নয় আনন্দকুমারী ! কথা বলতে বলতে  
আবার পাগড়ারী করতে থাকেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—তোমার  
দ্বারা কাজ উদ্ধার হয় তো রক্তপাত হয় না আর। তোমার উদ্দেশ্যটা  
এখন ব্যক্ত কর, তুমি কি স্বপ্নে যেতে চাও ?

—না না জাঁহাপনা, গৃহে আর ঠাঁই হবে না আমার।  
চৌধুরীর মুখের হাসি মিলিয়ে যায় কথা বলতে বলতে। বলে,—  
আমার মা ঠাকরুণ আর কি আমার মুখ দেখবেন ?

—তবে তোমার গন্তব্য কোথায় তাই বল !

ঈষৎ বিম্বয়ের সঙ্গে কাশীশঙ্কর শুধোলেন।

—মান্দারগেই ফিরবো আমি। তবে গৃহে আর ফিরবো না।

—কে আশ্রয় দেবে ? সাগ্রেহে বললেন কুমারবাহাদুর।

আনন্দকুমারী স্তব্ধ হয়ে যায় ; মুখে কথা কোটো না। আকাশের  
চাদের দিকে সলাজ চোখ তুললো। চন্দ্রকান্তকে মনে পড়লো।  
একবার তাঁর কাছে শেষ-আশ্রয় চাইতে দোষ কি ? চৌধুরীর  
সুপ্ত মনে সহসা প্রতিহিংসার আগ্নেয় ঘরে যেন। যোব বিপদের মধ্যে  
ঠেলে ফেলে দিয়ে মৃত্যু আর সমাজের ভয়ে পালিয়েছেন চন্দ্রকান্ত।  
ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত ফণা তুলে একবার তাঁকে দশাবে না আনন্দকুমারী !  
কেমন যেন নেশাচ্ছন্নের মত চৌধুরী বললে,—দেখা যাক, কে আশ্রয়  
দেয় ! মরি কি বাঁচি !

কাশীশঙ্কর বললেন,—আমি যে এখন তোমার সাহায্যপ্রার্থী।  
কার্য উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত কে তোমাকে মুক্তি দিবে ?

ইদিক-সিদিক দেখলো চৌধুরী। স্তিমিতকণ্ঠে বললে,—যদি  
বলি একটা আশ্রয় না হয় মহাশয় আপনিই দেন ? আমার দ্বারা  
কোন উপকার হয় তো আদেশ অবগুই পালন করবো।

পায়চারী থামিয়ে কেমন যেন নিকটে এগিয়ে আসেন কাশীশঙ্কর।  
আনন্দকুমারীর কাছে এসে বললেন,—বিদ্যাবাসিনীকে চাই আমি।  
কুম্বাসের অন্ত্যচার থেকে তাকে রক্ষা করতে চাই। বিদ্যাকে  
পাই তো তোমাকেও আশ্রয় দিতে পারি।

খিল খিল শাফে হঠাৎ হেসে উঠলো আনন্দকুমারী। হাসতে  
হাসতে বললে,—আশঙ্ক হলো কুমারবাহাদুর ! আশার আলো দেখতে  
পেলায়।

স্নেহের স্তরে কাশীশঙ্কর বললেন,—বিদ্যা আর তুমি একত্রেই  
থাকতে পারো স্তাহুটিতে, আপত্তি হবে না কারও। কিন্তু তুমি  
চৌধুরীর মেয়ে, তুমি কোন দুঃখে অজ্ঞার ঘরে বাস করবে ?

চৌধুরী হেসে হেসে বলে,—মান্দারগে ঠাঁই না পাই তো  
স্তাহুটিতে বাবো আমি। আপনারদের চরণে থাকবো। বাই  
হোক, মনে হয় আপনি এখন খুবই বিচলিত। স্থির হোন আপনি,  
উদ্দেশ্য আপনার সফল হবেই। আমি সাহায্য করবো সাধ্যমত।

আসন বসলেন কুমারবাহাদুর। পারের ডাবর থেকে কটা পাণ  
তুলে মুখে দিলেন। বললেন,—এতক্ষণে আমি স্বস্তি বোধ করছি।  
মান্দারগের সঙ্গে আমার চাক্ষুঃ পরিচয় নেই। অজ্ঞাত স্থান থেকে  
একজন বন্দীকে মুক্ত করা সহজ কথ নয়।

—তাঁই বলি, আপনি এত ব্যস্ত হন কেন ?

—আব ব্যস্ত হওয়ার কারণ নাই ! তোমার সহায়তা পেয়েছি,  
আব কিছু চাই না আমি।

—আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন মৃত্যুর হাত থেকে। আমি  
কখনও ভুলতে পারি না উপকারকে।—এই পৃথিবীতে কে কাকে  
রক্ষা করে ?

বজ্রার ছাদের সিঁড়িতে জগমোচন দেখা দেয়। বলে,—জুজুব,  
বজ্রা জলে ভাসিয়ে দিক তবে ?

কুমারবাহাদুর বললেন,—ঐ। একটা কথু একশা দক্ষায়  
বলতে পারি না আর।

এক-খিল টাকা পেয়েছে মাঝির দল। এষ্ট যোব নিশীথে নৈশ  
অভিযান তাদের উৎসাহের অভাব হয় না। মাঝির দলকে গাঁজা  
খাইয়ে দিয়েছে জগমোচন লেঠেন। তামাকের কলঙ্গের গাঁজা ভরে  
ভরে খাইয়েছে।

বজ্রা জলে ভাসলো প্রচণ্ড ঠেলা বেয়ে। তাঁর থেকে গভীর  
জলে ভাসতেই চৌধুরী বললে,—কুমারবাহাদুর, একটা যদি প্রশ্ন  
করি, উত্তর দিবেন কি ?

—আসবং দেবো। কথা বলতে বলতে একটি তাকিয়া টেনে  
নিয়ে এসে দিয়ে বসলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—আমার জীবনে  
গোপনীয় কিছুই নাই।

সম্মতি পেয়ে ইদিক সিদিক দেখতে থাকে চৌধুরী। কিস-কিস  
কথা বললে,—মহাশয় কি বিবাহ করেছেন ?

হঠাৎ অটহাসি হাসলেন কাশীশঙ্কর। এসতে হাসতে বললেন,—  
আজ নয়, বহুকাল পূর্বেই এই গতিত কাড়টা সমাধা করেছি।  
আমার একটি কন্যা আছে, তাঁর নাম বনলতা, বনবালা, বহুবন্দরী।

মনে মনে আহত হ'লেও মুখে শুক হাসি ফোটান আনন্দকুমারী।  
বলে,—বনলতার মা কোথায় আছেন এখন ?

—স্তাহুটিতেই আছেন। আমার পিতালয়ে।

—তাঁর নাম কি ?

ইতস্তত বোধ করেন যেন কুমারবাহাদুর। খানিক থেমে  
বললেন,—তাঁর নাম মহাশ্বেতা। আমি নাম দিয়েছি রাতরাণী।

আঘাতটা বৃক লাগে যেন। চৌধুরী অপলক চোখে তাকিয়ে  
থাকে আকাশের দিক। অক্ষুটকণ্ঠে বললে,—তাঁর সিন্দুর অক্ষয়  
হোক। তিনি খুবই ভাগ্যবতী।

—ঈশ্বর জানেন। আমি ভাগ্যগণনা জানি না।

কেমন যেন আশাহতের মত একদৃষ্টে চেয়ে আছে আনন্দকুমারী। তার মনের সকল আনন্দ আর উৎসাহ যেন দপ ক'রে নিবে যায়।

ভাসমান মেঘের আড়ালে কখন লুকিয়েছে পূর্ণাকার চাঁদ। জ্যোৎস্নার আলো যেন ক্ষীণপ্রভ হয়ে আছে। কাশীশঙ্কর একবার লক্ষ্য করলেন আলো-আঁধারিতে। দেখলেন চৌধুরাণীর উজ্জল চোখ দু'টিও যেন নিশ্চল হ'তে থাকে। তার মুখের হাসির আভাস অদৃশ্য হয়।

বজ্রা গজেন্দ্রগমনে নদীর দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলেছে। জলে হালের আবারে ছপাছপ শব্দ ওঠে। একসঙ্গে অনেকগুলি হাস চলেছে।

চোখ নানালো চৌধুরাণী। কোমরের জড়ানো শাড়ীর বেঁধে খুলে আঁচল টেনে পিঠে ফেললো। বললে,—বিদ্যাবাসিনী যদি ফিরতে না চায়?

ক্রমুগল কুণ্ডিত হয় কাশীশঙ্করের। বললেন,—তবে তো রাজমাতার জীবন বক্ষা হওয়া অসম্ভব। আমিই বা তাঁকে মুখ দেখাবো কোন লজ্জায়?

কেমন যেন হতাশার হাসি হাসলো আনন্দকুমারী। বললে,—বিদ্যাবাসিনী নাবী। নারীজাতি স্বামীর ঘর ত্যাগ করে না সহজে। তবে আশার কথা এই, বিদ্যা স্বামীর অত্যাচারে অস্তিত্ব হয়ে আছে।

—আমরাও তাই জানি। কুমারবাহাদুর আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন। বললেন,—বিদ্যাকে আবার সহ মেতেই হবে।

—আর আমাকে বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে হবে! ঈশ্বর কক্ষ হয়ে বলে চৌধুরাণী।

—না, না, সে কি কথা! তোমারও একটা কিছু পাকাপাকি ব্যবস্থা হবে বৈ কি। কুমারবাহাদুর চোখ পাকিয়ে বললেন। বললেন,—তোমার মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।

—দেখা বাক কি হয়, ভেসে বাই না ডাঙ্গায় উঠি। কথাই শেষে সহাস্তে উঠে পড়লো চৌধুরাণী। বললে—আমি ঘরে যাই, আপনি বিশ্রাম করুন কুমারবাহাদুর!

কাশীশঙ্কর দেখলেন, নন্দ্যোবনা মেয়েটি ঠিক সাধারণ মেয়ের মত নয়। তার কথা আর হায়ে-ভায়ে কুটে ওঠে এক ব্যক্তিত্ব—যা সচরাচর দেখা যায় না! তার রূপ-বৈচিত্র্য ঢুককে যেন প্রলুব্ধ করে! তার চাপচলনে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়!

—আনন্দকুমারী! কুমারবাহাদুর ডাকলেন নাতিউককণ্ঠে। একটা কথা আছে। মুখে হাসি মাখিয়ে সিঁড়িতে দেখা দেয় চৌধুরাণী। সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গীতে বুক চিত্তিয়ে বলে,—কুমারবাহাদুর, আমি এসেছি।

—নিকটে আসিস। কথাটি গোপন, সববে ব্যক্ত করা যায় না। কথার শেষে চোখ-ইশাওয়া ডাক দেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—তুমি কি খুবই শাস্ত-রাস্ত?

বজ্রার ছাদে উঠে কুমারবাহাদুরের কাছাকাছি গিয়ে আবার বসলো আনন্দকুমারী। বললে,—আপনার অনুমান ঠিক। সত্যিই আমি রাস্ত। নিদ্রায় চোখ জড়িয়ে আসছে।

—রাত্রির আহাটটা তবে সেসে নাও। কাশীশঙ্কর কথা বলতে

বলতে আবার আসনপিঁড়িতে বসলেন তাকিয়া সরিয়ে দিয়ে। বললেন,—আহারান্তে নিদ্রাই স্বাভাবিক।

একটু হাসলো চৌধুরাণী। বললে,—আপনি অভুক্ত থাকবেন আর আমি বাক্ষরীর মত গোশ্রাসে গিলতে বসবো? তা হয় না কুমারবাহাদুর!

নৈকট্যের আবেগে বিমুগ্ধ হয়েছেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—তবে তুমি আর আমি একত্রে আহারে বসতে পারি। কিন্তু আরও খানিক সময় উত্তীর্ণ হোক। ক্ষুধার তত তীব্রতা বোধ করছি না ঠিক এখনই।

—কথাটি ব্যক্ত করুন। গোপন কথাটি কি, তাই শুনি।

কথা বলতে বলতে চৌধুরাণী একটি তাকিয়া টেনে নেয়। দেহটা ঈষৎ এলিয়ে দেয়।

কাশীশঙ্কর বললেন,—আমাদের শাস্ত্রে গাংকর বিবাহটা কি, তুমি কি জ্ঞাত আছো?

এখানে ও পাশে মাথা হুলিয়ে আনন্দকুমারী বললে,—আমি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নই কুমারবাহাদুর, মাংসজ্ঞা করবেন।

নিরাশ হলেন কাশীশঙ্কর। মুচু গম্ভীর স্বরে বললেন,—গাংকর বিবাহে জাতবৈধম্য রক্ষা হয় না।

খিল-খিল শব্দে আবার হাসি ধরলো চৌধুরাণী। হাসতে হাসতে বললে,—আপনার এ চিন্তা কেন তাই প্রশ্ন করি।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকেন কাশীশঙ্কর। তার পর বলেন,—তোমার জ্ঞা আনন্দকুমারী।

হাসি থামে না। চৌধুরাণীর হাসির শব্দ নদীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে। কেমন যেন ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হাসতে হাসতে বললে,—বিবাহে আর কুটি নেই কুমারবাহাদুর! পুরুষজাতির প্রতি আমার ঘৃণার শেষ নাই।

ঠিক এই ধরনের স্পষ্টাঙ্কি শোনার অভ্যাস নেই কুমারবাহাদুরের। তিনি যেন কেমন অস্থিত বোধ করলেন। কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারলেন না।

আনন্দকুমারী আবার বললে,—আমার কথায় আপনি কি আহত হ'য়েছেন?

ঠা না কিছুই বললেন না কাশীশঙ্কর। আকাশের দিকে চোখ মেলে বসে থাকলেন নিশ্চুপ।

চৌধুরাণী আবার সহাস্তে বললে,—কুমারবাহাদুর, প্রসঙ্গটা এখন চাপা থাক। চলুন আগে আহার শেষ করি। আমাদের খাওয়ার পাত্র সাজিয়েছে নীচের ঘরে।

কাশীশঙ্করের মুখের আকৃতির কোন বিকার দেখা যায় না। কেবল একটা গাঙীয়া প্রচ্ছন্ন হয়ে কুটে আছে। তিনি শুধু বললেন,—তাই চল, আনন্দকুমারী।

বললেন কিন্তু ফরাস ত্যাগ ক'রে উঠলেন না কুমারবাহাদুর। তিনি সন্ধ্যার পক্ষপাতী। পদখলন ক'রে বলে তিনি জানান না। কিন্তু আজ এই জ্যোৎস্নার রাতে কেমন যেন স্থির থাকতে পারলেন না কিছুতেই। মোহধরী আনন্দকুমারীকে মুখ ফসকে বসে ফেললেন কথাগুলি। কার্জটা কি গহিত হয়েছ, তাবতে থাকলেন মনে মনে।

—কৈ, আসুন। কথা বলতে বলতে চৌধুরাণী একখানি হাত আগিয়ে ধরলো।

কাশীশঙ্কর সেই নরম হাত ধরলেন নিজের হাতে। ধঁরেই উঠলেন তিনি। আনন্দকুমারীর মুখপানে তাকিয়ে ঈষৎ হাসলেন যেন। খুশীর হাসি। রাত্রি তখন বেশ গভীরতর হয়েছে।

আঁখি জল থেকে স্বীপে উঠেছে আনন্দকুমারী, তবুও তার ভয়ের কাঁপুনি ধরে থেকে থেকে। ম্যাগেটকে বসবার মনে পড়ে আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। ম্যাগেট শিল্পী, বিদ্বান আর বৈজ্ঞানিক হ'লে কি হবে, তার অপহরণের স্পৃহা যেন ভয়াবহ। তার পৈশাটিক লালসা—ভাবতে ভাবতে আনন্দকুমারী কেমন যেন স্থির হয়ে যায়। সিঁড়ি-মধ্যপথে পিঁড়িরে পড়ে বিকল যন্ত্রের মত।

কাশীশঙ্কর বললেন,—শরীরগতিক কি ভাল নয় তোমার ?

চৌধুরাণীর চোখের দৃষ্টিও থমকে থাকে। কুমারবাহাদুর দেখলেন মশালের আলোয়, আনন্দকুমারীর অনিন্দ্য মুখকান্তি যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। কি এক অত্যাচারের ক্রেশে যেন জঙ্ঘরিত হয়েছে। কার-ক্রেমের চিহ্ন স্পষ্ট হয়েছে মুখে।

আঁচলে মুখ মুছলো চৌধুরাণী। কাশীশঙ্করের চোখের বিক্ষিপ্ত চাউনি বেশীকণ যেন দেখা যায় না। চোখ নামিয়ে নেয় আনন্দকুমারী। ক্রৌণকণ্ঠে বলে,—কুমারবাহাদুর, আমার ভয় হচ্ছে বে !

হঠাৎ কোথা থেকে এক রাশ ভয় এসে আক্রমণ করে বণিক-কন্ডাকে। ম্যাগেটের সঙ্গে একত্রে দিন আর রাত্রি কাটিয়ে আজ নির্ভয়ের রাজ্যে এসে ত্রাসের হাত থেকে যেন রেহাই পায় না। অদৃশ্য ভয়ের করাল ছায়া দেখতে পায় যেন।

—আমি থাকতে ভয় পাওয়ার কারণ কি ? কুমারবাহাদুর চুপি চুপি কথা বললেন, কথা যাতে অস্ত্রের কানে না যায়।

—আমার কোন' দোষ নেই, ম্যাগেট জোর করলে। আমাকে তার বজ্রাঘ তুললে ! মুখে আঁচল চেপে কান্নার স্রবে হঠাৎ বললে চৌধুরাণী।

—তুমি চঞ্চল হও কেন এত ! কে তোমার কাছে জবাবদিহি চায় ? কাশীশঙ্কর বললেন হাসতে হাসতে। বললেন,—রাত্রি গভীর হয়েছে আনন্দকুমারী। ক্ষুধার ঝালর জঠর জ্বলছে।

—আমাকে বন্ধন কুমারবাহাদুর। আমার তরে আপনি কষ্টভোগ করবেন কেন ?

—আমাকে কি তুমি পণ্ডা ঠাওরাও ? সহস্রোত্তে শুধালেন কাশীশঙ্কর। আনন্দকুমারীর চৌলখাওয়া চিবুক তুলে ধরলেন।

খানিক অপলক তাকিয়ে থাকে চৌধুরাণী। ছুঁর্বোধ্য কথা শুনে অবুঝের মত যেমন তাকায় মানুষ, ঠিক সেই ধরণের অবাক চোখ যেন। সহসা ছুঁই চোখ বন্ধ করলে সে। নাতজানুতে বসে পড়লো কাশীশঙ্করের পদতলে। জ্বলভরা চোখ তুলে বললে,—আপনি দেবতার চেয়ে বেশী আমার কাছে, আপনি যে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। মরণের হাত থেকে রক্ষা ক'রেছেন।

—রক্ষা করেন তিনি, মানুষ তো ছার ! আবার কথা বলতে বলতে হাসলেন কাশীশঙ্কর। আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখিয়ে দিলেন, লুকিয়ে-থাকা বক্ষাকর্ভাকে, ঈশ্বরকে। চৌধুরাণীর একখানি হাত ধরলেন সঙ্গের। বললেন,—আমারে বসতে চল'। অন্য আর মাসে শীতল হ'লে বিবাদ লাগবে। আমিও ক্ষুধার্ত।

—ক্ষমা করবেন। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো চৌধুরাণী। বললে,—চলুন আপনি ; আমিও যাচ্ছি।

নীচের ঘরে এসে আবার বিম্বিত হয় সে। ছুঁ'খানি আসন প'ড়েছে পাশাপাশি। আত্যাধ্য সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন খানসমা রামপাখা ধঁরে পীড়িয়ে আছে এক পাশে। রঙীন লঠন জ্বলছে বজ্রার মধ্যে। ছাঁকা কীসার বাসনের সোনা-আল ঠিকবোজে।

চৌধুরাণীর চোখের বিশ্বাস দেখে হো-হো শব্দে তেমে উঠলেন কুমারবাহাদুর। হাসতে হাসতে বললেন—আমার খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে আশ্চর্য্য হয়েছেো তুমি ! কথার শেষে আবার উচ্চতর কণ্ঠে তেমে উঠলেন তিনি। বললেন,—একটা ছাগ আমি গোটাঁই খাই। অবাক হও কেন ?

সত্যিই এক গামলা মাংস দেওয়া হয়েছে কাশীশঙ্করের আসনের সমুখে। খালায় যেন পূর্বত প্রমাণ ভাত, গোবিন্দজোগ ঢালার।

কুমারবাহাদুর আসনে বসলেন। গলুয়ের জল ঢাললেন হাতে। আনন্দকুমারীও সলজ্জার বদলো পাশের আসনে। পাশের ঘরে চোখ পড়লো সহসা। চৌধুরাণী দেখলো কক্ষের ছুঁই পাশে পুথক হুঁটি শয্যা রচিত হয়েছে। তৎক্ষণাৎ চোখ ফির্বিয়ে নেয় চৌধুরাণী। কাশীশঙ্কর দেখতে পান না কিছুই—তিনি তখন মুদিত চোখে গলুয়ের মন্ত্র বলছেন।

গঙ্গার বুক থেকে এক বলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে আনন্দর কপালে যেন শত শত চুম্বা খেতে থাকে। [ ক্রমশঃ ]

“সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে—কোন স্রবিধার জন্তে নয়, সম্মানের জন্তে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রজ্জ্বলতা থেকে মুক্তি দেবার জন্তে। মানুষের সেই প্রকাশ-তত্ত্বই আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব—নব যুগের উদ্বোধন করে আমরা জয়যুক্ত হব।”

—বরীন্দ্রনাথ



[ ছবি পাঠানোর সময় ছবির পেছনে নাম, ধাম ও  
বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না ]



ওয়ার্ড লেক ( শিলং )

—উমাপদ চৌধুরী





মার্বল-রক

—ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

জল কল্লোল

—বণজিতকুমার মুখোপাধ্যায়









ওড়নার আড়ালে

—কান্তি ভাই (সাবিত্রী)

# ছবি র কথা সাধারণে

শ্রীবিনায়কশঙ্কর সেন

“ও তোমাদের ছবি টিবি বুঝি নে ভাই—”

এ অতি সাধারণ কথা, সাধারণ লোক অর্থাৎ ধারা কখনো ছবি আঁকেন না বা ছবি দেখেন না তাঁদের মুখ থেকে প্রায়ই শুনেতে পাওয়া যায়। এই মহাবাদের নিচেব প্রচ্ছন্ন ভাবটি যেন ছবি দেখতে পারা—ছবি আঁকতে পারার মতই একটা বিশেষ প্রতিভার বস্তু, যা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এ কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। এ ঠিক যে, ছবি আঁকতে হলে এবং ভাল ছবি আঁকতে হলে বহু পরিশ্রম ও বহুদিনকার শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন; কিন্তু ছবি দেখতে পারা অনেক সহজ—বাবু স্ত্রী প্রয়োজন হয় কিছুটা বিদগ্ধ চিত্তবৃত্তি ও কপিং কচিবোধ। অবশ্য কচির তারতম্যের উপরে বিচারের সুক্ষতা নির্ভর করে এবং তা'ও সম্পূর্ণ আপেক্ষিক, তবে সাধারণ ভাবে যে কোন-লোকই ছবি দেখতে শিখতে পারেন এবং ছবি দেখে যথেষ্ট আনন্দও সঞ্চয় করতে পারেন, যা থেকে কি না তিনি শুধু অন্ধ অজ্ঞানতা ও উত্তমের অভাবজনিতই বঞ্চিত।

ছবি কি? শিল্পকলার একটি বিভাগ মাত্র। আমাদের শাস্ত্রে কলা-বাক্যকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

- ১। চিত্র
- ২। ভাস্কর্য
- ৩। সঙ্গীত
- ৪। নৃত্য

যদিও শিল্পের আধুনিক সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক এবং মানুষের দর বকম বৃত্তিকেই শিল্প পর্যায়ে ফেলা হয়, যেমন মোটির গাড়া গলানো একটা ‘আঁট’, বই বাঁধানোও একটা ‘আঁট’—এক কথায় ছুতো সেসাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবটাই ‘আঁট’। কথাটা কিন্তু খুব মিথোও নয় এবং এতে হাস্যবোধও কিছু নেই, তবে সে কথা বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ সাহিত্যের মত বিশুদ্ধ শিল্প বলতে আমরা এ চারটিই বুঝি। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা নিজের ধারণা অবশ্য অভিনয়ও একটা আঁট এবং নৃত্য ও সঙ্গীতকে আঁটের দলে নিতে হলে তা'কেও নিতে হয়। শাস্ত্রকাররা এত বুদ্ধিমান হয়ে অভিনয়কে কেন আঁটের পর্যায়ে থেকে বাদ দিলেন, কথাটা বুঝতে পারিনি।

যাই হোক, শিল্পকলার এই বিশেষ ভাগে কার কি-প্রাণ্ডণ বিচার করলে দেখা যায়, চিত্র হচ্ছে বর্ণ-শিল্প, একটি সমস্ত ক্ষেত্রের উপরে প্রক্ষেপের সাহায্যে কোন বস্তু বা কোন দৃশ্যপটের সাদৃশ্য ফুটিয়ে তোলা—তাতে দুই স্তর (Dimensions) আছে, তৃতীয়টি নেই।

ভাস্কর্য—আকার শিল্প, তাতে বর্ণের কারবার নেই কিন্তু আকৃতি আছে এবং তিনটি স্তরই এতে বর্তমান। ভাস্কর্যে য-এর ব্যবহার চলতে পারে বাটে, তবে না হলেও ক্ষতি নেই এবং প্রায়ই ভাস্কর্য এই কারণে হয় এক বড়।

সঙ্গীত—শব্দশিল্প, শব্দকে নানা তানে লয়ে, মীড়ে গমকে সাজিয়ে বদ সৃষ্টি করা। সে ঐতিশ্যিক, দৃশ্যশিল্প নয়।

নৃত্য—গতিশিল্প, দেহকে নানা ভাবে আন্দোলিত করে চন্দ্র সৃষ্টি করা। সঙ্গীতশিল্পও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সে দৃষ্টি ও ঐতিশ্যিক দুইই।

অভিনয়—ভাবশিল্প, কথা ও ভঙ্গ চালনা দ্বারা কোন ভাবকে ফুটিয়ে তোলা। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সঙ্গীত ও নৃত্য দুই-ই। সেও ঐতিহ্য ও দৃষ্টি শিল্প।

কোন সন্দেহ অতীতে মানব জীবনে শিল্প বা চিত্রশিল্পের আবির্ভাব হয়েছিল তার সঠিক হিসেব নেই। তবে এ ধারা যে দিকে দিকে দেশে দেশে মানুষের ভেতরে বিকাশলাভ করেছিল তার বহু নিদর্শনই সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে রয়ে গ্যাছে। আবার দেশে দেশে কালে কালে চিত্রের ধারাও বদলে যায় যা কি না ছবি দেখতে না আবশ্য করা পর্যন্ত বোঝা যায় না। একবার এক টুকু চর্চা করলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, শুধু দেশে দেশে বা কালে কালেই এর বিভেদ হয় না, এমন কি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও এর বিভেদ হয়ে থাকে। সাইন্সিটান, ইজিপ্সিয়ান প্রভৃতি অনেক শিল্পধারাই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গ্যাছে। বর্তমান কালে সারা পৃথিবী-ব্যাপী যে ধারা চলেছে তাকে খুল ভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা চলতে পারে। যথা—

- ইউরোপীয়ান স্কুল।
- আরারবিক ও পার্শীয়ান স্কুল।
- ইণ্ডিয়ান স্কুল।
- চায়নীয় স্কুল।

‘স্কুল’ কথাটার অর্থ হলো এক একটা ধারা। একবার ছবি তাক্সা আবস্ত করলেই এদের ভেতরকার তফাত বেশ বুঝতে পারা যায়। এদের সবারই বিষয়বস্তু এক, সাধারণ প্রকৃতি, আকাশ, গাছপালা, মানুষ, পশু-পক্ষী, সাপ-মাছ, পোকা-মাকড়, স্বর্ধ্যাস্ত-সূর্যোদয়, দিন-রাত্রি, বর্ষা-বসন্ত-শীত অর্থাৎ যা কিছুই প্রতিদিন দেখতে পাই আমাদের চোখের সামনে। দেব-দেবী, পরী-স্ত্রী, ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোঙ্কসের কাল্পনিক ছবিও অবশ্য আছে। অশ্চর্য সারা পৃথিবীর অঙ্কন-রীতি বিভিন্ন। চীন দেশের ছবি দেখে চীনে মানুষের চোখ মুখ বা অঙ্গ সজ্জা দেখেই তা বুঝতে হয়না, ছবির আঙ্গিক দেখলেই তা বোঝা যায়।

পার্সীয়ান বা আরারবিক ছবিও তাই। তাদের কাজ অতি সূক্ষ্ম এবং সে বিশেষ ধারা বুঝতে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের কোনই কষ্ট হয় না, কারণ ভারতবর্ষে ইয়েজ আসবার আগে সে ধারা অত্যন্ত চলেছিল। মুসলমান নবপতি এবং আরব ও পারস্যের জনসাধারণ সে ধারা নিয়ে এসেছিল ভারতবর্ষে।

ইউরোপীয়ান শিল্পধারাটি বর্তমানে পৃথিবীর দরবারে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষিত হয় এবং তারাই পৃথিবীর সমস্ত ভায়গায় অল্প বিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছে। তা' বলে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব আর আসন দেওয়া চুল। শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতা বা নিরুপুষ্ঠতা বলে কোন বস্তু নেই ও একটা দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র। তবে ইউরোপীয়ান শিল্পধারা যে একটা অত্যন্ত ব্যাপক স্থান অধিকার করেছে এবং পৃথিবীর সকল স্থানেই সকল লোকের ভেতরেই তার কিছু না কিছু চর্চা হচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইউরোপীয়ান শিল্পের বিশেষ বিশেষ এর বাস্তবতা থাকে বলে Photographic approach.

ভারতীয় চিত্রকলা বলতে অনেক ব্যাপক ধারা বোঝায়। ভারতবর্ষ বহু দিন ধরে বহু বিভিন্ন জাতির অধীনতা-পাশে বহু ধারার ভারতীয় শিল্পধারার উপরে বিভিন্ন ধারার যত প্রভাবপাত হয়েছে, এমন বোঝ করা আর কোন দেশেই হয়নি। উপরন্তু আমরা এ দেশের বাসিন্দা হওয়ায় এখানকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিল্পরীতির স্ফুর্তিস্বক প্রভেদ সহজেই ধরতে পারি। যেমন ত্রাখা যায় রাজপুত বা কাঙা স্কুলে। এই ছুই স্কুলেরই উদ্ভব হয়েছিল ভারতবর্ষে যোগল ও পাঠান রাজত্বের সময়, তাই তাদের দুয়েরই ধারার উপরে যোগল এবং পাঠান চিত্রধারার প্রভাব অত্যন্ত বেশী রকম পড়েছে। ভারতীয় স্কুল বলতে সারা ভারতব্যাপী বিভিন্ন কালের বিভিন্ন স্কুল দেখতে পাওয়া যায়। সুদূর অতীতে ভারতবর্ষে ছিল এক শিল্পধারা যার নিদর্শন রয়ে গ্যাছে অজন্তা-এলাবারা। এই শিল্পধারাই প্রভাব রয়েছে সিংহলের সিগিরিয়া, অম্বরাসাপুর, কাণ্ডী প্রভৃতি স্থানে। এঁরা পরত গারে পাথর কেটে গুহা বা গুহা নির্মাণ করে তার দেয়াল ও ছাত চিত্রণ করেন, কাগজ বা কাপড়ে আঁকা কোন চিত্রের নিদর্শন এঁরা রেখে যাননি।

ভারতের প্রদেশে প্রদেশে চিত্রশিল্পের বিশেষ এক একটি ধারা রয়েছে। বাংলাদেশে আছে 'পট'। এই পটশিল্প বিকাশলাভ করেছিল মন্দিরের ধারে ধারে। এই পটের স্বত্বিকর্তারা ছিলেন শিল্পী পরিবার। বাসার সবাই আঁকতেন ছবি, অনেক সময় ছবিতে 'শ্রমভেদ' বা Division of labour ও অবলম্বন করা হতো। তা' এই রকম, বাড়ীতে হয়তো 'শেব স্পর্শ' বা Finishing touch দিতো গুস্তা বাড়ীর কর্তা যিনি বহু দিন ধরে বহু ছবি একে উজ্জ্বলের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁর পক্ষে কাগজের প্রদেপ তৈরী করা বা এমন কি ছবির নক্সা বা ড্রই করাও সময়ের অপব্যয়। তাই বাসার আর সবাই যার যেদিকে হাত তাই ঠিক করে দিত আর শেষে গৃহকর্তা তাঁর শেষ গুস্তাদি লাগিয়ে দিতেন তাতে। তাঁদের স্মৃতি ছিল এই যে, তাঁরা নিতান্ত নূতন ছবি আঁকতেন না। তাঁরা প্রায়ই আঁকতেন দেব-দেবীর ছবি, সেই জন্ত বাগা বরা নক্সা তাঁদের প্রস্তুতই থাকতো। মন্দিরের কাছেই বাজারে বা মেলায় যে শোক সমাগম, হতো তারাই ছিল তাঁদের খরিদার। র এক রেখা দুয়েরই কারবার ছিল তাতে। উড়িয়ায় ছবি বিকাশলাভ করে বেশী বইয়ের মলাটে এবং ভেতরকার চিত্রকে অবলম্বন করে। তার সঙ্গেও বাঙালার পটের বেশ সাদৃশ্য আছে।

দক্ষিণ ভারতের মাতুরার একটি ধারা বিকাশলাভ করে তা' একবারেই দক্ষিণী। এদের অনেক নিদর্শন রয়েছে মন্দির-গাত্রেই দেয়াল-চিত্রে। এই ধারাই ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্য ও মালাবারে প্রবেশ করে। তবে সেখানে গিয়ে মালাবারবাসীদের হাতে একটু ভিন্ন ধারা প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণে আর একটি যে বিশেষ ধারা বিকাশলাভ করেছিল, তাকে বলা হয় তাম্রোয় স্কুল। এঁরা ছবিতে সোনা রূপোর পাত প্রবাল এমন কি হীরে মণিমুক্তা পর্যন্ত ব্যবহার করতেন। তা ছবির ভিতরে বিশেষ পঙ্খক্তিতে আটকে দেওয়া হতো। সে সব ছবি শৈলীতে না হলেও বস্তবাত্মক হতো অত্যন্ত মূল্যবান।

এমনি ধারা হায়দ্রাবাদ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, বিহার, গাঁড়হায়াস, সকলেরই একটা বিশেষ বিশেষ ধারা

ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই এখনও রয়েছে। এমন কি, কোল, ভীল, সাঁওতাল, টোড়া, পুন্ডাইয়া, মুণ্ডা, ওরাও এদেরও ধারার একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাৎ বেশ বুঝতে পারা যায়। বিশেষ শৈলী ছাড়াও বিষয়বস্তুর ভেতরেও নানা জিনিষ ত্রাখবার আছে যা ছবি ত্রাখা আরম্ভ না করা পর্যন্ত বোঝা যায় না। পূর্বের দিনের ছবির বিশেষ বিষয় ছিল দেব-দেবী, পুরাণ-রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনা নিয়ে ছবি। রাজা-রাজ্ঞার আলকো ও তাদের দরবার যুদ্ধ বা নীকার কাহিনী লিখেও ছবি আঁকা হতো। চাণাভূসো, সোঁকান পাটী রাস্তা-ঘাটের ছবি প্রায় ছিলই না। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ছিল সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, চন্দ্রালোকিত রাত্রি, বিদ্রোহ-বিদ্রোহ বর্ষা, পুষ্পভারাক্রান্ত বসন্ত, এরা বর্ষা ও বসন্তের বিপুল ও সূক্ষ্ম রূপ সম্ভার শিল্পীর মনকে চিরদিনই আকর্ষণ করেছিল।

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়। আর ঐ হিমালয় টানের দক্ষিণে। হিমালয়বাসী মানুষদের দেখে মনে হয় চীনজাতি হিমালয়কে যত বেশী সফর করেছে, ভারতবাসী তার কিছুই করেনি। নেপালী, ভূটানী, তিব্বতি এঁরা সবাই মঙ্গোলীয়ান জাত, চীনও তাই। তাই সর্বদাই তাদের চেহারা ও কৃষ্টিতে মিল। সেই কারণেই ঐ সব দেশের শিল্পধারায়ও চীনের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বর্তমানে যদিও এরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বুদ্ধের ছবিই ওদের দেশে বেশী মেলে তবু কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ, যম বা রাম-রাবণ, অশ্বত্থ, ভীম, দুর্গোপদেবীর ছবিও এদের দেশে অনেক পাওয়া যায়। মণিপুরীরাও মঙ্গোলীয়ান জাতি এবং মণিপুরের শিল্পধারাও ওদেরই গা-বেঁধা।

এই হলো মোটামুটি ভাবে ভারতীয় শিল্পকলার বিবরণ—প্রদেশে প্রদেশে—অতীতে। বর্তমানে কোন কোন জায়গায়, ধারার পরিবর্তন হয়েছে বটে কিন্তু সব জায়গাতেই তা হয়নি। আবার কোথাও কোথাও নূতন ধারাও চুকছে, পুরোনো ধারাও মরবার মত হয়ে বেঁচে আছে। ইংরেজ এদেশে আসবার পর এদেশের শিল্পের দরবারে একটা নূতন ধারা ঢোকে তা একেবারে বিলেতী। সেই সময় অনেক শিল্পীই সেই ধারা শিখতে থাকেন কেউ বা ব্যক্তিগত সাহেব শুস্কর কাছে, কেউ বা সঙ্গ-প্রভুক্তি আট-স্কুলে। সেই আমল থেকে বহু ভারতীয় শিল্পী বিলেতী ধারার চর্চা করেছেন এবং এখনও করছেন। এঁদের অনেকের নামই প্রকৃত মেধা থাকলেও বিজ্ঞানের অভাবে জনসাধারণের মন থেকে মুছে গ্যাছে। তবুও অনেক শিল্পীই রয়েছেন কালের কাছে ধীর অমর আসন পেয়েছেন। হু' একজনের নাম করতে হলে বলতে হয় ত্রিবাঙ্কুরের রাজ-পরিবারের রাজা রবি বর্মা, মহারাষ্ট্রের মিঃ এম. ডি. ধুরন্ধর, বোম্বের মাতায়ে, বালা দেশে শিলাচাঁগ স্বর্গীয় যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী ইত্যাদি। গুরু অবনীন্দ্রনাথ 'বেঙ্গল স্কুল অব পেইন্টিং' প্রবর্তন করবার আগে পাশ্চাত্য ধারায় অতি সূক্ষ্ম 'অয়েল পেইন্টিং' করতেন। আলোচ্য-চিত্রে তিনি ছিলেন অতি সূক্ষ্ম কারিগর। রাজা রবি বর্মা ও অবনীন্দ্রনাথ সমসাময়িক কিন্তু সাধারণতঃ বিশেষ ভাবে বাঙালার লোকের ধারণা রবি বর্মা অবনীন্দ্রনাথের পূর্বসূর। এ ধারণার কারণ রবি বর্মা অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন পরবর্তী কালেও দেশের লোক অবনীন্দ্রনাথকে নূতন স্টাইল দেখেছে খনন রবি বর্মার শুধু পুরোনো 'প্রিন্ট' ছাড়া আর কি

সেখানে পায়নি। রবি বর্মা একবার কলকাতা এসে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই দুই মনীষীর সাক্ষাৎকারের কোন বিবরণ কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখেনি।

এঁদের পরবর্তী কালে ধারা পাশ্চাত্য শিল্পপথ অবলম্বন করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রবি বর্মার স্মরণযোগ্য ভ্রাতা রাজা রাজা বর্মা, বোধাইয়ের মিঃ যোশী, পাঞ্জাবে মিঃ ঠাকুর সিং, বাঙলা দেশে স্বর্গীয় ভবানীচরণ লাহা, স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু প্রভৃতি। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, এদের কার্যবহু উল্লেখযোগ্য সাংগ্রহ এখনও দেশে তৈরী হয়নি।

অবনীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেন 'বেঙ্গল স্কুল'। পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি পাশ্চাত্য শিল্পধারার অতি সূক্ষ্ম কারিগর ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন কলকাতার আর্ট স্কুলের তদানীন্তন অধ্যাপক ই. বি. হাভেল। অধ্যাপক হাভেল ভারতবর্ষ ঘুরে এখানকার যে শিল্প-সম্পদ দেখলেন, তাতে তাঁর চিন্তাধারা একেবারে ঘুরে গেল। তিনি পাশ্চাত্য ধারা বাদ দিয়েও প্রাচ্য রীতিতে ছাত্রদের ছবি আঁকাতে চাইলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম শিষ্য এবং সর্বাধিক রসজ্ঞ শিষ্য। তাঁর অক্লান্ত আদর অনুবক্ত দান বিষয়কর। অবনীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে বাঙলা দেশে সার্ব মিত্তিক্রিয়া তৈরী হওয়া উচিত।

অবনীন্দ্রনাথ 'বেঙ্গল স্কুল' তৈরী করে তাঁর পাশ্চাত্য পদ্ধতির জ্ঞান ও ভারতীয় পদ্ধতির প্রাণ ছবির ভেতরে ঢোকালেন আর তাতে সংযোজন করলেন জাপানী মূর্থে দেওয়া বা wash। তাঁর প্রথম যুগের ধারা ছাত্র, তাঁদের সকলের ছবিই যদিও এই পদ্ধতিতে আঁকা, তবু প্রত্যেকের ছবির ভেতরেই বিশেষ ব্যক্তিত্বটি একটু দেখলেই ধরা পড়ে। এঁদের দলে নাম করতে হলে বলতে হয় নন্দলাল, চাখতাই, উকিল, হালদার, ক্ষিতীন মজুমদার প্রভৃতি।

বাংলার পটের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই পটের পটভূমিকায় আর একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন শ্রীযুক্ত যামিনী বায়। এরও শিক্ষা আরম্ভ হয় পাশ্চাত্য ধারার কলকাতা সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ে। তার পর তিনি বেঙ্গল স্কুল অব পেইন্টিং দ্বারা প্রভাবান্বিত হন, এবং সেই ধরণে wash এর ছবি আঁকা আরম্ভ করেন। সেই পদ্ধতিতে যখন তিনি স্বপ্নের শিল্প সৃষ্টি করছেন এমন সময় হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন বহুদিন উপেক্ষিত বাংলার পট এবং পটুয়াদের, এবং সেই প্রাচীন পটকে তাঁর পাশ্চাত্য শিল্পের ও বেঙ্গল স্কুলের জ্ঞানের ভিত্তিতে ঢেলে আরম্ভ করলেন পরীক্ষা নিরীক্ষা। প্রথম প্রথম এঁকে অত্যন্ত বিরোধিতা সহ করতে হয়েছিল কিন্তু দেশবাসী তার মহতী প্রচেষ্টার মধ্যাঙ্গ বুঝতে পেরে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়েছে এবং বর্তমানে তিনি এই পট চিত্র নিয়েই রয়েছেন। যামিনীবাবুর পট টিক বাঙলার প্রাচীন পট নয়, তবু সেও পট এবং বাঙলার শিল্প-সাধারণ একটি বিশেষ ধান।

আর একটি ধারার প্রবর্তন করেন শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, তা' বিশেষ ভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিশ্রণ। শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর কণ্ঠক্ষেত্র বাঙলার বাইরে হওয়াতে তাঁর ধারা বাংলার শিল্পরাজ্যে বেশী প্রভাবপাত করেনি।

বাংলার পটুয়াদের মধ্যে সামান্য কয়েক ঘর মাত্র বেঁচে আছে, কলকাতায় ও কলকাতার আশে পাশে। তেমনি সামান্য কয়েক ঘর

মাত্র শিল্পী বেঁচে আছে তাঁজোর জেলায় ধারা এখনও তাঁজোর পেইন্টিং করেন। কিন্তু আনুসৃত্য না থাকায় তাঁদের সৃষ্টিও অতীতের সে স্তরমক ও জৌলুস নেই এবং বহুদিনের অনাদরে আঙ্গিকও অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। মাদ্রাসার একটি লোকও নেই। রাজপুতানা বা কাড্ডার অবস্থাও তাই। তবে চারু শিল্পের ভারতীয় বিশেষ পদ্ধতিটি যা খেলেও ভারতবর্ষের কারুশিল্প প্রায়ই বেঁচে আছে যার ভেতরে ভারতীয় প্রাণধারার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

অবনীন্দ্রনাথের বেঙ্গল স্কুলও বর্তমানে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আধুনিক শিল্পীদের ভেতরে বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠী নেই। তারা বহু দলে বিভক্ত, তবে মনে হয় বেশীর ভাগই ফরাসী 'ইমপ্রেশনিজম' এবং আরও অনেক 'ইজম' এরই পক্ষপাতী। তাঁরা সবাই বর্তমানে নানা ধারা নিয়ে চলেছেন। সহসা লোকের চোখে এ পরিস্থিতিতে ভাস্কর বলে মনে হতে পারে কিন্তু এ যে নব যুগের গড়নেরই পূর্বসূরী নয়, এ কথাও বলা কঠিন।

মোটের ওপর জ্ঞাখা গেল শিল্প-কলা কোন একটা বিশেষ ধারায় বা বিশেষ জায়গায় ঠাঁড়িয়ে নেই, যদিও গোড়াগড়ি সব দেশেই তার একটা চারিত্রিক বিশেষত্ব রয়েছে। সাধারণ ভাবে ভারতীয় শিল্পকলার ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার আভ্যন্তরীণ তফাৎ বিচার করতে গেলে বলতে হয় পাশ্চাত্য শিল্পকলা বাস্তবতামূলক বা 'রিয়ালিস্টিক'। আরও সহজ করে বলতে হলে বলতে হয় পাশ্চাত্য শিল্পকলা সম্ভ্রামূলক বা 'ডেকোরিভ'। প্রায়ই অদীক্ষিতের কাছ থেকে এই প্রশ্ন শোনা যায় যে, তোমাদের ছবির চোখ হাত পা ও বকম লম্বা কেন, কোমর অত সূক্ষ বা কাঁধ অত মোটা কেন? তার উত্তরে বলতে হয় ওটা জোর বা 'একসেনচুয়েশন' (accentuation)। দৈনন্দিন জীবনে যখন আমরা কথাবার্তা বলি তখন যদিও আমাদের সেই সময়কার মানসিক পরিস্থিতির উপরে তার প্রকাশ ভেদ হয় তবু সেটা ততটা লক্ষ্যীয় নয় বরং যখন আমাদের সেই সলোপট বলতে হয় রঙ্গমঞ্চ বা রূপালি পর্দায় উঠে। একটা বিশেষ অবস্থাকে বিশেষ ভাবে বোঝান। ভারতীয় চিত্রকলা বা ভাস্কর্যও তাই। সেই শিল্পীরা—আমরা সহজ চোখে প্রকৃতিকে বা দেখি তার চাইতেও একটু এগিয়ে শরীরের বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরে জোর দিয়ে বা জোর কমিয়ে দিয়ে শিল্পীর মানসলোকের রূপ সৃষ্টি করেছেন বা করবার চেষ্টা করেছেন এবং সেই রীতিই ফুটিয়েছেন দৃশ্যপট ও আনুসঙ্গিক সমস্ত ব্যাপারেই। এ কথা—যতক্ষণ ছবি জ্ঞাখা আরম্ভ না করা যায়, ততক্ষণ কিছুতেই ক্ষয়ক্ষম হয় না। তার পরেও একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবি মাত্রই উৎকৃষ্ট নয় এবং পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে আঁকা ছবি মাত্রই নিকৃষ্ট নয়। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে আঁকা ছবি মাত্রই উৎকৃষ্ট নয় এবং ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবি মাত্রই নিকৃষ্ট নয়। রসের বিচারে পক্ষপাতিত্বের স্থান নেই। হু' পক্ষেরই গুণান এবং হু' পক্ষেরই হাতুড়ের দল আছে। তবে কোন পক্ষের কোনটি উৎকৃষ্ট বা কোনটি নিকৃষ্ট কাজ, তা বুঝতে অনেক সময় ও অনেক চর্চার প্রয়োজন হয় এবং তা বোঝবার পরও অনেক ক্ষেত্রেই তা' সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ও দর্শকের ব্যক্তিগত রুচির ইস্যায় মাত্র। বহু দিনের পরিশ্রমে, বহু চর্চায় জাগ্রত সেই রুচিবোধই ছবি জ্ঞাখার প্রধানতম আনন্দ ও এই সূক্ষ্ম সাধনার সঙ্গকার পুঙ্খানুপুঙ্খ।

# রবীন্দ্রায়ণ

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

## ১৮শ শতাব্দীর চট্টোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মদিন ১৮৬১ সাল বাঙলা দেশে বাঙলা সাহিত্যে ও ঠাকুর-পরিবারে একটি স্মরণীয় বৎসর। এ বৎসর বাঙলা সাহিত্যে নবযুগের অবতারণাকে বাঙলার গুণিসম্প্রদায় প্রকাশ্য ভাবে বরণ করিয়া লন। জোড়াসাঁকোতে ঠাকুর-বাড়ির পার্শ্ববর্তী সিংহ-বাড়িতে বিজ্ঞানসাহিনী সভার উদ্বোধনে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ বঙ্গভারতীয় পূজারিবৃন্দ বঙ্গসাহিত্যে ভিক্টোরিয়ান যুগের অভ্যুদয়ের অগম্য মাইকেল মধুসূদনকে বাঙলা কাব্যে নবধারা অমিত্যাক্ষর ছন্দ প্রেরণ আনয়নের জন্ত প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করেন।

বিরাট পুরুষ রবীন্দ্রনাথ কেন, যে কোনো জীবনীই ইতিহাস, সে কারণ কবিগুরু জন্মের অব্যবহিত পূর্বে, জন্মের সমসাময়িক ও অব্যবহিত পদের সময়ে দেশে যাহা যাহা প্রধান ঘটনা ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছায় ঘটিয়াছে, তাহাও কিছুটা লিপিবদ্ধ করা অবশ্যক এবং তাহার মধ্যে তদানীন্তন সমাজ বলিতে দেশের লোকের জীবন-যাত্রার ধারা, দেশের আইন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাও ধরিতে হইবে এবং সে কারণ দেশের প্রধান প্রধান ব্যাপারের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে যে যে বৎসর তন্মধ্যে ১৮৬১ সন্থকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। প্রথমই আইন সঙ্ক্রান্ত বিষয় কিছুটা হইল এই যে, ১৮৬১ সালে একতা সূত্র একটি ব্যাপারে দৃঢ়তর হয়। সরকার বিচারপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন করেন। এতদিন বিচার কার্য দুই প্রকার স্বতন্ত্র প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইতেছিল, সমগ্র ভারতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের কার্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ কর্মচারীর দ্বারা নিষ্পন্ন হইত এবং তাহার শেষ নিষ্পত্তির জ্ঞান (আপিলে) কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল আদালতের ভাষা প্রথমে উর্দু পরে বাঙলা হইয়াছিল। এই দুই আদালতের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল হইত। মুসলমান আমল হইতে কোম্পানির আমল পঞ্চম্বে এদেশে যে সকল আইন প্রচলিত ছিল, বিচারকার্যে তাহাই গ্রহণ করা হইত। কেবল কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ—এই তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরের জন্ত তিনটি সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার বিচারক বিলাত হইতে কেবল ব্যারিষ্টারেরাই নিযুক্ত হইয়া আসিতেন এবং তাঁহার বিলাতি Equity এবং Common Law অনুসারে বিচারকার্য নিষ্পন্ন করিতেন। ১৮৬১ সালে স্থির হইল যে, ভারতবর্ষে এই দুই প্রকার বিচারালয় রহিত করিয়া একমাত্র হাই কোর্ট উচ্চতম আদালতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাতে একটি আদিম বিভাগ

(Original jurisdiction) এবং একটি আপিল বিভাগ (Appellate jurisdiction) থাকিবে এবং তাহাতেই কলিকাতা প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি শহরে ও প্রদেশগুলির সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্য একই আইনের দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে। হাই কোর্টে বিচারক পদে বিলাতি ব্যারিষ্টার, সিভিলিয়ান এবং ভারতীয় ব্যবহারজীবী বিলাত হইতে নিয়োগপত্র পাইয়া নিযুক্ত হইবেন ও হাই কোর্টগুলি ভারত গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। তদনুসারে মহারাজা ভিক্টোরিয়ার লেটসার পেটেন্টের দ্বারা কলিকাতা হাইকোর্ট ১৮৬১ সালে গঠিত হয় এবং রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, সদর দেওয়ানী আদালতের সরকারী উকিল, রমাপ্রসাদ রায় প্রথম ভারতীয় বিচারক মনোনীত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাই কোর্টে যখন ১৮৬২ সালে কাজ আরম্ভ হইল তখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের অল্পতম প্রধান উকিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত তাঁহার স্থানে কলিকাতা হাই কোর্টে প্রথম ভারতীয় বিচারক বা পিউনি জজ নিযুক্ত হইলেন। ইনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ হইলেও বাঙলা দেশবাসী হইয়াছিলেন। ইহার পুত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত সরস্বতীও বঙ্গ সাহিত্যে পরিচিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু ও পিতা শম্ভুনাথের ছাত্র প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ছিলেন।

পাঞ্জাব হইতে বাঙলা—উত্তর ভারতের জন্ত একটি সর্বোচ্চ আদালত কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং গমনাগমনের সুযোগ বর্ধিত হওয়ায় কলিকাতায় সকল প্রদেশ হইতে অধিকতর সংখ্যক লোকের সমাগম হইতে লাগিল ও সকল প্রদেশবাসীর সচিত্র বাঙালীর সহজাত বুদ্ধির সন্যোগ হইল। একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিবারও লীজ বপন হইল এবং কালে ইহা হইতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিল।

১৮৬১ সালে মধুসূদনের ‘আত্মবিলাপ’ তত্ত্বাবধিনি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার পরের বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ের বদাশ্রিত্য ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্ত তিনি বিলাত যান ও তিন বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা হাই কোর্টে ব্যারিষ্টারি কার্য আরম্ভ করেন। এই ১৮৬১ সালে বাঙলার আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের উর্গাতা ও বহু তথ্যবস্তুর আবিস্কর্তা আচার্য দাস প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রবিধি (Constitution) কী ভাবে হওয়া উচিত—তাহার খসড়া প্রস্তুত করিয়া দেশে ও বিদেশে মনীষীরূপের নিকট যিনি যশস্বী ও বরণ্য হইয়াছিলেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতায় (পার্ক সার্কাসে) অধিবেশনের সভাপতি, এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পরশরাম



# লক্ষ্মীবিলাস

কেস ঔল

\*  
এম. এল. বসু স্ট্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লি:  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-২

পণ্ডিত। তিলিলাল নেহরুরও এই ১৮৬১ সালে কবির সহিত একই দিনে জন্ম। সূত্রবা দেখা যায় একই বৎসরে ভারতের ভাগ্যবিধাতা কাব্যে, বিজ্ঞানে ও রাজনীতিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবার জ্ঞাত তিনটি প্রতিভাশালী পুরুষের সৃষ্টি করেন। ভারতগগনে যুগপৎ Three stars of the first magnitude on the ascendant-এর সমাবেশ। আমাদের ধর্মজগতে নবপ্রাণ সঞ্চারকল্পে কিছুকাল পূর্বে মহাসাধক পরম ভট্টারক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শুভাবির্ভাব হয়। ১৮৬১ সালেরই (বাঃ ১২৬৮) ভাগ্যে দেখা ঘটিল তিনি লোকহিতার্থে বাঙলার পঞ্চবটী মূলে ‘পরমহংসদেব’ রূপে প্রকট হইয়াছেন। ক্রমে তাঁহার রক্ষিচ্ছটা সাগরপারের পশ্চিমাকাশ প্রাপ্ত পথন্ত আলোকিত করিল।

এতদ্ব্যপেক্ষ ১৮৬১ সালের কথা বলিতেছিলাম। কবিগুরুর প্রাক জন্মকালে ও জন্মের অব্যবহিত পরের সময় দেশের পটভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ১৮৫৬ তইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত এই দশ বৎসর একটা যুগসন্ধি বলিলে অস্মার হয় না। নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাঙলা দেশে, হিন্দু সমাজে একা বাঙলা সাহিত্যে যে সকল পরিবর্তন আসিয়াছে, ঠাকুরপরিবারের চিন্তাধারার ও জীবনযাত্রার উপরেও তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

১৮৬০ খৃঃ নীলকর বিষধরদংশনকাতর প্রজ্ঞানিকর ক্ষেমকরণ কেনচিত পথিকের দ্বারায় প্রকাশিত হইল। রচয়িতার নাম না থাকিলেও নীলদংশনখানির সাহিত্যিক মূল্য ব্যতীত আর একটা বিশেষ মূল্য আছে। নীলকরের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ইহা সহায়তা করিয়াছিল এবং সে সিঁহায়ে ইহা ইংরাজি সাহিত্যে দাসপ্রথার বিরোধী আন্দোলনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘Uncle Tom’s Cabin’-এর সহিত সর্বথা তুলনীয়। পরে প্রকাশ পায় ডাকবিভাগের পরিদর্শক, বঙ্কিমচন্দ্রের ‘অভিন্ন সুহৃদ’ স্তবকবি দীনবন্ধু মিত্র, যিনি পরে একজন সুদক্ষ নাট্যকার বলিয়া পরিচিত হন, এই পুস্তকের জনক। কিন্তু ইহার অল্পবাদ করিয়া গাদরিং সাহেব স্বজাতির বিরোগভাজন হন ও তাহার ফলস্বরূপ ইংরাজের উচ্চতম আদালত কর্তৃক ইংরাজ সম্প্রদায়ের কুংসা প্রচারের জ্ঞাত হাজার টাকা অর্থদণ্ডে ও এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মহাপ্রাণ কালীপ্রসন্ন সিংহ তদুপেই আদালতে ঐ টাকা দাখিল করিয়া দিয়া বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেন।

এই সময়েই সুপ্রিয় কোর্টের বিচারপতি সার মর্ডান্ট ওয়েল্‌স্‌ বিচারাসন হইতে বাঙালী জাতির প্রতি যে সকল কটুক্তি প্রায়ই ব্যবহার করিতেন, বাঙালী তাহা নতমন্তকে সহ্য করিয়া লয় নাই। বিচারকের এই সকল কটুক্তির প্রতিবাদের জন্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পরে মহর্ষি), বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পরে মহারাজা বাহাদুর সার), কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ কলিকাতার নেতৃবৃন্দ রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে অগ্রণী করিয়া শোভাবাজারের রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ এক বিরাট জনসভা করেন। এই জনসভায় বাঙালীর সচেতন আত্মসম্মান বোধের প্রমাণ পাইয়া, আমরা হৃৎস্রোত ভাষায় বলি “নাটমন্দিরস্থ পাথরের গুরুড়েরাও ডানা মেলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।” ফলে টেকচাঁদেব পিসীর মুষ্টিযোগ “নারকেল মুড়ি ও ঠনঠনের নিমকির” প্রয়োগ না করিয়াও ওয়েল্‌সের মুখরোগ সারিয়া গেল। “ওয়েল্‌স ব্রেক হইলেন।” বসন্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ

এই নামে “বেওয়ারিশ লুচির ময়লা” বাঙলা ভাষায় ঘরোয়া কথাবার্তায় ‘তলানীন্তন কলিকাতার সমাজের কতকগুলি নক্সা আঁকিয়া “এই এক নতুন” বলিয়া বাঙলার রসপিপাসুদের নিকট আসিয়া ঠাঁউইলেন। ইহা যেমন অভূতপূর্ব তেমনি আজ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছে।

বাঙালী এই সময়ে আর একটি ঘটনায় নিজের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সিপাহী বিপ্লবের সময়ে কলিকাতার ইংরাজেরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কলিকাতায় মাণাল ল প্রচারের জন্ত বড়লটি ক্যানিং-এর নিকট বারবার জেদ করিতে লাগিল। কিন্তু লর্ড ক্যানিং, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর (পরে মহারাজা), রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ও তাঁহাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে কিছুতেই মাণাল ল প্রচারের সম্মতি দিলেন না। ইংরেজ সম্প্রদায় বিদ্রোহ করিয়া ক্যানিং-এর নাম দিলেন ‘দয়ার অবতার’ (Clemency Canning) এবং তাঁহার বিনায়কালে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে অসম্মত হইলেন। বাঙালী নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে ১৮৬২ সালে একটি সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থাও করিলেন।

ইতিমধ্যে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লেডী ক্যানিং-এর মৃত্যু হওয়ায় বাঙালী জাতির প্রতি তাঁহার সন্মমততা ও সমাহৃতিব কথ্য চিহ্নদ্বারা জাগরক রাখিবার জন্ত বাঙালী তাহার দৈনন্দিন গৃহস্থানার মধ্যে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত করিল। চিরপ্রচলিত ছানাবড়া পরিবর্তিত আকারে লেডী ক্যানিং নামে মিঠাম-সমাজে স্থান পাইল এবং পরে তাহাই লেডীকেনি নামে বাঙলার শহরে ও পরগণায় সংজ পরিচিত।

সিপাহী-বিপ্লবের পর কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়া ভারত রাণী ভিক্টোরিয়ার রাস রাজত্বের আশীষিত হইল। বড়লটি তখন হইতে বড়লটি ও রাজপ্রতিনিধি হইয়া ভারতের সারক্ষণের ব্যবস্থা রাজধানী কলিকাতায় বসিয়া করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় এক বেলপথের ও টেলিগ্রাফের বিস্তারে, কারণ ১৮৫৭ সালে মোটে আসানসোল পর্যন্ত রেলপথ হইয়াছিল, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রকৃষ্ট যোগ হওয়ায় দূরত্ব-ব্যবধান, বহু সময়ক্ষেপ এবং গমনাগমনের যোরতর বাধা অপসারিত হওয়ায় প্রদেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতাবোধের সঞ্চার হয়। তখন কলিকাতা হইতে হাওড়ায় নৌকায় পারাপার হইত। বহু বৎসর পরে ১৮৭৩ খৃঃ সার ব্রাডফোর্ড লেসলি ভাসমান হাওড়া পোল শ্রমন্ত করিয়া কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যোগসাধন করেন। এই বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হুভিক-পীড়িতের সাহায্যের জন্ত কলিকাতার নেতৃবৃন্দ টাউন হলে সভা করিয়া অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন এবং হুভিক-পীড়িতের সাহায্য দানে সফলকাম হইলেন।

এদিকে সে যুগে যেমন নানা ঘটনাপ্রস্রোতে পুরুষদের নানা উন্নতি হইতে লাগিল, দেশের মাতৃজাতিও যে অন্ধকার গহবরে নিশ্চেষ্ট ভাবে কালান্তিপাত করিতেন তাহা নহে। মহর্ষির পিতামহ রামমণি ঠাকুরের সময় হইতে তাঁহাদের পরিবারে স্বাধিকার প্রচলন সধকে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মহর্ষির মধ্যমা পিসী এবং লেখকের বৃদ্ধা শ্রীপিতামহী রাসবিলাসী দেবীর একখানি পুঁথি হইতে জানা যায় মহিলা শিক্ষকার বাড়ীর মেয়েদের স্তবাবলীর সাহায্যে সঙ্কত শিক্ষা



দিতেন। আমার খুশিপিচামত গোকুলনাথ বলিতেন যে তাঁহার পিতামহী উক্ত বাসবিলাসী দেবীর মুখে শুনিয়াছিলেন যে, বিবাহের পর দুই তিন বৎসর মেয়েদের সন্তুত শিখিতে হইত। ১৮৫০ সালের ৬ই নভেম্বর অপরাহ্নে কলিকাতা শিমুলিয়া পল্লীতে একটি নারীশিক্ষা মন্দিরের ভিত্তি সমারোহের সহিত স্থাপন করা হয়। সম্ভ্রান্ত বাঙালীদের অনেকের উপস্থিতিতে একটি অশোক গাছের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নিকটে ভিত্তি প্রস্তর অস্থাপনপূর্বক প্রার্থিত করেন ও বাইট্‌ন (Bethune) অশোক গাছের পাতা ছিঁড়িয়া ভূস্বামীর নিকট হইতে জমি ও ভিত্তির দখল লন। ভূমিখণ্ডটি দান করেন পাথুরিয়াঘাটার স্বর্গকুমার ঠাকুরের দৌত্বের রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তদানন্তর আইন-সচিব মাননীয় জন ইলিয়ট জিকেরওয়ার্টার বাটন (পূর্বাঙ্গ) বাঙলা ভাষায় হুই-বিজালয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই বিজালয়ের নাম বাইট্‌ন স্কুল ও পরে বাইট্‌ন কলেজ হয় কিন্তু সেদিন বিজালয়ের নামকরণ হইয়াছিল “হিন্দু বিমেল স্কুল।” স্বাধীনতার জগৎ আগ্রহযুক্ত যে সকল ভ্রমণের চেষ্টায় যত্ন ও অর্থ ইত্যাদি উদ্বল, তন্মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন অগ্রগণ্য। নারীশিক্ষার প্রতীকস্বরূপ অশোকতরু স্থাপন দক্ষিণারঞ্জনের সৌন্দর্য্য বোধ উদ্ভূত করিয়া (Aesthetic consciousness)। ঈশ্বরচন্দ্র বিজয়দেব ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার ইত্যাদি স্বপক্ষে ও উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। “স্বাধীন ভাষ্যের” সম্পাদক ‘গুডফ্রাউন্ডলি’ গৌরীশঙ্কর তর্কালঙ্কার ইত্যাদি বিশেষ পোষকতা করেন। মদনমোহন স্বয়ং দুই কলাকে শিক্ষার্থে এখানে প্রেরণ করেন ও স্বয়ং শিক্ষকতার ভার অবৈতনিক ভাবে গ্রহণ করেন। এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। বিজয়দেবের মহাশয়ের ‘বর্ণ পরিচয়ের’ পূর্বে মদনমোহনের ‘শিশুশিক্ষা’ গ্রন্থাবলী বন্ডের তেহু এই নবস্থাপিত বিজালয়টি। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৫১ হইতে এই বিজালয়ের কার্যাবস্থা অভিজাত সম্প্রদায় মুসলিম প্রভাবে তখনো যৌব পদ ‘নবীন’ ও ইত্যাদি বিরোধী ছিলেন।

ইহার বহু পূর্বেও কলিকাতার বালিকা-বিজালয় ছিল। অনেকগুলি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত ও বালিকাদের পূর্ণাঙ্গ লেখার ব্যবস্থা হয়, যাহা স্কুল কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। স্যার এডওয়ার্ড বায়ান প্রভৃতি স্ত্রীমণি কোর্টের বিচারপতিবা ও কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক এই কমিটির সভ্য ছিলেন। রাজা হার রাধাকান্ত দেব ও পাথুরিয়াঘাটার উমানন্দন ঠাকুর বহু পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে এই সকল পাঠশালা পরিদর্শন ও মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা পরিচালনা করিতেন। উমানন্দনের বাড়ির সামনে বালিকাদের ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিবার একটি স্থান ছিল। সেকালে নারীশিক্ষায় উৎসাহ দান মানসে রাধাকান্ত ‘দ্বাশিক্ষা’ নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন যন্নি তিনি সনাতনপন্থী দলের ছিলেন।

মহাত্মা বাইট্‌ন বিজালয়ে বালিকাদের যাতায়াতের জগৎ কয়েকটি গাড়ী ও মোড়া দান করেন এবং তাঁহার চরম ইচ্ছাপত্র বা উইলে তাঁহার অধিভার প্রতিনিধি দিয়া যান :—

I give and devise all my interest in the lands, buildings and other property in Calcutta now intended to be used and occupied as a Female School to the E. I. Co. and their successors and

assign FOR EVER with my request that they will endow the said institution as a Female School in perpetuity and honourably connect therewith the name of Babu Dakshina Ranjan Mukerjee in honourable testimony of his great exertion in the cause.

ছাত্রদের জন্ত বিজালয়ের গাড়ীগুলির গাড়ী লেখা থাকিত কতাপোষা পালনীয় শিক্ষানায়িত্ব যত্নতঃ।

দেবেশ্বনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমা কন্যা ও কনিষ্ঠা ভাতৃপুত্রকে বাইট্‌ন স্কুলে পাঠার্থে প্রেরণ করেন। তিনি তথাকার শিক্ষার সম্পূর্ণ পোষকতা করেন তথায় বাইবেল-ঘটিত শিক্ষার কোনো উৎপাত ছিল না বলিয়া।

নানাদিক দিয়া এইরূপে জাতির নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল। সাতিত্যক্ষেত্রেও তখন অনেকগুলি কবি ছিলেন যাহারা বঙ্গীয় ভাষাজননাকে নানা ভাবে সেবা করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বড় দান যিহেজ্জনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। মাইকেল মধুসূদন তৎকালীন নবীন কবিদের মধ্যে যিহেজ্জনাথকে সর্বোচ্চ আসন দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—  
If I am to doff my cap to any modern Bengali poet, it must be to the author of Swapna-prayan and to nobody else.

কিন্তু নবজাগৃত জাতির সকল প্রকার আশা ও বেদনাকে জাতীয় ভাষায় উপযুক্তরূপে প্রকাশ করিতে পারেন, এমন এক জন শক্তিমান বাণীর বঙ্গপুত্রের অভাব দেশমাতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন ও প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। ভগবান সে প্রার্থনা পূরণের ব্যবস্থা করিলেন।

কাসমোহিনী কল্লবিধায়িনী পূর্ণেন্দ্রবিজয়নার গৌরবস্বরূপ লস্যাটককে বঙ্গাক ১২৬৮ সাগটি (ইং ১৮৬১) শুভ শিশুসোম সেখাবৎ প্রতিভাত হইবে। তাহার অঙ্কে শোভমান নবজাত শিশুটির কর্ণবৃগলে স্বয়ং ভারত জননী যে আশীর্বাদী কুণ্ডল পরাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে প্রাচী ও প্রতীচী দিগ্‌মণ্ডল সমকালে আলোকিত হইল। কলিকাতা মহানগরীর মুখমণ্ডল, তথাকার ঠাকুর বংশের মুখছবি, বঙ্গের স্ত্রী সমাজের মুখাবলি এক যিহেজ্জনাথ ঠাকুরের—  
“রাত্রিদিবা করিছে লোচনবারি

মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত হে তোমারি—”

সেই পূর্ণাঙ্গনতাগাশ বৈষ্ণীতা, অজ্ঞতার তামস বাস্পাচ্ছাদিত জননী ভারতের বদনকরুণ ও যুগপৎ নবলোকে নবমুখী ধারণ করিল। সেই নাতিবৃহৎ আগন্তকের প্রাণধারণ লীলায়, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে মূর্ত্ত বিধ্বংসনীর অপার করুণা ও আনন্দের আবির্ভাব বিশ্ববাসীর গোচরে আসিয়াছে। সেই নবজাতকের পরবর্তীকালের অমৃতবাকী হারা আমরা অনুভূতি কথঞ্চিৎ প্রকাশ করি—

“একবিন্দু নয়নের জল

কালের কপোলতলে শুভ সমুজ্জ্বল—”

এবং সেই ১২৬৮ সাগটিও তাহার সহিত অচ্ছেদ্য সংযোগ যুক্ত মানবকটি চিরদিন আমাদের ও ভাবী বংশধরের স্মরণ পথের শরণী আলোকিত করিতে থাকিবে।

বাল্যকালছটায় তাহার প্রকাশ বাসা, কৈশোর, যুবসন্ধির মধ্য দিয়া শিক্ষা, দীক্ষা, প্রতিভার ফলে কোবক রবীন্দ্রের উদ্যোগ ও প্রস্তুতি দলবিকাশ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র, মহর্ষি ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যজ্ঞেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় 'বড় বাড়ার' 'ছোটবাবু' বিশ্ববরণা ঋষি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ জন্ম ১২৬৮ সালের ২৫এ বৈশাখ সোমবার ৭ই মে ১৮৩১ মঙ্গলবার কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে মৌনবাশিতে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম সাধারণত ৬ই মে সোমবার বরা হয় কিন্তু তাঁহার জন্ম হয় বারি তৃতীয় প্রহরে, সূর্য্যোদয় ৭ই মে মঙ্গলবার হইলে। এই ১৮৩১ সালে দ্বাবিকানাথের স্বণ খোর করিয়া যে আয় হইল তাহার মাহি সমারোহে নির্বাচন ব্যবস্থা কবিলেন এবং যে উজ্জ্বল আভারের ইঙ্গিত দেখা দিল তাহা বর্ষাকালের আবর্তনে শশিকলাব মতো দিন দিন বাড়িয়া যাঠিতে লাগিল, পক্ষভেদে দর্শকের দৃষ্টিপথে কখনো অবলুপ্ত হয় নাই। প্রতিভা সংযোগে তাহার শিল্প কিরণ বা দীপ্তির সমৃদ্ধি দৈববশে কবিজননীর অবলোকন করা ঘটে নাট ঘটে কিন্তু ক্ষয়হীন পূর্ণচন্দ্রোদয় কবিজনক যে জীবিতকালে দেখিয়া গিয়াছেন, ইহা পিতাপুত্রের এবং বঙ্গদেশের পথম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

ছাবকানাথের আমলের নামা অমৃতান ও ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানোদয়ের পূর্বেই বেবেদপরিবারের জীবনযাত্রা ও চিন্তাপ্রণালী সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়াছে। মহর্ষি সকল দিকে বায় সংকেত করিয়া ভ্রমণ ও ভ্রমণের সাহায্যে ব্যবস্থা ঠিক রাখিয়াছিলেন। যে জাঁকজমক আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা ও উৎসব-পরম্পরার সহিত যজ্ঞেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ বাল্যকালে পরিচিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে তাহার স্বযোগ ঘটে নাই। তিনি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের ছেলের মতোই বর্ধিত ও আত্মশাসিত পথে পরিচালিত হন ও তাহা সাধন করিবার অস্বাভাবিক পরিবেশ সৌভাগ্যক্রমে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বহুদিন পুস্তকের মধ্যে এবং নিজের অসামান্য সৃষ্টি-নৈপুণ্যের অমূল্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

বাড়ীর পাঠশালাতে পরিবারস্থ অগ্রাঙ্ক বালকদের সহিত গুরুমহাশয়ের নিকট বালক বরির নিয়মিত লিখন-পঠনের স্বরূপাত হয়, তবে তাহার পূর্বেই অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের পূর্বেই তাঁহার বিজ্ঞানশিক্ষা আরম্ভ হয়।

তখন ঠাকুরদের সকলের বাড়িতেই একটি কবিতা পাঠশালা থাকিত। বাড়ীর প্রতিবেশীদের সন্তানবরাও একত্রে সেই পাঠশালায় পড়িত। চার বৎসর হইলেই বালককে অগ্রজদের সহিত পাঠশালায় যাঠিতে হইত এবং সেখানে বসিয়া থাকা অভ্যাস করিতে হইত। গুরুমহাশয়ের বলিভেন আগে "আদমশক্তি" হউক, পরে লেখাপড়া হইবে। বালক গুরুমহাশয়ের অবাধ বেগুচাননা দেখিয়া ও তর্জন গর্জন শুনিয়া গুরু প্রতি ভয়ে অর্জন করিত কিন্তু অগ্রাঙ্ক বালকদের পাঠ্যবৃত্তি শুনিয়া মুখে মুখে কিছু কিছু শিখিত। পরে পঞ্চম বর্ষে বালকের হাতে খড়ি দিয়া তাহার রীতিমত বিজ্ঞানশিক্ষা আরম্ভ হইত। রবীন্দ্রনাথ আসন দুবস্তু করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক কিছু শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়ের নাম ছিল মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিবাস বর্ধমান জেলা।

পাঠশালায় বিজ্ঞানভিত্তিক কঠোর চর্চাই ছিল বলা কঠিন, তবে শৈশব কালেই তাঁহার সাহিত্য-বাস্তবজ্ঞান আরম্ভ হয়। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তখন পুরা 'দাঁস রাজত্ব'। (জীবনমুখিত প্রঃ)। ছেলেরদের বেশ-কটির জঙ্ক চাকরদের হুঁট হাতে করিয়া পাঁড়িয়া থাকিত ও অগ্রাঙ্ক শাস্তিভোগ করিতে হইত। আর তাহারও ছেলেরদের নানাবিধ উপায়ে শাসন করিত ও যাচাতে কোনোরূপ অগ্রাঙ্ক আচরণ না করে তজ্জঙ্ক কড়া নজর রাখিত। সেকালে বিস্তর বাঙালী ভৃত্য পাওয়া যাঠিত, পরে যাহাদের অধিকাংশ স্থান হিন্দুস্তানী ও উড়িষ্যাতে অধিকার করিয়াছে। কঠিন বাঙালী পানসামা দেখা যায়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'ঈশ্বর' নামে যে তাঁহাদের চাকর ছিল, সে সন্ধ্যায় ছেলেরদের হটগোল নিবারণের জঙ্ক তাহাদিগকে লইয়া বসিয়া বামাগ্ন ও মহাত্মার চন্দ্রনাট্য। অগ্রাঙ্ক চাকরবরাও সেখানে আসিয়া বসিত। কবি একটি বড় চট্টা নিজেই পড়িতেন, তাহাও শুনিত, তখন গার ঈশ্বরকে পড়িতে হইত না। পাঠশালায় পাঠ্য কিছু অতি অল্প ছিল, যাহাদের মধ্যে চারকাণ্ডের ও বামাগ্নও প্রধান। ১২৭৩ সালেই রবীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে প্রবেশ করিলেন কিন্তু বেশি দিন সেখানে থাকা হইল না। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে নর্মাল স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন, সেখানে তিনি ছাবরবিত্ত দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তখন এই বিজ্ঞানমুখি চিৎপুর সোডের উপর পাথুবোতা ঈশ্বর ঠিক মধ্যস্থে শ্রামলাল মল্লিকের বাড়িতে অবস্থিত ছিল।

কবির প্রাণে সহজাত অমৃতসলিলা ফল্গু জায় একটা স্বর বহিয়া যাঠিত। প্রথম ভাগে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বর প্রথম স্বাক্ষর উঠিল। ঈশ্বর যখন বামাগ্ন পড়িত তখন সেই স্বর স্বাক্ষর হইত। কিশোরী চাট্টোয়ার পাঁচালীর গানে সেই স্বর বালকজনয় উদ্বলিত করিয়া তুলিত। এই স্বর বাঁচার প্রাণে ভাগে, তাঁহার গায়ক ও কবি হওয়া আশ্চর্য নয় তবে গানটা সহজেই আসে, অমূল্যন ও সাধনা সাপেক্ষ, কবি হওয়া ভাগ্যের কথা, কবিতা জন্মান, প্রস্তুত হন না। তখন বাড়িতে গানের হাওয়া চাবিনিকেই বহিতছিল। নাট্যাভিনয়ে গানের মহলায় গানের চর্চা চলিত। প্রসিদ্ধ গায়ক যতুভট্ট (যতনাথ ভট্টাচার্য) তখন তাঁহাদের বাড়ির বেতনভোগী সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। বাড়ীর সকলে গানের চর্চা করিতেন। লাক্ষ্মীনাথের জঙ্ক বামমোহনের নিযুক্ত গায়ক ভাটয়ুগল কৃষ্ণ ও বিষ্ণু নাম তখন শতবে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুর গুণপনা সকলকেই আকৃষ্ট করিতেছিল। এমন কি, ১৮৭২ সালে যখন বাঙালীর সাধারণ বঙ্গমক গ্রামাঞ্চাল থিয়েটার বোর্ডন ষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিষ্ণু বঙ্গমকের ভিতর হইতে গান গাঠিতেন। তথায় প্রথম নাটর নোলদর্পণের অভিনয়কালে নাট্যজ্ঞ গিরিশচন্দ্র সাধারণ বঙ্গালয়ে লোগন করেন নাট। টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় এবং পেশাদারী না জীবন তখনো তাঁহার মতবিরুদ্ধ ছিল এবং বাবসা হিসাবে গ্রামাঞ্চাল থিয়েটারের সাফল্যে তিনি সন্নিহিত ছিলেন। তাই, এই অভিনয়ে প্রতি কটাক করিয়া একটি ব্যঙ্গ কবিতা মহাকবি গিরিশচন্দ্র বদ করেন—

তাতে পূর্ণ অর্দ্ধইন্সু কিরণ, সঁদূর মাখা মোতিব হাব

\* \* \* \*

কিবা ধর্মক্ষেত্রে স্থান,  
অন্যক্ষেত্রে “বিষ্ণু” করে গান,  
অবিনাশী মুনিষ্মি করছে বসে ধ্যান,  
সবাই মিলে ডেকে বলে ‘দীনবন্ধু’ করে পার।

মিলে যত চাধা বরে আশা, নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার।

স্থানমাতাছো হাড়ি শুঁড়ি পয়সা সে দেখে বাহার।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার ‘নটচুড়ামণি অর্ধেকশতাব্দী’ শীর্ষক পুস্তিকার (অর্ধেকশতাব্দী মৃত্যুতে, ১৯০১) একস্থানে লিখিয়াছেন—“গানের শ্রেষ্ঠ ছিল—স্থানমাতাছো হাড়ি শুঁড়ি পয়সা সে দেখে বাহার।” এই অর্ধ-ইন্স প্রসিদ্ধ নট হস্তাঙ্গিক অর্ধেকশতাব্দীর মুস্তফি (মুখোপাধ্যায়), জাশকাস থিয়েটারের সহসম্পাদক ও নাট্যপরিচালক ছিলেন। বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ আগমনী ও বিজয়ার গান এবং ব্রহ্মসংগীত বাতীত কলাবতী মার্গ ও অজ্ঞাত গান গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈষ্ণবধানায় একাধিকবার তিনবার সৌভাগ্য আমানের হইয়াছিল। বিষ্ণুচন্দ্রের পিতা কালীপ্রসাদ ক্রুবতী। বিষ্ণু ১১ বৎসর বয়স হইতে ৭৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত, বতনের তিনচতুর্থাংশ কমিয়া যাওয়াতেও, ৬৭ বৎসর একান্নিক্রমে ঠাকুরসমাজের গায়কের কাণ্ডা করিয়াছেন। ১৮৩০—১৮৯৭ একটি বনও তিনি সমাজে অমুপস্থিত হন নাই। ১৯০১ সালে ৮২ বৎসর যুগে ইনি দেহত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় দিকে যখন

ঐ সব আসরে প্রবেশাধিকার ছিল না, তখন দূরে থাকিয়া সকল গানের বসের আশ্বাদনের সুযোগ ছিল। কাজেই গান গাওয়া তাঁহার সহজেই আয়ত্ত হইল। আর কবিতা রচনা করার সুযোগ একরূপ অনাহতই আসিয়া জুটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের যুগ্মতাত্ত্ব্যের পুত্র জ্যোতিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন কবির অপেক্ষা বয়সে বড়। ইহার পুত্র শিল্পী শ্রীমান বামিনীপ্রকাশ। কবির বয়স যখন ছয় সাত বৎসর তখন জ্যোতিপ্রকাশ বাঙলা শেব করিয়া ইংরেজি পড়িতেন। তিনি একদিন হঠাৎ রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখিবার প্রণালী শিখাইয়া দিলেন ও জোর করিয়া কয়েক ছত্র লিখাইয়াও লইলেন। রবীন্দ্রনাথ পয়সার বাধিতে শিখিলেন। তখন পত্র লেখার চর্চা আরম্ভ হইল। কবি যখন নর্মাল স্কুলের ছাত্র তখন তাঁহার পত্র রচনার কথা পণ্ডিতগণের আগোচর ছিল না। একদিন উক্ত স্কুলের শিক্ষক তৎকালীন প্রসিদ্ধ পাঠ্যপুস্তক “প্রাণী বৃত্তান্তের” লেখক সাতকড়ি দত্ত নিম্নের দুই ছত্র কবিতার পরে কী লেখা যাচিতে পারে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন—

বরিকরে ছায়াতন আছিল সবাই

বরণা ভরসা দিল আঁধার নাই।

বালক রবি মুহুর্ত মাত্র চূপ করিয়া থাকিয়া তৎক্ষণাত উত্তর দিলেন—

মৌনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে

এখন তাহার স্তখে জলকুড়া করে।

[ক্রমশঃ।

## সমুজ্জ্বল মুখশ্রী

নিয়মিত “বোরোলীন”  
ব্যবহারে আপনার  
তনুশ্রী দিন দিন উজ্জ্বল  
ও কমলীয় হয়ে উঠবে।  
মুখশ্রীর কোমলতা  
ও সজীবতা বজায় থাকবে  
এর প্রায় পক্ষী স্নিগ্ধ স্নায়ু  
আপনার মনে আবেগময়  
অনুভূতি এনে দেবে।

পরিবেশক:- জি, দত্ত, এণ্ড কো  
১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১





বোরোলীন

উচ্চাপের ক্রেসক্রীম

সকল টিসনারী ও ঔষধালয়ে পাওয়া যায়

# কলা-বিলাস

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

শ্রীঅবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

## দশম সর্গ

বৎসগণ, তোমাদের সকলের বিশেষরূপে জেনে রাখা উচিত--  
প্রত্যেকের এই মায়াকৃতি। কিন্তু দেখো, তুলেও যেন  
গুলির সেবা করে বোসো না। যারা বিদ্বান তাঁরাই কেবলমাত্র  
লাগ ও শ্রীবুদ্ধিকল্পে কামনা করেন-- ধর্মামুগ কলা-কলাপ। ১  
“ধর্মামুগ” কলাগুলি অগ্ৰাণ্য কলাবিভাগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রধান।  
গুলি হচ্ছে :—

- (১) সর্লভতে দয়া,
- (২) পরোপকার,
- (৩) দান,
- (৪) ক্ষমা,
- (৫) অননুয়া,
- (৬) সত্য,
- (৭) অলোভ,
- (৮) প্রসন্নতা। ২

“অর্থামুগ” কলাগুলি হচ্ছে :—

- (১) নিত্য উপান-শীলতা,
- (২) নিয়ম-পরীপালন,
- (৩) ক্রিয়া-জ্ঞান,
- (৪) স্থান-তাগ,
- (৫) পটুতা,
- (৬) অমুদ্বৈগ,
- (৭) স্ত্রীলোকদের উপর অবিশ্বাস। ৩

“কামামুগ” কলাগুলি হচ্ছে :—

- (১) পোষাকের পারিপাট্য,
- (২) স্বকুমারতা,
- (৩) চাকতা,
- (৪) গুণোৎকর্ষ,
- (৫) নানাবিধ গৃহ্যাদি লীলা,
- (৬) প্রিয় বা প্রেমসীর চিত্তজ্ঞান। ৪

“মোকামুগ” কলাগুলি হচ্ছে :—

- (১) বিবেক-বতি,
- (২) প্রশান্তি,
- (৩) তৃষ্ণাক্ষয়,
- (৪) সন্তোষ,
- (৫) সঙ্গ-তাগ,
- (৬) পরমাত্মায় নিজেব জীবাত্মার বিলীয়মানতা,
- (৭) পরম-প্রকাশ। ৫

এই তোলে ধর্মাদি চতুষ্টিয় কলা। সর্বসাকুল্যে বরিশটি তোলে  
এদের ক্রমবিভাগ। সম্যাকের ধর্ম কীকি দিতে চান, সেই  
বিদ্বানদিগের এগুলি বিজ্ঞা। ৬

পাঁচটি রয়েছে “স্বধামুগ” কলা। যথা :—

- (১) মাৎসর্য-তাগ,
- (২) প্রিয়বাদিত্ব,
- (৩) সুধীরতা,
- (৪) অকোপ,
- (৫) বৈরাগ্য। ৭

এই স্বধামুগ কলাগুলি কিন্তু মানুষ ব্যবহৃত করে পর্যাখে, স্বাখে  
নয়। ৭

সাতটি রয়েছে “শীলামুগ”-কলা।

- (১) সংসঙ্গ,
- (২) কামজয়,
- (৩) শুচিতা,
- (৪) গুরু-সেবা,
- (৫) সদাচার,
- (৬) নিখিল প্রতিজ্ঞান,
- (৭) যশোলিপ্সা। ৮

“প্রভাবামুগ” কলা সতেরটি, যথা :—

- (১) তেজঃ,
- (২) সঙ্ঘ,
- (৩) বুদ্ধি,
- (৪) ব্যবসায়,
- (৫) নীতি,
- (৬) ইঙ্গিত-জ্ঞান,
- (৭) প্রগলভতা,
- (৮) সহসহায়,
- (৯) তুষ্ণাক্ষয়,
- (১০) সন্তোষ,
- (১১) সঙ্গ-তাগ,
- (১২) পরমাত্মায় নিজেব জীবাত্মার বিলীয়মানতা,
- (১৩) পরম-প্রকাশ। ৯

- (৯) কৃতজ্ঞতা,
- (১০) মন্ত্র-বক্ষণ,
- (১১) তাগ,
- (১২) অম্বাগ,
- (১৩) প্রতিপত্তি,
- (১৪) মিহোজ্ঞ,
- (১৫) অনুশাসনা,
- (১৬) সমপ্রতিভতা,
- ও (১৭) আশ্রিতজন-বাসনা। ৯-১০

তিনটি রয়েছে "মানানুগ" কলা। এগুলি মনের জীবন।  
যথা :—

- (১) মৌনতা,
- (২) অচাপলা,
- ও (৩) অজিহ্মা।

যাযা বিদগ্ধ তাদের উচিত, এই চতুষ্টয় কলাগুলিকে স্বগতঃ  
প্রয়োগ করা। ১১

আরও দশটি কলা রয়েছে, সেগুলিকে কলা হয়—“ভেষজ,”  
অর্থাৎ যে রোগের যে ঔষধ। যথা—

- (১) শক্তিমত্তের বিরুদ্ধাচরণ,
- (২) বা শক্তিমত্তকে প্রণতি,
- (৩) বলোদয় তসেই বৈবর্তাচরণ,
- (৪) আর্জের প্রতি ধর্মচরণ,
- (৫) দুঃখে ধৈর্যধারণ
- (৬) স্তম্ভে উথলে না থাড়া,
- (৭) ঈর্ষ্যের বেগানে ছাড়াছড়ি সেখানে সাবিতাগ করণ,
- (৮) সং-বিষয়ে মোহাগ,
- (৯) মন্ত্র-সাময় উপস্থিত হলে প্রজ্ঞার বিকীরণ,
- ও (১০) নিম্নমণীয় সমস্ত ব্যাপারেই পরাভুততা। ১২-১৩

বসগণ, সর্বশেষ আমি তোমাদের শোনাব কতগুলি সাবকথা।  
সর্বলোকের এই সমসার এই বাণীগুলি সাবকথা। বসগণ,

- (১) যত বকমের সত্য রয়েছে তার মধ্যে গুরু বাক্যটিকেই সাব  
সে জেনো।
- (২) সমস্ত কাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ন হচ্ছে গো-ব্রাহ্মণদের তার পূজা।
- (৩) অত্যাধিকট পাপগুলির মধ্যে লোভ শ্রেষ্ঠ।
- (৪) যা কিছু উপতাপ জন্মায় তাদের মধ্যে 'ক্রোধ' শ্রেষ্ঠ।
- (৫) গুণীদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান শ্রেষ্ঠ।
- (৬) বিপুলবিশ্ববিভবের চেয়ে যশস্বিতা বড়।
- (৭) উৎকট দুঃখগুলির মধ্যে 'সেবা'ই সার্ব দুঃখ।
- (৮) যত বকমের নাগপাশ রয়েছে তাদের মধ্যে 'আশা'  
দুঃখনিঃগতম।
- (৯) যতবকমের ধনরত্ন রয়েছে তাদের মধ্যে দান-ধনই শ্রেষ্ঠ।
- (১০) সেই প্রদেশগুলিকেই স্বর্ষের বলে জেনো, যেখানে  
সেই শতবুর উপদ্রব।
- (১১) জিজ্ঞাস্য চেয়ে অধিক মানসনিকর আর কিছু নেই।
- (১২) দাচিঙ্গের চেয়ে বড় অকল্যাণ-নেই।

- (১৩) ধর্মই সংসার—পাথকের শ্রেষ্ঠ পাথর।
- (১৪) একমাত্র সত্যই পবিত্র করে তোলে স্তম্ভপথ।
- (১৫) বিলাসাদি বাসন-শ্রেষ্ঠ রোগ।
- (১৬) গৃহ সমৃদ্ধি নাশ করতে আলস্যই সেরা।
- (১৭) যা কিছু দ্বান্দ্বীয়, তাদের মধ্যে নিঃস্পৃহতার স্থান  
সবার উপরে।

- (১৮) মধুরেরও মধুর হচ্ছে প্রিয়বচন।
- (১৯) নয়নে সব চেয়ে আঁধার ঘনায় দর্প।
- (২০) সবার চেয়ে বড় উপহাসাস্পদ হয়েছেন 'দস্ত'।
- (২১) যত প্রকারের স্তুতি দেবে, তাদের মধ্যে অসৌহার্দ  
সব চেয়ে বিস্তৃত।

(২২) যতবকমের বরণীয় অনুষ্ঠান বা নিয়ম রয়েছে তাদের  
মধ্যে অচাপলাই বরণীয়।

(২৩) অনেক কিছুই অপ্রিয় থাকতে পারে, কিন্তু পৈতৃক  
দোষ নেই।

(২৪) নৃশাস কর্মগুলির মধ্যে মানুষকে ভাতে-মারা (বুজিচ্ছদ)  
অস্বীকার্য।

(২৫) পুণ্যরাশির মধ্যে কাকনা শ্রেষ্ঠ।

(২৬) পুরুষদের চিহ্নগুলির মধ্যে কৃতজ্ঞতা শ্রেষ্ঠ।

(২৭) যত বকমের মোহানুগ প্রজ্ঞা রয়েছে, তাদের মধ্যে  
মায়ী শ্রেষ্ঠ।

(২৮) যে কারণগুলি নরকে নিয়ে যায় মানুষকে, তাদের  
মধ্যে কৃতজ্ঞতা প্রধানতম।

(২৯) ঈশ্বরের মধ্যে স্ত্রীমদন শ্রেষ্ঠ।

(৩০) জ্ঞানভেদের ব্যাপারে স্ত্রী-বাক্যই প্রবল।

(৩১) যে মানুষ ক্রুর সেই-ই আসল চাঁড়াল।

(৩২) কলিযুগে যে সব অবতার প্রকট হয়েছেন তাদের মধ্যে  
ঈশ্বরজালিক শ্রেষ্ঠ অবতার।

(৩৩) শাস্ত্রই অনবজ মণিপ্রদীপ।

(৩৪) উপদেশই অনবজ মঙ্গল হান।

(৩৫) ক্রেশের গণনায় বাক্যকোর স্থান সর্বাগ্রে।

(৩৬) মৃত্যু-তুল্য যত বকমের দুঃখভোগ রয়েছে সেগুলির  
মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে চিরবাগির।

(৩৭) বিবম বিবগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠই শ্রেষ্ঠ বিব।

(৩৮) কুষ্ঠ কিসপাদির অপেক্ষা বেগাব ভাসবাসা সাংঘাতিক।

(৩৯) ভাবাই গুস্তের পরম ধন।

(৪০) পরলোকবন্ধুদের মধ্যে পুত্রই শ্রেষ্ঠ।

(৪১) সস্ত্র শলোর চেয়ে শত্রু সাংঘাতিক।

(৪২) দুশ্পুত্রই কুল-ধ্বংসের শ্রেষ্ঠ কাণ।

(৪৩) বহুগণের শ্রেষ্ঠ বক্তা হচ্ছে যৌবন।

(৪৪) মোহন বেশভূষার চেয়ে রূপ বড়।

(৪৫) সস্ত্র রাজা লোভের চেয়ে সন্তোষ বড়।

(৪৬) সম্রাটের সমস্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে সংসঙ্গ সাবস্তর।

(৪৭) শোষণকারীদের মধ্যে চিন্তার চেয়ে দড় কেউ নেই।

(৪৮) কোটরাগির মত দাহন ছাড়াই বিবেক অস্বীকার্য।

(৪৯) বিশ্বাস বা প্রণয়ের সার হচ্ছে মৈত্রী।

(৫০) যত রকমের মতাব লোগ রয়েছে, তাদের মধ্যে  
নির্ধন্যই শ্রেষ্ঠ।

(৫১) যত রকমের ব্যাদি রয়েছে, সস্তোচ তাদের মধ্যে  
উৎকট।

(৫২) কৌটিল্যের মত নির্জলা অধরূপ আর নেই।

(৫৩) যত রকমের নির্মালি রয়েছে, তাদের মধ্যে সরলতার  
স্থান আদিত্যে।

(৫৪) বিনয়ের তুলি রত্নমুকুট নেই।

(৫৫) দুর্গাসনগুলির রাজা হচ্ছেন দ্যুতক্রীড়া।

(৫৬) মকুতটের পিণ্যচদের চেয়েও সাংঘাতিক হচ্ছে।

...স্বীকৃতিত্ব ১৪—২৭

(৫৭) জাগাই শ্রেষ্ঠ মণিবলয়।

(৫৮) ঞ্জিতই উচ্ছলতম কর্ণধ্বজ।

(৫৯) গল-মৈত্রীর চেয়ে চপলতর আর কিছু নেই।

(৬০) অনেক প্রয়াস বুঝা হয়ে যায়, কিন্তু জুর্জনের সেবা  
বার্ষ্য হবেই।

(৬১) মোক্ষসুত্রই শ্রেষ্ঠ উত্তান।

(৬২) প্রিয়দর্শনই অমৃতবৃত্ত করে।

(৬৩) শ্রেষ্ঠ লভ্য হচ্ছে ব্রহ্মরতি।

(৬৪) সঙ্কলের বিরেকনাশ করতে হলে মূর্খসিদ্ধা বসায়।

(৬৫) সফল যত মহাকুত রয়েছে, তাদের মধ্যে কুলীনেরাই  
শ্রেষ্ঠ।

(৬৬) সত্যযুগের অবতারণার চেয়েও সৌভাগ্যই জেনে  
রেখে কামা।

(৬৭) রাজদরবার সব চেয়ে স্থূল শব্দাঙ্গল।

(৬৮) স্বভাবকোটিলো প্রথম স্থান অধিকার করে রমণীসুন্দর।

(৬৯) স্তম্ভের যোগে না কিছু রয়েছে, তাদের মধ্যে ঔচিত্যই  
সব চেয়ে স্তবনীয়।

(৭০) চন্দ্রনাথি অমূল্যপনের চেয়ে গুণবান শ্রেষ্ঠ।

(৭১) শোকের জন্ম দিতে কণ্ঠাই পতীয়াসা।

(৭২) নির্বোধই অমুকল্যার শ্রেষ্ঠ পাত্র।

(৭৩) ধনদৌলতই আসল সৌভাগ্য।

(৭৪) কৌর্তির মুখা মূল হচ্ছে জনপ্রীতি।

(৭৫) মস্তুর চেয়ে বড় তালবেতাল-নেই।

(৭৬) এক গজ আড়ের যে সব ধন-কুবের রয়েছে, তাদের  
শিকারই বেশী উপকারী।

(৭৭) স্বাস্থ্যকর যা কিছু হতে পারে, তাদের মধ্যে মানসিক  
শান্তিই শ্রেষ্ঠ।

(৭৮) বিদ্রি় তীর্থসেবার চেয়ে আশ্বর্য্যত মঙ্গলের।

(৭৯) নিদ্রাসাদের মধ্যে কুপন শ্রেষ্ঠ।

(৮০) সবচেয়ে বড় অশ্রুশান হচ্ছে--সসারের আচার-বিবর্তিত  
মায়া।

(৮১) জায়-বুচ্ছি স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ বন্ধা।

(৮২) ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞেতা শ্রেষ্ঠ প্রতাপী।

(৮৩) ঈর্ষ্যা-ই শ্রেষ্ঠ বন্ধা।

(৮৪) অপবশের মত কুস্থানে-মরণ আর নেই।

(৮৫) মাতাই মাঙ্গল্য মহোত্তমা।

(৮৬) পুষ্যোৎসব উপদেশ ইত্যাদির চেয়ে পিতাই মহন্তর।

(৮৭) তীক্ষ্ণতর যত রকমের কাজ রয়েছে, তাদের মধ্যে খুন-  
খাবাপিই শ্রেষ্ঠ।

(৮৮) শাপিত খণ্ডের চেয়েও বিচ্ছেদ সাংঘাতিক।

(৮৯) প্রণামই উত্তম চোর--অহঙ্কারের বা ক্ষোভের।

(৯০) যত রকমের কষ্ট-ভিক্ষা আছে, তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যের  
জোড়া নেই।

(৯১) পুষ্টিকরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে 'মান'।

(৯২) কৌর্টিই সসার বীরদের শ্রেষ্ঠ সার।

(৯৩) শ্রেষ্ঠ নাস্তি হচ্ছে 'প্রভুভক্তি'।

(৯৪) সৌখ্যের যত রকমের বাধি রয়েছে, তাদের মধ্যে যুদ্ধে  
নিধনই সৌখ্যের শ্রেষ্ঠ বাধি।

(৯৫) বিনয়ের মত কলাগণ আর নেই।

(৯৬) অনিমানি সর্গ সিন্ধির চেয়ে উৎসাত বড় জিনিষ।

(৯৭) পরম প্রার্থিবর্জনের মধ্যে পুণ্যই শ্রেষ্ঠ।

(৯৮) পরম প্রকাশ গুলির মধ্যে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

(৯৯) সসারের মানুষের কাছে অন্ধ-মানুষ নগণ্য। কৌর্টিই ধন্য।

১৪—৩৮

আর বসঙ্গণ, জেনে রেখো, এই কলা-বিজ্ঞাগুলিকে আয়ত্ত করে  
যিনি কুশলী হয়ে ওঠেন, তিনিই অর্থের সৃষ্টি ও অর্জনতরে  
বিজ্ঞানী হন, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ হন।--সর্বগুণগুলির মধ্যে  
ব্রাহ্মণের মত। ৩৯

নানান রকমের কলা রয়েছে। তার ভিত্তিও আদে, অন্ততও  
আদে। কিন্তু এই যে, একশটি দারগত বাক্য তোমানের শোনাগেলেন,  
জেনে রেখো, সেগুলিকে যিনি বিচারমূলে ব্যবহার করবেন, তিনিই  
দর্শন পাবেন লক্ষ্যার। লক্ষ্যাদেবীর প্রয়োজন সর্গকালেই প্রত্যাক। ৪০

এই পয়স্ত ব'লে শ্রীমূল্যের থানগেলেন। তারপরে আচায়ে  
যথা-কৃত্য অমুষ্ঠান করে বিদায় লিলেন শিষ্যদের। ধীরে ধীরে প্রবেশ  
করলেন নিজের মন্দিরে।

তখন অস্ত গেছেন চাঁদ।

নক্ষত্রের ফুল ফুটে উঠেছে রাত্রির ওড়নায়। ৪১

এই 'কলা-বিজ্ঞান'—

নানান আসনের খেলা দেখার ;

অধরেতে মুচকি হাসির চাঁপা মোটার ;

এবং লোকজনকে উপদেশ দেয় ;

যেন সে একটি প্রেমিক রতন।

ধীরে মধুর আলোপে রয়েছে বিচিত্র একটি আবেদন। ৪২

"ফেমেশের" প্রতিভাসাগর থেকে উদ্ভিত হয়েছে এই কলা-বিজ্ঞান

সেই বিলাস, তিম-বর্ণা চন্দ্রদের মত, নিখিলের মনে নিতা দা

করক আনন্দ--এই তাঁর প্রার্থনা। ৪৩

ইতি কলাবিলাসে সকল কলা নিকপণা নান দশমঃ সর্গঃ।

# শ্রীযতী আভেরএর দিনপঞ্জী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

তরু দত্ত

## শেষ কথা

১৪ই ফেব্রুয়ারী মার্গরিভের ছেলে হয়। ওর মা বাড়ী ছিলেন না। জেনারেল তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন অসুস্থ এক পুরোনো বাস্কবীর বাড়ী, প্রায় মাইল দুয়েক দূরে। মার্গরিং জোর করেই ওর মাকে পাঠিয়েছিল, নয়ত ভদ্রমতিলা যেতে চাইছিলেন না। বিকেল চারটে নাগান যন্ত্রণা শুরু হয়। ওর স্বামী কি লিখছিল বৈঠকখানায়। পাশেই ও বসে বুনছিল। কয়েক মিনিট বাদে ও সোফার উপরে পড়ল। স্বামী তাড়াতাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে জানতে চাইল, “কি, কি হল?”

“কিছু না গো, বড় ক্লান্ত লাগছে।”

ও উঠে এসে বসল স্ত্রীর পাশে। দারুণ উবিগ্ন হয়ে পড়লেও ও তা ঢাকতে চেষ্টা করছিল। দুজনে হাত ধরাধরি করে বাস বইল নীচের।

“লুই”, শেষ পন্থা ও বলল, “আমি ওপরে যাচ্ছি, শরীফটা কেমন যেন করছে।”

উঠে পিঁড়াল ও। সবই যেন ওর চারিদিকে ঘুরতে লাগল। ঠিক করে ও বসে পড়ল।

“লুই বড় দুর্গল লাগছে!”

ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে লুই একটা কৌড়ে শুইয়ে দিল আশ্বস্তে আস্তে। “তুমি নয়! না যেন, লক্ষ্মী! তোমার মাকে আমি ডাকতে যাচ্ছি, আর ডাক্তারকে খবর পাঠাচ্ছি।”

ও বেরিয়ে গিয়ে তেবেসকে পাঠিয়ে দিল। আনন্দে দিশেহারা হয়ে দাঁটা ওর পোশাক পবিত্র হুলতে লাগল।

“আজই না তেবেস? বাছা আজ আসছে?”

“হ্যা, থুহুদি।”

তেবেস ওকে হেঁদা গাউন দিতে গেল ও হেসে বলল, “সব চেয়ে ভালটা দে তেবেস, এখনি লোকজন আসবে।”

পৌনে এক ঘণ্টা কেটে গেল, বাখা বেড়েই চলল। ওর চোখ কেটে জল পড়তে লাগল। কি গেল গরম জল আনতে। দুই হাতে মুখ ঢেকে ও জানালার ধারে বসেছিল; স্বামী এসে ঢুকল; ওর মুখ থেকে হাত সরিয়ে দেখল, ও কাঁদছে।

“বোহা! এত কম বয়সে এই কষ্ট!” ওর কপালে চুমা দিয়ে ও বলে উঠল। তার পর জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা—যন্ত্রণা হচ্ছে খুব বেশী?”

ওকে আশ্বস্ত করবার জন্য হাসতে চেষ্টা করে মার্গরিং জবাব দিল, “না গো, সামান্য ব্যথা।” কিন্তু ও ক্রমশই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে দেখে মার্গরিং বলল, “এ বাখা সবই ভুলে যাব গো যখন কোল জোড়া ধন আসবে। এতে বড় পক্ষান্তরের বদলে যন্ত্রণা সইতেই হবে।”

স্বামীর হাত ধরে গিয়ে ধীরে ধীরে ও শুয়ে পড়ল। ঢা ঢা করে ছটা বাজল। আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল। লুই ছটকট করতে লাগল ডাক্তারের দেরী দেখে। ও উঠে দেখে মার্গরিং জড়িয়ে ধরল ওকে যন্ত্রণা বোঝে।

“যেও না লুই, একা বড় ভয় করছে, যেও না গো!”

“চুষ কব লক্ষ্মীটি, একটু শান্ত হতে চেষ্টা কর!”

ইটি গোড়ে ও বসে পড়ল বিজ্ঞানর পাশে, স্ত্রীর মাথা কাঁধে রেখে। মার্গরিভের চাপা নিশ্বাস, অনর্গল অশ্রু—এসব দেখে বোকা যাচ্ছিল কী যন্ত্রণা ওর হচ্ছে। সাতটা বাজল; স্ত্রীও এক নিশ্বাস ফেলেই ও অজ্ঞান হয়ে গেল; প্রসব হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় বাড়ীর দরজায় এসে খামল একটা গাড়ী। ওর মা এলেন। ফেরার পাথেই ঠর কাছ খবর পৌঁছেছে। উনি ঘরে ঢুকতে ক্যাপ্টেন উঠে পিঁড়াল, স্ত্রীর মাথা বালিশের ওপর রেখে ঠর কাছ গিয়ে সাক্ষেপে বলল, “দারুণ যন্ত্রণা সহ করতে করতে ও অজ্ঞান হয়ে গেছে; ছেলে হয়েছে।”—তারপর বেরিয়ে গেল। ওর মার সঙ্গে সঙ্গে তেবেস এল; দশ মিনিট বাদে এলেন ডাক্তার; পাশের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন সব কথা খুলে বলল ঠরকে।

“ওর মা এখন ওর কাছে আছেন”, ও বলল শেষে।

ঘরের দরজা খুলে গেল। মাদাম আভের ডাকতে এলেন ম’সিয়া শাঁতাকে, “আম্রন ডাক্তার বাবু, খাসা নাহুস-হুস ছেলে হয়েছে।”

লুই আর ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। তশ্রীচ্ছন্নভাবে ও চোখ বুজে শুয়ে ছিল। ডাক্তার নাড়ী দেখলেন। আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর ও চোখ তুলতেই প্রথম তার সঙ্গে চোখাচোখি হল। ওকে আশ্বস্ত করবার জন্য হাসল মার্গরিং। কপাল চুষন করে ওর স্বামী হাত রাখল ওর হাতে।

“বাচ্চাটা কেমন আছে গো?” চুপি চুপি মার্গরিং প্রশ্ন করল। মাদাম আভের লুইয়ের হাতে ছেলে দিতেই লুই তাকে রাখল প্রহতির বুকে। মার্গরিং বহুক্ষণ চেয়ে বইল তার দিকে; ওর মুখে ক্ষুদে উঠল বিজয়িনীর হাসি। “ওসো, এই দেখ আমাদের সম্ভান!” তারপর অপূর্ব হাসি তেবে বলল, “কি গো, ছেলে যে বাপের তামি চায়!”

লুই বসে মাকে আর ছেলেকে আদর করল।

“ভগবান আমার স্ত্রী-পুত্রের মঙ্গল করুন, তিনিই তাদের রক্ষা করুন সর্বদা!”

ডাক্তার ওর হাতে এক গ্রাস পানীয় দিয়ে বললেন, পোয়াতীকে সবটা খাইয়ে দিতে।

মার্গরিং উঠে বদতে চেষ্টা করল।

“না মা শুয়ে থাক, এখনো তুমি বড় দুর্বল, ‘শি ঠা’ করে উঠলেন

ডাক্তার ব'জো লি-টাস থেকে বানিকট গেল ও হাম্বলক বসল,  
“আর পারছি না।”

“কিন্তু এটুকু যে খোঁজই করে।”

অমনি মার্গিফ চুপক দিয়ে থেকে মিল দিল।

“বত পাব বাওরা-শাওরা কর তে।” ডাক্তার বললেন, “তা মতর  
নতুন মাছবটির বাওরার জোড়াই হবে কোথা থেকে।” এমন ওত  
হলে অয়ে শান্ত হবে না, এরকম বলে রাখলাম।

ডাক্তার বেড়িয়ে গেলেন দুটোয় দাখ।

“কেমন দেখলেন?” দুই বন্ধু হয়ে উঠল।

উত্তরে ডাক্তার ছোট একটি ষ্টিল শিল্পে।

“বলুন ম'সিরা শ'রাজী,” দুই অধীর হয়ে জামান চাইল।

ডাক্তার এর কাঁধে হাত রাখলেন।

“সবু বন্ধু, ধৈর্য ধর।” মার্গিফের ভয়ে থেকেই অমনি তার  
বেধিঃ ভেতরে ভেতরে এর দাঁড়া খুঁজি আসল। এটা একটি  
আপার কথা। কিন্তু এর কোন দায়েরা বন্ধুর হাতের কি না সন্দেহ  
এটা ভাল-মন্দ হুইটীঃ এর কোনও না হবার কোনও না কি  
এর ডাক্তারের জোব আছে। এখানে অতঃ ও উদ্দেশ্যের সাথে লড়াই  
জিতে ও বেড়িয়ে আসতে পারবে মনে হয়। এর দাঁড়া কি এখন  
আমের মতই অটুট আছে?”

“আমাদের বিষয় আগে পরে এল্লিল মানে এর না অতঃ হতেছিল,  
ভাতে ও অমেরকা যোগে ও হুসল হয়ে পাঠছিল। আর যে মাস  
আমাদের বিয়ে হয়।”

“হী, হী কখন ও পুরোপুরি সেরে ওঠে মি।”

বানিকট ম'সিরা শ'রাজী আভ্যন্তর দিয়ে এসে দূর হয়ে ষ্টিল  
শিল্পে।

“আজ্ঞা, বিয়ে পর আর অতঃ হইনি, না?”

“উঁহ, হুসল পালি অজান হয়ে গিয়েছিল।”

ডাক্তারের কানে প্রথম জোব তুটী দুটোয় বিয়ে মূর কিছু  
বুঁজছিল। “দাবডাবের কিছু মেট তে, এর বসল অহা সেরে উঠেই।”  
কলে তারপর হেটারি করে বললেন, “তব পোয়ানা শু, দাবডাব  
কেন? এবসলে কোন বাওর কাঁচের হার মানে না পোয়ানা  
আমার দ্বির বিশ্বাস।”

উঁহা ঘরে চুকলেন। মার্গিফ লজ্জার লিকে এসে বসেই বাসন্ত  
সেধে হাসল। “কোথার গিয়েছিল গো? এসে থাকো।”

বিছানান্তে একটি ভাষণা করে ছিল ও, দুই বসল।

“কি যম্বর দেখতে হয়েছে ডেকেরা?” মার্গিফ বলল।

বামোদ হাত নিয়ে বাজটার ভাতের উপর বাসল মার্গিফ।

“কি নবম না? হেমনি মোটা-সোটা।” না বলছিল সেধে চ'মাসে  
হলে মনে হয়, এর জোব তুটী কিছু ভবত হোমার মত পোয়ানাঃ  
অমনি বন্ধ, অমনি পাতল, কিন্তু হলে সত্যক জোব পোয়ানা না।  
ওর চুলগুলো কেমন বসন্ত?”

“ঐক হোমারট চুলের মত বৃদ্ধিতে কালে,” উত্তর মিল লুট।

“ত, আর সবট হোমার মত হয়েছে।”

“পালি আমার পক্ষ সাই করবে নাকি গো?” দুই পলায় দুই  
জামতে চাইল।

“আমি এক বর্ণত মিথ্যা বসন্ত না গো, নাকি জিজ্ঞাসা

কর না। আজ্ঞা, তা, ডেকেরা ষ্টিল দুটোয় মত পোয়ানা  
না।”

“উঁহ, এমন বেশী কথা না বলি। ভাল, হ'মনি ম'সিরা  
শিল্পে।” “একটু দুখির বাও সাজ।” ই সোয়াহ।

বাজটা হুয়া কথিরে ষ্টিল, মার্গিফ বাও হয়ে পোয়ানা দি  
ডাক্তার, “সেহ এর কিল পোয়ানা ডাক্তার বাও।”

“সেহ ক, দুখ সাজ।”

লজ্জার সোঁকর লাল হয়ে ষ্টিল মার্গিফঃ “কিহ ম'সিরা  
কালিও না দুখ বাওরাবার কক, তা হলে হোমার মত পোয়ানা  
হবে।”

ডাক্তার বেড়িয়ে গেলেন। সব বটী বাতি মিলে মিলে  
হল। এটা বটী তুটী আর জিম্বারি আসল করে ছিল। হুসল  
লিক পরে অমেরকা হা গিয়েছিল ষ্টিল। অমেরকা কে হার না হার  
কক হুসল ষ্টিল মত পোয়ানা, হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল  
মিল হুসল ওর কলমার ওর হুসল পোয়ানা হুসল হুসল হুসল হুসল  
বাজটা দুখির শব্দ। হুসল হুসল শব্দ। কটি হুসল হুসল হুসল  
আমেরকা হুসল শব্দ। হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল

“কি হা ম'সিরা, আর সজ্জা থেকে আদি আসল পোয়ানা  
হুসল।” হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল  
বাজটা হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল

“সিহেরা হুসল হুসল হুসল,” হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল  
হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল

“সিহেরা হুসল হুসল হুসল,” হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল  
হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল

“সিহেরা হুসল হুসল হুসল,” হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল  
হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল

“সিহেরা হুসল হুসল হুসল,” হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল  
হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল

হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল  
হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল

হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল  
হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল

হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল  
হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল

হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল  
হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল

হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল  
হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল

হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল  
হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল

হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল  
হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল হুসল



জাতে কি, জন্মদিনে কি বাসা উপঢাওয়া দিলি বলত ?"—ওর হাসি ধরে না।

"হ্যাঁ, এর চেয়ে বড় উপঢাওয়ার জায়গা পাওয়া সম্ভব নয়" লুই ওর সমস্ত ছেসিকে আঁড় করল।

মার্গারিৎ হামীর হস্ত চুম্বন করল। তারপর বানিক বাজ প্রস্তুত। "লুই, হামীর কাছে তার কথা হয়েছে ?"

"বাক্য হল না মা, আমি শুনি তার কসেই মিথছি।" কাপ্তেন বুঝে কি অল্প দিকে মন দেবার মত অবস্থা ছিল—কিন্তু হোব। বিশ্রামের প্রয়োজন। কান্না কঝাবারী করে। "কনসার্বি মা। কবে ঘুমিয়ে নে।" বলে টুনি ঢলে গেলেন।

পরদিন সকালে সন্ধ্যা আগে এ জেলে উঠল। লুই সাবরাত চাপতেনি। শব্দে ধাবাশের জল নয়, উল্লেখ। বিছানার পেছনে গিয়ে এ টুড়ির ছিদ্র ভিন্নীটার সামনে। নিজেরই বিবেচনায় ও বৃদি হয়েছিল, এমন সময় কানে এক বন্দীর সেই "লুই।"

ও লুই পিঠাল। মার্গারিৎ এর দিকে পূর্ণ আত্মত্যাগ ভাবের চুটি মেলে চেয়ে ছিল। মার্গারিৎ হামীর বিবর্তন হৃদয় ওর দ্বারা বুঝে। এদিকে এসে এক জড়িয়ে বসল।

"লুই তুমি হুমান কি ?"

"না, আমিও আমার সবকিছু হেঁটে গা।"

"কি বলল মেই ?" বৃদি এভাবে নিজের স্বাধীন প্রতী উদ্ভাসে হৃদয়কে পড়বে।"

"তাত চল, তুমি কেমন আছ ?"

"হাপনের মত সুস্থ গো, আর অভ্যস্ত সুখী।"

হামীর হাত নিচে খেলতে খেলতে ওর চোখে পড়ল কিয়ৎ আড়িটা। ও হাসল, "কখন তোমার ওটা পড়িয়েছিলাম, তখন যেন যে কত কষ্ট ছিল।"

"আর আছ ?"

ও হামীর হাতের উপর নীরবে রাখা রাখল। "আজ আমি সবচেয়ে সুখী, প্রিয়।"

ওদের আলগে ছেলোটর ঘুম ভেঙে যেতেই সে কিছু বুজতে লাগল। লুই বুঝতে পারে মশারী কলে মিল, কুসে মিল একটা জানল। কিবে এসে খেল মার্গারিৎ ওকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

"চৌচাটার শিশু পেয়েছে লাভ।" জেসে জানাল মার্গারিৎ।

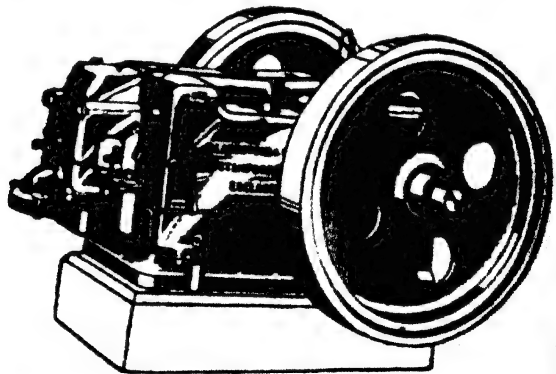
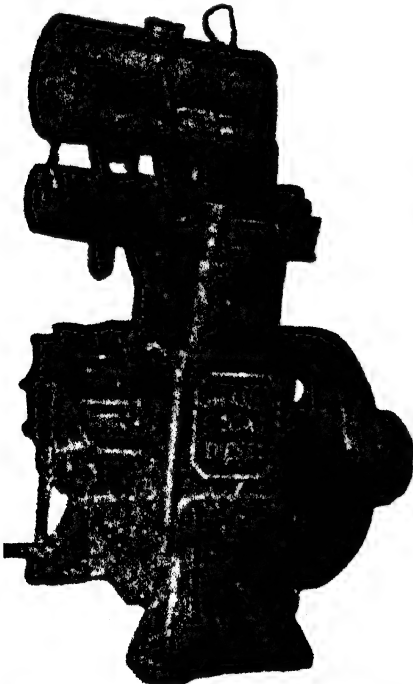
"বিনে ত না, একবারে থাকসেব মত গিলছে। ওর গীত থাকলে মাঝেও পেয়ে কেলেত বোধ হয়", টাটা করল লুই।

ছেলেটা আচম্বাক্ত শুনে খাড়া কিয়ৎ বাপের দিকে তাকাল, যেন একটা হাসল।

"সেইচ লুই, এর গালমল খেতেও তোমার দিক চেয়ে হাসছে, কোন দিক চক্ষেপ নেই। ছেলের মত জেসে।"

"মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেঁচে দুধ খায় না গো ?" লুই জেসে জিজ্ঞাসা করল।

"ত কি করে জানবে ? এই ত সব একটা হল। না বাপু, ছেলেই ভাল।"



অত চাই, গ্রাণ চাই, কুটীর শির ও কুটিকাৰ্ণ সেপের অত ও গ্রাণ এবং বাপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বহু মিন, লিটার, ব্রাকটোন ভিকেল ইঞ্জিন, লিটার পাল্পিং সেট, তাভলু ভিকেল ইঞ্জিন, তাভলু পাল্পিং সেট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এজেন্টস্:—

এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

১৩৮ নং ক্যামিং স্ট্রিট, ভিকল কলিকাতা—১

ফোন ১—২৭-৪২৭৫

। ওর—প্রিয় হীরাণ, বরগার, ইমেপ্ট্রিক মোটর, জাভাসো, পাল্প ট্রাকটর ও কলকারখানার ব্যবসায় সহযোগিতা বিবেকে কত কষ্ট থাকে।

“আমারা সেই মত, কিন্তু আসছে বার, বছর খানেকের মধ্যেই জন্ম নেবে ছোট একটি খুকি—ঠিক তোমার মত দেখতে।”

“বছর খানেকের মধ্যে?” বাথার ছাপ ফুটে উঠল ওর মুখে। অজ্ঞান পদে ও আশ্চর্য ভাবে বলল, “আমার স্বপ্নের কথা?”

“তোমার স্বপ্ন? পাগলি কোথাকার! স্বপ্নের কথা কেউ বিশ্বাস করে?” বলে ওর গাল টিপে দিল।

মার্গরিৎ তবু বিষম ভাবে মাথা নাড়ল, “আমি বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু আমার এই স্বপ্ন যে অত্যন্ত বকম।”

“কিন্তু আর তো ভয়ের কিছু নেই। প্রসবের সময়টাই আশঙ্কা জনক। তুমি সগোঁরবে পুরস্কার হাতে বেরিয়ে এসেছো। সেপদীয়া থেকে।” বলে ও ছেলের মাথায় হাত রাখল।

“তোমার কি মনে হয় সব বিপদ কেটে গেছে লুই?” আশায় আনন্দে ওর চোখ জলে উঠল।

“নিঃসন্দেহে, মার্গরিৎ।”

লুই-এর কথা ও পরম বিশ্বাসে মেনে নিল বড় আশস্ত হল।

“লুই বাইবেল থেকে কিছু পড়ে শোনাও না!” ও আবেদনের স্বরে বলল।

না ভেবেচিন্তে বইটা খুলেই ও পড়তে শুরু করল যা প্রথম চোখে পড়ল। সেটি ১১৪ নম্বরের স্তোত্র :—

—“ভগবানকে আমি ভালবাসি; তিনি আমার ক্ষীণকণ্ঠ শুনতে পারেন।

—“তিনি আমার প্রার্থনা শুনছেন; সাধা জীবন ধরে প্রতিদিন তাঁকে আমি স্মরণ করব।

—“মৃত্যুর ব্যথা আমার ঘিরে ধরেছে; কবরের ভীতি আমার আকুল করে তুলেছে।

—“অপরিসীম যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আমি, ডেকেছি তোমার হে ভগবান!

—“ভগবান আমার আত্মকে মুক্তি দাও; তুমি, তুমি ভগবান করুণাময়, স্রষ্টাকার; তুমি দয়ানয়।

—“ভগবান সন্তানদের রক্ষা করেন; বড় অবজ্ঞা সহ্য করেছি, তাই তিনিই আমার উদ্ধার করেছেন।

—“হে আত্মা, স্বীয় শাস্তিস্রোকে প্রবেশ কর, ভগবান তোমার সব কিছু দান করেছেন।

—“তিনি মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছেন আমার আত্মকে, অজ্ঞ মুখে দিয়েছেন আমার নয়নের, সর্ব পতন থেকে আমার বাঁচিয়েছেন।

—“এই মরলোকে আমি তাঁরই প্রীতিার্থে বেঁচে থাকব!”

ওর পড়া শেষ হলে মার্গরিৎ আঁচড়তে লাগল, “মৃত্যুর ব্যথা আমার ঘিরে ধরেছে; ভগবানকে আমি স্মরণ করেছি। ভগবান, আমার আত্মকে উদ্ধার কর।” তারপর ওর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল ধীরে ধীরে, “চিরন্তন তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন; তিনি আমাদের একেও দেখবেন, না গো?”

“হ্যাঁ গো!”

সারাদিন ও বেশ হাসি-খুসী ছিল। ১৬ তারিখ সন্ধ্যা নাগাদ ও ঘুমিয়ে পড়ল। ডাক্তার এসে ও ঘুমুচ্ছে দেখে পথে আসবেন বলে চলে বাচ্ছিলেন; হঠাৎ সেই সময় ও জেগে উঠে শঙ্কিত হয়ে তাকাতো

“কি হল মা?”

“ভয়!” ও বলল দারুণ বিচলিত ভাবে। ওর হৃই চোখে অস্বাভাবিক একটা ছায়া।

“ভয়?” ডাক্তার হেসে উঠলেন, “হা, হা! ভয় কিসের মা?”

ও স্বামীর কাঁধে হাত রাখল। “বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছি, না লুই?” “হ্যাঁ গো।”

“আবার সেই স্বপ্ন দেখেছি গো,” অসন্তুষ্ট শঙ্কিত ওর চাউনি।

“হো, হো! স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছ বাছা?” ডাক্তার বললেন,

“তোমার ছেলে যদি জানে তার মা এমন ভীতু, কি ভাববে বলত? এই নাও, এটুকু খেয়ে নাও দেখি,” বলে এক কাপ দুধ এগিয়ে দিলেন ওর মার হাত থেকে নিয়ে। এক চুমুকে ও সবটা খেয়ে নিল।

“এখন ভাল লাগছে না?” বলে ডাক্তার উপদেশ দিলেন, “এই সব খারাপ চিন্তাগুলো দূর করে দাও মা; এতদূরল অবস্থায় ভয় পাওয়া ঠিক নয়; এমন যে কত দেখলাম—প্রথম মা হয়ে সব এই রকম নানা উদ্ভট চিন্তায় আকুল হয়ে ওঠে; ভালো করে ঘুমাও মা-মণি, বৈ সোয়ায়।”

লুই ঠাঁর সাথেই বেরিয়ে গেল, জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে ডাক্তার মাথা নাড়লেন, “অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছে; রাতে জ্বরটা বাড়বে; এক দাগ গুণ্ণ দিও।”

“আর আশা নেই ডাক্তারবাবু?” নীচু নীচস গলায় কান্দুনি জানতে চাইল।

“উঁহ, সেকথা বলছি না, হয়ত ভাল হয়ে যাবে, অসম্ভব কিছু নয়; কিন্তু যা ভয় করছিলাম, ঠিক তাই হল; জ্বরটা!”

উনি নীচে গিয়েই দ্রুতপদে উঠে গেলেন; দেখলেন সিঁড়ির রেলিং-এ মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে লুই। অস্তুরঙ্গের মত উনি ও পিঠে হাত রাখলেন; লুই চমকে উঠল; ঠেকে দেখে বলল, “ও, আপনি।”

“আমি বলতে এলাম যে ও যেন বাচ্চটাকে আর দুধ ন খাওয়ায়; একটি দুধ—মা পাঠাচ্ছি; নয়ত বাচ্চাও অন্তর্বে পড়বে সবচেয়ে সতর্ক থাকতে হবে, ও যেন বিপদের বিস্ময়াস্ত আভাস ন পায়। তবে ও একদম ভেঙে পড়বে।”

তারপর লুইয়ের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, “আর মাসি এভাবে মুহুর্ত পড়ো না; ভয়ের বিশেষ কিছুই দেখছি ন শতকরা, পাঁচটা মুহুর্ত হয় না এসব কেস-এ। জ্বরটা এ মুশ্বিলজনক বটে, কিন্তু কোন অসুখটা না শুনি? আচ্ছা বৈ আসি; বৈ সোয়ায়।”

লুই প্রহৃত্তর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মা মেয়েতে কথা হচ্ছিল ওর স্তান কপালে লেগেছে গাঢ় লালের ছোপ, আর চোখও চকচক করছে; দারুণ আবোগের সঙ্গে ও কথা বলছিল, নীচু গা অবজ্ঞা, কারণ পাশেই ওর ঘুমন্ত শিশু। স্বামীকে আসতে দেখে তারদিকে ফিরে তাকাল।

“মার্গরিৎ!”

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ও ইশারা করল যে বাচ্চটা ঘুমুচ্ছে।

হেসে ওর পাশে গিয়ে বলল।—

“ভগো, কথা একটু কম বললেই পারত যে এসময়ে; স্নান পছন্দ যে, শরীর ঝাড়াপ হবে।”

এমন সময় তেরেস এল; দরজাটা কাঁচ করে উঠতেই বাচ্চাটার ঘুম ভেঙে গেল।

“দেখলি তেরেস, তুই বাচ্চার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি!” একটু ধমকের স্বরে ও বলল। তার পর বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চপল হাসিতে মুখের হয়ে বলল, “বাবু, আমার হয় ঘুমবেন, নয় থাকেন; আসলে কোথাকার!”

ও ছেলেকে দুধ খাওয়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় ধীরে ধীরে ওর তপ্ত হাতে হাত রাখল লুই।

“শুনছ, ওকে দুধ দিও না।”

সন্ধিষয়ে চেয়ে মার্গারিৎ প্রশ্ন করল, “কেন?”

“তোমার অঙ্গ অঙ্গ হয়েছিল কি না, তাই জ্বরের ঘোরে ওকে যদি দুধ দাও, ওর শরীর খারাপ হবে। অঙ্গ ছাড়লেই আবার খেতে দিও, কেমন?”

শান্ত উৎকর্ষ কণ্ঠেই কথা কট লুই বলল। কিন্তু ওর বুক ফেটে যেতে লাগল যখন দেখল কেমন ভাবে মার্গারিৎ করুণ দৃষ্টিতে একমনে শুনেছে ওর কথা।

“বেচারি!” বলে সাধে ও চোখ বন্ধ করল। পরে বাচ্চাকে আনর করতে গিয়ে দু’কোঁটা জল তার মুখের ওপর পড়ল; তাড়াতাড়ি সেটা মুছে দিলে ওর স্বামীর চোখ তা এড়ায় নি” সে স্নেহে বালিকা-বধূ মাথায় হাত রাখল। খানিক বাদেই ও চোখ তুলে চাইল। এমন ভাব দেখাল যেন পরম শান্তিতে বিশ্রাম করছে।

“কিন্তু বাচ্চাটির খাবার কি হবে?”

“মিস্যি শান্তো এখনি দাঁট পাঠাবেন বলে গেলেন।” বলেই ও ছুড়ে দিল, “দু-তিন দিনের ব্যাপার।”

সারা সন্ধ্যা জ্বরের ঘোরে কাটল; তবু মুখে টু’ শব্দটি নেই। ও প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, ওর যন্ত্রণা দেখে স্বামী যেন উদ্বিগ্ন না হয়।

দাই এলে মার্গারিৎ তাকে ভাল করে দেখল। মার্গারিৎর চেনা লোক, স্ত্রীর বিকার; বড় ভাল মানুষ। তিন ছেলের মা। মার্গারিৎ ওর হাতে চীন দিল, “আচ্ছা তোমার দুধ ভাল ত বাচ্চা, বলকারক বেশ, না?”

“আজ্ঞে, মানাম, তুমি ত আমার বড় ছেলে দুটিকে দেখেছ—কেমন যশ-গুণ্ডা। ছোটটিও ওই ধরনের। বছর খানেক বয়স হল, লোকে দেখে ভাবে তুই বছরের ছেলে। জানত, এর আগে এ কাজ আমি করিনি; কিন্তু মা, ডাক্তার বাবু ওসিক যখন গেলেন তখনকার খোজ, আর জানালেন যে তোমার ছেলের জন্ত দরকার, মাওপিছু না ভেবেই আমি এগিয়ে গেছি: ‘ডাক্তার বাবু আমার দায়ী খুবই ভাল, গায়েও কম স্তোর ধরি না। আমার নেনেন?’ নি তুমি রাজী, ‘হ্যাঁ, স্ত্রীর বিকার, তুমি বড় ভাল মানুষ,’ উনি গেলেন। কিন্তু আমি বাধা দিচ্ছি, ‘মনে নেই ডাক্তারবাবু, উনিই ত কিংবা আমার গিওমকে রকে করেছিলেন ও ভুবে যাচ্ছিল যখন?’

মার্গারিৎ চাবী বোয়ের দিকে চেয়ে দেখল, ও বাড়নের খুটে খ মুছল।

“বাচ্চাটিকে দেখাবে মা?”

ওর হাতে ছেলে দেবার সময় হাজার রকম আবোল-তাবোল বেশ দিল মার্গারিৎ। ছেলেকে কি ভাবে যত্ন করতে হয় তার

বিবরণ অনভিজ্ঞ বালিকার মুখে শুনে দাঁট ত তেরেস বাঁচে না। মার্গারিৎ স্বামীর সঙ্গে বসে দেখছিল ওর বাচ্চার খাওয়া। বন্ধুত্ব ধরে দাঁটয়ের বৃকের দুধ গেয়ে ছেলোটা তার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ল, মার্গারিৎর চোখ জলে ভেসে গেল। ওর স্বামী ওর মুখ তুলে নিয়ে চুমা খণন দিলে, মার্গারিৎ তার হাত ধরে নিরাশার স্বরে বলল, “দেখো, আমি যখন থাকব না, বাচ্চাটা আমার একদম ভুলে যাবে!”

সাব্যবাহিক ঘমতে পারল না ও, শেষে অমুরোধ করল ওর বাচ্চার বিছানা ওর বিছানার ধারে এনে রাখতে। লুই ভেবেছিল ও ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই একটা কোঁচের ওপর শুয়ে একটু হাতপা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল, আর এক ভাবে তাকিয়েছিল ওর স্ত্রীর দিকে। মার্গারিৎ তার ভেলেব দিকে ঝুঁকে কি দেখছিল, লুইয়ের দীর্ঘশ্বাসে ও ফিরে তাকাতেই লুই প্রশ্ন করল।

“কি গো তুমি এখনও ঘুমও নি? করছ কি?”

“ছেলোটাকে দেখছি।”

“এখন ঘুমিয়ে নিলেই ভাল করতে, ছেলেকে দিনের বেলায় দেখতে।”

“কিন্তু তার আগেই যদি মরে যাই?” আশ্রয় ভাবে মার্গারিৎ ফিস ফিস বলল।

“পাগলী কোথাকার,” লুই এসে ওকে জড়িয়ে ধরল, “দিনরাত তুমি খালি মৃত্যু চিন্তাই করবে?”

“জান না তোমার ছেড়ে যেতে কী কষ্টই হচ্ছে, নবাগত অতিথিকে ও ছাড়তে বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু—”

“তবু কি? কে তোমার যেতে দিচ্ছে? ভগবান? আমার হাত থেকে যমরাজ স্বয়ং এসেও তোমার ছিনিয়ে নিতে পারবে না মার্গারিৎ!” দুকণ্ঠে ও ঠাঁত ঢেপে বলল, কম্পিত ওষ্ঠ দিয়ে স্পর্শ করল মার্গারিৎর ওষ্ঠ। শূন্য দৃষ্টিতে মার্গারিৎ হাসল।

“লুই, প্রিয়তম!” ওর কপালের চুলগুলি সরাস্তে সরাস্তে আবেশের স্বরে মার্গারিৎ ডাকল।

লুই উঠে ওকে ঘূমের ওয়ুধ দিল।

অর পুরোপুরি না ছাড়লেও ১৭ তারিখ সকালে ওকে অনেক সস্থ লাগল। ডাক্তার যখন এলেন, ও তার স্বাভাবিক হাসিতে তাঁকে আপ্যায়িত করল। প্রথমেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আজ ছেলেকে দুধ খাওয়াতে পারবে কি না। ডাক্তার হাসলেন।

“তুমি মা বড় অধীর হয়ে উঠেছ দেখছি; আগে নাজী দেখি তার পর ছেলের কথা।—বাঃ বাহু বেশ বুঝেছেন ওর কথা হচ্ছে,” বলে বাচ্চাটাকে উনি আদর করলেন। মার্গারিৎর নাজী দেখে উনি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

“তোমার অঙ্গ এখনও ছাড়েনি মা; ছেলেকে এ অবস্থায় দুধ খাওয়ান ঠিক হবে না।” রোগীগীর ভাব পরিবর্তন দেখে উনি সাধনা দিলেন, “সেবে ওঁ মা, তারপর যত খুসী দুধ খাইও, কেমন?”

“তা আর আমার ভাগ্যে নেই ডাক্তারবাবু!” ওর মুখে অতৃপ্ত করুণ হাসি খেলে গেল। শিশুর কপালে মুখ রেখে ও বলল, “ভগবান তোকে দেখবে বাপ, তোর বাবা থাকবে, কিন্তু মা থাকবে না যে, মা থাকবে না!”

ফিরে তাকাতেই যখন দেখল ওর স্বামী মুখ অজস্রিক ঘুরিয়ে আশ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে সযত্ন করতে, তাড়াতাড়ি মার্গারিৎ জোর

করে স্নেহে বলল, “আমি বড় বাড়াবাড়ি করছি না গো? একটুখানি স্বপ্ন হয়েছে আর ধরে বেখেছি যে আমি মরতে বসেছি।” লুইয়ের কাঁধে ও হাত রাখল।

“নাও বাপু ভূমিই ত এখনো কালো প্রজাপতির পেছনে পেছনে ছুটছ; আমারগুলো কত সহজে তাড়িয়ে দিলাম দেখত? কেন কষ্ট পাচ্ছ? আমি মরব না লুই, মরতে চাই না। হল ত? আচ্ছা, মিসিয়া শাঁতো, এত অল্প বয়সে, এমন খাদ্য স্বাস্থ্য থাকলে কেউ কখনো সামান্য স্বপ্নে মরতে পারে?”

“মোটের না, মোটের না। তোমায় দেখে বড় আশ্চর্য হলাম মা; সব সময় প্রকৃত থাকতে চেষ্টা কর; কালকেই তা হলে স্বপ্ন ছেড়ে যাবে।”

আবার আসবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। বিকাল চারটে নাগাদ জ্বর বাড়ল; ওর বাবা এসে দেখলেন প্রলাপ শুরু হয়েছে।

“বাবা, বস এখানে!” সামনের চেয়ার দেখিয়ে ও বলল, “আমি সেরে উঠব, না বাবা? আর একটু সেরে উঠলেই আমার দক্ষিণ দেশে যাব, নীসে।”

তাবপন স্বামীরকে বলল, “সেই ছোট বাড়ীটা আবার ভাড়া নেব, কেনন? সেখানেই ত আমাদের নতুন অভিবাসন কথা প্রথম আলোচনা করি আমরা। আবার যাব ত নীসে? বল না গো?”

হঠাৎ দাক্ষিণ শব্দ্য ও চেষ্টা উঠল,

“কই? ও কই? আমার ছেলে আমায় ফিরিয়ে দাও!” বিছানায় ও উঠে বসল।

“এই ত তোমার ছেলে, তোমার পাশেই রয়েছে; কেন মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছ?” ওকে শুইয়ে দিয়ে লুই ছেলেকে রাখল ওর পাশেই।

“বাছার খিদে পেয়েছে গো”, বলেই ও জামার বোতাম খুলতে গেল। লুই সন্তর্পণে বাধা দিল।

“মার্সো, ডাক্তার তোমায় মানা করে গেছেন না ওকে দুধ দিতে?”

“কেন?” অবাক হয়ে প্রশ্ন করল মার্গারিৎ, কারণ স্বপ্নের ঘোর ওর কিছুই মনে ছিল না।

“তোমার যে অন্ত্র খরছে।”

“অন্ত্র?” ও চমকে উঠল।

“হ্যাঁ, গো।”

“তেনম বাড়াবাড়ি নয়, না প্রিয়? সেরে উঠব’ন। বলত লুই, শীগগির আমি সেরে উঠব, তাই না?—কাল?” ব্যথাভরা কণ্ঠে ও প্রশ্ন করল।

“হ্যাঁ—জ্ব-একটার বেশী কথা লুই বলতে পারছিল না। ইতিমধ্যে ডাক্তারকে ডেকে পাঠান হয়েছিল; তিনি এসেন।

“ডাক্তারবাবু, আমি মরতে চাই না, আমি সেরে উঠব। লুইয়েরও তাই মত; ও সত্যি কথাই বলে।”

মিসিয়া শাঁতো ওর বাড়ী দেখলেন।

“ভগবান দেখছেন? আমার স্বপ্ন তেনম নেই, না?”

“সামান্য আছে; তোমার এখন ঘুমতে চেষ্টা করা উচিত মা, একটা ঘুমের গুঁড় দেব।”

“তা হলেই ঘুম হবে?”

“হ্যাঁ মা।”

“সারারাত?”

“নিশ্চয়ই।”

“আর সকালে উঠে দেখব সেরে গেছি, না?”

“একদম সেরে উঠবে না, তবে দেখবে অনেক তাজা লাগছে শরীরটা।”

উনি প্রেসক্রিপশন লিখতে বসলেন; ওরুধের দোকানে লোক গেল; ও ওরুধ খেল; তন্দ্রা এল; ঘুমিয়ে পড়ল। ওর স্বামী আর মিসিয়া শাঁতো ওর পাশে বসে রইলেন। ওর বাবা আর মাও ছিলেন। দম নিতে ওর যেন কষ্ট হচ্ছে, গা পুড়ে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লেও ছটকট করতে লাগল বিছানার ওপর। সবাই চুপ করে বসে রইলেন। খবরের কাগজ হাতে মিসিয়া শাঁতো বসেছিলেন, ঘন ঘন তির্যক দৃষ্টিতে রোগিণীর অবস্থা লক্ষ্য করছিলেন। ওর মা ছেলটাকে দোল দিচ্ছিলেন, বাপ কাতর নয়নে চেয়ে ছিলেন প্রাণতুলা কন্ঠার দিকে, তাঁর একমাত্র সন্তানের দিকে। ওর স্বামীর দিকে চেয়ে তিনি দেখলেন, তার মুখে অবাক যন্ত্রণার কালো হয়ে উঠেছে। নতজানু হয়ে ও বসেছিল স্ত্রীর শয্যার পাশে, থেকে থেকে ক্লান্তিতে, অবসাদে মাথাটা নামিয়ে রাখছিল তার বালিশে। হাতের মুঠোয় ধরা ছোট তন্তু হাতটি ও থেকে থেকে চুম্বন ভরে দিচ্ছিল, ঘুমিয়ে পড়ার আগে মার্গারিৎ স্বামীর হাতে ওঠে ভাবে হাত বেগেই শুকেছিল। সকাল প্রায় ছটা নাগাদ, যখন পূর্বের আকাশ সাদা হয়ে এল, মার্গারিৎ চোপ বুলে উঠে বসল।

“লুই কই? আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না ত?” লুই যে একে ধরে বসেছিল, তা ও বুঝতে পারেনি।

লুই তাড়াহাড়ি সবে বসল।

“এই ত বন্ধু, কোথায় ছিলে?” শিশুশব্দ হাসিতে ও বললল করে উঠল। শীর্ণ হুটি হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল মার্গারিৎ। তার পর আবার শুয়ে পড়ল বিফারিত নেত্রে।

“লুই, ছেলটো কই?”

বহুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মার্গারিৎ তার মুখে চুম্বা দিল।

“বাছারে, ঘুমিয়ে আছিস? বাবার বেলা ভেবেছিলাম তোর স্বচ্ছ চোপ হুটি দেখে যাব। যাক, স্কোভ নেই সেক্ষেত্রে। ওকে দোলনায় শুইয়ে দাও গো! দেখ যেন জেগে না ওঠে।”

কাপ্তেন ছেলেকে দোলনায় রেখে এলে, তরুণ পিতার হাত হুটি চেপে ধরল মার্গারিৎ পবন স্বপ্নে।

“বন্ধু, বড় অন্ধকার, আর একটু কাছে এস, আরো কাছে আরো!” দারুণ আবেগে জড়িয়ে ধরল ও স্বামীর হাত।

“উঃ, বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত,” ও বিড় বিড় করে বলল, “কি ঘুমটাই পাচ্ছে, প্রিয়, প্রিয়তম, এ ঘুমের আগে আমায় টেনে নাও, বুকে টেনে নাও।”

লুই ওকে বুকে টেনে নিল।

“ভগবান আমাদের মঙ্গল করুন।” মার্গারিৎ বলল।

ঘুমের আগে ছোট বেলা থেকেই এ প্রার্থনা ও করে এসেছে। ওর চোখ বন্ধ হয়ে গেল, চোঁট ছুটো ঈষৎ কঁক হয়ে গেল। সুখান দিয়ে উড়ে গেল ওর স্মরণীয় আত্মা ভগবানের বিশাল স্রষ্টা পানে, আর মার্গারিৎ আচ্ছন্ন হয়ে রইল পৃথিবীর ঘরে।

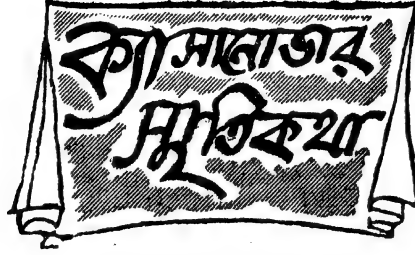
মাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব

সমন্ব লাইফবয় দিবে স্নান করেন

খেলাধুলা করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্মই বলুন ধুলোময়লায় ছোয়াচ ঝাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধুলোময়লায় থাকে রোগের বীজাণু যার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের নানারকম ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে এবং স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে।

লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করলে আপনার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে; আপনি আবার তাজা স্বরূপে বোধ করবেন। প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন।





[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

মুখের মুহূর্তগুলি আসে আর যায়—নিবিড় করে ধরতে গিয়ে  
ওধু তার বেশটুকু নিয়েই শান্ত হোতে হয়।

আমারও যাবার মুহূর্তটি ঘনিষে এলো এক অব্যস্তিত ঘটনায়।  
এক অকৃতজ্ঞ স্বল্পপরিচিতকে সাতাবোর বিনিময়ে পেলান জুরাচুরীর  
অপবাদ। বিতৃষ্ণায় ফ্লোরেন্স ছাড়তে বাধ্য হোলাম।

কিন্তু যাবার আগে টেরেদার কাছে না গিয়ে পারলাম না।  
আর বিদায় মুহূর্তে আমাদের অশ্রুসজ্জল নিবিড় আলিঙ্গন ওর স্বামী  
বেচারার চোখে যে সর্ধেকুল ফুটেয়েছিল, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি রোমে। আমার কাছে কার্ডিঙ্গাল  
পাসিয়োনের নামেও একটি পরিচয়-পত্র ছিলো। সেগানি নিয়ে  
আমি দেখা করতে গেলাম ওর সঙ্গে। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে  
আমার নিজের মুখ থেকে আমার পলয়নের কাহিনী শুনতে  
চাইলেন।

—“কিন্তু সে যে বিরাট কাহিনী”, সবিনেরে জানালাম।

—“ভালোই তো, আমি শুনেছি তুমি বলতে কইতে বেশ  
ভালো পারো।”

—“কিন্তু তাহলে আমি বরং এই মেয়ের উপর বসেই বলি।”

—“না, না, তা কি হয়? তোমার অনন দানী জামাকাপড়!”

এক জন ভূতা একটি টুল গ্রন্থ হাজির করলো। না আছে  
তার হাতল, না আছে ঠোঁটের দেবার জায়গা। প্রচণ্ড বিরক্তি আর  
অস্বস্তিতে অলে উঠলাম। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আর দায়সারী  
গোছের করে গল্পটি বললাম পনেরো মিনিটের ভিতর।

—“তোমার বলার চেয়ে লেবার ভঙ্গী ভালো।”

—“আরাম করে না বললে আমার কথা বলার জুত হয় না।”

—“কেন, এখানে তুমি আরাম পাছ না?”

—“না, বিশেষ করে আপনার এই টুলটা।”

—“তুমি তোমার স্বাক্ষরটা ই বৃষ্টি পছন্দ করে?”

—“তা’ করি।”

—“এই নাও প্রিন্স ইওজেনের অস্তোষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে আমার  
ভাষণ—এটা তোমাকে উপহার দিলাম। আশা করছি আমার  
লাতিনে কোন খুঁত পাবে না। হ্যাঁ, কাল দশটার সময় মহাহুভব  
পোপ তোমাকে দর্শন দাবেন।”

বিদায়ের ইঙ্গিত বুঝে উঠে এলাম।

আমি পোপকে আগে জানতাম যখন তিনি পাট্রুয়াতে সামাজ্য  
একজন বিশপ ছিলেন। ওর পবিত্র পাট্রুয়ার পবিত্রতম ক্রশচিহ্নকে  
চুষন করতেই উনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আর আমার

সবিনয় নিবেদনের উত্তরে জানতে চাইলেন—পোমে উনি আমার জন্তে  
কী করতে পারেন।

—“এটুকু ব্যবস্থা করার চেষ্টা করন, যাতে আমি নিরাপদে  
ভেনিসে ফিরে যেতে পারি।”

—“আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে রাজনৃতের সঙ্গে আলোচনা করে  
তোমাকে তাঁর মত জানাবো।”

এবপর কিছুক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোপ আলোচনায় দর্শনের  
সময় উত্তীর্ণ হোলো আমি বিদায় নিলাম।

কিছুদিন পরে রোম থেকে চলে যাবার সময় আর এক বার  
পোপের দর্শনপ্রার্থী হোলাম। উদ্বেগ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কি না  
জানা। অবশ্য আমাকে উনি এমন সহদয়তায় অভ্যর্থনা করলেন  
যে আমি প্রায় অভিভূত। গদগদ চিত্তে জানালাম ভগবানের মূর্ত্ত  
শ্রুতীক—পৃথিবীতে উনি ছাড়া আর কে? যে কোনো পৃষ্টানের  
জীবনে সবচেয়ে বড় উৎসব ওর দর্শন—সবচেয়ে বড় কামনা ওর  
সঙ্গ।—গর্ভোজল মুখের শ্মিত প্রসন্ন হাসিটুকু আমার চোখ এড়ায়নি।  
একটি ঘণ্টা পরে আমার সঙ্গে ভেনিস, পাট্রুয়া আর প্যারিসের গল্প  
করতে লাগলেন। খুব আগ্রহ দেখলাম ওর ঐ সব জারগা ঘুরে  
আসতে। সব আলোপ আলোচনার শেষে আমার আমার প্রার্থনাটির  
কথা অবগ করিয়ে দিলাম—অতি বিনীত ভাবে। উত্তরে তিনি  
আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন—“ঈশ্বরের কাছে নিবেদন কর বৎস।  
আমার প্রার্থনার চেয়ে তাঁর করুণার শক্তি অনেক বেশী।”

আর দু’টি দিন ছিলাম রোমে। তারপর কোন খেয়ালের বেশ  
সোজা পাড়ি দিলাম টুরিয়ে।

## দশম পরিচ্ছেদ

কাউট এ, বি’র সঙ্গে পরিচয় হয় কাউট বোরোমিওর বাড়ীতে।  
আর প্রথম দর্শনেই ভদ্রলোক আমাকে কী যে পেয়ে বসলেন  
জানি না। প্রায় ছবেলাই একসঙ্গে খাওয়া লাওয়া হো করতেন, মাঝে  
মাঝে বিশেষ প্রয়োজনে টাকাও ধার নিতেন—অবশ্য একদিন  
মনের আবেগে আমার কাছে স্বীকার করে ফেললেন যে, আমি  
না থাকলে ওকে না পেয়ে মরতে হোতো। সম্প্রতি এমন অর্থাভাব  
চলেছে। উনি স্পেনে কাজ করতেন, বিয়েও করেছেন শুধানে।  
ওর সহধর্মিণী?—ওর মতে একটি বিহ্যজ্ঞেখা—বয়স এই পঁচিশ কি  
ছাষিশ। ভদ্রলোক আমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন মিলাদে  
ওর বাড়ীতে কিছুদিন থাকার জন্ত। প্রত্যাখ্যান করাই উচিত  
ছিলো আমার, যখন জেনেছি পরিবারের সমস্তসমুদয় অভাব—

স্বভাবের ধর্ম—সে যাবে কোথায়? এ স্পেনীয় বিদ্রোহীকে একবার প্রত্যক্ষ করবো না?—চিঠি পাঠছি যে—টুকরো টুকরো কথার ফুলকি চমক জাগায় মনে—ছবি এঁকেছি ইংরেজ মেয়ের বোধশক্তি, স্পেনের নিবিড় অন্ধত্ব আর ফ্রান্সের লাবণ্য আর মাথুর্য্য গড়া সেই বিদ্রোহী।

বিস্তৃত হয় যে কপাল—যোগকল মিলসো না বরাতে। দেখতে মন্দ না, নেহাৎ ছোটোখাটো গড়ন আর তেমনি গম্ভীর। আমাকে দাবার আগে চিঠিতে জানিয়েছিলেন ছোটুকরো তাকেটা কিনে নিয়ে যেতে। ওখানে পৌঁছে তাঁকে যখন জানালাম যে তরুণ তামিল ছোয়েছে, তখন মাত্র একটা শুষ্ক ধবধব জানিয়ে বললেন, ওর পুরুত ঠাকুরকে বলবেন আমাকে দামটা দিয়ে দেবে। গেতে বসে কাউন্ট এ, বি উচ্ছ্বসিত কিন্তু শ্রীমতীকে দেখলাম দারুণ গম্ভীর, মাঝে মাঝে আমাদের হাস্যকৌতুকের উত্তরে একটু মুহূর্তস্বরূপ প্রত্যুত্তর। গাবারের খালা থেকে একটি বারও চোখ তুলতে দেখলাম না—অথচ প্রতিটি খাওয়ার অসংখ্য ক্রটি ধরে অজস্র বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখলাম পুরুত ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। অবশ্য ওই কাকে একটা কথা বলে রাখা ভালো—ইতালিতে প্রায় প্রতি বাড়িতেই একটি করে পুরুত ঠাকুরের খুঁই চলন। গৃহস্থের কাছেই তাদের গাওয়া শোওয়া সব চল, বললে ঘরকন্নার হাজার খুঁটিনাটির দায়িত্বও তাদেরই ঘাড়ে। এ বাড়ীর পুরুত ঠাকুরটি আছেই একটা গীর্জায় ভোরবেলা প্রার্থনা করতে যান—কিরে এসে সারাদিন সমস্ত দাসরাটি চালাতে হয়, সেই সঙ্গে কদ্রীটিরও হাজারো ফরমান।

গাবার পর কাউন্ট আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘর অবধি এলেন—তার নীরস ব্যবহারে বিবস্ত, লজ্জিতও বটে, তবে আশ্বাসও দিলেন পবিত্র ঘনিষ্ঠ হলে মাঝেমাঝে সন্ধান পাবো নিশ্চয়ই।

সে যাবে। আপাততঃ বাড়ীর সেরা ঘণ্টা পেয়ে মনটা খুসী। বাড়ীর আগল অবস্থা সত্যিই অভাবগ্রস্ত। বাসনপত্র মাটির, দাগলাগা টেল-ঢাকা,—বাধুনি, কি, সবই একটি মেয়ে, পরিচ্ছন্নও জীর্ণ। আমার ফরাসী পরিচারক ক্রেয়ারমও তো তার শোবার আস্তান' দেখে নেইই আকুল—ছোট্টা, নোঁরা, অন্ধকার খুঁসী একটা।

ভোরবেলা বিছানা থেকে ওঠার আয়োজন করতে বাচ্ছি, এমন সময় পুরুত ঠাকুরের প্রবেশ। আমাকে অনুবোধ করলেন যে কদ্রী জিজ্ঞাসা করলে আমি যেন বলি যে পুরুত ঠাকুরের কাছ থেকে আমি তিন শ' ফ্রাঙ্ক এ তাকেতার দাম হিসাবে পেয়েছি। আমার তো চক্ষু স্থির।

—“একজন পুরোহিত ছোয়ে আপনি আমাকে মিথ্যা বলবার জগ্গে অনুবোধ করেছেন? অশ্চর্য্য! না: বলতে হলে সত্যি কথাই বলুন।”—

—“আপনি তাহলে গিন্নীমাকে চেনেন না মশায়? আর এ বাড়ীর ধারাও কিছু জানেন না দেখছি। বেশ, আমি কর্তার সঙ্গেই কথা বলবো তাহলে।”—

পুরুত ঠাকুরের মত কাউন্টকে দেখলাম শ্রীমতীর মেজাজের ভয়ে সশঙ্কিত। স্ত্রীর মিথ্যা দস্ত বাঁচাবার জগ্গে আমাদের মধ্যে শামটা ঠিক হয়ে গেছে বলতে বাজী হলেন।

ঘরে বসে কতকগুলো চিঠিপত্র লিখছি। দরজা ঠেলে ঢুকলেন মিস্ট্রী—তাঁদের একজন পারিবারিক বন্ধু সঙ্গে আমার পবিচয়

করতে। ভদ্রলোকের নাম মার্শিস ক্রেয়ারম, প্রায় আমারই সমবয়সী। অভিবানন জানিয়ে বললেন আমার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য এড়াতে চান না—তাহাড়া এই ঘরখানিতেই একমাত্র আশ্রন রাখার ব্যবস্থা, তার আশ্রন থেকে বঞ্চিতও হোতে চাননা। ক্রেয়ারমও ইতিমধ্যে আমার বাস্চা খুলে জামাকাপড় জিনিষপত্র সব বের করে ফেলেছিলো—ক্রেয়ারগুলোও প্রায় সবকটাই স্থগীকৃত। তারমধ্যে মার্শিস কাউন্টসকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ছোট্টা একটা পুতুলের মত নিজের থাটর উপর বসিয়ে দিলেন। লক্ষ্য করলাম কাউন্টসের মুখ বাধা ছোয়ে উঠেছে—জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়েন।

—“যথেষ্ট বরস তো হয়েছে—তবু শিখলেন না আমাদের মত মহিলাদের সঙ্গে মান রেখে কি করে চলতে হয়?”

—“ঠিক কথা কাউন্টস! মাগ্ন করি বলেই তো আপনাকে শাড় করিয়ে রেখে নিজে বসতে পারি নি”—

তার পর জামাকাপড়ের স্থপের দিকে চেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোনো মহিলাকে আশা করছি কি না?

—“না, তবে আশা আছে, মিলানে এমন একটির সন্ধান পাবো নিশ্চয়ই, যাকে এগুলি উপহার দিতে পারবো।”—

সেদিন রায়ে আচাধা থেকে শুরু করে আচাধা-পাণ্ডুলি, মদ এমন কি টেবিল-চাকগুলি অবধি এলো ওই ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে। খেতে বসেও লক্ষ্য করলাম, মার্শিস অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন কাউন্টসের রুক্ষ গাভীঘোর ক্রটি শোধরবার জগ্গে। খাবার পর সকলে মিলে গেলাম অপেরা দেখতে—সুখবর মিললো সেখানে টেরেসার দর্শন পেলাম। ঠিক করলাম শীগগিরই যাবো ওর সঙ্গে দেখা করতে।

ভোরবেলা ক্রেয়ারমও এসে খবর দিলে, একটি মেয়ে দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে। সম্মতি পেয়ে ঘরে এসে ঢুকলো লীপাঙ্কী স্ত্রী লাবণ্যময়ী একটি তরুণী, আরোমন জানালো আমার জামাকাপড় কাচা আর সেলাই-কোড়াই ইতাদি করার ভার নেবার জগ্গে। ভারী ভালো লাগলো ওকে,—“কোথায় থাকো তুমি?”

—“এই বাড়ীরই নীচের তলায় আমার মা-বাবার সঙ্গে।”—

—“তোমার নাম?”

—“জেনোবিয়া।”—

—“বা:। রূপের মতো নামটিও মিষ্ট। তোমার করপল্লবে চুঘন জানাতে পারি?”

—“না, তা' আর হয় না, এ করপল্লব আগেই অবিকৃত। এখানকার কার্ণিভালের শেষেই একজন দক্ষিণ সঙ্গে আমার পরিচয় স্থির।”—

—“কেমন দেখতে তোমার ভাবী স্বামীটি? স্বাম্বর?—বেশ ভালো রোজগেরে তো?”

—“না, না, কোনোটাই নয়—শুধু নিজের একটি বাড়ী, হবে এই আশাতে বিয়ে করছি।”—

—“খুব ভালো বলেছে। ভারী খুশী হলাম শুনে। আমার যে তাকে দেবার মতোও কিছু কাজ আছে—যাও, গিয়ে ধরে নিয়ে এসো।”—

আমার সম্মান সমাপন হোতে না হোতেই জেনোবিয়া তার হু

বরকে ধরে নিয়ে এসে হাজির। ছোটখাটো মানুষটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যহীন।

—“এই যে, আপনিই এই মিটি মেয়েটিকে বিয়ে করছেন?”

—“আজ্ঞে হাঁ! মশায়! আর দিন দশেক পরেই বিয়েটা হবে।”

—“দিন দশেক, কেন? কাগজ বা নয় কেন?”

—“উঃ আপনার এত তাড়া?”

—“নিশ্চয়ই, অন্ততঃ আপনার জায়গায় আমি তাই-ই করতাম। যাক, এই সিকটা দেখুন। কাল বলনাচে যাবার জন্তে একটা ‘জোমিনো’ করে দিতে হবে। তার জন্তে এই রইলো দশ সেকুইন— আপনার বসিদের টাকা হিসেবে।”

লোকটা তো আকস্মিক আটখানা হোয়ে চলে গেলো। একটু পরেই আমিও মিলানে টেরেসার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কেন জানি না টেরেসার প্রতি আমার একটা অতি কোমল মমতা ভরা ভালবাসা বরাবরই ছিলো...দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সেটা বরা না কমে বেড়েই চলেছিলো।

আনন্দে অধীর হোয়ে টেরেসা আমাকে স্বাগত জানালো। অপ্রত্যাশিত ভাবে আবার দেখা হওয়ার আনন্দে আবেগে ও ভালো করে কথাই বলতে পারছিল না। একটু প্রকৃতিস্থ হোয়ে প্রথমেই জানালো ও আর ওর স্বামীর সঙ্গে থাকে না। অসহ হোয়ে উঠেছে স্বামীর সঙ্গে। টেরেসা অবশ্য স্বামীকে অর্থ সাহায্য করে, তবে এক সপ্তে যে, তাকে বোমেই থাকতে হবে। সিজারো এসেছে ওর সঙ্গে মিলানে। টেরেসা কথা বলে যাচ্ছিল আর আমি মনে মনে বিশ্লেষণ করছিলাম আমার নিজের অসুস্থতি। আজ আঠারো বছর ধরে টেরেসার প্রতি আমার ভালোবাসা কোথাও মলিন কোথাও ফুল হয়নি...কিন্তু আজ আমার মনের গঠন এমন হোয়ে দাঁড়িয়েছে যে একটীর উদ্দেশ্যেই সর্বস্ব অর্পণ দিয়ে শূন্য হোতে আর পারে না। মনের বৌদ্ধিতে একমুখিত্বের পূজায় সে নাড়াজ।

সেদিন বাড়ী ফিরে খাবার টেবিলে দেখলাম কাউন্টসের মেজাজটা বেশ খুশী খুশী...এমন কি আমার দীর্ঘ অসুস্থত্বের রহস্য করে বললেন—

—“সারাটা দিন কাটলো কোথায় জানি না ভেবেছেন? কিন্তু শ্রীমতীর যে একটা শ্রীমান আছেন, আপনার এত ঘন ঘন যাতায়াতে তিনি না সরে পড়েন।”

—“সরসেই সেই শূন্য জায়গা পূর্ণ করবো।”

—“আপনার উপহারে যারা বিগলিত হয়ে পড়ে, তাদের কাছেই শুধু আপনি দাসত্ব স্বীকার করেন।”

—“ঠিক বলেছেন, পারতপক্ষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করি না... কারণ দেখছি এই পন্থাটি অবলম্বন করলে আর কিছুতেই হতাশ হতে হবে না।”

“কিন্তু আপনার বান্ধবীটির মনের খবর জানান বলে মনে হচ্ছে না তো...অত্যন্ত অর্থলোভী ছাড়া আর কেউ পারে গ্রেসির সঙ্গিনী হতে?”

নিঃশব্দে শুনে গেলাম। ইঙ্গিতেও প্রকাশ করলাম না যে আমার বখাসকর গ্রেসির ব্যাঙ্কে থাকে...প্রকাশ করলাম না আমার নিশ্চিত অর্থ যে টেরেসা শক্তিমানের হাতেই আশ্রয় পেয়েছে...

সেখানে সকলে মিলে প্রথমে এক জুয়ার আড্ডার পরে একটা

অপেরা দেখতে গেলাম। সবশেষ দৃশ্যের কিছু বেশী টাকা হেরেছিলাম আমি। বোটারী কাউন্টের আমার চেয়েও বেশী দুঃখ হোলো তাইতে। ঠুকে হায় হায় করতে দেখে মনে মনে হাসলাম... ঠুর ঠুরী যাকে ঘণা করেন সেই গ্রেসির কাছেই আমার হাজার হাজার ফ্রান্স জমা আছে। আমার অর্থকৃতির বহরে বিগলিত হৃদয়ে কাউন্টস এসে জিজ্ঞাসা করলেন টাকার প্রয়োজনে আমি আমার দামী লোমের পোষাকটা বেচবো কি না। প্রায় হাজার সেকুইন দাম হবে ওটার উনি শুনেছেন।

—“ক্কা করবেন, ওটা ছাড়া অল্প কিছু বেচতে পারি, ওটি কিছুতেই বেচবো না।”

—“মাশিগু ত্রিলাংসি ওটা উপহারের জন্ত কিনতে চান।”

—“ওকে বলবেন আমার মাপ করতে—”

আর কোনো কথা বললেন না, যদিও কিছু একটু বিচলিত দেখলাম ওকে। সেখানে অপেরা থেকে ফেরার পথে টেরেসার সঙ্গে দেখা হোলো। জিজ্ঞাসা করলাম গ্রেসির কথা সত্যি কি না। উত্তরে টেরেসা জানালো গ্রেসির সঙ্গে ওর নিছক বন্ধুর সম্পর্ক। টেরেসা নিজে এখন রীতিমত ধনী, সে চায় সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে থাকতে। কারো আশ্রয়ে নয়। ভালো লাগলো ওর এই মনোভাব।

পরদিন রাতে কাউন্টস আমার গাড়ীতেই থিয়েটারে যাবার অমুরোধ জানালেন। খুব খুশী হোয়ে রাজী হলাম। কিন্তু কে জানতো পরে এমন প্রশ্ন ঘটেবে? গাড়ী চলেতেই ওর পাশে বসে ওকে জানলাম ঐ লোমের পোষাকটা আমি এখন ওকে উপহার দিতে পারি বিনিময়ে শুধু একটু অনুগ্রহ বরণ...

—“আমাকে অপমান করছেন?” আঙনের ফুলকি বরতে লাগলো, “আশ্চর্য, আপনার মত লোকও ভুলবশতঃ মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানে না”—

—“কিন্তু মহাশয় ভুল করছেন মুকুতায়, প্রশংসা অপমান কিছু নেই। বেশ, যদি বড্ড বাড়াবাড়ি করে থাকি ক্ষমা করুন। আর ঐ পোষাকটি পরে আমাকে একটু খুশী করুন।”

—“যদি আপনাকে ভালোবাসতাম তাহলে ক্ষমার প্রশ্ন উঠতো। আর আপনার ভুল ব্যবহারে আমার কাছে আপনি ক্রমেই অপ্রীতিকর হোয়ে উঠছেন।”

—“আমার স্বভাবটা সবদময় মেজাজের উপর নির্ভর করে। খুব মোলায়েম ভাবে স্তম্ভ করতে দেখলেই আপনার ভালো লাগবে তো?”

—“আপনার স্বভাব কিরকম তা জানবার জন্তে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আপনাকে আমি গ্রাহ্যই করি না।”

—“এখানে আমাদের মিল আছে দেখছি। আমি আপনাকে কোনো দিনই গ্রাহ্য করিনি, করি না।”

—“তা’ সত্ত্বেও আমার পিছনে হাজার সেকুইন খরচ করতে যাকিলেন?” কীষ্ক লোমের হাঙ্গি কাউন্টসের।

—“ভালোবাসার খাতির নয়, আপনাকে নীচু করবার জন্তে, আপনার ঐ বিরাট আত্মসন্ত্রস্তিয়ার ঘা’ দেবার জন্তে।”

কি উত্তর আসতো জানি না, কিন্তু বরাতক্রমে সেই মুহূর্তেই গাড়ীটা থিয়েটারে এসে থামলো, আমি গেলাম জুয়ার আড্ডার আর কাউন্টস সোজা বন্ধের দিকে। সে রাতে প্রচণ্ড হার



হোলো আমার। ফেরার পথে আবার কাউন্টসের সঙ্গে খিটিমিটি বাধলো—

—“আজ রাতে অনেক টাকা হেরেছেন সুনলাম—শেষ হয়েচে, খুব খুশী হয়েছি। মার্শিস হাজার সেকুইন দিতে রাজী আপনাকে ঐ পোষাকটার জন্তে। বেচতে পারেন এখনও, বরাত খুলে যাবে।”

—“আপনার বরাতও খুলে যেতে পারে তো। ওটা লাভ হবে কেমন—আপনার জন্তেই যে উনি কিনতে চেয়েছেন সেটা আমি জানি।”

—“হয়তো।”

—“না, অত সহজে আপনি ওটা পাচ্ছেন না। ওটা পাবার একমাত্র উপায় আমার কথায় রাজী হওয়া। না হলে আপনাদের টাকার জন্তে আমার খোড়াই কেয়ার।”

—“আপনার ঐ পোষাকের জন্তেও আমার ঘন হচ্ছে না।”

এই রকম স্তমধুর বাক্য বিনিময় করতে করতে আমরা বাড়ী পৌঁছলাম। কাউন্ট আমার ঘরে এসে ঢুকলেন আমাকে একটু বোকাতে। আমার জুয়ার চেয়ে যাওয়াটাই ওঁর লাগে বেশী।

—“ত্রিসংসি আপনাকে হাজার সেকুইন দিতে রাজী। তাতেও তো আপনার খানিকটা আয় হবে।”

—“ঐ লোমের পোষাকটার জন্তে? ওটা তো আপনার স্ত্রীকে আমি বিনা পরসায় দিতে রাজী। কিন্তু আমার কাছ থেকে উনি নেবেন না।”

—“অবাক কাণ্ড মশাই! অথচ বলতে কি পোষাকটার জন্তেও ক্রোপ উঠেছে। নিশ্চয়ই আপনি ওর আত্মসম্মানে যা দিয়েছেন কোনো সময়। আমার উপদেশ নিন ওটা, ত্রিসংসিকে সেচে ফেলুন।”

—“ভেবে দেখবো, কাল আপনাকে সঠিক জানাবো।”

ভোরে উঠই গ্রেঞ্জির কাছে গেলাম। হাজার সেকুইন বার করে আনলাম ব্যাঙ্ক থেকে। আর গ্রেঞ্জিকে জানালাম এ সবকে কাউন্ট কিছু না জানাতে। বাড়ী ফিরে এসে দেখলাম কাউন্ট আমার ঘরে আগুনের ধারটিতে বসে অপেক্ষা করছেন।

—“কি ব্যাপার বলুন তো মশাই? আমার স্ত্রী আপনার উপর ভরসার বেগে আছে অথচ কিছুতেই কারগটা খুলে বলছে না—”

—“কারগটা আর কিছুই নয়। ওই লোমের পোষাকটা আর কারো হাত থেকে ঠেকে আমি নিতে দেবোনা। আমার হাত থেকে ছাড়া। উনিও নেবেন না। কিন্তু এতে ভরসার বাগের কী আছে?”

—“হঁ—শ্রেফ বোকামি ছাড়া কিছু নয়। শুধুন আমার কথা, আপনার ধরণ দেখে মনে হয় টাকা আপনার হাতের ময়লা—এরকম মন হওয়া খুবই ভালো। তবে কি না ঐ টাকাটা পেলে আমি বড় খুশী হতাম। বন্ধুদের খাতিরে ওদব আত্মসম্মান ছাড়ুন মশাই—মার্শিস এর কাছ থেকে হাজার সেকুইন নিয়ে আমাকে ধার দিয়ে ফেলুন—”

ওঁর কথায় প্রবল হাসির দরকে আমার বিধম খাবার যোগাড়। চোরা কাউন্ট অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে গেলেন। আমি ঠেকে ছুঁহাতে জড়িয়ে ধরে বললাম অবশ্য একটা আলাভা কটেই।

—“বেচবো, কথা দিলাম ত্রিসংসিকেই বেচবো ওই পোষাকটা।

কিন্তু টাকাটা আপনাকে ধার দেবোনা। ওটা দান করবো আপনার স্ত্রীকে। কিন্তু মনে রাখবেন তাঁকে ‘সহজ নম্র শোভন হতে হবে—এই সর্ভে। ব্যুত্রে পরেছেন তো? এখন ঐ ভাবে ব্যবস্থা করতে পারেন—”

—“তাই দেখি”—বলে কোচারা কাউন্ট বিদায় নিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় অপরাতে ত্রিসংসির সঙ্গে দেখা করলাম। সে বললে,—“সুনলাম আপনি নাকি ওই লোমের পোষাকটা আমাকে বিক্রি করতে রাজী হয়েছেন। সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। আপনি যখন বলবেন তখন আপনাকে পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক পাঠিয়ে দেবো।”—

—“কাল সকালেই আপনি লোক পাঠাতে পারেন পোষাকটা নিয়ে যাবার জন্তে।”

পরদিনই সকালেই ওর লোক এলো। এসে এত আলোচিত পোষাকটি নিয়ে গেল। দুপুরে উনি নিজেই এসেন আমাদের সঙ্গে একত্রে খাবার জন্তে। তার আগে প্রচুর সুখাঞ্চ আতর্ষা পাঠিয়েছিলেন। খাবার টেবিলে বীতিমত আড়ম্বর সহকারে বাসটি রেখে তার থেকে পোষাকটি বের করে গম্বিত আনন্দে ওই দর্পিতা স্পেনীয় মহিলাটিকে উপহার দিলেন। আর তিনি ধন্যবাদে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন। আর ভরলোক এমন ভাবে হাসতে লাগলেন যে, এসব ব্যাপার তিনি অতি অভ্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ বলে বসলেন যে কাউন্ট যদি সত্যিই বুদ্ধিমতী হ’ল তবে ঐ পোষাকটি আবার বিক্রী করে ফেলবেন—কারণ সবাই জানে যে অত দামী পোষাক কেনার মত আর্থিক সঙ্গতি ওঁদের নেই। কথটা অত্যন্ত ঐতিহ্যকর সন্দেহ নেই—তাই এবার ধন্যবাদের বললে কটুকাটবোর বর্ষণ শুরু হলো। শেষে বাগের আলায় কাউন্ট বসলেন যে মার্শিস এত বড় বোকা যে এমন উপহার দিলে যা তিনি ব্যবহার করতে পারবেন না। এই ঝড়ের মধ্যেই একটি প্রতিবেশিনীর আগমন হলো। ঘরে ঢুকেই টেবিলের উপর ছড়ানো বহুমূল্য পোষাকটির দিকে নজর পড়লো তাঁর—

—“ভারী চমৎকার তো। আমার কিনতে ইচ্ছে করছে।”

—“ওটা বিক্রী করে দেবার জন্তে কেনা হয়নি”—কক্ষ উত্তর কাউন্টসের।

ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে মহিলাটি তৎক্ষণাৎ প্রসন্নাক্ষরে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ কথোপকথান পর তিনি বিনায় নিয়েই আবার সেই চাপা আক্রোশের বিকোষণ শুরু হলো। কাউন্টসের সজ্ঞাধ কুৎসিত বাক্যবাণের উত্তরে ত্রিসংসিও তীব্র, তীক্ষ্ণতম শ্লেষে তাঁকে বিথতে লাগলেন—কিন্তু ওঁর প্রত্যেকটি স্বতীক্ল শ্লেষভরা বাক্যবাণই আশ্চর্য্য ভরমানার খাপে ঢাকা—শেষকালে বিপরীত ক্রান্ত অবস্থায় বসে ভঙ্গ দিয়ে কাউন্টস সোজা চলে গেলেন শয্যার আশ্রয়ে শয়ন কক্ষের অভিমুখে।

ত্রিসংসি আমার হাতে পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক ওঁজ দিয়ে উঠ চলে গেলেন। সবাই চলে গেলে কাউন্ট আমাকে দীর্ঘ দীর্ঘে বললেন যে, যদি আমার হাতে সময় থাকে আমি যেন ওঁর স্ত্রীকে একটু সঙ্গ দিই কারণ ওঁরও হাতে কয়েকটা জরুরী কাজ রয়েছে।

—“দেখুন আমার পকেটে হাজার সেকুইন রয়েছে, যদি কাউন্টস একটুও বুঝদার হন তবে সব টাকাটা ঠেকে দিয়ে আসবো।”—

উঠে ঘরে গিয়ে ত্রিলসিংহ দেওয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি বেখে ব্যাক থেকে আনা নোটের ভাড়াটি পকেটে পুতলাম। ছেলেমানুষি ছাড়া কি? দেখতে চাইলাম কারো টাকাতোই আমি নির্ভর করি না, আমার নিজের যথেষ্ট আছে।

দেখলাম কাউন্টেন শয্যাসীনা। তাঁর একপাশে বসে অত্যন্ত কোমল ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম শারীরিক স্বস্থতা সম্বন্ধে, বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সম্বন্ধে, দু'একটা মন্তব্যও করলাম।

—“আপনি বাইরে বেরোননি? ঘরোয়া পোষাক পরে রয়েছেন? চুলগুলোও আঁচচানো নেই?”

—“সত্ত্ব হলে আপনার সঙ্গেই সময় কাটাতে ভালো।” আমার উত্তর।

—“আপনার জুয়ার আড্ডা ছেড়ে আমার সঙ্গে সন্ধ্যাটা মাটি করবো?”

—“আনন্দের সঙ্গে। ইতিমধ্যে অনেক টাকা হেরেছি তার উপর আজ মার্শিসএর কাছ থেকে যা পাওয়া গেল সেটাও আর খোঁজতে রাজী নই...আমার হাত থেকে তো আর নিলেন না...”

—“অত টাকা হাতছাড়া করা সহজ?”

—“হাতছাড়া নয়, আমি তো আপনাকেই দিতে চেয়েছিলাম। সে যাক, বড় ঠাণ্ডা আসছে, দরজাটা বন্ধ করে দেবো কি?”

—“না, আমার খোলাই ভালো লাগছে—খোলা থাক।”

—“তাহলে মানাম, এখন থেকেই বিলায় নিতে হোলো। আমার ঘরের আঙনের ধারটো অনেক বেশী লোভনীয়।”

—“আপনি লোকটা খুবই খাবার তবুও বসতে পারেন কিছুক্ষণ কারণ মন লাগছে না সময়টা।”

কি জানি কেন মনটা কেন অস্বমনস্ক আর বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিলো—পোষাকটা নিয়ে এত কচকচিতে আসার সময় ঘরে দেখে এসেছি...জেনোবিয়ার মিষ্টি হাসি ভরা স্তন্যর মুখখানি ঝুঁকে পড়ে আমার জামা সেলাই করছে...তার সেই মুখখানি মনে পড়তে? কি জানি কিছুতেই ঢাকতে পারিনি নিজের অস্বচ্ছন্দ্য, সাদা দিতে পারিনি সহজ শোভন ভাবে...কি জানি কতখানি আঘাত করলাম দর্শিতা রমণীর আত্মগর্বে...

আমার নীরস ব্যবহার ঠেকে কতখানি গভীরে ব্যথা দিয়েছে তা তুধু মেরেবাই বলতে পারবে...জানি না কোন দুঃখই আমাকে দিয়ে বলাসে,—“আমার দোষ নেই মানাম, আপনার সৌন্দর্য আমাকে একটুও আকর্ষণ করতে পারছে না...এই রইলো! পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক আপনাকে সাধনা দিতে...আমি চললাম”—

টেক্সেলের উপর নোটগুলি বেখে সোজা বেরিয়ে এলাম। অস্ত্রার, অধীতিকর সবই বুঝছিলাম কিন্তু কে যেন জোর করে অমন করলে আমাকে।

কিন্তু পরদিন খাবার টেক্সেল কাউন্টেনের ব্যবহারে আমি অবাঞ্ছিত, অমুতপ্ত, লজ্জিত। যেমন মদুর, তেমনি ভদ্র তেমনি শোভন সঞ্চিত। বিবেকের দাশন-জালা সহ্য করলাম...কেন রাগে অমন করে অপমান করেছি। যেমনি ঠেকে একা পেলাম তখনই অমুতপ্ত কণ্ঠে স্বীকার করলাম কাল রাগে অমন হৃৎকণ্ডের মত ব্যবহারের জগৎ ওর আমাকে ঘৃণা করা উচিত।

—“দুঃখ আপনি? বর- উটোটাই আমি ভেবেছি, আমি

তো আপনার কাছে বীতিমত কৃতজ্ঞ...ভাবতেই পারি না আপনার এ আত্মগল্পনা কেন?”

আমি ওর হাতখানি ধরে ধীরে ধীরে আমার ওষ্ঠের কাছে আনতেই হঠাৎ উনি ঝুঁকে পড়ে আমার গালের উপর চুমো খেলেন... আমি তখন লজ্জায় রাঙা, অমুতপ্তে দিশাহারা...

সেখানে অপোবতে মুখোশ পরে ‘বল’ এর ব্যবস্থা ছিলো। আমি এমন ভাবে সজ্জাছিলাম যে, ভাবলাম কেউ আমাকে চিনতে পারবে না। আমার নতির কোঁটা, ঘড়ি, এমন কি মণিবাগটাও বদলে ফেলেছিলাম! আর মণিবাগটাতে ছিলো প্রায় সাতশ’ সেউইন। জুয়ার আড্ডায় সকল্যে তো খোয়ালাম একঘণ্টা মধোই। সবাই আশা করেছিলো এবার নিরন্তর হবো। কিন্তু আর এক পকেট থেকে আর একটা বাগ বার করে আবার খেলতে শুরু করলাম—এবার বরাং খুলসো, একেবারে দুহাজার আউশ’ ছাপ্পান্ন সেউইন জিতলাম।

সেদিন বাকী সময়টুকু নাচ, গান আর ভল্লোডের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে তোড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলাম কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে। কারণ তারপরই সবাই মিলে যেতে হবে জেনোবিয়ার বিবাহোৎসবে যোগ দিতে। আমাদের সঙ্গে ত্রিলসিংহও গিয়েছিলেন। গ্রামের বাড়ীতে ওদের বিবাহের ভোজসভা আমরা সবাই গান গেয়ে আবৃত্তি করে মুখর করে তুললাম। প্রচুর আহাণ্যের আয়োজন, সবাব অলঙ্কার ভোজসভার ব্যয়ভারটা অগ্নিই বহন করেছিলো। বহু গ্রামা-মন্ডার আবির্ভাব হয়েছিলো, কিন্তু শ্রীমতী বৃন্দেশী জেনোবিয়ার সঙ্গে আমি একমুহূর্তও ছাড়িনি। উৎসব বখন চরমে তখন উৎসব-মত অবস্থায় সবাই টেবিল ছেড়ে উঠে পার্শ্ববর্তীর সঙ্গে আলিঙ্গন আদান প্রদান করতে লাগলো...আমি আড়চোখে দেখে নিলাম বরবেশী বিবল দজ্জিটির চুখনে কাউন্টেনের মুখখানি বিরক্তির আর রাগে টুকটুক করছে...

বিবাহের শেষে জেনোবিয়াকে আমার গাড়ীতেই তুলে নিলাম...ওর সঙ্গ স্বামীর সাগর সম্বন্ধিত।

পরদিন রাগে আবার গেলাম অপোবতে। জুয়া খেলাতেই কাটতো সন্ধ্যাটা কিন্তু হঠাৎ দেখা হোয়ে গেলো সিজারোর সঙ্গে। আমার সিজারিনা? হুট ঘণ্টা ওর সঙ্গে আলোপে কাটলো...কি মন-ভরা সময়টুকু। ওর মনের সব কথা আমার কাছে উজাড় করে দিলে। বারবার অনুরোধ করলে আমি যেন ওর হোয়ে টেরেসার সঙ্গে আলোচনা করি। ব্যাপারটা কিছুই নয়...ওর সাধ নাবিক হবার, ওর নিশ্চিত ধারণা যে ওর মা যদি ঠকে আপাতঃ প্রয়োজন মত টাকা দিয়ে সাহায্য করে ওর ভবিষ্যৎ ও নিজে গড়ে তুলবে। আমি কথা দিলাম টেরেসাকে রাজী করাবো। সেদিন রাগে ওর সঙ্গে একসঙ্গেই খেলাম। বাড়ী এসে সোজা বিছানায়। পরদিনও সারাদিন ঘর থেকে আর বেরোইনি। তখনলাম কাউন্টেনে গেলেন সান এঞ্জেলোতে। মাশাম একা আছেন। সাধারণ ভদ্রতারোধে রাগে খাবারের পর মাশামের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম, খাবার টেক্সেল যোগ দিতে না পারার জগৎ ক্ষমাও চাইলাম। কাউন্টেনের ব্যক্তার আশঙ্ক্য সৌজগত ভরা। জানালেন ওর বাড়ীতে আমার কোনো লৌকিকতার প্রয়োজন নেই, যেমন খুশী তেমনি ভাবে থাকতে

পারি। কিন্তু আমার মনে তোলা ভিতরে ভিতরে কোনো পাঁচ খেলছেন। কাণ্ড গুঁর মুখের কেমন এক মোহময় হাসির আভাস— অমন হাসি শুধু সেই মেয়েবাইর হাসতে পারে, যাদের মনে আছে প্রতিশ্রুতির অনিবার্য শিখা। আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু তেনে আমার দিকে নজির কোঁটোটা বাড়িয়ে দিলেন এক টিপ নেবার জগ্গে। নিজেও নিলেন একটপ।

—“কিন্তু মাদাম এটা কি বলুন তো? এ তো ঠিক নশ্রি নয়?”

—“না, একরকম গুঁড়ো, মাথা ধরার পক্ষে অব্যর্থ।” তবে নাক দিয়ে বক্তৃতা পড়ে নিজেই।”

আমি রকম অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলাম। জোর করে চেয়ে বসলাম, “আমার মাথার রোগ নেই, তাছাড়া নাক দিয়ে বক্তৃতা পড়ার আমার একটুও ভালো লাগবে না।”

—“ভয় নেই বোনী বক্তৃতা হবে না।” তখনও সেই মোহময় হাসির টুকরো ঘোঁটার কোয়ার—কিন্তু বক্তৃতা হবেই এটা ঠিক।”

বলতে না বলতেই জ্বলন একদমের চার পাঁচবার চেঁচা ফেললেন—  
“দেখ এককোঁটা বক্তৃতা আমার নাক থেকে পড়লো আমার হাতের উপর। কাউন্টেন্স একটি রপার বাটি নিয়ে টেবিলের উপর বসলেন।

—“দেখ আগুন কাছে, আমারও নাক থেকে বক্তৃতা পড়ছে।”  
একজন বসলেন, চুঁজান কাছাকাছি এগিয়ে এসে বাটি ধরে বসে পড়লেন। চুঁজান নাক থেকেই বাটিনাতে বক্তৃতা পড়তে লাগলো। অবশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই থেমেও গেল।  
তখন জ্ঞান জ্ঞান একটা পাতা আনিতে গাওঁ জগ্গে মুখ ধুতে কলম।

—“আমাদের বক্তৃতা এটা মিলন আমাদের চুঁজান মনে গভীর হলে আগুন, চুঁজান এমন মিষ্টি বন্ধুদের বক্তৃতা শুধি করার বার বক্তৃতা বুঝার আগে নেই।”—কাজিয়ে ধীরে ধীরে বসলেন।

আমি ব্রাকথার লিখার মন দিলাম। আমি একটু গুঁড়ো

বললাম কিন্তু “উনি কিছুকালই দিতে বাজা দিলেন না আর নামাও বসলেন না কোনো মনে। শুধু বসলেন ওর এক বক্তৃতা একে দিয়েছে। আমি তখন কেবলো একজন জগ্গেজগ্গে বোঁজ। একজনকে বোঁজ

না। গুঁড়োটির পূর্ণ কিরণ নিয়ে জিজ্ঞাসা  
লাম ওটা কি তোতে পারে, কিন্তু কোনো  
বেগতো দুই কথার আমার চেয়ে বেশী  
উনি বলে মনে তোলা না। বাটা ফিরে  
বক্তৃতা মনে সিঁড়ানায় গিয়ে শুলাম। নানা  
বাটিকা করতে করতে মনে তোলা নাম  
দেব মেয়ে—তার উপর যতট ভাল এখন  
উনি অথবা আমার প্রতি দুটা ছাড়া আর  
কি নেই—অন্তর—

পরদিন জেরায়মও একসময় এসে  
নামে যে একজন সম্মানী আমার সঙ্গে  
একবারে এসেছে—কিন্তু কথা বলতে চায়।  
দি কিছু সাহায্য দিয়ে ভাগিয়ে দিতে

বসলাম। কিন্তু সম্মানী এক-পর্যায়ও সাহায্য চায় না, কেবল  
আমার সঙ্গে একা দেখা করতে চায়। গোপান দেখা করতে। লোকটি  
বেশ বুদ্ধ। ইসং নীচ তোয় অভিবাদন জানিয়ে একটা নীচ টুল এগিয়ে  
দিলাম। কিন্তু সে ওসব গ্রাহ্যই না করে কাঁড়িয়ে কাঁড়িয়েই বসতে  
লাগলো।

—“মশায়, আমি যা বলবো মন দিয়ে শুনবেন। আমার  
সাধারণ করায় আপনি কান না দিলে, আপনার প্রাণহানির  
আশঙ্কা আছে। আমার কথা সমস্তটা শোনা হলে আমি যা বলবো  
ঠিক তাই করবেন। কিন্তু একটি প্রশ্নও আমাকে করবেন না—  
কাণ্ড কোনো কথাই আমি উত্তর দেবোনা। আপনি নিশ্চয়ই  
মানবেন যে আমার এই নীরবতা বিশ্বস্ত ভাবে বিশ্বাসের মর্যাদা  
দেবার জগ্গেই! আমার প্রতিজ্ঞা আমার কথার সন্দেহের অবকাশ  
নেই, কারণ আপনাকে খুঁজি বার করার মধ্যে আমার কোনো  
স্বার্থই নেই। আমি নিজেই বশ্য হজি আপনাকে জানাত। আমার  
স্থির বিশ্বাস যে আপনার জন্মের পরেই আপনাকে দিয়ে আপনার  
যুক্তির উপায় লিখতে সিঁড়ন।। টুখ আপনাকে হাঙ্গা করেননি।  
এখন বসুন আমার কথার আপনার মনে বিদ্যমানও সাড়া ভাগছে  
কি না, আমার সব কথা আপনি শিখান করে শুনবেন কি না।”

—“নিশ্চিত থাকুন মহাত্মজ, আপনার প্রতিটি কথাই আমি  
মন দিয়ে শব্দভারই শুনবো। বসুন—আপনার কথা শুধু সাড়া  
ভাগায়নি, সাড়া মনে চেয়ে এক অজানা আশঙ্কাও ভাগিয়ে তুলেছে।  
আমি প্রতিজ্ঞা করছি আপনার উপদেশ মানবো—বদি অবশ্য  
আমি সম্মান “চ” না লাগে, আর সাধারণ বৃষ্টির অগম্য না হয়।”

—“বুঝ ভালে। কিন্তু আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, এ  
বাপাশির ফলফল বাই তোক না কেন, আমাকে তার মধ্যে টানতে  
পারেন না, আর আমার সম্বন্ধে কারো কাছে একটি কথাও উচ্চারণ  
করবেন না। আমাকে চেনেন তাও বলবেন না, চেনেন না তাও  
জানাবেন না। কেমন বাজা?”

ফোন  
৩৪২৫৫০২

সর্বসুখ সম্ভাভ  
সুন্দর এলক্সার

একমাত্র  
গির্জা সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুতকারক

জুয়েলাস

কে. এল. সিংহ এণ্ড সন্স

১৬৭ বি, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—“বু! প্রতিজ্ঞা করছি কথা রাখবো। কিন্তু এবার শুক  
কেন। কোথাকাল যে অসহ্য হয়ে উঠেছে”—

—“আজ দুপুরে আপনি একেবারে একা অসুস্থ পার্কেই সামনে  
দুইজন সন্তানের অসুস্থ নবাবের বাড়িতে চুকলেন। তিন তলায় উঠে  
গিয়ে বী নিকের চরভায়ে বোতাম টিপলেন। যে দরজা খুলতে  
আসবে তাকে বললেন যে আপনি মালাম—কেন চান। আপনার  
ভাবপন বাড়ী চুকতে কোনো বাধাই হবেনা—মনে হয় আপনার  
নামও বোধহয় কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। যদিই জিজ্ঞাসা করে  
হাতোক বাজে একটা নাম বলবেন। এখন মালাম—এর সঙ্গে দেখা  
হবে তখন বুঝে তার আর সবতভাবে আসাপচারী করবেন—ওঠা  
করবেন তার বিদায় ভঙ্গিও বজায়ে। মহিলাটি গরীব, তাকে চুচামটি  
বর্ণমুখা সিনে কুণ্ঠিত হাবেন না—তাকেই তাকে ভাব করা সহজ  
হবে। তখন তাকে বললেন যে, কাল রাতে একজন চাকর এসে  
একটি চিঠি আর একটি ছোটো বোতল যা নিয়ে গেছে—সেই  
বোতলটি না নিয়ে আপনি বাড়ী থেকে নড়বেন না। মহিলাটি হাতী  
না হওয়া অবধি ছাড়বেন না কিন্তু সাবধান বোধী গোলামাল ওঠামেটি  
না হয়। তাকে ঘর থেকে বেরোতে কিবা কাউকে ডাকতে যেতে  
দেবেন না। নবাবের ছোল বললেন যদি বোতলটা আপনার কাছে নিয়ে  
দেখ তাহলে অপরাধক যা টাকা দেবে তার দু'গুণ বেশী টাকা আপনি  
দেবেন। ভয়ে সেই টাকার অঙ্ক এমন কিছু বেশী নয়—কিন্তু  
আপনার জীবনটা অনেক বেশী মূল্যবান। বাস্—আর কিছুই আমার  
বলবার নেই। এখন কথা দিন আমার কথা আপনি ঠিক ঠিক  
রাখবেন?”

—“বিশ্বাস করুন নিশ্চয়ই রাখবো। আমার জীবন-সেবতা  
সত্যিই আপনার মত মহাত্মন্যকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন—সহজ  
থেকে জ্ঞানের উদ্দেশ্য।”

—“তাই হোক, ইন্সর তোমাকে আশীর্বাদ করুন”—

সন্ন্যাসীর ওই অসুস্থ আঘাতে কাহিনীতে কিন্তু আমার একটুও  
হাসি পেল না। কেন জানিনা আমার মনের কোণে কোথাও  
একখানি ছোটো বৃন্দ-স্বপ্নের মেঘ আছে, হাজার আলোর ফড়েও তা  
সরেনা... তাছাড়া সন্ন্যাসীর চেহারাটাও বিশ্বাসযোগ্য দেখালেই  
মনে হয় অত্যন্ত সাধারণতা।

সিকান্দা-লেখা কাগজটা নিলাম আর ছোটো ছোটো পিস্তলও  
পকেটে ভরলাম। তারপর সেই বহুস্ত-কুঠির মধ্যম বাহা করলাম।  
কোরাম ওকেও সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিছু দূরে ওকে অপেক্ষা করতে  
বলে আমি সোজা সেখানে গেলাম।

এক অতি কুৎসিত-দর্শনা বৃদ্ধার সামনে শেষ পর্যন্ত হাজির  
হলাম। তার হাতে দুটি সেকুইন দিতেই সে থলথলে গলায় বলে  
উঠলো যে সে জানে আমি প্রথমে পড়েছি। জান যে নিজের দোষেই  
আমি নিজে অসুখী আর আমাকে এ বাপার সাহায্য করতেও সে  
পারবে। এই ধরণের কথায় মনে গেলো এ নিশ্চয়ই বাতুকরী ডাটনী  
ধরনের স্ত্রীলোক। কিন্তু আমি যেই বললাম যে সেই ছোটো  
বোতলটি না পেলে আমি এক পাও নড়বো না, তখন তার মুখখানা

কী বীভৎস আর ভয়ঙ্কর চেয়ে উঠলো ধাককা করা হার না। ধরল  
করে কীপতে কীপতে ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে—বহুস্ত  
আমি আমার পকেট-খুঁটিতে হার করে ওর মাথার উপর তুলে ধরলাম।  
আর সেই অবস্থায়ই সেই বললাম অপরাধকের চেয়ে দু'গুণ টাকা দেবে  
তবে সন্ত সন্ত ওর সমস্ত বিকান্ত শাস্ত্র জোরে গেল।

—“আমি ছয় সেকুইন হারালাম, কিন্তু আপনি এখন সব জানতে  
খুঁশীয়েই ওর দু'গুণ টাকা আমাকে দেবেন। কারণ এবার আমি  
আপনাকে চিনতে পারছি।”

—“কে আমি?”

—“জিহাদকোমো ক্যাসানো দি ভেনেদিয়ান।”

বহুস্তরার পকেট থেকে বারোটি সেকুইন হার করে টেরিসের উপর  
রাখলাম। দেখলাম খুঁশীতে বৃদ্ধার চেয়ে জন এসে গেল।

—“আপনার জীবন জানি করতে চাইনি তবে প্রবল ভাবে প্রত্য  
পড়িয়ে প্রচণ্ড দুঃখ ভোগ করার চেয়েছিলাম।”

—“দুঃখ বলুন সব কথা।”

আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোটো ঘরে গিয়ে চুকলাম—কিন্তু  
অসুস্থ সব জিনিস ঘরখানি ভরা—নানা আতঙ্কের নানা ধরনের মিল  
বোতল, নানা রঙের পাখর, বাতু, নব-বর্জিত প্রাণীর, সীতামি  
উদ্ভন আর বাকীকৃত কাম্যের মুখ।

—“এই আপনার গোপন।”

—“এতে কি ব্যস্বে?”

—“আপনার আর কাউকেও বন্ধ বেরোতে দেশেরো অসুস্থ  
এই লেখাটা পড়ুন, বুঝতে পারবেন।”

একদমে বৃদ্ধার ব্যাপারখানা কি। তখন অনেক কাল আমার  
সেদিন সেই মুহূর্তে কেন উজকটে গেলো উঠিনি। বহুস্ত আর বহুস্ত  
অতি শয়তানী পেশনিসাধীর কথা মনে করে আমার চুলখানা বার  
জোরে উঠেছিলো—আর বিন্দু বিন্দু ঘামে আমার সর্কাক দি  
গিয়েছিলো।

—“এই বন্ধ দিয়ে আপনি কি করবেন?”

—“আপনার সর্কাকে মাগাতাম। কেমন করে দেখবেন  
এই দেখুন।”

এই বলে একটা দু'ফুট লম্বা বাস টেনে এনে টেরিসের উপর  
রাখলো। তার পর একটু বহুস্তরার হাসি হামতে হামতে বাস  
ডালাটি খুলে ধরলো। আমি ঝুঁকে পড়তেই দেখি আদ হাত লম্বা  
একটা মোমের তৈরী নয় মুষ্টি উণ্ড করে শোভানো—আর আমার  
এ কি! তার পিঠের উপর পরিহার করে লেখা আমার নাম।

কিন্তু কি অসুখী কাটা হাতে কুৎসিত অসুস্থ-দর্শন জোরেই  
মুষ্টি! তবে আমার চেহারা আর লম্বা মোটামুটি এনেছে। কি  
কয়েকটি জায়গা এত সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিস্ময় ভাবে গড়া জোরেই  
বেটপ সন্তের মত মুষ্টি! আমার ভাবতেই আমি ভো ভো করে গেলো  
হেসে উঠলাম—

[ ক্রমঃ

অভুবাদিকা—শাস্তা বসু।

[ মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য ]



# দেখুন!



দস্তক্কর নিবারণে

বিশেষ

প্রতিরোধক!

## কলিনস সুপার-হোয়াইট টুথপেস্ট

আপনার হাসির চমক অটুট রাখে

- গবেষণাগারে কে৪২ নম্বর পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কলিনস সুপার-হোয়াইট (সাদা অংশ) দস্তক্করী জীবাণু (কালো অংশ) প্রতিরোধের ঘাটীর (সাদার চারদিকে ধূসর আবরণ) গড়ে তোলে।

পেপারমিট-গন্ধী সুশীতল আশ্বাদ।



লম্বা করুন, ক্যাপটি  
বহুবার কত সুবিধে।

৪৭ ৫৭৪ A

জেনি মানার্স এণ্ড কোং প্রাইভেট লি.  
বেঙ্গলুরু বাবুদাকারী

# সিন্ধুপারে

শ্রীনারদরঞ্জন দাশগুপ্ত

ভিন্ন

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই বা হাতি ঘরখানি—সেখা খুবই পছন্দ হল আমাদের। পাশাপাশি দু'খানি খাটে ধবধবে ঝিঙ্কান—সকলি মিছেব লেগে দিয়ে ঢাকা। শোবার ঘরের উপযুক্ত সমাধান টেবিল ও জলপাত্র আয়বরণও পরিষ্কার পচ্ছিন্ন।

চন্দনাথ বলল, “তাড়ালে আমাদের জিনিষ নিয়ে আসি?”

মতিলালটি হেসে বললে, “বেশ ত। একটু বাত হয়েছে, আমরা লোকজন এখন নেই, নইলে আমিই জিনিষ আনিতে গিতাম।”

একটু সমস্ত ভাবে শুধালাম, “কত করে আমাদের গিতে হবে?”

মতিলালটি বলল, “দৈনিক ১২ শিলিং ৬ পেনি মাথা-পিছু—ব্রেড ও বেকার্সট (অর্থাৎ বাদে খাবা ও সকালের চা-জলখাবার)।”

বুঝা! শুনে বুকটা কেঁপে উঠল। আমি যখন বিলেতে আসি তখন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে, তাই আমার আসার বিস্তারিত বাবস্তার কথা হয়ত তোমার ঠিক জানা নাই, কিংবা জানলেও মনে নাই। তোমার মনে আছে কি না জানি না—আমার বিলেত আসার দানব মত ছিল না। তার কারণ বাবার শরীর ভাল যাচ্ছিল না এক ঠিক সে সময় টাকা-পয়সার দিক দিয়ে আমাদের অবস্থা যে খুব সমস্ত ছিল, এমন কথা বলা যায় না। যদিও অত বড় জমিদারী আমাদের, তবুও তার আশ্রয়পত্র ছিল মুকন্দলাল হাটে—তিনি নানান চুঁতোয় টাকা পাঠাতে গোণমালা করছিলেন, দান কি বাবা দেশে গিয়ে কখনও জমিদারীর কিছু দেখেন নি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বাবা ও শালার সঙ্গে কথাবাতা করে ঠিক হয়েছিল যে, মাসে মাসে ২৫-৩০ টাকা করে আমাদের পটান হবে এক আমি এমন করেই হোক তার মধ্যে ঢালিয়ে নেব। আমার আগে কলকাতায় যে মাড়োয়ারী হাসপাতালে আমি কাট করছিলাম, তাদের সঙ্গে লেগাপড়া হয়েছিল যে, আমি এ দেশ থেকে বছর দু'এর মধ্যে পাশ করে ফিরে গেলে, আমাকে বেশী মাইনেব একটা ভাল চাকুরী ত' দেবেই, অস্বিক্ষত আমার আদা-বাওয়ার খবরও তার দেবে। কারণ সে সময় আমি আসি, তার বছর দুই পরে সেই হাসপাতালেই আমার উপরওয়াল। একটি বড় ডাক্তারের চাকুরী পালি হওয়ার কথা ছিল। বিলেত থেকে পাশ করে ফিরে না গেলে এমন সে চাকুরী হওয়ার আমার কোনও আশা ছিল না। কেন না, সে সময় আমার চেয়ে আগে পাশ করা আরও দু'জন ডাক্তার সেই হাসপাতালেই কাজ করছিলেন। তাই সব দিক বিবেচনা করে বাবার কথাই দানব শেষ পর্যন্ত মত দিয়ে দু'বছরের জগ্ন এই টাকাটা মাসে মাসে পাঠাতে বাজী হয়েছিলেন।

কিন্তু যদি সাড়ে বারো শিলিং করে বোজ দিতে হয় শুধু বাদে খাবা এক সকালবেলার চা-জলখাবারের জগ্ন, তাহলে শেষ পর্যন্ত

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চন্দনাথকে বরখান, “এদের দানব বড় বেশী।”

চন্দনাথ বলল, “আজ বাতটা ত থাকি। সকালে খুঁজলে এর চেয়ে সম্ভার ঢের জায়গা পাওয়া যাবে।”

ট্যান্ডি থেকে জিনিষ-পত্র নিয়ে দু'জনে উপরে আমাদের ঘরটিতে বাথলম। চন্দনাথকে বললাম, “তুমি একটু ঘুটলে নাও—আমি ঘুর আসি।”

চন্দনাথ বলল, “কোথায়?”

বললাম ঘাট ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে। স্বরেশের সঙ্গে দেখা করে তাকে নিয়ে এসে আমাদের বাড়টা দেখিয়ে নি। বাথ লকামের তাকে না গেলে, একলা কোথায় সম্ভার ঘব খুঁজব?”

চন্দনাথ বলল, “তোমার শরীরের সমস্তকে বাতচুই দি। এ পরেও আবার বেরকবে?”

শরীরের ক্ষমতার পিছনে যে আমার মনের একান্ত দুর্বল্য রয়েছে সে কথা চন্দনাথকে বোকাবার চেষ্টা না করে ভুললাম আমি সিঁড়ি দিয়ে। চন্দনাথ দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, “কিছু খাবে না?”

তাঁই ত খাওয়ার কথাটা ত একবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। হ্যাঁ বরফত পাবলান—সাঁতাই দক্ষণ ঝিদে পেয়েছে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চন্দনাথকে বললাম, “ফিরে আসি। তারপর বা হয় কিছু খাবো।” চন্দনাথ বলল “পাবে কোথায়? এ দেশে রাতে খাওয়ার ম পাৰ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।”

ঘড়ির দিকে তাকালাম। প্রায় পৌনে আড়াই ঘণ্টে সাড়ে আটটার ভিক্টোরিয়ার ফোকটোনের দ্বিতীয় ট্রেন ব পৌছবার কথা। চন্দনাথকে “সে বা হয় তার।” বলেও কথার অপেক্ষা না করে বাইরে এসে ট্যান্ডিতে উঠে কলকাতা ট্যান্ডিকে আগেই সাঁতাইতে বলে গিয়েছিলাম। বলা যায় এতক্ষণ পর্যন্ত যোবার দরক ট্যান্ডি ভাড়া জিনিষ নামাবার ম চন্দনাথই ট্যান্ডি-ড্রাইভারকে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি ঘটা বামনের মধ্যেই ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে এসে ছাড়িয়ে গিয়া ট্যান্ডি বিলের করে দিয়ে ঠিক প্র্যাটিকশন্ট খুঁজে নিয়ে চলে। স্বরেশ—প্র্যাটিকশন পাইচারা করছে। রেগা লম্বা ঢেঁকি গায়েব বা অত্যন্ত কালো, তাই তাকে খুঁজে পেতে দেখিবার কাছে গিয়ে প্রায় স্বরেশকে জড়িয়ে ধরলাম। স্বরেশ আমি দেখে অবাক হয়ে গেল—ট্রেন ত এখনও আসেনি।

বিস্তারিত সব স্বরেশকে বললাম। বললাম, “চল আমি হোটেলের বাওয়া যাক।” স্বরেশ বলল “চল”।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে বাস্তায় এসে স্বরেশ বলল, “ট্যান্ডি ত

মনে মনে আর পরমা খরচ করে ট্যান্ডি চড়ার বাসনা আমার মোটেই ছিল না। কিন্তু বাস বাওয়ার কথা সুরেশকে বলতে একটু লজ্জা হলো। এখান থেকে দূর ত কম নয়।

বললাম, “চলো! ট্যান্ডিতেই বাট।”

সুরেশ বলল, “সেই ভাল। সোজা বাস এখান থেকে আছে কি না জানি না। তাহলে আবার বাস্তার পুলিশমানকে গিয়ে সব জিজ্ঞাসা করে নিতে হয়।”

দু’জনে ট্যান্ডি নিয়ে আবার রওয়ানা হলো। এবার আমার নির্দেশ মত খানিকদূর পেরে ট্যান্ডি এসে দাঁড়াল—২৭ নং বেডফোর্ড স্ট্রিট।

কিন্তু একি! বাড়ীটা একটু অন্তরকম বলে মনে হচ্ছে না? সে বাড়ীর বাটী বাহরে কাল ধাপের বলেই মনে হয়েছিল কিন্তু এ বাড়ীর বাটী যেন একটু বেশী লালচে; বাইরের গড়ন অবশ্য একই ধরণের—সেই ফেনিয়ার, কয়েক ধাপ সিঁড়ি ফুটপাথ থেকে উঠে গিয়েছে। ভাবলাম—আমার দেখার ভুল।

ট্যান্ডি-ডাইভারকে বিদেয় করে দিয়ে আমরা উঠে গিয়ে সদর দরজায় কড়া নাড়লাম। কিন্তু কৈ?—বাটীরে সেই ‘লিনকলন হল হোটেল’ লোটাতে নেই। একি সব ভৌতিক কাণ্ড!

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর একটি বৃদ্ধা মহিলা সদর দরজাটি খুলে বলে একটু বিস্ময়ে ভাবতে শুভাল, “কি চাই?”

জিজ্ঞাসা করলাম “এই কি লিনকলন হল হোটেল?” জোরে জোরে ছবায় “না-না” বলে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে আমাদের মুখের সামনে দরজা দিল বন্ধ করে। ফাল ফাল করে সুরেশের মুখের দিকে তাকানো।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুরেশ বলল, “তুমি নিশ্চয়ই ঠিকানা ভুল করেছ।”

বললাম “চলনাথ বলল—বেডফোর্ড স্ট্রিট। আমি নিজে দেখলাম ২৭ নং।”

সুরেশ একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে বসল। কাস্তব ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, “কি করা যাবে?” সুরেশ বলল, “লিনকলন হল হোটেল বলতে না?”

বললাম, “তাই ত মনে আছে।”

বলল, “চল, একজন পুলিশমানকে জিজ্ঞাসা করা যাক। এদেশের পুলিশমানরা আশ্চর্য! সব খবর রাখে।”

সহাতী আশ্চর্য্য এদেশের পুলিশ। এর পর কত বাব কত সমস্যা অতি সহজ সমাধান মিলেছে এদের কাছে। সমস্ত লণ্ডন সহরটি যেন তাদের নখাঙ্গে—কোথায় কোন বাস্তার কি ভাবে যেতে হবে, কোথায় গেলে কি পাওয়া যাবে, ঠিক পড়া মুখস্থ বলার মতন অতি সহজে বলে দেয় এবং বিশেষ আগ্রহ সহকারে। সাধারণতঃ ছাঁ ফুটির উপর লম্বা; কালো পোশাক পরা মাথায় কাল উঁচু টুপি—গভীর দীর্ঘ পরদক্ষেপে বাস্তার মাঝে মাঝে ঘূরে বেড়াচ্ছে—যেন এদের জাগ্রত দৃষ্টির প্রভাবের সমস্ত সহবর্তী চলেছে সমস্ত শাশ্বত পথে।

চললাম দু’জনে ফুটপাথ ধরে। সুরেশ বলল, “চল কোনও একটা বড় বাস্তার মোড়ে গেলেই পুলিশ পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে পেয়ে

আমার যুগে তখন আর কথা নাট—চলেছি দু’জনে। খানিকটা গিয়ে বড় কোনও বাস্তা নয়—একটা ছোট বাস্তার মোড়ের কাছে, অল্প দিকের ফুটপাথ দিয়ে দীর্ঘ পরদক্ষেপে চলেছে এক জন পুলিশমান। সুরেশ তাড়াহাড়ি বাস্তা পার হয়ে পুলিশমানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আমিও সঙ্গে গেলাম।

সুরেশ শুভাল, “ধন্য করবেন। লিনকলন হল হোটেলটি কোথায় বলতে পারেন?”

পুলিশমান বলল, “লিনকলন হল হোটেল? কি ঠিকানা?”

সুরেশ বলল “আমাদের জানা ছিল—২৭ নং বেডফোর্ড স্ট্রিট। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি সেটা নয়।”

পুলিশমান বলল “নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। তাহলে হয় নিউ বেডফোর্ড স্ট্রিট, কিংবা বেডফোর্ড প্রেস, কিংবা আপার বেডফোর্ড প্রেস—এর কোথাও একটা হবে। এতগুলি সব আপনাদের খবর নিতে হয়।”

কোথা নিয়ে কি ভাবে এ সব বাস্তার যেতে হয় সুরেশ বিস্তারিত সব জেনে নিতে লাগল। সে সব কথা আমার শুনবার ইচ্ছা সবেও আমার কানে যেন কিছুই ঢুকল না।

হঠাৎ সুরেশের কথায় যেন চমক ভাঙল। সুরেশ বলল, “চল ট্যান্ডি নেওয়া যাক—বাসে এ সব জায়গায় বাওয়ার ঠিক সুবিধা হবে না। আর ইতিবর্ত বা কত?”

যতটালিতেই মত বললাম, “চল।” আরও বেশ খানিকটা দৌটে গিয়ে বড় বাস্তার মোড়ে ট্যান্ডি পাওয়া গেল। কোথায় গেলে ট্যান্ডি পাওয়া যাবে এ সব খবরও সুরেশ পুলিশমানের কাছে নিয়েছিল।

আবার চলল ট্যান্ডি। কোথা নিয়ে কোথায় নিয়ে গেল—কিছুই সেবার কবিনি তখন। সুরেশ একবার ট্যান্ডিতে জিজ্ঞাসা করেছিল—“যথেষ্ট টাকা কড়ি সঙ্গে আছে ত? আমার কাছে কিন্তু বিশেষ কিছু নাই।” উত্তর দিয়েছিলাম “কিছু আছে।” আশ্চর্য্য ছাট পাউণ্ড অর্থাৎ শতবানক টাকা তখন পকেটে ছিল শেষ হয়।

ট্যান্ডি এসে দাঁড়াল—আর একটা বাড়ীর সামনে। আগেই বলেছি—সবই এক বকমের বাড়ী। ট্যান্ডির জানাল দিয়ে বাড়ী কালো ধরণেরই মনে হল। একটু যেন উৎসাহ হল মনে। সুরেশকে জিজ্ঞাসা করলাম—“কোথায় এলাম?”

সুরেশ বলল, “২৭ নং নিউ বেডফোর্ড স্ট্রিট।”

বললাম, “তুমি নেমে দেখ। আমি আর নামব না।”

সুরেশ “আচ্ছা” বলে ট্যান্ডি থেকে নেমে গেল।

কিছুক্ষণ পর ঘিরে এসে আমাদের বলল, “এখানেও নয়।”

“তা হলে?” শুধু এই কথাটি আমার মুখ দিয়ে কোনও বকমে যেন বেরল।

সুরেশ শুভাল, “আচ্ছা—সেইদীঘর তাট থেকে সেখানে গিয়েছিলে না? কতক্ষণ লেগেছিল যেতে—মনে আছে?”

বললাম, “বিশীক্ষণ নয়।”

সুরেশ বাইরে ট্যান্ডি-ডাইভারের সঙ্গে কি সব কথাবার্তা বললে। তার পর ট্যান্ডিতে এসে উঠে বসল। চলল ট্যান্ডি।

সুরেশ বলল, “বোধ হয় বেডফোর্ড প্রেস হবে। ট্যান্ডি-ডাইভারের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম। এ দেশের ট্যান্ডি-ডাইভাররা সব বাস্তা জেনে এবং শুধু বাস্তার নাম ও নম্বরটা বলে দিলেই ঠিক গিয়ে

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সুরেশকে শুধলাম, “যদি না পাওয়া যায় ত কি হবে ?”

সুরেশ বলল, “অত ভাবছ কেন ? যদি না পাই বাসেল স্কোয়ারে আমার এক বন্ধু আছে—এক বোডিং-হাউসে থাকে। তাদের ওখানে ঘরও খালি আছে—আমি খবর নিয়েছি। তবে জায়গাটা তত ভাল নয়—সেইখানে তোমাকে রাতের মত তুলে দিয়ে, কাল সকালে এসে যা হয় করা যাবে।”

শুধলাম, “তুমি থাক কোথায় ?”

বললে, “আর্লস কোর্টে—সে এখান থেকে অনেক দূর।”

শুধলাম, “সেখানে জায়গা নেই ?”

সুরেশ শুধু একটি কথার জবাব দিল, “না।”

ট্যান্ডি এসে দাঁড়াল—২৭ নং বেডফোর্ড প্রেসে। কিন্তু এটাও লিনকলন হোটেলে নয়।

সুরেশ বলল, “আর কত ট্যান্ডি-ভাড়া দেবে ? আপনার বেডফোর্ড প্রেস এখান থেকে বেশী দূর নয়। চল হেটেই যাওয়া যাক।”

“চল।” বলে গাড়ী থেকে নেমে ট্যান্ডি-জাইভারকে বিদেয় করে নিলাম। সুরেশের প্রহর সে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল—আপার বেডফোর্ড প্রেসটা কোন দিকে।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একবার মাথার উপরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম—অন্ধকারে কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ—একটুও তারা দেখা গেল না। হয় যে ! কেন জানি না বুক ছাপিয়ে জল এল চোখে। কোনও রকমে সামলে নিলাম। হঠাৎ একটা হাওয়ার সমস্ত শরীর উঠল কাঁটা দিয়ে কেঁপে—বুঝলাম কি অসম্ভব শীত !

সুরেশ বলল, “জোরে জোরে চল,—নৈলে ঠাণ্ডায় জমে যাব।”

কিন্তু ছুঁপা এগিয়েই বৃষ্টিতে পারলাম—আমার শরীর আর নিজেকে বইতে একেবারেই রাঙা নয়। ফুটপাথে শুয়ে পড়তে পারলেও বেন আমি বাঁচি। মনের না শরীরের—কোনটার স্বাস্থ্য যে তখন বড় হয়ে উঠছে সে বিচার করার শক্তিদূরুও নাই।

যাই হোক, তবুও চললাম। কিছুদূর গিয়ে বাস্তার পাশে একটি ছোট ভোজনাগার—ইট্রাজীতে থাকে বলে ‘কাফে’ চোখে পড়ল। চারিদিকে শাসি আঁটা উজ্জল বৈদ্যুতিক আলোতে ভিতরটা উদ্ভাসিত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অনেক ইরেজ পুরুষ ও মহিলা ভিতরে পান আহার করছিল।

সুরেশকে বললাম, “কিছু চা খেয়ে নিলে হত না ?”

সুরেশ শুধাল “তুমি ডিনার (সাদা ভোজন) খাওনি বুঝি ?”

বললাম “না।”

সুরেশ বলল, “চল, আগে বাড়ীটা দেখে নি, তারপর এসে না হয় কিছু খেয়ে নেবে।”

শুধলাম, “খোলা থাকবে ?”

সুরেশ বলল “এ কাকেগুলো প্রায় রাত ১২টা পথ্যস্ত খোলা থাকে।”

চললাম—বেশ খানিকটা হাঁটলাম। ২৭ নং আপনার বেডফোর্ড প্রেসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ফুটপাথ থেকে সিঁড়ি দিয়ে ৩৪ ধাপ উপরে উঠলাম। চমকে উঠলাম—সবর দরজার পাশে লেখা রয়েছে—লিনকলন হল হোটেল। বৃশ ! অকুল সমুদ্রে

সুরেশ শুধাল, “ল্যাচ-কী আন নি ?”

জিজ্ঞাসা করলাম, “সেটা আবার কি ?”

সুরেশ একটু হেসে বলল, “বাড়ির সবর দরজার চাবি। বাসা নিলেই সবর দরজার চাবি এরা একটা দেয়।”

বললাম, “না।”

সুরেশ কড়া নাড়ল। সেই মহিলাটি এসে দরজা খুলে দিল। একটু হেসে আমাকে বলল—“আপনি ল্যাচ-কী না নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন—তাই আমি জেগে বসে আছি আপনার জন্য।”

সুরেশ বলল, “অসংখ্য ধন্যবাদ !”

উপরে উঠি গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলাম। ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথের উপর মনে মনে যে একটা রাগ হয়েছিল—সেটা এতক্ষণ টের পাই নি। কেন সে ‘আপার বেডফোর্ড প্রেস’ না বলে শুধু বেডফোর্ড ট্রাট বলেছিল ? তাকে বেশ মিষ্টি করে ছুঁকথা শুনিয়ে দেব, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এই রকম একটা সম্বন্ধ করে নিলাম মনে।

উপরে উঠি নিজের ঘরে গিয়ে দেখি চন্দ্রনাথ একটা বিছানায় বেশ লেপ মুড়ি দিয়ে অবোরে ঘুমুচ্ছে। কাছে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম ‘চন্দ্রনাথ ! চন্দ্রনাথ ! ওঠ। সুরেশ এসেছে।’

চন্দ্রনাথ একবার আঁচলে বিছানার উপর পানিকটা উঠে বসে কেমন বেন বিহ্বল দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইল। তার পরই আবার শুয়ে পড়ল—অল্প দিকে মুখ ফিরিয়ে।

সুরেশ বলল, “থাক ডেকা না। ও এখন অবোরে ঘুমুচ্ছে।”

পাশেই আমার বিছানা পাতা—একটা বৈদ্যুতিক শক্তিতে যেন আমার শরীরটাকে টানছে সেই দিকে। সুরেশ ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। প্রসাধন-টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে সুরেশ বলল, “এই যে, তোমার জগৎ চারখানা সাঙুটুইট এখানে ঢাকা দেওয়া আছে। জলও ঘরে আছে দেখছি।”

জান চন্দ্রনাথের উপর রাগ জল হয়ে কৃতজ্ঞতার মন গেল ভরে।

সুরেশ বলল, “আমি একখানা খাই—কি বল ?”

বলতেই হল, “আচ্ছা !”

সুরেশ একখানা স্যাণ্ডউইচ বেশ উপভোগের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোট লাগল। খেয়ে—জল খেয়ে বলল, “আমি এবার চালি—টিউ। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।”

বললাম, “আচ্ছা—কাল সকালে এসো কিন্তু।”

সুরেশ বলল, “হ্যাঁ ! কিন্তু এগারটার আগে আসতে পারব না ব্রেফকাষ্ট খেয়ে আসতে হবে ত !”

বললাম, “এগারোটা—অত দেরী করবে ?”

সুরেশ বলল, “তাব আগে হয়ে উঠবে না, অনেক দূর যে এখা থেকে।”

সুরেশ চলে গেল। আমি তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি পথ্যস্ত গেলাম। সুরেশ বলল, “তোমাকে আর নামতে হ’ল না।”

বললাম, “না ভাই ! আর পাচ্ছি না।”

ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে, কি আকর্ষণে জানি না, প্রথমে চাইলাম বিছানার দিকে। কোনও রকমে পরিহিত কাপড়-চোপ

সুরেশের নামে সুরেশের নামে সুরেশের নামে সুরেশের নামে সুরেশের নামে



বছানার পাশেই তারে ঝুলছে আলো নেবাবার কলটি। নিমিয়েও  
বিলাম।

শুয়ে মনে হল—তাই ত থাওয়া হল না। কিন্তু উঠি উঠি করেও  
ঠাবার শক্তি পেলাম না। ভাবলাম—একটু জিরিয়ে নি। কিন্তু  
খেন যে অব্যবহৃত গমিয়ে পড়লাম—নিজেই জানি না।

### চার

বুলা! দৈর্ঘ্য ধরা। লগুন আমার প্রথম বাত্মির অভিজ্ঞতা  
একটু বিস্তারিত করেই লিখলাম—পড়তে পড়তে দৈর্ঘ্য হারিয়ে না;  
কেন না তার একটু প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়। পরে  
প্রায় মাসাধিক কাল যে একটা অবসাদগ্রস্ত হতাশ মন নিয়ে আমি  
এই দূর বিদেশে কাটিয়েছি—ভাবলে এখনও ভয় পাই। এখন মনে  
হয়—প্রথম রাতে একটি অবশ মনের উপর ঐ রকম দিশেহারা ঘাত-  
প্রতিঘাতে মানুষের বেঁচে থাকার স্বাভাবিক আনন্দের পথটি আমি  
যেন কিছুদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আমি যখন চলে আসি, তুমি তখন ছেলেমানুষ। কাজেই  
আমার চরিত্রের বিশেষ কিছুই তোমার জানা নাট। শুধু জানতে—  
মেজনা অভ্যাস লোক—বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা নিয়েই বেশীর  
ভাগ সময় কাটান। কিন্তু আমার মনের পরিচয় কিছুই তুমি  
পাওনি। এক কথায় শুধু এইটুকু এখন বলে রাখি—সে যুগে আমার  
মনটা ছিল একটা ভালকা। বসিন বেবুনের মতন—যে দিক দিয়ে

হাওয়া বইত সেই দিকেই মহা আনন্দে অনায়াসে ভেসে চলে যেত  
মনভরা আবেগ নিয়ে—এক সামান্য একটু আঘাতেই ফেটে পড়ে  
যেত ধলায়, আর যেন কোনও দিনই উঠবে না। হরত বলবে—  
এ ত অতি দুর্বল মনের পরিচয় হল। হরত তাই। কিন্তু ঐ রকম  
মন দিয়েই যে ঠৈরী করেছেন আমাকে বিধাতা। সেটা ভুললে ত  
চলবে না।

এইবার আমার কান্ট্রিনীট শুরু করি। পরের দিন সকালবেলা ঘুম  
ভাঙ্গল, তখন বেলা ১টা বেজে গেছে। চন্দ্রনাথই আমাকে ডাকল,  
“বিকাশ, ওঠ। ওঠ। আর দেবী কবলে, সকালের খাবার খেতে  
পাবে না। ব্রেকফাস্ট ঠৈরী বলে দরজার ধাক্কা দিয়ে গেছে।  
ওদের সকালের খাবারের জঙ্ক একটা সময়ের নিয়ম আছে।”

চন্দ্রনাথও তখন বিছানায় শুয়ে—সোপে ঢাকা। আমি আপাদ-  
মস্তক সেপটিকে ভাল করে জড়িয়ে জড়িত করে শুধালাম।

“কটা পধ্যন্তু এরা খাবার দেয়?”

চন্দ্রনাথ বলল: “বতহু মনে পড়ে—রোধ হয় সাড়ে নটা  
বসেছিল। নটা দশ হলো।”

বললাম “তুমি ওঠ না আগে। একাট ত’ স্নানের ঘর।”

আমানের ঘরের সঙ্গেই সংলগ্ন একটা স্নান ইত্যাদির ঘর ছিল।

চন্দ্রনাথ বলল—“আমার ত দেবী হবে না—তোমারই ঠৈরী  
হতে দেবী হয়। তুমিই আগে ওঠ।”



## স্বর্ণশিল্পী ও মনিকার গিনি ম্যানসন

জুয়েলার্স

প্রধান কার্যালয়:—

২২৬, রাসবিহারী এডেনিউ, কলিঃ-১৯

গ্রাম—“গিনিম্যান” • ফোন—৪৬-১৪৭২

শাখাসমূহ:

বহুবাবু বাজার, ভবানীপুর

১নং হিন্দুস্থান মার্ট, বাঙ্গীগঞ্জ, ফোন: ৪৬-১৪২৫

“না।” বলে পাশ ফিরে ওলাম।

চন্দ্রনাথ বলল, “না, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।”

একটু পরে শুয়ে শুয়ে খাটের শব্দে বুঝলাম—চন্দ্রনাথই আসে উঠল।

বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রনাথের প্রচণ্ড ধাক্কায় চমকে ঘুম ভাঙল। বললে, “এই বার উঠে পড়। আর দেবী করো না। আমি স্বানের টবে গরম জল ভরে রেখে এসেছি—সটান গিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়, শীত কেটে যাবে।”

কোনও বকমে বিছানার উঠে বসলাম। কিন্তু এক—কি প্রচণ্ড শীত! এ বেন ধারণারও অতীত। ঘরের চারিদিকের জানালার শাশি জাঁটা, গায়ে যথেষ্ট কাপড়-জামা আছে—কিন্তু তবুও বসেই বেন বরক হয়ে জমে গেলাম। কোনও বকমে উপরের লেপটা টেনে গায়ে নিলাম জড়িয়ে। বললাম, “এত শীত উঠব কি করে?”

চন্দ্রনাথ বলল, “জোর করে উঠে পড়, নৈলে হবে না।”

উঠি উঠি করে কিছুক্ষণ কাটল। কতকটা আন্দাজ করতে পারবে যদি বলি—আমাদের দেশের পৌষ মাসের দারুণ শীতের রাত্রে হিম ঝাণ্ডা জলে স্থান করবার জ্ঞান নাহলে হলে নানাবিধ ঠিক আগেই যে বকম ‘মনের অবস্থা’ হ’ল কতকটা সেই বকম হয়েছিল আমার। বাই তোক, শেষ পর্যন্ত, আজও স্পষ্ট মনে আছে, লেপটাকে জড়িয়ে নিয়ে স্বানের ঘরের দরজা পৃথগু গিয়ে, লেপটিকে মোষে ফেলে দিয়ে কোনও বকমে স্বানের টবের গরম জলের মধ্যে ঢুকে যেন বাঁচলাম। চন্দ্রনাথ এক-টন গরম জল ভরে রেখে এসেছিল—যতটা গায়ে সয়।

আমাদের তৈলী হতে হতে প্রায় পোনে দশটা হয়ে গেল। ঘর ছেড়ে ছুঁজনে নেমে এলাম নীচে। এক তলার সিঁড়ির গোড়ায় একটি সাদা পোখাকপরা তরুণীর সঙ্গে দেখা হলো—সিঁড়ির কাপেট পরিষ্কার করছে—বোধ হয় বাড়ার যি। আমাদের দেখে একটু হেসে বললে, “সুপ্রভাত!”

চন্দ্রনাথ বলল, “সুপ্রভাত!” তার পর শুধাল, “ব্রেকফাস্ট কোথায় গেতে পাওয়া যাবে বলতে পারেন?”

একটু হেসে মহিলাটি চন্দ্রনাথের দিকে তাকাল। “বললে, ‘ব্রেকফাস্ট ত আর খেতে পাওয়া যাবে না। ব্রেকফাস্ট ত উঠে গেছে!’

জিজ্ঞাসা করলাম ‘তার মানে?’

মহিলাটি বললে “সাতো নটা পর্যন্ত যে ব্রেকফাস্ট।”

চন্দ্রনাথ বললে, “তা তোক। আমরা সঠিক জানিতাম না। গৃহকর্ত্তী কোথায়?”

বললে, “নীচে নেমে যান—সামনেই ব্রেকফাস্ট খাওয়ার ঘর—সেইখানেই আছেন।”

নীচে মান—এক তলারও নীচে। আগেই বলেছি—রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গিয়ে ওদের একতলার সদর দরজা। সাধারণতঃ অনেক বাড়ীতে রাস্তারও নীচে আর একতলা থাকে, যাকে ইংরাজীতে ওরা বেসমেন্ট বলে। দোতলার ওঁঠার সিঁড়িই ঘরে নেমে গিয়েছে সেখানে। এই সব সেই দিনই প্রথম শিখলাম।

নীচে নেমে গিয়ে সামনেই খাওয়ার ঘর। দরজা ঠেলে ঢুকলাম। দেখলাম—এখানে ঠাণ্ডা অনেক কম।

বেশ বড় ঘর—ছোট ছোট অনেকগুলি টেবিল এবং তার পাশে ছ’খানি কিংবা চারখানি চেয়ার চারি দিকে সাজান। প্রত্যেক টেবিলে ধবধবে সাদা চাদর পাঁতা ও একটি করে ফুলদানিতে ফুল দেওয়া রয়েছে। প্রত্যেক চেয়ারের সামনে টেবিলে ছুদী কাঁটা চামচ পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এবং একটি টেবিলে এক কোণে গৃহকর্ত্তী ভদ্রমহিলা বসে থাকেন।

এবার আমিই প্রথম বললাম “সুপ্রভাত!”

ভদ্রমহিলা একটু হেসে “সুপ্রভাত” জানাল আমাদের।

চন্দ্রনাথ শুধাল, “আমাদের জ্ঞান কি ব্রেকফাস্ট নই?”

মহিলাটি বলল “আপনাদের অবস্থা দেবী হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা বোধ হয় সঠিক জানতেন না। তাই আপনাদের জ্ঞান আমি কিছু খাবার রেখে দিয়েছি। বসুন।”

বললাম, “অনেক ধন্যবাদ!”

আমরা একটি টেবিলে বসলাম। একটু পরে সাদা পোখাকপরা একটা যি আমাদের টেবিলে দু’জনের মত চা, টোস্ট, মাদান, আদিসিক দু’টি ডিন, মাংসমলেড প্রভৃতি সাজিয়ে দিয়ে গেল।

\* \* \* \* \*

খাওয়ার পর আমরা একতলার উঠে এলাম। একতলার উঠে এসে বা-হাতি একটি দরজা দিয়ে একটা বেশ বড় ঘরে ঢুকলাম—এটি বাড়ার সাধারণ বসবার ঘর। ঘরে বেশ পুরু কাপেট পাঁতা এবং ছোট-বড় অনেকগুলি গদিখাঁটা কোট চারি দিকে সাজানো। মাঝখানে একটি নীচ গোল টেবিলের উপর দু’তিনখানি খবরের কাগজ ও বিলিতি মাসিক বা মাসান্তিক কতকগুলি পত্রিকা ছড়ান রয়েছে। ঘরের এক পাশে দেওয়ালের গায়ে বাচার করে গাথা আগুন জ্বালাবার উত্তন—গনগনে কয়লার আগুন জ্বলছে। এ ঘরটির সজ্জান খাওয়ার সব গৃহকর্ত্তীই আমাদের দিয়েছিলেন। তখন বেলা প্রায় গোপাটা বাজে—ঘরে অজ্ঞা কোনও লোক দেখানো না। ছুঁজনে গিয়ে আগুনের ধারে দু’টি কোট বসলাম।

চন্দ্রনাথ বলল, “বসে কি হবে। চল বেরুই।”

বললাম, “চিনি না, শুনি না—যাব কোথায়?”

চন্দ্রনাথ বলল, “একটি থাকার পাকা ঘর ঠিক করতে হবে ত?”

বললাম, “স্বপ্নে আশ্রয়।” বাড়ির দিকে চেয়ে বললাম—“এখনই এসে পড়বে।”

চন্দ্রনাথ বলল, “তাহলে তুমি স্বপ্নবশে জ্ঞান অপেক্ষা কর আমি ঘরে আসি।”

শুধলাম, “একলা? কোথায়?”

বললে, “মেজদার সেই বজুর কাছে, মেজদার চিঠি আছে আমার সঙ্গে। তিনি কাছাকাছিই থাকেন। এর পরে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি সাড়ে এগারটার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান।”

বললাম, “কোথায়?”

চন্দ্রনাথ বলল, “মার্গমন্ট রোড—টেবিলের স্কোয়ারের কাছে। বেশী দূর নয়। কাল রাঙেই আমি গৃহকর্ত্তীর কাছে সব খবর নিয়েছি।”

শুধলাম, “একলা চিনে যেতে পারবে?”

বলল, “তা আর পারব না? পথে জিজ্ঞাসা করে নেব।” এই বলে চন্দ্রনাথ উঠে পড়ল।

শুধালাম, “তা আমি কি তোমার জন্য অপেক্ষা করব?”

চন্দ্রনাথ বলল, “স্বপ্নে এসে তুমি বরু তার সঙ্গে বেঁচে যে-দুচার জায়গা দেখে এসো। আমিও দেখি। তার পর বিকেলে চা-এর সময় পরামর্শ করে যা চয় ঠিক করব।”

এই বলে চন্দ্রনাথ বেঁচে গেল। একলা ঘরে বসে—চাইলাম জানালার দিকে। উ—বাইরে কি কুরাশাছিন্ন মেঘলা অন্ধকার! হঠাৎ ঢমকে উঠলাম। এ কি! মনটা এত ভারি কেন?—প্রতক্ষণ ঠিক যেন টের পাইনি—ক্রমেই যেন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। কাল রাহের সেট অঙ্কুরে কূল পাওয়াব অবলম্বনটি আজ আর নাই, কখন যেন হাত থেকে আবার গেছে বাসে। তোমাদের মুখগুলি এক এক করে মনে করতে লাগলাম। মনে পড়ল সেই আমাদের সেগের শীতকালের সকাল বেলার পরিষ্কার সোনালী সোদটুকু। এ আমি কোথায় এলাম! সাত সমুদ্র তের মনোব পায়ে—অন্ধকার এই কারাগারে—কি পাপের শাস্তিতে হল আমার নির্দোষ? একটা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে একটু অল্পমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

এমন সময় ঘরে একটি পূর্বদেশীয় যুবক এসে ঢুকল। ছোট-খাট মানুষটি—মাথের বা কালো—কিন্তু বেশ কিছুটা, ইংরেজী পোশাক পরিধান। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম—মুখে একটি বেশ নম্র ভঙ্গুর চাপ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে “স্বপ্নভাত! বড়ই খারাপ নিমটা আজ।” তার পর আশ্রমে যত কাছে সম্ভব একটি কোঠে বসে একটি পত্রিকা নিল টেনে। খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে দুটো কথা বলার চেষ্টা হ’ল।

শুধালাম, “আপনি কোন দেশ থেকে আসছেন?”

বলল, “ভারতবর্ষের নিকট দেশ থেকে। আপনি?”

বললাম “আমিও ভারতবর্ষের বাংলা দেশ থেকে আসছি।”

আর কোনও কথা বলল না। লোকটি কথাবার্তা খুব কম বলে দেখছি। আমিই আবার কথা বললাম—“তা এটা কোঠেসেই থাকেন বুঝি?”

বললে “আপাততঃ। কাছাকাছি ছ’তিনটে ঘর দেখেছি—ছ’-এক দিনের মধ্যেই উঠে যাবো।”

শুধালাম, “কবে দেশ থেকে এসেছেন?”

বললে “তা, প্রায় ছ’মাস হলো। এত দিন লগুনের বাইরে একটি চমৎকার বাড়ীতে ছিলাম। কিন্তু আদা-হাওয়ায় অনেকটা হাওয়া নষ্ট হয় বলে—এবার লগুন সহরের ভিতরই থাকব। কাজের অসুবিধা হয় অত দূরে থাকলে।” শুধালাম—“আপনি কি কখনও কাজ করেন, না লেখাপড়া করেন?”

বললে “আমি ছাত্র। ইঞ্জিনিয়ারি পড়ি। আপনি?”

এতক্ষণ একটা প্রশ্ন করতে যেন বাঁচলাম। আমিই ত টেনে নিই কথা চালাচ্ছিলাম প্রশ্নকণ।

বললাম, “আমি ডাক্তারী পড়তে দেশ থেকে সরে এসেছি।”

‘তা’ বলে আবার চুপ করে গেল। কিন্তু আর একটি প্রশ্ন আর লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলাম না। শুধালাম, “আজ থাকার ভাল জায়গা আপনার সন্ধান আছে?”

লোকটি আমার মুখের দিকে তাকাল। শুধাল, “লগুনের

বাইরে কোনও সাধারণ (সম্মিত বসবাসের পল্লী) থাকলে আপনার অসুবিধা হবে?”

বললাম “না—সে ত খুব ভাল হয়।”

লগুনের বাইরে—চরত কাঁকায়—চরত সেখানে আকাশ গাছ-পালা দেখতে পাওয়া যাবে—মনটা একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল। এই বিরাট দৈত্যের গল্লবের থেকে চরত পাব একটু মুক্তি।

বললে “স্বপ্ন একটি জায়গা আছে এবং বেশ সস্তা। আমি সেইখানেই ছিলাম। চোয়ারি ক্রশ-শ্রেন থেকে টেনে যেতে হয়, আর ঘটা তিন কোণটার লাগে। এলটাম পার্ক জায়গাটির নাম। ১৪ নং গ্রীণস্ট্রাম বোডে মিসেস ব্রেক বলে একটি ভদ্রমহিলা বাস করেন—তিনিই অতিথি বাগান। মাত্র ছ’ গিনি করে সপ্তাহে—বেড ব্রেকফাস্ট এবং সন্ধ্যাবেলায় সাপার (হালকা দরবের সন্ধ্যা ভোজন) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শান্তিপূর্ণ জায়গাটি।”

স্বপ্নে ঘরে ঢুকল। উঠে দাঁড়িয়ে স্বপ্নকে বললাম, “স্বপ্নে, চল। এখনই যেতে হবে।”

স্বপ্নে শুধাল “কোথায়?”

বললাম “এলটাম পার্ক। চোয়ারি ক্রশ-শ্রেন থেকে যেতে হয়। এই ভদ্রলোকটি সন্ধান দিলেন—থাকার খুব ভাল জায়গা আছে।”

স্বপ্নে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলোচনা করে বিস্তারিত জেনে নিল। আমি ও স্বপ্নে রওয়ানা হলাম—এলটাম পার্ক অভিমুখে।

লিনকলন হল কোঠের থেকে বাসে চোয়ারি ক্রশ-শ্রেনে এসে, শ্রেন ধরে যখন এলটাম পার্ক-শ্রেনে এসে পৌছলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা হল। শ্রেনটি নীচুতে—খানিকটা উপরে উঠি গিয়ে এলটাম পার্ক পল্লী। আমি ও স্বপ্নে উপরে উঠি গিয়ে বাস্তব পাঁড়লাম।

সত্যি চোখ জুড়িয়ে গেল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাস্তব দু’ধারে ঠিক একই দরবের ছোট ছোট মোতলা বাড়ীগুলি, সামনে একটি করে ছোট বাগান, বাগানের সামনে বাস্তব ধারে একটি করে মোতলা ছোট গোট এবং একটি সস্তা বাস্তব সেই গোট থেকে বাড়ীর সদর দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সবটাই ঠিক কম-বেশী একই ধাঁচে তৈরী—যেন একই দিনে কোনও একজন কারিগর সমস্ত বাড়ীগুলি তৈরী করে রেখেছে।

দিনটা অবজ্ঞা মেঘলা ছিল—কিন্তু এখানে সেই লগুনের অন্ধকার কুরাশা নাই। বাড়ীগুলির কাঁকে কাঁকে বাস্তব ওপরে তরঙ্গায়িত মাঠের পর মাঠ—তার ঘন সবুজ রঙটা সত্যিই আমার বুককে ওপরে যেন একটা শীতল প্রসঙ্গ লাগিয়ে দিল। আমি একদৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে রইলাম।

স্বপ্নে বলল, “ওহে চল, কোথাও মধ্যাহ্ন ভোজনটি সেরে নেওয়া যাক। বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।”

স্বপ্নে বলল, “ঐ দূরে বাস্তব ও পাশে একটা ক্যাফে আছে বলে মনে হচ্ছে। চল দেখা যাক।”

ছ’জনে গেলাম সেই দিকে; সত্যিই ক্যাফে। একতলায় সামনের ঘরটিয় খানকয়েক ছুতান টেবিল রয়েছে, পাশে চোয়ারি। পাঁচ-সাত জন ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা বিভিন্ন টেবিলে বসে আছে। আমরাও একটা টেবিল দখল করলাম।

স্বপ্নেই খাবার আনতে বলল। গেলাম—ল্যাং চপ (অর্থাৎ সিদ্ধ করে ভাজা খানিকটা কচি ভেজার মাংস) সঙ্গে কিছু সিদ্ধ বাঁধাকপি ইত্যাদি তরিতরকারী, ছ’ টুকরো করে ফ্রুট ও মাখন

এবং পরে জ্যাম ইত্যাদি দিয়ে তৈরী খানিকটা পুজি। এক কাপ করে চা-ও গেয়েছিলাম। মোটের উপর আমাদের খরচ হল আট শিলিং সাত পেনি; বলা বাহুল্য খরচটা আমিই দিয়েছিলাম—বখন টাকা নিতে এসে, স্বদেশ ছিল জানালা দিয়ে অন্তরমনস্ক ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে।

১৪নং গ্রীন স্ট্রোম বোডের সামনে এসে যখন পাঁড়লাম, তখন ছুটো বেজে গেছে। কাফ থেকে বেরিয়ে এক জন পুলিশমানকে স্বদেশ রাস্তার খবর বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছেছিল এক পুলিশমানও অল্প কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিল ঠিক। বলেছিল, “সোজা চলে যান বায়ে দ্বিতীয় রাস্তা নেবেন এক তার পর খানিকটা গিয়ে ডাইনের তৃতীয় রাস্তা হচ্ছে গ্রীন স্ট্রোম বোড।”

রাস্তার দুধার ঠিক সেই একই ধাঁচের বাড়ী। অতেনে না থাকলে হঠাৎ ঠিক বাড়ীটি চিনে বার করা কঠিন। আমরা নম্বর দেখে বাড়ীটা খুঁজে নিলাম।

সামনের সরু লোটার গেটটা খুলে, বাগানের রাস্তা কেয়ে আমরা সবার দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে দিলেন—একটি মহিলা। ইনিই মিসেস ব্রেক।

ভক্তহিত্যকে দেখেই আমার ভাল লাগল। বয়স ঠিক আশ্চর্য করা কঠিন, তবে মধ্যবয়সী—একমাথা চুল টেনে ঝোঁপ করে আঁচড়ান এবং একটি কালো জাল দিয়ে চুলগুলি ঢাকা। চেখে চশমা এক চপমার আড়াল থেকে কোণ ছুঁটির একটি ব্রিঙ্ক মুত হাসিতে মুখখানি সব সময়েই শুধু যে উদ্ভাসিত হয়ে আছে তাই নয়, মুখখানিতে একটা সহজলভ্য ভাব লাকিলোর পরিচয় পাওয়া যায়। মোটের উপর ছোটখাট মাছুষটি—কিন্তু পরিণত গড়নের সামন্তত দুই এড়ায় না। কথায়-বার্তায় ধরণ-ধরণে সব সময়ই একটা অক্ষুণ্ণ চক্ষুশতা যেন সারা অঙ্গ দিয়ে ঠিকবে পড়ছে।

দরজাটি খুলে মুত তোসে বললেন, “সুপ্রভাত।”

স্বদেশ বলল, “আপনার এখানে ঘর খালি আছে কিন্তি। আমার এই বন্ধুটি সবে ভাবতবর্ষ থেকে এসেছেন। এর থাকবার জায়গা হবে কি?”

মহিলাটি দরজা খুলে অনর্থনা জানালেন, “ভিতরে আসুন।”

ভিতরে গিয়ে দেখলাম—সেই একই ধরণের বাড়ী—সামনেই সোতলার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে এবং ডাইনেরটি খাবার ঘর এক বাঁয়েরটি বসবার ঘর। লণ্ডনের বাড়ীগুলির সঙ্গে তুলনা এই যে, এ বাড়ীগুলি একটু ছোটখাট ধরণের এবং একতলায়ও নীচে ওমা থাকে বেশমোট বলে—তা এসব বাড়ীতে নাই।

সোতলার শোবার ঘর শোবার অল্প মহিলাটি আমাদের উপরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা অবশ্য বিশেষ বড় নয়, তবে বেশ ঝটখটে এবং রাস্তার দিকে বেশ বড় একটা জানালা এবং খাট সিঁড়ান প্রসাধন টেবিল প্রভৃতি আসবাবপত্রও ভাল। ঘরের সঙ্গে সংলাপ না হলেও কাছেই স্নান ইত্যাদির ঘর। মহিলাটি বললেন যে, “এটি শোবার ঘর এবং নীচে খাবার ঘরটিই বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।”

তিনি আরও বললেন—“নীচের বসবার ঘরটি নিরিবিলি ব্যবহারে আপনার কোনও অসুবিধা হবে না। কেন না, আমরা বাড়ীতে শু লোকজন বেশী নেই—মাত্র আর একটি জাপানী স্ত্রীলোক

থাকেন। তিনি ডোরে বেরিয়ে যান আর রাতে ফেরেন। তাঁর সঙ্গে আপনার প্রায় লেখাই হবে না।”

শুধালাম, “আমার আর একটি বন্ধু আছেন। তাঁর থাকবার কোনও ব্যবস্থা হতে পারে?”

মিসেস ব্রেক একটু বেবে বললেন, “আপাতত নয়, তবে কিছু দিন পরে ব্যবস্থা করতে পারব বলে মনে হয়।”

খাবার এবং বসবার ঘরটি দেখবার জন্য নীচে নেমে এলাম। রাস্তার দিকে জানালা রয়েছে—ঘরটিও ভাল। একটি বড় টেবিলের চার পাশে লাল গদি-আঁটা চেয়ার এবং ঘরের কোণে একটি লাল গদির কোঁচও রয়েছে। মেঝে বেশ লাল পুরু কার্পেট পাতা। কার্পেট অল্প একদোশর বাড়ীতে প্রায় সর্বত্রই থাকে—এখানে আমার শোবার ঘরটিতেও ছিল।

স্বদেশের দিকে ‘হাকিয়ে বললাম, “কি করে?”

স্বদেশ বলল, “একুনিটি ঠিক করে ফেল। সব দিক নিচে এমন সবিরের জায়গা পাবে কোথায়?”

বললাম “কিন্তু চন্দনাথ—”

বলল, “অত ভাবতে গেলে আর এ দেশে থাকা যায় না। এখানে জায়গা ছেড়ে দিলে আর পারবে না। পাবে না হয় চন্দনাথ আসবে।”

আমাকে কথায় আমারও মনের কথা। সব দেখে শুনে আমার মনে জায়গাটিকে একবারে আঁকড়ে ধরতে, কিছুতে ছাড়তে রাজী নয়। মুখে বললাম, “তাই হোক।”

মহিলাটি সঙ্গে কথাবার্তা সব ঠিক হলো।

শুধালেন, “কবে আসবেন?”

বললাম, “আজই। আমি এখনিই গিয়ে নির্দিষ্ট পরে শুড়িয়ে নিতে আসছি।”

মহিলাটি দেওয়ানের ভিতর থেকে একটি কাগজ বার করে বললেন, “দুপুর দিকে ডোবাি ক্রশ থেকে অনেকগুলি গাউী আছে। কখন আপনার আসার সুবিধে হবে?”

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, “এই মকন ছুঁটা আশ্চর্য।”

মহিলাটি বললেন, “ভাল কথা। ছুঁটায়ই একটা গাউী আছে এবং তার পরেই ছুঁটা কুড়ি মিনিটে। এই দুটির একটায় এসেই ঠিক হবে। আমি ইতিমধ্যে আপনার ঘর শুড়িয়ে দেখে দেব। রাতে এসে খাবার থাকেন ত?”

বললাম, “হ্যাঁ।”

বললেন, “বেশ ভাল কথা।”

লিনকলন হল সোতলে এসে যখন পৌঁছিলাম, তখন প্রায় সাত চাবটা বাজে। স্বদেশ ডোবাি ক্রশ ঠেগন থেকেই বিদায় নিয়েছিল—কি কাজ আছে। কত মন্থর বাসে গিয়ে কোথায় নেমে লিনকলন হল সোতলে যেতে হবে বিস্তারিত আমাকে বুঝিয়ে বলে দিয়ে গিয়েছিল।

বাসে আসতে আসতেই বুঝতে পেরেছিলাম, যদিও মনের মত বাড়ীটা ঠিক হওয়ার মকন একটা স্বস্তির হাওয়া বটেছে কিন্তু কোঁটা ফুটে আছে মনে। এই স্বস্তির হাওয়াতে কাঁটার বাথার থেকে থেকে দৃশ্যত করে লাগতে লাগল—তাঁই শু। চন্দনাথকে এ ঠকান হল, তাকে বাস দিয়ে স্বার্থপরের মতন নিজের বাসাটি নিশ্চয় ঠিক করে।

হোটেল চুকে বাইরে বসবার ঘরটিতে গেলাম, চন্দ্রনাথ হস্ত  
ত্রিখানই অপেক্ষা করছে। ছিলও তাই। চন্দ্রনাথকে দেখে নিজেকে  
একটু অপ্রস্তুত মনে হতে লাগল—যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছি  
তার কাছে।

চন্দ্রনাথ শুধাল, “কি খবর? এত দেরী?” শুধালাম “তোমার  
খবর কি?”

চন্দ্রনাথ বলল, “আমি ত তোমার ভুল অপেক্ষা করে বসে আছি।  
আমি এতবার যাব।”

শুধালাম, “কোথায়?”

চন্দ্রনাথ বলল “বেশী দূর নয়—কাছাকাছি—টবিরটন ষ্টোয়ার।  
আমার যেজানার বন্ধু একটা ঘর আমার ভুল আগাই ঠিক করে  
দেখেছিলেন। কাজেই আমাকে যেতেই হল। আর ঘরটিও  
চমৎকার—বড় ঘর, স্পন্দর আসবাব-পত্র—জানালা দিয়ে ষ্টোয়ার দেখা  
যাচ্ছে। বাড়ীওয়ালী ভদ্রমহিলাটি খুব ভাল। সস্তাও বেশ। বেত  
ও বেকফাট সম্ভ্রান্তে তিন গিনি।

চন্দ্রনাথ এতগুলি কথা এক নিশ্বাসে বলে ফেললে বানিকটা যেন  
দৈর্ঘ্যব্রতের মতন। একটা ছোট স্বস্তির নিশ্বাসে আমার মনের  
বাহিরে গেল খসে। একটা কপট অভিমানের স্বরে বললাম,  
“আব আমার কি দশা হবে?”

চন্দ্রনাথ বলল, “তুমিও চল আমার সঙ্গে। আমারই বাড়ীর  
কাছাকাছি দুটো ঘর আমি দেখে এসেছি তোমার জন্য। বেশ ভাল  
নয়। একটু বেশী—সম্ভ্রান্তে সাত-দশ গিনি করে বেত ও বেকফাট।  
লগুন সহস্রের ভিতরে ঐ বকমই ভাড়া মাগকাট। আমার বাড়ীর  
মহিলাটি মোস্তাফিজ জানা-শোনা কি না—তাই বোধ হয় একটু সম্ভ্রান্ত  
সিমেছেন।”

মুগ্ধ ব. গাছীয়া মাথায় চুপ করে বসে বসেই রইল।

চন্দ্রনাথ শুধাল, “তা, তুমি এতক্ষণ করলে কি?”

আব কপট গাছীয়া সাধা চলল না। বললাম, “আমিও একটা  
ঘর ঠিক করে এসেছি।”

“ও!” বলে চন্দ্রনাথ ক্রো-ক্রো করে হেসে উঠল। তারও বুকে  
সেই ছয় বইস একটা স্বস্তির হাওয়া।

লিনকলন হল হোটেলের সেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে, আমার  
জিনিষপত্র ঝুড়িয়ে নিয়ে যখন সদর দরজা খুলে বাইরে এসে  
শীড়িয়েছি, তখন সন্ধ্যা আর নয়, অন্ধকার রাত্রি—ঘড়িতে সময় সাড়ে  
পাঁচটা। সামনেই বাস্তার ট্যানি শীড়িয়ে। ভাটটার আমার কাছ  
থেকে জিনিষগুলি নিয়ে ট্যানিতে সন্ধিয়ে রাখতে লাগল। চন্দ্রনাথ  
আগাই চলে গিয়েছে।

সদর সিঁড়ির উপরের ধাপে শীড়িয়েই দেখতে পেলাম, সকালবেলার  
সেই সিংহলবাসী যুবকটি ফুটপাথ দিয়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে  
আসছে—সঙ্গে একটা বিনোদী তরুণী। তরুণীটি যুবকটির সঙ্গে সঙ্গে  
ঠিক হোটেল পর্যন্ত উঠে এসে না—ফুটপাথেই বাড়ীর বেলি-এর  
পাশে চুপ করে শীড়িয়ে গেল, অন্ধকারে নিজেকে একটু আড়াল করে।  
যুবকটি শিঁড়ি নিয়ে উঠতেই আমার সঙ্গে দেখা।

তাকে বিশেষ বক্তব্য দিয়ে বললাম যে, তাইই নির্দেশ মত বাড়ী  
ঠিক করেছি। এক বাড়ীটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

যুবকটি বলল, “ভালই থাকবেন। মহিলাটি খুবই বড় করেন।  
এখনই হাফেন বৃষ্টি?”

বললাম “হ্যাঁ।”

কবরদান করে বিনায় সম্ভ্রান্ত জানিয়ে সে হোটেলের মধ্যে চুকে  
গেল—কিন্তু তরুণীটি সেখানেই চুপ করে শীড়িয়ে—বোধ হয়  
সিংহলবাসীর অপেক্ষায়। বাস্তার গ্যাসের আলো আমাদের সদর সিঁড়ির  
উপরে বানিকটা এসে পড়েছে কিন্তু তরুণীটি যেখানে শীড়িয়ে ছিল সে  
তাৎক্ষণিক অন্ধকার, তাই তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু  
তার শীড়িয়ে থাকার ভক্তিমার মধ্যে তার অজ্ঞানবোধের মাহুদ্য সহজেই  
পতল এগে। তত কিতুই আমার চোখে পড়ত না যদি না হঠাৎ  
আমি অতর্কিত করণম যে তরুণীটি অন্ধকারের আড়াল নিজেকে লুকিয়ে  
দেখে আসারও উজ্জ্বল দুটো চোখেই হঠাৎ দৃষ্টিতে আমার চোখ-  
হুথ যেন বিহ্বল-বাগল শিক্ত করছে। কখন যে সেই দৃষ্টিবাহ আমার  
নয়নে লেপ করে অস্তুর গিয়ে পৌছেছিল—ঐব পাইনি। কিন্তু ট্যানি  
কার লগুনের বুকের উপর দিয়ে যেহে যেহে আমার অন্ধকার বুকের  
মাথা সেই দুটো চোখ, দুটি প্রতীপশিখা মতন জ্বলতে লাগল  
অনেকক্ষণ।

[ক্রমশঃ]



ক্যালকাটা অপ্রটি ক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ

ফোন • ৩৫ - ১৭১৭ প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্ণিক বসু ব্রহ্ম

গ্রাম - ক্যাল অপ্রটিকো • ৪৫ নং আম্বহার্ট স্ট্রীট • ৪১ এসেজীতা - ৬

৪১ বিয়ে



# পঞ্চতপা

আন্তোব মুখোপাধ্যায়

১১

অন্ধকার শাল গাছের নিচে সাইকেল হাতে নিরাপন্ন ব্যবধান  
দাঁড়িয়ে ছুই চোখ বিক্ষারিত করে ভুতুবা বু দেখছে আর  
দরদর করে ঘামছে।

তারই দোকানের এক ঘরে টিন টিন করে আলো বলছে একটা।  
সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে খাটিয়ার ওপর বসে আছে লোকটা আর  
ক্রমাগত পাইপ টানছে। পাইপ নিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।  
দেখানো পাইপ ধরাচ্ছে আবার। তার আঁচর চকচকে মুখ  
লাল দেখাচ্ছে খেকে খেকে। ভুতু বাবু চোখ জানে, সে লালিনা  
স্বাস্থ্যকৃত।

ভুতু বাবু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর দেখে চেয়ে চেয়ে। মনে  
হয় তারই দোকানে আসা নিয়েছে এক মূর্তিমান বিলুপিকা।  
মড়াইয়ের বাতাসে গাছের পাতা মড়মড়িয়ে ওঠে। ভুতু বাবু কান  
ভিতর দিয়ে একটা অজ্ঞাত শব্দ শ্রোত পা রেখে নামতে থাকে।

রাতের পর রাত কাটিয়েছে দোকানে, কখনো এমন হয়নি।

শলাই বলে উঠল নিবন্ধ পাইপের মুখে। তেলতেলে লাল মুখ  
হুলুহুলু টুটুসে দেখালো আবার। লোর গোড়ায় মেঝেতে দ্বিতীয়  
মূর্তি। অন্ধকারের মতই কালো আর থমথমে। ক্রমাগত মদ গিলছে  
সেও। ঘরের টিনটিমে আলোয় বাইরে দিকে বিগট একটা ছায়া  
পড়েছে তার। সেই ছায়ার নড়চড়া দেখে ভুতু বাবু বুঝতে পারে,  
থেকে থেকে বোতল উবুড় করে গলায় ঢালা হচ্ছে।

পর পর চারদিন... ভুতু বাবু জেদে কাঠ। আরো এগারো  
দিন বাকি।

কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল এখনো বোঝে না।  
কেন রাজি হল? টাকার লোভে।  
নাড়তে লাগল তার চোখের সামনে।  
দুলছিল। একদিকে গোল আর  
ছুই চোখ। নাকের ডগায় টু  
সিঁড়ি সিঁড়ি করে উঠছিল।  
রাজি হয়েছে ভয়ে। অজ্ঞাত  
না হলে তার দোকানের  
থেকে। লোকটা তার

ওর করতে পারছে না।  
নিনালা নাট বখন লোকটা  
লাল। র পায়েব নিচে মাটি  
মহিল ছিল তার গোল গোল  
বদলার হলগে গোটা শরীরটাই  
ই শুধু রাজি হয়নি।  
বদলার বন বুকেছিল, রাজি  
হবে না। ত তুলতে হবে এখন  
আর একটি দাঁড়িয়েছে মতামতের

প্রত্যাশায় নয়। মুখ বন্ধ করার জন্তু আর কৌতূহল দমন করার  
জন্তু। টাকার দোলানিতে সেটা সম্ভব না হলে আরো উপায় আছে  
হাতে। সে উপায়টিও আড় আড় দেখেছে ভুতু বাবু, উপলব্ধি করেছে।

নোটের তাড়া দুলছিল রণবীর ঘোষের হাতে আর ডাবডেবে  
মড়া চোখে নিনিমেষে চেয়েছিল হোপুন।

কেউ তারা ভয় দেখায়নি। তবু ভয় পেয়েছিল ভুতু বাবু।  
রণবীর ঘোষের হাতে টাকা আছে, টাকায় না হলে হোপুন আছে।  
একবার টাকার দিকে তাকাও। তারপরে হোপুনের দিকে।  
ওই পাণ্ডা মড়া চোখের সঙ্গে দ্বিতীয়বার আর চোখোচোখি করার  
সাধ হবে না। চেয়ে থাকো টাকার দিকে। নাকের ডগায় টাকার  
বাতাস মিষ্টি লাগবে। টাকা নাড়ার ফরফর শব্দটা মিষ্টি লাগবে  
কানে। বিহ্বল হাত বাড়িয়ে টাকা নাও তারপর। মড়া চোখের  
দিকে তাকিও না আর।

হাত বাড়িয়ে টাকাই নিয়েছে ভুতু বাবু।

কিন্তু ওই টাকাই অস্বস্তির কারণ, ভয়ের কারণ, বিলুপিকা  
কারণ। এত টাকা না পোলে অত ভারত না ভুতু বাবু, অত ভয়ও  
পেত না। অত টাকা পেয়েছে বলেই গোলমালে ঠেকে সব কিছু।  
গোলমালে ঠেকে বলেই ভাবছে। আর বত ভাবছে তত ভয়  
বাড়ছে।

দু'দিনের মধ্যে সব কিছু যেন ওলট পালট হয়ে গেল ভুতু বাবু  
চোখের সামনে। অথচ ব্যাপার সামান্য। গোড়ায় গোড়ায় তো  
টাকা নিয়ে ছুঁপিচড়নের এক একটা দলকে এমন ঘর ছেড়ে দিয়েছে  
কতবার। বিদেশে বেঘোরে এসে পড়েছে। রাতে মাথা গৌড়ার  
আস্তানা নেই। টাকা ফেলো, থাকো একবার ছুঁরাতে। ভুতু বাবু  
জন্তু ঘরে সব পুরে তালবন্ধ করে সাইকেল ঠেগে চলে যায়  
চৌদ্দ মাইল দূরে নিজের বাড়ি। ভাড়া কাফের আলমারি, তেলটি  
আসবার পত্র বা ব্যবহার করা হাড়ি কড়াই চুরি করার জন্তু অতটক  
দিয়ে দল বেঁধে বাড়িবাস করতে আসবে না কেউ ভুললোকে চোখে।  
মুখ দেখে লোক চিনতে পারে ভুতু বাবু। তাছাড়া ছুটুকো চুটি  
ভয়ও নেই কিছু। আদিবাসীরা আর ঘাই হোক, চুরি শেখেনি।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটাই অসম্ভব ভয় সঞ্চার করেছে  
ভুতু বাবুর মনে। পনের দিনের জন্তু তার দ্বিতীয় ঘরটি দল  
করেছে রণবীর ঘোষ। দিন নয়, শুধু রাতেব জন্তু। মড়াই ছেড়ে  
চলে যাচ্ছে বরাবরকার মত। দিনকতক থাকা দরকার এখন  
পার্টনারের সঙ্গে বনছে না বলেই এই ব্যস্ততা নাকি। পনের  
রাত্রির জন্তু হলেও যে কোনদিন চলে যেতে পারে।

কিন্তু পনের রাত্রির জন্তু অত টাকা কেন? এর পনের ভাগ  
এক ভাগ হলেও তো ভুতু বাবু রাজি হয়ে যেত। অত টাকা কেন  
আর অত থমথমে গোপনতা কেন? সেই গোপনতার সদ্যা  
মড়া চোখো লোকটা কেন?

দোকানের শুক থেকেই হোপুনকে ঢেনে ভুতু বাবু। তা  
আনুষ্ঠানিক কর্তৃকলাপ জানে। মনে মনে সমীহ করে। কি  
এরকম ভয় কখনো করেনি। কিছু দিন ধরেই লোকটার বন  
ভাবছিল ভুতু বাবু। বিগত কটা দিনের মধ্যে ওর সঙ্গে না  
যোগাযোগ ঘটেছে বার কতক।

নিবিবলিতে ফস ফস করে আনকোরা নেট বার করেছে ছুই  
তিনটে করে। মুখ ফুটে কখনো বলেনি বিশেষ কিছু। সামান্য

ইঙ্গিতে ভুতু বাবু বুঝে নিয়েছে। হাড়িয়া বা পাচাই নয়, খাঁটি বিলিতি চাই। হাড়িয়া, পাচাই তো ওদের ঘরে সর্বদাই মজুত থাকে। ওর মুখের দিকে চেয়েই ভুতু বাবু পরিষ্কার বুঝতে পারে, সেবল জাঁটা বিলিতির স্বাদ লোকটা ভালো করেছে জেনেছে।

ভুতু বাবু কি এই ব্যবসা করে না কি? মোটে না। বিশ মাইল দূরে শতরের দোকান সকলের জন্তেই খোলা। তুমি গেলে তুমিও নিয়ে আসতে পারো। কিন্তু তোমার যাওয়ার ফুরসত নেই বা সঙ্গতি নেই। আমি এনে দিই তোমার হয়ে। বোতলের নাম নিই আর পরিশ্রমের দাম নিই। ব্যস, বিসেকের কাছে পরিষ্কার ভুতু বাবু। যার দরকার, যেমন করে তোক আনবেই সে, ভুতু বাবু উপলব্ধ মাত্র।

কিন্তু তা বলে হোপুন! তাপনের জ্ঞা! ভুতু বাবু অবাক। অবগু এ অর্থের যোগানদার কে ভুতু বাবু অটরে জেনেছে। কিন্তু জেনে বিশ্বাস চ্যুত্ব বেড়েছে। তবু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি কিছু। জিজ্ঞাসা করবে কাকে। লোকটার বোবা চাল-চলনের ব্যতিক্রম নেই কিছুমাত্র। বব আরো শান্ত আরো নিশ্চল মনে হয়েছে। কিছু জিজ্ঞাসা করলে এই জমাট কালো পাথর মূর্তি যে ভার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে সে এক অস্বস্তি। ভুতু বাবু কিনিম এম নিয়ে খান্নাস।

তার পর সরাসরি এই ঘর ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব, নাকের ভগ্নাব বগাবার ঘোষের টাক! সেলানো এবং সেই সঙ্গে হোপুন! ভুতু বাবু ভত্বকে গেছে, তারনাটি স্থাব অরকাশ বড় পায় নি।

দূর শাল গাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধবে গেছে ভুতু বাবুর। যেতে পারবে বাঁচে। কিন্তু পা বেন পাথর হয়ে গেছে। নড়তেও পারছে না।

সকো হতে না হতে নড়াটের হটগোল খেনে যায়। কর্ণটাবাবু ওপরে উঠে যায়। আদ্যাদ্যাবা ব্যস্তমস্ত হয়ে ঘরের দিকে ছোট্ট হাড়ির টানে। ভিন্দিশি কুলীকামিনের আস্তানা এদিকে নয়। একটু রাত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ভুতু বাবুর দোকানের আশপাশে জনমানবের চিহ্ন বড় থাকে না। রাত আটটা বাজতে না বাজতে ছাঁদশ ঘর বাঁধা খান্দরের বাজের খাখার উপরে চলে যায় শেষ বারের টাঁকে। তার পরেই বজ্রির শুদ্ধতা। ধীরেস্থে তখন দোকান গোলারাব বাবস্থা করে ভুতু বাবু। আব ছোকরা কর্মচারী ভটোর সঙ্গে গল্পগুজব করে।

কিন্তু ছাঁদিন ধরে রাতেব খাখার উপরে পাঠিয়েই ওদের বিদায় দিতে হচ্ছে। একটা ঘর তালাবন্ধ করে ফেলে দ্রুত দ্রুত প্রতীক্ষা। জিপে করে বগাবার ঘোষ আসে এক সময়। বাক্যাবয় না করে সাইকেল নিয়ে প্রস্থান করে ভুতু বাবু। দূরে অন্ধকারে শাল গাছের নিচে এসে দাঁড়ায় তার পর। খাটিয়ায় বসে পাইপ ধরায় বগাবার ঘোষ। ক্রমাগত পাইপ টানে। পাইপ নিয়ে যায়। দেশলাই জ্বলে ধরায় আবার। পিচ্ছিল লালিমায় চকচকিয়ে ওঠে গোটা মুখ।

সাইকেল-হাতে ভুতু বাবু দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্পান্দের মত। কতক্ষণ ঠিক নেই।

তার পরে, অনেক পরে শ্রুত গতিতে পাচাইয়ের ওপর থেকে নেমে আসে হোপুন। পূজীভূত খানিকটা নিটোল অন্ধকারের মত।

ভুতু বাবু জানে, অর্থ দিয়ে সহজে কেনা যায় না ওদের। কিন্তু মদের বশ প্রায় সকলেই।

সমস্ত রাত তা বলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। সে না এভাবে। কতদূর যেতে হবে ঠিক নেই। গোলগাল দেহ সঙ্গেও সাইকেল চেপে অনায়াসে চলে যাওয়া অভ্যাস আছে। কিন্তু কামিন ধরে শরীরটা বেন কাঠ। নড়তে-চড়তে সম্ভট।

আরো এক রাত। একই ব্যাপার দেখল ভুতু বাবু।

সিমেন্ট ভেজাল সাক্রান্ত সমস্ত অঘটন জানে। প্রথমে ভাবল, সেই ব্যাপারেরই প্রতিশোধের চক্রান্ত কিছু। কিন্তু ভুতু বাবু নির্দোষ নয়। হঠাৎ মনে হল, তা নয়। একেবারেই নয় তা। আর কেউ না জামুক, ভুতু বাবু তো জানে ঘর দখলের কথা। জানে যখন, ওখানে দারাবন্ধ কিছু সঘটনের সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া প্রতিশোধ নিতে চলে এভাবে ঘর দখলের দরকারই বা কি? তাহলে কি? তাহলে কেন?

ভুতু বাবুর গোল চোখে পলক পড়ে না প্রায়। দম বন্ধ করে ভাবতে থাকে।...তাহলে এমন কিছু, যার জ্ঞা ঘর দরকার। এমন নিজন, এমন গোপনে। কোনো একজনের আমার প্রতীক্ষা। কেউ একজন আসবে।

...যেই তোক সে, পুরুষ মানুষ নয়।

একটা রোমাঞ্চকর উত্তেজনায় হঠাৎ যেন চোখ হয়ে উঠল ভুতু বাবু। সঙ্গে সঙ্গে এক উচ্চল চপল মেয়ের মূর্তি ভেসে উঠল চোখের সামনে। আডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে বরনা। ভারী ভার দেখেছে এই লোকটার সঙ্গে। বখন তখন যেখানে সেখানে ঘোরে জিপে করে। মেয়েটাকে ভালো মনে হয়নি কোন দিন। তবু, বুশি ছিল মনে মনে। দোকানের খন্ডের বাড়িয়েছে অনেক। একবার এসে চা গেতে বসলে টানে টানে অনেক আসে।

কিন্তু তা বলে এই ব্যাপার! খান্না হয়ে উঠতে লাগল ভুতু বাবু। কিন্তু সেই সঙ্গে এক ধরনের নির্মম উত্তেজাও উপলব্ধি করছে যেন। পরিবেশটা নিজের লোকান ঘর না হলে...

কিন্তু সহসা বেন বিজ্ঞাতের ঘায় একেবারে বিমুচ হয়ে গেল আবার। সমস্ত চেতনাস্রব্ধ বৃষ্টি পড়ে ছাই হয়ে গেল এক নিমেষে। দেহের সব রক্ত জল।

...তাই যদি হবে, সঙ্গে এ তেন অচুচরটি কেন? এই চক্রান্ত কেন? মদে এতই হুঁদম লোকটাকে বশীভূত করা কেন?

দর দর করে ঘাম করতে লাগল ভুতু বাবুর। সাইকেলটা পড়ে যাবার মত হল হাত থেকে। বগাবার ঘোষের চালচলন অনেক দিন লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করছে।...এবারে সব বুঝে ভুতু বাবু। সব জেনেছে। বগাবা চ্যাটাই নয়। আর কেউ, যে যেচ্ছায় আসবে না। জোর করে আনা হবে। সেই জন্তেই এই চক্রান্ত। সেই জন্তেই হোপুন। সেই জন্তেই তাকে মদ গোলানো।

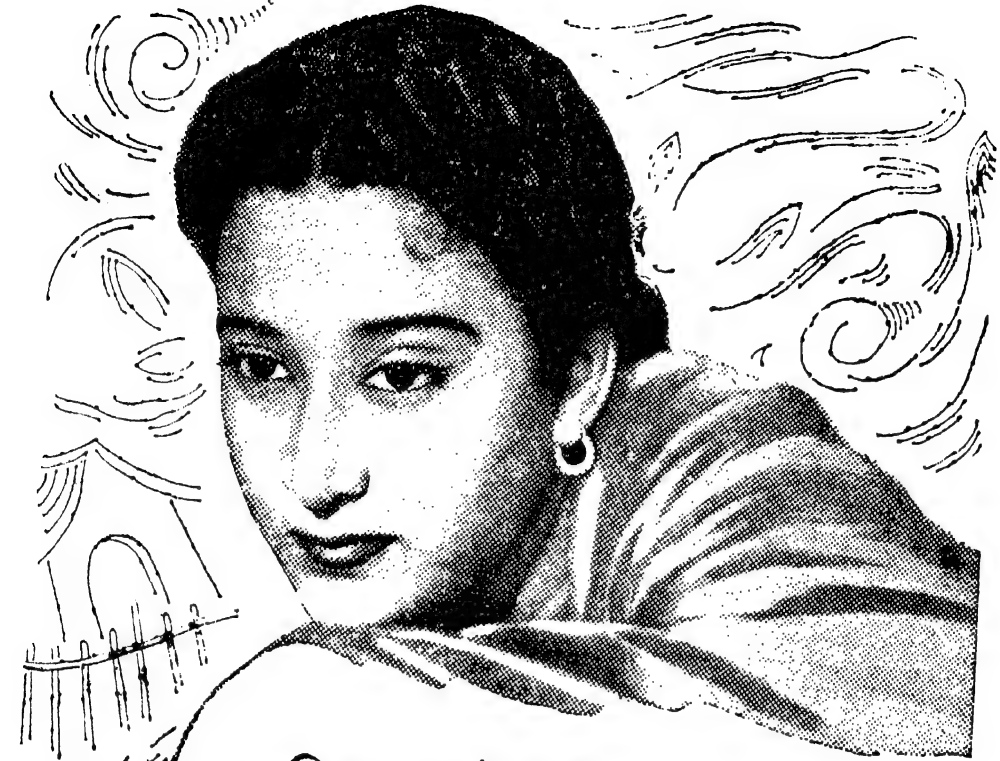
সাইকেল নিয়ে টলতে টলতে প্রস্থান করল ভুতু বাবু।

মনে মনে একধার থেকে জল্পনা কল্পনা করে চলেছে সাহান্না। এক একবার এক একটা যুক্তির জাল বুনেছে। কিন্তু খানিক বাদেই সেটা জোরাগো লাগছে না তেমন। আবার ভাবছে। কোন অজুহাতই জুটাই লাগছে না খুব।

মাসির চিঠি এসেছে। মাসতুতো বোনের বিয়ে। অবিলম্বে তাকে যেতে হবে। বিয়ের প্রায় মাসখানেক দেরি এখনো। কিন্তু

—ওই অতনু মেসটার গারে হাওয়া লাগছে না বলেই না গরম  
সেই! আবার তেমন হাওয়া লাগলে প্রলয় হতে কতক্ষণ? যেমন  
যোগ তেমন! কথার যৌঁকে ভূত বাবুকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে প্রায়।  
—শুকনো মড়াইয়ে ভালো যোগাযোগ ঘটেছিল বলেই ভালো হতে  
চলেছে। অমান ভালো যোগাযোগ হলেই নিশ্চিন্দ। কিন্তু না  
বলে? উটো হলে? তখন? তখন সমঝে চলা ছাড়া আর উপায়  
কি? উল্টো যোগাযোগ কি হচ্ছে না? থব হচ্ছে। যার সঙ্গে  
যার মেসার কথা নয় তার সঙ্গে সে মিশছে। যার সঙ্গে যার মেসার  
কথা নয় তার সঙ্গে সে মিশছে। ওই যেমন পক্ষন সাঁওতাল মাঁকির  
ওই আধক্ষাপা ছেলটো আমাদের কটাক্ষের ঘোষাবাবুর সঙ্গে এসে  
ভিড়ছে। ঘোষাবাবুর পরসায় মদ গেলে, তার জিপে করে ঘুরে  
বেড়া আর সকাল সন্ধ্যা গুজগুজ করে। আমি নিশ্চয় কাঙ্ক্ষি  
না, মা-সন্ধ্যা ছুঁজনে আলাদা আলাদা থাকলে নিশ্চয়ই বা কি  
আর ভয়ের বা কি! কিন্তু ছুঁজনে একসঙ্গে হয়েছে বলেই না  
মেয়েদের যত ছুঁবনা! সকাল দুপুর বিকেল রাতির এখন তাদের  
বাড়ির বাইরে পা বাড়তে হচ্ছে দশবার ভাঙতে হবে। ঝড় এসে  
তার আর সময় অসময় কি, সব সময়ই সমঝে চলতে হয়। অবশ্য





## সবিতা চ্যাটার্জী

বলেন “আমি সর্বদা লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি—এটি  
এমন একটি বিশুদ্ধ, শুভ্র সাবান।”

সবিতা এখন বাংলা দেশে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় চিত্রতারকার অন্-  
তম। কিন্তু শুধু তার অভিনয় নয়, তাঁর  
স্বকোমল সৌন্দর্য্য এবং অপূর্ণ লাবণ্যও  
চিত্রশিল্পীদের মুগ্ধ করেছে। এই লাবণ্যের  
বস্ত্র তিনি মেন মোলায়েম লাক্স টয়লেট  
সাবানের সাহায্যে। আপনিও বিশুদ্ধ,  
শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে  
ত্বকের যত্ন নিন। সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যের  
তত্ত্ব শুধু সাইজের সাফল্য কিছুর।



লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকার সৌন্দর্য্য সাবান

দশ পনের দিনের মধ্যেই ঘোণবাবু চলে যাচ্ছে মড়াই ছেড়ে। কিন্তু দশ পনের দিনই বা কি কম কথা! কখন কার বরাতে অভিযাপ লাগে ঠিক কি। পা বাড়িয়ে অভিযাপ কুড়োনোর থেকে ঘর-বন্দী হয়ে থাকার ভালা। ভালো নয় মা-লক্ষ্মী? আপনিই বলুন— অভিযাপের ভয় কে না করে, অভিযাপের ভয়ে স্বয়ং অমন লক্ষ্মী ঠাকরুণকেই বলে সমুদ্রের গর্ভে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, হুঁ—

মস্ত একটা দম নিল ভুতু বাবু। জোরে জোরে হাতপাখা চালানো কিছুক্ষণ। ঘামে জ্বজ্বরে হয়ে গেছে থলথলে মুখ।

কার অভিযাপে বা কোন অভিযাপের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে বন্দি নদী ঘটেছিল লক্ষ্মী ঠাকরুণের, ভুতু বাবু যেমন জানে, সাধনাও তেমনিই জানে প্রায়। কিন্তু সবটুকু শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পন্দ কাঠ একেবারে। কি বলতে চায় বা কি বলতে এসেছে আর অস্পষ্ট নয় একটুও। স্থান কাল ভুলে বিমূঢ় নেড়ে সাধনা চেয়ে বইল ভুতু বাবুর মুখের দিকে।

ভুতু বাবু হাসতে চেষ্টা করল এতক্ষণে।—যাক, অনেক গল্প করা গেল মা-লক্ষ্মী। মন খুলে হুঁটো কথা বলি তার জো আছে, লোকানের ভাবনা ভেবেই অস্থির। তা'বলে গল্প করতে বললে ভুতুর মনে মুখে আগল নেই, বা ভাববে তাই বলবে। চলি এবার মা-লক্ষ্মী, ওই ভুতু হুঁটো এতক্ষণে কি দিয়ে কি করছে ঠিক নেই—ভালো করে গেলাস না ধুয়েই হয়তো চা দিয়ে বসছে কাউকে—

থপ থপ চরণে তব তব করে পাঠাড থেকে নেমে আসছে ভুতু বাবু। এবারের ঘাম বরাটা কায়িক পরিশ্রমের দরুণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা মুখে একটা প্রসন্নতার তৃপ্তি।

গোটা স্থপতিগুটাই চঠাং বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে সাধনার। লজ্জা নয়, ঘৃণা নয়। অতৃপ্তিশূন্যতা। সেটা গেল একসময়। ভুতু বাবুর কথাগুলো তুলিয়ে দেখতে লাগল আবার। আরো স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করল। বরাবরই ভয় করতে সোপানকে। কিন্তু সে ভয়ের মধ্যে আর ঘাঁট থাক, অবিশ্বাস ছিল না। দূর্য্যাপাতার বিশ্বাস ছিল, সপ্তমের সূচিতা ছিল। ওই কালো মূর্তিতে কালিমার আভাস-মাত্র দেখে নি কখনো। কিন্তু আজ এক মুহূর্তে সব বিশ্বাস, সব সপ্তম এক নয় পঙ্খিলতার স্পর্শে একেবারে বিকৃত হয়ে গেল বৃষ্টি। জিপে বরষার ঘোবের পাশে সোপানের সেই নিশ্চল পাষণ মূর্তি হেসে উঠল চোখের সামনে। শুধু ভুতু বাবু কেন, সাধনাও দেখেছে। নিজের উঠল চঠাং। মড়াইয়ের গহবরে বা সন্মরীর অপরাহ্ন রোমন্থনের পরিলেশে লোকটার সেই বিসদৃশ চাঁতিনি, বিসদৃশ আচরণের মধ্যে আজ যেন বিভীষিকা দেখতে পেল।

কিন্তু সেদিনই আর এক ব্যাপার ঘটে গেল। সাধনা আরো বিহ্বল, আরো বিভ্রান্ত।

বিকালে পাগল সর্দার এসে জঞ্জির। চাঁদমণি নিখোঁজ হবার পরে প্রতিদিনের মধ্যে এই প্রথম পল্লীর্ষণ। চিন্তা ভাবনা স্থগিত রেখে সাধনা এগিয়ে এলো। কিন্তু পুণির অভ্যর্থনার মুখর হয়ে উঠতে পারল না আগের মত।

খানিক তার মুখের দিক চেয়ে থেকে সর্দারই কুশল প্রসন্ন করল প্রথম, তু ভালো আছিস দিদিয়া?

—ভালো আছি সর্দার। তুমি ভালো তো? এলো ভিতরে

সর্দার দাঁড়ায় এসে বসল। অসুখে দেয়ালে চেস দিয়ে ঠাঁড়িয়ে বইল সাধনা। দেখেছে। আরো শীর্ণ আরো শুকনো দেখেছে লোকটাকে। বারংবার স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। কিন্তু সব থেকে আগে চোখে পড়ে একটা কর্কশ কক্ষতা। কোটাগত ছুই চোখে খরখরে অসহিষ্ণুতা কেননা। চোখে চোখ রাখাও সহজ নয় খুব।

—উবাসির বাবু ঘরে নাই?

—এখনো ঘেমন নি। তুমি কাজ থেকে এলে?

সর্দার ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ কাজে যায়নি আজ। অল্প দিন বা অল্প সময় হলে সাধনা এই নিয়ে পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করত বা অনুবোধ করত। কিন্তু ভুতু বাবু তাকে বোঝা করে দিয়ে গেছে একেবারে। চূপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। মনে হল, পাগল সর্দার এতদিন বাদে চঠাং এমনি আসিনি, কিছু যেন বলার বলার করছে।

—তু বস দিদিয়া, ঠাঁড়িন থাকলি কেন।

সাধনা দেয়াল ঘেঁষে বসল উবুড় হয়ে। দেয়ালে চেস দিল তারপর।

সর্দার আবার বলল, তুর সত্ত্বে হুঁটো কথা ছেল।

হুঁটো ছেড়ে আস্তে পীরে অনেক কথাই বলাতে লাগল তারপর। অনেকটা নিজের মনে। সাধনা চূপ চাপ চেয়ে আছে। শুনেছে। আর অবাক হচ্ছে। ভুতু বাবুর গোড়ার দিকের বহুতার মত এও প্রায় দার্শনিক গোছের শোনাচ্ছে। তবে অত বড়িয়ে বা বেগে ঢেকে বলতে জানে না। বা বলে, মোটাটুকু সোজা এর স্পষ্ট।—কত যুগ বাদে মড়াইয়ের পুণির যুগ এসেছে। সেই পুণিতে শুকনো মড়াইয়ে জল হবে। কিন্তু সেই পুণির সঙ্গে কিছু পাপও এসেছে। 'মুনিমের মৃত্যু' পাপ এসেছে। পুণিকে 'খুঁতো' কার দেবার মতলব আঁটছে। গোটা 'গোরাম' সে পাপের হলকা লেগেছে, গোটা মড়াইয়ে সে পাপের 'জঁতা' পড়েছে। কিন্তু ওরা 'ধম্ম' মানে 'শাস্ত' মানে! যত 'ভৈষণ' যত 'পেচণ' তোক সে পাপ, তার 'পিত্তবিনে' হবেই, 'মিত্র' হবেই। কিন্তু যতক্ষণ না তা হচ্ছে 'ততক্ষণ' হ'লিয়ার থাকা দরকার। খুব দরকার। নইলে 'অনখ' হতে পারে, 'দুগপতি' হতে পারে। পাগল সর্দার সেই জগুই এসেছে, দিদিয়াকে সাবধান করতে এসেছে। সোপান বলেছে। সোপান বর্ণনো বাজে কথা বলে না।—হুঁটো অতবিনেতে একা কুখাও বাস না দিদিয়া, দিন ছুকুরেও না। ও পাপ বড় সায়না, চিন্তোকের দিকে 'তার মজর' পাপ 'নেবারণ' হয়ে গেলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, আবার সকলে তেয়ে খেলে বেড়াবে। পাপের 'আশচর্য' আর 'কর্দিন' ভগমানের কোর সে ছাড়বার হবেই হবে।

অল্প একটানা বলে গেল পাগল সর্দার। ঠাঁড়া একটা যান্ত্রিক বেশ খানিকক্ষণ যেন আচ্ছন্ন হয়ে বইল সাধনা। সচকি হয়ে তাকালো তারপর। সোপান বলেছে! সোপান সাবধি করেছে! সাধনা ঠিক শুনল কি? ঠিক বুঝল কি? সে নিজের চোখে দেখেছে তার বিসদৃশ চাঁতিনি, বিসদৃশ আচরণ নিজের চোখে দেখেছে তাকে জিপে বরষার ঘোবের পাশে! তাহা ভুতু বাবুও দেখেছে। অনেক কিছুই দেখেছে। পরবাক্যে লোকটার ঠাঁড়ি ভুতু বাবু বিশেষ করে ছড়িয়ে রেখে গেছে সাধন মনে।

কিন্তু বসন্ত গিয়েও বলা হল না কিছু। বিমল নেড়ে চেয়েই রইল শুধু। ফেনম করে যেন উপলব্ধি করে নিল, ওই লোকটার সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহের আঁচে দাঁড় দাঁড় করে ছলে উঠবে পাগল সর্দারের সমস্ত ভিতরটা। শোনামাত্র মরিয়া হয়ে ছুটবে ভুতু বাবুর কাছে, ছুটবে চৌপানের কাছে। চৌপান ছুঁছুঁবার প্রাণ দিয়েছে ওকে, ওর সখ্য হবে কি করে? মেয়ে তাড়িয়ে আরো নিবিড় করে পেয়েছে ওকে, কেমন করে হবে সখ্য?

কিন্তু চৌপানই বা সর্দারকে বলতে গেল কেন? সর্দারের মুখ দিয়ে দিল্লিয়ারে সাবধান করতে গেল কেন?

ছলনা? চাতুরী? যত্নবশত?

সাহুনা বোঝ। পাগল সর্দার উঠলে বাঁচে এখন। নিঃসঙ্গ হতে পারলে বাঁচে। চৌপানের প্রশস্তা বড় নয় এখানে। বড় ঘোঁটা, তার লজ্জা আর দিক্কার অপরিসীম।

কেন এসেছিল ভুতু বাবু?

ওকে সাবধান করতে।

কেন এসেছে পাগল সর্দার?

ওকে সাবধান করতে।

ছাঁকনের কেউই ওর কথা বলেনি বিশেষ করে। সাধারণ ভাবে লেখে। সাধারণ ভাবে কথাই বলেছে। সেদিন মড়াইয়ের সব ঘোঁটা। কিন্তু ওইটো মরো বিশেষ ইঙ্গিতটুকু অপ্রচ্ছন্ন নয়। শুন্য বৃক্কে পায়ে কাকে নিয়ে ছুজানবই ভয় এদের। অল্পখাওয়া ভুতু বাবুর মত মানুষ লোকান ফেল আসত না। পাগল সর্দারের ক আবার এক মেয়ে হাবানোর ঝড় উঠত না।

চোখে চোখ পড়তেই নিজের অজান্তে হঠাৎ ছাঁচোখ যেন চল র উঠল সাহুনার।

সর্দার ঢাল গেল।

সাহুনা উঠল এক সময়। সমস্ত দেহে বিস্ময় জ্বল। অশ্রুচিহ্ন। দাঁড়াতার সামনে এসে দাঁড়াল চূপচাপ। দেয়ালের ওধার কাশ দেখা যাচ্ছে এক ফালি। আকাশ নয়, আকাশ ঢাকা ঘন। খানিকটা। হঠাৎ মনে হল, চাঁদমণির ভীকনেই বীভৎস শব্দমৌর। পড়নি শুধু। সমস্ত মড়াইয়ের ওপর পড়ছে। ওর ওপরেও। মেয়ের তলা থেকে পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা যেন ঠিকবে বেঝতে ছে খানিকটা জ্বাংগা জুড়ে। দগদগে একটা ঘায়ের মত ছে দেখতে।

রাগিতে বাবার কাছে সরাসরি প্রস্তাব করল, কালই মাসির যাবে, তাকে রেখে আসতে হবে।

অবনী বাবু অবাক। মুখের দিকে চেয়ে একবারও মনে হল না। বাবুয়ের আনন্দে বাবার জঙ্ঘা মন নেচে উঠছে। বললেন, তো যাবিখন, এত ভাড়া কিসের, বিয়ের তো এখনো ঢের।

—না বাবা, যাব ঠিক করছি কালই যাব, তুমি রেখে এসো কে। কতকাল যাইনে, মাসি কি ভাববে, মাসি কি ভাবছে নই, এর পর দেরি করলে কথা শুনতে হবে। কদিন আগে হি ভালো।

মেয়ের এ ধরনের স্মৃতি বিস্ময়ের কারণ। মুখের দিকে চেয়ে ঠাট্টা না ঠিক। কিন্তু এই একবেলার মধ্যে ওর মনে বিশেষ

কিছু একটা পরিবর্তন ঘটেছে সম্প্রতি। কিছু একটা সন্তোষ যেন চেপে আছে। তবু জিজ্ঞাসাবাদ করতে ভরসা পেলেন না খব। ওর যাওয়া নিয়ে তাঁরই বরং একটা দুর্ভাবনা ছিল। ভেবেছিলেন যেতে চাইবে না সহজে। গেলেও থাকতে চাইবে না সহজে। বাবার জগৎ ব্যস্ত হয়েছে যখন, মতিগতি বন্ধাবার আগে বাড়ি হওয়াই ভালো। তবু বললেন, আগে যাওয়া তো ভালই, কিন্তু কালই কি করে হয়, আমি থেকে ছুটি নিতে হবে তো, পয়স্ট যাব।

—না বাবা না, প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল সাহুনা, যাব তো কালই যাব নইলে যাবই না বলে দিলাম। ভারী তো একদিনের ছুটি, ও তুমি কাল সকালে গিয়ে ব্যবস্থা করে এসো।

ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলো। বাবার জিজ্ঞাসা দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শব্দ হচ্ছিল। ভিতর থেকে একটা উদ্ভগত কান্না যেন ঠোলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সকলের ওপর ক্ষোভ, সকলের ওপর অভিমান। যেতে চায় না তবু যেতে হবে বলে। কারো ওপর ভরসা করে এখানে থাকতে পারছে না বলে।

বাহিরে মগোই গোঁজগোঁজ কলস সব। নিজের নয়, যিনি থাকবেন এখানে তাঁর। ওর বাবার। বাবা বিছানা জামা কাপড় মায় কুকার পরন্ত। নিজের ব্যবহার অনভ্যন্ত নয় তার বাবা। থেকে থেকে তবু টান টান করে উঠছে সাহুনার ভিতরটা। ভয়ে সব ফেল ছাড়িয়ে এনার তাকে এখান থেকে পালাতে হচ্ছে বলে।

পরদিন সকাল থেকেই মনে মনে একটা আশা পোষণ করছিল সাহুনা। বাবার মুখে নয়নি বাবু তাদের বাবার কথা শুনবে। শুনে একবার আসবে। সেই যে গেছে আর আসনি। সাত আট দিন হয়ে গেল। লজ্জার সীমা পরিসীমা ছিল না একদিন। সেদিনের কথা যখনই মনে হয়েছে, লাল হয়ে উঠেছে। কি করে এর পরে ভুললোককে মুখ দেখাবে ভেবে পায়নি। কিন্তু আজ ভাবছে অল্প কথা। আশ্রক। পারতে সাহুনা কথাই বলবে না। ওকে যেতে হচ্ছে বলে ক্ষোভ আর অভিমান তার ওপরেই বেশি যেন। কথা বলবে না। কথার জবাব দেবে না। তবু আশা করছে। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ছে আরো এক জনকে। চিৎ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলিকে।

ছোকরা চাকরকে দশ বার করে সন্স্করীর সম্বন্ধে আর বাড়ির সম্বন্ধে সব ব্যবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। একটু এন্দিক ওন্দিক হলেই বাবার কাছ থেকে সে খবর পাবে সেকথাও বার বার করে সমঝে দিচ্ছিল। এমন সময় বাবা ফিরলেন।

সঙ্গে আর কেউ না।

এখান থেকে দশ বাঘো মাইল দূরে ষ্টেশান। সেখান থেকে ট্রেন। ষ্টেশান পর্যন্ত ট্রাকে যাবে। আপিসের ট্রাক নিয়েই এসেছেন অবনী বাবু।

ট্রাক মেন কোয়াটারে পড়তেই স্তব্ধতা বিসর্জন দিয়ে উৎসুক নেড়ে চার দিকে তাকালো সাহুনা। নিচে নামছে ট্রাক। মড়াই দেখা যায়। মড়াইয়ের কর্মশ্রোত দেখা যায়। সেদিকে চেয়ে চেয়ে একটা কান্না যেন গুমরে উঠতে লাগল ভিতরে ভিতরে। ইচ্ছে হল চিংকার করে বলে ওঠে, ট্রাক থামতে বলা বাবা, আমি যাব না!

নিশ্চল বসে রইল মূর্তির মত।

ওই ভুতু বাবুর পোকান। দেখা যাচ্ছে...গালগাল লোকটা

বসে আছে কাশ বাজ সাধন নিয়ে। সাগরে সাধনা আবার তাকালো সেদিকে। ট্রাক থামিয়ে তার সঙ্গে অন্তত দেখা করবে একটি বার। দেখা করে বলবে, ভুত বাবু, আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। ভুত বাবুর ঢাকার সোত। ভুত বাবুর দোকানে সব কিছুব দাম বেশি। কিন্তু সাধনার মনে হল, ভুত বাবু ভারী আপন লোক তার। এই মুহূর্তে এত আপন বৃষ্টি আর কেউ নয়। তার মালশ্রী ডাকটা আর একবার শুনে গেলে হয় না।

ট্রাক ভুত বাবুর দোকান ছাড়িয়ে গেল।

সাধনার মনে হল আর কিছুই থাকল না। নিজের অজান্তে চোখে জল এসেছে কখন টের পায়নি। বাবার কথায় সচকিত হল। অনেকক্ষণ ধরেই নিশ্বাসে লক্ষ্য করছিলেন তিনি।—কি হল বল দেখি? এভাবে সাত তাড়াহাড়ি কে তোকে আসতে বলেছিল?

সাধনা বাইরের দিকে ঘুরে বলল প্রায়।

—না বাস তো বল, গাড়ি যোবাতো বলি।

সাধনা ঘাড় নাড়ল, না—।

—এইটুকু তো পথ এখান থেকে, ভালো না লাগলে চলে আসতে কতক্ষণ! ক'টা দিন আর, বিয়েটা হয়ে গেলে যখনই লিগরি আমি গিয়ে নিয়ে আসব'খন—মন খাবোপের কি আছে।

ভিজ়ে চোখেও সাধনা বাবার দিকে ফিরে না চেয়ে পারলো না। ঠিক এই মুহূর্তে এই সাধনাটুকুই মস্ত সদল মেন।

সকালে দোকানে এসে ভুত বাবুর চক্ষুস্থির। ঘরের দরজা ঠিক-করা খোলা। লোক নেই। সমস্ত ঘর জলে জলময়। জলে কাদায় সপসপ করছে মেঝে। জলের ডামের মুখ খোলা, ডান প্রায় খালি। ব্রস্ত চোখে চারদিকে চেয়ে দেখে নিল ভুত বাবু। আসবাব-পত্র তচমচ হয়ে আছে। কিন্তু বায়নি কিছু, সবই আছে। এমন কি খোলা দরজার গায় তালাচাবিও ঠিকঠাক ঝুলছে। কিন্তু ঘরের দুর্দশা দেখে রাগে হুগে ভুত বাবুর চোখে জল আসার উপক্রম। নিশ্চয় ওই দু'জনের একজন নদ খোয়ে মাতাল হয়েছে এমন যে অগভ্রনকে ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে হয়েছে মাথায়।

নিজের মনে সমানে গালাগাল দিয়ে চলল ভুত বাবু। সাতপুরুষ উদ্ধার করতে লাগল দু'জনেরই। আর কক্ষণো ঘর ছাড়বে না, এই শেষ। মিয়াদ শেষ হতে এখনো সাত আটদিন বাকি। এই সাত আটদিনের টাকা সে ফেরত দেবে। ওই মরাচোখো ডাকাতটাকে বলতে পারবে না কিছু। বলা নিরাপদও নয়। কিন্তু রণবীর ঘোষকে বলবেই। বলবে আর টাকা ফেরত দেবে। দু'দিনেই দিন নিশ্চিন্তে ধমুতে পেরেছিল ভুত বাবু। সাধনার সঙ্গে দেখা করে আসার পর থেকেই আর চিন্তা ভাবনা ছিল না। গাছতলার অন্ধকারে ঠাঁড়িয়ে আর দেখেওনি মাতাল দুটো কি করছে না করছে। মনে মনে ভেবেছে, ওরকম মোটা টাকা পেলে পনের দিন ছেড়ে এমন আরো পনের দিনের জন্ম ছেড়ে দিতে পারে ঘর। কারণ, আসল উদ্দেশ্যে ওদের ছাই দিয়ে এসেছে।

কিন্তু আবার? মিয়াদ বাড়ানো পূরের কথা, এই বাকি সাতদিনও দেবে না সে থাকতে। ওরকম মাতালের পাল্লায় পড়লে সর্বস্বান্ত হতে কতক্ষণ!

ঘর-দোর সন্ধ্যার হল। দৈনন্দিন দোকানপাঠ। সকাল গেল, দুপুর গড়ালো, বিকেল পেল। সন্ধ্যা। তারপর রাত্রি। উৎসাহ কমছে ভুত বাবুর। কড়া কথা বলতে গেলে কি হতে কি হবে কে জানে। বরং বৃষ্টিয়ে স্নজিয়ে বলবে রণবীর ঘোষকে। আর যেন দোকান পাট খোলা বেবে দু'জনেই চলে না যায় ওরকম। আর, ঘরের দরবস্তা না করে। তবু যত রাত বাড়ছে তত অস্বস্তি বাড়ছে। ছোকরা চাকর দুটোকে আজ আর আগে ছাড়েনি। বৃষ্টিয়ে বলতে গেলেও অনর্থ বাধবে কি না বিশ্বাস কি!

রাত বাড়ছে। মড়াই নিস্তর নিখুম আবার। কিন্তু দু'জনের একজনেরও দেখা নেই। না রণবীর ঘোষের, না গোপনের। কি করবে ভুত বাবু বুঝে উঠছে না। কখন চৌদ্দ মাইল সাইকেল ঠেঙিয়ে বাড়ি যাবে এবপর। চাকর দুটোকেই বা আর কতক্ষণ ধরে রাখবে। বসে বসে ঝিমুচ্ছে ওরা। ঝিমুনি আসছে ভুত বাবুরও। সমস্ত দিনের পবিশ্রম আর ক্লান্তি।

হঠাৎ উঠে বসে ছোটো বগড়াতে লাগল ভুত বাবু। বিক্ষয়, বিভ্রম। ফাল ফাল করে তাকাতো লাগল চারদিকে। না ঠিকই দেখছে। সকাল হয়েছে। পাখি ডাকছে পূবে মূবগী ডাকছে কোথায়। চাকর দুটো মেঝেতে পড়েই ঘুমুচ্ছে অব্যবহায়ে।

কি কাণ্ড! খাটিয়া থেকে নেমে ভুত বাবু গরপাক করতে লাগল আবার। চাকর দু'জনকে ডেকে তুলল। সমস্ত রাতির মদ্যে কেটে না আসার দরুন মনে মনে খুশি হবে কি হবে না ঠিক বুঝে উঠছে না।

সেদিন রাতিতেও এলো না কেউ। তার পরদিন সন্ডাল, রণবীর ঘোষ পাততাহি গুটিয়েছে মড়াই থেকে। সে কোনদিন চলে যেতে পারে শুনেছিল। তবু যথার্থ গেছে কেনে ভুত বাবু খুশিতে আটখানা। আপ ঘর ছাড়তে হবে না, টাকাও ফেরত দিতে হবে না।

একদিন একদিন করে দেড়মাস কেটে গেল মাসির বাড়িতে।

যত খাবার লাগবে ভেগেছিল সাধনা, প্রথম প্রথম তত খাবার লাগেনি। এক আটমকা ভ্রাসের বিভীষিকা থেকে ঢাল। নিশ্চিন্ততার মধ্যে এসে দিনকতক বরং হাঁক ফেলে বেঁচেছিল। তাছাড়া হঠাৎ সে এসে পড়ায় বিয়ে বাড়িও জমে উঠেছিল অনেক আগে থেকেই।

বিয়ে মেসের মাস তুতো বোনের মুখ খুসেছে আরো। এখন আর আভাসে ইঙ্গিতে ঠাটা নয়। সাধনাকে একলা পেয়ে সোজাস্তি জিজ্ঞাসা করেছে, তোমার সেই নবন বাবুর খবর কি সাধুনি?

আগের মত সাধনা আর ভেতরে ভেতরে উত্থাপ হয়নি এটুকু। বরং হাসিগাটার এদিকটাকে যেন মেনে নিয়েছে খুশি মনে। উঠে টিপলী কেটেছে, সে খোজে তোব দরকার কি, তুই বরং হোর গঙ্গারাম বাবুর খোজ খবরটা ভালো করে নেওয়া শেষ কর আগে।

ভাবো জামাইয়ের নাম শুনেছে গঙ্গাপদ।

তারপর বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে বাড়ি শান্ত হয়েছে আবার মাসতুত বোন স্বস্তরবাড়ি চলে গেছে। দিন কাটছে একটা ঢুটে করে। এবারে যেন একটু একটু করে থাঁপিয়ে উঠছে সাধনা।

অবনী বাবু আগেও একদিন এসেছিলেন। বিয়ের দিন এসেছেন। কিন্তু খুব বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করার অবকাশ তেনে পায়নি সাধনা। তবু এরই মধ্যে পাঁচবার করে স্তম্ভরীয়ে থেে

**সবাই জানেন -**

চটপট সরবরাহ  
করা হয় বলে  
**ব্রুক বণ্ড চা**  
একেবারে তাজা থাকে

...আর  
লোকে রোজ  
সাদে পাঁচ কোটিরও  
বেশী কাপ  
**ব্রুক বণ্ড চা**  
থেকে থাকেন



...আর বাজারে  
**ব্রুক বণ্ড**  
চায়েরই কাটতি  
সব চেয়ে বেশী

এই জন্যই অন্য  
যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে  
**ব্রুক বণ্ড চা**

ব্রুক বণ্ড ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

বেশী লোকে খান !

করেছে। বাগার স্বরিতে অস্থবিরের কথা জিজ্ঞাসা করেছে। পাগল সর্দার, ভুতু বাবু, এমন কি নিধুরামের প্রসঙ্গও তুলেছে। কিন্তু তারপর বোবা।

বাবার চিঠিপত্র পায়। মোটামুটি সংবাদও। কিন্তু তাতে মন ভরে না। মড়াইয়ের পাহাড় ধূসর মেঘের মত দেখা যায় এখান থেকেও। চেয়ে থাকে। মড়াই যেন ডাকছে তাকে। ক্রমাগত ডাকছে।

স্বন্দরী কি করছে এখন? ভরা হৃদয়ে ঝাঁড়িয়ে ঝাঁড়িয়েই বিমুগ্ধে নিশ্চয়। ছোঁকাটাটার হাতে ওর কি হাল হয়েছে কে জানে। বাবাকে ঝাঁকি দিতে আর কি!...পাগল সর্দার কি জানে ও চলে এসেছে? আর ভুতু বাবু? নরেন বাবু জানেই!...কিন্তু কি ভাবছে? আর যদি ফিরে নাই যায় সাধনা ওখানে, তাহলে? তাহলে কি নিজেও উপলব্ধি করতে পারছে না? কিন্তু সংগোপনে চেষ্টা করছে অমূল্যব করতে!...আর সেই ভদ্রলোক?...চিফ ইঞ্জিনিয়ার? সে কি টের পেয়েছে ও ওখানে নেই? মড়াইয়ে সেই থেকে আর দেখা যায় নি ওকে, লজ্জা কবচে? করে থাকলেও বাবাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না নিশ্চয়ই। ইচ্ছে থাকলেও করবে না—চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দেরীতে বাধবে। ভারী তো!...মাল্লব খুব চিনেছে সাধনা!...তবে নরেন বাবুর কাছে জেনে থাকতে পারে বা নিধুর মুখেও শুনতে পারে। সচকিত হয়ে ভাবনার লাগাম ধামিয়ে নিজেকেই চোখ বাঁড়ায় এক এক সময়। কি লাভ এসব জেনে? হেসেও ফেলে আবার নিজের মনেই। লাভ-লোকসান আবার কি? জানতে ইচ্ছে করছে তো করছে, বাস—

অবনী বাবু আবার একদিন এলেন মেয়েকে দেখতে। বিয়ে-বাড়ি এখন একদম ঝাঁক। বাবাকে এবার অনেকটাই নিরিবিলিতে পেল সাধনা।

—সেই ভেজাল সিমেন্টের কি হল বাবা, সব মিটে গেছে?

জবাবে অবনী বাবু জানানেন, গোলবোগের সম্ভাবনা বরা বেড়েছে। কলকাতা থেকে বে-সরকারী কমিটি আসবে ডাম দেখতে। তারা ডাম দেখবে আর সেই সঙ্গে সিমেন্টের ব্যাপারও ফরেন্সাল করে যাবে। এই সব কিছুর তলায় তলার পোখ-চাকলাদারের কারসাজি কিছু আছে বলেই অবনী বাবুর ধারণা। অবশ্য কবে পর্যন্ত আসবে কমিটি ঠিক নেই কিছু।

বাবাব মুখের ওপর সাধনার ছুঁ চোখ ঘরে এলো এক চক্কর।—ওই কট্টাঙ্গিরা এবারে খুব উঠে-পড়ে লেগেছে বুঝি?

—তা লাগবেই তো, যার যেখানে স্বার্থ। ওদের একজন এখানে আছে আর একজন তো সেই সব কাণ্ড করে কবেই গা ঢাকা দিয়েছে।

সাধনা অবাক। কাণ্ড করে! কই সে তো কিছুই জানে না! বাবার মুখের ওপর আর একপ্রস্ত বিচরণ করে স্থির হল ছুঁ চোখ। মুড় কঠে জিজ্ঞাসা করল, ছুঁজনের কে আছে ওখানে?

—বোম্বের ওই পাটনার...রিজেন চাকলাদার।

সম্পূর্ণে একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস মুক্তি পেয়ে বাঁচল যেন। শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল আবার, আর ওই লোকটা কি করে গেছে বলছিলো...?

মেয়ের দিকে। খোয়াল হল সাধনা আগেই মাসির বাড়ি চলে এসেছিল বটে...জানার কথা নয়। ছুঁ চার কথায় সমাচার বা বললেন শুনে কিছুক্ষণের জঙ্ক সাধনার বাহুজান লোপ পেল যেন। রববীর ঘোষ মড়াই ছেড়ে গেছে সেও প্রায় মাস দেড়েক হল, সাধনা চলে আসার পরেই। ঠিক তার তিন দিন বাদে আডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে বরবা নিখোঁজ হয়েছে। আজ পর্যন্ত তার কোন খবর নেই। মড়াইয়ে এই নিয়ে মন্দ গুণগোল হয়নি। কলকাতায়ও খোঁজখবর করা হয়েছে অনেক। ছুঁজনের কারোই পাত্তা মেলেনি। এমন কি থিঙ্কেন চাকলাদারও রববীর ঘোষের কোন হদিস দিতে পারেনি। হয়ত বা জেনেও ইচ্ছে করবেই দেখনি।

আম্বল হওয়া মাত্র সাধনা চলে এলো বাবার সমুখ থেকে। যা শুনল দুঃখের কথা, লজ্জার কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর ভিতরের একটা কালো দ্রাব্যও যেন অপগত। লোকটা বিদায় হয়েছে। আর হয়ত মড়াইয়ে আসবেও না। বরবার জঙ্ক দুঃখ করবে? করা উচিত। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে না ও তার কি করবে? বরং চেষ্টা এক মুক্তির আনন্দ উপছে উঠছে। সোঁটা গোপন করার জঙ্কই বাবার কাছ থেকে চলে আসা। দেড় মাস মড়াই ছেড়ে এসেছে। দেড় মাস? দেড় বছর। দেড় যুগ।

পরদিন বাবার সঙ্গে মড়াইয়ে রওনা হল সে। মাসি অবাক, বাবা অবাক। প্রথম বারেও যেমন কেউ ধরে রাখতে পারেনি শুকে, এবারেও কারো নিষেধ বা অম্বলোকে কান দিল না।

...মড়াই!

দূর থেকে চোখে পড়ানাত উজ্জ্বল আনন্দে ট্রাকের ধারে বৃষ্টি পড়ল প্রায়। ছেড়ে আসার সময় মনে হয়েছিল ভিতরটা পোষ শূন্যতার ভরে উঠেছে। আজ তার উল্টো। এত আনন্দ ধরছে না। নিনিমেয়ে দেখছে। এই দেড় মাসের পরিবর্তন যাচাই করে নিচ্ছে। এ স্তম্ভি সমাবেশে দেড় মাস দেড় পলকের মতই। তা! ওপর শুনেছিল, অসময়ে প্রায়ই বৃষ্টি হওয়ার দরুনও কাজ কর্মে ওই পড়েছে। তবু যাও হয়েছে তাই উপলব্ধি করার একাগ্রতায় উৎসাহ হয়ে উঠল যেন। পারলে আজই একবার মড়াইয়ে নামে। কিন্তু বাবা তাহলে দেহেখন। ঘাড় ফিরিয়ে ইয়ং কৌতুকে বাবার একবার দেখে নিল।

আপিস কোয়ার্টারস।

উৎসুক চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সাধনা। কিন্তু এই ভরা হৃদয়ে “কে আর বাঁচবে বসে আছে? ওই দূরে কোণের ঘন্টা একজনের। আর উঠানের এদিকে আর একটা আর একজনের। ঘরে বসে কাজ করছে না মড়াইয়ে নেমেছে কে জানে। মনে মনে লজ্জা পেল একটু। ভিতরে ভিতরে ভাবছে কি না, সে যে এসেই যদি ওই দুজনকে একুনি জানানো যেত।

ভুতু বাবু লোকান।

—বাবা, ট্রাক থামাতে বলো একবারটি। গুই, থামাও একটু! নিজের বলে উঠল ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে। অবনী বাবু কিছু বলার বা বোঝার আগেই ট্রাক থামল এবং সাধনা নেমে পড়ল।

—তুমি ট্রাক নিয়ে বাড়ি চলে যাও বাবা, আমি আসছি একটু বাদেই।

অন্তর্ধান। অবনী বাবু দেখলেন, মড়াইয়ে প্রথম আসার আগে যা ছিল, রাতারাতি তার থেকেও যেন মেয়ের বয়স কমে গেছে অনেক।

মা-লক্ষ্মী!

খালি গায়ে কাঠের কাশি বাজের সামনে বসে থিমুচ্ছিলেন ভুতু বাবু। মহা চোখের সামনে তার আবির্ভাবে বিময় আর আনন্দে উদ্ভাসিত। ঝাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল সাধুনা।

—এসো মা-লক্ষ্মী, এসো। জিব কাটল, আশ্রন মা-লক্ষ্মী আশ্রন—বসন—কবে এলেন?

সাধুনা হাক জবাব দিল, এখনো ভালো করে আসিনি, ট্রাক থেকে এখানে নেমে পড়েছি।

উঠে ভুতু বাবু একমাত্র চিনের চোরাটা কেড়েমুছে বসতে দিল। —ভুতুর ভাগ্য, বসন মা-লক্ষ্মী ওরে এই ছোঁড়ার, চা কর না ভালো করে, বেশ করে সাবানডালে গোসল ধুয়ে নিস আগে।

তকুম দিয়ে ছট বদনে কাশি বাজের সামনে সমসীন হল আবার, আপনি ছিলেন না এতদিন গোটা মড়াই অন্ধকার।

সাধুনা মুখ টিপে হাসছে তেমন। কোনদিনই খারাপ লাগেনি, আজ তো কথাই নেই।

—বোনের বিয়ে হল?

মাথা নাড়ল।

মাসির বাড়ি এবং বোনের বিয়ের খবরাখবর নিতে লাগল ভুতু বাবু, সন্কেপে একটা ফিরিস্তি দিয়ে সাধুনা জিজ্ঞাসা করল, তার পর এখানকার সব খবর বলুন।

পা গুটিয়ে আট সাঁট হয়ে বসল ভুতু বাবু।—খবর খুব ভালো মা-লক্ষ্মী, কিছু গণ্ডগোল নেই আর, খালি জল বিষ্ট একটু বেশি হচ্ছে এই বা। এদিক ওদিক চেয়ে কঠিন একবারে সমে নামিয়ে আনল হঠাৎ, সেট যে সেট বলেছিলাম মা-লক্ষ্মী মনে আছে? আপদ বিনেয় হচ্ছে একেবারে, আর আসতে হচ্ছে না বাছানকে... বা ভেরেছিলাম ঠিক তাঁত, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন গা ঢাকা—তিন দিন বাদেই ওদিকে আর এক মেয়েও মড়াই থেকে একেবারে যেন উরে গেল—চাটাজী সাহেবের সেই মেয়েটা মা-লক্ষ্মী—সাঁট ছিল আগের থেকেই, বুকেলেন না?

সাধুনা বুকেছে আগুই। বুকে চায়ের পেরালায় মনোনিবেশ করেছে।

তেমনি নিচু গলায় সোংসাছে বলে গেলেন ভুতু বাবু, সে এক হৈ-হলুধুলু বাপার মা-লক্ষ্মী, ওই তো শরীর ভেদ মহিলার, নড়তে চড়তে কষ্ট, তার আবার সেজেগুজে থাকেন অষ্টপ্রহর—তা কোথায় গেল

—কিন্তু—

কিছুটা বিরেস করিয়া কতকটা সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা বা যার—এমন কোব জিবির বিরল। বর্তমান সময়ে এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নস্বারা নিকৃষ্ট সস্তা জিবিরেই বাজারে প্রচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিত্রাচারিত কলাবৈপুণ্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমনোহরের মোহ যাতে কোব সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিবিরের সমাদরের কোবদিন অভাব ঘটে না। তাই আমাদের নিখিত অলঙ্কার সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই প্যামরা অবসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং

এস, সরকার এণ্ড কোং

ফোন-৩৪-৩১৪০, প্রুণ-রুশলী ঞ্ণেকার, গ্রাম-গিনিমার্ট

১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

২০৮, রাসবিহারী এজিনিউ • কলিকাতা-১২



সাজপোষাক কোথায় কি—দিনে সাত বার করে ওই সেহ নিয়ে ওপর নিচ করা—যাকে দেখে তার কাছেই কি কান্না—কি কান্না—আমার মেয়েকে খুঁজে বার করে দাও তোমরা—তা খুঁজতে কি বাকি ছিল কোথাও, কোলকাতায় পবিত্র গোক খোঁজা করা হয়েছে—ভ্রম মহিলার কথা ভালো রীতিমত কষ্ট হয় এখন।

মুখের দিকে চেয়ে কণ্ঠের কোন লক্ষণ দেখল না সাধুনা। মহিলা, অর্থাৎ, স্বর্ণীর মায়ের দুঃখ ওর মনেও যে বেথাপাত করল খুব, তাও নয়।

বাড়ি ফিরেই স্বন্দরী-দর্শনে গোয়াল ঘরে ঢুকল সর্দারে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল আগে। অনেক দিনের অদর্শনের পর মা যেমন করে ছেলেকে দেখে। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। মাথা নেড়ে সিং হুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল গোকটা। সাধুনার মনে হল, আনন্দ করছে আর সেই সঙ্গে অভিমানও জানাচ্ছে।

পরদিন কথায় বাবার মুখে শুনল, নরেন বাবু নেই এখানে, আপিসের কি কাজে কলকাতায় গেছে পাঁচ সাত দিনের জন্য। ভালো লাগল না। এ ক’দিনে ওর আসাটাই খানিকটা পুরানো হয়ে যাবে।

চুপরে বাইরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে সাধুনা মড়াইয়ের উদ্দেশে পা চালিয়ে দিল। এবই প্রতীক্ষায় ছিল। দিনটাও ভালো। মেঘলা, ছায়া ছায়া।

কাল লক্ষ্য করেনি। কিন্তু উপর থেকে আজ মড়াইয়ের দিকে চোখ পড়তেই অবাক। পরিবর্তন হয়েছে বই কি। মড়াইয়ের এক দিকের রূপ বদলে গেছে একেবারে। মাটির দেয়ালের ওদিকটা। সেই কোন তলায় পড়েছিল নোঙর দু’চার হাত আবর্জনা-গোলা জল। তাকালেও গা ঘিন ঘিন করত। সেই জল কি করে এবই মধ্যে ওই বিশাল উঁচু মাটির দেয়ালের প্রায় আধাআধি উঠে এসেছে। আর সেখান থেকে পিছনের দিকে যতদূর চোখ যায়, জল আর জল। বর্গার লাল জল। গাঢ়-গৈরিক। থকথকে অপরিষ্কৃত, তবু অপকৃপ। মেঘলা আকাশ, ঘূসর পাখা, আর পারিপার্শ্বিক সৃষ্টির সঙ্গে ঠিক যেমনটি মেলে।

চোখে পলক পড়ে না সাধুনার। প্রত্যহ সাময়িক মাটির দেয়াল তোলার অর্থ এখন বুঝেছে।

মড়াই। সাধুনা নেমে এলো। আগের মত তর তর করে নয়। জলে জলে পিছল হয়ে আছে। নিচে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাতাস, সেই মুক্তি আর সেই বোমাধ। গঠন-সমাহারের পরিবর্তন কিছু চোখে পড়ে না বটে, তবু তফাৎ কিছু উপলব্ধি করা যায়। কাজের ভাড়া বেড়েছে, নিবিষ্টতা বেড়েছে, আবহাওয়ার একটা অলক্ষ্য তাগিদের ইঙ্গিত। সম্ভবত জলের দফন। যতদূর আকাশ সদয়, যতটা পারো এগিয়ে যাও। ভুরু কুঁচকে সাধুনা আকাশের দিকে তাকালে একবার ১০০খনই এঁঠ, ভরা বরষায় কি হবে কে জানে?

এ ছাড়াও তফাৎ কিছু দেখেছে। সাজার লোক কর্মরত। ক’জনকে আর বিচ্ছিন্ন করে চেনে। কিন্তু ওর অমুপস্থিতি যেন সকলেই অনুভব করছিল। যেমন দিয়ে পাশ কাটাতে সেখানেই মানুষগুলো চোখে নীরব অভ্যর্থনার আভাস দেখল। খুশিতে আনন্দে ভরে ভরে উঠতে লাগল সাধুনা। ওর যাওয়াও সার্থক, ফিরে আসাও সার্থক।

নিজের হাতে কাজ করে না পাগল সর্দার, কাজের তদারক করে। তাই করছিল। দূর থেকে সাধুনাকে দেখে এগিয়ে আসতে লাগল। সাধুনা ঠাঁড়িয়ে পড়ল। কাছে আসতে সর্দারের ঘামে ভেজা কালো মুখ খুশিতে চকচকে হয়ে উঠল। দেখতে লাগল নিরীক্ষণ করে।

সাধুনাও হাসছে। কি দেখছে সর্দার?

—তুকে ১০০তমনি জবাব দিল সর্দার, তু চলে যেয়েছিলি কেনে দিদিয়া?

—বাঃ রে, বোনের বিয়ে, যাব না? বলল বটে, কিন্তু ওর খুশিভরা চোখের দিকে চেয়ে বিব্রত বোধ করতে লাগল। স্পষ্ট বলছে যেন, বোনের বিয়ে আর কতদিন পর হয় বাপু, তোর ডব লেগেছিল দিদিয়া। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কেমন ছিলে বসো সর্দার—

—ভালো ছেলাম। ভালো থাকার ছোটখাট একটা কিরিস্তি দিল সর্দার। আজকাল আর কাজে কামাই করছে না। তবে জলের জন্য মাঝে মাঝে আপনি কামাই হয়ে যায়। নয়তো রোজ আসে। অনুযোগ করল, যাবার আগে দিদিয়াব ওকে বলে যাওয়া উচিত ছিল। তাহলে তার স্বন্দরীর এত কষ্ট হত না। জানার পরে অবশ্য প্রায়ই গিয়ে সে স্বন্দরীর দেখা শুনা করে এসেছে, ইত্যাদি—

সাধুনা বাবার মুখে শুনেছে সে কথা। কৃতজ্ঞ নেত্র তাকালে তার দিকে। প্রশঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলল সর্দার, হাতা প্রশ্ন করল, উরাসীর বাবু তুর বিয়া কবে দিবে?

দিনে দুপুরে এই পরিবেশে এমন বোগাঙ্গা প্রশ্ন শুনে কাণ না হাসি পায়। সাধুনা হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল, দিলে কি হবে? একেবারে তো চলে যাব এখান থেকে!

সর্দার মাথা নাড়ল, তা বটে। সত্যাতটুকু উপলব্ধি করল যেন। বিগল ছায়া নামল মুখে। আর তজ্জন ভিতরের দক্ষ মানুষটাকে যেন দেখতে পেল সাধুনা। বিস্তৃতি দেখতে পেল। ওকে দেখে যত খুশি হোক, যত ভালো আছে বলুক, এক নিঃসীম বেদনার জ্বালা মানুষটাকে বরাবরকার মত আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেছে চাঁদমণি। পাগল সর্দার বরাবরকার মতই বুড়িয়ে গেছে।

সর্দারের দোসরটিকেও দূর থেকে লক্ষ্য করেছে সাধুনা। সেদিন নয়, পরদিন। কোদাল দিয়ে পাঠাড়ের গা-খোঁষা মস্ত একটা পাথরের তলা থেকে মাটি সরেছে। ওর আশে পাশে আরো অল্প কাজ করছে কেউ কেউ। তবু মানো হয়, চার পাশে একটা কঁচ বিচ্ছিন্নতার গমিও টেনে নিয়ে নির্বন একাধারায় ওই এটল পাথরটার সঙ্গে যুক্ত নেমেছে। চোখে চোখ পড়তে সাধুনা দ্রুত প্রত্যাহন করল সেখান থেকে। পিছন ফিরে তাকালে না একবারও ১০০ ভাবছে। বরষার নিখোজ হওয়ার মধ্যস্থে সত্যিই কি এই লোকটাও জড়িত? বিশ্বাস হয় না যেন। বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু ফিরে তাকাবে আবার, এমন সাহসও নেই।

পা থেমে গেল।

অন্যের ওই প্রেসার-গেট সলর ব্লকের দিকে এগোচ্ছে হিন চারটি লোক। একজন চিচ্ছ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। ওকে দেখেছে। সকলেই দেখেছে। এখানে এলে দেখা হবেই জানে ১০০



গত কালই আশা করেছিল। সংগোপন প্রত্যাশায় হৃৎচোখ সজাগ ছিল আজও।

দলছাড়া হয়ে ভদ্রলোক এদিকেই আসছে। বাকি ক'জন কাজের দিকে এগোচ্ছে। সাধুনা না দেখার ভান করল প্রথম। কিন্তু সেও এক বিভ্রম। ঠাঁড়িয়ে পায়ে করে আঁচড় কাটতে লাগল আশুভেক্তা পাখুরে বালিতে, আর হাসতে লাগল সোজাসজি তাকিয়ে। এই বর সচজ।

কাছে এসে বাদল গাঙ্গুলি হাসিমুখে বলল, পবন এসেছ শুনলাম? খবর বাথো। নিধর মুখে শুনেছে বোধ হয়। নিধু কাল এসেছিল। খশির লালিমায় সাধুনা তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল শুধু।

—আজ এখানে আসতে আসতে ভাবছিলাম দেখা হবে, ঠিক ভেবেছিলাম দেখা।

সাধারণ ছাড়া কথা। কিন্তু ভাইকেই লাল। এ বকম ভেবেছিল জানলে সাধুনা আসতই না কখনো। সে কথা আর বলে কি করে। চুপ করে থাকাও কাজের কথা নয়। বলল, ভেবেছিলাম এই দেড় মাসে কত কি না জানি হয়ে গেছে, এসে দেখি যেমন কে যেমনি, কিছুই হয়নি।

শাদা কথায়, কি-ই বা এমন কাজের লোক আপনারা!

বাদল গাঙ্গুলি প্রচ্ছন্ন কৌতুকে চুপ চাপ দেখল একটু। -ডায়েরি ব্যাপারে ওর এই আগ্রহের কারণ কিছুটা জানে এখন। জলধারা এক সন্ধ্যায় নবীন ছাব সে বাসেছিল কোয়ার্টারে। সেদিন কেমন মনে পড়েছিল ওর কথা। পরে পব অনেক দিন দেখেনি বলেই হয়ত। কথার কথায় তখন শুনেছিল। আভাসে অনুমানে নবীন যতটুকু জানত।

চম্বা গাউন্টে প্রায় কৈফিয়ৎ দেবার মত করেই জবাব দিল, তুমি ছিলে না এখানে, যাব যেমন খশি কঁাকি দিয়েছে।

তেনে ফেলল। এ প্রশ্নমতা নিজের কাছেই প্রায় বিশ্বাসের কারণ। যাচ ফিরিয়ে দেখল, সঙ্গী অকিসার ক'জন অনেকটা এগিয়ে গেছে। আর কিছু না বলে ফিরে চলল।

উৎফুল্ল চোখে সেদিকে চেয়ে সাধুনা ঠাঁড়িয়ে বইল অনেকক্ষণ। বাবার দুঃখ শুনেছিল, জল বুড়ির ব্যাধিতে ভদ্রলোকের নাকি মেজাজ বিগড়ে আছে। তার ওপর বেসরকারী কমিটি আসছে কাজ দেখতে আর গিমেন্টের যত্নসলা করতে, সে উদ্বেগও কম নয়। এই সেড্যাসে বেশ শুকনোই দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে। কিন্তু এ সব সঙ্গেও ওকে দেখে অজ্ঞা সকলের মত এরও চোখে মুখে সেই খশির অভ্যর্থনা উপলব্ধি করেছে সাধুনা।

শুড়ির উদ্দেশ্যে পা চালিয়ে দিল। দেবি হয়ে গেছে। হোক গে।—কুশ, প্রসন্ন। এই কর্পরিসেবের প্রতি একাধা অনুভূতির আশ্বাসন একটা। অপরিচীত মমতা। বেশ হত, এই মানুষদের মিত সেও যদি কাজে লাগতে পারত কিছু। বেশ হত, পুষ্ণ শাশ্বত হলে। এ সময়ে ডায়েরি ভালো মন্দ নিয়ে ক্রান্তে পারত, আলোচনা করতে পারতো চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গেও।

—সেং! সপ্রগলভ লজ্জায় সমস্ত মুখে যেন আবার লাগল এক প্রশ্ন।

...পুষ্ণ মানুষ হলে কেউ আমলই দিত না ওকে।

দিন দুই গেছে আরো।

কোন কাজে মন বসছিল না সাধুনার। সন্ধ্যা পার হতে চলল। খানিক আগে বাড়ি ফিরেছে আর ঘরে ফিরে বববার মায়ের সঙ্গে সাধুনাভের কথাটাই ভাবছে।

মেন কোয়ার্টারসূত্র এক পাখরের আড়ালে হাত পা ছড়িয়ে বসেছিলেন মিসেস চ্যাটার্জী। প্রসাধন পারিপাটা নেই, শিথিল বেশবাস। ভারী মুখে বিষর কালছে ছাপ। উদাসীন বিবাদের এই ছনিয়াব প্রতিকূলতাব কথাই ভাবছিলেন বোধ হয়। একেবারে সাগনাসামনি পড়ে হকচকিয়ে গিয়েছিল সাধুনা।

পালিয়ে আসত। কিন্তু মহিলার অপ্রসন্ন দুই চোখ যেন কাচপোকার মত অটিকে ফেলল ওকে। মনে হল, ঠাণ্ডা ইশারায় ডাকছেন। পাশে পাশে কাছে আসতে আবার খানিক বিশ্লেষণ করে দেখলেন ওকে। পরে সাক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন, এতদিন কোথায় ছিলে?

বলল। সে যে ছিল না এখানে সেটা ঐরও অগোচর নয় জেনে অবাক।

আর একদফা উচ্চ পূর্ণবক্ষণ। ঠিক ওকে নয় যেন। ওর ভিতর দিয়ে এই বরষের সকল মেসের ওপর বিকল্প ভ্রুকুটি একটা। কিন্তু কঠোর বললে গেল হঠাৎ। মুগ্ধাবও। গলা নামিয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যাবার আগে বববার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল একদিনও?

কাল নরম  
মসৃন  
কেশের  
জ্য



কেএমপি  
ব্র্যাণ্ড  
নারিকেল তৈল



২ পা: ১২ পা:  
২ পা: ৩ পা:  
আপান চিত্রে  
পাতন্য মায়

পার্বিত্র হিন্দু অয়েল মিলস  
১ মেছুয়া বাজার স্ট্রীট-কলিকাতা-৭

চট করে জবাব দিয়ে উঠতে পারেনি সাধনা। শেষ দেখা হয়েছিল ভূত বাবুর ঘোটেলে। সাধনাকে দেখে এক একটু প্যরেই রণবীর শেষকে দেখে ব্যঙ্গ কৌতুকে বলছিলেন উঠছিল যে দিন। তার পর আয় জানবে কি করে, সাধনা নিজেই পালিয়ে এসেছিল।

জবাব শুনে মিসেস চাটাজী বিস্মিত। তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল? কবে? কেন? আমাকে বলনি—

কান্নার মত শোনালো প্রায়। কিন্তু সামলে নিলেন। দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলার ক্ষোভে হিঙণ বিরক্ত। মুখ ঘুরিয়ে রুঢ় মনবোগে ওপারের আকাশ-বৈরা পাছাড দেখতে লাগলেন তিনি।

সেই থেকে মনটা ভারী হয়ে আছে সাধনার। ভদ্রমহিলা যেমনই হোন, মেয়ের ভালো ছাড়া মন্দ তো কখনো চাননি বরং একটু বেশি ভালো চাইতেন বলেই অমন করতেন।

বাটবের ঘরে বাবার সঙ্গে আরো একজনের সাদা পেয়ে খুশিতে ধড়মড়িয়ে উঠে ঈঁড়াল সাধনা। কিন্তু যত খুশি ততো লজ্জা। যত আনন্দ ততো সঙ্কোচ। হঠাৎ যেন অভিভূত হয়ে রইল হুঁচাব মুহূর্ত। দাওয়া ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল তাড়াহাড়া।

বাবা ডাকলেন, কই রে সাধনা, নরেন এসেছে!

এসেছে তো ভানে। কিন্তু বায় কি করে। সেই থেকে প্রতীক্ষাও করছে মনে মনে। কিন্তু সামনে গিয়ে ঈঁড়ানো দায়।

নরেনই সহজ করে দিল ওর আসাটা। অবনী বাবুর সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে জানান দিল, দেড় মাসে মাসির কাছে রান্নাঘরের নতুন কি শিখে এলে হাতে কলমে পরীক্ষা চাই—একটু এদিক ওদিক হলেই গোলা!

আগের দিনের একটা স্তর কানে লাগছে। এ ঘরে এসে দরজার কাছে ঈঁড়াল সাধনা। এতদিন পরে সাক্ষাতের আনন্দ থেকেও মানুষটাকে দেখে নেওয়ার কৌতুহল বেশি।

নরেনের হুঁচোখ তার মুখের ওপর আটকে রইল হুঁচাব মুহূর্ত। তারপর হালকা অনুশাসনের স্তরে জিজ্ঞাসা করল, যা বললাম কানে গেলো?

সাধনা জবাব দিল না। দেখছে তেমনি। হাসছেও।

অবনী বাবু মেয়ের দিক টেনে ঠাটা করলেন, কানে গেলেই বা করবে কি, এই দেড় মাসের মধ্যে দেড় দিনও কি ও মড়াই ছেড়ে ছিল ভারো নাকি!

হাসি চেপে জড়জি করে বাবার দিকে তাকালো সাধনা। নরেন সঙ্গে সঙ্গে সার দিয়ে দাবী প্রত্যাখ্যার করে নিল যেন। বলল, তা বটে, এতবড় চশ্চিন্তাব বোকা মাথায়, গেলেও বা নিশ্চিন্তে থাকে কি করে।

আবারও দৃষ্টি বিনিময়। দেখাটাই শেষ হয়নি যেন সাধনার। মুহূর্ত হাসি, সর্কোতুক নিরীক্ষণ।

অবনী বাবু উঠে এলেন। আপিসের পোষাক বদলে হাতমুখ ধোবেন। নরেন সামনের দিকে বুকু এলো তৎক্ষণাৎ। গলা নামিয়ে বলল, এতদিন দেখা নেই দেখে ভাবলাম মাসি এবার হাতের মুঠোয় পেয়ে বোনঝিকেও একেবারে ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে ছাড়বেন।

হাসি স্পষ্টতর হল। শালা ঈঁড়ের আভাসও দেখা গেল প্রায়। কিন্তু তবু কথা বলবেই না সাধনা।

নরেন সোজা হয়ে বলল। চোখে চোখ রাখল আবার। হালছাড়া গলায় বলে উঠল, কি ব্যাপার, চিড়িয়াখানার জীব ঠাওরালে নাকি আমাকে?

নিরীক্ষণের কৌতুকগল্পনা শেষ হল এতক্ষণে। সাধনা জোরেই হেসে উঠল।

[ ক্রমশঃ ]

## ইনফ্লুয়েঞ্জা বিরোধক ব্যবস্থা

‘ফ্লু’ বা ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি নাব্যাক্ক হোঁষাতে বোগ। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এইটি ছড়িয়ে পড়তে পারে ব্যাপক ভাবে। সেজন্য বিশেষ রকম সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। চিকিৎসাবিদ বা চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞরা এই ব্যাপি বিরোধের জ্ঞান যে সকল ব্যবস্থা অহুসরণে পরামর্শ দিয়ে আসছেন, সেগুলো মোটামুটি এইরূপ :—(১) স্বাস্থ্য-রক্ষার সাধারণ নিয়মগুলো পালন ও কঠোর থাকা; (২) আলো-হাওয়াযুক্ত গৃহে কাজকর্ম ও শয়ন; (৩) সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি বন্ধ জায়গার অনুষ্ঠান এক সভ্যসমিতি বর্জন; (৪) গায়ে অতিরিক্ত তাপ বা শৈত্য না লাগান; (৫) ট্রাম, বাস, ট্রেন প্রভৃতিতে ভ্রমণ কালে অতিরিক্ত ভীড় এড়িয়ে চলা; (৬) লবণ জলে ঘন ঘন নাসিকা ধোতকরণ; (৭) হাঁচি ও কাশির সময় নাকে ও মুখে কমান বা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো ব্যবহার; (৮) অপরের তোসালে, ঘ্রাস বা প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার না করা; (৯) বোগ নিবারণক বা প্রতিষেধক টীকা গ্রহণ; (১০) বোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে প্রেরণ কিংবা গৃহে পৃথক স্থানে রাখার ব্যবস্থা; (১১) যথাসম্ভব শীঘ্র চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ এক (১২) রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি জীবাণুমুক্ত করা এক বাসনপত্রও নিয়মিত ভাবে শোধিতকরণ।

মাসিক বহনভী—প্রাণ



ফুলের মত...  
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা  
ব্যবহারে ফুটে উঠবে



রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ হকের স্বাস্থ্যের  
জগে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার  
স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তুলবে।



রেক্সোনা প্রাইভেট লিমিটেড, এম পক্ষে ভারত প্রস্তুত

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

R.P. 148-X52-BG

# এক মুঠো আকাশ

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

বাঁলীগঞ্জের ট্রাম থেকে নেমে কেঁট দোতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়। এই বাড়ীতেই সে এসেছিল দিন দশেক আগে ছেলে-চাপা-সেওয়া ফোর্ড গাড়ীর অনুসরণ করে। আজ তার রক্ত চুল, কালী-বদা চোখ, ময়লা কাপড় দেখে বাড়ীর কর্তা সমস্ত হ'ন, আপনার শালা ভাল আছে ?

কেঁট স্নান হ'সে। ভদ্রলোক উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে বলুন ?

—না, এখনও মারা যায় নি।

—তবে কি—

কথা শেষ করতে না দিয়ে কতকগুলো প্রেসক্রিপশন কেঁট পকেট থেকে বার করে দেয়। বলা বাহুল্য, এগুলি গৌরীর ভাইয়ের। ভদ্রলোক হাতে নিয়ে খুলেও দেখেন না, বলেন, এ আর আমি কি দেখব ? আপনি এত দিন আসেন নি কেন ? আমার স্ত্রী বোজ্জই আপনার কথা জিজ্ঞেস করেন।

—মিছিমিছি এসে আর কি হবে, কিছুই তো বোঝা যায়নি।

ডাক্তাররা বলছেন 'অপারেশন' করলে হয়ত বাঁচতে পারে। তাই—

—আমরা কি করতে পারি বলুন ?

—অন্ততঃ শ'খানেক টাকা এখনি চাই।

—বসুন। এনে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক ওপরে চলে গেলেন। একটু পরে শুধু টাকা নয়, সঙ্গে চাকরের হাতে সিগাড়া, মিষ্টির প্লেটে নিয়ে এলেন—আমার স্ত্রী পাঠিয়ে দিলেন, খেয়ে নি'ন।

কেঁট হাত জোড় করে বলে, মাফ করবেন, খাবার মত মনের অবস্থা আমার এখন নেই।

ভদ্রলোক ক্রোর করেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত কিছু খাননি, যা পারেন—

কেঁট কথার উত্তর না দিয়ে একটা সম্বেশ জল দিয়ে গিলে ফেলে।

—কেননা থাকে একটু জানাবেন, বিশেষ চিন্তিত বইলাম।

কেঁট সম্মতি জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। কেঁট কোথাও এতটুকু সময় নষ্ট না করে সোজা টালীগঞ্জে চলে আসে। সমস্ত বস্তাটার বিবাদের ছায়া পড়েছে। ছেলোটর অবস্থা খাবাপ, কেঁট তা সকালেই দেখে গিয়েছিল, টাকার দরকার না থাকলে হয়ত সে এখান থেকে বার হ'ত না। ওদিকে গিয়েছিল বলেই যদি দরকার হয় তবে শ্যামলাকে খবর পাঠায়, তার পর টাকার যোগাড় করে বস্তাতে ফিরেছে। গৌরীর ঘর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে, ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে গেছে ছেলোট মারা যায়নি, তবে আর বেশীক্ষণ নয়, ঈপ্সরের মত শ্বাস টানছে। এমন ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা যমের সঙ্গে বোঝাপড়া চলল, তারপর সব শেষ।

গৌরীর বুকফাটা কান্না, অন্ধদের শোকদেখানো চোখের জল,

বয়ঃজ্যেষ্ঠদের অহেতুক ব্যস্ততা কেঁটকে এতটুকু বিচলিত করে না বস্তাবই একটি যুবককে ডেকে সে একান্তে পরামর্শ করে।

—ছেলোটর সংস্কারের কি হবে ?

—জানি না, গৌরীকে জিজ্ঞেস করব ?

—কোন ব্যবস্থা কি হয়েছে ?

—কে করবে, ওদের তো কেউ নেই।

—যদি টাকা দিই, তুমি একটা খাটিয়া কিনে আনবে ?

—দিন, কাছেই মড়াপোড়ানর খাট পাওয়া যায়, আমি এখন নিয়ে আসছি।

যুবকটি চলে যায়। কেঁট জমিদার-বাড়ীর প্রাক্ষণে দাঁড়ি সিগারেট খায়। বিরক্তিকর কান্না তার অসহ লাগে। কতকটা দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল ছিল না, শ্যামলের ডাকে ফিরে তাকায় মদনকে নিয়ে সে এসে হাজির হয়েছে। শ্যামল নিজে থেকেই বাঠিকানা খুঁজে গেতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে কেঁটদা, সেই কখন থেে য়ুর্হি।

—আমিও তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ এলি না কেন।

—এই আমার বন্ধু, মদন—

কেঁট মদনের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার কথা শ্যামলের কা অনেক শুনেছি, আজ দু'জনে এসেছ ভালই হয়েছে।

মদন হেসে বলে, কত দিন থেকে আপনার কাছে আসব ভাবছি—

—জানি। কেঁট একটু থেমে বলে, এখন এক বার শ্বাস যেতে হবে একটা ছেলেকে পোড়াতে।

শ্যামল কৌতূহল প্রকাশ করে, কে কেঁটদা ?

—এই বস্তাবই একটা ছেলে, একটু আগে মারা গেছে।

—তোমরা গিয়ে কয়েকটা জিনিষ কিনে আন, আমি ব দিচ্ছি।

কেঁট বস্তীর ভেতর চলে যায়। মদন সেই দিকে তাকিয়ে ব কেঁটদা' এত গভীর লোক না কি ?

—সব রকম গ্র্যাফটি ওর জানা আছে।

—কি ব্যাপার বল তো ?

—এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।

দু'জনে ঘুরে ঘুরে এদিক-ওদিক দেখে। কেঁট এক ভদ্রলোককে নিয়ে ফিরে আসে।

—পণ্ডিত মশাই, আপনি এই ছেলে দু'টিকে একটু বুঝিয়ে দি কি কি জিনিষ আনতে হবে।

পণ্ডিত মশাই বললেন, আমি বরং এদের সঙ্গেই যাচ্ছি, যে ক জিনিষ না আনলেই নয়, নিয়ে আসব।

—বস্তী থেকে বেরুতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব রকম ব্যবস্থাই কেঁট করেছিল, কিন্তু গৌরীর কাছ থেে

তার ভাইয়ের মৃতদেহ নিয়ে আসতেই যা দেবী হ'ল। গৌরী ছোট মেয়ের মত হাউমাউ করে কাঁদছে, আমার যে আর কেউ রইল না গো, আমি আর একলা কিসের জন্তে বেঁচে থাকব?—কাঁদতে কাঁদতে সে অজ্ঞান হয়ে না পড়লে কেঁঠনের বেরুতে বোধ হয় আরও দেবী হয়ে যেত। সংজ্ঞাহীন গৌরীকে পণ্ডিত মশাইয়ের জিম্মায় বেখে কেঁঠরা খাট নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কাঁধ দিচ্ছে মাত্র চার জন। সামনে কেঁঠ আর রাজেন, বস্তীর সেই যুবকটি। মদন আর শ্রামল পিছন দিকে। মদন আগে অনেক বার কাঁধ দিয়েছে, থেকে থেকে চোঁচায়, বল হরি, হরিবোল।

খানিক দূর গিয়ে শ্রামল কাঁধ বদলায়, নাঃ, হালকি আছে।

মদন উত্তর দেয়, সেই জন্তেই তো বেছে বেছে খাট নিয়েছি, যাতে না কাঁধে লাগে।

—আমি কিন্তু আগে শ্রামানে যাইনি।

—আমি অনেক বার গিয়েছি। এই তো সেদিন এক বুড়ীকে নিমতলায় নিয়ে গেলাম, খুব ধুমধাম হ'ল। খৈ ছড়াচ্ছে, পরসা ছড়াচ্ছে, ভিথারাদের খুব মজা।

মদন বলে, বাড়ী ফিরতে আজ অনেক রাত হয়ে যাবে।

—কেন? শ্রামল জিজ্ঞেস করে।

—শ্রামানে পৌছে খালি চুল্লী পাওয়া, কার্টের যোগাড়, অনেক সময় লাগবে।

কেঁঠ শুধু বললে, শ্রামানে পৌছে দিয়ে তোমরা বাড়ী চলে যেও, বাকী সব কাজ আমি করে নেব।

যদিও কেঁঠ বলেছিল শ্রামলদের চলে যেতে কিন্তু মৃতদেহে আঙিনা না ধরা অবধি তারা শ্রামানে ছিল। পাঁচ-ছটা চুল্লী জ্বলছে অন্ধকারের মধ্যে, সে-ও এক দৃশ্য!

শ্রামল এক সময় চুপি চুপি মদনকে বলে, কৈ আমার তো ভয় হয়ছে না!

—ভয় করবে কেন?

—কি বকম যেন মনে হ'ত, শ্রামানে এলে ভয় করে।

—চল, এইবার কেটে পড়ি।

শ্রামল এগিয়ে গিয়ে কেঁঠর কাছে এসে দাঁড়ায়, কেঁঠরা, আমরা বার যাই?

কেঁঠ পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে শ্রামলকে দেয়, তোর চলে যা, কাল কিবা পরশু আমার সঙ্গে অনন্ত কেবিনে দেখা করিস, মদন তুমিও এস।

তার চলে যায়। কেঁঠ আর রাজেন অনেকক্ষণ বসে থাকে। সব কাজ শেষ করে বস্তীর ফিরতে রাত হয়ে গেল। কেঁঠ রাত্তর দাঁড়িয়ে রাজেনকে অভ্যর্থনা করে, আমি আর ভেতরে যাব না। দেখে এস তো আর কোন দরকার আছে কি না।

রাজেন চলে গেলে কেঁঠ সামনের চায়ের দোকান থেকে এক ভাঁড় কফি। সারা দিনের অনিয়মের পর গরম চা খেতে গিয়ে কেমন মন গা ঘুলিয়ে ওঠে। একটু পরেই রাজেন ফিরে এসে খবর দেয়, এখন আর কিছু দরকার নেই, গৌরীর কাছে বস্তীর অন্ত মেয়েরা গিয়ে। অনেকক্ষণ কৈদে এখন আবার ঘুমিয়ে পড়ছে।

কেঁঠ সেখান থেকে হেঁটে এসে মোড়ের মাথায় বাস ধরে।

সারা রাত কেঁঠ ঘুমুতে পারে না। কি একটা আশ্বাসাশু বৃক ভার করে বয়েছে। বার বার যে কথা মনে পড়ছে তা হোল গৌরীর নিঃসঙ্গ কান্না। গৌরী একা, এই বিরাট পৃথিবীতে তার আপনাব বলতে কেউ নেই। ঠিক এ ধরণের কোন চরিত্রের সঙ্গে কেঁঠর পরিচয় ছিল না। হয়তো গল্পে পড়ছে কিবা কারো কাছে শুনেছে, কিন্তু নিজের জীবনে এ অভিজ্ঞতা তার বিচিত্র মনে হয়।

ঘরের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, ছাদে গিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়।

দূর আকাশ একটা তারা খসে পড়ে। সেই দিকে তাকিয়ে কেঁঠর আরেক কথা মনে হয়। তার নিজের বলতে কে আছে? এ বিরাট পৃথিবীতে সে-ও তো একা, আত্মীয়-স্বজন কারো কথাই আজ তার মনে পড়ে না। এই ছাদের নীচেই শুয়ে আছে দাদা, বৌদি, অথচ কতখানি ব্যবধান! গ্রামাণ্ড আজ-কাল ওপরে আসতে পারে না। জনলায়, দরজায় তার নিষেধের পদ্ধি টাঙ্গানো রয়েছে। এ চিন্তার শেষ কোথায়?

কেঁঠর হঠাৎ মনে হয় গৌরী তার চেয়ে সুখী। তার কেউ নেই বলে সে একা, কিন্তু কেঁঠর সবাই আছে, তবু সে একা। গৌরীর চেয়ে আরও বেশী একা।

কেন জানা নেই, এ চিন্তা তার মনে শান্তি এনে মিল, নিজেকে তার অনেক হালকা মনে হয়। ঘরে এসে বিছানার শুয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম তার দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফেলে।

অনন্ত কেবিনে যে আসে আশু বাবু তাকেই জিজ্ঞেস করেন, কেঁঠর কোন খবর জান?

বেশী ভাগ লোকই বলে, তারা কিছু জানে না। শ্রামল অবশ্য বলেছিল, কেঁঠরা'র সঙ্গে শ্রামানে গিয়েছিলাম।

—কবে?

—এই তো ক'দিন আগে, একটা ছেলেকে পৌড়িতে।

প্রভাত দূর থেকে মন্তব্য করে, কেঁঠকে আবার এ বোঁসে ধরল কেন?

আশু বাবু বলেন, তা কেন, দরকারের সময় ও তো বরাবরই কাঁধ দেয়।

—কি জানি, আমার ও-সব ভাল লাগে না। নিজের বাড়ীর লোককেই পুড়িয়ে অস্থির, তার ওপর পাড়ার লোক?

—সবাই এর মত লেে আর সমান নয়?

প্রভাত আর তর্ক করার সময় পায় না। ছায়ামঞ্চের সম্পাদককে দেখে ব্যস্ত হয়ে তার সঙ্গে আলোচনা শুরু করে, সত্যি বলছ পুলিশ গোলামাল করবে?

—তাই তো শুনিছ, ও লেখাটা ছাপানো ঠিক হয়নি।

—তুমিই তো জোর করে বললে লিখতে।

—ভাবগাম বেশী বিক্রী হবে। হলও তাই, প্রায় পাঁচ শ' কপি বেশী কেটেছে। কিন্তু আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেলছে!

—এমন কি অম্লীল হল?

সম্পাদক ব্যাজার মুখে বলে, ম্লীল-অম্লীলের কি আর কাঁধ মাপকাটি আছে, যখন যা খেয়াল চাপে—

—আগেও তো একবার নোটশ পাঠিয়েছিল?

—সে প্রায় দু'বছর আগে। খেসারতও কম দিতে হয়নি, পাচশো টাকা।

—তারপর ?

—কাগজের নাম পাট্টালান, এখন আবার মবেছে। সম্পাদক, প্রকাশক হওয়ার এই বিপদ। তোমানের আর কি, লিখেই থালাস।

—কি করবে ঠিক করছে ?

—টাকা-কড়ি কিছুই নেই। যদি বলে, হয় জেলে যাও নয় জরিমানা এত টাকা, অগত্যা জেলেই যেতে হবে।

চারে চুমুক দিয়ে প্রভাত জিজ্ঞেস করে, বৌদিকে বলেছেন ?

—বলে লাভ নেই, ওর গায়ে যা কিছু গয়না ছিল সবই সেকরার দোকানে বাধা আছে।

সম্পাদককে খুবই বিমর্ষ দেখায়। আসন্ন বিপদের হাত থেকে বাঁচার কোন পথই পায় না।

উৎসাহ দিয়ে প্রভাত বলে, খাবড়িয়া না, দেখি আমি কি করতে পারি। শেষ পর্যন্ত কাফর কাছে না পাই, বেলাবাণীকে এক বার বলে দেখব। আমাদের কাগজটা ও সন্তা ভালবাসে।

ইতিমধ্যে কেবিনে হৈ-চৈ করার লোকেরা এসে গেছে, সকলেই কেঁটার সাক্ষরদ। বিত্ত টেচিয়ে বলে, কেঁটার এই সময় ডুর মারলো ? এদিকে রাঘব বোয়ালের কাছে উঠতে বসতে মুখ-খিচুনি থাকি।

ভোঁতন বলে, রাঘব বোয়ালের আর দোষ কি, ওর পরসায় এত দিন নেচেছে কুদেছে, এখন ভোটের যা রেজাল্ট।

—সন্তা, কি হ'ল বল তো ? যন্তুর খবর বেরিয়েছে সবই অন্তরা জিতছে।

—কেঁটার ওস্তাদ লোক, টাইম নাকি কেটে পাড়েছে।

—কি আশ্চর্য ! বাড়ীতে গেলে পাওয়া যায় না, ভোরবেলা বেরিয়ে যায় আর অনেক রাতে ফেরে। বিত্ত মন্তব্য করে, কেঁটার জন্তো হা পিতেশ করলে তো চলবে না, চল রাঘব বোয়ালকে যা হোক কিছু বলে আমি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলে সাং দেয়, চল, যা আছে বরাতে।

বিত্তাভাবের কাছে এসে শামল দেখে, ছেলেরা সব বাইরে পাড়িয়ে চোমেটি করছে, ভেতরে ঢুকছে না। মদন সামনের ফুটপাথে পাড়িয়ে আবেক জন ছেলের সঙ্গে গল্প করছিল। শামলকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলে, তুই এসে পড়েছিস, খুব ভাল হয়েছে। আমি ভাবছিলাম তোরই কাছে যাব।

—বাপার কি, স্থল হবে না ?

—ষ্টাইক !

—কেন ?

—জ্ঞ জানে ! সকালে এসেই গুনগাম ক্লাশে যেতে হবে না, ষ্টাইক করতে হবে। বাস—

—আজ-কাল বেশ এমনি এমনি ছুটি পাওয়া যায়।

—চল আমরা কেটে পড়ি। এই যে চুণীলাল, এর বাড়ী যাব বলেছি, তুই চুণীলালকে চিনিস না ? চুণীলাল মদনের পাশেই পাড়িয়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে বলে, স্থলে দেখছি।

—কাঠ ক্লাশে পড়ে। লেখাপড়ায় বেশ ভাল, প্রত্যেক বছর পাশ করে। আমরা খার্ড ক্লাশ পর্যন্ত একসঙ্গে পড়তাম—কথা

বলতে বলতে তারা তিন জনে এগুতে থাকে। চুণীলালের বাড়ী বেশী দূরে নয়, দুটো রাস্তা পেরিয়ে ডান দিকে মোড় নিতে হয়।

বেশ বড় বাড়ী, দুটো ঘর পেরিয়ে চুণীলালের পড়ার জায়গা। চুণীলাল বলে, এইট আমার রাজ্য, এখানে পড়ি, শুই, সব কিছু করি।

শামল তারিফ করে, ক'টা ছেলে এমন নিজস্ব ঘর পায়, আমরা তো দেখেই লোভ লাগছে। সকলে এক সঙ্গে ছোট খাটটার ওপরই বসে পড়ে। মদন চুণীলালকে বলে, এই শামলের কথাই আমি বলছিলাম। ওর হাতে অনেক সময় আছে, তোমানের কি কাজে দরকার ?

চুণীলাল শামলের দিকে তাকায়, তাহলে তো খুব ভাল হয় সারা দিন স্থলে থেকে, তার পর পড়া করতে হয়, তাই বেশী সময় পাই না, যদি তোমার সুবিধ থাকে—

শামল অবার হয়ে জিজ্ঞেস করে, কিসের সুবিধে ?

—দেশের কাজ করার।

—দেশ !

—হ্যাঁ, চোখ বুজে বসে থাকলে তো আমাদের চলবে না, দেশে জন্তো ভাবতে হবে। অন্তায়-অন্তাচারের বিরুদ্ধে—

শামল খামিয়ে দেয়, কার অত্যাচার ?

—সে কি আর এক দিনে বোঝান যায় ? আমাদের অফিসে এ দেবেনদা সব বুঝিয়ে দেনেন।

—দেবেনদা কে ?

—আমাদের নেতা, এরকম লোক আমি হ'ট দেখিনি। খুব ব পাণ্ডিত, দেশের জন্তো জেলে গেছেন কত।

মদন এতক্ষণে কথা বলে, আমি আর শামল তোমার সঙ্গে এক দিন যাব।

—এক দিন কেন ? আজই চল না।

শামল হঠাৎ প্রশ্ন করে, তোমরা কি কাজ কর ?

চুণীলাল বিজ্ঞের হাসি হাসে, সে কি এক রকম, হাজারটা কাজ আছে। এই যে ষ্টাইক, সে তো আমাদেরই কাজ।

—তাই না কি ?

—কোন স্থল আজ হবে না। সকাল থেকে আমাদের দল চা গেছে, তোমাকেও এসব কাজ করতে হবে।

—এতে আমি রাজী আছি।

—আমাদের দাবী যদি না মানা হয়, তাহলে এই দলে এক একদল ছেলে আছে যারা নিম্নেয় কলকাতার সহর লণ্ডনও যা সব কিছু বন্ধ করে দিতে পারে।

মদন ও শামল সবিস্ময়ে চুণীলালের কথা শোনে, তার বক্তব্য আর দলের চমকপ্রদ কীর্তিকলাপ।

এ ক'দিন যে কেঁটারকে কেউ খুঁজে পায়নি, বলা বাহুল্য, তা প্রধান কারণ গোপী। সন্ধ্যায় অভিজ্ঞ কেঁটা ভাল করেই বুঝে গোপীর মন থেকে লজ্জা, ভয়, সংকোচ সরিয়ে দিতে না পারা তাকে সহজ করে তোলা সম্ভব নয়। সেই জন্তেই হোজ কেঁটা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, কথার কৌশলে ফেল-আসা দিনের কথা জে নিয়েছে এবং তারই ঠাঁকে এই গোলমালে দুনিয়ার সঙ্গে খাপ খাই দেওয়ার জন্তে নিজের হুজুকে গোপীর মনে বদ্ধবুল করায়।

করেছে। বার বার সে বলেছে, অত কীদলে চলে না, নিজেকে না দেখলে কে তোমায় দেখবে?

গৌরী কান্নায় ভেসে পড়ে, আর যে পারছি না।

—পায়তে হবেই।

—আপনি ভাবতে পারছেন না, এই এক বছরের মধ্যে বাবা, মা, ভাই, বাড়ী-ঘর—

কেউ নীচু গলায় বলে, জানি তুমি সব হারিয়েছ, কিন্তু বাঁচতে তো হবে।

গৌরী উল্লাস চোখে অস্ত্র দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, আর ইচ্ছে নেই।

—ও কথাই কোন মানে হয় না।

—কীর জন্তে বাঁচব?

—নিজের জন্তে।

গৌরী উত্তর খুঁজে পায় না, নীরবে মাথা নাড়ে।

কেউ ধমকে ওঠে, যদি মরতেই চাও তো চটপট মর, গঙ্গায় অনেক জল আছে।

একথা বলেই কেউ চলে এসেছিল। কিন্তু আধ ঘণ্টা বাদে মাথা ঠাণ্ডা হলে সে বুঝতে পারে অস্বাভাবিক করেছে। গৌরীর সব আশা ভেঙ্গে গেছে, তার উপর অস্বাভাবিক কঠোর হওয়া উচিত হয়নি। ফিরে এসে দেখে, গৌরী সেইখানেই বসে আছে। কেউকে দেখে কাতর কণ্ঠে বলে, আমায় কিছু পরসা দেবেন, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

কেউ পকেট থেকে একটা টাকা বের করে দেয়।

—আপনি আমার জন্তে এত করলেন, জানি না—

—শোধ দিতে পারবে কি না ভাবছ? হাতে পরসা থাকলে বার দরকার তাকে দিই, ফেরৎ পাব বলে নয়।

—শরীরটা খারাপ লাগছে, এখন আমি আসি।

কেউ গৌরীর দিকে তাকিয়ে বোঝে সত্যিই সে অস্বস্থ। বলে, এতক্ষণ বাড়ী যাওনি কেন?

—আপনাকে না বলে কি করে যাব, তা ছাড়া হাতে একটাও পরসা ছিল না।

—তুমি ভেবেছিলে আমি ফিরে আসব।

গৌরী এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, চলতে চলতে বলে, হ্যাঁ।

—কেন?

—তা জানি না।

পবদিন সন্ধ্যাবেলায় কেউ মন্ত্রমেণ্ডের অদূরে গৌরীর সঙ্গে বসে আলুকাবলী খাচ্ছিল। দিনের আলো নিবে গেছে, দুবে এসপ্লান্ডে, বিজ্ঞাপনের বকমকে আলো, ট্রাম-বাস, কত বকম লোক। সেই দিকে তাকিয়ে থেকে কেউ হঠাৎ জিজ্ঞাস করে, এত বড় সহরে তোমার থাকার একটা জায়গা হবে না?

গৌরী খুব আন্তে উত্তর দেয়, এত দিন তো হয়নি।

—তুমি চেষ্টা করনি।

—করেছি।

—কি?

—কলকাতায় পৌঁছে আমি আর আমার ভাই ওই টালীগঞ্জের

## রুগ্ন অবস্থায় বা রোগভোগের পর বেশীর ভাগ রোগীকেই পিউরিটি বার্লি দেওয়া হয় কেন?

কারণ পিউরিটি বার্লি

- ১) রুগ্ন অবস্থায় বা রোগভোগের পর খুব সহজে হজম হয়ে শরীরে পুষ্টি যোগায়।
- ২) একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী হ'লে এতে ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট বালিশস্তের সবটুকু পুষ্টি-বর্ধক গুণই বজায় থাকে।
- ৩) স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সীলকরা কোটোয় প্যাক করা হ'লে ধাঁচ ও টাটকা থাকে—নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।

# পিউরিটি

ভারতে এই বার্লির চাহিদাই সবচেয়ে বেশী

বিনামূল্যে

“মায়াদের জানবার কথা”  
পুস্তিকাটির জন্ত লিখুন :—অ্যাটলান্টিস (ইন্সট) লিমিটেড (ইংল্যান্ড-এ সংগঠিত)  
ডিপার্টমেন্ট, এফ বি-পি-২, পো: বক্স ২০০২, কলিকাতা-১৬



বস্তীতে থাকার জায়গা পেলাম সে-ও শুধু পণ্ডিত মশাইয়ের জন্তে। বস্তীর সামনে যে পাকা দালান দেখেছেন, ওটা এক জমিদারের। উনি পণ্ডিত মশাইকে খুব শ্রদ্ধা করেন। ক'লকাতায় এলে পণ্ডিত মশাই ওদের বাড়ী উঠতেন। আমরা যখন নিঃশব্দ অবস্থায় এখানে এলাম, উনি দয়া করে নিজের জমিতে এই বস্তীটি করে দেন। আমরা সাত-আট ঘর লোক থাকি সবাই এক গায়ের। আগে লাড়া নিতেন না, এখন—

কেষ্ট বাধা দিয়ে বলে, আমি তা শুনেই চাই না, তুমি নিজেকে কেঁটা করেছ?

—তাই তো বলছি। থাকবার জায়গা পেলাম, কিন্তু হাতে এক পয়সাও নেই। ভাইটা এসেই অস্ত্রখে পড়ল, কি দুর্ভাবনা! কাজের জন্তে বাড়ী বাড়ী ঘুরেছি, কিছুই পাইনি।

—কেন?

—কে আমার বাথবে? কি পারি আমি, না শিখেছি লেখাপড়া, না আছে ভারী কাজ করার শক্তি।

—সেলাইএর কাজ জান না?

—জানি। কাউকে করে দিলে খুসী হয়, কিন্তু পয়সা দেয় না।

—থরের কাজ?

—কে আমার জমিন হবে? উটকো লোক কেউ বাথতে চায় না।

—কোথাও কাজ পাওনি?

হু-এক জায়গায় গেয়েছি। যারা ভুতের মত খাটিয়ে নেয় আর হাসের শেষে ছুতো খুঁজে তাড়িয়ে দেয়, মাইনে দেয় না। তখন অত টাকার দরকার,—

গৌরী খেয়ে যায়। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, তার পর?

—ভিক্ষা শুরু করলাম, ভাইয়ের চিকিৎসা তাতে যা হয় হত। এমনই বয়স, হল একেবারে রাজসোগ। কেষ্ট কোন উত্তর দেয় না। গৌরী নিজের মনে বলে, ভিক্ষাই বা আজকাল ক'জন দেয়, আর সেবেই বা কষ্ট জ্ঞানকে। এত ভিকিরি!

—তোমার মত ভিকিরিকে কেউ ভিক্ষা দেয় না—

গৌরী কুন্তুর মুখের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন?

—তুমি তো, চোখ তুলে ভিক্ষা চাও না।

—যানে?

—যদি বাবুদের চোখে চোখ রেখে ভিক্ষা চাইতে, তারা দিত।

গৌরী বিস্মিত হয়, আপনি কি বলছেন?

—সত্যি কথা, এক বর্ষ বানিয়ে বলছি না। দয়া করে কেউ ভিক্ষা দেয় না, খুসী হয়ে দেয়।

—আপনি?

—আমার কথা ছেড়ে দাও, এক দিন জানতে পারবে। তবে যা বলছি শুনে রাখ। চোখ তুলে চললে এ মহুরে থাকবার তুমি অনেক জায়গা পাবে, বেশ ভাল ভাবে থাকবার। নইলে না খেয়ে মরতে হবে।

গৌরী কি বলতে যায়, কেষ্ট থামিয়ে দিয়ে বলে, আর সেরী কোর না, বাড়ী যাও।

এ প্রসঙ্গের শেষ কিন্তু এখানেই হল না। পরদিনই সকালবেলা কেষ্টর সঙ্গে দেখা হতেই গৌরী ঐ একই কথার অবতারণা করে।

—কাল আপনি যা বললেন আমি এখনও বুঝতে পারিনি।

—এখনও ভোলনি সে কথা? আস্তে আস্তে বুঝে ফেলবে।

—আপনি আমায় কি করতে বলেন?

কেষ্ট তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমি যা বলব তাই করবে?

—তা ছাড়া আর কি করব?

—আমার সঙ্গে দোকানে চল, কয়েকটা জামা-কাপড় কিনে নাও।

—জামা-কাপড়?

—তোমার কাপড়-চোপড় বড় ময়লা, একসঙ্গে ঘুরলে লোকে তাকায়।

—কিন্তু আপনার কাছ থেকে কি করে নেব, বস্তীর লোকেরা কি ভাববে?

—কি আবার ভাববে, সবাইকে বোল কেষ্টদা' দিয়েছে।

গৌরীর চোখ আনন্দে নেচে ওঠে, কেষ্টদা', সত্যি আপনারা কেষ্টদা' বলে ডাকব?

—নয়ত কি কেঁটা বলে ডাকবে ভেবেছিলে?

গৌরী লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে, ছি ছি, আপনি যে কি বলেন!

—চল, দোকানে যাওয়া যাক।

রাস্তায় চলতে চলতে রেফিউজিদের ফুটপাথের দোকান থেকে ওরা শাটী-ব্লাউজ কেনে। গৌরী প্রথমেই বলে'দিয়েছিল, দু'টি মিলের শাটী ছাড়া আর কিছু কিনবে না। কেষ্ট কথার অস্ত্রা করে নি, গৌরীর পছন্দমত নীল আর হলদে রংয়ের ছাপা শাটী কিনে দেয়।

—ব্লাউজ কিনবে না?

—আমার আছে।

—আর কি নেবে?

গৌরী একটু ইতস্ততঃ করে বলে, বরং একটা সায়া—

—নাও না।

দোকান থেকে বেরিয়ে কেষ্ট বলে, বিকেলে নিশ্চয় করে নৌ শাটী পরে এস।

গৌরী সম্মতি জানিয়ে চলে যায়।

আজ প্রায় চার দিন বাদে দুপুরবেলা কেষ্ট অনন্ত কেবিনে এল বিশেষ কোন লোক ছিল না, আস্ত বাবু চেয়ারে বসে চুলছিলেন কেষ্টর গলা শুনে চমকে উঠে, চোখ কচলে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপা কি বল তো? থাকো-থাকো আজ-কাল কোথায় উপে যাও পাও পাওয়া যায় না!

সে কথার উত্তর না দিয়ে কেষ্ট আস্ত বাবু কাছে একটা চেয়ার বসে পড়ে, বড্ড ক্ষিপে পোয়েছে, চটপট খাবার দিতে বলুন।

—কি আনবে?

—ডিম ভাজা, কটী মাখন আর যদি চপ থাকে—পেট ভরে খাও আস্ত বাবু অর্ডার দিতে রাষ্ট্রাঘরে চলে যান। ফিরে এসে কেপিঠ চাপড়ে বলেন, সত্যিই আশ্চর্য লাগছে, এরকম হাসিখুসী তো তোমার অনেক দিন দেখি নি?

—কেন, আমি কি চিরকাল হা-হতাশ করেই বেড়াব, বাগির হচ্ছি।



—এ বুড়াকে কীকি দিতে পারবে না, কি হয়েছে বল।

—আপনার কি মনে হয়?

আশু বাবু ভেবে নিয়ে বলেন, হয়তো কোথাও পাকা চাকরী পয়েছে।

—ঠিক ধরেছেন। পাকা চাকরী, তবে মাইনে দেয় না। যাক্ গ, এদিকের খবর বলুন।

আশু বাবু এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলেন, এবার ব্যস্ত হয়ে বলেন, দর্শনাশ হয়েছে, রাঘব বোয়াল কাং—

—সে তো জানি, তেরে গেছে। তাতে কি গোল?

—এর পরও জিজ্ঞাস করছ কি হ'ল? উদ্দেশ্য বেগে আশুন, ছোঁড়াগুলোকে যা তা বলে গালিম্বাদ দিয়েছেন।

কেউর মুখ খমখম করে, কি বলেছে?

—বিশেষ করে তোমার উপর রাগ, ওর টাকা নষ্ট করেছে, ওর নাম ডুবিয়েছ তোমরা—

—সে গাধাগুলো কিছু বলতে পারলো না!

—কি বলবে, জান তো তুমি ছাড়া ওরা এক পা চলেতে পারে না।

কেউ চট্‌চট্‌ ঠাট্‌ ঠাট্‌র খাবার রেখে দিতে বলুন, আমি রাঘব বোয়ালের সাথে দেখা করে আসি।

আশু বাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েন, এত তাড়া কিসের? না বেয়ে যেও না।

কিন্তু কেউ ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়েছে, ও কত বড় শয়তান আমি দেখতে চাই।

রাঘব বোয়ালের বাড়ী বাবার পথে কেউর সঙ্গে ভৌতনদের দেখা হয়ে গেল, তারা অনেকেই রকে বসে আড্ডা মারছিল। ভৌতন বলে, কেউন', এত দিন কোথায় ছিলে, আমরা যে গরখোঁজা করছি।

কেউ সে কথাব জবাব দেয় না, গম্ভীর গলায় বলে, আমার সঙ্গে আয়।

—কোথায়?

—রাঘব বোয়ালের বাড়ী।

—ওরে বাপুস্। সেদিন যা অপমান করেছে, আর ও-মুখো হচ্ছি না।

—এত ভয় কেন, আর আমার সঙ্গে।

ভৌতন বেগে বলে, তুমিই আমাদের নাচিয়ে দিয়ে কেটে পড়লে, আর যত অপমান সহ্যে হ'ল—

—তোবা কি মানুষ, বেশ করে শুনিয়ে দিয়ে আসতে পারলি না?

আর কেউ আপত্তি করে না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেউর সঙ্গে যেতে হয়। আজ কিন্তু দারোয়ান গেট ছেড়ে দেয় না, রক্তগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাস করে, কিস্কা মাজতা?

কেউ বিচিয়ে ওঠে, কাকে চাই জান না, রাঘব বোয়ালকে, তোমার বাবু।

দারোয়ান আর বাধা দেবার সাহস পায় না। কেউর মেজাজ দেখে বাবুকে খবর দিতে চলে যায়।

কেউরা এসে বসবার ঘরে জমা হয়। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না, আসন্ন ঝড়ের পূর্বে মুহূর্তের মত খমখম করছে। কেউর চাপখুচাপ কালি, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে।

দারোয়ান ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়, ও লোক বাং নেহি শুনা, জবাবদত্তি—

তার পরেই সিঁড়িতে পট পট করে চটির আওয়াজ। পর্দা সরিয়ে রাঘব বোয়াল দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢোকেন, কি চাই?

কেউ ঠাঁতে ঠাঁত ঘষে বলে, কৈফিয়ত!

রাঘব বোয়াল হতভম্ব হয়ে যান, কৈফিয়ত কিসের?

—এদের কাছে আপনি কি বলেছেন?

—কেন, ওরা বলেনি!

—আপনার মুখ থেকে শুনেছি চাই। বুঝতে পারছি না ওরা বাড়িরে বলাচ্ছিল কি না।

রাঘব বোয়ালের আর দৈর্ঘ্য থাকে না, বলেন, ওরকম চড়া গলায় আমার সামনে কথা বোল না।

—কেন, আমি কি আপনার চাকর?

—শাট—আপু।

—ইউ শাট—আপু।

সমস্ত ঘর-শুদ্ধ সবাই শিউরে ওঠে। ভৌতনরা ভয় পায়, তারা জানে বেগে গেলে কেউর মাথার ঠিক থাকে না। তেমনি ভয় পায় রাঘব বোয়ালের বাড়ীর লোকেরা যারা এর মধ্যে এসে জড় হয়েছে ঘরে, বাগানায়। তারা জানে, মুখের ওপর কথা রাঘব বোয়াল কোন দিন বরনাস্ত করতে পারে না। অসহ্য রাগে রাঘব বোয়ালের কান লাল হয়ে ওঠে, তোমানদের আমি পুলিশে দেব, শয়তান! টাকা চুরি করেছে?

—তাকে থামিয়ে কেউ চিংকার করে বলে, টাকা চুরি আমরা করিনি। তুমি করেছে, এত বড় বাড়ী, গাড়ী, সব লোক ঠকিয়ে। আমরা চোর হ'লে তুমি ডাকাত।

—কি! রাঘব বোয়ালের মুখ দিয়ে কথা বার হয় না।

তুমি প্রত্যেক দিন লোক ঠকাও, আমরা ঠকাব তোমাকে!

রাঘব বোয়ালের বড় ছেলে কেউর কাছে এগিয়ে আসে, বাজে গোলমাল বাড়ীর ভেতর করবেন না, রোজ এসে যে টাকা নিয়ে গেছেন তার কি করেছেন জবাব দিন।

—ভুতের বাপের শ্রদ্ধ করছি। কে জানত আপনার বাবাকে? চার দিকে তার নাম ছড়িয়ে দিয়েছি, এতগুলো মিটিং ডেকেছি, নিজের চোখেই তো দেখেছেন।

—এত করলেন কিন্তু বাজে ভোটা পড়ল না কেন?

—দেশের লোক আর গাধা নেই বলে। তারা মানুষ চিনতে শিখেছে। ভোটা দিয়েছে এক জন প্রফেসরকে, সে এত বিজ্ঞাপনও দেয়নি, লোক ভোটাধার চোঁচাও করেনি।

রাঘব বোয়াল আর চুপ থাকতে পারেন না, হাঁক দেন, দারোয়ান, রঘু পাড়—

—দারোয়ানদের বাবাও আমাদের কিছু করতে পারবে না। তবে কেন জেরেছেন, আসল কাণ্ডটা জেনে নিন, আমাদের দোষ নয়, নিজেরই দোষ। এত দিন ধরে যে সব নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করেছেন তারাই চাবুক মাঝে এবার আপনারাকে।

একথা বলেই কেউ নিজের দলকে ডাক দেয়, চলে এস সবাই।

ভৌতনরা এতক্ষণ কাঁচ হয়ে ঝাঁড়িয়েছিল, সংকেত পেয়ে কেউর বরয়ে আসে। হতবাক রাঘব বোয়াল নিশ্চয়

আফ্রোশে চেয়ারে বসে পড়েন। চাকর, দারোয়ানদের আতুল দিয়ে দেখিয়ে ছেলেকে বলেন, ওদের সব কাজে যেতে বল, আর ডাক্তারকে এক বার খবর দে।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে কেঁঠে দেখে গৌরী ঝাড়িয়ে আছে, পরনে তার সকালের কেনা সেই নীল শাড়ী।

—তুমি অনেকক্ষণ এসেছ ?

—আধ ঘণ্টার ওপর।

—একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম।

—হাতে কি হয়েছে, আমি বেশ এখানে ঝাড়িয়ে কত 'কি' দেখেছিলাম।

—নতুন শাড়ী পরে বেশ দেখাচ্ছে।

গৌরী চুপ করে থাকে।

—চল একটু বেড়িয়ে আমি।

কেঁঠে গৌরীকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। সাতেরী পাড়ায় বড় বড় লোকানের সামনে, যেখানে আলোর মেলা, সেখানে দিয়ে হাঁটতে হুঁজনেরই ভাল লাগে। কত বকম জিনিষ, ক-বেক-এর মূল্যবান সামগ্রী। এক সময় কেঁঠে বলে, কত দামী দামী জিনিষ দেখেছ ?

—বেশ স্পন্দন !

—ঐ শাড়ীগুলোর দাম জান ?

—কত ?

—একশ' দেড়শ' হুশ'।

—বা বা ! কারা পার ?

—যাদের অনেক টাকা আছে।

গৌরী কেঁঠের দিকে তাকায়।

—তাই ত, অনেক দূর গ্রেটে এসেছি। বাড়ীতে বাগা করেছে ?

—না, গিয়ে করব।

—চল, বরং কোন লোকান চুকে থেয়ে নেওয়া যাক।

মিষ্টির দোকান চুকে ওরা কেবিনের মধ্যে গিয়ে বসে। গৌরী বলে, বা, কি সুন্দর জায়গা ! এতটুকু ঘর, পাখা ঘুরছে, পাখরের টেবিল— দোকানের ছোঁড়া চাকর এসে জিজ্ঞাস করে, কি আনব বাবু ?

কেঁঠের বা মনে এল হুঁ-চার বকম খাবার বলে দেয়। গৌরীর মন অনেক দিন বাদে বেশ হালকা হয়ে যায়। হুঁজনে নানা বকম গল্প করে। গৌরী জিজ্ঞাস করে, আপনার বাড়ীর কথা যে বলবেন বলেছিলেন ?

কেঁঠে হাসে, হ্যাঁ, আমার একটা বাড়ী আছে—

—বলুন—

—ওই তো বললাম, এখনও ভাগ হয়নি। হ'লে আমার হবে নীচে একখানা ঘর, ওপরে একটা, এক ফালি ছাদ

—তা নয়, বাড়ীতে কে আছেন ?

—কেউ নেই।

—সেদিন যে বলছিলেন জামার কথা ?

—ও আমার ভাইঝি।

—তবে কেউ নেই বললেন কেন ?

—ওকে আর আমার কাছে আসতে দেয় না।

—কে ?

—দাদা-বৌদি।

—দাদা-বৌদির কথা তো বলেন নি ?

—ওদের ভাল লাগে না।

—কেন ?

—বড় টাকা, আনা, পরসার লোক। মনটা এতটুকু ছোট, কেঁঠে আতুল দিয়ে পরিমাণ দেখায়। ইতিমধ্যে খাবার এসে পড়ায় এ প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়। হুঁজনেরই বেশ খিদে পেয়েছিল, তাই ভাল করে খাবারের সন্ধ্যাবহার করে। কচুদী, সিঙ্গাড়া, আরও হুঁবার আনিয়ে নিতে হয়।

থাওয়া শেষ হলে দাম চুকিয়ে বাইরে বেয়িয়ে আসে। টিপ-টিপ করে বুটী পড়ছিল।

—তাড়াহাড়ি পা চালিয়ে চল, জোরে বুটী নামার আগে ট্রামে করে তোমাকে পৌঁছে দিই।

গৌরী জোরে হাঁটতে থাকে। ট্রামে বেনী ভীড় ছিল না, সামনের দিকে খালি সিটে হুঁজনে পাশাপাশি বসে। গৌরী বলে, আজও কিছ্র কাজের কথা হল না।

—সে নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।

—কত দিন আপনি এরকম টাকা লেবেন ?

—যত দিন তোমার দরকার।

টালীগঞ্জের কাছে এসে ট্রাম থামে, বেশ জোরে বুটী পড়ছে। হুঁজনে নেনে দৌড়ে একটা গাছের তলায় গিয়ে পাড়ায়।

—উঃ, কি বড় বড় বুটীর ফোঁটা !

—তোমার জামা-কাপড় যে একেবারে ভিক্স গেছে !

—আপনি বুঝি শুকনো আছেন ?

—আমার তো ভয় নেই, ভেজা অভ্যাস আছে। দেখ, তোমার আবার স্বর না হয়।

—আমরা বাঙালদেশের লোক, জলেই মাছুব ! ঐ যে ট্রাম আসছে, আপনি চলে যান।

—বেশ, তুমি তাহলে বাড়ীতে যাও।

কেঁঠে ট্রাম-ষ্টপেজে আসে। সেখানে রাজেনের সাঙ্গে দেখা, একেবারে ভিক্স গেছেন যে কেঁঠে বাবু !

—ইঠাং বুটী এল।

—গৌরী কোথায় গেল ?

—বাড়ী গেছে।

প্রথম ট্রামটা এক বকম না থেমেই চলে যায়। অগত্যা বৌ ঝাড়িয়ে ঝাড়িয়ে রাজেনের সাঙ্গে আলোপ করে। রাজেন জিজ্ঞাস করে, আপনারা তো ভবানীপুরে মিষ্টির দোকানে গিয়েছিলেন, না ?

—হ্যাঁ, তুমি ওপাড়ায় ছিলে বুঝি ?

—বাজারের কাছেই ছিলাম, দেখলাম আপনারা চুকলেন।

—তুমি এসে না কেন ?

—কাজ ছিল। কিছ্র শাড়ী কিনতে আপনি ঠকে গেছেন।

—কেন ?

—ও লোকানগুলোতে দামের ঠিক থাকে না। আরও জুট আনা, দশ আনা কমে পাওয়া যেত।

দ্বিতীয় ট্রাম এসে পড়ে।

—আজ চলি ভাই, আর এক দিন আসব।

কেঁঠে ট্রামে উঠে পড়ে।

[ ক্রশশ ]



এই শিশুটির জন্য এক মুহূর্তও ভাবতে হয় না

কারণ সে

# ল্যাকটোজেন

খেয়ে পুষ্ট

১৩/৩/১৪

সিলোন রেডিয়ো থেকে 'ল্যাকটোজেন' হিন্দী প্রোগ্রামে বীণা ব্রায়ের কথা শুনুন।

রবিবার...রাত্রি ৭টা-৪৫ মি: থেকে রাত্রি ৮টা এবং  
বৃহস্পতিবার...রাত্রি ৮টা-৩০ মি: থেকে রাত্রি  
৮টা-৪৫ মি:।

৪১ মিটার ব্যাণ্ডে

১৪

বিকৃত বিবরণের জন্য লিখুন

নেসল্‌স গ্রুডাক্টস ( ইণ্ডিয়া ) লি:

পোস্ট বক্স নং ৩২০ পোস্ট বক্স নং ৩১৫ পোস্ট বক্স নং ১৮০  
কলিকাতা বোম্বে মাদ্রাস

'F'

# দলদা

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

জরাসন্ধ

এক জনের সঙ্গে, জিনিষপত্রের বাহুল্য নেই। যেটুকু ছিল, তাও দরাজ ভাবে বিলিয়ে ছাড়িয়ে খুব সন্তুষ্ট হয়ে গেল। চোখে পড়বার মত বইল শুধু, একটা বড় আকারের প্যাঁকিং কেস। তার মধ্যে ভর্তি বই। কিন্তু জিনিষ ছাঁটাটাই যতটাই সহজ হোক, মানুষ ছাঁটাটাই একটু কঠিন হয়ে পীড়াল। বনমালীকে দেখে যেতে হবে। কিন্তু মনিবকে একা ছেড়ে দেওয়া তার একেবারেই ইচ্ছা নয়। তাকে বাঁজী করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেবতোষের পরিকল্পনা কিছু অসম-বদল করতে হল। নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়বার আগে কিছু দিন তার বিক্রমপুরের গ্রামের বাড়িতে কাটিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিতে হল। অনেক দিন মায়ের সঙ্গে দেখা নেই। কয়েক মাস আগে এখানে এক বার এসেছিলেন সলোচনা দেবী। বাড়ি কেলে বেশী দিন থাকা সম্ভব হয়নি। ছেলেকে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লেখেন, কিন্তু যাবার জন্তে কোনো দিন পীড়াপীড়ি করেন নি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'যেদিন ওর ইচ্ছা হবে আপনিনি আসবে। ভালো আছে, এইটুকু জানলেই আমার হল।' সে খবরটা অবশ্য নিয়মিত জিনিষে থাকে দেবতোষ। সসারের তারও তো ঐ এক মা। শুধু বনমালীকে এড়ানো নয়, ক'টা দিন মায়ের কাছে গিয়ে থাকবার জন্তে তার নিজের গরজও কম ছিল না।

খালবিলের দেশ। স্ট্রিমার-স্টেশন থেকে পঁচিশ মাইল নৌকা-পথ। সকালে বগুনা দিয়ে বাড়ির ঘাটে পৌঁছতে বেলা প্রায় শেষ। সলোচনা দেবী একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। উঠানে ধান শুকোচ্ছিল, পা দিয়ে নেড়ে দিচ্ছিল রাধুর মা। দাদাবাবুকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে খবর দিতেই ধড়মড় করে উঠে পড়লেন। বেরিয়ে এসে বললেন, 'হ্যাঁ রে, একটা খবর দিতেও পারিস নি? সারা দিন পেটে একদানা ভাত পড়েনি। দুটো চাল ফুটিয়ে নামাতে যে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

দেবতোষ হাসতে হাসতে বললে, কেন, তুপুরবেলা যা রে'ছেছিলে, হ'জনে মিলে সব বুঝি চেঁছে-মুছে খেয়েছ? পাত্তে কিছু নেই?

—শোনো, ছেলের কথা! আমি কি জানি, তুই আসবি?

রাধুর মা বলল, বাড়িতে তো ভাত রয়েছে, মা! ডাল-তরকারী যা আছে, দাদাবাবুর হয়ে যাবে।

—সে তো যাবে। কিন্তু সেই ও বেলায় শুকনো আলো চালের ভাত খেতে পারবে কেন? তুই যা, দুটো চাল ধুয়ে আন।

—কিছু দরকার নেই মা, বাধা দিয়ে কাল দেবতোষ, যা

আছে, তাই দাও। কত কাল তোমার 'দলা' থাইনি মনে করতে পার?

সলোচনা হঠাৎ জবাব দিতে পারলেন না। ভাবলেন, কী বলে পাগল ছেলে! তাঁর মনে নেই? এই তো সেদিনের কথা, ইস্কুল থেকে ফিরে মায়ের পাতের ভাত-তরকারী না পেলে ছেলে কুক্করের বাধিয়ে বসত। শুধু পাতের হলোই চলবে না। মেখে ছেদা পাকিয়ে রাখতে হবে। শুকনো শুকনো করে মাথা সেই 'দলা'ই ছিল দেবতোষের কাছে অমৃত। শেষ কণাটি পর্যন্ত খুঁটে খুঁটে খেয়ে ফেলত। অথচ অস্ত্রের হাতের অনেক বেশী উপাদেয় বাগা তার মুখে রুচত না।

ঝালের ঘাটে স্নান সেরে বান্নাঘরের বারান্দার কাঁটার কাঁঠের পিঁড়ির উপর এসে বসলো দেবতোষ। সেই আগের দিনের মত সলোচনা ভাত মেখে মেখে তুলে দিলেন তার পাতের উপর। দেবতোষ পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে বললেন, আমি যে আসবো, তুমি নিশ্চয়ই জানতে, মা! যা যা ভালবাসি, সবই তো রে'খেছ। মোচার দাঁট, খোড়ছেঁচকি, কুমড়োর ডগা দিয়ে মটর ডাল কুলের অঞ্চল—কোনটাই বাদ পড়েনি।

সলোচনার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। নিশ্বাস ফেল বললেন, আমি কী করে জানবো, বাবা? যিনি সব জানেন, এ তাঁরই কাজ। তিনিই হয়তো আমার হাত দিয়ে এঁট জিনিষ ক'টা বাঁধিয়ে রেখেছেন তোমার জন্তে।

গ্রামের সঙ্গে দেবতোষের আশ্রমের নাড়ির যোগ। কিন্তু এবার তার কোথায় যেন একটা বাঁধন শিথিল হয়ে গেছে। দু'দিন যেতে না যেতেই সেটা মা'র চোখেও দরা পড়ল। থেগলেন, ছেলে তেমনি মা'র ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, এ-বাড়ি ও-বাড়ি পৌজ-ববর নেয়, অগ্রণে বিলুখে ডাকতে এলে যায়, যা করবার করে। তবু বোঝা যায়, এ সব শুধু অভ্যাসের টান, এ সবের মধ্যে মন কোথাও নীড় বাঁধতে পারছে না, হয়তো আশ্রয় খুঁজে ফিরছে অল্প কোনোখানে।

হ্যাঁ রে, দেবু, বনমালী ভালো আছে তো? একদিন প্রশ্ন করলেন সলোচনা।

হ্যাঁ, মা, তাকে দেশ পাঠিয়ে দিয়েছি। ওখানে আর আমাকে ফিরতে হবে না। চার মাসের ছুটি নিয়েছি।

সলোচনার মুখে হঠাৎ হৃদিস্তার ছায়া ফুটে উঠল। কিন্তু

ছেলেকে তা জানতে দিলেন না, অল্প কথা পাড়লেন, মন্তব্য কি ওখানেই আছে না বলল হয়ে গেছে?

—ওখানেই আছেন।

—তার ছেলে দুটি?

—তারা তো ওখানে থাকে না! কোলকাতায় বোর্ডিং-এ থেকে গড়ে।

—ওখানে আর কার কাছে থাকবে? বলে নিখাস ফেললেন সলোচনা। আহা! ঐ বকম মানুষ, তার কপাল জ্বাৰ।

সলোচনা চলে যাচ্ছিলেন। দেবতায় কী একটা বলতে গিয়ে চিন্তিত: করছেন দেখে ফিরে দাঁড়ালেন, কিছু বলবি?

—বলছিলাম, এবার একটু ঘুর আসি।

—কোথায় যেতে চান?

—প্রথম কিছু দিন কোলকাতা। তারপর, ভাবছি এক বাব ফিগ সিকে বেরাবো। তুমিও চলে না?

সলোচনা কোনো দিন বাড়ি ছেড়ে নড়তে চান না। দেবতায় দু'চার বাব চেষ্টা করেছে 'তীর্থের নাম করে মাকে নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে পড়তে। কিন্তু গুঁর মুখে ঐ এক কথা—'এই স্বত্ত্বের ভিত্তিই আমার সব চেয়ে বড় তাঁর, বাবা! এখানে যদি ঢোখ বৃদ্ধিতে পারি, আর তাঁর হাতের একটু আশ্রয় পাই, তাহলে আর কিছুই চাই না,' আরও সেই কথা বলেই দেবতায়ের এই ঘুর আসার প্রস্তাবে তিনি সম্মতি দিতে পারতেন। কিন্তু এই কদিন তার মুখের সিকে চেয়ে সহজেই বুঝতে পেরেছেন, তাঁর এই আশ্রয়ভাঙ্গা ছেলেটির উল্লার নিলিপ্ত মনের কোণে এমন কোনো দাগ লেগেছে, যেখানে মায়ের হাতের একটুখানি স্পর্শ তাঁর একান্ত প্রয়োজন। কে জানে, হয়তো সেই জন্মেই সে সকলের আগে মায়ের কাছেই ছুটে এসেছে। সন্তব্য জন্মেই কিছু দিন অন্তত তাঁর স্বত্ত্বের ভিত্তি মাথা ত্যাগ করা দরকার।

কর্তাদের আমল থেকে কলকাতার জেদর একটা একমাসি বাসা বসে গেছে। দেবতায়ের জ্যাঠা-জ্যাঠাই এই মহোত্তর সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করে। দেবতায়ের এক পাশে খান তিনেক ঘর, বামায়ের ইত্যাদি নিয়ে একটা অংশ সলোচনা নিজের জন্মে বেধে দিয়েছেন। আপাতত: সেইখানে গিয়ে গুঁটাই স্থির।

এই তো সে দিনের কথা। হেনা মনে মনে স্থির করেছিল, এ জেল গকে ছাড়তে হবে। সে অল্পবয়সে জানাবার আগে জেলর সাহেবের হাছে কী বলবে, কতটুকু বলবে, তা-ও সে গভীর ভাবে চিন্তা করে রাখছিল। কমলার প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিল, নিজের কাছ থেকে পালাতে চাই। তার পর অপ্রত্যাশিত ঘটনার স্রোত এমন জায়গায় গকে নিয়ে এল, যেখানে আর পালাবার প্রয়োজন রইল না। যাকে উপলব্ধ করে সে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তিনিই নিজেকে নিশাঙ্গে সরিয়ে নিয়ে গেছেন, সমস্ত ভয়-ভাবনা-সমস্তার হাত থেকে তাকে চিরদিনের তরে মুক্তি দিয়ে গেছেন। কিন্তু এই মুক্তিই কি সে চেয়েছিল? শৃঙ্খলা তো মুক্তি নয়? এ যেন প্রতিদিন তাকে একটু একটু করে গ্রাস করছে। এক দিন সে বন্ধন থেকে পালাতে চেয়েছিল, আজ এই নিরাপত্তা রক্ষিত থেকে পালাতে চায়। আজকার প্রয়োজন যেন আরো বেশী। জেনানা ফাঁটকের এই কুস্ত বেষ্টনী

মধ্যে প্রতিটি ছোট-বড় পরিচিত বন্ধ তাকে প্রতি মুহূর্তে স্রবণ করিয়ে দিচ্ছে, তোমাকে যেতে হবে, এখানে তোমার জায়গা নেই। জেলর সাহেব তাকে স্নেহ করেন। কিন্তু তার অন্তরের এই অর্থহীন ব্যাকুলতা তিনি বুঝতে চাইলেও সে বোঝাবে কেমন করে? এই বিব বৃকে কবে কোন মুখে, কোন লজ্জায় সে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? কী উত্তর দেবে যখন জানতে চাইবেন, কী তোমার কষ্ট? কিসের জন্মে তুমি চলে যেতে চাও?

এমনি যখন তার মনের অবস্থা, তখন এক দিন সকালবেলা সশীলা এসে জানাল, জেলর সাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হেনার হঠাৎ মনে হল, তিনি বোধ হয় অন্তর্ভাবী। তার মনের ডাক গুনতে পেরেছেন। সশীলা বলল, তৈরি থাকিস। চাবটার সময় টনি আফিসে এসেই নিয়ে যাবো।

পথে যেতে যেতে হেনার পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগল। বৃকের ভিতরে ঢুক-ঢুক করছে কিসের যেন আশঙ্কা। কেন ডেকেছেন, আপনি কিছু জানেন মাসীমা? শুক মুহু যবে জিজ্ঞাসা করল সশীলাকে।

সশীলা হেসে ফেলল, ভয় নেই। কীসি দেবেন না তোকে।

একটা কি কাঁইল দেখছিলেন আলুকদার। জন্মের সাড়া পেয়ে ঢোখ তুললেন। সশীলা সেলাম করে বলল, আমি তাহলে বাই বাবা। বাটনিটা বুঝিয়ে দিয়ে এসে ওকে নিয়ে যাবো। জেলর বাবু মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। দু'-তিন মিনিট পরে ফাইলটা

**কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম**

**আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"**



এটি পাঁচটি  
২৫ টি  
২৫ গজাক্ষর

- কল্ল প্রস্তুত
- স্ট্রোপে স্ট্রো
- মসিনে প্যাক
- ৩ ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি  
ও সর্বত্র বন্ধন করিতে

**আর্য বেকারী আর্য কনফেকশনারী**

**কলিকাতা - ২৯**

বন্ধ করে ফিটা বাঁধতে বাঁধতে বললেন, হ্যাঁ ; তোমাকে ডেকেছিলাম ; একটা কাজ করতে হবে।

তেনা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। তালুকদার বললেন, ভাবছিলাম, মেয়েদের কিছু উল্লের কাজ শেখালে কেমন হয়? এই যেমন ধব—মোজা, গেঞ্জি, সোয়েটার, মাক্সার এসব যদি বুনতে শেখে, জেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা করে খাবার সাহায্য হতে পারে।

তেনা ঘাড় নেড়ে জানাল, এ বিষয়ে সে একমত।

—শেখাবার ভারটা তোমাকে দিতে চাই।

—আমি পারবো কি? বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিল তেনা।

—কেন পারবে না? আমি তো তোমার হাতের কাজ দেখেছি।

তেনা মাথা নত করল। হাতের কাজের প্রমাণটা সশীলা লুকিয়ে রাখতে চাইলেও জেলের সাত্তেবেব কাছে গোপন নেই, এটুকু জানতে পেরে লজ্জিত হল। তালুকদার বললেন, জেলের সিপাহীরা সবকাধী খরচায় একটা করে জারসি পেয়ে থাকে। সেগুলো আমাদের কিনতে হয়। ওর কিছুটাও যদি তোমরা বুন দিতে পার, অনেক পরস্য বাচবে। এ নিজেই বসন্ত শুরু কর। গোড়ার দিকে একটু-আধটু খারাপ হলেও বিশেষ ক্ষতি নেই।

এ বিষয়ে একটা মোটামুটি আলোচনা হল। জারসি বুনতে কত উল লাগে, কত নম্বর কাঁটা চাই, কাজটা ভালমত শিখতে কতটা সময় লাগবে, মাসে কতগুলো করে তৈরী করার সম্ভাবনা—এই সব এবং আনুমানিক ব্যাপারে এই মেয়েটির জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সেটা প্রকাশ করার দক্ষতা দেখে তালুকদার বিস্মিত হলেন। এই জাতীয় কাজে নারীরাগিয়ে ওকে দিয়ে যে শুধু ভাল ভাটানা হয়েচে, সে কথা ভেবে মনে মনে লজ্জিত হলেন। শেষের দিকে বললেন, তুমি তাহলে তোমার ছাত্রীর দল ঠিক করে ফেল। একটু বুদ্ধিওক্তি আছে, শিখবার আগ্রহ আছে, কল্লতঃ বড়ব পানেক থাকবে, এই সবেরে হুটি পাচ-ছয় মেয়ে হলেই কাজ শুরু করা চলবে। কী বল?

তেনা কুণ্ঠিত স্বরে বলল, শেখাবার ভার আমি নিলাম, হাব! সাধ্যমত চেষ্টা করবো। কিছু দোক ঠিক করবার কাজটা আমাকে নিতে বলবেন না।

এ বিষয়ে ওর আপত্তিটা সে অস্বীকৃত নয়, বুঝতে পারলেন তালুকদার। বললেন, বেশ তাই হবে। ওটা আমি নিজেই এক সময়ে গিয়ে করে দিয়ে আসবো।

দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, সশীলার আসতে বোধ হয় বেশি হবে। ততক্ষণে তুমি বস! ঐ নারান্দার গিয়ে একটু বসো। বলে আবার একটা ফাইল টেনে নিলেন।

মিনিট দুই পরে তাকিয়ে দেখলেন, তেনা তেমনা কাঁড়িয়ে আছে। মুখ লেগে মনে হয়, কী যেন বলবার আছে, অথচ বলতে পারছে না। কিছু বলতে চাও? কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন তালুকদার। তেনা ঢপল হয়ে উঠল। চোখ-মুখে দেখা দিল অশ্রুস্তির রেখা। দুই-একবার ইতস্ততঃ করে হঠাৎ বেরিয়ে এসে ব্যাঙুল কঠ—আমি যে এখানে আছি থাকতে পারছি না।

—কেন? সবমিয়ে প্রশ্ন করলেন জেলের সাত্তেবেব।

—আপনি তো সবই জানেন। যে কারণে, যেমন করে শুঁকে চলে যেতে হল, তার পর আমি এখানে মুখ দেখাছি কেমন করে?

মহেশ বাবুর বিষয় কেটে গেল। যে কাঁটা কথা শুনলেন, তারই

ভিতরকার বেদনাটুকু অল্পভর করে নিঃশব্দে চেয়ে বইলেন জানালায় বাইরে। তেনা যেন আপন মনে বলতে লাগল, এত দুঃখ দিলাম। সব বুখা হল। এত করে বাঁচ হাত থেকে বাঁচাতে চাইলাম, সেটী দুর্নামি আর অপমানই মার হল। আমাবই জঙ্কো সকলের কাছে মাথা হেঁট করে চলে গেলেন!

—তুমি ভুল করছ তেনা, দৃঢ় গষ্ঠীর স্বরে বললেন তালুকদার। তাকে কারো কাছেই মাথা হেঁট করতে হয় নি। অপমান বা অমর্যাদা নিয়েও সে যায় নি। নিশ্চয়ই দুর্নামি তাকে স্পর্শ করে নি। যে যাঁট বলুক, আমার এই কথাটা তুমি নিঃসন্দেহে মনে নিতে পার।

তেনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই দৃঢ় কণ্ঠের মশায় যেন সে খুঁজে পেল এক পথের আশ্বাস। তালুকদার জানালায় বাইরে দৃষ্টি রেখেই মৃদু-কোমল স্বরে বললেন, দুঃখ দেবার কথা বলছিলে। কিন্তু দুঃখ তো তুমি শুধু দাওনি, পেয়েছ তাও অনেক বেশি। সে কথা আর কেউ না জাচুক, আমি তো জানি।

তেনার চোখের কোল দুটো হঠাৎ জলে ভরে গেল। কোনো কথাই বলতে পারল না। ছোট্ট অসুখাধী যখন গাও বেরে গাড়িয়ে গেছে তা-ও মুচলার চেষ্টা করল না। সেই অসুখ-লারিয়ে যুগমানার দিকে অবকাশ তাকিয়ে থেকে তালুকদার আবার বললেন, শেখান সব কথা আমি জানি না। হয়তো এমন কিছু আছে তোমার জীবনে, যা জঙ্কো নিজের হাতে নিজেকে আত্মতঃ দেওয়া চাই আর কোনো ভিত্তি ছিল না। কী সে কারণে সে প্রশ্ন তুলবো না। একটা কথা শুধু বলতে চাই। যেচ্ছার যেপথ থেকে নিজেকে সবিধে নিয়ে এসে, সেদিকে আর ফিরে তাকিও না। হাতের শুধু কঠোর পাবে আর কোনো ফল হবে না।

তেনা জাঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিঃশব্দে চেয়ে বইল। তালুকদার বললেন, আমার এই কথাগুলো হয়তো মাদু-সকলার উপদেশ কিন্তু পানদি সাত্তেবেব সারিলের মত শোনাচ্ছে। শুধু যে কোনোটাটা মনে নয়। মেয়েমানুষ বলে কল্লতঃ বলে শুধু এই সমস্যার ডাকেই মনঃ লিখে হবে, আর তা না হলেই জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল, একথা যখন বললেন, তাঁর মেয়েমানুষকে শুধু মেয়ে বলে দেখেন, মানুষ বলে দেখেন না। সবকল্লার বাইরেও সে বিশাল পৃথিবী পড়ে আছে, তার দায়িত্ব কারো চেয়ে ছোট নয়। তার ডাক যদি শুনতে পার, তাহলে যা পানদি কিংবা পেতেই নাওনি, তার কল্লতঃ এতটুকু জেট থাকবে না।

তেনার আনত উজ্জ্বল চোখের উপর থেকে যেন একটা আবেগ উঠে গেল। তত্প্র কণ্ঠে বলল, না, না। আমার আর কোনো জেট নেই। কেমন যেন দুগল হয়ে পড়েছিলাম। দৃঢ় ছটফট করছি মনটা। হঠাৎ আপনার কাছে ছুটি এসেছিলাম। না, আমি আর কোথাও যেতে চাই না। এখানেই থাকবো। নাকো মাসে এসে কাঁড়াতে পারবো আপনার পায়ের কাছটিতে, তার পর—হ্যাঁ হঠাৎ খেমে গেল।

তালুকদার মৃদুতর্কাল অপেক্ষা করে বললেন, কী বলছিলে বল।

—বলছিলাম, এই জেলের মোহান তো এক দিন শেষ হবে। সে কথা যখনই মনে পড়েচে, ভয়ে আমার বুক কঁপে উঠেচে। কোথায় যাবো? কোথাও গিয়ে কাঁড়াবো, এমন ভাবগা তো আমার নেই।

ছাড় আর সে ভয় নেই। আপনার কাছে এসে মনে হল, জায়গা আছে। একটু আশ্রয়ের ভাবনা আমাকে ভাবতে হবে না।

আপনার অজ্ঞাতসারে ঢমকে উঠলেন জেলের সাতের। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন। তেনা কক্ষা বরল, কিন্তু বুঝতে পারল না। বিষয়ে কুঠায় নির্ভর করে বইল। অনেকটা যেন কৈফিয়তের স্বরে বললেন তালুকদার, তোমার ঐ 'আশ্রয়' কথাটা শুনে অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তোমারই মত আরেক জন—না; সে কথা এখন থাক। ঠা; তোমার কথা আমি ভেবে দেখছি। সেই প্রথম যেদিন তোমাকে দেখলাম, 'তুমি এসে আমার কাছে তোমার টিকেট নিয়ে, তখন থেকেই ভেবেছি। সেদিন কী হয়েছিলাম, তোমার হয়তো মনে আছে।

—সে কথা একটি দিনের তরেও ভুলিনি, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হুনা। আপনি বলেছিলেন, তোমার কথা যেন উল্লেখ, আমার একটা কথাও তেমনি তোমাকে স্মরণে হবে।

—হুনা। আজও তার সবটুকু বলবার সময় আসেনি। শুধু যেনে দেখা। এখনকার ব্যাপার শেষ হলেই তোমার ছুটি নেই। তোমাকে জানাব সবকিছু হবে।

হুনা উল্লসিত হয়ে উঠল, আমি তার জজ্ঞা বৈদ্য হয়ে আছি। কিছু কুঞ্চিত স্বরে বলল, আমি পাবনা কি?

—কেন পারবে না? নিজের এগুয়ে বিশ্বাস রাখিও না। মজার পারবে।

—তোমার দমত সে বিশ্বাস হয়তো এক দিন ফিরে পাবে, বিবাহিত, কচা বলল তখন, কিন্তু জড় হয়, যেসকাল আপনি আমার দিকে চাইছেন, তার অধিকার বোধ হয় আমার নেই?

—কেন?

—হাসলে, আমার সব কথা আপনাকে স্মরণে হবে।

—কী তোমার সব কথা?

—তোমার জানবার যত কিছু পাপ, যত কিছু অজ্ঞান, ছেলেবেলা থেকে যে দুঃখ দিয়েছি, এর প্রত্যেকটি, যত বন্ধনা সরেছি, সব আমি আপনার পায়েব কাছে নাবিয়ে দেবো। তার পরও যদি মনে করেন, আমি অরোধ্য নই, আপনার দেওয়া কাজের অধিকার যাচাই হাবিয়ে দেবনি, আপনার সব আদেশ আমি মাথাচ পেতে দেবো।

—কেন, তাই হবে, এক-বাশ বিদ্যাসংঘের বোর্ড পায়ে বেঁধে কাজে নামা যায় না। মনের মধ্যে বটিকা যখন দেখা দিয়েছে, সে ছাড়া কুলে ফেলাটা ভাব্যে। অন্যকো তোমার সব কথা। ওই যে তোমার এককটি এসে গেছে। স্মরণে মত আরেক দিন এসে।

ওখানে ঘরে চুকল একবারে হস্তবল হয়ে। দাঁড় বিসময়ের সঙ্গে একগাধা কৈফিয়ত শুরু করলেই মাকপথে বাধা পড়ল। জেলের সাতের বললেন, চার-পাঁচ দিন পরে বিকেলের দিকে আর এক বার একে আনতে হবে। তার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে দেবে।

আচ্ছা, চক্কর, সেলাম করে কলস জমানারগী। কৈফিয়তের হাত থেকে এত শীঘ্র নিষ্কৃতি পাবে, একেবারেই আশা করেনি।

তালুকদার উঠে দাঁড়ালেন। তেনা এগিয়ে এসে গলায় জাঁচল দিয়ে মাটিত মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল তার পায়েব কাছে। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল সশীলার সঙ্গে।

দেওয়ান-খন্ডির দিকে তাকিয়ে উনিও বাইরে যাবার জন্তে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় বিরাট ঠাক-ডাক করে মহাবল সিং এসে হাজির। সঙ্গে জন চুই সিপাই আর এক দল করদী। একটা জোয়ান সোকে ডাক দিচ্ছে থেকে ধরে টানতে-টানতে নিয়ে আসছে দু'জন মেট। গায়েব জামাটা ছিঁড়ে গেছে। চুল উস্কে-খসকে। চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে আঁশ। জেলের সাতের জিজ্ঞাসা-দৃষ্টিতে জমানারের দিকে চাইতেই সে বুক ঠুকে সেলাম জানিয়ে উজ্জকণ্ঠে অভিযোগ পেশ করল, কাম নেতি করতা হয়। ফিন্ মেটকো ভি গাদি দিয়া।

লোকনও উত্তেজিত হাব চেঁচিয়ে উঠল, আমাকে মেরেছে চক্কর! এই দেখুন—বল পিছন হিরে দাঁড়াস। পিঠের উপর, বাঁড়র পাশে চোড়া দাগ। কোথাও কোথাও কেউ গিয়ে রক্ত বেরিয়েছে।

—কে মেরেছে? প্রশ্ন করলেন জলর।

—ই মেট, বলে একটা অগ্নিদৃষ্টি ছুঁড়ে মাথল পাশেব এক জন মেটের দিকে।

—মেরে একে? মেটকে জিজ্ঞাসা করলেন তালুকদার।

—কাজ করে না। তাই বলতে গিয়েছিলাম। মা-বোন তুলে গালাগাল দিয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল সিপাই বাবুকে।

—তার পর?

মেট নিকন্তর। জেলের সাতের প্রশ্ন করলেন, মেরেছে কি না জানতে চাইছি। মেট এক বার জমানার এক বার সিপাইদের মুখের দিকে চেয়ে বিভ্র-বিভ্র করে বলল, একটা খাল্লু মেরেছি চক্কর!

সকলের অজ্ঞাতে জেলের সাতেরের ওঠের কোণে একটি স্ক্রল হাসির রেখা ফুটে উঠল। সেই চিরন্তন "এক খাল্লু" জেলের ডিসিপ্রিন বন্ধার প্রাথমিক তার যাদের উপর সেই সব সন্ধাব-কয়েদীর নাম মেট। কেতাবী নামটা বেশ গাল-ভরা কমভিক্ট ওভারসিয়ার। তাদের পোষাকের প্রধান অঙ্গ একটি চামড়ার বেণ্ট, তার সঙ্গে লাগানো পিঠলের চাপরাশ। কারণে, অকাবশে এই বস্ত্রটি তারা শাসন-দণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে প্রশ্নকর্তা অস্বীকার করে না, তাহিল্য ভের উত্তর দেয়, মেরেছি এক খাল্লু। যদি জানতে চান, দাগ হল কেমন করে, সূত্বের পাওরা বড়ই হুঙ্কর।

রাউণ্ডে যাওয়া বন্ধ রেখে জেলের আবার তার আসনে গিয়ে বসলেন। মহাবল সিং চুকল তার বানী, আসামী, সাক্ষী-সাবুয়ের দল-বল নিয়ে।

[ জমঃ।

॥ মাসিক বন্ধুসতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

# ব্যক্তিত্বে রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীঅজয়েন্দ্রনারায়ণ রায়

৩

রামেন্দ্রসুন্দর প্রস্তাব তুললেন—কবির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবার বয়স পঞ্চাশ হতে চলেছে, তাঁকে বাঙালার সাহিত্যসেবীদের পক্ষ হতে মানপত্র দেওয়া উচিত। আমি মনে করছি সাহিত্য পরিষৎ এতে অগণী হবেন। এই শুভেই বাঙালার এক শ্রেণীর সাহিত্যিকরা রামেন্দ্র বাবুর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁরা বললেন—রবীন্দ্রনাথ কী এমন করেচেন বাঙালার সাহিত্যের জন্ত, যাতে তাঁকে সম্মান দিতে হবে? শুভেই বললেন রামেন্দ্র বাবু—যুগপ্রষ্ঠাদেরকে এমনি অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। অনেক দিন আগে বুঝেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর—রবীন্দ্রনাথ এক জন হবেন বিশ্বের মধ্যে। সেই জন্ত নিতান্ত বন্ধু হলেও বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অবদানের কথা। কাণ্ডও কথায় কান না দিয়ে সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হতে সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা করালেন। বিরুদ্ধবাদীদেরকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাই লিখলাম—শ্রীযুগ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মশায়কে রামেন্দ্রসুন্দর যে চিঠি দিয়েছিলেন—আপনার পত্র পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। রবীন্দ্র সর্বেশ্বরের বিবরণ সবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধিত অভিনন্দন-পত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র রবীন্দ্র বাবুর পকাশ বহুত পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহার বহু বৎসরের সাহিত্যসেবার উপলক্ষ করিয়া দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছি মাত্র। কোনরূপ রাজ্য অভিষেক করেন নাই, কোনরূপ পদবী দাবী করেন নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া চিরকাল মত্তভেদ আছে ও থাকিবে। সে বিষয়ে পরিষদ কোন মত দিয়া গুপ্ততা দেখাইবে না, বা দেখান নাই। তবে তিনি বহু বৎসর সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিমাণও কম নয়; সে বিষয়ে মতবৈধ নাই। কাজেই একটা উপলক্ষ পাইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা পরিষদের অঙ্গার অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে।

এই ধারা পত্রে মর্মে মর্মে দেশবাসীকে বোঝাইয়া দিলেন, কবিকে সম্মান দেওয়া অপরাধ হয় নাই। আরও লিখলেন—এই কাজে এমন কিছু টাকাও খরচ হয়নি পরিষদের পক্ষে। বার জন্ত দেশের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। সাধারণের টাকা খরচ হইলেও অবশ্য আমাকে তাহার জবাবদিহি করিতে হইত। কিন্তু জানা উচিত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতায় আসিলে তাঁহার ব্যথোচিত সর্ধক্ষী করিয়াছিলেন পরিষদ। পরিষদের স্থাপনকর্তা ঐরমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকেও সর্ধক্ষী করা হইয়াছিল। বিদেশী সাহেব একবার পরিষদে আসিলেও তাঁহারও যথেষ্ট সর্ধক্ষী হইয়াছিল। বিজ্ঞানীগণের বহুসংখ্যক লাইব্রেরি যখন নিলামে চড়িয়া বাঙালীর হুই গালে চুপ-কালি মাথাইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন পরিষদ মধ্যে পড়িয়া ওই লাইব্রেরিট বন্ধা করিয়াছে। অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান দেখাইয়া পরিষদ কিছু অঙ্গার করে নাই।

এই ভাবে অনেক চিঠি লিখে রামেন্দ্র বাবুকে বহু কশাঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। তবু তিনি বিশ্বকবিকে উপেক্ষা করতে পারেন

নাই। বুঝেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এক কালে বিশ্ববাসীর মধ্যে এক জন সেরা মানুষ হবেন। হলেনও তাই। পেলেন নোবেল প্রাইজ। তখন বিশ্বকবিকে দেশের লৌক সম্মান দিতে গেলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, বলেছিলেন—আমি যদি আজ বিদেশ হতে নোবেল প্রাইজ না পেতাম, তাহলে ত আপনাদের চিনতেই পারতেন না।

হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রামেন্দ্র বাবুর সহপাঠী। তাঁর বাড়ী ছিল বহুবাজারে। তিনি জ্যোতিষী বিজ্ঞায় একজন পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। অনেক টাকা খরচ করে বহু বই আনিয়াছিলেন কান্দার হারিড ইত্যাদি দেশ হতে। তাঁর বিজ্ঞার পরিচয় পেয়ে অনেক জন্ত, উকিল, মোক্তার, সাবজন্ত, ডাক্তার এসে বাড়ী ভণ্ডি করে রাখতেন। গাড়ী, ঘোড়া, নটর ঠাঁড়িয়ে থাকতো।

সেই হরিমোহন বাবু প্রাইই আসতেন রামেন্দ্র বাবুর বাসায় আলোচনা করতে। নানা আলোচনার পর রামেন্দ্র বাবু শুধু হাসতেন তাঁর কথা শুনে। নানাকণ জিজ্ঞাসা করলে শুধু বলতেন, আমি অনেক পড়ে এ শাস্ত্রকে বিশ্বাস করতে পারিনি। হয় তো এক দিন ঠিকই ছিল। মনে হয় মুসলমান যুগে লুপ্ত হয়ে গেছে সম্পূর্ণ শাস্ত্র। তুমি ভাল ভাবে আরও পড়ো, তখন বুঝতে পারবে। তুমি ত শুধু বাক্যদান নও যে পড়ো পেলে খুশী থাকবে। এই ভাবে কথা হতো বন্ধুর সাথে। নব্বই বছর পর এক দিন হরিমোহন বাবু এসে বললেন রামেন্দ্র বাবুকে, এতো দিন পরিশ্রম করে রামেন্দ্র, বুঝলাম তোমার কথাট ঠিক। কতক মিললেও বুঝলাম সম্পূর্ণ নয় শাস্ত্র।

তখন আরম্ভ করলেন রামেন্দ্র বাবু—তোমার আক্ষেপ করো না। এটা ত একটা শাস্ত্র বটে। এক দিন এক জন মহাপুরুষ এসে নিশ্চয়ই একে সম্পূর্ণ করবেন। আমি ভেবেছিলাম, তুমিই বা সেই মহাপুরুষ। যে ভাবে আবহ করছিলেন।

তখন হরিমোহন বাবু হেসে অস্থির। আমি কী কথি-মুনি? আমার এমন বিজ্ঞা নাই একটা শাস্ত্র উদ্ধার করি। তুমিই পারো রামেন্দ্র, যদি ইচ্ছা করে। রামেন্দ্র বাবু শুনে কেবল হাসতে লাগলেন।

রামেন্দ্র বাবু পুজোর ছুটিতে আর ঘোম্বের ছুটিতে বাড়ী আসতেনই। তখন যেন একটা শিক্ষিত লোকের মেলা বসে যেতো জেমো নুতন বাড়ীতে। ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, মাষ্টার, পণ্ডিত বোকাই থাকতো নুতন বাড়ী। কান্দার ইচ্ছার মাষ্টার দেবেশ্রনাথায় বায় সে সময় উপস্থিত থাকতেন। তাঁকে রামেন্দ্র বাবু বললেন—তুমি লেগো ত দেবিন, আমি বলে যাঁই। তিনি লিখছেন এমন সময় রাম বাবু বললেন ছি দেবিন! ঘটিকা বানানে দীঘ ইকার দিলে। সেই একটা দিনের একটা কথা হতে শিক্ষা করে নিলেন দেবিন বাবু। সেই হতে গিলে খেতে লাগলেন বানান। এখনও তিনি ঝেঁটে আছেন। ওই অঙ্কলের মধ্যে এক জন বড় পণ্ডিত, বাংলা ভাষায়



ইংরাজি মতে শিক্ষা দেখে রামেন্দ্র বাবু মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, কী শিক্ষা হয় আমাদের বুঝি না। একটা কী ছুটো পাশ করে এসে ছেলে, তাকে তার না কি বাবা জিজ্ঞাসা করলে—হা রে। পচিশ টাকা সোনার ভরি হাল আড়াই আনার সোনার গহনা করে এলাম, কী দেখো বাবা বল? তখন স্তন্যেত পাবো—ও সব আমাদের পড়া হয় না। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করি আমার বাতীটা বেশে দে ত বাবা, সে বলবে আপনি অস্ত্রের কাছে যান। হা রে, দুটো পাশ করে এসে কী শিখে এসি বল ত? নিরুত্তর।

আমার জানা ছিল, কেউ তখনকার দিনে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে এ ধরী কথা বলতো না। সে সমাজের সব কাজ করার মত শিক্ষা নিয়ে আসতো। এখন অর্থশাস্ত্র করে এসে এ কী শিক্ষা! এ সবের মূল হচ্ছে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করতেই সব মেধা ব্যর্থ শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কাজের কিছু হচ্ছে না।

তৎকালীন লর্ড সার্ভের লর্ড রোল্যান্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি দিবসের সময়ে স্পষ্ট বলেছিলেন—রামেন্দ্রচন্দ্রের প্রাচীন নব্যতর শিক্ষা প্রণালীর একটা সূক্ষ্ম চিত্র প্রদর্শন। সেই চিত্র দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। সকলেই যেই তার অবলম্বন করে চলা উচিত। শিক্ষার মধ্যে ধর্ম ও নীতি কাস্ত্রের মত বিদ্যা না থাকিলে সে শিক্ষা শিক্ষাটী না।

জোমা কান্দার বড় বাবু রামেন্দ্রচন্দ্রের একটা দিন কলকাতার থেকে এলেন, একটু যদি কলকাতার দিন খানক কথা। দেশভ্রমণে সেই পাতাখানার ভাব। বসুকাহার বন্ধু-বান্ধব তাঁর বলতেন—হা রে বাবু! এখনও তোমার বাবো আমা তার গেল না! জগিত হয়ে যেতেন—তা হলে ত আমায় দুটো সেই দিন! আমি ময়ূরপুঞ্জধারী হলে বলতে চাই? যখন ডাক দিয়েছেন দেশের বড় বাবু তখন শিখিত অশিক্ষিত সকলেই তাজির। তখন ইংরাজি উনিশ শ' পাঁচ কী ছয় মাস। দেশের পোলে দেশের লোক আমাদের বড় বাবু শুধু পঞ্চায়েই মনে, তিনি আমাদের একজন স্বদেশী দেশচিহ্নিত। তিনি সকলকে ডেকে বলতেন—তোমরা বিদেশী কাপড় আর পরবে না। বিদেশী জিনিস ব্যবহার করবে না। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করে বল আমাদের স্বদেশী জিনিস মত খাওয়াপাওয়া ছোক, তাই আমরা ব্যবহার করব।

এমন করেও ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে না বুঝে রামেন্দ্র বাবু তাঁর ছোট কন্যাকে নিয়ে পাড়া প্রতিবেশী সকল মেয়ে-ছেলেকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন নিজের বাড়ীতে। কাঁচা সকলে এসে পায় করলেন—রামেন্দ্র বাবুর লেখা বঙ্গলক্ষীর বসুকাহার। মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন সকল ছেলে-মেয়েতে। একটা উদ্দেশ্য দেখা গেল সারা গ্রামে।

তখন সমস্ত গ্রামের অধিবাসীকে নিয়ে গেলেন কালী মাতার মন্দির। সস্ত্র সস্ত্র গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলো—আজ থেকে আমরা বিলাতি কাপড় পরবো না। বিলাতি জিনিস কিনাবো না, আজ থেকে হিন্দু-মুসলমান আমরা ভাই ভাই। এক হওয়া মিলে মিলে থাকবো আমরা। আজও মনে পড়ে ত্রিংশে আশিন কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে ঐ দিন বাঙালার লক্ষী বাংলা ছেড়েছিলেন। ঐ দিন আবার বাংলায় আসা অতিষ্ঠা হলেন। বাংলায় হাট-মাঠ জুড়ে বসলেন।

রামেন্দ্র বাবু যে আনন্দ বলার নয়। বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা

যেন রামেন্দ্র বাবুর নিজের মনের কথা। সাধে জানকী বাবু বলেছিলেন—রামেন্দ্র বাবু ভারতকে ভালবাসতেন কতকটা ভারত ভারত বলিয়াই, কিন্তু আরও ভালবাসতেন ভারত তাঁতার নিজের বলিয়াই। ভারতের যা কিছু—তাঁতার আকাশ মৃত্তিকা তাঁতার উদাস প্রান্তর, তাঁতার হিমালয়, তাঁতার ভাগীরথী, তাঁতার কথা, তাঁতার কবি ও দার্শনিক সবচেয়েই তাঁতার অমূল্য বস্তু তাঁতার। তাঁর ভারত বাধ্যকি বৃদ্ধির ভারত। যে কালের প্রভাবে নিমজ্জিত হ'লো, এই যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতেন। রামেন্দ্র বাবুর প্রকৃতি তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা সব দেশসেবার জন্য।

রামেন্দ্র বাবু নিজে সস্ত্র বাবু স্বীকার করে গেছেন, তিনি অন্তরে অন্তরে স্বদেশী। এই বীজ বপন করে গেছেন তাঁর পিতা যখন তাঁর বয়স অষ্টম বর্ষ।

একখান মার বই হ'তে রামেন্দ্র বাবু পরিচিত স্বদেশী হিসাবে। তিনি শুধু দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন দেশসেবক। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর মাতৃভাষাকে স্বীকার করাতে ইউনিভার্সিটি পক্ষ হতে। শেষকালে দেখেও গিয়েছেন।

প্রাণপণ বুদ্ধ করে গেছেন নিজের বিপণ কলত্রকে হাতে তুলে না দেশের ভক্ত গবর্ণমেটকে। এ ভক্ত সামান্য ভাগ স্বীকার করতে হয়নি রামেন্দ্র বাবুকে। কত বার বলে গেছেন রামেন্দ্র বাবু, বাঙাল হতেই হবে আমার বাংলা ভাষা। আমি না পেতে পেলেও কখন গবর্ণমেটের চাকরী নেবো না। হাজার হ' হাজার টাকা দিলেও গবর্ণমেটের গোলামী করবো না।

## ৪

পেড়লার সাতের রামেন্দ্রচন্দ্রের প্রাণদার ও গুণগ্রাহী। তিনি রামেন্দ্রচন্দ্রকে ডাকিয়ে বললেন—তোমার একটা চাকরী স্থির করেছি মতামত, তুমি এখানে যাও, নিশ্চয়ই তোমার উন্নতি হবে। গবর্ণমেটের চাকরী বুঝো না? একটু চিন্তা করে বললেন রামেন্দ্র বাবু—আপনাকে বাড়ী থেকে এসে পরামর্শ করে উত্তর দেবো।

হ' তিন দিন পরে বাড়ী থেকে এসে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন রামেন্দ্রচন্দ্র—আমার মায়ের মত পাওয়া গেল না। তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। বিবর্ত হয়ে সাতের বললেন তোমার মত হল না বল। তুমি কি দুঃখোয়া শিশু? মায়ের মত কবাত পাওলে না! তবে কি না সাব! আমার মত ছিলো না অতো দুঃখ দেখে চাকরী করতে। চমকে উঠে বললেন সাতের—দুঃখ দেশ! জানো আমি সতি সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এখানে চাকরী করতে এসছি। তুমি আমার চেয়ে কতো ছোট জানো? তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন—আমরা ঘরবান্দা বাঙালী। আমরা বাংলা ছেড়ে কোথাও চাকরী করতে পারবো না। তখন হাসতে লাগলেন পেড়লার সাতের।

হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে যখন মালব্যের ডাক এলো, তুমি এখানে চাকরী করবে এসো। হাজার টাকা মাহিনা দেবো, খাওয়া-খাওয়ার কোন বরচা লাগবে না।

বাড়ীর সকলে এ খবর পেয়ে আশ্বাসে বাঁচেন না। চারশো টাকার মাহিনায় এক পরয়া বাঁচ না, তা ছাড়া বড় বাবুর মা বুড়া, তাঁর পক্ষারানও হবে, যদি শেবই সেখানে হয় তো কন্ডাই নাই।

সকলে একত্রিত হয়ে স্থির করলেন রামেন্দ্রকে বলা যাক। সে মত করে কি না দেখা যাক। মা সন্ধ্যাে বলতে গিয়ে স্তন্যে পেলেন ছেলের বাচ্ছ—না! তোমরা বল ত আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু আমাকে একেবারে কাশীতে রেখে আসতে হবে। চাও ত আমাকে নিয়ে চল। এ কথা শুনে সকলেই নিরাক্তর।

কাশিমাজারের মহারাজা রামেন্দ্র বাবুকে বললেন, আপনাকে আমার কৃষ্ণনাথ কলেজে কাজ নিতে হবে। কলকাতার চেয়ে মাইনে বেশী দেবো। তাও বাড়ীর কাছে হবে, আমাকে মত দিন।

অনেক ভেবে রামেন্দ্র বাবু বললেন, আমি কলকাতার স্ত্রী সমাজ ছেড়ে সাহিত্য পরিষদ ত্যাগ করে কোথাও থাকতে পারবো না। আমাকে মাগ করন মহারাজ!

বাড়ীর লোক বুঝলো রামের নাতী পোতা আছে কলকাতায়, সে কলকাতা ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবে না। এমন সন্নিধিও ছাড়লে রাম! একটু যদি বোঝো বাড়ীর এতো কাছে চাকরী!

১৯০৩ সালে কৃষ্ণকমল বাবু ছয় মাসের ছুটি নিলে, রামেন্দ্র বাবু বিপণ কলেজের অধ্যক্ষ হলেন অস্ত্রারী। তারপর কৃষ্ণকমল বাবু আর যোগ দিতে পারেন নি। কলেজে তখন স্বামী অধ্যক্ষ হলেন রামেন্দ্রস্বন্দর। আইন এবং আর্ট পড়ান হ'তো বিপণ কলেজে। সকল বিদ্যোগেই অধ্যক্ষ হ'লেন রামেন্দ্রস্বন্দর। তখন মাত্র নরশো ছাত্র পড়ে কলেজে। রামেন্দ্রস্বন্দর চিন্তা করে দেখলেন—একা আমার সকল বিভাগ দেখা সম্ভব হবে না। তখন তিনি জ্ঞানকীনাথকে ল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন।

এই বিষয়েও কী কম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল রামেন্দ্রস্বন্দরকে! তদানীন্তন ডিরেক্টর পেড্‌লার সাহেব এসেন কলেজ পরিদর্শন করতে। তিনি ল্যাবরেটরী ও লাইব্রেরী দেখে হুং প্রকাশ করলেন এতো দৈর্ঘ্য কলেজের!

তখন সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী বললেন, রামেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে অনেক বিজ্ঞানের বই আছে, তাতে ছেলেরা অনেক সন্নিধি পায়। শুনেই সাহেব বললেন রামেন্দ্র বাবু ত বিপণ কলেজ নয়। আমি অনুমতি দিতে পারি না বি-এস-সি খুলিবার।

তারপর ভাইস্‌চ্যান্সেলার হলেন স্যার আন্তোথ। তিনি দেখতে পাঠালেন বিপণ কলেজ, পি. কে. সেনকে দিয়ে। দেখে এসে পরামর্শ আরম্ভ করলেন রামেন্দ্রস্বন্দর, পি. কে. সেন, স্যার আন্তোথ ও সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী। স্যার আন্তোথ বলতে চান রামেন্দ্র, তোমরা ভুল করে না। এমন গবর্ণমেন্ট নিজে ল কলেজ খুলতে চান। তোমরা কি গবর্ণমেন্টের সাথে জড়াই করে পের উঠবে?

তখন রামেন্দ্র বাবু উত্তরজিত হয়ে বলে উঠলেন, এ জীবনই ত সংগ্রাম। দেখাই যাক না। আত্মহত্যা নীতি আমি পছন্দ করি না। শুনে সকলেই বুঝলেন। রামেন্দ্রস্বন্দর সহজে ছাড়বেন না। তার পর সুরেন্দ্র বাবু ট্রাষ্টী গঠন করলেন স্যার রামবিহারী, লর্ড সিংহ, রাঘবকৃষ্ণনাথ সেন বাহাদুর, কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রস্বন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে নিয়ে। সেক্রেটারী হ'লেন রামেন্দ্রস্বন্দর।

তার পর থেকেই প্রবল ঝড় ব'য়ে গেল রামেন্দ্রস্বন্দরের মাথার উপর দিয়ে। তাঁর স্ত্রান্নিষ্ঠা, সত্যের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, দুর্বার

সাহসের জগাই বক্ষা পেলো বিপণ কলেজ। রামেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞেস করলেই বলতেন—এ ভগবানের দয়া। তাঁর ইচ্ছা না হ'লে এ কলেজ বন্ধ পোতো না।

প্রতিজ্ঞা করলেন রামেন্দ্রস্বন্দর—এ কলেজকে বি. এস-সি, পর্যায় তুলতেই হ'বে। আর্ট-দশ বছর গবর্ণমেন্টের সাথে জড়াই করে বি. এস-সি পড়াবার অনুমতি পেলো গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে। এই সময় কী দুঃসহ যাতনা ভোগ করেছিলেন ত্রিবেদী মহাশয়, বঙ্গার নয়।

এক দিন এক বন্ধুর প্রার্থে উত্তরে বলেছিলেন—আমি এ কলেজকে এতো ভালবাসি, আমার নিজেই মনে করে। তা ছাড়া সুরেন্দ্র বাবু যুক্ত আছেন বলে আশাও। তিনি যে এমনো প্রতীক স্বাদিনতা-যুদ্ধের।

কলেজের নিয়ম পঞ্চাশ মিনিট পড়াবার। জ্ঞান থাকতো না রামেন্দ্র বাবুর, পড়িয়েই চ'লেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কেও মনে পড়িয়ে দিলে বলতেন—এ আমার নিজের ছেলেদেরকে পড়াচ্ছি, সময় দেখে কী পড়ান সম্ভব?

আর একটা কথা, রামেন্দ্র বাবু ভাল্লাবসেনের ছেলেদেরকে সেন বাড়ীর ছেলে। ছাত্ররা এসে বলতো রামেন্দ্র বাবুকে, স্যার আমরা খেলবো অমুক কলেজের সাথে। তখনই তিনি পরিচয় করে তাদেরকে বলতেন—পারবি ত? এ মাং, আমার নিশ্চয় বলাচ্ছি পারবো।" দেবিস সেন আমার মুখ হাসান নে। পারি যদি কী দেবেন স্যার? আমি ছেলেদেরকে পাঠাব। আর স্যার কোথা! ছাত্রদের দল হাসতে হাসতে চলে গেল। জগদ্বাহ করে এসে রামেন্দ্র বাবুর কী খুসী। সেন তাঁর ছাত্ররা ভাবত জয় করে এসেছে। তখনই ভকুম পাঠিয়ে দিলেন স্বামী ইন্দুপ্রভা দেবী বাচ্ছ—আজ এখনই একশ' জন ছাত্র আমাদের বাড়ীতে থাক। ইন্দুপ্রভা দেবীও মেয়ে গেলেন আরোহণে। ছাত্ররা প্রচুর আহার করে গেছে কত দিন। এ সেন রামেন্দ্র বাবুর নিত্যকথ্য ছিল।

ছোট্টো ছাত্রদের বিবাদ হচ্ছে খাওয়া-বাপার নিয়ে। স্বপারিনটেনডেন্ট কিছুতেই মিটাতে পারেন না। রামেন্দ্র বাবু শুনে তার দিলেন আর একজন ছাত্রদেরদা প্রকোষকে। তিনিও অক্ষম হলেন। তখন রামেন্দ্র বাবু নিজেই ভাব নিলেন। সকল ছাত্রকে ডাকিয়ে বললেন—সত্যই অগ্রগণ্য আমি তোমাদের অভিযোগ শুনবো। এ ক'দিন তোমাদেরকে শাস্ত ভাবে থাকতে হবে। আর একটা কথা—সেদিন আমি তোমাদের সাথে একসঙ্গে খাবো। কী যোগাড় করো দেখলে।

শুনেই ছাত্ররা আহ্লাদে বাড়ে না। অধ্যক্ষ আমাদের সাথে থাকেন! তাঁকে ভাল করে প্রার্থাতে হবে। সে যোগাড়ই সকল বিভেদ ভুলে সকলে এক হয়ে খাটতে লাগলো।

ঠিক সময়ে রামেন্দ্র বাবু বললেন—রাজগ পেটুক মানুষ, তোমরা জানো ত? তারা এলে ছাঁদ নেয়—তখন হেসে ছাত্ররা বাগ দিয়ে বলল—আপনাকে আমরা জানি স্যার! আপনি কেমন ছাঁদ নেওয়া বায়ন, তা-ও জানি।

তখন হেসে বললেন রামেন্দ্র বাবু—আমার সাথে দৌছিত্রোও আসবে সব, হবে তো? ছাত্ররা খুসীর ধুমে বলে—হু-তিনটে ছেলে আনবেন তার জন্তে এত বললেন? হু-তিন শো লোকের আয়োজন করেছি আমরা।

সন্ধ্যা আটটার পর রামেন্দ্র বাবু খেতে গিয়ে বসলেন—যে সব ছাত্রদেরকে ছোট জাতি বলে ঘৃণা করে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা, ঠান্ডেই পাশে নৌতিরদেরকেও বসালেন সেই সব ছাত্রদের পাশেই। এতো বড় ব্রাহ্মণকে ওই সব জাতির পাশে বসে খেতে দেখে ছাত্ররা বিস্মিত। যা নিয়ে এতো দিন এতো বিরোধ চলে এসেছে, একদিনের একটা ঘটনায় তার মূলোচ্ছেদ! খেতে খেতে তিনি কেবল বলেন গল্পচ্ছলে—জাতি সৃষ্টি করেছে আমাদের অজ্ঞানতা। আমাদের পরাধীন দেশে একটা কাজ চাই তো! তখন জ্যাস্ত খুড়ার গন্ধাধারা দবাভো! এ-ও হাই! দেশ যখন স্বাধীন হতে থাকবে তখন এই জাতিভেদ সাপের খোসার মত আপনি ঝবে পড়বে। এসব শিগবে তোমাদের মত লেখাপড়া ছাত্রদের কাজ হতেই সমাজ।

খাওয়া দাওয়া'র পর সকল ছাত্র এক হয়ে অম্মা চাইল রামেন্দ্র বাবু'র কাছে। বললো—আমরা তুল করেছি সার! আপনি আমাদের জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছেন সার!

বিপণ কলেজের যখন ষষ্ঠ তৈয়ারী হয়ে উঠে গল নতুন বাড়ীতে, তখন অধ্যক্ষের জন্ম একটা পৃথক ঘরের ব্যবস্থা হলো। তা'ছাড়া উনিভারসিটিও এই মত।

তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন ভার হয়ে—আমাকে একঘরে দরবেন কেন আপনারা? আপনাদের সাথে থাকলে কী অসুবিধা মানার? কেউ উত্তর দিতে পারেন না তখন।

আমি চাই একটা কলেজ মাগগাভিন বার করতে। তার জন্ম নব দিলেন প্রফেসরদের মধ্যে এক জনকে। এর নাম দিলেন বিপণ-কলেজ পত্রিকা। সকল প্রফেসরকেই উৎসাহ দিতেন লিখবার জন্ম। কখনও নিজের ভাবে ভাবিত করে নিরুৎসাহ দরতেন না প্রফেসরদিগকে। স্বাধীন ভাবে সকলকে লিখবার সুযোগ দিতেন। এই সময়েই বের হয় ক্ষেত্র বাবুর "অভয়ের কথা।" এই বই পড়ে খুশী কতো রামেন্দ্র বাবু। আরও উৎসাহ দেওয়াতে দু'-এক নি বই লিখে অমর হয়ে আছেন ক্ষেত্র বাবু।

রামেন্দ্র বাবু এলেই প্রফেসরদের মধ্যে উৎসাহের একটা বান ডেকে যেতে! ভাবতেন, আর কিছু না কিছু শুনতে পারো। তিনি সেই আরম্ভ করতেন গ্রীক সভ্যতা থেকে ফে করে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের বিবরণ। দান দিন বা বৈদিক যন্ত্র, কোন দিন গীন্দ্রদর্শন। কখনও বা বৈষ্ণব দশ তত্ত্ব। কটা আনন্দ-হিজোদ বইতো। যেন একটা রোট খনি মাটি থেকে তুলিয়ে নিতে গিলেই হয়, সোনা না হয় হীরে।

এই সময় বরীশুনানারায়ণ বোধ বলতেন—আমি রামেন্দ্র বাবুকে খুব বড় একজন গুণিত বলে কেবল চিনতাম। তাঁর সাথে খাও গতো কোন সভা-সমিতিতে। তাঁর গুণিতপূর্ণ বক্তৃতাও শুনতাম। কিন্তু এমন বের প্রাণ খুলে মেলবার সময় হয়নি। এখন

দেখছি আমার আত্মায়ের চেয়ে বড়। এখন আমি তাঁর ব্যবহারে অভিজ্ঞত।

দেখছি রামেন্দ্র বাবু দর্শন ও বিজ্ঞান ভালবাসেন বলিয়া সেই বই কেবল আনাইতেন না। নাটক নভেলও আনাইতেন সকলের মানোরঞ্জনের জন্ম।

রামেন্দ্র বাবুর অধ্যাপক-সম্মা স্থাপন করলেন বিপণ কলেজে। এর মধ্যে প্রাচীন নবীন বলে কোন প্রভেদ থাকলো না। তিনি এসে উৎসাহ দিতেন, আর বলাতেন ছাত্রদেরকে—স্বাধীন হবার শিক্ষা দিন। তারা যেন জগতের কাছে বলতে পারে আমরা পরাধীন নই।

তখন একটা ঠৈ-ঠৈ বাপার স্ত্রীস্বর বোসকে নিয়ে সারা বালার। ওটেন সাহেবকে নিয়ে সকলেই প্রায় বলে—এটা ছাত্রদের খুবই অগায় শিক্ষকদের উপর। তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন—ও সব ছেলে যে মানবে না পরাধীনতা, ও শুনবে কেন অজ্ঞায়! সঠিবে কেন বাধাবরা নিয়ম!

৫


এক সময় বৃক্ষকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বলেন—আমার মত ভট্টাচার্য্য বামুন ত নয় রামেন্দ্র? ও বামুঁকির বাম, বেদের ইন্দ্র, কালির ভারতচন্দ্রের স্তম্বর। ওর সঙ্গে আমার তুলনা? আমি তো ফলাবে পেটো-কাড়া একজন বামুন। জ্ঞানে-বিজ্ঞায় ক'জন রামের মত আছে বল দেখি!

জ্ঞানবৃক্ষ ভ্রাঙ্কি মুক্ত কণ্ঠে নিজের কথা বলে গেলেন। তার পর ভূগঙ্গী প্রশংসা করলেন রামেন্দ্র বাবুর।

এক সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য পরিষদের উপর বিরক্ত হয়ে সাহিত্য পরিষদ ত্যাগ করলেন। তখন সকলেই ভাবলেন

ফোনঃ ৩৪-৪৯০২

G.V



বিবাহে যৌতুক দানের আনন্দ একান্তভাবে আপনার; আপনাকে সেবা করার আনন্দ আমাদের।

**গিনি ভবন**

১০২, বহু বা ডায়াল স্ট্রীট, কলি. ১২

ব্রাঞ্চ ৪—২৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

(রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল)

অতো বড় পণ্ডিত একজন তাগ করলেন সাহিত্য পরিষদকে ! বাপার কী ! কোন সন্ধান জানতে না পেরে প্রশ্ন করলেন রামেন্দ্র বাবুকে । তিনি বললেন—বলারো কী ছাই ! নতুন নতুন লোকের মত সম্বন্ধ করতে পারচেন না । সকলে একমত হয়ে সাড়া দেবে এ কেমন কথা । নিজের মতবাদ বিসর্জন দেবে এ-ও কী হয় ! তাহলে কী শাস্ত্রী মহাশয়কে আর পাবেন না সাহিত্য পরিষদ ? তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন, এখন আমাকে বোঝাতে হবে ।

কিছু দিন বিরাগ থাকার পর শাস্ত্রী মহাশয় একখানি প্রাটিন গ্রন্থ রমাকল্পদ্রুম রামেন্দ্র বাবুর হাতে দিয়ে বললেন—এটা সাহিত্য পরিষদকে দেবে ।

তখন রামেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করলেন, এতো ভালবাসেন যখন সাহিত্য পরিষদকে, তবে বিরাগ কেন ?

—আমি লোকের কথা সইতে পারি না, তখন হেসে পণ্ডিতবরকে বললেন—কথা শুনে হবে । এরা যে নতুন যুগের মানুষ । এ ধারা আলোচনা হওয়ার পর আবার তিনি যোগ দিলেন সাহিত্য পরিষদে ।

প্রায় শাস্ত্রী মহাশয়কে বলতেন—আমরা কাজ করতে এসেছি কবে যাবো । আমরা নামের পদের আকাঙ্ক্ষী নই । কোন দিনও কোন পদের জ্ঞান আমরা আকাঙ্ক্ষা করবো না । সমস্ত জীবন সাহিত্য সাধনা করে যাবো—তাই হয় । আমার মত লোককে ওরা সম্পাদকের ভার দিলো না, কার্কে আর দেবে বল ত ? হেসে বলতেন—হয় তো আমার ও ভার বহন করার শক্তি নাই ভেবেচেন ।

তেজস্বী ব্রাহ্মণ তখন বলতেন—তাই বলে অজ্ঞায়ের তোবামোদী করতে হবে ? তাও হয় বহুজনের মতের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয় । রামচন্দ্রকেও এই রকম ভাবে রঞ্জন করতে হয়েছিল প্রজ্ঞাসাধারকে ।—তোমাকে পারবার উপায় নাই রাম ! আমি ত রাম নই ।

এর অনেক দিন আগের কথা । অক্ষয় সরকার তখন নবজীবনের সম্পাদক । তাঁর সাথে একটু পরিচয় ছিল রামেন্দ্র বাবুর । তখন রামেন্দ্র বাবু পাঠ্যজীবন । একটু-আধটু লেখারও সখ ছিল । তিনি গিয়ে অনেক আলোচনা করতেন লেখার বিষয় নিয়ে । কেমন ভাবে লিখতে হয় তাও বলে দিতেন । এক রকম বলতে গেলে তিনিই গুরু রামেন্দ্রস্বন্দরের । এ সব আলোচনা রামেন্দ্র বাবুর প্রথম কলেজ চুকেই ।

বি, এ, পরীক্ষা দেওয়ার পর প্রথম মনে হলো এবার লিখতে হবে । এতো লজ্জা যে নাম দেবারও সাহস হয় না । লেখা পাঠিয়ে দিলেন নবজীবনে । ভয়ে ভয়ে থাকেন লেখা বের হয় কি না । বের হলো বেনামীতে নয় স্বনামে । এই প্রথম হাতে-খড়ি বলতে হয় ।

সরকার মহাশয় রামেন্দ্রস্বন্দরের ভাবগম্ভীর ভাষা যতদূর বললে হয় বের করলেন । রামেন্দ্র বাবু ভেবে পান না—আমার নাম পেলেন কী করে ! তার পর মনে এলো একবার যাদের লেখা দেখেচেন তাদের নাম-ধাম ভুল হয় না ।

তখন রামেন্দ্র বাবুকে পেয়ে বসেছিল কালাঁপ্রসন্ন বাবুর ভাব-গম্ভীর ভাষা । তিনিই বললেন নিজে—এই ভাব কাটিতে আমার অনেক দিন লেগেছিল । ভাবতাম এ ভাষা ছাড়া ভাব প্রকাশ

করা যায় না । অনেক চেষ্টার পর আমার জ্ঞান হলো, নিজের ভাষা না হলে সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায় না । সেই থেকে রামেন্দ্র বাবু কখন অমুকরণ করেন নি জীবনে । তখন বুঝলেন, কেন অক্ষয় বাবু কেটে কুটে ভাষা বদলে বের করতেন ।

তার পর স্মৃতিস্রাব্ধ ঠাকুর বার করলেন সাধনা । তখন রামেন্দ্র বাবু আকাশ-পাতাল নামে এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দিলেন । সেই প্রবন্ধ বের হওয়ার পর রামেন্দ্র বাবুর উৎসাহ হলো লিখবার । তখন কয়েকটা প্রবন্ধ লিখে দিলেন । সমস্ত কয়টাই বের হতে লাগলো সাধনায় ।

তখন আর একটা মাসিক বের হলো জন্মভূমি, বঙ্গবাসী অফিস থেকে । ফটোগ্রাফ বলে এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তিনি দিলেন । রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বের করলেন ‘দাসী’ বলে এক মাসিক পত্র । তিনি চেয়ে পাঠালেন প্রবন্ধ রামেন্দ্র বাবুকে । খুসী মরে না রামেন্দ্র বাবু—এখন আমাকে চাইতে লেগেছে গো । আমিও এক জন লেখক ছলাম । পর পর কয়েকটিই পাঠিয়ে দিলেন ‘দাসী’র সম্পাদক রামানন্দ বাবুর নিকট ।

তারপর বের হলো এক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র সাহিত্য । এটা বের করলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি । তিনি বলে রাখলেন—রামেন্দ্র বাবু ! তোমার লেখা আর অল্প কাগজে দেওয়া হবে না, আর থেকে তুমি আমার ।

কী করেন রামেন্দ্র বাবু, যত সব লেখা দিতে হয় সমাজপতির কাগজ সাহিত্যকে । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উমেশচন্দ্র বটবাস, রজনীকান্ত গুপ্ত, আনি বেসান্ট, সামাজিক বাণী ও তার প্রতিকার, ধর্মের প্রমাণ, ধর্মের জয়, সত্য, আত্মার অবিনাশিতা, মাধ্যাকর্ষণ, অমঙ্গলের উৎপত্তি, মায়াপুরী, এই ধারা সর্গজননমিত বহু প্রবন্ধ সাহিত্যের কলেবরে আত্মপ্রকাশ করেছে ।

তখন রামেন্দ্র বাবুর খ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে । তাঁর প্রবন্ধ পাবার জ্ঞান সকল মাসিক পত্রিকার সম্পাদক উন্মুখ হয়ে আছেন । যদি কেউ কোন প্রবন্ধ রামেন্দ্র বাবুর কাছে থেকে নিয়েচেন, কী রাগ সমাজপতি মহাশয়ের ! তিন চারটে প্রবন্ধ লিখে তবে রাগ ভাঙতে হত রামেন্দ্র বাবুকে ।

তের শো দশ সালে রামেন্দ্র বাবু ‘জিজ্ঞাসা’ নামে একখানা বই বের করলেন । তাকে কয়েকটা প্রবন্ধ আছে ‘স্বথ না দুঃখ’, ‘সত্য’, ‘জগতের অস্তিত্ব’, ‘আত্মার অবিনাশিতা’, ‘মাধ্যাকর্ষণ’, ‘এক না দুই’, ‘অমঙ্গলের উৎপত্তি’, ‘বর্তমান’, ‘পঞ্চভূত’, ‘উদ্ভাপের অপচয়’, ‘কলিত জ্যোতিষ’, ‘নিয়মের রাজত্ব’, আরও দু’চারটে প্রবন্ধ জুড়ে ।

বই যখন রামেন্দ্র বাবুর হাতে পড়লো তখন খুশী ধূমে আচ্ছন্ন হয়ে ভাবলেন—কোথায় আমার স্বর্গগত পিতা ! যিনি আমার ভিতরে স্বাধীনতার রাজ বসেছিলেন । একমাত্র তাঁরই আশীর্বাদে আমি মরুভূমি অতিক্রম করে চলেছি । পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুষ্কপ্রায় । কবে আমার পিপাসার নিবৃত্তি হবে দেব ! চোখে জল পড়তে লাগলো । ঈশ্বরপ্রভা দেবী এসে বললেন—তোমার বই না কি ছাপিয়ে এনেচো ? কৈ একখানা নাও না ? তখনই একখানা বই হাতে নিয়ে দেখেন, স্বামীর চোখে জল । তুমি কাঁদছো কেন ? দুঃখে নয় ভাবাবেশে । আনন্দের দিনে আমার বাবাকে মনে পড়লো । আচ্ছা তুমি এতো লিখছো বোঝা যায়

না কেন? রামেশ্বর বাবু বললেন, বাঃ, আর কেও না বুঝুক তুমি ত বোঝো। আমার বই।—বুঝি না ছাই। তুমি থাকো, বুঝিয়ে দাও তবে।—না-না; তুল ব'লচো কত সময় তুমি ব'লো এই জায়গাটা কেমন লাগচে। সত্য ব'লচি কেমন যেন সে স্থানটা বুঝতে পারিনি। ভুলই লিখেছিলাম। বাবা ইচ্ছলে যেতে দিতে ভালবাসতেন না। তুমিও পড়ালে না, আমি আবার মাঝুঃ! ক'কে বই পাঠাচ্ছা নাম লিখলে যে—ওঁর নাম জানবে না। রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা। আমারও ব'লতে পারো বড় দাদা।

সেই 'জিজ্ঞাসা' বইখানা পেয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন বিজ্ঞেন্দ্রনাথ তাই এনে চক্কা দেবী তাঁর কল্লা ও তাঁর মাকে শোনাতে লাগলেন।

“শাস্তিনিকেতন, ১০ই অগ্রহায়ণ।

সাহিত্য পরিষদের ঝট্টো বঙ্কাবলীর শির-স্থানীয় একমাত্র সারস্বত বহুমানাস্পদ ত্রিবেদী মহাশয়!

আপনার পুস্তক পাঠিয়া পরম লাভ বলিয়া মনে করিলাম। ‘জিজ্ঞাসার’ প্রথম অধ্যায় পাঠ্য করিয়া যেরূপ আনন্দ বস অনুভব করিলাম তাহাতে কৌতুহল জাগিয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ের আরও কয়েকটা পাতা পাঠ্য করিলাম; ইচ্ছা এক দৌড়ে শেষ পৃষ্ঠাব কুলে উপনীত হই। কোমর বাঁধিলাম পষান্ত। কিন্তু আর পারিয়া উঠি না, মনের খেদে পুস্তকখানি বন্ধ করিলাম। আমার পুস্তকখানি হ’ল দিনের উপায়ে খোঁজা হইবে। ভূরি ভোজন করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিব না। যতখানি পড়িলাম অকুদ্রিম সত্য বলিয়া মনে হইল, সমস্তই মধুমক্ষী। পাঠ্য সমাপ্ত হইলে আমার যাত্রা বলিবার কথা তাহা কোন মত ভাবে বলিবার চেষ্টা করিব।

আপনার ঔণাভবক

বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পর শুনেই স্ত্রী ইন্দুপ্রভা প্রশ্ন করলেন—তোমার সাধের সাহিত্য পরিষদের লোকদেরকে ঝট্টো বললেন কেন? তখন হেসে অস্তির রামেশ্বরবন্দ্যঃ বললেন, তোমার সমাজপতি হওয়া উচিত ছিল। তোমার মত সমালোচক ত দেখিনি মেয়েদের মধ্যে!—তা হবে না! অতো বড় লোক লিখলেন কেন বলতে হবে? তখনও হাসি ছাড়েনি রামেশ্বর। আমাকে বাড়াবার জঙ্ক, বুঝলে না?

রামেশ্বর বাবুর ‘জিজ্ঞাসা’ পড়ে খুবই ভাগ লেগেছিল বিজ্ঞেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের। কয়েক দিন পরই আর একখানি চিঠি লিখে অস্ত্রের খবর নিয়ে চিঠি লিগলেন।

তখন শুয়ে আছেন রামেশ্বর বাবু বিছানায়। আর সকলেই আছেন বাড়ীর লোক। এমন সময় শিগুন এসে চিঠি দিয়ে গেল। রামেশ্বর বাবু বললেন তাঁর কল্লা চক্কাকে, তোর মাকে এনে এই চিঠি খানা পড়।

“শাস্তিনিকেতন, ১লা পৌষ,

প্রিয় ত্রিবেদী মহাশয়, ‘জিজ্ঞাসার’ আমি হৃদ্য চার পাঁচ অধ্যায় পড়িয়াছি। আপনার গ্রন্থখানি জিনিষটা খুব ভাল—বিশেষতঃ আমার মত অকেজো লোকের পক্ষে। কিন্তু সকল পাঠকের পক্ষে তাহা আমি বলিতে পারি না। কারণ বিজ্ঞানবের অবোধ ছাত্ররা তাহা পড়িলে খুব সসারের আবর্তে পড়িয়া হাবুডু বুটয়া তাহাদের প্রশান্ত পরিচ্ছেদ হইবে। চন্দ্রের ওপরি কেউ চক্ষ দেখে নাই, অতএব চন্দ্রের ওপরি সহিত এপরি সম্বন্ধ কিরূপ তাহা মনুষ্যের জ্ঞানাতীত। এ কথাটা আপনি খুব জোরের সহিত প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ সবকিছু একটি কথা আপনার প্রতি বক্তব্য আছে। আত্মোপাস্ত পাঠ্য করিয়া আপনার নিকট ভাস্কর, এখন না। কিন্তু আপনার শরীরটার আন্ত আরোগ্য প্রয়োজনীয়। তাহার পর অজা কথা। আপনি ভাল আছেন ভনিলে আরও মনের কথা জানাইব।

আপনার ঔণাভবক

শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর।”

চক্কা, এক বার তোর মাকে জিজ্ঞেস কর তো, কী অজ্ঞার দেখলেন কোথায়?

তখন ইন্দুপ্রভা দেবী বললেন ঠিকই ত লিখেছেন। তবে আমাদের মত লোক তোমার লেখা পড়ে হাবুডু খাবে।

তখন রামেশ্বর বাবু বললেন—দেখ, তোর মা ঠিক ধরতে পারে কি না! আমি কোন লেখা তোর মাকে না দেখিয়ে কাগজে বের করি না।

চক্কা, তোর বাবাকে বলে নলেন লেখাতে পারিস, নে। তা হ'লে অনেক লোক পড়তো। আর একটা কাজের মতো কাজও হ'তো।

তখন রামেশ্বর বাবুর উচ্চ হাস্যের শ্রোতে ঘর ভরে উঠলো।

[ক্রমশঃ।

## যক্ষা ব্যাধির নয়া প্রতিষেধক

মহাশয়-জীবনের পক্ষে যক্ষা ব্যাধি মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধির প্রতিকারকল্পে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের প্রয়াস ও গবেষণার অন্ত নেই। সফল ও এর ভেতর পাওয়া গেছে প্রচুর, এইটী স্বীকার করতেই হবে অসঙ্কোচে। অন্ততঃ এককালে যে বলা হ'ত ‘যাব হয়েছে যক্ষা, তাব নেই বক্ষা’, এ যুগে কথ্যটি ভবত সত্য বলা চলে না; এ ব্যাধি নিরাময়ের জঙ্ক এর ভেতর বহু ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র বের হয়েছে এবং আরও বের করার জঙ্ক অব্যাহত উদ্ভ্রম চলেছে বিশ্বের নানা বায়গায়, বিভিন্ন গবেষণাগারে।

যক্ষা ব্যাধির প্রতিষেধক টীকা হিসাবে বি. সি. জি. আন্ত অনেক

দেশেই চালু। সম্প্রতি বহু গবেষণাস্থলে আর একটি নতুন প্রতিষেধক ঔষধ বের করেছেন ডাবলিনের আইরিশ মেডিক্যাল বিসিট কাউন্সিল। জঙ্কর উপর এই ঔষধের কায়াচিকিৎসা—যা পরীক্ষার প্রমাণিত হয়েছে, সম্মিলিত গবেষণাগারের ডিরেক্টর ডঃ ভিনসেন্ট প্যারী সে সকল বিস্তারিত ঘোষণা করেছেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক ভাষণে। ঔষধটি ডাবলিন ড্রাগ (সেবোরেটরি লেবেল বি ৬৬৩) নামেই এখন পরিস্ত পরিচিত। যক্ষার আক্রমণ প্রতিরোধে মহাশয়-শরীরে এর প্রয়োগ যদি ঠিক ভাবে হয়, তবে দ্রুত এবং নিশ্চিত সাড়া পাওয়া যাবে—আইরিশ আবিষ্কারক সংস্থাটি এ বিশ্বাস ও দাবী রাখেন।

# বর্ণালী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

মূলখা দাশগুপ্তা

মুগ্ধ উপরে উঠে এসে দ্বিদিনকে ও-ভাব চোখে হাত-ঢাকা দিয়ে বসে থাকতে দেখে একটা পা-টেপা ভাবের কাছে এগিয়ে এসে মৌরীর চোখের নোচে হাত ছোঁয়াল।

—এ কি হচ্ছে? মৌরী ঠেলে দিল মগ্ধের হাতটা।

—অন্ধকারে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নি, তাই দেখছিলাম তুই কীদছিস কি না।

—কীদব কেন? ভুল ঘোরালো মৌরী।

—কীদবি কেন? কারণটা আমি কি করে বলব? কেন সে এক এক সময় ভীষণ কীদতে ইচ্ছা করে, তার কারণ মাহুব নিজেই বুঝে উঠতে পারে না; তা পরে বলবে। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

—তোর কি মনে হয়?

—আমার কি মনে হয়? আন্দাজ করতে বলছিস? ঠিক না হলে মাথার বাড়িটাড়ি মেয়ে বদবি না তো?

—না।

একটু ভাববার ভঙ্গি করে মগ্ধ। তার পর বলে—নামটা স্বদর্শন, ভাবছি নামের প্রভাবটা হয়ত চরিত্রে কিছু আছে। তা মন্দ কি। প্রেমিক মাহুব, ভালো তো।

—প্রেমিকদের মেকির কারবারই চাণ্যেত হয় বেশী। অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়াল মৌরী।

—দেখ দিদি, বাড়াবাড়ি করিস নে। যার সঙ্গে আজ বাদে কাল বিয়ে—

—ঈ তার জগ্গই। নইলে ভাবনাটা ছিল কি। এই পরিচয় তো শেষ হয়ে যেত আজই।

—ব্যাংলি! এখন শেষ হয়ে যায় নি তাহলে! একটা স্বস্তির নিশ্বাস টানার ভাব করে বসে পড়ে মগ্ধ। মাথাটা চেয়ে সে তেমনি আকাশের দিকে।

চাঁদটা তখন উঠে এসেছে একেবারে মাথার উপর কিন্তু আলোটা তার আর আগের মত স্পষ্ট নেই। হাওয়ায়-ওড়া পাতলা মেঘ ভেসে ভেসে এসে ঢেকে ফেলেছে তাকে। আর সে তারই এ-কীক ও-কীক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচা করছে কেবল তার উজ্জ্বল রূপটা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে। রূপ দেখার তৃষ্ণার চাঁটে রূপের নিজেই দেখাবার তৃষ্ণা যে একটুও কম প্রবল নয়, যেন তারই একটা দৃষ্টান্ত চলছে আকাশেও।

চেয়ারে মাথা রেখে মগ্ধকে ও-ভাবে বসে থাকতে দেখে মৌরী বলে—হ্যাঁং যেন তুই বউ ভাবনার পড়ে গেলি মনে হচ্ছে?

—তোর কি উপায় হবে তাই ভাবছি।

—আমার উপায় ভাবছিস! হেসেই ফেলল মৌরী। আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে মনের চাপা ভাবটাও যেন গেল অনেকটা ওর হাপকা হয়ে। তা স্থির করতে পারলি কিছু?

—স্থির করা ব্যাপারটা কোন সময়ই তেমন কিছু কঠিন নয়। বিশেষ করে তোর বেলা তো নয়ই। কঠিন হলো যে স্থির করার নিয়ে পৌছানোর পথ মেলা নিয়ে।

—অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে তার ধারণাটা এমন পরিষ্কার যে, উপায় খুঁজতে একটুও অন্ধকার হাতড়াতে হয়নি। ঠেকে গেছিস সেই উপায়ে গিয়ে উপস্থিত হওনি নিয়ে। পথটা খুবই দুর্গম বুঝি?

—দুর্গম বলে কোন শব্দ নেই মগ্ধবীর অভিধানে। পথই নেই। নির্ভয়ে সঙ্গে দেওয়া যায় এমনি পাত্রেব কথা মনে পড়ে গিয়েছিল কিন্তু কোন পথ নেই যে গিয়ে উপস্থিত হবে প্রস্তাবটা নিয়ে।

—কেন তোর আগেই অপর কেউ গিয়ে প্রস্তাবটা করে ফেলেছে? চোখ মিটমিট করল মৌরী।

—না। যিনি ঠীকে সৃষ্টি করেছেন তিনিও তাঁর জগ্গ উপযুক্ত কল্পা বানিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই একটা তুচ্ছ কারণ তৈরি করে অববাহিতই রেখে দিয়েছেন।

এই বাব সত্যিই কোতুল লোধ করে মৌরী।—নামটা বল তো? দেখি প্রস্তাবটা নিজেই গিয়ে করে উঠতে পারি কি না।

—বললাম যে, তার উপায় নেই।

—বেশ, উপায় না থাকে প্রস্তাবটা না হয় নাই-করা গেল। পরিচয়টা জানতে বাধা কি?

পরিচয় কি দেবে মগ্ধ! ও কি কোন বাস্তব লোকের কথা বলছে? মগ্ধ জানে, যোগাযোগ বইখানা দিদির কাছে ধর্মগ্রন্থ বিশেষ, বিপ্রদাস ওর কাছে আদর্শ পুস্তক, কুমু ওর মন খাবারের অধুণ। মনের তুলান থানাতে কুমু চোখ বুজে আত্মতৃপ্তি করত “প্রিয়: প্রিয়স্বামীসি দেব সোতুম” মগ্ধ দেখেছে মৌরী মেলে ধরে বসে কুমুকে। বলে, যে শ্রদ্ধা দিয়ে কুমুকে তার সৃষ্টিকর্তা গড়েছেন আমাদের গড়বার সময় আমাদের সৃষ্টিকর্তাও নিশ্চয়ই তার কিছুটাও অন্তত দিয়ে গড়েছেন। আর বিপ্রদাস—মৌরীর কাছে নাকি ও নামটার সঙ্গে তিনটা ছবি জড়ানো। তার প্রথমটা হলো, দার্শনিক এক বলিষ্ঠ পুরুষ ঘোড়াকে নিজ মরজি মত চলতে দিয়ে ক্রান্ত দেহে বসে আছেন। বিপ্লব দৃষ্টি তাঁর দিগন্তে মেলা। মন ভারক্রান্ত প্রিয়তম বোনের ডিবাং মঙ্গল অমঙ্গল চিন্তায়। আর তার দ্বিতীয়টা হলো, স্বামীর হাতে বোনের লাঠনার স্থির থাকতে না পেরে অগ্রস্থ শরীর নিয়েও বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। গায়েব সাদা মোটা চাদরটা লুটিয়ে পড়েছে তাঁর মাটিতে। গেনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন—‘আয় কুমু আমার কাছে’ আর। আর তার তৃতীয় আইটেমেব ছবিটা বলতে তো মৌরী দম্বরমতো অভিভূত হয়েই পড়ে—স্বামীর ঘরে চলে যাচ্ছে কুমু। আর হয়ত দেখা হবে না। আর হয়ত ওকে এখানে আসতে দেবে না। বোনকে তার জীবনের সকল অমঙ্গলের সকল বেগুরের পরপারে পৌঁছে দিয়ে আসতে বসলেন, তখনও ভোর হয়নি। তখনও আলো

**দেখুন!** অন্ধকণ্ঠী সানলাইট সাবানেই  
এসব কাচা হয়েছে!



সানলাইটের ফেণার আধিক্যই এর কারণ!

সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়জামা  
সাদা ও উজ্জ্বল হয়।



ফোটেনি, বোনের হাতে তুলে দিলেন একটি নিজ তুলে নিলেন একটি এসবাজ। বললেন 'আমি ছুঁজনে মিলে বাজাই।' দিদির চোখে মুখে তখন একটা আলো খেলছে। যদিও মঞ্জুর কাছে বিপ্রদাসের রূপটা একমাত্র দাদা। এছাড়া আর কোন চেহারাও ও তাঁকে ভারতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ এই মুহূর্তে কেন জানি তাঁকেই মনে পড়ে গেছে মঞ্জুর দিদির উপযুক্ত পাত্র হিসাবে। মৌরীর পাত্রের পরিচয় জানতে চাওয়ার জবাবে ধীরে ধীরে বলে—কুমুর দাদা।

বিময়ে ভুরু ঘোঁরা মৌরী—কুমুর দাদা—সে আবার কে?

—কুমুর দাদা, সে আবার কে? কুমু আর বিপ্রদাসের সঙ্গে তোকে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না কি?

—হা ভগবান! মাঝখান এ ভাবেও নিরাশ করতে হয়? ভেবেছিলাম নাম-ঠিকানাটা জেনে নিয়ে একেবারে গোলাপ-কুঁড়ির মালা হাতে গিয়ে দাঁড়াব সামনে। তার পরও ফিরিয়ে দিতে পারেন এমন পুরুষই হন তো তাঁরই মন জয় করব, এই হবে আমার সাধনা।

—দুঃখ ত এই। এমন পাত্র থেকেও নেই। বিজ্ঞানী আর ডাক্তার আজ-কাল কত পারে আবার যেমন কিছুই পারে না, জীবন দিতে পারে না—লেখকদেরও সেই এক অবস্থা। সৃষ্টি করতে পারে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তাই বলছি, মনের বিচরণ ক্ষেত্র মেষ-লোক থেকে মর্ত্যলোকে নাড়িয়ে আনুন মহাশয়া। প্রথম প্রথম শব্দ ঠেকবে কিন্তু সেটা সত্য। কেতাবী জগতে মন যেমনি সচল, দেহ তেমনি অচল। ও-জগতের নায়ক নিয়ে জীবন চলে না।

বৌদি মুখে অপ্রসন্নতা শরীরে রান্নাঘরের পোয়াজ-বস্ত্র মাংস-মসলার এক সামিশ্রিত গন্ধ নিয়ে এসে কাছে শাঁড়ালে।—তোমরা ভাই এখানে একটা কলিং-বেল-টেল গোছের কিছু লাগিয়ে নাও বাপু! খবর দিতে নিতে ডাকতে এত বার বার উপর-নীচ করতে আমি পারিনে।

সত্যি, সন্দর্শন আসবার পর থেকে আজ বিশ্রাম একটুও মেলেনি অমিতার। হঠাৎ করে ওরোটা কিছুই করে ওটা সম্ভব হয়নি। সেটা পুথিয়ে নেওয়া হচ্ছে হাতের আয়োজনে। নিয়ে আসা হয়েছে ছোট পিসিকে। ছোট পিসি নিয়ে এসেছেন তার রান্নার লোকটিকে, যে না কি তিনহাজারী পিসেমশাইয়ের পদস্থ অতিথিদের সদাই সামলাতে অভ্যস্ত। মুরগী-মটর-ডিম-বিশিট-পেস্তা-বাদাম-পেশোয়ারী চাল—অব ও কত দেশী বিদেশী আয়োজন ঘরময় ছড়ানো। মাঝখানে ছোট পিসি এক শান্তিনিকেতনী ঘোড়ার চেপে বসে উল্লারক করছেন। সাধা কি অমিতা সে ঘর থেকে বে-বায়। এটা হয়েছে তো ওটা করে। ওটা হয়েছে তো সেটা করে। বেচারীর অনভ্যস্ত কোমর সতি কটকট করছিল। চোখ কেটে আসছিল জল। মঞ্জু ওকে হাত ধরে টেনে ওর চেয়ারটার বসিয়ে দিলে। অমিতা বসে কিন্তু মুখে বলে—থাক, আমার আর বসে কাজ নেই। ছোট পিসির থম-ধরা মুখ আরো থম ধরে উঠবে। আর অপরাধ বলব কি। তোমার দাদাটাই মানুষ! জুতো মচমচ করে রান্নাঘর থেকে আমার ডেক নিয়ে এসেন—আমার কি কাণ্ডজান নেই। তোমরা ছুঁজনে ছাণে, আমি রান্নাঘরে আর সন্দর্শন বসবার ঘরে একা। যেন তোমাদের ছাদে থাকার, আমার রান্নাঘরে থাকার আর সন্দর্শন ঘরের একা থাকার কারণে আমার কাণ্ডজান নেই। আমি

এই কিছুক্ষণ আগেই না চা করে নিয়ে এসে? কি করে জানব আমি, তোমরা কখন ছাণে এসেছ?

—এই না জানাটাকেই দাদা অপরাধ মনে করেছেন। মঞ্জু বলে।

—রান্নাঘর থেকে পা দূরের কথা, মুখটা পর্যন্ত বার করে ঠাণ্ডা হতে ফুরাস্ত দিচ্ছে না। এদিকের খবর জানব কি করে?

—সেটা আবার দাদা জানেন না। তাই সব সময় সব ঘটনা জানবার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না, ম্যানেজ করতে জানতে হয়। তা জানবে না কেবল 'কি অজায়' বলে উঠবে বেগে। এসেছ তো নিশ্চয়ই এক পশলা ঝগড়া করে?

—এসেছিই তো।

—জানি।

—তুমি হলেও করতে।

—পাগল!

—করতে না? মিথো মিথো দোষ ঘাড়ে চাপিয়ে রাগ দেখাতে চূপ করে থাকতে?

—আচ্ছা, সে যাক। কিন্তু দাদা যখন বললেন—'সন্দর্শন এক কেন' তখন তুমি জবাব দিলে না কেন? 'তার এখন একটা ঠাণ্ডা থাকা দরকার তাই।'

স্বামীর সখ্যে নাশিল ভুলে গেল অমিতা। কেন, তার ঠাণ্ডা থাকা দরকার কেন?

মৌরী রাগত ভাবে চোখ টিপল মঞ্জুকে। মঞ্জু তা দেখেও দেখ না।—ঠিক তোমার এই জিজ্ঞাসাটা এই ভাবে দাদাও করতেন আর তখন তুমি আঁচল ঘুরিয়ে চলে আসতে আসতে বলতেন, 'নিয়ে তোমার প্রয়োজন নেই।' দাদা তোমার কাণ্ডজান অজার কথা ভুলে গিয়ে ভাবতেন, 'কি হলো।' আর সে অজস্র তুমি ভুল্ললোকদের খোঁজে পড়তে বেরিয়ে। এসে দেখতে, সত্যি তার একা থাকার প্রয়োজন আছে কি নেই। থাকে হ্যাঁ চলে গেলে। না থাকে তো বসতে কাছে। বাস হয়ে গেল। রি ম্যানেজ করতে জান না, কেবল ঝগড়া আর বাগাবাগি, বাগাবাগি ঝগড়া।

—ও সব মুখেই বলা যায়। ঘাড়ে পড়লে তখন দেখা যাবে মৌরীর দিকে তাকিয় বলে—হোক না আগে, তার পর বুঝবে বিয় কত মধু।

মৌরী বলে—জোড়ায় জোড়ায় তোমাদের দেখছি, স্বাস্টা মিঠা না কথা, বোকাটা কি নিজের জিভের জগ্ন তুলে রেখেছি?

মাথা দোলাল মঞ্জু।—এ বাপু তোমাদের শিশুদের মধু খাণ্ড পরিণতি দিয়ে মধুর বাটটিকে গালাগাল দেওয়া।

বিময়ে চোখ বড় করে মৌরী।—বাপাঘরটা কি রে! তুঁ মুখে রামনারের মত কানে ঠেকছে যে। তুঁই না কি বিয়েই করবি যদি এমন মধু ভরা, তবে বিয়েতে তোর এত বিরাগ কেন?

—বিরাগ? কি বলে! বিয়ে আমি করব না। তাবক মধুর পাত্রটা জীবনে আমাদের না হলেও চলে কিন্তু হুণপাত্রটি জীবন ধারণের পক্ষে কেবল অপরিহার্যই নয়।

সব স্বাদের মূল আর বার জন্মের আজ আমাদের জী সব স্বাদ এমন বিশ্বাসের পথ দিয়ে গিয়ে ঠেকছে আমি যে সেই হুণপাত্রটির অন্বেষণে—কিন্তু তার দেবী আছে। বস



আমি নীচে যাচ্ছি। তুমি নির্ভয়ে বিশ্রাম কর বৌদি! রাত্রার পর পরিচালন থেকে পরিবেশন সব ভার আমার। তরতর করে নামতে নামতে একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দানার সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া ভাবে মুখোমুখি অবস্থার ঠাঁড়িয়ে পড়ল মঞ্জু। জয়দেব বোধ হয় শেষ পর্যন্ত নিজেই ওপরে উঠে আসছিল। —সুদর্শনকে একা বসিয়ে রেখে তোরা সবসময় অমন ছাদে গিয়ে বসে আছিস কেন?

—আমরা না থাকলেই বৃষ্টি একা হলো?

—আমরা বসে বসে গল্প করলে ভাবি ভালো সময় কাটবে তাই। নইলে বসতে কি?

মঞ্জু জানে কথাটা সত্য নয়। এই সন্ধ্যার সময়টা ঘবে বসে থাকতে জয়দেবের বিয়ম আপত্তি। এটা তার তাস খেলবার সময়। 'তাসটাই বেশ', তাকে খেলাটা তিন তাসের, এ সময়টা তাকে কোন মতেই আটকে রাখা যায় না বাড়ীতে—গেলে আজ মতল সে বাড়ী থাকতই। এতকণে কবে সে চলে যেত। কিন্তু বাড়ীর প্রতি কর্তব্যটিকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে সব সময় ঢাকা যায় না—অবশিষ্ট তাকেও আপত্তি ছিল না তার। আপত্তিটা বাড়ীর এবং তা এমন কম জোরালো নয় যে অন্যায়সে অবহেলা করা চলে। সুদর্শনকে একা দেখে দু-একবার ঘরে ঢুকে দু-চারটা কথা বলেছে, বসেছে আবার উঠে এসেছে আবার গেছে। তার পর আমিতাকে উপরে ডেকে তাক্ততা প্রকাশ করেছে—তবু কারু দেখা নেই। এ ভাবে যেতেও পারছিল না বসতেও পারছিল না। এবার সে হাঁটা দিল। কিন্তু ক'ণা গিয়েই ঘুবে এসে ডাকল মঞ্জুকে, এই মঞ্জু শোন। মঞ্জু এসে নাচু গলায় বলল—কুড়িটা টাকা দেনা। ফালকেট দিয়ে দেবো। ঐ যে সেদিন দিয়েছিলি ঠিক কথা মতো আজ সকালে তোকে দিয়ে দিয়েছি না?

হালল মঞ্জু। তা দিচ্ছি। কিন্তু সকালে নিয়ে সন্ধ্যায় আবার নওয়াকে কি ঠিকমত দিয়ে দেওয়া বলে? টাকা এনে দিল মঞ্জু। আজ বাত করে না দান!

—না না। আজ তাড়াতাড়িই আসব। জয়দেব হীটা দিল।

মঞ্জু এসে অতি সাবধানে এবার উঁকি দিল বসবার ঘরে। দখল সুদর্শন চোখের দু' কোণায় ভাঁজ কেলে বসে সিগারেট টানছে। চোখের ভাঁজ চিন্তা করছে বলে, না হাতের সিগারেটের ধোঁয়ার জগ্ন বৃকল না মঞ্জু। ঢুকবে—একটু ভালল ও। না আগে এক বার রাত্রার পরটা হয়ে আসতে হয়। বৌদিকে নির্ভাবনায় সে থাকতে বলে এসেছে যে।

যখননা যা সেজেছে পুঁঠি ডাঁটার চকুড়ি আর ইলশে-বেগুন ধোল মার ঘর তো নয়, যেন এটা বড় হোটেলের বাবুচিখানা। ছোট সিঁড়ির চাকর কানাইলাল ধবধবে পাজামা আর হাউই সাট পরে এমন খ হাত চালিয়ে যাচ্ছে যে, এমনি রাত্রার ঘরে এমন আয়োজনে অভ্যস্ত। শুধু মনিবের থাক্তির কোন মতে কাজটা উত্তরে দিয়ে যাচ্ছে। ওদের রান্না তার হাতে থালা প্লেট এগিয়ে দিচ্ছে না তো মনিবের বড় সাহেবের হাতে ফাইল পর তুলে দিচ্ছে। সে উঠল মঞ্জু। সবাই মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। ছোট

পিসি কোলের উপর প্লেট নিয়ে পেস্তা-বালাম বাছছিলেন। চোখের বিমলের চশমাটা নাকের উপর ঠিক করে বসিয়ে মঞ্জুর দিকে চাইলেন। মুখে অসন্তুষ্টি—তোমরা দুজনে নাকি ছাদে গিয়ে বসে আছ?

—অতিথির সামনে বসে কেবল কথা বললেই কি আপায়ন বেশী ভালো করা হয়? একা থাকতে দিতে হয় তাকেও। এবার যাবো।

পেস্তাবালামের গোসা ঝেড়ে ওঠে ঠাঁড়ালো ছোট পিসি।—ছেলে যে এমন এককথার থাকল—আমার আশ্চর্যই লাগছে। তোমরা! জান না আমি তো জানি, কত বড়ঘরের ছেলে আর কি ভাবে থেকে অভ্যস্ত সে। যদিও পিসিমার দিকে তাকিয়েই ছোট পিসি কথাগুলো বললেন তবু মঞ্জুর বুকে কষ্ট হলো না উদ্বেগটা সেট। ছোটপিসির ধারণা ওরা দু'বোনে পাঁচ অল্পবয়সী যতটা খাতির যতটা সমীহ দেখানো উচিত তা দেখাচ্ছে না। ওদের ব্যবহারটা হচ্ছে সাধারণ।—ওদের লঙ্কায়ের বাড়ীর যে এলাচি কাণ্ডকারখানার কথা শুনেছি হঁর মুখে—ছিগেন তো গিয়ে কয় দিন। শুধু ওর জগ্নই এ—থেকে গেলেন ছোট পিসি। বোধ হয় তারও বাজল। কারণ বহু বার বহু প্রকারে তিনি বৃষ্টিয়েছেন সখল শুধু মাত্র তাদের জগ্ন।

ঐ জানে মঞ্জুর এ সখল পিসেমশাইয়ের খাতির। পিসেমশাই আর পাত্রের ব্যবসারী বাবার সঙ্গে কোথা দিয়ে যেন একটা স্বার্থের জট পাকিয়ে গেছে আর তারই ফল এটা। এ সখল হবার পর ছোট পিসির বুক চিরে একাধিক বার নীরবাস পড়ে একটি মেয়ের জগ্ন। তবু একথা সত্য, এ বিষয়ে তারই জগ্ন। মঞ্জু পিসিমার এই সাময়িক খেমে যাওয়ার কীকো রঙনা হলো। —আমি যাচ্ছি বসবার ঘরে। কিছু করবার হলে ডেকে। বৌদিকে আমি সুদর্শন বাবুর শোবার ঘরটা যে ঘরে হবে সেটা ঠিক করতে দিয়ে এসছি।

ভালো কথা মনে পড়িয়ে দিল মঞ্জু। বাড়ী থেকে ডানলোপী তোষক বালিশ অনানত গোড়া পাঠাতে হবে তো। বাগানের উঠে ঠাঁড়ালো। —আমি যাচ্ছি। তার উৎসাহের কারণ ভালো মিষ্টির খোঁজ, সে গাড়ীটা নিয়ে ব্রতে পারবে। সমস্ত-দিন আজ সে এই করছে। তার ধাবনা, এ বিষয়ে তার জুড়ি নেই। বিজ্ঞান শেখাতে বললে বলে, এও মস্ত আর্ট। আর্ট যেমন বলে শেখানো যায় না—এত তেমনি। প্রতিভা থাকা চাই।

মঞ্জু এলো বসবার ঘরে। সুদর্শন ঠিক তেমনি ভাবে বসে সিগারেট টানছে। সামনের এসেটো ছাই আর আদেক-খাওয়া সিগারেট ঠেসে গেছে। মঞ্জুকে দেখে সিগারেটের ছাইটা আঙুলের টোকায় ঝাড়তে ঝাড়তে বললো—আয়ন।

বসল মঞ্জু। অঁচাল দিয়ে মুখ মুছল। একটু অপেক্ষা করল। তার পর জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—মেঘ করেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে বেশ, কোথাও বোধ হয় বৃষ্টি হচ্ছে।

সুদর্শন তাকিয়ে রইল ওর দিকে। কিন্তু কথা বলল না কিছু।

মনে মনে মাথা নাড়ল মঞ্জু। তখন মৌবীর কাছে অপ্রস্তুত ভাবে হঠাৎ ক্ষমা চেয়ে ক্ষেপতে গেলেও ব্যক্তিটি অমন সহজে হাত-জোড় করার নয়।

[ ক্রমশ: ]



## মানবেন্দ্র পাল

এক-বাড়ি রজনীগন্ধা কলেজ স্ট্রীট থেকে কিনে নিল বেথা।

এটা অবশ্য উপরি। হঠাৎ খেয়াল হল। ভাবল মন্দ না। আজ বিছানার কাছে নিশেধে রজনীগন্ধা যখন আলো করে থাকবে তখন সেই আলোয় ওরা দু'জনে অন্ধকার সিঁড়ি অতিক্রম করে ফিরে যাবে সুদূর অতীতে। আজকের রাতটা তো জেগে থাকবার রাত। আজ আর কিছুতেই ঘনোতে দেব না ওকে। ভালোই হয়েছে, কাল রবিবার। কাজেই শনিবারের একটা রাত জাগলে কিছুই হবে না।

আবার ট্রামে উঠল বেথা। ও অফিস থেকে ফেরবার আগেই সমস্ত গুছিয়ে ফেলতে হবে।

প্রতি বছর এই দিনটিতে জোব কমপিটশান চলে। কেউ কম বায় না। তবে বেথা হারেনি। বরঞ্চ অবনাই'হেরেছে দু-এক বার।

বাড়ি এসেই অবনীকুমার দেখে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সমস্ত ঘরটা নিখুঁত ভাবে-সাজানো। সাজানো অংশটই প্রত্যেক দিনই থাকে কিন্তু এ দিনটার মনে হয় সারা তৃপ্ত ধরে বেথা পরিশ্রম করছে। পাট আলমারী টেবিল চেয়ার এমন কি বুক-শেলফটা পর্যন্ত স্থান পরিবর্তন করেছে। বছরে এই একটি দিন বেথা এক বার করে সব সরিয়ে নড়িয়ে রাখে। এক বছরের একঘেয়েমিকে এমনি ভাবে এই বিশেষ দিনটিতে বেথা বদলে নেবার চেষ্টা করে।

ঘর চুকট অবনী সব বুঝতে পারে। অমনি লজ্জার অপরাধে মাথা ঝেঁট হয়ে যায়।

অফিসের কাপড় তখনো ছাড়া হয়নি, এমন কি ফ্যানটা পৃথক খুলে দেওয়া হয়নি, বিম্বিত বিমূঢ় অপরাধী অবনীকুমারকে ঠিক এই মুহূর্তে চকিত করে দিয়ে পর্দা সরিয়ে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় বেথা।

মুখের ওপর চক-চক করছে এক টুকরো হাসি। হুঁচোখে অভিনয় ভরা জল। কোনো রকমে একটা খান পাড়িয়ে দিয়ে বলে—সার, আপকো একটো চিঠি হার।

এই বলে অবনীর হাতে কোনো রকমে খামটা গুঁজে দিয়ে বেথা দ্রুত পাশিয়ে যায়।

খাম খোলবার আর দরকার হয় না। সেই মুহূর্তেই অবনীর সব মনে পড়ে। আবার এক বার বিবেকের দর্শন বুকখানা আঙ্গিয়ে দেয়। মনে মনে ভাবে ইশ! কাঁ হু! এ মুখ নিয়ে বেথার কাছে দাঁড়াবে কী করে?

খামখানা ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়ে।

—আজ আমাদের বিয়ের দিন। তোমাকে প্রণাম জানাচ্ছি।

বিষয়বস্তু সেই একই। তবু রোম্যক আছে, শুধু সামান্য এই চিঠি লাইনের ভেতরে আজ অবনীকুমারের নিদাক্ষণ পযায়।

বিয়ের অনেক পূর্বে থেকেই বেথার সঙ্গে অবনীর ঘনিষ্ঠতা ছিল। চিঠিপত্রও চলত নিয়মিত। তারপর ক্রমে ক্রমে ওরা ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। কিন্তু চিঠি লেখাটা বন্ধ করে নি। এটা বেথারই তাগিদ। ও বলে—চিঠি লেখার ভেতর একটা রোম্যক আছে। তাহাড়া যখন আমরা ছিলাম পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে—যখন কোনো ক্রমেই আমাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না, তখন বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করেছে এই পত্র-দূত। আজ দিন ফিরেছে বলে কি একে বার দেব?

সেই থেকে এমন কি বিয়ের পরও নিয়ম হল, অস্তুত এই বিয়ের দিনটিতে ওরা পরস্পর পরস্পরকে এট একই বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দেবে। একই দিনে একট পিওন একই বাড়িতে ছুটি নীল খামে-ভরা চিঠি বিলি করে দিয়ে যাবে।

প্রথম প্রথম বেথাই মনে করিয়ে দিত। মুখে কিছু বলত না। ঘুম থেকে উঠেই একটি প্রণাম।

অবনীকুমার শশবাস্ত হয়ে উঠত—আরে আরে, কী ব্যাপার!

—কী ব্যাপার মনে নেই?

বুদ্ধিমান অবনীকুমারের মনে পড়ে যেত। তাড়াতাড়ি বলতো ও তাই তো!

—আমার চিঠি লিখেছ?

—চিঠি!

—তাও ভুলে গেছ? বেশ আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি না পাই হো, জয়ের মতো আড়ি।

অবনীকুমার আর বিছানার সুরে থাকে না। তাড়াতাড়ি উঠ কোনো রকমে গারে একটা জামা চড়িয়ে তখনই বেরিয়ে পড়ে পোষ্টফিসের উদ্দেশে। ওখানেই একটা চিঠি লিখে পোষ্ট করে দেবে।

কিন্তু এর পর আর বেথা মনে করিয়ে দিত না। যত পুনরা হচ্ছিল ওরা, তত যেন অবনী কেমন চিলে হয়ে পড়ছিল। চিলে হয়ে পড়ছিল যার; তেমন করে বেথার সঙ্গে গল্প করে না, তেমন করে কথায় কথায় বলে না—চলো বেড়িয়ে আসি। যেটুকু কথা হয়, তা শুধু অফিস নিয়েই। কেমন করে উন্নততর গ্রেডে যাবে সেই চিন্তাতেই অবনী যেন বিভোর।

বেথার এটা ভাবো লাগত না। তাই অভিনয় বাড়ত বিপণ। ঠিক করলে, বিয়ের দিনের কথা আর মনে করিয়ে দেবে না।

দেয়ও না আর।

বেচারী অবনীকুমার প্রথম প্রথম কয়েক বার ভুলে গিয়ে লজ্জিত বেশনায় প্রতিজ্ঞা করলে মনে মনে, আর কখনো ভুল করবে না। সেই থেকে নতুন বছরের ক্যালেন্ডার পেয়েই অবনীকুমার বিয়ের দিনটিকে চিহ্নিত করে রাখত।

এতে অবশ্য অবনীকুমারের আর ভুল হয়নি। ভুল হয়নি মার্কে হার হয়নি। বেথা মনে মনে সখী হত। কিন্তু স্বাম্যকে এই বিশ দিনটিতে চমকে দেবার জগ্গে মনে মনে নানারকম কলিও আঁটিত এবং প্রতিবারই ভাবত—আজ যদি ওর 'চিঠি' না আসে, যদি ভুল গিয়ে থাকে, তাহলে—

কিন্তু অবনীকুমারের আর ভুল হয় না।

ট্রাম চলেছে। সেডিজ সার্টটার এক পাশে রজনীগন্ধার খাঁ সন্তর্পণে নিয়ে বেথা তাকিয়ে আছে ফুটপাথের দিকে। মনটা ঠা-  
অনেক দিনের অনেক কথা সব ভিড় করে আ-  
প

না, এখন থাক। সে সব কথা আলোচনা হবে আজ রাত্তিরে।  
সারা রাত ঘরে।

ফুল কেনাটা হল এবার উপরি। এর আগে কোনো বছর ফুল  
কেনার কথাটা মনে হয়নি। ঘর-দোর গুছিয়েছে, পরিষ্কার করেছে,  
অবনীকুমারের মনের মতো খাবার তৈরি করে রেখেছে, একমাত্র কস্তা  
চিলুকে স্বামীর কোল থেকে বার বার নিজের কাছে টেনে নিয়ে  
অজস্ত্র বার আদর করেছে। তারপর বিকেলের ডাকে দু'জনের চিঠি  
এলে, দু'জনেই অপক্লান্তি পড়ে ফেলেছে। কিন্তু ফুলের  
কথা মনে হয়নি কারও। অবনীকুমার শাওঁ কিনে এনেছে সেদিন,  
কিন্তু ফুল আনবার কথা মনে পড়েনি।

মনে পড়ল এবার বেখার। হঠাৎই মনে পড়ল। দশ বছর  
আগে একদিন এক ভীকর মূক বালক তার কাছে ফুল নিয়ে এসেছিল।  
সেদিনটা বেখার বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কিন্তু সেই মানুষটার সঙ্গে  
আজকের মানুষটার তফাৎ যে অনেক!

সে আর ফুল নিয়ে এল না কোনো দিন।

বাড়ি এসে পৌঁছল যখন বেখা তখন পাঁচটা বাজছে। যদিও  
আজ শনিবার, তবু অবনীর ক্ষিরেতে সেই সাড়ে পাঁচটা। অফিস আর  
অফিস। অফিসের চেয়ে বড়ো ঘেন আর কিছু নেই।

ঘরে ঢুকতেই চিলু ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল মাকে।

—কী সন্দের ফুল!

—তোর বাবা আসেনি?

চিলু বলে—না, বাবা আসেনি, তবে বাবার নামে একটা  
চিঠি এসেছে। বলে তখনই চিলু ছুটে গিয়ে একটা নীল খাম  
এনে দিল।

বেখা দেখল এটা ওরই চিঠি। কিন্তু—

কিন্তু তার নামে তো চিঠি এল না! জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে,  
আর কোনো চিঠি আসেনি?

চিলু যেন মায়ের দুঃখটা বুঝতে পারল। বিমর্ষ ভাবে মাথা নেড়ে  
বললে—না তো।

বেখার চোখ দুটো মুহূর্তে কেমন নিশ্চল হয়ে গেল। যে  
আনন্দের দীপটি একক্ষণ ধরে তার মনের গভীরে আলোময় করে  
গেয়েছিল, এই মুহূর্তে কে যেন সেটা ছুঁ দিয়ে নিবিয়ে গিয়ে।

কিন্তু তাও মুহূর্তের জ্ঞান। পরক্ষণেই বেখার হুঁই চোখ চকচক  
করে উঠল। পাতলা ঠোঁটের ওপর পীতবর্ণ কামড় বসিয়ে কী যেন  
ভাবল। তার পর গভীর ভাবে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল, হয়তো এখনি  
আজকের এত আয়োজন তছনছ করে ফেলেবে, কুচিয়ে ফেসাবে  
বহনশীলতার পাণ্ডি।

কী জানি, বেখার যত বয়েস বাড়ছে তত যেন বাড়ছে অভিমান।  
একটুতেই যেন ভেঙে পড়ে—গলে যায়, কিছুতেই স্তন্যে চায় না  
অবনীর কোনো কথা। কেবলই মনে হয়, সে মানুষটা যেন  
আর নেই—সেই রোমান্টিক পুরুষটা যেন দূরে সরে যাচ্ছে—বহু  
দূরে।

কিন্তু অশান্তি সে দিন ঘটল না। অবনীকুমার এল একটু  
গেই। হাসিখুশি মুখ। তবু যেন কোথায় একটু অপ্রস্তুতের  
আলো।

চুকেই চিলুকে কাছে টেনে নিয়ে একটু আদর করে জিগোস করলে—  
তোর মা কোথায় রে?

চিলু নিশ্চয়ই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। তার পর নিচু  
গলায় বললে—মায়ের মন খুব খারাপ।

অবনীকুমার চমকে উঠল। বললে—কেন?

—বোধ হয় মায়ের নামে চিঠি আসেনি অনেক দিন, তাই।

চিলু একটু থেমে আবার বললে—আজ একটু আগেই খবর নিচ্ছিল  
চিঠি আছে কি না—ওই যা—বলতে ভুলে গিয়েছি, তোমার নামে যে  
একটা চিঠি এসেছে।

এই বলে চিলু এক-ছুটে চিঠিখানা আনতে গেল। অবনীকুমার  
সেই সুযোগে জামার পকেট থেকে একটা মুখ-আঁটা ঠিকানা-লেখা  
খাম বের করে টেবিলে রেখে দিলে। যথানিয়মে বেখাকে চিঠি  
আজ সকালেই লিখে রেখেছিল কিন্তু পোষ্ট করতে ভুলে গিয়েছিল  
বেমালুম।

মনে মনে অবনীকুমার তাই কষ্টকে অজস্ত্র ধগ্বাদ জানালে—  
ঠিক সময়ে চিঠির কথা ভুলেছিল।

মিটমাট হয়ে গেল। মনোমালিঙ্গতা আর হল না। খাম  
দেখেই বেখার মনের মানি দূর হয়ে গেল। লক্ষ্য করবার সময়  
পেল না, খামে পোষ্টাফিসের স্ট্যাম্প আছে কি না।

বেশ কেটে গেল সেদিনের সন্ধ্যাটা। স্বামিন্দ্রী আর ঐ দশ  
বছরের কস্তা চিলু। হাসি-গল্প আর খাওয়া।

চিলু অবনীর গলা জড়িয়ে ধরে বললে—আজ আর সন্ধ্যার সময়  
তুমি বেরোতে পারবে না বাবা!

অবনীকুমার হাসল একটু। বললে—আচ্ছা, তাই হবে।

চিলু এবার মায়ের কোল ধরে এসে পড়ালো। বললে—মা,  
আমার জন্মদিন করে?

—জন্মদিন! বেখা যেন চমকে উঠল।

চলকাবার মতো ব্যাপার তো কিছু নয়! অত্যন্ত সাধারণ  
একটি শিশুমনের জিজ্ঞাসা।

কিন্তু বেখার মনে হল, যদিও চিলুর এক বছর বয়েস  
থেকেই জন্মদিন নিয়মিত ভাবে উদ্‌যাপন করে আসা হচ্ছে তবু  
এই প্রথম চিলু নিজে জিগোস করে জানতে চাইল, জন্মদিন  
কবে?

বেখা যেন কেমন খিত্তিয়ে গিয়েছিল। অবনীকুমারের লক্ষ্য  
এড়ানি। বললে—কী হল এমন চুপ করে গেলে?

বেখা যেন কোন দূর জগৎ থেকে ফিরে এল। শুকনো গলার  
বললে—চিলুর জন্মদিন—

অবনীকুমার তখন মেয়েকে ডাকল নিজের কাছে। বললে—  
এসো মা, আমি বলে দিচ্ছি।

চিলু মায়ের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে বাপের কোলে উঠে বসল।

অবনীকুমার ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে বললে—আজ হচ্ছে  
ইরিজির কত তারিখ? কুড়ি না? বিশে জুলাই আমাদের  
বিয়ের দিন, আর তেইশে আগষ্ট হচ্ছে তোমার জন্মদিন। তা হলে  
বল দেখি আর কদিন বাকি রইল?

অবনীকুমার আদর করে মেয়েকে গালে একটা চুমু দিতে বাজিল,  
কিন্তু সেজ্ঞা হল না। দূর ভুলে গিয়েছে তার মনে।

ধীরে উঠে চলে বাজে । অতঃপূর্বের মুখখানা এই মুহূর্তে যেন কেমন  
কালো হয়ে উঠেছে ।

অবনীকুমার ভাবল একবার ডাকে, কিন্তু জ্ঞান, ডাকলে ত  
 রেণা এখন আর আসবে না। ওর সেই পুরনো জায়গায়  
 অনেক দিন পর অজ্ঞ আবার নতুন করে আবার  
 এখানে তবু শুধু ডাকা মানিয়ে নিয়ে চিহ্নর টনক নড়ানো। এখনি  
 হালের বকম প্রশ্ন করে বসবে—মায়ের কি হয়েছে বাবা? মা  
 চলে গেলে কেন? মায়ের মুখটা এমন শুকনো কেন? বসো না?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিল অবনীকুমার। না, ডেকে দরকার নেই। রেখা একটু একলা থাকুক। জ্বর চিহ্ন—তার মনটা কেও প্রকল্প রাখা দরকার। ও এখন শিশু। ওর মনে যেন আঁচড়াটা না পড়ে।

শ্রাবণের রাত্রি। বাইরে ঘন অন্ধকার। রূপ-রূপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

এ একটা দুর্লভ রাত। চিমু বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে অকাতরে। এ পাশে অবনীকুমার আর বেথা। কারও মুখে কথা নেই। অবনীকুমারও তো প্রস্তুত ছিল তার জন্মে। কিন্তু—

কি কোথা দিয়ে যেন কী হয়ে গেল! কোন এক অসতর্ক  
মুহুর্তে চিহ্ন কী যেন বলে ফেলেছিল। কে জানত তার প্রতিক্রিয়া  
গড়াবে এত দূর!

অবনীকুমার কিন্তু জানে। জানে বলেই ও-ও আজ কথা বলছে না, ঝাঁটাচ্ছে না রেখাকে। একটু আদর করলেই যে রেখার মন ফিরে যাবে এমন তরল মন যে নয়। ও মনকে আয়ত্ত করা বড়ো কঠিন।

জানলা দিয়ে কীটা-কীটা বৃষ্টির ছাঁট আসছিল। অবনী বললে একবার—জানলাটা বন্ধ করে দেব? রেখা উত্তর দিল না। মাথার কাছে—অন্ধকারে সেই বজনিগন্ধার ঝাড়—যেন আলোর কোয়াঁরা। সেই আলোর পথ বেখে বেখে কত সপিল সিঁড়ি অতিক্রম করে রেখা তখন পেছিবের চলেছে। চলেছে কোন স্থপতির অতীতে।

বারো বছর আগের কথা। সে তো বড়ো কম দিন না। বারো বছর আগে এই অবনীকুমার ছিল সম্পূর্ণ অসামান্য মানুষ। যৌবনের মাতাল রক্ত তখন ফুটছে সর্বাঙ্গে—চণ্ডা কপাল। দীর্ঘ স্বপ্নাম দেখ—বকভরা সাহস।

এক দিন রেখার সঙ্গে এক অসস্ব দ্বিপ্রহরে লুডো খেলতে খেলতে চট করে নিজের পাকা ঘাঁটিটা রেখার ঘাঁটির সামনে এগিয়ে দিল।

বেধা একটু চমকে পুলকিত হয়ে গভীর আগ্রহে ছুঁচাটা খোসের মধ্যে নাড়তে লাগল, যেন অবধারিত তিন পড়ে। তিন পড়লেই থাওয়া।

অবনাকুমার হেসে বললে—খুব সাহস আমার না ?

মোট টিপে একটু হাসল রেখা। চাপা স্বরে বললে,—সাহস  
নয় কু:সাহস।

এই সামান্য একটি কথাই কিন্তু তাৎপৰ্য্য ছিল গভীর। আগের দিন বিকেলেও অনীকুমার এসেছিল বেথামের বাড়ি। - কলকাতার পরিশেষ। নিজের বাড়িতে লোকের অভাব নেই। তাছাড়া ~~অল্প~~ ভাড়াটেও রয়েছে। যথেষ্ট ~~সুখের~~ ~~জিহ্বা~~ ~~সবাই~~ বাতায়ন

করে। তবু তারই মাঝে কেমন করে যে অবনীকুমার কয়েকটা  
মুহূর্তের জন্যে রেখাকে টেনে নিয়েছিল, তা যেন কিছুতেই ভাবা  
যায় না।

উনিশ বছরের রেখা তখন খরখর করে কাঁপছিল।

—ছাড়ো ছাড়ো, কী সর্বনাশ !

রেখা ছাড়তে বললে বটে কিন্তু ততক্ষণে জোখ তার বুজে  
 এসেছে।

অবনীকুমার ছাড়ল বটে, কিন্তু তখুনি না। রেখার পাণ্ডুরণ  
 ঠোঁট ছুঁটির ওপর আর একবার তৃষার দৃষ্টি মেলে বললে, কেমন  
 জ্বক ?

ততক্ষণে দেখা সামলে নিয়েছে। এক বার ঘর থেকে বেরিয়ে  
দেখে এস। না কেউ নেই।

আবার এসে ঢুকল ঘরে। অবনী তখন অশ্রুমনস্কের ভাণ করে একটা বইয়ের পাতা গুল্টাচ্ছিল। বেথা এসে দাঁড়ালো পাশে।

—আমার খুব সাহস না? অবশ্যী গভীর ভাবে তাকালে  
একবার।

বেথা বললে—সাহস নয় দুঃসাহস !

—কেন ?

—কেন জিগ্যেস করছ? যদি ধরা পড়তাম তাহলে কী  
সর্বনাশ হত ভাবতে পার?

সর্বনাশের কথা কোনো পুরুষই ভেবে এগোয় না। যারা জানতে যায় তারা এগোতে পারে না। যারা এগোতে চায় তারা বুকের মধ্যে নশলের আগুন জ্বালিয়ে এগোয়—সে আগুনের তাপে মেয়েদের জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্কার পুড়ে ছাই হয় যার। তারা সেই আগুনের শিখায় ঠিক নিজেদের বুকের গোপন গহবরে লুকিয়ে রেখে মরে আনন্দ পায়। সে মৃত্যুর মধ্যে পূলক বুঝি আর কিছু নেই।

রেখা এমনি ভাবে দিনে দিনে তিলে তিলে মরছিল  
 মরছিল আর এক বিচিত্র আনন্দে তার সমস্ত হৃদয়টুকু ভরে উঠছিল

কিন্তু এ স্থখ চিরদিন রইল না। রেখার মা-বাবা ক্রমাৎ লক্ষ্য করলেন অবনীর ওপর রেখার একটা কেমন দুর্বোধ্য আঁকা গড়ে উঠছে। এটা তাঁদের ভালো লাগল না। বিশেষ রেখ চঞ্চলতা। রেখা যে তাঁদের বড়ো আদরের, বড়ো গর্বের মেয়ে

অবনীর ওপর ঠন্দের কোনো মোহ ছিল না। ছেলোট শু

শিক্ষিত লোকমায় বটে—কিন্তু—ভ্রাঞ্জন নয়। এমন কোনো া  
তাদের উপস্থিত হইনি বার জন্তে বেখার মতো মেয়েকে এই পায়ে  
হাতে তুলে দিতে হবে। এখানে সময় আছে অনেক—এক রে  
সুন্দর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করবার মতো সম্ভাবনাও যথেষ্ট।  
ভেবে তাই অকস্মাৎ এক দিন অনানীকমায়ের ওপর নোটিশ পড়ল।

যেন আর এ বাড়ি না আসে কখনো।

এ কথা দেখা জানতে পারেনি প্রথমে। যখন জানিল, ঐ পাখরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু নষ্ট করবার মতো নেই। এখানে পাশের ঘরে ও বসে আছে একা। এতক্ষণ নিঃ চলে যেত, কিন্তু যে বাড়িতে এত দিনের এত বাঙালী আসা সে : থেকে চিরদিনের মতো এতে যাবার আগে একবার আসে যে বাড়ির দিঘাটির সঙ্গে দেখা করে যাবে না।



## টেকা টেকা নট টেকা নট টেকা...

কোলকাতার নিউ মার্কেট, যাকে পুরোনো আমলের লোকেরা হগ সাহেবের বাজার বলেন, একটি অতি আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠান। কথায় বলে কোলকাতা সহরে পয়সা ফেললে মাঝরাতেও বাঘের চুপ পাওয়া যায়। নিউ মার্কেটের দোকান বাজার, আর হরেক রকমের মাল দেখে কথাটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দোকান পাট ছাড়াও নিউ মার্কেটে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে, যথা নানারকম দোকানী ও খন্দের ধরবার জন্ত তাদের অভিনব উপায় অবলম্বন। শোনা যায় সাহেব, ও বিশেষ করে মেম সাহেব দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখলেই কোন কোন দোকানী নিজেকে একত্রে ইংরাজী ভাষাভাষী ও বিনয়ী দোকানদার প্রতিপন্ন করবার জন্ত হাত নেড়ে বলেন “টেক তো টেক, নট টেক নট টেক, একবার তো সি” অর্থাৎ জিনিষ কিম্বা না না কিম্বা, দোকানে এসে একবার দেখে তো যান! দোকানীর এই অভিনব আবেদনে বহু বোড়েল খন্দেরও নাকি ঘায়েল হয়েছে বলে শোনা যায়। মাত্র এক মিনিটের জন্তে দোকানে গিয়ে শেষে ঘটনাক্রমে পড়ে হরেক রকম মালপত্র কিনে খন্দেরকে বেহুতে দেখা গেছে।

আবার খন্দেরও নানারকম। কেউ কেউ পুরনো ধরনের ও পুরনো প্যাটার্নের জিনিষ পছন্দ করেন। আজকালকার বাজারে নিতাই পুরনো জিনিষ আবিষ্কার ও চালু হচ্ছে কিন্তু এরা সেই যে পুরনো জিনিষ আঁকড়ে বসে আছেন তো আছেনই তার আর কোন নড়চড় নেই। আর এক ধরনের খন্দের আছেন যারা নতুন ধরনের জিনিষ দেখলেই তা কিনে যাচাই করে দেখেন। যে কোন সমাজের পক্ষে এ ধরনের লোক বিশেষ দরকার কারণ এরা না থাকলে প্রগতি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নতুনত্বের স্বাদ চলে বাবে। সব নতুন জিনিষই যে ভাল হতে হবে তা বলাই না। আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে জিনিষ ভাল না হলে বাজারে তা টিকতেও পারে না কারণ খন্দের

বিজ্ঞাপন দেখে বা নতুন জিনিষ বলে একবার কিনে পরখ করেই বুঝবে এবং ভাল না হলে দ্বিতীয়বার আর কিনবে না। আজকের এই দ্রুত বৈজ্ঞানিক যুগে ভালো নতুন জিনিষ আমাদের সংসারে রাজিই প্রায় আসছে এক স্বায়ী হয়ে যাচ্ছে। ধরুন পেনিসিলিন কদিনই বা বেরিয়েছে কিন্তু আজ ঘরে ঘরে ডাক্তাররা ব্যবহার করছেন। ইংরাজীতে একে বলা হয় ওয়াটার ড্রাগ বা অ্যান্টিবায়োটিক। বিশ বছর আগে কজনের ঘরে নাইলনের জামাকাপড়, প্লাষ্টিকের জিনিষ ছিল? অথচ আজ এ সব জিনিষ কত হাজার হাজার পরিবারে স্থান পেয়েছে। তেমনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বনস্পতি। বনস্পতি, বিশেষ করে ডালডা বনস্পতি আজ দেশের লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে তার প্রধান কারণ ডালডা বনস্পতি ভালো জিনিষ।

বনস্পতির গুণাগুণ সম্বন্ধে সরকারী গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন। ডালডা বনস্পতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিনা একথা অনেকেই প্রশ্ন করেন। এর উত্তর হচ্ছে ডালডা বনস্পতি ভালো না হলে আজ ঘরে ঘরে তার এতো আদর হোতনা। বি অতি উত্তম জিনিষ, কিন্তু আজকাল খাঁচি বি সাধারণ লোকে যে দামে কিনতে পারে, সে দামে সবদময় পাওয়া মুশ্কিল। তাই রোজকার জন্ত নিশ্চিত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। জানেন কি ডালডার প্রতি আউন্স ১০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়, যা ভাল খিয়ের সমান? ডালডা স্বাস্থ্যের জন্তে তাই এতো ভালো। ডালডা শুধুমাত্র খাঁচি ভেজলে তেল থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদাই গীল করা ডবল চাকনা ওলা টিনে পাওয়া যায়। ডালডার সব ব্রানাই মুখরোচক হয়। নিশ্চিত মনে ডালডা বনস্পতি কিম্বা—জানেন তো ডালডা শুধুমাত্র খেজুর গাছ মার্কা টিনে পাওয়া যায়—সর্বদা দেখে কিনবেন।

বেথা তা বুঝেছিল, তাই কোনো রকমে চোখের জল মুছিয়ে নেজের পড়ার বইগুলোর মধ্যে থেকে কী একটা বই টেনে নিল, এই অল্পসময়টুকুর মধ্যেই এক টুকরো কাগজে কী যেন লিখল বল-বল ফলে। তারপর বেরিয়ে এল।

শ্রুত পায়ে এগোচ্ছিল ও পাশের বাবান্দার দিকে—মা বেরিয়ে হলেন রাগান্বিত থেকে। ভুরু কুচক বললেন—একটু—রাগান্বিত হয়ে এসে না।

বেথা ফিরে দাঁড়ালো, চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। কান্না-জড়ানো স্বরে বললে—আসছি।

মা বিচলিত হলেন না। বললেন—ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?

এবার আর বেথা ফিরে দাঁড়ালো না বললে—ও ঘরে অবনীদা' রয়েছে, ঠিক একটা বই ফেরত দিয়ে আসছি।

ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢুকল বেথা। অবনীর চোখের দিকে তাকাবার মতো মনের জোর তার ছিল না। কোনো রকমে বইটা একটু খুলে চিঠিটা দেখিয়ে দিয়ে অবনীর হাতে সবতুকু সমর্পণ করে বেথা চলে গেল।

অবনী একবার ভাল এখনি সেও উঠে চলে যায় ; কিন্তু দৃষ্টিকটু বলে বসে রইল। বসে রইল আরও আশায়—যদি বেথার মা আসেন। যদি লজ্জিত হয়ে বলেন—ওর কথার তুমি কিছু মনে কোনো না বাবা, তুমি যেমন আস, তেমনি এসো।

কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে গেল, তবু কেউ এল না। তখন অবনীর মনে আর একটা হুশাশা জেগে উঠল, ভালল, বেথা হয়তো আর একবার আসবে।

নিম্নমেষ চোখে অবনী তাকিয়ে রইল। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক টুকরো আকাশ। এই অসময়ে কোথা থেকে বাতাস ঘরে এসে ঢুকল। দূরে শূন্য টিপাইয়ের ওপর ঢাকাটা সেই বাতাসে উড়তে লাগল।

সে মুহূর্তে অবনীর মনে হল, এত বড়ো শূন্যতা বুঝি জীবনে তার কখনো আসেনি।

\* \* \* \*

আজকের আকাশটাও তেমনি মেঘাচ্ছন্ন। তবে জুলাই মাস। মেঘটা অকস্মিক নয়।

অবনী এক বার পাশ ফিরে গুলো। না, বেথাও ঘুমোয় নি—কপালের ওপর হাতটা কেসে রেখেছে। যেন তার মুখটা দেখতে না পায় কেউ।

দীর্ঘ বারো বছর আগে সেদিন বেলা ঝরোটার সময় বেথাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই অবনী চিঠিখানা পড়লে। মাত্র দু-তিন লাইনের চিঠি—এমনি সর্বনাশ যে হবে তা আমি অনুমান করেছিলাম। যাক্ এর জন্তে দুঃখ করি না। তোমার ঠিকানাটা আমার জানা আছে। আমি তোমায় প্রতি মঙ্গলবারে চিঠি লিখব। সে চিঠি তুমি ঠিক পাবে বুধবারে। আর তুমি লিখো শুক্রবারে যেন চিঠি পৌছয় ঠিক শনিবারে। আমি প্রতি শনিবার বিকেলে পিওনের জন্তে পথ চেয়ে থাকব।

তাই হল। প্রতি বুধবার আর শনিবার দুটুকু থেকে দু'টি বাতুল ছন্দের আন্তরিকতা নিশ্চয় সবার অগোচরে ছুই প্রতীকাকাতর প্রণয়ীর কাছে এসে পৌছতে লাগল।

চিঠির পর চিঠি জমতে লাগল। প্রতিটি চিঠি শুষ্ক হয়ে তুলে রাখে। তুলে রাখে ক্রিয়াকাহারের একটা শূন্য টিনে। সেটি আবার লুকনো থাকে তার গরম কাপড়ের ট্রাকের নীচে।

এমনি করে একাটির পর একটি মাস কেটে গেল, কেটে গেল একটি বছর।

এখন আর শুধু চিঠি নয়—এখন নিত্য দেখা হওয়া। দেখা হওয়াতেও মন ভরে না, আরও নিবিড় হতে চায়। কত নির্জন বিকেলে ওরা গিয়ে বসেছে মাঠে। কত সন্ধ্যা ট্যান্ডিতে চড়ে বেড়িয়েছে নিকুশের পথে।

তবু তৃষ্ণা মেটে না। অথবা প্রণয়ের স্বভাবই এই। প্রথমে একটুখানি হাতের স্পর্শ—আঙুলে আঙুলে ছোঁওয়া ; প্রস্রব আর স্তব্ধতা পেলে সেই স্পর্শকাতর মনটুকুই আবার সর্বগ্রাসী লোভে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন তার দাবী মিটোনোও বত কঠিন—না মিটোনোও তত বিতর্কনা।

বিশেষ বেথা—সে যে আবার স্বাদ পেয়েছিল এক বার পুরুষের বুকুর উত্তাপের।

এক দিন এই নিয়ে আলিপুর রোডের খালের ধারে বসে এসের মধ্যে বেশ এক পশলা ঝগড়া হয়ে গেল।

অবনীর লোভটা যেন একটু বেশি বেড়ে উঠছিল। কিছু দিন ধরে একটা অস্বাভাবিক অবনীকে যেন ছেলেমানুষের মতো পেয়ে বসেছে। বিকেলে দেখা হলেই অবনী বাঁকা চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বলবে—তা হলে এবার রাজি ?

—কী ? না জানার ভাগ করে বেথা যেন অস্বমনস্ক ভাবে জিগ্যেস করে।

—কী, জান না ? অবনী হাসে।

বেথা লজ্জায় কথা বলে না। নিশ্চয় মাথা নাড়ে।

—আচ্ছা বেশ, কাছে এসো কানে কানে বলি।

বেথা তাড়াতাড়ি সরে বসে,—কী যে করো এই খোলা জায়গায়! কেউ যখন দেখবে—

—দেবি, হুঃসাহস না থাকলে ভুল ভ ভিন্সিন মেলে না।

—বেথা হেসে বলে—যাক আর হুঃসাহস দেখিয়ে কাজ নেই। এক বার হুঃসাহসের ফলটা তো দেখেছ ? এবার পুলিশের হাতে যেতে হবে। অবনী উত্তর দিল না, চুপ করে রইল।

বেথা একটা চিমটি কাটল। বললে—হুঃসাহসের ফেরটা সব সময়েই লুডোর বোর্ড নয় জেনো।

অবনী বললে—তা জানি, কিন্তু আমার প্রাপ্যটা লুডোর বোর্ডের নীচে চাপা দিও না, দোহাই !

এবার বেথা অবনীকে মুহূর্তে একটা ঠেলা দিলে। বললে,—কী বাজে বকছ। ছেলেমানুষ হচ্ছ দিন দিন ?

অবনী হাসল আবার। বললে দেবি, পুরুষদের এই ছেলে-মানুষীটির লোভেই তোমাদের মতো চরিত্রবস্তী মেয়েদেরও বুকুর রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। হয় না কি ?

কথা শেষ করে অবনী আস্তে করে বেথার পিঠের ওপর হাতটা রাখল। বেথা সে স্পর্শটুকু সরিয়ে দেয়নি।

সেই যে সরিয়ে দিল না, সেইটেই হল বেথার পরম সখ্যতি। অবনী লাকিয়ে উঠল। তা হলে কালই ?

—এত ব্যস্ত কেন, বিস্টো হোক না। যেজি করে বিয়ে, এর তো হালিমা নেই।

—তা নেই, বিয়ের পরের বউ আর বিয়ের আগের প্রিয়া এ দুটোর যে তফাক্ত অনেক। আমি প্রিয়াকে পরিপূর্ণ ভাবে পেয়ে বধূকে বরণ করতে চাই রেখা!

রেখা 'না' বলতে পারেনি।

তার পর এল সেই দিনটি। ওর ঘরে সেদিন কেউ ছিল না। চাকরটাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছিল দুপুর বেলাতেই। সেদিন বেলা তিনটের সময় ও এল। রেখা এত কাঁপছিল যে মনে হচ্ছিল এখনি বৃষ্টি জ্ঞান হারিয়ে পড়ি যাবে।

অবনীর হাতটাও কাঁপছিল। সেটা বোঝা গেল যখন ও চাবি দিয়ে তালা খুলছিল।

তবু তালা খোলা হল। ঘরে ঢুকেই রেখা যেন থমকে গেল। এ কোথায় এস? ধবধব করছে বিছানার চাদর—হুট বালিশ। মাথার কাছে টিপাইয়ের ওপর পেতলের কলসীতে বজ্রনীলগন্ধার বাড়।

পরস্পর একবার চোখোচোখী হল। রেখা অমনি মুখটা নামিয়ে নিল। এরই মধ্যে ওর মুখটা রাঙিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে অবনী ফ্যানটা খুলে দিল।

সে সন্ধ্যার রেখা বাড়ি ফিরল সেই বজ্রনীলগন্ধার কাড়টি বৃকে করে। মনটি তার অজ ভরে আছে কানায় কানায়।

মা জিগেন্স করলে—ফুল কোথায় পেলি রে?

মেয়ে বললে—আমার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম, সে দিয়েছে।

\* \* \* \* \*

এই সেই বজ্রনীলগন্ধা। অন্ধকার রাতে এই ফুলেরই আলোর পথ দেখে দেখে রেখা চলে গিয়েছিল অনেক দূর। এবার যেন চমক ভাঙল। বাইরে বৃষ্টি থেমেছে। পাশে শুয়ে রয়েছে সেই ছরস্তু অবনীকুমার।

ঘুমিয়ে পড়েছে কি? বোধ হয়, না।

শেষ পঞ্চমুখের মা-বাবাকেই এগিয়ে আসতে হল অবনীর জন্তে। রেখার বাবা হাত জোড় করে বললেন অবনীকে—দয়া করো।

এ প্রার্থনার দরকার ছিল না। তার আগেই ওরা বিয়ের দিন স্থির করে ফেলেছিল। এবং যথাদিনেই রেখার বাবা যথানিয়মে মেয়েকে সম্প্রদান করলেন অবনীর হাতে।

সবই হল, কিন্তু হল সংক্ষেপে। অবনী বা রেখার তাতে কোনো আক্ষেপ ছিল না। তারা তখন পরিপূর্ণ।

বিয়ে হল এদের বিশ্বে ভুলানি, কিন্তু চিহ্ন জন্মালো সেই বছরেই ডিসেম্বর মাসে। অর্থাৎ বিয়ের মোট পাঁচ মাস পরে।

তা হোক, তবু এদের আনন্দের সীমা নেই। ফুটফুটে মেয়েটি নিখুঁত গড়ল।

রেখা বলে—এ কার মতো হয়েছে বসো তো?

অবনী বলে—আমার মতো, তাতে আর সন্দেহ কি?

—ইস। উনি যেন এত সুলভ। এ হয়েছে ঠিক আমার মতো, নয় রে চিহ্ন?

এই বলে দুমস্ত শিশুর মুখে বারে বারে চুমু দেয়।

বিয়ের পর একটা দিনও অবনী বস্তুরবাড়ি যায়নি। রেখাও না। তবু দাঁড়ানি হয়েছে খবর গেয়েই রেখার মা সেই রাতে প্রাণ

তুলে আত্মীয় করে চিঠি লিখলেন। সে চিঠির শেষ কথা লাইন এই—

—পোষ মাসে পোষলক্ষী আমাদের ঘরে এসেছে। তাকে দেখবার জন্তে আমার মন ছটকট করছে। কিন্তু নিয়ে যাবে কে? উনি তো বাতে পঙ্কু। আমি কলকাতার পথঘাট ভালো চিনি না। তবু আমার পেটের মেয়ের মেয়ে, তাকে দেখবার জন্তে আমাদেরই যেতে হবে।

এ চিঠি লিখলেন রেখার মা বারোই পোষ রাত্তিরে। অল্প অল্প চিঠির মতো রেখা এ চিঠিখানাও তুলে রাখলে বন্ধ করে। তবে সেই ক্রিমক্রাকারের বাজ্ঞে নয়।

অর্থাৎ সে চিঠিগুলো তার নিজস্ব। ভবিষ্যতে অনেক নির্ভর মুহূর্তে অবনীরা সে সব দিনের চিঠিগুলো পড়বে, কিন্তু পড়াতে পারবে না কাউকে। আর এ চিঠিখানা—এর মূল্য আলাদা। বড়ো হলো একদিন রেখাই তুলে দেবে চিহ্নর হাতে। বলবে—তোরা জন্মদিনে এই হল প্রথম আত্মীয়দ্বারা তোরা দিদিমার।

দিদিমা হয়তো তখন এ জগতের পাট চুকিয়ে চলে গিয়ে থাকবেন। চিহ্ন সেদিন সেই চিঠি হাতে করে কি ক্ষণকালের জন্তেও তার দিদিমাকে মনে করবে না?

যাক সে কথা। মনে করবে কি করবে না, সে এখন বহুবুয়ের কথা। কিন্তু তার আগেই দেখা দিল আর এক গুরুতর সমস্যা। সে সমস্যার কথা রেখার মনে কোনো দিনই আসেনি। প্রথম মনে করালো ঐ অবনীকুমার।

চিহ্নর সে বার তিন বছর পূর্ণ হল। প্রতিবাদের মতো এবারও স্বামি-স্ত্রীতেই মনের আনন্দে শিশুর জন্মোৎসব পালন করলে। কিন্তু সেই রাতেই অবনীকুমার হঠাৎ তুলে একটা সাংঘাতিক প্রস্তাব

প্রথমে অবনীকুমার কোনো কথাই বলে নি। কেমন গভীর হয়ে ছিল। রেখা মুহূর্তেই দিয়ে বললে—কী হল? হঠাৎ এত গভীর। অবনী তবু চুপ।

রেখা আবার খোঁচালো—কী হল?

অবনী ধীরে ধীরে বললে—মেয়ে বড়ো হচ্ছে।

খিল-খিল করে হেসে উঠল রেখা—এ আর নতুন কথা কি? এখন থেকেই মেয়ের জন্তে পাত্র দেখো।

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-  
সার জন্ম পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাপ্তে ২-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যার্লসের ব্র্যাশন্যাল কিংস লেকচার

৩৩, একতালিয়া রোড, কলিকাতা-১৩

অবশিষ্ট সে ঠাট্টা শুনল না। বললে—ওর জন্মদিনের তারিখটা বদলাতে হবে।

বেথা ঠিক বুঝতে পারল না। আশ্চর্য হওয়ার অুরে বললে—কেন?

—কেন বুঝতে পারছ না? মেয়ে যখন বড়ো হবে, তখন নিজের জন্মদিনের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মরে যাবে না? তাছাড়া আমাদেরই কি কম লজ্জা? মেয়ে তখন কী চোখে দেখবে তার বাপ-মাকে? কী ভাববে, করনা করতে পারো?

বেথা বোবা হয়ে গেল। এ দিকটা তো সে ভাবে নি।

অবনী বলছে তখন—মেয়েরা বড়ো বড়োই হোক মায়ের চরে বড়ো আদর্শ তাদের জীবনে নেই। তুমি আমি মেয়ের সামনে সেদিন কী আদর্শ তুলে ধরব বেথা?

বেথা তখনো চুপ। এক সময়ে ফিস-ফিস করে উঠল—যেন আর কি তিন বছরের মেয়ের কানে না যায়। বললে—তবে উপায়? উপায় এখনো আছে। চিহ্ন বড়ো হবার আগেই নয় বদলে দিতে হবে আমাদের বিয়ের দিন, মিথ্যে করে বলতে হবে, আমাদের বিয়ে ঐ বছর জুলাই মাসে হয়নি, হয়েছে একটা বছর আগে।

বেথা শিউরে উঠল। বললে—না না, তা হয় না, বিয়ের দিন লুকনো যায় না। ও দিনকে আমি হারানো পাবব না।

—তা হলে চিহ্নের জন্ম-তারিখটা বদলে দিতে হয়। এখন থেকে আর সাতাশে ডিসেম্বর ওর জন্মদিন করা হবে না। করতে গেলে হিসেব মতো আরও কটা মাস শিখিয়ে দিতে হবে।

বেথা এবার উত্তর দিল না। শুধু অবনীর হাতখানা নিজের হুটোর তুলে নিয়ে বুকের কাছে টেনে আনল।

পরের বছর চিহ্নের জন্মদিন পালন করা ডিসেম্বরে হল না। ইচ্ছে করেই অবনীকুমার কর্তার হয়ে রইল—এক বারও রেখার কাছে ফুলল না চিহ্নের কথা।

বেথাও কথা তোলে নি। মনে মনে সেও বুঝেছে, অবনীই ঠিক। ও বুদ্ধিমান পুরুষ—দূরদৃষ্টি আছে। আজ না হয় চিহ্ন ছোটো—কিন্তু যেদিন সে বড়ো হবে—যেদিন নিজের জন্মদিনে নিজের বন্ধুদের ডেকে নিয়ে আসবার ইচ্ছে করবে, সেদিন? সেদিন মা-বাপের হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে তার কি লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবে না?

তখন এক এক সময় রেখার কেমন রাগ হত অবনীর ওপর। মনে হত এ সমস্তার জন্তে তো ওই দায়ী। বিয়ে হওয়া তো পালিয়ে বাচ্ছিল না।

তবু নিরানন্দ এ বছরের ঐ সাতাশে ডিসেম্বরও বেথা চুপি চুপি লুকিয়ে লুকিয়ে চিহ্নের জন্তে কিনে দিলে একটা ব্রুক।

এমনি ভাবে চলল আরও ক'বছর। বেশ চলছিল। বছরে হু'দিন বড়ো আনন্দের। বিশেষ জুলাই আর—আর চিহ্ন নতুন জন্ম-তারিখ ভেঁশে আগষ্ট।

এ হু'সাত বছরে রেখার বেশ সয়ে গিয়েছিল। প্রতি বছর কেবল জন্মদিন উপলক্ষে চিহ্নের হু'বার পাওনা হত। এক বার হত সাত বছরে। আর একবার হত অত্যন্ত পোপনে। সে পাওনা এক মেয়ে আর বা ছাড়া আর কেউ জানত না। তবু বন্ধু চিহ্ন হেসেদাঁড়বে, সে কিছু জিগ্যাস করে না। সে পেয়েই মুগি।

কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল ঐ বার। আজ প্রায় দশ বছর বয়সের কাছাকাছি এসে মা-বাপের বিয়ের দিনের আনন্দ উল্লাসের মধ্যে সহসা প্রশ্ন করল—মা আমাদের জন্মদিন কবে?

আজ ঐ বীতনিত্র রাত্রিশবে রেখার সমস্ত বুকখানা বেন টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভাবল ঠেচিরে ওঠে—হতভাগী মেয়ে, ও কথা আমাদের জিগ্যাস করা কেন?

কিন্তু না, ভুল করে চিহ্ন তাকে জিগ্যাস করলেও অবনী ভুল করে নি। ওর জবাব অবনী নিজেই দিয়েছে।

ঠিক এর পর থেকে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন এসে গেল রেখার সংসারে।

দিন কাটতে লাগল। হাসি-খুশি গল্প বেড়ানো। কিন্তু সে বিশেষ জুলাই আর এল না। বেথা ইচ্ছে করে ভুলতে লাগল। ভুলতে লাগল তাদের অতীত ইতিহাস—সত্যি ভোলা যায় না, তাই নির্মম পরিহাসে উপেক্ষা করতে লাগল তাদের বিয়ের দিনটিকে। কী দুর্ভাগ্য হয়েছিল সেদিন, পারে নি বিয়ের দিনটিকে বদল করতে, তার বদলে সঙ্কল্পে অস্বীকার করে গেল ডিসেম্বরের সাতাশ তারিখটিকে। আজ ঐ দীর্ঘদিন পরে মনে হয় রেখার, মা হয়ে কী করে পেয়েছিল সেদিন এত বড়ো নির্মম হতে?

আজ তাই দুপুর লজ্জার সন্ধ্যাকালে বেথা ভুলতে বসল তার অতীতকে।

বিয়ের দিনটা ঠিক আসে, কিন্তু তেমন ভাবে বেথা আর অবনীকে প্রণাম করে না। শিওন ঠিক ঐ দিনেই হয়তো চিঠি দিয়ে যায়, কিন্তু সে চিঠির কোনোটিই আজ আর অবনী কিম্বা রেখার লেখা নয়। চুপচাপ—নিখুম মনমরা বিবাহ-বাংসরিক একটার পর একটা আসে আর চলে যায়।

অবনী বাব বোঝে। কিন্তু একটি কথাও বলে না। শুধু মাঝে মাঝে জিগ্যাস করে সেকোও ইমারে পড়া মেয়ে চিহ্ন—আচ্ছা মা, আগে তোমাদের বিয়ের দিনে যেমন আনন্দ হত, এখন তেমন হয় না কেন?

রেখার মুখে এক টুকরো দান হাসি ফুটে ওঠে। বলে,—মন বদলে যায় বে।

—কিন্তু দেখো, আমাদের জন্মদিনের বেলায় তোমাদের মন আমার এমনি ভাবে রদলে না যায়। এবার আমার কয়েক জন বন্ধুকে বলতেই হবে। মা—

বেথা বেন চমকে উঠল।

—তোমার কী হয়েছে বলো তো?

বেথা বলে—শরীফটা ভালো যাচ্ছে না রে। ভাবছি, তোর বিয়ে খা একটা দিয়ে যেতে পারলে বাঁচতাম।

চিহ্ন মুখ লাল করে ক্রীত চলে যায় পড়ার ঘরে।

কিন্তু সমস্তা আরও আছে। আগষ্ট মাসের জন্মতারিখটার জন্তে সমস্তা নয়, সমস্তা সেই পুরনো ডিসেম্বরের সাতাশ তারিখটার জন্তে। বেথা আজও চুপি চুপি বে ঐ দিনটার মেরেকে কিছু দেয়। এখন আর ব্রুক নয়, এখন শাড়ী।

চিহ্ন অবাক হয়ে বখন জিগ্যাস করে—তুমি প্রত্যেক বছর ঐ সময় একটা করে শাড়ী লাও কেন মা? তখন বেথা লজ্জার কোপে



সকোচে আর ঝাঁড়তে পারে না। বিমিত্র চিত্তকে অভিজ্ঞত করে দিয়ে রেখা যেন ছুটে গালিরে যায়।

অবশেষে অল্প বারের মতো এবারও তেইশে আগষ্ট এল। চিহ্ন এখন সেকোও ইয়ারে পড়ছে। এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে পুরনো আমনকেই চলে গেল। রেখার মা মারা গেছেন, বাবা গেছেন তার আগেই। দিদিমার জন্তে চিহ্নের মনটা মাঝে মাঝে বড়ো ধাবাপ করে। কী জানি কেমন করে যেন বড় ভাসোবেসে ফেলেছিল বুড়াকে। আজ তাই জন্মদিনের আনন্দ-উৎসবের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে মনে চিহ্ন প্রণাম করল তার দিদিমাকে।

বাড়িতে আজ বেশ ঠৈ-ঠৈ। খুব ঘটা করে এবার অবনী মেয়ের জন্মোৎসব পালন করছে। বছরে তো আনন্দ করবার এই একটি মাত্র দিন। বাইরের লোক খাওয়ার কথাটা অবশ্য রেখাই পেড়েছিল। ইচ্ছে ছিল, জন কতক কালজের বন্ধুকে খাওয়াবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাড়ার কয়েক জনও বাদ পড়ল না।

যথাসময়ে মেয়েরা এসে পড়ল। চিহ্ন স্নান করেছে কৌনু সকালে। কপালের ওপরে ছোট্ট শিশুদের কৌটাতিক ঘিরে অসংখ্য চন্দনের বিন্দু।

বন্ধুরা এসে ঘিরে ফেলল। চিহ্ন ওদের হাত ধরে নিয়ে গেল নিষ্ঠুর ঘরে।

কত গল্প, কত গান, কত হাসি, কত ঠাটা। কিন্তু চিহ্নের বেশিগণ এ ধরণের হালকা আনন্দ ভালো লাগে না। এক সময়ে সে অল্প কথা পাড়ল। তার ছেলেরবার কথা—মা-বাবার বিবাহ-বার্ষিকীর আবছা মধুর স্মৃতি, আর দিদিমার কথা।

দিদিমার কথা বলতে বলতে রে চোখে জল আসত। কী ভালোই না বাসত তাকে! কিন্তু বেশি যেতে পারত না ওখানে। বাবা যেন পছন্দ করতেন না। কেন করতেন না কে জানে?

—আমার দিদিমার কোটী দেখবি?

আগ্রহ না থাকলেও ভ্রমতার খাতিরে সম্মতি জানালো মেয়েরা।

চিহ্ন বলল—দাঁড়া, মায়ের কাছ থেকে ট্রাকের চাবিটা আনি। একটি মাত্র ফোটো বা ক'রে এনেছিলাম। এখনো মামাতো ভাই-বোনেরা দেখলেই কেড়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই লুকিয়ে রেখেছি মায়ের ট্রাকে। এই বলে উৎফুল্ল চক্কলতায় চিহ্ন এক রকম ছুটতে ছুটতেই গেল বাছাঘরে।—মা, তোমার ট্রাকের চাবিটা একবার লাও না?

বড় ব্যস্ত ছিল রেখা। কথা বলবার সময় পর্য্যন্ত নেই। কোনো রকমে জাঁচল থেকে বনাম করে চাবিটা ফেলে দিল।

আন্তে আন্তে ট্রাকটা থলল চিহ্ন। সেকালের ভারী ট্রাক। এই ট্রাকটা অনেক দিন অনেক বার অনেক নির্জন বিঃহরে হিঃ থলছে। থলতেই যেমন একটা ধুলার গন্ধ আসে। বসকালের পুরনো শ্মৃতিজড়ানো সেই ট্রাকের গহবরে অতি গুপ্তগণ চিহ্ন একবার হাত দেয়, যেন কারা ঘুমিয়ে রয়েছে। শাজও তেমননি করে ট্রাক থললে। কিন্তু মনটা অল্প দিনের মতো শান্ত ছিল না। ও-ঘরে বন্ধুরা বসে রয়েছে।

তাড়াতাড়ি পুরনো গরম জামাগুলো সরতে লাগল। এক সময়ে মায়ের একটা বড়ো ক্রিমজ্যাকারের কাপড়—ভালো করে খুতো দিয়ে

বাঁধা। লুকিয়ে একটু হাসল চিহ্ন। ওর ভেতরে কী আছে, চিহ্ন জ্ঞান। লোভ সামলাতে পারে নি এক দিন। খলে ফেলেছিল। হে—একটা চিঠির প্রথম দু'এক লাইন পড়েই কান্নের দু' পাশ লাল হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সেই যে চিনি বন্ধ করেছিল আর খোল নি।

দিদিমার ফোটোটা ছিল পাশেই। চিহ্ন সেটা তুলে নিল। তুলে নিতে গিয়েই লক্ষ্য পড়ল ট্রাকের খোপে আরও কতকগুলো পুরনো চিঠি। এগুলো তো এর আগে লক্ষ্যে পড়ে নি।

পুরনো চিঠির একটা আকর্ষণ আছে চিহ্নের কাছে। একটা পোর্টকার্ড তুলে নিল।

—এ যে দিদিমার লেখা!

পোর্টকার্ডটা উন্ট সাল-তারিখগুলো দেখবার চেষ্টা করল। পুরনো চিঠি। কিন্তু চিঠিতে কোথাও সাল উল্লেখ নেই। শুধু তারিখটা আছে। বারোই পোর।

এক নিশ্বাস চিঠিখানা পড়ে ফেলল চিহ্ন। কিন্তু—কিন্তু ঠিক যেন বুঝতে পারল না।

ক'কে লেখা?

আবার ভালো করে ঠিকানাটা পড়ল।

না, মাকেই তো লেখা।

কিন্তু—

কিন্তু এ কোন মেয়ের কথা লিখেছিলেন দিদিমা?

আবার পড়ল—আবার পড়ল চিঠিখানা। মাখাটা কি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে? এ কোন্ মেয়ে?

চিঠির শেষটুকু পড়বার জন্তে চিহ্ন চিঠিখানা একেবারে চোখের সামনে এনে ধরল।

না, কেখা তো পরিভার, পড়তে কোনো অসুবিধে নেই?

—পৌষ মাসে পৌষ-লক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছে। তাকে দেখবার জন্তে আমার মন ছুটকুট করছে। কিন্তু আমার নিয়ে বাবে কে? উনি তো বাতে পলু। আমি কলকাতার পথ-ঘাট ভালো চিনি না। তবু আমার পেটের মেয়ের মেয়ে, তাকে দেখবার জন্তে আমাকেই যেতে হবে।

ধরধর করে চিহ্নের হাতটা কঁপে উঠল। মাখাটা যেন কেমন করছে।

সেই অবস্থাতেই ছুটে গেল মায়ের কাছে।

—মা!

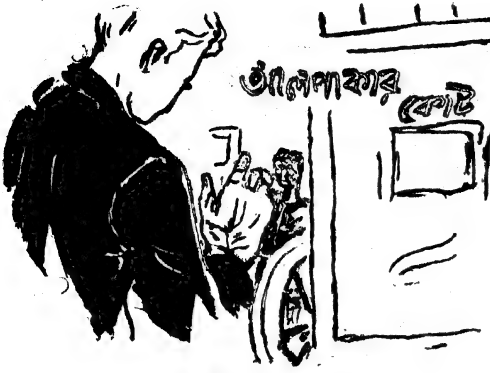
সে কণ্ঠস্বরে ভীত-ব্রহ্মচরিত্ত হৃদয়ে রেখা হাল্কাখর থেকে সেরিয়ে এল।

কিছু জিজ্ঞাস করবার আগেই চিহ্ন সেই চিঠিখানা মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কাঠা-ভড়ানো ব্যাকুল স্বরে বললে—আমার যে আরও একটা বোন ছিল, তার কথা তো আমায় কোনো দিন বলে নি?

বলতে বলতে চিহ্ন ছুটে গিয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কুঁপিয়ে উঠল।

রেখার পাতলা টোট দু'টো একবার কঁপে উঠল।

কিন্তু না, সে আরও লাবণ্যী, আরও কঠোর। টোটের ওপর পাঁতের কামড় বসিয়ে সে কেবল নিজেকে সংযত রাখবার জন্তে চেষ্টা করতে লাগল।



### শ্রীঅবিনাশ সাহা

**বোশেপ মাস।** বাড়ীতে বিয়ের ধুম লেগেছে। হাট-বাজারের  
অন্ত নেই। বিরাট ফর্দ নিয়ে নকুলচন্দ্র ঢাকা ছোট।  
হাতে সময় খুবই কম। তাইই বাজার নিয়ে ঘিরে আসা চাই।  
বেলা এগারোটা। সূর্য যেন আগুন ছুড়ছে। মাথার ওপর  
ধান রাখলে ফুটে খই হয়। নকুলচন্দ্রের ওঠাগত প্রাণ। একে  
থলথলে বিরাট দেহ—তার ওপর আবার ঘটি-ঘটি জল খাওয়া।  
ভুঁড়ি নয় তো, তেল-ভর্তি খুদে জালাই একটা। পেটের ওপর ঝুলছে!  
সব চেয়ে বিপদে ফেলছে নকুলচন্দ্রকে কালো কুচকুচে শোমগুলো।  
অবিরত হল ফোটাচ্ছে যেন গায়ে।

মেল ট্রেন এসে নামে নকুলচন্দ্র। প্রাটফর্ম লোকজনে গমগম  
করছে। কুলি, ফেরিওয়াল, পানিওয়ালার দৌড়াদৌড়ির বিরাম  
নেই। সবচেয়ে গোড়গাড়ির গাড়োয়ানরাই আছে ভাল। ওত  
পেতে এক একটি থেকশ্যেই যেন শিকার ধরতে ব্যস্ত। যাত্রীদের  
কেউ একজন পালানীতে পা বাড়িয়েছে কি ছুটে গিয়ে হেঁকে ধরছে।  
অবশ্য যাত্রীরা তাতে কেউ বেজার হচ্ছে না। আদর আপ্যায়নে  
খুশীর হাসিই খেলে কারো কারো ঠোঁটের কোশে। কেউ ডাকে,  
আইয়েন বড় মিঞা। কেউ বা মাহারাজের বললে মাহারাজ সম্বোধন  
করেই আর একজনকে খুশী করতে চায়। আর একজন হয়তো  
জিজ্ঞেস করে, কোন হানে ঘাইবেন—দিগবাজার? ওঠেন না বি,  
এক মিনিটে পৌঁচাইয়া দেই। রকটের চাকার (বাবারের চাকা)  
মালুম বি পাইবেন না...

নকুলচন্দ্র কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে ব্যস্ত ভাবেই  
প্রাটফর্ম নামে। হাতে গোটা কয়েক রেশন ব্যাগ ও ছোট একটা  
এটাচি কেস। যাবে নবাবপুর হয়ে চকবাজার। জায়গায় জায়গায়  
নেমে হাট-বাজার করতে হবে। অবশ্য খালি হাত-পা থাকলে একুপি  
গাড়ি-খোড়ার দরকার ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে নিকুপায়—ট্যাকের  
কড়ি গণ্ডা কতক গড়া দিতেই হবে। সব দিক ভেবে-চিন্তে একখানা  
গাড়ি নিজেই মনস্থির করে নকুলচন্দ্র। তবে শহরে ও নতুন নয়।  
ঢাকার গাড়োয়ানদের বিলকণ জ্ঞান আছে। মুখে ওরা যাই বলুক,  
স্বচক্ষে না দেখে কিছুতেই গাড়িতে উঠে না।

গাড়োয়ান মাত্রই কোন না কোন যাত্রীর পেছু নিয়েছে। কিন্তু  
নকুলচন্দ্রকে হেঁকে ধরেছে একঘোষে চারপাঁচ জন। ওর আঙুল-  
পেঁচা দিয়ে আঁকিগলাই চমকো সকলকে বেশী করে আঁকিগলাই চমকো

হাতের বিছে কবচ-জোড়ার-জোনালুও কম নয়। সূর্যকিরণে নবগ্রহের  
নয়টি রক্ত অল-অল করছে। অসহ্য গরমে মটকার পাঞ্জাবীটা অনেককণ  
গা থেকে খুলে কাঁধের ওপর ফেলেছে নকুলচন্দ্র। পুরোনো হলেও  
ওটার একটা আলদা আভিজাত্য আছে। ওরা হয়তো সকলেই ওকে  
জমিদার আর নয়তো তালুকদার ঠাউরিয়েছে। তা যা ভাবে ভাবুক।  
ও কাকেও কিছু বলবে না। বিদেশ-বিভূইয়ে একটু খাতির স্বত্ব  
পেলে ক্ষতি কি!—কারো কোন প্রচেষ্টা জবাব না দিয়ে খুশীর  
আমোজেই সকলের সঙ্গে প্রাটফর্মের বাইরে চলে আসে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে  
খুঁটিয়ে দেখতে থাকে মাথবন্দী গাড়িগুলোকে। না, বরাত আজ  
ওসমান গাড়োয়ানেরই ভাল। নকুলচন্দ্র অল্প কারো কথায় কান না  
দিয়ে ওসমানকে ভাড়ার কথা জিজ্ঞেস করে।

ওসমান তো মহা খুশী। খোঁরা মেহেরবান। যাক, দু'দিন পরে  
আজ তাহলে এক জন খানদানী সোয়ারীই পাওয়া গেলো। ভাড়ার  
কথা তাই সোজাসজিদ না বলে বেওয়াজ মতো বিনয়ে ফেটে পড়ে,  
আপনাপা চরণের ধূলা ঝাইড়াবি খাই মাহারাজ, আপনাপা লগে  
আবার মর ভাও করণ লাগব নাকি? ওঠেন না, মোন যা চার  
দিয়েন।

ওসমান বিনয়ে বতই গলে পড়ুক না নকুলচন্দ্র ওতে ভালো না।  
সরাসরিই আবার বলে, না না মিঞা, ওসব মোন চাওয়া-চাওয়ি কাম  
নাই। যা নিরা সোজা কও।

আরে! বার কয়েক বিনয় প্রকাশের পর সোজা কথার ভাড়া  
নগর পাঁচ সিকে ঠিক হলেও ওসমানের আবদার শেষ পর্যন্ত থেমেই  
যায়।—সাইদের সময় ওঠেন ত বি গাড়িতে! এক দিনের কাম  
নাকি! খুশী অইলে আর কিছু দিয়েন যোড়াবে খাইবার।

না না, আর কিছু পাইবা না। যাইবা ত তড়াতিড়ি নও এলা  
নকুলচন্দ্র দূত থেকেই বস্ত্র্য পেশ করে।

যোড়া ছুড়তে ছুড়তে ওসমান একটু অভিমান মিশ্রিত করে  
জবাব দেয়, ইড়া কে কইলেন মাহারাজ বামু না? অজায় বি কি  
কইলে পারের খনে জোতা (ছুতো) খুঁলা মারেন না।

জবাবে নকুলচন্দ্র মুখে কিছু না বলে হাসতে হাসতেই গাড়িতে  
ওঠে। ওসমান যোড়ার পিঠে চাবুক কবে নবাবপুরের পথ ধরে।

দেখতে দেখতে গাড়ি নবাবপুরে এসে পড়ে। বাঁ ফুটের মোড়ে  
ঐ সাদা বাড়িটাতেই মুলজী সিদ্ধার আপিস। ফর্দে এক নব  
মোহিনী বিড়ি ছুঁওগিল রয়েছে। আড়তদার আপেকা খোদ আপি  
থেকে নেওহাই শ্রেয়। খাঁটি আর তাজা জিনিষ। নকুলচন্দ্র  
জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বখাওয়ানে গাড়ি বাঁধতে বলে।

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ওসমান লাগাম কবে ঝাঁড় করার গাড়ি  
কিছু মুস্থিল হচ্ছে, শুভ কাজের বাজার করতে এসে গোড়াতেই খোঁ  
কেনা চলে না। হিসেব মতো পাঁচ আনার সিদ্ধিই আগে কিন-  
হয়। সিদ্ধিতে সিদ্ধি লাভ। না, কষ্ট যাই কেন হোক না, শাস্ত্রী  
বিধি অবহেলা করা চলবে না। সিদ্ধির দোকান অবশ্য গলির ও  
সীমান্তে। গাড়ি অতো ভেতরে যাবে না। গরমে পায়ে হোঁ  
যেতে হবে। তা হোক, তবু গাফিলতি করে অমঙ্গল ঘটানো চল  
না। কত আদরের পাঁচ। অনটন থেকে এত বড়টা হয়েছে  
বলতে গেলে বসের মুখ থেকে কিয় এসেছে। না না, বিধি মতে  
কাজ হোক। নকুলচন্দ্র গাড়ি থেকে নেমে সোজা সিদ্ধির খোঁ  
ঘটনা হয়। পুরোনো বাজারের দিন গরমে কষ্ট

পা পড়তেই সমস্ত শরীরটা ঝংকার দিয়ে ওঠে। হয়তো কোসকাট কুটে গিয়ে তলায়। কিন্তু কি আর করা যাবে? হাঁপাতে হাঁপাতে সূঁচি পাঁচ আনার কিনে কোন রকমে মূলজী সিন্ধার আপিসে এসে ঢাকে। থপ কঁর বসে পড়ে হলান দেওয়া বড় বেকটার ওপরে। নাগাপ্তেই সেলসম্যানের নজরে পড়তেও দেবী হয় না। ভক্তলোক প্রথমেই কোন কাজ কারবারের কথা না জিজ্ঞেস করে বিড়ি আর দশলাই এগিয়ে দেয়। আদর আপায়নে নকুলচন্দ্র আশাতীত খুশী হয়। ওর বোধ হয় একটা বিড়ির তেটাই পেয়েছিল। কৌটার খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে একটা বিড়ি ধরিয়েই খানিক দম নিতে থাকে।

সেলসম্যানও তার প্রাথমিক কর্তব্য শেষ করে অস্ত্র দিকে মন দেয়। না, নকুলচন্দ্র এখন অনেকটা স্বস্থ। তাড়াহাড়ি কাজ শেষ করাষ্ট এখন বিষয়ে। হাতের পোড়া বিড়িটা যথাস্থানে নিক্ষেপ করে নিজের আঁজি পেশ করে।

সেলসম্যান মনোযোগ দিয়েই ওর কথাগুলো শোনে এবং কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ না করে বেশ ভক্ত ভাবেই জবাব দেয়, পাঁচ হাজারের কমে তো এখানে বিক্রি নেই বাবু সাহেব! আপনি এজেন্টের কাজ থেকে নেবেন।

নকুলচন্দ্রের উত্তর শুধু হেসে থানিকটা শীতল হয়ে এসেছিল, মুহূর্তে আবার গরম হয়ে ওঠে। বলে কি বেটা! পাঁচ হাজারের কমে বিক্রি নেই! হ্যাঁটে বাজারে দোকানদার যে এক পরসার বিড়িও উপভোগ করে বেচে থাকে। গৃহস্থের পক্ষে এক সঙ্গে এক হাজার বিড়ি কেনা কি কম হলো! কোথাকার লাট বেলটি এসেছে তোরা? নকুলচন্দ্র কাছা ঝেড়ে বেক ছেড়ে উঠে পড়ে। কাজ নেই পরসার দিয়ে জিনিষ কিনতে এসে লোকের পায়ে তেল ফালায়। ট্যাকে কড়ি থাকলে বিড়ির অভাব হবে না! তেত-পাটে আপিসে ঢুকছিল তেতপুড়েই বেরিয়ে আসতে উত্তর হয়।

সেলসম্যান ওর হাবভাব বুঝে কি যেন বলতে বাচ্ছিল কিন্তু নকুলচন্দ্র সে সুযোগ নেয় না। মুখের উপরেই কড়া করে শুনিয়ে দেয়, কাম নাই মশয় আপনার ঢলাইনা কথা শুনবার। পরসার থাকলে বিড়ি অনেক পায়ুনে! বাগে গজ গজ করতে করতেই আপিস থেকে নেমে এসে গাড়িতে উঠতে যায়।

ওসমান কোচাবন্ধের ওপর বসে সবই লক্ষ্য করছিল। সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, কি অইল মাহারাজ, বিড়ি আনলেন না?

অইন কোনহান থনে। হালায়া (শালার) যে মাথার কিরা বইচে, পাঁচ হাজারের কম বেচব না! —সফ্রোখেই উত্তর করে নকুলচন্দ্র।

যেন মনে হাসি পেলেও ওসমান সমতা রেখেই সাধনা দেয়, হাজারে বি গেচিলেন হালা ভাইটাগ (ভাট্টার) কাছে! অগ বিড়ি পা থনে কম দামেই পাইবেন নে চকে।

নকুলচন্দ্র বলে, হ, তাই নও। পাঁচ হাজারের কমে বেচব না কথ্য হালায়া সাইন বোর্ডে লেইকা খুইলেই ত পারে।

ওসমান ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাতে চালাতে বলে, বুচচেন না মাইনধেরে পেরাসিনে করাই হালাগ কাম।

নকুলচন্দ্র আর কথা বাড়ায় না। একটা সীটে বসে আর একটা টি ওপর পা তুলে নিয়ে কিঞ্চি আদায় করতে থাকে।

ওসমানের প্রাণেও বোধ হয় সহসা খুশীর হাওয়া লাগে। চড়া বোঙ্গে প্রাণ খুলে গান ধরে, আমি বন ফুল গো...

নকুলচন্দ্রের সেমিকে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। শুভ কাজের সওয়া করতে এসে প্রথমেই বাধা পেলো। শালা ভাট্টারের কাছে না গেলেই ছিল ভাল। মনটা অবিরতই খুঁতখুঁত করতে থাকে। গাড়ি বড় জোর হাত পঞ্চাশেক এগিয়েছে আবার দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চোঁচাতে থাকে, আরে বাথ বাথ, এই বড় কাপড়ের দোকানটার সামনে লাগাও।

ওসমান গান থামিয়ে চলতি ঘোড়ার মুখে লাগাম কষে গাড়ির গতি বোধ করে। নকুলচন্দ্রের নির্দেশ মতো শাহী ট্রোসের সামনে নিয়েই গাড়ি দাঁড় করায়।

নকুলচন্দ্র মাতা ঢাকেশ্বরীর উদ্দেশ্যে বার কয়েক কপালে হাত ঠুকে ধীরে স্রষ্টাই গাড়ি থেকে নামে। দোকানের সেলসম্যান মুহূর্তে ছুটে আসে গাড়ির কাছে। সবিনয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানায়। পান সিগারেট যোগে আপায়নেও ক্রটি হয় না।

নকুলচন্দ্র প্রথমে ভাবে সিগারেট খাবে না। কে জানে, এখানেও সওয়া হবে কি না। জাঁকজমক তো এদের আরো বেশী। কি বলতে কি বলবে তার ঠিক কি! —একটা পান মুখে দিলেও সিগারেট ধরতে দ্বিধা বোধ করে। কিন্তু না, এরা রীতিমতো ভক্তলোক। চাইলে আর গজ কাপড়ও এরা কেটে বিক্রি করতে রাজী। শালা ভাট্টারদের মতো অতো ফুটনি নেই। কথায় কথায় মনের খুঁতেই একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেল। উঁচিয়ে পাঁচিয়ে কাপড়ের জমি পরীক্ষা করে নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়েই একখানা বেনারসী শাড়ী গন্ত্য করে। বড় পছন্দসই শাড়ী পাওয়া গেছে। এ বং পাটকে মানাবে ভাল। কুটুমের কাছেও খাতির পাওয়া যাবে। খুঁতে গঙ্গদ হয়েই শাড়ীর বাস্টা বগলে ফেলে গাড়িতে এসে ওঠে নকুলচন্দ্র। আর একটা সিগারেট হাতে করে এনেছিল। গাড়ি ছাড়লে ধরিয়ে মৌজ করতে থাকে।

গাড়ি বাংলা বাজারের পথে চলেছে। হয়তো পঞ্চাশ গজও হবে না। নকুলচন্দ্র আবার চোঁচাতে শুরু করে।

ওসমান চলতি ঘোড়ার মুখে আবার লাগাম কষে মাথ্য বাস্তাতেই গাড়ি দাঁড় করায়। বিরক্তির সঙ্গেই জিজ্ঞেস করে, কিছু ফালাইয়া আইলেন নাকি মাহারাজ?

আরে না মিঞা, কিছু ফালাইয়া আইছি নাই। শাড়ীর ই ব চলব না। মনেই আঁচিল না শুভ কাজে আসমানী ব চলব না। তড়াহাড়ি গাড়ি ঘোরাও, হাতের সিগারেট বাস্তায় ছুঁড়ে ফেল অস্থির হয়ে ওঠে নকুলচন্দ্র।

মুখে চুপ খাওয়ার মতো আওরাজ তুলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ি ঘোরাতে বাধ্য হয় ওসমান। ইচ্ছে করে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে দেয় গোঁয়ো ভুঁতটাকে। কিন্তু পারে না।

শাড়ীর রটা এখনো ঠিক অপছন্দ নয় নকুলচন্দ্রের। কিন্তু হলে কি হবে; পাটার মা যে মুখে বাঁটা আরবে। পুই-পুই করে বেচারার লাল শাড়ীর কথা বলে দিয়েছে। কেন যে এ রটা তখন পছন্দ হলো! শালা ভাট্টারই মেজাজটা কিগড়ে দিয়েছে! —গাড়ি ঘোরাতে কিঞ্চি দেবী হচ্ছিল ওসমানের—নকুলচন্দ্র খেঁটে পড়ে, আরে এই মিঞা কদিন গাড়ি চালাইচ? এতক্ষণ লাসে গাড়ি দুলাইতে!

কি যে কন্ মহারাজ! ঘোড়ার বি তো আর কলের জান না যে বুতাম টিগুব আর ঘুব! একটু সবুর করেন।—এই হালা ঘোড়ার পো, মহারাজ বি বাগ করবার নৈচে হোনচ না (মনছিল রে)। লাগামে টান দিয়ে কবে এক টাবুকের ঘা মারে।

দেখতে দেখতে গাড়ি আবার শাহী ট্রোসের দরজায় এসে লাগে। সেলসম্যানও আবার এসে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু নকুলচন্দ্র হাসতে পারে না। শুকনো মুখেই শাড়ীর বাস্কাটা হাতে করে গাড়ি থেকে নামে। খানিক ইতস্তত করে সঙ্কোচের সঙ্গেই আবার জানায়, এই শাড়ীটা দয়া কইরা একটু বদলাইয়া দেওরন লাগব।

সেলসম্যান নয়তো যেন রসের ভিয়েন। আত্মদে ডগমগ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাণ্টা বিনয় প্রকাশ করে, আরে আর লেইগা এত দিক করবার নৈচেন ক্যান। আপনাগ দোকান, একবার ছাইড়া দশ বার বদলাইয়া নেন না।

উত্তর শুনে নকুলচন্দ্রের গোমড়া মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিনা দ্বিধার আবার একটা সিগারেট ধরায়। হাসতে হাসতেই বলে, এই শাড়ীই, ইডার বদলে একটা লাল রঙের তান।

ইস, এই ত ঠেকাইচেন মহারাজ। ইয়ার জুড়ি ত লাল রঙের বি আইব না। কিছু বাড়ন লাগব। তবে জমিন বিও জানা সময় আইব। নকুলচন্দ্রের আবার সেলসম্যান উত্তর করে।

উত্তর শুনে নকুলচন্দ্র মাথায় হাত দিয়ে বসে। বলছে কি বোটা। পঞ্চাশ টাকাতেই ত চকু ছানাবড়া। আবার কারো বাড়ন লাগব!—কিন্তু কি আর করা যায়, চাইলে তো আর দাম ফেরৎ পাওয়া যাবে না। অগত্যা দেখতেই হবে!—অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানায় নকুলচন্দ্র।

আর, এক লম্বা বানারদৌর বাস্কা লইয়া আয়, নকুলচন্দ্রের সম্মতিতে খুশী হয়ে যোগানদারের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে সেলসম্যান।

চোখের পলক পড়তে না পড়তে বাস্কা এনে হাজির করে যোগানদার। সেলসম্যান বাস্কের ডাগা খুলে উজ্জ্বল জানায়, ল্যান মহারাজ, এক লম্বা বানারদৌর। পাকা রং সার্ভা জরি।

গোটা বাস্কের মধ্যে মাত্র একখানাই লাল রঙের শাড়ী আছে। নকুলচন্দ্র শাড়ীখানা টেনে নিয়ে ভাঁজের মধ্যে হাত গলিয়ে জমি পরীক্ষা করতে থাকে।

সেলসম্যান স্বয়ংগ বুঝে আবার উজ্জ্বল জানায়, ইয়ার আর জমিন পরখ করন লাগব না মহারাজ। ইচ্ছা করলে জল বি বাইলা জানবার পায়বেন। রং জরির জেলায় কয়নার (কনে) বি রেশনাই বাড়র জামাই বি খুশী আইব। চকু বইজা লইয়া যান। জামাই খুশী হবে কি না পরের কথা। কিন্তু নকুলচন্দ্র নিজেই খুশী হতে পারে না। বিচার করে দেখলে আগের শাড়ীখানাই চের ভাল। বোটা বাগে পেয়ে খাংখা জিনিবকেই ভাল বলে চালাতে চাচ্ছে। মত শালা চোটার কারবার সেলসম্যানের উজ্জ্বলের কোন জবাব না দিয়ে মনে মনেই ইতস্তত করতে থাকে নকুলচন্দ্র।

সেলসম্যান অপরূপ বুঝে আবার উসকাতে থাকে, তামাম ঢাকা শহর ঘুরলে ইরকম শাড়ী মিলব না মহারাজ! দেখছেন না, লাটের মদে এই একটা বি খালি লাল শাড়ী।

কথা শুনে নকুলচন্দ্রের ইচ্ছে হয় পাণ্টা মোটা কথা শুনিবে দেয়। কিন্তু পারে না। দায় বখন ওয় নিজের তখন মুখ বুজে সব শুনেছেই

হবে। মনের ভাব মনেই চাপা দিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গেই মস্তব্য করে, আগের শাড়ীখানাই আমার মনে ধরচে। ইখানা—

মুখের কথা শেষ করতে পারে না নকুলচন্দ্র। সেলসম্যান হুঁচক খে বিফারিত করে প্রতিবাদ করে, আইজ্ঞা আপনে কন কি মহারাজ! রৈসে রৈসে হুইরা আপনার বি চক্ষের ঠিক নাই। ইডা আইল এক লম্বা আসল চিঙ্গ। এর লগে আপনে খুটা মালের জানপচান করবার চান?

নকুলচন্দ্র এবার হুঁসে উঠতেই বাচ্ছিল, কোন বকমে আত্মসম্বরণ করে। সবিনয়েই শুধায়, আইজ্ঞা কন, কত দেওরন লাগব?

না না, দামের কথা আর আপনেরে কেনে কই! চিঙ্গ বিই যখন আপনার পছন্দ হয় নাই, কৃত্রিম স্কাভের সঙ্গেই উত্তর করে সেলসম্যান। বলতে বলতে আবার একটা সিগারেট আর বেশলাইটা এগিয়ে দেয়।

হাজার হলেও নকুলচন্দ্র সোভ সম্বরণ করতে পারে না।

সিগারেটটা ধরিয়ে আবার শুধায়, সময় নাই, তড়াতিড়ি কন কি দেওরন লাগব?

না না, আমি কিছু কইবার চাই না। ইনদাব কইরা আপনেই বি যা হয় তান।

আরে ধুতর, খালি খালি কতা বাড়ান। আপনার জিনিব আপনে না কইলে নিবার পাক্সম নাকি?

আইজ্ঞা বনীর (বোনী) সময়ে দর ভাওয়ের কাম নাই। আর দউশগা (দশটা) টেকা তান।

হাতের সিগারেটটার জোরে একটা টান দিয়েছিল নকুলচন্দ্র উত্তর শুনে মনে হয় মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। শালা কুটি বলে কি কোথায় দশ টাকা কম হবে তা না আরো দশ টাকা বেশী। ন বাজার করতে আসাই আজ ভুল হয়েছে!—হাতের সিগারেট হাতে থাকে, নকুলচন্দ্র আর নকুলচন্দ্রের ভেতরে নেই।

সেলসম্যান সমতা রেখেই যোগানদারের উদ্দেশ্যে বলে, এই এইডা বাস্কের মদে ভাল কইরা বাইন্দা দে।

নকুলচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারে না। তাড়াতিড়ি বাগা দে না, এত দরে নিবার পাক্সম না। এই সমান সমান করেন।

আপনে কন কি! তাহলে কিছু দেওরন লাগব না। আর টেকাও ফেরৎ লিয়া যান শাড়ী বিও অমনিই নিয়া যান।

মস্তব্য শুনে নকুলচন্দ্র মনে মনে ভাবে, সে ত তোমরা কতই চোটার দল। মুখেই কেবল লণ্চপানি!—প্রভাত্তরে বলে, অনিয়ু কন কি! পাঁচ টেকা কম করেন।

বনীর সময় দরভাও করবেন না। দেবার হয় দশটা তান নয়ত অমনিই লইয়া যান।

বেলা অনেক হয়ে গেছে। নকুলচন্দ্র বোঝে আর কথা বা অনর্থক অপদ্রব্ধই হতে হবে। চোটার একটা কানা কড়িও করবে না। তাই আর কথা না বাড়িয়ে দশ টাকার একখানা ছুড়ে দিয়েই মস্তব্য করে, নেন আপনাগ মোন যা চায়।

সেলসম্যান বোধ হয় এবার বিবেকে যা খায়। হ হাসতেই একটা টাকা ফেরৎ দিয়ে—মস্তব্য করে নেন, কি আর আপনে যখন অসম্মত হন। কিনা (কেনা) দামে বি দিলাম।

নকুলচন্দ্র হাঁ ধী কিছু না বলে মুখ ভার করেই শাড়ীর

হাতে করে গাড়িতে এসে ওঠে। মনে মনে গালাগালি দেয়, নে শালার তগ ঘাটের কড়ি। আর কোন দিন যদি এ মুখো হই—

মুখ বুজাই নকুলচন্দ্র চলতে চায়, কিন্তু ওসমান ছাড়ে না। কাটা ঘারে হুণের ছিটা দেয়, কি অইল মাহারাজ, শাড়ী বি—বদলাইলেন?

হা, বোজ্ঞে তোমার কি কাম মিঞা? সেলসম্যানের সঙ্গে না পেরে ওসমানের ওপরেই ফেটে পড়ে নকুলচন্দ্র।

কিন্তু ওসমান দমে না। আপন চণ্ডে পুনরায় ভেঁচি কাটে, না, এমনই জিগাই আর কি। আপনার মুখখান বি ত শুকাইয়া বলদের পাটার মতন দেখাষ্টবার নৈচে—

এই মিঞা, মুখ সামলাইয়া কতা কইও, নকুলচন্দ্র তেড়ে ওঠে।

চটনে ক্যান মাহারাজ, বৈরুে কি মাথায় বি কিছু ঠিক আছে না কি? কোনহানে যামু কন?

নকুলচন্দ্র গলার স্বব গম্ভীর করে উত্তর করে, বাংলা বাজার লও।

গাড়ি ঘুরেবের আগোজ তুলে বাংলা বাজারের দিকেই ছুটতে থাকে। ওসমান ঘোড়ার পিঠে চাবুক করে আবার গান ধরে, আমি বন ফুল গো—

গাড়ির ভেতরে নকুলচন্দ্রের অবস্থা শোচনীয়। শাড়ীর বাস্কা খুলে ডাক ছেড়ে বাদতে ইচ্ছে করে। ইস শালা বদমাশ, গালে খাপ্পড় মেরে টাকাগুলো কেড়ে নিলে। পাঁটার না এখন এ শাড়ী টান ঘেঁরে ফেলে না দিলে হয়—

গাড়ি বাংলা বাজারের সোমানা প্রার ছাড়িয়ে চলে। কিন্তু নকুলচন্দ্রের কোন সাড়া-শব্দ নেই। বেগতিক দেখে ওসমান সহসা ঘোড়ার মুখে লাগাম করে গেষের সঙ্গে প্রশ্ন করে, বাংলা বাজার বি ছাড়াই চললেন মাহারাজ, যাইবেন কোনহানে?

ওসমানের তাড়ার সহসা যেন সন্ধি ফিরে পায় নকুলচন্দ্র। তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে রাখ রাখ মিঞা! আগে কইবার পাঁচি না। চক্সা প্রেসে লও।

হা ত বি কালারিয়া আইলাম মশয়, ওসমানের কণ্ঠে বিরক্তির সুর।

তার কি করুম? ঐহানই যাওয়ন লাগব।

হ, আপনে ত বি কইয়াই খালাস! আমার পেবাসিনিডা। কারা জাহে?

আরে নও নও মিঞা! কল বাড়াইয় না, একক্ষণ চইলা। যাইবার পারতা।

ইস, হাওয়াই জাহাজে উঠচেন নাকি মাহারাজ?

বেকায়নার পড়ে নকুলচন্দ্র আর হুঁ থা করে না।

ওসমান গজ-গজ করতে করতেই গাড়ি ঘোরাতে থাকে। থাণীতি চক্সা প্রেসের ফটকে এনে দাঁড় বরায়।

নকুলচন্দ্র আর বিলম্বিত দেরী করে না। তাড়াতাড়ি পকেট হাণ্ডে একটা কাগজ বার করে প্রেসের ভেতরে ছোটে।

সব বোতাই দেখছি সমান। কত বার হুঁটাকা দিয়ে প্রোগ্রাম গণিয়ে নিয়ে গেছি। আজ বোটা কিছুতেই তিন টাকার কমে নয়। তাও আবার ডাকে পাঠাবার খরচা আলাদা দিতে ঢাকার কুটি আর কাঁকে বলে! সন্ধ্যোগ পেলেই পকেট করবে। পাঁটার কপালে যে কি আছে ভগবানই জানেন!

বিরক্ত হয়ে নকুলচন্দ্র তিন টাকাতাই বাজী হয়ে বার। নগদ হুঁটাকা অগ্রিম জমা দিয়ে উঠে পড়ে।

ওসমান আবার গাড়ি ইঁকাতে, ইঁকাতে, নির্দেশ মতো বাবু বাজারের পুলের মুখে এনে দাঁড় করায়। সূর্য পশ্চিম দিকে হেসে পড়েছে। এখানে ঢের সওয়া বাকী। ব্যস্তমস্ত হয়েই নকুলচন্দ্র গাড়ি থেকে নামতে বাঙ্ছিল, ওসমান বাধা দেয়। কোচবার খেকে লাফ দিয়ে নেমে আবার জোড়ে, ঘোড়ার বিজল খাইব, মাহারাজ, কিছু ছাড়েন।

নকুলচন্দ্রের মেজাজটা স্বভাবতই ভাল নেই। ওসমানের আবাদেব হুঁসে ওঠে, কিছু ছাড়ুন মানে?

কইলাম ত মশয়, ঘোড়ায় বি জল খাইব, ওসমানের কণ্ঠেও কর্কশতা ধান-ধান হয়ে স্বরে পড়ে।

নকুলচন্দ্র কিছুটা সামলিয়ে নিয়ে বিষয় প্রকাশ করে, কি জানি মিঞা, কোন দিন ত কিছু দেই নাই!

জান নাই এমন বি জান। ডর নাট, ভোগা দিয়া কিছু নিম্ন না। মাইনসেবে জিগাইলেই পাইবেন।

আরে চাই না মিঞা কেউব জিগাইবার। এই নেও, বলতে বলতে ক্রমাল খুলে একটা আনি ওসমানের হাতে দিতে বার নকুলচন্দ্র।

ওসমান ঢোখ কপালে তুলে হুঁসে ওঠে, ভিক্সা জান নাকি মশয়! চাইর পরসার বি ত ঘোড়ার জিকাও ভিজব না!

না ভিজলে আমি কি করুম? ইয়ার বোই আমি কিছু দিবার পারুম না। তোমার লগে কিছু কতা আচিল নাকি?

কতা আবার কি থাকব মশয়! জিগাস না মাইনসেবে। এই খলিল মিঞা, অদুরই খলিল গাভোয়ান গাড়ি ইঁকিয়ে বাঙ্ছিল, তার উদ্দেশ্যে চোঁতে থাকে ওসমান।

নকুলচন্দ্র কাঁপরে পড়ে। না, সব দিক দিগেই আলাতন শুরু হয়েছে আজ। নিজের কপালে নিজেই করাঘাত করে ওসমানকে বাগ ধরে, এই মিঞা, কাম নাই কেউব ডাইকা, এই নেও, আবার ক্রমাল খুলে আর একটা আনি হাতে গুঁজে দিতে বার।

ওসমান দাঁও বুখে আবার কোপ মাঝে, কি তামসা করবার নৈচেন মশয়। আর না জান এউগা স্বকি বি ত দিবেন (একটা সিকি)! ঘোড়ায় খাইব সঙ্গে বি হার মাজত। আপনার আকিল কি?

আকিল তুমি ভাল কইরাই দিলা মিঞা! আর আকিলের কতা মুখে আইন না। এই নেও, পিণ্ডি গিল গা, বাগের মাথায় আরো হুঁ আনা পরসা বার করে দেব নকুলচন্দ্র।

পরসা চার আনা পেয়ে ওসমানের ঠোঁটে কিঞ্চি হাসি দেখা দেয়। নকুলচন্দ্রের কড়া কথাব কোন জবাব না দিয়ে সোজা পালের একটা সরাইখানায় গিয়ে ঢোকে। যাবার সময় ঘোড়া হুঁটোর মুখে ছোঁলা ভিজানো আর বাগের টিন ছুঁতে বেঁধে দিয়ে বার।

ওসমান আর ঘোড়া দুটো তবু একক্ষণ পরে একটু হাঁপ ছাড়বার অবসর পায়। কিন্তু নকুলচন্দ্রের আজ দুখা-ভুলা বলে কিছুই নেই। বিকেল ছটার গাড়িতে ফিরতে না পারলে অনেক রাত হয়ে যাবে। সামনে কৃষকদের খন অক্ষকার। রাজ্যের সাপ-খোপের ভয়ও কম নয়। তাড়াতাড়ি নেমে কেনাকাটার মন দেয়। এক লহমার পাঁচ দেয় ঢাকাই বলসাবান সোয়া দেব, স্বগন্ধি আনারপুরী ডামাক,

এক কুড়ি ককে ও পাঁচ হাজার টিকে কিনে ফেলে। নির্দেশ মতো মুন্টো সজে সজে গাড়ির ছাদে চাপিয়ে দেয়।

দেখে দেখে ওসমানের গায়ে আলা ধরে। নতুন ঝ-পালিশ হয়েছে গাড়িপানায়। এই সমস্ত ছাইপাশ চাপিয়ে শেষটার না দাঁপ ধরিয়ে দেয়। গৈয়ো ভূত কোথাকার! ঘোড়ার গাড়ি না করে মোবের গাড়ি করলেই হতো। ১০০-কিস্তি মুখে কিছু বলতে পারে না। এইমাত্র নগদ চার আনা পয়সা ফাউ বাগিয়েছে, একটু চক্কুলজ্ঞা তো আচ্ছ! নকুলচন্দ্রের কাণ্ড-কারখানা দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতেই থাকে। গৈয়োটা শেষটার না তামাম ঢাকা শহরখানা ছাদের ওপর চাপিয়ে দেয় ১০০-না হোক, ভগবানকে ধন্যবাদ! মিনিট কুড়ি পচিশের ভেতরেই বাবুজাকারের পাট মিটে যায়। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে গাড়িতে এসে বসে। সন্মুখের খালি সীটটার ওপর পা তুলে দিয়ে একটু আরাম করতে থাকে।

ওসমানও খানিকটা চালা হয়ে—মনের আনন্দের গাড়ি হাঁকিয়ে চলে। এবার চকবাজার। নকুলচন্দ্র আশ্বাস দিয়েছে, এখানেই বাজার শেষ।

দেখতে দেখতে গাড়ি এসে চকবাজারের ছোট কাটবার সামনে এসে লাগে। অবসর দেহেও কিংবদন্তি বল সবার হয় নকুলচন্দ্রের। মনের খুশীতেই গিয়ে ঢোকে কাটবার ভেতরে। সারা দোকান খোঁজ খোঁজ। কিন্তু না, কোথাও নিজের গায়ের মাপে একটা আলপাকার কোট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দাম কম-বেশী যাই হোক—অজ্ঞাত সওদা এক রকম করে প্রায় সবই হয়ে গেছে। শুধু মিলছে না এই কোটটা। অথচ না হলে চলেই বা কি করে? পাঁটার স্বত্তর তো শুনেছি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। সঙ্গে জনকয়েক সঙ্গীত বরষাত্রীই আসবে। নিজের বলতে তো একটাও ভাল জামা নেই। কোটটা হলে মানরক্ষা হতো। তা ছাড়া এই উপলক্ষে কেনা হলেই হল, নয়তো কবে আর আসছে শুধু একটা কোট কিনতে? এক দোকানদার না করে তো নকুলচন্দ্র আর এক দোকানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেখানে বিফল হয়ে আবার আর এক দোকানে, না, কেউ দিতে পারছে না

ওর মনমতো কোট। সবাই বণু দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে। বেটাদের যেন ঠাট্টার পাত্র আমি। অর্ডার দিও তো গায়ের দজ্জিক দিয়েও করিয়ে নিতে পারি রে হতচ্ছাড়া দল। তবে আর তাদের দোরগোড়ায় ধনী দেবো কেন? সময় নেই বলেই না তাদের দোর দোর ঘুরছি। অতো চো টেপাটেপি কিসের? এত বড় তো দোকান সাজিয়ে বসেছিস, লব কবে না, একটা কোট বার করতে পেরেছিস নে? কেন, জীবনে আমার মতো বণু কারো দেখিসনি নাকি! নকুলচন্দ্র ঘুরে ঘুরে অস্থির হয়ে ওঠে। সারা গা দিয়ে অঝোরে ঘাম ঝরছে। লোমণ্ডা ভিজ্ঞ জবজবে। ভালুকের মতোই দেখাচ্ছে হয়তো। বেটারা ত হয়তো অতো হাসছে। জামাটা গায়ে দিলে অবশ্য হয়। কিন্তু এখন আর সে উপায় নেই। হতচ্ছাড়ারা যা ভাবছে ভালু ওদের দিকে না তাকালেই হলো। সারা কাটরা ঘুরে শেষটার হয়েই গাড়ির দিকে ঘিরে আসে নকুলচন্দ্র।

ওসমান কোচবাজার ওপর বসে একটা বিড়ি ফুকছিল, নকুলচন্দ্র দেখে বিশ্বয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, খালি হাতে আইলেন মাঠাণা কিচু আনলেন না!

নকুলচন্দ্র বিরক্তির সঙ্গেই জবাব দেয়, কি আয়ুম মিতোমগ তামাম কাটরা ঘুরে একটা আলপাকার কোট পাই না।

ওসমান ততোধিক বিশ্বয়ের সঙ্গে পান্টা প্রশ্ন করে, আলপাকার কোট পাইলেন না! কার গায়ের?

কার গায়ের আবার নিজের লেইগাই চাইচিলাম।

আপনার লেইগা আলপাকার কোট? কন কি মাঠাণা আপনার তামাম গায়ে না আলপাকার রইচে, চাউরগা (চাবুতাম) বি খালি লটকাইয়া লন না, বাহারের কোট অইবে নে।

ওসমানের রসিকতায় বেগে উঠতেই বাচ্ছিল নকুলচন্দ্র কিন্তু জানি কেন ফিক করে হেসে ফেলে। নিজের গায়ের দিকে তো শেষটার মটকার পাঞ্জাবীটাই চড়িয়ে নেয়।

গাড়ি রেল-স্টেশনের পাথে উল্লেখ্যে ছুটতে থাকে।

## এরা আর ওরা

রমলা দেবী

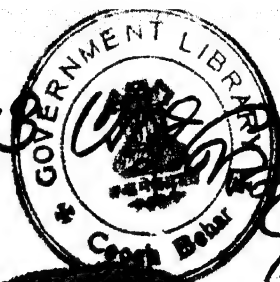
ওদের সাথে তাল মিলিয়ে চলা  
ওদের সুরে সুর মিলিয়ে বলা  
ভালবাসার নিয়ম মেনে চলা  
এদের আজও হল না।

ওদের কথা বুঝবে না ত এরা  
এদের কথাও শুনেবে নাক' ওরা  
এক নিয়মে ওঠা বসা ঘোঁরা  
এদের ওদের হল না।

চিরকালই চলল হানাহানি  
খামল নাক' মিথ্যা কানাকানি  
জীবন নিয়ে করে টানাটানি  
ওদের সাথে এরা।

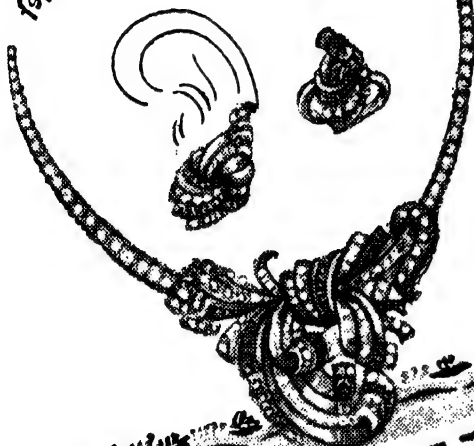
এরা, ওরা, মিলবে হায় কবে  
পরস্পরে আপন করে লবে  
কবে এদের বিবাদ মিটে যাবে  
মিলবে এরা ওরা।

মৌলিকতায়, নির্ভরতায়



৩২

জিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট



১৩৭ সি, ১৩৭ সি/১, বহুবাডার স্ট্রীট, কলিকতা-১২

ফোন ৩৪-১৭৬১ • গ্রাম: প্রিলিমান্টমা

ব্রাঞ্চ : বালিগঞ্জ - ২০০/২/সি-রাজবিশারী এডিন্ডি

কলিকাতা-২৯ • ফোন : ৪৬-৪৪৬৬

ব্রাঞ্চ - ডহামশেদপুর

ফোন : ডহামশেদপুর - ৮৫৮

শ্রী ৪২৬ পুস্তকালয় ১২৪, ১২৪/১ বহুবাডার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ (ক্রেতামিত্র, বালিগঞ্জ) (শ্রী ৪২৬)

# ফরাসী বিপ্লবকালের একটি প্রেমের কাহিনী

ঐতিহাসিক রচয়িতা ফ্রান্সোয়া ফ্যাব্র

ফরাসী বিপ্লবের রক্তাক্ত স্রোতে ছুটি নিরক্ষর রক্তের ধারা এসে মিশেছিল, ছুটি কৃষ্ণমণি প্রস্তুত হওয়ার আগেই ছিন্নমূল হয়ে রক্তের সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল, তার কথা অনেকেই জানেন না। ঐতিহাসিকগণ একটির কথা বিশদ ভাবে বর্ণনা করলেও আরেকটিকে উপেক্ষা করে গেছেন। কারণ সেইটিতে বিপ্লবের আগুন বিশেষ ছিল না—ছিল প্রেমাস্পদের জ্ঞান আত্মবিসর্জন। সেই কাহিনীই এখানে বিবৃত করবো।

নব্বাঁশের মেরী এ্যান শার্লট কর্তৃক আত্মগুপ্ত ফরাসী বিপ্লবের জোয়ান অব আর্ক বলা হয়। সাধারণ চাষীর ঘরে তাঁর জন্ম—যদিও পূর্বপুরুষের মধ্যে অনেকে রাজনীতিক, শাসক এবং বোদ্ধা ছিলেন।

শৈশবে শার্লট কনভেন্টে পড়াশুনা করেন। তার পর কাকীমার কাছে থাকে কালে ভেন্ট্যুর প্রচারক ও অনেকের লেখা পড়েন। তখনই তিনি দেশপ্রেমের অল্পপ্রেরণা লাভ করেন।

ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার সময় তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। রাজনৈতিক মতবাদে তিনি ছিলেন ‘গিরণ্ডিন’—যাদের কাম্য ছিল শান্তি ও সাম্য। কিন্তু ‘মাইটেন’ দলের প্রাধান্যে সেই সময় প্যারিসে বিপুল রক্তের স্রোত বয়ে চলাছিল।

ষোড়শ নুইয়ের পর (জানুয়ারী, ১৭৯৩ খৃঃ) তারা অসংখ্য লোকের গিলোটিন অর্থাৎ শিরশ্ছেদ করে। কায়েনে বসে শার্লট প্যারিসের সব খবরই পেতেন। সেই সময়ই মাইটেন দলের একজন প্রধান নেতা জীন পুল ম্যারাটের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মে। তাকে হত্যা করে দেশকে বাঁচাতে হবে—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি প্যারিসে আসেন। ম্যারাটের দর্শনপ্রার্থী হয়ে তাকে লিখলেন—“আমি এইমাত্র কায়েনে থেকে এলাম। জন্মস্থানের খবরের জ্ঞান নিশ্চয়ই আপনি উৎসুক? এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করবো ও আপনাকে এমন অবস্থার উপনীত করবো, যাতে ফ্রান্সের প্রভুত উপকার হয়।”

কিন্তু দাম্পত্য মঞ্জুর হল না। শার্লট আবার লিখলেন, তা’ও ব্যর্থ হ’ল। তখন তিনি নিজেই এক দিন ম্যারাটের বাড়ীতে গেলেন। সেখানে দ্বাররক্ষীদের জানার্লেন যে, মাইটেন দলের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি ম্যারাটের আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছেন। কিন্তু তবুও রক্ষীরা তাকে ঢুকতে দিল না।

সেই সময় ম্যারাট উৎকট চর্খরোগে আক্রান্ত হয়ে কখন দিয়ে সমস্ত শরীর জড়িয়ে একটা টবে শুয়েছিলেন। গোলমাল শুনে তিনি শার্লটকে ভিতরে আসতে বললেন। বুকের সঙ্গে ছোঁয়া ছোঁয়ে শার্লট ভিতরে ঢুকলেন।

শার্লট ম্যারাটকে বললেন, “কায়েনে ভ্রমার উত্তেজনা চলছে। গিরণ্ডিনরা কি বের্নি বড়ায় করছে।”

ম্যারাট বললেন, “যেতে দাঁও ওদের, দু’-এক দিনের মধ্যেই সবগুলিকে গিলোটিন করছি।”

উত্তেজিত শার্লট কথা শেষ হওয়ার আগেই ম্যারাটের বুকে ছোঁয়া বসিয়ে দিয়েছেন। ম্যারাটের চাঁৎকারে পাশের ঘর থেকে ছুটি মেয়ে দৌড়ে এসে শার্লটকে ধরে ফেললো। শার্লট পালাবার প্রায় কোন চেষ্টাই করেন নি।

টাইবুতাসে বিচার আরম্ভ হ’ল.....

—“তোমার কি বলবার আছে?”

—“তুই এই যে, আমি সফল হয়েছি।”

—“কে তোমাকে দিয়ে এ কাজ করাল?”

—“আমার স্বামী।”

—“ম্যারাট তোমার উপর কোন অস্ত্রায় করেছিলেন?”

—“ও একটা পুত, ফ্রান্সকে ছারখার করে দিচ্ছিল।”

—“কিন্তু ওকে মেয়ে তুমি কার উপকার করলে?”

—“লক্ষ লক্ষ লোকের।”

—“কি জেবেছ, দেশে আর ম্যারাট নেই?”

—“ওর পরিণাম দেখে সবাই শিক্ষা পাবে।”

শার্লটের প্রাণদণ্ডের আদেশ হ’ল।

আদম লান্স নামে একজন জার্মান-ফরাসী প্যারিসে থেকে পড়তেন উৎসুক হয়ে এক দিন তিনি শার্লটের বিচার দেখতে গেলেন।

আদামীর কাঠগড়ায় শার্লট দাঁড়িয়ে। তার নরম সোনালী চুলে নব্বান্ন চাষীর একটি সাদা টুপি। বাদামী রঙের চোখ দুটি বিষম; শাস্ত্রগভীর চাউনি। সমস্ত অবয়বে স্বর্গীয় আত্মহত্যার ভাব।

মুগ্ধ আদম কোট থেকে আবেশে টলাতে টলাতে বাড়ী ফিরলেন। তার সমস্ত মন-প্রাণ অর্পণ করেছেন শার্লটকে।

শুধু আর একটি বার তিনি শার্লটকে দেখেছিলেন।

১৭৯৩ খৃঃ ১৭ই জুলাই সন্ধ্যায় একটু আগে শার্লটকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সারা দিন সমস্ত আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু বখন শার্লট গিলোটিনের কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন ঠাণ্ডা মেঘের ঝাঁক দিয়ে গোঘুধির এক টুকরো বিষম আলো এসে শার্লটের পায়ে পড়লো—অন্তগামী সূর্যের শেষ আভা বিদায়গামী মর্ত্য আত্মাতিকে বরণ করে নিতে। শার্লটের মর্ত্যমুখী মুখি সেই স্বর্গীয় আভায় বসন্ত হয়ে ধীরে ধীরে এসে গিলোটিনে মাথা রাখলো।

ধারালো খুঁটটি পড়ার আগে আনন্দান শার্লট বলেন, “আমার কর্তব্যই প্রধান, আর সব কিছুই নয়।”

আদম লান্স বধ্যভূমি থেকে বাড়ির মত বেরিয়ে এলেন। তার চোখে ভাসতে লাগল, সেই স্বর্গীয় আভায় মগ্নিত শার্লটের মর্ত্যমুখী মুখি—যাকে ভালবেসে তিনি পছন্দ করেছিলেন। শার্লট তার প্রণয়ের কথা জেনেও যায় নি—এমন কি, আদম লান্সকে তিনি কোন দিন দেখেনও নি, তাতে একটুকুও টুংগে নেই আদমের। তিনি সেই দেবীকে ভালবেসেই গম্ব হয়েছেন। তার জন্ম একটা মহৎ কিছু তাগ করার অন্তর ইচ্ছায় অস্থির হয়ে উঠলেন আদম। তাঁর এমন কিছু নেই, যা সেই দেবীর কাছে নিবেদন করা যায়! হ্যাঁ, আছে—তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন। তাই তিনি সেবন।

আদম লান্স শার্লটের বিচারের নিশ্চয় করে একটি প্রচারণার লিখলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বন্দী করে রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হ’ল। তাকে বলা হ’ল যে, ভুল স্বীকার করে যদি তিনি জাখাগীতে ফিরে চলে যান, তবে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

উদ্ধীপ্ত সুরে আদম উত্তর দিলেন—“যত দিন আমার প্রাণ থাকবে, তত দিন আমি এ অস্ত্রায় বিচারের প্রতিবাদ করবো।” তাঁকে মুক্তাণ্ড দেওয়া হ’ল।

হাসিমুখে আদম লান্স গিলোটিনে মাথা রাখলেন। শার্লটের রক্তচিহ্ন তখনও গিলোটিন থেকে মুছে যায় নি।

“দেবি আমার। একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।” শান্তি খণ্ড নেমে এল.....

ছুটি রক্তের ধারা একসঙ্গে মিলে গেল। তাঁদের আত্মাও কি মিলে নি!



## আকাশ-জয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাশিয়ার কর্তৃত্বপূর্ণতার কাহিনী

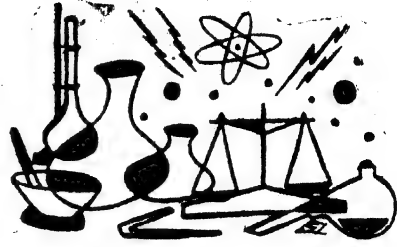
এতো দিন প্রচারিত হয়নি। আমরা শুধু জানতাম যে, রাশিয়া উচ্চাকাশের গবেষণায় পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের চেয়েই পেছিয়ে পড়ে নেই, কিন্তু সঠিক ভাবে তারা যে কি পরীক্ষা করছে এবং সেই গবেষণামূলক পরীক্ষার ফলাফল যে কি, তার জ্ঞান থেকে বিশ্বজগৎ একবারেই বঞ্চিত ছিল। প্রত্যেক দেশের বিজ্ঞানীরাই উপলব্ধি করতেন, রাশিয়া এই গবেষণায় নীরব দর্শকের ভূমিকা কিছুতেই নিতে পারে না। কারণ, মহাকাশে ক্ষমতার প্রদারের সঙ্গে সঙ্গে যে কোন দেশের সৈন্য বিভাগের শক্তি বর্ধনেরও একটা যোগাযোগ আছে। সমর-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ করে রাষ্ট্র ঐ উপগ্রহে সৈন্যস্থাপন এবং তৎসঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্র প্রেরণের চারোজন করতে পারবে, সেই এই বিশেষ সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবাহী বলে পরিগণিত হবে। তাই মহাশূন্যের গবেষণায় সোভিয়েত রাষ্ট্র পেছিয়ে নেই,—আমেরিকার সঙ্গে সমান তালে প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। রাশিয়া কি করছে, তার কিছু সুবাদ সম্পত্তি প্রকাশিত হয়েছে, তাই রাজ পাঠকদের পরিবেশন করবো। নিরপেক্ষ মহলের অভ্যুদয়, উচ্চাকাশের গবেষণায় আমেরিকা বা রাশিয়ার তুলনার ইউরোপের অসামান্য রাষ্ট্র অনেক পেছিয়ে আছে।

মার্ক কয়েক মাস আগে প্যারিসে কলেজ অফ এরোনটিক্স-এতে এক বিজ্ঞানী-সম্মেলনে, সোভিয়েত বিজ্ঞানী দল রকেটের সহায়তায় তাঁদের উদ্ভাবিত নানা প্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে উচ্চাকাশের বিষয়ে যে গবেষণা করেছেন, তার কিছু ফলাফল প্রকাশ করেন। এই সমস্ত গবেষণা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭০ মাইল উচ্চাকাশের বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য বিজ্ঞানী-দলকে সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা উচ্চাকাশের ঐ অঞ্চলে রকেটের সাহায্যে কয়েকটি কুঁকরকে প্রেরণ করেন। আকাশের ঐ মুক্ত পরিবেশে অবস্থান করার ফলে কুঁকরগুলির দৈর্ঘ্য জটিকারক কোন ফলাফলই পরিলক্ষিত হয়নি।

একটি বড়োয় রাশিয়ার বিজ্ঞানী ডাঃ পোলোসকভ তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করেন। উচ্চাকাশ গবেষণার যন্ত্রাদি ছোট ছোট মজবুত যন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করে রকেটের সাহায্যে উচ্চাকাশে প্রেরণ করা হয়েছিল। রকেটটি তাদের মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করে; তার পর তারা প্যারাসুটের সাহায্যে নামে আসে পৃথিবীর মাটিতে। মহাকাশে অবস্থানের স্বল্প সময়ের মধ্যেই স্বয়ংক্রিয় কাঁচা-ক্ষমতার মাধ্যমে ঐ যন্ত্র নানা প্রকার মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে নেয়। ঘটনাক্রমে প্যারাসুট যদি না খোলে, তাহলেও তথ্যবাহী সমস্ত যন্ত্রের ক্ষতিগ্রস্ত হবার কোনই আশঙ্কা নেই। যন্ত্রাদির আধার সমূহ এতাই মজবুত যে, বিনা প্যারাসুটে পৃথিবীর বুকে এসে পাল্লা গেলেও তাঁদের শিশুসদৃশ ক্ষতি হয় না।

এক একটি রকেটের নাকের ডগায় লাগিয়ে একজোড়া করে বাঁক মহাকাশে পাঠান হয়েছিল। বাঁকগুলি লম্বায় প্রায় সাড়ে ৬ ফুট, চওড়ায় প্রায় ১৬ ইঞ্চি আর ওজন ৬ গণেরও বেশী। প্রত্যেকটি বাঁক ছুটি করে কয়েক বিভক্ত,—একটি কক্ষ বাতাস-নিবারণক এবং চৌম্বিক রুদ্ধ এবং অপরটি মহাশূন্যের পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য উন্মুক্ত। বাতাস-নিবারণক কক্ষটিতে থাকে বাটারী, ঘড়ি, ক্যামেরা এবং মোটর সমেত বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, তথ্যবাহী সংগ্রহের জন্য উচ্চতর তত্ত্বাবধিত রাখা হয় থার্মোমিটার,

## বিজ্ঞানবার্তা



### পক্ষধর মিশ্র

মানোমিটার, বাতাসের নমুনা সংগ্রহের জন্য কাচের আধার, ইত্যাদি। কক্ষগুলি যুক্ত থাকে প্যারাসুটের সঙ্গে, উপযুক্ত সময়ে প্যারাসুট খুলে গিয়ে তাদের পৃথিবীতে অবতরণ করতে সহায়তা করে। রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে পৌঁছবার পর যন্ত্রপাতি সমেত বাঁকগুলিকে মোটরের সহায়তায় রকেটের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ, রকেটের উপস্থিতি তথ্যবাহী সংগ্রহের ব্যাপারে যন্ত্রসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মহাকাশে বাতাসের গতিবেগ পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন উচ্চতায় পর পর পাঁচটি মৌরা-উৎপাদনকারী বোমা ফাটান হয়। মৌরার কণিকাগুলির বায়ু এক মাইক্রনের অর্ধেক এবং তাদের ব্যবহারের সমতা খুবই কম। কেবল ৫০ মাইলের উচ্চে তারা খুব তাড়াতাড়ি নীচের দিকে নামতে থাকে। বাই সোক, দেখা গিয়েছে মহাকাশের ঐ উচ্চ অঞ্চলে অবস্থিত বাতাসের পরিমাণ কম হোলেও গতিবেগ বেশ বেশী। গরমকালে বাতাস পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং শীতকালে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়।

মস্কোর স্ট্রিকটে অবস্থিত এরোমেডিক্যাল গবেষণা-কেন্দ্রের প্রধান ডাঃ পোকরোভস্কি তাঁর ভাষণে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৭০-৮০ মাইল উচ্চত, মহাকাশের পরিবেশ জীবদেহের উপর কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাই আলোচনা করেন। এই গবেষণার ফলে মানুষের আকাশ-জয়ের পবিত্রকল্পনা স্বাধীন হতে। ডাঃ পোকরোভস্কি জানান, রকেটে পরিভ্রমণের ফলে উচ্চাকাশের পরিবেশ জীবদেহের সর্বপ্রকার কাঁচাকলাপের উপর বিস্তার সৃষ্টি করতে পারে, তাই এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান পরীক্ষামূলক ভাবে অজ্ঞান না করে, এবং সেই স্থানে দেহগত সর্বপ্রকার জীবনক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণের উপায় খুঁজা না করে মহাকাশে যাত্রার চেষ্টা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। মানুষ পৃথিবীতে বসে বসে মহাকাশে মানবদেহের নিয়ন্ত্রণের যে সব ব্যবস্থা অবলম্বনের পবিত্রকল্পনা করছে, তা সবই আত্মমায়িক।

রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা কুঁকরের সহায়তায় তাঁদের এই গবেষণা পরিচালনা করেন। প্রথমে তাঁরা কয়েকটি কুঁকরকে একেবারে বাতাস ও পরিবেশের সঙ্গে সংযোগশূন্য, রুদ্ধ টিউবের মধ্যে পুরে রকেটের সাহায্যে মহাকাশে প্রেরণ করেন। প্রত্যেকটি টিউবের মধ্যেই বাতাস পরিমাপক, উত্তাপ ও তাপ পরিমাপক যন্ত্রাদি এবং তৎসঙ্গে প্রাণীদের দেহের উত্তাপ, রক্তচাপ, নড়ীর স্পন্দন, ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার তথ্যবাহী সংগ্রহেরও আয়োজন সম্পন্ন ছিল। জিহ্বার সারের কুঁকরগুলিকে খোলা টিউবের মধ্যে করে

রকেটের সাহায্যে উচ্চাকাশে প্রেরণ করা হয়। এইবার তারা মহাশূন্যে ব্যবহার করার জন্য বিশেষ ভাবে নিশ্চিত পোষাকের দ্বারা আবৃত ছিল। তাদের দেশের সেইই সংস্কৃত ছিল অগ্নিজেন সিলিগুর এবং বিভিন্ন তথ্যাবলী সংগ্রহের মান্য প্রকার যন্ত্রপাতি, উভয় পরীক্ষাতেই নানা ভাবে কৃষ্ণগুণিত মহাশূন্যের বিভিন্ন উচ্চতার এবং গতিবেগের মধ্যে পরীক্ষামূলক ভাবে ছেড়ে দিয়ে, পরিশেষে প্যারাসুটের সহায়তায় পৃথিবীপৃষ্ঠে নিয়ে আসা হয়। ক্রমশঃ বিজ্ঞানীর মতে এই পরীক্ষার ফলাফল খুবই আশা প্রদ, কুকুরদের অচেতন না করেও এই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছে, তাদের উল্লেখযোগ্য কোনই ক্ষতি হয়নি। এই গবেষণার ফলে আশা করা যায়, মানুষ ৭০-৮০ মাইল উচ্চাকাশের পরিবেশে নিজেকে নিরাপত্তার বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিত হতে পারবে। ডাঃ পোকরোসসি বহুতার উপসম্মানে আশা প্রকাশ করেন যে, সমগ্র দেশের বিজ্ঞানীমহলের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার সমবেত প্রচেষ্টায়

মানুষের শূন্যজয়ের স্বপ্ন একদিন না একদিন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবেই।

রাশিয়ার প্রতিনিধিদের উপস্থিতি এবং তাঁদের বহুতার বিষয়বস্তু উপস্থিত বিজ্ঞানিসমূহের মধ্যে যথেষ্ট কোঁড়ালের সঞ্চার করেছিল কিন্তু সম্মেলনে তাঁদের আলোচনায় বিদেশী বিজ্ঞানীর মধ্যে অনেকে সম্মত হতে পারেন নি, তাঁদের অভিযোগ, রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার সমস্ত দিক বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে সমর্থ হননি কি ধরনের রকেট যন্ত্রপাতি এবং কুকুরকে মহাশূন্যে পাঠান হয়েছিল সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই জানেন না। গত বছর কোপেনহেগেনে একটি সম্মেলনে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা এই বছর মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টার কথা উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু ডাঃ পোলোসকভে বহুতার বোঝা যায় না, তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি সমূহ ঐ কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপিত হবে কি না। যাই হোক রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের ব্যবহার অত্যন্ত বন্ধুস্বপ্ন ছিল।

## দুঃখের সেতু

( Thomas Hood-এর বিখ্যাত "Bridge of Sighs" কবিতার সহৃদয় অনুবাদ )

জীবনে যাত্রার শুধুই ক্লান্তি তেমনি অভাগী একটি আরো,  
মরণের কোলে পেরেছে শান্তি একটি কথাও শোনে নি কারো।  
কোন সে বিধাতা গড়িয়াছিলেন এত স্নন্দর কোমল করে—  
নাও তুলে নাও দেখানি তার শুধু দেখানি যতন ভরে।  
সিন্ধু বসন শবাচ্ছাদন ঝরে ঝরে পড়ে নদীর জল,  
আয় তুলে নিই বুকে করে তারে ঘণা করে আর কি হবে বল ?  
শুধু নিন্দার ছুঁয়ো না তাহারে যদি কিছু জান বিধাতা কি সে,  
তাই নিয়ে এস মানুষের মত দেখ এ জীবন-মরণ বিবে।  
সে কে ছিল আর কি ছিল সে কথা সে পিয়ার আর আজিকে নয়,  
শুধু চেয়ে দেখ একটি নারীর কি হয়েছে সারা জীবনময়।  
অজীত দিনের কলঙ্ক তার সমাজ শাসন মানি নি বৃষ্টি—  
সে কথা হারার নদীর ধারায় মরণ-মাধুরী পেরেছে খুঁজি।  
বিশ্বনাথার একটি অংশ ধ্বংসের মাঝে পেরেছে ছুটি,  
থাক সৌর তার তবু শেষ বার মুছে দাও তার গুঁট ছুটি।  
জলে-ধোয়া তার মাথা-ভরা চুল বানান এলায়ে বুটায় পড়ে,  
দাও তুলে দাও শুধু একবার সাজিয়ে মনের মতন করে।  
তাকে ঘিরে আজ অসুখ আর আলোচনা শুধু হল মুখ,  
বারে বারে শুধু প্রশ্ন ঘনায় কোথা তার দেশ কোথায় ঘর।  
মা তার কোথায় কে গো তার পিতা ভাই-বোন তার কেহ কি ছিল ?  
তারো চেয়ে সেটী আপনার জন নারীর সে ধন কোথায় গেল ?  
দেখ সব এসে আর যাই থাক এই ধরণীর মমতা নাই,  
লক্ষ জনার নগর-দুয়ার শুধু একজন পেল না টাই।  
ভুল সব ভুল অন্ধ আবুল ছিঁড়ে পড়ে গেছে বানান যত,  
পিতা-মাতা আর ভাই-বোন রেহা সে সব স্বপ্ন হয়েছে গত।  
এবতারা সম প্রেমের সে শিখা লুটায়ছে তার ধূসির তলে,  
শেষে গিয়াছেন বিধাতা তিনিও নারীর নয়ন অশ্রুজলে।

নির্জন তার অন্ধ-জীবন বন্ধ দুয়ার বিজন রাস্তি—

দাঁড়ায়েছে এসে তটিনীর তীরে কালো জলে বেধা হাজার বাতি।

শীতের হাওয়ায় কাঁপন জাগায় তবু তার মনে জাগে নি ভয়,

অন্ধ শীতল গুঁট কালো জল এমন আপন কেহ ত নয়।

পিছে ধোয়ে আসে কঠিন শাসন উদ্ভাদিনীর জীবন ভরে—

এখন তাহারে বাঁচাতে যে পারে সে শুধু নয়ন এমন করে।

নারীর গহন তে মহামরণ বহন-কালো ছ' বাজ ঘিরে,

নিয়ে যাও যোবে বেধা যতদূর শুধু এ ধরার সীমানা ছেড়ে।

এমনি কবির ছ' বাজ বাজায় কাঁপ দিল নারী আবুলতায়,

তুচ্ছিন তটিনী কাঁপ খব-খব উঠে আর পড়ে চলে দেখায়।

তারি দুই কূলে ভেবে দেখ সব কে আছে মানুষ দাঁড়াও এসে,

করিও গান পান কোরো তাই যে-জলে মানুষ গিয়াছে ভেসে।

আর কথা নয় তুলে নাও তারে অতি সবতনে নারীর ধীরে,

বিধাতা যাহারে গড়িয়াছিলেন এত স্নন্দর কোমল করে।

মরণ-শীতল সোনার অন্ধ যতনে তাহারে টানিয়া নাও,

মানুষের দেশ ছেড়ে চলে যায় তাহারে মানুষ সাজিয়ে দাও।

জল-কান মাথা ঢোপ ছুটি তার মরে যেন তবু রয়েছে চেয়ে—

কিছু তার ছায়া দুঃসাহসের কিছু তার ভরা হতাশা দিয়ে,

কিছু তার কালো অন্ধ নিগতি কিছু তার ভরা শূন্যতাতে,

সব মিলে ওই তীক্ষ্ণদৃষ্টি চেয়ে আছে দূর ভবিষ্যতে—

ধ্বংস তাহার দুঃখের ভাবে লোক-নিন্দায় ছন্নছাড়া—

জীবন-জাগার মরুভূমি মাঝে হারিয়েছে তার জীবনধারা।

বন্ধ কর গো অন্ধ নয়ন কি আর হবে গো এমন চেয়ে,

হাত ছুটি শুধু রাখ এক সাথে প্রার্থনা তার যাক সে পেয়ে।

এ জীবনে মোর যত ভুল-দোষ প্রতিটি বিন্দু আমারি সে যে,

শুধু এ জীবন গড়েছেন যিনি তাঁরি পদতলে চলিলু নিজে।

অনুবাদক—বীরেন্দ্রকুমার রায়।

## আপনাদের সঙ্গে কারবার করেই আমাদের আনন্দ...

আপনাদের আমরা আরও ভাল করে জানতে চাই। সেইজন্মেই আমাদের বিশেষ মার্কেট রিসার্চ বিভাগ আপনাদের পছন্দ অপছন্দ, কি কারণে আপনারা কোন কোন জিনিষ কেনেন আবার কি কারণেই কেনেন না—এসব সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। আমাদের প্রতিনিধিরা সারা ভারতবর্ষের ঘুরে বেড়ান—বড় সহরে, মধ্যবল সহরে, গ্রামে নানাবিধের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা করেন এবং এইভাবে আপনাদের নিত্য পরিবর্তনশীল প্রয়োজন ও রুচির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এই তথ্য অনুসন্ধান চালানো হয় বলেই আমরা রিস্কোর মত নতুন জিনিষ বাজারে ছাড়তে পারি বা কোন চলতি জিনিষ বদলাতে পারি—যেমন ধরুন আমরা বদলেছি লাক্স টয়লেট সাবানের সুগন্ধ।

আমাদের তৈরী অনেকগুলি জিনিষই আপনারদের পরিচিত এবং আমাদের প্রতিনিধিদের তৈরী রিপোর্টগুলিতে আপনাদের খবর আছে কিন্তু আপনারা আমাদের কাছে শুধু রিপোর্টের সংখ্যা আর তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন... আপনাদের সঙ্গেই আমাদের কারবার। আপনাদের প্রয়োজন যেটাতে, নাযা দামে উৎকৃষ্ট জিনিষ দিয়ে আপনাদের সন্তুষ্টি সাধনে, আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই।

দেশের সেবায়  
হিন্দুস্থান লিমিটেড





# বিবেকানন্দ ১ স্টোড ৫

সুমণি মিত্র

১৫

পুতুল-পুজার এই ওসঙ্গে আজ  
পরিব্রাজক স্বামিজীর  
একটা ঘটনা যদি বোলি,  
হয়তো হাসি হবে কাজ । ১

স্বামিজী তখন  
পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ।  
দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে কোর  
জলে-বোধুরে  
ভারতের নানাদেশ  
ঘুরে ঘুরে শেষে  
এসেছেন আলোয়ার দেশে ।  
আলোয়ার রাজ্যের দেওয়ান সায়েব  
মেজর জীরামচন্দ্র এই  
তীক্ষ্ণমেধা, দীপ্তদেহী  
নিরাকাম্য সাধুকে দেখেই  
প্রস্থায় অভিভূত হন,  
তারপর বাক্যালাপ,  
তারপর গৃহে আমন্ত্রণ ।

স্বামিজীর দিবা প্রতিভায়  
বিমুগ্ধ হোয়ে,  
বিপুল আশায়

দেওয়ান সায়েব  
মনে এক নিশ্চাপ ফলী আটেন  
দেওয়ান ভাবেন—  
এই ঈশ্বর যদি তিনি  
রাজ্যের রাজ্যকে ডাকেন,  
স্বামিজীর সাঙ্গদ্যে  
যদি তাঁকে টেনে আনা যায়,  
ইংরিজীভাবাপন্ন মহারাজজীর  
মনোভাব ঘুরে যাবে ঠিক ।

\* \* \*  
রাজ্যকাজে উদাসীন  
মহারাজ মঙ্গল সিং  
সে-সময়ে বাইরে ছিলেন ।  
এমন সময়  
দেওয়ানের কাছ থেকে  
মহারাজ পত্র পেলেন,  
লোভনীয় ছোটো এক লাইন—

“A great Sadhu  
With a stupendous knowledge  
of English  
Is here.” ২

অর্থাত্—‘মহারাজ  
আমার বাড়িতে কাজ  
পাশখুলি দিন একবার ।’

\*  
দেওয়ানের চিঠি পেয়ে  
মহারাজ আনন্দ পান,  
কেন না রাজ্যের  
দাক্ষণ শিক্ষাভিমান,  
তার ওপর  
বিলিতি মেজাজ ।  
রাজ্য তাড়াতাড়ি  
স্বামিজীর সন্ধান  
পা. বাড়ান দেওয়ানের বাড়ি ।

তারপর স্বামিজীকে পেয়ে,  
খুঁটানী নীতিবাদ  
একরাশ পেটে পুরে থেয়ে  
বিরুদ্ধ ভঙ্গীতে  
মহারাজ বোললেন শ্রেফ,—

১। ঘটনাটা The life of Swami Vivekananda  
(by his eastern and western disciples) থেকে  
লওয়া ।

২। “একজন সাধু এখানে এসেছেন । ইংরিজীতে তাঁর  
পাণ্ডিত্য ।”

"I have no faith  
In idol-worship.  
What is going  
To be my fate?"

প্রশ্নের স্বর শুনে  
স্বামিজীর এই মনে হয়,—  
জানাকিনেই স্পাহা  
প্রশ্নের মূল-স্বর নয়।  
বোঝা গ্যালো বেশ,  
এতে আছে সে-যুগের  
মূর্তি-পূজার প্রতি  
ধার-করা ছাঁদি বিবের।

ঘাই তোক,  
স্বামিজী কি কম?  
স্বামিজী জানেন  
কোন পথে কতো দূর  
নিয়ে গেলে তাঁর  
শিকারের ছুটে বাবে দম্ব।  
—“সে কি কথা মহারাজ মজল সি!”  
স্বামিজী হাসেন,—  
“Surely  
You are joking!”

শিকিত মহারাজ  
তবু অবিলম্ব,  
কঠে দৃঢ়তা এনে কথা বাড়ানেন,—  
“No Swamiji,  
Not at all!  
You see,  
I really cannot worship  
Wood, earth, stone and metal  
Like other people.  
Does this mean  
That I shall fare  
Worse  
In the life hereafter?”

৩। “মূর্তি-পূজাতে আমার বিশ্বাস নেই, তা আমার দশটা  
হবে?”

৪। “আপনি নিশ্চয়ই রহস্য কোরছেন।”

৫। “না স্বামিজী, মোটেই তা নয়। দেখুন, বাস্তবিকই আমি

লোকদের মতো কাঠ, মাটি, পাথর বা ধাতুর পূজা কোরতে  
নি না। এতে কি আমার পরজন্মে অধোগতি হবে?”

আলোয়ার রাজ্যের যতো অধিবাসী  
আসলে কৃষ্ণ-ভক্ত সব,  
মূর্তি-পূজার বিশ্বাসী।  
তারা ভাবে—আজ  
স্বামিজীর দৌলতে  
যদি মহারাজ  
পুতুল-পূজার প্রতি  
প্ররাসিত হন, তবে  
আলোয়ার রাজ্যের  
সকলেই তনে খুশি হবে।

এমন সময়  
স্বামিজী সটান  
একটা অতৃপ্ত পুত্র ঘটনা ঘটান!

ঘটনাটা এই,—  
দেয়ালে একটা ফটা টাঙানো দেখেই  
স্বামিজী চকিতে  
বোললেন—ফটাখানা তাঁর হাতে দিতে  
ছবিটা রাজ্যের,  
তবুও প্রশ্ন তাঁর নাটকীয় ঠাটে,—  
“আচ্ছা, বলো তো দেখি  
এছবিটা কার?”

দেওয়ান জবাব দান,—

“আমাদেরই মহারাজজীর,  
এ তাঁরই প্রতীক।”  
হঠাৎ আদেশ আসে মেঘমন্ত্র রবে,—  
“Spit upon it!”

স্বামিজীর কথা শুনে  
সভাসদ ভরে স্তম্ভিত।  
নিঃস্বল সাধুটির  
এত বড়ো দুঃসাহস কিসে,  
রাজার সামনে বলে যাতে—  
“খুঁত ফ্যালো তাঁর ছবিটাতে!”

মানে মনে ভাবেন দেওয়ান—  
আজ বুঝি স্বামিজীর  
বাঁয় গর্দান!

সন্ন্যাসী তবু বেপারোয়া,  
বালসভা শিরবিত কোরে  
স্বামিজীর দারুণ তাসিদ,—

“এতে খুঁত ফেলুন।”

"Any one of you  
May spit upon it."

বিশ্বয়ে হস্তবাক্ সৰ,  
নিম্পাণ ছবি যেন চিত্রশালার !  
— "What is it  
But a piece of paper ?" ৮

এদিকে দেওয়ান  
ভয়ে আর বিশ্বয়ে  
রাজার মুখের দিকে চান !  
সম্যাসীঅতিথির  
আজ বুঝি স্বায় গদান !

তবুও না ছোড় বান্দা  
স্বামিজীর জিহ্বা—  
"Spit upon it !  
I say  
Spit upon it !" ৯

সকলে বজ্রহস্ত যেন !  
মনে মনে ভাবে—  
খাল কেটে কুমীরকে  
খেছার ডেকে আনা কেন !

তার পর রীতিমতো যেমে,  
প্রকাণ্ড কক্ষের  
দুঃসহ স্তব্ধতা ভেঙ্গে,  
কোনোমতে ঢোক গিলে  
দেওয়ানজী বোললেন শুধু—  
"What ! Swamiji !  
What are you asking me  
to do ?  
This is the likeness  
Of our Maharaja !  
How can I do such a thing ?" ১০

৭। "আপনাদের মধ্যে যে কেউ তোকে এসে এই ছবিটাতে  
থুতু ফেলুন।"

৮। (কেউই এগিয়ে এলো না দেখে স্বামিজী বোললেন)  
"এ কি ? এটা তো এক খণ্ড কাগজ মাত্র !"

৯। "ছবিটার ওপর থুতু ফেলুন, আমি বোলছি ফেলুন।"

১০। "স্বামিজী, আপনি এ কি আদেশ কোরছেন ? এটা  
হচ্ছে আমাদের মহারাজজীর প্রতিকৃতি ! এর ওপর থুতু ফেলি  
কি করে ?"

শিকারীর কোশলে  
সমুদ্র-উপকূলে  
এসে গ্যাছে বনের হরিণ !

সশব্দে ছুটে এলো বাণ,—  
"ওকি কথা বলেন দেওয়ান ?  
যতোই-যা-হোক,  
এটা তো একটা শুধু টুকরো কাগজ,  
ছবিটা তো সত্যিই মহারাজ নন ;  
রক্ত-মাংস এতে আছে কি রাজার ?  
আছে তাঁর প্রাণ-স্পন্দন ?  
তবু কেন এত সঙ্কোচ ?  
কেন একে এত সম্মম ?"

"Be it so,  
But the Maharaja  
Is not bodily present  
In this photograph.  
This is only  
A piece of paper.  
It does not contain  
His bones and flesh and blood.  
It does not speak or behave  
Or move in any way  
As does the Maharaja.  
And yet  
All of you  
Refuse to spit upon it,—  
Because..." ১১

এতক্ষণ পার  
দেওয়ান ও সকলের  
প্রাণ এলো ধড়ে,  
পরিচিত বন্ধকে  
ফিরে পেলো স্বামিজীর স্বরে ;  
মুখ থেকে থুতু পড়ে মেঘের মুখোশ।

"...Because  
You see in this photo  
The shadow of the Maharaja's form."

১১। "তা তোকে, তাই বোলে এই ফটোতে মহারাজ  
আর সশরীরে উপস্থিত নেই। এটা তো এক টুকরো কাগজ  
এতে না আছে তাঁর অস্থি, না আছে তাঁর রক্ত-মাংস, না  
তাঁর কথাবার্তা, না আছে তাঁর চালচলন। তা সত্ত্বেও এ  
ফেলতে আপনারা নারাজ, কেননা—"

Indeed  
In spitting upon it,  
You feel  
That you insult your master,  
The prince himself." ১২

সমস্ত দেখে শুনে  
রাজা তো অবাক !  
প্রতীক-পূজোর  
এমন সরস ব্যাখ্যা  
শোনেননি আর ।  
সারেরি শিক্ষাভিমান  
দীর্ঘে দীর্ঘে খঁসে পড়ে তাঁর,  
মুখে চোখে ঠাণ্ডা ছায়  
বিশ্বাসের স্নিগ্ধ আমেজ ।

এবার স্বামিজী  
স্বয়ং রাজার দিকে ফিরে বোললেন,—  
"See, your Highness,  
Though  
This is not you in one sense,  
In another sense  
It is you.  
That was why  
Your devoted servants  
Were so perplexed  
When I asked them  
To spit upon it.  
It has a shadow of you ;  
It brings you  
Into their minds.  
One glance at it  
Makes them  
To see you in it !  
Therefore  
They look upon it  
With as much respect  
As they do upon your own person." ১৩

১২। "কেননা, এই ফটোতে আপনারা মহারাজের সাদৃশ্য, গর ছায়াটা দেখতে পাচ্ছেন। তাই সত্যিই এর ওপর খুঁত খালার কথা ভাবতে গেলেই মনে হোচ্ছে—এতে আপনারদের প্রভু, মহারাজকেই অসম্মান করা হবে।"

১৩। "দেখুন মহারাজ, এক হিসেবে এছবিটা যদিও আপনি আর এক হিসেবে দেখতে গেলে এছবিটা আপনিই। সেইজন্মেই

## প্রাণতোষ ঘটকের লেখা

প্রাণতোষ ঘটক—বাঙালী সাহিত্যে পুরাতন ও পরিচিত, কিন্তু উপস্থানে বিষয়বস্তুর নতুনত্বে বিশ্বসের স্রষ্টা করিয়াছেন। লেখকের 'আকাশ-পাতাল' ও 'মুক্তাভ্রম' পতনোন্মুখ বাঙালী আভিজাত্যের কাহিনী। এই ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ কাহিনী-রচনার সাহস আগেকার মানুষের ছিল না। যেখানে একটু এদিক-ওদিক হইলে সাহিত্য পর্ণগ্রাফিতে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে, সেখানে মাত্রা বজায় রাখিয়া চলার বিষয় আছে। পারদর্শন প্রাণসন্নিয়। শ্রীমান প্রাণতোষ অধিকন্তু গবেষণার ক্ষেত্রে পুরাতন 'কলকাতার পথঘাট'—এর হৃদয় দিয়া ও আভিধানিক 'রত্নমালা' পুনর্গ্রাথিত করিয়া পণ্ডিতজনকেও বিম্বিত করিয়াছেন। 'কলকাতার পথঘাটে' প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে অনেক পুরাতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।—'বিশ্বদেব বই' প্রসঙ্গে সাবাদ-সাহিত্য, শনিবারের চিঠি, সাহিত্য সংখ্যা। ১৩৬৪।

"এতাবৎকাল অতীত কলকাতার ওপর যেসব প্রবন্ধ ও পুস্তিকা বেরিয়েছে তার সংখ্যা নগণ্য নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠকের হাতে সেগুলো ঘোরা-ফেরা করে না। যারা কোতুলী তারা হয় তো স্থাপনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে এসব বইয়ের পাতা ওঁটাবে। কিন্তু কলকাতার পথ-ঘাটকে কেন্দ্র করে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যপূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ বাংলা ভাষার পরিবেশন করার ভার প্রাণতোষ ঘটক সম্বন্ধে স্বীকার করেছেন। এজন্য তাঁকে সাব্বাধ জ্ঞানান্তে হয়। একত্রিশটি বাস্তব ইতিবৃত্ত সন্নিবেশন প্রাণতোষ ঘটক। নানা মৌলিক গ্রন্থ থেকে সমগ্র তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, তথ্য সাজানো এবং সবসব বর্ণনার তাঁকে শক্তির পরিচয় দিতে হয়েছে। তিনি গল্প-উপন্যাস লেখেন। কিন্তু কলকাতার পথ-ঘাটের ঐতিহ্য ও সহজ পরিচয় রচনার তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা প্রশংসার দাবী করতে পারে।"—দেশ।

আকাশ-পাতাল—(দুই খণ্ডে সমাপ্ত) ১ম পাঁচ টাকা। ২য় পাঁচ টাকা বারো আনা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা-৭। মুক্তাভ্রম—পাঁচ টাকা। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। কলকাতার পথ-ঘাট—তিন টাকা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা-৭। রত্নমালা (সমার্থাভিধান)—আড়াই টাকা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা ৭। বাসকসজ্জিকা—চার টাকা। মিত্র ও বোষ, কলিকাতা-১২। খেলাঘর—চার টাকা। সাহিত্য ভবন, কলিকাতা-৭।

॥ যজ্ঞস্থ ॥

মুঠো মুঠো কুয়াশা—আড়াই টাকা। সাহিত্য ভারতী, কলিকাতা-৭। মনোহারী—আড়াই টাকা। ক্যালকাটা বুক ক্লাব, কলিকাতা-৭।

প্রতীক-পূজার  
এ একই রহস্য,  
এ একই সুর।

"Thus it is  
With the devotees  
Who worship stone  
And metal images of Gods." ১৪

এতক্ষণে মহারাজ  
বুঝেছেন নিজের গলদ,  
মন থেকে সরে গ্যাছে  
সংশয়ের সিন্ধু অবরোধ,  
মনের গভীরে  
আচমকা এসে গ্যাছে  
বিশ্বাসের স্নেহোন্তর বোধ!

"It is because  
An image  
Brings to their minds  
Their Ishta,  
Or some special form  
And attributes of the Divinity,  
And helps them to concentrate,  
That the devotees  
Worship God in an image.  
They do not worship the stone  
Or the metal as such." ১৫

"মহারাজ,  
বহু দেশ কোরেছি ভ্রমণ,  
কোথাও দেখিনি আমি  
গৃহী বা ভ্রমণ  
পাথরের উপাসক কেউ।

এতে খুব ফেলতে বলার আপনার অন্তরবক্তা চরচরীরা অতোখানি  
ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ছবিটা আপনারই ছাড়া; এটা দেখে  
আপনারই কথা তাঁদের মনে পড়ে যায়। একবার এ-ছবিখানা  
দেখলেই, এর মধ্যে আপনাকেই তাঁরা দেখতে পান। সেই  
কারণেই আপনাকে যেমন তাঁরা মান্য করেন, আপনার এ ছবিটাকেও  
তাঁরা ঠিক সেইরকমই মান্য কোরে থাকেন।

১৪। "ভক্তও পাথর বা ধাতুনির্মিত দেব-দেবীর মূর্তিকে এই  
চোখেই চাখেন।"

১৫। "যেহেতু মূর্তি ভক্তকে তার ইষ্ট-দেবতার কথা স্মরণ  
কোরিয়ে দায়, কিংবা ঈশ্বরের কোনো বিশেষ আকার বা গুণের  
কথা মনে কোরিয়ে দায় এবং মনকে একাগ্র করবার সহায়তা করে,  
সেই জন্তেই তারা প্রতীকের মাধ্যমে ঈশ্বরের পূজা করে। তারা  
পাথর বা ধাতুর উপাসক নয়।"

কাউকে দেখিনি আমি  
পূজা দিতে ধাতুর উদ্দেশে।"

"I have travelled to many places,  
But nowhere have I found  
A single Hindu  
Worshipping an image,  
Saying,  
'O Stone ! I worship Thee !  
O Metal ! Be merciful to me' !" ১৬

ফটোটা আপনি নন,  
তবু এটা দেখে  
আপনাকে মনে পড়ে যায়,  
পাথর দেবতা নয়,  
দেবতার মূর্তিকে জাগায়।"

"Everyone is worshipping,  
O Maharaja,  
The same one God  
Who is the Supreme Spirit,  
The Soul of Pure Knowledge.  
And God appears to all  
Even  
According to their understanding  
And their representation of Him." ১৭

শেষ হোলো স্বামিজীর কথা,  
ঠিক যেন শেষ হোলো গান।  
মনে হোলো যেন,  
চেতনার আশে-পাশে  
স্বরের আবেশ বেগে  
থেমে গ্যাছে চাচ-অর্গান্!

নবজাত বিশ্বাসে রীতিমতো বিহ্বল হোয়ে,  
বিশুদ্ধ শ্রদ্ধায় দুটা চোখ তরলিত কোরে,  
নিজেকে ফুলের মতো নিবেদন কোরে তাঁর পায়  
বোললেন মঙ্গল সিং—

১৬। "আমি বহুদেশ ভ্রমণ কোরেছি, কিন্তু কোথাও কো-  
হিন্দুকে মূর্তি-পূজা কোরতে গিয়ে বোলতে শুনিনি,—'হে প্রভু  
আমি তোমার পূজা করি! হে ধাতু, তুমি আমার প্রা-  
সাদর হও!'"

১৭। "মহারাজ, সবগেই সেই একই পরমাত্মার, বিশুদ্ধ জ্ঞান  
আধার সেই পরব্রহ্মসত্তারই পূজা কোরে থাকে, এবং তিনিও ভক্ত  
ভাব এবং আকাঙ্ক্ষা অমৃত্যুরী সকলকে দর্শন দান।"



"Heretofore  
I did not understand its meaning !  
You have opened my eyes !  
But  
What will be my fate ?  
Have mercy on me." ১৮

অজস্র আবেদন এটা,  
ব্যাকুলিত প্রাণের বিলাপ !  
এটা হোলো সত্যিই  
মঙ্গল-বুদ্ধির  
নতমুখী সলজ্জ হাস !

কৃপার আবেগে স্নিগ্ধ হোয়ে  
স্বামিনী এবার  
মমতামখিত স্বরে  
প্রার্থীর অন্তরে  
প্রান্তির পিপাসা জাগান।—

"O prince,  
None but God  
Can be merciful to one,  
And He is ever-merciful !  
Pray to Him.  
He will show His mercy  
Unto you !" ১৯

১৬

অবিশিষ্ট রাজা, ২০  
তোমাকে কটাক্ষ কোরে এট! বলা নয়,  
তোমার উদার দুই  
অন্তোখানি হয়নিকো স্থান ;  
—এট! আমি বোলছি তাঁদের,

১৮। "এতদিন আমি মূর্তিপূজার অর্থই বুঝতে পারিনি !  
আজ আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন ! কিন্তু আমার কি দশা  
হবে স্বামিজী ? আপনি আমায় কৃপা করুন।"

১৯। "মহারাজ, এক পরমাশ্রা ছাড়া কেউ কাউকেই  
করণী কোরতে পারে না, আর তিনি হোচ্ছেন সর্বদাই করুণাময় !  
তাই কাছে প্রার্থনা করুন, নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে কৃপা কোরবেন।"

২০। রাজা রামমোহন রায়।

তোমারই মতামত  
পরবর্তী ব্রাহ্মনেতা ধীর  
পুতুল-পূজার নামে  
প্রচণ্ড বিতীর্ষিকা ধান ! ২১

[ক্রমশঃ।

২১। রাজা রামমোহনকে কেবলমাত্র মূর্তি-পূজার বিরোধী  
বোললে, তাঁর উদারতা, বিশেষরূপে এবং গৌরবকে খর্ব করা হবে।  
মূর্তিপূজা-বিরোধী, একেশ্বরবাদী কিংবা বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী হওয়া  
সত্ত্বেও তিনি প্রতীক-পূজাকে কোনোদিন অশাস্ত্রীয় বোলে  
নির্দেশ করেন নি। রাজা কিছুটা মূর্তি-পূজার রহস্য বুঝতেন।  
তিনি একথাও বোলেছেন,—"ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ঐ কাল্পনিক রূপের  
আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়। এক জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়।"  
তাই অধিকারীভেদে প্রতীক-পূজার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার কোরে  
গ্যাছেন। এ-ব্যাপারে তাঁর মনোভাব পরবর্তী ব্রাহ্মসংস্কারদের  
চেয়ে অনেক বেশি উদার এবং সঙ্গতমুক্ত।

মহর্ষি, রাজনারায়ণ, অক্ষয়কুমার বা বিভাসাগর—সকলেই  
মূর্তিপূজাতে সম্পূর্ণ অনাহা প্রকাশ কোরে গ্যাছেন ; অথচ কেউই  
মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো মূর্তি ছাড়াতে পারেন নি।

মহর্ষি প্রতীক-পূজার বিরুদ্ধে নিছক প্রতিবাদই কোরে গ্যাছেন,  
রাজার মতো শাস্ত্র, যুক্তি বা লোকব্যবহারের দিক থেকে আলোচনা  
কোরে এ-বিষয়ে মোহন কিছু বোলে যাননি। তাঁরই অমুগামী  
রাজনারায়ণ বাবুও মূর্তি-পূজার বিরুদ্ধতা কোরেছেন বিশেষ কোনো  
যুক্তি না-দেখিয়েই।

প্রত্যক্ষবাদী অক্ষয়কুমার শ্রৌতভেদে মূর্তি-পূজাকে একপ্রকার  
নিম্নাধিকারীর ধর্ম বলে সঙ্গীতমানে স্বীকার কোরলেও, জ্ঞান-বিজ্ঞানের  
যুগে এর অমুপযোগিতা প্রমাণ কোরে একে বর্জন কোরেছেন।  
বিভাসাগর মশাইএরও ঐ একই যুক্তি—বা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ তা  
কখনোই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হোতে পারে না, আর মূর্তি হোচ্ছে আকার-  
বিশিষ্ট এবং জড়। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর আর মূর্তি ইন্দ্রিয়ের  
প্রত্যক্ষ ; কাজেই ঈশ্বর মূর্তি হোতে পারেন না বা ঈশ্বরেরও মূর্তি  
হোতে পারে না।

বুদ্ধির এই সিদ্ধান্ত হয়তো আমাদেরও মনে নিতে হোতো, যদি  
না পরবর্তীকালে সমন্বয়যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মূর্তির সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব  
লাভ কোরতেন, সাধনার দ্বারা প্রতিমাকে জাগ্রত না কোরতেন।

সংস্কার-যুগে একমাত্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই তাঁর ধর্ম-জীবনের শেষ  
স্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হোয়ে মূর্তি-পূজার রূপক  
ব্যাখ্যা কোরে গ্যাছেন এবং তা ধর্ম-সাধনার অঙ্গীভূত বোলে স্বীকার  
কোরতেও পেছ-পা হাননি।

এই সব দিক থেকে বিচার কোরলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে,  
রামমোহন-পন্থীরা প্রচুর পরিমাণে রামমোহন থেকে বিপথগামী।

"Institutions do not make men, any more than  
organisations make life ; and even the ideal  
university . . . will be a superior piece of mecha-  
nism unless each student strives after the ideal  
of the scholar."

—T. H. Huxley,



নীলকণ্ঠ

পঁচিশ

টলিউড থেকে শুধু আক্রেপ নিয়ে ফিরেছি, একথা লিখলে তুল হবে। টলিউডে-বিষয়ও আছে। বিষয়: মঞ্জরী-দেবী। যে-কোনও উপস্থানের চেয়ে অলৌকিক কিন্তু এতটুকু অসীক নয়। অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন মঞ্জরী, কিন্তু তাঁর নিজের জীবনে যে নাটক তার সঙ্গে কোনও তুলনা হয় না তাঁর অভিনীত কোনও ছবির কাহিনীরই। রাজপথ থেকে রাজতন্তে নয়; সে ইতিহাস পুনরাবৃত্তিতে হস্তাকর হয়ে গেছে। পাক থেকে পশ্চিম; সমাজ পরিত্যক্ত জীবনের অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে আরেক দিন শুধু সমাজপতিদের নয়, সমস্ত সমাজের স্বীকৃতি আদায়ের মধ্যে ঘটনার উপনি-পতন রোমাঞ্চকর। মেয়েমানুষ থেকে বয়সীতে এই রূপান্তর আরব্যোপস্থানের চেয়েও আশ্চর্য। গরীব থেকে শুধু বড়লোক মাত্র হয় নি মঞ্জরী; যে-সমাজ তার পিতাকে করেছে সমাজপতি অথচ তাকে করেছে সমাজচ্যুত, সে-সমাজকে ক্ষমা করে নি সে; যৌন অভিমান নয়; স্বীকৃতি আদায় করে করেছে মুখের প্রতিবাদ। সমাজের পরিচয়পত্রে যোগ করেছে নতুন বর্ণপরিচয়। টলিউডের নরকে অনেক অধঃপতিতা পতিতা হতে বাধ্য হয়েছে। তাদের চোখের জল টলিউডের মাটিতে পড়ে শুকিয়ে যায় নি; তার তিত্বক টলিয়েছে। সর্ব নিম্নস্তরের পতিতা হয়েছে সর্বোচ্চ স্তরের সঙ্গে পরিকীৰ্তা। মেয়েদের নিয়ে ছেলোপেলার আমরা শুধু পুরুষের হাসিই দেখেছি; কোনও মেয়ের অটহাসি দেখি নি। মঞ্জরী এই সমাজের মুখের ওপর প্রচণ্ড ব্যঙ্গের সেই মুখের অটহাসি।

মঞ্জরীবালা কেন্দ্র করে মঞ্জরী দেবীতে উত্তীর্ণ হলো সেই

অভিজ্ঞতাই টলিউডের রক্ততীর্থে আমার একমাত্র লাভ। সেই জীবন নাট্য এখানে উপস্থানের মত সাজিয়ে দিলাম। জীবনের সত্যকে উপস্থানের আদিকে জন্ম দিতে যেটুকু কল্পনার অঙ্গন মাখানো দরকার সেইটুকু দিয়েছি বলেই একে কাহিনী বলছি, না হলে একে সত্য ঘটনা বলেই আখ্যায়িত করতাম। কিন্তু নিখাদ সোনার যেমন অলঙ্কার অসম্ভব, তেমনি নিছক সত্যকথন রিপোর্ট হয়, সাহিত্য হয় না। তাই সত্যের ভিতর ওপর এ-হুচ্ছে বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রিত ইমারত।

একটি কথা; একাধিনী একজন চিত্রাভিনেত্রীর জীবনী মাত্র নয়; সেই জীবনকে উপলক্ষ্য করে এই লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা করেছি আমি যে, পশ্চিম দিয়েই মাত্রই চিরকাল পূজা দেবে; পঙ্কজের খবর নাও না কোন দিন; কিন্তু যে লিখবে তার কাছে পঙ্কজের চেয়ে পঙ্কজের দাম কম নয়; পঙ্কজ জন্মায় বলেই পশ্চিম—পশ্চিম। শুধু পঙ্কজের গন্ধে মানুষের মন উদ্ভ্রান্ত হতে পারে কিন্তু সত্যকে পাবে না সে; শুধু পঙ্কজের বর্ণনার পুলিশের ডায়েরী হতে পারে, সাহিত্য অসম্ভব। পঙ্কজ জন্মানোর বেদনার সঙ্গে পশ্চিম হয়ে একদিন ফুটে ওঠার আশাই সাহিত্যের একমাত্র দাবী; পঙ্কজের সঙ্গে যেটুকু পঙ্কজ—জড়ানো, সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তব জীবনও ততটুকুই জড়ানো; তার বেশী নয়; তার কমও নয়।

ট্রাম ঠপেজে ঠাড়িয়ে মঞ্জরী আঁচলে-বাঁধা পয়সাগুলো গুলে। কি হবে গিয়ে। একবার তার মনে হোল। কি হবে গিয়ে ফিরে যাউ, সে ভাবলো। মনে মনে সে ঠিক বুঝতে পেরেছে, এ অসম্ভব, মাঝের থেকে এই হুঁটো টাকাও আস্ত থাকবে না। আঁচলে হাত দিয়ে টাকা ছুটো আরেক বার স্পর্শ করতেই আরো ভেঙে হল। হুঁটো আস্ত রূপার টাকা। গত সপ্তাহে হলু বাবু ছুঁনি পর পর তার ঘরে আসে নি। অনেক সাইন্স আর উপায়তন হয়ে তবে সে বন্দের ছুটিয়েছিল। ছুটি কলেক্স বাবু। তানেরই একজন বোধ হয় কলেক্সের মাইনে থেকেই হবে, এই ছুটি টাকা দিয়ে যার। হলু বাবু জানলে?

এটা কি টালিগঞ্জের ট্রাম? মঞ্জরী এককণ্ঠে পাশের লোকটির ভালো করে দেখলে। কল্লিগাঁবার দালালটির মত চেহারা, অবিকল কালো, নাড়ব-মুত্ব। গায়ে মসমালের পাঞ্জাবী, পায়ে কালো চটি হাতে ওটা কি? কল্লিগাঁবার দালালের হাতে কখনো দেখে নি। ঠ্যা টালিগঞ্জের গাড়ী। কোথায় যাবে? মঞ্জরী জবাব দিলে না; প্রথমে গাড়ীটার উঠে পড়লো; ভাড়া নৌ, সে জানে; তবুও লোকটার পেছন পেছন এসে উঠলো। মঞ্জরী আঁচ করলে, লোকটা চিনে ফেলেছে, সে কোথাকার। না হলে মেয়েছেলেকে নিশ্চয় আপনি করে ডাকত।

হলু বাবু জানলে? আরেক বার ভাবতেই একটু ভয় পেলো মঞ্জরী। তারপর মনে মনেই বোধ হয় সাইন্স সক্ষম কোরবার জন্মেই হবে বললে: ও জাহ্নক। বাটটা টাকা দেবে; তাও আজ পাঁচ টাকা কাল দশ টাকা করে। এর দিকে তাকালে, ওর সঙ্গে কথা বললে অভিমান; ছুঁনি অসম্ভব সন্দেহ। মঞ্জরী এবার স্পষ্ট করে বলে দেবে: সে পারবে না।

ট্রাম আর যাবে না। বাঁচার মধ্যে ঢুকছে। মঞ্জরী নেমে পড়ল আর সেই লোকটি। লোকটা এককণ্ঠে লেডিজ সীটের পেছনেই বসেছিল। মঞ্জরী খেয়াল করে নি।

এখানে কোথায় যাবে ?

কোথায় যাবে। তা ছাই মঞ্জরীই কি ভালো করে জানে ? গোকুলের  
তার তার রাগ হোল ভীষণ। কত বার মঞ্জরী তাকে বলেছে  
টিকানাটা একটু কাগজে লিখে দিতে, না, ট্রাম যার পর আর যাবে  
না, সেটখানে নেমে যে কোন রিক্সওয়ালাকে বললেই হবে বায়োস্কোপের  
ছবি তোলা হয় যেখানে, সেখানে নিয়ে যেতে ; বাস !

আচ্ছা এখানে কোথায় বায়োস্কোপ ?

বুঝছি, কিন্তু কোন ষ্টুডিওতে যাবে ? ওত না কবি ?

ক—কবি !

এতক্ষণ বলনি কেন ? কার কাছে যাবে ?

রাখাল বাবু, রাখাল দত্ত গো ! 'গো' কথাটা মঞ্জরী এখানে  
লাগাতে চায় নি কিন্তু তবুও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ও, শ্রাবের কাছে ! একট্রার জগে ! তা, তার জগে আর  
হঁকে বিবস্ত্র করে কেন ?

গোকুল যে তাই বললে।

গোকুল কে ? ও ! বুঝছি, গোকুল ত' ষ্টুডিওর কলি।  
আমার এসিষ্টেন্ট ! চলো রাখাল বাবু কাছে আমিই নিয়ে যাচ্ছি।  
গোকুলের নাম কোরবারই দরকার নেই সেখানে, বুঝেছ ?

মঞ্জরী চুপ করে রইল ; মনে মনে বলল, আমরা বেগারী সকলের  
সব কথাই চট করে বুঝে নিই। শুধু নিজের মন নিজেরা  
বুঝেন, কেন কে জানে !

একখানি রিক্স নিলে লোকটা। কাজ না হলেও ভাড়াটা  
বোধ হয় বাঁচলো ; মঞ্জরী একটুখানি খুসীই হল। পানের দোকানে  
থেকে শিশ দিলে এক জন। এক জন চেঁচালে : কোথায় চলছেন  
তার ? রিক্স থেকে নেমে মঞ্জরীই ভাড়া দিলে।

আজ তার শরীর খারাপ, শরীর ভালো না থাকলে কোনও  
পুরুষ মানুষই কোনও মেয়ে মানুষের জন্তেই একটি কড়ি বার  
করতেও রাজী নয়।

তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় সে জানে, এই হল সম্ভব।

গেটের ওপর বুড়াকারে লেখা : কবি ফিল্মস্ সাইণ্ড ষ্টুডিও।  
এক জন মিস্ট্রীই হলে হয়তো। বললে মঞ্জরীর সঙ্গের লোকটাকে :  
কি লাটমার্গিক, এতক্ষণ সময় হোল ? যাও, কর্তা ভেতরে রেগে  
ফায়ার ! চাকরী বোধ হয় আজ গেলো তোমার।

লে লে তুই চুপ কর। আমার চাকরী কে খায় রে ? লম্বা  
সক এক ফালি রাস্তা পাব হয়ে মঞ্জরী যে ঘরটার এসে ঢুকলো, অত  
উঁচু, অত বড় আর অত নিস্তর ঘর সে আর আগে দেখেনি।  
আর কি গরম হ্যা, লম্বা বন্ধ হয়ে এলো প্রায় মঞ্জরীর।

ঘরে চার-পাঁচটি লোক। সবাই বোবা। কেউ কথা কয় না ;  
খন্দের মাচানো নজরে মঞ্জরী এক বলক কটাক্ষ ঘুরিয়ে আলো সকলের  
মুখের ওপর দিয়ে। বুকতে পারলে এরা সবাই একজনের জন্তে  
অপেক্ষা করেছিলো কিন্তু সে মঞ্জরীর জন্তে নয়।

বহু দিন আগে একবার ব্যারাকপুর-এর এক বাগান-বাড়ীতে

উৎসবের দিনে

কে. হোড়ের

মুবাঙ্গিত  
প্রমাধন মাছগী

কে. হোড় এও লিখ  
কলিকাতা ১৪

গিয়েছিল, তার দিদির সঙ্গে। তখন তার বয়স বেশী নয়। ঠিক সেই বাগান-বাড়ীর মতই না কিংবা হুঁড়িও। সহস্রের কাছেই, কিন্তু সহর থেকে যেন অনেক দূরে। পরিত্যক্ত প্রাসাদের মত মনে হয়। ছুঁ-চারটি লোক, তাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। এটা যেন এক দিন কোন প্রাচীন রাজার রাজপুরী ছিলো। সৈন্ত-সামন্ত সব বেঁচে পড়েছে, যুদ্ধ করতে আর ফিরে আসে নি। সেই সব ফেরারী ফৌজদের যাদের কোন দিন এরা দেখে নি, তাদেরই কল্পিত জীবনের আখ্যান নিয়ে মনগড়া রূপ দেওয়ার ছেলে-ভুলানো খেলা জমাবার চেষ্টায় অলস ক'টি লোক অলসতর কল্পনায় মশগুল। ফুঁতির ঠাণ্ডা আবহাওয়া কাজের আসরে। যা এদের প্রচেষ্টার মতই নিষ্ফল। কলের পুতুল দম দিয়ে দিলে তবে চলে, না হলে অচল।

ঘরের মাথায় জমেছে বুল, ভুতের মত দেখায় অন্ধকার কোণে কোণে। সে খুল বেড়ে পরিষ্কার করবার দায় নেই কারুর; দায়িত্বও নেই। নোতুন বারি আসে এখানে, তাদেরই চোখে পড়ে শুধু। পুরোনোর মেনে নিয়েছে এই জঞ্জালকে; যেমন মেনে নিয়েছে এই ঘরে তার আর লাইট আর কামেরা আর মাইক, অভিনেতা আর অভিনেত্রী; বাইরের উঁচু আসনে পায়বাদের বক-বকম কখনও থামে কখনও থামে না, ভেতরে অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের সলাপ বলে ঘাওয়ার মত কেউ কান দেয় না তাকে, থেমে গেলেই তবে মচেন্তন হয়, না হলে নয়।

কিন্তু আজ রবিবার তাই, না হলে মঞ্জরী এখনও জানে না এই নিষ্ফল প্রাসাদে প্রাণ সঞ্চার হয় মুহূর্তে। লোকজন, কথাবার্তা হৈ-হৈ, যেন কি হচ্ছে, যেন কি হবে, এই এক সন্তানবায় কাঁপতে থাকে। এমন কি সে বকম স্রুটি হলে এই ঘরে ঢুকে হঠাৎ মনে হয়, বাংলা দেশের কোন পাড়াগাঁয়ে ঢুকেছি; মাটির ঘর, মেঠো রাস্তা, গাঁয়ের লোক : চোখ'ভুটা বগড়ে নিয়ে তবে আপনি বুঝবেন : স্রুটি চলেছে।

আজ রবিবার, তাই মনে হচ্ছে যেন কোনও বাড়ীতে বিয়ে শেষ হয়ে গেছে কাল। অলস মন্থর মুহূর্ত বাসি ফালসর গন্ধে একটু বুঝি উদ্মনা উদাসও করে।

মঞ্জরীর সখিত ফিরে এলো রাখাল বাবুর প্রসঙ্গে। বিনোদ তোমার পাঠিয়েছে এখানে ?

হ্যাঁ, মঞ্জরী ব্লাউজের ভেতর থেকে বার করে আনলে একখানা চিঠি।

রাখাল দস্ত এপকেট ওপকেট হাতড়ালেন চশমার জন্তে। পেলেন না। ~~কিছু~~ ক্রুদ্ধন করলেন তিনি। চিঠিখানা খুলতেই খেয়াল হল চশমা তাঁর চোখেই আছে।

এর আগে প্লে করেছো লখ করে কখনো ?

না।

ভালো ভালো সিনেমা দেখ তুমি ?

না।

কোন স্রুটি দেখেছ কোনও ছবির এর আগে ?

না।

তোমার ছবি তোলা আছে একখানাও ?

না।

ঠিক আছে। মন্তব্য করলেন পরিচালক। মঞ্জরী এবং ঘরের আর সব লোক বুকে নিল ঠিক নেই।

তুমি এই মাঝখানটায় গিয়ে কাঁড়াও দেখি।

মঞ্জরী উঠে গেলো হতাশ ভঙ্গিতে। কিন্তু কাঁড়ানো ঠিক যেমতাবে বললেন রাখাল বাবু, ঠিক অবিকল সেই ভাবে। কাঁড়ানো অভ্যাস তার অনেক দিনের।

মুখটা তোলো, আরও একটু বাঁ দিকে, না, না ডান দিকে নয় বাঁ দিকে, ঐ তারিটার দিকে তাকাও ; হ্যাঁ ঠিক আছে।

একটা ছোট আওয়াজ হতে মঞ্জরী মুখ ফেরালে।

নাও আরেকখানা ষ্ট্রল নাও হে। আরেক বার মুখ তোলো ত' তুমি বাংলা পড়তে পারো ?

হ্যাঁ। মঞ্জরী একদিকে একটা 'হ্যাঁ' বলতে পেরে অবাক হলো।

একজন লোক এসে তার হাতে একখানি লম্বা বড় কাগজ দিলে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা পরিষ্কার। পড়তে কষ্ট হবে না মঞ্জরী ভগবানকে ধন্যবাদ জানালে।

ওতে রুশ্বিনী যে কথাগুলো লেছে সেই কথাগুলো শুধু তুমি বলবে। পুরুষের ডায়ালগ তোমার বলবার দরকার নেই।

মঞ্জরী পড়লে, এত দেবী হল কেন নাথ ?

একটু থামলে তারপর। পুরুষের কথাগুলো তার বলবার নয় কিন্তু পড়ে দেখলে এর উত্তর সেই লোকটির বলবার কথা লেগে রয়েছে ; তোমার কথা ভাবতে ভাবতেই দেবী হয়ে যায় রুশ্বিনী !

কি মিথ্যা কথা ! মঞ্জরী ভাবলে সে যুগে ব্যাটাছেলেগুলো বানিয়ে বানিয়ে মেয়ে মানুষের কাছে মিথ্যা বলে থুসী হত। হুঁ বাবুও ত দেবী হলে মঞ্জরীকে আজও অমনি মিথ্যা বলে ; কিন্তু এ কি, রুশ্বিনী যেন বিশ্বাস করেছে সেই কথা। রুশ্বিনী বলছে :

আমি সামান্য নারী ; রাজকাজে ব্যস্ত থেকেও তুমি আমার ভোলো না নাথ ?

মঞ্জরী কিন্তু জানে, হুলু বাবুর সব মিথ্যা। মঞ্জরীর ভালবাসা মতই মেকি। মঞ্জরী অবশ্য ভুলে গেলো যে হুলু বাবুর কথাবলার তাকেও অমনি মিথ্যা বলতে হতো। মঞ্জরী শুধু মনে মনে বলতে রুশ্বিনী তুমি বোকা। ভীষণ বোকা।

মঞ্জরী এসে বসতেই দেখলে এক কাপ চা ; কিন্তু পেয়ালায় তেঠা পেয়েছিল, কিন্তু বাটি হলেই যেন ভালো হতো। চায়ের পূর স্বাদটা সে পেনে। প্লেটে ঢেলে ঢেলে মঞ্জরী চাইকু খেলে ভয়ে ভয়ে কাঁকে দিয়ে খবর দিলে তুমি পাবে ?

গোকুল বাবু আমার জায়গা জানে।

গোকুল ? বেশ দু'দিন তিন দিনের মধ্যেই তুমি খবর পাবে।

ঘর থেকে বেরোতেই রিক্সার আসা সেই লোকটাকে দেখা যায়। আমিই খবর দিয়ে আসব তোমায় ; সেই পাব সেই তোমার ওখানে যাব ; জায়গাটা কোথায় ? রূপচাঁক ..

মঞ্জরীর এবারে রাগ হল। সে তাকাতেই লোকটা বলতে থাকে থাক। গোকুলের কাছেই জেনে নেব।

ক্রোধের মধ্যে সবাই একবাক্যে স্বীকার করলে : এক মঞ্জরীকে দিয়ে হবে না।

অসম্ভব, এ ত কাঁড়াতেই জানে না !

একে আবার বিনোদ বাবু জোটাতে কোথা থেকে একবারে বাজায় মেয়েছেলে !

আরে, সোনার বলার সেই মেয়েটাই ত ! ভীষণ কালো

পেচি মঞ্জরী বলে ডাকি। একটা বোন আছে। আপন নয়, নাড়ায়ারী একটা বাবু রেখেছে সেটাকে।

নূপেন শুই এর বাবা; এই পেচি মঞ্জরীর।

নূপেন শুই? লরোটা শান্ডাসের বড়বাবু।

হ্যাঁ। আমরা ঠাট্টা করতাম কার মেয়ে বলে; নূপেন আর মহাসেব চাটুজ্যে ছ'জনেই যেত কি না সোনার বাগার কাছে। তবে ও নূপেনেরই মেয়ে, নূপেনের মুখ বসানো একেবারে।

ছোটখাটো পাট হতে পারে।

রাখাল দস্ত একটুও কথা বলেনি এতক্ষণ। একেই নেব। মেয়েটার কিছু নেই, সব করে নিতে হবে। শুধু camera face আছে অসম্ভব। গোকুল পবন্ত দিনই কাগজপত্র নিয়ে সই করিয়ে নিয়ে আসবে। যারা দাঁড়িয়ে উঠেছিল তারা বসে পড়লো চেয়ারে।

ছবির দফা হয়ে গেল। সবাই বললে কিন্তু মনে মনে; রাখাল দস্তের সামনে বলবার সাহসে কুলোয় না কারুর। শুধু একজন আপত্তি ছুড়ে মারলো সোজা।

কি পাবলিসিটি একে দেব? প্রশ্ন করল মি: গাঙ্গুলী।

এত কাল যা সকলকে দিয়ে এসেছেন; অভিজাত বংশের সম্ভ্রান্ত হকণ।

এ ত' তরুণীই নয়, অভিজাতও কোন জন্মে নয়।

এত দিন পাবলিসিটি করবার পরেও একথা বলতে পারলেন মাপনি?

বাবের আমরা অভিজাত বলি, তরুণী বলে চালাই, তারা সবাই ঠিট? রাখাল বাবুর প্রশ্নের উত্তরে মি: গাঙ্গুলী বললেন: কিন্তু পুসিগোলকে দুব বলে চালাবার দিন গেলো বলে।

এবারেই তো আপনার বাহাদুরী দেখা যাবে। এবারে যোল থানা থাওয়ান পাবলিককে, দুধের তেঠা তাতেই মিটেবে।

তথাস্ত! মি: গাঙ্গুলী ফিরে এলো তাঁর স্বপক্ষে। আমরা স্নানগী বলে, মালিকের যে খোঁড়া রেসে দৌড়াচ্ছে সে খোঁড়া লও তাকেই back করা salesman-এর কাজ।

তাই করুন, আর জেনে রাখুন, এ-যোড়া dark horse কিন্তু ঠা নয়। সন্ধ্যা হয়ে যাবার পর মঞ্জরী ফিরে এলো তার ঘরে। নিকটা হতাশা আর অনেক ক্লান্তি নিয়ে।

এসে দেখলে হলু বাবু খাটে শুয়ে বই ওটাচ্ছে। দিন ৯ তোমার ফিরে গেলো কিন্তু, কি বলে মঞ্জরী? গরাককে রাখবে ত? হলু বাবু ঢ় বদলেছে।

কি বললেন? মঞ্জরীর হতাশা জিজ্ঞাসায় হলু বাবু আঁচ করলে। আশাজনক যেন কিছু ঘটেনি মঞ্জরীর শাপগো, মনটা একটু হাল। যাক। হয়ত আরোও কিছু দিন মঞ্জরী তারই থাকবে।

গোকুল বলছিল কি না তুমি ফিল্ম নামছ। ভালো! ভালো! ফিল্মটার মঞ্জরী না কি অভিনেত্রী কুলবাণী, কোনটা তোমার ভালো লাগছে সুনতে রাণী?

দিনের বেলাতেই হলু বাবু চড়িয়ে এসেছে তা হলে।

হ্যাঁ ভালো কথা। ইনক্রিমেন্ট হয়েছে অফিসে। তোমাকেও কিছুটা অংশ দেব তার; তোমাকে শুধু কথাতেই খুসী করে এসেছি; এবারে কাজেও প্রমাণ পাবে তার।

আপনি বসুন একটু; আমি আসছি।

কাপড় নিয়ে নেমে গেল নীচতলার মঞ্জরী। নীচের তলার ঘরের মোক্কেয় রুজ্বিলীর ছেলেরা শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। এই ছোঁড়া ওঠ। বলতে বলতে মঞ্জরী দেখলে হাতে একটা কাগজ গোঁজা। হাত থেকে সেটা খসিয়ে নিয়ে দেখলে ছাপা ছাণুবিল।

কেলে দিতে গিয়ে কোথ পড়ল 'পতিতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন'। বোম্বাটা একটা আবেদন। পাড়ার লোকের কাছে। কয়েকটি পতিতার পাড়ার যুবকদের নৈতিক উন্নতির বাধ্যতাবশত এখানে ঘর নিয়ে আছে। সমাজের মঙ্গলের মুখ চেয়ে এদের উচ্ছন্ন করা দরকার, তার জন্তেই পাড়ার সকলের পক্ষ থেকে মাতাবরদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে ছাণুবিল মারফৎ।

কে কে সই করেছে দেখা যাক। মঞ্জরী স্বাক্ষরগুলির ওপর নজর নামিয়ে আনল। প্রথম নামটি পড়তেই তার জ্বংপিও লাকিয়ে উঠল স্বস্থান থেকে মুখের কাছে। বড় বড় টাইপে সম্মুখিত স্বাক্ষর হুলাল চাঁদ দস্ত।

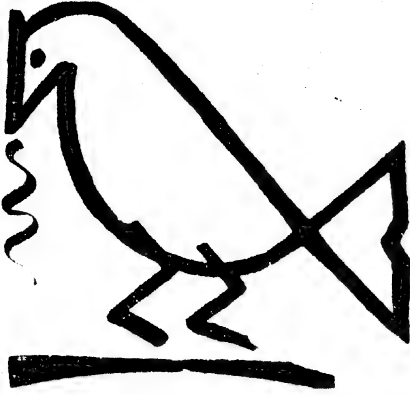
চানোর ঘরে ঢুকে চান করলে না মঞ্জরী।

গত পাঁচ বছর ধরে হলু বাবুর বাঁধা সে। এক-আধবার লুকিয়ে অগ্না খন্ডের মঞ্জরী বসিয়েছে বাঁধা হয়ে। সে জন্তেও দায়ী হলু বাবুই। প্রয়োজনমত টাকাও তাকে দেয় নি হলু বাবু। শুধু শরীর পাতাই সার হয়েছে মঞ্জরীর। জাত তার জন্ম থেকেই গেছে কিন্তু পেট ভরেনি মাসের দশ দিন। আর সেই হলু বাবু প্রতিদিন উচ্ছন্ন কামনা করছে তার। কিন্তু মঞ্জরী যে এই পথে এসেছে এ কি তার নিজের ইচ্ছেয়? ভালো লাগে তার দিনের পর দিন শরীর দিয়ে রোজগার করতে? কেউ যদি তাকে বিয়ে করত সে কি কোন গেরস্থ বধূর চেয়ে কম ভালোবাসতো তার স্বামীকে। হলু বাবু ত বিয়ে করেও চরিত্র ঠিক রাখতে পারে নি। কিন্তু কে তাকে বিয়ে করবে? সে যে বেস্তার মেয়ে, এর পর মঞ্জরী কি কোনও হাত আছে? কিন্তু তার বাবা কালও তো ভ্রমলোক সমাজের সকলের সঙ্গে সমান হয়ে মিশবেন। অথচ তার মেয়ের বেশবার উপায় নেই কোথাও। অল্পের জন্তে শরীর দেয়া ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই। ছবির এই কাজটা সে পায় না? [ক্রমশঃ।

"শিক্ষক যেখানে বজা, ছাত্র শুধু শ্রোতা; শিক্ষক যেখানে দাতা, ছাত্র শুধু গ্রহীতা,—সেখানে ছাত্রের স্বাধীন চিন্তাশক্তির উদ্বেগ হইতে পারে না। সেখানে শিক্ষক ছাত্রের 'অন্ধের দৃষ্টি'; শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত সে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। সে সর্বদাই নিজেকে অক্ষম ও দুর্বল মনে করে এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে সঙ্গার-সমুদ্রে পড়িয়া চতুর্দিক অন্ধকার দেখে।"

—বাসী বিবেকানন্দ

## ছোটদের আসর



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। টাঙ্গাওয়ালা বলে 'বিশ্ববিদ্যালয়'। গোখলিয়ার মোড়ে সারি-সারি টাঙ্গা ঝড়িয়ে থাকে। ডাকে—আইয়ে বাবু আইয়ে। পেয়ারে লোক চড়ায়। কাক্রীটের রাস্তার ওপর দিয়ে কপ-কপ শব্দ করে ঘোড়া চলে। টমটমের মতন ঘটা বাজে টাঙ্গাওয়ালার পায়ের চাপে। হাতের চাবুকের লাঠিটা চলন্ত ঢাকায় ঠেকিয়ে কটাকট শব্দ করে সে বলে যায়।—বাঁচো ভাইয়া, বাঁচো শেঠ, বাঁচো সাইকেল—কপ-কপ কপাকপ, ঘোড়া চলে।

পার হরে যায় গবেশমহল্লা, রামাপুরা, সোনারপুরা, ভেলুপুরা, কেন্দার, হরিশচন্দ্র, শিবালয়, দুর্গাবাড়ী—রাণীভবানীর মন্দির। ওধার থেকে কামাচ্ছার রাস্তা এসে মেশে, সঙ্কটমোচনে মহাবীরের মন্দির ও মনোরম বাগান। পুরোন পানওয়াটা ঠেকিয়ে ওঠে 'জয় সিংরাম' বছরের পর বছর নাকি বাকে পায় তাকে ঢেকে—সকায় পাওয়া যায় পঞ্চকোশীর পথ, তীর্থবাড়ী কাণী, পরিক্রমা মারে এই পথে—সামনে জেগে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেকুরা রঙের প্রাচীন ফটক, যেন ধ্যানগম্ভীর।

তার পর পিচালা রাস্তার ছ'ধারে, কোথাও নিম, কোথাও বাবলা, কোথাও কুকচূড়া, কোথাও পলাশ গাছের সারি—প্রাসাদের পর প্রাসাদ—মাথায় মাথায় মন্দিরচূড়া—বাণীনিকেতন, একটার পর

একটা আবুর্কেন কলেজ, আর্টস কলেজ, সার্যাল কলেজ, ইন্ডিনিয়ারি কলেজ, বিরাট লাইব্রেরী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্টেল, খেলার মাঠ, সমস্ত গেকুরা রঙের, যেন একটা আদালার রাজ্য কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, গন্ধা থেকে কাছে, শহর থেকে দূরে।

প্রোফেসর্স কোয়ার্টার্স, ছোট ছোট বাগানওয়ালা সোতলা বাড়ীগুলি পাশাপাশি বিক-বিক করছে, একটিকে বাথার দান্দা থাকে, ও উঠলে মীরাকে নিয়ে। অতিথি যেন এখানে প্রত্যাশিত। অপ্রত্যাশিত নয়। যখন কেউ আসবে, গরম গরম হাণ্ডিয়া, কিংবা লুটি আর আলু-পটোলের তরকারি, এ আর বলতে হয় না। সোতলার ঢাকা বাগান থেকে বিস্তীর্ণ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় মাইলের পর মাইল ভুড়ে যেন স্বপ্ন সার্থক করেছে একটি লোকের—নাম যার মদনমোহন মালবী। রাজা-মহারাজা থেকে সাধারণ লোকের কাছ থেকে ভিক্ষার মুলি ভরে নিয়ে মালবীজী রচনা করেছেন সর্বভারতীয় পরিকল্পনা। পাশাপাশি বাড়ী মিরবাবুর, ভোগর সিংএর, পাণ্ডামবেকরের, যোবীজীর, মৈত্রমশায়ের। নাগবাবুর, শাস্ত্রজীর, ভট্টনগরের, সুরমলায়ের। ছাত্রছাত্রীও সারা ভারতের। স্তবকে স্তবকে কুকচূড়া ফুটেছে রাস্তা যেন আলো করে, আকাশে বকের পালকের মতন দান্দা মেঘের কৃপ, সাইকেল-রিম, মোটর, বাস, টাঙ্গা একা দেখা যায়, সিনেমার ছবি মতন দূরে চলে যাচ্ছে—অধ্যয়ন অধ্যাপনা বিস্তীর্ণ জায়গা হুত, আবাদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের।

তবু এর চেয়ে নালন্দা বড়ো ছিল। সেখানে থাকত দশ হাজার ছাত্র!

তবু এর চেয়ে আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সারা পৃথিবীর মনোবীর কাছে। কেন? কিসের জন্তে?

কাব্য, সেখানকার শিক্ষার ধারা ইংরেজের অনুকরণ নয়, স্বদেশের অনুসরণে। সনাতন ভারতবর্ষের নিজস্ব পথে। যির শ্রেষ্ঠ কবির পরিকল্পনায়। তাই পৃথিবীর দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সেখানে মাথা নীচু করে মনন কিছু শিখতে আসে, সেখানে নয়। সেখানে এগুজ পিয়াসনকে ভারতীয় হতে হয়।

এখানে হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক, সনাত্ত আর শিক্ষিত, সবাই অধ্যাপক। এমন কোথায় পাওয়া যায়! মিত্রমশাইয়ের মেয়ে গুরুমুখ সিংএর পুত্রবধূকে বলেছে—হয় আমি কোর করতে পারতা হায়, পড়তে পারতা হায় না চাকরী করে পারতা হায়? অর্থাৎ তোমার স্বামী কি করে? এখানে পড়ই না চাকরী করছে? গুরুমুখ সিংএর পুত্রবধূ এ হিন্দী বোলে না। তবু বলে এই বাল্যের কালিক এখোন পড়ছে, নাকরী করতে পড়া ধর হোবে তোবে তো। কি কারোবার ক কিছু ঠিক আছে বেহেন?

সব বাড়ীর সামনে যেমন ফুলের বাগি তেমনি রঙীন ফুলের মতন সাজসজ্জা দ্য মাদ্রাজী মেয়েদের নাকে হীরে, কানে গাঁ কত দূর থেকে জলজল করে, গুজরাটী রঙীন শাড়ী, বাঙালী মেয়ের পাশি শা মতন কাপড় পরার ধরণ। সর্বভারতীয় আকর্ষণ করে—এই ঘুরিয়ে কাপড় প নকল করে ডাচিয়ারা, পাশাবীরা, ইউ

# রত্নবেদী

ত্রিপ্রভাতকিরণ বসু

মেয়ের। বাঙালী মেয়েরা দক্ষিণী মেয়েদের মতন খোঁপায় মালা জড়ায়। এ যেন অল্প বাজা। এখানে মূৰ্খ কেউ নেই, এখানে প্রাদেশিকতা নেই। এখানে শুধু সহযোগিতা, এই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর কোয়ার্টার্স।

রেলের থার্ড ক্লাস কামরায় এক বাঙালী ছোকরা চলেছিলো, পান খেয়ে জল। খেয়ে পীচ ফেলছে জানলা লক্ষ্য করে, হাওয়ায় সে পীচ উড়ে এসে পশ্চিমী ভঙ্গলোকের রাজহাঁসের মতন সাদা খন্ডের চান্দরে লাগলো। ভঙ্গলোক প্রতিবাদ করলো। বাঙালী যুবক, দেখলে, চলেছে তো থার্ড ক্লাস, তার আবার এমন মেজাজ! না হয় আশাবাদে পানের ছোপ একটু লেগেই গেছে সাদা চান্দরে। কী এমন মহাভারত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? এমন করলে ফর্দা ক্লাস যেতে হয়।

ছেলেটি প্রশ্ন করলে—উদ্ধত প্রশ্ন—কে তুমি লাটিমাত্রব?

জবাব হল—আমি কে জানলে তুমি চমকে যাবে—ভঙ্গলোকের শাস্ত্র উত্তর।

তবু ছেলেটি জেদ করে—আরে ভাইয়া বোলো না, কোন ছায় ভূম? বাতাও না কোর নাম? কাঁহা কা নবাব খাঞ্জা খী?

নাম হামার মননমোহন মালবী।

তখন মমা চাওয়ার পালা। কুপ্তিত হওয়ার পালা। মননমোহন মালবী ইরেজ রাজহাঁসে গর্নফেমেন্টের মত। সারা দেশের সম্মান।

মালবীজী ঘরে বেড়াছেন ছেলের নখে—হোমরা ভালো হও, বড়ো হও বলে। হোমাদের জন্মে গঙ্গা থেকে কাছ শতর থেকে দুই পাঠগৃহ করে দিয়েছি, অধ্যয়ন নিয়ে থাকো। সময় অভ্যাস করো।

কে শোনে কার কথা? সন্ধ্যা হতেই সারি সারি সাইকেল চললো শহরের দিকে—বিক্রাসে শহর কান্ধির দিকে—হাজার হাজার সাইকেল, কে তাদের গতিরোধ করে?

সিনেমা দেখে, সববৎ খেয়ে, নানা রকম আমোদ করে, নাগামারি করে, রাস্তা যুবশক্তি ফিরলো হঠাৎ—যার দরজা বন্ধ হতে গেছে।

চুকলো তারা পাঁচিল উপক্কে, চুকলো তারা জানলার গরাদে ভেঙে।

সুপারিটেণ্ডেন্ট দরজা পাতারা দিতে এসে ভলের কুঁজো ছোঁড়া দেখলে তার মাথার কাছ ঘেঁসে।

রাগ না করে মালবীজী বোকায়েন—তোমরা আগামী কালের ভরসা। আমি আশা করব, এ রকম কাজ তোমরা আর করবে না।

গরমের ছুটি এসে গেল। হঠাৎলের ঘরে ঘরে পাখা চালিয়ে আলো ছেলে বেখে ছেলেরা যেয়ার দেশে চলে গেল—হুঁ মাস ধরে পাখা চলতে আর চলতে লাগলো—পাখা-ফী আর লাইট-ফী দেয় না কি তারা? ছুটির সময়ে লোক না থাকুক, কারেন্ট খরচ হোক।

গান্ধী এসে বললেন, এমন রাজপ্রাসাদের মতন জাহাজের মতন বিরাট কুঠির দরকার কি দরকার? এখানে থেকে পড়ে ছেলেরা কি তাদের খড়ের কুঠির, খোলাব চালের ঘরে, টিনের চামার মধ্যে কির যেতে পারবে? ইন্ডেক্সের ইউনিভার্সিটির মতনই ত লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে এখানে? লাভ কি তাতে?

মালবীজী বললেন, ইরেজের বা কিছু ভালো তারা নিক্, সনাতন ভারতের বা কিছু ভালো, তাও গ্রহণ করুক।

একজন বাঙালী প্রোফেসরকে ছেলেরা তাড়াতে চায়, পড়ানো

ভালো হয় না বলে। ছেলেমেয়েরা মিছিল করতে লাগলো—চলবে না, চলবে না। বাঙালী ছেলেমেয়েরাও যোগ দিলো। বাঙালী অধ্যাপকদেরও সমর্থন ছিল।

অবাঙালী মালবীজী সেই বাঙালী প্রোফেসরকে ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। তিনি প্রায়াপবেশন শুরু করলেন। চলে গেলেন বিদ্যালয়ে ডাকবালোয়—যে বিদ্যালয় পাড়াডালা আর্টস কলেজের ছাদে উঠলে দেখা যায়।

ছেলেদের উত্ত্বৃষ্টি জাগলো না। বাঙালী প্রোফেসরকে চলে যেতে হল অবাঙালীকে চেয়ার ছেড়ে। মালবীজী হেরে গেলেন। হেরে গেলেও তাঁর প্রেম রেখে গেলেন এখানকার মাটিতে মাটিতে, যে মাটিতে এক দিন চাবশা গ্রাম ঠাঁড়িয়েছিলো।

সেই সোম্য শাস্ত্র মুন্সুর বৃদ্ধ মালবীজীর কত কথাই মীরা শুনলো। দেশের জন্তে, জাতির জন্তে, ধর্মের জন্তে, আত্মসম্মানের জন্তে, যিনি এত চিন্তা করেছেন, সেই মালবীজীর জীবনের কত কথাই মীরা শুনলো কদিন ধরে। কানী প্রথম দেখা যায় যে-ব্রীজ থেকে, আজ তার নাম মালবীর ব্রীজ।

গেকুয়া বড়ের প্রাসাদগুলি ছক-কাটা জমির ওপর মুন্সুর ভাবে সাজানো—প্রত্যেকটির মাথায় মন্দির—যেন কোনো বাণীভীর্ষ, পৃথিক দেখলেই চিনতে পারে, যে পৃথিক পঞ্চক্রোশীর পথে চলে যায় ক্রান্তিপদে, যে-পৃথিক গঙ্গার বৃকে নৌকো ভাসিয়ে যায় চূর্ণারের পথে, মিঞ্জাপুরের পথে, গাতিপুরের পথে।

ভোর হয়, সন্ধ্যা নামে, সারি সারি মন্দিরের চূড়ার চূড়ায় পেতলের কলসে সূর্য্যরশ্মি ছড়িয়ে।

আবার সেই কথা উঠলো। এখানকার অবাঙালী প্রোফেসররা বললেন—শান্তিনিকেতন আরো বড়ো, আরো মহান—ভারতের প্রাচীন সাহিত্য-শিল্প ও কাব্যধারার সঙ্গে পৃথিবীর মিলন নিত্য ঘটছে বলে—তার আত্মকুঞ্জ, তার শালবীথি, তার খোয়াই, ঘনের ঐক্যে নয়—ভাবের ঐক্যে গরুস্ত শান্তিনিকেতন বলে,—

হেথায় সবরে হবে মিলিবারে

আনত শিরে।

সেই ঐনিকেতন শান্তিনিকেতন মীরা এখনো দেখে নি, কিন্তু শুনেছে—তার আহ্বান দেশে দেশে সাড়া জাগায়, সাগরের এপারের ওপারে।

বাঘা দেখে এসেছে। বললে, বাংলা দেশের এমন পরিচ্ছন্ন রূপ কোথাও দেখি নি, যেমন শান্তিনিকেতনে। প্রকৃতি এমন মিষ্ট কোথাও নয়, যেমন শান্তিনিকেতনে। আত্মকুঞ্জ, শালবীথি, সিংহদান, কলাভবন, ভ্রামলী, উত্তরাগণ, খোয়াই, তিন-চার মাইল জায়গা জুড়ে মহাকবির করনার রূপ দেবার প্রচেষ্টা—যার চোখ আছে, সেই দেখে অবাক হবে।

কিন্তু দেখে নি কত লোক। দেখতে চায় না কত লোক। নিন্দে করে কত লোক। তারা এই বাংলা দেশেরই।

এক দিকে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজপ্রাসাদের মতন বৃহৎ অট্টালিকাগুলি, জাহাজের মতন হট্টেলগুলি, আর এক দিকে বিশ্বভারতীর কাণামাটির কুটীরগুলি, আর কিছু কিছু সাধারণ বাড়ী কি করে—ভুলনা হবে? মীরা ভেবেই গেলো না।

তবু এখানকার অল্পসংখ্যক আলোকিত রাতগুলি, কুসুমুদা

আর বাবলা গাছের মাথার সোনালী আলোর সকালবেলাগুলি মীরার ভালোই লাগলো।

সোজা সোজা দাঁতা পড়ে আছে, যত দূর ইচ্ছে, তুমি যোয়ো।

সুন্দর সুন্দর বাগান আছে এখানে ওখানে সেখানে।

কিন্তু ষাঁড়ও আছে। কাশী সহস্রই অসংখ্য ষাঁড়, শিবের বাহন, তোমার গলা থেকে কুলের মালা কামড়ে খেয়ে নিলেও তুমি কিছু বলতে পারবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে তাদের আরো অত্যাচার।

ষাঁড় যদি তোমায় তাড়া করে, তুমি একটা ইটও মারতে পাবে না। শুধু তোমায় ছুটতে হবে। ষাঁড়গুলো তেমনি পাজী, মানুষ-বিশেষতঃ মেয়েমানুষ দেখলেই তাড়া করবে। তুমি যদি কোনো গাছের পাশে লুকিয়ে পড়ো, সে চার ধার ঘুরে-ঘিরে তোমায় খুঁজবে আর ঠাক পাড়বে গাঁক্ গাঁক্ গাঁক্।

তারার বার-তার ফসলের ক্ষেতে নেমে যত ইচ্ছে ফসল খাবে। কেউ কিছু বলতে পাবে না।

সুতরাং পথে বেরোলেই তোমায় লক্ষ্য করতে হবে কোন্ দিকে কোন্ ষাঁড়টা ঠাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পেলেই তোমায় অস্ত্র পথ ধরতে হবে। যারা গ্রাস করে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ষাঁড় তাদের তাড়াও করে না। জ্ঞানপাপী ষাঁড়!

তবু এখানকার নির্বাক্ত জীবনযাত্রা মীরার ভালো লাগলো না। সকাল থেকে অধ্যাপকরা পড়তে চলে যান আমি কলেজ, সায়ান্স কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আয়ুর্বেদ কলেজ, কৃষি কলেজ। ছেলেমেয়েরা একটা টাঙ্গা বাসে স্কুলে চলে যায়। তখন মেয়েদের রাজহা। বাঙালী, বিহারী, গুজরাটী, সিদ্ধী, মারামী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, অসমীয়া মেয়েদের আলাপ-পরিচয়, বেড়ানো। বিকসে প্রোক্সেররা ফিরলে সেজেগুজে মেয়েদের পথে পথে বেরিয়ে পড়। দিগন্ত এখানে অব্যবহিত, স্বাধীনতা এখানে প্রচুর, কিন্তু একঘেরে। বৈচিত্র্য নেই কোনো।

বৈচিত্র্যের মধ্যে পোষ্টমাষ্টারবাবু মারা গেল ক'দিনের সেপটিক-জ্বরে। ছেলেপুলে ছিল না। দেশ থেকে ভাইয়া এসে পড়লো, জীবনে বারা খোঁজ নেয়নি। বৌদিকে নিয়ে গেল দেশে, সঙ্গে তার পঞ্চাশ হাজার টাকা। খবর এলো কে খুন ক'রে রেখে গেছে পোষ্টমাষ্টারের দ্রাক। সকলে বললো, আহা, তাই সে এখান থেকে যেতে চায় নি!

এ সব পুরোন খবর। আগের দিনের কথা! মীরা আজ চায় লাড়াই। শান্ত জীবনযাত্রা নয়। এতে আনন্দ নেই। বাহাদুরী নেই। নিজের পরিবার প্রতিপালন করতে মানুষ পনের কথা ভাবছে না, এ যেন কেমন!

হেসেকে মানুষ করছে, সে ছেলে বড়ো হ'য়ে বাপকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে অস্ত্র বাড়ীতে। সংসার চালানোর এই ত' সুখ! এই বয়সেই ও বুঝতে পেরেছে, জীবনের গতি ঠিক করে নিতে হবে ছোটবেলাতেই। কি ক'রে ঠিক ক'রে নিতে হবে? বুদ্ধিবলে। আজ সারা দেশে যে এক অসামান্য তার কারণ কি? অশিক্ষা আর কুশিক্ষা।

কোনোই শিক্ষা যে পেলো মা, সে জানলো না, ভালো কি আর দুল কি। আর যে আদল শিক্ষা পেলো না, সে বাজে হয়ে গেল। বি-এ পাশ এম-এ পাশ করেও মানুষ কেন মানুষকে ঠকানো? ঠকানো এইমতে যে তার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা। ওপরওলা

একজন আছেন যিনি পাশপাশের বিচারে শাস্তি আর শাস্তি দেন, তাঁর অস্তিত্ব এখনকার শিক্ষা স্বীকার করে না। স্বীকার না করলেও কাজ হয়ে যায়।

এ আলোচনা শুধু বুড়োদের জন্তে নয়, ছোটদের জন্তেও। তাই অহল্যাবাদি ঘাটে ভাগবত-কথা শুনতে সে বসলো মন দিয়ে। কথক ঠাকুর বলছিলেন, পৃথিবীর সকলেই স্ত্রধ চায়। বাড়ী, টাকা, জমিজমা, পোশাক-পরিচ্ছদ, গয়নাগাটি, আমোদ-প্রমোদ, সবই কিন্তু পাবার পর পুরোন হয়ে যায়। আর তাতে স্ত্রধ হয় না। তখন নতুন জিনিস খোঁজে।

যে মুখ কখনো ম্লান হয় না, সে মুখ পাওয়া যায় যিনি চির-আনন্দময়, তাঁকে পেল। তাঁকে কি করে পাওয়া যায়? ভালো কাজের মধ্য দিয়ে। ভক্তিতে।

চঞ্চলা লক্ষ্মী তাঁর বৃকে বাস করেন, তাই তাঁর নাম শ্রীনিবাস। শ্রীধর। সত্যতামা মনে করেছিলো তাঁকে পেয়েছে, তাই ওজন করা হল ঠাঁড়িপাল্লায় তুলে। রাশি রাশি অলঙ্কার, স্বর্ণমুদ্রা আর মূল্যবান বস্তু এক দিকে। আর এক দিকে শ্রীকৃষ্ণ। কিছুতেই সমান হয় না। শেষ পর্যন্ত একটি তুলসীপাতা চন্দন মাথিয়ে রাখা হল, শ্রীকৃষ্ণের পাল্লা হালকা হয়ে ওপরে উঠে গেল।

ঋষির কার কথা বলেছে? বেদে, উপনিষদে, পুরাণে কার কথা? বেদেরও আগে যে মহেশ্বোরদেবের সভ্যতা ছিল, অনেক উঁচু, তা কাদের? অনাধ্যদেব। অনাধ্যদেবের মধ্যে পড়ে কারা? বাঙালী, গুজরাটী, মারামী, মাদ্রাজী। আধ্যদেবের আগেও তারা সভ্য ছিল। তাই এদের মধ্যে আহায়ে বিহারে এত মিল। পরে এলো আধ্য। রাজপুত, শিখদের পূর্বপুরুষ। তাহ্মলিগু আর রাজা শশাঙ্ক অনাধ্যদেবের সভ্যতায় উজ্জ্বল। তন্ত্র আর কালী আর শিব নিয়ে বাঙালী প্রথম উপাসনা শুরু করেছে।

তার পর পার্শ্বসারথ শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে বাঙালীর স্নেহপ্রবণ মন নাড়ুগোপাল, গোপীজনের বসীবদন আর রাধাকে নিজস্ব ক'রে নিয়েছে। কালীপ্রদমন ক'সবধ পর্যন্ত তার। তার পর মথুরার রাজা যখন দ্বারকার গেলেন—মীরার গিরিধারী—ভজনের মধ্য দিয়ে বাঙালী তাঁকে নিয়েছে, তীর্থযাত্রায় নিয়েছে, কিন্তু বাস খুলন দোলযাত্রার শিখিপাখা মাথায় মদনমোহনের মতন নেয়নি।

সেই ভগবানের দিকে মন চালিয়ে দিতে হবে গজার স্রোতের মতন। যা কখনো থামে না।

কথকঠাকুরের এস-ব কথা ছোটদের বোঝাবার নয়। বায়না করতে লাগলো বাড়ী যাবার জন্তে। কীদন্ত লাগলো কিনে পেয়েছে বলে। মীরার বয়সী আরো কয়েকটি মেয়ে ছিলো। তারা শুনছিলো, বুঝুক না বুঝুক। বাঙালী মেয়ে ছোটবেলা থেকেই ধন্যকথা শুনতে চায়। সিনেমার মতন এর আকর্ষণ না থাকুক, তবু এই সব কথা তাদের ভালো লাগে। ব্রতকথার মতন। এপারে ঘাটে ঘাটে আলো ছলো উঠছে, ওপার ঘন অন্ধকার। নদীতে নৌকা চলেছে। ঘাটের ওপর ঘড়িতে সাতটা বাজছে। ওরা কথা শুনে যাচ্ছে। কথক বলে যাচ্ছে।

গঙ্গা সোজা সমুদ্রে যায়। যমুনা সোজা যায় না, সে গঙ্গায় এসে পড়ে যমুনার শাখানদীর, যমুনার মায়কর তাদের স্রোত পাঠায়। সেই স্রোত পাঠায় নদীর বকে পাঠায় স্বর্গ। ঋষির ঋষি ক'রে যাবে পড়ে,



তারাও বলে, আমাদের জল সাগরে পৌঁছে লাও। উজ্জী নদী বরাকের পড়েছে, বরাকের দামোদরে, দামোদর গঙ্গায়, গঙ্গা সবলের জল সমুদ্রে পৌঁছে দিচ্ছে।

ভগবানের দিকে মন এর-ওর-তার মাঝে পাঠালে হবে না, তোমাকে সোজা যেতে হবে। নিয়মে বাঁধা তাঁর রাজ্য। বিধাস রাখলে অলৌকিক ঘটনা ঘটে। বলেছেন ষাঁরা, তাঁরা মহাপুরুষ। পরমহংসদের মিথো কথা বলার লোক নন, বৃদ্ধদের নন, শ্রীচৈতন্য নন, শ্রীঅরবিন্দ নন। গীতাঞ্জলির গানগুলি মিথো নয়। বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, গান্ধী বাজে কথা বলতে আসেননি। রাজ্যরাণী মীরা বুখাই রাজ্য ছেড়ে চলে যাননি।

বুদ্ধাবনের সনাতন গোঁস্বামী সিন্ধুপুত্র, তিনি পাথরের গোঁপাল পূজা করেন। সেই গোঁপাল একদিন বলে বঙ্গলেন পায়স খাব।

সনাতন বললেন, পায়স কি করে দাব ঠাকুর? তুচ্ছ চাই, চিনি চাই, ভালো চাল চাই। মাধুকরী—মানে লিক্ক ক'রে এই কটা মোটা চাল পেয়েছি, তাই বেঁবে দিয়ে তোমায় ভোগ দিই। পায়সের বায়না আজ কোরা না। পায়স যদি খেতে চাও, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করো।

ভাত চড়াবার আগেই কোন ধনী সিন্ধে পাঠিয়ে দিলে পরমান্নের উপকরণ। এটা কি নিতান্তই গল্প?

তিনিই তাঁর ব্যবস্থা ক'রে নেন। তুমি যখন বলো, দেবোত্তর ক'রে গেলুম, ঠাকুরের নিত্যসেবা হবে, সে দেবোত্তর থাকে না। ঠাকুর অভুক্ত থাকেন। মন্দির ভেঙে যায়। কত ভাড়া শিবমন্দির সারা দেশ ছুড়ে।

কথক বলে, ঠাকুর কি বিগ্রহের মধ্যে? না। বিশ্বাসে। ভক্তিতে। দুর্গামূর্তি ভাঙতে এসে মাথা ভেঙে দেবে, কিন্তু নিজ দেবে ছলে বিসর্জন।

জগন্নাথের গোল গোল চোখে চুঁটো হাতে কি এমন রূপ ছিল যে চৈতন্যদেবের মতন মহাজ্ঞানী জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলেন? তিনি যা দেখেছিলেন, সে চোখ কি আমাদের আছে? নীলাচল পার হয়ে নীল আকাশ পার হয়ে নীলসমুদ্র পার হয়ে কি মহাপ্রভুর জগন্নাথ গ্রহে গ্রহে ছড়িয়ে পড়েন নি? কথক ঠাকুরের প্রশ্ন।

রক্তবেশীর দেশের লোক মীরাবর চোখে জল। কাশী শহর ছুড়ে মন্দিরে মন্দিরে ঘন্টা বাজতে থাকে। কথক ঠাকুর বলে চলে—আপনারা একটি ছুটি পয়সা কেউ দেন, কেউ দেন না। একজন ডাক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টার এর চেয়ে কম কথা খরচ করে অনেক বেশী বোজগার করে। তার জঙ্গে আমার ডাং নেই। ওপথে শাস্তি নেই। এপথে আছে, সেই আমার গান। ব্রাহ্মণ নিলোঁভ হবে। ব্রাহ্মণ দশ দিনে অশোচ পালন করে বলে আপনারা বলেন, নিজ স্তুতিবা দেখোছে, কিন্তু শাস্ত্রকারী যে বিধান দিয়ে গেছেন সাধারণ শ্রমিকের পাগেব প্রায়শ্চিত্তের চতুর্গুণ করতে হবে ব্রাহ্মণকে, সে বিধানে কথা বলেন না কেন? বাবু, আমার কাজ আমাকে করে যেতেই হবে। এতক্ষণ ধরে এই লোকটা যে বকবক করলো—এত চৌচালো, তার ফলে সারা বাত হরত আমার গুমই হবে না, জেগে কাটাতে হবে তবু আসছে কাল বিকেল হলেই আবার আমার শ্রীমদভাগবত নিয়ে এখানে এসে বসতে হবে। কিনে আনতে হবে নিজের পয়সার ফুলের মালা গলার পরবার জন্তে।

ইতিমধ্যে একজন ভাবের বোঝে অজ্ঞান হয়ে গেছে। বশকণ কথা চসলো, ততক্ষণ তার ভাব আর হাত-পা ছোঁড়া ছুঁড়ি। যেই কথা ধামলো অমনি সে উঠে বসলো। ধন্যধন্যন্তে তার ধৃতি সাঁট ছিঁড়ে গেছে, পকেটের পয়সা ছড়িয়ে পড়েছে। খুব জোরান লোকটা, কিন্তু বর্ধের বশকণ কখনো তার মনটা কেমন অবশ হয়ে যায়, কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে যায় কিটের মতন। কিন্তু অজ্ঞান কোনো সময়ে এমন হয় না। মীরা অবাক হয়ে যায়।

কথক ঠাকুর উঠতে সকলে পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করলো—মেয়েপুরুষ সকলে। কিন্তু কেউ পয়সা দিলো না। মীরাবর নেই তাই। থাকলে সে দশ টাকা দিয়ে বসত। এত গরীব, কিন্তু মুখে কি স্তম্ভের হাসি। কত শাস্তি এর মনে, মীরা ভাবে।

কথক ঠাকুর বলে চলে—Godless educations. ঈশ্বর-বিহীন শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের দেশের ক্ষতি করছে। বাচ্চাদের শেখাতে হবে—

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে  
রয়েছ নয়ন নয়নে।

জীবনে তোমারে খুঁজিয়া ফিরছি  
রয়েছ জীবনে জীবনে।

তাদের শেখাতে হবে—

জীব সেবা করে যেই জন,  
সেই জন পূজিছে ঈশ্বর।

ঘুম থেকে উঠে তাদের গাইতে হবে—

বিমল প্রভাতে মিশি একা সাথে  
বিধনাথে করো প্রণাম।

উদিল কনক রবি রক্তিম রাখে,  
বিতঙ্গ গাহে গান, আনন্দে জাগে,  
তুমি মানব নব অনুরাগে

পবিত্র নাম তাঁর করো যে গান।

বাঘা—জেলখাটা বাঘা। দেশ যখন স্বাধীন হয়নি, তখন তাদের ক' ভাইয়ের কল্লনা ছিল, জননী জগদ্বিমির শৃঙ্খলমোচন করতে হবে। এক চিন্তা, এক ধান।

ইংরেজ চলে যাবার আগে সে জেলে ছিল। নিতান্ত কিশোর তখন।

ইংরেজ চলে যাবার পর দেখলে দেশের যুবকদের সামনে আর কোনো লক্ষ্য নেই। আর কোনো দায় নেই। বৃকের রক্ত দেবার আর কোনো ব্রত নেই।

হিন্দি, বাংলা, ইংরেজী সিনেমা, নানা হোটেল নানাম রকম থাঙ্করা, নানা ধরণের নানা দামের ছুতো-জামা, চুলের কারদা, চামার বাহার, খেলার খবর, পয়সা ওড়ানো,—এই হল যুবকদের চর্চা। মেয়েরাও বাব গেল না। ইংরেজ চলে যাবার পর ইংরেজী শেখার আগ্রহ আর চেষ্টা ক'মে গেল, ইংরেজী পোষাক ইংরেজী কারদার মান বাড়লো।

তরুণের সাহস, তরুণের শক্তি, তরুণের তাগ, তরুণের বীরত্ব একেবারে মিলিয়ে গিয়ে রইলো শুধু ফাজলামি। তখন বাবাদের দলের হাতে অনেক অস্ত্র, হাতবোমা থেকে রিকলবার পর্যন্ত। পড়তে লাগলো ইন্ডিয়ানিং, করতে লাগলো ডাকাতি—বড় লোকের টাকা

কেড়ে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্তে—যেমন রঘুনাথ বাবু ছিলো রঘুচাঁদ।

বাগ্‌সীটোলায় ও থাকে। কিন্তু দল ওদের মছোদরিতে—চৌক পার হ'য়ে বিশ্বধরগঙ্গ পার হ'য়ে রাজঘাটের পথে মছোদরিতে।

ও বলে জীবনের মহিমা হল লড়াইয়ের মধ্যে। বিনিময়ের মধ্যে আরাম-কেন্দ্রার শুয়ে নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে নয়। মাথার ওপর জৈঠের কড়া বোদ, আবাড়ের প্রবল বৃষ্টি ব'য়ে পড়ুক, বড় আয়ুক, তুফান উঠুক, ফিরব না, যখন যাত্রা হল সুরু।

অভাব না হ'লে যিনি অভাব গুরুণ করেন, তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না। বিপদ না এলে যিনি বিপদমোচন, তাঁকে চেনা যায় না। দীন না হ'লে দীনবন্ধকে বোঝা যায় না। হতভাগ্য যে, সে কখন অভাব হবে সেই দুর্ভাবনার কখনো আরাম করতে পারলো না, ঈশ্বরের বিশ্বাস আনতে পারলো না, মানুষের খোশামোদ ক'রে, অসাধু পথ ধ'রে অজ্ঞার ক'রে শুধু টাকা বোজগারের প্রাণপাত চেষ্টা ক'রে পাপের বোঝা দুঃখের বোঝাই বাড়ালো, মা নয়, বাপ নয়, ভাই নয়, বন্ধু নয়, প্রতিবেশী নয়, আত্মীয় নয়, পর নয়—কান্নার জন্তেই মাথা ঘামালো না—সে শুধু স্তম্ভ থেকে, আনন্দ থেকে, শান্তি থেকে, তৃপ্তি থেকে দূর থেকে দূরে যেতে লাগলো। সে যেদিন পৃথিবী থেকে সরে গেল, কান্নার কোনো ক্ষতি হল না। কেউ তাকে মনে রাখলো না। এই রকম লোকই হাজার হাজার কোটি কোটি। তাদের মধ্যেও রঘুচাঁদ মনে রাখবার মতন রঘুনাথ বাবু, দুঃখীর দুঃখে যার মন কাঁদত, অত্যাচারীর অহঙ্কার যে চূর্ণ করবার ক্ষমতা রাখত।

বাখার এই সব কথা মীরা শুধু শুনত না, গিলত। তার মনে হত, সত্যি, কত জজ ব্যাবিষ্টার রাজাপাল ক্রোড়পতি ত এলো গেলো, কে বা তাদের গ্রাহ্য করলো? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আশানন্দ ঢেঁকি—যিনি ঢেঁকি দিয়ে ডাকাত মেরেছেন ব'লে সম্মানের উপাধি পেয়েছিলেন ঢেঁকি, তাঁর কথা শুধু শাস্তিপুত্র গুপ্তিগাড়া কেন, সারা বাংলার লোক আজো মনে করে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে। কবিরাজ বলেছেন আশানন্দকে আধপেটা খেঁ খেতে, সকাল ন'টার মধ্যে—সদ্ধিভাব হয়েছে যখন। বিকল ওঠের সময়ে ঐ পথে যেতে কবিরাজের নজরে পড়লো, একজন খেঁ ভেজে ভেজে মিছে, আশানন্দ দুখে ধলে যাচ্ছেন। কবিরাজ বললেন, এ কি মশাই, সকাল ন'টার বে খেতে বলে গেছি।

সকাল ন'টার ত বসেছি। কিন্তু আধপেটা যে কিছুতেই হচ্ছে না!

বাখা বলে, জানো মীরা, সব জানতে হবে, পৃথিবীতে যা জানবার আছে। বিজ্ঞানের যত কথা, দর্শনের যত কথা। পাশ ক'রে পণ্ডিত হয় না, অজ্ঞান এই প'ড়ে আর জানে আর অভিজ্ঞতার মান্ত্য বড়ো পণ্ডিত হয়। তার প্রমাণ শব্দচন্দ্র। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ। প্রমাণ ক্রীতদাস ঈশপ, যার গল্প কথামালা। বন্ধিমচন্দ্রের মতন কি-এ পাশ ত দেশভরা, কিন্তু বন্ধ মাতরম্ কে বলতে পারলো? মাইকেলের মতন ব্যাবিষ্টারের কি অভাব আছে? কিন্তু মেঘনাদবধ তারা শোনাতে পেরেছে? আমরা আদার ব্যাপারী। কিন্তু জাহাজের খবরেও আমাদের দরকার আছে। একটা জাহাজ, তৈরী করতে কত ইশপাত দরকার হয় জানো?

কত? মীরা বলে।

চার হাজার টন। সাতাশ মণে এক টন মনে রেখো। ঐ ইশপাতে তিনশো মালগাড়ী হ'য়ে যায়। আট লক্ষ পেরেক গজাল আর খিল চাই। দোতলা বাড়ীর মতন উঁচু একটা জাহাজ পাঁচ ছ' মাইল লম্বা ইলেকট্রিক তার লাগে। মাল যা ধরে একটা জাহাজে, তা পাঁচশো মাল গাড়ীর মাল। যে কল চালায় জাহাজকে, তা রেলের ছ'টা ইঞ্জিনের সমান। যা তৈরী করতে হাজার হাজার শ্রমিক আর লক্ষ লক্ষ টাকা লাগে, যার নৌবিভাগের কণ্ঠচাঁচী আমদানী করতে হয়, দুর্লভ স্বাস্থ্য আর কঠিন পরীকার পর—তা ধ্বংস হয়ে যায় একটি টর্পেডোর বায়ে—আশ্চর্য্য মনে হয় না? সেই টর্পেডো আসে ডুবোজাহাজ থেকে। সেই ডুবোজাহাজে জলের তলায় কোথায় আছে যন্ত্রে ধরা পড়বে। মাথা ঘামিয়ে এত আবিষ্কার যখন ইলগু আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী, রাশিয়া জাপান করেছে, তখন আমরা ভালো ইংরেজী বলতে শিখে বেশ মাইনের কাজ করাকেই জীবনের সার ব'লে বুঝেছি, আর এখন তা ছাড়া কিছু ভাবতে পারছি না, তাই আমার ভারতবর্ষ আজ অনেক অনেক পচাতে। আড়াই হাজার মাইল লম্বা ভারত উপকূল। তেরো শতাব্দীতে তাহ্মলিপ্ত বন্দর থেকে আমরা জাহাজ ছেড়েছি সে রকম জাহাজ ইংরেজও তখন তৈরী করতে পারেনি। আজকের তরুণরা দলে দলে সমুদ্র রক্ষার যাচ্ছে না দ্বাবে আড্ডা মারছে।

মীরা বলে, কি করা যাবে বাবালা? পথ তো খোঁ নেই!

পথ খোঁলা থাকে না। পথ ক'রে নিতে হয়। স্ববিদের আশ্রা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা যেত জীবনকে তৈরী করবার জন্তে। সেইখ থেকে শিখত আয়ুর্বেদ, লতাপাতার গুণাগুণ, মকরদ্বন্দ্ব, চাবনপ্রা তৈরী। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা যেত ধর্মবিজ্ঞা শাস্ত্রবিজ্ঞা শিখা গুরুর আশ্রমে। পথ তারা ক'রে নিয়েছিলো। সেদিন কার জাহাজ তৈরী করে দেশে দেশে পাড়ি দিয়েছে, পাহাড়ে পাহাড়ে করেছে, গুহার গুহার ছবি এঁকেছে, আকাশছোঁয়া মন্দির করে সমুদ্র থেকে শাঁখ এনে তুলসীতলায় বাজিয়েছে, কাবুল থেকে জাকির এনে পোলাও রেখে খেয়েছে।

আর আজ? বাস-ট্রামের পা-দানীতে কোনো রকমে একটা চুকিয়ে গিয়ে ঝুলতে ঝুলতে অকিস চলেছে। এক পা হাঁট পাবে না। পাথের না দিয়ে পথ পার হবার বিস্তেটা বেশ শিখে তাই না?

কচুরিগিলির কচুরি, ঠাঠেরিবাঝারের বাসন, বিশ্বনাথের গা মালাই, দশাখমেঘের গোল গোল ছাতা, সন্ধ্যার আরতি, মানুষ ভিড়—কাশী নিত্যনতুন। পাড়ে হাউলি, চুঁচি চৌকি, মদনপুর পাড়ার নাথগুপ্তিও নতুন নতুন। ভুগুসহিত্যের গণনা, কালভৈ ডোর, বীরেশ্বরের পোরধরা, সন্ধ্যার পুজো—বৃদ্ধদের এখানে কত কা বাড়ী ছেড়ে স্বাশীতে চলে আসা মানে সংসারই তাগ ক মণিকর্ণকান্ন শেষ কাজ হ'য়ে গেলে বেন নিশ্চিন্দ। কাশী করতে এসেছে যে সব প্রবীণারা তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে ম ভারী ভালো লাগে। ওরা বিশ্বনাথের পায়ে চলে এসেছে। 'আর মীরা নেই।'

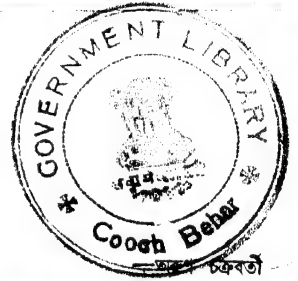
# আলোকচিত্র

... এ সময়ের প্রচলন ...

সময়ানুসারে একটি যেতপ্রস্তুত-মুদ্রিত আলোকচিত্র মুদ্রিত  
হয়। মুদ্রিত নাম 'পুরুষ ও প্রকৃতি'। আলোকচিত্রটি  
কনক দত্ত গৃহীত।

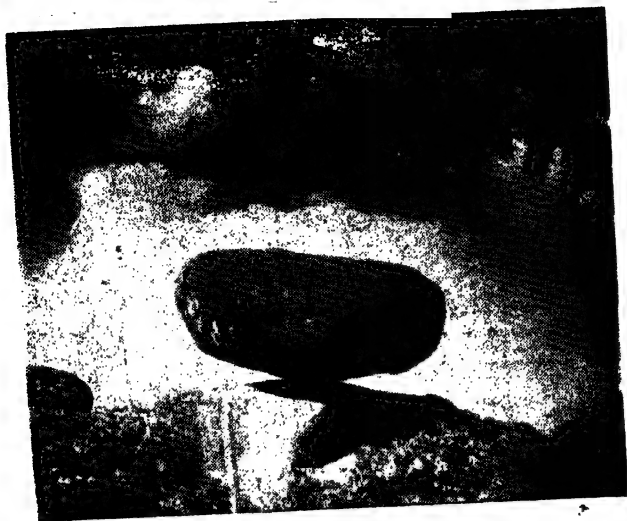
সাজঘর

—বাসন্তী ঘোষ



দ্বি-মুদ্রিত (পাটনা)





ব্যালাল

—দেবপ্রিয় দে

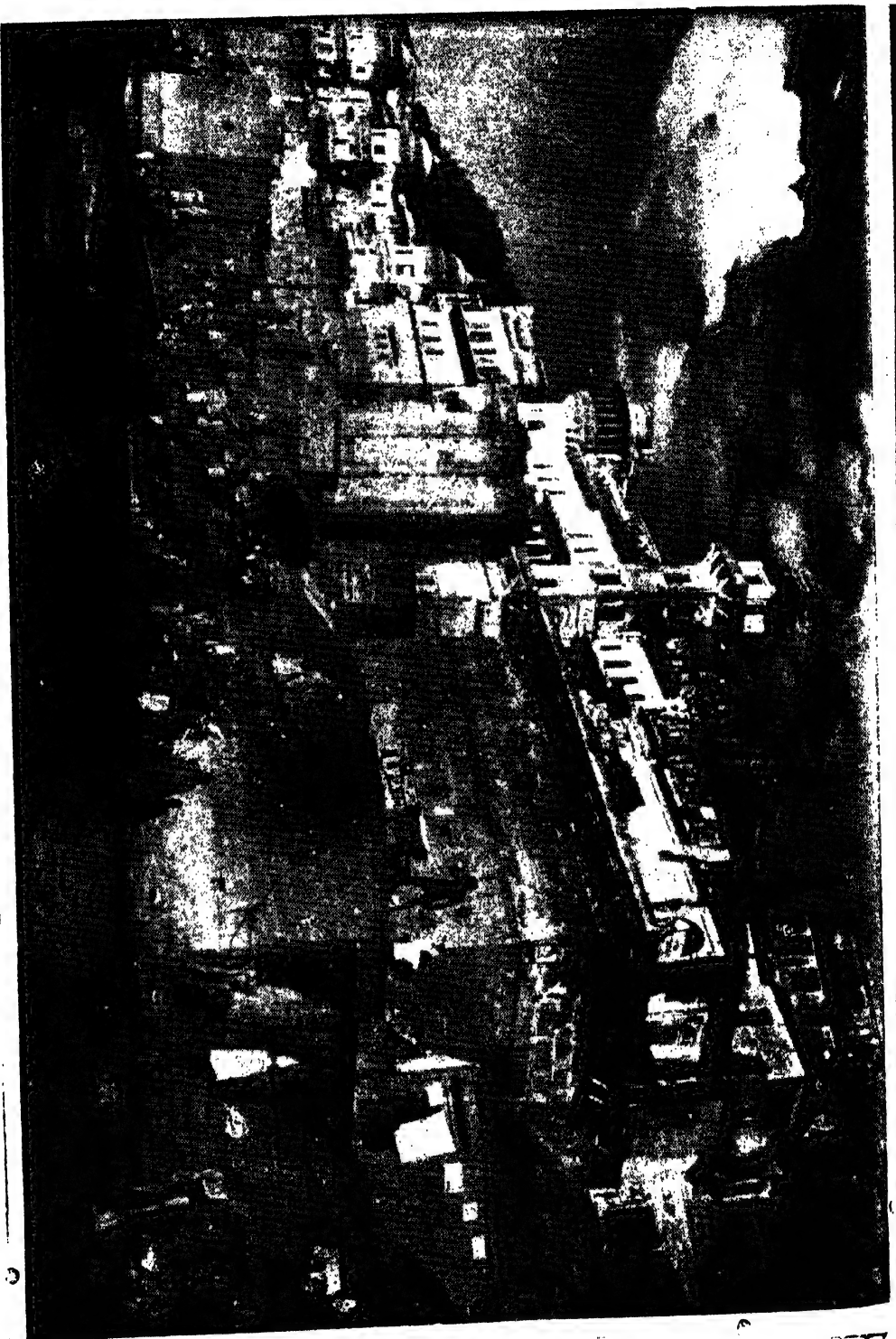
দারুণ অগ্নিবাণে

—সুকমল ভট্টাচার্য





শ্রীবিষ্ণুমূর্তি (গৌড়, মালদহ)



কল্লির ঘাট

—দীপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বালা দেশের, মহারাষ্ট্রের, মাজাজের, গুজরাটের কোন দূর দূর গ্রাম থেকে বিধবারা করে এখানে চলে এসেছে, কাকর টাকা আসে, কাকর আসে না, কাকর ছেলে পাঠায়, কাকর পাঠায় না, অল্পপূর্ণার রাজ্যে অভাব কাকরই হয় না। শিবের ত্রিশুলের ওপর যে বাগানসী, তা হাজার হাজার বছর ধরে পুণ্যলোকী মানুষের মনে শেখ শাস্তি বলিয়ে এসেছে।

কিন্তু মারা এখানে থাকতে আসেনি। সমুদ্রকূলে তার জন্ম, নরুদ্রতীরে সে মানুষ, সমুদ্রের মতনই চকল। অনেক দিন এক জায়গার থাকবার মেয়ে সে নয়।

কাঁথির পিসিমাকে বললে, দিদা, এবার কোথায় যাবেন?

তুই কি ফিরে যাবি তাদের কাছে? যারা আর তোকে চায় না, তুই মুখ ঘুটে সে কথা বলতে পারছ না?

আমার লরেটোর পড়া যে শেষ হয়নি। সেটা কি ওরা শেষ করতে দেবে না? যদি ওরা আমার চলে যেতেই বলে, তাহলে আমি ফের, আমার ফুলের পড়াটা শেষ করতে দাও। মাঝপথে আমি যি অগাধ জলে পড়ে যাব। একথা আমার শুনবে না, এত নিষ্ঠুর কি ওরা হবে?

পিসিমা বলেন, কি জানি বাবু! ওদের মন ওরাই জানে।

মারা বলে, জানেন দিদা, আপনাদের সঙ্গে কাশীতে এসে বাবালা'কে দেখে আমার এই লাভ হল যে, গরীব হ'য়ে যাবার ভয় আর রইলো না, কথায় যে বলে, জীবনের বণফতের তার দেখা পেলাম। আমি এবার লড়াই করব। আমি ভয় আর করব না। ভয় মানেই পাগ, এগন বুঝেছি। [ক্রমশঃ]

## জলকণা

### হাল খ্রিস্চিয়ান হাওয়ারসন

বিশাল বড়ো সমুদ্রের মধ্যে অনেক, অনেক দূরে—জল যেখানে অপরাধিতার মতো, নীল আর হৃদয়ের মতো স্বচ্ছ, এখানটা এতোই গভীর যে, হাজারটি গেটের উঁচু গম্বুজ পর পর দাজাগে<sup>১</sup>তবে উপর থেকে একেবারে তলায় গিয়ে ঢেকে,—সেখানে

■ সাগর-রাজ্যের দেশ।

তোমরা বুঝি ভেবেছিলে, জলের নিচে বালি ছাড়া কিছু নেই? তা নয়, মোটেই তা নয়। অপরূপ স্নানর সেখানকার গাছপালা, এতো হালকা তার ডালপালা যে, জল একটু কঁপে উঠলো কি তারা নেচে উঠলো খিরখিরিয়ে—আচমকা দেখলে তাদের জীবন্তই মনে হয়। ডালের কাঁক দিয়ে দিয়ে কতো বকমের ছোটো-বড়ো মাছ ছুটোছুটি করে বেড়ায়—ঠিক যেমন আমাদের গাছে গাছে গুড়ে পাখির কাঁক।

জল যেখানে সবচেয়ে গভীর, সেখানে সাগর-রাজ্যের প্রাসাদ। দেয়ালগুলো তার প্রবালের, উঁচু জানলাগুলো পরান্না-দানো, আর শব্দের কাজকরা ডেউ খেলানো ছাণ, ডেউয়ের দোলায় দোলায় এই ফুলে, এই বৃক্ষে। কী যে স্নানর লাগে দেখতে, প্রতিটি শব্দের বুক বকমকে উজ্জল একটি মুক্তো, তার যে কোনো একটি পেলে উপরকার দেশের যে কোনো রাজা ধন হ'য়ে যায়!

সাগর-রাজ্যের দ্বী মারা গেছেন অনেক দিন; তাঁর বড়ি মা

সাগর-সমাজে তাঁরাই যে সবচেয়ে বড়ো ঘর, এ নিয়ে বেজায় দেমাক তাঁর। তাঁর লেজের কি না বাবোটা খিচুক বসানো, সেইটেই বড়ো ঘরের মার্কী—অন্ধদের বড়ো জোর ছটা। এ ছাড়া তাঁর আর সবই ভালো, সবার মুখেই তাঁর স্মরণাতি। রাজ্যের ছয় মেয়ে, ছটি ফুটফুটে ছোটো রাজকন্যা; বড়ি তাঁর নাতনীদের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন। সবাই তারা স্নানর, সবচেয়ে স্নানর হ'লো একেবারে ছোটোটি। তার গায়ের রঙ গোলাপের পাণড়ির মতো নরম, সমুদ্রের মতোই নীল তার চোখ; অবশি অন্ধ সব জলকণার মতো তারও পা নেই, পায়ের দিকটায় মাছের মতো লম্বা ল্যাঙ্গ—তা কী কোমল আর কতো উজ্জল!

সমস্ত দিন মেয়েরা প্রাসাদের বড়ো বড়ো ঘরে খেলা করে; সেখানে চার দিকের দেয়ালে ফোটে নানা রঙের হরেক রকম স্নানর ফুল। পান্নার জানালাগুলি একটু খুললো কি মাছেরা নীতরে এলো ঘরে, যেমন আমাদের জানলা দিয়ে চড়ুই পাখি উড়ে আসে। কিন্তু মাছদের সাহস চড়ুইপাখির চেয়ে অনেক বেশি; তারা সোজা রাজকন্যার কাছে এসে গা বেঁধে খেলা করে, পায় তাদের হাত থেকে, আলর করলে আর যেতেই চায় না, গায়ের সঙ্গে লেগে ঘুরে বেড়ায়।

প্রাসাদের সমুখে মস্ত বাগান ভেঁরে গাছের সারি, কোনোটা আগুনের মতো লাল, কোনোটা মেঘের মতো গাঢ়-নীল; গাছের ফল সোনালি রঙে বলোমনো; অলঙ্কালে সূর্যের মতো উজ্জল গাছের ফুল। আমাদের বাগান হয় মাটিতে; ওদের লগান বালিতে, উজ্জল নীল রঙের বালি, গরুর-অলো আগুনের মতো নীল। সমস্তটার উপর অদৃষ্ট স্নানর একটা নীল রঙের ছোপ; সেখানে গেলে মনে হবে যেন অনেক উঁচুতে উঠি গেছি, আকাশ মাথার উপরে, আকাশ পায়ের নিচে—সমুদ্রের তলায় যে আছি তা মনেই হবে না। জল যখন শান্ত, তখন সূর্য তাকিয়ে থাকে যেন বেঙনি রঙের একটা প্রকাণ্ড ফুল; তার ভরা পেয়াদা থেকে পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন উল্টে পড়ছে।

বাগানের একেক অংশ একেক রাজকন্যার দখলে; সেখানে তারা যার যা খুশি করে। এক জন তার বাগান সাজিয়েছে তিমির চোরা ক'রে; আরেক জনেরটা ঠিক জলকণার মতো; কিন্তু সবচেয়ে ছোটো কন্যার যেটা সেটা একেবারে সূর্যের মতো গোল; আর সূর্যটা তার চোখে কি না লাল দেখাতো—সেই জন্তে তার ফুলগুলোও সব টকটকে লাল রঙের; এই মেয়েটি কিছুটা অদৃষ্ট গোছের, ভারি চুপচাপ, একা ব'সে ব'সে কী যেন ভাবে। হয়তো এক দিন উপরে এক জাহাজ ডুবছে; তাঁর নানারকম রঙের স্নানর জিনিস নিয়ে যেতেছে তার বোনরা; কিন্তু শিশু-কোলে-করা শেত পাখরের একটি বালকমূর্তি ছাড়া এই মেয়ে আর কিছু চায় না। মৃতিটি নিয়ে সে তার বাগানে রাখলো; রোপণ করলে তার পাশে একটি লাল ফুলের গাছ। গাছটি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠলো, তার লম্বা ডাল হয়ে পড়লো মাটির উপর—সেখানে চিব-চকল বেঙনি রঙের ছায়ার যেন ডালে মূলে জড়াঁজড়ি।

এই জলকন্যা সবচেয়ে ভালোবাসতো মানুষদের কথা শুনতে, সমুদ্রের উপরে বাদের দেশ। ঠাকুমাকে খুঁচিরে খুঁচিয়ে সব গল্প শুনতো সে; জাহাজের আর মানুষের আর ডাক্তার প্রাণীর মতো গল্প তিনি আসছেন সব। ওখানকার ফুল নাকি গন্ধ আছে,



কী ভালো লাগতো তার একথা শুনে, তাদের সমুদ্রে ফুলগুলো তো। সব গন্ধহীন, ওখানকার বনের রঙ সবুজ, আর তার ডালপালার মাছ যতো ছুটে ছুটে বেড়ায়, সব নানা রঙের, আর কী মিষ্ট গলায় গান করে তারা ! ঠাকুরার মনে অবশিষ্ট ছিলো পাখিদের কথা, কিন্তু বলবার সময় মাছই বলেছিলেন : নাভনীরা তো আর কখনো পাখি জ্বাখেনি, বললে কি কিছু বুঝতো তারা ?

গল্প শেষ ক'রে ঠাকুরা বলতেন : তোমাদের যখন পনেরো বছর বয়স হবে তখন তোমরা উঠতে পারবে সমুদ্রের উপরে ; পাছাড়ের কাঁকে বসে চাঁদের আলোয়, দেখবে জাহাজ যাচ্ছে, বুঝবে ক'কে বলে শব্দ, আর ক'কে বলে মানুষ ।

পরের বছর সবচেয়ে বড়োটির বয়স পনেরো বছর হ'লো। অজ্ঞ সব বোনদর—আজা চোরাবীরা ! মেজোটি বড়োটির এক বছরের ছোটো, সেজোটি মেজোর ছোটো এক বছরের ; এমনি ক'রে-ক'রে সবচেয়ে ছোটোটির কপালে আরো পাঁচ-পাঁচ বছর ব'সে থাকা ! পাঁচ বছর পরে আসবে সেই শুভদিন, সে-ও উঠতে পারবে সমুদ্রের উপরে, দেখতে পারবে উপরকার পৃথিবীর সব কাণ্ড। যা-ই হোক, বড়োটির যখন বাবার সময় হ'লো, সে কথা দিলে, ফিরে এসে বোনদের কাছে সব গল্প বলবে ; বড়ো ঠাকুরা বিশেষ কিছু বলতেই পারেন না, আর তারা যে কতো জানতে চায় তার তো কোনো ইয়তাই নেই !

কিন্তু ছেলেরদের এই বাধা থেকে ছাড়া পাবার আগ্রহ সবচেয়ে ছোটোটির মতো। আর কালুগই তেমন তীব্র ছিলো না। সবচেয়ে বেশি দেরি তারই—আর চূপচাপ একা বসে কী ভাবে সে ! কতো রাত খোলা-জানলা দিয়ে বন্ধ নীল জলের দিকে সে তাকিয়ে থেকেছে, চাব দিকে নাছেরা ছুটোছুটি ক'রে খেলা করছে ; দেখেছে সে সূর্য আর চাঁদ, রান তারার আলো, উপরে কেমন দেখায়, তার চেয়ে হয়তো অনেকটা বড়ো, অনেকটা উজ্জ্বল। যদি হঠাৎ কালোছায়া পড়েছে—একটা তিমি বৃষি, না কি মানুষের বোকাই একটা জাহাজ ভেসে চ'লে গেলো। সে-সব মানুষ স্বপ্নেও ভাবলে না যে তাদের অনেক, অনেক নিচে ছোটো এক জনকণা জাহাজের হালের দিকে ফাকুল আগ্রহ দিয়েছে লম্বা হাত দুটো বাড়িয়ে।

তার পর সেই দিন এলো, যার কথা বলছিলুম, বড়ো মেয়েটির বয়স হ'লো পনেরো, উঠলো সে সমুদ্রের উপরে।

ওঃ, ফিরে এসে তার সে কী হাজার গল্প। সবচেয়ে ভালো লেগেছে তার চাঁদের আলোয় বাতির উপর বসে মস্ত শহরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে, সেখানে তারার মতো ঝিকঝিক কতো আলো আর কতো গান-বাজনা। দূর থেকে সে শুনেছে মানুষের আর গাড়ির আওয়াজ, দেখেছে গির্জার উঁচু গম্বুজ, শুনেছে ঘণ্টার শব্দ, আর ওখানে যেতে পারবে না ব'লেই ও-সব জিনিষের জন্তো তার আরো বেশি মন-কেমন করছে।

এ-সব গল্প শুনে শুনে ছোটোটির নিশ্বাস পড়ে না। এর পর হায়ে তার খোলা জানলার যখন সে দাঁড়ায়, জলের ভিতর দিয়ে উপরে তাকিয়ে সে সেই বিরাট শহর শহরের কথা ভাবতে ভাবতে এমন তন্দ্রা হয়ে যায় যে, তার মনে হয়, সে বৃষি গির্জার ঘণ্টার শব্দ

উঠলো সমুদ্রের উপর, সূর্য তখন অস্ত যায়-যায়, আর তা দে এতো ভালো লাগলো তার যে, সে ফিরে এসে বললে, জলের ওপরে যা-কিছু তার চোখে পড়েছে, এতো সন্দর আর কিছুই নয়।

—সমস্ত আকাশ একেবারে সোনার সোনা, সে ফিরে এবে বললে।—আর মেঘগুলো কী যে নন্দর তা আমি ব'লে দেখাতে পারবো না—এই লাল, এই বেগুনি, এই কাজল-কালো, ভেদে মিলিয়ে গেলো আমার মাঝার উপর দিয়ে। কিন্তু আরো তাড়াহাড়ি উড়ে এলো জলের উপর দিয়ে এক-ক'ক কপোলি রাজহাঁস, টিক সেখানে সূর্য নেমে গসেছে। আমি তাকিয়ে বইলুম তাদের দিকে, সূর্য অস্ত গেলো ; সমুদ্রের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে আর মেঘের ধাব-ধাবে যে গোলাপি আভা, তা-ও গেলো আন্তে-আন্তে মিলিয়ে।

তৃতীয় বোনব ওপরে বাবার সময় হ'লো। সব চেয়ে বেশি সাহস তারই, সে চললো এক নদীর স্রোত ধ'রে ধ'রে। নদীর দু-ধারে ছোটো-ছোটো সবুজ পাছাড় ; সেখানে গাছ-পালা, সেখানে আত্মবিক্ষেপ, কাঁকে-কাঁকে ঘর, বাড়ি, প্রাসাদ। সে শুনলো পাখির গান ; আর সূর্যের তাপে তার মূণ প্রায় পুড়ে যাবার মতো হ'লো, থেকে-থেকে তাই সে জলে ডুব দিয়ে নিলে। এক জায়গায় একদল ছেলেমেয়ে লাকালাকি ক'রে স্নান করছে ; তার খব ইচ্ছে হ'লো ওদের সঙ্গে গিয়ে খেলে, কিন্তু ওরা তাকে দেখেই ছুটে পালালো বিমম ভয় পেয়ে, আর ছোটো কালো একটা জানোয়ার তাকে দেখে এমন ঘেউ-ঘেউ করতে লাগলো যে অগত্যা সে-ও ভা পেয়ে ফিরে এলো সমুদ্রে। তবু সে ভুলতে পারে না সেই সবুজ বন, আর ঘন-নীল পাছাড় ; আর ফটফুটে ছেলেমেয়েগুলোর বা কী, পাখনা নেই, তবু কেমন নির্ভয়ে নদীতে সাঁতার বেড়ায় !

চতুর্থ বোনটির অতো সাহস হ'লো না, সে খোলা সমুদ্রে রইলো, ফিরে এসে বললে, অতো সন্দর আর কিছুই হ'তে পারে না শাদা পাল-তোলা জাহাজ দূর দিয়ে ভেসে গেছে, এতো দূরে মনে হচ্ছে যেন একক'ক গাছচির ; জলে খেলা করছে ফুটিব শুত্তকের দল ; বিরাট তিমি এক নিশ্বাসে হাজারটা ফোয়ারা ও দিয়েছে আকাশে।

পরের বছর পঞ্চম বোনটির পনেরো বছর হ'লো। জন্মদিন পড়লো শীতকালে ; সমুদ্রের তখন সবুজ রঙ, প্রায় সব বরফের পাছাড় জলে ভাসছে। সে বললে, সে' মুক্তোর মতো শাদা দেখতে—অবশিষ্ট মানুষের দেশের গির্জাও চেয়ে চেয়ে বেশি বড়ো। এরই এক পাছাড়ের চূড়ায় বসে সে বা তার চুল দিলে খুলে, জাহাজগুলো তাড়াহাড়ি পাল তুলে যতো শীগগির পারলো ছুটে পালালো ;

সন্ধ্যাবেলার সমস্ত আকাশটা পালে-পালে ভ'রে গেলো ; বিরাট পাছাড়গুলো এই উঠছে, এই ডুবছে, নীল-লালটে আভায় উঠছে ঝিকঝিকিয়ে ; আর মেঘ ছিঁড়ে বিছাৎ উঠলো, গুমগুম ক'রে গড়িয়ে চললো বাজের আওয়াজ ; তক্ষুশি নামানো হ'লো সব জাহাজের পাল, সবাই সেখান জড়োসড়ো ; শুধু রাজকন্যা চূপচাপ ব'সে শান্ত চোখে থাকলো বাকচোরা বিছাতের দিক।

—একমুঠি প্রথম-বার উঠে নামা রকম নতুন-নতুন



দেখে গেলো মুখ হ'য়ে, কিন্তু সেনতুনের মোহ শীগগিরই কেটে গেলো, কিছু দিনের মধ্যেই উপরের পৃথিবীর চাইতে নিজের বাড়িই তাদের ভালো লাগতে আরম্ভ করলো : আর কোথাও কি সব-কিছু এমন মনের মতো পাওয়া যায় ?

প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ বোন হাতে হাতে রেখে গভীর জল থেকে উঠে আসতো। অপরূপ তাদের কণ্ঠস্বর, এমন কোনো মানুষের হয় না। বড়ের আগে-আগে জাহাজের সামনে দিয়ে তারা যেতো দাঁড়—গান গাইতো মধুর স্বরে। সে গান যেন বলতো,—জলের নিচে আমাদের কী যে আনন্দ তা কি দেখে না ? ওগো নাবিক, ভয় করো না ; এসো, নিচে নেমে এসো আমাদের কাছে।

নাবিকরা অবশ্য সে-কথা বুঝতে পারতো না ; তারা ভাবতো, এ-শব্দ শুধি শুধু জলের শব্দ ; এমন কি করে তারা সমুদ্রের লুকানো ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আসতো : কেন-না, জাহাজ ডুবলে সবাই তো মরবে, আর মৃত মানুষ ছাড়া সাগর-রাজের প্রাসাদে কেউ কখনো ঢোকেনি।

পাঁচ বোন যখন সন্ধ্যাবেলায় সাঁতরে বেড়াচ্ছে, ছোটোটি ব'লে আছে তার বাবার প্রাসাদে, একা শুক হ'য়ে মুখ উঁচু ক'রে তাকিয়ে। কাদতে ইচ্ছে করে তার, কিন্তু জলকক্কা তো কাদতে পারে না ! সে জল যখন তাদের মন-খারাপ হয়, মানুষের মেয়েদের চাইতে কতো বেশি যে কষ্ট পায় তারা, তার অন্ত নেই !

দীর্ঘাঙ্গ ফেলে সে ভাবে,—কবে হবে আমার পনেরো বছর ! আমি ঠিক জানি, উপরের পৃথিবী আর সেখানকার মানুষদের ভালো খুবই লাগবে আমার। শেষ পর্যন্ত এতো আশার সেই হয় এসো।

ঠাকুমা বললেন, নে, এবার তোব পালা। আয়, তোকে ১৫ বোনদের মতো ক'রে সাজিয়ে দিই,—বলে তিনি তার চুলে রাসন শাদা শাপকার মালা, আধখানা মুক্তা দিয়ে তৈরি তার বকটা পাগড়ি ; তার পর আটটা বড়ো-বড়ো কিছুককে লকুম জেন তার লাজের সঙ্গে লাগতে—তাতে বোকা যাবে সে কতো প্রায়ের মেয়ে।

বড়ো অন্তরিতে লাগে এতে,—ছোটো রাজকক্কা আপত্তি করলে। শুক্ল দেখাতে হ'লে এক-আধটু অন্তরিতে গারে না মাখলে র না,—হেসে বললেন ঠাকুমা।

এতো জাঁক-জমক কিন্তু রাজকক্কার মোটেই পছন্দ হ'লো না ; যার ভার মুকুটটা ব্রহ্মলে তার বাগানের লাল ফুল পরতে পারলে যদি হতো, তাতে তাকে মানাতোও ঢের ভালো। কিন্তু সে হয় পেলো না ; ঠাকুমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমুদ্রের উপর সে উঠলো সে, ফেনার মতো পাতলা।

যখন জলের উপর জীবনে প্রথম সে দেখা দিলে, সূর্য ঠিক হয়ে নেমে গেছে। মেঘেরা বলছে লাল-সোনালি আলোর, যাঁরা ফুটেছে আকাশের পশ্চিমে, বিরাটের হাওয়া বইছে, সমুদ্রটা মস্ত একটা আয়নার মতো নিশ্চল পড়ে। তিনটে মতোলা এক জাহাজ ঠাণ্ডা জলের উপর চূপ ক'রে শুয়ে ; একটি ঠাণ্ডা তুলে দেওয়া, সেটাও কিন্তু নড়ছে না, হাওয়ার বেশি জোর। নাবিকেরা সিঁড়িতে চূপচাপ ব'সে। ডেক থেকে আসছে পাছনার শব্দ। তার পর অন্ধকার হ'লো, হঠাৎ একসঙ্গে উঠে আসে হ'লে উঠলো জাহাজে, উড়লো অগুস্তি নিশেন।

ছোটো জলকক্কা কাঁপুনের ঘরের কাছে গেলো সাঁতরে। জাহাজটা জলের দোলানির সঙ্গে-সঙ্গে আঙে ওঠা-নামা করছে ; এক বার সে উঁকি মেয়ে কাচের জানলা দিয়ে তাকালো। ভিতরে অনেক জমকালো পোশাক-পরা মানুষ ; তাদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর এক রাজপুত্র। খুব অল্প বয়স তার, বড়ো জোর বোল-সত্তরে ; বড়ো-বড়ো কালো তার চোখ। তারই জন্মদিনের উৎসব আজ। নাবিকেরা ডেকের উপর নাটছে, আর রাজপুত্র তাদের সামনে বেরিয়ে আসতেই একশো হাউই লাক্ষিয়ে উঠলো আকাশে, রাত হ'য়ে গেলো দিন। জলকক্কা তাতে এতোই ভয় পেলে যে খানিকক্ষণ সে চূপ ক'রে রইলো জলে ডুবে।

আবার যখন সে তার ছোটো মাথাটি তুললো, তার মনে হ'লো যেন আকাশের সব তারা তার গায়ের উপর ক'রে পড়ছে। এমন অগ্নিবর্ণ আর কখনো সে দেখে নি ; সে কখনো শোনেও নি এমন অশ্রুযুগ্ম ক্রমতা মানুষের আছে ! তাকে ঘিরে ঘুরছে যেন বড়ো-বড়ো সূর্য, হাওয়ার সাঁতরে বেড়াচ্ছে জলজলে মাছ, আর সমুদ্রের শান্ত জলে পড়ছে তার পরিষ্কার ছায়া। জাহাজে এতো আলো যে সব স্পষ্ট দেখা যায়। কী সুখী এই রাজপুত্র, কী সুখী ! সে নাবিকদের অভিমুদন গ্রহণ করলো, 'একটু হাসি-ঠাট্টা করলো তাদের সঙ্গে, এদিকে গানের মধুর সুরগুলো রাত্রির দীর্ঘবতার গেলো মিলিয়ে।

রাত বাড়লো ; কিন্তু এই জাহাজ আর এই সুন্দর রাজপুত্রকে ছেড়ে সে যেন কিছুতেই নড়তে পারছে না। ডেউয়ের দোলা-লাপা কেবিনের ফুটো দিয়ে সে তাকিয়েই রইলো। নিচে জল কেনিছে উঠছে, জাহাজ বুঝি ছাড়লো। ঐ তো তুলে দিচ্ছে পাশ, উঁচু হ'য়ে উঠছে ডেউ, হাতির শুঁড়ের মতো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলো, দূর থেকে শোনা গেলো বাজের আওয়াজ।

নাবিকেরা যেই দেখতে পেলে বড় আসছে, অমনি তারা আবার নামিয়ে দিলে পাশ। বড়ের সমুদ্রে মস্ত জাহাজটা হাঙ্গা এণ্ডেটুকু নৌকার মতো তুলছিলো ; ডেউগুলো অসম্ভব উঁচু হ'য়ে উঠে জাহাজের উপর দিয়ে গেলো গড়িয়ে—একবার সে নিচে ডুবে যায়, এক বার সে মাথা তুলে ওঠে।

এ-সব ব্যাপারে জলকক্কার অবশিষ্ট খুবই মজা লাগলো, কিন্তু নাবিকদের সবাই একেবারে ভয়ে ভেড়াসড়ো। জাহাজ গেলো ক্ষেটে, মোটা মান্ডলগুলো ডেউয়ের দাপটে পড়লো মূয়ে, জোরে জল চুকতে লাগলো। জাহাজ একটুখানি এদিক-ওদিক হুলসো, তার পর বড়ো মান্ডলটা বাঁশের কঞ্চির মতো গেলো ডেটে ; জাহাজ উন্টিয়ে গিয়ে জলে ভ'রে উঠলো। জলকক্কা এতক্ষণ নাবিকদের বিপদ বুঝতে পারলে ; কেন না, ভাঙা জাহাজের মোটা মোটা কাঁচ ডেউয়ে ডেউয়ে ভেসে পাচ্ছে তার গায়েই লাগে, সেই জন্ত তাকেও সাবধান হ'তে হ'লো।

কিন্তু ঠিক তখন একেবারে বুলকালো অন্ধকার হ'য়ে এলো, চোখ আর কিছু দেখা যায় না। একটু পরেই ভয়ঙ্কর এক বিহাতের চমকে সে সমস্তটা ভাঙা জাহাজ দেখতে পেলো। জাহাজ যেই তলিয়ে গেলো জলের নিচে, তার চোখ খুঁজলো রাজপুত্রকে। প্রথমটা সে খুঁশি হ'লো ; ভাবলে, এখন তো সে আমার বাড়িতেই আসবে। কিন্তু একটু পরেই তার মনে পড়লো যে, জলের নিচে তো মানুষ বাচে

না ; কাজে কাজেই রাজপুত্র যদি বা কখনো তার প্রাণসে ঢোকে, চুকবে মৃত মানুষ হ'য়েই।

না-নন্দা, রাজপুত্র মরবে না, মরবে না। নিজের বিপদের কথা ভুলে ভাড়াচোর টুকরোর ভিতর দিয়ে সে সাঁতরে গেলো, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলো রাজপুত্রকে। সে একেবারে তখন অবসর হ'য়ে পড়েছে, অতি কষ্টে জলের উপর রেখেছে মাথা তুলে। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে সে চোখ বুজেছিলো—নিশ্চয়ই ডুবে মরতো, যদি না ঠিক সেই মুহূর্তে জলকক্কা এসে তাকে বাঁচাতো। সে তাকে দু-হাতে জলের উপর তুলে ধরলো, শ্রোতে ভেসে চললো দু'জনে।

সকালের দিকে থামলো ঝড়, ঠাণ্ডা হ'লো সমুদ্র, কিন্তু জাহাজটার কোনো চিহ্নই পাওয়া গেলো না। সমুদ্রের ভিতর থেকে সূর্য উঠলো আশ্রনের মত, তার আলোর রাজপুত্রের গালের আভা ফিরে এলো যেন। কিন্তু চোখ তার তখনো বোজা। রাজকক্কা তার উঁচু কপালে চুমু খেলো, মুখ থেকে সরিয়ে দিলে ভিজে চুল। সে যেন তার বাগানের খেতপাথরের মূর্তির মতোই দেখতে। সে আরেক বার চুমু খেয়ে মনে মনে প্রার্থনা করলে, রাজপুত্র যেন নীল গিরি ভালো হ'য়ে ওঠে।

তার পর তার চোখে পড়লো শুকনো ডাঙা, পাহাড়গুলো বরফে চিকমিকিয়ে উঠেছে। পাড়ের ধার দিয়ে দিয়ে চলছে সবুজ বন আর বনে ঢোকবার মুখে একটা মঠ কি গির্জা—কী যে, ঠিক বোঝা-গেলো না। ঢোকবার পথটির ছ' ধারে সারি সারি খেজুর, পাশের বাগানে সেবু গাছের ভিড়। এখানে ছোটো একটি উপসাগর, জল গভীর হ'লেও শান্ত, পাহাড়ের শুকনো শক্ত বালি। এখানে ভেসে এসে লাগলো জলকক্কা মরো-মরো রাজপুত্রকে নিয়ে, মাথা উঁচু ক'রে তাকে শোয়ালো গরম বাতুতে, সূর্যের দিকে ফেরালো তার মুখ।

গির্জার ঘণ্টা বাজলো ঢং-ঢং ক'রে, একদল মেয়ে বাগানে এলো বেড়াতে। জলকক্কা তাড়াতাড়ি স'রে গিয়ে কতকগুলো পাথরের পেছনে লুকোলো, ফেনায় ঢাকলো মাথা, তাতে তার ছোটো মুগটি আর কেউ দেখতেই পেলো না। কিন্তু আড়ালে থেকে সে চোখ রাখলো রাজপুত্রেরই উপর।

একটু পরেই এক জন মেয়ে এগিয়ে এলো। রাজপুত্রকে দেখে সে যেন ভয় পেয়েই গেলো, সে মনে করলে ও মরে-গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে ছুটে গিয়ে তার বোনদের ডেকে আনলো। জলকক্কা দেখলে, রাজপুত্র তাজা হ'য়ে উঠেছে, মেয়েরা সব তার মুখের উপর মুখ নিচু ক'রে হাসছে। কিন্তু রাজপুত্র চোখ মেলে অবশি তাকে খুঁজলো না ; সে তো আর জানে না, কে তাকে বাঁচিয়েছে। আর তাকে যখন গির্জার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো, এতো মন-খারাপ লাগলো জলকক্কার যে, সে তক্ষুণি বৃণ করে জলে ডুব দিয়ে ফিরে গেলো তার বাবার প্রাণসে।

ফিরে এসে সে যেন আগের চেয়েও বেশি শান্ত, বেশি চুপচাপ হ'য়ে গেলো। বোনরা জিজ্ঞাস করলে, সে ওপরের পৃথিবীতে কী-কী দেখে এলো, কোনো জবাব দিলে না সে।

সেখানে রাজপুত্রকে রেখে এসেছিলো, সেখানে কতো সন্ধ্যায় সে গিয়ে উঠতো। সে দেখতো, পাহাড়ের বরফ গলছে, বাগানে শেক উঠেছে ফল ; কিন্তু রাজপুত্রকে কখনো দেখতো না, ভ্রান মুখে ফিরে যেতো সমুদ্রের তলায়। বাগানে বাসে রাজপুত্রের মতো দেখতে সেই পাথরের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকা হয়ে উঠলো তার একমাত্র আনন্দ। ফুলগুলোর জন্তে তার আর মমতা নেই ; বিপুল প্রচুরতায় বেড়ে উঠে তার সিঁড়িগুলো ছেয়ে ফেললো, তাদের লম্বা লম্বা পাতাগুলো গাছের ডালে ডালে এমন করে জড়িয়ে ফেললে যে, সমস্ত বাগান যেন একটি কুঞ্জবন হ'য়ে গেলো।

তার পর সে তার মনের দুঃখ চেপে রাখতে পারলে না। গোপনে কথাটা বললে এক বোনকে, সে বললে অল্প বোনদের, তার বললে তাদের কোনো কোনো বন্ধুকে। তাদের মধ্যে এক জলকক্কা রাজপুত্রের কথা শুনেই বৃষতে পারলে : জাহাজের উৎসব সে দেখেছিলো নিজের চোখে ; রাজপুত্র কোন্ দেশের, কে সেখানকার রাজা, সব জানা ছিলো তার।

আয় বোন—ব'লে জলকক্কারা তাকে জড়িয়ে ধরলো। একসঙ্গে হাতে হাত ধ'রে তারা ভেসে উঠলো ঠিক সেই রাজপুত্রের প্রাণসেই সামনে।  
( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )

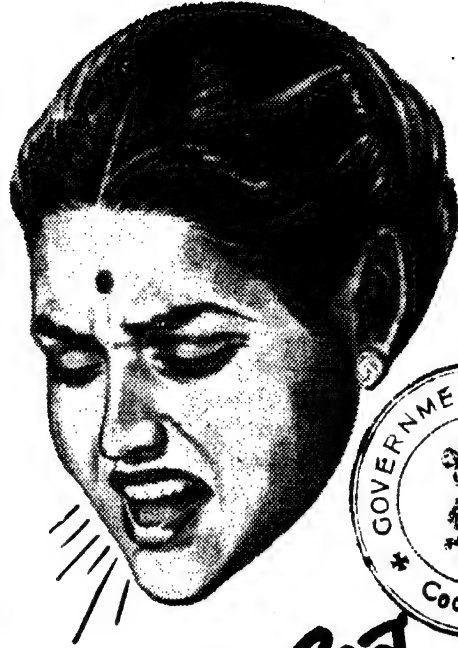
অমুবাদক—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

## ছোট মেয়ে বাণী

সলিল মিত্র

ছোট মেয়ে কচি সোনা নাম রেখেছি বাণী,  
গিলি খিলি হাসিটি তার মিষ্টি বড় জানি।  
ফুলের বনে একলা মনে কতই খেলা করে,  
সোহাগ ভ'রে হাতা-পাতা জড়িয়ে বৃকে ধরে।  
কয় সে কথা চুপি চুপি ফুলের কানে কানে,  
সোপানতার কি সেই কথা ঐ তো শুধু জানে।  
বাশি বাশি মিষ্টি হাসি বাণীর চোখে-মুখে,  
নয়ন ভ'রে দেখলে পরে জড়িয়ে ধরি বৃকে !  
চুপিসাড়ে বলি তারে 'বাণী-বাণী মোর—  
সফলতায় ভ'রে উঠুক জীবনখানি তোার !'

কামির  
মূলকারণ দূর  
করুন



**সিরোলিন**  
খান

নিরাপদ  
পারিবারিক  
ওষুধ

সিরোলিন কেবল যে কাশি  
'খামিয়ে দেয়' তা নয়—  
কাশির মূলকারণ হুট-  
জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।

# খেলা হল

## টেনিস

**উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার ৭১তম অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে।** ৩৫টি দেশের বহু কীৰ্ত্তিমান খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার খেলোয়াড়দের জয়জয়কার! এই দুই দেশের পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়রা পাঁচটি বিবরের বিজয়ী ও বিজিতের পুরস্কারগুলি লাভ করেছে। পুরুষদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার কীৰ্ত্তিমান খেলোয়াড় লুই হোড। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় হোডের এটিই শেষ খেলা। কারণ, তিনি পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। উইম্বলডনে পেশাদার খেলোয়াড়দের স্থান নেই। লুই হোড পর পর ছ'বছর উইম্বলডনে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করলেন। মহিলা বিভাগে বিজয়িনী হয়েছেন আমেরিকার নিগ্রো টেনিস-পটায়রী মিস, এ্যালথিয়া গিবসন।

সিম্বলস ফাইনাল (পুরুষদের)

লুই হোড (অস্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৬-১ ও ৬-২ সেটে এাসলে কুপারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

সিম্বলস ফাইনাল (মহিলাদের)

মিস এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৬-৩ ও ৬-২ সেটে মিস ডার্লিন হার্ডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইনাল (পুরুষদের)

গার্ডনার মুলয় ও বাজপেটী (আমেরিকা) ৮-১০, ৬-৪, ৬-৪ ও ৬-৪ সেটে লুই হোড ও নীল ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইনাল (মহিলাদের)

মিস এ্যালথিয়া গিবসন ও মিস ডার্লিন হোড (আমেরিকা) ৬-৩ ও ৬-২ সেটে মিসেস থেলমা ল ও মিসেস মেবী হটনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল

মালভিন রোজ (অস্ট্রেলিয়া) ও মিস ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) ৬-৪ ও ৭-৫ সেটে নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) ও এ্যালথিয়া গিবসনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

## ক্রিকেট

টেস্ট-ক্রিকেট মাঠে ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় টেস্ট-মাঠ অমীমাসিত ভাবে শেষ হয়েছে।

পিটার মে 'টসে' জয়লাভ করে প্রথম ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত করেন। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেটে ৬১৯ রান সংগ্রহ করে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ২৫৮ রান করেন।

৬১৯ রান পিছনে রেখে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ব্যাট করতে নামেন। কিন্তু খেলার মধ্যে বৃষ্টি নামায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলোয়াড়দের মনো

ব্রাসের সৃষ্টি হল। শেষ পর্যন্ত ৩৭২ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হল 'ফলো অন' করতে বাধ্য হল। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে উল্লীয়মান খেলোয়াড় কোলী-স্মিথ ও ডেনিস প্রাটকিনসন দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে নিজ দলকে পরাজয়ের হাত হতে রক্ষা করেন। ৩৩৭ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৩১৯ (৬ উইকেট ড্রেন্ডে)—গ্রেভনি ২৫৮ রিচার্ডসন ১২৬, মে ১০৪, কলিন কাউডে ৫৫, ডেরিক রিচার্ডস ৩৩, গডফ্রে ইভান্স ২৬, কোলী স্মিথ ৬১ রানে ২ উইকেট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—প্রথম ইনিংস—৩৭২ (৩ রানে মট আউট ১২১ সেবাস ৪৭, আর কানহাই ৪২, এডাটিন উইকস ৩৩, এফ, ট্রুমান ৬৩ রানে ৫ উইকেট ও লেকার ১০১ রানে ৩ উইকেট।)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—৩৩৭ (কোলী স্মিথ ১৬৮ গুণ্ডার্ড ৬১, প্রাটকিনসন ৪৬, আর কানহাই ২৮, ষ্টাথাম ১১১ রানে ৫ উইকেট ট্রুমান ৮০ রানে ৪ উইকেট।)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—৬৪ (১ উইকেট)।

[ অমীমাসিত ]

লীডস মাঠে চতুর্থ টেস্ট মাচের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ৫৭ ইনিংস ও ৫ রানে পরাজিত হওয়ার ইংলণ্ড দল বাবার জয়ের গৌরব অর্জন করল। 'লীডস' মাঠের চতুর্থ টেস্ট মাচকে 'লো কোরি' মাচ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কোন খেলোয়াড়ই সেফুরি লা করতে পারেন নি। তা ছাড়া পাঁচ দিনের টেস্ট আড়াই দিনে সমাপ্ত হয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—প্রথম ইনিংস—১৪২ (আর কানহাই ৪৭, ওয়ালকট ৩৮, ফ্রাঙ্ক ওয়েল ২৯, লোডার ৩৬ রানে ৬ উইকেট লেকার ২৪ রানে ২ উইকেট ও ট্রুমান ৩৩ রানে ২ উইকেট।)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—২৭৯ (পিটার মে ৬৯, কাউডে ৬৮, শেফার্ড ৬৮, টম গ্রোভনি ২২, ওয়েল ৬৯ রানে ৭ উইকেট গিলক্রিষ্ট ৭১ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস—১০২ (ওয়ালকট ৩৫, সেবাস ২৯, লোডার ৫০ রানে ৩ উইকেট ট্রুমান ৪২ রানে ২ উইকেট লেক ৬ রানে ১ উইকেট)।

[ ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৫ রানে বিজয়ী ]

## ফুটবল

কলকাতার ফুটবল মাঠের দর্শকদের উল্লেখ্য আচরণের ঘটনা এমন নগররূপে দেখা দিয়েছে এবং এই খেলার ব্যাপারে কত নিষ্ঠা ব্যক্তি অকারণে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার নাগরিক জীবন দুর্বিষম হয়ে উঠেছে। গত ১৫ই জুলাই মহামেডান ও হাওড়া ইউনিয়ন রায়পুর পাল্টা লীগের খেলার এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। সামান্য ফুটবল

খেলাকে কেন্দ্র করে অবাধ মারামারি, ধর্ষণতলা ও চোরসী এলাকার লোকানপাট ও ট্রামবাস বন্ধ হওয়ায় সাধারণ নাগরিকের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। পুলিশের হস্তান্তরের ব্যাপারে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে যুগান্তরের মন্তব্যের উপর পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। "কলিকাতা ময়দানে ফুটবল খেলা উপলক্ষে যে লজ্জাজনক মারপিট ও গুণ্ডাগোল দেখা দেয়, তাহা শান্তিকামী সহরবাসী মাঝকেই উন্মিষ করিয়া তুলিয়াছে। অবিলম্বে বন্ধ একদা এই শ্রেণীর ঘটনা ঘটিল। বহুদিন পরে আবার তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া শুধু অনভিপ্রেত নয়, ইহার পরিণামও আশঙ্কাজনক। কাজেই গভর্নমেন্ট ও জনসাধারণ উভয়েরই বিষয়টি সম্বন্ধে সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া দরকার। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন, মহামেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল, রাজস্থান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক নামাঙ্কিত ক্লাবের অস্তিত্ব থাকার ফলেই অনেক সময় অপ্রতাপ্য রেবারেখি ও পারাপারি দেখা দেয় এবং তাহা ঘটতেই শেষ পর্যন্ত অচ্যুতসাহারী হাক্কামা সৃষ্টি করিয়া বসে। সুতরাং এত শ্রেণীর নামকরণ বজায় রাখা ঠিক কি না গভর্নমেন্ট সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, নাম পরিবর্তনের দ্বারা কিছু

সুস্থ হইতে পারে। কিন্তু আসল পরিবর্তন দরকার মনোবৃত্তির। খেলা শুধু মানসিকতার জিনিষ—তাহার প্রতিবন্ধিতা আনন্দের প্রতিবন্ধিতা। তাহা যেখানে হিসে, আক্রোশ ও মারপিটে পর্যাবসিত হয়, সেখানেই বৃষ্টিতে হবে পিছনে সেই শুষ্ক মনোভাবটি নাই, যা খেলোয়াড়ী আদর্শরূপে সর্বদেশে স্বীকৃত। সেই মনোভাব কেবলমাত্র নামের অচলবদলেই রূপান্তরিত হবে কি?"

সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা; লীগ খেলার আকর্ষণকে ক্ষুণ্ণ করলেও লীগ প্রায় সমাপ্তির মুখে।

কোন অঘটন না ঘটলে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করায় কোনও বাধা ঘটবার সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব মহামেডান অপেক্ষা তিন পয়েন্ট বেশী নষ্ট করে একই অবস্থায় আছে।

পাকেচকে এবারে লীগ প্রতিযোগিতার নামা বন্ধ আছে। এর ফলে প্রতি ডিভিসনে একটা করে দল বাড়ল। এর ফলে বহু খেলা বেড়ে গেল। একে তো নিব্বারিত সময়ের মধ্যে খেলা শেষ হয় না, তার পর রেলিশেশন বন্ধ হওয়ায় যে সমস্তার, উত্তর হোল আই, এক, এ কর্তৃপক্ষ কি সে কথাটা একটি বার ভেবেছিলেন?

## বিশ্মৃত দিনের কবিতা

বন্দে আলী মিয়া

নৈশত মেঘের ঘটা—বসন্তীন গহন তিমির  
একটি কামনা-বিশ্ব মোর মনে বচিতেছে নীড়—  
নিশীথ যৌদ্ধের দাঁচে পড়ে গেল স্তম্ভক আকাশ  
বসন্তাব বৃকের মাঝারে গুমরায় ক্ষুসিত নিশাশ।

নাগিনীর বিষবাম্পে নীল হলো মাধবী জীবন  
আমার দিনের প্রান্তে চেয়ে আছে ভূষিত নয়ন;  
তোমার মন্দির পাশে উচ্ছ্বসিত একটি আবেগ  
শিহরায় ঘুমের মতন প্রেমহীন বিরস উদ্বেগ।

বাসকশয়ার পার্শ্বে পুষ্পসোভী মধুপের ভিড়  
আমার ঘুমন্ত বৃকে নাচে তাই অশান্ত কবির।  
বিশ্মৃত দিনের গান ফুটাইয়া গেছে কবে হায়  
তাহার পরশ আছে পরীদের ছুটি পাখার।

দিনের ঈশান কোণে অলিতেছে আঁবির প্রদীপ  
উদয়তারারা তেথা ফেলে গেছে প্রভাতের টিপ।  
প্রবাল দীপের বৃকে জেগে আছে রাতের বিলাস  
আজি কি ফিরিবে পান্থী ছিঁড়ি তার বন্ধন-পাশ?

সিন্ধু-শকুনি আজ খুঁজে ফেরে মানস সবিতা  
হারিয়ে গিয়েছে কোথা পুরাতন একটি কবিতা!  
তাহার বেদনা বাজে প্রভাতের বিদম্ব তারার  
আমার ক্ষুধিত মন শিচ্ছ পানে ফিরে ফিরে চায়।



## কাচ-শিল্পের অগ্রগতি

কাচ আর কাচের মূল্যমান কখনই এক নয় মতি। কিন্তু তা হলেও আধুনিক জগতে কাচ একটি অপরিহার্য পদার্থ এবং সেদিক থেকে এর মূল্যও অনস্বীকার্য। নেহাৎ ইনকো বা ভল্লুর জিনিস বলে কাচ আর অবজ্ঞাত নয়, মানুষের নানা প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে ঘরে ঘরে আজ চলেছে তার দুর্বার অভিনি। এমন হয়ে উঠেছে—কাচ তথা কাচ-নির্মিত দ্রব্য-সামগ্রী না হলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যেন চলে না। কাচের শিশি, বোতল, টিউব, নল, শার্শি, আর্শি,—এ সব ত আছেই, কাচের গ্রাস, কাচের বাসন, কাচের চুড়ি, কাচের আলমারী—সর্বত্রই কাচ। দূরবীক্ষণ, অবীক্ষণ, ক্যামেরা থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধালি বিভিন্ন সরঞ্জামও কাচ অপরিহার্য ভাবে চাই। এই বাস্তবিক যুগে সৌহার্দ্যের চেয়ে কাচের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কম কিসে? এইটিকে ‘কাচের যুগ’ বলতেও নিশ্চয়ই আপত্তি থাকতে পারে না। কাচের জিনিস না হলে আজ যে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ অচল। দেখে স্বস্তিই মনে হয়, এ যুগে কাচ কাচের গৌরব বা সমকক্ষতা দাবী করবার মতোই সাহস সক্ষম করছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বিশেষ কাচকে কেন্দ্র করে একটি উন্নত ধরনের শিল্প গড়ে তুলবার সুপরিণতি প্রয়াস আরম্ভ হয়। গত ৪০ বৎসরকাল মধ্যে এর যে অগ্রগতি হয়েছে, এক কথায় উহাকে ‘বৈপ্লবিক’ বলে আখ্যাত করা চলে। বস্তুত: আজ শুধু বহির্ভারতেই নয়, ভারতের অভ্যন্তরেও কাচ একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছে। কোন অতীতে একটি ফিনিসীয় বণিক দল সিরিয়ার সমুদ্রশোণকুলে রজনকাঁচাকালে কাচ জিনিসটিকে আবিষ্কার করেন। আগুনের তাপে আলকালি নামক দ্রব্য পদার্থের সঙ্গে বালুকা ও ছাই মিশ্রিত হয়ে সেদিন যখন এইটিকে স্থিতি হ’ল, তখন বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এমনি ভাবে কাচের আবিষ্কারের পর কাচ ও কাচ-শিল্পের উন্নতির প্রয়াস চলে যুগে যুগে এবং আজ সমগ্র বিশ্বে, এমন কি ভারতেও এর সাফল্যের স্বাক্ষর পড়ে।

নিজা ব্যবহারের উপযোগী কাচের জিনিস এবং চিকিৎসা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক কাচ দ্রব্য তৈরীর জন্তে এ দেশে বহু বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিসের উৎপাদন প্রণালী বিভিন্ন ধরনের এবং সকলই এখন সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-অনুসৃত। এই শিল্পের উন্নতির জন্ত শিল্পসমূহ দেশগুলিতে গবেষণাও চলেছে প্রচুর। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা মহানগরীতে জাতীয় সরকারের

গবেষণা-মন্ডির স্থাপিত হয়েছে এবং এইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে ঠিক ৭ বছর পূর্বে ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসে। এই কয় বছরে তেঁতরই আলোচ্য গবেষণা-সংস্থাটি (স্টেটাল গ্রাস এণ্ড সিরামিক ইনস্টিটিউট) নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রভূত কাঙ্ক্ষাবৃত্তা প্রদর্শন করেছে।

এদেশে কাচশিল্পের প্রসার ও অগ্রগতির মূল্যাকান চিহ্ন করতে চলে চলে যেতে হয় প্রথম মহাযুদ্ধের দিনগুলোতে। ১৯১৪ সালে প্রয়োজনের তাগিদে সারা ভারতে তিনটি বড় বড় কারখানা স্থাপিত হয়। ক্রমেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা-নান কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলে এবং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয় অবধি (১৯৪৭) এই সংখ্যা প্রায় এক শত হয়ে পৌঁছায়। কাজে এই কারখানাগুলোর পাশাপাশি কতকগুলো স্মলস্টেট কারখানাও পরস্পর নির্ভরশীল কারখানাও গড়ে উঠেছে। তন্মধ্যে স্বতন্ত্র চুড়ি তৈরীর কারখানাটি হচ্ছে প্রায় ১৫টি। বর্তমানে ভারতে মোট গ্রাস ওয়ার্কস বা কাচের কারখানা পাঁড়িয়েছে ১৩০টির উপর—এর মধ্যে এক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই রয়েছে প্রায় ৩০টি কারখানা।

এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার। উল্লিখিত কারখানা সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাচ প্রস্তুত প্রণালীরও পরিবর্তন হয়ে চলেছে দিন দিন। সাধারণত: কাচ একটি ভল্লুর পদার্থ বিশেষ এক্ষণে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে এইটি অভূতর এমন কি ব্যস্ত জায় নমনীয় কাচের আবিষ্কারও সম্ভব হয়েছে। কাচ ও কাচশিল্পের বৈজ্ঞানিক উন্নতির বিশেষরূপ প্রসঙ্গে কাচ প্রস্তুত প্রণালী পরিবর্তনে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়। পূর্বে যুগে সাহায্যে হাওয়া দিয়ে কাচ গলানো হতো, আজ সেখানে রয়েছে স্বয়ংক্রিয়-বস্ত্রপাতির-হাঙ্গির; পণ্ড কার্বেস-এর জায়গায় দেখা দিয়ে ‘ট্যাক কার্বেস’। পঞ্চাশত্বে এই শিল্প উৎপাদনের ব্যাপারে সরাসরি আগুনের স্থলে বর্তমানে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে একেবারে গ্যাসে।

অভূতর বস্তু আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্প ও শিল্পজাত পণ্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে আশ্চর্য রকম। অজ্ঞাত বহু মূল্যবান জিনিসের জায় সোটিক্স-গ্লাস পাম্প, কনস্ট্রাক্ট পাইপ, বল বেরাণি গজ প্রভৃতিও আজ তৈরী হচ্ছে কাচেই। কাচশিল্প সম্ভার রিপোর্ট যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে—বিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে লোহা ও রবার, তেমনি আধুনিক শিল্পজাত পণ্যের ক্ষেত্রে কাচের জায়গাত্র। বস্তুত: ভারতীয় কাচশিল্প কাচ ও কাচের রকম জিনিসের একটি মোটা চাহিদা এক্ষণে মিটিয়ে চলেছে। উৎপাদন পরিমাণ থেকেও ভারতীয় কাচশিল্পের এই অগ্রগতি বিশেষ ভাৱে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫০ সালে উৎপাদনের পরিমাণ যেখানে ৮৭ হাজার ১৮০ টন, সেখানে ১৯৫৫ সালেই উঠা হয়ে পড়ে

৩ লক্ষ টনের উপর। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে উক্ত পরিমাণ উপস্থান সম্ভব হয়েছে এবং এর মূল্যও ৪ কোটি টাকাও বেশী হাড় কম নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ১৯৬০-৬১ সালের শেষার্শ্বে মধ্যে উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে একবারে দুই লক্ষ টন এবং সেবার নানাবিধ অন্তর্বিধ। সম্ভব ও কার্যখানায় কার্যখানায় কাজও এগিয়ে চলেছে।

কারিগরি মান উন্নয়নের সঙ্গে কাচশিল্পের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, একটি সত্যকেই অস্বীকার নেই। এই উপমহাদেশে এ দিকটির এখনও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বিশেষ ভাবে এই কারণে যে, এ জল যে কাঁচা মাল প্রয়োজন, অর্থাৎ বালুকা, চূণ, লোহার চিকানাির সমন্বিত কোন অপর্যাপ্তরূপে বিদ্যমান। কাচ কাচশিল্পের যে প্রকটপূর্ব ভূমিকা, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনও এই স্বাক্ষর না করে পারেননি। কমিশন স্পষ্টই মন্তব্য করেছেন—সামান্য পনের উপর বড় শিল্প নির্মিতকাল এবং এদিক থেকে জাতীয় অর্থনৈতিক দৃষ্টান্তোত্তে কাচশিল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। কাচ ও কাচশিল্পের ক্ষেত্রে বাণিজ্য স্বার্থ ভাবিত এখনও অত্যধিক সম্পূর্ণ আর্থনির্ভরীয় হয়ে উঠতে পারেনি। এর জন্য সরকারী মনোযোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা আরও ব্যাপক আকারে প্রয়োজন। প্রাপ্ত একটি হিসাবে দেখা যায়—১৯৫৫-৫৬ সালে বিশেষ থেকে যে পরিমাণ কাচসরা আমদান্য করা হয়, তার মূল্য প্রায় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। এই সময় ভারত থেকে বিশেষ রপ্তানী হয়ে যায় মোটামুটি ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাচের জিনিস। সারা ভারতে এই শিল্পক্ষেত্র প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত কর্মচারী সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার; তন্মধ্যে প্রায় ৮ হাজার কর্মচারী কাজ করে চলেছে এই খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে। বহুদিন যাবৎ, কাচ ও কাচশিল্প ততট প্রসার ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, একটি আজ নিঃসংশয় বলা যায়।

## হাস্করের চামড়া থেকে শিল্প-সম্ভার

বিজ্ঞান-লব্ধার আশীর্বাদে কত তুচ্ছ বা পরিত্যক্ত জিনিস বহুমূল্য শিল্প ও সম্পদে পরিণত হচ্ছে, বলবার নয়। সামুদ্রিক ভয়াবহ জীব হাস্কর—অতীত কালে মানুষের শত্রু হিসাবেই একটি ছিল প্রধানতঃ গণ্য। বস্তুতে কি, মাগুংগেব কাছে এর তেমন কোন মূল্যই স্বীকৃত হয় নি সেদিনে। গবেষণা চলল বছরের পর বছর—যুগের পর যুগ। তার পর ধরা পড়ে গেলো এক দিন—গভীর সমুদ্রের এ বৃহদাকার মৎশটি মানুষের স্বপ্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ যোগাতে পারে প্রচুর।

জলজ জীব হাস্কর স্থলের অধিবাসী মানুষের কাজ কি ভাবে লাগতে পারে? আধুনিক কালের একটি মস্ত আবিষ্কার—হাস্করের গায়ে যে শিরায় কাগজের মত অসংশয় স্বক বা ছাল থাকে সেইটি খুবই মূল্যবান। দেখা গেলো স্পষ্টই—এইটিকে ঠিক মত ট্যানিং বা শোধিত করে চমৎকার হাইড্রোপ্যাপার চামড়া তৈরী করা যায় এবং সেই চামড়া থেকে গড়ে তোলা চলে নানা প্রয়োজনীয় শিল্প-সম্ভার। অবশ্য কাঁচা ও অগোছা করেকটি জিনিস পালিশ বা মসৃণ করার কাজে হাস্করের গাত্র-স্বক ব্যবহৃত হচ্ছে বহু দিন কিন্তু সেদিন থেকে এইটি 'লোদার' বা শোধিত চামড়ার রূপ গ্রহণ করলো, সেদিন হাস্কর মানুষের পরম শত্রু হলেও শেষ অবধি শত্রু হিসাবে ঘৃণা ও পরিত্যক্ত হয়ে থাকলো না।

হাস্করের স্বক বা গাত্রাবরণ থেকে শোধিত চর্ম তৈরীর করেকটি বড় ও কার্যখানায় গড়ে উঠেছে পশ্চিমী দেশগুলোতে। নিউজার্কের

(আমেরিকা) একটি প্রকাণ্ড কারখানা থেকে (ওশেনলেনার কর্পোরেশন) গত পাঁচ বছরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য শোধিত চামড়া তৈরী হয়েছে। যত দূর জানা যায়, হাস্করের 'স্পিনীজ' বা প্রজাতি একটা দুটো মাত্র নয়—প্রায় দুই শতাধিক। এরের সব কর্তী চামড়া থেকেই আবার শোধিত চামড়া হয় না। পরাকার প্রধাণিত হয়েছে, মাত্র ১০১২টি 'স্পিনীজ' বা প্রজাতি চামড়া তৈরীর লক্ষ্য উপযোগী।

একটি আগের বলা হল—ভয়াবহ জীব হাস্করের বিস্তার 'স্পিনীজ' বা প্রজাতি রয়েছে। তন্মধ্যে যে কর্তী বিশেষ ভাবে চামড়া তৈরীর কাজে আসে, সেগুলোর চলতি নাম—'টাইগার', 'লিওপার্ড', 'ডাঙ্কি', 'ব্রাইল', 'সার্ক', 'সেগুলা', 'ব্লাক টিপ', 'ম্যাকারেল', 'হামার হেড', 'স-স্কিন', 'নাস', 'জাপানিস স' ও মরোক্কো শার্ক। হাস্কর ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নৌকার বোঝাই কিংবা ডকে এনে গাত্র-স্বকটি ছাড়িয়ে কোলা হয়। তার পর সমুদ্রের ফলে ভাল বকম ধরে এতে হুণ মিশিয়ে বেশে নিতে হয় অস্বস্ত্য: চাব কি পাঁচ দিন। পরিশেষে ছাল সব তাঁজ তাঁজ করে জাহাজে বোঝা পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন চর্ম-শোষণ কারখানায়।

বিশ্বের জলবানিতে অবশ্য একটি সম্ভার হাস্কর পাওয়া যায় না। বেকীর ভাগ হাস্করের স্বক আমদান্য হয়ে থাকে সেমি-উপকাল সমুদ্র প্রকা থেকে। যেমন মাল্লিকা উপসাগর, মাল্লিকোর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল অঞ্চল, নদ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান সাগরের জলে বড় হাস্কর পাওয়া যায়। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের পাইন হীপও অসংখ্য হাস্কর ধরা পড়ে আসছে এ যাবৎ। ক্রোয়িডার জলরাশি হাস্করে ভিড় এবং সেজ্জা পুঙ্খোক্ত ওশেন লেনার কর্পোরেশন সম্প্রতি ক্লা-এর টুয়েন্টি একটি হাস্কর শিকার কেন্দ্র পথান্ত স্থাপন করেছেন। বিশেষ ধরনের জাল বা বর্না দিয়ে হাস্কর ধরার প্রথা অনেক কালের। এছাড়াও আধুনিক যুগে কয়েকটি নয়া পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে হাস্কর শিকারের।

মানুষ আজ হাস্করের দেহের প্রতিটি অংশ একটি না একটি কাজে লাগাচ্ছে বা লাগাবার চেষ্টা করছে। এদের 'লিডার' বা যকুং-এ খাতপ্রাণ 'ক' যথেষ্ট পরিমাণ আছে বলে ক্যামিকাল বা রাসায়নিক কোম্পানীগুলোর দিক থেকে এর চাহিদা খুবই বেশী। কতক শ্রেণীর হাস্করের ডানায় টানান্দেব একটি চমৎকার খাবার তৈরী হয়। হাস্করের মাংসবহুল অংশটি অজ্ঞাত কয়েকটি জন্তুর এক প্রকার প্রধান খাদ্য। এই সামুদ্রিক জীবটির দেহ-কাঠামোতে আসলে কোন হাড় নেই। কাজেই গায়েব ছালটা ছাড়িয়ে নিলে বাকী অংশটি স্নগজই একাকার হয়ে যায় এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাররূপেও ব্যবহৃত হয়। বাজারে হাস্করের দাঁতের মূল্যও নিশ্চয়ই কম বলা চলে না। এ থেকে নানা ডিজাইনের মনোহর অলঙ্কার তৈরী হচ্ছে আজ-কাল। হাস্করের চামড়ায় শিশুদের জুতা ভাল ভাল পাহুকা হয় এবং বড়দের জুতারও উপরিভাগটা তৈরী হয়ে থাকে। এ ছাড়াও এই চামড়া থেকে আজ বহু কাজের জিনিস নির্মিত হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন শিল্প কারখানায়। লগেজ, কোমরবন্ধ, পোর্টফোলিও, প্যাকেট-বই, সিগারেট-কেস, হাতবড়ির ব্যাগ ও রকমারী জৌড়াসামগ্রী থেকে আরম্ভ করে কত বিচিত্র শিল্পসম্ভারই না হাস্করের মূল্যবান চামড়াভাজ। বিজ্ঞানীদের দাবী—মানুষের কাছে এই জলজ প্রাণীটির অবগান নানা কারণে ব্যর্থ হবার নয় কখনই।



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

### বারীন্দ্রনাথ দাশ

ফে: চে: শিরা: যখন তার সোনা-বঁধনো দাঁতে একটুখানি হাসির ঝিলিক খেলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “জেনী, আমায় বিয়ে করবে?” জেনী কহবে না, কথাটি সোজা-সুজি বলতে বলতেও বললো না।

জেনা ভাবলো, চে: শিরাকে যদি সে নিজে নাকচ করে দেয় তাহলে বড়ো ভাই চিয়েন চাং-এর সঙ্গে একটা কলহ অনিবার্য—কারণ প্রথমত চে: শিরা-এর কাছ থেকে কিছু অর্ডার পায় চিয়েন চাং, দ্বিতীয়ত চে: শিরা-এর বোন টি লিং-এর সঙ্গে তার কিছু ভবিষ্যতের স্বপ্ন জড়িয়ে আছে। তাই নিজের থেকে কোনো কথা বলতে চাইলো না সে।

শুধু বললো, “চে: শিরা: আমবা পশ্চিম দেশের মেয়েদের মতো নই যে, নিজদের বিয়ে নিয়ে ঠিক করবে। আমাদের পরিবার খুব রক্ষণশীল। তুমি বাবাকে জিজ্ঞেস করো। তিনি যা বলবেন তাই হবে।”

চে: শিরা: যখন বুড়ো ওয়াঙ-এর কাছ গিয়ে বলল, বুড়ো ওয়াঙ-এর মনে তার ত্রিবিংশ বছর আগেকার চায়না টাউনের গুণ্ডা-সর্দারের প্রবৃত্তিগুলো হঠাৎ চেগে উঠলো। কিন্তু ত্রিবিংশ বছর আগেকার ওয়াঙ আর এই ওয়াঙ-এ অনেক তফাস! কাঠের চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে হাতের নালা ঘুরিয়ে চললো বুড়ো ওয়াঙ।

তারপর আস্তে আস্তে বললো, “চে: শিরা: ক্যান্টনের কে বংশের একজন যোগ্য সন্তানের কাছ থেকে এই প্রস্তাব পেয়ে ঢুকিয়েনের ওয়াঙবংশ দ্বন্দ্বও সম্মানিত হোলো। ওয়াঙবংশের মেয়ে কে কলের ছেলের পায়ে রাখবে বুঝো হবার যোগ্যতাও নেই।

“আমি যদি যোগ্য মনে করি,—” বলে উঠলো অর্ধেক চে: শিরা:।

“আমায় বলতে দাও, বুড়ো ওয়াং বাবা দিয়ে বললো, “আমি কি বলছিলাম জানো? আমি বলছিলাম যে বংশের লোকেরা খুব উদার। তাই তুমি জেনীকে দেখে কক্ষপাশ্রুত হয়ে এই প্রস্তাব করেছো। হয়তো পরে এই আকস্মিক কক্ষপাশ্রুত তোমার অমূল্যোচিত হতে পারে। সুতরাং বুঝা চকল না হয়ে তুমি ভালো করে ভেবে দেখ।”

“আমি ভালো করেই ভেবে দেখছি,” চে: শিরা: উত্তর দিলো।

“এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই,” বললো বুড়ো ওয়াঙ, “এক বছর সময় নাও। এক বছর পরেও যদি তোমার মনে হয়

তুমি জেনীকে স্বীকৃতি গ্রহণ করতে চাও, তখন আমায় এসে বলো, আমি তখন জেনার ভবিষ্যৎ সুখের ক্ষেত্রে তোমার বাবা হিসেবে হাত করা কর্তব্য মনে করবো, তাই করবো।”

“কিন্তু—”

“আমি যা বলেছি, এর বেশী কিছু এখন আর বলতে চাই না,” বুড়ো ওয়াঙ শেষ করলো। “তবে তুমি আমার ছেলের বন্ধু সুতরাং ছেলের বন্ধু মতো এ বাড়িতে যাওয়া-আসা করবে। ছেলে বন্ধুর মতোই সবার সঙ্গে মিশবে। সবার সঙ্গে দেখা হলে কথাবার্তা হবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন,” বলে চকু নিম্নলিখিত করলো বুড়ো ওয়াঙ।

কে চে: শিরাকে উঠে পড়তে হোলো। অডাল থেকে ও আর মিনি এদের কথাবার্তা সবই শুনতে পোষছিলো।

জেনী খুশি হয়েছিলো খুব। আর মিনি তো হেসে গুন। “ম্যান ভাষণ চালাক,” মিনি তাকে বলেছিলো। জেনী হেসে মিঃ হাতে চিমাটি কাটলো।

মিনি হাসতে হাসতে বলতো, “এবার একদিন তোমার বাবা বয় ফ্রেণ্ডকে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।”

জেনী সেদিন দিলীপকে প্রথম এ বাড়িতে নিয়ে এলো সেই বাড়িতে বাইরের লোক কেউ ছিলো না। মিনি খুব খুশি হ তাড়াহুড়ো চায়ের ব্যবস্থা করতে লেগে গেল।

দিলীপের মুখে নিভুল ইংরেজি শুনে স্ব-চাং খুব বিমুগ্ধ। ত উপর যখন শুনলো সে খুব ভালো ওয়ালজিটিং-বাগ জানে আর তা তার উপর স্ব-চাং-এর শ্রদ্ধার আর সান্না বইলো না।

বললো, “তুমি তো অল্প বাঙালী ছেলের মতো নও? তুঁ কোন কোন জায়গায় যাও নাচের রাগিতে? তোমায় দেখেছি ক তো মনে পড়ে না!”

দিলীপ উত্তর দিলো, “আমি কিন্তু তোমায় দেখেছি। পরত দিন তুমি গোয়েন্দা স্লিপারে ছিলে। আমার বন্ধুর মনে পড়ে তুঁ বোজার সঙ্গে নাচছিলে।”

“বোজীকে তুমি কেনো?” স্ব-চাং জিজ্ঞেস করলো।

“বোজীকে ঠিক চিনি না, তবে বোজীর বড়ো বোন অলগাকে থ ভালো করে চিনি।”

দিলীপ চলবে—স্ব: চাং নিশ্চিত হোলো। তার প্রশ্ন



# এই নামগুলোর উপর নির্ভর করুন

—পরিচিত প্রস্তুতকারীর

বনস্পতিই সবসময়

দোখে কিনুন।

স্বাস্থ্যপ্রদ ও শক্তিদায়ী বনস্পতি দিয়ে সর্বকক্ষ  
বারাবরা করা বুদ্ধির কাজ—কিন্তু তার চেয়েও বুদ্ধির কাজ  
প্রস্তুতকারীর নামটি দেখে নেওয়া!

বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোনও সদস্য  
কর্তৃক প্রস্তুত বনস্পতি কিনলে জানবেন যে এই  
বনস্পতি কঠিন সরকারী আইন অনুযায়ী সরকারী  
উদ্বোধনের নিয়মাবলী কারখানায় তৈরী।  
এসব কারণেই হাত না লাগিয়ে বনস্পতি তৈরী  
ও সীলকরা টিনে প্যাক করা হয়, যাতে  
টান্টকা ও বিতর্ক থাকে।

সব সময় এই তালিকার নামগুলো যে কোনও  
কোম্পানীর তৈরী বনস্পতি কিনবেন

নাম	উপকরণ
অনুত বনস্পতি কোঃ লিঃ	পেরেকের মাথো
অনুতের হুয়ার মিলস লিঃ	সোজ
বোয়ার অয়েল ইণ্ডাস্ট্রিজ	বদলকা
বি বোয়ার হুয়ার বনস্পতি	খরসি
ভারত বনস্পতি প্রোডাক্টস লিঃ	বেড়িও
ভবনবর ডেজিটেল প্রোডাক্টস লিঃ	প্রভাত
ভদ্রাঙ্গা তাম্রনাথানাকর প্রাইভেট লিঃ	খিচি
ভি-সি-এফ বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস	পদ্মক
ইষ্ট এশিয়াটিক কোঃ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ	জকে
ইষ্ট কোষ্ট ফুড প্রোডাক্টস লিঃ	মশোকা
দগুন ক্রাফটস ফিল্ম কোঃ লিঃ	কাই কোয়ালিটি
মিশুরান ডেজিটেলসেট কর্পোরেশন লিঃ	জুই
মিশুরান সিভিল লিঃ	লোটার
ইন্ডিয়ান ডেজিটেল প্রোডাক্টস লিঃ	লাচন
ইন্দোন ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ	অল
কামিয়ারভ ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ	—
কুম্ব প্রোডাক্টস লিঃ	কুম্ব
মার্গারিট এন্ড ফ্রাইন্ডস অয়েল কোঃ প্রাইভেট লিঃ	প্রকাপ
মেন্ডে ডেজিটাল এন্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোঃ লিঃ	কাফেল
মোহি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ	কোচোলে
মাইসোর ডেজিটেল অয়েল প্রোডাক্টস প্রি	চাহুত
পালানপুর ডেজিটেল প্রোডাক্টস লিঃ	নটর
গোটা ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ	কুম্বার
এস-ভি ডেজিটেল প্রোডাক্টস	পোপাল
হো হোয়াইক ফুড প্রোডাক্ট কোঃ লিঃ	বেদন
মোহাইকা বনস্পতি প্রোডাক্টস লিঃ	মোহাইকা
মটিক অয়েল মিলস কোঃ লিঃ	সেপদ
টাটা অয়েল মিলস কোঃ লিঃ	পকাও
তুঙ্গভদ্রা ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ	কুম্বার
ভেজিটেল প্রোডাক্টস লিঃ	প্রতাপ
ভেজিটেল ডিটামিন ফুড কোঃ প্রাইভেট লিঃ	ভিটামিন
ওয়েটল ইণ্ডিয়া ভেজিটেল প্রোডাক্টস লিঃ	সান ক্রাফট

বনস্পতি  
গিল্লীদের পরম বন্ধু

প্রচারক :  
বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স  
এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া



যোজীব সিদ্ধি অলপী তাকে চেনে, বাস, এর বেশী পরিচয় আর দরকার নেই।

কিন্তু চিয়েন চাং অতো সহজ ভাবে নিতে পারলো না দিলীপকে। খুব মামুলি সৌভাগ্যে সাধারণ দু'চারটা কথাবার্তা ছাড়া বিশেষ কিছুই বলছিলো না সে। তা ছাড়া দিলীপকে দেখে এমন কিছু অর্থবান বলে তার মনে হোলো না এবং অর্থবান নয়, এরকম বিদেশীর উপর তার আগ্রহ খুবই কম।

সেই দু'চারটা কথাবার্তার ফাঁকে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কিসের ব্যবসা করো?"

"বা সামনে আসে, যার থেকে দুটো পয়সা হয়, তাই করি।" দিলীপ উত্তর দিলো, "কোনো বিশেষ লাইন আমার নেই।"

"এখন কিসের ব্যবসা করছো?" জিজ্ঞেস করলো চিয়েন চাং।

"স্ক্রাপ।"

"স্ক্রাপ?" চিয়েন চাং কুণ্ঠিত করলো, "স্ক্রাপ বেচবার চেষ্টা করছো বুলি? বাজারে তো এখন ফ্রেতা বেশী নেই!"

দিলীপ একটু তেজে উত্তর দিলো, "না, বেশী নেই। তবে তাদের মধ্যে আমি একজন। আমার হাতে একটি পাটি আছে, ওরা চিনছে! আমার সন্ধান বা ছিলো তা ওদের দিয়েছি। তবে তাতে কুলেয়নি। আমার আরো কিছু লাগবে।"

"তাই নাকি?" লক্ষিয়ে উঠলো চিয়েন চাং। তার হাতে একটি পাটি আছে যা স্ক্রাপ বেচবার চেষ্টা করছে। এমন সন্ধান নাকি উঠে করে অবতরণ করলে বৃক্ষমানব কাজ হবে না, সে ভাবলো।

মিনিট পোনবোন মধ্যে সে খুব অল্পকাল ভাব গল্প করতে লাগলো দিলীপের সঙ্গে। মিনিট পঁচিশের মধ্যে তাকে প্রিন্সিপাল মন্তপান করবার আমন্ত্রণ জানালো। তার পর দিন দিলীপের অফিসে গিয়ে দেখা করলো। ব্যবসার কথাবার্তা পাললো।

তিন দিনের মধ্যে জেন-জেন চুক গেল। কিছু অর্থ সঞ্চয় করলো চিয়েন চাং। আর লক্ষ্য করলো যে বাজারে দিলীপের অসাধা যোগাযোগ। তবে যে পরিমাণ দৃত্য থাকলে এই যোগাযোগগুলো কাজে লাগানো যায়, দিলীপের সেটা নেই বলেই সে খুব বেশী কিছু করতে পারছে না।

এ লোককে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না, স্থির করলো চিয়েন চাং।

জেনীর ব্যাপার জেনী বুঝবে, জেং-শিয়া বুঝবে, সে ভাবলো, আর যে তেতু জেং-শিয়া অন্তত্ব পনবান লোক, তাই উপর স্বভাতি, স্তব্ধা জেনী যে শেষ পর্যন্ত দিলীপের মোহ কটিয়ে জেং-শিয়া-এর উপরই মনোনিবেশ করবে তাতে চিয়েন চাং এর কোনো সন্দেহ বহিলো না। যদি জেং-শিয়া জেনীর মন জয় করতে না পারে, সে জেং-শিয়া-এর দোষ। চিয়েন চাং তাকে বাড়িতে নিয়ে জেনীর সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দিলো, তার করবার সন্ধানও করে দিয়েছে, এর বেশী আর কী করতে পারে? জেনী যদি দিলীপকে বেশী পছন্দ করে, চিয়েন চাং তাতে বাধা দেওয়ার কে?

স্তব্ধা জেনীদের বাড়িতে দিলীপের নিয়মিত আসা-যাওয়া শুরু হোলো আর সেখানে আলাপ হোলো চাশিম সুলেমান, জয়প্রকাশ ত্রিবেদী, না মিল চাং, ন্যাসেল ববিনসন, জেনীর লবেল

মাঝখানে কয়েক দিন জেনীদের বাড়িতে বায়নি চেং শিয়াং এক দিন সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে গাড়ি থাকিয়ে যেতে যেতে দেখলো ফুটপাথ দিয়ে হেটে যাচ্ছে মিনি আর আহ কিম। ফুটপাথে পাশে সে গাড়ি থামালো, ইচ্ছে তার জেনীর খবর একবার মিনির জিজ্ঞেস করে।

কিন্তু মিনি কোনো কথা বললো না, শুধু একটু নড়, কদ হেটে চলে গেল।

জেং শিয়াং লক্ষ্য করলো যে মিনি আর আহ কিম দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে একটা অর্থহীন হাসি হাসলো। সেই হাসি জেং শিয়াং-এর ভালো লাগলো না।

মিনি যে তাকে এড়িয়ে চলে সেটা সে যে লক্ষ্য করেনি তা না তবে আগে এ নিয়ে মাথা ঘামার নি সে। তার লক্ষ্য জেনী। জেনীর বোন মিনি বাড়িতে তার সামনে যেহেতু কি যেহেতু না সেটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে তার মনে হয়নি কোনো দিন।

কিন্তু আহ কিম-এর সামনে মিনির এই তাচ্ছিল্য তার গা জ্বালা ধরিয়ে দিলো। সে জানে আহ কিম মাও-হুস-কুং সমর্থক, আহ কিম কলকাতার এক প্রগতিশীল চীনা যুবক সমিতির সেক্রেটারি, সেই সমিতির কার্যকলাপ বানচাল করে দেওয়ার জর যাদের মারফতে জাতীয়তাবাদী অর্থবান চীনা-দের টাকা খরচ হ হচ্ছে, জেং জেং শিয়াং তাদেরই একজন।

স্তব্ধা আহ কিমের সামনে মিনির এই ব্যবহারে সে অনেক অপমানিত বোধ করলো। ক্ষিপ্ত হাত ঘাম সে ভাবলো, আহ কিম এটা শোখ জামি নেবে। এমন শিক্ষা দেবে মিনির।

কয়েক দিন গাড়ি নিয়ে সে আহ কিমের বাড়ি গিয়ে গাড়ি নিয়ে লক্ষ্য করলো। কিন্তু একটা পাড়ো যায় না মিনির। প্রত্যেক দিনই বেগে আহ কিম-এর সঙ্গে। আহ কিম যখন গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে নিতে আসে। তিন সাত আট গবে এক মিনির কাছে মিনি কাজের শেষে একটি বেরোচ্ছে।

খুব কাজের চাপ ছিলো মিনির, অন্তত্ব দ্রুত হয়ে মিনি তার থেকে বেরোলো—আর আহ কিম বেরোনোর দুরন্তই গেলো না।

দ্রুত পদক্ষেপে বেঁচেই গেলো ফুটপাথ ধরে পথে জেনীর মিনি ওয়াহ। এমন সময় ফুটপাথের পাশে জেং শিয়াং গাড়ি এসে বের করলো।

গাড়ির নেতর থেকে জেং শিয়াং ডেকে বললো "গাড়ি নে এসে।" তোমাদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছি।"

সেদিন মিনি খুব দ্রুত। জেং শিয়াংকে বরাহি কব্ব ককক সে, তাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার এই কথা তার প্রস্তাব্যান করবার ইচ্ছা হোলো না।

একটু পর, মিনিট পাঁচেক লাগবে, কী আর দ্রুত হায়ে মিনি ভাবলো।

একটু ভেতর হামি তেজে সে গাড়িতে জেং-শিয়াং-এর পা এসে বসলো। জেং-শিয়াং গাড়ি ধাক্কা দিয়ে দিলো এসপ্লানেশন দিক মিনি একটু অবাক হয়ে দ্রোণ হুলে জেং-শিয়াং-এর দিকে তাকালো।

"লিওনে গাড়ির একটা মোড়ানে সামান্য একটা কাছ ঘটি

তোমার সময় নষ্ট হবে না। হেঁটে যেতে তোমার যতক্ষণ লাগতো, তার আগে আমরা বাড়ি পৌঁছে যাবো।”

মিনি আস্তে আস্তে বললো, “লিগুসে ষ্ট্রীটে বাওয়ার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। আমার এখানে নামিয়ে দিলেই ভালো হয়।”

চে শিয়াঃ হাসলো, বললো, “আমাকে ভয় কিসের মিনি! আমি তোমার ভাবী ভগিনীপতি। তোমায় লিগুসে ষ্ট্রীটে না নিয়ে যদি বেড রোডের এক পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কিছুক্ষণ বসে গল্প করি, তাহলে কোনো দোষ হয় না, কেউ কিছু বলবেও না।”

সুন্দে মিনি চুপ করে রইলো। তার পূর্ব মুখ কিরিয়ে একটু হাসলো নিজের মনে।

সেই হাসি অবলোকন করে চে শিয়াঃ পুলকিত হলো। জীবিত স্মৃতিস্বপ্নে তার নিজের জ্ঞান এক যেকোনো মেয়ে আকর্ষণ করবার মতো তার শক্তি ও ব্যক্তির সম্বন্ধে তার আস্থা বেড়ে গেল।

পূর্ব যুগি হয়ে বললো, “মিনি, তুমি একটা স্পোন্ট। তোমার শিল্প চাঠিতে অনেক বেশী।”

সেখানেই বসে মোড় লাল খালো। চে শিয়াঃ গাড়ি থামালো। মনে মনে থেকে একটি ট্যান্ডি এসে তার সামনে আঁড় ভাবে দাঁড়ালো।

এই বিবন্ধ হয়ে সেদিনের তাকালো চে শিয়াঃ। শিব ট্যান্ডি-ভট্টাচার্যের উপর তার ভীষণ রাগ। কিন্তু গাড়ির আরোহীদের ভিত্তি মারামের তার রাগ জল হয়ে গেল। হঠাৎ পর্বতবাহরা পাঠাবী রোজ হঠাৎ করে বসে।

তার পূর্ব মনের যুগিতে মিনির দিকে ফিরে কি মনে একটা বলতে শিখা গেল, মনে গেল। মিনি নেই। দরজা খোল।

এখন তাকিয়ে দেখে, বাহ্যে ছেড়ে ফুটিপাথে উঠে চম-চম করে ভিতর ফুটিপাথে দিকের দিকে যাচ্ছে মিনি ওয়াহ।

এখন আসলো হাসলো, তার পূর্ব সবুজ হোল।

সুন্দে থেকে অন্ধ গাড়িগুলো অর্ধেক হয়ে অর্ধ সিদ্ধ।

কিন্তু পূর্ব চে শিয়াঃ পাড়াভাড়া সামনের দিকে ছুঁতে দরজাটা মনে করে গাড়ি থাকিয়ে দিলো চৌধুরীর দিকে।

তার আসলো বাগ আসলো মিনির উপর। ভাবলো, নাঃ, মিনিরকে তোমার ভালোমতের ভেবেছিলুম, তাহলেই নয়।

এই পূর্বদিন সে আবার গাড়ি নিয়ে গেল আহ-কিমের লগ্নির মনে। সেদিন মিনিরকে পেলো না সে গিয়ে পৌঁছানোর আগেই মনে চলে গেল। তার পূর্বদিন আবার গেল।

সেদিনও মিনিরকে হয় হোলো না। কারণ সে আবার আহ-কিম কয়েকটি ঘোষালো লোকান থেকে।

চে শিয়াঃ সহজে হাস ছেড়ে সেওয়ার ছেলে নয়। সে আবার গেল পূর্বদিন। সেদিন সন্ধ্যায় পেলো। দেখলো তিনি আহ-কিম-এর দিকান থেকে একলা বেরিয়ে আসছে।

মিনি বানিকটা এগিয়ে যেতেই চে-শিয়াঃ গাড়িটা নিয়ে গিয়ে হাঁপাখের পাশে দাঁড় করালো। তাবশর ডাকলো “মিনি!”

মিনি ওয়াহ তার ডাকে সাড়া দেবে কিনা সে সব্বন্ধে একটু সন্দেহ ছিলো চে শিয়াঃর মনে।

কিন্তু অবাক হোলো যখন দেখলো, মিনি ঘাড় কিরিয়ে তাকে লগ্নি পূর্ব দাঁড়ালো, তাবশর আস্তে আস্তে তার গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো।

চে শিয়াঃ অবাক হোলো, খুশিও হোলো। বললো, “সেদিন তুমি আমায় না বলে গাড়ি থেকে নামে গেলে মিনি! আমি খুব দুঃখিত হয়েছিলাম।”

মিনি কোনো উত্তর দিলো না।

“কোথায় যাচ্ছে? বাড়ি? এসো, গাড়ির ভেতর উঠে এসো। তোমায় পৌঁছে দিই।”

মিনির উত্তর এলো না। কিন্তু পেছন থেকে কাঁধের উপর টোকা পড়লো।

ফিরে তাকিয়ে চে শিয়াঃ দেখে, আহ কিম এসে দাঁড়িয়েছে, গাড়ি অন্ধ পাশে।

আহ, কিম বললো, “বন্ধু, দিদির সঙ্গে বিয়ের কথা তুলবার পূর্ব যেনকে জোর করে গাড়িতে তুলে রেড রোডে হাওয়া খাওয়ার চেষ্টা করানো খুব সমর্থনযোগ্য নয়, দিনের পর দিন তার অপেক্ষায় দোকানের কাছে গাড়ি এনে দাঁড় করালোও ভালো কথা নয়। তুমি বুদ্ধিমান লোক। আশা করি এ প্রচেষ্টা ছেড়ে দেবে। যদি ছেড়ে না দাও নানারকম অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটতে পারে। আমাকে তো চেনো। এবার যেতে পারো।”

চে শিয়াঃ ভাবলো, গাড়ি থেকে নামে একটা ঘূষি বসিয়ে দিই আহ, কিমের চোরাগলে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়লো কাছই ফুটিপাথের উপর দাঁড়িয়ে আছে আরো চার-পাঁচজন চানম্যান। তাদের সে চেনে। আহ কিমের দলও লোক তারা। তাদের বীটানো খুব নিরাপদ নয়।

চে শিয়াঃ আর কোনো কথা না বলে গাড়িতে ঠাঁট দিলো। মিনি ওয়াহ আহ, কিমের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আহ, কিম হাসলো মিনির দিকে তাকিয়ে।

চে শিয়াঃ গাড়ি থাকিয়ে দিলো। খানিকটা গিয়ে মুখ কিরিয়ে দেখলো আহ, কিম আর মিনি হাত ধরাধরি করে ফুটিপাথ দিবে হেঁটে যাচ্ছে।

মিনির উপর রাগ তুলে গেল সে।

সমস্ত আকোশ এখন গিয়ে পড়লো আহ-কিমের উপর। একটা রাজনৈতিক উদ্ভ্রা তাব অনেক দিন থেকেই ছিলো। সেটা এখন ব্যক্তিগত জিয়াসহ পর্বিত হোলো। মনে মনে একটা সাম্প্রতিক সঙ্কল্প করলো সে।

তাবপর বেগিন্ত জীবিত ট্যান্ডির ভিত্তি মিশে গেল।

এই পূর্ব ভেনীনের বাড়ি যেতে বেশ বানিকটা নৈতিক সাহস সক্ষম করতে হোলো এর চে শিয়াঃকে। ব্যাপারটা ওদের বাড়িতে জানাজানি হবে, সেই সম্ভাবনা তাকে বিচলিত করলো।

অনেক ভেবে-চিন্তে একদিন টিলিকে সঙ্গে নিয়েই ওয়াহদের বাড়ি এসে উপস্থিত হোলো চে শিয়াঃ। টিলিকে আনলো এই ভেবে যে, সে সঙ্গে থাকলে ওয়াহেরা তাব উপর হস্তা বিবস্ত্র হোক না, সেটা আবেক জন মহিলায় সামনে প্রকাশ করবে না। তাছাড়া চিরদিন চাঃ বীটমতো উলসিতই হবে।

ওয়াহদের বাড়ি উপস্থিত হয়ে হাঃ চাঃ চিরেন চাঃএর কাছে খুব সাধর অলোচ্ছ্যই পেলো চে চে শিয়াঃ। ওরা বাব বাব কিজেন করলো, এখনি তাব দেখা নেই কেন?

নানা কাজে ব্যস্ত ছিলো সে—জানালো যে শিয়াং।

জেনী খুব স্বস্ত্যতার সঙ্গে গল্প করতে লাগলো টিলিং-এর সঙ্গে।

যে শিয়াং খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো মিনিও এসে যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। খুব সহজ ভাবে কথাবার্তা বলাচ্ছে, এমন কি তার সঙ্গেও যেন কোনো দ্বিধাই কিছু হয়নি।

একটু নিশ্চিত হোলো যে শিয়াং।

এমন সময় এসে উপস্থিত হোলো দিলীপ। আর সঙ্গে সঙ্গে যে শিয়াং একটি ভাবান্তর লক্ষ্য করলো জেনীর মুখে, বোটা অণুবাবন করা তার মতো বহু অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়।

যথারীতি তার সঙ্গে আর টিলিং-এর সঙ্গে দিলীপের আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

এমনি লোকটাকে যে শিয়াং-এর খাবাপ লাগলো না, কিন্তু যতো বার মনে পড়লো দিলীপকে দেখা মাইট জেনীর চোখ-মুখ বলমলো হয়ে ওঠা, ততোবারই একটা সন্দেহের জল বিঁধতে লাগলো তার মনে।

এক কীকে চিয়েন চাংকে জিজ্ঞেস করলো, “লোকটা কে?”

চিয়েন চাং খুব সতর্কতার সঙ্গে সহজ ভাবে উত্তর দিলো, “ক্যানিং স্ট্রিটে ব্যবসা করে।”

“তোমার বন্ধু?”

“বন্ধু নয়, চেনা।”

“নিশ্চয়ই খুব ভালো বন্ধু চেনা, তা নইলে বিদেশী লোক, তোমাদের বাড়িতে এত যাওয়া-আসা?”

“খুব যাওয়া-আসা নেই,” চিয়েন চাং উত্তর দিলো, “নাথো মায়ে আসে, এই পর্যন্ত। এলে কি করবো, তাড়িয়ে তো দিতে পারি না। এটা নদের দেশ। তবে হী ইজ নাইস ফেলো।”

চিয়েন চাংকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না যে শিয়াং।

একটু পরে স্ববোধ পেতে ওর ভাই স্তাং চাংকে আড়ালে ঢেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “স্তাং চাং, এটা দিলীপ লোকটা কে?”

স্তাং চাং অতো সজাগ নয়, চিয়েন চাং-এর মতো।

বললো, “দিলীপ? সে জেনীর বন্ধু। চমৎকার লোক, খুব ভালো ওয়ল্জ জানে।”

“ওকে এখানে কে এনেছে? চিয়েন চাং?”

“না, চিয়েন চাং ওকে একটুও পছন্দ করে না।” স্তাং চাং উত্তর দিলো, “ওকে জেনী এনেছে।”

বাস। যে যে শিয়াং যা জানাবার জেনে গেল।

“জেনী এনেছে? জেনী? জেনী তাহলে দিলীপের সঙ্গেই ভাব

করছে।—এবার একটু একটু করে উত্তপ্ত হতে শুরু করলো যে শিয়াং।—জেনী? জেনী ওয়াও? একটা চীনে মেয়ে? তার সঙ্গে ভাব একজন বাঙালী ছেলের সঙ্গে? কেন? কলকাতার চীনে সমায় ছেলে নেই?”

কিন্তু বেশী ভাবপ্রবণ যে শিয়াং নয়। অত্যন্ত পরিকল্পনাপ্রবণ তার মন। জেনীর ভাবনা ছেড়ে দিয়ে সে দিলীপের সখ্যে ভাবতে শুরু করলো।—নিশ্চয়ই সে খুব বড়ো ঘর বা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে নয়, যে শিয়াং ভালো, তাই যদি হতো সে কোনো বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করে ফেলতো এদিকে। চীনে মেয়ের উপর সে যখন আকৃষ্ট হতে পেরেছে তখন সে নিশ্চয়ই সে ধরনের বখাটে ফিরাদি-মন বাদ্গালী ছেলে যারা গ্যালোরী-গুয়ান, চীনা, গোলানীজ এদের মধ্যে বন্ধু খুঁজে বেড়ায়। না, এর ব্যবস্থা করা খুব শক্ত হবে না, স্থির করলো যে শিয়াং।

খুব হাসিমুখে আবার ওদের মধ্যে গিয়ে বসলো সে। মন খুলে নানানবন্ধন গল্প কাঁদলো সবার সঙ্গে, বিশেষ করে দিলীপের সঙ্গে। দিলীপের মুখ দেখে মনে হোলো তারও বেশ লাগছে যে শিয়াংকে। টিলিংও খুব সহজ হয়ে গেল দিলীপের সঙ্গে। দিলীপ এমনি স্নেহ বসিক লোক! নানানবন্ধন চুটকি গল্প বলতে ওস্তাদ; তার মুখ নানানবন্ধন সব গল্প শুনে প্রচুর হাসলো সবাই, যতো না হাসবার তার চাইতে বেশী হাসলো কে যে শিয়াং আর তার বোন টিলিং।

কিছুক্ষণ পর টিলিং বললো, এবার তাকে যেতে হবে। কে যে শিয়াং উঠে দাঁড়ালো। তারপর দিলীপকে বললো, “তুমিও যাবে না কি আমাদের সঙ্গে? তোমার তাহলে বাড়িতে নামিয়ে আসতে পারি।”

“না, ধন্যবাদ, আমি আরো কিছুক্ষণ আছি,” দিলীপ উত্তর দিলো। তখন কে যে শিয়াং বললো, “কাল সন্ধ্যাবেলা কী করছে? যদি কোনো কাজ না থাকে তো আমাদের বাড়ি এসো। একসঙ্গে বসে একটু জ্বিক্স করা যাবে।”

দিলীপ সানন্দে বাজী হোলো। এ ধরনের আমন্ত্রণ সে কখনো প্রত্যাখ্যান করে না। কিন্তু বিষম হোলো জেনীর মুখ। আর আতঙ্ক জাগলো চিয়েন চাং-এর চোখে, যখন শুনলো টিলিং বলছে, “দিলীপ, আমি কিন্তু বসে থাকবো তোমার জন্তে।”

তার পরদিন দিলীপ গেল যে শিয়াং-এর ফ্ল্যাটে।

গিয়ে দেখলো, যে শিয়াং নেই। কি একটা কাজে যেন বাইরে গেছে। আসতে একটু দেরি হলে, দিলীপকে বসতে বলে গেছে।

বাড়িতে টিলিং একা, সে মিস্ত্রি হেসে দিলীপকে ভেতরে নিয়ে বসালো।

[ ক্রমশঃ ]

“The painter’s mind must of necessity enter into nature’s mind in order to act as an interpreter between nature and art, it must be able to expound the causes of the manifestations of her laws....”

—Leonardo Da Vinci.



স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে প্রস্তুত  
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

ঠাকুরের ভবিষ্যৎ কল্পনায় যিনি চালনা করবেন, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাদের যিনি প্রেরণা দেন, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে তাঁকে তাঁরই সম্ভাবনাদের হাতে সঁপে দেবার যেন স্বযোগ হয়েছিল ঐ দীর্ঘ রোগশয্যাটিতে শুয়ে। এই স্বদীর্ঘ রোগশয্যাটি তাঁকে সাহায্য করেছিল সারদা দেবীর প্রকৃত রূপটি ভক্তদের চোখে ফুটিয়ে তুলতে, তাঁর লুক্কায়িত জীবন থেকে সর্বসমক্ষে তাঁকে টেনে আনতে। নতুন নহবংখানার বেড়ার আড়ালে ঐ অপরিচরিত ছোট্ট কুঠুরীখানাতে যে ভাবে তিনি আত্মগোপন করে থাকবার প্রয়াস পেতেন, ঠাকুরের দেহাবসানের পর তাঁর কথা কেউ জানতেও পারতো না।

আজকের সারাটি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম ও মন্দির, তার বাজটুকু নিহিত ছিল ঐ দীর্ঘ রোগভোগ জনিত ঠাকুরের কষ্টবিদূষণে সমভাবে চেষ্টিত উম্মুখ ভক্ত সম্ভান কয়েকটি এবং সারদা দেবীকে এই অবসরে এক নিবিড় শ্রদ্ধার নিগড়ে বেঁধে দেওয়ার মধ্যে।

আজ ভগবান পরমহংসদের সশরীরে বর্তমান নেই, এবং সারদা দেবীও তাঁর নশ্বর দেহে জীবিতা নেই। কিন্তু যে মহান শিক্ষা তাঁদের জীবনার্শে রয়ে গেছে, আজকের দিনে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন তারই ঘরে ঘরে প্রচার ও তারই আলোচনা। আমাদের পতনোন্মুখ জাতিকে রক্ষা করার অপর কোন অস্ত্র নেই।

সারদা দেবীর শিক্ষা ছিল 'মাহুয় যখন অপরের ক্রটি দেখে তখনই সে নিজেকে কলুষিত করে ফেলে। অস্ত্রের দোষ দেখে তার লাভ কি হয়? শুধু নিজেকেই ক্ষত-বিক্ষত করে শুধু সে নিজেকে। অস্ত্রের দোষ দেখতে দেখতে তাদের দোষ ছাড়া পরে আর কিছুই তার চোখে পড়তে চায় না।'

ছিল না। অস্ত্র দিয়ে নিজেও তিনি তা পালন করতেন। তিনি নিজে অপরের দোষ বড় একটা দেখতে পেতেন না। দেবমন্দির প্রার্থনাকালে তিনি বলতেন, তাঁর চোখে যেন কারুর দোষ-ক্রটি ন পড়ে। সত্য সত্যই তাঁর এ প্রার্থনা বিফলে যেতো না।

আজ সমস্ত ইয়োরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর অপর প্রান্তে খ্রীশ্রীসারদা দেবীর পুণ্যস্থতির আয়োজন চলছে। তাঁর সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনার্শে যে দেবীশক্তির বিকাশ ঘটেছিল তা দেশের দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত উদ্ধাম নরনারীসম্মিষ্ট মাতৃমন্ড্রে দীক্ষিত করার প্রয়োজন এসেছে।

আমরা ভারতবাসীরা সেই মায়েরই সম্ভান হয়ে দেশের ও পবিত্র আদর্শকে হারাতে বসেছি, তা কি তাঁর জীবনকাহিনী আলোচনা করলে আবার কিরে পাবো না? ভারতীয় নারী আর পরামুর্করণের ফলে পাশ্চাত্য উগ্র স্বাধীনতার মোতে তাদের বিলাস ব্যসনের আকর্ষণে পথভ্রষ্ট হতে চলেছে, আপন গৃহ সসারের শান্তি আশ্রয় যে ধর্ম ও সংস্কৃতি, তাকে তুলতে বসেছে! ভারতের যেকোনো কিছু নিজস্ব সম্পদ তাকে অবহেলা করে শান্তিনাশক অন্ধ অসার বস্তুর পিছনে জলন্ত আগুনের মুখে পতনের মতই দ্রুত আকর্ষণে ছুটে চলেছে।

আমরা হয়তো ভারতে পারি, পরম শঙ্কো সারদা দেবী অনাস্বাদ্য হলেই জন্মেছিলেন। তাঁকে অতুর্করণ বা অনুসরণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তা ভেবে নিশ্চেষ্ট থাকলে তাই প্রবন্ধনাই হবে।

সারদা দেবীর জীবনের প্রারম্ভ থেকে অবসান পর্যন্ত আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই—তিনি সাধারণের চেয়েও সাধারণ ছিলেন। অতি সাধারণ ঘরে তাঁর জন্ম; সাধারণ ভাবে জীবনযাপন সাধারণের সাথে মেলানোশা বা সঙ্গ। তাঁর অশন বসন ভূষণ সব সাধারণ। অসাধারণের কিছুই দেখা যায় না। কেবলমাত্র তাঁর সহিষ্ণুতা ক্ষমা সেবাপরায়ণতা এবং অপরিচরিত স্নেহশীলতা ও কল্যাণ নিষ্ঠার দ্বারাই তিনি অসাধারণ হয়ে পৌছতে পেরেছিলেন।

কাজেই অসাধারণের মোহ বর্জন করে প্রয়োজনের ডাকে সাৎ দিয়ে অস্ত্র-ঐর্ষ্যে ও চরিত্রমার্গের দিকে তাকাদৃষ্টি রেখে দল নিধনী ও ছোট-বড় ভেদাভেদ তুলে শত গৌরবের মধ্যেও নিজের পরাধীন বোধ না করে শত দাবিত্যের মধ্যেও নিজেকে হুংখী বোধ না করে নির্লিপ্ত শান্ত ও তৃপ্ত ভাবে চলার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সাধারণত্ব থেকে অসাধারণত্ব পৌছাবার মূল তথ্য। আর মানব থেকে দেবত্ব আরোহণের পথ। সেই পথেরই নির্দেশ আমরা পাই পরম-স্বাধার্যা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মধ্যে। নতুন তাঁর মত আমাদের মত কী-ই না সাধারণ ছিল?

আগেই বলা হ'ল, কত সাধারণ ঘরে তাঁর জন্ম, কত সাধারণ কর্মে তিনি অভ্যস্ত। যে কোন আনন্দে আনন্দ প্রকাশ, দুঃখে দুঃখবোধ; স্নেহে বিগলিতা ভাব, অজ্ঞানে কটোবতা, সবই তাঁর সাধারণের মত। অতি সাধারণের মতই স্বামিসমন্বয় তিনি ব্যাকুলিতা, স্বামিসেবায় পুলকিতা। আবার পালিতা কণ্ঠা রাগ প্রতি অহরহিত ও স্নেহ প্রকাশেও দেখতে পাই তিনি কত সাধারণ!

সারদা মায়ের আশীর্ষক জীবনযাপন এতই আমাদের সর্বসাধারণের মত সাধারণ যে, তিনি যেন আমাদেরই সঙ্গে মিশে মিশে এক হয়ে আছেন। তাঁকে আমরা বৌদীতে বসিয়ে পণ্ডিত

শ্রদ্ধা পাত্রী বলে পূজা করতাই শুধু চাই না, আমরা তাঁকে মস্তুরের অন্তরতম রূপটিতেই ঘেন পাই। অন্তরতম ভাবে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করার স্বযোগ পেয়েই আমরা বিচার করতে পারি, কিসে তিনি সব কিছুতেই আমাদের মত এত সাধারণ হয়েও দেবীপদবাচ্য হয়ে এমন অসাধারণকে পৌছতে পেরেছিলেন?

এই বিচারে প্রথমেই চোখে পড়ে, সাধারণের মত স্বামিসম্পর্কনে যাকুলিতা হলেও সাধারণের মত স্বাধীনসম্পর্কযুক্ত হয়ে স্বামীকে একান্ত নিজস্ব করে অধিকার করতে তিনি কখনো উন্মুখ ছিলেন না। স্বামী তাঁর প্রিয়তম ছিলেন বটে, তাঁর অন্তরের অন্তরতম ধ্যানের দেবতা তাঁর ইষ্টদেব ছিলেন। তাঁর সেবা, তাঁর যত্ন তাঁর স্বধন-স্ববিধার তত্ত্বাবধান, তাঁরই ধ্যান, তাঁরই চিন্তা, তাঁরদা দেবীর জীবনে অস্থগণের সাধা ছিল। স্বামীর আদেশে নিজেকে গড়ে তোলা, তাঁরই ভাবে ভারিত হওয়া, তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। স্বামীকে সেবা করা, কাছে পেতে চাওয়া, স্বীকৃতি হিসাবে তাঁর আন্তরিক কামনা হলেও সে অধিকারকে তিনি অন্যায়সে অপরের হাতে তুলে দিয়ে ছুটিচটে থাকতে পারতেন। এসব ক্ষেত্রেই তিনি সাধারণ থেকে অসাধারণের এক ধাপে উঠতে পেরেছিলেন। সন্তোষই ছিল তাঁর 'অভ্যুদয়ম্ স্বপ্নম্'। যা কিছু পাবার হাঁস আকাঙ্ক্ষা ছিল তার অভাবে

কখনোই তাঁকে মনের প্রকৃষ্টতা হারাতে বা অপবকে দায়ী করতে শোনা যায়নি। স্বকৃত পুণ্যার্জনে প্রাপ্তি এবং পুণ্যের অভাবে হারানো এই বিচারে তিনি তুষ্ট হ'তেন।

কল্যা, ভগিনী দ্বী ও মাহুরূপে নারীর যে করাট মহিমময়ী রূপ আমরা জানি, অতি সাধারণ পরিবেশের মধ্য থেকে আপনি ব্যক্তিগত চারিত্রিক মহিমায় ও অপরিমীম মনোবলে তিনি সে সব করাটিতেই কি ভাবে অসাধারণ পরিচয় দিয়েছিলেন তা আমরা দেখেছি। সাধারণের মত বিন্দুমাত্র স্বাধীনগতও তাঁকে তাঁর কোন একটি রূপেই সাধারণ গণ্ডিতে আটকে রাখতে পারেনি। এই ছিল তাঁর অসাধারণের পৌছবার মূল মন্ত্র।

সাবদা দেবী ছিলেন ভ্যাগের প্রতিবর্তী। তার সঙ্গে সন্তুষ্টিতা ধর্ম ও ককর্ণা তাঁকে এক অপকল্প রূপ দিয়ে মাহুরের মনে ভগবতীর আসনে স্থান দিয়েছিল। ভারতীয় নারীশক্তির আদর্শই তাঁর জীবনযাত্রার পাতায় পাতায় ভরা।

পৃথিবীতে তো অনেক সাম্রাজ্যবাহী রাজ্যশাসন করে শ্রবণীয়া হয়ে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে অশিক্ষিতা লজ্জাশীলা অবগুষ্ঠনবতী দারিদ্র্যপিষ্টা পল্লারমণী সাবদা দেবীর তুলনা হয় না। সেই সব মহৎকুলশীলোদ্ভবা রাজারা সকলেই শ্রবণীয়া সন্দেহ নাই কিন্তু

## মনের কথা

“এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?”

“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়েছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের কৃতিজ্ঞান, সততা ও দক্ষিণবোধে আমরা সবাই খুশী হয়েছি।”

# মুখার্জী জুয়েলার্স

নিম্ন সোনার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-স্বকল্পী  
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



আমাদের মা সারদা দেবী শুধু মরগীয়াই ন'ন, তিনি সকলের মরগীয়া, বন্দনোয়া, বরগীয়া ও নমস্তা।

তারা অভিজাতবংশে জন্মগ্রহণ করে, ঐশ্বর্যবিলাসে প্রতিপালিতা হয়ে, স্বর্ণসিংহাসনে আরোহণ করে, প্রজারই ঐশ্বর্যে প্রজাদের প্রতিপালন করে গৌরব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সারদা দেবী সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করে দারিদ্র্যচ্ছায়ায় পিষ্টা হয়ে জীবনের অধিকাংশ সময় নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রেখেও একমাত্র উদার হৃদয় বিখ্যাত সেবাপরায়ণতা ও আত্মবিলোপের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অগণিত লোকের মনঃসিংহাসনে অবিরোধন করেছিলেন।

দারিদ্র্যপিষ্টা লজ্জাশীলা একটি পল্লীবালিকা, মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে যে সেবা ও আত্মদানের ব্রত নিয়ে দক্ষিণেখরে স্বামীর কাছে এসেছিলেন, উত্তরকালে দেবীরূপে সম্বন্ধিত হয়েও সে সেবাব্রত থেকে বিপদমুক্ত ও বিদ্যাত হ'ননি। তাঁকে আমরা শেষজীবন পর্যন্ত অভিনামশুল্ক আত্মোৎসর্গীকৃত সেবানিরতা জগজ্জননীর মত অপার্থিব স্নেহে প্রেমে ধনী নির্ধনী উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সমজ্ঞানে ব্যবহার করে যে সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী হতে দেখতে পাই, তা পৃথিবীর সকল রাজমহিষীর রাজসম্মানকেও ছাড়িয়ে যায়।

আপন অন্তরের ঐশ্বর্য সারদা দেবী কখনো প্রচার করেননি। বরং সঙ্কোচ ও দৈন্তের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হ'তেন। আগুন যেমন ছাইচাপা থাকে না, তেমনি তাঁর মহিমাও লুকিয়ে থাকেনি। আপনি ফুটে বর হয়েছেন। শুধু তাই নয়, ভক্তসদয় ছাড়িয়েও সর্বসাধারণের মধ্যে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

আধুনিক উগ্রস্বাধীনতার যুগে সারদা দেবীর পবিত্র জীবন কাহিনীর বহুল ও ব্যাপক প্রচার হ'লে আমরা ভারতীয়া নারী ব্যুত্বে পারি যে, স্বাধীনতার বা প্রকৃত রূপ তা কোনকালেও কোন আবরণেই ঢাকা থাকেনি ও থাকতে পারে না। তথাকথিত চরম পরাধীন ও কুসংস্কারপূর্ণ গোঁড়ামীর যুগে অবগুণ্ঠনের আড়ালেও ক্রীষ্টীয়ারদা দেবীর যে স্বাধীন স্বতন্ত্র রূপখানি আমাদের চোখে পড়ে, সারা বিশ্বে তা অনুকরণীয় ও আকাঙ্ক্ষনীয়।

সারদা দেবীকে লড়াই করে এ ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন করতে হয়নি। অন্তরের ঐশ্বর্যের সাথে শরীরে মহান বন্ধনই তাঁকে দেশকালের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে এ স্বাধীন রূপখানি দিয়েছিল। এ স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা আজকের যুগের প্রগতি যুগের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা থেকে সম্পূর্ণই পৃথক। তাতে কোন উগ্রতার লেশমাত্র নাই, আত্মপ্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা নাই, সবল মন প্রকাশেরও কোন দাবী নাই। তাতে আছে শুধু সহজ সলজ্জ প্রাণবন্ত একটি গতি, ঐকান্তিক আত্মোৎসর্গীকৃত নিপুণ সেবা, পরম পরিচরিতা-মাতুল্যেব এবং অপূর্ণ তাগ, ক্ষমা ধৈর্য ও পরদোষামুদর্শিতার একান্ত অভাব। সর্বোপরি নিরহঙ্কার ও নিরভিমানযুক্ত একটি দীনভাব।

সারদা দেবী তাঁর অমর জীবন বাপন করে আগত অনাগত সকলের জন্য তাঁর সরল অনাড়ম্বর ও শিক্ষাতথ্যপূর্ণ জীবনবাণন কাহিনী ও অমর বাণী রেখে ২০শে জুলাই ১৯২০, বাল্য ঠাঠা শ্রাবণ ২৩২৭ সনের মঙ্গলবার তাঁর নম্বরদেহ ত্যাগ করে ভগবান রামকৃষ্ণের সঙ্গে চির-মিলিতা হ'ন।

জনসাধারণের প্রতি তাঁর অন্তিম-বাণী ছিল 'বদি মনের শান্তি

কাম্য হয়, অন্তের দোষামুদর্শী হ'য়ো না। বরং নিজের দোষ দেখে গোটা পৃথিবীকে আপন করতে শেখো। এখানে কেউ পর নয় এই পৃথিবী তোমাদেরই একান্ত নিজের।'

তাঁর বাণী এমনই উদার ও বিশাল যে, এর আশ্রয়ে সকল সমভাবে শরণ নিতে পারে। এখানে নানা জাতি, নানা ব নানা আচার নানা ধর্ম বা নানা বিচারের কোন জায়গা নাই খালি আছে সব কিছুকে মিলিয়ে এক মহামানবতা। এক স্বর্গ অক্ষরন্ত প্রেমসমুদ্র। যার অবগাহনে সত্ত মুক্তি স্তম্ভিষ্ঠ। লক্ষ্য মোক্ষ। কণ্ঠ—সেবা। বন্ধন—ধর্ম।

## শেষ

## বর্ষগান্তে

## রাণী দেবী

থেমে গেছে বর্ষ গন্তীর গর্জন,

খমখমে পল্লব সিক্ত।

স্তব্ধ স্বনন সন ক্রান্ত প্রভজন,

এলো অবগুণ্ঠনে নিশীথিনী নোপবনে,

চুরি করে নিখিলের গুণন।

মঞ্জীর চরণে মৃদু মৃদু গমনে,

এলো এঁকে আঁখিকোণে অঞ্জন।

হেসে ওঠে চন্দ্রমা লজ্জিত হ'লো অমা,

ব্রহ্মে লুকালো যত কালিমা।

পুঞ্জিত কালো মেঘে অধর ছিল ঢেকে,

চকিতে খচিত হলো নীলিমা।

বিশ্বয়ে দেখি চেয়ে বিশ্ব আলোয়ে ছেয়ে,

গলানো রূপোর ঘেন বহা।

ঝলমল তরুদল কিরণে সমুজ্জল,

সজল মুখিকা হলো ধলা।

## বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

স্মৃতির একঘেয়ে বাধাধরা জীবনের মাঝে হঠাৎ এলো বিা ভাবের ঝড়। অসীমের আবির্ভাব তার জীবনে যে অপ্রত্যাশিত, তেমনি রোমাঞ্চকর।

চৈত্রের মধুর সন্ধ্যাকাল। নিজের ঘরে বসে স্মৃতি তানপুরা সুর দিয়ে বসন্তরাগের আলাপ শুরু করেছে। সামনে তার সদ্য শিক্ষক ওস্তাদ আনোয়ার খাঁ উপবিষ্ট। করবীও উপস্থিত ছিল সেখানে, স্মৃতির গান শেষ হলে তারাই শুরু হবে।

কোনো খবর না দিয়েই অসীম প্রবেশ করলো ঘরে। স্মৃতি হঠাৎ ওকে দেখে গান থামিয়ে দেয়; বসে থাকে মুখ নীচু করে



তত্ত্ব তানপুরার বৃক্কে জাগিয়ে রাখে সুরের মূহু বন্ধার। যেত গোলাপের মত ওর দুটো গণ্ডে ছড়িয়ে পড়লো লজ্জাকণ্ণ অভা।

করবী উঠে দাঁড়িয়ে সহান্তে বলে—কি সোভাগ্য! অন্তর, আনন্দ!...ও কি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বহন।

অসীম সোঁকায় গা এলিয়ে দিয়ে একটি সিগারেট ধরায়। তার পর বলে, গান থামালে কেন স্তমিতা? বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম তোমার গান, ভারি চমৎকার লাগছিলো, আমাকে দেখলে গান থেমে যাবে জানলে, বাইরেই থাকতাম।

তরুণ ওস্তাদ আনোয়ার, একটা বক্স কটাক্স নিষ্কেপ করে দেখলো এ বাড়ীর নতুন আগন্তুককে। তার পর ছাত্রীর দিকে চেয়ে বলে,—আজ-কাল গান আপনাদের মোটেই মনোযোগ নেই স্তমিতা দেবি! এ বক্স গান্ধিলি যদি আপনি করেন তো আমি কি করতে পারি? আপনাদের দিদিমাকে কৈফিয়ত তো আমাকেই দিতে হবে?

মুহু হেসে সে কথার জবাব দেয় করবী,—ওর সোঁষ নেই ওস্তাদজী! নানা একেই খারাপ ছিল, তার ওপর ওর বাবা চলে যাওয়াতে আরো বিমর্শ হয়ে গেছে। আরো দু-চার দিন যেতে দিন, আবার দর টিক হয়ে যাবে। নে মিতা, গানটা শেষ কর।

আবার গান শুরু করলো স্তমিতা। কিন্তু হারানো সুরকে কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারলো না। বাবে বাবে সুরের ছন্দপতন ঘটতে লাগলো।

বড় অস্বস্তি বোধ করছিলো সে। অসীমের শাবিত ছুরির মত চোখ দুটো দিয়ে তত্ত্ব অভা যেন ঠিকের পড়ছিলো ওর মুখের ওপর। কোনো বক্সে সে গান শেষ করে তানপুরাটা নামিয়ে রাখলো। বক্স সেটি তুলে নিয়ে গানের জগ্না নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে বসলো।

অসম স্তমিতার দিকে চেয়ে বললো—তোমার চেহারা দেখছি ভারি খারাপ হয়ে গেছে মিতা, অস্বস্থ-বিস্থ করেনি তো? তোমার বাবা তোমার তত্ত্বাবধানের ভার আমার ওপর দিয়ে গেছেন, সে কাজ তো এখন থেকে আমাদেরই করতে হবে।

স্তমিতা মুহু কণ্ঠে বলে—আমি ভালোই আছি।

অসম উঠে দাঁড়িয়ে ওকে বলে—এসো না, তোমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি মিতা! বেশ মেঘলা দিনটা আছে। বাইরের হাওয়া-বাতাস লাগলে শরীরমন দুটোই তাজা হবে। দিন-রাত বাড়ীতে আবদ্ধ থাকলে ও-দুটো জড়লাবাপন্ন হয়ে যায়।

চোখ তুলে চায় স্তমিতা অসীমের দিকে। কি ছিলো ওর চোখ দুটোতে? বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রভাব! পুরুষের আকর্ষণ?

অসীম আবার ডাকে—দেবী কোরো না মিতা, চলে এস।

সে ডাকে ছিলো আদেশের সুর। সে আদেশ লঙ্ঘন করবার শক্তি স্তমিতার ছিল না। ধাঁ, মনে মনে সে-ও চাইছিলো, বাড়ীর অব্যাহতি সঙ্গ ও আবহাওয়া থেকে কিছুটা সময় পালিয়ে থাকতে।

চট করে শাড়ীটা পাঁটে নাও মিতা!

কুণ্ঠিত পদে দু-চার পা আগ্রসর হয়ে থমকে দাঁড়ায় স্তমিতা, নিজের শাড়ীর আল্টাটা ধরে নাড়া-চাড়া করে। শাড়ী পাঁটাবে? না থাক, দিদিমা গেছেন মার্কেটে; যদি ফিরে আসেন তাহলে? এতটা হুসান্স দেখানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

—কি হল? কাঁপড় ছাড়বে না? বেশ তো, কোনো প্রয়োজন নেই। বেশ চমৎকার আসমানী শাড়ী তো রয়েছে তোমার পরনে, এতেই মানিয়েছে তোমাকে বিউটিফুল। এসো, আর দেবো নয়। করবীর দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করে অসীমের সঙ্গে বেরিয়ে যায় স্তমিতা।

করবীর বিস্মারিত দৃষ্টি ছিলো ওদের গতিপথ পানে। বার্থতার দ্বানি বৃক্কের ভেতর ওমরে উঠছিলো, পরাজয়ের হতাশা চোখে-মুখে!

সমস্ত রাগ নিষ্কেপ করলো মায়ে ওপর। সেই কোন দুপুরে যে বেরিয়েছেন, বাড়ী ফেরবার নামটিও নেই! তিনি স্তমুখে থাকলে, মিতা ওকে কলা দেখিয়ে একলা অমন করে কি যেতে পারতো অসীমের সঙ্গে?

—আর মিতাই বা কি ধরনের বেহায়া মেয়ে? হলেই বা স্তদামের কাকা! বয়সে তো এমন কিছু বড় নয়? একবার তু করে ডাকলেই কি ছুটে যেতে হয়? বোকা মেয়েটার কবে যে একটু বুদ্ধি-সুস্থি হবে!

কাটা ঘায়ে ওর আবার মুগ্ধ ছিটিয়ে দিলো ওস্তাদ আনোয়ার ঠা। —আর মিথ্যে বসে থেকে লাভ কি করবী দেবি! গান আরম্ভ করুন। কিছু মনে করবেন না; বলছি যে স্তমিতা দেবী হঠাৎ ওর সঙ্গে বাইরে গেলেন, ব্যাপারটা যেন ভালো ঠেকলো না আমার চোখে। মানে আপনাকেও তো সঙ্গে নেওয়া যেতো।

আহতা ফণিনীর মত কঁঁস করে উঠলো করবী—আপনি আমাকে কি এতই অপদার্থ ভাবেন ওস্তাদজী? যে একবার তু করে ডাক দিলেই আমি ছুটে যেতাম ওদের সঙ্গে? নিজের ভালোমন্দ বোঝবার মত যথেষ্ট বয়েস হয়েছে মিতার; সে বিষয়ে আর আমাদের মতামত প্রকাশ করা অবাস্তব।

তানপুরায় মনোযোগ দেয় করবী। কিন্তু সেটাও যেন আজ বিগড়েছে। সুরটা যেন কেমন বেতলা। সব সমস্তার মীমাংসা করলেন মায়া দেবী। চট-পট চটির শব্দ তুলে, সওদা-করা এক বোকা জিনিষ নিয়ে ঘরে ঢুকে, ইফাতে ইফাতে সোঁকায় বসে পড়লেন।

মাখন, জেলি, কেক, বিস্কুট, চকোলেট তার সঙ্গে স্নো, পাউডার, আরো কত কি, একটির পর একটি বাগ থেকে বার করে টেবিলে সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—মিতা কোথায় বে রুবি? ডাক তো তাকে। আহা বাপ চলে গিয়ে মেয়েটা বউ মনমরা হয়ে গেছে।

ঠোট উটে জবাব দেয় করবী—সে একটু সান্দা ভ্রমণে বেরিয়েছে, অসীম বাবুর সঙ্গে।

—ও মা, সে কি কথা গো? দিদিমা বিষয়ে গালে হাত দেন।

—আর তুই তো বাছা মরা মানুষ নোস, ওকে একলা যেতে দিলি কেন তার সঙ্গে? নিজেও যেতে পারলি না? \*তোকে আর কত শেখাবো বাছা?

ছিলোছেঁড়া ধমুকের মত ছিটকে উঠে সোঁজা হয়ে দাঁড়ায় করবী। তিন্তু কণ্ঠে বলে, তোমরা সকলেই আমাকে কি ভেবেছো বল তো মা? আমার রূপ নেই বলে কি আত্মসম্মান বলেও কিছু নেই? অসীম বাবু মিতাকে ডাকলেন সঙ্গে যাবার জন্তে; আমার সঙ্গে একটা কথা বলাবও প্রয়োজন বোধ করলেন না! আর আমি কি না যেতে যাবো তার সঙ্গে? কেন? কিসের জগ্না এত হীনতা স্বীকার করবো বলতে পারো?

‘তুমুল বড়ের পূর্ব নিশানা দেখে উঠে দাঁড়ায় শুভদ্র আনোয়ার।  
মায়া দেবীকে নমস্কার জানিয়ে দ্রুত পদে পালায় ঘর থেকে। শীকার  
হস্তচ্যুত হওয়াতে মায়া দেবীও ধৈর্য হারিয়েছিলেন, চিংকার করে  
বললেন—কিসের জন্তে জানো না?—এত দিন ধরে বড়লোকের  
বাড়ীর পাটিতে, জলসায় তোমাকে নিয়ে কত ঘোরাত্মক করলাম;  
বাড়ীতে কত ছেলে ধরে নিয়ে এসে মুঠো-মুঠো পরের টাকা খরচা  
করে চায়ের মজলিশ বসালাম।

সম্ভতার নাম করে এক গুণ্ডা মাঠার রেখেছি নাচে, গান, সব  
বিষয়ে তোকে এরিষ্টোক্রট করে তোলবার জন্তে! সব কি আমার  
ভয়ে ঘি ঢালা হল? আজ পর্যন্ত তার ফল দেখা দূরে থাকু  
একটা কুঁড়িরও নাম-গন্ধ নেই?

ছি! ছি! কি যেনা! কি যেনা! বাগে মুখমণ্ডল তাঁর  
স্বস্তিমবর্ণ! স্বাস্থ্যবাসের গতি অস্বাভাবিক, ঘণ্টাক্ত কলবর।

চৌচামেচি শুনে অনিল কখন এসে দাঁড়িয়েছিলেন ঘরে,  
নিশাঙ্ক স্তন ছিলো মায়ের প্রলোপাঙ্কিতলো। শাস্তকণ্ঠ বলে সে,—  
আহা এত চৌচামেচি করাছো কেন মা?

দোষটা কি করির? সে তো চোরাটা পেয়েছে তোমারই মত!  
তাকে ঘবে-মেজে, নাচিয়ে গাইয়ে তো একটা অপরাধ কিছু করতে  
পারবে না। বড়দির ছিলো বারবার মত রূপ, সেজন্তে তাকে  
বড়লোকের বাড়ী বিয়ে দিতে বেগ পেতে হয়নি! সব মেয়েরই যে  
এককম ঘরে বিয়ে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই?

আমাকে বলে না—কত পাত্তর চাই তোমার? আমাদের মত  
মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে অনেক পাওয়া যাবে। ও সব রাজা-উজির,  
জজ-বারিষ্টার ছুঁবে না, ওর জন্তে আর মাথা ঘামিও না।

মায়া দেবীর জোষবহিতে ঘেন ঘুতাহতি পড়লো! কোমরে  
হাত দিয়ে, সপ্তমে কণ্ঠ চড়িয়ে বললেন—বাটে! কত হাতি গেলো  
তল, এখন ফড়ি বলে আমার এক হাঁটু জল!

এই আজ থেকে আমি চুপ করলাম, দেখি তোমাদের ভাই-  
বোনের দৌড়টা। জামাইয়ের পয়সায় নবাবী আর কত দিন চলবে?  
এবার আসছে তার আসল মালিক। নিজের চার খুঁটে খেতে শোখো।  
আমি তো ঢের করলাম—ঘাটে কিছু বৃদ্ধি ছিলো, বড় বড় ঘরের  
সঙ্গে মেলাসেবা করবার মত ক্ষমতা আর শিক্ষা ছিল, তাই রাজ-হাঙ্গ  
রাখতে পেরেছিলাম তোমাদের। বাপ তো বেশ গিসেছিলো অষ্টরঙা।  
সফলর মধ্যে তো ঐ বাড়ীখানি। তা জামাইটাকে এত চেষ্টা করলাম  
বশে আনবার, সে কি আমার স্বপ্নের জন্তে? ঐ পোড়াকপালীটা  
যদি ঠিক মত আমায় কথা মেনে চলতো, তবে সোমনাথ তো কোন  
ছাত্র—স্বয়ং বিশ্বাসিয়ারে ধ্যান ভাঙিয়ে আমি ছাড়তুম। দু’চার দিন  
চেষ্টা করে উনি দিলেন রণ ভঙ্গ! তার পর কোথায় ক্লাব কোথায়  
লেক—হাতো সব হাবাতে ঘরের ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে দিন-রাত ঠৈ-  
চৈ করে বেড়াতে লাগলেন! তা পারলি একটা কুই-কাতলা গোছের  
কিছু গাঁথতে? তাহলে বুঝতুম ক্যামতাতা।

জোড়হাত করে কামান্ডিরা গলায় বলে করবী!—চুপ করে মা,  
ঢের বলেছো এবারে থামো! জামাই বাবুর পয়সায় রাজভোগ আর  
—সব করবো নেই; নাচ-গানও আজ থেকে আমার শেষ হল।

দোহাই তোমার মা! আর আমার জন্তে তুমি ভেবো না! আমার নিজের  
উপায় আমি নিজেই করতে পারবো। আরো জেনে রাখো,—তোমার ঐ  
কট-কাংলা ধরার পদ্ধতিটাকে আমি ঘূর্ণা করি। ও কাজ আমার দ্বার  
হবে না... তবে না... খড়ের মত ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো করবী!

অনিল বিশ্বজব্বা দু’চোখ মাঝ দিকে মেলে দিয়ে বুললো—আজ  
তুমি এসব কি বলছো মা? বাবা কি রেখে গেছেন, কিসা দিন  
চলছে আমাদের, সে কথা কি কোন দিন জানতে দিয়েছো আমাদের?  
আর জামাই বাবুর বাড়ীতেই বা কেন আমাদের এনেছো? এত  
ক্লিমিত্তা করবার শিক্ষা তো তোমার কাছেই পেয়েছি আমরা!  
আমাদের অবস্থামাফিক্ চাল-চলন কেন শোখাও নি আমাদের? কার  
হয়ে মনুষ্যপুঞ্জ ধারণের এ বিড়ম্বনা ভোগ কেন?

যাক যা হবার তা হয়ে গেছে। লেখাপড়া যখন শিখেছি  
পেট চালাবার উপায় একটা হবেই। বাগের মাথায় সতি কথাগুলো  
বলে ফেলে আজ উপকারই করলে আমাদের। চঞ্চল পাদ ঘর  
থেকে বেরিয়ে যায় অনিল।

আয়েজগিরির অগ্র্যুৎপাত শেষ হয়েছে। এবার ভয়ে আর  
তপ্তজল দ্রবণের পালা।

সোফায় বসে নিজের হঠকাতিবার জন্তা নিজেকে বারবার থিকার  
দিলেন মায়া দেবী। অমৃতপাণ্ড-ভয়ে ক্রোদন্ত অন্তর। দু’চোখে  
নেমেছে তপ্ত অশ্রুধারা।

হায়! হঠাৎ এ কি নিবৃদ্ধিতার পরিচয় দিলেন তিনি? এত  
দৈর্ঘ্যচ্যুতি এর আগে তো আর কখনও ঘটনি তাঁর জীবনে?

কত বাধা-বিপত্তি, বড়-কাপটা তো বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে  
অসীম ধৈর্য, অধ্যবসায় বলে বরাবর জীবনযুদ্ধে জয়মাল্যই যে  
এসেছে তাঁর ভাণ্ডো?

তা-না হলে, বিলেন্সফের বড় ব্যারিষ্টারের শিক্ষিতা মেয়ে হা  
একটা পশাবহীন উকিলের সঙ্গে ঘর করা কি সাধারণ কথা? ক  
বৃদ্ধি খাটিয়ে তার বাইরের পালিশটা বজায় রাখতে হয়েছিলো—  
সেজন্তেই তো এক পর্যায়ে জন্মানো সম্ভব হয়নি—বিশিষ্ট কেতাহর  
সমাজে তা না হলে আনাগোণা করা সম্ভব হতো?—বাইট  
জীকজমক দেখে তার কখনও বুঝতে পেরেছে যে মাল্লখটার মা  
আয় সাত আট শোর বেশী নয়?

এর ওপর আবার কর্তা গিয়ে তাও যখন বন্ধ হয়ে গেলে  
হেতনার জ্যাট থেকে, বাড়ীখানা ভাড়া দিয়ে কি লজ্জায় ছি-  
কটা বছর। তবুতো তখন বড় মেয়ের গোপন সাহায্য ছিলো,—নি  
সেই অনানুগোণা বিধাতা পুরুষ যে তাঁর একটু স্বর্থ দেখলেই  
চড়চড়িয়ে মরেন, তা-নাহলে, কি-ই বা এমন হয়েছিলো তার? ব  
বছর পাড়ার মেয়ে বোঁহলো বিয়েছে; সব তো ঠিক বজায় আ-  
আবার এত ঐশ্বর্য এত যত্নের মধ্যে থেকেও বাচ্চা আমার এ  
পেলো না!

—চোখে জাঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠেন মায়া দেবী।

—এত কষ্টের পর,—জামাইয়ের বাড়ীতে একটা বছর যা হোক  
একটু স্বস্তিতে কেটেছে! ছেলোটাকে মাস্তব করতে পেরেছেন,—কি  
ঐ অলুকুণে মেয়েটা? কম মাথা খেলিয়ে পরিশ্রম করতে হচ্ছে ওর  
জন্তে? তার কিছু বুঝলো না? শুধু অবস্থা গোপন করার জন্তে দোষের  
ভাগী করে গেলো তাঁকে! নির্বোধ,—আহাঙ্ক আর কাকে বলে!

সন্ধ্যা সমাগমে, বিলাসচঞ্চল কলকাতা মহানগরী। অসীমের গাড়ী  
দুটে চলেছে। চৌরঙ্গী, রেড রোড, ছাড়াই গঙ্গার ধারে হ'তার পাক  
নোরাফেরা করবার পর সে বললো—এবারে কোথায় বাবে মিতা?

—আমি তো বাস্তা-বাট চিনি না,—চলুন যেখানে হয়, মুহূষ্মে  
জ্বাব দেব সুমিতা।

—ঠিক আছে—চলো আমার ক্লাবে যাই।

গাড়ীখানা যেন উড়ে চলেছে। সুমিতা শঙ্কিত চিতে জড়োসড়ো  
হয়ে বদবার চোঁকা করে,—বারে বারে ওর গায়ে লাগছে অসীমের  
হাতের মুহূ শক্তি। [ক্রমশঃ।

## রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু

ইন্দ্রাণী বসু

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে মহান রূপে দেখেছিলেন। মৃত্যুর মহিমা  
তিনি কত ভাবে তাঁর কাব্যের ভিতর যে আমাদের বোঝাবার  
চেষ্টা করেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। জন্ম হলেই মৃত্যু  
অঙ্গগ্হাবী। জন্ম ও মৃত্যু একেবারে অঙ্গাদ্বী ভাবে জড়িত।  
মৃত্যুর অস্তিত্ব না থাকলে পৃথিবী এত সুন্দর মনে হ'ত কিনা  
সন্দেহ!

আমরা সাধারণ লোকে মৃত্যুভয়ে সর্বদাই কাতর। কিন্তু  
ঈশ্বরের মরণকে উদ্বেগ করে কত কাব্যই যে রচনা করে গেছেন!

আমরা আমাদের প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোককাতর হয়ে ক্রন্দন  
করি। কিন্তু কবি বলেছেন,—

“নীরবে আকুল চোখ ফেলিতেছ বুখা শোকে  
নয়নাঙ্গণার।

ছিলে যারা বোবভরে বুখা এত দিন পরে  
করিছ মার্জনা।”

আমরা মৃত্যুর রূপ কল্পনা করার সময় তার ভয়াল ভয়ঙ্কর মূর্তির  
কথাই সর্বাগ্রে ভাবি। কিন্তু কবিশঙ্কর ‘মরণ’ কবিতাটি থেকে  
তাঁর দেখা মৃত্যুর রূপ দেখি অল্প ভাবে।

“মরণ যে

তু'ছ মম গ্রামসন্ধান।

মেঘবরণ তুব, মেঘ জটাজুট,

রক্তকমল কর, রক্ত অধরপুট,

তাপবিমোচন করুকোর তব

মৃত্যু অমৃত করে দান।”

ঈশ্বরের এখানে মেঘবরণ মৃত্যুর ভিতরেই তাপবিমোচনকারী,  
অমৃতদাতা মৃত্যুকে দেখেছেন।

মৃত্যুই যে শান্তি, এই কথা হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে কত দূর  
চিন্তাশক্তি, কত দূর মনের জোর থাকা প্রয়োজন তা সহজেই  
অনুময়। আমরা কবির এই চিন্তাশক্তির পরিচয় পাই “মৃত্যুর পরে”  
এই কবিতাটিতে। এখানে কবি বলেছেন,—

“আজিকে হয়েছে শান্তি, জীবনের ভুলভ্রান্তি  
সব গেছে চুকে।”

মৃত্যুর পরে আত্মা কোথায় যায়, এ প্রশ্ন আমাদের সকলের  
মনেই কখনও না কখনও জাগে। কিন্তু আমরা নিজেরা কখনও

উত্তর দিয়ে নিজের সাধনা দিতে পারি না। কিন্তু কবির মনেও  
যখন এই প্রশ্ন জেগেছিলো তখন বলেছেন,—

“বুখা ভারে প্রশ্ন করি, বুখা তার পায়ে ধরি  
বুখা মরি কেঁদে—

খুঁজে ফিরি অশ্রুজলে, কোন অঞ্চলের তলে  
নিয়েছে সে বেঁধে।”

তারপরেই আবার নিজের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন,—

“পলকে বিচ্ছেদে হায় তখনি তো বুখা যায়  
সে যে অনন্তের।”

এই যে বোঝার ক্ষমতা এ কত দূর অন্তর্দৃষ্টি থাকলে তবে সম্ভব,  
এটা আমরা সকলে একটু তলিয়ে দেখলেই হৃদয়ঙ্গম করব।

কিন্তু এত জ্ঞানী ব্যক্তিও এক জায়গায় তাঁর ভীতির কথা বলে  
গেছেন। মৃত্যুকে এক সময় তিনিও ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু সে  
ভুল ভ্রান্তিতেও তাঁর সময় লাগে নি। তিনি বলেছিলেন,—

“মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে  
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।”

এই একই কবিতাতে আবার ভুল ভ্রান্তির কথা বলেছেন শেষে,—

“স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে  
মুহূর্তে আশ্রয় পায় গিয়ে স্তনান্তরে।”

সবশেষে আমরা মত মরণভয়ে ভীত সকলকে তাঁর আশার  
বাণী শুনিতে শেখ করছি—

“চিন্ত-আশ্রয় দাও মেলে, নাই যদি দর্শন পেলে  
আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ—  
মর্মে জাগারে দিবে প্রাণ।

## আজ এই সন্ধ্যায়

অনুজ্ঞা দেবী

আজ এই সন্ধ্যায়

আমরা হুঁজনে হাতে হাত বাধি বসিলাম ঘাসের পরে,

দিগন্তের অসীম সীমায়

আমাদের কথাই স্মৃতিলিখনে লিখে দিল কে যেন

ইন্দ্রধনু বিলিক-হানী অক্ষরে।

আমার অমুভূতির নায়িকা বাতাসের শিহরণ নিয়ে

শুধু চেয়ে বইল

সেই দিগন্তের পানে।

বাঁধনের ভীতি নেই, চিরধৈর্যক্ষমাশীল প্রান্তর

ভরে উঠেছে গানে।

তবু তার অন্তর কেন কাঁপে :

কেন নিরাশার মন্ত্র জপে !

মনে হয় আকাশের বাণী

তেপলা গুই কাচের রথে চড়ে

কিছু বলে যায় ওর কানে, যে কথা ও জ্ঞানত না :

বড় কি পেয়েছ ব্যথা ? হে সগি,

চাও কি সাধনা ?

# সাহিত্য পরিচয়

লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক

পাঠক-পাঠিকা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, আমাদের দেশের সংবাদপত্রে দেশের গুণীজনদের জন্মবার্ষিকী অপেক্ষা মৃত্যুবার্ষিকী পালনের সংবাদই অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাঙালী জাতি সম্মান দেখায় মৃতদের এবং জীবিতদের প্রতি কোন নজর দেয় না। এ কথাও সত্য যে, আমাদের মধ্যে কোন কোন বিখ্যাত ব্যক্তিকে বিদেশীরা সম্মানে ভূষিত না করা পর্যন্ত আমরা তাঁদের দিকে ফিরেও তাকায় নি, বরং ব্যঙ্গ-বিজ্ঞাপন মধ্যে তাঁদের নিম্ন পর্যায়ে নামাতে চেষ্টা করেছি। প্রমাণস্বরূপ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করা যায়। নোবেল পুরস্কার লাভের পর বঙ্গদেশবাসীর দৃষ্টি পড়ে কবির প্রতি—যেজ্ঞা তাঁর আক্ষেপের সীমা ছিল না। বর্তমানেও বাঙালী জাতির এই মজ্জাগত অভ্যাসটির কোন পরিবর্তন হয়েছে, তেমন কথা আমরা বলতে চাই না। হুজুরের বিষয়, সম্প্রতি হুজুর বিখ্যাত সাহিত্যিকের জন্মতিথি পালনের আমন্ত্রণপত্রে দেখলাম, আহ্বানকারীরা লেখকদের পুত্র-কন্যাগণ ছাড়া অন্য কেউ নয়। লেখকদের বংশধরদের নামের পরিবর্তে প্রকাশকদের নাম দেখতে পাওয়া গেলে আমরা হুঃখিত হ'তাম না। আরও স্থবী হ'তাম, কোন সান্নিধ্য নামের বদলে তৃতীয় জনদের নাম দেখলে। যাই হোক, হুজুর বিখ্যাত লেখকের পুত্র-কন্যারা তবু কর্তব্য পালন করেছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, প্রকাশকরা এমন ক্ষেত্রে কেন নীরব থাকেন? উক্ত হুজুর বিখ্যাত সাহিত্যিক ব্যতীত বর্তমান বাঙালী সাহিত্যে আরও অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক আছেন—যাঁদের জন্মতিথি পালন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু, তাঁদের গুণাবলিশনগণ যে-কোন কারণে ভিখিপালনে উক্তাগী হ'তে পারেন না, সেই হেতু তাঁরা জীবিত অবস্থাতেই বিমুত ও অনাদৃত থাকবেন—এই যুক্তি অর্থহীন। আমাদের দেশবাসীর স্বক্ষে দোষ চাপালেও কোন লাভ হবে না, আমরা জানি। 'বাঙালী আত্মভোলা জাতি' কথাটি তা হ'লে প্রবাদবাক্যে পরিণত হ'তে পায় না। কিন্তু প্রকাশকদের দায়িত্ব থাকবে না কেন? প্রকাশক দিনের পর দিন যাঁদের লেখাকে পণ্য করছেন এবং হুঁ পয়সা ঘরে তুলছেন, তাঁদের প্রতি কিঞ্চিৎ রূপাদৃষ্টি দান করুন—আমরা সবিনয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি। বিদেশের প্রকাশকরা অল্প দৃষ্টিকোণে দেখে লেখকদের। লেখকদের প্রচারের আর লেখকদের জীবনে রাখার চেষ্টা তাঁদের অনগ্রসাধারণ। আমরা যে অন্তর্জ্ঞ লেখকটিকে আমাদের ব্যবসা-বিশণির সন্দর দরজার শীর্ষে বসিয়ে থাকি সম্মানে, তাঁর নাম ক্রীণেশ। এমন প্রচেষ্টায় আমাদের ব্যবসাবুদ্ধি বা বাণিজ্য-লাভের লোভ প্রমাণিত হয়—ভক্তির

নামগন্ধ থাকে কি না, সেটি প্রমাণ-সাপেক্ষ। গণেশ লি চলেছেন অবিরাম। প্রকাশকদের তাঁকে 'বয়ালটি' দিতে হয় একটি কপর্দকও। কিন্তু আসলে যাঁরা লিখছেন ও প্রকাশকদের ব্যবসাকে চালু রেখেছেন, তাঁদের দানদান দি হয় কিছু কিছু। আমরা বলি, এই আর্থিক দেনা-পাওয়ার সম্প্রদায় থাকলেও শুধু মাত্র টাকা দিয়েই প্রকাশকদের কর্তব্য শেষ হয়ে য না। আধুনিক যুগের প্রকাশকদের কর্তব্য এত সামান্য সীমা আবদ্ধ নয়। বটতলার যুগের সঙ্গে কলেজ স্ট্রীটের 'কেতাবপট্টির' তুলনা করা চলে না। প্রকাশকরা যেমন মন থেকে চেয়ে থাকে লেখকদের লেখার উত্তরোত্তর উন্নতি হোক, তেমন লেখকরা য অন্তর থেকে কামনা করেন, প্রকাশকদের মনোবৃত্তির উন্নতিটা যে অবনতির দিকে না নানে।

বিদেশের প্রকাশকদের কর্তব্য গাদার মডার ভিন্ন ভিন্ন লেখক বইয়ের বিজ্ঞাপন একসঙ্গে সাজিয়ে দিয়েই শেষ হয়ে যায় না ওরা চায় লেখকরা বেঁচে থাকুক, এবং লেখকরা বাঁচলে তবেই লেখক বাঁচতে পারে। আমাদের দেশে যেমন লেখকের লেখাকে ক্যাপিটালা করা হয়, ওদেশে লেখকদের মূলদন হিসাবে ব্যবহার করে। লেখক মাত্র লিখেই খালাস পায়, অজ্ঞাত কাজকর্ম বা প্রচারের জন্ত সাহায্য করবে প্রকাশকরা। আসল কথা, বিদেশী লেখকদের প্রচারের য কায়লা-কালুন তা আমরা এখনও কল্পনা করতে পারবো না অনেক হয়তো অস্বীকার করবেন না, আমাদের দেশের কত শত প্রথম শ্রেণীর লেখক-লেখিকা কেবলমাত্র যথার্থ প্রচারের অভাবে অকাল-মৃত্যু বরণ করেছেন। অথচ ওদেশে পুরানো ও বিগায়ে লেখকদের বই এখনও সমান হারে বিক্রী হচ্ছে প্রকাশকদের গুণপণ্য। লেখকদের জন্মতিথি পালনের প্রসঙ্গে এত কথা লেখা কাব্য, জন্ম-মৃত্যু-মুখতি-উৎসব পালনের রেওয়াজ প্রবর্তিত হোক আর না হোক, প্রকাশকরা এখনও যদি গুণ্যকিবহাল না হন, তবে লেখকদের শুধু মৃত্যুতিথিই তাঁদের প্রত্যেক দিনের অবশ্য পালনীয় কাজ হয়ে দাঁড়াতে বেশী দেরী হবে না।

## উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

সম্পূর্ণ

আজকের দিনে পরিমল গোস্বামীর একটি নির্দিষ্ট আসন আছে সাহিত্যের দরবারে। সাহিত্যের এমন একটি দিক—যে দিকের একমাত্র দিকপাল বর্তমানে পরিমল গোস্বামী। তাঁর নানা স্থানে রচিত রচনাগুলি একত্রে সংকলিত করে প্রকাশিত হয়েছে সম্পূর্ণ।

নানকরণটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বহুমতীতে প্রকাশিত বহু রচনাও এই গ্রন্থের শোভাবৃদ্ধি করছে। শরিয়ল গোহাঙ্গীর চিন্তাশক্তির প্রাবল্য, তাঁর পদচয়নের বৈশিষ্ট্য ও রসসঞ্চারিত কুশলতা প্রত্যেক সাহিত্য-পাঠকের আদরের বস্তু। এই গ্রন্থটি বহুল ভাবে পাঠকগণ কর্তৃক সমর্থিত হোক—এই আশাই আমরা রাখি। মিত্র ও বোদ, ১০ শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীনাথ রায়। দাম—তিন টাকা মাত্র।

### আকাশ ও মৃত্তিকা

দীর্ঘ দিন ধরে উপাঙ্গাসাদি রচনা করে বাঙালির সাহিত্য-ভাণ্ডারকে ধারা ভরিয়ে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে সবরাজকুমার বারুচৌধুরীর নাম উল্লেখনীয়। উপাঙ্গাসের মধ্যে ইনি বাঙলা দেশকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে সাধারণ বাঙালী জীবনের যাত-প্রতিযাতনয় ঘটনাবলুল নৈনিক বাবহারিক জীবনের ছাপ স্পষ্টসিদ্ধ। চারিত্রগুলিও বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল। সবরাজকুমারের গ্রন্থগুলির মধ্যে এটিও একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মাসিক প্রেস, ৩১এ শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীনাথ রায় সেনগুপ্ত। দাম—সাতো তিন টাকা মাত্র।

### স্বরের গুরু রবীন্দ্রনাথ

মানুষের জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের গান তো বাঙালির কোথাগোরে সঞ্চিত এক অপূর্ণ রত্ন-সমার। বাঙালীর মানস মনের চেতনা জেগেছে রবীন্দ্রনাথের গানে। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি গানের রাজা। শুধু কথায় নয়, স্বরের মাধ্যমে তিনি এনেছেন এক অভিনয় নতুনত্ব। রবীন্দ্রনাথের গানের স্বর মার নিভস্বতরই পরিচায়ক। স্বরের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান এর মার্গ্য রত্নরূপে বাঙালীর মনের মণিকুটিমে জমা হয়ে রয়েল। রবীন্দ্র-স্বর নিয়ে এখানে আলোচনা করেছেন তাঁরই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বাঙালীর এক বিদগ্ধ-সন্তান জগদ্বীর ডক্টর কালিদাস নাগ। শুধু তাই নয়, স্বরের দরবারে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বও ইনি এখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা রসগ্রাহী মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে সন্দেহ নেই। গানের রাজা রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা অনেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরও চিত্তব্রজ করতে সমর্থ হবে বলে আশা রাখি। বুক-ব্যান্ড, ৫ শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীনাথ রায় বসু। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

### কাজের কথা

জীবনের রঙ্গভূমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ প্রয়োজনীয় বস্তু হতে পারে, তবে একমাত্র নয়। বিজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য ছাড়া মানুষকে মনুষ্য-সমাজের যোগ্য আসন দেওয়া যায় না, এ-ও যেমনই ঠিক তেমনই বিজ্ঞা-শিক্ষার সঙ্গে তাকে বিনয় সৌজন্যতা শিষ্টাচার প্রভৃতি আবশ্যকীয় গুণগুলিও আয়ত্তাবীনে আনতে হবে। মানুষকে বিনয়-গুণ, সৌজন্য-বোধও বড় হতে অনেকখানি সহায়তা করে, এ কথা যে কোন পণ্ডিতমহাশয় স্বীকার করবেন। এই সত্যের প্রচারবাহী আলোচ্য গ্রন্থখানি। গ্রন্থখানি বহু বিদগ্ধজনের প্রশংসালাভে সমর্থ হয়েছে। কয়েকটি কাহিনী এর সঙ্গে সন্নিবেশিত করে গ্রন্থটিকে আরও উপভোগ্য করে তুলেছেন লেখক শ্রীনাথ রায় বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান যুগে বিশেষ

করে উদীয়মানদের জীবনে এই গ্রন্থ আলোকপাত করুক। এই কামনাই করি। শ্রাশানাল হাউস, ১৬ শিবপুর রোড, হাওড়া থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীমতী উষা দাস। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

### পূর্বরাগের ইতিহাস

অল্পকালের মধ্যে যে ক'জন শক্তিমান লেখকের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাঁদের মধ্যে বাবীন্দ্রনাথ দাশের নাম উল্লেখযোগ্য। রচনা-চাতুর্ঘ্যে, পটভূমিকা-নির্বাচনে বাবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বে এটি একটি নাটক ছিল, নিউ এম্পায়ার মঞ্চও এই নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে। বর্তমানে সেই নাটকটিকে উপাঙ্গাসাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। সহজ ভাবে বিষয়বস্তুর বিকাশের জন্তে এই গ্রন্থটি পাঠকের কাছে সমাদর লাভ করবে। সবেলি চরিত্রটি সৃষ্টি করে স্বধীকুমারের প্রশংসা ভাজন হবেন বাবীন্দ্রনাথ দাশ। কালকটি বুক ক্লাব প্রাইভেট লিঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বসু। দাম তিন টাকা মাত্র।

### রক্তকমল

একশো বছর আগেকার স্বাধীনতা-সংগ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা অনেকগুলি গল্পের সঙ্কলন গ্রন্থরূপে দেখা দিয়েছে সুপরিচিত সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'রক্তকমল'। নামকরণেই বোধ হয় বোঝা যায়, গ্রন্থটির ভিতরের সম্ভার সমৃদ্ধ। আজকের দিনে শতবর্ষ আগের সেই গৌরবময় অভিনয় নতুন করে মানুষের মনে প্রেরণা যোগাবে। আশার কথা। মানুষের মনে আজকের দিনে ইতিহাস-চেতনা নতুনত্বের এক রূপ নিচ্ছে, বিশেষ করে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের আবহন তো অবর্ণনীয়। সেই ইতিহাসকে কেন্দ্র করে সাহিত্যসৃষ্টি করে গজেন্দ্রকুমার ইতিহাসেরও যেমনই প্রচার ও প্রসার করেছে, তেমনই গল্প-সাহিত্যকেও করেছেন সমভাবে পুষ্ট। গজেন্দ্রকুমারের রচনা সম্বন্ধে নতুন করে বলবার কিছুই নেই, তবে তাঁর রচনার পটভূমিকা নির্বাচন সবিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। গজেন্দ্রকুমারের রচনায় স্থান-কাল-পাত্রগুলির স্থান স্থানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর রচনার কলাগে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি। প্রাপ্তিস্থান—এস. সি. সরকার ও সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম তিন টাকা মাত্র।

### মাটকোঠা

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একটি লগ আসে, যার আহ্বানে চিরাচরিত গণ্ডী-তানা জীবনের পথ পরিবর্তন হয়। জীবনের ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনা হয় সেই একটিনাত্র ঘটনাকেই কেন্দ্র করে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন লেখক অভিনেতা প্রশান্ত চৌধুরী। 'শান্তি' চরিত্রটির মধ্যে এই উক্তি বেন প্রস্তুটিত হয়ে উঠেছে। শুকদেব চরিত্রটিও বিশেষত্বের দাবী রাখে। লেখকের রচনাভঙ্গী ভালো। নারীর মনের যাত-প্রতিযাত বা শাস্তির মধ্যে দিয়ে ফেটানোর প্রচেষ্টা হয়েছে সেই চেষ্টায় লেখক সফল হয়েছেন বলা যায়। আত্মীয় প্রকাশ মন্দির, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী। দাম তিন টাকা মাত্র।



## চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত

শিপ্রা দত্ত

পূর্বের লোকসঙ্গীত, যা ছিল একদিন পূর্বের সম্পদ—পূর্বের গল্প, তা আজ লুপ্তপ্রায়। দরিদ্র, দুর্ভাগ্য, অজ্ঞ পূর্ববাসীর সকল জীবনব্যাপী প্রতিচ্ছবি এই লোকসঙ্গীত। যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় পূর্ববাসীর সংস্কৃতি, গভীর উদ্বেগ ও অসুস্থিতি। সেই ভাষায়, নিজের ভক্তিতে পূর্ববাসীরা গেয়ে গেছে গান। কে, করে, কোথায়, কোন সালে এই সব গীত রচনা করেছে তা আজ অজ্ঞাত। কিন্তু সেই শিল্পীর গানেই বহুতর হৃদয়ে সমস্ত পূর্বের বৃদ্ধি—তার ভুলে হৃদয়ে পলিত হয়েছে পূর্বের বেদনা—তার স্তবে অল্পবিস্তৃত হয়েছে নিরাশার মধ্যে আশার সন্ধান। বাস্তব জগতের কঠোর আঘাতের মধ্যেও হৃদয়ের স্বপ্ন রচনা করে তারা এই গানের স্তবে। ভাবের আবেগে স্তবের সজ্জার মাধুরীতে শ্রমজীবীর কষ্ট তারা ভুলে যায় তাদের দুঃখ-ভাবাক্রান্ত জীবনের ক্রেশের ব্যথা। আশার ইন্ধনবোধ উদ্ভাসিত হয় পূর্ববাসীদের মানসিকাবে। তাদের জীবমুখ হৃদয়ে আনন্দের শিউরণ জাগে। এই লোকসঙ্গীত তাদের অন্তর গোঁড়—বর্তমানের আনন্দের উৎস—ভবিষ্যতের আশার নিশানা। তাদের অজ্ঞ অস্ত্রের দৃক বাসিন্দীর বৃদ্ধি নীরবে অঙ্গুলিলা কল্প করে চলেছে—তা একান্ত ভাবে তাদের বস্তুতাত্ত্বিক ও মানসিক উৎসাহের প্রয়োজনের দাবী মিটাবার জন্যই রচিত হয়েছে।

দেশের রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রক্রিয়ায় গ্রামের এই সাংস্কৃতিক গাথা—বা গ্রামবাসীর একান্ত নিজেসব সম্পদ—তা আজ আহুত চাবাতে বসেছি। তাই আজ এই লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করতে অনেক গ্রামটি বিচরণ করতে হয়। আগের মত গ্রামের এই আনন্দ-উৎস অব্যবহাসিত নয়।

পূর্ববাসীর চট্টগ্রামের ঢাৰী ও মজুবদের কয়েকটা দুঃখ-ভাবাক্রান্ত গান সম্বন্ধে আজ লিখছি। একটি গানে গেয়েছে—

“আঁরা চাউপাটা চাৰা,

হালচট, বোয়া কই, ইয়ান আঁয়ার পেশা

আঁরা গভজব কামই কবি খাই,

আঁরা চাউপাটা চাৰা,

হালচট, বোয়া কই, ইয়ান আঁয়ার পেশা

আঁরা বড় বড় মানুষ হজল,

ঠাকৈ লাখি মাৰে।

আঁরা চাউপাটা চাৰা।”

এই গানের মধ্য দিয়ে অব্যক্তিত, কাঙ্ক্ষিত, গোপী পেশা সম্বন্ধ-বিশ্রাবক অভিমানেও স্তব পলিত হয়েছে।

নিম্নমুখের দুঃখ-ভাবাক্রান্ত জীবন মূর্তি হয়ে ফুটে উঠছে এটি একটি গানে—

“দেশের খোঁজখোঁজ, আর কোঁকোব বড় আঁতে,  
সব জীবন্তে মরা।

বেয়ানে ঘুমতুন উঁচি পথের কামত, খাই।

চাবাচিন মজুবি কবি, দিনের বেতন ন পাওলাম,

আঁজুটা লিভ, ন পাওলাম ভোরে,

লম টোকাব মোটী নাটায় ভাঙিয়া।

বাড়োত, খাই নাও কিদি খাইম?

বেয়ানে খাই যে মজিভ ভাঙা,

বিহালে কি খাইম?

আঁরাব ভাই, চৌলেব লাট বাতে,

কৌ যে লাটুৰ লাট করলে যে ইয়াৰ।

কাওডেব মোহানে গিট, হুট গোলাম বেয়ান।

গিছনি আঁছিল গয়াকাটা, আঁজু হিরে পোত।

যখন পিচ মিছিয়া কিবি চাউলাম,

কয় যে মোহাব হাইলকম হোবে ইয়াৰ।

কাশটা মাৰি, বাড়োত ধবি কি কটলাম ভাই,

পটীয়া খানা গিট, উলান মোওকরা দিলামবে জোটাট।”

এই ভাবে সাধা দিন পরিবর্তনের বিনিময়ে তাদের প্রতি এ অবিশ্য কবি হয় ও দেশের সর্বত্র যে অসামুদ্রা দেখা গিয়েছে— তাই এখানে ফুটে উঠেছে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গভীর কৃষ্ণ ও মজুবদের কি ভাবে জরাজীর্ণ হ’তে বলিত করেছে—তারই মধুস্বর কাহিনী শোনা যায় এই গানে—

“বারা বাঁদুনির কওয়ালা খাইয়ে হাটে খাটে জিওঁ জিওঁ,  
ধানের কল হটবে।

কাঁক মন্থে এক গোলা ধান খায়, তার বউএ সাবান

পাখা কেঁচাইত, যায়।

পাড়াবুদ আসি বউএ হবহুই চটল উন চড়াই দিবে,  
কুলাং লাই চটল কাবিবাব লাই, হুয়া তিভা পটকাইতা মা'বগ্য,  
তুস কুয়া পিসে থাই।

কুলাং কবি দিয়বে চটল, মাঝিবাং লাই কি বইবে।  
গরম পানি লাইসো চৌলের গায়,  
কিছু চটল কেনের হুগে পিসে উংবাইবে,  
তলের গুণ জো পোড়া লাইসো, মাঝের গুণ কচাল চইবে।  
কবির কল্পনাতে মোচন বাঁধী কব,  
পাকিস্তানে বাগা বাঁধুনার কল খাইকতা ন।

বউ এর কিয়ত স্বপ্নের লাই ভাগুরীর দয়া চইবে।  
কালবাহারের এবা কলকারখানার প্রচলনে পণীর দুখী মজুরদের  
জীবনের শোচনীয় পরিস্থিতি বুঝি হলে ফুটেছে এই গানে—

"দেশের চটল চটল কিছু দেখানি ?  
পণীরের কবকল্পা মইলান ঠের পাইওনি।  
দেশের মাঝে বুড়টুড়া হাং আকিন ধাত,  
মাঝে মাঝে মাংসাবগ্যা কব,  
মোটেও আকিন নাট।  
আবার কল টে'রা মি এক তোলা পাই।  
এই বিচার কেও করেনি।  
(গরীব) গোলাব রান কল, ডালাই ধার।  
বালাবান্ধনী মরি মার,  
হিক্যা-ফিরি কল চার।  
এক ঘেব চটল আট আনা পইসা,  
কোন দিন কিছুনি (গরীব) ?"

কালবাহারের ক্ষতি, চটলের শোচনীয় পরিস্থিতি ও দুখের  
সুচনার যে কবিতাদের প্রবর্তন হয়েছিল—তার কল মজুরের যে চরম  
লাঞ্ছনা, গল্পনা দৃষ্ট করত চলেছে—সেই দুখের কাকিনী প্রতি  
বয়েছ বালাব সঙ্গল চালাদের গানের ছন্দে—

"লাকল বিলির আর কত দেখাবি জাতে,  
কেও বস্তে সোনার খটত, কেও পড়ি রয় কালতে।  
ছেলে মোতের আদর পেল, সেবি মা'বর দুজিক।  
সাবু স্রুকা চোর চটল কনটলও উপলক্ষে।  
কড় কটিল হানীর পক্ষে, কনটলের মাল আনিতো।  
শেল কিনিতে হোতল ভাত, চটল কিনিতে পকেট হার,  
ভাতাবত, চটল ন থাকক, সালা জামা খাইলে গার,  
বিকতে হলো ভাবে, চটল দিয়ম ন খাইত।"

এক মিকে যেমন বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বুলে কল কারখানার  
প্রবর্তনার চালা মজুরদের চরম দুর্দশা চলেছে—তেমনি অনেক মজুরের  
দুর্দশানও চলেছে। সেই উপলক্ষে এই গান বচিত হয়েছ,—

"পেশার মিলের আদর কারখানা বে—চন্দ্রখানা,  
বালামাটার এলোকাতে পাকিস্তানের পবরমেটে,  
পাহাড় কাড়ি কিছু হার না।  
পাকিস্তানের দয়া হইল, কাবখানা খুলি দিল।  
গরীব লোকের অভাব হার না,  
সাথে সাথে লোক আসি,

স্বাধীন দেশের স্বাধীন দেশ।

দ্রুপদ আর ভাঙে হবে না।  
পেশার মিলের কারখানা ভাবী,  
হাইদ্র জঙ্গতে ইলেকট্রী,  
বাঁধ দিবে যে নদীর বিজ্ঞানায়।  
দীক্ষের আর জবর মল্লিক,  
তার বৃদ্ধ গরীবের দ্বন্দ্ব।  
ডেলি বেতন বাকী, রাখে না।"

অভাব অনটনে দুখী চানী নিজেব সতীত্ব জলাঞ্জলি দিবে সদায়েব  
অভাব দূর করার চেষ্টা করছে, তার মর্মান্তিক কাহিনী—

"আবার ঘোরাণী গেলগই ভাশ ছাড়ি,  
এই দুনিয়ার জালা আঁট সহিত ন পাড়ি।  
জাউ খেচুদী পাতিয়ে বলি, নাগলখানাং হাই,  
তার ভগগলে পাইল খেচুদী, আঁব তালাস নাই।  
এতকালে কিল্লাই আইরম, হোর লাই নাই আর খেচরী।  
কটল লাইডগার ঘবং সেলাম কইকতাম তার খেচমত ;  
লাকল পেটের লাই বলি, ন চাইলাম ইচ্ছত।  
আঁব মনে ন লয় বৃত্ত,  
পোয়া উগ্যা মইবগ্যা, কি'ব পোয়াউয়া ফুলি হইবে তুখ।  
পেটের বোগং গেল গই বাহু, বৃকত ছেল মাঝি  
অনবে পাড়াইল্যা মা বইন, ইচ্ছতে খাইকত।  
আতিক্যা বিপদে পইলে খোলাবে ডাইক্য।"

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোরাকিনের



কথা, এটা  
খুবই খাড়া-  
বিক, কেননা  
সবাই জানেন  
ডোরাকিনের  
১৮৭৫ সাল  
থেকে দার্ক-  
মিলের অভি-  
জতার কলে

তারের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে কল-ভাঙ্গিকার  
কল লিখুন।

ডোরাকিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

পো-কম :—৮/২, এল্‌গ্যান্ডেট ইস্ট, কলিকাতা - ১

রাষ্ট্রবিভাগের পর বহু চাষা মজুর এ দেশ ছেড়ে ইণ্ডিয়াতে গেছে।  
কিন্তু যেসব গরীব দুঃখীরা আজও পাকিস্তানে আছে,—সাখিহীন  
এ দেশে বাস করার কৈফিয়ত তারা দিচ্ছে—

“আঁর বাড়ীঘর কারে দিতাম ?

আঁরে ক্যান ভুতে পাইয়ে হিন্দুস্থান বাইতাম।

আডে আছে ছুয়া ধেওন গাই,

উগ্যার দুখে খরচ চলে,

আর উগ্যার ভুখ খাই।

লোকের কথা হনি হিন্দুস্থান বাই,

হাডে গেলে কি খাইতাম ?

আডে আছে, খেতে তরকারী,

ফইর ভরা মাছ আছে।

ভাই, স্ত্রুখে খাইত পারি।

আটা, রুটা, জাউ খেচুয়া,

কিইলাই বাই জান হারাইতাম।

যারা হেন্দুস্থান গিইয়ে,

স্বরাজের আলোনালানে, জায়ন হাবাইয়ে।

লোকের কথার ভাব না বুঝি,

কিইলাই ছুখের বারমাইত। গাইতাম।”

সর্বস্বার্থ চাষা মজুরদের উত্তর মজুরীবেনে যে প্রেমের মশাকিনী  
ধারা বয়ে যায়—তারও ছিটে-কোটা পাওয়া যায় তাদের স্মরণে  
মুছ না। কোকিলের প্রথম কাকলীতে প্রেমিকার চকল মনের  
প্রতিচ্ছবি মুঠ হয়ে ফুটেছে এই গানে—

“এই বছর নতুন কুইলায় ডাক ছারে,

অমন পরাণ বিদরে ;

কুইলা কালা শব্দ ভালো নানান জেটা জানে।

গাছের আগাত পাতার ত্রুত বইয়া কুইরে

আই মোর পরাণ বিদরে।”

কোকিলের ডাক বিরহীকে কি ভাবে প্রভাবিত করে তারই একটি  
গান শুধুন—

“কাউরা কালা কুইলা বালা,

আঁখির পুতলি কালা,

আর ও কালা অঙ্গের নিশানা।

ওরে কালরূপে জগতজোয়ারে অ বঁধুয়া।

মনর শাস্তি অইল না

তোর জালায় আর পরাণ তো বাঁচ না।”

চাটগাঁর কোন মজুর অস্ত্র দেশীর বুঝতীর মোহে পাড়ে—প্রেমে  
পাগল হয়ে—সে স্বপ্নে ছাড়তে বাধ্য হ'ল। সেই প্রেমের ফলস্বরূপ  
প্রবাহিত হয়েছে এই গানে—

“মনরে ধর্য মানো নাও দালা,

দিলরে আঁর ধর্য মানো না।

চাটগা ছাড়াইল মোরে পরীজান সোনা

পরীজান রাস্তা দিয়া যায়।

কির কির শাড়ীর আঁচল বাতাসে উড়ার।

তার চোখের বিজলী, মন করে দেবালা।

পরীজানের গামছা বর উম,

বকত রাইয়েল বক ছাড়ায় চোখত আরো বুম।

তার চোড়র কণী হইনলে উড়ে পরাণে মুরছ না।

পরীজানের মাথার কালাচুল।

য়ান মেয়র পিছে হাজার পদীপ করে জুল জুল।

তার চোখডাকে ইসারায়, হাতে করে মানা।

তার হাতত, বাজু, পশত জোরা মল,

তার বুকত, মরদের বরণ, মুখত করে ছল।

ওতার মুখর কণী কনে চায় দাদা

দিল যদি যায় জানা।”

বিরহী প্রেমিক নিজেকে প্রিয়াহারী মজলুর সঙ্গে করনা করেছে—

“তোয়ার প্রেমে দেবালা অইয়া,

ঘুড়ির আমি মজলু অইয়া।

তোয়ার নামে তসবী লই,

জুইপাম মালা নীরবে বই।

বিনা স্ত্রুতার গাঁইখাম মালা,

পরবী দিয়ম বন্ধুর গলার।”

বর্গাদেশ চটগ্রামবাসীদের একটি বিবাত কর্তৃক্ষেত্র। মজুরদের  
অনেক চটগ্রামবাসী সেখানে গিয়ে বরা রমণীর প্রেমের জালে আঁস  
হ'য়ে নিজের দ্বাপুত্রের কথা বিস্মৃত হয়। কোন কুহকিনীর কুহর  
তার স্বামী তাকে ভুলেছে—এই গানে বিরহিণী দ্বার বেই কল  
কারা ধ্বনিত হয়েছে—

“বস্ত্রা বন্ধু গেল ছাড়িয়ে

সদািলে মোর লাগ লাগাই।

এমন রসের কালে কার সোয়ামী ঘরত নাই ?

ছোড়োকালে বিয়া দিলরে

মা বাপের চোখে ছাই,

আরে রকুম বাই তুলি বলি

কন হতীনের ছরাপাই।”

বর্মী রমণীদের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হওয়ায় চাটগাঁর বহু শ্রমিক  
মজুরদের স্বপ্নের নীড় ভেঙে গেছে। চটগ্রাম নদীপ্রধান দেশ  
বিশেষ করে সমুদ্রের উপকণ্ঠে এই দেশটি অবস্থিত বলে এই দেশে  
মজুর শ্রমী নাবিক হিসাবে সমস্ত ভারত ও পাকিস্তানে বিখ্যাত  
চাটগাঁর নৌকার চালককে বা মাঝিকে “সাম্পানওয়ালা” বলে  
নিশীথ কালে সাম্পানের মাঝির প্রিয়তমা তার প্রিয়তমের বির  
গাইছে—

“অ ভাই, চান্দমুখে মধুর হাসি।

দেবালা বানাইলি সাম্পানের মাঝি।

বাহার মারি বারগৈ সাম্পানরে।

ন মানে উজান ভাডি।

কুতুবদিয়ার পাছিমধারে সাম্পানজলার ঘর।

লাল বকটা তুলি দিয়ে সাম্পানর উজর।

অ ভাই চান্দমুখে মধুর হাসি

দেবাইলা বানাইলি মোরে সাম্পানর মাঝি।”

কেবলমাত্র দুঃখ-দুর্দশা বা প্রেমের গান নয়। নানা ভ্রত  
সামাজিক গীত নানা পদাঙ্গীতে শোনা যায়।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে চাষার ক্ষেত চাষ করবার জন্য ব্যস্ত  
পড়েছে। এককিন্তু মেঘও আকাশের বুক নেই। মেঘটা কি



ওর ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে মেঘরাণীর কাছে চাবারী দল বেঁধে বৃষ্টি  
কামনা করছে—

“আয়রে মেঘরাণী মেঘ ধুই ধুই পেলা পানি।

কলাতলে গলা গলা—

কচুবন ডুবাই ফেলা।

হালা! তারা তের ভাই,

নল ডুবাইত পানী নাই।

কালো মেঘ, ধলা মেঘ তারা সোদর ভাই।

অইন কোনাদি বর পেলাইদে, ভিজি অরত যাই।”

আবার অতিবৃষ্টি হ'লেও তার জন্ত চাবারী আবেদন জানায়।  
বঙ্গমতীর স্নেহস্পর্শে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলে। প্রতি আবারের  
সাত তারিখে বঙ্গদ্রাক্ষকে ভোগ দেয় চাবারী। সমস্ত চাবারী  
বঙ্গদ্রাক্ষকে ভোগ দেওয়ার পর গলবস্ত্রে সবার মঙ্গলার্থে এই গান  
গেয়ে থাকে—

“বর বর বর বঙ্গমতীর বর

লটকাই লটকাই ধর।

পাড়াপড়শীর ভাগ্যে ধর।

অন্তিম পথিকের ভাগ্যে ধর।

বঙ্গমতীর বর।”

সমস্ত বিশ্ববাসীর হিতার্থে বর প্রার্থনা একমাত্র সরল, দরিত্র  
চাষাদের পক্ষেই সম্ভব। যারা নিজেদের প্রতি বিলুপ্ত করিত করে  
বিশ্ববাসীকে বাঁচিয়ে রাখছে—প্রতিদানে পাচ্ছে অবহেলা, অপমান ও  
অধিচায়। ঢেঁকিতে চাল ভাল্লবার সময় তাদের একত্রে কন্ঠের  
শ্রম লাগব করবার জন্তও—তারা ঢেঁকি জীবনের একটি চমৎকার গান  
বচনা করেছে।

বিবাহাট্টান বাঙ্গালীজাতির বৈশিষ্ট্য। এই বিবাহকে উপলক্ষ্য  
করে, নতুন বৈবাহিককে উপলক্ষ্য করে, কনে সাজানোকে ও বর  
সাজানোকে উপলক্ষ্য করে বহু গীত আছে। এমন কি, বিবাহ  
উপলক্ষে যে সব স্ত্রীআচার আছে প্রতিটিকে উপলক্ষ্য করেই  
গান গাওয়া হয়। স্থান সঙ্কুলতা বশতঃ বিশদভাবে সেই সব গান  
আপনাদের কাছে পরিবেশন করা গেল না। তন্মধ্যে একটি গান  
মাত্র দিচ্ছি। কনেকে শব্দবোঝাতে বাজনা বাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে  
তাই দৃষ্ট—

“দয়াল বড় মিঞার খি

জোরকারা বাজাইয়া হারগৈ

বারইপারা দিই।

বারইপারার মাইয়া পোয়া খিয়াই তঁঅসা চার।

জোরকারার ধমকে জইনউন চমকি আছাড় খায়।”

কেবলমাত্র আনন্দ-উৎসব নয়। জীবনখেলা সাঙ্গ হলে এ তরী  
বহন হুতুর শমন পেয়ে পরপারে হাবার জন্ত যাত্রা করে—তাকে  
উপলক্ষ্য করেও অনেক সুন্দর সুন্দর গান আছে।

“দিন ফুহাইল

সইলা অইল

পথর সখল লইলা কি ?

ওখর হায়া

তেরাগ গরি

বখন পখির তরাতরি।

ন গেলে তে বান্ধি নিব,

মোটা রহি গলাত সি।

পেয়াবা বারা আছে খার,

সমন লই পিছদি।

দিন ফুহাইল সইলা অইল

পথর সখল লইলা কি ?”

মুসাফিরকে মহাযাত্রায় যেতে হ'বে। বোল হাত ঘরে রাব  
কুলায় নাই—তাকে সোয়া হাত করবের মধ্যে বাস ক'রতে হবে—

“মুসাফির জঙ্গী তালাশ গর।

ডাক দিলে চলি যাবি কত কজরের ভিতর।

বোল হাত্যা বাশর ঘর ন কুলাইল জনমভর।

পাচ পাহাত্যা মাটার ঘর,

যাইবি এগাখর।

মুসাফির জঙ্গী তালাশ গর।”

এই সব শ্রমিকদের গানে এমন সব আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সুর ধ্বনিত  
হয়েছে—যা তাদের গভীর চিন্তাশীলতা ও মননশক্তির পরিচায়ক।  
পিতৃবিবাহিণী অভাগী কন্ঠার হৃদয়বিদারক গান, ছেলেভুলানা ছড়া,  
হিন্দু মুসলিমের নানা ব্রত পার্বণের গান, তাছাড়াও চাঁদ, ফুল, পাখী,  
বর্ষার ধারা প্রভৃতি ছোটখাটো নানা বিষয়কে অবলম্বন করে পল্লীসঙ্গীত  
আছে। এই রকম বহু লোকসঙ্গীত এখনও পুরীর নিভৃত আনন্দের  
উৎস্বরূপ রয়েছে। যদিও ব্যাকরণ, ছন্দ, ভাব ও ভাবার দিক দিয়ে  
এসব সঙ্গীতে অনেক ত্রুটি পাওয়া যায়। তবু এই সব গানের মধ্যে  
কুটে উঠছে আমাদের দেশের নিপীড়িত, লাঞ্চিত, দুঃখী পরিজনদের  
দৈনন্দিন জীবন কাহিনী। তাদের মানসাকাশে যে ভাবের উৎস  
জ্বলেছে—তাকেই সুরের মাধ্যমে রূপ দিয়েছে। এই ত্রুটিবহুল  
ছড়াগুলি চাটগাঁর শ্রমিক-সমাজের অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র। এই  
ছড়ার প্রতিবিশ্ব দুঃখ শ্রমিক সমাজের যে মনোবাজের পরিচয় আমরা  
পাই—তা হ'তে অনায়াসেই প্রতীয়মান হয় যে স্ববেগ, স্ববিধা  
পেলে এদের মধ্য হতেও গড়ে উঠে সর্বহারাদের কবির দল। যে সব  
বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে কবিতা রচনা করে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধি  
লাভ করেছে—সেই প্রতিটি বিষয় প্রতিবিম্বিত হয়েছে চাটগাঁর চাষী-  
মজুরদের গানে। এত সাধারণ ভাষার, স্বাভাবিক সুরের—যে এত বড়  
বিষয়ে গান রচনা করা সম্ভব একমাত্র এরাই তা দেখালো, এটাই  
তাদের বৈশিষ্ট্য। পল্লীমাঘের মণিকোঠায় এই সব দুঃখীদের গানের  
মধ্যে এমনিতর কত মণিমণিক্য লুকিয়ে আছে তা কে জানে ?  
কিন্তু গভীরতা ও সরলতার ভিত্তিতে বিচার করে এই সব গান যে  
কোনও সাহিত্য-বাসরে একটু আলস্যের আশা করতে পারে। চাটগাঁর  
পল্লীসঙ্গীতে হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজের গান অনুলব্ধিত হয়েছে।  
এক সমাজের প্রভাব যে অল্প সমাজে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে—  
তাও প্রকাশ পায় এই সব গানের মধ্য দিয়ে। কেবলমাত্র মজুরদের  
দুঃখের কাহিনী নয়,—তাদের স্বখ, দুঃখ, হর্ষ, বিবাদ, প্রেম, বিরহ  
প্রকাশ পেয়েছে এই সব গানে। স্থানে স্থানে দেশীয় ভাষার সঙ্গে শুদ্ধ  
ভাষার সম্মিশ্রণও দেখা যায় এই সব গানে। ভাষা ও ভাবের  
অসামঞ্জস্যতার দৃশ্য যদিও সাহিত্যের আসরে এই সব গানের স্থান  
নাই—তবু সহজ ও সরলতার দাবিতে সাহিত্যাকাশের কোন কোণে  
একটু স্থান হরত এরা পেতে পারে।

## রেকর্ড-পরিচয়

‘হিজ্ মাটার্স ভয়েস’ ও ‘কলহিয়া’র প্রকাশিত রেকর্ডের সন্নিহিত পরিচয় :—

### হিজ্ মাটার্স ভয়েস

N 82750—শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ প্রতিভামতী শিল্পীর কণ্ঠে হুঁপানি কীটন ‘আজি গোন্ধল নগরে’ ও ‘কল লালি জীবি কুরে’—বল্লী প্রকাশনার প্রকাশ।

N 82751—সুন্দর সেনের গায়িকা হুঁপানি আধুনিক গান ‘এতো সুব আব এতো গান’ এবং ‘তোমার গানি লুকিয়ে চান’—সঙ্গীত-শিক্ষাভ্যাসে তৃপ্তি দেবে।

N 82752—কুমারী শীলা সেন ‘সোলে সোলে রে চান’ ও ‘তোমার কাছে তো কোন দিন আমি’—আধুনিক গান হুঁপানি জনচিন্তকরী হবে।

N 87544—মাউথ অর্গ্যান ‘শিখালা’ ও ‘বাঁধন’ চিত্রে হুঁটি জনপ্রিয় স্বর বাজিয়েছেন শিল্পী মিলন গুপ্ত।

### কলহিয়া

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসভা শাখার শিল্পিগণ শ্রীযুত পঙ্কজ কুমার বসিকের পরিচালনার হুঁপানি নটিকা ‘ধরার মেতে’ GE 24845 হইতে GE 24847 এক ‘অনিদ্রা দীপ’ GE 24848 হইতে GE 24850 রেকর্ডে প্রকাশ করেছেন। জনকলাপকর এই সেট হুঁটি সকলেই ভাল লাগবে।

GE 24857—পাণ্ডালাল ভট্টাচার্য ‘তোমার মতন আমিও তো’ ও ‘আলার বেলা এই জীবন’—শিল্পীর লক্ষ্যে আধুনিক কালের হুঁপানি আধুনিক গান।

GE 24858—কুমারী কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ‘মল্লর আসিয়া ক’রে সেছে কান’ ও ‘সে কেন দেখা দিল রে’—নবগতা শিল্পী পি.ডি. এল. রায়ের হুঁপানি গানের অর্থ সাক্ষ্যেছেন সার্থকতাপে।

GE 24859—কুমারী নিরঞ্জা মিশ্র ‘মুদর গোখলি আকাশের’ এবং ‘মুগ্ধ আমার কাণ্ডন এসে’—হুঁপানি আধুনিক গানে সঙ্গীত-বসিকদের প্রীতি অর্জনে সক্ষম হবেন এই নবগতা শিল্পী।

GE 30366—রেকর্ডে ‘তাসের ঘর’ বাঁধাচিত্রের হুঁপানি গান ‘আমার গানই স্বর ছিল’ ও ‘বাঁধিছ মিছে দীপ’—গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীন মজুমদার।

GE 30367—‘তাসের ঘর’ চিত্রের অন্ত হুঁপানি গান ‘নৃত্তে ডান মেলে’ ও ‘নীরবে বস কণা’—প্রথমধানি গেয়েছেন হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয়ধানি গেয়েছেন কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন মজুমদার।

GE 30368—‘স্বপ্নের পরশ’ বাঁধাচিত্রের ‘আমার যে বীণা’ ও ‘আমি নীল পরা’—গেয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ ছাড়াও লোকসভা শাখার জনকলাপকর গানগুলি শ্রীযুত পঙ্কজ মল্লিক মহাশয়ের পরিচালনার GE 24851 হইতে GE 24856 রেকর্ডে প্রচারিত হয়েছে। শতান গুপ্ত, মৃণাল চক্রবর্তী, শাহন মিল্ল, ————— শ্রীমতী উৎপলা সেন, বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়,

কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিগণ এই রেকর্ডগুলিকে তাঁদের মনো কণ্ঠে সমীকৃত করে তুলেছেন।

## আমার কথা (৩১)

### হুঁপা সেন

শ্রী বাঙালি মন, ভারতের বিভিন্ন ভাষার গানে সুরের মাত্রাভাব সৃষ্টি করে যে ক’জন বাঙালী শ্রমায় অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত সুরকার-হুঁপা সেনের নাম অন্যতমের কথা বার। বাঙালি সেনের অতুলনীয় সঙ্গীত সম্পদের আবাদ এরা প্রচণ্ড ভো করেছেন। উপরন্তু বিভিন্ন ভাষাভাষী সঙ্গীতের বসও এরা দুর্দমারূপে গ্রহণ করেছেন।

আতীতকালের মধুরমোহন সেনের কণ্ঠে এই জন্ম ১৯১১ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে। বার হুঁপার উপস্থান্য সেনের পিতা ছিলেন গাওক ও কাশীমহালায় বাসবাটী প্রমুখ বড় ঠিকারদার হুঁপা এই গায়কের ব্যাতি ছিল প্রচুর। হুঁপালাসও বাসকাল বারের কাছেই সঙ্গীতের পাঠ সেন। কুমার বাগ্যপ্রদান ইন্সটিটিউট থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার পরই শিল্পিক্যে হয়। শিল্পকলে তিরোধান হুঁপালাস শিল্পারায় হার পড়েন। স্বাভাবিক ভীষণরূপে হয় বাধে বারিত। সনের সেনা জন্ম প্রভাব বিচারে তাহা দুর্দমারায়। কয়েকটি টিউলানী করিতে থাকেন। এই সময় সনের বাগ্য-বিশিষ্টের পর ইনি প্রকাশ করিতেছেন বার চাহা বারেরমধ্যস্থ হুঁপার ভোলাসের সের সম্পর্কে আসেন ও তাঁরই শিষ্য গ্রহণ করেন। লাতানশাও, রেকর্ড কোম্পানী কলকাতার শাখা সৃষ্টি করলে ইনি নিজের ছাত্রী শ্রীমতী বিতা সেন সহ একটি বৈধবস্তুর গান রচনা করেন। হুঁপালাসের জীবনে এই প্রথম রেকর্ডি। এই সময় প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সুরকার কমল দাশগুপ্তের কাছে পরিচয় লাভপ্ত। উৎকর্ষ রেকর্ড কোম্পানী কলকাতার শাখা খুললে, সেখানে প্রধান শিক্ষক হলেন বিমল দাশগুপ্ত, সেখানেই সুরকারী হলেন হুঁপালাস। প্রধানকার কর্মসূচির পরিচয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি গানে প্রকাশিত করেন হুঁপালাস। সেই প্রথম সুরকাররূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা। এর কিছুকাল পরেই বিমল দাশগুপ্তের মৃত্যু হয়।

ব্যয়-বাহ্যেবর অন্ত রেকর্ড কোম্পানী কলকাতার শাখা তুলে দিত বাধ্য হলেন। এর পর সেনালায় সঙ্গীত-শিক্ষকের দায়িত্ব নিরা প্রবেশ করলেন। তার পর হিন্দুস্থানের সি. সি. সাহার ভাষ হরেকৃষ্ণ সাহা ‘মেলাডি’ প্রতিষ্ঠা করলে, তার সঙ্গেও যোগদান করেন, মেলাডির রেকর্ডি হোত হিন্দুস্থানী। তার পর হিন্দুস্থানী পুরোপুরি ভাবে যোগদান। এখানে কাজ করার সময় পরলোক্য সুর-সাধক অল্পম ঘটকের সম্পর্কে আসেন ও এক নতুন জীবনে সেনার কাঠির স্পর্শ অনুভব করেন। পরলোক্যগত প্রমথেশ্বর বড়ুয়া মহাশয়ের বাড়ীর ঠিকিভতে তখন ভেলেও বিপ্রনারায়ণ ও বিশা টার্কিন কী বেটা তোলা হচ্ছে। পরিচালক ছিলেন বখাক্রমে নটরা অরীক্ষ চৌধুরী ও রূপ. কে. শোরে। উভয় ছবিই সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন অন্তর্যম। তাঁর সহকারী হলেন হুঁপালাস। তার পর র সঙ্গীত একটি প্রচারচিত্রে নিজে সঙ্গীত পরিচালনার ভাব এরা





লোকমাণ্ড তিলক : প্রামাণ্য ছায়াচিত্র

লোকমাণ্ড তিলকের জীবনী অবলম্বন করে ভারত সরকার একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে সারা ভারতকে তা উপহার দিয়েছেন।

দীর্ঘ দিনের পরাবানিত্যের অবসানকল্পে ভারতের সন্তানদের অবদানের ইতিহাসে লোকমাণ্ডের একটি বিরাট আসন সুরক্ষিত। লোকমাণ্ডের নেতৃত্বে সেদিনকার ভারতবর্ষ পেয়েছিল একটি সত্যিকারের পথের নিশানা। সাংবাদিক তিলকের নির্ভীক লেখনী সেদিন গঠন করেছিল ভারতের জনমত। শুধু তাই নয়, প্রায় চল্লিশ বছর আগে ভারতের রাজনীতিক গগনে ঐ পশ্চিম ভারতেই যে সন্তানের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁর আদর্শ ও নেতৃত্বের তুলনার তিলকের নেতৃত্ব ও আদর্শ অনেক উঁচুদের এবং স্বকলপ্রসূ। তিলক ভারতে সত্যিকারের প্রশ্ন সফার করতে চেয়েছিলেন। ভারতের বৃক্কে নির্ভীকতা ও রৈবায় প্রেসেপ বুলিয়ে দেওয়ার জন্য কোন বিদেশী শক্তি তাঁকে নিযুক্ত করবার মত স্পন্দী প্রকাশ করতে পারেনি। 'মহাত্মা'-আখ্যায় উপযুক্ততম অধিকারী তিলকের উদ্দেশ্যে আমরা প্রণাম নিবেদন করি।

আমাদের বর্তমান বস্তু এই চিত্রটির নির্মাতাদের প্রতি। তিলকের জীবনী উপহার দিয়ে তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। তবে একটা কথা উল্লেখ করি। ছবিতে যখন তিলকের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাসিক ঘটনাগুলোও দেখানো হ'ল— জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডও দেখানো হ'ল—সেই সময় রবীন্দ্রনাথের নাইট-হুড ত্যাগ ভারতের ইতিহাসে এক অকৃতপূর্ব ঘটনা। ভারতের নব রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের অবদান এই অকৃতজ্ঞের দল এবং অকৃতজ্ঞ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ভারত সরকার অস্বীকার করলেও মহাকাল তা চিরমিষ্টই স্বীকার করে বাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছাড়া ভারতের আর কোন প্রদেশে কবি-রবির জন্মদিন সরকারী ছুটিগণিন বলে গণ্য করা হয় না অথচ রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'ভারততীর্থ' আখ্যা পেয়েছে সে কবিতার নাম বঙ্গতীর্থ হয়নি। তিলকের সমকালীন অনেক ঘটনাই দেখানো হয়েছে বা সে সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, অস্বীকার করব না—বাঙালী সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল ও জীৱরবিশ্বের প্রতিকৃতিও হানলাভ করেছে—জালিয়ানওয়ালাবাগও দেখানো হ'ল—অতএব রবীন্দ্রনাথ নেই—আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই দেশবন্ধুও

পারে? পরিশেষে নিশাভাবকে এইটুকুই বলি যে অকৃতজ্ঞতার আর নিলজ্ঞতারও সীমা আছে একটা।

## কাঁচামিঠে

বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার চিত্রজগতও সমানভাবেই পৃষ্ঠ জয়েছে জ্যোতিষ্ময় রায়ের কল্যাণে। সুসাহিত্যিক জ্যোতিষ্ময় রায়ের লেখনীপ্রসূত উদয়ের পাথে ও অল্পকাল আগে প্রদর্শিত তাঁরই লেখনীপ্রসূত ও পরিচালিত কাহিনী 'টাকা-আনা-পাই' চিত্রলোকে বিশ্বের সঞ্চার করেছিল। তাঁর বর্তমান অবদান 'কাঁচামিঠে'। দুটি তরুণ ও দুটি তরুণীকে মুখ্যতঃ কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। একটি ঘর ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে এদের চরিত্রের ও কর্মধারার বিকাশ। এদের অল্পবয়সের হালকা হুইমোর, নরম মনের আপান-প্রদান, অপরিপক্ব চিন্তের ঘাত-প্রতিঘাত, ভাবধারা-বিনিময় গল্পের প্রধান উপজীব্য ও যথেষ্ট আনন্দ দিতে সক্ষম হয়। কাঁচুকু হুয়ে হাসতে হাসতে বাঙলাছবির দর্শকবৃন্দ যখন হাসির ছবি দেখতে হতাশ হয়ে পড়েন সেই সম্বন্ধে কাঁচামিঠের মত হাসির ছবি তাঁদের বিরক্তিকে পরিণত করবে তুণ্ডিতে। বদলে দেবে স্বাদ। ছবিটি হাসিরই ছবি অথচ কাঁচুকু দিয়ে হাসানোর প্রচেষ্টা এতে এতটুকু নেই—বরং স্বচ্ছতা ও সাবলীলতার এ ভরপুর।

প্রধানাংশে দেখা দিয়েছেন রবীন মজুমদার, অমৃপকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও তপতী ঘোষ। এঁরা চরিত্র-চক্ৰে যথামাপ্য রূপদান করতে কৃতকার্য হয়েছেন। অমৃপ-সাবিত্রীর বাগার ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, সাবিত্রীর প্রণয়কাঞ্চীরূপে জীবন নয়, ভূত্যা-বৈশী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রের পাণিপ্রাধিন্যরূপে বিনতা রায় ও ছবি বিশ্বাসের সহধর্মিণীর ভূমিকায় বেলুকা রায়ের অভিনয় অপারিসীম প্রশংসার দাবী রাখে। এ ছাড়া অভিনয়শ্রেণী আত্মন মিহির ভট্টাচার্য, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, নবদীপ হালদার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, শুক্লা দাস প্রভৃতি। স্বস্থর ঘোষের চিত্রগ্রহণ ও রাজেন সরকারের সঙ্গীত-পরিচালনাও ভাল লাগবে। সবার শেষে, জ্যোতিষ্ময় বাবুর সর্বাদ্বৈত অভিনয় জ্ঞানিয়ে এবং পূর্বাহ্নে তাঁর আগামী অবদানগুলির সাক্ষ্য কামনা করে বলি কাঁচামিঠে ভাল ছবি হয়েছে একথাও যেমনই সত্যি, তেমনই কাঁচামিঠে যে টাকা-আনা-পাইএর ধাক্কা-কাঁছেও বৈষতে পারে নি একথাও অনস্বীকার্য।

## মমতা

বাঙলা দেশের সমাজজীবনে সংমার আসনটি খুব নিরাপদ নয়। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসেবে সে স্বামীর যেমনই মাথার ভূষণ হয় আবার সন্তান-পোষ সংমা হিসেবে অপরের চোখে তাকে মোটেই ভাল দেখায় না। অবশ্য এরও যে ব্যতিক্রম নেই এমন কথা বলা যায় না। বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখছি, কোন এক সংমা তাঁর সন্তানলোকে যে চোখে দেখতেন বোধ করি তাঁর সেই স্নেহ তাঁর নিজের সন্তানও পায় নি। শেখোন্ড-পর্ধ্যায়ের কোন এক সংমাকে কেন্দ্র করে 'মমতা'র কাহিনী রচিত। মমতা স্বামী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পেল তার চার মাসের মাতৃহার সপক্ষীকৃত্য। কিছুকাল পরে দেখা গেল সে কাল ও বোবা, সকলে ধারণা করল সংমার বিশ্বদৃষ্টিতে শিশুর এই পরিণতি। মমতার ব্যথা কিন্তু আর কেউ বুঝল না, সে

— মমতা নামের আর 'মা' কোটাটো স্বামী প্রতাপ

এবার বেক বসল। তাঁর সম্মানবোধ তাকে টেনে রাখল, ফলে রাধাকে নিয়ে মমতার গৃহভাগ, তাকে ছুঁলে ভর্তি করা, অশেষ বস্ত্রে তার মুখে কথা ফোটানো, প্রতাপের আগমন, ভুল বোঝাবুঝি পরে রাধার মুখে 'মা' শুনে প্রতাপের অভিমানে বিসর্জন ও মধুর মিলন। এই জাতীয় অভিনব বক্তব্যকে চলচ্চিত্রের রূপ দিয়ে তাকে সর্বজন সমক্ষে উপস্থাপিত করার প্রয়াস অভিনন্দন-যোগ্য সন্দেহ নেই। তবে কয়েকটি ভুলত্রুটি ছবিটির সাফল্য অনেকখানি কুঠারঘাত করেছে। বাঙালী-সমাজে দ্বার মুক্ত্যন্তেও সাধারণতঃ এক বছর কালাশৌচ পালন করা হয়, এখানে দেখলুম জন্মের মৃত্যুর চার মাস পরেই প্রতাপ মমতাকে বিবাহ করছে, রাধা সত্যিই কালা কি না পরীক্ষা করার জন্তে প্রতাপ যখন চাঁৎকার করে 'রাধা-রাধা' করে ডেকে জিনিব-পত্নী ভাঙতে আরম্ভ করল বাড়ীর আর কেউ সেখানে উপস্থিত হ'ল না। মাঠনের সমস্ত টাকা ছুঁড়ে ফেল দিয়ে কর্তাদের উপরূক উত্তর দেওয়া কল্পনায় ভাল মানায় সত্যি, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেটা কতটা সম্ভব—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ নেই কি? স্ববীরের তার বাবাকে বিশেষ মনে পড়ে না—পরে শুনলুম সে পিছুবিয়োগের

পরই মাঠারী করতে শুরু করে। উপরিউক্ত উক্তিগুলি পরস্পর-বিবোধী নয় কি? যে ছেলে মাঠারী করতে পারে তার বাবাকে মনে রাখার মত সে সময়ে তার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। সুবীরের ঘরে যেখানে স্বর্গীয় মোহনদাস করমচাঁদ পাকীর মূর্তি বসানো আছে সেখানে কি কোন বঙ্গ সন্তানের মূর্তি বসানো যেত না? যে ঘটনার উল্লেখ করে সেই মূর্তি দেখানো হয়েছে সেই ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিজ্ঞাসাগর, রামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথের মূর্তি কি সেখানে রাখা যেত না? ভারতের রাজধানীসহ সমস্ত প্রদেশগুলিতে বাঙালী মনোহীরা কতটুকু সম্মান আজ পাচ্ছেন? বাঙালী বলে পরিচয় দিয়ে বাঙালার অসংখ্য যুগমানবদের উপেক্ষা করার মত অমার্জনীয় অপরাধ আর নেই। আর একটি ভয়ানক ভুল চোখে পড়ে—যেদিন প্রতাপ রাধাকে পরীক্ষা করছে সেদিনও দেখি, সে শিশু পূর্বের দিনই জন্মতিথির আসরে তাকে দেখি যে একটি রাতেই তার বয়েস প্রায় বছর তিনেক বেড়ে গেছে। বাঃ আচর্য!

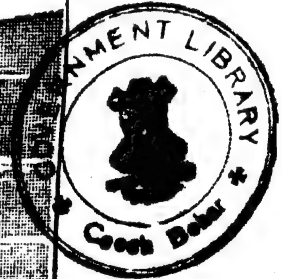
অভিনয়ে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে সকলকে অভিক্রম করে গেছেন বেবী রাধা। নুক ও বধিরের অভিনয় করার সঙ্গেই সমস্তই চোখে মুখে রাধা যে একটি বিরাট শ্রুততা কৃটিয়ে তুলেছে তাতে

বিশ্বের নিষ্ঠুরশিক্ষামূলক চিত্র  
আপনাদের প্রিয় চিত্রগৃহে মুক্তি প্রতীক্ষিত



এ. ডি. এম. চিত্র  
**হায়পনডি এক ডালকে**  
(অসীম-সমৃদ্ধ চিত্রশারী শিক্ষামূলক চিত্র)

এন.দত্ত • সদাশিবজি রাও কবি • সন্তোষী.



তার ভবিষ্যৎ শিল্পিজীবনের উজ্জ্বল্যটাই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর পরই প্রশংসা পাবেন দীপক ও অরুণভী মুখোপাধ্যায়। পরস্পর বিবোধী দুটি চরিত্রের পাশাপাশি সংস্থাপন উভয়েরই প্রতিভা কুমারের সহায়ক হয়ে উঠেছে। এদের সঙ্গেই মধু দেব নামও উল্লেখ্যনীয়। তিনিও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বোম্বাইয়ের বলরাজ সাহনী এই প্রথম বাঙালয় অভিনয় করলেন! অভিনয় তিনি ভালই করেছেন, তবে তাঁর অভিনয় মনে দাগ রাখতে সক্ষম হয় না। এ ছাড়া রূপায়ণে আছেন অমর মল্লিক, ডাঃ হরেন, ভবরায়, নবদীপ হালদার, ছবি ঘোষাল, তপস্বী ঘোষ, অপর্ণা দেবী, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, রেবা দেবী, আশা দেবী, মারা ভট্টাচার্য, শাস্তা দেবী প্রভৃতি। মমতার শেষ দৃষ্টটি প্রত্যেকটি দর্শককে অভিভূত করে তুলবে সন্দেহ নেই।

### বসন্তবাহার

ছায়াছবির মধ্যে দিয়ে সাধারণের মধ্যে সঙ্গীতকে তুলে ধরাব প্রয়াস নিয়ে যে কটি ছবি এসেছে তাদের মধ্যে বিকাশ রায়ের প্রয়াস যেমনি মন্থ ও তেমনিই সার্থক, এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করছে বসন্তবাহার। সঙ্গীতের বস-আত্মদানমাত্রিনী দর্শক সাধারণকে পূরন পবিত্রস্তির খোঁসাক জুগিয়েছে বসন্তবাহার। সুর, তান, রাগের মোতনয় ইন্দ্রজাল বিস্তার করে শ্রুত্ব করে বাহে দর্শক সাধারণকে সঙ্গীতময়ী এই চিত্রটি। গানের ছবি হিসাবে বসন্তবাহার অতুলনীয় ঠিকই তবে গান বার দিয়ে বসন্তবাহারের সমালোচনা করলে পূর্বাঙ্ক মতটি ঠিক পোষণ করা যায় না। কাহিনীকাব অনিলবরণ ঘোষ রয়সে তরুণ, তাঁর সেখায় ত্রিভুতা আছে, আছে আত্মবিকতা। তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবনের আয়ত্তা সাক্ষ্য কামনা করি। কাহিনীর প্রথমার্ধ বেশ একরকম বার তারপরই শুরু হৃৎকম্পিত মিনিটে অতি নটকীয়তা। আবেগের প্রায়শা নাট্যর সৃষ্টির পক্ষে—সত্যরক ও যেমনই আবার নটকের গভীরতাকে চত্যা করে এই অতি আবেগ প্রবণতাই। শেষের দিকের ঘটনাগুলিকে ধাপছাড়া একরকম অস্বস্তি হয় না। তরুণ সঙ্গীতসাপক জয়ন্ত মুখু হয় মুম্বাইয়ের গানে, সে তাঁর শিষ্য দেব কিঙ্ক তাঁর কাছে পায় কথায় কথায় আবার, অবজ্ঞা ও অপমান। তাঁর মেয়ে লতার সঙ্গে জয়ন্তের হয় মন বিনিময়। মুম্বাী লতার বিয়ের ঠিক করে এক কুমারবাহারের সঙ্গে। জয়ন্ত দিয়ে আসে এনিকে লতাও কুমার বাহারের সঙ্গে বিয়ে করে দিয়ে ও নিজের পিতৃ পরিচয় পেয়ে সকলে মিলে চলে আসে নিজস্ব দেশে। মুম্বাইও জীবনের ধারা যায় বনলে। বাইজী হয়ে যায় গৃহস্থ-পুত্রিনী। এদিকে লতার স্মৃতি মনে পড়ে মাওগার নিজের গায়েতলুকের মণ্ডল ত্যাগ করে যায় স্বরভ, সঙ্গে সঙ্গে করে দেশত্যাগ, লতাকে সে বুজি বেড়ায়। নানা ঘটনার পরে মাওগার সন্তান পর লতা বধন চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন সেই সময় ঘটনাচক্রে জয়ন্তের সঙ্গে লতার হয় পুনর্মিলন। নিজের বিয়ে ভেঙ্গে গৃহত্যাগ করল জয়ন্ত তারপর তার বাবার সম্বন্ধে পণ্ডিত্যক নারব। অবাঁজ জয়ন্তের এই গৃহত্যাগ — নিজের তি ফল প্রসব করল সে সবকে কিছুই জানা

আরও দু'একজন স্বনামধন্য পূর্ববৃত্তির লেখনীতে আবর্তিত হয়েছে তবু পরিবেশের গুণে চরিত্রটি বড় ভাল লাগে। যে কুমার দু'দিন বাদে জামাই হতে বাচ্ছ মুম্বাই তখনও তাকে 'আপনি-আজ্ঞে' করা ভাল লাগে কি? চিঠি লিখে-জয়ন্ত চাককে দিয়ে—গুণু চিঠিটি —তা খাম টিকানা লেখা বা তা জোড়া বা তাতে ডাকটিকিট লাগানো কি চাবরের দ্বারা হবে? ভামু বন্দোপাধ্যায় ও মারা ভট্টাচার্য চরিত্র দুটি অনাবশ্যক খট্ট মাত্র। ও চরিত্র দুটি কাঁচিছাঁটা করে কোন ক্ষতি হোত বলে মনে হয় না।

অভিনয়ে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন বিকাশ রায়। ধরে গেলে তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে ছবির গায়ে সত্যিকারে বসন্তের ছোঁয়া লাগল। বড় দরদ দিয়ে চরিত্রটি সৃষ্টি করে তুলেছে তিনি। তারপরই প্রশংসা পাবেন সুনন্দা বন্দোপাধ্যায় মুম্বাইয়ের দম্ব, আত্মগরিমা আবার লক্ষ্যের অর্থদৈন্ত, বাঙালী-স্বল সহজ রূপটি সমান নৈদুগ্ধের সঙ্গে সৃষ্টি করে তুলেছেন। অল্পি যোগ্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, অভিনয় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। নারক বসন্ত চৌধুরীর অভিনয় শুধু না তার স্বাভাবিক নয়, স্বতঃস্ফূর্ত নয়, স্বজ্ঞ নয় তবে স্থানে স্থানে তাঁর শক্তি আভাস পাওয়া যায়। প্রাণেশ্বরী অভিনয়ে দর্শককে মতিয়ে রেখে অপর্ণা দেবী। পাতাড়া সাঙ্কাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, দী মুখোপাধ্যায়, জীবন বত্র, ভামু বন্দোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী ও লতার অভিনয়ও প্রশংসনীয়, বহুদিন বাদে প্রতাপ মুখোপাধ্যায় দেখা গেল। কঠিনশীল কঠোর সঙ্গে চমৎকার ভাবে ওঠে মিলিত প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। শীলা চট্টোপাধ্যায় (ওরফে সুমালা চট্টোপাধ্যায়) এখনও স্বাভাবিকতাকে আয়ত্তে আনতে পারেন নি, তবে সজ্ঞাবনা প্রশস্ত। এ ছাড়া রূপায়ণে আছেন—প্রীতি চৌ সৌরেন ঘোষ, প্রীতি মল্লিক, বেচু সিংহ, ভামু রায়, অমূল্য সেনগুপ্তা, শুভা দাস, নিভাননী দেবী, সন্ধ্যা দেবী, মারা ভট্ট আশা দেবী প্রভৃতি। এ ছবিতে ভারতের বহু বন্দনা সুনন্দা সম্বন্ধ ঘটছে, সে কথা কারোই অবদিত নেই। প্রাণেশ্বরী অতি জানাই জ্ঞানপ্রকাশ বোঝকে। প্রশংসার দাবী করতে? চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত। আবার বলি গানের ছবি হিসাবে কাহার অতুলনীয় এক এই ছবি উপহার দেওয়ার জন্যে বিকাশ নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্থ।

### রূপপট প্রসঙ্গে

সঙ্গীত-সাধক দিলীপকুমার সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞা একজন উল্লেখযোগ্য পুঙ্খ। দিলীপকুমারের দরভরা কঠোর প্রগতি পাণ্ডিত্য বিভিন্ন ভাষার তাঁর অনায়াস অধিকার বাঙালী গৌরবেরই বস্তু। চমকিত্রে এবারে তাঁকে প্রথম দেখা যাবে স্থায়ী পরিচালিত 'মাধুরী' চিত্রে। দিলীপকুমারের পতিভাসনার এই ছবি ধনজয়, সত্যনাথ, গোবিন্দগোপাল, জীবন বত্র, ছবি বন্দোপাধ্যায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়, আসপনা বন্দোপাধ্যায় উৎপলা সেন ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের কঠোর শোনা যাবে।

অভিনয়-শিল্পীদের। \*\*\* ভারতের চলচ্চিত্রলোকের অসংখ্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ নীতান বসু বর্তমানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'র কণ্ঠস্বর রূপ দিতে বাস্তব। হরিপ্রসন্ন দাশ সঙ্গীতের ভার পেয়েছেন। নবাবগাঁওীয়া রায় সহ অভিনয়গোষ্ঠী আছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায় বসন্ত চৌধুরী, অসিতবরণ, উৎপল বসু, মঞ্জু দে, ভাবতী দেবী প্রভৃতি। \*\*\* মহাকবি মধুসূদনের বাক্যসম্রাজ্ঞী রচনা 'বৃদ্ধা' শাবিকের মাঝে রৌঁকে চিত্রায়িত অবস্থায় শীঘ্রই দেখা যাবে, সেই সঙ্গে এই ছবিতে দেখা যাবে জীবন বসু, সুনীল নাথগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, ভাস্কর্য্যগোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তপস্বী ঘোষ, আবদুল নাস, অমিতা বসু, বাজলমল্লী প্রভৃতিদের। \*\*\* কমল গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'গোপা স্তন্যদ্বার' ভূমিকাসিঁপিতে আছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কালী বস্কোপাধ্যায়, অরুণকুমার, অরুণকুমার, নর বস্কোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, গাম লাহা, ডাঃ হাবেন, পদ্মা দেবী, মঞ্জু দে, শোভা সেন, জয়শ্রী সেন, মল্লি বস্কোপাধ্যায়, সুরা দাস প্রমুখ শিল্পীগণ। কামোবা ও স্তনের ভার পেয়েছেন যথাক্রমে অনির গুপ্ত ও বাগচি। \*\*\* খ্যাতিমান কবি বিমল ঘোষের 'মোহন' কাহিনীটি চিত্রায়িত হচ্ছে মাতৃ সেনের পরিচালনায়। সত্য সিন্ধুন তরুণ শিল্পী গামল মিত্র। নিভৃত চক্রবর্তী যোগজ্ঞান কামোবা হাতল। চরিত্রগুলির রূপ সিন্ধুন—ছবি বিদ্যাস, কান্ত বস্কোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, নীপক মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর্য্যগোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, অপরী দেবী ও নবাবগাঁওীয়া রায় প্রমুখ শিল্পীরা। \*\*\* কলকাতার পলিটেকনিক অসীম বস্কোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি 'কদাচন', তার অভিনয় করেছেন ছবি বিদ্যাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনিরকুমার, কালী বস্কোপাধ্যায়, বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, অরুণকুমার, নর বস্কোপাধ্যায়, তপস্বী ঘোষ, আবদুল নাস, অপরী দেবী প্রভৃতি। অসীম বস্কোপাধ্যায়ের পরিচালক জীবনের আমোদ মনোহর মানা কবি। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন শ্রীমতা রেখা দেবী মহাশয়।

## চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

### হাস্যকৌতুক অভিনেতা শ্রীজহর রায়

হাস্যকৌতুক অভিনেতা হিসেবে শ্রীজহর রায় একটি বিশিষ্ট স্থান কাব্য করে আছেন আজকের দিনের বাংলা মঞ্চ ও চিত্রক্ষেত্রে। এক অত্যন্ত শিল্পী ইনি, যখন তখন হাসি ও আনন্দের উপাদান হই তাঁর এতটুকু বাধে না। এক কালের সিরিয়াস কলিনেতা তাঁর নিজেকে কমেডিয়ান করে তুলেছেন, সে অবিশিষ্ট জানবার পায়। কিন্তু কমেডিয়ান জহর রায়কে আমরা যখন পেয়ে— ন বিধিত না হয়ে পাবপূর না। অভিনয়-কলার একটা মোহন যেমন গুলে গুলে আমাদের সম্মুখে।

এইটো মতো এই স্বনামধন্য শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলো আমার টি বাসককে। সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা—কাঁচ অভিমত জানা। সেটো আরম্ভ হলো, আমার এক একটি প্রশ্নের উপর চলল উত্তর।

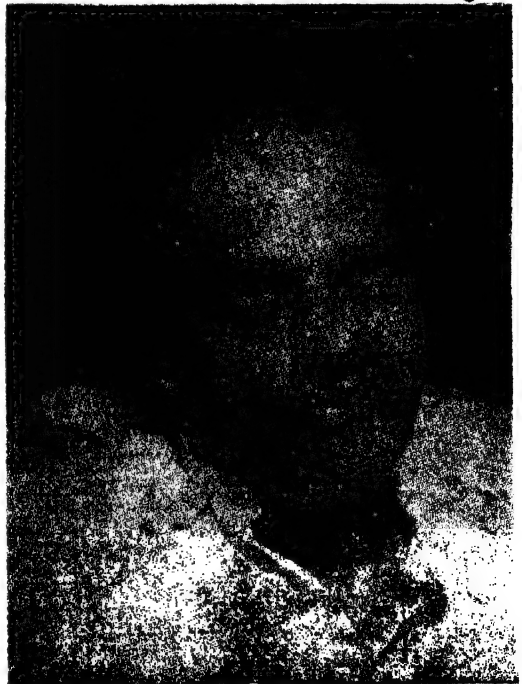
১৯৪৬ সালের 'পূর্ববঙ্গ' ছবিতে বটেশ্বরের ভূমিকায় আমার

প্রশ্নের উত্তরে।—“কোন ছবিতে এবং কোন ভূমিকায় অভিনয় করে আমি সবচেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি, বলা হয় তো একটু কঠিন। তবে তখন সিত পরিচালিত 'উপহার' ছবিতে ভোলা চব্বিই অভিনয় করে আমার খুব ভাল লেগেছে এটি না বলে পারবো না। এর একটি প্রধান কারণ ভোলা চরিত্রটিতে আমার মনের খোঁষাক খুঁজ পেয়েছিলাম। অন্য সব ছবিতে সাধারণতঃ মনের সঙ্গে মিলিয়ে এমনটি পাওয়া যায় না। ফলে অভিনয় করে আশাহুতর তৃপ্তি সব সময় পাওয়া যায় না।”

চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে যোগদান প্রথম প্রেরণা পান আপনি কোথায় এবং এতে যোগদানের কারণ কি? ধীর কণ্ঠেই উত্তর করলেন শ্রীজহর—“অভিনয় করার প্রেরণা পাই ছোটবেলাতেই এবং সে আমার ব্যাপার কাজ। বাবা চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে অভিনয় করতেন এবং বহনকেও তিনি ছিলেন একজন কুশলী অভিনেতা। বাবার সঙ্গে থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগে আমিও অভিনেতা হইবো, যোগ দেব চলচ্চিত্রে। এ লাতিনে আসবার চোড়াকাব কথা হিসেবে এইমাত্র বলতে পারি। এতে যোগদানে ব্যক্তিগত প্রশ্ন বা আপত্তি মনে আমার কখনই উঠনি বা ছিল না। ছবিতে আত্মপ্রকাশের পরও সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে আমার কোনই পরিবর্তন আসেনি, এটুকুও বলতে পারি।”

এর পর আমার প্রশ্ন থাকলো সাধারণতঃ আপনাদের দৈনন্দিন কণ্ঠস্বরটি কি? এর আপনাদের কোন বিশেষ হরি আছে কি না?

শ্রীজহর উত্তর করলেন—“দৈনন্দিন কণ্ঠস্বরের মধ্যে খুব একটা











ভিটামিন মুক্ত

**কোলে**  
**KOL**  
**বিস্কুট**

যাঁরা ওলের বিচার করেন

তাঁরা সকলেই প্রচন্দ করেন

সবসময়ে

**কোলে**

**বিস্কুট**

কোলে বিস্কুট কোম্পানীঃ  
প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা ১



পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্র্য

খনি প্রাকট

মেরী

পেটিটবারো

নাইস

কলেজ

টেস্টা

ডেন্টা

ক্রামক্রাকার

কয়েন

স্পোর্ট

জিগারবাট

গাউসহোল্ড

সল্‌জি

বার্বেলক্রীম

কার্বেনয়েব

চকোলেটক্রীম

বেবীক্রীম

স্ট্রট ক্রাকার

প্রভৃতি

আরও অনেক রকম।



## গান্ধীর প্রতিমূর্তির স্থান হেথা নয়

“দাক ট্রাফিক বোর্ড অফিসারের মূর্তিটি সরাইয়া তৎস্থলে গান্ধীর প্রতিমূর্তি বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। গান্ধীর মৌলি বাঙ্গালদেশে জনক করে নাই। তাঁহার অতিসামান্য কাপুরুষতা এম্ লোককেই প্রভাব দিয়াছে এবং বাঙ্গালদেশের অশুভাবের ক্ষতি করিয়াছে। মূর্তিয়ারামের মূর্তি সরাইয়া তৎস্থলে কোন মূর্তি বসাইতে হইলে তাহা হান্না বিবেকানন্দের হওয়া উচিত। কথাক্ষেত্রে যাহাযাহের পাখ এক লক্ষ লোক প্রতিদিন এই মূর্তির নিকে তাকাইয়া অঙ্কতঃ একটি কথা মনে করিয়ে—চালাকীর ধারা কোন মহৎ কাণ্ড হয় না। লজ্জার পথঘাট, কুল, হাসপাতাল অধিক উন্নতি প্রভৃতি সার্বক করিতে হইলে জাতীয় চরিত্রের পুনরুদ্ধার সরকারের আগে দরকার। তাহা ভুল চাই বিজ্ঞাসাগর এম্ বিবেকানন্দের আদর্শ।”

—যুগবাহী (কলিকাতা)।

## নির্লোভী ভূপতি

“বিদ্যাসাগর পোষ্ট অফিসের সহকারী অফিস মন্ত্রকন্যাস ঘরের (বিশ্রাম চান্দ্রাব বিদ্যোত্তর) কমিটি পূর্বে দীপ্তপতিত্বের একে নতুন তাহার বন্ধুত্বের ফলক প্রত্যেকের কিস্কিন্দন হইতে শত কাকার নাই কুতরাং পায়। অনেক বার সেই ভুললোক উক্ত প্রতিষ্ঠানে অগাধ ভক্তিতে নেতীর কথা বলায় সে ইচ্ছাকে নেতিগুলি নিষেধায় দেয়। ভুললোকটি বাক্যের সমস্তই মুগ্ধ তন। এই একমাত্র যুগে ভূপতির নিঃসংশয় বিশ্বাস প্রকাশনীয়।”

—কলিকাতার সর্বস্বত্ব

## ডাইডোলের অব্যবস্থা

“হুগ ও অসম বাকিদের ভুল ডাইডোল বিভিন্ন প্রাথমিক পরিকল্পনা করিয়াই শ্রবণ মাসে আসিয়া গেল। বহুমান বামপন্থার ধারণা কিছু সচর ও গায়ে ডাইডোল বিভিন্ন বস্তু হইলেও মনোহর মনোহর ও মোড়কের ধারণা বাপক এলকায় জালকের বস্তু হইতেও ডাইডোলের কাট অনাবরণ্য হার ও অক্ষমদের প্রকাশ হয় নাই। যে সব সচর ও গায়ে ডাইডোল বিভিন্ন কাজ ভুল হইয়াছে সেখানে বাপকদের অধিক দায়িত্ব ও অক্ষমদের পথ্যের বহু অনাবরণ্যের এই সর্বোৎকৃষ্ট হইতেই বসিয়া অভিযোগ শোনা হইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে উপাধীনকীল কাকির পরিবারের অঙ্কভুক্ত জালকের নামেও ডাইডোলের কাট বিবরণ করা হইয়াছে। এমন কি, কাট বিভিন্ন শ্রেণী একটি ক্ষেত্রে ডাইডোলের বেশন দেওয়া হইয়াছে বসিয়া জনবর শোনা হইতেছে। গম্বিল অপেক্ষা বামপন্থার পৌর এলেকা সম্প্রদায় এই সব অব্যবস্থার অনিবার্য অধিক পরিমাণে ক্ষত হইতেছে।”

—বীরদাম

## ধানচালের তদন্ত

“লেখার কালে বহুমান বাজারে চালের দাম ২৩.০০ মণ। বিভিন্ন সাপোর্ট অফিসে চুলক সামগ্রির একজন অঙ্কাক সর্বস্বত্ব সাক কাকিরে চাইলেন “নাম হো কাকিরেছে না। আপনাদের ধারণা কি?” বাচা উত্তর হইল তাহাও সার মন্ত চাচার গোমায় গোমায় ধান, ঘরে ঘরে চালের বস্তা কেবল চালের কাজের জন্ত চাচার বাজারে চাল বিক্রয় করিতে আসিতে পারিতেছে না বসিয়াই চালের সব

প্রশাসনা না করিয়া পাগা যায় না। আমানতের ভূভাগ্য, আইসের আশা নাই। তাহা না হইলে ইচ্ছার মতে বদার শেষে বর্ধমানের সদর বাজার বোধ হয় চাইলের বস্তা গড়াগড়ি বাইত। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, মহাশয়, আপনারা ব্যাঙ্কগুলির হিসাব দেখিয়াছেন কি? গান-চালের কারবারে লক্ষপতিদের কি ভাবে আগাম দেওয়া হইয়াছে তাহার খোঁজ রাখেন কি? সমস্ত গ্রামাঞ্চলে খাজনাভারে হাটাকার, ইচ্ছা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? ভারত সরকার খাজনাভার মূল্য বৃদ্ধি উৎপাদন সমস্ত প্রভৃতি তদন্ত ও তাহার রিপোর্টের লক্ষ্য লক্ষ্যে মেহতার নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। অবাক কাণ্ড! এই কমিটির প্রস্তাবসমূহ মনোহর একটি স্তর। পুলিশ কোর্টের উকিলের মত প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে বাহাতে উক্তের কোনও ক্রমেই চাচার ছাড়া মজুত বাণ্যের অপরাধ আর কাহারও স্বাক্ষর না পড়ে। এমন ভাবে প্রশ্ন বাধা হইয়াছে—বাহাতে সরকার ও বিজ্ঞান বাজারের যে নীতির ফলে ‘মজুত বাধা’ সহজ, সহজ ও প্রসারিত হয়, তাহার কোনও ইচ্ছিতই প্রসারিত হয় না আসে। বহুতঃ এই বিশেষ সমস্যাটি প্রশ্নের মধ্যে তোলাই হয় নাই। প্রশ্ন উঠিয়াছে—কেবল উৎপাদক চাচার বিবরণ। তাহার ঘরে কত ধান আছে? বাজারে তিনি বেশী দিলেন কিবা দিলেন না? কিরূপ পরিমাণ জমির উৎপাদক চাচার ‘বাধা’ করায় থোক থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। কেবল চাচার, চাচার আর চাচার। এক ক্ষেত্রে কেবল ব্যবসায়ীদের আঁততে কিরূপ আছে, এতদ প্রশ্ন করা হইয়াছে।

তাহাও স্থানীয় ছোট ব্যবসাদারদের কথা। যে বড় বড় চাকা দ্রুত ঘুরিয়া ছোট চাকাকে ঘুরায় তাহাদের সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন নাই।”

—নূতন পত্রিকা ( বর্ধমান )।

### স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী

“গত কলা ১৬ই আগষ্ট সমগ্র দেশের ছায় এখানেও স্বাধীনতা-সংগ্রামের শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আজ হইতে শতবর্ষ আগে ১৮৫৭ সালে ভারতের বুকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জন-জাগরণ বা বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। আজ সেই বিদ্রোহের শতবার্ষিকী দিনে সমগ্র জাতির সহিত আমরা সেই প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের শহীদদের উদ্দেশ্যে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অশ্যাচারের বিরুদ্ধে বাহারা সেই দিন সারা ভারতব্যাপী বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল, গণ-চেতনানীন ভারতবর্ষে ইহার গুরুত্ব কম নহে। দেশাত্মবোধে উদ্ভূত মরণজয়ী সংগ্রামীদের এই বিদ্রোহ জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম পথ-প্রদর্শক। সেদিন বাহাদুর সাহের নেতৃত্বে, নানী সাহেব, তাঁতিয়া তোপী, লক্ষ্মীবাবু, কুমার সিং, আজিমুল্লা প্রভৃতির অধিনায়কতায় সারা দেশব্যাপী ইংরেজ সৈন্য বাহিনীর মধ্যে যে বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছিল, ভারতের ইতিহাসে সেই দাসত্বমুক্তির সংগ্রামকে জাতি চিরকাল অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ রাখিবে। আজ হতে শতবর্ষ আগে ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের বুকে যে বিদ্রোহের বহিঃপ্রজ্জ্বলিত হয় ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যেই প্রথম, তার কারণ ছিল অনেক। বাংলা-বাহিনীর উপর ব্রহ্মদেশে গিয়া যুদ্ধের আদেশ, গরু ও শূকরের চর্কিমিশ্রিত টোটা ব্যবহার প্রভৃতির সঙ্গে ছিল বিদেশী শক্তির বর্বর অত্যাচারের অমানুষিক তাণ্ডব। এই সব কারণ মুখ্যতঃ প্রধান হইলেও ভারতের বীর সন্তানগণ কোন দিনই ইংরেজ শাসনকে মানিয়া লইতে পারে নাই। এই সুযোগে সেই বিদ্রোহী বীরেরা সমগ্র দেশময় যে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন আজিকার স্বাধীন ভারতবর্ষ সেই রক্তাক্ত বিপ্লবের কাহিনী পড়িয়া বৃথিতে পারিবে—বাংলাদেশে চিরদিনই বিপ্লবী আন্দোলনে অগ্রণী। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। দিপাহী বিদ্রোহের রক্তাক্ত ইতিহাসের পাতায় তাহা চিরকাল অল্পান হইয়া থাকিবে।”

—বীরভূম-বার্তা

### অসাপু সাংবাদিকতা

“বাইশে জুলাই তারিখের ‘টাইম’ লিখিয়াছে—পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী বাঙলা দেশে সন্মুখগ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করেন। ১৯৪৬ সনে তিনি বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ( অর্থাৎ chief minister ) নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সনে কলিকাতার রাজপথ যখন হিন্দু-মুসলমানের রক্তে লাল হইয়া ওঠে, তখন তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে শান্তির বাণী প্রচার করেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সনে ভারত যখন বিধাবিলস্ক হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিল তখন তিনি পাকিস্তানে যাইয়া মন্ত্রিপদ লওয়া মুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না বরং গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেন। ১৯৪৯ সনে তিনি যখন পাকিস্তানে গেলেন তখন সকলে তাহাকে ‘ভারতের চর’

বলিল কিন্তু পাকিস্তানের ডিব্যাং প্রধান মন্ত্রী মনে মনে হাসিলেন তারপর আর লিখিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া লিখিলাম না।”

—জনমত ( জলপাইগুড়ি )

### মৃত্যুপথ যাত্রী

“প্রায় ৪০০০ হাজার উগ্রাঙ্গ কলিকাতা মহানগরীর শিয়ালদহ ট্রেন-প্রাটফরমে ও সন্নিহিত স্থান সমূহে মরিচে বসিয়াছে। সরকার সকল প্রকার সাহায্য বন্ধ। ইহাদের পুনর্দ্রুতি অথবা আশ্রয়শিবি-গমনের পথ বন্ধ। বাস্তবের কি চমৎকার রূঢ় পরিহাস! জাতি উদ্দেশ্যে যেতার বহুতা মানুষ শ্রবণ করুক এবং উগ্রাঙ্গদের দুর্বল সম্পর্কে অভিযোগে সরকারী প্রতিবাদ মানুষ পাঠ করুক। ইহা অতিরিক্ত মানুষ আর কি চায়? ছন্নছাড়া মরণপথের যাত্রী এই সকল অন্নহারা গৃহহারা উগ্রাঙ্গ পরিবার বালার বুকে অনাহারে ক্ষয় যখন মরিতেছে তখন বালার কাগ্রেস-ভবনে কাগ্রেসকর্মিণের ভারত-স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল বহুতা মন্ত্রা ও নেতাদের মুখ হইতে শুনি যন্ত্র হইতেছে।”

—ত্রিপ্রোতা ( জলপাইগুড়ি )

### জলাভাব

“গত সপ্তাহে আমরা মহিষদল থানায় এই বৎসর জলাভাব বশত চাষবাসের সঙ্কট সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে গৌণালি ক্যানাল জল চাষের জন্ত প্রদান করিতে যে অমুরোধ জানাইয়াছিলাম, তাহা তমলুকের সেচ বিভাগীয় এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের তৎপরতা মেদিনীপুর পুষ্কপ্রান্তায় এ্যাক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তবে উক্ত থানা নালখালগুলি অধিকাংশই জমিদারের এবং জমিদারা সরকার গ্রহণের পর সেইগুলি বর্তমানে অনাথ হইয়া পড়ায় সাংসার অভাবে অনেকাংশে ভরিয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে জনসাধারণ কিছু কিছু কাটাছিয়া জল লইবার আশ্রয় চেষ্টায় বত হইলেও একটু উচ্চ সোবরে জলের উপযুক্ত চাপ মুখের কাছে না পাইলে দূরবর্তী জমিগুলিতে জল লওয়া সম্ভব হইতেছে না। এক্ষেত্রে তমলুকের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার ও জেলা এ্যাক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তায় প্রশংসা সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উক্ত ক্যানালের জলের চাপ আরও এক বাড়াইতে অমুরোধ জানাইতেছি। শ্রাবণ মাস সমাপ্ত এবং বর্তমান কোটালও সমাপ্তির পথে। অবিলম্বে এ বিষয়ে দৃষ্টি প্রদান ন করিলে চাষের মূল্যবান সময়ই অতিবাহিত হইয়া যাইবে।”

—প্রদীপ ( তমলুক )

### শোক-সংবাদ

গত শনিবার ১১ই শ্রাবণ সাহিত্যিক অন্নপূর্ণা গোস্বামীর পরলোক গমন করেছেন। দীর্ঘদিন ইনি সাহিত্যসেবা করে এসেছেন ও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে লালা পুরস্কার প্রদান করেন ( ১৯৫২ ) ও আন্তর্জাতিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় বাঙলা দেশ থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান ( ১৯৫৪ )। মাসিক বসুমতীর সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের যোগস্বত্ব ছিল, আমাদের গত সংখ্যাতো তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রীতিভাজনেষু

‘মাসিক বহুমতীর’ বিগত সংখ্যায় আমার জীবন-কথা সম্পর্কে যে সচিত্র বিবরণী ব্যহির হয়েছে, তার জন্ম সম্পাদক হিসাবে আপনাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই জীবনকথার যিনি লেখক তাঁহাকে আমার প্রগাঢ় সাধুবাদ জানানেন, সেখাটির ভিতর দরদ ও প্রীতি কুটিয়া উঠিয়াছে। ‘মাসিক বহুমতীর’ সঙ্গে প্রথম তরুণ বয়স হইতে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং যোগসূত্র নানা দিক ‘দেয়ে, সেই প্রীতির সম্পর্ক আরও গাঢ় হইল। কিন্তু তৃতীয়াংশ লেখাটির নিত্য অনবধানতা বশত কিছু ভুল (বোধ হয় ছাপার ভুল) আছে। পরবর্তী সংখ্যায় সংশোধন করিলে বাহির হইবে। যেমন যুগান্তর ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৯৪৭ নহে এবং ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ৬ মাসের পরেই আমার নাম সম্পাদক হিসাবে বোঝিত হয়—১৯৪৮ সালে নহে। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১০ বছরের মধ্যেই আমি সহকারী সম্পাদক (Asstt. Editor) পদ লাভ করিয়াছিলাম, ১২ বছরের মধ্যে নহে।

‘বিশ্বাস্য reference’ এর জন্ম তারিখের দিক দিয়া এই ভুল সংশোধন বাঞ্ছনীয়। যদিও নিজের কথা উল্লেখ করা শিষ্টাচার-সম্মত নয়, তবু কৌতুহলী পাঠকদের জন্ম আরও দুটি কথা লিখিলে সন্তোষজনক হইত। যেমন বন্ধা হিসাবে আমার জনপ্রিয়তা। ই কমিউনিষ্ট-অকমিউনিষ্ট দেশ সূচ সাগর পৃথিবী পরিক্রমা। আধুনিক জগতের সম্পাদকদের মধ্যে আমিই প্রথম সেন্সিটিভ ইউনিটন ও কিং যুক্তবাস্তব গোষ্ঠী দুনিয়ার বৃহত্তম অংশ পরিভ্রমণের সৌলগা জ্ঞান করিয়াছি। বাঙ্গলা কাগজের একজন সম্পাদকের পক্ষে ওই যোগ্য লাভ সম্ভবতঃ উল্লেখযোগ্য। আপনি বাহা ভালো বিবেচনা করেন, করিবেন। পুনরায় আমার প্রীতি ও ধন্যবাদ নিবেদন হইতেছি। ইতি আপনাদের আবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

এম্পায়ার স্ট্রেট বিল্ডিং প্রসঙ্গে প্রত্যাব

আপনার সম্পাদনায় ১৩৬৪ সালের আষাঢ় মাসের ‘মাসিক বহুমতী’র যে সংখ্যাটি ব্যহির করেছেন তা’র ৩৭০ পাতায় ‘শ্রীনেত্র’ বোধ মহাশয়ের লেখা প্রবন্ধ ‘এম্পায়ার স্ট্রেট বিল্ডিং’ তার চতুর্থ লাইনে বোধ মহাশয় জানাচ্ছেন “বাড়িটি ১৪১০ ফিট উচ্চ ও ১০২ তলা।” অথচ সত্যকার সর্বকাল বি-এ মহাশয় লিখিত ও মর্ডার বুক একজনী দ্বারা প্রকাশিত “বুক অব নলেজ” নামক বই-এ ৪৪ পাতায় লেখক জানাচ্ছেন, “সর্বসমত এই বাড়ীতে ৭৫ তলা আছে এবং ইহার উচ্চতা ১০০০ ফুট, ইহার কোনটি ঠিক বলিয়া জানিব? আপনার মতামত পেলে সত্য বোঝা যাবে আশা করি। মর্ডার বুক একজনীকেও চিঠি দিলাম তাঁদের মতামতের জন্ম। এই বইটি একটি পাঠ্যপুস্তক এটা আপনি নিশ্চয় জানেন, সেইজন্যই আমার আগ্রহ বেশী—ছাত্রকে কি ভুল পড়ানো হবে কলকাতা মহাবাস কোরে? অধিক বাতলা। নমস্কার গ্রহণ করিবেন।—অনিল মুখার্জী

পত্রিকা-সমালোচনা

প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায়, ধর্মালোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে মাসিক বহুমতী নিম্নলিখিত প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাকে



‘তামসী’ ভালো লাগছে। লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করছে এই লেখাটি। ‘লোকপাটে’র লেখক বাংলাসাহিত্যে পাকা হয়ে বইলেন। ‘রাজার রাজার’ অনেক দিন থেকে চলেও লেখাটির প্রতি আকর্ষণ সমানই আছে। সেটা বোধ হয় ভাবার গুণ ও চরিত্র চিত্রণে বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বলেই। পরিমল গোস্বামীর ‘স্মৃতিচরণ’ বেশ লাগছে। শ্রমণি মিত্রের জীবনী-কবিতা ‘বিরেকানন্দ স্তোত্র’ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যুগপ্রয়োজন ও উনবিংশ শতাব্দী শীর্ষক অংশটি Original। বামোহন সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—‘তুমি নিখাত John the Baptist’ বা ঠাকুরের আবির্ভাব সম্বন্ধে “ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কেন বোললে না খুঁসে তুমি”...বিশ্বজনকে চিন্তার খোরাক ভুগিয়েছে। শ্রীমালতী গুহ-বায়ের ‘খ্রীষ্টাব্দনা দেবী’র ‘অঙ্গন-প্রাঙ্গণে’ সীমাবদ্ধ না বেধে সাধারণ ভাবে পরিবেশিত হতে দিতে বাধা কি? —সোয়েন বসু। কলিকাতা—১০

মাসিক বহুমতীর রুচিসম্মত প্রকাশের জন্ম আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ‘রাজার-রাজার’ লেখক উদয়ভানুকে তাঁর চমৎকার লেখার জন্ম ধন্যবাদ। অজ্ঞ ও প্রতাহর লেখক ‘নীলকণ্ঠ’র আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন। তিনি যে আদর্শের জন্ম ইহা লিখিতেছেন তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে। মাসিক বহুমতীর অঙ্কা লেখাগুলোও বর্তমানে সুন্দর হইতেছে, তাহার জন্মও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি লেখক সমেত আপনাকেও। আশীষকুমার বো I. S. W. Colony বার্পপুর আসানসোল।

কিনতে চাই

১৩৬৩ সালের চৈত্র সংখ্যা বহুমতী—শ্রীস্বর্নধর বড়ুয়া। ৩

১৩৬৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা বসুমতী—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কেরা, সংখ্যেটড়া, পোঃ জামপুর, জেলা—বাঁকুড়া।

১৩৫৭ সালের শ্রাবণ, ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা অথবা ১৩৬২ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার বিনিময়ে ১৩৫৫ সালের কান্তিক ও ১৩৫৬ সালের মাঘ সংখ্যা বসুমতী—শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় C/o বান্দব পাঠাগার, পোঃ ও গ্রাম ধাত্রীগ্রাম, জেলা—বর্ধমান।

বেচেতে চাই

১৩৬১, ৬২ ও ৬৩ সালের সম্পূর্ণ মাসিক বসুমতী বাধান ও খোলা অবস্থায় আছে। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ১৮ টাকা। শ্রীজীবন চক্রবর্তী, চক্রবর্তী অপটিক্যাল কোম্পানী, ১০নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

১৩৫৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা ও ১৩৬১ সালের চৈত্র সংখ্যা বেচেতে চাই; ১৩৫৮ সালের মাঘ সংখ্যা বসুমতী আমার প্রয়োজন। ১৩৫৮ সালের ফাল্গুন কিংবা চৈত্র সংখ্যার বিনিময়ে ১৩৫৮ সালের মাঘ সংখ্যা দিতে পারি—শ্রীচিন্তামণিবরুণ দে, পোঃ বালিসাই, জেলা—মেদিনীপুর।

১৩৬০ হইতে ১৩৬৩ সাল, ১৩৬৬-১৩৪১, ১৩৫১-১৩৫৫, ১৩৫৮-১৩৬০ সালের বসুমতী—শ্রীস্বধীরকুমার মিত্র; ১১সি নেপাল ডটাচার্জ সেন, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

১৩৫৫ সালের কান্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৬০ সালের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন একটি করে মাসিক বসুমতী আছে। প্রতি সংখ্যা ১৮ দেড় টাকা মূল্যে ডাক খরচ সমেত।—শ্রীমহাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বোরহাট, গোলপুকুর জেলা—বর্ধমান।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

মহাশয়, মাসিক বসুমতীর গ্রাহক মূল্য বাবদ আপনাব ১৬৭৭৭৭ তারিখের পত্রমত ১৫৮ টাকা পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সন্ধান দিলেন। শ্রীমতী মেনকাশুল্লারী দেবী—Lalpur, Behar.

বাংলা দেশের সব খবর জানার জগ্না মাসিক বসুমতী নিরমিত পড়তে চাই। এক বছরের জগ্না গ্রাহক করবেন।—Miss Mahasveta Dutt. Sholapur.

১৩৬৪ সালের আষাঢ় মাস হইতে মাসিক বসুমতীর চাঁদা ২৫৮ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বা করিবেন।—Punnyarani Das. Assam.

I am remitting herewith my subscription for monthly Basumati for the period from Asar Aগ্রহায়ণ. kindly ensure proper delivery of a copy. Thanking you.—Leela Ghose. Deputy Superintendent. C/o. Asstt. Collector, Central Excise, Jubalpur.

আমাদের মাসিক বসুমতীর আষাঢ় '৬৪ থেকে মাঘ '৬৪ পর্যন্ত চাঁদা ১৮৮ পাঠাইলাম। শীগগির আষাঢ় সংখ্যা পাওয়ার আশা সাগ্রহ প্রতীক্ষায় বইলাম।—শ্রীমতী চাঁপাবাণী মণ্ডল, মেদিনীপুর।

Sending Rupees fifteen only being the annual subscription of 'Masik Basumati' from Asar number. Please instruct your despatch department to write the address properly—Sm. Anil Samanta. Hazaribagh.

আমার বার্ষিক মূল্য ১৫৮ টাকা M. O. করিয়া পাঠাইলাম আষাঢ় সংখ্যা হইতে "মাসিক বসুমতী" পাঠাইবেন। নমস্কার গ্রহণ করিবেন।—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সেন। বল্লভপুর, বর্ধমান।

মাসিক বসুমতী ছ' মাসের সড়াক মূল্যস্বরূপ ৭৮০ পাঠাইতেছি আমার চাঁদা চৈত্র মাসে শেষ হইয়া গিয়াছে। যদি সম্ভব হয় ও বৈশাখ হইতে বই পাঠাইবেন নতুবা আগামী মাস হইতে পাঠাইবেন—যুক্তি মুখার্জী। জয়লপুর।

Herewith sending Rs. 7-50 in advance for half-yearly subscription of 'Masik Basumati' kindly acknowledge and arrange to send the magazine from this month onwards. Thanking you.—Sm. Sulekha Roy. Bombay.

## শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অস্থিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে সামাজিকতা বন্ধা করা যেন এক দুর্ভাগ্যের বোঝা বহনের সামিল হয়ে পড়িতে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারণ উপনয়নে, কিংবা শুভদিনে, কারণ শুভবিবাহে কিংবা বিবাহ-বাহিকিতে, নয়তো কারণ কোন কৃতকার্যতায় আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার

'মাসিক বসুমতী'। এই উপহারের জন্ত শুদ্ধ আবেগের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই থাকা। প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা ভেদে খুশী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যেকোন জ্ঞাতব্যের জন্ত লিখুন—প্রচার বিভাগ।



॥ मासिक वस्तुमती ॥

ভাদ্র, ১৩৬৪

(দেশী পট)

লক্ষ্মীত্রী

—মহীতোষ বিশ্বাস অঙ্কিত





সতীশচন্দ্র যুধোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



# মাসিক বসুমতী

৩৬শ বর্ষ—ভাদ্র, ১৩৬৪

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

[ প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

## কথামৃত

আমি বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি সকলেই দুর্বলতা পাইতেছে, জন্মাবধি আমি শুনিয়া আসিতেছি, আমি দুর্বল। যখন আমার পক্ষে আমার স্বকীয় অন্তর্নিহিত শক্তির জ্ঞান করিন। পড়িয়াছে, কিন্তু যুক্তিবিচারের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, যাকে কেবল আমার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে জানিলাভ বস্তু হইবে মাত্র, তাহা হইলেই সব হইয়া গেল।

যে কোন উপদেশ দুর্বলতা শিক্ষা দেয়, তাহাতে আমার বিশেষ গতি। নব-নারী বালক-বালিকা যখন দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই এক প্রশ্ন করিয়া থাকি—তোমরা কি বল পাইতেছ? কারণ, আমি জানি, সত্যই একমাত্র বল প্রদান করে। আমি জানি, সত্যই একমাত্র প্রশ্নপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে কিছুতেই আমাদের বোধলাভ হইবে না, আর বীর না হইলেও সত্যে যাওয়া ষাইবে না। এই জন্তই যে কোন মত, যে কোন শিক্ষাপ্রণালী মনকে ও মস্তিষ্কে দুর্বল করিয়া ফেল, মাছুষকে কুসংস্কারবিষ্ট করিয়া তোলে, যাহাতে মানুষ অন্ধকারে

মস্তিষ্কগ্রস্ত অসম্ভব, আজগুবি ও কুসংস্কারপূর্ণ বিষয়ের অন্বেষণ করায়, আমি সেই প্রণালীগুলিকে পছন্দ করি না। কারণ, মানুষের উপর তাহাদের প্রভাব বড় ভয়ানক, আর সেগুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সেগুলি বুখামাত্র।

শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞানের উদ্বোধন—এই সব না হইলে দেশের উন্নতি কি করিয়া হইবে? সাধারণের ভিতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হইলে কিছু হইবার জো নাই। পুণ্য, ইতিহাস, গৃহকাণ্ড, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্রগঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হইবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করিতে হইবে। যাহাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণ হন, তাহাদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়। মেয়েদের তোমরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machine (উৎপাদন-যন্ত্র) করিয়া তুলিয়াছ। রাম, রাম! এই কি তোমাদের শিক্ষার ফল হইল? মেয়েদের আগে তুলিতে হইবে, mass-কে (আপামর সাধারণকে) জাগাইতে হইবে, তবে ত

—স্বামী বিবেকানন্দ

# এলবার্ট আইনস্টাইন

ক্ষিতীশচন্দ্র সেন

শায়ায় শায়িত পাঁচ বছরের কৃষ্ণ ছেলের মন ভোলানোর জন্তে পিতা নাবিকের 'দিগ্‌দর্শন' যন্ত্র নিয়ে এলেন। ছেলে প্রথমে অশ্রুমনস্ক ভাবে বহুটি নাভাচাড়া করলো। তার পর যন্ত্রের কাঁটার কাধ-কলাপ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। কোন অদৃশ্য শক্তি একে আকৃষ্ট করছে? এই অনুসন্ধিৎসাই কি বালকের মনে ভবিষ্যতে অগণিতখাত বিজ্ঞানী হবার প্রেরণা দিল?

এই বালকই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ এলবার্ট আইনস্টাইন। ছেলে বয়সেই এর স্বভাব ছিল অসাধারণ। বাগানের চেষ্টা ভিন্ন বকমের। খেলাধুলায় তেমন মন দিল না। কলনাপ্রিয় লাভুক ছেলেটি একাই অশ্রুমনস্ক হয়ে ঘরে বেড়াতে এবং পাখী, ফুল ও নৈসর্গিক শোভা দেখতে ভালবাসতো।

জার্মানীর দক্ষিণ প্রান্তে ব্যাভিরিয়া প্রদেশের উল্ম নগরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ আইনস্টাইনের জন্ম হয়। আইনস্টাইনের এক বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা উল্ম পরিভ্রমণ করে মিউনিক সহরে এসে সপরিবারে বসবাস করেন। খোল বছর বয়স পর্যন্ত আইনস্টাইনের এখানেই কাটে।

আইনস্টাইনের অনুসন্ধিৎস মন ছেলেবেলা থেকেই বয়োজ্যেষ্ঠদের নানারূপ প্রশ্ন করতো। এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ লক্ষ্যস্থল ছিল পিতৃব্য জ্যাকব। জ্যাকব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন এবং এক পরিবারেই বাস করতেন। তিনিই ভাতৃপুত্রের জীবন গঠনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। ছেলেটি ভৌতিক কাহিনী বা আকস্মিকী গল্পের চেয়ে অস্ত্রের বই পড়তেই বেশী ভালবাসতো। তাই এই বিষয়ে অজ্ঞাত ছেলেদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু অজ্ঞাত বিষয়ে পড়ায় তেমন মন ছিল না।

আইনস্টাইনের পিতা ছিলেন সাহিত্যপ্রিয়। দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলা তিনি পরিবারের সকলকে শীলার গোটে প্রভৃতি জার্মান গ্রন্থকারদের বই পড়ে শোনাতেন। মাতা ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়। পিতা ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে কোন দিন অল্পপস্থিত থাকলে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা সঙ্গীত-চর্চাভেদী কাটতো। ছেলেবেলায় আইনস্টাইনকে বেহালা শেখানো হয়। অবসর বিনোদনের জন্তে তিনি বেহালা বাজাতেন, তাতে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতেন। এই ভাবে আইনস্টাইন ছেলেবেলায় পরিবারের তিন ব্যক্তির নিকট তিন বিষয়ে উৎসাহিত হতে লাগলেন—পিতার নিকট সাহিত্যে, মাতার নিকট সঙ্গীতে এবং পিতৃব্যের নিকট গণিতে ও বিজ্ঞানে।

ছয় বছর বয়সে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্কুলে যাওয়াই ছিল ভয়াবহ ব্যাপার! সেকালের জার্মান স্কুলের আইন-কাহ্ন ছিল খুবই কড়া, সেনাদলের মত। শিক্ষকেরাও সহ্যহৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন না। স্কুলের পড়া মুখস্থ করতে হতো। জিজ্ঞাসিত হলে আউড়ে দিতে হতো, না হলে চুপচাপ বসে থাকবার নিয়ম ছিল। কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হলে বেত্রাঘাত— আইনস্টাইনের ভাবপ্রবণ জিজ্ঞাস্তা-মন একদম আইনে

কিছুতেই সায় দিল না। তিনি অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন। মনে হতো যেন স্কুলটা একটা গোলামখানা। ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ইহুদী। তাছাড়া খেলাধুলা করতেন না বলে অল্প ছেলেদের প্রিয় ছিলেন না। কাজেই স্কুলে একাকী নিজের মনে সঙ্কুচিত হয়ে থাকতেন। স্কুলের পরে বাড়ী এসে মেহশীল পিতামাতার কাছে শান্তি পেতেন।

দশ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে যিনি মিউনিকের লুইথপোল্ড জিমনেসিয়ামে ভর্তি হন। এই জিমনেসিয়াম-গুলি তাই স্কুলের অনুরূপ, সেখানে আট বছর পড়ে ডিপ্লোমা পেলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যায়।

শাস্ত্র, উদ্যমীনে ছেলেটি স্কুলের শিক্ষকদের নিকট খুবই রহস্যময় হয়েছিলেন; এমন কি, তাঁরা একে নিয়ে অনেক সময় বিব্রত হতেন। ইনি সাহিত্যে প্রভৃতি বিষয়ে কাঁচা ছিলেন। যে বিষয় তাঁর ভাল লাগতো না, সে বিষয় তাঁকে শেখানো মুশিল হতো। কিন্তু ঠাঁই বছর বয়সেই তিনি গণিতশাস্ত্রে এত ব্যাপণ হতেছিলেন যে, এ বিষয়ে শিক্ষকদেরও শিক্ষকতা করতে পারতেন। অল্প বিধে তিনি প্রশ্রবণে শিক্ষকদের জর্জবিত্ত করতেন। তাঁরা সব প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে হতবুদ্ধি হতেন। এ বিষয়ে একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে: একদিন স্কুলের ঘটটার পরে একটি শিক্ষক আইনস্টাইনকে একান্তে ডেকে বসানেন, “এলবার্ট, তুমি রাশ আমাকে এত প্রশ্ন কর যে, আমি সব উত্তর দিতে পারি না। বোধহয় কেউ পারবে না। এতে আমাকে অপদস্ত হতে হয়।”

“সর, আমি এ জন্তে ছুঁখিত, কিন্তু আমি জানতে চাই”—

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, পৃথিবীর সবাই তোমার এ সব প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাকে আর অপদস্ত করো না। ক্লাসে আমাকে আর প্রশ্ন করো না।”

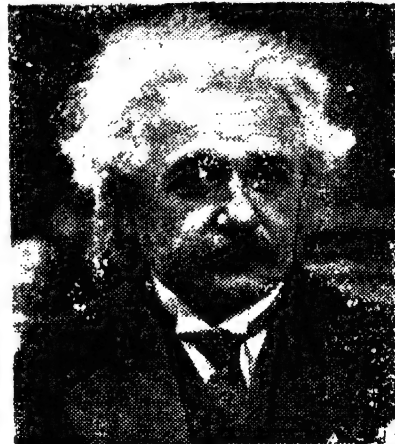
এ সময় জার্মানীর সামরিক শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যুবক সৈন্যদলে ভর্তি হওয়া গৌরবজনক মনে করতো। আইনস্টাইন সৈন্যদল সম্বন্ধে যথেষ্ট ভীতি ছিল। এমন কি, স্কুলের ছেলেরা সৈন্য সেজে খেলা করতো, তিনি দূর সার থাকতেন। তাঁর হতো, তাঁকে সৈন্যদলে যোগ দিতে হলে তিনি আর বাঁচবেন এই জন্তে তিনি পিতামাতাকে অনুরোধ করেন, জার্মানী ছেড়ে দেশে যেয়ে বসবাস করবার জন্তে।

ইতিমধ্যে তাঁর পিতার ব্যবসা খারাপ চলছিল। পি করলেন যে, ইটালির মিলান সহরে যেয়ে আবার নতুন করে ব শুরু করবেন। শুনে আইনস্টাইন খুবই আনন্দিত হলেন। যখন শুনলেন যে, তাঁকে এই মিউনিক সহরে একাই থাকতে স্কুলের পড়া শেষ করে ডিপ্লোমা নিয়ে যাবার জন্তে, তখন একেবারে দমে গেলেন। জীবনে এই প্রথম তাঁকে একা থাকতে হলো। গৃহের সুখ-শান্তিও আর বইলো না। খুবই বিব্রত হলেন। তারপর পালাবার এক মতলব

গেউনিক ভাগ করে

বসন্ত ঋতুর, কখনও বাষ্কির সুপারিশে বার্ষিক সফরের পেটেন্ট  
ক্রিষ্ণ দ্ব্যবশ্যে ১১-২ লো। যদিও মাইনে বেশী নয়,  
কিন্তু হিসেব একটি স্বায়ত্ত-প্রাণী চলে যেত। পূর্বেই তিনি  
ক্রিষ্ণ ছিলেনও এতটাই নৈ। এখানকার কাজ শিখে নিতে  
ক্রিষ্ণ ঈজারল্যাণ্ডের নারতে অল্পের ছাঁসাত ঘণ্টা লাগতো,  
ক্রিষ্ণ সময় লাগে ক্রিষ্ণে দিতেন। এতে সুবিধা হলো  
বসন্ত ঋতুর কাজ তিনি।

তাঁর মতবাদ প্রচারিত হবার পর বৈজ্ঞানিক-সমাজে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হলো। তখনও তিনি অপরিচিত। সম্ভান নিয়ে জানা গেল যে, তিনি পেটেন্ট অফিসের একজন সামান্য কেবালী মাস্ত্র, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। এতে সবাই বিস্মিত হলেন। এর পর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে অধ্যাপক হবার জাজ্ঞে আহ্বান করা হয়। কিন্তু আইনষ্টাইন প্রথমে রাজী হন নি। এ চাকরীই ভাগ, কারণ কাজের অবসরে অধ্যয়ন করবার অনেক সময়



## এলবার্ট আইনষ্টাইন

পাওয়া যায়। পরন্তু অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলে অধ্যাপনার জন্তে অনেক সময় অতিবাহিত করতে হবে। তাঁর নাম কেনার আকাঙ্ক্ষা কখনই ছিল না। শান্তিতে থেকে নিজের প্রিয় অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকতে পারলেই স্ত্রী হবেন।

কিন্তু এখন আর পেটেন্ট অফিসে কাজ করা চলে না। বৈজ্ঞানিক-সমাজে স্থান নেওয়া দরকার। অতঃপর জ্বরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের প্রবেশনায় তিনি বার্ষিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাময়িক ভাবে অধ্যাপনা করতে রাজী হলেন। অবশেষে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে জ্বরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

আমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি বক্তৃতা করতে যেতেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রেগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক বেতনে নিযুক্ত হইলেন। যে-সব ছেলে শিশুতে ইচ্ছুক তাদের তিনি সাহায্য করতেন। অনেক সময় ক্লাশের পড়া রেখে দিয়ে নিজের গবেষণার বিষয় ছেলেদের নিকট ব্যাখ্যা করতেন। এক বছর পর আইনষ্টাইন তাঁর প্রাক্তন বিদ্যালয় সুইস ফেডার্যাল পলিটেকনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে তিনি পাণ্ডিত্যের জন্তে বিখ্যাত হয়েছেন, কাজেই পুরনো বিদ্যালয়ে এসে খুব সম্মান পেলেন। বক্তৃতা দেবার সময় খুব ভিড় হতো। খুব কৌতুক মনে হতো যখন পক্ষকণ গর্জিত পুরনো শিক্ষকেরা তাঁর উচ্চদণ্ডে পাণ্ডিত্যের জন্তে খুব নীচু হয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতেন।

এখনও তিনি আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। কিন্তু মুশিল হলো যে, শিক্ষকতা করবার দক্ষণ তাঁর নিজের কাজের ব্যাঘাত হতো। শীঘ্রই ভাগ্যলক্ষী তাঁর এই বিষয় দূর করলেন। জার্মানীর বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ ম্যাক্স প্লাঙ্ক ও ওয়ালটার নার্নষ্ট, জ্বরিক এসে আইনষ্টাইনকে অম্ববোধ করলেন, বার্লিনের প্রেসিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সভা হয়ে কাইজার উইলহেল্ম ইন্সটিটিউটের অধ্যাপকতা করবার জন্তে। এখানে তাঁকে কেবল গবেষণা করতে হবে, অধ্যাপনা করতে হবে না। ইচ্ছা হলে বক্তৃতা দিতে পারেন। কাজটি অতি সম্মানের, বেতনও অনেক বেশী। দুই বছর পলিটেকনিকে চাকরি করবার পর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বার্লিনের কাজে যোগদান করেন। তিনি একাই বার্লিনে গেলেন। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলো। দুই ছেলে তাদের মায়ের কাছেই রইলো।

বার্লিনে আইনষ্টাইনের অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিলেন। তাঁরাই তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু তিনি যেতেন অস্বস্তি, এক পিতৃব্যের বাড়ীতে। পিতৃব্যের এক মেয়ে ছিল, নাম এলসা! মেয়েটি বিধবা, তাঁর দুই কন্যা। মিউনিকে ছেলেবেলায় তিনি এলসার সঙ্গে খেলা করেছেন। দু'জনের সখ্যতা ছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এলসার সঙ্গে আইনষ্টাইনের বিয়ে হয়। মেয়ে দুটিও তাঁদের সঙ্গেই বাস করতো। আইনষ্টাইন মেয়ে দুটিকে নিজের মেয়ের মত মনে করতেন। এলসা স্বামীর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি হলেন একাধারে গৃহিণী, মাতা, রন্ধনকারিণী, সচিব ও বন্ধক। স্বামীর সব খাবার তিনি নিজে হাতেই বাঁধা করতেন। স্বামী পড়ার ঘরে চুকলে কাউকে কোন গোঁসমালা করতে দিতেন না। নেত্র্য কাজ না থাকলে কোন দর্শক দেখা করতে পারতো না। সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য হাতের কাছে গুছিয়ে দিতেন। বাইরে বার হবার সময় পকেটে

সাবান নিয়ে। স্বানের এক দৃষ্টি কামানোর দুই রকম সাবান। স্বানের ঘরে রাখলে পাচ্ছে অস্বস্তি। ই রাখা হতো, যাতে দুই কাজই চলে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আইনষ্টাইনের বার্লিনে আগমনের কয়েক মাস পরেই, প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলো। শান্তিপ্রিয় আইনষ্টাইন এতে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি মোটেই হুঁ হুঁ তাঁর গবেষণায় আরও গভীর তিনি একাই বা কি করবেন? কারো কাছের আপেক্ষিকতাবাদের দ্বিতীয় মনোনিবেশ করলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পর কম লোকই তাঁর মতবাধা প্রকাশিত হলো। পৃথিবীর খুব নানা থাকলে এ সব বোধগম্য করতে পারে। গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞান, বিজ্ঞান ধারণা করা যায় না। চরম অস্বস্তি মনে থাকলে আনন্দিত হওয়া উচিত বোধ হয় না। চরম অস্বস্তি মনে থাকলে আনন্দিত হওয়া উচিত বোধ হয় না। চরম অস্বস্তি মনে থাকলে আনন্দিত হওয়া উচিত বোধ হয় না।

আলো সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন। প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে চলে। আলোর গতির কখনও পরিবর্তন হয় না। ঘড়ির গতি অনুসারে ঘড়ির কলের স্পন্দন ছিলেন দেওয়া যায়, তাই ঘড়িটি রকেটের দ্বারা একটি চলন্ত বাহনে বেধে না মুহূর্তের মধ্যে আলোর বাহনটি বস্তু চলতে থাকবে ঘড়ির কলও বস্তু লাগবে, ঘড়ির স্পন্দন হবে। সাধারণ অবস্থায় এক ঘটা বাজতে যে সময় লাগে, তাই পৃষ্ঠ সময় দরকার হবে। আলো হওয়ার দক্ষণ এক ঘটা বাজতে আরও বেশী সময় লাগবে। আলোর গতির দ্রুততা ঘড়ির স্পন্দন বাহনের ভিতরে স্থিত ঘড়ির সঙ্গে বাইরে সাধারণ। এ যাবে। যদি ঘড়ি ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করলে এ পরিবর্তন লক্ষ্য করা না পুরোপুরি স্পন্দন হবে। আলোর বেগের সমান হয়, তাহলে ঘড়ির কল চলবে।

পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত মতবাদ অনুসারে পদার্থ হতে হয়। শক্তির সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। পরস্পরের কোন সাদৃশ্য নেই। আনি জানকলের উচ্চতর ওজন বা স্তর নেই। এক গ্রাস জল গরম করলে তাই এ সব প্রশ্ন মোটেও তাপের পরিমাণের পরিবর্তন হবে। কিন্তু গ্রাসকে আর অধিক-তর তাপ ওজনের কোন তারতম্য হবে না। কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদে পদার্থগতিক শক্তি এবং পদার্থ দুটি বিভিন্ন সত্তা নয়, পরস্পর মতনই বৃদ্ধি পদার্থবাদ তাই সত্তা এ দুটি ভিন্নরূপে ব্যক্ত হয়। এই বিশ্লেষণ মনে করতো যে শক্তি প্রমাণিত হলো যে, পদার্থ অপরিবর্তনীয়, পরস্পর মতনই বৃদ্ধি পদার্থবাদ তাই পদার্থ শক্তি হলো প্রবাহমান পদার্থ। বস্তুকে শক্তির সারি থাকে গণিতিক বস্তুতে পরিবর্তন করা সম্ভব। আপেক্ষিকতাবাদে তাই হলো তিনি সামান্য অনুসারে এই পরিবর্তনের হার নির্ণয় করা যায়। করেন, জার, সোল প্রচুর শক্তি লুপ্তায়িত রয়েছে। কাঠ, খড়, রব স করে প্রভৃতি যে কোন পদার্থের সম্পূর্ণ এক গ্রাম বস্তু খাওয়া চলতি শক্তি কপালবিত্ত করলে আড়াই কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা করে আবার নতুন পা হবে। তিন হাজার টন কয়লা পোড়ালে অল্পকণ শক্তিই আনন্দিত সাত এক গ্রাস জল উত্তপ্ত করলে মোট জলের ওজনের এক সহস্র এক ওজন পাবে যে, কোন হুম-অমৃদুভি-সম্পন্ন তুলনায়ও এ নিয়ে যাবার মতো হবে না। এক হাজার টন জল সম্পূর্ণ বাষ্পীভূত করলে প্রথম তাঁকে বিশ তাপের দরকার, তার ওজন হবে মাত্র এক গ্রামের মত আর বইতে ভাগ। এই সূত্র থেকেই পারমাণবিক শক্তিকে আটম লাভার এক কাজে নিয়োগ করবার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল।

স্তর ওজন ও আয়তন তার বেগের উপর নির্ভর করে। বস্তুর বেগ যত বেশী হবে তার ওজনও তত বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু আয়তন কম যাবে। বস্তু যদি আলোর বেগের অর্ধেক গতিতে চলে, তা তার আয়তন শতাত্তশের প্রায় পনের ভাগ সঙ্কুচিত হবে। সাহায্যে ইলেকট্রন ও প্রোটনের গতি বৃদ্ধি করে দেখা গেছে যখন তাদের গতিবেগ প্রায় আলোর বেগের সমান হয় ন তাদের ভর যথাক্রমে ৬০০ গুণ এবং শতাত্তশের ৩০ ভাগ হয়।

তারার আলো যখন সূর্যের দ্বার ঘেঁষে পৃথিবীতে আসে তখন লোম বর্ণিমা সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের ফলে বানিকটা থেকে যায়, কেবলো সোজা আসে না। পূর্বে ছুটি তারা যে অবস্থায় দেখা যেত, তারা থেকে গেলে তাদের অবস্থান সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হবে। মনে যে মনে তারা স্থান পরিবর্তন করেছে, হয়তো পদার্থের আরও নিকটে এসেছে অথবা দূরে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু মুন্সিল হলো যে, রূপ তখনই সম্ভব হবে যখন সূর্য পৃথিবী এবং তারার মাঝখানে থাকে, অর্থাৎ দিনের বেলায়। কিন্তু দিনের বেলায় প্রখর বেগে যা দেখা যায় না। আইনস্টাইন প্রস্তাব করলেন যে, সূর্যের পূর্ব হতে চলে দিনের বেলায় তাই দেখা যাবে। আইনস্টাইনের এক বিজ্ঞানীর মাধ্যমে প্রমাণ করার জন্য পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত হলেন। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে একটি অধ্যয়ন দিন। ত্রি দিন পূর্ব সূর্যগ্রহণের সময় একটি পর্যবেক্ষণ করবার জন্য ইংল্যান্ডের বঙ্গল সোসাইটি ছুটি জার্মান দল পাঠালেন, একটি ব্রেজিলে এবং আর একটি ফ্রান্সে। তাঁরা শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহণের সময় তার অবস্থান সম্বন্ধে আলোকচিত্র গ্রহণ করলেন। পরে এ সকল আলোকচিত্র পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, আইনস্টাইনের পথনা একবারে সত্য হল।

আইনস্টাইনের সহকর্মীরা উদ্ভাসিত হয়ে তাঁকে অস্বিনন্দ জানিয়ে দেন, এমন আপনাব্য তত্ত্ব মিথুলা প্রমাণ হওয়াতে আপনি নিশ্চয়ই খুশী হয়েছেন। এই কথা শুনে তিনি মুগ্ধ থেকে আমাদের পি দাবিয়ে বেগে একটি আশ্রয় হয়ে বসলেন, আমার ত আমার কোন দরকার ছিল না। তাদের প্রমাণের দরকার আমার তাই বাইত পেল। এই ভাবে তিনি বিশ্বাসী হইলেন। খুব লোকটি তাঁর তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে পারলো। তাহলেও আখ্যাতি জনসাধারণে প্রচারিত হলো। এই নিজনতাগ্রন্থটি চার দিক থেকে উত্ভাস হতে লাগলেন। পৃথিবীর প্রায় আধাত্তই বহু চিঠিপত্র পেতে লাগলেন। ফটোগ্রাফার, বৈজ্ঞানিক, হস্তনির্ণীত-সংগ্রাহক প্রভৃতি বহু লোক তাঁকে বিবস্ত্রিত লাগলো। হলিউড থেকে তাঁর চলচ্চিত্র নেওয়ার জন্য তাঁকে টাকা দিতে চাইলো। এই সব অর্থ-শ্রমে আইনস্টাইন মস্তব্য করেন, পৃথিবীর লোক উন্মত্ত হয়েছে।

সূর্যের প্রারম্ভে জামেীর বিখ্যাত লেখক, চিত্রকর, বিজ্ঞানী, প্রভৃতি বিরানলই জন বিধান ব্যক্তি মিলে একটি পথপত্র প্রচার করলেন, জামেীর যুদ্ধ করছে আত্মরক্ষা করার জন্য। কাজেই জামেীর নির্দোষ। যোষণাপত্রটি আইনস্টাইনের চিঠি আনা হয়েছিল সেই করবার জন্যে। কিন্তু ওই শাস্ত্রশিষ্ট

ভদ্রলোকটি সেই করতে অস্বীকার করে বসলেন, যুদ্ধ যখন আরম্ভ হইয়াছে তখন কে দোষী এবং কে নির্দোষী, এ সম্বন্ধে বাদামুবাদ না করে, পৃথিবীর সকল জাতি এক হয়ে শান্তির ব্যবস্থা করাই এখন মুক্তিযুক্ত। এরূপ উক্তি আইনস্টাইনের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হলো। নেহাং তিনি মুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক বলে বিশাসঘাতক আখ্যা থেকে অব্যাহতি পেলেন। তাহলেও তাঁকে অনেক কটুক্তি সহ করতে হয়েছিল।

অনেক চেষ্টা করলেও তাঁকে পরিপাটি থাকবার অভিাস করানো যেত না। চিলা পায়জামা, পুরনো কোট এবং তামাকের পাইপই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। তিনি ছিলেন অতি সদাশয় ব্যক্তি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের উপকার করবার জন্যে অধিকতর সময় নিয়োগ করতেন এবং অস্ত্রের দুঃখে সহ্যভুক্তি দেখাতেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁকে পদার্থবিজ্ঞান নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারের সমস্ত টাকাই তিনি প্রথমা স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন। প্রথমা স্ত্রী আইনস্টাইনের কাছ থেকে নিয়মিত সাহায্য পেতেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি পৃথিবীর সব দেশেই ভ্রমণ করতে লাগলেন—ইংল্যান্ড, দক্ষিণ-আমেরিকায়, জাপানে, প্যালেস্টাইনে, স্পেনে ও যুক্তরাষ্ট্রে। কেবল বৈজ্ঞানিক বস্তুত উপলক্ষেই যেতেন না, মানুষের শ্রমসমৃদ্ধি সম্বন্ধেও আগ্রহাশ্রিত ছিলেন। তিনি রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিগ্গপ্রেমিক। আইনস্টাইন দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ভ্রমণে যান ১৯২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে, ইতালির নেতা উইজমানের প্ররোচনায়। প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমেরিকাবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে। এখানে অনেক অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

অতিমধ্যে অল্পাভাব প্রভৃতির জন্যে জামেীর আভাস্তবীণ অবস্থা সন্ধান হইছিল। দুর্বৃত্তদের অত্যাচার বৃদ্ধি পাছিল। এই সময়ে হিটলার ব্রাউন সার্টি ষ্ট্রিক্টুপার নামে দল গঠন করেন। পরে এই দলই ন্যাসি নামে পরিচিত হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হাজার হাজার লোক এই দলে যোগদান করে। এদের কার্যকলাপ ছিল ভীতিপ্রদর্শক। ইহুদী-বিদ্বেষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাছিল। হিটলারের দল ছিল আইনস্টাইনের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষী। তিনি অনেক ভীতিপ্রদর্শক চিঠিপত্র পেতেন, কিন্তু এ সব কিছুই গ্রাহ্য করতেন না। বিপদ ক্রমেই ঘনিয়ে এল। ডাঃ ওয়ালটার রথেনো যুদ্ধের সময় খাজ এবং যুদ্ধোপকরণ সৈন্যদলের নিকট পরিবহন সম্বন্ধে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি এই সময় জামেীর পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে এ কাজে নিয়োগ করাতে হিটলারের দল ক্ষিপ্ত হলো। কারণ তিনি ছিলেন ইহুদী। একদিন অফিসে যাবার সময় তাঁকে রাস্তার উপরে গুলী করে হত্যা করা হয়। তিনি ছিলেন আইনস্টাইনের বিশেষ বন্ধু। আইনস্টাইন এ ব্যাপারে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্যে তাঁর স্ত্রী উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে বিদেশে গেলেই স্ত্রী নিশ্চিন্ত হতেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে লীগ অব নেশন্সের শাখা-কমিটি অব ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন, স্থাপিত হলে তাঁকে এই কমিটির সভ্য করা

হয়। শাস্তি স্থাপনের জল্পা পৃথিবীর বিজ্ঞানদের একত্রিত করাই এট কমিটির উদ্দেশ্য। সভার মধ্যে ম্যাডাম ক্যুরী, বব্যাট মিলিকান ও লরেঞ্জ ছিলেন। এরা সবাই আইনষ্টাইনের বিশেষ বন্ধু।

যখন আইনষ্টাইন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুতা দিতে গেলেন, তখন জার্মানিতে নাসিস দল প্রবল-পরাধীন। আইনষ্টাইনের প্রতি নাসিসদের বিশেষ আকোশ। তিনি মনস্থ করলেন যে, জার্মানিতে আর ফিরবেন না। বেলজিয়ামে যেয়ে বসবাস করবেন। বেলজিয়ামে যাবার পথে খবর পেলেন, তাঁর বার্লিনের বাড়ীঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে মাধ্যমিক অন্ত্রশস্ত্রের সন্ধান। তাঁর বাস্কের সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বেলজিয়ামে এসেই প্রিশিয়ান অ্যাকাডেমিতে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। জার্মানীর এত কাছে বেলজিয়ামেও তিনি নিরাপদ নন। ইতিমধ্যে নাসিসরা তাঁর মাথার জন্তে এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছে। শুনে তিনি মাথার হাত বুলিয়ে চেঁসে বললেন, তিনি জানতেন না তাঁর মাথার এত দাম। তাঁকে ইউরোপ পরিত্যাগ করে যাবার জন্তে বার বার অঘরোধ করা হচ্ছিল। অবশেষে তিনি রাজী হলেন। প্রথমে লণ্ডনে, পরে যুক্তরাষ্ট্রে সতর্ক পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবরের মাঝামাঝি তিনি নিউইয়র্কে পৌছেন। নিউইয়র্ক থেকে সোজা প্রিন্সটনে চলে যান। সেখানে ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড ষ্টাডিজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন।

তিনি ছিলেন মানুষের ভবিষ্যৎ সন্ধে ব্যেঠে আগ্রহান্বিত এবং তাদের দুঃখকষ্টে সমাহৃত্তিসম্পন্ন। এই জ্ঞানতপস্বী তাঁর ভাবের বিভোর হয়ে থাকতেন। যতটা সম্ভব অস্ত্রের সসর্গ এড়িয়ে চলতেন। সামাজিক রীতি-নীতিতে তিনি বিদ্বিষ্ট না হলেই খুশী হতেন। তিনি মান-সম্মান, টাকা-পয়সা, রাজ-পোশাক সন্ধে ছিলেন উদাসীন। নিভূতে লেখাপড়া করতে এবং অবসর সময়ে বেহালা বাজাতে পারলেই সবচেয়ে সুখী হতেন।

জার্মানীর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে লাগলো। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রাইনল্যান্ড এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া জার্মানী অধিকার করলো। আইনষ্টাইন প্রথমে যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরে বুঝলেন যে, ওই নৃশংসতা ও হত্যা নিবারণ করতে হলে বলপ্রয়োগ অনিবার্য। তিনি এ-ও জানতেন, যে দেশ যত বেশী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করবে সেই দেশই পৃথিবীতে জয়ী হবে। তিনি ছিলেন পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা সন্ধে ওয়াকিবহাল। ইতিমধ্যে মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের বিভাজন দ্বারা প্রচুর শক্তির সন্ধান পাওয়া গেল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২রা আগস্ট, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার এক মাস পূর্বে, তিনি বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে এক পত্রে জানালেন যে, ইউরেনিয়ামের বিভাজন দ্বারা প্রচণ্ড শক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই শক্তি হয়তো জিন্নজাতীয় অতি শক্তিশালী বোমা তৈরী করতে নিয়োগ করা যেতে পারে। এরূপ সম্ভব হলে, এ জাতীয় একটি বোমার ধ্বংস করবার চেষ্টা আর বিস্তারিত। অতএব এদেশের সরকারকে এ সন্ধে

অবহিত হয়ে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই সাবধান-বাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে খুব ক্ষিপ্ততা সন্ধেই কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন বিজ্ঞানীদের একত্রিত করলেন, এ সন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্তে অবশ্য আইনষ্টাইন আটম বোমা তৈরীর ব্যাপারে কোনরূপে সাক্ষী ছিলেন না।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার নাগরিক হন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সটনের অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য অবসর গ্রহণের পরও গবেষণা কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তখনও আপেক্ষিকতত্ত্ব সন্ধে গবেষণা সম্পূর্ণ হয়নি। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে আপেক্ষিকতাবাদের তৃতীয় পর্ব প্রচার করা হলো। তিন বছর পর এই পর্বই সমাধািত করে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট ভিবোসিমাতে প্রথম আটম বোমা বিস্ফোরণের পর তিনি অনুভব করলেন যে, এ ভাবে পারমাণবিক শক্তিকে অপব্যবহার করলে পৃথিবীতে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁর সভাপতিত্বে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি সমিতি বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি ইমার্জেন্সি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণকে বুদ্ধি দেওয়া যে, নতুন উদ্ভাবিত শক্তি খুবই প্রচণ্ড। একে ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ না করলে বিপজ্জনক অবস্থা হবে। আইনষ্টাইন বিশেষ করে বললেন, বিবদমান দেশসমূহ ত্বরিতে পরস্পরের প্রতি এই শক্তি প্রয়োগ করলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কার্লেই মনুষ্যজাতির নিরাপত্তার জন্তে জন্মত গঠন করতে হবে। পৃথিবীতে সব সোকেই বাস বরবার অধিকার আছে। পদস্পর্ষ হীনতানি না করে যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি সহনশীল হয় এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি মানুষের উপকারে নিয়োগ করে, তাহলে ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল এই মহানামের দেহাবসান হয়। বর্তমান শতাব্দীতে বিশ্বজগৎ সন্ধে মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম পর্যন্ত, পরমাণুর অভ্যন্তর থেকে অসীম বিশ্ব পর্যন্ত একটি ভিন্ন রূপ মানুষের নিকট প্রতিভাত হয়েছে। মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এত অল্প সময়ে এত দ্রুত পরিবর্তন আর কখনও সম্ভব হয়নি। কেবল প্রয়োজনের তাগিদেই নয়, মানুষকে অনুসন্ধিৎসাই বিশ্বপ্রকৃতির তুর্দীঘ্য রহস্যকে উদ্ঘাটন করে চেষ্টা করছে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদই বিজ্ঞানীয় বিশ্বজগতের বৈচিত্র্য সন্ধ্যে বর্তমান মতবাদ উদ্ভাবিত করতে সাহায্য করেছে।

বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠগুণ। গুণাবাসী মানুষ থেকে আ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষের সভ্যতার যে অগ্রগতি, তা স হয়েছে মানুষের বুদ্ধিমত্তার জন্তেই। কিন্তু এট অগ্রগতি স মনুষ্যজাতির শন্যায় ফলে হয়নি। খুব কম লোকই উচ্চভাবসম্পন্ন অতিপ্রতিভাশালী করেক জন মহাপুরুষই মনুষ্যজাতির চিন্তানার তাঁরাই যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে অনির্বচনীয় অসংখ্য প্রকৃতির 'রহস্যের রূপায়ণ করেন এবং মানুষের ভাবধারাকে উত্তরোত্তর উ পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

# ভূমিকম্প

ঐশ্বরীকেশ রায়

**সেদিন** গ্রীসের ভূমিকম্পে ধনভরনের যে অপরিমিত ক্ষতির বিবরণ সংবাদপত্রে ঘোষিত হ'ল, সে কি কোন দৈব টানা বা আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়? পৃথিবী-পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে যে কম্পন মাঝে-মাঝে অনুভব করা যায়, এ কি কেবল বিধির ধান বলেই আশ্চর্য্য থাকতে হবে? ধরিত্রীর ধারক সহস্রকোটি স্তম্ভ চঞ্চল হলে ভূমিকম্প হয়, কল্পনাবিলাসীরা এ কল্পনা কি কিস্তি? গ্রীসের প্রসিদ্ধ দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে পৃথিবীর রক্তস্রোতে বায়ুপূর্ণ গহবরের বন্দী বায়ুর মুক্তি প্রচেষ্টাই ভূমিকম্পের কারণ। অল্পদক্ষিণে মধ্য এই সকল মুক্তিহীন কাঠিনীর পরিবর্তে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভূমিকম্পের কার্য-কারণ নির্ণয় করতে, উদ্ভাটন করতে চায় এর প্রকৃত বস্তু।

ভূপৃষ্ঠের বহিরাবরণের গভীরতা চল্লিশ মাইল। নানা জাতীয় শিলার সমন্বয়ে এই বহিঃকর্ষ গঠিত। রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু, তুষার প্রভৃতির নানা ক্রিয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের এই শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্ষয়িত শিলার পললরূপে সঞ্চয়, ভূ-সংকোচ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিপাত সত্যতঃ সৃষ্টি করে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধন করে। ভূমিকম্পও একেবারে পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। আপাতঃ দৃষ্টিতে ভূ-পৃষ্ঠ নিশ্চল বা ন্যূনকম্পনে হলেও সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাত, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা, জলপ্রপাতের জলরাশির সবেগে নিয়ে পতন, যানবাতনের দ্রুত গমনাগমন, এমন কি বায়ুগুণ্ডে বায়ুচাপের পরিবর্তনও ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে অবিরত যে সূক্ষ্ম কম্পন অনুভূত হয়, তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও ভূমিকম্পলিপি যন্ত্রে ধরা পড়ে। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন কারণে বিবর্তনকারী ভূ-পৃষ্ঠের মুক্ত বা তীব্র যে কম্পন তার উৎস ভূপৃষ্ঠের গহবরে এবং তাকেই আমরা সাধারণতঃ ভূমিকম্প বলি। স্থলভাগের গাঢ় সমুদ্রগর্ভেও ভূমিকম্প বিবল নয়।

বা-নির্মিত ঘণ্টার কোন স্থানে আঘাত করলে ঘণ্টার বহিঃকর্ষে এক প্রকার তরঙ্গায়িত স্পন্দন অনুভব করা যায়। ফলে কোন ভাবী জিনিষ পড়লেও এইরূপ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ভূ-পৃষ্ঠের বহিরাবরণ স্থিতিস্থাপক বলে কোনরূপ আঘাতে সেখানেও কম্পন অনুভব করা যায়। পৃথিবীর অভ্যন্তর কোন কারণে আলোড়িত হলে স্থানবিশেষে কম্পন জনিত তরঙ্গ ভূ-পৃষ্ঠে যে স্পন্দনের সৃষ্টি করে তাকেই ভূমিকম্প বলে। ধাতু বা জলে তরঙ্গের সৃষ্টি হলে যেমন তার আংশিক স্থানচ্যুত হয় না, ভূমিকম্পের সময়ও সেইরূপ শিলার অংশগুলি সে নিয়মের বাহিরে করে না, তরঙ্গের ব্যাপ্তিতে মাত্র কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের ক্রিয়াস্থল ভূ-পৃষ্ঠে, কিন্তু স্পন্দনের স্রোত হয় ভূগর্ভে, অধিক দ্রিশ মাই গভীরতার মধ্যে। কয়েক বৎসর পূর্বে ৪০ মাইল গভীর স্থানেও স্পন্দনের স্রোতের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই উৎপত্তিস্থলকে বলে ভূকম্পনকেন্দ্র (Seismic focus) এক ভূগর্ভের বহিঃকর্ষে অবস্থিত কেন্দ্রের ঠিক উপরিপ্তি স্থানকে উপকেন্দ্র (Epicentre) বলে। ভূকম্পন-কেন্দ্র, ভূপৃষ্ঠ থেকে তার গভীরতা এক উপকেন্দ্র ভূকম্পলিপি যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ভূমিকম্পের প্রধান কারণ বলে মনে হলেও বস্তুতঃ দেখা যায়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত যত অধিক হয়,

ভূমিকম্পের সম্ভাবনা এবং গুরুত্বও তত কমে যায়। আগ্নেয়গিরি-প্রধান স্থানসমূহে শিলাস্তরের অপটুত্ব নিবন্ধন সেই অঞ্চলে সম্ভাব্যতঃ ভূমিকম্প বেশী হয়। এইরূপ ভূমিকম্পের প্রবলতাও দূরপ্রসারী হয় না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপ ও স্ত্রীমাত্রার মধ্যেবর্তী ক্রাকাতোয়ার এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জাপানের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে কেবলমাত্র নিকটবর্তী স্থানে প্রবল ভূমিকম্প চলেছিল; কিন্তু এইরূপ ভূমিকম্পের প্রবলতা সাধারণতঃ কমই হয়। এমন কি অনেক সময় কোন কম্পনই অনুভব করা যায় না। মার্টিনিক দ্বীপে ম'পেলে (Mont Pelee) ১১০০ খৃষ্টাব্দে সক্রিয় হলে অতি সামান্য কম্পনই অনুভব করা গিয়েছিল। এরূপ বহু অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূপৃষ্ঠে কোন স্পন্দনই অনুভূত হয় না। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কিলোউয়াতে প্রতিষ্ঠিত ভূকম্পলিপি যন্ত্রে সময় সময় মাসে কয়েক শত স্থানীয় কম্পন ধরা পড়লেও, আগ্নেয়গিরি সে-সময় নিষ্ক্রিয় থাকে; সেজন্য এরূপ ভূমিকম্পের সম্ভাব্য কারণ মনে হয়, ভূগর্ভে ম্যাগমা নামক গলিত ধাতু ও দ্রব গ্যাসীয় পদার্থে পরিপূর্ণ এক প্রকার শিলার সঞ্চরণ। ইহা ব্যতীত, আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হবার পূর্বে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প, বিবিধ বায়বীয় পদার্থ, গলিত লোহা প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ চাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে চেষ্টা করে, তার ফলেও ভূত্বকের কিয়দংশ আলোড়িত হয়; অবশ্য এক্ষেত্রেও তীব্রতা ও ব্যাপকতা কমই হয়। জাপানে এ বিষয়ে বহু গবেষণার পর স্থির হয়েছে যে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের মধ্যে নিগূঢ় কোন সম্বন্ধ বর্তমান নাই।

ম্যাগমার সঞ্চরণ বা ভূগর্ভের চাপ থেকে বিভিন্ন পদার্থের মুক্তি-প্রচেষ্টা স্থানীয় ভূমিকম্পের কারণ হলেও, ভূমিকম্পের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ এখনও নিকপিত হয় নাই। তবে বিভিন্ন কারণের মধ্যে ভূত্বকের ভাঁজ ও স্তরচ্যুতি, ভূসংকোচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্তরচ্যুতির দ্বাবাই প্রধানতঃ তীব্র ও ব্যাপক ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিকগণ আরও লক্ষ্য করেছেন যে, শীতকালে এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ভূমিকম্প বেশী হয়, অবশ্য এর কারণ এখনও অজ্ঞাত। আবার নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর অন্তর যে স্থানবিশেষে প্রবল ভূমিকম্প হয় তাও দেখা গেছে; যেমন, জাপানে প্রবল ভূমিকম্প হয় তের বছর অন্তর। সেজন্য এক বা একাধিক কোন শক্তি ভূমিকম্পের মূলে কার্যকরী হয় তা' এখনও নির্ণয় করা যায় নাই।

অস্বাভাবিক ভাবে বিপর্যস্ত, বৃষ্টি ও চাঁদযুক্ত পালশিশিলাস্তরের স্বাভাবিক অবস্থার আসবার বহু বর্ষব্যাপী চেষ্টার কোন স্তর ধ্বংস গেলেও প্রবল ভূমিকম্প হয়। স্থবীতাপ, বায়ু, বৃষ্টিপাত, তুষার, হিমবাহ প্রভৃতির দীর্ঘকালের ক্রিয়ার ফলে পাহাড়-পর্বতের উপরিভাগের শিলাস্তর ক্রমশঃ শিথিল হয়। এই অবস্থায় সেই স্তর ঢালের দিকে কাত হয়ে থাকলে অভিকর্ষ তাকে অবিরত নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ করতে থাকে, ফলে স্তরটি একদিন হঠাৎ নিম্নগামী হ'লে তার পতনজনিত ধাক্কা হয় ভূমিকম্প। এইরূপ ভূমিপাতের ফলে যেমন ভূমিকম্প হয়, তেমনই আবার ভূমিকম্প হলেও ভূমিপাত হতে দেখা যায়। ভূমিপাতের ফলে যে ভূমিকম্প হয়, পৃথিবীর বহিরাবরণ মাত্র তাতে স্পন্দিত হয়, এক তাও খুব

প্রবল ভাবে নয়। পৃথিবীর অন্তরে এর জগা বিশেষ কোন চাক্ষুষ লক্ষিত হয় না। উত্তর-আমেরিকার বকি, ইউরোপের আল্পস, ভারতবর্ষের হিমালয় প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিগত বিবল নয়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর দার্জিলিং পাঠাতে এবং ১১০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর পাঠাবে ভূমিগতের জগা সামান্য ভূমিকম্প অনুভূত হয়। বিরাট তুমারত্বের পরনেও এইরূপ ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

পৃথিবীর উপরিভাগ নীতল মনে হলেও অন্তস্তর গুই উত্তপ্ত। তাপবিকিরণ করে পৃথিবী ধীরে ধীরে সাক্ষ্যিত হওয়ায় প্রবল চাপে কোথাও সমুদ্র এবং কোথাও পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক হোমস্ বলেন, ভূগর্ভে তেজস্ক্রিয় (Radio active) পদার্থ থাকায় পৃথিবীর নীতল হওয়া সম্ভব নয়; আভ্যন্তরীণ উত্তপ্ত পদার্থের পরিচলন-স্রোত দুর্বল ভূত্বকে আত্মভূমিক (Longitudinal) চাপ দেওয়ায় ভাঁজবিশিষ্ট পর্বতের সৃষ্টি হয়। আবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলাস্তর অবিরত ক্ষয় হয়ে ক্ষয়িত অংশ জলস্রোতে সমুদ্রগর্ভে নীত হয় এবং বহু বছর ধরে স্তরে স্তরে পাললিক শিলারূপে সেখানে সঞ্চিত হয়। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কোন শক্তির ক্রিয়ায় সেগুলি উৎখানো হয়ে পর্বতের সৃষ্টি করে। এমনি করেই পৃথিবীতে জল ও স্থলের একটা সাম্য অবস্থা বক্ষিত হয়ে আসছে।

হিমালয়ের গঠনপ্রণালী ও তার শিলাস্তরে সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ জীবাশ্মরূপে পেয়ে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, হিমালয়ের উপাদান যে পাললিকশিলা তা একসময়ে সমুদ্রগর্ভেই ছিল। উত্তর-দক্ষিণে পার্শ্বচাপের ক্রিয়ায় সেই শিলাস্তর ভাঁজ হয়ে উর্ধ্বে উঠে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত বলে গণ্য হয়েছে। ইউরোপের আল্পস পর্বত হিমালয়ের মত পাললিকশিলায় গঠিত ভাঁজবিশিষ্ট। তা। পাললিক শিলাস্তরে এই যে ভাঁজ, এর তুলনা করা চলে, পাশে চাপ দেওয়া বই, সতরঞ্চ বা কাপেটে যে ভাঁজ পড়ে তার পে। এমনি ভাবে ভাঁজ বাঁওয়ার জগতের গুলি ক্রমাশ: দুর্বল হ় আর ভয় হয়ে স্থানচ্যুত হয়। ভূত্বকের কৃষ্ণিত, বিপর্যস্ত ও তি (Fault)-যুক্ত এই সকল স্তরের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়াস চাতিব পার্শ্ব ভূভাগ সারে গেলে ভূমিতে যে তার ধাক্কা লাগে, তাইই স্পন্দন চাবিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে ভূগর্ভে আসে এবং প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হয়। অনেক সময় এইরূপ চাতি ভূত্বকের এত গভীর প্রাঙ্গণে সংঘটিত হয় যে, তার স্পন্দন আমরা ভূগর্ভে আদৌ অনুভব করি না। চাতিব ফলে ভূমিকম্প হলেও, চাতিব চান্দ্র্য প্রমাণ এইজগত অনেক সময় পাওয়া সম্ভব হয় না। চাতিব সহিত ভূমিকম্পের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তার সাক্ষ্য দেয় আতঙ্ক সৃষ্টিকারী কয়েকটি ভূমিকম্প; তার মধ্যে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বেলুচিস্তানের, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে আসামের এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কোয়টোর ভূমিকম্প প্রধান। কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশে যে ভূমিকম্প হয়, ভূতবলিগণ তার অস্ত্র এক কাশণও অহুমান করেন। তাঁরা বলেন, হিমালয়ের শিলাস্তর ঝুইপাতের দ্বারা ক্ষয় পেয়ে সিদ্ধ-গঙ্গার স্রোতে পরিণত বাহিত হয়ে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হয় এবং তাতে যে বিরাট চাপের সৃষ্টি হয়, তারই ক্রিয়াতে উক্ত স্থানে মাঝে মাঝে

ক্রমবর্ধনশীল হিমালয়ের গঠনকার্য এখনও অব্যাহত গতিতে চলে। তাই হিমালয় ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে এখনও ভূমিকম্প হয়।

স্থলের জায় সমুদ্রগর্ভেও ভূমিকম্প হয় এবং ইহা Tsunami নামে সর্বত্র পরিচিত। প্রশান্ত মহাসাগরগর্ভে অধিকাংশ ভূমিকম্প উৎপত্তিস্থল বলে দেখা গেছে। তবে আটলান্টিক মহাসাগর মাঝামাঝি ও উত্তর-দক্ষিণে একটি ভূকম্পপ্রবণ স্থান আছে। সমুদ্রগর্ভে Tsunami-র ক্রিয়া যেমন তীব্র ভাবে অনুভূত না হলেও, উপকূল এর ধাক্কা লাগে কলনাতীত! ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে প্তুগালের রাজধানী লিসবন, ১৭০৩ ও ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে Tsunami সৃষ্ট হওয়া ভেসে গিয়ে হাজার হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে। সমুদ্রগর্ভে ভূমিকম্প হলে সমুদ্র-স্তরে যে তরঙ্গের উৎপত্তি হয় তার উচ্চতা ১ ফুট, বিস্তার ১০০ থেকে ১০০ মাইল পর্যন্ত এবং গতিবেগ ঘণ্টা ৩০০ থেকে ৫০০ মাইল হয় অর্থাৎ এরূপ তরঙ্গ প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে মাঝ বায় সটায়। অনেক তীব্র ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সমুদ্রগর্ভে হওয়ার ফলে সমুদ্রগর্ভের শিলাস্তরে চাতি দেখা গেছে।

বৃটিশ বৈজ্ঞানিক ভন্স মিলনে জাপানে পদার্থবিজ্ঞা অধ্যাপক সময় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যে ভূকম্পলিপি যন্ত্রের আবিষ্কার করেন—এখন এত উন্নতি হয়েছে যে, তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের অতি সামান্য ক—মা আন্দাজ অনুভব করতে পারি না, তাও লিপিবদ্ধ হয়।

এর পরে আরও কয়েক প্রকার ভূকম্পলিপি যন্ত্র আবিষ্কৃত হ়ে আরব সাগরে বাড়েব ফলে চেইয়ের পাক্ষীয় ভূপৃষ্ঠের যে স্পন্দন দূরবর্তী বোম্বাই-এর কোলোবা মানমন্দিরে ভূকম্পলিপি যন্ত্র ধরা পড়ে তাতে সমুদ্রগর্ভে ভাঁজের অব্যবগণ পুষ্টিই সাবধান হতে পারেন। এ যন্ত্রের সাহায্যে ভূকম্প-তরঙ্গের প্রকৃতি থেকে আন্দাজ ভূমিকম্পে উৎপত্তিস্থল বা কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, কেন্দ্রের গভীরতা, পৃথিবীর অন্তস্তরে অবস্থা এবং কম্পনের তীব্রতার মঙ্গান পাঠ। কম্পনের তীব্রতা অনুসারে কাঁচ থেকে অতি তীব্র পর্যন্ত তার দশটি বিভিন্ন শ্রেণীবর্ত করা হয়েছে। এসব তথ্য জানানার জগ্রে পৃথিবীর বিভিন্ন মানমন্দির ভূকম্পলিপি যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। এত তথ্য জেনেও ভূমিকম্পে প্রবাস দেবার মত শক্তি বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞ আভ ও অর্জন করা পাবেন নি। কোন জাপানী প্রাণিতত্ত্ববিদ না কি লক্ষ্য করেছেন সমুদ্রজাত এক প্রকার মাছ ভূমিকম্পের কয়েক বর্গা পূর্বে বেশ চ হয়ে উঠে। এ যদি সত্য হয়, তা হলে পূর্ণাঙ্গ সাবধান হতে আর বিপদ থেকে জাগ পাওয়া যেতে পারে। অবজ্ঞা মাছের ভবিষ্যদ্বাণী করবার ভার দিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চেষ্ট নান। করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে প্রবাস জ্ঞানাব্যব মত অতি সূক্ষ্ম আবিষ্কৃত হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীতে বছরে যে হাজার ভূমিকম্প হয় তার মধ্যে প্রায় ২৫-টি বেশ বড়।

জলের চেই-এর মত ভূমিকম্পের তরঙ্গও কেন্দ্রের চারি প্রায় উপবৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে, বাধা পেলে জলের চেই-এর এরা পথও পরিবর্তন করে। ভূমিকম্প-তরঙ্গ তিন প্রকারের (Primary) বা অর্থাৎ তরঙ্গ (Longitudinal w সেকেন্ডে ৫°৪ মাইল বেগে এবং দ্বিতীয় (Secondary) বা তরঙ্গ (Transverse wave) মুখ্যর প্রায় অর্ধেক (৩ মাইল) বেগে পৃথিবীর অন্তস্তর দিয়ে যায়, তৃতীয় একপ্রকার (Surface wave) পৃথিবীর বহিরাবরণের উপর দিয়ে যায়



গতিবেগের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা ভূকম্পলিপি বহু ও ফল্পের উৎপত্তিস্থলের দৃষ্ট নির্ণয় করা যায়, আর তীব্রতার দ্বারা ক্ষয় স্থির করা হয়। অবশ্য ১৮০০ মাইল গভীরতা পর্যন্ত মিক ও গৌণ তরঙ্গ যত গভীর প্রদেশে প্রবেশ করে তাদের বেগও তত বাড়ে। প্রথম দুই প্রকার তরঙ্গের গতিবেগের পার্থক্য ৭৫ উৎপত্তিস্থল থেকে উন্নত তরঙ্গ উপরে একই স্থানে আসতে দর যে তারতম্য হয়, তা থেকে কেন্দ্রের অবস্থান জানা যায়। ধর্মিক তরঙ্গ কঠিন, তরল বা বায়বীয় যে কোনরূপ পদার্থের দ্বারা দিয়ে এবং গৌণ তরঙ্গ কেবল কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়েই ত পাবে। কিন্তু ভূ-অভ্যন্তরে ১৮০০ মাইলের পর ২৩০০ মিল দৌত ও নিকালের স্তর। তা হলে কি পৃথিবীর অভ্যন্তরে কেন্দ্রের চারিদিকে উক্ত বিশাল স্থানটি তরল বা বায়বীয় পদার্থে ? কেহ কেহ বলেন, এত ন্যূন পৃথিবীর যে বিরাট চাপ (প্রতি ইঞ্চিতে হুন্ড্র মফ) পড়ে, তাতে কোন পদার্থ বায়বীয় তো নয়ই, মন কি তরল আকারেও থাকতে পারে না; কঠিন যে নয় তা' গৌণ তরঙ্গের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তবে ঐ স্থানের উপাদানের অবস্থা মন তরল হওয়া অসম্ভব নয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ এই অঞ্চলের উপাদানের অবস্থা সম্পর্কে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই।

পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে কখনও ভূমিকম্প হয় নাই; তবে ভূ-সাম্রাজ্যে চ্যুতিযুক্ত দুর্বল শিলাস্তরবিশিষ্ট স্থানেই ভূমিকম্প বেশী হয়। এসকল স্থানকে দুটি কটিবন্ধের আকারে কল্পনা করে ভূতত্ত্ববিদগণ তাদের নাম দিয়েছেন “প্রকম্পন কটিবন্ধ” (Seismic Belt), একটি কটিবন্ধ উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার পশ্চিম পার্শ্ব অর্থাৎ বরিক ও এণ্ডিসের পার্বত্য অঞ্চল, এলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, জাপান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে এবং অপরটি ভূমধ্যসাগর, আলপস পর্বত, ককেশাস পর্বত ও হিমালয় পর্বতের উপর দিয়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। কটিবন্ধ দুটির অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যে সমস্ত পর্বতের গঠন-কার্য এখনও শেষ হয় নি, তাদের নিকটবর্তী প্রদেশগুলি ভূমিকম্প প্রবণ। ইউরোপের পশ্চিম উপকূলে কোন প্রকম্পন কটিবন্ধ না থাকার এই কারণ সম্বন্ধিত হয় যে, ওখানকার মহাদীপসোপান (Continental shelf) বরাবর অনেক দূর পর্যন্ত ঢালু সমুদ্রে নেমে গেছে; আর উত্তর আমেরিকার পশ্চিমে এবং এশিয়ার পূর্ব উপকূলের অধিকাংশ স্থানে মহাদীপসোপান নাই বললেই চলে; বিশেষতঃ চিলে (chile) ও জাপানের অনতিদূরেই প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা এত অধিক, যে আটলান্টিক মহাসাগরের কোন স্থানই তত গভীর নয়। প্রথমোক্ত কটিবন্ধটি ও প্রশান্ত মহাসাগরের “আগ্নেয় মেখলা” (Fiery ring of the Pacific)-র অবস্থান তুলনা করলে দেখা যায় যে উভয়েই ঐ একই স্থানের উপর দিয়ে বিস্তৃত এবং এতে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অমৃদগার পদবন্দর

নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়, উৎপত্তির কারণস্বরূপ উভয়েই ভূত্বকের দুর্বলতার সুযোগ নেয়।

সাধারণতঃ ধারণা করা হয়ে থাকে যে, ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত পদার্থের স্থানচ্যুতি হয়; আসলে কিন্তু তা' নয়। ভূত্বক স্বভাবতঃই খুব স্থিতিস্থাপক, এর ভিতর দিয়ে তরঙ্গ প্রবাহিত হবার সময় তরঙ্গের প্রবাহপথে অবস্থিত শিলার কণাগুলি অতি সামান্য ভাবে স্থানচ্যুত হলেও ইহার উপরিভাগের আলগা সকল পদার্থ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এমন কি, কখন কখন কয়েক ফুট দূরেও নিক্ষিপ্ত হয়। সামান্য পরীক্ষার দ্বারা এ ব্যাপারটি অনেকটা পরিষ্কার হয়; কাঠের একটি টেবিলের উপর পাথর রেখে যদি টেবিলের উপর জোরে আঘাত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, পাথরের টুকরাগুলিও সঙ্গে সঙ্গে স্থানচ্যুত হয়ে লাফিয়ে উঠছে কিন্তু টেবিলের কাঠের কণাগুলির কোনরূপ স্থান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে না। ঠিক এই ভাবেই ভূমিকম্পের সময় পৃথিবীর উপরিভাগের ঘর-বাড়ি, গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির স্বাভাবিক অবস্থার বহু পরিবর্তন সাধিত হয়। ভূমিকম্পের তরঙ্গ শিলাস্তর অতিক্রম করবার সময় স্পন্দনের জগ্জ তাহা মধ্যে পর্যায়ক্রমে যে সংকোচন ও প্রসারণের উৎপত্তি হয়, তাইই ফলে আভ্যন্তরীণ জলপ্রবাহের বহু ক্ষতি সাধিত হয়, কোন কোন প্রস্রবণের জলধারা শুষ্ক হয় আবার কারোও বা জলধারা পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, এমন কি অনেক সময় নতুন প্রস্রবণের সৃষ্টিও হয়; নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে নতুন প্রবাহপথে নদী প্রবাহিত হয়। ভূত্বকে ফাটল আর বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়ে তার থেকে বাষ্পমিশ্রিত জল উৎক্ষিপ্ত হয়; বালির বাঁধ অতীতের ভূমিকম্পের দ্বারা দেয়।

ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও, এর ভয়াবহ ধ্বংসলীলা মানব-মনকে অভিভূত করে। ভূমিকম্পের ফলে কত সুসমৃদ্ধ জনপদ যে লুপ্ত হয়ে গেছে, কত লোকের অকালমৃত্যু হয়েছে তার সংখ্যা নাই। পৃথিবীতে বিহাদের ভূমিকম্প এবং ১১৫০ খৃষ্টাব্দে আসামের ভূমিকম্পকে একটা খণ্ডপ্রলয়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে। বিহাদের ভূমিকম্পে বাংলা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত এর প্রকাপে বিপর্যস্ত হয়েছিল। ভূগর্ভ থেকে উৎক্ষিপ্ত জন, কাশা, বালি শতক্ষেত্র পূর্ণ করে তাকে অল্পদূর ক্ষেত্রে পরিণত করেছে; আর বহু নগর কম্পনের তীব্রতায় ধ্বংসস্থাপে রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণতঃ ভূমিকম্পের কম্পন কয়েক সেকেন্ড মাত্র অল্পকাল স্থলেও, এক্ষেত্রে তা তিন চার মিনিট ছিল। ১১২৩ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর টোকিওর ভূমিকম্পে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় এবং টোকিও উপসাগরের তলদেশ ২০০ ফুট উচ্চ উঠে যায়; কিন্তু ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ভারতের ভূমিকম্পে কছ উপসাগরের উপকূল অনেকখানি নেমে যায়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে আলাস্কার Yakutat Bay-র প্রসিদ্ধ ভূমিকম্পে উপকূলের অংশবিশেষ প্রায় ৫০ ফুট উর্ধ্ব উঠে এক নতুন জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পের আঘাতে মাত্র ৩০ সেকেন্ডে নিউজিল্যান্ডের নেপিয়ার সহর ১১৩১ খৃষ্টাব্দে নিশ্চির হয়। ১১৩৮ খৃষ্টাব্দে আনটোলিয়ার ভূমিকম্প প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের বহু পরিবর্তন সাধনকারী আসামের ভূমিকম্প এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে

• মহাদীপসোপান—মহাদেশের উপকূলভাগ কিছুদূর পর্যন্ত ঢালু ভাবে সমুদ্রে নামিয়া গিয়া পরে সোজা নামিয়াছে। এই ঢালু অংশকে দীপসোপান বলে। এখানকার জলের গভীরতা ৬০০ ফুটের অধিক

# ছেঁড়া জীবনের সূতা

(অপ্রকাশিত)

শিবনাথ শাস্ত্রী

ঠাকুর, ঠাকুর, দিন হল অবসান,  
তোমা হাতে করে দিব মোরে ?  
এক গতি, এক মতি করে হবে প্রাণ,  
পড়িব না আর মোহবোরে ?

ছিল শক্তি, ছিল কাজ, এবে গেল দুই,  
রহিসাম তুমি আর আমি,  
দিবা-অস্ত পদ-প্রান্তে আপনাদের থুই,  
কেলিও না তে হৃদয়-স্বামী !

খাটিয়া খাটিয়া দিন শান্ত-শান্ত-সেতে  
অপরাজে যথা কৃষীজন,  
হাত-পা ছড়িয়ে বাস আপনাদের গতে  
ভুলে যায় শ্রম-উপাঞ্জন ।

তেমনি তোমার পদে হাত-পা ছড়িয়ে  
বসিবারে দিও দিবা শেষে,  
নিরাশি ও শ্রমহীন পরাণ ছুড়িয়ে,  
ভুলে যাও জীবনের ক্রোশ ।

ছেঁড়া জীবনের সূতা এখন শুছাই

হার দিয়ে বসি নিজ ঘরে,  
ঘুচাবে বাহির দুটি তোমা পানে চাই  
সত্যরূপ দেখি গো অন্তরে ।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ক্রিয়াকালে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে মফস্বদে ভূমি শক্ততামিলা হয়েছে, সমুদ্রে নতুন দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। ধ্বংসকারী এই যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, এর প্রত্যেক থেকে জাণ পাবার কি কোন উপায় নাই ? ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার লং বীচের ( Long Beach ) ভূমিকম্পে বহু স্থলময় অটালিকা নষ্ট হওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি এলিকে আকৃষ্ট হয়। অনেক পরীক্ষা করে তাঁরা দেখলেন, ইম্পাক্টের কাঠামো ( Frame ) আর কংক্রিট ( Concrete ) দিয়ে তৈরী বাড়ার বিশেষ কোন ক্ষতিই ভূমিকম্প আর করতে পারে নি। ভূমিকম্পপ্রবণ জাপানে ঐ রীতিতে গৃহাদি নির্মাণ করে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। কলিকাতা এবং অমৃতসাগর নগরেও বর্তমানে গৃহাদি নির্মাণ কার্যে ইম্পাক্টের কাঠামো ও কংক্রিটের ব্যবহার প্রচুর ভাবে হচ্ছে। মনে হয়, এক্ষণে প্রাচীনে নির্মিত গৃহের আর কোন বিশেষ ক্ষতি ভূমিকম্প করতে পারবে না। ফলে অনেক ধন-স্বনন ন্যাসের আশংকা থেকে সম্পূর্ণ না হলেও বহুলাংশে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

পূর্ব-আলোচিত ভূমিকম্প জনিত তৃতীয় প্রকার তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা স্থলভাগের শিলা অপেক্ষা সমুদ্রগর্ভের শিলার মধ্য দিয়ে দ্রুততর বেগে গমন করতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ার এক ভূমিকম্পের উক্ত তৃতীয় প্রকার তরঙ্গ যে বেগে নিউইয়র্ক গেছল, তার চেয়ে অধিকতর বেগে জাপান এসেছিল। এই সিদ্ধান্ত এর থেকে করা যায় যে, স্থলভাগের অধিকাংশ শিলা গ্রানাইট ও সমুদ্রগর্ভে রচিত হয়েছে

বাসাল্ট শিলায় এবং অটালিটিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে শিলার উপাদান এক নয়। মুখ্য ও গৌণ তরঙ্গের গতিবেগের থেকে কৌণিক দ্রবত্বের অনুপাতের বর্ণিত হয়ে থাকে।

কেল থেকে ভূগর্ভে তরঙ্গের আগাতপ্রাপ্ত হানের কৌণিক দূরত্ব	প্রতি সেকেন্ডে গতিবেগ (মাইল)	
	মুখ্য তরঙ্গ	গৌণ তরঙ্গ
৩০°	৫.৪	৩.০
৬০°	৬.৮	৩.৭
৯০°	৭.৯	৪.৩

১৮০০ মাইলের অধিক গভীরতায় মুখ্য তরঙ্গের এ মাইল গতিবেগ হঠাৎ ৫ মাইলে নামে এবং গৌণের গতি খুব মৃদু হয়ে আসে। আরো গভীরতর প্রদেশে মুখ্য আলোকরশ্মির ধর্ম অনুসারে ( Refracted ) হয়; ফলে কৌণিক দ্রবত্বের পর কোন স্পন্দনই অনুভব করা যায় ভূমিকম্প-তরঙ্গের এই সকল আচরণ থেকে সিদ্ধান্ত করা যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে ৪৪০০ মাইল ব্যাসের যে স্তর তার ১৮০০ মাইল পুরু আবরণের অবস্থার সমান নয় এবং ঐ আ- ৭৫০ মাইল অবশিষ্টাংশের সমপর্যায় নাই। ভূমিকম্পের দ্বারা এইরূপে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ অনেক তথ্য জানা যায়।

# স্মৃতিচিত্রণ

পরিমল গোস্বামী

তৃতীয় পর্ব

১

পরীক্ষার ফল ভালই হল এবং কেমন করে হল তা আমি  
জানি না। কোন প্রশ্ন কিভাবে লিখলে এম-এ  
পাশক খুশি হবেন জানা ছিল না, বিষয়ের ক্ষেত্রে একেবারে নবাগত  
লোকই হই। কোনো বিশেষ শ্রেণিতে পাস করার লোভও ছিল না, কিন্তু  
দেবী প্রথম শ্রেণীই পেয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা  
এক শেষ পরীক্ষা দুইয়েতেই প্রথম শ্রেণী হল, আশ্চর্য্যের পক্ষে  
কিনারা মন্দ নয়। আমাদের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়েছিলেন  
জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়। জীবনেও তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম  
স্থান পেয়ে গেছেন স্বদেশের কাছ থেকে।

যাই হোক আমার আবার সমস্যা দেখা দিল, পরবর্তী কর্তব্য  
কি? শাস্ত্রনিকেতনের শিক্ষায় ছেদ পড়ায় মনে হুঃ ছিল।  
সপ্যাম তে আর ফেরা হল না, অথচ দেখি চিত্রাকর শিক্ষার  
গিনাটাই আবার একটু একটু করে মাথা তুলছে।

পুনরায় কলকাতাতেই চলে এলাম।

এক এসেই সোজা সরকারী আর্টস্কুলে গিয়ে অধ্যাপক পার্শ্ব  
শ্রীমের কাছে মনোবাদের প্রকাশ করলাম। তিনি আমার  
খা মনোযোগ নিয়ে শুনলেন। আমার বক্তব্য ছিল আধুনিক  
শিক্ষিত কিছু স্মরণে করতে পারব কি না, অর্থাৎ শেষ লক্ষ্য তেল।  
তিনি বললেন যে রীতিতে কাজ করছে তা ছেড়ে এখনই অন্তরীক্ষিত  
গোয়া সম্ভব হবে না, আগেবাটী ভুলতে কিছু সময় লাগবে, অতএব  
প্রাচীন পদ্ধতির জলেই লেগে থাক, তেলের আশা ছাড়। তাই  
প্রাচীনপাঠ্য বামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ও সেই কথাই বললেন।  
অর্থাৎ অয়েল পেণ্ট চলেবে না।

অগত্যা তাই। আমার শিক্ষক হলেন হেড মাস্টার ঈশ্বরীপ্রসাদ  
বর্মা। আমাকে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে নেওয়া হল। ঈশ্বরীপ্রসাদ  
আমাকে অতিরিক্ত খাতির করতে আরম্ভ করলেন। আমার প্রতি  
সই পক্ষেশ বুদ্ধের স্নেহ আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।  
তিনি প্রথমেই আমাকে সম্মানিত করলেন তাঁর ডানপাশে আমার  
সহ একটি পৃথক আসনের ব্যবস্থা করে। খুব কাছে বসলেন।

তারপর আমাকে তাঁর হাতের কাজ দেখাতে লাগলেন। তিনি  
তখন বাইরের কোনো মহারাজার অর্ডারি একটি মিনিয়চার পেণ্ট  
করছিলেন আইভরির উপর। বললেন একমাত্র এতেই শয়সা,  
হোমাকে এ কাজ শিখিয়ে দেব। তারপর আমাকে মিউজিয়ামের  
আর্ট-গ্যালারিতে নিয়ে রাজপুত পেণ্ট-এর পদ্ধতি বুঝিয়ে দিলেন  
মোটামুটিভাবে এবং একখানা ছবি দিয়ে বললেন এখানা বাড়িতে  
নিয়ে গিয়ে কপি কর। নিজ হাতে কপি করতে করতে তবে  
একটা পদ্ধতি আয়ত্ত হই, বৃত্তে স্মরণে হই। কিছুদিন এ কাজ  
করতে হবে তোমাকে। সে ছবিখানার একটি কপি করেছিলাম, তাতে  
অস্ত্র রত্নের সঙ্গে সোনা রঙও ছিল। কপিখানা এখনও অবিকৃত আছে।

খুব ছুটির পর প্রায় প্রতিদিন তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে  
নিয়ে যেতেন এবং হালুয়া খাওয়াতেন। তাঁর পুত্রের (রামেশ্বর বর্মা)  
অনেকগুলি পেণ্ট তাঁর ঘরে টাঙানো ছিল, দেখালাম। তাঁর  
নিজের আঁকা ভারতীয় রাগ বাগিনীর কল্পিতরূপ করেছিলেন।  
সে ছবিগুলো আমার ভাল লাগেনি।



ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মা তাঁর মিনিয়চার পেণ্ট দেখাচ্ছেন।

এরপর মাসখানেক তাঁর নিতান্ত অমৃগত হয়ে চলার পর তিনি আমাদের আরও বেশি খাতির করতে লাগলেন এবং এই সময় তিনি তাঁর সবচেয়ে গোপন কথাটি আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন। এ কথা ছিল তাঁর মনে মনে। হয় তো কাউকে কখনও বলতে পারেননি, তাই আমাদের বলতে পেরে তিনি নিজের ঘাড় থেকে যেন একটা বড় লেখা নামিয়ে ফেললেন।

তাঁর একান্ত ইচ্ছে আমি আর্টস্কুল ছেড়ে দিই। বললেন, “এখানে কিছুই হয় না। এখানে থেকে যারা পাস করে বেবায় তারা মাথা খুঁড়েও খ্রিশ্চ টাকা বেতনের একটি চাকরি পায় না।” তারপর একটু চাপা গলায় একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে অস্বাভাবিক ছাত্রদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—“ঐ যে দেখছ ওদের, ওরা সবাই র্যাক্সেস হতে এসেছে এখানে। কি রকম র্যাক্সেস শুনে? এক র্যাক্সেস গম ভাণ্ডার কল খুলে করে থাকে। আর এক র্যাক্সেস এক অফিসের কেরানি হয়েছে। এখানে পড়লে তুমি ঐ রকম র্যাক্সেস হবে। রাজি আছ?”

আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি। ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, “আমার মতো যদি মিনিয়োরের কাজ শেখ তা হলে এতে কিছু সুবিধে হতে পারে। যদি ফুলে টিকে থাক তা হলে আমি শিখিয়ে দেব, কিন্তু তোমাকে বলি না থাকতে, তুমি এ পথ ছাড়।”

ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং কানে এই মন্ত্র দিতেন। ক্রমে তাঁর কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করলাম, বুঝলাম তিনি সত্যি কথাই বলেছেন। কারণ সেই ১৯২৪ সালে শিল্পীর কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না, তার প্রমাণও পেলাম চার পাঁচ বছর পরে এক বিজ্ঞাপনের সাহায্যে। খ্রিশ্চ টাকা বেতনের একজন শিল্পীর দরকার হয়েছিল, আবেদনপত্র এসেছিল প্রচুর। সেও আবার ছবি আঁকার কাজ করতে নয়, ফোটোগ্রাফের এনালার্জিমেট গিনিশিং-এর কাজে। অনেক শিল্পীই তখন নিজের চেষ্টায় এই বিজ্ঞা শিখে নিয়েছিলেন অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য।

ঈশ্বরীপ্রসাদ আমার প্রকৃত হিতৈষীর কাজ করলেন।

আবার শহর থেকে গ্রামে। এখানে কাজ কিছুই নেই, তবু এ পরিবেশ নিতান্ত আশানার। রতনদিয়া গ্রামের পরিবেশ।

পাথর ভাঙনে যখন কালখালি ট্রেন রতনদিয়ার সীমানার উর্টে এসে তখন থেকে এ গ্রামের দাম বেড়ে যাচ্ছিল দ্রুত। জায়গাটি পাইকপাড়ার সিন্ধু জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এক সম্ভবত ১৯১৭ সালে সাহেববংশী অরুণকুমার সিংহকে দেখেছিলেন রতনদিয়া কাছারীতে : ততদিনে রতনদিয়া গ্রামে প্রকাণ্ড বাজার বসে গেছে এবং বর্ষার চন্দনা বিদেশী বহু নৌকো ভরা বন্দরে পরিণত হয়েছে। এ বন্দরের স্থায়ী বহুরে প্রায় চার মাস, তার পর নদী শুকিয়ে যায়, তখন আর নৌকো চলে না।

বাজার ও বন্দর গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে। আগে এ অঞ্চলটি ছিল চাষের ক্ষেত আর ঝোপঝাড়ের অরণ্য। স্থানানুগ ছিল এই দিকে। ট্রেন থেকে চন্দনানদী পর্যন্ত শড়ক তৈরি হল বণিকদের জন্য। দ্রুত দিকি মাইল মাত্র। গ্রামের সঙ্গে বাজারের যোগাযোগ — একটি শড়কে। তার পাশে প্রকাণ্ড ফুলঘর তৈরি হল,

আরওতনে খুব বেড়ে গেল। সব রকম মাছ, তরিতরকারী দুখ, বেলা আটটা থেকে একটা পর্যন্ত বিক্রির বিপ্লব নেই। কি শতা সব জিনিস, কি স্বাদু এবং টাটকা।

বাজার ও গ্রাম—মাখখানেক একটি পথ। এতবড় বাজার কিন্তু তান্ত্রিক আমাদের শান্তি কিছুমাত্র বিঘ্নিত হয় নি। বর্তমানের বিচারে এ গ্রামকে সম্পূর্ণ অবিকৃত বলা চলে। অথচ কারো মনে কোনো বিষয়েই কোনো আতঙ্ক নেই। গৃহসংলগ্ন জমিতে তরিতরকারী, ফলের গাছে ফল, আম কাঁঠাল ইত্যাদি—সবই অবিকৃত, খোলা পড়ে আছে। আসবাবপত্র খোলা বৈঠকখানায় পড়ে আছে, কোনো দিন কিছু চুরি হয় না। শিশুর চোবের আবির্ভাব বছরে একবার হয় কি না সম্ভব। মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে নদীতে স্নান করতে যায়। কোনো দিন কোনো অব্যাহতি ঘটনা ঘটেছে এমন শোনা যায় নি।

রতনদিয়া গ্রামটি পূর্ব পরিকল্পিত একটি সুন্দর ছোট উপনিবেশের মতো। এ গ্রামে যদিও সবাই হিন্দু, কিন্তু চারদিকের সমস্ত গ্রামে হিন্দু মুসলমানের মিশ্র বাস। সবাই যেন এক পরিবারভুক্ত। সাধারণ মুসলমানেরা সবাই প্রায় কৃষিজীবী। তারা দৈনিক বাজারে দুধ তরিতরকারী বিক্রি করে নগদ পয়সা উপায় করে। তা দিয়ে মাছ কেনে। সবাই নিজ নিজ অদৃষ্ট মেনে নিয়ে তৃপ্ত। তারা ইংরেজ রাজত্বের খোঁজ রাখে না, তারা সবাই ঈশ্বরের রাজত্ব বাস করে। বড় বড় ব্যাপারে জীবন মরণ সমস্যা তারা ঈশ্বরের বিচার মেনে চলে। কারো বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ নেই। তাদের মুখের দিকে চাইলে বহু কালের অভ্যস্ত একটি আশ্চর্যজনক সরলতার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান যে সামাজিক ভাবে পৃথক, তা ভাল হোক মন্দ হোক, সবাইই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এ নিয়ে কেউ কারো সীমানায় অনধিকার প্রবেশের কথা চিন্তা করে না।

এদের মাখখানেক বাস করার মতো ভূমি আর নেই। গ্রামা জীবনের আর একটি বড় আশ্রয় হচ্ছে এখানে ঘড়ি না হলেও চলে। এ পরিবেশ স্থায়ীভাবে ছাড়ব এ কল্পনা ভাল লাগেনি কখনো। এ ব্যাপারটি মনের সজ্ঞান পরিকল্পনাজাত নয়। খুব সম্ভব মনের দিক দিয়ে একটি বিরোধহীন পরিবেশ আমাদের পছন্দ বলেই।

স্থায়ীভাবে গ্রাম ছাড়া নয়, স্থায়ীভাবে গ্রামে থাকলে ক্ষতি কি, এই প্রশ্নটিই মনে বড় হয়ে দেখা দিল। সম্পূর্ণ গ্রাম জীবন। এখানে তখন মাসে দশ পনেরো টাকা একটি পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। অধিকাংশ পরিবার পাঁচ ছ টাকার চলে।

আমার এম-এ ডিগ্রীর ভবিষ্যৎ মূল্য ডিগ্রী পাবার পরই ভুলে গিয়েছি। গ্রামে বসে ডিগ্রীর কথা মনে পড়ার ক্ষেত্র নেই কিছু। গ্রামের ঐক্য দ্রুত লোপ পাচ্ছে, কিন্তু তবু তার প্রতিটি ধূলি কণার সঙ্গে যে অঙ্গাঙ্গি পরিচয়, সে পরিচয় ভুলতে হবে এ কল্পনা বেদনা দায়ক কিন্তু ডিগ্রীর কথা ভুলে যেতে কিছু মাত্র দুঃখই বোধ হল না।

স্থির করলাম গ্রাম ছেড়ে কোথায়ও যাব না।

মাটির সঙ্গে সম্পর্ক আরও নিবিড় করে তুললাম। বাড়ির সন্ধ্যা জমিতে নানা গাছ লাগাতে লাগলাম, নানা জাতীয় আমের কলম এবং নতুন ধরনের নারকল গাছ কলকাতা থেকে রেল পার্সেলে আনিতে নিলাম। কোদাল এবং কুড়লের সঙ্গে পরিচয় বাড়ল। মাটি কোপানো এবং বড় বড় গাছ কাটাতেও পটু বাড়ল।

থ্যে আমার মামাশুভ্রের ভাগ্নে উপেন্দ্রনাথ বাগচী এসে বেল রতনদিয়া বাজারে ডিসপেনসারি খুললে কেমন হয়। বখানা ছিল না গ্রামে। বাজারে তখন এক মাত্র ডাক্তার র বসাক, কুমারপালি থেকে এসেছেন সেখানে। উপেনের দং জানা ছিল, চিকিৎসা ব্যাপারেও তার জনপ্রিয়তা ছিল। মার ওষুধ তৈরিতে ছিল তাঁর আকর্ষণ। বালাকাল থেকে ওষুধ খেয়ে আসছি। প্রেসক্রিপশনের ওষুধ আমি বরাবর 'তরি ক'রে নিতাম, অতএব নানা জাতীয় মেজার দ্রাঙ্গ ও সহ আমার ব্যক্তিগত ডিসপেনসারিটি তখন প্রায় পানরো হুয়ের প্রাচীন। বালাকাল থেকে এ কাজে আমার ষোপাঞ্জিত। অতএব প্রস্তাবটি খুবই মনের মতো হল। উপেন নাকো এর বাড়ি থেকে অনেক ওষুধ এবং আসামারি নিয়ে এলো। একখানা বড় ঘর ভাড়া নেওয়া হল মাসে পাঁচ টাকা। তিন মূল ধন লাগল মাত্র ছশ টাকা, সেটি আমি দিলাম।

দশ উৎসাহ জাগল। 'ডিগনিটি অফ লেবার' কথাটিতে তখন পুলক খেলে যেত। তত্পরি আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্রের অদৃষ্ট র ইঙ্গিতটি সর্বদা চোখের সামনে। দোকান বেশ জমে উঠল। করি খুঁচো সব রকম বিক্রি। প্রথম দিকে আমি নিজ হাতে পেশিএর ভার নিগান। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার প্রায় সকল ধর মাত্রা আমার মুখস্থ হয়ে গেল। ওষুধের শাসল আসত ৭। ট্রেশন থেকে ডিসপেনসারি পবন্ত পৃথক দৈর্ঘ্য ষ্টাটা-পথে ৭ দশ মিনিট। একদিন একটি বাস্ক আমি নিজে মাথায় ক'রে ৭ এলাম খুব গর্বের সঙ্গে। এর উদ্দেশ্য ছিল পাঁচজনকে দেখানো সাধারণ নজর বা পাত্রে আমিও তা পারি। শ্রমের স্বঘ্না ওরাই না পাবে কেন। আদর্শবাদের চূড়ান্ত!

করা বাহুল্য, এতে নিন্দা বটে গেল। আমি এই নিন্দারই অপেক্ষা বহির্গত। মনের উৎসাহ আরও তীব্র হয়ে উঠল। সব দিকই স্বাধর বর্জন করেছি বড়টা সম্ভব। এটি তার মাধ্যমের একটি। নিন্দা ঠিল প্রায় সামাজিক ভাবে। সমাজের কিছু পরিচয় দেওয়া থাক।

পল্লীসমাজ অবগত সর্বত্রই এক। কয়েকজন আত্মচিহ্নিত নেতা সর্বত্রই আছেন এবং তাঁদের দাপট কম নয়। এহদিনে এরা আর নেই সম্ভবত। রতনদিয়া গ্রাম এ থেকে মুক্ত ছিল বরাবর। গ্রামটি অনেক দিক থেকেই ছিল আধুনিক। কিন্তু পল্লীসমাজ একটি মাত্র গ্রামে সামান্য থাকে না, আশে পাশের অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে এক একটি সমাজ এবং এ সমাজ ভ্রাঙ্গণ-প্রধান। শ্রাঙ্ক বা বিবাহ রাজ্য সঙ্গতি থাকলে সমাজভ্রঙ্ক নিমন্ত্রণ করাই বাতী। এই নিমন্ত্রণ কয়েক রকমের আছে। যথা (১) সমাজভ্রঙ্ক দ্বী-পুরুষ মিলিয়ে, (২) সমাজভ্রঙ্ক, কিন্তু শুধু পুরুষদের (৩) শুধু স্বগ্রামের দ্বী-পুরুষ মিলিয়ে, অথবা (৪) স্বগ্রামের শুধু পুরুষদের। কোনো উপলক্ষে যখন সমাজভ্রঙ্ক সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয় তখন আড়ালে বসে সমাজপতি তাঁর সান্দ্রোপাঙ্গ নিয়ে নিমন্ত্রণকারীর কোনো গণ্ডা খুঁত বের করার চেষ্টা করেন, অবশ্য পূর্বে থেকেই যদি তাকে জড় করার উদ্দেশ্য থাকে। প্রয়োজন বোধে খুঁতের অভাব হয় না। তখন সবাই মিলে নিমন্ত্রণকারীর অজ্ঞাতনামে জোট পাকতে থাকে এবং ভোজনের সময় উপস্থিত হওয়া সম্ভবে যদি দেখা যায় নিমন্ত্রিতরা কেউ আসছেন না, তখন বোঝা যায় কিছু ঘটছে।

এমনি হয়েছিল আমার বিবাহ সময়ে। আমার কালা থাকতেন অগ্রত, তাঁর বিবাহ হয়েছিল এমন পরিবারে যেখানে বিধবা বিবাহ বা ঐ জাতীয় কোনো গুরুতর কলঙ্ক ছিল। কালা সপরিবারে এসেছিলেন বিবাহ উপলক্ষে। অতএব মহা হুযোগ। রতনদিয়ার লোকদের কারো এ নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না, কিন্তু ভিন্ন গ্রামের সমাজপতি জেটি পাকতে লাগলেন। তিনি ভয় দেখিয়ে বহু নিমন্ত্রিতকে আটকে রাখলেন। বেলা গড়িয়ে যায় এবং তাঁদের আশা প্রায় ছেড়েই দেওয়া হয়েছে, এমন সময় দেখা গেল একে একে আসছেন সবাই। শেষ মুহূর্তের এই উদারতায় কৃতজ্ঞ না হয়ে পারা গেল না। পরে বোঝা গেল, এর মূলে 'উদরতা'। ভাল ভাল মিষ্টান্নের আরোজনের কথাটা ছাড়িয়ে পড়েছিল।

এই জাতীয় বিরোধিতাকে কখনো ভয় করি নি আমি, এবং পান্টা এঁদের বিজ্ঞপ্তি করায় তখন উৎসাহবোধ করেছি। একটি ঘটনা বলি। মুরগীর মাস খাওয়া সে-যুগে নিশ্চিনী ছিল, বিশেষতঃ প্রকাশে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে রান্নাঘরেই মুরগীর মাস বরাবর রান্না হয়েছে, অবগত নিয়মিত মুরগীর মাস খাওয়ার গরজ ছিল না কারোই। আমরা এ বিষয়ে সংস্কারমুক্ত ছিলাম। মাঝে মাঝে ডাক্তার কার্তিক বসাকের বাড়িতেও সবাই মিলে খাওয়া হত। এক দিন কথাটা খুব প্রচার হয়ে পড়ল এবং নদীর ওপারে অবস্থিত সমাজপতির কানোও পৌঁছল। তিনি এই উপলক্ষে আমার বৈঠক বসাতে লাগলেন, খবর এলো। এ কথা শোনামাত্র আমরা তাঁকে একখানা চিঠি লিখলাম। চিঠিখানা ছিল এই রকম :

মহাশয়, আমরা নিয়-স্বাক্ষরিত ভ্রাঙ্গণ সম্ভানগণ গত রাতে ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসাকের বাড়িতে অতিশয় তৃপ্তি সহকারে তিনটি পুষ্ট মুরগীর মাস ভক্ষণ করেছি। রান্না অতি উপাদেয় হয়েছিল।

এ চিঠির নিচে আমরা প্রায় দশ জন সই করেছিলাম। চিঠি যথাস্থানে পৌঁছেছিল, কিন্তু এর পর সব ঠাণ্ডা। সে আজ কত দিনের কথা—তেরিশ বছর হবে। তখন কিঞ্চিৎ দাঙ্কিতা ছিল, মনে কিছু উগ্রতা ছিল, তাই এখন যা অত্যন্ত রক্ষণ মনে হয়, তারই বিরুদ্ধে উৎসাহের সঙ্গে লড়াই করেছি। আহত মস্তক সাপের মতোই তাকে মাটিতে পড়ে ধুকতে দেখেছি। কি বেদনাময় সে দৃশ্য! অনিবার্যকে রোধ করবার উপায় নেই, অথচ অনিবার্যকে গ্রহণ করবারও ক্ষমতা নেই। নির্বীণ, কর্মবিমুখ, স্বয়ং বাবতীয় পাপ-কাজে লিপ্ত, সমাজপতিদের এই দুরবস্থা নিজ চোখে দেখেছি। দূর কালের পটে



গ্রামের সরলপ্রাণ চাচারী

দেখলে বোঝা যায়, আমাদের নিষ্ঠুরতা প্রকাশের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। মৃতপ্রাণকে আঘাত করাটা বাড়াবাড়ি।

কিন্তু আরও একটি বড় জিনিস এতদিন লক্ষ্য করিনি। রতনদিয়া গ্রামে এতদিন আমাদের ছাত্রজীবনে বন্ধুদের মধ্যে যে স্তরের আলাপ আলোচনা মেলামেশা এবং ক্রিয়াকলাপ চলত, ইতিমধ্যে তার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের দলের সবাই প্রায় পরস্পর বিজ্ঞিত হয়ে পড়েছি, বন্ধুরা সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তী ধাপের যারা অবশিষ্ট রয়েল তারা না পারল সেবাপড়া শিকারে, না পারল মান্জিত হতে। তারা রতনদিয়ার অভিজ্ঞতার ভাঙনের তলায় চাপা পড়ে গেল। তাদের সঙ্গে আমাদের ভেদ অতি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। শিক্ষাবিজ্ঞান গ্রামা ছেলে তারা আমাদের বোঝে না, আমরাও তাদের বুঝি না। তারা উগ্র, এক সম্পূর্ণ শালীনতাবিজ্ঞিত।

এইটি স্বয়ংসম ক'রে ভয় পেয়ে গেলাম। এসের মধ্যে থেকে কিছু কথা বিশ্লেষণক। যতই গ্রাম্য হব বল্লনা করি না কেন সেটি ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত মনের গোমায়ীক কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়— এই নিষ্ঠুর সত্যটি মনের মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। সবচেয়ে আবার পরীক্ষাগত রেখার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করলাম।

এর পরেও ছ'সাত বছর নানা পরীক্ষার পাথে চলেছি, অভিজ্ঞতাও লাভ হচ্ছে বিবিধ। লিখন বৃত্তিই যে শেষ পর্যন্ত অবলম্বন করতে হবে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পরবর্তী কয়েক বছরের অনেক কিছুই কেনটা আগে কেনটা পরে ঘটেছে তা এখন আর মনে করতে পারি না, কেননা এ সবের কোনোটিই জীবনের মোড় বোঝায়নি।

এর মধ্যে বছরখানেক গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল ইনসটিটিউটে পড়েছি। কিছু একটা করা দরকার। চাকরি যদি করতেই হয় তবে স্টেনোগ্রাফি ভাল এমন উপদেশ দিয়েছিলেন অনেকে। সাধারণ ভাবেই খুব দ্রুত সেবার অভ্যাস ছিল আমার, কপি পেন্সিলের সাহায্যে কলেজের অধ্যাপকের বক্তৃতা লিখেছি অনেক দিন। অন্তঃর শটহাওয়ে সফল হব এমন বিশ্বাস ছিল। প্রিন্সিপ্যাল সেনের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ছিলেন বাবার সহপাঠী এবং পরিচিত। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে অভ্যর্থনার বদলে তিরস্কার আরম্ভ করলেন। বললেন বয়স পার ক'রে এ লাইনে এসে কেন? সরকারী চাকরির মনোনিয়ন তো অনেকটা আমার হাতেই, সাত শ' আট শ' টাকা পর্যন্ত পাচ্ছে অনেক। তোমার এখন সে পথ বন্ধ। এখন পাস করলে হয়তো কোনো মার্চেন্ট অফিসে দুশো টাকার চাকরি করবে, কিন্তু কানে আসবে লাখ লাখ টাকার আলোচনা। ভাল লাগবে না সে কাজ।

দুঃখ হল খুবই। তবু ডক্তি ইল্যাম। স্কুলটি ছিল বোঝার ঠিকানা। এক বছর পড়লাম সেখানে। সেখান দত্ত স্টেনোগ্রাফি শেখানোর পিটম্যান পদ্ধতিতে। প্রথম বছর শেষে পরীক্ষা দিলাম মিনিটে ৮০ শব্দ (অফিশিয়ালি), আসলে ১০০ শব্দ ডিকটেট করা হয়েছিল সেবেনাবু নিজেই বলেছিলেন। টাইপরাইটারে ব'সে পোতাটাকি শব্দই নির্ভুলভাবে ট্রান্সক্রাইব করেছিলাম। ইংরেজী

একটি বেশি মাত্রায়, এক

শটহাও পড়ার সময় এই শব্দগ্রন্থ চিহ্নের সাক্ষি লিখন পদ্ধতি খুব ভাল লেগেছিল। তখন মনে হত এটি আগে শেখা থাকলে সকল অধ্যাপকের বক্তৃতা আধাপোড়া লিখে নেওয়ার কত সুবিধে হত।

তখন অধ্যাপকের বক্তৃতা আধাপোড়া লিখে রাখার মতোই ছিল। পরীক্ষা দেবার পর আর স্কুলের সীমানায় বাইনি, শটহাওয়ের প্রতি এবং স্টেনোগ্রাফির চাকরির প্রতি মনে বিতর্ক জেগে উঠল। অনেকদিন পরে এক সহপাঠীর মুখে শুনেছিলাম পরীক্ষায় আমি প্রথম হয়েছিলাম এবং আমার জ্ঞান কিছু প্রসিদ্ধও ছিল। কিন্তু ঐ স্কুলের সীমানায় পুনরায় যাওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

এই কয়েক বছরের মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বলাইচাঁদ মথোপাধ্যায় (বনজুল)। ঘনিষ্ঠতা আগেই ছিল, কিন্তু এবারে গলায় গল ভাব হল। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল আইন অমান্য করে চলায় দিক দিয়ে আমাদের দুজনের চরিত্রে অনেকখানি মিল ছিল। দু'জনেই অনিয়মিত এবং এসোমেলা। বলাই এ বিষয়ে আমার চেয়ে কয়েক ডিগ্রী বেশি। এ সময়ে কয়েক মাস বা কয়েক বছর একই সঙ্গে কাটিয়েছি। একবার এক ঘরেও, বলাইয়ের নাওয়া খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই নিয়মও নেই, হয়তো দশ পনেরো দিন পর এক দিন ঘান হল। চুলে চিকনির স্পর্শ নেই, ছুতোয় কালি নেই।

একবার পটুয়াটোলা সেনের এক মেসে ছিলাম। তা আর এখন মনে নেই। সেখানে আমার পুরনকার সহপাঠী বন্ধু শিকরণ মৈত্র থাকত। বলাইয়ের ভাই ভোলানাথ এখানে কিছুদিন ছিল মনে হয়। সেই সূত্রে বলাই এখানে আসত। শিবের ছর হয় একবার, আরের পরে অন্য পথ্য দরকার। বলাই সম্ভবত শিবকে গুণ দিয়েছিল, অন্তঃর বলাইয়ের খেয়াল হল মেসের ভাত তো ভাল নয়, ভাল ভাত কারো বাড়ি থেকে ভিক্ষে ক'রে আনা যায় না? বলাই তৎক্ষণাৎ মেস থেকে একখানা থালা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ভাত ভিক্ষের উদ্দেশ্যে।

বলাইয়ের কষ্টের, চেঁচার এবং ব্যস্তি ছিল দুর্বীর। সব সময়েই তা ধারালো, তা সব বাপা কেটে এগিয়ে চলে এবং তা চমকপ্রদ রূপ চিত্তহারী। পনেরো মিনিটের মধ্যে বলাই একাধি একখানা খালি শুধু ভাত নয়, অনেকগুলো বাগ্জিত সাজানো বোল ভাল ইত্যাদি নিয়ে এসে হাজির। সেই খাণাখানার নিচে মেসের খালাখান লজ্জায় মাথা ঢেকে আঁতে।

বলাই এক অপরিচিতের বাড়িতে চুক সোজা গিয়ে বলল "এ বন্ধু আজ অন্য পথ্য করবে, মেসের ভাত অস্বাদ্য, তাই ভাল ভাত ভিক্ষে করে নিয়েছি, সম্ভব হলে এই খালি কিছু ভাল ভাত দিন একবারে সোজা কথার সোজা প্রস্তাব, প্রস্তাবে কোনো দ্বিধা কোনো দীনতা নেই। ধীরে কাল্পে ভাত চাওয়া হল, সম্ভবত এ এই রকম চাওয়ার সরলতা এবং এর মধ্যকার নহুদ দেখে এমন হলেন যে তাঁদের নিজেরের খালা-বাটিতে বা শাজিয়ে বলাইয়ের। তুলে দিলেন, টিকানাও জিজ্ঞাসা করলেন না।

বলাই ছিল এমন খেয়ালি ও গুরুজ্ঞাতাল। কলকাতার শহরের বাড়িতে প্রবেশ ও ভাত ভিক্ষে পাওয়া যায় কিন

পাচ্ছিল সম্ভব। এক শুধু এ

অনেক ঘটনা যার প্রত্যেকটি চমকপ্রদ, এবং একটা আর একটা স্বতন্ত্র।

গন্ধারি ছাত্রদের কাছে কডলিভার তেল অস্ত্রত তখন খুব ছিল। বলাইকে এই তেল কিছুকাল খেতে হয়েছিল নিউমোনিয়া মণ থেকে উঠে। বোতল ধরে মুখে ঢালত যতটা সম্ভব। সময় আমরা মির্জাপুর স্ট্রীট ও হারিসন রোডের সংযোগ র ত্রিকোণাকার বাড়িতে থাকি। ওটির নাম ইন্টারন্যাশনাল টি। এখানে আরও ডাক্তারি ছাত্র থাকত, তার মধ্যে সয়কুমার সেন আমাদের অঙ্করঙ্গ ছিল। এই অমিয় কেও বলাইয়ের মতোই মাঝে মাঝে বোতল ধরে কডলিভার ল মুখে ঢালতে দেখেছি। শেষে আমিও এরকম অভ্যাস রছিলাম। কডলিভার তেলের বোতল দেখলেই এরা লোভ মনেতে পারত না।

এই সময় অমিয় সেনের বিয়ে। ডাক্তারি ছাত্র, অতএব বলাইয়ের ম্যাল হল বিয়েতে সর্বাংকুশ উপহার হবে এক বোতল কডলিভার হল। কারা এতে কীকি নেই, সম্পূর্ণ সারবান এবং মৌলিকতায় দার সব উপহারকে হার মানাবে। তখন আমাদের কারো কাছেই ঋদ্ধ পয়সা বিশেষ কিছু থাকত না, খাচ সম্পর্কে আমরা সর্বদা রুচিসহী। বলাই ঠিক করল উপহারের জঙ্ক বেঙ্গল কেমিক্যালের কডলিভার তেল কিনবে এক বোতল, দাম কম, সম্ভবত দেড় টাকার নিচে। সেটি খাটি নওয়েজিয়ান তেল, এখানে বোতলে পোরা। ডি জন্স কডলিভারও খুব চলত তখন, সেটি বিদেশী।

কেনার সময় আমি সঙ্গে ছিলাম। আমাদের বোড়ি হাউসের নিচে বি-বোসের লোকান। বলাই বেঙ্গল কেমিক্যালের তেল চাইল এক বোতল। সেখানে বাটারএক ভল্ললোক বসে ছিলেন, তিনি হঠাৎ বলল বদলেন, “কিনছেন যদি, তা হলে আর দেশী কিনছেন কেন?” এরকম ধারণা তখন আমেরেই ছিল, বিদেশী নামের উপর অতি বিশ্বাস। কিন্তু বলাই একথা শুনে মুহূর্তে সেই ভল্ললোকের দিকে গবে দাঁড়াল। তখন তার মস্তিষ্কের তরু, এবং কৌতুক কেন্দ্র যুগপৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সে সামনের গন্ধের উপর একখানা পা তুলে দিয়ে সামনে একটু বঁকে (শু মস্তিতে বলতে লাগল, “আমার এই স্বাস্থ্য দেখছেন? ওজন বারো টন। কিন্তু আগে আমি ছিলাম কাকাল। শুধু বেঙ্গল কেমিক্যালের কডলিভার অয়েল খেয়ে এই স্বাস্থ্য হয়েছে আমার। অতএব আপনি যত ইচ্ছে চৌচান, টেচিয়ে গলা দিয়ে রক্ত বার করুন, তবু আপনার কথা আমি মানতে রাজি নই।”

ভল্ললোক মাথা নিচু করে বোকার মতো বসে বসলেন।

সমস্তই খোরালের মাধ্যম, কোনোটিই পূর্ব-পরিকল্পিত নয়। যেমন, একদিন অমিয় সেনের বিয়ের পর মজাসঙ্গীর হঠাৎ একটি স্ত্রীগোপ পাওয়া গেল। আমরা হুজনে হুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আবিষ্কার করি সত্য বিবাসিত অমিয়কুমার তার স্ত্রীর কাছে একখানা চিঠি আদ্যন্ত করে শেষ হবার আগেই কলোজে ঢলে গেছে। চিঠিখানা বলাই তার চিঠির প্যাড খুলে আবিষ্কার করল।

আমি তখন সেই চিঠি নিয়ে বাকটুকু লিখলাম। অমিয়কুমারের লেখা যেখানে শেষ হয়েছে তার পর থেকে এই ভাবে লিখলাম—

“সে যা হোক, আমি তোমাদের বাড়িতে যেতে চাই, কিন্তু যেতে যেতে বড় লজ্জা হয়। তোমরা যদি ওখান থেকে যেতে লেগ, তা হলেই যেতে পারি। লিখবে তো?—ইতি” তারপর এ চিঠি খামে বন্ধ করে তার উপর অমিয়র স্ত্রীর নাম ও ঠিকানা লেখা হল। অমিয়র স্বস্তরবাড়ি ওখান থেকে ইটাপথে তিন মিনিটেরও কম পথ। মির্জাপুর স্ট্রীটের উপর।

আমি অস্ত্রের হাতের লেখা স্তম্ভর নকল করতে পারতাম, যার লেখা সেও ধরতে পারত না অনেক সময়। যাই হোক, এ চিঠি পৌছে দেবার ভার নিল বলাই। সে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, কতুয়া গায়ে, খালি পায়ে, এবং চুলগুলো আরও অবিস্ত্রস্ত করে, অমিয়র স্বস্তরবাড়ি ঢলে গেল এক কড়া নেড়ে গ্রাম্য উচ্চারণে গিয়ে বলল “অমিয় দালাবাবু নতুন দিদিনথিকে এই চিঠিখানা পাঠিয়েছেন।”

ঘটনাটা ঘটেছিল সম্ভবত বেলা একটায়। তার পর আমরা বিকেলে বেরিয়ে যাই এবং এ চিঠির পরিণাম কি ঘটল তা জানবার জঙ্ক সন্ধ্যার পরেই ফিরে আসি। এসে দেখি অমিয় গুন হয়ে ঘরে বসে আছে, আমাদের দেখামাত্র একখানা চিঠি আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল এই নাও তোমাদের চিঠির উত্তর।

অমিয়কুমার মিষ্টবভাবের মানুষ। কারো উপর চটেতে দেখিনি কখনো, আমাদের উপরেও চটেছিল কি না ঠিক বোঝা গেল না।

ঘটনা অনেক দূর গড়িয়েছিল। নতুন জামাই চিঠি দিয়েছে, অতএব তাতে স্বস্তর বাড়ির সবাইই অধিকার—চিঠির কথা সঙ্গে সঙ্গে প্রচার হয়ে গিয়েছিল। ফলে তার স্বস্তরবাড়ির সবাই একে একে অমিয়কে নিয়ে বাবার জঙ্ক এসেছেন। অমিয়র স্বস্তরও এসে গেছেন একবার।

একটি নিষ্ঠুর কৌতুক সম্ভেত নেই। বলাই যে কি পরিমাণ খেয়ালি তার আরও দৃষ্টান্ত আছে। একদিন অমিয়র অল্পস্থিতিতে



ভিস্ফোজিং ঘরে

তার টেবিলের ল্যাম্প থেকে চিমনিটা খুলে নিয়ে টেবিলের উপর ভেঙে রাখল। আমিও কিছু সহযোগিতা করলাম এ কাজে। আঙুলের সঙ্গে ক্রমাল ভড়িয়ে ধুলাম আর জলে মিশিয়ে ঝকঝকে বিছনার চাদরটির উপরে বিড়ালের পদচিহ্ন একে দিলাম কয়েকটি। কাজটি খুব নিখুঁত হয়েছিল। আমিও ফিরে এসে কোনো অদ্ভুত বিড়ালের উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত বর্ষণ করতে লাগল।

একদিন অপরাহ্নে চঠাং খেদাল হল কলকাতার বাইরে কোথায়ও ঘুরে আসা থাক। বলাই আমি ও শিব মৈত্র অবিলম্বে চলে গেলাম শিয়ালদা স্টেশনে। পকেটে আমাদের উদ্বৃত্ত পয়সা কোনো সময়েই বেশি থাকত না, সেদিনও ছিল না। সবার সব পয়সা একত্র করে বলাইয়ের হাতে দিলাম। বলাই সে পয়সা বুকিং ক্লার্কের সম্মুখে ঠেসে দিয়ে বলল, “দাদা, তিনখানা রিটার্ন টিকিট দিন।”

“কোথাকার?”

“তিতো বিরক্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি দাদা, যে-কোনো স্টেশনের দিন, আটকারে না কিছু।”

বুকিং ক্লার্ক খুব কৌতুক অনুভব করলেন এ কথা, এবং পয়সা হিসেব করে তিনখানা কাঁচরাপাড়ার রিটার্ন টিকিট দিলেন।

ঐনের মধ্যে এক ভ্রমলোকের সঙ্গে আলাপ হল, তিনিও কাঁচরাপাড়া যাবেন। বলাই তাঁর সঙ্গে খুব ভাল জমিয়ে নিল, এবং তাঁকে দাদা বলতে আরম্ভ করল। বলাই ক্রমে প্রস্তাব করল তাঁর বাড়িতে গিয়ে বৌদির হাতের রান্না খেয়ে তবে অজ্ঞ কথা। ভ্রমলোক মহা বিশদে পড়লেন। তিনি যতই প্রসঙ্গটা অন্তরিক্তে খোঁজাবার চেষ্টা করেন বলাই ততই তাঁর সম্পর্কে এবং বৌদির সম্পর্কে আলাপ করতে থাকে। অবশেষে কাঁচরাপাড়া পৌঁছানোর পরও যখন আমরা তাঁর সঙ্গে চলতে শুরু করলাম তখন তিনি যতরকম ভাবে সম্ভব আমাদের নিরুৎসাহ করতে লাগলেন। বললেন, “রাত্রি বেশি হলে কেবাব আর গাড়ি পাবেন না, আপনাদের ভ্রমণ কষ্ট হবে, আপনারা সত্যিই আসবেন না, আমার বাড়ি এখান থেকে চার মাইল”—ইত্যাদি।



কলিকাতা জাত ভিক্ষে করে নিয়ে এলো

আমরা শুধুই একটু ‘মজা’ করার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে মাইলখানেক গিয়েছিলাম।

ইন্টারজাশনাল বোর্ডিং বলাই, আমি ও বলাইয়ের দুবসম্পর্কীয় এক ভাই (সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়) একটু ঘরে বাস করতাম। সে ঘরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধেশ্বর পড়ত মেডিক্যাল স্কুলে। পড়াশোনায় তার খুব নিষ্ঠা ছিল। বলাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল তার অপরিণাম। তার পড়ার সুরিখে হবে এই উদ্দেশ্যে বলাই মেডিক্যাল কলেজ থেকে মাসুকের ব্রেন, ফুসফুস ইত্যাদি প্রভৃতি কি ভাবে সংগ্রহ করে এনেছিল জানি না। সেখানে পৃথক পৃথক মাটির ইঁড়িতে কমাঁলিনে ডোবানো থাকত, ইঁড়িগুলো থাকত তক্তাপোষের নিচে। তিনখানা তক্তাপোষের মাঝখানে বসে একটা সস্তরকি পাঁতা ছিল—এইখানে বসে ব্রেন বা ফুসফুস বা ইত্যাদি কাটা হত এবং সিদ্ধেশ্বরকে এ সবার অ্যানাটমি বোঝানো হত। সেই সস্তরকির উপর একটা কুকার ছিল, তাতে প্রায়ই মাস রান্না হত। একদিকে মাসুকের ফুসফুস কাটা হচ্ছে অপরদিকে পানির মাস রান্না হচ্ছে। সস্তরকির উপর মাসখানেকের ধূলা জমে আছে, কখনো তারই উপর শুয়ে পড়েছে বলাই। মাসুকের সেই সব দেহের ইঁড়িতে কমাঁলিনে ডোবানো থাকত বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অংশ ফুলত না, তার ফলে সেই সব অংশ কিছুদিনের মধ্যেই পচে উঠে ঘর ঘুরিয়ে ভরে তুলত। কিন্তু সবাই নির্বিকার। তার মধ্যেই পাওয়া শোওয়া সবই স্বাভাবিক ভাবে চলছে।

আমারও অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন ধরে একটা ফুসফুস কাটা হচ্ছিল। ফুসফুসের ভিতরটা এই প্রথম দেখার সুযোগ পেলাম। ফুসফুসের পণ্ডিত অশ্বের গায়ে ছোঁতে বড় নানা রকম চোঁরাবার করবার মতো কালো এক একটা অংশ, কেউ যেন সেসব জায়গায় ভুঁবার ছোঁপ লাগিয়ে দিয়েছে। ও-সব অংশের নাম সুনলাম কার্ণনাইজড অংশ, অত্যধিক ধূমপানে বা ধোঁয়া নাকে ঢাকলে ফুসফুসে এ রকম এক একটা এলাকা কালো হয়ে যায়।

কাটাকাটির কাজ শেষ হবার পর আসল বিপদ। বলাই একদিন রাত দুটোয় উঠে কাটা ফুসফুস খবরের কাগজে ভড়িয়ে গোপনে পথের রেফিউজ বিনের মধ্যে ফেলে এলো। বলাই, যদি পুলিশ ধরে তা হলে বিপদ। বলবে, নরহত্যা করেছে। প্রমাণ করতে হবে, করি নি। ততদিনে শাস্তির চূড়ান্ত।

খিয়েটার দেখা অনেক দিন থেকেই একটি বড় নেশা ছিল বলাইও নিয়মিত দেখত। কিন্তু আমাদের হাতে উদ্বৃত্ত পয়সা কোনো সময়েই বেশি থাকত বলে মনে পড়ে না। মাসের শেষ দিকে কোনো বন্ধু এলে তাকে শোষণ করে একেবারে গজভুক্ত কপিথবৎ করে ছেড়ে দেওয়া হত। সাহেবগঞ্জ থেকে প্রবোধ এলে তার উপরেই আক্রমণটি বেশি হত। প্রবোধ ছিল অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, সে আমাদের ভক্ত থক করে তুলত হত, এটি জানা ছিল বলেই আমাদের কোনো সন্দেহ হত না। তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম খিয়েটারে অথবা সিনেমায়। একটা পয়সা হাতে থাকতে তাকে ছাড়াত হত না। সে যখন সাহেবগঞ্জ ফিরে যেত, তখনকার অবস্থা বলাইয়ের ভাষায় : প্রবোধদা! পকেট আমরা একেবারে খালি করে ফেলতাম, শেষে তাঁর যারা সময় অজ্ঞ কোনো বন্ধুর কাছ থেকে পয়সা ধার করে দিতাম, সে ধার প্রবোধদাই শোধ করতেন বলাই বাহুল্য। প্রবোধদার বাবার স



থোঁচা দাড়ি, ময়লা পোষাক ! দাড়ি কামানোর পয়সাও থাকত—বলাই এ গল্প তখন অনেককে স্তমিয়েছে।

প্রবোধ ছিল অত্যন্ত কোমল হৃদয় এবং সেণ্টিমেন্টাল। কোনো গান্ধী নটিক তার সঙ্গে দেখা প্রায় অসম্ভব ছিল। মনোমোহন আর ‘প্রফুল্ল’ অভিনয়ে প্রবোধ, বলাই ও আমি গিয়েছিলাম। ৫ কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন কান্দতে আরম্ভ করল যে, তা ঠেকানো গেল। সে উঠে যাবেই। কান্দতে কান্দতে উঠে পড়ে, এবং হয়, আমরা দু’দিক থেকে তার হাত ধরে জোর করে দিই। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। একটি পরেই আবার শুরু হৃৎস্বরের দৃশ্য আরম্ভ হয়, আবার প্রবোধের সেখানে বসে হৃৎস্বাধা হয়ে ওঠে। জোর করে চলে যেতে চায়। বলে ও খরচ করব এবং এত হৃৎস্ব সহ্য করব, এ আমি পারব আবার তাকে ঠাণ্ডা করি, আবার সে কান্দতে কান্দতে উঠে।

দানি বাবুর পরে প্রবোধকে কান্দাতে লাগলেন শিশিরকুমার ডি তাঁর সীতা নাটকে। কিন্তু তত দিনে প্রবোধ থিয়েটারে বসে আর মাধুর্য় হৃদয়ঙ্গম করতে শিখেছে, কান্দতে কান্দতে উঠে বাবার করেনি।

থিয়েটারে হৃৎস্বের দৃশ্য দেখে কান্দি কেন এবং পয়সা খরচ করে

কান্দি কেন, এ প্রশ্নের ঠিক উত্তরটি আজও মেলেনি। আরিষ্টটল থেকে অত্যাধি এ চেষ্টা হয়ে আসছে, অনেক উত্তরই ভাল লাগে কিন্তু সম্পূর্ণ মনে হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে ট্রাজেডি দেখতে আমরা পছন্দ করি—তা-সে *Katharsis* হোক বা না হোক, অথবা যে অর্থেই হোক। কিন্তু প্রবোধ যখন বলেছিল “পয়সাও খরচ করব এবং কান্দবও, এ আমি পারব না”—তখন অন্তত সে মুহূর্তের জন্য আরিষ্টটল একটি দূরে সরে ছিলেন, এ দৃশ্যটি দেখতে পাননি।

বলাইয়ের খেয়ালের মৌলিকতা বলাইকে একটি অদ্ভুত চরিত্রে পরিণত করেছিল। আরও দু’জন খেয়ালি ব্যক্তির সংসর্গে এসে বলাইয়ের চরিত্র আরও খুলেছিল। সে দু’জন ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শিবদাস বসুমতীক। প্রথম জন বলাইয়ের শিক্ষক, দ্বিতীয় জন তার সহপাঠী। খেয়াল বিষয়ে এ দু’জনকেই বলাইয়ের বড়লা বলা চলে। এদের কথা পরে বলব। ইতিমধ্যে আর একটি ছোট ঘটনা বলি।

একদিন বলাইয়ের হঠাৎ খেয়াল হল কোনো একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সে পাখে এসে কাঁড়াল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি পদমত্ত মতো যুবককে ডেকে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে ফেলল; দু’জনের মধ্যে চিঠিপত্র লেখা চলছিল কিছুকাল।

[ক্রমশঃ]

## ঠেকে গেছি প্রেমের দারে

### উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

বেদান্ত বলেন, জগৎটা একান্ত ভাবে মায়া। এই মায়ায় কান্দে পড়িয়া জগৎকে সত্য বলিয়া মনে হয় এবং তাহাবই ভুল মাহুষের বন্ধন ও ত্রিবিধ হৃৎস্বের নরক-যন্ত্রণা সহ্য করা। এই মাসিক জগতের মত ফিরিস্তির এই শাসনটাও একটা মায়া, একটা প্রকাণ্ড কাল্পনিকতা ! ইহার পুলিশ-প্রহরী, কাজী-কারাগার, ইহার দীপাস্তুর ফাঁসি ! ইংরেজের পেয়াল-পাঠিক, হাঁক-ডাক শাসনের শাসনিক যত হাঁক-ডাক, ফিরিস্তির লাট-বেলাট এইত তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত সর্বস্ব কিছুই ভাঙি। যেদিন আমাদের আত্মানুভূতি হইবে, আমাদের স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারিব আর সেই আত্মানুভূতির স্বাধীনতা হইতে আমরা বলিব, ইংরেজ নাই—সেদিন ইংরেজ থাকিবে না ! উষার বস্ত্রিম রাগের স্পর্শে তমিস্রা রজনীর আঁধার যেমন নিমেষে লোপ পাইয়া যায়, ইংরেজের রাজ্য-সাম্রাজ্য, তাহাব শিক্ষা-সভ্যতার বাড়াবাড়ি ও ভড়াছড়ি নিমেষে অন্তহিত হইয়া যাইবে ! ফিরিস্তির যা কিছু বাধন-ছাঁদনএর অস্তিত্ব কেবল আমাদের মুঢ়তায়, এ দেশী লোকের ভাঙিতে। ফিরিস্তির প্রেমে আমরা মজিয়া আছি বলিয়া তাহাদের আট-কাটে বীথিয়া রাখিয়া দিয়াছি। তাহাদের শিক্ষা চলিতেছে আমাদের প্রেমে, ঐ স্নেহ শাসনকে আমরাই আমাদের অনুরাগ-আকর্ষণ দিয়া বর্তাইয়া রাখিয়াছি। কিন্তু আর নয়, মুক্তির দিন আসিয়াছে। এই ফিরিস্তির প্রেমের ডোর ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতার ভাগীরথী প্রবাহে অবগাহন করিয়া আমাদের একবার বেদান্ত মন্ত্রে বলিতে হইবে—ত্রৈলোক্যম্, আমরা ব্রহ্ম ! আমরা ঋষিযুনির সন্তান ! আমরা ত্রীকূলের উত্তরাধিকার। আমাদের শোণিত সংস্রবে রহিয়াছে প্রতাপ শিবাজীর শোণিত সম্পর্ক। আমাদের অধীন রাখে কে ! আমরা মুক্ত স্বরাট !

‘সন্ধ্যা’, ১৩১৪ : রাজস্রোহ মামলার অভিযুক্ত।

তার টেবিলের ল্যাম্প থেকে চিনিমিটা খুলে নিয়ে টেবিলের উপর ভেঙে রাখল। আমিও কিছু সহযোগিতা করলাম একাজে। আউলের সঙ্গে ফ্রামাল জড়িয়ে ধুলো আর জলে মিশিয়ে ঝকঝকে বিছনার চাদরটির উপরে বিড়ালের পদচিহ্ন এঁকে দিলাম কয়েকটি। কাজটি খুব নিখুঁত হয়েছিল। অমিয় ফিরে এসে কোনো অদৃশ্য বিড়ালের উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত বর্ণন করতে লাগল।

একদিন অপরাহ্নে চট্টাং খেয়াল হল কলকাতার বাইরে কোথায়ও ঘুরে আসা যাক। বলাই আমি ও শিব মৈত্র অবিলম্বে চলে গেলাম শিরাদল স্টেশনে। পকেটে আমাদের উদ্ভূত পয়সা কোনো সময়েই বেশি থাকত না, সেদিনও ছিল না। সবার সব পয়সা একত্র করে বলাইয়ের হাতে দিলাম। বলাই সে পয়সা বুকি ক্লার্কের সম্মুখে ঠেলে দিয়ে বলল, “দাদা, তিনখানা বিটার্ণ টিকিট দিন।”

“কোথাকার?”

“তিত্তো বিরক্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি দাদা, যে-কোনো স্টেশনের দিন, আটকাতে না কিছু।”

বুকি ক্লার্ক খুব কৌতুক অনুভব করলেন একথা, এবং পয়সা হিসেব করে তিনখানা কাঁচরাপাড়া বিটার্ণ টিকিট দিলেন।

ট্রেনের মধ্যে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, তিনিও কাঁচরাপাড়া যাবেন। বলাই তাঁর সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে নিল, এবং তাঁকে দাদা বলতে আরম্ভ করল। বলাই ক্রমে প্রস্তাব করল তাঁর বাড়িতে গিয়ে বৌদির হাতের রান্না খেয়ে তবে অজ কথা। ভদ্রলোক মহা বিপদে পড়লেন। তিনি যতই প্রসঙ্গটা অন্তর্দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করেন বলাই ততই তাঁর সম্পর্কে এক বৌদির সম্পর্কে আলাপ করতে থাকে। অবশেষে কাঁচরাপাড়া পৌঁছানোর পরও যখন আমরা তাঁর সঙ্গে চলতে শুরু করলাম তখন তিনি যতরকম ভাবে সম্ভব আমাদের নিরুৎসাহ করতে লাগলেন। বললেন, “বাত্রি বেশি হলে ফেরবার আর গাড়ি পাবেন না, আপনাদের ভাষণ কষ্ট হবে, আপনারা সত্যিই আসবেন না, আমার বাড়ি এখন থেকে চার মাইল”—ইত্যাদি।



—একজন মিস এঙ্গেল

আমরা শুধুই একটু ‘মজা’ করার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে মাইলখানার গিয়েছিলাম।

ইটার্ণজ্ঞানশাল বোডিং বলাই, আমি ও বলাইয়ের দূরসম্পর্কীয় এক ভাই (সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়) একটি ঘরে বাস করতাম সে ঘরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধেশ্বর পড়ত মেডিক্যাল স্কুলে। পড়াশোনায় তার খুব নিষ্ঠা ছিল। বলাইয়ের প্রহি শ্রদ্ধাও ছিল তার অপরিমো। তার পড়ার স্তবধি হবে ত্রে উদ্দেশ্যে বলাই মেডিক্যাল কলেজ থেকে মাস্কুসের ব্রেন, ফুসফুস ইত্যাদি প্রভৃতি কি ভাবে সংগ্রহ করে এনেছিল জানি না। সেখান থেকে পৃথক পৃথক মাটির ইঁড়িতে ফর্মালিনে ডোবানো থাকত, ইঁড়িগুলো থাকত তক্তাপাথের নিচে। তিনখানা তক্তাপাথের মাঝখানে শুধু একটা সতরঞ্চি পাঁতা ছিল—এইখানে বসে ব্রেন বা ফুসফুস বা ইত্যাদি কাটা হত এবং সিদ্ধেশ্বরকে এ সবার আনানটনি বোঝানো হত। সেই সতরঞ্চির উপর একটি কুকার ছিল, তাতে প্রায়ই মাংস রান্না হত। একদিকে মাস্কুসের ফুসফুস কাটা হচ্ছে অন্যদিকে পর্টার মাংস রান্না হচ্ছে। সতরঞ্চির উপর মাংসখানেকের ধূলা জমে আসে, কখনো তাবই উপর শুয়ে পড়েছে বলাই। মাস্কুসের সেই সব লেহা ইঁড়িতে ফর্মালিনে ডোবানো থাকত বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অশুদ্ধ হত না, তার ফলে সেই সব অংশ কিছুদিনের মধ্যেই পড়ে উঠে ঘব ঘর্ষিত ভাবে ফুলত। কিন্তু সবাই নিবিচার। তার মধ্যেই থাওয়া শেওড়া সবই স্বাভাবিক ভাবে চলছে।

আমারও অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন ধরে বৌদি ফুসফুস কাটা হচ্ছিল। ফুসফুসের ভিতরটা এই প্রথম দেখার সুযোগ পেলাম। ফুসফুসের খণ্ডিত অংশের গায়ে ছোট-বড় নানা রকম চোবাব কয়লার মতো কালো এক একটা অংশ, কেউ যেন সেসব জায়গায় ভুখোব ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে। ওসব অংশের নাম শুনলাম কার্ণাইজড অংশ, অর্থাৎ ধূমপানো বা পোঁদা নাকে বানান ফলে ফুসফুসে এই রকম এক একটা এলাকা কালো হয়ে যায়।

কাটাকাটির কাজ শেষ হবার পর আসল বিপদ। বলাই একদিন রাত দুটোয় উঠে কাটা ফুসফুস খবরের কাগজে জড়িয়ে গোপনে পড়ে রেফিউজ বিনের মধ্যে ফেলে এসে। বলল, যদি পুলিশ ধরে, তা হলে বিপদ। বলবে, নরহত্যা করেছে। প্রমাণ করতে হবে, করি নি। ততদিনে শাস্তির চূড়ান্ত।

থিয়েটার দেখা অনেক দিন থেকেই একটি বড় মেশা ছিল। বলাইও নিয়মিত দেখত। কিন্তু আমাদের হাতে উদ্ভূত পয়সা কোনো সময়েই বেশি থাকত বলে মনে পড়ে না। মাসের শেষ দিকে কোন বন্ধু এসে তাকে শোষণ করে একেবারে গজতুক্ত করিপথবৎ করে ছেড়ে দেওয়া হত। সাহেবগল্প থেকে প্রবোধ এসে তার উপরেই আক্রমণ বেশি হত। প্রবোধ ছিল অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, সে আমাদের জগা থক করে তুলত, এটি জানা ছিল বলেই আমাদের কোনো সন্দেহ হত না। তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম থিয়েটারে অথবা সিনেমায়। একটা পয়সা হাতে থাকতে তাকে ছাড়া হত না। সে যখন সাহেবগল্প ফিরে যেত, তখনকার অবস্থা বলাইয়ের ভাষায় : প্রবোধদার পকেট আমরা একেবারে খালি করে ফেলতাম, শেষে তাঁর যাবত সময় অল্প কোনো বন্ধুর কাছ থেকে পয়সা ধার করে দিতাম, সে ধার প্রবোধদারই শোধ করতেন বলা বাহুল্য। প্রবোধদার যাবত সব

খোঁচা লাড়ি, ময়লা পোষাক ! লাড়ি কামানোর পয়সাও থাকত  
-বলাই এ গল্প তখন অনেককে স্তমিচ্ছে।

প্রবোধ ছিল অত্যন্ত কোমল হৃদয় এবং সৌটিমেটাল। কোনো  
গান্ধী নটিক তার সঙ্গে দেখা প্রায় অসম্ভব ছিল। মনোমোহন  
পরে 'প্রফুল্ল' অভিনয়ে প্রবোধ, বলাই ও আমি গিয়েছিলাম।  
৪ কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন কাঁদতে আরম্ভ করল যে, তা ঠেকানো  
গ। সে উঠে যাবেই। কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়ে, এবং  
হয়, আমরা দু'দিক থেকে তার হাত ধরে জোর ক'রে  
র দিই। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। একটি পরেই আবার  
জ্বক দুঃখের দৃশ্য আরম্ভ হয়, আবার প্রবোধের সেখানে ব'সে  
। দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। জোর ক'রে চলে যেতে চায়। বলে  
।ও খরচ করব এবং এত দুঃখ সহ্য করব, এ আমি পারব  
আবার তাকে ঠাণ্ডা করি, আবার সে কাঁদতে কাঁদতে উঠে  
।

দানি বাবুর পরে প্রবোধকে কাঁদতে লাগলেন শিশিরকুমার  
'ডি তাঁর সীতা নটিকে। কিন্তু তত দিনে প্রবোধ থিয়েটারে ব'সে  
তার মাধুর্য হ্রদয়ঙ্গম করতে শিখেছে, কাঁদতে কাঁদতে উঠে বাসার  
করেন।

থিয়েটারে দুঃখের দৃশ্য দেখে কাঁদি কেন এবং পয়সা খরচ ক'রে

কাঁদি কেন, এ প্রশ্নের ঠিক উত্তরটি আজও মেলেনি। আরিষ্টটল থেকে  
অভাবিধি এ চেষ্টা হয়ে আসছে, অনেক উত্তরই ভাল লাগে কিন্তু সম্পূর্ণ  
মানে হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে ট্রাজেডি দেখতে  
আমরা পছন্দ করি—তা-সে *Katharsis* হোক বা না হোক, অথবা  
যে অর্থেই হোক। কিন্তু প্রবোধ যখন বলেছিল "পয়সাও খরচ করব  
এবং কাঁদবও, এ আমি পারব না"—তখন অন্তত সে মুহূর্তের জন্য  
আরিষ্টটল একটি দূরে সরে ছিলেন, এ দৃষ্টি দেখতে পাননি।

বলাইয়ের খেয়ালের মৌলিকতা বলাইকে একটি অদ্ভুত চরিত্রে  
পরিণত করেছিল। আরও দু'জন খেয়ালি ব্যক্তির সংশ্লেষে এসে  
বলাইয়ের চরিত্র আরও খুলেছিল। সে দু'জন ডাক্তার বনবিহারী  
মুখোপাধ্যায় ও শিবদাস বসুমঙ্গিক। প্রথম জন বলাইয়ের শিক্ষক,  
দ্বিতীয় জন তার সহপাঠী। খেয়াল বিষয়ে এ দু'জনকেই বলাইয়ের  
বড়লা বলা চলে। এঁদের কথা পরে বলব। ইতিমধ্যে আর একটি  
ছোট ঘটনা বলি।

একদিন বলাইয়ের হঠাৎ খেয়াল হল কোনো একজন অপরিচিত  
ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সে পথে এসে কাঁড়াল  
এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি পদম মতো যুবককে ডেকে তার সঙ্গে  
ঘনিষ্ঠতা ক'রে ফেলল; দু'জনের মধ্যে চিঠিপত্র লেখা চলেছিল  
কিছুকাল। [কমলা:]

## ঠেকে গেছি প্রেমের দারে

### উপাধ্যায় ব্রহ্মবাক্য

বেলাস্ত বলেন, জগৎটা একান্ত ভাবে মায়া। এই মায়ায় কাঁদে পড়িয়া  
জগৎকে সত্য বলিয়া মনে হয় এবং তাহারই জন্য মানুষের বন্ধন ও ত্রিবিধ  
দুঃখের নরক-বস্ত্রণা সহ্য করা। এই নাসিক জগতের মত ফিরিস্তির এই শাসনটাও  
একটা মায়া, একটা প্রকাণ্ড কালনিকতা ! ইহার পুলিশ-প্রহরী, কাজী-কারাগার,  
ইহার দীপান্তর কাঁসি ! ইংরেজের পেয়াল-পাঠক, হীক-ডাক শাসনের শাসনিক  
যত হীক-ডাক, ফিরিস্তির লাট-বেলাট এইতে তাহার অস্তিত্ব পথান্ত সর্বত্র কিছুই  
ভ্রান্তি। যেদিন আমাদের আত্মাহুত্ব হইবে, আমাদের স্বরূপ আমরা বুঝিতে  
পারিব আর সেই আত্মাহুত্বের স্বাভাবিক হইতে আমরা বলিব, ইংরেজ নাই—  
সেদিন ইংরেজ থাকিবে না ! ইহার রক্তিম বাগের স্পর্শে তমিষা রজনীর  
আঁধার যেমন নিমেষে লোপ পাইয়া যায়, ইংরেজের রাজ্য-সাম্রাজ্য, তাহার  
শিক্ষা-সভ্যতার বাড়াবাড়ি ও জড়াহুড়ি নিমেষে অস্তিত্ব হইয়া যাইবে ! ফিরিস্তির  
যা কিছু বাঁধন-ছাঁদন-এর অস্তিত্ব কেবল আমাদের মূঢ়তায়, এ দেশী লোকের  
ভ্রান্তিতে। ফিরিস্তির প্রেমে আমরা মজিয়া আছি বলিয়া তাহাদের আট-কাটে  
বাঁধিয়া রাখিয়া দিয়াছি। তাহাদের শিক্ষা চলিতেছে আমাদের প্রেমে, ঐ  
শ্রেষ্ঠ শাসনকে আমরাই আমাদের অনুরাগ-আকর্ষণ দিয়া বর্ধাইয়া রাখিয়াছি।  
কিন্তু আর নয়, মুক্তির দিন আসিয়াছে। এই ফিরিস্তির প্রেমের ডোর ছিন্ন  
করিয়া স্বাধীনিকতার ভাগীরথী প্রবাহে অবগাহন করিয়া আমাদের একবার  
বেদান্ত মন্ত্রে বলিতে হইবে—ব্রহ্মবাহু, আমরা ব্রহ্ম ! আমরা স্ববিমূর্ষির সন্তান !  
আমরা শ্রীকৃষ্ণের উত্তরাধিকার। আমাদের শোণিত সংশ্লেষে রহিয়াছে প্রতাপ  
শিবাজীর শোণিত সম্পর্ক। আমাদের অধীন রাখে কে ! আমরা মুক্ত স্বরাট !

'সন্ধ্যা', ১৩১৪ : রাজমোহন মায়লার অভিব্যক্তি।

# সোবিয়তের দেশে দেশে

মনোজ বসু

বলসইতে এত পালা দেখলাম, মস্কো আট থিয়েটারে একদিন যাওয়া তো উচিত। কিন্তু দেশের ক্ষেত্র পা বাড়িয়ে আছেন, প্রস্তাব কারো কানে ঢোকে না। শেষ পর্যন্ত মোটামুটি পাঁচেরন হলাম আমরা। আর দোভাবিবা ইরা—ইংরেজী করে বুঝিয়ে দেবার জন্ত। পালা হল উষ্ণ হৃদি (warm heart) আমরা আসার আগে কালিদাসের নাটক হয়ে গেছে। সময় নেই যে রয়ে সয়ে কোন ভাল পালা দেখে যাব এখানে।

হলে চুকে রাগ হচ্ছে। অস্ত্রন চেকভের মতো গুণী নিজে গড়ে তুললেন—জগৎজোড়া নাম—যে বস্তু এই? হালফিল আমাদের কলকাতার থিয়েটার যা পঁড়াচ্ছে, ভাল বই খারাপ নয় এর চেয়ে। সিনসিনারি অফা-মরি কিছু নয়। বলসই থিয়েটার তো চোখ ধাঁড়িয়ে মাথা খারাপ করে দিয়েছে। এখানে ভেবেছিলাম না জানি আরও কি দেখতে পাব! শুরুতেই মুগ্ধে পড়েছি তাই।

প্রেমের গল্প। হাসি রহস্যও যুব। উনিশ শতকের পরিবেশ। এর মধ্যে একটা সিনে কিছু বাহ্যিক দেখলাম। জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নৌকো চড়ে কাছারি বাড়ি যাচ্ছেন। বাড়ির নিচে নদী। উঠলেন বাবু সজ্জ হয়ে, ছুতোয় জলকাদা না লাগে। ছেড়ে দিল নৌকা, গান বাজনা ও কৃত্তিকান্তির ব্যাপার আছে, সেই সব শুরু হয়ে গেল। চলছে, চলছে—ঘর বাড়ি গির্জা মাঠ গাছপালা পার হয়ে চলছে, অবশেষে কাছারি বাড়ির ঘাটে এসে লাগল। জমিদার সদলবলে নেমে পড়লেন। নৌকার সঙ্গে সঙ্গে চললুম আমরাও চলছিলাম যেন। এখন কাছারি বাড়ি পৌঁছে সেখানকার কাজকর্ম দেখছি।

ব্যাপারটা বুঝলেন? নৌকা একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে, কেঁজের উপর দর্শকের দৃষ্টির উপর থেকে, তা ছাড়া যাবেই বা কোথা? পিছনের পর্দা ফুরে যাচ্ছিল এ তাবৎ। পর্দায় তাঁকা গির্জা ঘর বাড়ি গাছপালা প্রভৃতি। আলোর কারসাজি তার উপর। নৌকার ভিতর গান বাজনার সমাবোধ এবং জীবন্ত অভিনয়—সমস্ত মিলিয়ে দুইবিভিন্ন ঘটায় দর্শকের। রেলগাড়িতে চড়ে হঠাৎ যেমন দেখেন গাড়ি ঠাঁড়িয়ে আছে, গ্রামগুলো সামনের দিক থেকে পিছনমুখে চলছে, এখানেও সেই বস্তু দেখালে উল্টো রকম প্রত্যয় কেন না হবে।

অভিনয় যত এগোচ্ছে, মাসুম হচ্ছে বলসইর সঙ্গে তফাত কোথায় এই থিয়েটারের। বলসইতে সিনসিনারি আলো সাজ পোশাকের বাহ্যিক—এক টিকিটে যুগপৎ অভিনয় ও ম্যাজিক দেখে নিচ্ছেন; এবং পালা-বিশেষে সাক্ষাসও। মস্কো আট থিয়েটারে শুধু মাত্র একটি বস্তু—অভিনয়। আমাদের থিয়েটারে প্রমুট করার রেওয়াজ—গানের এক একটা কলি যেমন দু-বার করে গায়, থিয়েটারেও ঠিক তাই। একবার উইংসের অন্তরাল থেকে প্রমুটার মশারের আকৃতি অমি; দ্বিতীয়বার ঠেকের বহির্দেশে অভিনেতা। তারই ইউরোপ

চষে বেড়িয়েছি বলতে পারেন—প্রায়ই তো পয়লা সারির সিটে বা থিয়েটার দেখেছি—প্রমুট শুনে শুনে বলার রেওয়াজ ওদের নেই টোন্টের মুখস্থও নয়, নাট্যকারের লিখিত বস্তু অন্তরের ভিতর থেকে পুরোপুরি নিজ বস্তু হয়ে বেরিয়ে আসে। সাজ হবার এই হালক নাটক, ভুবনময় ঠিক ডাক করবার কিছু নয়—কিন্তু প্রাণচালা র অভিনয়ই করছে প্রতি জন।

ইরা আমার ঠিক আগের সিটে। পাত্র-পাত্রী কে কী বলতে অঙ্ককারে কানের কাছে মুখ গুজনে ইংরেজি করে যাচ্ছে। বিবাহ লাগে, চটে যাই। আ, থাম দিকি ডুমি! নয়তো উঠে ওদিকে গিয়ে বোসো ওদের যদি প্রয়োজন থাকে।

কথা বুঝছেন?

না। কিন্তু সমস্ত বুঝতে পারছি।

সত্যি কথা, অভিনয়ের মধ্যে যে কত সামান্য ব্যাপার আজকে আসরে বসতে পারছি। নায়িকা সেজেছে ঐ যে মেয়েটা, কুড়ি-বাঁধ বছর বয়স কিন্তু মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সর্গন্ধ দিয়ে ও অভিনয়। চোখ বুজে আঙ্গু ও যেন অভিনয়ের ছবিটা দেখতে পাও মনের গুঁড় লোকে যত রকম ভাবের আনাগোনা, মূর্ত্তন দর্শকের কাছে অবলীলাক্রমে সমস্ত যেন মেলে ধরছে। মস্কো আট থিয়েটারে দেশজোড়া নাম এমনি হয়নি।

২৮

মস্কোয় জিনিষ কিনতে যাওয়া রকমারি। যা কিনবেন, কিটা ঠাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে যায়। অথচ দেশে আপনারা সা হয়েছেন, স্নাতেনির দুটা-একটা না নিয়ে এলে কেমন হয়? পুরে বেলা ঠাঁড়িয়ে জিনিষ কিনবেন সত্যি সত্যি ঐ একটা কিছা দুটা—এক কিউ শেষ করে অল্প কিউয়ে গিয়ে ঠাঁড়াবেন, অধিক কি করতে হবে বলুন। আমাদের বটুক-দা'র বুদ্ধি করলে হয়, বিলে মাছ ধরতে গেলাম। হোগলাবন ও জলকাদার ভিতর ঠাঁড়িয়ে ছিপ ফেলা এক জায়গায় যা হবার হল, যাও তখন অজ্ঞাথানে। মস্কোয়ই এঁ সঙলা করার ব্যাপার। বটুক-দা খানিকটা চেষ্টা চরিত্র করে শেষে দেখি ডাডায় উঠে খেজুর শুড়ি চেশান দিয়ে ঠাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে বিড়ি ধরিয়েছেন। ও বটুক-দা, খালি খালুই ফিরিয়ে নিয়ে গেলে বাড়ি লোকে বলবে কি? বটুক-দা' জবাব দিলেন, খালি কেন হবে ভাই? হাট ঘুরে যাব, হাট থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে বলব পরে এনেছি। বিরক্ত হয়ে আমরাও এক একবার ভাবছি তাই: তুলোঁর, কাবুঁর গিয়ে কিছা একবারে খাস দিলি থেকেই যা-তোক কিছু নিয়ে নিতে তো হয়। এত কামেলা করি কেন? কিন্তু বটুক-দা'র গল্প উপসংহার মনে পড়ে যায়। হাটে পৌঁছুতে বড় দেরি হল, সব মাই উঠে গেছে, এক ডালিতে ইলিশ আছে গোটা কয়েক। তাই সই—নির্ভীক বটুক-দা বাড়ি গিয়ে হরতো বলেছিলেন, ইলিশ মাছই ধরে

হুপে। বটুক-দাঁর বাড়ির ওরা অত্যন্ত ভাল মানুষ, এক কথায় যেন নিয়ে বসে পোতে মাছ কুটতে বসে গেলেন। আপনারা যে তা না। এমনই তো কোথ চুপাটেচুপি করেন, সোবিয়েতে যোরা চাটি খা কিনা! সিলুয়া কি বিরাটের কারো বাড়ি, লুকিয়ে থেকে খুঁচুপি সোবিয়েতের বই ফেঁদে নিয়েছে দেখগে। মস্কোর গাধা-মারা জিনিষ কাসেমো সহ নয়ন সন্মুখে ধরে দিলেও কতবার আপনারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবেন।

আমাদের এক টাকায় ওদের চুরাশি কোপেক। রুবল (অর্থাৎ একশ কোপেক) দাম দাঁড়াল তবে এক টাকা তিন আনার মতো। এই রুবল যেন পোলানকুচি ওদের কাছে। মস্কোর এই ঠাণ্ডার মধ্যে ফুল ফোটে বড় কম। এস্তার কাগজের ফুল বানায় ফুল দেওয়া-নওয়ার স্বপ্ন পাবার জন্ম। স্থবের বাপায়ে শোকের ব্যাপারে কাগজের ফুলের ছয়লাপ। আসল গাছের গোলাপ প্রতিটির দাম হল তিন রুবল অর্থাৎ সাড়ে তিন টাকার উপর। কিনতেন? মাধারণ জুতো এক জোড়া দেড়শ চুশ রুবলের কম নয়। ওভারকোট হাজার দেড় হাজার। খাবার জিনিষ সস্তা সেই তুলনায়। আলুর সের বাবো আনার মতো। কচি পাউণ্ড বাবো আনা।

দর শুনে আমরা থ হয়ে বাই, আর ওরা কি কাও করছে কেনা-বিক্রির জন্ম। ক্যামেরা গ্রামোফোন রেকর্ড, ঘড়ির দোকানে কিউ। এক মস্কো শহরই দশ লক্ষ ঘড়ি কাবার হয়ে গেল এক সপ্তাহে। আরও যে যোগান দিয়ে উঠতে পারে না। শুধু অর্থাৎ সর্ববস্ত্র বিপণিকে চুকছি—বস্ত্রের মেলার মতো মানুষ ঢেলে পারা যায় না। ছোট ছোট দোকানে চুকে দেখেছি—এমন কি বইয়ের লোকালয়ও সবানো পাঠ্যপুস্তকের মরশুমটা বাদ দিয়ে লোক জন নাক ডেকে যায়। অসম্ভব ইতর বিশেষ নেই কোনখানে। টাকা পকেটে থাকে যেন সব কামড়ায়, খরচ করে নিশ্চিন্ত হয়।

কেনই বা হবে না বলুন ভবিষ্যতের ভাবনা যখন নেই। ছলে পুসল চাকরিবাকরি অশুভ বিস্ত্র-বৃত্তা বয়সের ব্যবস্থা—সকল শাসকবাক্যের। মাধারণ মানুষ কাজ করবে, খাবে বেড়াবে, আমোদ ক্ষুধা করবে—বাস। ফালতু টাকা কিসের দায়ে রাখতে বাবে? জিনিষ পত্রের দর বেশি, বোজগারও তেমনি অনেক বেশি। ইচ্ছাপ-মাষ্টার মশায়ের কথাই শুন। চাকরিতে ঢোকান আট শ রুবল; বাইশ-শ রুবল অবধি মাইনে ওঠে। চার ঘণ্টার পাটনি—অল্পত ঠিকে পড়িয়ে (প্রাইভেট টাইশানি নয়) উপরি বোজগার হয়। আরও আছে। এদেশে এক মাষ্টার মশায়েরই শুধু আয়, স্ত্রী, বাঁধা বাড়া করেন ঘর সসার দেখেন। এখানে স্ত্রীরও পৃথক আয় আছে। মেয়ে পুরুষ কাজ সকলেরই। শুধু মাত্র কমিকের বেলা নয়, সর্বক্ষেত্রেই। পারিবারিক আয় তা হলে কত বেড়ে গেল বিবেচনা করুন। এক পয়সা সঞ্চয় করবে না, দোকানে দোকানে তাই এমনি মজ্বব।

খানা পিনা আস্তে আজকে আবার ইউনিয়ন অব রাইটার্স খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই একটি মাত্র ইউনিয়ন, যার সভ্য তাবৎ লেখকেরা। রাশিয়া বলে নয়—সোবিয়েতে যতগুলো গণতন্ত্র সর্বদেশের সকল লেখক। বিপুল প্রভাব অতএব। সাহিত্যিক বলতে যা কিছু বোঝেন, সমস্ত ইউনিয়নের তাঁবে। শাখা আছে নানা শহরে। গণতন্ত্রগুলো দরকারে মাসিক নিজ দেশে আলাদা কনফারেন্স করে; তাদের কর্মকর্তাও আলাদা কিন্তু মাথার উপরে আছে ইউনিয়ন।

কাজকর্মের অবধি নেই। বিভিন্ন দপ্তরে সমস্ত ভাগ করা আছে। যতগুলো দপ্তর সোবিয়েত দেশে প্রতিটির জন্ত আলাদা এক এক দপ্তর। পৃথিবীর সেরা ভাষা ও সাহিত্যগুলার সঙ্গে যোগাযোগে জন্ত পৃথক দপ্তর আছে। গ্রাতুক ডানিয়েলচুকের সঙ্গে পবিত্র হয়েছ, সে হল বৈদেশিক দপ্তরের লোক। খাটছে—অগুস্তি লোক একদল ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে আছে, চীনা সাহিত্য পরে একদল, ইলগু ফ্রান্স আমেরিকার ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চা করে আর একদল। আসোচনার বৈঠক বসে শ্রায়ে। বিদেশ থেকে বিস্তর বই আসে; কর্মীরা পড়ে শুনে যে সব বইয়ের তারিফ করে, সেগুলোর অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা হয়। কোন কোন বই ছেপে বেরবে, কোনটা বাতিল হবে ইউনিয়নই তার বিচারের মালিক।

বিদেশের লেখকদের দাওয়াত দিয়ে আনি ইউনিয়নের তরফ থেকে। আমাদের লেখকরাও বাহিরে যান। অতিথি গেলে বড্ড খুশি হই আমরা। শুধু যে বন্ধুরাই আসেন এমন নয়। অনেক এসে তর্কাতর্কি গালিগালাজ করেন। শেখটা বুধসময় হয়। পরস্পরের সাহিত্য আরও ভাল করে বোঝা যায় লেখকদের যাতায়াতে সাহিত্যের ঘর বাতে জাতির আত্মার দাবি পাই, মানুষে মানুষে সম্পর্ক নিবিড়তম হয়।

\* \* \*

ইউনিয়ানের বড়কর্তা কেউ হবেন, মুখপাত্র হয়ে যিনি সব বলছেন। বলছেন, দেয়ালে পোষ্টার দেখছ এ? কংগ্রেস হচ্ছে—লেখকদের কংগ্রেস। অনেক বছর পর হচ্ছে। ব্যবস্থা লেখক-সমিতির। বিপুল তোড়জোড় চলছে। আমাদের বত গণতন্ত্র, সব জায়গায় লেখকরা কনফারেন্স করছেন আসন্ন কংগ্রেস সম্পর্কে। সোবিয়েতের তাবৎ অঞ্চল থেকে লেখকরা আসবেন। বাইরের বড় বড় অনেক লেখককেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

ভারতের কাকে কাকে করলেন?

কিরাণ চন্দর তো আছেই। আব্বাস এবং আরও কে কে যেন—বাংলার কেউ নেই, নিশ্চিত হল। বলি নিমন্ত্রণের লিষ্ট কিভাবে আপনারা ঠিক করেন বলুন দিক।

সতত্তর মেলে না, আমতা-আমতা করছেন: বীদের নাম সঙ্গে আছে, সোবিয়েতের মানুষ বীদের বই টি পড়ে তাঁদের কথা থেকে ঠিকঠাক করতে হয়।

সে জানি, গোণাগুণতি করেকটা নাম জানা আছে। নাম জানিয়ে রেখেছেন সেই মহাশয়েরা শুধুমাত্র লেখা নয়—শতাব্দিক অস্ত্র ক্রিয়া-কৌশলে। অস্ত্রশ্রাফ যাবতীয় ব্যাপারে ঘুরে ফিরে ডাক আসে তাঁদের।

বাংলা সাহিত্য বলে এক বস্তু ছিল—সত্যি সত্যি কি বিশ্বাস করেন, ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ডা-ও লোপ হয়ে গেছে একবারে?

কোন রকমই সে খবর আসে না, কি করা যাবে?

দোষ আমাদেরই, অস্ত্রের উপর রাগ করে কি করব? রবীন্দ্রনাথের পর আর তো কেউ নজর মেলে বাইরের পানে তাকালাম না—পূর্বের শেষ প্রান্তে নানা সঙ্কট নিয়ে আছি পড়ে ঋণিত অবহেলিত একটি জাত। বিদেশের খাতির-আছান এবং টাকটা-সিকিটার যে স্রবোগ আসে ভারতের ছায়পথ বয়ে এবং ভারতের রাজধানী দিল্লি অচিরে সমস্ত ভাগাভাগি করে নেন।

এই লেখক কংগ্রেসেরই ব্যাপার। ওঁরা একটা নাটক চেয়েছিলেন যাতে ভারতীয় জীবন-চিত্র আছে। নাটকটা রূপ তুলিয়া করে

নিয়ে কংগ্রেসের জ্ঞানীজ্ঞানীদের মধ্যে অভিনয় করলেন। এমন-কি পাশা-ভাগনে ছোঁড়া নাটকে হাত মজা করছে—খবরটা দিলি পীছানোর গুহাঙ্ক—সঙ্গে সঙ্গে নাটক চলে এলো। বাইরের দাঁকপক্ষী কেউ জানল না। হাবেন মুখচ্ছে মশায়ের মুখে শোনা, ঠাা হকচকিয়ে বাচ্ছেন। আমরা চেয়েছিলাম ভারতীয় জীবনের নৃত্যকার ছবি থাকবে যে নাটকে। এর ঘটনা হল মধ্যে লগুন কিবা পারি হলেও বোমানান হয় না। অথচ এসে গেছে ভাবত থেকে। বাতিল করাও চলবে না। শোড়া বাংলা সাহিত্যে এই এই হাল আমলেও ভাল ভাল দেশি নাটক লেখা হয়েছে। কিন্তু হলে হবে কি—জোরদার মাতুল কোথায়, বধাসময়ে বধাহানে বস্তা যিনি গুঞ্জে দেবেন ?

ক্লশ-সাহিত্য সম্বন্ধে যে কথা আজ অনেকের মনে ঘুরে ফিরে তাই উঠে পড়ে।

ইউনিয়ন এত সব ব্যবস্থা করলেন, লেখকদের এখন সচ্ছলতা—কিন্তু ভাল সাহিত্য হচ্ছে কই তেমন ?

হচ্ছে বই কি ! খবর রাখেন না তেমন আপনারা—

সে তো বটেই। ভিন্ন দেশের পুরোপুরি খবর রাখা সোজা নয়। আগেও তো এই ছিল। তবু সাহিত্য নিজের জোরে বিদেশের ঘরে ঘরে বিদেশির মনে মনে আপন করে নিত। তেমন সব দিকপাল সাহিত্যকার কোথায় আজকের দিনে ?

ভুললোক বললেন, দেশের উপর দিয়ে কী বড় বয়ে বাচ্ছে, সেটা বিবেচনা করুন। বিপ্লবের পব থেকে চলছেই। ঘরের শত্রু বাইরের শত্রু। তারপরে মহাযুদ্ধ গেল যার ধকল যোল অনা এখানে। কাটানো যারিনি, খেতে পাচ্ছেন। সাহিত্য হল শাস্তির ফসল—ক'টা দিন আমরা শাস্তিতে থাকতে পেলাম বলুন !

আর এক কারণ, লেখকের স্বাধীনতা নেই। ছাঁচে ফেল সাহিত্য ফলাবার অভিনা।

চমকে ওঠেন তিনি : কে বলল ?

আপনিই তো। কোন বই ছাপা হবে না হবে, এখান থেকে ঠিক করে দেন। কেউ অতএব এমন লিখবে না, কর্তাদের বা পছন্দসই নয়। যে কথাগুলো কর্তৃপক্ষ সকলকে শোনাতে চান, তারই সাহিত্য বানানো হচ্ছে। স্বাধীন সহজ সাহিত্য গড়ে উঠছে না।

ভুললোক হেসে বলেন, এই দেখুন—মিছে বদনাম সিঁছেন। কর্তা কেন হতে যাব ? আমরাও তো লেখক। ইউনিয়ন লেখকদেরই—সমস্ত লেখক মিলে মিশে গড়েছে। আর এই যদি নিয়ন্ত্রণ বলেন, এ জিনিষ সকল দেশেই আছে।

আমাদের নেই। আমরা সব-কিছু লিখতে পারি। দেশে ইচ্ছা মতো বই বের করি—কারো পছন্দ-অপছন্দর দার দারি নে।

কিন্তু অপছন্দ হলে ছাপা বই বাজায়ান্তু হয়ে যায়। পবিশ্রম অর্থব্যয় সমস্ত অকারণ। একই পদ্ধতির বকমফের। পাঠকের কাছে পৌঁছানো অনুচিত মনে হলে আমাদের ইউনিয়ন আগেভাগে বন্ধ করে, আপনাদের সরকার বন্ধ করে ছাপা হয়ে যাবার পর। কোনটা ভাল, বিবেচনা করে বলুন এইবার। ছাপানোর পরে, না ছাপানোর আগে ?

ক'টা বই বা বাজায়ান্তু হয় ভারতে ? কালে ভজ্ঞে কলচি।

তবু ছোটো কাশাৰ আমরা লিখতে দিইনে—লড়াই বাধানো আ-  
ধনতত্ত্ব কিংবা বাওরা। বাকি সব কিছু লেখা চলে। সমাজ তত্ত্বের মিক  
চলবে না, কিন্তু রাষ্ট্রের মাতব্বদের বিরুদ্ধে বন্ধুকে লিখতে পারা।

বলতে লাগলেন, শত্রুরা রটার আমরা নাকি সমালোচনা চাটান  
ডাঙ্গা মিথ্যা। সমালোচনা ছাড়া এগুলো যায় না, শেষ কটি  
শোধন হয় না—একটা শিশুও জানে। এমন কি পাঠকদেরও আমরা  
ডেকে আনি আছা বকম সমালোচনা যাতে হয়। পাঠকে লেখক  
মিলে মিশে সোধগুণের বিচার করেন। লেখক ক্রমশ কটিলু হা  
ওঠেন পাঠকদের তাড়নায়। শুধুমাত্র পাঠকবাও কনকারেখা কা  
বইয়ের সম্পর্কে মহামত দেন। প্রত্যেকটি লাইব্রেরি দ্বারা কমিকার  
সম্পত্তি-ভবন এমন কি ইস্থল কলেজের ভিতরে পাঠক কনকারেখা  
ব্যবস্থা আছে। এই যে কংগ্রেস হবে, ছাত্র শিক্ষক অভিনয়  
সবাই তাতে যোগ দেবেন। সারা অঞ্চলের লেখকরা লেখক  
পাবেন, যাদের ভক্ত লিখে যাবেন তাঁরা। নিরক্ষরতা নেই বা  
বইয়ের বিধম চাহিদা। সাধারণ বই পনের-বিশ হাজার  
গল্প উপন্যাস হলে এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ ছাপা হয় এতিয়ান  
এত মানুষকে প্রভাবিত করছে, লেখকের কি বিরাট দায়িত্ব  
করুন। খামাল অতএব হতেই হবে। কিন্তু পাঠকসিপি সি  
করি আমরা লেখকবাই, বুঝব রাষ্ট্রনীতিকবা এর ভিতরে নেই  
আমাদের ভুল হলে, উপরে বোর্ড আছে, সেখানে পুনর্বিচার হতে পারে

১৯০৫ থেকে ১৯৫১ সাত বছরে নতুন বই সাড়ে ন'শতা  
বেরিয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে বইয়ের প্রদর্শনী হবে—গত বিশ বছর  
যাবতীয় বই দেখানো হবে দেখানো। সোবিয়েতের বই দ্রি  
হত বেরিয়েছে, তা-ও থাকবে। গকির 'মা' উনত্রিশটা ভা  
তর্জমা হয়েছে একশ তিন বকমে। ভুবনপ্রিয় বই আরও অনেক  
আছে।

কাজ নেই। বখা ইচ্ছা ঘুরে বেড়ানো, মোকানো হুঁ  
সম্ভব হলে কিছু কেনাকাটা করা। ভোকস আজ রাষ্ট্রে সি  
ভোজ সিঁছেন।

বিস্তার জাঁদরেল ব্যক্তি এসে জমেছেন। আমাদের রাষ্ট্র  
কে, পি, এস, মেননকেও ডেকেছে। এমন গতিক, মাঝে মা  
ভুল হয়ে যায় বিশেষ-বিভূরে আছি আমরা। ভোজের মত  
জায়গা বদলাবদলি হচ্ছে—এর পাশে গিয়ে বসলাম থানিক,  
চলে এলো আমার পাশে। আছি মাত্র কালকের দিনটা,  
পরে কে কোথায় ? কথাবার্তা বেনদায় জড়িয়ে বাচ্ছে—আর  
হবে না হয় তো এ জীবনে ! মানুষ বড় ভাল, মানুষে মানুষে  
নেই—দূরের মানুষ কত সামান্য সময়ে একেবারে আপন হয়ে যায়

মেনন বহুতায় জমিয়ে তুলেছেন : এই ভারতীয়দের নেম  
গুনে লগুনের এক কাগজে লিখল, রাশিয়া ভারতের সঙ্গে  
জমাচ্ছে ( Russia is wooing India )। আরো বাপু :  
জমানো কি—মিলন তো হয়েই গেছে শান্তির মধ্যে ( They have  
already been wedded in peace )। কথা কেমন বসিয়ে ব  
মেনন, যেখানে যান দিয়া এক হাসিখুশির আবহাওয়া বানিয়ে তোলে

বাঙালি ক'জনের কাল রাষ্ট্রে বিনয় রায়ের বাড়ি পাও  
আমাদের সবাই ভোজ—গুজরাটি ভারতের আগেই হয়ে গে

গাওঁপলি থেকে সাত ঘণ্টা-খানা জীবিত মৎস্যের কোল খাওয়াবেন, সিনথ কথা দিয়েছেন। মন্ডো শহরে শেষ খাওয়া—খানাপিনা সেয়ে এসে ঐ বাতেরই প্রেন ধবব। ছিমছাম ছোট ছোট খামো-দ্বী বাচ্চা ছোটটি নিয়ে দিবিয়া আছেন। অজু বলে ডাকে ছেলেটিকে—এমন মিষ্ট ছিলে! সতমার মধ্যে ভাব জমে গেল। বিস্তর সম্পদ অজুর। মন্ডো শহরে খেলনার একজিবিসন আছে কি না জানতে চান? রেজিবিসনে কি দেখবেন, অজুর যা আছে আনতে বলুন না। কতও হয় না—বয়ে বয়ে নিজেই জেতাদের সামনে ছড় করছে। লজ্জার বস্ত্র বকম খেলনা পাওয়া যায় সমস্ত—ওর বাইরে একটাও নেই। বিনয় আর জ্ঞান দেবী তঁজনেরই চাকরি, অতঃপর কাজে কল্যাণ। ছেলে কিতাবগাটনে ইচ্ছুক পড়ে—সেখানে থাকতে হয়। শনিবার বিকালে মা-বাপের কাছে আসে, সোমবার ভোরেবেলা চলে যায়। বাংলা শেষে বাড়িতে, ইচ্ছুক বাশিয়ান। আমাদের দামনে কিছুতে বাশিয়ান বলতে না অজু। সগঠ আমবা এতদিনে পাঁচটা মন কলকথা শিখেছি—সকলে মিলে একটা পুরা প্রশ্ন শীড় হামো গেল। আমাদের এত কষ্টের বাশিয়ান প্রশ্ন—তুই অজু মনো জগত নিয়ে ছিল বালায়।

এ ছেলেই হাত তাকিয়ে বেবিয়ে পড়া চাটি কথা নয়। মন্ডোর উচ্চ ভাঁশ হলে দেবি হয়ে গেছে বিকম। জোরে ঢালো—বাঁধা ছিল এখন কিছু থাকি। সেট কখন সাধা করে ছোটল থেকে হুগুপি এগোয়ান দুবুতে হবে। সতমারের আমাদের না দেখে ইংরেজের বকাবকি লাগিয়েছেন হতে। দেবি দিইনে। মন্ডো এগোয়ান বুঝতে পারছেন, বিশ মন্ডোর ধাক্কা শহর থেকে। প্রেন ছাত্তর ঠিক সাড়ে বারোটা—জোরে ঢালো গাড়ি, আরও জোরে—একি মাঝে তিন মটর উপর ছোটলে বলে আছেন, চলে যাবার আগে হাতুঁ লম্বা হয় বনি। দেশের মানুষ পেল কা যে করেন টাং সব। কথারগত ফুরগ নেই—তিনিই লেগে পড়ে অতিক্রমে মন্ডোর এসে টানাটানি করে সেগুলো বাইরে এনে ফেললেন। আরও কত জনের সঙ্গে তার জামিয়ে আছি, মন খুলে দুটা কথা বলতে পারলান না বাগার বেলা। এগোয়ান অবশি চলল জনকয়েক, প্রেন বনো করে দিয়ে ফিরে আসবে।

কাঁ কাণ্ড। বারোটা বেজে গেছে, সাড়ে বারো হয়ে এলো—বসেই আছি, প্রেনের কব্জার সাড়া শব্দ নেই। পল ঘবে এসে বলল, থাক বসে যেমন আছে; দেবি হলে। একটা বেজে গেল, ওরা বোথ হু লেপ মুড়ি দিয়ে পড়েছে। দেখে এলো তো ভাই আর একবার! পল আবার উঠল। অনেকক্ষণ দেবি করে এসে বলে, ওঁ—হুগী হুগী!

পল বলে, শুদিকে নয়—ছোটলে ফিরতে হবে। আবহাওয়া বাধাপ, বাতে প্রেন ভাড়বে না।

রাত কিম্বিকম করছে। হুগোপটা ভাবুন একবার হাড়-কাঁপানো মতে আবার এখন সেই বিশ মাইল। রাশায় কদাচিৎ একটা হুটা গাড়ি তঁজন একজন মাত্রয়।

ছোটলে জোরালো আলোগুলো প্রায় সব নেভানো। কয়িডরে এখানে একটা ওখানে একটা—কায়েকেশ পথ বুজে চলা যায়। নিভতি হয়ে গেছে। দোতলার অফিস ঘরে মেট্রন যেয়েটা দেখছি কাইল ও খাতাপত্রের মধ্যে মগ্ন হয়ে বসে কাজ করছে!

এতগুলো ছুতোর আঙুরকে চমকে মগ্ন হোসে। দেখে তেয়ে ফেলল : এ কি, তোমরা যে আবার?

সকালবেলা বাব। আবহাওয়া ভাল হলে খবর পাঠাবে।

মুশকিলে ফেললে। কি করি এখন বসো দিকি—

মুশকিল সামলাবার জন্য হাসিমুখেই ছুটোছুটি লাগিয়েছে। আমাদের বিছানাপরে তুলে দিয়েছে এর মধ্যে। সকালবেলা ঘরগুলো ভাল করে বুয়ে বোজা মুক করে নতুন বিছানা পাতেবে নব আগন্তুকদের জন্য। বাত্রির তৃতীয় প্রহরে কোথার মানুষ জন, কোথায় কি, ডেকে হোল সকলকে—সেমন যেমন ছিল, ঠিক করে দিক।

ভোর বেলা উঠতে হবে—রাতের আর কতটুকু বা আছে?—

উষ্মে ঘুম হল না। সাড়ে ছটায় পোশাক পরে উঠি। সাতটায় ঘর থেকে বেবিয়ে পাক দিয়ে এলাম এদিক-সেদিক। মানুষজন দেখি না, অফিসার থম থম করছে। অটটার সময় চৈ-চৈ পড়ল—খবর এসে গেছে, ব্রেক কাই খেয়ে এখনই বেবিয়ে পড়তে হবে। প্রেন ছাড়ল এবারে সত্যি। বেলা দশটা—কিন্তু আকাশ অন্ধকার, কুয়াশায় ঢাকা এই তো দশর আনকার। কাল দুপুরবেলাটা উজ্জল বোধ লেখছিলাম এক বলক। আরও একটা দিন, মনে পড়ছে। এত দিন কাটিয়েছি মন্ডোর, তার মধ্যে মোটমোট এই দুই দিন।

## ২৯

যে-পথে এসেছিলাম, সেই পুরানো পথ ধরেই বাড়ি বাড়ি। দুপুরের খানা আখুঁবিনসে। বাতী তাৎখাল কাটাং। কাল দিনমানে সীমাস্তের তেরমেস হয়ে কাবুল। কিংজিও হুটো দল হয়ে। আমাদের নামিয়ে দিয়ে প্রেন পনের ক্ষেপে এসে শিঙ্কনের দল নেবে।

আখুঁবিনসে নামতে গিয়ে সিঁড়ির মুখে থমকে ঠাঁড়াই। বৃষ্টি-বানলা হয়ে গেছে বুব, কাঁচা গ্যাওয়ে জল-কালয় ভর্তি। ওর মধ্যে নামি কোথায়? ওরাও বলছে, বরুন—বরুন—। বাস এসে ঠাঁড়াল প্রেনের দরজার গায়ে—সিঁড়ি থেকে বাসের গন্ধরে। অফিস-বাড়ি আধ মাইলের উপর এই জায়গা থেকে। কাল-জল ছিটাতে ছিটাতে বাস সেখানে পৌছে দিল। এবা খানাপিনা অস্তে ফিরিয়ে আনল প্রেনে।

এই শুধু নয়, মজা আছে আরও। যথারীতি দরজা এঁটে দিয়ে প্রেন তো ছাড়ল। দৌড়ছে তার বেগে—এমনি দৌড়তে দৌড়তে চল করে উঠে পড়বে তো আকাশে। কিন্তু থানিকটা গিয়ে আর এগোয় না। এমন তো হবার কথা নয়। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করি। দেখবার কি আছে—চতুর্দিকে কাদা জল, আমাদের গায়ের বিলের ধানক্ষেতে আবার মাসে চাষ দিয়ে বকমটা করে রাখে। ইঞ্জিন তার পথে হঠাৎ বন্ধ করে দিল নিঃশব্দ। গতিক কিছু বুঝতে পারি নে—আমরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাই। পাইলট খোপ থেকে বেগিয়ে এলো।

কি হল মশাই?

কাদায় ঢাকা বসে গেছে।

পাড়াগায়ে গরুর গাড়ির ঢাকা এমনি বসে যায় কাদার মধ্যে। গাড়োয়ান ও চড়শাবেরা, এবা কখনো বা পাশের ভূইক্ষেতের চাষীদের ডেকে সকলে মিলে ঠোলাঠেলি করে তুলে দেয়। ঢাকা মারা বলে এই প্রণালীকে। কাজাকিস্তান প্রান্তরের কাদায় নেমে, দেখুন বা, আমাদেরও ঢাকা মাগতে বলে।

দরজা খুলে পাইলট ও অল্প অফিসারেরা টপাটপ লাফিয়ে পড়ে অফিসঘরের দিকে গেল। তার পরে দেখি, বিস্তর লোক মিলে বড় বড় দুই লোহার পাত বয়ে আনছে। ঢাকার ঠিক সামনে কাদার উপরে সেই পাত দুটো পেতে দিল। পাইলটেরা উঠে এসে আবার কাঁটা দিয়েছে। প্রাণেশ্বর ঘুমে দুঃস্থ বেষে, ঘোরতর আওয়াজ করছে। অবশেষে নড়ল প্লেন; কাশ থেকে ঢাকা বেরিয়ে লোহার উপরে উঠল। আর কি—বেশি কাদার জায়গাটা পার হয়ে এসে, ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে পড়ল। তবে তো বোঝা যাচ্ছে, হামেশাই এই কাণ্ড ঘটে হোমোদের এখানে। নয় তো প্রকাণ্ড লোহার পাত এরাডোমে এনে মঞ্জুত রেখেছে কি জ্ঞান?

মস্তো থেকে তাসখন্দ বারো ঘণ্টার পথ। দুই জায়গায় সময়ের ফারাক তিন ঘণ্টা। একটা রাতে ঠিক হিসাব মতোই তাসখন্দে নেমেছি জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটেছে, যেন দিনমান। দিগবাস্তু মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়া এমন পরিষ্কার জ্যোৎস্না কতদিন দেখিনি! অনেকবারের আদা বাওয়ায় জায়গাটা চেনা হয়ে গেছে, মাতব্বর বীরা অভ্যর্থনায় আসেন তাঁদের নাম অবধি বলতে পারি। আজকে এসেছেন জন চারেক মাত্র। বলছেন, এরাডোমের বেস্তারায় ব্যবস্থা আছে বামেলা আগে চুকিয়ে নিন।

সে ভাল। শহরে পৌঁছে ডিনারে বসতে বসতে রাত পুইয়ে যেত। কিন্তু বাইরে এসে দেখি, গাড়ি একটাও নেই। মতলব কি গো? জামাইয়ের সেই গল্প। বিস্তর দিন স্বস্তরবাড়ি পড়ে থাকায় ধনঞ্জয়কে শেষটা পিটুনি খেয়ে সরতে হল। আমাদের সেই গতিক। ভরা পেটে এখন পায়ে হাঁটবে নাকি অতদূরের শহর অবধি?

না, জায়গা এবার এখানেই—এরাডোমের একবারে কাছে, বাস্তাটা পার হয়ে গিয়েই। অসমান্ত বাড়ি, বাস্তার পগার লাফিয়ে উঠানে পৌঁছুতে হয়। দালানে ঢালাও বিছানা করেছে, পাড়াগাঁয়ের বিয়েবাড়ি বরযাত্রীদের জ্ঞান যেমন করে। যাকগে, একটা রাত্রি মোটে—ক'খটাই বা আছে এই রাত্রির।

এখনো কিছু কবল আছে ট্যাকে। সীমানা পার হয়ে গেলেই কবলের নোটগুলো পাকিয়ে কান চুলকানো ছাড়া কি কাজে আসবে। অতএব প্রথম প্রাতঃকৃত্য, যে বস্ত্র চোখের সামনে পড়বে কিনে ফেলে ট্যাক খালি করা। দোকানের বোঁছে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় ঐ শহর অবধি গিয়েছি। গাড়ি নিয়ে ছুটেছে সেই অবধি। কী কাণ্ড, প্লেনে ঢুকতে হবে এখনই। শীতকাল এসে পড়েছে, হিন্দুকুল বেলাবেলি পাড়ি দিতে হবে। তেবমস রীতিরক্ষার মতে একটুখানি আয়দরিয়ায় এসেছি। বিদায় সোবিয়েত ভূমি! অক্ষরার পাতাল নয়, দিব্যধাম স্বর্গও নয়—আমার আপনার মতোই মাল্লবেরা হাসি অশ্রুর লক্ষকোটি সঙ্গার করছে, বড় আপন করে পেয়েছি তাদের। বিদায়, বিদায়!

কাবুল। কাবুল হোটেলের নতুন ব্লক খুলে দিয়েছে, এবারে জায়গায় অস্থবিধা হল না। গুপ্ত মুখজেরা আছেন বহাল তব্বিতে অতএব অভ্যাস দিই, নিমন্ত্রণ খাই এবং অ্যাবাসির জীপে ঘোরাঘুরি করি। পরের দিন দিল্লির প্লেন ছাড়বার দিন নয়। উত্তম, বাবুর বাসা দেখে আসা গেল। প্রশস্ত দুই চেনার গাছ সিংহদ্বারের মতন।

উপরে উঠে যেতে হয়। জাড়া পাহাড়ের নিচে সম্রাট বাবুর কবরখানা—টালি ছাওয়া ছাত, সজ্জা চুনকাম করা দেয়াল। অল্প পুরানো কেল্লার চিহ্ন। খেত পাথরে নতুন মসজিদ বানাচ্ছে পাশে।

তার পরের দিনও যাবে না প্লেন। আবহাওয়া খারাপ উত্তম। নেতাজি কোথায় এসে লুকিয়ে ছিলেন, জায়গাটা শুধু দেখে আসি। বাজার—ভারতীয়দের বিস্তর দোকানপাট। তারপাশে এক ঘিঞ্জি পাড়ায় ঢুকেছি। গলির মাথায় সঙ্কীর্ণ এক বাড়ি দেখি মিলে। বণচক্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতবর্ষের নাগপাশ ছিঁ ফেলবেন, এখানে থেকে তার আয়োজন হচ্ছিল।

তার পরের দিন লটবহর নিয়ে এরাডোমে হাজির হয়েছি। কফির চলে যান। সুলেমান রেজ পথ ছাড়ে নি এখনো। আ উত্তম। ক্যামেরা ও ঘড়ি এখানে অনেক সস্তা ভারতের মতো ক ডিউটি নেই বলে। বাজার চুড়ে পছন্দ করা যাক। কিন্তু ঘরমুন্নন এখন—সহযাত্রী অনেকে হস্তার ছাড়লেন সুলেমানের যতক্ষণ ভাল খবর আসে—ইসলাম এখানে চলে বসে। তা সে দিন গো মাস কোক, চাই কি বছর হোক পুরো। হোটেলের আর ফিরছি—ঘণ্টা দুয়েক বিচার-বিবেচনার পর হুকুম এলো: ঢুকে তাহলে প্লেন।

উত্তম কথা। দেখা যাক সেট অবধি গিয়ে। না হয় ফি আসব। হোটেল আর বাছে কোথা?

ছোট এক কোটা আমাদের প্লেন। আকাশব্যাপ্ত স্বলেম অদৃশ্য মূর্তির ভিতর নিয়ে উপরে-নিচে ডাইনে-বামে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকি দেখছে, কোন সব চিজ রয়েছে এই কোটার ভিতর। ঝাঁকুনি দি দিয়ে তার পর? কৌতূহলের অবসানে মুচড়ে হুমড়ি ছুড়ে দেবে কো তুমার শৃঙ্গে? আমাদের চিহ্ন মাত্র রইল না, এবং তৎসহ খা ভরতি এই যত আয়ুধ নিয়ে বাড়ি পাঠকুল বিমর্শনের জ্ঞান।

কিন্তু কিছুই হয়নি, সে তো টের পাচ্ছেন। কিন্তু কিস্তি \* নিক্ষেপ করে নাজেহাল করছি আপনাদের। সফারদর জ্ঞ এরাডো উপর থেকে সভয়ে দেখছি—তুমুল হৈ-হল্লা, দাঙ্গা বেধেছে সম্ভব কোন-কিছু ব্যাপার নিয়ে। দরজা খুলে মালুম হল, অভ্যর্থনার জ্ঞ এসেছেন। ভাই ব্রাদার সব দল জুটিয়ে এসেছেন, নানান সমিতি থেকেও এসেছে। ওর মধ্যে আমার চেনা কেউ নেই বটে, কি সমিতির তা ছাড়াই না, তারা পাইকারি হারে মালা দেবে বেঁটে মাল্লব দলপতিকের নিয়ে ইতিমধ্যেই এমন ব্যস্ত—স্তুপীকৃত মাল থেকে নিচে জুতো স্বক এক জোড়া পা বেরিয়েছে, বোকার ক্লাস্তি পা দুটো উঠিগুটি এগুচ্ছে। সেনাপতি বেন দিবিজয়ে বেরিয়েছিলেন—কাবুল থেকে মেক্সাগার অবধি বিজয় করে ফিরলেন। অথচ জানে আপনারা, জুতোর তলার ধূলা মাটিও লাগতে দেয় নি ওরা। কো বাহাদুরির ফলে মালামান, বুঝতে পারি না। এক মহিলা নামলেন তিনি দিল্লিরই—রক্ষ নেই, তোড়া ও মালা উঁচিয়ে চতুর্দিক খেঁয়ে-করে ছুটেছে। টুক করে আমি লাইন ছেড়ে জনতার ভিতর ঢুকে গেলাম—প্লেনে আসি নি, স্বধর্নার দলের যেন আমি তার পরে কীক বুয়ে আরও কিছু পিছিয়ে কাস্টমসের আড়গাড়া মধ্যে ঢুকে পড়লাম।



# চরিত্র

শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু

[ বাস্তবদর্শী চিত্রাঙ্কন-বিশারদ ]

“আমার মনে হয় যে ছন্দাঙ্গু কাব্য-সাহিত্য অপেক্ষা তাল-স্বর মিশ্রিত সঙ্গীত-মূর্ছনার সহিত বোধ্যবিত্ত শব্দকলার যেন গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে”—বর্ষণ-মুখর এক সন্ধ্যায় গগার নিভৃত প্রকোষ্ঠে আনায় জানালেন ভারতের অজ্ঞাতম শক্তিমান চৈশিলী শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু।

ঢাকা জিলা বিক্রমপুর পরগণা নিবাসী শ্রীবসু ১৮৯৮ সালের চক্রাবারী মাসে ময়মনসিংহ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। মাতামহের সান্নিধ্যবোধ ও চিত্রকলাভ্রমণ এবং মেহময়ী জননীর উৎসাহ পাঠরত মল্লকর মনে বোধাঙ্কনে প্রেরণা দেয়। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ হইতে ব্রিটিশ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী হইয়া কলিকাতায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের (অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ইঞ্জিনিয়ারী ক্লাসে ভর্তি হন। এক বৎসর পরে উচ্চ পবিত্রাণ করিয়া তিনি ১৯১৩ সালে পদাচরণ গুপ্তের ছুবিলী আর্ট একাডেমীতে প্রবেশ করেন। শ্রীবসু মনে করেন যে তাঁহার পরলোকগতা মাতার অদৃশ আশীর্বাদের জগুই বোধ হয় তাঁহার এই পরিবর্তন সাধিত হয়।

১৯১৬ সালে তিনি সরকারী আর্ট স্কুলে চলিয়া আসেন এবং পরবর্ত্তক অবনীন্দ্রনাথের আত্মীয় সনায়মজা শিল্পী ঙ্ঘামিনীপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন এবং ১৯১৮ সালে প্রাইমেট পদবী প্রাপ্ত হন। এই সময় শ্রীহেমেন্দ্র মজুমদার, যোগেশ শীল, সতীশ সিংহ, যামিনী রায় প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। ছাত্রাবস্থায় তিনি আর্ট স্কুলে প্রথম একটি যান্ত্রিক-চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এবং ১৯১১ সালে ভবানীচরণ দাস, তার রাজেন্দ্রনাথ মুখাঙ্কি ও অধ্যক্ষ পাশী রাউনের সহায়তায় ইংরেজীতে তিনি “সোসাইটি অব ফাইন আর্টস” সর্বভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী-সঙ্ঘে রূপান্তরিত করেন। ১৯২৩ সালে শ্রী বসুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর তার আন্তোথায় মুখোপাধ্যায় উক্ত সোসাইটির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিবসে বিদেশী দর্শকদের প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভারতীয় দর্শকদের নির্লিপ্ততা তার আন্তোথায়ের মনকে অতিশয় ব্যথিত করে ও অতুলচন্দ্রের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেন।

শ্রী বসুর অঙ্কনে ও সংগঠনে সন্দেহ হইয়া ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সর্বপ্রথম “গুরুপ্রদত্ত ঘোষ” পদে দেন এবং উচ্চ দ্বারা তিনি লণ্ডন রয়েল একাডেমীতে ছুই বৎসর (১৯২৪—২৬) শিক্ষালাভ করেন। অবসর সময়ে তিনি ইংরাজের প্রসিদ্ধ চিত্রশালা সমূহ পরিদর্শন করেন।

ভারতে কিরিয়া অতুলচন্দ্র কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে

যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৩০ সালে ভারত সরকারের স্থপারিশ ক্রমে লণ্ডনে সন্ধ্যাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও কুইন মেরীর প্রতিকৃতি অঙ্কনের জন্ত প্রেরিত হন। পরবৎসর দেশে কিরিয়া লুপ্ত ফাইন আর্টস সোসাইটি পুনরুদ্ধারের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন এবং ১৯৩৩ সালে মহারাজা তার প্রজ্ঞাব্যবহারীক প্রভৃতির সহায়তায় গ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর উদ্বোধন করেন। এই সময় তিনি নিজস্ব চিত্রশালায় অঙ্কনে রত থাকেন এবং “তিব্বতী মেয়ে” “সন্ন্যাসী” এবং ছোট ছোট প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রগুলি জনসমানদের লাভ করে। প্রতিকৃতি অঙ্কনে তাঁহার পারদর্শিতা বহুজন-স্বীকৃত। তন্মধ্যে তার আন্তোথায় মুখোপাধ্যায়ের “বেঙ্গল টাইগার” নামে প্রতিকৃতি আজ সর্বজনবিদিত। কিছুকাল যাবৎ তিনি লোকসভা ও রাজ্য বিধান-সভার জন্ত চিত্রগ্রহণ, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির প্রতিকৃতি অঙ্কনে ব্যাপৃত আছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ময়ূরভঞ্জ মহারাজা ও মহিষাবল রাজার জন্ত অনেকগুলি চিত্রাঙ্কন করিয়া দিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত “শতবার্ষিকী (১৮৫৭—১৯৫৭)” ও “কামীর রাণী” ডাকটিকিট দ্বয়ের চিত্র তাঁহারই পরিকল্পিত।

আমার প্রশ্নের উত্তরে অতুলচন্দ্র বলেন যে, স্মৃতিভাণ্ডারের রূপসায়র হইতে চয়ন করিয়া যে অঙ্কন প্রধানতঃ তাহাই প্রাচ্য-দেশীয় পরোক্ষদর্শী চিত্রকলা এবং ইহার মধ্যে আসেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় প্রভৃতি—আর সৌম্যবক্তা পরিধি, দৃষ্টান্ত, কাল ও নিত্য পরিবর্তনশীল প্রকৃতির মরমুহূর্ত্তগুলিকে অমর করিয়া রাখার জন্ত যে রূপায়ণ উহাই যথাতঃ পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষদর্শী চিত্রাঙ্কন। ইহার মধ্যে পড়েন সতীশ সিংহ, বসন্ত গাঙ্গুলী,



শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু

মানব দত্তগুপ্ত, জয়মূল্য আবেদন প্রভৃতি। তাঁহার গুরুজন, বন্ধুজন ও ভবিজন তাঁহাকে বহুতাত্ত্বিক শিল্পী আখ্যা দিলেও একাগ্র সাধনায় তিনি উহার মর্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হন।

কথা প্রসঙ্গে তিনি শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর বহুযুগী কর্মপ্রতিভার উজ্জ্বলিত প্রশংসা করেন। শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার সহধর্মিণীর সহযোগিতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। স্বাধীনতার দশম বার্ষিক উৎসবে সম্প্রতি (১৯৫৭) প্রাদেশিক কংগ্রেস অতুলচন্দ্রকে এক বিশেষ সভায় সম্বর্ধনা করেন।

### অধ্যাপক ডাঃ পুলিনবিহারী সরকার

[ খ্যাতনামা বিজ্ঞান ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ]

রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণায় যে স্বল্প কয়েক জন বাঙালী ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করে বিজ্ঞান-জগতে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন,—অধ্যাপক ডাঃ পুলিনবিহারী সরকার তাঁদের অন্যতম। বয়স প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করেছে—এখনও তিনি পরিপূর্ণ ভাবে কর্মময় জীবন বাপন করছেন। বিজ্ঞান কলেজে যান,—দোতলার রসায়ন বিভাগের পাশের বারান্দায় প্রায়ই দেখতে পাবেন এই প্রধান অধ্যাপককে।—মুখে সর্দুদাই সিগারেট, ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করছেন বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান-জগতের কর্মব্যাবার আর অনর্গল ধূমপান করছেন। অনেক দিন আগে তাঁর এই ধূমপান করা নিয়ে একটা বেশ মজার ঘটনা ঘটেছিল। অধ্যাপক সরকার, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র,—আচার্য্য রায় ধূমপান করা অত্যন্ত মশগুল করতেন। অধ্যাপক সরকার তখন প্যারিস থেকে ফিরেছেন,—অত্যন্ত ধূমপান করেন, কি করে যেন কথাটা আচার্য্যদেবের হানে গিয়ে পৌঁছলো। আচার্য্যদেব তে বিবাসনই করেন না,—নাঃ এ হতেই পারে না।

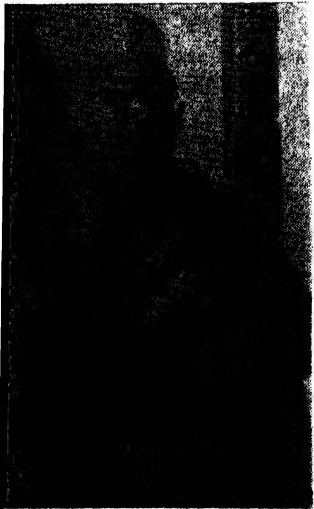
পুলিন আমার ভারী ভালো ছেলে—সে সিগারেট খেতেই পারে না।” বাই হোক, কত দিন গুজব অবিশ্বাস করা যায়? একদিন হুপুরবেলা আচার্য্যদেব নিজেই হঠাৎ এসেন অধ্যাপক সরকারের ঘরে, দেখা বাকি ছেলেরা করছে কি? এদিকে তখন ডক্টর সরকার সবমাত্র একটা চুরুট ধরিয়ে মনের আনন্দে ধোঁয়া ছেড়েছেন,—হঠাৎ মাঝে মাঝে দেখেন

রকমে চুরুট ফেলে, নিবিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে ওঠেন। আচার্য্যদেব তে রেগেই আছেন,—“ছেলেদের সাথেবীড়ানা শেখা হয়েছে। ধোঁয়াই যদি গিলতে চাও—বিড়ি খেতে পার না? দেশের পরসাদ দেশে থাকে।” অধ্যাপক সরকার তখন পাসাতে পারলে বাঁচেন।

অধ্যাপক সরকার ১৮৯৫ সালের ২২শে নবেম্বর কোলকাতায় তাঁর দাদামশায়ের বামাপুত্র লেনের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি বাস সোনাইপুরে—ঠাকুরদা ছিলেন জমিদার। পিতৃ ৬বসন্তকুমার সরকার ছিলেন আইনব্যবসায়ী। আইনব্যবসা করতেন তমলুকে;—তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন, মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। কলেজে পড়বার সময় তাঁর বাক স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন। মা—শ্রীমতী সরোজিনী দেবী এখনও তমলুকে বাস করছেন—বয়স তাঁর ৮২ বৎসর।

অধ্যাপক সরকার বালাশিক্ষা লাভ করেন তমলুক জামিন্দার স্কুলে। ১৯০৯ সালে শেষ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে পনের টার জলপানি লাভ করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন ডাঃ মেঘনাদ সাহা অধ্যাপক সন্তান বোস, জ্ঞান মুখার্জী আর সন্তান ঘোষ। জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী, মেঘনাদ সাহা আর ডাঃ সরকার এক মেতে এবং হিন্দু হোস্টেলে একসঙ্গে বহুদিন বাস করেছিলেন। কিছুদিন ডাঃ সাহা আর ডাঃ সরকার এক ঘরে বাস করতেন। কলেজ-জীবন অধ্যাপক সরকার ছিলেন একজন বড় স্পোর্টসম্যান। Y. M. C. A. এর স্পোর্টসে সেরা খেলোয়াড়ের সম্মানও তিনি একবার লাভ করেছিলেন। বিকেনবেলা ফুটবল খেলে, শব্দপার ব্যায়াম করতেন হয়ে ফিরে এসেই রাতে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন,—রাতে প্রায় খাওয়া আর তাঁর হতো না। বন্ধুবান্ধবরাও কেউ ডাকতে যেত না—কাগজ ঘূমের ঘোরে তিনি বড় হাত-পা ছুঁড়তেন, তাতে সকল বিরক্ত হতো।

অধ্যাপক সরকারের ভাষায়—“কেবল মেঘনাদই আমাকে জো করে গর নিয়ে গিয়ে খাওয়াত। ডাকতে এসে সে কত দিন কিল-বুঁসি খেয়েছে, তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। আমার মেঘনাদ আমায় কম আলোচন করে নি। ও ঘুম থেকে উঠতো খুব ভোরে—তার পর চিৎকার করে এক ঘন্টা জাগরণ ভাবা পড়তো। ওঃ, ও কি কষ্ট,—কিছুতেই আমি ঘুমোতে পারতাম না। রাগ করে মার মাকে উঠে জোর করে আলো নিবিয়ে দিতাম।” ১৯১৩ সাল বি, এস-সি, রসায়নশাস্ত্রে অনার্স সহ পাশ করে তিনি এম, এসসি ক্লাসে যোগ দেন এবং ১৯১৬ সালে এম, এস-সি পাশ করেন। অল্প থাকায় এক বছর তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন নি। পাশ কর পরেই ১৯১৭ সালে তিনি শিক্ষক হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯১৭ থেকে ১৯৫৭ এই স্বর্ণচল্লিশ বৎসরকাল তিনি অধ্যাপক হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের সংযুক্ত আছেন। ১৯২৫ সালে অধ্যাপক সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ গ্রহণ করে ফ্রান্সে করেন। সেখানে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনঅরগ্যানিক কেমি গবেষণাগারে অধ্যাপক উরবার অধীনে গবেষণা করে ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ফ্রান্সের টেট ডক্টরেট ডিগ্রীর অধি



—এর সম্মান খুবই বেশী। অধ্যাপক উরবীর গবেষণাগারে তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল গ্যাডোলিনিয়াম আর ইউরোপিয়াম এই দুই মৌলিকের শ্রেণীনির্ণয়। এই মৌলিক ধাতুকে খুবই দুশ্রাব্য, —অধ্যাপক উরবীর গবেষণাগারে গ্যাডোলিনিয়াম মাত্র ৮ গ্রাম ছিল। এতো কম বস্তু নিয়ে কাজ করা খুবই কঠিন। অধ্যাপক সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই কাজ সম্পন্ন করেন এবং ৩০৮০টি বৈজ্ঞানিক পদার্থ প্রস্তুত করার পর শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ গ্যাডোলিনিয়াম পুনরায় পরিষ্কৃত করে বিশুদ্ধ মৌলিক ধাতুটি অধ্যাপক উরবীকে ফেরত দেন। অধ্যাপক উরবী তাঁর এই কৃতিত্বের অত্যন্ত প্রশংসা করেন।

কালি থেকে শিক্ষালভ করে ফিরে এসে তিনি আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এবং ১৯৫২ সালে রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। গবেষণামূলক শতাধিক প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে অধ্যাপক সরকারের কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে।

অধ্যাপক সরকার বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান অকাদেমির সমিতির আজীবন সদস্য ও হাশনাল ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সের সভ্য। ১৯৩৯ সালে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতির আসনও তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও ছাত্রবৎসল। তিনি অত্যন্ত মাহুভক্ত—ছুটিতে প্রায়ই সব কাজ ফেলে তিনি তনুকে চলে যান, রন্ধা মাঁষ কাছে বসে দিন কাটাতে জগা। তনুকেবও বহু স্মৃতিস্মরণীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত। এই সন্মানসময় বৈজ্ঞানিক দীর্ঘজীবন লাভ করে ভারতবর্ষের রসায়ন-বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা ও গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধতর করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

### শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র

[ প্রাতিমান ব্যারিষ্টার ও প্রসিদ্ধ জনসেবক ]

সুনিপুণ তর্ককৌশলতা, স্মৃতিশক্তি মেধা, স্থির যুক্তি সাধল করে যে সকল ধুরন্ধর আইনবিদরা পৃথিবী প্রান্তভাগে পৌছে হাসিমুখে কর্মসম্পন্ন করেছেন প্রাতিমানের সঙ্গে, তাঁদের মধ্যে বিনা আয়াসেই আমরা নাম উল্লেখ করতে পারি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের। আইনে স্পৃহা তাঁর পৈত্রিক। পিতৃদেব স্বর্গীয় মহাপ্রবীরা মিত্রও ছিলেন একজন ব্যারিষ্টার, তা ছাড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার প্রধান কর্ম-সচিবের ও নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সমিতির একজন সভাপতি আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। ভারতের আইন-সংসদেও একজন বঙ্গীয় সম্মান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য পরলোকগত ডাঃ শ্রী দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর নাম কারোই অজানা নয়। শঙ্করপ্রসাদ তাঁর দৌহিত্র। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শঙ্করপ্রসাদের জন্ম। প্রথমে দিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালভ করে ইন্ডিয়ান স্কুল থেকে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩৪ সালে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই-এস-সি করলেন পাশ (১৯৩৮)।

নিপুণ (বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ) থেকে বি-এ। তারপর বিলাত

যাত্রা। সেখানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ট্রিনিটি কলেজের ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হলেন শঙ্করপ্রসাদ। ল-ট্রাইপস নিয়ে বি-এ পাশ করলেন। বিলেতের ছাত্রজীবন শঙ্করপ্রসাদের নানা কৃতিত্বের সমুজ্জল। সেখানে নানা সংকর্ষে বাঙালীর তথা ভারতের মুখ তিনি উজ্জল থেকে উজ্জলতর করে এসেছেন। শুধু মাত্র গিয়ে তথাকথিত ভালো ছেলেদের মত গ্রন্থ অধ্যয়নের মধ্যেই তিনি নিজেকে সেখানে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি, সেদিনকার নিজের তারুণ্য সর্বতোভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন উত্তমের সঙ্গে। কেমব্রিজ অগ্রদূত আন্তর্জাতিক ছাত্র-কংগ্রেসে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করেন (১৯৪১), লণ্ডনের স্বরাজ হাউসের ও গ্রেট ব্রিটেনের ভারতীয় ছাত্রসংস্থার ইনি ছিলেন প্রধান কর্ম-নির্বাহক, ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান স্টাডেন্সিয়েশ্যনের কার্যকরী সমিতির ছিলেন একজন সভ্য; কেমব্রিজের মজলিসের ইনি ছিলেন সভাপতি, গ্রাসগো (১৯৪২) ও নিউকাসল-অন-টাইন (১৯৪৩) এ অগ্রদূত ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শঙ্করপ্রসাদ। নানাবিধ অপকর্ম করে বড়লটি পদ থেকে লর্ড লিনলিথগো অবসর গ্রহণ করে এখান থেকে ফিরে গেলে সেখানে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে ভারতীয় ছাত্ররা তাঁকে যে কুক্ষপতাকা প্রদর্শন করে, তাদের মধ্যে ইনিও ছিলেন অন্ততম। বামিংহামেও ভারত-সচিব কুখ্যাত এমারির অপকীর্তির জগ্গে এদেবই প্রচেষ্টায় এক বিরতি প্রতিবাদ ঘোষিত হয়। বেয়ারলিশের আম্বোলান সমর্থন মানসে শঙ্করপ্রসাদের কৃতিত্ব বিস্তারিত। বিশ্ববরেণ্য রাজনীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ মেননের সঙ্গে ইণ্ডিয়া লীগে ইনি কাজ করে এসেছেন। লিঙ্কনস ইন থেকে ১৯৪৩ সালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ভারত ফিরে আসেন ১৯৪৪ সালে। ব্যারিষ্টারী শুরু করেন ও কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে আই-এন-এ আম্বোলানে যে বিরতি ছাত্রদল গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন



শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র

ব্যারিস্টার শঙ্করপ্রসাদ। বঙ্গবাসী কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগেও ইনি অধ্যাপনা করেছেন।

বঙ্গবাসী কলেজের বাণিজ্য-শিক্ষার্থী সঙ্ঘের সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-কলেজ সঙ্ঘের সহ-সভাপতি এবং আইন-কলেজ পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের পদও এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। পরলোকগত বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতি থাকা কালে ইনি মধ্য কলকাতায় জেলা কংগ্রেস কমিটিতে তাঁর সহকারিত্ব করেছেন। এ ছাড়া অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এঁর নাম যুক্ত। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় একজন সদস্যরূপে গণ্য হন। সাংস্কৃতিক দলের সভ্য হয়ে নবচীন পরিদর্শন করেন (১৯৫৪), পশ্চিমবঙ্গের বিচার, শাসন, ভূমি সংস্কার ও আইনবিভাগের মন্ত্রিত্ব ভার গ্রহণ করেন (জুন ১৯৫৬)। মন্ত্রী শঙ্করপ্রসাদের কর্মক্ষমতা, জনহিতকর প্রচেষ্টা, অনমনীয় কর্মোদ্যম, যেমনই প্রশংসার্য, তেমনই গোঁয়বশিষ্ট। একজন মন্ত্রী যে মানুষেরই প্রতিনিধি এই সভ্যের মর্যোপলব্ধি করেছিলেন শঙ্করপ্রসাদ এবং তার মর্যাদা দিতেও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য বোধ করেন নি। মন্ত্রী থাকাকালীন সরকার পক্ষে যোগদান তাঁর চোখে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ছদ্মবেশে নানা স্থানে ঘুরে দুর্নীতি দমনের প্রচেষ্টা তাঁকে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় করে তোলে। কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য সরকার যখন বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির জন্তে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন কংগ্রেসী শঙ্করপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়েছিলেন সেট প্রচেষ্টায়। রাজ্য পুনর্গঠনের প্রক্ষেপে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাবে, ট্রাম আন্দোলন ও শিক্ষক ধর্মঘটে, ভূমি সংস্কার আইনে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা সর্বজনবিদিত। এই স্বার্থাঘোষী, দুর্বলচিত্ত পুরো মন্ত্রী, তিন পোয় মন্ত্রী ও আর্থসেবী মন্ত্রী দলে তিনিই ছিলেন একমাত্র জন, যিনি সত্যি দেশ ও দেশের জন্তে ভেবেছিলেন কিছু, করেছিলেনও কিছু এবং করতে চেয়েছিলেন আরও কিছু, তিনিই একমাত্র জন যার দেহে বাঙালী অনায়াসে মেনে নিতে পারত এবং তাতে স্বকলসই ফলত এ কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা যায়। প্রার্থনা করি, তাঁর আরও কাজ সম্পূর্ণ করতে আবার একদিন তাঁর আবির্ভাব হবে তাঁর যথাযোগ্য স্থানে, তাঁর আসন আজ শূন্যই আছে, তিনিই আবার তা একদিন করবেন পূর্ণ।

ব্যক্তিগত জীবনে শঙ্করপ্রসাদ বিবাহ করেছেন ভারতের এক ধুরন্ধর আইনজ্ঞ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান স্যাডজ্যোক্ত জেনারেল স্যার শ্রীমুখোমোহন বহুর একমাত্র কন্যাকে। তিনি শ্রীমতী অলকা মিত্র।

আমার প্রশ্ন, আইনজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে গেলে কি কি বিশেষ গুণ থাকার প্রয়োজন—উত্তর দেন—পীড়ার জন্তে সব সময় প্রস্তুত হও, একবার মক্কেলের কাছে আবার বিচারকের কাছে, এই পরীক্ষা দেওয়ার দৈনন্দিন ব্যাপার। আর বিশেষ ভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ে দক্ষতা থাকা দরকার, যেমন সাহিত্যে, সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে, বস্ত্র-বিজ্ঞানে, শিল্পে। কারণ এ জাতীয় বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে যদি মামলা উপস্থাপিত হয় আর আপনি সে বিষয়ে যদি অনজ্ঞ হন তা হলে লড়বেনই বা কেমন করে আর জেরা করবেনই বা কি করে? জিজ্ঞাসা করি—পৃথিবীর আইনের দরবারে ভারতের স্থান কোথায়? জিজ্ঞাসা করি—পৃথিবীর আইনের দরবারে ভারতের স্থান কোথায়?

বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন—আর কেন তা জানেন—তার প্রায় কারণ বাঙলা দেশ ভারতের অন্তর্গত বলেই—হিমালয়কে অতিক্রম করে আজ অবধি যেমন কোন পাড়া মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পনি, তেমনই সারা বিশ্বে এমন কোন আইনশালা যে শ্রেষ্ঠতায় বিষয়ে কলকাতাকে অতিক্রম করে গেছে।

### শ্রীরণদেব চৌধুরী

[ সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন ব্যারিস্টার ]

পাবনা জেলার হরিপুরের চৌধুরীগোষ্ঠীর খ্যাতি বহুব-বিশ্ব

এই বংশের দুর্গাদাস চৌধুরী—স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন তিনি বহুমুখ্যের সমসাময়িক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দুর্গাদাস সন্তান-সৌভাগ্য অতুলনীয়! তাঁহার সাতটি পুত্র ও দুইটি কন্যা ইহাদের সকলেই বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। দুর্গাদাসের প্রথম পুত্র স্বনামখ্যাত আন্তোয় চৌধুরী ছিলেন নামকরা ব্যারিস্টার; ২য় তিনি হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত হন। দুর্গাদাসের তৃতীয় ও কুয়দনাথ চৌধুরী ছিলেন বিখ্যাত শিকারী। 'সবুজপত্র' সম্পাদক বিখ্যাত লেখক প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) ছিলেন দুর্গাদাসের চতুর্থ পুত্র। দুর্গাদাসের পঞ্চম পুত্র সুহৃদ চৌধুরী ছিলেন খ্যাতনা আই, এস, এস অফিসার। কর্ণেল মম্বনাথ চৌধুরী আই, এস, এ ছিলেন দুর্গাদাসের ষষ্ঠ পুত্র। মম্বনাথ মাস্তাজের প্রথম ভাবত সার্জেন জেনারেল হইয়াছিলেন। চলচ্চিত্রাভিনয়ে প্রখ্যাতনামা শি দেবিকারাবী ইহার কন্যা। দুর্গাদাসের সপ্তম পুত্র ব্যারিস্টার অমিয়না চৌধুরী 'এ. এন চৌধুরী' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি বিখ্যাত ডাওয়ার মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন। দুর্গাদাসের পুত্রের মধ্যে একমাত্র ইনিই বর্তমানে জীবিত আছেন। বাংলা মাত্রে স্বসন্তান হায়দ্রাবাদ-বিজেতা লেফটেন্যান্ট চৌধুরী ইহার পুত্র দুর্গাদাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ী দেবী একজন নামকরা লেখিক ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'সাধারণী'তে তাঁ নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। 'পূর্বকথা' নামক পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন। দুর্গাদাসের কনিষ্ঠা কন্যা মৃণালিনী দেবী পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতা।

দুর্গাদাসের দ্বিতীয় পুত্র যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (জে, চৌধুরী) এ নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন অনন্তসাধারণ। ইনি বিখ্যাত ব্যারিস্টার ছিলেন। আইন বিষয়ক সাপ্তাহিক Calcutta Weekly Note এর ইনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। স্বদেশী আন্দোলনে সময় ইনি শিল্পপ্রতিষ্ঠার আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বঙ্গলক্ষ্য কটন মিলস, হিন্দুস্থান ইলেকট্রিক্স, গ্রাশনাল ইলেকট্রিক্স প্রভৃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি সম্বন্ধে ছিলেন। অনেক যুবককে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় ইনি অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। দেশের কল্যাণ সাধনই ইহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বহু স্বদেশী মামলা ইনি বিনা পারিশ্রমিকে পরিচালনা করিয়াছিলেন। লোকমার বালগঙ্গাধর ভিলকের মামলার ইনি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া জয় বোঝাই যান। ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সদস্য নিযুক্ত হন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক লবণতন্ত্র প্রবর্তনের প্রতিবাদের ইনি সদস্যপদ পরিত্যাগ করেন। শিকার বিস্তার ব্যতীত জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে বলিয়া ইনি

প্রাঙ্গণে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। National Council of Education এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের ইনি অঙ্গতম ছিলেন।

রাজনীতি ব্যাপারে তার স্বরেন্দ্রনাথের সহিত তৎক্ষণাৎ যোগাযোগের নিষ্ঠা হয়। যোগাযোগের কর্মক্ষেত্রে আকৃষ্ট হইয়া স্বরেন্দ্রনাথ যোগাযোগের আপন জন করিয়া লইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইহারই ফলে, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বরেন্দ্রনাথের তৃতীয়া স্ত্রী সরসীবালা দেবীর সহিত যোগাযোগের স্তম্ভ পরিণত হয়। সরসীবালা দেবী বর্তমানে জীবিত আছেন। যোগাযোগের সময় সরসীবালা দুই পুত্র ও দুই কন্যা। ইহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়দেব চৌধুরী শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাচ্য ছিলেন। ইনি বেরলিন Electric Supply Corporation-এর সমস্ত বস্তুপাতি স্থাপন ও অগ্নি সমস্ত কাজ একটি দায়িত্ব ছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইনি অকালে পরলোকগমন করেন। ইহার একটি পুত্র আছে—ইহার নাম জনদেব। যোগাযোগের ও সরসীবালা দুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা অজিতা ছিলেন Union Public Service Commission-এর বর্তমান সভাপতি। বৈজ্ঞানিক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী। ইহাদের কনিষ্ঠা কন্যা অমিতা আর. জি. কের মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক স্বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারী যোগাযোগের ও সরসীবালা দুই পুত্র বৎসব চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। আলিপুর স্টেশন হাউসে অবস্থিত পাবলিক স্কুলে বৎসবের বিদ্যালয় হয়। সেখানে হইতেই তিনি সেণ্টজেনারিস স্কুলে ভর্তি হন। পরে হিন্দু স্কুল হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় কমপালদাসি ও অ্যাডিশনাল ম্যাথামেটিক্স এবং বেকানি এই তিনটি বিষয়ে তিনি শতকরা আশীর বেশী নম্বর পান। সেণ্ট জেনারিস কলেজ হইতে বৎসব ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আই. এ. সি. এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বি. এ. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ব্যাবিষ্টারি পড়িবার জন্ত বিলাত গমন করিলেন। বৎসব ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে Grays Inn-এ যোগদান করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বৎসব কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

সম্পূর্ণ নিজেই চেষ্টায় বৎসবের আইন ব্যবসায় সর্বাঙ্গতর ব্যাতি অর্জন করেন। Constitutional Law এবং Companies' Act-এ তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য সর্বত্র বিদিত। এই দুইটি বিষয় লইয়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ হাইকোর্টে যে সমস্ত বড় বড় মামলা হয় সেই সব মামলায় বাদী বা প্রতিবাদী কোন না কোন পক্ষ সমর্থন করিবার জন্ত তাঁহার নিকট অত্যাশ্রয় আসে। অত্যাশ্রয়ী বৎসব এই সমস্ত মামলা পরিচালনা করিবার জন্ত কলিকাতা হইতে সুরেন্দ্রনাথ কোর্ট, এলাহাবাদ হাইকোর্ট, ইষ্ট পাঞ্জাব হাইকোর্ট, পাটনা হাইকোর্ট, আসাম হাইকোর্ট, উড়িষ্যা হাইকোর্ট, জব্বলপুর হাইকোর্ট, বম্বে হাইকোর্ট ও অগ্নি হাইকোর্টে গমন করেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে Pakistan Industrial & Finance Corporation-এর অধ্যক্ষের Corporation-এর সরকারী ও বেসরকারী প্রকৃষ্টার মিলিত প্রাচ্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত Limited Company পরিচালনা করিতে আইনগত উপদেশ দিবার জন্ত বৎসব কলিকাতা গমন করেন।

বিহার সরকার Indian Copper Corporation-এর Kayanite-এর খনিগুলি দখল করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। ইহাতে পাটনা হাইকোর্টে যে মামলা হয় তাহাতে বৎসবের Indian Copper Corporation-এর পক্ষ সমর্থন করেন। এই মামলায় বিহার সরকার হারিরা বান। বৎসবের আইন বিষয়ক নৈপুণ্যের ফলে আসাম হাইকোর্টে Assam Revenue Tribunal যে ultra vires তাহা প্রমাণিত হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টে এর ফলবৎসব বৎসবের Evacuee Properties Act-এর আইনগত অসঙ্গতি প্রদর্শন করেন। বাকের মানলার moratorium সম্বন্ধে নূতন পথের প্রদর্শন করেন বৎসব।

স্বরেন্দ্রনাথের যোগাযোগে বিভিন্ন বৎসবের স্বদেশপ্রেম বিশেষ প্রশংসনীয়। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাংলার ভাষণে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যদানের জন্ত বৎসবের অগ্রান্ত পরিচালনা করেন। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান হইতে দলে দলে বাঙ্গালীরা আসিতে আরম্ভ করিলে এই সব বাঙ্গালীদের সাহায্য করিবার জন্ত বাঙ্গালীরা সহায়তা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমিতির সহিত বৎসবের সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই সমিতির অর্থসংগ্রহের জন্ত তিনি বহু স্থানে গমন করিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বঙ্গোপাধ্যায়ের পৌত্রী শ্রীমতী মোরা দেবীর সহিত বৎসবের বিবাহ হয়।

শিক্ষাবিত্তের বৎসবের উৎসাহ অপরিমিত। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বরেন্দ্রনাথ কলেজ কাউন্সিলের সভ্য হন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কলেজ কাউন্সিলের সেক্রেটারি এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। বৎসবের বর্তমানে Calcutta Weekly Notes-এর সম্পাদক। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ইনি Supreme Court Appeals নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রকাশের সময় হইতেই এই পত্রিকাটির তিনি সম্পাদক। খেলাধুলায় বৎসব বিশেষ উৎসাহ অনুভব করেন। ছাত্রাবস্থায় ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলায় ইনি নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইনি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট, মোহনবাগান ক্লাবের অঙ্গতম পুণ্ডিত সরস্ব



শ্রী বৎসব চৌধুরী

# রাজার রাজা



উদয়ভাগু

কি আজকের রাত জাগিয়ে রেখেছে রাজগৃহের প্রতিটি মহলকে।

কিসকিস গুপ্তন, গোপন পদধ্বনি, চোরাহাসির চাপা শব্দ ভাসাভাসি করছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে এখনও। চাঁদোয়া থেকে ঝুলানো বেলোয়ারী লঠনের রঙীন আলোব আভা দেখা যায় অনেক দূর থেকে। ঘুম নেই কারও চোখে, জাগরণের পালা চলে তাই। কি একটি দুর্ঘটনার কথা বাতাসের ভায়ে ছড়িয়ে পড়েছে এক মহল থেকে অল্প মহলে। কোতুলের ব্যাকুল দৃষ্টি ফুটেছে সকলের চোখে। তবুও নাকি ঘটনা গোপন করতে সকলেই সচেষ্ট। রাজপুত্রীর বাইরে যেন কথা না ছড়ায়। পল্লীর আর সমাজের কেউ যেন না জানে। ঘৃণাকরেও টের না পায়।

রাজমাতা বিলাসবাসিনী প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে অনেক ভাবভাবির পর তিনি আশ্বস্ত হন। মুখে হাসি মাখিয়ে বললেন,—ইচ্ছাবরী হ'তে সাধ হয়েছে পোড়ামুখীর! দেখা যাক রাজা শুনে কি বিচার করে।

অজাগ রাত্তি রান-গম্ভীর মুখাকৃতিতে দেখতে পাওয়া যায় রাজপুত্রীদের। পথ চেয়ে প্রতীক্ষায় থাকেন যেন। সদরের রঙমহল থেকে রাজা অন্দরে কিরে আসেন কি অবস্থায় কে জানে? আগভোগে কিছুই বলা যায় না, রাজাবাহারুর অন্ধজ্ঞানে কি অজ্ঞানে কিরবেন।

রাণীদের মুখেও আজ লুকানো হাসির ঝিলিক খেসে যেন। মুখে আঁচল চাপতে হয়, হাসি লুকাতে হয়। সকলের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী হয়েছেন বড়রাণী উমারানী। চোর ধরা পড়েছে, কিন্তু উমারানী চোরের অপরাধ অস্বীকার করতে চান।

অন্দরের দাসী আর পরিচারিকার দল চোব খঁরেছে। অন্দরের শিচ্ছেন পুরুষদের সচল ছায়ামূর্তি দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সববে চিংকার করতে লেগে গিয়েছিল তারা। যুগল ছায়ামূর্তি পুরুষতীরে, গন্ধরাজ ফুলের গাছের আড়ালে।

পূর্ণিমার আর বেরী নেই। তাই চাঁদের আলোয় দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত আত্ম। আকাশে অগুণ্টি তারা, কম্পমান শিখায় ঝিকিঝিকি জ্বলছে। সোনালী চুমকিখটা আকাশের চন্দ্রাতপ যেন। চাঁদের চতুর্দিকে গোলাকার চন্দ্রমণ্ডল বিস্তৃত হয়ে আছে। তাই আজকের গুপ্তরজনীতে লোকচক্ষু এড়াতে পারবে না চোরের দল। ধরা পড়লো দাসীদের চোখে। ভূত-প্রতের আশঙ্কায় কৈ-হল্লা জ্বললো তারা। সত্যিকার মানুষ না ছায়ামূর্তি সঠিক ঠাওরাতে

দাসীদের সত্বর চিংকারে যে যেখানে থাকে সমস্ত হুসে উঠলো। শেষ পর্যন্ত ধৃত দুই চোরকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সলাজে মুখ লুকায় দাসীরা। কারও মুখে আর কথা জোগায় না। কেউ কেউ বললে,—ও হরি, এ যে দেখছি আমাদের শিবানী আর শশিনাথ! যি আর আগুন এক হ'লে আর কি বন্ধে আছে!

শশিনাথ লজ্জায় মুখ নত করে। শুধু শিবানী সেন বেপবোয়া। ভয়ভরের বালাই নেই যেন। ধরা পড়েছে, তাও বুঝ চিত্তিয়ে আছে নির্ভয়ে। মিটিমিটি হাসছে।

দাসীদের একজন বললে,—রাজবাড়ীতে কুলদেবী আছেন, ইষ্টমূর্তি আছেন। এখানে এই অনাচার কি সহ হবে কারও! এই বেলেলাপণা!

শিবানী ছাড়া গোয়েছে, কিন্তু শশিনাথ মুক্তি পায় না। তারে ঘিরে এক ব্যুত রচিত হয় যেন দাসীদের। শশিনাথ আনত মুখে বসে থাকে পুকুরঘাটের এক পৈঠায়। সে যেন মুক আর বধির হাজার কথাতেও বা কাড়ে না।

দাসীরা বলে,—রাজামণ্ডর বা বিচার করবেন তাই হবে। আমরা এমনিতে ছাড়বো না।

শশিনাথের বুক হুক হুক করে। লজ্জায় মুখ দেখাতে পার না। পুকুর চাঁদের প্রতিবিম্বের দিকে চোখ রেখে নিশ্চুপ বসে থাকে।

সাজের ঘটা দেখে কে শিবানীর! লাল রঙের শাড়ীতে কে দেখায় তাকে, বিয়ের কনের মত। খোঁপায় ক'টা চাঁপাফুল দিয়েছে। আঁটস'টি শাড়ীতে গাছ-কোমর বেঁধেছে। কপালে সিঁদুকটিপ আর পায়ে আলতা রাঙিয়েছে। শশিনাথ বলেছিল তাকে লাল শাড়ী পরতে।

যদিও বিধি বাম হয়। লোক জানাজানিতে লজ্জার সীমা থাকে না। শশিনাথ যেন কাঁপতে থাকে ভয়ে ভয়ে।

কেবল উমারানী গুদের পক্ষ নেন। দাসীদের প্রতি রুষ্ট হন কোপ প্রকাশ করেন। তাদের ধমকানি দেন। বললেন,—শশিনাথ ছেড়ে দাও তোমরা। আর যাই হোক, শশিনাথ চোর নয়।

দাসীরা বলে,—সেই আশাতেই রাত বেরাতে অন্দরের পুরুষরা এসেছে। ভাঁড়ার থেকে কি চুরি ক'রতো কেউ বলতে পারে!

বড়রাণী ভংসনার স্বরে বললেন,—ছি ছি, তোমাদের পাণ্ডে ভোগ আর কি। বার যেমন মনের বাসনা—সেই রকম চি করে। শশিনাথ ভাঁড়ার লুণ্ঠিতে আসবে কোন দ্রুত?

দাসীরা বললে,—তাইতো ভাব জমিয়েছে শিবানীর সঙ্গে। পাঁচ

শিবানী আর চুরি করে শশিনাথ। দেশে তার অভাবী সংসার।  
না করলে শশীর চপলে কোথা থেকে ?

সদরের রঙমহল থেকে কালীশঙ্কর যখন পাড়ীতে ফিরলেন।  
বাক্তি বেশ ঘন হয়েছে। গুলাব আতরের সুগন্ধি ভাসিয়ে  
দন রাজা। বৈশাখের তপ্ততা স্বিকৃত্য ভরিয়ে দিলেন।  
রাজপ্রাসাদের প্রান্তের গাছে গাছে শাখা আর পাতা  
অকম্প হয়ে আছে। বাতাস আর চলছে না হঠাৎ।  
র পাড়ী অন্দরে পৌছতেই রাজমাতার পক্ষ থেকে আহ্বান  
পাঠ হয় তাঁকে।

—বিলাসবাসিনী দেবী একবার সাক্ষাৎ চান রাজাবাহাদুর!  
কথা শুনে কেমন যেন জড়কটে বললেন,—কেন? এ-হেন  
র?

—নিশেষ প্রয়োজন আছে। তবে তিনি স্বয়ং আপনার মহলে  
দ্রুত পারেন, যদি জ্বুং করেন তবেই।

—এবমুখ। তাই হোক। আমি এখন পদচারণায় অক্ষম।  
হৃদয়ী যেন ক্ষমা করেন।

কথার শেষে আবার চোখ বন্ধ করলেন রাজা। পাড়ীমধ্যে  
দ্রুত তাকিয়ায় এলিয়ে পড়লেন। সোনায় পাতে মোড়া একটি  
লা ছঁকা ধরিয়ে দেয় খানসমা, বাজার হাতে। অপুরী তামাকের  
চুমি ধায় গুলাবী আতরের সৌগন্ধ।

একজন অবলা নাকি আজ রাতের মত রঙমহলে এসেছিল।  
চিরশিনী একজন, গৃহস্থকন্ঠা। রাজার পেয়ারের খোসায়ুদেরা  
থাক থেকে তাকে যে আসে, কেউ বলতে পারে না। যৌনগন্ধিতা  
থেকেছিল রাজার কাছে। বসেছিল,—হাতে হাতে টাকা না  
গোঁ মায়তো কিসের আশে এসেছি?

সহাস্ত কালীশঙ্কর বসেছিলেন,—কত টাকা? এক লক্ষ  
কি?

গৃহস্থের মেয়ে সমস্ত বলে—আমাদের কি দরাদরি মানায়? যা  
বন তাই হাত পেতে নেবো। তবে আগাম টাকাটা চাই।  
মরা অভাবী, তাইতো এই রূপে এসেছি।

কেমন যেন অবিশ্বাসের আভাস শোনা যায় তার কথায়।  
হৃদয়ী সুর যেন। তাই অসহ্য ঠেকে রাজাবাহাদুরের কাছে। তিনি  
বিয়ে চিরিয়ে বললেন,—অভাব যখন প্রকট তোমার, তখন হাতে  
কাপায় দেখি না কেন?

—অভাবী, তাই পাত্র পথান্ত জোটে না। এই দুই হাতই  
মাগে পাত্র। এইতো হাত পেতেছি রাজাজী!

কথার শেষে দুই হাত পাতলে সে ভিক্ষাপাত্রের মত। চোখে  
ক্লদৃষ্ট ফুটলো।

তাঁর শব্দে সহসা হাসলেন রাজাবাহাদুর। 'তাসতে হাসতে  
লেন—এই লও ভিক্ষা, যাও বিদেয় হও।

কথা বলতে বলতে এক মুঠো মোহর শব্দে ছুঁড়ে দিয়ে দিলেন।  
বপ বললেন,—দেওয়ানজী এই শূয়রের রাজ্যকে ফটকের বাইরে  
ছি দিয়ে আসেন। খানিক খেয়ে বললেন,—পারেন তো এর  
ইপালে দক্ষলোহার দুটা ছাপ দিয়ে দেন। দাগী থাক, লোকে  
নিব তবে।

—মার্জনা করবেন রাজাজী! দুটো ধরবেন না। অভাবের  
তাড়নায় স্বভাবটা নষ্ট হয়েছে। কাতর সুরের কথা ভাসে রঙমহলে।

কালীশঙ্কর আলবোশার শটকা মুখে তুলতে গিয়ে নামিয়ে নিয়ে  
বললেন,—অধিক কথার কোন প্রয়োজন দেখি না। বিদায় লও  
এখন। এই মুহূর্তেই।

মোসায়েবের দল ভেঙে পড়লো যেন। হতাশ চোখে চেয়ে  
থাকলো। ভেবেছিল দালালী পাবে রাজার কাছ থেকে। মাঠে  
মারা গেল তাদের প্রাণ্য অর্থ।

দেওয়ানজী এসে গবিতার হাত ধরে টেনে তুলে নিয়ে যান।  
বলেন,—জোঁলোকের মেয়ে তুমি, তাই কথার আকটাক নাই।  
যা খুশী তাই বল। টাকা আর মোহর আমাদের রাজার কাছে  
পাখরের হুড়ির সামিল।

—তা আমি জানি দেওয়ানজী!

—তবে যা পেরেছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নাও। বিলম্ব কর না।  
আমার সহ চল। তোমার ভাগ্য ভাল যে রাজা তোমাকে সহজে  
বিনায় দিয়েছেন। কথা বলতে বলতে দেওয়ানজী যেন ক্রোধে  
কাঁপছেন থেকে থেকে।

—আমার অঙ্গ স্পর্শ করবেন না দেওয়ানজী! ছেড়ে দিন।  
আমার পা আছে, আমিই বাছি।

তাজিলোর হাসি হাসলেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—  
দেওয়ানজী বুড়া হয়েছেন, তাই বোধ করি মনে ধ'রছে না তোমার।  
দেওয়ানজী!

—বলেন রাজাবাহাদুর।

—একটা জোয়ান পাইকের হাতে ওকে সঁপে দেন দেওয়ানজী!  
সিংহের গজ্ঞান যেন রাজার ক্রুদ্ধকটে! হেলান দেহ তুলে  
বীরাসনে বসলেন। বললেন,—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!  
আমার মুসলমিন সিপাহীরা কেউ বাহিরে আছে?

—ক'জন আছে কাছেই। রঙমহলের দুয়ার আগলে আছে।  
দেওয়ানজী ভয়ের সুরে বললেন। কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত  
হকচকিয়ে ওঠেন।

দু'হাতে সজোর তালি ঠুকলেন কালীশঙ্কর। ঈর্ষ ব্যঙ্গের  
হাসি হেসে বললেন,—তবে তো ঠিক আছে।

মোসায়েবরা নড়ে-চড়ে বসলো। খেয়ালী রাজার কি ইচ্ছা হয়  
কে জানে! হয়তো এখনই যা হয় একটা শাস্তি দিয়ে দেবেন।  
কিংবা গাবদে পুরে রাখতে জ্বুং দেবেন।

কালীশঙ্কর হেসে হেসে বিক্রপের সুরে বললেন,—ওকে দিয়ে দেওয়া  
হোক একটা সিপাহীএর কাছে। ভোয়ের আলো ফুটলে ছেড়ে দেবে।  
মোসায়েবরা বললে সমস্বরে,—ম'রে যাবে হজুর!

—তাই থাক! আবার ক্রুর হাসি হাসলেন রাজা বাহাদুর।  
বললেন,—ওকে অর্থ দিয়েছি, তবে আর বিনিময়টা বাদ যায় কেন?

একজন মোসায়েব বললে,—মুখ নারী রাজাবাহাদুর, অপরাধ  
ধাষ্য করবেন না।

—মুখের জ্ঞান হোক। কালীশঙ্কর সহাস্তে বললেন,—দেওয়ানজী,  
ওকে ভ্যাগ করেন। সিপাহীদের একটাকে ডাকেন। অধিকক্ষণ আমি  
আর নাই রঙমহলে। অন্দরে যেতে চাই।

তখান্ন।



কথার শেষে দেওয়ানজী বৃহৎ কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

গর্বিণী নারী ক্রোধে যেন ফুলছে থেকে থেকে। ক্রুদ্ধা কণিনীর মত পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। কোমরে হাত। হিলে দেহভঙ্গিমা। হঠাৎ কথা বললে সে। ভুরু বাঁকিয়ে বললে,—চাই না আমার টাকা। আমাকে যেতে দিন।

হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন রাজা। তাঁর উর্দ্ধবপু হাসির তোড়ে নেচে নেচে উঠলো। শ্বেতপাথরের খালিতে সাজানো নীলাভ মিনাকাজের রূপার পানপাত্র। হাসতে হাসতে পিয়লায় মদিরা ঢাঙ্গতে থাকেন। টইটবুর পাত্র মুখে তুলে আর একবার বোরদুষ্টিতে দেখলেন ঐ সান্তিসিনীকে। একজন মোসায়ের বলল,—রাজাবাহাদুর, আপনি সিংহের সনান, একটা মুখিক বৈ তো নয় ওটা! তবে আর কেন?

চূপ কর বেয়াদপ! তোদের তো ঘরে শাক-সজ্জনা, বাহিরে বত বাবুনা! কালীশঙ্কর ধমকে ধমকে বললেন। মুখে টলটল পাত্র তুললেন।

একজন তুর্কী সিপাই এসে সেলাম হুক দাঁড়ালো। কটি থেকে বুলছে বাঁকা তরোয়াল।

পাত্র নামিয়ে রেশমী রুমালে মুখ মুছতে মুছতে কালীশঙ্কর বলেন,—দেওয়ানজী, টাকা আমি ফেরৎ ল'বো না। যা দিই তা আর ফেরৎ লই না আমি। মর্দানী মেসেটার কোন কথার ঠিক নাই। একবার চায়, আবার তৎক্ষণাৎ চায় না। বিপরীত কথা কয়।

দেওয়ানজী বললেন,—সত্যি রাজাবাহাদুর, বড় যেন দেমাকী।

পানপাত্র শেষ করলেন কালীশঙ্কর। আবার মুখ মুছলেন রেশমী রুমালে। বললেন,—দেওয়ানজী, সিপাইকে বাংলাে দিন। ওদের বিদায় করেন। আমিও উঠি।

বাতাস নেই আজ। গুমোট গরমে রাজা বধ্যাক্ত হয়ে উঠছেন। চূপাশ থেকে বিচিত্রবর্ণের বাপাখা চলছে তবু।

খতমত খেয়ে যায় মোসায়েরের দল। একে অন্তর মুখপানে তাকায়।

রেশমী রুমালে গুলাবী আঁতব মাথানো। রঙমহলের জানালায় ভিজে খসখসের পর্দা। কালীশঙ্কর আর কোন দিকে দৃকপাত করলেন না। মহল থেকে বেরিয়ে পাকীতে উঠলেন।

মহেশনাথের কানেও কথা উঠলো। সেজের আলো আলিয়ে পরম ভক্তিতে রামায়ণ পাঠ করছিলেন তিনি, আপন কক্ষে। কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের পুঁথি স্তব ও ছন্দে পড়ছিলেন। সেজের উজ্জ্বল আলোর তবুও এক রাশ কালো, কিছুতেই যেন চোখে দেখা যায় না। নিমেষে কাকুলের মূর্তি যেন মহেশনাথের—গুধু তাঁর চকু আর বস্ত্রের শুভ্রবর্ণ চোখে পড়ে। রূপালের মাঝে সিঁদুরের লাল টপ্পা। শিখায় একটি স্তবাহু।

শিবানী আর শশিনাথ অঙ্গরের পুকুরতীরে রাস্তার অন্ধকারে মনের কথা বলাবলি করতে এক হয়েছিল—দেখতে পেয়েছে দাসী আর পরিচারিকার দল।

মহেশনাথ বললেন আপনি মনে,—হুঁটাকেই বিভাঙিত করা শাস্ত। শিবানীর মুদর্শন করতে চাই না আমি। শশিনাথকে মনে

ধরেছে তার, শশীর দোষ কি! আমাকে আর শুনাও কেন সকল কুখ্যা! আমার সহ্য হয় না, ক্রোধের ছালা ধরে। থাকে না আর।

মহেশ্বার যত একজন দাসী অদৃশ্য থেকে কথা ব ফিসফিসিয়ে বলে,—শিবানী কুল-মজাতে চায়। লোকের ব মুখ দেখাবে সে কি ভরসায়?

মহেশনাথের মুখাকৃতি আরও যেন বাতংস হয়ে যায়। বিরক্তির চিহ্ন ফুটেছে। ক্রোধের আতিশয্যে বিকলাঙ্গ দেহ কী খরখরিয়ে। খানিক নিস্তব্ধ থেকে মহেশনাথ বললেন,—তবে যদি শিবানীর পাণিগ্রহণ করে, আমার কিছু বলার নাই। শি তবু পাত্রস্থ হয়।

দাসী আঁড়ালে থেকে বললে,—শশিনাথ যদি তাতে একমত হয়?

বিকট স্বরে হাসলেন মহেশনাথ। তাঁর ছায়া চকল হয় তা বেগে। ক্রুর হাসি ত্রসে বললেন,—শশিনাথের সূচ্যভয় না আমি তাকে বেহাই দেবো না। স্বহস্তে খুন করবো। শিবা সম্মুখে।

দাসীর কথা নয়, অল্প এক নারীকণ্ঠ বাহির থেকে কথা ব মিতি-মিষ্ট কণ্ঠে। বলে,—শিবানীর দোষ নাই। আমরা শশিনা সঙ্গে শিবানীর বিবাহ দেবো।

রামায়ণ থেকে চোখ তুললেন মহেশনাথ। নবমস্তরে বললেন কে কথা বলে? বড়বাণী কি?

—হী মহেশ ঠাকুরপো! আমিই সেই অভাগী।

—প্রণাম লও বড়বাণী! যা মন চায় তেমন ব্যবস্থা কর', অ সম্মত আছি এ বিবাহে। শিবানীর পাত্র মেলা-দুস্তর।

—এই বিবাহে তুমি সম্মত আছে? কি? উমারাগী মূঢ় শুধালেন।

মহেশনাথ বললেন,—হী সম্মত আছি, তবে অনাচারের প্র দিতে চাই না। বিবাহ হয় হোক।

—তাই হবে।

মহেশনাথের মৌখিক সম্মতি শুনে উমারাগী যেন ছুট থাকলেন।

কেন কে জানে, মহেশনাথ অট্টহাসি ধরলেন হঠাৎ। হাদ হাসতে স্বগত করলেন—নারী আর পুরুষের মিলন অনর্থক বড়বাণী! কেবল সাবধান হও, আমাদের মুখে যেন চূপ-কালি পড়ে। কলঙ্ক রটনা যেন না হয়। রাজমাতা আর রাজাবাহা যেমন বলবেন তেমন হবে।

উমারাগী ছুটে পালিয়েছেন। গেছেন বিলাসবাসিনীর মহলে।

রাজমাতা বললেন,—শশিনাথকে গ্রহণ করতে হবে শিবানীকে নয়তো তার বিপদ হবে। রাজাকে বলবো উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে।

—আমারও এই এক কথা। বড়বাণী বললেন ইতি-উতি দেখে বললেন,—এ সুরোগ হেলায় হারালে আর ফিরে আসবে না রাজমাতা শিবানীর বিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে।

—আমিও তাই বলি। বিলাসবাসিনী বললেন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,—কথি কালীশঙ্কর কি বলে।



সর্বমঙ্গলা আর সর্বজয়া দুয়োরে দেখা দেন। সর্বমঙ্গলা  
সেন,—রাজা তাঁর মহলে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা  
রেন।

চুপি চুপি রাজমাতা বললেন,—নেশার ঘোর নাই তো মেজ  
র ছোটরাণী? সাদা চোখে কথা বলবে তো?

সর্বজয়া বললেন,—মনে তো হয় না। রাজা বেশ সহজ ভাবেই  
ছেন।

—তবে আর ভাবনা কেন? চন্দ্র তোমাদের সঙ্গে যাই। আমাকে  
গমরা ধরে নে চল। কথা বলতে বলতে পালাও ছেড়ে উঠলেন  
রমাতা।

গাস-কামবায় সোনার কেদারায় রাজা বসে আছেন।

উমারানী তাঁর মাথায় গোলাপজল ছিটিয়ে দিলেন গোলাবগাশ  
কে। বললেন,—রাজমাতা আসছেন এখনই।

—কেন?

—শিবানী আর শশিনাথের কথা জানাতে আসছেন। তার  
জন অন্তরের পুরুষতীরে একত্রে ধরা পড়েছে। দাসীরা দেখতে  
য়ে চোর-ডাকাত ব'লে ভুল করেছে। রাজবাড়ীতে জানতে আর  
কী নাই কারও।

উমারানীর ক্রোধকণ্ঠ বাহুবর্ধনে ধরলেন রাজাবাহাদুর।  
লেন,—তোমার অভিপ্রায়টা কি তাই শুনি?

ধানিক স্তব্ধ থাকেন বড়রাণী। ভেবে ভেবে বললেন,—হৃজনের  
য়ে আমার সায় আছে। আপনি সেই মত ব্যবস্থা করেন।  
যদি না হয় ত'টাকে বিদায় করেন রাজগৃহ হ'তে। যা ইচ্ছা  
করুক ওরা। শিবানীকে পাত্রস্থ করলে লোকলজ্জা থেকে  
চা যায়।

—কাশীশঙ্করের জন্ম অপেক্ষা করবে না? আগে সে আসুক।

রাজা কথা বলতে বলতে হু'খানা লবণঠিকরি মুখে দিলেন।  
ধা অল্পভব করছেন তিনি। আকর্ষ মন্ত্রপানের পর ক্ষুধার্ত হয়েছেন  
না।

উমারানী বললেন,—বিলম্ব হ'লে শশিনাথ হাতছাড়া হ'তে  
রে। কিছু অর্থ দিয়ে হৃজনের রাজগৃহ ত্যাগ করতে আদেশ  
ন। বলেন, শশিনাথ তার পিজালয়ে লয়ে যাক শিবানীকে।

—পরে যদি মেয়েটাকে ত্যাগ করে শশিনাথ? সম্পর্ক যদি  
র হয়?

—শিবানীর হুঁত্যা বলতে হবে।

—তবে তোমার কথাই থাক। শশী তাকে ল'য়ে যাক।

কাশীশঙ্করের সম্মতি পেয়ে খুশী হাসি হাসলেন বড়রাণী।  
লেন,—এই রাজমাতা আসছেন ভূপীতে। আপনার বক্তব্য তাঁকে  
নায়ে দেন তবে।

—কাশীশঙ্কর যদি কিছু মনে করেন? রাজাবাহাদুর  
লবোলাস নল মুখে তুলে বললেন জড়িতকণ্ঠে।

উমারানী বললেন,—তাঁকে রাজী করানোর ভার আমার 'পরে  
ন। আপনি অবচলিত থাকেন, এই অনুরোধ।

কথার শেষে উমারানী রাজার কক্ষ থেকে বেরিয়ে জাবার

ছুটলেন যেন। নেশার মুখে বেশ সুবাদ লাগে যেন লবণঠিকরি।  
আরও ক'খানা মুখে তুললেন কাশীশঙ্কর।

গঙ্গার বৃকে চাঁদের ছায়া—জলপ্রপাতে বিলিমিলি খেলে।  
তরল সোনা যেন গঙ্গার জল। কাশীশঙ্করের সুবুহু বজ্রা  
মন্ত্রগতিতে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। তীরভূমিতে  
অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে এখানে সেখানে। হোমকুণ্ড জ্বলছে তান্ত্রিকদের।  
যেন চিত্রা জ্বলছে শ্মশানে!

আচার শেষে আবার বজ্রার ছাদে উঠলেন কাশীশঙ্কর।  
মুগ্ধত্ব চিবাতে চিবাতে। চর্য্য-চোষা লেহ-পেয় আচার  
করছেন কুমারবাহাদুর। মেজাজ খুশী হয়ে গেছে ভূপ্তিকর  
সুখাঙ্গে। জ্যোৎস্নাধবল ফরাসে বসলেন তাকিয়া টেনে  
নিয়ে। বললেন,—খানসমা, আনন্দকুমারীকে বল' সে-ও ছাদে  
আসুক।

চাঁৎ যেন একখানি অনিন্দ্যহন্দর মুখকান্তি ভাসলো কুমারের  
মানসপটে। রাতরাণীকে মনে পড়লো তাঁর। মহাশোচ্যকে।  
সহধর্ম্মিণীর কথা ভাসলো যেন কর্কটহরে।

চৌধুরাণী এসে ব'সলো ফরাসের এক পাশে। বললে,—  
কুমারবাহাদুর, আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত না হয়।

আনমনা কাশীশঙ্কর বললেন—দেখো, চৌধুরীর মেয়ে, তুমি তো  
আমার সহোদরার বান্ধবী।

—ঈ তাইতো। পান চিবানো স্বগিত বেধে আনন্দকুমারী  
ক্রীণ হাসির সঙ্গে বললে।

—তবে তুমি তো আমারও ভগিনীতুল্য।

—ঈ তাইতো। আবার বললে আনন্দকুমারী। রাতের  
অনাবিল হাওয়ায় তার আলুলায়িত কক্ষ কেশ উড়ছে। আলোও  
উড়ছে।

—তুমি কি নিদ্রায় কাতর হয়েছো?

—না না, আদর্শেই নয়। মান্দারণে যতক্ষণ না পৌঁছাই  
ততক্ষণ আমার নিদ্রা নাই চোখে।

—আমারও তরুণ। তাই বলি, গল্পগুজে রাত্রিটা অতিবাহিত  
করা ঝাঁক।

—বেশ কথা। আপনার যেমন অভিক্রটি।

হেসে হেসে কথা বলে আনন্দকুমারী। আকাশে চোখ তোলে  
একবার। তার দীর্ঘ দুই চোখে আকাশের আর পূর্ণচাঁদের প্রতিচ্ছায়া  
খেলে।

—চুপি চুপি একটা কথা বলি তোমাকে। চৌধুরাণী, আমাকে  
কমা করবে?

—কেন কুমারবাহাদুর? এমন কথা বলেন কেন?

—আমি হয়তো অসংযত হয়েছিলাম তোমার প্রতি।

খিল-খিল শব্দে হেসে উঠলো আনন্দকুমারী। হাসতে হাসতে  
বললে,—কৈ? কখন? আমার তো মনে পড়ে না?

স্বস্তির শাস ফেললেন কুমারবাহাদুর। আকাশের চাঁদসম  
রাতরাণীর মুখখানি যেন বখন তখন চোখে ভাসছে। চক্ষু মুদিত  
করলেই সেই মানসীকে দেখতে পাওয়া যায় যেন। তাঁর মধুমিষ্ট

কথা কানে ভাসে যেন। মহাযেতা যেন কানে কানে কথা বলছেন  
হুমায়ের।

কুমারবাহাদুর বললেন,—মান্নাশের গল্প বল' তুমি। আমি  
শনি।

মুহূৰ্জ্ঞ হাসলো চৌধুরাণী। বললে,—আপনি আসে হুতাছুটির  
গল্প শোনান। তারপর আমি বলবো।

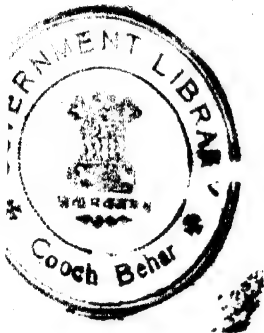
—যেহ কথা। কাশীশঙ্কর বললেন ইহিক-সিহিক দেখতে  
দেখতে। বললেন,—হুতাছুটিতে আমাদের তিন পুরুষের বসবাস।

রাত্রির হাওদার গতি অবস্থা। শেঁ-শেঁ। শব্দে বাতাস  
চলেছে। তাঁরের পাছ-পাছড়ার ঢাকলোর একটা অদ্ভুত শব্দ  
ভেসে আসছে যক্ষসজার। যেন শত শত লোক একসঙ্গে কথা  
বলছে।

মাকির সোৎসাহে হাল জেনে চলেছে। তবুও বজ্রার গতি

ধীর। চৌধুরাণী একবার লক্ষ্য করলো। মান্নাশের চাঁদ মে  
তাঁদের সমুদ্রাণী। বজ্রার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ এসিয়ে চলে  
আকাশপথে। একজোড়া যাত্রির পাখী কর্ণ শ্রবণে ডাক  
ডাকতে বজ্রার হৃদয়ের ওপর ঘিরে উড়ে বার তীব্রগতিতে। গঙ্গা  
এক তাঁর থেকে অন্য তাঁরে চললো উড়তে উড়তে। চন্দ্রাসার  
শাট দেখা যায়—একজোড়া লক্ষ্মীপেটা।

অভ্যাসমত তাঁদের উচ্চলে চৌধুরাণী একটা নমস্কার ক্রকসে।  
কাশীশঙ্কর ধামলেন না। হুতাছুটির কাহিনী কি এক কথাই  
হয়? কুমারবাহাদুরের কথা একান্ত্রিভেত ওনতে থাকে চৌধুরাণী।  
যিও হাতের স্নিগ্ধবীতস বাতাসে তাঁর ঘুম-ঘুম পায়। চক্ষু কান  
আসে। মনে মনে নিঃশব্দত ত্যাপ করে আনন্দকুমারী। সঙ্গে  
শোনে কুমারবাহাদুরের কথা। চোখে তন্দ্রার ঘোর উপর  
করে সে।



## অক্ষুট

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আসব-কোণে ঐ যে জলস বীণা,  
ঐকাতানে লিচ্ছ না কেউ যা  
কেউ তোলে না শ্রু।  
গুণ, নিজের বৃকে স্তব্ধ আছে যা  
তাঁতেই ভরপুর।  
যার না বোকা—বাক্সল' কিছু কি না!

কুম্বাসে কান পেতে তাঁই শুনি—  
ভাবছে কি ও? ভুলেছে সব মন!  
জাগে না ডেউ, যন্ত্রণা আব হুঃ-সীড়া যত  
এই পৃথিবীর সকল প্রয়োজন  
হেঁয় না ওকে, পড়ে আছে অহলাসই মত।  
তবু... হাওদার তাঁরে একটি করে গুণি—

দৈব'গনের অশ্রুত বন্ধার।  
গাছের মাথা কীপছে পাখীর গানে।  
মুহূৰ্জ্ঞ মুহূৰ্জ্ঞ বর্ণন কার!  
ফুটল কি প্রেম অঘটনের টানে?



ভবি পাঠানোর সময় ছবির পেছনে নাম, ঠিকানা  
এ বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।

১০৭-টানা

—এক সিক্সসান দাঁত



মেঘ-মল্লিক

—তপন মল্লিক





বিদেশী পাখী (আলিপুর চিড়িয়াখানা)



ହାତନାମ ପାମ

—ନିଆଇଟାମ ଶିଳ



# বিশ্ব

## কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

আচার্য্য অগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত

২২

৩০ জুন ১৯০৩

Thomson House

১৫ই আষাঢ়

১৩১০

শ্রী

বেংকার দশশয়্যাপন্ন অবস্থার টেলিগ্রাফ পাইয়া আমাকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহাকে জীবিত দেখিব একপ আশামাত্র ছিল। ডাক্তাররা তাহাকে কেবলই Strychnine ত্রিণ্ডি প্রভৃতি ঔষধি কৌন মতে কৃত্রিম জীবনে সজীব রাখিবার চেষ্টায় ছিল। আমি যেদিন আসিয়া পৌঁছিলাম সেদিন তাহার রোগীর জীবনের বাণী পরিত্যাগ করিয়াছিল। আমি আসিয়াই সমস্ত Stimulants ছাড় করিয়া দিয়া হোমিওপ্যাথি শিকিৎসা করিতেছি। রক্ত ওঠা ছইয়া গেছে—কাশি কম, শ্বাস কম, পেটের অস্বস্তি কম—বিকারের উপায় বন্ধ হইয়া গেছে—বুকের বাথা নাই—বেশ সহজ ভাবে খাবারী কহিতেছে, অনেকটা সবল হইয়াছে—আশা করিতেছি ই থাকিটা কাটিয়া গেল।

কিন্তু বিজ্ঞানস্বের জ্ঞান আমার উত্তরে সীমা নাই। এখান হইতে তাহার সংস্কার সঙ্গতি করিব এমন উপায়মাত্র নাই—সুই অব্যবস্থার মুখে ফেলিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে—যা হইতে পারিব তাহার কোন ঠিকানা নাই। কি আর লব তুমি মোহিতবাবু ও রমণীকে লইয়া বিজ্ঞানস্বকে দাঁড়ইয়া দাও—ইহাকে তোমাদের জিনিষ বলিয়াই মনে করিও। আমি নিতান্ত একলা হওয়াতেই এত বিষ হইতেছে—তোমরা আমার যোগ না দিলে আমার পক্ষে অসাধ্য হইতেছে। নূতন যে সকল উপায় নিযুক্ত করিতে হইবে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের সাহায্য করিয়া দাও—ছেলেদের খাওয়া দাওয়া এক চরিত্র নিয়মের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দাও—অধ্যাপনের নিয়ম বাধিয়া নহিলে এই সময়ে মাঝপথে উচ্ছিন্ন হইয়া উঠিলে আর সাহায্য কঠিন হইবে—বিজ্ঞানস্বের বদনাম হইবে এক বর্তমান জগতের অবস্থায় এমন সকল কুনীতি কুশিক্ষা কুদৃষ্টান্ত বিজ্ঞানস্বের প্রবেশ করিতে পারে যে ভবিষ্যতে কেবল মাত্র অমৃত্যু করিয়া তাহা সাধোদন হইতে পারিবে না। কুজবাবু সপরিবারে আছেন—তিনি ছেলেদের উপর দৃষ্টি রাখা তাহার দ্বারা সম্ভবপর নহে—কিন্তু নূতন ছেলে আসিয়াছে তাহাদের চরিত্র ও আচরণ কল্পনা নাই—তাহারা বিজ্ঞানস্বের বহি কোন কল্পনা করেন করে তবে

আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। তুমি আর লেশমাত্র বিলম্ব করিও না। মোহিতবাবু বিজ্ঞানস্বের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া জানিয়া আসিয়াছেন তাহাকে সমস্ত ডাকইয়া আমার এই চিঠি দেখাইয়া একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়ো। বেংকাকে দিনরাত্রি সাবধানে সেবাশ্রদ্ধা করিতে হইতেছে—চিঠি লিখিবার সময় অত্যন্ত অল্প—এইজন্ত মোহিতবাবুকে চিঠি লিখিতে পারিলাম না। তুমি তাহাকে আমার আন্তরিক উদ্বেগ জানাইলে তিনি কখনই উদাসীন থাকিবেন না—তাহাকে অনেক খাটাইয়াছি আরও অনেক খাটাইব। এ বিজ্ঞানস্বকে সম্পূর্ণ তোমাদের নিজের করিতে হইবে। যতক্ষণ লিখিতেছি ততক্ষণ আমার ঘুমো উচিত ছিল কিন্তু বিজ্ঞানস্বের বর্তমান অব্যবস্থায় আমাকে বিশ্রাম করিতে দিতেছে না। ছুটি কবে পাইব?

তোমার বহি

২৩

[ অক্টোবর বা নভেম্বর ১৯০৫ ]

বসু

আমি পলাতক। একদিন তুমি ছিলে কোণের মধ্যে, আমি ছিলাম জনতায়—আমি আজ কোণ খুঁজিতেছি, তুমি ভিড়ের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছ। যে-কাজ তোমার মূলত্ববি ছিল সে তোমাকে সাধিয়া লইতে হইবে। আমার কাজ সারা হইয়াছে; তাই চোখ বুজিবার পূর্বে বাতি নিবাইবার আয়োজন করিতেছি। এখন তুমি আমাকে ডাক দিলে চলিবে কেন? দেশের লোকের কাছ হইতে আমার মজুরি চুকাইয়া লইয়াছি—পুরা বেতন পাইলাম কি না সে হিসাব করিবারও ইচ্ছা নাই—এখন ছুটি লইয়া একটু বিশ্রাম করিব, এই জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। এই বিশ্রামের দাবী আমার অজ্ঞার নয়—এক সেটা মজুর করিতে দেশের লোকের নিক্তি পরসা খরচ নাই—সন্মানসম্বন্ধিয়ার জন্ত অনেক কাঠ-খড় দরকার হয়, এমন-কি অপমানও নেহাৎ বিনি খরচায় হয় না। কাল আবার বোলপুরে ফিরিতেছি। সেখানকার আকাশে এবং আলোয় কিছুমাত্র কুপণতা নাই—ছেলেবেলা হইতে একান্ত মনে ঐ আকাশকে আলোকে ভালবাসিয়াছি—আমার স্বদেশের কাছ হইতে আর কিছু না পাও—ঐ জিনিষটি প্রাণ ভরিয়া পাইয়াছি—সুখা এখনো মেটে নাই। বৌঠানকে নমস্কার দিবে।

তোমার বহি

২৪

[ ৮ জ্যৈষ্ঠাব্দ ১৯৩৮ ]

বন্ধু

তোমার চিঠি পাইয়া বিশেষ সাধনা অনুভব করিয়াছি। আমাদের চারিদিকেই এত দুঃখ এত অভাব এত অপমান পড়িয়া আছে যে নিজের শোক লইয়া অভিভূত হইয়া এবং নিজেকেই বিশেষরূপে দুর্ভাগ্য কল্পনা করিয়া পড়িয়া থাকিতে আমার লজ্জা বোধ হয় আমি যখনই আমাদের দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখি তখনই আমার নিজের দুঃখতাপ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আন। আমাদের অসহ্য দুঃখশার মূর্তি ঘরে ও বাহিরে আজকাল এমনি স্পর্শিষ্কৃত হইয়া দেখা দিয়াছে যে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি লইয়া পড়িয়া থাকিবার সময় আমাদের আর নাই।

এবারকার কংগ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা ত শুনিয়াছি—তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত্রি নিমুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘাঘের উপর দুই দলে মিলিয়াই যুগের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করিবে না—আর্য্যের পূর করিয়া তুলিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে। কিছুদিন হইতে গবর্মেণ্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে—এখন আর সিঁড়িমানের সময় নাই—যেটুকু উত্তাপ এত দিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের ঘরে আঁদন দিতেই নিমুক্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া “বন্দে মাতরম্” কাগজে স্বাধীনতার অভয়মন্ত্রপূর্ণ কোনো উলার কথা আর পড়িতে পাই না, এখন কেবল অস্ত্র পক্ষের সঙ্গে তাহার কলহ চলিতেছে। এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ ঝাঁড়াইয়াছে—চরমপন্থী, মধ্যমপন্থী এবং মুসলমান—চতুর্থ পক্ষটি গবর্মেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে ঝাঁড়াইয়া যুক্তি হারিত্তেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেই বয়। আমাদের নষ্ট করিবার জন্ত আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মূলিও নয় কিচনাদেরও নয়—আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা “বন্দে মাতরম্” ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিস্যাং করিতে পারিব।

শরৎ বহু দিনের পর আমাদের ওখানে দিশি রান্না খাইয়া এবং বৌঠাকুরাণীর শাড়িপরা শ্লিষ্টমুখি দেখিয়া ভরি খুশি হইয়া বেলাকে চিঠি লিখিয়াছে।

কারখানা ঘরের কাজ চালাইবার উপযুক্ত Engine lathe প্রভৃতির কথা তোমার চিঠিতে পড়িয়া বিশেষ লোভ জন্মিত্তেছে। আমি যেমন করিয়া পারি বোলপুরে টেকনিকাল বিভাগ খুলিব। ধন্যপাল আমাকে গোটাকতক কল দিতে স্বীকার করিয়াছে। তাহার কতকগুলি কৃষি-ব্যাপারের যন্ত্র আছে, একটা কাপড় কাচিবার আমেরিকান কল আছে। সে বলে আমি যদি টেকনিকাল বিভাগ খুলি তাহা হইলে আমাকে সাহায্য জোগাড় করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার condition এই যে এই টেকনিকাল বিভাগের নাম রাখিতে হইবে Indo-American Industrial School, আমি

শিলাইদহ

কাজের হয় তাহা হইলে আমেরিকার ঋণ স্বীকার করিতে আপত্তি করিব না। আচ্ছা, তোমাকে যদি হাজারখানেক টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাই, তবে স্বদেশকে দিয়া আমার Workshop-এ মাসমাসলা কিনাইয়া পাঠাইয়া দিতে পারিবে কি? এ-সম্বন্ধে তোমা উত্তর পাইলে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা দেখিব।

রথীর চিঠি প্রায়ই পাই। তাহার সেখানে আনন্দ ও উৎসাহে সঙ্গে পড়াশোনা করিতেছে। বলা বাহুল্য, তুমি আমেরিকায় গিয়া তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইবে—নিশ্চয়ই তাহার তোমাকে তাহাতে কলোজে টানিয়া লইয়া যাইবে। তোমার সঙ্গে আমিও জুটিতে পারি কত খুশি হইতাম। বৌঠাকুরকে আমার কথাটা শ্রবণ করাই দিও—সমুদ্রের এপারের কালো বন্ধুদের ভাগে হৃদয়ের একটা অংশ রাখিয়া দেন যেন। ইতি ২৩শে পৌষ ১৩১৪।

তোমার রবি

২৫

[ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১৭ ]

বা জ্যৈষ্ঠাব্দ ১৯১৩ ]

508 W. High Str  
Urbana, Illinois U. S.

ও

বন্ধু,

আমি অনেক দিন হইতে তোমার চিঠির জন্ত অপেক্ষ করিতেছিলাম। আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলাম না বন্ধুকে কোন স্তর কোথায় কেমন করিয়া কি পরিমাণে ছিন্ন হইয়াছে। এ দীর্ঘকাল এ সম্বন্ধে আমি নিরবচ্ছিন্ন বেদনা অনুভব করিয়াছি অবশেষে আমি এই কথাটি ঠিক করিয়াছিলাম যে আমাদের মাংসখা এই একটা মায়া, এই একটা ভুল বোঝার কৃয়াশা দেখা দিয়াছে ইহা সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া লড়াই করিয়া কোনো ফল নাই কিছু দি চূপ করিয়া থাকিলে পর ইহা আপনাই স্বপ্নের মত কাটিয়া যাইবে তাই আমার মনে ছিল দীর্ঘকাল প্রবাসবাসের পর যখন ফিরিব তৎ দেখিব মায়াবরণ মিলাইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমে আমি সমাদর লাভ করিব, একথা মনে করিয়া আনাই—যখন অসহ্য অবস্থায় শিলাইদহে বসন্ত যাপন করিতেছি তখন গীতাঞ্জলি হইতে আমার ছোট ছোট গান ইংরেজি গল্পে তত্ত্ব করিয়াছিলাম, ব্রহ্মজ্ঞের জন্ত মনে করি নাই সেগুলি কোনো ক লাগিবে—বিশেষত ইংরেজি ভাষায় আমার অধিকার সম্বন্ধে আ মনে লেশমাত্র অহঙ্কার নাই। দৈবক্রমে সেগুলি কাজে লাগিয়াছে তাহাতে আমার বিশেষ ভাবে এই আনন্দ যে যাহাযা আমাকে ভালবাসে তাহার গৌরব অনুভব করিবে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি সহসা এখানকার লোকের মনে একটা বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে—অনেকে বাংলা শিখিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে হয়ত তাহার একটা স্তম্ভল আছে। এদেশে আসিয়া আমি দুঃসাহসে ভর দিয়া ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে দুই একটা বক্তৃতা করিয়াছি, শিকাগো যুনিভার্সিটিতে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল সেই উপলক্ষ্যে সম্প্রতি আমি এখানে আসিয়াছি। আমার বক্তৃতা এখানকার লোকের ভাল লাগিয়াছে, আরো আমন্ত্রণ পাইয়াছি। কিন্তু বক্তৃতা করিয়া কেমনো আমার পক্ষে এতই ক্লান্তিকর যে, কি করিব ভাবিয়া



পাইতেছি না। আগামী এপ্রেল মাসে ইংলেণ্ডে ফিরিবাব কথা আছে। সেখানে ম্যাকমিলানরা আমার রচনা প্রকাশ করিবাব জন্য উজোগী হইয়াছে। আমার অনেকগুলি কবিতা এবং কিছু কিছু নাটক তজ্জমা করিয়াছি—সেগুলি ছাপা হইলে সমাদৃত হইবে এমন আশা আছে। এমনি করিয়া এখানকার গোলমালের মধ্যে দিন কাটিতেছে—বতই আদর অভাবনা পাই না কেন—মনের ভিতরটাতে একটা ক্লান্তির ভার অনুভব করিতেছি—দেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানকার অবাবিত আকাশ অপরাধান্ত আলোক এবং অনবচ্ছিন্ন অবকাশের মধ্যে নিমগ্ন হইবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রায়ই একটা উদ্বেগ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এখানে আমার কিছু কাজ আছে—সে কাজে ভঙ্গ দিয়া গেলে সেটা অত্যাশ হইবে তাই এই আবর্তের মধ্যে দূরীয়া বেড়াইতেছি। আশা করিতেছি, দেশে ফিরিয়া গিয়া আরো উৎসাহ ও শক্তির সঙ্গে আমার কাজে লাগিতে পারিব।

তোমার  
রবি

১৬  
১৫ মে ১৯১৩

C/o Messrs. Thomas Cook & Son.  
Ludgate Circus, London.  
15 May. 1913

বন্ধু,

তোমার বন্ধু Mrs. Boole-এর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তিনি তোমার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উৎস্রুকা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বয়স আশী পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার বুদ্ধিশক্তির স্ফূর্তি! তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি বিম্মিত হইয়াছি। Miss MacLeod আমাকে তাঁহার গুণানে লইয়া গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তোমার কি এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে? যদি এখানে একসঙ্গে মিলিতে পারিতাম ত স্বখের হইত। এদিকে আমার বোধ করি ফিরিবাব সময় কাছে আসিতেছে; এখানকার সামাজিকতার ঘূর্ণির টানে পাক পাইয়া আমার শরীর মন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানদের চিন্তাও আমাকে পাইয়া বসিয়াছে—তার অধিক দিন দূরে থাক! হৃদয় ক্ষতিকর হইতে পারে।

ইহার মধ্যে একদিন এখানকার সভায় "চিত্র"র ইংরেজি অনুবাদ গিয়া শুনাইয়াছিল। এখানকার শ্রোতাদের ভাল লাগিয়াছে। রাইবিশ থিয়েটারে আমার "ডাকঘর" নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

তবু এই খ্যাতি-প্রতিপত্তির বোঝা হাওয়ার মধ্যে মন টিকিতেছে। একটুখানি নিভৃতের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করিতেছি। তবু কাজগুলো কোনোমতে শেষ করিতে পারিলেই দৌড় দিব।

গত বারে দেবনের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। তাহাঁকে দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম।

তিনিরাছি, তোমার কাজ অগ্রসর হইতেছে এবং বাহিরের দিক দিয়া তোমার বাধাবিধ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। ফিরিয়া গিয়া আর অনেকটা পরিচয় পাইব, এই প্রত্যাশা করিয়া রহিলাম।

তোমার রবি

২৭

[ ১৪ এপ্রিল ১৯১৪ ]

শান্তিনিকেতন  
[ ১ বৈশাখ ১৩২১ ]

বন্ধু,

তুমি ত তোমার জয়যাত্রায় বেরিয়েছ—“শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তা” আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, তুমি জয়মালা বহন করে নিয়ে এসে তোমার দেশকে অলঙ্কৃত করবে, তুমি বিধাতার আশীর্বাদ নিয়ে গেছ। আজ পরলা বৈশাখ, আত্মকের নব বর্ষারস্তের উৎসবে আমি এই প্রার্থনাই করছি—এতদিন ধরে যে সোনার ফসল তুমি ফলিয়ে তুললে মহাকাঙ্গের তরুণী বোঝাই করে দেশে দেশান্তরে সেই ফসল প্রাণ বিস্তার করে দিক।

যদি সম্ভব হয় এবার একবার আমার বন্ধু রোটেনষ্টাইনের সঙ্গে আলাপ করে এসো। তিনি ত খুশি হবেন-ই, তুমিও হবে। আমি তাঁকে, তোমার কথা আগেই লিখে দিয়েছি। তুমিও তোমার পৌছা সবাদ তাঁকে দিয়ে।

বৌঠাকুরাণিকে আমার নববর্ষের সন্তোষ জানিয়ে।

তোমার রবি

২৮

[ সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর ১৯১৬ ]

বন্ধু,

তোমার চিঠি এখানে এসে পেলুম। জাপানে গেলে সুবিধা হ'ত, কেননা, সেখানে হাতে কতকটা সময় ছিল। কিন্তু এখানে এসে পৌঁছেই এমন প্রচণ্ড দরপাকের মধ্যে পড়ে গেছি যে, কিছুই ভাববার অবকাশ নেই—কেলট আমাকে টানটানি ছেঁড়াছেডি করে গেলে নিয়ে চলেছে। এখানকার মোড়ো বাতাসে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়বার জো নেই—বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয়েছে। অন্তত মার্চ মাস পর্যন্ত আমাকে এই ঘূর্ণির টানে স্রব থেকে সহরে ঘরিয়ে নিয়ে বেড়াবে। যাই হোক, আমি কোনো জায়গায় একটুখানি স্থির হয়ে বসবার সময় পেলোই তোমার গান লেখবার সময় করব। তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাকতে পারতুম তা হ'লে আমার খুব আনন্দ হ'ত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা হ'লে তোমার এই বিজ্ঞান-যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে, এই কথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আত্মকে তার স্মৃতির দিন এসেছে। কিন্তু এ ত তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ হ'তে চলে। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্ধোধন হয়—তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী করে দিয়ে বাবে—তার পর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চলেতে থাকবে। কত বার আমরা নানা মিথ্যার সঙ্গে জড়িয়ে কত মিথ্যা জিনিসের স্মৃতি করেছি—তার উপরে অজস্র টাকা ব্যয় করেও তাদের বাঁচিয়ে তুলতে পারিনি। কেবলমাত্র অভিমান দিয়ে ত কোনো সত্য বস্তু আমরা স্বপ্নন করতে পারিনে। কিন্তু এ যে তোমার চিরদিনের সত্য সাধনা—

যে মধ্যে যে আশানুরক ফলিত, আশানুরক পেতে—তুমি যে  
জন্মটা খবির হস্ত ভোমার হস্তকে তোমার অন্তরে প্রত্যেক সেক্ষেত্রে  
পেতে, এইজন্যে বাহিরে তাকে প্রকাশ করবার পূর্ণ অধিকার উপর  
তাকে দিয়েছেন। সেই অধিকারের ভায়ে আজ তুমি একলা  
লিখির তোমার মানসপত্রের বিজ্ঞান-সংবন্ধীকে সেরে ফর-পত্রের  
উপরে প্রতিষ্ঠিত করছ। তোমার মন্তব্য ৩৫%, তোমার তপস্যার  
ফল—সেই সেই আশার অঙ্গল হবেন, এবং প্রসন্ন হৃদয় হস্তে তার  
জন্তসেব নব নব রং লান করতে থাকবেন।

শেষে ফেরবার জন্তে মন ব্যাকুল হ'বে হয়েছে। এখনকার কাজ  
সেই হ'তে কত দিন লাগবে জানিবে। কিন্তু এইসকল উদ্ভাসে  
লাগিবার মত ঘুর বেড়াতে আর থাকিবে।

তোমার রবি

২১

[ অক্টোবর ৭, ১৯১৭ ]

কলিকাতা

বন্ধু,

এতদিন শরীরটা অত্যন্ত টেনসনে অবস্থায় ছিল—এখন ভাল  
ধরা শুরু হয়েছে। কানের উপরে এক পক্ষা পড়ি গেছে—ভাল  
ক'রে চমকে পাচ্চি। তার উপরে শরীর এমন স্বাচ্ছন্দ্য যে,  
প্রতিদিনের সামান্য কাজটুকু করবার জন্তে তাকে ঠেলাঠেলি করতে  
হয়। ডাক্তার বলছে, একবারে চূর্ণচাপ ক'রে থাকত। তাই  
এতদিন পরে চিঠি পড়বার ও চিঠি লেখবার জন্তে একজন সেফট্যারী  
রাখতে হয়েছে—সর্বদা নিজের কাছে কাছে একজন একজন লোককে  
লাগিয়ে রাখতে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে, কিন্তু আর উপায়  
নেই। এমিকে কনগ্রেসের সময় একটা কিছু বলবার জন্তে আমার  
উপরে অন্তরে বাহিরে তাগিদ এসেছে, কিন্তু কিছুকাল বিশ্রামের পর  
যদি ভাল থাকি ত চেষ্টা করব—এখনকার মত শ্রুগভীর নিষ্কণ্ণ্যতার  
মধ্যে ভুব মারব। কোনো নূতন যোগ্যার গেলে মনের বিকস্পিততা  
ঘটে, তাই শাস্তিনিকেতনে যাওয়া ঠিক করছি—সেখানে বিশ্রামের  
ছুটি—কেউ লোকজন নেই। বেলাকে ছেড়ে সেশী দূরে যাওয়ায়  
চলেবে না। কানটা আশা করি বিশ্রামের পরে আবার সতেজ  
হ'বে—না যদি হয় তা হ'লে বঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নেপথ্যে ম'রে পড়ব—

মামি তোর বৈঠা নে রে

আমি আর বাইরে পারলেন না।

নিবেদিতার বইয়ের সেই ভূমিকা লেখবার মত মনের সচেষ্টতা  
নেই। তোমাদের লেকচারের জন্তে করে তৈরী হ'ব তা বলতে  
পারিবে—বোধ হয় এখন থেকে কর্তব্যকে সর্গীর্ণ ক'রে এনে জীবনের  
একটা সীমা নির্ধারণ ক'রে নিতে হবে—এই সহজ কথাটা মনে রাখতে  
চেষ্টা করব—বা আমি পারি তার চেয়ে আমি বেশী পারিবে।

তোমার রবি।

“বার চোখ স্বন্দরকে দেখতে পেলে না আজন্ম, তার চোখের জ্ঞানাজ্ঞান-  
শলাকা ঘ'য়ে ঘ'য়ে ফাইয়ে ফেলালেও ফল পাওয়া যায় না, আবার যে  
স্বন্দরকে দেখতে পেলে সে অতি সহজেই দেখে নিতে পারলে স্বন্দরকে,  
কোন গুরু উপদেশ পরামর্শ এবং ডাক্তারি দরকার হ'ল না তার,  
সিঁদে অজ্ঞানই সে স্বন্দরজনকে চিনে নিলে।” —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

১ জানুয়ারি ১৯১৯

বন্ধু,

তোমার খুব কঠিন স্বকর্ম ছায়াশিল্পী হয়েছিল। আমার ৬  
লড়াই ক'রে ভাল থেকে ভাল বোধ হচ্ছে। সম্পূর্ণরূপে হতে যে  
হয় অনেক দিন লাগবে। ফেরলতা এক সুকণ্ঠী এখনে দুগুণে  
তার মধ্যে ফেরলতা তার সেরে উঠছেন—কিন্তু প্রকটী ৬৭  
জানবার কাশি আছে।

কিন্তু ফেরলতার মধ্যে একদিনও ইনসুরেক্টা হয়নি। আমার  
কিয়ার, তার কাশি, আমি ওদের বদার পক্ষিতক শীতল রোগ  
আসতি। ফেরলতার অনেকেই ছুটির মধ্যে বাড়িতে নিজের দুগুণ  
এক সজ্জারকের আভাষ থেকে এক ভেটী ভেটী দুগুণ-স্বাভাবিক  
এসেছে। তার ছিল, তার এখন এসে যোগ হচ্ছে—কিন্তু ওদের  
সে লক্ষণ বর্তমানে এক সাধারণ স্বরূপে এ বছর অনেক কমে। আমার  
এখানে প্রায় দুশো লোক, অল্প হাসপাতাল পাঠাই পূর্ণ শান্ত  
আছে—এমন করণও হয় না—তাই মনে ভাবছি এটা শ্রমের  
শীতলতার ফল হয়েছে।

অজিতের অস্বাভাবিকভাবে সাহিত্যের ক্ষতি হবে। তার ক  
ছিল—সে সম্পূর্ণ নিমিত্ত তার প্রবল পক্ষের বিকাশ এক প্রান্ত  
মাত্র বিকাশ নিজের মত প্রকাশ করতে পারত। ঠিক সময়ের  
সে স্বকর্ম আর কোন বাস লেখক আমার ত মান পড়ত না।

আমি নিজে কোন স্পষ্ট বামার পড়িনি—কেবল মনে মনে  
খুব একটা রাগি আমাকে ঢোপ দিবে—সেই পুনঃ পুনঃ ক্রান্তি  
আমার ছুটির দরবার। আমার দ্বারা বর্তমানে হতে পারে নানা ভয়ে  
তা করছি, এখন অন্তরে জন্তে জায়গা ছেড়ে দেবার সময় এসেছে  
নূতন লোক এসে নূতন ভাষায় নূতন কালের জন্তে কথা ক'রে থাট  
হতে আবশ্যিক—নিজের পালাটাকে তার সময় অতিক্রম করিয়ে ত  
ক'রে তেনে রাখটাই ভাল। ইতি ১৭ পৌষ ১৩২৫।

তোমার রবি

৩১

২৪ নভেম্বর ১৯২১

বন্ধু,

তোমার “অব্যক্ত”র অনেক লেখাই আমার পূর্ণ-পরিচিত  
এবং এগুলি পড়িয়া অনেক বারই ভাবিয়াছি যে, যদিও বিজ্ঞানবাণীর  
তুমি তোমার স্বরোবধী করিয়াছ তবু সাহিত্যসংবন্ধী সে পানদ না  
করিতে পারিত—কেবল তোমার অনুবোধনই সে অনাদৃত হ'ই  
আছে। ইতি ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮।\*

তোমার রবি

\* বিশ্বভারতীর সৌজন্তে।

অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁরা অপেক্ষা এক বৎসরের বড় ভাগিনের সত্যপ্রসাদ গল্পোপাখ্যান বাড়িতে একই কক্ষের নিকট অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষা পরিদর্শনের ভার রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথের উপর ছিল। সোমেন্দ্রনাথ সোমের ভাষাে কথিতা মাচুলা বাঙালী পড়াইরা সঙ্গত ও প্রতি আবৃত্তি করিতে মনস্ত করিয়াছিলেন। এই বাঙালী শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের অংশের উপকার হইয়াছিল তাহা বলিতেই হইবে। সোমেন্দ্রনাথ বালকসিগকে নানাবিধ শিক্ষা দিবার ক্ষমতা বিশেষ যত্নবিশিষ্ট ছিল। রবীন্দ্রনাথকে স্কুলোপস্থলের পূর্বে প্রসিদ্ধ বাঙালী কুস্তিগীর স্কটের স্কট জীয়া সি পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখিতে হইত। তার পূর্বে বাঙালী সাহিত্য, যুদ্ধবোধ, কাকবন, জামিত্রি, গণিত, জ্যোতিষ ও ভূগোল অধ্যয়ন, তাহাদের ছিল। বাড়ী আসিয়াই জ্যাকন ও জিম্নাসটিক, সন্ধ্যার পূর্বে সঙ্গত ও ইংরেজি। সন্ধ্যার চুটি ছিল না, শুধুমাত্র নিকট (বিশু চক্রবর্তী প্রভৃতি) কীটজীবি এবং বাড়ীর সামনে উদ্ভিদ-মৎস্যজীব পুষ্করিণীতে সন্ধ্যায় কীট-অভ্যাস করিতে হইত। ইহা ছিল হিসাবের মধ্যে। হিসাবের ছিল, মাঝে মাঝে সত্যনাথ তত্ত্বাবধানের নিকট গিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা। উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের যে 'কাকাল' বা 'কাকাল' বিবৃত করিয়াছিল, সেখানে কাকাল জমিন না। তার গারে বসিত হইয়া একটা কাকাল তাঁহাদের বাড়ীর 'পরিবার' যাবৎ 'কাকাল' আশ্রিত ছিল, তাহাদের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথকে অধিবাস্ত 'কাকাল' হইত ও বড় দিন কবি কে ছিলেন। ফলিত ও গণিত ইহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাঙালী ও প্রাচীন উপাখ্যানেরও তিনি ইহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখন সকল সমস্ত পরিবারের সত্যপ্রসাদ সত্যপ্রসাদের অগ্র প্রথম একটি পরিবারের ঘর থাকিত, রবীন্দ্রনাথের বাক্যবোধ, মানচিত্র ও হাটী জীয়া থাকিত (Terrestrial & Celestial) অর্থাৎ ভূমণ্ডল ও নবীনমণ্ডলের নীতিগত। বাড়ীর লোকের ঐ ঘরকে 'ইচ্ছল ঘর' বলিত। এটি ঘরন ছাত্রবৃত্তির বিশেষ শ্রেণিতে অবস্থান করেন। রবীন্দ্রনাথের সত্যপ্রসাদে বসন্তোৎসবের একদিন রবীন্দ্রনাথ একখানা বই চাতিতে গিয়া এমন সাধুভাষা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা আব কিছুদিন নর্মাল হইয়া পড়িত থাকিলে হইতো বা জন্মে বিস্তৃত সঙ্গত তাহাদের কথিত। এই আশংক্যেই মহর্ষি তাঁহাদের বাঙালী হইয়া কথিতা দিলেন। সত্যপ্রসাদের সাধুভাষা প্রয়োগের সঙ্গত। মহর্ষির সকল জিনিষ বেশ স্মৃতিশক্তি ও যথার্থ হইত স্মৃতিশক্তি ছিল। আচরণ, বেশভূষা ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে নিপুণ উপদেশ দিতেন ও কাহিনীতে ক্রিয় হইত তাহাদের বর্ণনা মনে স্মৃতিশক্তি বিস্তৃত হইতেন। এই শিক্ষার ফলে তাঁহাদের রচনা বিস্তৃত হইতেন। হিমালয় ভ্রমণান্তে মহর্ষি সোমেন্দ্রনাথের বাড়ী আসিয়া তখন বাড়ীময় একটা সাড়া পড়িয়া বাইত (শিল্পিত) রবীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' প্রঃ)। সে সময় যেমন ধূতির সহিত জী (চন্দ্র) না থাকিলে পরিচ্ছন্ন ভোজ্য হইত না, সেইরূপ রবীন্দ্রনাথের উপর জোকা না থাকিলে, এক বাহিরে বাইতে হইত। ও শুভভালা লপটা ছুতা পরিচ্ছন্ন অপরিহার্য ছিল। একলা টাউজারের সহিত বক-খোলা কোট পরিলে কামিজ

# রবীন্দ্রায়ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৬খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কলাবের সজিত দিনে টাই ও অপরাহ্ন হইতে বো পবা সত্যাত্মবাহী অপরিহার্য। মহর্ষি-পরিবারের পুঙ্কবো বাড়াতে সাধারণত ধূতির বসলে ইচ্ছের পরিচয় কিছু জিহ্বার উপলক্ষ ও সামাজিক অস্থান ধূতি অবস্থাই পরিচয় হইত ও এই নিয়ম সকল ঠাকুর বাড়ীতেই ছিল। মহর্ষির নিকট বাইবার সময় সকলেই ধূতির পান ফেলিয়া বাইতেন। অন্ধরে রবীন্দ্র-জন্মের মহর্ষির আত্মার তত্ত্বাবধানের জন্য পাকশালায় রাখতেন। কাজেই সত্যপ্রসাদের মনে একটা দারুণ সন্তোষ তাহা জাগিয়াছিল, বর্জ্যহাতিতে গিয়া তাহাতে তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়িল। এইবার রবীন্দ্রনাথের প্রতিমততা ইহা হইয়া পড়া আরম্ভ হইল। প্রথমে তিনি 'বেঙ্গল হ্যাণ্ডেইম' নামক একটি ফিরিস্তিপ্রধান ফুলে উত্তি হইতেন। সেখানে ইহা হইয়া বা ল্যাটিন বিজ্ঞানের সহিত ফুল-পালাদা বিজ্ঞান যথেষ্ট আদর হইয়াছিল।

১৮৭৫ মাস ১২৭১ ই ১৮৭৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথের উপনয়ন মহর্ষি-প্রবর্তিত অতুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। মহর্ষি কেবলনাথ সাবিত্রী-নীলা পুত্রদেব কর্তে নিয়াই কর্তৃত্ব হন নাই। তিনি তাহাদের বিস্তৃত উচ্চারণ ও তাহাদের অর্থ বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামেন্দ্রনাথের জ্ঞান দেবেন্দ্রনাথেরও বাঙালী দেশে প্রচলিত সাহিত্য উচ্চারণ বিস্তৃতবোধে মনঃপূত ছিল না। তিনি আনন্দচন্দ্র বোহাঙ্গবিশেষের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাহায্যে বিস্তৃত উচ্চারণ বোধ ও বোহাঙ্গ পুত্রদের শিক্ষা দেন। ভট্টাচার্য বি-এ পাশ করিয়া ইহা হইতে কৃতজ্ঞতা হওয়া রবীন্দ্রনাথকে ইহা হইতে পড়াইতেন। মহর্ষি বোহাঙ্গ ও অপরাহ্নে অর্জন পুত্রদের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরিবারের প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। উপনয়নের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠার সহিত নিজ গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতেন। ইহাই তাঁহার ধর্মজীবনের ও সাধনার সূত্রপাত। তাঁহার তরুণ মনে পূর্ব-স্মৃতিবিশেষে প্রভাব বীজ সর্বত্র অঙ্কুরিত হইয়াছিল এক পিতার দৃষ্টান্তে ও বাক্যে তিনি বিশেষ প্রভাবান ছিলেন। এমন কি, অল্পবয়সে ভয় পাইলে অল্পেই যন্ত্রোপবীত জড়হিয়া গায়ত্রীমন্ত্রজপে সে ভয় দূর করিতেন। সাংসারিক দুঃখকষ্ট দুঃখোগে ইহা মন্ত্রে মনোনিবেশ পুঙ্ক সে-দুঃখে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এই বিশ্বাস তাঁহার ভক্তিমাত্র পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। এইবার একবার কবিকে মহর্ষির সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইতে হয়। ভ্রমণকালটা বেশ একটু লম্বা বকমের হইয়াছিল। ইতিপূর্বে একবার মাত্র কবি কবিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন। ডেবু কবির ভয়ে তাঁহাদের কিছুদিন পানিহাটির এক বাগানবাড়িতে (ছাত্তাবাসের) আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এবার মহর্ষি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া এসাসে গিয়াছিলেন। প্রথমে কয়েক

দিন শান্তিনিকেতনে থাকিয়া তাহার পরে সাত্বেবগঞ্জ, দানাপুর প্রভৃতি স্থানে কয়েক দিন কাটাওয়া অমৃতসরে এক মাস থাকেন। সেখানে গুরুদ্বারা ও সর্ববর্নমন্দির এবং জাতিভেদশূন্য শিষ্যদের তথায় দিব্যাবিরাগ্নি আশ্রিত, ভজনগান ও আরাধনা মহর্ষির মনে দৃঢ় বোধাপাত করে। সেইরূপ বঙ্গদেশে একটি স্থান বা আশ্রম স্থাপিত দেখিতে তিনি উৎসুক ছিলেন কিন্তু সম্যক কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তথা হইতে ডালহাউসি পাঠাড়ে তাঁহার বক্তৃতাশিখরে পৌছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথকে কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত সঙ্গে সঙ্গে কিছু গণিত আর জ্যোতিষ পড়িতে হইত। মহর্ষি স্বয়ং তাঁহাকে পড়াইতেন।

চার মাস বাদে শ্রীঅববিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসকে লিখিত মহর্ষির একখানা পত্র ( হিমালয় বক্তৃতাশিখর ১৪ই আঘাট ১৭১০ শক ) হইতে জানা যায় “রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্রস্বরূপ তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি, তাহার প্রমুখ্যৎ এখানকার তাবৎ বৃত্তান্ত চুখকরূপে জানিতে পারিয়াছ।” এই জীবন্ত লিপিটি তাহার অমৃতচর কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়ের জিম্মায় কলিকাতায় ইতিপূর্বে আসিয়া পৌছায়। কলিকাতায় ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথকে আবার সেই বেঙ্গল স্ন্যাকাডেমিতেই বাইতে হইল কিন্তু যে স্বাধীনতার স্বাদ পাঠিয়াছে যে বন্ধন মানিতে চায় না। দীর্ঘকাল বন্ধন দশায় থাকিয়া পক্ষ না হইলে পিঞ্জরবন্ধুত্ব বিহীনমতে ধরিয়া আনিয়া পুনরায় পিঞ্জরে ভরিয়া দিলে সে পলাইতেই চায়। রবীন্দ্রনাথ স্থল হইতে নিঃশ্রমিত পলায়ন আবস্থ করিলেন। অভিব্যক্তিগণ সে কথা বুঝিয়া তাঁহাকে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে পাঠাইলেন।

১৮৮১ সালের ২৫এ ফাল্গুন চৌদ্দ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। এই সময় তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার গণপ কবনে তাঁহার বৌঠাকুরাণী জ্যোতিবিন্দু-পত্নী কাদম্বিনী দেবী। ইনি কলিকাতার খান্দানামা সঙ্গীতরসিক জগমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা ও শিক্ষার গুণে একজন বিদূষী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অমুরাগ ছিল। তৎকালীন যুগসাহিত্যপ্রবর্তক ও পরে রবীন্দ্রনাথের বৈবাহিক কবি-গুরু বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা ইহার প্রিয় থাকায় ইনি কবিকে বখেঁপে শ্রদ্ধা করিতেন। ইহার স্বহস্তে প্রস্তুত আসন পাঠয়া বিহারীলাল “সাধের আসন” লেখেন। ইনি রবীন্দ্রনাথকে বিহারীলালের কবিতার আদর্শ কবিতা লিখিতে উৎসাহিত করিতেন। ইনি সাহিত্য ও সঙ্গীতামুরাগী মাত্র ছিলেন না, স্বামীর উপদেশে অস্বাধীন বিজ্ঞান নিপুণ হইয়াছিলেন। কলিকাতার ও চন্দ্রনগরের রাজপথে বিচরণকালে এই অস্বাভাবিক দম্পতি তাঁহাদের সম্ভ্রম সামাজিকতার গুণে বহু সম্ভ্রান্ত প্রাচীনপন্থীরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। নূতন স্কুলে যাওয়াও রবীন্দ্রনাথের আচরণের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হইল না। ব্যাপার বুঝিয়া কতৃপক্ষ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। এত দিনে রবীন্দ্রনাথের মনস্বামন্য পূর্ণ হইল, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা পাঠিলেন। এই সময়ে তাঁহার গৃহশিক্ষকেরা তাঁহার অগ্রাঙ্ক বিষয়ে পড়াশুনা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অবশেষে কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শেকসপিয়ারের ম্যাকবেথ প্রভৃতি তাঁহাকে পড়াইতেন ও তাঁহাকে

স্থলে পড়া এই পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ তখনকার এনেটস ৭ দিলেন না। তখনকার ফোর্থ ক্লাসেই ইতি হইল। কি বয়সে তিনি অল্পপক্ষে কতটুকু লাভ করিয়াছিলেন দেখা সেই চৌদ্দ পনেরো বৎসর বয়সেই অতি সামান্য ইং অল্প সংস্কৃত, অল্প জ্যোতিষ, সামান্য অস্থি ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞা। শিক্ষা করিয়াছিলেন যাহা ধর্মবোধের মধ্যেই নয় কিন্তু মাত্র তাঁহার অসাধারণ ব্যাপ্তি হইয়াছিল।

তখন বাড়লা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে অতি অল্পই অপঠিত ছিল। বৈষ্ণব কবিতা ও মহাজন পদাবলী (রামপ্রসাদ রচনাবলী সমেত) প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইতে অক্ষয়চন্দ্র সরকার একটি স্কন্দর সংস্করণ বাহির করেন। রবীন্দ্রনাথ তাহা সাগ্রহে পাই করেন ও বিভ্রান্ত চণ্ডিদাস আনি সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালীন ‘বিবিধার্থ-সং পুরাতন কয়েক খণ্ড এবং প্রতি মাসে প্রকাশিত ‘জ্ঞানানুধ’ ও প্রাচীন ‘অবোধবন্ধু’, ‘বঙ্গদর্শন’ কবির মনের আহার যোগাইত। ইহা সেই সুর—যে সুর প্রাণে বাজিয়া বাজিয়া তাঁহাকে পরীক্ষার বিমুগ্ধ করিয়া তুলিল—সেই সুরই তাঁহাকে শিখাইল সাঙ্গীত শিখাইল কবিতা রচনা।

গুণেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ‘নল নাটকের’ মহলা দিব্য বাড়ির বারান্দার বেলায় দুরিয়ার দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ তখন তাহার সাঙ্গীত-লহরী আয়ত্ত করিতেন। বালক রবি দ শিখিতেন পাঁচালী দলগঠনকামী পিতৃ-অমৃতচর কিশোরীর নিকট। বন্ধু বৃদ্ধ ভীকণ্ড সিন্ধের নিকট, অগ্রজ জ্যোতি দাদার (নতুন দ নিকট অনিঃশ্রমিত ভাবে ক্রীড়ার ছলে, আর বৈশন্যহোগী ও নিকট। তাহার উপর বড় দাদা হারমোনিয়াম ও অর্গ্যান বাজাই জ্যোতি দাদা পিয়ানো ও বাজান, কত লোক গান করে—ইহাতে দিক হইতে সঙ্গীতে সাফলালাভ অপরিহার্য। স্বভাবত রবীন্দ্রনাথকে সকলেই গাহিতে বলিতেন, তিনিও তাহাতে অ ছিলেন না। তাঁহার গান শুনিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা ক নয় দশ বৎসর বয়স হইতে বাড়ার মাঘাৎসবে গায়কদের সহিত যোগদান করিতেন। তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে মৌল প্রভৃতি বিখ্যাত ওস্তাদদের গতিবিধি ছিল। সিপাহী-বিপ্লব লখনউএর নবাব ওয়াজেদ আলি শা সপরিবারে সপরি চিড়িয়াখানাসহ কলিকাতার অপর পাঠে মেটািবুকজে সরকারে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার আশ্রিত বড়ে মিঞা, ছোট মিঞা প্র সঙ্গীতবিদগণ এবং চিকিৎসক হাকিমগণ কলিকাতার অঙ্গ সমাজে বিশেষ সমাদরের সহিত আত্মত হইতেন। মার্গদর্শী মজলিশে প্রায় সকল বড়লোকের বৈঠকখানাও সর্বগমন ছিল।

রবীন্দ্রনাথের এক দিকে যেমন স্থল-পালানো বিজ্ঞা হইতেছিল, অল্প দিকে তেমনই সঙ্গীতবিজ্ঞাবিদদের এর চলার সাধনার অনুশীলনও চলিতেছিল। বিখ্যাত সঙ্গীত যহু ভট্টের ইচ্ছা ছিল যে স্রবণ রবীন্দ্রনাথ যেন ক রাগিণীতে তাঁহার ঘর এবং নাম বজায় রাখেন। সেদিকে ভট্টের সকল চেষ্টা কিরূপে তিনি এড়াইয়া চলিয়াছিলেন কৌতুককর কবিকাহিনী আমরা কবির নিজের মুখে একাধিক

রাম চলিতেছিল—যদিও তখন রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী কবিসংগের  
র অতিক্রম করিতে পারেন নাই, যদিও ছন্দবন্ধের  
র নিয়ম পদ্ধতি মনোমত ভাঙিয়া গড়িয়া লইতে বালক কবি  
না পারেন নাই। ললিত পদবিশ্বাস, রচনা-মাধুর্য ও ভাষার  
চ দখল অবধান করিয়াও কেহই কিন্তু বালকের ভবিষ্যৎ চিন্তা  
রা উচ্চাশা পোষণ করেন নাই। স্থূল ছাড়াই সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক  
রূপ মাননোপে তাঁহার গৌরবভার অনেক কমিয়া গেল।

বড় দিদি সৌদামিনী দেবী হতাশা জানাইলেন—“রবির কিছুই  
না” বলিয়া। কেত কেত অধ্যয়ণ করিলেন, গুরুজনদের তাঁহাকে  
প্রাণ করা পর্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন। কেবল একজন তাঁহার আশা  
চলেন না—তিনি জ্যোতিবিন্দুনাথ।

জ্যেব করিয়া রবিকে কোনো কাজ করানো যায় না, ইহাই তাঁহার  
চি। যত দিন তাঁহাকে জ্যেব জবরদস্তি করিয়া ঢালাইয়া লটবার  
ক্ষম অবশ্য হইতেছিল, তত দিন তাঁহার মন ছিল বেড়া ভাঙার  
এখন স্বাধীনতা পাটয়া তিনি সান্ত্বিতের মুক্ত বাগতে বিচরণ  
হে লাগিলেন। যে অন্তঃপ্রেরণা তাঁহাকে কাণে ব্রতী করিতে  
হ, ফল মন তাঁহাকে যে পুত্রী অনুসরণ করিতে বলিত, যে  
বিশ্ব জাতিবার জগা, পড়িবার জগা তাঁহার আকুল আগ্রহ জন্মিত,  
পাঠ্যপুস্তকে সেসবের সামান্যই সন্ধান থাকায়, তথায় উপস্থিতির  
তাৎসম্য সবই নষ্ট করিয়া দিত। ফল হইত এদিক ওদিক ভ্রমিকের  
নামই হইত না। এখন সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিল।  
ইছামতী পঠন, ভ্রমণ সবই হইতে লাগিল; তবে মাষ্টার পণ্ডিত  
না ছিল। এই সময়ে মোটোপলিট্যান ইন্সটিটিউশানের প্রাক্তন  
ইন্সট্রাক্টর ব্রজনাথ দত্ত ও ঐ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান পণ্ডিত  
ব্রজ ভট্টাচার্য বরীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন।

সমস্যা পণ্ডিত মহাশয় সেকালের নিয়মাবলী শৃঙ্খলা প্রভৃতি  
কাব্য পড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উদ্ভট শ্লোক ও কৌতুকজনক  
সংস্কৃত শ্লোকও ছাত্রকে মুখে মুখে শিখাইতেন। সে পরিচয়  
‘রাজা ও রাণী’তে দিয়াছেন। রাজা বিক্রমদেব ও দেবদত্তের  
পদ্যবাদের মধ্যে দেবদত্ত প্রথমে সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক শুক  
হই রাজা বাবা দেওয়ার দেবদত্ত বহুত করিয়া বলিলেন—

অনুস্বর ধনুস্বর নহে, মহাবাক্য,

কেবল টঙ্কার মাত্র! ত্রে বীর পুত্র,

ভয় নাই! ভালো, আমি ভাষায় বলিব।

‘স্বতন্ত্র ললিত বঙ্গভূমাদের জগা বরীন্দ্রনাথের অগ্রজেরা প্রসিদ্ধ।  
রাখও অসাদারণ সঙ্গীতপুণ্যের অধিকারী যেমন, অল্পবয়সেও  
দূর গায় তেমন অনলসাদারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বাহার  
বিখ্যাত বিক্রমের ভাষাখন মূল সংস্কৃত বাক্যটি নিয়ে দিলাম—

শাস্ত্রে স্ফটিকিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ঃ

স্বাধাধিতোহপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।

শাক্তে স্থিতাশি রমণী পরিবক্ষণীয়ঃ

শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতো কুতো বশিষ্ঠম্।

তদন্থাথ ঠাকুর প্রণীত ‘নবরত্নমালা’ গল্পে সন্নিবেশিত  
এই উদ্ভট শ্লোকের রচনা বরীন্দ্রনাথকৃত ছন্দে অনুবাদ দেখা  
সত্যেন্দ্রনাথের ‘বাল্যকাথ্য’ হইতে জানা যায় যে, যখন  
কি গণেশ্বর ও গুণেশ্বরের উত্তোগে ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত

হয় তখন বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার পণ্ডিতমণ্ডলীর নামসম্মিলিত  
নিয়মিত শ্লোকটি নাট্যমঞ্চের শিরোভূষণ হইয়াছিল—

ধ্বস্তবিক্ষিপণকামরসিঃশব্দঃ-

বেতালভট্টঘটকপর্বকালিদাসাঃ।

খাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়া

রত্নানি বৈ বরকচিন্ ব বিক্রমশ্চ ॥

বরীন্দ্রনাথ বহুদিন সংসারে নিঃসঙ্গ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ  
ভ্রাতা বৃধেশ্বরের শিশুকালে মৃত্যু হওয়ায় তিনিই জননীর ছোট ছেলে  
বলিয়া অত্যন্ত মাতুলস্নেহভাজন ছিলেন। স্বাত্র চৌদ্দ বছরের রবিকে  
বাথিয়া মায়ের লোকান্তর গমনে রবির লাগন-পালনের ভার তাঁহার  
বহুদিনকে লইতে হইয়াছিল। মাতুলবিরোগের দরুন সংসারের সচিত  
নিজের সখ্যকের কথা অরণ করিয়া পরিত্যক্ত বয়সে বরীন্দ্রনাথ  
লিখিয়াছিলেন যে, তিনি তখন সংসারে শেওলার মতো ভাসিয়া  
বেড়াইতেছিলেন। স্ততরা তিনি বহু মধো থাকিয়াও একা।  
এইরূপ নিঃসঙ্গ অবস্থাই তাঁহাকে অন্তর্মুখী করিয়াছিল। সঙ্গীতীন  
বরীন্দ্রনাথ যেমন প্রকৃতির সচিত স্নেহতাস্থাপনে যত্ববান হইয়াছিলেন,  
তেননি পুস্তককট সঙ্গী করিয়া পাঠে অধ্যবসায়ী ছিলেন। এই  
সকল কারণই তাঁহাকে নিজের রচনার মধো নিজেকে বিস্তার  
করিবার পাথে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। কিন্তু কেবল পারিপার্শ্বিক  
আবেষ্টনই একজন বরীন্দ্রনাথ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়, ইহা ভগবৎ-  
কৃপা ও অলৌকিক প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। তাই কবি বলিয়াছেন  
যে “কবিৎ ও লাজ” ভিতরে না থাকিলে টানাটানি করিয়া তাহাদের  
বাগির করা যায় না।

কবিতা রচনা চলিতে লাগিল। হোক তাহার মাত্র উচ্ছ্বাসের  
আবেগ, হোক তাহার কল্পনার অপরিমিত প্রতিকৃতি, হোক তাহার  
কায়স্থান ছায়ামূর্তি, ভাবের বাহন ভাষার উপর কবির অধিকার  
স্বতই বর্ধিত হইতে লাগিল। বরীন্দ্রনাথের পারমাধিক কবিতা  
শুনিয়া মহর্ষি হাসিয়াছিলেন। ভারতমাতা সধন্য কবিতায়  
‘নিকটের’ সহিত ‘শকটের’ মিল গুণেন্দ্রনাথ কোনো ক্রমেই মঞ্জুর  
করিতে না পারিয়া হাসির ঝড় কোন্ অজানা পাথে সে শকট  
উড়াইয়া দিরাছিলেন কিন্তু তাহাতেও কবির রচনা সমান ভাবে  
চলিতেছিল ও তিনি ভ্রমণঃ যে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন  
তাহার পরিমাণ যে কত তাহা কেহই জানিতে পারেন নাই—  
যতক্ষণ না জ্যোতিবিন্দুনাথের ‘সর্বোজিনী’ নাটকের প্রথম সংশোধনের  
সময়ে (১৮৭৫ সাল) বরীন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইয়া  
জয়ব্রত পালনের দৃষ্টে জ্যোতিবিন্দু-লিখিত গল্প বক্তৃতার  
স্থলে একটি গীত সন্নিবেশ করিয়া দুগুটির গাছায় ও সামঞ্জস্য রক্ষা  
করিয়াছিলেন। গীতটি বরীন্দ্রনাথের অতি অল্প বয়সেই ও অত্যন্ত  
সময়ে রচিত—

অল্ অল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ

পরাণ শপিবে বিধবা বালা।

ইহার পব রবিকে জৈনা (জ্যোতিদাদা) নিজের দলভুক্ত  
করিয়া লইলেন। অতঃপর জৈনা পিয়ানো বাজাইয়া হিন্দী সুর  
ভাঙিয়া নানারকম গৎ প্রস্তুত করিতেন। সেই সময়ে তাঁহার বন্ধু  
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও বরীন্দ্রনাথ দুইজনে দুই পার্শ্বে বসিয়া সেই  
সকল গানের সুরে গান বাঁধিতেন; ইহারই ফলে জ্যোতিবিন্দুর

‘মানমরী’ (পরে পূর্বদক্ষ নামে প্রকাশিত) গীতিনাট্যের সৃষ্টি। জ্যোতিবিন্দুনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীও গানের সুরে কতকগুলি গান বাঁধিয়াছিলেন। ইহাদের এই গান রচনার পদ্ধতিটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাধারণত আগে গানের কথা রচিত হয়, পরে তাহাতে সুর সংযোজ হয়, ইহার উল্টা দিকে আবর্ত্ত করিলেন। আগে গৎ বা সুর প্রস্তুত হইত, তাবপর সেই সুরের উপযোগী ভাষা রচনা করিয়া গান রচিত হইত। গুনিরাছি, ইহাই পশ্চিম-ভারতের অনুমোদিত প্রথা।

এইটাই ছিল ঠাকুরবাড়ীতে পরিবর্তনের যুগ। মহর্ষি নিজের স্বদেশিকতায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, কাজেই সকলেই সেই ভাবে ভাবান্বিত হইতেন। মহর্ষি মাতৃভাষায়ও শ্রীকৃষ্ণ সাধনে বহুশীল ছিলেন। একবার তাঁহার কোনো আত্মীয় তাঁহাকে ইংরাজিতে পত্র দেওয়ার মহর্ষি সেই পত্রখানি অপঠিত অবস্থায় ফেরৎ দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—যে কোনো দেশের দুই জন লোক যখন এক জায়গায় জড়ো হয়, উপস্থিতি থাকে, তখন তাহার মাতৃভাষাতেই কথা কয়। স্বজাতীয়কে পত্র লিখিতে প্রত্যেক দেশবাসী মাতৃভাষা ব্যবহার করে। বাঙালী আত্মীয় বাঙ্গালাকে চিঠি দিবে অবশ্যই বাঙলায় এবং তলানীস্থান পরাধীনকরণকারী অনেকেই যখন স্বীয় আত্মীয়কে ইংরাজিতে পত্র লিখিতেন, তখন সে সবাদ পাঠিলে মহর্ষি দুঃখিত হইতেন। বেশভূষায়, সাহিত্যে, গানে, নাট্যে, চিত্রে, ধর্মে স্বদেশিকতা বিস্তারিত করিয়া সর্বপ্রকারে নানাক্রম পরিবর্তন চলিতেছিল। ‘শ্রীমদ্ভাল নবগোপাল’ নামে খ্যাত নবগোপাল মিত্র ‘রাজনারায়ণ বসুর পরিকল্পনা’ বাস্তবে পরিণত করিবার নিমিত্ত যে ‘চৈত্রমেলো’ (পরে নাম হয় হিন্দু মেলা) স্থাপিত করিয়া স্বদেশী শিল্পে নতুন প্রাণ জাগাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, ঠাকুরবাড়ী সর্বতোভাবে তাহাতে সহায়তা করিতেছিল। সকল অন্তর্ধান ও প্রতিষ্ঠানের নামের সহিতই ‘শ্রীমদ্ভাল’ (জাতীয়) আখ্যা প্রদান করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ‘শ্রীমদ্ভাল নবগোপাল’ বলিত। আর তিনি পাড়ায় পাড়ায় তরুণদের সংঘবদ্ধ করিয়া জিম্‌ক্লাসটিক চর্চার আশ্রয় করিয়াছিলেন ও সর্বদা বহুতায় ব্যারামের উপযোগিতা ঘোষণা করিতেন। তাই তাঁহাকে Father of physical culture in Bengal বলিত। বাঙালার কতৃৎ স্ত্রী-পুরুষে মিলিত বান্ধবী খেলাঘরের সাহায্যে তিনি সার্কাসের দল গঠন করেন, সেজ্ঞা তাঁহাকে বাঙালী সার্কাসের প্রবর্তক বলা চলে। তিনি একটি অশ্বশালা রাখিয়া ঘোড়ার চড়া শিখিবার ‘রাইডিং স্কুল’ করেন। সেখানে বিলাত যাত্রার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপনা অভ্যাস করেন। নবগোপাল পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি লাইসেন্স অফিসাররূপে বহু দিন কার্য করিয়াছিলেন।

এদিকে সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদামিনী দেবী বোম্বাই হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সায়া, শেমিক, জ্যাকেট প্রভৃতির সাহায্যে বঙ্গ মহিলার বেশভূষার মনোজ্ঞ পরিবর্তন আনয়ন করিতেছিলেন। আবার ওদিকে ‘নবনাটকের’ অভিনয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যে ভাবে অভিনেতাদের পোষাক পরাইয়া মঞ্চে অবতীর্ণ করান, সেই ভাবেই পোষাক পরিধানের রেওয়াজ বাঙলায় ক্রমে ক্রমে বাঙালী পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া যায়।

জ্যোতিবিন্দুনাথ দুখকাব্য যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তন যুগের মাঝখানে আসিয়া পড়ায় তাঁহার

রচনা শ্রীকৃষ্ণদাস সম্পাদিত ‘জ্ঞানানুধর ও প্রতিবিম্ব’ এক বিহারীলা ‘অবোধবন্ধু’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার গল্প রচনা ‘ভুবনমোহিনী প্রতিভার সমালোচনা’ ও জ্ঞানানুধর প্রথম বাহির হইয়াছিল। জ্ঞানানুধরে যে বাঁধা বাঁধিয়াছিল তাহা বন্ধ হইল না, তাহা মধুরতর হইয়া বাকুত। ইহার পরেই জ্যোতিবিন্দু পরিকল্পনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ‘ভারতী’ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন ইহাও লেখকদের এক জন। তাঁহার বয়স তখন দুই বোলে। ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘনাদবধ সমালোচনা’ প্রকাশিত হয়। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ সমালোচকের সহিত একমত না হইয়া পাদটীকায় নানাবিধ মন্তব্য করেন। ইহাতেও রবীন্দ্রনাথের অসন্তোষ হয় নাই। যোগেন্দ্রনাথ চূড়ামণি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় (ভারতী মেঘনাদবধ) প্রতিবাদ ও আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। প্রথম বঙ্গ শ্রাবণ ১২৮৪ হইতে ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের দুইটি প্রবন্ধ, বাহ্য কবিতা, ছয়টি সমালোচনা, প্রথম উপন্যাস ‘করুণা’ কিংবা ‘ভিখারিণী’ নামক বড় গল্প ও ‘কবিকাহিনী’ কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন এই পত্রিকার ‘সম্পাদকীয় বৈঠক’—এই নামে কলিকাতা রচনা প্রকাশিত হয়। প্রথম পুস্তিকাধারে মুদ্রিত রচনা মধ্যম্বে কেত বলেন ‘কাল যুগল’ গীতিমালা, কেত বলেন ‘বঙ্গ কাব্য উপন্যাস, কিন্তু কবি নিজে বলিতেন যে যখন তিনি অমলো তাঁহার মেজদাদ সত্যেন্দ্রনাথের নিকট ছিলেন, তখন তাঁহার প্রবোধকল্পে যোগ প্রথম বঙ্গবীর ভারতী হইতে ‘কবিকাহিনী’ পুনর্মুদ্রিত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহা ১ শালের কথা। পুস্তিকাধারে মুদ্রিত ইহাও তাঁহার প্রথম রচনা ইহার পূর্বে কবির ‘স্বতন্ত্র বিলাপ’ কবিতা চৈত্রমেলার প্রকাশ। তাঁহার সেজন্যদা সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত হয় এবং চৈত্র উপহাররূপে আর একটি লখ্য কবিতা তাঁহার নামে মুদ্রিত বিস্তারিত হয়। কবির প্রথম উপন্যাস ‘করুণা’ কোনো দিন গদ্য না হওয়ায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। দ্বিতীয় পুস্তক ‘করুণা’ ১২৮৬ সালে ‘জ্ঞানানুধর ও প্রতিবিম্ব’ (রাজসাহী) হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া তাঁহার অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল সাধারণে জানে, সোমেন্দ্র বিবর্ত্ত-মস্তিষ্ক ছিলেন কিন্তু তিনি নিজ সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার একটি গীত নিয়ে উদ্বৃত্ত করিয়া দিলাম।

ললিত আড়াঠেকা

দেখিতে তরঙ্গময় ভব পারাবার

তরঙ্গ সে কিছু নর আতঙ্কই সার।

অসীমের ভাব বত

সদয়ে আনিবে তত

কম বড় বয়ে যাবে

হুসু তরণটির মত দেখিবে সমার।

কম বড় বয়ে যাবে

সদয়ে অটল হবে

কি ভয় কি ভয় তরে ?

অতিক্রমি দুঃখ-শোকে

অনন্ত অনন্ত লোকে

নিরশিবে অনন্তের মহিমা অপার।

সত্যেন্দ্রনাথ পারিবারিক সাহিত্য ভাবধারার মধ্যে বহু হইয়া ও সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া স্বেচ্ছাভিজ্ঞ থাকায় তাঁহার সাহিত্য জীবনের প্রথম উন্মেষ ও কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহার রচনার এক প্রকার পারিবারিক সাহিত্য বলা চলিতে পারে। প্রভিন্স বিকাশের দ্বিতীয় স্তর পরে দেখানো হইতেছে। [ ক্রমশঃ

# তামসী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

জরাসন্ধ

ক'দিন পরে সকালের ডাক দেখতে গিয়ে একটু আশ্চর্যই হলেন তালুকদার। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র তাঁর বড় একটা থাকে না। হাঙ্ক একেবারে একসঙ্গে ছ'খানা। একখানা লিখেছেন দেবতোষ—কালকাতায় এসে আত্মনা নিয়েছি। ক'দিনের মধ্যেই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শুরু করবো, এই বকম সদিচ্ছা আছে। শুধু পুরী স্টেশনের নয়, মাদ্রাস, মহাবলীপুরম পক্ষিতীর্থম, চাই কি গুম্বদম পর্যন্ত দাওয়া করতে পারি, মা-ও হয়তো সঙ্গে যাবেন। ঋণঃ দস্তুরমত তীর্থ পবিত্রতা। কবে ফিরবো, জানি না। আপনার কথা প্রায়ই বলেন—ইত্যাদি। দ্বিতীয় চিঠিখানা হুঁচকিতার ছায়া পড়ল মহেশের মুখে। থানিকক্ষণ কী ভাবলেন। তার পর প্যাড টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন।

দিন চারেক পরে সকালের দিকে ওদের বাসায় যখন পৌঁছলেন তালুকদার, দেবতোষ ঘরেই ছিলেন। বেরিয়ে এসে বললেন, পাগলটা কি বলুন তো দাদা! পর পর ছ'খানা চিঠি! তালুকদার বললেন, একখানায় ভরসা হল না। যদি হঠাৎ কসকে দি? একটা জরুরী কাজে বেবোতে হবে তোমাকে নিয়ে। আমার তীর্থযাত্রা হয়তো ছ-চারদিন পেছিয়ে যেতে পারে।

দেবতোষ কিছু বলবার আগেই স্থলোচনা এসে পড়লেন। ইমার পুজার ঘর থেকে বেরিয়েছেন। শাস্ত্র সন্মত মুখখানার পর একটি শুচিস্তব্ধ তন্ময়তা তখনো যেন লেগে রয়েছে। হুঁচকিতার মুখে প্রণাম করতেই বললেন, বাসো বাবা, আগে আমার খাবারটা নিয়ে আসি। আমি সব গুছিয়ে রেখেছি। দেরি যেন। তালুকদার বললেন, খাবারটা এখন থাক মা! ওটা ফিরে এসে ধীরে-স্বস্তে হবে। তার আগে, অনুমতি করেন তো আপনার এই ছেলেটিকে একটু খাটিয়ে নিয়ে আসি।

—সেজন্তে আবার অনুমতি কিসের বাবা? তুমি বড় ই; দরকার হলে ওর কান ধরে নিয়ে যাবে। আমাকে বলতে বকেন?

দেবতোষ গভীর ভাবে বললেন, দরতে হলে বা কানদে ধরবেন, মা!

—কেন, ডানটা কি অপরাধ করল?  
—ওটা মা আর নিতাই পণ্ডিত মশাই হুঁজনে মিলে এত শিখেন যে আঠারো বছরেও তার ব্যথা মরেনি।

মিলিত হাসির শব্দে ঘর ভরে গেল।

বেরোবার মুখে স্থলোচনা বললেন, তুমি কোথায় উঠেছ, মহেশ?

প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতে পেরে তালুকদার বললেন, যেখানেই উঠি, দুপুরবেলা মায়ের প্রসাদ পেয়ে তবে যাবো। সেজন্তে ভাববেন না।

স্থলোচনা খুসী হয়ে বললেন, কিন্তু ফিরতে যেন অনেক দেরি করে ফেলো না।

পাথে আর বিশেষ কোনো কথা হল না। শিয়ালদ ঠেঁশনে বেলে চড়ে ওরা নামলেন এসে বেলঘরিয়ায়। সেখান থেকে রিক্সা নিয়ে থানিক বাদে গলির মধ্যে একটা একতলা বাড়ির সামনে গিয়ে কড়া নাড়লেন। খুলে দিল একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের বিধবা মেয়ে। ওরা ভিতরে ঢুকতেই প্রণাম করে মহেশের পায়ের ধূলা নিল। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছে শান্তি?

—জরটা একভাবের চলেছে।

—চলো, দেখে আসি।

পাশেই একখানা ছোট ঘর। তক্তপোলের উপর একটি মেয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে। বয়স বোধ হয় সাতাশ, আটাশ। রোগজীর্ণ শীর্ণ দেহ। মাথার কাছে বসে একটি অল্পবয়সী মেয়ে আস্তে আস্তে হাওয়া করছে। পায়ের দিকটার একখানা টুলের উপর বসে একজন বয়ীসী। মহেশ বাবুকে দেখে হুঁজনেই উঠে দাঁড়াল এবং ছোট মেয়েটি এগিয়ে এসে প্রণাম করল। ডাক্তার রুগীর দিকে তাকিয়েছিলেন; মহেশ ইংবাজিতে বললেন, এই মেয়েটির চিকিৎসার ভার তোমাকে নিতে হবে, দেবতোষ! এই জন্তেই তোমাকে নিয়ে আসি। কই, উমা কোথায় গেল?

—এই যে, বাই, বলে এগিয়ে এল সেই বিধবা মেয়েটি।

তালুকদার বললেন, ইনি ডাক্তার। যা জিজ্ঞেস টিক্সেস করেন, সব বুঝিয়ে দাও। এখন থেকে উনিই ওকে দেখবেন। তুমি তা হলে যা দেখবার দেখে নাও দেবতোষ! তার পর কথা হবে। আমি ওদিকে আসি।

রোগিণীকে মোটামুটি পরীক্ষা করবার পর ডাক্তারকে ভিতরের দিকের বারান্দার মহেশ বাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। একটা মোড়ার উপর তিনি বসে আছেন, আর তাঁর সামনে দেয়ালের ধার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সাত-আটটি নানা বয়সের মেয়ে। সকলের

পরনেই মোটা তাঁতের সাদি, আর তাঁতে-বোনী ছিটের তৈরি জামা। পাশে একটা খালি মোড়া পড়েছিল। তার উপর দেবতাকে বসতে বলে মতেশ প্রসন্ন করলেন, কেমন দেখলে তোমার কণী ?

—টাইফয়েড বলেই মনে হচ্ছে। একটা শ্লাইড না নিয়ে ঠিক বলতে পারছিলাম। আগে জানলে ও সব সবসময় নিয়েই বেরোনো যেত।

—আমার কি সে সব পেয়ালা ছিল ?

উমা বলল, আনাদের ডাক্তার বাবুকে খবর দিলে রক্ত নেবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন।

—তিনি এখনো রক্ত নেননি ? একটু বিস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলো দেবতায়।

—না। বলে গেছেন, অল্প ডাক্তার এসে রক্ত নিতে চাইলে, যা কিছু দরকার পাঠিয়ে দেবেন।

তালুকদার বললেন, তিনি হচ্ছেন হোমিও। হোমাদের এই সব রক্তারক্তির মধ্যে নেই।

—তিনিই বৃষি দেখছিলেন ? জানতে চাইলেন দেবতায়। তালুকদার বললেন, হ্যাঁ। তাঁর ওষুধে বিশেষ কাজ হল না দেখে ছেড়ে দিয়েছেন। সেট খবর পেয়েই তো তোমাকে নিয়ে এলাম।

হোমিও ডাক্তারকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হল। তালুকদার বললেন, ততক্ষণ চল, তোমাকে সবটা পরিচয় নিয়ে আসি।

বারান্দার কোলে উঠান। তার খার বৈশে একখানা লম্বা দরজার টিনের চালা। এক দিকে খান চারেক তাঁত আর তার সবসময়, আর এক দিকে দুটো সেলাই-এর কল। কোণের দিকে উল বোনার সবসময়। তাঁতগুলোতে টানা চড়ানো। তোয়ালে, গামছা বিছানার চাদর, আর একটাতে মনে হল সাড়ী। মেসিন হুঁটাতে আটকে আছে আন-সেলাই জামা। দেখে বোকা যায় সব গুলোতেই কাজ চলছিল। যারা করছিল, এই মাত্র উঠ গেছে। পাঁচিলের ধারে একটা ছোট চালায় দুটা ঢেঁকি। একটাতে ধান ভানা হচ্ছে। তার সামনে গোবর-নিকানো আস্তিনায় বসে একটি বুড়ী ডালের বাড়ি দিচ্ছে। চোখে ভালো দেখতে পায় না। একটি মেয়ে কানে কানে কী বলতেই আনন্দে কলরব করে উঠল, কৈ, কৈ, আমার বাবা কোথায় ? আচ্ছা কত দিন দেখিনি। মেয়েটি আবার ফিস-ফিস করে কি বলল। বুড়ী খুসী হয়ে খুঁকে পড়ল আগের কাজে।

খিড়িকের দরজা পার হয়ে ওঁরা পড়লেন গিয়ে বাগানে। কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ভিষে তিলক জমি। ছোট ছোট প্রট করে শাক-সবজির চাব হচ্ছে। বেগুন কুমড়া, লাউ-এর মাচা। একখানা ক্ষেতে দুটি মেয়ে পুঁই-এর চারা লাগাচ্ছে।

তালুকদার চলতে চলতে দু-একটা কথা বসছিলেন। দেবতায় শুধু দেখছিলেন বিষয়বিষয় চোখ মেলে। বারান্দায় ফিরে এসে বসতেই উমা একখানা খালার উপর হুঁ গোলাস ডাবের জল নিয়ে ধল্ল ঝুঁদের সামনে।

তালুকদার বললেন, তোমাদের নতুন গাছের ডাব বৃষি ?

—হ্যাঁ এই প্রথম পাড়া হল।

—কাকে দিয়ে পাড়ালে ?

উমা জবাব দিল না। দেবতায় লকা করলেন, সলজ্জ হাসিতে

তার মুখখানা ভরে উঠেছে। বোকা গেল, কান্নাট সে নিজেরই করেছে কিংবা ওর মত কাউকে দিয়ে করিয়েছে। যে মেয়েটি রুগীর মাথা হাওরা করছিল বেরিয়ে এসে বলল, শাস্তিদি' আপনাকে একবা ডাকছে, কাকাবাবু।

তালুকদার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, চল যাচ্ছি।

ওঁরা দুজনেই উঠে এলেন। কাছে এসে দাঁড়াতেই কম্পি হাতখানা ধীরে ধীরে পাটের পাশ দিয়ে নামিয়ে দিল শাস্তি। মত ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, থাক থাক। অস্ত্রের মধ্যে কি প্রশংসা করতে আছে ? আমি এমনই তোমাকে আশীর্বাদ করছি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো।

শাস্তি স্বীর্ণ কণ্ঠে থেমে থেমে বলল, আমি আর বাঁচবো না কাকাবাবু !

—পাগল ! তাহলে এদের দেখবে কে ? এই তো ডাক্তার বলাছেন, ভয় পাবার মত কিছুই হয়নি। শুধু অতিরিক্ত খেতে আ অনিয়ম করে করে এই অসুখ ডেকে এনেছ।

শাস্তি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল। অতি কণ্ঠে হাতখান কপালে ঠেকিয়ে কী একটা বলতে গেল। দেবতায় এগিয়ে এ হাতটা ধরে ফেলে বললেন, থাক আর কথা বলবেন না। নিয়মি ওষুধ পস্তর খেলে ক'দিনেই আপনি ভালো হয়ে যাবেন।

শাস্তির চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে উঠল।

ফিরবার পথে পাশাপাশি বিজয় বসে দু'জনেই অনেকক্ষণ নিজে নিজের চিন্তায় ডুবে বইলেন। ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে প্রথম মো ভঙ্গ করলেন তালুকদার। বললেন, মেয়েটাকে টেনে তুলতে যার লাগবে। কি বল ?

—তাইতো মনে হচ্ছে।

—তাহলে ? তোমার তাঁথি যে সিকয়ে উঠল।

দেবতায় হেসে উঠলেন।

—ও কি, হাসলে যে ?

—হাসবার কথা যে, দাদা ! এত দিন কোনো কাজেই আপনাদের লাগিনি। কখনো লাগতে পারি, সে আশাও কোনো কা ছিল না। আজ যদি হঠাৎ সে সুযোগ এসে থাকে, তার চেয়ে তীব্র নাম করে টো-টো করে ঘোরাটাই কি আমাদের বড় হল ?

—শুধু তোমার কথা নয়, মার কথাও ভাবছি।

—মা তো যাচ্ছিলেন শুধু আমাকে আগলাবার জন্যে।

—কি রকম ?

—কি জানি ? ওঁর হঠাৎ মনে হল আমাকে এবার কাছে কা রাখা দরকার।

মহেশ ওঁর মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বইলেন। ডাক্তার মুহু হেসে বললেন, আমাদের যে একটা কাজ ছুটে গেল, এতে বোণ ! উনি খুশীই হবেন। আমাকে নিয়ে আজ-কাল ওঁর বেজায় ভাবনা বলে জোরে হেসে উঠলেন।

তালুকদার যোগ দিলেন না। চিন্তিত মুখে মাথা নে বললেন হ'।

মেজের কামরায় একদম ভিড় নেই। দু'জনে আবার গি বললেন পাশাপাশি। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ক'টি আছেন জো ?



—কেন? আর থাকবার দরকারটা কি?

—আমার দিক থেকে কোনো দরকার নেই। পেশাটো আমি একলাই সামলাতে পারবো। Blood reportটা যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে পাওয়া যায়, কাল সকালেই আবার সেতে হবে। আশ্রমের নামটোম তো দেখলাম না। বাড়িটা আবার চিনতে পারবো তো?

—আশ্রম কাকে বলছ?

—তবে কী দেখে এলাম? হোম-টোম জাতীয় কিছু? ঠিকজিহ্নে যাকে হোম বলে, 'আশ্রম' হল তারই বাংলা নাম।

—না হোমও নয়, আশ্রমও নয়। বলতে পার আশ্রয়। ওরা মর Ex-Convicts.

—Ex-Convicts! ডাক্তারের চোখ দুটো বিষয়ে বিস্মৃত হল।

—হ্যাঁ। তোমার আমার মত ভদ্রবরেই ওদের কম। সঠিকানই মানুষ। তার পর একদিন ছিটকে এসে পড়ল জেলখানায়। কিন্তু জান তো, আমাদের দেশে বাবা মেয়েমানুষ হয়ে জন্মায়, তারা যদি কোনো কারণে এক বার ঘরের বাইরে এসে পড়ে, সে আর ফিরে যেতে পারে না। বেরোবার বাস্তা আছে, চুকবার দরজা নেই। দ্রোণ তাই আর ঘরে ফিরতে পারেনি। যে গিয়েছিল সেও জায়গা পায়নি। এমন আরো কত আছে! কে তার খোঁজ রাখে?

শেষের কাটি কথায় কেমন একটা উদাস স্বর লেগে রইল। বাড়ার বাইরে বৌদলীশ মার্চের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তালুকদার। প্রজার একটু ক্ষুদ্র কর্ণে বললেন এদের কথা তো কোনো দিন হলেন নি, দাদা!

—তখন কোনো উপলক্ষ হয়নি। আর, বলবার মত আছেই কি? তবে এবার যখন তোমাকে এর মধ্যে আসতে হল, তখন আরে ঐ কি? সব কথাই বলবো।

তালুকদার যে মেসার্সে উঠছিলেন, দেবতায় নিজে গিয়ে স্থান থেকে ওর বিজ্ঞান আর স্টেকেসটা নিয়ে এলেন। কোনো দাপট সুনলেন না। দোতলার বারান্দায় একটি সজ পাট-রঙ্গ সতরঞ্চি বিছিয়ে রেখেছিলেন সুলোচনা। তার উপরে টি কালব দেওয়া তাকিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার পর হুঁজনে ধান্দে আশ্রয় নিলেন। ডাক্তার হঠাৎ বলে উঠলেন, এ, মস্ত ভুল যে গেছে দাদা! আপনার সিগারেট তো আনা হয়নি?

তালুকদার পকেটে হাত দিয়ে বললেন, তোমার ভরসা করে তো গিনি, যে ভয় দেখাচ্ছে। আমার স্বপ্ন আমার সাথেই থাকে। ঐটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ধোঁয়ার রস তো পেলে না, ভায়া! যে কী বস্ত্র, জানবে কেমন করে?—বলে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে গেলেন। ডাক্তার কী একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। র মনে হল সেই রিংলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে যেন তারই খুঁটিনি নিবিষ্ট হয়ে গেছেন। এমন করে কেটে গেল অনেকক্ষণ। বিপর গলাটা এক বার পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন তালুকদার, জি থেকে তের বছর আগেকার কথা। নতুন প্রমোশন পেয়েছি— ঐ থেকে পুরোপুরি জেলের। ছোটখাটো একটা জায়গায় থাকতে যা, এই আশাই করেছিলাম। হঠাৎ হুম করে বদলি করে দিল ঐটা মস্ত বড় ফার্স্ট ক্লাস ডিস্ট্রিক্ট জেলে, সেখানে যজ্ঞাট লেগেই য়ি। বড় দায়িত্ব পেলাম। সরকারের উপর কতজ্ঞ হবার কথা।

কিন্তু আমার হল প্রাপ্য। সারা দিনরাত খেটে যখন বাসায় ফিরি, দেখে সাড় নেই, মন থাকে খিচড়ে।

এক। তার সঙ্গে কোন দিন হুঁ একটা কথা হয়, কোনো দিন হয় না, ছেলে ছোট ছোট ছোট। তাদের সঙ্গে দেখাই হয় না। বাইরে স্বস্তি নেই, ঘরে শান্তি নেই। এমনি করে দিন যায়। এমন সময় এক দিন জেলে একটি নতুন কয়েদীর আমদানি হল। মেয়েমানুষ। কিন্তু গেটে এসে যখন পাঁড়াল, মনে হল এক বলক বলন্ত আশুন। আশুনের অনেক রূপ। কখনো সে তুলসীতলার সফাদীপ, কখনো দেওয়ালির আলোকমালী, কখনো আবার সর্বগাসী দাবানল। মেয়েমানুষের রূপটাও বোধ হয় অগ্নিধর্মী। কেউ মঙ্গল-প্রদীপ, কেউ আলোয় কেউ বা প্রলয়ের মণাল। এই মেয়েটাকে বোধ হয় শেষের দলে ফেলা চলে। নাম কলাগী। কিন্তু ঘরে বাইরে অকলাগ ছাড়া আর কিছুই সে দিয়ে যায়নি। সে দোষ অবিশিষ্ট তার নয়। দোষ যদি কারো হয়ে থাকে, সে তার বিধাতার, যিনি সেই হৃৎভাগীর সর্গঙ্গে অসহ রূপের শিখা ছালিয়ে এমন ঘরে এমন পরিবেশে তাকে পাঠিয়ে দিলেন; যেখানে ঐটাই হল তার অভিশাপ। কে জানে এটা তাঁর খেয়াল না কৌতুক!

নিতান্ত পাড়াগাঁয়ে গরবের ঘরে জন্ম। তার এক প্রতিবেশীর কাছে শুনেছি, বছর দশেক বয়স হতেই ওর বাপ-মা ওর ঘরের বাইরে যাওয়া বাধণ করে দিলেন। তাকে দেখলেই নাকি পাড়ার ছেলে-বুড়োর মাথা ঘুরে যেত। তার পর স্কুল হল বিয়ের চেষ্টা। ভালো ঘর জুটবে কী? ষাটাই দেখতে আসে ভয় পেয়ে যায় ঐ রূপ দেখে। পাড়ার গিন্নীরা বলবলি করতেন, মেয়েমানুষের অত রূপ ভালো নয়। ওদের কপালে দুঃখ আছে। কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। এক জন ইরেজ কবি পৃথিবীজন্তু স্বন্দরী নারীদের সম্বন্ধে ঐ রকম একটা মন্তব্য করে গেছেন। যাক সে কথা। শেষ পর্যন্ত কলাগীর বর জুটল। অনেক দূরে ঐ রকম এক পাড়াগাঁয়ে। কনের বয়স পনেরো ঘোলে। বর ত্রিংশ-বত্রিশ। গ্রামের হাটখোলায় একটা মুদি দোকান আগলায়, কোনো রকমে সসার চলে।

বিয়ের পরে দেখা গেল, বর বেচারী দোকান ফেলে বাড়িতেই ঘুবু করছে। অভিভাবকেরা প্রমাদ গণলেন। পাড়ার হুঁচারজন মুকবির গোছের লোক পরামর্শ দিলেন, ছেলেকে বিদেশে পাঠাও চাকরি করতে। তাদের গায়ে আশুনের আঁচ লেগেছিল। মহকুমা সহরে চাকরিও একটা জুটিয়ে দিলেন তাদের মধ্যে কে এক জন। তার পর স্কুল হল নানা রকম পতঙ্গের আনাগোণা। বৌ পুকুরে নাইতে গেলে সেখানে ছিপ ফেলবার হিড়িক পড়ে; মন্দিরে গেলে সেদিন গ্রামশুদ্ধ লোকের ভক্তি উথলে ওঠে। অন্ধকার রাতে ঘরের পেছনে পায়ের শব্দ পাওয়া যায়; বাসন মাজতে গেলে গায়ে এসে পড়ে উড়ো চিঠি। স্বপ্ন-শাওড়ী জানতে পারলেন, এবং সব কিছুর জন্তে বৌকেই দায়ী হতে হল। স্বামী বেচারী মাঝে মাঝে আসে। শোনে সবই। কিন্তু সে নিরুপায়। কোন এক মুকবির কাছে পাড়তে গিয়েছিল কথাটা। ধমক খেয়ে চলে গেল চাকরিস্থলে।

এদিকে বত দিন যায়, বৌএর দিকে আর তাকানো যায় না। পেট ভরে ডাল-ভাতও জোটে না, তবু কপে-কুলে উঠছে স্বাস্থ্যের জোয়ার। একটি শিশু যদি আসত ওর কোলে, হয়তো ওইই মধ্যে দেখা দিত একটখানি তাঁটার চাঁদ। কিন্তু তার কোনো

লক্ষ্য নেই। পতঙ্গের দল বেড়েই চলেছে। তারই মধ্যে একটি একেবারে সোজামুজি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে বসল। অর্থাৎ গভীর রাতে বাঁপের বেড়া কেটে চুকে পড়ল ওর শোবার ঘরে। গায়ে হাত দিতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। লক্ষিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠল না, চৌকামিচি করে লোক জড়ো করবার চেষ্টাও করল না। বালিশের নিচে থাকত একটা ধারালো কাটারি। আন্তে আন্তে উঠে অন্ধকারে বসিয়ে দিল কোপ। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিংকার আর একটা ভারী জিনিষ পড়ে যাবার শব্দ। এই টুকুই তার মনে আছে। তার পর কী হল সে জানে না। জানাবার মত অবস্থা যখন হল, চোখ খুলতেই দেখল বরেন্দ্রার এক কোণে পড়ে আছে, জব জব করছে চুলের বোঝা, আর চারদিকে গিজগিজ করছে লোক। ধূমড করে উঠে বসতেই চোখে পড়ল উঠানের এক কোণে পড়ে আছে একটা লাশ। কাঁধের আঁকেকটা নেমে গেছে, গলাটা স্থলে পড়েছে এক পাশে, তবু চিনতে কষ্ট হল না। প্রবীণ ব্যক্তি, গ্রাম্য সম্পর্কে ভাসুর হন কল্যাণী।

তার পর যা হয়ে থাকে। ধান, পুলিশ, উকিল মোক্তার, হাকিম, আদালত, শেষ পর্যন্ত আমার জেলখানা। দেবতায় আপত্তি জানানলেন কিন্তু এ কেস—এ তো তার জেল হবার কথা নয়। সে যে মেয়ে; খুন বদি করে থাকে আত্মরক্ষার জন্তেই করেছে।

তালুকদার বললেন, তুমি তো বলছ আত্মরক্ষা, সাক্ষীর তা বলল কই? গ্রামের সব মাতব্বর ব্যক্তির দল বেঁধে হলপ করে বলে এল, মেয়েটার চরিত্র খারাপ। নিয়মিত খদ্দের ছিল জন কতক; ভাসুর ছিলেন পাথের কাঁটা, তাই তাদেরই একজনের সঙ্গে সদৃশ করে বোচারাকে ডাকিয়ে এনে খুন করেছে। হাকিমও বোধ হয় আগুন দেখে ভড়কে গিয়েছিলেন। তাই ছেড়েও দিলেন না কাঁসি দ্বীপাস্তবও দিলেন না। ৩২৬ ধারায় ছ'বছর জেল দিয়ে ছাম আর কুল দুটোই বজায় রাখলেন।

জলে আসবার পরদিন সে নিজে থেকেই চুকে গেল ঢেঁকিশালে। ভয়ঘরের রূপসী তরুণী; সেলাই টেলাই গোছের একটা নরম কাজ দিতে চেয়েছিলেন। রাজী হল না। বলে বসল, ও সব করতে গেলে গতর থাকবে কেন? ফিরে গিয়ে আবার তো সেই ঢেঁকিই ধরতে হবে। কিন্তু জেল থেকে ফিরবার পর ঢেঁকি-ঘরটাও যে খালি পাওয়া যায় না, সে কথা তখনো জানতে পারেনি কল্যাণী।

যত দিন জেলে ছিল, খোঁজ-খবর কেউ নেয়নি। চিঠিও নয়নি, দেখা করতেও আসেনি। যেদিন খালাস হল, গোরাবী, পথথরচ আর রুড মাটিন ফাও থেকে সামান্য কিছু বখসিস দিয়ে একটি মেয়েছেলের সঙ্গে গুকে খন্তরবাড়িতেই পাঠিয়ে দিলাম। এসকট গুকে পৌছে দিয়েই ফিরে এল।

তার দিন তিনেক পর রাত এগারোটার সময় বাড়ি ফিরছি। দেখলাম সদর দরজার পাশে অন্ধকারে কে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম কে? মাথা তুলে বলল, আমি কল্যাণী।

—তুমি এখানে?

—কোথায় যাযো! ওরা ঘরে নিল না, ঘেরে-ঘেরে তাড়িয়ে দিল।

—গিয়েছিলাম। মা নেই; বাবা রাখতে চাইলেন না।

তার পর যা বলল, তার মান, আশ্রয় দিতে রাজী ছিল অর্থাৎ পীড়াপীড়িও করেছিল কেউ কেউ। কিন্তু সে যে কী আশ্রয় বুঝতে পেরে সেখানে আর দাঁড়ায়নি।

ওকে নীচে বসতে বলে উপরে গেলাম। মৌবা ক'দিন খেবে ভুগছিল। সেই দিনই দুটো পথা পেয়েছে। ক্রান্ত হয়ে ঘুমো আবার নেমে এলাম। চাকরটাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ই সামান্য কিছু ভাত-তরকারী পড়ে আছে। তাই বেড়ে দিতে বল কল্যাণী যেন তৈরি হয়েই ছিল। বলবার অপেক্ষাও রাখল খাওয়ার ধরণ দেখে চাকরটারও বুঝতে অসুবিধা হল না যে দু'দিন কোথাও কিছু জোটেনি। তার পর চাকরকে সিপ গারদে স্ততে পাঠিয়ে, তারই ঘরে ওর শোবার ব্যবস্থা করে দি বন্ধ করে উপরে উঠে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠেই মীরাকে সব খুলে বললাম। সে বা চূপ করে থেকে শুধু বলল, আমাকে এক বার ডাকলেই পারতে। বললাম, বড় ঘোষাচ্ছিলে, তাই আর ডাকাডাকি করিনি।

নিচে এসে দেখলাম কল্যাণী এরই মধ্যে স্থান সেবে এক ভিজে চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে মহা উৎসাহে কাজে গেছে, যেন এ বাড়িতে সে নতুন আসে নি; এটাই তার সঙ্গার। আমাকে দেখে রান্নাবর থেকে বেরিয়ে এসে বলল দাঁড়ান, দাদা! অর্থাৎ সম্বন্ধও একটা পাতিয়ে ফেলেছে রাতা? আমি ফিরে দাঁড়াতেই এগিয়ে এসে প্রণাম করল। বললো হল? হঠাৎ প্রণাম করছ যে? তেমনি মাটির দিকে ত আস্তে আস্তে বলল, আপনি যে ক'টা টাকা দিয়েছিলেন, দিয়ে একখানা কাপড় কিনেছি। নতুন কাপড় পরে গুরু প্রণাম করতে হয়।

এবার নজরে পড়ল, তার পরনে একখানা লালপেড়ে সাড়ী। বললাম, তা তো বুঝলাম। কিন্তু এসব কী করছ তুমি —কী সব! বলে মুখ তুলে তাকাল।

রান্নাঘরের ঢোরা একেবারে বদলে গিয়েছিল। সেই দি আঙ্গুল দেখলাম। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, বা, থাকতে ও বাঁধবে কেন? ব্যাটাছেলে রান্নার কী জানে! "ছেলে," মানে আমার চাকরটি দেখলাম বেজায় খুসী। অধিকার সানন্দে ছেড়ে দিয়ে দিমিঘির ফাইফরমাজ খাটতেই বাত

কল্যাণী বলে উঠল, বৌদি কোথায়, দাদা? শুনলাম, অসুখ। ওপরে যেতে পারি? আর কেউ নেই তো? চা দিয়েই ওকে উপরে পাঠিয়ে দিলাম। তার আগে ওর স্বামীর বাপের ঠিকানাটা জেনে নিলাম। ও হেসে বলল, ঠিকানা কী হবে? চিঠি লিখবেন তো? ওরা কেউ আসবে না।

দু'দিনও লাগল না। আমার সঙ্গারের সব ভার চলে কল্যাণীর হাতে। এমন অনায়াসে যে আমরা কেউ জা পারলাম না। ছেলে দুটোকে শিখিয়ে দিল, আমি তোমাদের এক দিনের মধ্যে তারা গুর খাওটা হয়ে গেল। তাদের খাও পরানো, ইস্কুলে পাঠানো, মীরার সেবা-স্বত ওষুধ-পথা, উপরে রান্নাবান্না—সারা দিন যেন চরকির মত ঘুরছে।

হুয়েলাই আমার ফিরতে দেবি হয়। মীরাকে তার আগেই চলে দেয়। কোনো আপত্তি শোনে না। তার পর আমি লে খালা সাজিয়ে ধরে দেয়, পাখা নিয়ে সামনে বসে। কোন ফিরে ফেরে রাখবার উপায় নেই।

কিন্তু আশুন চাপা থাকে না। তাকে বেঁধেও রাখা যায় না। তদ্র মতলে সাড়া পড়ে গেল। এবার পুরুষ নয়, এক ধবধব স্ত্রী-তদ্র। যে সব শুভাকাঙ্ক্ষিনী প্রতিবেশিনীর দল নিত্যন্ত ছুসময়েও হান্না দিন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ান নি, তাঁরা এসে যখন তখন চুপ করত লাগলেন। আমার কণ্ঠা স্ত্রীর জন্তে তাদের দরদ উঠলে ঠল। কত উপদেশ, কত শাস্ত্রবন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উপলক্ষ্য। একটি। একদিন বিকেলে আফিসে বেরোচ্ছি, মীরার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কানে এল, একজন বয়ীসী মহিলা নিয়ে বিনিয়ে বলছেন, জান তো মা, ঘি আর আশুন পাশাপাশি থাকলে প্রলয় ঘটতে কতক্ষণ! এখন শক্ত না চলে রে আর কৈদেও কুল পাবে না।

সব শুনলাম, সব দেখলাম, মীরার মুখে হাসি নেই, চোখে কিসেব লেছা। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। শুধু, পথা যন্ত্র আন্তি, মনো কাজে লাগছে না। এদিকে কল্যাণীর কথাই ঠিক হল। তার পিতৃকুল এবং শশুরকুল কোনো দিক থেকেই কেউ উদ্ধবাচ্য বল না। যে-সব বেসকু-তোম বা অবলা আশম-টাশমের খৌজ-বর সংগ্রহ করেছিলেন, বার বার লেখালেখি করেও কাবও কিছু মেলেনি। কল্যাণীর মামলা চলবার সময় একজন 'নাময়' সাম্প্রতিক কাগজের তত্ত্ব সম্পাদক তার বীরত্বের প্রশংসা করে তিন-চল্লিশ আলোময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার শরণ নিলাম। তিনি একবার শুকে দেখতে চাইলেন, সাম্প্রদিক পরিভাষায় যার 'ম' ইনটারভিউ। উদ্ভ্রাণ বোধ হয় বাড়াই করা, কল্পনার বীরাঙ্গনার সঙ্গে বাস্তবের মিল কতখানি! কল্যাণীর সঙ্গে সম্পাদক মশায়ের আলাপোপাখি ঘটিয়ে দিলাম। তার পর তিনি এত ঘন ঘন সাক্ষাৎ গ্রহণী শুরু করলেন যে কল্যাণীকে আর তার সামনে বেরোতে রাজী করানো গেল না।

মীরার মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত ওর কোনো ব্যবস্থা হল কিনা। কিছু দিন থেকে প্রশ্নটা বড় ঘন ঘন আসতে লাগল। একদিন রে আফিস থেকে ফিরে কাপড় ছাড়ছি। শুকনো মুখে এসে বল, 'কল্যাণীর কিছু করতে পারলে? আফিসের কতগুলো আপাতের মর্নাতি তিন্ত হয়েছিল। কড়া জবাব বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, দেখছই তো কোনো চেষ্টাই বাকী রাখছি না। একটা রোগা টায়গা না পেলে ঘাড় ধরে বাস্তায় তো বেব করে দেওয়া ঘন?'

মীরার ক্রান্ত চোখ তুলে শুধু একবার তাকাল। তারপর নিশ্চেষ্টে সরে গেল নিজের ঘরে।

এই কয়েক দিন পারের ঘটনা। বরাবর নিয়ম ছিল আমার পাতের পারাবটা উপরে আমার শোবার ঘরে ঢাকা দেওয়া থাকত। গাড়ি ফিরবার পর, সন্ধ্যা থাকলে মীরার এসে খালা-বাটিঙলো গুছিয়ে দিয়ে দিত, আর অন্তস্ত থাকলে আমি নিজেই নিয়ে খুয়ে খেয়ে শতাম। কল্যাণী এসে সব উন্টে দিল। অপেক্ষা করে থাকত,

লুচি ছাড়ার শব্দ পেতাম। অল্প সব উপকরণ আগে থেকেই সাজিয়ে রাখত। আমার হাত-পা ধোওয়া শেষ হতে না হতেই দেখতাম খালা নিয়ে উপরে উঠে আসছে। অনেক দিন আপত্তি জানিয়ে বলেছি, খাবারটা এখানে বেখে দিয়ে তোমরা খেয়ে নিলেই পার। কষ্ট করে বসে থাকবার দরকার কি? লুচিঙলোও তো আগেই ভেজে রাখা চলে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিত, না, তা চলে না। খালাটা আসনের সামনে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলত, আপনি তো জানেন, এতে আমার কষ্ট হয় না। এক কথা আর কত বার বলবো?

নিমফল জেনে ও নিয়ে আর কথা-কাটাকাটি করিনি। ঐ ব্যবস্থাই মেনে নিয়েছিলাম। সেদিনও নিশ্চেষ্টে খেয়ে নিচ্ছিলাম। রাত এগারটা বেজে গেছে। কল্যাণী দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। উঠে মুখ বুজে যাবো; চৌকাঠ পর্যন্ত যেতেই হঠাৎ বলে উঠল ধরা গলার, আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? আমি আপনার কী করেছি? খমকে দাঁড়িলাম। দীর্ঘায়ত ঘন-পল্লব ছুটো কালো চোখের তারা একভাবে চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে। কিছু একটা বলা দরকার। বলতেও যাচ্ছিলাম। কল্যাণী বসে পড়ে হুঁততে আমার পা ভড়িয়ে ধরে বরকব করে কৈদে ফেলল, আপনার পায়ের পড়ি আমাকে এক পাশে পড়ে থাকতে দিন। আপনারদের ছেড়ে, বাকী নাককে ছেড়ে আমি কোথাও গিয়ে থাকতে পারবো না।

পা ছাড়তে চায় না। নীচু হয়ে বা হাতের ওর কাঁধের পাশটা ধরে সরাবার চেষ্টা করে বললাম, এসব কী পাগলামি হচ্ছে! ওঠো, আজই তো আর বাছ না কোথাও।

হঠাৎ একবারে কানের কাছে কেটে পড়ল তীব্র স্বর—নীচে যাও কল্যাণী। চমকে উঠলাম। ওর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কল্যাণীও তাড়াতাড়ি উঠে অঁলে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। অলস্ত চোখ মেলে সেদিকে একবার তাকিয়ে আমার দিকে ফিরে তিন্ত করলে বলে উঠল মীরার, এই জন্তাই বুঝি কোথাও ওর জায়গা হয় না?

সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ তখনো মিলিয়ে যায়নি। চাপা ভাংসনার স্বরে বললাম, মীরার! মীরার জ্বরেপও করল না। ঠিক সেই স্রুইই আবার বলল, আর একটুখানি সবু বরতে পারলে না? আমি আর কদিন।

ভীষণ উত্তেজনার দুর্বল শরীর খবরখ করে কাঁপছিল। মনে হল এখনই পড়ে যাবে। এগিয়ে ধরতে গেলাম। ছিটকে সরে গেল। তারপর কোনো রকমে টলতে টলতে ছুটে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

সে রাতটা আমার কাটল সবটাই প্রায় পায়চারী করে, কখনো বারান্দায় কখনো ছাদের উপর। ভোরের দিকে একটু গাড়ি নিয়ে যখন নিচে নামলাম, চাকর এনে খবর দিল, কল্যাণী নেই। বৃক্কের ভিতর কেমন একটা ধাক্কা লাগল। তারপর নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এ ভালোই হল। এতদিন ধরে আমি যে সমস্ত মেটাতে পারিনি, সে নিজেই তার সমাধান করে দিয়ে গেছে। আফিসে বেরোচ্ছি; ঐ চাকরটাই একখানা

কিন্তু সেখানে উপরে উঠা দেবেদি হাতের পেশুসিলে দেখা—

কিন্তু! একবার ইচ্ছা! হল, তেঁরী কী লিখে ছেবে গেছে।  
কিন্তু একটা বাড়িতে গিয়েও খেমে পেলো। কল্যাণ, তোর বাপ  
কিন্তু লিখে আর। সে চিঠিতে কি ছিল, আরও আমি জানি না।

আজিও বাবার পাবে কান পাল দলে দলে সিপাইরা ঢকে  
বুঁজতে বেরিয়েছে। কে বললে বুঁজতে? তারও ভাবা পেলো  
কালিকাতার কাছে, বাইতী বা কতুম।

চৌক পাওয়া পেল পথনির বিকাশ বেলা। জেল থেকে বাসিন্দা  
কুঁড়ে কানো একটা বাসান। তার ভিতর লিকে একটা এঁগা পুরুষ।  
সেঁখানো।

খুশি হো একটু-আটু সান্ধিতচা। করে বাসো, ডাক্তার। আমি  
জাই ও কসে বকিত। তখনকি, তোমাদের কবির পুর কত নাকি  
বুড়ার মহিমা কীকন করে গেছেন। মল বড় বন্ধন, ইচ্ছা কোল  
পেতে সে তাপিতকে আরও সে, এমন সব ভালো ভালো কথা হাতের  
কীতে লেখ আছে। তার কী লেখছেন জানি না। কিন্তু বুড়া যে  
কত মহতর, কত কুশলিত সেদিন আমি বড়কে প্রত্যেক কল্যাণ।  
কি বিবাহের অনুশর। সেই এই যে নারীও কপ বুড়ার পাশে তার কি  
বীজনে বিকৃতি নী হতে পারে। তখন লড়াই হে-হাঃ। কতগুলো  
জোম থাবারি উপর থেকে হাবার চোখ পড়তে পারে সে খেঁয়াল হয়নি।  
হঠাৎ তার জিকার তখন ছুটি গিরে লেজার যে সকাল হার গেছে।  
ডাক্তার এল। অনেককণ ওঁর পর জানি কিবে এল। কিন্তু  
কীলুনি ছিল এল ঘর। মাত্রে মাত্রে লীল কলক চোখ বেলে ডাক্তার  
আব চমকে চমকে ওঠে।

সেই বড়। তার পর চলল একটানা বাথ ডিক্লিনার পালা।  
ছোট বড় কত ডাক্তার লেজেন। কুঁড়ে বাথি শিশিতে আর  
ডাক বোকাই হল। কুঁড়ে কুঁড়ে হাত পাত আর জাহা  
হইল না। তবু জোম থাবা ছিল না। তার পর জেলের এক  
কবিরাজ। প্রাচ্য, মধ্যাচ্য, কোকাস ও সন্ধ্যার চার বকম কুঁড়ে  
আব কটমট অনুশর চালালেন কিছু দিন। শেষ পর্যন্ত ডিক্লিনার  
হাল হাটলেন।

আমি বুকেছিলোম, মরাকে বীজাত হলে সকলের আসে ঐ বাতি  
আব তার অভিলপ্ত পাকিল থেকে একে সরতে হবে। কিন্তু কলির  
জতে বাব বাব কলপ আনেন জানিওও কটাগের হল লেজো  
পারি নি। তার পর বড় ওঁর পেলো ছুটি। প্রক নিজে লেজির  
পড়লো। শিশুললার কয়েক হাস কলির ছুটি পোবে জেলের  
কল্যাণ খুললো। মরীর পাতে মোড়লা বাতি। চকড়া বোলা  
বাহালায় ইচ্ছারূপের তরে টিক সামনেই দেখা যেত বিশাল তৈলব  
আব তার ওপারে বসারি, নাককল, আদ, কীটোলের বাগান-বেরা  
ব্রায়। সেখানেই পড় থাকত লিমে বৌরী জাপ। একদিন কলল,  
জলো, লোনা, এ জাহালা আমাৰ বড় জালো লেগেছে। এখানে  
আমাদের কিছু দিন থাকবে তো?

আমি পাশে কসে তার বন্ধনতী বীৰ হাতবানী আমাৰ হাতের

আব কিছু দিন কেউই বাবালায় বাওয়া বড় হয় তো। কিন্তু  
থেকে তোলা বাবা। কল্যাণের বাব বৌসে বাট পাশে। তার  
উপরে তরে তরে সারা দিন কাটে। এখনই মনে পড়ে, কল  
বসি। সেদিনও শিকরের কাছে কসে আন্তে আন্তে মাথায় সা  
বুলিরে চিহ্নিলায়। হাত বোহে বড় লুটী। তেঁরো পাশে যা  
খুলো। মরীর তরে আছে চোখ বুজে। একটা হাত লিখে  
লানে পড় আছে আমাৰ কোলের ওপর। অনেককণ নিশেত সে  
পেল। তার পর আছে আন্তে চোখ খুলল। ফিনিট কলর যেন  
মুখেৰ লিকে চোখ থেকে কলল, আমাৰ বাবাটা কুলে বার জু  
কলিরে লাও না? আব তরে থাকতে পারছি না। তবে  
ককম নড়াচড়া ডাক্তারের নিশে। কিন্তু ওর মূলে নি  
চোখ না কলতে পারলাম না। শিশিরে বাত লেজো  
বাথিল লিখে হাসলো। সেটা একটুখানি উপরে লিকে খুল লিখে  
আমাৰ কিছুকণ কেমনে ডাকির থেকে কলল, একটা বাত হলে  
লিখুক খুলে আমাৰ গলনের বাতীরা এল লাও না? সব নি  
কল্যাণ, একটু খুলোও তেঁরী। এর বাতের গলনা লিখে কীলো  
মরীর ডিক্লিনার জাই লাভ, জাই অনুশর। শু শু খেমে লেজো কি  
জাই বনাব। অনেক দিন খুলে খুলে আন্তে-তাল তার চোখ  
থেকে পড়লি। কলার কলার বিকল হার টের। কলল, ওর মতো  
লল আব বকতে পারি না। কলকি, নিজে এসে না লড়াই  
আব আশাও না করে এসে লিগার। ওর জীল থেকে চোখ নি  
ডাক্তারিও খুল লিগার ওর সামনে। অনেককণ সেই নিজে  
বীল।

কল্যাণের হাত। লিখে সব আমক লেজো বড়  
লিরেছিলো ওর বাব। ওর কল ছিল আমাৰ হাতের লেজো না  
আব নতুন করে গড়লো। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তার পর সা  
খুলে না একবানো। জাই লিখে একদিন বড় অনুশর বাতী  
জেল ললত আমাৰ বড় ললত করে। কললো কলল, ওর  
সর সেজে। আব কি সে বড় আছে? একবার বড় ললতী  
কলছিলোম এই নিজে। ও তখন লেজো কললোম। তখন  
জলিলার বাতি লেজলত। আমাকও বোত হার। হাতের  
সোনার চুড়ি আব গলার একটা লালবর্ণ লেজোম পর লেজো না  
আমাৰ লেজোম পেল চুড়ে। লিখে কললাম, কল্যাণ পর না ও  
আমি কিছুতেই বাতের না। ওর পর আব না পরা ললত  
লিখি লিখে নামতে নামতে অনুশর হঠাৎ আমাৰ পা বৌসে লিখি  
কিন-কিন করে কলল, আমাৰ সব চোখ বড় কললার লেজো  
সকলই কলল, সেটা বোকা না? আব গলনা লিখে কীলো  
সেই বাতী চোখেৰ ওপর জেলো উঠল। কললাম, ও সা  
ডিক্লিনার বাতের হার পেল। আন্তে পড়ব বুঝনা? এসে না লড়াই  
খিই?

খু-কসে আমাৰ হাতল সেই সলল হাসি। তারপর সে  
ঐ লেজোমটা আব ঐ বালাজোড়াটা লাও জো কলার  
জাই লিগার। একটু নড়াচড়া করে ও-টো আমাৰ অনুশর  
আমাৰ ঐ

তুমি তো জান, ডাক্তার, চিরদিনই আমি কাঠখোঁটা মাইব।  
এর ফলটল আমার আসে না। সেদিন কিছু হুটো চোখ আমার  
সা হয়ে উঠল। বললাম, তুমি চলে বাবে, আর বৌ নীকর  
সেবার জন্তে পড়ে থাকবে আমি একা? সে অভিশাপ  
থাকে মিও না, মীরা! মীরা আর কিছু বলল না। দেখলাম,  
ও হুঁচোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বৌটার খুট  
মুচিয়ে দিলাম। একটু শান্ত হবার পর বলল, আর  
গদনাগুলো আমি তোমাকে দিয়ে গোলাম।

চমকে উঠে তাকালাম ওর মুখের দিকে। একী বলছে মীরা!  
মন থাকবে না, ওর ঐ গদনা দিয়ে আমি আর একজনকে সাজাতে  
হা? বাবার সময় ঐই আদ্যোপাট কি বোধেছিল আমার জন্তে!  
কে চূপ করে থাকতে দেখে মীরা বোম হত বুকেতে পারল আমার  
কথা। হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়ে বলল, তুমি যাগ  
! শোনোই না কি বলছি? তুমি যা ভাবছ, আমি তা  
না দিন কল্পনাও করতে পারি না। ওগো, এতদিনও কি  
থাকে চিনতে পারিনি?

আমি তাড়াহাড়ি বলে উঠলাম, না, না। আমি কিছুই ভাবছি না  
। বল, তুমি কী বলবে।

মীরা একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, এ গদনা তো তোমাকে  
এমনি দিচ্ছি না। এ বেল আমার জন্মদিন। যে অপরাধ  
মর কাছে করেছি, এ শুধু তার একটুখানি দণ্ড।

আমি স্তব্ধ হয়ে গোলাম। একে কী উত্তর দেবো, বল? আমার  
কে বোঝে তান, এই যে আজ সে নিতান্ত অমন্যে দুঃখের দুয়ার  
খিচিয়েছে, এর মূল এমন কিছুই নেই। তোমাদের শাস্ত্র বাক্য  
হাদি। এর পেছনে আছে শুধু একটা রীত আর তাকে আশ্রয়  
একটি মেয়ে মরণোত্তর বীভৎস কণ। আমার দু কৌটী সাক্ষী  
হুটো স্তোক বাক্য সেখানে কী করতে পারে। তবু বললাম,  
কাজে তো তুমি কোনো অপরাধ করনি, মীরা। যদি কিছু  
থাকো, সে শুধু একটা ভুল। ঐ অবস্থার সম মেটেই তা করতে।

তার জন্তে তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো নাপিস নেই। মন থেকে  
সব দাগ তুমি মুছে ফেলে দাও।

অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে সে কান্ড হয়ে পড়েছিল। এবার  
মাথাটা আমার কাঁধের উপর নামিয়ে দিয়ে বলল, ওগো, আমি  
জানতাম, বাবার আগে তোমার ক্ষমা আমি পাবোই। কিন্তু, তুমি  
ক্ষমা করেছ বলেই তো আমার অপরাধ মুছে না। তোমার  
পায়ে পড়ি, আমার কথাটা রাখো। আমার শেষ সাধটুকু পূর্ণ করতে  
দাও। বললাম, বেশ দাঁও তোমার গরন। কিন্তু তুমিই যদি না বসে,  
তোমার ঐ সোনার তাল দিয়ে আমি কি করবো? মীরা অনেকক্ষণ  
কোনো কথা বলল না। সেহের সবটুকু তার আমার উপর ছেড়ে  
দিয়ে সেই নিবিড় সান্নিধ্যটুকু যেন শেষবারের মত অমৃতভব করতে  
লাগল। আরো কিছুক্ষণ সেই তার কাটির আশ্চর্য কল্পন কণে  
ধীরে ধীরে বলল, ঐ অভাগী মেয়েটা, যে শুধু শত্রুতাই করে  
গেল আমার সঙ্গে, ওর মত বারি বিনা দোষে জেলে আসে, তার  
পর যেসব গিরে সসার কোথাও হাঁট পায় না, পার শুধু লাঞ্ছনা,  
এইগুলো দিয়ে তাদের একটা উপায় করে। এক কৌটা  
আশ্রয়ের অভাবে আর কেউ যেন অমন করে প্রাণটা না দেয়।  
বলেই উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেসে পড়ল আমার বুকের উপর। আমি  
বাধা দিলাম না। ঐই কান্নার তার প্রয়োজন ছিল। আরো  
কিছুক্ষণ পর বুকের গুচ্ছতার বধন একটু হালকা হয়েছে, আন্তে  
আন্তে খুলে নিয়ে আবার তাকে বিছানার শুটে দিয়ে দিলাম। খানিকটা  
বিশ্রাম নিয়ে আমার হাতখানা চেপে ধরে কাঁচর শুরু করল, বল,  
আমার কথা রাখবে?

ওর কক্ষ চুলগুলো কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বললার,  
রাখবে। এবার তুমি ঘুরোও।

মীরা বস্ত্রহীন পাণ্ডুর মুখের উপর একটি পরম ভূগির আজ  
ফুটে উঠল। অশ্লষ্ট আলোতেও সেটা আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

মাসখানেকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল!

[ক্রমশঃ]

## ক্ষণ-লিখন

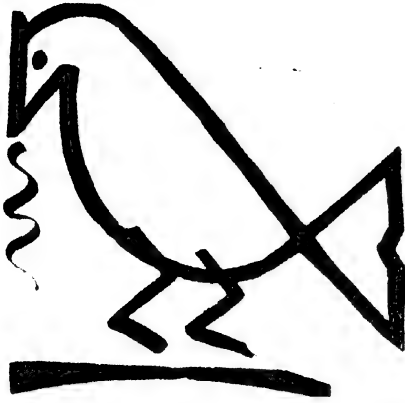
### নিজন দে-চৌধুরী

সর্বদা শাক্তিত থাকি। কেবলি সশর জাগ, যদি  
এই দিন-রাত্রি ভাঁবে জীবনের মধুর ব্যঞ্জন  
দিয়ে যে কবিতা লিখি, মুহুর্তের আনন্দ-বেশন।  
মৃত্তর যাব হৃদয়—অপ্সার-আশা-আকাংক্ষা

স্বর্ণাক্ষরে সারাক্ষণ যে ছন্দ-ভাষা লিখি, তার  
সকলি হাবায় যদি? কোনো দিন আচমকা হাঙরায়  
যদি কোনো অসাবধানের দক্ষিণের জানলা হুটী খুলে  
সব শাণ্ডিলিখি যদি অকস্মাৎ ছিঁড়ে-খুঁড়ে বার?

হায় হে! হোস্তাই তো হায়। এই মেঘ-বিশীর্ষ আকাশে  
কত কাব্য লেখা হয়। বৈশাখের দীর্ঘ হাকাকার  
যে আনে, আবার সেই নব্রহ্মতে অশান্ত কান্নার  
প্রাবণে ক্ষুব্ধ হোক লিখে রাখে। রামধনু-বস্ত্র  
সপ্তপদী মুছে বেশ বেদনার বিচিত্র বিভাজে

## ছোটদের আসর



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

বাঁধা ওর বৌদির কাছে নিয়ে গেল মীরা। স্বরমা তার নাম। বাঁধানীটোলাবই এক বাড়ীর চার তলায় ঘরে স্বরমা থাকে। জানলার ধারে দাঁড়ালে নাচে—অনেক নাচে গঙ্গা দেখা যায়, গঙ্গাই ত বাস্তা থেকে তিন তলার সমান নাচে।

বাড়ীতে পাথরের দেওয়াল, পাথরের সিঁড়ি, এত পাথর কাশীতে এসেছিলো কোথা থেকে? কত কাল ধরে এত পাথর এমনি দাঁড়িয়ে আছে। কাশীতে না কি কখনো ভূমিকম্প হয় না। শিবের বিশূলের ওপর কাশী। সেই বিশূল এক বার নড়ে উঠেছিলো কলিযুগের পাপে। ভূমিকম্প এক বার হয়েছিলো কাশীতে। কাশীতে বারা জীবন কাটিয়ে দিতে এসেছিলো, সেদিন তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিলো।

আর এক বার ভয় পেয়েছিলো। স্বরমা গল্প করে,—বোসো ভাই, বলি সেদিনকার কথা। এলো বেরিবেরি, পা ফোলে আর হাট খারাপ হয়। মরতে লাগলো বাঙালীরা, যারা সর্ষের তেল খায়। হিন্দুস্থানীদের কিছু হল না। সেদিন যে সব বুড়ো-বুড়ি কাশীতেই প্রাণ দেবে বলে এসেছে—মণিকর্ণিকার ঘাটে ছাই হ'য়ে গিয়ে শিবলোকে যাবে বলে এখানে অপেক্ষা করছে, তারা দলে দলে পালালো।

প্রাণের মারা এমনি জিনিস! সে প্রাণ দিতে এসেছে, সেই প্রাণ নিয়েই তারা কাশীর মতন তাঁর ছেড়ে দেশের দিকে চলে গেল।

শুধু তারা বইলো, যারা বিশ্বাস করে—কাশীর গঙ্গার ধারে সে বিশ্বাস শাস্তি আছে। সেই মুটির মতন, যে বিশ্বাস করত, গঙ্গা হ্রদ করলে পাপ কেটে যায়। সে গল্প জানো ত?

মীরা বললে—জানি না বৌদি! বলুন না।

সকাল বেলায় চার তলায় ঘরে মিটে বোসে কার না গুল্লন্ততে ভালো লাগে? বাঁধানী চলে গেছে। মীরা একলাই যেতে পারবে। বৌদি এক হাতে লুচি বেলে নিয়ে কড়ায় দিলে দিতে গল্প বলতে লাগলো।

গঙ্গার ধারে এক কুঠরোগী, যাকে দেখছে তাকে বলছে—ওগো, তোমাদের মধ্যে কে নিষ্পাপ আছে, আমার ছুঁয়ে দাও। দিলে আর সেরে যাব।

কে দেবে? সকলেই ত জানে পাণ্ডী তারা। রোগী বললে, পা তো সব তোমাদের কেটে গেছে। আজ চুড়ামণি যোগে গঙ্গানান কর্তে আনছি। আর কি পাপ আছে?

তাঁহি বুঝি হয়? গঙ্গানান করতে হয়, করতে এসেছে। যে ধীমারে, নোকায় ভিড় ক'রে ছুঁগে যেতে চুড়ামণি যোগে গঙ্গানান করলো। করলো বলেই কি সব পাপ চলে গেল? অত বিশ্বাসই আছে? সেই ভরমার কুঠরোগীর গায়ে কি হাত দেওয়া যায়? পাঁচ মুচি স্তন বললে, তুমি ঠিক বলেছ। দাঁড়াও আমি গঙ্গানান কর এসে তোমার গায়ে হাত দিচ্ছি। ও মা, সে যেহেঁ এসে গায়ে হাত দিলো, বৌদি একেবারে সেরে গেল। সে বৌদি আর কেউ নন, স্বরমা মহাদেব। মুচিরক এমনি সব জিনিস দিলেন, যাতে তার মনে চিরশান্তি এলো। শাস্তিতে ত লোকে খোজে? টাকা বসো, কড়ি বসো, বাউ বসো, জমি বসো, ছেলে বসো, মেয়ে বসো, মান বসো, প্রতিপত্তি বসো—লোকে এই সব চায়, যাতে মনে শান্তি আসে। শান্তি বসে আছে, তার কুঁড়েঘরে থেকেও স্তম্ভ। শাস্তি বার নেই, তা অট্টালিকা থেকেও ভুংখ। সেদিন চম্পালাল বলে এক মাড়ার মারা গেল, যাব কোটি কোটি টাকা। মারা যাবার সময়ে আমায় ডাক্তার বাবুকে বলে গেল—টাকা যেন কান্সর না থাকে, ছেলোম জামাই সবাই চাইছে, সে যেন শীর্ণগির মারা যায়। ভাইয়েরা চাবি থেকে ছুটে এলো ঘটা ক'রে চিকিৎসা ক'রে জীবন শেষ ক'রে দিলে।

ইতিমধ্যে লুচি ভাঙা হয়ে গেছে, ফুলো-ফুলো লুচির সঙ্গে আর ছোটকি দিয়ে থালা এগিয়ে দিলো স্বরমা মীরা'র সামনে—খাও ত বলে।

মীরা বলে, বৌদি, আমার জন্তে করছিলেন বুঝি? অ বুঝতেও পারি নি। আমি তো এই জল খেয়ে এলুম বাঁধানী'র বাড়ী।

জল খেয়ে, এসেছো, এবার লুচি ক'রে জলযোগ করো।

আহা, জল মানে বুঝি জল? কি বাংলা ভুলে গেলেন ইউ-পিতে থেবে সেই গোত্র? স্বরমা হেসে বলে। এসেছি বাংলা দেশ থেকে বৌ হয়ে কাঁ তোমার দাদা এখানে জ্যোতিষী ছিলেন—চর্চা করতেন। গণেশ মহল্লায় মর নিয়ে থাকতেন। ইহাৎ এক দিন

— কালী আশ্রম,

# রত্নবেদী

কাটবে না। তিন তলায় ঠাকুরঘরে মা কালীর পায়ের কাছে ভালো করে তেল দিয়ে একটি প্রদীপ জ্বলে রেখে এসে। মল্লটো বড়ো করে দিয়ে। সারা দিন জ্বলা চাই। যদি নিবে যায়, আমাদের এসে বোলে। সারা দিন লক্ষ্য রেখো যেন তেল থাকে।

তার পর? মীরা বলে।

বারে বারে আমি যাই। দেখে আসি। দুপুর বেলা হঠাৎ উনি বলেন, আমার বুকটা কেমন করছে, একটু মালিশ করে দাও। মলিন তেল মালিশ করতে করতে কতক্ষণ কেটে গেল। উনি বলেন, এবার দেখে এসে। প্রদীপ বোধ হয় নিবে গেছে।

গিয়ে দেখি ভাঁট, প্রদীপ নিবে গেছে। তেল আছে, তবু নিবে গেছে। এসে দেখি উনি—

প্রতিমা চোখে জ্বালা দেয়। মীরার চোখেও জ্বল।

আপনি খুব অসুবিধায় পড়লেন?

অসুবিধা বলে? মুখা আমাদের আর কি উপায় আছে বলে বাঁধনীগিরি ছাড়া? ঐ বাড়ারই এক অংশ এক ইঞ্চুল-ইম্পেস্টের ভাড়া থাকতেন, তাঁর দ্বারা আমাদের মেয়ের মস্তন টেনে নিলেন। রান্নার ভার দিলেন আর আমাদের দিন চলে যায় এমন মাঠনের ব্যবস্থা করে দিলেন। এখনো তাঁদের ওখানে কাজ করি। মাজ তাঁরা বিদ্যাচলে গেছেন, তাই আমাদের সকলবেলায় গেলে।

বাঁধনীগিরি? বাংলাদেশের মূর্খ মেয়েদের এ ছাড়া আর কি কোনো উপায় নেই?

না ভাই, আর কোনো উপায় নেই। আমার মাসভূতা দাদা ছিলেন মস্ত যাকুর। আশ্চর্য্য তাঁর পেলা। সেই দাদা যখন মাসে মারা গেলেন, তখন আমার মাসীমা বাঁধনী আর বৌদি মাসে মাজা খিয়ের কাজ নিলেন। বায়ুনের মেয়ে বলে কেউ কোনো জা দেখালে না। অহা, বৌদি তার বাপের কত আদরের মেয়ে ছিলো, তিন ছেলের পর এক মেয়ে—কোথার কি হয়ে গেল সব!

মীরা বলে, দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। এখন তো অস্ত্র বকম বকম!

কই হয় ভাই! স্বাধীনতার উৎসবে আলো জ্বলে, বাজী পোড়ে, বু পয়সা অভাবে ছেলেরা স্থূল থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়, ক্রিস্মা অভাবে কত লোকে চিরকল্প হয়ে থাকে। কত লোক জি কাজ না করেও টাকা পায়। আর কত লোক কাজ চায়, জিও পায় না, টাকাও পায় না। এ বকম সমস্যা যত দিন থাকবে, তত দিন স্বাধীনতার আলো-বাজী-মেলা-মিছিল সব বিশী মনে হবে। কাশীতে এক দিন এমন দিন ছিলো, যখন আট আনার বাজার ছিলো একটা মুটে ভাকুতে হত। মুটের ভাড়াও ছিল এক পয়সা। ভাড়া দিন এক পয়সা। ষি দিন এক পয়সা। সেই দিন না থাকলে আমরা স্বাধীনতার মান্নে বুঝতে পারব না।

গেয়ে উঠে মীরা হাত ধুয়ে এসে আবার বসলো। জানলার দরজা গরদের কাছে দুটো বাদর উঁকি মারছিলো, ওদের মাচায়ে চতুর্দিকে শিক লাগাতে হয়েছে—মারা একটা বেলুন নিয়ে উড়ে গেল। ও দুটো ভেঁটি কেটে নেমে গেল। আবার হৈ-হৈ, উর বারান্দা থেকে কার শাড়ী নিয়ে পালাচ্ছে।

ও বাড়ীর ছাদে উঠে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো শাড়ী। টুকুরো টুকুরো করে।

গুলী করে মারতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু উপায় নেই, শ্রীরামের অহুচর সব। মহাবীরের শিষ্যসেবক।

মীরা বলে, বৌদি বাঁদের কাছে আছেন, তাঁরা কেমন?

তাঁরা ভারী মজার লোক। ইন্সপেক্টর বাবু চিরদিন বেহারে কাজ করে এসেছেন, ভাগলপুর মুন্সেব, মোতিহারী, ধারভাঙ্গা, মজফরপুর। কাশীতে এলেন রিটারার করে জ্বীকে নিয়ে। ধর্মকল্প করে দিন কাটিয়ে দেবেন এই চিন্তা। সারা দিন মন্দিরে মন্দিরে গদ্যার ধারে ধারে কাটিয়ে আসেন। বাড়ীতেও ধান-ধারণা সব-পুজো নিয়ে থাকেন। ভারী আরামে দিন কাটে স্বামি-স্ত্রী। তার পর স্বক হল যন্ত্রণা।

যন্ত্রণা?

ঐা যন্ত্রণা। স্বামীর খাওয়া হয়ে গেছে, স্ত্রী ভাতের থালাটি নিয়ে বসেছেন, এলো দু'গাভী লোক—পিশিমা আমরা এসেছি।

এসেছে তো কৃতার্থ করেছে। সেই ভাতের থালা ওদের এগিয়ে দিয়ে তিনি রান্নাঘরে চুকলেন। আমি ভাত নিয়ে চলে আসছিলাম, আমাদেরও চুকতে হল ঠর সঙ্গে। আবার উঠলে আশ্রন দেওয়া। আবার রান্না চড়ানো।

এ প্রায় প্রতি দিন।

মাসীমা এসেছি। মামাবাবু এসেছি। দাচু এসেছি। তাউই মশাই মাউইমা এসেছি।

একদল যায় তো আর এক দল আসে। হৈ-হৈ হাসির হুজুড় রাত বারোটা অবধি। পুজোপাঠ সব শিকয়ে উঠলো। ভদ্রলোক যা পেছন পান, সব খরচ হয়ে যায়, ধার হয়; তবু কাশীতে বাড়ী করে থাকার খোঁসারং দিতে হয়। যেখানে যত আশ্রয় আছে এই স্রবোণে কাশীবাস করে নিতে চায়।

শেষটা অতিষ্ঠ হয়ে উনি বাড়ী বদলালেন। গণেশমহল্লা থেকে চলে গেলেন কামাছার। কাউকে ঠিকানা দিলেন না।

ক'দিন খুব আরামে কাটলো।

এক দিন দুপুরবেলা হঠাৎ—জ্যোতিষশাই, আপনি এখানে এসে উঠেছেন? উঁকি কই রে হয়েছে আপনার বাড়ী খুঁজতে!

আচ্ছা মীরা, তুমিই বোলো, কি বকম মনে হয়? ভালো মানুষ ওঁরা, কাউকে কিছু বলতে পারেন না, আমাদের বলতে ইচ্ছে করে, কাশীতে কি হোটেল নেই? ধর্মশালাও তো খোলা আছে। কালীবাড়ীতেও থাকা যায়। মরতে এখানে কেন?

চলে গেলেন বুলানালা, চলে গেলেন শিবালয়, গেলেন লঙ্কা—সেখান থেকে আবার ৩৭বিঘনাখ দূর হয় বলে এলেন পাঁড়োহাউলি কিন্তু অতিথিরা শুঁকে ছাড়লো না, ঠিক আবিষ্কার করলো আর পাত বার করে বলতে লাগলো, বারে বারে বাড়ী বদলান কেন? এই তো আজ কর্তী গিন্না বিদ্যাচলে গেছেন বাস করে—এক দল এসে দরজা গোড়ায় মাল পত্র রেখে ঠিক অপেক্ষা করছে, রাত্রে কিংলই দরজা খুলে চুকবে। শুধু কি ঢোকা? বলে, মাছ খাব, মাংস খাব, মামলেট খাব, বা ওঁর বাড়ীতে ঢোকে না।

মীরার হাসি পায়, কী অত্যাচার! স্বরমাকে ওর ভালো

মীরার সঙ্গে ও রাস্তায় নেমে এলো। গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে। বলে, আমরা আগেকার লোক, গায়ে কিছু একটা না জড়িয়ে রাস্তায় বেরোতে পারি না। আর মাথায় কাপড় সব সময়ে থাকে। দেখো সব চলছে খোঁপা দেখিয়ে ধ্যাং-ধ্যাং করে, কি রকম বেহায়া দেখায়!

মীরা বলে, আর ওরা ভাবে বৌদি, আপনারা জ্বলী।

সে তো চিড়িয়াখানায় বাদররা ভাবে মানুষগুলো কী অসভ্য।

এখন কে বাদর, কে মানুষ বিচার করবে কে বৌদি?

বড় রাস্তায় বড় বড় ঘড়া মাথায় নিয়ে গোয়ালারা ঐবিশ্বনাথের দূধ নিয়ে চলেছে ব্যোম ব্যোম শব্দ করে। লোকে পথ ছেড়ে দেয়। কী শক্তি ওদের গায়ে! এত ভারী ঘড়া কীথেকে বরা কি চাটখানি কথা? ঐবিশ্বনাথের স্নান হবে এই ঘড়া ঘড়া দূধ দিয়ে। চরণামৃত হিসাবে লোকে পাবে। মীরা মনে করে—এ কথা ভাবতে নেই, দেশের কত ছেলে এক কৌটা দূধ পাচ্ছে না, আর ঐবিশ্বনাথের পূজো হচ্ছে ঘড়া-ঘড়া খাটি দূধ দিয়ে! পাণ্ডাদের বলতে গেলে, তারা মারতে আসবে। তেমন ক'রে ভাবতে শেখেনি ব'লে—সোমনাথের মন্দির লুট হয় বারে বারে। কিন্তু ছোট ছেলেও জানে আসল সোমনাথের গায়ে হাত দেয়—এমন সাধ্য কোনো মানুষের নেই; মন্দির ভেঙে মসজিদ ভেঙে মানুষকে অপমান করা হয়, নিজেকে ছোট করা হয়, ভগবানের কিছুই করা যায় না। তাই বিশ্বনাথ-জগন্নাথ-সোমনাথরা মানুষের হাতেই আবার ফিরে আসেন। কালাপাহাড়ীরা, গজনীর মানুষেরা ম'রে যায়। ভগবান হাসিমুখে জেগে থাকেন! যেমন রাজব ফিরে আসে, ক্লাইভ, উমিচাঁদ, মীরজাফর চিরদিনের মতন ম'রে যায়—চিরদিন ধ'রে লোকের মুখে মুখে অভিশাপ পায়। কাকুর বলবার সাহস থাকে না—আমি, আমি মীরজাফর উমিচাঁদ জগৎ শেঠের বংশধর। রাজশক্তি একদিন স্পষ্টা ভবে অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা স্মৃতিস্তম্ভ তোলে, ময়দানে অপূর্ণ ভাস্কর্যের অস্বাদ্য মূর্তি পিঁড়ি করায় তাদের, যারা ভারতের স্বাধীনতার বৃদ্ধ দমন করেছিলো—তাদের নামে রাস্তা পার্ক তৈরী করে, যারা তাদের শাস্তি দিয়েছে যারা নিজের দেশে স্বরাজ চেয়েছিলো। তার পর ঢাকা ঘরে যায়। মূর্তি স্মৃতিস্তম্ভ নাম বিলুপ্ত হয়, যারা এক দিন দণ্ডিত হয়েছিলো, তারা পায় বীরের সন্ধান।

বাঘার কাছে শুনে শুনে মীরা আজ-কাল এমন ভাবনা ভাবতে শিখেছে। তবু দেখে, তারাই উন্নতি করে, জীবনে সুখী হয়,—অন্ততঃ বাইরে থেকে দেখলে ঐ মনে হয়—যারা দেশের কথা ভাবে না। যারা বলে না—

ও আমার দেশের মাটি তোমার

পায়ের ঠিকাই মাথা।

তোমাকে বিশ্বমণীর বিশ্বমাণের

আঁচল পাঠা।

বলে না,

যে তোমারে ছাড়ে ছাড়ুক,

আমি তোমায় ছাড়ব না মা!

তোমার চরণ করব স্মরণ

মানের আশে দেশ বিদেশে

যে মরে সে মরুক ঘুরে

তোমার ছেঁড়া কাঁধা আছে পাঠা

তুলতে সে যে পারব না মা!

সেদিন তুলসীদাসের সাধনক্ষেত্রে বাধা বলছিলেন দেশাঙ্কবোনে গান রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ভারতবর্ষে আর কেউ লেখেনি। হয় এ পৃথিবীতেও কেউ লেখেনি! তাঁর গান যত লোককে প্রেরণা যুগিয়েছে, এমন আর কাকুর নয়। শুধু দেশপ্রেমের কথাই কেন? জীবনের পথে চলার কথা। এসো মীরা, আমার সঙ্গে গা মিলিয়ে একটা গান শোখো—

যদি দুঃখে দহিতে হয়,

তবু মিথ্যা কর্তব্য নয়।

যদি দৈন্ত্য বহিতে হয়,

তবু মিথ্যা চিন্তা নয়।

যদি দগু সহিতে হয়,

তবু মিথ্যা বাক্য নয়।

জয় জয় সত্যের জয়।

আবার বলো,

যদি দুঃখে দহিতে হয়,

তবু অস্তিত্ব কর্তব্য নয়।

যদি দৈন্ত্য বহিতে হয়,

তবু অস্তিত্ব চিন্তা নয়।

যদি দগু সহিতে হয়,

তবু অস্তিত্ব বাক্য নয়।

জয় জয় মঙ্গলময়।

হাওয়ার সে স্তর অসিঘাট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিলো।

এমন সময়—

ব্যপ্তি রাঘব রাজারাম।

পতিত পাবন সিয়ারাম।

বলতে বলতে একদল লোক আসতে ওরা উঠলো।

কাঁথির পিসিমা বলেন, কেমন লাগছে মীরা এখানে?

খাঁচার পাখীর যেমন লাগে মুক্ত আকাশ দিলা। স্বর্গীয় কোলাগে পাহাড়ের কোল। ছিলাম বাগানের কোয়ারা, কল টিপ খোঁ হ'ত, হয়েছি বনের বর্ণা, নিজের আনন্দে ব'রে চলেছি।

কিন্তু এরকম তো চলবে না। এক বার তো ফিরতে হবে বাসের কাছে ছিলি, তাদের মতামতটা তো জানা দরকার। তারা হয় খবরই নেয় না, সমানে তো খরচের টাকা পাঠিয়ে রাখে যে জন্তে। সাত-আট মাস ধ'রে!

যেদিন টাকা পাঠানো বন্ধ করবে, সেদিন ভাবা বাবে। ঐ এখন আমি রামনগর চললুম বাখাদার বাড়ীর সকলের সঙ্গে।

মীরা ভাবে কাশীতে এসেছিলেন শঙ্করাচার্য এসেছিলেন শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন বুদ্ধদেব। নতুন ধর্ম বাঁধাই প্রচার করেছেন, তাঁদের কাশীতে আসতে হয়েছে। এই জন্তেই হয়তো কাশী হিন্দুর ভাঙ্গো লাগে।

বাঘার বোন স্মৃতি কিন্তু একটা মজার কথা বললো নৌকার

একদিন —



খন নি। বসেছিলেন—আমার বাবা আর মা-ই তো বিধবাবধি আর পূর্ণ। কী অসাধারণ মনের জোর দেখো! পারে কেউ?

বাবার দাও বললেন, এসেছিলেন নেপালের রাজা ত্রিভুবন বাদীসের য়ে। বিধবাবধির মন্দিরে সেদিন সকালে আর কেউ চুকে রনি, ওমাই প্রাণ ভরে পূজা করেছিলো। কিন্তু জবাবাহার দার চর ছিলো পাহারা দিয়ে। যাতে রাজার সঙ্গে ইংরেজ সরকারের খাবারী না হয়।

মীরা বলে, সে কি? বাবা ত মন্ত্রী। রাজার চেয়ে মন্ত্রী বড়ো! কান্দে কী কথা?

এক দিন নেপাল রাজার চেয়ে মন্ত্রীরাই বড়ো ছিল। রাজার প্রাসাদে প্রহরী থাকত পাহারা দেবার জন্তে, রাজা যাতে না পালিয়ে যেতে পারে। বাইরের কোনো লোক যেন রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। এমনি কেটেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। আশীশ নেপালী প্রজাকে মূর্খ রেখে, রাজাকে নজরবন্দী করে, মন্ত্রীরা ক্রমাগত রাজকোষের বৈধি ভাগ অর্থ লুটে-পুটে নিয়েছে। ইমালয়ের পাহাড়ের উঁচু চূড়া বেরা নাচ উপত্যকায় কাঠমুন্ড শহর দূরের পর দিন এই অনাচার সহ করেছে। ইংরেজ গভর্নমেন্ট সার দেছে। তার পর—

তারপর?

রামনগরের রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের দিকে চেয়ে মীরা শেষটা স্নতে চাইলো।

তার পর ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হল—তখন এক জন ইংরেজ লেডি ডাক্তারকে রাজা ডেকে পাঠালো বাদীর চিকিৎসার জন্তে। তার মারফৎ খবর পাঠালো হিন্দুস্থান সরকারকে। তার পর এক দিন মঙ্গলবলে এখানে পালিয়ে এলো। বাদীদের সে দিন কী বাগ!

তারপর?

তার পর স্বাধীন নেপালের স্বাধীন নরপতি ত্রিভুবন মন্দিরে গেল নেপাল রাজশক্তি নিয়ে মন্ত্রীদের শক্তি হরণ করে। জবাবাহারেরা গাণ্ড হয়ে গেল। বাঙালী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যে নেপালে বুদ্ধের বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই নেপাল সমুদ্র দেশ হয়ে উঠলো। একটা কথা জেনো মীরা, ইংরেজ অবিধামত ইতিহাস বিকৃত করেছে, কিন্তু গ্রীকরা ভারতবর্ষের যে ইতিহাস লিখেছে, তাতে নিজেদের নীচতা, পরাজয়, কিছু গোপন করেনি—আর ভারতের মহত্ত্ব উল্লসিত সমস্ত প্রকাশ করেছে। পুস্তক বাবু, চন্দ্রশেখর শৌর্য—গ্রীকরাই জানিয়ে গেছে, আর কেউ নয়। তারা না জানালো আমরা জানতেই পারতুম না। চন্দ্রশেখর নাটকও সৃষ্টি হত না। ঐতিহাসিক হবে সকলের উদ্দেশ্যে। দিপাইবিন্দ্রোই নয়—বাংলার সরাসরি বিন্দ্রোই প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ—এ কথা চাপা পড়ে গেছে ঐতিহাসিকের সর্বোপায়ায়। অবশ্য, ইতিহাস লেখাও অতি কঠিন কাজ। এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করছিলেন। হাজার হাজার বছর আগে থেকে শুরু করে। হঠাৎ তার জানলার সামনে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো, কি করে ঘটলো তিনি নিজের চোখে সব দেখলেন। তার পর যে সব লোক গিয়েছিলো, বারো প্রত্যক্ষদর্শী, অর্থাৎ নিজের চোখে সব দেখেছে, তারা এক একজন এক এক রকম কাহিনী বললো—কাকর সঙ্গে কাকর মিললো না। তখন ঐতিহাসিক ভাবলেন দিনের আলোয় কেটা ঘটনা নিজের চোখে পরিষ্কার দেখেও যখন ভিন্ন ভিন্ন লোকের

মুখে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ শোনা যায়, তখন হাজার হাজার বছর আগের ইতিহাস কত বিকৃত হয়ে গেছে সহজেই ভাবা যেতে পারে। অতএব থাক ইতিহাস রচনা।

রামনগরের ঘাটে ব্যাসকানী দেখতে তখন অনেক বাদী এসে গেছে। ছায়াময় ব্যাসকানী, সেখানে ময়লো গাথা হয়, সেও ভালো লাগছে কলকাতার বেজিপার্কের বদ্বিজীবনের চেয়ে। [ক্রমশঃ]

## জলকন্ঠা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

### হান্স ক্রিশ্চিয়ান হ্যাগারসন

বাকমকে সোনালি পাখরের প্রাসাদ, শ্বেতপাখরের উঁচু সিঁড়ির ধাপ সোজা সমুদ্র থেকে উঠে গেছে। মাথার সোনার গম্বুজ; বিরাট থামগুলোর কঁকে কঁকে শ্বেতপাখরের মূর্তিগুলো হঠাৎ দেখলে সত্যিকার মানুষ বলেই মনে হয়। উঁচু জানলাগুলো পরিষ্কার কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যায়, মধ্যমলের পূর্ণ-খুলোনা বিশাল ঘর, দেয়ালে জয়কালো ছবি। সাগর-রাজার মেয়েদের পক্ষে এমন অপূর্ণ দৃশ্য দেখা মস্ত একটা ক্ষুতির ব্যাপার; সব চেয়ে বড়ো একটা ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে তারা দেখলো, মাঝখানে এক ফোয়ারা খেলছে, তার জল উঠছে পিচিকিরির মতো উপরের বকমকে গম্বুজ পর্যন্ত; কঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঝিলকিয়ে পড়ে নাচছে জলে, চিকচিক করছে চার দিকের শব্দর গাছপালা।

এখন জলকন্ঠা জানলো কোথায় থাকে তার প্রিয় রাজপুত্র। এখন থেকে প্রায় বোজ সন্ধ্যায় সে সেখানে যায়। সাইস করে বাড়ির যতোটা কাছাকাছি সে যায়, অতোটা আর কোনো বোন যায় না। শ্বেতপাখরের বারান্দার তলা দিয়ে যে ছোটো খাল গেছে, এক দিন সে তা দিয়েও সাঁতরে গেলো খানিকটে। এখানে, উজ্জল জোছনার রাঙে বঁসে বঁসে সে রাজপুত্রকে দেখে, রাজপুত্র তো তাকে দেখতে পায় না, সে জানে নিজে সে একা-একা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

কখনো রাজপুত্র বেড়াতে বেয়েই রঙ-করা শৌখিন নৌকায়, উপরে ওড়ে নানা রঙের নিশান। জলকন্ঠা লুকিয়ে থাকে পাড়ের সবুজ বাশ-বনে, কান পেতে শোনে তার কথা; তার রূপালি বোমটা মাঝে মাঝে হালকা হাওয়ায় উড়ে যায়, তার বশবশানি নৌকোর কেউ যদি শোনে তো মনে করে বুঝি একটা বুনো হাঁসের ডানা-স্বাষ্টানি কেঁপে গেলো।

কোনো-কোনো রাঙে জেঙ্গেরা মশালের আলোর মাছ ধরে; রাজপুত্রের কথাই বলাবলি করে তারা, কতো তার মহৎ কীর্তি। সে-সব কথা স্নতে-স্নতে জলকন্ঠার মন স্রুতে ভরে উঠে; ওড়ের লড়াই করে সেই-ই তো তাকে বাঁচিয়েছিলো, আর সে শুয়েছিলো তার হাতের উপর অবশ মাথা রেখে—কিন্তু সে তো তা জানে না, স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

শেষে সব মানুষই জলকন্ঠার প্রিয় হয়ে উঠতে লাগলো। আহা, সে যদি মানুষ হতো। কতো বড়ো মানুষের পৃথিবী, সমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজ করে তারা উড়ে যায়, মেঘ-মাদানো পাহাড়ের চূড়ার বেয়ে ওঠে; আব তাদের বন-জঙ্গল ধুঁখু কতো দূর চলে গেছে, অতো দূর জলকন্ঠার চোখ যায় না।

অনেক জিনিষের মানে সে বুঝতে চায়, কিন্তু তার বোনের ভালো রে জবাব দিতে পারে না। যেতে হোলো আবার তাকে বুড়ো কুমার কাছ—তিনি তো সমুদ্রের ওপরের দেশের অনেক বর রাখেন।

যে সব দেশের মানুষ ডুব মরে না, তার কি চিরকাল গটে? আমরা বারা সমুদ্রের তলয় থাকি—আমাদের মতো তারাও মরে না?

ঠাকুমা উত্তর দিলেন, মরে বৈ কি। আমাদের মতো মরতে হবে তাদেরও, তাদের জীবন আমাদের চাইতে অনেক ছোটো। আমরা বাঁচি তিনশো বছর, তার পর ম'রে সমুদ্রের কেনা হ'য়ে ভেসে বেড়াই। অমর আত্মা নেই আমাদের, সেই পুনর্জন্ম। এক বার কেটে-কল্যাণী ঘাসের মতো আমরাও চিরকালের মতো বাঁচি শুকিয়ে। কিন্তু মানুষের বেলায় শরীর ধুলো হ'য়ে গেলেও আত্মা বেঁচে থাকে; আমরা যেমন মানুষের বাড়ী-ঘর দেখাবা জন্তে জল থেকে উঠি, তারা ওঠে উর্ধ্ব-আকাশের অজানা-অপরূপ রাজ্যের দিক। যাকে তারা বলে স্বর্গ;—আমরা তা দেখতে পারিনে।

আমাদের আত্মা নেই কেন? ছোটো জলকল্যাণী জিজ্ঞেস করলে, ..আমি তো অন্যায়সে তিনশো বছরের আয়ু ছেড়ে দিতে পারি, যদি একদিনের জন্তেও মানুষ হ'য়ে বাঁচতে পাই, যদি পাই স্বর্গের সেই বাড়ির খোঁজ।

ঠাকুমা বললেন, এসব কথা ভুলেও মনে আনিস নে। টের ভালো আছি আমরাই; কতো বেশি দিন বাঁচি, কতো সুখে থাকি।

একদিন তো মরতেই হবে; তারপর সমুদ্র আমাকে ফেনার মতো অবিশ্রান্ত আছড়াবে, চুম্বার করে ভেঙে উড়িয়ে দেবে হাওয়ায়, আর কখনো মাথা তুলে উনবো না সমুদ্রের গান, কখনো দেখবো না সুন্দর ফুলগুলো, আর এই উজ্জল সূর্য। আচ্ছা, ঠাকুমা, অমর আত্মা কি পাওয়া যায় না কিছুতেই;

পাগল! এ অবিশ্বাস সত্যি কথা যে যদি কোনো মানুষ তোকে এতো ভালোবাসে যে তার বাবা-মা'র চেয়েও তুই প্রিয় হ'য়ে উঠিস, যদি সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোকেই চায়, আর বিশ্বের মন্ত্র পড়ে শপথ ক'রে বলে যে চিরকাল তোকেই ভালোবাসবে সে; তা হ'লে অবশি তার আত্মা উড়ে আসবে তোব মধ্যে, মানুষের সার্থকতা তুই জানবি। কিন্তু তা কি কখনো হ'তে পারে? আমাদের চোখে আমাদের শরীরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ ঘেঁটো, সেই লাড়ুটাই তো তাদের চোখে পবন কুংসিত, তারা ওটাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। শরীরের সঙ্গে ছুঁটে বিদগ্ধে খুঁটি না থাকলে নাকি ওদের চোখে সুন্দর দেখায় না—যাকে ওরা বলে পা।

দীর্ঘশ্বাস ফেল জলকল্যাণী নিজের শরীরের দিকে তাকালো: এমন সুন্দর, এমন নরম—কিন্তু এ তো! একটা শাঁসওয়ালা ল্যাজ।

ঠাকুমা বললেন, সুখী তো আমরাই। তিন শো বছর আমরা হেসে-খেলি, লাফিয়ে-সাঁতার বেড়াবো—সেটা অনেক কাল—তার পর মরবো নিশ্চিন্ত হ'য়ে। আজ রাজে সভায় একটা নাচ আছে যে।

ঠাকুমা যে নাচের কথা বললেন, এমন জমকালো ব্যাপার—

অসম্ভব অসম্ভব কখনো দেখা যায়নি; সভার সেরাগুলো সব

হাজার-হাজার শব্দ বসানো, কোনোটার গোলাপি রঙ, ঘাসের মতো সবুজ আবার কোনোটা; কিন্তু সবগুলোই ভিতর থেকে তীব্র আলো বেরিয়ে আসছে, তাতে সমস্তটা ঘর আলোয় আলোময়। স্বচ্ছ দেওয়া ছাড়িয়ে তাদের আলো জ্বলও অনেক দূর গিয়ে পড়েছে; তাতে বলমল করে উঠছে লাখ-লাখ মাথের আঁশ—কোনোটা লাফ কোনোটা বেগুনি, কোনোটা সোনালি কি রূপোলি, একটা ছোটো একটা-বা বড়ো।

সভার মাঠখান দিয়ে ব'য়ে চলেছে স্বচ্ছ উজ্জল একটা স্রোত তারই উপর নাচছে দলে-দলে জলপুরুষ আর জলকল্যাণী, তাদের নিজেদের অপরূপ কণ্ঠস্বর তালে-তালে অমন মধুর নাচের ভবি পৃথিবীতে কখনো দেখা যায় নি। তারই মধ্যে ছোটো রাজকল্যাণী গলায় যেন স্রবের ফোয়ারা, তেমন তো আর কারো নয়। হাততালি দিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালে সবাই।

এতে সে খুশি হ'লো। সমুদ্রে কি পৃথিবীতে তার চেয়ে অপরূপ স্বর কোনোখানেই নেই, এ সে ভালো ক'রেই জানে একটু পরেই সে উপবকার পৃথিবীর কথা ভাবতে লাগলো; নরক রাজপুরুষকে ভুলতে পারে না সে, তার যে অমর আত্মা নেই, এতে সামলাতে পারে না সে। পিতার প্রসাদ থেকে সে পালিয়ে এসে ভিতরে যখন ব'য়ে চলেছে উৎসবের স্রোত, তার ছোটো উপেক্ষা বাগানে গিয়ে ব'সে রইলো সে চূপ ক'রে।

আচমকা সে শুনলে, শিঙার ফুঁয়ো শব্দ জলের উপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে গেলো। মনে-মনে সে বললে, এই বৃষ্টি তে বেরলো শিকার—যাকে আমি বাবা-মা'র চেয়েও বেশি ভালোবাসি সব সময় ভাবি যাব কথা, যাব মধ্যে আমার জীবনের সব মানক জ'মে রয়েছে। সব, সব বিপদ আমি নেবো—তাকে যদি পাই, আর পাট সেই সঙ্গে অমর আত্মা। আমার বোনেরা নাচুক বাজ সভায়; আমি যাবো সেই ডাইনীর কাছেই—চিরকাল তাকে মিলান ভয় ক'রেই এসেছি—কিন্তু এখন সে ছাড়া আমার তো উপায় নেই আর।

গেলো সে বাগান ছেড়ে; ফেনিয়ে-ওঠা দে-বুঁধি ছাড়িয়ে ডাইনীর বাসা, গিয়ে ঝাঁড়ালো তার দারে। এ-পথে সে আরো কখন আসেনি। এ-পথে ফোটে না ফুল, মাড়াতে হয় না সাগর-বায় সবুজ জাওলা, পার হ'য়ে আসতে হ'লো ধু-ধু ধুব বালুবাশি, হয় ফেনিয়ে-বোরা ঘূর্ণিঙ্গল। বেলগাড়ীর চাকার মতো কৌশ-কৌশ করে ঘুরছে সেখানকার জল-যা-কিছু কাছ পায়, টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যার অন্তর পাতালে। এই ভীষণ জায়গা দিয়েই যেতে হ'লো তার ডাইনীর দেশে, যাবার আর পথ নেই যে। তারপর পেরোতে হ'লো একটা ডোবা, লিকলিকে পিছল কালাগুলো টপক ক'রে ফুটতে ডাইনী এটাকে নাকি বলে তার খেলার মাঠ। এর পরে একটা বন্য মধ্যে তার বাসা—বাসাখানাও অন্ধুত!

চার দিকে বসে গাছ আর ঝোপঝাড় সব ফণিমনসার জাত। কে লক্ষ্যুও একেকটা সাপ যশা উঁচু করে দাঁড়িয়ে: ডালগুলো টি লবা লিকলিকে হাতের মতো, আঙুলগুলো জাপ্ত পোকা; ব থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতি অঙ্গ সমস্ত দিক নড়ছে, বাড়িয়ে দি নিজেকে। যা-কিছু তারা ধরে, এমন ক'রেই আঁকড়ে ধরে যে জর আর সে-সব ছাড়ানো যায় না।

ভীষণ বনের দিকে তাকিয়ে ছোট্টা জলকক্সা চূপ করে একটু বইলো। ভয়ে টিপটিপ করতে লাগলো তার বুক। নিকটবর্তী ন ফিরে যেতো, যদি না তার মনে পড়তে রাজপুত্রের কথা—  
দয়তা! কথাটা ভেবে তার সাহস বেশ বেড়ে গেলো। সে  
লে তার লম্বা চুল; যাতে কণিমনসার আঁচকে না যায়;  
উপর হাত ছুঁটি চেপে ধরে মাজের মতো ক্ষতবিক্ষেপে জলের  
দিয়ে শৌ করে চলে গেলো সে; পেরিয়ে এলো বিদগ্ধ  
লা, খামকাঠি তার তার পিছনে বাগ হাত বাড়ালে।

টো অবশিষ্ট সে লক্ষ্য না করে পারলে না যে প্রত্যেকটি গাছের  
মধ্যে কিছু-না-কিছু আঁচড়ে দরা, হাজার ছোট ছোট হাত  
র বেড়ির মতো শক্ত হয়ে চেপে রয়েছে। সমুদ্রে ভূব মারে  
মায়ূষ এই পাতালে তলিয়ে গেছে; তাদের সাদা-সাদা কক্সাল  
কণিমনসার মুখের মধ্যে থেকে বিকট দাঁত বার করে  
দ। তার জড়িয়ে রয়েছে ডাটার জন্তদের কঠো-কঠো মুণ্ড,  
র পাঁজর, আর আন্ত কক্সাল! নানা জিনিসের মধ্যে এক  
কথাও দেখা গেলো; তাকে তারা আঁচড়ে ধরে গলা টিপ  
ছে। কী ভীষণ দৃশ্য বেচারী ছোট্টা রাজকন্যার চোখে শুধু  
নাই হোক, এই আতঙ্কের বনের ভিতর দিয়ে সে নিগিগ্ন হো  
হোল। তারপর পিছু কাশ-তরা একটা ভায়াগা; মস্ত মোটা  
ই শমুকরা সেখানে শুভ্রত্ব করে বেছাছে, আর তাই মাঝখান  
ইনীর বাড়ি—বস্ত তর্জাগা জগাহাজ তলে মেরছে, তাদের হাত দিয়ে  
ব। এখানে বঁসে ডাইনী কুচ্ছিৎ একটা কোলাবাতকে আদর  
ছিলো, আমরা যেমন পোষা পাখিকে আদর করি। বিকট মোটা  
টা শমুকগুলোকে সে পায়রা বঁসে দাকে—তার তার সারা গায়  
মায়ূষ হাত-পা ছড়িয়ে বেড়ায়।

ডাইনী বললে, কী চাও তুমি আমার কাছে হা আমি জানি।  
একটা আন্ত বোকা, কিন্তু তুমি যা চাও তাই হবে। কিন্তু  
পঙ্ক ভ্রমক বিপদে পড়বে তুমি—ওগো ফুটফুট রাজকন্য,  
খা তোমাকে আগুই বঁসে রাখছি। লাকটা হোমার পঙ্ক  
না—এই তো? চাও তুমি তার বললে মায়ূষের মতো ডাইনী  
—এই তো? তা-তলে রাজপুত্র তোমাকে ভালোবাসেনে, তুমি  
অমর আস্থা। তা-ই নয় কি? একথা বঁসে ডাইনী এতো  
য়ে হেসে উঠলো যে তার পোষা শমুক বাহুগুলো চমকে লাফিয়ে  
সারা গা থেকে করে পড়লো।

ঠিক সময়েই তুমি এসেছো,—ডাইনী বলতে লাগলো। যদি  
স্তব পরে আসতে তা-তলে আর এক বছরের মধ্যেও তোমার  
কিছু করার দাখি আমার থাকতো না। তোমাকে দেব  
কটি মন্ত্র-পড়া জল, তা নিয়ে তুমি মাতের ডাওয়া যাবে, তীরে  
সেই যাবে। অমনি তোমার লাজ বঁসে পড়বে, গজির উঁচবে  
ছোট্টা কাঠি, মায়ূষের আদরের পা। কিন্তু মনে রেখো—ভীষণ  
র দারুণ কষ্ট পাবে; মনে হবে তোমার শরীরের ভেতর দিয়ে কেউ  
লা একটা ছুরি চালিয়ে গেলো। এই কপালবের পর যে-যে  
ব তোমাকে, সেই বলে উঁচবে তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে শুন্দরী  
। থাকবে তোমার ভজির লাবণ্য, এতো হালকা পা কোনো  
ই নয়; কিন্তু প্রতি বার পা ফেলতে তোমার অসহ্য জ্বা  
—এইটো বেন খোলা তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে, রক্ত

পড়বে শ্রোতের মতো। পারবে তুমি এতো কষ্ট সহ করতে?  
যদি পারো, তাহলেই তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করি।

পারবো, পারবো, কীশঙ্কবে বললে রাজকন্য। মনে পড়লো  
তার রাজপুত্রকে, এতো দুখে তাকেই তো পাবে সে—আর পাবে  
অমর আস্থা।

ডাইনি বলতে লাগলো,—ভেবে দ্বাখো—একবার মায়ূষ হয়েছে  
কি আর কোনো দিন জলকক্সা হ'তে পারবে না। পারবে না কখনো  
বোনদের কাছে ক্ষিরতে, যেতে পারবে না বাপের বাড়ি—আর  
যদি এমন হয় যে রাজপুত্র তোমাকে এমন একান্ত ভালোবাসলো না  
যে তোমার জন্ত সে বাবা-মাকে ছাড়তেও প্রস্তুত হ'তে পারে,  
যদি তুমি তার সমস্ত ভাবনার আর প্রার্থনার জড়িয়ে যেতে না  
পারো, যদি না বিশপের মস্ত্রে তোমাদের বিয়ে হয়—তাইলে যে  
অমরতা তুমি চাও তা কখনো পাবে না, কখনো না। যে রাহে  
রাজপুত্র অস্ত্র একজনকে বিয়ে করবে, সে রাত্রি ভোর হ'তেই তোমার  
মৃত্যু। দুখে তখন চুরমার হ'বে যাবে তোমার বুক, সমুদ্রের কেনা  
হ'বে ভাসবে তুমি।

মুমূর্ষ মতো মানিমুখে জলকক্সা বললে, তবু, তবু আমি সাহস  
করবো।

আরেকটা কথা। আমাকেও তোমার কিছু দিতে হবে তো—  
এতো কাণ্ড করা কি সহজ কথা! সমুদ্রের তলার তোমাদের  
সকলের কষ্টই মধুর, তার মধ্যে সবচেয়ে মধুর তোমার কষ্ট। তাই  
দিয়ে রাজপুত্রকে মুক্ত করবে ভেবেছো তো? কিন্তু তোমার এই  
কষ্টস্বরূপ আমি চাই। তোমার মধ্যে সবচেয়ে যেটা ভালো জিনিস,  
তাই এই মন্ত্র পড়া জলের দাম; নিজের রক্ত মিশিয়ে সেটা তৈরি  
করবে আমি—খোলা তলোয়ারের মতো ধার হবে তো তার  
সেই জ্বলন্ত।

জলকক্সা বললে, আমার কষ্টই যদি কেড়ে নিলে তো আমার  
আব বইলো কী? কী দিয়ে রাজপুত্রকে মুক্ত করবো।

বইলো তোমার অস্ত্রের লাবণ্য, থাকলো তোমার ভজির স্ত্রী,  
তোমার কথা ভরা দৃষ্টি। এসব জিনিস মায়ূষের তল চিন্তকে  
মুক্ত করা সহজই হবে। বেশ! সাহসে কুলোবে তো? জিত বার  
করো—ওটা কেটে নিয়ে আমি নিজে রাখবো। মন্ত্র পড়া জলের  
এই দাম।

তার তাই হোক। বললে জলকক্সা।

ডাইনী তখন ফুটন্ত কড়াইতে সেই বিব তৈরি করতে লাগলো।  
অগে সে কড়াইটা বাত-শমুক দিয়ে বেশ ভালো করে মুছে নিলে,  
বললে, বিশুদ্ধ ভাবে সব করতে হয়। তারপর তার বুকে একটু  
আঁচড় কাটলো, কালো-কালো রক্ত গড়িয়ে পড়লো কড়াই গলানো  
আলকাতার মতো। সঙ্গে সঙ্গে অনেক মশলা ঢালা হ'লো।  
তারপর কড়াই থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠতে লাগলো এমন  
বিকট বীভৎস মূর্তিতে যে দেখলে ভয়ে মুচ্ছা যেতে হয়। তার  
ভেতর থেকে আবার কঁকানি গোড়ানির ঝাওয়াজ আসছে—অনেকটা  
কুমীরের কান্নার মতো। অনেকক্ষণ পরে মন্ত্র-পড়া জল পরিষ্কার  
জলের মতোই টলটলে দেখা গেলো—তৈরি হয়েছে।

ডাইনী বললে জলকক্সাকে,—তবে, এই নাও। সঙ্গে সঙ্গে  
তার জিন্দা টেনে কেটে ফেলো। বোবা হবে গেলো ছোট্টো

জলকঙ্কা—না পারে সে কথা বলতে, না পারে গাইতে। বাবার সময় ডাইনী বলে দিলে, 'যদি ফণিমনসারী তোমাকে ধরতে আসে, এই জলের একটুখানি ছিটিয়ে' দিয়ে—তাদের ডানাতুলি হাজার টুকরে' হ'য়ে ছিঁড়ে যাবে।

কিন্তু এ উপদেশের কোনোই দরকার ছিলো না। চকচকে শিশিটা তার হাতে তারার মতো বলমল করছে—তাই দেখেই ভয়ে মবে গেলো ফণিমনসারী। 'পার হ'য়ে এলো সে ভীষণ বন, পার হ'য়ে এলো ডোবা, ছাড়িয়ে এলো ফেনিয়ে ঘোরা চরকি-জল।

এইবার সে বাবার প্রাসাদের দিকে তাকালো। নিবে গেছে সজরা আলো, সবাই ঘুমিয়েছে। ভিতরে সে কেমন ক'রে যাবে—গেলে তো কোনো কথাই বলতে পারবে না? শেষবারের মতো ছেড়ে যেতে হ'চ্ছে এই বাড়ি—কষ্টে তার বুক প্রায় গেলো ভেঙে। লুকিয়ে সে গেলো 'বাগানে, প্রতি বোনের কুঞ্জ থেকে একটি ক'রে ফুল নিলে ছিঁড়ে নিজেরই হাতে, চুমো খেলো অনেক বার; তারপর ঘন-নীল জলের ভিতর দিয়ে ভেসে উঠলো সে উপরের পৃথিবীতে।

তখনো সূর্য ওঠেনি। রাজপুত্রের প্রাসাদে পৌছিয়ে পরিচিত শালা সিঁড়ি দিয়ে সে উঠে এলো। আকাশে তখনো চাঁদ জ্বলছে; ছোট্টো জলকঙ্কা শিশিতে ভরা মস্ত-পড়া জল ঢেলে দিলে গলায়। ধারালো ছুরির মতো সেটা যেন তার ভিতরটাকে ছিঁড়ে দিয়ে গেলো, মূহুর্তে হ'য়ে পড়ল সে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙলো তার মুহুর্ত, সমস্ত শরীর অসহ যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে। বাক, থুড়ে বাক। তবু তো সে গেলো তার এতো আরাধনার জল, দেখতে গেলো অপরূপ রাজপুত্রকে ঠিক তার সামনে, রাত্রির মতো কালো চোখ মেলে তারই দিকে তাকিয়ে থাকতে। লক্ষ্য পেয়ে নিজের চোখ সে নামিয়ে নিলে। একী! কোথায় তার মাছের মতো ল্যাজ? কোমল মশণ ছুটি পা নামে এসেছে যে! কিন্তু কোনো আবরণ নেই তার; বুখাই সে ঢেঁটা করলে তার লম্বা ঘন চুল দিয়ে নিজেকে ঢাকতে।

রাজপুত্র জিজ্ঞাস করলে, সে কে, কী ক'রেই বা এখানে এলো! উত্তরে সে তার উজ্জ্বল-নীল চোখ হুঁটা বড়ো ক'রে মেলে তাকালো, একটু হাসলো—হায়, সে তো কথা বলতে পারে না। রাজপুত্র তাকে হাতে ধ'রে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেলো। ডাইনী ঠিকই বলেছিলো; তার এমন লাগলো যেন খোলা তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে হাঁচছে সে, কিন্তু সে-কষ্টটা অনায়াসেই সে সহ করলে, এগিয়ে গেলো সে দখিলি হাওয়ার মতো হাসক'র পায়ে; যে দেখলো তাকে সে-ই অবাক হ'লো তার লজ্জানীলার লাবণ্য দেখে।

প্রাসাদে ঢুকলো সে, তার জন্ত আনা হ'লো বেশমের আর মশলিনের বাহার কাপড়; সেখানে বরা থাকে, তার মতো স্বন্দর কেউ নয়—কিন্তু সে না পারে কথা বলতে, না পারে গান পাইতে। রাজা-রাণী আর রাজপুত্রের সামনে বোজ গান করে কয়েক জন দাসী, তাদের বেশমি কাপড় সোনালি বুটি তোলা; তাদের মধ্যে একজনের পরিষ্কার স্বন্দর গলা শুনে রাজপুত্র খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলেন। তাতে জলকঙ্কার মনে বড়ো কষ্ট হ'লো; সে তো জানে এর চেয়ে ঢের বেশি স্বন্দর ছিলো তার গান। সে ভাবতো, হায় যে, তার

কি মনের অমন কষ্টের চিরকালের মতো খুঁইয়ে বসেছি,

দাসীরা নাচতে শুরু করলো। তখন উঠলো আমাদের জলকঙ্কা, লীলায়িত শুভ্র ছুই বাহু বাড়িয়ে দিয়ে মুহু ভঙ্গিতে যেন হাওয়া সে ভেসে বেড়াতে লাগলো। প্রতিটি ভঙ্গিতে ফুটে উঠলো তা জলের নির্ভূত লাবণ্যের ছন্দ; তার উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে যে-ক'র বলমল করে উঠলো তা দাসীদের গানের চাইতে অনেক নিবি হ'য়ে মর্মে গিয়ে বাজলো।

সকলেই মুগ্ধ হ'লো, সবচেয়ে মুগ্ধ হলো রাজপুত্র। সে তাকে ডাক, আমার কুড়িয়ে পাওয়া সোনা। বার-বার নাচলো সে, যদি প্রতিটি পা কেলতে অসহ যন্ত্রণা হ'লো তার। রাজপুত্র বা দিলে সে সব সময় তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে; তারই পাশের মখালের বাসিন্দে মশলিনের বিছনা পাতা হ'লো জলকঙ্কার।

রাজপুত্র তাকে পুরুষের পোশাক তৈরি করিয়ে দিলে; সে চ'ড়ে সে বখন সেরাবে, এই কুড়িয়ে-পাওয়াও যাবে তার মত। এক সঙ্গে কতো সুগন্ধি বনে তারা বেড়ালো, সবুজ ডালপালা ছুঁ ছুঁয়ে গেলো কাঁধ, নতুন পাতার ঘনতার মধ্যে লুকোনো পাকিস গানের জলশায় কী ফুটি! উঠলো জলকঙ্কা তার সঙ্গে গা পাগড়ে, নরম পা ফেটে বক্ত বেকলো, অমনি অমচরেরা ছুটে এসে ধাঁধা ক'রে। কিন্তু একটু মুচকি হেসে উঠলো রাজপুত্রের মা আরো উচুত; সেখানে দেখা যায় মেসেরা পায়ের নিচে কেস-কা গড়াগড়ি যাচ্ছে; ছুটছে এ-ওর পিছনে, যেন একঝাঁক পা দেখাশুধরে চলেছে উড়ে।

বাত্রে, প্রাসাদের সবাই বখন ঘুমে বিভোর, জলকঙ্কা পাখ সিঁড়ি দিয়ে আসতে নেমে এসে জলে পা ডুবিয়ে ব'সে থা। তখন তার মনে পড়ে জলের নিচে তার প্রিয়জনদের।

একদিন বাত্রে, তখন সে শিঁড়িতে ব'সে পা ধুচ্ছে, তার মা সাঁতরে এলো সেখানটায়, একসঙ্গে, হাতে হাত ধরে, গান গ গাইতে। কী করণ সে-গান! সে ডাকলে তাদের; সে তাকে দেখেই চিনতে পারলে; সে চ'লে আসায় তাদের বাড়িতে হুখ সে-কথা তাকে না-ব'লে পারলে না। এর পর থেকে যে বোজ বাত্রেই আসে। একবার সঙ্গে ক'রে বুড়ো ঠাকুমাকেও এসেছিলো—অনেক দিন জলের উপরকার দেশটি দেখেননি। একদিন সাগর-রাজাও এসেন, মাথায় তাঁর সোনার মুকুট; কি হুজ্বন ডাঙার খুব কাছে ভিড়তে সাহস পেলেন না, মেয়ে তাই কোনো কথাই বলা হ'লো না।

এদিকে ছোট্টো জলকঙ্কাটি ক্রমেই রাজপুত্রের বেশি প্রি উঠছে। কিন্তু তার কাছে সে কুড়িয়ে-পাওয়া সোনালি, কিছু নয় সে; কুঁকুটে মিষ্ট খুকুমণি—তাকে বিয়ে করব তার মাথায়ই এলো না কখনো। কিন্তু বিয়ে না করলে? পারে সে অমর আত্মা? বিয়ে তাকে করছেই হবে—নয় হ'য়ে যাবে সে, ছুটতে হবে তাকে চিরকাল, সমুদ্রের অশ্রাহ ধাক্কা স'ঙ্গে-স'ঙ্গে।

রাজপুত্র বখন তাকে বৃকে নিয়ে আদর করেন, তার জিজ্ঞাস করে, তুমি কি আর-সকলের চেয়ে বেশি ভালো আমাকে?

রাজপুত্র বলেন, সবচেয়ে তোমাকেই তো ভালোবাসি মতো ভালো আর কে? তুমিও তো আমাকে কম ভালো

একটি মেয়েকে পলকে দেখেছিলেম, আর বোধ হয় কখনোই না—তুমি অনেকটা তার মতোই। ছিলেম একবার এক ঠাণ্ডা জাহাজ, ডেকের ব'লে খেরে-খেরে ঠেকলেন গিরে এক গির্জার ধারে, সেখানে একদল মেয়ে পুজা-অর্চনা দাচ্ছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট্টোটি কুড়িয়ে পেলো আমাকে, বাচালো আমার। একবার শুধু তাকে আমি দেখেছিলাম, তার ছবি আমার দৃষ্টিতে আঁকা হ'য়ে গেছে, তাকে ছাড়া আর ক'লোবাসতে পারবো না। কিন্তু সে তো দেবতার সেবিকা, 'রে পাবো তাকে? তুমি তার মতোই দেখতে, সেইজগাই বৃষ্টি ছা' আমাকে সাধনা দিতে? আমাকে কখনো ছেড়ে যেরো না। জলকন্ডা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলে, হায় বে. সে তো জানে না ই তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলুম! দুবস্ত ডেউগুলোর উপর দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলুম বনের মধ্যে সেই গির্জার ধারে; জলুম পাগড়ের আলো লুকিয়ে—একুণি কেউ এসে পড়বে, আশায়। তারপর দেখলেন সেই সুন্দর মেয়েটিকে এগিয়ে যে—তাকেই সে ভালোবাসে আমার চেয়ে বেশি! সে এক বার দীর্ঘশ্বাস ফেললো, জলকন্ডা তো কঁদতে পারে না। মরে নাকি দেবতার সেবিকা, মন্দির ছেড়ে কখনো আসতে পার না, আর তো তাদের দেখা হবে না। আমি আছি সব সময় র সঙ্গে-সঙ্গে, রোজ তাকে দেখি; আমি তাকে ভালোবাসবো, শুভ ভাবনটা উৎসর্গ করবো তাকেই।

এদিকে রাজ-অমাত্যরা বলাবলি করে, প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে আমাদের রাজপুত্রের তো বিয়ে। মন্ত জাহাজ সাজানো আছে সেই জগাই। সকলকে জানানো হয়েছে তিনি দেশভ্রমণে যোগদান, আসলে কিন্তু যাচ্ছেন রাজকন্যাকে আনতে, লোকজন সঙ্গ-সামন্ত বিস্তার যাবে সঙ্গে। এসব কথা শুনে জলকন্ডা মুচকি হাসে; জগাইর মনের আসল ভাবখানা তার চেয়ে ভালো কে জানে!

একদিন রাজপুত্র তাকে বললে, আমাকে তো যেতে হ'চ্ছে। হুদা রাজকন্যাকে দেখতে যেতেই হ'বে আমাকে, আমার মা-বাবার চিঠি তাই। কিন্তু সেই মেয়েকে বিয়ে ক'বে ঘরে আনতেই হবে—এমন কোনো জোর তাঁরা করবেন না। অবশি আমার পক্ষে তাকে ভালোবাসাও অসম্ভব; গির্জার সেই মেয়ের মতো তুমি দেখতে ব'লে কি আর সে-ও তেমন হবে? যদি বিয়ে করতেই হবে, বর: তোমাকেই করবো—আমার কুড়িয়ে-পাওয়া সোনা, মুখ কথা নেই, চোখ-ভরা কথা। এই ব'লে সে তার চুলগুলো মাড়লে জড়িয়ে একটু আদর করলে; সঙ্গে-সঙ্গে জলকন্ডা মন পাড়ের সার্থকতা আর অমব আনন্দের মধুর স্বপ্নে নোনা দিয়ে উঠলো।

কমকালো জাহাজে চ'ড়ে প্রতিবেশী রাজ্যের দেশে যেদিন যাওয়া, সেদিন রাজপুত্র বললে জলকন্ডাকে, জাহাজে তার পাশে ঠাঁড়িস, সোনা আমার, সমুদ্রে তোমার ভর্য করে না তো? তারপর বললে, বটে সঙ্গে কেমন পাগল হ'য়ে উঠে। জলের নিচে থাকে কতো মছর মাছ, কতো আশ্চর্য জিনিস যা ডুবুরিরা দেখে।

জলকন্ডা একটু হাসলো এসব কথা শুনে। সমুদ্রের তলার ঠাণ্ডা না আছে ভা কি আর তার চেয়ে ভালো জানে পৃথিবীর কোনো মানুষ?

রায়ে চাঁদ উঠেছে আকাশে, জাহাজের সবাই ঘুমিয়ে, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সে ব'সে থাকলো। জাহাজ চলেছে সমুদ্রকে চিরে, জল উঠেই কেনিয়ে। সেদিকে তাকাতেতাকাতে তার মনে হ'লো। সে যেন তার বাবার প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে তার ঠাকুরার রূপোলি মুকুট। তারপর দেখলো তার বোনো জল থেকে উঠে আসছে, তারি ম্লান তাদের মুখ, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তার দিকে। সে হাসলো তাদের দিকে তাকিয়ে; সে যেমনটি চেয়েছিলো ঠিক তেমনটি সব ঘটছে, এই কথা তাদের বোঝাতে যাবে, এমন সময় সেখানে এসে পড়লো একজন খালাশি। তাকে দেখেই বোনো হঠাৎ এমন ছব দিলে জলের মধ্যে যে, খালাশি ছোকরা মনে করলে জলের উপর সে শুধু ফেনাই দেখেছিলো—আর কিছু নয়।

পরের দিন সকালে জাহাজ ঢুকলো রাজধানীর বন্দরে। বাজলো শব্দ, বাজলো জয়ঢাক, সেনা-সামন্ত মিছিল ক'রে গেলো শহরের ভিতর দিয়ে, উড়লো নিশান, চললো বলসানো সড়িন উঁচিয়ে তুরুক সোতার। রেজিই নতুন-নতুন আমোদ, নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া লেগেই আছে। কিন্তু রাজকন্ডা তখন সেখানে নেই, তাকে পাঠানো হয়েছে দূরের দেশে লেখাপড়া শিখতে, রাজবাশের সবরকম গুণপনা সেখানে সে আয়ত্ত করছে। কিছুদিন পরে, সে ফিরলো দেশে।

এই আশ্চর্য রাজকন্যাকে দেখতে ছোট্টো জলকন্ডা কিছু উৎসুকই ছিলো,—যখন দেখলো স্বীকার করতে বাধ্য হ'লো,—সুন্দরী বটে, এতো সুন্দর কোনো মেয়ে সে কখনো দেখেনি।

রাজকন্ডার গায়ের চামড়া এমন শাদা আর নরম যে তার ভিতর দিয়ে নীল শিরাগুলো যেন স্পষ্ট ফুটে বেরিয়েছে; বাঁকা ভুরু নিচে বকবক করছে কালো একজোড়া চোখ।

এ বে সেই! রাজপুত্র ব'লে উঠলো তাকে দেখেই। এই তো আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো—মড়ার মতো যখন প'ড়েছিলুম সমুদ্রের ধারে! সঙ্গজ বন্ধুকে সে নিলে কাছে টেনে। তারপর কুড়িয়ে-পাওয়া বোবা জলকন্ডাকে বললে, আজ আমার স্নহের সীমা নেই। যা আমি আশা করতে সাহস পাইনি, তাই হয়েছে। আমার স্নহে তুমিও কি আজ স্তবী হবে না?—আশে-পাশের সকলের মধ্যে তুমিই তো আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো।

বোবা জলকন্ডা হুংং একবার রাজপুত্রের হাত চেপে ধরলে। এখনই ভেঙে যাচ্ছে তার বুক; যদিও সেই বিয়ের রাত এখনো ভোর হয়নি, আসেনি তার মরণের দিন।

আবার গির্জার বাজলো ঘণ্টা, দূতেরা বেরুলো শহরের পথে-পথে আসন্ন বিবাহের ঘোষণা নিয়ে। বদোতে জললো রূপোর প্রদীপে স্তম্ভাকি আঙুন, বিশপ সোনার ধূপতিতে ধূনা দিলে, বর-বধু হাতে হাত রাখলো, উজারিত হ'লো বিবাহের পবিত্র মন্ত্র।

ছোট্টো জলকন্ডা পরেছে আজ বেশমের আর সোনার কাপড়, রাজকন্ডার গুড়নার আঁচল ধ'রে পিছনে ঠাঁড়িয়েছে। কিন্তু না দেখেছিলো সে এই শুভ অনুষ্ঠান, না শুনেছিলো গুরুগভীর বিয়ের বাজনা। শুধু সে ভাবছিলো তার আসন্ন অবসানের কথা; তার মনে হ'লো পৃথিবী ও স্বর্ণ দুই-ই সে হারালো।

সেই সন্ধ্যাতই বর-বধু জাহাজে সেলো ফিরে।

কামান, হাওয়ায় উড়লো পংপং নিশেন, আর জাহাজের খোল  
ছাৎ সোনালি কাপড়ের অপূর্ণ শামিয়ানার তলার কিংবাবের  
নরম জাজিম পাঁতা হ'লো,—বর-বধু রাঙে সেখানে শোবে।  
অল্পকূল হাওয়া উঠলো; নীল জলের উপর দিয়ে জাহাজ হালকা  
ছন্দে চললো হলে-হলে।

অন্ধকার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই রাশি-রাশি রঙিন আলো জ্বলে  
উঠলো, ছাদের উপর শুষ্ক হ'লো নাচ। জীবনে প্রথম বার সমুদ্র  
থেকে মাথা তুলে যে-দৃশ্য সে দেখেছিলো জলকঙ্কায় তা মনে পড়ে  
গেলো। এ দৃশ্যও তেমনি জমকালো—তাকেও যোগ দিতে  
হ'লো নাচে, জাহাজের তক্তার উপর পাখির মত হালকা পায়ে  
সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মুগ্ধ হ'য়ে গেলো সবাই: এতো  
সুন্দর সে-ও কখনো নাচে নি। ভীষণ লাগলো তার ছোটো  
হুঁটি পায়ে; কিন্তু সে-কষ্ট যেন তার আজ লাগলোই না—অনেক  
বেশি কষ্ট যে তার মনে?

আজকের পরে সে আর তাকে দেখবে না—যার জন্তে সে ছেড়ে  
এসেছে বাড়ি-ঘর, মা বাবা হারিয়েছে তার মধুর কণ্ঠস্বর, বোজ  
সয়েছে অসহ্য যন্ত্রণা—আর সেই মায়ুঘটি এক কঁোটা সন্দেহও করে না  
তার জন্তেই তো সে এতো সব করছে! আজই শেষ! এর পরে  
সে আর নিশ্বাস সেই বাতাস টানবে না যে-বাতাসে তার প্রিয়তমের  
জীবন; আর দেখবে না ঘন-নীল সমুদ্র, তারায় ছাওয়া আকাশ।  
আসছে চিরন্তন রাত্রি—সেখানে আর কোনো ভাবনা নেই, কোনো  
স্বপ্ন সেই। জাহাজের উপর ব'য়ে চলেছে ফুঁতির শ্রোত; সে-ও দুপুর  
রাত পর্যন্ত সকলের সঙ্গে হাসিলো, নাচলো—মনের মধ্যে তার  
নিশেব-হ'য়ে-বাওয়া মৃত্যুর ভাবনা। তারপর রাজপুত্র গেলো তার  
সুন্দরী বধুকে নিয়ে জমকালো শামিয়ানার নিচে বিশ্রাম করতে।

এখন সব চূপচাপ; হাল ধ'রে একা একজন মান্না ঠাঁড়িয়ে।  
জাহাজের সিঁড়িতে শালা হাত হুঁটি হেলান দিয়ে ঠাঁড়িয়ে পূর্বের  
আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। কখন ভোর হবে?  
সূর্যের প্রথম আলোর রেখাই তো তার মৃত্যুর তলোয়ার। তার  
বোনেরা জল থেকে এলো উঠে, মৃত্যুর মতো ম্লান তাদের মুখ;  
এতো সুন্দর লম্বা চুল তাদের ছিলো, ঘাড়ের উপর দিয়ে ফুরফুর  
ক'রে উড়তো—এখন আর নেই।

কী হ'লো চুল?

'চুল দিয়েছি আমরা ডাইনীকে,'—তারা বললে। 'যাতে  
তোকে মরতে না হয়, যাতে সে তোর জন্তে কিছু করে। ডাইনী  
দিয়েছে এই ছুরিটা তোর জন্তে, এই নে।' সূর্য উঠবার আগেই  
এই ছুরিটা তোকে রাজপুত্রের বুক দিতে হবে বসিয়ে; যেই তার  
গরম রক্তের কঁোটা তোর পায়ের উপর পড়বে, অমনি আবার তোর  
ল্যাজ হ'য়ে যাবে। আবার তুই হবি জলকঙ্কা, সমুদ্রের ফেনা হ'য়ে  
যাবার আগে বাঁচতে পারবি তিনশো বছর। শীগগির কর শীগগির!  
সূর্যোদয়ের আগে হয় সে মরবে, নয় মরবি তুই! বুড়ো ঠাকুমা  
আমাদের রাজাই কীদে তোর জন্তে,—কীদে-কীদেতে কোথ তাঁর  
অঙ্ক হ'য়ে গেছে, মাথার চুল সব পড়ে গেছে—যেমন গেছে আমাদের  
চুল ডাইনীর কাঁচিতে। মেঝে ফ্যাল, মেঝে ফ্যাল রাজপুত্রকে, তারপর  
আয় আমাদের কাছে। একুশি! একুশি! সেবছিসনে পূর্বের আকাশে

শেষ, সব শেষ! এই ব'লে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা  
গেলো।

বর-বধু বেখানে শুয়ে, ছোটো জলকঙ্কা তার সোনালি  
সরিয়ে ঢুকলো; তাকিয়ে দেখলো রাজপুত্রকে, চুমু খেতে  
কপালে; তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো আলো  
মুহূর্তেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। রাজপুত্র ঘুমের মধ্যে অকুট ব  
বললে—তার বধুর নাম; তার স্বপ্ন সে দেখছে, শুধু তারই—  
জলকঙ্কায় হাতে কাঁপছে সেই সর্গনেশে ছুরি!

হঠাৎ সে দূরে ফেলে দিলে মৃত্যুর সেই ধারালো জিহবা;  
লাল ডেউগুলো লাফিয়ে উঠলো সব দিকে; চেউয়ের উপর দি  
চললো যেন এক পাগলি মেয়ে, মুকুট তার টাটকা রক্তে ছো  
তার প্রিয়তম রাজপুত্রের দিকে শেষবার যে-চোখ মেলে  
তাকালো তা ক্রমেই স্থির, ঘোলাটে হ'য়ে এলো। তার  
জাহাজ থেকে কাঁপিয়ে পড়লো সমুদ্রে, ঠিক বুঝতে পারলে  
শরীর আস্তে-আস্তে ফেনা হ'য়ে গ'লে যাচ্ছে।

জলের বিছানা থেকে উঠলো সূর্য। এমন কোমল উ  
আলোর পাপড়িগুলো পড়লো তার নারা গায়ে যে, জলক  
বুঝতেই পারলে না যে সে মরছে। এখনো সে দেখছে জে  
সূর্যকে, তার মাথার উপর ভাসছে হাজার-হাজার স্বচ্ছ সুন্দর  
এখনো তার চোখে ভেসে উঠছে জাহাজের পাল, বাগানো  
আলোর নাচ! মাথার উপরে সেই অশরীরী জীবনের কণ্ঠস্বর  
পড়ছে সুর—তা এমনি মধুর, এমনি কোমল যে মাত্রমাত্র  
সে-শব্দ ধরাই পড়ে না, যেমন ধরা পড়ে না মায়ুঘের চোখে  
মৃতি। তাকে ঘিরে তারা ঘুরে-ঘুরে উড়ে বেড়ালো,—যদি  
তাদের নেই—নিজেদের লবুতা ইচ্ছার বেগে তাদের ঠেলে  
নিয়ে যায়। শেষটায় জলকঙ্কা দেখলো যে তার শরীরও  
মতো হালকা হ'য়ে যাচ্ছে; মনে হ'লো কে যেন  
সমুদ্রের ফেনা থেকে আস্তে-আস্তে ঠেলে তুলছে উপরের  
কোথায় আমি? যাচ্ছি কোথায়? সে জিজ্ঞেস ক  
তার কণ্ঠস্বর বেরুলো, শোনালো ঠিক ঐ আকাশকঙ্কাদের  
সে শব্দ অসৌক্যিক, শান্ত, স্নিগ্ধ! তার মধুর কোমলতা  
গহনতলে নিবিড় হ'য়ে থ'বে পড়লো।

আকাশ-কঙ্কাদের একজন বললে, তুমি যে আমাদের মধ্যে  
পড়েছো! আজ হ'তে তুমিও যে আকাশ-কঙ্কা! জলকঙ্কার  
আত্মা নেই; কোনো মায়ুঘের ভালোবাসা পেলে তার আত্মা  
হ'য়ে ওঠে! তার অনন্ত জীবন নির্ভর করে অপরের উপর।  
আত্মা আকাশ-কঙ্কাদেরও নেই। আমরা তা অর্জন কবি নি  
ভালো কাজের জোরে। আমরা উড়ে বাই গরম দেশে; ও  
পৃথিবীর ছেসেমেয়েরা বিধাক্ত হাওয়ার ঝাপটায় ধুকছে। অ  
স্নিগ্ধ নিশ্বাসে হাওয়ার বিব চ'লে যায়, তাদের প্রাণ ব  
বাতাসের মধ্যে আমরা ছড়িয়ে যাই ঠাণ্ডা হাওয়া, তাকে সুর  
ক'রে তুলি ফুলের মিলি গন্ধে; এমনি ক'রে সমস্ত পৃথিবীতে বি  
যাই স্বাস্থ্য আর আনন্দ। তিনশো বছর ধ'রে এমনি সুর  
জোরে আমরা অবরতা লাভ কবি—মায়ুঘের চিরন্তন সার্থক  
অশীর্ষক হই। আর তুমি ছোটো জলকঙ্কা—তুমি তোমার প্রা  
ক'রে রাজপুত্রকে বাঁচিয়েছো; হৃদয়ের প্রেরণায় মায়ুঘের প্রেম

করেছো, এতো দুঃখ পেলে আমাদের মতো মানুষের—এখন তুমি অপরূপ সেই নিয়ে উঠে এসেছো পরিবর্ষের শ; এখন তিনশো বছর ধরে সুকাজ করলে আমরা আত্মা রেস্ত পারবে।

হাট্টা জলকত্তা হুঁধের দিকে বাড়িয়ে দিলে তার আলোক-উজ্জ্বল তার সরল কোমল হুঁটি স্বচ্ছ নীল বাহ; তারপর জীবনে বার জলে ভিজে উঠলো তার চোখ।

এদিকে জাহাজে সবাই উঠেছে জেগে, আবার শুরু হয়েছে। সে দেখলো রাজপুত্র নববধূকে নিয়ে বসে আছে; তাকে না পেয়ে তাদের মন বড়ো খাবাপ; স্নান মুখে তারা তাকিয়ে নিচু মুখে চেউরের ফেনার দিকে—যেন তারা জানে এই সমুদ্রের ঘর মাঝে ঝাঁপ দিয়েছে সে। অদৃশ্য হয়ে জলকত্তা রাজপুত্রের লে চুমু দিলে, হাসলে তার দিকে তাকিয়ে; তারপর আকাশ-দেব সঙ্গে উড়ে মিলিয়ে গেলো জাহাজের উপর দিয়ে ভেসে-যাওয়া পিণি মেঘের মধ্যে, তাদের সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে গেলো দিগন্ত ছাড়িয়ে।

তিনশো বছর পরে আমরাও যাবো স্বর্গরাজ্যে,—সে বললে।

একজন কানে কানে বললে, আরো আগেও যেতে পারি। যে সব মানুষের বাড়িতে ছোট্টা ছেলেমেয়ে আছে, তাদের ভেতর অদৃশ্য হয়ে আমরা উড়ে বাই; আর যখন আমরা দেখতে পাই একটি ভালো ছেলে, যে তার মা-বাবার বুক, মুখ উজ্জ্বল করেছে, তাদের স্নেহের পুতুল হয়ে পড়িয়েছে, তখন ঈশ্বর আমাদের এই প্রতীক্ষার সময়টা কাটিয়ে দেন। শিশুরা কেউ জানে না যে আমরা ঘরে-ঘরে উড়ে বেড়াচ্ছি; জানে না তাদের ভালো কাজে খুশি হয়ে আমরা একবার হাসলেই তিনশো বছর থেকে একটা বছর কমে যায়। কিন্তু যখন আমরা দেখি বদমেজাজি দুষ্ট ছেলে, মনের দুখে আমরা কাঁদি, আর আমাদের প্রতি অশ্রুবিন্দু আমাদের প্রতীক্ষার সময় একদিন করে বাড়িয়ে দেয়।

অমুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

## সমাপ্ত

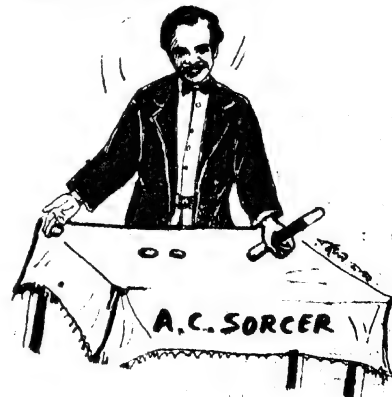
## একটি চমকপ্রদ ম্যাজিক

যাদুকর এ, সি, সরকার

মস্ত এক বৈঠকখানা ঘরে সমবেত হয়েছেন দর্শকবৃন্দ। এখানেই দেখানো হবে ম্যাজিক! আরম্ভ হতে এখনও প্রায় দশটা দেবী, তবুও এরই মধ্যে হলের অর্ধেক ভরে গেছে দর্শক। য় মধ্যে আবার কচি-কাচার সংঘটিত বেশী। কচি-কাচারাই য় খেলা বেশী পছন্দ করে কি না, তাই। প্রদর্শনী আরম্ভ করার। যখন হ'ল তখন তো ঘরে তিলধারণের স্থানটুকুও নাই। য় প্রায় বারো আনা অংশ ভরে গেছে কচি-কাচার দলে। তবুও শকটি শোনা যাচ্ছে না—সবাই চুপচাপ। কথটা শুনে য় হচ্ছ না তো? না হবারই তো কথা। বহুদেব সঙ্গে যখন মরা একত্র এক জায়গাতে থাকো, তখন তো তোমাদের কলরবে য় হয়ে ওঠে চারি দিক। চাই কি হুঁ-এক হাত ঝগড়া মারামারি য়াহতি হলেই বা কে আটকায়! যে ঘটনাটার কথা বলছি সেটা য়শের নয় বিলাতের। ওদের শৃঙ্খলাবোধ ও সৌজন্ম আমাদের য়র ছেলে-মেয়েদের চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ। নিয়মানুবর্তিতা তাদের য়গিত। যাক সে কথা। এখন যা বলছিলাম। যথাসময়ে য় দেখানো আরম্ভ করলাম। হুঁ-তিনটে ধুব চমকপ্রদ খেলা য়ানোর পরে আরম্ভ করলাম একটি অপেক্ষাকৃত ছোট্ট খেলা। য়দের সামনে একটি টেবিলের উপরে আমি রাখলাম তিন বকমের য়ি মুদ্রা—একটি হাফক্রাউন (আড়াই শিলিং) একটি দুই শিলিং য়টি এক শিলিং। খেলাটার কথা সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে য় দর্শককে পাল্লাবন্ধরূপ সঙ্গে নিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে য়ি। আমার অল্পবয়স্ক কালে এক জন দর্শক তার আসন য় উঠে এসে তার পছন্দ মতন যে কোনও একটি মুদ্রা তুলে য় হুঁঠো করে ধরে রাখলো, আর মনে মনে একশ' বার ঐ মুদ্রাটির

নাম করে হুঁঠো ধুলে মুদ্রাটিকে আবার যথাস্থানে নামিয়ে রেখে আমাকে ডাকলো। আমি ঘরে ফিরে এলাম; চোখ বন্ধ করে প্রত্যেকটি 'মুদ্রা' এক' এক বার হাতে তুলে নিয়ে পছন্দ-করা মুদ্রাটি সবাইকে যখন দেখালাম তখন তো সবাই বিম্বরে হতবাক হয়ে গেল।

শোন এবার খেলাটার কৌশল। একটি মুদ্রাকে কিছুক্ষণ হাতের হুঁঠোর মধ্যে রাখলে শরীরের উত্তাপে তা বেশ গরম হয়ে যায়—এ তো তোমরা দেখেছই। শীতকালে বা শীতের দেশে এই প্রক্রিয়া হয় আরও ভাল। টেবিলের উপরে পড়ে-থাকা মুদ্রাতে আর কিছুক্ষণ হুঁঠো করে রাখা মুদ্রাতে যে তাপমাত্রার পার্থক্য এ অল্পভব করেই এনা যায় ঠিক মুদ্রাটি।



# এক মুঠো আকাশ

পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

যদিও প্রভাত সম্পাদককে ভরসা দিয়েছিল কিছু টাকা জোগাড় করে দেবে বলে, কিন্তু কোথাও তেমন সুবিধে করে উঠতে পারে না। তাই 'সবুজ ঘাসের' ট্রেড-শো দেখতে এসে বেলারাগীর সঙ্গে দেখা হতেই সে ঐ কথার অবতারণা করে।

—আপনাকে একটা কথা বলার আছে।

বেলারাগী তেঁসে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার? আবার প্রশ্নোত্তর না কি?

—না, আমাদের পত্রিকা সম্বন্ধে।

—কি হয়েছে?

প্রভাত আমতা-আমতা করে, মানে একটু মুঞ্চিল হয়েছে, সম্পাদকের নামে ওয়ারেন্ট এসেছে। হয় জেল নয় ফাঁস।

—ঠাণ্ডা!

—ঠাণ্ডা আর কি, একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, ওরা বলছে অশ্লীল।

বেলারাগী অবাক হয়, এমন লেখা ছাপালেন কেন?

—আমি তো আর ছাপাই নি, সব ঐ সম্পাদকের কাজ।

একেবারে আঁকাট মুখ্য ইংরিজি থেকে অনুবাদ করেছে—

—তাই তো ভাবনার কথা!

প্রভাত আন্তে আন্তে বলে, প্রায় পাঁচশো টাকার দরকার। জানেনই তো কাগজের অবস্থা, কোথা থেকে যে এত টাকা দেবে—

—পাঁচশো! সে তো অনেক টাকা! এক কাজ করুন, চালা ফুলুন। আমি দশ টাকা দেব এখন। প্রভাত আর এ বিষয়ে কথা বলার উত্সাহ পায় না। বেলারাগী নিজে থেকে জিজ্ঞেস করে।

—'সবুজ ঘাস' কেমন লাগল?

—তেমন সুবিধের হয়নি।

তখনও অনুষ্ঠান শেষ হয়নি। বেলারাগী বলে, চলুন, আমরা বরং বেরিয়ে পড়ি। ভীড় ভাঙলে বড় দেয়ী হবে।

—চলুন।

বেলারাগী এগিয়ে গিয়ে এক ভদ্রলোককে ডেকে আনে। আলোপ করিয়ে দেয়, ইনি বিনোদ রায়, অভিনেতা, প্রযোজক, আরও অনেক কিছু। আর ইনি প্রভাত বাবু বই লেখেন।

কথা বলতে বলতে তারা নীচে নেমে আসে, কর্তৃকর্তাদের সঙ্গে দু'চারটে মুখের কথা হয়। বেলারাগী সকলকেই বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, বলে গাড়ীতে উঠে পড়ে। বিনোদের বড় গাড়ী, নিজে চালায়। সামনের সিটেই তিনি জেনে বসে পড়ে।

বাড়ী পৌছে বেলারাগী প্রভাতকে ছাড়ল না। বুললে, আশ্রন, আমাদের সঙ্গে। কফি খেয়ে যাবেন।

তারা তিন জনে বসবার ঘরে এসে বসে। প্রভাত ভালো করে বিনোদের দিকে তাকিয়ে দেখে। স্ত্রী চোখা, সিন্ধুর পাঞ্জাবী,

—আমি নিজেদের তিন, চোখে বন্ধু-বের-চশমা।

প্রভাত প্রশ্ন করে, আপনি কোন ছবিতে কাজ করছেন?

বিনোদ উত্তর দেয়, ছবিতে বেশী কাজ করি না, থিয়েটারে অভিনয় করি।

—কোন থিয়েটারে?

—এ্যামেচার।

—ওঃ।

—বেলার জন্তে এবার ফিল্ম লাইনে নামছি

—কোন বইতে?

—নিয়তির পরিহাস।

—কাব লেখা?

বেলারাগী উত্তর দেয়, লেখকের নাম প্রভাত বাবু।

প্রভাত বিস্মিত হয়, তার মানে?

—আপনাকে আগেই বলেছিলাম, আমি প্রডাকশন করবো

—হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে।

—তারই প্রথম বই আপনাকে লিখতে হবে।

আনন্দে প্রভাতের চোখ-মুখ সেজে ওঠে, এতক্ষণ বলেননি নাম কে ঠিক করলে?

—আমি।

—চমৎকার নাম দিয়েছেন, পোষ্টার পড়লেই লোকের

—খুব ভালো করে লিখতে হবে প্রভাত বাবু!

—কিন্তু প্রটী তো এখনও বললেন না?

বেলারাগী মিষ্ট করে হাসে, পরে বলবো। এখন থেকে আগতে হবে আপনাকে, সিঁদুরিও লেখা তো সোজা কথা নয়।

—ও নিয়ে আপনি ভাববেন না, একেবারে ফার্স্ট ক্লাস দেবো। তা ছাড়া হাতে সময়ও অনেক, পত্রিকাই এখন উঠে গে

বিনোদ এতক্ষণ এদের কথা শুনছিল, কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলে, বেলার, তোমার সঙ্গে দরকারী কথাটা সেবে নি বেলারাগী উত্তর দেয়, তাড়া কি, হবে এখন।

প্রভাত বোঝে, তারই জন্তে এরা কথা বলতে পারছে না ঠাড়িয়ে বিদায় চায়, আমায় মাপ করবেন, এবার চলি।

—এখন উঠবেন?

—আজ চলি, কাল বরং আগবো, বলে প্রভাত নমস্কার থেকে বেরিয়ে যায়।

বিনোদ উঠে গিয়ে বেলারাগীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎ বসে।

—কই, এ ভদ্রলোকের কথা তো আগে বলনি?

—বেলারাগী অন্তমনস্ক ভাবে বলে, মনে ছিল না। (ভাবলাম একে দিয়ে লেখালেই হবে।

—টাকা নেবে তো?

—কত আর, শতিনেক টাকা।





# লক্ষ্মীবিলাস

কেশ তৈল

এম. এল. বসু স্মার্ট কোং প্রাইভেট লিঃ  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-১

—মাত্র ?

—আবার কি। লোকটি ভাল, তবে বুদ্ধি কম। দেখলেই তো বুঝতে পারো—

—আশ্চর্য্য, সবাইকেই তুমি বোকা মনে কর ?

বেলারাগী ফুলদানীর ফুলগুলো সাজিয়ে রাখে।

—কি দরকারী কথা বলছিলে ?

—আমায় কত টাকা দিতে হবে ?

—যা বলেছিলে—

—ঠিক তো, তার বেশী কিন্তু দিতে পারব না।

বেলারাগী হাসে, দিলেও নেবো না। বত কমে সম্ভব বই তুলতে হবে, দেখছো তো বাজার ?

—পরিচালক ঠিক করছে ?

—প্রমোদ।

—প্রমোদ ? কি বলছো, ও যে একেবারে আনাড়ী।

—তাত কি হয়েছে, সাড়ে সাত শো'য় পুরো বই ! চল্লিশ দিনের মামলা।

—একটু রিভি হয় যাচ্ছে। বিনোদ গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করে।

—মেটেই না। লোক আসবে বেলারাগীকে দেখতে, পরিচালকেও নয়, লেখককেও নয়।

বিনোদ কি বলতে যাচ্ছিল, বেলারাগী খানিয়ে দিয়ে বলে, ওপরে চল সিঁদো ! হয়ে গেল, আমি চান করে নিই।

বেলারাগীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রভাত হাওয়ার ভাসতে ভাসতে চলে। নিজেকে তার খুব হালকা মনে হয়। এত দিন বাদে অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ সিনেমার গল্প লেখার স্বযোগ পেয়ে বেলারাগীকে মনে মনে ধন্তবাদ জানায়। এই সুখবরটি অরুণাকে না জানিয়ে বাড়ী ফিরতে তার ইচ্ছে করে না। অরুণা প্রভাতের ছাত্রী, প্রাইভেটে তিন বার ম্যাট্রিক ফেল করে এ বছর পাশ করেছে। আগের দু' বছর অল্প মাষ্টার ছিল, বার বার ফেল করায় তাদের বাড়িরে প্রভাতকে আনা হয়। আশ্চর্য্য প্রভাতের কপাল, অরুণা পাশ করল। এমন কি, থার্ড ডিভিশানে নয়, সেকেন্ড ডিভিশানে। অরুণার বাবা বলেছিলেন, আপনার বাগানদারী আছে, অরুণা যে পাশ করবে আমি ভাবিনি, তাই ত বিয়ের সম্বন্ধ করছিলাম, প্রভাত অমায়িক হেসে উত্তর দিয়েছিল, মেয়ে আপনার খুব শাপ', ঠিক কোচি: পায়নি বলেই—তা তো বুঝতেই পারছি। যাই হোক, ও বত দিন পড়াশুনা করবে আপনাকে ভার নিতে হবে। বলা বাহুল্য, প্রভাত এ কথায় সম্মতি দিয়েছিল। অরুণা সকালে কলেজে পড়ে, বিকেলে প্রভাতের কাছে।

আজ প্রভাত যখন অরুণার বাড়ীতে এল, তখন প্রায় দুটো বাজে। উঠানে যি বাগন মাজছিল, প্রভাত ডেকে বলে, দিমিগিকে এক বার খবর দাও।

বাইরের ঘরে বসতে বসতেই সে শুনতে পায়, যি অরুণাকে চেষ্টিয়ে ডাকছে। মিমিট হয়েকের মধ্যে অরুণা নেমে এস। প্রভাতকে দেখে চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করে, এ কি, এখন যে ?

—বস, একটা খবর আছে।

—কিসের ?

—আমার গল্প সিনেমায় উঠবে।

—সত্যি, কোন গল্প ?

—নিয়তির পরিহাস।

অরুণা হাততালি দেয়, কি মজা, আমাদের পাশ দেবেন তে সবাই গিয়ে ছবি দেখে আসব। বাবা এমনতে ছবি দেখে না, যি আপনার বই হলে নিশ্চয় যাবে। যাই, মাকে বলে আসি।

প্রভাত বাধা দেয়, আচ্ছা বোস না, সব কথা শোন।

অরুণা বসে পড়ে, তাই তো আপনার কথাই শুনিছি না, এ বলুন।

—আজই সকালে ঠিক হ'ল, প্রথমেই তোমাকে খবর দি এসাম।

অরুণা কপট রাগের ভাণ করে বলে, আমাকে দেখেন না : কা'কে দেখেন শুনি ? আপনার সেই খেদীকে ?

—আচ্ছা, তার কথা আনছ কেন ?

—একশ' বার আনব। আমি বরাবর দেখেছি আমার স কথা বলতে গেলেই আপনার খেদীর কথা মনে পড়ে, তার মত চাল ছাত্রী আর পান নি। কিন্তু আচ্ছা, বিয়ের সময় আপনাকে এর চিঠিও দিল না !

প্রভাত মনে মনে বিরক্ত হয়, কি কথা বলতে এসাম আর তু কি শুরু করলে বল ত ?

অরুণা প্রভাতের মুখটা দেখে নিয়ে বলে, রাগ করেছেন বুঝি আচ্ছা, আর একটি কথাও বলব না। এবার বলুন—

—তোমাকে বেলারাগীর কথা বলেছিলাম, এবার বই তুলার আমার লেখা উনি খুব ভালবাসেন কি না, তাই আনাকে দিয়েই—

অরুণা এতক্ষণ কোন কথাই শোনে নি, হঠাৎ প্রভাতকে খানি জিজ্ঞেস করে, একটা কথা বলব ?

—কি কথা ?

—রাগ করবেন না ?

—বল না ?

—বেলারাগীর বুটা খুব ফর্দা ? ছবিতে যেমন দেখায় ?

—না, শ্যামবর্ণ।

—ওঁর বাঁ গালে একটা 'বিউট স্পট' আছে না ?

প্রভাত আবার বিরক্ত হয়, আমি অত দেখি নি।

অরুণা হাসে, চোখে-মুখে তার ছুঁতু-মুঁতু, ঠাণ্ডা, দেখেন আবার। আমার কাছে অত সাধু সাজতে হবে না।

—কি মুস্তিল, যা বলি তাই নিয়েই ঝগড়া—

—ঝগড়া তো করি নি। আমাকে এক দিন বেলারাগীর ক নিয়ে চলুন না ?

—সেখানে কি করবে ?

—বেশ আলাপ-সালাপ করে আসব, কলেজের মেয়েরা সব অ হয়ে যাবে।

প্রভাত এবার উঠ পড়ে, আমি তাহলে চলি, আজ ৭ সন্ধ্যাবেলা আসব না, একেবারে কালকে।

অরুণা বিষয় প্রকাশ করে, আশ্চর্য্য লোক, এলেনই বা এ যাচ্ছেনই বা কেন ?

প্রভাত গজ-গজ করে, বললেই বা ওনছে কে ? আমি চলল

অকণা ধমকে ওঠে, যান দেখি কেমন যেতে পারেন? বন্ধন ঐ পারে, আমি মিষ্ট জল নিয়ে আসছি।

—আমার দেবী হয়ে যাবে।

—কোকু গো, কি এমন রাজকাব্য পড়ে আছে তুমি? যতকণ আসছি, পত্রিকাটা পড়ুন।

অকণা আদেশ জারী করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। প্রভাত লমহাঘের মত বসে পত্রিকার পাতা ওঁটোতে থাকে।

চুশীলাল শ্যামলের সঙ্গে দেবেনদা'র আলাপ করিয়ে দেবার পর থাকে শ্যামল প্রায়ই দেবেনদা'র বাড়ী যায়। বিভিন্নপদের এক প্রাক্তে হুখানা ঘর নিয়ে গুঁর বাসা। দেবেনদা'কে শ্যামলের অদ্ভুত লাগে। দেশের জন্তে উনি অনেক ত্যাগ করেছেন, সে সব কথা বলতে বলতে হুঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আবার কত সময় ছেলেনাদুগের মত কঁদে কেঁদে কেঁদে। শ্যামল চুপটি করে শোনে। সেদিনও তিনি বলছিলেন, লেখাপড়া কর শ্যামল, ভাল করে লেখাপড়া কর। জ্ঞান না হলে কোন কাজ করা যায় না।

শ্যামল কোন কথা বলে না, জ্ঞানে দেবেনদা' শুধু বলতেই ভালবাসেন।

—আমরা কলেজ ছেড়েছি অন্তঃসাগ আন্দোলনের সময়, কিন্তু পড়া ছাড়িনি। জেলে কি বন্দির সব সময় এন্টার বই পড়েছি, কবী, বিদেশী, যা পেয়েছি। এখনও কত কবিতা আমার মুখস্থ। একটু থেমে আবার বলেন, কিন্তু ভুল করেছি, মারা জীবন ধরেই ভুল করলাম। দেশের জন্তে সব ছেড়েছি, বাড়ী, ঘর, সমাজ, কিন্তু কি লাভ হল?

শ্যামল অগত্যা আস্তে বলে, কেন দেশ স্বাধীন হয়েছে, আপনাদের মত লোক না থাকলে—দেবেনদা' হাসেন, স্বাধীনতা তো কাগজ-কলমে। যাদের জন্তে প্রাণপণ করে বাঁচিয়াম তাদের কিছুটা হল না! না পেল তারা বেঁচে, না শিল্প তারা লেখাপড়া—

—চর আস্তে আস্তে—

—আর হবে, বিশ্বাস হারিয়েছি। যে পাটির জন্তে হাজার হাজার যুবক সেদিন প্রাণ দিয়েছে আজ সে পাটির কি অর্থতা! এক জন্মও সত্যিকারের মানুষ সেখানে নেই। যারা কোন দিন দেশের কথা ভাবেনি, এতটুকু ত্যাগ করেনি, সে দিনকার সবচেয়ে বড় স্বার্থপর যারা তারাই টাকার জোরে আজ পাটির হোমড়া-চামড়া হয়ে বসেছে। আমাদের মত লোকের সেখানে আর স্থান নেই।

কথা বলতে বলতে দেবেনদা'র চোখ-মুখ জাল হয়ে ওঠে, উত্তেজনার ঠিকি ওঠেন, ভেঙ্গে যাবে, সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এত বড় মিথ্যা কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না। শ্যামল এসব কথা'র কিছুই বুঝতে পারে না। তবে এইটুকু সে জানে দেবেনদা' যা কিছু বলেন, তার পেছনে লুকোন আছে একটি আঘাত পাওয়া ব্যথিত মন। তাঁর চিন্তাশ্রিত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় বলে, দেবেনদা', কালী একবার যেতে বলোছে।

—যেও, ঐ এখন আমার ডান হাত।

বাইরে থেকে কালীকে দেখে শ্যামলের মনে হয়েছিল লোকটা ভাল নয়, কিন্তু কাছে এসে আলাপ হতে তার মত বললে যায়। উত্তর-কলকাতার এক অধ্যাত গলিতে তার আন্তান। শুধু-গারে

লুঙ্গী পরে বসে থাকে। মাথার চুল এত পাতলা যে কালো টা'র পরিষ্কার দেখা যায়। নামের সঙ্গে চেহারার অবিকল মিল। প দিয়ে জল গড়ালে কালীর মতই দেখায়। শ্যামল দরজায় কড়া নাড়তে কালী নিজেকে এসে দরজা খোলে, এস ভেতরে। দরজা বন্ধ করে শ্যামলকে ঘরের ভেতর নিয়ে যায়। ছোট ঘর, আসবাব নেই বলসেঁ চলে। মাছরের ওপর বসে শ্যামলের হাতে হাত-পাখাটা ধরিয়ে দেয়, বড় গরম, একটু হাওয়া কর।

শ্যামল এ ধরণের আতিথ্যে বিস্মিত হলেও, কালীর কথামতাকে বাতাস করে। কালী পালক দিয়ে কানে স্নডুস্নড়ি দিতে দিতে চোখ বুজেই জিজ্ঞেস করে, বহন কত?

—বোল।

—বালা-মা কত দিন মারা গেছেন?

প্রশ্ন শুনে শ্যামল চমকে ওঠে। তবু উত্তর দেয়, মা মারা গেছে ছোটবেলায়, বাবা আছেন।

—ভাই-বোন অনেকগুলি বুঝি?

—আমি একা।

কালী এক চোখ খুলে দেখে, এ লাইনে ক'দিন?

শ্যামল ঠিক বুঝতে না পারে জিজ্ঞেস করে, এই পার্টিতে?

—পার্টি-ফাটি নয়, এখন কি করছ?

—কিছুই করি না।

কালী হুঁহাত দিয়ে মুখটা বগড়ায়, কি পারো?

শ্যামল আশ্চর্য হয়, কি রকম বলুন?

—পকেট মারতে পার?

শ্যামল স্তব্ধ হয়ে যায়, অনেককণ চুপ করে থেকে বলে, ঠোঁট করিনি।

—মিথো কথা বলতে পারো?

শ্যামল এবার সহজ গলায় উত্তর দেয়, পারি।

কালী এবার হুঁচোখ খুলে ভাল করে তাকায়, ইচ্ছা শ্যামলের পিঠ চাপড়ে বলে, বাঃ, তুই ঠিক পারবি।

কালীর কাছে বাহবা পেয়ে সলজ্জ হাসিতে শ্যামলের মুখ ভরে ওঠে। কালী জিজ্ঞেস করে, বড় বড় বাড়ীর সামনে পেতলের নেম-প্লেট থাকে দেখেছিস?

—হ্যাঁ।

—কাল হুটো খুলে আনিবি। আমার কাছে তালিম নিজে হলে প্রথমে নজরগা দিতে হয়।

—কাল কখন আসব?

—এই সময়েই, শ্যামল চলে বাচ্ছিল, কালী ডেকে বলে, জু-ডাইভার আছে?

—না।

—ঐ কোণ থেকে হুটো নিয়ে যা।

শ্যামল ঘর নিয়ে কালীর বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে।

গৌরীর সঙ্গে জলে ভিজে থেকে অবধি কেঁটার শরীর ভাল নেই। সারা শরীরে ব্যথা, জ্বর, অকটি অনেকগুলো উপসর্গ এক সঙ্গে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সকলের চাইতে কষ্ট দরকারের সময় হাতের কাছে এক গ্রাস জল এগিয়ে দেবার লোক নেই বলে। তবু এমই মথো

বাপ-মায়ের নিবেদন অগ্রাহ্য করে শ্যামা এসেছিল। ঘুম ভাঙতে কেউ দেখে, বালির গেলান নিয়ে শ্যামা বলছে, কাঁকু, এটা খেয়ে নাও। কেউ সে কথা না শুনে প্রশ্ন করে, ওপরে এসেছিস যে, বাবা বন্ধুকে না?

—বাবা নেই, অফিসে গেছেন।

—এখন ক'টা বাজে?

—দুটো বেজে গেছে। কষ্ট হচ্ছে কাঁকু?

কেউ চিন্তিত মুখে বলে, ওপরে এসে ভাল করিস নি, তোর বাবা শুনেলে বন্ধুকে, নীচে যা—

—তোমার যে ঝর হয়েছে কাঁকু, ডাক্তার বাবুকে খবর পাঠাব?

—না, আর এক দিন শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে, তুই এখন যা।

শ্যামা কেউর কথা মত বালির গেলান রেখে নীচে চলে গেল বটে কিন্তু স্বপ্নেগেলেই ওপরে এসেছে, দরকারী জিনিষপত্র কাঁকার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছে।

এরই মধ্যে এক দিন বিপত্তির সৃষ্টি হল, শ্যামার ছোট ভাই দিদির ওপর রেগে বাবাকে বলে দিলে, বাবা, দিদি তোমার কথা শোনে না, খালি খালি ওপরে যায়।

বলরাম সব আফিস থেকে ফিরছিল, কথা শুনেই মাথায় তার আগুন জ্বলে ওঠে, ডাক দিলিকে।

শ্যামা আসতেই বলরাম সজ্ঞারে কান মলে দেয়, বাদর মেয়ে, ওপরে কি করতে যাও?

শ্যামা খতমত খেয়ে যায়, চোখের জল সামলে ধরাগলায় বলে, কাঁকুর অসুখ করেছে—

বলরাম চাঁকার করে ওঠে, বেশ হয়েছে। ও মরুক, বাঁচুক, তোর তাতে কি? ওপরে যেতে বাধা করেছি বাস, আর কোন কথা শুনেতে চাই না।

চৌচামিচি শুনে শ্যামার মা ছুটে এসেছিলেন, আহা একটু বালি দিয়ে এসেছে তা অত মারধার করার কি আছে?

—মেয়েকে এমন আঁকারা দিও না, বাপের অবাধ্য হওয়া—

শ্যামার মা সুর পান্টায়, আর তোকোও বলি মেয়ে, নিজের বাপকে ভো চিনিস, গোলমাল করিস কেন?

—এর পর থেকে আমি সব কিছুব জন্তে তোমাকে দায়ী করব, কোন রকম ছাকামী আমি পছন্দ করি না।

বলরাম গজ-গজ করতে করতে কলতলায় চলে যায়।

—ঠিক এই সময় শ্যামল এসে দরজা ঠেলে। শ্যামার মা বললেন, খোকা, দেখ ত কে এসে?

খোকান ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়, শ্যামার মা চৈতিয়ে বলে, জিজ্ঞেস কর কাঁকে চাইছেন।

খোকানের পুনঃসৃষ্টির আগেই শ্যামল উত্তর দেয়, কেউদা' আছেন?

খোকান বলে, ওপরে।

শ্যামল দরজা পার হয়ে উঠানে এসে দাঁড়ায়, শ্যামা বলে ফেলে, কাঁকুর যে ঝর।

—এক বার বলুন আমি দেখা করতে চাই, আমার নাম শ্যামল।

সঙ্গে সঙ্গে কেউর গলা শোনা যায়, ওপরে এসে শ্যামল। আমি

শ্যামল ওপরে উঠে গিয়ে কেউর বিছানার একধারে বসে পড়ে, কত দিন ঝর হয়েছে কেউদা'?

—ক'দিনই তো—

—আমরা তাই ভাবছি, আপনি আসছেন না কেন। এখন

কত ঝর?

—বেশ নয়, কাল-পরও খুব বেড়েছিল। দুর্বল করে দিয়েছে বেশ,—কেউ বালিসে ভর দিয়ে উঠে বসে, শ্যামল ঝাঝ জেঁ বাইরে ছাদে বোধ হয় জল আছে, আর ঐ গামছাটা দাঁও, মুখটা ধুয়ে ফেলি।

মুখ ধুয়ে কেউ অনেকটা সুস্থ বোধ করে। দুটো বিছুট আর বালি খেয়ে বলে, বেশ ভালো লাগছে এখন।

শ্যামল নিজের থেকেই বলে, টাকার দরকার আছে কেউদা'?

—কেন?

—আপনার ভাগের অনেকগুলো টাকা আমার কাছে রয়েছে।

—দরকার হলে পরে নেব।

শ্যামল জিজ্ঞেস করে, জানান প্রভাতদা'র বই ছবিতে উঠছে?

—প্রভাতের? আমাদের প্রভাত?

—হ্যাঁ।

—কি বই?

—নামটা ভুলে গেছি। খুব শক্ত নাম।

—ভাল কথা, প্রভাতের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি।

—বেলাবাগী পাঠ করবে।

—তাই না কি?

—খুব ভীড় হবে, না কেউদা'?

—ভাল বই হলে হবে নিশ্চয়।

কেউর সঙ্গে শ্যামলের অনেক কথা হয়, কিন্তু সে কালী দেবেনদা'র বিষয় কিছুই বলে না। কথার ঝাঁকে এক সময় জিজ্ঞেস করে, আপনি কবে থেকে বেরুতে পারবেন মনে হচ্ছে?

—কাল কিংবা পরও।

—আমি অনন্ত কেবিনে থাকব, যদি আপনাকে না পাই এখানে এসে খবর নেব।

—সেই ভাল, আন্তদা'কে আমার কথা বোল।

—আন্তদা'ই তো আমাকে পাঠালেন, আপনি না গেলে আন্তদা' মন খারাপ হয়ে যায়।

—আন্তদা' বড় ভাল লোক।

—আমি তাহলে এখন আসি কেউদা', শ্যামল নীচে নেমে যায়।

ক'দিন থেকেই মদন বড় একলা পড়ে গেছে। শ্যামল আজ-কাল আর আগের মত আসে না। জ্বল পালিয়ে পাকে, কিন্তু আড্ডাসংঘের বৈঠকে যেমন শ্যামলের সঙ্গে আগে দেখা হত, নৈনন্দিন কাজকর্মের খুঁটিমাটি আলোচনা হত, এখন আর তা সম্ভব হয় না। সব সময়ই ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে শ্যামল বলে, চলি ভাই, দেবেনদা'র কাছে যেতে হবে।

মদন কত সময় বিরক্ত হয়ে বলেছে, কি দেবেনদা' দেবেনদা' করিস, এ যে কেউদা'র বাড়ি হয়ে উঠল।

—এ অল্প ব্যাপার, না মিশলে বুঝি না।

—আমি একলা একলা কি করব?

—কি আবার করবি, ইচ্ছল যাবি। বাড়ীর কাজ করবি, লায় সোনার হার পরে বসে থাকবি।

—ক'দিন ছবি দেখিনি, চল না একটা—

—বলছি তো সময় নেই, দেবেননা' ছাড়া কালীর কাছে তালিম নতে হবে।

—কালীকে নাম ধরে ডাকিসু?

—দাদা বললে চটে যায়।

—জাহান্নামে যা, আমার কি, পরে ভুগবি।

শ্রামল একথা গ্রাহ্য করে না। আড্ডাসেবের অল্প কারো সঙ্গে মদনের তেমন বনে না। শ্রামলের পরে মাত্র এক জন যাকে সে লানবাসে, সে মল্লদা'। আজ বাড়ী থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় মল্লদা'র সঙ্গে দেখা, হু'তিন দিন না কামানোর ফলে মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে ময়লা পাঞ্জাবী। মদনকে দেখে ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ?

—কোথাও যাইনি, এমনি।

—বস তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি।

মদন বোঝে মল্লদা' এতক্ষণ কথা বলার লোক খুঁজছিল, তাকে পেয়ে সতি খুসী হয়েছে, বলে, মল্লদা' আপনাকে বড় স্নান দেখাচ্ছে, শরীর খারাপ হয়নি তো?

—শরীরের আর দোষ কি ভাই, কত আর সহবে!

—আপনি একটুতে বড় মুখড়ে পড়েন, কি এমন হয়েছে বলুন তো?

—তুমি জান না মদন, নন্দিতার বাবা পরশু আমাদের বাড়ী গিয়েছিলেন। নন্দিতাকে দেখা আমার চিঠি দেখিয়ে শাসিয়ে এসেছেন, পুলিশে নালিশ করবেন বলে।

—সে কি, তার পর?

—আমাকে বললেন, তুমি কেন এসব চিঠি দাও, আমার মেয়ে কখনও তোমায় লিখেছে? আমি কিছু উত্তর দিইনি। পুলিশেও যদি দেয়। আমি কোন দিন বলব না যে নন্দিতাও চিঠি দেয়।

—কিন্তু উনি কি করে চিঠিটা পেলেন?

—জানি না। কোন দিন জানতে চাইবোও না, যদি না নন্দিতা নিজে থেকে বলে।

ঠিক এই সময় নন্দিতা এসে তাদের বাড়ীর সোতলার ছোট বেলিড ধরে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মল্লদা'র দিকে পেছন ফিরে মদনের সঙ্গে কথা বলছিল, তাই মদন ইঙ্গিত করে।

মল্লদা', ওই যে—

মল্লদা' ফিরে তাকিয়ে নিশ্চল দৃষ্টিতে নন্দিতার দিকে চেয়ে থাকে। মদন মাথা হেঁট করে, মাঝে মাঝে, আড়চোখে মল্লদা'র দিকে তাকায়, দেখে তার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, হঠাৎ মল্লদা' তার পিঠ চাপড়ে বলে, চল মদন, তোমাকে কিছু খাওয়াই।

মদন বুঝতে না পেয়ে বারান্দার দিকে দেখে, নন্দিতা চলে গেছে।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার মল্লদা'?

—নন্দিতা আমায় সত্যিই ভালবাসে, তার কোন সন্দেহ নেই।

—কি করে বুঝলেন?

মল্লদা' কথার উত্তর না দিয়ে মদনের হাতটা ধরে এগিয়ে চলে।

কেউ যদিও শ্রামলকে বলেছিল স্তব্ধ হয়েই অনন্ত কেবিনে আসবে, কিন্তু পরদিন বাড়ী থেকে প্রথম বেরিয়ে সোজা গেল ঢালীগঞ্জের বস্তিতে গৌরীর কাছে। একদিন বার বার তার গৌরীর কথা মনে পড়েছে, অস্থির মধ্যে এমন অসহায় অবস্থার না পড়লে সে যেমন করে হোক একটা খবর পাঠাতো। টাম-টপেজ থেকে হেঁটে গৌরীর বস্তি পর্যন্ত যেতে কেউ বোধ কষ্ট হয়। হু'জায়গার দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নেয়।

বস্তির মুখে একটা ছোট ছেলেকে দেখে জিজ্ঞেস করে, গৌরী আছে?

—আছে বোধ হয়, বলে ছেলেটি চলে গেল। কেউ অবাঁক হয়, আগও ছেলেটিকে দেখেছে, কেউ আসলে সে লাফাতে লাফাতে গিয়ে গৌরীকে ডেকে আনত। এক বৃদ্ধ দাওয়ার ওপর বসে হুকো টানছিলেন, কেউ তাঁকেই জিজ্ঞেস করে, গৌরী আছে?

বৃদ্ধ ব্যাকার মুখে উত্তর দেন, কি করে জানব, কলকাতার সহরে দেখছি সোমথ মেয়েরা ঘরে থাকে না।

এ ধরনের উত্তর কেউ আশা করেনি, গৌরীর ভাইকে পোড়াত্তে যাওয়ার পর থেকে এ বস্তির সকলেই তাকে ভালবাসতো, এলেই দুটো কথা বলতো। আজ হঠাৎ যেন সব পাল্টে গেল। আর কোন কথা না বলে কেউ নোজা গৌরীর ঘরের সামনে এসে হাজির হল। দরজা খোলা, গৌরী সেলাই করছিল, কেউকে দেখে চমকে ওঠে, কেউনা—

—কি হয়েছে গৌরী, ওরকম করছ কেন?

গৌরী কোন কথা বলতে পারে না, হু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে।

—কি হয়েছে গৌরী, আজ সব কেমন অদ্ভুত লাগছে! কেউ ভাল করে কথা বলছে না, তুমি কাঁদছ? গৌরী নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, এত দিন আপনি কোথায় ছিলেন?

—বাড়ীতে।

—ওঃ, গৌরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—কি ভাবছ?

—ভাবিনি। তবে আজ এলেন কেন?

—তাত কোন দোষ হয়েছে?

—আপনি বাড়ী যান। গৌরী উজ্জ্বলিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

সেই দিকে তাকিয়ে থেকে কেউ আস্তে আস্তে বলে, সেদিন বাড়ীতে বস্তিতে ভিজে খুব অসুস্থ হয়েছিল, এত দিন বিছানায় পড়েছিলাম, বাড়ী থেকে এক পা বেরুতে পারিনি। আজ প্রথম বেরিয়েই তোমার খবর নিতে এসেছি। একটু থেমে বলে, এখনও বেশ দুর্বল, পা কাঁপছে।

গৌরীর এতক্ষণ খেয়াল হয় এখনও সে কেউকে বলতে বলেনি। উঠে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছে বলে, এইখানে বসুন।

কেউ গৌরীর পরিত্যক্ত জায়গায় বসে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে, বল?

—বলব, পরে।

—কখন?

—এখানে নয়, সবাই কান পেতে আছে।

—কি বলছো ?

গৌরী চার দিক দেখে নিয়ে নীচু গলায় বলে, ঠিকই বলছি, আমাকে আপনাকে নিয়ে—কথা উঠছে ?

—হ্যাঁ, রাজেন লাগিয়েছে।

—রাজেন ? কেউ গুম হয়ে যায়, ঠিক বলছো ?

—সে অনেক কথা, আমি না কি ভালো মেয়ে নই, আপনাদের সঙ্গে—গৌরী স্বরস্বর করে কঁদে ফেলে, কেউ স্থির গলায় প্রশ্ন করে, তুমিও কি চাও আমি চলে যাই ?

সে কথার সোজা উত্তর না দিয়ে গৌরী বলে, আমার যে আর কেউ নেই !

—দরকার হলে আমার সঙ্গে যাবে ?

গৌরী মুখ তুলে তাকায়, কোথায় ?

—জানি না, তবে চেষ্টা করব যাতে তুমি বাঁচতে পারো।

গৌরী চুপ করে থাকে।

—কি বল ?

—হঠাৎ কি বলা যায় ?

—আমি চললাম, তুমি ভেবে-চিন্তে জানিও।

কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, গৌরী ছুঁকরে কঁদে ওঠে, এরা আমাকে বাঁচতে দেবে না কেউনা'। কেউ সংঘত কণ্ঠে উত্তর দেয়, তুমি শান্ত হয়ে ভাবো, যা ভালো বুঝবে, আমি সেই ব্যবস্থাই করে দেব।

আর কথা না বাড়িয়ে কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মুখোমুখি রাজেনের সঙ্গে দেখা, প্রত্যক্ষ সে বাইরে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল। রাজেন খেঁকিয়ে ওঠে, প্রত্যক্ষ কি সুস্বস্তর দেওয়া হচ্ছিল ?

কেউর কান লাল হয়ে যায়। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে হাসবার চেষ্টা করে, সবই তো শুনেছো।

—ছি ছি, ভদ্রলোক ভেবেছিলাম, কেউনা' বলে ডেকেছিলাম, দেখে কি না—

—কি ?

—একটা অসহায় মেয়েকে টাকার সোভ দেখিয়ে—

—বাজে বোক না, খাবড়ে মুখ লাল করে দেব।

রাজেন ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়, চেষ্টা করে ওঠে, কার কাছে মেজাজ গরম করছেন, আপনাদের মত কলকাতাই বাবু ডের দেখেছি। পেটে এক, মুখে এক—

রাগে কেউ কাঁপছিল। ঠাস করে রাজেনের গালে এক চড় মারে। আচমকা আঘাতে রাজেন প্রথমটা ভড়কে গিয়েছিল বটে কিন্তু পরক্ষণেই বাঘের মত কেউর ওপর লাফিয়ে পড়ে। শরীর দুর্বল না থাকলে কেউ হয়ত কিছুক্ষণ বুঝতে পারত। কিন্তু বলিষ্ঠ রাজেন তাকে এক ধাক্কা মারতে ফেলে অমানুষিক প্রহার করতে থাকে। ইতিমধ্যে চারদিকে লোক জমা হয়ে গেছে, জড়ের মধ্যে থেকে কথা শোনা যায়, ছেড়ে দে রাজেন, মরে যাবে যে। কেউ বললে, নাক কেটে যে রক্ত পড়ছে, পুলিশ হাসানায় পড়বি নাকি ? সকলেই হৈ-হৈ করছে, গৌরী কোন কথা না বলে এক পাত্র জল নিয়ে সেখানে ছুটে আসে। রাজেন ততক্ষণে কেউকে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। গৌরী বিনা ভয়িকায় কেউর মাথার কাছে বসে জল দিয়ে

তার মুখের রক্ত ধুয়ে দেয়। গৌরী ভয় পেয়েছিল, বোধ হয় কেউ অজ্ঞান হয়ে গেছে, কিন্তু তার গম্ভীর শব্দে একটু আশ্বস্ত হয়। কেউ বিড়-বিড় করে বলে, শরীরটা দুর্বল, তাই বেকায়দার ফেলে দিয়েছে, এর শোধ আমি নেব।

রাজেন চাঁৎকার করে ওঠে, কানে কানে কি বলা হচ্ছে ?

কেউর বললে গৌরীই উত্তর দেয়, রাজেননা', তুমি ঘরে বাও। ভদ্রলোক অস্বস্ত।

রাজেন হাসে ওঠে, ভদ্রলোক না চামার ! ওর হয়ে আর তোমার দালালী করতে হবে না।

—কেন মিথ্যে কথা বাড়ানো, জানো তো সবই। উনি তো আমাদের কোন মন্দ করেন নি ?

—ভাল-মন্দ কি তোমার কাছে শিখতে হবে, না তোমার ঐ বাবুর কাছে ?

গৌরী প্রত্যক্ষ পর্যাপ্ত সংঘত তাই কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এবার তার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, কথা বলতে শিখবে তো আমার কাছে এসো। যা তা বলতে তোমার মুখে বাধে না ?

—যা তা আবার কি ? যা সত্যি, তাই বলেছি। অত চলাচল কিসের ? বোজ একসঙ্গে বেড়ানো, শাড়ী কিনছো, জামা কিনছো, কত ফুর্টি করছো, আমরা কচি থাকা—

অপমানে গৌরীর মুখ কালো হয়ে যায়। ছি, ছি, কি যো, কি নোরা মন তোমার ?

এবার অসহায় ভাবে সে অজ্ঞানের দিকে ফিরে তাকায়, কিন্তু কার কাছে এতটুকু সহ্যমুহুর্তি পায় না। বুকেরা বললেন, রাজেন তো অজ্ঞান বলে নি। তুমি আমাদের জাতি-কল্যাণ, তোমার ভাল-মন্দ দেখা আমাদের কর্তব্য।

বুদ্ধারা বললেন, চাট-চাট করে নেচে বেড়ানো, তার ওপর চোখা-চোখা বুলি কে সহ করবে ?

বুদ্ধেরা বললে, রাজেন ঠিক করেছে, আরও হ' যা দিলে হতভাগা আর অল্প মেয়েদের ওপর নজর দিত না।

পণ্ডিত মহাশয় রায় দিলেন, জীবনে সাংসারের দাম অনেক গৌরী, বয়স হলে বুঝতে পারবে।

চাপা কান্নায় গৌরীর দম বন্ধ হয়ে আসে, অসহায় ভাবে কেউর দিকে তাকায়।

কেউ তখন উঠে বসেছে। ক্লান্ত স্বরে গৌরীকে বলে, একটা গাড়ী ডেকে দেবে, বাড়ী যাব।

রাজেন থিঁচিয়ে ওঠে, নিজের পা নেই, যাও না। ও কি করবে—

গৌরী দৃঢ়স্বরে বলে, চলুন আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব।

কেউর কোন কথা বলার আগেই রাজেনের দল শাসিয়ে ওঠে, মনে রেখো, ওর সঙ্গে গেলে আর এখানে চুকতে পাবে না।

কেউ গৌরীর কাঁধে একটা হাত রেখে সকলকে শুনিয়ে বলে, চল গৌরী, এ নরকে তোমায় এক রাত্রিও ফেলে রেখে আমি শান্তি পাব না।

গৌরী বক্তৃতাশিতার মত কেউর সঙ্গে বস্তি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পেছনে রাজেনের দল তখনও শাসিয়ে যাচ্ছে।

জনে টান্ধোতে পাশাপাশি বসে, কেউ কথা বলে না। দু'জনের মধ্যেই তোলপাড় করছে, গৌরী ভাবছে তার অনিশ্চিত ভব কথা। অল্প ক'দিনের পরিচিত কেঁঠোর উপর সম্পূর্ণ করে সে আত্মীয়তার সব বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে চলে এসেছে। কে পারে এই নতুন পথের শেষ কোথায়? কেঁঠর চোখের সামনে সেই অপ্রীতিকর বস্তির ঘটনা, সমস্ত শরীর-মন তার আড়ষ্ট গড়ে। এত দুর্বল যে কোন কিছু চিন্তা করারও শক্তি তার তাই টানা-জাইভার যখন জিজ্ঞেস করলে, কোন দিকে যাবে, তবু বাড়ার বাস্তুটা বলে দিয়ে চুপ করে রইল। সারা পথ সে কে কোন প্রশ্ন করেনি, শুধু বাড়ীর মোড়ে এসে বলেছিল, এখানে। রিক্সা নিতে হবে।

গৌরী তার নির্দেশ মত রিক্সায় চেপে বসে।

রিক্সা এসে বাড়ীর দরজায় থামলে কেঁঠে নেমে টেলা দিয়ে দেখে বা গোলা বয়েছে। ভেতরে কাছাকাছি কেউ ছিল না। কেঁঠে ঠিক নিয়ে লম্বা পায়ের সোজা সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। চুপে দরজা বন্ধ করে সে প্রথম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। গৌরী এই হয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, কেঁঠে ব্রাহ্মণ স্বরে বলে, আমি আর ছিঁ না গৌরী, একটি শুয়ে পড়।

কেঁঠে সত্যি সত্যি বিছানায় নেতিয়ে পড়ে। গৌরী একক্ষণে বদ্ধভূত পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে, সব ব্যাপারটাই তার মন মনে আশ্চর্য লাগে। মার এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে জীবনের কি বিরাট পরিবর্তন! এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে কেঁঠের সঙ্গে এক রাত কাটাতে হবে তা সে কিছুক্ষণ আগেও কল্পনা করতে পারেনি। চুপ করে কেঁঠর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, দেখে ধীরে সে ছটকট করছে। কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, যে কোন ওষুধ নেই? মৃত্ত স্বরে কেঁঠে উত্তর দেয়, দেখ তো ওই ছোট ষাটের 'এনাসিন' আছে কি না—

গৌরী বাজুটাই কেঁঠর কাছে নিয়ে আসে, দু'টো বড়ী সাগ্রহ করে কষ্ট কোন রকম গিলে ফেলে আবার শুয়ে পড়ে। অল্পক্ষণের মধ্যে নিশ্চিন্ত আরামে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

ক্ষিদে-তেষ্টায় কাতর গৌরী কেঁঠর মাথার কাছে বসে থাকে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে অবধি ছানা কেঁঠর খাবার ওপরে নিয়ে আসবার জন্তে ছটকট করছিল। বাবা বেরিয়ে যেতেই আর সময় নষ্ট না করে থালা নিয়ে সোজা ওপরে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকে, বাবু, দরজা খোল, খাবার এনেছি।

কেঁঠে তখন ঘনে অচেতন। গৌরী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। জামা বাবু দরজায় আঘাত করেও উত্তর না পেয়ে বিচলিত হয়। তার মাঝেই হয় কেঁঠর নিমন্ত্রণ শরীর খুব বেশী খারাপ হয়েছে, তাই ভুটে গিয়ে ছাদের মিকের জানালায় খড়খড়ি তুলে ভেতরে উঁকি মারে। গৌরী খড়খড়ি খোলার শব্দে চমকে উঠে ঠাড়াই। কাকার ঘরে এই অপরিচিতা মেয়েটিকে দেখে জামার বিশ্বাসের সীমা থাকে না। কিন্তু কাকার মাথায় জলপটি দেখে তার স্থির বিশ্বাস হয় কেঁঠে বেশীস হয়ে পড়ছে। চিন্তিত মুখে জামা নীচে নেমে আসে। মা জিজ্ঞেস করেন, কি রে খাবারের থালা ফিরিয়ে আনলি যে?

—কাকার খুব অসুখ,

—তাই নাকি, ডাক্তার ডাকতে বললে?

জামা আস্তে আস্তে বলে, আমার সঙ্গে কথা হয়নি,

—তাহলে?

জামা মার কাছে সব খুলে বলে, জিজ্ঞেস করে, এখন কি করি মা? মার শব্দার চেয়ে কৌতুহল বেড়ে যায়, বলেন, চল আমিও দেখে আসি।

জামার মা যেহেতু পিছু পিছু উপরে এসে খড়খড়ি তুলে দেখেন, কথা মিথ্যা নয়। সত্যিই কেঁঠর শিয়রে এক জন অপরিচিতা ভদ্রমহিলা বসে আছে, ঘরের দরজা বন্ধ।

কেঁঠর দাদা বাড়ী ফিরে শ্রীর কাছে এ খবর পেয়ে তেলে-বেগুনে ছলে উঠলেন, ছিঃ ছিঃ, ভদ্রলোকের বাড়ীতে এ সব কি?

—তোমার সবটাতে চোঁচামিচি করা চাই।

—তবে কি মুখ বুজে সব সহ্য করব?

—এ সব কলেঙ্কারী ব্যাপার পাড়ায় জানাজানি হওয়াও তো ভাল নয়। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করো।—এর আমি হেস্টনেস্ত করে ছাড়বো। তোমায় বলে দিলাম, আর কোন কথা শুনছি না।

বলরাম বেগে উঠানে পায়চারী করতে থাকে। জামার মা বুখিয়ে বলে, এখন শোবে চল, সকালে উঠে বা হয় কোর।

শ্রীর এ যুক্তি বলরামের অপছন্দ হয় না, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

গলীর রাতে কেঁঠর ঘুম ভাঙে। শরীরে আর আগের মত যন্ত্রণা নেই, তবে খুব দুর্বল। কোন রকমে উঠে ঘরের আলো জ্বালে। গৌরী মাটিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। দরজা খুলে ছাদে এসে দাঁড়ায়, থোলা হাওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা করে দেয়।

হাজার রকম চিন্তা তাকে চেপে ধরে। গৌরীকে নিয়ে কি করবে সে? কোথায় যাবে, কোথায় রাখবে? কিছুই ভেবে পায় না। একমাত্র ভরসা সকাল বেলা আস্তা' কি প্রভাত যদি সাহায্য করে।

কেঁঠর হঠাৎ খেয়াল হয় তার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, আবার ঘরে ফিরে আসে। গৌরী ঘুম ভেঙ্গে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। কেঁঠকে দেখে জিজ্ঞেস করে, আপনি কেমন আছেন?

—ভালো। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?

গৌরী উত্তর দেয় না, কেঁঠে ঘরের কোণ থেকে থানিকটা মিয়োনো বিস্কুট বার করে আনে, গৌরীর হাতে থানিকটা দিয়ে বলে, খাও।

গৌরী আস্তে আস্তে বলে, আপনি যখন ঘুমুছিলেন, কে এসে দরজা খেঁজছিল—

—বোধ হয় জামা।

—তার পর কাঁবা খড়খড়ি খুলে দেখছিল, হ'বার।

কেঁঠে বোঝে দাদা-বৌদি নিশ্চয় খবর পেয়েছে। হঠাৎ বলে, গৌরী, ভোরে উঠেই আমবা বেরিয়ে যাব।

তখনও ভোরের আলো পরিষ্কার হয়ে ফোটেনি, কেঁঠে গৌরীকে নিয়ে নীচে নেমে সন্তপণে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। সমস্ত পাড়াটাই ঘমে অচেতন। সদর রাস্তায় ভিস্তিরা জল দিচ্ছে। নিজেদের পাড়াটা ভাড়াভাড়ি পেরিয়ে মোড়ে এসে রিক্সা নিয়ে প্রভাতের বাড়ীর দিকেই যায়।

গলির মধ্যে হ'খানা ঘর নিয়ে প্রভাত থাকে। কেঁঠে অনেক ধাক্কাধাক্কি করার পর প্রভাত ব্যাজার মুখে দরজা খুলে দেয়।

কেউ। তুই! এত দিন বাদে কেউকে চঠাৎ এ ভাবে দেখে আচরণ হয়, জিজ্ঞেস করে, এ সময়, ব্যাপার কি ?

কেউ কোন কথাই জবাব না দিয়ে বলে, গৌরীকে এনেছি, ঘরে ডেকে নিয়ে আয়।

—গৌরী কে ?

—যদি হোক সে পরে বলছি, তুই রিক্সা থেকে নামিয়ে ভেতরে নিয়ে আয় !

প্রভাত আর বিকস্মিত না করে গৌরীকে আপ্যায়িত করে, আগুন, বাড়ীর দরজায় এসে রিক্সাতে বসে থাকবেন না কি ?

গৌরী কথামত ভেতরে যায়। কেউ রিক্সা ছেড়ে দিয়ে চট করে মোড়ের দোকান থেকে কচুরী-সিদ্ধাড়া-মিষ্টি কিনে আনে।

প্রভাত যোগে বলে, এ কি, আমার বাড়ীতে এসে খাবার কিনে আনলি, তোর যত সব বান্দরামী—

কেউ সে কথায় কান না নিয়ে বলে, অনেক দরকারী কথা আছে, তোর পরামর্শ চাই।

—বল।

—একটু পরে, তুই আগে গৌরীর হাত-মুখ ধোবার ব্যবস্থা করে দে।

বাটীতে প্রভাত একা থাকে, তাই কোন বকমই অসুবিধে ছিল না। গৌরীকে কলঘর দেখিয়ে দিয়ে প্রভাত বাইরের ঘরে এসে কেউকে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার বল তো ?

—সে অনেক কথা, পুরো একটা উপজ্ঞাস।

—বল তো শুনি ?

কেউ খুব সংক্ষেপে বলে যায়, গৌরীর সঙ্গে আসাপ থেকে শুরু করে কালকের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার পর অপ্রত্যাশিত ভাবে তার সব ভার নেওয়া পৃথিবী, সমস্ত কথা।

প্রভাত প্রশ্ন করে, এখন কি করবি ঠিক করেছিস ?

—তাই তো ভাবছি।

—মেয়েটাকে বের করে আনলি কেন, ভালবাসিস ?

—সেটা ভাববার সময় পেলাম কই, বোধ হয় রাগের মাথায়।

—বিয়ে করবি ?

—যদি কোন উপায় না থাকে।

—এ ছাড়া আর উপায় কি ? এত অল্প বয়েসের মেয়েকে সাধারণ কাজ দিতে কেউ রাজী হবে ? আর কি করবেই বা। সন্ধ্যা মধ্যে বাঁচতে হলে বিয়ে করতে হবে।

কেউ চিন্তিত মুখে বলে, তুই তো আমার অবস্থা জানিস, এ কি করে বিয়ে করবো ?

—এখন না হয়, দু'দিন পরে।

—তা পারি, বাড়ী ভাগ হয়ে গেলে। তাও মাস তিনেক বটেই, এ ক'টা দিন কি করি ?

—ঘর নিয়ে কোথাও গুকে রাখ, তার পর যা হয়—

কেউ বাধা দিয়ে বলে, ঘর পাওয়াও তো মুশ্কিল, অনেক উঠবে, এখনও তো বিয়ে হয়নি।

—সে জায়গা আমি ঠিক করে দিতে পারি, যদি তোমার আপত্তি না হয়।

—কোথায় ?

—বেহালার কাছে, পিনাকীর একটা ঘর খালি আছে।

—কোন পিনাকী ?

—ফোটোগ্রাফার, আমাদের কাগজের কভারের ছবিগুলো

সবই ওর তোলা—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছবিগুলো তো দেখি একই মেয়ের নানা বকম ও

প্রভাত সায় দেয়, সেই মেয়েটার সঙ্গেই থাকে।

—ওর বউ ?

—না, বিয়ে করার ছেলে পিনাকী নয়।

—তবে ?

—এই বকম চাক-গেরত থেকেই কাটিয়ে দেবে।

গৌরীকে প্রভাতের বাড়ীতেই অপেক্ষা করতে বসে। কেউ ব দেখতে বেরিয়ে পড়ে। সহরের এক প্রান্তে ছোট্ট হলদে র দোতলা বাড়ী। বাড়ীওয়ালা উপরে থাকে, নীচের ভাড়া ও ঘর দেখে কেউ সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে, থুসী হয়ে প্রভাত বলে, একলা থাকার ভর নেই অথচ সব আলাদা ব্যবস্থা। এ ভালোই হ'ল। [ ক্রমশ

## এক প্রত্যয়

### সন্তোষ চক্রবর্তী

বঙ্গের শরীর থেকে ভয় আর বিচ্ছেদের ভ্রাণ  
এলে গেলো : 'যতই-না খুঁজে ফেরো সীমানার তীরে,  
আকাঙ্ক্ষার ব্যগ্র স্বর, সন্ধ্যার বিষণ্ণতা ম্লান,  
অধুনা পাবে না তাকে—পল্লবিনী সেই সঙ্গিনীরে।'

তার নাম কুমকলি এখনো অরণে আবুলিত,  
এবার স্বগত উক্তি : তাহার আবেশ তুলে নিয়ে  
মুতির চেতনা-ভরা এই মন আশায় নিহিত—  
পাঁচটি ঋতুর পর আবাহন সে রক্ত-তুলি দিয়ে।

হৃদয়ে বসন্ত এঁকে আসবেই : বঙ্গের শরীর





[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

হাসছেন? বেশ বেশ, হাসুন যত খুশী, ডাইনী বিড়-বিড় করে বলতে লাগলো—কিন্তু ওই মোমের মূর্তিটিকে রক্তে ধুয়ে সিতাম তবে আপনার কি সর্বনাশ হোতো দেখতেন। র মস্তক-তন্তুর আমি ছাড়া এ তল্লাটে জানে আর কেউ? একটা র পড়ে যদি ওই মূর্তিটাকে আবার আগুন ফেলতাম, তাহলে তো ন্যাসের কিছু আর বাকী থাকতো না।

—হুম, কিন্তু আপাতত তো এটা আমার অধিকারে। এই লো আপনার বারো সেকুইন। এবার একটু আগুন জ্বালান, বিকট মূর্তিটাকে পোড়াই—আর ওই বোতলের বক্তৃতা জানলা লয়ে বাতায় ফেল দিই।

বৃদ্ধা হাঁক ছেড়ে বাঁচলো, মনে হোলো মূর্তিটাকে গলিয়ে লাত। ও ভয় পেয়েছিল বিষম। ভেবেছিলো বুঝি ওগুলো মি বাইরে নিয়ে যাবো ওর শয়তানীর প্রমাণস্বরূপ। এইবারে গলাসে আটখানা হোয়ে বলতে লাগলো, আমি হচ্ছি সাক্ষাৎ সন্ত, আমার মত এমন সং এমন উদার দেখা যায় না—সঙ্গে সে মিনতিও করলো, যাতে বা কিছু হোয়েছে কারো কাছে আমি। বলি। প্রতিজ্ঞা করলাম—না, কাউকেসও জানবে না বিনু-সর্গও। তখন ডাইনীটা আরও বারো সেকুইন চেয়ে বললো—কি প্যার? না তাহলে মস্তুরের জোরে ওই কাউটেসকেই আমার ধামে হাবুহুব খাওয়াবে। আমি প্পষ্টই জানিয়ে দিলাম আমি র জন্তে একটুও গ্রাহ্য করি না। সেই সঙ্গে একথাও বললাম, গলায় ভালোয় এইবেলা ওই জয়ন্ত ব্যবসা ছেড়ে দিত, না হলে শিগিরই ধনে-প্রাণে ডুবতে হবে।

এতগুলো টাকা গেলো বটে কিন্তু সন্ন্যাসীসকলের কথা বর্ণে পূর্ণ মানার জন্তে একটুও অমৃত্যাপ করিনি। সন্ন্যাসীটির কেমন মদু বিবাস ছিলো, আমার একটা অমঙ্গল ঘটবে বলে। খুব বড় চাকর-বাকরের মধ্যে কেউ যে হয়ত ডাইনীর কাছে ওই জটা দিতে গিয়েছিল তাকেই জেরা করে কিছু জেনেছিলেন। আমি কিন্তু ঠিক করেছিলাম কাউটেসের ওই মতলব যে হোপরি কীস হয় গেছে আমার কাছে একথা কোন দিনই তাঁকে নিতে দেবো না। তাই আমার ব্যবহার আরও কোমল, নম্র আর স্নেহাত করে আনলাম। অবশ্য আমার সৌভাগ্য ডাইনীর মস্তুরেই কাউটেসের একবারে অন্ধ বিশ্বাস ছিলো—কারণ তা' না হলে আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জালা মিটানো আমাকে হত্যা পায় জন্ত গুণ্ডা ভাড়া করতোও পিছপাও হোতেন না বলেই আমার বিশ্বাস। আমি ইচ্ছে করেই এক দিন ঠকে একটা চমৎকার সৌখিন

উপহার দিয়ে ওর হাত দুটি চূষন করে বললাম,—আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার উপর আপনি এত রোগে গেছেন যে আমারে খুন করবার জন্তে গুণ্ডা ভাড়া করেছেন।

বলতে না বলতেই লক্ষ্য করলাম ওর মুখ টকটকে লাল হোয়ে উঠলো কিন্তু চট করে সামলে নিলেন নিজেকে। চলে আসবার সময় দেখলাম, বেশ ভারাক্রান্ত মনে বসে রয়েছেন। ভালো কি মন্দ করেছিলাম, জানি না কিন্তু তার পর থেকেই কাউটেসের ব্যবহার একেবারে বদলে গেল। এক দিনের জন্তেও এতটুকু ক্রটি আর ঘটতে দেখিনি কোথাও।

### একাদশ পরিচ্ছেদ

এবার ইল্যাণ্ডের পথে। কিন্তু ভারাক্রান্ত মন; মনের তটপ্রান্তে আছড়ে পড়ছে মূর্তির ঢেউ, একের পর এক।

কি আশ্চর্য্য ভাবেই না মনের হৃকৃতম তন্ত্রীতে আঘাত করে করে যায় সেনরিয়েটা, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে কি অভাবনীয়রূপে আসে ওর চকিত স্পর্শ! মনে পড়ে—

এক মঙ্গলবারের সকালে ক্লোরামঁত এসে বলে, এক জন সাধু খুঁজছেন। আমার সাধু? ভাবতে না ভাবতেই আমার সবচেয়ে ছোটো ভাই সাধুর বেশে এসে হাজির। আমাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত আবেগে আমার দুটি হাত জড়িয়ে ধরলে। ওর উচ্ছ্বাসে বিরক্তই হলাম। কারণ চিরকালের বাড়িগুলো এই ভাইকে কোনো দিনই আমি দেখতে পারতাম না ওর উচ্ছ্বাস, অসংবত স্বভাবের জন্তে। তাছাড়া গত দশ বৎসর ধরে কোনো খোঁজই রাখিনি। ভালো করে চেয়ে দেখলাম ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড়, রক্ত শীর্ণ অপরিচ্ছন্ন চেহারা, ভিখারীরও অধম। জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ঠিকানা পেলে কোথায়? জানালে, মাসিয়ে ব্রাগাদিনের কাছে।

—সে কি! তুমি তাঁকে আমার ভাই বলে পরিচয় দিয়েছো? শিউরে উঠলাম আমি।

—নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, আমি যেম তোমার জীবন্ত প্রতীক।

—তোমার মতো ওই আহম্মুক জড়ভরত ডেহারটাকে?

—তিনি তা' ভাবেননি। আমি যে তাঁর সঙ্গেই থেলাম।

—ওই পোষাকে? আমার মাথা হেঁট করিয়ে ছেড়েছো।

—তিনি আমাকে এখানে আসার ভাড়াটাও দিয়েছেন।

—হুম। তাহলে সত্যিই ভিখারী হোয়েছো। কিন্তু এখন আমার কাছে কি চাও তুমি? সোজাহুজি বলে রাখছি, আমার দ্বারা কিছু হবে না। যা বলবার, চলো তোমার দ্বাইখানাতেই গিয়েই

বিশ্রাম করছি, এমন সময় মার্কোলিনা তাঁৎ বললে,—আমরা তো অভিনেত্রী—এতে পৌছে গেছি। যাক্, তাহলে মাদামের কাছে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পূরণ করবার সময় হোলো। হ্যাঁ, উনি এখানে না পৌছানো অবধি আপনাকে কিছু বলতে বারণ করে দিয়েছিলেন, এমন কি আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞাও করিয়ে নিয়েছিলেন।

—আরে সত্যি! বেশ মজার ব্যাপার তো? বলো বলো তারপর?...

—উনি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। এতক্ষণ চিঠি আটকে রাখার জন্যে রাগ করবেন না তো আমার উপর?

—পাগল হোয়েছো? তুমি একজনের কথা রেখেছো, তা'তে আমি রাগ করবো? কিন্তু চিঠিটা কই, বার কর তাড়াতাড়ি—

—দাঁড়ান—এই বলে একতারা কাগজ বের করে ও বাছতে বসলো।

—ওঃ এটা আমার জন্মের সার্টফিকেট।

—জানি তুমি ১৭৪৬ সালে জন্মেছ।

—আর একটা তো দেখছি আমার সত্যতার সার্টফিকেট।

—রাখো রাখো ওসব, পরে কাজে লাগবে। এখন আসল চিঠিটাই বার কর না?

—আপা করি হাবাইনি।

—ঈশ্বর না করুন—কৌতূহলে আর অদম্য আগ্রহে আমার তখন আত্মহারা অবস্থা।

—এই যে পেয়েছি—আরে না তো! এতো আপনার ভায়ের লেখা ক'টি কবিতা।

—চুলোর যাক কবিতা, পুড়িয়ে ফালো ও সব আগুনে। আমার চিঠিটা কোথায় বার করো আগে।

—ওঃ ভগবান! এই—এই যে পেয়েছি!

ওর হাত থেকে খামটা একরকম ছিনিয়ে নিলাম। সাদা খাম, কোনো ঠিকানা নেই। খামটা ছিঁড়তে গিয়ে আমার আঙ্গুলগুলো প্রবল উত্তেজনার খরখর করে কাঁপতে লাগলো। সীলটা ছেঁতে ফেলতেই দেখলাম, নামের জায়গায় লেখা—

“আমার সারা জীবনের মহত্তম পুরুষকে।”

এ কি আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা? আশ্চর্য, আরও আশ্চর্য যে তখনও বাকী। সাদা পৃষ্ঠার একটি কোণে লেখা—

‘হেনরিয়েটা’—আর একটি অক্ষরও নয়।

‘ম্যাট্র, স্বচ্ছ সেট চিরপরিচিত’ লিয়নভস্কী! আমারই হেনরিয়েটার—কোনো ভুল কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই তাতে। এর সেই অভিন্ন ইঙ্গিতময় রচনা-বিভাস—স্মৃতির পটে যে আজও অস্ফুট শব্দ বিদ্যায়ের দিনে সেই শব্দ শেষ লিপি! একটিমাত্র কথা ‘বিদায়’—সমস্ত না-বলা কথাকে মূর্ত করে তুলেছিলো।

আমার হেনরিয়েটা! বার বিচ্ছেদ সুদীর্ঘ কালের প্রলেপে এতটুকু স্নান হয়নি। দিনে দিনে আমার সমস্ত সত্য ও মিশে গিয়েছে গভীর থেকে গভীরতম অম্লভূতিকে। ওকে পাওয়ার চেয়ে ওকে হারিয়েই ওকে নিবিড় করে পেয়েছিলাম।

কিন্তু হেনরিয়েটা, পারলে তুমি এত নিষ্ঠুর হতে? তুমি দেখেছিলে, তুমি চিনেছিলে তবু তুমি ধরা দিলে না? তাই বুঝি

তুমি হেনরিয়েটা? কেন ভয় পেয়েছিলে কি? দীর্ঘকালের স্বামীর প্রাণে যৌবনের লাভণ্য কিছু স্নান হয়েছে বলে? হোলো বছর আগে তখন তোমার মাধুর্য-সর্বোত্তম ভুব দিয়েছিলো, তার সেই মুগ্ধ ওে আজও তো তেমনি আছে। তুমি স্বামী হোয়েছো—শুধু কথা তোমার মুখে শোনার আনন্দ থেকে আমায় বঞ্চিত করলে—তুমি এ নিষ্ঠুর কেমন করে হোলো হেনরিয়েটা? আমাকে আজও ভালোবাসে কি না এ প্রশ্ন তোমায় আমি করতাম না—আমি জানি, আ তোমার যোগ্য নই। মহিমময়ী, মাধুর্যময়ী প্রিয়া আমি কালই তোমার কাছে ফিরে যাবো আমি। তুমিই তো বলেছো তোমার দরজা আমার কাছে চিরদিন খোলা।

ওকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে কত কথাই না বলছিলাম। কিন্তু সখিত ফিরে গেলাম মার্কোলিনার বিমিত্ত বিগ্ন দৃষ্টিতে। খেঁচা হোলো মন চাইলেই ওর কাছে যাবার, উপায় আমার নেই। কান জানি আমি ও চায় না আমাদের দেখা হোক—ওর ইচ্ছার মূল্য আমায় দিতেই হবে—সেইখানেই তো আমার প্রেম সার্থক। তাবু সেই এর মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করলাম, হৃদ্যর আগে আর একটিমাত্র শুধু ওর দণ্ড প্রার্থনা করবো।

মার্কোলিনা সবুয়ে বলে উঠলো,—কি কাণ্ড বলুন তো মিসিয়ে আপনাব চেতারা দেখে তো আমি রীতিমত ঘাবড়ে গেছি একবারে সাদা ফাকাশে হোয়ে গেছে মুখ—একটি কথাও বলছে না—কাউন্টস আপনাকে চিনতেন শুনলাম, কিন্তু ওর নাম শুনে আপনার যে এমন দশা হবে বুঝতে পারিনি।

—কে বললে তোমাকে আমার বন্ধু ছিনাম?

—কাউন্টসই বললেন। তাছাড়াও আমাকে বললেন, যদি জীবনে সুখী হতে চাও তবে ওর সঙ্গে কখনও ভাগ কোরো না। হার রে, উনি কি আর জানেন যে আমাকে দেশে পাঠাবার সব ব্যবস্থাই আপনার করা হোয়ে গেছে? আমি কিন্তু তখনই সঙ্গে করেছিলাম আপনারই ছুঁইবার মধ্যে বেশ নিবিড় প্রেমই ছিলো—আচ্ছা অনেক দিন হোলো কি?

—হোলো, সত্যেরো বছর হবে।

—ওঃ তাহলে নিশ্চয়ই তখন খুবই কম বয়স ছিলো ওর—কিন্তু আজ ওর যে আশ্চর্য পাগল-করা রূপ এর চেয়ে সৌন্দর্য তখন নিশ্চয়ই ছিল না—

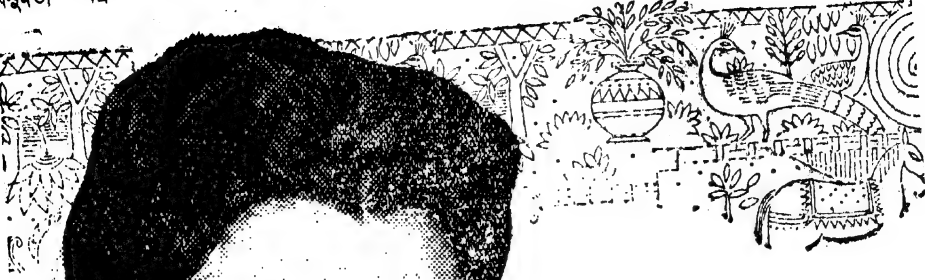
—মার্কোলিনা দোড়াই তোমার—আর হোলো না—

—আপনাকে কাছে পেয়েও হাবালাম—আমার কপালে এ সুখ ছুটলো না।

—মার্কোলিনা, তুমি চিরস্থায়ী হবে—তোমার সময়সী বেটে তোমার জীবনে নিশ্চয়ই আসবে, তার ভালোবাসা তোমাকে ফিরে রাখবে চিরদিন।

কয়েক দিনের মধ্যেই মার্কোলিনার যাবার সুযোগ এলো। লণ্ডনের ভেনিশীয় রাজবৃত্ত মিসিয়ে কুইরিনির সঙ্গে এক দিন থিয়েটারে সাক্ষাৎ হোলো। প্রথম পরিচয়ের পর এক দিন কুইরিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। আর তাঁর বাড়ীর ভোজসভায় তাঁর মার্কোলিনার মামার সঙ্গে ওর নাটকীয় পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎ।

মিসিয়ে কুইরিনিই মার্কোলিনার পিতৃগৃহে পৌছানোর সব ভার নিলেন। তার মামাই তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, তাছাড়া মিসিয়ে



## নিম্মি

তাঁর বকের যত্ন নেন লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে “এর গুণতাই পরিচয় দেয় এটি বিশুদ্ধ!” তিনি বলেন

অন্দরী নিম্মি ভারতীয় চলচ্চিত্রে ভাবাবেগ পূর্ণ ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। তাঁর চোপ দুইটি অপূর্ব অমর এবং তাঁর কোমল ফুলের পাগড়ির মত লাবণ্যও মনোমুগ্ধকর। শুভ্র এবং বিশুদ্ধ লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে তিনি তাঁর লাবণ্যের যত্ন নেন—এটি একটি মোল্যারেন, সুগন্ধ সৌন্দর্য সাবান।

নিম্মি এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেণের শ্রেষ্ঠ স্বন্দরীদের দৃষ্টান্ত অহুসরণ করুন—বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবান নিরমিত ব্যবহার করুন!

## লাক্স

## টয়লেট সাবান



চিত্র-তার কাদের সৌন্দর্য সাবান

কুইবিনি মালাম জেনারেশা নামে একটি বিখ্যাত মহিলাকে মার্কোলিনার সঙ্গিনী হিসাবে পাঠালেন।

যাক, আমি নিশ্চিত। কিন্তু মার্কোলিনার বিচ্ছেদও আমাকে এমন তীব্র ভাবে কাতর করবে, বুঝতে পারিনি। ওকে বিদায় দিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ কেঁদেছি। শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রায় পুরো একটি দিন ঘুমের শেষে দেখলাম, সেই-সেই আবার সন্তোজ হয়ে উঠেছি। আশা আর আনন্দের মনের ক্ষুধিতে ইংলেণ্ডে যাবার আয়োজন শুরু করলাম।

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইস্রায়েল !

বিশদী যেদিন প্রথম পা দেয় ইস্রায়েলের মাটিতে, সেদিন প্রথমেই তাকে কার্টমসের পীড়াপায়ক অত্যাচারের কবলে পড়তে হয়। আরও হয় কণ্ঠচরীদের রূঢ় পরীক্ষার আচরণে। ইংরেজ আইন মেনে চলবে কঠোর নিষ্ঠায়। তার জন্ত কর্তৃপক্ষ, অমার্জিত, দাস্তিক আচরণও স্বীকা করে না, বিশেষ করে কণ্ঠচরীরা—ফরাসীরা জানেন, কেমন কর্তব্যের সঙ্গে মেশাতে হয় ভদ্রতা আর আন্তরিকতার সহজ সুর।

ইস্রায়েলের মাটিতে পা দিয়ে আমার মনকে প্রথম আকৃষ্ট করে ওর পরিচ্ছন্নতা। সারা দেশটাই যেন সৌন্দর্য্যে, প্রাচুর্য্যে আর পরিচ্ছন্নতায় ঝল-ঝল করছে। আর সবচেয়ে বেশী ভালো লাগলো কাগজের নোট। এক টুকরো কাগজের বিনিময়ে সব পাওয়া যায়, সব দেওয়া হয়। লণ্ডন, জেভার, ক্যান্টারবেরী।

প্রত্যেকটি শহরই আমাকে মুগ্ধ করলো। প্রথমে অবশ্য লণ্ডনই ছারী আন্তর্য্যাপাত্তর। কিন্তু নতুনবের মোহ কাটিবার পর থেকে কেমন মৈত্রিহীন নিঃসঙ্গ কাটতে লাগলো দিনগুলি।

লর্ড পেমব্রোক আমাকে মন্ত্রণা দিয়েছিলেন ‘টার টালার্গ’ হোটেলে থেতে—তাহলে নাকি আমি লণ্ডনের সেরা স্মরণীদের দর্শন পাবো। কথামত গিয়েছিলাম, হোটেল-মালিকের সঙ্গে পরিচিত হোয়ে খুশীও হয়েছিলাম। লর্ড পেমব্রোক-এর কথা জানাতে তিনি বললেন, ঠিক ওরকম ভাবে নয় তবে আমি যদি একত্রে আহাযের জন্ত একটি সঙ্গিনী খুঁজি—তাহলে শুধু মুখ ফুটে এক বার জানালো চলেবে। এই বলে তিনি ওয়েস্টার ডেকে বললেন, একটা মেয়ে ধরে আনতে—এমন ভাবে যেন বললেন যে, একটা স্লাম্পেনের বোতল নিয়ে আয় তো। কিন্তু যেটা এলেন, তাকে দেখেই তো আমি মুগ্ধ। যাবার জোগাড়। তাড়াহাড়ি একটা শিল্পি দিয়ে বিদায় করলাম। কিন্তু হা হতাহাসি! পর পর যে কয়টি নমুনা এলেন, তাঁদের প্রত্যেকের রূপেই আমি অস্থির। শেষ অবধি ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা—বললাম, আমি একাই থাকছি, দয়া করে আর কষ্ট করবেন না।

সেদিন বাড়ী এসে ভাবী একটা অভিনব পস্থা মনে এলো। পরিচারিকাকে ডেকে বললাম, আমার বাড়ার তিনলস্টাটা ভাড়া দেবো, তাহলে আর এমন নিঃসঙ্গ কাটাতে হবে না আর তার জন্তে ওর যা বাড়তি কাজ হবে, সে সবার দরুণ সন্তোষে আশ-পাশি করে তাকে দেবো। পরদিনই ওকে নিয়ে জানলায় নোটিশ টাঙালাম :—

—সমস্ত তিনলস্টা ভাড়া

হওয়া চাই। ইংরেজী ও ফরাসী কথোপকথনেও অভ্যস্ত এবং কোন দর্শনপ্রার্থীই প্রবেশ নিষেধ।

বৃদ্ধা পরিচারিকারি তো এই ভুল্লত বিজ্ঞাপন দেখে হাস হাসতে দম বন্ধ হবার যোগাড়। আমি বললাম,—হাসছো কেন বাছা তুমি কি ভাবো, কেউ ঘর নিতে আসবে না ?

—ঠিক তার উল্টো। সারা দিন-রাত কি ভীড় হয় দেখবেন যাক সে, ফানী ঠেকাতে পারবে।

—থব বেশী হবে কি ? ইংরেজী আর ফরাসী দুটো ভাষার ব লিখেছি যে।

—আহা ! এমন বিজ্ঞাপন পড়ার জন্তেই কত ভীড় হয় দেখুন।

সে কথা সত্য। এক বার নোটিশটা না পড়ে কেউ যায় না। দ্বিতীয় দিন আমার নিগো ভৃত্য জাবরি আমাকে দেখালে চুপে খবরের কাগজে কি ভাবে আমার বিজ্ঞাপনটা ফলাও করেছে।

—ভুললোকারি কঠিনজান আছে আর আমোদপ্রিয় তো বটে। কারণ, উনি যে চান তাঁর শুধু তরুণী হলেই চলবে না, একলা হওয়া চাই, আবার নিয়মগত ! তাছাড়া তাঁর কাছে কোনো সাক্ষাৎকার প্রবেশ নিষেধ—অর্থাৎ ভুললোকারি নিজের তাকে সর্বদা সঙ্গে দেবেন তবে ভয়ের কথা, যদি তরুণীটা রাতে ঘুমোবার সময়েই শুধু থাকেন ? কিংবা যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেরিয়ে যান বাড়ী থেকে আর যদি সাক্ষাৎকারী হিসাবে বাড়ীওড়ারও প্রবেশ নিষেধ করেন !

একথা মানতেই হবে, ইংরেজী দৈনিকগুলিই ছুনিয়ার ও পত্রিকা। যা কিছু ঘটে তা’ নিয়ে মুক্তকণ্ঠে আলোচনা পত্রিকা মারফৎ। যে দেশে কোকরা স্বাধীন ভাবে বলতে স্বাধীন ভাবে লিখতে পারে সে দেশের মানুষই তো আসল স্বাধী।

যাই হোক, দশ দিন ধরে প্রায় শ’থানেক তরুণীকে প্রস্তাব করার পর এগারো দিনের দিন যখন খেতে বসছি, এমন একটি তরুণী এলো। মোজা আমার খাবার ঘরেই। বয়স হোলো বিশ থেকে চব্বিশের ভিতর। দাঁঘল, তন্দী, স্তম্ভী দে অত্যন্ত মার্জিত, বাচ্চাচান কঠিন পুষ্টি—শাস্ত, গম্ভীর গর্জিত মুখশ্রী—আর ঘন মেঘের মত কারো চুল।

সুন্দর সত্ত্ব ভঙ্গীতে আমাকে অভিযান জানাতেই আমি জু দাঁড়ালাম। কিন্তু আমাকে অস্বস্তি জানালে আমি যেন খাটো ছেড়ে না উঠি। ওর কঠিন আর বলার ভঙ্গীতে বোঝা গেল, সে বন্দনী বরাণা ধরে মেয়ে। আমার সঙ্গে কিছু খেতে অস্বস্তি করায় এমন সন্তুষ্ট মুখ ভঙ্গীতে প্রত্যাখ্যান জানালে যে, অর্থাৎ মুগ্ধ হোয়ে গেলাম। মেয়েটি এসেই ফরাসী ভাষায় কথা শুরু করেছিলো, পরে কথায় কথায় অতি সুন্দর আর নির্ভুল ভাষে ইতালীয় ভাষায় কথা বলতে লাগলো। মেয়েটি জানালো আমি সব রকম সন্তোষ ও রাজী। আমিও রাজী হয়েছিলাম, ওকে সেখান আর কথা শোনার পর থেকেই।

—সমস্ত তিনলস্টাটা নেওয়া আমার পক্ষে বড় বেশী হয়ে পড়বে যদিও আপনি সস্তা ভাড়ার কথাই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তবুও থাব জন্ত সন্তোষে ছ’শিল্পি-এর বেশী খরচ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—ঠিক আছে। ওই ভাড়াই আমিও ঠিক করেছিলাম আপনি কিছু ভাববেন না। আমার পরিচারিকাই আপনার বা

—অনেক ধন্বাদ! তাহলে খুব স্তবধা হবে আমার।  
পরিচারিকাকে তাহলে জবাব দেবো। কারণ সে বড় পয়সা  
দেবে। আমার আয়ের পক্ষে সেটা বেশ মারাত্মক হয়ে পড়ে।

বরং আপনার লোকটিকে সন্তোষে ছাপেনী করে দেবো।  
সমজ্ঞা করে কিন্তু বেশী খরচ করার সাধ্য নেই আমার।

—কিছুমাত্র সম্বোধন করবেন না। আপনি যদি এক পেনী দেন  
আমার রাঁধুনীকেও রোজ এক পেনী দামের খাবার আপনাকে  
বলবো। রান্না নিয়ে আপনি বুঝা ভাববেন না। আর তাছাড়া  
নী যা আপনাকে দিয়ে যাবে, যত খাবারই হোক সবই নেবেন  
না করে। কারণ আমার বলা আছে রোজ চার জনের মত  
করতে অথচ খেতে আমি একা। আপনি এক পেনী দিলে  
ঐ ওর পুরোপুরি লাভ। কিছু মনে করবেন না আপনি এতে।  
—কি আর বলবো, আপনার এ উদারতা আমি কখনো  
বো না।

সব ব্যবস্থা চোয়া গেলো। মেসেটি চলে গেলো জিনিসপত্র সব নিয়ে  
দুত। এসেছিলো যখন তখন ওর মুখখানা ছিলো পাণ্ডুর হান—  
এর সময় দেখলাম বস্তুম আভাসে উজ্জ্বল। ওর নাম কুমারী পলিন।

পরিচারিকার মাঝে পলিনের সব খবরই কানে আসতো।  
যার ঘর ছাড়া বেশবাস পরিবর্তনের জন্তে ছোটো একখানি ঘর বেছে  
লিখে, চাকর-বাকরদের চেয়েও ছোটো ঘরখানা। এমন পানীয় হিসাবে  
ছাড়া কিছুই খায় না। সকালে ছোটো একটুকরো কটা শুধু আর  
মুঠে স্থাপ, এর সঙ্গে আর একটিমাত্র ডিম সে যাই হোক না কেন।

এম্ব শুনে তখন পরিচারিকাকে শিখিয়ে দিলাম পুরো প্রাতরাশ  
ক দিতে আর জানাতে, এ বাড়ার নিয়মই সব ঘরে পুরো প্রাতরাশ  
দানো—না হলে আমি ভয়ংকর হুংকিত হবো। একখানি চিঠিও  
খোঁজিলাম ভালো একটা ঘর বেছে নেবার অম্বোধন জানিয়ে।  
এ সবশেষে কেরামতকে পাঠালাম সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।  
রাঁধা মধুর হোলো। ঘরে গিয়ে দেখি বেশ কয়েকখানি বই  
বিলের উপর স্তুপীকৃত, তাছাড়া অল্প সব নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের  
কটাকি—যা দেখলেই দারিস্যের কথাই মনে হয়। আমি যেতেই  
লিন এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালে।

—কি করে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো।

—আপনার সঙ্গে দিয়ে—অন্তত খাবার সময়টায়। একা যেতে  
লেই গোপায়ে গিলি, ফলে শরীরও ভেঙে পড়ে। যদি কিছু মনে না  
দেন আপনি আমার সঙ্গে খেতে এলে আমার পক্ষে খুবই ভালো  
। অবশ্য তাঁর জন্ত আপনার বিস্ময়াত্রও অস্তবধা ভোগ করতে  
ব না কোন দিক দিয়েই—

—তাই হবে, কিন্তু খুব যে মনোরম সঙ্গ পাবেন তা' মনে হয় না।

সেদিন আরও অনেক কথাই হোলো। কথায় কথায় জানলাম,  
লিন ইংরেজ নয়, বাইরে থেকে এসেছে। অথচ ছোটো থেকেই  
সেই কথা বলতেই অভ্যস্ত। ক্রমেই ওর মধুর অথচ সযত  
বহাওর ওর শাস্ত্র-শ্রী আমার মনকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করছিলো  
মহাম। আর ওর কথায়-বাস্তায় আমার দূত বিশ্বাস হয়েছিলো  
রীতিমত অভিজাত-কন্যা। এক দিন আরও ঘনিষ্ঠ প্রশ্নই করে

লাম পলিনকে,—আপনি বিবাহিতা?

—হ্যাঁ।

—মাতুলস্বহের স্বাধ পেয়েছেন আপনি?

—না। তবে অম্বুব করতে পারি বৈ কি?

—আপনার স্বামী? তার সঙ্গে এ বিচ্ছেদ কেন?

—তিনি অনেক দূরে থাকেন। বিচ্ছেদ নয়—কিন্তু দোহাই  
আপনার, আর প্রশ্ন করবেন না।

—একটা কথার অন্ততঃ জবাব দিন—এখান থেকে যখন চলে  
যাবেন—সে বাড়ার কি স্বামীর সঙ্গে মিলবার আশায়?

—হ্যাঁ, কথা দিছি ইল্যাপু ছেড়ে যাবার আগে আপনাকে ছেড়ে  
যাবো না। এই স্বপ্ন-সমৃদ্ধিতে ভরা ছোটো দ্বীপটি ছেড়ে যাবো  
শুধু আরও শুখী হবার আশাতেই—আমার প্রিয়তমের সঙ্গে পেলে।

একটা প্রবল বেদনার অম্বুভূতিতে আমার বৃকের ভিতরটা মুচড়ে  
উঠলো—আর থাকতে না পেয়ে আবেগে বন্ধকটেই বসে উঠলাম,  
—আর আমি পড়ে থাকবো পিছনে—হতভাগ্যের মতো!  
পলিন, পলিন আজ স্বীকার করছি আমি তোমাকে ভালোবেসেছি,  
প্রকাশ করিনি শুধু তোমার অসন্তোষের ভয়ে।

—চুপ করুন, শান্ত হোন—আমার কোনো অধিকার নেই  
আপনার কথা শোনার—আমার সাধ্যও নেই আপনাকে বাধা দেবার  
—আমার অম্বোধন শুধু রাখুন। তা না হলে কালই আমাকে চলে  
যেতে হবে এবাড়ী ছেড়ে: সেটা যে আরও কষ্টদায়ক হোয়ে উঠবে।

—তোমার কথাই শিরোধার্য পলিন! থাক ও প্রসঙ্গ—তোমার  
বইগুলি আমাকে দেখাবে? তোমার ওই মহৎ স্রষ্টার মনের পিপাসা  
কি দিয়ে মেটাও, জানতে ইচ্ছে করে।

—নিশ্চয়ই দেখাবো। কিন্তু দেখলে হতাশ হবেন বলে রাখছি।  
পলিন দেখালো ইংরাজিতে মিলটন, ইতালীয়তে আরিয়োস্টো,  
ফরাসীতেও কিছু সাখ্য আর বাকী সব পর্তুগীজে।

—তোমার এত চমৎকার সংগ্রহ! কিন্তু বেশীর ভাগই পর্তুগীজ  
ভাষায় কেন?

—আমি পর্তুগালের মেয়ে বলে।

—বল কি! তুমি পর্তুগীজ? আমি ভেবেছিলাম, ইতালীয়—  
আশ্চর্য! এই বয়সে পাচটা ভাষা দখল করেছে! স্পেনীয় ভাষাও  
জানো নিশ্চয়ই?

—জানি বৈ কি। পাশাপাশি থাকার দরুণ ওটা আপনা হোতেই  
শেখা হোয়ে যায়।

—পলিন, তোমার পরিচয় আমি সত্যিই জানতে চাই। হ্যাঁ,  
জানবাব অধিকার আমি রাখি। আর তোমার বিশ্বাস রাখার  
অধিকারও আমি রাখি। তুমি আমায় জানাও পলিন, তোমার সত্য  
পরিচয়, তোমার জীবনের অতীত কাহিনী—

—জানি আমি। বলবো আপনাকে—সব কিছুই বলবো—  
পরিপূর্ণ বিশ্বাসেই বলবো—কিন্তু গোপন করবো না। আমি জানি,  
আপনি ভালোবাসেন আমাকে—আমার অনিষ্ট আপনার হারা কখনই  
সম্ভব হবে না।

—এই সব পাণ্ডুলিপি কিসের?

—আমারই জীবন-কাহিনী; আশ্রন আপনাকে পড়ে শোনাই সব।

এক হতভাগ্য কাউন্টের একমাত্র কন্যা আমি। ছোটো ছিলাম  
তখন—সেই সময় রাজাকে হত্যা করার বড়ফন্দি দল ধরা পড়ে

তাদের সঙ্গেই অভিযুক্ত করে বাবারও প্রাণলগ্ন দেওয়া হয়। আমি না সত্যিই বাবা অপরাধী ছিলেন কি না—বাক্সজায় করে গোপন হিসা আর বিচ্ছেদের কারণে পড়ে প্রাণ দিলেন।

মা আমার আশ্রমে লেখাপড়া শিখেছিলেন। সেখানে এক জন মঠবাসিনী ছিলেন আমার নিজের মাসী। আমিও সেই আশ্রমেই ছিলাম, প্রায় আঠারো বছর বয়স অবধি। আমার যা কিছু শিক্ষা, সব সেখানেই। ইচ্ছা ছিলো, কত দিন না বিয়ে হয় তত দিন ওখানেই থাকবো আশ্রমের লোকের সাহায্যে পরিবেশে—তা ছাড়া আমার মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনী মাসীকে আমি বড় ভালবাসতাম।

কিন্তু দানামশায় নিয়ে এসেন আমাকে আঠারো বছর বয়সেই। বাবার সম্পত্তি বাজসরকার থেকে বাজহাস্ত কর। হয় নি। তার প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী তখন আমিই। এক দুঃসম্পন্নী আত্মীয়া, মাকুঁইস ত এক—এর বাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা হোলো। তাঁর বাড়ীর অর্ধেকটাই প্রায় আমার ক্রয় ছেড়ে দিয়েছিলেন—তা ছাড়া এক জন শিক্ষিতা অভিজাতবন্দীয়া ধাত্রী বাবা জোয়েছিলেন—মি. চাকর আর অল্পান্তর বহু পরিজনই আমার পরিচর্যার জন্য ছিলো। বটে কিন্তু আসল কতী খেলান আমার ধাত্রীটি—বাই হোক, বরাতখন ওর স্বভাবটা ভালোই ছিলো।

কিন্তু আসল বিপদ শুরু হোলো বছর তিনেক পরে। এক দিন দানামশায় এসে জানালেন, এক কাউন্ট আমাকে পুরবধূরূপে মনোনীত করতে চান—তাঁর উপযুক্ত পুত্র মাল্লির থেকে সরে ফিরেছ—আর এই বিবাহ আমাদের সমস্ত অভিজাত সনাতন বীতমিত আনন্দের সাজা জাগাবে—এমন কি, রাজা আর রাজ-পরিবারেরও সাহস সম্রতি আছে এতে।

—কিন্তু দানামশায়, আমি তাঁদের স্বীকৃতি করতে পারবো কি ?

—খুব পারবি যে পাগলী ! আর ওরিয়ে তোকে একরকম মাথা ঘামাতে হবেই না।

—কিন্তু দানামশায়—মাথা ঘামাতে হবে না বললে চলবে না ; আগে আমরা পরামর্শের সঙ্গে পরিচিত হই।

—বিয়ের আগে এক বার আলাপ হবে বৈ কি। তার তার ক্রয় বিয়ের কিছু এমিক-ওমিক হবে না, সে সব আগেই যা ঠিক হবার হোয়ে গেছে।

আশ্চর্য্য ! বাক মন দিতে পারি নি, তার কাছে নিজেকে নিবেদন করতে হবে অক্বেষ মতো ? না, কখনই এ তোতে পারো না। সম্পূর্ণ অজানা, অপরিচিতের নাগপাশে নিজেকে এমন ব্যক্তিবর্গের জড় পুঙ্খের মত জড়াতে দেবো না—চলো না। ধাত্রীকে বললাম সব। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো যুক্তি দেবার সাহসও নেই ওর। তখন গোলাম আমার সন্ন্যাসিনী হেহমরী মাসীর কাছে। সব শুনে উনিও বললেন, কাউন্টকে আমার ভালো লাগা উচিত, তবে বিয়ে জিনিষটাই হোলো একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা—তা ছাড়াও ব্রেজিলের রাজকুমারীর প্রিয়পাত্র ওই কাউন্ট—এ বিয়ের সম্বন্ধ উনিই করেছেন।

হতাশায় ভেঙে পড়ি নি। শেষ অবধি কি হয়, পরিচয়ের প্রথম

পরম্পর পরিচিত হলো। আমি নিশেধে সাধারণ শুধু ; কবছিলাম কাউন্টকে। গভীর মনোযোগে শুনছিলাম তার কথা। কিন্তু প্রথমেই মনে হোয়েছিলো, এও কাছে আত্মনিক কখনও করবো না—কখনও করতে পারবো না—কিছুতেই না। অতি প্রগলভ পরচোকারী, আত্মস্বরী নির্ধারণ লোকটিকে যা বরণ করতে হবে ? সাধারণ ভ্রাতৃত্বজ্ঞানেরও অন্তর যাব, সন্তান নিজের গুণগান করতে এতটুকু যাব সংকট হয় না, এমনি দুর্ভাগ্য বসিকতা আর কাল্পনিক বীকৃতি কালীনীর যাব একমাত্র ব্যক্তি তাকে কখনও শ্রদ্ধা করা যায় ? তার সঙ্গে কখনও কি যুগ্মকর্ম করা ? তা ছাড়া চোখ দুটিকেও নিরাশ করেছিল ওর কুসংস্কৃত মনের এই তীব্র সমালোচনা মনেই ছিলো। বাইরে ন নম্র, সবত বাবজারে কোথাও তার চির কুটী উঠতে দিইনি। এ আমার এ অতি সম্বত, অতি ভল বাবজারের ফলেই আশা করছি ওই অতি উচ্ছসিত, অতি প্রগলভ কাউন্ট আমাকে মনোনীত কর চাইবেন না।

এ হতাশা! দিন আটকে যেতে না যেতেই আমার জানালেন, তাঁর পিতা-পুত্র আমাকে একটা দিন নির্দিষ্ট করে অহুরোধ জানিয়েছেন—বিবাহের চুক্তিপত্রের মত করবার জন্য বিবাহের চুক্তিপত্রে না আমার মৃত্যুর পরামর্শনাত ?

এই চুক্তির আমার একমাত্র আশ্রয় মাসীর কাছ ঘুরি মাসী জানালেন উনিও সংশয়িত কাউন্টকে—এর সঙ্গে আমার কি কথা উনি ভাবতেও পারবেন না। কিন্তু এটা এমন ভাবনক ভুল লোক যে, চলে বসে কৌশলে সম্রতি আলাপ করবার শিল্পপাত মনে মানীর কথাই আমি একবারে অকূল সমুদ্রে পড়লাম—কিন্তু সেই দুহুঠেই বিস্তার চমকের মত একটা অসুখ মতলব আসে যে বসো গেলে গেলে। তখন বাড়ী চলে এসো। বেশিরকাল কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলাম মাকুঁইস ত সমুদ্রের মত আমার চতুর্ভাগ্য পিতাকে বন্ধী করেন—যিনি আমার পিতার বা ক্রয় ধাত্রী—সেই কাউন্টের নির্ভর প্রকৃতির মাতৃসমীক। সবত ম ঠেকে খুলে জানালো—উপরসংহারে লিখলাম আমার এমন দায়ী অনাথা অবস্থার ক্রয় উনিই হো ধাত্রী। ঈশ্বরের কাছে ভগ্নতি করতে হবে আত্ম আমার পায়িত্ব না নিয়ে—আমি তাকে আশ্রয়প্রার্থিনী—আমাকে ব্রেজিলের রাজকুমারীর যোগ্যতা বন্ধী করুন আর মনোনীত স্বামী নিরীক্সনে অধিকার দিন।

চরম উত্তেজনা আর কৌকর মাধার লিখে পাঠিয়েছিলাম আমার ধারণা ছিল না লোকটিও কাউন্টের মতলবের আশ্রয়ে তাকে এতটুকু করবার কোমলতা আছে। তবু আশার একটা মত ছিলছিলো মনে, আমার ভাষা আর লিপির অভিজ্ঞতায় কি এতটুকু জাগবে না ? কায় বিচারের দায়িত্বে পিতার স্বীকৃত নাশ করা কর জাগ্য দায়ী কি প্রত্যাখ্যান করবেন ?

তুঁদিন পরে আশাতীত ভাবে এলো উত্তর। না, লিপির মত নয়। লোকের মারফৎ। তিনি বললেন, মাকুঁইস তাঁকে গোপ পাঠিয়েছেন আমাকে জানাত যে—আমি মনে জানাই ওই বিবাহ আমার মতামত স্থির করতে পারছি না, বতরুণ ব্রেজিলের রাজকুমারী সম্রতির কোনো নিষ্ঠুর বিবাসযোগ্য প্রমাণ পাই। এইটুকু

মনে সম্ভব নয় বলেই তাঁর বিষম অধরকে পাঠিয়েছেন।  
তার উত্তরে প্রতীকা না করেই আগছকটি চলে গেলেন। কিন্তু  
সময়ের মধ্যেই তাঁর অপকণ সৌন্দর্য্য শুধু আমার দুই নয়,  
তার সমস্ত মনের উপর গভীর বোধপাত করে গেল। সজ্জ মুক্তি-  
তার আশায় আর আকস্মিক মৃদুবেব আবির্ভাবে আমার মনের  
সময়ের অবস্থা বর্ণনার অতীত! কে জানতো সেই তাঁর মধুর  
চোখের কেন্দ্রে অপেক্ষা করছে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ?

এর পর থেকে আমি যখনই যেখানে গেছি, ওই ভক্তলোকের সঙ্গে  
মিলেবো হয়েছে। বুকেই আশ্রয়! গীত্কার গেছি, খিয়েটাবে  
ছি। কোনো উদ্ভ্রাণে উৎসাহে গেছি, কি পবিত্রতাসের কোনো  
সঙ্গমস্থানে যেখানেই গেছি একে লেগেছি। আর যখনই  
তা থেকে নামতে বা উঠতে গেছি পেতেছি ওর প্রসারিত  
কান্নার নিভেই আকস্মিকতা করে অনাস্রা ঠাণ্ডা  
নিশ্বাস করে সতর্ক হোতে ভালো জানি না। কিন্তু ওর সেলাম  
টা যেটা জিনিষ—ধরা পড়লাম আপন মনেই কাছে। যদি  
কোন দিন একে দেখতে না পেতাম, সমস্ত দর্শনের হোতে উঠতো  
হাস—আমি মনে হোতো অর্ধমর্ত্য!

আমার জীবনের ধুমকেতু সেই কবিতাটিকে সঙ্গে প্রাণেই দেখা  
গোলে নন্দামশট বিধা হাঁপ এটা অধ্যাত্মটির বাজারে কিন্তু আর  
কিছুই ওর পুরানো কথা উঠেনি।

এক দিন সকালবেলা স্নানত পেরে, আমার পরিচালিকার ঘরে  
দুই এক বসেই গল্পের আদ্যোক্ত্য। এক এসেছে জানিবার জন্য  
যে নীতি প্রণালী নিয়ে একটি তরুণী চারিটে আছে—আমাকে  
ওর সহায় সম্বন্ধে সঙ্গে মনোভাব জানালে। সেগুলোর দিকে  
বললাম ওয়েই চাও খিবিতে নিলাম। এমন কিছু ভালো নয়।  
কিন্তু জানালে, আপন মনেই ভালো জিনিস নিয়ে আসবে।  
একটা কন্যার গিয়ে ওর দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলাম।  
একশতাঙ্গী আমার সমস্ত মন ছুড়ে দে, তরুণের অনিন্দিত্যের  
খিঁচুপড়ে তার সঙ্গে এটা তরুণী! কি করে সম্ভব? আমার  
ইন্দ্রিয় না তরুণীটি আরও নীচাচী তার চেয়ে—ভাবতে ভাবতে  
কিটো কখন চলে গেল দেখান করিনি। পরিচালিকাকে প্রশ্ন  
বাক্য ও এসলে, আগে করনো দেখেনি যেহেতুকে।

আপনি ঠিক সেই সময় ছোটো বোতের গুটি ভরে সেস নিয়ে  
হাঁকবে। একে আমার নিজের ঘরে থেকে আনলাম। তার পর  
খা বসেই শুক করলে একে আমার দিকে চাইতে বললাম—  
দুইটে ও চাইলে আমার যুগের দিকে—কোনো সন্দেহ হইলো না  
হি। কিন্তু মনের প্রবল উত্তেজনার একটি কথাও বলতে পারলাম  
না। তাছাড়া পরিচালিকাটির সামনে কোনো অব্যবহিত খিঁচুপড়ির  
কথা ঠিক নয়। ওকে বললাম আমার টাকার ছোটো খসিটা  
সেখানে। যেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখনই ছদ্মবেশী  
সিগারী আমার পায়ে উপর এসে পড়লো!

—আমার ভাগ্য আপনার হাতে—আমি বুকেছি আপনি ঠিক  
হতে পেরেছেন।

—ঠিক ঠিক চিনেছি কিন্তু আমি ভাবছি আপনি কি পাগল?

—আপনি জানেন—

—সে জানে—তাকে টাকা দিয়ে হাত কবেছি।

—কি! এত দূর সাহস?

সে উঠে ঠাণ্ডা। তখনই দেখলাম পরিচালিকাটি মুচকি  
হাসতে হাসতে টাকাগুলি গুণতে গুণতে ঘরে চুকছে। সেগুলি  
ভাঙে করে ঝুঁজিতে তুলে একটা মাথা হেলিয়ে নমস্কার জানিয়ে ও  
নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে ওই চক্ষুণীতা পরিচালিকাকেও বার করে দেওয়াই  
আমার উচিত ছিলো। কিন্তু আমি ভালোম, কিছু না জানার  
ভাণ করে থাকি কেন? তাতে অন্ততঃ মান বাঁচবে।

দিনের পর দিন চলে গেলো। পনেরোটি স্থলীখ দিন।  
এক দিনও আর দেখিনি সেই তরুণ ছদ্মবেশীকে। নিজের  
কাছে নিজেই লজ্জা পেলাম নিজের মনের চেহারা দেখে—  
সারা দিন-রাত আমার কাঁচছ শুধু স্বপ্ন দেখে। সারা মন—চিন্তা  
আমার ভার পেছে এমন গভীর বিষমতায়? শুধু ওর নামটুকু জানবার  
জন্তে কি ব্যাকুলতা! পরিচালিকাকে জিজ্ঞাসা করলেই পারতাম—  
কিন্তু ওর উপর কেমন বিতৃষ্ণা আর সন্দেহও এসে গিয়েছিলো।

‘তবু হইলো না ধৈর্য্যের বীধ—মন মানলো না সম্বন্ধের অম্মশাসন।  
এক দিন প্রশ্রাণ করতে করতে নিতান্তই যেন হেলাভরে জিজ্ঞাসা  
করলাম। সেই সেমু-ওয়ালী আর আসিনি?

পরিচালিকাটি ধুস্তও কম নয়। আমার চলনা ও ঠিকই হয়েছে।  
বললে, ছদ্মবেশ ধরা পড়ার ভেতই আর আসতে সাহস করে না।

—ছদ্মবেশ আমি ধরে ফেলেছি। কিন্তু আমি অলস হচ্ছি যে,  
তুমি এক জন পুরুষ জেনেও সমস্ত লুকিয়েছিলে আমার কাছে?

—আপনি অসহ্য হবেন আমি ভাবিনি। আমি ঠিকে চিন্তায়।

—কে উনি?

—কীত শু আল। আপনি নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন। কারণ, মাস  
চারেক আগে কি প্রয়োজনে উনি যে এসেছিলেন আপনার কাছে?

—তবে যখন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেমু-ওয়ালীকে কেনো  
কি না, তখন কেন মিথ্যা বলেছিলে?

—কমা করুন। শুধু আপনি অপ্রস্তুত হবেন বলে। আমিও  
এই গোপন ব্যাপারে আছি জানলে আপনি বাগ করবেন বলে।

ওর এই স্বাভাবিক সত্য ব্যাখ্যাত আমি ধুসীই হলাম। তাছাড়া  
আরও ধুসী হলম কেনে আমার কুমারী মনের প্রথম নৈবেদ্য তাহলে  
অপাত্রে নিবেদিত হয়নি। আমি শুনেছিলাম, তরুণ কীত শু আল—  
এর নাম বহু ক্ষেত্রে—বিখ্যাত অভিজাত পরিবারে। কিন্তু এখন  
সম্পন্নহীন। তবু মাকুইস পমবালের মত প্রবল প্রভাপাশালীর অধীনে  
পন্থ কথ্যচারী সে—ভবিষ্যৎ উন্নতি তো সহজলভ্য তার। আর  
আমি তো আছি—ভাবতেই সমস্ত চিন্তাধারায় কেমন কেমন যেন  
স্বপ্নের আবেশ লাগলো। তার অভাব মোটাতে বিধাতা আমাকেই  
নির্দিষ্ট করেছেন—ভাবতেও মধুর—মধুর কল্পনাতে আবার মুহূর্তগুলি  
ভরে উঠলো আকাশ-কুসুম চরনে—কিন্তু থাকে এমন করে বিধায়  
দিজেছি—সে কি আর কিংবদে?

আমার গোপন কথাটি সে তো জানে না? সে কি আসবে?

[ ক্রমশঃ।

# ব্যক্তিহে রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীঅজয়েন্দুনারায়ণ রায়

রামেন্দ্র বাবু নিজের প্রশংসা শুনে মগ্ন হ'তেন। তখন সে প্রসঙ্গ পরিহার ক'রতে চেষ্টা ক'রতেন। ব'লতেন, স্বব-স্তুতি শুনার জ্ঞাত ত অনেক দেব-দেবী ব'য়েচেন, এসব আমার কাছে কেন ?

তখন তাঁদের জবাব ছিল, আপনিও ত' মানুষ নন সার ! আপনি দেবতার চেয়ে কম কী ?

দুঃখ ক'রে বলতেন—আমি মানুষ ; আমি এক জন পরাধীন দেশের জীব।

পরের গুণকীর্তনে তেমনি আবার তিনি ছিলেন পঙ্কমুখ। যখন রামেন্দ্রসুন্দরকে কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র হ'য়ে বিজ্ঞাসাগর উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব ক'রলেন, তখন তিনি বার বার নিবেদন ক'রে ব'লেছিলেন—এ উপাধি দেবেন না আমাকে, এ দেবার যোগ্যতা বাঙলা দেশে মাত্র এক জনেবই আছে। আমার মনে হয়, সারা ভারতের মধ্যে এক জনেবই অধিকার আছে বিজ্ঞাসাগর হবার।

আপনি নিজেকেই বা কম মনে ক'রচেন কেন ? তাঁর হাজার গুণ থাকলেও তিনি কী আপনার মত বেদবিৎ ?

শুনেই কানে আঙুল দিলেন। কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীকে ব'ললেন রামেন্দ্র বাবু—ও কথা শুনবো না আপনার। উনি যে ছিলেন স্বাধীনচেতা, আমাদের এই পরাধীন দেশে। যা' কেও কখনও ব'লতে সাহস করেননি, তাই তিনিই—একমাত্র তিনিই ব'লতে পারতেন মুখের উপর স্পষ্ট। তাতে গভর্নমেন্টের বড় বড় কর্তারাই রাগ করুন, আর দেশের সমাজপতিরাই রাগ করুন। ক'রও স্বাতির রাখতেন না অজ্ঞায়ের প্রতিবাদে স্পষ্ট কথা ব'লতে। কতো সময় দুঃখ ক'রতে শুনেচি সেই মহাপুরুষকে—এতো অশিক্ষিত দেশ আমাদের, এ দেশের জাতির ঘন ভাঙাতে কত শতাব্দী যাবে কে জানে ?

রামেন্দ্র বাবুকে কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর দান গ্রহণ ক'রতে হ'লো বটে, কিন্তু তিনি ব'লেছিলেন—এ দান আমি মাথা পেতে নিলাম, আর মাথার উপরেই রাখবো যত দিন বাঁচবো ; দেশের লোকের সামনে বের ক'রবো না কোন দিন।

এক বার রামেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সার গুরুদাস বাবুর তর্ক-বিতর্ক হ'লো কয়েকটা বিষয় নিয়ে সিনেটে। ব্যাপার অতি সামান্য ; কিন্তু স্থিতিবুদ্ধি গুরুদাস বাবু বড় ক'রে দেখলেন সে বিষয়কে। সব শুনে রামেন্দ্র বাবু কেবল হাসলেন।

পরের দিন রামেন্দ্র বাবু বই নিয়ে প'ড়ছেন, বেলা তখন আটটা। চাকরে এসে খবর দিলো জজ সাহেবের গাড়ী এসেছে। তিনি ব'ললেন—নিয়ে এসোগে। যখনই দেখালেন জজ সাহেব আর কেও নন, গুরুদাস বাবু, তখন কী ক'রবেন ঠিক পান না। এত দূর ব্যস্ত হ'তে তাঁকে দেখা যায় না। গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলেন। সার গুরুদাস বললেন—আমারই ভুল হ'য়েছিল রামেন্দ্র ! পরে বয়ে দেখলাম তোমারই কথা ঠিক। তমি ক'তো বড়

তখনই বুঝলাম, যখন কথার প্রতিবাদ না ক'রে কেবল গা আমাকে ডেকে পাঠালেন না কেন ? কী প্রয়োজন আপনার আমার বাড়ী আসার ?

গুরুদাস বাবু যাওয়ার পরই রামেন্দ্র বাবু গেলেন তাঁর অতি বিনয় বচনে গুরুদাস বাবুকে বললেন—আমাকে চাবুক কী প্রয়োজন ছিল সার ! হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইলেন বাবু, তা ছাড়া পায়ের ধুলোও নিলেন। তখন নির্বাক মুখ থেকে বের হ'লো—তোমার জয় হোক রামেন্দ্র !

রামেন্দ্রসুন্দর গুণগ্রাহী ছিলেন। কোন গুণী লোকের উপস্থিতি হলে তিনি চিন্তা করতেন—কেমন ভাবে তাঁর ইচ্ছা করা যায়। কায়েন মনসা বাচা যেমন ভাবেই হোক, তাঁর থেকে কোন ক্রটি হতো না।

শুনলেন রামেন্দ্র বাবু, দীনেশ সেন মহাশয় অন্তস্থ হয়ে আছেন নিজের বাড়ীতে। সবার পেছাই তাঁর চিকিৎসা করলেন। বললেন নিজের স্ত্রী ও মাকে—তোমরা কিছু করে চালা তুলিয়ে আমার হাতে দাও, আমি দেবো ও গুণীমানুষকে।

সকলেই একমত হয়ে টাকা তোলাতে লাগলেন। তাঁর জ চক্ষুসার সঙ্গে কিছু নেবো না, সে ছেলেমানুষ। শুনেই রামেন্দ্র বললেন—কেন নেবে না ? তার বিয়ে হয়েছে, একটা র হয়েছে। মনে করবে তার মেয়ের একটা জামা কিনে নি প্রথম হতে শিক্ষা দাও অন্ময় হলে মানুষকে দিতে হয়। তার হয়ে তুমিই দাও—বললেন স্ত্রী ইন্দুপ্রভা দেবী। বললেন—আমি পারি কিছু ওকে দিতে দেখাব। এগনর শিখুক।

দীনেশ বাবুর নিজের হাতের লেখা হতেই তুললাম—“রাগীর দীঘির পাড়ে একটা খোড়ো ঘরে—আমি রোগ পড়ে বড় কষ্টে সময় যাপন করছিলাম। ডাক্তারগণ বললি আমি ভাল হব না। এই নিদারুণ চির ভবিষ্যতের সমুখের আমি ভীত ও কাতর ভাবে মৃত্যু কামনা করিতেছিলাম। প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া, সাধা রাত্রি অনিদ্রা ও নৈরাশের এক দিন আমি মানসিক উৎকর্ষা দূর করিবার জ্ঞান প্রাপ্ত করিতেছিলাম। এমন সময় ডাকপিওন আসিয়া এক সন্ধ্যা আমার হাতে দিয়ে গেল, পত্রখানি রামেন্দ্র বাবুর। আমি ও তাঁহাকে দেখি নাই ; কিন্তু এই অদৃষ্ট-ব্যক্তির আশ্বাসবাণী ও নিকট বেন অদৃষ্টের আকাশ হইতে ঘনঘটা দূর করিয়া মুহূর্তে স্বর্গের জ্যোতি দেখা দিল। তার পর কলিকাতায় আমি তখন শয্যাপার্শ্বে আমার চির-আকাজিকত প্রকৃত মুখখানি দেখি তিনি আমার সে সময় দূরবস্থা দেখিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রায় আসিয়া বলিতেন অমুক অতো টাকা দিয়াছেন। তাঁ জ্ঞাত শ্রীযুক্ত নাটোরের কুমারকে পাইলাম। লাগলে





লিলি  
বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ  
দ্রব্য

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে প্রস্তুত  
লিলি বার্লি প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

বৃত্তি করিয়া দিয়াছেন, এই সুবাদ পাইলাম। স্বপ্নের সময় তেমন ভাবে কখনও পাই নাই। কিন্তু দুঃখের দিনে তাঁহার গভীর স্নেহ আমি হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিয়াছি।

ভারপ্রাপ্ত গুপ্ত এক জন ছাত্র রামেন্দ্রচন্দ্রের। তার অভাব জানিতে পেরে তাকে নিজ বাড়ীতে রেখে পড়িয়েছিলেন। নিজের ভাই কিংবা ছেসেদের চেয়ে তাকে কম ভালবাসতেন না। শেষ জীবনে ভারপ্রাপ্ত বাবুও কম উপকার করেন নি—এই পরিবারভুক্ত জনের। রামেন্দ্রচন্দ্রের বসে রয়েছেন নিজের কামবাগ, এমন সময় এক জন ছাত্র এসে হাজির। তার নাম জিজ্ঞাসা করায় বললেন—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কী চাও তুমি? আমি সার! আপনার কাছে দিনকতক দর্শন শাস্ত্র পড়তে চাই। খুব খুশী হয়ে বললেন রামেন্দ্র বাবু—এমন কথা কারও মুখে শুনি নি। আমি খুব আনন্দ সহকারে তোমাকে পড়াব। সেই দিন থেকেই যোগেশ বাবুকে বিজ্ঞান করতে লাগলেন। একে নিজের পড়া, কলেজে যাওয়া, তা ছাড়া সাহিত্য-পরিষদ ত আছেই। যোগেশ বাবু এলে তাঁর আহ্নার-মিত্রা থাকতো না। স্ত্রী ইন্দুপ্রভা দেবী বলতেন, তাঁর দেবর দুর্গাদাস বাবুকে—ঐ ছেলে ত তোমার দানাকে না মেরে ছাড়বে না। কে শোনে সে কথা! এলেই তাঁকে পড়াবেন। কখন কখন হেসে বলতেন—ও ছেলে এসে আমারও আলোচনা হয়। ভাই দুর্গাদাস বাবুকে নিষেধ করে বলে দিলেন—ওকে যেন কিছু বলা না হয়। ওর মত দিন ইচ্ছে পড়ে থাক।

কয়েক দিনই একটা ছোকরা এসে রামেন্দ্র বাবুর বাড়ীর পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। ইন্দুপ্রভা দেবী স্বামীকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে—ঐ দেখ, ঐ ছেলেরা আমার বাড়ীর পাশে কেবল ঘুরে ঘুরে আসে, তাকায় বিদেয় উপর। রামেন্দ্র বাবু একটু চেয়ে থেকে বললেন দ্বীকে—কয় তো আমাদেরকে বলতে পারো না, তাই বিদেয় দিকে চেয়ে থাকে। হ্যাঁ! তুমি কি না! ছুঁড়ি কি, তাদের দিকে চাইবে না?

একথা শুনেই ডাকলেন ছেলেটিকে। কী নাম তোমার? আমার নাম হজুর—ব্রজেননাথ ঘোষ। আমাদেরকে হজুর হজুর বলতে নাই। কী বলে ডাকবে তাহলে? কেন সার বলবে। এই দিকে ঘোরা-ফেরা করো, কী দরকার বলো? আমি সার একটু লেখাপড়া শিখি। কোন কাল ছুটতে পারচিনে। চাষের কাজও শিখিনি। এখন আমি অনাহারে আছি সার! একটা কাজের জন্তে সার আপনার কাছে ঘোরা-ফেরা করছি। আপনি অতি মহৎ লোক বলে। এই পর্যন্ত বলে সেই ছোকরা কীদমে লাগলো রামেন্দ্র বাবুর পায়ের উপর পড়ে।

অতীত দুখে রামেন্দ্র বাবু বললেন দ্বীকে, দেখ গো দেশের অবস্থা। আমার কাছে এসেছে খাবার সংস্থানে। আমি এক জন শিক্ষক দরিদ্র মল্লধ, আমার দ্বারা কী কাজ হবে? তবুও পা ছাড়তে চায় না। তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন—তুমি পা ছাড়া। তোমার একটা ব্যবস্থা করবে। তুমি এখন খাওয়া যাওয়া বাড়ীর ভিতরে।

ইন্দুপ্রভা তখন মুখিলে পড়লেন। একে কেনা চাল, তাতে কলকাতার মত জায়গা—হ্যাঁ! দিনের পর দিন যে ছেলেরা খেয়েই চলেছে, একটা ব্যবস্থা কর। তখন রামেন্দ্র বাবু বললেন দ্বীকে তুমি রাজার মেয়ে নও? একটা ছেলের খাওয়া দেখাও।

আমাদের বাবার বাড়ীতে যে নিজের জমির চাল। কথা শেষ না হয় স্বামী বললেন—এখানে যে আমার বন্ধু জল করা চাল। এই চাল খাওয়াতে হবে।

এক দিন কিছু খরচ দিয়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি আরও পড়গে। আর কিছু দিন পড়ার পর আবার তাঁকে এ বললো, আমার একটা চাকরীর যোগাড় দেখে দিন সার! তবু রবীন্দ্রনাথকে লিখে শিলাইদহে একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দিলেন।

পুজোর ছুটিতে রামেন্দ্রচন্দ্রের বাড়ী গিয়েছেন। এমন সময় ধ বাড়ী এসে ধরলো, আমার ছেলেপুলে নাই হজুর! কাপ চোপড় একেবারে নাই। পুজোর কদিন কেউ কাজ দেবেন আমি খাওয়া অভাবে মরে যাবো হজুর! এ স্বপ্ন ভাবের মত বিধি রামেন্দ্রচন্দ্রের কানে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো ঘনাকা! দেখি কী করতে পারি।

তখনই বেব হলেন রামেন্দ্র বাবু ভিক্ষার কুলি হাতে। আর কাপড় ও কয়েক মণ চাউল যোগাড় হলো। তখন তিনি বিতরণ ফণ্ড বলে জেমোতে একটা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এর কাজ ছিল পুজোর সময় কেউ যেন জেমো অঞ্চলে অনাহারে থাকে। কেউ যেন কাপড় না খাওয়া হয়। যত গরীবই হো না সে।

গরীব ছুখী ও বয়সে বড় হলে একটা সম্বন্ধ ধরে ডাকবে রামেন্দ্র বাবু। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, এ যে আমার মা-বাব শিক্ষা।

বাবুভূম জেলার মহম্মদ ইসমাইল বলে রামেন্দ্র বাবুর একজন ছাত্র লগুন কিডস সহরে অর্থের অভাবে খুবই বিপন্ন হয়ে রামেন্দ্র বাবু একখান চিঠি দিলেন। পত্র পেয়েই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন দ্বীর কাছ থেকে হাওলাত নিয়ে তিন শত টাকা পাঠালেন। টাকা পেয়ে মহম্মদ ইসমাইল রামেন্দ্রচন্দ্রেরকে যে পত্র দিয়েছিলো তার অনুলিপি দিলাম।

My Dear Gurudev !

With proper regards I acknowledge the receipt of kind aid of Rupees 300/- it has come to me in time of need. Had it been a week latter I would have been in most disgraceful condition I left unpaid, the cost of apparatus of other laboratory, expenses for the last session of the College closes next saturday altogether till the middle of September. It is needless to mention that I owe you life-long debt, you are good enough to say that I owe you no thanks, but it is beyond me to thank you sufficiently for the kindness shown to me. I shall then reverence you as my Guru of one who is like my own father. \* \* \*

I remain Sir,  
Your ever grateful pupil  
Sd/ M. Ismail.

কোন কাজের জন্য রামেন্দ্র বাবুর কাছে এলেনই হয়। তিনি ট দিয়েই আছেন। কেও যে সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করলেই—আমার দ্বারা যদি একটা লোকেরও উপকার হয়।

৪৫৫ জ্ঞানী লোক রামেন্দ্রবাবুর একটু যদি নিজের সম্বন্ধে ছে! কেও না ডাকলে খাওয়া-নাওয়া নাই। কেও করলে বলতেন—ক! তোমরা ত কেও বসো নাই স্থানের দ্বী ইন্দ্রপ্রভা বলতেন স্নেহের স্বরে—কে অত বড় মামুষকে ব বাব। তোমার কী প্রয়োজন থাকে না স্থান-স্থানের? তেন—এটা যে তোমাদের নিত্যকর্মের মত আমাকে নাওয়া-নাওয়া। সেই জন্তে এ ভাবনাটা তোমাদের উপর ছেড়ে রেখেছি।

না হয় তাই ছেড়ে দিলে। বাস্তা দেখে চল না কেন? কী তখনও তোমাকে ধরে নিয়ে যাবো? কত বার রাস্তার পা ব ল দেখি। কী হাসির কথা! সেদিন এক জন মহিলা ধ ধরে আনলে, দেখেছো কী তাকে?

নলেন বটে, আমি তাঁকে দেখিনি।—তুমি কী লক্ষণ, কখন ময়েছেলের মুখ দেখো না। হাসতে লাগলেন রামেন্দ্র বাবু। বলেন সেদিন পাশের বাড়ীর বন্ধুকে দেখতে চাইলাম তুমি মুখ াসলে। যখন তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দিলাম তোমার তখন জ্বলে। দেখলে কী তোমার মহত্ব গোড়া যেতো, না তোমার জ্ঞানতে পারতো, ঠিক করে বলতে হবে! তখন রামেন্দ্র হাসিতে ভরা মুখ, কথা নাট মুখে, এক দিন সকলে মিলে পরামর্শ

।—আজ আমার মধ্যম দালা এগেছেন ঠিক শুদ্ধ নিয়ে থিয়েটারে হলে। দালাব কথা কিছুতেই ফেলতে পারবো না। ভগিনীপতি নারায়ণ প্রস্তাব করতে গিয়েই শুনলেন—তুমি ছেলোমানের মত কলা না মধ্যম ভুলে! আমি যেতে পরবো না।—বাম বাবু। ও অনেক জ্ঞানের কথা আছে, তোমাকে দেখতে হবে, চল। আর না বাড়িয়ে হাসতে লাগলেন রামেন্দ্র বাবু।—তোমার ঐ হাসিকে মন করে বাম বাবু! তুমি না তসে একটু অধ্যমতি দাও। তখনও হাসি। তখন পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা স্ত্রী যাবে এসে চুকলেন। সব সাথে বললেন, তোমার কেবল ভয় ছাড়া দেখতে বলে। কপতে হবে না চল চল।

তখন মুখ খুললো রামেন্দ্র বাবুর, তুমি ঠিকই কথা বলেছো। ৪৫৬ ভয় আছে বলেই ত আমাদেরকে মানুষ হতে হয়।

যখন রামেন্দ্র বাবুর কন্ঠা মারা গেছে তখন তিনি সদর ঘরে স আকাশ-পাতাল কী ভাবছেন। ভাই দুর্গাদাস ঘুমিয়ে পড়েছেন, ঢাকা দিয়ে, তাঁরই পাশে। এমন সময় স্বরেন্দ্রনাথ বানার্জী স উপস্থিত। তিনি বললেন, তুমি নাকি খুব কাতর হয়েছো? ৪৫৭ যা যাওয়াতে? মুখ না তুলতেই হুঁচকি কাঁটা চোখের জল পেলো রামেন্দ্র বাবুর। সে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন স্বরেন্দ্র নাথ—শুয়ে রয়েছেন কে মুখ ঢাকা দিয়ে?

শুনেই বললেন, ও আমার ভাই দুর্গাদাস; না না ও আমার বা, আমার বন্ধু। আমাকে দেখতে না পেলে ও ভেবে আকুল হয়। ঠায়ে আমার চোখের জল পড়লো, ও ভাই আমার স্নেগে থাকলে ছিয়ে নিতো নিজের কাপড় দিয়ে। এই যে আমার কন্ঠা মরার ণ নিয়ে আমাকে কঁাদতে দেয় না! ও ভাই আমার স্নেগের ণ, এই অপটু দেখকে বহন করে নিয়ে চলেছে।

স্বরেন্দ্র বাবু থামিয়ে দিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। বুঝে গেলেন রামেন্দ্র বাবুর কী ধারা ভাবপ্রণয়!

রামেন্দ্র বাবুরা তিন ভাই। এক জন খুড়তুতো ভাই ছিলেন। কেও কোন দিন বুঝতে পারেনি নীলকমল বাবু রামেন্দ্র বাবুর নিজের সন্তোদর ভাই নন।

নতুন বাড়ীর পাশেই আছে ধর্মরাজতলা, সেখানে আনিয়েছেন নীলকমল বাবু শ্রীশ্রীসাধু-বাবাকে। তাঁর প্রধান আশ্রম মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণখণ্ড গ্রামে। এতো প্রবল তাঁর মাহাত্ম্য যে হাজার হাজার লোক তাঁর কাছে থাকতোই। নানা সহপদেপ স্তমতো। তাঁর এতো গুণ যে কয়েকটা জেলার লোক তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না।

তখন রামেন্দ্র বাবু বাড়ীতে আছেন। তাঁর কাছে স্থবী সঙ্জন আদার বিরাম নাই। তিনি তন্ময় হয়ে থাকেন নিজের অধ্যয়নে। কে বলবে তাঁকে নিজের তপস্বী ছেড়ে সাধু-মহাত্ম্যর কাছে যেতে? ভাই নীলকমলের খুব ইচ্ছা—দালা এক বার আসেন সাধু-বাবার কাছে। তা হলে আরও প্রকট হন জ্ঞানগম্ভীর সাধু-বাবা। নিজের মাহাত্ম্য ক'রে বলতে পারেন না। ধরলেন তাঁর বৌদিকে। ইন্দ্রপ্রভা দেবী বললেন—ভাই! তোমার দালা ত' সাধুদেরকে দেখতে পারেন না, কী বলবো ভাই!

এক বার দেখা করতেই হবে বৌদি! আপনাদের পায়ে ধ'রে বলছি। কী আর করেন। বড়বাবুকে ধরলেন তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রপ্রভা—গা গা শুনছো। সাধু-বাবা এসেছেন তোমাদের বাড়ীতে একরকম, তাঁর সাথে এখনও দেখা করোনি?

ওর জন্তে ত' আমার ভাই-ই রয়েছে। আবার আমি কেন?—তুমি গেলে ত' কোন অপরাধ হবে না। তুমিই যাও না একবার?

কেন—আমার ভাই কী তোমাকে ওকালতি দিয়েছে?

—যদি বলেই থাকে, এমন অজ্ঞাত কি করেছে?

—আমি যেতে রাজি আছি। তুমি যদি কয়েকটা কথার জগার দাও।

বল, আমি ঠিক বলবো।

আজ্ঞা সাধু-বাবা হাত দেখেন নাকি?

না।

উনি মাহুলী দেন কি না?

না।

তবে আমি যেতে রাজি আছি; নীলকমলকে খবর দাও। নীল বাবুর খুদী ধরে না সাবাদ পোয়ে। সাধু-বাবাকে বলে একটা সময় স্থির করা হলো। যথাসময়ে রামেন্দ্র বাবু এসে উপস্থিত হলেন। জেমো কান্দীর লোকে আসতে সেদিন বাকী ছিল না।

ধর্মতলার ঘরে চুকলে বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া কেও চুকতে পেলো না। রামেন্দ্র বাবু গিয়েই প্রণাম ক'রে প্রশ্ন ক'রলেন—বাবা! আপনি কী হাত দেখেন না?

ঈশ্বং তসে বললেন—দেখি বাবা! এ বিজ্ঞে আমি আয়ত্ত ক'রেছিলাম কি না।

—এ বিজ্ঞা কী আপনি সম্পূর্ণ আছে, বিশ্বাস করেন?

—শিখেছি মাত্র। ও-সব চর্চা করি নাই।

—আপনি কি পয়সা নেন লোক এলে?

—আমি নিজে টাকা-পয়সা ছুই না। কেও ইচ্ছা করে দিলে কিরিয়ে দিই না।

—কী করেন ?

—আশ্রম-খরচে ব্যয় হয়। সাধু-সম্প্রদায়ের সেবায় লেগে যায়।

—আপনি কি ওখুঁ দেন বাবা ?

—কবিরাজী অনেক দিন শিখেছিলাম, যদি কাজে লাগে আপনাদের। সেই জন্তু সেই মতে ব্যবস্থা দিয়া থাকি।

—এতে আপনার কী উপকার হয় ?

তখন হেসে বললেন সাধু-বাবা—আমি যে অন্ন গ্রহণ করছি আপনাদের। কিছু ত' সে-স্বর্ণ শোধ করা চাই।

রামেন্দ্রসুন্দর খুঁসি হয়ে বললেন—আপনি অকপটে সব বললেন, সেই জন্তু খুব আনন্দিত হলাম।

সাধুবা স্বির দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করলেন রামেন্দ্রসুন্দরকে—আপনি কী সাধু-মোহান্তর উপর তত সঙ্কট নন ?

—কে বললে আপনাকে ?

—কেন, আপনার অনেক লেখা থেকে দেখতে পাই, আপনি বলছেন যেন সাধুদেরকে পলাতক। নিজের বন্ধাট না ব'য়ে এই ধারা আনল করে।

হেসে রামেন্দ্র বাবু বললেন—বলেই যদি থাকি, তুল করেচি কি ? কিন্তু আমি বলি না রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে। তাঁদের এক শিষ্য ত' জগতের সামনে আমাদের ভারতকে তুলে ধরেছেন। এই আমি চাই, আপনাদের কাছে থেকে। যুমান ভারতকে জাগিয়ে তুলুন। যুগ্য জাতিভেদে প্রথা সমাজ থেকে মুছে ফেলে দিন। তা হলেই আমার ভারত আবার জেগে উঠবে। কৈ ! তা তো দেখতে পাই না ! প্রতি মুগে মুগে দেখে আসিচি, একজন মহাপুরুষ এসে সমাজের যে কয় জন মাথা তাঁদেরকে নির্ভীক করে চলে যাচ্ছেন। আপনারা নাকি বলেন—আপনাদের মধ্যে রাজনীতির গন্ধ নাই। সমাজ যে আপনাদের কাছে থেকেই শিগতে চান। এক দিন আসবে, সে দিনের আর বিলম্ব নাই, আপনাদের ভিতর হ'তে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে, তিনি আমার পরাধীন ভারতকে মুক্ত করবেন।

স্বির চোখে ব'সে ব'সে শুনলেন রামেন্দ্র বাবুর কথা।

কথা উঠলেই বলতেন এমন তেজস্বী প্রাণ আমি এদেশে কাউকে দেখিনি। রামেন্দ্র বাবু একজন মহা তপস্বী।

বি, এ, পাশ করে এসেই রামেন্দ্রসুন্দর পিতামহের সব পুরাতন পুস্তক বার করে পড়তে লাগলেন।

চ' মাস অধ্যয়ন করে বুঝলেন, কী এতো দিন পড়লাম। আমাদের ঘরের বস্ত্র পড়ে থাকতে এতো দিন সূঁচো কাচের কাববার করেই জীবন শেষ করতে চলেছি ! এই মনে হতেই একটা থিকার এলো মনে। তখন থেকেই বেদের দিকে দৃষ্টি পড়লো।

একটু বুঝে নেবেন বেদ, এমন পণ্ডিত নাই দেশে। ত নিজ থেকে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হরপ্রসাদ শ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলে মনের মত উত্তর পান না। নি মনের কাছে ডেকে ডেকে প্রশ্ন করেন—আমাকে শিখিয়ে দেব ! তোমার দিকে চেয়ে আছি ; তোমার আশীর্বাদ প্রা করি দেব ! তুমি কৃপা করো।

হয়তো কোন পিতৃপুরুষ কৃপা করে থাকবেন। তিনি ভাল ভ বেদ জেনে তখন লিখতে আরম্ভ করলেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

একদিন জাপানের এক পণ্ডিত এসে ভারতের সকল পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করেন—কার কাছে গেলে ভারতের আদি শিক্ষা আ করতে পারবো ? সকলেই একবাক্যে বলেন—সে পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর। তখন এলেন রামেন্দ্র বাবুর কাছে। এসেই অল্প পণ্ডিত বলার সাথে তাঁর সব মিলে গেল। দেখলেন এক জন জ্ঞানগুণ সমাপ্রকৃষ্ট এক স্বয়ংকে।

কিমুরা সাহেব বললেন—আমি বেদবিজ্ঞা শিক্ষা করতে চাই।

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—আমি নিজেই জানি না আপনার শেখাব কি ? কিছু দিন পর কিমুরা সাহেব এসে বসে রয়েছে রামেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করলেন—কী চাই সাহেব ? শিখ হেসে কি সাহেব বললেন—কিছু না, আপনাকে দেখতে এসেছি। এখানব লোকের মন খারাপ হ'লে হিমালয় যায় দেখতে, তাই আমার আসো আপনার কী অস্থগ হয়েছিল ? কিছু দিন দেখিনি।

—না হ'লে আট-ন মাস আমার না আসা হয় ?

রামেন্দ্র বাবু বললেন—এবার আমি বেদ একটু একটু বুঝেচি। তো আপনাকে বোঝাতে পারবো।

সেই আরম্ভ হ'লো বেদ পড়ান। শিষ্যের সাথে গুরুর আলোচন দিন নাই রাতি নাই, আলোচনার আর বিরাম নাই। কী ন আশ্বাসন বলার নাই।

কিমুরা বলে গেছেন—আমি ভারতের স্বয়ং সন্ধান করেই সাহেব একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর গুরুকে—আপনার এ রাগ কেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞার উপর ?

ভুল বুঝে তাহলে। বিজ্ঞার উপর আমার রাগ হতেই পারে না তবে আমার দেশের শিক্ষা ওদের চেয়ে ঢের ভাল। এ বলাতে বা বুঝবেন না। আমার মত হাজার রামেন্দ্রসুন্দর হাজার হাজার বছর পরমাত্ম নিয়ে এসে এ দেশের বিজ্ঞার কথা মাত্র শেষ কর পারবে না। এ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। ভেবে পাই ন কী পণ্ডিত ছিলেন এ মুনি-স্ববিগণ !

মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তখন চোখে জ রামেন্দ্র বাবুর। বললেন—ওরা বলুক না কেন, ওদের জ্ঞানের সী নাই। আমি মাথা পেতে শুনবো। কিন্তু তুলনা করে এটা ই বলে বর্ণনা করতে গেলে শুনবো না। [ ক্রমশঃ ]

“সমাজের মনোবর্তন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাঙ্গলা দেশে আজ হ্রলভ নয়। কাব্যের কুমুদিনি, বিজ্ঞানের চুম্বিকাণ্ডি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের স্নাকডাউর পুতুল, নীতির টিনের ভেলু এক ধর্মের জয়চাক—এই সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।”

—প্রথম চৌধুরী

ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেক্সোনা  
ব্যবহারে ফুটে উঠবে

রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল  
অর্থাৎ স্বকের স্বাস্থ্যের জন্যে  
তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা  
আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে  
বিকশিত করে তুলবে।

Rexona  
BLENDED WITH CADYL

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান  
রেক্সোনা প্রোপাইটাইল লিঃ এর পক্ষে ভারতে প্রাপ্ত



## স্মারেন্‌টাইন্

মোপাসাঁ

মেয়েদের সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। কাশণ, ভেলেন্সের মতো আলোচনার এ ছড়া আর কি বিষয় থাকতে পারে? আমদের মধ্যে এক জন বলল: পাঁচাও, এসম্পর্কে একটা অদ্ভুত ঘটনা আমার মনে পড়ছে। এই কলে সে তার কাহিনী শুরু করল:

এক এক সময় এক বকমের করুণ রাস্তা এসে মেঠ-মনকে ভাষণ ভাবে আক্রমণ করে। গভীরতরুর ঝিলের এক সন্ধ্যাবেলার বাড়ীতে চূপচাপ বসে আছি,—ঐ বকমের একটা অবসরভা এলে আমার চোখে ধরল। মনে হ'ল—ঐ নিরকরণ রাস্তায় হাতে আত্মসমর্পণ করে এখানে বসে থাকলে, আমি হতত আত্মহত্যা করে বসব।

কোটটাকে গায়ে চাপিয়ে উদ্বেগজনক অবস্থার তাই বেরিয়ে পড়লাম। বুলভারে নেমে এসে হঠাৎ শুরু করলাম কাফেগুলোর পাশ দিয়ে। তখন বুড়ি শুরু হয়েছে; তখন মুঘলধারে অবস্থান নয় যে, পঞ্চাভারী একেবারে হস্তদস্ত হয়ে আশে-পাশে আশ্রয় নেবে। ঝুঁড়ি-ঝুঁড়ি বুড়ি অবিস্মৃত ভাবে নেমে এসে জামা-কাপড়ের উপর ঢকঢক করে কোটার জমে ভিকিরে দিচ্ছিল। ঐ বিবস্ত্রের দাবায় পোষাকের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যেন আত্ম হয়ে আসে। কাফেগুলোর জনসমাগম তখন নেই বললেই হয়।

এ সময়ে কি করা যায়, ঠিক করতে পাচ্ছিলাম না। কয়েক ঘটা কাটাবার মত একটা আরগার খোজে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এলাম। এই প্রথম অবস্থার করলাম—সে-সন্ধ্যায় সময় কাটাবার মত কোন জায়গা সারা প্যারীতে নেই। শেষে ঠিক করলাম—রূপোপজীবিনীদের ভিড়ের সন্ধ্যে যে থিয়েটারটার নাম আছে, সমরটা ওখানে কাটতে আসব।

অন্ত বড় থিয়েটার-হলে দর্শক খুব অল্পই। চপন, বশন, চলদাড়ির হাঁট, টুপি, রঙ—এ সব দেখে ঐ সব দর্শকদের শ্রমী নির্ধারণ করতে বিশেষ কষ্ট হয় না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মায়া প্রায় একটাও চোখে পড়ে না ওদের মধ্যে। আর, মেয়েগুলো জানাই ত, সেই একই বকমের—সাদাশিঙে, ভেঙে-পড়া মুখে-আসা;—চলার ভঙ্গীটা স্তম্ভ আর কেন জানি না, একটা নিম্মল ঘৃণা ওদের

অবসর মৃতিগুলোকে দেখছিলাম,—মৃগণ, নাতিহুল। যেটা সোটা শরীরের সঙ্গে শীর্ণ চেহারাও চোখে পড়ে; পঞ্চাভারী ভাঁড়ামি সর্বাসে, পাঁচাগুলো লম্বা-লম্বা, বাঁকা। মনে হচ্ছিল—চড়া দাম লৈকে শেষ অবস্থায় সস্তার ওরা বিক্রয়, সেটুকু পাত্তা বোগা ওদের একটারও নয়।

হঠাৎ, ওদেরই মধ্যে একটা ভয়গোছের একটা চোটা চোখে চোখে পড়ল। মেয়েটির বরস অল্প নয়, তবে চেহারাটা সহ্য খাপছাড়া, উগ্র। তাকে খামিয়ে, কিছু চিন্তা না করে পাশবলসীতে হারের জন্য দর ঠিক করে ফেললাম। কে-একা ঘরে ফিরে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না; তাই ঐ স্তম্ভের মেয়েটির সন্ধ্যা বেছে নিলাম।

মেয়েটিকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। ওর অস্থির ছিল মাটিরপট্টের একটা মন্ত বড় বাড়ীতে। সিঁড়িতে গিয়ে আলো তখন নিবে এসেছে। দিয়ারলাই-এর কাঠির আসনে ঠোঁট খেতে খেতে অবাচ্ছা মনে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মেয়ে অনুসরণ করছিল। সামনে থেকে তার পোষাকের স্পন্দন কানে আসছিল।

পাঁচতলার এসে মেয়েটি থামল। ভিতরের দরজাটা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কি কাল অর্ধি থাকতে চাও?

নিশ্চয়ই; সেট বকমই ত কথাবার্তা হয়েছিল।

না, কিছু মনে কর না, আমি এমন জানতে চাইলাম একটা পাঁচাও, আমি একুশি আসছি।

আমাকে অনুসরণে পাঁচ কবিরে যেন মেয়েটি কথাবার্তা করে গেল। তাঁটা দরজা বন্ধ করার পরে কানে এল—মতল্যে কার সঙ্গে যেন সে কথা বলছে। আমি একটা বিমিত্র হয়ে হয়ে পড়লাম। ভাবলাম—ভয় দেখিয়ে ঢাকা অশ্রুতায় আসে আছে না কি মেয়েটি? মুঠো আর পৌঁছোলে আমার পেন্সন ছিল। মনে মনে বললাম—যেখা যাক কি হয়।

কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটা যেন খুব সত্যক হয়ে নেড়ে-চেড়ে বেড়াচ্ছে। তার পর, তার এক দরজা খোলার শব্দ হল। মনে হ'ল, তখনও কিছু কথাবার্তা আসছে; তবে গলাব স্বরটা খুব নীচু।

মেয়েটি ফিরে এল; হাতে একটা অলস বাতি। বর বলল—এবার তুমি ভিতরে আসতে পার।

আত্মীয়তার সুরে বেশ আশ্চর্য হয়েই সে কথাগুলো শুনলাম। ভিতরে ঢুক পড়লাম। একটা খাবার ঘর পেয়েই হঠাৎ কামরায় পৌঁছলাম। খাবার ঘরটা দেখতে বোকা যায়, ওখানে পাঁচ দাওয়া কোন কালেই হয় না। যে ঘরে প্রবেশ করলাম ঐ-এরকম মেয়েদের সচরাচর যে-এরকম ঘর হয়ে থাকে। গোছেরই। আসবাবপত্র আছে কিছু, পর্দাগুলো সব লাল। মনে মনে তোমক পাতা—ওপরে সন্দেহজনক কতকগুলো লাল লাগ।

মেয়েটি আমার সহক হয়ে বসতে অনুবোধ করল।

সন্ধ্যার চোখে ঘরটাকে আমি পৃথিব্যকণ করছিলাম। সন্দেহ হবার মত কিছু চোখে পড়ছিল না। মেয়েটি খুব পোষাক খুলে ফেলল। আমি ওভারকোটটা খোলার আগেই সে বিছানায় ঢুক পড়েছে। তার পর সে হাসতে হাসতে

না, তোমার আবার কি হল? এমন স্তম্ভিত হয়ে গেলে কেন? এস, দাঁড়াব না।

মেরুর দেখানেনি ওর পাশে বিছানার স্তরে পড়লাম। মিনি পাচেক পরেই কেমন একটা বোকামি মাথার চাপল; মনে হল—পাচেক পরে এখনি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু ফেরবার বাড়ির সেই ভয়ঙ্কর অবসন্নতা আবার আমার চেপে ধরল। নড়াচড়া সব শক্তি যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি। নিলাকরণ করে বিবক্তি সম্বন্ধে ঐ পাঁচ জনের ব্যবহার করা বিছানার সব চূপচাপ স্তরে বসেলাম। খিঁচটাব-হলেব আলোতে যেমনের উদ্ভেক হয়েছিল, সেটা যেন হঠাৎ আমার মধ্যে থেকে উঠে গেল। বেরলাম, গায়ে-গায়ে স্তরে আছি। আর পাঁচটাবই মত হল মনুষ্যত্বের মেয়ের শব্দ। তার উদারীন অভ্যন্তর চুপচাপ অতৃপ্ত ভাবে বিশি বিবাহ।

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম: এখানে তুমি কত দিন হ'ল?

এই পনেরই সাতমুয়ানীতে ছ'মাস হবে।

এর আগে তুমি কোথায় ছিলে?

কোন্ টাউ। কিন্তু লাবওয়ানটা এমন পিছনে লাগল যে ওখান থেকে আসতে ব্যাধি হ'ল। এই বলে, তাকে নিয়ে বকুটি কি লগাট করেছিল, তার একটা মন্ত কাহিনী কেসে বসল মেয়েটা। হঠাৎ করেই কি যেন একটা মনোহর ভাবে পেল। প্রথমে মনে হল যেন নিশ্বাস চেপে ধরে, তার পর আস্তে একটা শব্দ হল। কিন্তু পরিষ্কার কানে এসে—কউ যেন চেয়ার থেকে পড়ে গেল।

হতভাগি বিছানার উপর উঠে বসে মেয়েটিকে কোব গলায় দাঁত বসলাম: ও কিসের শব্দ?

শব্দ, অস্বাভাবিক গলায় মেয়েটা বলল—মিছেমিছি তুমি উদ্ভ্রষ্ট শব্দ। আসতে আমার প্রতিবেশিনীর ঘর থেকে। তুমি নিবিধানে ময়লা পিন্দু-বোতের বাস্ন নিয়ে পাতলা মেঝেতে বসেছ। তাই ও-ঘরে শব্দ হ'লে মনে হয় যেন এ-ঘরেতেই এসেছে।

সিসেমিটা এমন জোর করে চেপে ধরল যে, বিছানার মধ্যে হুঁক পড়লাম। কথাবার্তা আবার শুরু হল। এই লাব সম্পর্কে স্বভাবতই একটা কৌতূহল হয়। কবে যে তারা হোয়াস করেছিল এই পাথে নেমে আসতে! হয়ত, ওদের উপর উপর থেকে পদ্মটাকে সবাত পালসে অকলঙ্কর ফিট করে পড়তেও পারে। হয়ত, নিতান্ত সরলতায় বিগত সঙ্কটের ইতিহাস যখন ওরা দ্রুত বলে চলে, তখন ওদের মধ্যেও হঠাৎ মত কিছু চোখে পড়ে যেতেও পারে। এই কৌতূহলব মেয়েটিকে তার প্রথম প্রেমিকের কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

মি জানতাম—সে মিথো বলবে। তাতেই বা কি আসে যায়! মিথোও কিছু মন্থশীল সত্য ঘটনাও ত' আবিষ্কার পাবি!

মিটক বললাম—কই, বললে না তোমার প্রথম প্রেমিক

তাই না কি? বলা, তার পর কি হ'ল? তুমি তখন থাকতে কোথায়?

আজ্ঞে তব-এ।

সেখানে কি করতে?

একটা বেস্টারীর কি-সিগি করতাম।

ফেস ওয়াটার সেলস-এ; ডেন না কি তুমি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি বই কি; সেই বোনাকীরের বেস্টারী? ত?

হ্যাঁ, ঠিক পরেই।

তা ঐ শিডিমাখিটা তার কাজ গোছাল কি করে?

ওর বিছানা পেতে দাঁড়িলাম, এমন সময় আমার উপর ভরবন্তি করলে।

হঠাৎ আমার এক বন্ধুর জানা-জনা এক ডাক্তারের কথা মনে পড়ল। ভুলসোকেব দুইতে প্রার্থনা ছিল, আর মেজাজটা ছিল দাশনিকের। কাজ করতেন একটা বড় হাসপাতালে। কুমারী মাসেব, আর লাববিনিতানের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে ছিল সৈনিন্দ। ভবনের, পরদা ওয়াস পুরুষগুলোর হাতে হতভাগ্য মেয়েগুলো কেমন করে কদম্ব শিকার হয়ে ঘরা পড়ত,—সে কাহিনী তিনি ভাল করেই জানতেন।

সব ক্ষেত্রেই দেখছি, ডাক্তার বলতেন, সমগোত্রীর পুরুষের হাতেই মেয়েদের বিপদ ঘটেছে। এ-সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বড় কম নয়। নিবপরাধীক লেহনুই করার অভিবাসে সব সম্বরই বোনদের অভিবৃত্ত করা হয়ে থাকে।

এটা কিন্তু সত্য নয়। পুণ্য আতরণ করার প্রবৃত্তি বনৌদ্গপতি। আছে সন্দেহ নেই, তবে সে অনাস্বাদ পুণ্য নয়।

আমার সঙ্গিনীর দিকে তাকাল। হাসতে হাসতে বললাম—বুঝতেই পারছি, তোমার কাহিনী আমার সবই জানা। তুমি ভাঁজা, শিডিমাখিটা মোটেই তোমার প্রথম প্রেমিক নয়।

না, না, আমি সত্যি বলছি, শপথ করে বলছি।

তোমার কথা সব মিথো।

তুমি বিশ্বাস করছ না; কিন্তু আমি শপথ করছি, আমি সত্যি বলছি।

না, তোমার মিথো কথা বাধ; সত্যি ঘটনাটা কি আমার বলবে?

মেয়েটা যেন একটা বিধাগ্রস্ত, বিমিত হয়ে পড়ল। আমি আবার শুরু করলাম—শোন তে, আমি এক জন যাত্রকর; সম্বোধন বিজ্ঞতাও আমার জানা আছে। সত্যিটা লুকোবার চেষ্টা করলে, তোমায় এখনি ঘুম পাড়িয়ে ফেলব; তার পর, আসল সত্যিটা সহজেই বেবিয়ে আসবে।

ও-জাতের মেয়েবা যেমন হয়ে থাকে,—মেয়েটা জীত, বিমূত হয়ে পড়ল। তার পর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় বলল—তুমি কি করে সব বুঝতে পারলে?

উত্তরে বললাম—এবার তোমার সত্যি কথাটা শুরু কর।

আবার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইছ? সেটা তেমন কিছুই নয়। গায়েতে সে বাব কি একটা উৎসব ছিল। আলেকজান্ডার নাম এক গানসামা এসেছিল। এসেই কোন্টী সঙ্গীত শুনল।







টেক টেক  
নট টেক নট টেক...



কোলকাতার নিউ মার্কেট, যাকে পুরোনো আমলের লোকেরা হগ সাহেবের বাজার বলেন, একটি অতি আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠান। কথায় বলে কোলকাতা মহার পয়সা ফেললে মাঝরাতেও বায়ের হুধ পাওয়া যায়। নিউ মার্কেটের দোকান বাজার, আর হরেক রকমের মাল দেখে কথাটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দোকান পাট ছাড়াও নিউ মার্কেটে প্রচুর জিনিষ আছে, যথা নানারকম দোকানী ও খদ্দের ধরবার জন্ত তাদের অভিনব উপায় অবলম্বন। শোনা যায় সাহেব, ও বিশেষ করে মেম সাহেব দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখলেই কোন কোন দোকানী নিজেকে একত্রে ইংরাজী ভাষাভাষী ও বিনয়ী দোকানদার প্রতিপন্ন করার জন্ত হাত নেড়ে বলেন “টেক তো টেক, নট টেক নট টেক, একবার তো সি” অর্থাৎ জিনিষ কিছুন বা না কিছুন, দোকানে এসে একবার দেখে তো যান! দোকানীর এই অভিনব আবেদনে বহু বোড়াল খদ্দেরও নাকি ঘায়েল হয়েছে বলে শোনা যায়। মাত্র এক মিনিটের জন্তে দোকানে গিয়ে শেষে ঘটনাক্রমে পথে হরেক রকম মালপত্র কিনে খদ্দেরকে বেরুতে দেখা গেছে।

আবার খদ্দেরও নানারকম। কেউ কেউ পুরনো ধরনের ও পুরনো প্যাটার্নের জিনিষ পছন্দ করেন। আজকালকার বাজারে নিত্যই নতুন জিনিষ আবিষ্কার ও চালু হচ্ছে কিন্তু এরা সেই যে পুরনো জিনিষ আঁকড়ে বসে আছেন তো আছেনই তার আর কোন নড়চড় নেই। আর এক ধরনের খদ্দের আছেন ঠাণ্ডা নতুন ধরনের জিনিষ দেখলেই তাকিয়ে যাচাই করে দেখেন। যে কোন সমাজের পক্ষে এ ধরনের লোক বিশেষ দরকার কারণ এরা না থাকলে প্রগতি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নতুনদের স্বাদ চল যাবে। সব নতুন জিনিষই যে ভাল হতে হবে তা বলাই না। আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে জিনিষ ভাল না হলে বাজারে তা টিকতেও পারে না কারণ খদ্দের

বিজ্ঞাপন দেখে বা নতুন জিনিষ বলে একবার কিনে পর করেই বুঝবে এক ভাল না হলে দ্বিতীয়বার আর কিনবে না আজকের এই দ্রুত বৈজ্ঞানিক যুগে ভালো নতুন জিনিষ আমাদের সংসারে যোজ্জই প্রায় আসছে এক স্বায়ী হ যাচ্ছে। ধরুন পেনিসিলিন কদিনই বা বেরিয়েছে কিন্তু আ বরে বরে ডাক্তাররা ব্যবহার করছেন। ইংরিজীতে এ বলা হয় ওয়াটার ড্রাগ বা অত্যাস্চর্য্য ঔষধ। বিশ বয় আগে কখনের বরে নাইলনের জামাকাপড়, প্লাষ্টিকের জিনিষ ছিল? অথচ আজ এ সব জিনিষ কত হাজার হাজার পরিবারে পেরেছে। তেমনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বনস্পতি বনস্পতি, বিশেষ করে ডালডা বনস্পতি আজ দেশের ল পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে তার প্রধান কারণ ডাল বনস্পতি ভালো জিনিষ।

বনস্পতির গুণাগুণ সবন্ধে সরকারী গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন ডালডা বনস্পতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিনা একথা অনেকে প্রশ্ন করেন। এর উত্তর হচ্ছে ডালডা বনস্পতি ভালো হলে আজ ঘরে ঘরে তার এতো আদর হোতনা। অতি উত্তম জিনিষ, কিন্তু আজকাল ঠাট্টা বি সাধারণ লোকে দামে কিনতে পারে, সে দামে সবসময় পাওয়া মুক্তি তাই রোজকার জন্ত নিশ্চিত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। জানেন কি ডালডার প্রতি আউন্সে ১০০ আণ্ডার্লিং ইউনিট ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়, যা ভিটামিন সমান? ডালডা স্বাস্থ্যের জন্তে তাই এতো ভালো ডালডা শুধুমাত্র ঠাট্টা ভেবজ তেল থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপ তৈরী হয়। ডালডা সর্বদাই শীল করা ডবল চাকনা ওলা টি পাওয়া যায়। ডালডায় সব রাসায়নিক মুদ্রারোচক হয়। নিশ্চিত মনে ডালডা বনস্পতি কিছুন—জানেন তো ডালডা শুধু খেজুর গাছ মার্কা টিনে পাওয়া যায়—সর্বদা দেখে কিনবে



आचार्यजी आचार्यजी विद्यालय कक्षायां अक्षरां विद्या

স। সে দার্শনিক ছিল বলে এই স্বর্গীয় চিরকট বৃষতে পায়ল।  
দ্যাপারটি তার দেহভাঙের নির্দেশ বলে সে হয়ে কলল এক তার  
এ সংকট বর্ষল না যে প্রেমের দেহতা এরা-র ইচ্ছাভেট গোলাপ  
উঠতে।

গোটা ষোলোস্তিকা! সে নিষেধ মনে বলতে লাগল, এখন  
চায় মাত্র—জানানো শুধু এক ভালোবাসার সময়ের তত্ত্ব অস্তিত্ব।  
সে গোলাপ পাড় তার সমাদি থেকে উঠেছিল তা বেন  
পাশ্চিকার হয়ে আমাদের কাছে বলতে : হারা বেঁচে আছে তারা  
[বাসো]। সময় থাকতে জীবনের আনন্দকে উপভোগ করবার  
এই কান্ডিনী আমাদের শিক্ষা নেয়।

সবল পৌরলিক বাপারটা এই বকম মনে করল। এই বিষয়ে

সে একটা শোকের কবিতা লিখেছিল আমি তা 'তাবাক'র সাধার  
পার্মিগারে একাংশ শতাব্দীর বাইবেলের মলাটের পের চর্মাং পে  
যাট। তালিকার লেখা ছিল—মিসেস সাল-সফরন—এফ, এ  
১৪৩১, ১৭১ বি। পশ্চিম লোকদের যে মুসাবান পাতটি এত দি  
নজরে পড়েন তাতে কম পক্ষে চুসাকীটি শক্তি পরিচ  
মেরোভিন্সিয়ান হককে লেখা ছিল—তারিখটা সম্ভবত ছিল সহ  
শতাব্দীর। কবিতাটির শুরু এই ভাবে—

এখন কবিচ শোক, চাঞ্চি ফিরিয়া প্রত্যাখ্যান করেছিলে যা-  
এক শেষে এই ভাবে—'প্রহাণলির বিধানময় গানের মোরা জ  
বুনি।' পাঠোদ্ধার করার পরই সম্পূর্ণ কবিতাটি আমি নিশ্চ  
প্রকাশ করব।

অমুবাদক—শ্রীশ্রীবীরকান্ত গু

## রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

একটি দোকানের মংস্তাধার

পশ্চিমের বাজা বোস চোখ বাক্সে পথচারীকে  
বর গ্রীষ্মের শব্দ-কাজিকে।  
চলবে-চলবে চমক উঠলুম পায়ের দোকানের দিকে তাকিয়ে—  
চোখে কেনে এস এক সমুদ্রের স্বপ্ন—চিরা-স্বপ্ন—  
হু-হাত কাচের বাসে বসিনী লাবণ্যের সুনীল প্রতিমা।  
( বিচির কি বিচির এম।  
সমুদ্রকে বল করেছে বস-মির এও কো। )

দোকানের সামনে কুশল পুরানো পলী  
এক শব্দ ছিল দিয়ে গেল পাড়ের পড়ন্ত বৌট—  
হু-হাত কাচের আধার মাড়ের গায়ের—  
পুঙ্খক হাল কাল পাখারের ঠান্ডা দেয়  
সোনাল ময়লা তার বাক্সে হু-হাতের সমুদ্র  
হালে হু-হাতের ক্রবাল-হু-হাতের মলাট দিয়ে—  
চিটু আর নীচুত একলা-মেলো পথ-পাথে  
বাসের আগের বকিন গাছের আল-গালি দেয়—  
চিকচিকিয়ে উঠে যাদের গায়ের সোনা,  
পাখারের লাল আর বাক্সের চোখের মৌল।  
( বিচির কি বিচির।  
সমুদ্রকে বাঁধল শেষে বস এক মিত্র। )  
গ্রীষ্মের প্রচণ্ড অপবাস্যের বৌট  
হঠাৎ পড়ল মেঘের ছায়া—

যে উত্তরে কলের চিমনির ধোঁয়ার সঙ্গে গা মিলিয়ে  
উঠল কালো মেঘের ধোঁয়া—  
লিকলিকিয়ে উঠল বিদ্যুতের আগুন।

জনের প্রচণ্ড তাপে আকাশখানা কেট গেল বজ্রের গর্জনে।

( বিচির কি বিচির হায়।

কবু এবং মিত্র শেষে অগস্ত্য হার মানিয়ে যায়। )

শশনে হাওয়া বসে গেল ছুরির মতন তীক্ষ্ণ  
ছড়িয়ে গেল গড়ির গেল উম্মানের মতন  
বিকট আবারে—  
তার পর নামল বৃষ্টি—শিলাবৃষ্টি।  
বিদ্যুতের আগুন পুড়ে বাঙালি আকাশের বণ্ড বণ্ড অধিকণা  
সে প্রচণ্ড অতর্কিত স্বপ্নের আক্রমণ থেকে বলা পেতে  
উঠলুম দোকানের সিঁড়িতে সেট পুরানো পলীর পিছনে,  
বেখানে হু-হাত সমুদ্রের মাথা ঘুরে বেড়াচ্ছে  
লাল-পুঙ্খের অগ্নিগাটের শব্দে হু-হাতের মংস্ত-করা—প্রবাল-বীণে  
কুন্ড কুন্ড তকগুয়ের স্বির অন্তরালে—অবিচলিত।  
( বিচির কি বিচির।  
সমুদ্রকে বল হাড় বস এক মিত্র। )

কড় উঠবে না কোনো দিন—কোনো দিন হু-হাতের ঐ সমুদ্রে  
উৎসল হবে না তার হু-হাত মেঘের গর্জনে,  
চাঁদ তারার দেশ থেকে নিশাসিত ঐ সমুদ্রের আকাশে  
ভ্যোংস্তার আলোর মতন বৃষ্টি আব জোবের আলোর মতন বাজা।  
সেই স্বপ্নময় আলোর তলে

গুবে বেড়াবে মাছেরা তাদের পাখনার ভব দিয়ে  
নিদ্রাহারা নিশীথের তবলিত চাকলা  
বসিন হু-হাতের প্রবাল-গুহার অন্তরালে  
কুন্ড লতা-পাতার অলিগলির পথ-পথে বাহার দিয়ে  
আর জীবনের সকল বিকোলের আলায় কুন্ড হাওয়া

সহরে মাহুদের পুড়ে হাওয়া মন—  
ঐ স্বির সমুদ্রের নীলাত স্বপ্নের শৈত্য—কুড়িয়ে হারে

হঠাৎ এক আগুন-অগ্নি গ্রীষ্মের কড়-গু-অপবাস্যে।



### ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পার্কের বেঞ্চিটায় বসবার মতলবে সজ্জিত এগিয়ে এলো। ক্লান্ত ছুপু। বাদের কাজ নেই তারা শুয়ে, বসে, গড়িয়ে সময় কাটিচ্ছে। সজ্জিতের কাজ নেই, কিন্তু 'গড়িয়ে বেড়াবার সময় কোথায় তার ?

এত দুপুরও সমস্ত বেঞ্চিতে মানুষ! কেউ ঠা করে ঘুমুচ্ছে অকাতরে। কেউ বসে বসেই চোখ বুজে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে। কেউ আধ-শোয়া অবস্থায় তেলান দিয়ে অতীতকে মনে মনে রোমন্থন করে চলেছে।

না, কোথাও বসার উপায় নেই! বিশ্রামের আশায় তার মত আরও এত লোক আসবে এই ছোট পার্কটায়, সজ্জিত ভাবতে পারেনি।

পার্কটার চার দিক ঘুরে অবশেষে স্টেশন কোণের বেঞ্চিটায় চোখ পড়ল। আধখানা বেঞ্চি খালি। বাকি জায়গাটা এমন এক জনের দখলে যাকে এ সময় এখানে সে কল্পনা করতে পারেনি। এরও কি বিশ্রামের জায়গা মেলেনি কোথাও? তারই মত গৃহহীন, লম্বাছাডার দলের তো নয় সে।

যাক, ভাববার প্রয়োজন নেই, এগিয়ে গেলো বেঞ্চির কাছে সজ্জিত। দূরে বিলিতি নাম-না-জানা গাছটার দিকে একদুটো তাকিয়ে ছিল সে। কাছে যেতেই উদাস দৃষ্টিতে এক বার তাকিয়ে দেখলো সজ্জিতকে। তার পর যেমন দূরে তাকিয়ে ছিলো তেমনিই দূরে তাকিয়ে রইলো।

এক বার একটু ইতস্তত করে বেঞ্চিটার এক কোণে বসে পড়ল সে। বসবার সময় আড়াচোখে এক বার তাকালো বেঞ্চিটার শেষ প্রান্তে। না, কোন সাদা নেই। এক জন পুরুষ যাকে সে কোন দিন দেখেওনি, সে পাশে বসলেও সাদা নেই মেয়েটির। সজ্জিতকে সে বোধ হয় আমল দিতেই চায় না।

তা না দিক। সজ্জিত বসলো জুত কোরে। মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণের জগ্ন নড়ে-চড়ে বসলো। শব্দ করলো কাশির ছলে। হিল-কয়ে-বাওয়া চটটাকে বেঞ্চিটার লোহার পায়ায় ঘষে শব্দ করলো।

—কিছু বলবেন? মেয়েটা সজ্জিতের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন

সজ্জিত হঠাৎ মেয়েটার প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেল। একটু কঁপে উঠল। এ বকম হবে, সে আশাও করেনি।

—মুনাতো! অতি কষ্টে জবাব দিলো। যেন স্বর বার হতে চাইছে না। কে গলাটা টিপে ধরছে তার—তবে শব্দ করছিলেন এমনি? এবারে যেন মুখোমুখি ঘুরে বসলো।

কোন বকমে ঢৌক গিলে জবাব দিলো—হাঁ।

সজ্জিতের মুখের চেহারা দেখে মেয়েটি হেসে ফেল সজ্জিত আরও লজ্জায় পড়ল। মাথাটা হেঁট করে বসে অরু করল।

—দেখুন, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। এটাই হুঁজনে পাশাপাশি বসে আছি। হুঁজনে গল্প ব সমস্তাগুলো তুলে ধরতে পারি পরস্পরের স্তম্ভে। আপনিস্ট বলুন!

—সমস্তা! কথাটা বলে এতক্ষণে সজ্জিত মেয়েটি সহজ ভাবে চেয়ে দেখলো। সাধারণ আর দশটা মেয়ের ওটা তার কথাতে সে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু মুখে তার বৃদ্ধির ও চিন্তার ছাপ কিছু বোকা যায়নি তো! চোখে কোন শাণিত দীপ্তিও তো দেখা যায় না! চাহনি বরং। মুখে ক্লাস্তির কালিনা। যেন অনেক সর্বল কচি মুখটিকে বার বার আগাত করে অকালে চেয়েছে।

সজ্জিত চুপ করে থাকায় মেয়েটা আবার বলতে আপনাব জীবনে? সম্ভাভেব কি আছে বলুন? নেই এই তো? আলাপ-পরিচয় হতে কতক্ষণ লাগে

সজ্জিত এর পরও বোকাম মত তাকিয়েই রইলো অনেক পড়েছে। উপস্থানটির নায়িকাও প্রথম সাজ কথা বলতে পারে না। অতি আধুনিক নায়িকাও দারুণ সমস্তায় পড়েছি। মেয়েটিই আবার কথা বলবে এবারে সহজ হোয়ে এলো সজ্জিত। মেয়েটা নাটকীয় ভাবে কথা শুরু করলেও এবারে ঘরোয়া ক চায়। মন্দ কি! দেখা যাক কি তার সমস্তা।

মেয়েটার দিকে আবার তাকালো সজ্জিত। সম মুখখানা আরও করুণ হোয়ে উঠেছে তার।

ছোট ছেলের মত প্রশ্ন করলো সজ্জিত—কি সম মেয়েটা একটু সরে এলো তাব দিকে। বলবে মল্লিকা। স্থল ফাইটালে পাশ করার পর কলোয়ে কিন্তু দাদা আর পড়াতে পারলেন না। তাই—কথাটা শেষ না কোরেই ছেলেমানুষের ম বললে,—আপনারটা আগে বলুন। ব্যাটা ছেলে হয়।

কি বলবে সজ্জিত? তারই মত পাশ ক সে। সসারে মা-ভাই-বোন আছে। বাবা নো তারই গলগ্রহ। এক জন আত্মীয়ের বাসায় থাকে মেয়ে পড়ায়। ও কাহিনী তো মল্লিকার : শুরু করলেই বলবে ও তো জানি। ও সম

মধ্যে পঁচানব্বই জনের। ও কি বলতে হয়! ও তো তার  
থের উষ্ম ও কান্তির ছাপে স্পষ্ট কুটে উঠছে।

জিজ্ঞাসে চূপ করে থাকতে দেখে মল্লিকা নড়েচড়ে বসল।

—কই বলুন?

—কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। আমতা আমতা করলো সুজিত।

—বলবার কিছুই নেই বোধ হয়? একটু হাসলো মেয়েটা।

—না, তা নয়। অনেক বলবার আছে কিন্তু কোনটা আগে আর  
পরে বলব, তাই ভাবছি।

প্রাগৈর্হিতা আগে বলবেন। তবে দোহাই, সেই একঘেয়ে  
গানানি যেন না হয়। ভাইটার স্কুল থেকে নাম কাটা গিয়েছে,  
বাকী আছে বলে; মায়ের অসুখ কিন্তু ডাক্তার দেখাতে  
না। বোনটার বয়স হয়েছে কিন্তু বিয়ে দিতে পারছি না।  
আফিমের নেশা, সরকার আফিমের কেটা কমিয়ে দিয়েছে।

সুজিত এবারে আরও মুখিলে পড়লো। কি বলবে? জানতে  
সমস্তার কথা। কিন্তু তা শুনতে রাজী নয়। তবে? বলবে  
গানের কাহিনী? আজ পর্যন্ত কোন মেয়েই তার প্রেমে পড়েনি,  
কি চেয়েও দেখেনি তার দিকে। সেই প্রথম মেয়ে যে তার  
একা-একা এমন করে কথা বলছে এক যাবত সফল কোঁতুল  
পুসোমাটায়।

সুজিত ভাবছে। মেয়েটাও নির্বাক। মাথার ওপরের গাছটা  
ছোট। লাল ফুল খরে পড়লো তাদের মাঝখানে কাঁকা বেঙ্কিটার  
দু'জনেই চমকে তাকালো ফুল ছাট দিকে চেয়ে। তার পর  
মুখ খুললো—প্রথমে—কই বললেন না তো?

—আপনি বলুন, বেশ ভাল লাগবে। আমার ঠিক আসছে না।  
মল্লিকা দু'মিনিট ভেবে নিলো। তার পর পরিচিতার  
সুজিতের দিকে আরো সরে এসে স্তম্ভ করলো তার  
কথা। বললে—জানেন অভাব-অভিযোগ তো স্বাভাবিক।  
সে আপনি আমি আজই দূর করতে পারি না কিন্তু  
অভাবের মধ্যে যে অস্থায়ী শান্তি, ক্ষণেকের আনন্দ সেটা  
ও সৃষ্টি করতে পারি?

সুজিত এবারে বুঝতে না পেরে বোকার মত চেয়ে রইলো—এই  
না, দু'জনে এখন তো ঋণিকটা পরিচিত পরস্পরের মধ্যে।  
ও বেড়িয়ে আসি। নয়তো দু'জনে একসঙ্গে একটু সিনেমা  
নয়ত কোন রেইরেটে গিয়ে বসে চা খাই আর গল্প করি।  
ত বললে—বেশ তো! এ সমস্তার সমাধান এমন কিছু কঠিন  
আমি ভাবছিলাম—

—যব-সঙ্গারের কথা—কথা কেড়ে নিয়ে মল্লিকা উজ্জ্বল হোয়ে  
গেল। আপনার সঙ্গে কি ঘর পৃথক হয়েছে না কি?

এতগণি অন্তরঙ্গতা কি মেয়েদের স্বভাবজাত না মল্লিকার বিশেষ  
নশের লক্ষণ? তবু মল্লিকার কথায় সুজিত একটু লাল হয়ে  
গেল। ঘাড় নেড়ে জানালো, না।

—তবে, এমন একটা সময় যখন আপনিও বোকার আর  
ও তাই। পার্কে আমরা কথা বলছি, কেউ শুনেছে না, তবু মনে  
অনেক মাল্হু আশে-পাশে কান পেতে আছে! তাই না?

কি বলতে গেল সুজিত। মল্লিকা আর কথা বলবার অবকাশ  
দিয়ে গেল একতরফা ভাষা।

—কোথায় যাবেন, বেড়াতে?

—না।

—রেইরেটে?

—তাও না।

—তবে?

কথা বলছে সুজিত কিন্তু বুকেটা হুফুফু করছে। ভরে বা লজ্জায়  
নয়। পকেটের অবস্থার কথা ভেবে। খরচটা হবে তারই। সে  
পুরুষ। আদ্যার ধরেছেন ভদ্রমহিলা। ক্ষণেকের অতিথি যেন।

পার্কটার প্রায় তিন দিক ঘুরে অবশেষে তারা বার হবার পথ  
পেলো। মল্লিকাই এভাবে ঘোরালো। সহজ পথ চেনে না ওরা।  
পুরুষকে বশ করার অস্ত্র হাতে আছে, তাই তার সন্ধ্যাবহার করতে  
জানেন না।

সুজিত চলতে চলতে বুকপকেটটার ওপরে হ'বার হাত বুলিয়ে  
নিলো। টিউশনির শেষ পুঁজি পাঁচ টাকার নোটটির অপব্যয়  
কথা ভেবে ব্যথায় ভরে উঠলো মনটা। মনে হোলো চুনীর কথা।  
ছেঁড়া, তালি-দেওয়া প্যাঁটটা পরে পান্ডার পাঁড়ার ঘরছে।  
সমবয়সী বন্ধুদের নতুন জামা-প্যাঁট পরতে দেখে হস্ত বাড়ী চলে  
এসেছে। কিন্তু কাক'ও খুঁজে পাচ্ছে না যার কাছে জানাবে তার  
একটা নতুন প্যাঁটের আদ্যার।

কি ভাবছেন বলুন তো? ভাবছেন মল্লিকা কেমন বেহারা,  
নয়? কথটা বলসেই আড়চোখে একবার সুজিতের মুখের  
দিকে তাকিয়ে দেখে নিলে ওর মুখের ভাবটা।

সুজিত বললে না, না, এতে বেহারা ভাববার কি আছে?

—নেই! কেনা নেই, পরিচয় নেই, তার সঙ্গে—কথটা শেষ  
না কোরে খিল-খিল করে হেসে উঠলো। হাসি খামিয়ে বললো,—  
হয়ত কোন দিনই আর আমাদের দেখা হবে না। কখনও এই পার্কে  
যখন এই বকম দুপুরের সময় আসবেন আর ঐ বেঙ্কিটার বসবেন  
তখন মনে হবে এক প্রগলভা মেয়ের কথা, যার পান্ডার পড়ে—

মল্লিকার কথা কানে যায়নি সুজিতের। মন ওর চলে গিয়েছিল  
আমবাগানে ঘেরা গ্রামের পোড়ো ভাঙা বাড়ীটার ভেতরে; যেখানে  
একটা এই বকম প্রগলভা মেয়ে কোন দিন ঘুরে বেড়ালে মানাবে  
কি না?

—আর ভাবতে হবে না, চলুন আজ সিনেমায় যাওয়া বাক!  
ভাল বই হচ্ছে সিনেমাটার।

—সিনেমা? প্রশ্ন করাই থেমে গেল সুজিত। তাদের এই  
নাটকীয় অভিযানে সিনেমাই ভাল। হয়ত তাদের মতই নায়ক-  
নায়িকার সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যাবে।

—কেন সিনেমা আপনার ভাল লাগে না বৃষ্টি? জাবায়  
আদ্যারের স্তর মল্লিকার গলায়। আর ঘনিষ্ঠ হবার প্রয়াস। চলতে  
চলতে কয়েক বারই সুজিতকে ছুঁয়ে গিয়েছে তার পেলব তলু। সেটা  
নেহাতই পাশাপাশি চলার বেগে। তার বেশী কিছু নয়।

সিনেমা-হলের সন্মুখে এলো তারা। রঙীন প্রজাপতির মত  
উড়ে বেড়াচ্ছে মল্লিকার দল। কেউ জোড়া বেঁধে, কেউ দল বেঁধে।  
তাদের চার পাশে পুরুষ-মৌমাছির মত এক-আধজন ভক্ত। চার দিকে  
বিলাতি সেটের উগ্র উদ্‌মান। পুরুষের চোখে মোহ সৃষ্টি করার  
চরম আয়োজ্য। এখানে নেই বোকারের সমস্তা, কেউ শব্দ

বলে ভাল শাড়ী একটা কেনার তাগিদ, নেই বেশন আনার টাকা জোগাড়ের কথা। এ এক স্বপ্নের রাজ্য যেন! এখানে কেবল খুশী আনন্দ তন্ময়তার আবেশ।

এমিক-ওমিক এক বার তাকিয়ে দেখে নিলো সজ্জিত। না চেনা-মুখ চোখে পড়ে না। তাদের সম্মুখেই একজোড়া দম্পতি টিকিট কিনে হলে চুকলো। বেজায় ভাঁড়। টিকিট পাওয়া মুশিল। ওরা বোধ হয় বজ্রের যাত্রী।

নোটটা পকেট থেকে বার করলে সজ্জিত। তার পর মল্লিকার দিকে চেয়ে বললে—টিকিট পাওয়া যাবে তো?

—তাই তো! এই লখা লাইন দিয়ে—মল্লিকাকেও চিহ্নিত দেখা গেল। হঠাৎ খুশীতে উদ্ভাসিত মুখগানা কেমন যেন কালো হয়ে এলো।

—শাঁড়াই তো লাইনে, সজ্জিত এগিয়ে গেল লাইনের দিকে।

—না, আমার দিন, বলেই সম্মতির আপেকা না কোরে সজ্জিতের হাত থেকে নোটখানা একরকম কেড়ে নিয়ে কৌশলের সঙ্গে পাঁচ সিকার ছ'খানা টিকিট কেটে আনলো মল্লিকা।

—স্বপ্নের মুখের জয় সর্বত্র, কি বলুন? মল্লিকা একটু তৃপ্তির হাসি দিয়ে সজ্জিতের কথাবলি শিলা।

এবারে সজ্জিত চারি দিকে চেয়ে দেখলো। জয়ের গর্বে বুক ভরে এলো। পাশে ক্ষণেকের চেনা বাস্তবী। যাকে সে জয় করেছে যাকে সে পাশে বসিয়ে আড়াই ঘণ্টা হলের মধ্যে কাটাতে পারবে। যার জন্ত সে একক মাহুয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বার বার আশ-পাশ থেকে চ্যাড়ার দল তাদের দিকে লুকু দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকবে।

পাশাপাশি বসলো তারা। সত্যি ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে না এক বারও পাঁচটা টাকার কথা। চুনীর কথা। স্বপ্নের রাজ্য। নায়ক রাস্তার রাস্তায় ঘরে বেড়িয়ে অবশেষে চাকরী পেয়েছে। লটারীর টিকিটে টাকা পেয়েছে আর পেয়েছে নায়িকাকে তার অকলঙ্কী হিসাবে। বহু দিনের দেখা স্বপ্ন তাদের সফল হয়েছে।

চাঁদনী রাত, পাশাপাশি তারা বসে। দেখে দেখে লাগিয়ে, মনে মনে। তারা ছুঁয়ে আছে পরস্পরকে। কেউ তাদের সবাতে পারবে না।

সিনেমার নায়ক-নায়িকার রোমাঞ্চ আঁজ সজ্জিতও অচুত্ব করছে। অবশেষে কোন সময় মল্লিকা তার হাতের ওপর হাত রেখেছে। তার উষ্ণ নরম স্পর্শ তার দেহে শিহরণ জাগিয়েছে। জীবনে এত আনন্দ আছে, এ তো সজ্জিত জানতে পারিনি। তাদের এই অভিনয় তো সিনেমা থেকে কোন আশে কম নয়? এর শেষ পরিণতি কি সিনেমার নায়ক-নায়িকার মত তাদের বেলগও হবে? শুধাবে না কি মল্লিকাকে কানে কানে?

—মল্লিকা!

কই মল্লিকা? এই তো ছিল পাশে। কোথায় গেল? ও হয় বাইরে গিয়েছে, আসবে এখনই।

সিনেমা ভেঙে গেল। তবু মল্লিকা এলো না। কোথায় গেছে বাইরে বেরিয়ে এসে তল্ল-তল্ল করে খুঁজলো মল্লিকাকে। মল্লিকা নেই। কিন্তু মল্লিকার কাছে যে তার পাঁচ টাকার নোটটার যে টাকা রয়েছে।

মল্লিকাকে সেদিন সজ্জিত আর খুঁজে পায়নি। অনেক দিনও হঠাৎ মল্লিকাকে দেখতে পেলো সজ্জিত। তারই মত এক জনের মত ঘরে সিনেমা-হলের দিকে চলেছে।

—শুনছেন?

ওরা থামলো না।

সজ্জিত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো। একবারে মল্লিকার পাশটা খালি ছিলো, সেই দিকে।

—শুনছেন?

মল্লিকাও খেমে পড়লো। তাকালো সজ্জিতের দিকে।

—আমায় বলছেন? মল্লিকার মুখে কোন ভাবান্তর নেই ক্রটাও একটু কুঁচকে গেল না!

—হাঁ।

—আপনাকে তো চিনি না!

—চেনেন না? অবাক-বিশ্বয়ে চেয়ে বইলো সজ্জিত।

—না।

—জল করেছেন। মল্লিকার সঙ্গীটি মস্তব্য করলো। তারা সজ্জিতকে বোকার মত ঈড়িয়ে থাকতে দেখে ছো-ছো করে উঠলো। সঙ্গে মল্লিকাও হেসে উঠলো খিল-খিল কোরে। ও কোরে পার্কে তার পাশে বেড়াবার সময় হেসেছিল। অবিকারী হাসি।

সজ্জিত জোর কোরে যেন চেঁচিয়ে বলতে গেল, আমার ও পাঁচ টাকার ফেরৎ আড়াইটা টাকা? চেঁচিয়ে বলতে গেল এত চুনীর প্যাট কিনে দিতে পারিনি। প্যাণ্টের টাকা যে আদ কাছে।

ততক্ষণে ওরা কাউটারের সামনে ঈড়িয়েছে। সেখান থেকে আড়চোখে এক বার সজ্জিতকে দেখলো মল্লিকা। বোধ হয় বুক পায়লো সজ্জিতের অবস্থাটা। সজ্জিতের কথার জবাবে বলতে চাইলো, চুনীর প্যাট সে টাকার না এলেও, পানির ইতিহাস নোটটা কেনা হয়েছে তাতে। পানি যে অনেক দিন থেকে মল্লিকা বসেছিল, 'মিদি, ইতিহাসের নোটটা আনিস, ওর দাম ইতিহাসের যে অনেক কম'। পুষ্টির অভাবে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে-বাওয়া মেটে কল্লম মুখখানার দাম কি চুনীর চেয়ে কম?

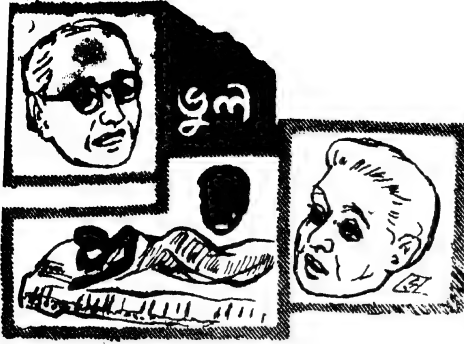
[ বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন। ]

# যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব সময় লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

খেলাধুলা করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্মই বলুন ধুলোময়লার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধুলোময়লায় থাকে রোগের বীজাণু যার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাক্ষ করে এবং স্বাস্থ্যকে অক্ষত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন। এতে আপনার শরীর ঝরঝরে করে তুলবে।





### শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অভয় ডাক্তারের। আবছা আঁধার! কালো মস্ত চেহারার লোকটির। মুখ ঠিক দেখা যাচ্ছে না, হৃদয়গণের মতো চেহার। পা টিপে এগিয়ে আসছে—এগিয়ে আসছে বিছানার দিকে। একটা কিছু কুমতলব রয়েছে, মনে মনে অভয় অনুভব করছে সেটা। বিছানার পাশে এসে লোকটি পড়ালো, চেয়ে দেখলো অভয়ের দিকে। অভয়ের মনে হল এ মুখ তার চেনা, কত বার যেন দেখেছে। কিছুতেই মনে করতে পারলো না। ইচ্ছে হল ছুটে পালায়,—পারলো না, নড়বার শক্তিও যেন লোপ পেয়েছে। ত্রুটি ফুটে উঠলো লোকটির মুখে, মস্ত বড় লোমশ হাত বাড়ালো সে—গেটে বড় বড় আঙুলগুলো সাঁড়াশির মতো এগিয়ে আসছে! বাগা দেবার শক্তি নেই, অসহায় চোখে আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো অভয়। গলার উপর এসে একটু থামলো আঙুলগুলো, তার পর গলা টিপে ধরলো। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, সমস্ত শক্তি একত্র করে আঙুল ছাড়ার জন্যে। বাঁকুনি দিয়ে উঠে বসলো বিছানায়।

বিলম্বিত স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলো অভয় ডাক্তার। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে, তাকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে গলা। আলো আলিয়ে বিছানার পাশে চরারের ঢাকা-সেওয়া গ্লাসের জল ঢক-ঢক করে পান করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো সে।

দরজা খুলে বাইরের দাওয়ায় বেকির ওপর এসে অভয় ডাক্তার বসলো। ভাত্র মাস, জলে ভরে উঠেছে নদী-নালা। গত ক'দিন বৃষ্টি বরছে অবিরাম, জল থই-থই করছে মাঠে, হাওরে, গানকোতে। সন্ধ্যা পর্বত গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি করে বৃষ্টি খেমেছে। ভিজা বাস, ভিজা মাটি, ভিজা পাতার টিক-টিক করছে আলো—চাঁদের আলোও মনে হচ্ছে ভিজা। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলো অভয়, কৃষ্ণ চতুর্ভূজ চাঁদ উঠে এসেছে প্রায় মাথার ওপর, চাঁদের গা ঘেঁসে লালচে জ্যোতির্গুণ্ড, হালকা সাদা মেঘ দ্রুত ছুটে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। জ্যোত্স্নাই শুধু ভিজা নয়, চাঁদও যেন বিন্দু হয়ে উঠেছে ঐ ক'দিনের বৃষ্টির ছাট সেগে।

ছপ-ছপাং—কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলো অভয় ডাক্তার! বহু দূর থেকে বাতাস ভেসে আসছে জলে পড় পড় শব্দ। ছপ-ছপাং—ভিড়ি বেয়ে কেউ হয়তো বাজছে। ছোট নালা চলে গেছে অভয় ডাক্তারের বাড়ীর পাশ দিয়ে পশ্চিমের হাওরে। বর্ধকালে কিছু বুঝক উপায় নেই, সব জলে ভরে ওঠে—একাকার

হয়ে যায়, হুস্তর হয়ে ওঠে গ্রামের এক বাড়ী থেকে আরেক বাড়ী ব্যবধান। নিস্তব্ধ নিস্তব্ধ রাত চাঁদের আলোর স্বপ্ন দেখতে। অভয় ডাক্তার শুনে লাগলো জলে পড় পড় শব্দ, মনে লাগলো একটা তাল আছে এ শব্দের। ক্রমে শব্দ এগিয়ে আসছে ডাক্তারের মনে হল—এগিয়ে আসছে তার বাড়ীর পাশের নালা ধরে। জলের ওপর দিয়ে ভেসে-আসা বহু পূর্বের শব্দ—নালা যেখানে জলের ভেতর নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে গেছে।

ছেলেবেলা থেকে একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তিভরা সত্য যা ফিরছে অভয় ডাক্তার। এক নাম-না-জানা অস্বস্তি, আতঙ্ক কি আর কিছু। থেকে থেকে দেহ কাঁটা দিয়ে ওঠে, টিপ-টিপ করে থাকে বুক, দেহের ওপর দিয়ে বয়ে যায় এক শীতল প্রবাহ। জ্বলালে আর দশ জনের মতো নয়, একথা সে অনুভব করে এসে চিরদিন। তাই এড়িয়ে চলেছে সে সবার সঙ্গে। একটা ছাপ আর আশংকার মাঝখানে যেন তার মন নিত্য হুলছে। বহু করছে সে ভয়ঙ্কর এক আবির্ভাবের প্রত্যাশা প্রতিনিয়ত তার মনে। সে যা জানে না জানতে হবে তাকে সে কথা।

অভয় ডাক্তার বহু দিন শহরে কাটিয়েছে। গ্রামে বাড়ী। সে বাড়ীর চিরুণে নেই আজ। মূলবাড়ী আজ যোপ-জঙ্গলে ঢাক সাপ-শেয়ারের আশ্রয়। এখানে থেকে আজ তিন বছর ডাক্তার করছে অভয়, মূলবাড়ীর বাইরে ঘর করে আছে সে। এক বছরেই এক পাশে ডাক্তারখানা—আলমারির পর আলমারি গুঁবগুঁবে, অপর পাশে তার শয়ন ঘর—এপাশ-ওপাশ টানা বারান্দা সামনের দিকে। ডাক্তারী পাশ করে অভয় ডাক্তার পুরুষদের গ্রামে ফিরে এসেছে। ভালো ছাত্র ছিল সে। ভেবেছিল চাকরি করবে,—গ্রামে তাকে ফিরে যেতে দেখে হয়েছিল তার। গ্রামের লোকও সেদিন অবাক হয়ে চেয়ে দেখে অভয় ডাক্তারের কথা ভুলে গেছে তারা বহু দিন। এ বাঁ অভয় বলে একটা ছেলে ছিল, সেই ছেলেই যে অভয় ডাক্তার এ বিশ্বাস হয় না তাদের।

ছপ-ছপাং—ক্রমেই এগিয়ে আসছে জলে পড় পড় শব্দ। অভয় ডাক্তারের বাড়ীর দিকেই আসছে যেন! হয়তো ডাক্তারের কাছেই আসছে। চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে বাজ হালকা মেঘ দ্রুত,—দাওয়ার বলে অভয় ডাক্তার সেদিক দেখছে।

শহরের বাইরে সোকের দিন কাটছে স্বপ্ন-ভ্রমে, জী টিলে,—দিনের পর দিনগুলি আসছে বাজছে, খোয়ালই নেই এ একটা দিন আরেকটা দিনের অনুভূতি! প্রভাত হয়,—গন্ধগুণ্ডবে, নাওয়া-খাওয়া দিন কেটে যায়, সন্ধ্যা আসে ক্রমে রাত্রি গভীর হতে থাকে, গ্রামের বৃকে আঁধার নামে হয়ে ওঠে চার দিক, ঘুমিয়ে পড়ে গ্রাম। ঝিল্লির ঝি আঁধার কাঁপে, রাত্রির পাখীর পাখা-ঝটপটানি আর পেচের আওয়াজ মাঝে মাঝে আঁধার চিড় খায়। আবার প্রভাত এমনি পুরুষের পর পুরুষের চলে জীবনবাড়া, বৈচিত্র্যহীন নেই একের সঙ্গে অন্তের বিপুল মাত্র। অভ্যস্ত জীবনপ্রবাহ! যুবক হর, যুব হর, তার পর অসংখ্য তার ছেলে—জীবন অনুভূতি। শক্ততা, হিসাব-সেব, স্বপ্না-ঝাঁটি, মায়া-মো সবই আছে, যেমন চিরদিন ছিল—বৈচিত্র্য নেই মোটেই



বচিহ্ন আসে সে জীবনধারায়, হুঁচকার বছর মনে রাখ  
গর পর ভুলে যায়। গভাঙ্গাগতিক জীবনযাত্রা চলতে

। ডাক্তারের বয়স পঁচিশ-ছাশিশ হলেও দেখে মনে হয়, বিশেষ  
না। লাল গায়ের রঙ, একহারা চোখা, ছোট মুখে কালো  
খুঁটি কোটর-প্রবিষ্ট, চোখ দুটির দৃষ্টি বেন ভেতর থেকে  
ভুছে। মুখের ভাব রুট গভীর, হাসি বা কৌতুক বেন এ  
ক্সে নয়। কচিং অল্প হাসি ভেসে ওঠে সে-মুখে, অসম্ভব  
পায় সে-হাসি, মুখভাব কাঠিন্দ্র, তাতে করে কোন বেশী কম  
-হাসি ভাবতে রীতিমতো বাধে। অভয় ডাক্তার কথা বড়  
ল না, মেশে না কারও সঙ্গে,—রোগ আর ঔষধ ছাড়া কারও  
নি সম্পর্ক নেই তার। রাস্তায় চলতে অবাক হয়ে লোকে  
ক চেয়ে দেখে, কথা বলতে সাহস করে না।

লা-আঁধারে মেশা সবুজ পাতার ছায়ায় ঘুমিয়ে-পড়া গ্রামেব  
য়ে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে অভয় ডাক্তার। স্বপ্নের  
ল গেছে সে। কানে ভেসে আসছে জলে দাঁড় পড়ার শব্দ,—  
—বহু দূর থেকে ভেসে আসছে তা'। আকাশ থেকে—  
লুকা ছুটে-চলা সাদা মেঘের ওপার থেকে বেন ভেসে আসছে  
! একটা গোপন অর্থ আছে এ শব্দের!

সী বিশেষ দিনের কথা মনে পড়লো অভয় ডাক্তারের। এমনি  
ন সেদিন, জলে ভরে উঠেছিল নদী-নালা।

চৌদ্দ বছর আগে দেখা বাবার মুখ মনে পড়লো তার।  
সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে একটা শীতল প্রবাহ অমৃতব করলো সে, কাঁটা  
দিয়ে উঠলো গা—লোমগুলি সব খাড়া হয়ে উঠলো। কোথায়  
গিরেছিলেন তিনি, ফিরতে রাত হয়েছে সে-দিন, কত রাত মনে নেই  
অভয়ের। ছুটে এসে তিনি বাড়ী চুকলেন, অভয়কে বললেন,—  
পালিয়ে যা অভয়, একুশি পালিয়ে যা—যা দাঁড়াস নে, এখানে ফিরে  
আসিস নে আর! ডাকাত—ডাকাত পড়েছে!

তার পর ঘরের কোণে তুলে-রাখা প্রকাণ্ড খাঁড়া হাতে নিয়ে  
বেরিয়ে গেলেন তিনি। কি তার কথায় ছিল, অভয় জানে না, কিন্তু  
একুশি ছুটে পালাতে হবে, এ কথা বুঝেছিল সে—বুঝতে পেরেছিল,  
এক মুহূর্তও সেখানে তার থাকা চলবে না আর। তার পর কোন  
দিকে সে ছুটেছে, সে খেয়াল আর তার ছিল না। হঠাৎ থমকে  
দাঁড়ালো সে, বহু লোকের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে! ফিরে  
তাকালো,—আঙুন—আঙুন লেগেছে বাড়ীতে। অভয় ফিরলো,—  
দাঁড়িয়ে ভেবে নিল একটু, তার বাবার নিষেধ। সে মানতে পারলো  
না, বাড়ীর দিকে ছুটে চললো আবার। ফিরে এসে দেখলো, বাড়ী-  
ঘর-দোব সব জলে গেছে, হাল্লা করছে গ্রামবাসীরা চার দিকে জড়ো হয়ে।  
ডাকাত পড়েছিল, বাড়ী ঘেরাও করে আঙুন লাগিয়েছে। গ্রামের  
কেউ ভয়ে বেবোয় নি, ডাকাতেরা চলে গেছে অনেকক্ষণ। তার  
বাবাকে আর খুঁজে পায় নি অভয়। কিছু দিন ধরেই বেন তিনি  
বুঝতে পেরেছিলেন এ ডাকাতের কথা, ব্যবস্থা করেছিলেন সব কিছু।



সুনিপুণ  
স্বর্ণশিল্পী  
ও  
মনিকার

গিনি  
ম্যানসন

সুয়েলাস

প্রধান কার্যালয় :—

২২৬, রাসবিহারী এডেনিউ, কলিঃ-১৯

গ্রাম—“গিনিম্যান” \* ফোন—৪৬১৪১২

শাখাসমূহ :

বহুবাবু বাজার, তবানীপুর

১নং হিন্দুস্থান মার্ট, বালীগঞ্জ, ফোন : ৪৬-১৪২৫

যাকে বছর বছর সেই যে অভয় বেরিয়ে গিয়েছিল কিংবদন্তি, নিঃসঙ্গ আর অন্ধকারে। এ ক'বছর বরষা ধার কবরত রয়েছে তাকে, অজিতব্রত কবরত রয়েছে বরষা ধার, এবারের অবাস্তব সে-সব কথা। ডাক্তারী পাশ করে তিন বছর আগে সে দিনে এসেছে আবার গ্রামে। গ্রামের লোক তার কথা কুল গিয়েছিল, অজ্ঞাত রয়েছে তার, আবার তাকে কিংবদন্তি বলে। মনে মনে হাসলো অভয়—কি বুঝে তার, কেন সে আশা দিয়ে এসেছে। এ তিন বছর বসে আছে এখানে সে ভিসের প্রতীকায়।

মাকে ছাড়া যেন সে কেবল, বাস্তব নয় সেটা। ছেলেবেলায় কথা মনে নেই তার। থাকবে কি কবে—বসে তার মার পাঁচকী বছর এখন। মাকে মনে করতে পারে না সে, হঠাৎ কিংবদন্তি—কোন এক কালে তিনি ছিলেন এ কথা মনে পড়ে শুধু, কখনো একটা মাঝারি দৃষ্টি ধরা পড়ে কোন মতোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে না সেটা। বুড়ো পেরেছিল সে এক দিন, তার পর আর মনে নেই। এ মনের দল তার মার স্মৃতি কি সোপ, বুড়ো উঠে পড়বে না অভয় ডাক্তার। তার মনের স্মৃতি যেন এই ভাবের স্মৃতির সঙ্গে মিশে আছে। তার পাশেও এক দিন ডাক্তারেরই না কি মোর ফেলছিল। তার বাগানে স বেবেছে, গ্রামের কারো সঙ্গে বড় একটা মিশ্রণে না, কেমন এক পাকাত হালোবাকতম। গ্রামের উদর সীমার অন্য ডাক্তারেরে ডি, তাকেও বাড়া থেকে বড় একটা বেগোতে লিফেন না তিনি। পদে এর কারণ না বুঝলেও আজ সব বুঝতে পারছে অভয় ডাক্তার—তই বসে রয়েছে ততই বুঝতে পারছে। মা-বাবা দু'জনই পরে ডাক্তারের হাতে মরছেন। একটা কিছু কারণ, একটা কিছু অর্থ কমেই এল। টাকা তার বাবার ছিল কিন্তু তার মাথা-ডাক্তারেরা পর নি—সেইট একমাত্র কারণ হতে পারে না এ ডাক্তার।

কান পেতে এবার শুনলো ডাক্তার, শব্দ যেন বুঝে চলে যায়। গাভাস উঠে বঠে। না, এশিরকি আসছে শব্দ—বাগাস চিরন্তই এবার স্পষ্ট শুনতে পেলে সে—হপ-হপা—ময় সরে বেতেই তল জোয়ারের প্রায়ন নামলো পৃথিবীর এ বুকে, সত্যপ্রাণ শুভ শাড়ী-পরা পৃথিবীর দিকে চলে বসে বঠলো ডাক্তার।

সকালের কথা মনে পড়লো অভয়র, সেও যেন স্বপ্ন, সত্য নয়। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোপ চুটী আগে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো তার। অনেক কিছুই আঁক বুঝতে পারছে সে।

আজ সকালবেলা, নৌকা নিয়ে লোক এসেছিল মৌবপর থেকে—ভোখলের অম্বু, বেতে হবে। লোকের হাতে আগাম টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে ভোখল। ভোখল শেষ মুদগমান, অবগাপর গৃহস্থ। কোন কালেই ছ' মাসের বেশী জেলের বাইরে থাকে নি সে। লোকে ভয় করে তাকে, জেল থেকে বেরিয়ে এলেই লম্বা হয়ে ওঠে। জেল তাকে বেতেই হবে আবার,—তাঁর নিজের কাজের জন্তেও বটে, লোকের জন্তেও বটে। বাইরে তাকে থাকতে দিতে রাজী নয় কেউ। কখন যে তার শনি-দুই কার ওপর পড়বে বলা শব্দ, সর্বনাশ তার করবেই সে। চুবি, ডাক্তারি, বাহাজানি, ঘরে আঙন দেওয়া,—এ যেন তার এক কৌতুক। দারোগা, পুলিশ সবাই তাকে ডেনে, বাইরে এলে ছ' মাসের ভেতর জেল তাকে পুরবেই তারা। অদৃশ্য কৌতুকগণ গল্প রয়েছে এই ভোখল আর তার দ্রষ্টক নিয়ে—লবই অভয় ডাক্তার গল্প রয়েছে এই ভোখল আর তার দ্রষ্টক নিয়ে—লবই অভয় ডাক্তার গল্প রয়েছে। লোকের হাতে চুবি-ডাক্তারি করতে গিয়ে কত বার ঘর

পড়েছে ভোখল, মেয়ে হাত খঁড়ো করে গিয়েছে তার, মার ডেনে গিয়েছে লোক, ওরা চলে যেতেই মিনি সে বেতে উঠে।

পুলিশের লোকও মনে মনে ভয় করে এই দাঙির হাঙ্গুর। এক বার আদালতে এক দারোগা টাটা করেছিল, জেল বসেছিল,—ই'ছ'টাক এবার বাঁচায় পুরে'ছ। মনে মনে ভোখল উত্তর দিয়েছিল—ছ'মাস আগেই একমাসের ই'ছ'র বাঁচা থেকে বেবেছে সে ভোখল শেষ এবার চু না। ছ'মাস পরে বেরিয়ে গিয়ে এক দিন এল সেটা ন কান কেটে গিয়েছিল ভোখল। ভোখলকে অভয় মদ্যে সকলেই ডেনে। হাস তিনেক জেল থেকে বেরিয়ে এসে হয়েছে—এবার মতোই মার টিক করেছে সে। তার এ একবার বিধাস করনি। গত পাঁচ বছর তার মনে মনে থেকেই, ঠিক মতো বুঝে করে মনে মনে এসেছে সে ডাক্তারখানায়। সেটা করে বসেছে—ভোখলকে বুঝে ডাক্তার, এক দিন সেমার এই ডাক্তারখানা বুঝে ডাক্তার হাজার হাজার মনে মনে আসবে—ডাক্তার—ডাক্তারি বুঝে ডাক্তার, ভোখলের হাতে যেদিন পড়বে সেদিন এক বছর হবে ভোখল। অভয়র শুনলো না ভোখলের মার কান মনে করলে সে কি হবে করবে পড়ে না বলা শব্দ। ঠিক মতো বুঝেই নয় সেটা বুঝলেও কেন সে আসে, ডাক্তার মনে পড়লো, মনে মনে বুঝলো, এই কখনো শক্তিশালী লোকের মনে এটা বসেছে—মোম হয়ে, ডাক্তারের হাতে পড়বে তার কোন মত একটা বাঁচবে কি না সে যে কত বসে সে কখনোই মনে মনে ভোখলকে নিয়ন্ত্রণ বা বুঝে রাখলো কোন দিনই মনে পড়লো।

আজ সকালে অভয় ডাক্তার ভোখলকে দেখতে মৌবের পাঠা ভোখলের অম্বু, লজ্জার মতো পড়ে চলে যায় সে ডাক্তারী আছে তার কই জেল-মেরে। ডাক্তারকে দেখেই ডাক্তারি হয়ে উঠলো তার। বউ-ছেলে-মেয়ের দিকে চলে বসলো—চলে যা, ডাক্তারের সঙ্গে কথা আছে আমার। পাশে গার এক কলসীকি দেখিয়ে অভয়কে বললো,—বসে ডাক্তারী গেল দগাট, সেখানে বঠলো শুধু অভয় আর ভোখল।

ডাক্তার ভোখলের পাশে বসে বিজ্ঞানা থেকে ভোখলের মনে ফুলে নিল। জেল হাত ছাড়িয়ে নিল ভোখল—এ রোগ আমার ছাড়বে না ডাক্তার। তিকিমসার জন্তে তোমাকে ডাকিনি, তখা বার অভয় অবাক হল, কি কথা থাকতে পারে তার সঙ্গে ভোখল বললো,—বলো ?

ভোখল এবার আর হাসলো না, বললো,—আমি জানি এ আমি বাঁচবে না। একটা আগ্রহ নিয়ে তাকালো সে ডাক্তার দিকে—জানো ডাক্তার, এই ভোখল কারো স্বপ্ন বাখনি। এ স্বপ্ন থেকে গেল, সেটা শোধ করবার আর সময় হল না।

ভোখল তাকে কেন এসব বলছে বুঝতে পারলো না অভয় জিজ্ঞাসা করলো, কার কাছে ?

এ কথাই কোন কথায় নিল না ভোখল, জিজ্ঞাসা করলো তোমার মা-বাবাকে মনে পড়ে ?

—মায় কথা ঠিক মনে নেই, বাবার কথা মনে আছে।

—ডাক্তার তাদের খুন করেছে—না ?

নাথ নেড়ে অভয় বললো,—হ্যাঁ।

—কে সে ডাকাত শুনবে?

অভয়ের মনে হল নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার। কষ্ট করছে না,—বলো।

—পঞ্চাননপুরের কৃষ্ণ বাবুকে ডেনা?

—ভবিষ্যৎ?

—হ্যাঁ, তোমার মা-বাবাকে সে হত্যা করেছে।

—অসম্ভব! জোরে বলে উঠলো অভয়। কৃষ্ণ বাবুকে ডেনে তার চোখের সামনে এক অমানিক বৃদ্ধ ভরলোকের ছবি ভেসে গেল। নাথ নেড়ে অভয় বললো,—এ হতে পারে না।

কতিন হাসি ভেসে উঠলো নৌখতার মুখে—অসম্ভব নয় ডাক্তার। যে মা-বাবাকেই ও শুধু খুন করেছিল খুন করেছে আমার নাই ম সর্বস্বকেও। ডালিম আমার বড় ভাই। সে সমস্ত এক বড় নি ছিল না এ তরোঁ। কৃষ্ণ বাবুকে ছাড়া তুমি যা দেখছো না ও তা ছিল না, সেখানেই জমিদারের তুমি জানো না। বাবাও কষ্টে আমি জানকি করেছি কিছু সব মিলিয়েও একটা কাজের সমান হয়ে না। আমাকে অবিশ্বাস করছো? শুধুতো মিথ্যে কথা বলার কাজে ভোগে তোমাকে নিতে আসিনি। জা মিথ্যে বলবে—কি তুমি নেখতার কাছে পাবে তুমি?

অভয়ে কানে শুধু কি দূর ভাবনা—অভয় বললো,—বলো।

—বীচেরে না তাই বলায়। আমার একটা কথাও অবিশ্বাস না। সে সমস্ত জমিদারের হত বাবাপ্রকারে সাহায্য করেছে

ডালিম সর্বস্ব। যেদিন তোমার মা মারা যান তোমার বাবা বাড়ী ছিলেন না সেদিন। রাতে ডাকাত পড়েছিল, কৃষ্ণ বাবু নাকি নিজে উপস্থিত ছিল সেখানে। তোমার মা আত্মহত্যা করেছিলেন কি না! বলতে পারবে না, তার লাস পাওয়া গেছে পরদিন।

একটু থামলো ভোমল শেখ। কষ্ট নিশ্বাসে শুনে যাচ্ছে অভয় ডাক্তার, মনে হচ্ছে এ এক উপকথা—সত্য নয়। ভোমল আবার বলে চললো,—আমি আমার খোঁজ নিয়ে থাকতাম, ভেতরের কথা সব বলতে পারবে না। যে কারণই হোক, খুব ভার করে ডালিম চলে এলো এক দিন। কৃষ্ণ বাবু খুব অপমান করে থাকবে। বাড়ী এসে ডালিম বললো,—দেখে নেবো আমি এই ভবিষ্যতের বাচ্চাকে। বলা যতো সহজ এসে দেখে নেওয়া তত সহজ নয়। তোমার বাবা খুব তেজী লোক ছিলেন, বাস্তির করতো তাঁকে সবাই। ডালিম সেদিনই তার সঙ্গে দেখা করলে, পরামর্শ করলো তোমার বাবার সঙ্গে। ঠিক পোয়ে কৃষ্ণ বাবু তোমার বাবা আর ডালিম দু'জনকেই খুন করেছে।

ভোমল থামলো। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অভয়। একমুহুরে উঠলো ভোমলের চোখ তঁটি। বললো,—আমি পারলাম না, তুমি এর প্রতিশোধ নিয়ে ডাক্তার।

অভয়ের লাল দেহ আরো লাল হয়ে উঠেছে, দৃষ্টি ঠিকবে পড়ছে চেতর থেকে। বললো,—নেবো। ভেবে না, এর এমন প্রতিশোধ নেবো আমি—কথা শেষ না করে ঠাঁতে চাঁত কামড়ে ধরলো অভয়। সেখানে আর অপেক্ষা না করে উঠে চলে এলো সে।

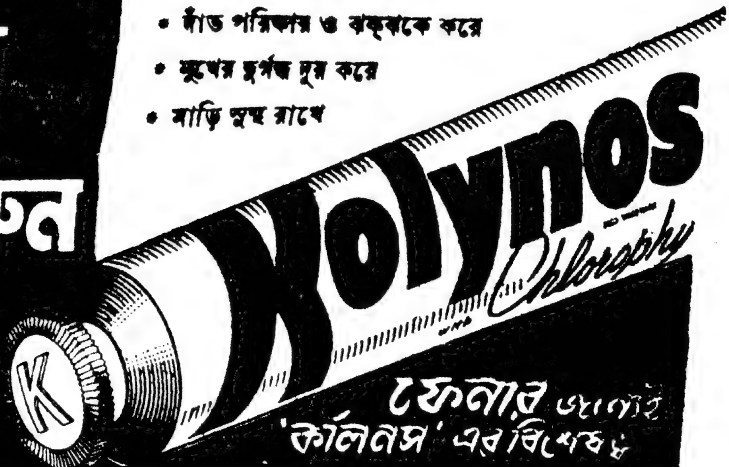
দাঁতের  
ক্ষয়

বন্ধ করুন

সক্রিয় স্কেলোফিল সঙ্কল

বিক্রয়কর সঙ্কল কলিনস টুথপেস্ট

- দন্তকরী জীবাণু তড়ায়
- দাঁত পরিষ্কার ও বন্ধক করে
- মুখের দুর্গন্ধ দূর করে
- বাড়ি সুস্থ রাখে



ফেনার ওয়াশিং  
'কলিনস' এর বিশেষত্ব

এত দিন যা বুঝতে পারিনি আজ তা সে বুঝতে পারছে।

‘ছপ-ছপাং’—দাঁড়ের আওয়াজ হচ্ছে তার বাড়ীর পাশে, চোখ ফিরিয়ে সেদিকে চেয়ে দেখলো অভয় ডাক্তার।

ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে একটি লোক নামলো। মাঝি নামলো না, বড় নৌকা। কাঁদের নৌকা বুঝতে পারলো না অভয়। লোকটি নেমে তার বাড়ীর দিকেই আসছে। অভয় বুঝতে পারলো বাড়াবাড়ি অস্থখ করেছে কারো, নইলে এতো রাতে তার কাছে লোক আসতো না।

লোকটি দাঁড়ায় ডাক্তারকে বসে থাকতে দেখে অবাক হল। দাঁড়ায় উঠে এলো সে, নমস্কার করে বললো,—পঞ্চাননপুরের জমিদারদের কর্মচারী আমি। কুঞ্জ বাবুর মেয়ের অস্থখ, আপনাকে একুশি যেতে হবে। অভয়কে কুঞ্জ বাবুর চিঠি দিল সে।

অভয়ের মনে হল, এরি জন্তে বেশ এতক্ষণ এখানে বসে সে অপেক্ষা করছিলো। মুখ তার কঠিন হয়ে উঠলো, অলসে লাগলো চোখ ছুটো। হুঁ-এক কথা কি হয়েছে জেনে নিল সে, বললো,—দাঁড়ান, একুশি আমি তৈরি হয়ে আসছি।

ঘরে গিয়ে অভয় দেখলো ঘড়িতে আড়াইটে বেজেছে। একটা হাত-ব্যাগে কতকগুলো ঔষধ পুরে নিল সে, একটা ঔষধ তৈরি করে নিল ইঞ্জেকসন দেবার জন্তে। তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কর্মচারীটিকে বললো,—চলুন।

পথে একটি কথাও বললো না অভয়। এতে আশ্চর্য হল না কেউ। সবাই জানে ডাক্তারের ধরণই এই। নৌকা চলেছে, ডাক্তার একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সামনের দিকে।

পঞ্চাননপুরে পৌছোতে পাঁচটা বেজে গেল। বাইরের ঘরেই কুঞ্জ বাবু বসে আছেন। তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে দেখলো অভয়। ডাক্তারকে তকুশি ভতরে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। বললেন, ফেরবার পথে এদিকে এলো ডাক্তার, কথা আছে।

মেয়েটি বিছানার পড়ে আছে,—অচেতন নয়, কিমিয়ে-পড়া। অরতপ্ত সেহ—রোগপাণ্ডুর মুখ। অভয় বুঝলো, বেশ কিছু দিন রোগে ভুগছে মেয়েটি। বয়স উনিশ-বিশের বেশী হবে বলে মনে হল না। মুখ তকিয়ে উঠেছে—যেন একরাশ বাসী যুঁইফুল। ডাক্তারকে দেখে সরে দাঁড়ালো উৎকণ্ঠিত আত্মায়া আর পরিচারিকার দল। একজন বিছানার পাশে এগিয়ে দিল একখানা চেয়ার। মেয়েটির মুখের দিকে আর তাকালো না অভয়। অত্যন্ত ধীরে সাবধানে পরীক্ষা করে দেখলো সে। হাতব্যাগ থেকে তার নাম ছাপানো কাগজ বের করে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলো,—নাম?

—রাজ্যেশ্বরী দেবী। কে এক জন উত্তর দিল।

—বয়স?

—বছর কুড়ি হবে।

মুখের পরিষ্কার অক্ষরে লিখে যেতে লাগলো অভয়। রোগের নাম, ঔষধের নাম সব পরিষ্কার করে লিখলো। একটা শিশিতে কয়েক দাগ ঔষধ দিল খাওয়ার জন্তে। তৈরি করে নিয়ে আসা ঔষধ পুরলো ইঞ্জেকসনের নলিতে, তার পর সাবধানে বস্ত্রবহা নাড়ী বের করে ইঞ্জেকসনের সূঁচ বিধলো। বস্ত্রশাস্ত্রিক দীর্ঘ শব্দ করে আবার কিমিয়ে পড়লো মেয়েটি। এক অদ্ভুত রূঢ় হাসি ভেসে উঠলো ডাক্তারের মুখে। ইঞ্জেকসনের স্বচ্ছ নলির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত ঔষধ ঠেলে দিল সে সেই নলি দিয়ে। মেয়েটির

দিকে আর তাকিয়ে দেখলো না সে, হাতব্যাগ তুলে নিয়ে গেল সে-ঘর থেকে।

বাইরের ঘরে গিয়ে কুঞ্জ বাবুর মুখোমুখি সে বসলো।

জিজ্ঞাসা করলেন,—কেমন দেখলেন?

ডাক্তার মাথা নেড়ে উত্তর দিল, যেন এক টুকরো ক বলছে,—ভালো নয়।

—কি রোগ?

—লিখে রেখে এসছি।

—বাঁচবে?

—বলতে পারবো না। ইঞ্জেকসন একটা দিয়েছি, ৯ দিয়েছি। দরকার হলে বিকেল বেলা লোক পাঠাবেন।

একটু সময় চুপ করে রইলেন কুঞ্জ বাবু, চোখ-মুখ ঠাণ্ড হয়ে উঠলো। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন,—এ আমার মেয়ের ও বেশী ডাক্তার, একে তুমি বাঁচাও। রমেশের ছেলে তুমি, ও আমার বাল্যবন্ধু, তোমাকে বলছি,—আমার সর্বস্ব তোমাকে ও একে বাঁচানো চাই।—ব্যগ্র হুঁচোখ মেলে তিনি ডাক্তারের চোখে দেখলেন।

নির্ধাক বসে আছে অভয়। হুঁচোখ তার চিক-চিক কর ভাবাবেগের চিহ্নলেশহীন কঠিন মুখভাব আরো কঠিন হয়ে উঠে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে কুঞ্জ বাবুর দিকে।

অভয়ের সেই কঠিন মুখের ওপর চোখ রেখে কুঞ্জ বাবু লাগলেন, তাঁরও মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে তখন। বললেন—ডাক্তার, নিঃসন্তান স্ত্রী দ্বারা যাবার পর আমি আর বিয়ে করি অথচ আশ্চর্য, রাজ্যেশ্বরী কি করে আমার মেয়ে হল, এ প্রশ্ন পর্যন্ত কাউকে করতে দেখলাম না। ছ’মাসের রাজ্যেশ্বরীর এসেছিলাম। এক দুর্ধাগের রাতে ডাকাত পড়েছিল বাঁট হাতে ছেলেমেয়েকে নিয়ে ছুটতে গিয়ে হেঁচট লেগে বাঁট যায়, মার বুক থেকে ছিটকে পড়ে ছ’মাসের শিশু মেয়ে। এনে আজ বিশ বছর তাকে আমি মানুষ করছি। শুধু তা তার বাবা বুঝতে পেরেছিল মেয়ে বেঁচে আছে—তাকে হত্যা আমি।—মিনতিভরা কণ্ঠে কুঞ্জ বাবু এবার বললেন,—এ মেয়ে গেলে আমি বাঁচবো না। একে বাঁচাতেই হবে ডাক্তার। একে বাঁচাও। মরে যাবো আমি, এ আমি সহ্য করতে পারি।

অভয় ডাক্তারের মুখভাবে কোন পরিবর্তন দেখা ও তেমননি নির্ধাক বসে আছে সে। কালো চোখের গর্ভে কুঞ্জ বাবুকে বিধছে।

কুঞ্জ বাবু শেষ চেষ্টা করলেন,—একে বাঁচাতেই হবে। মেয়ে এ, তোমার বোন।

চমকে উঠলো অভয় ডাক্তার। দেখতে দেখতে লাল হ সাদা হয়ে উঠলো। উঠে দাঁড়ালো সে, মাথা নেড়ে ধাক্কা বললো,—জাগে জানলে হয়তো বাঁচতে পারতাম, এ হতো না। সময় নেই—আমি বাই।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অভয় ডাক্তার। কি জান কতো আগে জানলে, সে কথা ঠিক বোঝা গেল না।

সেদিনই গ্রাম ছেড়ে চলে গেল অভয় ডাক্তার। সৈদ্ধা বড় চাকরি পেয়েছে সে।



বুকের দুই হাজানোর  
অমজা থেকে  
আমায় মুক্তি দিয়েছে

# নেস্টাম

ঘন, গম প্রভৃতি শতচূর্ণের সংমিশ্রণে  
তৈরী আদর্শ শিশু-খাদ্য। নেস্টাম  
শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের পক্ষে  
অপরিস্কার উপাদানগুলো  
ব্যাপরিমাণে হুগিয়ে স্বাভাবিক-  
ভাবে তাকে পুষ্ট করে।

- রান্না করতে হয় না
- সহজেই মিশে
- পরিপাক স্বস্তি  
সবল করে



নেস্টাম দিয়ে পিঠে, কেক প্রভৃতি নানা উপাদেয়  
খাদ্য তৈরী করা যায়।

বিনামূল্যে পুষ্তিকার জন্ত লিখুন :

নেসেল্‌স্ প্রডাক্টস্ ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ

পোঃ অঃ বক্স ৩৯৮, কলিকাতা • পোঃ অঃ বক্স ৩১৫, বোম্বে,

পোঃ অঃ বক্স ১৮০, মাদ্রাস



মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

### সেই হার্মোনিয়াম !

মিতার মা হার্মোনিয়ামটা কিনেছিলো শখ করে—ময়েকে গান শেখাবে বলে। জনশ্রুতি আছে—মিতার মার নিজেরই না কি গানবাজনার খুব শখ ছিলো প্রথম বয়সে—তা সে শখ আর মেটাবার সুযোগ হয়নি। বিয়ে হয়েছিলো নেহাৎ অল্প বয়সে—তার পর খন্তরবাড়িতে পদার্পণ করবার পর থেকে সে পাঁচ চুকে যায় একেবারে। একে তো খন্তরবাড়ির সবাই ভীষণ গৌড়া, তার যে খাণ্ডার শান্তুড়ির পাল্লায় পড়তে হয়েছিলো, তাতে প্রাণের সবখানি গানের সুর চোখের জল হয়ে বেরোতো। স্ততরা—

তার পর খন্তর-শান্তুড়ী মরবার পর কলকাতায় এসে যখন নিজের ঘর-সামার পাতলো মিতার মা, তখন আর বয়স নেই—মিতা-ই তখন চোদ্দ বছরেরটি। তবু তাতেও দমে না গিয়ে নিজে স্বামীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে একটা উৎকৃষ্ট হার্মোনিয়াম কিনে আনলো মেয়ের জন্তে। নিজের জীবনের অর্পণ সাধ মেয়ের মধ্যে দিয়ে যদি সার্থক করে তুলতে পারে।

মিতাকে গান শেখাবার জন্তে সপ্তাহে তিন দিন করে মাষ্টার আসতো—আর তিন ঘণ্টা ধরে শিল্পী হবার পরিব্রাতি প্রয়াসে পাশের বাড়িগুলির মাথা ধরিয়ে ছাড়তো মিতা। তবু তার মা অটল আশা অসীম ধৈর্য আর অধ্যবসায় নিয়ে সেই তিন ঘণ্টা ঠায় বসে থাকতো মেয়ের পাশে। মেয়ের চেয়ে মায়ের সাধনার একাগ্রতা-ই বেশি। তবে শুধু মিতার মা-ই নয়, আরেক জন একাগ্র শ্রোতাও সমান অধ্যবসায়ের সঙ্গে মিতার পাশে বসে থাকতো সারাক্ষণ। সে আমাদের থুঁক।

থুকুর বয়স তখন নয় কি দশ। দিব্যি শাস্ত্র-শিষ্ট লক্ষ্মী মেয়েটি, ছোটবেলা থেকেই ওর গানের দিকে ভীষণ যৌক—এক্সবাবে ছোট বয়সে যখন আর সব বাচ্চারা চুধিকাঠি নিয়ে খেলা করে, তখনই কোথাও রেডিও রেকর্ড বাজলেই ও কান খাড়া করে চুপচাপ শুনতো। দেখে-শুনে ওর বাপ বলতেন—মেয়েটার গানের দিকে টান আছে, একটু বড়ো হলেই ওকে গানের স্কুলে ভর্তি করে দেবো। মা মুখকামটা দিয়ে বলতেন—ঠ্যা, বেখে দাও তোমার সোতাগের কথা! যার বাপ দেড়শো টাকা করোণী আর দেড় ডজন যার পুথি—তার মেয়ে নাচগান বা শিখবে তা জানাই আছে—তা সে স্বয়ং উর্দু এসে জেনার মেয়ে হয়ে জন্মালেও।

কখাটা সত্যিই। থুকুর বাবা সদাগরী আপিসের কে বিদেশী মালিকের মুনাফার হিসেব কষে কষে চুল পাকিয়ে ফেলত—কিন্তু তার দক্ষিণা বিশ বছরে বেড়শো টাকায় পৌছেচে। তাঁর তৃতীয় সন্তান—তার পরেও আছে আর চারটি। তা আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতীগোষ্ঠী মিলিয়ে পরিবারের আয়তন দেড় বটে প্রায়।

স্ততরা থুকুর যতই সহজাত সঙ্গীতপ্রীতি থাক, তার পি আর পরিপোষণ যে কতটুকু হবে—তা থুকুর মার কথায় ব অক্ষরে ফলতে শুরু করলো। থুকুর বয়স হলো গান শিখবার—তা ছাড়িয়েও চললো ক্রমে—কিন্তু থুকুর বাপের আর টাকা হ না মেয়েকে একটা যেমন-তেমন হার্মোনিয়াম কিনে দেবার আবার তাকে গানের স্কুলে দেওয়া কি গানের মাষ্টার বাবা—ও দূরের কথা!

তাই থুকুর আমাদের গতি হলো ঐ পাশের বাড়িতে। তিন দিন মাষ্টার আসতো মিতাকে গান শেখাতে—থুকু নি হাজিরা দিতো ঠিক। সে সময়ে কোনো কিছুতেই তারে বাড়িতে কেউ ধরে রাখতে পারতো না—এমন কি, কোথাও কে নিয়ে যাবার লোভ দেখালেও কাজ হতো না। এই তিন ধরে ঠায় বসে ঐ প্রাণান্তকর টোচামেটি শুনতো কি করে এটুকুে তাই ভেবে অবাক হবার কথা। তার পর ক্রমালে মুখ মুছতে মাষ্টার যখন বিদায় নিতো, তখন থুকু বাড়ি ফিরে আঁধার করে।

একদিন রোববার দুপুর থুকু পড়া করছিলো বাবার বসে। এক জায়গায় ছিলো Reba sings well—থুকু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেলো। বাবা চোখ বুজে শুয়েছিলেন, কি করলেন—কি হলো থুকু? থুকু বই বন্ধ করে রেখে বাব হাত বুদিয়ে দিতে লাগলো। তার পর খানিকক্ষণ পরে আ সুরে বললো—একটা কথা বলবো বাবা?

বাবা চোখ মেললেন—এতক্ষণ নিশ্চিন্তে মেয়ের সেবাটুকু ই করছিলেন। বললেন—কী, মা?

—মিতার মাষ্টারমশাই কী বলেছেন, জানো বাবা? ব আমাকেও মিতার সঙ্গে সঙ্গে গান শেখাবেন—অমনি লাগবে না। মিতার মা-ও বলেছেন তাই—তুই এসে মিতার গান শিখবি। তোর বাবাকে বলিস একটা হার্মোনিয়াম দিতে বাড়ীতে অভ্যাস করার জন্তে—তা নইলে তো গা যায় না। আচ্ছা বাবা, একটা হার্মোনিয়ামের দাম কত? ক্রেসেও যদি ছোট আর খারাপ হয়?

তার পর বাবার গলা জড়িয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে কি বললো—জানো বাবা, আমি এক পয়সা এক পয়সা করে মা টাকা জমিয়েছি আমার ফুটো বাজের মধ্যে—সেদিন গুণে ও সে-সব টাকা তোমায় দিয়ে দেবোঁখন বাবা! আর তার লাগে তুমি দিয়েঁখন—তাহলে একটা হার্মোনিয়াম হয়ে না মিতারটার চেয়ে ছোট হলেও হবে—তুমি দেখো।

থুকুর বাপ শুকনো জে খানিকক্ষণ মেয়ের মুখের দিে রইলেন। চোখ ছলছলিয়ে এলো তাঁর। হুঁহাত বাড়িয়ে মেয়েকে বুকে টেনে নিলেন। তার পর ভারী গলায় ব হবে বৈ কি মা, খুব হবে! তোমায় সাড়ে তিন টাকা দি

নয়াম তোর আমিই কিনে দেব, একটু সবুর কর মা—পূজোর টা যদি পুরো পাই, আর সব খরচ ফেলে তোর হার্মোনিয়াম আগে কিনবো মা !

কু. আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললো—পূজোর সময় দেবে বাবা ?  
মো। আমি আর এবার পূজোয় জামাকাপড় কিছুই চাইবো না, তুমি দেখো ।

মামি থকুর বেকার মাম! বি-এ, পাশ করে কলকাতায় চাকরির চেষ্টা করছি বছর খানেক—দিদির আশ্রয়ে । বাড়ীতে যা ছাড়া আমার কাছেই কখনো সখনো থকু তার মনের কথা বলে । ওর হার্মোনিয়ামের শখ আমারও অজানা নয় । করতো—একটা হার্মোনিয়াম কিনে দেবো ওকে—দিদির র আছি এত দিন । কিন্তু রোজগার বলতে তো একটা ম—পানরো টাকার—তার থেকে দশ টাকা দিদির হাতেই দিই—মাসের শেষে আবার দিদির কাছেই হাত পাতে ত—তার পরসার জন্মে । একটা যেমন-তেমন হার্মোনিয়ামের শ্রাব্যনক টাকার কাছাকাছি । যদি কখনো চাকরি পাই—মারবার কথা । কিন্তু তখন কি আর ভাববার সময়ও থাকবে ! যাপনমেয়েতে যে সময়ে ঐ কথা হচ্ছিলো—আমিও ঘরের উপস্থিত ছিলাম নিম্নিতের ভাণ করে । সব শুনলাম । পর বাপ ঘুমিয়ে পড়লে মেয়ে যখন বটখাতা গুটিয়ে উঠে লো—আমায় জেগে থাকতে দেখে চুপচাপ আমার পাশে বসলো । কিছুক্ষণ এঁটা-সেঁটা নাড়াচাড়া করে পেয়ে বিনা দোহেই বলে ফেললো—আচ্ছা মামা, একটা হার্মোনিয়ামের কত ?

বুধলাম, ও ছাড়া ওর মাথার চিন্তাই নেই আর । হেসে ম—কত হবে আর ! টাকা পাঁচ-সাত বোধ হয়—ঠিক জানি বলে সেগুলো বিশেষ ভালো নয় !

থকু বাধা দিয়ে বললো—তা হোকগে, বাজবে তো ? তা হইলো ।

আমি দেখলাম—দাম বলে ফেলে বিপদ বাড়িয়েছি । হয়তো ১ দিন আমার পরসার এক বোকা নিয়ে এসে হাজির করবে চুপি—এই নাও মামা, পাঁচ টাকা যোগাড় করবেছি । এবার এ এসে দাও—তা হলেই তো গেছি ।

সুতরাং তাড়াতাড়ি করে বললাম—কিছু ভেবো না থকু ! পর বাবা যখন পূজোর সময় কিনে দেবেন বলেছেন—তখন গা হার্মোনিয়াম আসবে বিলেত থেকে—মিতারটার চেয়েও গা ।

থকু আর কিছু না বলে গভীর মুখে উঠে গেলো । পূজো এলো, যথাসময়ে থকুর বাবা বোনাসও পেলেন । কিন্তু অধেকের বেশিই গেলো সহকর্মীদের কাছে দারাবছরের দেনা করতো । আর বাকি বা বইলো, তাতে একটা হার্মোনিয়াম বা হতো—কিন্তু থকু বাদেও আরো তো ছেলেমেয়ে আত্মীয়-জন রয়েছে—তাদের কথাও ভাবতে হয় তো পূজোর সময় ! তা ছাড়া, কোনো এক অলস মধ্যাহ্নের তন্দ্রামগ্নের ক্ষণে ছোট্ট একটা কী অঙ্গীকার করা হয়েছে—তা মনে রাখলে সদাগরীদের কেরানীর চলে না । অঙ্গীকার পূর্ণ করার উপায় নেই বলেই

বেশি করে অঙ্গীকার ভুলতে হয় । সুতরাং থকুর হার্মোনিয়াম আর হলো না ।

থকুও কিন্তু তা নিয়ে আর কোনো দিন একটা কথাও বলেনি কারো সঙ্গেই । বাপ-মাও এক দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তা দেখে । গরীবের ঘরে ও-সব শখ না থাকাই ভালো । শুধু আমি মাঝে মাঝে থকুর চোখের দিকে যখন চেয়ে দেখেছি—ওর চোখের তাবাতা অত্যধিক বকমের কালো মনে হতো—ওর বয়সের তুলনায় ।

মাগের দয়া হয়ে সাত দিন বোগে ভুগে হঠাৎ মারা গেলো মিতা । শোক সামলে উঠে মিতার মা ঠিক করলেন—জায়গা বদলাবেন । জিনিষ-পত্র বাধাছাঁদা করে গাড়ীতে তুলে দিয়ে পাড়ার সবার বাড়ীতে দেখা করত গেলেন । থকুদের বাড়ীতে যখন এলেন—পিছনে চাকর একটা বাস মাথায় করে চুকলো ।

হার্মোনিয়ামের মাধ্যমে মিতা তথা মিতার মার সঙ্গে থকুর খুব হৃদয়তা জন্মে গিয়েছিলো । মিতা হঠাৎ মারা যাওয়ায় থকুও কম শোক পায়নি । তার উপর স্নেহপরাণা মিতার মা-ও চলে যাচ্ছেন অজ্ঞ । তাই থকু পাড়ার আর সব ছেলেমেয়েদের মতো মাল-বোকাই গাড়ীর চার-পাশে ভাঁড় করে দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরের এক অন্ধকার কোণে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো ।

মিতার মা এসে বললেন—চললাম দিদি ! হৃদ্যাগ্য নিয়েই এসেছিলাম, হৃদ্যাগ্য বয়েই বিদায় নিচ্ছি । কিন্তু কৈ, থকুকে দেখছি না যে ? তাকে ডাকুন ।

থকু এলে তার হাত ধরে মিতার মা বললেন—মিতার হার্মোনিয়ামটা আমি থকুকে দিয়ে বাচ্ছি দিদি ! যোগ্য পাচ্ছেই পড়বে—মিতার আত্মা শান্তি পাবে । নিজের অপূর্ণ সাধ মেয়ের মধ্যে দিয়ে মোটাবো বলে কিনেছিলাম ওটা । তা সে স্বপ্ন সফল হলো না, মিতা চলে গেলো । অবিশ্টি বেঁচে থাকলেও স্বপ্ন আমার কটটুকু সার্থক হতো জানিনে । তাই আজ পর হাতে তুলে দিলাম হার্মোনিয়ামটা । ওর স্বপ্ন যদি সার্থক হয় তবে আমার স্বপ্নও সার্থক হবে—এই আশা রইলো ।

মিতার মার চোখে দু'কাঁটা জল বিক মকিয়ে উঠলো । থকুর মারও । কেবল থকু নিশ্পলক নেত্রে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো হার্মোনিয়ামটার দিকে ।

হার্মোনিয়াম গেলো থকু—কিন্তু গান শেখা আর হলো না । বাব-মার হৃদয় ছিল মেয়ের একটা শখ মোটাত পারছেন না বলে । সেটা যখন মিটেই গেছে ভাগ্যক্রমে, তখন অন্নাঙ্কসোর প্রতি আর চিন্তা কী ! আর তা ছাড়া দিতে চাইলেই বা দেবার উপায় হচ্ছে কী করে ! সুতরাং থকুর গানের মাঠারও জুটলো না, গানের খুলে ভক্তিও আর হয়ে উঠলো না ।

আর নিজে যে চেষ্টা করবে, তারই কি ঘো আছে একটু ! বাড়ীতে চারখানা যদি বা ঘর তো চার চারে বোলো জন লোক—হার্মোনিয়াম বাজাতে বদবার এক তিল ফাঁক কোথাও কি মেলে ! তার উপর ছোট্টা ভাই-বোন বড়ভাইদের হাত থেকে হার্মোনিয়ামটাকে সব সময় ডানা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়, যক্ষের ধনের মতো আগলে বেড়াতে হয় । তার জন্তে অত্যাচারও জোট কম নয়, তবু সে নির্বিবাদে সহ্য করে সব-কিছু ।

মাঝে মাঝে কোনো সন্ধ্যাকালে—যখন ছেলেমেয়েরা খেলে ফেরেন, বড়রা তখনো আপিসের পথে, মাসি-শিদিরা পাড়া বেড়াতে গেছে—সেই ঝাঁকে হঠাৎ হার্মেনিয়ামটাকে সম্ভরণে বাজান থেকে বার করে বাজাতে বসে থকু। তাও কি নিশ্চিন্ত হবার যো আছে একটু? হয়তো মা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক দেয়—ওই! মেয়ে গলা সাধতে বসেছেন! ওরে ও থকু, ভাইটাকে একটু ধর না বাপু—এই এখন সব এসে পড়বে আপিস থেকে—এদিকে চা-জলখাবারও হলো না। আর একটু যে কাজে সাহায্য করবে—তা কেন—দিন-রাত এই নিয়েই আছে!—খিশি মেয়ে হয়েছো কি করতে? মাকে সংসারের কাজে একটু সাহায্য করতও শিখলে না? জন্মেছো গণীর ঘরে—ওসব বিবিয়ানার সাধ কেন বাপু!

একটানা গজর গজর করে চলে মা। সেদিকে কান না দিয়ে নিবিষ্ট চিন্তে সঙ্গীত-সাধনা করবার মতন মনের অবস্থা তখন আর থাকে না। আর সন্তাই তো, মা একলা মানুষ, কত আর পারে! হার্মেনিয়ামটাকে বাজাবন্দী করে আবার উঠতে হয় থকুকে।

হার্মেনিয়াম হলো—কিন্তু থকুর গান শেখা আর হলো না।

তার পর সাত আট বছর কেটে গেছে। থকু এখন সত্তেরো বছর বয়স্কণী—কলেজে পড়ে। নিজে একটা টিউশনি করে পড়ার খরচ চালায়। থকুর বাবার বিচার্যার করবার সময় এসে গেছে। আর কিঞ্চিৎ বেড়েছে কিন্তু তার তুলনায় অনেক বেশি বেড়েছে সংসারের পরিধি আর জীবনযাত্রার ব্যয়-মাত্রা। দাদা একটা নামমাত্র চাকরি করে। আর মেজনা' আই. এ. ফেল করে চায়ের দোকানে আজ্ঞা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

হার্মেনিয়ামটা বাজাবন্দী হয়ে পড়ে আছে এখনো বাটের তলায় এক কোণে, থকু মাঝে-মাঝে ধুলো বাঁড়বার অছিলায় বার করে দেখে আর দার্শন্য ছাড়ে। ছলছলিয়ে ওঠে তার চোখ।

এমন সময়ে থকুর ছোট ভাইটার অস্থখ হলো—মারাম্মক রকম! ডাক্তার বললেন—প্যারাটাইফয়েড। সিরিগাস চার্ণ নিয়েছে—ক্লোরোফর্মসিটিন দিতে হবে ইমিজিটেটলি—ফুগ কোর্স! নইলে—

ওষুধটা তখন নতুন বেঁধেছে—চাবটি কোর্সের দাম আটশ ট টাকা। বাবা শুনেই মাথায় হাত দিয়ে বসলেন—অতো টাকা এখন কোথায় পাবো—মাসের শেষ! ধারও ব কারো কাছে পাবো—সে আশা নেই। বন্ধু-বান্ধবরা সবাই কিছু না কিছু পাবে—তার উপর এই হুমুলোর বাজার, সবাইই অবস্থা সমান। কি করি!

মা কঁদে বললেন—আমার বা হুঁ-একগাছি চুড়ি ছিলো তা তো বহুকাল আগেই পেয়েছো—শাঁখা আব নোয়া ছাড়া তো সঙ্গে সোনার দানাও নেই! এখন বাছাকে আমার বাঁচাই কি করে?

আমি তখনো আছি এই পরিবারে। মাঝে একটা চাকরি করতাম, মাস দুই হলো আবার বেকার বসে আছি, ছাঁটাই কর দিয়েছে।

অফিস বাবার সময় থকুর বাবা বললেন—দেখি, যদি পারি যোগাড় করতে—

থকু সেদিন আর কলেজে গেলো না। বসে রইলো ভাইয়ের শিয়রে পাথরের মূর্তির মতন। সন্ধ্যা সাতটার সময় বাবা ফিরল শুকনো মুখে। নাঃ, কোথাও হলো না!

মা কঁদে উঠলেন। ওগো, কী হবে তবে? ডাক্তার যে সব গেছে আজকের মধ্যে ওষুধ দেয়া চাই—

থকু চুপচাপ সব গোলা সেপান থেকে। আধ ঘণ্টাখানেক পরে থকু নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো কণ্ঠ ভাইয়ের শিয়রে কাছে। মা বসে পাখা করছিলেন। এতদূর শুকু চোখে পান নাড়ার দিকে চেয়ে থেকে তার পর ডান হাতটা বাড়িয়ে ধর বললো মৃদু অকণ্ঠ স্বরে—এই নাও মা, টাকা, ওষুধ আনতে পাঠাও কাউকে—

মা চমকে উঠে ওর দিকে তাকালেন। তাঁর এক চোখে আলো আরেক চোখে অন্ধকার বলসে উঠলো। পানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে মেরের মুখের দিকে চেয়ে বসলেন। তার পর ভয়ে ভয়ে হু গলায় বললেন—টাকা! টাকা তুই কোথায় পেলি?

তার পর মৃদু অকণ্ঠ অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলো থকু হার্মেনিয়ামটা বাঁধা দিয়ে এলাম সত্তর টাকায়। মিস্ত্রিরদের ব একটা হার্মেনিয়াম কিনবো কিনবো করছিলো অনেক দিন থেকে সেকেন্ডহাণ্ডে, অল্প টাকার মধ্যে। তাকেই দিয়ে এলাম। মোটে গানে দরদ আছে—যত্ন রাখবে জিনিষটা। কিন্তু তুমি আরও কোরো না, ওষুধ আনতে পাঠাও ডাক্তার বাবু কাছে।

থকুর মার চোখ ছলছলিয়ে উঠলো। ধরাগলায় বললেন হার্মেনিয়ামটা বাঁধা দিয়ে টাকা আনলি তুই? মিতার মার ও সাধের জিনিষ! ও কি আর কোনো দিন ছাড়াতে পারবি তুই এই অভাবের সংসারে?

এতদূর অতি কষ্টে নিজেকে চেপে রেখেছিলো থকু। এ আর পারলো না। তার নিশ-কালো ছাঁচোখ ছাপিয়ে রক্ত করে জল ঝরে পড়লো। কান্না-ভেজা কণ্ঠে বললো—না মা, দরকার আর ছাড়িয়ে! ও অভিশপ্ত হার্মেনিয়াম!

বারাংবার বসে শুনছিলাম আমি সব কথা। থকুর কথাব উর্ আমি মনে মনে বললাম—না থকু, ও হার্মেনিয়াম অভিশপ্ত না অভিশপ্ত আমাদের জীবন—এই হতাশা মধ্যবিস্তার জটিল আর অভিশপ্ত—তারের মানুষের মত বাঁচবার সাধ-আশা 'মানুষ' হয়ে উঠবার আশা-আকাঙ্ক্ষা!





## মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়

ডিসেম্বরের কড়া শীতের মধ্যে স্নমথর ফিরেও গাভাটা যখন ডায়না নদীর শুকনো খাত পেরিয়ে বাচ্ছিল তখন প্রায় ত্রিশ বছর। শীতের সন্ধ্যা পাঁচটা বাজতে না বাজতে এসে গেল। ঘুলো উড়িয়ে চলেছে স্নমথ। অনেকক্ষণ আমরা চুপ করে বসে আছি। বেশ হিমেল হাওয়া তীরের মত চুকছে ভেতরে। মিনি ভোরকোটির কলাশটা তুলে কানো ঢাকা দিয়ে বসলাম। মনে নানা রকম এলোমেলো ভাবনা আসছে। সেটাকে তাত স্নমানব জন্মে একটা সিগ্রেট ধরলাম। স্নমথকেও একটা দিয়ে দিতে হল। এবার বেশ এক পাশে তেলে বসে জানলা দিয়ে তের কন্ঠ বের করে দিয়ে হাতের চেঁচাটা গালের উপর রেখে তাত করে বসেছি। হঠাৎ অনেকক্ষণ পর স্নমথ কথা বলল, 'যে কাটা পথটা দেখছিস, বর্ষার সময় এটা থাকে না, এটা স্পারি পথ। তোর ভাগাটা যদি ভাল থাকে, তবে ফেব্রার দিন বন দেখতে পারি।'

তাই না কি? উৎসুক হয়ে বললাম, বোধ হয় জলটল খেতে এসে; এটা ত নদীর শুকনো খাত বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস, এটা ডায়না নদীর খাত, বর্ষার সময় কি সে হারা হয়, কল্লনা করা যায় না এখন। যে জলজলি আমরা গিয়ে এলাম মনে আছে ত?'

স্নমথর শেষের কথার জবাবে বললাম, হ্যাঁ নিশ্চয়। ওখানে কি বাঘ-টায় সব আছে?'

বাব আছে, গণ্ডার আছে, হাতী আছে। ফেব্রার দিন রাত্তি কবর, গোথে পড়তে পারে; তবে কি জানিস, আজ-কাল এত ট্রাফিক লেগে যে, পেট্রোল ডিজেলের গন্ধ ওরা সহ্য করতে না পারে রাস্তা থেকে অনেক দূরে থাকে।

এ সব রাস্তায় রাত-বিরতে চলার বেশ একটা খিঁসি আছে, আমি বললাম। স্নমথ সে কথার স্বীকৃতি জানিয়েও আক্ষেপের ভাবে বলল, তবে দশ-পনেরো বছর আগেও যে রকম ছিল আজ-কাল এর শতাংশের একাংশও নেই।

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছি খুব মনোযোগ দিয়ে নয় অবিশিষ্ট, তবে মন লাগছে না। এখান থেকে ভূতানের দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল, উত্তর দিকে যে নীল পাহাড়গুলো দৃষ্ট ঠেকে যাচ্ছে এখান থেকেই ভূতানের আরম্ভ। স্নমথ বলে যাচ্ছে, সেজা সামনের দিকে তাকিয়ে ষ্ট্রিয়ারি-এ হাত রেখে। অন্ধকার ঘন

হয়ে উঠেছে, ফায়েরের হেড লাইট জেলে দিয়ে আমরা লালমাটি বাগানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আর বেশি দূর নয় বোধ করি। ডায়না পার হয়ে এসেছি, আর একটা ছোট নদীর ব্রিজের উপর দিয়ে চলে এলাম। বহু দিন আগের তৈরী ব্রিজটা আজও ঠিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এ ব্রিজের আকারটা অনেকটা গাড়োয়াল ডিষ্ট্রিক্টের বহু পুরোনো খুলন্ত ব্রিজের ধরণের। হু'পাশে চা-বাগান। সমান করে ছাঁটা চা-গাছগুলো, মাঝখানে সেজা পিচের রাস্তা। বেশ লাগছে চলতে। মনটা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল, হঠাৎ চমকে উঠলাম স্নমথর কথায়।

কি রকম জাস্ত্র গ্রাউডেকার? স্নমথ বলল, চল দেখাব। লেগক মাহুর তোরা, একটা গল্প ফেঁদে ফেল দিকিনি। আমার নামটা তার মধ্যে যে ভাবেই হোক স্থান পাবে আশা করি।

নিশ্চয়, নিশ্চয়! তা গল্পটা কি শুনি?

আরে সে এখন কি; বুড়ো নিজের মুখেই বলবে শুনিসু।

আমি বললাম, কি, তোমার শিকারের গল্প না কি?

ইয়েস, শিকার! তা শিকারই বলতে পারিস, আই হু গ্রাউডমিট, তবে আবার নয়। মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল স্নমথ।

বাগাধটা গোলমালে মনে হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর কত দূর আছে তোমার বাগান? দিকি রাত হল।

স্নমথ হাসল, কেন হোর ভায়-টয় করছে না কি?

আরে না না, ভয় কি। একবারে নাবালক ঠাউরেছ! ছেলেবেলার কথা তুলে গেলে?

দূর, এমন বললাম, বলল স্নমথ, বোধ হয় থাক্তের প্রয়োজনটা বেশি অনুভব করছিস। আর অলক্ষণ কষ্ট কর, আমরা এসে গেলাম বলে। হ্যাঁ, কি বলছিলাম, সেই বুড়োর কথা—একটু থেমে আবার বলল স্নমথ।

তুই হুয়াত পিসাসই করতে চাইবিনে কিন্তু ইট ইজ এ টু ফ্যাক্ট।

খুব মালমশাদার বুদ্ধি? বললাম আমি।

একটা কথা সত্যি জানিসু কানু, আমি নিজেকে দেখে আশ্চর্য হই, ও বাটা বুড়োর ওপর কেন জানিনে রাগ করতে পারবিনে। তুই লেখ। আমি হসক করে বলতে পারি তুই রাগ করতে পারবি না, ওকে শয়তান বলে ভাগিয়ে দিতে পারবি না।

আমি একটু জোরেই বলল, কেন ভাগিয়ে দেব কেন? আগে শোনাই যাক ওর কথা।



কিসের ঠাটা প্রাপকেষ্ট? তিজাত চোখে চেয়ে বললাম।  
এই কিরে-খার ব্যাপার নিয়ে। কেমন উলসীন শুক-সলায় বলল  
না।

কেন? প্রাপকেষ্ট কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, বার তিনেক  
করেছি বলে।

তুমুথ তেমে জিজ্ঞাস করল, তিন বার না চার বার?

না বাবু বিয়ে তিন বারই, তবে—একখাটা শেষ না করেই  
কষ্ট নিজেকে সমর্থন করল। বলল, কি করব বাবু, বাড়া-  
গুলিকে কে জাখে? নতুন পরিবার এত মাস কয়েক আগে  
এসেছে।

বেশ বেশ, আমি আর তুমুথ ইচ্ছিতপূর্ণ দুই-বিনিময় করে  
এসে বললাম, তা এটির বয়স কত হবে?

একশ-বাইশের বেশি হবে না।

আমি ত' ক্রমেই কৌতুহলী হয়ে উঠছি। চারটে নাবীর সাম্পর্কে  
। করে সে এসেছিল আর কেমন করেই বা একে একে তাদের  
তিন জন তার জীবন থেকে যাসে পড়ল, এ কাহিনী যেমন যেমন  
ছিল আমি আপনাদের ঠিক সেই ভাবে তার কথাগুলোই বলবার  
করব। তিনিই বিশ্বাস করে কি না।

বোজ সন্ধ্যাবেলা বাঁশি বাজাহাম পুতুর পাড়ে এক পুরোনো  
ঘরের তলায় বসে। সন্ধ্যা ছিল দু-চার জন। এক দিন পূ-  
বেলাম বাসের কাছে। বাপ বলল, কোন কাজকর্ম নেই নছাব,

বাঁশি বাজিয়ে গোপিনীদের মন ভোলাচ্ছ? কুলাকার বেরোও—বেরোও  
বাড়ী থেকে।

আমিও সুযোগ বুঝে একদিন মায়ের বাস ভেঙে ত' জোড়া অনন্ত  
নিয়ে সটকে পড়লাম বাড়ী থেকে, তারপর চারমুখি দিয়ে বাতাসটি  
একেবারে পটুয়াখালি। এখানে-ওখানে চু' মারতে মারতে বন্ধ  
করেক পরে ভাগ্যক্রমে এসে পড়ি এই লালমাটিতে। বুঝতেই  
পারিলাম বাবু, চা-বাগানে কাজ করার ক্ষেত্রে তখন বিস্তার দরকার হত  
না। শিলিগুড়িতে সায়েবগুলা বগু-গুগু ডোয়ারার লোক দেখলেই  
জিজ্ঞাস করত—এই বাবু, কাম করোগা? আমিও চলে এলাম কাম  
করতে, গায়ের ইচ্ছা চিঠি লেখার বিস্তার অবস্থা আমার হয়েছিল।  
কত আর বয়েস তখন? উনিশ কি দুই হতে বোধ হয়।

তখন এত বাবুও ছিল না, আর এত সব বাড়ী ঘরও হয় নি।  
সায়েবের কুঠার কাছে আমাব এক আন্তানা ছিল। বেশ আছি,  
নিজের মনে সারা দিন পাড়ে থাকি ফাটুরীতে। আন্তানার যেটুকু  
থাকি বাগা-বাগা করতে কেটে যায়। নিজের মনে আছি, কোন  
কামেলা নেই। পাড়া দেখিনি কখনো, খুব আমোদ লাগছে।  
সঙ্গী-সাথী জুটেছে ত' একটা। বাঁশি এখানেও ছাড়িনি, রেজ আসব  
জমাই তুমতুমার ধারে বসে। দেখতে দেখতে তুমতুমায় কল এল।  
তুমাসের মাতামাতৃক সময় বর্ষাকাল এসে গেল। সারা দিন কখনো  
ঝিপ-ঝিপ, ঝুপ-ঝুপ, কখনো একেবারে গড়গড় করে বৃষ্টি পড়ে,  
খামবাব নামগক নেই। বাগানে ঘুবাব উপায় নেই, জোঁকের  
উৎপাত আর বস্ত্রচোরা ডামডিমের ভয়ে। সায়েব উলিঙেন ঘোড়া



## পিউরিটি বার্লি শিশুদের এত প্রিয় কেন?

কারণ পিউরিটি বার্লি

- ① খাটি গরুর দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে শিশুরা খুব সহজেই  
দুধ হজম করতে পারে।
- ② একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী ব'লে এতে  
ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট বালিশস্যের পুষ্টিবর্ধক গুণ সবটুকু বজায় থাকে।
- ③ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সীলকরা কোটোয় প্যাক করা ব'লে খাটি ও  
টাটকা থাকে—নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।

## পিউরিটি

ভারত এই বার্লির চাহিদাই সবচেয়ে বেশী

PTY 274

“মায়াদের জানবার কথা”

**বিনামূল্যে**

পুস্তিকাটির জন্য লিখুন :—অ্যাটলান্টিস (ইন্সট) লিমিটেড (ইংল্যান্ড-এ সংগঠিত)  
ডিপার্টমেন্ট, এফ বি-পি-৩, পো: বক্স ২০০২, কলিকাতা-১৬

নিরে ছুটে বেড়ায় অকস্মিক, কে জানে কোন দিকে নদীর পাড় ভাঙছে। বৈকালে জটলা হয় আপিসের বাবাকার, আর দু'দিন, তার পরই নির্ধাৎ জল ঢুকবে দক্ষিণ দিকের নতুন চাষাগাছের বাগানে। মনটা বড় খাবার হয়ে গেল সেদিন, কেন মরতে এলাম এখানে? দু'বছরের মধ্যে বাড়ীর একটা খবর নিইনি, নিজের খবরও চিইনি, যা খেঁচা তত কঁদে কঁদে অনর্থ করে তুলেছে। দেব একখান চিঠি।

আবার বাত্রে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাভাল ভাবি, না শানা, যা চুকিয়ে গিয়েছি যাক। তা'ছাড়া চিঠি পাঠ করব কি করে? ডাকগোলা ত' এখন বেতে পারবে না। বর্ষা কাটুক, তার পর দেখা যাবে। পানের খাটোরায় ধুম সন্টার ঘুমছে। ভাবতে ভাবতে আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ অনেক বাত্রে ঘুম ভেঙে গেল, কিসের যে সৌন্দর্য আওড়াই হচ্ছে বুঝতে পারলাম না। ভয় চড়ে লাগল, তবে কি সিঁড়ির দরজাটা ভাল করে এটে দিইনি? ক্ষমতা হল না যে তারামজালাকে ডাকি। হুগাং হুগাং বলে ঘাপটি মেয়ে পড়ে থাকলাম।

জোলের আলো ঘরে আসতেই মাথার কাছে খাড়া-করা বরমটা নিয়ে বাইরে এলাম, এসেই মনে হল, বাত্রে কেন অত ভয় করেছিল। বোধ হয় স্বপন দেখে থাকব। ঠাণ্ডা আর ঘটি নিয়ে উঠানে নেমে গেলাম। পেছনের কলাবাগানে দেখি একাইটু স্কল। কী ব্যাপার? বিড়কীর ছুরোয়ের নিচে ভুমভূমা এসে পড়েছে।

কুরোব পাড়ে মুখ ঘুরে, প্রতিদিনকার কাজ দু'বালতি জল নিয়ে পাকঘরে বাকলাম। বিড়কীর কাছে কতখানি জল মেলে দেখা দরকার, কি জানি আজ বাত্রে এখানে থাকা যাবে কি না।

বিড়কীর দরজা মানে টিনের দু'খানা পারা তার তলার শক্ত করে ছুটো খেঁজুর পাছের শুঁড়ি ঠেকনা দেওয়া।

বলব কি বাবু, ভগবানের লীলা, আসল মাটি খেয়ে নিয়েছে, শুঁড়ির ঝাঁকে মানুষ আটকে! কি করব ভেবে পেলাম না, ধনুর দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাছি। কে জানে প্রাণ আছে কি না। কোথা থেকে ভেসে এসেছে সন্তের-আঁটার বছরের পাঠাড়া মেয়ে। ঘরে তুলতে বুকের মধ্যে ধক-ধক করে উঠল। কি করব, ঘরে নিয়ে যাব, সেক-তাপ করব, ডাক্তারকে খবর দেব?

হুপূর নাগাদ জ্ঞান হল। ঠাণ্ডা বাবু, এ গল্প খুব ছোট। কে-হিসাবি মানুষ আমি, কোন কিছুই শুছিয়ে নিতে জানলাম না। পেয়ালের বশে কখন কি করি তার ঠিক নেই। কাঁধী আমার কাছে প্রায় দেড় বছর ছিল। কি গায়ের রং! তেমনি চেতারা। আপনাতা ত' বাবু অনেক পাঠাড়া সহরে গিয়েছেন, নিশ্চয় দেখেছেন, কেমন ওদের হয় গায়ের রং।

কাঁধী তাতছাড়া হয়ে গেল আমার নিজেরই দেবে। বানে ভেসে এসেছিল আবার ভেসে গেল। ওরাও ঘরে থাকবার নয় বাবু! এখন আর হুগু হয় না। ঐ ডাক্তারই আমার কাল হল। পরলা নব্বয়ের শরতান ছোঁকরা, ওকে ফুলিয়ে নিয়ে গেল। আমি জানতাম না তা নয়, তবে ঠিক ধরতে পারিনি, এতটা করবে তাও বুঝিনি। চার মাস তখন তার গভাবস্থা।

অলীলাক্রমে বলে যাচ্ছে প্রাণকেট, যেন সে নিরাশ্রিত ভাবে তার অতীতটাকে দেখছে, যেন এ তার নিজের নয়, আর কারো কথা আমায়ের শোনাজে।

সারেরের অর্ধাধি ময় জানতে গছে গিয়েছিল। তখনকা দিনে হাতীতে চড়ে যেতে হত। চার দিনের পথ। এর মধ্যেই ও ওরা ভেসে পড়বে এ আমার ধারণার আসেনি। বেশ মনে আর কিরে এলাম মজল বার দিন বৈকালে। শাড়ি এনেছিলাম ত'খন নতুন বাগেরগাটি হবে, কাচের চুড়ি। সারেরের কুঠিতে মাল খেঁচা দিয়ে বেশ ভগমগ হয়ে আসছি বাড়ীতে, তখনো জানিমে ডাক পালিয়েছে। ঘরে ঢুক দেখি কেউ নেই, ভাবলাম, বুঝি বাই কোথাও গিয়েছে। কতক্ষণ হয়ে গেল ঝেউত আসে না। জা লাভ শরীরে একবার পাকঘর, কুরোতলা, কলাবাগান, বিড় সব ঘুরে এলাম। কাঁধী, কাঁধী, কত ডাকলাম। না, স নেই ত'!

প্রাণকেট এমন গলাব স্বব কবল, যেন এখনো খুঁজছে!

সন্ধ্যা হল, ধুম হল, বেতকার মত জল তুলে পাকঘরে নিয়ে গেল। 'কিছু আজ হঠাৎ ও নিকে চা করতে বলল কেন? এ যে বছরে ত' কবেনি? আমার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল। খাটোর শুয়ে শুয়েই ডাকলাম—ধুম! ধুম! দুই চা করছিস কেন, কাঁধী কোথায়?

চা বেতে বেতে সব শুনলাম। বিদ্বান লাগল চা, গলাব কয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল যেন, পোটর মধ্যে কেমন একটা মোচড় দিয়ে উঠল। ধমুক বললাম, আজ চা-ডাল নিয়ে দুই লাইন চা অবাক হয়ে সে তাকাল আমার দিকে, কিছু শুখাল না।

মাথার খুন চোপ গেল আমার। কি করব? এখনো তত খুঁজলাম, না, নিজের কোন জিনিষ বেত দেয়নি। কাচের চুড়ির পটপট করে ভেঙে ছুড়ে ফেলিলাম। উমুনে ভাত চাপান দ্বি টান ঘরে তেঁকেচিটা নামিয়ে নতুন কাপড় দু'খানা শুঁড়ে দিল গনগন আঙুনে। তাতোও মনের জালা মিটল না, তাত-পা নিশ্চি করতে লাগল।

পরে আকোপ হয়েছে, ইস! করকের চারটে টাকার কাপড় পোড়ালি হত। সেই বারেরই না-বাবাকে বেশি করে মনে পর লাগল। তুলেই গিয়েছিলাম দেশ-ঘরের কথা। চিঠি লিখল আমি শীগগির যাচ্ছি।

আর দেরি নয়, পরদিনই সারেরের কাছে ছুটি নিলাম ত'মা বিয়ে করতে দেশে যাব বলে।

প্রথম বোয়ের কথা শেষ করে থাকির আমার হাতের জো কোণটা মুছল প্রাণকেট। ঠাণ্ডা বো বই কি, এ ছাড়া আর কি ব পারি, না হয় নাই বা হল ময় পড়ে বিয়ে। তবে যে সময় এদের ফিলি একবারেই নেই?

বাট-বাট বহরের বুকের এখনো কি মনে পড়ে উদ্ভত জো নিফল কামনার সেই কামিনিকে? আশ্চর্য!

আমি কিছুই জিজ্ঞেস করব না ভেবেছিলাম কিন্তু বজাভ প্রায় করে বললাম, আজ প্রাণকেট, আজও কি সেই কাঁধীকে ও ময়ন আছে?

শুট মনে আছে বাবু। এই নতুনটিকে নিয়ে তিনটি পরি আমি বিয়ে করলাম, ছেলে-পিলেও আছে। আরও হবে কি? ভগবান জানেন! কিন্তু সেই দেউতা বছর যে আমার পি কেটেছিল তার কথা আজও যেন মনে করতে দেখা লাগে।

জন্ত সাধের বাঁশিটা সেদিনই ভেঙ্গে চূম্‌চূমার সঙ্গে ফেল দিয়ছিলাম, আর কোন দিন বাঁশি বাজাইনি।

বেলা আড়াইটে প্রায় বাজে-বাজে, মনবাহার বিন পেরালা যা এনে দিল। চায়ে চুম্বক দিয়ে স্তম্ভ বলল, এবার তোমার প্রথম বয়ে-করা বোয়ের কথা বল দিকি প্রাণকেটে! তুমি যে দেখছি সেই গল্পীর ভক্ত বুড়ো বয়সে কোথের জল ফেললে? এ্যা কি ব্যাপার!—বলে ছাড়া করে তেলে উঠল।

স্তম্ভের ঠাট্টার এবার সতি প্রাণকেটে লজ্জিত হল, কি যে বলেন ফ্রেট বাবু, কোথের জল কোথার ফেললাম? আমার দুই সতীন্দ্রী দু'দু'গে গিয়েছে তাদের স্তম্ভট কোথের জল ফেলিলে, আর সে ত—তাবপর?

বহু দিন পরে বাড়ী পৌঁছলাম। কিন্তু ভিত্তিতে পারলাম না, মারা গিয়েছে আমি নিকলেন হবার এক বছরের মধ্যে। শাশুয়ে নাই, কল্যাণনে। বাঁধন ছিঁড়ে গেল, সব বাঁধন ছিঁড়ে গা দেশের। বুড়ো মশাই কর্তব্য সারলেন পাশের দ্রাঘের দা দাসের সেজ ঘরে স্তম্ভমারীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে। চাঁদো টাঙ্গা আমি নিজেরেই খসে কললাম।

প্রাণকেটে নিশ্চিন্দ্রপ্রাণ একপানী লালচে কটোগ্রাক বের করল, সব কাগজের মোড়ক খুলে। বোধ হয় পুরানো ট্রাঙ্কের তলার ছিল। ছবিখানার উটেটা পিঠে জা হয়ে গিয়েছে। কম্পাং এগারো বছরের কো স্তম্ভমারী দেখতে বোধ হয় হু ছিল। ছবি দেখে প্রাণকেটেব হাতে কিরিয়ে দিলাম।

বাবু, তখন আমার ডবকা বয়েস, মিথো বলব না, রক্তের নেশা গবেছে। তখনকার দিনে চুক্‌চুক্‌ সব জনেরই স্নেহত এখানে। গগন বাবুর প্রধান সাক্ষেরে হলাম আমি আর মম্বা। ভাবি এক এক সময়, ভাৱ-অভাৱ বলে সঙ্গারে দুটো জিনিস যদি থাকে আর পাণ করলে অভাৱ করলেই যদি তার জল ভোগ করতে হয়, তাহলে ত' আমাদের নিশ্চয় ভোগান্তি হোত। কই কি হল?

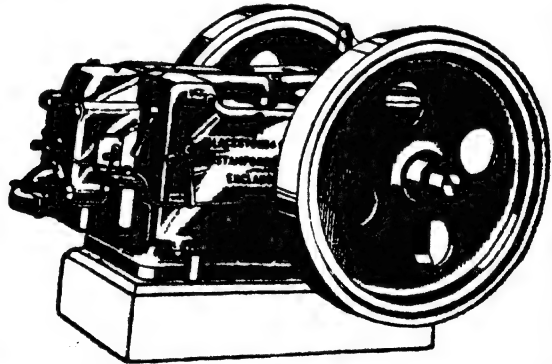
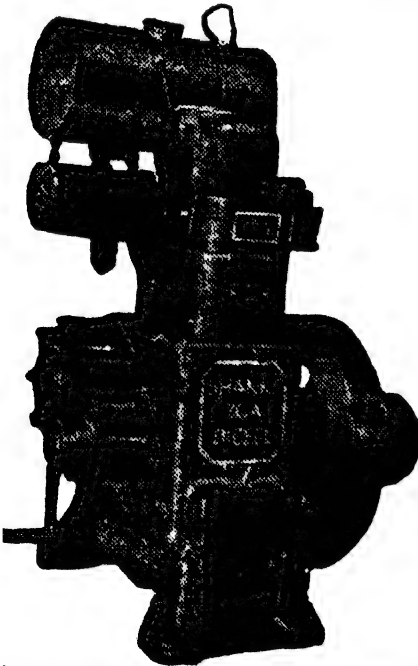
আমরা সায়েরের ভোগের আয়োজন বাড়িয়েছি, তার পূর্বকারও নেহাৎ কম পাইনি। তা'ছাড়া বিলাসের উপকরণ সায়েরের উচ্ছিন্ন হলে পর ছিটে-ছাটা আমাদের ভাগে এসেছে, বস্তুতই ইনি। যখন প্রথম বাগানে ঢুকি, মাইনে ছিল পঁচিশ টাকা, সায়েরের কুপায় হল দেড়শ' টাকা। মম্বা পেত পঁচাত্তর টাকা, হলো দু'শ' টাকা। মম্বা বিয়ে করল, গগন বাবু বিয়ে করল। এখন শু দিকি ভরা সঙ্গার।

বলে চলে প্রাণকেটে, গরম কালের সন্ধ্যা, বোধ হয় ত্রয়োদশী হবে, তাই সন্ধ্যার আকাশ অন্ধকার নয়। তার! ফুটেছে। বায়টা বোধ হয় শনিবার হবে। কুলী-লাইনে খুব মাদল বাজছে, গগন বাবুর বাগানে বলে আছি তিন জনে, উনিই কথাটা পাড়লেন একথা সেকথা হতে হতে।

আজ্ঞা প্রাণকেটে একটা কাজ করলে কেমন হয়? তুমি ত' এখানে অভিজ্ঞ লোক?

কি কাজ। খুব নীচ গলায় আলাপ হচ্ছিল আমাদের।

গগন বাবু বলল, সেদিন সায়েরের কথার ভাবে বুকলার কুলী



অর চাই, প্রাণ চাই, কুটার শিল্প ও কৃষিকার্য্য দেশের অর ও প্রাণ এবং আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিন, লিটার, ব্রাকটোন ডিজেল ইঞ্জিন, লিটার পাম্পিং সেট, শান্তস ডিজেল ইঞ্জিন, শান্তস পাম্পিং সেট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এজেন্টস্ :—

এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১৩৮ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট, বিতল কলিকাতা—১

ফোন ১—২২-৫২৭৫

বৈঃ জঃ—১১ ইঞ্জিন, মল্লার, ইলেকট্রিক মোটর, ভারবাহ্য, পাম্প ট্রাকটর ও কলকারখানার ব্যবহার্য্য সরঞ্জাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রস্তুত থাকে।

কামিনীদের ওপর অঙ্গচি ধরে গিয়েছে সায়েরের, যদি—বাবু! করতে পারি আমরা বুকে প্রাণকেষ্ট, আমাদের বরাহ খুলতে দেরি হবে না।

আমরা তখন সায়েরের হাওয়া পান করছি তিন জনে। বুকেলেন কি না বাবু! বট করে মাথায় খিলিক খেল গেল।

মম্বাধ বনতে লাগল, আমাদের হাতে আপাতত কিছু নেই, ভরসা এক তোমার ওপর।

কুছ পরোয়া নেই। কিন্তু একেবারে নগদ কারবার চাই আমরা। কথার খেলাপ না হয়।

ঠিক আছে, গগন বাবু, এবার যদি বিশ্ব, তুমি নাও তবে তার জায়াপ্রাণ্য তুমিই পাবে। কিন্তু আমরা যদি কুচবিহার বা জলপাইগুড়ি থেকে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে পারি, তাহলে বখরা হবে তিন জনের।

সেদিন এই পর্যন্ত। ভারতে ভারতে যে যার আন্তানায় চলে এলাম। গগন বাবু কথারার্থী ঠিক করবে, কাল রবিবার, কি জানি ডাক পড়তেও পারে। মম্বাধ আর গগন বাবু তখন বিয়ে হয়নি। বাবু, মওকা যখন পাওয়া গিয়েছে, ঠাঁও মারতে ক্ষতি কি?

প্রথমেটা খুব কালাকালি করত হুকুমারী। প্রথম দিন কিছু বুকেতেই পারেনি, আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম কি না। এক রাতে মাত্র এক ঘণ্টার জন্তে যদি করতের একশ টাকার নোট পাওয়া যায়, তাহলে ঐ সামান্য সময়টুকু একলা বিছানায় কাটাতে আমার আপত্তি নেই।

হঠাৎ আশ্চর্যভারের ভাব নিয়ে প্রাণকেষ্ট বলে উঠল, বাবু, আপনারা ভাবছেন উঃ কি শিশাচ! বাবু, টাকাটা কি বড় নয় বলতে চান?

কি জবাব দেব, প্রয়োজনই বা কি প্রাণকেষ্টকে কিছু বলবার? ও বা বলছে বনুক। কি হবে ওকে বলে টাকা বড় কি, কি—

প্রাণকেষ্টের কথায় সত্যতন হয়ে উঠলাম, বুকেলেন বাবু, এদিকে এসে মন-মেজাজ তখন অস্ত্র বকম হত। আর ঠাঁ, একথাও জোর করে বলব আমি, ভূরাস! অকসল বত বড়োদুনা দেখবেন, যে তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে আছে, সব ব্যাটা ঘু! শুধু বাগান কেন বাবু, এখানকার কুদে সহরেও ঐ ব্যাপার। আপনি বতই বলুন ওর খুব নাম-ডাক, মানী মামুল, বড়লোক, সমাজের মুকুবি, বড় বড় ব্যবসা তার—আমার ঢাথকে ঝাঁকি দেওয়া বড় শক্ত! আমি বিশ্বাস করিনি। বনুক দিকি তাদের কেউ বনুক বুকে হাত দিয়ে, ঠাঁ নিজের বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়েই সংভাব জীবন কাটিয়েছি, বিশ বছর আগে কোন দিন কোন অবস্থাতেই অস্ত্রের হুমকী বোয়ের ঘরে থাকা মারিনি। লাখি মেয়ে কাঠের দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকিনি। তবে বুধর ঠাঁ বুকের পাটা, ঠাঁ সাজা তার স্বভাবকবিত্তির।—কথা বলতে বলতে প্রাণকেষ্ট রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল, গগন! বগ ফুলে ফুলে উঠছে।

আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম, একুণি হয়ত এমন কারো নাম করে হবে, বাক আমরা জানি, চিনি—প্রজ্ঞা করে পাঁচ জনে। এ প্রসঙ্গ এখনি বন্ধ করতে হয়।

সম্মত প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, আরে যেহেতরি, অস্ত্র লোকের 'কথায় কাজ কি? নিজের কীতি বলা, তাহলেই ব্যর্থ।

ঠাঁ বাবু তা ঠিক, অস্ত্রের কথায় কাজ কি।—বলে একেবারে হাত জোড় করে ফেল প্রাণকেষ্ট। তা দেখুন নতুন বাবু, আপনাদের কাছে এই প্রার্থনা, আমাকে পাণ্ডা বলে ভাববেন না। আমি ত' বলি, ভগবান, কৃতকর্মের ফল সবাই ভোগ করুক। আমিও যার যাব না, তা জানি।

আমি আর সম্মত সম্বন্ধে বললাম, থাক ও কথা বাদ দাও। আমি পুরোনো কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বৌ সকালে এসে তোমায় কিছুই বলল না?

না বাবু, কিছুই বলল না। তখন মনে বেশ সোচ্চারিতি হল, এই ত' বাপু পোষ মেনেছ। এখন বুকেতে পারি কেন সে কিছু বলে নি এটুকু মেয়ে, তার মনে কি ফোঁ! এর পরে আরও কয়েক বা: তাকে বেতে হয়েছিল, শেষের বার আমি প্রায় শ' তিনেক টাকা পেয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমরা কুচবিহার থেকে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেললাম। এই বাড়ীতেই তখন নাচ-ঘর ছিল, আমরা ছয় ছ' মাস, নয় ত তিন মাসের কড়ার নিয়ে আসতাম। শুধু সায়ের নয়, আমরা কেউই তার পোসদ থেকে বঞ্চিত হই নি। নয় বছর উইলিয়ামের আগুণের কাজ করেছে তার পর এল সেজিল। এক দিনকার ঘটনা বলি।

ঠাটা করে অনেক দিন বাসে একবার বললাম হুকুমারীকে, দেখবে না কি নতুন সায়েরকে?

দুপুর বেলা সে তখন মেয়েকে ভাত মেখে দিচ্ছিল তৃণ দিয়ে। ইশানী আর চুপ করে থাকত না, কথায় কথায় জোর উত্তর করত।

আমার ঐ কথায় খুব বেগে গেল, বলল, কেন বাবুদেরও ত বৌ আছে, তাদের বড় কাল বলে বৃষ্টি মান বকে হবে না? আজও মেয়েমাছের আনতে পার নি নাচঘরে? ছপ্তা হয়ে গেল সায়েরকে উপাসী রেখেছ! চশমধোর কোথাকার! টাকাটাই সব হল? বলে আমার দিকে কি অবজার দৃষ্টিতেই ও তাকাল!

আবার সেই ভাবে বসে মেয়েকে খাওয়াতে লাগল। আমি আঁটলাম না। সেদিন যেতে বসে কোন কথারার্থী হল না; মনটা কেমন হল। বিকলে মম্বাধর সঙ্গে শিকারে বেরিয়ে গেলাম। লুকিয়ে-চুরিয়ে বুনা শূরোটা হরিণটা এখানে যাদের বনুক আছে তারা মারে। হয় বিট অফিসারকে নেমস্তম্ভ করতে হয়, নয় ত টাকা কামাই হলে বখরা দিতে হয়।

ফিরে এসে আর তাকে দেখতে পাইনি। নিজেই ধরাধরি করে বাজ পাটবাঙলা কুরাতলায় এনে রেখেছিল। মেয়েটাকে কল দিয়ে ভালো করে জড়িয়ে এক পাশে শুইয়ে রেখেছিল, সব সুনসান গগন বাবুর কাছে। এখন বিরলম গণারটার সময়, একটা বুনা শূরোর মেয়ে নিয়ে দেখি গগন বাবু, ধু বসে আছে আমবাছটাগ কাছে। খড়ের চাল, তার চিহ্নমাত্রও নেই। কাঠের ঘা পুড়তে বেশি মেহনত লাগেনি, তখনো গগনগন করতে আঙুন এদমর ত' বাতাস থাকে না, ঐতকাল, তাই বকে আশে-পাশে বাড়ীতে আঙুন ধরেনি। দেখে-সুনে মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে লাগল, তখনো চাইলাম হুকুমারীর কথা, মেয়ের কথা। গগন! হুটল না। গগন বাবুর দিকে তাকাতেই তিনি আম—

বললেন, মেয়ে আমার বাড়ীতে আছে, চল আজ ওখানেই  
ব।

অনেক কষ্টে ফিস-ফিস করে শুধোলাম, আর ?

আর ? আর সব শেষ !

প্রাণকেষ্ট একনাগাড়ে তার দ্বিতীয় কাহিনী শেষ করে দম নিল।

সেই, সেই সময়ের মত এখনো স্বর ওর গলা থেকে বেরোতে  
ছে না। জোর করে গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, বাবু, আমার

বলবেন না, যদি ধুমপানের কিছু পাই তাহলে একটু—

নিশ্চয়, নিশ্চয়! স্তম্ভ বালিশের তলা থেকে সিগারেটের  
ট্যাকট বের করে ধরল প্রাণকেষ্টের সামনে, আমিও একটা নিলাম।

আশ্চর্য! এর পরেও কি করে ভাবে প্রাণকেষ্ট ভোগান্তি ওর  
য়নি? চল বারান্দায় গিয়ে বস। যাক, আমি প্রস্তাব করলাম।

ম বন্ধ করা কাহিনী শুনে তখনতে আমাদেরও যেন দমবন্ধ  
গয় আসছিল।

আঃ খোলা হাওয়ায় এসে বাঁচলাম! প্রাণকেষ্টের কাহিনী ত'  
এখনো শেষ হল না, তখন অনেক বাকি। আমার বারান্দায় ভাঁকিয়ে  
বসে বৈকালিক চা-পর্ব সমাপন করবার বাসনা ছিল কিন্তু স্তম্ভের  
বিপরীত ইচ্ছা। সে বলল, চল চা খেয়ে একটু ইভনিং ওয়াক্ করে  
আসি, সারা দিন ঘরে বসে আছি।

তথ্যস্ব। তাহলে ধড়াচুড়া পরে নিতে হয়।

নিশ্চয়, বলল স্তম্ভ, কিন্তু প্রাণকেষ্ট তুমি ত' গরমের কিছু  
আনোনি বাবু! স্তম্ভের চোখ সব দিকে।

সঙ্গত হবে কি না চিন্তা না করেই আমি বললাম, চল স্তম্ভ,  
বেড়াতে বেড়াতে প্রাণকেষ্টের বাড়ীর দিকেই যাওয়া যাক।

তা মন্দ নয়, বলল স্তম্ভ, আমাদের সান্ধ্য-ভ্রমণও হবে আর  
প্রাণকেষ্টের গরম জামাও নেওয়া হবে।

আমি ভাবছিলাম, আজ প্রাণকেষ্ট রাতে খাওয়ার টেবিলে  
আমাদের গেষ্ট হোক।

একশাকটিলি সে! তোমাকে ভাবতে হবে না কাম্বু, আমি ঠিক  
করেই রেখেছি।

ঠিক আছে। আমরা পথে বেরিয়ে পড়লাম। ফায়ারীর দিকে  
এগিয়ে যেতে যেতে অনেক বাবুদের ঘর-বাড়ী দেখলাম, কুলকামিনী  
হুঁ-এক জনকেও চোখে পড়ল। যাক্ সে সব কথা।

দ্বিতীয় বিবাহ এবং নিরবচ্ছিন্ন অনেক দিন এই জীবন  
অবস্থার নটী সন্তানের জন্ম ছাড়া প্রাণকেষ্টের এই সময়টার  
কোন বৈচিত্র্য নেই। সাত মাস আগে নবমটির জন্মদান কালে  
দ্বিতীয় জীবন মৃত্যু হয়।

তার পরই বথারীতি নাবালকদের লালন-পালন করবার জঙ্ক  
প্রাণকেষ্ট তৃতীয় বার দারপরিগ্রহ করেছে না কি বাধ্য হয়ে! কিন্তু  
এখানেই প্রাণকেষ্টের অজ্ঞাতসারে এমন একটি মারাত্মক অপরাধ  
হয়েছে যে সে না কি কিছুতেই মন থেকে খটকা দূর করতে  
পারছে না।

কি সৌ?!

সত্যি বাবু, বললে পেতায় ঘাবে না, আমি আপনাদের পায়ে হাত  
দিয়ে বলতে পারি, এ লুকোচুরির মধ্যে আদর্শেই ছিলাম না।  
তবে ইঁা বলতে পারেন মরতে তুমি আবার বিয়ে করলে কেন?

কি করব বলুন, ঐ দুধের বাছাদের জাখে কে? বলবেন, কেন তোমার  
বড় বড় মেয়েরা আছে। তা আছে কিন্তু তাদের কি নিজের নিজের  
সংসার নাই?

আমরা অভয় দিয়ে বললাম, না বাবু, তুমি তিনটে কেন আরও  
বিয়ে কর। আমাদের বলবার কিছু নেই। কিন্তু তোমার মত মানুষের  
মনেও হঠাৎ অপরাধের ভয় কি করে ঢুকল, সেইটে আমাদের বল।

ইঁা বাবু সেই কথাই ত' বলব, পরামর্শ দেন আমি কি করব।  
আমার বয়স হয়ে গিয়েছে, এ বয়সে কে আর মেয়ে দেয়? তাই  
ভেবেছিলাম দুঃস্থ বিধবা-টিধবা যদি পাই তাহলে—আমার ঘরে  
ভগবানের ইচ্ছায় দুটো ভাতের অভাব ত' নেই। তা ছাড়া মা-মরা  
কাচাকাচাগুলোকেও মানুষ করবে, আমারও দুটো ভাতজল করবে।

মনে মনেই বললাম হুঁ, তুমিও ভগবানের ইচ্ছা মান দেখি!

প্রাণকেষ্ট বলে চলে, তা কুলিখানার সর্দারকে বলেছিলাম কথাটা।  
সে আমার গেরামের লোক। আমাকে খবর দিল তার সন্ধান মেয়ে  
আছে। তবে সে বিধবা নয়, তার স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে,  
মা-বাপের এমন সঙ্গতি নাই যে মেয়েকে পায়ে। তা আমি বললাম,  
মা-বাপ এসে থাকলে আমার কোন আপত্তি নাই। ইঁা বাবু বুঝলেন  
কি না, আগের পক্ষের সঙ্গে মেয়ের ছাড়াছাড়ি মানে একেবারে  
ডায়ামিটার হয়ে গিয়েছে।

ডায়ামিটার! সে কি?

স্তম্ভ একেবারে হো-হো করে হেসে উঠল, এঁা প্রাণকেষ্ট  
একেবারে ডায়ামিটার? সেই মেয়েকে তুমি পছন্দ করলে?

—তাতে আর কি বাবু, আগের পক্ষের সঙ্গে যখন কোন সবন্ধই  
নাই। ও, বুঝলাম। ডায়ামিটার অর্থাৎ ডাইভোর্স।

প্রাণকেষ্ট স্তম্ভের হাসির প্রস্তুত অর্থ জলদগম করতে পারে নি।  
যাক্ গে, কি-ই বা লাভ হবে এই ভুলটুকু শুধরে দিয়ে। তাই আর  
কিছু বললাম না।

কথা পাকাপাকি হয়ে যায়নি তখনো, বলল প্রাণকেষ্ট, এই গত  
শ্রাবণ মাসে হঠাৎ এক দিন দুপুরবেলা আশিস থেকে কিরে এসে দেখি,  
এক জন মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে বলে আছে বেলা ছটা  
থেকে। কি ব্যাপার? কারও আসার কথা ছিল না। সে  
মেয়েই আমাকে শুধালো, আপনায় জগেই কি কুলিখানার সর্দার  
মশাই পাত্রী খোঁজ করেছিলেন?

আমি ত' তাজব বনে গেলাম, ইঁা কিন্তু আপনাবা বিশ্বাস  
করতে চাইবেন না বাবু, সে মেয়ে নিজেই বলল 'আমায় আশ্রয় দিন,  
মা-বাবাকে বিচান দর্য করে।'

একেবারে আমার পায়ে হাত দিতে আসে। আমি ত' ইঁা-ই  
করে উঠলাম। বললাম, বেশ থাক। সত্যি বলছি বাবু ও, ওর মা-  
বাবা সবাই যদি এমন থাকতে চাইত আমি মানা করতাম না। সে  
নিজেই বলল, 'না এমন থাকতে পারিনি, আপনি সত্যি করে আমার  
বিয়ে করুন, মা-বাবাকে আসতে আজই চিঠি লিখে দেব, আমি  
অনেক কষ্ট করে এসেছি, দর্য করে একখানা পোষ্টকার্ড দিতে পারেন।'

আমি ততই অবাক হছি বাবু, এ মেয়ে তাহলে ত' লেখাপড়া  
জান। আচ্ছা বাবু, আপনাবা বলুন, সে ত আমার চেহারা, ঘর-বাড়ী  
বাচাকাচা সবই নিজের চোখে দেখল। তবে কেন এই বুড়োকে  
যেচে বিয়ে করবার জন্তে সাধাসাধি করল? আমার বিয়ে করাতেই

কি অস্বাভাবিক? আর এই গুরু মেয়েটিকে ঘরে ঠাই না দিলেই কি হার হত? আপনারা বিধান মানিব, বিচার করে বলুন।

আমি আর স্তম্ভ জিজ্ঞেস করলাম—কেন এই নিয়ে কি গোলযোগ হয়েছে কিছু?

প্রাণকেই উত্তর দিল, ঠা। বাবু হয়েছে, কিন্তু বিয়ে এখন করেই ফেলছি, আর ত ফেলতে পারিনে?

কথা বলতে বলতে আমরা অনেক দূর এসে পড়েছি।

প্রাণকেই বলল, ঐ যে বাড়ীটা দেখছেন বাইরে কলাবাড়ী। এটে আমার বাড়ী। চন্দ্র-বাবু, গরীবের বাড়ীতে একটু চা খেয়ে আসবেন।

এই ত চা খেয়ে বেরোলাম, এখন আর নয় প্রাণকেই, আর এক দিন আসা যাবে। তুমি চট করে চান্দ-চাঁদের একটা নিয়ে এস। আমরা এখানেই একটু পায়চারি করি—স্বস্তি বলল।

প্রাণকেই চলে গেল।

দুঃখ তোমার প্রাণকেই, ভাই স্বস্তি! আমার আশ্চর্য লাগছে। এত বিচিত্র রকমের ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে! কিন্তু সত্যি কি তুমি মনে কর ওর ফীলি নেই?

আমার ত-তাই মনে হয়। নইলে যে মেয়েগুলো ওর জীবন থেকে খসে পড়েছে তাদের জন্তু ওর মনে কোন দাগ নেই কেন?

কে বলল দাগ নেই স্বস্তি! আমার ত মনে হয়—

কথা শেষ করতে দিল না, স্বস্তি থামিয়ে দিয়ে বলল, ছোট ইজ এনাফ, ঐ দেখ এসে পড়েছে। চল এবার ফেরা যাক।

প্রাণকেই অসুযোগ করতে লাগল, আপনারা গেলেন না?

ঠিক আছে, এবার এসে যাব, বললাম আমি।

আর গিয়েছেন, এ স্ত্রীযোগটা হারালাম। জানেন বাবু, নতুন বৌ আমার খুব বড়-আস্তি করে।

বেশ ত, ভাল কথা। তবে এই যে কিছুক্ষণ আগে কি বলছিলেন অপরাধ টপরাধ?

ঠা সে পাতকের কথা আর বলবেন না। চেহারা যদি দেখতেন তাহলেই বুঝতেন, এ আমাদের ঘরের মেয়ে নয়, ভ্রমলোকের ঘরের।

তা তুমি কি অভয়?

না, তা বলছিলেন, দেখ আরও গুরুতর। বলি শুধুন। আমি ঘণাক্ষরেও এর বিন্দুবিদগ্ধ জানিতাম না। মেয়ের মা-বাবা এল চিঠি পেয়ে। দিন স্থির হল।

সন্ধ্যার লগ্ন। সামান্যই আয়োজন। আমারই দু-চারজন চেনা-জানা লোক উপস্থিত আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিয়ে ত

হবে, বিয়ে পড়াবে কে? পুরোহিত কোথায়? মেয়ের বাপ বলল, সে সব ভারতে হবে না। আমি মনে করলাম, ওদের সঙ্গে যে দু'জন লোক এসেছে, হবেও বা, তারা কেউ পড়াবে। ছান্দা তলার বসেছি, ওর বাপই মন্ত্র পড়ে বিয়ে দেওয়া। বাবু ওরা বামুন!

শেষের কথাটা বলতে বলতে বুদ্ধ প্রাণকেইর স্বরে আতঙ্কের আভাস ফুটে উঠল। বলল, বিয়ের আগে যদি জানতে পারতাম! সকাল বেলায় বাগানের সকলে এখন কথাটা শুনলো আমায় ত গালমন্দ করতে লাগল। আমি আর কি করব বলুন? বিয়ে এখন হয়েই গিয়েছে। কিন্তু বাবু, মহাপাতকের কাজ করেছি। আমি সাহা হয়ে বামুনের ঘরের মেয়েকে বিয়ে করলাম! ছি, ছি!

অমূল্যচান্দা স্বপ্ন হয়েছে বুড়োর।

তাতে আর কি হয়েছে, আজ-কাল ও-রকম কত হচ্ছে, অনেকেই জাত-যাত মানেন না। এত ভাববার কি আছে? সাদ্ধা দিয়ে বলল স্বস্তি।

না বাবু, আগে যা করেছি, করেছি। সে নিজের একান্তের মধ্যে ছিল। কিন্তু—আমি ক্ষম করে বলে ফেললাম—তবে বোধ হয় এত দিনে তোমার কৃতকর্মের ফল ভোগ হচ্ছে।

হঠাৎ কি রকম যেন রুঠ হয়ে উঠল প্রাণকেই। পরক্ষণেই আতঙ্কিত ভাবে বলল, ঠিক বলেছেন বাবু, হয়ত তাই। কিন্তু আমি ত ইচ্ছে করতে বা জোর করে এ মেয়েকে ঘরে আনিনি, সে আপনি এসেছে, তাতে আমার অস্বাভাবিক কি, বিচার করুন।

একটু থেমে আবার আস্তে আস্তে সহজ ভাবে বলল, বুঝলেন বাবু, যা মেয়েকে বলে তুই এ কি করলি? জাত খোয়ালি বলে আমিও কি শেষ বয়েসে ওদের হাঁড়ি হৈসেলে খাব? কান্নাকাটি করে : মা আলাদা রেখে খায়। মেয়ে কিন্তু আমায় খুব বড়-আস্তি করে।

কথা বলতে বলতে প্রাণকেইর মুখখানা প্রসন্ন হয়ে উঠেছে, এ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, যদিও অন্ধকারের দক্ষণ মুখখানা ভাল ভাবে দেখা যাচ্ছিল না। ওর এই প্রসন্নতা আমাদের দু'জনকেই বিস্মিত করল।

ওর জীবনের বিচিত্র ঘটনার ভীতের কথাই মনে পড়ছিল আমার থেকে থেকে, লালমাটি ছেড়ে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। আচ্ছা এখন কি করে সম্ভব বলতে পার স্বস্তি, জিজ্ঞেস করলাম আসার দিন গাড়ীতে উঠে, প্রথম জীবনে যে নিজের বৌকে সায়েদের বাড়ী স্বয়ং পৌঁছে দিয়েছে অল্পান বদনে টাকার লোডে, আজ সে উঁচু জাতের মেয়ে বিয়ে করে এমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে কেন?

ওটা প্রেক্ষুডিস ছাড়া কিছু নয়, বয়েস হয়েছে ত!

শুধু কি তাই? হবেও বা!

## কৃষ্ণ

### শ্রীপ্রজ্ঞেশকুমার রায়

কৃষ্ণমেঘে তুমি কৃষ্ণ,

অন্ধকারে তুমি কৃষ্ণ,

কৃষ্ণ তুমি সূর্য্যের রাত্রিতে,—

সবার অন্তে কৃষ্ণ,

কৃষ্ণ তুমি সবার আদিত—

আদি-অন্ত-হারি স্বর

বাজে কৃষ্ণ তোমার বাঁশিতে।



বসুমতী—ভাড়া

দেখুন! অন্ধকী প্রানলাইট  
সাবানেই এসব কাজ  
হয়েছে!

অতিরিক্ত ফেণার দরকার  
এ সম্ভব হয়



সাঁ ন লাই ট  
সাঁ বা ন

জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে





# পঞ্চতপা

আন্তোষ মুখোপাধ্যায়

১২

নরেন এবং সাহনা দুজনারই ভিতরে ভিতরে কিছু একটা আঁস হয়ে গেছে যেন। চিক ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে কথায় কথায় একদিন যে অবস্থির মুখোমুখি হয়েছিল, মনে মনে তার জন্ত দুজনেই কুণ্ঠিত তারা। সেটুকু মুছে ফেলার ব্যগ্রতাও তাই দুজনারই সমান। হাসিমুখি চপলতার মধ্যে পরস্পরের মনোবরণের স্বপ্ন আগ্রহটুকুর প্রকাশ নেই, অমুভূতি আছে।

সাহনা ভাবে, ভাগ্যে মাসির বাড়ি গিয়েছিল, নইলে কি লজ্জা, কি লজ্জা। ও লজ্জা বৃষ্টি আর জীবনে কাটবে ওঠা যেত না। মনে মনে সঙ্কচিত নরেনই বেশি। কি না কি কথা একটা, তাই শুনে একেবারে দেউলের মত ওদের বাড়ি থেকে উঠে এসেছিল। নিজের সেই দৈন্ত ওরও বিষম লজ্জার কারণ।

কিন্তু মাসির বাড়ি গিয়েছিল বলে আজ নরেনই মনে মনে খুশি বেশি। এই বাঙ্কিত আশপের দরুনই নয় শুধু। সেভমাসে মেয়েরা বদলেছে অনেক। নতুন সবুজের মত ফিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আবার। গোড়ায় যে মেয়ে মড়াইয়ে এসেছিল তেমনি। বয়স তার থেকেও বেশি। মাঝখানে ওই উজ্জ্বল প্রাচীর নারীচেতনার কানায় কানায় বাঁধা পড়ে আসছিল। কামা তাইই। কিন্তু ওই থেকেই এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা এসেছিল। সশয়ও।

কিন্তু সে অখ্যায় একেবারে মুছে গেছে এখন। চেতনার বাঁধ ভেঙেছে। নিজেকে আগলে রাখার কারিগরী ভুলেছে। সেভমাসের শূন্যতা ভরাতে তিনগুণ উপছে উঠছে। হাসে গল্প করে, হৈ-চৈ করে। বাগালে রাগে, চোখ রাঙালে ডবল চোখ রাঙায়। বেড়াতে বেরোন দুজনে। পুরানো জায়গায় নতুনের ছোপ লাগে। শাল-মহুয়ার দিকে যায়, পাহাড়ের দুর্গম কোনো পাথরে ওঠার ভীত চেষ্টায় হেসে আটখানা হয় নিজেই, একসঙ্গে চা খেতে আসে তুতুবাবুর লোকানে। নরেন বাবু কত প্রশংসা করে তুতুবাবুর, তার কাল্পনিক ফিরিস্তি দেয় গম্ভীর মুখে। লজ্জার স্বপ্নে গলভে থাকে তুতুবাবু। তাই দেখে হাসি চাপা দায় হয়ে ওঠে নরেনের।

সাহনার অগোচরে নরেন চেয়ে চেয়ে দেখে এক এক সময়। নতুন করে আবার কাঁচা বয়সের যাহ্ন লেগেছে ওর মধ্যে। বা এই মড়াইয়ে আর এই মড়াইয়ের পাহাড়ী পরিবেশেই শুধু মানায়।

বলেও ফেলে, ভাগ্যে জায়গাটা এরকম, অল্প কোথাও হলে পড়ে যেত !

নিরীহ মুখে পাঁচটা প্রশ্ন করে সাহনা, যিন্মী মেয়ে বলত ? না পেয়ে হেসে ওঠে।—আগে বা ছিলুম জানেন না, তড়ন্তি গাছে উঠতাম বলে মাসের হাতে কম কিল খেয়েছি !

চেষ্টা করলে এখনো পাঠো বোধ হয় গাছে উঠতে।

না, এখন আর পারিনে, মোটা ধুমসী হয়ে গেছি।

নিজের সম্বন্ধে অমন একটা বিশেষণ প্রয়োগের আনন্দেই তারা হেসে সারা। কতটা মোটা হয়েছে নরেন পরীক্ষাতক চোখে তাকিয়ে দেখে চেয়ে চেয়ে। তৎকর্ত একটা অমুভূতি হাসি চাপা নিয়ে হয় তাকেও।

নরেনের খুশি হওয়ার আরও একটা কারণ আছে।

অবনী বাবুর মধ্যেও কিছু পরিবর্তনের আভাস পাচ্ছে সে।

থেকেই এই বাড়িতে তার অবস্থিত আনাগোনা। অবনী বাবু পাঁচ থাকুন আর নাই থাকুন, যখন খুশি এসেছে, যতক্ষণ খুশি থেকেছে কিছু বিনোদের আঁচড় পড়তই একটা দৃষ্টা। ভুললোক কি ভাবেন কি না, মনে মনে অসন্তুষ্ট হন কি না কে জানে ! যিনি নরেনের মন থেকে এখন সে সশয়ও গেছে। কোন কারণ নেই তবু গেছে। ওর এবারের এই আসা যাওয়া এবং মেয়ের সঙ্গে মজা মেলামেশায় ভুললোকের একটুখানি সন্দেহ প্রশ্রয়ও আছে। কেন করে নরেন যেন সেটুকু উপলব্ধি করেছে।

অমূল্য অবকাশ পেলে সাহনাকে ও নিজেই হয়ত বলা উজ্জলতার মুখে ওর বলাটা না হালকা হয়ে ভেসে যায়। যা আশ্রয় বলবে। সাহনা থাকুক, শান্ত হোক একটু। তখন বলবে সন্ত অববোধ ভাঙা জটিলীর সঙ্গে ওর তুলনা চলে এখন।

কিন্তু বেজায় রাগ হয় নরেনের এই অকাল বৃষ্টির ওপর। কল দরুন ডায়ের কাঁজে বিষ হুজ্জ বলে চিন্তিত হয়ত হয়েছে, কিন্তু রাগ হয়নি কখনো। এ যেন এক গম্ভীরতার আমিল। মিনকতক কি বেশ। আবার শুরু হয়েছে। সময় নেই অসময় নেই যমযমি নামসেই হল। আশিপের পর বর্ষাতি নিয়ে অবজ্ঞা হাজিরি নিয়ে পাবে। দিচ্ছে না এমনও নয়। কিন্তু সাহনাই হয়ত চোখ বড় করে বলে ওঠে, এই বলে কি কাণ্ড ! কি কাণ্ডের সন্কেটা উঠতে না উঠতে জলের ছিটে কৌটা কোথাও লাগল কি না অবনী বাবুর হাতে সেই পরীক্ষার সন্কেটা। তাছাড়া বেড়ানো বর্ষা মিনকতক ওটাই মস্ত আকর্ষণ ছিল।

সকাল থেকেই সেদিন আকাশ নির্বেদ। বোধ উঠেছে কালোভেজা মুখে একপ্রস্থ হাসির মত। হুপূরে বোধ থাকল না ঠিক শীতকালের পড়ন্ত আলোর মত ভারী একটা মিষ্টি ছায়া পরে সর্বত্র। যে আলো আর যে হাওয়া বরুনো মনকেও বাঁচবে।

আশিপ ঘরের টেবিলে জীকার সাজ সরঞ্জাম কাগজপত্র রেখেই নরেন উঠে পড়ল শেষ পর্যন্ত। অনেকক্ষণ ধরে উপস্থিত ভেতরটা। বিকলে আবার শুরু হবে কি না এক পশলা কে জানে ! কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। আসলে ওই আকাশ, ওই বাতাস আর এক নিভৃতের দিকে টানছে ওকে।

সরাসরি এসে ট্রাক চাপল। যেন কোয়ার্টারস্‌এ উঠে ট্রাক ছেড়ে দিল। তার পর পা চালানো জেনারেল কোয়ার্টারস্‌এর দিকে।

বেশিদূর যেতে হল না। মুখোমুখি দেখা। সাধনা অবাক।  
ক' ব্যাপার, এ সময়ে এদিকে কোথায়?

সব ব্যাপারে গুর এই সহজ বিষয় নরেনের ব্যক্তি নয় খুব।  
দু' বিষয় হলে বরং খুশি হত। অত্যাঁহ হালকা স্ববেই জবাব দিল,  
দিকে অবনী বাবু নামে এক ভদ্রলোক থাকেন, যাঁজিলাম তাঁর  
দ্বি-...তা তুমি কি সুপারিশানে বেরিয়েছ?

জবাব না দিয়ে সাধনা তেমনি হালকা করেই পাঁচটা প্রশ্ন করল  
মাবার, অবনী বাবু নামে ভদ্রলোকের বাড়ি এখন যাচ্ছেন, আপিস  
নই?

—আছে। নরেন ঘটা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল একটা। দিনটা  
নয় ভালোমাত্র ভদ্রলোকে; কতবার হাতে এক পেয়াল চা খেয়ে  
মাসি।

তবে উঠল সাধনা। বলল, হাতের নাগালে ভুতুবাবুর দোকান  
হাটের এ পথস্থ আসছিলেন চা পেতে?

যে অবকাশের প্রতীক্ষা মনে মনে, তারই একটা হাতছাড়া হয়ে  
গল, নরেনও সেটুকু উপলব্ধি করল মনে মনে। আর কিছু না  
কর, শুধু বলতে পারত, ভুতুবাবুর দোকানে ভুতুবাবু আছে, ওই  
ভদ্রলোকের কন্ঠাট নেই বলেই এত পরিশ্রম আর পশুশ্রম।

বলি বলি করেও বলা হল না। সাধনা তড়বড়িয়ে উঠল, আমি  
কিন্তু এখন আর ফিরছি না, পাঁচ দিন ঘরে বসে দম বন্ধ, সেই সকাল  
থেকে বেরব বেরব কছি—ভুতুবাবুর দোকানে চলুন আপনাকে চা  
বাগোচ্ছি।

চা আর না হলেও চলে। সানন্দ-প্রত্যাবর্তন এবং অবতরণ।  
সাধনাও খুশি ধরে না। বলল, চমৎকার দিন কবেছে, না? চলুন  
হাটয়ে নাবব, চট করে চা খেয়ে নরেন, আমি ভুতুবাবুর পারায়  
ড গলে ডাকবন জোর করে। হেসে উঠল।

ভুতুবাবুর দোকানে ঢোকা হল না।  
—প্রার্থীর ভিড় সেখানে। এ আবহাওয়ায়  
যেহে অজুহাতে অনেকেই বেরিয়ে এসেছে।  
বা চুকতে পারত। আপায়ন করে ভুতুবাবু  
মাব ব্যবস্থাও করে 'দিত। কিন্তু আপিস  
ইমে সঙ্গিনী ওদের মধ্যে গিয়ে ঢোকা  
দখ অফিসারের সাজে না। সাধনাও বোকে,

আপনার কপাল মন্দ আমি কি করব!  
জবাব না দিয়ে মন্দ-কপালজনিত  
খখানি করে তুলতে চেষ্টা করে নরেন। লোক  
থাকলেও এ সময় ভুতুবাবুর দোকানে  
যে চুকতে ভালো লাগত না। এগিয়ে  
। মড়াইয়ে নামটা আপিসের কাজের  
গুরুত। নৈতিক না হোক বাহ্যিক কৈফিয়ৎ  
ছে।

মড়াইয়ের ধারে এসে সাধনা চ্যালেঞ্জ করল,  
কে আগে নামতে পারে দেখি।  
নরেন পাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, দেখ  
ভালো হবে না, জ্বলে জ্বলে যা হয়ে  
পড়লে ভুখন?

সে সম্ভাবনা আছে। তবু ছাড়াই পাঠা নয় সাধনা। চেস  
দিয়ে বলল, আচ্ছা ভীতু আপনি, হাত ধরে নামাবো?

নরেন হাত বাড়িয়ে দিল, ধরো না।

সাধনার উৎকর্ষ ছুই চোখ মুড়েরে জঙ্ঘা আটকে গেল তার মুখের  
ওপর। অননুভূত এক রোমাঞ্চের স্পর্শের মত লাগল নরেনের।  
ততক্ষণে ছুঁচার পা নেমে গেছে সাধনা। ফিরে দেখল আবার।  
বলল, তাঁর থেকে হাত পা না ভেঙে আপনি বরং একটা আঁছাড় থান,  
লোকে দেখুক। নামবেন তো নাহুন।

মড়াইয়ের সেই একটানা কর্মস্রোত। কিন্তু রোজই নতুন মনে  
হয় সাধনার। আজকের দিনটা আরো অদূত লাগছে। মড়াইয়ের  
গহবরে মেঘলা দিনের সর্গা জড়ানো ঠাণ্ডা বাতাসের ছড়াছড়ি। আর  
সাধনার মন তার থেকেও হালকা।

অনর্গল কথা বলছে। এখানে পাঁড়াজে, ওটা দেখছে, পাঁচ  
কথা জিজ্ঞাসা করছে। জবাব পেল কি পেল না 'খেয়াল নেই,  
প্রত্যাশাও নেই। মড়াইয়ে নেমেই পাগল সর্দারকে একবার বোঁজা  
অভ্যাস। কাছে দূরে ছু চোখ ঘুরে এলো আজও। দেখতে পেল  
না। দূরে কোথাও আছে। আজ আর কারো কাছে বাগো নয়  
কারো কাছে পাঁড়ানো নয়। মড়াইয়ের বাতাসের মতই হালকা হয়ে  
শুধু ভেসে বেড়ানো।

খেয়াল হতে দেখল, চানি: মেসিন চলছে যেখানে সেদিকটায়  
এগোচ্ছে তারা। ও আর এখন রণবীর ঘোষের আওতা নয়। আর  
কোনো কট্টাটারের হাতে গেছে। অদূরে একদল কামিন বুড়ি  
মাথায় পাথর কুঁচি সরাচ্ছে। এরই মধ্যে এক নজর দেখে নিল  
সাধনা। পাঁচ মিশালি বয়সের মেয়ে সব। ওদের দিকে চেয়ে  
চান্দমণির কথা মনে পড়ে যায় তবু। রণবীর ঘোষের পাশাপাশি  
ওকে দেখে অমনি দূরে পাঁড়িয়ে মেয়েটা সেদিন পাঁড়িয়ে পাঁড়িয়ে

G.V

ফোনঃ  
৩৪-৪৯০২

বিবাহে যৌতুক দানের  
আনন্দ একান্তভাবে  
আপনার; আপনাকে  
সেবা করার আনন্দ  
আমাদের।

**গিনি ভবন** মুজিব কুশলী  
পরিচালক ও স্বর্ননিপাতি  
১০২, বহুবাজার স্ট্রীট, কলি:- ১২

জাঃ ১-২৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৩  
(রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল)

হুঁ চোখ ভাঙ কবছিল ওকে। আজ অন্তত এসব আর মনে করতে চায়নি সাধনা। কিন্তু ঠাণ্ডামণি ওর মনে লগ কেটে আছে। না চাইলেও মনে পড়ে।

ছোট নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে চলল। পাশের লোকটা কথাবার্তা বিশেষ বলছে না। সেনিকেও খেয়াল নেই খুব।

চানি! মেশিন চলছে না এখন। লোকজনও বিশেষ নেই। কনভেয়ারের শেষ মাথায় অনেক উঁচুতে সেই ঘরের মত জায়গাটার দিকে চোখ গেল। কেনে ওঠার সুযোগ না পোলে ওই মইয়ের মত খাড়া সিঁড়ি বেয়েই যেখানে উঠবেই একদিন ঠিক করেছিল।

সাগরে বলল, ওখানে উঠি চলুন না?

—কোথায়?

—ওই যে উঁচু ঘরের মত, ওখানে।

নরেন বলল, ওখানে উঠতে গেলে পা হড়কে একেবারে বিকলপ দেখতে হবে।

যেন ছোট মেয়ের এক অসম্ভব আদার নাকচ করে দিল এক কথায়। ভুল কুঁচকে সাধনা মাটি থেকে কতটা উঁচু হতে পারে এক ওঠাটা একেবারেই অসম্ভব কি না তাই দেখতে লাগল।

ওদিকে নরেন দেখছে, মড়াই আজ ছোট বড় অনেক অফিসারকেই টেনেছে। অদূরে অ্যাডমিনিট্রিটভ অফিসার এবং আরও দু'তিনজনদের দল চোখোচোখি হল। সাধনাকে বলল, তুমি এখানে পীড়াও একটু, এগাও সব হাওড়া খেতে নামলেন কি না দেখে আসি।

সাধনাও এক নজর দেখে নিল তাঁর দর। বিশেষ করে বর্ণনার বাবাকে। কিন্তু এতদূর থেকে মাহুটটাকে দেখা যায় এট পৃথক। পায়ে পায়ে নরেন তাঁদের কাছে গিয়ে পীড়াল।

দশ মিনিটও নয়। ফিরল আবার। তাঁরা আর একদিকে চলে গেলেন। কিন্তু এদিক ওদিক চেয়ে সাধনাকে দেখল না কোথাও। বিমিত্র নেত্রে চারদিকে তাকাতে লাগল সে। মেয়েটা গেল কোথায়?

টুপ করে কাছেই ছোট একটা পড়ল কি। চমকে উঠল নরেন। উপরের দিকে চেয়ে বিমুদ। কনভেয়ারের সেই মাথা থেকে সহস্রাে উঁকি দিচ্ছে সাধনা!

নরেন ভয়ে দিশেহারা। চিংকার করে উঠল, ওখানে কি কচ্ছ?

তেমনি চিংকার করে জবাব পাঠালো সাধনা, বিকলপ দেখছি।

—লীগঞ্জির নেমে এসো! বখাৰ্শ্ব বেগে গেছে।

—লীগঞ্জির উঠি আসুন! বেগরোয়া জবাব।

—কি দস্তি মেয়েবে বাবা! তুমি নামবে কি না?

—আগনি উঠবেন কি না?

হতভাল হয়ে হাল হাড়ল নরেন। কীধের কোটটা আছড়ে মাটিতে কেলল সে। ভয়ে হুত্বিত্তার ঘেমে উঠছে। কিন্তু চকিতে আরো একটা ভয়ের কথা মনে হল। এই খাড়া সিঁড়ি ধরে ওঠা বত সজ্ঞা নাহা ভক্তো নয়। ওঠার থেকেও নামার সময় বিপদের সম্ভাবনা বিস্তার। ওর কথা তখন সাধনা যে নেমে আসতে চেষ্টা করতেন উত্তম। ভাড়াভাড়ি একজন কর্মচারীকে ডেকে নির্দেশ দিল কেন-কেন লাগানোর ব্যবস্থা করতে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল জালাদার। ওপর থেকে সাধনা হাসতে লাগল এতদূর।

একুনি নামতে হবে, ভাড়াভাড়ি চারদিক দেখায় মনে দিল সে হুঁচোর বেন জুড়িয়ে গেল। বিশ্বদণ না হোক অপকল্প বটেই। এত উঁচু থেকে কাছাকাছি বেঁধেবেবি দেখাচ্ছে এতবড় হুট্ট। ওপর আকাশ। নিচে বিজ্ঞান-পথে যুগ-যুগান্তের সাধনার বিচিত্ররূপ। সেই মহিমার সামনে হঠাৎ বেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল সাধনা।

এত উঁচু থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু দেখায় দিকে খুব মনে ছিল না। নইলে দেখত, একটা মেয়ে কোথায় উঠছে তাই চেয়ে এর দেখছে নিচের অনেকেরই। আর মড়াইয়ের গল্পের পীড়িয়ে পু থেকে দেখছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বালদ গান্ধীও। দেখছে না টি. শাড়ির আভাসে বুঝতে পারছে শুধু দুঃসাহসিক। কে।

কোনরকমে ওপরে উঠে ম্লির বার করে ধীপাতে লাগল নরেন। তাই দেখে আর একদফা তেলে উঠল সাধনা। নরেন ধমকে উঠে খামো! আর হাসতে হবে না। এতটুকু ভয় ডর নেই তোমাং?

অন্ত সময় হলে প্রত্যুত্তরে তেমনি করেই কিছু বলত। ম্লি যেখানে পীড়িয়ে আছে তার স্তব্ধতার ঘোর কাটেনি এখন। নিচের দিকেই চোখ গেল আবার। বলল, এতবড় অন্তরের মত পীড়িয়ে নিজের এক পীড়া ভয়ের কথা ভাবতেও লজ্জা।

নরেন ধী করে চেয়ে বইল তার মুখের দিকে। সেটুকু উপলব্ধি করে সাধনা লজ্জা পেল বেন। বলল, দেখলেন কি?

—দেখছি তোমার মাথা আর আমায় হুট্ট।

তেলে উঠল সাধনা। হুট্টই পাল। চলুন।

কেন-কেন আসতে দেখে আবারও ছেলেমানুষের মতই গুণি হয় উঠল সে। ওতে করে নামবে, ভাবতেও রোমাঞ্চ। হাত ধর মনে কেনে এ ওঠালো তাকে। কেনে ঘুততে লাগল। বেন বাহাস মিত্র চলেছে তারা। সাধনার মনে হল শব্দবের দস্ত সব সচলিয়ে প বেতে নামছে।

ছোট কেজ। ওর পা বৈদে পীড়িয়ে আছে নরেন। হাতে হা লাগছে। কাঁধে কাঁধ ট্রেক বাজছে। খাড় কিরিয়ে চাল জানল এটা সেটা জিজ্ঞাসা করছে বখন, ওর নিঃশ্বাস এসে লাগছে গালে মুখে

একটা বলল উচ্ছ্বাসে বিগল বলে নরেন ভিতরে ভিতরে নিঃশ্বাস করে বাখল সাধনকণ।

কেজ তুমি শশ কদল।

বিকল আরা এক নিবিড় হুট্ট।

কেজ থেকে মাটিতে পা কোবার সঙ্গে সঙ্গে এক বিপন্নিত বাজার স্তব হুত্বনেই।

হঠাৎ হুত্বের একদিকে সামাল সামাল বব উঠল একটা লোকজন যে বার কাজ ফেল উৰ্দ্ধ্বাসে ছুটল সেই দিকে। চিংকার, ওচামেটি, হটগোল। এত লোক হুত্বিয়ে কি মড়াইয়ে, এমনতে বোকা বার না। ওপর থেকেও স্তব্ধতায় লোক নেমে আসছে।

সমিত কিসতে নরেনও আর একটি কথাও না বলে প্রায় সোঁপে চলল সেদিকে।

সাধনা দেখানেই পীড়িয়ে। মড়াইয়ের এই বিভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ত চেয়ে। এই কোলাহল জানে।

আব্বাসিডেট হয়েছ।

সাধনা আড়ট। আর্ট আব্বাসি। কি হল? কার দল

হল? কিন্তু এক পা নড়ার ক্ষমতা নেই। বস্তাবার বস্ত হুটিনার কথা শুনেছে, একই অবস্থা। চোখে দেখা বুঝে থাক, নির্ধম কিছু কান এসেও ভিতরটা ঘুলিয়ে ওঠে থেকে থেকে। কিন্তু না দেখুক, নাভানা বা নাশানা পর্যন্ত শাস্তি নেই।

কি হল? কে গেল? ক'জন গেল?

পিদপিল করে লোক জমছে এখানে। মড়াটোয়ের ওদিকটা কালো মাথার কালো হয়ে গেল। তবু লোক আসছে। হটগোল বাড়ছে।

হুটিনার বিবরণ জেনে আবার ফিরেও যাচ্ছে কেউ কেউ। পায়ে পায়ে এগোলে সামান্য। জনা দুই লোক ওর সামনে সামনি আসতে ঠাড়িয়ে পড়ল। মুখেই শিকে চেয়েই লোক দুটো বৃকল, জানতে চায় কি হয়েছে। তাতা জানাল, পাথর চাণা পড়েছে একজন। পেয়ার পাথর—সঙ্গে সঙ্গে শেষ।

সামান্যর চোখে বোকা হাস। বোকা প্রশ্ন। অর্থাৎ, কে? আমি কেমন? আমি তিনি?

—চোপুন। নিজের থেকেই জানাল তার, ভাল ভাল শাবের পাথর আলগা হয়েছিল, বোকোর মত তারই তলার মাটি কাটছিল লোকটা। সবাই বলছে, ইসলামী মাথা ঠিক ছিল না ওর—ওরর বড়ো সর্দারটা কপাল চুকে বক্ষাবন্ধি করতে একবারে—

নিম্ন সবিয়ে, মরবদাষ্ট পাথর নড়িয়ে, দলপাকানো দেহটা সবিয়ে ফেলার পর এক ঝাঁক চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এসে ওঠ এক কথায় বলল কুলিবাবু।—নিজের লোহেই গেল তার লোকটা, ওই পাথরের নিচে বসেই তলাকার মাটি সরেছিল—

চুপচাপ ঠাড়িয়ে বালল গাখুলি অস্ত্রমনোবর মত ভাবছিল কিছু। নাহিল সেই প্রথম দিনের কথা। বড় স্বজাতি পরিজনের সেই জিহাও বিবেচকের জবাবে পাথর পাড়িয়ে এটী এককনের সামনা-সামনি বুক ফুলিয়ে ঠাঁড়ানো। সেদিন মড়াটী-ঘেরা গোটা পাহাড়টার

মহা শক্ত নিটোল মনে হয়েছিল একে। আরকের এটী শেষ দেখলে কে বলবে একবারিও হাড় ছিল ও পেতে।

হেঁচো খাটো এমন হুটিনা মড়াটোয় কারো অনেক ঘটেছে। কাজের তাড়ায় সে বিশেষত্ব কাটিয়ে ওঠাও শক্ত হয়নি খুব। কিন্তু চারদিকে চেয়ে আজ বালল গাখুলির ক্রমেন মনে হল এটী একটা অপব্যয় অস্ত্রের উদ্দেশ্যকে যেন খেঁতলে দিয়ে গেল। বালল গাখুলি নয়, চিক ইঞ্জিনিয়ার সচেতন হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ। কুলিবাবুকে আদেশ করল, সোবের কথা পরে হবে, জটলা বন্ধ করে এখন সব কাজে যেতে বলুন, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, আর এক মিনিটও নয়!

কিন্তু কখনো কে? কাজ দার্য করবে তারা কক্ষপও করল না। বরং ক্ষুব্ধ হল। অসন্তুষ্ট হল! জাতের অধর্ক লোক যুক্তসংঘের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। বারো আছে, তারাও

জায়গার জায়গার গোল হয়ে দুটির মত বসে। কুলিবাবুদের হুট অস্ত্রশাসনে কাউকে নড়ানো গেল না। উদ্ভেট এটী সময়ে এভাবে কাজের তাড়া দেওয়াটা প্রায় নির্ধম মনে হল ওদের সকলের কাছে।

সামান্যর কাছেও। অল্পের এসে ঠাড়িয়েছে কখন। আজ্ঞারতার বোর কাটেনি। স্তব্ধ, বিবর্ণ। নিজের অগোচরে দু চোখ খুঁজছে কাকে। খুঁজছে পাগল সর্দারকে। তাকে দেখল না। দেখল এদের। দেখল কলের মানুষ চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে। বেদনাবিহ্বল হুটতে এ নিশ্চিন্তা নির্ধম মনে হল শুধু।

চোখে চোপ পড়তে সোজা ফিরে চলে।

হুটিনার প্রসঙ্গে অবনী বাবু হুৎ করলেন। মনেনও অনেক কথা বলল। কিন্তু সামান্যর মুখে কথা নেই একটিও। পাগল সর্দারের কাছে যাবে ফেরেছিল। বাসনি। যেতে পারেনি। চাক্ষুণির অস্ট্রের পরে গিয়েছিল। কিন্তু এবারে পারল না। সোবের শিকে সামান্যর মন বিকল হয়ে উঠেছিল চোপনের ওপর। ওর বিসদৃশ আচরণ দেখে ত্র পেয়েছিল। আরো ত্র পাইরে দিয়েছিল জুজুবাবু। কিন্তু...

ধমকে গেল। নিজের ভিতরটাই দেখতে চেষ্টা করল যেন। এটী কি চেয়েছিল? আর্ড আকৃতিতে শিউবে উঠল প্রায়। না, এ সে চায়নি, কোনদিন চায়নি!

পাগল সর্দারের কাছে যেতে পারেনি। কিন্তু মড়াটোয় এসেছে পথের হুটিনাই।

সর্দার আসেনি। ওর সঙ্গে আরো বিশ ত্রি জন আসেনি। কাজ শুরু হয়েছে আবার। সামান্যর মনে হয়েছে এই কালো মানুষদের কাজের মাথা যেন শ্রাণ নেই আর। চিক ইঞ্জিনিয়ার এসে তত্ত্বাবধান করে যাচ্ছে, কুলিবাবু তাগিদ দিচ্ছে। ভাই ওঠা, তাই কাজে লাগা।

ততীয় দিন পাগল সর্দার এলো। বাকি সকলেও। ওর আসার সঙ্গে সঙ্গে কলের মাথা যেন নতুন করে শোকার ছায়া

ফোন  
৩৪-৫০০২

সবরুটি সম্রাট  
সুন্দর আলফার

এক মাত্র  
জিনি সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুত কারক

জুয়েলাস  
**কে.এল.সিংহ এণ্ড সন্স** (KLS)  
১৬৭ বি.বহু বাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

নামল আবার। কাজে ছেদ পড়ে গেল। যারা কাজে লেগেছিল, কাজ বেলে তারাও আত্ম আত্ম জড় হল এসে।

অনুরে দাঁড়িয়ে চূপচাপ দেখছে সাধনা। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অসন্তোষ দেখছে। কুলিবাবুরের ত্যাগ দেওয়া দেখছে। তারা বলছে, যারা কাজ করবে না তারা বাড়ি যাও, যখন কাজ করবে তখন এসো। এখানে এসে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার অর্থ কী?

সাধনার ইচ্ছে হল চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে গিয়ে বল, যে লোকটা গেছে সে ওদের গায়ের মাঁষির ছেলে আর পাগল সর্দারের বৃকের পাজর। ওদের এতবড় শোকে এটুকু ব্যতিক্রম ডামের কাজের এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

কিন্তু ক্ষতি হোক না হোক তাগিদ দিয়ে ফল কিছু হল না। বরং ফোত বাড়ল ওদের। এক জায়গায় ভিড় না করে বিচ্ছিন্ন ভাবে কাছে দূরে যে যার দাঁড়িয়ে রইল বা বসে রইল চূপচাপ। দূরে একদিকে টহল দিচ্ছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার। সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আছেন, আরো কেউ কেউ আছে। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের চাপা অসহিষ্ণুতা তাঁদের উত্তেজিত করণ।

পায়ে পায়ে পাগল সর্দারের দিকে এগলো সাধনা। এ ছদ্মবেশ তার ভিতরেও পরিবর্তন এসেছে একটা। উচ্ছলতার বদলে আবার সেই অন্তর্মুখি মনের গতি। স্থির, শান্ত, পরিণত।

সর্দার ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। পরে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল একবারে। ওকে আর কখনো কীদতে দেখেনি সাধনা। মেয়ে হারিয়েও না। বোবা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল সাধনা।

খানিক বাদে শান্ত হল পাগল সর্দার। উদ্ভূত হয়ে হাঁটুর ওপরের আঁখানা কাপড়ে চোখের জল মুছে ফেলল। পরে একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হোপুন চলে গেল দিদিয়া—!

সাধনা বলতে পারল না কিছু। একটা সাধনার কথাও না। চূপচাপ তার পাশে বসল শুধু। কাছাকাছি বারী ছিল, দূরে সরে গেল আর একটু।

সর্দার আবার বলল, বাবুরা সকলে বলতে লেগেছে, হোপুন বোকা ছেল—পাথরের লিচে বসে মাটি কাটতে যেয়েছিল—কিন্তুকি হোপুন মরল ছেল, কুছুতে তার ডর লাগত না!

—আমি জানি সর্দার। একটু থেমে প্রায় মুখোমুখি ঘুরে বসল সাধনা। কিন্তু তোমরা হাত পা গুটিয়ে বসে আছ কেন? কাজ কছ না কেন?

মুখ দেখেই বোকা গেল, এই ব্যথার মুহূর্তে ওর মুখে এরকম কথা আশা করেনি সর্দার। মুহূর্তের জন্ত তার চোখে যেন অবিশ্বাসের ছায়া নামল একটা। বলল, তু উদের মতন আমাদেরকে কাজের ত্যাগ দিস লা দিদিয়া।

—না, ওদের মত দেব না। কিন্তু যে কাজ করতে করতে হোপুন মরে গেল সেই কাজটাই তোমরা বন্ধ করে বসে আছ?

দিদিয়ার এমন শান্ত কণ্ঠস্বর পাগল সর্দার আর শোনে নি কখনো। কিন্তু আজ তার এই ক্ষতর সঙ্গে খানিকটা খেলও মিশে আছে। জবাব দিল, তুরা ভদ্রজন আছিস দিদিয়া, আমাদিগের দুঃখ তুরা বোঝতে লাড়বি—এই ডাম হব কিন্তুকি হোপুন আর কিরবে লা—উ চলে গেল—উ মরে গেল—আমাদিগের দুঃখ তুরা বোঝবি লা দিদিয়া।

চূপচাপ অনেকক্ষণ। তারপর তেমনি আন্তে আন্তে সাধনা বলল আবার, দুঃখ না বুঝলে তোমরা কাছে এলাম কি করে সর্দার!... এই তিন দিন তোমরা কাজ বন্ধ করেছ, এই তিনদিনই হোপুন মরে আছে—তোমরা কাজ শুরু করলেই সে বেঁচে উঠবে। এই ডাম হয়ে গেলে চিরকাল বাঁচবে হোপুন, কোনদিন মরবে না। গলা ধরে আসছিল সাধনার। একটা উদ্গত অল্পভূতি চেপে আন্তে আন্তে উঠে দাঁড়াল। বলল হোপুনের আগে আরো অনেকে এখানে জীবন দিয়েছে... হয়ত আরো দেবে, কিন্তু কেউ তারা মরবে না সর্দার, বতকাল এখান দিয়ে জল যাবে ততকাল বাঁচবে তারা। কাজ করোগে যাও সর্দার।

পায় পায় ফিরে চলল সাধনা। কিন্তু পাগল সর্দার বিহ্বলের মত দেখাচ্ছে ওকে। দুচোখ টান করে দেখছে। নিজের জরা সারয়ে আর মর্মচ্ছন্দী বেদনা সারিয়ে দেখছে। তার কানো মুখ চকচকে দেখাচ্ছে আবার। নিজের অগাচরেই উঠে দাঁড়াল। তাকাতো চারিদিক।

—আই! হুই—কামি চালা কানা!

সমস্ত শক্তি উজাড় করা কণ্ঠস্বর। মড়াইয়ের খোলা বাহাস পর্বন্ত গমগমিয়ে উঠল যেন। বাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল কাছে ব লোক, দূরে লোক, নাজেহাল কুলিবাবুর। সহকর্মী পরিবৃত বাদল গাঙ্গুলিও।

বিকেল। বাবা ফেরেনি এখানে। একটু বাদেই ফিরবে হয়ত। নরেন বাবুও আসতে পারে। কিন্তু যথেষ্ট আর ভালো লাগছে না। বাইরেও লাগবে না জানে। একটা গুমোট ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছে সাধনা অনেকবার। ভাবতে চেষ্টা করেছে। এমন লাগছে কেন? হোপুন মরে গেল তাই? মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। মনে সারাক্ষণই পড়ছে। কিন্তু হুণ্টনার বেদনাই নয়। আরো কিছু। আরো কি।

পিছনের দিকের নতুন পাহাড়ী রাস্তা ধরে আন্তে আন্তে এগোচ্ছে সাধনা। দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গায়। হুঁসাত বছরের একটা পাহাড়ী ছেলে আপন মনে খেলছে বেশ। মস্ত একটা সুপুড়ির খোলে দড়ি বেঁধে সড়সড় করে টেনে নিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে অজাবে বড় বড় গোঁটাকতক ইট পাথর চাপিয়েছে খোলের মধ্যে।

হঠাৎ এই-ই ভালো গেল সাধনার। অগ্নমনস্ক হতে চেষ্টা করল ওর সঙ্গে সঙ্গে। সহজ হওয়া বা সহজ কিছু করার তাড়না। সোংসাহে এগিয়ে গিয়ে বলল, দাঁড়া, আমি টানছি তোকে।

নিজের হাতে ইট পাথর ফেলে দিয়ে বলল, নে, বাবু।

দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলল তারপর। ছেলোটা হাসতে লাগল হি হি করে। সাধনাও হাসছে।

বেশিক্ষণ নয়। অনুরের মাথায়টিকে দেখেই হাসি মিলিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে সকৌতুকে দেখছে চেয়ে চেয়ে। কাছাকাছি হতে বলল, দৃষ্টটা ভালই লাগছে দেখতে।

সাধনা ধমধমে গম্ভীর। একে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন পরিষ্কার হয়ে গেছে কেন বিগত কটা দিনের এই অসহিষ্ণুতা আর অসহিষ্ণুতা। হোপুনের ওই মর্নবাতী যুগ্মত্বকে প্রায় অসম্মান করেছে এই

হুদ—এই কলের মাছুব। যস করে জবাব দিল, পরিশ্রম সার্থক  
তা হলে।

এগিয়ে চলল। মুহূর্তের জন্ত থমকে গেল বাদল গাঙ্গুলি।  
নিযে জিজ্ঞাসা করল, কি বললে?

—বললাম, আপনার ভালো লাগছে যখন, আমার  
পরিশ্রম করাটা সার্থক হল। পিছন ফিরে তাকিয়ে ক্লক  
৫, বলে উঠল, এই ছোঁড়া, অত নড়িস কেন? বসে থাক  
চুপ করে, দেব উন্টে ফেলে।

দেখল আড় চোখে। মাছুষটা হাঁ করে চেয়ে আছে মুখের দিকে।  
জ্ঞ আরো কিছু বলতে চায় সাহসনা। আরো কিছু বলতে পেলে  
ঠাণ্ডা হয়। এমন কিছু যাতে লোকটার মনে হয় তাকে গ্রাহ্য  
র না ও। ঝাঁঝের মাথায় আর কিছু হাতড়ে না পেলে তার  
খাই টেনে আনল আবার। বলল, আপনার ভালো লাগলে  
পুনিও গিয়ে ওখানে বসতে পারেন, আমি স্বচ্ছন্দে টানতে পারি।

এইবার হয়েছে খানিকটা। হুঁচকার পা এগিয়ে গেল সাহসনা।

নিজের অভ্যাসে যেন পা ফেলছে বাদল গাঙ্গুলি। বিষয়ে,  
গীতুকে নির্ধাক খানিকক্ষণ। আমি...ওখানে বসব?

কষ্টের বললে ফেলল সাহসনা। গঙ্গার মুখে জবাব দিল, মুখ  
দকে বলে ফেলেছি, দয়া করে অশ্রাবধ নেবেন না।

অর্থাৎ, আমার যা বলবার বলেছি, এবারে আপনি পথ  
সেগতে পারেন। কিন্তু পথ দেখার বললে ওকেই দেখছে বাদল  
গাঙ্গুলি। নারী বোধের মহিমা দেখছে। বিব্রত মুখে হাসল  
একটু, কি ব্যাপার?

জবাব না দিয়ে সাহসনা এগোতে লাগল। স্পৃড়ির খোলে বাঁধা  
দড়িটা হুঁততে পিছনে ধরা। সড়-সড় সড়-সড় শব্দ হচ্ছে। ছেলেটা  
বসে আছে ধ্যান গঙ্গার মুখে। ঢালু পথ, টানতে কষ্ট নেই। আর  
টানছে সে খেয়ালও নেই বোধ হয়। লোকটার মুখে হাসির অভাস  
দেখে উষ্ণ হয়ে উঠছে আবার।

একটু অপেক্ষা করে বাদল গাঙ্গুলি অল্প প্রসঙ্গ তুলল। থাক,  
তোমাকে একটা কথা বলব ভেবেছিলাম। সেদিন মড়াইয়ে ওই  
এলিভেটরের ওপরে গিয়ে উঠেছিলে কেন?

ঈশ্বর ক্লক কেটে পাঁচটা প্রশ্ন করল, অস্থায় হয়েছে?

—হয়েছে। বিপদ হতে পারত।

—কি বিপদ?

—ওখান থেকে পড়লে তোমার আর চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেত না।

এরকম সুযোগই চাইছিল সাহসনা। শ্রদ্ধার স্নেহে জবাব দিল  
ভংকবাং, না গেলেই বা। ওর একটু পরেই তো পড়েছিল  
আর একজন, তারও আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু

এনবদ

অজস্র চিত্রকলা  
এলোরার ভাস্কর্য  
আগ্রার তাম্রমহল  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

**এস, সরকার এণ্ড কোং**

ফোন-৩৪-৩১৪০, হুগলী রাস্তা, গান্ধী নগর, গ্রাম-গিনিমার্ট

১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২  
২০৮, রাসবিহারী এডিনিউ • কলিকাতা-১২

— কিন্তু —

কিছুটা নিরুৎসাহ করিয়া কতকটা  
সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা না যায়—এমন  
কোন জিনিষ বিবল। বর্তমান সময়ে  
এইরূপ আপাতমনোহর, স্বপ্নহারী  
বিক্রী সস্তা জিনিষেরই বাজারে প্রচুর  
দেখা যায়। আমাদের চিরায়ত  
কলাবৈপ্লবের উচ্চ আদর্শকে এই  
আপাতমনোহরের মোহ স্বাভাবিক  
সময়ে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক  
দৃষ্টি রাখিবার দৃঢ় সংকল্প আমাদের  
আছে।

সত্যিকারের ভাল জিনিষের  
সমাদানের কোনদিন অভাব ঘটে না।  
তাই আমাদের নির্মিত অলঙ্কার  
সমূহের সৌষ্ঠব সাধনে এই আদর্শই  
আমরা অনুসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং



কায় কতটুকু কতি হল তাতে? অন্তত, আপনায় মনে কতটুকু লাগ পড়ল তার জগতে?

বীতরাণের তেতু পাঠ হল একতরফ। মড়াইয়ে বিগত তিন দিনের ঘটনাবলী মনে পড়ল। বিশেষ করে আজ দুপুরের ব্যাপারটা। হাসতে লাগল অল্প অল্প।—এই ব্যাপার!—তোমাকে আজ ওই সর্দার লোকটার কাছে বসে থাকতে দেখেছিলাম বটে, কি যেন বলছিলে...কি বলছিলে?

—বলছিলাম, তোমার লোক ঘরেই তাতে কি হয়েছে, তাকে তো সরিয়েই ফেলা হয়েছে চোখের সামনে থেকে—এখন বড় রাহুরেবের মেজাজ গরম হবার আগে তাকাতাকি সব কাজে লাগায়ে দাও।

হাই বলুক, সমলবলে সর্দার কাজে দেগেছে, নিজের চোখে দেখেছে। বাঙ্গল গাঙ্গুলি দুই দুই হাসছে তেমনি। বাড়ি কিবিরে লোকটাকে ডাকলো দুই একবার, ফেরল। পরে বলল, বুঝলাম।

হাজার ওপর আড়াআড়ি বড় একটা শুকনো গাছের ডাল পড়ে আছে। খেয়াল না করেই সাধনা পেখিরে গেল সেটা। বাঙ্গল গাঙ্গুলিও। চড়ি বাঁধা সুপুতির খোল আটকে বেতে ছেলেটা হাত চরে পড়ল। হুঁজনেই ওরা খুব পীড়াল। ছেলেটার হাতে লাগল বোধ হয় একটা, হাত বদতে বদতে সে কাল কাল করে চেয়ে হঠক ভাব সাধখির মিকে। সাধনা অশ্রুভরতের একশেষ। কিন্তু ছেলেটাকে ঘরার অবকাশ পেল না, তার আগেই ছুটে পালালো সে।

বাঙ্গল গাঙ্গুলির মজা লাগছে বেশ। নিশলক দুই-বিনিময়। শুকনো ডালটা সরিয়ে বাস্তা পরিষ্কার করে দিল। হুঁচার হাত টেনেই লড়িটা হাত থেকে ফেলে দিল সাধনা।

—দেখলে?

—খুব তুলে সাধনা তাকালো শুধু।

—ওই শুকনো ডালটা পথ আটকে ছিল।

—তাতে কী?

—বলছিলাম, এখন ওটা শুধু একটা বিষ ছাড়া আর কিছু নয়।

ঈষৎ উত্তপ্ত কর্তে সাধনা বলে উঠল, তা বলে মামুষও তাই?

—মামুষের শোকটাকে যদি অমনি করে চোখের সামনে কেলে বেখে দিই, তা হলে তাই।

সকোভে প্রতিবাদ করল, লোকটা মাটি-কাটা কুলি মজুর বলেই গুরুত্ব বলছেন, ভুললোক হলে বলতেন না।

হুঁচার পা চূপচাপ অগ্রসর হয়ে বাঙ্গল গাঙ্গুলি এবারে শান্তমুখে জবাব দিল, 'আমি নিজ হলেও বলতাম। ওই লোকটার মত আজ যদি আমিও অমনি খেমে যাই, একবারও চাইব না সকলে মিলে আমার নিয়ে একটা শোকের দেয়াল গড়ে তুলুক।—পাছটা হাতে করে সরিয়ে দিলাম, কিন্তু শোকটাকে তো আর হাতে করে সরিয়ে ফেলা যায় না—বায় কাজে ডুবে থেকে। কিন্তু তোমার সর্দার সেটা বুঝবে কি করে বলে, বোঝে না বলেই এ সময় কাজের তাগিদটাকে এত নির্মম বলে মনে করে। হাসল একটু, কিন্তু তুমিও তো দেখছি তার মতোই।

কিরে কিরে দেখছিল সাধনা। মনের সেই গুমেটা চাপ এবারে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। হাসলো লাগছে, ভালো লাগছে, আর কীক বুঝে এবারে বাস্তার লজ্জা যেন চড়াও করছে ওকে।

একটু এগিয়েই বাস্তাটা যেন কোমলতরঙ্গের দিকে তার গেল।

হুঁজনেই পীড়াল ভাব। খুব তুলে সাধনা যেসেই ফেল বসল, আমার মাথাও ওই সর্দারের থেকে বেশি উর্ধ্ব নয়।

নিজের কথাগুলো নিজের কাছেই ভালো লাগছিল বাঙ্গল গাঙ্গুলির। মেজাজ প্রসন্ন আরো। বলল, বাগটা একটু পড়েই দেখছি, বা বলছিলাম শোনো তাহলে—ওই ওর ভায়গায় এত কলকলো উঠবে না।

শেখের ছদ্ম অশ্রুশ্যামের কণার পাণ্ডা প্রভৃৎ তরল, সাধনা উঠলে কি করবেন?

—ওর উঠলে এই ডায়েম আসাই বক করে দেবে।

সাধনাও হাতের পাণ্ডা নয়। বলল, এই ডায়েম কখনো আপনাকে দিন হাত তাহলে আমাকেই পাহারা দিতে হচ্ছে।

বলেই ভয়ভির একশেষ। তরলোকের হাসিভর হুঁচক যেন ওর বুকের ওপর আটকে আছে। সত্য কথাই ভাববে হাসত কিছু বলার খোঁজেই হল। অন্তরত ভেবে বসলি। কিন্তু তনী মাহুঘটা হুঁচোখ পাহারার কাজ শুরু করেছে প্রায়।

আসন্ন সন্ধ্যার মজিরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বাঁচল। অন্তরত মিকে একবার চেয়ে কোন কথা না বলে চপল পায় সোজা বস্তির পথ হল সে।

মতকপ দেখা গেল একে, বাঙ্গল গাঙ্গুলি পাড়ির। ভয়প গন্তব্যপথ ধরল সেও।

অনেকটা এগিয়ে সাধনা পিছন ফিরে তাকালো একবার। হুঁচক জেসোভ লাগল তাবপর। কিন্তু খুব সচেতন মনে নয়... ভাবছে আর লজ্জা পাচ্ছে। নিজের ব্যবহারের কথা ভেবে লজ পাচ্ছে। কিন্তু আরো বেশি লজ্জা পাচ্ছে আর কিছু হেরে হোশুনের অমন আকস্মিক বৃত্তা মনে লাগ কেটে বসার মত। কিন্তু সেই বৃত্তার বেদনা শুধু নয়, এর ওপর আর কেউ অসহিষ্ণু কোভে এমন করে কাটাগো কেন এ কদিন কাটালো চিক ইঞ্জিনিয়ারের সেই দাত্তিক কর্তব্যপরায়ণ বরদাভ করতে পারছিল না বলে, সেই নিত্যাশ রুত্তা অসহ হযাই বলে।

...চিক ইঞ্জিনিয়ার না হলে আর কেউ হলে এমন হুঁচক সলাজ বিভ্রমায় ক্রুটি করে উঠল মনে মনে, হুঁচকি তো! বিশ্ব ভিত্তবে কেউ বলছে, হুঁচকি না।

মেজাজ আজ অন্তত মোটেই প্রসন্ন থাকার কথা নহে চিক ইঞ্জিনিয়ারের। ছিলও না। ডপুর্বে মড়াই থেকে উঠে আসি এসেই ছেড় আপিসের চিঠি পেয়েছে। এলপাট কমিটি হাজার দিনকণের নিশল। মাকে দিন পনের বাকি।

এলপাট কমিটি ডায়ের গঠন পরিদর্শন করবেন। আসন্ন আলোচনা করবেন। মতামত জানাবেন...আর, যোগ-ঢাকসাধার সিনেক্ট সক্রান্ত গোলযোগের ব্যাপারটারও নিশ্চয় করে যাবেন।

সরকারী কাজে এই পরিদর্শন নীতি জানা আছে। কিন্তু জান অফিসিয়াল এলপাট কমিটির হাতে এই শেখের দায়ির অণ্ড মনঃপূত নয়। চিক ইঞ্জিনিয়ারের সত্ততা এবং কর্তব্যপরায়ণতা ডিপার্টমেন্টেই ভালো জানে। বাইরের কারো জানার কথা নয়। আর, একত্রে এলপাট ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যস্থতা নিশ্চয়োজন।



গনে। মনের সহজ স্বেচ্ছা হলে তাকে বলছিল, বিকেলে বাড়ি আসতে, পরামর্শ আছে; কিন্তু একবারে ভুলে গেছে।

সচরাচর হয় না এমন ভুল। নিজের কোয়ার্টারের দিকে পা চালিয়েও ঠিক মনে পড়েনি। আপন মনে হাসতে তখনো। যোমকুন করতে কিছু। মিষ্টি কিছু। আগে এরকম বিমুগ্ধতার আভাস মাত্রে চোখ বাড়িয়ে সচেতন করতে নিজেকে। সেই নারী-বিশেষী বিবদাশ্রয়ীদের শেকল খুলে দিচ্ছে। অসহিস্যু বেবে যুহুর্থে সে প্রজন্মের দৃষ্টান্তে ছিন্নভিন্ন করেছে তারা। কিন্তু এটী এক মেয়ের কান্ড ওরা চার মেনেছে। আলোর ঘরে চারমানা কীটের মত অগোচরে আশ্রয় নিয়েছে। কবে চিকিৎসার নিকটে গিয়ে না।

চলতে চলতে একটা অবস্থার কথা ভাবছিল বাবল গাঙ্গুলি। প্রায় ফেলমাফুকের মতই ঢাকছিল, এই মেয়েটাকে ওর মা দেখলে হাতী ধুশি হত।

অত্যাশঙ্কী এইবার মনের কথা মনে হল কেমন। ওর সঙ্গে ওই বাপ মেয়ের ঘনিষ্ঠতার কথা। এ সব কোঁকরুল প্রকাশ করেনি কখনো। তবু জানে। কিন্তু এতদিনও কোন সম্ভাবনার আভাস পর্যন্ত পেল না কেন? ভুল কুটিল ভাবতে ভাবতে চলল। বোধ হয় সেটা সম্ভব নয়। সামাজিকতার বাধা আছে হয়ত। এমন কিছু অসিদ্ধান্তমূলক মামুল্য নন অবনো বাহ।

মনের কথা মনে হতে খেয়াল হল বিকেলে এক আসতে বলছিল। প্রত্যক্ষ এসে বসে আছে হয়ত। তাড়াহাড়ি পা চালালো।

মরেন অপেক্ষা করছিল ঠিকই। গোটা দুই সিগারেট শেষ করে কানকাঠি নিয়ে পড়েছে। প্রতীকা ভালো লাগছে না খুব। এই সময়ে ঠিক এইখানে বসে থাকার কথা নয় তার।

বাবল গাঙ্গুলি ঘরে ঢুকে বলল, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তো? একটা চেয়ার টেনে বসল সামনে। হাসির আভাস। কানকাঠি কিছুটা ভুগ্নমে ঠেসে দিয়েছিল মরেন চৌধুরী। সেটা নিরাপদে ফিরিয়ে এনে তাকালো তার দিকে।—এত দেবি বে?

—তোমার প্রিয় বাবুরীর জন্তে। প্রসন্ন হাসতে জবাব দিল, ভগ্নানক বাগ আমার ওপর—তুমি বসে আছ তুলেই গেছি।

চুপচাপ মরেন কান ব্রহ্মবৃদ্ধির আমেজ উপভোগ করে নিল একটু।—রাগ কেন?

—আমি একটা অজাত্যারী, পাবও, তাই। লোকের ভক্ত কোন মারা মমতা নেই, কুলি মন্ডুরার মরে গেলেও কাজ আদার করে নিই—

মরেন জবাব।—বলল একথা?

—প্রায়। উৎসুক মুখে হেসে উঠল বাবল গাঙ্গুলি। ঘেঁষেটি সত্যি ভালো হে, শেষে বাগ পড়তে লজ্জার একাকার।

খুঁজ টিপে হাসছে মরেনও। তবে বাস্তবিক মনোবাস কানকাঠির দিকেই বেশি। এরকম নির্মম সজীবতা আগে আর কবে দেখেছে? অনেক দেখেছে। কলকাতার নেশান বিল্ডার্স লিমিটেডও দেখেছে। এর থেকে অনেক বেশি দেখেছে। তবে নেশান বিল্ডার্স জেড আসার পর আর দেখেনি। কানকাঠি পকেটে ফেলে সোজা হুর



উৎসবের দিনে



কে. হোডের

মুবাঙ্গিত  
প্রমাণন সাহসী

কে. হোড এন্ড কোং

কলিকাতা-১৪

বসল।—সামান্যকে তোমার কমপ্লিমেন্ট জানিয়ে দেব'খন—আরো গুণি হবে আর আরো লজ্জা পাবে। বাক, এখন এদিকের খবর কি কি বসো।

বস্তুরাজ্যে ফিরে এলো বালক গাঙ্গুলি। পকেট থেকে চিঠিটা বার করে সামনে রাখল। দিন পনের মধ্যে আসছেন মহারথীরা... কে কে আসছে দেখিনি।

—আসবে তো জানা কথাই।

—কি করা যায় ভাবছি।

—সিমেন্ট কেন্দ্রের?

—হুঁ।

—এ ব্যাপারে তাদের মতলবটা কি না জানলে আগের থেকে কুমি ভেবে কি করবে?

—মতলব কিছুটা বোঝা যাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে নরেন বসল, গেলেও তোমার ভাবনার কিছু দেখিনি। খোঁচ-চাকলাদারের তুর্ভাগ্য বা হবার যথেষ্ট হয়েছে। মাসের পর মাস লোকসান খেয়েছে, অপদস্থ হয়েছে, ঘৃণ দিতে এসে নাভেহাল হয়েছে, তারপর আসল দোষী যে সেও সরে গেছে এখান থেকে—এর পরেও ভাবা যখন স্বভাব তোমার, ভাবো বসে বসে, কি আর করবে।

পরামর্শের জন্ত ডেকেছিল, কিন্তু এরকম নির্বিকার পরামর্শ বালক গাঙ্গুলি আশা করেনি। তবু হেসেই ফেলল সেও। বসল, তোমার উপদেশ মনে রাখতে চেষ্টা করব।

একপার্ট কমিটি আসার প্রতিলিপি পেয়েছে খোঁচ-চাকলাদার কারের দ্বিভেন চাকলাদারও। কারণ, এই পরিদর্শনের সঙ্গে সিমেন্ট কেন্দ্রও জড়িত।

খুলি এবং আশাশিত হবার কথা।

কিন্তু কর্মজীবনে দ্বিভেন চাকলাদার এত অসহায় আর কখনো বোধ করে নি।

তিন মাস হতে চলল পার্টনার নিরুদ্দেশ। রণবীর ঘোষের খবর বার্তা দ্বিভেন চাকলাদারও যথার্থই জানে না। এই তিন মাসে ক্রমাগত কলকাতা এবং মড়াইয়ে ছোটোছুটি করে কালধাম ছুটেছে। মড়াইয়ের কাজ শেষ হলে রণবীর ঘোষের সঙ্গেও সম্পর্ক বরাবরকার মতই শেষ করে দেবে, জানা কথাই। অনেক হয়েছে, আর নয়। কিন্তু সত্ত বর্তমানে সামাল দেবে কি করে, ভেবে পাচ্ছে না।

নারী-ঘটিত ব্যাপারে তার দু' মশ দিন দু' মেরে থাকাটা নতুন নয়। আগেও এরকম করেছে অনেকবার। ওই সন্ধ্যার মেয়েটাকে সরানোর পরেই তো নিখোঁজ হয়েছিল পনের দিন। কিন্তু তিন মাস অভাবনীয়... বিশেষ করে এই সন্ধ্যার সময়। এখান থেকে সে যাবার আগেই হাবভাব দেখে বুঝেছিল, কিছু একটা মতলব কাঁচছে। সে যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের ওই মেয়েটার জন্ত, সঠিক বোঝে নি। এর পর মড়াইয়ে আর আসা সম্ভব নয় তার পক্ষে ঠিকই। এমন কি কলকাতায়ও কিছু দিন তার গা-ঢাকা দিয়ে থাকারই কথা। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তাকেও একটা খবর পর্যন্ত

দেবে না, এমন দারিদ্র্যজননশূন্যতা ভাবা যায় না। ওই মেয়েটাই উ... যাঁহু করল না কি শেষ পর্যন্ত।

রাগে আর হুশিয়ারি জ্বলছে দ্বিভেন চাকলাদার। মনে মনে বুকেছে হাতের টাকা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত রণবীর ঘোষের আর টিকি দেখা যাবে না। চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ঘৃণ দেবার জন্ত আনা সেই তিরিশ হাজার টাকা তার হেপাজতেই ছিল। লোকটা অপচয় করত, কিন্তু টাকা-পয়সার গরমিল করত না কখনো। তাই এদিকটা ভাবে নি দ্বিভেন চাকলাদার। মাত্র তিরিশ হাজার নিয়ে সরে আজও পড়বে না। শেষ করে তবে আসবে।

কিন্তু দু' চার দিনের মধ্যেই ছোট মড়াইয়ে আর একটা খবর ছড়ালো।

আর কাটা ঘায়ে হুগের ছিটে পড়ল দ্বিভেন চাকলাদারের।

খবরটা মহাসমারোহে রাষ্ট্র করলেন অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের গৃহিণী মিসেস চ্যাটার্জী। বরণার মা।

মায়ের ওপর মায়ের রাগ পড়েছে এতদিনে। চিঠি লিখেছে।

কোথা থেকে?

—আর বলো কেন কাণ্ড! যেখানে যাচ্ছেন আনন্দে আর গর্বে ডগমগিরে উঠছেন মহিলা।—একবারে সেই বিলেত থেকে—লণ্ডন থেকে! বিয়ে? ও মা বিয়ে করেই তো গেছে! জামাই মন্ত বিদ্বান, এখানে অবশ্য চাকরীটা তেমন ভালো করত না, কলেজে প্রফেসরি করত একটা। কিন্তু অত বিদ্বান ক'দিন আর ছাইচাপা থাকবে? বারাকন্ডর বোকে, তারাই ডেকে নিয়ে চাকরী দিয়েছে। শুধু তাই! মেয়েটা পর্যন্ত সেখানে কি একটা চাকরীতে লেগে গেছে। তাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা!

আনন্দে গর্বে মিসেস চ্যাটার্জী হেসে-কঁদে সারা। চেনা মুখ মাঝেই সবিস্তারে সুখের জানিয়ে দিলেন। স্বামীর ওপর জুজুমজারী হল, আশিসস্বস্ত লোক যেন অবিলম্বে জানতে পারে খবরটা। শুধু তাই কেন, বেশ ভালো করে একটা পার্টীও তো দিতে হবে সকলকে!

মনে মনে বিখ্যাস করল না শুধু হুঁজুন। বরণার বিলেত যাওয়াটা নয়, প্রফেসরকে বিয়ে করাটা।

একজন ভুতুবাঁবু। অল্প জন দ্বিভেন চাকলাদার।

ভুতুবাঁবু হাসল মনে মনে। আর দ্বিভেন চাকলাদার ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সব ক'টা ব্যাকে নোটিস দিল, একলায় দস্তখতে রণবীর ঘোষ আর বেন এক পরস্যাও না তুলতে পারে। অথবা, তার নির্দেশ ছাড়া কোথাও বেন তাকে টাকা না পাঠানো হয়। রণবীর ঘোষ শেষ কত টাকা তুলেছে না তুলেছে, তারও হিসেবে চেয়ে পাঠালো সে। ...বিলেত যদি গিয়েই থাকে, তিরিশ হাজার টাকা দু'জনের পক্ষে বেশি দিন নয় খুব। ক্ষতি বা হয়েছে, হয়েছে—দ্বিভেন চাকলাদার এবারে ভালো হাতে শিক্ষা দেবে তাকে।

মড়াইয়ের আকাশে এমন ঘনঘটা এর আগে আর দেখে নি কেউ। ক'টা দিনের জন্ত মাত্র বর্ষণে ছেদ পড়েছিল একটু। আকাশ আজ যেন এক অজুত কালোর বড়বড় মেতেছে।

মিসেস চ্যাটার্জী অর্ধাং বরণার মায়ের সঙ্গে আজ আবার দেখা হয়েছিল সামান্য। ভিন্ন মূর্তি মহিলায়। মেদবহল দেখে

জানলোন্তেজনা যেন ধরে না। ওকে ধরে বেঁধে ঝাড়া একঘণ্টা মেয়ের সমাচার শুনিরেছেন। এই মেয়েটার কাছেই নিজের মেয়ের সম্বন্ধে মস্ত দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন একদিন। এটা তারই জ্ঞের সাধনা বোঝে।

আকাশের অবস্থা দেখিরে কান বকমে ছাড়ান পোয়ে এসেছে। শুধু সাধনা নয়, ঘরমুখি হয়েছে সবাই। অল্প অল্প বাতাস বইছে। গুড়-গুড় মেঘ ডাকছে জলদগম্ভীর। মেঘের কালো সমস্ত দিনের আলো টেনে নিচ্ছে, শুধু নিচ্ছে বেন।

কিন্তু এরই মধ্যে ওই মহিলার কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ির দিকে চলেছে সাধনা। খবরটা রাষ্ট্র হওয়ার পরে ভুতুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওর। ভুতুবাবুর সবজাস্তা হাসি ভালো লাগেনি সেদিন। আকারে প্রকারে যা বসেছে তাও না। গলা নিচু করে বসেছে, বিশেষত যাওয়া আজকাল আর শব্দ কি মা-সম্মা—গেলেই হল। ...তবে কার সঙ্গে গেছেন সেটাই কথা। অমনি একবার গিয়েছিলাম ঘোষবাবুর পাটনার বিজুবাবুর কাছে—ওই ফিজেন চাকলাদার মা-সম্মা। ভুললোক যেত করেন একটু আধটু—তনলাম যা, তাতে তো ভুতুর চক্ষু স্থির!

চক্ষুর খানিক স্থির করে সেটা দেখাল ভুতুবাবু। পরে খন্দেরের সাদা পোয়ে উপস্কার টেনে দিল চট করে।—তা গেছে যখন গেছেই, যাব সঙ্গেই যাক ভালো থাকলেই ভালো, কি বলেন মা-সম্মা? আমাদের অতশত খোঁজে কাজ কি—

মহিলার সকল শোষ সকল অপ্রিয় আড়ম্বর মন থেকে মুছে গেছে সাধনার। আ-হা, যা ভাবছেন মহিলা, তাই যেন সত্যি হয়। ...ওঁর এত আনন্দ এত আশা আবার যেন বার্ষ হয়ে না যায়। ভুতুবাবুর কথা মিথ্যা হোক, মিথ্যা হোক, মিথ্যা হোক।

বাড়ি ফিরতে হাঁপ ফেলে বাঁচলেন অগ্নী বাবু। বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বকাবকি করলেন একপ্রস্থ।—এ ঝড় যদি এসে যেত কি হত! কাকপক্ষী বাইরে নেই, অথচ মেয়ের বদি হ'ল থাকত একটুও!

কিন্তু ঝড় এলো আরো ঘণ্টাখানেক বাদে। এই এক ঘণ্টা জানালার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে সাধনা। দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মেঘের নিচে মেঘ এসে জমছে। তার নিচে আবার। মাঝে মাঝে শুধু সেই জলদ গুড় গুড় শব্দ একটা। ভয়াল উল্কার, বিরাটের কল্ল স্রবের মহিমা। ওই পাহাড়, ওই মাটি, ওই গাছপালা, ওই বাতাস—সব এক মহাকর্ষের বেদনাতুর প্রতীকায় স্তব্ধ, সমাধিস্থ।

সাধনাও।

ঝড় এলো। ঝড় নয়, প্রলয়। কল্লাস্ত।

জানালো বন্ধ করে ঘরের দরজার একটুখানি খুলে বারান্দার ওদিকের দেয়াল ছাড়িয়ে সেই কুমারীন লীলার দিকে চেয়ে দাঁড়ায় মত দাঁড়িয়ে রইল। ঝড়ের ঝপটায় দরজা আঁকড়ে আছে, জলের কণা ছুঁচের মত বিধছে মুখে। হ'ল সেই সাধনার।

মড়াই বন্ধনের অন্তিম বিদ্রোহ? পাহাড় ভেঙে পড়বে? প্রকৃতি লগ্নভণ্ড করে দেবে তার আগুন সৃষ্টি? ...প্রাণের পরে আজ যেন তার অন্ধ ঈর্ষ। তবু অপরাধ! সমস্ত আকাশে বৃষ্টি অজস্র দিগন্তের মাতামাতি হানাহানি। তবু অপরাধ। আলুখালু হতাশ বনস্পতি পড়ছে মুখ খুঁড়ে। তবু অপরাধ।

দরজা ধরে ঠক ঠক করে কাঁপছে সাধনা। ভয়ে নয়, ওই বিরাটের স্পর্শে। ওই অপরাধের স্পর্শে। শ্রম্ত বসন, জলকণার সর্বস্ব ভিজ়ে, খোলা চুল উড়ছে। হুনিয়া বলসানো বাজ পড়ল একটা কড় কড় করে। দরজা আঁকড়ে তবু দাঁড়িয়েই আছে তেমনি। নির্বাক, নিম্পলক, বোবা। কিন্তু ওর ভিতরে বলছে কেউ। বলছে কিছু। আর কাঁপছে থর থর।—থামো, থামো, থামো! আর দেখিও না, আর দেখিও না! আর দেখতে পারিনে! আর সহিতে পারিনে। ওই সর্বগ্রাসী বিরাটের মুখোমুখি আর দাঁড়াতে পারিনে! এবারে শাস্ত হও। এবারে প্রসন্ন হও। এবারে স্তম্ভ হও। শাস্তি, শাস্তি, শাস্তি, শাস্তি, শাস্তি, শাস্তি... ছাঁচোথ বুজে এলো সাধনার। নিম্পন্দ, বিহ্বল।

[ক্রমশঃ]

## ভগ্নবীণ

### শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

ভেঙে গেছে বীণ ছিঁড় গেছে তার,

তবু এ বীণার স্রোত ঝঙ্কার,

কেন তুলে হাহাকার?

কেন আঁখি-কোণে শুধু অকারণে,

অজ্ঞ-বাদল বিরহ বাধায় .

ঝরে পড়ে বার বার?

স্রুথের স্বপন সোহাগ যতন

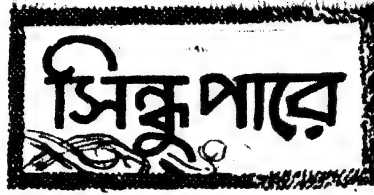
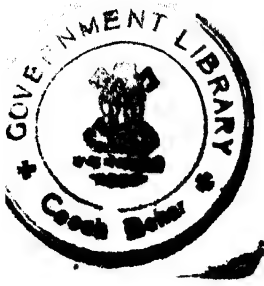
গেছে যদি, যাক, আঁখি-বিমোহন,

হাসি-সাথে যাক মায়,

প্রেম যদি যায় কিবা রহে হায়

পথের ধূলায়, বেদনা লুটায়,

কারা বিনে যিছে ছায়।



শ্রীমদ্রসদগুরু দাশগুপ্ত

পাঁচ

১৪ নং গ্রীণহোম রোড—বাগেরা লাওরা সেবে রাতে যখন গিরে নিজের বিছানায় চলে গিয়ে পড়লাম—সত্যই মনটা একটু হালকা বোধ হল। এ রকম হালকা মন অনেক দিন যেন পাইনি।

রাতে আহারের পরিমাণ খুব বেশী না হলেও বেশ কুপ্তির সঙ্গে খেতেছিলাম। কুটী মাখন, বড় একখানা মাছ-ভাজা এক ধরনের সাদা আলু-সিদ্ধ করে মোলায়েম মশুর ভাবে মাখান। সঙ্গে চা-ও ছিল। সবই বেশ সুখাভ।

বাগেরা লাওরা সেবে মিসেস ব্রেকের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলাম—সেই খাবার ঘরেই। ঘরের এক পাশে সেওয়াল আঙুন ছালাবার জায়গায় একটি ইলেকট্রিক আঙুন ছালাবার মতগুণীতটা কতকটা মকনীয় হয়েছিল। মিসেস ব্রেকট এক রকম আমাকে শুতে উপরে পাঠিয়ে গিলেন। বললেন, “আপনাকে বড় রাস্তা দেখাচ্ছে। আপনি আজ সকাল সকাল শুতে পড়ুন—আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।”

বললাম “সত্যি আমি রাস্তা।”

চুপচাপ নিবিবিধি বিশ্রামের জন্য মনটা তখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মিসেস ব্রেকের “শুভরাত্রি” উত্তরে তাকে “শুভরাত্রি” জানিয়ে আমি উপরে উঠে গেলাম। গিরে কাপড় ছেড়ে সটান শুতে পড়লাম বিছানায়।

বিছানায় শুতে পড়ার একটু পরেই নীচে থেকে টু-টাং পিড়ানোর শব্দ কানে এসে বাজতে লাগল। মিসেস ব্রেকট কি পিড়ানো বাজাচ্ছেন? চুপচাপ নিবিবিধি রাতে এই বিশেষ পল্লীতে ঘুর থেকে ভেসে-জাসা পিড়ানোর বিশেষী শুতে মনটা যেন নিশ্চেষ্ট নাগালের বাইরে গেল চলে—একটি অজেনা দেশে।

সকালবেলা ঘুম ভেঙেই যেন চমকে উঠলাম—এ আমি কোথায়? অজানা, অজেনা, নির্বাসিত দেশে একটা অসহায় আকুল মনোভারে মনটা যেন উঠল কেঁদে। সমস্ত রাত ঘুমের মধ্যে আমি যে তোমাদেরই নিয়ে ছিলাম—সেই আমার আলোভা নীল আকাশের বকবকে দেশ, সেই স্বপ্নের মায়াজ-ভরা মিষ্টি মুখখানির অপরিণীত রস।

উঠতে ত হবেই। কোনও রকমে শুবি মনটাকে টেনে নিয়ে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নীচে নেমে গেলাম। খাবার ঘরে চুকে দেখি—টেকিসের উপর এক পাশে একটি সাদা চাষের পেতে আমার জন্য ব্রেকস্টার্টের সবজি মাখান রয়েছে। পিছনে রান্না-ঘরের দিক থেকে একটা জুগুন্স বিশেষী গানের স্বর কানে ভেসে এলো। মিসেস ব্রেকট গাইছেন বোধ হয়।

মিসেস ব্রেককে কি ভাবে ভেঙে খাবার চাইব ভাবছি—এমন

সময় মিসেস ব্রেকট এসে ঘরে ঢুকলেন। আগেই বলেছি—মিসেস ব্রেক খুব ভক্ত চাষ-মসেন এবং সেই ভাবেই এসে ঢুকলেন ঘরে।

হেসে আমাকে সুপ্রভাত জানিয়ে শুধালেন—“হুম ভাসে হয়েছিল ত? অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমলেন।”

দড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, ১১টা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। বললাম “না। আপনি খুব সকাল সকাল ঘোঁসে ঘুমিয়ে?”

বললেন “না। আমি হোব ১১টা বাজলে না বাজতে উঠে পড়ি। সাপারের অনেক কাজ করতে হয়। একটা মি. অফ আমার আছে। কিন্তু সে ঘণ্টা ছুট এর জন্য এসে ঘর ভরে পড়তে করে মিসেস চলে যায়। বাকি সব কাজই ত আমার।”

এই বলে হেসে আমার দিক চেয়ে বললেন “বরেন। এখনই আপনার বেকফাস্ট নিয়ে আসি।”

ঘর থেকে চলে গেলেন। ১১টা মনে হয় যে বেল পড়ায় ঘুমলে যোগ হয় ভ্রমহিলার অন্তর্বিধা হয়, তাই ঐ ভাবে কথটা ইঙ্গিত গিলেন আমাকে।

বেকফাস্ট নিয়ে এসে সজিয়ে গিলেন টেকিল। বিশেষ কিছুই নয়। চা, হুটকরো কুটী ও মাখন এবং একটি সিদ্ধ ডিম। যোগ অবশ্য ভাগেই লাগল কিন্তু খাওয়াটা একটু কম-কম মনে হতে লাগল।

আমি যখন বেকফাস্ট পাকি, মিসেস ব্রেক মাঝে মাঝে ঘর বাতায়ত করছেন—১১টা-১১টা-সেটা মানান কাজে। এক কাকে বললাম, “মিসেস ব্রেক। আপনি এই ঝুত অত ভোরে শুতেন কি করে?”

বিস-বিস করে তোসে উঠলেন। বললেন “সবই অনেক। বাবা হয়ে এ রকম অভ্যাস করতে হয়।”

শুধালাম, “কামি বেলা করে উঠেছি বলে আপনার বিশেষ অন্তর্বিধা হল, না?”

বললেন “না। একদিনে আর কি এসে-যায়। কাল ত আপনি বড় রাস্তা ছিলেন। তবে সাধারণতঃ ৮টা থেকে ১১টা ব্রেকফাস্ট বাগেরা শেষ হলেই আমার অন্তর্বিধা হয়।”

বললাম “কাল থেকে তাই হয়ে।”

বললেন “অনেক বরবাদ।” ঘর থেকে আবার বেগিয়ে গেলেন।

বেকফাস্ট পেয়ে সস্তর অর্থাৎ লগুন অভিমুখে বগদানা চললাম—আমার ডাক্তারী পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে।

বাগেরা সময় মিসেস ব্রেক শুধালেন, “আপনি কখন ফির আসবেন? ৯ টার মধ্যে ফিরে আসবেন আশা করি। আবার সাতক ছটার সাপার বাট।”

বললাম, “তার অনেক আগেই ফিরে আসব। আমার কাজ শেষ হলে লগুনে আমি আর এক ঘুরেও থাকব না।”

লণ্ডনের কাজ-কর্ম সেরে ফিরে আসতে আসতে আমার প্রায় পাঁচটা বাজল। লণ্ডনেই মধ্যাহ্নে সামান্য কিছু আহাৰ এবং ডেয়ারি-ফ্রুশ ঠেঁগনের কাছাকাছি লায়ন্স কর্ণার হাউস (চাইতামি তল-গোপেব সোফান) চা খেয়ে নিষেদ্ধিলাম।

বাড়ি সাপার খেয়ে মিসেস ব্রেকের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করছিলাম। কথায় কথায় মিসেস ব্রেকের পরিচর্য কতকটা পাওয়া গেল।

মিসেস ব্রেকের স্বামী বেঁচে আছেন; তিনি স্মৃষ্ মেসোপটেমিয়ার সৈন্য বিভাগে কাজ করেন—ক্যাপটেন ব্রেক। ১৪ নং গ্রাণ্ডহাম রোড হাউসে ১১ বছরের তত্ত্ব লীভ নেওয়া বাড়ী। ক্যাপটেন ব্রেক বা মাসোহাবা পাঠান তাতে এই বাজারে মিসেস ব্রেকের চালান করিলেন। তাই তিনি হু—একটি ভাড়াটে অতিথি বাড়ীতে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। তবে বেশী দিনের তত্ত্ব নয়। মিসেস ব্রেক অংশ করেন যে, বছর খানেকের মধ্যেই তিনি তাঁর স্বামীর কাছে মেসোপটেমিয়ার যেতে পারবেন; এবং তখন এ বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে যাবেন চলে।

আমিও তোমাদের বিষয়ে অনেক গল্প করলাম। তোমাদের বিষয়ে কথা বলতে খুব ভাল লেগেছিল—আজও মনে আছে। তখন মিসেস ব্রেক তোমাদের ছবি দেখতে চাইলেন। উপরে শোবার ঘরে গিয়ে স্ট্রিকেশনের ভিতর থেকে তোমাদের ছবিগুলি নিয়ে এসে মিসেস ব্রেককে দেখালাম। তিনি খুব আগ্রহ সহকারে সব ছবিগুলি দেখলেন—বিশেষ করে সুখার ছবি। বায়ে বায়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, “কি মিষ্ট! কি মিষ্ট চেহারা!” তারপর একটি চেসে বললেন, “ছবিগুলি আজ আমার কাছে থাক। কাল সকালে আমি আপনাদের ঘরে সাজিয়ে দেবো। কেমন?”

হেসে বললাম “বেশ ভাল।”

পরের দিন বিকালে লণ্ডন থেকে ফিরে এসে দেখি, সত্যিই ছবিগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আমার শোবার ঘরে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছেন—সেওয়ালে আঙুন জালারাব উম্মুরটির উপর একটি হাক আছে সেইখানে। কেবল সুখার ছবিটি রেখেছেন—আমার প্রসাধন টেবিলের উপর। তবু তাই নয়, সুখার ছবিটি আংবার সাজিয়েছেন ফুল দিয়ে।

মিসেস ব্রেকের বাড়ীতে দিন দশক কাটল—এ একই ভাবে। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমি সহবে চলে যাই, বিকালে ফিরি, সন্ধ্যাবেলা সাপার এক সঙ্গেই খাই এবং তারপর বেশ খানিকক্ষণ মিসেস ব্রেকের সঙ্গে গল্প করি কিংবা হস্তত্ব খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

যদিও বাড়ি বাইরে প্রচণ্ড ষীত, তবুও মিসেস ব্রেকের প্ররোচনায়ই প্রথম বেড়াতে বেরিয়ে দেখলাম—বেশ ভালই লাগে। গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে গলায় মাফলার জড়িয়ে, মাথায় টুপি দিয়ে, হাতে দস্তানা পরে বাড়ী থেকে বেরিয়েই খানিকটা খুব জোরে হু হু করে হাঁটতে হয়। এবং জারপার শরীরটা একটু গরম হয়ে উঠলেই বাইরের ঠাণ্ডাটি মধুর লাগতে শুরু করে। অবশ্য যদি বাইরে বৃষ্টির উপক্রম না থাকে! কেন না এসেলে প্রায়ই বৃষ্টি হয়, বিশেষতঃ ষীতকালে।

এই দিন রাতের মধ্যে মিসেস ব্রেক মাত্র দুই দিন আমাকে

নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম দিনই বেড়াবার এমনই একটি সুন্দর জায়গার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন—বার কথা আমি জীবনে ভুলব না। এই জায়গাটির নামই এলটাম পার্ক, বার নামে এই পর্যাটের নামকরণ হয়েছে। এমন প্রাণজড়ানো মনোবৃত্তি হান আমি খুব কমই দেখেছি এবং হানটির প্রতি আভাও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমাদের বাড়ীর পিছন দিকে আর এক সারি একই ধরনের বাড়ী এবং তাই সামনে একটি বাস্তু। সেই বাস্তুবা ওপাশেই এলটাম পার্ক—খোলা সবুজ মাঠ অনেক দূর পর্যন্ত চলে গিয়ে ডেউ খেলিয়ে নেমে গেছে নীচে এবং সেই মাঠের উপর ছড়ান মাঝে মাঝে বড় বড় কয়েকটি পাহাড়—এইমার। একটা অবশ্য নাতিশ্রুত কালো পাত্রে-চলা পথ সেই মাঠটিকে চারি দিকে ঘিরে আছে—সবুজ শাড়ীর কালো পাত্রে মনন এবং এই বাস্তুটির ধারে ধারে কিছুদূর অন্তর অন্তর একটি বেঞ্চি পাঠা—পথিকদের বসে বিশ্রাম করার ঠাই। এই পার্কটির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, সাধারণত সহরের পার্ক বলতে আমরা যা বুঝি—এটা মোটেই তা নয়। ছোট-বড় ছাটাইকরা নানান রকম গাছের সারি দিয়ে সাজিয়ে, নানান রং-রং ফুলের গয়না পরিবেশ এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্যটিকে ফুল করার কোনও চেষ্টা ত হয়ইনি বরং হানটির স্বাভাবিক মাধুর্যটিকে বাস্তব সহজেই চোখে পড়ে, সেই দিকে যেন কর্তৃপক্ষের নজর।

এই পার্কটির স্মৃতিতে সঙ্গে আমার সে যুগের মনের অল্পভূতি

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম  
আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”

এটি সত্যি ২৩টি বড় প্যাক

আর্যের স্বাস্থ্য, তৃপ্তি ও সঞ্চয় বক্ষা করিতে

- কলে প্রস্তুত
- স্ট্রমে সঁকা
- মসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্সল্টেশনারী  
কলিকতা - ২৩

নিবিড় ষোণ—তাই পার্কটির কথা এত করে বললাম। এলটাম পার্কে থাকার সময় আমি নিজে এখানে এসে প্রায়ই চূপচাপ একলা ঘরে বেড়াইতাম—বিশেষতঃ চাঁদের আলোতে। শীতকালের রাত্রে—লোকজন বেশী থাকত না। হুঁ-চাঁদ জোড়া তরুণ-তরুণী হয়ত আশে পাশে বেকিতে নিজেরদের প্রেমের ভাবে বিতোর হয়ে থাকত বসে কিংবা হয়ত ধীর পদক্ষেপে ঘরে বেড়াত নিজেরদের মুখ কথাবার্তার মধ্যেই তন্ময় হয়ে। অল্প কাউকে কেউ লক্ষ্যও করে না, অল্প কাউকে কেউ যেন চেয়েও দেখে না। তাই নিরিবিলি আপন মনে বেড়াতে কোনও দিন কোন বাধা পাইনি এখানে।

বুলা! আগেই বলেছি, একটা ভারি মন নিয়ে এ দেশের জীবন আমি শুরু করি। সেই প্রথমেই আমার মনের বেলায় যে চূপসে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, কিছুতেই তাকে এ দেশের হাওয়ায় ভরিয়ে হাফা করে আকাশে ভাসিয়ে তুলতে পাচ্ছিলাম না। এ দেশের হাওয়ায় যে নিজের মনের কোনও খোরাক পাইনি—মনটাকে ভরাই কি দিয়ে? সে যুগে আমার মনের সমস্ত খোরাক ছিল, সেই সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে, সেই নীল আকাশের দেশে তোমাদের ঘরে—একটা উপবাসী মনের মাটিতে এলিয়ে-পড়া ছাড়া উপায়ই বা কি?

তাই বোধ হয় ফুরস্ত পেলেই ছুটে ছুটে আসতাম এলটাম পার্কে, একলা—যেন একটা নেশার ঝোঁকে। এই ঘন সবুজ ঘাসের উয়ুক আবহাওয়ায় এ দেশটাকে তুলে খানিকক্ষণ তোমাদের নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতাম—তোমাদের প্রত্যেকের বিষয় ছোট ছোট খুঁটিনাটি কত কথা যে মনে ভেসে ভেসে উঠত, আমার নিজের সে সব জানা ছিল বলে কখনও ভাবি নি। বেশ মনে আছে—কুয়াশাচ্ছন্ন চাঁদের আলোর স্থানটিকে নিয়ে ক্রমে আমার মনে গড়ে উঠত একটা মায়ারাজ্য—না এদেশের না ওদেশের; এবং সেই মায়ারাজ্যে আমি তন্ময় হয়ে ঘুরে বেড়াইতাম তোমাদের সঙ্গে, যেন একটা অপূর্ণ নেশার পুলকে। হঠাৎ চমকে উঠলাম—হাতবড়িতে চেয়ে দেখতাম ১১টা বেজে গেছে—নেশা যেত কেটে, ফলে বিগুণ অবসাদ ভরা মন নিয়ে ধীর পদক্ষেপে ফিরে আসতাম—১৪ নং গ্রীণহোম বোডে।

মিসেস ব্রেকের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল আরো একটা দিক দিয়ে। মিসেস ব্রেক বিশেষ সঙ্গীতভাবাগিনী ছিলেন এবং সন্ধ্যাবেলা খাওয়ার পর মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে নিতেন তাঁর গানবাজনা শোনার জন্য। মিসেস ব্রেকের মনোরগনের জগৎ খানিকটা আমাকে থাকতেই হত, তারপর অভ্রতা কাটিয়ে—একটু বেড়িয়ে আসি বলে—পালিয়ে যেতাম এলটাম পার্কে।

বাড়ীতে চুকেই ডাইনে খাবার ঘর—বাঁয়ের ঘরটি ছিল মিসেস ব্রেকের গান-বাজনার আসর। এইটাই মিসেস ব্রেকের বসবাস ঘর—স্নেহের মোটা কাপেট পাতা, দামী আসবাবপত্রের সাজান এবং ঘরের কোণে একটি পিয়ানো। ইংরাজী সঙ্গীত সে যুগে আমি কিছুই বুঝতাম না, তবে পিয়ানোর উপর মিসেস ব্রেকের অস্বাভাবিক সঞ্চালনের ভঙ্গীতে মনে হত পিয়ানো তিনি ভালই বাজান এবং যখন তিনি গান গাইতেন, গানের সুরটি মাঝে মাঝে কানে মিটাই লাগত। ঐর গানের হুঁ-একটি পদের সুর আজও আমার কানে বাজে। যখন তিনি টেনে টেনে গলা কাঁপিয়ে গাইতেন

“Spring is co-o-o-ming—”  
কিংবা  
“long long rest  
In your snow-white nest  
—Kiss your mammy—” ইত্যাদি

তখন গলায় সুরের খেলায় মনে হত—ও দেশের মাপকাঠি বোধ হয় তিনি ভালই গান। এই সঙ্গে বলে রাখি, জঁ তিনি আমাকে ছুটি গানও শিখিয়েছিলেন।

যথা—  
“I passed by your window  
In the cool of the night  
Lilies were watching  
So still and so white  
Oh! I sang softly  
no one was near  
—Good night! God bless you  
my dear.” ইত্যাদি

গান দুটি মোটামুটি শিখেই আমার মন আকুল হয়ে উঠেছিল তোমাদের জগৎ—আজও মনে আছে—কবে দেশ গিয়ে তোমাদের এই গান শোনাব। বোধ হয় গান শোনার অল্পপ্রেরণাও পেয়েছিলাম—তোমাদের শোনাব বলে। কিন্তু তোমাদের কোনও দিনই শোনাব হল না।

এই দিন দশকের মধ্যে চন্দ্রনাথ এখানে বেড়াতে এসেছিল ছ’দিন। প্রথম দিন বিকেলে আমার সঙ্গে এসে ‘চা’ খেয়ে পর করে ঘণ্টা দুই থেকে ফিরে গেল। এবং দ্বিতীয় দিন আমারই নেমস্তর বিকেলে এসে, রাতের খাবার খেয়ে, এলবাম পার্কে বেড়িয়ে অনেক রাত্রে ফিরে গিয়েছিল এবং সেদিন মিসেস ব্রেকও বেড়াতে বেরিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে এবং এটুকুও আমার লক্ষ্য এগার নি যে, চন্দ্রনাথকে মিসেস ব্রেকের বিশেষ ভাল লেগেছিল। চন্দ্রনাথেরও সবই খুব পছন্দ হয়ে গেল—স্থানটি, বাড়ীটি এবং মিসেস ব্রেককেও।

রাত্রে খেতে বসে মিসেস ব্রেককে বললাম, “আমার এই বন্ধুটির জগৎ আপনাকে একটা ঘর দিতেই হবে, মিসেস ব্রেক!”

মিসেস ব্রেক তৎক্ষণাৎ সহাস্ত্রে উত্তর দিলেন “নিশ্চয়ই দেবো। এ মাসটা বাক—(চন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে) ডিসেম্বর মাসের প্রথম থেকেই আপনি আসতে পারেন, যদি অবশ্য এ বাড়ী আপনার পছন্দ হয়।”

বললাম, ঘরের যদি আপনার অন্তর্বিধা হয়, আমার ঘরে আর একটা ছোট খাট ঘরে বাবে—আমরা দু’জনেই না হয় এক ঘরেই থাকব।

চন্দ্রনাথ বলল “আমি রাজী আছি। আমারও এ বাড়ী খুব ভালই লেগেছে।” এ কথা অবশ্য চন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার আগেই হয়েছিল।

মিসেস ব্রেক বললেন “না না, তাহলে মিঃ বাগটার (চন্দ্রনাথের) কষ্ট হবে। আমি আমার শোবার ঘরই ছেড়ে দেব।”

তখন একটু অবাক হলাম—নিজে শোবার ঘর দেবেন কেন!

প্রহৃত কম নয়! মিসেস ব্রেকের শোবার ঘর দোতালার, আমার ঠিক পাশেই বেশ বড় ঘর, এবং আমার ঘরের চেয়ে অনেক গুল খাট-বিছানা প্রভৃতি আসবাবপত্রের সাজান। আমার ঘর একটা কিন্তু মিসেস ব্রেকের শোবার ঘরে ছোটো বড় বড় গালা।

বললাম, “তা হলে আপনার?”

বললেন, “আমার জন্ম ভাববেন না। পিছনে একটা ছোট ঘর আছে—আমার থাকার পক্ষে যথেষ্ট হবে।”

চন্দ্রনাথ অনেক ধন্বাদ দিয়ে কথা পাকা করে নিল। আমার সঙ্গে যে ব্যবস্থা, সব ঠিক সেই ব্যবস্থাই হলো—এমন কি সেনাও স্থাতে হু গিনি।

আরও একটু অবাক হলাম, যখন রাত দশটা পর্যন্ত এলটাম পার্কে ডিনার মিসেস ব্রেক আমাদের সঙ্গে না ছেড়ে ষ্টেশন পর্যন্ত এলেন—দুনাথকে টেনে তুলে দিতে। ওখান থেকে ষ্টেশনটির দূরত্ব নেহাৎ নয়—বোধ হয় প্রায় এক মাইল হবে।

দাড়া দিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে যেতে মিসেস ব্রেক বললেন—“মাকার আপনার এই বন্ধুটি! স্থির, ধীর—সুন্দর কথাবার্তা।”

বললাম, “ওকে আপনার এত পছন্দ হয়েছে জেনে খুবই খুশী রছি। ওই ত এ দেশে আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।”

বললেন, “এ রকম বন্ধু পাওয়াতে আপনি ভাগ্যবান।”

মাঝায় বোধ হয় একটু ছুই বৃদ্ধি এলো। বললাম “হ্যা, বাইরের গ্যা কিছু কিছু আমার আছে অস্বীকার করি না। কিন্তু আসল গ্যাটি আমার নেই।”

একটু হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে শুধালেন “কি রকম?”

বললাম, “এই ধরন না, আপনার বাড়ীতে বাস করার সুবিধা পেয়েছি, আপনি আমাকে কত যত্ন করেন—সবই আমার ভাগ্য। কিন্তু আসলের বেলায় দেখি কাকি।”

বললেন, “এখনও বুঝতে পারি নি।”

বললাম, “আপনার পছন্দসই মানুষটি হওয়ার ভাগ্য চন্দ্রনাথের দিনেই হল—আমার এত দিন থেকেও হল না।”

হেসে বললেন “আপনি ভয়ানক হিংস্রক প্রকৃতির লোক ত!”

বললাম, “হিসার কারণ ঘটলেই লোকের হিংসা হয়।”

বললেন, “আপনি অবাক করলেন।”

বললাম, “কেন?”

হেসে বললেন, “আপনার মনটি সাত সমুদ্র তের নদীর পায়ে কথানি মিষ্টি মুখের কাছে রাখা—এ দেশের কিছুই আপনার মনকে স্পর্শ পর্যন্ত করে না—সেইটুকুই ত এত দিন লক্ষ্য করে মিছি।”

বললাম, “তাই বলে এ দেশ সামান্য দানাপানি দিয়ে আমাকে জুগ করে রাখবে—সেটাই বা সহিতে পারি কৈ?”

খিল-খিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, “আপনি ভয়ানক ছু।”

মিসেস ব্রেকের বাড়ীতে দিন দশেক থাকার পর এমন একটা দিন ঘটল, যাতে আমার অবসাদ ভরা ভারি মন একটা বিশ্বাসে উঠল। সেই কথাই এইবার বলি। [ক্রমশঃ]

# বহুমূত্র

## আরোগ্য হয়

প্রজাবের সঙ্গে অভিরিক্ত শর্করা নির্গত হলে তাকে বহুমূত্র (DIABETES) বলে। এ এমনই এক সাংঘাতিক রোগ যে, এর দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষ ভিলে ভিলে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। এই দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও সাময়িক ভাবে শর্করা নিঃসরণ বন্ধ থাকে। ব্যতীত, বিশেষ কোন দ্বারী ফল পাওয়া যায় না।

এই রোগের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—অত্যধিক পিপাসা এবং ক্ষুধা, ঘন ঘন শর্করাযুক্ত প্রস্রাব এবং চুলকানি ইত্যাদি। রোগের সঙ্গীণ অবস্থায় কারবাঙ্কল, কোঁড়া, চোখে ছানি পড়া এবং অস্বস্তি অটিলতা দেখা দেয়।

‘ভেনাস চার্ম ট্যাবলেট’ পুরাতন ইনানি মতে দুর্লভ ভেষজ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ব্যবহার করে হাজার হাজার লোক মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভেনাস চার্ম ব্যবহারে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনেই প্রজাবের সঙ্গে শর্করা পতন এবং ঘন ঘন প্রস্রাব কমে যায় এবং তিন কি চার দিন পরেই আপনার রোগ অধিক সেরে গেছে বলে মনে হবে। খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বিশেষ কোন বাধানিষেধ নাই। কিম্বাশুল্যে বিশদ বিবরণ-সম্বলিত ইংরেজী পুস্তিকার জন্ত লিখুন। ৫০টি বটিকার এক শিশির দাম ৬৬০ আনা, প্যাকিং এবং ডাক মাশুল ফ্রী। নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (B. M.)

৬-এ, কানাই শীল ষ্ট্রীট, (কলুটোলা)

পোষ্ট বক্স নং ৫৮৭, কলিকাতা।

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



## বার্তাম্বর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

পার্ক স্ট্রীট কোনো একটি ক্লাবে,—অসীমের পাশের সোফার  
আড়ষ্ট ভাবে বসেছিলো সুমিতা।

কত রকমারী ক্যান্ডিন-হুবল্ড ছেলে-মেয়ের ভিড় এখানে। এদের  
চলনে, বলনে নেই কোনো জড়তা। এদের ভেতর থেকে দু'-চারজন  
বিশদ্বন্দ্যমাজের কেঁটবিঁটের সঙ্গে সুমিতার আলাপ করিয়ে দিলো  
অসীম।

এর মধ্যে ছিলেন একজন বয়সী মহিলা। উজ্জল-স্বাম গায়ের  
রং; আঁটসাঁট গড়ন, মুখখানি বেশ লাগে চোলে।

পরিবাসে তাঁর দুখ-গরদের থান, শাদা সিঁড়ের ব্লাউস—হাতে  
বাঁচুরের চামড়ার শাদা ড্যানিটিবাস, পায়ে হাইহিল শাদা জুতো।  
চালচলনে সবজাত্যের ভাব সুস্পষ্ট।

—তিনি এনে পাশের সোফাটি দখল করে বসে জিজ্ঞাসা  
করলেন—অসীম, এ মেয়েটি কে? আগে দেখেছি বলে  
তো মনে পড়ছে না?

—হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে জবাব দেয় অসীম। আমার  
দাদার বন্ধু সোমনাথ ত্রিবেদীর কন্যা সুমিতা ত্রিবেদী। হ্যাঁ,  
ওঁর ক্লাবে শর্যপণ, আজই প্রথম!

—সুমিতার দিকে ফিরে বলে—এস মিতা, তোমার আলাপ  
করিয়ে দিই মাসীমার সঙ্গে—ইনি বিখ্যাত আর্টিষ্ট স্বর্গীয় তারানাথ  
বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাচে, গানে, শিল্পকলার অদ্ভুত  
দক্ষতা এঁর! এঁর অলকাপুরীতে অনেক ছেলে-মেয়ে নাচ-গান  
শিখে বিখ্যাত হয়েছে।

আচারলক শিক্ষাগুলো বাঁচে জনসমাজে প্রচারিত হয়, দেশ-  
বিশেষে ওঁর ছাত্র-ছাত্রীরা আদর্শ শিল্পরূপে পরিচিত হয়, সেজন্তে  
মাঝে মাঝে কম্পিউটিন জনসার আয়োজনও করা হয় এঁর  
ব্যবস্থাপনায়।

মুহু মুহু হাসেন মাসীমা। সিঁহুর-রং ঠোঁট দুটির কীকে  
শাদা মার্কেলের মত চক্চকে ঠাঁতের সারি চিকমিকিয়ে ওঠে!  
কৌতুক ভরে বলেন তিনি—আঁ, তুমি যে সেই আগেকার চারপদের  
মত আমার গুণগান শুরু করলে অসীম! নিজের উপলব্ধি  
দিয়েই সেটা ওকে বোঝবার সুযোগ দেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত  
নয় কি? আজকালকার এই বিজ্ঞান-সর্কীয় যুগের মানুষ চায়,  
সব কাজের পেছনেই থাকবে একটা অকাটা যুক্তি—তবেই তবে  
সেটা গ্রহণযোগ্য, তার থেকেই জন্মাবে বিশ্বাস, নির্ভরতা,  
ব্যবস্থা, না সে সব ও ক্রমেই বুঝতে শিখবে।

—আজ্ঞা এখন তোমার কি কি শিক্ষা চলছে, শুনি তো মা?

সুমিতা জবাব দিতে পারে না। এত রকমারী মাছয়ের  
লিডে সে এর আগে আর কখনও আসেনি, ওর যেন কেমন  
ভয়-ভয় করছিলো।

অসীম বোঝে ওর অবস্থাটা। জবাব দেই দেয়,—বাড়ীতেই  
শেখা সব ওর। আগে শুনেছি বেশ ভালো নাচতো, তবে এখন  
সে সব ছেড়ে দিয়েছে। গানের গলা চমৎকার, আর পিয়ানো,  
গীটার এই-আজ-কাল যেটা চলছে, সে সব শিক্ষাও চলছে ওর।

আঁকার ওপর বেশ দখল আছে, কালকটা গাল'স কলোজে  
পড়ে, আসছে বছরে বি, এ, দেবে! তবে বাইরের সোসাইটিতে  
তেমন বাতায়াত, মেলামেশা নেই কি না, সেজ্ঞা এ সার্টিফিকেটের  
অভাবটা রয়ে গেছে।

মনোবাগ দিয়ে সব শুনে মিশ্রি গলায় সম্ভাব্য প্রকাশ করেন  
মাসীমা। খুব ভালো কথা। অল্পবিস্তর সব শিক্ষাই আছে  
এর ভেতর; খালি একটু কালচারের পালিশ দিয়ে নিলে,  
চমৎকার হবে এ মেয়ে! তুমি আমার অলকাপুরীতে এসো  
মা, তোমাকে আমি—মানে আমি, তৈরী করবো। আই মার্ট  
মেক্ এ জেম্ অফ ইউ!

সিঁদিমাকে বোলবো আপনার কথা। ওকফোর্টে জবাব দেয়  
সুমিতা।

মহাবাস্তব ভাবে বলেন মাসীমা—নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! তাঁকে  
বলবে বৈ কি! তাঁর মত নেবে বৈ কি। আমি আজই  
তোমাকে আসতে বলছি না, তবে কি জানো? তোমার দিক  
দিকেও ইচ্ছার প্রাবল্যটা থাকা চাই মা, তবেই ঠিক কালের  
সঙ্গে ভাল রেখে চলবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

এ যে দেখছো, শোনে যে মেয়েটি এসে পাঁড়ালো, এখনি শুরু হবে  
ওর নাচ। ওটি আমারই হাতের তৈরি একটি জুয়েল; সিনেমায়  
এখন ওর কত নাম! ছবির পর্দায় নিশ্চয়ই দেখেছো ওকে—মানে  
পড়ছে না? তোমাদের শুকতারী সেন গো!

—সিনেমা? বাংলা বই সিঁদিমা পছন্দ করেন না কি না, তাই  
দেখা হয় না আমার।

মিন-মিন করে সুমিতার কণ্ঠস্বর। ফ্যানের তলায় বসেও  
বিনবিনিরে ঘামতে থাকে সে। অবাক চোখে চেয়ে থাকে—অবুঝ  
শ্রোকের ওপর নৃত্যরতা লাস্তমরী শুকতারার দিকে।



সে নিজেকে নাচতে শিখেছিলো। বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এ নাচের মূলনা হয় না। কিন্তু নাচের পোষাকটা বিস্মি! এত লোকের ভিড়ে চাখ-খাঁথানো ফলমলে নিওন লাইটের মাঝে ভারি লজ্জা করে ওর। বিরুদ্ধ দর্শকদের উজ্জ্বলিত সাধুবাদের মাঝে শুকতারার নাচ শেষ হল।

উঠে দাঁড়ালেন মাসীমা। স্বমিতার হাতটা ধরে আকর্ষণ করে বললেন—এসো আমার সঙ্গে। অসীম, তুমিও এসো।

পালেশ একটি নির্জন কক্ষে তিনি ওদের নিয়ে বসলেন। বয়রা ছুটলো তাঁর অর্ডার মত খাত্তসস্তার আনতে।

এক বলক মিষ্টি হাওরার মত, মূল্যবান প্রসাধনীর স্ববাস ছড়িয়ে, নৃত্য-ভঙ্গিমায় ছুটে এসো শুকতারার সেন।

চটল কণ্ঠস্বর তার জলতরঙ্গের মত বেজে উঠলো—স্বালো, অসীম যে! ক্লাবে কি অক্ষুচি ধরে গেলো?

আরে না, না। এই বৈবয়িক গণ্ডগোল নিয়ে কিছু দিন বড় ব্যস্ত ছিলাম কি না! সহাত্তে জবাব দেয় অসীম।

—আজ আমরা একটি নতুন মেয়েকে পেলাম, আমাদের অলকাপুরীর জন্ম। এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলেই মনে হয় আমার। এর নাম স্বমিতা ত্রিবেদী। আর এর পরিচয় তো তোমাকে একটু আগেই দিয়েছি স্বমিতা। হুজনের যোগাযোগ ঘটালেন মাসীমা! নমস্কার-বিনিময় শেষ করে—

স্বমিতার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় শুকতারার, কৌতুক ভরে নজর বোনার ওর সর্পিঙ্গে। তারপর মিষ্টি হাসি বজ্রপলার মত ঠোঁটে মাখিয়ে নিয়ে বলে—আপনি যে একটি জিনিয়স, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ আমি। কেন না, মাসীমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ, ধারণা তেমনি নিভুল! আপনার লোভনার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য মাঝে মাঝে হবে আশা করি। কি বলো অসীম?

এমন স্তম্ভভাষায় আত্মপ্রশংসা শোনার অনভাস্তা স্বমিতা। কি যে জবাব দেবে ওর কথার, হঠাৎ কিছু ভেবে পায় না। দ্রুতভালে মুহুরে ওর বক্ষস্পন্দন। গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে উঠেছে। শুককণ্ঠে বলে সে, আমি—আমি অতি সাধারণ, এবারে কিন্তু আমি বাড়া যাবো, বিদ্যা হয়তো ভাবছেন!

উজ্জ্বলিত হাসির ঝড় বয়ে গেলো ওর কথার। মাসীমা ওর পিঠে মুহুরে মুহুরে চাপড় দিতে দিতে বলেন—আমি নিজে গিয়ে তোমাকে পৌছে দেব মিতা!

মাসীমার অর্ডার মত খাবারের প্লেট এলো। কাপ, ডিস, বোতল মাস সবই এলো। ডিসে সাজানো মার্টিন চপ, শ্রাউউট, পেট্যাটো-চিপস আর কেক। তার সঙ্গে শ্রালাড আর ফিস ফ্রাই!

—থেরে নাও মা! স্বমিতাকে অনুরোধ করেন মাসীমা।

—শুধু একটু কেক দিন আমার, এসব আমি খাবো না, শরীরটা ভালো লাগছে না।

ত্রিমুষ্টির স্বমিষ্ট বাক্যতান্ডনার শেষ পর্যন্ত স্বমিতার আপত্তি টিকলো না! অতি কষ্টে গিলতে লাগলো খাবারগুলো,—যেমন করে যোগী ওষুণ গেলে ডাক্তারের তান্ডনার।



মুখার্জীর গল্পনা  
শুদ্ধ ও সুন্দর

মুখার্জী  
জুয়েলার্স



বহু বাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২ ফোন-৩৪-৪৮১০

শুকতার আর অসীমের হাতে ফেনিল তরল পানীয়-পূর্ণ কাচের গেলস। খাতের কাঁকে কাঁকে ওরা চুপক দিচ্ছে ওতে। সুমিতা মাঝে মাঝে মুখ তুলে চায় দেদের দিকে—ভয় আর বিময় দুটি চোখে ওর !

মাসীমা বোথেন ওর মনের কথা। নিজের দুটি সারিয়ে রেখে, দুটি পায়ে কফি ঢাললেন, একটি ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে অপরটি নিজে গ্রহণ করলেন।

নিজের মনিবকে আঁটা ষড়িটার পানে চেয়ে চমকে ওঠে সুমিতা। উঠে পঁড়িয়ে-বাকুল ভাবে বলে—আমি আর এখানে থাকবো না, ওদিকে—

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে শুকতারা—দিদিমা ভাবছেন ? তা মিতা দেবার দিদিমার ভাবনাটা কিছু অমূলক নয়—অসীম ! এত রাত হলো,—তার পর—তুমি সঙ্গে ছিপিখোলা সোতার বোতলের মত, হাসির তরঙ্গ ছিটকে উঠলো শুকতারার কণ্ঠে।

মাসীমা মোলায়েম কণ্ঠস্বরে সহামুভূতি ঢেলে দিয়ে বলেন—আহা, তোমার ওর অবস্থাটা বুঝতে চাইছো না, বেচারী বড় ভালো মেয়ে।

ভালো মেয়েদের চাল-চলন এই রকমই হয় কি না। এখনি আমল সকেলেই উঠবো মিতা, কফিটা খেয়ে নাও।

—হুক-হুক কম্পিত বকে ওর আদেশ পালন করে সুমিতা।

মাসীমা সুমিতার সঙ্গে চললেন। শুকতারার পা দুটো যেন টলছে—অসীম নিজের বাহুবন্ধনে নেয় ওর একখানি হাত,—বলে,—এসো,—তোমার গাড়ীতে যাবে ? না আমি পৌঁছে দেব ?

—নিজেকে মুক্ত করে নেয় শুকতারা !—আঁকাভূক ঝুকিয়ে, মদিরোচ্ছল দৃষ্টিবাণ হেনে বললো,—খাঙ্ক ইউ এ লট—আই উইল মানেজ—গুড বাই ! সুমিতা দেবি ! আবার দেখা হবে আশা করি !

একটা ইরিজি গানের কলি, গুন-গুন করে ভাঁজতে ভাঁজতে, নাচের ভঙ্গিমায় পা ফেলে ফেলে—ওদের আগে আগে এগিয়ে গেলো শুকতারা সেন।

রাত্রি দশটা বেজে গেছে। মাসীমাকে উইংসে বসিয়ে দিদিমাকে ডাকতে গেলো সুমিতা।

বাড়ীটার যেন কেমন থমথমে ভাব ! লজ্জায় ভয়ে ওর সর্ব্বাঙ্গ যেন কঁপে উঠছে। না,—কাজটা ভালো হয়নি ! দাঙ্গল অমুশোচনায় ওর মনটা ভরে ওঠে !

—এদিক-ওদিক ঘুরে সে দিদিমার সন্ধান করে। কোথায় দিদিমা ? সে এত রাত করে বাড়ী এলো, কই চিন্তাকুল হয়ে দিদিমা ছুটে এসে, এর কৈফিয়ৎ চাইলেন না তো ? ছোট মাসা, মামা, কৈ ! কাকুর দেখা মিশছে না যে !

দিদিমার ঘরের শেছনের বারান্দায়, একটি ইঞ্জিচোরায়ে মুদিত নেত্রো অর্ধগয়ান ভাবে পড়েছিলেন তিনি !

সুমিতা ক্রিকর্ভাববিমুক্ত অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত পঁড়িয়ে থাকবার পর সন্কেচ ভরে ডাক দেয়, দিদিমা ! মিসেস বর্ণণ এসেছেন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে, আপনি একবার যাবেন কি ?

উঠে বলেন দিদিমা। তাঁর থমথমে অন্ধকার মুখখানি মিটার বক্ষস্পন্দনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো।

—বর্ণণ ! সে আবার কে ? এত রাতে যেতে আলাপ করতে

এলেন, ব্যাপার তো কিছু বুঝতে পারছি না ? আচ্ছা যাও তুমি, আমি যাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন ও মুহু প্রসাধন সেরে, ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে উইংসে এলেন দিদিমা।

যুক্ত করে নমস্কার জানিয়ে, বিনীত কণ্ঠে বলেন,—কি সৌভাগ্য আমার ! আপনি এসেছেন আমার সাথে আলাপ করতে ? তা অসীম, তোমাকে পেয়েও বড় খুশি হলাম, না খেয়ে কিছ বাওয়া হবে না, ওরে অ কবি, এদিকে আয়তো মা, দেখ এসে, কে এসেছেন !

মিসেস বর্ণণ প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলেন, আপনি বসুন দিদি, মোটেই ব্যস্ত হবেন না আমাদের জগে, এই মাত্র খেয়ে আসছি আমরা।

অসীম দিদিমার পায়ে ধুলো নিয়ে মাথায় ছুইয়ে বলে—অলকাপুরীর নাম নিশ্চয়ই আপনার অজানা নেই, তারই প্রতিষ্ঠাতা ও স্বনামধন্য পরিচালিকা ইনি, মিসেস বর্ণণ। ওঁর শিক্ষার পরিকল্পনা যেমন উন্নত, তেমনি স্বকৃতিপূর্ণ। আমার ইচ্ছা, সুমিতাকে ওঁর ছাত্রী করে দিই, অবশ্য আপনার আর মিতা যদি ইচ্ছা থাকে। ওঁর হাতে তৈরি প্রত্যেকটি মেয়ে, এক একটি জিনিয়স। মিতার ভেতরেও অনেক সঙ্গুণ আছে, সেগুলো ওঁর সাচচোখে পরিমার্জিত হয়ে উঠবে।

—তুমি বড় বেশী বলে ফেলাছো! অসীম ! আমি এমন কিছু অলৌকিক বিত্তা জানি না, যে কমলাকে হীরে করতে পারবে। তবে, যে প্রকৃত হীরে, তাকে কাঁচচোরাের ভেতরে রেখে আরো ছাতিময় করাই আমার কাজ। মিতাকে অল্পকণ দেখেই মনে হল ও একটি আসল রত্ন। ওকে পেনে, বোগ্যস্থানে শিক্ষা প্রয়োগ করার একটা সার্থক স্বপ্নের পরিতৃপ্তি ; সেইটাই হবে আমার পরম আনন্দ লাভ।

—বু ভালো প্রস্তাবই তো করেছেন আপনি, এতে আমরা আপত্তির কি আছে ? আর সুমিতার বাবাও অসীমের ওপর তা ভালো-মন্দ দায়িত্ব নিয়ে গেছেন সুনাম, তখন তার মতামতের কিছুটা মূল্য আছে বৈ কি ?

প্রসন্নভরা কণ্ঠে জবাব দেবার চেষ্টা করেন দিদিমা কিন্তু এ স্বরে বেজে ওঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ।

—তবে মনের গোপন বাসনা চুপি চুপি বলে,—

মন্দ কি ! ঐ ল্লাবে তো কবিকেও ভর্তি করা যেতে পারে এ্যারিষ্টোফ্রেট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার বাইচাল একট কিছু ঘটে যেতেও তো পারে ?

—আচ্ছা আজ আসি, রাত অনেক হলো, পরে আবার আসবো।

যুক্ত করে নমস্কার জানিয়ে উঠে পঁড়ালেন মিসেস বর্ণণ মোলায়েম হাসির সঙ্গে বললেন—একদিন আশুন না আমরা অলকাপুরীতে, মনে হয় ভালো লাগবে আপনার।

—অবশ্যই যাবো, আপনি যখন নিজে এসেছেন আমার সঙ্গে আলাপ করতে। মেয়েদের উন্নতিমূলক শিক্ষার প্রতি আমরা সহামুভূতি আছে, নিশ্চয়ই অসীম বলেছে সে কথা আপনাকে ?

অসীমের দিকে প্রশ্নমুচক দৃষ্টিপাত করলেন দিদিমা, মিসেস বর্ণণকে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে।

অদীমের রূপচূর্ণাঙ্কণে চোখ দু'টি তখন স্মৃতিভার রূপসুখা পান করছিলো, সেজন্তে দিদিমার অর্থপূর্ণ কথার জবাব মিললো না তার দিক থেকে—জবাব দিলেন মিসেস বর্ণণ।

আপনার স্মৃতিচিহ্ন কথা আমাদের বিদগ্ধ সমাজে কাকুর অজানা নেই দিদি! আপনাকে দেখবার, অনেক দিনের বাসনা আজ আমার পূর্ণ হল,—আচ্ছা—নমস্কার, আপনার বিশ্রামের হয় তো ব্যাঘাত করলাম!

আশ্চর্যসংসার বিগলিতা দিদিমা, ভাবাবেগ সাবরণ করতে না পারে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন মিসেস বর্ণণকে। স্নেহোচ্ছল কণ্ঠে বললেন—ওকি কথা! কত ভাগি আমার আপনার পায়ের ধুলো পড়লো আমার বাড়ীতে!

এর পর কত বার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাবো আপনার।

নিজে এগিয়ে গেলেন দিদিমা মিসেস বর্ণণের গাড়ীর কাছে, তাঁকে বিদায় সন্তাষণ জানাতে।

—স্মৃতি স্বস্তির নিশাস ছাড়ে। ভাবে, হাক্ বাঁচা গেলো—দিদিমার রাগ পড়েছে তাহলে! কিছ্ ভুল ভাঙলো তার দিদিমার গাড়ীর কঠোর শব্দে।

—এসব কি মিতা?—নিজেই যদি নিজের দায়িত্ব সব বুঝতে শিখেছে, তবে জামাইয়ের ভাত খেয়ে, তার বাড়ীতে থাকার জামার আর দরকার কি?—সব তো ঠিক করে এসেছো দেখছি! নেহাত সোমনাথ আমার ওপর তোমার ভার দিয়ে গেছে, তাই না বলে পারছি না, যখন অসীমের সঙ্গে বাইরে গেলে,—তখন কবিকে তোমার সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিলো, সে তোমার সব কাজে সহায়তা করে, তোমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করে,—তোমারও কর্তব্য তার সঙ্গে ঐ বকম শ্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা—আজকের ব্যাপারে সে মনে যথেষ্ট আঘাত পেয়েছে!

স্মৃতি দিদিমার মুখের পানে চেয়ে বিম্বিত ভাবে বলে—অদীম বাবু ছোটমাসীর বাবার কথা না বললে, আমি কি করে বলবো দিদিমা? গাড়ী তো আমার নয়!—আর এতে ছোটমাসীর বাথা পাবারই বা কি আছে?

সে যখন তার বান্ধবীদের সঙ্গে সিনেমায় যায়, বেড়াতে যায়, কৈ আমি তো যাই না, বা এতে কোন দুঃখ বোধও করি না!

—রীতিমত অবাক হয়ে যান দিদিমা, স্মৃতিভার মুখে স্পষ্ট জবাব শুনে।

—একি হল? যে কথাই তিনি আজ বলতে যান, সব কথাতেই আজ সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় কেন? বোঝাবও যে বোল ফুটলো দেখছি! লাজুক, ভীত, মুখচোরা মেয়েটা আজ মুখখা হয়ে উঠলো, কোন্ মন্ত্র বলে? না, কোথায় যে কেন কি ঘটছে! তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্যের ভিতরে কোথায় যেন ফাটল ধরেছে! অদৃষ্টচক্রের পরিবর্তনের ঘরবর নিনাদ তিনি আজ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন!

বোধকিন্তু পদক্ষেপে নিজের ঘরে প্রবেশ করে সশব্দে রুদ্ধ দরজায় থিল তুলে দিলেন তিনি!

—স্মৃতিটা বসে রইলো নিশ্চল ভাবে। নিজের উদ্ধত আচরণে, সে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলো, দিদিমার মুখের ওপর এমন স্পষ্ট ভাষায় জবাব দেওয়া কেমন করে সম্ভব হলো তার পক্ষে?

জায়? না অভায় করেনি সে! চোখের সামনে তার,—

ছোট মাসী, ছোট মামা, দিদিমা, সকলে মনের স্মৃতি আমোদে দিন কাটাচ্ছে আর তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে ক্রীচন-বাঁধা জীবনের ছকে! নিজেরা হয়দম্ব যাচ্ছেন, থিয়েটার-সিনেমা, ক্লাব আর পার্টিতে; তার ভাগ্যে কচিং ঘটে, বেড়ালের ভাসো শিকে ছেঁড়ার মত। বাড়ীতে সাক্ষা আসার জরজরমত হয় ওঁদেরই জন্তে; আর ওকে তখন রেখে দেওয়া হয় মাসীরের তত্ত্বাবধানে!

কেন? কেন? ওর অন্তর বলে কি কোনো পদার্থ নেই? আজ যে সে সভ্য সমাজে মিশতে পারে না, নেই তার স্বচ্ছন্দগতি, সাবলীল ভঙ্গিমা, যেমন আজ দেখেছে ক্লাবে অল্প মেয়েদের মধ্যে? সে কার জন্ত? 'তার এই জড়তাপূর্ণ, যন্ত্রবৎ জীবনধারার জন্ত দায়ী কে? কিসের জন্ত সে হাসি-খুসি, চকল চপলতায় স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি? না কিছুমাত্র অভায় করেনি সে আজ!

ওদের জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, সে কাকুর হাতের খেলার পুতুল নয়! তারও নিজস্ব সভা বলে কিছু আছে; আর আজ থেকে তার সবব্যবহারও সে করবে।

ক্ষিদে ছিলো না, ক্লাস্ত পায়ের নিজের ঘরে গিয়ে শয্যায় এগিয়ে দিলো অবসর দেখখানি।

এতক্ষণে মনে উদয় হল দারুণ অভিমান। উদাসী পিতার হৃদয়হীনতা অন্তরে জাগালো স্রুতীর বিকোভের আলোড়ন।

আজ তার নিভীক মানবীয় সভা, হঠাৎ যেন নিস্তার জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠেছে, পিতার নীরব উপেক্ষার বিচার করতে।

কেন তিনি কাকুর প্রতি এমন অবহেলা প্রদর্শন করলেন? তার প্রতি কি ছিলো না তাঁর কোনো দায়িত্ব? কোনো কর্তব্য?

শুধু ব্যাকের টাকা আর বাড়ীই কি তার পাতনা? মাহুহীনা কাকুর পক্ষে, পিতার স্নেহছায়া লাভের আশা, এমনই অবান্তর মনে হল তাঁর কাছে? যে তিনি তার নির্দাসন-দণ্ড দিলেন একটা স্নেহহীন কঠোর, স্বার্থপূর্ণ পরিবেশের মাঝে? যার জন্ত তার জীবনের একটা দিক, একটা মহাপুঙ্গবতার ভরে আছে? যার জন্তে আজ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ জীবনপথে, তার সঙ্কোচপূর্ণ পদক্ষেপ?

এক-রাশ জটিল প্রশ্ন ভিড় জমালো, ওর অভিমানহত অন্তরে।

মনে পড়লো স্ফদামকে! হায়! দামীদা! আজ তুমি যদি পাশে থাকতে—জ্বালাময় বিদগ্ধ অন্তরটা আজ বার বার যে তোমাকেই চাইছে।

অসহায়, অন্ধকার, চারি ধারে আমার বড় অন্ধকার! [ক্রমশঃ।

## ওমরের সম্বন্ধে দু'টি কথা

মধুশ্রী চট্টোপাধ্যায়

ওমরের রূবাইগুলি যেন বহুবুর থেকে ভেসে-আসা অসংখ্য সুরের মূহু শুঙ্কন-ধ্বনি। যৌবনের এক মধুময় দিনে দেখলাম, অজস্র পুশ-সজ্জায় পূর্ণ ধরণীর বিচিত্র সজ্জা, পান করলাম যৌবনের রঙীন দেশায় পরিপূর্ণ মদিরা, উদ্ভূসিত প্রাণের আবেগচঞ্চল ব্যাকুলতা ভরা স্বপ্নালু অলস দিন দেখতে দেখতে গাড় অন্ধকারে ঢেকে গেল। একটি জীবন যেন সত্যফোটা একটি ফুল, যবে পড়ে যাবে, আবার

নতুন দিনের আলো কোটাব সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ফুটে উঠবে তার জায়গায়।

ওমরের কাছে এসব এক রাত্রির ঘটনা। জীবনের অস্তিত্ব তিনি একজন্মেই স্বীকার করেন, পরজন্মে নয়। সেই জন্মেই বলেছেন—

“জীবন-স্রোত শূন্য হবার আগে  
পাত্রখানি নাও ভরে নাও বিবিড় অলুবাগে।”

তিনি এই জীবনটাকে একটি প্রভাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। \* \* \*

“একটি প্রভাত আসে বিকশিত ফুলের মতন  
মরা বাঁচা শুধু এক বেলা

খেয়ালীর স্বপ্নের খেলা।”

এই যে আসা-যাওয়া, দিন আর রাত্তির, আলো আর অন্ধকার, এর মধ্যেই বা কি আর শেষেই বা কি?

“রেখা শেষে লুপে চলে যায়

জানো কি কোথায়?”

এ প্রশ্ন তো তাঁর মনেও জেগেছিল?

ববীন্দ্রনাথও বলেছেন—

“পথের শেষ কোথায়

কি আছে শেষে?”

গাঙ্গীও যখন রাজা জনকের সভায় প্রমোত্তর কালে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছিলেন ‘এর পর কি আছে?’ যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিয়েছিলেন— ‘এর পর কি আছে জানতে চাইলে তোমার মস্তক স্বকল্যাণ হবে, আর জানতে চেষ্টা না।’ ওমরও সেই প্রশ্ন করেছেন—কিন্তু সমাধানের কোনও ইঙ্গিত দিয়ে যাননি।

জন্মান্তরের প্রতি তাঁর আস্থা নেই, এটা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

“জীবনের অবসানে নাটকেরও হয়ে যায় শেষ।”

কিন্তু তারপরেই দেখি—

“আমাদেরও হ’ল দিন বাদে

নামতে হবে মাটির শেষে

কে জানে সই তার পরে ফের

এট আসরে আসবে কে যে।”

আমাদের আশু হিসেব করা দিনের মত! বাঁধা-ধরা নিয়মে মহাকাল যেন সন-সর্গবা বয়ে যাচ্ছে। ফুল ফুটল একটি সুন্দর আলোভরা প্রভাতে, ঝরে পড়ল নিশীথে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে যেটুকু আনন্দ করতে পারা সম্ভব, ওমর সেটুকুই নিঃশেষে উপভোগ করতে বসেছেন, কাল প্রভাত হবার পূর্বেই হয়ত আমাদের চলে যেতে হবে। তাই কায়ের ভাবনাগুলো তুলে রাখতে বলেছেন।

যারা কালের ভাবনার অস্থির, ইহকাল পরকাল কোনও কালেরই কাজ বাদের দ্বারা হবে না—অথচ অস্থিরতার অন্ত নেই যাদের, তাদের ছ’নৌকায় পা দেওয়া ভাবকে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

“মুখ্য তোদের ঈঙ্গিত ধন  
কোথাও যে রে নাই।”

এটা একটা নিষ্ঠুর সত্য।

এক শ্রেণীর লোককে ওমর বিজ্ঞপের কশাঘাতে জর্জরিত করে  
[ তুলেছেন তাঁর কাব্যে।

যারা আকর্ষণ পিপাসা নিয়ে পরিপূর্ণ পানপাত্রের কাছ থেকে।  
থাকবেন তাঁরা ওমরের মতে—

“পূর্ণ করি দাঁও সখি পানপাত্র মোর,  
অক্লান্ত হ’য়ে থাক স্বপ্নের ঘোর—”

কিংবা—

“থাক সখি পড়ে থাক যত গৃহকাজ  
এস এস ছুটে এস আজ  
পানপাত্র দ্বারা ভরি নাও,  
ফাঙন আঙন ফেলে দাও  
নীতের কুহেলী আবরণ।”

বা—

“ওমর বলে আমার সাথে  
বেরিয়ে এস আজকে রাতে  
তবুখার জটিলতা শাস্ত্রবচন ভুলে।”

“দাঁও পিয়াল, প্রিয় আমার  
এই অধরে পূর্ণ করে,  
বাক অতীতের অনুতাপ আর  
ভবিষ্যতের ভাবনা ম’রে।”

ইত্যাদি মনে তো নীতিমত রেগে যাবেন।—তাঁদের বহুকালক  
অন্ধ সংস্কারছন্ন মনে এসব হাঁকা কথা, বা জীবনে একটু ছা  
দেওয়ার অপরাধে কঠোর আত্মতুষ্কি ব্যবস্থা করেন, তাঁদের জ  
তিনি বলেছেন— \* \*

“মুযাজ্জীনের কণ্ঠ শোনা থাকে  
মুখ্য তোদের একূল ওকূল ডুবল ঘণীপাকে।”

ধর্মযাজকদের ব্যঙ্গ করে তিনি তৎকালীন সমাজের প্রতি বহু কট  
করে গেছেন। প্রচলিত ধর্মবিশিষ্ট তাঁর অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা কি নি  
ভাবে ফুটে উঠেছিল—তা তাঁর রুবাইগুলি পড়লেই বোঝা যায়।

অথচ তিনি সত্যাত্মী ছিলেন। আত্মজিজ্ঞাসু ছিলেন, শুধু ও  
নয়, তিনি ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানী।

তৎকালীন সমাজের ধর্মের কাঠামোর ভিতরের বস্তুকে তিনি  
অগ্রাহ্য করেন নি, করেছিলেন কাঠামোটাকে। বাহ্যিক আচার-সম্বন্ধ  
মাহুষের ভেতরের বস্তুকেই তিনি চেয়েছিলেন।

ববীন্দ্রনাথের যেমন সীমার মাঝে অসীম, ওমরের তেমনি স্রো  
এক সাকী, এদের ভেতরেই তিনি সুখী সম্প্রদায়ের রহস্যময়  
সাধনপথের রূপ এবং অরূপের তত্ত্ব জীবন ভোর করেছেন। তিনি  
বলেছেন—

“পাঠাইয়াছি একদিন  
আমার আত্মায় সেই পরিচরয়ীন  
সুদূর অদৃশ লোক বধা—  
জানিবারে জীবনের ওপারের দূ’-একটি কথা  
দীর্ঘ দিন পরে মোর আত্মা এসে ফিরে  
ডেকে বলে ধীরে  
চোখে দেখ স্বামী  
স্বর্গ ও নরক তব একাধারে আমি।”

ঈশ্বরের কাছে তিনি দয়া ভিক্ষা করেছেন করুণ ভাবে—

“পাপের মরিচা পানে মত্ত মোর দুঃস্বপ্ন জগত

শান্ত করে দাঁও ত্বারে রূপা দানে ওগো দয়াময়।

কমা করো যদি আমি করে থাকি কোনও অপরাধ  
ওমর চাহে না কিছু—যাচে শুধু তোমার প্রসাদ।”  
করা— “কমা করো—দয়া করো দুর্বলে দেব !  
ভাস্ত্র জনে শাস্তি দেওয়া তোমার কি সাজে ?  
তুমি যে দয়াল-দাতা, মেহপূর্ণ প্রাণ  
অক্ষমের বাথা যে গো বুকে তব বাজে !”  
এই মিনতিপূর্ণ করুণা-ভিক্ষার পরও কি অবিশ্বাসী বলা চলে ?  
তিনি ঈশ্বরের একদে বিদ্বাসী ছিলেন। তিনি বসেছেন—  
“সত্য একা বিশ্বব্যাপী সত্য ছাড়া নাই যে কিছু  
সেই একদে কেন্দ্র করে বহুর প্রকাশ হচ্ছে পিছু।”  
ঈশ্বর এক, কিন্তু বহুর মধ্যে তাঁর প্রকাশ, এ কথা তিনি স্বীকার  
করেছেন।

“ছোট বড় নানা রূপে দিকে দিকে ষাঁহার বিকাশ  
সবার মাঝারে থেকে তবু ষিনি সদা অপ্ৰকাশ,  
জরা-মৃত্যু ঘৌবনের বিখজোড়া বিতর্কের মাঝে  
এ তো সেই নির্বিকার নিয়ত বিরাজে।”  
ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিকল্প, তিনি কিছুই করেন না। অথচ  
চিনিই সত্য। তিনিই জ্ঞেয়—তিনিই জ্ঞাতা, একথা হিন্দুদর্শনও  
লভেন। এইখানে ওমরের সঙ্গে উপনিষদের বাণীর আশ্চর্য্য মিল  
খা যায়। ঈশ্বরের দেখা পেতে হলে তাঁর জন্তে সর্ব্বের ছাড়তে  
না—তিনিও স্বীকার করেছেন—

“দেখা যদি পেতে চাও তাঁর  
ছাড়ো এষ্ট অনিত্য সাসার  
ছিন্ন করে জীবনের যত কিছু কঠিন বন্ধন !  
জগতের শত পাকে বন্ধ জীবগণ  
পারে না দেখিতে তাঁরে  
বৈরাগ্যের কঠোর কুঠারে  
স্বজনের মায়া-মোহ পাশ

না যদি করিতে পার নাশ।”  
বীন্দ্রনাথ বলেছেন— “তোমার প্রকাশ হোক  
কুহেলিকা করি উৎঘাটন  
সূর্য্যের মতন”

মর বলেছেন— “ওগো বিশ্বধারী  
একমাত্র তুমি হেথা সত্য-পথচারী  
খোলো খোলো তব সিংহ-দ্বার  
দেখাইয়া দাও আজি  
কোথা পাবে সুপথ আমার।”

বীন্দ্রনাথ বলেছেন—  
“উজাড় করে লও হে আমার সকল সঞ্চল,  
শুধু ফিরে চাও হে চঞ্চল।”

কিনা— “চির জন্মের বেদনা  
ওহে চির জীবনের সাধনা  
তোমার আন্তন উঠুক হে জলে,  
রূপা করিও না দুর্বল বলে  
যত তাপ পাই সহিবারে চাই  
পুড়ে ছাই হোক বাসনা।”  
এই ধরনের কবিতার বা গানের সঙ্গে ওমরের একান্ত মিল আছে।  
“নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে  
বয়েছ নয়নে নয়নে।”

গানটির সঙ্গে ওমরের—  
“বধির এ কর্ণ ভায়,  
নাহি পায় পদশব্দ তবু !  
আমাদেরই দৃষ্টি-পথে  
জেগে আছো অপরূপ প্রভায়,  
তবু এই অন্ধ আঁখি  
রূপ তব দেখিতে না পায়।”

কবিতাটিতে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

আনন্দের মধ্যেই যে ঈশ্বরের প্রকাশ, একথা তিনি সাকী এক  
সুরার মধ্যে দিয়েই বহু ভাবে ব্যক্ত করেছেন। উপনিষদ বলেছেন—  
আনন্দই ব্রহ্ম। সং-চিং-আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ। আনন্দই সত্য।  
এক সত্যই আনন্দ—এ কথা তো বহু জ্ঞানীরাও বলে গেছেন।

ওমর বলেছেন—  
“ওগো সাকী, নিয়তির তরঙ্গ ভাঙনে  
জীবন-তরঙ্গী যদি হয় কুলহারী,  
না মেলে আশ্রয় যদি পথশ্রমে হ'লে মোরা সারা,  
কিছু নাহি আসে-যায়, আমাদের করে  
পানপাত্র পূর্ণ যদি থাকে।

সত্য বরে সাথে-সাথে নিম্দেশিতে  
পথ জীবনের সকল বিপাকে।”

ওমরের কাণের বহু দিক আলোচনা করার মত বস্তু আছে। রূপ ও  
অরূপের যে তত্ত্বটি কিন্তু তিনি বা বলতে চেয়েছেন তা বোধ-হয় এই—

“ঢালিছে যে স্থখা শাখত সাকী  
নিখিল পাত্র পরে  
কোটি বৃদ্ধ উঠিছে ফুটায়  
ফেনিল সে নির্ধরে।  
তোমার আমার মত কত শত  
সেই স্রোতে সদা ভাসে  
সাকীর পাত্র পূর্ণ সত্যত  
কেউ যায়, কেউ আসে।”

You shall have joy, or you shall have  
power, said God; you shall not have both.

—Emerson.



## লাক্ষাশিল্প ও পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাক্ষার গুরুত্ব আজ অনেকখানি এবং এইটিকে কেন্দ্র করে মস্ত শিল্প গড়ে উঠছে এই রাজ্যে। ছাত্রপোকার মত এক প্রকারের কাট-নিংসহ লাগাই হচ্ছে লাক্ষা। অপর দিকে লাক্ষা-কাটগুলোর প্রধান খাত পলশ, কুশুম প্রভৃতি গাছের রস। পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তরগুলোতে এ সকল গাছ প্রচুর সাধ্যায় রয়েছে বলে লাক্ষার চাষ এখানে খুব সহজ। লাক্ষাশিল্পে এই রাজ্যের অগ্রগতির মূল কারণই এইটি বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

কিছু দিন আগে পর্যন্তও পশ্চিম-বাংলার লাক্ষার বার্ষিক গড়পড়তা উৎপাদন ছিল ৪৫ হাজার মণ। কিন্তু এই উৎপাদনের হার এক্ষণে বেড়ে গেছে বিপুল পরিমাণে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বিহারের বিস্তার লাক্ষা উৎপাদক অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সেই থেকেই এই রাজ্যে এই ফসলের উৎপাদন দ্রুত বেড়ে গেছে। বলতে কি, যেখানে বার্ষিক উৎপাদন ছিল মাত্র ৪৫ হাজার মণ, সেটি হয়ে পাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার মণ এবং ভেতর। অপর দিকে পূর্বে যে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের লাক্ষা উৎপাদন ছিল ভারতের মোট উৎপাদনের ৪'৮ শতাংশ, এক্ষণে সেইটি বৃদ্ধি পেয়ে ২২'২২ শতাংশে পাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের লাক্ষা উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উৎপন্ন লাক্ষা পরিশোধনের জন্য ঝালদা, বলরামপুর, তুলিন, পুরুলিয়া ও আদ্রায় বহু কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এই কারখানাগুলো অবশ্য কুটারশিল্পের ভিত্তিতে চালু—বাস্তবিক পদ্ধতিতে গালা উৎপাদনের জন্য কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে দুইটি বড় কারখানা। ভারতে উৎপন্ন লাঠি-লাক্ষার এক-তৃতীয়াংশই এখানে পরিশোধন করে গালায় পরিণত করা হয়। সমগ্র দেশে লাক্ষা পরিশোধনের ৪ শত কারখানা (দেশী) আছে এবং তন্মধ্যে প্রায় ১৬০টি কারখানাই স্থাপিত এই পশ্চিম-বাংলায়। আলোচ্য কারখানাগুলোতে অসংখ্য শ্রমিক কর্মনিযুক্ত রয়েছে, এবং অবিরাম সচেত্ন রয়েছে জীবিকা নির্বাহের জন্যে।

মাছবের প্রয়োজনীয় বহু জব্য-সামগ্রীতে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে লাক্ষার উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ হলেও এর ব্যবহার এখানে অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এই অঞ্চলে প্রধানত: খেলনা, চুড়ি, স্বর্ণালঙ্কার ও অলঙ্কার পালিসের কাজে লাক্ষা ব্যবহার করা হয়। লাক্ষার বেশী ব্যবহার চলে বানিশ, গ্রামোফোন রেকর্ড, সীসের গালা প্রভৃতি এবং ইনসুলেটিং জব্যাদিতে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ

কেন, সমগ্র ভারতে উৎপাদনের তুলনায় লাক্ষার ব্যবহার সামান্য। একটি সরকারী হিসাবে বলা হয়েছে—উৎপন্ন লাক্ষার মাত্র ৮ শতাংশ ভারতে ব্যবহৃত হয়। শতকরা অবশিষ্ট ৯২ ভাগ লাক্ষার রপ্তানী হয়ে যায় ব্রুটন, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, কিশি প্রভৃতি শিল্পমুখ্য দেশগুলোতে। এতে অবশ্য ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে প্রচুর। হিসাবে দেখা গেছে—ভারত থেকে বহর যে লাক্ষা রপ্তানী হয়, তার গড়পড়তা মূল্য প্রায় ১০ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা।

ভারতে লাক্ষা উৎপাদনের মোট পরিমাণ হচ্ছে ১১,০০,০০০ মণ। তন্মধ্যে রাজ্য হিসেবে উৎপাদনের হার এইরূপ:—বিহার—৪,৫০,০০০ মণ; মধ্যপ্রদেশ—২,৭৫,৫০০ মণ; পশ্চিমবঙ্গ—২,৪৫,০০০ মণ; উত্তর প্রদেশ—১১,০০০ মণ; বোম্বাই—৬৫,০০০; উড়িষ্যা—১৮,০০০ মণ; আসাম—১৮,০০০ মণ; পাঞ্জাব—২,১০০ মণ এবং অন্যান্য রাজ্য ১৮,০০০ মণ। লাক্ষাশিল্পের সমবিক অগ্রগতির স্ব দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাক্ষার গুরুত্বের দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার'সে ব্যবস্থা ও প্রস্তুতিগুলো সম্যক কার্যকরী করবেন, এইরূপ দাবী নিশ্চয়ই রাখা যায়।

## খাত্ত হিসেবে কাজুবাদাম

যত দূর দেখতে পাওয়া যায়, খাত্ত হিসেবে কাজুবাদামের ব্যবহার এদেশে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এখানকার ছাত্র বহির্দেশেও আজকের দিনে এর সমাদর যথেষ্ট এবং বিভিন্ন কবিন, রেস্তোরাঁ, কফিহাউস প্রভৃতিতে আছে এ সবরবাতের ব্যবস্থা। শুধু একটি স্বস্বাদু খাত্ত বলেই কাজুবাদামের উচ্চ সমাদর নয়, পরন্তু এইটির জন্যে এর বিশেষ খাত্তগুণই দারী। প্রকৃত প্রস্তাবে, বিশেষণ মারফত কাজুবাদামের ভেতর মাছুর খুঁজে পেয়েছে পর্যাপ্ত খাত্তপ্রাণ বা 'ভিটামিন'।

এই ফলটির গুণাগুণ নিয়ে খাত্তবিজ্ঞানীদের গবেষণা অবশ্য চল আসছে বহু দিন থেকেই। গবেষণায় খাত্ত হিসেবে এর মূল্য ও পুষ্টিকারিতা ধরা পড়েছে অনেকখানি। খাত্তবিজ্ঞানী তথা খাত্ত বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন—কাজুবাদামে শতকরা ২১ ভাগ রয়েছে প্রোটিন ও ২২ ভাগ খেতদার পদার্থ এবং মেহজাতীয় পদার্থ বলতে যেটি বুঝায়, সেটি আছে কমপক্ষে শতকরা ৪৭ ভাগ। এ ছাড়া এই শ্রেণীর বাদামের শর্কাস আয়রণ, ক্যালসিয়াম, নিকোটিনিক এসিড, রিবোফ্লাবিন—এ সকল পুষ্টিগুণ উপাদানগুলোও বিশেষ ভাবে বিস্তারিত।

কাজুবাদামের চাষ আজ-কাল ভারতের বহু প্রদেশের মধ্যে

বেশী পরিমাণে জন্মে থাকে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতেই। বঙ্গো ও এর চার চলেছে বটে কিন্তু চাহিদার তুলনায় উৎপাদন খুবই কম। মাদ্রাজ আর অন্ধ্র রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলা-তে প্রচুর কাঁজুবাদাম জন্মায় এবং সেখান থেকে এটি চালান ঘাসে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে। কাঁজুশাঁস তৈরীর পর জন্তে দক্ষিণ-ভারতে গড়ে উঠেছে বেশ কতকগুলো কাঁজু-না।

বহু বকমারী মুখরোচক ও উপাদেয় খাত আমরা পেয়ে আসছি কাঁজুবাদাম থেকে। এর শাঁস কি কাঁচা কি ভাজা—যে কোন টি খাওয়া যায়, তবে সামান্য মূণ বা চিনি মিশিয়ে নিতে হয় দবকার বোধে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো। নানাবিধ আমিস, মিস ও মিষ্টি খাবার স্বগন্ধ করার জন্তেও এই শাঁস ব্যবহার করা শাঁসটায় তেল দিয়ে ভাজলে অবশ্য ঘরে বেশী দিন রাখা চলে। কাঁচা অবস্থায় এটি সাধারণতঃ ভাল থাকে এক বছরেরও বেশী। আমেরিকা প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রে খাবার চকোলেট তে কাঁজুশাঁস ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কাঁজুবাদামের শাঁসবিহীন খোসাগুলো থেকেও কতকগুলো দু ও পুষ্টিকর খাত হয়। বস্তুতঃ কাঁজুশাঁসে যেখানে 'ক' ও 'থ' প্রাণ রয়েছে সেদিকেই বাজুফল বা কাঁজুবাদামের শাঁসবিহীন গায় আছে যথেষ্ট পরিমিত 'গ' খাতপ্রাণ। এটিটিকে কত ভাবে কলাগান যায়, সেজ্ঞা এবং ভেতর বড় পরীক্ষা হয়েছে খাত-বা-স্বাস্থ্যগুলোতে এবং পরীক্ষায় সুফলও পাওয়া গেছে প্রচুর। টর উপর খাত হিসেবে, বিশেষ করে পুষ্টিকর খাতরূপে কাঁজু-মের মূল্য ও গুরুত্ব এ যুগে অর্দো অস্বীকার করা চলে না। গ্রনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশে যদি এর চাষাবাদ আরও বৃদ্ধি পায়, তবে প্রভূত কাজেই আসবে এবং এই ব্যাপারে জাতীয় গায়ের সজাগ দৃষ্টি ও সক্রিয় সহযোগিতা বেশী বকম না থাকলে নয়।

## চাকুরী থেকে অবসরের বয়ঃসীমা

চাকুরী বা কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের বয়স সংক্রান্ত বহু ব্যবস্থা আছে প্রায় সকল দেশেই। কোথাও বা ৫৫ বছর ; কোথাও ৬০ বছর, আবার কোথাও হয়ত ৬৫ বছর বয়সে এই প্রশ্নটি

এসে দেখা দেয় চাকুরীজীবী, বিশেষ করে সরকারী চাকুরিদারের কাছে। স্বতঃই ধরে লওয়া হয় যে, একটানা দীর্ঘ ২৫৩০ বছর কাজ করার পর গড়পড়তা মানুষের কর্মক্ষমতা এবং চিন্তাশক্তি আটুট থাকে না বা থাকতে পারে না। বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর গ্রহণের বয়স বেধে দিবার নিয়মটি এসে দাঁড়িয়েছে এই ধারণা বা বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই।

কিন্তু প্রশ্ন এখনও থাকে—অবসর গ্রহণের উক্ত বয়ঃসীমা নির্ধারণ অর্থাৎ বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের চলিত ব্যবস্থা একান্ত সমীচীন বা প্রয়োজনীয় কি না? অল্প দেশে যেমনই হোক, গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এই নিয়ে জোর গবেষণা চলেছে। গবেষণার ফাঁকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এবং ভেতর মন্তব্য করেছেন— বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর গ্রহণের বয়স নির্ধারণের বর্তমান নীতি বা রীতিটি অচল। তাঁরা দেখেছেন—৫৫ বা ৬০ বছর বয়সে যাবা বাধ্য হলেন কাজ থেকে অবসর নিতে, তখনও তাঁরা কাজ চালিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট সক্রিয়, স্বাস্থ্য তাঁদের জুট। তদুপরি দেখা গেছে—কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার পরই স্বাস্থ্য তাঁদের ভেঙ্গে পড়ে দ্রুত এবং বিনষ্ট হয়ে যায় ক্রমেই সকল পৌরুষ ও মনের ক্ষুদ্রি। অবশ্য এ মন্তব্যটি তাঁরা করেছেন—গড়পড়তা সরকারী ও বেসরকারী চাকুরিয়া বা চাকুরীজীবীদের দিকে তাকিয়ে।

আলোচ্য সমস্যা নিয়ে আমেরিকার লাইফ এক্সটেনশন সার্ভিস ফাউন্ডেশন সে তদন্ত বা পর্যালোচনা চালিয়েছেন, সেটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার। সম্প্রতি ফাউন্ডেশন ৩০টি প্রশ্ন সম্বন্ধিত একটি প্রশ্নমালা ছাড়িয়ে দেন ১৫ শত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট। উত্তরদাতারা সকলেই মোটামুটি এই কথাটা বলতে চেয়েছেন— অধিক বয়সেও নিশ্চিন্ত স্বাস্থ্য ও মনের শান্তি বজায় রাখবার জন্তে অর্থটাই সবচেয়ে বড়। জীবন ধারণের উন্নততর ব্যবস্থা থাকলে ৫৫ বা ৬০ বছর, এমন কি ৬৫ বছর বয়সেও সাধারণ অবস্থায় শরীর ভেঙ্গে পড়ে না কিংবা সহসা কারণ হয় না কর্মশক্তি বিলুপ্তির। তারপর অবসর জীবনে কি ভাবে সময় অতিবাহিত তথা সময়ের সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে, সেইটোও এ প্রশ্নে ভালরকম বিচার্য। বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা নির্ধারণ কালে এই জরুরী প্রশ্ন কয়টি সম্মুখে রাখলে সিদ্ধান্ত সঠিক হবে অনেকটা, এই দাবীটি রাখা চলে।



ক্যালকাটা অর্পাটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড

ফোন • ৩৫ - ১৭১৭ প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু ব্রহ্মরি  
গ্রাম - ক্যালকাতা • ৪৫নং আম্বহার্স্ট স্ট্রীট • কলিকাতা - ৯

# বনানী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

মূলোখা দাশগুপ্তা

মৌরীর কাছে ওরকম হাতজোড় অবস্থায় মঞ্জু ওকে দেখে ফেললো বলে ততটা নয়, যতটা মৌরী ওভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেলো বলে—প্রথমটায় কেমন যেন বোকাই বনে গিয়েছিল সন্দর্শন। তবু সহজ ভাবটা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল সে। মুখে হাসি রেখেই চায়ের কাপটা নিয়েছিল হাত বাড়িয়ে। চায়ে চুমুক দিয়ে ভালোলাগার প্রশংসাসূচক শব্দ করেছিল ‘বাঃ’। দাঁড়িয়ে-থাকা মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল—দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

এই ঘটনার পর যে পথটা খোলা ছিল সন্দর্শনের কাছে, সেটা এই—এই সহজ ভাবটাই বজায় রাখা বা সম্ভব হলে এটার মাজাটা আরো একটু বাড়িয়ে দেওয়া। প্রথম ধাক্কায় করেছিলও সে সেটা। কিন্তু মঞ্জুর মনে হলো, সন্দর্শনের চরিত্রটাই বোল-করা কাগজের মতো; ঝোঁকটাই গোটানোর দিকে। মেলে ধরলেও সময় নেয় না ওটিয়ে যেতে।

অনুপায় মঞ্জু জানালার দিকে তাকিয়ে বসে রইলো মুখে এমন একটা হাসির ভাঁজ ফেলে বেন, কোন মজার দৃশ্য ওর দুইটিটাকে বাইরের দিকে আটকে রেখেছে। সন্দর্শনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করাটা শুধু ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর অপেক্ষা।

অবশি মঞ্জু যে একেবারেই কিছু না দেখছিল বা না শুনছিল তা-ও নয়। বাস্তব মিষ্টি গন্ধ গলিপথ পার হয়ে গিয়ে কোঁকুল জাগিয়ে তুলছিল প্রতিবেশীর। ওদের বাড়ী আজ কি ব্যাপার? ঘরে ঘরে ব্যক্তি অলছে, নানা বাস্তব গন্ধ আসছে। মৌরীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে? ছেলে এসেছে? কি করে ছেলে? মস্ত ডাক্তার! এখনই ‘মস্ত’ হলো কী করে? ডাক্তার আর উকিল চলে পাক না ধরতে মস্ত হয় কখনো? তা ডাক্তারীতে মস্ত না হলেও অবস্থায় এখনই মস্ত বিরাট ধনী? এ্যা! তবে বৃষ্টি ভালো? জিভটা সামলে ফেঁসতে হয় যার। তবে বৃষ্টি আলোপ পরিচয়ের বিয়ে? নয়! ওর পিসেমশাইএর বন্ধুর ছেলে। এবার অনুভূ কন্ডার দিকে তাকিয়ে মা কি ভাববেন কে জানে! হয়তো এমন একটি আত্মীয়ের খোঁজ করবেন মনে মনে। হয়তো একটি নিঃশব্দ চাপাতে হবে। আছে, আছে কি আর না। কিন্তু কোন উপকার করবে তারা—সে আশায় বালি। হয়তো জানতে চাইবেন মা ছেলের বয়স। প্রায় সব জানার পর এবার ‘এতো কে জানেন’ বিরক্তি প্রকাশ করবে মেয়ে। মৌরীর-সৌভাগ্য সবকে ধারণাটা অসমাপ্ত থেকে যাবে মার, ছেলের বয়সটা না জানতে পেরে।

বাড়ীটা কি এতো কাছে? কথা কি তারা টেটিয়ে পাড় মাখায় করে বলছিল? না। স্বভাবগুলো মঞ্জুর ভীষণ চেনা।

শ্রাওলের শব্দ তুলে লম্বা বারান্দা পার হয়ে नीচে নেমে গে বাসনদেব। আওয়াজ পাওয়া গেল ছোটপিসির পাড়ী বেরিয়ে যাওয়ার ভারি সুরিধে হয়ে গেছে ছোড়াটাটার। ছোটপিসি না বললে তা পাড়ী চাইবার সাহস কখনই তো তার হতো না কিন্তু এর সঙ্গে তার দৈ, ওর রসকদমের জন্ম ছুটোছুটি তাকে তো করতাই হতো মঞ্জুর দৃষ্টিটাকে বাসনদেব শ্রাওলের শব্দ বাইরে থেকে টেনে এনেছি বারান্দায়—এবার সেটাকে ঘরে এনে সন্দর্শনের দিকে তাকালো সে।

নীরবে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে সন্দর্শন হাতের জলস্ত সিগারেটটির দিকে চোখ রেখে।

নাঃ! তার মুখে, চোটে তার দুই চোখের কোঁচকানো দৃষ্টিতে র মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে, লজ্জা বা অপরাধীর মনোভাব বলে তার অর্ধ কিছুতেই করা যায় না। উলটে আরো মনে হচ্ছে, একটা অস্বীকারের চোঁহারা না দেখানো পর্যন্ত তার আহত আত্মমর্দ্য যেন কিছুতেই শান্ত হতে পারছে না। মঞ্জু বুঝলো, কেউ ক বাবে না। বৃদ্ধটা হুঁপকে করা হবে। হঠাৎ কেমন যেন একটা আনন্দ আর আত্মীয়তা বোধ করলো মঞ্জু সন্দর্শনের প্রতি। মুখের উপর এসে-পড়া অগোছালো চুলগুলো হাত দিয়ে সরায় সরাতে বললো—কথা খুঁজে পাচ্ছিনে। কিছু বলুন।

অতি মনোযোগের সঙ্গে হাতের অর্ধেক শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা যাস্ট্রের ভেতর ঠেসে ঠেসে নেবাতে লাগলো সন্দর্শন।—আমিও পাচ্ছিনে।

—তবে?

নেবানো সিগারেটটা যাস্ট্রের ভেতর ফেলে এবার সোজা হয় বসলো সন্দর্শন।—শুনি, মেয়েদের নাকি কখনোও কথার অন্য হয় না।

—হী, এবার অনেক কথা বলার মতো একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছেন বটে! বলতে পারি, বেচারী মেয়েরা কি করবে বলুন! চোখ বাঁধানো নেই, ভয় দেখানো নেই, হিসাব চাওয়া নেই—কর দেওয়া নেই—অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছে তারা কেবল এই একটা মাত্র ক্ষেত্রে। আরন্তেও এসে গেছে এ বিজ্ঞাটাই আরো বলতে পারি, বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, শক্তি অপক্ষয়ের এমন একটা পথ খুলে রেখেছিলেন বলেই; নইলে এতো দিতে এ আত্মশক্তি তারা সক্ষম করতো—কিন্তু না। এসব কথার উত্ত প্রত্যুত্তরের জন্ম একটা জোরালো প্রতিপক্ষ থাকা চাই। ছোড়া না হলে আমার জন্মে না। বিষয়-বস্তু ভেদে মানুষকে আছে তো—আছে না? তার চাইতে বলুন এ সময়টা আপা সাধারণত কি ভাবে কাটান বা কি ভাবে কাটলে আপনা ভালো লাগবে বলে মনে হয়? আমরা দেখি, আমাদের দু মাথো তা সম্ভব কি না।

—এ সময়টা মানে সন্ধ্যার সময়টা?

—হী।

—আমার সন্ধ্যার আনন্দের আরোজন?

—সন্ধ্যার আনন্দ বলে কোন চিহ্নিত আনন্দ আছে না কি?

—বিষয়-বস্তু ভেদে মানুষভেদের মতো সময়ভেদে চিহ্নিত আন আছে বৈ কি।



# স্বাধীন!

আপনার সর্দি  
বিপজ্জনক হ'তে পারে !

গুরুতর রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে— এই উত্তম  
নিশেষ কার্যকরী মলমটি দিয়ে সর্দির যন্ত্রণা দূর করুন!

সর্দির জ্বালা যখন যখন শুরু হয় তখন তখন  
সর্দিতে কেন ভুগছেন! শোবার সময় বুকে পিঠে ও গলায়  
ভিকস ভেপোরাব মালিশ করুন... আর সর্দি যেখানে যন্ত্রণা  
দিয়ে, ঠিক সেখানেই আপনি বোধ করবেন বেশ স্বাধীন।  
ভিকস ভেপোরাব যখন অসহ্য আপনার সর্দির জ্বালা  
যন্ত্রণা দূর করে... আর ঘুম থেকে উঠেই আপনি আবার  
আগের মতই স্বস্তি বোধ করবেন। পরিবারের সকলের  
পক্ষে উপকারী।

ইহা দু'ভাবে সর্দি উপশম করে !



১  
ইহা বাস-  
প্রশ্বাসের সঙ্গে  
কাগ করে—

ভিকস ভেপোরাব  
থেকে যে শক্তি শালী  
উদ্বেগের গন্ধ বেরিয়ে তা  
আপনি বাসের সঙ্গে গ্রহণ  
করে গলায় ও নাকে সর্দির  
যন্ত্রণা দূর করতে পারেন।



২  
ইহা হৃকের  
ভিতর দিয়ে  
কাগ করে—

ভিকস ভেপোরাব  
মালিশ করা মাত্রই উহা  
হৃকের ভিতর দিয়ে প্রবেশ  
করে, আপনার বুকের  
সর্দির বাধা দূর করে।



**ভিকস**  
ভেপোরাব

বুকে, পিঠে ও গলায় মালিশ করুন !

এখনই ভিকস ভেপোরাব ব্যবহার করুন :

**নতুন** ছোট ট্রায়াল সাইজ টিন—মাত্র ৪০ নং পঃ ও তত্পরি ট্যাক্স।



যাম দেখা দিতে চাইলেও যামবার মেয়ে মঞ্জু নয়। বললো—  
বশ তাই।

একটু সময় তাকিয়ে রইলো স্বদর্শন মঞ্জুর দিকে। তারপর  
বললো—মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে।

—বিষয় ?

বাজার-দর নয়।

—ও তো আপনি জানেনই না ! কিন্তু মেয়েদের দর ?

—বাজার-দরের মতো মেয়েদেরও কোন বাঁধা দর আছে, আমার  
চান নাই।

বাঃ, তা থাকবে না কেন ? দর অর্থে তো টাকা-পয়সার দরই  
গাফার না কেবল। মর্যাদাটাও দর। আর বেশী দিকে না তোক,  
অশিক্ষের দিকে একটা মাত্রাও নিশ্চয়ই তার আছে—কিন্তু তা যখন  
আপনার জানা নেই, তখন যে যেমন আদায় করতে পারে—তাই না ?  
আদায় করতে না জানলে তবে তো ঠিকতে হবে দেখছি।

পাখার হাওয়া থেকে আডাল করে আর একটা সিগারেট ধরালো  
স্বদর্শন—জীবনভর মানুষ শিখতে শিখতে চলে। আমি না হয় এ  
বিত্তোটা এখানেই শিখবো।

—যে শিক্ষাটা সব প্রথমে হওয়া উচিত, সেটা যে কেন শেষ জীবন  
পর্যন্তও ছেলেদের হয় না, বুঝিয়ে—বলেই কেসে ফেললো মঞ্জু।  
বললো—না এ ঠিক হচ্ছে না। এক সন্ধ্যার অতিথি আপনি।  
যদিও আক্রমণটা আপনার দিক থেকেই আসছে, তবুও হার স্বীকার  
করা উচিত আমারই। নলেছি তো, আজ এ বাড়িতে আপনার জন্য  
অসম্ভব বলে কোন কথা নেই। দেখবেন আরো, অসম্ভব কিছু  
বললেই তা সম্ভব করে সবাই অসম্ভব খুসী হয়ে উঠবে। বলুন, কি  
ভালো লাগবে আপনার ?

আকাশে যে আয়োজনটা অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছিল সেটা যেন শেষ  
হলো একক্ষণে। ছাড়লো জোর ঠাণ্ডা বাতাস। উড়তে লাগলো  
জানলা-দরজার পর্দা। রজনীগন্ধার খোপা থেকে বরে পড়লো  
মেহেতে কিছু ভেজা ফুল। ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে নরম মিষ্টি গন্ধে  
ছোট্ট ঘরটা উল্লাসে ভরে। সময় হলো এখন জোরালো বাতীটা  
নিবিয়ে সবুজ বাতীটা জ্বালিয়ে দেবার। কিন্তু তারপর গর নিজের  
পক্ষে এখানে বসে থাকারটা যে হবে সাদা বাতীটার চাইতেও বেমানান !  
ডেকে আনবে না কি মৌরীকে ?

ছুটে এসে বেড়িওর ঢাবী বোরালো অমিতা। কি সুন্দর রবীন্দ্র-  
সঙ্গীত হচ্ছে। রেডিওটা খোলানি কেন ?

কেন যামিনী না যেতে জাগালো না,

বেলা হলো মরি লাঞ্জে—

মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে অমিতা খুসীতে হাসলো।

পরদার নীচ দিয়ে দেখা গেল আলো পড়ে চকচকিয়ে ওঠা চন্দ্রমাস  
ছোট্ট পা আর শান্তিপূরী দুইটা গিলে-করা কালো জরিপাড়। 'বাব'  
থেকে ফিরলেন যতীন বাবু। প্রতিদিন আরো রাত হয়। আজ  
শুধু স্বাভা-বন্ধা করে এলেন। নইলে রাতে না হবে কিদে  
না হবে বুঝ। স্বদর্শন চোখ তুলে বারান্দার দিকে তাকালো।  
মঞ্জু বলল—বাবা !

—ও !

কিন্তু যতীন বাবু এসে চুকলেন এ ঘরেই। চোখ দু'টা তার

ঈষৎ লাল। মাথার চুল কিছুটা উসকো। কাবর, ঝড়ো বাতাসট  
তিনি পাখের পেয়েছিলেন।

হাতের সিগারেটটা ঘাসট্রের ভেতর ফেলে উঠে দাঁড়ালো স্বদর্শন  
তাকে বসতে বলে নিজেও আসন গ্রহণ করলেন যতীন বাবু ; আর ম  
বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো ছাদে মৌরীর কাছে।

তখন বুট্টি পড়া শুরু হয়ে গেছে। মৌরী ওর ইঞ্জিচেরারটা চিলে  
কোঠার ভেতর টেনে এনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাড়ীর আঁচল দিয়ে বু  
মুচছে শব্দ খেকে।

—শ্রীমতী এবার বুঝি চিলেকোঠার বসে প্রকৃতির বুট্টিভেজা রূপ  
দেখবেন ?

—আজ্ঞে হাঁ। তা আপনি কি করতে বলেন শ্রীমতীকে ?

—খামকা ভালমানসী দেখান নে দিদি ! যেন আমি বললেই  
তুই আমার কথা রাখবি ? আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি—  
মান-অপমান বোধটা কেবল তোরই আছে না আমারও থাকতে  
পারে ?

—হয়েছে কি ?

—এই ভুলকোটি যে আজ এখানে বয়ে গেলেন, তা কি  
আমার জন্য ?

—নিশ্চয়ই নয়।

—সত্যে থেকে ছাউ আর আন্দেক-খাওয়া সিগারেট দিয়ে ছাইদান  
ভরাট করতে করতে যে কথা এবং দার কথা উনি ভাবছেন, তার  
ভেতর কি আমি আছি ?

—একেবারেই না।

—এ অবস্থায় আমার এঁকে সঙ্গ দেবার চেষ্টা করার কোন মানে  
হয় না, তাতে আমার মান থাকছে ?

—একেবারেই না।

—এখন আমার কি করা উচিত ?

—তাকে বসে বসে ভাবতে দিয়ে, উচিত নিজের কাজে চলে  
বাওয়া।

এবার তেমে গড়িয়ে পড়লো মঞ্জু।—এই দিদি, একই ভেতর কি  
ভীষণ আপন ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল তুই স্বদর্শন বাবুকে ?

বুকে পেলো না মৌরী ওর কথার কি করে এ মানে হয়।

বললো—এই মানে হয় আমার কথার ?

—একমাত্র এই মানোটাই হয়।

চট গেল মৌরী। বেশ ছয়টা হয়। বিয়ে ভেঙ্গে ফেলা যখন  
যাচ্ছে না তখন আপন ভাবতে তো হবেই একদিন।

—তা তো হবেই। কিন্তু একদিন নয়, সেটা এখনই শুরু হয়ে  
গেছে—মা গো ! হাসি থামিয়ে দম নিল মঞ্জু। চোখের জল মুচল  
আঁচল দিয়ে। তারপর বললো—তবে আর কেন ভুলকোটিকে সবার  
কাছে অপদ্রব করছিস ? এ তোর ঠিক হচ্ছে না। হচ্ছে কি ?  
সবার মনে প্রশ্ন জাগছে না, সমস্ত দিন মেয়ে আমাদের অমন কথা  
বললো, কাছে রইলো। বিয়ের আগের আজ্ঞাদে বোকা-বোকা ভাবটা  
কেমন স্বদর্শন মুখের ওপর এসে বাড়ছিল—হ্যাঁ কি হলো ! ছাদে  
গিয়ে মেয়ে অমন বসে রয়েছে কেন মুখ ঢেকে ? স্ত্রিনি বা করেছিলেন  
সবার চোখ বাঁচিয়েই তো করেছিলেন। অবাব বেবার বা তা তুইও  
সবার চোখ বাঁচিয়ে দে।

ভুরু দুটো কুঁচকে ছোট করে মঞ্জুর সিকে তাকিয়ে রইলো মৌরী।  
 ও বললো—বল না?

—সব তো তুই বলছিস। শেখটুকুও তুই-ই বল।

—আমি তোকে বলছি, সহজ ভাবে এসে নাচে বসতে এবং কথা  
 নাচে। রাজী?

একটু ভাবলো মৌরী। বেশ আসছি। তুই যা।

—আসবি?

—আসবো।

—ঠিক?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিক।

নাচে নেমে এলো মঞ্জু। বাবা বসবার ঘরেই আছেন। কথা  
 লেছেন সুদর্শনের সঙ্গে। কিছুক্ষণের জঙ্গ সুদর্শনকে নিয়ে আর  
 ১ ভাবলোও চলবে। নিজের ঘরে চলে এলো মঞ্জু। হাত দিয়ে  
 দেখ করে দেখলো শাড়ীটা—না তুমেন ভেজেনি। একুশি এটুকু  
 কিয়ে যাবে বাতাসে। বাতি না জ্বলে অন্ধকারের ভেতরই  
 সায়রাটা টেনে এনে বসল মঞ্জু জানালার কাছে। এটুকুই বাকী  
 ছিল। সমস্ত দিন কথা বলতে পারে ও; বলেও তাই। কিন্তু  
 দিনের ভেতর কিছুটা সময় ওর চাই—অন্তত যা না হলে দিনটায়  
 ত থেকে গেল বলে মনে হয় ওর, তা হলো চূপচাপ বসে কাটাবার  
 কথা কিছুটা নির্জন অবসর। ভাবনার জগৎও বড় বিচিত্র ওর।  
 গর চেহারাটা যেন পাঁচ বছরের শিশুর বাড়ি একটা ঘাট বছরের  
 দ্বয়ের মাথা। মঞ্জু জানে, প্রকাণ্ড বার করলে ওর সঙ্গে মিলিয়ে  
 ও চিন্তা-জগতের এই রূপটা মানুষের কাছে বামন আকৃতির ঠেকবে  
 এবং বামনকে মজা উপভোগ করার মতোই মুখ করে তারা তা  
 উপভোগ করবে। তাই অপরের ভৌতুক বন্ধ করতে সে নিজেই  
 কাঁচুক করে তাদের নিয়ে। কিন্তু যখন ও নিজে ভাবতে বসে—  
 হঠাৎ সত্যি ভাবে—গভীর ভাবে ভাবতে চেষ্টা করে। বড় বড়  
 বিষয়বস্তু তার। যে সব বিষয়বস্তুর শেষে একটা করে নীতিশব্দ  
 জাড়া থাকে কিন্তু নীতি যেখান থেকে দিনে দিনে সরে যাচ্ছে  
 তাহল যোজন দূরে।

ওলট-পালট হাওয়া বৃষ্টিটাক নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি  
 হয়। দূরের নারিকেল গাছটা তেল-জল না জোটা পাগলা ছেলের  
 তো বাতাসের সঙ্গে সমান তালে মাথা ওলট-পালট করে স্থান করে  
 যেনর আনন্দে। বেডিওটায় বেজে চলে সেতার। দু'তিনটা ঘর  
 গার হয়ে আসতে গিয়ে আর বৃষ্টি বাতাসের শব্দে চাপা পড়ে বেডিওর  
 ঠিকি শব্দটা হারিয়ে সে আলাপ-এঘর থেকে শোনায যেন, বাদলা  
 প্রকৃতির আপন নিভৃত আলাপের গুঞ্জনের মতো।

রান্না বোশাণ দেওয়ার কাজ শেষ করে ছোট পিসির অহুমতি  
 নিয়ে বেরিয়ে এসে এবার হাঁপ ছাড়ে অমিতাও। রাউজি বড়ি  
 ভিজে গেছে ঘামে। ভিজে গেছে পেটা-কোটাটা কোমর  
 ধাস্ত। উঠে পাড়ানো মাত্র সে বাম কোঁটায় কোঁটায় নামে আসছে  
 ঠিক-কোমর বেয়ে। মুখটা দিয়ে বেকছে যেন আগুনের শিখ।  
 বাম মুখটাকে ঠাণ্ডা করলো অমিতা বৃষ্টি সিকে উঁচু করে তুলে ধরে  
 ঠিকি ছাটে ভিজিয়ে। তার পর চলল ভিজে শাড়ী পায়ের পাঠা  
 থেকে টেনে তুলে ধরে রান্নার ঘরের উদ্দেশ্যে। এবার দরকার তার

## প্রাণতোষ ঘটকের লেখা

প্রাণতোষ ঘটক—বাঙলা সাহিত্যে পুরাতন ও পরিচিত, কিন্তু  
 উপভাসে বিষয়বস্তুর নতুনবে বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। লেখকের  
 ‘আকাশ-পাতাল’ ও ‘যুক্তাভঙ্গ’ পতনোমুখ বাঙালী আভিজাত্যের  
 কাহিনী। এই ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ কাহিনী-রচনার সাধ আগেকার  
 মানুষের ছিল না। যেখানে একটু এদিক-ওদিক হইলে সাহিত্য  
 পূর্ণগ্রাফিতে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে, সেখানে মাত্রা বজায়  
 রাখিয়া চলার বিষয় আছে।—পারকর্ষে প্রশংসনীয়। শ্রীমান  
 প্রাণতোষ অধিক গবেষণার ক্ষেত্রে পুরাতন ‘কলকাতার পথঘাট’  
 এর হৃদয় দিয়া ও আভিধানিক ‘রত্নমালা’ পুনঃসৃষ্টি করিয়া  
 পণ্ডিতজনকেও বিম্বিত করিয়াছেন। ‘কলকাতার পথঘাট’ প্রাচীন  
 কলিকাতা সম্বন্ধে অনেক পুরাতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।—‘বিষয়বস্তুর  
 বই’ প্রসঙ্গে সংবাদ-সাহিত্য, শনিবারের চিঠি, সাহিত্য সংখ্যা। ১৩৬৪।

“এতাবৎকাল অতীত কলকাতার ওপর যেসব প্রবন্ধ ও পুস্তিকা  
 বেরিয়েছে তার সংখ্যা নগণ্য নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠকের হাতে  
 সেগুলো ঘোরা-ফেরা করে না। যারা কোঁহুসী তারা হয় তো  
 ষ্ঠানল লাইব্রেরিতে গিয়ে এসব বইয়ের পাতা ওঁচাবে। কিন্তু  
 কলকাতার পথ-ঘাটকে কেন্দ্র করে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যপূর্ণ অথচ  
 চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় পরিবেশন করার তার প্রাণতোষ ঘটক  
 সমস্ত স্বীকার করেছেন। এজ্ঞা তাঁকে সাধুবাদ জানাতে হয়।—  
 একত্রিশটি রাস্তার ইতিবৃত্ত শুনিয়াছেন প্রাণতোষ ঘটক। নানা  
 মৌলিক গ্রন্থ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁকে প্রচুর  
 পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, তথ্য সাজানো  
 এবং সরস বর্ণনায় তাঁকে শক্তির পরিচয় দিতে হয়েছে। তিনি গল্প-  
 উপভাস লেখেন। কিন্তু কলকাতার পথ-ঘাটের ঐতিহ্য ও সহজ  
 পরিচয় রচনায় তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা প্রশংসার দাবী  
 করতে পারে।—শেষ।

আকাশ-পাতাল—(তুই খণ্ডে সমাপ্ত) ১ম পাঁচ  
 টাকা। ২য় পাঁচ টাকা বারো আনা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসো-  
 সিয়েটেড, কলিকাতা-৭। যুক্তাভঙ্গ—পাঁচ টাকা।  
 বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। কলকাতার  
 পথ-ঘাট—তিন টাকা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড,  
 কলিকাতা-৭। রত্নমালা (সমার্থাভিধান)—আড়াই  
 টাকা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা-৭।  
 বাসকসজ্জিকা—চার টাকা। মিত্র ও বোষ,  
 কলিকাতা-১২। খেলাঘর—চার টাকা। সাহিত্য  
 ভবন, কলিকাতা-৭।

॥ যন্ত্রস্থ ॥

যুঠো যুঠো কুয়াশা—আড়াই টাকা। সাহিত্য  
 ভারতী, কলিকাতা-৭। মনোহারী—আড়াই টাকা।  
 কালকাতা বুক শ্রাব, কলিকাতা-৭।

একটি ভালো স্থানের। শরীর থেকে পোষক-রহন-কীটাজিহ্মের যে গন্ধ বেরুচ্ছে—নাক সিঁকালো অমিষ্টা, এ গন্ধ ঘূর করতে একটি আন্ত সাবান শেষ হবে। আর শরীর থেকে তাড়ালেই হবে না কি? নাকে লেগে রয়েছে না গন্ধটা? সেটও উপড় করতে হবে ঠিক শিশিধানকে। অমিষ্টা এমনতেই একটু প্রসাধন-প্রিয়, তাতে পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে ও—প্রসাধনটা ওদের বন্ধে। তিনটে বাজতে না বাজতে আলতা-সিঁদুর-কাঁচল-লতা নিয়ে বসে পড়ে তাই। কালো চিহ্নণ করে তোলে চুল ফসফি হলে। খোঁপা বাঁধে নানা ছাঁচে। কাঁচল টানে, আলতা পড়ে, টিপ দেয়। পাবে কুঁবে-শাড়ী নয়তো নীলাধরী। তার পর পান খেয়ে হেঁচি দুটি বাছা করে তুলে বৈকালিক প্রসাধন শেষ। অমিষ্টার বাগান চালচলন সাজবিশেষ্য। তাই তার প্রসাধন সবখানে আলতা সিঁদুর কাঁচল-লতা বার পড়লে কিন্তু জেনি টেলি তার চোখে উইলো বিলিতি প্রসাধন। এখনও যা বাজতেই হবে সব কিলে কিলে পারান। কিন্তু ঘূর-বালায় মেয়ে মৌরী, মজু। এসব মাথার খোঁপা খাড়ে ভাঙে—পিঠি আছড়ায়। তৈলহীন কল চূলের গুচ্ছ কাঁচেকই ওঁচ মুখের উপর। ঘুপের শাড়ী বলা হয়ে ওঠে না সকারও। অমিষ্টা বলে—হেসেতা তোমাদের লিকে কুলেও ভাতাবে না।

মজু বলে—কুলেও ভাতাবে না? কিন্তু ভাতাবে কুলে তো?

—না মুখ দেবারে।

—মুখ দেবারে। তবে তো অবতিত চমত হচ্ছে। পীড়াও কাল থেকেই ওঁচ-শাড়ী লাগছি আমি। তোমার চূণ হলুদ—

—চূণ হলুদ! জো বড় করে অমিষ্টা।

—ঐ যে, তুপের ভানের সময় তুমি মাথ—ঐ নাম যেন কি—নাম যেন কি—মাথা চুলকায় মজু—ঐ বোঁচি সত্যতা করো না।

—সেন-হলুদ।

—সেন-হলুদ—কাল থেকে এ রঙটা আমার চাই। হেসেদের তাকানোটা আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ওদের লিখে কিছু করতে চলে—তা বিয়ে, কাজ আর তাকানো হাই তোক চেঁচাটাই তুমি বলছো মুখা? হাই বীকাব। পিসিমা বলেন, যে ঠাকুর যে কুলে তুই।

আর মৌরী? মৌরী ঘূর গছায় করে তোলে। এসব কথা তুমি আমার কাছে বলে না বৌচি। আমার চোখ হয় মেয়েজাতীর জন্ত।

অমিষ্টা বুঝতে পারে না। কেসেরা বপ চাব আর তার জন্ত মেয়েবা স্বপচরী করে, এতে তুপ হওরাব, লজ্জা পাওরাব কি আছে?

—ঠিক তো। মেয়েদের কেন, লজ্জা পাওরাব থাকে তো আছে হেসেদেরই, কি বলে?

তাই বা কেন থাকবে! অমিষ্টা মজু এ কথাও মানতে রাজী নর। মজু চালে। মৌরীর ঠোঁটের কোণে যে ভীক পড়ে তা সামান্য অতি সামান্য কিছু বাঁক।

বড়ই গরমিল থাক, সব কিছুটা মিলিয়ে আনাই। অমিষ্টার শরীরহতে জিলে তার এসে গিয়েছিল। স্থান শেষ করে করে এসে নিশেধে লজ্জার ছিটকানিটা বড় করে দিল অমিষ্টা। লম্ব মিনিট অন্তত—লম্ব-পনেয়েটা মিনিট তার পিঠী টান না করে ও কিছুতেই পারছে না। চটপট হাতে প্রসাধন শেষ করে, শাড়ী পাগলে আলতো ভাবে তুপে পড়লো সে বিন্দনার। আরামে বুকে এসে অমিষ্টার

হুঁচোখের পাঠা, আর সেই বোকা চোখের অন্ধকারে চাটাজিহ্মের ভেসে উঠলো মাসিক আগে দেখা আয়নার ওই চেঁচাটাই। শুন্দই, ওর বপ সেসেই হুড় হয়েছিল জয়দেব। সেদিন ওদের বিয়ে চূর্ণ অভিবাবকই বুঝি মনে গুলন করতে পারেন নি। এম কারণ বি কাকে কবছ তা নিয়ে নয় জয়দেবের বরসটাই ছিল না বিয়ে করা একুশ হয়েছিল কি না তার সন্দেহ। আর ওদের ভরকের আদর্শ কারণটা ছিল, ওরা বড় লোক। ওর বাবার লক্ষ্য ছিল ওরা—নির্ভণ আর মুখের বাহন। নয়তো গোপাতা। কিন্তু ওরা কোনটাই ছিল না জয়দেবের। সে তখন বি, এসসি পড়ছিল খালি সজে। তবু হুঁ পক্ষে অভিবাবককেই তাদের বিমুগ্ন ঘুরিয়ে হলো। উদ্ভোগ আয়োজন করে বিয়েও দিতে হলো। অভিবাবক মর্যাদার আসন প্রস্তুত করে বাগানেই যে হবে আজ সাত-আট বছর আগেও কথা। আজ ওদের চুটি ডোলাদের থাক ওরা বাস-মার কাছের। ভালোই তো। চেঁচাদের নৈমিত্ত্য পোষায় না। আর জয়দেবের বা বোকাগার। ওরা ওর ডোলাকে উইলো শুন্দদেব চেঁচাট, তার ডিগি, তার ঢাক। পূর্বানুভব নাভূন করে আজ মনে হওরাব পেছনে কারণটাও অবশিষ্ট হোঁচ আসে শিছু চটায় মতো। মৌরীর চটাই। এমকর সেই ঘন অনেক বেশী বড়লোকের মেয়ে। কিন্তু মৌরীর কাছে ওর ডোলায় কল হাব হয়ে গেল। বিয়ে করে যে মেয়ে বিবিত গেল সে যা বাকী জেতা হয়ে গেল সমস্ত জীবনের জন্ত। একটা লম্বাঘাস জল অমিষ্টা। অমুঠ! অমুঠ! থাকলে কত অসহ্যের ভেতর পথ কত না ভাঙ্গা এগিয়ে আসে, আর নটলে!

অমুঠ! অমুঠটাই সব। ঠিক এই কথাটাই বলছিল কানাইলাল বামুকে। বাগা হয়ে গেছে তার। তৈরী বাগা সাজিয়ে রেখে সে উমানের চাব পাগে বিয়ে। চপ-কাটলে-কাটী রেখেছে নি বিবিত গড়িয়ে। জেজ্ঞ দেওয়া হবে গরম গরম। কাজ শেষ হা ছোট পিসির ছেঁচ-বাওরা পাঞ্জিনিকেতনী মোড়াটায় বসে উইলো তে বুঝি লেখছিল সে। তার হাতে একটা বিড়ি লিখে নিজে একটা মি বসে যে ওর সঙ্গে গল্প জমায়ে তেরন দাচন বামু ছিল না। তাই এক হয়েও কোথা গিয়ে যেন তার মনে হচ্ছিল এক নয়। কথার পর সৌকর লাপট আসে পড়ে তাদের স্থানের মুখে আর তার পরই পা তাদের ভূতাকর মুখে। ছোট পিসির পরই কানাইলালের মুখও ব পড়ছিল। বামু সমস্তই বুঝে বসে সমর কাটাছিল মেয়েজাতীর কয়ে চামচ বাজিয়ে। কুতর্বা করে গিলো কানাইলাল হোক এটা পাওরাতে বলে। লাক গিয়ে উঠে পাঞ্জির গিয়ে উমান কোঁচ চাপালো বামু। কিন্তু মুখ গুজিয়ে উইলো। বৌচি বলেন, ওঁচ নাকি হাচ্ছে-তাই হয়। কানাই এতো এতো সব ভালো ভালো বাঁচ জানে আর ও চাটুকুও ভালো বানাতে জানে না। সে ভগবান, এ লজ্জা এ অপমান থেকে রক্ষা কোরো। নইলে আত্মকর মত বেঁচে থাকবার ইচ্ছেটাই ওর উবে হবে। ভালো চা বানাবা জন্ত বামু প্রাণপণ চেঁচায় লেগে গেলো। অমিষ্টা যে ভাবে চা করে তার সব করলো সে। জল আবার ফুটতেই নামিয়ে ফেললো। চা চালবার আগে টি-পট্টাক উমান ঘরে গরম করলো। চাক মেখে চা গিল। উইলোজী গিয়ে থেকে পাঁচ মিনিট সময় বাপা

লো বসে বসে। কাপ গরমকল দিয়ে বুয়ে না নিলে চা ঠাণ্ডা হয়। প্রতিদিন মনে করিয়ে দেয় বৌদি প্রতিদিন সে ভুলে যায়। আশ্চর্যকর ভাবে কথাটা আজ মনে পড়ে গেল ঠিক যেন। বিলিতি হুধ ঢেলে চামচা দিয়ে চা নাড়তে নাড়তে এবার হুধ হুধ উঠলো উজ্জল হয়ে। চায়ের সোনালী বটাঁই বলে দিচ্ছে। চা আচ্ছা হয়েছে।

চারে চুষক দিয়ে চানচুর ভাজা চিবাক্তে আর কথা বলতে ইচ্ছে হবেই। এক আখটা কথা বলতে বলতে কথার ক্রমে উঠলো নাইলাল। কথার মতো কথা কি ওর কিছু কম—সাতেরে বাঁওরা হার টাইম। চালচলনের কাহারা। মেমসাহেবের মেজাজ আর জ্ঞ। মেমসাহেবের লাল্পতা সম্পর্ক থেকে তার রান্নার দক্ষতা, লো ভালো মাইনার ডাক আসা পর্যন্ত কত বিবর কত কথা।

—ভালো ভালো মাইনা? তবু সে যায় না। কেন? জানতে। কেরে পারে না বাবু।

কারণ আছে—বিশেষ কারণ আছে। বৌদি টাকার কাজ কেনে? এমনি এমনি এখানে পড়ে বয়েছে? বড় লাভের জুত ছোটখাট তি ছাড়তে হয়! ভাগ্যের সন্ধান আছে সে। জানে কি বাবু, ওর সাহেবের ক্ষমতার কথা?

কত জা'না জানলেও কিছু যে জানে, তা জানালো বাবু।

সে কি জানে, সাহেব থাকে খুশী বিশেষ পাঠাতে পারে—ইসেও পাবণী আমেরিকা? শুণু মাত্র সাহেবের মজি নির্ভর? জানে না? যে ওর কাছ থেকে কেনে রাখুক বাবু বিশেষ পাঠাবার হকী-কর্তী ল তাব সাহেব। তার দরজার ঘরনা না লিরে কার পা বাড়াতো য না। কত কত ছেলেরে সে দেখেছে এসে হাত কপে পাকিয়ে ঠাকতে—উপহার দিতে, ভেঁট দিতে। এমন কি—বিবাস করবে কে বাবু—বাছার করে দিতে, মেমসাহেবের ফরমাস খাটতে?

বেশ তো জানলো, বিবাস করলো বাবু কানাইলালের সাহেবকে স্ত্রী না করে কার বিশেষ বাওরার উপার নাই। সে সুযোগের জুত চার সাহেবের দরজার ঘরনা দিতেই হয়। কিন্তু তার সঙ্গে কানাইলালের ভাগ্য-অধেষণের সব্ব কি?

—আছে আছে। সেও সেই সুযোগের অপেক্ষাই দিন শুণ্ছে আর বাবুর্চি জজির কাছে ইত্যরসরে শিখে রাখছে ইংরেজীটা।

ততকণে বাবুর্চি হুধের হীর ভেতর লিরে সালা-সালা ঠাও আর লাল টকটকে জিভটা দেখা বেতে শুক করেছে।—বিশেষ! বিশেষ সব্বকে বাবু এটুকুই জানে, সেখানে একটা কিছু শিকতে যেতে হয়। কেউ বায় ডাকার হতে, কেউ ইজিনিয়ার। আরো অনেক কিছু আছে নিশ্চয়ই—ও জানে না। কিন্তু কানাইলাল যাবে কি করতে?

চলো পা-কায়া-পরা পা কাঁকার কানাইলাল।

কোন-কোন জিনিষটা শিকতে আর দেখতে বিশেষ না গেলে হয়? পত্রিকা পড়ে কি বাবু? অক্ষর-পরিচয়ইন বাবুর হুধ যে লাল হয়ে উঠলো, সে যে লাল হুধ হুধ নীচু করলো—সে সব লক্ষ্য করে না কানাইলাল।

তার ভেতরটাও তো কেলই। সে তো বুঝতে পারছে তার বিশেষে বাবার কথাটা বাবুর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকবে। কিন্তু কেন? এ তো দেখিল সে তুলেছে সাহেবেরা একরল সব যাচ্ছে এবার বিশেষের বাছার বুয়ে দেখে অবিশ্বাস্য জুত। তবে রান্না শিখতেই বা বাবার

প্রয়োজন হবে না কেন? কানাইলালের পা বাঁকুনী আরো বেড়ে ওঠে। খানাপিনা বা হয়—তাব রান্না, তার পরিবেশন, তার টেবিল চোবাবে কাঁটা-চামচ—বাওরা-বসা তার কোনটা দেখে? এ সব শিখতে হয় না। রপ্ত হতে হয় না বিশেষী বীতিতে। কত নিতুল শেখা সম্ভব এখানে বসে। কিন্তু তুল হলে সাহেব বায় চটে। একদিন চটে গিয়ে মেমসাহেবকে বলছিলেন—সেও এতাকে বিশেষ পাঠিয়ে। শিখে আশুক কি ভাবে ওদেরে 'ইয়োটার' মনিবের বস্ত করে। মস্ত মস্ত লোক সব কেমন তাদের ওপর নির্ভর করে। দেয় জীবন কাটিয়ে! নইলে ওকে দিয়ে পোয়াবে না আমায়। অভাবনীয় ভাবেই সুযোগটা এসে গিয়েছিল। বসেও কেলতো দেখিনেই কথাটা। কিন্তু বড় বেগে গিয়েছিলেন সাহেব—হাসের সময় কোন কথা বলতে নেই। একটু থামলো কানাইলাল। তারপর বললো—ওঁরা দেশের সেবা করেন, আমরা ওঁদের সেবা করি। ওঁরা দেশের সেবা করা শিখতে বিশেষ যান, আমরা যাবো ওঁদের সেবা করা শিখতে। ওঁরা বিশেষ থেকে না দেখে না শিখে আসলে দেশের কোন কাজ করতে পারেন না, বিশেষী কাজগুলো আমরা পারবো কি করে?

এতকণে নিজের মতো মাথা নাড়লো বাবু।

বৌদিশ শুয়ে থাকার সাহস ছিল না অমিতার। কে জানে ছোটশিসি এখনও রান্না করেই আছেন কি না! তাই বহি থেকে থাকেন তবে তিনি রান্নাঘরে আর ও ঘরে দরজা বন্ধ করে তুলে—আ, এতো সাহস না দেখানোই ভালো। উঠ পড়েছিল ও। দরজার বারান্দার ঠাড়িরে পড়তে হলো ক্রমিকাক। কান পেতে তুললো বারান্দার ঠাড়িরে পড়তে হলো ক্রমিকাক। কান পেতে তুললো কানাইলালের কথা। হাসি চেপে সোজা ছাদের দিকে বাড়িল রান্নার আলোর দেখতে পেলো অন্ধকার ঘরে জানালার কাছে বসে আছে মজু। বুলিটা শুখন প্রায় ঘরে এসেছে। বেটুকু পড়ছে তাতে বাপটা ভাব নেই। শিসিমা কাঁটা দিয়ে বুলির জল সরাজ্জন বারান্দার। মজুদের ঘরে এসে চুকলো অমিতা। বাতি আলিরে দিতে হঠাৎ আলোর হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো মজু।

অমিতা জিজ্ঞাসা করলো—মাখার চিন্তা আছে কি কিছু?

—আপাতত নুত।

—তোমার বাপ-দাদাদের যে কথা বস্ত দেখতে সাহস নেই, তোমার ছোটশিসির বাড়ীর ভৃত্য তা ভাবে—এর ভেতর চিন্তা করবার মতো কিছু আছে বলে মনে হয়নি তোমার?

কানাইলালের বলা কিন্তু তখনও শেব হয়নি। সে তখন বলছে তার বিশেষের লক্ষ্য কি এ বাড়ীর কাজটাই ভেবেছে বাবু। পাগল! তার লক্ষ্য দিল্লী। একবার ঘুরে আসতে পারলো দিল্লী তাকে ডাকবে না, কে বলতে পারে? কে বলতে পারে পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপানো লোভনীর সব ডিনার টেবিলের পেছনে ও? ঠাড়িরে থাকতে দেখা যাবে না?

যে বাবু কাচের কাপ-ডিস জেছে বৌদির কাছে বসক খেতে খেতে হাসে; দিল্লিমিশের বস্তুরে কাছে চায়ের নামে পরমকল সন্ত হয়ে দিতে গিয়ে ট্রে শুকু কেবত আনতে আনতে—'ভজ মন মেবী রান্নার নন্দনে' গেয়ে ওঠে—কের বসক ধার, কের হাসে—সে বাবুর মন আজ প্রথম ব্যর্থতার হুশে ছেয়ে গেল।

অমিতা যখন ভিজ়ে বারান্দা তখনো নেকড়া দিয়ে মুছে দেবার জন্ত রামুকে ডাক দিলো, ছাড়া-ছাড়া চেহারায় কাছে এসে চুপ করে পাঁড়িয়ে হইলো রামু।

দুষ্টি-বিনিময় হলো অমিতা আর মঞ্জুর। জিজ্ঞাসা করলো মঞ্জু—কাজটা এমুণি ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে রামু? শিসেমশাই-এর মতো একজন সাহেবের খোঁজ আগে করে নিলে হতো না?

হতবাক হয়ে গেল রামু, নিমিষাণি বুঝলো কি করে ওর মনের কথা!

—কি, অমন বোকাম মতো চেয়ে রয়েছিস কেন? আগে একজন সাহেবের খোঁজ করে নিলে ভালো হতো না? তিন হাজারী না হোক, নিশেন দেড়-চুই।

রামুর কাছে তখন মঞ্জুর বোবার বিমরটাই বড় হয়ে উঠছে—আপনি কি করে বুঝলে সিঁদিমণি?

—তোমার মুখের লেখা পড়ে।

—মুখে আবার লেখা পড়ে নাকি! অবিখ্যাসের সঙ্গে হতে দিয়ে খুশী হুচ্চলো রামু।

—পড়ে না? তুই আমাদের সঙ্গে যে ভাবে কথা বলিস, বলিস সে ভাবে ছোট পিসির সঙ্গে? ও বাড়ীর কেঁঠর গলা জড়িয়ে ধরে হি-হি করে হাসিস, করিস কখনো সে রকম কানাইলালের সঙ্গে?

—না তো!

—কেন করিস না?

—মোকাম মতো তাকিয়ে রইলো রামু, মঞ্জুর দিকে।

—ঐ মুখের লেখা পড়ে। তুইও জানিস সে-লেখা পড়তে। পত্রিকা পড়ার চাইতে এ লেখা পড়া অনেক শক্ত। কানাইলালের চাইতে তুই কিসে কম? ঐ, তার মতো অবশ্যি তোর সাহেব নেই। তন্নত হয়েছে কি—কানাইলালের সাহেব তো আমারই শিসেমশাই—তোমার বাওয়া আটকাবে কে? কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি বোকা তবে?

বিশ্বাস যে রামু করলো তা নয়, কিন্তু মনের দুঃখ-দুঃখ ভাবটা কেটে গেল। বিশ্বাস—কানাইলালেরই যে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হবে ভারই বা বিশ্বাস কি। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো রামু নেকড়া-হাতে, বারান্দা মুছতে।—‘ভজ মন মেহী মাতার নন্দনে।’

—আবার। জিতু কাটলো রামু।

বসবার ঘরের উদ্দেশ্যে আসতে আসতে মঞ্জু বললো—বৌদি ভারি ছি কি জানো, ভাবছি, কানাইলালের পরিকল্পনাটা দিল্লী পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। হয়তো পরিকল্পনা কমিশনের মেম্বার টেবলার হয়ে যেতে পারে।

বসবার ঘরে এসে দেখলো ওরা একটুও গল্পে জমেনি। প্রধান অভিধি যদি গল্পী না হয় তবে গল্প জমবেই বা কা’কে নিয়ে। বাবুদেব এ-ট্রেন থেকে ও-ট্রেনে হারিয়ে চলেছে রেডিওর চাবী। কখন শব্দ হচ্ছে ঘর-ঘর, কখন বেজে উঠছে বর্মী কথা বা ইন্দোনেশিয়ার

সংবাদ। বতীন বাবুর সঙ্গে কথা বলছে সুদর্শন সবিনয়ে আঙুলে ঐ আর আঙুলে না দিয়ে। জয়দেবকে ঘরে না দেখে গল্পীর হয়ে উঠলে অমিতার মুখ আর ওদের সঙ্গে মৌরীকে না দেখেই হয়তো টোলের কোণে যে চুল পরিমাণ কাঁক ছিল সেটুকুও সেঁটে গেল সুদর্শনের।

বসে অমিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে মঞ্জু বললো—যুদ্ধটা কত হবে দু’পক্ষ।

—যুদ্ধ! কোথায় কড়া যুদ্ধ হবে?

একটা নিশ্বাস টানলো মঞ্জু—কানে কানে কথার জবাবের নমুনা এই! বেগে উঠলো সে। কোথায় তা আমি কি করে বলবো। তবে হবে।

—যুদ্ধ, কখনোই আর যুদ্ধ হতে পারে না। রেডিও বন্ধ করে উঠে এলো বাবুদেব।

হেসে ফেললো মঞ্জু। না হবে তো না হবে। যুদ্ধ দিয়ে করলো কি আমি। না আছে একটা ঘোড়া না আছে একটা তলোয়ার। লক্ষ্মীবাদী হওয়া তো বটছে না কপালে।

বতীন বাবুর জন্ত বহুকণ ধরে সিগারেট খাওয়া বন্ধ রাখতে হয়েছিল সুদর্শনের। চেন মোকামর যাকে বলে সুদর্শন তাই। কষ্ট হচ্ছিল তার। হঠাৎ খেয়াল হতেই বতীন বাবু উঠে গেছেন। সিগারেট ধরালো সুদর্শন। তার পর ওর নিজস্ব ভঙ্গিতে চোখ দুটো কুঁচকে ছোট করে তাকালো মঞ্জুর দিকে—ঘোড়া আর তলোয়ার পেলেই আপনি বৃষ্টি যুদ্ধে নেবে যেতে পারেন?

—পারি। তবে একটা ঘোড়া আর একটা তলোয়ার দিয়ে তো আর অসমর্থের সঙ্গে লড়ায়ে পারবো না? একজন লড়ায়ে প্রতিপক্ষও একজন হতে হবে। অসমর্থ দিতে পারেন তো লড়ায়ে অসমর্থের সঙ্গে।

—লক্ষ্মীবাদী, লক্ষ্মীবাদী হয়েছিলেন ইংরেজের সঙ্গে লড়ায়ে আপনি লড়ায়ে কার সঙ্গে?

—লড়ায়ে কার সঙ্গে! লড়াবার জন্ত সময় সময় আমি যে দল মতো মানসিক যন্ত্রণা বোধ করি।

—আমি সরবরাহ করবো না হয় আপনাকে ঘোড়া আ তলোয়ার।

সুদর্শনের চোখে ঠাটা-বিক্রম না পরিহাস তাকিয়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ করে না মঞ্জু। বসে—উঁহ, আপনার সরবরাহ দিয়ে আমার সগ্রাম চলবে না। ও তো ব্যবসায়ীর ব্যবসা—

—এই মঞ্জু, ছোট পিসি—অমিতা! টোটে আঙ্গুল চাপা দিয়ে মঞ্জু চুপ করবার ইশারা করে। সুদর্শন সত্যের সিগারেট আবার গ্রাসট্রে ভেতর ফেলে। বাবুদেব উঠে বড় কৌটো ছোট পিসিকে ছেড়ে দেয় কিন্তু তিনি বসেন না। আহ্বান জানান খাবার টেবিলে আসবার খাবার সময় নেমে আসতেই হলো মৌরীকে। বাবা নিজে গি জেক নিয়ে এলেন তাকে। [ক্রমশঃ]

কাশির  
মূলকারণ দূর  
করুন



সিরোলিন  
খান

নিরাপদ  
পারিবারিক  
ঔষধ

সিরোলিন কেবল যে কাশি  
'ধামিয়ে দেয়' তা নয়—  
কাশির মূলকারণ হুট-  
জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।



# বিবেকানন্দ

## স্টোত্র

সুমণি মিত্র

১৭

বিপ্লবী ক্রান্তির আদর্শে মন-প্রাণ ঢেলে,  
মুক্তি-পুঞ্জের ঘাড়ে কেন তুমি সব দোষ ফেলে  
'পূরণ' ও 'তত্ত্ব'কে দ্বিগুণ করে গেলে রান্না ?  
পুরাণের যুগটাকে তামসিক কেন বোলে গেলে ? ১

১। স্বাক্ষর-যুগের প্রেরণাই হোচ্ছে ফরাসী-বিপ্লব। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের স্বাধীন চিন্তাবাদীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হোয়ে স্বাক্ষর-যুগের প্রতিভাবান সোতার আমাদের পৌরাণিক যুগের শাস্ত্র, লোকব্যবহার ও ধর্মসাধন পদ্ধতিকে নির্মমভাবে আক্রমণ করেছিলেন। রাজা রামমোহনই প্রথম বোকা। তিনি পৌরাণিক যুগের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে, জাতীয় অবনতির সমস্ত হেতুকে আরোপ কোরে এই পৌরাণিক যুগটাকে জাতীয় জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্তে এক ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হোয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, রামমোহনের মতো অতো বড়ো মনীষীও পুরাণধর্মের বিকাশের ধারাটাকে ধরতে পারেননি, বৌদ্ধ-যুগের অধঃপতনের পর পৌরাণিক ধর্মের সাধনাস্থ সাময়িক ভাবে যে আবর্তনা এসে জন্মেছিলো, তিনি তাই শুধু দেখেছিলেন। অবিশিষ্ট, আমাদের এই পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে তাঁর এই অমূল্য সিকান্ত নিশ্চয়ই একটা ব্যতিক্রম।

তবু পরবর্তী ব্রাহ্মসঙ্ঘস্কারকের মতো তিনি ইউরোপীয় স্বাক্ষরকের দ্বারা অন্ধভাবে পরিচালিত হননি, তাঁদের মতো তিনি পৌরাণিক ধর্মকে একেবারে অধর্ম বোলে উড়িয়ে তাননি। পুরাণকথিত ধর্মকে তিনি অধঃপতিত যুগের একটা নিম্নস্তরের ধর্ম বোলে স্বীকার কোরে গ্যাছেন। এ-ব্যাপারে তিনি পরবর্তী ব্রাহ্মনেতাদের চেয়ে কিছুটা উদার এবং আত্মস্থ।

ক্রান্তির মন্তবাদ ভারতের পক্ষে কি খাটে ?  
এমনকি ইউরোপ কি ফল ফ'লেছে বোলে তাতে ?  
স্বাধীনতা-সাম্যের ধান্ধাটা ধরা প'ড়ে গ্যাছে  
উনিশ-শো-চোদ্দার নৃশংস সংগ্রামটাতে !

বিগত যুগের প্রতি সে-যুগের আধুনিক ক্রান্তি  
সংগ্রাম শেষ কোরে সে নিজেই হোয়েছে হতাশ !  
সাম্যবাদের ভিত্তি কোনোদিন হয়নি কোে দৃঢ়,  
স্বাধীনতা-মৈত্রীর স্বপ্নটা হোয়েছে বিনাশ !

বাই হোক, আমাদের পূরণ ও তত্ত্বের যুগ  
ভারতীয় জীবনের সাময়িক তুচ্ছ অস্ত্রখ।  
কাকর অস্ত্রখ হোসে প্রথমে তো ডাকো ডাক্তার,  
না কি চাও অগ্রিম স্বশাসনের চিতায় উত্থক ?

অধঃপতিত ঐ পূরণ ও তত্ত্বের দিন  
স্বামিতার দৃষ্টিতে একেবারে নয় প্রাণহীন।  
ধর্ম-জীবনে তার পঙ্ক্তা এসেছিলো ঠিকই,  
তাই বোলে কোনোকালে হয়নি সে মৃত্যু-মলিন।

মুক্তি-পুঞ্জের নামে জঞ্জাল জন্মেছিলো বোলে  
মুক্তিকে ভেঙ্গে ফেলে অমূর্তে পাড়ি দেওয়া চলে ?  
চিহ্নভাঙ ঐ স্বভাবের ধারাটাকে ফের  
সাগরের মুখ থেকে নিয়ে বাবে গিরিগুহ্যাতলে ?

তোমার বুদ্ধি ষাটকে একেবারে দিলো বরবাদ,  
সিন্ধির গুহা থেকে ঐ শোনে! তার প্রতিবাদ।  
স্বামিতাও আজীবন জ্ঞান-বোগী হওয়া সত্ত্বেও  
এ-ব্যাপারে তাঁর মত ঢের বেশি অপকৃপাত।

“Those reformers  
Who preach against image-worship,  
Or  
What they denounce as idolatry,—  
To them I say—  
Brothers !...  
A beautiful large edifice,  
The glorious relic  
Of a hoary antiquity  
Has,  
Out of neglect or disuse,  
Fallen into a dilapidated condition ;  
Accumulations of dirt and dust  
May be lying  
Everywhere within it ;  
May be, some portions  
Are tumbling down to the ground.



What will you do to it ?  
Will you take in hand  
The necessary cleansing and repairs  
And thus restore to the old,  
Or  
Will You pull the whole edifice  
Down to the ground  
And seek to build  
Another in its place,  
After a sordid modern plan  
Whose permanence  
Has yet to be established ?”<sup>২</sup>

১৮

চাইলেও পারবে না ; এমন কি বুদ্ধও, বীর  
পুতুল-পুজোর প্রতি সবচেয়ে বেশি বিস্মারক,  
মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির পরেতে নিজেই  
পুজোর পুতুল বোসেছেন সারা এশিয়ার !

পৃথিবীতে দুটো দল প্রতীকের উপাসক নন,  
এক হোলো বুদ্ধের আর বারো পশুর অধম ।  
এ-দু’য়ের মাঝখানে আর বসে মাঝারি দল,  
প্রতীকের প্রয়োজন সকলেরই আছে বেশি-কম ।

সে-তিসেবে পুরাণেই আমাদের বেশি কল্যাণ ।  
এখানে ‘সোহঙ্ক’ নয়, আমি দাস, তুমি ভগবান ।  
বাসনাবিবল মনে বেদান্ত বেদনাসায়ক,  
সতত ভক্তি-পথে সবচেয়ে কম লোকদান ।

এ পথেও একদিন ‘তুমি-আমি’ একাকার হবে,  
‘দাসোহঙ্ক’ মিশে যাবে ‘সোহঙ্ক’-এর মহা বৈভবে ।  
তখন হয়তো আর পূরণের প্রয়োজন নেই,  
তার আগে পূরণের সোপানটা পার হোতে হবে ।

প্রাপ্তির শেষে গিয়ে তবুও কি তাকে ভুলে যাবো ?  
ছাড়ে উঠে সিঁড়িটাকে ভুলে যেতে বাধ্যবনা ভাবো ?  
পূরণের ‘দাসোহঙ্ক’ ‘সোহঙ্ক’-এরই সোপান যখন,  
জানের চরমে উঠে ভক্তির মানে খুঁজে পাবো ।

২। “যে সব সংস্কারকেরা মূর্তি-পুজোর বিরুদ্ধে প্রচার কোরে থাকেন, অর্থাৎ পুতুল-পুজো বোলে বার নিলে কোরে থাকেন, তাঁদের আমি বোলি,—ভাই—স্বন্দর বিরাট একটা বাড়ি, বহুকালের প্রাচীন একটা মহান্ন স্থাপতিচিহ্ন অবশেষে এবা অব্যবহারের ফলে কাজ পড়নোমুখ। তুমি তাকে কি কোরতে চাও ? প্রয়োজন মতো পরিষ্কার এবং মেরামত কোরে তাকে তার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনবে, না সমস্ত বাড়িটাকেই ভেঙ্গে ফেলে তার বদলে বাজে আধুনিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আর একটা বাড়ি তৈরী কোরবে, বার স্থায়িত্ব সবকিছু এখনো কেউ নিশ্চিত নয় ?”

—The Religion we are born in (Colombo to Almora : Page 408.)

তখন বুঝবো এই পৃথিবীতে আছে মতো ভাব,  
কোনোটাতেই হেয় নয়, কম-বেশি সবেতেই লাভ ;  
‘জ্ঞান’ বা ‘ভক্তি-যোগ’, কেউ কারো বিরুদ্ধ নয়,  
আত্মজ্ঞানের পথে সকলেই এক-একটা ধাপ ।

তখন সমস্বয়, তার আগে বুঝা কোলাহল !  
মতুষ্যর বুদ্ধিটা সিক্তির অভাবেরই ফল !  
সিদ্ধ সাধকই শুধু একথা বিশেষ কোরে বোঝে—  
রাগাটা বড়ো নয়, একান্ত্রতাটাই আসল ।

১৯

তুমি কিংবা পরবর্তী ব্রাহ্ম-মতো বার  
বুদ্ধিকে নিয়োজিত কোরে  
অকপে ভিত্তিতে  
নোতুন ধর্মমত পোড়ে  
ধর্ম-সমস্বয় চাও,  
তারো এটা কেন ভুলে যাও  
বুদ্ধি বা যুক্তিটা  
ধর্মের শেষ কথা নয় ?  
আত্মার অমুভূতিটাই ;  
বিচিত্র বিষের  
ঐক্য-সত্তাটার  
সাক্ষ্যে দর্শন চাই ।  
বুদ্ধির মন্ত্রণা নিয়ে  
জ্ঞানকে ভিত্তি কোরে  
মৃত্তিকে ছেঁটে বাদ দিয়ে  
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান শাস্ত্রকে যদি  
একেখরের বাদে  
জোর কোরে টেনে এনে কেউ  
নোতুন ধর্মমত করেন হাজির,  
সেটাও সমস্বয়,  
তবে সেটা নিম্নশ্রেণীর ।<sup>৩</sup>



৩। “He (Raja Rammohan Roy) spared no system of idolatry. He directed his able pen in exposing and denouncing in no measured terms the idolatrous prejudices of Hinduism, Mahommedanism and Christianity. But at the same time he culled together passages from these scriptures inculcating Monotheism. Thus he proved a friend and foe to each of the three principal religious systems of the world. An unsparing and throughgoing iconoclast, he yet failed not to extract the simple and saving truth of monotheism from every creed, with a view to lead every religious sect with light of its own religion to abjure idolatry and acknowledge the

ওটা হোলো বুদ্ধির,  
সাধনা বা সিদ্ধির নয়।

বুদ্ধির কৌশল  
কেটে যায় বুদ্ধিরই বলে,  
কিছু বা' পেসে তুমি  
হৃদয়ের গিরি-গুহাতলে,  
প্রাপ্তির চরমেতে  
একোর অমুভূতি যেটা,  
—সে হোলো মৃত্যুহীন,  
স্বপ্নের মতো অলুপ্তে।

আসল সম্বন্ধে  
বুদ্ধির নিপীড়ন নেই,  
একটা বিশেষ মতে বিশেষ পথেই  
যুক্তির ধ্বজা তুলে  
সবাইকে টেনে আনা নয়,  
সাধনার জোরে  
'এক'কে বিশেষভাবে অমুভব কোরে  
অনেকের মাঝখানে  
তাকে পেতে হয়।  
এইভাবে সাধনার শেষে,  
একদিন একবারে  
প্রাপ্তির চরমেতে এসে  
ব্রহ্মের অমুভূতি পেসে,  
এক আর অনেকের  
মায়িক সামাটা যুড়ে গেলে  
তখন বুঝবে তুমি এই—  
বহুধর্মী ব্রহ্মের  
অসত্য বোলে কিছু নেই।  
তখন তোমার  
বিচিত্রতার প্রতি  
বিদ্বেষ থাকবে না আর।

এই যে সম্বন্ধ  
—এ হোলো বোধির,  
বিচিত্র সাধনার চরমে গিয়েই  
অখণ্ড একোর অমুভূতি এই।

তোমার সম্বন্ধে  
বুদ্ধির কৌশল আছে,  
সাধনালব্ধ এই  
সাক্ষাৎ অমুভূতি নেই!  
তাই জন্তেই  
তোমাদের মতবাদটার  
বহুধর্মী ব্রহ্মের  
বিচিত্র স্বাক্ষর নেই।

তাই জন্তেই  
ব্রহ্মের মর্ত্যাগমন,  
যুগের প্রান্তে এসে  
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের  
সাধনার এত আয়োজন।  
স্বামিজী বলেন,—  
“To proclaim  
And make clear  
The fundamental unity,  
Underlying all religions,  
Was the mission of my Master.  
Other teachers  
Have taught  
Special religions  
Which bear their names,  
But  
This great teacher of the nineteenth  
cent

Made no claim for himself,  
He left  
Every religion undisturbed  
Because  
He had realised  
That, in reality,  
They are all  
Part and parcel  
Of the one Eternal Religion.”

[ ক্রম

One Supreme. He went through the Hindu, Mahommedan and Christian scriptures with indefatigable perseverance, and set forth the unity of God from the teachings of these books, while he argued away with unsurpassed ingenuity and erudition all doctrines inculcating Polytheism.”

—The Brahma Somaj, or Theism in India.  
(Indian Mirror, July 1, 1865) by Keshab Ch. Sen.

“আমার গুরুদেবের জীবনের উদ্দেশ্যই ছিলো, সমস্ত ধর্মের  
যে ঐক্য রয়েছে, তাকে ঘোষণা করা। অজ্ঞাত আচার্যেরা  
বিশেষ ধর্ম প্রচার কোরেছেন, সেগুলো তাঁদের নিজের  
পরিচিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহান আচার্যসব  
জন্ত কোনো দাবী রাখেননি। তিনি কোনো ধর্মের ওপরেই হস্ত  
করেননি, কেননা, তিনি সাধনার দ্বারা উপলব্ধি কোরেছিলো  
সমস্ত ধর্মই এক সনাতন ধর্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ।”

—My Master (page 6

## ছাবিশ

ঠাণ্ডা জল ঢাললে গায়ে মঞ্জরী, তার সমস্ত ভাবনার গায়ে ঢেলে দিলে ঠাণ্ডা জল। ছবির কান্না সে পাবে না। এই সত্যিই তার নির্বাসন নিয়তি।

রাজ আপনি বান, আমার শরীর বইছে না।  
ছাড়িয়ে দিচ্ছ এখন থেকেই। কিন্তু আজ একটু বেশী রাত তোমার কাছে থাকব বলেই এসেছিলাম। কালই আমার যেতে হচ্ছে মধুপুর; এক হপ্তাও থাকতে পারলাম না। কালই হবে।

আপনার পায়ে পড়ি হুলুবাবু; আজ আপনি বান।  
হুলুবাবু মঞ্জরীকে ভালো করে দেখলো। কি হলো। কি পারে। শরীর খারাপ, ক্লান্তি, ওসব বাজে কথা। ওদের তো ক্লান্তি আসে না। তবুও হুলুবাবু বুঝলো, আজ এখানে লে মেজাজই খারাপ হবে। আমোদ জমবে না। ভাবানীপুরে র কাছে গেলে কেমন হয়? হুলুবাবু উঠলো।  
মধুপুর থেকে কিরে এসে দেখব। আমার কলকাতার মোতাজ স্ন গোছে।

হুলুবাবুর মদ খেলেই কারিবা আসে আর গা গুলিয়ে ওঠে মঞ্জরীর।  
টি কথাও বললে না সে।

নীচের চৌকাঠ পেরিয়ে গিয়ে ছেঁড়া কাগজগুলো তুলে নিলে হুলুবা, পতিতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন।

নিজের সই-এর ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলো।

তাশ হয়ে ওপর দিকে একবার তাকাল হুলুবাবু। ধাক্কা হলো প্রায় বাড়ীউল্লীর সঙ্গে।

কি গো ভালো মানুষ? আজ চললে যে এখনই?  
আর ভালো লাগে না; ভাবছি এ সব ছেড়ে দেব। হুলুবাবু হলো নিজেকেই বললে কিন্তু জাননা শুনতে পেল।  
ভালো লাগে না কি গো? মঞ্জরী বগড়া করেছে?  
বগড়া? কই না? শরীর খারাপ তার।  
শরীর খারাপ? ঠোট উলটে ভঙ্গী করলে সে। বেস্তার আবার র ভালো হয় করে? হন হন করে জ্ঞানদা চললো মঞ্জরীর দিকে।

মঞ্জরীর ঘর বন্ধ।

তাই বলে। আশঙ্ক হল জ্ঞানদা। অল্প বয়সের লুকিয়ে থাকা ঘরে। মঞ্জরীর পেটে পেটে এত? হাসিতে বীভৎস ালো প্রোঁত জ্ঞানদার বসন্ত-মুদ্রিত মুখ।

মার না খেয়ে কাল্লা মঞ্জরীর জীবনে এই প্রথম।

হুলে কুলে কঁাদলে মঞ্জরী, আর ভাবলে। এই সমাজের বিরুদ্ধে নিও প্রতিশোধ নেবার নেই। ছাণ্ডালি ছাপিয়ে নয়। বেদন করে নয়, গোপন সুভঙ্গ দিয়ে সমাজের মধ্যে ঢুকে; বিশ্ব দিয়ে। লুপিত দেহ দিয়ে জড়িয়ে। কলুষিত করে কর্মর কামনায়।  
তার কান্না চাই টাকা। ছবির কাজটা হয় না?

মঞ্জরীর ইতিহাস আর পাঁচজন বেস্তার চেয়ে তখনও পৃথক তেমন জেগেবাগো ভাবে অসাধারণ কিছু নয়। শুধু বেস্তাদের মত সে জ্ঞাতপিতার সম্ভান নয়। তার বাবার নাম নুপেন শুই।  
দেবী স্থানভাষার সম্ভান। সম্ভার পর ক্রমে খেলেন, রাত



## নীলকণ্ঠ

ন'টায় আসেন মঞ্জরীর মার কাছে। রাত বারোটায় বাড়ী কিরে বান। কিন্তু একদিন অন্তর একদিন। যেদিন নুপেন আসেন না, সেদিন আসেন মহাদেব চাটুজ্যে। নুপেন আর মহাদেব দুই বন্ধু। একই নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করতে ঈর্ষা বোধ করেন না, এমন বন্ধু বোধ করি বিরল। নুপেনকে মঞ্জরী বাবা বলেই ডাকে, মহাদেবকে সোনা-বাবা! মাকে মঞ্জরী একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো; তুমি বাবাকে বেশী ভালোবাস না, সোনা-বাবাকে? সোনাবালা তার জবাব দেয় নি। বলেছিলো বেস্তার কাউকে ভালোবাসতে নেই পেঁচি। ব্যবসা নষ্ট হয় তাতে। তুই কাউকে ভালোবাসতে হাসনে। আর পুরুষ মানুষের ভালোবাসা, মুসলমানের মুরগী পোষার চেয়েও মারামারক।

মঞ্জরীও কাউকে ভালোবাসে না। ভালোবাসে গান গাইতে শুধু, কিন্তু পায়ে না। গানের হাতেখড়ি তার স্বর্গস্থখী, ইন্দুসুখীর কাছে। তারা দুই বোন, দুই বাঈজী। কিছুদিন টাঙ্গরায় তাদের বাড়ীর পাশে মঞ্জরী আর তার মা ছিলো। সেই সময় সা রে গা মা সেধেছিলো মঞ্জরী; সে আর ক'দিন? তার পরেই তারা উঠে যায় ভাবানীপুরে। গান শেখা আর এগোয়নি। সোনাবালা মঞ্জরীকে বলেছিলো, হুংখ করিস নি পেঁচি, বা লিখেছিল তাতেই চলবে। বাবুরা কি আর গান শুনতে আসবে। বা হয় একটা কান্নার কাছে প্যাঁপ্যাঁ করলেই হয়।

বাবুরা হয়ত খসী হয় কিন্তু মঞ্জরী হয় না। পুরুষমানুষকে না হয় ভালোবাসতে নেই কিন্তু গান ভালোবাসলে দোষ কি? গান কি পুরুষমানুষের চেয়েও খারাপ। না, খারাপ নয়। খারাপ যদি পৃথিবীতে কিছু থাকে সে হল কাউকে না ভালোবাসে দেহ

ভাত-বেড়ার মধ্যে হলো বহরী মনে এই কথা কেমন করে তোলাপাড় করে সাধারণ, সমস্ত রাত। এত হুঁতাপ্য নিয়ে সে কেন জ্বালালো ? কেন ? কেন ? কেন ?

হৃদয়বল্লভ মজরী গোছগাছ করে নিল সব।

সোনারালা জিজ্ঞাস করলে : হৃদুবাবু করে আসবে যে হৃদুপুর থেকে ?

হৃদুবাবু আর আসবে না। এসেও আহার করছে আর নয়।

শোন দু'দিন কথা একবার। আসবে না, যাবে কোথায় ?

হা ভর কোরছে। নুশেন ওইর এবার পেনসনের সময়। সোনারালায় হুসবর। মজরীই একবার জবর। তার পেটে যে এমন মেয়ে এলো কি ক'রে, সোনারালা ভাই অনেক সময় ভাবে। কিন্তু এখন কিছু বলে না :

মজরীকে সে'জামে। একবার বৈক বসলে বিশা বাকুরে বই কয়ে না। বিবিধ ওখানে বাজে, ক'মিন বাসেই ফিরবে। সেই সঙ্গে হৃদুবাবুও চলে যাবে যেমন করে হোক।

মজরী বখন বিবির বাড়ী গিয়ে উঠলো, তখন হৃদুবল্লভ। আপন মিনি নয়। হার পুথি। কিন্তু মজরী ভালোবাসে হার চেয়েও বেশি। মজরী হৃদুবল্লভের আসবে ভাবেনি। ভাবি খুসি হল কেলারানী ; হৃদুবাবু কোথা রে ?

ধাকতে এলাম আমি ; জিজ্ঞাস করছিল হৃদুবাবুর কথা ?

তুই তো এখন থাকবি ক'মিন ; হৃদুবাবুকে ছেড়ে মিসির কথা মনে পড়ল তাই ভাবছি !

পরে ভেবে ; এখন এটা নাও মিসিনি।

সুটকেস নিয়ে কোলারানী উঠলো ওপরে শোবার ঘরে। হৃদুপানে হুখানো ঘর ছোট ছোট ; দাকখানে কেলারানীর খাবার ঘর। এইখানে রতনচাঁদ এসে রাত কাটাবে হার। বেলারানী একটু হুল, কিন্তু ক'রল। আর পুঙ্খবদ্যুৎ বা চায় সে তাই। কখনও আশঙ্কি করে না ; কিছুতেই। শরীর খাবারের কথা জানার না ; একবারও বলে না : আচ্ছ বাড়ী বাও লক্ষীট। রতনচাঁদ ছাড়া তাকার না কারন দিকে। রতনচাঁদ ছাড়া আর কোনও মাত্রা নেই তার। বহন হয়েছো বা সেখার তার চেয়ে কম বহন।

হা কেনর আছে যে ?

সেই মজরী কগড়া করছে রাত দিন।

তাহলে তুইও সেই বকম আছিস পেঁচি ?

আমি কি বকম আছি তা ত দেখেই পাচ্ছিস।

তুই আরো বোগা হয়ে গেছিস আর...

আর কি বল ?

আর এখনও তেমন তুলো।

কি করে বুঝি ?

বাইরে সিজা ১৮-১৮ করছে ; পরল মিসিনি নিশ্চয় ?

ঐ যে সত্যিই ত'।

ধায় ধায় ; আমি মিসে মিছি। কত সেব রে ?

আসে অট্ট আনা নিত ; বোগা হয়ে গেছি বখন বলছিস, তখন হ' আমরী দে।

বায়লার বৈক পরল দু'জনে মিলে কেলারানী করলে ; এক হিসেবী

হৃদুবাবুর ক'র করে এলো নাকি ?

না ; আমরীই আর ভালো লাগে না মিসি !

ভালো লাগে না ? অথাক করলি পেঁচি ; এ আবার কার ক ভালো সেগেছে ? অতেন করে নিতে হয়।

এবার অভ্যাস বদল করব।

কি করবি ?

জানি না ; মজরী ভালো একবার সিনেমার কথাটা কস, তারপর কি করে হল, চুপ করে পেল।

কিন্তু কোলারানী চুপ করলে না। সেই বলল : বিবেচনা নাযবি ? ওদে খায়াপ। শরীর একবারে যাবে। সেই ভাবে না। টানা ছাচকার মাঝি কেন ? আমরাকেও বলে, সিনেমা তুলবে, নামতে। আমি বলি, না ; ও আমরাকে গিরে হবে না। হবে না, বলি কটে, কিন্তু হয়, জানি ; বাগা করে, ভালো ত দেখেছি ; আমিও পারি। কিন্তু ঐ ত বেশ আছি ; কি হবে একজন ঘেয়ে পাচ জনকে নিয়ে ?

তুমি সিনেমা দেখ বিবি ?

সে কি রে ? ভালই ত' সন্ধ্যার পছন্দায় রূপ-ভরম দেখতে ; মেয়েটা বেশ করেছে। বড় হুং হোল ; যবে পেল শেষে ঘামে অভ্যাসে ; বাবি একমিন ?

ধা ; চল কালই বাই মিসি।

কাল নয় যে ; তজ্জ্বাং বাবে। কাল লক্ষীপুজো আছে।

লক্ষীপুজো করে নাকি। এককলে হাসলে মজরী। তারিও দেখল এক কোলে একটি লক্ষীপ্রতিমা ছোট চাখপায়র ওপর। কল মিসে সাজানো। হৃদুপানি শাঁখ বক্স ; কটি নেই কিছুতে।

এমনি করে একটু চোখ বন্ধ করে বসি। লক্ষীর দ্বায়েই ত'ব কিছু ; তাছাড়া পানের বোকা না কহুক, একটু কম চেপে বসবে।

জোয়ার বর্ষবাস হবে, আর আমরার ?

তুই ইন্দ্রলোকে থাকবি সুখে।

বর্ষেও হৃদুবাবু বাবনে তাহলে, মজরী অথাক হল। সেখানেও মেয়েছলোর জেত সুখ-সুবিধে সব। সেখানেও খুদী করতে হ' পুঙ্খবদ্যুৎজালোকে ; তা হলে যথেষ্ট পাঁচি নেই।

কি অত আকাশ-পাতাল তারছিস যে পেঁচি ?

কিছু নয়। ঘুমবে একটু।

নে না ; গড়িয়ে নে একটু ; আমিও তো শোব।

কেলারানী বখন বাঙাতে বাঙাতে মজরীকে তুললে ঘুম থেকে, তখন সামনের আর আশের পাশের বাড়ীতে লক্ষ ওয়াট ইলেকট্রিক আলো পুড়ে গেছে। সন্ধ্যার বউনী হয়ে গেছে কাপড়ের লোকান আর মনোহারী লোকান। কুদ্রী চাই বলে থেকে গেছে অস্তর বা চারেক। আর চান খেব হয়ে চুল বাঁধা হয়ে গেছে নীলমণি নয় সনের বসন্তসোনার।

ভর সন্ধ্যার মেয়েমাছুং এমন বেহ'ন ঘুমোর নাকি যে পেঁচি ?

খপ দেখছিলাম মিসি।

কি খপ ?

সেখিসিগুম সকাল হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা সাত্তে সাতটার, তুই সকাল দেখলি ? খপ তো আচ্ছা দেখিস তুই ?



চাকার আসিনা

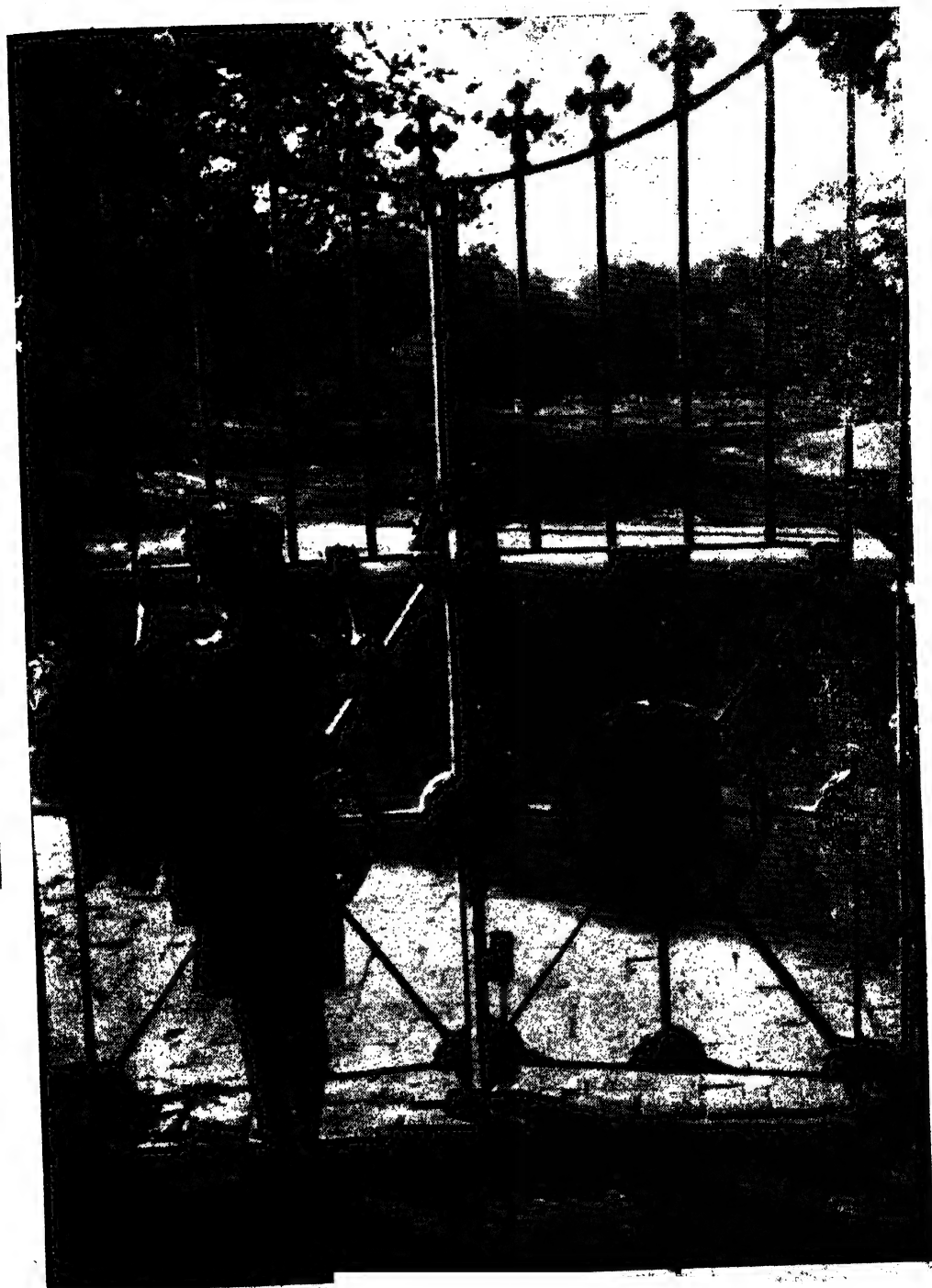
—বৈষ্ণব হালদাস





হুন্দির আশাদ

—কলক ১৩



বন্দীর ব্যাখ্যা

—বন্ধুত্বল হুতোয়ায়





। ; সকাল এখনও সন্ধ্যাই হয় নি ; মঞ্জরী হতাশ হল ;  
হ'তে এখনও অনেক দেবী ।

ত আটটার রতনচাঁদ এলো । জামার গলায় হীবের  
ম লাগিয়ে ক্রমালে সেট আর পাতলা গাঁকে আর কানের  
দামী আঁতর লাগিয়ে । মঞ্জরী অবাক হল । লোকটার  
আছে কিন্তু দিগিও তো তেমন কিছু গুছিয়ে নিয়েছে বলে  
হয় না ! তারপর হিসেব করতে মনে পড়লো-জাত ব্যবসাদার ;  
ছলের কাছে আসে কিন্তু বতকণ থাকে ততটুকুর দাম দেয় ;  
তত আসে না । বাপ-ঠাকুরদার মান রাখতেই আসে ।  
ছলে না রাখলে পরমা বাধা যায় না ।

—আমার বোন মঞ্জরী ।

হা, হা ! দেখেই বুকে নিয়েছি । মুখের কাঁচি ভবত তোমারই  
।

মঞ্জরী মনে মনে হাসলো । বেলাবাগী তার মার-পেটের বোন  
কিন্তু বলতে হয়, ভুলতেও হয় ।

আজ কত টাকা ঠকালো ?

রাম ! রতনচাঁদ জিত কাটলো ; চ' পরমা বেশী নেবো  
জ গদ্যেরক ঠকালো না ।

মঞ্জরী মেপে মেপে দেখলে রতনচাঁদকে । যেমন করে রতনচাঁদ  
ন করে দেখে নেয়, সোনা আর হীরে । দেহের থেকেও কথাবার্তায়  
। মোক্ষ পাবার পথে চলেছে । অর্থাৎ মোক্ষ । ঘি-চুখের শরীর  
র নিশ্চিন্ত ঘুমের । শুধু চোখ দুটো বলে দিচ্ছে—আদর করতে  
হতেও বেহিসেবী হয় না রতনচাঁদ । মেয়েজলের কাছে মিছে কথা  
ন, মিথ্যার মতই শোনায় । খদ্দেরকে সন্তা বলে না ভুলও ;  
সন্তা সত্যির চেয়েও খাটি শোনায় দে-সব । চোখ দুটোই হুঁ ফালি  
বি । ভেতর পরন্ত কেটে বসে, বাইরের যা শুকিয়ে যায় কিন্তু  
কোয় না ভেতরের ছালা । রূপকথার দিনে রাক্ষসের প্রাণ থাকতো  
খিয়ার ছোট বৃকে । অজানা অবণ্যের বুনা ফলের ভেতর । জলের  
গলে অতল শাতালে কুমীরের চোখের মণিতে । আর রতনচাঁদের  
দয় বৃষ্টি পড়ে আছে টাকার থলিতে । ফাটকাব দর ওঠা-নামায় ।  
দীবা, পান্না, জহরতের ঠিকুরে-পড়া ছাতিতে । বেলাবাগী পুজো করে  
জাতিক । রতনচাঁদের উপাস্তা গণেশ । কাক্তিকের ময়ূর চলতে  
চলতে রাস্ত হয় । গণেশের মোটর গাড়ী পেটল ঢাললে চলে ।

গান হোক একখানা । কিন্তু গানের আগে কাজের কথা হোক ।  
কাজের কথা বলতে গিয়ে থামলো রতনচাঁদ । একবার কটাক্ষ  
হাললো মঞ্জরীর দিকে ।

ওর সামনে বলতে পারো । বেলাবাগী মঞ্জরীকে উঠে যেতে  
দিলো না ।

হা রানী, সে দেখেই বুকে নিয়েছি । কাল বারোটায় লোক  
আসবে । এই হারোটো রাখো । পকেট থেকে রতনচাঁদ বার করলে  
রাঙাটো ।

বাক্সে হাত দিয়ে পরিষ্কার করলে রতনচাঁদ । তার পর বেলাবাগীর  
হাতে দিলো । বেলাবাগী উঠে গেলো সিলুক খুলতে ।

কি বললে এটা দিয়ে দেব ।

আমার লোক আসবে হুপুর বারোটায় ; এসে পেলবে :

কাল রাত, চন্দ্রমাটা জলে গেছেন ; লাও দেখি ।

মনে থাকবে তো ?

এখনও অবিশ্বাস করো ?

রাম ! রাম ! কি যে বলে রাণী ! বিশ্বাস-অবিশ্বাস, নেই,  
কুটো লোকের হাটে না যায় তাই ।

এ কি কুটো মাল, যে কুটো লোকের হাতে যাবে !

মঞ্জরী বুঝলে, চোরাকারবারও আছে রতনচাঁদের । হয়ত  
সেইটেই পরমার গোপন হুড়ঙ্গ । কিছু বললে না ।

এবারে গান হোক একখানা ।

আজ মঞ্জরী গাইবে । পেঁচি, গা তো একখানা । বহু দিন ধরে  
তোর গান শুনি নি । মঞ্জরী কিন্তু আপত্তি করল না । ধরলে তার  
একখানাই জানা গান ।

‘বনের পাখী উড়ে গেছে ; মনের পাখী কান্দে তাই !’

বহুৎ আচ্ছা !

বাইরের আকাশে কখন মেঘ জল হয়ে নামলো ।

সে-রাঙিরে রতনচাঁদ থেকে গেলো । এই বৃষ্টির মধ্যে বাড়ী  
যাওয়া অসম্ভব । গাড়ী ছিলো ; কিন্তু গাড়ী ফেরৎ গেল ।

আজ রাতে কাদের সঙ্গে যেন তোমার কথা ছিলো না ?

সে আর হোত না কি রাণী ? বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে কিছু বাতচিৎ  
ছিলো । কিন্তু এতো বৃষ্টিতে বাঙ্গালী বাবুর বাড়ী থেকে বেরোয় না !  
বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে আবার কি কথা হবে ? ঠকান্নে বৃষ্টি  
কাজিক ?

শুধু মঞ্জরী দেবি !

দেবি কথাটা কেটে বসে গেলো পেঁচি মঞ্জরীর মনে ।

শুধু একবার দিদির কথা ! এতটুকু বিশ্বাস নেই আমাকে, ঠকান্ন  
কেন ?

ফিল্ম বানাজি একখানা, তুমি ত আর হিরোইন হলে না রাণী ?

আমি হিরোইন হলেও হিরো হবে অন্য লোক, সইতে পারবে ত ?

হা হা হেসে উঠলো রতনচাঁদ, কি যে বলে রাণী !

অন্য কাক্তিকের পর্যাশ্রয় ঘুম এলো না মঞ্জরীর ।

নানা দিক দিয়ে মঞ্জরীর কয়েক বছর ব্যবসায় আজকের দিনটা  
একটু ব্যতিক্রম । হুণুবাবুর সঙ্গে সন্ধ্যা কাটেনি । কোন খদ্দেরের  
জন্তেও বাইরে দাঁড়াতে হয়নি । কোন খদ্দেরের কথা তার মনেই  
হয়নি আজ । এ এক অভিজ্ঞতা কিন্তু তার পরেই সে হিসেব  
করলো হাতে যা আছে তাতে এক মাস চলবে । সামনের মাসটা  
কোনও বকমে । ভারতে ভারতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল মঞ্জরী ।

আজ তুমি কেমন যেন অল্প মায়ুষ হয়ে গেছে ?

বেলাবাগীর কথায় চমকে উঠলো রতনচাঁদ, বলল, কেন ?

তুমি নিজেরই ভেবে দেখো ।

বুঝতে না দিলো বেলাবাগী বুঝলো সবই । আর দোষ দিল  
বারে বারে নিজের কপালপর, নিজেকে একেবারে উজাড় করে দিয়েই  
তার এ অবস্থা । একটুও হাতে না রেখে এতদিন ধরে সে শুধু দিচ্ছেই  
এসেছে । অথচ সমস্ত সাধারণ মেয়েরাও জানে যে মেয়ের কাছে  
সহজেই পুরুষরা সব পায়, ন চাইতেই, যে সিলুক খুলে দেয় মনের আর  
দেহের, সেখানে বেশী দিন আকর্ষণ বাসা বাঁধে না । বাস্তব মেয়ে  
মায়ুষ প্রথম চাওনিতেই বুকে দেয় কোন তাড়নার ঘরের বউ কৈলে  
কোন আসে মায়ুষ । তখন সে টানে কাঁচপাকাকে যেমন চান

বেঙ্গল ল্যাম্প। পাখীকে যেমন উড়ান শক্তি রহিত করে নিয়ে আসে সাপ নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে একটু একটু করে। আন্তে আন্তে। কিন্তু সাপের চেয়ে যে অনেক সাংঘাতিক সে জানে খেয়ে ফেললেই ফুরিয়ে গেল খেলা। সে আধমরা করে রেখে দেয় শীকারকে। বেলারানীও যে এ তথা জানে না তা নয়, কিন্তু তার বাঁধা মাছবাটির জন্তে ভারি দুঃখ হয়। রতনচাঁদের বউকে সে দেখেছে, বেলারানী তার পাশে ঝাঁড়তে পারে না; চেহারা যথেষ্ট, চমকিতেও এমনকি। তাই সে সব দিয়েছিল রতনচাঁদকে, বউয়ের কাছে যা পায়নি রতনচাঁদ বেলারানী তা দিতে একবারও দ্বিধা করেনি, একটুও সময় নেয়নি; বোঝেন স্বাভাবিক কামনার মুহূর্ত আছে, বিকৃত কামনা সমুদ্রের মত অতল আর আকাশের মতই অসীমও সে বুঝি। শুধু শঙ্কিতায় সে জঘন্তম, পক্ষকুণ্ডের চেয়েও দুঃসহ, উগ্রতম বিষবাস্পের চেয়েও দুর্গন্ধ। তাই বিকৃত কামনার তাতে দিন-রাত যে দম্ব করে রাখতে পারে তার কাছেই মজা খোঁজে তারা। পরিহাস করতে চায় সহজ পথের অনায়াস আরাম। বেলারানী রতনচাঁদকে এখনও হারায়নি কিন্তু হারাতে সে জানে, অস্ত্র কোথাও একটুখানি হাতছানি দিলেই ভুলে যাবে রতনচাঁদ। তবুও বেলারানী প্রথম দিনেও যেমন ধরা দিয়েছিলো আজও তেমনি। এতটুকু ঈর্ষ্যার কারণ হয়নি সে কোন দিন একটুকু ঈর্ষ্যা করেনি কোন দিন। রতনচাঁদ যা নিজে থেকে দিয়েছে তাই নিতে এতটুকু বেজার হয়নি। আত্মসে আর উজ্জ্বলিত জানায়নি তার আরো চাই। পরসা রেখেছে হিসেবীর মত; কিন্তু যৌবন বিলিয়ে দিয়েছে বেহিসেবীর অরূপোপজীবিনীর মত। আর রতনচাঁদ এখন তার কাছে যত না আসে আরামের জন্তে তার চেয়েও বেশী আসে কারবারের খাতিরে। বাঁকাচোরা কারবারের কারবারি; বাড়ীর নীচের চোরা কুঠরীর মত ব্যবহার করেছে বেলারানীকে; রেখে দিয়ে গেছে কোকেন, আর হীরে, চালান করে দেবার আগে অনেক অনেক চোরাই মাল। বেলারানীর ওপর নির্ভর করতে হয়েছে তাকে। নির্ভর করে ঠকতে হয়নি আজও। তাই বেলারানীর ঘর ছেড়ে অস্ত্র ঘরে বাবার চেষ্টা করেনি রতনচাঁদ। কিন্তু বেলারানীর বড় বড় ব্যবহার ভালো লাগে না রতনচাঁদের। এখানেও সেই খবরদারী। ভিজলে অস্ত্র করবে। বড় খাটছে রতনচাঁদ; এত ভালো নয়। বড় বেহিসেবী হয়ে পড়েছে নাকি রতনচাঁদ। রতনচাঁদ বিরক্ত হয়, কিন্তু হাসে। বেলারানী ভাগ্যিস বিয়ে করার মত মেয়ে নয়।

বিছানা ছেড়ে উঠলে মঞ্জরী।

কলঘরে দিকে এগুলো সে। খিল খুলে বাহিরে বেরতেই মনে হলো স্যাঁৎ করে কে সরে গেলো। কে হতে পারে? দাঁত দিয়ে চৌচের নীচের কামড়ে ধরলো। তারপর বাড়তি আঁচলটুকু দিয়ে সারা গা জড়িয়ে সে এগিয়ে চলল। চূপ, ফের কোঁস করে উঠলো রতনচাঁদ। তারপর একটি একপোটা টাকার নোট গুজে দিল মঞ্জরীর হাতে। হঠাৎ মঞ্জরী এক হাতে সুইচটা টিপে দিলে; আলো থেকে রতনচাঁদ একটু চোখ সরতেই ধাক্কা দিলে মঞ্জরী আর মেঘবহুল রতনচাঁদ কোণে বসানো মস্ত গোলটবের মধ্যে গিয়ে পড়লে। মঞ্জরী দরজা খুলতেই দেখলো বেলারানী ঠাঁকাচ্ছে। কি হয়েছে? কি? বেলারানীকে ঠেসে সরিয়ে দিয়ে শাড়ী ঠিক করতে করতে বললে কিছু হয়নি। এই

কলঘরে ছিলাম আমি, দরজা বন্ধ করতে ভুলে যাওয়ার উনি বুঝতে না পেরে চুকে পড়েছিলেন। কথাগুলো শুনতে পেয়ে রতনচাঁদের মনে হলো সে বরফ-জলের মধ্যে বসে আছে; তবুও ঘাম হচ্ছে কেন? বেলারানী যেতে দিলে মঞ্জরীকে আর বুঝলে সবই, তাই কিছুই বললে না। কপাল ভাঙ্গল আজ থেকেই।

পরের দিন সকালে সূর্য উঠে অনেকক্ষণ হামাগুড়ি দেওয়ার পর তবে মঞ্জরীর ঘুম ভাঙলো। ঘুম ভাঙামাত্র কাল বাস্তবের বিশি ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেলো। পড়ে যাওয়ামাত্র সকালের চেহারাটা কালো হয়ে এলো তার চোখের ওপর। মঞ্জরীর এখন হঠাৎ বোধ হচ্ছে কাঙ্ক্ষা ভালো হয়নি। বেজার আবার লোক বেলোক কি? আর মঞ্জরী যদি রতন চায় সত্যি-ই জীবনে, তা হলে কিছুক্ষণের জন্যে অস্ত্র রতনচাঁদের তাকে চাওয়াটিকেও মেনে নিতে হবে বৈ কি। কেন তার এ মতিভ্রম হলো? সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল হুলুবাঁবুর ওপর। তার মেজাজই খারাপ করে দিয়ে গেছে হুলুবাঁবু। এক পরসা দিয়ে বায়নি কিন্তু বেজারবস্তির উপর ঘোড়া জমিয়ে দিয়ে গেছে। আজ রোজগারের পথ শুধু বন্ধ নয়। রোজগারের প্রাবৃত্তির উধাও। কি করবে তবে মঞ্জরী? কি সে করতে পারে? এত অসহায় এ আগের মঞ্জরী আর কখনো এমন ভাবে বোধ করেনি।

চান-চান করে বাবার জন্তে মঞ্জরী তৈরী দেখেও বেলারানী একটি কথাও কিছু বললে না। কিছুদিন থাকবে বলে কাল যখন মঞ্জরী এলো তার এখানে, বেলারানী আজ সকালে কিন্তু আর সে ভেবে পেলো না যে সে তখন কেন এত খুসী হয়েছিল। তার এতদিনের মৌচাক তার নিজেরই একজন যে এমন ভাবে ঢিল মারবে এ সে ভাবে নি। নিজের একজন। থুঃ বলেই বেলারানী মঞ্জরীকে ভাঙ্গা মৌচাকের বোলতার মত বিধতে না পেরে হঠাৎ ঝিক্কার দিলে। সে খুঁত তার নিজের গায়ে ফিরে এলো; আর দিলে; থুঃ? মল মেয়েছেলে যখন ভালোমানুষী করতে যায় তখন যে সে শুধু ভালোমানুষের মল করে তা নয়, তার নিজের মল করে সবচেয়ে আগে। রাগ হওয়ায় কথা বেলারানীর যে জন্তে, রতনচাঁদের পাত্রী পরিবর্তনের কারণে, বেলারানী কিন্তু অস্ত্রহী হয়নি তাতে; দু'দিন মঞ্জরীর জন্তে রতনচাঁদ একটু ছুঁক ছুঁক করলেও সে জানত, রতনচাঁদ আবার তার ঝাঁড়ে এসেই বসত। কিন্তু নিজেরও ভালো না, অস্ত্রকেও বঞ্চিত করব, মঞ্জরীর মনোবৃত্তি বেলারানীর ভালো লাগলো না। শেকল কেটে পাখী উড়িয়ে দিয়ে কার লাভ হল? কিন্তু বাবার সময় আর থাকতে পারলো না, মঞ্জরীকে জড়িয়ে ধরে বেলারানী কান্দলে, এ তুই কি করলি পেঁচি?

মঞ্জরী কিছু বললে না। চূপ করে এক সময়ে সে বেরিয়ে গেলো। নিজের গুই নোরা জায়গায় ফিরে যেতে বিচ্ছিন্ন লাগছিলো মঞ্জরীর; বাড়ী এসে পৌঁছে তার আরও খারাপ লাগলো। দোতলায় নিজের ঘরে মার সঙ্গে কে যেন কথা বলছে। এ সময়ে আবার কে এলো কাছে। হুলুবাঁবু ফিরে এলো নাকি?

ও মা মঞ্জরী? ভগবান বা করেন, এই ভদ্রব্রহ্মক এসেছেন, তুই সেই কোথায় গিয়েছিলি কাজ করবার জন্তে, সেইখান থেকে তোমার দিদির কাছে গেছে শুনে, এটা তোমার আমার হাতেই দিচ্ছিলাম। নাও। মঞ্জরী কাগজটা হাতে নিতেই উত্তেজনায় তা ছদপিণ্ড তার চৌচের কাছে লাফিয়ে উঠলো। ভগবান হয়ত তা

দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। সই করে দাঁও এখানে। লোকটির হাত থেকে কলম নিয়ে মঞ্জরী সই করলে গোটা গোটা অক্ষর : মঞ্জরী দেবী! এ কি মঞ্জরী দেবী কার নাম? এবারে মঞ্জরী তার কুটিল হাসি হাসলে; মঞ্জরীবালা নামটা ভালো নয়; সিনেমায় আমি 'মঞ্জরী দেবী'। এই নামই রাখব ঠিক করেছে। তুমিই এ কাজ পারবে মঞ্জরী। আগেই যখন নামের কথা জেবেছ, তখন সিনেমার হিসেবে তুমি নাম একদিন পাবেই। এই কথাগুলো মনে মনে বললেন ভদ্রলোক আর যে কথা উচ্চকণ্ঠে বললেন তার সারমর্ম; পরন্তু থেকে কাজ শুরু হচ্ছে। টাকা; নগদ টাকা সে পাবে; প্রথম মাসের মাইনে আগাম একশো পঁচাত্তর টাকা। আমাদের গাড়ী এসে তোমায় পরন্তু তুলে নিয়ে যাবে দশটায় তৈরী হয়ে থাকে। এই ক'টি কথা বলে অবশেষে নিষ্ক্রান্ত হন ভদ্রলোক; চান করার জন্তে পা বাড়ায় মঞ্জরী; তারপর কী মনে পড়তে খেমে যায়! মনে পড়ে, সন্ধ্যায় রতনচাঁদের সাধনাবাগী বেলারাগীকে : হারের আঙুটি গেন বুটো লোকের কাছে না যায় এক বেলারাগীর আশ্বাস—একি বুটো মাল যে বুটো লোকের কাছে যাবে। এবং তারও আগে রতনচাঁদের নির্দেশ মনে পড়ে, মঞ্জরীর; ঠিক দুপুর বারোটায় আমার লোক এসে বলবে, কাল রাতে চশমা ফেলে গেছেন আমাদের ঘবে—ঠিক আছে; অফুট আওরাজ করে মঞ্জরী। তারপর যায় কল্লিগীর ঘরে; অবিনাশকে ধরে গিয়ে।

অবিনাশ কল্লিগীর দালাল কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসী, মাঝে মাঝে মঞ্জরীর কাজ করে। অবিনাশকে সব বুঝিয়ে গড়িয়ে ঠিকানা বাতুলিয়ে মঞ্জরী নিশ্চিন্তে চানের ঘরে ঢোকে। আরেক বার কুটিল হাসি আসে তার।

কাল রাতে বাবু যে চশমাটা ফেলে গেছেন?  
দাঁড়াও, দাঁড়াও। বেলারাগী তুলেই গেছলো কথাটা। ঘরে এসে ঢুকে দেখলো ঠিক বারোটা ঘড়িতে। হার ধর আঙুটি আরেকবার দেখলে।

ফলফলে পাখরটা যেন তার কপালের কালোকে ঠাট্টা করছে। একটা চশমার খাপের মধ্যে পুরে, চশমার খাপটাকে দিলে লোকটার হাতে, আর ভাবলে রতনচাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক কি এবছরই শেষ?

একটু বাসে বেলারাগী খেতে বসবে, আবার দরজায় কড়া নাড়লো কে! দরজা খুলে দিতেই বেলারাগী শুনলো কাল রাতে বাবু যে চশমাটা ফেলে গেছেন? লোকটি আবার বললে। এটো মাত্র একজন এসে ঐ কথা বলে আঙুটি যে নিয়ে গেল।

আঙুটি?

আঙুটি মানে চশমা—চশমাটা নিয়ে গেল কে—

দাঁড়ান আপনি! বাবু বাইরে গাড়ীতে বসে আছেন, গিয়ে বলছি।

লোকটি ফেরৎ এলো। হাতে এক টুকরো কাগজ নিয়ে। তাতে লেখা, এতদিন কারবারের পর এ জোড়ুরী তুমি না করলেই পারতে রাণী! রতনচাঁদ এই কথা লিখেছে। লিখতে পারলো তাকে। সমস্ত ভুলে বেলারাগী দৌড় দুপুরের রাজপথ দিয়ে। দেখলো রতনচাঁদের গাড়ী চলে গেছে অনেকদূর। শুধু ভিজ়ে রাষ্টার ওপর চাকর-দাগ পড়েছে; হাল্ধের চামড়ার ওপর বেহন করে বসে যায় চাবুকের দাগ, ঠিক তেমনি। নিজের কপালে, গায়ে হাত বুলোল বেলারাগী, চাবুকের দাগ নেই কোথাও; কিন্তু তবুও ভাঙ্গা করছে কেন?

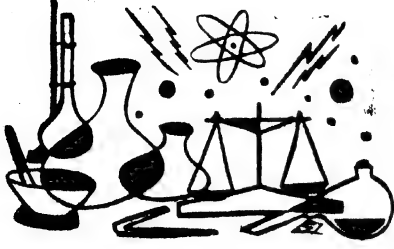
[ক্রমশ:]

## একটি আশ্চর্য মেয়েকে

দেবী রায়

জগতে মেয়ে অনেক তবু তোমার মত কেউ  
পারে না দিতে শাস্তি এই জীবনে কোনোখানে,  
সুদূরপর্যন্ত এ মনে ভালোবাসার ডেউ  
তোমাকে ছাড়া বিফল তাই বেঁচে থাকার মানে।  
বেদনা এসে ছড়ায় শুধু গভীর অবসাদ,  
এখানে দিন দীর্ঘতায় কেবলি 'ব' 'ব' 'ব'  
হৃদয় থেকে ফুরিয়ে দেয় ভালোবাসার স্বাদ,  
গভীর দ্রুত স্বপ্ন করে মনের অন্ধারে।  
সোনার চেয়ে অনেক দামী সোনার মত মনে  
অঙ্কুর বারুণ এই স্বপ্ন-মহাভূমি  
ফসলহীন হয়েছে শুধু বিফল আয়োজনে  
কেটেছে দিন কেটেছে রাত এবং মৌসুমী  
স্বপ্ন থেকে স্বপ্নরত্নের হয়েছো তারপর  
যা কিছু পড়ে রয়েছে তা সব ধুলো-বালির ঝড়।

# বিজ্ঞানবাত্তা



## পঞ্চমের মিশ্র

আত্মমেশনের দিন এগিয়ে আসছে। মানুষের প্রয়োজন যাবে কমে; কলকারখানায় যন্ত্র নজর রাখবে যন্ত্রের উপর, কাজকর্ম, উৎপাদন সব কিছুই চলবে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে। ক্রমবর্ধমান যন্ত্র-জগৎ-এর ক্ষমতার সীমানা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, সে মানুষের দৈনন্দিন কর্মসূচীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। গবর পাওয়া গেল, সম্প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মূহু বিদ্যুৎ সঞ্চালনের সহায়তায় ঘুম পাড়াবার এক রকম যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। অনিদ্রায় ভুগছেন অথবা আপনার রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়েছে, রাতে কিছুতেই ঘুম আসে না—তখন এই যন্ত্র আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। এই যন্ত্রের উদ্ভাবক, সোভিয়েত ইনস্টিটিউট অফ এক্সপেরিমেন্টাল সার্জিক্যাল এপারেটস-এর বিজ্ঞানী মিঃ ইউরীহুদি জানিয়েছেন যে ঘুমপাড়ানী যন্ত্রটি ব্যবহার করা খুবই সোজা। একটা রবারের টুপী থাকে, সেটা পরিয়ে দেওয়া হয় মাথায়, টুপীটির সামনে চোখের পাতার কাছে এবং পিছন দিকে বথাক্রমে ইলেকট্রোড থাকে দুটি। এই ইলেকট্রোডের মধ্যে দিয়ে মূহু বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চালিত করে রোগীর মাথায় স্নিগ্ধ উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়। যন্ত্রের সহায়তায় কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর আবেশে রোগীর চোখে ঘুম আসে। কেবল ঘুম পাড়িয়েই ঘুম পাড়ানী যন্ত্রের কাজ শেষ হয় না, পাশেই লাগান থাকে একটা পরিমাপক যন্ত্র—আপনি ঘুমোবেন আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ যন্ত্রে আপনার স্রুতির মরতায় পরিমাণ দেখা যাবে।

সমাজের প্রতি বিজ্ঞানের দায়িত্ব প্রতিপালন করবার জন্য গড়ে উঠছে একটি প্রতিষ্ঠান—নাম তার সোসাইটি ফর সোসাল রেশপনসিবিলিটি ইন সায়েন্সেস। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞানানুযায়ী সকলেই এর সভ্য হতে পারেন। এর প্রধান কার্যালয় আমেরিকায়,—সভ্যরা ছড়িয়ে আছেন সমগ্র দুনিয়াতে। অধ্যাপক পাউলিং, অধ্যাপক কুলসন প্রভৃতি বহু বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এই প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য। স্বয়ং মহামতি আইনষ্টাইনও এই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান উত্তেজনা ছিলেন। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির প্রয়োজনে মানুষের নিজস্ব প্রচেষ্টায় যে বিজ্ঞান গড়ে উঠছে, সে আজ মুষ্টিমেয় কতিপয় ক্ষমতাসিদ্ধ প্রয়োচনায় যাত্রা করেছে ধ্বংসের পথে। বিজ্ঞানের এই প্রলয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করে বিজ্ঞানীরা শঙ্কিত হয়ে উঠছেন। সভ্যতাকে বাঁচাবার জন্য সমাজের প্রতি বিজ্ঞানের কর্তব্য নির্ধারণ করা এবং সেই কর্তব্য পালন করার প্রয়োজন খুবই বেশী। সোসাইটি ফর সোসাল

রেশপনসিবিলিটি ইন সায়েন্সেস এই মহান কর্তব্য পালনে এগিয়ে এসেছেন, আমরা সর্বাঙ্গতঃ করণে তাঁদের এই কল্যাণকর প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

এই সঙ্গে আর একটি আনন্দের সুবাদ পাঠকদের পরিবেশন করছি। খ্যাতনামা রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় মহাশয় ১৯৫৭-১৯৫৮ সালের জ্ঞান সোসাইটি ফর সোসাল রেশপনসিবিলিটি ইন সায়েন্সেস-এর কার্যনির্বাহক সমিতির একজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক জন ইউব্যাঙ্ক-এর ব্যক্তিগত পক্ষে জানতে পারা গেছে অধ্যাপক রায় নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পেয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যে আমরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সবদা পাওয়া গেল, অষ্ট্রেলিয়াতে ইনস্ট্রুমেন্টার ভাইরাসের এক প্রতিবেদক আবিষ্কৃত হয়েছে। 'ইনস্ট্রুমেন্ট' থেকে ধারা কাবু হয়েছেন আর ধারা এখনও তার চক্রপাকে মাঝে মাঝে নাজেহাল হচ্ছেন তাঁরা সকলেই মনে-প্রাণে এই প্রতিবেদকের প্রচার কামনা করবেন। অদ্ভুত এই রোগ ইনস্ট্রুমেন্ট! বিচিত্র এর বীজাণু, এর অবস্থিতি সব ধর-ছেঁয়ার বাইরে। বিশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক জগতেও, বিজ্ঞানের সর্বক্ষমতা প্রয়োগ করে মানুষ একে আয়ত্তে আনতে পারেনি, তাই অষ্ট্রেলিয়ার আবিষ্কৃত প্রতিবেদক ব্যবহারযোগ্য হলে মানব সমাজের যে প্রভূত উপকার হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রাচীন কালেও এই রোগে মানব সভ্যতাকে বহু বার বিবর্ত করেছে। প্রেরণবাসীরা একে ভয় করতো, বলতো এই মহামারীর সঙ্গে গ্রহ-উপগ্রহের যোগাযোগ আছে। যাই থাকুক না কেন, অগাধ রোগের মহামারীর সঙ্গে সাধ্যমতো যুদ্ধ মানুষ করতে কিছু এর কাছে সে ছিল একেবারে অসহায়। বিজ্ঞান-গর্ষিত মানুষের নজর এই রোগের প্রতিকারের প্রচেষ্টার প্রতি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ হয়েছে মাত্র কিছু দিন আগে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯১৮-১৯১৯ সালে যখন ইনস্ট্রুমেন্ট রোগের মহামারী সমগ্র পৃথিবীর উপর তাত্ত্বলীলা চালিয়ে প্রায় দেড় কোটি লোকের মৃত্যুর কারণ হলো, তখনই চিকিৎসা-বিজ্ঞান হয়ে উঠলো তৎপর। মানুষের অল্পতম প্রধান এই শত্রুর বিনাশে সমগ্র বিশ্বে স্রু হলো গবেষণা, ১৯৩৩ সালে বিজ্ঞানীরা ইনস্ট্রুমেন্টা এক প্রকার ভাইরাস আবিষ্কার করলেন, এর মূরগীর ডিমে তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এক সহজেই মানুষ বা অল্প প্রাণীকে আক্রমণ করতে পারে। এর একটা প্রতিবেদকও বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন; এই প্রতিবেদক 'এ' শ্রেণীর ইনস্ট্রুমেন্টার বিরুদ্ধে কিছু সময়ের জন্য কার্যকরী হলেও অল্প শ্রেণীর ইনস্ট্রুমেন্টাতে কোন সাহায্যই করতে পারে না। এর পর ক্রমে ক্রমে 'বি' এবং 'সি' এই দুই শ্রেণীরও ইনস্ট্রুমেন্টার ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৫৭ সালে যে ইনস্ট্রুমেন্টার সঙ্গে আমাদের পরিচয় তা সর্বপ্রথম চীন এবং জাপানে স্রু হয়। এর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারলেন, এই রোগে ক্রমে ক্রমে সমগ্র বিশ্ব বিপন্ন হবে, তাই প্রতিকারের জন্য আশ্রয় চেষ্টা শুরু করলেন। রোগীদের গলা থেকে জীবাণু সংগ্রহ করে পাঠান হলো জেনেভাতে 'ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগ্যানাইজেশনের' সদর কার্যালয়ে। তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে এর প্রতিকার আবিষ্কার করবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। জাপান, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি স্থান থেকে ভাইরাস সংগৃহীত হয়ে বিমানযোগে তাঁদের কাছে নিয়মিত পাঠান হতে

লাগলো। দেখা গেল, এই ইনস্পেক্টর ডাইরাস 'এ' শ্রেণীর, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, 'এ' শ্রেণীর যে প্রতিবেদক ঊষ পূর্বেই আবিস্কৃত হয়েছিল, তা এই জীবাণুর উপরে কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারলো না। আপনাদিগ প্রশ্ন করতে পারেন, এর কারণ কি? কারণ কিছু দিন আগেই আবিস্কৃত হয়েছে—'এ' শ্রেণীর ডাইরাস কোন কোন সময় পরিবর্তিত হয়ে অগা এক বিশেষ ডাইরাসে পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত ডাইরাস সমূহ খুবই স্থায়ী এবং তারা নিজস্বের মতো অথবা আবার নতুন কোন ডাইরাসের সৃষ্টি ঘটায়। একটির ব্যবহারের সঙ্গে অপরটির ব্যবহারের ও গুণাগুণের কোনই মিল নেই। বর্তমান সময়ে ইনস্পেক্টর ডাইরাস আমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তা 'এ' শ্রেণীর পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত এক বিশেষ ধরনের অতিক্রম বীজাণু।

এই রূপান্তরিত ডাইরাসের সৃষ্টির বিষয়েও বিজ্ঞানীরা মুক্তিলাভ বিস্তার করছেন। এই পরিবর্তনের কারণ কি? আমাদের মতে তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহই 'এ' শ্রেণীর ইনস্পেক্টর ডাইরাসের রূপান্তরের একমাত্র কারণ। নির্দিষ্ট ভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়—তবে জগতে যে রকম ব্যাপক ভাবে পরমাণু সাক্রান্ত নিষ্ফারণের পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তার তেজস্ক্রিয়তার পরিবর্তিত এই ডাইরাসের আবির্ভাব মোটেই বিচিত্র নয়।

### তার আলেকজান্ডার ফ্রেমিং

পেনিসিলিনের আবিষ্কার বিখ্যাত বিজ্ঞানী তার আলেকজান্ডার ফ্রেমিং-এর জীবন কাহিনী আজ আপনাদের পরিবেশন করছি! পেনিসিলিনের আবিষ্কার বর্তমান কালের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে—এই যুগ হলো আন্টিবায়োটিকের যুগ। টাইফয়েড, বস্মা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ আন্টিবায়োটিক ঊষ সমূহের আবিষ্কারের ফলে বর্তমান দশকে অতি সহজেই নিরাময় করা যায়।

বিজ্ঞানী ফ্রেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করে এই যুগের সূচনা করেছেন। ১৮৮১ সালের ৬ই আগস্ট স্ট্রটলাণ্ডের আয়ারদারিতে তার জন্ম হয়, লাউডন যুব স্কুল, কিলমারনক আকাদেমি প্রভৃতি

শিক্ষায়তনে বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি লণ্ডন পলিটেকনিক হাইস্কুলে যোগদান করেন। প্রথম কর্মজীবন তাঁর আরম্ভ 'হয় এক জাহাজ কোম্পানীতে। চার বছর এই কোম্পানীতে কাজ করার পর তিনি আবার ছাত্র হিসাবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট মেরী হাসপাতাল মেডিক্যাল স্কুলে যোগদান করলেন। ১৯০৬ সালে ডাক্তারী পাশ করার পর ঐ হাসপাতালে বিজ্ঞানী সার এলব্রাথ রাইটের গবেষণাগারেই তাঁর গবেষক-জীবন শুরু হয়, বিখ্যাত এই বিজ্ঞানীর শিক্ষা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাই বিজ্ঞানকর্মী ফ্রেমিং-এর প্রারম্ভিক-গবেষক জীবনের প্রধান সহায় ছিল। ১৯২১ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জীবাণু-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্রেমিং জীবাণু-বিজ্ঞানের বহু শাখাতেই গবেষণা করেছেন,—এই সব বিষয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণার ফলাফল-সমন্বিত রচনার সংখ্যাও অনেক। তিনি জীবাণুনাশক লাইসোজাইমেরও আবিষ্কারী। মানবদেহের রক্তের উপরেও তিনি অনেক গবেষণা করেছেন।

পেনিসিলিন আবিষ্কারই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই পেনিসিলিনের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। ঔফাইলোকক্কাস জীবাণু বৃদ্ধি নিয়ে গবেষণা করার সময় হঠাৎ একদিন জীবাণু-সমন্বিত গবেষণা মাধ্যমের মধ্যে বাতাস থেকে সাক্রামিত হয়ে একটি সূক্ষ্ম ছত্রাকের সৃষ্টি হয়। দেখা গেল, এই ছত্রাকের চারদিকের জীবাণু কি এক অজানা কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। বিজ্ঞানী অনুমান করলেন, জীবাণুর বিনাশের জন্তু নিশ্চয়ই ঐ ছত্রাকই দায়ী। শুরু হলো গবেষণা, ছত্রাকটির নাম পেনিসিলিয়াম নোটেটান, আর এইই মধ্যে থেকে পাওয়া গেল জীবাণু-নাশক অত্যন্তব্যর্থ এক পদার্থ! এই পদার্থের নামকরণ হলো পেনিসিলিন।

পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্তু বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্রেমিং ১৯৪৫ সালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্ববিখ্যাত এই বিজ্ঞানী ১৯৫৫ সালের ১১ই মার্চ আকস্মিক ভাবে হৃদরোগে পরলোক গমন করেছেন।

## ● মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য ●

### ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজি: ডাকে ..... ২৪

বাৎসরিক " " ..... ১২

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজি: ডাকে

( ভারতীয় মুদ্রায় ) ..... ২

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে

গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ

মণিঅর্ডার কূপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা

উল্লেখ করবেন।

### ভারতবর্ষে

ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সভাক ..... ১৫

বাৎসরিক সভাক ..... ৭।০

প্রতি সংখ্যা ১।০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে ..... ১৫.০

( পাকিস্তানে )

বার্ষিক সভাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ ..... ২১

বাৎসরিক " " ..... ১০।০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " ..... ১৫.০



## সাহিত্যে দেহবাদ

বাংলা দেশে চিরকাল একদল সাহিত্যিক আমাদের সাহিত্যের তথাকথিত সমালোচকের কাছে তিরস্কৃত হয়ে আসছেন। ইত্যের বাধাধরা রাস্তা অতি কষ্টে ত্যাগ করে ধীরে বহু বিপদের থেকেও পরীক্ষামূলক সাহিত্য সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন, তাঁদের ত্রুটি ক্রোধের আর সীমা থাকে না সনাতনপন্থী এই সমালোচকের। ক্ষেত্রে বলতে বাধা নেই বা স্বীকার করতে কুঠা নেই, সাহিত্যের ইতিহাসে কোন ক্ষেত্র বা ধারা নেই। কিন্তু বর্তমান যুগের লোচনাচারীদের সনাতন খোঁজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় দুই নারুতির পরিচয়। এরা দুনিয়ার হাল-হকিৎ জানতে পরামুগ্ধ, ন-বিদেশের আধুনিক সাহিত্যের কোন খোঁজ রাখেন না, চোখে জ্ঞানিক-চশমা পরলেও দৃষ্টি এঁদের সীমাবদ্ধই থাকে—কেবল এক ঠাকুরের বশে লেখনী ধারণ করেন এবং ভিত্তিহীন যুক্তি দেখিয়ে গালিবর্ষণ করতে থাকেন অপার্থী ভাষায়। সম্প্রতি জর্নিক সাহিত্য-মালোচক (!) আধুনিক বাঙালী সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে দেহবাদের ধারা তুলেছেন আবার। পৌরাণিক নারায়ণ-চক্র দ্বাৰা সত্যদেহ খণ্ড-বিখণ্ড করেন, আলোচ্য লেখকও (শুধু মাত্র নামের অজ্ঞানত?) লেখনী চালনা করেছেন আধুনিক সাহিত্যের সত্যদেহানির নজর দেখিয়ে। স্বদেশনৈতিক কার্যকরী হওয়ার নানা তীর্থের স্রষ্টা হয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে। মসীর অসিধারী হয়তো জানেন না, তাঁর অসিতে ধার পড়ে না কতকাল এবং হয়তো জানেন না লৌহযুগের অন্তর এ যুগে একেবারেই অসল। যাই হোক, সমালোচকের বক্তব্য : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জন কয়েক সাহিত্যিক দেহবাদকে আশ্রয় করে বড়ই অজ্ঞান হয়েছেন। সাহিত্যের মূলভিত্তি হানির রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়তে পড়তে তিনি নাকি আদিম অজ্ঞত্বভিত্তি শিউরে শিউরে উঠছেন। শুধু মাত্র জন কয়েক লেখকের লেখার ছন্দে ছন্দে তিনি পর্ণপ্রাঙ্কির আশ্রয় পেয়ে তাঁদের নামের একটি 'ব্রাহ্ম লিট' পর্যন্ত পেশ করে ফেলেছেন সাহিত্যের দরবারে।

শৈশব যাক, তালিকাভুক্ত লেখকরা এখন ভয় আর আশঙ্কার লেখনী আমায়োগ্য করেন কি করেন না।

কি ভাবাত্মক দেশের শাস্ত্র আর পুরাণ, কাব্য আর মহাকাব্য, এমন আমাদের জ্ঞান অভিধান মনোযোগের সঙ্গে সমালোচক পড়ছেন কি না আমরা জানি নেই। না-জানি সমালোচকটি এই সকল মহাগ্রন্থ

— সত্যের পালানো! এখানে

দ্রববস্থা হয়, এক কোঁটা বিদেশী পান করলে হয়তো দাঁত-কপাটি লেগে যাবে তাঁর। 'মা কানী' মার্কস, 'মহাশূন্য' মার্কস কিংবা 'শনিঠাকুর' এর এক-আধ পাঁচটেই যিনি চোখে সর্ষে ফুল দেখেন, তাঁর সমুপে করাসা কুঁইয়া, ঝড়, ভূইয়ি, বাগান ভড়কা ধরা শুধু বিপজ্জনক নয়, অপ্রয়োজনীয়।

দেশ-বিদেশের বর্তমান সাহিত্য পর্য্যালোচনা করলে বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্যের আঁচনা থেকে ছায়াখামি আর ভাঁড়ামি বিদ্যার গ্রহণ করছে। বৈজ্ঞানিক যেমন বিজ্ঞানের দ্রবীণে পৃথিবী দেখছেন তেমনি আধুনিক কালের সাহিত্যিকরা বাস্তব দৃষ্টিতে দেখছেন সমাজ-সচেতন মানুষকে। ইলানী কালের সাহিত্যিকরা বিশ্বাস করেন, সসার-বন্দ্য পালনের জগৎ দেখকে যেমন বাতিল করা যায় না, তেমনই মানুষের কাহিনী লেখার মধ্যে মানবদেহকে বাদ দিয়ে শুধু 'গাথা' রচনা করা যায়, সাহিত্য রচিত হয় না। সনাতন কালের বাসীকি, বেদবাস, হোমার, দান্তে, সেক্সপীয়র, কালিদাস থেকে আধুনিক কালের রথী মহারথীরা দেখকে বাগ দিয়ে লিখতেন না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অপ্রচুর ভাবে দেখ-তত্ত্ব শুনিয়েছেন। গান্ধীজী পর্যন্ত 'আত্মকথা' আত্ম-দেহকে বাদ দিতে পারলেন না। কিন্তু একদা শুধু আমাদের 'কল্লোল'-যুগকে দেহাশ্রয়ী আখ্যা দেওয়া হয়। আবার সেই ধারা তুলেছেন আজকালের সমালোচক, আজকের সাহিত্যের বিরুদ্ধে। দেহবাদের পক্ষে যুক্তি দেখানো নিরর্থক আমার জানি। সমালোচক 'ব্রাহ্ম লিট' পেশ করেছেন সাহিত্যের দরবারে, তালিকাভুক্ত লেখকরা নিশ্চয়ই আইনজ্ঞ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে তাঁদের পক্ষে 'কাউন্সেল' নিযুক্ত করবেন। মামলার ফলাফল নির্ভর কবে 'নির্দোষ মুক্তা'র রচয়িতা আমাদের সকল লিটারেরী কমিটির চূড়ামা বিচারক রাজশেখর বসুর স্বদক্ষ বিচার-বিবেচনায়। আদালতে বিচারকরা নিরপেক্ষ বিচার করেন, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে কোন লাভ হয় না তাঁদের কাছে—দেহবানী সাহিত্যিকরা রাজশেখরের পুস্তক-প্রকাশকদের ধরাধরি করলে কিছু না হোক দীর্ঘ লিখিত সাক্ষ্যিকট লাভ করবেন অতি অল্প।

সমালোচকটির ব্যাখ্যা বা বেদনার কেন্দ্রস্থল যে-কোন পাঠকের কাছেই ধরা পড়ে। ব্রাহ্ম লিটের লেখকদের বই বাজারে বেশ ভালই বিক্রী হচ্ছে—অত্যন্ত ফোড়ের সঙ্গে স্পষ্টভাবে স্বীকার করে ফেলেছেন সমালোচক এক বাঙালী দেশের পাঠক-পাঠিকা, সম্প্রদায়কে একান্ত দোষী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু সমালোচক হয়তো জানেন না, আজকালের পাঠক-পাঠিকা পূর্বপেক্ষা অনেক বেশী সজাগ ও

থকদের বইয়ের চাহিদা শুধু বাঙলা দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই বৈকি। দেহবাদের ধূয়া তুলে কি কোন লেখার চাহিদা কমানো যে আর এযুগে? সমালোচক স্বীকার করবেন না, কিন্তু বর্তমান সের লেখক এবং পাঠক-পাঠিকা বিশ্বাস করেন, দেহকে বান দিয়ে তাকার সাহিত্য কেউ কখনও সৃষ্টি করতে পারে না। শুধু যাক-পরিচ্ছদ আর উজ্জ্বলের দিন বহুদিন আগেই শেষ হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন এই, সমালোচকের কিছু বই বাজারে কি প্রকাশিত হচ্ছে? সেই বই কি যথেষ্ট বিক্রীত হচ্ছে না এবং পোকার কাটছে? হি যদি হয়, তবে তিনি দেহবাদের রাস্তায় চলতে পারেন। ওনার বিভ্রান্ত পাঠক-পাঠিকা তবেই গরম কেকের মত তাঁর রচনা গলতে অচিরং বসে যাবে।

বাই হোক, সমালোচকের যাতে বিন্দুমাত্র জ্ঞানগমি হয় শুধু মাত্র মই কাপণেই এ-পুলে ডি, এইচ, লরেন্সের লেখার খানিকটা উপস্থিতি করছি। লরেন্স দেহতত্ত্ব সম্পর্কে বলেন :—

“Science has a mysterious hatred of beauty, because it doesn't fit in the cause-and-effect

chain. And society has a mysterious hatred of sex, because it perpetually interferes with the nice money-making scheme of social man. So the hatreds made a combine, and sex and beauty are mere propagation appetite.

Now sex and beauty are one thing, like flame and fire. If you hate sex you hate beauty. If you love *living* beauty, you have a reverence for sex. Of course you can love old, dead beauty and hate sex. But to love living beauty you must have a reverence for sex.

Sex and beauty are inseparable, like life and consciousness. And the intelligence which goes with sex and beauty, and arises out of sex and beauty, is intuition. The great disaster of our civilization is the morbid hatred of sex.”

## উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

### রূপহলুদ

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্গত: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম চিরদিন লেখা থাকবে সোনার অক্ষরে। সম্পূর্ণ নিজস্বতা নিয়ে তিনি দেখা দিয়েছিলেন সাহিত্যাকাশে, সমগ্র আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর লেখনীর রশ্মি। ভাবের ব্যঞ্জন্য, চিন্তাধারার অপূর্ণ প্রকাশভঙ্গিয়ার বিভূতিভূষণের জোড়া পাওয়া দুষ্কর। ‘পথের পাঁচালী’-স্রষ্টার বর্তমান গ্রন্থ রূপহলুদ কয়েকটি ছোট গল্পের সংকলন! গল্প-সাহিত্য আজ যে মহামূল্য বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত তার বহুলাংশ সরবরাহ করে গেছেন বিভূতিভূষণ। এক সরল অনাড়ম্বর ঘটনার দর্পণে অতীত অবলুপ্ত ইতিহাসের সারিবদ্ধ ভাবে প্রতিবিম্ব-সৃষ্টির যাচতে বিভূতিভূষণের দক্ষতা অনস্বীকার্য। বিরজা হোম ও তার বাধা, বুড়ো হাজরা কথা কয়, কালী কবিরাজের গল্প, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে আমাদের ডাক্তারি, বর্ষলের বিড়ম্বনা প্রভৃতি গল্পগুলি গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্ধন করেছে। একটি মুখবন্ধ রচনা করেছেন বিভূতি-জায়া বন্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান র‍্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., ১৩ গান্ধী রোড (হারিসন রোড) থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দাম—৫ টাকা মাত্র।

### শ্রেয়সী

স্ববোধ ঘোষ বাঙলার সাহিত্যাকাশে এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। বাঙলা সাহিত্যকে নানা দিক দিয়ে তিনি করেছেন পুষ্ট। জীবনের ক নতুন আদর্শ তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেছেন তির্যক সজ্জ। ‘শ্রেয়সী’ তাঁর একটি উপন্যাস। এক প্রাচীন

অভিজাত পরিবারকে কেন্দ্র করে এ কাহিনী। কমল বিশ্বাস অবাধ আভিজাত্যে তার বখারীতি পথেই চলতে থাকে। তৎপুত্র অতীনের যুগে হয় পথ-পরিবর্তন, তাদের আভিজাত্য, কংশগর্ভ এক নতুনতর রূপ নিল। মোড় ঘুরল গরিমায়। সেই পথে চলতে থাকল। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে স্ববোধ ঘোষ সমগ্র কাহিনীটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। অতীন চরিত্রটি আরও সম্যক প্রকৃষ্টনে সাহায্য পেয়েছে কেতকী ও কাজরী চরিত্রের মাধ্যমে। এই দুটি নারীর পৃথক জীবনযাত্রার মধ্যেই বিকশিত হয় অতীনের চরিত্র। শ্রেয়সী পাঠক-পাঠিকার কাছে শ্রেয়: হোক, এই কামনাই করি। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীমলয়েন্দ্রকুমার সেন। দাম পাঁচ টাকা।

### দ্বীপপুঞ্জ

কথামিত্রী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের খ্যাতি ছোট গল্পের মহলে অধিক মাত্রায় পরিব্যাপ্ত হলেও উপন্যাসের আসরেও তাঁর আসন অটল। দ্বীপপুঞ্জ উপন্যাসটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। হরিবংশ নামে এ আগে প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমানে এর অঙ্গসজ্জা বর্তমানোপযোগী করে তুলে ধরেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। চরিত্রচিত্রণে এঁর লেখনী প্রতিভার পরিচয়ই দিয়েছে। মানব-মনের অন্তর্স্থ ভাব-বিনিময় ফুটে উঠেছে এঁর লেখায়। মুরলী, নবরীপ, মনোরমা, মঙ্গলা প্রভৃতি চরিত্রগুলি প্রকৃত ভাবে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। ত্রিবেণী প্রকাশন, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীকানাইলাল সরকার। দাম সাড়ে চার টাকা।

## পসারিণী

তরুণদের সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয় সমবেশ বঙ্গর নাম একটি নিপুণ লেখনী নিয়ে আবির্ভাব হয়েছিল সমবেশ বঙ্গর পসারিণী। কতকগুলি ছোট গল্পের সংকলন। গল্পগুলির মধ্যে সমবেশের দরদ ও অমৃত্যুর চিহ্ন বিজ্ঞান। একটি আন্তরিকতার স্বর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে। গল্পগুলি পাঠকমহলে সমাদর লাভ করুক। এম, সি, সরকার য্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীমদ্রায় সরকার। দাম আড়াই টাকা।

## রোমান হলিডে ও অস্বাভাবিক গল্প

বিদেশী চলচ্চিত্র-কাহিনীগুলি বর্তমানে এক নতুন ধারার দিকে এগিয়ে চলেছে। এখন চিত্রনির্মাতারা গল্প-প্রধান কাহিনীগুলির দিকেই অধিকমাত্রায় মনোনিবেশ করেছেন। কয়েকটি খ্যাতিলাভ বিদেশী ছবির কাহিনী বাঙলায় অনুবাদ করেছেন ভাবানী মুখোপাধ্যায়। এই রচনাগুলি ইতিপূর্বে প্রথমে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। অনুবাদক হিসেবে ভাবানী মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। অনুবাদের মাধ্যমে নানা দেশের সাহিত্যের সঙ্গে দেশবাসীকে পরিচিত করার প্রচেষ্টার জন্য তিনি ধন্যবাদার্থী। এই গ্রন্থে রোমান হলিডে, জেম হিয়ার টু ইটারনিটি, স্কারামুস, নাইটস অফ দি রাউণ্ড টেবল, সারিত্রা, বেয়ারফুট কনটেন্স, পিকনিক প্রভৃতি ছায়াচিত্রের কাহিনীগুলি পরিবেশিত হয়েছে। সাহিত্য্যমোদী এবং চিত্র্যমোদী এই উভয় শ্রেণীর প্রতিিনিধিরা এই গ্রন্থপাঠে পরিতৃপ্ত হবেন। এস, রায় য্যাণ্ড কোং, ১৭৬ বিবেকানন্দ রোড থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীকমলরঞ্জন রায়। দাম আড়াই টাকা।

## লিলির প্রেম

অনুবাদ-সাহিত্যে বীদের দখল পাঠক-সমাজে স্বীকৃত, তাঁদের মধ্যে শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাটভূঁর নাম উল্লেখযোগ্য। বহু প্রখ্যাত বিদেশী লেখকদের রচনা বাঙলায় অনুবাদ করে এঁরা যথেষ্ট প্রসিদ্ধি

অর্জন করেছেন। পূর্বে প্রশিয়ার লেখক হেরমান ব্রডারমানের 'সত্য অফ সডন' উপন্যাসটির যে অনুবাদ এঁরা করেছেন লিলির প্রেম নামে সেই অনুবাদ-উপন্যাস জনসমাদর লাভে সমর্থ হবে আশা করা যায়। লিলি চরিত্রটি এঁরা নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই চরিত্রটি বড় দরদ দিয়ে ফোটানো হয়েছে। ক্যালকার্টা পাবলিশার্স, ১০ জামাচরণ দে স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীমদ্রায় সরকার সেন। দাম চার টাকা।

## ধৃতরাষ্ট্র

বড় অভিনীত এই নাটকটির খ্যাতি এখন কারোরাই অবিনশ্ত নেই। সমাজে যে দুর্নীতির বিদ্যাব্যপ চূকছে এবং তার ফলে সমগ্র সমাজ আজ বিশিয়ে উঠছে এবং সেই দুর্নীতি স্রনীতির মুখোমুখি নিজেকে আবৃত রেখে চালিয়ে যাচ্ছে তার ধ্বংসলালা, এই পটভূমিকার নাটকটি রচিত। নাটকটির কৃতিত্ব ভরপুর। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি স্বচ্ছ ও প্রশংসনীয়। এই নাটক আজকের দিনে এক বিশেষ আসনে বহন করে। লেখক—ধনঞ্জয় বৈরাগী। আর্ট য্যাণ্ড লেটার্স, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২ থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীধরজিৎ সেন। দাম—মূল্য সম্বরণ দু'টাকা ও শোভন সম্বরণ আড়াই টাকা।

## অনুশীলা

রমাপতি বঙ্গর সাহিত্যিক খ্যাতি আজকের নয়। প্রায় দু'শ বছর ধরে বাঙলা সাহিত্যকে তিনি নানা ভাবে পুষ্ট করে আসছেন। তাঁর বর্তমান গ্রন্থ অনুশীলা। একটি নাচের ছাত্রী অনুশীলা। তার জীবনে পর পর এসে স্বর্গ, নবীনমাধব ও ইন্দ্রনাল—এই তিন জনের মধ্য দিয়ে অনুশীলার চরিত্রিক বিকাশ ও তার জীবনের গতিপথের ধারা প্রকাশ পায়। লেখকের মনোমগ্ন রচনাভঙ্গী ভাল লাগল। ঘটনাগুলি সুরপায়িত এবং তিনটি পুরুষের তিনটি পৃথক রকমের চরিত্র গঠনেও লেখক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।—এস, বানার্জী য্যাণ্ড কোং, ৬ রমানাথ মঙ্গুমার স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীমদ্রায় সরকার বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

## শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্রিমুদ্রার দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব কাহে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক ভূমিস্বয়ং বোঝা বহনের সামিল হয়ে পড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চল না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বাহিকিতে, নয়তো কারও কোন কৃতকার্যতার আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী'। এই উপহারের জন্য সন্তুষ্ট আবেগের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রস্তুত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা ভেদে বৃত্তী করেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের প্রাইস-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যেকোন জ্ঞাতব্যের জন্য লিখুন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।



# মৌলিকতায়, নিষ্ঠুরতায় ও আত্মনিষ্ঠতায়

★★



১৬৭ সি ১৬৭ সি/১ বহুবাডার স্ট্রীট, কলিকাতা-২২

ফোন ৩৪-১৭৬১ • গ্রাম - প্রিলিমান্টা

ব্রাঞ্চ : বালিগঞ্জ - ২০০/২/সি - রাসবিহারী এডিনিউ

কলিকাতা-২২ • ফোন : ৪৬-৪৪৬৬

ফোন : ডাহামেদপুর - ৮৫৮

ব্রাঞ্চ - ডাহামেদপুর ★

আই.এ.এ. পুর্নোদিতিলনা ১২৪, ১২৪/১ বহুবাডার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ (বহুবাডার স্ট্রীট) (বহুবাডার স্ট্রীট)



## ঘেঁটুর গান ঐক্যদেব রায়

ঘেঁটুর গান দক্ষিণবঙ্গের অল্পতম বিশিষ্ট গোষ্ঠী-সংগীত। ঘটাকর্ণের অপভ্রংশ ঘেঁটু। গল্প আছে যে, ঘটাকর্ণ নামে একজন অমর ঐক্যের নাম শুনিবে না বলিয়া কানে ঘট্টা বাধিয়া রাখিত। ঘট্টাকর্ণকে ব্যঙ্গ করার ছলে যুগ যুগ ধরিয়া ঐক্য-ভক্ত বাঙ্গালী তাহাকে লইয়া গানের মাধ্যমে উল্লাসে মাত।

ফাল্গুন সংক্রান্তিতে ঘেঁটুর পূজা হয়। হাটের মাঝে 'কেলে হাড়ী' রাখিয়া সর্বজনসমক্ষে তাহা পদাঘাতে ভাঙাই ঘেঁটুপূজা অর্থাৎ ভগবদ্বিষেবী ঘটাকর্ণের দর্পচূর্ণ করাই এ পূজার মূল উদ্দেশ্য। তাহার পূর্বে সারা ফাল্গুন মাস ধরিয়া বালকদল সাজগোজ করিয়া প্রতি সন্ধ্যায় গৃহস্থদের ঘরে ঘরে গান গাহিয়া বেড়ায়। তাহাদের মধ্যে একজন সাজে ঘেঁটু, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অল্প সকলে নানা ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করে, সেও সাধ্যমত গান গাহিয়া সেগুলির জবাব দেয়।

কালের পরিবর্তন হইতেছে—সকালের মধ্যেও সমাজ-চেতনার ডেউ আঁসিয়াছে, ঘেঁটুগানের মারফতও দেশের সাম্প্রতিক ট্রাংকট্রের নানা ফিবিং মুক্ত হইয়াছে। রাজনৈতিক চেতনার দিনে, এ গান জাতীর আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া নবরূপে দেখা দিয়াছিল।

বালকদের মুখে জ্যাঠামি মনে হইলেও এসব গানে নানা উপদেশ, নানা ঘরোয়া নীতিকথা প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে। পল্লীবাসীদের বিশ্বাস—ঘেঁটুপূজা করিলে দাঁড়, খোস প্রভৃতি চর্মরোগ হয় না, তাই চর্মরোগী বালকরাই এ গানের পুরোজগে অংশ গ্রহণ করে—

আজ আনন্দে ঘেঁটু লয়ে সজে  
নাচিয়া নাচিয়া চল সবে ধাই।  
মনের আনন্দে দাঁও গো পূজা  
এমন দিন ত আর হবে নাই।  
খোস চুলকুনা ঘেঁটু দিছিল গায়  
সতী-নারীর বীর পতির পায়।  
বামে দাঁড়ারে সতীনারী  
পতি বিনা সতীর গতি নাই।

সংক্রান্তির দিনে ঘেঁটুরপূজার আয়োজনে ঘেঁটুর সধীকূলে কিশোরী-বেশী কিশোরদল চাঁল-চাঁল, বাগানের ফুল, দ্বীবাশ, লাজুর। ঘেঁটুর পূজা মানেই কিছু ঘেঁটুর

বিবাহ; তাহার জন্ত সীতাপুরের বাসনা নামিকা এক পাত্রীকে মনোনীত করা হয়, তাহার গায়ে-হলুদের আয়োজন হয়, জল সইবার ব্যবস্থা হয়—

ঘেঁটুর রাজার জন্তে কনে দেখতে যাই ক'জন।

সীতাপুরে আছে মেয়ে, নামটি বাসনা।

মেয়ের বয়সের নেই গাছ পাথর

আশীর কম হবে না।

হবে যেটি ঘেঁটুর কনে, কুলোয় শুয়ে দুধ খায় দু'বেলা।

জল-সইতে গিয়াও সবাই ঘেঁটুর রূপগুণ লইয়া নানাপ্রকার ঠাটা-বিক্রপ, হাসাহাসি করিতে লাগিল—

সাধের মালা হইল গাঁথা বরণভালাতে

ঘেঁটুর রূপ দেখে আজ বিরূপ হলাম আমরা সবতে।

আ মরি, কি রূপের গঠন, (দেখে) গাটা কবছে কেমন,

গলা সরু, মাজা মোটা, টাক ধরেছে মাথাতে।

কম হয়েছে চোখের জ্যোতি, জোল হয়েছে বুকের জাতি

পাঁতগুলো সব নড়তেছে আর চুল নেই চোখের ভুরুতে।

ক্রমে ক্রমে বাড়লার চিরপরিচিত জর্জর লাড়ই বৃদ্ধ হইল।

একল বালক ঠাটা করিয়া নানা প্রশ্ন করিলে ঘেঁটুও তাহার জবাবে গান গাহিয়া উত্তর দিতে লাগিল। হরিবিষেবী অন্তি ঘেঁটুকে তাহারা জলশুদ্ধ করিয়া লইতে বলিল—

জল শুদ্ধ করিয়া লও, হাত পা তোমার ধোও।

ঘেঁটু পবিত্র হইবার জন্ত হরিগুণ গান করিয়া বলিল—

ভাগ্যমানে কাটার পুকুর চণ্ডালে কাটে মাটি।

কুমারের কলসী, কীসারির ঘটি।

জল শুদ্ধ, স্থল শুদ্ধ, শুদ্ধ মহামায়া

হরিনাম করিলে পরে শুদ্ধ হয় আপন কায়।

(বল হরি হরি, হরি হরি বল রে)

ঘেঁটুগান বাড়লার সালতামামি গান। সারা বৎসরের নানা ঘটন-অঘটনের ফিরিঙ্গি-ফর্দ এ সকল গানে থাকে। সাধারণতঃ এ সকল গান পূর্ববঙ্গের মাগান গানের মতো বালকদলই সমবেত ভাবে গৃহস্থদের ঘরে ঘরে গাহিয়া ফিরে।

বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় সর্কুৎ এবং চক্ষিণ-পরগণা, হুগলী ও হাওড়া জেলার কোথাও কোথাও ঘেঁটুগানের বিশেষ চলন ছিল।

কোন এক সময়ে ঘরের মেয়েদের জলকষ্ট লাঘব করিবার জন্ত

পণ গৃহস্থ কূপ খনন করিয়া দিয়াছিল, অকালপক রসিক  
সেই ঘটনা অবলম্বনে গান বাধিয়া গাছিল—

বেঁটু তাই ভাবি মনে।

আর তো সহ্য জলের কষ্ট বার না গো কেনে।

গিন্নী বলেন, আর তো আমি জল খাব না পুকুরে।

কুলীতে তপ্ত বালি চলতে নারি দুপুরে।

কর্তা বলেন, লখুরে।

বেখানে সস্তা পাখি আনি গো ডেকে মজুরে।

পচা চাল ঘরে ছিল, সেগুলোর গতি হ'ল।

মিষ্টি জল উঠল তবু এঁটেল মাটির গহনে;

বেঁটু গো ভাবি তাই মনে।

নিউর মধ্যে যে শ্বেষাঙ্ক পরিহাস রস আছে তাহা উপভোগ্য।  
কি, রামায়ণের দেবচরিত্রগুলিও বালকদের কৌতুক হইতে বাদ  
নাই। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণও নিশ্চয় বালাকালে একবার খোস-  
ায় ভুগিয়াছিলেন, শেষ পর্যন্ত বেঁটুপূজা করিয়া তাঁহারা  
। রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাহারা রাম-  
র পুতুল সাজাইয়া পাকীতে চড়াইয়া গান গাহিতে বাহির

সে বছরে খোস হয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের গায়।

হায় হায় হায়!

সে বছরে খোস হয়েছে লক্ষ্মণের গায়।

কৌশল্যা স্ত্রীরা রাণী এরা, কেঁদে কেঁদে পাগলিনী  
দশরথ নৃপমণি ভূমিতে সোটায়ে।

হায় হায় হায়!

শেষে—

মন্ত্রী বলে—“শোন রাজা কর তুমি বেঁটুর পূজা।

আপদ বাল্যই দূরে যাবে সমস্তরূপা মম মন্ত্রণায়।”

কোন কোন বেঁটুগানে বেশ কবিত্বও আছে। অবগু এ কবিত্বও  
মূল্য ধরণের। এই শ্রেণীর গানই অকালপক বালকদের নিকট  
হতে সভ্যকবিত্বের ভাব্য আসরে টাই পাইয়াছে। ঐরূপ একটি  
টুগানের নিদর্শন—

কি হেরিলেম অপকূপ হাইতে জলে।

ভুবনমোহন কালোরাশ কাঁড়িয়েছে ঐ কদমতলে।

গলে মণিমুক্তা দোলে পদচিহ্ন বন্ধস্থলে

বহুনার ছই কূলে আলো কইরে,

মোহনচূড়া হেলেছে বামে রে, মন মোহিয়ে।

কাঁড়িয়েছে ঐ কদমতলে।

বেঁটুগান রাখাল বালকদেরই গান—কানুন মাসে বেঁটুর পূজা, কিন্তু  
খোস-পাঁচড়া-মাসের দেবতা বেঁটুর বিজয়াভিষান চলে সারা বৎসর  
ধরিয়; তাই গোষ্ঠের প্রান্তরে আর পুকুরের ঘাটে বেঁটুর জয়গানেরও  
বিরাম নাই—

ঐ ডাবর বাজা, ঐ কঁাসর বাজা।

এলো এলো দ্বারে বেঁটু রাজা।

ধামা বাজা তোরা কুলো বাজা।

এলো এলো দ্বারে বেঁটুরাজা।

এই-ই ঘটাকর্ণ, তগো এই-ই ঘটাকর্ণ

বেন ছেঁড়া ছাত্তা বর্ষ।

কাণের ঘটা তোরা বাজা বাজা।

কানে ঘটা বাধা আমাদের এই

বাটা বেঁটুরাজা।

কৃষাণী বালিকাদের কাছে বেঁটুর গান আর একটি ভিন্ন রূপ ধারণ  
করিয়াছে। ফাল্গুন সক্রান্তির দিন কৃষাণী গৃহস্থ ঘরের বালিকারা  
দল বাধিয়া চাপান ও উত্তোরের মধ্য দিয়া বেঁটুর গান গাহিয়া থাকে।

একদল গান গাহিয়া অমুরোধ জানাইল—

বেশ তো ভাই, বল না সই, সমিত্তা এই

তোমার কেমন ভাই।

দিদিশাত্তা ভাঙবে তোমার হোক না সমিত্তা যেমন।

অপর দল চাপান দিল—

বলি লো, বাঁশ গাছেতে ফলাছে কাঁঠাল

ও তার বড় বড় কোয়া।

বেঁটুর দল জবাব দিল—

হ্যা, ভাই বর—এই ফাল্গুন মাসে,

কাঁঠাল ফলে বুঝি বাশের পাছে?

অপর দল আবার প্রশ্ন করিল—

বাঁশ গাছেতে ফলাছে কাঁঠাল ও তার বড় বড় কোয়া।

মুড়ির সনে খেতে গেলেই ভাল, নয় সব ভোরা।

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়াকিনের



কথা, এটা

খুবই আন্তা-

বিক, কেননা

সবাই জানেন

ডোয়াকিনের

১৮৭৫ সাল

থেকে দার্ঘ-

দিনের অভি-

জতার কলে

তাদের প্রতিটি বস্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন বছরে প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-ভালিকার  
অঙ্ক লিখুন।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এসম্প্রায়েভ ইস্ট, কলিকাতা - ১

কাঁচায় না খায়, খোলে ঝালে, পাকায় না খায় খুলে,  
স্বর্ণহারে পৌছে বায় ও সে খেলে পায়ে দলে ।

সবাই এক সঙ্গে—

ও দিদি খেলে পায়ে দলে ।

বঁটুর দল এবার নিজেবাই সমস্তার সমাধান করিল

—ওগো দিদি, ও দিদির সই—

এর ভাঙানিটা হচ্ছে মই ;

বোঝো গো শুয়ে খেয়ো দই—

না বোঝো তো কয়র হৈ-টে ।

## পূজার নতুন নতুন রেকর্ড

হিঙ্ক ম্যাটার্স ভয়েস

N 82753 (আধুনিক)—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, “আমার এ গানে” ও “তোমার প্রথম গান প্রথম তারার মতো ।” N 82754 (আধুনিক)—শ্রীমতী উৎপলা সেন, “তোমার ভুবন হ’তে আমার এ নাম” ও “দোলা দিয়ে যায় কে দোলা দিয়ে যায়” । N 82755 (ধর্মমূলক)—শ্রীমতী কবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, “রইল কথা তোমারি নাথ” ও “ওগো নিহঁর দরদী ! এ কি খেলছো অমুখন ।” N 82756 (আধুনিক)—মাল্লা দে, “এই ক্ষণটুকু কেন এতো ভাল লাগে” ও “আমি আজ আকাশের মতো একেলা ।” N 82757 (আধুনিক)—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “ঘুম-চুল চুল চাউনি চোখে” ও “ওগো আমার কোকিল-কালো মেয়ে ।” N 82758 (আধুনিক)—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, “যে প্রেমের দেখা মেলে” ও “আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি ।” N 82759 (পল্লীগীতি)—সনৎ সিং, “রথের মেলা রথের মেলা বসেছে” ও “এ যোর যোর লেগেছে যোর” । N 82760 (আধুনিক)—শ্যামল মিত্র, “এই পথে যায় চলে” ও “সেদিনের সোনার সন্ধ্যা ।” N 82761 (আধুনিক)—আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, “তারাদের চুম্বকি জলে আকাশে” ও “আমি আল্পনা একে বাই” । N 82762 (আধুনিক)—শ্রীমতী সুরীতি ঘোষ, “গানে গানে আমি যে খুঁজি তোমায়” ও “এই ফুলের দেশে কোন ভ্রমর এসে ।” N 82763 (কৌতুক নক্সা)—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী তপতী ঘোষ (ফিল্ম), “স্বামী চাই”—দুই খণ্ড । N 82764 (আধুনিক)—শ্রীমতী গীতা দত্ত (বায়), “ঝিরি ঝিরি চৈতালী বাতাসে” ও “কক্ষচূড়া আগুন তুমি ।”

### কলহিয়া

GE 24860 (আধুনিক)—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, “ও বন্ধু, এই বকুলঝরা শ্রাবণ রাতে” ও “জীবনের নদীতটে টেউ ভেঙে পড়ে ।” GE 24861 (আধুনিক ও পল্লীগীতি)—শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকর, “মনে রেখো, মনে রেখো” ও “রঙিলা বাঁধিতে কে ডাকে ।” GE 24862 (আধুনিক)—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও জুপেন হাজারিকা, “জাঁকা বাঁকা এ পথের হ’ পাশেই” ও “গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ মেঘ এ গরজার ।” GE 24863 (আধুনিক)—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, “প্রজাপতি মন আমার” ও “আজ কেন ও চোখে লাজ কেন ।” GE 24864 (ধর্মমূলক)—পাদ্যলাল ভট্টাচার্য, “সেই

কারো নয় গো মা” ও (শ্যামা-সঙ্গীত) “শ্যামা মা কি আমার কালো ।” GE 24865 (আধুনিক)—বিজেন মুখোপাধ্যায়, “ওগো কক্ষচূড়া, বলো আবার” ও “এ নহে বা ঢেরছি যুগ যুগ ধরে ।” GE 24866 (আধুনিক)—কুমারী গায়ত্রী বসু, “মেঘ মেঘ মেঘ কত মেঘ করেছে আজ” ও “দূর বনপথে আলোতে ছায়াতে ।” GE 24867 (আধুনিক)—শৈলেন মুখোপাধ্যায়, “তোমার দেখেছি কত রূপে কত বার” ও “এ মন আমার যেন ভ্রমরের সুর হয়ে ।” GE 24868 (আধুনিক)—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, “ফুল গো, তোমারে ছুঁয়ে বরাবো না ধুলিতে” ও “কুসুম যেমন করে ।” GE 24869 (আধুনিক)—শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, “দোলে দোলে এ দূর বিহঙ্গের পাখনা” ও “সোনার তরী নয় গো আমার ।” GE 24870 (ধর্মমূলক)—কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, “প্রভাতে উঠি মাতা যশোমতী” ও (কীর্তন) “বল না রে সখি, কহ না রে ।”

### চিত্র-গীতি

বসন্ত বাহার—বিকাশ রায় প্রোডাকশনস (প্রাইভেট) লিমিটেড, সঙ্গীত পরিচালনা :—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ । N 76057—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অজান্ত, “আঁধারে আমি তোমায়” ও “গগনে গগনে মত্ত ।” N 76058—বিসমিল্লা ও সম্প্রদায় (শানাই), সুর :—বসন্ত বাহার, সুর :—ধন । GE 30369—প্রমুদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, “ললিতা গো বলে দে” ও “বাঁধো ফুলনা” । GE 30370—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রমুদ বন্দ্যোপাধ্যায়, “বাঁধো ফুলনা” ও “বারে বারে ছুটে বাই ।” GE 30371—এ, টি, কানন মানিক বর্মা ও এ, টি, কানন, “নবীকে দরবার” ও “নবলি কালী ।” GE 25837—অমর সিং বস্তাল (ক্যারিওনেট), সুর :—“আহা বদলা জমানা” (‘মিস ইণ্ডিয়া’) সুর :—চুপ হো বা (‘বন্দী’) ।

## আমার কথা (৩২)

### শ্রীশ্রাম গঙ্গোপাধ্যায়

সাধনারই পরিপূর্ণতার রূপ সিদ্ধি । অকৃত্রিম উজ্জম সঙ্গে করে নিয়ে আসে বিজয়ের আশ্বাদ । জরুলক্ষীর বরমালা তাঁদেরই জন্তে নির্ধারিত থাকে ধীর অনমনীয় আঙ্গুরিকার সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকেন সাধনার পথে । খ্যাতিমান স্বরোদবাদের শ্রীশ্রাম গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে সফলতা এসেছে ফেলে-আসা শ্রমশণ্ডিত দিনগুলির কল্যাণে ।

কলকাতার বড়বাজারের গঙ্গোপাধ্যায়-পরিবারের কথা বাড়লা দেশে কারোর অজানা নয় । এই পরিবার জন্ম দিয়েছে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী স্বর্গীয় যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে তৎপুত্র প্রথম ভারতীয় বৈমানিক শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে এবং বিখ্যাত কলারসিক স্যাটিনী শ্রী ও, সি, (অর্ধশ্রেয়সী) গঙ্গোপাধ্যায়কে । এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হেয়ার স্কুলের প্রধানশিক্ষক স্বর্গীয় স্বরধনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অন্তঃস্থ বাঙালার অন্ততম প্রাচীন তবলাবাদক স্বর্গীয় মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত তবলাবাদক শ্রীহরেন্দ্রকুমার (হীক) গঙ্গোপাধ্যায় । এর ছয় পুত্রের মধ্যে বিশিষ্ট তবলাবাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার (নাটু) গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশ্রাম

গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। কলকাতায় ১৯১১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর আজকের দিনের প্রসিদ্ধ স্বরোদবাসক শ্রীশ্রামকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ। বাবা সেতার বাজাতেন চমৎকার। পাঁচ বছর বয়সে সেতারে বাবার কাছে নিলেন দীক্ষা। এদিকে ভর্তি হলেন নর্থ সাবার্ণিগ স্কুলে—স্কুলের পড়ায় মন বসে না, সঙ্গীত দূর থেকে দেয় হাতছানি। প্রাণের পরতে পরতে স্বাক্ষর দেয় স্বরের মূর্ছনা। স্কুল থেকে পালাতে শুরু করলেন। তবে এ তথাকথিত স্কুলপালানো নয়। স্কুল পালিয়ে সিনেমার লাইন দেওয়াও নয়, স্কুল পালিয়ে বাড়ী এসে বেওয়াজ করা। স্কুলপালানো অধিকমাত্রায় যখন বেড়ে ওঠে সেই সময় নিজের চোখে-চোখে রাখবার উদ্দেশ্যে বাবা ভর্তি করে নিলেন হেয়ারে। সেখানে বাবার চোখে ধুলো দিতেও কন্যুর করলেন না। এই ভাবে ১৯২৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন আই-এ পড়ার পর কলেজী পড়ার ইতি ও সঙ্গীতের মধ্যে পুরোপুরি আত্মনিমগ্ন।

বাবার কাছে প্রথম পাঠ নেওয়ার পর শিষ্য গ্রহণ করলেন ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর (১৯১৮)। ১৯২৪ সালে কেরামতুল্লা সোকাঙ্করের দিন পর্যন্ত তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন শ্রামকুমার। ইনি থাকতেন মেছুয়াবাজারের একটি বাড়ীতে। শ্রামবাজার থেকে প্রতি সন্ধ্যায় বস্ত্র নিয়ে সমস্ত জলবুড় উপেক্ষা করে পরব্রজে যাতায়াত করতে হত বালক শ্রামকুমারকে। রাাত্রি দশটা অবধি ওস্তাদ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করে খেতে যেতেন, একবার ভেবেও দেখতেন না শিক্ষার্থী বালকটির কথা, তার পর রাত আড়াইটে অবধি শোখাতেন, একটু ভুল হলেই অমাব্যবিক প্রহার। এই সময় শ্রামকুমার প্রভূত সাহায্য এবং উৎসাহ পেয়েছিলেন তাঁর মধ্যম অগ্রজ শ্রীঅমল্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। ভাতার উন্নতির জন্তে ইনি স্বৈচ্ছায় নিজের প্রভূত স্বার্থ হানিমুখে বিসর্জন দিয়েছেন। এক প্রত্যহ ওস্তাদের বাড়ী তাঁকে নিয়ে যেতেন ও সমানে সেই রাত আড়াইটে অবধি বসে থেকে এঁকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে আসতেন। একরূপ স্নেহ এবং তাগত্বীকার সত্যই হল! কেরামতুল্লার মৃত্যুর পর তাঁরই শিষ্য স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ বহুকে গুরুপদে বরণ করে নিলেন শ্রামকুমার। মন তখন আকৃষ্ট হয়েছে স্বরোদের দিকে, সেতারে মন বসে না। অথচ গুরু তাতে রাজী হন না। একদিন ঘটনাচক্রে পরলোকগত নলিনীনাথ শেঠের বাড়ীতে এঁর হাতের ব্যাঙ্গো শুনে ধীরেন্দ্রনাথ সম্মত হলেন স্বরোদের পাঠ দিতে। ধীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর



শ্রাম গঙ্গোপাধ্যায়

পর শ্রামকুমার গুরু-প্রণাম জানালেন লোকবরণ্যে স্বরসাধক আলাউদ্দী খাঁকে। এর সঙ্গে পরিচিত হতে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন এঁর জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র হীরা বাবু এবং সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ সঙ্গীত-সম্মেলনে শ্রামকুমারের সাধারণ্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ। ১৯৩৭ সালের ৫ই এপ্রিল আকাশবাণীর তৎকালীন একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা শ্রী পি. সি. চৌধুরীর অমুরোধে বিনা পরীক্ষায় বেতারে স্বরোদ বাজান। আজ অবধি কোন ছাত্রাছাত্রী-সঙ্গীতে ইনি অংশ গ্রহণ করেননি এবং ভবিষ্যতে ও জগতে কোনদিন যে যাবেন না, এ বিষয়েও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কর্তার পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে ধীর সাধনার স্তূতপাত, আজ তাঁর জীবন ভরে গেছে সার্থকতার সুবসায়। সেই অমূল্যকরণ্য সাধনা অল্পপ্রাণিত করুক তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের, এই কামনাই করি।

... এ সঙ্গের প্রহরদণ্ড ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে দুর্গামূর্তি গঠনের একটি চিত্র মুদ্রিত হয়েছে। এই মূর্তি ভাস্কর শ্রীরমেশ পাল কর্তৃক নির্মিত হয়।





[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

বাড়িতে টি লিং একা। সে মিষ্টি হেসে দিলীপকে ভেতরে নিয়ে বসালো। জিজ্ঞেস করলো, “তোমার কি দিতে পারি? হইকি সোডা না বীয়ার?”

“হইকি, বস্তাবাদ!” দিলীপ বললো।

বেয়ারা এলো ট্রে-তে করে হইকি আর সোডার বোতল নিয়ে। হইকির বোতলের মুখে সাইফন আঁটা। বেয়ারা একটি ছোটো টেবিলে গেলাস রেখে এক পেগ হইকি ঢেলে তাতে সোডা মিশিয়ে দিলো। একটি ছোটো গেলাসে করে একটুখানি ওয়াইন নিলো টি-লিং।

অত্যন্ত জমকালো ভাবে সাজানো তাদের বসবার ঘর। দেয়ালে একটি চীনে পেন্ডুল আর চিয়ান কাই শেকের একটি ছবি ছাড়া চৈনিকদের কোনো ছাপ নেই। আসবাব পত্র একেবারে পাশ্চাত্য।

টি লিং-ও পরে আছে একটি স্মার্ট। ওয়াইনের গেলাস তুলে সে বললো, “তু আওয়ার নিউলি মেড ফ্রেণ্ডশিপ।”

দিলীপও একটু হেসে তার গেলাসটা তুললো।

তার পর কিছুক্ষণ আবহাওয়া আলোচনা। বড্ড গরম এখন। এ সময়টা দার্জিলিং শিলই ভালো। বৃষ্টি নামলে ভালো হয়। তবে বেশী বৃষ্টি হওয়াটা বাধনীয় নয়। রাস্তায় জল জমে—ইত্যাদি।

আবহাওয়ার আলোচনা শেষ হতে দিলীপ ঘড়িতে দেখলো আট ঘণ্টা কেটে গেছে।

“চে শিয়াং কখন ফিরবে,” সে জিজ্ঞেস করলো।

“বলে তো গেছে শীংগিরই ফিরবে,” বললো টি লিং, “তোমার নিশ্চয়ই খুব তাড়া নেই?”

“কিছু না। তবে চে শিয়াং থাকলে আরো জমতো, ওকে আমার বেশ লাগে।”

“ওখু আমি থাকতে একটুও জমছে না বলতে চাও?” বলে একটু হাসলো টি লিং।

“না, না, তা নয়” বলে দিলীপ একটু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করলো, “মহিলার সাহায্যে আমি একলা থাকলে নিজেকে একটু বোকা-বোকা অনুভব করি।”

টি লিং স্থির দৃষ্টিতে একটুখানি তাকালো দিলীপের দিকে। তার পর বললো, “এটা নিশ্চয়ই জানো যে চে শিয়াং তোমার বোকা বানাবার জন্তেই আমার কাছে একলা ফেসে গেছে।”

দিলীপ অবাক হলো। “মানে?” জিজ্ঞেস করলো সে। টি লিং চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। আবেগান্বিত অনুভব করলো দিলীপ। বললো, “আচ্ছা, মেট্রোর নতুন ছবিটা দেখেছো?”

টি লিং হেসে ফেললো। বললো, “থাক, আর প্রসঙ্গ পাটোতে হবে না। তোমার বলতে আপত্তি। তোমার সেদিন দেখেই আমি চিনে নিয়েছি, তুমি বেশ সালাসিধে। আচ্ছা, একটা কথা আমার বলবে? তুমি জেনীকে ভালোবাসো?”

“এ কথা জিজ্ঞেস করছোই বা কেন? আর আমিও বা উত্তর দেখো কেন?” দিলীপ বললো।

“দেখ উত্তর না দিলেও যে আমি কিছু জানবো না তা’তো নয়। সেদিন তোমাকে আর জেনীকে দেখে বুঝে নিয়েছি, আর তোমাদের সন্ধক্ষে দু’-চারটে কথা কানোও এসেছে। আমার তাতে কিছু আসে যায় না, তবে আমার যদি বন্ধুর মতো নাও আমি তোমার কিছু উপকার করতে পারি, আব কিছু উপকার আমিও আশা করি তোমার কাছ থেকে।”

“কি রকম?”

“আমি আর চিয়েন চাং দু’জনে দু’জনকে খুব ভালোবাসি, সে কথা নিশ্চয়ই জানো না।”

“চিয়েন চাং যে তোমার জন্তে পাগল, সে কথা জেনী আমার বলেছে,” দিলীপ উত্তর দিলো, “তবে তুমি যে চিয়েন চাংকে ভালোবাসো সেটা জানতাম না।”

“চিয়েন চাং-এর জন্তে আমি আরো অনেক বেশী পাগল,” টি লিং মুহু গলায় বললো।

“চিয়েন চাং-এর জন্তে!”

সে কথার উত্তর দিলো না টি লিং, আস্তে আস্তে বললো, “আমি চীনের মেয়ে। সুতরাং ভালোবাসতে পারি আর বিয়ে করতে পারি আমার দেশের ছেলেকেই। আমি কত দিন ধরে আশা করে ছিলাম এমন একটি ছেলের যে একেবারে দেশের মাটির মানুষ, আমার ভায়ের মতো বিদেশী ফুল নয়। হয়তো তেমন ছেলের খোঁজ পেতাম দেশে, কিন্তু সেখানে বাওরার উপায় নেই। আমার ভাই আমার সেখানে বাওরার পথ বন্ধ করে রেখেছে। এ দেশে এসে হঠাৎ পেয়ে গেলাম চিয়েন চাংকে।”

“কিন্তু চিয়েন চ্যাং কি তোমাদের দেশের মাটির মানুষ?”

“ওর বাইরের চলন-বলন দেখে ওকে তুমি ভুল বুঝো না। ও একেবারে ঝাঁটি দেশের ছেলে। ওর যেটুকু বিদেশীয়ানা সেটা আসলে তার বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পালানোর যে কামনা তার একটি প্রকাশ মাত্র। এই পরিবেশ তার ভালো লাগছে না। সে চীনে কিরে যাবে না। সে আমেরিকা সব্বন্ধে নানা রকম গল্প শুনেছে, সেটা সোনার দেশ, সেটা স্বর্গের দেশ, ইত্যাদি। সুতরাং স্থির করেছে সে সেখানেই যাবে। তাই তার এই সাহেবিয়ানা।”

“চানে চলে গেলেই পারে,” দিলীপ বললো।

“সেটা সম্ভব নয়।”

“কেন?”

টিং লিং এ প্রশ্নের উত্তর দিলো না। “কাউকে বোলো না, তোমায় বিশ্বাস করে বলছি,” সে বলে গেল, “আমি খুব চেষ্টা করছি যদি দেশে ফিরে যাওয়া যায়। আর যদি তার ব্যবস্থা করে উঠতে পারি চিয়েন চ্যাংকেও নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে।”

“আমার এসব কথা বলছো কেন?” দিলীপ আন্তে আন্তে জিজ্ঞেস করলো।

“জে শিয়াং তোমায় এখানে কেন এনেছে জানো?” টিং লিং জিজ্ঞেস করলো।

“জে শিয়াং-এর দুর্বলতা আছে জেনীর জন্তে। ভালোবাসা বলবো না, সে কাউকে ভালোবাসতে পারে না। কারো জন্তে তার দুর্বলতা এলে সে পাগল হয়ে যায় তার জন্তে, তারপর তাকে পেলে চুরে তার সমস্ত মোহ কেটে যায়, ফিরেও তাকায় না তার দিকে। কিন্তু তার জীবনে জেনী হচ্ছে প্রথম মেরে, যে তার দিকে ফিরেও তাকায় না। তার ধারণা, জেনী তার ত্যাগাক্তা করে না তোমার জন্তে। তাই তোমায় ভাব করির দিচ্ছে আমার সঙ্গে।”

দিলীপ অবাক হয়ে তাকালো টিং লিং-এর দিকে।

“এ সব তার কাছে নতুন নয়,” টিং লিং বলে চললো, “তার নিজের কাজ শুঁড়িয়ে নেওয়ার জন্তে আমার চেহারার সাহায্য সে অনেক নিয়েছে। চিয়েন চ্যাংকেও সে আমার কাছে এনে আলাপ করিয়ে দেয় কোনো একটি বিশেষ মতলবে। কিন্তু আমিও যে চিয়েন চ্যাংকে ভালোবাসলাম সেটা জে শিয়াং জানে না। জানলে চিয়েন চ্যাং-এর ক্ষতি হবে। তাই আমি জানতে দিই নি, এমন কি চিয়েন চ্যাংকেও নয়। আমি শুধু এই ভাগ করে বেড়াচ্ছি যে চিয়েন চ্যাংকে আমি খেলিয়ে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা দিলীপ, কি দুর্ভাগ্য বলা তো? লোকে তো শুনি খেলিয়ে বেড়ানোর জন্তে ভালোবাসার ভাগ করে। কিন্তু আমার করতে হচ্ছে ঠিক তার উল্টো।”

দিলীপ হাসলো।

“তোমার আমার দরকার,” টিং লিং বললো, “চিয়েন চ্যাং-এর ভালোর জন্তে—যাতে সে কোনো বিপদে না পড়ে—তাকে আমি মাঝে মাঝে হুঁ-একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই, যেটা আমার নিজের জানানো সম্ভব নয়। অথচ কাউকে পাচ্ছিলাম না যাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারি। আর তোমায় যখন জে শিয়াং নিয়ে এসেছে, আর চাইছে যে কিছুদিন তোমার সঙ্গে আমার একটা যোগাযোগ থাক, তখন মনে হলো ঠিক যে সুযোগ চাইছিলাম, সেটা পেয়ে গেলাম।”

“কী সুযোগ?” দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

“দেখ, তোমায় বিশ্বাস করে বলছি,” বললো টিং লিং, “আহ-কিম আর মিনির সঙ্গে আমার একটু যোগাযোগ হওয়া দরকার, সেটা তোমার মারফতেই হবে। জে শিয়াং তোমায় আমার কাছে নিয়ে এসেছে তার একটা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে। সুতরাং তুমি যদি আমার কাছে আসো, আমি যদি তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াই কেউ কোনো রকম সন্দেহ করবে না।”

“জেনী করবে।”

“জেনীকে সব খুলে বলতে পারো। সে কাউকে বলবে না, টিং লিং উত্তর দিলো।

“চিয়েন চ্যাং সন্দেহ করবে।”

“চিয়েন শুধু ভাববে যে তুমি আমার সব্বন্ধে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছো,” টিং লিং হেসে বললো, “তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তাকে আমি ঠিক সামলে নেবো। উপস্থিত তোমায় একটি কাজ করতে হবে। করবে তো?”

“বলো।”

“আগামী মঙ্গলবার বিকেলবেলা তুমি চিয়েন চ্যাংকে যেমন করেই হোক তোমার সঙ্গে সঙ্গে রাখবে। সিনেমায় হোক, রেস্তোরাঁর হোক, বাই-এ হোক, যেখানেই হোক, ওকে আটকে রাখবে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত।”

“কেন?”

টিং লিং আন্তে আন্তে বললো, “সেদিন জে শিয়াং-এরই একটা কাজে একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা। আমি চাই না যে সে ও কাজে যায়।”

“কী কাজ?”

“সেটা তোমার জানবার দরকার নেই।”

“একটু যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা,” দিলীপ বললো।

টিং লিং উত্তর দেওয়ার আগেই দরজায় বেল বাজলো।

“জে শিয়াং এসে গেছে,” টিং লিং ব্যস্ত গলায় বললো, “এ নিয়ে আর কোনো কথা নয়। অল্প কথা বলা যাক। কী বলা যায়? হ্যা, পার্ল বাকের বই পড়েছো?”

আবার বেল বাজলো দরজায়।

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের যাবতীয় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-  
সার জ্ঞান পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাতে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৩-৮টা

ডাঃ চার্লসের ব্র্যাশন্যাল কিওর সেক্টর

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১১

“আমি গিয়ে খুলে দিই,” দিলীপ উঠতে গেল।

“না, না, বেয়ারা যাবে। বসো, পাশ্ বাকের কি কি বই পড়েছো?”

“প্রায় সবই পড়েছি। শুড আর্থ, ড্যাগন সীড, মাদার, শিকলী।—

দরজা খুলে দেওয়ার আওয়াজ এলো।

“শুড আর্থ সিনেমাটা দেখেছো?”

“হ্যা, হু-তিন বার দেখেছি।”

“পল মুনি অদ্ভুত অভিনয় করেছে, না? লেই পঙ্গপাল আসা দৃষ্টটি? কী স্বন্দর”—

একজোড়া ছুতো মশমশ করতে করতে ঘরে ঢুকলো।

“তুমি?” বললো টি লিং।

দিলীপ ফিরে তাকিয়ে দেখলো।

টি লিং-এর ভাই কে? সে শিরাং নয়, এসেছে চিয়েন চাং।

“সে শিরাং কোথায়,” সে জিজ্ঞেস করলো।

“সে তো বাড়ি নেই,” উত্তর দিলো টি লিং।

চিয়েন চাং-এর খুঁটী অঙ্ককার হলো। সে একবার দিলীপের দিকে একবার টি লিং-এর দিকে তাকালো।

“ওর ফিরতে দেয়ী হবে,” টি লিং গভীর ভাবে বললো।

চিয়েন চাং কোনো উত্তর দিলো না।

“তুমি কাল সকালে এসো। সে শিরাংকে থাকতে বলবো,” বললো টি লিং।

“ভাবছি একটু অপেক্ষা করে যাবো,” চিয়েন চাং বললো।

“অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই চিয়েন চাং,” উত্তর দিলো টি লিং, “সে শিরাং-এর ফিরতে অনেক দেয়ী হবে।”

চিয়েন চাং আবার হু-জনের দিকে পর পর তাকালো। তার পর বললো, “ও, আচ্ছা।”—বলে বেরিয়ে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে দিলো টি লিং-এর বেয়ারা।

দিলীপ কোনো কথা না বলে বসে রইলো ‘চুপ করে’। সে ঘরের জানালা বাস্তার উপরেই।

টি লিং স্নান মুখে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তাকিয়ে রইল বাস্তার দিকে, যে পথ দিয়ে চলে গেল চিয়েন চাং। পথের ধাঁকে সে অদৃশ্য হতে টি লিং ফিরে এলো তার চেয়ারে, আশ্বে আশ্বে হলো, “বেচারি চিয়েন চাং! আমার উপর রাগ করে চলে গেল। আমি তাকে বসতেও বললাম না।” একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো টি লিং।

“বলসেই পারতে” দিলীপ বললো।

“না, সে শিরাং রাগ করতো। সে চায় তুমি এখান কিছুক্ষণ ফলা থাকো। কে জানে হয়তো সে শিরাংকেও সেই আসতে লেছিলো, যাতে সে এসে তোমার আর আমার একলা দেখে।”

“কেন?”

“এও বোঝো না? খবরটা জেনীর কানে তুলে দেওয়ার জন্যে।”

“ও—।” দিলীপ এবার বুঝলো।

তারপর অনেকক্ষণ হু-জনেই চুপচাপ। অনেকক্ষণ সে শিরাং-এর খা নেই।

একটি বাহুড় ঘরে ঢুক হু-তিন পাক খেয়ে উড় বেরিয়ে গেল।

সামনের বাড়ী থেকে পিয়ানোর সুর ভেসে এল। রাগ চান্দাচুরগুলা হাঁকে গেল।

টি-লিং আশ্বে আশ্বে বললো, “চিয়েন চাং এর আজ রাতি হবে না। এত চঞ্চল সে। একটুও বোকে না।”

চুপ করে রইলো একটুখানি। তারপর আবার বক্ত “আমায় দেখে মনে হয় আমি কী স্থখী। এরকম চেহারা ছাছলো, এরকম উন্নত জীবনযাত্রার মান। কেউ যদি জানে

দিলীপ টি-লিং-এর কাছে তার ছেলেবেলার অনেক তনেছিলো সেদিন।

টি-লিং-এর বাবা ছিলেন যুদ্ধের আগে ব্যাক অফ চায়নার ডিরেক্টর। খুব পুরানো অভিজাত বংশ তাদের। চীন সহ আমল থেকেই জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে তাদের পরিবারের যোগা

টি লিং-এর মা আমেরিকান। জাপান বধন চীন আক্রমণ : টি-লিং তখন বেশ ছোটো, বছর নয়ের বয়েস। সে শিরাংও ছে আর হু-জনেই আমেরিকান, মায়ের সঙ্গে সে বছর শীত তাদের নানকিং ফিরে বাড়ির কথা। কিন্তু বাপ চিঠি লিখে জা যে এখন ফেরার দরকার নেই। পরে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

ওরা তখন নিউইয়র্কে। সেখানকার চায়না টাউনের চীনে সম সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। ওরা খুলে পড়ে, হ বছরব্যব সব আমেরিকান। ওর মামার বাড়ির তরফের আত্মীয় সব আমেরিকান। চীনে পরিবার হু-চারটি বাদের সঙ্গে আনাচে তারাও অভিজাত সমাজের—নিউইয়র্কের চীন ককাল স্কেনা ইউনিভার্সিটির একজন চীনে অধ্যাপক, শাহাই থেকে বেড়াতে কয়েক জন চীনে কোটিপতি—এই সব। চীনা, জাপানী, ইং আমেরিকান এসব পার্থক্য সে বুঝতো না তখন। বাদের মিশতো তারা সবাই এতো ভালো যে কোন রকম পার্থক্য বুঝ অবকাশ তখন হয়নি। পার্থক্য বুঝলো একদিন।

মায়ের সঙ্গে বেরিয়েছিলো একদিন। একটি দোকানের সা গাড়ি বেখে মা ঢুকলো দোকানে। টি লিং গাড়িতে বসে রইলো।

এমন সময় দেখে একটি চীনে ছেলে পাশের গলি থেকে বেরি এখানে এলো। হাতে তার কতকগুলো চীনা কাহুস। নিউইয়র্কে চায়না টাউনটা কাছেই। হয়তো তাদের দোকান সেখানে। এ বাড়ির মেয়েরা তৈরি করে। হয়তো বাড়ি থেকে ‘দোকানে ম নিয়ে যাচ্ছে ছেলেটি। টি লিং-এর বড়ো ভালো লাগলো। তাকি তাকিয়ে দেখতে লাগলো সে।

এমন সময় বাস্তার উদ্গো দিক থেকে আসছিলো হু-তিনটি ছেলে কাছাকাছি আসতে একজন চীনে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললো “এই চিক্,—”

চীনে ছেলেটি দাঁড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো, “আমায় বলছো? হ্যা, তোমায় বলছি। তুমি চিক্—মারামারি করবে?”

কাহুসগুলো এক পাশে নামিয়ে রাখলো ছেলেটি। কিন্তু কিছু করবার আগেই তার হুখে একটি খুসি বসিয়ে দিলো সেই আমেরিকান ছেলে।

চীনে ছেলেটির চোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। কিন্তু সেও ছাড়বার ছেলে নয়। তবে রক্ত না ফিরা



পঞ্চাশী কয়েক জন এসে তাড়াহাড়ি খামিয়ে দিলো তাদের। আমেরিকান ছেলেগুলো চলে গেল তাদের পথে। চীনা ছেলেটি ঠোঁটে কুমাল চেপে ধরে ফাটসগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল অন্য দিকে। গাড়িতে বসে রুদ্ধ-নিশ্বাসে তাই দেখলো টি. লি।

ওর মা ফিরে এলো। গাড়িতে চুকে গাড়ি চালিয়ে দিলো বাড়ির দিকে। টি. লি: তখনো চূপচাপ।

মা সেটি লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলো, “কি তোলো ডালি?”

তখন টি. লি: আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, “মামি, চিঙ্ক মানে কি?”

ওর মা একটু অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে, বললো, “এ কথা তুমি কোথেকে শিখলে?”

“একটু আগে একটি আমেরিকান ছেলেকে সুনলাম একটি চীনা ছেলেকে চিঙ্ক ডাকছে।”

“ও—! ওটা ভালো কথা নয়। কয়েক জন ঠুপিড লোক আছে, যারা চীন দেশের লোকদের চিঙ্ক বলে। তবে তুমি তাদের মুখে শুনেছো। ওরা নিশ্চয়ই ওই চীনে ছেলেটির স্থলের বন্ধু।”

“আমি জানি না,” টি. লি: বললো, “আমি শুধু দেখলাম যে চীনে ছেলেটি চলে যাওয়ার সময় তার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে।”

“ও ডিয়ার, ডিয়ার, বললো চীনে মেয়ে টি. লি:এর আমেরিকান জননী, “ওরা কি এত সিলি যে, মাঝামাঝি করলো নিজদের মধ্যে। ওই আমেরিকান ছেলেগুলো নিশ্চয়ই খুব ঠুপিড। ওরা যে কিছু মনে করে বলেছে তা নয়, বারা খাৰাপ ছেলে ওরা পাথে-বাটে বাব-তার

সঙ্গে মারামারি করে বেড়ায়, আমেরিকান ছেলে দেখলে হয়তো তাকে আরো খাৰাপ গালাগাল দিয়ে তার সঙ্গে মারামারি করতো। এ নিয়ে তুমি অতো আপস্ট হয়ো না ডালি!”

টি. লি: কোনো উত্তর দিলো না।

ওর মা বলে গেল, “আমেরিকানরা চীনাদের কতো ভালোবাসে, জানো? আমাদের দেশে যুদ্ধ বেধেছে আর এখানকার লোকেরা আমাদের দেশের লোকদের জন্তে কতো কি পাঠাচ্ছে—কতো জামা-কাপড়, কতো খাবার, কতো টাকা। আমি যে সোয়েটার বুনছি দেখছো, সেটাও চাইনীজ রেডক্রেসের জন্তে। কিছু দিনের মধ্যে একটা প্রদেপান বার করা হবে চীনা তেলার জন্তে, তুমি-আমি-আমরা সবাই যাবো। দেখবো, আমাদের দেশের কতো ছেলেমেয়ে আছে এই শহরে।”

টি. লি: চূপ করে শুনে গেল মায়ের কথাগুলো।

বাড়ি ফিরে টি. লি: এক সময় চেঃ শিয়াকেও বলেছিলো পথের ঘটনার কথা।

চেঃ শিয়া তখন সবে স্কুল থেকে বের-বল খেলে ফিরেছে।

হাতের মাসুল ফুলিয়ে অল্প হাত দিয়ে সেটি অনুভব করে সে বললো, “ওই চীনে ছেলেটি নিশ্চয়ই ভীত। তাই ওরা ওর পেছনে লেগেছিলো। আমায় কেউ বলতে আশঙ্ক না, তখন দেখা বাবে! আর ওরা সব-আজ্ঞে-বাজ্ঞে ছেলে-মেয়েদের পক্ষে এটা সম্ভব। আমাদের বন্ধুরা অন্তরকম। পীট, স্টীভ, আয়ান, এরা কোনোদিন ও বকম বলবে না।”

টি-লি: আস্তে আস্তে বললো, “আমাদের দেশের একটি ছেলেকে যে ওরা রাস্তায় ধরে মারলো সেটা আমার ভালো লাগেনি।”

কুমালে ও বেশবাসে ব্যবহারে  
চিশ্ত আমোদিত হয়; ইহার  
সুগন্ধি দীর্ঘস্থায়ী।

**কাণ্ডা**  
অনুগম সুরভিসার



দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-১১

“ডাষ্ট বি সিলি,” চে শিয়া উত্তর দিলো, “ওরা তো গুরু ধরে মারেনি, ওদের একজন আর এ যাবামারি করেছে। ফেয়ার ফাইট। কিছু বলবার নেই।”

চে শিয়া এ কথা বলে চলে গিয়েছিলো হাত-মুখ ধুতে।

টিং লিং চূপচাপ বসেছিলো অন্ধকার বারান্দায়।

তার বার বার মনে হচ্ছিলো, এখানে চার মিকে আকাশচুম্বী বাড়িগুলো ঘিরে এত নিওন-সাইনের আলো, ওখানে ফিক্‌থ্‌ এভিনিউতে হুহুগ ট্রাফিক—আর এখন সাংজাইতে, ক্যান্টনে, ফু-চাওতে, আর এখানে সেখানে অস্বাস্ত শহরে গিয়ে বোমা ফেলাছে জাপানীরা, আর তার মতো ছোটো ছোটো মেয়েরা মায়ের কোল বেঁসে কুঁকড়ে বসে আছে।

দিন তিন চার পরে একদিন দেখলো ওর মা খুব ব্যস্ত। সকাল থেকে এখানে সেখানে ফোন করছে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে টিং লিংকে বললো, সাজগোজ করে নাও। এখন বেরোতে হবে।

টিং লিং বললো, “মামি, একটা কথা বলবো ভাবছিলাম। চলো আমরা ড্যাডির কাছে ফিরে যাই।”

টিং লিং-এর মা একটু স্নান হেসে ওর চুলে হাত বুলিয়ে বললো, “সে হয় না ডার্লিং। ড্যাডি এখন চুংকিং-এ আছে। সেখানে গেলে আমাদেরও অসুবিধে হবে, ওঁরও অসুবিধে হবে। ওখানে তো তোমার জন্মে ছিল নেই। তোমার ড্যাডি লিখেছে আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে, তারপর যখন যুদ্ধ শেষ হবে তখন তোমার ড্যাডি এখানে বেড়াতে আসবে। এখান থেকে আমরা সুইজারল্যান্ডে যাবো, তারপর দেশে ফিরে যাবো। আর এখানে আমাদের কতো কাজ। দেশের জন্মে কতো টাকা তুলতে হবে। আমরা তো আজ সেখানেই থাকি।”

নিউইয়র্কের চীন অঞ্চলে একটি চীনেদের স্থল আছে। মায়ের সঙ্গে টিং লিং গেল সেখানে। চে শিয়াকেও বলা হয়েছিলো, কিন্তু সেদিন ওর এক বন্ধুর গাঁয়ের বাড়িতে পাটি। সে গেল না।

সেই স্থলে যেতে আরেকটি বড়ো-সড়ো মেয়ে তার হাত ধরে তাকে একটি ঘরে নিয়ে বসালো। সেখানে আরো অনেক মেয়ে—ছোটো বড়ো মাকারি। সবাই বসে তারা আর রঙিন ক্রেপ কাগজ দিয়ে ফুল বানাচ্ছে।

“তুমি ফুল বানাতে জানো?” জিজ্ঞেস করলো বড়ো মেয়েটি।

“না,” উত্তর দিলো টিং লিং।

“খুঁ সোজা। বোসো। আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।”

কয়েক বার দেখতেই শিখে নিলো টিং লিং। ফুল বানাতে বসে গেল সবাব সঙ্গে।

ফটাখানেক পরে আরেক জন এসে সবাইকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। টিং লিং বিরুদ্ধ হয়ে দেখলো, এক দীর্ঘ প্রেসেশান সারি বেঁধে পাড়িয়েছে।

এতো চীন দেশের লোক এই নিউইয়র্ক শহরে! টিং লিং অবাক হয়ে ভালো—এত ছেলে, এত মেয়ে তার বয়সী? কী স্থলার, কী ফুটফুটে দেখতে। শোভাযাত্রীদের মাঝখানে মাঝখানে দীর্ঘ ব্যানার। তাতে নানা রকম দ্রোগান চীনা ভাষায় আর ইংরেজিতে লেখা। শোভাযাত্রার এক প্রান্তে বিউগেল বাজাচ্ছে একজন আর ড্রাম বাজাচ্ছে দু’তিন জন ছেলে।

তার টিং লিং-এর সামনে কোনো কোনো জেজেরারবা নিজেছে

সাজিভরা কাগজের ফুল, নিউইয়র্কের পথচারীদের কাছে সেগুলো বিক্রাবে।

শ্রুকের আক্রমণে বিপর্যস্ত দেশের জন্মে টাকা তুলবার জন্মে এই প্রেসেশান, এত বড়ো শোভাযাত্রা নাকি বেরায় নি অনেক দিন।

কাগজের রিপোর্টারেরা ঘোরাঘুরি করছে চারদিকে। স্লাশ বালব বলসিয়ে কোটো তুলছে প্রেস ফটোগ্রাফারেরা।

এক-সাজি কাগজের ফুল নিয়ে তাদের সঙ্গে বোণ দিলো টিং লিং-ও। মামি কোথায়, মামি?—একবার ডাবল সে।

দেখলো তার আমেরিকান মা নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদের মধ্যে, আর প্রেস রিপোর্টারদের ডেকে ডেকে বুরিয়ে দিচ্ছে ওটা-ওটা সেটা।

মায়ের জন্মে খুব গর্ব হোলো টিং লিং-এর, হোক না তার মা আমেরিকান, সে তো এখন চেং পরিবারের বৌ। আর শুধু তার মা কেন, নিউইয়র্কের অনেক চীনের অনেক আমেরিকান বৌ অসঙ্কোচে এসে বোণ দিয়েছে এই প্রেসেশানে।

একবার শুধু চে শিয়া-এর কথা মনে পড়লো। বেচারি চে শিয়া—ভালো টিং লিং-সে জানে না সে-কী মিস করলো।

নিউইয়র্কের জুলাই মাসের অমন গরম—একটুও অল্পভব করলো না টিং লিং।

গান গাইছে সব ছেলেরা মেয়েরা। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শহরের জনবহুল রাজপথে কাগজের ফুল ফেরি করে বেড়ালো টিং লিং। এমন উত্তেজনা, এমন আনন্দ, তার জীবনে আর কোনোদিন আসেনি।

কেটে গেল আরো কয়েকটা বছর। জার্মানী যুদ্ধে নামলো, পরে নামলো আমেরিকাও। টিং লিং-দের দেশে ফেরা হোলো না কিছুতেই। মাঝখানে একবার কি একটা কাজে নিউইয়র্কে এসেছিলো টিং লিং-এর বাবা। তখন শুধু মাসখানেকের দেখা।

তারপর আরো দু’তিন বছর, যুদ্ধ, খবরের কাগজে নিত্য নতুন হেড লাইন—আর নিউইয়র্কের ফ্যাশান-হুহুগ অভিজ্ঞত সমাজের হুহুগ জীবনযাত্রা। তারই মধ্যে বড়ো হয়ে উঠলো টিং লিং, দৈনন্দিন কাজকর্মের কঁাকে কঁাকে সবুজ থামল চীনদেশের ঝাপসা স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

কেটে গেল আরো কয়েক মাস। ইউরোপে যুদ্ধ থেমে গেল, বিশ্বজুড়ে জার্মানীতে প্রবেশ করলো ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী আর রুশ সেনাবাহিনী।

নিউ ইয়র্ক সেদিন সন্ধ্যায় আলোয় আলোকময়। রাস্তায় ভিড়। হোটলে রেস্তোরাঁ নাইট ক্লাবে উজ্জ্বল নাচের আসর। চারদিকে থাকিতে সিলে শিকনে মেশামিশি।

তারই মধ্যে এক আমেরিকান বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে টিং লিং মাঝে মাঝে ভাবছিলো, কবে আমাদের দেশের যুদ্ধও থামবে।

তাও একদিন থামলো। এটম বোমা পড়লো হিরোশিমা, নাগাসাকিতে, জাপান আত্মসমর্পণ করলো।

মাসখানেক পরে চুংকিং থেকে চিট্টা এলো টিং লিং-এর বাবার, —মামি নাশকিং থাকি। তোমরা সবাই সেখানে চলে এসো।

1

ইংরেজ শাসনের যুগ !...

নেশ আকাশের স্তব্ধতা প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে থান-থান হয়ে গেল। এত কোলাহল কেন ? কিসের এত হটগোল ?—ভারত জেগেছে। বঙ্কিত ভারত, লালিত ভারত, পদলিত ভারত জেগেছে। যে ভারতবাসী একদিন ইংরেজের পাশবিক সোভ আর অমানুষিক নীচতার দংশনে জর্জরিত হয়ে পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল, তাবাই আজ ধুলি-সজ্জা ছেড়েছে—চোখে জ্বলেছে বোম্বের বন্ধি, মনে জেগেছে বাঁধন ছিন্ন করার ঐকান্তিক স্পৃহা।

এলো বিপ্লব। তাকিয়ে দিল ভারতের জড়তার ঘুমঘোর—হঠাৎ চোখ মেলে ভারতবাসী দেখলো জ্বলেছে অনল—সারা আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে। ও কিসের আগুন ? ও যে বিদ্রোহের আগুন ! ও লাল বা কিসের ? ও তো বা নয়—ও যে রক্ত—অত্যাচারিতের রক্ত, অত্যাচারীর রক্ত মিশে একাকার হয়ে গেল—রাঙিয়ে দিল কি অব্যাহতের উজ্জ্বল দিনের চলার পথ ?

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ দমনেরও তিড়িক পড়ে যায়—চলে তলাসী, মলে নিধাতন, কাঁসার দড়ি থাকে প্রস্তুত, রিভলভার থাকে ভরা। হাটে দিন—কাটে মাম—কাটে বছর। কত বিপ্লবী ধরা পড়ে, কিন্তু বল্লব তো মরে না ! আরও ছড়িয়ে পড়ে গুপ্ত বিপ্লব—দিকে দিকে। 'তুনদের আকর্ষণ করত নব নব উদ্ভাবিত হয়—আর দরকার হয় ছুরীর চোপ রতন চিনে নিতে। কি এক অদম্য আকর্ষণ প্রতি বের দুয়ার খোলায়, দূরত্বের ব্যবধান ঘোচায়, পরকে করে ভাই। তো চুম্বকের দিকে গেরকের আকর্ষণ নয়, এ প্রভাতের সোনার লোর প্রতি নবীন কিশোরের আকর্ষণ ! যুগ যুগ ধরে যাব ক্ষয় নেই, য নেই, ভুশি নেই।

\* \* \* \*

শামল ছায়ায় ঢাকা কত গ্রাম ঈড়িয়ে আছে পাশাপাশি, ছবির চন। অন্তর্মিত সূর্যের আলোকে গৈরিক হয়ে গেছে সমস্ত কাশ, বনানী, পুকুরের জল। পড়ন্ত বেলা—আস্তে আস্তে চঞ্চল হয়ে উঠছে গ্রাম—দু—একজন লোকও এবার দেখা যায় পথে। দের মধ্যে রজনও একজন—চলেছে সে—চোখে উৎসুক সন্ধানী ! বাড়ীগুলো পেছনে পড়ে থাকে, ঘোষেদের পুকুরটার ধার য় আরও একটু এগিয়ে প্রত্যাশার আবেশে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ঠ—ঈড়িয়ে পড়ে সে। একদল ছেলে ফুটবল খেলে—বিদ্যৎ গ ছুটেছে—উত্তেজিত ভাব—পৃথিবীর আর সব কিছু লুপ্ত হয়ে ছ তাদের কাছে। কয়েক জন ছেলে অচেনা—দূর গায়ের নিশচর মাচ খেলতে এসেছে। এই সুরোগ নিতেই তো মুল আর ার মাঠে হানা দেওয়া। এত চাঞ্চল্যের মধ্যে কিছু তাদের ভাবে লক্ষ্য করা শক্ত। তবু ধৈর্য ধরে ঈড়িয়ে থাকে রজন, টি দায়িত্বের বোঝা তার কাঁধে—আজ নিজের কচিতে আর ষে কোন কিশোরকে দলে টেনে আনতে হবে—উজ্জ্বল সম্ভাবনার ব যাব মনে। যদি না পাবে ? যদি ব্যর্থ হয় ? প্রীমস্তা কি বন ?

খেলা জমে উঠেছে। দর্শক বেশী নেই। বার্য আছে তারা ! মার্চের ওদিকে—গাছের ছায়ায়। একা রজন এদিকে। ঠ ছেলে—বরসটা অজ্ঞদের তুলনায় কম—পাতলা পাতলা য় কিপ্রগতিতে বল নিয়ে দৌড়াচ্ছে বিপক্ষের গোলের —অদূত কোশলে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে



প্রয়াসী

—আরও কাছে—গোলপোর্ট এবার তার নাগালের মধ্যে এসে গেল—উত্তেজনার দর্শকরা চাঁৎকার করে উঠেছে—এক মুহূর্ত—হঠাৎ কি হল—পরক্ষণেই ছেলোট ছিটকে এসে লুটিয়ে পড়ল রজনের একটু দূরে—খেলার মার্চের সীমানার বাইরে। রেফারী সিটি দিল—খেলা থামল—চাঁৎকার উঠল, 'কাউল ফাউল'। ততক্ষণে রজন ছেলোটর কাছে পৌছে গেছে। একবার তাকে দেখে নিয়ে হাত নেড়ে জানালো আর কাজিকে আসতে হবে না—খেলা চলুক—ঠিক আছে। রজনকে দেখে নিশ্চিন্ত হল তারা—রেফারীর ছাইশিল শোনা গেল—পেনাল্টি কিং ১০০—নেতিয়ে পড়েছে ছেলোট—লেগেছে পায়ে—কিন্তু অনেকক্ষণ খেলার আর উত্তেজনার ক্লাস্তিটাই বেশী প্রবল—লাল হয়ে উঠেছে কচি মুখখানা। পায়ের হাড়ে লেগেছে—মাশিশ করে দিতে দিতে তাকিয়ে দেখলো রজন—একবারে বাছা—সরটা উজ্জ্বল শ্যাম, একমাথা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া অবিস্মৃত চুল ১০০—একটু পরে লঙ্কিত ভাবে উঠে বসল ছেলোট—হাতের কলহটা পড়ে গিয়ে কেটে গেছে—রক্তে—ধুলোয় মাখামাখি—ঘোষা দরকার। কুড়ি বছরের রজন ব্যায়াম-করা হাতে অনায়াসে তুলে নিল তাকে কোলে। প্রতিবাদ জানালো ছেলোট—না না, নামিয়ে দিন, হেঁটেই যাব।

রজন তখন চলতে শুরু করেছে—সন্নেই হেসে বলল—লজ্জা কি ভাই, দাদা হই যে আমি।

কেন এত স্নেহ ? এ কি শুভুই ছোট ছেলের আঘাতের বেদনায়



সহায়ভূতি ? না কি বুদ্ধিদীপ্ত কালো চোখের মাঝে মিলেছে কোন সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত ?...

যোষেদের পুকুরঘাটে এসে রজন তার বন্ধু আর ধূলো ধুইয়ে দিল। তার পর পাশে এসে বসল। গাছপালার ঢাকা নিম্ন জায়গাটা—এখনই অন্ধকার হয়ে আসছে।

—যত্নশীল কমলো ? নিশ্চিন্ততা ভঙ্গ করে রজন।

—হঁ, বেশী লাগে নি আমার—জবাব দেয় ছেলেটি।

—তুমি খুব স্বন্দর খেলো তো ! চমৎকার বল কাটাও।

সপ্রশংসে দৃষ্টির সামনে শিশুসুলভ গর্বের সঙ্গে লজ্জা মিশিয়ে মাথা নিচু করে ছেলেটি। তার পর আক্ষেপের স্বরে বলে—আর একটু হলেই গোল হয়ে যেত। ইশ, বাজেনটা এমন চাঞ্চল্য করলে !

ফুলে-গুঁঠো পাঁটার দিকে ছুঁজেনই তাকায়।

—তুমি আবার বাগে পেলো শোধ নেবে তো ?—সকৌতুকে প্রশ্ন করে রজন।

—নাঃ, তা কেন ? ও অজ্ঞায় করলেই কি আমাদেরও তাই করতে হবে ? খেলায় প্রতিহিংসা কিসের ? হেসে বলে—তা ছাড়া ওর সঙ্গে পারবও না আমি।

ওর কথার ধরণে খুসী হয় রজন। একটু পরে প্রশ্ন করে—তোমার নাম কি ?

—অশেষ—অশেষ মুখোপাধায়।

—কোন গ্রামে বাড়ী তোমার ভাই ?

—এই গ্রামেই তো, একটু দূরেই বাড়ীটা।

—তাই নাকি ? আশ্চর্য্য হয় রজন, কই তোমার তো কোন দিন দেখিনি ? আমার তো এই পাশের গায়েই বাড়ী।

—এখানে আমি নতুন এসেছি যে,—বিশাল চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে তাকাল অশেষ—এটা আমার মামার বাড়ী। স্বথময় বল্লোপাধায় আমার মামা।

—ও, তাই বল ! স্বথময় কাকার ভাগ্নে তুমি ? বেড়াতে এসেছা ? তোমাদের বাড়ী কোথায় ?

ম্লান হাসল অশেষ।

—থাকতাম কলকাতায়, এখন এখানেই থাকি, মাসখানেক হল আছি—আমার মা-বাবা মারা গেলেন কি না। এক নিম্বাসে কথাগুলো বলে যায় সে।

একটু অস্বস্তিতে পড়ে চুপ করে থাকে রজন।

অশেষই প্রশ্ন করে—আপনায় কি বলে ডাকব ?

—আমায় 'রজনদা' বলে ডেকো। তুমি যাদের সঙ্গে খেলছিলে তারা সবাই আমায় ডেনে। কোন ক্রাশে পড় তুমি ?

—ক্রাশ নাইন।

ছেলেটাকে ভাল লেগেছে রজনোর। সাধারণ কথাবার্তার ঝাঁকে ঝাঁকে আসল কাজে অগ্রসর হবার পথটা ঠিক করে নিয়েছে সে। এবার শুরু করে দিল।

—জানো, আমাদের একটা অভিনয়-সম্মুখ আছে। তুমি আসবে তাতে ? তাহলে এবার অভিমন্ত্র্য পাঠাও তোমায় দিই।

কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকায় অশেষ।

—খুব রাজি, কিন্তু আমি অভিনয় করতে পারব কি না, না জেনেই যে পাঠ দেবেন বলছেন ?

জেরা করার ধরণ দেখে হাসে রজন—বলে—আমরা দেখলেই বুঝতে পারি কে পারবে, না পারবে। আমাদের এক দাদা আছেন, তিনিই শেখান, তাঁকে চিনিয়ে দেব তোমায়।

মনে মনে বলে—অভিমন্ত্র্য হয়ে সম্ভবতীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে নাই পারলে, ইংরেজ-রথীর সঙ্গে পারবে তো ? তাহলেই হবে।

একটু পরে আবার বলে, আমাদের একটা লাইব্রেরীও আছে, বই পড়তে ভালোবাস তুমি ?

—খুব, উৎসাহে চক-চক করে ওঠে অশেষের চোখ দুটো, খুব ভালোবাসি।

চুপ-চাপ যায়। রজন প্রশ্ন করে—তুমি তাহলে আমাদের কাছে আসছ ? কবে আসবে বল ?

—কালই যাব। রবিবার তো।

অবাক হয় রজন—অবজ্ঞা এই আশাতেই তার এই শনিবারের ছেলেধরার অভিধান, তবু অশেষের আহত পাঁটার দিকে না তাকিয়ে পারে না। তার দৃষ্টি অমসরণ করে হেসে ওঠে অশেষ।

—পায়ের কথা ভাবছেন বন্ধি 'রজনদা' ? ওতে কি ? আমি না ছেলে। মা বলতেন ছেলেদের অত সহজে কাতব হতে নেই।

সন্ধার অন্ধকার নেমে এসেছে—গ্রামের কোলাহল ক্রমেই আসছে ক্রমে—রজন উঠে পড়ল।

—তাহলে ঐ কথাই রইল। কাল তুমি সন্ধ্যার আগে বেও, কেমন ?

গ্রাম আর বাড়ীর পথ বলে দিল রজন—ওদের বাড়ীটা ছাড়িয়েই শ্রীমন্তদা'র বাড়ী—সেখানেই যেতে বলল। অশেষও উঠে পাঁড়ায়—অন্ধকারে দেখতে পায় না রজন, যত্নপায় তার বিশাল চোখ দুটো বেদনার্ত হয়ে উঠেছে। বুঝতে দেয়ও না অশেষ—সোজা হয়েই পাঁড়ায়—বলে, তাই যাব।

রবিবার বিকলে। শ্রীমন্তদা'র ঘরে বসে কথা বলছিল রজন। আর সবাইয়ের মত সেও শ্রীমন্তদাকে গুরু মত শ্রদ্ধা করে। তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণে বহু ছেলে বিপ্রবন্ধে দীক্ষিত হয়েছে, রজনও তাদের একজন। তাঁর অঙ্গুলি হেলনে তারা প্রাণ দিতে পারে, শ্রীমন্তদা'র স্নেহও অপরিদীয়। ক্রমেই রজন ভেতরে ভেতরে চকল হয়ে উঠেছে—অশেষ যে তারই মুষ্টিমান পরীক্ষা। কেমন হবে অশেষ ? যদি সে তার অযোগ্যতাই প্রমাণ করে ? কাল অশেষকে যেন ঠিক বুঝতে পারেনি সে। বড় বেশী গভীর, বয়সের তুলনায়—কিছুতেই অতিরিক্ত উজ্জ্বল প্রকাশ করে না।

হঠাৎ ডাক শোনা যায়—'রজনদা' !

লাফিয়ে ওঠে রজন—ঐ তো অশেষ,—এসেছে, এসেছে, এই যে আমি। অধীর আগ্রহে এগিয়ে যায় রজন আর একটু পরেই ঘরে ঢোকে, পেছনে অশেষ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অশেষকে দেখেন শ্রীমন্তদা—'দাদা হাফ প্যাট আর সার্ট পরা—রোগা—মাথায় এক মাথা কড় চুল, মুখটা একটু বেশী লাল। কালকের মত ধূলি-ধুসরিত নয়—সব মিলিয়ে একটি রূপবান কিশোর। মুহূর্তের জন্ত থমকে বান শ্রীমন্তদা' ; এ কি ! পলাশ ফুল নয় তো ? ততক্ষণে ওরা সামনে এসে পাঁড়িয়েছে।

রজন বলে—অশেষ, ইনিই আমাদের সবার দাদা—শ্রীমন্তদা', আজ থেকে তোমারও দাদা।

পর মুহূর্তে কচি নরম হাতে প্রণাম করে অশেষ—শ্রীমন্তদা' তেমনি করেই তাকিয়ে থাকেন অশেষের দিকে, বলেন—বস।

এ অশ্বত্থের দৃষ্টি বঙ্গনের সুপরিচিত—তার বুকাটা চিপ-চিপ করে। সামনে বসে পড়ে অশেষ—তার কিন্তু বেশ-মাত্রা ভীত ভাব দেখা যায় না—নিভীক উজ্জল চোখে স্পষ্ট করে তাকায় শ্রীমন্তদা'র দিকে—তঁার চোখে চোখ রেখে। আর সেই কালো চোখের গভীর দৃষ্টির আগুনে শ্রীমন্তদা'র সব সন্দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। না পলাশ ফুল এ নয়। এ যে কেয়া। যেমন আছে সৌন্দর্য্য তেমনি আছে কাঁটার বেড়া! স্বস্তির নিশ্বাস ফেল সহজ হয়ে আলাপ শুরু করেন তিনি।

—তোমার কথা শুনলাম বঙ্গনের কাছে। তুমি অভিমত্য়্য হব তো? পা কেমন আছে?

—পা মন্দ নয়, অভিমত্য়্য নিশ্চয় হব যদি আমার যোগ্য বিবেচনা করেন।

—বেশ বেশ, তোমাকে বইও দেখাবে বঙ্গন। ওং, তোমার পাটা'র যে ভীষণ ফুলেছে? কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে এসেছিল অশেষ, কেউ যাতে না দেখতে পায়। কিন্তু ফোলাটা আরও বেড়ে গেছে জোর করে পথ-চলার পরিশ্রমে। ধরা পড়ে লজ্জিত ভাবে হেসে বলে।

—হ্যাঁ, একটা ফুলেছে—ঠিক হয়ে যাবে।

মুখটা আরও লাল দেখাচ্ছে, লজ্জার না বেদনার কে জানে? আসল কথায় এসে পড়েন শ্রীমন্তদা'। বোঝেন ও খাটি সোনা—একে এখনি কাজে লাগানো যায়—আগুনে পোড়াবার দরকার নেই।

—অশেষ, জান তো ইংরেজ আমাদের কি দুর্গতি করছে, আমাদের সোনার ভারত ছালিয়ে দিল, আর ভায়ে ভায়ে ধন যাচ্ছে বিদেশে। যারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে, বারো অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলছে—তাদের ওরা জেলে দিচ্ছে, দ্বীপান্তরে পাঠাচ্ছে, কাঁদাকাঁদে বোলাচ্ছে। তাদের অপরাধ—তারা নিজের দেশে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু বিপ্লবীকে সবিয়ে বিপ্লবের আগুন নেবানো যায় না ভাই! তাই দেখ, এত বিপদ এত উৎপীড়ন, সব তুচ্ছ করে দলে দলে এই বিপ্লবের আগুনে আত্মহত্যা দিতে এগিয়ে আসছে কত যুবক, কত কিশোর, কত বালক। শোনার মত কান যদি তোমার থাকে অশেষ, তবে তুমিও শুনতে পাবে—দেশমাতা আমাদের কাতর হয়ে ডাকছেন তাঁর শৃঙ্খল মোচন করতে। তুমি মাড়া দেবে অশেষ? দুঃখিনী মায়ের ডাকে? তোমার মা হারিয়ে গেছেন এ আকাশে, তাঁকে তুমি খুঁজে নাও দেশের মাটিতে। পারবে না ভাই?

হারানো মায়ের কথায় যে বেদনার ঝড় ছোট্ট বুকাটার উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে—বাইয়ে তা প্রকাশ পায় না। চোখের দৃষ্টিটা শুধু উজ্জল হয়ে ওঠে।

—নিশ্চয় পারব শ্রীমন্তদা'। আমার চিরদিনের স্বপ্ন আমি বিপ্লবী হব। শপথ করছি আজ থেকে ভারতের শৃঙ্খল মোচনই হবে আমার ব্রত।

গভীর তৃপ্তি আর স্নেহে অশেষের মাথায় হাত দিতে গিয়ে কপালে হাত ঠেকে যায়—আর চমকে ওঠেন শ্রীমন্তদা'—একি গা যে পুড়ে যাচ্ছে, এত জ্বর নিয়ে এলে কেন ভাই আজকে?

হাসল অশেষ—হুস্তির হাসি—আমি যে বঙ্গনদা'কে কথা

দিয়েছিলাম, দাদা আজ আসব। সারা দিনই শুয়েছিলাম—বিকলেও জ্বর কমল না যে, তাই মামীমাকে লুকিয়ে—আর বলতে পারো না। সহসা সব সাবধের বাঁধ ভেঙে যায়—জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে। শ্রীমন্তদা' তাকে ধরে গুইয়ে দেন—অশ্রুট কণ্ঠে বলেন—সাবাস!

চলে পরিচর্যার পালা। ফুলের মত কচি মুখখানা ব্যাধায় মান হয়ে গেছে। শ্রীমন্তদা' বলেন—জ্বরটা খুবই ছিল। তার ওপর এই জ্বরম পায়ে এতখানি পথ চলে এসেছে, ক্লান্তিতে জ্বরটা বেড়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য? যতক্ষণ কথা বলেছি বুঝতে দেয়নি ওর কোন দৈহিক কষ্ট হচ্ছে! জ্বরের জ্বরেই মুখটা অত লাল লাগছিল। অদ্ভুত বঙ্গন! দু'জনের চোখকে কাঁকি দিল এই এক ঠোঁট ছেলের ধৈর্য্য! জ্বরীর চোখ বটে তো—রতন বার করেছিল।

অশেষের মাথায় হাওয়া করতে করতে অবাক চোখে তাকায় বঙ্গন—শ্রীমন্তদা'কে এত কথা বলতে সে কোন দিন শোনে নি। খুব চাপা লোক। বিষয়মায়িকো নিজের সাফল্যটাও সে অহুভব করতে পারে না যেন।

কাটল কিছুদিন। ক্রমেই অশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। বৈপ্লবিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে অভিমত্য়্য বধের মহড়াও চলে। অশেষ খুব স্বল্পর ভাবে লোকের গলার স্বর নকল করতে পারে—মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে। ছেলেবেলা এই গুণের সাহায্যে সে মামাতো বোন শান্তি ও বেগুকে বশ করে ফেলেছিল। এখানেও সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। এর পরের খিয়েটারটাতে ওকে স্ত্রী-ভূমিকায় নামানোর পরিকল্পনাও হতে লাগলো এখন থেকেই। কিন্তু অশেষের সব চেয়ে বড় গুণ, যে কাজে সে হাত দেয় স্তম্ভভাবে করে। তাই মামীমা যখন বলেন—ওরে, আমি হুঁটো ডুব দিয়ে আসি, ততক্ষণ আচারগুলো একটু দেখিস বাবা, রন্ধুরে দিয়েছি।

তখনও যেমন অশেষ বইটি হাতে করে দাঁড়ায় এসে বসে—মামীমা না আসা পর্যন্ত স্তম্ভ ভাবে আচার পাহারা দেয়, তেমনি স্তম্ভ ভাবে শেখে সে বিপ্লবের কাজ—আঁকায় হাত তার ভাল—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুরেশলা' বাদলদা'র সঙ্গে গুপ্তকক্ষে ইস্তাহার আর পোষ্টার আঁকে—সহকর্মীরা শ্রান্ত হলেও ওর ক্লাস্তি আসে না। আবার ঠিক তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে সে অভিমত্য়্যর পাঠ করে—বীররস ফোটার—যুদ্ধ করে সন্তরখীর সঙ্গে। তাই প্রথম রাতের অভিনয়ে অভিমত্য়্যর জগ্রে বঙ্গ বঙ্গ পড়ে গেল আর কলকাতার ছেলে অশেষ



হুড়-বিহীন কেবল বাতাস প্রাণের নতুন রূপ। বহীর্লীনের চোখের মল  
আর তাকার না, কবজলীল বাহ বাহ বোঝ করে—

—কে যে ফেসেট? নতুন এসেছে গায়ে? কোন্ গ্রামে  
বাড়ী?

আর বিজ্ঞরা বলেন—বিশিষ্ট, শিবর পাঠ শিখিয়েছে কট!

অভিনব শেষে সাতকণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে যায়—এগিরে আসেন  
কাঁকোয়া, পিসিরাগা—মরাক ডোবে অশ্রু দেখে ঐশ্বর্য্যার প্রতি  
এঁদের অঙ্গাঙ্গ্য প্রেম-অভিযোগ। অশ্রুকে লোকে টেনে এনে কেউ  
বলেন—বাঁধে ঐশ্বর্য্য, কি বলে এই বুকের ফেসেটকে অভিনব  
গাছালি যে হতভাগা? কেউ বলেন—কখনই কখন কি এমনি পাবার  
হত হয়?

ঐশ্বর্য্য গাঙ্গেন—আর কখন যেন তাকেন, হ্যা হ্যা! থাকলে কি  
যে চলেবে? অভিনবের পাঠ তো শু শু অভিনব, সত্যি 'যদি' এক  
হতে দিতে হয়, তাহলেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। হুড়টা দেখার  
মত তাঁকি দুটীতে কি দেখতেন তিনি অশ্রুের হয়ে? যখন ও  
ঠা না থাকতো তখনও তিনি লক্ষ্য করতেন ওর নিশ্চিই বন  
ভিনেরহতের দেখার জন্য, একটা বিশিষ্ট তলীতে পাড়ার অশ্রু—  
গোলাল এসে দিয়ে একটা পা হুড় দেওয়াসে বেশে হাত ছুটী পেছনে  
দিয়ে পাড়ির থাকে—তলী বোড়ার মত বাড়টা একটু বাকানো।  
চাওতেন ঐ তলী বোড়টা সামান্য ইলিতে উঁচর বেলে ছুটতে  
পারবে কি না উঁচর মক্ষর পাখে। কচি বুকের মিকে তাকাবার সময়  
কোথা বিদ্রবী? শেষের প্রয়োজনে অশ্রুের মত হাজাখটা ছেসে  
বুড়ার পাখে এগিরে বাবার আসনে দিতেও কঠরর কল্শিত হবে না  
একটুও।

এ অশ্রুের এক নতুন অভিজ্ঞতা—এ কি অপরিণীত হাড়স্নেহ,  
সীমাহীন মমতা। শু শু পাড়া-প্রতিবেশী নর, আশ-পাশের গ্রাম থেকে  
নিমন্ত্রণ আসে—তাল অভিনবের পুরকার আর কি, বড় করে  
বাঁজানো। বন্ধাহারী অশ্রুের খেতে না পারলে কত অম্লযোগ—  
রোগা বলে কত স্নেহে তিরকার। আর বাইরে ঐশ্বর্য্য' পাশে বসে  
খেতে খেতে স্ফাপান তাকে।

—তোমার কিছু হবে না, বা দেখছি। ঐ তালপাতার সেপাই  
হয়েই থাকবি। শুনে বন্ধনরা হা হা। বাড়ীতেও মামীমার বকুনি,  
মামাতো বোনদের অম্লযোগ—

—এ কি অনাঙ্কিষ্ট বাপু, লোকে নেমজ্ঞর করছে বলে জেরে ছেলে  
বাড়ীতে কোন সময় গীতে কুটো কাটবে না। কি চেহারা হোচ্ছে  
দিন দিন!

মামা কোলকাতার চাকরী করেন, তাই তাঁর বকুনিটা আর  
জনতে হয় না। শু মামাতো বড় ভাই স্নানীল তাকে কেমন একটা  
উঁচর চোখে দেখেন—স্বযোগ পেলেই বকতে শুরু করেন—তাতে  
স্নেহ নেই, আছে ছালা। আঙ্গকাল অশ্রুের আর গ্রাহ করে না,  
শু বড়ল'কে এড়িয়ে চলে।

তার পর একদিন সব আনন্দের ওপর বরনিকা টেনে দিয়ে  
ঐশ্বর্য্য'কে প্রেরণ করে নিয়ে গেল রাজবন্দী হিসাবে। সেই  
বিদ্রায়ের দিনে দশ-বোটা প্রাণের লোক ভেঙ্গে পড়ল—সবার চোখে  
জল। শু শুকন বিদ্রবী দলটির চোখে বলে উঠল আঙন—  
প্রজিহিসার আঙন! তার পর চাকলা একদিন জুড়ানো—কয়েক

বছর কেটে গেল। এর মধ্যে কত ঘটনা ঘটল—কত বিদ্রবী  
তাকারি হয়ে গেল, কত উল্লস অত্যাচারী প্রাণ ছিল, তাইলে লোকে  
কত শেখী অভিনবের কক কল। তেমনি আশার প্রেরণা হত কত  
বিদ্রবী, সাজানো হল কত কতক হাফল, ফেসেট ফেসেট  
লটীজল; কত তলী ছেঁড়ার কাফিরী বাতাসে জেলে গেল, হ্যা  
বিদ্রবীসে মনের পাড়ার বড় কিলে সেবা হয়ে গেল সেই অত্যাচারী  
নাম—হাত তাকের বগাশুঁড় থেকে এক এক বিদ্রবী দিতে লক্ষ্য  
কিলে টাকের উল্লসন মীল গ্রাম বিকসিত হয়ে গেল—হ্যা  
জাত। কীসীর হাতি মলার পাশে বুড়ের বুকের হাতি হাত  
হয় না, সত্যি শুকন শুকন কোন অত্যাচারী বাসককে সামনে থেকে  
তলী করে পর হুড়টে পটাসিয়াম সাইনাইট খেয়ে গলে পাচ কিলে  
বালক—কিলের ছালায় বিকৃত হয় না হুড়, কচি বুকে সেবে থাকে  
কুণ্ঠিত জিত হাতি। তাইলে সে হাতি যেন পল্লিলালী নামক  
সেজীর প্রতি ব্যক্তের দুর্ভিকাত।

তারই মাসে অশ্রুের নিজের নিতীর পেরেছ অত্যাচার—ঐশ্বর্য্য'  
নেই—সেই বন্ধনের ডান হাত। হু' জন্মের মামা সীমাহীন গীত  
থেকে গীতকতর হয়ে উঠেছে—হ্যা শুকন গ্রাম গ্রাম তালপাড়া  
করে অশ্রুের বাড়ী মাটী কবে—কিছুই পায় না। কোথায় শুকন  
থাকতে পারে বাসকোপ্ত বিদ্রবীসক বই আর বিলাসার, বোম্ব তার  
ইজাহার—পুলিশী মসকে তা ঢোকে না—এই মতো অশ্রুের শুল  
ছেড়েছে। প্রথম হল জন্মের একজন হয়ে সমসামান্য ম্যাট্রিক পাশ  
করে হুকেছ কলেজে।

দীর্ঘ দিন পর যখন ঐশ্বর্য্য' অশ্রুে অত্যাচার হয়ে বাড়ী ফিরলেন,  
তখন তাঁর প্রথম দিন দেখা হের বছরের অশ্রুের বোণা তেঁতাবাট  
নিতা ব্যারাম আর কুচকাওয়াজ করা খাল বছরের অশ্রুের পেটের  
ভাজে ভাজে মিলিয়ে গেছে। শুরুরম্বে কাজ শুল ছোল পুলিশকে  
কীকি দিয়ে। আর অল্পদিন পরেই বন্ধনরা অনেকে প্রেরণার হয়ে  
গেল! অশ্রুের কিন্তু ঐশ্বর্য্য'র সঙ্গে থাকে ছারার মতন—হু'চিন  
মাস পরে আই, এম, সি পরীক্ষা—বই ছোঁবার সময় নেই। দিন  
নতুন ছেলে দলে আনতে ঐশ্বর্য্য'কে সাহায্য করে—অভিনব, খেলা  
আর বইএর সোত দেখায়, তাকে যেমন করে একদিন রঙন  
দেখিয়েছিল। পুলিশ নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে—ঐশ্বর্য্য'কে রাতে  
বাড়ী থাকতে হবে—কিন্তু সারা রাত চলে গুপ্ত অভিনব—অশ্রুের  
থাকে পাশে—দেহরক্ষীর মত। সারা রাত নিশ্চিই সময়ে ও ছানে  
ঐশ্বর্য্য' প্রাণে প্রাণে নেতাজের সঙ্গে দেখা করে বেড়ান—চলে  
আলোচনা, পরামর্শ উপদেশ—অন্ধকারেই কত ছেলে-মেয়েকে বিদ্রব  
মন্ত্রে লীকা দেন।

একদিন ছুটিতে মামা এসেছেন বাড়ী—জানিয়ে দিল অশ্রুের—সে  
পরীক্ষা দিতে পারবে না। শুনে মামা অবাক হয়ে চেয়ে বইলেন  
কিছুক্ষণ তার দিকে—ত'কো হাতে ধরা, টানতে তুলে গেছেন—  
শেবে বোঝালেন—সে কি কথা যে! চোদ্দ বছরে ট্যাণ্ড করে  
ম্যাট্রিক পাশ করলি, কত উল্লস ভবিষ্যৎ তোমার! পরীক্ষা দিবি  
না কি? কি এমন কাশ তোমার?

তারপর বেগে গেলেন—কুলাচার ছেলে। বাপ-মার বুকে  
চুপকালি দিবি? হি, হি, জ্ঞান ছেলে হয়ে—তার কত ইচ্ছে ছিল  
তুই ডাক্তার হবি।



ডিটামিন যুক্ত

কোলে

**২৫০**

বিঙ্গুট

যাঁরা ওদের বিচার করেন

অঁরা সকলেই পছন্দ করেন

সবসময়

কোলে

বিঙ্গুট

কোলে বিঙ্গুট কোম্পানী  
প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১



পুষ্টিকর খাদ্য সম্ভার

খিনএরাকট

মেরী

পেটিটবুঝো

নাইস

কলেজ

টেপ্টা

ভেণ্টা

ক্রীমক্রাকার

কয়েন

স্পোর্ট

জিঞ্জারনাট

হাউসহোল্ড

সল্টী

মার্ভেলক্রীম

কাকেনয়ের

চকোলেটক্রীম

বেবীক্রীম

সল্ট ক্রাকার

প্রভৃতি

আরও অনেক রকম।

বড়দা' কত ব্যঙ্গ করলেন,—এখন সামলাও আদরের গোপালকে ।  
কুসঙ্গে মিশে এই সব বৃদ্ধি হচ্ছে ! ভারি কাজের লোক !

অশেষ অচল অটল ।' ভেমনি বুনা বোড়ার মত বিশিষ্ট ভদ্রীতে  
পাঁড়িয়ে রইল।

রাত্রে 'শুয়ে' ঘুম আসে না—জানলা দিয়ে এক টুকরো আকাশ  
চোখে পড়ে—একটা উজ্জ্বল তারা জল-জল করছে—অশেষের চোখ  
হুটো জ্বালা করে, জলে ভরে যায়—সত্যিই কি সে অযোগ্য সন্তান ?  
কানে বাজে মায়ের কথাগুলো—রোজ কাগজ পড়ে শোনাতে  
শোনাতে ; বিপ্লবীদের গল্প বলতে বলতে বলতেন—মামুষের মত  
মামুষ হয়ে বাঁচি খোকা, পুত্র মত বেঁচে কি লাভ ? খোকা তুই  
বড় হয়ে বিপ্লবী হোস্ দেশের লোক ভোর নামে স্রষ্টার মাথা নত  
করবে । পারবি খোকা মুতুভর জয় করতে ?

আজ কোথায় তার মা ? ঐ কি ? তারা হ'য়ে ফুটে আছেন ?  
বাথায় কি স্নান তাঁর চোখ ? কৈ তা তো নয় ! ঐ তো উজ্জ্বল  
চোখে হাসির অভাস—তৃপ্তির হাসি । ঐ তো আলোর পথ চেয়ে  
তাঁর আশীষ নেমে এলো ! তার কোন শংস নেই, সঠিক পথই সে  
বেছে নিয়েছে—বস্তির নিঃশাস ফেল চোখ বুজলো অশেষ, আর ঠিক  
তখনই জানলার ধনিত হল শ্রীমন্তদা'র সঙ্কেত টক্-টক্ । নিঃশব্দ  
পায়ে অশেষ বেরিয়ে এলো ।

হন হন করে বাড়ী কিয়ছিল অশেষ, তখনও রাত আছে । নদীর  
ধারে একটা নতুন বজরা দেখে থমকে পঁড়ালো গাছের আড়ালে ।  
কার বজরা ? কোথা থেকে এলো ? পুলিশের নয় তো ? তল্লাসী  
করতে—এসেছে ? শ্রুকুমার ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীতে যে অনেক জিনিষ  
রয়েছে অশেষদের বাড়ীতেও—বলা তো যায় না । ছুটলো অশেষ ।  
শ্রুকুমারকে জাগিয়ে তুলে জানালো সব ।

—চটপট সব সরিয়ে ফেল স্ক্রু, খুব সম্ভব সার্চ করতে এসেছে ।  
আমিও বাই, আমাদের ঘরেও ।

শ্রুকুমার বলে—দূর, ভোঁদের বাড়ী সার্চ করবে না—কোন বার  
তো করে না ।

—না রে, এবার মনে হয় টের পেয়েছে, কতদিন আর চাপা  
থাকবে । সেদিন থানায় হাজরী দেবার দিন ছিল শ্রীমন্তদা'র, ফেবার  
পথে যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন দীর্ঘ খুড়ো দেখেছিল ।  
তখনই শ্রীমন্তদা' বলেছিলেন এবার তুই গেলি অশেষ : ও বুড়ো  
এখন ঠক্কঠক করে থানায় যাবে । বাটা একটা স্পাইট-লাক  
তুই প্রস্তুত হ', দেখিস ভুল করে বিষ্ণুর মত বিপদে ফেলিস নি ।  
ওর জন্তেই তো বজ্রনদা'রা সব ধরা পড়ল ।

বলেই ছুটলো সে । সব ঠিকঠাক করে শুয়ে পড়ল ।—আর  
সত্যি সবার সৃষ্টির জড়তা না কাটিতেই সদল বলে দারোগা বাবু এসে  
হাজির হলেন ।

—শ্রুনীল বাবু, বাড়ীটা একটু দেখব ।

তখন শুধু মামীমা বা শান্তি আর বেণু নয়, বড়দা' পর্যন্ত হতবাক ।  
এ বাড়ীতে স্বদেশী কাবে ঢুকলো ! ষাট হোক, কিছুটা পাওয়া গেল  
না । শুধু বাজে কাগজের স্তূপ পড়তে পড়তে হেমন দারোগার মাথা  
উঠল ধরে—অশেষের মুখে ছুটু হাসির ঝিলিক—গ্যা ফলে গেল ধীরে ।  
তাঁরা বেরিয়ে যেতেই বড়দা' রাগে ফেটে পড়লেন, মামীমা শব্দক  
চোখের জল ফেসলেন অশেষকে এই সর্দানা পথ ছাড়বার অত্যাচার  
জানিয়ে । অশেষ নিরীকান !—তারপর প্রায় প্রতি মাসেই দারোগা  
বাবুর আগমন হতে লাগল—বাপারটা ক্রমেই গা মগড়া হয়ে পঁড়াল  
—সবাই মেনে নিল ।

[ আগানাবারে সমাপ্ত ।

## আকর্ষণ

অমুজা দেবী

আমাকে সচকিত করে  
বিনিত্র রজনী আমার সাথে যুগোযুগী হল,  
বলল : শুকতারা আর কোনদিন  
বিদায় নেবেন,  
সূর্য-প্রহরের প্রথম লগ্ন আর কোনদিন  
প্রথম পরশ দেবেনা ।

আমার সচকিতভাবে কেটে গেল  
মৃত্ত হেসে বলি : তবে তো তোমার অনেক কাহিনী  
তখন মহাবাহিনী হাসলো । ক্লান্ত তরুর আয়েস  
ভাংগা আবিলতা এনে  
কালো শাড়ির স্নগ্ধ আঁচল বৃক্শের ওপর  
টেনে দিল । বলল :

তবে গুচ কথাটি বলি শোন,  
এ পৃথিবীর পুনরুত্থান বিপ্লবের আশ্রয়ে  
আর কোনদিন যাতে না জাগে,  
তারি মহাব্রত নিয়েছি আমি,  
ধ্বংসের মহরা চলেছে  
সৌরজগতে ।



জুমিষা বলেন

ঠিক যাহা চেয়েছি  
তাই আমি পেয়েছি

আজ্ঞামূলবিশিষ্ট মম ঘন কেশরাশি,  
কামদেব রাণী দেখে হাসে ঈর্ষাহাসি।  
এমনি কেশের রাশি তুমিও পাইবে,  
কে, এম, পির নারিকেল তৈল  
যদি ব্যবহার করিবে।  
জীবনের শুরু হ'তে জীবনের শেষ,  
শুভ্র কভু হ'বেনাকো তব কৃষ্ণ কেশ।

**কে,এম,পি**

মার্ক।

**নারিকেল তৈল**



ফোন  
৩৪-৩৪১৪

গ্যারান্টি ১০০% খাঁটি

২ পাঃ ১ পাঃ ২ পাঃ ও ৫ পাঃ  
'সিল' করা টিনে এখন সর্বত্র  
পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক

পবিত্র হিন্দু অয়েল মিলস্  
১নং, মেছুয়া বাজার স্ট্রীট,  
কলিকাতা-৭



# খেলা হল

ফুটবল

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব দীর্ঘ আট বছর পরে লীগ বিজয়ের সম্মান অর্জন করায় ক্রীড়ামোদী মাঝেই খুসী হয়েছেন। এবারের লীগে মহামেডান দল অজ্ঞাত, দলগুলি অপেক্ষা অনেক উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রকাশ করে লীগ বিজয়ের সম্মান অর্জন করেছে। এইবারের লীগ বিজয় মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় খুলনা করল। ইতিপূর্বে একমাত্র ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব আট বার লীগ বিজয়ের সম্মান অর্জন করেছিল। মহামেডান দল এবার নিয়ে ন'বার লীগ বিজয়ের সৌরব অর্জন করল।

এবারের ক'লকাতা মাঠে লীগ খেলাগুলি শেষ হওয়ার পর দেখা গেছে, ক'লকাতার ফুটবল খেলার মান অনেক নিম্নসুখী। খেলোয়াড়দের মধ্যে সে নৈপুণ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

খেলোয়াড়দের এই ব্যর্থতার মূলগত কারণগুলি অগ্রসন্ধান করলে দেখা যায় যে, তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগ সুবিধার অভাব। ক'লকাতার বড় বড় ক্লাবগুলি লীগ ও শীর্ষ বিজয়ের জন্য বাইরে থেকে প্রতিবছরই খেলোয়াড় আমদানী করেন। শেষ পর্বন্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে ঠিক মত বোঝাপড়া না থাকায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ দক্ষতা দেখাতে চান। সেইজন্য খেলার মান ক্রমশঃ নিম্নসুখী।

খেলোয়াড়দের সুযোগ সুবিধা নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছিলাম বলে মনে হচ্ছে। তবুও এই প্রসঙ্গে হুঁ-চারটে কথা বিবেচনা করে দেখার মধ্যেই কারণ আছে বলে মনে করি।

খেলোয়াড়রা যখন অকল্যাণে হয়ে পড়েন সেই সময় তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করা একরকম দুঃসহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। যে প্রতিষ্ঠানের জন্য বোবনের অমূল্য সময়, শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষ করে দিতেছেন সেই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন শেষ হওয়ার তাঁর দিকে দৃষ্টিভ্রমের প্রয়োজন আছে বলে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা মনে করেন না। শুধু সেই প্রতিষ্ঠান কেন—আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষের যে বাজেট কর্তৃত্ব আছে, সে কথা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা চলে না।

প্রতি বছরই 'চারিটি' খেলার ব্যবস্থা হয়। এতে আই, এফ, এ-র বাৎসরিক আয় কয়েক লক্ষ টাকা। কিন্তু এই সমস্ত টাকা ঠিক মত ব্যয় করা হয় না, তায় প্রকাশ ১৯৫০ সালের আই, এফ, এ-র বিভিন্ন খাতে আয়-ব্যয়ের হিসাবে। এই আয়-ব্যয়ের হিসাব হইতে মাত্র হুঁ-একটি ঘূঁটাও উল্লেখ করিতেছি।

এক কথায় আই, এফ, এ-র হাতে মোট টাকা আদিস্বায়ে ৪,১৬৮১৬ ৮/৯ পাই আর ব্যয় হইয়াছে ২,০০১২২ ৮/৬ পাই।

টেনিসখেলার জন্য ব্যয় হইয়াছে ২,৪৪২।০ পান। 'মিনারেল ওয়াটারের' জন্য ব্যয় দেখান হইয়াছে ৩,০৭৭/০ পান। এই

খেলোয়াড়রা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরিয়া জল পান ব কিন্তু আই, এফ, এ-র হিসাবে প্রতিটি চারিটি খেলার আয় দুই শত টাকার মত 'মিনারেল ওয়াটারের' জন্য খরচ হই এখন প্রশ্ন হইল, এত রঙিন জল পান করিল কে?

তাছাড়া বকশিশ বাবদ খরচ হইয়াছে ১\*৬১ টাকা। কাহাদের বকশিশ দেওয়া হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ জনসাধারণের টাকা খেলোয়াড়দের শ্রমে উপাধ্বিত। ত বখেচ্ছাচারের সন্ধানে সাধারণের বলার অধিকার আছে। এ সরকারের হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি।

খেলোয়াড়দের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বলা যায়, এফ, এ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলেই চারিটির টাকা হইতে কিছু স্বতন্ত্র ভাবে রাখিয়া দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্য করিতে পারেন

কলকাতা মাঠে আই, এফ, এ শীর্ষের খেলা শুরু হয়ে আই-এফ এ শীর্ষের ইতিহাসটুকু বলেই এবারের মত খেলার আলোচনা শেষ করব। আগামীবারে আই, এফ, এ খেলাগুলি বিস্তৃত আলোচনা করব। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, বহিরাগত দলগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী দল সেই সমস্ত দলগুলির মধ্যে কোন দল যদি শীর্ষ গৌরব অর্জন করে তাহ'লে আশ্চর্যাবৃত হওয়ার কোন নাই।

আই, এফ, এ শীর্ষ প্রতিযোগিতা ভারতের অজ্ঞতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আই, এফ, এ শীর্ষের খেলা শুরু। ১৮ শেখের দিকে ডালহৌসী ক্লাবের সম্পাদক এ. আর, ডব্লিউ ও বি সি লীগুসে, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ওয়াটসন, শোভাবাজার এন, সর্বাধিকারী একটি সভার স্থির করেন 'ট্রিডস কাপ' থেকে বড় করে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন, যাতে শক্তিশালী দলগুলি ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানের শ্রেষ্ঠ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারে; তাহলে ভারতীয় খেলার মান অনেক উন্নত হবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যক আধিক করলেন কুচবিহার ও পাতিয়ালায় মহারাজা, শ্রীর এ, এ, ও ডালহৌসী ক্লাবের জর্জেন সঙ্গত।

আই, এফ, এ-র প্রতিযোগিতার প্রথমবারের খেলা হ'ল ভাগ করে খেলান হ'ল। একটি বিভাগের খেলা এক অপর বিভাগের খেলা ক'লকাতার অধুষ্ঠিত হয়। ১৩টি দল এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। লন্ডো রয়্যাল আইক্লিপ বেজিমেন্ট এক ক'লকাতা বিভাগে ফিরে ডিভিশন আয়, এ, জয়লাভ করে ক'লকাতার ডালহৌসী পরম্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই খেলার রয়্যাল আই

— প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মোহনবাগান দল ১৯১১ সালে ১৬ বিজয়ের গৌরব অর্জন করে।

ইউরোপ সফর করে এসেছে এবং পোলো খেলায় উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে ড্রসী প্রশংসা অর্জন করেছে।

দ্বিতীয় ডিভিশনের লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে হাওড়ার ঠাকুরশানাল ক্লাব। সুতরাং আগামী বার থেকে ইন্টারশানাল লীগকে প্রথম ডিভিশনে খেলতে দেওয়া হবে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, পর পর তিন বছর হাওড়ার তিনটি টিম দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে প্রথম ডিভিশনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। ১৯৫৫ সালে বালী প্রতিভা। ১৯৫৬ সালে হাওড়া ইউনিয়ন ও ১৯৫৭ সালে ইন্টারশানাল ক্লাব।

### প্যারালিম্পিক

কয়েক সপ্তাহ আগে ব্যাকিংহামশায়ারের ষ্টোক ম্যাণ্ডভিলে ঐতিহাসিক প্যারালিম্পিকের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। ব্যাংক শ্রমিক আধুনিক অলিম্পিকের সৃষ্টি করে খেলাধুলার মাধ্যমে যে মজা ও সৌভাগ্যের বন্ধন এনে দিয়েছেন, তারই মত অভিশপ্ত কল্যাণ মুক ও বধিরদের জন্য ফ্রান্সের আর এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি ই অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হলেন মঃ কলেস আলকেস। ষ্টোক ম্যাণ্ডভিলের হাসপাতালের ক্রীড়ালয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের কয়েক শত প্রতিযোগী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বিজয়ী তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছে আমেরিকা। এরপরই ষ্টোক ম্যাণ্ডভিল হাসপাতালের স্থান।

জ ভিলে এবার বিশ্ব পোলো প্রতিযোগিতায় এবারে ভারত ৫-২ গালে পরাজিত করেছে 'সেভারসিন' দলকে। 'সেভারসিন' দলে গাল, স্পেন ও মেক্সিকোর খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা আছেন।

ভারতীয় পোলো দল যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দল, সে কথা কারো জানা নেই। ইতিপূর্বে ভারতীয় দল বেসরকারী ভাবে কয়েকবার

### সাঁতার

ইংলিস চ্যানেল অতিক্রমের আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় মহিলা সাঁতারে গ্রেট এণ্ডারসন প্রথম স্থান লাভ করেছেন। মহিলা সাঁতারের পক্ষে ইতিপূর্বে ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করা সম্ভব হলেও আজ পর্যন্ত কোন মহিলার পক্ষে প্রথম স্থান অধিকার করা সম্ভব হয়নি। ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করতে গ্রেট এণ্ডারসনের সময় লেগেছে ১৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট আর দ্বিতীয় স্থানধিকারী কেনথ রে ১৬ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে অতিক্রম করেছেন।

ভারতীয় সাঁতারু মিহির সেনের এবারের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেছে। মিহির সেন সাড়ে ১৪ ঘণ্টা জলে থেকে সন্তান্য স্থানে পৌঁছাতে পারলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে আর একজন সাঁতারু হিমাদ্রি রায়। সেড়ে ঘণ্টা সাঁতার কাটার পর প্রচণ্ড শীতের জন্য জল থেকে উঠে পড়েন।

বাধীনতা-সংগ্রামের শতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ 'বু-জয়ন্তী' উৎসবে খেলাধুলার আয়োজন করেন। একটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে স্বর্গীয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির নামাঙ্কিত শীত উপহার দিয়েছেন। খেলাটিতে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ২-০ গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত করে।

বাধীনতা লাভের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানে ইতিপূর্বে দুই একজন কীর্তমান ক্রীড়াবিদকে সতর্কতা জানানো হয়েছে। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক এস, রায়কে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সতর্কতা জানিয়ে একজন প্রকৃত গুপী ব্যক্তিরই সমাদর করেছেন।

## কান্না-ভরা আকাশ

সৈয়দ হোসেন হালিম

আবার জমাট অন্ধকার।  
আকাশ-মাটিতে জমানো বরফ।  
ফিসফাস আকাশ-বাতাসে,  
বর্ষণের আগে স্থির মৌন প্রস্তুতি—  
বেদনার-ভেঙে-পড়া শোকাত্ত জননীর  
কান্নার পূর্ব মুহূর্ত।  
অন্ধকার কালো জলে কিরণ ফটিক  
অশ্রুটি স্বচ্ছতা।

মেঘের ছাদের নীচে রৌদ্র-নিশিত  
হামাগুড়ি দিয়ে ইটের নিখল প্রয়াস  
কাকের দীঘল চোখে অকৃত দৃঢ়তা—  
সাগর লজ্জনে হুসোহাসিক নাবিকের কাঠি।  
চেনাদের ডালে-ডালে দুরন্ত অস্থিরতা।  
আকাশ-মাটিতে নীরব প্রস্তুতি—  
বরফ গলার পূর্ব মুহূর্ত।  
পানকৌড়ির কালো রঙে হলুদের চৌরা—

ডুবকাটা পাখীর রঙে দরিত্রের নীরব সতর্কতা।

দেশলাই বলার পূর্ব মুহূর্তে

বারুদের বোবা কান্না।

জিরো ডিগ্রিতে চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের

বরফ-গলানো হিট।

আকাশ-মাটিতে সজল সিঁদুর—

শোকাত্ত জননীর কান্নার পর মুহূর্ত।



### হারানো সুর

যুক্তি কাহিনীর পটভূমিকার মধ্যে নতুন কিছু নেই। কেন না, বহুকাল আগে প্রদর্শিত বোনাস কোলমান ও গ্রীয়ার গারসন অভিনীত রাগের চারভেট এবং পঙ্কজ মল্লিক অভিনীত সাদাকালো (?) কেই বার বার মনে করিয়ে দেয় হারানো সুরের কাহিনীর মূলমন্ত্র, তবু ছবিটির চিত্রায়নের দিকে যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন নির্মাতাবর্গ, সে প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসারই অর্হাৎ হারানো সুরের চিত্রনৃত্য শুধু লোকের সমর্থনলাভ করবেই, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। বিশেষজ্ঞদের কাছে জানা যায় যে, ইচ্ছা বিশেষ রকমের ছুটিনার মাছুরের মস্তিষ্কের প্রতিফ্রিয়াসিল স্তর শিরা-উপশিরাগুলি আঘাতপ্রাপ্ত হলে সাময়িকভাবে বিপর্যাস্ত হয়ে যায়। বার কাল আঘাতগ্রস্ত মাছুরের মনে শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যৎই আসন পায় এক অতীত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়ে বার বিশ্বাসের অতল অন্ধকারে। ঠিক অল্পবয়স্কভাবেই আবার যদি সে আঘাত প্রাপ্ত হয় তখন সেই শিরা-উপশিরাগুলি আবার বন্ধ হয়ে যায় আসে; যোগী তখন আবার অতীতকে মনে করতে পারে কিন্তু এই মহাবতী আসে হুড়ে বার চিরকালের জন্যে তার মনে থেকে। এই পটভূমিকার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে হারানো সুরের কাহিনী। কাহিনীর প্রথমার্ধে কাহিনীকারের কৃতিত্বের ভাবব হতে উঠেছে। মানসিক চিকিৎসালয়ের কর্মপ্রণালী, গল্পায়িত করে কাহিনীটিকে মনোময় করে তোলা হয়েছে। চিত্রের গতিও বাধাহীন ভাবে প্রবাহিত। ছবিটির আর একটি প্রধান গুণ যে দুটি একটি অখ্যাত ছাড়া প্রায় সারা ছবিতেই পরিবার অর্থাৎ কোন জন দুর্বোধ্য নয়। অর্থাৎ প্রেরণকৃত, প্রত্যেকটি সলাপ পর্যন্ত অতি সহজসোধ্য, চিত্রনাট্যকারের কৃতিত্বের প্রমাণ। অবশ্য একবারে দেখাওটি নেই কলমেও ভুল হবে। যে অলোককে পুণিলে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই অলোককে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দিয়ে এসে বসে তার সৌজন্য্য পরিবর্তন না করিয়েই (পলাশপুর এসে সে মিথি বাড়ি-গোঁক কামিরে সভা-ডবা হয়ে উঠল), পুণিল সবচেয়ে বসে কি বেশোরা—তারপর দেখা গেল

লোকের লক্ষণ বলে মনে হয় না। ছোটবেলা থেকে অলোক উঠে পড়ল অথচ বসে সে উঠে খাড়াল তখন দেখলুম সে সম্পূর্ণ অক্ষত। ওরকম ভাবে খাড়া থেকে যে পড়িয়ে পড়ল তার সেই কি সোহা দিরে তৈরী যে একটু হুড়ে পর্বত মেল না? খালা অলোকের ভাড়া, ওরকমই পরিবারভুক্ত অথচ তার বা-বাবার কোন সন্ধান নেই, এমন কি তারা কৃত হলেও তাদের সন্ধ্যে কোনো উল্লেখ পর্বত নেই—প্রথম দিকে হাসপাতালে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে উপস্থিত তখন মুখোপাধায় অভিনীত চরিত্রটি যদি আলার বাবার চরিত্র বসে করে নেওয়াও যায় তা হলে হাসপাতালে অলোককে গোড়া থেকেই দেখতে পাচ্ছি পাগলের বেশে কিন্তু কেন? ছুটিনার সে যুক্তিসঙ্গতিটুকুই হারিয়ে ফেলেছে তা ছাড়া আর তার সব ঠিকই আছে। এমন কি তার সলাপের মধ্যেও পরিচালক উদ্ভাসমূলক কোন সলাপ ছুড়ে দেন নি—চন্দ্রাবতীর সঙ্গে সে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলেছে, অথচ তার রূপসজ্জা দেখে মনে হয় সে বেন একটি পাগল—একজন যুক্তিহীন আর একজন উদ্ভাসে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান যেমন ভয়ানক মারাত্মক বকসের ভুল করেন তারা বার নজরুল ইসলামের যুক্তিসঙ্গত মূল্যতা এবং ভঙ্গুভর্তী ভক্ততা দেখে তাকে 'পাগল' বলে অভিহিত করেন। এখানেও অলোকের ভক্ততার জন্যে তাকে পাগল সাজিয়ে ঠিক সেই বকম দুইই করা যায়।

অভিনয়ক্ষেত্রে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সূত্রিকার। বাংলা দেশ আজ সূত্রিকা সেনকে সত্যি গর্ব করতে পারে, সূত্রিকার অভিনয় বৈচিত্র্যপূর্ণ, একচেয়েমী নেই, শুধু তাই নয় এই প্রেমিকা তরুণীরই যে রূপ তিনি একটি ছবিতে দুটিতে তোলেছেন আর একটি ছবিতে ঐ প্রেমিকা তরুণীরই একটি ভিন্নতর রূপ দুটিতে তোলেছেন এই ক্ষেত্রে তিনি আজ জন-গণ-মন-অধিকারিণী। উদাহরণস্বরূপ অরি পুরীক্ষা, শাপমোচন, সবার উপরে, সাগরিকা, শিল্পী, হারানো সুর প্রভৃতি ছবিগুলিতে তিনি এক চরিত্রেই অভিনয় করেছেন প্রেমিকা নায়িকার রূপ। কিন্তু সেই একটি রূপই তিনি উপরোক্ত প্রত্যেকটি ছবিতে দুটিতে ফুলেছেন ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিমায়। উত্তমকুমারও ভাল অভিনয় করেছেন, তবে সূত্রিকাকে তিনি এখানে অতিক্রম করতে পারেন নি। নবাগতা কান্তরী গুরুকে একটু সরস হতে চলে, হতে চলে আর একটু কোমল। পাহাড়ী সাজাল, দীপক মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রা দেবী তাঁদের নানানুভাবী অভিনয়ই করেছেন এবং লোক সাধারণকে আনন্দই দিয়েছেন। একটি কিছুকিমাকার ধরণের অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত, যোগীর সঙ্গে তাঁর দুর্ঘাবহার কাহিনীর ধারাই সমর্থিত কিন্তু যোগীর ধারের সঙ্গে তিনি যে ভাবে সলাপ বলেছেন তাতে করে তাঁর সন্ধ্যে আসেকার মত গাল আর পোষণ করা যায় না, বানিকটা লাফালাফি, নাচানাচি আ নানবীর অভিব্যক্তির নাম কি অভিনয়? চরম আকার কব হয়েছে খ্যাতিমান শিল্পী তখন মুখোপাধ্যায়ের প্রতি, একবার বার চন্দ্রাবতীর শিল্পে তাকে পীড় করিয়ে শুধু একটিমাত্র বাক্য 'চলুন'—তাঁর মুখে হুড়ে দিয়ে একটাসের মুখ হাসানো হয়েছে। পুথিকালিক যুক্তিসঙ্গতির মধ্যে তাঁর নামটি অক্ষত করা পর্বত প্রবেশকী বলে মনে করা হয় নি। ছোট্ট যুক্তিকার চমককারভাবে সব

রম্যারি, আবার কমা কর'—কলাপটি তিনি অপরূপে বলেছেন। এবং রবিবাহ উজ্জলতার ভঙ্গুর। এরা ছাড়া অভিনয়াদেশে আছেন পারিজাত বসু, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হরেন, বীরাঙ্গ বাস, প্রীতি জুমদার, অপ্সেন পাঠক, বোরা রায়, নোনা দেবী প্রভৃতি। অল্প কয় পরিচালিত এই ছবিটির চিত্রনাট্যকার সুবকার ও প্রচার-সচিব বাক্রমে নৃপেন্দ্রকুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও রমেন চৌধুরী।

## ব্রহ্মপট প্রসঙ্গে

মহামুনি কল্পের পাঁচজন কণ্ঠস্বরের সমন্বয় ঘটেছে চন্দ্রনাথ ছবিটিতে। কাহিনীকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্রনাট্যকার—নৃপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুবকার বরীন চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক—কার্তিক চট্টোপাধ্যায় এবং নায়ক উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী সাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, চন্দ্রা দেবী, পদ্মা দেবী, সুচিরা সেন, বেণুকা রায় ও রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি। \* \* পরতরামের পরমপাখর গল্পটির পরিচালনা ও সুব-বাচনার ভার গ্রহণ করেছেন বিশ্বের দরবারে বাঙলার গৌরববর্ধক পরিচালক ও সুবকার স্বাক্রমে সত্যজিৎ রায় ও রবিশঙ্কর। তপায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীমতী হাবীবালা সহ তুলসী চক্রবর্তী, পদ্মা পদ্ম বসু, জহর রায়, মণি শ্রীমানী এবং বাঙলার এক অসাধারণ অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। \* \* দেবকীকুমারের পরিচালনায় চিত্রায়িত হচ্ছে সোনার কাঠি।

অভিনয়ের জন্তে নির্বাচিত হয়েছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়, আশীষকুমার, প্রশান্তকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, ভারতী দেবী, তপতী বোব, প্রীতিমারা মুখোপাধ্যায়, সীতা সিং, শিবা বাস, শ্রাবনী চৌধুরী, সীমা দত্ত প্রভৃতি। \* \* হারামসিন্দুরীর পর বিভাপতির বোমকে দেখা বাজে অকৃত ইঙ্গিতের চিত্রকর-পরিচালকরূপে। সুয়েডনাথ মিত্রের এই কাহিনীতে সুবাবোপ করছেন বরীন চট্টোপাধ্যায়। কপায়নের দায়িত্বগ্রহণ করছেন ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, নীপক মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, চিত্রিতা মণ্ডল ইত্যাদি—এর সলাপ রচনা করেছেন সম্প্রতি পরলোকগত সাহিত্যিক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। \* \* কিশোর কবি ছবিটিতে পরেন মজুমদারের পরিচালনায় আপনায় দেখতে পাবেন পাহাড়ী সাজাল, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, সাধন সুবকার জহর রায়, শোভা সেন, দেববাণী, অপর্ণা দেবী ও নবাগতা মহলিকাকে। বাঙলা দেশের এক ভাব্যবিক্রিয়িত প্রতিভাবর কবির জীবনীই এর কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। \* \* বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'অভিষাপ' ছবিটিতে অভিনয় করেছেন কাছ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, শুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, মল্লু দে, শোভা সেন, প্রীতিমারা মুখোপাধ্যায় ও সীতলী। \* \* শৈলেন দেব কাহিনী অবলম্বনে এবং অল্প সুবকারের পরিচালনায় গড়ে উঠেছে বাগদত্তা ছবিটি। এতে অভিনয়াদেশে আছেন ছবি বিশ্বাস, বীরাঙ্গ ভট্টাচার্য, বরীন বহুমদার, প্রশান্তকুমার, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্ডল বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্মা সাজাল, পদ্মা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায় এবং তপতী বোব প্রভৃতি অনাবদ্য শিল্পিবর্গ।

## আলো চাই

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

সারাদিন কর্ণবাত শিনাক্তের শেষে  
সেহময় আহত অবশ,  
তস্ত্রাত্তুর অসাড় নিভত হ্রাস দুই চোখে  
জীবৎ-মাত্রির ঘনশীল বর্ষণ, ঘুম আসে।  
সেহ এলাই নিভত জাঁধার বকে  
জানাতুর জাঁধি তার পর কঁকে কঁকে,  
আমি দেখি বাতালপথে ফেরে আছে সীমানীন জাঁধি  
নব জনস্রের ইশারায় কে বেন আমায় ডাকে।  
কখন তস্ত্রাত্তুর চোখে অভকার সীমায় বাহিরে  
অনন্ত সৌন্দর্য্য মারে বুঁজে কিরি একটুকু আলো,  
অজ্ঞাতমী কঠকরে জ্বাব আসে আলো নাই আলো নাই  
বক্যা পৃথিবীর বুক জাঁধির অজস্রিত সার।

চমকে উঠি রুহ নিঃশ্বাসে  
কে বেন নোশা রক্তের খাবার...  
বহু তুখা মাহুবেব রূপিত ছিল  
বহু চোখে অটহাসি হাসে পাশব পীড়নে।

সমস্ত প্রহরী তাই দেখি তারা মোতাকের মাথে  
পথে পথে রক্তমোতী হিত্র দস্তরায় বোরে,  
হৃতিক উজাড় ঘরের আনাচে কানাচে  
রক্তচক্ষু শিতসের গলা টিপে ধরে।

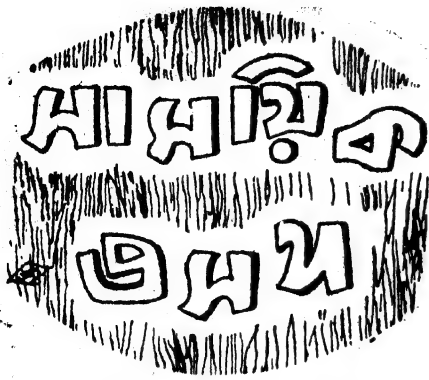
ভবুও অব্যাহ আমায় বলন্ত চোখ  
বয়লারের আগুনে বলসে বাতায়র কড়া বুখে,  
এ বাঁকালো বোকে পোড়া জাঁধির কালো পেখীতে  
কঠিন লপথ মেয়ে তস্ত্রাত্তুর চোখ ওঠে রুখে।

অনন্ত আলোর আকাশ তলে

বে জাঁধার স্পর্শে করেছ তুমি মোরে স্বপ্নাত্তুর,

উন্নত চলার পাথে আজ জানাই প্রতিবাদ

হে বহিষ্কৃত! আপাদ্রী বিনয়ের মাঝে একটু আলো চাই।



### কাপড়ের কলের চক্র ও চক্রান্ত

“রাজ্যসভায় শ্রীপুথীরাঙ্গ কাপুর জিজ্ঞাসা করেন যে, মিলগুলিতে মজুত কাপড় ক্রয় করিয়া জনসাধারণের নিকট কম দামে বিক্রয় করিবার কথা গভর্ণমেন্ট চিন্তা করিতেছেন কি না? কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ঐরূপ কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই এবং তিনি মনে করেন যে, গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন না। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রীর এই উত্তরে আমাদের বিমিত্র হওয়ার কিছুই নাই। জনসাধারণ কাপড় কিনিতে পারিল কি পারিল না তাহা লইয়া দ্বাধা দামানো হয়ত তাঁহার কর্তব্যের মধ্যেও পড়ে না। কাপড়ের কলগুলিতে মজুত কাপড় জমিয়া উঠিতেছে। তাহা জমিয়া উঠুক, তাহাতে কি আসে-যায়? একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন যে, মজুত কাপড় খালাস করিবার জন্য তিনি উপযুক্ত সময় (appropriate time) পর্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। তিনি প্রায়টিকে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। কাপড়ের কলগুলিতে কাপড় জমিয়া উঠিতেছে। বেশী দামের জন্য লোকে প্রয়োজনীয় কাপড়ও কিনিতে পারিতেছেন না। এই সকল মজুত কাপড় খালাস করিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত সময় আর কি হইতে পারে? তিনি মনে করেন, বেশী দাম সত্ত্বেও লোকে কাপড় ক্রয় করে (people have gone in for cloth even when the prices are high)। এই উক্তির মধ্যে জনসাধারণের অবস্থা স্পষ্টে তাঁহার অন্তর্ভুক্তই পরিচয় পাওয়া যায়। দাম বেশী হইলে সর্বশেষ পরিমাণে কাপড় ক্রয় করেন, ঐরূপ লোক অবশ্যই আছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ হেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পরেন, নিতান্ত দারো না ঠিকিলে বেশী দাম দিয়া কাপড় ক্রয় করেন না। অধিকাংশ দ্ব্যবসিত শ্রেণীর লোক বৎসরে কয়খানা কাপড় পরেন, তাহা তিনি জানেন কি?” —দৈনিক বঙ্গমতী।

### নিরামিষ ভোজন

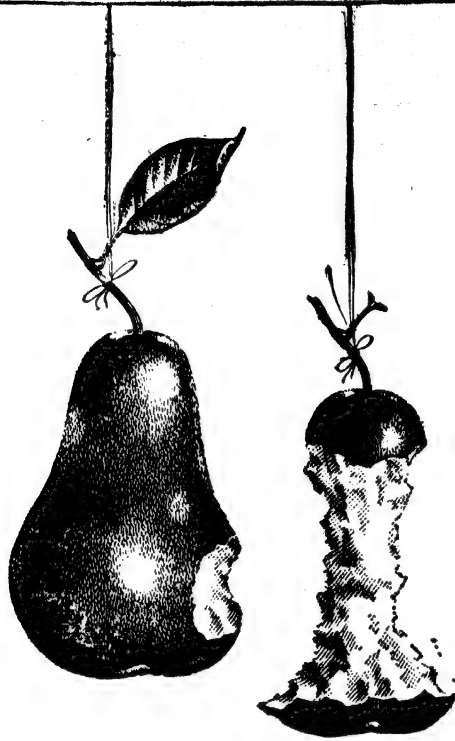
“আগামী নভেম্বর মাসে বোম্বাই নগরে বিশ্ব নিরামিষাশী সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। মণ্ডনের আন্তর্জাতিক নিরামিষাশী সমিতি, বোম্বাই-এর জীবহিতৈষী লীগ, নিখিল ভারত পশুপক্ষী সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নিরামিষাশী সম্মেলনকে

সিহল, জাপান, কানাডা, মালয়, তিব্বত, ইটালী, বুটেন প্রভৃতি পঞ্চাশটি দেশ সম্মেলনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং সম্মেলনে প্রতিনিধির সংখ্যা খুব কম হইবে না। কিন্তু সম্মেলনের পক্ষ হইতে নিরামিষ ভোজনের অর্পণকে যে প্রচার কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আমিষ ভোজনের ফলে মানুষের রক্ত-বিকৃতি ঘটে, রোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি ভোঁতা হইয়া যায় ইত্যাদি না হয় বুঝা গেল। কিন্তু আমিষ ভোজনের ফলে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং নিরামিষ ভোজন আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রী বজায় রাখিয়া যুদ্ধ নিবারণে সাহায্য করে, এই ধরনের কথার তাৎপর্ষ্য বুঝিয়া উঠা কঠিন। অবশ্য জীবপ্রীতি ও সান্ত্বিকতার দিক হইতে নিরামিষ আহারের গুণপনা অনেকেরই স্বীকার করিয়াছেন। গান্ধীজী, বার্গার্ড শ' প্রভৃতিও এই দলে। তবে জৈব-প্রোটিন আহার ভিন্ন মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সামর্থ্য পুষ্ট হয় না এবং নিম্ন রক্তচাপ ও ক্রোনোরী আক্রমণ ইত্যাদির ভয় থাকে, ইহাই বলেন অধিকাংশ বিজ্ঞ ব্যক্তি। সুতরাং প্রশ্নটি লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতবৈধ আছে। হয়ত আলোচ্য সম্মেলনে সমস্তর একটা নির্ভরযোগ্য মীমাংসা হইয়া যাইবে।”

—যুগান্তর।

### পাকিস্তানী নির্বাসন

“পাক প্রধান মন্ত্রী জিন্নাহবর্গী বহু খামেলার মধ্যেও সময় করিয়া ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গ সফরে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। সব্বদে প্রকাশ : তিনি পূর্ববঙ্গে গিয়া তাঁহার আগুয়ামী লীগের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন, কুবক প্রজাপাটির কতককে লইয়া বা ভাগাইয়া ‘কোয়ালিশন’ গঠনের চেষ্টা করিবেন এবং এই শক্তি-বৃদ্ধির উপর ভরসা করিয়া আগামী ইলেকশনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবেন। আর চেষ্টা করিবেন—পূর্ববঙ্গের আগুয়ামী লীগের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট (বর্তমানে জাতীয় আগুয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট) মোলানা ভাসানীর জনপ্রিয়তা লাভ করিতে—বলা চলে, মোলানা ভাসানীর জনপ্রিয়তা খতম করিতে। মোলানা ভাসানী নাকি মফঃব্বলের জনসাধারণের ইতিমধ্যেই চিত্ত হরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মোলানা ভাসানী সত্যই জিন্নাহবর্গীর গতিপথে এক কণ্টকবরুণ। ঢাকার একটি সব্বদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, মোলানা ভাসানীকে খতম করিবার বড়যন্ত্রও আছে। তাঁহাকে মারিয়া কেলিবার কথা বলিয়া জীতি প্রদর্শন করিয়া অনেক চিঠিপত্রও নাকি ছাড়া হইয়াছে। মোলানা ভাসানী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ঢাকার সম্মেলনে জাতীয় আগুয়ামী লীগ নামে একটি দল গঠন করিয়াছেন। এই দলের আহুত সভাপতি মোলানা জিন্নাহবর্গীর আগুয়ামী লীগের সমর্থকগণ যেভাবে আক্রমণ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—বিশিষ্ট নেতাদের মাথা কাটাইয়াছে এবং পরে পূর্ববঙ্গের কোন কোন সহরে উক্ত দলের সভা যেভাবে পণ্ড করা হইয়াছে, তাহা নিছক গুণামি ভিন্ন কিছু নহে। ক্ষমতার অধিষ্ঠিত লীগের নেতৃবর্গ এই সকল রাজনৈতিক গুণামির নিন্দা করেন নাই। সুতরাং মোলানা ভাসানীর নিরাপত্তা সর্বদা পূর্ববঙ্গের লোক চিন্তিত হইতেই পারেন। একমাত্র ভরসা—যদি জিন্নাহবর্গী তাঁহার দলের সমর্থকগণকে গুণামি ও মারামারি হইতে বিরত থাকিতে সশপথ করিয়া দেন, তাহা হইলে জাতীয় লীগের বিরুদ্ধে কোন



## দেখে পরখ-আমর দেখে পরখ...

অসেক জিনিষ আছে যা বাইরে থেকে দেখে পরখ করতে গেলে ঠিকার সম্ভাবনাই বেশি। যেমন ধরুন কল। বাইরে থেকে দেখে মনে হোল বেশ সরস, কাটার পর দেখা গেল ভেতরে পোকাকার খাওয়া। সেই জন্তে কল কেনার সময় দেখে পরখ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু সাবান বা অন্যান্য মোড়কের জিনিষ পরখ করা যায় কি করে? এর একটি নিশ্চিত উপায় বুদ্ধিমান সোকাবদারদের জানা আছে— তাঁরা দেখেন জিনিষটির নামটি গুত্রোপুরি বিখ্যাত-যোগ্য কিনা এবং সেটি এমন মার্কার জিনিষ কিনা যা তাঁরা ব্যবহার করেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন।

প্রায় ৭০ বছর ধরে জনসাধারণ হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষগুলির ওপর আস্থাভাবন কারণ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এই জিনিষগুলির গুণাগুণের কোন তারতম্য হয়নি। এই জিনিষগুলির ওপর তাঁদের আস্থার আর একটি কারণ, এগুলি বাজারে ছাড়বার আগে আমরা পরখ করে তুম্বাই ছাড়ি।

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী আমাদের সব জিনিষের ওপর—কাঁচা

মাল থেকে তৈরী হওয়া পর্যন্ত, আমরা পরীক্ষা চালাই। এ ধরনের পরীক্ষা চলে প্রতি সপ্তাহে সংখ্যায় ১২০০। আমরা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিই যে এ জিনিষগুলি সব রকম আবহাওয়াতেই চালান এবং মজুত করা যাবে। আমাদের পরীক্ষাগারে 'কৃত্রিম আবহাওয়া' সৃষ্টি করে আমরা দেখে নিই যে বিভিন্ন আবহাওয়াতে এ জিনিষগুলি কেমন থাকে। আপনারা বাড়ীতে এ জিনিষগুলি যে রকম ব্যবহার করে পরখ করেন, আমরাও ঠিক সেইভাবে এইগুলি পরখ করে দেখে নিই। আমাদের তৈরী জিনিষগুলির মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে—লাইকবর সাবান, ডালডা বনস্পতি, মিক্স, এস আর টুথপেস্ট অর্থাৎ সবগুলিই আপনাদের পরিচিত জিনিষ। এই জিনিষগুলির এত প্রশংসা কারণ এই জিনিষগুলি বিখ্যাত-যোগ্য। কঠিন পরীক্ষা চালানোর পর বাজারে ছাড়ি হয় বলেই এগুলি সর্ব-সাধারণের এত বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে।



দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার



বেরূপ পুরাতন লীগমার্কা আক্রমণ চলিতেছে, তাহাতে আগামী নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও অব্যাহ হইবে, ইহা মনে করাই শক্ত। মোলানা তাসানীর ভয়সাই তো অব্যাহ নির্বাচন।” —আনন্দবাজার পত্রিকা।

### নেতাজীর অসম্মান

“এক দিকে কলিকাতার আউটরাম মূর্তির জায়গার নেতাজীর ছবি পুলিশের হাতে লাঞ্চিত হইতেছে, হাজার হাজার লোক ঝাঁড়াইয়া তাহা নিকরকার চিত্তে দর্শন করিতেছে, আর একদিকে চলিয়াছে তাঁহাকে লইয়া উত্তেজিত কল্লনা ও গবেষণ। এক দিকে সবাদপত্রের নেতাজী মূর্তি সত্যাগ্রহের সবাদ ব্রাহ্মাউট করিতেছে, আর একদিকে কতকগুলি লোকের কল্লনা ফলাও করিয়া প্রকাশ করিতেছে। কিজা এক নেতাজী আলোচনার কাল্পনিক কাহিনী বাহায়া প্রচার করিয়াছে, নেতাজীর সম্মান তাহারায় থাকে নাই। নেতাজী ছিলেন অথও ভারতে বিদ্বান, অথও ভারতের বাহীনতা ছিল তাঁর ধানের আদর্শ। কিজা নাগাপাহাড় ভারত হইতে বিজয় করিতে, খণ্ডিত ভারতকে আরও খণ্ডিত করিতে ইচ্ছুক। নেতাজীর আশ্রণে বাহাদের লেশমাত্র বিশ্বাস আছে তাঁহারায় এই ব্যক্তির কাজে তাঁহার সম্মান কল্লনাও করিতে পারেন না। খেবর বলিতেছেন,—নেতাজী নেপালে ষাঁটি করিয়াছেন। নেপাল কি পৃথিবীর বাইরে মঙ্গলগ্রহে যে, তিনি সেখানে আসিয়া থাকিলে খেবর ছাড়া আর কেহ তাঁহার খবর পায় না? এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, নেতাজীর সঙ্গে তাঁর বোগ্যোগ আছে। অথচ তাঁহার মৃত্যুরহস্ত তদন্ত কমিটির সামনে সে উপস্থিত হয় নাই। ইহার কথা লেশমাত্র মূল্য নাই, নেতাজীর নামে কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করিয়া খবরের কাগজে নাম ছাপানোই ইহার উদ্দেশ্য। নেতাজী যদি জীবিত থাকেন এক যদি কোন কারণে এখনও ভারতে আসা বাহীনীর মনে না করেন, তবে তাহা লইয়া অঙ্গ গবেষণার কি প্রয়োজন? নেতাজীর বইগুলি তো কাহাকেও পড়িতে দেখি না? যে নপুসকের দল নেতাজীর সম্মান রক্ষার অগ্রসর হয় না, তাঁহার নাম উচ্চারণের অধিকার তাঁহাদের নাই। হেমন্ত বসু, অমর বসু এক নেতাজীর নূতন ভক্ত প্রফুল্ল ঘোষ এক জ্যোতিষ বহুকে খালাস করিয়া একটি শাড়ী ও দুই গাছি প্রান্তিকের চুড়ি বেঙ্গল ভ্রাশনাল ভ্রাশটিকার বাহিনী পাঠাইয়া দিলে উচিত কাজ হইবে।” —যুগবানী (কলিকাতা)

### নেহরুজীর আফালন

“ঐনেহরু রাজ্যসভার খুবই আফালন করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গোয়াকে যদি সামরিক জীভাতের বড় রকমের কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সামরিক ষাঁটিতে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে সেই প্রচেষ্টা খুবই গুরুতর হইবে এক ইহা ভারতের প্রতি অবজ্ঞানোচিত কার্য হইবে। ভারত কখনই তাহা বরদাস্ত করিবে না। কান্দীর সমস্তার উল্লেখ করিয়াও ঐনেহরু বলেন যে, কান্দীরে পাকিস্তান যে অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস পাঠিতেছেন, ভারত তাহার বোধোচিত উত্তর দিবে। আমাদের বিশ্বাস, লোকসভা ও রাজ্যসভার দেশের বহু রাজনীতিবিদ ও বিদ্বানের সমাবেশ ঘটাইবে। তাঁহাদের সম্মুখে নেহরুজী এই ভাবে আফালন করিবার স্পর্শা কি তাহা রাখেন তাহা আমরা বৃথিতে পাই না। নেহরুজী বহন বার বার ঘোষণা

করিতেছেন যে, গোয়ার সামরিক ষাঁটি স্থাপনের প্রচেষ্টা বা পাকিস্তান কর্তৃক কান্দীর আক্রমণ ভারত সহ্য করিবে না তখন ভারত কি করিবে তাহার প্রকৃত পাঠ্য জবাব তাঁহার নেহরুজীর কাছে চাহেন নাই কেন? বিরোধী দলের ২১৪ ব্যক্তি ছাড়া আর সকলে কি তবে জী হজুরের দল? কান্দীর লইয়া পাকিস্তান যে অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে এইরূপ মনে করা অব্যাবহিক নহে যে, অল্প ভবিষ্যতে পাকিস্তান পশ্চিমী রাষ্ট্র জোটের সহায়তায় কান্দীর আক্রমণ করিবে। ভারতের বৃকে যে হাজার হাজার পাকিস্তানী গুপ্তচরের অবলোকিত্রে তাহাদের কার্যকলাপ চালাইয়া বাইতেছে সেই দিন তাহারাও আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিবে এক ভারতের বিরুদ্ধে আত্ম ধারণ করিবে। আজ যে সমস্ত তথ্যকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দ ভারত শাসনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন, সেই দিন তাঁহাদিগকেও যদি রক্তমঞ্চে অপার দৃষ্টে অবতরণ করিতে দেখি তাহা হইলে আমরা আদৌ বিম্বিত হইব না। পাকিস্তান সরকারও তাহা জানেন। একটি মাত্র ব্যক্তির খামখেয়ালীর জন্য দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে, ইহা দেশবাসী কোনদিনই বরদাস্ত করিবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।” —যুগবানী (কলিকাতা)

### জলাভাবে কৃষকের হাহাকার

“বর্তমান জলাভাবে সর্বত্র কৃষকের হাহাকার ধনি উঠিয়াছে ও কৃষিকার্যে গভীর হতাশাস দেখা দিয়াছে। এ বৎসর অধিক বিলবে বৃষ্টি নামার লোকে কৃষিকার্যে হাত দিয়াছিল। সামান্য কিছু কিছু জমি গভীরাক্ষণগুলিতে আবাদ হইয়াছে বটে কিন্তু সাম্প্রতিক বৃষ্টির অভাবে প্রায় সর্বত্র কৃষিকার্যে ব্যাহত হইয়াছে। যে সমস্ত স্থানে আবাদ হইয়াছিল প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে তাহাও শুকাইয়া বাইতেছে। কৃষকেরা আকাশের দিকে তাকাইয়া দিন গণিতেছে। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ ঘনাইয়া আসে বটে, কিন্তু শবৎকালের জলহারা মেঘের স্তর সবই নিম্নল হইতেছে ও আদৌ সফল হইতেছে না। এ পর্যন্ত বেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে পুষ্করীগুলির অর্দ্ধাংশও পরিপূর্ণ হয় নাই। আণবিক শক্তির তেজস্ক্রিয়া অথবা ধূমকেতু আদির প্রাহুর্ভাবের ফলে যে কারণেই হউক পৃথিবীর অনর্থ ঘনাইয়া আসিতেছে। একে ত’ খাতসঙ্কটে দেশ ম্রিয়মান তার উপর বিধির বিধানে দেশবাসীর চরম দুর্গতি দেখা দিতেছে। ভগবানের কি ইচ্ছা কে জানে! আমাদের এতদক্ষলে সেচ ব্যবস্থা না থাকিলেও অবিলম্বে সবুজের লোণা জল বা সম্ভব হইলে সুবর্ণেরখার জল কেন্দ্রে প্রবেশ করাইলেও কতকটা উপকার হইতে পারে। কৃষিকার্যে জলাভাবে চারিদিকে বেরূপ দারুণ হাহাকার উঠিয়াছে তাহাতে এ বিবরে স্থানীর পূর্ণ কর্তৃপক্ষের ঘরানিত ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।” —নীহার (মেদিনীপুর)।

### লাল কিতার মাহাত্ম্য

“গত কৈশাখ মাসে ভাটপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত মাধিগ্রাম মৌজার এক ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২১টি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সরকার হইতে পুড়েবাগা বাড়ীগুলির পুনর্নির্মাণের জন্য এককালীন কিছু সাহায্য বা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা



আছে। তাই তাঁহারা ঋণের জন্ত দরখাস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোন ঋণ বা সাহায্য তাঁহারা পাইলেন না। এম, ডি, ও, অফিসে খোঁজ লইয়া জানা যায় যে, সেই দরখাস্তগুলি নাকি কমিশনারের কাছে পাঠানো হইয়াছে। ঋণ বা সাহায্য তাঁহারা কবে পাইবেন বা আদৌ পাইবেন কি না, সে বিষয়ে কোন স্থির নিশ্চয়তা নাই। সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গ কমিশনারের কাছে শারকলিপি পেশ করিবার উদ্দেশ্যে Case no ও issuing date চান কিন্তু তাহাতে সন্নিহিত পেশার নাকি জানান যে ইহা জনসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় নহে; এই দুঃস্থ বর্গীয় তাঁহারা বর্তমানে অভাবনীয় দুঃস্থতার মধ্যে পড়িয়াছেন। বর্তমানে সাহায্য পাইলে অতি অল্প খরচে তাঁহারা ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিতেন। নতুবা সম্পূর্ণ দেওয়ান খসিয়া পড়িলে চতুর্দশ খরচ বেশী হইবে। লাল ফিতার বাঁধা পড়িয়া এই সমস্ত দুঃস্থ ব্যক্তিবর্গ আর কত দিন দুঃস্থতালা সহ্য করিবেন! সরকার ইহা অনুধাবন করিবেন কি?"

—বার্তা (নিজপুর)।

### প্রবামূল্য

"মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, জেলায় খাল ও চাঁচল আছে এক চালানও পাইয়াছে। তাহা যদি হয় তবে প্রতিদিন মূল্য বাড়িতেছে কেন? নশা প্রয়োজনীয় প্রবাসির মূল্যও বাড়িয়া গিয়াছে। সরকার যাদি নিজে আসতে নিলে তাহা টিন ও সিমেন্টের পর্য্যায় আসিবে লিয়া তাহারাও বোধ হয় আশঙ্কা করেন। স্ততবা টাঙ্কের নাম ইনিয়াই ইউক এক চালান আসে নাই অজুহাতেই ইউক—যে কোন মজিয়ায় মূল্য বাড়িয়া দিলে বলিবার কেহ নাই। মানুষের ক্রয়শক্তি বাড়িয়া গিয়াছে, স্ততবা ভাবনার কিছু নাই। শুক বাড়িয়া দিলেও প্রবামূল্য বাড়ে না। উপর তলার ধারণা যেখানে এই, সেখানে মানুষের প্রতিকারের সমস্ত পথ রুদ্ধ। সর্বপ্রকার ট্যাংক বসাইয়া ও গাঙ্গ আদায় করিবার অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়া প্রবামূল্য কমান য় না। ঘূষের পরিমাণ কত বাড়িয়াছে তাহা হিসাব প্রতিকারের দাশ! থাকিলে ব্যবসায়ী দিতে পারে কিন্তু তাহা দিলে সে মরিবে এক বৃহত্তরীতাগণ নিশ্চিন্তে ও পরমানন্দে থাকিবে। অগণের, বৃষ, দুর্নীতি, গীড়ন প্রকৃতি বন্ধ করিতে পারিলে এ সকল সমস্যার সম্মুখীন হওয়া য়। সে পথ বন্ধ দূরে। তাহা করিতে গেলে সময়কালে চাঁদা বা সাহায্য করিবে কাহার?"

—ব্রিস্তোতা (জলপাইগুড়ি)।

### সংস্কার ?

"কংগ্রেসের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ কংগ্রেসকে শ্রদ্ধা আসনে খুন-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা সাধু সন্দেহ নাই। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব কংগ্রেসেরই উপর জন্ত হইয়াছে। জনগণের সেবা করিবার স্বযোগ যে প্রতিষ্ঠান লাভ করিয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানে যদি সাক্ষা মানুষের অভাব হয়, আদর্শভ্রষ্টের ভীড় জমে, ক্ষমতাচ্যুতের উদ্ভাটনা দেখা দেয়, তাহা হইলে সেই প্রতিষ্ঠান যে গণ-সমর্থন হারাইবে, ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। কংগ্রেস বলিতে পরাধীন ভারতে জনগণের প্রতিষ্ঠান বুঝাইত। এখন ইহা হল ছাড়া আর কিছুই নহে। একদা এই কংগ্রেসের পতাকাভূমি পাইয়া দেশবাসী এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের

বিক্ষয়ে লড়াই করিয়াছিল, এখন দেশের মানুষ কংগ্রেসে আসিত। পুলিশের বেয়নেটের সম্মুখীন হইতে, নির্বাসন-সাজনাকে হাসিমুখে বরণ করিতে এখনকার মত পারমিত সংগ্রহ বা এম, পি, ও এম, এস এ, হইবার জন্ত নয়। কংগ্রেস তখন ছিল ত্যাগ এবং জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। আজ কংগ্রেস তাহার সেই মহান ঐতিহ্য হারাইয়াছে। আজ আদর্শবান বহু মানুষ কংগ্রেস হইতে সরিয়া আসিয়াছেন। বাঁহারা কংগ্রেসে থাকিয়া এখনও আদর্শের পূজা করিতেছেন, তাঁহারা অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত। তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই অনাচার-অকাহারে দিন কাটাইতে হইতেছে। বাঁহারা আদর্শের ধার ধারে না, পরাধীন ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট বলিয়া বাঁহারা পরিচিত, তাহারা এই আজ কংগ্রেস দখল করিতে চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বাঁহারা কংগ্রেসের দুর্দ্বন্দ্বি দেখিয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া কত দলের দাশ লইয়া এম, এল, এ, বা এম, পি, হইবার আশায় নির্বাচনে মাতিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গত নির্বাচনে বাঁহারাভি রাজনৈতিক গাউন পরিবর্তন করিয়া বড় কংগ্রেসী সাজিয়াছিল। দেশবাসী তাহাদের এই অপব্যবহারিণি প্রত্যয় সের নাই। ইহাদের মধ্যে অনেকেই গোষ্ঠারান হারিয়া এখন স্বাধীনতা আন্দোলনের বর্ষ পালন করিয়া বাইতেছে। ইহারা যে কংগ্রেসের কলঙ্ক, বাঁহারা কংগ্রেস সংস্কারের জন্ত আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা কি এখনও এই কর্তার সত্য উপলব্ধি করেন মাই?"

—সমাধান (ছগলী)।



**ROY COUSIN & CO.**  
4, DALHOUSIE SQUARE  
CALCUTTA-1

Sole Agents for  
**COVENTRY WATCHES**  
Official Agents for  
**OMEGA & TISSOT WATCHES**

## আসামের বাঙালী ও বেকার সমস্যা

“আসাম রাজ্যের বেকার সমস্যার প্রতি ইন্দোনী রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আসাম রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাঙালী সমাজের মধ্যেই সর্বাধিক। উন্নত বাঙালীদের মধ্যে বর্তমানে এই সমস্যা অতি শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন বিভাগ উন্নতদের সঠিক পুনর্বাসনে সাহায্যকর আসাম রাজ্যের স্থানে স্থানে বিভিন্ন শিক্ষালয়ে এবং অজ্ঞাত প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত অর্থ সকল ক্ষেত্রে উন্নতদের স্বার্থে ব্যয়িত হয় না বলিয়া অভিযোগ করা হইতেছে। অজ্ঞানকে আসাম সরকার এখনও সরকারী চাকুরিতে উন্নতদের নিয়োগে বৈষম্যমূলক বিধান অনুসরণ করিতেছেন। এমন কি, আসামের স্থায়ী অধিবাসী বাঙালীদিগকেও সর্বত্র সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম হাইকোর্ট, ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজ, আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বহু সংখ্যক কর্মচারী কাজ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাদের মধ্যে বঙ্গভাষাভাষী প্রায় নাই বলিলেই চলে। আজ কাল আসাম অয়েল কোম্পানী এবং চা-বাগানসমূহেও বাঙালী নিয়োগে নানাক্রম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইতেছে। আসামে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাঙালীদের সংখ্যা যেখানে রাজ্যের মোট লোকসংখ্যার নান্দিক এক-তৃতীয়াংশ, সেখানে এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরণের কোন যুক্তি থাকিতে পারে কি? আমরা এই বিষয়ে রাজ্য কর্তৃপক্ষের সম্মুখে মনোবাগ আকর্ষণকরম আশু সুবিচার দাবী করিতেছি।”

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

## শরতের আগমনে

“শরৎ কালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এ দেশের এক বৈশিষ্ট্য। এই সময়ের মনোলাভী দৃশ্য—বন উপবন ও শান্তক্ষেত্র আদির স্বামিনী, সুশ্রুতি জ্যোৎস্নালোক, প্রকৃতির শীত সৌম্য মৃতি প্রাণে অনির্বচনীয় আনন্দ দান করে এবং ফল ফুল, তরীতরকারী আদির প্রাচুর্য লোকের মনে স্বভাবতঃই আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। তাই বাংলার কবি সময়টাকে শ্রেষ্ঠ ঋতু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এ বৎসর বুটিকালে বুটিক অভাবে কৃষিকার্য ব্যাহত হইয়াছে। তরীতরকারী আদিও পর্যাপ্ত উৎপন্ন হইতে পারে নাই, এতদ্ব্যতীত গৃহ তৈয়ারীর একমাত্র অবলম্বন বাঁশগাছ বুটিক অভাবে তাড়াও জটিল হইতে পারে নাই। কৃষিক্ষেত্রেও এখনও সম্পূর্ণরূপে জামল রূপ ধারণ করিতে পারিল না। অধিকন্তু এখনও অনেকস্থলে কৃষিকার্য চলিয়াছে জানা যায়। এত অসময়ের চাষ কৃষকের স্বকল পাটবার আশা কি? কাজেই শরতের আগমন সুখের হইলেও কি করিয়া লোকের মনে আনন্দের উদ্বেগ হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ আর দেশের সর্বত্র ভবিষ্যতের এক অন্তত ইঙ্গিত দেখা দিয়াছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জরাদির মূল্যবৃদ্ধি এ অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে ও খাদ্যমূল্য বৃদ্ধিতে লোকে অধিকতর গ্লানগ্রস্ত হইতেছে। তার উপর এ বৎসর প্রাকৃতিক বৈলক্ষণ্য শরৎ ঋতুর প্রারম্ভেই একরূপ বুটিক নামার ভয়া ভাবের ভরা নদীতে একটু শরতের স্পন্দন দেখা দিয়াছে। মাঠ ভরা ধান, বুকভরা আনন্দ সবই যেন অস্তিত্ব হইতে চলিয়াছে ও এক দুর্দিনের কাল মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় কয়জনই বা শরতের আনন্দ উপভোগ করিবে?”

—নীহার (কাঁধ)।

## দেশের অবস্থা ও কর্তৃপক্ষ

“কিছু দিন ধরে কোলকাতার প্রভাবশালী দৈনিক কাগজ কয়েকটি পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের অভাব-অভিযোগের প্রস্তুত চিত্র প্রকাশ করে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মেদিনীপুর জেলার যে অবস্থার সাবাদ আমরা পাই সেটাও ভয়াবহ! তবে দুর্ভাগ্য আমাদের, সে সাবাদটা কোলকাতার কাগজ বহন করে আনিচ্ছে না। ফলে অবস্থাটা আমরা জানলেও দেশের অনেক জানেন না এবং অনেকের মতন সরকারের উপর মহলও এ বিষয়ে অজ্ঞ। মেদিনীপুরের এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে আমাদের বে মহকুমা রয়েছে সেখানের অবস্থাটা ভয়াবহ বললে বোধ হয় ভুল হবে না। দ্বিতীয়েম দেশ—এই মহকুমা। কল নেই, কারখানা নেই, কোন ফুটিংশিল নেই, শুক, রুক্ষ মাটির বুক থেকে বে ফসল কৃষকের ঘরে আসে, তাতে কৃষক-পরিবারের অন্নসংস্থান হয় না, কৃষকের ঘরের চালে খড় জোটে না, কৃষকের পালিত গরুর অবস্থাও পরিণতি হয়ে শীড়ায় শরৎচন্দ্রের “মহেশের” মতন। কেবল গরু নয়, ডুকা নিবারণের সামান্য জল সংগ্রহের জন্য অসংখ্য গ্রামের কুলবধূদের অভিবান করতে হয় ২১০ মাইল দূরে। একটি সম্পদ ছিল জঙ্গল। যে সম্পদের সমস্ত রস নিঃসৃত নিত্য কাঠ-মহাজনের হল। কিন্তু শোধনের ব্যয় হিসাবে বাণের ব্যবহার করা হতো সংখ্যা তাদের ধর কম নয়। জঙ্গলের কাঠ তারা কাটতো, ঘরের গরুর পাড়ী দিয়ে



## যুব-উৎসবে স্কাউট প্রতিনিধি

দ্বন্দ্ব বিমান-বাঁটিতে আন্তর্জাতিক মধ্যে-যুব-উৎসবে যোগদানকারী ভারতের একমাত্র স্কাউট প্রতিনিধি উত্তরাপাড়ার শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বোম্বাইবাসিনের ব্যাডনামা শ্রীদময় বন্দ্যোপাধ্যায়

(সম্মানিত)।

বিবেকানন্দ স্তোত্র" প্রথম দিকে পড়িই নি; তার কারণ সে সময় বাইরে থেকে চেহারা দেখে মনে হয়েছিল, এ নিশ্চয় দুর্বল ছিলে লেখা শিথিলচিত্ত কোন ভক্তের ডায়েলগুস। আপনাদের পত্রের কয়েকজন পাঠক-পাঠিকা প্রশংসা জানাতে লেখাটির প্রতি আকৃষ্ট হই এবং তাইই পরিচয় এই পত্র। বিবেকানন্দ সন্থকে কোন লেখা দেখলে উৎসাহের অঙ্গসর হই, কিন্তু বড় দুঃখের প্রত্যাবর্তন ঘটে। কতকগুলি বুদ্ধিহীন ভাবাজ্ঞানহীন ভাবাসুর লেখা পড়ে বিতর্ক এসে গেছে। মনে হয়েছে, বিবেকানন্দের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এদের কাছে এমন বার্ষ্য ভাল কি ভাবে? স্বর্ধ্য জো সক্ষম বস্তুকেই উত্তপ্ত করে—মধ্যাহ্নপূর্বের মত সেই প্রদীপ্ত বিবেকানন্দকে চোখের ভলে মাগমাখি করে দেখা অবশ্য একজাতীয় শক্তির কাজ। শক্তি অপহারী সেই সব শক্তিজ্ঞান লেখকে দেশ ছেয়ে গেছে; তারই মধ্যে শ্রীযুক্ত মিত্রের লেখায় বুদ্ধির উজ্জ্বলা দেখলুম। দেশে অপবুদ্ধিও আছে। নিজের সম্বন্ধে জীবদেহীর অতিরিক্ত ভাবতে নারাজ কিছু সূচতর লোক ইন্দ্রানী বিবেকানন্দের বাখ্যা করছেন যত-মধুর সঙ্গ এক পাশ্চাত্যে বসিয়ে। এরা খিলাবীর গজকাঠি একটি পেয়েছেন পাশ্চাত্য গুরুব তান্ত্র তত্ত্বের দ্বারা থেকে। তাই দিয়ে মাগছেন, আর বড় হোটর বৃত্তে বৈজ্ঞানিক কৌতুহল, এবং সত্যকথা গুণিয়ে জানানোর অভিমান চরিতার্থ করছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ বসদাসের নামলে পরের জন্ত পাঠটাইম ফিচার কয়েক অভ্যন্ত মঙ্গলকর নন। তাঁকে বুঝতে যে আন্তিক্যবুদ্ধি ও শ্রদ্ধাশীলতার প্রয়োজন, তা শ্রীযুক্ত মিত্রের আছে। শ্রীযুক্ত মিত্রের দৃঢ়তার আমি প্রশংসা করি। তাঁর লেখ পড় বোঝা যায়, তিনি পুরোপুরি ভক্ত। কিন্তু ভক্তির কাঁড়নিকে তিনি ঘৃণা করেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে যিনি যথার্থ দেবতা মানেন, তাঁর পক্ষেই দেবতার মন্দির নির্ধারণের প্রয়োজনকে দমন করা সম্ভব। শ্রীযুক্ত মিত্র বিবেকানন্দের সমাধির উপর কথার তাজমহল নির্মাণ করেন নি। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে "বিবেকানন্দ স্তোত্র" বারা প্রথমেই সংগ্রহ করবেন, আমি তাঁদের অন্ততম। কেবল ভাল লেখা বলে নয়, শ্রীযুক্ত মিত্র আমাদের একটি বিশেষ হুবিগ করে দিয়েছেন বলে। জীবনী লেখার অনেক পদ্ধতি আছে, একটি হোল বাণীর মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখা। মিত্র মহাশয় এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি; বিবেকানন্দ বাণীর বরপুত্র নন, বিবেকানন্দের বাণীর চেয়ে বিবেকানন্দের জীবন অনেক বড়। কিন্তু উপলব্ধিবান পুঙ্খ বলে, বিবেকানন্দের বাণী চিন্তাসঙ্গলন মাত্র নয়—আত্মসাক্ষ্যকারের দ্বিঘাচেননা বহন করেছে তাঁর উক্তি। বিবেকানন্দই বিবেকানন্দকে উজ্জ্বল করে গেছেন। আর একজন বিবেকানন্দ না হওয়া পর্যন্ত গত বিবেকানন্দকে তাঁর বাণীর আলোকেই বুঝতে হবে। সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক নানা প্রয়োজনে তাঁর বাণীর বহুল ব্যবহার করা হয়েছে, তবু বিবেকানন্দ হিমাদ্রির গহন প্রবেশপথের শিশা ও দীপকপে বিবেকানন্দের ছড়ানো বাণী-মণিখণ্ডগুলি ব্যবহার করা হয়নি এখনো উপযুক্ত রূপে। বিবেকানন্দ জীবনীর ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সুমণি মিত্র এ বিষয়ে অগ্রণী জীবনীকার। অজ কারণ বাদ লিয়েও, স্বামীজীর সুপ্রখ্যাত সটীক বাণী সঙ্কলনরূপে আমার কাছে বিবেকানন্দ-স্তোত্র মহামূল্যবান হয়ে থাকবে। সন্নিবেশের কৌশলে বিবেকানন্দকে কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শ্রীযুক্ত মিত্র। বীরবাণীর রচয়িতা

বলে বিবেকানন্দকে কবি বলছি না,—তিনি বা কিছু বলেছেন, সত্যের দিব্যালোক ও দিব্যগন্ধময় সে সকলই গজভাষায় কথিত হয়েও কি আশ্চর্য্য আভ্যন্তর ছন্দকে অনাগ্রাসে রক্ষা করেছে—শ্রীযুক্ত মিত্র সেগুলিকে কাব্যর বাছাঁকার দেবার পূর্বে সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য আমার যা সামান্য পড়া আছে, তার থেকে বুঝতে পেরেছি শ্রীযুক্ত মিত্র কি ভাবে তাকে মন্বন করেছেন। তাঁর পরিশ্রমের স্মৃতি আমাদের কাছে আসনের সামগ্রী। মাসিক বহুমতীর সম্পাদক মহাশয়কেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই লেখাটি প্রকাশের জন্ত তো বটেই, ইতিপূর্বে নিবেদিতার উচ্চাঙ্গের, ফরাসী জীবনীর অনুবাদ প্রকাশের জন্তও বটে। জীবনী কোথায় কি ভাবে সাহিত্য হয়, তার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে নারায়ণী দেবীর অনুবাদ করা সিজল রেমার নিবেদিতা। নারায়ণী দেবী শুধু ভক্তবাদ করেন নি, মরনী অদৃষ্টিক প্রকাশ করার ব্যাপারে বাংলা ভাবার শক্তিকেও প্রমাণ করেছেন। আত্মার মহান সঙ্গীতময় কাহিনীরূপে নিবেদিতার অনুবাদ আমাদের ভাষায় স্থায়ী আসন পাবে। আমার এবং আমার বক্তৃতাের অনেক গুটী অনন্দের আশ্রয় ঐ অনুবাদ গ্রন্থটি সম্বন্ধে লিখব লিখব কয়েক কিছু লিখে ঠাট্টা সম্ভব হয়নি আলতবেশ। এতে অপরাধ ঘটেছে, কারণ যে কোন হৃদয় স্বহৃদিকে সন্দর্ভনা জানান পাঠকের পবিত্র দায়িত্ব। শ্রীশঙ্করপ্রসাদ বসু, (বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক) ১ নম্বরপাড়া লেন, কাম্বলিয়া, হাওড়া।

### গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Herewith I am sending Rs. 15/- to you for yearly subscription for Monthly Basumati—Kabita Ghosal. Nirmal Kutir Jamshedpur.

আমিন মাস হইতে এক বৎসরের "মাসিক বহুমতী"র subscription পাঠাইলাম।—শ্রীমতী সাধনা গাঙ্গুলী। সাননগর, নিউ দিল্লী।

'মাসিক বহুমতী' এক বছরের মূল্য বাবদ ১৫/- পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া শ্রাবণ সংখ্যা নীচ পাঠাইয়া দিবেন।—বেলা বাগচী। এলাহাবাদ।

১৫/- আগামী আরও এক বৎসরের মাসিক বহুমতীর টাল বাবদ পাঠাইলাম। আশা করি যথাসময়ে বই পাঠাইতে থাকিবেন। Malati Rani Ganguly. গ্রাঃ M 51076, Bombay.

বার্ষিক মূল্য মাসিক বহুমতীর জন্ত ১৫/- টাকা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া শ্রাবণ সংখ্যা পাঠাইবেন। Sm. S. Banerjee গ্রাঃ M 51353 Bilaspur.

আপনাদের মাসিক বহুমতী পড়ে কত যে ভাল লাগলো তা আর কি লিখবে। তাই আমি অজ্ঞ আবার বাৎসরিক গ্রাহিকা হবার জন্ত ৭ টাকা ৫০/- নয়া পয়সা পাঠালুম। আমাকে আবার শ্রাবণ সংখ্যা থেকে বহুমতী পাঠিয়ে বাধিত করবেন। শ্রীপ্রতিভা দে। শিবসাগর, আসাম।

মাসিক বহুমতীর জন্ত ছয় মাসের ৭০/- টাকা টাল পাঠাইলাম। আশিন সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইবেন। Dolly Pachal. Kadamtalla, Howrah.

Rupees seven 50 n. p. are sent herewith as subscription for Monthly Basumati for the months from Baisak to Aswin for Bengali year 1364. Purnima Sarker. Jabulpur.

# — আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক —

সটীক, সচিত্র ও বিশুদ্ধ  
অষ্টাদশপর্ক

## কাশীরামদাস-মহাভারত

শ্রীবিনোদলাল চক্রবর্তী, এম্, এন্-সি-সম্পাদিত  
কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার  
সেন, এম্, এ, পি, এইচ, ডি-লিখিত কাশীরামদাসের  
সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ভূমিকা-সংবলিত।  
বড় বড় অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। বহু ত্রিধর্ম-রঞ্জিত চিত্র ও  
চিত্তাকর্ষক প্রচ্ছদপটে সুশোভিত। মূল্য—১৬ টাকা

সটীক, সচিত্র ও বিশুদ্ধ  
সপ্তকাণ্ড

## কৃত্তিবাস-রামায়ণ

কবিত্বপূর্ণ পূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উত্তরটনাগর, বি, এ-সম্পাদিত  
(চতুর্থ সংস্করণ)  
বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা। উৎকৃষ্ট কাগজে ২৫খানি ত্রিধর্ম ও  
২৬খানি একদর্শ ছাফটিন চিত্রে সুশোভিত। ইহাই একমাত্র  
সম্পূর্ণ ও সর্বসঙ্গমঙ্গল রামায়ণ। মূল্য—১২।০

## সটীক শ্রীমদ্ভাগবত

[সমগ্র মূলগ্রন্থের বাঙ্গালার গভাবুবাদ]  
পণ্ডিত-কুলভিলক আচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ  
দ্রবলধনে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্রীজীব শ্রায়তীর্থ, এম্, এ,  
কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। মূল্য ১৫ টাকা।

## আয়ুর্বেদ-শিক্ষা

(আয়ুর্বেদমতে লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ)  
(১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড একত্রে)

বিদ্যাজ্ঞা অমৃতলাল গুপ্ত কবিত্বপূর্ণ কর্তৃক সম্বলিত ও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ  
বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বপূর্ণ অধ্যাপক কবিরাজ নলিনীকর সেন, কাব্য-  
গায়ক-সাংখ্য-তর্কতীর্থ মহাশয় কর্তৃক আন্তঃ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত  
প্ৰথম সংস্করণ। মূল্য—২৯ টাকা।

মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান-রচিত

## আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী

সমগ্র অভিযানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সরল বাংলায় লিখিত একমাত্র  
প্রামাণ্য গ্রন্থ। ৬৪৪ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট অ্যাটিক কাগজে মুদ্রিত ও  
৪১খানি ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত কটো ও ৪খানি ম্যাপসহ  
সুচকিত প্রচ্ছদপটে সুশোভিত। মূল্য—৭।

## অলেখক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীত পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার অমৃত বাণী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশাবলী সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায়  
বিবৃত হইয়াছে। সুন্দর প্রচ্ছদপটে সুশোভিত ও চারিখানি  
চিত্র-সংবলিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—৬ টাকা।

অম্বিনীকুমার দত্ত শ্রীত

## ভক্তিশোণ

সংশোধিত ১৭শ সংস্করণ। মূল্য—৩ টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ অভুলকৃষ্ণ দত্ত এম্-ডি শ্রীত

## হোমিওপ্যাথিক মেট্রিরিয়া মেডিকা ও থেরাপিউটিক্স

পরিবর্দ্ধিত পরিশিষ্ট-সংবলিত অভিনব দশম সংস্করণ। প্রত্যেক  
চিকিৎসক, ছাত্র ও গৃহস্থের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বাংলা ভাষায়  
লিখিত ইহার সমকক্ষ গ্রন্থ অন্য কোনও ভাষায় আছে কি না সন্দেহ।  
উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ২৯ টাকা।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক, এম্-এ শ্রীত

## আশুতোষের ছাত্র-জীবন

গ্রন্থে আলোচিত বাংলার উজ্জ্বল রত্ন আশুতোষের জীবনের এই  
পর্য্যায়টি ছাত্র মাত্রেরই আদর্শ-রূপে গৃহীত হওয়া উচিত। ৭খানি  
চিত্র-শোভিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই। ৮ম স। মূল্য ২।

রজন ও খাত্ত বিজ্ঞানে বহুদর্শিনী লেখিকা  
শ্রীবাণীপাণি দেবী সাহিত্য-সরস্বতীর

পরীক্ষা-সিদ্ধ বহু বহু জাতীয় তথ্যসহ অভিনব পাক-প্রণালী

## নেসেদেবের পিকনিক

পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ২।০ টাকা

— বিশ্বসাহিত্যে নবতম অবদান —

## প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেরা গল্প

হুঁড়িখানি একবর্ণ, দ্বিবর্ণ ও ত্রিবর্ণ চিত্রসহ  
প্রষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গল্প, রূপক ও রূপকথার গল্প,  
হৃদয়ের গল্প ও ডিটেকটিভ গল্প-সম্বারে সমৃদ্ধ।  
হিনরজন প্রচ্ছদপটে বিমণ্ডিত—দীর্ঘদ্বারী  
চমৎকার বাঁধাই। মূল্য—৪ টাকা।

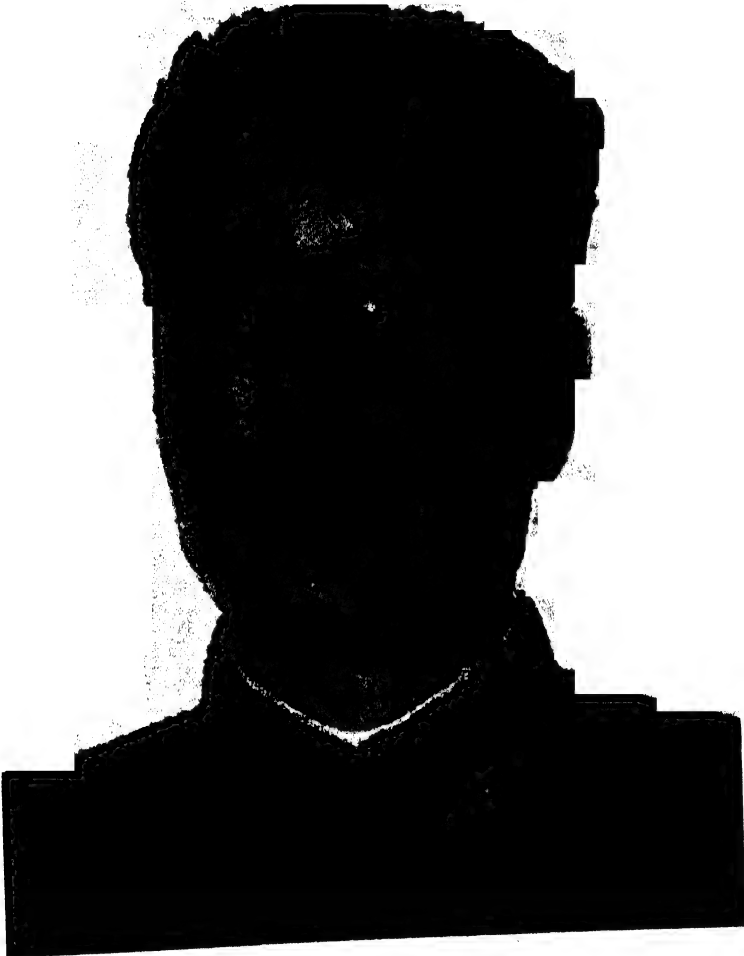
## শিবরামের সেরা গল্প

কুড়িখানি অমূল্য চিত্রসহ হাত্তরসাময়িক গল্প ও  
নাটকের একত্র সমাবেশে সমৃদ্ধ। নয়নরঞ্জন  
প্রচ্ছদপটে বিমণ্ডিত—দীর্ঘদ্বারী চমৎকার  
বাঁধাই। মূল্য—৪ টাকা।

## অচিন্ত্যকুমারের সেরা গল্প

অলেখক অচিন্ত্যকুমারের বিবিধ প্রেষ্ঠ গল্প-  
সমূহের একত্র সমাবেশে সমৃদ্ধ। বহু চিত্রে ও  
সুদৃষ্ট প্রচ্ছদপটে সুশোভিত—দীর্ঘদ্বারী  
চমৎকার বাঁধাই। মূল্য ৪।

চক্রবর্তী, চাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ—১৫ কলেজ স্ট্রোয়ার, কলিকাতা—১



(পঞ্চশত্বে রচিত)

॥ মাসিক বসুমতী ॥

আধুন, ১৩৬৪

চু এন লাই

শিল্পী—রথীশচন্দ্র চক্রবর্তী



# ସାମ୍ବିକ ସମୁଦାୟ

॥ स्थापित १७२९ ॥

[ প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ]

# कथासूत

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক আত্মার সর্ববিধ শক্তি, পবিত্রতা, সর্বব্যাপিতা ও  
 সর্বজ্ঞতা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। ১০-প্রত্যেক মানবের, প্রত্যেক প্রাণীতে—  
 সে যতই দুর্বল বা মগ্ন হউক, সে বড়ই হউক, ছোটই হউক—সেই  
 সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ আত্মা রহিয়াছেন। আত্মা হিসাবে কোন প্রভেদ  
 নাই—প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। ১১-সকল আত্মা ও ইন্দ্রেরী  
 soul শব্দ সম্মুখ নির্ধারণী। আমরা বাহ্যকে মন বলি, পাণ্ডাঘোষা  
 তাহাকে soul বলন। পাণ্ডাত্য প্রদেশে আত্মা সম্বন্ধে বর্ষা  
 জান কোন কালে ছিল না। ১২-আত্মা মন ও মূলশরীর উভয় হইতেই  
 পৃথক; এই বাণটি মনের মধ্যে পরিভ্রমণভাবে রাখিতে হইবে।  
 আর এই আত্মাই মন বা মূলশরীরকে সঙ্গে লইয়া এক দেহ হইতে  
 দেহান্তরে গমন করে। যে সময়ে উহা সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ লাভ করে,  
 তখনই উহার আর জন্মমুখ্য হয় না—তখন উহা বাবীন হইয়া যায়—  
 ইচ্ছা করিলে এই মন বা মূলশরীরকে রাখিতেও পারে অথবা উহাকে  
 পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকালের জন্ম বাবীন ও মুক্ত হইয়া বাহিরে  
 পারে। বাবীনতাই আত্মার লক্ষ্য। ইহাই আমাদের ধর্ম  
 —বাবীন হইয়া পুনরাগমন।

# তরু দত্তের জীবনী ও রচনা

ক্রাইস বান্দে

১৮৭৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী কলকাতা থেকে একটা চিঠি পাই—আমার প্রকাশকদের মারফৎ। এক ভারতীয় তরুণী আমার 'La femme dans l' Inde antique' "প্রাচীন ভারতে নারী" নামে বইটি অনুবাদ করবার অনুরোধ করে এই চিঠি লেখেন। চিঠির সাথে ছিল একটা বই : সুন্দর ইংরেজী কাব্যে অনুদিত ফরাসী কবিতার সংকলন : 'A Sheaf Gleaned in French Fields.'—একই সাথে পাওয়া এই বই ও চিঠির লেখিকার বয়স অতি অল্প, তা' সঙ্গেও ইতিমধ্যে তিনি স্বদেশে ও ইংল্যান্ডে বহুখণ্ড খ্যাতি লাভ করেন। নাম তাঁর তরু দত্ত। কলকাতার এক খুঁটান-পরিবারের—মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও সুপণ্ডিত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্তের মেয়ে ইনি।

ভারতবর্ষ থেকে পাওয়া এই চিঠিই তরু দত্ত ও আমার মধ্যে যোগাযোগের প্রথম সূত্র। সে সংযোগ নিরন্তর বিধান বড় ডাড়াডাড়ি ছির হল—এই প্রতিভাশালিনীর অকাল মৃত্যুতে। তাঁর লেখা সেই চিঠিগুলি (যা' কলকাতা থেকে বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত পয়ে প্রকাশ করেন, 'এ ইক ট্রিনিড ইন্ কেম কীলডেন'-এর পরিবর্তিত সঙ্করণে), তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আমার লেখা পোকাডর শিখার চিঠিগুলি আর তরু দত্তের কবিতার বইয়ের নতুন সংকরণে সংযোজিত তাঁর সঞ্চিত জীবনী থেকে যে তথ্য পেরেছি, তার সাহায্যে আমার মনের পট সজ্জাকার অনাম্যাত এক ব্যক্তিত্বের যে কয়েকটি মাত্র রেখা ফুটে উঠছে, সেই রেখা ক'টি আঙ্গ পুনরুদ্ভাব করাই আমার উদ্দেশ্য।

১৮৮৬ সালের ৪ঠা মার্চ তরু দত্ত কলকাতার জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৯ সালে সপরিবারে তাঁর বাবা ইউরোপে আসেন ও চার বছর এখানে কাটান। তরু ও তাঁর দিদি অল্প মাস তরেক ফ্রান্সের একটি ছাত্রাশ্রমে থাকেন। তারপর ইংল্যান্ড গিয়ে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কোর্স-এ তাঁরা বিশেষ উৎসাহের সাথে যোগ দেন।

ভারতের গোবিন্দ বাবু সপরিবারে যখন কলকাতায় ফিরে আসেন, তখন তিনি তরুকে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতের দীক্ষা দেন। তাঁর কন্ঠার পাঠ-সম্ভারপাই তাঁকে আমার সর্বদা পাই। চমৎকার একটি পারিবারিক চিত্রে তিনি দেখিয়েছেন মাণিকতলা স্ট্রীটের পৈতৃক ভবনে কি ভাবে বটায় পর বকী তাঁরা পড়াভরসা মনোই ফুঁবে থাকতেন।

তরুর এসলে তাকে তিনি বলেছেন : "ও খুঁই পড়তে পারত; তেমনি তাড়াডাড়িও পড়ত; কিন্তু পড়ার সময় কোনও হুঁবাধা জঙ্গ বাধ দিয়ে যাওয়া ওর ঘাতে সহিত না। নানারকম অভিধান

লিখে রেখে, তবে শাস্তি। ফলে কঠিন শব্দ বা ব্যাক্যগুলির মানে এমন সহজে ওর মনে গেঁথে যেত যে যখনই আমাদের মধ্যে কোনও তর্ক উঠত সংস্কৃত, ফরাসী অথবা জার্মান কোনও প্রয়োগ বা ব্যাক্যাদ্য সম্বন্ধে, দশ বাবে অন্তত আট বাণ ও-ই জগা হত। এক এক সময় আমার এমন ক্ষিণ চোপে যেত যে আমি বলতাম, 'বেশ ত বাজি রাখা যাক।' বাজির অঙ্গ ছিল সাধারণত এক টাকা। কিন্তু যখন কেতার বেঁটে অর্থের সন্ধান মিলত, দেখা যেত ও-ই বাজি মাং করেছে। ও কিন্তু যখন হেরে যেত, বড় মজা লাগত তখন ওকে দেখতে। প্রথমেই প্রাণ খুলে খানিক হেসে নিত, তারপর আমার গালে পড়ত মুহু টোকা, সেই সঙ্গে ওর প্রিয় কবি ব্যাণ্টে আউনিং-এর হয়ত কয়েকটি লাইন, 'হায় প্রিয়তম, বয়সে তুমি যে বড়, জ্ঞানে তুমিই প্রবীণ, আর তুমি, তুমি যে পুঙ্খ।'—অথবা অল্প কোনও পরিহাস।"

পাণ্ডিত্যের কাছে সানন্দে মাথা নত করতে তরুর বাবা সার প্রস্তুত ছিলেন, এমন কি, নিজের কন্ঠার কাছেও তার ব্যতিক্রম হত না। এই সব কথা তাঁর কাছ থেকে বার বার শুনে আমি গোঁধে কখন কখন ভেসে ওঠে তাঁর সন্ধান-গোঁয়ে ধন শিক্কাপ।

তরু দত্তের বাবা মেরেকে ইউরোপীয় শিকার সাথে সাথে প্রাচীন ভারতীয় ভাষার শিকড় করে তোলেন,—এখানেই আমরা দেখি ভারতের গুপ্ত—মায় ব্রাহ্মণ ও ইসলাম ধর্মের গুপ্ত—খুঁটান সভ্যতার প্রভাব কত সুন্দর। 'মিসিয় গায়সাঁ ত তাসি-র মতে, "ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান ও পার্সীরা নিজেদের ধর্মকেই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ইচ্ছা খোলে, কেবল ছেলেরের নয়, মেয়েদেরও। আজ অবধি এমন তাক্সর কথা বড় শোনা যায় না।" \*

তরুর কিন্তু ইতিহাসের দিকে তেমন টান ছিল না। একদিন লর্ড ল- (লিটন ?) যখন কলকাতায় এঁদের বাড়ী বেড়াতে বান, তখন অল্পর হাতে একটা উপভাস দেখে সেটা কেড়ে নিয়ে ছুই বোনেবে তিনি বলেন, "উপভাস বেশী পড়া ভাল নয়। ইতিহাস পড়া দরকার।"—তরু জবাব দেয়, "লর্ড ল-: উপভাসই আমাদের বেশী ভাল লাগে।"—"কেন?" এই প্রশ্নের জবাবে তা সপ্রতিভ ভাবে হেসে বলে, "কারণ উপভাস হল সত্যি, আর ইতিহাস

\* 'মিসিয় গায়সাঁ ত তাসি ভারতের নারীশিকার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীমতী দেবী কার্পেটেরকে তিনি প্রাণে-ম প্রহা করতেন ভারতের নারী প্রস্রুতিতে কার্পেটেরের অঙ্গাঙ্গি



লিখিত" ("Because novels are true, and histories are false.")। এই ভাবে পরিভ্রাসের মাফেট সে বুঝিয়ে দিল কটা গোটা জাতের—কাব্য-পদ্যটির হিন্দু জাতের—কচিত্র দৃষ্টিবিশ্ব : ভিত্তাস চাই না, চাই পুণ্য !

প্রাচীন সংস্কৃত কবিরের প্রতি তরুর ছিল গভীর ভালবাসা। গমায় লেখা তার করাসী একটি চিত্রিতে সে বলেছিল, "মাদমোয়াজেল, গানেন না, আমার স্বদেশের, আমার স্বদেশবাসীর প্রতি আশনার মুরাগ (তার সাক্ষী আশনার বট, সাক্ষী আশনার চিঠি) কি ভাবে প্রমায় বিচলিত করে তোলে। আমি দৃষ্টকণ্ঠে বলতে পারি, প্রমায়ের মহাকাব্যের যে কোনও নারী-চরিত্র প্রত্যেকের প্রস্কার পাশ্রী, প্রত্যেক স্বদেশের অমূল্য সম্পদ। সীতার চেয়ে করণ, তাঁর চেয়ে প্রেমময়ীর চরিত্র আমার আর একটা দেখাতে পারেন? আমার ত বিশ্বাস হয় না। সন্ধ্যাবেলা যখন আমার মা আমাদের সেশের প্রচলিত গানগুলি গান, আমার হৃৎ-চোখ জ্বলে ভেসে যায়। স্বিতীয়বার বনবাসের সময় সীতার বিলাপ, একাকিনী যখন তিনি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দারুণ হতাশা আর ব্যথায় মুহমান—এ-যুগ এমন হৃদয়-বিলসরক যে চোখের জল না ফেলে তা' কখনও শোনা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।"—এই চিঠির সাথেই তরুর সংস্কৃত থেকে ছুটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ আমরা পাঠিয়েছিল। তাদের স্বল্প পরিসরে যে ভেজের পরিচয় পেয়েছিলাম তা' অবিস্মরণীয়। বিষ্ণুপুরাণের ছুটি কাহিনী : 'এব', আর 'রাজসি ও মৃগ'।

আজন্ম মায়ের মুখে প্রাচীন কাহিনী শুনে, বাবার কাছে সংস্কৃত পাঠের নীলা পেয়ে তরুর দত্তের কণ্ঠেও কি ধ্বনিত হবে শুধু তার সেশেরই বন্দনা? তার কাব্য-প্রতিভার বাহন হবে কি হিন্দুস্তানী? ভারতের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই কি তার বিয়বস্ত হবে—বেখানে গহন অরণ্যে স্বীয় গরিমায় বিরাজিত অগণ্য বিটপী? সেকালের সংস্কৃত কবিরের মত সেও কি হরিণীর চঞ্চল গতিই অনুধাবন করবে একদৃষ্টে, দেখবে জড়োয়াখচিত মোটুপিকিরের লাভ? বিশাল বনানীর বুকে, বিলম্বিত জগ্ৰোধতলে শুনে কি শুধু কোকিলের কূহ-মাধুর্য? নাগিনীর হিংস্র বনন? যুগেশ্বরের হস্তার? বহু বর্ণের কমলশোভিত নৌঘিতে সে কি শুধু কেলিযুদ্ধ বলাকার পানেই তাকিয়ে থাকবে? নিশাবের হৃৎক্লিষ্ট পর্বতে পর্বতে ফেনময়ী তরঙ্গিনী তটিনীর চপল ময়ূখ কি সে বর্ণনা করবে, না কি বর্ণনা করবে উজ্জল নীলকান্ত আলোকে দ্রাঘ চিত্রভাবারবৃত্ত হিমালয়ের হীরকজ্বলতা?

না! বায়ীকি ও ব্যাস-উল্লিখিত দৃগাবলী সামনে রেখে আমাদের এই ভারতীয় খৃষ্টান তরুণী ফিরে পাড়িয়েছে নিশ্চয় পাশ্চাত্যের আর, যেখানে প্রাকৃতিক আকর্ষণ অনেক কম, কিন্তু মায়ের বহর অনেক বেশী। তাই, 'বিশেষী তরুণী'র প্রতি কবি শীলর-এর উক্তি একটু বদলে নিয়ে ওর কবিতার বইয়ের শেষে ও লিখেছিল, "বে-কুল, বে-কল আমি এনেছি, তা আর এক দেশের, আর এক স্বর্গের আলোয়, আর এক লাভময়ী প্রকৃতির বুক থেকে চেন করা।"

'Ich bringe' Blumen mit und Friichte,  
'Gereift an einer andern Flur,

In einen andern Sonnenlichte,  
In einer glücklichen Natur.

(শীলর-এর উক্তির প্রথমটা ছিল 'Sie brachte' Blumen...)

আমাদের ফরাসী কবিরের গানগুলি অনুবাদ করতে শুরু বড় ভালবাসিত; কিন্তু ইতিপূর্বেই বলেছি, এই ভারতীয় তরুণীটি আকর্ষণ ময় ছিল আমাদের সভ্যতার, তাই সে এত গানগুলি হিন্দুস্তানীতে অনুবাদ না করে করল ইংরেজীতে। ফলত, ম'সিয়্য গারসিয়া ত তারি স্বনামধন্য লেখনী মাধ্যমে আমরা ভারতীয় মহিলা কবিরের নামের যে তালিকা পাই, সে-তালিকা বৃদ্ধি না করে তরুর অবিকার করল তার আসন ইল্যাপোর কবিরের মাঝে।

কিন্তু আমাদের রুসিকাল কবিরের কবিতা অনুবাদ করা এই তরুণী কবির উদ্দেশ্য ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী কবিরের ধারণা ছিল যে 'ভাব আবেগ প্রকৃতির উচ্চ স্থান সিতে হবে মননশীলতাকে। কবিতা বলতে তাঁরা বুঝতেন একখণ্ড স্বচ্ছ ফটিক, যার সাহায্যে মানুষের চিন্তাধারা স্বচ্ছন্দে পড়া চলেবে। কাজেই এই শতাব্দীর ফরাসী লেখকরা এই তরুণী কবির চিত্র হরণ করতে পারেন নি। কারণ যে দেশ তাকে জন্ম দিয়েছে, সে-দেশে কবিতা মানেই ভাব, কল্পনা, আবেগ, আর সেখানকার প্রকৃতির মতই তা প্রাচুর্য-মণ্ডিত। তরুর সত্যিই বীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর কবিকুল। তাঁদের মধ্যেই সে খুঁজে পায় তার স্বদেশবাসীদের অস্বিষ্ট : স্বদেশের প্রতিক্রিয়ার তীব্র নাটকীয় প্রকাশ, উপমার বথেক বাবহার, বর্ণের বিশুল সমারোহ। ম'সিয়্য ভিক্তর হগোর প্রতি তরুর উজ্জ্বল দেখে তাই আশ্চর্য হয় না। তার কবিতার বইয়ে প্রতিটি কবিতার ভূলায় তারই দেওয়া মন্তব্যে তাই সে সোংসায়ে টেটিয়ে উঠেছে : "একটি পাণ্ডটাকায়, ছোট কয়েকটি লাইনের পরিসরে ভিক্তর হগো সবকিছু মন্তব্য করা সত্যিই দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরের মধ্যে জন্মের তাঁর নাম। শেক্সপীয়ার, মিলটন, বায়রণ, গ্যোথে, শীলর প্রকৃতির সাথে পাশাপাশি তাঁর আসন বহননি থেকেই প্রতিষ্ঠিত আছে কবিরের স্বর্গে।"

যদিও তরুর দত্তের সক্রিয় কল্পনাপ্রতিভা ভিক্তর হগোকে লামার্তিনের চেয়ে অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছিল, তবু তার আধ্যাত্মিক, সপ্তা দিয়ে সে স্বীকার করে নিয়েছিল 'মোন্টাসিয়' ও 'হামসী'-র কবির (লামার্তিনের) নৈতিক মহত্ব : "মেজাজ, কল্পনার, উজ্জ্বল্যে, উচ্চভাবে, ঠাইলে—কবিত্ব বলতে বা' কিছু বোঝায়—একমাত্র পরিভ্রাতা ছাড়া—যব কিছুতেই তাঁকে ভিক্তর হগোর কাছে মাথা নত করতে হবে। পরিভ্রাতায় তিনি অনন্ত। তাঁর অন্তর স্বভাবতই আধ্যাত্মিক। সাক্ষী জননীর কোলে বসে বেশিকা তিনি শৈশবে পেয়েছিলেন, তা' তিনি কখনও ভোলেন নি। জননীকে তিনি তাই সহস্রবার মরণ করেছেন তাঁর লেখনীর সপ্রেম অর্চনায়।"

তারপর ম'সিয়্য লামাদ্রা সবকিছু তরুর দত্ত লিখেছে, "লামাদ্রা আর লামার্তিন হচ্ছেন বর্তমান জালের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁদের রচনাবলী গভীর, পবিত্র, আধ্যাত্মিক। দু-জনেই তাঁদের গর্ভধারিণীর কাছে এ-বিষয়ে ঋণী। কারণ উভয়ের জননীই ছিলেন ভক্তিময়ী, প্রথর বুদ্ধিমতী আর আত্মত্যাগী (Women of prayer, large-minded and self-denying)।"

নামাভিন, ভিক্টর হুগো ও লাম্প্রাদের সাথে সাথেই তরু দত্তের দে ও মস্তব্যে আমরা পাই সমকালীন প্রায় প্রত্যেক পান'সির। উল্লেখ; বেরাজের, লভ্রা, যুসে, ভিইনী, জীমতী জিয়ারকী, -ব্যত, ত্রিজো, পঁসার, গোতিয়ে, ওয়াঁ, রবল, বারিয়ে, ওজিয়ে, সুবন, লকঁ-স্ত-লীল, গ্রাম, মাহুয়েল, কোপে, লামোইন, প্রোদম, রী প্রভৃতির।

তরু দত্ত কেবলমাত্র ফরাসী থেকে অনুবাদ করেই কান্ত হয়নি।

উদ্ভেদ ছিল ফরাসী লেখিকা হওয়া। যে কয়টি পাণ্ডুলিপি রখে গিয়েছে, তার মধ্যেই একটি মূল ফরাসীতে রচিত উপজ্ঞাস যা গেছে: 'জীমতী আর্ভের-এর দিনপঞ্জী'—বা আমরা আজ শ করছি আর বার সবকে পরে আরো আলোচনা করব।

তরু দত্ত কেবল আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে ভালই বাসেনি, তাদের ভ্রমভূমিকে সে ভালবেসেছিল নিবিড়ভাবে। ফ্রান্সের ঈশ্বর চূর্ণাঙ্গের ক্ষণে তার এই ভালবাসার পরিচয় আমরা পেয়েছি।

'দত্তের বাবা কপি করে আমার পাঠিয়েছেন অপ্রকাশিত কয়েকটি ত-লেখা-পাতা বার বকে এশিয়ার এই দুহিতা, যখন পনেরো বৎ তার বয়স হয়নি, অমর করে বেখেছে আমাদের স্বদেশবাসীর গায়ের কাহিনী এমন করণ ভাবে, বা' দেখে কেউ বলবে না যে গানও ফরাসী নারীর বৃকের কথা তা নয়। তরু তখন লগুনে ল। ওর বিশেষ-ভ্রমণের ডায়েরী থেকে—১৮৭১ সালের ২৯শে ৩০শে জানুয়ারীতে লেখা—একটু তুলে দিই এখানে:—

২৯শে জানুয়ারী, ১৮৭১। লগুন। ৯ সিডনী প্রেস, অনদ্রো চারার।—বহুকাল হল ডায়েরী লেখা ছেড়ে গিয়েছিলাম। শেববার খন এই ডায়েরী হাতে নিই, তারপর থেকে কত পরিবর্তনই না টে গেছে ক্রালে! হায় রে! ক্রালে কতই না পরিবর্তন ঘটে গল! কয়েক দিনের জন্ত পারীতে যখন গিয়েছিলাম, কি রূপই চার দেখে এসেছিলাম। কি বাড়ী! কি রাস্তা! কি অপূর্ণ সৈন্ত-হাছিনী! আর আজ? সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সব নগরীর দ্বীপী যে ছিল, আজ তার একী সৈন্ত। যুদ্ধ যখন বেখেছিল, সর্বাঙ্গ:করণে আমি ফরাসীদের পক্ষই নিয়েছিলাম—তাদের পরাজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকা সম্বন্ধে। একদিন সন্ধ্যাবেলার যখন বুদ্ধ পুরোদমে চলেছে, উপরুপরি যখন ক্রাল পরাজিত হয়ে চলেছে, তখন ফরাসী সম্রাট সম্বন্ধে বাবা কি যেন মাকে বলছিলেন—কানে এল। তাঁদের বেগে নীচে গিয়ে শুনলাম, ক্রাল অধিকৃত। তারপর আরো কত ভুসংবাদ এল: পারীর বিপ্লব, সম্রাজ্ঞী ও যুবরাজের ইচ্ছাপ্রাপ্তে পলায়ন, সম্রাটকে বশিকরণে উইলহেমসুহোহের কাছে প্রেরণ, পারীতে জাৰ্গাণ বর্বরতা, ট্রাসবুর্গে বোমা! বোমার মুখে কি দুর্দশা ওদের! বাড়ী-ঘর শুড়িয়ে গেল। চারিদিকে বহি-লীলা!...

হায়! হাজার হাজার লোক বৃকের রক্ত দিল তাদের দেশের জন্ত, তবু সে দেশকে পড়তে হল শত্রু-কবলে! এরা কি এমনই পাশে ময় ছিল যে, ভগবৎকণে এরা চার নি—যার ফলে এই যোব? না, এদের মাঝেই হাজার হাজার লোক ছিল, আজো আছে, ভগবানই তাদের সন্তান। ক্রাল, হায় ক্রাল, কি তোমার পতন! এই নিদারুণ অগ্নিপতনের পর, এই নৈস্তের শেষে, তুমি কি উঠে দাঁড়াবে

৩০শে জানুয়ারী। সোমবার। যখন আমরা গোবাক বসেছিলাম, প্রান্তরাশের ঘটা বাজল। নীচে গিয়ে আমাদের ইতালীয় চাকরের মুখে শুনলাম, পারীর পতনের সংবাদ। 'টাইমস' পত্রিকার পড়লাম, 'কাল জাৰ্গাণ দুর্গগুলি অধিকার করবে।' টেলিগ্রামে এই খবরই পাওয়া গেছে। এতক্ষণে বোধ হয় দুর্গ ওরা অবরোধ করে ফেলেছে। প্রত্যেক রেজিমেন্টের অস্ত্র-শস্ত্র ওরা কেড়ে নেবে। 'ক্রাল, হায় ক্রাল! আমার বৃক থেকে আজ রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে।

ভারতীয় এক তরুণীর লেখা এই ক'টি পাতায় আমি খুঁজে পেলাম সেই স্বতীত্ব ব্যথা, সেই বৃক-কাটা কান্না, সেই প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব, স্বদেশ-প্রেমের সেই স্বত:কৃতি—যা এক দিন ঠিক এই সময়েই আমার বাধ্য করেছিল অধ্যাত এক ডায়েরীর পাতায় আশ্ব-প্রকাশ করতে। সত্যিই, এশিয়ার এই তরুণীর বৃকে যে ছাপুণিও ছিল, তা' আমাদেরই মত যে-কোনও ফরাসী রমণীর। সত্যিই আমাদের সেই দুর্গতির দিনে ঝুরে ঝুরে সেই হৃদয় থেকে আমাদেরই মত নীরবে রক্ত ঝরে পড়েছিল।

তরুর এই ডায়েরীতেই আমরা উল্লেখ পাই তার সিঁদী অল্পর। মনোবৃত্তি ও রুচিতে হুই বোন ছিল অভিজ্ঞা। হুই বোনই ঘর-কন্নার খুঁটিনাটির মধ্যেই গভীর অধ্যয়ন ও কাব্য-চর্চার অবকাশ কি ভাবে পেতে হয়, জানত। তরুর প্রতিভার পথ থেকে অল্প নিজেকে সর্বদাই বিছিন্ন রাখত, বাত ছোট বোনের বিকাশের কোনও অস্থবিধা না হয়। আমার চোখের সামনে হুই বোনের একটি কটো মেলা আছে, বার মাঝে হুটি জীবনের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। অল্প—সৌম্য, শান্ত, সযত—বসে আছে; ভারী পাশে, প্রোমে, নিবিড়তার অন্ধক বেন আছে; করে দাঁড়িয়ে আছে তরু—প্রাণোচ্ছল, অপূর্ণ কেশনামমণ্ডিত কামল-চোখে আগুনের সুরণ।

অল্পরও বাসনা ছিল ফরাসী সাহিত্যের বৌততে তার অজ্ঞতি তর্পণ করবে। তার অনুমিত কবিতার মধ্যে 'The young captive'-ই অস্তম। এই প্রশস্তি-কাব্য সে আকর্ষ কৃতিত্বের সাথে অনুবাদ করেছিল। তার রচনা-শৈলী হয়ত কবি শেনিয়ের ফরাসী কবিতাকে ম্লান করে দিতে পারত। কবি Coigny-র মত সে-ও বৃষি বসেছিল,—

“এ-শু বসন্ত মোর; দেখে বাব নবান্ন-উৎসব;

উজান-গরিমা-রূপে মোর কাণ্ড পুরে  
আজো শুধু হেরি নব অক্ষপাভা করে,  
অখণ্ড দিবস আমি দেখে যেতে চাই।

মরিতে চাহি না এই জীবন-প্রভাতে।”

১৮৭৬ সালে তরুর কবিতার বই প্রথম প্রকাশ কালে সে লিখেছিল, “এইখানে জানিয়ে রাখি যে A-স্বাক্ষরিত কবিতাগুলি অনুবাদিকার একমাত্র প্রিয় জ্যোতি তপসিনী অল্পর অনুবাদ। মাত্র ছুড়ি বছর বয়সে, ১৮৭৪ সালের ২৩শে জুলাই, সে বীতরু চরণভঙ্গে চির-বিজ্ঞান লাভ করেছে। সে যদি আজ বেঁচে থাকত তবে তার

শবেগা বস্ত্র কথা আছে তাঁর মধ্যে সব চেয়ে করুণ হচ্ছে, 'হতে ১' কথাটি।"

একথা তরু বখন সেখে, তার আগেই সেই ব্যাধির লক্ষণ তার সেখা যায়, যে-রোগের কবলে পড়ে তার দমিকে ইহলোক ভাগ হ'য়। ১৮৭৭ সালেই আমার লেখা তার দ্বিতীয় পত্রে সে ছিল, একটি বিশেষ ধরনের কাশি তাকে সর্বদা ভোগাচ্ছে। দিন সে আমার জানিয়েছিল, হয়ত পারী-তে সে আবার আসছে : বাবা ক্রান্ত ও ইল্যাণ্ডে ওর চিকিৎসা করাতে চান। দু'টি ন ইতিপূর্বে হারানোর পর ওর বাবা তাঁদের শেষ সন্তানটিকে ই যমের নজর থেকে আড়াল করবার চেষ্টা করছিলেন। র শরীর কিন্তু এমন ভেঙে পড়ল যে ইউরোপ যাত্রা স্থগিত হতে হল। ৩-শে জুলাই তরু আমার কাঁপা হাতে সেখে : হুমোয়াজেল, দারুণ অশ্রুখে ভুগলাম। বাবা-মার একান্ত নী ভগবান শুনেছেন, আমি বীরে বীরে সেয়ে উঠছি। ই আপনাকে বড় করে চিঠি লিখতে পারব আশা করি।"— ৪ বৃক্কের যোগেই শেষ অবধি এমনি অলীক আশা গীকে ঘিরে রাখে।

আমায় সে আর চিঠি লিখতে পারে নি। তবে অনেক দিন গ, এক বিবাদভরা যুহুর্ন্তে সে আমায় যে ফরাসী লাইনটি টেরেছিল, হয়ত সেই লাইনটিই সে বারে বারে আবৃত্তি করেছিল। সময়ে।

"অচেনা বঁধু, প্রিয়তমা, বিদায়, মোরে বিদায় দাও।"

তরুকে কোন দিন দেখি নি, তবু ওকে ভালবেসেছি। ওর ভিটি চিঠিতেই ওর অন্তরের সল মাধুর্যের, ওর স্পর্শকাতর মনের,। সদাশয়তার পরিচয় আমি পেতাম, বার ফলে ক্রমেই ও আমার কটমত আত্মীয়ার মত হয়ে উঠেছিল, আর বার ফলে, ইউরোপীয় ঠান সভ্যতার বড় হয়ে ওঠা সত্ত্বেও, ওর স্বভাবে ভারতীয় নারীর জাগত ধর্ম আমার চোখে ফুটে ওঠে। তা'ছাড়া মাত্র বাইশ হু বয়সে আমি যে-ভারতীয় নারীদের আদর্শে অনুপ্রেরিত য় প্রথম বই লিখি, তাঁদেরই একজন বংশধরের হৃদয়তর। ভালবাসা ত সাগরের পারে থেকেও কি ক'রে আমি উপেক্ষা করি ?

তরু দত্ত সেয়ে উঠছে জেনে ওকে আমি অভিনন্দন ণিয়েছিলাম। ওর মাথামে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম ওর মা ও বাকে। 'নব্বয়-নাম মে ভিক্তোরিয়ার' এর একটি প্রতিমূর্তি আমার রে ছিল। তারই সামনে রাখা একটি তোড়া থেকে ছিড়ে নিয়ে রক আমি একটা ফুল পাঠাই। ফুলটি 'আমারাহ'। লালচে ণিপড়িঙলো এর কখনও তকিরে যায় না। অমরতার প্রতীক। হায় রে ! তরু দত্তের নামে এ উপহার বখন পাঠাই, তার বেশ হুয়েক দিন আগেই সে ইহলোকের মায়া কাটির চলে যায় ! ওর বাবা-মার হাতে পড়বে আমার অভিনন্দন-পত্র, ওরই আরোগ্য-কামনার লথা :—

"গত ৩-শে আগষ্ট সন্ধ্যাবেলা ও আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে সেই লোকের পানে—যেখানে বিরহ আর ব্যথার নাম কেউ শোনে নি।" ওর বাবা আমার লিখে পাঠালেন, 'ভগবানের প্রতি ওর বিশ্বাস ছিল অসীম : এক নিয়মবদ্ধ শাস্তি নেমে এসেছিল ওর সজা : একজন ও ডাক্তারকে বলেছিল, 'দেখুন, শরীরের অসহ

বহুগই আমার চোখ দি়ে জল টেনে আনে ; তা' নয়ত অন্তর আমার আজ অপরিমীয় শান্তিতে ময়। জানি ভগবানই আমার সহায়।"—এমন শান্ত স্বভাবের মেয়ে আমি দেখি নি, আমার এই শেষ সন্তানটির মত। আমার স্ত্রী ও আমি আজ, জীবনের সারাহে, নিঃসঙ্গ পড়ে আছি শূন্য এই গৃহে বার প্রতিটি কোণ একদিন মুখবিত ছিল আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় তিন সন্তানের কলহরে। না, আমাদের ভগবান আছেন,—তিনিই সবার গতি, সব দুঃখে তিনিই সাহায্য। সেদিন আগতপ্রায়, যেদিন আমরা সবাই আবার মিলিত হব পরমেশ্বরের চরণতলে চিরদিনের জন্ত।

আমায় এই চিঠি লেখার কিছুকাল আগেই তিনি তাঁর কড়া তরুর জীবনী লেখা শেষ করেন এই ভাবে, "কেন এই তিনটি তরুণ জীবন তাদের বিরাট অশ্রমায় ভবিষ্যতের মায়া কাটির চলে গেল, আর আমি, পুত্রপ্রায়, পড়ে রইলাম এই শোচনীয় জীবন বাপন করতে ? আমার মনে হয়, এসবই প্রকৃতি—ওদের অনাগত জীবনের জন্ত এসবের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এমন দিন আসবে যখন সব হেয়ালীই পরিষ্কার হবে বাবে আমার চোখে। আর পরমপিতার জয় ! তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক !"

এই স্থির বিশ্বাসের মাঝেই আমরা বৃষি তরু দত্তের জীবনে তার পিতার প্রভাব কত গভীর, আর তাই তাঁর প্রতি আমাদের সখ্য চিত্ত স্বতঃই নত হয়।

তরু দত্তের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই 'Calcutta Review' পত্রিকায় তার প্রিয় কবি Gramont থেকে অনুদিত তার আটটি সনেট প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ সনেটটি ঐশী করুণার মাহাত্ম্য সযত্নে রচিত। তরু দত্তের ব্যক্তিগত জীবনের শেষ কথা ক'টিই যেন এই সনেটে প্রকট হয়ে ওঠে। সর্বপ্রথম সনেটটির ভাবাবলয়নে সনেটগুলির ভঙ্গার মন্থ্য করা হয়, ভগবানের ভালবাসা পৃথিবীর এই অসুট প্রহ্নটিকে যেন স্বর্গের দিব্য-পরিবেশে ফুটে উঠতে সাহায্য করে।

তরু দত্তের অকাল মৃত্যুতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-কতি হল, তারই প্রসঙ্গে রচিত শ্রদ্ধার্থ বেশ-বিবেশের বস্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে পুণ্যোক্ত পত্রিকাটি অন্ততম। 'Calcutta Review'-এ লেখা হয়, "তরু দত্ত ইংরেজী লিখতে পারতেন উচ্চশিক্ষিতা ইংরেজ রমণীর মতই সুকটিসম্পন্ন সুদক্ষ ভাষাতে। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই কোমল, অন্তরুখী, করুণ-রসাত্মক, গভীর ধর্মভাবাপন্ন, নিম্নলিখ উদ্ধৃতিয়িত করুণার আলোয় সমৃদ্ধ,—বা বর্তমান শতাব্দীর ইংরেজ কবিদের মাঝে তাঁর চিরস্থায়ী আসন পেতে রেখেছে।"

ভারত-অনুযায়ী খ্যাতনামা ফরাসী পণ্ডিত, পারী-র এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি মঁসিয় গার্স্যা ত তাসি একটি জনসভায় এই ভাবে তরুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করেন, "গত ৩-শে আগষ্ট, মাত্র ফুড়ি বছর বয়সে তরু দত্ত কলকাতায় দেহরক্ষা করেছেন। তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা প্রতিভার অধিকারী ; এই বয়সে তাঁর স্বদেশী ভাষা, পবিত্র সঙ্কত ভাষাতেই তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল না কেবল, শুধু ভাবে তিনি ইংরেজী ও ফরাসী অহর্গল বলতে ও লিখতে পারতেন। এতত আমরা আশ্চর্য্য হই না, কারণ ইউরোপাই ছিল শিক্ষার ক্ষেত্র। সব চেয়ে বড় কথা, যে বয়সে তরুণ-ভক্তদ্বী ছাত্রাবাসের গভী কাটির উঠতে পারে না, সেই বয়সেই, আপন

প্রতিভাশীল অল্পান লেখনীনিঃসৃত ইংরেজী কবিতার সঙ্কলন তিনি প্রকাশ করেন। উদ্ভবকালে তিনি 'A Sheaf Gleaned in French Fields' নামে একটি বই প্রকাশ করেন, অপর ইংরেজী কবিতার অনূদিত কয়েকটি ফরাসী কবিতার সঙ্কলন।—এই তরুণী নিজেকে যে খ্যাতি ভারতীয় বলে আমার কাছে ব্যক্ত করেছিল, এ হচ্ছে পরমপ্রশংসার, পরমশুণিত, কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্তের সর্বশেষ সন্ধান। গোবিন্দ বাবু ইতিপূর্বেই আর এক গুণবতী কস্তাকে হারিয়েছেন; এ-ও মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বন্ধাক্রান্ত হয়ে মারা যান।\*

ভারতের বড় ল্যাট লর্ড লিটন-ই প্রথম এগিয়ে যান শোকসন্তপ্ত গোবিন্দ বাবুকে সহায়ত্ব জ্ঞানান্তে। ইল্যাপুর সাহিত্যে ও রাজনীতিতে কশাক্রমে বাঁদের নাম বিখ্যাত হয়ে আছে, সেই পরিবারের সুরোগ্য সন্ধান 'clytemnestre' গ্রন্থের লেখক লর্ড লিটন—নিজেকে একজন উঁচুদের কবি—অত বড় ভারতীয় প্রতিভার প্রতি অর্ধ নিবেদনের সুরোগ্য ব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ থাকতেও পারে যে বিখ্যাত 'Last Days of Pompei' গ্রন্থের Lady Lytton-Bulwer ছিলেন লর্ড লিটনের জননী। জননীর প্রভাব তাঁর চরিত্রের ওপর এমন গভীর রেখাপাত করে যে, কখনও নারীর মাঝে প্রতিভার সন্ধানপেলে সম্মানে সে প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানানো ছিল লর্ড লিটনের বৈশিষ্ট্য। এ-রই কাকা লর্ড হেনরি লিটন ক্রান্তে রাজস্ব ও সাহিত্যিক-রূপে একাধারে জনপ্রিয় হন। ভারতের বড়ল্যাট লর্ড লিটনকেই গোবিন্দ বাবু তাই তাঁর কথ্যার অপ্রকাশিত এই ফরাসী উপজাতি উৎসর্গ করেন।\*

তরু দত্তের মৃত্যুর পর গোবিন্দ বাবু তাঁর সন্ধানদের সাথে পরলোকে পুনর্মিলিত হবার আশায় বুক বেঁধে আশ্রয় চেষ্টা করতেন তাঁর প্রিয় কস্তার রচনাবলী প্রকাশ ও প্রচার করতে। তরুর জীবনী-সংলগ্ন 'A Sheaf Gleaned in French Fields'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশান্তে তিনি স্থির করেছেন, ফরাসীতে লেখা তরুর উপজাতি ক্রান্তেই প্রকাশ করবেন। আমি তাই 'শ্রীমতী আর্ডের-এর সিনপটী' ক্রান্তে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছি।

তরু দত্তের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে আমি অবগে অবীর হয়ে পড়ি। লেখাটি আগাগোড়া তার বুড়া বাবা বসে বসে কপি করে পাঠিয়েছেন : "লিখতে গেলে হাত আমার কাঁপে; ধীরে ধীরে তাই কপি করতে হয়েছে।"—গোবিন্দ বাবু এই বিরাট কাজে হাত দেবার পর আমার জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অসম্বন্ধ লেখার কোথাও কিছুমাত্র কৈপে বাবার চিহ্ন পেলাম না। এই কঠোর অথচ দায়িত্বপূর্ণ কাজটি করবার সময় এক নতুন প্রেরণায় তিনি উত্ত্বঙ্গ হয়েছিলেন তা' সহজেই বোঝা যায়; আমার তিনি লিখেছিলেন, "বতকণ কপি করি, মনে হয়, আমি ওর সাথেই কথা বলছি।"

পরিক্রমে ও প্রেরণায় 'শ্রীমতী আর্ডের-এর সিনপটী' বই ফরাসী হোক না, বত বার পড়ি, আমার মনে পড়ে বার আমাদের

দেশের টবে-সাজানো বিদেশী ফুলের কথা : এ-দেশের জল-হাওয়া তাদের যতই স্নেহ থাক, তবু গন্ধ থেকে যায় স্বপ্নের এক ভিন্ন-দেশের মাটির। ভারতের প্রভাব তেমনি এই উপজাতি থেকে গিয়েছে। মার্গরিৎ আর্ডের-এর প্রেমাস্পদ নরহত্যা করে নিজেকে সমাজের চোখে ঘৃণিত করে তুললেও, মার্গরিৎ-এর মনোভাব তাঁর প্রতি অপরিবর্তিত রয়ে গেল,—এর মধ্যে শুধু বাইবেলের শিক্ষাই মূর্ত হয়ে ওঠে নি। হিন্দু সমাজের সেই রীতির কথাও স্মরণ আসে। পতি ভাল হোক মন্দ হোক, সং হোক, দুষ্টরিত্ত হোক—তবু সে দেবতা! নারিকার স্বভাব-মার্ধ্ব ও নরহত্যা, প্রত্যেক চরিত্রের স্বভাব, কবিত্বময় উপমা—সব কিছুই আমাদের বারে বারে ভারতীয় জীবনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তবু অনেক ভারতীয় লেখকদের মাঝে প্রাণনীর অথচ সহজলভ্য বা' নয়, তা' এই বইয়ে আমরা পাই : স্মৃতি ও সংযম। ইংরেজী জীবনের প্রভাবও এর মাঝে কিছু পাওয়া যায় : পারিবারিক বর্ণনা ও Home-এর নিবিড় আত্মীয়তা।

এই উপজাতি আমরা কাব্য থেকে নাটক, নাটক থেকে কাব্য ঘুরে ফিরে আসি। অসাধারণ এর উদ্ভাবনা-শক্তি। ভারতীয় নারীদেরই মত স্বাভাবিক অথচ ক্ষত্র-ভাষায় মার্গরিৎ আর্ডের-এর প্রতিটি ভাব-পরিবর্তন তরু সহজেই ফুটিয়ে তুলেছে—একাধারে তাক্রণের নির্মল আনন্দ থেকে প্রেমের প্রাণ্ডও আবেগ, অন্ধ দিকে সাধী সতীর, নবীন জননীর সাংসারিক স্বর্থ থেকে মৃত্যুর দারুণ বেদনা অবধি। মার্গরিৎ-এর দিনপঞ্জীর প্রথম কয়েকটা পাতায় আমরা পাই এক পঞ্চদশকে কেন্দ্র-ক'রে অনবচ্ছিন্ন পারিবারিক স্নেহছায়া; তারপর দুইটনার রক্ত আবেগে, পূর্ণদীপ্তিতে জেগে-ওঠা নারীর আত্মচেতনা, অব্যক্ত ব্যথায় সে ফিরে পড়ার আশ্রয় পরিচিতি ক্রুরের পানে। ক্রান্তের পল্লবালার ধর্মভীরুতা স্বপ্নরূপে একেই তরু দত্ত। মার্গরিৎ আর্ডের-এর চিত্তে ছেলেবেলায় কনজেক্টর মৃতির কত মূল্য তা জানা যায় ভগিনী ভেরোনিকের মৃত্যুতে তার মনোভাব দেখে; আর তাঁর স্বর্গে অবস্থানের প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাসের মাঝে। পরিণয়ে বঙ্গল-স্বত্রটিও তাই দেবমাতা মেঘির চরণতলে উৎসর্গ ক'রে নিজেকে সে ক'রে তোলে তাঁর একান্ত আশ্রয়ের উপযুক্ত। পত্নী ও মাতারূপে সে তাই তোলে নি প্রেমাবতারের জননীকে।

বহু বার মার্গরিৎ আর্ডের-এর কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, এ-ও বুধি ভারতীয় এক তরুণী আমাদের ফরাসী খুঁটান আগুতার বড় হয়ে উঠছে। তরু দত্তের চিঠি-পত্র পড়ে তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমার কাছে ধরা দিয়েছে, সেই তরু দত্তের কণ্ঠই যেন থেকে থেকে শুনতে পেয়েছি মার্গরিৎ-এর কণ্ঠে। এই নারিকার মতোই বার বার খুঁজে পেরেছি তরু দত্তের নিরাবরণ কমনীয় সত্যকে, তার স্বপ্নের স্পর্শকাতর ভালবাসাকে, ভগবানের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাসকে। শ্রীমতী আর্ডের-এর শিষ্টভবনই যেন তরু দত্তের বাসগৃহ। পিতা-মাতা পরিবেষ্টিত মার্গরিৎকে দেখে মনে পড়ে বার বাবা-মার স্নেহনীড়ে লালিত তরু দত্তের স্বপ্ন।

মৃত্যুর যে-ভাবনা ধীরে ধীরে মার্গরিৎ আর্ডের-এর সিনপটীতে স্নানিত হয়ে উঠছে তা' লক্ষণীয়। বোড়ীর মনে প্রথমে জেগেছে

\* তরু দত্তের যে কয়টি রচনাবলীর উল্লেখ এ বাৎ করেছি, তা

সংগ্রহ করে প্রকাশিত পঞ্চদশখণ্ডের মাসিক পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হইবে।

এই ত সব ছাশিশ বছর পূর্ণ হয়েছে (মৃত্যু? এক কাছে? পরম্পিতার স্নেহে, আনন্দে মুখের এই বৃহৎ ছেড়ে বাওয়া? ভগিনী জৈরোনিক পরম সুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। কেন, আমি বুঝে উঠতে পারি না। জীবন কি শুধুই তিক্ততার একটানা অভিজ্ঞতা? মার্ঘ্য কি সেখানে নেই?—এ অবধি আমি ব্যথা কি কোন দিন জানতে পারি নি। এই জগৎ—কী স্বন্দর।”

কিন্তু ওর ভুল ভাঙতে দেয় হয় না। জীবন তার স্বরূপ নিয়ে মার্গরিতের সামনে আত্মপ্রকাশ করে। মানসিক উত্তেগের পরেই আসে শারীরিক স্বরূপা : তরু নতু বর্ষা বস্ত্রবিক জীবনের দস দিয়ে তা' ব্যক্ত করেছে। সেধিকার নিজে জীবনের ছায়া ও অশ্রুখের অস্তিত্ব অভিজ্ঞতা পুরোমাত্রার উপভাসের শেষ অংশটিকে সমাচ্ছন্ন করে তুলেছে মৃত্যু-চিন্তায়। তবু মৃত্যুর সাথে চিরজনের ধানই প্রথিত হয়ে আছে। ভগিনী জৈরোনিকের অস্তিম-শয্যায় যে অমরতার আলো দেখা দিয়েছিল, সেই আলোতেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মার্গরিতের শেষ মুহূর্ত, সেই আলোই ভাবের হয়ে ওঠে তরু নতুকে ঘিরে।

মার্গরিতের মাঝে আমরা যদি তরু নতুর ভাবধারা, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও অকাল-মৃত্যুর সাদৃশ্য পেরে থাকি, সে সাদৃশ্য এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ। তরু নতুর জীবনে আসেনি সেই স্বপ্ন, যে বড় মার্গরিতের জীবন-কলিকে অকালেই বুদ্ধচ্যুত করল। অল্প বয়সেই তরু নতু ইহলোক ত্যাগ করে। হাম্পট্রের ও হাউসের প্রেয়-রসে সে ছিল বঞ্চিত। তবু তার হৃদয়ের প্রশস্ততাই করনার তাকে এ ভাব উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল। তার মা আর বাবা একমাত্র বয়ে গেলেন এই পৃথিবীতে—তার সাথে পরলোকে মিলিত হবার পরম-স্বপ্নের অধার প্রতীকার। যদিও তার জীবনের স্মৃতি সবচেয়ে বড় করে জাঁক আছে তার বাবা-মার অন্তরেই, তবু তার সাহিত্যের খ্যাতি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আজ পৌঁছে গেছে। তারতর্ক্য ও ইংল্যান্ডের মধ্যে এই বশবিনারি গৌরব নিয়ে ইতিমধ্যেই কাঁড়কাড়ি পড়ে গেছে। আমি বলতে পারি, ফ্রান্সেও চিরদিন সবাই নতল করবে এই তরুণী বিশেষিনীকে, ফ্রান্সের নীনতম মুহূর্তে আপন ভাব ও হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যে নিজেকে করাসীসের সাথে অভিন্নতা মনে করেছিল।

অনুবাদ : পৃথ্বীজনাথ মুখোপাধ্যায়।

## আলো আলো চোখে

জয়ন্তী সেন

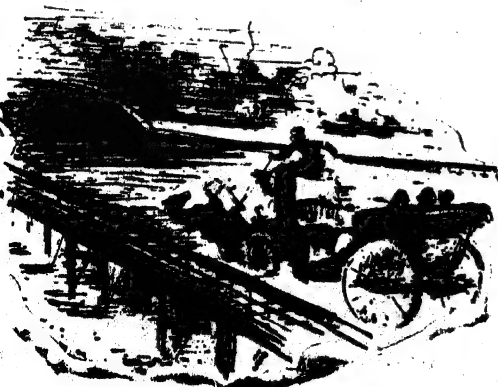
মেঘ থেকে মেঘ ঘন সিঁড়ির ক' ধাপ  
আকাশের নীল হ্রদে সেখানে আনত  
আলো আলো মুখ কার ছায়া ঘন সোনালী আভার  
চেনা মনে হয় তাকে বিকেলের ঝিলিমিলি হৃদে।  
সবুজ টিরার টিপ গোয়ালির সন্ধ্যা কপালে  
ভীকু পায়ে ধাপে ধাপে নীল জলে ছায়ার কাঁপন  
হলুদ জীচল ওড়ে এসোমেসো পাড়ের ছরিতে  
হুটু তারি থিকিমিকি—চোখ ভরা সাঁঝের কাজল।  
সেবেছি কি তারে কড় জীবনের চেনা সবশীতে  
দিনের প্রথর বেজে—তারাইন রাতের প্রহরে?  
দিনের রাতের স্বপ্ন পালা করে আসে বার বার  
ক্রমাগত প্রত্যাহার ফুল-কোটা সাজ করে করে;  
পরিচিত সেই ক্ষণে জীবনের হঠক তাগিদে  
পাখুরে জমির পরে পথ কেটে চলাব প্রয়াসে  
স্বপ্নেরা উবাও পারী—মেঘে তার চিহ্ন পলাতক।  
তবু গোয়ালির কণে শব আসে-কণাটির মত  
ছায়া তার ভাসে মনে মেঘে মেঘে আকাশের নীচে  
পলক কুলিক তারে ডান্ডো লাগে কবিক আভাস  
কবিতার হুটু কলি ভূসে বাওয়া গানের চরণ  
হঠাৎ বয়সে পাওয়া মধুমুখিত অনেক কালের

শিবদাস তার বাহনটিকে হাতে টেনে চলছিল। হুশ' উপহারের প্যাকেটটা আমাদের কারো হাতে ছিল। এমন সময় বীড়ন ট্রাটে মিনার্ভা থিয়েটারের কাছাকাছি বিপরীত দিকের একটি বাড়ির সঙ্গে সাইকেলটি হেলান দিয়ে রেখে ভিতরের এক হারমোনিয়াম মেঝামেজের সোফানে ঢুকে গিয়ে বলল, "দাদা, এক খণ্ড দড়ি দেবেন? বড় বিপদে পড়েছি।" সোকানী এক খণ্ড দড়ি তার হাতে তুলে দিল। শিবদাস তৎক্ষণাৎ তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে উঠে পড়ল। উঠে দেখে সোকানী লাফিয়ে শূন্যে উঠে পড়েছে—মুখে ঘনিত হচ্ছে "এ কি কাণ্ড, এ কি করেন মশায়।" শিবদাস গম্ভীর ভাবে বলল, "আগুন যে উপকার করলেন তা কল্পন করে বলুন।" তা ভিন্ন আগুন আমাদের জ্যেষ্ঠ, পুজনীয়, আবার আগুনার ধূলা দিন।—শিবদাস গম্ভীর ভাবে সোকান থেকে বেরিয়ে এসে উপহারের প্যাকেটটা সেই দড়ির সাহায্যে তার সাইকেলের কেরিয়ারের সঙ্গে বেঁধে নিল।

শিবদাস কোম্পানী বিচার শিখেছিল। প্রথম পরীক্ষার সময় সে আপন কোম্পানী বিচার ক'রে বুঝতে পারে সে সময় সকল গ্রহই তার প্রতিফল, অতএব পাস করা তার হবে না। এমনি অবস্থায় গুজব ভ্রমতে গেল সে সব বিষয়ে পাস করেছে। শুনে মনটা তার ধরাপ হয়ে গেল। তবে কি তার বিচারে ভুল হল? সে একে একে প্রত্যেক পরীক্ষকের কাছে যেতে লাগল সত্য বাচাইয়ের উদ্দেশ্যে। যেখানে যায় সেখানে পাস করেছে। শুধু একজন পরীক্ষক মার্ক বললেন না, এক শুধু তাই নয় তিনি অত্যন্ত কড়া লোক ছিলেন—আইন না মেনে মার্ক জানতে আসাতে তিনি শিবদাসকে তার বিষয়ে ফেল করিয়ে দিলেন।

শিবদাস ফেল করেছে জানতে পেরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল—কারণ গণনা মিলে গেছে।

সেটি সম্ভবত ১৯২৫ সাল। শিবদাসের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে আমরা উপস্থিত ছিলাম। বিয়ের কিছুদিন পরেই কোনো একটি ঘটনা নিয়ে তার স্বত্ববাবুটি সঙ্গে তার কিছু মনোস্তব ঘট, এক এই ব্যাপার নিয়ে কিছু চিঠি লেপালেখি চলে। একদিন শিবদাস আমাদের কাছে প্রস্তাব করল সে সবগুলো চিঠি পড়ে পোনাবে। সে বত চিঠি লিখেছিল তার নকল রেখেছিল।



যোড়া আড়াই খেয়ে প'ড়ে গেল।

তাই ঠিক হল। অনেক চিঠি, কোথার পড়া বার? বলাই বলল, রাজে মরদান গিয়ে কোনো আলোর নিচে বসে পড়লে বেশ হয়। অগত্যা তাই ঠিক হল। আমরা সেখানে গেলাম রাত বারোটা আশান্বিত সময়ে। টাকা ট্রান্সিসহ সমস্ত চিঠি পড়া শেষ করতে মোট তিন ঘণ্টা লেগেছিল। সে প্রকাণ্ড এক ফাইল। শিবদাস সব বিষয়ে ছিল নিখুঁত।

রাত তিনটোর কোথার বাওয়া যায়? ঠিক হল একটা ফীটম ভাড়া ক'রে সকাল পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়াব। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া, শিশিরে বাস ভিজে উঠেছিল। শীত অনুভব হচ্ছিল বেশ। চা খাওয়া দরকার। আমরা তখন ট্র্যাণ্ড রোড ঘ'রে চলেছি। শিবদাস হীকল চালাও হাওড়া ট্রেন। চা খাওয়া দরকার, অতএব হাওড়া ট্রেন।

এই অতএবটা আমাদের ভ্রান্তি। হাওড়া ট্রেনের ঠেল যে মাত্রিকালে বন্ধ হয়ে যায় সে খোয়াল কারোই ছিল না। ট্রেনের গাড়ি-বারান্দার আমাদের ফীটম গিয়ে পড়ল, আমরা নেমে ভিতরে গেলাম। সেখানে এক পুলিশ কনষ্টেবল আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। শিবদাস বলল আমরা চা খেতে এসেছি। কনষ্টেবল আমাদের বুঝিয়ে বলল রাজে ঠেল খোলা থাকে না, চা এখন পাওয়া যাবে না। শিবদাস তৎক্ষণাৎ তার ডান হাতখানা খণ করে ঘ'রে হস্তরেখা বিচার করতে লাগল। কি বলেছিল মনে নেই, তবে তার ক'টি সম্ভান তার সংখ্যা বলেছিল এক তা মিলে গিয়েছিল। কনষ্টেবল মহা খুশি, সে বলল "পাঁড়ান চায়ের ব্যবস্থা করছি"—বলে কোথায় চলে গেল এবং মিনিট পনেরো পরে ফিরে এলো এক চাওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে। তিনটি মাটির ভাঁড়ে তিনজন সেই চা খেলাম, চায়ে হৃদয়ের বদলে ক্ষীর! উপাসের লেগেছিল।

এই প্রথম দেখলাম শিবদাস উপকারীর পায়ে ধুলো নিল না, খুব ভারিজে চলে গাড়িতে এসে উঠল। গাড়িতে উঠতে দ্বিতীয় আর একটি কনষ্টেবল এগিয়ে এসে আমাদের খুব খাতির করতে লাগল। শিবদাস দুজনকেই কিছু বখশিস দিতে গেল, তারা বখশিস নিতে অস্বীকার করল। গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে। শিবদাস বলল "ঠিক করেছে না নিয়ে—এইটাই আমরা দেখতে এসেছিলাম।" কনষ্টেবলরা তা শুনে আরও একবার সামরিক ভঙ্গিতে সালাম জানাল।

ফিরতে একটি ঘটনা ঘটেছিল। হাওড়া ব্রিজ তখন ভোরবেলা খুলে দেওয়া হত সপ্তাহে কয়েক দিন। আমরা ব্রিজ পার হওয়ার সময়েই খুলে দেওয়ার সময় হয়েছিল। গাড়ি সব থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ঘণ্টা বেজে গেছে। আমাদের কোচম্যান হঠাৎ গাড়ি খুব জোর ছুটিয়ে দিল ব্রিজ খুলতে খুলতেই বাতে পার হয়ে যেতে পারে, নইলে অসম্ভব ঘটনা হুই সেবি হবে। পার হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু পার হয়েই বোড়া আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। হৈ হৈ ব্যাপার। শিবদাস ভীষণ রগে গেল কোচম্যানের উপর। আমরা দৈবাৎ বেঁচে গিয়েছিলাম, কারণ গাড়িটা সোজাই পড়িয়ে ছিল। বোড়াকে তুলে সেবার পর গাড়ি আবার চলেতে আরম্ভ করল।

সমস্ত রাত বাইরে থাকার কলে আমি সর্পিভাবে আঁকাত হয়েছিলাম এবং কয়েকদিন ল্যালাশারী থাকতে হয়েছিল সেজন্য।

শিবদাস কলোজে পড়ার খরচ চালাতো নিজে উপার্জন করে। খুব পরিশ্রম করতে হত, সেজন্য পড়ার বতটা মনোযোগ দেওয়া দরকার, তা দিতে পারত না। সেজন্য সে প্রথম এম-বি পরীক্ষাতে মেটেরিয়া মেডিকার ফেল করেছিল। সম্ভবত ওষুধের মাত্রা মুখস্থ ছিল না। ছোট একখানি বই তার হাতে দেখেছি, তাতে ওষুধের মাত্রা ছাপা ছিল। সেই বই সে যন্ত্রের মতো মুখস্থ করবে বলে উঠেপড়ে লাগল। ফেল করে শিবদাস একবারই মাত্র খুশি হয়েছিল, কারণ তাতে ছিল তার কৌণ্ডীবিচারের নিতুলতার প্রমাণ। এবারের ফেল করার জন্য সে তৈরি ছিল না। কিন্তু জেন ছিল তার অন্ত্যন্ত বেশি। সে ওষুধের মাত্রা এ থেকে জেড পর্যন্ত মুখস্থ করবেই, বাতে একটিও ভুল না হয়। অর্থাৎ প্রায় চার শ' সাড়ে চার শ' ওষুধের মাত্রা মুখস্থ করতে হবে।

ডাক্তার বইখানা সে সর্বদা পকেটে নিয়ে ঘুরত। কিন্তু একা একা মুখস্থ করা বড় একঘেয়ে লাগে। কোথায়ও ভুল হলে নিজে বই খুলে যাচাই করতে হয়, তা ভিন্ন ভুল হচ্ছে কি না তা চেক করা নিজে নিজে সম্ভব নয়। অতএব সে তার নিজস্ব ভকিতে একটি কৌশল উদ্ভাবন করল। পথে চলতে চলতে শিবদাস হঠাৎ সাইকেল ধামিয়ে কোনো পছন্দসই ভদ্রলোকের পায়ের ধূলা মাখার নিয়েই বলল, "দাদা, আমি মেডিক্যাল ছাত্র, পরীক্ষার ডোজে ফেল করেছি, আপনি এই বইখানা খুলে ধরুন, আমি মুখস্থ বলে বাই, ভুল হলে বলে দেবো।" মুখে করুণ সরল হাসি। ভদ্রলোক চিন্তা করবারও অবসর পেলেন না যে, তিনি কি করছেন। কিন্তু তাঁর না করে উপায় ছিল না। শিবদাসের বালকোচিত সরল অহুযোগ, অত্যয় কিছু নয়, কিন্তু অদ্ভুতপূর্ব। হয়তো ভদ্রলোক কিছু গর্বও বোধ করলেন।

ঘণ্টাটির মৌলিকতা লক্ষ্যবীর।

শিবদাসের মুখস্থ বলা আরম্ভ হয়ে গেল। কিছু পরেই ভদ্রলোক বললেন, "এবারে একটু ভুল হল।"

শিবদাস থমকে পঁড়াল। তা হলে মুখস্থ ঠিক হয়নি। বইখানা ভদ্রলোকের হাত থেকে খণ্ড করে কেড়ে নিয়ে তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে বলল, "হ'ল না দাদা, আমি একটি চাম লোদকু"—বলেই দ্রুত সাইকেল চালিয়ে দিল।

শিবদাসের নিজস্ব গড়া কয়েকটি ধ্বজাস্বক শব্দ ছিল। ওর মুখে উচ্চারিত হলে তার বেশ একটি অর্থ ফুটে উঠত। 'লক্ষ্যলক্ষ্য' এই বাক্য একটি শব্দ, মানে চোখাচোখি, খুব শোনা যেত তার মুখে। "চাম লোদকু" জিহ্বা দিয়ে ভিন্ন অর্থ। কখনো নির্বোধ, কখনো কুশণ, কখনো ধূর্ত।

চোরকাই প্রেসের মোড়ে এক প্রহরী পুলিশের পায়ের ধূলা নিয়ে খুব বিনীতভাবে এক সম্মানে জিজ্ঞাসা করল, "আপকা ইডিয়সি কনজেনিটাল হ্যার কি অ্যাকোইয়ার্ড হ্যার?" কিছুই বুঝতে না পেরে কনজেনিটাল হ্যারের সঙ্গে বলল "কনজেনিটাল হ্যার।" শিবদাস বলল "ও! আপ একদম বর্ন (born) ইডিয়ট হ্যার, তা হলে ঠিক আছে, আমি এই গলিতে একটি নির্দিষ্ট কাজ করব আপনি একটু পাহারা দিন" বলে সাইকেলটি তার হাতে দিয়ে বধ্যকর্তব্য করতে গেল। কনজেনিটাল যে অন্তর নিবারণের জন্য সেখানে ছিল,

পকেই সম্ভব। তার লোক বশ করার বিত্তা ছিল একেবারে অমোঘ।

এই চরিত্রের অঙ্কন হয় না। এ তার ব্যক্তিত্বের নিজস্ব রূপ আর পাঁচজনকে ছেড়ে লক্ষ্যবীর হয়ে উঠছে। তার চেহারা সব চরিত্রের সঙ্গে এ সব উদ্ভট ব্যবহার এমন মানিয়ে গিয়েছিল যে এ সব বাদ দিয়ে তাকে ভাবাই যেত না। সব চেয়ে বড় কথা শিবদাসের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ প্রাণবর্ষ ছিল, তেজও ছিল অসাধারণ। তার হাসিটি সব সময় বেদনামণ্ডিত মনে হত, সেজন্য সে একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক চরিত্র ছিল।

দারিদ্র্য ছিল তার প্রথম ছাত্রজীবনে। কিন্তু তা সে বুড়তার সঙ্গে জয় করেছিল এক অবস্থা ফিরিয়ে 'কেলেছিল। তার এম-বি পাস করার পর তার সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখা হয়নি, কারণ আমি কিছুদিন কলকাতায় ছিলাম না। হঠাৎ কয়েক বছর পরে একদিন কর্পোরেশন স্ট্রীট ও গ্র্যান্ড স্ট্রীটে মোড়ে দেখা। ছোট গাড়ি একখানা আমার পাশ ঘেঁষে এসে পঁড়াল।

সে দিকে ফিরে চাইতে না চাইতে গাড়ির চালক শিবদাস খণ্ড করে আমার হাতখানা ধরে তার অন্ত্যন্ত সরল হাসিতে মুখখানা উজ্জাসিত করে ক্রমাগত বাংলায় এম-এ পরীক্ষার পাঠ্যের নাম করে যেতে লাগল এক বলল "এর মধ্যে তোমার কাছে কি কি বই আছে?" আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। ভুল তুলছি না তো? কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই সে তেমনি হেসে বলল, "বাংলায় এম-এ দিচ্ছি।"

খবরটি আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল শিবদাস-চরিত্রের সঙ্গে এর অসঙ্গতি নেই কিন্তু, একবার তার পকেই এম-বি পাস করার পর বাংলায় এম-এ পরীক্ষা দিতে উৎসাহী হওয়া সম্ভব। পরে তুলেছিলাম সে এম-এ পাস করেছিল। আরও পরে আরও একটি খবরে অন্ত্যন্ত বেদনা বোধ করেছিলাম—শিবদাস মোটর ছুঁটনার মারা গেছে। খবরটি বহুবল মনে পড়ে তার ভাইসোর কাছে থেকে তুলেছিলাম।

১৯২৬ সালে মেবারে বলাই এম-বি পরীক্ষা দেবে, সেই বছরেই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় সেখানে যেতে হল সরকারী আইনে। কারণ বলাই বিহার-প্রবাসী বাঙালী, অর্থাৎ বিহারী, অতএব



"আপনি এই বইখানা খুলে ধরুন, আমি মুখস্থ বলে বাই।"



গোঁসার পড়া চলবে না। সুতরাং সে কলকাতার এম-বি হল না, বিহারের এম-বি-বি-এস হল। এই সময় ইন্টারভিশনাল বোর্ডিং-এর অন্ত্যস্ত ভাঙারি ছাত্রও শেষ পরীক্ষা দিয়ে চলে গেলেন। অন্তঃপাশ এলেন এক দল এজিনিয়ার। আমাদের পুণ্ডিতন সহবাসী ছিলেন জীয়াপুত্রের বিদ্রুতি মুখোজ্জ্বল। তিনি খুব আত্মদে প্রকৃতির, হৈ হল। ক'রে খুব জমিয়ে রাখতেন। তিনি ভাঙারদের মনস্তত্ত্ব থেকে স্বচ্ছ হ'লে এজিনিয়ারদের মনস্তত্ত্ব এবং তার পরবর্তী কালেও ছিলেন। আর একটি বহুতপূর্ণ চরিত্রের লোক ছিলেন এখানে। তিনি জাৰ্মানি ইসলামও প্রভৃতি ঘরে এসেছিলেন। কেন, তা আমাদের কাছে বুঝে যা ছিল, কেননা তিনি ইংরেজী বা জাৰ্মানি কিছুই ভাল জানতেন না। কিন্তু তাঁর খুব জ্ঞানবলার ছিল। মাঝে মাঝে ভোরবেলা ট্রেনে জাৰ্মানি বা ইংরেজী অভিধান খুলে নিয়ে চিঠি লিখতে বসতেন। একথাটা চিঠি শেষ করতে হুঁকির মিল লাগত। ইংরেজ ও জাৰ্মানি মনেদের চিঠির উপর। প্রথমতঃ সবই দেখিয়েছিলেন হুঁ একথাটা।

অতুলানক প্রকৃতির তখন ইন্টারভিশনাল বোর্ডিং-এর মাসিক। সে এই জুলাইকোকে ঠাট্টা ক'রে বলত প্রথমপত্র লেখা যে কারো কাছে এমন বিতীর্ণিকার যাপাণ হতে পারে তা তে জানতাম না, আমরা তে জানি ঠাট্টা একটি আমাদের যাপাণ। এই জুলাইকো আমাদের খুব পছন্দ করতেন, কেননা চিঠিলেখার আমি তাঁকে অনেকবার সাহায্য করেছি। ইংরেজ মেয়ের চিঠিগুলো আমাকে দেখাতেন। তাতে তাঁর প্রশংসিত লিখতে, "আর কত দিন অপেক্ষা করব, তুমি আমাকে ভারতবর্ষ নিয়ে মাঝে প্রতিজ্ঞা দিয়েছ, আমি দিন তনছি।"

জুলাইকো যে মেয়েটিকে ধান্না দিয়েছেন তা বুঝতে সেরি হল না। ইনি, লণ্ডনের এক ছুঁলের মেয়ে, নাম নেলি, তার সঙ্গে চিঠিতে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, সে মেয়েটি অনেকদিন আমাকে চিঠি লিখত পড়াশোনা আর ছবি আঁকার ব্যাপার নিয়ে। তাঁর আঁকা জলরঙা একগুচ্ছ ডারোলেটের ছবিটি খুব সুন্দর হয়েছিল, এ ছবির প্রশংসা করতে কি খুঁশি!

একদিন এই জুলাইকোকে সমস্ত গায়ে ব্যাণ বেরোল। দারুণ জয়ের ব্যাপার। তখন ইন্টারভিশনাল বোর্ডিং এ ভাঙার কেউ ছিল না, আমি নিজে থেকে ডেকে আনলাম আর এক বন্ধুকে, তিনি ভাঙারি ছাত্র। নাম সমরেশ ভট্টাচার্য, নিমন্তলা ষাট শ্রীটির বিখ্যাত সার্জন লুইস ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র। সমরেশকে বললাম, তাই একটা ব্যবস্থা কর, সবাই সমবেদন করছে হল পূজা করেছে। তার পাছক সবাই। সমরেশ একটুখানি দেখেই আমাকে বাইরে এসে পোশাক বলল মল নয় বিপ।

সমরেশ পরে এসে তাঁর সন্ত নিয়ে গেল, ভারতীয়ান বিজ্ঞানকন পঞ্জিচিত। ওয়েবে ব্যবস্থা হল, কিন্তু কেন যে যোগী ইনজেকশন ইন্ডিয়ান বিনামূল্যে হওয়া সম্ভব নিতে অস্বীকার করলেন জানি না। তবে জানা গেল ইতিমধ্যে তিনি কোনো এক দৈব ওষুধের ব্যবস্থা করে কেলেছেন। তারপর অনেকদিন তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। পরে শুনেছি কেনো এক সন্ন্যাসীর চোলা হয়ে তিনি পঞ্জিকা আকর্ষণে এক সন্ন্যাসিনীর অনেক ছুর এগিয়েছেন, গায়ে তার মধ্যে থাকেন। তারও পরে শুনেছি তিনি আর কেউ নেই।

ইন্টারভিশনাল বোর্ডিং-এ থাকতেই আমি যেটা ছোট নজর লিখতে আরম্ভ করি। সে সব ছোটখাটো কাগজে ছাপা হত। বলাইও লিখত। আমাদের দুজনেরই তখন লেখার পরিমাণ ছিল কম। এক তারও একটা বড় অংশ ছিল কয়দারেসি বিয়ের উপহার লেখা। বলাইয়ের বিয়েতে আমি নানা নামে একখানা বইয়ের আকারে অনেকগুলো উপহার কবিতা ছাপিয়েছিলাম। নানা ছন্দে লেখা ছিল কবিতাগুলো। ১৯২৬ সালে বিজিয়ার আমায় একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়—নাম আর্টের অর্থ; এ প্রবন্ধের কথা আগে একবার বলা হয়েছে। এরই কাছাকাছি সময়ে কলকাতার সিনেপারলর হাণ্ডের সঙ্গে পরিচয় হয়। কিভাবে হয় তা আর মনে পড়ে না। তাঁর জন্মদেখে কলকাতা ছাড়া বাকি গল্প লিখেছিলাম। কাছিক নজরক ইসলাম 'নওরোজ' নামক একখানা কাগজ বের করেন, তিনিও আমার একটি বাকি রচনা ছেপেছিলেন। দীর্ঘ ইউরোপ প্রবাসখ্যাত গিরিজা মুখোপাধ্যায় তখন সেউপলস-এর ছাত্র, তিনি দেউটা নামক একখানা মাসিকপত্র বের করেছিলেন। সে কাগজে বাকি রচনা লিখেছিলাম, বলাইও লিখেছিল।

একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বাকি গল্প লিখি ১৯২৬ সালে। সেই আমার প্রথম বড় বাকি গল্প। কোনো বড় সেটি প'ড় আমার কাছ থেকে নিয়ে হান মাসিক বহুমুখীতে। বহুমুখী (চৈত্র ১৩৩৩) সংখ্যায় সেটি ছাপা হয়েছিল, বহুমুখী সিলভার জুবিলি সংখ্যায় সেটি পুনরুদ্ভূত হয়েছে। তখনকার সকল বাকি লেখাতেই একটা অপরিপকতার ছাপ স্পষ্ট, এবং বহুমুখীতে।

লেখা তখনকার দিনে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আনন্দাং, উপার্জনেচ্ছার কদাপি নয়। লেখা ছাপা হলেই একটা তৃপ্তি। কলকাতা লিখলেও সিনেপারলর ভিন্ন কলকাতাসৌষ্ঠীর অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে অনেক পরে, সম্ভবত পাঁচ ছ' বছর পরে। সিনেপারলর দাঁশ ব্যক্তিটি বড়ই সহায় এবং মনোখোলা ছিলেন, আমার সঙ্গে তাঁর শ্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিছুদিনের মধ্যেই এবং শ্রীতি বশতই তিনি আমার লেখা পছন্দ করতেন। ফোটাগ্রাফিতে তাঁর আকর্ষণ ছিল, এ বিষয়ে আমি তাঁকে সাহায্য করেছি অনেক পরে।

ইন্টারভিশনাল বোর্ডিং-এ এই সময়ের মধ্যে আর একজন অধিবাসীর কথা মনে পড়ে। নাম বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি নৃতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত হয়েছেন পরে। এজিনিয়ার দলের মধ্যে কাশীর তারারচণ্ড গুইনের কথা আগে মনে পড়ে। তিনি তখন বি-ই পাশ ক'রে বেলে চাকরি করতেন, শিয়ালদহের পাথে তিনি ছিলেন ডেইলি প্যাসেঞ্জার। তিনি সাহেবী পোষাকে থাকলে কেউ তাঁর সঙ্গে বাংলার কথা বলতে ইতস্তত করত। তাঁর সেই দীর্ঘ, পেশীমিষ্টাস আঙোর মতো। এ দুইয়ের যোগাযোগ বাঙালীর মধ্যে আমি আর দেখিনি। তারারচণ্ড উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন এবং নিজে গাইতেন। ইন্টারভিশনাল বোর্ডিং-এ এই উপলক্ষে মাঝে মাঝে গানের আসর বসত। সঙ্গী গায়কেরা আসতেন।

তারারচণ্ড গুইন আমাকে বাছাচর্চায় দীক্ষা দিয়েছিলেন, আমার মতো কী দেখেও চড়তে চড়তে ক্রমে পশ্চিমাট ডন এবং পশ্চিমাট বৈকুণ্ঠ উঠেছিলাম। আগে ছুলাজীবনে তাগোরের চৌ একপ্যাণ্ডার সাহায্যে মাঝে মাঝে বাছাচর্চা করেছি। তার কোনো সময় ছি?



দৈন্যে নিবাস গ্রহণ করে পাকস্থলীর কিছু উপকার হয়েছিল, তখন কিছুকাল ধরে জারক রসসমূহ বধা পরিমাণ নির্গত হয়েছিল তাদের নিজ নিজ গুপ্ত বাস থেকে। এই তারারতরণ পরে ভনেহিলায় ওরা বাজার এলিনীরায় হয়েছেন। কৃষ্ণকুমার বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষ সখ্য হয়েছিল, পরে তাকে হগলী জেলা এলিনীরায় পাঠে দেখেছি।

ইন্টারজাশক্তাল বোজিএর ম্যানেজার প্রথমে ছিলেন মাখনবাবু, পরে রবি বস্কিভ। ইনি হরিবাবু নামে পরিচিত। সাইকেলে খুব জ্ঞান করে খ্যাত হয়েছিলেন, সত্যতাবেও বেশ নাম ছিল। তিনি আমাদের বন্ধুত্বানীর হয়ে উঠেছিলেন। হাস হয়েক আগে আ-কটিটবিজারী লাড়ি তুল নিয়ে দেখা করেছিলেন, পরিচয় না ওেড়া পর্যন্ত চিনতে পারিনি। রবি বস্কিভকে ইতিপূর্বে শেষ দেখেছিলাম ১৯৪৩ সালে এ-জার-পি কর্মীজগে সাইকেলে ছুটতে। তার পরেই এই প্রায় সন্ন্যাসী বেশ।

চেনা-অচেনার ব্যাপার নিয়ে আরও দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গেই সেগুলো বলে রাখি।

মুন্দের মধ্যে ১৯৪৪-৪৫ এর কোনো এক সময় রে ট্রিটে এক মিলিটারি অফিসারের পাশ কাটিয়ে বেতে তিনি খণ করে আমার হাত ধরে হেসে বললেন, “চিনতে পারেন?” আমি বলি, “না”। তিনি ভীষণ বিম্মিত হয়ে বললেন, “সে কি কথা?—সেখুন ভাল করে ভেবে।”

হু তিন মিনিট কেটে গেল কিছুই মনে পড়ল না। তখন তিনি একটু দমে বাওরা সুরে বললেন শরৎদার কথা মনে নেই ইন্টারজাশক্তাল বোজিএর?

এবারে আমার বিস্মিত হবার পালা। ইন্টারজাশক্তাল বোজিএ কিছুকাল আগে আমরা একত্র কাটিয়েছি, এবং তা দুচার দিন মাত্র নয়। আমরা একসঙ্গে অভ্যুত্থানক, রবি বস্কিভ প্রভৃতি মিলে গ্রুপ ফোটা তুলিয়েছি। শরৎ সেন এম বি পাস করে আয়ুর্বেদ এবং আইন পড়ছিলেন। তিনি সবাইই শরৎদা ছিলেন, এই মাহুতাকে চিনতে পারিনি!

পরে ভেবে দেখেছি এর ব্যক্তিগতত করেকটি কারণ ছিল। প্রথমত তাঁর চমৎকার ছাপাটি পাতের একটুও মুখে ছিল না, তাঁর গৌরবান্বিত কৃষ্ণ কাপড়িতে পরিপূর্ণ এবং পোষাক বোল আনা মিলিটারি। তবু এ ঘটনাটি আমাকে খুব ভাবিয়েছিল এবং এই বিবরণ নিয়েই ১৯৪৬ সালে “নতুন পরিচয়” নামক একটি গল্প লিখেছিলাম, সেটি ঐ বছরেই প্রকাশিতে ছাপা হয়েছিল। (পরে গল্পটি “মারকে লেজে” বইতে ও শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প সংকলনে স্থান পেয়েছে।)

আরও একটি মজার ঘটনা। বছর চারেক হয়ে গেল। কর্ণওয়ালিস ট্রিটে ট্রামে উঠছি। পুরনো গরিবীন ট্রাম। উঠেই ভিতরে প্রবেশ করে ডানদিকে চারজনের উপযুক্ত যে একটি তপ্ত আসন ভারী বী কোণে বসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক দীর্ঘ কেশ ও শঙ্কণ্ডকারী গৈরিক বসন সন্ন্যাসী উঠে আমার বী পাশে বাইরে অবস্থিত যে আধাধান আসন তাইতে বসলেন। আমাদের দুজনের ব্যবস্থানে ব্যবস্থান একটিমাত্র জানালা।

ছিলেন। এমন সময় বী ধারের সেই জানালার পাশ থেকে সেই সন্ন্যাসীর মুখ আমার কানের কাছে বসে উঠল, “এই যে পশ্চিমবঙ্গ!”

আমি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম সেই অজেনা মুখের দিকে।

“আমাকে চিনতে পারছেন না?”

“না। ঠিক মনে হচ্ছে না তো।” লজ্জিতভাবে বলি। হয় তো তিনিও লজ্জিত হচ্ছেন।

তারপর হঠাৎ দুহাতে তাঁর সমস্ত লাড়ি চেপে আড়াল করে মাথাটা বতটা সমস্ত জানালার ভিতর গিরে গলিয়ে বললেন, “সেখুন তো এবারে চিনতে পারেন কি না?”

ট্রামের বাজীরা আমার দিকে আমার উত্তরের অপেক্ষার চেয়ে রয়েছে। কিন্তু আমি সেই লাড়ি চেপে ধরা মুখও চিনতে না পেরে প্রায় বেয়ে উঠছি। সন্ন্যাসীও লাড়ি থেকে হাত সরানি না, আশিও তাঁর মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারি না।

অবশেষে সন্ন্যাসী হত্যাণ হয়ে লাড়ি ছেড়ে গিরে বললেন, “আমি—এর দাঁড়া, এবারে চিনতে পারছেন?”

চকিত মনে পাড়ে গেল সব। চেনা উচিত ছিল একজন। কিন্তু প্রথমেই তিনি না রূপ যে জাতি বটেছিল তা আর পেল না সহজে। ট্রাম মুখে বাজীর কাছে আমি অপরাধী হয়ে রইলাম।

১৯৫৩ সালে আরও একজন পরিচিত পুলিশের লোককে সন্ন্যাসীবেশে দেখলাম যুগান্তর অফিসে। তবে একে চিনতে কষ্ট হয়নি। অনিবার্য পরিবর্তনের পাথে চলেছি আমরা। ব্যাপারটা ভুলে থাকি বলেই মাকে মাঝে চমকে উঠতে হয়। আর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ মাহুবেই মনে যে বৈরাগ্য জাগতে থাকে, এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু হুঁ-টার জন যে বাইরেও গৈরিকবাস পরেন এক লম্বা চুল-লাড়ি রেখে বৈরাগ্য ঘোষণা করেন, সেটি নিতান্তই বাহুল্য বলে আমার মনে হয়।

১৯২৬-২৭এর মধ্যে রাজবাড়ির (ফরিদপুর) রাজা সূর্যকুমার দারের পুত্র সৌরভস্রোহনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি রতনসিয়ারে তাঁর হেড মাস্টার ক্রোলাকানাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে—অথবা ক পৈলেনে চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসতেন। কংসরাজে একবার ক’রে পুজোর মধ্যে তাঁদের প্রাসাদে গিরে হাজির হতাম। সৌখি দলের খিরেটার হত সেখানে। স্থানটি রাজবাড়ি ট্রেন থেকে হু মাইল দূরে, লক্ষ্মীকোল নামক জায়গায়।

রাজা সূর্যকুমার ছিলেন বরিশালের জমিদার মতিলাল ঘোষ-বস্তিদারের ভগিনীপতি। তিনি সূর্যকুমার দারের এজেন্টের এক্সিকিউটর ছিলেন। তাঁর এক পুত্র রাজবাড়িতে রাজা সূর্যকুমার ইনষ্টিটিউশনে পড়ত। সে বধন ম্যা ট্রি কুলেশন পাড়ে (১৯২৬) তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয় সূর্যকুমারের বাড়িতে। ছেলেরাটির ছবি আঁকার বেশ হাত ছিল, দেখে



হুঁহাতে লাড়ি চেপে ধরে বললেন, সেখুন তো, এবারে চিনতে পারেন কি না?

গল লেগেছিল। আমিই বলেছিলাম, একে যেন আর্ট হুলে দেওয়া হয়। থ্যাট্রিকুলেশন পাস ক'রে সে কলকাতা সরকারী আর্ট হুলে ভর্তি হয়েছিল। তার পর সে গেল মাদ্রাসে দেবীপ্রসাদের হাতরুপে। কালীকঙ্কর ঘোষদত্তিয়ার এর নাম। শিল্পীরূপে আজ সে সম্মানিত।

জমিদার-সম্মান কালীকঙ্কর খুব বিলাসিতার মধ্যে মজ্বল হয়েছিল। হু' মাইল দূরে হুলে যেত হাতীতে চড়ে, হাঁটা নিবেশ ছিল। এর মধ্যে দেবীপ্রসাদ বারচৌধুরী সম্পর্কে একটিমাত্র কথা শুনেই আমি দেবীপ্রসাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কালীকঙ্কর সরকারী আর্ট হুলের কোনো গল্পশোনে হুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল আরও অনেকের সঙ্গে; বেরিয়ে এসে সে ভিন্ন প্রদেশের হু' একটি আর্ট হুলে, সব কথা প্রকাশ ক'রে, আবেদন করেছিল ভর্তি হওয়ার জন্য। কিন্তু 'এক্সপেলড' শুনে কেউ রাজি হয়নি। রাজি হলেন একমাত্র দেবীপ্রসাদ। তিনি তখন কলকাতার ছিলেন, কালীকঙ্করকে ডেকে পাঠালেন। কালীকঙ্কর তার কাজের নমুনা দেখাল, দেবীপ্রসাদ তা পছন্দ করলেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে নিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি আমার কাজ দেখ, এক বর্গ, আমার কাজ তোমার পছন্দ হয় কি না। পছন্দ হলে তোমাকে ভর্তি, হাতে বলব।'

কালীকঙ্কর এ কথার স্তুতি হয়েছিল, কোনো শিক্ষক যে ছাত্রকে এতখানি প্রভা করতে পারেন তা তার জ্ঞান ছিল না। এ সুবাদ, আমার কাছেও নতুন। আত্মকমতার নিঃসন্দেহ বিশ্বাস থাকলেই তবে এতখানি মানসিক ওদার্য সম্ভব। কিন্তু এ তো অনেক কাল আগের কথা। চার পাঁচ বছর আগে দেবীপ্রসাদ আমাকে একখানা চিঠিতে প্রসঙ্গত বা লিখেছিলেন তার মর্ম এই যে 'কালীকঙ্কর ফাইনাল পরীক্ষা দিলে অবশ্যই ফার্স্ট হত, কিন্তু পাস করলে হুল ছেড়ে যেতে হ'বে ভরে পরীক্ষাই দিল না সেবারে। একটি বছর অতিরিক্ত শিখল ব'লে ব'লে। ওর নিষ্ঠা দেখে শুকে মনে মনে গুজর সম্মান দিয়েছি।'

এ যুগের কোনো শিক্ষকের মুখে এমন কথা দুলত বৈ কি।

১৯২৫-২৬ থেকে আমি প্রায় প্রতি শনিবারে আজিমগঞ্জে যেতাম প্রবোধের কাছে। পরে বলাই যখন কিছুকাল আজিমগঞ্জের হাসপাতালে ডাক্তারের চাকরি নিল তখন আজিমগঞ্জের আকর্ষণ বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

কলকাতা থেকে একদিন জানা গেল জোড়াসাঁকোর 'নটর পূজা' অভিনয় হবে। এই অভিনয়টি প্রবোধকে বাদ দিয়ে দেখতে

ইচ্ছে হল না, অথচ চিঠি গিরে জানানোরও সময় ছিল না। আমি সন্ধ্যাবেলা রওনা হয়ে রাত তিনটে আসাঙ্গ সময় গিরে পৌঁছলাম আজিমগঞ্জে। তারপর সেখান থেকে সকাল আটটার রওনা হয়ে বিকেল সাড়ে চারটের কলকাতা এসে পৌঁছলাম। টিকিট বিক্রি হচ্ছিল তোরঙ্গী রোডে অবস্থিত কার অ্যাণ্ড মহলানবিশের ফুটবল ও সঙ্গীতবস্ত্রের দোকানে। হাওড়া থেকে সোজা সেখানেই গেলাম আগে। গিরে দেখি টিকিট কেনার খুব ভিড় নেই, তাতে খুবই উৎসাহিত হয়ে দোকানে প্রবেশ করেই দুখানা টিকিট কিনে নিয়ে চলে এলাম জোড়াসাঁকোর। কিন্তু জোড়াসাঁকোর ভিড় দেখে অবাক! ভয় হল, সম্ভবত অনেক ঘেরি ক'রে কেলেঙ্কারী, অতএব দ্রুত পা চালিয়ে ভিতরে ঢুকতে গিরেই অপ্ৰত্যাশিত বাধা।

টিকিট পরীক্ষক বললেন, 'এ টিকিট চলবে না।'

'কেন?'

'এ তো আগামীকালের টিকিট, তারিখটা পড়ে দেখুন।'

পড়তে জানি না বলা সম্ভব নয়, কিন্তু হুখে হল আগে কেন পড়িনি। এবং আগামী কালের টিকিটই বা কিনলাম কেন? অথবা কার অ্যাণ্ড মহলানবিশই বা তা দিলেন কেন? আমরা তো বলিনি আগামী কালের টিকিট চাই।

টিকিট পরীক্ষক ব্যাপারটা অমুমান করলেন। তিনি বললেন 'আজকের টিকিট অনেক আগেই সব বিক্রি হয়ে গেছে, তাই বিক্রেতা ধীরে টিকিট কিনতে গেছেন তাঁরা আগামী কালের টিকিটই কিনতে গেছেন এটি খবর নেওয়া হয়েছে। কোনো নোটিশ সেখানে অবশ্যই আপনাদের ডোখের সামনে ছিল, আপনারা হয় তো দেখেননি। আপনারা যে আজকের টিকিট ভুলে কালকের টিকিট কিনছেন এটি হয় তো তাঁরা কল্পনাই করতে পারেননি, তাই এই বিভ্রাট।'

প্রবোধ ও আমি পবম্পর পবম্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। কাল সকালেই তার ফিরে যাওয়া জরুরি দরকার। মনে হচ্ছিল পায়ের নিচে যেন মাটি নেই। এত উৎসাহ এত পরিশ্রম সব বুধা।

এমন সময় রথীন্দ্রনাথকে দেখে হঠাৎ মরীয়া হয়ে উঠে তাঁকে গিরে বললাম—এই ভুল হয়েছে—যেমন ক'রে হোক আজকের আমাদের দেখার ব্যবস্থা ক'রে দিন। রথীন্দ্রনাথ কথাটি মাত্র ন বলে আমাদের ভিতরে নিয়ে গিরে দোতলায় পাঁড়িয়ে দেখবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। যেখানে গিরে পাঁড়ালাম, তিন বছর আগে তার নিচের ঘরে বাস করেছি। অনেকেই পাঁড়িয়ে দেখছিলেন, তাতে অবস্থিতি হয়নি কিছু। হলেও তা মনে পড়েনি। [ক্রমশঃ]

When we come to the younger generation, however, we realize that 'cosmic consciousness' and 'love of humanity' have really been left out of their composition. They are like a lot of brightly-coloured bits of glass and they only feel just what they bump against, when they're shaken. They make an accidental pattern with other people, and for the rest they know nothing

# বঙ্গপ্রবন্ধ

## জা. স্মার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লেখা বিভিন্ন সুবীরন্দের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

র (১৩৬৩) শায়দীয়া সংখ্যায় এই পত্রগুচ্ছে ভারতের এক স্মরণীয় সন্তান, বাঙালার মুখোজ্জলকারী পুরুষ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বিবরকে লেখা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মোট প্রায় বিয়াল্লিশখানি অপ্রকাশিত পত্র মুদ্রিত হয়েছিল—দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহারাজা যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং ঐ সকল জনহিতকর ব্যাপারে তিনি ন অপরিহার্য পুরুষ ছিলেন, তারই পরিচায়ক ঐ চিঠিগুলি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল আমাদের রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের উক্ত সমালোচকদের। এ বছরেও মহারাজাকে লেখা ঐ জাতীয় আরও কয়েকখানি অপ্রকাশিত চিঠি প্রকাশ করা হ'ল। প্রথম চিঠিটি এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতৃপুত্র দ্বিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব লিটারেচার-এর চিঠিটি ব্যতীত প্রত্যেকটি চিঠিই ইংরাজীতে লেখা। এই প্রসঙ্গে চিঠিগুলি প্রকাশ করতে অসুবিধা দেওয়ার জন্য পোত্র বর্তমান মহারাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।—স]

### দ্বিতীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্রের পত্র

'ভাণ্ডার'

৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

৩০ আশ্বিন ১৩১২

শ্রী মহারাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় জিচরণসু—

বন্দে মাতরম্

ভাই ভাই এক ঠাই

ভেদ নাই, ভেদ নাই

এক দেশ, এক ভগবান

এক জাতি, এক মনপ্রাণ

বিনয়াবনত :

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্যারীচাঁদ মিত্রের পত্র

২১শে মার্চ ১৮৮২

জা,

শ্রী মহাশয়, স্মার প্রভাতে আমার আশাপের বিষয় আমাদের কর্ণেল অলকটকে (১) জানাইয়াছি। সমস্ত সমাচার ন বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। আপনার বৈঠকখানার রসজ্ঞ আমন্ত্রণ পাওয়া তিনি বিশেষ সৌভাগ্যের চিহ্ন করেন। কর্ণেল অলকটের বিশেষ ইচ্ছা, যে কক্ষে হানের ব্যবস্থা হইবে, সেই কক্ষটি বেন সর্বতোভাবে প্রাচীন

ভারতে প্রত্যেক ঈশ্বরভক্তবাসীর আশোনের (খিওসকিট) প্রসূত। তারতপ্রবন্ধ পুস্তক।

ভাবধারণ সজ্জিত করা হয়। পরিপূর্ণ ভারতীয় জীবন বাপন করা ই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার ইচ্ছা ঐ কক্ষে বেন টেবিল-চেয়ারের পরিবর্তে তাকিয়া-ফরাসের আয়োজন হয়। সমগ্র কক্ষটিতে বেন একটি পরিষ্কার ভারতীয় বৈরাগ্য করে।

একশ্রেণী, তাঁহার সহিত পত্রালাপ করিয়া দিনটি স্থির করিয়া লইলেই হয়।

আপনাদের

প্যারীচাঁদ মিত্র

রাজনারায়ণ বসুর পত্র

প্রিয়বরেষু,

২২ মার্চ

মহাশয়, আগামী কল্যা সন্ধ্যায় আপনার গৃহে যে অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছে, ঐ অভিনয় দর্শনের ইচ্ছা আমার পুত্র ও তাঁহার দুই জন স্ত্রী পোষণ করেন। স্ত্রীরা অনুগ্রহপূর্বক তারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তিনখানি প্রবেশপত্র আমার ঠিকানায় পাঠাইবার আদেশ দিলে সুখী হইব।

আশা করি স্নেহ ও স্বাক্ষর্যে কালাতিপাত করিতেছেন।

ইতি

আপনাদের

রাজনারায়ণ বসু

ব্রাহ্মেন্দ্রলাল মিত্রের পত্র

৮ মাসিকতলা

কলিকাতা

১লা জানুয়ারী ১৮১১

প্রিয় যতীন্দ্র,

অভ্যকার নববর্ষের উজ্জল প্রভাতে তোমার সম্মানপ্রাপ্তির বাসতা বহন করিয়া আনিলাম। তোমার প্রাপ্ততর অভিনন্দন জানাই।

উর্বে, কথটা বলিয়াই ফেলি, আমি আশা করিয়াছিলাম এ বৎসর তোমাকে 'ব্যারোনেটসি' (২) দেওয়া হইবে। বাহাই হউক, তাহা এ বৎসর হয় তো হইল না তবে প্রার্থনা করি বৎসীত্র আগামী কোন এক বৎসরে ঐ সম্মানে তুমি বিভূষিত হইবে।

সাক্ষাতে তোমাকে অভিনন্দন না জানাইয়া কেন যে পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম, সে বিষয়ও আশা করি তোমার জ্ঞানী নহে।

তোমাদেরই  
রাজেন্দ্রলাল মিত্র

### ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পত্র

প্রিয়বরে,

বুধবার

মহাশয়, জীবনী সক্রান্ত কিঞ্চিৎ তথ্য প্রেরিত হইল, আপনাকে দিয়া আমি নিশ্চিত, অল্পগ্রহপূর্বক উহা একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। আশা করি উহা গৃহীত হইবে।

আপনাদের  
কেশবচন্দ্র সেন

### সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

মহাবালেশ্বর  
মার্চ ২৭, ১৮৯৫

পরম গুজনীর কাকামহাশয়,

আমি পুনরায় তথ্য সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে রাজা রবি বর্মা কলিকাতাতেই গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে তিনি হার্জিলিঙ-এ স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় গমন করিয়াছেন। আমার অনুমান, আপনি ভ্রমশূন্যপক্ষে কলিকাতার বাহিরে ছিলেন বলিয়া প্রকৃত সন্ধান অবগত হন নাই। বাহাই হউক, আমি পুনরায় রাজাকে পত্রে নির্দেশ দিতেছি আপনার সহিত ভবিষ্যতে সংযোগ স্থাপন করিতে।

এখানে আমি কার্যোপলক্ষেই আসিয়াছি এবং এখানকার কার্য সমাপ্ত হইলেই সাতারায় ফিরিয়া বাইব, সেখানেও বহু কার্য অসম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানটি অত্যন্ত মনোরম, হার্জিলিঙ বা সিমলার মত এই স্বাস্থ্যনিবাসটি অত্যন্ত শীতপ্রধান এবং উষ্ণে অবস্থিত নহে। এখানে বাস করিলে প্রচুর আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে ভ্রমণ করিবার মত উপযুক্ত স্থানের অভাব নাই। অনেক পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া এখানে স্বীয় স্বাস্থ্যোদ্ধার করেন। এখানে বাস করিলে পর্বতের ধ্যান-গম্ভীর অপরূপ শোভা প্রাণ মন বিশেষভাবে মাতাইয়া তোলে। প্রকৃতি অগুণ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া স্থানটিকে নয়নাভিরাম করিয়া তুলিয়াছে। প্রতাপগড়ের দুর্গটিও এর একটি কেন্দ্র হইতে নয়নপাচের দূর—ইহা সেই প্রতাপগড় বখার মহাবীর শিবাজীর বাহনধের আক্রমণে আকস্মিক ধ্বংস করিতে হইয়াছিল আপন যত্ন্যকে। এখানকার জলবায়ুও স্বাস্থ্যের পক্ষে

সর্বশেষ অল্পকূল। আশা করি আপনার বারানসী-ভ্রমণও আনন্দদায়ক হইয়াছে। ইতি

আপনার স্নেহের  
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

### মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের পত্র

পরম স্নেহাশ্রিত রাজা বতীন্দ্র,

বিশ্ববিভাগে সিনেটের গত শনিবারের অধিবেশনে ঠাকুর আইনের অধ্যাপনার জন্য ত্র্যমাত্রণ সরকারকে বাতিল করিয়া ট্রেডলিয়ান মহাশয়ের নিয়োগ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে আশা করি সে সম্পর্কে রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে বিজ্ঞপ্তি পাইয়াছে।

তোমাকে আমার এ বিষয়ে পত্র লিখিবার হেতু যে আমি জানিতে চাই যে এ সম্পর্কে তুমি কিছু ভাবিয়াছ কি? কতৃপক্ষের সিদ্ধান্তই কি অবশেষে সফল হইবে? ত্র্যমাত্রণ বাঙ্গালী, আমাদের স্বজাতি, তাহার পক্ষ অবলম্বন করা এবং তাহার অগ্রগমনে সর্বাঙ্গীণভাবে সাহায্য সাহায্য করাই আমি বিশ্বের বলিয়া গণ্য করি। আমি এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানিয়া লইব না, কতৃপক্ষের কার্যের প্রতিবাদ করিব। তাঁহাদের পক্ষপাতপূর্ণ কার্যের সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন, ইহাও নিশ্চয়ই তুমি উপলব্ধি করিয়াছ। তাঁহাদের অবাস্তব কার্য আমি কিছুতেই সমর্থন করিব না, ইহার বিধিত করিবই এবং তৎকর্ত্ত কোনপ্রকার বাধা-বিপত্তি আমি বিস্মৃতও গ্রাহ্য করিব না। সত্যের জন্তে যুদ্ধ করিতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত, সেখানে আমার বিবেক আমার প্রধান সহায় হইবে এবং সেই যুদ্ধে ঐ বিবেকই আমার পরিচালিত করিবে।

পত্রোত্তরে তোমার স্মৃতিস্তম্ভ মতামত জানাইয়া উদ্বিগ্নতা দূর করিও।

অশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী  
রমানাথ ঠাকুর  
৩০শে আগষ্ট ১৮৭৬

### মহেন্দ্রলাল সরকারের পত্র

৫১ শাখারীটোলা,  
কলিকাতা  
২৪এ মে, '৮২

প্রিয়বরে,

মহারাজা, অতকার প্রোভাত সত্যই সর্বতোভাবে বরগীয। আমাদের মধ্যে সে আপনার 'নাইটহুড অব দি ঠার অফ ইন্ডিয়া' রূপী সম্মান প্রাপ্তির সাবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। আপনাকে সমগ্র অন্তরের সম্রদ্ব ও বিনত অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। অতকার সুর্য্যদণ্ডলীর মধ্যে আপনার স্থান অটুট, আপনার দেশসেবা ভবিষ্যতের সন্ধানদের মধ্যে আদর্শরূপ। দেশের অগ্রগতিতে এক জাগরণে আপনার স্থান দেশবাসী চিরদিনই স্মরণ করিবে। দেশের ও জাতির বিকাশপথের আপনি এমন একজন অকৃত্রিম সহায়ক বাহার জন্ত সমগ্র দেশ তথা দেশের প্রত্যেকটি সন্ধান গর্ব অনুভব করিতে পারে।

প্রদায় অবনত  
মহেন্দ্রলাল সরকার

২। 'তার' উপাধি বঙ্গাঙ্কমিকভাবে ভোগ করার প্রধায় অভিজিতি। কোন বাঙ্গালী আজ অবধি ব্যারোনেটসি পান নি। চারজন বোম্বাইয়ের অধিবাসী এই ব্যারোনেটসি পেয়েছেন।

## কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের পত্র

চট্টগ্রাম

২৫শে ফেব্রুয়ারী

নীয়ে,

পাঞ্জা বাহাদুর, বহুদিন সাক্ষাতের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত চট্টগ্রাম আগমনের ঠিক পূর্বেই মহারাজকুমারের নিকট যে মহারাজা বাহাদুর বর্তমানে বাসমানীধামে। আপনাদের আমায় চাক্ষুষ সাক্ষাৎ প্রত্যাশা না ঘটিলেও আমি তি নিয়তই মহারাজের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করি। রাসদে মহারাজের যে কি বিশেষ স্থান সংরক্ষিত আছে। করিতে এ লেখনী অক্ষম জানিবেন।

শান্ত নদীর মোহনীয় গতিধারা ও আমার অতি প্রিয় এই মধ্য দিয়া যেন বঙ্গ জননীকে নবরূপে দেখিতেছি। আর আরো কাছে ক্রমেই আসিতেছেন। আর কোন কর্মে না, কোথাও ঘাটতে প্রবৃত্তি হয় না শুধু মাত্র ইচ্ছা হয় যে এই দৃশ্য উপভোগ করি, মায়ের এই মহিমময়ী রূপে অরলোকন করি, নয়ন ধ্বজ হউক, স্বদয় পবিত্র হউক, হউক। ভক্তিনন্দ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

নবীনচন্দ্র সেন

## সাহিত্যচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের পত্র

১১ কাঁটাপুকুর স্টেশন

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

৩১শে জানুয়ারী ১১-০৭

মিত্রে,

দর রচিত কয়েকটি সামান্য গ্রন্থ লইয়া মহামহিমাবিত। দরবারে উপস্থিতি এবং এই নিবেদন যে মহারাজ এই হুণ করিয়া অধীনের আনন্দ বর্ধন করুন।

ভক্তি-অর্থ দান প্রসঙ্গে মহারাজার দরবারে নিবেদন যে ঐহিক সাহিত্যকারণ কর্তৃক তাঁহার কল্পনাপ্রসূত রচনা বিমার্গ বিশেষ চরিত্রের ভাব অনুসরণ করিতেছেন—বাহার দের রচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর এবং কুফলদায়ী। বুদ্ধিকে ধ্বংস করিতে হইলে পুনরায় আমাদের সনাতন প্রাচীন সাহিত্যগুলির মন্বন বিশেষ প্রয়োজনীয়, আবার মহান জীবনের প্রভাব আলোকের রশ্মিধারায় অবগত হইলে আমাদের আলোকে নিজেদের ভরাইয়া তুলিতে হইবে। সেই

বাহারকেই নবরূপ দিয়া দেশ ও দেশের মধ্যে প্রচার করিয়া সন্তানদের মানসক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই পথ মার মনে হয় যে অত্কার এই পাশ্চাত্য অনুকরণমোহ করা সম্ভবপর হইবে এবং কৃতি বঙ্গলাইয়া দিবে। চুপেচুপে রাসের প্রাচীন সাহিত্যগুলির প্রতি আমরা উদাসীন, পূর্বপুরুষগণের কীর্তিরাশি আমাদের অভিভূত করে না। ইচ্ছা যে সকল বিরাট শক্তিসম্পন্ন বীরদের এবং মহিমাবিত।

পূজনীয়া বীরসম্রাটের কীর্তি কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, বর্তমান যুগের করজন সন্তান সে সবকে সমাকরণে অবহিত আছেন? তাঁহাদের জীবনী করজন সন্তানের মধ্যে আলোকপাত করিয়া থাকে? ইহা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ব্যথার বস্তু।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ চিন্তা করিয়াই আমি এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছি, জানি না ঈশ্বরের কুপায় কতদূর সফলকাম হইব। সংস্কৃত এবং প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কাহিনীসমূহকে এখনকার শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মনের মত করিয়া নবরূপে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি বাহাতে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য তথা প্রাচীন মাতৃভূমির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পতিত হয়। এই ‘রামায়ণী কথা’ আমার দাদা বংসরের পরিভ্রমের ফল। বাম্বীকির মূল রামায়ণটিকে আমাকে সমগ্রভাবে আরম্ভে আনিতে হইয়াছে। ইংরাজীতে লিখিত পুস্তিকাটি ‘বেহলা’ গল্পেরই বস্ত-সংক্ষেপ। উহা অবশ্য ‘মর্ডার রিভিউ’ হইতে পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে। ইয়োমোপীয়েরা এ দেশে আগমন করার বহু পূর্ব হইতে যে আমাদের দেশের সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল এবং সে যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে উৎকর্ষতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল ও সেই সভ্যতা ইয়োমোপীয়ে সভ্যতার অপেক্ষা বহুগুণ সমৃদ্ধ এই সত্যই অত্কার তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট উপাধিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। এবং এ ধারণাও আমি পোষণ করি যে তরুণ সম্প্রদায় তথা মহিলাদিগের মধ্যেও এই সত্য প্রচারে কোন অস্ত্রেরই আশ্রয় আমি গ্রহণ করি নাই।

বর্তমান যুগে মহিমাবিত মহারাজ যে একজন শীর্ষস্থানীয় পুরুষ ও সত্যের পুনরুজ্জীবন কোন প্রয়োজন নাই। বিতার ক্ষেত্রে, বহাভ্যন্তর ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে, মহারাজের সহিত তুলনীয় এমন কেহ এখন বর্তমান বলিয়া আমার মনে হয় না। বাহার নেতৃত্বে দেশ আজ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে, বাহার শাস্তিগণ শত শত দরিদ্র বাচিবার সন্ধান পাইয়াছে, বাহার প্রেরণায় দেশে অনেক সংসাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে বা হইতেছে তাঁহার কীর্তি কাহিনী ব্যক্ত করা আমার ক্ষমতা-বহির্ভূত। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন বসু হইতে শুরু করিয়া আধুনিককালেরও কত অসংখ্য লেখক মহারাজের উৎসাহে সৃষ্টির উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাহার তুলনা নাই। আজও এমন কোন লেখক নাই, তিনি যত শক্তিমানই হউন না কেন মহারাজের উৎসাহযোগ্য যিনি অপরিণীত সৌভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া গণ্য করেন না।

অবশেষে অধীনের নিবেদন, গ্রন্থগুলি কুপাণ্ডুর পাঠ করিয়া বীর মহামূল্য মতামতে অধীনের সাহিত্য সাধনকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিবেন। ভক্তিনন্দ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আশা করি কুশলে আছেন। ইতি—

মহারাজের প্রতি প্রধানত

দীনেশচন্দ্র সেন

প্রেরিত গ্রন্থের তালিকা :—

(১) রামায়ণী কথা

(২) বেহলা

(৩) ফুল্লরা

(৪) সভা

(৫) ইংরাজী বেহলা

—এ মাইথ অফ সেক-গডেস।

## ভোলানাথ চন্দ্রের পত্র

২৬শে জানুয়ারী ১৮৬১

প্রিয়বর বতীন্দ্রবাবু,

আমার চারখানি পুস্তক আপনাকে এই প্রসঙ্গে পাঠাইবার সুযোগ গ্রহণ করিতেছি।

আমার এই রচনাপ্রকাশের ক্ষেত্রে ঠাকুর-পরিবারের নিকট হইতে যে অকৃত্রিম সাহায্য লাভ করিয়াছি, সে বিষয়ে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সন্নিবিষ্ট করি। আপনাদের পরিবারের এই অকৃত্রিম সহযোগিতা না পাইলে কি হইত বলা যায় না।

আমার লোকবরণ্য খুল্লতাতের প্রয়াণের পর আপনি তাঁহার স্থানে সমাসীন। তাঁহার কীৰ্ত্তি সমগ্র দেশের গৌরববর্ধক। আপনার নেতৃত্বের আশ্রিত বিশেষ প্রয়োজন, আপনার প্রতিভা প্রকাশের লগ্ন হারদেশে আগত। সারা দেশ আজ আপনার দিকে চাহিয়া আছে। আপনি নেতৃত্ব দেশ ও দশকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করুন ও আমাদের আনন্দবর্ধন করুন। ভারতের জাতীয় সংবাদপত্রের উন্নতিবিধান আজ অত্যাবশ্যক। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও আপনার অবদান গৌরববন্ত স্থাপন করুক। ভারতের সংবাদপত্র কর্মীগণের উপকারার্থে একটি তহবিল স্থাপন করিতে আপনাকে অনুরোধ করি। ভারতের প্রধানতঃ বঙ্গেরই সাংবাদিকতা সারা বিশ্বকে চমৎকৃত করিয়া, পুলকিত করিয়া, বিমুগ্ধ করিয়া যেদিন তুলিবে সেই দিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

হাটীর মহাশয় এখানকার প্রাচীন পরিবারগুলির ইতিহাস সকলকে ব্যাপ্ত, তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে লইয়া আপনার কাছে ঠাকুর পরিবার সবন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ কয়েকখানি গ্রন্থ চাহিতেছি।

আশা করি সর্বাঙ্গীন কুশলে আছেন।

আপনারই

ভোলানাথ চন্দ্র

## ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধির পত্র

মিউনিসিপাল অফিস

হাওড়া

৭ই ডিসেম্বর ১৯০৩

শ্রীচরণকমলেশ্বর,

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। কিরণবাবু (৩) বহুসংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইরাছি। ইহার পর আপনাকে কোন

৩। মহারাজা বতীন্দ্রমোহনের মেজ মেয়ে স্বর্গীয় বরেন্দ্রাবিন্দিনী দেবীর (বাগিচাঘর ৩১১১ মনোহরপুরের রোড) বিখ্যাত কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় বনমালী মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী) ছোট ছেলে। স্বর্গীয় কিরণমালী মুখোপাধ্যায়। জন্ম—১৮৭২, বৃত্ত ১৯০৩। অসাধারণ শক্তিমান ব্যাচামবীর। এর বীরত্বের কয়েকটি কাহিনী আজও পরিবারের মধ্যে আবেগ ও আশ্রয়ের সঞ্চার করে। সঙ্গীতেও এর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। সে বিষয়ে ৬গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ও সজ্জাদ — নিম্নে উল্লিখিত পত্রগ্রহণ করেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে উপেক্ষা

প্রকারে বিরক্ত করা অত্যন্ত রূঢ়তা বিবেচনা করি। কিন্তু বিশেষ কারণে আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া বিরক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। আশা করি স্বীয় স্নেহগুণে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। কোন সময়ে আপনার সহিত স্নেহভাবে কথা কহিবার অবসর হইবে এই পত্রবাহকের হস্তে একটু লিখিয়া দিলে অত্যন্ত অমুগ্ধহীত হইব। ইতি—

সেবক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিচারপতি স্থার আশুতোষ চৌধুরীর পত্র

বার লাইব্রেরী

কলিকাতা

১২ই ডিসেম্বর ১৮৮৮

পরম শ্রদ্ধাশ্রী মহারাজা বাহাদুর,

বড়লাট বাহাদুরের লিভিতে(৪) আমার পরিচয়রূপে আপনার গৌরবমণ্ডিত নামটি উল্লেখ করিবার গৌরব অর্জন করিতে পারি কি?

আগামী কল্যাণ কর্মদিবস, শুভক্লান্ত বিশেষভাবে ব্যস্ত রহিয়াছি নতুবা নিজে গিয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া আসিতাম। তত্ত্বিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিয়া সুখী করিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের

আশুতোষ চৌধুরী

৫৩৫৪ ধর্মতলা

কলিকাতা

২৫শে জুন ১৮৮৮

পরম শ্রদ্ধের মহারাজা বাহাদুর,

আমার ভ্রাতা বোগেশচন্দ্র চৌধুরী(৫) অনুকূলে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহাকে একখানি পরিচয়পত্র হান করার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করিতে পারি কি? সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম-এ এবং তাহার ছাত্রজীবন কৃত্তিষে পরিপূর্ণ। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে এদেশে আরও কত উন্নতিমূলক দৃষ্টি অবলম্বন করা বাইতে পারে, এই সম্পর্কে সে মহারাজার সহিত আলোচনা করিতে চাহে। গতানুগতিকভাবে সরকারী চাকুরীর চেষ্টা না করিয়া বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের প্রতি তাহার এই আগ্রহ আশা করি আপনার প্রশংসা লাভে সমর্থ হইবে। এক এই আশা করিয়াই আপনার দরবারে আমি উপস্থিত।

৪। তৎকালীন বড়লাটের মাঝে মাঝে এক মিলনসভা আহ্বান করে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হতেন। এখনকার সঙ্গে পার্থক্য এই যে, এই সভার অভ্যাগতদের সঙ্গে বড়লাটের পরিচয় এ, ডি, সি করা হতেন না, করা হতেন কোন বিশিষ্ট অভ্যাগত। এই জাতীয় সম্মিলনকেই লিভি বলা হতো।

৫। প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার এক দেশবরণ্য আইনসাংবাদিক। রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্রনাথের জামাতা। সাহিত্যাচার্য প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজ। এসব গৌরবময় পরিবারের এক একটি খ্যাতিমান সন্তানের বিস্তৃত পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রকোষ ইন্দ্রির দেবী চৌধুরাণী জীবনীতে (চারণন) মাসিক বহুমতীতে কিছুটা দেওয়া আছে।

আপনার পত্রগ্রহণের পত্র কৃত্তি ব্যারিষ্টার শ্রীচরণেব চৌধুরী। ১৯৫১ সাল

আমার বিশ্বাস, মহারাজা হুগাঁচরণ লাহা এ বিষয়ে যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন তাহার উপর আপনার মূল্যবান পরিচয়লিপি আমার অল্পকাল সেই উপকার পাইতে যে কি পরিমাণে সাহায্য করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আশা করি গ্রন্থের প্রথম দাবদাহ আপনার স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে নাই। প্রণাম জানিবেন। ইতি

আপনার স্নেহাশীন  
আন্তর্য্যাত চৌধুরী

### বিচারপতি স্তার চন্দ্রমাধব ঘোষের পত্র

৩ স্যালবাট যোড

২৭শে

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা বাহাদুর, অপরাহ্ন সাড়ে চারি ঘটিকার মদীয় ভবনে একটি আপবাহিক চা-চক্রে মিলিত হইলে আনন্দিত হইব। এই আহ্বান আমার পূর্বাভায়ে করা উচিত ছিল, বিলম্বে আহ্বানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এবারের চা-চক্রে মহারাজা একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাইবেন, এই ঐতিহ্যসম্মেলনে আমি আনুমানিক দ্বাদশ জনকে আহ্বান জানাইয়াছি, মহারাজা হয় তো স্থখী হইবেন এই দ্বাদশ জনের মধ্যে সকলেই বাঙ্গালী, একজনও পশ্চিমা ইরাজ নন।

আপনাদের  
চন্দ্রমাধব ঘোষ

### মহারাজা স্তার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুরের পত্র

পোতাঝাঝা

২৪শে মে ১৮৮২

প্রিয়বরেষু,

স্তার বতীন্দ্রমোহন, তোমার ঠার অক ইণ্ডিয়ান নাইটহুড প্রাপ্তিতে পরম আনন্দিত হইলাম। তোমার গৌরবে-সৌরভে সমগ্র বঙ্গ আমোদিত। তুমি আমার প্রাণভরা অভিনন্দন গ্রহণ কর। আজিকার বলদেশে তোমার মত বিচক্ষণ ভীষণ জননায়কের বিশেষ প্রয়োজন। প্রার্থনা করি, স্বীয় নেতৃত্বে দেশ ও জাতিকে ধীরে ধীরে ক্রমাগতির দীর্ঘস্থানে পরিচালিত কর।

ভগবানের চরণে তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

তোমাদের  
নরেন্দ্রকৃষ্ণ

### মহারাজা স্তার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পত্র

কাশিমবাজার রাজবাটী

৩১শে জাম্বারী ১৮১৮

পরম ভক্তভাজন মহারাজা বাহাদুর,

আপনার ৩০ তারিখের পত্রখানি পাইয়া যে কি পরিমাণে উদ্বিগ্ন হইলাম তাহা-এই ক্ষুদ্র পত্রে বর্ণনা করা সাধ্যাতীত ব্যাপার।

আমার প্রতি মহারাজের সুগভীর কল্পণ আমাকে আজ্ঞার

করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অতকার সমাজে বা রাষ্ট্রক্ষেত্রে অধীনের যেটুকু আসন স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহার জন্তও মহারাজের স্নেহই লাগি। আমার কিসে উদ্বিগ্ন হইব, কি ভাবে আমি উপকৃত হই এ বিষয়ে মহারাজের পবিত্র অনাবিল মেহ চিরকালের জন্য এক মহামূল্য রত্ন হিসাবে আমার অন্তরে রক্ষিত হইবে।

আপনি অনিয়া স্থখী হইবেন যে মহামান্য বড়লটি বাহাদুর কর্তৃক আমার নিমন্ত্রণ গৃহীত হইয়াছে, ঐ উপলক্ষে এ গৃহে আপনার পদধূলি বিশেষভাবে আশা করি।

আশা করি সর্বাঙ্গীন কুশলে আছেন।

আপনাদের  
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

### বিচারপতি দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর পত্র

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েশন

১৮ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রিট

কলিকাতা

২৪শে আগষ্ট ১৮৮৫

প্রিয়বরেষু,

মহাশয়, কৃষ্ণদাস স্মৃতিরক্ষা তত্ত্ববিলের হিসাবাদি পূর্ববেক্ষণ করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, অন্তর্গত তাহার বোলো হাজার ছয় শত আটটা টাকা আয়ের অল্প কিছু ঐ অঙ্কের মধ্যে যাত্রা হয় হাজার নয় শত তেরো টাকা এ ব্যবৎ আদায় হইয়াছে।

বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সহিত আমি আলোচনা করিয়াছি। একান্তবর্তী হিন্দু পরিবার প্রথা সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্যবলার এক দিতে তিনি স্বীকৃত হইয়াছেন। বাবু আন্তর্য্যাত মুখোপাধ্যায়ও(৬) এ বিষয়ে তাঁহার বাহা ধারণা তাহা লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আমার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি

মহাশয়ের চির-অনুগত  
দ্বারকানাথ চক্রবর্তী

প্রিয়বরেষু,

মহাশয়, আগামী কল্যা দিবা দুই ঘটিকা হইতে তিন ঘটিকা মধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। দেউলিয়া-বিল সম্পর্কে ম্যাসোসিয়েশনের পত্রটিও সঙ্গে লইব, কাজে লাগিতে পারে।

চিরাহুগত  
দ্বারকানাথ চক্রবর্তী

### রাজকুমার সর্বাধিকারীর পত্র

১৮ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রিট

আগষ্ট ২২, ১৮৮৮

প্রিয়বরেষু,

মহাশয়, আপনি অনিয়া স্থখী হইবেন যে বিবরাট পার্লামেন্টে উদ্বিগ্ন হইয়াছে। এই সবকিছু অন্তর্ভুক্ত কাগজটিতে বিস্তারিত বিবরণী পাইবেন। এই বিষয়ে ছোটলটি হয়তো আপনাকে কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে

তাঁহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধে জানিয়া লইবে। আমাদের বন্ধুবাটী  
কিরূপ ভাবে সাজানো হইয়াছিল, সে সম্পর্কেও এই অন্তর্ভুক্ত কাগজটি  
আপনাকে আলোকপাত করিতে পারিবে।

আমাদের প্রত্যেকটি কার্যকলাপের প্রতি শ্রেণিক তীক্ষ্ণ নজর  
রাখিতেছে, তাহার্য্য সর্বতোভাবে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে  
চাহিতেছে, অতএব এবাধি ক্ষেত্রে অতীব সতর্কতার সহিত আমাদের  
অগ্রসর হইতে হইবে। রাজকুমার সর্বাধিকারী

তাজহাটের রাজা গোবিন্দলাল রায়ের পত্র

১১ চৌরঙ্গী লেন

২২ জাহুরারী ১৮৮৮

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা, আপনাদেও অভিনন্দন পত্র পাইয়া বহু হইলাম। যে  
সম্মান আমার উপর বহিত হইয়াছে, আপনাদেও অভিনন্দন তাহা  
অপেক্ষা কোন অংশ কম নয়।

বিশ্ববরোণ্য পরিবারের স্নানমন্ত পুরুষ আপনি আপনাদেও  
তীক্ষ্ণবী নেতার অভিনন্দন পাওয়া ভাগ্যের কথা, ঐ পত্র আমার নিকট  
বিশেষ মূল্যবান বস্তু। আমার প্রতি আপনাদেও অমৃত্যুতর মধ্যমা রক্ষা  
বেন করিয়া বাহিতে পারি। শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনাদেও  
গোবিন্দলাল রায়

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র

বাগবাজার

শ্রদ্ধাংশদেবু,

২১শে অক্টোবর ১৮৮৮

মহারাজা বাহাদুর, আপনাদেও অভিশ্রাব অমৃত্যুতর বহু বাবুর  
মাইকেলের জীবনী নোটের কিয়দংশ আমি পুনর্বার লিখিয়া দিয়াছি  
এক পরিবার ভাবে তাহার একটি নকল করিয়াছি। নকলটি এই  
সঙ্গে পাঠাইলাম। আপনি পড়িয়া দেখিবেন এক যদি আরও কিছু  
পরিবর্তন, পরিবর্তন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন তাহা  
করিবেন। বহু বাবুর কিঞ্চিৎ টাকা সহযোগে পরে উহা সরাসরি  
গৌরদাসকে পাঠাইয়া দিবেন। আপনি যদি অধিক অঙ্গল-বদল  
করেন, তাহা হইলে সমগ্র রচনাটিই আবার সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তন  
করিয়া নকল করিতে হইবে এক গৌরদাসকে পাঠানো হইবে। এ  
বিষয়ে গৌরদাস আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া আমার প্রাণ বাহির করিবার  
উপক্রম করিতেছে। যে জীবনী গৌর টাইপ করাইয়া রাখিয়াছে,  
তাহার মধ্যে অর্ধাংশ পরিশিষ্টে বহু বাবুর নোট বাইবে। স্তবরা  
বাহাতে অতী এই রচনা গৌরের হস্তগত হয়, কৃপাসূচক সেই অনুবাদী  
ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি। শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি—

চিরাহুগত আপনাদেও  
কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বাপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

৬ দ্বারকানিধি ঠাকুর লেন

১৩ই ডিসেম্বর ১৮৮৮

পরম পূজনীয়দেবু,

কল্যাণের লিখিতে আমার অল্প অল্পদ্বাপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক  
আমার স্বদেশের বাব মেসজিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও বাব মহেশীমোহন

চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় প্রদানের জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতে  
পারি কি? আপনাদেও নাম যদি আমাদের পরিচয়-প্রদায়ক রূপে গণ্য  
হয় তাহা হইলে নিজেদের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিব।

আপনাদেও মেসজিনী  
দ্বাপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুমারী সত্যেন্দ্রবালা ঠাকুরের (৭) পত্র

৩ দ্বাপেন্দ্রনাথ টেরেস

কুইন্স গেট

লণ্ডন

২১শে সেপ্টেম্বর

পরম পূজ্যপাদ কাকামহাশয়,

আপনাদেও মেসজিনী এক প্রেরিত ১৫০ পাউণ্ডের আশীর্বাদী  
আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনাদেও আশীর্বাদী ঐ ১৫০ পাউণ্ড  
শিরোধার্য্য করিয়া গ্রহণ করিলাম। আমার এই দুর্ভাগ্যের দিনে  
উহা পরিত্রাতার রূপ লইয়া আসিয়াছে, আগামী শীতে উহার  
সাহায্যেই হস্তাঙ্ঘ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিব।

কাকামহাশয়, সুখে-দুঃখে যেরা জীবনের অনেকগুলি বৎসর  
কাটিয়া গেল, আরও স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি কাটিবে—সাক্ষাৎ কখনও  
বাচিবে কি না জানি না তবে পত্র বড়টুকু জানা বার ততটুকুর জন্যই  
উগ্রবীর হইয়া থাকি। কলিকাতায় আমার পরমপ্রিয় পরিজনদের  
আকৃতি কিরূপ, তাঁদের আকাঙ্ক্ষা বা অবসরবিনোদন কি, দৈনন্দিন  
কর্মসূচী কিরূপ, সেখানকার বাড়ীটি কিরূপ দেখিতে, সেখানকার নব-  
নারীর জীবনধারা কিরূপ, এই সকল বিষয়ে জানিতে খুবই ইচ্ছা করে,  
মাঝে মাঝে পরমাত্মীয়দের সম্পর্শ হইতে জন্মের মত দূরে সরিয়া  
থাকার বেদনা অশ্রুর উৎস্রেক করে। আমার পিতৃদেবের সঙ্গ  
হইতে আমার এক পিতৃহারা আলেখ্য দর্শন করিয়াছি। আমার  
প্রবল ইচ্ছা, আপনাদেওও প্রতিভূতি আমার হস্তে আসে।  
অনুগ্রহপূর্বক আমার এই ইচ্ছাটুকু পূরণ করিয়া সুখী করিবেন। বতই  
দূরে থাকি, আমি কেমন করিয়া প্রকাশ করিব যে ভারতের পথ-বাট,

৭। মহারাজা বতীন্দ্রমোহনের খুল্লাত ভারতবরোণ্য আইনবিদ  
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার  
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দ্বিতীয় পক্ষে রেভা: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে  
কমলাকে বিবাহ করে ইংল্যান্ডে বসবাস করতে থাকেন, এ তথ্য  
স্ববিদিত। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের এক ছেলে প্রসন্নকুমার ও দুই মেয়ে  
সত্যেন্দ্রবালা ও নাগেন্দ্রবালা। তিন জনের মধ্যে সত্যেন্দ্রবালাই বৈদ্যিক  
জীবিতা ছিলেন। সত্যেন্দ্রবালা বিলেতেই লালিতা-পালিতা একবার  
মাত্র ভারতে এসেছিলেন। মহারাজা বতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর  
তাঁর পুত্র মহারাজা প্রতাপকুমারের অতিথি হয়ে, অবস্থান করেছিলেন  
বিধবা ঠাকুর ক্যাসেলে (১১.৯-১০)। ঐ চিঠির পত্রমূল্য  
বথেষ্ট। হস্তভাগিনীর ব্যথা বেদনা মূর্ত হয়ে উঠছে তাঁর পক্ষে।  
বিলেলে বাস করেও স্বদেশের জন্তে ব্যাকুলতার, হৃদয়বিধ-সংশ্রমে,  
পরিজনদের থেকে দূরে থাকার তাঁর হৃদয়ে চিঠিগুলি জীবন্ত হয়ে  
উঠছে। ঐ চিঠি যে কোন লোকের হৃদয়কে অতিক্রম করে কোনো  
এ বিষয়ে সত্যি।



নদী-নালা, আকাশ-বাতাস সদা সর্বদাই আমার আহ্বান করে। আমার পিতৃভূমি, আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ, আমার পূর্ণপুরুষগণের লীলাক্ষেত্র, আমার জনক-জননীর জন্মস্থান শত শত মনস্বীর পদরঞ্জ-ধ্বজ ভাবভূমিকে স্তব্ধ ইল্যাণ্ড হইতে প্রণাম নিবেদন করি।

আপনার এবং পরিবারস্থ সকলের কুশল সুবাদ মিয়া অমৃগৃহীতা করিবেন ও আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করিয়া ধন্য করিবেন। ইতি

আপনার স্নেহমুগ্ধা

সত্যেন্দ্রবালা ঠাকুর

হোটেল বেলেভু

মেটন, ফ্রান্স

২৮শে মার্চ

পরম প্রদাম্পদ কাকামহাশয়,

অজ্ঞ প্রভাতে আপনার আশীর্বাদে এ স্থলে পৌঁছিয়াছি। গতকাল রাত্রে পানী ছাড়িয়াছি। রাত্রে ট্রেনে অত্যন্ত শীত অনুভব করিয়াছিলাম এবং তজ্জগৎ কিংকি অন্তঃবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অজ্ঞকার আকাশের ঐ প্রভাতসূর্য গতবাতের সমস্ত অবসাদের অবসান ঘটাইল। সূর্যের মিষ্ট মধুর তাপবাণি শরীরে শক্তির সঞ্চার করিতেছে। আপনার সাহায্য না পাইলে একগুণভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষয় হইত। আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইত না। আমার মনে হয় এখানে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করিলে আমার স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে শ্রীসম্পন্ন হইবে। আত্মীয়-বিবর্তিত জীবনের শেষাংশে আপনার করুণা, স্নেহ ও মমতা আমার নিকট এক মতাব্য বস্তু বিশেষ। ঈশ্বরের নিকট সর্বতোভাবেই আপনার মঙ্গল কামনা করিতে থাকি। আমার বিশেষ বান্ধবী মাননীয়া শ্রীমতী তেজমাণ্ড এখানে আছে।

আপনি এবারের গ্রীষ্মে কোথায় বাইতেছেন?

আশা করি কুশলে আছেন। আমার ভক্তিনত প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আমার ভ্রাতার সুবাদ জানিতে বড় ইচ্ছা হয়, তাহাকে আমার প্রীতিপূর্ণ আশীর্বাদ জানাইবেন, সুবিধামত সে যদি মাঝে মাঝে পত্র লেখে তো বড়ই আনন্দিত হইব।

স্নেহাঙ্কিতাঙ্গী

সত্যেন্দ্রবালা ঠাকুর

দাদাভাই নোরজীর পত্র

লণ্ডন

১৪ই ফেব্রুয়ারী

১৮৫৯

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা, যদিও একযোগে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থাপন বর্তমানে কিছুকালের জন্য স্থগিত করা হইয়াছে এবং ভারতস্থ ও স্থানীয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষগণ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অতিমত প্রদান করিয়াছেন তথাপি আমি কিম্বদন্তি নিরাশ হই নাই। আমি লক্ষ্য করিতেছি যে ইংল-বঙ্গীয় সমাজের প্রতিনিধিগণ বান্ধবীগণকে বিশেষ যত্নের চক্ষু দেখেন, শুধু তাহাই নয় তাহাদের কোন কিছুই স্বীকার করিয়া প্রাণান্ত দিতে নারাজ। এ বিবরণ কি কোন প্রতিনিধিগণ সত্যিই

করিয়া দেশের স্বত্ব স্বার্থ উদ্ধার করিতে হইবে। আমি বতকপ এখানে আছি আমার সাধ্যমত সংগ্রাম আমি চালাইয়া যাইব। এখন আপনার ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্যাসোসিয়েশনের সাহায্য পাইলে বড়ই উপকার হয়। ভারতের আজ ভাগ্যবশের দিন, অজ্ঞতা ও ভ্রান্তিকার বাশ্প দূরীভূত হইয়া জ্ঞানের ও প্রগতির (নৈতিক ও বাস্তবিক উভয়তাই) আলোর দ্বাত হইয়াছে। তবে সংগ্রাম ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই, সহজ পথে, তাহার স্বার্থ উদ্ধার হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না অতঃ এই স্থানে থাকিয়া আমি তো এই অভিজ্ঞতাই সঞ্চর করিয়াছি। ভারতের সাহায্য আমি চাই, তবেই আমার সংগ্রাম সাফল্যভূষিত হইবে। ভারতে আজ যে শক্তির মিছিল চলিয়াছে দূর হইতে তাহা আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। ভারতবাসীকে নির্যাতন অভিভূত করিয়া রাখিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য। তাহাদের মনোমত বস্তুগুলি মুখের সামনে ধরিয়া দিয়া তাহাদের অভিভূত করিয়া তাহাদের স্তব করিয়া রাখিতে চায় এই ব্রিটিশ সরকার। আইরিশরা কেমন করিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাইল? তাহারা দলে দলে প্রতিনিধি এখানে প্রেরণ করিয়াছিল সংগ্রামেরই উদ্দেশ্যে, সে প্রচেষ্টা তো তাহাদের সফল হইয়াছে বলা যায়। অতএব এইখানেই তো আমরা আইরিশ (এবং ইংরেজের) নিকট হইতে প্রভূত শিক্ষা পাইলাম। অধ্যবসায় ও অবিচলিত নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় আইরিশরা দিয়াছে। পণ করিতে প্রস্তুত আছি, বতদিন না জয়লাভ করিব, ধামিবে না, ভারতবর্ষ কি এখনও তাহার সম্মানদের প্রেরণ করিবে না?

দাদাভাই নোরজীর

পণ্ডিত বিষ্ণু দিগবরের পত্র

গার্ল মহাবিদ্যালয়

১০ই মার্চ ১৯০৫

মহাশয়েষু,

পরম পূজাপাণ্ড শ্রীমন্ বামী ওজানন্দজীর নির্দেশে বস্ত্র ডাকযোগে আপনাকে একখণ্ড মাসিক 'সঙ্গীত অমৃত পর্ব' প্রেরণ করিতেছি। আগনি কৃপাপূর্বক পাঠ করিবেন এবং অমুগ্রহ করিয়া স্বীয় মহামূল্য মতামত দানে আমাদিগকে কৃতজ্ঞ করিবেন।

আমাদের প্রচেষ্টায় মহারাজের প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা অতীত প্রকাশসহকারে ত্রিকা করি।

বিষ্ণু দিগবর

অধ্যক্ষ

নবাব বাহাদুর আবদুল লতিফের পত্র

১৬ তালভলা

৭ই জাহুয়ারী ১১

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা বাহাদুর, আপনার 'মহারাজা' উপাধি কলাভূমিক রূপে গণ্য হওয়ায় আমি যে কি পরিমাণে সুখানুভব করিতেছি তাহা সত্যিই প্রকাশ করা যায় না। আপনার সম্মান সৌভাগ্য সমগ্র দেশকে স্পর্শ করিয়াছে।

আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল লাক্ষিতে গিয়া আপনাকে প্রত্যক্ষদর্শন জানাইয়া আমার ত্রিকৃত অভ্যাসি লগ্ন্যতর আশ্রয় লেখা করিলে তা

# চাৰুজন

মহাৰাণী সূচাক দেৱী

( ব্ৰহ্মানন্দ-হুজিৰা ও মনুৰতজ-ৰাজৰাজা )

শিভিন্দন ও জ্ঞানাজ্ঞান-শালা যে বৈচিত্ৰ্যময় মানব-জীবনে নিত্যসামী তাতা তিব্বাৰী ব্ৰহ্মন দেৱী মহাৰাণী সূচাক দেৱীৰ সন্নিহিত সাক্ষাৎ-পাঠিয়ে কলকাতা কলিমাৰ। কাৰণ, অসমৰ দেৱীও তীব্ৰৰ নিবাসিত চিত্ৰাভিন এক বিভিন্ন পুস্তক-পত্ৰিকা পাঠ কৈছিল কৰ্মকাৰ্যৰ আনকটা স্থান ছুটিয়া বহিৰাহে। এই বনামৰজা পৰ্য্যবেক্ষকতী, মাতৃকুল্য হুজিৰা সল ও মনুৰতজ কাৰকাৰ ল'ৰন-প্ৰাৰ্থীৰ মনে এক সতীৰ বোধপাতি কৰে।

"মহা-বিদ্যা" প্ৰবৰ্ত্তক ভাৰতবৰ্ষৰ মনোৰী ব্ৰহ্মানন্দ কেশৱজ্ঞ দেৱীৰ কৃতীয়া কৰ্ম ও চৰ্চৰ সন্ধান সূচাক দেৱী ১৮৭৪ সালে কলকাতাৰ ষ্ট্ৰীটৰ দেৱীৰ বাহকল দেৱীৰ পুত্ৰ জন্মগ্ৰহণ কৰে। প্ৰথম পুত্ৰ বিভাজন কৰিা সাত বছৰ বয়সে তিনি Miss Spigel-এৰ মিনাৰী বিভাজনে (Church of Scotland) জতি হয়। পৰে তিনি Victoria Institution-এ যোগদান কৰিা উক্ত শিক্ষা লাভ কৰে। শিক্ষাৰ্থীৰ বিবৰে তিনি পুৰুষত ১৮৮৪ সালে ও উপাধ্যায় ১৮৮৪ সালে সন্ধান পালেৰে হাৰিৰ বৰজ্ঞ প্ৰথম কৰিা আৰ্ণ জননীৰূপে প্ৰতিষ্ঠাত হন। পাঠ্যাবস্থাৰ সূচাক দেৱী



মহাৰাণী সূচাক দেৱী

তলানীতন হুজিৰা-সল (National Ladies' Association)

একজন সন্নিহিত সন্ধান থাকে নানাজন মহাৰাজসৰাৰ কৰ্মে নিজে নিযুক্ত কৰে। উইট পৰে All India Womens' Conference (A. I. W. C.) পণ্ডিত হয় এক মহাৰাণী বিভিন্ন সময়ে উইট সম্পাদিকা ও সন্ধানতীপৰে কৃত চৰ্চাছিলে। উইট কৰাৰী অধিকলমে তিনি প্ৰথম অলিম্পিক বক্তৃতা সেন। উইট ব্যতীত বৰ্ত্তমানে তিনি নিখিল বৰ মহিলাসল, কলকাতা ইনষ্টিটিউশন, হামকুক মিলন একাডেমী অক ক্ৰাইন আৰ্চি, বাৰাই (ইদাপ) সন্ধানৰ সন্ধান, দেৱল, ভাৰত মহিলাসল, মাতৃকুল-সল প্ৰকৃতি মনো শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্ৰতিষ্ঠানেৰে সন্নিহিত কৃত বহিৰাহে। বহিৰাহেৰ মনোৰূপৰাৰ মনোৰূপাৰ প্ৰতিষ্ঠাত "জ্ঞান-মন্দিৰ" মহাৰাণীৰ আৰ্হুকো নিখিল হয়।

১৯০৪ সালে দেৱীৰ বাৰা মনুৰতজৰ মহাৰাজা মনোৰূপে কৃত দেৱীৰ সন্নিহিত তিনি পণ্ডিতকৰে আৰহ হয়। ১৯১০ সালে তিনি মহাৰাজাৰ সন্নিহিত টালাও বাৰা কৰে এক কিতুদিয়েৰ মনো কৰাৰ তীব্ৰৰ জোৰ। তলানী মহাৰাণী সূচাক দেৱীৰ বাৰী কুচকাৰ মহাৰাজা পৰলোক গমন কৰে। উইট দুই বছৰ পৰে অৰ্ধাৎ ১৯১২ সালে মনুৰতজ মহাৰাজা বাহকল দেৱীৰ কৰাৰ তিনি লোক মনুৰতজ চৰ্চা পৰে।

১৯০২ সালে তীব্ৰৰ কৰ্মা জৰতী দেৱীৰ সন্নিহিত মনোৰূপ মহাৰাজাৰ বিবাহ হয় এক পুত্ৰ ব্যাৰিৰ কৰেৰ বিভাৰ মহাৰাজাৰে সহৰ (১৯০২ সালে) কলকাতাৰ সন্নিহিত মনুৰতজ লিপ্ত থাকাকালীন বিদ্যানুষ্ঠানৰ মনুৰতজ পণ্ডিত হন। তাই মহাৰাণী জানালে "আৰ্ণ বাৰী ও প্ৰাণ-প্ৰতিম পুস্তক হাৰিৰে আৰাৰ বৈৰাগ্যৰ জীবন চলাই এখন।" অৰ্ধ প্ৰথম চৰ্চাতেই তিনি সল অৰ্ধকৰ জীবন বাপনে অভ্যস্ত বহিৰাহে।

পূৰ্বকালে দেৱীৰ বাৰাসমূহৰ মনো নানাজন জনজিৱন উন্নয়নমূলক কৰ্মে যে মনুৰতজ সৰ্গাগ্ৰণ্য বাৰা হিচাবে স্বখ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল তাতা মহাৰাণী সূচাক দেৱীৰ আগ্ৰহে এক কৃতপূৰ্ণ মহাৰাজা ১৮৮৪ সালে উত্তাপ ও বৰ্ত্তমানে মহাৰাজা প্ৰতাপৰেৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাৰ সন্ধানৰ হয়। উইট ৬ পি, কে, সেন ও শ্ৰীমন্তীপত্নী নিৰোগী উক্ত বাৰ্য্যৰ দেৱীৰ ও বাৰদৈৱিক পৰামৰ্শ লাভকৰে কৰ সম্পাদন কৰিছিল।

বিগত পতাবীতে ব্ৰহ্মানন্দ কেশৱজ্ঞৰ সাৰ্হুলাৰ হোতৰিত "Lily Cottage" এ তলানীতন জ্ঞানী, গুণী ও বাৰ্হিক ব্যক্তিৰে একটা প্ৰধান মিলন-কেন্দ্ৰ গঢ়িা উঠিছিল। তলজ্ঞ সূচাক দেৱী মহাৰাণীৰেৰ ঠাকুৰ, পৰমপুৰ্য্য শ্ৰীমন্তীৰূপৰে, বাৰী বিবেকানন্দ, বৰজ্ঞনাথ ঠাকুৰ, বিপিনচন্দ্ৰ পাল, দেৱদু চিত্তৰজন, মহামতি গোপাল, অৰ্চাৰ্য্য জগদীশচন্দ্ৰ বৰ, আৰ্চাৰ্য্য প্ৰকৃতিৰেৰেৰ প্ৰকৃতিৰ

প্রতি বিশেষ ভাবে পরিচিত হন। এই সমস্ত প্রাচ্যবর্ণীর নমস্ত্রের মধ্যে কিছু কালের জন্য অল্পরোধ করিলে মহাশয়ী আমায় জানালেন, 'হুজুর আমায় দালাল নামকরণ করেছিলেন কল্যাচন্দ্র,—ঠাকুর দায়কদের ও আমায় পিতামাতাকে হত্য বরাবরি করিয়া গৃহে বৃদ্ধ করিতে দেখিয়াছি এবং আমায় ঠাকুরমাকে নিজ হাতের মতন পরমহুসসের সঙ্গে করিতেন—মহাশয়ী পোষক মহারাজার হুজুর পর দালাল দিয়া আমায় বলেছিলেন যে 'কৌশিকা' প্রসঙ্গে বক্তৃতা যেন নিজেকে হাজি 'মাসি'—হাজী বিবেকানন্দ (নামস্রনাথ) আমায়ের দ্বারা 'নয় কল্যাচন্দ্র' অভিনয়ে 'বহিষ্ঠ' করেছিলেন আর সাত মাসের আমি ও আমায় ছোট বোন উভয়ে আশ গ্রহণ করি,—বায়ী বিশিষ্ট পাল বলতেন যে অনেক কথা বলার আছে—তোমার আমায় চলির দাও—হুজুর পূর্বদিন সাক্ষ্য-প্রার্থী আমাকে বিবকবি বৌস্রনাথ কল্যে—Sworn is hanging on me আর আমায় হাজের ফুলগুলি তাঁহার বুকের উপর রাখিতে বলেন।" ইহা ছাড়া সতি অকল্য বক্তৃতা, মিসেস পি. কে. হাট, সফল দেবী, মেমলতা দেবী, টম্বিলা দেবী প্রভৃতি, হাজি দেবী, মহারাজের ভাগ্যবন্ধ ও ডাঃ চায়াপ্রদান কল্যাচন্দ্র প্রভৃতির সহিত তাঁহার কথকীয়ে ঘনিষ্ঠতা হয়। পণ্ডিত বক্তৃতালাল মেডেলর সহিত 'লগ-প্রাচ্য' সম্বন্ধে একবার এক মাসোচ্চায় সভায় তিনি আশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে মহাশয়ী দালাল কলিকাতার অবস্থানকালীন পূর্ব-পরিচিতা মহাশয়ী তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। 'সংস্কৃতি' নাইট হাজারে 'মাসোম' লিখা সংবাদ কল্যে। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমান রাজ্যপালিকা হিমতী পত্নী নাইট ও রাজ্যের কল্যাচন্দ্র ডাঃ বিধানচন্দ্র হার তাঁহার লব্ধে নিয়মিত বোঝাবব লইয়া থাকেন।

বাল্যকাল হইতে তাঁহার চিত্তেই অল্পবয়স বাক্য উল্লাস ও বহুমানকালীন তিনি বহু চিত্তির সঙ্গ ও অল্প দিকার স্রবণ গ্রহণ করেন। তাঁহার অধিত তৈলচিত্রগুলি বিবিধ প্রদর্শনীতে বৈশিষ্ট্য হান লাভ করিয়াছে। বর্তমান মাসের তিনি 'তজ্ঞানন্দ' কল্যে সেন বক্তৃতালালার জন্য কলিকাতা বিবিকাগরে এককালীন লগ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রসোক্তপত পুত্রের প্রতিবন্ধ্যার্থে একটি পারলিত লাইসেন্সী স্থাপনের ১২ পৃথক বণ হাজার টাকা ভরৎক প্রদত্ত হইয়াছে।

বিশ্ব জীবনের বিভিন্ন সময়ে মহাশয়ী লিখিত প্রবন্ধ ও বিবাসসূত্র ১৩৫৭ সালে প্রকাশিত 'প্রতি' পুস্তকে প্রথিত করা ইচ্ছাছে। প্রথম জীবনে তিনি যে সেবাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন মহাবধি তাঁহা পূর্ববক্তার মৌল্যমান। তাঁহার গুণদানে বহু বিবায় ও প্রতিষ্ঠান আজও উপকৃত হইতেছে। হুই লতালাল নহু-বঙ্গ এই মহারসী মহিলাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া আসিলাম।

### শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস

[হাইকোর্টের কৃতপূর্ব বিচারপতি ও মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের প্রাক্তন স্যামিনিষ্ট্রেটর]

অনিশ্চিত অবয়ব থেকে সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির সাক্ষ্যের পথের সেতু হ'ল বৈধ, নির্ভা, উত্তম। জীবনের উষ্মালয়ের দাক্ষিণ্যেই ভবে থাকে জীবের কালিয়ার অপরাধের আকাশ ভাঁয়ে হয় ও পাতিলের স্রোতটিতে। বাঙালোদের এই কল্যাচন্দ্রী সভ্যদের

নামের তালিকার শীর্ষস্থানেই দেখা দেবে শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাসের নাম। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণার বাসিন্দা। পরলোকগত চন্দ্রশেখর দাসের কনিষ্ঠ পুত্র কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন অধিকর্তা (স্যামিনিষ্ট্রেটর) বিখ্যাত আইনজ্ঞ শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ও বাল্যকালে হুই প্রচণ্ড আঘাত জীবনে পান, চার ও সাত বছর বয়সে বধাক্রমে বাবা ও মা হৃৎকনকেই হারান। জীবনের ইতিহাস-রচনার বোধনবলার এই অপ্রত্যাশিত আঘাত তাঁকে সচেতন করে তুলে জীবনবোধের প্রতি। এই আঘাতের তোড়েই তাঁর জীবনের শ্রোতব্যের চিরদিন সার্থকতার উপকূলের উপর নিয়োজিত হয়ে গেছে। পাটনা থেকে চতুর্থ স্থান অধিকার করে স্কলারশিপ নিয়ে এক, এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন গোপেন্দ্রনাথ। কলকাতার এসে যোগদান করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। গণিতে এম. এ পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান করলেন অধিকার। এর পর অল্পকাল সবে পবেষণা করানালীন সম্পর্কে আসেন পুত্র সিংহ পুত্রনার ডাঃ শ্রীর আততোষ মুখোপাধ্যায়ের। আততোষ আইনের দিকে আকর্ষিত করলেন গোপেন্দ্রনাথকে। গোপেন্দ্রনাথের জীবনে আততোষের প্রভাব অপরিমিত। অমলিন দীপ্তিতে আততোষ আজও বিরাজমান গোপেন্দ্রনাথের মনে মন্দিরে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আইন পরীক্ষার প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টের একজন আইন ব্যবসায়ীরূপে হলেন পণ্য। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রহণ করলেন আইন-কলেজের বক্তৃতাধানের দায়িত্বভার। আইন এ স্নাতকোত্তর বিসার্চ স্কলার ছিলেন গোপেন্দ্রনাথ। এক, এতে স্কলারশিপ ছাড়াও ছাত্রজীবনের দীর্ঘ প্রতিষ্ঠার পরিচায়করূপে লাভ করেছেন ঠাকুর আইন-পদক, পার্ভীচন্দ্র হার সুবর্ণপদক এবং বিবিকাগর সুবর্ণপদক। ১৯১৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দীর্ঘ ব্রিটিশ বছর অপরূপ কল্যাচন্দ্রের সঙ্গে পরিচালনা করেছেন বত



শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস

মায়াল, যুক্তি, তর্ক ও জেয়ার প্রবর্তায় নিজের আসন হারী করে নিয়েছেন কৃতী আইনবিদদের দরবারে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে গোপেন্দনাথ কলকাতা বিচারিকবরণের অন্ততম বিচারকের পদে নিযুক্ত হলেন। ১৯৫০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই পদে সমাদীন। অবসর গ্রহণের পরেই মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের স্টাডমিনিষ্ট্রটোরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করে ভারত সরকারের আইন কমিশনের একজন সভ্য বলে হলেন পণ্ডিতগণিত (১৯৫৫)। আইনে ইনি আর্টিকুল্ড ক্লাক ছিলেন ভারতবর্ষে আইনজ্ঞ স্তার রাসবিহারী ঘোষের সূচ্যোগ্য অমুজ ধুবন্ধর আইনজ্ঞ স্তার ধিপিনবিহারী ঘোষের। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ইনি লণ্ডন, প্যারী, রোম, ভিয়েনা, ২২ব্রিখ, নেপলস, স্কোভেল, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেন। স্কোভেলের শিল্প সস্তার একে যুক্ত করেছে। ২২ব্রিখে দেখেছেন বহু ভারতীয় সেখানকার ব্যবসায় জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতীয় হিসেবে এই সমস্ত দেশগুলিতেই যথেষ্ট ভ্রম ব্যবহার পেয়েছেন এবং দেখেছেন যে ঐ দেশগুলিতে ভারতের প্রভাব অনতিদূর। ব্যক্তিগত জীবনে বাঙালার এক প্রাতিঃসরকারী শিক্ষাবিদ হিন্দু ছেলের শুভবরণ স্বর্গীয় রসময় মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা মণিমালা মিত্রের পাণিগ্রহণ করেছেন। আজ সত্তরের পানপ্রাপ্ত এসে ব্যবহারিক কর্মজগতের অন্তরালে এসেছেন গোপেন্দনাথ। কিন্তু তাই বলে তাঁর এখনকার দিনগুলিও কর্মহীন নয়। সং গ্রন্থাদি পাঠ করে এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রমুখ বহু জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সমাজ সেবা করে দিন কাটছে গোপেন্দনাথের। তাঁর সভাপতিত্বে এবং দানে বহু প্রতিষ্ঠান পুষ্ট হচ্ছে। নিরোজিত হচ্ছে তারা সত্য ও সন্দেহের সাধনায় এগিয়ে যাচ্ছে তারা কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে।

### অধ্যাপক ডাঃ সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[ খ্যাতনামা গণিতবিজ্ঞানী ]

খ্যাতনামা গণিতবিজ্ঞানী ডাঃ সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৯৩ সালের ২৭শে এপ্রিল ঢাকা জেলার মালপাড়িয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়রা

ছয় ভাই, ভাইদের মধ্যে তিনিই সকলের বড়। পরলোকগত অমর কথাসিন্ধী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর সহোদর ভাই।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বালাশিক্ষা লাভ করেছিলেন হুমকা গভর্নমেন্ট স্কুলে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে স্কুলে তাঁর বরাবরই খুব সুনাম ছিল। ১৯০৮ সালে হুমকার ঐ স্কুল থেকেই সরকারী বৃত্তি লাভ করে তিনি সম্মানে এন্ট্রান্স পরীক্ষার উত্তীর্ণ

হন। কলেজের শিক্ষা তাঁর আরম্ভ হয় ঢাকার—ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১০ সালে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় আই এন্ড সি পাস করেন। এই পরীক্ষাতেও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সরকারী বৃত্তি লাভ করেছিলেন, আই, এন্ড, সি, পাশ করার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করলেন। ঐ কলেজ থেকেই ১৯১২ সালে গণিতবিজ্ঞানে অনার্স সহযোগে বি, এন্ড, সি, এবং ১৯১৪ সালে গণিতবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর সহিত এম, এন্ড, সি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। তিনি হিন্দু কলেজ ফাউণ্ডেশন স্কলারশিপও লাভ করেছিলেন।

এম, এন্ড, সি, পাশ করার পর তাঁর প্রকৃত গবেষক-জীবন শুরু হলো। ১৯১৫ সালে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারশিপ লাভ করলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালে নবনির্মিত বিজ্ঞান কলেজের ফলিত গণিত বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। অধ্যাপনার সঙ্গে চললো গবেষণা, ক্রমেই গবেষক মহলে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খ্যাতি বৃদ্ধি লাভ করতে লাগলো। ১৯১৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি লাভ করলেন। ঐ বৎসরই অধ্যাপক ডাঃ গণেশপ্রসাদের স্থলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই গুরুদায়িত্ব লাভ করার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর।

ডাঃ সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষক জীবনে ডাঃ গণেশপ্রসাদ এবং সি, ডি, রমণের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। স্নাতকের ফলে স্ট্রট তরঙ্গের বিষয়ে তাঁর কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই সময়ে পর পর ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ সালে। এই প্রসঙ্গেই তাঁর গবেষণার সুবিধার জন্য তিনি একটি বহু উদ্ভাবন করেন। যন্ত্রটির নাম সেন ব্যালিস্টিক ফ্রোমিটার। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রথম জীবনের এই কাজ বিজ্ঞানীমহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। ১৯১৮ সালে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক্যালকুলাস ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যেই তাঁর এবং তাঁর ছাত্রদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়ে তাঁদের খ্যাতিকে যথেষ্ট বিস্তৃত করেছে।

১৯২২ সালে বৃত্তান্ত কর্মক্ষেত্র থেকে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ডাক এলো। তিনি ভারত সরকারের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করলেন। স্তার গিলবার্ট ওয়াকারের আমন্ত্রণ ক্রমেই ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নতুন কর্মস্থলে যোগদান করলেন। প্রথমেই তাঁকে কোলাবা এবং আলোবাগ মানমন্দিরের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। ঐ পদ গ্রহণের পরেই ১৯২৩ সালে লঙ্কোতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি পদার্থ ও গণিত-বিজ্ঞান শাখার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। এই অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে তিনি ভারতীয় সমুদ্র সমূহে সাইক্লোনের সৃষ্টি, বৃষ্টি, এবং ধ্বংস বিষয়ে আলোচনা করেন।

নতুন কর্মক্ষেত্রে এসে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণা প্রধানতঃ ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান ও আবহাওয়া বিজ্ঞান বিষয়েই কেন্দ্রীভূত হলো। ভূমিকম্প বিবরণ তাঁর মৌলিক গবেষণা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট সন্মান লাভ করে। ভারতীয় সাগরসমূহের



সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বহাওরা মণ্ডলে গোলাবোণের সঙ্গে সংযুক্ত পৃথিবীর যুদ্ধকল্পন ঘরে তাঁর একটি আলোচনা ১৯২৮ সালে ফিলজফিক্যাল ট্রানজাকশন ৮ রয়েল সোসাইটিতে প্রকাশিত হয়। এর পরে ভূমণ্ডলের কল্পনা বিষয়ক তাঁর নিজস্ব মতবাদ তিনি গঠন করেন। ক্রমেই ছাত্র ডাঃ বাল্যোপাধ্যায়-এর নিকট গবেষণা করবার সৌভাগ্য ভর জন্ম, তাঁর কাছে সমবেত হতে থাকে। বোম্বাই সরকার খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁকে হায়ের রয়েল ইনসটিটিউটের অর্ধবৃত্তিক অধ্যাপক পদ দিয়ে নিত করেন। এই সময়েই বহু ছাত্র তাঁর কাছে গবেষণা করে গানে উল্লেখ্য উপাধি লাভ করেন।

১৯৩৩ সালে ডাঃ বাল্যোপাধ্যায়কে ভারত সরকার ডাইরেক্টর রেল অফ অবজারভেটরীস নিযুক্ত করেন। ১৯৩৪ সালে বিজ্ঞানী বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূপদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক এক হাওয়া বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করবার ইউরোপ ভ্রাতা করেন। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে আবহাওয়া ন বিভাগের অধ্যক্ষ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করার পর তিনি আবার ডাইরেক্টর জেনারেল অফ অবজারভেটরীস নিযুক্ত হন ১৯৫০ সালে ঐ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বাক্যী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর এই নামা বিজ্ঞানী বাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গণিত-বিজ্ঞানের কের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে কৃত্রিম উপায়ে ত নামানোর জন্ম তাঁর বিখ্যাত গবেষণা শুরু হয়। মেঘের ওড় বড় বেলুনে করে জম্যাট কার্বন ডাইঅক্সাইড ও সিলভার হাইড্রো বর্ণন করে, ঠাণ্ডা জল ছড়িয়ে বৃষ্টিপাত ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় আংশিক সাফল্য লাভও হয়েছিল। ইমানে এই বিজ্ঞানী বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় পদ অধ্যাপক। লেখাপড়া নিয়েই কাটছে তাঁর শান্ত অবসর শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশ তাঁর খুঁই পছন্দ, তাই মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে কিছু দিন কাটিয়ে আসেন। র কেন্দ্রে মৌলিক গবেষণা এখনও তিনি করছেন,—কয়েকটি তেও হাত দিয়েছেন। আলোচনা এসঙ্গে এই সৌম্য, সদালাপী বিজ্ঞানী ভূপদার্থ ও আবহাওয়া বিজ্ঞান বিষয়ে ভালো বই লেখার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন।

জীবনে বহু সম্মান এই বিজ্ঞানী পেয়েছেন। অসংখ্য গীর তিনি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন; তাঁর উপদেশ দলালাভে গুরু সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নাম-করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় জ্ঞানদাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। মনোগ্রাফ, পুস্তিকা মিলিয়ে এই বিজ্ঞানীর গবেষণা ও চিন্তামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা শতাধিক। পদ বাল্যোপাধ্যায়-এর মধুর ব্যবহার সহজেই সকলকে রে। সঙ্কল্প ও সহায়ত্বভিত্তিক মনের জন্ম সকলের কাছেই প্রিয়। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সখ হলো ছবি তোলা। ত নানা রকম যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে তিনি এখনও র। ভারতের শিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্রে এই খ্যাতনামা নেতৃত্বও মতামতের মূল্য ও প্রয়োজন খুবই বেশী। আশা বিজ্ঞানীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

## উক্ত হেমনাথ সান্যাল

[ ভারত-বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ও অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ]

নিখিল ভারতে বর্তমানে যে স্বল্প-সংখ্যক বিখ্যাত আইনবিদদের নাম জ্ঞাত হয়, তন্মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার উক্ত হেমনাথ সান্যাল অন্ততম। সাধারণ্যে তিনি "হেম সান্যাল" বা এইচ, এন, সান্যাল নামে সমধিক পরিচিত। স্বদক্ষ তর্কজ্ঞান, স্মৃতিশক্তি মেধা ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হইয়াছেন।

১৯০২ সালে শ্রী সান্যাল রংপুর জেলার নীলকামারী সহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়সে দশম শ্রেণীতে পাঠকালে পিতা জানকীনাথ সান্যাল পরলোকগমন করেন। পূর্ব বৎসর তিনি স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ সালে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে অর্থনীতিতে অনার্স সহ গ্রাডুয়েট হন। উক্ত বৎসরেই উচ্চ-শিক্ষার্থে তিনি ইংল্যান্ড গমন করেন এবং ১৯২৫ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতি ও আইনে ট্রাইপস গ্রহণ করিয়া London School of Economics এ গবেষণায় বৃত্ত হন। ১৯২৭ সালে তথা হইতে Ph. D ডিগ্রী লাভ করিয়া Inner Temple এ আইন পড়িতে থাকেন। ১৯২৯ সালে ভারতে কিরিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। প্রথম দিকে তাঁহাকে যথেষ্ট বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয় কিন্তু দৃঢ়চেতা হেমনাথ কয়েক বৎসরের মধ্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। সেই সময় কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবীরা তাঁহাকে সহকারী (জুনিয়র) হিসাবে পাইতে সক্ষম হন। কিছুদিনের মধ্যে হেমনাথ কলিকাতা "বারের" তৎকালীন কার্যেই স্বার্থের মূলে আঘাত করিয়া জন্মপ্রিয় হন।

প্রথম বৎসরে হাইকোর্ট হইতে মাত্র একাদ টাকা আদায় হওয়ার



হেমনাথ সান্যাল

বহুবাক্য ও আত্মীয়বন্ধন তাঁহাকে সরকারী শিক্ষাবিভাগে অধ্যাপনার বৃত্তি গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। কিন্তু ভগবৎ-বিশ্বাসী ও কর্মনিষ্ঠ হেমনাথ অধিকতর আগ্রহে আইন-ব্যবসায় লিপ্ত হন। তিনি না শিক্ষাবিভাগ তাঁহার সহায়তার কতটা উপকৃত হইতে কিছু আইন-জ্ঞগণ যে একজন মুখোন্মুলকারী বাঙ্গালী ব্যবহারজীবী হইতে বঞ্চিত হইতে ইহা গ্রহণ সত্য। অগাধ বিত্ত অর্জন করা সম্ভবও শ্রী সন্ন্যাস কলিকাতা বারের প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তির সহিত মধুবালাশে রত থাকেন এবং তিনি বহুদিন হইতে উহার একজন “বেসরকারী নেতা” হিসাবে পরিচিত। সেখানে আজও তিনি “একমেবাদ্বিতীয়ম্।” ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি বহুবিখ্যাত মামলা পরিচালনা করিয়াছেন।

ছাত্রাবস্থায় শ্রীসন্ন্যাস নানারূপ ক্রীড়ায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তৎকাল বর্তমানে তিনি কয়েকটি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিয়া বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের সহায়তায় অল্পবয়স্ক বালকদের নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু সাংস্কৃতিক ও সামাজ্যসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আইনের দিক্‌পাল হেমনাথের প্রতিটি দর্শনপ্রার্থীর সহিত মিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ আলাপ ওনিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার পরিহাসপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। আমার সহিত সাক্ষাতের সময় তিনি একটি “সন্ন্যাসীর কমতুল” দেখাইয়া বলেন যে, কয়েক বৎসর পূর্বে কান্দীধামে বাবা বিশ্বনাথজীউর মন্দির হইতে নির্গমনকালে আকস্মিক ভাবে এক জটাভূটবারী সাধুপুরুষ তাঁহাকে উহা প্রদান করেন। উহা গ্রহণ করায় পরিবারবর্গের প্রচুর আপত্তি উঠে কিন্তু অটল থাকিয়া আজও উহা তিনি সবলে রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীসন্ন্যাসের ক্ষুদ্র অখণ্ড মনোরম বাসভবনে তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাগারে নানা ধরণের পুস্তক দেখিয়া মনে হয় যে, জ্ঞান আহরণের ব্যাকুল আগ্রহে উহা গড়িয়া উঠিয়াছে। বহু অল্পসঙ্খ্যে পাঠক উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কর্মপ্রতিভা যে লুক্কায়িত থাকে না—উহা বর্তমান মাসে নয়াদিনীতে কেন্দ্রীয় সরকারের “অতিরিক্ত সালিসটার জেনারেল”রূপে হেমনাথের নিয়োগ মারফৎ প্রমাণিত হইয়াছে। কলিকাতা মহানগরী হইতে তাঁহার কর্মক্ষেত্র স্রুদূর দিল্লী সহরে অপসারিত হওয়ার শুধু যে ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষতি সাধিত হইবে, তাহাই নহে—আইনের একটি পরিপাটি গ্রন্থালার বিরাট অংশ শূন্য হইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যক্তিগত বা প্রদেশগত স্বার্থের উচ্চে জাতীয় সরকারের আহ্বানের স্থান হওয়া প্রয়োজন বলিয়া সকলে মনে করেন।

মানব-দরদী হেমনাথের এত জনপ্রিয়তা থাকা সম্ভবও গত সাধারণ নির্বাচনে তাঁহার পূরাজয় দলের সাংগঠনিক ক্রটির জন্য সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

কলিকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রিকা তাঁহার কর্মময় জীবনী-প্রকাশের জন্য আগ্রহাষিত ও সচেষ্ট হন কিন্তু একজন বিশিষ্ট পুরাতন পাঠক হিসাবে তিনি সানন্দে উহা “মাসিক বহুমুখী”তে প্রকাশার্থ উপহার দেন।

বিদায়কণ্ঠে মনে হল যে কর্মদীপ্ত, স্বনামধন্য, আন্তঃপ্রতিষ্ঠ, সদানন্দ, অমায়িক ও যুবজন্মোচিত বাহ্যের অধিকারী এই মানুষটি আজ দূর-পাথের যাত্রী ও আরও উচ্চতর গৌরব-শিখরে উঠিবেন। তাই স্মরণ করিলাম—শিবাস্তে পছানমস্ত।

## স্টীমারে

অবনীকুমার নাগ

এখন অনেক রাত—একটা কি দুটো,  
আমি ডেকে রেলিঙে হাতের ওপর  
থুতনি রেখে চুপচাপ ঈড়িয়ে আছি।  
ঝিরঝিরে বাতাস এসে আমার মাথায়  
হাত বুলায়ে দিচ্ছে; আবেশে আরামে আমার  
চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে, আর—  
পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের স্বপ্ন অমুভব করছি  
সেহের প্রতিটি কথা দিয়ে।

আকাশের ওপরে আলোর মেঘে কুমারীচাঁদ  
বিটু মিটু করে তাকাচ্ছে আর হাসছে;  
তার উজ্জ্বল মুখ থেকে হলুকে হলুকে আলোটা এসে  
মিষ্টি গানের মতো স্টীমারের ডেকে, নদীর বুকে,  
আর আমার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে  
মনের-ইখায়ে কত না তরঙ্গ তুলছে।

স্টীমারটা ধবন ছাড়লো তখন  
হারেমের সচরীর কারদার  
তীর-বান্দশাকে নদীর ডেউহাত দিয়ে  
‘সোলাম’ ‘সোলাম’ বলে ছুলাং ছুলাং করে  
আন্তে আন্তে পিছিয়ে এলো।  
আমি ডেকে ঈড়িয়ে তাই দেবলাম।  
এখন আর ডেউ নেই। বাঁধা পাথে এখন  
স্টীমার গন্তব্য স্থলে চলেছে আপন-মনে।  
বুকে তার কতো নিস্ত্রাময় যাত্রী।

এখন স্টীমার চলেছে আর  
জলে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ে  
কতটুকুরো, কত খান খান হচ্ছে।  
এই বুঝি ভালো; হয়তো এই-ই বেশ।

তাই ভাবছি:

এমন রাতে আর ঘুমের-কেবিনে  
আমি নাই-খা সেলাম।

# রবীন্দ্রায়ণ

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

৮খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

যে রত্নগর্ভা মহীয়সী মহিলা কয়েকটি সত্ত্বের জন্মদাত্রী তন্মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন রবীন্দ্রনাথ, সেই পরম শ্রেয়সা সায়দামুন্দরী দবীকে নানা সাংসারিক ও আর্থিক সকল ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়া তি-পার্শ্বচািরণী হইয়া চলিতে হইয়াছে। তেজস্বিনী শান্তদীর বর্তমানে ঝাঁপকে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য ও উৎসব মুখরিত বৃহৎ সোয়ের লোকলৌকিকতা, সামাজিকতা ও বাবতীয় ভার কঠোরপে ধন করিতে হয় ও অনতিকাল পরেই দিকৃপালসম শ্বস্তুর তিরোভাবে না ঝটিকায় নানাবিধ উবেগ সঞ্চিত হয়, সেই পূজনীয়াকে বাসনা বলিলে অতৃপ্তি হয় না। পরেও প্রায় ত্রিশ বৎসর রয়া স্বামীর প্রেরণা ও শৈলভ্রমণের মধ্যে অপর দীরতার সহিত, ধর্মিক ভ্রমণের লইয়া এই মহিলাকে অতগুলি সন্তান-সন্ততির ক্ষা ও পোষণ এবং তাঁহাদের বিবাহাদি ও শিশুপালন প্রভৃতি হল কার্যেই কলাশ সাধনে নিরত থাকিতে হয়। বধাসাধ্য ঙ্গিতে ও প্রমুদিতায় যে গৃহটিকে পূর্ণ রাখিয়াছিলেন ইহা তাঁহার ম কৃতিত্ব নয়। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও আধ্যাত্মিক বলও যথেষ্ট ছিল। টি ভাষা যেমন না জানিলে প্রত্যেক ভাষার প্রয়োগশক্তির বোধ হয় না এবং সম্যক বুৎপত্তি লাভ হয় না, তেমনি রবীন্দ্র-জ্ঞানীর জিত সঞ্চার ও জ্ঞান শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টাকে পরিপুষ্ট করে। রীর আদর্শে শুধু স্বামীর সুখ দুঃখের সন্নিহী হইলেই হয় না, কমিণী ও সহধর্মিণী হওয়া যে বাহুদীয় এ সঞ্চার তাঁহার বাস্যা তে শেষ দিন পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে বন্ধমূল ছিল বলিয়াই ভিতরের শান্তি বাহিরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কবির বয়স যখন মাত্র চতুর্দশ বৎসর তখন এই মহীয়সী মহিলা বৈজ্ঞানী ১২৮১ সালে পরলোকগমন করেন। বালক রবীন্দ্রনাথের হৃদয়োগের পর ও মায়ের শেষ অগ্রহুতার জন্ত তাহার কিছু পূর্ব তেই বালকের লালন-পালনে তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা সোদামিনী ার সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পত্নীরও সাহচর্য ছিল। তৎপরে বর মেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের পত্নী নীলময়ী দেবী সসারের ভার ণ করেন ও তাঁহার বড়জা ঘিজেন্দ্র-পত্নী সর্বমুন্দরী দেবীকে তিনি সারিক কাজ কর্মে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেন। কবির মাগ্রন্থ সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমোদাবাদে বিচারকের পদে সমাসীন ার সত্যেন্দ্র-পত্নী জ্ঞানদামিনী দেবী স্বামীর সহিত আমোদাবাদে কতেন। মাতৃবিয়োগে কবির মনের অবস্থা কী হইয়াছিল তাহা ার বসিখিত রচনার পাঠক-পাঠিকারা জানেন।

কিছুকাল পরে কবি আমোদাবাদে তাঁহার মেজদাদার নিকট ছানকালে তাঁহার ইংরাজি শিক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। ই ইংরাজি সাহিত্য পাঠ করিয়া তাহার ভাব অবলম্বনে বাংলা

রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন যশের কিরীট মাথায় ধারণ করিয়া বাণীকুলে বিচরণ করিবেন, তখন অনেকেরই তাহা বুঝিয়াছিলেন কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষের “কালের প্রান্তরপটে লিখিব অক্ষর নিজ নাম” —এই গবিত বাণী সম্পূর্ণ ভাবে সার্থক করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে পরে বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন তাহা অদৃষ্ট দেবতা তখন নিজ পেটিকার মধ্যেই গুপ্ত রাখিয়াছিলেন, তাহা তখন স্বপ্নেও কেহ ভাবিতে পারে নাই। কাজেই রবীন্দ্রনাথ আত্মীয়দের মতে আর মানুষ হইলেন না যেহেতু অর্থকরী বিজ্ঞা তাঁহার আরম্ভ হইল না ও এই চিন্তায় বিভ্রত হইয়া আত্মীয় সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ব্যারিষ্টার করিবার জন্ত বিলাতে পাঠাইলেন। মাত্র সত্তেরো বৎসর বয়সে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মেজদাদার সঙ্গে “পুণা” নামক জাহাজে বিলাত বাত্মা করেন। সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী তখন ছেলে মেয়ের সহিত ট্রাইটন অফলে বাস করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেইখানে আগ্রর লইলেন ও সেখানকার পাবলিক স্কুলে অর্থাৎ এদেশীয় উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। সেখানকার অধ্যক্ষ প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন— What a splendid head you have, তোম দুখের ভাবেই শিক্ষকের মনে আশার সঞ্চার কাণে বুঝির পরীকার তখনো কোনো সুযোগ ঘটে নাই। সে বিদ্যালয়ে থাকিয়া তাঁহার কিন্তু বিশেষ ফলপ্রসু শিক্ষালাভ ঘটিল না। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ডায়রনাথ পালিত ( পরে ডাঃ স্তার ) তাঁহাকে লগুনে লইয়া আসিলেন। ল্যাটিন শিক্ষকের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ও বাড়ীতে তিন জন শিক্ষকের নিকট পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ লগুন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র হইলেন। কলেজে তাঁহার গুরুদের মধ্যে ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সাহিত্যিকদের অন্যতম John ও Henry Morley ডাক্তর, John Morley পরবর্তীকালে Lord Morley হন। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক বার্কলের পরিবারে ও আচার্য স্বর্টের পরিবারে কিছুদিন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। সাহিত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ইন্দোমৌলীয় সংগীত শিক্ষার আশ্বিনিরোগ করেন। রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা অর্জন মানসে বিলাতের তৎকালীন বিখ্যাত রাজনীতিক বক্তাব্বর ট্রাইট ও গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতা শুনিতে রবীন্দ্রনাথ বিলাতের পার্লামেন্টের হাউজ অব কমন্স সভার অধিবেশনগুলিতে নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিতেন আর সাধারণ ও জাগতিক জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার ও চিত্রশালা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গ্রন্থপাঠাঙ্গিতে বহু থাকি তাঁহার অবত কর্তব্যের মধ্যে ছিল। লগুনে অবস্থানকালেই “ভারতীতে” “ভর” “তরী” নামক একটি কবিতা ও “ইন্দোমৌল-প্রবাসীর



পত্র, নামে দুটি পত্র প্রকাশিত হয়। যে পত্র-সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ এতটা প্রসিদ্ধি, এই তাহার স্মরণাত। ইয়োরোপ প্রবাসীরা এ তিনি বিলাত ও ইংরাজ জাতি সবন্ধে যে সকল মন্তব্য করিয়া, সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ পাট্টাচার্য তাহার সমালোচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ আবার তাহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠাইতেন। ইংরাজ বড়লাড়ার সহিত তাহার কিছুদিন উত্তর কাটাকাটি চলিয়াছিল।

লণ্ডনে তারকনাথ পালিতের পুত্র লোকেন্দ্রনাথ কবির সহাধ্যায়ী ছিলেন ও ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থী হইয়া ভারতে যেরেন। মহর্ষির আদেশে দেড় বৎসর পরে কবিকে দেশে ফিরিতে হয়। তাঁহার আর ব্যাবস্থার হওয়া হইল না। বিলাত প্রবাসের কালে কবি ইংরাজি ভাষা ও গান আয়ত্ত করিলেন। দেশে আসিয়া “বান্দীকি প্রতিভা” ও “কাল যুগরা” রচিত ও অভিনীত হইল। কবি বলিয়াছেন এই রচনার তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে অনুসরণ করিয়াছেন—

“এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী

তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরনী ?”

“বিজ্ঞান সমাগমের” এক সম্মেলনীতে রবীন্দ্রনাথ বান্দীকির ভূমিকা অভিনয় করেন। তাহাতে প্রমাণিত হয় যে কবি একজন ভালো অভিনেতা। সে অভিনয়ের দর্শক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ ষাঁহাদের নাম “বঙ্গবাসী”তে প্রকাশিত বিজ্ঞান সমাগমের বিবরণীতে পাওয়া যায়। ডাঃ শ্রীর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিনয় দেখিয়া নূতন অভিনেতা কবিকে একটি গানে অভিনয়িত করেন। কবির পঞ্চাশৎ বর্ষপুর্তিতে তাহার দেশবাসী কলিকাতা টাউন হলে যে প্রেক্ষা সভা আহ্বান করিয়া কবিকে অভিনয় প্রদান করেন, সেই সভায় শ্রীর গুরুদাস তাহার সেই বহুকাল পূর্বে রচিত গানটি পাঠ করিয়াছিলেন—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ হুমারে থেকে না আর  
অজান ভিমিরে তব সুপ্রভাত আরবার।  
উঠছে নবীন “রবি”, নব জগতের হবি,  
বান্দীকির প্রতিভা যে দেখাইতে পুনর্বার।

“মণিমন” “মুসিরাশি” খোজো বাহা দিবানিশি,  
ও ভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর।

ঠাকুরবাড়ীতে এই “বান্দীকি প্রতিভার” বহুবার অভিনয়ে অজ্ঞাত ভূমিকার নটদের পরিবর্তন হইলোও বান্দীকি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও লক্ষ্যসদার ছিলেন অক্ষর মজুমদার একবার ছাড়া। সেবারে অক্ষর বাবু হলে অকর্তৃপ হন অর্ধাঙ্গনাথ। বিজ্ঞান সমাগমের শেষ সম্মেলনীতে নাট্যমঞ্চে কবি সাধারণের সমুখে প্রথম দেখা দিলেও ইহাই তাহার প্রথম অভিনয় নয়। ইহার বহু পূর্বে বাড়িতে জাতীয়সমের সমুখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “মানমরীতে” “মদনের” ভূমিকা (১৮৭৬?), মেজলাদা ক্রোমেনাথ ইয়, ১৮৭৭ (?) সালে “বিবাহ উৎসব” ঐতিহ্যে একটি দ্বি-ভূমিকা ও “অলৌকিকবাবু” প্রহসনে (১৮৭৮) নামভূমিকা অভিনয় করেন। তখন “অলৌকিকবাবু” নাম

কর আর করব না।”

পূর্বে জেডারাকো ঠাকুরবাড়ীতে জ্যোতিরিন্দ্র প্রমুখ

Committee of Five এর উদ্ভোগে যে “কৃষ্ণকুমারী” অভিনীত হয় তাহাতে কৃষ্ণকুমারীর মাতার ভূমিকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন। এই Committee of Five বা পঞ্চজনীর সভায় সভ্য ছিলেন—(১) গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, (৩) যতুমল মুখোপাধ্যায়, (৪) অক্ষরচন্দ্র চৌধুরী এবং (৫) কৃষ্ণবিহারী সেন। তাহার পর ‘বড়দের দলের’ উদ্ভোগে রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘নবনাটক’ গুণেন্দ্রনাথ প্রমুখের ব্যবস্থাপনার অভিনীত হয়। “মানমরী” “পুনর্বসন্ত” নামে পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত আকারে জ্যোতিরিন্দ্রের তত্ত্বাবধানে পরে ‘ভারত সঙ্গীত সমাজে’ অভিনীত হয় আর ‘বিবাহ উৎসব’ কোনো দিন হুজিত হয় নাই। “অলৌকিকবাবু” বাড়ীর অভিনয়ে কবির সহযোগী অভিনেতা ছিলেন ‘সত্যসিদ্ধ’ ভূমিকার বড়লাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ।

বিলাত হইতে ফিরিবার পরে বিশ বৎসর বয়সে ‘ভয়ঙ্কর’ প্রকাশিত হয় কিন্তু গ্রন্থখানির আর খিত্যের সন্ধান হয় নাই যদিও পরে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য করিয়াছেন—

চলেছে ভেসে কত না আশা তরী অনাদি প্রোত বেগে  
কতকালের কুসুম উঠে-ভরি’ বরণ ডালি ছেয়ে।

এই পুস্তক প্রকাশের পর ছাত্রমহলে রবীন্দ্রনাথের নাম হইল “বাঙলার শেলি”। আকাশে বাতাসে তখন ‘রবি বাবু’। কাব্যে আসিল নূতন ছন্দ। ক্রমে ১২৮৮ সালে “সন্ধ্যা সঙ্গীত” প্রকাশিত হয়। গড়ে তখন রবীন্দ্রনাথ ‘ভারতীতে’ “বিবিধ প্রসঙ্গ” ও ‘বৈঠাকুবাণীর হাট’ লিখিতেছেন। এই সময়েই তাহার অননুসরণীয় সুরের লক্ষণ সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। ১২৯০ সালে “ভাস্কর্য ঠাকুরের পদাবলী” ও “প্রভাত সঙ্গীত” প্রকাশিত হইল।

নবছন্দে নবভাবে বঙ্গসাহিত্যে ভরপুর হইয়া উঠিল। পিতন-বৃত্তি সমালোচকমল গভীর ভাবে বলিলেন—“এসব অংশট, বোকা বার না, এ চলেবে না, এ কাব্য নয়—কাব্য।” কাব্যের শব্দগুলো কিন্তু সবই বাঙলাভাষার, দেখিলে বাঙলা অভিব্যক্তি সবই পাওয়া হইতে পারিত।

প্রতিভাও উদ্বোধনের অপেক্ষা রাখে। বাড়িতে বড়লাদা, নতুনলাদা জ্যোতিবাবু ছাড়াও কবিকে প্রথম বয়সে উদ্বোধিত করেন অক্ষরচন্দ্র চৌধুরী।

বঙ্গসাহিত্যের আর এক নব-জাগরণের প্রভাত-আলোকে যে কলকট বিহঙ্গকুলের কাকলিতে ডারভীকুল মুগ্ধিত হইরাছিল তাহার অগ্রগী ছিলেন “সারণ-মঙ্গলার” কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। তাহাকে অনুসরণ করিয়া যে নবীন-বান্দীরা সাহিত্যক্ষেত্রে যাত্রারত করিয়া-ছিলেন সেই দলে রবীন্দ্রনাথ, অক্ষর চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন, ‘এবার’ কবি অক্ষরকুমার বড়াল, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং বিহারীলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র অধিনাশচন্দ্র। এই অক্ষরচন্দ্র চৌধুরী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী, আদুল্লাহাবাসী, এম, এ, এবং বি, এল হইয়া এটনি হন কিন্তু বাস্তব জগতে আদালতের কচকচানি অপেক্ষা কল্পরাজ্যে কাব্যরচনা ও চিত্রশিল্প ইহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। জ্যোতিবিশ্ব লিখিয়াছিলেন—

অক্ষর তাই,

বনের পাখী বলে এসে

গান গায় গ্রাম দেশে



তাহার কি কর্ম থাকা আদালত পিছরে

বসন্তের সহকার

মুক্তবায়ু প্রাণ বার

অবলম্ব কারাগারে সে কি কত মুক্তবে ?

তোমার কি সাজে সখা আদালত-পিছরে ?

ইংরাজি কাব্য ও সাহিত্যে ইহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল।  
সাহিত্য স্রব্ধতীর সেবারও তাঁহার লেখনী রসবিকাশে সকলতা  
চিত করিয়াছিল। ইহাকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

অন্তঃপ্রবন নমো নম

অধন অকমে কম

ভঙ্গ আমি মিহু ছন্দবর্ণে

মগধে কলিঙ্গে গোড়ে

কল্পনার ঘোড়সোড়ে

কে বলে পারিবে তোমা সনে।

ন রবীন্দ্রনাথ 'ভারতীতে' 'নির্ব্বের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিলেন

ন এ পত্রিকাতেই অক্ষয়চন্দ্র নির্ব্বিরগীর প্রাণের ব্যাধা লিখিলেন—

কে জ্ঞানিত ভাগ্যে ছিল হেন অভিশাপ,

হ'ল সার অঙ্গুঢ়ালা, নিরাশ, মরম আলা

নিবানিশি কুলু কুলু আকুল বিলাপ।

অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহিত্য-সহচর। প্রথম  
৭ কবি ইহার সহিত কাব্যশাস্ত্র আলোচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ  
পতি চণ্ডীদাসের ভাষার কাব্য লিখিতে মনস্থ করিয়া 'ভানুসিংহের  
বলী' রচনা করিলেন। এই 'ভানুসিংহ' লইয়া একটি কৌতুকাবহ  
যটিকাছিল। এই সময়ে অধ্যাপক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়  
গীতে ছিলেন। সেখানে তিনি ইন্দোরোপীয় সাহিত্যের সহিত  
শব্দ কবিতার তুলনা করিয়া একটি নিবন্ধ লেখেন। এই নিবন্ধে  
সিহকে প্রাচীন পদকর্তা বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন ও এই  
লিখিয়া তিনি 'উষ্টর' উপাধি পান।

ভানু' যে 'রবিব' নামান্তর মাত্র তাহা তখনো প্রকাশ পায় নাই।  
নাথের কৌতুক রচনা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের ভাবনী' তখনো  
বলে প্রচারিত হয় নাই।

বি বখন 'বঙ্গভাষার লেখক-এ' অমুক্ত হইয়া কাব্যজীবনের  
কাশ লোনে তখন লেখেন তিনি ব্রহ্ম মাত্র, স্বতী তাঁহার মধ্য  
বহু বিচিত্র স্রব বাহির করিতেছেন। এই ভাবে সারা  
কবির সাধনা।

লাভ হইতে ফিরিবার পর সাহিত্যসমালোচক কবি প্রিয়নাথ  
সহিত রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য ঘটে। ইন্দোরোপের বিখ্যাত  
দৈব রচনাবলী প্রিয়নাথের অমৃত ছিল। ইনিই প্রথম  
ইন্দোরোপীয় সাহিত্যাদ্যরনে উদ্বুদ্ধ করেন। পরে বিশ্ব-  
রবীন্দ্রনাথ যে সম্পূর্ণ ওয়াকিবতাল তাহার আরম্ভ এইখানে।  
যে অজীত হইতে কবি বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে চিরদিনই সজাগ  
। তাঁহার জীবনকাল নব প্রকাশিত কোনো গ্রন্থই তাঁহার  
নাই শুধু বাংলা বা ইংরেজি সাহিত্যক্ষেত্রে নব-শিক্ষাক্ষেত্রে  
উদ্যম। এইখানে আর একটি জীবন-বহু প্রভাবের কথা

স্মরণীয়। সে বন্ধু বিশ্ববিদ্যুত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।  
আচার্য জগদীশের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অল্প-বয়সে হয় এক  
সেই হইতেই উভয়েই অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই কবি ও বৈজ্ঞানিকের  
মিলনে উভয়েই পরস্পরের জ্ঞানশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই  
বিজ্ঞানচর্চার সাহচর্যের ফলেই হয়তো কবি প্রাকৃতিক আনন্দের  
মধ্যেও বাস্তবের বেদনাকে বিমুগ্ধ হন না এক তাহা কবির বহু রচনার  
প্রকাশ। এমন কি তাঁহার প্রিয় স্বতু বরবার আনন্দের মধ্যেও তিনি যে  
পৃথিবাসী গৃহহারার কথা বলিতে ভুলেন নাই তাহাও একদিন কবিকে  
জগৎশূন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন। আর উভয়ের রাজ্যে  
প্রাণের সাড়া জীবনাত্তোর মতো কিনা তাহার সন্ধানে স্রব  
জগদীশচন্দ্র যে একনিষ্ঠ সাধনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেও কবির  
উৎসাহ যে কতদূর কার্যকরী হইয়াছিল তাহা তিনি নিজ মুখেই  
বীকার করিয়াছেন।

'সন্ধ্যা সঙ্গীত' ও 'প্রভাত সঙ্গীতের' মাঝখানে কবিকে আর  
একবার বিলাত বাড়া করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ভীষণ  
অন্তর্দুঃখ, লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা, ঘটনাসমাবেশের পারিপাট্য ও সবতা  
বিশ্লেষণের শক্তির পরিচয় তাঁহার প্রীতি রচনাতেই পাওয়া যায়।  
তাঁহার বাগ্মিতাও অসাধারণ। কঠোরের নানা বৈচিত্র্য বাহা  
তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছিল তাহা আমাদের দেশে অতি  
অল্প বাগ্মীই আছে। প্রবন্ধ পাঠের সময় কবির বর মাধুর্য না  
হারাইয়াও যে গাভীপূর্ণ গভীর নাদে পরিণত হইতে পারিত তাহা  
বাঁহারা শুনে নাই তাঁহারা অহুমান করিতেও পারিবেন না।  
সে সময়ে তাঁহার সেই বৃহৎ কঠোর এমন গভীর ও ব্যাপক হইয়া  
উঠিত যে কলিকাতা টাউন হলের মতো স্থানেও বক্তার কথাগুলি  
হলের অপর প্রান্ত হইতে স্পষ্ট বৃষ্টিতে পারা বাইত। পৃথিবীর  
সকল দেশ হইতেই বহুতা দিবার জন্ত তিনি স্রবর আহ্বান  
পাইয়াছেন এবং সকল দেশেই তাঁহার অসামান্য শক্তি বাগ্মী বিশেষ  
সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যদি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতেন তাহা হইলে তিনি  
হয়তো ব্যবহারজীবীরাপে লক্ষ্যপ্রাপ্ত হইয়া ক্রোড়পতি হইতে পারিতেন  
কিন্তু ভাগ্যবিধাতা ডাঃ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতিক  
লইয়া যে খেলা খেলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে লইয়াও সেই খেলাই  
খেলিলেন; মাত্রাজ হইতে তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া পাঠাইয়া গিলেন।

মাত্রাজ হইতে ফিরায়া আসিয়া কবি কাব্যালোচনার ও রচনার  
মনোনিবেশ করিলেন। যে সকল পত্র পত্রিকার একটি নাম  
হইয়াছিল তাহাখাই রবীন্দ্রনাথের রচনা বহু ধারণ করিতে সক্ষম  
ছিল। কবি তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থে সহিত এক স্থানেই থাকিতেন,  
চন্দ্রনগরে মোরান সার্কেলের বাগানে, কলিকাতার সর্ব স্ট্রীটে,  
দাঙ্গিলিঙ্গে, সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহচর ছিলেন।  
কিছুদিন এইরূপে কাটাওয়া কবি বোম্বাই অকলে কারোয়ার  
সভোক্তারূপে নিকট চলিয়া গেলেন। এইখানে 'প্রকৃতির  
প্রতিশোধ' লিখিত হয়। 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে', 'প্রভাত সঙ্গীতে'  
আনন্দের জন্ত, সৌন্দর্যের জন্ত একটা চকল আবেগময় আকুল  
জাকজাকরই প্রমাণ মেলে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সদায় অসীমের  
বন্দ, সীমারও বৃহৎ নর—অসীমও পূর্ণ নর—উভয়ের মিলনেই পূর্ণনিব্ব।  
তাঁহার সকল রচনার উৎকর্ষ তা স্রবের স্রবের স্রবের স্রবের স্রবের

প্রতিশোধের পর “হবি ও গান” (১২১০) ও “কড়ি ও কোমল” (১২১২) প্রকাশিত হইল। কড়ি ও কোমল প্রকাশের পর “কাব্য” সমালোচকমণ্ডল অন্তর্ভুক্ত হইলেন। কেবল রাহ’তে কাব্য হইতে মধু সঞ্চয়ের বঞ্চিত হইয়া মক্ষিকার মতো হুঁচকারিটা ত্রণ খুঁজিয়া বাহির করিয়া—

উড়িসনে রে পায়রা কবি, খোপের ভিতর থাক্ ঢাকা।

তোর বকুবকামি কৌসকৌসানি তাও কবিত্বের ভাব মাথা  
তাও ছাপাঙ্গি গ্রন্থ হ’ল নগদ মূল্য এক টাকা।

বলিয়া গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিলেন। ব্যঙ্গ বিদ্রোপ রচনার সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক সমালোচনার চিরদিন নিরস্তর থাকিলেন। কেবল জীবনে একবার মাত্র ‘দামু ও চামু’ ইহার ব্যতিক্রম ও পরে তাহাও তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে পরিত্যক্ত।

এই সময়েই (১২১৬ বঙ্গাব্দ) কবির ‘রাজা ও রাণী’ নাটক প্রকাশিত ও কলিকাতায় বিজিতলায় (বীর-জি তলায়?) অর্থাৎ ধনভাঙ্গা স্ট্রীট ও সায়কিউলার রোডের সংযোগস্থলে সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে অভিনীত হয়। কুমারসেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন সত্যেন্দ্র-জামাতা—বঙ্গসাহিত্যের অন্ততম মক্ষিপাল, সন্তুষ্ট ও কুরাসীভাবায় কৃতবিশ্ত, ‘বীরবল’ হুন্দ্রনামে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরচিত স্বনামধন্য প্রথম চৌধুরী।

পর বৎসরে “বিসর্জন” রচিত হয়। পরবর্তী গ্রন্থ “মানসী” বহন প্রকাশিত হয় তখন কবির জীবনে ভাবুকতার আতিশয্য চলিতেছে। কোনো স্থানে নিজের আদর্শের অম্লরূপ একটি কবিকৃষ্ণ নির্মাণ করিয়া তিনি নিহুতে দিন বাপন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে গাজিপুরে কিছুদিন ছিলেন এবং সেখানে একটি বাড়ীও ক্রয় করেন। “মানসী”র অধিকাংশ কবিতা ও ‘গোলাপছড়ি’ গল্প গাজিপুরে লিখিত। গাজিপুর হইতে কবি ফিরিয়া আসিলেন, কবিকৃষ্ণ আর হইল না। সে বাড়িখানি তাঁহার ভাগিনের অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়কে দান করেন। কলিকাতা হইতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া গো-শকটে পেশোয়ার পর্বত দীর্ঘকাল ভ্রমণে বাহির হইবার সঙ্কল্প কবি করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহা হইল না। শিশু আদেশে জমিদারী দেখিতে বাইতে হইরাছিল।

“বালক” জমিল “হবি ও গান” ও “কড়ি ও কোমল” মাঝখানে ও কবি “মুকুট” নাটক ও “রাজহি” উপভাস, “হোলা নট্য,” “ভ্রমণ বৃত্তান্ত” ও কিছু প্রবন্ধ তাহাতে সন্নিবেশিত। এই সময়ে কবি যে শিশু সাহিত্যের অবতারণা করিলেন তাহা অপূর্ব অভাবনীয়, সম্পূর্ণ নূতন তাহারই পরিণতি আমরা “শিশু” ও “শিশু ভোলামাথ” এবং সে-সব দেখিতে পাই। রাজহির আখ্যান ভাগ লইয়া পরে নাটক রচিত হয় ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের ভাণ্ডার বুদ্ধিকল্পে প্রথম অভিনীত হয়। হেলে মেয়েদের জন্তই “বালক” পত্রিকার বোধ হয় সৃষ্টি কিন্তু “বালক” নিজের পায়ে পাড়াইতে পারিল না। “ভারতীর” অংকে চলিয়া পড়িল। “ভারতী ও বালক” কিছুকাল একত্র দেখা গেল। অজদিন পরে বালকটির

হৃদশা হইল, সে আহার বন্ধতায় মৃত্যুরাজ্যে চলিয়া গেল। মৃতবৎসা “ভারতী” “সাধনায়” মনোনিবেশ করিলেন।

১২১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের লেখনীর উপর বহুলভাবে নির্ভর করিয়া তদীয় ভ্রাতৃশ্রদ্ধা বঙ্গেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকদের কর্মশক্তি লইয়া স্বাধীননাথ ঠাকুর সম্পাদক হইয়া ‘সাধনায়’ প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশ। তিনি ‘সাধনায়’ গল্প পত্রের জুড়ি ধাক্কাইয়া দিলেন। ‘সাধনায়’ সময়ে তাঁহার রচনা নানা প্রকারে বিচিত্র। সাময়িক ইংরাজি পত্রিকা হইতে সার স্কলন, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, রাজনৈতিক আলোচনা, সমাজতত্ত্ব, গ্রন্থ সমালোচনা, মাসে মাসে কাব্য ও ছোট গল্প প্রভৃতি বিবিধ রচনা ‘সাধনায়’ প্রকাশিত হইত। একই বৈধিক নানারূপ বিভিন্ন বিষয় লিখিয়া কেহ যে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছেন ইহা বোধ হয় ইন্দোরোগীর সাহিত্যক্ষেত্রেও বড় দেখা যায় না। ইহা জিন্ন গাণ্ডাহিক “হিতবাদী” প্রকাশের সহিতও তাঁহার এই সময়ে সম্বন্ধ ঘটে। শুধু লেখা নয়, তিনি “হিতবাদী”র একজন ডিরেক্টরও ছিলেন। ‘সাধনাতৈই’ কবির উপদেশে তাঁহার ভ্রাতৃশ্রদ্ধা অবনীন্দ্রনাথ “স্বপ্নপ্রয়াণের” চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা স্বাধীন বিকাশে পথের সন্ধান পাইল। যে ছোট গল্প রচনার রবীন্দ্রনাথ বাঙলাসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী, তাহারও আরম্ভ “হিতবাদীতে” ও “সাধনায়”। গল্প রচনার কবির আনন্দ তাঁহার এক পত্র প্রকাশ—

“গল্প লেখায় কৃতকার্য হ’লে পাঁচজন পাঠকেরও মনের স্তরের কারণ হওয়া যায়। ১০০ গল্প লেখার একটা সুখ এই, বাদে কথা লিখব, তার আমার দিন-রাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে যেরে দেবে। আমার একলা মনের সঙ্গী হবে। বর্ষার সময় আমার বন্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে এবং রৌদ্রের সময়, পদ্মাতীরের উজ্জল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের উপর বেড়িয়ে বেড়াবে।”

এই সময়ে কবি সাধনার স্তরের মধ্য দিয়া বাইতেছিলেন, এ সময়ের কথা তাঁহার অপর একখানি পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

“নৌকায় থাকিতাম। সঙ্গে যে লোক ছিল সে প্রত্যহ প্রত্যবে এক বাট ডাল সিদ্ধ করিয়া আমার টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিয়া বাইত। আমি সেই ডালটুকু খাইয়া লিখিতে বসিতাম; সমস্ত দিন লিখিতাম। কোনোক্রমে চিন্তাবিক্ষেপ হইত না, অপরাহ্ন পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটার সময় খানকতক লুচি খাইতাম, তাহার পর বাহিরে ‘ইন্ড’ চোয়ালে শয়ন করিতাম; নৌকা নদীর উপর অশ্রান্ত ভাবে চলিতে থাকিত। এক sittingএ পঞ্চভূতের ডায়েরি, গল্প, কবিতা অনঙ্গল লিখিয়া বাইতাম। স্নানি বোধ করিতাম না।”

“পঞ্চভূতের ডায়েরি” আরম্ভ ও ভাণ্ড ভবতি কিন্তু শেষেরকা হয় নাই কারণ—

শেষ দেখা কি ভালো?

তেল ফুরিয়ে বাবার আলো

নিভিয়ে যাব আলো।

[ ক্রমশঃ ]

॥ মাসিক বন্ধুত্ব বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িক পত্র ॥

# ও ম র থৈ য়া ম

( অপ্রকাশিত )

কাজী নজরুল ইসলাম

মুগ্ধ করো নিখিল-হৃদয় প্রেম-নিবেদন কোশলে,  
হৃদয়-জয়ী হে বীর, উড়াও নিশান প্রিয়ার অঞ্চলে ।  
এক হৃদয়ের সমান নহে লক্ষ মসসিদ আয় 'কা'বা',  
কি হবে তোর তীর্থে 'কা'বা'র, শান্তি পাবি হৃদয়-তলে ।

লয়ে শরাব পাত্র হাতে পিই যবে তা মস্ত হ'য়ে,  
জ্ঞান-হারা হই সেই পুলকের তীব্র-যোর বেদন স'য়ে ।  
কি যেন এক মন্ত্র-বলে যায় ঘটে কি অলৌকিক,  
প্রোজ্জ্বল মেরে জ্ঞান প'লে যায় বর্ণা-সম পান ব'য়ে ।

এক নিঃশাস প্রবাসের এই ছনিয়া রে ভাই, মদ ঢালাও !  
কালকে তুমি দেখবে না আর আঁজ যে জীবন  
দেখতে পাও ।

খামখেয়ালীর সৃষ্টি এ ভাই কালের হাতে লুঠের মাল,  
তুমি তোমার আপনাকে এই মদের নামে লুঠিয়ে দাও ।

মদের নেশার গোলাম আমি, সদাই থাকি হুইয়ে শির,  
জীবন আমি পণ রাখি ভাই প্রসাদ পেতে তার হাসির ।  
শরাব-ভরা কুঁজোর টুটি জাপটে সাকী হস্তে তার  
পাত্রে চালে নিষ্ঠুর হাতে নিঙড়ে তাহার লাল রুধির ।

আজ্ঞা আমার এই সে গুহা, মদ ঢোলাই-এর এই দোকান,  
বাঁধা রেখে আত্ম-হৃদয় করি হেলায় শরাব পান ।  
আরাম-মুখের কাঙাল নহি, ভয় করি না হৃদ-শায়,  
এই ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুতের উর্ধ্বে ফিরি মুক্ত-প্রাণ ।

মীন-কুমারী হুঙ্গারী কয়, শুকাবে এই বিল যখন  
তোমার-আমার কি হবে ভাই তাই ভেবে মোর  
ব্যাকুল মন ।'

রাশী কয়, 'কাবাব যদি হই হুজ্জাই তুই-আমি,  
গসলে এ বিল মদের স্রোতে মোদের কি তার

বিধর্মীদের ধর্মপথে আসতে লাগে এক নিমেষ,  
সন্দেহেরই বিপথ-ফেরৎ বিবেক জাগে—এক নিমেষ ।  
দুর্লভ এই নিমেষটুকু ভোগ করে নাও প্রাণভরে,  
এই ক্ষণিকের আয়েশ দিয়ে জীবন ভাসে এক নিমেষ ।

জন্মদিনী ভাগ্যলক্ষ্মী, ওফে ওগো গ্রহের ফের ।  
স্বভাব দোষে চিরটাকাল নিষ্ঠুরতার চানছ জের ।  
বন্ধ তোমার বিদারিয়া দেখতে যদি এই ধরা  
খুঁজে পেতো ঐ বুকে তার হারা-মনি-মাণিক ঢের ।

আমার ক্ষণিক জীবন হেথায় যায় চলে ঐ ত্রস্ত পায়  
ধরশ্রোতা স্রোতস্বতী কিংবা মরু-ঝঞ্ঝা প্রায় ।  
তারির মাঝে এই ছদিনের খোঁজ রাখি না—ভাবনা নাই,  
যে গত কাল গত, আর যে আগামী কাল আসতে চায় ।

শুনছি আমার তমুর তীরে যৌবনেরই মদির স্তব,  
পান করে যাই মদিরা তাই শুনছি প্রাণে বেগুর রব ।  
ভিক্ত স্বাদের তরে সুরার ক'রো না কেউ ভিরকার,  
তাক্ত মানব-জীবন সাথে মানায় ভালো ভিক্তসব ।

হায় রে হৃদয়, ব্যথায় যে তোর স্বরছে নিতুই রক্তধার  
অন্ত যে নেই তোর এ ভাগ্য-বিশর্ঘ্যের, যক্ষণার ।  
মায়ায় ভুলে এই সে কায়ার আসলি কেন রে অবোধ,  
আখেরে যে ছেড়ে যেতে হবেই এ আশ্রয় আবার ।

আজ আছে তোর হাতের কাছে  
আগামী কাল হাতের বান্ধ,  
কালের কথা হিসাব ক'রে বাড়াসনে তুই হুঃখ আর ।  
স্বর্গ করা ক্ষণিক জীবন—করিসনে তার

পশুশ্রম করিসনে তুই হাতড়ে ফিরে সকল দোর,  
সোভাগ্যের সাথে বরণ করে নে চূড়াগ্য তোর।  
এই জীবনের জুয়াখেলায় হবেই হবে খেলতে ভাই  
আসমানি হাত হ'তে যেমন পড়বে ঘুঁটি ভাগ্যে তোর।

এই কুঁজো—যা আমার মতন ভোগ করেছে প্রেম দাহন,  
সুন্দরীদের মাথায় থাকি, পেলো খোপার পরশন।  
এই সোরাহির পার্শ্বদেশে এই যে হাতল দেখতে পাও,  
পেলো কতই ওঙ্কর ক্ষীণ কাঁকালের আলিঙ্গন!

তুমি আমি জগ্নিনিকো—যখন শুধু বিরামহীন  
নিশীথিনীর গলা ধরে ফিরত হেথায় উজ্জলদিন;  
বন্ধু, ধীরে চরণ ফেলো! কাঙ্কল হাঁথি সুন্দরীর  
আঁখির তারা আছে হেথায় হয়ত ধূলির অন্ধ-লীন।

প্রথম থেকেই আছে লেখা অদৃষ্টে তোর যা হবার,  
তাঁর সে কলম দিয়ে—বিনি ছুঁখে সুখে নিবিকার।  
শ্রেয় বোকামী, কারাকাটি লড়তে যাওয়া তার সাথে,  
বিধির লিখন ললটি-লিপি টলবে না যা জন্মে আর।

ভালো করেই জানি আমি, আছে এক রহস্ত-লোক,  
যার না বলা সকলকে তা ভালোই হোক কি মন্দ হোক।  
আমার কথা ধোঁয়ায় ভরা, ভাঙতে তবু পারব না  
থাকি সে কোন গোপনলোকে দেখতে বাহা।  
পায় না চোখ।

চলবে না কো মেকি টাকার কারবার আর, মোল্লাজি।  
মোলের আবাস সাক ক'রে নেয় শেয়ান বাহুর কারসাজি  
ঝেরিয়ে ভাঁটিখানার থেকে বলল হেঁকে বৃদ্ধ পীর—  
'অনন্ত ঘুম ঘুমাবি কা'স পান করে নে মদ আজি।'

সবকে পারি কাকি দিতে মনকে পারি ঠারতে চোখ,  
খোদার উপর খোদাকারিতে ব্যর্থ হয় এ মিছে স্তোক।  
ভীক পুন্ড বুদ্ধি দিয়ে জাল বুনলাম চাতুর্যের  
মুহুর্তে তা দিল ছিঁড়ে হিংস্র নিয়তির সে নোখ।

এই যে রক্তীন পেয়ালাগুলি নিজ হাতে গড়ল সে  
কেলবে ভেঙে খোলাল-খুঁশীর লীলায় এদের বিনদোষ?

পেয়ালাগুলি তুলে ধরো চৈত্রী লীলা ফুলের প্রায়  
ফব্রুৱ তোর থাকলে, নিয়ে ব'স লীলা-রুখ দিলপ্রিয়ায়।  
মউঙ্গ করে শরাব পিও, গ্রহের ফেরে হয়ত ভাই  
উপেটে দেবে পেয়ালা সুখের হঠাৎ-আসা বন্ধাবায়।

খেয়াম! তুই কাদিস কেন পাপের ভয়ে অযথা?  
ছুঁখ করে কেঁদে কি তোর ভরবে প্রাণের শূন্যতা?  
জীবনে যে করল না পাপ নাই দাবী তার তার দয়ায়  
পাপীর তরেই দয়ার সৃষ্টি, আনন্দ কর ভোল ব্যথা!

ঘেরা-টোপের পদা-ঘেরা দৃষ্টি-সীমা মোদের ভাই,  
বাইরে ইহার দেখতে গেলে শূন্য শুধু দেখতে পাই।  
এই পৃথিবীর আধার বৃকে মোদের সবার শেষ আবাস—  
বলতে গেলে ফুরায় না আর বিষাদ-করণ সেই কথাই।

মসজিদ মন্দির পিঙ্কায় ইহুদ-খানায় মাজাসায়  
রাত্রি-দিবস নরক-ভীতি স্বর্গ-সুখের লোভ দেখায়।  
ভেদ জানে আর খোঁজ রাখে ভাই খোদার যারা রহস্যের  
ভোলে না এই খোশ-গল্পের ঘুম-পাড়ানো কল্পনায়।

এই ধরাতে দেখছ যা তার সকল-কিছু সব মায়া,  
এই তুমি বলছ যা সব, শুনছ কলবর—মায়া।  
তিনভাগ জল একভাগ থল এই পৃথিবীর, এ-ও মায়া,  
গোপন প্রকাশ সত্য-মিথ্যা এসব অবাস্তব মায়া।

'ঘুমিয়ে কেন জীবন কাটাস?' কইল খনি স্বপ্নে মোর,  
'আনন্দগুল প্রফুটিত করতে পারে ঘুম কি তোর?  
ঘুম মৃত্যুর যমজ-ভ্রাতা তার সাথে ভাব করিসনে,  
ঘুম দিতে ঢের পাবি সময় কবরে তোর জনম-ভোর।'

হৃদয় যদি জীবনে হয় জীবনের রহস্তজয়ী,  
খোদা কি তা জানতে পারে মৃত্যুতে সে অবগুই।  
কিন্তু তুমি থেকেই যদি শূন্য ঠেকে সব কিছুই,  
তুই যখন রইবে না কা'ল জানবে কি আর শূন্য বই?

আকাশ যেদিন দীর্ঘ হবে, আসবে যেদিন ভীম প্রলয়,  
অন্ধকারে বিলীন হবে গ্রহ তারা জ্যোতির্ময়,  
এতদূর আমার দামন ধরে বলব কেঁদে, 'হে নির্ভর,  
নিঃশেষ মরণের কোন ভয়ে আবার মরতে হয়?'



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব তখন এমন হুসছে মন।

ধরা পড়ে গেছি আপন মনের কাছে—তুমিও নাবীর দুনিবার আকর্ষণে ভেসে গেছে সব মুক্তি-ভক্ত আর বিচার-বিবেচনার ছোটো ছোটো আড়াল। বিমিত পুসকে শুরু হয়ে শুধু অহুতব—মনের কানায় কানায় ভরা ভোরারের প্রবল উজ্জ্বাস—

সে কি আসবে ?

এমনি সময়ে একদিন আমার পরিচায়িকা ঘরে এসে ঢুকলো, চোখে-মুখে খুশী উপছে পড়ছে,—“মাশাম, সেই লেস-ওয়ারী জ্বার এসেছে—তাকে নিয়ে আসবো এখান ?”

—“তুই কি পাগল হলি ?” প্রচণ্ড বিষয়ে আমি চমকে উঠি।

—“বেশ, তবে বিবাহ করে দিবে যদি ?”

—“না না, এখানেই নিয়ে এসো, আমি নিজে কথা বসবো ওর সঙ্গে।”

কঠিন হবো, তির্যকার করবো, অনেক প্রতিজ্ঞাই তো ছিলো—

কিন্তু চোখের সামনে শুকে দেখে কোথার ভেসে গেলো সব—বিবাহীম সন্ধ্যাচরীম স্পষ্ট ভাবার শুধু জানালার আমার ভালোবাসা—নিবেশন করলাম আমার প্রেম—ওকে ঘিরেই বা মগ্নিত হয়ে উঠেছি।

আর এ-ও জানিলাম—বুধাই এ ভালোবাসা, আমার মিলন—

সুন্দর-পরাহত—শুধু স্বপ্নলোকেই সম্ভব—কোনো আশাই নেই।

ও জানালে সম্প্রতি মাকুইস ওকে একটি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজের

ভার দিয়ে ইল্যাড পাঠাচ্ছেন—কিন্তু যাবার সময় আমাকে পাবার

প্রতিশ্রুতি যদি পাথেররূপে না পায় তবে সে বার্ষিক সহ করার

চেয়ে বৃত্তাও ভালো। আমাকে ছাড়া ওর জীবনের কোনো অর্থ,

কোনো মূল্যই ওর কাছে নেই। আমাকে অমরোথ জানালে বেন

আমি ওর এখানে আসার সম্মতি জানাই। আমি তো সম্মতই।

মাত্র বাইশ বছর বয়স ওর। আমার চেয়ে মাথার বুঝি একটু

ছোটোই হবে। ছিপিছিপে একহারি চেহারা—অপূর্ণ লাবণ্যভরা—

গলাব স্বর আরও মিষ্ট—সবে বাড়ির আডাল দেখা দিয়েছে।

লেস-ওয়ারীম হুসবে ভাই নিখুঁতই হোতো।

তিনটি মাস কাটিলো। সপ্তাহে তিন চার দিন করে না এসে

ও পারতো না। বেকীর ভাগ সময়েই আমার পরিচায়িকাটি তার

খসাম কোঁচুস নিয়ে চার পাশে ঘুরুর করতো। কিন্তু সে না থাকলেও আমার স্থির বিশ্বাস যে, নিবিড় বিহবল মুহূর্তও ওর আমার

প্রতি সম্মান আর সর্বস্বের বিশ্বাসও অভাব হোতো না।

বিপদের মুহূর্তটিও আকস্মিক ভাবেই এসে পড়লো। হুঁজনের কেউই এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একদিন সকালে ও এসে—  
দু'চোখ ভরা জল। আদেশ এসেছে বাত্রা করার—লগুন অভিমুখে  
ম'সিরে জ সা'এর কাছে পত্রবাহকরূপে। এমন কি কেরোলে  
ইতিমধ্যেই একটি ছোটো দীয়ার অপেক্ষা করছে ওর জন্যে বতবীজ  
সম্ভব লগুন পৌছবার তাগিদে। দেখলাম, হতাশার তীব্র বেদনার  
ওর শুধু কণ্ঠই রুদ্ধ হয়নি, হিরভাবে চিন্তা করার শক্তিও হারিয়ে  
ফেলেছে। শুকে আশা দিতে গিয়ে আমি একটা মতলব ঠিক করে  
কেললাম। জানি না, কোথা থেকে মনের এত জোর এত সাহস  
পেরেছিলাম যে বলে বললাম আমি ওর সঙ্গেই বাবো ওর পরিচায়কের  
ছদ্মবেশে। কিন্তু তাইতে ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে—এব  
অবধি হুঁজনে মিলে ঠিক করলাম যে আমি ওর ছদ্মবেশ নেবো আর  
ও বাবে আমার সহধর্মিণীর ছদ্মবেশে।

আর ইল্যাডও পৌছেই আমরা বিয়ে করি, যদি তাহলে এই  
পালিয়ে আসার কলঙ্ক মুছে বাবে। শুকে বোঝানোর আর সাহস  
যোগানোর জন্যে যুক্তি কিছু কম ছিল না আমার—একটি মেয়ের  
সম্মতি না থাকলে তাকে নিয়ে কেউ পালাতে পারে না। অতএব  
ও সোধী কোথায় ? তাহাড়া আমার সম্পত্তির অধিকারী হোতে বাচ্ছে  
তারই প্রিয়পাত্র—এতে মাকুইস আমাকে শাস্তি তো দেবেনই না বর  
খুশী হবেন। আর তত দিন আমার বহুমূল্য গহনা, হীরে জহরত  
তো আছেই।

দিন এসে গেলো। আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে,  
অব্রহতার ভাব করে পড়ে রইলাম। তারপর ছোটো একটি বাগে  
বিশেষ দরকারী কয়েকটি জিনিষ আর গহনার বাস্কাটি ভরে পুস্তকের  
ছদ্মবেশ পরে বাড়ীর পিছনে চাকরদের সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে  
গেলাম। আশ্চর্য, কেউ আমাকে চিনতে পারলো না। এমন কি  
বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার সময় বেরাঘাটাও চিনলো না। বাবু  
নিশ্চিন্ত। কিছু দূরেই অপেক্ষা করছিলো ও। হুঁজনে মিলে  
জাহাজে গিয়ে উঠলাম—বামি-স্ত্রী পরিচয়ে। কিনা বাথার কেটে  
গেলো বাত্রা করার মুহূর্তটিও। মধ্যরাতের আগে ক্যাপ্টেনেরও  
সেখা মেলেনি। তিনি সকলে এসে আমাকে জানালেন, তাঁর উপর  
আদেশ আছে বেন আমার প্রতি বক্তের কোনো কটী না হয়।  
আমি কীতে জ আল-কে পরিচয় করলাম আমার স্ত্রী হিসাবে।  
ক্যাপ্টেন শুকে সঙ্গত নমস্কার জানালেন।

দিন কাটতে লাগলো।

থেকে ক্যাপ্টেনের কাছে কয়েকটা চিঠি এলো। দেখলাম, একটা চিঠি খুব মন দিয়ে পড়ে আমাকে এক পাশে ডেকে আনলেন। তারপর সন্ধ্যার সঙ্গে জানালেন, ওর উপর হুকুম এসেছে মাকু ইসের কাছে থেকে যে একজন তরুণী পশ্চিমী মহিলা এই জাহাজে আছেন; তাঁকে যেন কোথাও নামতে না দেওয়া হয়। আর তিনি নিজের তাকে নিয়ে সোজা লিসবনে চলে আসেন যেন—এই হুকুমের অস্তিত্ব তাঁর জ্ঞানদণ্ডে দিতে বিধা করবেন না। ক্যাপ্টেন সাহেব আরও সন্ধ্যার সঙ্গে বললেন, এই জাহাজে একমাত্র আমার স্ত্রী ছাড়া অপর কোনো মহিলাও তো নেই—অন্তএব ও যে সত্যিই আমাদেরই স্ত্রী, তার প্রমাণ আমাদের দেখাতে হবে। তা'না হলে আমাদের অমান্ত করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

—“তিনি তো আমাদেরই স্ত্রী, খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বললাম। “কিন্তু প্রমাণ করার মত কোনো কাগজপত্রই তো আমাদের সঙ্গে নেই।”

—“হুম্বিত, অত্যন্ত হুম্বিত। ঠেকে তাহলে আমার সঙ্গে লিসবনেই করে বেতে হবে। কিন্তু আপনি নিশ্চিত থাকুন, যতদূর সম্ভব সম্মানের সঙ্গেই ঠেকে নিয়ে যাওয়া হবে। এটাও মাকু ইসের আদেশ।”

—“কিন্তু ক্যাপ্টেন, স্ত্রী তো, বামারই সহগামিনী?”

—“মানছি, একশো বার মানছি কিন্তু হুকুম যে মানতেই হবে। আপনিও লিসবনে করে বেতে পারেন। চাই কি আমাদের আগেই দেখানো পৌছতে পারেন।”

—“তবে আপনাদের সঙ্গেই বাই না কেন?”

—“সেটা যে হবার নয়। আমার উপর কড়া হুকুম আছে আপনাকে এখানে নামিয়ে দেবার। কিন্তু আমিও ভাবছি, এটা কেমন হোলো যে আপনাকে ইল্যাণ্ডে পৌঁছে দেবার কথা মাকু ইস একবারও আপনার স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেন নি? বাই হোক, মাকু ইস যে তরুমহিলাটির খোঁজ করছেন তিনি যদি আপনার স্ত্রী না হ'ন, তবে তাঁকে লগুনে আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।”

—“আজ্ঞা, ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নিতে পারবো কি?”

—“নিশ্চয়ই, তবে আমার সাধনে।”

কেবিরে গিরে কাউন্ট “প্রিয়তমা পত্নী” সম্বোধন করে সব ঘটনা বললাম—ভর ছিলো পাছে ও উত্তেজিত হয়ে সব কীস করে দেয়—কিন্তু ও ধীরভাবে সব শুনে জানালেন, আমাদের হুকুম না মানা ছাড়া আর গতি নেই—তবে আশা আছে শীগগিরই আবার আমরা মিলবো। ক্যাপ্টেনের সামনে কোনো কথাই বলা গেল না, তবু জানিয়ে দিলাম, লগুনে পৌঁছেই আমি মঠবাসিনী সেই সন্ন্যাসিনীকে চিঠি দেবো—আর ও যেন পৌঁছেই সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা করে। এদিকে আমার গহনার বাজ দামী হীরা, জহরতুন্ড ওর কাছেই রয়ে গেলো। চাইতে পারলাম না পাছে ক্যাপ্টেনের সঙ্গেই হয় যে ওকে নীতিমত ধনিকজ্ঞা দেখে আমি ঠকিয়েছি।

ভাগ্যের পাশে নিজেকে সঁপে দিলাম। বাবার আগে চোখের জলে পরশপকে অভিভূত করে আনিসন করলাম। ক্যাপ্টেনের চোখও শুক ছিল না।

ওকে নিয়ে বাবার পয় আমাকে নামতে হোলো একটি মাত্র ব্যাগ সঙ্গে করে—তাইহেঁ শুধু পুরুষের পোষাক, বই, কাগজ-পত্র, একটি

ভালোয়ার আর একজোড়া পিন্ডল। ক্যাপ্টেন-এর হাঙ্গামা চুকিয়ে একটা সরাইখানার এসে চুকলাম। মালিকের কাছে জানা গেল লগুনে একটা দল আছে, আমি সহজেই সেই দলে ভিড়ে পড়তে পারি। খরচ শুধু একটি ঘোড়ার দাম। মালিকই সেই দলটার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভালোই লাগলো তাঁদের। বাজা শুরু করলাম। কিন্তু পুঁজি তো নিশ্চেষ্ট—তাই দু'এক দিন পরেই আরও সম্ভার একটি আশ্রয়ে উঠলাম। বেশ পরিচ্ছন্ন স্থানর ভিনতলা একটি বাড়ীর একটি ঘর নিলাম। বাড়ীওয়ালী শুধু ভজ নয় মনটিও ভারী নয়। সহজেই বিশ্বাস করতে পারলাম ঠেকে। অল্পরোধ জানালাম আমাকেও মেয়েদের পোষাক কিছু কিনে এনে দিতে—কারণ আর পুরুষের ছদ্মবেশ বাইরে বেরোবার সাহস বা ইচ্ছা হুটোই ছিল না—সবল তখন মাত্র পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা—সামনে অন্ধকার ভবিষ্যৎ। দুদিনের মধ্যেই নিজেকে শেলাম—কঠিন ভাগ্যের মুখোমুখি কাড়িয়ে সফলহীনা একটি তরুণী—বার জানা হোলে গেছে সোজা পথে চলতে গেলে ভয় করলে চলবে না।

দশ শিলিং সম্ভারের ভাড়া। তাও বেশী দিন চালানো সম্ভব হোলো না। তাছাড়া আমার প্রতি লোকদের বিশেষ করে যুবকদের কোঁতুহল একটু বাড়াবাড়ি রকম উগ্র হোতে লাগলো। শেষ অবধি হাটের আটটা বাড়ীর পাশেই এক বুদ্ধকে বেতে দিলাম—সেড' গিনি পাওয়া গেল। বাড়ীওয়ালীও আমার অবস্থা বুঝে আরও সম্ভার একখানা ঘর খোঁজ করছিল। বাইরে খেতে বাবার সম্ভতি ছিল না বলে একটি পরিচারিকাকে জোটাতে হোয়েছিলো—আর সেটাই সবচেয়ে বিরক্তিকর—ভাবতাম, দুনিয়াতত্ত্ব সবাই বুঝি বড় করে আমাকে ঠকাতো চায়। আসলে একটু-আধটু চুরি লোকজন করেই থাকে কিন্তু বার কাছে দৈনিক এক শিলিং-এর বেশী খরচ করা সম্ভব নয়, তার কাছে ওই একটু চুরিও অনেকখানি গায়ে লাগে। বেশী কিছু খাওয়া ছেড়ে দিলাম। শুধু রুটি আর জল। দিনে দিনে শরীরও হোতে লাগলো সীর্ণ থেকে সীর্ণতর। এমন সময়ে একদিন আপনার ওই অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়লো—চোখে পড়লো বিভিন্ন পত্রিকায় আপনার প্রতি কটাক্ষ। “বড়ার বাবে কোথায়?” কোঁতুহল দমন করা সহজ হোলো না—তারপর তো সবই জানা আপনার—হ্যাঁ, ইতিমধ্যে একটা ঘটনা বলা হয়নি। আমি ইল্যাণ্ডে পৌঁছবার দিন তিনেক পরই আমার সন্ন্যাসিনী মাসীকে একটি চিঠি লিখি সব ঘটনা জানিয়ে—আর তার সঙ্গে সকাভর মিনতি জানাই, যাকে মনে মনে আমি বলে বরণ করেছি তাকে রক্ষা করতে, তাকে আশ্রয় দিতে। আরও জানালাম, যত দিন না আমাদের দু'জনার মিলনের পথে সব বাধা সরে যায় তত দিন লিসবনে কিংবো না। চিঠিটা প্যারিস দিয়ে মাদ্রিদে পাঠালাম—হলপথে এটাই সবচেয়ে সোজা রাস্তা। দীর্ঘ তিনটি মাস পরে মাসীর চিঠি শেলাম। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন মহিলাটির পৌছানো খবর মাকু ইসকে দিলে তিনি সোজা আদেশ দেন, তার একটা চিঠি সমেত মহিলাটিকে সন্ন্যাসিনী মাসীর আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিতে। চিঠিটার মাসীকে লিখে জানিয়েছেন যে তাঁর বোনবিকে পাঠানো হোলো, এবার মাসী যেন তাকে ঘরে চাৰি-বন্ধ করে রেখে দেন। সোভাগ্যক্রমে আমার চিঠিটা মাসী আগেই পেয়েছেন। তিনি ওকে নিরাপদে একবারেই ঘরে বসে

রে রাখলেন বাতে কেউ কিছু টেব না পায়। এদিকে মাকু'ইসকে ঠি দিলেন, বাকে পাঠানো হয়েছে সে তাঁর বোনকে নয়, তারই দ্বারশে একটি তরুণ। এখন মাকু'ইস তরুণটিকে এখান থেকে বাবার ব্যবস্থা করলেই ভালো—কারণ আজ্ঞা পূর্ববদের বসবাস বহির্।

ইতিমধ্যে কাউন্টের সঙ্গেও মাসী দেখা করেছেন ও মাসীর পায়েরে কমা চেয়েছে আর আমাদের দু'জনারই জন্মই তিনকা চেয়েছে ব মেহের আজন্মের—আমার সমস্ত হীরা জহরত গহনাগুলিও মাসীর হাতে তুলে দিয়েছে। মাসী ওর সন্তোষ আর স্নেহের ব্যবহারে ব খুশী।

এদিকে মাকু'ইস চিঠি পড়ে নিজেই চলে গেলেন মাসীর কাছে। মাসী তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন যে, আজন্মের সন্মান আর বিব্রতা অনুভব রাখতে হলে এখন একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার, আর সব ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ গোপন থাকা দরকার। কারণ তাঁর নজর মান-সম্মত ও এর উপর নির্ভর করছে। কাউন্ট যে মাসীকে ব গহনাগুলি কিভাবে দিয়েছে তাও জানিয়ে দিলেন। মাকু'ইস ব ঘটনাটাই গোপনে রাখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন—তবে মনি যে একটুও বাগ করেন নি তার প্রমাণ মাসীকে সহাস্ত রিহাসে ওর জিজ্ঞাসা—এমন একটি অপরাধ স্নেহের কান্ডি তরুণকে ব তার সঙ্গীতন করতে পাঠিয়েছিলেন তার জন্তে মাসী নিশ্চয়ই মাকু'ইসকে কমা করবেন। যাই হোক, কাউন্টকে সঙ্গে নিয়ে তখনই উনি চলে গেলেন। তারপর থেকে চিঠি লেখার দিন অবধি মাসী মসর আর কোনো খবরই পাননি। ওদিকে সারা লিসবন ছুড়ে হুটটাই রটেছে যে কাউন্ট লণ্ডনে আর মাকু'ইস আমার প্রতি কানো দুর্বলতার জন্তেই আমাকে লুকিয়ে রেখেছেন! এটাও ঠিক, মাকু'ইস আমার সব খবরাখবর রাখার জন্ত চর নিযুক্ত করেছেন। দার মাসীর কথা মত আমিও তাঁকে লিখেছি যে আমি এখন লিসবনে বেরতে রাজী, যদি উনি কথা দেন যে সাধারণ সঙ্গে সম্পূর্ণ হাইনসঙ্গত ভাবে কাউন্টের সঙ্গে আমার পরিচয় হবে। গা না হলে ইল্যাগেই আমি সারাজীবন কাটা—এখানে আর বাই হোক, যুক্ত স্বাধীন জীবনযাত্রায় পদে পদে আইনের বাধা দাসবে না।

এখন আমি মাকু'ইসের উত্তরের অপেক্ষা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাকু'ইস আমার সঙ্গে রাজী হবেন আর খুশী হয়েই আমার দমত সম্পত্তি কিভাবে দেবেন। বাবার মৃত্যুর খানিকটা কতিপূর্ণ হবে।

—“কি ভাবছো?”

—“কিছু না।”

—“যেটাই কিছু না নয়—ভাবছো যে আমার প্রেমে তুমি মরতে পারো, তাই না?” কিন্তু দিন দিন যে কণ হতে হতে মিলিয়ে বাবার ব্যবস্থা করছো—যা শুকটোছো নিরাশ্রয় চোখ মেলে, এ কি দেখিনি আমি? না, যদি সত্যিই আমাকে খুশী দেখতে চাও তবে বেরিয়ে এসো ঘোড়ার চড়ে—দিন-রাত এই নিঃশব্দ অলস যুদ্ধেগুলোকে কোন মতে পার করে দিলেই কি বাহ্য থাকে?”

—“পলিন, প্রিয়তমা—তোমার কোনো কথাই তো আমি না শুনে পারি না—কিন্তু কির, এসে।”

—“দেখবে আমি কৃতজ্ঞ—দেখবে তোমার আহািরে রুচি—রাতের ঘুম—”

—“বাস্ বাস্—একুশি ঘোড়া সাপ্পাতে বলছি।”

শুভ্র কোমল হাতখানিতে চুম্বনের মুহূর্ণ দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কিংসটনের রাজ্যে। আমাদের দু'জনার পরিচয় আজ নিবিড় বন্ধুত্ব পরিণত—কিন্তু আমার পিপাসিত মনের তৃষ্ণা যে শুধু বন্ধুত্ব তৃপ্ত হতে চায় না—সুক, লুক আকাঙ্ক্ষার ফালা আমার রাতের ঘুম আমার দিনের আনন্দ সব কিছু হরণ করেছে। অথচ পলিন দিনে দিনে ভরে উঠছে অপরাধ মাধুর্যে—কোন অনুরাগ লাভের স্বা-প্রোতে—চিন্তায় বিভোর—দ্রুপে ছিল না আশে-পাশে—হঠাৎ কিসের ধাক্কা? ঘোড়াটা তীব্রবেগে মুখ ধুবড়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে আমিও একবারে শূন্যে লাফিয়ে উঠে সজোরে কুমিল্লিয়া গ্রহণ করলাম। ওঁঠবার ক্ষমতা রইলো না বজায়—সৌভাগ্যক্রমে দেখি, কিংসটনের ডিউকের প্রাসাদের সামনেই পড়েছি। ডিউকের লোকজনের সাহায্যে বাড়ী এলাম গাড়ীতে করে। বাড়ী এসে বিছানায় শুয়েই ডাক্তারকে খবর দিলাম।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন—বেশী রক্ত মচকে গেছে। হাড়-ডাক্তার সবকে আমার আশ্রয় অনুলক। অবশ্য এ-ও জানালেন, হাড় ভাঙলে মন্দ হতো না, তাঁর কৃতিত্ব ফলাবার সুযোগ ঘটত।

এতকণ পলিনের সঙ্গে দেখা না হওয়াতে আশ্চর্য লাগছিলো। শুনলাম ও বাড়ী নেই, কোথায় বেরিয়েছে। প্রায় ঘণ্টা ছই পরে এসে হাজির—গভীর উত্তেজনার সমস্ত মুখখানি রক্তরাঙা—হুটি চোখে অহুতপ্ত বেনদার ছায়া—

আমার পাশে বসে পড়ে বললে—“শুধু আমার জন্তেই তোমার এই দশা, আমার জ্বের ফলেই তোমাকে হাড়ভাঙার নিদারুণ শ্রমণ ভোগ করতে হচ্ছে—”

বলতে বলতে ওর হুটি চোখ ছাপিয়ে বর-বর করে জল পড়তে লাগলো—অশ্রুশোচনা আর সমবেদনা? না আরও কিছু?—দেখলাম, ওর মুখখানি যুত্তের মত বিবর্ণ, মুচ্ছাহতের মত আমার পাশে ঢলে পড়ছিলো—তাড়াতাড়ি গুকে ধরে ফেললাম।

—“করুণাময়ী, শোনো শোনো, অত অধীর হোয়ো না, ডাক্তারি, শুধু মচকানোর ব্যথা—”

—“সর্বস্বকা! উঃ বি-চাকরগুলো কি মিথ্যাই না বলতে পারে? আমাকে কি ভাইই না পাইয়ে দিয়েছিলো! দেখো দেখো, এখনও আমার বুকের ভিতরটা কেমন কাঁপছে।”

—“পারছি—বুঝতে পারছি—আমার সমস্ত অহুতপ্ত দিয়েই পারছি, এই আকস্মিক হৃৎপিণ্ড আমার সারা মন যে জ্বিরে দিলে।”

তবিত ব্যাকুল হুটি অধর দিয়ে ওর বস্ত্রি কোমল হৃৎপিণ্ড হুটি অধর স্পর্শ করতেই অহুতব করলার প্রতীকান, এ যে কী প্রাপ্তি, এ যে কী পরম প্রাপ্তি, আমার সমস্ত অশু-পরমায় বহুত হয়ে উঠলো নিবিড় পুলকে।

হাসছে পলিন।

—“হাসছো যে? কেন হাসছো বলতেই হবে।”

—“প্রেমের এই চকিত ছলনার, বা সব সময় জরী হয়। জানো, আমি সেই বুড়োটার কাছে গিয়েছিলাম আমার আঙুটি কিভাবে



আমতে। ওটা তোমাকে দেখো, আমার ওই ছোট চিহ্নটি সাগরজীবন তোমার কাছে থাকবে—

—“পলিন—পলিন, আমার মনটাকে তুমি কি ভাবে বলা হে ? শোনো, ‘সোনার ঢেয়ে সোনামুখের ঢেয়ে বেশী দাম বুঝবে শে’—তাই না তোমার তুচ্ছ জ্বরং—তোমার প্রেম ঢেয়ে বেশী দামী।”

—“আচ্ছা গো আচ্ছা ! আর যদি দুটাই পাও ? শোনো, এখন থেকে আমার বসন্ত দিন না ডাক আসে তত দিন আমার হৃদয়ে থাকবে মধুচন্দ্র-উৎসবমণ্ড দম্পতির মত, কেমন ? শোনো, তুমি নড়বে না এই বিছানা থেকে—আমাদের খাবার এইখানেই দেবে। জানো, এই ক’দিন পাশাপাশি থেকে গোপন প্রেমের স্বপ্ন আমিও কান্ড হোয়ে উঠেছিলাম। আমি আজ ভোরে মনে মনে ডেবেছিলাম ভেঙে দেবো এই হলনার লুকাচুরি, নিবেদন করবো আপনাকে তোমার ব্যগ্র-বাকুল বাহুবন্ধনে। বতরুণ না সেই ‘কাল’ পত্র আসে আমাদের বিচ্ছেদের স্থানা জানিয়ে ততক্ষণ আমি থাকবো তোমার পাশে—”

—“সেই পত্রবাহক রাস্তার চৌর-ডাকাতের হাতেও পড়তে পারে !”

—“অত সৌভাগ্য আমাদের বরাতে নেই প্রিয়তম !” চুপ করে চেয়ে থাকি পলিনের মুখের দিকে।

পশ্চিমালয়ের সেরা সুন্দরী—কোন বনেন্দী, সজ্জাত, অভিজাত পরিবারের শেষ প্রতীক—আজ প্রেমের মাধ্যমে অঙ্গলি পূর্ণ করে আমার পাশে এসে ঝাঁড়িয়েছে—কটি মুহূর্ত ভরে দিতে রঙে-রসে, ছন্দে-স্বরে—তার পর মিলিয়ে যাবে এই চকিত বিদ্যুৎঝেবা মনের প্রান্ত ভরে দিয়ে ঘন কালো মেঘে—

নিশ্চয় বনেন্দীর মন ভরে উঠে।

এই বাড়ীটা ছাড়বো না টিক করে ফেললাম। অন্ততঃ বসন্ত দিন পলিন এখানে আছে। ও সহজে বাড়ী থেকে বেরোতো না, এক রবিবার উপাসনার বাওয়া ছাড়া। ওর মনটা ছিলো ভারী ধর্মপ্রবণ কিন্তু স্বাধীন চিন্তাও ওরোগতো।

আমি সোজা হুকুম দিয়েছিলাম আমার সঙ্গে কেউ যেন দেখা করতো না আসে—আমার বাড়ীতে কেউ যেন না ঢোকে। এমন কি ডাক্তার অবধি নয়। সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি, আমি এখন সম্পূর্ণ স্বস্থ। আমাকে দেখতে আসার বা খোজ-খবর নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি চেয়েছিলাম আমাদের হৃদয়নার এই ক্ষণ-স্বর্গে একটিও বিচ্ছেদের মুহূর্ত যেন না আসে।

মার্ডিনলীকে লিখেছিলাম, লণ্ডনের সেরা কুস্ত্র প্রতিভূতি শিল্পীকে পাঠাবার জন্তে। একজন ইহুদী শিল্পীকে ও পাঠিয়েছিলাম। ছুটি ভারী চমৎকার প্রতিভূতি শিল্পীকে পাঠাবার জন্তে। একজন ইহুদী শিল্পীকে ও পাঠিয়েছিলাম। ছুটি ভারী চমৎকার প্রতিভূতি শিল্পী একেছিলাম। অল্পত সাপুত এনেছিলাম—একবারে নিখুঁত বলা চলে। আমার প্রতিভূতিটি একটি আটের উপর বাঁধিয়ে পলিনকে উপহার দিলাম। এই একটি মাত্র উপহার পলিন আমার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলো। দিনের ক্ষণ দিন চলে গেলো।

প্রতিটি দিন ভরে দিয়ে নব নব স্তম্ভরস—প্রতিটি দিন আমি পেতাম আমার প্রিয়াকে নতুন রূপে—নতুন রহস্যে। আমাদের সারা দিন-রাত যেন একটি বীশার বন্ধার—পলিন এক এক দিন অকুট ওজনে জানাতো—“কি জানি মিসকর থেকে হয়তো ডাক

কোনো দিনই আগবে না—কোনো দিনই এসে পৌঁছবে না সেই চিঠি।’ স্বপ্নে স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভবিষ্যতের করুণা নিয়ে ভাল বৃনতাম হৃদয়ে বসে। কাউন্টের কথা পলিনের শুধু স্মৃতিতেই ছিলো—মন থেকে হৃদে নির্বাসিত হয়েছিল তার। তাই ও বলতো, শুধু স্বপ্নের স্বপ্নের প্রভাবেই নারীর মন এমন মুগ্ধ কি করে হয় ও বুঝতে পারে না—কখনো বলতো,—“আমার মনে এই বাইরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হোয়ে যে মিলন তাইতে প্রায়ই স্বথ আসে না—রূপহারী আনন্দের পর নেণাভাতার আলো থাকে শুধু—”

কিন্তু অবশেষে এলো সেই একলা-বাহিত পদধানি। নিবিড় কালো বিচ্ছেদের রেখা আমাদের মাঝখানে টেনে দিয়ে। এমন ভাবে সেখা চিঠিখানি যে ফিরে যাবার সুবন্ধে কোনো দাম্পত্য কোনো প্রতিবন্ধকতাই টিকতে পারে না। দু’খানি চিঠি—একটি মাসের কাছ থেকে আর একটি মাসের। মাসের জানিয়েছেন, বসন্ত শীত সপ্তর ফিরে যেতে জলপথে বা স্থলপথে। আর সেখানে পৌঁছালে তাকে তার সমস্ত শৈল্পিক সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে—আর তাদের সম্পূর্ণ আইনসম্মত, লোকচান সম্মত বিবাহ উৎসবের অহুতানে কোনো ক্রটিই ঘটবে না। মাসের তাকে প্রকৃত ডায়েনের মর্যাদায় আর স্বচ্ছন্দে ভ্রমণের জন্তে দু’হাজার পাউণ্ড ঠাকি পাঠিয়েছেন। কিন্তু পলিনের বিনিয়াদী মন মাসের এই টাকা পাঠানোতে কিছু ক্ষুদ্র আর বিরক্ত দেখলাম, ‘উনি কি ভাবেন আমি অর্থকষ্টে পড়েছি ?’

পলিন ধনী—পলিন উদার। যখন সত্যিই অর্থাতারে ছিলো, তখনও ওর আঁটিটা আমাকে উপহার দেওয়া থেকেই বোঝা যায়। ওর ভরণ-পোষণের সব ভার আমার উপর দিতে ও লক্ষিত কৃতি ছিলো তাই। যদিও ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো আমি ওকে কোনো দিনই ঠকাবো না।

বিদায়ের মুহূর্তটি যখন স্থির হোয়ে যায় তখন কি করুণ-মধুর শ্রান্ত দিনগুলি কাটে। নিবিড় করে কাছে পেয়ে নিশ্চেষ্ট করে বিলিয়ে দেবার ব্যাঘ্য সমস্ত মন ভাগ্যক্রান্ত। হৃদয়ে বসে থাকি মুগ্ধমুগ্ধ, সব বলা যেন শেষ হোয়ে গেছে ; কিছু চাওয়া কিছু পাওয়া যেন বাকী নেই। খেতে বসে হৃদয়ে আনমনে উঠে আসি, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শব্দার আশ্রয়ে হৃদয়নার কাঁটে বিন্দ্র রজনী

যাবার দিন এলো। আমি ডোজার অবধি ওর সঙ্গে গেলাম। ১২ই আগষ্ট ও যাত্রা করলো। সঙ্গে দিলাম আমার বিনিয়াদী ক্রয়্যারমতকে। মাস্ট্রিণ অবধি পৌঁছে নিচে পলিনকে। যাবার আগে ওর শেষ কথা—

‘একটি মিনিট রেখো। আমি না ডাকলে কখনো লিগবনে এসো না। না—কোনো কারণ দেখানোর প্রয়োজন আছে কি ? তুমি বুঝবে আমার মনকে অশান্ত, বিকৃত করে তুলো না। অপর্যাপ্ত চকল মনে সব কিছু করা যায় কিন্তু তুমি তে। আমাকে ভালোবাসো তুমি কি চাইবে আমার মান, সধম, স্তায়নিষ্ঠা সব জানিয়ে দেবার একমাত্র কারণ হোতো ? আমি কি স্থির করেছি জানো ? দিনব্যত মনকে বোঝাবো আমার স্বামী ছিলো তুমি, হৃদয়নার মিলিত দিন কেটে গেছে, আজ আমি বিধবা, আমি লিগবন বাড়ি জিটী বায় বিবাহের জন্তে।’



কোথার—কোথার যেন একটা ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে এই হুটি বিচ্ছেদে—আমার জীবনের হুটি মধ্যাহ্নিক বিচ্ছেদে। যা আমার সমস্ত সত্যকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিয়ে গেছে, যার গভীর কত সারা জীবনের অশ্রুসিকনে ও মিলিয়ে যারনি।

একটি পনেরো বছর আগে হেনরিয়েটার বিদায়ের দিন আর একটি আজ। আশ্চর্য্য! এই হুটি নারীর চরিত্রে কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! শুধু শিকার সাধনা একজনকে আরও বিকশিত হাতোচ্ছল, আরও স্তম্ভসম্পন্ন! আরও স্ফোরিত করে তুলেছে অপরাধ চেয়ে। পলিনের ছিল আভিজাত্যের গর্ব, ও আরও গম্ভীর, আরও ধ্বংসপ্রবণ কিন্তু হেনরিয়েটার চেয়ে বেশী আবেগবহী। এই হুটি নারীই আমার জীবন ভরে দিয়েছে স্বপ্ন-রস-ধারায়।

কালের প্রলেপে মিলিয়ে গেছে দু'জনই, যেমন সব কিছু মিলিয়ে যায়। কিন্তু বিশ্বস্তির আবরণও তো মাঝে মাঝে সরে যায়, তখন দেখি হেনরিয়েটার হাসিভরা মধুর মুখখানিই উজ্জলতর হোয়ে ফুটে উঠেছে মনের পাটে। কেন তা আজ বুঝি। যেদিন হেনরিয়েটাকে পেয়েছিলাম সেদিন ছিলাম বাটশ বছরের তরুণ, ছিলো স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্ন রচনার বয়স। আর পলিন এসেছিলো দীর্ঘদিনের বহুরের অভিজ্ঞ, চিয়ারবুজিসম্পন্ন একটি মনের কাছে, আজ বেশ বৃদ্ধে পাবি বয়সের ছাপ কেমন করে মনের মধ্যে বিচারের পাঁড়িপাড়া কুলিয়ে তার অকারণ পুলকের গতিরোধ করে।

ফিরে এলাম লগুনে। সমস্ত বাত্রি গভীর অবদানে কাটলো। ভোরবেলা আমার ছোকরা চাকর জারবি ঘরে ঢুকলো পরম চকোলেটের গ্রাস হাতে করে।

—“আপনার পরিচায়িকা জানতে চায় সেই বিজ্ঞাপনটা আবার কুলিয়ে নিতে হবে কি না?”

—“শরতানী! ও কথা বললে আমি ওকে খুন করে ফেলবো।”

—“রাগ করবেন না, ও আপনার ভারী অমুগত। আপনাকে এমন কাতর ভাবে বুঝে পড়তে দেখেই ও জিজ্ঞাসা করছিলেন।”

—“দূর হও! আর বলে রাখছি এ সম্বন্ধে কথা বলা তো দূর, মনেও স্থান দেবে না তোমরা!”

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বার্লিন।

লগুন থেকে বার্লিনে চলে এলাম। ক'টা দিনের মাঝে কিছু ঘটনা কিছু বৈচিত্র্য ছিলো বৈ কি। কিন্তু সে কথা থাক। বার্লিনে প্রথম দিন পৌছেই দেখা করলাম লর্ড মার্শালের সঙ্গে—ভাইয়ের মৃত্যুর পর উনিই এখন লর্ড হেইস। ঠেকে শেষ দেখেছিলাম লগুনে—স্টল্যাণ্ড থেকে ফিরছিলেন—সেখানে ওর সম্পত্তি পুনরধিকারের লব্ধে গিয়েছিলেন। অবশ্য সেটাও সত্ত্ব হোয়েছিলো রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের ক্ষেত্রেই।

এই ব্যতিকথা সেবার সময় উনি বার্লিনে প্রচুর আয়াসে আরামে রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের পরম প্রিয়পাত্র হোয়ে দিন কাটাচ্ছেন। যদিও রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন না। কারণ সে সময় ওর বয়স আশীর উপর। কিন্তু ওর সরল মধুর প্রকৃতির একটুই পরিবর্তন হয়নি। উনি সারদে আমাকে আছান

—“কিন্তু রাজনীতি থাকার লক্ষ্যে অহুঁরোধে জানাসেন।

আমি বললাম, বহুক্ষেপে থাকতে পারি যদি রাজ-অহুঁরোধে একটি মনোমত কাজ পাই। কিন্তু আমার হোয়ে রাজার কাছে সুপারিশের লক্ষ অহুঁরোধ করতে উনি বললেন, তাইতে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশী হবে।

—“রাজার দাবী যে কোনো লোকের চেয়ে মানুষ জেনার ক্রমতা তাঁর অনেক বেশী। নিজেই তিনি যাচাই করে নিতে ভালোবাসেন। কখনও কখনও যার মধ্যে কেউ কিছুই দেখতে পায় না, তার মধ্যেও অনেক প্রতিভার আবিষ্কার করেন, কখনও ঠিক তার উল্টোটাই ঘটে”—

উনি আমাকে সোজা হুজি রাজার কাছে চিঠি লিখতে বললেন,—“অবশ্য যখন লিখবে তখন আমার সঙ্গে যে তোমার পরিচয় আছে সে কথাও উল্লেখ করতে পারো। তাহলেই রাজা আমাকে তোমার সব্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন—আর বলতে হোলো আমি যে তোমার সব্বন্ধে ভালো ভালো কথাই বলবো, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো”—

—“কিন্তু, মহাশয়, আমি লিখবো সোজা রাজার কাছে—আমার কোনো পরিচয়ই তো তাঁর জানা নেই? আমি তো ভাবতেই পারছি না লেখার কথা?”

—“কিন্তু তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাও—কেমন না?”

—“নিশ্চয়ই।”

—“তাই-ই যথেষ্ট, তোমার চিঠিতে ওই ইচ্ছাটাই প্রকাশ করলেই হবে।”

—“রাজা উত্তর দেবেন?”

—“কোনো সম্বন্ধ নেই তাইতে। কারণ সবার চিঠির উনি উত্তর দেন। উনি জানিয়ে দেবেন কখন কোথার তোমার সঙ্গে ওর দেখা করার সুবিধা হবে। আমার কথা শুনে চলো—আর বা কিছু হবে আমাকে জানিও”—

ওর কথা মতই সানসিগা ভাষায় সলজভাবে একটি চিঠি লিখে পাঠালাম। মাত্র একদিন বাণেই ফ্রেডারিকের সেই করা উত্তর এলো—আমার চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে আর জানিয়ে বেলা চারটার সময় সানসিগি কোয়ারে রাজার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হোতে পারে।

আমার আনন্দ তখন কল্পনাভীত। উন্মাহের চোটে নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগেই গিয়ে হাজির। খুব সাদামাটা একটা কালো রঙের পোশাক পরে। ভিতরে চুকে কাজকেই দেখতে পেলাম না। একজন প্রহরী, শাস্ত্রী অবধি না। ছোটো একটা সিঁড়ি দেখে সোজা উঠে গেলাম, সামনেই খোলা দরজা—চুকে পড়ে দেখি চিত্রশালা। একজন লোক এগিয়ে এসে আমাকে সগ্রহগুলি দেখাবেন কি না, জানতে চাইলেন।

—“আমি এখানে শির-সগ্রহ দেখতে আসিনি। এসেছি রাজার দর্শনার্থী হয়ে—তিনি যে জানিয়েছিলেন বাগানেই থাকবেন”—

—“ঠিক এই মুহূর্তে তো তিনি কল্যাণ-এ বাসী বাজছেন। আহা! তাই তাঁর অবসর বিনোদনের রীতি। নোজই তাই করেন। আচ্ছা, কোনো সময় ঠিক করে দিয়েছিলেন কি?”

—“হ্যাঁ, চারটার সময়—হরতো ভুলে গেছেন তাহলে।”

—“তিনি কখনোই ভালেন না। বড়ির কীটা ঘরে ঠুঁর কাছ—আপনি বক বাসানেই অপেক্ষা করুন”—

বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা করতে হোলো না—দেখলাম উনি আসছেন। সঙ্গে সেজেটারী আর একটা চমৎকার স্প্যানিয়েল কুকুর। বেই আমাদের দেখতে পেলেন অমনি আমার নাম ধরে ডাকলেন মাথার বিশিষ্ট পুরানো টুপীটা খুলে নিয়ে। কি জলদস্যুর স্বর! ঠিক এমনটাই আমি চেয়েছিলাম।

নিশ্চয়ই চেয়ে রইলাম।

—“কি! কথা বলতে পারেন না আপনি? আপনিই না আমাকে লিখেছিলেন?”

—“হ্যাঁ, কিন্তু কিছুই মনে করতে পারছি না, কি বলবো? আমি ভাবতে পারিনি রাজার—আমার সমস্ত অমূল্যত্ব এমন করে আচ্ছন্ন করে দেবে। আমি ভবিষ্যতে বরাবর প্রস্তুত হোয়েই আসবো। লর্ড মার্শালের আমাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিলো—”

—“ওহো, উনি আপনাকে চেনেন নাকি? আছেন বেড়াতে বেড়াতে কথা হবে। কি বলতে চেয়েছিলেন আমাকে? আচ্ছা এই বাগানটা কেমন লাগছে বলুন তো?”

ওঁর বাগানের সবচেয়ে মতামত জানতে চাইলেন। বলা উচিত ছিলো এ সবচেয়ে কোনো ধারণাই আমার নেই। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই অজ্ঞতা প্রকাশ! বা’ থাকে বরাতে বলে সোজা বললাম—“চমৎকার!”

—“কিন্তু ভাসাই-এর বাগান এর চেয়ে অনেক সুন্দর!”

—“তা’ ঠিক কিন্তু সেটা শুধু অজ্ঞতার ফোয়ারার জন্তে।”

—“সত্যিই তাই; কিন্তু এখানেও আমার ক্রটি নেই কিছু। জলই নেই এখানে—তিনশ’ হাজার ক্রাউন খরচ করেছি কিছুই হয়নি।”

—“তিনশ’—হাজার ক্রাউন! যদি এত খরচ করা হোয়ে থাকে তবে জল তো প্রচুর পরিমাণে ওঁর কথা—”

—“ওহো! আপনি দেখছি জলের কারিগরীতে বিশেষজ্ঞ!”

বলা উচিত কি ভুল দেখছেন? অসম্ভবত্ব করা তো মোটেই সমীচীন নয়। তাই চুপচাপ মাথা হেঁট করে রইলাম—যে অর্থে হ্যাঁ, না, হুই-ই বোঝায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এবার উনি প্রশংসা চেয়ে গেলেন। তারপর বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তেনিসের নোশক্তি আর সৈন্তসংখ্যা কত? ধাতুই হোলো আমি।

—“বিশিষ্ট যুদ্ধজাহাজ আর বহুসংখ্যক নৌকা।”

—“আর স্থলপথ?”

—“সত্তর হাজার সৈন্ত। সবাই রাষ্ট্রের প্রজা। সৈনিক থেকে হিসাব করতে গেলে গ্রাম-পিছু একজন সৈনিক—”

—“না আপনার উক্তি ভ্রান্ত। মনে হয় আবারও গল্পে আমাকে ভোলাতে চান। তার চেয়ে আপনারদের করপ্রথা সম্বন্ধে বলুন।”

রাজা-রাজড়ার সঙ্গে এভাবে কথাপকথন আমার এই প্রথম। ওঁর বলার ধরণ হঠাৎ প্রশংসাত্মক হলে বাওরা, এসব দেখে নিজেকে মনে হচ্ছিল যেন আমি কোনো ইতালীয় নাটকের অভিনয় করছি—যেখানে একটা কথা ভুল হোয়ে গেলেই দর্শকদের নিষ্ঠুর টিককারী স্বর হবে। বাই হোক, আমি বললাম, করপ্রথার পুঁথিপত্র জানেন সঙ্গেই আমি পরিচিতি।

—“তাই-ই আমি চাই।”

—“তিন রকম কর আছে। একটি ধর্মসাম্রাজ্য, একটি দুর্ভাগ্যক্রমে অভ্যন্তরীণ রাজ্য আর একটি নিঃসংশয় ভাষা। প্রথমটি রাজ্যের বিতরণী যুদ্ধের, তৃতীয়টি জনপ্রিয় কর।”

—“বেশ, বেশ কিন্তু রাজ্যের ধর্মসাম্রাজ্য বলার অর্থ কি?”

—“প্রজার তহবিল শূন্য করেই তো রাজার কোবাগার পূর্ণ হয়। তাছাড়া এতে মুদ্রা চালু থাকতে না পারায় ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হোয়ে রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে।”

—“তবু যুদ্ধেরকে তো প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করছেন?”

—“দুর্ভাগ্যক্রমে প্রয়োজনীয়—কারণ যুদ্ধ যে সর্বনাশা আত্মহত্যার প্রকৃতি তো রাখতেই হবে—আর তৃতীয় করটির জনপ্রিয়তার কারণ, সেটি জনকল্যাণেই ব্যয়িত হয়, প্রয়োজনীয় জলসেচ, প্রাণী খনন, বিজ্ঞানচর্চা, শিল্পচর্চা প্রভৃতি বিভিন্ন হিতকর কাজে—”

—“হ্যাঁ এ কথাগুলি ঠিকই। আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই কালসাবিগিকে চেনেন?”

—“নিশ্চয়ই! আমার একসঙ্গেই তো ‘জেনোস’ লটারী প্রতিষ্ঠা করি—প্রায় সাত বছর আগে পারিসেতে—”

—“কি জানি আপনারদের ঐ ‘জেনোস’ লটারীটা আমার একটুও ভালো লাগেনি। মনে হয় শ্রেফ জুয়া ছাড়া কিছু নয়। ক্ষিতবার স্থির নিশ্চয়তা জানলেও আমি কখনও গুতে যোগ দিতাম না।”

—“ঠিকই বলেছেন। কারণ, জনসাধারণ কখনোই লটারীর পিছনে ছুটতো না যদি না তার আড়ালে ওই ভুয়া নিরাপত্তার লোভটি থাকতো।”

হঠাৎ কথা পালাটের রাজা আমার দিকে চেয়ে বললেন,—“আচ্ছা, আপনি যে অত্যন্ত সুপুঙ্খ, সেকথা আপনি জানেন?”

—“এ-ও কি সম্ভব যে একজন বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার পর আপনি আমার মধ্যে সব গুণ ছেড়ে শুধু ওই তুচ্ছ রূপটুকুই দেখলেন, যেটা শুধু আপনার নেহেরকী নির্কারণেই প্রয়োজন!”

হেসে ফেললেন রাজা—পরক্ষণেই বললেন,—“লর্ড কেইথ তো চেনেন আপনাকে। আমি তাঁর সঙ্গে আপনার বিষয়ে কথা বলবো।”

টুপীটা মাথা থেকে খুলে নিলেন—বুঝলাম বিষয়ের ইঙ্গিত। সম্ভব অভিব্যক্তি জানিয়ে বিদায় নিলাম।

তিন-চার দিন পরে লর্ড মার্শাল আমাকে ডেকে পাঠিয়ে জানালেন, রাজা খুব খুশী আমার সঙ্গে সেদিনের পরিচয়, আর আমার জন্তে কাজের চেষ্টাও করবেন, বলেছেন। খুব উৎসাহ হোয়ে রইলাম, কোন কাজের জন্ত ডাক আসে—কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নাই।

এই মুহূর্তকা সেখান সময়তেই রাজা ফ্রেডারিকের যৌন ডাউস অব ব্রালউইক সন্তান এসেছিলেন রাজার কাছে। পরের বছরই ফ্রান্সিসের যুবরাজ ওঁর কস্তার পাণিগ্রহণ করেন। ওঁদের আগমন উপলক্ষে রাজা একটি ইতালীয় অপেরা অনুষ্ঠানের আদেশ দেন। সেখানে সেই উৎসবে রাজাকে আবার দেখলাম—কালো গোবাক, প্রতিটি সেলাইএর উপর সোনার কাজ, কালো সিকের মোটা—সব জড়িয়ে কেমন একটা হাতকর ধর্মি—যেন অভিনয়ের ঠাকুরা—প্রতাপশালী সম্রাট নয়। এক বলসে লম্বা টুপী আর এক হাতে সোনের হাতটী ধরে ঈশ্বরকে প্রণাম করছেন। প্রত্যেকেরই নির্দোষ

হোয়ে চোরে বইলো ঠর সিকে—এক বুদ্ধর ভিন্ন রাজকে ইউনিফর্ম ছাড়া অস্ত্র কিছু কখনও পরতে দেখেছে কি না স্বরণেও আনতে পারে না।

রাজার প্রাসাদ দেখেছি—তাই দেখেছি সেখানে অস্ত্রাস্ত্র বিরাট মুসজ্জিত কক্ষগুলির সঙ্গে রাজার নিজস্ব শয়নকক্ষটির কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! ছোট্টা একটি ঘর—একধারে পক্ষীর আড়াল দেওয়া অতি সাধারণ ছোট্টা একটি বিছানা। কোনো পাছকা, কোনো বস্ত্রবাস কিছুই নাই, একটি পুরানো বাত্রে পরার টুপি ছাড়া। শীতের সময় ওই টুপিটির উপরই তিনি ঠর বাইরের টুপিটি পরেন। ঘরের একধারে একটি সোফা, তার সামনে একটি টেবিল—কাগজ কলম আর লেখাতদানীতে সুপারিত, আধপাড়া অবস্থার খাতাও কয়েকটি দেখলাম। ওই ঘরখানির পরিচরক জানালে—ওই কাগজপত্র আর খাতাগুলিতে গত বছরের ইতিহাস লেখা আছে। আকস্মিক ভাবে কয়েকটি খাতা পড়ে যায়। সম্প্রতি রাজা আর লিখছেন না—তার পবে বোধ হয় অসমাপ্ত লেখাটা আবার ধরেছিলেন। কারণ, তাঁর মৃত্যুর ঠিক পবেই ওটি প্রকাশিত হয়।

পাঁচ-ছয় সপ্তাহ কেটে যাবার পর লর্ড কেইথ জানালেন যে, রাজা আমাকে একটি অফিসারের পদে নিযুক্ত করেছেন—সেটি হোলো পমিরেনিয়ান ক্যাডেটদের দলপতি বা শিক্ষক—সম্প্রতি এই ক্যাডেট দলটি খেলা হোয়েছে। সাধারণ মাত্র পনেরো জন ক্যাডেট—দলপতি পাঁচ জন, প্রত্যেকের অধানে তিন জন ক্যাডেট। আর পারিশ্রমিক ছ'শো ক্রাউ—আহার, ক্যাডেটদের সঙ্গে একই টেবিলে। আর কাজটা? ক্যাডেটদের সঙ্গে সর্বত্রই থাকা; এমন কি রাজসভাতেও অবগত তখন কিতাটিতে বাধা ইউনিফর্ম পরতে হবে। আমাকে এখন মনস্থির করে কেসেতে বলা হোয়েছে কাজটা নেওয়া স্বত্ব। কারণ বাকী চার জন দলপতি অথবা শিক্ষক নিযুক্ত করা হোয়ে গেছে। আমি লর্ড কেইথকে জানালাম, পরদিন নিশ্চয়ই আমি মতামত জানাবো, আজকের দিনটা চিন্তা করে নিয়ে।

কি অসীম প্রচেষ্টায় প্রবল হাত দমন করে বাড়ী ফিরে এলাম, সে আমিই জানি। কিন্তু আরও বেশী অবাক হোলাম শুনে এই পনেরো জন পমিরেনিয়ান রীতিমত ধনী আর অভিজাত কন্যার। তিনটি বিরাট হলঘর আসবাবপত্র শুল্ক এবং কয়েকটি

ছোটো ছোটো সাদা চুপকাম করা শোবার ঘর—শব্দা আর শব্দাধার দুইই শোচনীয়! একটা কাঠের টেবিল আর ছুটি চেয়ার, বাস! ক্যাডেটরা জোর বারো-তেরো বছর বয়সের হবে। টাইট শোবার, স্ক্রু চুল ছোটো করে ছাঁটা, বিশি বোকা-বোকা ভাব আর যন্ত্রের মত ভঙ্গী। তাদের শিক্ষকের তো প্রথমে ভূতাত্ত্বিকগণেই কেলেহিসাম—পরিচয় পাবার আগে।

পরদিন সোজা লর্ড কেইথের কাছে গিয়ে সবিস্তারে সব জানালাম—আর সবিনয় নিবেদন করলাম আমার অক্ষমতা। লর্ড কেইথ হাসলেন, শুনে আর স্বীকারও করলেন এ কাজ না নেওয়াই ঠিক। তবে বার্লিন ছেড়ে যাবার আগে রাজাকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে যাওয়া উচিত, সে উপদেশও দিলেন। উপদেশ মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হোলো। ফিরে এসে যাত্রার আয়োজন শুরু করলাম। মন তখন স্থিরই করেছি রাশিয়া যাবার জন্তে। ম্যাসিয়ে দ্য ভাগানাকে চিঠি দিলাম পিটার্সবুর্গের ব্যাঙ্ক জানাতে—যাতে আমাকে প্রতি মাসে খরচ চালাবার মত অর্থ দেওয়া হয়। একটি ভৃত্যও জুটে গিয়েছিলো নাম ল্যাঘার্ট। যাবার আগে আবার গেলাম রাজসকাশে—অত্যন্ত পরিচিতির মতই এগিয়ে এলেন রাজা, প্রশ্ন করলেন পিটার্সবুর্গ যাত্রা করছি কবে?

—“পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই—যদি অনুমতি করেন—”

—“বেশ বেশ—মঙ্গল হোক,—কিন্তু সেখানে কি করবেন কিছু ঠিক করেছেন? তাছাড়া ওখানের রাগীর কাছে কোনো পরিচয়-পত্র সঙ্গে নিয়েছেন?”

—“কিছু না, শুধু এক জন ব্যাঙ্কারের কাছে একটি পরিচিতি-পত্র আছে আমার।”

—“ওটাই আসল দরকার। আজ্ঞা ফেরার পথে যদি এখন হোয় যান তবে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, রাশিয়ার খবর শুনবো।” বিদায়!

—“বিদায়!”

দুই শত ড্রাকট সঙ্গে নিয়ে বার্লিন থেকে রওনা হোলাম।

[ক্রমশঃ]

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

## দৃষ্টিহীন

(John Milton এর On His Blindness)

হায় কেন এই অকালে আঁধার নেমে  
এলো নয়নের মাঝে, বাণীহারা ভাষা,  
ক্লান্তিভার হোলো অপমৃত্যু, এ জনমে  
বা ছিল মোর সেবাস্বীকৃত। তবুও তো আশা  
জ্যেগে রহে বুকে কহিতে কাহিনী আপন  
কবিতার গানে, ডরে মরি পাছে মোর

অক্ষমতা জানে দেবতা বিরূপ হন;  
প্রশ্ন করি, “সেবা যদি চাও হে ঈশ্বর,  
দৃষ্টি তবে কেন নিলে হরে?” হেনকালে  
শুনি, ধৈর্যের আশ্বাস বাণী, “যে রাজার  
আদেশ পরে নিখিল বিশ্ব ছুটে বলে,  
তুচ্ছ সেবা তাঁর কাছে ক্ষুদ্র মানবের।

যে সঙ্গে নীরবে তাঁর আঘাত বেদনা  
শ্রেষ্ঠ তারি পূজা সার্থক তার সাধনা।”

—অনুবাদ : তপতী চক্রবর্তী

ପ ଥୁ ଓ ପା

আণ্ডতোষ মুখোপাধ্যায়

39

শো'কের বাড়ী থেকে শব্দই অপসারণের পরেও যেমন মৃত্যুর চিহ্ন ছড়িয়ে থাকে, তদ্বের পরে গোটা মড়াইয়ের সেই অবস্থা। সমস্ত প্রাকৃতিক স্থাবরতার একেবারে গোড়ায় নাড়া পড়েছে যেন। পাথরে আর গাছপালায় মড়াই ছেয়ে গেছে। বাস্তব অবস্থাও তাই। এতদিনে ওপারের কুলি-বসতির পাকা ব্যবস্থা সম্বন্ধেও যে ক'টা তাঁবু ছিল, মাটি নিয়েছে। তবে লোকজনের খবর কিছু কানে আসেনি। সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে উঠে থাকবে সাময়িক অববোধের ও-ধারে মড়াইয়ের লাল জ্বলে গৃহস্থঘরের আটচালা ভাসছে অনেকগুলো। আর গাছের ভাঙা ভাল। মড়াইয়ের গৈরিক-যৌবনে যেন কলঙ্গ লেগেছে।

সম্পূর্ণ দিন কেটে গেল রাস্তা পরিষ্কার করে, মড়াইয়ের গহ্বর থেকে পাথর আর গাধালা 'দসিয়ে মোটা মুটে কাজের ব্যবস্থায় কিনে আসতে।' তার পরের দিন বিধাতা যেন রূপণ হাতে আলোড়ন পাঠিয়ে একটু, যিট্ট বোন চিকচিকিয়ে উঠল। সকাল থেকে কাজের তাড়া লাগল মড়াইয়ে।

তারপরই অপ্রত্যাশিত আলোড়ন আবার একটা। দূর থেকে, ওই দূর থেকে খবরটা কানাকানি হয়ে এমিকে পাগল সর্দারের কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে সময় লাগল না খুব। কোদাল শাবল গাঁইতি ফেলে পায়ে পায়ে লোক চলল সেদিকে। ওই দূরে, যেদিকে পাহাড় ঘেঁষে মড়াই বেঁকে গেছে সম্পূর্ণ। যেদিকে আকাশে শকুনি উড়ছে অনেকগুলো সেদিকে। কোঁতুহল আর চাপা উত্তেজনা। ক্রমশ বাড়তে লাগল সেটা। কাজ শুরু হবার আগেই কাজে ছেদ পড়ল আবার।

আর উদ্ভেজনার একেবারে বসে পড়েছে পাগল সদাঁর।  
 স্বভাবীরদের অনেকে দৌড়ে এসেছে ওর কাছে। নিজেদের ভাবার  
 বলাবলি করেছে কি। তারপর আবার ছুটেছে।

আনন্দে গড়াগড়ি করতে ইচ্ছে বাচ্ছে পাগল সর্দারের। ঠিকমত চেনা বাচ্ছে না বলে খটকা লাগছে জনের মনে ? কিন্তু না দেখেও এতটুকু সংশয় নেই পাগল সর্দারের। সে নিঃসন্দেহে বলে দিতে পারে কোঁটা কে। বলে দিতে পারে ঝড়ে পাথর নড়ে কার বিকৃত শব্দ মড়াইয়ে গড়িয়েছে। শব্দ নয় ঠিক, শব্দ হলে সকলে চিনতে পারত।

ককালো পরিণত হয়েছে প্রায়। কিন্তু পাগল সদায় ঠিক বুঝেছে।  
না দেখেও জানেছে। তোরাও চিনবি। হাত হীরের আঙঠি নেই  
দুটো। পোষাক-আশাকের চিহ্ন নেই। নীল চশমা? পাছাড়ি  
ভেঙে ঝেঁঝে করগে যা, যেখান থেকে গড়িয়েছে ওটা সেই জায়গা  
খুঁজে বার করগে যা—ঠিক মিলবে কিছু, তোরাও চিনবি ঠিক।

এসব খবর বাতাসে ছড়ায়। কন্মকর্তীরাও সবাই গুল্লগল্লার মুখে চলেছে সেদিকে। এমন কি পোশাক ফেলে আজ ভুতুবাবুও নেমে এসেছে। থেকে থেকে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে ভুতুবাবু। গোল জোলের স্থির হয়ে আসছে এক একবার। সেই এক কালো কেন জোলে ঠে ঠে করছিল সমস্ত বস, এমন আর সেই বৃত্তে না চাইলেও বৃত্তে পারছে। যত পারছে ততো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

পাগল সদীর দেখেছে সকলকে। বারাই যাচ্ছে ওদিকে, চেয়ে  
চেয়ে দেখছে তাদের। দেখাও বাও, বেশ ভালো করে দেখে নাওগে  
বাও। দেখছে আর তার কান্না মুখে গলগলিয়ে হাসি উপছে  
উঠছে।

সান্ত্বনাকে দেখে আনন্দে একেবারে ঘেন অধীর হয়ে উঠল সে।  
—দিদিয়া! জাঁই রে দিদিয়া! উদিন তুকে বলি নাই হোপুন  
মরদ ছেল ? আখুন দেখে লে রে দিদিয়া, আখুন দেখে লে!

স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলেনি। য়েটুকু ছড়িয়েছে আভাসে ইঙ্গিতে। সাধারণ কানে গেছে, কিন্তু মধ্যায় ঠিকমত ঢোকেনি যেন। এখনো ফাল-ফাল করে চেয়ে রইল সর্দারের মুখের দিকে। কিন্তু আজ এই প্রথম এত হাসি এত আনন্দের মধ্যেও সর্দারের মুষ্টিটা কেমন যেন কুংসিত ঠেকল ওর চোখে।

পারলে খেই খেই করে নাচত সদাঁর। অনর্গল কত কথা বলল,  
কত কি বলল ঠিক নেই। সবই হোপুনের প্রশস্তি! ও একটু  
খামলেই সামুনা বাড়ি কিরবে ভাবছিল।

কিন্তু এরই মধ্যে আবার একটা বিশেষ উদ্ভেজনা দেখা গেল  
লোকজনের ছটাছুটি আনাগোণায়।

আবার এক চমকপ্রদ চাক্ষু্য। আবার এক হাড়-কাঁপানো  
থবর।

লোকজন পাহাড়ে উঠছিল মৃতের চিহ্ন খুঁজতে। বেশি খুঁজতে হয়নি। পেয়েছে। সেই সঙ্গে আর একটা ভয়াবহ আবিষ্কারে শুরু সকলে।

আর একটা ককাল। এটা সম্পূর্ণ ই ককাল।

কিছু পুরুষের নয়। নারীর। রূপোর গয়না আটকে আছে  
কিছু, পাশেও পড়ে আছে হুঁ-চারখানা।

কখন, কেমন করে বাড়ি ফিরেছে। সাদ্ধনা খোয়াল নেই। কেমন করেই বা সর্বারকেও নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে এত পথ হেটে, জানে না। - সর্বার এক সময়ে হাত ধরে, টেনেছিল মনে আছে। সর্বার যন্ত্র-চালিতের মত উঠে এসেছিল তাও মনে আছে। - তারপর কখন বাড়ি এসেছে হ'ল স' নেই।

ভিতরের দাঁড়ায় বসে আছে সদাঁর। সাজনা ঘরে। অবনীবাণ  
কৃপাণত ঘর-বার করছেন। এ অবস্থায় এভাবে দুজনকে রেখে  
বেকুতেও পারছেন না। বুথে কেউ সোরগোল না করলেও ওই  
দুটো কঙ্কালের একটিকে মনে মনে স্নান করছে সবাই। গুরুগুরে।  
কিন্তু ভিতরটা সত্যের চিত্রিত হইবে।

কেউ। অবনীবাণ্ড না। কিন্তু এদের দুজনকে দেখে অমুখান করেছেন। বুয়েছেন।

সামান্যর ইচ্ছে হচ্ছিল দেখালে মাথা ঠুকে সচেতন করে নিজেকে। তার যে এখন অনেক ভেবে দেখার আছে, অনেক কিছু বুঝতে বাকি। রোদ উঠলে যেমন কুয়াশা মিলায়, তেমনি সোজা হুজি একবার নিজের ভিতরে তাকাতে পারলেই কিছু একটা প্রতিলিকার যেন অবগান ঘটতে পারে। কিন্তু তাকাতেও পারছে না, ভারতেও পারছে না। একটা বোবা নিশ্চিন্ততা একেবারে গ্রাস করেছে তাকে।

...এই জগতই আসবে বলেও আর আসেনি চাঁদমণি। সেই রাত্রিতেই হয়ত ধরা পড়েছে। মরণ শানাইছিল যে মানুষটা তার হাতেই ধরা পড়েছে। সে দৃষ্ট ভাবতে গিয়ে অব্যক্ত বাথায় একলা ঘরে অদ্ভুত আত্মনাদ করে উঠল সাধুনা। চাঁদমণির সেই পা-ছোঁয়া স্পর্শ সর্বঙ্গে সিঁড়ি সিঁড়ি উঠল। ...হয়ত কাঁচপাকার মত টেনে নিয়ে গেছে, বলির পত্তর মত... সাধুনার মনে হল, ওর বুকের হাড়গুলো যেন মটমট করে ভাঙছে কে। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বাবে কোথায়? দাওয়ায় পাগল সর্দার। আঙুলে আঙুল বসে পড়ল আবার।

...তারপর কাদ পেতেছে হোপুন। সেই প্রলোভনের কাদে ধবীর ঘোবকে আটকেছে। পিছল প্রলোভনের কাদ উপলব্ধি সাধুনা। সর্বঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে আবার। ওই জগতই জিগে সেই লোকটার পাশে দেখা গেছে তাকে। ওই জগতই মড়াইয়ে ধার সেই গোল-চরা পাহাড়ের নির্জন হোপুন অমন করে চেয়ে চেয়ে পথত ওকে। ওই কাদ দেখেই ভুতুবাণ্ড ওকে সতর্ক করে দিতে এসেছিল। আর পাগল সর্দার ওকে সতর্ক করতে এসেছিল তো গাপুনেরই ইচ্ছাতে...।

ভিতরে ভিতরে সবক'টা উপলব্ধির তার যেন একসঙ্গে সজাগ হয়ে তুলতে চাইল সাধুনা। ব্যাকুল আকৃতি... ওই পায়গ-মুতি গাকটার নির্মম নৃশংসতাই বড় না আর কিছু বড়?

চমকে উঠল একেবারে। অরের চৌকাঠে পাগল সর্দার দাঁড়িয়ে। ই-বিনিময় হতে বলল, আখুন বাইবে দিলিয়া...

সাধুনা অবাক। যেন দুটো গল্পগুজব করতে এসেছিল, ধ-দুঃখের কথা কহিতে এসেছিল—বেলা পড়ে আসছে দেখে এখন ল। সাধুনা মাথা নেড়েছিল কি না নিজেই জানে না।

বাইরে এসে মেন কোয়ার্টার্স-এর বাগান ধরল পাগল সর্দার। লর পুতুলের মত এগিয়ে চলল সে। মেন কোয়ার্টার্স-এর তর দিয়ে, গেট হাড়িসের পাশ দিয়ে একেবারে পাহাড়ের ধারে স দাঁড়াল। পায়ের নিচে মড়াই। বায়ে শুকনো খটখটে। দিকে ডাম বাধা হচ্ছে। তাইনে মাটির সেই সাময়িক তরোধ।

অজ্ঞানস্বের মত হাঁটতে হাঁটতে ছাড়িয়ে গেল সেটা। আরো ১ খানিকটা এগিয়ে থামল একজায়গায়। এখানেও পায়ের নিচে লাগত মড়াই। কিন্তু এখানে মড়াইভরা জল। লাল জল। ১ ঘোঁষন। উজ্জল, কলকল। একাধ মনোযোগে পাহাড়খোঁবা রেখা দিকে দেখতে লাগল পাগল সর্দার।

...কেন জায়গাটা হবে? তখন তো মড়াইয়ে জল ছিল না

কিন্তু... আর কত ভাববে, কত কানো কানো করি।

কিন্তু কোথানটা হব?

কোথানটা আরও ঘুমিয়ে আছে চাঁদমণির মা ফুলমণি?

ওই খানটা ১... নাকি ওই খানটা?

জলের নিচে পাথর, তার নিচে মাটি, তার নিচে...

মস্ত শিকারী ছিল পাগল সর্দার। এমন শিকারী হয় না নাকি। কিন্তু শিকার করা ছেড়ে দিল কেন? সকলের বিস্ময়।

ছাড়বে নাই বা কেন। বড় শিকারের পথে ছোট শিকারে হাত ওঠে না মন ওঠে? শেষে যে শিকার করেছে পাগল সর্দার... বাথ ভালুকও তুচ্ছ। তার পর শিকার ছাড়বে না তো কি!

পাহাড়ীরা ছিল ওদের জাতশত্রু। পাহাড়ের ডগায় থাকত।

কাঁক পেলে এসে লুঠতরাজ করে যেত। ওদেরই কাউকে মনে ধরেছিল ফুলমণির! এদেরই কারো সঙ্গে 'ছাতই' হয়ে চলে গিয়েছিল। সর্দার তো বনে জঙ্গলে শিকার নিয়ে থাকত বছরের বেশির ভাগ সময়। সে শিকার জগে ঠেকল এর পর।

শিকারীরা ধৈর্যের পাহাড় না কি। মিথ্যা নয় বোধ হয়। প্রায় এক বছর ধৈর্য ধরে ছিল পাগল সর্দার, নির্বিড় প্রতীক্ষার স্তব্ধ হয়ে ছিল। শিকার আসবে জানত। বনের হরিণ কোশে ঝড়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে কতক্ষণ? তার স্বভাবই তাকে টেনে আনে। ফুলমণিই বা পাহাড়ে পাহাড়ে নেচে বেড়ানো কুলে থাকবে ক'দিন? তার স্বভাবও তাকে টেনে আনবে।

এনছিল।

বছরের বড় শিকারের উৎসবে বেরিয়েছিল শাঁওতালরা। পাঁচ দিনের দেশময় শিকারোৎসব। ছেলে বুড়ো বৌদির বোয়োর 'ভু-ভু' নাগরা পিটিয়ে, 'শবঃ শবঃ' বাঁশ ফুকে আর 'তুতু' তুতু' শাকোয়া বাজিয়ে। কাছে দূরে কে আর না টের পায় ওদের এই শিকার অভিযান। পাঁচ দিন আর কোনো মরদ পুঙ্খের টিকি দেখা যাবে না দেশে গাঁয়ে।

কিন্তু পাগল সর্দার বায়নি।

...সেও বড় শিকারেরই প্রতীক্ষা করছিল।

সুখি-ডোবা আবছা আলোয় শিকার সেদিন নিশংকে এসে দাঁড়িয়েছিল ওই ছোট ঝাড়া পাহাড়টার ডগায়।

এত মন দিয়ে আর কখনো তার ছোঁড়েনি বোধ হয় পাগল সর্দার।

বাণবিন্দু পাখি যেমন উটে পাটে শূন্য থেকে নেমে আসে মাটির দিকে, ওর শিকারও তেমনি লপটে বপটে নেমে আসছিল নিচের দিকে। সবটা আসেনি, কাছেই একটা পাথরে আটকে গিয়েছিল। ক্ষিপ্ৰচরণে সর্দার গিয়ে তুলে নিয়েছিল তাকে। শিকার একবার মাত্র চোখ মেলে দেখেছিল তার নির্মম শিকারীকে, তারপর পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজেছিল। অতি বস্ত্র, অতি সঙ্গোপনে বুক করে শিকার নিয়ে নেমে এসেছিল সর্দার। তারপর...

তারপর, ওই জলের নিচে পাথর, তার নিচে মাটি, আর তার নিচে...

নরেনকে দেখা মাত্র সাধুনা ভিতরের গুমোট অসহিষ্ণুতা কাটিয়ে ওঠার পথ পেল যেন। এক পলক দেখে নিয়ে আলতো গ্রহণ করল, করে এমন...

নরেন অবাক। কবে এলাম কি রকম?

নির্লিপ্ত মুখে সাধনা আবার তাকালো তার দিকে। আপনি কি এখানেই ছিলেন নাকি এ ক'দিন?

জবাব না দিয়ে নরেন হাসতে চেষ্টা করল একটু। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আরো অবাক সে। এ ঠিক ঠাট্টাও নয়, অহুযোগও নয়। নিষ্কলুষ অভিমানের স্বাক্ষর একটু।

বালল গাঙ্গুলির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই সন্ধ্যায় নরেন এসেছিল। আশা করেছিল, চিক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা সাধনা তুলবে। কিন্তু সাধনা তার খার দিয়েও যায়নি। পরদিনও না। অথচ হোপনের ছুটিনার পরের সে খমখেমে মুখভাব আর ছিল না। খর খুশিতে উপছে উঠতে দেখেছিল অনেকবার। বালল গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা যোগাযোগের প্রসঙ্গ সাধনা আগেও সম্ভবপূর্ণে পরিহার করেছে। অথচ ভিতরের একটা চাপা আনন্দ চাপতে পারেনি। তাছাড়া আরো অনেক কিছু উপলব্ধির কারণ ঘটেছে অনেকবার। বিশেষ করে মাসির বাড়ি যাওয়ার আগে সেই বিকেলে নরেনের হালকা ইঙ্গিতে অপ্রতিভ লালিমায় শব্দমড়িয়ে উঠে রান্নাঘরে পালানো।

এবারেও সাধনা বলেনি কিছু, বালল গাঙ্গুলি বলেছে। বলেছে, সন্ধ্যায় সে কি রাগ তার ওপর। আর রাগ পড়তে লজ্জায় একাকার হয়ে। বালল গাঙ্গুলির বারার মধ্যেও চিরচরিত নিম্পৃহতার অজানা নরেন লক্ষ্য করেছিল বই কি। মনে হয়েছিল, সেই রাগ আর লজ্জা চিক ইঞ্জিনিয়ারের মক-রক জীবনে ঠাণ্ডা প্রলেপের কাজ করেছে।

তারপর গত চার পাঁচদিন আর আসেনি নরেন। বড়, জল—ঝড়াইরে বিপর্যয় কম ঘটনি ক'টা দিনের মধ্যে। আজই শুধু জল হয়নি সকাল থেকে। তবু আসবে ভাবেনি। কিন্তু বিকেল হতে পারে পারে চলে এসেছে কেমন।

আগে হলে এটুকু অভিমানই দখল বাতাসের স্পর্শ বলে মনে হত। কিন্তু এ প্রেশরের বাতনা বিরম। এবারে নরেন সেটা হাড় হাড় টের পোরেছে। পাচ্ছে। নাওয়ার ওপর মোড়ার বসে পড়ে বলল, এ ক'দিন ঘুমিয়ে কাটালে নাকি, আকাশের অবস্থা দেখেনি?

দু-চার ঘুঘুত অপেক্ষা করে সাধনা আকাশের অবস্থাটা তার মুখ থেকেই আঁচ করে নিতে চেষ্টা করল যেন। তারপর ঘরে চলে এলো। আবহময়লা শাড়াটা বদলে নিল। আয়নার মাথা আঁচড়ে নিল একটু।

নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চায় সাধনা। নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। ওই বড়টা যেন ওই বৃক্কের উপর এক অনড় বোঝা চাপিয়ে নিয়ে গেল। কি বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর ভিতরে ভিতরে। ঘটে বাচ্ছে। দুঃসহ লাগে। ও কুলতে চায় ওই ঝড়ের কথা। চাঁদ্রমণির কথা, হোপনের কথা, পাগল সর্পারের কথা... ওই ঝড়ঝড়ের জীবনের বর্ণনা বুঝি গ্রাস করতে আসছে।

নিজেকে ভুলতে চায়। মাসির বাড়ি থেকে বুকে আসার পর জীবনে যে নতুন জোয়ার এসেছিল, সেই জোয়ারেই আবার ভাসতে চায় সাধনা। বেরিয়ে আসতে চায় এই শুকতার আবরণ ভেঙে। চেষ্টাও করছে। চেষ্টা করছে সহজ হতে, সহজ হতে।

নরেনের কথা শুন সত্যিই মনে হয়েছে এ ক'দিন। করে হয়েছে,

ওই লোকটাই পারে এই অসহ্য গুমোট খান খান করে ভেঙে দিতে। বিকেলে জল-বৃষ্টি সবেরও প্রতীক্ষা করেছে।

ফিরে এসে বলল, চলুন আর বসতে হবে না, যে বিদ্যুটে ছিঁরি আকাশের, একুনি হয়ত আবার ঝঝঝ শুরু হবে।

একটু দেখে নিয়ে নরেন বলল, বেরোলে পরে যদি শুরু হয়?

হয় হবে, আপনাকে আর সে গবেষণা করতে হবে না, চলুন।

বেরিয়ে সেই পিছন দিকের পাহাড়ী রাস্তা ধরল সাধনা।

—এদিকে কোথায়?

—ঘরের বাড়ি। ফিরে তাকালো, ভয় করছে?

ওর দিকে চেয়েই নরেনের আজ হঠাৎ কেমন মনে হল, যে অবকাশের প্রতীক্ষা করছিল এতদিন, আজ সেটা আসবে। যে কথাটা বলি বলি করেছে বলা হয়নি এতদিন, সেটা আজ বলা হবে। এ সংশয়ের থেকে সে অনেক ভালো। জবাব দিল, না তুমি সঙ্গে থাকলে আর ভয় কি।

ভালো লাগছে সাধনার। ভালো না লাগিয়ে ছাড়বে না। সেই জোয়ার জীবনে ফিরে বাবে সম্ভববন্ধ। সাধনা হেসে উঠল। ওই হাসি দিয়ে গোটা পাহাড়ের ওপর থেকে কালো মেঘের কালো ছায়াটা পর্যন্ত দূর করে দেবে যেন। বলল, ভয় না তো কি, এ ক'দিন আসেননি কেন? কি বাচ্ছেতাই সব ব্যাপার হল একটার পর একটা, দুটা কথা বলারও লোক পাইনি।

—খবর লাগনি কেন? নরেন নিম্পৃহ।

—এতদিন কোন খবরটা দিতে হয়েছে মশাই আপনাকে?

—জল-বৃষ্টি মাথায় করে বাই বলে তুমিই তো কতদিন কত খোঁচা দিয়েছ।

সাধনা বলতে বাচ্ছিল, খোঁচা খেয়েও তো আসতেন। বলল না। এবারের এই না আসার হেতুও কেমন করে যেন উপলব্ধি করেছে। সাধনা আপস করতে চায়। কিন্তু সোজা রাস্তায় নয়। নিজেকে সজাগ করে। বলল, খোঁচা না ছাই, আসলে আপনি আজকাল আর আমাকে দু'চক্রে দেখতে পারেন না।

নরেনের ভিতরে প্রেশরের সাদা জাগছে আবার একটা। সংশয়ের পর্দাটা যেন পাতলা হয়ে আসছে। পাশাপাশি চলার একটা স্পর্শ লাগছে কোথায়। তবু এই সেই প্রতীক্ষিত অবকাশ কি না বুঝে উঠল না। জবাব না দিয়ে হাসতে লাগল সেও।

—থাক, আর হাসতে হবে না, যে ভাবে হাঁটছেন এখানেই সম্ভ্য।

—এটা কি হাঁটার মত রাস্তা, ঠোঁড়র খেতে খেতে শ্রাণ গেল।

সাধনা হেসে কেসল, এখানে ঠোঁড়র খাওয়া অভ্যাস হয়নি? কিন্তু জবাব শোনার আগে চট করে সামলে নিল।—সত্যি বা হয়েছে রাস্তাঘাটের অবস্থা, এক ঝড়ে সব কাত।

পাথরের ওপর পা কেসে কেসে নরেন চলেছে। মন বলেছে, সময় আসেনি, আসবে। অবকাশ আসেনি, আসবে। আজই আসবে। ধমনীতে একটা উক শ্রোত বইছে ওর। জোর করেই চেষ্টা করল সহজ হতে। বলল, শুধু ঝড় কেন, এই বৃষ্টিটাও কম ভয়ের নাকি। কোথায় কোথায় বজা হয়েছে খবর এসেছে—এককম হলে তো হয়েছে আর কি। আপনি, সারাক্ষণ এই কথা আর এই ভাবনা।

সান্না ধমকে পাড়িয়ে গেল। তুক কুঁচকে তাকালো। তরুণের চোঁটার মড়াইয়ের উপর থেকে যে অবাহিত ছায়াটা সরিয়ে খেঁচিল সেটা বেন বিগ্গন হয়ে উঠল আবার। আর সেই পাখা-রও। বলে উঠল, চিড়-ইঞ্জিনিয়ারের মুখোমুখি বসে গালো হাত রে তাই ভাবুন সে, আমায় সঙ্গে আসতে হবে না, বাবু।

হুঁ হুঁ করে দু'-চার পা' এগিয়ে গেল সে। নরেন প্রথমে বাক, পরে খুঁশি। কাছে এসে বলল, তোমার সঙ্গে এলে কি গালোচনা করতে হবে শুনি?

—কোন আলোচনা নয়। শুধু বড় বড় পা ফেলতে হবে আর আসতে হবে। হাসার নমুনা ওর মুখেই বরল প্রথম।

নরেনের আপত্তি নেই। চলার গতি বাড়ল। দিনের আলো ন কালো হয়ে আসছে আরো। কোন দিকে বা কোন পথে লেছে কারোই হুঁস নেই। কথা অনর্গল সান্নানাই বলছে। গাবোল ভাবোল কথা। হাসছেও খুব। নরেনেরও হাসার ভূমিকা। কিন্তু কেমন বেন লাগছে। ওকে দেখে আজ হঠাৎ বরনার খা মনে পড়েছে। কোথায় বেন মিল। থেকে থেকে অন্তর্দৃষ্টি কটা। ওই নারীচাপল্য আর প্রশ্রয় ঠিক তার উদ্দেশ্যে, সে উপলক্ষ্য মাত্র। বরনাও বাইরে থেকে কত জনকে মন প্রশ্রয় দিয়েছিল। হাসার ভূমিকা নরেনের, কিন্তু হাসি ভ্রমন আসছে না।

সান্না ধমকে পাঁড়াল এক জায়গায়। সামনেই বাঁকের মুখে ই বিশাল পাথরের আড়াল। তার ওপাশে বড় গাছ ভেঙে দে আছে একটা। একান্ত নির্জনে এই আড়ালের ওপাশে কদিন দেখেছিল দুজনকে। চাঁদমণি আর হোপুনকে। সর্বাঙ্গ ঝড় সিঁড় করে উঠল কেমন ১০০-আমোঘ আকর্ষণ একটা।

আড়াল পেরিয়ে সেই ঢালু পাথর। যেখানে ওরা বসেছিল। স আর ছিল কোথায়। চাঁদমণি শুয়েই ছিল প্রায়। আর ওর খের ওপর, বৃকের ওপর ঝুঁকেছিল হোপুন। অনেকদিনের একটা। মৃত্যুবিলম্ব অস্বস্তি ভিতর থেকে বেন নড়ে চড়ে উঠছে আবার। মন উঠছিল এখানে চাঁদমণি আর হোপুনকে দেখে। যেমন ঠেছিল প্রথম সন্ধ্যায় বামনা উৎসব থেকে ফেরার পর রাতের নিস্ত্র শয্যায়। পাথরটা বেন ইশারায় ডাকছে ওকে। নিজেকে পাড়িয়ে যেতে না পারার বাতনা বৃষ্টি ওখানে গিয়ে বসলে কমবে কটু। অজ্ঞাত অনড় বোকাটা হালকা হবে।

পাশের লোকটা যে নিনিমেবে লক্ষ্য করছে তাকে সে খেয়ালও হল না বোধ হয়। লজ্জা পেল, হেসেও উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে মকেও গেল একটু। চাঁদমণির উজ্জ্বল হাসির মত লাগল বেন নিজের হাসিটা। লাগুক, ও আর পরোয়া করে না। বলল, থাকেন কি, আর হাঁটে না, চলুন ওই পাথরটার গিয়ে বসি একটু।

চপল পায়ের গিরে পাথরটার উপর বসে পড়ল হুপ করে। পচাপ নারীমুখের বর্ণছটা দেখছিল নরেন। পায়ের পায়ে এগিয়ে ল সেও। প্রায় মোহগ্রস্তের মত। বসল পাশে।

চকিতে বাড়ি কিরিরে সান্না তাকালো একবার। এত কাছে যে বসায় মত ছোট নয় পাথরটা। বসছে তো বসছে, সান্না পরোয়া। বলল, কি হল এমন চপচাপ বে? জায়গাটা

উজ্জ্বল মুখে চারদিকে তাকিয়ে জায়গাটা বেশ তাই বেন উপলব্ধি করতে লাগল সে। কিন্তু মনে পড়ছে অল্প কথা। প্রথম সন্ধ্যায় সাঁওতালদের বামনা উৎসব থেকে ফেরার পথে এর থেকে আরো বড় পাথরে বসেও সেটা বড় মনে হয়নি খুব। আর ওকে নীরব দেখে এই ভ্রলোকই সেদিন বলেছিলেন, এমন চপচাপ কেন।

অস্বস্তি আঁজও। কিন্তু সেদিনের মত অত ভীষণ অস্বস্তি নয়। নেশার মত। ভ্রলোক চেয়ে আছে নিম্পলক, উপলব্ধি করেই সান্না অল্প দিকে ঝাড় ফেরালো আরো। পড়ো গাছটার দিকে চেয়ে অকুট কর্তে হেসে উঠল, বেচারী গাছটার অবস্থা দেখুন একবার।

তারপর সবাকো শিহরণ একটা।

এক হাত ওর পিঠে, অল্প হাত দিয়ে তার মুখখানি সম্পূর্ণ নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল নরেন।

চোখে চোখে, চোখের তারায় তারার বিনিময়।

বিহ্বাস্তম্পর্শের মত।

নিমেবে নেশার বোর কেটে গেল বেন সান্নানার। চপলতার চিহ্ন মুছে যেতে লাগল। শুকনো খরখরে লাগছে জিরে ডগা, টোট। সামলে নিয়ে জোর করে হাসতে চেষ্টা করল একটু। নড়েচড়ে সরে বসতে গেল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা সবল আকর্ষণে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার বৃকের ওপর। মুহূর্তের অবকাশ পেল না। হুই টোট বিদীর্ণ হতে লাগল থেকে থেকে; ঘন, উষ্ণ, নির্মম। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল অধরের বাধা। দাঁতে লাগছে, জিরে লাগছে।

বাধা দেবে ভাবছে। প্রাণপণ চেষ্টা করতে চাইছে বাধা দিতে। কিন্তু সর্বাঙ্গ অবল। ওর হাড়গোড় হুজু মটমট কার ভাঙবে নাকি মাছুষটা! নিবিড় বাতনা। জাহ্নতে, কটিদেশে, গুণভারে। দেহ-সেহলীতে ভাঙনের তাণ্ডব। আর পারছে না সান্না। বাধা দিতে পারছে না। স্পর্শ-বিহ্বলতার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে ১০০ ঘূমের মত লাগছে। শিথিল হয়ে আসছে সব কিছু। সান্না হাল ছেড়ে দিল। এলিয়ে পড়ল। সেই বাতনার মধ্যও কতকালের, কত যুগের একটা জমাট-বাধা শিতল অবরোধ বৃষ্টি বাপ হয়ে নিশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অস্তিম বিন্মুতির মুহূর্তে আবার এক ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হল বেন। পাথরচ্যুত হয়ে নরেন মাটিতে বসে পড়ল। সান্না বসে পড়ল। সান্না উঠে বসল। পাঁড়াল। পা কাঁপছে খরখর। বৃকের ভিতরে বেন হাড়ুতী পিটছে ঠক ঠক করে। বাতাস নেই। বিপ্রস্ত বেলবাস ঠিক করে নিল। বিফারিত হুই চোখ নরেনের মুখের ওপর। লজ্জা নয়, ভয় নয়, হুণা নয়। রাজ্যের বিষয় আর বিভ্রম।

চকিতে ঘুরে পাঁড়াল। কিরে চলল। পিছন কিরে তাকালো না একবারও। তবু উপলব্ধি করল মাছুষটা আসছে পিছনে পিছনে। পাঁচ সাত মিনিটের পথ আর। কিন্তু আর ফুরায় না বেন।

শোনো—

পা থেমে গেল। থামতে চারনি তবু নরেন কাছে এসে পাঁড়াল। বীর, ছিন্ন। বলল, তোমার বাবার সঙ্গে আমি হুই একদিনের মতোই দেখা করব।



তুই চোখে এক বলক আঙন ছড়িয়ে হন হন করে এগিয়ে চলল সাধনা।

নরেন ঝাড়িয়ে বইল।

সেজ্ঞা নিজের ঘরে এসে একেবারে শয্যা নিল সাধনা। বাবা বাড়ি নেই। কিন্তু আসবে তো। কি করে মুখ দেখাবে সাধনা। সামনে গিয়ে ঝাঁড়াবে কেমন করে। রাগে আঙন হয়ে উঠতে চাইছে মানুষটাগ ওপর। পারছে না বলেই রাগ বাড়ছে, হাতনা বাড়ছে, অস্থি বাড়ছে। উঠে মুখ হাতে জল দিতে গিয়ে একেবারে হান করে এলো। কিন্তু গা ছুড়ায় না তবু। সেই স্পর্শ-বিহীনতা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

বাবা ফিরেছে টের পেল এক সময়। কিন্তু তিনি খেয়াল করলেন না কিছু। যতটা সম্ভব আড়ালে আড়ালে কাটিয়ে রাতের মত নিশ্চিন্ত হল সাধনা। আজ আর চোখে পাতায় এক করতে পারবে না জানা কথাই। না পাকক। অনেক বিচার বিশ্লেষণ বাকি। মানুষটার অমন দুঃসাহসের দরুন নিজেকে উত্তেজিত করে তোলাই বাকি। কিন্তু একা ঘরে টেটের গুলনি উপলব্ধি করছে আবার। বিমুত্তির সেই নির্মম স্পর্শগুলো গ্রাস করতে আসছে আবার। আঠে-পুঠে জড়িয়ে ধরছে। চর্যাং কান বাড়া করে নিজের বুকের স্পন্দন শুনেতে লাগল যেন সাধনা। কিছু একটা পরিবর্তন উপলব্ধি করতে লাগল। দেহের অন্তঃস্থলে সেই ডাঙনের সমারোহ মনে পড়তে লাগল।...বত ভাবছিল তত যেন ভরেও উঠছিল।

বাবার ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সাধনা। হু চোখ বগড়ে নিয়ে দেখল, দিবি বেল। সাধনা অবাক। কখন ঘুমালো! এমন বিচ্ছিন্ন ঘুম শিগীর ঘুমিয়েছে বলেও মনে পড়ে না।

কাজের কঁকে কঁকে ঘরে-ফিরে সেই এক কথাই ভাবছে। বিগত দিনের কথা। ওই একটা দিনের সঙ্গে সঙ্গে ওর জীবনের একটা অধ্যায় যেন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বাবার লাগছে না, বরং হাঁকা লাগছে অনেক।

বিমুত্তির হুহুতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল। না উঠলে...?

অসুট শব্দ নির্গত হল একটা মুখ দিয়ে। উন্মূন থেকে তেলের কড়া নামিয়ে ফেলল তাড়াহাড়ি। ফুটন্ত তেলের ছিটায় হাতের কব্জিতে কোঁধ পড়ে গেছে। দেখল। বিহ্বলের হলস্ত ছিটায় অমনি কবে লাই করতে চাইল একজনকে। ভাবতে চেষ্টা করল, ওর অন্তঃস্থলের এক সঙ্গোপন আশা দৃশ্যের মত উপড়ে কেলেতে চেয়েছে লোকটা। ওর জীবনে আর এক বাস্তবিকতার পরস্কার নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছে। আর একজনের প্রাণী ভাঙারের দিকে হাত বাড়িয়েছে নিল জেদে মত।

কিন্তু তবু চোখের সামনে ঠিক ইঞ্জিনিয়ারকে বড় করে তোলার চেষ্টা বাহত হচ্ছে থেকে থেকে। সেই নিঃসঙ্গ মানুষটাই তাকে নিজেদের করে দিয়ে সামনে এসে ঝাঁড়াচ্ছে বার বার। আর সাধনা রাগ করতে পারছে না বলেই অবাক হচ্ছে। ভালো লাগছে বলেই জল উঠতে চাইছে। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না বলেই অস্থি। নিজের অন্তঃস্থলে দুটি ঢালাল সত্ত্বপণে।

ওর এক্ষেপে আমন্ত্রণ ছিল? আহ্বান ছিল? সর্বোপরি বসে আছে চাইল, না, কখনো না।

কিন্তু সমর্থন আসছে না। উশ্টে যেন বাস্ক করছে কেউ, না কি! এতকালের যে জমাটবাঁধা অবরোধ হাওয়া হয়ে মিলিয়ে বাচ্ছে এখনো, সে তবে কি? আর তার প্রতি মোহ আছে কোনো? মায়া আছে কিছু?

এত বড় এক বিপর্যয়ের উপলক্ষ যে মানুষ, জীবনে আর তাকে মুখও দেখাবে না বোধ হয়। কিন্তু বাবার কাছে আসবে বলেছিল লোকটা। তিন-চার দিন কেটে গেল। আসে নি। সাধনার হলস্ত চোখে সেদিন এ প্রস্তাবের জবাব লেখা বলেই আসে নি বোধ হয়। ঠিক আশাও করছে না। আহুক, না আহুক বয়ে গেল। কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে কি একটা অসহিষ্ণুতা চাড়িয়ে উঠেছে যেন। উকচা বাড়ছে। রাগতে পারছিল না, কিন্তু এখন কারণ-অকারণে মেজাজ চড়ছে।

ওর এ কদিনের তাবতাব অবনীবাবুর লক্ষ্য করার কথা। কিন্তু সম্প্রতি চাকরাণি বাস্তবায় বিড়ম্বিত তিনি। তিনি কেন, সকলেই। এলপার্ট কমিটি এসে গেল বলে। এদিকে আকাশ আর বুটের বা অবস্থা, বাইরের তত্ত্বাবধান ছেড়ে কমিটির সব পরিদর্শন আপিসের ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যেই শেষ হবে বোধ হয়। অতএব হিসেব-নিকেশ জল্পনা-কল্পনার নথিপত্র সব গুঁড়ে পাখা, গোঁজগাছ করো, আপিস সাজাও। এ ছাড়াও উপরন্তুলাদের শ্রাবভাব চালচলনে এই কমিটিকে কেন্দ্র করে কেমন একটা শব্দার ছাড়া নেমেছে। কমিটি এলে প্রতিজ্ঞা কিছু ঘটতে পারে যেন। কি, সে আসল স্পষ্ট নয় কারো কাছে।

অবনীবাবু এই নিয়েই ব্যস্ত ক'টা দিন। সাধনার সঙ্গে যত কথা হয়েছে, তার বেশির ভাগই এই কথা। সাধনা শুনেছে কি শোনেনি, তাও খেয়াল করেন নি। তবু সেদিন কি মনে হল তাঁর। বললেন, নরেন আসেনি এর মধ্যে? আশিচেষ্টে দেখিয়ে বড় একটা...

জবাবে বখাসমত নিষ্পত্তি মুখে সাধনা টোট গুটালো শুধু। অর্থাৎ কে জানে, খবর রাখিনে।

একটু খটকা লাগল বোধ হয়। অবনীবাবু খেয়াল করে মেয়ের দিকে তাকালেন এবার। তেমনই বললেন, কি যে, আবার বগড়াবাটি করেছিস বুঝি?

ক্রান্তি করে হাসতে হল সাধনাকেও। দিবি পারবে এসব এখন। পাঁচটা অনুযোগে আসল জবাব এড়িয়ে গেল। বলল, তুমি তো দিন-রাত কচি মেয়ের মত শগড়া করতেই দেখো আমাকে।

সেদিনই নিজের উক্তাগে নরেনের সঙ্গে দেখা করলেন অবনীবাবু। ভড়কে গিয়েছিলেন প্রথম। এমন ধীর শান্ত ওকে আর দেখেননি কখনো। কিন্তু তুই এক কথার পরেই ওনলেন বা, তাতে পারিবারিক প্রশ্ন বিমুত হলেন। ভাবলেন, ওর মুখের এই অবস্থা বধন, বীতিমত হুঁতুড়ার কারণ যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নরেন তেঁতুবা এলপার্ট কমিটির প্রেসল তুলে নিজেকে আড়াল করেছে।

বাড়ি ফিরেই সাধনাকে বললেন সব। বললেন, এলপার্ট কমিটি যে আসছে তার ডেয়ারিয়াল হলেন বিশুল বাড়ুরী নামে এক ছাত্রলোক। মন্ত ইঞ্জিনিয়ার, মন্ত এক কার্ণ-এর মানেজি: ডাইরেক্টর। বালা গাঙ্গুলি সেখানেই চাকরী করত আগে, এর লকই একটা ওরানক পোলযোগের ফলে চাকরী হেঁচক হলে অবস্থা হারিয়ে গেল।



এত না বললেও চলত, শুণ্ড নাম শুনেই চিন্তা সাধনা।  
যতও। এ ক'দিন বাংলায় চুক্তিভা দেখেও দেখিনি, বা তার কোনো  
ধা শুনেও শোনেছি। কিন্তু আজকের খবরটা শোনা মাত্র নড়ে চড়ে  
জাগ হয়ে উঠল। নিজের ভাবনা চিন্তা তলিয়ে গেল সব। আরো  
দুই শোনার আশায় জিজ্ঞাসনেন্নে চেয়ে রইল শুণ্ড।

অবনীবাণ্ড বনে গেলেন, এই জ্বলন্ত ক'দিন ধরে এরকম অবস্থা  
খছি অপিসের। নরেন বলল, মস্তের এতটুকু নড়চড় হলে এখান  
কেও সোজা চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বসতে পারে বাদল গাঙ্গুলি!  
মন অদ্ভুত কথা তো আমি শুনিনি কখনো।

এতটা বরদাস্ত হল না সাধনার। ঝাখিয়ে উঠল প্রায়, নরেনবাণ্ড  
বেটেই বাড়াবাচ্ছি, আমি বলে রাখছি কিছু হবে না—এত সহজে  
দি সব ভেঙে যেত, দুনিয়ায় তাহলে আর বড় কাজ কিছু হত না।

উদ্বেগভর নিষ্করণে বের চলে এলো। কিন্তু উতলা সেও কম  
গনি। যা বলে এলো বাবাকে, সেটা তার মনের কথা, আশার  
খ। কিন্তু শুণ্ড এরই ওপর ভরসা করে মতি। নিশ্চিত থাকে সহজ  
র! নরেনবাণ্ড বা বলেছে, বাবা সেটাকে অদ্ভুত ভেবে অবাক হতে  
।নেন, কিন্তু সেসকল কিছু খটা যে অসম্ভব নয়, সে শুণ্ড সাধনাই  
রে। যে নাম শুনেল, তাঁর সঙ্গে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কথা মাত্র  
পসেরও কোন সম্ভাবনা নেই। হটকটানি বেড়েই চলল। ইচ্ছে  
য, এক্ষুনি নরেনবাণ্ডকে ডেকে পাঠায় একবার। কিন্তু সেও  
গনদিন সম্ভব নয় তার।

আর কোনদিকে মন দেয়ার মত মনের অবস্থা থাকলে নরেনের  
রিবর্তন চোখে পড়ত বাদল গাঙ্গুলি। হেড অপিস থেকে এক্সপার্ট  
মিটার নামগুলো আসার পর কথাবার্তা দু'চারটে শুণ্ড তার সঙ্গেই  
নড়ে, একটু আদর্শ পূরামর্গও করেছ। কিন্তু মুখেব দিকে ভালো  
র তাকায়নি বোধ হয়।

বাদল গাঙ্গুলির ভিতরে ভিতরে বিদ্রম এক মণীলার লড়াই চলেছে  
গল্প।...এরকম হতে পারে একবারও ভাবিনি। কিন্তু ভাবিনি  
ন সেটাই আশ্চর্য। বেদরকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশিষ্ট কমিটিতে  
পূর বাড়রীর আমন্ত্রণ নতুন কিছু নয়। দেশান বিলডাস-এ থাকতে  
কম অনেক কমিটিতে তাঁকে বোপ দিতে দেখেছে।

ভিতরে বাই সোক, বাইরে শান্ত মুখেই প্রতীক্য করতে লাগল  
। অভ্যর্থনার ভার পড়ল আডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের ওপর।  
ঠ হাউসে থাকবেন তাঁরা। মিটিংয়ের ব্যবস্থাও সেখানকার বড়  
-এ হতে পারে। যেমন ইচ্ছে তাঁদের।

বধা দিনে তাঁরা হলেন। বিকেলে নিজের কোয়ার্টার্স-এ এসেই  
ল গাঙ্গুলি খবর শেল। অথোরে জল পড়ছে তখন। এই প্রথম  
খ করি জলের ওপর বৃষ্টি হল সে। নরেনকে আগেই বলে রেখেছে,  
য পরিদর্শন করানোর ভার তার। একটা গাড়িও মজুত আছে  
দেয় জন্ত। কিন্তু আজ আর কেউ বাইরে বেরবেন না বোধ হয়।

বসে আছে চুপচাপ। ভিতরে শুকিয়ে আসা ক্ষতর মুখে নতুন  
লা একটা। বোম-চাকলাদার ফারের ওপর আর বাগ নেই একটুও।  
খট শিক দিয়েছে। তা ছাড়া অপকর্মে আসল নারক যে তার  
মতি, সে যত্নে দেখেছে। মস্তের পরে অভিযোগ বড় থাকে না

পারনি এখানে। অনেকটাই চাপাচাপির মধ্যে আছে, তাবলে  
মড়াটিকে জানতে বাকি নেই কারো। কিন্তু গোপাপড়া এখন  
আর বোম-চাকলাদার কার্যের সঙ্গে নয়। বোমাপড়া এক্সপার্ট কমিটির  
সঙ্গে...বিপুল বাড়রীর সঙ্গে। একবার তার বিচার করেছিলেন  
ভরলোক। আগারও তাঁর কর্তে এসেছেন বোধ হয়। কমিটির  
আর পাঁচজনও হয়ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সাথ দেবেন। কিন্তু এবারে  
আর সে বিচারের কোন আভাসও বরদাস্ত করবে না।

পবদিনও সকাল থেকেই মাঝে মাঝে জল হচ্ছে, মাঝে মাঝে  
ধামছে। এবট মতোই সদলে ডায় পরিদর্শনে বেরলেন কমিটি।  
কোথার আনন্দেই তাঁরা দেখলেন সবকিছু। কখনো সন্ধ্যাকুকে  
জানতে চাইলেন এটা সেটা, কখনো বা সপ্রশংস উচ্চাঙ্গ জ্ঞাপন  
করলেন। নরেনের সঙ্গে বারকতক দৃষ্টি বিনিময় করছে বিপুল  
বাড়রীর। সপ্রতিভ বিনয়ে নরেন ডায় সক্রান্ত আলোচনাও  
করেছে একটু আদর্শ। কিন্তু পূর্ব পরিচয়ের আভাসও ব্যক্ত হয়নি।

বিকলের দিকে বখানিদিষ্ট মিটিং বসল গেট হাউস-এ।

বাদল গাঙ্গুলি এলো।

নরেন চৌধুরী এমন কি আডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারও এই বেন  
বখাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারের মতিতে দেখল তাকে। সচেতন। সহৃদয়।  
...প্রায় দান্তিক।

বিপুল বাড়রী বাদে বাকি সকলেই সকলরূপে আপায়ন করলেন।  
নরেন পর্যন্ত আশা করেছিল, অমুপস্থিতির দরুণ সৌজন্যহুকে কিছু  
একটা বসবে। কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়ার তার ধার দিয়েও গেল না।  
হেসে পাটা অভিযান জ্ঞাপন করল সকলের উদ্দেশে। তারপর  
তাকালো চেয়ারম্যান বিপুল বাড়রীর দিকে।

এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন বিপুল বাড়রী।  
ক'গ্রাট্যুলাশনস!

তই এক মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময়। হাত মিলাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার।  
থাক ইউ।

চেয়ার টেনে বসল তারপর। সদস্যদের কোনরকম অনুরোধ  
হচ্ছে কি না খোঁজ নিল। অতি বর্ধার প্রসঙ্গ উঠল। ডায়  
কনট্রাকশন সংক্ষেপে তাঁদের মতামত জিজ্ঞাসা করল।

সকলেই প্রশংসা করলেন আর একদম। বিপুল বাড়রী চুপচাপ  
পাইপ টানতে লাগলেন। বিশেষ ফাইলপত্র সব হাতের কাছে  
এনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সে সবের ধার দিয়েও বলেন না  
কেউ। মুখে মুখে আলোচনা চলল, কি হচ্ছে, কি হবে, আরো কি  
হতে পারে।

সবশেষে বোম-চাকলাদারের সিমেন্ট প্রসঙ্গ। মনে মনে প্রস্তুত  
হয়ে নিল বাদল গাঙ্গুলি। সক্ষেপে ঘটনা ব্যক্ত করে জানালো, ওই  
ফারকে ডিসমিস করতে হবে।

কথা উঠল এই নিয়ে। কিন্তু যেসকল ভেবেছিল সেসকল নয়।  
ঘরোয়া আলোচনার মত। সদস্যদের কেউ কেউ কলসেন, এতবড়  
কাজে এই সামান্য বাপায় নিয়ে আর ঝাঁটাঝাঁটি করে লাভ কি।  
এতদিনে ওই ফারের ক্ষতি যথেষ্টই হয়েছে। এতবড় কার্য, এর  
আগে আর বধন কোনো অভিযোগ নেই, একেবারে বরখাস্ত না  
করে এবারের মত গুয়ানি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।  
বিশেষ করে, একে কর্মকর্তাদেরও কিছুটা গলদ আছে বধন। কত

মালের সঙ্গে কতটা সিমেন্ট যেনানো হচ্ছে ট্রাকের সেটা সব সময় দেখে নেওয়ার কথা।

কথাগুলো কতটা নীতিগত এবং কতটা স্বাধীনগত বুঝে উঠল না বাবল গাঙ্গুলি। জামিমেই পাণ্ডা জবাব দিল, ট্রাক কাজই করেছে, কাউকে অবিশ্বাস করেনি এটাই তাদের গল্প। কিন্তু তাবলে অবিশ্বাসের কাজ যিনি করেছেন তাঁকে বরাদ্দ করবেন কি করে?

প্রতিবাদ কেউ করেন না। কিন্তু মৌমাংসাও এখানেই শেষ হল না। বীরা এসেছেন, কেউ তাঁদের মধ্যে ওই ফার্মের প্রতি সহানুভূতিবীল নয়, গলাজলে ঝাড়িয়ে বললেও বাবল গাঙ্গুলি সেটা বিশ্বাস করে না। নরেনের ধারণা, তদারকক এসে সব কথাই একেবারে খুব বুজে সাই দিয়ে চলে যাওয়া রীতি নয় বলেই কমিটি এই প্রসঙ্গ নিয়ে পড়েছে। তা ছাড়া, যুগে বহু সৌজন্য প্রকাশই করুক চিক ইঞ্জিনিয়ারের নিশ্চয় আপ্যায়নে মনে মনে সকলের পক্ষে তুষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকটা যেন নিজের মধ্যেই আলোচনা চলতে লাগল। একজন বললেন, ফার্মের আসল কর্মকর্তা যিনি, তিনি নাকি বহুদিন ধরে নির্বাণ, দুর্ভটনার তাঁর জীবনান্ত ঘটেছে বলেও শোনা যাচ্ছে। অতএব এর পরে আর টানা-ঠেড়া করে লাভ কি। তাছাড়া, হয়ত বা কর্মচারীরাই করেছে এই কাজ, ভয়লোকেরা হয়ত কিছুই জানেন না।

অনেকেই অনুমোদন করলেন। একেবারে জাবিকায় হাত না দিয়ে কড়া ওয়ার্নিং-এ ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলাই সাধ্যমত করলেন তাঁরা।

চিক ইঞ্জিনিয়ারের খুশভাব বরদাতে লাগল। নরেন চৌধুরী এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার দু'জনেরই বেশ অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। বিপুল বাড়ীর দিকে তাকালো বাবল গাঙ্গুলি। সেই থেকে পাইপ টানছেন আর নির্বাণ স্রোতার মত শুনছেন। তাঁর চোপ-বুখে চাপা হাসির 'আভাস দেখল যেন বাবল গাঙ্গুলি। শান্ত মুখে সব ক'জন স্নাতকেই দেখল একবার। পরে স্পষ্ট করে বলল, কিন্তু আমি তাতে হাজি নই।

হালকা আলোচনার অস্বস্তিকর ছেঁচ পড়ল একটা। কিন্তু এসেছেন বীরা, পদবধীদায় সচেতন তাঁরাও কম নন। হেসেই একজন বললেন, এই সাধ্যমত ব্যাপারটা আপনি এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন মি: গাঙ্গুলি, একটু আধটু তুল জট তো লোকে কমাও করে!

আর টিঙ্গনীর মত শোনাল। জবাব দিল, ব্যাপার সাধ্যমত হলে আমি এত সিরিয়াসলি নিতাম না, আশা করি কমিটি সে আশা আমার ওপর রাখবেন। তুল জট আর চুবি দুটো এক জিনিস নয়। কিন্তু আমার অভিমত ওইটুকু চুবির বিকল্পও নয়। আমার অভিমত, যে মনোবৃত্তি আপনাদের ওই ডামের চল্লিশ ফুট চওড়া সেরাণকে বন্ধ করে রাখা করে দিতে পারে তার বিকল্পে। আমার মতে খোঁচ-চাকলাগার কার্গক ডিসমিস করতে হবে।

সকলেই চুপচাপ। বক্তা: সরকারী আদ্রাণে গভীরগতিক পরীক্ষণে আসা, তিক্ততা স্রষ্টী করতে কেউ বড় চান না। কিন্তু বিকল্প উল্লে বা প্রতিদুলতার আভাস পেলে এ রীতি সব সময় খাটে

তারা। সেই বকমই করলেন একজন। হালকা হেসেই বললেন, বরন, আমাদের বতামত যদি অস্বস্তিকর হয়?

—তা হলে আমি ধরে নেব, আপনারা আর কারো ডিসমিসভাল অ্যাক্রত করে যাচ্ছেন।

এরকম একটা জবাব প্রত্যাশা করেননি কেউ। নরেন যেহে উঠতে লাগল। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার কোনো অস্থিরার সুরে পড়া বার কি না ভাবতে লাগলেন। গুরুগভীর পরিস্থিতি। তিলের থেকে তাল হল যেন। একজন প্রবীণ সদস্য বলেই ফেললেন, দিস্ ইজ টু মাচ!

টুক টুক শব্দ হল। টেবিলে আঙুলে আঙুলে পাইপ টুকছেন চোয়ারম্যান বিপুল বাড়ী। অনেকটা আপন মনেই যেন। কিন্তু খুব দেখলে মনে হয়, কোথায় যেন রসের আমেজ লেগেছে। বীরে হুহুে বললেন, ওয়েল জেস্টসমেন, আমার মনে হয় এই ব্যাপারে এবারে আমার কিছু বলা উচিত।

খামলেন আবার। সকলেরই চোখ গেল তাঁর দিকে। বাবল গাঙ্গুলি অন্তর্গত বাড় ফেরাল।

—ব্যাপারটা হয়ত বা কিছুই নয়, আবার হয়ত বা অনেক কিছুই। কিন্তু আসল কথা, এই ডামের সমস্ত দায়িত্ব ধীর ওপর তিনি এই ফার্মকে বিশ্বাস করেন না, আর সেই অনাস্থা নিয়ে কাজও করতে চান না। চান না বরন, তখন আমরাই বা বাইরে থেকে এসে এ নিয়ে জোরজবাব দিই কেন? উই হাত সা মেনি শুড কন্ট্রিবিউস—সা মেনি ইনভিড! কাজেই আমার মতে কাজ যিনি করছেন তাঁর ওপরেই এই ফরমস্কার তাঁর ছেড়ে দিয়ে আমরা এ আলোচনা থেকে বিরত হই—আফটার অল, হোয়েন মি চিক ইঞ্জিনিয়ার ইজ ডুইং মাচ এ ম্যাসনিফিসেন্ট জব!

পকেট থেকে শলাই বার করে নির্বিষ্ট চিন্তে আবার পাইপ ধরাতে লাগলেন তিনি। কেউ আর প্রতিবাদ করলেন না কিছু। বাবল গাঙ্গুলি চেরে আছে তাঁর মুখের দিকে।

খবরটা শোনা মাত্র খুশিতে একেবারে উঠলো উঠল সাধনা। ওরই এক মস্ত দুর্ভাবনার আসান যেন। বড় সমস্তা এসে ছোট অনেক সমস্তা যেমন তলিগে যায়, একদিন তেমনি নিজের কোন কথা ভাবার অবকাশ পায়নি। কেবল মনে হয়েছে, কি হবে, কি জানি হবে। ডাম পরিদর্শনে বীরা আসছেন তাঁদের মধ্যে একটা নাম অপ্রত্যাশিত উত্থাপ করেছে তাকে। তাই প্রথম খবরটা শুনেই আনন্দে আটখানা। বলে উঠল, আমি বলিনি বাবা, এত সহজে গোলমাল কিছু হলেই হল! জোয়ার তো ভেবে সারা!

অবনীবাণ যেমন যেমন শুনে এসেছেন বলতে লাগলেন। অর্থাৎ, কি হল না হল। সাধনা উত্তেজিত, বোম্বাঙ্কিত। বাবা আবার যেখানে বাওয়ার সূচ সঙ্গে তারও মনে হল, যত বসে থাকার কোনো অর্থ হয় না। দুদিন আগেও ভেবেছে, বাইরে বেরনো এ জীবনের মতই ঘুচে গেল। কিন্তু এখন আর সে বকম মনে হল না এক বারও। সঙ্গসঙ্গত বিবৃতির আনন্দে উত্তর হয়ে উঠতে লাগল বাবারা— সঙ্গসঙ্গত বাড়ি গিয়ে হানা দিলে কেমন হয়? কানাক হলে কানাক

বাঁকি নেই সাধনার। এক ভাঁত টিপলে হাঁড়ির ভাঁত চেনা যায়।  
ব সন্নিধান জনিত সম্বন্ধে ভয় ওর গেছে।

তবু বাবে কি বাবে না ঠিক করতেই কিছুকণ পেরিয়ে গেল।  
টিপ জল পড়ছে আবার। ক্রুদ্ধ নেত্র সাধনা আকাশ দেখতে  
ল বাব বাব। আর ভিতরে ভিতরে অধীর হয়ে উঠতে লাগল।  
। জল একটু ধরতেই দরজায় শেকল তুলে দিয়ে সোজা সাধনের  
পা বাঁড়ালো।

...ওর ভয় সম্বন্ধে গেছে, তবু একজনের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে  
পথে, বিভ্রমনার একশেষ হবে। ...মনেবাবু। পা খেমে এলো  
যায়। হয়, হবে। অসহিষ্ণু চরণ অস্থির মুখে ফেলতে এগিয়ে  
আবার। দেখা হলো নিজেই দুখ তুলে তাকাত পাববে না,  
কি!

অন্তমনেব মত নিজের কোঠাটারে দিকে চলেছে বাবল গাঙ্গুলি।  
চিন্তা নেই, উদ্বেগ নেই। তা হ্রাস, অবসানপ্রস্তু। কিছু  
হ না, ভাবতে চাইছে না। কিছু কল্পনামূলক কলকোলাহল  
একটা। নিঃসঙ্গ অবকাশে সোটা আরো সুখের হয়ে উঠবে। ...  
থেকে বিপুল বাড়তি ওর বিকটচরণ করলে খুশি হত বোধ হয়।  
গাক হার মেনে ওর উত্তরমের শিবা অনেকটা নিশ্চিন্ত করে  
ছন।

যেই ভিতরটা আবার অন্ধকার। আলনার কোটা ফলে  
টিপতেই বিষয়ে শুধু একবারে। আরাম কেনারায় সমস্ত  
হত চলে গিয়ে নিঃশব্দ কোঠকে চেয়ে আছে ওই দিক।  
হাসছে বৃহ বৃহ ...।  
নীলা।

কোটা বাঁকুনি খেয়ে সচেতন হল বাবল গাঙ্গুলি। সমস্ত ক্রান্তি,  
অবসান কেটে গেল। সঙ্গ হল। এই মুহূর্তে অন্তত  
চারে সঙ্গ হতে হবে চকিতে উপলব্ধি করে নিল সেটুকু।

নীলা বলল, বিষম অবাক হয়ে গেলে যে ?  
হিটা খুলে বাবল গাঙ্গুলি সামনে এসে দাঁড়াল। জবাব দিল  
চোখে চোখ রাখল। তার চোখেও হাসির আভাস এখন।

নীলা হেসে জিজ্ঞাসা করল, চিনতে পারছে? তো ?  
বহানার একবারে বলল। নিখুঁত হাঁক দিয়ে বলল, চা কর।  
গালো তার দিকে। বলল, কই আর পারলাম। তারপর,  
কি মনে করে ?

মন দেখা সাধনা হয় প্রায়ই। মনে কোন লগও নেই ছাপও  
অন্তত, আগ্রহ কিছু নেই। নীলা জবাব দিল, এলাম বাবাব  
টেবিলের ওপর নিজের কোটের দিকে চেয়ে তেমনি হাসতে  
অন্য অঙ্গ। —কখন আহ ?

নীলা এসেছে জানলে কোটাটা শুধানে থাকত না নিশ্চয়ই।  
গাঙ্গুলির ইচ্ছা হচ্ছিল, ওর সামনেই ওই কোটা আছড়ে ভাঙে।  
এই পরিণতির অপেক্ষাতেই এটা ছিল এখানে। ক্রুদ্ধ জবাব  
চালো।

—এখানে এসে কি সব গোলবোশের কথা শুনছিলাম, মিটে  
!

পাশের দরজা খুলে গিয়েছিল।

তরল কণ্ঠে হেসে উঠল আবার নীলা। যে বকম হাসত।  
হেসে যেমন করে সমস্ত পরিবেশ নিজের দখলে নিয়ে আসত।  
সকোতুকে চেয়ে চেয়ে দেখল আবার একটু। বলল, অর্থাৎ, তবু  
তোমার বাগ কোনদিন পড়বে না, এই তো ?

—তোমাদের ওপর আমার কোন বাগ নেই তো।

নীলা হাসল না এবার, আবার একটু চেয়ে দেখল শুধু। পরে  
বলল, না থাকারই কথা, আজ যে এভাবে এসেছি সেটাই মস্ত গর্ব  
আমার। তবে বাবা খুব অমূল্যবস্ত্র।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে উফ হয়ে উঠছে বাবল গাঙ্গুলি।  
কিন্তু সেটা প্রকাশ হয়ে গেলেই পরান্নয়। ঠাণ্ডা জবাব দিল, মরা  
মানুষ অহতাপ শোনে না।

থমকে গিয়েও আবারও হেসে উঠল নীলা। বলল, এতবড়  
একটা জ্ঞান জিনিস গড়ে তুলছ, মরা মানুষ কি !

—চিফ ইঞ্জিনিয়ার গড়ে তুলছে।

নিখুঁচা দিয়ে গেল। কিন্তু দিয়ে আর বাবে কোথায় ? আগেও  
দরজার আড়ালেই ছিল, আবারো সেখানে এসে দাঁড়াতে বলেই  
তাড়াতাড়ি রাগাধর বন্ধ করতে গেল। ওর বুকের দিকে কেউ  
তাকালে স্পষ্ট দেখত, এই মেয়েটার পুনরাগমন সে একটুও পছন্দ  
করেনি। ফিরে আসতে গিয়েই দু'পা যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল  
নিখুঁচ। বাইরে, আবারো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একজন ...।

সিমিমণি !

সহসা একটা বা থেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে সাধনা। বাইরের  
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যবে আরাম কোনার অধঃশয়ন হাতবুখি  
নারীমূর্তি দেখেছে। দেখে চিনেছে। নিঃসঙ্গ কাঠ হয়ে অন্ধকার  
দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে তারপর।

যেবের মধ্যে নীলা হাসছে তখন। বলছে, ...আমি কবে বাব না বাব  
সে খোঁজে তোমার দরকার কি, আমি যদি আর না-ই বাই, তাহলে ?  
জবাব শুনল, তাহলে আমার কাজের কিছুটা কতি হতে পারে  
এই পর্যন্ত।

তরল হাসি। —তা হলই বা, তোমার থেকে তোমার কাজটাকে  
কবে আর বড় করে দেখেছি আমি !

অম্বে নিখুঁচ ওপর চোখ পড়ল সাধনার। সঙ্গে সঙ্গে মনে  
হল, জীবনে এত বড় দৈজ্ঞ আর আসেনি কখনো। যেমন এসেছিল,  
চকিতে আবার প্রস্থান করল তেমনি।

শ্রুত আশ্চর্যবিশ্রুত।

যেন কোঠাটার দাঁড়িয়ে এসে থামল। একটা পাখরের উপর  
বসল। বসে রইল নিশ্চল মূর্তির মত। অনেকদিন বাদে নরেনবাবু  
সেই কথাগুলো যেন কানে বাজতে লাগল আবার। —ওর জীবন থেকে  
নীলা সরে গেছে ভালই হয়েছে। ...ওই মেয়ে আজও পারে ওর জীবনের  
সব কিছু ওলটপালট করে দিতে, এই কাজ, এই নির্ভা সব কিছু  
তখনচ করে ফেলতে।

কঠোর গাভীরে থমথম করতে লাগল সাধনার সমস্ত মুখ।

কল্পকণ বসেছিল ঠিক নেই। চমকে উঠল একবারে। নিখুঁচ  
সামনে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি কৈফিয়ত দিল, নীলা সিমিমণিকে  
গোকাঁকি হ'উন-এ পৌঁছে দিয়ে ভাবলাম এমিক দিয়ে একটু বুর বাই-...

নিখুঁচ একটু হাসে কেন সিমিমণি ?

সান্না তার দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। তার পর উঠে পাঁড়াল। এমনি বসেছিলাম, এগিয়ে দেবে চলো। 'হুঁচর পা' গিটাই শান্তমুখে জিজ্ঞাসা করল, আমি গিয়েছিলাম বাবুকে বলেছি নাকি ?

নিধু অমনবদনে ঘাড় নাড়ল, বলেনি।

কিন্তু বলেছে। পৌঁছে দেবার জন্ত নীলা দিমিগির সঙ্গে কোয়ার্টারস-এর বাইরে এসেই চট করে আবার ফিরে গিয়ে বাবুকে জানিয়ে এসেছে, ওভারসিয়ার দিমিগির এসেছিল, এসেই চলে গেছে। বাবুর মুখভাব অবলোকন করার অবকাশ অবশ্য পায়নি। তখনই চলে আসতে হয়েছে। কিন্তু আর একজনের সম্বন্ধে বাবুকে সচেতন করার কর্তব্যটা কিছুটা যেন না করে পারেনি নিধুবাম। নীলা দিমিগিরকে পৌঁছে দিয়ে তারপর জেনারেল কোয়ার্টারস-এর দিকেই দ্রুত পা চালিয়েছিল সে। এখানে এমন দেখা হয়ে যাবে ভাবেনি।

গড় গড় করে বাবুর গুণকীর্তন করতে লাগল নিধু। সাবাক্ষণ নীলা দিমিগির সঙ্গে একটুও ভালো 'ব্যাভার' করেনি তার বাবু। সব কথার কড়া কড়া জবাব দিয়েছে। কাল সকালে ডাম দেখাতে হবে বলেছিল নীলা দিমিগির, কিন্তু বাবু 'পষ্ট' জবাব দিয়েছে, তাঁর সময় নেই, অল্প লোক সঙ্গে দেবে দেখাবার জন্ত। নীলা দিমিগির বলেছে, ক'দিন হুঁটা নিয়ে কলকাতায় আসতে। বাবু বলেছে সময় নেই। নীলা দিমিগির তর্ক করতে ছাড়েনি, বলেছে সরকারী কাজ কারো জন্ত আটকে থাকে না। ওর বাবু সে কথার জবাব পর্যন্ত দেয়নি, ইত্যাদি—

কিন্তু এত বলার পরও যুথের দিকে চেয়ে নিধুব মনে হল, অশাশ্বিত্য ঠিক জায়গা মত পৌঁছুল না। বতই বলুক, ওর ভিতরেও নাড়াচাড়া পড়েছে একটা। কিছুক্ষণ চূপচাপ থেকে এবার আশ্বে আশ্বে নিজের দুশ্চিন্তা প্রায় স্বীকারই করল যেন, বাবু তার হত কড়া 'ব্যাভারই' কহুক, দিনকন্তক এরকম দেখা সাক্ষাৎ হলে আবার সব ভুলে যাবে, বড় জ্বরদন্ড দিয়ে এই নীলা দিমিগির—

ঘাড় ফিরিয়ে এবার কার দিকে তাকালো সান্না। এতক্ষণ শুনছিল চূপচাপ। সন্তর্পণ আগ্রহে শুনছিল। কিন্তু শোনার কিছু নেই আর। তাছাড়া এর পরে চূপ করে থাকাও বিসদৃশ। প্রায় ফক্ষকটেই বলে উঠল, কি বকছ বকর বকর করে, আর আসতে হবে না, এবারে বাড়ি যাও।

নিধু কাঁড়িয়ে পড়ল।

সান্না এগিয়ে চলল হন হন করে।

মন্ত এক দুর্ভাবনা নিয়ে বসে আছেন অবনীবাবু। কোথায় কোথায় বন্ধা হচ্ছে, কোন্ কোন্ জায়গা ভেসে গেল, কোথায় কি রকম ক্ষতি হয়েছে,—একটু আগে সেই বৃত্তান্ত শুনে এসেছেন অবনীবাবু। এই বন্ধার ভাবগতিক ভাল নয় মোটেই, মেয়ের কাছে সেই দুর্ভাবনার ফিরিস্তি দিতে লাগলেন তিনি।

কোন উদ্বেগ প্রকাশ করল না সান্না, বা একটি কথাও বলল না। যুথের দিকে চূপচাপ চেয়ে রইল।

এক বর্ণও কানে ঢোকেনি তার।

রাত্রি। ঘরের আলো নিবানো। জানালার গরাদ ঘরে মূর্তির মত সান্না কাঁড়িয়ে। বাইরে অন্ধকার। আকাশে তারা নেই একটাও। দূরের এক কোণে অন্ধকার ফুঁড়ে বিদ্যুৎ চিকচিকিয়ে উঠছে এক একবার।

ইচ্ছে করেই নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছে সান্না। যে মূর্তি সভয়ে পরিহার করেছে বরাবর, নিজেকে দৃঢ় করে তাই নিঙড়ে নিয়ে আসছে চোখের সামনে।

...ওর মায়ের সেই মূর্তি।

...শেষের দিকে পুরোপুরি মাথা খারাপ হয়েছিল মায়ের। মাটির আগুন আটপ্রহর ধিকি ধিকি বুকে জ্বলছে। বোবা ব্যথার সান্না সেই ঝলসানো মূর্তি চেয়ে চেয়ে দেখেছে। মা নয়, একখানা জলন্ত কঙ্কাল। কাছে যেতে ভয় হত, ছুঁতে ভয় হত। শেষ বুকফাটা তৃষ্ণায়ও এক কোটা জল দিতে পারেনি যুথ। যুথ হুঁরিয়ে নিয়েছে, বলেছে, জল তুই কোথা পেলি ?

...জল নেই কোথাও, জল পেলি কোথায় তুই ?

...জল নেই, জল নেই, ও জলন্ত আগুন !

...গলানো আগুন ঢালতে এসেছিস তুই আমার যুথ, অ্যাঁ ? দূর হ' ! দূর হ' আমার সমুখ থেকে ! দূর হ' !

...সেই তৃষ্ণাট মূর্তির ওপর শাস্তির সমাধি উঠছিল। মারাবিনী এসেছে তার নিবিষ্টতার ভাঙন ধরতে।

দিগন্তে মুহুঁহু বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছে।

[ আগামী বারে শেষ। ]

## শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্রিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবীর কাছে সামাজিকতা বন্ধ। করা যেন এক দুর্নিবহ বোঝা বহনের সামিল হয়ে কাঁড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, রেষা আৰ ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কাহও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ-বাধিকান্তে, মর্যতো কাহও কোন কৃতকার্যতায় আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধ'বে তার মূর্তি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী'। এই উপহারের জন্ত প্রস্তুত আবরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা ভেদে ধনী হবেন, সম্ভ্রান্তি বেশ করবে শত এই ধরণের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এক এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে বেকোন জাতবোর জন্ত লিখন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী কলিকাতা



## শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

ছদ্ম

চন্দ্রনাথ বেরিয়ে যাওয়ার দিন দুই পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা  
খাওয়ার টেবিলে মিসেস ব্রেক বললেন—“কাল একজন অতিথি  
ছন আমার বাড়িতে। দিন তিন চার থাকবেন।”

বললাম, “কে অতিথি?”

মিসেস ব্রেক মুগ্ধ হেসে বললেন, “আপনার ধ্যানস্থ মনের ধ্যান  
যদি একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখেন—ভালই লাগবে।”

ললাম, “ধ্যান ভাঙ্গা না ভাঙ্গা নির্ভর করে ধ্যান ভাঙ্গানো  
উপরে। তাঁর যদি সে শক্তি থাকে, ধ্যান নিশ্চয়ই ভাঙ্গবে।”

ললেন, “তাঁর সে শক্তি আছে বলেই ত আমার বিশ্বাস। অবশ্য  
দিন তাকে দেখিনি।”

ধালাম, “যাহ্নটি কে?”

ললেন, “আমার ছোট খুড়তুতো বোন—নাম ভিভিয়েন মিস  
জ।”

লাম, “ও—মিস?”

মুঠেলে বললেন, “কেন—হতাশ হলেন নাকি?”

লাম, “আমার আর হতাশ হওয়া না হওয়ার কি আছে?”

লেন, “তা বটে। তবে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ  
এ রকম প্রাণবন্ত মেয়ে খুব কমই দেখেছি।”

লাম, “এমনি বেড়াতে আসছেন বৃথি?”

লন, “না। লগুনে একটা কাজের জগ্ন দেখা করতে আসছে।  
যেটি কাজ করে—লগুনে একটা ভাল চাকুরীর যোগাযোগ  
তাই আসছে।”

চূপ করে থেকে আবার বলে যেতে লাগলেন, “আমারই  
ভী—লিডনীর কাছে উলটান গ্রামে, মেয়েটি সেই গ্রামেই  
ছে—একবারে পাড়ারগেয়ে ছিল। তবে চার পাঁচ বছর  
। নেই—এখন হয়ত অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ব্রিটলের  
ত আছে অনেক দিন।”

র, “হঠাৎ চিঠি পেলেন বৃথি?”

ন, “চিঠিপত্র ওর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে চলে। আমি  
গুকে লিখেছি—আমার এখানে বেড়িয়ে যাওয়ার জগ্ন।

র ওঠেনি। কাজে হুঁ-চার দিন ছুটি গেলে গ্রামে মার  
—মা এখনও বেঁচে কি না।”

র, “বাণ বেঁচে নেই?”

“না। আমার কাঁকা অনেক দিন যারা গেছেন। একটি  
শ্য আছে, সেই গ্রামের জমিজমা ইত্যাদি দেখানো  
রটিকে আমি বড় ভালবাসি। প্রথম জীবনেই মেয়েটি  
শ্রীমতী পদবী

বললেন, “তখন ওর বয়স কত হবে—সত্তেরো আঠারো। গ্রামের  
একটি ছেলেকে ও ভীষণ ভালবেসেছিল। ছেলেটিও ছিল চমৎকার।  
হুঁজনের বিবাহ ঠিক হয়ে গেল। এমন সময় এলো যুদ্ধ। ছেলেটি  
যুদ্ধে গেল, আর ফিরল না।”

কেন জানি না, মনে মনে মেয়েটির বর্তমান বয়সের একটা আন্দাজ  
করে নেওয়ার কৌতূহল হল।

সুধালাম, “সে আজ কত দিন হবে?”

বললেন, “বছর সাত-আট হবে।”

খাওয়া-দাওয়ার পর মিসেস ব্রেকের গান-বাজনা শুনে একট  
সকাল সকালই শুতে গেলাম—বাইরে সমানে বৃষ্টি হচ্ছিল। বিছানার  
শুয়ে সহজেই বুঝতে পারলাম—মেয়েটিকে দেখার সতাই একটা  
কৌতূহল জেগেছে মনে।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গে দেখি, মনটা বসিও অল্প দিমের  
মতনই ভারি, তবুও ভারটা আজ যেন কতকটা সহনীয় বলে মনে  
হচ্ছে—যেন কিসের একটা নতুন আগ্রহে। কিসের আগ্রহ,  
ভেবে বুঝতে কতকটা যেন সময় লাগল।

সহর থেকে এলটাম পার্কে যখন ফিরে এলাম তখন ঘড়িতে চারটে  
বাজে—বিকেল আর নয়, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। শীতকালে এ  
দেখে চারটে বাজতে না বাজতেই সন্ধ্যা হয় শুরু।

এলটাম পার্কের বাড়ীর কাছাকাছি এসে হঠাৎ মনে পড়ল—আজ  
বাড়িতে একটা নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হবে। মেয়েটির কথা  
সকালবেলা অবশ্য মনে হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত দিন একেবারে ভুলেই  
গিয়েছিলাম। সকালবেলা, মেয়েটির চেহারা ধরণ-ধারণ, সবই  
মিসেস ব্রেকের কথার ভিত্তিতে, মনে মনে কল্পনার একটা  
ছবিতে যে গড়ে ওঠেনি—এমনও নয়। জীবনে একটা আঘাত  
পেয়েছে—অন্তএব বিষয় শাস্ত দুটে বড় বড় চোখ, স্থির ধীর সমাহিত  
ধরণ-ধারণ। মিসেস ব্রেক বলেছিলেন—প্রাণবন্ত। অন্তএব একটা  
ভীষণ বৃদ্ধির দীপ্তি সারা অঙ্গ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। একহারা  
গড়নের পরিপাটি সামঞ্জস্য যে মিসেস ব্রেকের কোন কথার ভিত্তিতে  
মনে জেগেছিল—বলতে পারি না।

বাড়ীর দরজা খুলে বাড়ীতে ঢুকই দেখি—মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে  
নেমে আসছে, সোতলা থেকে একতলার। তখন সন্ধ্যা হয়েছে,  
তাই আলো জ্বলে ঘরে। সিঁড়ির উপরে টানানো একটা উজ্জল  
বৈজ্ঞানিক আলোতে মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখতে গেলাম—কল্পনার  
যে ছবি পড়ে উঠেছিল, এতদূরারই তা নয়। একহারা মোটেই  
নয়—বেশ হঠপুঠি লম্বা গড়ন এক বড় একখানা মুখে দুটো অতিবিক্ত  
বড় বড় চোখ, শান্ত বিষম ত নয়ই বরং একটা অনাবিল উজ্জল

মাথার বাহার—তাও যেন একটু অতিরিক্ত বলে মনে হল, মনকে আনন্দ দিল না বরং একটু গীড়াই দিল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই একগাল হেসে বললেন—“আপনি ত মিটার চৌধুরী ? শুভসন্ধ্যা !”

বললাম, “হ্যাঁ—শুভসন্ধ্যা ! আপনি ত’ মিস্ কার্টারিজ ?”

হেসে মাথা নাড়িয়ে বললে, “না।”

একটু অবাক হলাম। তবে ইনি কে ? মিস কার্টারিজের সঙ্গে বোধ হয় আর কেউ এসেছেন ?

ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমার গায়ের ওভার-কোটটি খুলতে আমাকে সাহায্য করে। ওভার-কোটটি আমার হাত থেকে নিয়ে ব্যালিয়ে রাখল আলনায়। তারপর আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাথাটি ঈষৎ হেলিয়ে মুখে একটা হুট্ট, হাসি মাখিয়ে বললে, “আমি ভিড়িয়েন। কেউ মিস কার্টারিজ বললে ভয়ানক রেগে যাই।”

হেসে বললাম, “ও !”

বললে, “কথাটা মনে থাকে যেন।”

খাওয়ার টেবিলে বসে মেয়েটির অনঙ্গ কথায় প্রায় যেন হাঁপিয়ে উঠলাম। এত কথা বলে যে, আর কাউকে কথা বলার সুযোগই দেয় না। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে সে না জানে কি ? এইটেই বিশেষ করে আমাকে বোকাবার জন্ত যেন উঠে-পড়ে লাগল। অমন স্বন্দর দেশ পৃথিবীতে আর স্থিতিরীট নাই—চিরবসন্তের দেশ—না শীত না গরম ; ভারতবর্ষের লোকদের আপনা থেকেই একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে—তার মাঝবের মুখের দিকে চেয়েই তাদের ভবিষ্যৎ সহজেই বুঝতে পারে। ভারতবর্ষের মেয়েদের নাচ গান, বিশেষতঃ তাদের রং-বেগ-এর শাড়ী—আহা কি স্বন্দর ! ভারতের খাবার বিশেষ করে কারি—আহা যেন অমৃত, জীবনে এত সুখাত্ম সে কখনও খায় নি ; সে একবার বাবেই ভারতবর্ষে—ইত্যাদি কথায় আমাকে অভিভূত করে ফেলার কি প্রচেষ্টা !

মিসেস ব্রেক এক কীক একটু হেসে বললেন—“অসম্ভব ভারতবর্ষের মেয়েদের মুখ বড় মিষ্টি হয়। মিসেস চৌধুরীর ছবি দেখেই সেটা আমি বুঝতে পেরেছি।”

মেয়েটি যেন একটু অবাক হয়ে বললেন—“মিসেস চৌধুরী ! আপনার বিবাহ হয়েছে না কি ?”

একটু দৃঢ়ভাবে বললাম “হ্যাঁ।”

মেয়েটি চুপ করে গেল—বড় জোর মিনিট পাঁচ এর জন্ত।

গুথালাম—“আপনি ভারতের বিষয় এত খবর পেলেন কি করে ?”

বললে—“আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব সে দেশ ঘুরে এসেছে, তাদের কাছে শুনেছি। বইও পড়েছি অনেক। ভারতের বিষয়ে আমার একটা স্বাভাবিক কৌতুহলও আছে।”

বললাম—“তুনে খুশী হলাম।”

একবার আমার মুখের দিকে কেমন এক রকম করে একটু পরেই তাকিয়ে—যেন যন্ত একটা সত্য ধরে ফেলেছে—এই রকম একটা চাপা হাসিতে চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল করে গুথাল—“আপনি নিশ্চয়ই শুণ্ড রাজকুমার !”

অসম্ভব হয়ে গুথালাম “তার মানে ?”

বড় রাজা-মহারাজা আছে—কোটি কোটি টাকা তাদের আয়। তাদের ছেলেরা অনেক সময় সত্য গোপন করে এ দেশে বেড়াতে আসে, এ দেশের শিকা-দাকা ভাল করে বুঝে নেওয়ার জন্ত। আপনি নিশ্চয়ই তার একজন ?

“হেসে গুথালাম—“কি করে বুঝলেন ?”

বললে—“তাদের শুনেছি খুব অল্প বয়সে বিবাহ হয়। আপনার যখন এত অল্প বয়সেই বিবাহ হয়েছে—”

বললাম, “তখন আমি নিশ্চয়ই রাজকুমার—এই ত ?”

বললে, “তা ছাড়া আপনার চেহারা ধরণ-ধারনের মতোও কথাট প্রকাশ হয়ে পড়ে।”

“হেসে বললাম—“বাক্, আপনার বিশ্বাস ভাঙ্গতে চাই না।”

খাওয়া শেষ হয়েছে। মিসেস ব্রেক মুখে শুধু একটা চাপা হাসি মাখিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বললাম—“আপনি একটা অত্যাচার করে ফেললেন।”

গুথাল—“কি রকম ?”

বললাম—“আমার এত বড় গোপন সত্যটি মিসেস ব্রেকের সামনে মিলে প্রকাশ করে—”

বললে—“ও ক্লার। তা ক্লার কাউকে কিছু বলবে না। ও চাপা মেয়ে।”

রাত্রি খাওয়া-দাওয়ার পর মিসেস ব্রেকের বসবার ঘরে গা বাজনার আসর বসল। মিসেস ব্রেক একটা সুর বাজাবার প আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “ভিড়িয়েন খুব ভাল গান গায়। খবরটি আপনি এখনও জানেন না মিঃ চৌধুরী।”

বললাম—“বেশ ত। শুনি ওঁর একখানা গান।”

তৎক্ষণাৎ মিস কার্টারিজ পিয়ানোর ধারে গিয়ে দাঁড়াল এবং গান হল শুরু। অত্যধিক উচ্চকণ্ঠে গলা কাঁপিয়ে সমস্ত গা হুঁ গান গাইতে শুরু করল—অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল, ঘর পালিয়ে বাই। গানটা শেষ হলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মিসেস ব্রেক বললেন—“কি রকম লাগল ? গলা অদ্ভুত না ?”

বললাম—“সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।”

হঠাৎ উঠে পাঁড়লাম। বললাম—“আপনারা যদি আমাকে শ করেন—আমি একটু বেড়িয়ে আসি।”

তৎক্ষণাৎ মিস কার্টারিজ বলল, “হ্যাঁ, খুব ভাল কথা। আঁ মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসি। সমস্ত দিন বাড়ী বসে প্রায় হাঁপিয়ে উঠছি।”

সত্যিই মহা বিপদে পড়লাম। এই মহিলাটিকে নিয়ে এল পার্কে বেড়াতে যাওয়ার আমার আশে ইচ্ছা ছিল না। করিই বা কি। মিসেস ব্রেককে বললাম, “আপনিও চলুন।”

গভীর ভাবে বললেন, “না। একটা সুর আজ আঁ পিয়ানোর ভাল করে আয়ত্ত করতেই হবে।”

সাধারণতঃ এ রকম গভীর ভাবে “কথা মিসেস ব্রেক বলেন কি হল ? কিছু কি অপরাধ করে কেসেছি ?”

রাত্রির বেরিয়ে হুঁ-চান পা যেতেই মিস্ কার্টারিজ :

শুধালাম—“কেন বলুন ত? কিছু কি অজ্ঞার হলো?”

হেসে বললে—“অজ্ঞাটী আপনার নয়, আমার কিবা হয়ত হুঁজনারই।”

শুধালাম—“কেন? কি হল?”

হেসে হেসে বলতে লাগল—“যদিও ওর বয়স খুব বেশী নয় কিন্তু ও ভয়ানক সেকেলে। আধুনিক মেয়েদের মনোভাব চাল-চলন ও যেন বুঝতেই চায় না। ভুলে যায় জগৎটা ক্রমেই অনেক এগিয়ে যাচ্ছে।”

শুধালাম—“কি রকম?”

বলল—“এই রাত্রে এক জন বিবাহিত যুবকের সঙ্গে আমার একলা বেড়াতে বেরুনাটা ওর ঠিক পছন্দসই হল না।”

শুধালাম—“তা হলে এসেন কেন?”

বলল—“আমার বয়েই গেল। ওর পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে জীবনে আমাকে চলতে হবে না কি?”

ক্রমে হুঁজনে এসে পড়লাম এলটাম পার্কে। অগ্নমন্ড ভাবেই হেটে চলে এলাম—ভেবে পথ ঠিক করে আসিনি। এতক্ষণ মেয়েটি ফুটপাথের উপর দিয়ে আমার প্রায় গা ঘেঁষে চলছিল। এলটাম পার্কে চুকতেই হঠাৎ আমার ডান হাতটি টেনে নিয়ে নিজের বাঁ হাতের বগলের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে ধরল। হেসে বলল—“এ রকম ভাবে না চললে লোকে ভাববে কি? ভাববে—হয়ত আমাদের ঝগড়া হয়েছে।”

বললাম—“ভাবলেই বা কি এসে-যায়?”

বললে—“সে আমি সহ্যে পাব না।”

কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ডান হাতখানা টেনে সরিয়ে নেওয়ার যে ইচ্ছে হয়নি এমন নয়—কেন না, ও ভাবে চলতে একটু অস্বস্তি অনুভব করছিলাম মনে। কিন্তু ঐ কান্ডটুকুর মধ্যে যে রূঢ় ব্যবহার করার শক্তির প্রয়োজন, সত্য কথা বলতে গেলে তা আমার ছিল না। তাই ঐ ভাবেই চলতে হল। চলতে চলতে মেয়েটির অঙ্গের ভরা যৌবনের ঢেউ যে আমার অঙ্গ একেবারেই স্পর্শ করেনি—এমত কথা বলতে পারি না।

চলতে চলতে মেয়েটি শুধাল—“আচ্ছা, একাধিক বিয়ে আপনার দেশে চলে। তাই আপনার মতন শুণ্ড রাজকুমার প্রায়ই ত এদেশে এসে আবার একটা বিয়ে করেন—না?”

গম্ভীর ভাবে বললাম—“তা তাদের কথা আমি কি করে বলব?”

একটু যেন বেশী গা ঘেঁষে নাখাটা দ্রব্য আমার মাথার নিচে হেলিয়ে বললে—“আপনি কি ছটু! আপনার ঐ মিটি মুখখানি মধ্যে এত ছটু মি লুকিয়ে রাখেন কি করে?”

বেশীক্ষণ বেড়াইনি। ঠাণ্ডা লাগার ছুতো দিয়ে শীতাই যিনে এলাম। যিনে এসে হুঁ-চাষটি কথা বলে হুঁজনেই শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেলাম শোবার ঘরে।

বিছানার শুয়ে পড়ার পর সুধার মিটি মুখখানি আজ বেশ বিশেষ করে আমার শেষে বসল—মনটা বড়ই আকুল হল সুধার জন্য।

সুখীন্দ্র মুখশী

নিয়মিত “বোরোলীন” ব্যবহারে আপনার  
তুখী দিন দিন উজ্জ্বল ও কমনীয়  
হয়ে উঠবে।

মুখশীর কোমলতা ও সজীবতা বজায়  
থাকবে। এর প্রাণস্পর্শী বিন্দু সুবাস  
আপনার মনে আবেগময় অনুভূতি

এনে দেবে।

উদ্ভাসের কেসড্রীম

বোরোলীন

পরিবেশক

জি, দত্ত এণ্ড কোং

১৬, বনবিহীন সেন, কলিকাতা-১

সকল ইলেকট্রিক ও ডাকঘরখানায় পাওয়া যায়।





পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে আর মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলো না। মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করতে মিসেস ব্রেক গভীর ভাবে বললেন—“তিনি বিহানায় গিয়ে আরাম করছেন—এখনও ওঠেননি।”

সহরে গিয়ে নিজের কাজকর্ম সেরে সোজা বাড়ী না ফিরে চলে গেলাম চন্দ্রনাথের বাড়ীতে তার সঙ্গে খানিকটা গল্প করবার জন্য। বিশেষ করে এই মেয়েটির গল্প তাকে বলবার প্রবল আগ্রহ হয়েছিল মনে।

চন্দ্রনাথ সমস্ত কথা শুনে ত হেসেই অস্থির। তারপর বললে—“দেখো হিঁ গুপ্ত রাজকুমার! এ মেয়েটিকে যেন রাণী বানিয়ে না।”

বললাম—“রাণী বানাব। ওকে দেখলেই ত আমার পালাতে ইচ্ছে করে।”

চন্দ্রনাথ বলল—“ওটাও ভাল লক্ষণ নয়। বেশী বিরাগ অম্বুরাগেরই সূচনা।”

তারপর বলল—“বাই হোক, ওকে কিন্তু তুমি বেশী আমল দিয়ো না।”

বললাম—“আমি আমল দিই না-কি! এমন গায়ে-পড়া মেয়েও আমি আমার জীবনে দেখিনি।”

বললে—“জীবনে কটা মেয়েই বা দেখেছ? এ দেশে অনেক রকমের মেয়ে দেখতে হবে। তোমাকে ত আমি চিনি—তাই বলি একটু বুঝে চলো।”

নানান কথাবার্তার প্রায় ঘণ্টা দুই চন্দ্রনাথের কাছে কেটে গেল। বাড়ী ফিরে এলাম তখন ঘাড়া ছটা। বাড়ীতে ঢুকেই প্রথমেই দেখা হলো মেয়েটির সঙ্গে। প্রায় ছুটে এসে আমার হাতখানা ধরে হেসে বলল—“আপনি ত ভীষণ লোক!”

ওখালাম—“কেন কি হল?”

বললে—“মামুষকে এত ভাবাতেও পারেন! শুনেছি—সাধারণতঃ আপনি চারকটর মধ্যেই ফিরে আসেন, আর আজ ছটা বেজে গেল।”

গভীর ভাবে বললাম—“কাজ ছিল।”

সাপার টেবিলে আবার বসে হল মেয়েটির সেই অনর্গল কথা। আজ অবশ্য বেশীর ভাগ কথাই—থিয়েটার, থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রী এবং বিশেষ করে যার বিষয় আমি কিছুই জানি না, অপেরার সায়ক-পারিকাসের নিয়ে আলোচনা। এই আলোচনা প্রসঙ্গে অপেরা পারিকাসের অন্তরকণে কোনও কোনও গানের দু’একটি পদ মেয়েটি খেতে খেতেই হ’ হ’ করে গেয়ে ওঠল। সব সময় সব বিষয়ে সব কথায় নিজেকে কাহিনী করে লোককে মুগ্ধ করার কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই মেয়েটির চরিত্রে—সেটা সত্যিই লক্ষ্য করার জিনিষ।

সহসা মেয়েটি প্রস্তাব করে বলল—“কালকের দিনটাও ত আমি আছি। চলুন মি: চৌধুরী! কাল একটা থিয়েটার দেখে আসা থাক। উইনডোয়াম থিয়েটারে সার জিবন্ডি ডুমরিয়ান-এর বই আছে।

“এক্স স ফু”—তুনেছি খুব ভাল।”

আমি হঠাৎ কি উত্তর দেব, ঠিক করতে না পেয়ে মিসেস ব্রেকের দৃষ্টি দিকে তাকালাম।

মিসেস ব্রেক বললেন, “কাল আমার বাওরীও সম্ভব নয়।”

মেয়েটি তবুও নাছোড়বান্দা, বললে—“আপনি আমাকে নিয়ে চলুন মি: চৌধুরী!”

বললাম, “আমারও ত কাল বাওরী মুখিল।”

মেয়েটি বলল, “বেশ আমি একলাই যাবো। লণ্ডনের ভাল একটা থিয়েটার না দেখে আমি ফিরছি না।”

নানান কথা চলল। কথায় কথায় কি প্রসঙ্গে মনে নাই, মেয়েটি বলল, “আমি ভারতীয় সিদ্ধ ভয়ানক ভালবাসি। ভারতীয় সিদ্ধের তুল্য কাপড় ত জগতে দ্বিতীয় নাই। আমার ভারতীয় সিদ্ধের অনেক শোষাক আছে—এখন ত পরা চলে না। গ্রীষ্মকালে পরি।”

ক্রমে খাওয়া শেষ হল। মিসেস ব্রেক খাওয়ার জিনিষ-পত্র গুছিয়ে, তুলে রাখার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মেয়েটি মুখে একটু চাপা হাসি মাখিয়ে বলল, “ভারতীয় সিদ্ধের খুব ভাল নাইট ড্রেস (রাত্রে পরে শোবার শোষাক) আছে আমার, আপনাকে দেখাবো। নিশ্চয়ই খুশী হবেন।”

মিসেস ব্রেক ঘরে ঢুকে পাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “গান-বাজনার আসর আজ বসবে, না আপনারা বেড়াতে যাবেন?”

মহা উৎসাহে তৎক্ষণাৎ বললাম, “নিশ্চয়ই গান-বাজনা শুনব। আজ আর বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।”

বলে যেন ঝিচলাম। থিয়েটারে বাওয়ার অম্বুরোধ উপেক্ষা করেছি, যদি একটু বেড়িয়ে আসার অম্বুরোধ আসে—উপেক্ষা করার শক্তি হয়ত পাব না।

পরের দিন সকালবেলা মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল—মিনিট পাঁচ-এর জন্য। আমি যখন তৈরী হয়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য নীচে নেমে এলাম, দেখি মেয়েটি বেকবার জন্য তৈরী হয়ে সদর দরজার কাছেই পাড়িয়ে আছে। হেসে বললে, “সুপ্রভাত! আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সিঁড়িতে আপনার পায়ের শব্দ শুনে পাঁড়লাম।”

বললাম, “ধন্যবাদ! আজ এত সকাল সকাল বেরুচ্ছেন?”

বললে, “হ্যাঁ—আজ অনেক কাজ। কাল সকালেই ত চলে যাবো। এখনই বেরুতে হবে, ইতিমধ্যেই আমার সেরী হয়ে গেছে। চলি—কেমন?”

এই বলে দরজার কাছ থেকে হাত নেড়ে আমাকে বিদায় সন্ধ্যাৰ জানাতে জানাতে চোখে-মুখে কি রকম বেন একটা হুঁহু হাসি মাখিয়ে বললে, “আজ সন্ধ্যাবেলা সাপারে আমি থাকব না। রাত্রে যেন নিশ্চয়ই দেখা হয়।”

এক কথাগুলি বলেই দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই মিসেস ব্রেক খাবার ঘরে ঢুকলেন ব্রেকফাস্ট নিয়ে।

সুপ্রভাত জানিয়ে বললাম, “মিস কার্টারিজ আজ সন্ধ্যাবেলা সাপারে থাকবেন না বলে গেলেন।”

মিসেস ব্রেক বললেন, “না। উনি আজ সমস্ত দিন লণ্ডনে কাটিয়ে থিয়েটার দেখে রাত্রে বাড়ী ফিরবেন।”

বললাম, “একলাই সত্যি শেষ পর্যন্ত থিয়েটারে গেলেন?”

একটু বেন বিরক্ত-মাখানো সুরে বললেন, “ওর আবার একলা! লোক ছুটিয়ে নিতে ওর আর কতকণ?”



ঘড়িতে চেয়ে দেখলাম, রাত বারোটা বাজতে দশ মিনিট। মিসেস ব্রেককে 'ওভারড্রি' জানিয়ে শোবার ঘরে এসে লেপের নীচে শুয়ে শুয়ে প্রতক্ষণ একথানা বই পড়ছিলাম। ভাবলাম, এইবার আসো নিবিয়ে চাখ বুকে তোমাদের কথা একটু ভাবি। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ব।

হঠাৎ দরজার খুট খুট করে কে যেন বাইরে থেকে অতি সন্তর্পণে বাওয়াজ করল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঈষৎ খুলে মুখ বাড়ালো, মিস গার্লারিজ। একগালি হেসে চাপা গলায় শুধাল, "আসতে পারি?"

এ দেশের নীতি অমুসারের পুরুষদের শোবার ঘরে পুরুষ থাকলে ময়েদের ঢোকা অত্যন্ত অশ্রদ্ধা, বিশেষতঃ পুরুষদের পরিধানে যদি বোদন্তর পোষাক পরা না থাকে। আমার পরিধানে তখন শুয়ে ডার পোষাক, তাই উত্তরে আসতে বলিই বা কি করে? কিন্তু যেটি আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সটান ঘরে চুকে এসে যতটা শব্দে সম্ভব দরজাটি ভিতর থেকে দিল বন্ধ করে। এগিয়ে এলো টের কাছে, অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম, পরিধানে প্রায় কোনও বস্ত্রই ই, কেবল একটা পাংলা সিকের পোষাক—তোমরা যাকে সেমিজ 'তাই'; অর্থাৎ ময়েদের শোবার পোষাক। এই পাংলা সেমিজের তর দিয়ে সর্ব্বাঙ্গের সাদা ধবধবে রং বৈজ্ঞানিক আলোতে যেন মরে বেরুচ্ছিল।

সর্ব্বাঙ্গ তুলিয়ে বললে, "আপনাকে বলেছিলাম ভারতীয় সিকের ট ড্রেস আপনাকে দেখাব। এই দেখুন। গায়ে পরে যে কি পাম!"

বললাম, "ভাল।"

বললে, "হাত দিয়ে দেখুন, কি মোলায়েম।"

ময়েটির এই স্পষ্ট বেজায়পণার আমার শরীর-মন ক্রমেই যেন চিত হয়ে আসছিল। কোনও রকমে হাত বাড়িয়ে পোষাকটির ট কোণ একটু স্পর্শ করে বললাম "হ্যাঁ।"

ময়েটি বলল, "উঃ, কি শীত, আমি যেন জমে বাছি। আজ বন্ধুর সঙ্গে ডিনারে অন্তত চার গ্লাস শ্রাম্পেন্ থিয়েছি—ছিলাম ঠাণ্ডা লাগবে না—কিন্তু তা ত নয়।"

এতকণে লক্ষ্য করলাম—কথা সত্যিই একটু জড়ান। ব্লা! ধ্য হযো না। এ দেশের ময়েরা প্রায় সকলেই কম-বেশী মদ-তাতে কোনও সোব নেই এ দেশের নীতিতে।

ঠাৎ মিসেস ব্রেকের কথা মনে পড়ল। ছিঃ ছিঃ—তিনি এই র ময়েটির আমার ঘরে আসার খবর টের পেলো কি মনে ।। আমাকে নির্দোষী কখনই ভাববেন না।

শুধালাম, "মিসেস ব্রেক কি শুয়ে পড়েছেন?"

কথায় একটু চাপা বকমের খিল-খিল হাসি মাথিয়ে বলল, "উঃ, ক্ল্যারকে আপনি এত ভয় করেন? ভয় নেই গো ভয় নেই—অন্ত কাঁচা মেয়ে আমি নই। ক্ল্যারার ঘরের দরজা অনেকক্ষণ বন্ধ হয়েছে।"

চুপ করে শুয়ে রইলাম কিছু না বলে। হঠাৎ যেন আর কাঁড়াতে পাচ্ছে না—এই ভাবে বিছানার উপর বসে পড়ল। একটু যেন আদারের সুরে বলল, "আমি যে শীতে মরে বাছি।"

সহসা চোখের সামনে ভেসে উঠল—বিদায়ের সময় স্বধার সেই সলজ্জ কান্তর চাহনটি।

গভীর ভাবে বললাম, "মিস্ কাটারিজ! আপনি শুতে যান। এ রকম ঠাণ্ডা লাগলে আপনার অসুখ করবে।"

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল—কোনও কথা না বলে।

আবার বললাম, "শুতে যান—আর দেবী করবেন না মিস কাটারিজ।"

হঠাৎ যেন বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। "কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর লোক আপনি?"

এই কথাগুলি বলতে বলতে শব্দে দরজা বন্ধ করে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কথাগুলির মধ্যে একটা জড়ান ভাব ছিল—সেটা দেশার না কান্নার, ঠিক বুঝতে পারিনি।

ময়েটির সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। পরের দিন সকালে ব্রেককাঠে নেমে মিসেস ব্রেকের কাছে শুনলাম—ময়েটি আগেই বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

শুধালাম, "এত সকালে গেলেন?"

বললেন, "নইলে ব্রিটলে পৌছতে গুর দেবী হয়ে বাবে।"

পরে নিজের মনেই যেন বললেন, "বাঁচা গেল। গুর যে এত পরিবর্তন হয়েছে জানতাম না।" কথাগুলির মধ্যে একটা স্পষ্ট ভুণার ভাব প্রকাশ হল।

আশ্চর্য! মিসেস ব্রেকের মুখে কথাগুলি শুনে কেন জানি না, ময়েটির প্রতি কেমন যেন একটা কল্পণা এলো মনে। মনে পড়ল সেই প্রথম দিন দেখা হতেই ছুটে এসে আমার ওভারকোট খুলে নেওয়ার কথা। চোচারা। সকলকে হুঙ্ক করার একটা প্রাণশণ চেষ্টা করে আবার সকলের বিরাগ ভাজন হয়ে গেল।

[ক্রমশঃ]

"মরে না, মরে না কতু সত্য বাহা শত শতাব্দীর

বিশ্বস্তির তলে—

নাহি মরে উপেক্ষার, অপমান না হয় জহির

আধাতে না টলে।"

—রবীন্দ্রনাথ

# এক মুঠো আকাশ

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

শ্যামল কালীর কথা মত পরদিনই পেতলের নেমুনেট এনে দিয়েছিলো বলে সহজেই কালীর সাক্ষরদে হরে যেতে পেরেছে। 'প্রায়ই শ্যামলের পিঠ চাপড়ে কালী বলে, এ লাইনে খুব ছ'শিয়ার হয়ে' কাজ করবি। তাহলে আর কোন ভয় নেই।

কালীর আজ্ঞায় অনেকের সঙ্গে শ্যামলের আলাপ হয়েছে; তারা সবাই কালীকে ওস্তাদ বলে ডাকে। বেতে-আসতে পায়ের ধুলো নেয়, লেখাসেখি শ্যামলও শিখে ফেলেছে। আজ সে খোলাখুলি কালীকে জিজ্ঞেস করে, ওস্তাদ, আমায় কিছু কাজ দেবে না ?

কালী খেতে বসেছিল, এক গ্রাস ভাত মুখে পুরে পান্টা প্রস্র করে, কি করবি ?

—সে তুমি ঠিক করে দাও। আমি কি বলবো ?

—প্রথমে একটা হাতা কাজ কর।

—কি রকম ?

—একজন ছোঁড়া নিতাইএর কাছে ক'জন লোক চেয়েছে, তাদের একজামিন বন্ধ করে দিতে হবে।

শ্যামল বিস্মিত হয়, কি করে ?

—হাতা করতে হবে, আর কি। নিতাই-এর সঙ্গে যাবি, ওরা বলে দেবে।

—এর জন্তে ?

কালী হেসে ওঠে, টাকা মিলবে বৈ কি। মুফৎএর কাজ কালী করে না।

হৈ-চৈ করে তুল বন্ধ করার অভিজ্ঞতা শ্যামলের যথেষ্ট আছে কিন্তু ঠিক এ ধরণের টাকা নিয়ে অন্যদের পরীক্ষা করাটা তার কাছে নতুন। আগের দিন প্রস্রপত্র কটিন হয়েছিল, সেই অভ্যুহাসে করেক জন সারা বছর কাঁকি-সেওয়া ছেলে, কালীর দলকে ভেঁক এনেছে পরীক্ষা লগুতগু করে সেবার জন্তে।

বে হুলের সামনে তারা জড়ো হল, অল্পক্ষণ বাদেই সেখানকার একজন খবর দিয়ে গেল, আপনারা তৈরী থাকবেন। একটু বাট্টেই করেক জন টেচামিটি করে বেরিয়ে আসবে, ওদের সঙ্গে আপনারা মিলে যাবেন। ভিতরে ঢুক খাতা পত্তন—

আর কিছু বলতে হল না। নির্দিষ্ট সময়ে ছেলেরা বেরিয়ে আসতেই শ্যামলরা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গগনভেনী চীৎকার আর লোগান, জারিসংঘ এক হও, আমাদের দাবী মানতে হবে। যারা হলের ভিতর পরীক্ষা দিচ্ছিল, বাটে তাদের অস্থবিরে না হয় তাই কর্তৃপক্ষ হলের দরজা বন্ধ করার আদেশ দিলেন। তাইতেই ঠেলাঠেলি, মারামারির সূত্রপাত। জোর করে ভাড়া করা ছাত্ররা ভিতরে ঢুক বাত, দরওয়ানদের ঘূষি মারে, গার্ডেরা বাধা দিতে এলে তাঁদেরও জামা ছিঁড়ে দেয়, কাগজপত্র ভুটকুটি করে।

প্রাণপণ খাতা বাঁচাবার চেষ্টা করছিল তাকে বলে, উঠ পড়ুন, আর কেন ?

ছেলেটি করুণ গলায় বলে, কেন, আমরা পরীক্ষা দেব।

—খুব যে ফাট' বয় এসেছেন, এতগুলো ছেলে পায়লো আর তুমি উঠতে পারছা না ? শ্যামল এক দোহান্ত কালী ছেলেটার গায়ে ঢেলে দেয়। পাশের একটি ছেলে বাধা দিতে এলে শ্যামল তার চোখ থেকে চশমা কেড়ে নিয়ে হলের আবেক কোণে ছুড়ে ফেলে দেয়। মিনিট দশেকের মধ্যে সব কিছু বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। আবার 'লোগান' নিতে দিতে বিজয়ী ছেলেরা জটোল্লাসে হল ছেড়ে বাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যার পর শ্যামল কালীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। কালী একগাল হেসে বলে, নিতাই-এর কাছে সব শুনেছি, বাস, আমার একজামিনে তুই পাশ হয়ে গেছিস।

শ্যামল কালীর পায়ের ধুলো নেয়, ওস্তাদ, বা বলবে আমি ঠিক করে দেব।

কালী একটা দশ টাকার নোট বার করে শ্যামলকে দিয়ে বলে, এই নে। নিতাই ছাড়া আজ সবাই তোদের সঙ্গে নতুন ছেলে ছিল, কিন্তু কেউ কম যায় না, খুব হাল্লা করে এসেছে।

কালীর কাছ থেকে বেরিয়ে শ্যামল পকেট থেকে কলম আর ঘড়ি বার করে। আজকের গোলমালের মধ্যে তিনটে কলম আর দুটো ঘড়ি হাত সাফাই করেছে। সে কথা কালীর কাছেও সে চেপে গেছে। বাড়ী ফিরে নিজের বাস্তার মধ্যে সেগুলো রেখে দেয়।

বাস্তে খাবার সময় কথা উঠলো, আজকের গোলমালের বিবর, মামা নেশার বোঁকে বললেন, পরীক্ষা কেউ চায় না। আমি তো বলি, কেন মিথ্যা লেখাপড়া করা—

মামার শালা বটু বাবু খুবখান গলায় আপত্তি করেন, তোমার যেমন কথা। ছেলেগুলো যে ক্রমশঃ বদীর হচ্ছে। ইদুল থেকেই শুভাশী শিখলে বড় হয়ে কি হবে বলতে পারো ?

মামা একধার জবাব না দিয়ে শ্যামলকে জিজ্ঞেস করেন, তোরাও পরীক্ষার সময় এরকম গোমলাস করবি নাকি ?

শ্যামল তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর দেয়, ও, যারা লেখাপড়া করে না তারাই গোমলাস পাকায়।

—তোমার মত ভাল ছেলেরা নয়, বলে বটু বাবু তীব্রাক দৃষ্টিতে শ্যামলের দিকে তাকান।

এই ভয়লোকটিকে শ্যামল দু' চক্ষু দেখতে পাবে না। যোগা, হাডুগিলে ঢেহারা। সব বিবরে নাক গলালো অভ্যেস। দশ দিনের জন্তে এ বাড়ীতে থাকতে এসে দু'বাসের ওপর হয়ে পড়লেন, একই

বটু বাবু আবার বলেন, বই নিয়ে কখনও বসতে তো দেখলাম  
না!

মায়া মায়া বেশ, আলা, ও বাড়ীতে আর থাকে কতকণ! ইহুল  
দে, কোজি হ্রাসে বার—

—তাই বলে বাড়ীতে পড়বে না? আরহাও তো কিছু বাখাম  
র ছিলার না, কোন না কোন সময় বাড়ীতে বই নিয়ে বসতে  
যেছে।

ভামসের বিরক্তি হয়ে যায়, ইচ্ছে করে বটু বাবুর মুখে একটা  
জারে ঘুরি লাগায়। তবু কোন কথা না বলে খাওয়া শেষ করে  
শবে উঠে পড়ে।

বটু বাবু ভামসের খাওয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি তোমায়  
ছি জগৎ, ছেলেটার মতি-গতি ভাল নয়।

—তোমার সবাইকেই সন্দেহ।

—পরে বুঝবে। গরীবের কথা বাসি হলে সত্যি হয়।

—ওর বাবাকে চেন না ঘটু, খুব 'অনেষ্ট' লোক।

—কাজকে চিনতে আমার বাকী নেই। আজ নয়, একদিন  
বলব। তোমার ছেলেদের মুখ চেয়ে আমার বলা উচিত।  
জগৎ বাবু আর কথা বাড়াতে চান না, চল হে রাত হ'ল। হাত  
কেলি।

বাধ্য হয়ে বটু বাবু জগৎ বাবুর অনুসরণ করেন।

প্রভাতকে আকস্মিক বেলারানী বাদী প্রায়ই যেতে হয়। কারণ  
ও গল্পটা পুরো দেখা হয়নি। বেলারানী বোজই বিষয়বস্তু  
য়। তার প্রবেশিত প্রথম ছবিতে নারিকারপে সে বাতে সব  
অভিন্ন-প্রতিভা দেখাবার সুযোগ পায় তেমন হওয়া চাই।  
ত করমাস মতো খানিকটা করে লিখে নিয়ে যায়। বেলারানী  
বলে, হয়েছ, তবে বড় করমাস মত লেখা মনে হচ্ছে।

—বলুন তো একটু অল্প রকম করে দি।

—না না, অল্প রকম করতে হবে না। আর প্রাণ আনতে

—কোথায়?

—বছন বেখানে নারক পাগল হয়ে গেল, নারিকার চরিত্রে  
'প্যাথোজ' চাই।

—কি বকম ডায়ালগ চান বলুন?

লারানী হেসে কেল, সে আমি কি জানি। খুব করুন, মানে  
। কোথো জল এনে সিতে হবে।

নেক দিন বেলারানী কাজে বেরিয়ে বার প্রভাতকে বসিয়ে রেখে,  
বসে লিখুন, আমি এখন আসছি। হয়তো কোন দিন  
ী সত্যিই ভাড়াভাড়ি ফিরে আসে, হয়ত কোন দিন আসে না।  
বসে থেকে থেকে দ্রুত হয়ে চলে যায়। তবে বেলারানী না  
। বার সঙ্গে প্রায়ই প্রভাতের দেখা হয় সে হোল বিনোদ।  
গরজ সে কথা বিশেষ বলে না, তবে প্রভাত প্রশ্ন করলে সে  
য়।

দ প্রভাত বিনোদকে জিজ্ঞেস করে, বিনোদ বাবু, গল্পটা কি  
বলুন তো? বেলারানী বোজই তো বলে দিচ্ছেন।

দাদ সিগারেটের ধোঁয়া ছেঁকে বলে, বেলা ঠা দকমই।  
দলে বারি বের হয়।

—ওর সঙ্গে আপনাদের অনেক দিনের আলাপ?

—হঁ, বখন ও থিয়েটারে নাচতো, তখন থেকে।

—উনি খুব ভাড়াভাড়ি নার করেছেন।

বিনোদ সোকার গা এলিয়ে দেন, বলতে গেলে পাঁচ সাত বছর  
মধ্যে। ভা কয় উন্নতি নয়, থিয়েটারের গুণ বাড়ির থেকে একবারে  
ছিন্নতারকা।

—ওর সত্যিকারের বয়স কত?

—ভগবান জানেন!

—আপনি জানেন নিশ্চয়?

বিনোদ হাসে, ও জেনে কি লাভ?

বিনোদ উল্লেখ করতে থাকে, সোকার ওপরই এপাশ ওপাশ  
ফেরে। নিজের মনেই বিড়-বিড় করে বলে, বেলা যে কোথায় গেছে  
আমার বসিয়ে রেখে!

—এখুনি আসবেন বোধ হয়।

—আমি আর পারছি না। চলি। বিনোদ উঠে দরজা পর্যায়  
গিয়ে দ্বিরে আসে, আপনি আর একলা বসে থেকে কি করবেন,  
আমার সঙ্গে আসুন।

—কোথায়?

—কোন একটা বারে বাই, চলুন।

বিনোদ গাড়ী করে প্রভাতকে নিয়ে বার সাহেবশাড়ার দ্বিতীয়  
শ্রেণীর চান রেস্তোরাঁয়। এখানে খাবার আর পানীয়, দুই-ই  
পাওয়া যায়। এ ধরণের রেস্তোরাঁয় প্রভাত যে আসে আসেনি ভা  
নয়, তবে খুব স্বচ্ছন্দ অনুভব করে না।

বিনোদ জিজ্ঞেস করে, কি পান করবেন?

—আমি করি না।

—করে দেখুন না, একেবারে বিশ্ব নয়।

—তাহলে হ্যাঁ কিছু দিন।

বিনোদ দুটো হাইকির অর্ডার দেয়। পান করতে হলে ভাল  
জিনিষটাই করুন।

হু'পেসের বেশী খেতে প্রভাতের সাহস হয় না, তাইতেই মাঝা  
ঝিম-ঝিম করে। বিনোদ কিন্তু পাঁচটা পর্যায় সোডা দিয়ে চালিয়ে  
গেল, তারপর জল বেশাদে আরও দুটো। মাস পেটে পড়তেই নেপা  
জমে ওঠে। বিনোদের মন খুলে গেছে, বেলারানীর কথা জিজ্ঞেস  
করছিলেন, ওর জন্তে কত টাকা নই করেছি জানেন? হাজার,  
হাজার। ওকে পেলাম না। আলোরার পেছনে ছোটাই লায়—

প্রভাতের কৌতুহল হয়, এখনও তো ওর কাছেই আসেন।

—উপায় নেই, কি করবো।

—বেলারানীকে আপনি ভালবাসেন?

—ভালো আমি কাজকে বাসিনি, নিজেকেও না। এ লাইনে  
কত দিন আছি জানেন?

কত দিন?

দশ বছর। বাবা মায়া বাবার পর থেকে। বাড়ী পেলার,  
গাড়ী পেলার, নগর টাকা পেলার। আর কি চাই?

—আপনার মা?

—অনেক আগে মারা গেছেন। দুটো বোন ছিল, তাদের বিয়ে  
হয়ে গেছে।

—তার পর ?

বিনোদ হাসতে গিয়ে নেশার কোঁকে কেঁদে কেলে, তার পর আর কি, এই বা দেখছেন, মাতাল।

—আপনার মাথাও পর আর কেউ ছিল না ?

—আছেন জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাই-মা ! তাঁদেরও সম্পত্তি আমিই পাব।

—বলেন কি ?

বিনোদ হো-হো করে হাসে, আশ্চর্য্য হচ্ছেন ! কেন, ভগবানের দ্বারাই এই তেলামাথায় তেল ঢালা। যার টাকা আছে তার টাকা হয়, খাবার লোক নেই। যার দরকার নেই, তারই গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে হয়—

প্রভাত বাধা দিয়ে বলে, আপনার বাবা কি অনেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন ?

—তা কম নয়। নিজে রোজগার করেছেন, আমার হুঁ-দাহুর সম্পত্তি পেয়েছিলেন, সে-ও অনেক—

—বিয়ে করেননি কেন ?

বিনোদ কি ঘেন ভেবে নিয়ে বলে, করেছিলাম।

—তিনি ?

—নেই।

—মারা গেছেন ? কি স্থার—

বিনোদ এ কথাই উত্তর দেয় না। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরায়, বেলারাগী যে কিস্তি তুলছে তার অর্ধেক টাকা আমার।

—আপনি তো মনই দেন না এ ব্যাপারে।

—ও নষ্ট হবে, আমি ঠিক করে রেখেছি।

—তবে এতে নামলেন কেন ?

বিনোদ হাসে, বেলায় জ্বড়ে।

প্রভাত বিমিত্ত হয়, আপনি সত্যি আশ্চর্য্য লোক !

—আশ্চর্য্য লোক কিছু নয় প্রভাত বাবু, প্রেফে ক্তানপাগী।

একটু থেমে বলে, আপনি তো লেখক, আমারও লেখার ইচ্ছে আছে—

—আপনি লিখেন নাকি ?

—লিখি না, তবে লিখবো। একখানা বই।

—কি বিষয় ?

বিনোদ আবার হাসে, সে এখন বলব না, তবে দেখবেন, দেবদাসের চাইতেও ভাল বই হবে।

—আপনার বুদ্ধি সেবাদাস খুব ভাল লাগে ?

—সেবাদাস আমার বাইকেল। একটু থেমে প্রভাতকে প্রশ্ন করে, আপনি ভগবান বিশ্বাস করেন ?

—নিশ্চয়।

—প্রার্থনা করেন ?

—করি।

—তাহলে আমার জন্যে একটি প্রার্থনা করবেন ?

—কি ?

—যেন আমার ‘বাইসিস’ হয়।

প্রভাত দেখে, বিনোদের চোখের কোণে জল চক্-চক্ করছে।

দেস্তার। থেকে বেরিয়ে বিনোদ প্রভাতকে বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে ফলে যায়।

প্রায় এক সপ্তাহ বাদে কেউ অনন্ত কেবিনে এসে, আন্তদা’ জড়িয়ে ধরে বললেন, আর ভোরাকে ছাড়া হচ্ছে না। আন্তদা’র লোকানের কথা বুদ্ধি আন্ত-কাল মনে থাকে না ?

কেউ হেসে উত্তর দেয়, সব চেয়ে বেশী মনে থাকে আন্তদা’, কিন্তু সময় যে পাই না।

—কি এমন রাষ্ট্রকার্য্য করছ তুমি ?

—সে অনেক ব্যাপার। চলুন আপনার সঙ্গে পরামর্শ করি।

হুঁজুনে একান্তে বসে চা খেতে খেতে যে আলোচনা করল, তা হোল কেউর বাড়ী ভাগ করা নিয়ে। বলরামের উকীল কেউর সঙ্গে দেখা করে তার দানার মনোভাব জানিয়ে গেছে। অগত্যা কেউকেও তৎপর হতে হয়। আন্তদা’কে বলে, আমার একজন উকীল ঠিক করে দিন, যে সব ব্যুরে নিতে পারবে।

আন্তদা’ বলেন, সে আর এমন কি। আমার বড় শালার ছেলে বেশ ভাল উকীল, বল তো তাকেই ঠিক করে দি।

—আপনি বা ভাল বুঝবেন। সব দায়িত্ব আপনার।

—এত দিনে তাহলে বাড়ী ভাগ সত্যি সত্যি হচ্ছে।

—তা ছাড়া উপায় কি ?

—আমি বলি কেউ, একলা তুমি থাকতে পারবে না।

—সেকালা পাব কোথায় ?

—বিয়ে কর।

—ক’কে ?

—ক’কে, তা আমি কি করে বলব ? যাকে তোমার পছন্দ।

—পছন্দ এখনও কাউকে করি নি।

আন্তদা’ গলা নামিয়ে বলেন, কেন, গোঁরী ?

কেউ আড়চোখে আন্তদা’র মুখটা দেখে নেয়, তার কথা আপনি কি করে জানলেন ?

আন্তদা’ একগাল হেসে উত্তর দেন, আমি সব খবরই রাখি তারা।

কেউর ইচ্ছে ছিল, এ বিষয়ে আন্তদা’র সঙ্গে আর একটু কথা বলে কিন্তু প্রভাত এসে পড়ায় সে এ প্রশ্ন পাশ্চাতে বাধ্য হয়। প্রভাত কেউর মাথায় চাঁট মেয়ে বলে, তুই কি হয়েছিস বল তো ? তারপর একটা খবর পর্যন্ত দিলি না !

—খবর থাকলে তো ?

—‘রিয়েলী’ তুই একটা বা-তা—

আন্তদা’ ইত্যবসরে উঠে পড়েন স্বদেশের তদারক করিতে।

প্রভাত নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করে, জায়গাটা কি রকম লাগছে ?

—ভালই, কোন গোলমাল নেই।

—বা হোক, সন্দারী হয়ে পড়লি তো ?

—যেটুকু না হলে নয়।

—পিনাকীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?

—হয়েছে, সে রকম কিছু নয়।

—চিম্বর সঙ্গে ?

—কে ?

—পিনাকীর—

—ও হ্যাঁ, গোঁরীর সঙ্গে হয়েছে।

—মেয়েটা সত্যি ভাল। ওই হুজুগাটার পার্শ্ব পড় এতটুক



স্নানের সময়  
মনে  
রাখাবেন



একশ' বছরের  
ঐতিহ্য,  
বিশুদ্ধতা এবং  
অপরিবর্তিত  
গুণগুলির জন্য

আজও সমাদৃত

**লক্ষ্মীবিলাস**

তৈল

এম. এল. বসুমতী কোং প্রাইভেট লি:

লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-১

—কিসের কি ?

—গৌরীর ?

—নাশ তো বাড়ী ভাগের ব্যবস্থা করছে। আমিও আশুদা'কে উকীল ঠিক করতে বলেছি, ঝামেলা চুকলেই—

—হ্যাঁ, বেশী দেবী করিস না।

একদুখ পান খেয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে শামল আসে, আশুদা'র সামনে ঝাড়িয়ে বলে, শীগ্‌গিরি ডিম রুটি দিতে বলুন, তাড়া আছে।

—তোমার কেঁটা' এসেছে যে—

—কই ? শামল পেছন ফিরে কেঁটার দিকে তাকায়। হেসে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, জাহ্না লোক আপনি কেঁটা', একটা কথারও ঠিক রাখেন না।

—বড় ঝামেলায় মধ্যে ছিলাম।

—আমাকে একটা খবর দিলেও তো পারতেন। আর প্রভাতদা'ও হয়েছেন আপনার জুড়ী, সেদিন বললেন যে টুডিও দেখাতে নিয়ে যাবেন, তার কি হ'ল ?

প্রভাত উত্তর দেয়, এখনও পুরো কাজ স্ক্র হয়নি, হলে বলব'খন।

—আপনি আর বলেছেন !

—মাস খানেক বাসে খবর নিও।

প্রভাত উঠে গেলে কেঁটা শামলকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কাছে আমার কত টাকা আছে ?

—প্রায় তিরিশ টাকা।

—আজকে দিতে পারবে ?

—সঙ্গে তো বেশী নেই, পাঁচ টাকা আছে।

—তাই ঠাও, বাকীটা আশুদা'র কাছে রেখে দেও। আমি নিয়ে দেব।

শামল সম্মতি জানিয়ে পাঁচটা টাকা কেঁটার হাতে দেয়। কেঁটা আবার জিজ্ঞেস করে, সিনেমার টিকিট কিছু বিক্রী করলে না কি ?

—না, সময় পাইনি।

—আজ-কাল কি করছ ?

—অনেক ব্যাপার আছে, পথে বলব।

বলেই খাওয়া শেষ করে শামল উঠে পড়ে। কেঁটা বসে বসে সিগারেট ধরায়।

নতুন বাসার এসে গৌরীর ভাল লাগে। এখানকার বিলি ব্যবস্থা, পরিষ্কার ঘর, রান্নার সরঞ্জাম, বা কেঁটা কিনে এনেছে, সবই তার মনের মত। মাঝে মাঝে বসিও বস্তীর কথা ভেবে অস্বস্তি বোধ করে কিন্তু পরকণ্ঠেই কেঁটার উদারতা ও মহাব সে কথা ভুলিয়ে দেয়। প্রায় কেঁটা কোনদিনই এখানে থাকে না, নিজের বাড়ী ফিরে যায়। একেবারে মত সবলো কি দুপুরে আসে। কেঁটা না খেলে গৌরী খেতে চায় না বলে দুবেলাই তাকে গৌরীর কাছে খেতে হয়।

গৌরী বলে, বাড়ীতে কে আপনার খাবার নিয়ে বসে আছে ?

—কেউ নেই।

—তবে ?

—আমারও তো কাজ-কর্ম আছে, সময়ের ঠিক থাকে না।  
হলে পাছে তুমি না খাও, এই ভয়ে অনেক সময় কাজ ফেলে

—এলেনই বা। গৌরী মুখ নীচু করে বলে, একলা আমি কিছুতেই খাব না—

অগত্যা কেঁটাকে সময় করে রোজই আসতে হয়। এ আসার মধ্যে কর্তব্যবোধের চেয়ে আনন্দ ছিল অনেক বেশী। তাই সব কিছু ফেলে রেখে ঠিক সময়ে এসে গৌরীর দরজায় ধাক্কা দিত।

এখানে আসার পর যার সঙ্গে গৌরীর খুব আলাপ হয়েছে সে হোল চিমরী, সবাই ডাকে চিমু বলে। মেয়েটির রঙ ময়লা, কিন্তু মুখশ্রী ভাল। একটু বেশী গায়ে-পড়া। নিজেকেই এসে গৌরীর সঙ্গে আলাপ করে, আপনাতা বৃথি আজ এলেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনার নাম ?

—গৌরী।

—আমার নাম চিমু, সামনের ঘরে থাকি।

গৌরী মাহুর পেতে বসতে দেয়, বসুন।

চিমু বসে পড়ে, আমাকে আর অত খাতির করতে হবে না। একবার বসলে আর উঠতেই চাইব না। নিজের রসিকতায় হেসে ওঠে মেয়েটি। চারদিক তাকিয়ে বলে, এঘরে আমাদের এক বন্ধু ছিল, কিছু দিন আগে চলে গেছে।

গৌরী বিশেষ তেঁতুল দেখায় না, তাই বৃথি ?

চিমু বলে যায়, কি বরাতে মেয়েটার, এক মাস ছিল এখানে অতীত বাবু'র সঙ্গে। বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল, তাই তো চলে গেছে।

—বিয়ের পর চলে গেলেন কেন ? এত বেশ ভাল ঘর।

চিমু হাসে, বিয়ে হলে এখানে আর থাকবে কেন ভাই ?

—কেন ?

গৌরীর প্রশ্নে চিমু বিস্মিত হয়, বিয়ে করে এখানে কেউ থাকে না কি ?

—আপনারা ?

—আমাদের মত বাঙ্গের মাথার সিঁদুই সর্দার, তারাই থাকে।

চিমুর কোন কথাটাই গৌরীর কাছে পরিষ্কার হয় না। ঠিক এই সময় শিমাকী অজ্ঞ ঘর থেকে ডাক দেওয়ায় চিমু উঠে পড়ে, বাঁ তাই উনি এসেছেন, একমিনিট দেয়ী হলোই রসাতল করবেন।

এর পর ক'দিনের মধ্যেই চিমুর সঙ্গে গৌরীর বেশ আলাপ হয়ে যায়। আপনি তুমির দৃষ্টি কাটিয়ে তারা 'তুই তুই' করতে শুরু করে। চিমু বলে, বাই বলিস, তোমার কেঁটা' লোক ভাল মুখ খালাপ তো করে না। আমার কণ্ঠাটির কাছে একদিন তু' থাকতে পারিস তো কি বলেছি !

—খুব বকেন বৃথি ?

—কি না করেন, তবু মুখ বুঁজে পড়ে থাকতে হয়। কি আ উপায় বল ?

গৌরী রাগা করছিল। চিমু জিজ্ঞেস করে, মাছের ঝাল করছি বৃথি ?

—হ্যাঁ, কেঁটা' খুব ভালবাসেন।

—হ্যাঁ রে, তোমার কেঁটা' কি করেন ? সারা দুপুরই তো তে কাছে দেখি।

এ আবার কি ভাড়া কথা, যার সঙ্গে আছিল, সে কি করে না?

ওদের অবস্থা বেশ ভাল, দোতলা বাড়ী আছে।

উনিই বলেছেন বৃষ্টি, তুই জানলি কি করে?

আমি ওদের বাড়ীতে একদিন ছিলাম যে।

তাই নাকি, তোকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন? একটু

স্নান, না, তোর কেউদা সত্যিই ভাল লোক।

বী কাজ করতে করতেই উত্তর দেয়, আমি তো বলি দেবতা।

৫ দিন কত সময় এ ভাবে হুঁজুরের মধ্যে আলোচনা হয়।

প্রতি গৌরীর এই গভীর বিশ্বাস চিন্তকে যুগ্ম করে। অপর

দুই বিবিধ প্রশ্ন গৌরীকে কৌতূহলী করে তোলে। তাই

খতে বসিয়ে একদিন সে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি কাজ

প্রশ্নে কেউ বিমিত হয়। বলে, এ কথা কেন জানতে চাইছ

মনেকে জিজ্ঞেস করে, আমি কিছুই বলতে পারি না।

হাসে, ও এই কথা, আজ্ঞা পরে বলব এখন।

বীর অকারণ জিদ চেপে যায়, না, আজই বলুন।

দাঁজ থাক গৌরী, বলছি তো।

ন না?

ত্যা কেউ বলতে বাধ্য হয়, ব্যবসা করি।

ন মিথ্যা কথা বলে কেউ গৌরীকে শাস্ত করেছিল বটে কিন্তু

ন সে এই ভেবে শঙ্কিত হয় যে, একবার বখান গৌরীর মনে

যে বীজ উদ্ভূত হয়েছে তখন সব কিছু না জানা অবধি তা

শাস্ত হবে না। তাই প্রথম সুযোগ পেয়েই গৌরীকে সে

চেয়েছিল, গৌরী, তোমায় অনেকগুলো কথা বলার আছে

৩ বলা হয়নি।

কি বলুন?

হানে, জানি না তুমি কি ভাবে নেবে।

রী চুপ করে থেকে কেউকে কথা বলার সুযোগ দেয়।

হামি ছোটবেলা থেকেই অনেক রকম ভাবি, আজও। দেখ,

এই বুদ্ধি দিয়ে কাজ হাসিল করে। এত রকম যে জিনিষপত্র

করছ সবই মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে তৈরী করেছে।

নেই সে বাচতে পারে না। রাস্তায় বত বড় বড় বাড়ী দেখ,

৫, এ সব কাদের? যাদের খুব বুদ্ধি। যারা বোকা লোকদের

কা ভোজগার করে, তাদের।

১ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, সে কি বলছেন, লোককে ঠকালে

শাস্তি হবে?

হ না, সেইটাই তো সব চেয়ে মজার ব্যাপার। যার দত

১ তত খাতির। বখান একবার টাকা হয়ে যায় তখন কেউ

কি করে এত টাকা হল। সব চোর!

সার!

স্নান হুসে, জানি গৌরী, এভাবে ভাবতে গিয়ে তোমার

গবে কিছু এ সব সত্যি কথা। গয়লারা হুধে জল মেশার

১০ বক, কিন্তু ভেজাল ছাড়া কোন জিনিষ কি বাজারে

—যেটা খারাপ, কিনব না। দেখে কিনব।

—কি করে দেখে নেবে? বন্ধ টিনের মধ্যে ভেজাল মাল, ধরবার কি উপায় আছে? যারা ঠকায়, যারা চোর, তাদেরই টাকা, তাদেরই খাতির।

গৌরী নীচু গলায় বলে, তাহলে আমাদের টাকা চাই না।

—বাঁচবে কি করে?

—ভগবান বাঁচাবেন!

—সে হলে খুব ভাল হত। কিন্তু তোমার ভগবান একেবারে কালা আর কানা। কিছু দেখতে মনেতে পায় না।

গৌরী শিউরে ওঠে, ছি, ছি, অমন করে বলবেন না।

কেউ এবার বেগে যায়, ভগবান বাঁচালো তোমার ভাইকে, তোমাকে?

—ভাই-এর মারা বাবার ছিল তাই গেছে। কিন্তু আমাকে তো তিনি বাঁচিয়েছেন, আপনাকে পেলাম কি করে?

এর পর আর কথা চলে না। কেউ চুপ করে যায়, কিন্তু মনে শাস্তি পায় না। গৌরীকে বোঝাতে না পারলে হুঁজুরের মধ্যে দুই বেড়ে যাবে। গৌরীও বোঝে, কেউ ঠিক আগের মত সহজ হতে পারছে না। সব সময় কি বেন চিন্তা করে।

একদিন আগের মত বেড়াতে যেবিরে গড়ের মাঠে বসে, গৌরী ঐ কথাই জিজ্ঞেস করে, আপনার কি হয়েছে কেউদা?

—কিছু না তো?

—কি ভাবছেন এতো?

—ও কিছু না।

—আমাকে বলবেন না? গৌরীর অন্তিমানে হয়।

কেউ হেসে উত্তর দেয়, বেগে গেলে কেন, বলে লাভ নেই কেনেই বলছি না।

—কি?

—ভাবছি, তোমার মত যদি সব জিনিষে বিশ্বাস রাখতে পারতাম। যেমন তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো, আমাকে বিশ্বাস করো, সবাইকে বিশ্বাস কর।

—আপনি কাউকে বিশ্বাস করেন না?

—না।

—আমাকে?

কেউকে আবার হার মানতে হয়, তোমার কথা জালাল।

এইটুকুতেই গৌরী খুশী হয়, আর কাউকে বিশ্বাস করেন না?

কেউ গৌরীর মুখের দিকে তাকিরে অন্তমনস্ক হয়ে উত্তর দেয়, কেন এমন হয়েছে জানো? ছোটবেলা থেকে কেউ আমার বিশ্বাস করতে না। আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মা মারা গেলেন। আমার নাম হল অপরা ছেলে। বড় হতে লাগলাম, কান্নার ভালবাসা পেলাম না। একলা মানুষ হতে লাগলাম। ভাবতাম খুব বেশী। লেখাপড়াতেও সুবিধে করতে পারলাম না, আর কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামায়নি।

গৌরী গলায় দরদ দিয়ে বলে, আপনার বাবা, তিনি ভালবাসতেন না?

—বোধ হয় না। একটা এ্যান্ড্রিডেটে বাবার পা ভেঙ্গে বাওনার কাজ ছেড়ে দিতে হয়, সেও নাকি আমার দোষ, আমি অপরা।

—তারপর?

—দাদা আমার চেয়ে অনেক বড়, চাকরি করতো বাবার  
কাম্বিসে। সেই সন্সার চালাতে লাগলো। কিন্তু আমি দাদাকে  
হুঁচকে দেখতে পারতাম না।

—কেন ?

—ভীষণ বদরাগী লোক। একটু ভুলচুক হলেই আমাকে  
মারতো। কেউ বাঁচাতে আসতো না। কেউ একদৃষ্টে ঘুরে তাকিয়ে  
থেকে বলে যায়, আত্মীয়-স্বজন বারা আসতো, দাদার কাছেই আসত।  
আমি যে বাড়ীতে আছি কেউ একবারও ভাবতো না। মামার বাড়ী  
থেকে লোক এসে দাদাকে নিয়ে যেত, আমি থাকতাম একা। বারা  
শেষের দিকে পল্লু হয়ে পড়েছিলেন, আমাকেই দেখাশোনা করতে  
হ'ত।

গৌরী কেঁঠকে খামিয়ে দেয়, চলুন, রাত হ'ল।

কেঁঠ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পিড়ার, চল।

চলতে চলতে কেঁঠ আবার স্নান হেসে বলে, বাবা যদি হঠাৎ মারা  
না যেতেন, বাড়ীর অংশ আমি পেতাম না। উইল করলে সবই  
দাদাকে দিয়ে যেতেন।

—বোধি আপনাদের হয়ে কিছু বলতেন না ?

—আমার হয়ে বলবে ? আমাকে বোধ হয় বাড়ীর চাকরের চেয়ে  
কেনি উঁচুতে কিছু ভাবতো না। স্বার্থপর, তবে গুরু দেখে নেই,  
যেমন সবাই করছে। অথচ আশ্চর্য হচ্ছে, গুনের মেয়েটা আমাকে  
ছাড়া এক মিনিট থাকতে পারত না। বাপ-মার কাছে কত বকুনী  
খেয়েছে, মার খেয়েছে, তবু আমার কাছে ছুটে পাশিয়ে আসে। এখন  
শুনছি দাদা আমার গুণের বেগে আমার বিয়ের ঠিক করেছেন এক  
বোজবরের সঙ্গে।

গৌরী চমক গুঁঠ, সে কি, ওইটুকু মেয়ে !

—কেন বুঝবে সে কথা। এক স্থলমাষ্টার। হুটো ছেলে রেখে  
বউ মারা গেছে, তাদের জন্তেই আমার বিয়ে করছে।

—আজ এই প্রথম কেঁঠ গৌরীর সঙ্গে নিজের জীবনের কথা  
কল্যাণালি ভাবে আলোচনা করে। গৌরীর সমস্ত সহায়ত্ব কেঁঠের  
জন্তে উৎসর্গ হয়ে গুঁঠ, সে চার কেঁঠের মন থেকে এতদিনের পুঞ্জীভূত  
বেদনার ভার লাঘব করে দিতে।

তাই পরদিন চিহ্নর ঘরে গিয়ে সে বলেছিল, সত্যি চিহ্ন, কেঁঠদার  
তুলনা হয় না।

—কেন, আবার কি হল ?

—ছোটবেলা থেকে যে কি কষ্ট পেয়েছেন, শুনলে তুই অবাক হয়ে  
মরি।

—চিহ্নকে কথা বলার সময় না দিয়ে গৌরী গত কাল কেঁঠের  
মুখে বা বা শুনেছিল, বর্ণনা করে যায়। কথা শুনতে শুনতে  
চিহ্নর চোখে জল ভরে আসে। অটল দিয়ে চোখের জল মুছে  
থলে, তুই কখনও আমার মনে কষ্ট দিল না। গৌরী লজ্জা পেয়ে  
ঘুরে পিড়ার। চিহ্নর ঘরে সে বেশী আসেনি, চতুর্দিকে ছড়ানো  
ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। চিহ্ন বলে, ভবি দেখবি, বাসু না।

বড় ছোট নানা আকৃতির ছবি চিহ্ন গৌরীর সামনে সাজিয়ে  
দেয়। কত রকম দৃশ্য, কত মেয়ের ছবি।

গৌরী প্রশ্ন করে, এসব কাদের ছবি ?

—যাদের মুখ ছবিতে ভাল গুঁঠ।

—কি হয় ?

—বিক্রী।

—কোথায় ?

—পত্রিকার, কাগজের বিজ্ঞাপনে। মলাটে ছাপার, কখন  
ডেতরে। এঁট দেখ না—

চিহ্ন কতকগুলো পুরানো পত্রিকা বার করে আনে। গৌরী বেগে  
সব পত্রিকাগুলোর মলাটে চিহ্নর ছবি। অনেক রকম ভঙ্গীতে।  
গৌরী অবাক হয়, এ যে সব তোর ছবি রে ?

—আগে আমার ছবিই বেশী তুলত।

চিহ্নর কথায় গৌরীর কেমন খটকা লাগে। জিজ্ঞেস করে,  
আজিকালি তোলে না ?

—কম।

—কেন ?

—আমার চেয়ে অনেক স্থলমারী ছবি তুলতে ছুটে আসে বলে।

—তোর খায়াপ লাগে না ?

চিহ্ন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, না।

ঠিক বুঝতে না পেরে গৌরী চিহ্নর দিকে তাকায়। চিহ্ন মুখ নীচু  
করে বলে, আর ছবির মোহ নেই।

—কিসের মোহ আছে তুনি ?

—জীবনের।

—মানে ?

—ঘর, সন্সার। কিছুই হ'ল না।

বিস্মিতা গৌরী প্রশ্ন করে, এ তো বেশ ভাল ঘর, নিজের বাড়ী  
না হলে বুঝি মন গুঁঠে না ?

—তা বলিনি যে গৌরী, ছেলেপিলে না হলে, সমাজ না থাকলে  
মেয়েদের জীবনে কোন সুখ নেই।

—ছেলেপিলের কথা জানি না কিন্তু সমাজ চাই না আমি।  
বিশ্বী লোক তারা।

চিহ্ন মান হাসে, এখন তাই ভাবছিল, পরে বুঝবি। যদি নিজের  
ভাল চানু কেঁঠদাকে বুঝিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল, নইলে  
আমার লশা হবে।

—কেন, তোর বিয়ে হয়নি ?

—পুরুষদের তুই চিনিস না। বের করে আনবার সময় বিয়ে  
করব, স্থান করব, ত্যান করব, নানারকম বলে। পরে সব তুলে  
দায়।

গৌরী অবাক হয়ে চিহ্নর সীঁথির সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—সিঁদুর দেখছিল ? ও আমাদের পরতে হয়। মিথ্যে বউ  
সেজে বসে না থাকলে বাইরেও বেকন যায় না। চিহ্ন আর  
কথা বলতে পারে না, চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে।  
গৌরীও সে কান্নায় যোগ দেয়। সে চিহ্নকে জড়িয়ে ধরে যত্নের  
বলে, আমি জানতাম না কিন্তু, তাই একথা তুলে তোকে কষ্ট  
দিলাম।

চিহ্ন ধরাগলায় বলে, আমি বলছি গৌরী, বিয়ে করে ফেল।  
তোমার কেঁঠদা ভাল লোক, বোধ হয় রাজি হবে। নইলে পরে  
সারাজীবন অলে-পুড়ে মরি।

সারা দিন গৌরী এই কথা নিয়ে ভেবেছে। কেঁঠর কাছে



পাড়তে গিয়ে ও লজ্জায় পাবেনি। কথার কথার বলে, রটা খুব ভাল।

ঠ তবু তবু সিগারেট টানছিল। খিঁজেন করে, কে চিহ্ন, কীর বউ ?

। পরে নীচু গলার বলে, জানেন কেঁটা', তবু বিয়ে হয়নি। জানি।

কি করে জানলেন ?

ঘানের বিয়ে হয়নি, তারাই এ বাড়ীতে থাকে।

চিহ্ন তো বিয়ে করতে চায়, ঐ ভদ্রলোকই তো রাজী ন।

পরে হুংখ পাৰে।

। 'ভি কেট্টা', চিহ্ন চায় ছেলেরিগে, ঘরসংসার।

ব মেয়েই তাই চায়।

। সহজ গলার হেসে বলে, কই, আমি তো চাইনি ?

হিহে।

বে ?

। জ্ঞ না হয় কাল, কাল না হয় পরন্ত।

খন কি হবে ?

য়ে।

। লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। কেঁটা বলে, বিয়ের জন্তেই হিহি গোঁরা। ভেবেছিলাম হু'-এক মাসের মধ্যেই সব ঠিক। বাড়ী ভাগ করা, আলাদা থাকার বিলিবিবস্থা করা, হ আরও কিছু দিন সময় লাগবে।

চুপ করে থাকে, একটু পরে বলে, আমার জন্তে আপনার 'হল, না কেঁটা' ?

। সে, খুব কথা বলতে শিখেছে বে, কে মাঠার, চিহ্ন নাকি ? হেসে উঠে ষাঁড়ার, চিহ্ন আপনার খুব ভক্ত।

। ভক্ত, সে তো আমার দেখেনি।

। ডেকে আনিব, বেচারী সব সময় একলা থাকে।

'খন।

। ঘাবড়ায় ধরে, না, তাকে আনি, দেখুন না, খুব ভাল মেয়ে।

। গাল লাগে গোঁরার এই ছেলেরিগে। হেসে সম্মতি

। হুটে গিয়ে চিহ্নকে ধরে আনে। চিহ্ন সবমাত্র গা ঘুরে ছিল। গোঁরা কোন ওজর-আপত্তি না শুনে টানতে 'কেঁটার সামনে হাঙ্গির করে বলে, এই যে কেঁটা', চিহ্ন। বীকে কপট হাসের সঙ্গে বলে, জোর ছালায় এখানে। দেখছি। এরকম টানটানি করলে মাছব বাঁচে!

কেঁটার সঙ্গে আলাপ করবি না ?

। স বলে, তোমার কেঁটা' এমন একটা কেউ-কেটা নয় হুসে আলাপ করতে হবে।

। চতুর্কণে চিহ্নকে জোর করে মাছুরে বসিয়ে দিয়েছে।

। দ্বাকে পরিচিত করে নেওয়ার জন্তে কেঁটকে প্রায় করে,

। প্রভাত বাবুর খুব আলাপ আছে, না ?

। আমার অনেক দিনের বন্ধু।

—একটাও পড়িনি। বই পড়া আমার অভ্যাস নেই।

—তিনি কিন্তু আপনার কথা খুব বললেন।

—আমিও ওর কথা খুব বলি।

গোঁরা বাধা দিয়ে বলে, কই না জো! আশমি তো প্রভাত বাবুর কথা আমার তেমন কিছু বললেন নি ?

—কণার সময় হয়নি।

। ধীরে ধীরে এদের গল্পের আসর জমে ওঠে। কেঁটা লোকান থেকে গরম তেলভাজা কিনে আনে, চিহ্ন ঘর থেকে হুড়ি আর আচার নিয়ে আসে। সন্ধ্যাবেলাটা তিন জনেরই খুব আনন্দে কেটে যায়।

। শ্রামলের বাড়ীতে থাকতে আর এক মিনিট ভাল লাগে না, বটু বাবুর ছালায় সে অস্থির। ভদ্রলোক সারাক্ষণ বকু বকু করেন। বিশেষ করে শ্রামলকে হুকুতে পাবলে, তিনি বোঁব হয় অপরিণীত আনন্দ পান। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই শ্রামলকে ডুলে দেন, এই শ্রামল, ওঁঠ। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

। শ্রামল সাড়া দিতে চায় না। পায়ের কাপড়টা আরও জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বটু বাবু হার মানার পাত্র নয়। রীতিমত চোঁচাতে শুরু করেন, ছোট ছেলে, এত ঘুম কেন, আমি হুকুকে দেখতে পারি না। সকাল সকাল উঠে মুখ-হাত-পা ঘুরে কোথায় পড়তে বসবে, তা নয়, বেলা নটা পর্যন্ত ঘুম। ছালাতন বাবা, তেমন জগত্যা, একটা কথাও যদি ছেলটাকে বলে!

। এর মধ্যে ঘুমোনে অসম্ভব। বিরক্ত হয়ে শ্রামল উঠে খুব হুতে চলে যায়।

। এ তো বোজই লেগে আছে। তাছাড়া দেখা হলোই পড়ার কথা।

—কি পড়ছিস সেবার না কেন ? এককালে আমি ভাল ছাত্র ছিলাম।

। শ্রামল মুহু ঘরে উত্তর দেয়, আপনি কেন কই করবেন, কোটি রূপে আমি সব পড়ে নিই।

—আহা বেশী পড়লে তো দোষ নেই, ভালই হবে।

। আবার কোন দিন অল্প বিক দিয়ে প্রোকেন, মাথায় অত বড় বড় চুল কেন, বোঁপা বঁধবি নাকি ?

। বাইরের লোকের সামনে, সকলে হেসে ওঠে। শ্রামল উত্তর দেয়, চুল কাটার সময় পাইনি।

## বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

চুলের ঘাবড়ায় রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-  
সার জন্ম পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

সময় প্রাপ্তে ৯-১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা-৮টা

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্রাশন্যালা কিংয়ের সেক্টার

৩৬, একতাসিরা রোড, কলিকাতা-১৩

—বাড়ীত শুধু সবাই চুল কাটছে আর তোমার সময় হয় না ?  
হ্যাঁ নাশিতক ভাকলেই তো হয়—

—আমি নাশিতের কাছে কাটি না।

—তাই তো, চুলের বাহার নষ্ট হয়ে যাবে, কি ক'ন ? ভয়ানক বিষম হয়ে যাবে থেকে বেরিয়ে যাবে। তার পর এই তো সেদিন রাধা, ওর ঘরে ন'বহরের ছোট সামান্য কোনটা বলছিল, ভয়ানক, তুমি সিগারেট খাও ?

—কে বললে ?

—মামা বলছিল।

—বুটু মামা, কাকে বলছিল ?

—বাবাকে। তোমার জামা-কাপড়ে সিগারেটের গন্ধ, পকেটে দেশলাই থাকে।

বাগে জামল পাঁতে পাঁত ঘবে, বুটু বাবু যে রোজ তার জামা কাপড় বেঁটে দেখেন এবিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। সেদিনই রাধার হাতে অনেকগুলো লজ্জেল দিয়ে বলে, রাধা খুব ভালো মেয়ে। বুটু মামা আমার নামে কি কি বলে, আমার সব বলে দিস। তাকে আরও লজ্জেল দেব।

আজ সকালে আর এক ব্যাপার নিয়ে বুটু বাবুর সঙ্গে তার খটখাট লাগলো। নাওয়া খাওয়া সেরে হাতের বই নিয়ে জামল অল্প দিনের জন্যে সকাল সকালই বার হচ্ছিল। বুটু বাবু ভাকলেন, এত তাড়াতাড়ি কোথায় বাচ্চিস ?

—দুশ্লে।

—এখনও তো সাড়ে নটা বাজেনি।

—একটু দরকার আছে।

—কোথায় ?

জামলের আর বৈষ্য থাকে না। কল করে বলে কেসে, সে বোঁজে আপনাদের দরকার কি ?

বুটু বাবু জবাব শুনে রেগে অস্থির, কি, আমার কথাটার উত্তর দেবে না। এমন লাটসাহেব তুমি ?

—তা অত বাজে বকছেন কেন, কি দরকার তাই বলুন না ?

বুটু বাবু চীৎকার শুরু করে দেন, এ বাড়ীতে আমি আর এক মিনিট থাকবো না। যে বাড়ীর ছেলেরা গুরুজনদের সম্মান রেখে কথা বলতে জানে না, সেখানে আমি—

রান্নাঘর থেকে পিসীমা, ওপর থেকে জগৎ বাবু সকলেই ছুটে আসেন। জগৎ বাবু বদ্বিগ্ন বোঝেন বুটু বাবু অনেক বাড়িরে বলছেন তবু বলতে হল, জামল, বড়দের সঙ্গে কখনও অমন ভাবে কথা বলবে না। মাথা চাও। জামলের আত্মসম্মানে লাগে। সত্যিই তো ওর কোন দোষ নেই। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যে তাকে সর্বস্বকণ বিরক্ত করে তার কাছে মাথা চাইতে হবে কেন ? চোখ ফেটে তার জল বেরিয়ে আসে। জগৎ বাবু আর পিসীমাকে উদ্বেগ করে বলে, আমি তোমাদের কাছে একশো বার মাথা চাইছি যদি কিছু অস্ট্রায় করে থাকি, কিন্তু বুটুমার কাছে নয়।

এই বললই সে বাড়ী থেকে হন হন করে বেরিয়ে গেল, একবারও পোছন দিকে না ফিরে।

বুটু বাবু কোঁকন কাটেন, দেখলে ফেলের মেজাজ, তোমাদের প্রাঙ্গণে কলং জারো ?

জগৎ বাবু শ্রালককে বোঝাতে চেষ্টা করেন, কথা কি অত মনে করলে চলে ? তুমি বরং আজ বুটু বাবু রাখা নাড়েন, না ঐ ঘরেই থাকবে। ও ও তা প্রমাণ করে তবে আমার শান্তি।

সকালবেলাই এই অপ্রীতিকর ঘটনার জীবনে ওঠে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে অত দিনের মত বিস্তা এক জানাশোনা মনোহারীরা দোকানে বইগুলো এ বাড়ী ফেরার পথে নিয়ে যাবে বলে। আজ তার যেতে আর ইচ্ছে করে না। অনেক দিন বাদে মা পড়ে যায়।

বাড়ীতে মদন ছিল না। সেখান থেকে বেরিয়ে সংঘের পাখরের ওপর চুপচাপ বসে পড়ে। কাজের আর অফিস যাবার তাড়ায় সবাই ব্যস্ত, তাই এ একেবারে স্বাধীন। মদনের বন্ধু বিপিন সামনে জামলকে দেখে জিজ্ঞেস করে, মদনকে খুজছে ?

—হ্যাঁ।

—ময়ূরার বাড়ীতে আছে।

—তুমি তো ওদিকে যাচ্ছ, ওকে ডেকে দাও না থানিক বাদে মদন এল। জামলের কাছে হঠাৎ কি মনে করে ?

—এমনি।

—এমনি তো আর তুই আমার কাছে আসিস ন

—বাড়ীতে আর ভাল লাগছে না।

—কি হয়েছে ?

—বগড়া-খাটি। বুটু হতভাগা ! ও শালা অ

—বুটুমামা ! তা তোর পেছনে লেগেছে কেন ! কে জানে। মামা, পিসীমা আমার ভালবাসে। পারে না। জামল মদনকে অনেকগুলো ঘটনা বুটু বাবুর সঙ্গে বা ঘটছে সব। শুনে মদন বলে, বুটু ম মুক্তিলা ফেলতে পারে।

—আমিও ছেড়ে কথা কইব না, ওর ওস্তাদী বার

—কি করবি ?

—সে দেখিস—

জামল বদ্বিগ্ন দস্ত করে বললে বুটু বাবুর ওপর এ মনে মনে সে এখনও কিছু ঠিক করতে পারেনি। এ আলাপ করে তার মন অনেক হাল্কা হয়। কথার কথা ওঠে। মদন বলে, ময়ূরার জন্তে সত্যিই ক হৃৎকের গান করছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

—নশিতা কি বলে ?

—সে আর বলবে কি করে, দেখাশোনা সব বাড়ী জানালা সব বন্ধ, বেকবায়ও হুকুম নেই।

—তা হলে ?

—তা হলে আর কি। শুধু দুশ্লে বার আর সে সময় অফিস। চিঠিপত্র লিখতে পারে না। মা আজও ঘুমিয়ে আছে না।

—ইদারি।

—তুই একটা কাজ করবি ?

—কি ?

—মহুদা'র একটা চিঠি নশিতাকে দিতে পারবি ?

—এ আর এমন কি ! সুযোগ থাকলে নিশ্চয়ই।

—নশিতা এখন ইতুলে যায়। ঠিক সোয়া দশটার সময় ও বাড়ী থেকে বেরোয়। সঙ্গে কিছু লোক থাকে।

—সেখি কি করতে পারি। চিঠিটা দে, আতাই দিয়ে দিই।  
আবার কবে আসব—

মদন শ্রামলকে টেনে তোলেন, চল মহুদা'র কাছে, বেচারী খুব খুশী হবে।

পথে যেতে যেতে শ্রামল বলে, মহুদা'কে বলে আমার টাকা দিস কিছু।

—নিশ্চয়ই।

—তুই কিছু মেয়েটাকে ভাল করে দেখিয়ে দিবি। আমি ঠিক চিনি না।

মহুদা' কথা শুনে গলে পড়েন, এ যদি পাব শ্রামল, আমি ভায়াব কেনা চাকর হয়ে থাকব। শ্রামল ও মদন যুগপৎ বলে ওঠে, হি হি, ও কি বলছেন মহুদা !

মহুদার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে শ্রামল আর মদন হাজির হল নশিতার ছুলের সামনে। শ্রামল বলে এই ছুল নাকি, এখানে তা আমি প্রায়ই আসি।

—মেয়েদের ইতুলে ?

—দূর গাধা। ছুলের সামনেই বইএর দোকান দেখছিস ?  
নতুন পুরান দু'রকম বই-ই বিক্রী করে, আমার খন্দে।

—ওখানে কি করবি ?

—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

—মানে ?

—পাষ্ট অফিস। দোকানের ওই ছোকরাটার সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে। মহুদা'র চিঠিগুলো রেখে যাব, নশিতা নিয়ে যাবে। উত্তর হয় তাকে ছাড়বে নয় এখানে দিয়ে যাবে। ওকে কিছু পরশা নিলেই হবে।

মদন উৎসাহিত হয়, বেশ বৃত্তি করেছিস। ব্যবস্থা করে ফেল, নশিতার ছুলে আসার সময় হল।

দোকানের মালিকের বয়স কম। শ্রামল বলে, মনে রাখবেন শ্রায়, নাম নশিতা।

ভদ্রলোক হাসেন, এসব মিটি নাম কি আর ভোলা যায় ?

—একটা বইয়ের ভেতর করে দেবেন। অল্প কাকর হাতে বেন না পড়ে, তাহলেই কাণ্ড বাধবে।

—সে বিশ্ব নিশ্চিত থাকুন, এরকম অনেক করেছি।

টেবিলের ওপর করেকথানা দোকানের নামলেখা রুটিন পড়ে ছিল। শ্রামল হু'খানা নিয়ে নেয়। চিঠি-পিছু আট আনা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে শ্রামল বেরিয়ে আসে। মদন জিজ্ঞেস করে, হাতে ওগুলো কি রে ?

—রুটিনের কবর, এ দোকানের বিজ্ঞাপন।

—কি করবি ?

—বিলি করবো। তোর কাছে পেরিল আছে ?

মদন কলম বার করে দেয়। রুটিনের জলে লাইনকাটা কাগজে যেখানটার দোকানের নাম লেখা আছে তাব কাছে তীর চিহ্ন দিয়ে শ্রামল লেখে, এখানে মহুদা'র চিঠি আছে, আপনার নাম বসলেই দিয়ে দেবে।

মদন ঠেলা মারে, ঐ যে নশিতা আসছে।

চারটি মেয়ে একসঙ্গে আসছিল। সঙ্গের লোকটি বোধ হয় মোড় পর্যন্ত এসে চলে গেছে। শ্রামল জিজ্ঞেস করে, কোনটা ?

—একবারে ডান দিকে, ঐ যে চুল খোনা, গোলাপী শাড়ী পরা—

—ঠিক আছে, ঠাঁড়া আমি আসছি।

মদন ছুটপাথে উঠে দাঁড়ায়। শ্রামল সোজা মেয়েদের দিকে এগিয়ে যায়।

—রুটিন পেপার, ক্রী রুটিন পেপার, বলে শ্রামল একরকম জোর করেই তাদের হাতে কাগজ ধরিয়ে দেয়।

মেয়েরা নিজস্বের মধ্যে হাসাহাসি করে, বাবা, বাবা। এদের হাসায় অস্থির।

শ্রামল আসল কাগজটি নশিতার দিকে এগিয়ে লেখা কথাগুলোর দিকে আগ্রহ রেখে বলে, এই যে—

নশিতা ঠাঁড়িয়ে লেখাটা পড়ে, সবুজ দৃষ্টিতে শ্রামলের দিকে তাকিয়ে নীরবে ধ্বংস জানায়। অল্প মেয়ে তিনটি এগিয়ে গিয়েছিল। তারা পেছন ফিরে তাকালেই নশিতা রুটিনটা খাতার তলায় নিয়ে দ্রুত-পায়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

মেয়েরা চলে গেলে শ্রামল মদনের কাছে ফিরে মুকুর্ষি ঢালে বলে, কাজ হাসিল।

—সত্যি ! লেখাটা ও পড়েছে ?

শ্রামল হাসে, চোখে চোখে যে কথা হয়ে গেল।

শ্রামলের অস্থির যে মিথ্যে নয় তা তখনই বোঝা গেল। মদন বলে, ঐ দেখ, নশিতা দোকানে চুকছে।

—চালাক আছে, অল্প মেয়েদের ছুলে ছেড়ে এসেছে।

নশিতা দোকান থেকে চলে যেতেই শ্রামল গিয়ে হাজির হয়। দোকানদার বলে, চিঠিটা নিয়ে গেছে।

—সেখলাম, এসে কি বললে ?

—কি আর বলবে, উঃ আঃ করতে লাগল, আমি নাম জিজ্ঞেস করলাম।

—বই-এর মধ্যে করে দিয়েছেন তো ?

—নিশ্চয়, মেম্বুন্ডের কাব্য।

শ্রামল হেসে ফেলে, আপনি সত্যিই কবি।

ভদ্রলোক অস্বাভাবিক হাসেন, ব্যবসাদারও। বই-এর দাম তিন টাকাও ঐ সঙ্গে দিয়ে দেবেন।

শ্রামল আর মদন মহুদা'র সঙ্গে গিয়ে লেখা করে। মহুদা'র আনন্দে বিগলিত হয়ে আর সেদিন অফিস গেলেন না। তিন জনে সিনেমা আর রেইংরেটে আমোদে কাটাল।

[ ক্রমশঃ ]

# তান্দা

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

জরানন্দ

কিছু কেনাকাটা এবং দু'চার জায়গায় দেখাশোনার দরকার ছিল। সে দিনটা তাতেই গেল। পরদিন ডাক্তার ঘরে নিয়ে গেলেন বেলবরিস্বর। পথে যেতে যেতে বললেন তালুকদার, আজ তো তুমি একাই আসতে পারতে। আমার দরকার পড়ল কিসে ?

ডাক্তার বললেন, বাঃ, আপনাকে নিয়ে আবার ভালো করে সবটা দেখতে হবে না ? আজ যে চোখ দিয়ে দেখবো, কাল তো তা ছিল না।

রক্ত পরীকার ঘর। পড়েছে শাস্তির টাইফয়েড। তার জন্তে বা কিছু করা দরকার, সে সব সেরে নিয়ে মহেশের সঙ্গে চারদিকটা আবার ঘুরে ঘুরে দেখলেন সেবতোষ। এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বৌদির গরুনাই কি আপনার একমাত্র সন্তান ?

তালুকদার বললেন, গোড়াতে তাই ছিল। বারো হাজার টাকা পেয়েছিলাম গরনা বিক্রি করে। তারপর আরো কিছু কিছু জুড়তে হয়েছে।

—এক এখনো হচ্ছে।

—না, এখন আর বড় একটা পেয়ে উঠে না। ফেলে দু'টোয় বোজি-বরচা। তাছাড়া—বলেই খেমে গেলেন।

সেবতোষ বললেন, তাছাড়া যে আরো দু'চারটি পোষা আশনার আছে, তার কিছু কিছু খবর আমিও রাখি।

তালুকদার সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বললেন, এখন তো এদের আর পুঞ্জির দরকার নেই। নিজেকে বরচা কুলিরে বর কিছু কিছু জমাতেও পারে। তিনটি মেয়ে আর একখানা জাঁত নিয়ে স্তর করেছিলাম। আজ বারোটি মেয়ে কাজ করছে। ওয়ার্কসপটাও তাই বাড়াতে হয়েছে।

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, বৌদির কি কোনো ছবি আছে ?

—না, কোনো দিন ফটোগ্রাফারের সামনে নিতে পারিনি। ঐ এক কথা—আমার বড় লজ্জা করে।

সামনের দিকে দীর্ঘ দুটি মেলো, যেন কোন এক ছানারীক্ষ বসে লক্ষ্য করে বললেন তালুকদার। কে জানে এটাও হয়তো বিধাতার অভিশাপ। তা না হলে মীরা শুধু ছবি হয়েই থাকত আমার কাছে ; একদা করে এখানকার সব কিছুর রসের জন্ম দিতো না।

সেই বড়ী আজও বড়ি দিচ্ছিল। ঘরতে ঘরতে সেখানটায় তালুকদার বললেন, কেমন আছ, পিসী !

বড়ী একগাল হেসে বলে উঠল, এসেছ বাবা ? কাল কাচু তনলাম তুমি চলে গেছ। ভাবলাম, আমার সঙ্গে দেখা করেই চলে যাবে ?

—কাল আর সময় হলো না। আজ আবার এলাম।

—বেশ করেছ, বাবা ! তোমার দয়াতেই আমরা এতৎ মেয়েমানুষ দিবা খেয়ে-পরে সুখে আছি। তা না হলে—

—আমার জন্তে বড়ি রেখেছ তো ?

—রেখেছি বৈ কি, বাবা ! উমার কাছে আটা চোঁড়ায় করে রাখা আছে। মনে করে নিও, কিন্তু।

—নিশ্চয়ই নেবো। সেবার যেগুলো দিয়েছিলে, দুটো চা করে এক মাস কমে খেলাম।

বড়ীর শীর্ণ মুখখানা খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ষ্টেশনের পথে তালুকদার বললেন, বা দেখছি, এই টাইফয়েড খান্ধা সামলাতেই তোমার ছুটি ফুরিয়ে যাবে। ডাক্তার অভয় হয়ে কী ভাবছিলেন। হঠাৎ যেন তজ্জা ভেঙ্গে গেল। বলতে কী বলছেন ? ছুটি ? আশীর্বাদ করুন দাদা, ছুটি আমার জ হোক।

—তার মানে ?

—তার মানে, গোলামি আর করতে চাই না। ভাবছি, এ কোনো একটা গলির মধ্যে একখানা সাইনবোর্ড খুলিয়ে বা পড়বো।

—ও হুবতি ছাড়। আজকাল পাড়ার পাড়ার এম-বি হুড়াহুড়ি। তোমার মত ক্যামেল-ওয়ার্ল্ডকে পুছবে কে ?

নিজেকে দেখিয়ে বলেন, এরকম বিনি পয়সার হাজেল দি তো পেট চলবে না।

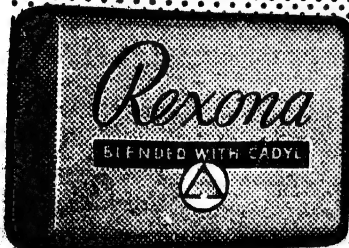
—খুব চলেবে, দাদা। দুটো তো মোটে পেট। তার ঝাঁ আর কতটুকু ?

তালুকদার গভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমার মনের কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি, সেবতোষ মেয়েগুলোকে দেখবার ঢালাবার কেউ নেই। ঐ পাঞ্জিই বা হোম



ফুলের মত...  
আপনার লাবণ্য রেঞ্জোনা  
ব্যবহারে ফুটে উঠবে

রেঞ্জোনা সাধানে আছে ক্যাডিল  
অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের জঙ্গে  
ভেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা  
আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে  
বিকশিত করে তুলবে।



একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান

রেঞ্জোনা প্রোপাইটারী লি., এর পক্ষে ভারতে একমাত্র

ভার ছিল ওইই ওপর। ও যবে থেকে পড়েছে, এখানকার অবস্থা প্রায় অচল। আমি যে এসে মাঝে মাঝে দেখবো, তাও সম্ভব নয়। কাজেই তোমাকে পাওয়া আর হাতে স্বর্ণ পাওয়া একই কথা। কিন্তু তাই বলে তোমার মত একটি ছেলে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করে এমন একটা তুচ্ছ কাজ নিয়ে পড়ে থাকবে, তাও আমি হতে দেবো না, তাই। ও-সব পাগলামো করো না।

দেবতাব্য হেসে ফেললেন, কিছু মনে করবেন না দাদা! আপনার কথা শুনে আমাদের অ্যানাটিমির প্রফেসর ডাক্তার যোবের প্রথম লেকচারটা মনে পড়ল। আপনার এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কথাটা তিনিও সেদিন অন্ততঃ বার পাঁচেক আউড়েছিলেন। কিন্তু একটা অত্যন্ত সোজা কথা তিনি হয়তো জানতেন না, আপনি জেনেও চেপে যাচ্ছেন। সেটা হচ্ছে এই, যা কিছু উজ্জ্বল, তাই স্থলব নয়। তার চাকরিক্য চোখ তুলতে পারে, মন ভোলে না।

তালুকদার সাহেবের মুখের উপর একবার চোখ বুদিয়ে নিয়ে আবার বললেন দেবতাব্য, আপনি কী ভাবছেন, আমি জানি। টাকাটা যে ভদ্রানক কাম্য বস্তু, সেটা অস্বীকার করি না। তবে এ-ও জানি, ওটাই সব নয়। দু'-একজন ভাগ্যবান ব্যক্তির খবর আমি রাখি, ডাক্তার হিসেবে যে Carrière তারা গড়ে তুলেছিলেন, সেটা সত্যিই উজ্জ্বল। সারা জীবন ধরে নেশার ঝোঁকে তারা শুধু ব্যাকের খাতার মোটা মোটা অঙ্কের ডান দিকে শক্তির পর শক্ত বোঁপ করে গেছেন। তারপর শেষ বয়সে যখন মনের পাখার চোখ ফেরালেন, দেখা গেল বাঁ দিকের অঙ্কটা মুছে গেছে, পড়ে আছে শুধু ঐ শক্তগুলো। কিন্তু আমার শুধু শক্ত দিয়ে চলেবে না, দাদা! এমন কিছু চাই যাতে মন ভরে।

তালুকদার এখনো কোনো সাড়া দিলেন না দেখে একটু আশ্বাসের সুরে বললেন দেবতাব্য, আপনার ভয় নেই। এই মুহূর্তেই কিছু স্থির করে ফেলিনি। তবে হঠাৎ একদিন যদি শুনেতে পান, বন্ধুরা আক্কেশ করে বলছে, যুথু ডাক্তার এমন সাধের চাকরিটা রাখতে পারলো না, শুনে যেন চমকে উঠবেন না।

ডাক্তারের কথা শেষ হলে নিশ্বাস ফেলে বললেন তালুকদার, তোমার কপালে দুঃখ আছে, তা বুঝতে পারছি। তবে আপাতত সে কথা ভাবছি না। ভাবছি, জেল-মহলে এত দিন মহেশ তালুকদারের নাম ছিল, 'মেয়েধরা'। অনেক সুনাম কুড়িয়েছি। এবার বোধ হয় 'ছেলেধরা', বলেও কীতি রেখে বাবো।

ডাক্তার হো-হা করে হেসে উঠলেন।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে দেবতাব্যকে একটা কী কাজের ভার দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন হুলোচনা। তারপর আদিক সেয়ে বারান্দায় এসে বসলেন মহেশের সামনে। কোনো রকম ভূমিকা না করেই বললেন, আমার দেবুর একটি বোঁ এসে দাও, বাবা! তুমি ছাড়া এ কাজ আমার আর কাউকে দিয়ে হবে না।

—বেশ তো মা, আমি খোঁজেই ইচ্ছা। এ আর এমন শক্ত কী।

—জানো, মহেশ, এতদিন ওর বিয়ে নিয়ে আমি একবারেই মাথা ঘামাইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, একজন চাই যে ওর ভার নেবে, ওকে বুঝবে, সব সময়ে পাশে এসে দাঁড়াবে। মাকে দিয়ে সে কাজ চলে না। তা ছাড়া আমি আর ক'দিন?

—সে কথা বললে কিন্তু বসড়া করবো, মা! হেসেও বিয়ে দিন।

মনের মত একটি বোঁ নিয়ে অনেক দিন ঘর করল। হু মাতি-নাতিয়র মুখ দেখুন। তবে তো আপনার ছুটি।

হুলোচনা হাসলেন, অতোখানি আমি চাই না বাবা! আমার স্থির হয়ে বসেছে, এখানে ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছে না, দেখে যেতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত।

হুলোচনা উঠে বাছিলেন। মহেশ বললেন, কিন্তু কী মেয়ে আপনার পছন্দ, তা তো বললেন না, মা!

—শোনো কথা! কী রকম আবার। ওর মন যাতে থাকে পেলে ও স্বামী হবে, তাকেই আমার পছন্দ। সে যে হোক, আমার কাছে তার একমাত্র পরিচয় সে আমার দেবা বোঁ। এর বেশী আমার আর কিছু জানবার নেই, বাবা।

ডাক্তারের সঙ্গে মাযের মুখের আদিল অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই ক্ষণকাল চেয়ে থেকে সজ্জ্ব কণ্ঠে বললেন তালুকদার, এ দেবতাব্যকে দেখে আশ্চর্য লাগত। অত বড় একটা দরাজ বড় দেখেছি, ততই মুগ্ধ হয়েছি। আজ্ঞা আর হই না। ও গুটা ও মাতৃগর্ভ থেকেই নিয়ে এসেছে।

হুলোচনা লজ্জা পেয়ে যেন তনুতে পাননি, ভাবে তাড়াহাড়ি ভিতরে চলে গেলেন।

পরদিন সকালের দিকে ঐশ। চাঁদের আগেই জামা-ক স্টকেসে ভরে নিচ্ছিলেন তালুকদার। একটা লালচে গোছের হাতে করে দেবতাব্য ঘরে ঢুকলেন। আড়চোখে একবার দেখে মহেশ বললেন, টেলিগ্রাম এল বুঝি?

—এল নয়; বাবে।

—বাবে!

—হ্যাঁ; এখন না পাঠালে ঠিক সময়ে পৌঁছবে কেন? ছু আপনার আজকেই শেব।

মহেশ কাপড় গোছানো বন্ধ করে বললেন, তোমার মতলব বল তো ডাক্তার? কাল তো একটা বাজ্ঞে অজুহাত তুলে বন্ধ করল। আজকে আবার কোন ছল নিয়ে এসেছে?

—দুর্ভিক্ষের ছলের অভাব নেই, স্বয়ং বিস্তারিত মশা গেছেন। কিন্তু দাদা, আজকের ব্যাপারে আমি শুধু আর বিশ্বাস না হয়, বাঁর আজ্ঞা তাঁকেই ডেকে নিয়ে আসছি।

—থাক; তোমাকে আর কষ্ট করে ডাকতে হবে না। বাচ্ছি। আর সঙ্গে বোঁখাপড়ার দরকার হলে আমি নিজের নিতে পারবো।

ওঁকে আর যেতে হল না। তার আগে হুলোচনাই পড়লেন। ডানখোলা স্টকেসটার দিকে চেয়ে দেবতাব্যকে কী তুই বলসিনি বুঝি?

—বললাম তো। মানছেন কৈ? ওঁর নাকি ভদ্রানক দা না গেলেই নয়।

মহেশ ছুয়-গাভীরের সুরে বললেন, ডাক্তারেরা জ্যান্ত মা মরা বলে শাটিকটকি দিয়ে থাকে, সবাই জানে। কিন্তু চোখের নাতকে দিন বানিয়ে দেয়, সেটুকু জানতে বাকী ছিল।

হুলোচনা হাসিমুখে বললেন, ঠিক বলেছ, বাবা। ঐ জন্মে একটা কথাও আমি বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু তোমার কী কাজের ক্ষতি হবে মা ছো?!

—কিছু না। আর যদি হয়ও, সে কতীর চেয়ে লাভটাই কি বেশী নয়? আর একটা দিন মায়ের কাছে থাকতে পেলোম।

সুশোচনার মুখখানা গাভুরগোঁবের উজ্জল হয়ে উঠল। স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, কতটুকুই বা থাকতে পার মায়ের কাছে। এসে অবধি ছুটোছুটির তো আর বিরাম নেই। এখনি আবার আমার সঙ্গে বেরোতে হবে।

—কোথায় যাবেন, মা?

সুশোচনার মুখের উপর একটুখানি করুণ ছায়ায় স্পর্শ লাগল। মুহূর্তকাল নতমুখে থেকে বললেন, কাল অনেক রাত পর্যন্ত দেবুর কাছে সবই শুনলাম। তখন থেকেই ভেবে রেখেছি, তোমার সঙ্গে গিয়ে একবার ওদের দেখে আসবো।

—আপনি যাবেন ওদের কাছে! বিষয়ে আনন্দে যেন টেঁচিয়ে উঠলেন জালুকদার।

—কেন যাবো না বাবা? আমার মারা মা বেঁচে থাকলে সেই তো সব করত। সে নেই বলে, তার এই কাজটুকু যাতে কোনো দিকেই অসম্পূর্ণ থেকে না যায়, আজ আমাদের সবাইকে তাই দেখতে হবে।

মহেশ ঈড়িয়ে বইলেন অভিজ্ঞতের মত। সুশোচনার মুহূর্ত আবার শোনা গেল, সেবুকে তাই বলছিলাম, তুমি যা করছ, তার ভুলনা হয় না। ঐ আশ্রয়টুকু না পেলে ওরা ভেসে যেত, কিংবা এমন জায়গায় গিয়ে ঈড়াত, যার কথা মনে হলেও গা শিউরে ওঠে। কিন্তু তোমরা পুঙ্খ মাশুখ। রতই দাও, মেয়েদের সব অভাব মেটানো পার না। খানিকটা থেকে যায়, বা তোমাদের হাতের বাইরে। সেটা তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছ বাবা! আমার যে হৃদয়ের জাত। আমাদের ক্ষিমে কিছুতেই মিটেত চায় না।

মহেশের চোখের ওপর ভেগে উঠল অনেক বছর আগেকার একটা রাত। তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে একটি মেয়ে। কানে এল তার ব্যাকুল কান্না। হঠাৎ চমকে উঠলেন সুশোচনার কণ্ঠস্বর। উনি বলে চলেছেন, আমার তো করবার কিছু নেই; সে শক্তিও নেই। তবু আমাকে দেখে যদি ওদের মনে এইটুকু বিশ্বাস জাগে যে ওটা শুধু ইচ্ছুল নয়, আশ্রয় নয়, ভাত-কাপড় আর একটু মাখা শুজবার জায়গা—এই দিয়েই তোমরা ওদের ধস্ত করনি, আরো কিছু আছে ঐ ঘর ক'খানির মধ্যে, যাতে মেয়েমাঝুদের মন ভরে, যা ওরা হ' হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে পারে, সেই জন্তই আমার বাওয়া। যদি না বুঝ থাকে, সেই কথাটাই আমি ওদের বুঝিয়ে দেবো। এইটুকু ছাড়া আমার আর কী করবার আছে?

মহেশ বললেন, মা, আজ বুঝতে পারছি, আপনার কাছে আমার অপরাধের অন্ত নেই।

সুশোচনা হেসে বললেন, শোনো ছেলের কথা! কী অপরাধ করল তুমি?

—ওদের কোনো কথাই আপনাকে বলি নি। হয়তো আজও কিছু না জানিয়েই চলে যেতাম। সেবতোষ আমাকে সে-লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছে।

—জাতে কোনো অপরাধ হয়নি, বাবা! এ কি বলে বেড়াবার খিনিষ?

—কিন্তু যে যদি নি, আমার সব কথা শুনেই হয়তো বুঝতে

পারবেন। একথা আমার মনে হয়েছিল, সেবতোষকে তাই বলছিলাম সেদিন, এই মেয়েগুলোর যে অভাব, সে শুধু অন্ন-বস্ত্রের নয়, শুধু আশ্রয়ের নয়। যে-ঘর ওরা একদিন ছেড়ে এসেছিল, তার পর আর ফিরে পার নি, গিয়ে দেখেছে দোর বন্ধ, সুখে, দুখে, ভক্তি, ভালবাসার ভরা সেই ঘরের আঁখানটুকু যদি ওদের দিতে না পারলাম, তাহলে তো কিছুই হল না! সেই কথা মনে করেই লোক-লস্কর, ইট-কাঠি জড়ো করে আশ্রম বা হোম না বানিয়ে, ছোট একটা গৃহস্থ-পল্লীর মধ্যে ঐ বাড়িটুকুতে এনে ওদের তুলেছিলাম। মনে মনে এই আশা ছিল, আপনার জন্মের কাছে জায়গা না পেলেও পরের কাছে, প্রতিবেশীর কাছে মাঝুদের যে স্বাভাবিক পাকড়া, সেটুকু থেকে ওরা বঞ্চিত হবে না। কিন্তু মা, সে আশা আমার সফল, হয় নি।

সুশোচনা বললেন, আশাটা তোমার অতিরিক্ত ছিল বলেই সফল হয়নি, বাবা!

—কিন্তু তখনো আমি হাল ছেড়ে দিই নি। আমার হ'—একটা আত্মীয়া—নাম বললে, আপনি না জিনলেও সেবতোষ চিনবে—আমরা যাকে বলি, সমাজ-কল্যাণ বা সেবান্ত সেখানে তাদের প্রতিষ্ঠা আছে। অন্যথ-আত্মকুর নিয়ে তারা বড় বড় প্রতিষ্ঠান চালিয়ে থাকেন। তাদের হ'—একজনকে ঘরে আমার ঐ বেলঘরির গলিতে নিয়ে এলাম। মেয়েদের ডেকে এনে বসিয়ে দিলাম ওদের পায়ের কাছে। ওরা অনেক তত্বকথা শোনালেন। পাণী-তাপী বিশখপানী মাঝুদের উদ্ধারের জন্তে যে-সব বড় বড় কথা বলে গেছেন মহাপুরুষেরা, তারই কতকগুলো আওড়ে গেলেন। এখন চলে গেলেন, মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, তারা শিখলো হয়তো অনেক কিছু, কিন্তু পেল না কিছুই। তার পরেও তাঁরা এসেছেন। মেয়েরা সম্মত হয়ে উঠেছে, ভক্তি, শ্রদ্ধা, অভ্যর্থনার কোনো ক্রটি না হয়। তারা যে ওদের বিশিষ্ট অতিথি, ওদের আশ্রয়লাভার পরম প্রজ্ঞাতাজন আত্মীয়া।

সুশোচনা জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা কি এখনো আসেন?

—না, মা! হ'—চার বার এসেই এসব ছোটখাট ব্যাপারে নজর দেবার মত উৎসাহ তাঁদের চলে গেল। আমিও বেঁচে গেলাম।

সেবতোষ বললেন, আপনি তুল করেছেন, দাদা! লেগে পড়ে থাকলে ওদের হাত দিয়ে একটা মোটা বকম জোনেশন-কোনেশন আদায় করতে পারতেন। আর কিছু না হোক, পোটা কয়েক টেঁকি আর কুলো বাড়ানো যেত, হুটো পরমা আসত। বাক সে সব বকেয়া কথা। আপাতত: সব চেয়ে দরকারী কথা হল, সাড়ে সাতটী বেজে গেছে।

—জ্যা, তাই নাকি। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সুশোচনা, বাই, তোমাদের চা নিয়ে আসি। ইস্, এত বেলা হয়ে গেছে।

—কিন্তু বেলা হয়নি মা! চাবের জন্তেও আমাদের কোনো তাড়া নেই।

—উঁহ্, ভটা একঘন্টাই বাধুন, দাদা, মাথা নেড়ে বললেন সেবতোষ। আটটার সময় চাবের তাড়া নেই, এতখানি অপরাধ আমাকে অন্তত: দেখান বা।

মহেশও বীতিমত ভেঙে উঠলেন, জাখ জোজাখ, সেই একটা...



হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবো। বনমালীর রাজ্যে বধন ছিলে, কি বকম আটটার সময় চা ছুটত, আমার তো আর জানতে বাকী নেই ভায়া!

সুলোচনা বললেন, বল কী বাবা, এ দিকে তো দেখি বনমালী বলতে অজ্ঞান!

—তা হলে কি হবে? মাসের মধ্যে অন্ততঃ দশ দিন বনমালীর ভাঁড়ারে যা ভবানীর রাজ্যে। সকাল আটটায় কেটলিতে জল ফুটেছে; হঠাৎ দেখা গেল চা নেই। ছুটল আমার নিখিরামের কাছে। চায়ের সমস্তা মিটল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার এল ছুটতে ছুটতে। কী ব্যাপার? হুধ নেই। নাঃ এইখানেই শেষ নয়। মাঝে মাঝে ভিন দফাও ছুটতে হয়। চা করতে হলে চিনিও তো চাই। বলে হেসে উঠলেন। সুলোচনা ব্যথিত স্বরে বললেন, তবু এ হতভাগটাকে কিছুতেই তাড়াবো না।

দেবতাব বললেন, ওর কথা তুমি বিশ্বাস কর, মা? সব বাড়িয়ে বলছেন।

—বাড়িয়ে বলছি! আমার সব নোট করা আছে হিসেবের খাতার। দয়া করে বিলটা এখনো পাঠাইনি।

—বিলের কথা বধন তুললেন দানা, তাহলে বলতে হয়, ওটা এ তরফ থেকেও বেতে পারে, এবং তাতে বোধ হয় আমারই লাভ।

—কী রকম?

—আজ্ঞে, বনমালী যদি নিখিরামের কাছে দশ বার গিয়ে থাকে, নিখিরাম বনমালীর শরণ নিয়েছে অন্ততঃ সত্তের বার। চাঁটা চিনিটা তো আছেই, মাঝে মাঝে ভাল চড়িয়ে দেখা গেল মূগ নেই।

—মূগ নেই?

—আজ্ঞে হী, মূগ নেই।

হুজনের মিলিত হাসির শব্দে ঘর ভরে উঠল। সুলোচনাও মৃদু হেসে ভাড়াভাড়ি বেরিয়ে গেলেন চায়ের জোগাড়ে।

চাঁপ শেষ হবার পর সুলোচনা বেলঘরিয়া বাবার উদ্ভোগ করতে বাঙ্ছেন, এমন সময় মহেশ কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, মাসের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।

সুলোচনা ফিরে দাঁড়ালেন।

মহেশ বললেন, বলছিলাম আমি আজ থাকি। আপনি দেখজ্ঞাবকে নিয়ে যান।

—কেন? সবিস্ময়ে বলে উঠলেন সুলোচনা।

একটু ইতস্ততঃ করে বললেন তালুকদার, আমাকে সঙ্গে দেখে ওরা যদি আপনাকেও আমার সেই বড় বড় আত্মীয়দের দলে ফেলে, স্টো তো আমি কিছুতেই সইতে পারবো না। অথচ তার ক্ষত্রে ওদের দেখ দেবারও কিছু নেই। তাই বলছিলাম, আপনি নিজেই যান। আমি থাকি।

কথাগুলো সহজ শ্রুত্রেই বললেন তালুকদার। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত বেদবীটুকু সুলোচনার অন্তর স্পর্শ করল। উত্তরে একটি কথাও বললেন না। শুধু তার বিকৃত চোখ দুটি অশ্রুপূর্ণ কান্ডশ্য করে উঠল।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই একটা দাশ চায়ের পাত্রে বাড়িয়ে তিনি তবসি নিশপক্ষে দেখভোজের সঙ্গে রিক্সার গিরে উঠলেন।

যারা জেল খাটে তাদেরও ছুটি আছে, সপ্তাহান্তে একদিন যারা জেলের জন্তে খাটে, তাদের ও বাংলাই নেই। পালপার্শ্বে ভারী প্রোগ্রাম, রবিবারে বিশেষ রুটিন। নিতান্ত নায়ে পড়ে দিন যদি বাইরে যাবার প্রয়োজন হয়, মূলত্বি কান্ডগুলো বচে ওং পেতে, ফিরে এলেই চেপে বসে। বেশ কিছুদিন আর হাড় অবসর দেয় না।

জেলের সাহেব ফিরে আসবার পর সুশীলা একটু খুঁজছিল তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্তে। কিন্তু বেলায় তার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য ব হয় তিনি ডুবে আছেন কাগজপত্রের স্তূপের মধ্যে, নয় তো ঘিরে রয়েছে ডেপুটি বা কোয়ার্টারবাসের দল। দিন পাঁচ ছ বিকাল বেলা ডিউটিতে যাবার পথে হঠাৎ একটু কঁাক দেখে পড়ল একদিন। তালুকদার মুখ তুলতেই বলল, হেনা একটু অ চায়, বাবা! কদিন ধরেই বলছিল, যা ভিড, আমি আনতে করিনি।

মহেশের মনে পড়ল, শেষ বেদিন তার সঙ্গে দেখা, হেনাকে দিয়েছিলেন, একদিন তার সব কাহিনী শুনবেন। তার জন্তে হয়তো আছে, কিন্তু মনের একটা প্রস্তুতি দরকার। সুশীল বললেন, আজ তো হয় না। ওকে একটু সময় দিতে হবে। বরং—বলে ডায়রি খুললেন তারিখটা নির্দিষ্ট করে দেবার জ সুশীলা বলল, ও বলছিল, ওর যা কথা পাঁচ মিনিটেই হয়ে বাবে।

মহেশ ডায়রি বন্ধ করে বললেন, ও, তাহলে এখনই নিয়ে এসে হেনা এসে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তালুকদার বললেন, তো সেদিনের কথা আমার মনে আছে। তার জন্তে আরেক দিন ডাকতে তা ছাড়া আর কিছু বলবে?

হেনা মাথা নেড়ে মৃদুকণ্ঠে উত্তর করল, না, আর কিছু ন সেই জন্তেই এসেছি। ভেবে দেখলাম, ওটা আমার বলা হবে ন তালুকদার ভিজ্ঞাপ্ত চোখে তাকালেন। বলতে বাঙ্ছিলেন, তো নাই বা বললে। কিন্তু তার আগেই বলে উঠল হেনা, আপনি কাছে বসে নিজের মুখে স্বচ্ছন্দে বলে যাবো, তেমন কথা তো আমি নয়। এ এমন কথা, যা বলতে গেলে বোধ হয় সব মেয়েমাঝেই জিত আটকে বাবে। তবু, না বলও আমার উপায় নেই। ত এত অপরাধের পর আর একটা অপরাধ করে বসলাম। ব জাঁচলের আড়াল থেকে একটা বাঁধানো খাতা বের করে এগিরে এ টেকিলের উপর রাখল। তারপর আবার পেছনে সরে গিয়ে বলল মুখ ফুটে বা বলতে পারিনি, অথচ বা না বলও আমার স্বনি নেই।

লক্ষ্যার মাথা খেয়ে সেই কথাই আমাকে বলতে হয়েছে এ খাতার পাতায়; প্রতি মুহূর্তে সে যে কী কঠিন পরীক্ষা, সে ত আমিই জানি। কী করবো? এ ছাড়া যে আমার আর কোন পথ ছিল না।

খাতাখানা তুলে নিয়ে প্রথম পাতাটা তুলতেই জেলের সাহেবের হুটি চোখে ফুটে উঠল বিররভরা প্রশ্ন দুটি। মাহুদের ইচ্ছাকরে সঙ্গে হুজুর তুলনা এত দিন কবিন্দোচিতি করনা বলেই তার ধারণ ছিল। আজ বসে হল, কথাটার মধ্যে অন্তর্ভুক্তি যদি বা থাকে তা সামান্যই। হেনার কথার কোনো জবাব না দিয়ে গুটি



পাতাগুলো উলটে বেতে লাগলেন। হেনা কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি কি দেখছেন, আমি জানি।

—কী বল তো ?

—খাতাটা ঠিক পথ দিয়ে আমার হাতে আসেনি। ওতে আপনার আফিসের ছাপ নেই।

—তাই নাকি! হঁ, তাই তো দেখছি। কিন্তু গেল কী করে ?

—তার জন্তে যা কিছু অপরাধ সব আমার। যে শাস্তি সেবেন, খুদী মনে মাথা পেতে নেবো।

—কিন্তু শাস্তিটা তো তোমার একার পাওনা নয় ? আর একজনকে পাঙ্কি কোথায় ?

“আরেক জন” এর ইঙ্গিতটা বুঝতে শেরে হেনার সমস্ত মুখখানায় হঠাৎ একরূপ আঁবির ছড়িয়ে গেল। সেইটুকু লুকোবার জন্তে সে নতমুখে ঝাঁড়িয়ে রইল। একথা আর বলা হল না, আপনার অনুমান মিথ্যা। খাতা আমি তাঁর কাছ থেকে পাইনি।

জেলের সাহেব হঠাৎ প্রস্ত করলেন, তুমি খুব ভালো আল্পনা দিতে পার, না ?

—আল্পনা! সবিস্ময়ে চোখ তুলে তাকাল হেনা।

—হ্যাঁ।

—না তো ? আল্পনা আমি কোনো দিন দিইনি।

—তা হবে। খাতাটা খুলে সকলের আগে ঐ কথাটাই আমার মনে হয়েছিল।

হেনা নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে নিল। তার মস্তুর লেখার সুখ্যাতি সে আগেও অনেক শুনেছে। কিন্তু এমন মস্তুর করে তা কেউ বলেনি। একটি লাজনত্র আনন্দের সিঁদ্ধ আলোয় তার আনত মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠল।

সেদিন জেলের সাহেবের সাক্ষ্য আফিস সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সংক্ষেপে সেরে নিয়ে খাতাখানা হাতে করে বসলেন গিরে দক্ষিণের বারান্দায়। প্রথম দৃষ্টিতে যে আল্পনার কথা তাঁর মনে হয়েছিল, সেটা এর লিপিসম্ভার সৌষ্টব। কিন্তু অক্ষরের ফ্রেম পার হয়ে যতই ভিতরে ঢুকলেন ভালুকদার, দেখতে পেলেন, ঐ খাতাটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে যে শব্দা, বেননা, লজ্জা, লাহুনার বিভিন্ন আলোখ্য, সেও এক ভ্যাগবিড়খিতা বখিতা নারীর নিভৃত মনের আল্পনা। শেষ পাঠাতি যখন শেষ হল, যেমন তেমন করে বলা এই অগোছালো ইতস্ততঃ ছড়ানো কাহিনীগুলো তিনি মনের মধ্যে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। কত কথা সে বলতে গিরেও বলতে পারেনি। বায়ে বায়ে তার ছিঁড়েছে, হারিয়ে গেছে যেই। সেই না-বলা কথার ঝাঁকটুকু তিনি ভরে দিলেন নিজের জাবার, মমতার স্পর্শ দিয়ে জুড়ে দিলেন তার ছিন্নহর। এমনি করে বে-হেনাকে তিনি দেখেননি, বিভিন্ন পটভূমিকার উপর গড়ে-ঠা তারই একটি অখণ্ড রূপ তাঁর চোখের সুরূখে ভেসে উঠল।

দুর্ভাগ্য বৈদ্যনা নদী আড়িয়ালখাঁ। তার উত্তর পার্শ্বখানিকটা

চলে গেছে খুলোর রাজ্য। নখর নখ, গন্ধ নখ, আশেপাশের লোকেরা বলে গল্প। নামটা কিন্তু ভগ্নানক জয়কালো— বাহাদুর নগর। হয়তো কোনো কালে কাছ-খারে কোথাও সত্যিকার নগর বসিয়ে রাজত্ব করতেন কোনো রাজা কিংবা নবাব বাহাদুর। তার পর একদিন সেলিহান রসনা বিস্তার করে ছুটে এল আড়িয়ালখাঁ। একে একে গ্রাস করল তার সকল কীর্তি। বাবার সময় উপরে-রেখে গেল খানিকটা উচ্ছ্রি— যাকে বলে চর। তারই উপরে গড়ে উঠেছে এই গল্প। দু-দুবার থেকে পাল তুলে ছুটে আসে বড় বড় সওদাগরী নৌকা, বয়ে আনে কত বকরের পণ্য—তেল, শুভ, লবণ, তামাক, নারকেলের দড়ি, তার সঙ্গে বর্তমান সভ্যতার নানা চটকদার বিদেশী বিলাস। কিরবার পথে নিরে বায় এ সেলের সব চেয়ে বড় সম্পদ বান, পাট, সর্ষে, কলাই। এই বাহাদুর নগরের একটা জীর্ণ ভাঙ্গা ঘাটের পাশে, হাট-বাজারের কোলাহল থেকে দূরে ব্রিনিমা বাটের ছায়ায় হেনা এসে বসত তার দাদার সঙ্গে। গজের পেছনে, নদী থেকে খানিকটা দূরে জড়াডড়ি করে ঝাঁড়িয়ে ছিল একসার চিনের বাড়ি—খানা, তার পাশে ডাকঘর, ডাক্তারখানা, আর একটু তকাত্তে রেজিষ্ট্রেশন আফিস। ওদের বাবা ছিলেন ঐ ডাকঘরের ড্রাক পোষ্টমাষ্টার, সদানিব মিত্র। বিপত্নীক বৃদ্ধ। সঙ্গারে ছুটি মাত্র তাঁর আসক্তি—একটা পুরানো আমলের গড়গড়া, আর এক সেট

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম  
আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”

• কমে প্রস্তুত  
• ঈষৎ সেকা  
• যেদিন প্যাক  
• ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, হৃদয়  
ও সর্বত্র রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কনফেকশনারী  
কলিকাতা - ২৯

বৈষ্ণব-সাহিত্য। আকিসের সঙ্গেই বাসা। খনিজের খাকবার ঘর। উপরে গিঁট, মাটির মেঝে, ছাঁচা বাঁশের বেড়া। বড় ঘরটার মাঝখানে পাটশান। তার এক দিকে থাকতেন তিনি আর এক দিকে হেনা। ছোট ঘরটাতে থাকত তার দাদা। আকিসের কাজটুকু শেষ হলই তিনি তাঁর শোবার ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসতেন। বাঁ হাতে নল, আর ডান হাতে কখনো বিজ্ঞাপতি, কখনো চণ্ডীদাস, কখনো বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত। একাধারে সরকারী পিয়ন এবং বেসরকারী বাহন লম্বু এসে মাঝে মাঝে কলকে পাগটে মিত।

বা বখন মারা বান, হেনার বয়স হবে সাত। দাদা তার বার-তের বছরের বড়। বি-এ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেছে। তার পর পাশের ঘর বেরোল। কিন্তু সনতের আর বেরোনো হল না। জড়িয়ে পড়ল এই বোনটিকে নিয়ে। সংসারে স্ত্রীলোক নেই। শুকে খাওয়ানো পরানো, আগলে রাখা, তুলিয়ে রাখা, সব সনতের হাতে। বেশ খানিকটা বড় হবার আগে পর্যন্ত দাদাই তার চুল বেঁধে দিত। বড় হয়ে বখন নিজে বাঁধতে শিখেছে, তখনো ফিতে কাঁটা নিয়ে মাঝে মাঝে তার ঘরে গিয়ে হাজির হত, চুলটা বেঁধে দাও না দাদা! সনত হয়তো তখন পড়াশুনা করছে। তেড়ে উঠে বলতো, পালা। তার পর কোন কোন দিন হঠাৎ গম্বীর হয়ে যেত। বোনকে কাছে ডেকে তার মাথার পিঠে হাত বুলািয়ে দিয়ে ব্রিড্ কঠে বলত, হ্যাঁয়ে, মার কথা তোমার মনে পড়ে?

হেনার চোখ দুটো ছলছল করে উঠত, মায়ের কথা মনে পড়ে যায়, দাদার হাতের নিবিড় স্পর্শে। মনে মনে বলত, কেমন করে পড়বে? তুমি ছাড়া আর কোনো মাকে তো আমি জানি না?

বেরেদের একটা মাইনর ইন্সুল ছিল ওদের বাড়ির কাছেই। ইখান্ডা নিয়ে হেনা সেখানে পড়তে যেত। ভালো ছাত্রী বলে তার াম ছিল। হেড মিস্ট্রেস সুরমা দি খাতির করতেন, স্নেহও করতেন। মাঝে মাঝে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে আল্লাদা করে পড়াতেন। কিন্তু হেনার আলদা ছিল তার দাদার ঘর। কত বই ছিল সনতের। বেশীর ভাগ প্রবন্ধ, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, মহাপুরুষ এবং মনীষীদের উপদেশ। একটু বখন বড় হয়েছে, মাঝে মাঝে এটা-ওটা নিয়ে নড়াচড়া করত। ভারী ভালো লাগত শ্রীম কথিত কথামৃত, স্বামিজীর বীরবাণী, ভগিনী নিবেদিতার অপরূপ জীবনকথা। কী সব সমিতির সভা ছিল তার দাদা। কোথায় কলেরায় প্রায় উজাড় হয়ে গেল, কোথায় বজায় তিন হাজার লোকের আশ্রয় নেই, কোথায় হঠাৎ আভান লেগে পুড়ে গেছে একটা গোটা বাজার, ঘর পেলোই দালা আর তার ছাঁচাটি বন্ধু গুণ্ড পস্তর চাল কবল বাড়ে করে ছুঁত। এমন দিন পেছে বখন হয়তো একনাগাড়ে লশ বারো দিন সনত বাড়ি আসেনি। ভারী ভাবনা হত হেনার। কিন্তু বাবা একটি বারও জানতে চাইতেন না তার কী হল। খোঁজ খবর নেবার কথা বলতে গেলে নিঃস্বাস কেলে বলতেন, কিছু দরকার নেই, যা! বখন তার সময় হবে, আপনাই আসবে।

মাঝে মাঝে সনতের কোনো কাজ থাকত না। তখন হেনাকে ডেকে নিয়ে পড়াত, কত গল্প বলত বেশবিসপের। কোনো কোনো দিন বিকালবেলা স্নেহ করে নিয়ে যেত সেই ডাঙ্গা বাট্ট। দাড়িরালাখীর বুকের উপর বসে আকিসের নোঁকায় ডিঙ। বগায়

গাছপালায় ঘেরা গ্রামের ছবি। হেনা বড় হয়ে একদিন ওদের সামনে গিয়ে দু'ধারে চেঁচিয়ে তুলে চলে য় মৃত্যু ঈশ লঙ্ক। বোধ হয় কোনো পাটের সাহেবে হাত তুলে বলল, দাঁধ দাদা, কী স্থলর ঈশারখানা!

সনত কী ডাকছিল। গম্বীর ভাবে বলল, সামনের সিন্। ওর উল্টো দিকটা তেমনি কুস্তি।

হেনা বুঝতে না পেরে দু'টি জিজ্ঞাস্য চোখ তুলে মুখের উপর। সনত বলল, আমাদের বারোহাতী তল দেখেছিল তো? কী চমৎকার দেখতে! পেছনে উঁকি মেরে দেখিস।

—কী দেখানো? প্রশ্ন করল হেনা।

—একগাঙ্গা দড়ি-দড়া, মোংরা বাখারি আর ছেঁড়া না হলে প্রতীমা তৈরি হয় না।

—বাঃ, তা হবে কেমন করে?

—ঠিক তেমনি। এই যে ঈশারটা দেখে তোমার গেল, ওর একটা উল্টো পিঠ আছে। সেখানে য়ে কয়েক লক্ষ মোংরা ডাঙ্গা ঘর আর ছেঁড়া কাঁথা। ব্রহ্ম ধ্বংসে খাবি থাকছে একপাল কঙ্কাল। তাদে মাংস দিয়ে তৈরি হয়েছে এ ময়ূরপক্ষী।

এ কথাবার কী উত্তর দেবে হেনা! এসব বখন বলত ফুটে উঠত কেমন একটা অদ্ভুত হাসি! সে হাসি দে করে, বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

কোনো কোনো দিন বাড়ি ফেয়ার পথে গজের ঐ টিনের শেডগুলো দেখিয়ে বলত সনত, আমার মাঝে য় করে জানিস হেনা? ঐ টিনগুলো সব আগুন লাগিয়ে দিই।

হেনা চমকে উঠত। তারপর আশ্চর্য করণ কর্তে ঐ আগুন যেদিন আসেনি, কী শান্তিই না ছিল আমা ঘরে। বোগ নেই, অভাব নেই, দেশ ছুড়ে বলমল কর এই চেঁচা টিনের চেঁচা লেগে সব ভেসে গেল। হেনার ইচ্ছা: করে, কী করে গেল। কিন্তু দাদার মুখের দিকে চেয়ে বলতে কিছুক্ষণ শিশুর মতো ঠাণ্ডিয়ে থেকে সনতই আবার তুলত সে য় কিসে গেল জানিস? ঐ পাট। সাহেবরা আর ত

চেলার বলে বেড়ায় পাট নাকি বাংলার সম্পদ। সম্প ওরই লোভে রাতারাতি কেপে উঠল মাহুতগুলো। এ ছিল ক্ষেত-খামার, ভিটে, ডাঙ্গা, সব ভেঙ্গে চষে অন্ধের য় গেল পাটের বীজ। পাটের বীজ নয়, সর্বনাশের বীজ খাত গেল, বাঁহা গেল, তার জায়গায় এল পোছা-পো নতুন মোট। তাই গিয়ে কিনল বিপাতী টেউটিন, আলোয়ান, জাপানী হাতা আর দিল্লী কুইনাইনের বড়ি। বাস্তিল আর কপিন? ঐ টিনেও আজ টান ধরেছে। ছাড়া আর গতি নেই। তাই বা কোথায়? গাছ তো এ প্রথম চোটে।

বলতে বলতে হঠাৎ পাড়িয়ে পড়ল সনত। পাশে আগাছা জ্বলেন দিকে আতলা তুলে বলল, কুই দেখিসনি এইখানে ছিল একটা ময়ূর বড় কলকল করে সনতের।

কত দিন আম কুড়োতে এসেছি। কী মিষ্টি আম! আর তেমনি  
জাম হত ঐ কণ্ঠের দিকে একটা গাছে। গোটা অঞ্চলের ছেলে-বুড়ো  
থয়ে ছড়িয়ে শেষ করতে পারত না। তারপর একবার গরমের ছুটিত  
গাড়ি এসে দেখি, সব ম্যাজিকের মত উড় গেলো। তার জায়গায় লম্বা  
বগা পাট। ঐ যে এঁদো পুকুরটা দেখছি, ডালিমের রসের মত জল  
ছিল। পাট পচিয়ে পচিয়ে গরম ঐ দশা। এই তো সেদিনের কথা। আজ  
গাটও নেই। পড়ে আছে শুধু আশসেওড়া আর শিয়ালকাঁটার বন।

এতক্ষণে প্রশ্ন করল হেনা, আর পাট বুনছে না কেন?

—দব নেই যে। কিন্তু এদিকে ধান-চালের বাজার আশুন।

—এবার তাহলে চালের দাম কমবে, না দাদা? বুদো হয়ে  
বলল হেনা। ঐ বস্তুর চড়া দর যে একটা সাংসারিক দৃষ্টান্তের  
কারণ, সেটা বুঝবার বয়স তার অনেক আগেই হয়েছিল। সনত সাদ  
সিল না, তেমনি চিন্তিত মুখেই বলল, তা আর হয় না। এ বড়  
মজার জিনিষ। একবার চড়ে বসলে আর টেনে নামানো যায় না।

—কেন?

শ্রদ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে হেনা বলত সনত,  
বড় হ; লেখাপড়া শেখ। তারপর নিজের বৃত্তে পারবি।

দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল হেনা। ইস্কুলে যায় আসে।  
সঙ্গী, সাথী বসতে ঐ দাদা আর তার লাইব্রেরী। সমবয়সী  
মেয়েরা লেখাপড়া ছুটোছুটি করে। ও থাকে এক পাশে। ওদের  
সঙ্গে কোথায় যেন ওর মস্ত বড় জমিল। মনের মধ্যে কিসের যেন  
অস্থিরতা। চারদিকের অভাব, দৈন্ত, রোগ শোক। এর কি কোনো  
শেষ নেই? আছে বৈ কি? একদিন নিশ্চয়ই আসবে, যখন  
মাথার কোনো ঝুংখ থাকবে না। তবে কেমন করে আসবে সেদিন,  
এই তার চিন্তা। মেয়েরা তাকে এড়িয়ে চলে। আড়ালে ঠাটা-  
বিজ্ঞপ করে। সেদিকে ওর খেয়াল নেই। মোটামুটি স্বচ্ছল  
পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যবতী মেয়ে। নিতান্ত ছোটটি নয়। সেকথা তাকে  
কউ মনে করিয়ে দেয়নি। নিজের সঞ্চকে এখনো যেন তার ঘুম  
চাঙেনি। নিজের সেই এবং সেই-সম্ভার দিকেও চোখ পড়েনি।  
এমনি সময়ে একদিন ছুটির পরে তার ডাক পড়ল হেড মিস্ট্রেস  
রুমারিয়ার ঘরে। ছ'-একটা মাহুলি কুশল প্রেরণের পর তিনি হঠাৎ  
জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাড়ি নেই, হেনা?

—হ্যাঁ; আছে তো। এবার পূজোর একটা সন্মার সাড়ি  
দিয়েছেন বাবা।

—বাবাকে বলো, আরো সাড়ি কিনে দিতে। কাল থেকে  
দার ঝুকু পড়ে এসো না, কেমন?

—কেন? বসেই অকস্মাৎ কিসের লজ্জার হেনার সমস্ত  
হাটা আড়ষ্ট হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে থলে গেল তার দৃষ্টির  
পারশ। এ যেন নিজেকে নিজের আবিষ্কার। হাঙা দিয়ে  
দবার সময় কেন যে লোকগুলো তার দিকে তাকিয়ে থাকে, কেন  
বছুরা গা টেপাটপ করে নিজের মতো, আর তাকে  
বলেই চুপ করে যায়, সব যেন অজ্ঞতার হঠাৎ অলো-ওঠা  
দ্বাং-শিখার মত তার চেতনার মধ্যে ঢুক খেলে গেল।

প্রথম সাড়ি পরে দাদার ঘরে গিয়ে প্রণাম করতই কৃত্রিম বিষয়ে  
চেঁচিয়ে উঠল সনত, আরে, হেনা! আমি ভাবছিলাম এ আবার  
কোন ডব্রমহিলা এসেন আমাদের বাড়ি?

—বাও, বলে মাথা নীচু করে দাঁড়াল হেনা। কুয়াসা-বৃক্ক  
অক্ষপাতের মত তার মুখে সেই লজ্জার স্পর্শটুকু সনতের চোখেও  
নতুন লাগল। সেদিকে কিছুকণ চেয়ে থেকে বসল, হঠাৎ আত্ম  
পেগামের খটা কেন?

—বাঃ, খটা আবার কিসের? নতুন কাপড় পরলাম, তাই।

—ও-ও, আমি মনে করেছিলাম, এটা বুকি নোটশ।

—কিসের নোটশ! ক্র কুণ্ডিত করে জিজ্ঞাসা করল হেনা।

—নোটশ, মানে, তোমাদের বাড়ী আর পোষাছে না, চললাম  
এবার নিজের ঘরে।

—তুমি ভারী অসভ্য হয়েছ দাদা! বসেই পালিয়ে গেল নিজের  
ঘরে।

এই যে নবজন্মের আশ্বাস এল হেনার মনে, খাতার পাতায় তার  
একটুপানি অভাস দিয়েই সে চলে গেছে অল্প কথায়। তালুকদার  
সাহেবের মানস চক্রে সেই ছবিটি স্পষ্টতর হয়ে উঠল। তিনি তো  
জানেন, এ হচ্ছে সেই চিররহস্যময় বয়সকি, যখন নিজেকে দেখে  
নিজেরই বিষয় লাগে। মনে হয়, যেন ঘুমিয়েছিলাম, রাতারাতি  
জেগে উঠে দেখি, আরেক দেশ এসে পড়েছি। বা কিছু দেখছি,  
তাই বড়ান, তাই স্বপ্নময়। প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন হঠাৎ অবাধ  
হয়ে দেখে, তাদের সেই কীপালী চক্কল, কিশোরী মেয়েটি কোথায়  
হারিয়ে গেল। তার জায়গায় যে এল তার প্রতি অল্প দেখা দিয়েছে  
জোয়ারের জাগরণ। শুধু তহুঁরখায় নয়, পূর্ণতার নবরূপ এসেছে  
তার গতিতে, তার চলার ছন্দে, তার কণ্ঠে তার হাব-ভাব নীলার।  
যেখানে সেখানে সে বড়ের মত এসে পড়ে না। যখন তখন শোনা  
যায় না তার উজ্জল হাসির কলধনি। চোখের দিকে তাকালে চকিত  
লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয়। একলা বসে ভাবে, কিন্তু ভেবে পায় না  
কী করবে তার নতুন-পাওয়া নিজেকে নিয়ে, কোথায় রাখবে তার  
এই হঠাৎ ভরে ওঠা লাভ্যের সন্টার। নির্জন ঘরের জানালা দিয়ে  
স্বপ্নময় দৃষ্টি পাঠিয়ে দেয় বুকে-বুড়োকে! কী দেখে সে জানে না।  
কথায় কথায় সে আনমনা। কারো ডাক তুললে চমকে ওঠে।  
অকারণে বুক ছাপিয়ে ওঠে উজ্জল আনন্দে। কখনো বুক জেতে আসে  
অব্যক্ত বেদনায়। কেমন করে জানবে সে, কখন কোন অসতর্ক  
মুহূর্তে বিদায় নিয়ে গেল তার কৈশোর, স্বপ্নের কানে কানে এসে  
গেল বোঁবনের লিপি।

সেহময়ের এই রূপান্তর বিশ্ব প্রকৃতির দান। সব মেয়ের  
জীবনেই আসে। হেনারও এসেছিল। কিন্তু এই নিতান্ত সহজ  
বস্তুর বহিঃ কোনো বিশেষ রূপ নিয়ে থাকে তালুকদারের চোখে, তার  
কারণ, এই মেয়েটির জীবনে এটা শুধু আবির্ভাব মাত্র। এল,  
কিন্তু প্রত্যাশিত পরিণতির পথ দিয়ে তাকে সার্থকতার নিয়ে  
গেল না!

[ ক্রমশঃ ]

[ মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য ]



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

প্রয়াসী

রুজনের নেতৃত্বে একটা ডাকাতি করেছিল অশেষ। শ্রীমন্তদা'র অধীনে আরও গোটা দুই ডাকাতি করার পর তার স্বপ্ন সফল হল। তাকে নেতা করে শ্রীমন্তদা' পাঠালেন খাজনার গাড়ী লুণ্ঠ করতে। প্রায় হবে তার নিজস্ব, নিজেরই পছন্দে সে স্বকুমার আর রমেনকে সঙ্গী হিসাবে নিল। এ বিরাট দায়িত্বের অর্থ সে জানে—যদি কোঁচল হয়, যদি কোন গোপন তথ্য পুলিশের কাছে ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে শ্রীমন্তদা' নিজের হাতে তাকে শাস্তি দেবেন—সে শাস্তি মৃত্যু-দণ্ড পর্যন্ত হতে পারে—কোন স্নেহের হর্বলতা তাঁকে তাঁর কর্তব্য হতে বিচলিত করতে পারবে না। আশ-পাশের পনেরো-কুড়িটা গ্রামের গভর্ণমেন্টের খাজনা তুলে নিয়ে যাবে ঘোড়ার গাড়ীতে। একটুখানি পথ, তারপর ট্রেনে তুলে দেবে। দায়িত্ব নিয়ে যাবেন দেশী রেভিনিউ অফিসার তারক সোম—সাংঘাতিক লোক একটা! সব টাকা কালেক্ট করে নিজের গ্রামের বাড়ীতে রেখেছেন, সেখান থেকেই রওনা হবেন, সঙ্গে থাকবে হুঁজন চৌকীসার আর কোচম্যান রহিম। তারক বাবুদেও বাড়ীটা অশেষদের গ্রামের প্রায় আট-নটা গ্রাম ছাড়িয়ে।

কি উপলক্ষ্যে তারক বাবুর বাড়ীতে একটু খাওয়া-দাওয়া ছিল—বেরোতে বেশ রাত হয়ে গেল। অবস্থা ভোরের মেলে যাবেন, অনেক সময় আছে—অস্থবিরে কিছু নেই। আর পথও সামান্য—তাই স্বদেশীদের ভয়টাও নেই। বর্ষাকাল আকাশ ভরা ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, অল্প বৃষ্টি পড়ছে, বেশ অন্ধকার। অনেক খবর সংগ্রহ করেছে অশেষ। তারই হুঁটির ওপর তার প্রায় গড়ে উঠল। এক—তারক সোমের সাত মেয়ের পর এক ছেলে—ভীষণ আত্মহারা। আর রহিমের একটি মাত্র মেয়ে মমতাজ—বুড়ো বাপের কলিজা।

সবর রাস্তাটা চলে গেছে হৈশনে। ঘোড়ার গাড়ীতে পাঁচ মিনিটের পথ, রাস্তা মাটির রাস্তা—বর্ষায় বেশ জখম হয়েছিল, অশেষ, স্বকুমার আর রমেন সন্ধ্যা হতে গা ঢাকা দিয়ে তারা গোড়ার দিকে অপাবাপ কোদাল চালিয়ে গোটা চারেক বিরাট গর্ত করে দিল—কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টির জলে পূর্ণ হয়ে গেল। কোদালগুলো রমেন দৌড়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে এল। তারপর তারা ঠাড়িয়ে রইল—স্বকুমার আর রমেনের পরনে লুঙ্গী, মুখে দাড়ী, খালি গা, কোমরে ভোজালি—যদি প্রয়োজন হয়। এক সময় শোনা গেল ঘোড়ার খুয়ের শব্দ। অন্ধকারে ঠাঁওর করে দেখল ওরা এগিরে ছারকে, গাড়ীটার

দরজাগুলো বন্ধ, কোচবাল্লের রহিম আর একজন চৌকী একজন। প্রথম গর্তটা পার হতে গিয়ে যে বিরাট তাতেই ভেতর থেকে তারক বাবু চীৎকার করে উঠলেন—

“কি করছিস রে ব্যাটারা? মেরে ফেলবি নাকি!

এয়াও ভয় পেয়ে গেছে—তার সামনের জলভরা দেখে আর এগুতে সাহস করলো না। রহিম চেঁচিয়ে রি “রাস্তা যে বড়ই জখম হইছে, কতী, ঘোড়া ষাতি পথে চলি? কি কন?”

—“তাই চল, একটু ঘর হবে, সময়ও আছে।”

এই চাইছিল অশেষরা—একটু সময় না পেলে কি : বনের পথে ধীরে ধীরে চলল গাড়ী, অশেষরাও থেকে অনুসরণ করতে লাগল। বেশ একটু যখন এগিয়ে ছাড়িয়ে; হঠাৎ অশেষ ছুটেতে লাগল, একটু পরেই চীৎ : —“ও, চাচা, গাড়ী থামাও গো, ও চাচা, বাবুর বা ও চাচা শুনছো।”

বিম্বিত রহিম গাড়ী থামাল—তারক বাবু দরজা বাড়ালেন। অশেষ তখন এসে পৌঁছেছে, হাঁফাচ্ছে—মাং জড়ানো, মুখ প্রায় সেবা যায় না, সেই পুরোনো ক্ষম লাগিয়েছে সে—গলার স্বরটা বদলে ফেলেছে। তারক বাবু প্রশ্ন করলেন—“কি হয়েছে?”

অশেষ হু' চোখ কপালে তুলে ফেললো—

—“তুমি তো তারক বাবু, তোমার ছেলের কলেরা। ষাৎ ছেড়ে গেছে; তবু বাবা ‘বাবা’ করে হেতুছে। শীগ্গির এস।”—

বিষম্বন্ধাও তুলে উঠল—প্রশান্তর কলেরা—হতে প হচ্ছো—তাকে খুঁজছে প্রশান্ত। তারক বাবু চঞ্চল হ তবু প্রশ্ন করেন—“তুই কে, কি করে জানলি?”

অশেষ তড়বড় করে—“আমার বাড়ী তো সেই বর্ধ বাবার দোকান আছে যে এই গেরামে, আমি এসেছিছ তোমার বাড়ীর যে লোক খবর দিতে এসেছেন, সে যে পথের ধারে মাটি নেছে—আমি ঘুমছি—ডেকে তুলে দিতে পাঠাল। যাবে তো চম শীগ্গির, পায়ে হেটেই যা রাস্তা হয়েছে গাড়ীর থেকে পা চলবে তাড়াতাড়ি।”

খুব সত্যি কথা, এক মুহূর্ত বিধা কতেন তারক বাবু—রহিম সবাই বিশ্বাসী, একবার প্রশান্তকে—ডাক্তারের বা তোর একটু অপেক্ষা কর, আমি একুণি আসছি।” হনহন করে এগোল, অশেষও সঙ্গে যায়, তারপর থা। —“ও মা গো, পায়ে যে কাঁটা ফুটলো” বলে : আব্বার বলে—

“তুমি ঠাডিওনি বাবু, চলে যাও, আমি পরে যাব।” অদৃশ্য হন। গাছের আড়াল দিয়ে স্বকুমার আর রমেন গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু পরেই সবাইকে একটি মেয়ের কঠিন শোনা যায়।

“ও বাপজান, তুমি কুখা গেলে গো! আমি লেগে আঁটরা আঁধারে কিছু দেখতে নারি গো।”

রহিম উঠে পড়ে—“আমার বেটার গলা না। এই আমি, হাঁড়ি না।” সবাই মোহিত হয়ে



বুকের দুই ছাড়া নোর  
সমস্যা থেকে  
আমার মুক্তি দিয়েছে

# নেস্টাম

ঘব, গম প্রভৃতি শস্যচূর্ণের সংমিশ্রণে  
তৈরী আদর্শ শিশু-খাদ্য। নেস্টাম  
শিশুর অল-প্রত্যঙ্গ গঠনের পক্ষে  
অপরিস্রাব উপাদানগুলো  
অধাপরিমাণে যুগিয়ে স্বাভাবিক-  
ভাবে তাকে পুষ্ট করে।

- রান্না করতে হয় না
- সহজেই মিশে
- পরিপাক যন্ত্র  
সবল করে



নেস্টাম দিয়ে পিঠে, কেক প্রভৃতি নানা উপাদেয়  
খাদ্য তৈরী করা যায়।

বিনামূল্যে পুষ্টিকার জন্ম লিখন :

নেসেল্‌স্‌ প্রডাক্টস্‌ ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ

পোঃ অঃ বক্স ৩১৬, কলিকাতা • পোঃ অঃ বক্স ৩১৬, বোম্বে,

পোঃ অঃ বক্স ১৮০, মাদ্রাস

চলে যায়। কি করে যে ঘেঁষে এখানে আসবে এ প্রশ্নও মনে আসে না তার শিউরেহের আধিক্যে। আর সেই মুহূর্তে লাফিয়ে পড়ে হুজুন—পলকে বলিষ্ঠ হাতে ম্যাসেরিয়া-অর্জবিত চৌকীদার ছুটোকে মাটিতে শুইয়ে ফেল মুখে কাণ্ড শুভ্র দেয়, বৃকে চেপে বসে ভোজালির কোণ ছোঁয়ায় বৃকে। ওদিকে স্নেহ-অন্ধ শিতার ডাক শোনা যায় দূরে “কোথা গেলি গো বেটা মমতাজ।”—বেটা তখন অশেষ হয়ে গাড়ীর ভেতর—তুলে নিল সিলকরা বাস্‌ট—ছুটতে লাগল বন দিয়ে—একটু দূরে গিয়ে ছইসিল দিল—সঙ্গে সঙ্গে চৌকীদারদের ছেড়ে লুঙ্গি তুলে অন্ধ হুজুনও লাফ দিয়ে পালাল। একটু পরে ব্যাপারটা বুঝে বুখাই চৌকীদাররা ছুটোছুটি করতে লাগল এদিক-ওদিক। রহিম যখন বৃকল মমতাজ সেখানে নেই, তখন বুখাই সে নিশির ডাক ভেবে নিদারুণ ভয়ে ঠক্কর করে কাঁপতে লাগল। আর তারক বাবু নিস্তক্ক বৃকল বাড়ীর দোর ঠেকিয়ে সবাইকে ডেকে তুলে যখন বৃকলেন সব মিথ্যে, তখন বুখাই দৌড়োলে গজরাতে গজরাতে—“পাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা হতভাগাকে।”

হতভাগায়া তখন ভোল পাণ্টে ভয়লোক সেজে সাইকেল চালিয়েছে জোর কদমে। ঐমন্তদা'র কাছে সিল ভেঙ্গে টাকা হবে গোপা, কার্তার বাস্‌টা উম্মের রসদ যোগাবে। কাল-পরশুর মধ্যে আশ-পাশের দশ-বিশটা গ্রামের বাছা-বাছা বাড়ী তোলপাড় করবে পুলিশ কিন্তু কোন নিশানা পাবে না। কৈফিয়ৎ দিতে দিতে তারক বাবুর হবে প্রাণান্ত, চাকরী নিয়ে পড়বে টানাটানি—ভালই হল, এক ঢিলে দুই পাখী বাজিয়ায়।

আরও একটা বছর কাটলো। কত গোপন ঠেঠক হয়, কত ছেলের ওপর কাজের ভার দেন ঐমন্তদা', মৃত্যুর সঙ্গে কোলাকুলি করে তারা—কখনও ফেরে, কখনও ফেরে না। লোকলুপ দুষ্টিতে চেয়ে থাকে অশেষ, কিন্তু বিপ্লবী দলের ছেলে, বৃক ফাটলেও মুখ ফোটে না। শেষে এক দিন এল বহু প্রতীক্ষিত দিন—কলকাতার দারুণ অত্যাচারী এক সাহেব, শিকার করতে বাচ্ছেন খবর পাওয়া গেল—আনন্দ করতে। অনেক বিপ্লবী তাঁর অত্যাচারে মৃত্যু বরণ করেছে, এবার তাই তাঁর পালা। তার পড়ল অশেষের ওপর, নির্দেশ পাওয়া গেল ধরা কোন মতেই দেবে না। যদি পালাবার সুবিধে না থাকে, ব্যস্ত হবে না, পকেটে রইল পটাশিয়াম সাইনাইড—হাতে রইল রিভলবার। সহকর্মী চলল গোপাল।

সেই বনে এসে তারা কাঠুরের বেশে আন্তানা গাড়ল। দিন দুই গেল, সব কিছু দেখে-শুনে পঞ্চাশট চিনে নিল ওরা। চিনে নিল লালমুখো সাহেবটাকে—যা ওদের লক্ষ্য। তৃতীয় দিন দুপুরে একটা সন্ধ্যাপ পাওয়া গেল। সাহেবের একটা বয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলোছিল আপনি-আজ্ঞে করে, খাতির দেখিয়ে। তারই কাছে জানা গেল, সাহেবের শরীর ধারণ-শিকারে বাবেন না, অন্তরা বাবে। এত বড় সুযোগ আর আসবে না। অশেষরা তৈরী হয়ে বুনো হল—তখন দুপুরবেলা। পোষাক তাদের ছেঁড়া-খোঁড়া, হাফা ছবাবেশ। তাঁবুর দক্ষিণে কিছুটা দূরে একটা পুকুর-পাড়ে এসে পঁড়াল ওরা। গোপাল ইট-পাথর চটে বেঁধে একটা পুটলী করে রাখল। তার পর দুই বন্ধু আলিঙ্গনে বহু হল। অশেষ হেসে বলল—“চললুম গোপাল, যদি আর না ফিরি তো এবার জাম্পিমানশিপটা তোদের গ্রাউই দেবে রে।”

এমনি হেলাভের মৃত্যুকে আলিঙ্গন দেয় বিপ্লবী। তাকে শুধু গ্রামের ফুটবল টিমের ক্ষতি হবে, আর কিছু না। ও দূর পদক্ষেপে সে এগিয়ে গেল। গোপালের চোখ দুটো ঝাপস আসে—অশেষহীন খেলার মাঠ, অশেষহীন অভিনয় কল্লনা ব না।—অশেষ তখন পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়েছে।

তাঁবুর এলাকায় এসে পড়ল অশেষ—অজুত ভাল সুখে সাহেব বাইরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বই পড়ছেন, টেবিলে ছইসির বোতল, গোলস। আর কেউ নেই—চাঁবা থেকে অল্প কোলাহল ভেসে আসছে। সাহেবের রিভলবার থাকতে পারে—থাক, ওটুকু ঝুঁকি না নিলে কেন? অশেষ সামনে এসে পঁড়াল—পকেট থেকে রিভল তখন হাতে নিয়েছে—আরও কাছে এগিয়ে গেল; মাত্র চার পাঁচ হাতের ব্যবধান—সাহেবের হাতের ওপর তার ছায়া পড়েছে—চমকে চোখ তুলে তাকালেন সা। আর পরমুহূর্তে ট্রিগার টিপল অশেষ—এক...দুই...তিন...করা হল না সাহেবের—চেয়ার থেকে ঢলে পড়লেন...স টেবিলটাও সেই ধাক্কায় ওঁটল—ছইসিতে আর রক্ত মিশে এক নিমেষে চারদিক দেখে নিল অশেষ—রিভলবারের আঁচকরদের কোলাহল খেমেছে—এখনি বেরিয়ে ওরা সব পারবে—তার আগেই—বাঁ হাতে পটাশিয়াম সাইনাইডট দক্ষিণের পুকুরটার পথে অদৃশ্য হল অশেষ। একটু পরেই ও শুনলো বহু পানের শব্দ—আর কোলাহল—অশেষ গতিবেগ বা—গোপাল ওলার আওয়াজ হতেই বোকাটা হাতে তুলে পাঁড়িয়েছিল—অশেষ কাছাকাছি আসতেই প্রাণপণ বলে পুকুরে ছুড়ে ফেলল—তারপর আঁকাবাঁকা বনের পথে অদৃ হুজনে। দূর থেকে শুনলো পদশব্দ আর শোনা যায় কোলাহল আসছে পুকুরঘাট থেকে—সার্বক এন্টেষ্টা—ড্রাস্ট হ অল্পসরণকারী দল—ইটের বোকা ফেলার শব্দে ভেবেছে আঁত পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর ভাবনা নেই—ওরা যখন বুঝতে পারবে, তখন এরা এ তল্লাট ছেড়ে গেছে—ভোল যে পাণ্টে।

এর পরেই কিছু গ্রামে ফেরা হবে না—সাহেবের মৃত্যুর 'অল্পপস্থিতি আর মৃত্যুর পরই উপস্থিতি—সন্দেহ হবে পুলিশ দুই বন্ধু মাস কয়েক ভাল মাছবের মত দেশ ভ্রমণ করে বেড়া ঐমন্তদা'দের সঙ্গে সব সংশ্রব ছিন্ন—পাছে সন্দেহ হয়। শেষে এ ফিরলো। শুনলো ঐমন্তদা' কলকাতায়—আজ ফিরবেন। ও খবর—মাগধানেক আগে জেল থেকে খবর আসে—হঠাৎ বর গ্যালাপিন টাইপের টি, বি, হয়েছে—রক্তনের বাড়ীর লোক, ঐমন্ত চৌর জট করেন নি—কিন্তু কিছু হোল না—ক'দিন হল সে গেছে চিততনে—শেষ ক'দিন সে বার বার অশেষকে দেখতে চেয়েই বজ্রহত্যের মত পাঁড়িয়ে রইল অশেষ। তারপর বাড়ী এলো। ঐমন্তদা' ফিরবেন কেনও সন্ধ্যায় সে ছুটলো না—পড়ল। সহসা বিপ্লবীর কাটিজের আবরণ ভেদ করে সারাশরীর তার কায়ার আবেগে ফুলে ফুলে উঠলো—বালিশে মুখ ঢেকে আঁকিতে লাগল—বেদন করে একদিন কেঁদেছিল শৈশবে—হা...নেতে...এ কি হল? রক্তলতা, আর ভয় কিরবে না?...

দেখতে চেয়েছিলে তুমি... দেখা হল না একটি বারও!—শ্রীমন্তদা' তার পাশ বসে মাথায় হাত দিয়ে ডাকলেন,—“অশেষ!”

চমকে উঠল সে কাঁদা থামাতে পারল না অশেষ—শ্রীমন্তদা'রই কোলে মুখ লুকালো সে—কান্নার বেগটা গেল বেড়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে শ্রীমন্তদা' বললেন—“কাদিসনি অশেষ, রজন চল গেল, তার অসমাপ্ত কাজ যে তোকেই সমাপ্ত করতে হবে ভাই! আর রজন-সেহঁটাই গেছে—ও বেঁচে থাকবে চিরকাল—ভারতের শহীদ মাহুদ বলে কত সম্মান করবে পূজা করবে। এই তো আমাদের পূর্বস্বার রে।”

আরও বছর থাকেনের মধ্যে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়াল—অসংখ্য হত্যা আর ডাকাতি—পুলিশ দিশেহারা হয়ে থাকে পেল তাকেই জেলে পুরে ফেলল। তার মধ্যে শ্রীমন্তদা'রও সবাই গেলেন—শুধু অশেষ ও আরও কয়েক জন বাইরে রইল। সব কাজের ভার অশেষ নিজের কাঁধে তুলে নিল এবার। বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ তার একেবারে উবে গেল। উদ্ধার বেগে সে বাংলা ও বিহারের গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ছুটোছুটি করে শ্রীমন্তদা'র অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার আশ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। বছর দুয়েকের মধ্যে সে অসংখ্য দল গড়ে তুলল—বিপ্লবের বহিঃ এতটুকু নিবতে দিল না। পুলিশ এবার তার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উঠল—মাই, বি, পুলিশের ঘানি জানে একটি মাত্র নাম—অশেষ মুখোপাধ্যায়—যারা যেখান থেকে পার—বেমন করে পার। পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে

অশেষ—আজ শুনলো পুলিশ—অশেষ মুখোপাধ্যায় অল্পক গ্রামে এসেছে, সাজ সাজ রব পড়ে গেল আই, বি, অফিসার দলবল নিয়ে ছুঁড়ির ওপর বেশট আঁটতে ইংল্যান্ড করতে করতে ছুটে এলেন, কোথায় কে? অশেষ হয়তো তখন মাঝি সঙ্গে নৌকো ভাসিয়েছে অথবা সাতের দেজে পাটনার ট্রেনে কাঠী রাখা কামরায় ছলান দিয়ে বসে ওলটাচ্ছে ইংরেজী নভেলের পাতা। পুলিশের ইনটেলিজেন্সট ব্রাঞ্চকে বৃদ্ধির খেলায় নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল সে।

এর মধ্যে অশেষ খবর পেলো বিয়ে হয়ে গেছে শান্তির, বেণুর, সুনীলেরও। কোনটোতেই সে থাকেনি। মামীমা কত দুঃখ করেন। কত ছেলেকে বলেন—“ওরে একবার তাকে আসতে বলিস।” তাদের সঙ্গে দেখা হলে কখনও অশেষ শুনতে পায়, কখনও পায় না। শুনতে পেলেও বাবার উপায় নেই—কুত্র গৃহের অর্গল সে ভেঙ্গেছে—সারা দেশে তার ঘর, স্নেহনীড়ের বাঁধন তো তার ভক্ত নয়। একদিন খবর এলো মামা মারা গেছেন। মুহূর্তের ভক্ত মামীমার ভক্ত মনটা হুলে ওঠে—আবার কাজের চাপে তুলে যায়। তারপর একদিন শুনলো মামীমার খুব অসুখ। বিপ্লবীর বৈধা বাঁধ ভাঙে—কুত্র গৃহকোণ হাতছানি দেয়। রাতের অন্ধকারে গাঢ়াকা দিয়ে ছ'বছর পরে বাড়ী ফিরল অশেষ। খিড়কীর পথে বাড়ী ঢুকে, মামীমার ঘরের দাওয়ায় কাছে এসে থমকে পড়াল সে। বোধ হয় সবাই ঘুমোচ্ছে। দাওয়ায় সুনীল বসেছিল, প্রায় করল, “কে?”



সুনিপুণ  
স্বর্ণশিল্পী  
ও  
মনিকার  
.....  
গিনি  
ম্যানসন

কুমিল্লা

প্রধান কার্যালয় :—

২২৬, রাসবিহারী এডেনিউ, কলিঃ-১৯

গ্রাম—“গিনিমান” • ফোন—৪৬-১৪১২

শাখাসমূহ :

বহুবাবু বাজার, ভবানীপুর

১নং হিন্দুস্থান হাট, বালীগঞ্জ, ফোন : ৪৬-১৪২৫



বড়না! প্রমাদ গুণলো অশেষ। তবু বলল “বড়না! আমি, অশেষ।”

অশেষকে বিমূঢ় করে দিয়ে সুনীল সন্তোষে বলল—“অশেষ! আর ভাই, মা তোকে দেখবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন। আর, গাড়িতে রইল কেন?”

বড়নার পেছন পেছন অশেষ তত্ক্ষাচ্ছন্ন মামীমার শয্যাপাশে এসে গাঁড়াল, ডাকল—“মামীমা!ঃ!”

চমকে চোখ মেলে অশেষকে দেখে হুঁহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ঝর-ঝর করে কঁদে ফেললেন মামীমা—“অশেষ! তুই! এত দিনে মনে পড়ল বাবা! কি চেহারা হয়েছে রে! ও সুনীল, বোমাকে বল ওর জন্তে খাবার আনতে।”

অশেষ বলল—“আমার জন্তে ব্যস্ত হতে হবে না মামীমা, তোমার অস্থখ শুনে দেখতে এলাম। কিন্তু আমি এসেছি কেউ ঘেন না টের পায়—পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে আদায়।”

কথাটা কিন্তু চাপা রইল না। গ্রামের সবাই দলে দলে দেখা করতে আসতে লাগল—গ্রামের ছেলে এত দিনে বাড়ী ফিরেছে—তার কি না এসে পারে?

তার ফলে পরদিনই এক আই, বি, অফিসার দলবল নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন—ঝাঙ্ক লোক, নাম শুনেছে অশেষ। সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেল। মুহূর্ত্তে জেলে যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হল অশেষ। তারপর হেসে আহ্বান জানালো—“এই যে আদায় মিঃ সেন, সত্যি এত দিন আপনাদের হয়রান করার জন্য দুঃখিত আমি। আপনাদের অনেকের প্রমোশন বোধ হয় বন্ধ করে রেখেছি তাই না? চলুন, আর দেবী কেন? রাজকুটিখি হবার জন্তে প্রস্তুত আমি। দেবী হলে আবার যদি পালাই, আপনাদের গ্রেড বাড়বার স্বপ্নটি এবারও ভাঙবে কি শেষে?”

নিরীকার ভাবে কথাগুলো হজম করলেন মিঃ সেন, ভাবলেন একবার পুরি আমার ডেরায়, তারপর বাছানকে দেখাচ্ছি—অশেষের আগমন সবাদের মতই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল গ্রেপ্তারের সবাদটাও। সারা গ্রাম ভেঙ্গে পড়ল তাদের বাড়ীতে। অস্থখ! মামীমা আকুল হয়ে কঁদতে লাগলেন—“কেন এলি অশেষ, কেন এলি তুই আমার দেখতে?”

তাকে চাপা গলার সাধনা দিল অশেষ—“কেন না মামীমা, ছিঃ, পুলিশের কাছে দুর্বলতা প্রকাশ কি তোমার সাজে?” তারপর হেসে উঠল—“এই বা কেনন আদায় বাপু, রাজার বাড়ী বাজডোণ খেতে দেবে না একবারও!...দিগন্তব্যাপী হাহাকারের মধ্য দিয়ে বলিষ্ঠ পদবীকশে এগিয়ে চলল অশেষ—সশস্ত পুলিশবেষ্টনার মাঝে। স্লক হল জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

তুখু সেনের ডেরায় নয়, অনেক আই, বি-পুলকের সঙ্গেই মোলাকাৎ হল। মিষ্টি কথা—‘বাবা’ ‘বাবা’—অর্থের প্রয়োজন—কিছুতেই বন্ধন অশেষ কোথায় তাদের দলের বিভ্রালবার আর ইস্তাহার লুকোনো থাকে এই ‘তুখু’ কথাটা বলে দিল না, তখন শান্তিধরর সমুখ সমরে আহ্বান জানালেন তাঁরা—অবশ্য একতরফা—পরখ করে দেখলেন কত শক্ত হতে পারে কুড়ি বছরের ভেতো বাদ্যালীর হাড়—কত ভায় সহ-শক্তি। পরীক্ষা দিলও অশেষ—শক্তি ও চৈতন্যের শেষ বিলম্বটি হয় না হওয়া অবধি স্থির হয়ে উন্নত দৃষ্টিকোণে

গাড়িতে রইল বিভিন্ন রকম অভ্যাচারের সামনে, তারপর একসময় সজ্জাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ল। খাটি ইম্পাউন্ড—ভেঙ্গে গেল—মচকালো না। এর পর রাজবন্দী হয়ে অনেক জেলে বোরা হল কোথাও কিন্তু শ্রীমন্তদার সঙ্গে দেখা হল না। কোথাও শে এক মাস আগে তিনি বদলী হয়ে গেছেন, কোথাও শোনে ম দুদিন আগে। প্রথম দু-চারদিন গাথাপ লাগল—বাইরের ব চকল জীবন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে—কিছুতেই মন বসে ন তারপর এই পরিবেশেই সে অভ্যস্ত হয়ে গেল—এখানকার খে প্যারেড, অভিনয়, হাতে-লেখা পত্রিকা—সবতেই সে অগ্রণী : এগিয়ে গেল। পরিবর্তে পেল অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, অফুরন্ত ভালোবাসা স্নেহ, শ্রীতি ও মমতা। কাটতে লাগল দিন। একদিন বড় চিঠিতে জানালো মামীমা আর নেই। আজ আর কান্না পেল অশেষের—কোন্ডের হাসি হাসল সে—যাক্, সবাই তাকে মু দিয়ে গেল একে একে—কোন বন্ধন আর তার রইল না পৃথিবীতে আই, বি, পুলিশ নতুন ঢাল ঢালতে অনেক বন্দীকে মুক্তি দিল স্বগৃহে অন্তরীণ করে। অশেষেরও ‘একদিন ছাড়পত্র মিলল—বি বছর পরে।

গ্রামে পা দিয়েই শুনলো শ্রীমন্তদা বাড়ীতে আছেন। তখ ছুটলো সে। ঘরে ঢুকে স্নান হয়ে গাঁড়াল—শ্রীমন্তদার বিশ দেহটা মিলিয়ে গেছে বিধানার সঙ্গে। আগের মতই নির্মল যে আহ্বান জানালেন শ্রীমন্তদা—“আয় অশেষ, আমি জানতাম : ছাড়া পেলেই ছুটে আসবি, আর, কত দিন দেখিনি যে তুকে!”

নিঃশব্দে প্রণাম করে পাশে এসে বসল অশেষ। ক্রমে ত শুনল বিনা সঠে শ্রীমন্তদাকে মুক্তি দিয়েছে গভর্ণমেন্ট—তুখু এ নিত্যসঙ্গী দিয়েছে—দুয়ারোগ্য রোগ ক্যানসার। অশেষ স্নানাহার বন্ধ হল। শ্রীমন্তদাকে বিচাতেই হবে যে। তার ও আছে বিপ্লবের কাজ—এতদিনের অল্পপস্থিতির ত্রুটি পূরণ কর হবে। এক মাসেই পুলিশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল—কিন্তু কোন ছা পায় না যে গ্রেপ্তার করবে অশেষকে। অতুত কৌশলে আ পুলিশের সব সঠে মেনে চলার ভাণ করতে লাগল। শত চেষ্টাে কিন্তু শ্রীমন্তদাকে ধরে রাখা গেল না—মাস তিনেক পর মহাপ্রের করলেন তিনি। আর তার পরদিনই একটা বড়বন্ধ মামল অশেষের নাম ঢুকিয়ে তাকে হাজতে পুরে পুলিশ আক্রোশ মেটালে মামলাও একতরফা—কিছুই হল না—অনেক বিপ্লবী বন্ধুর স পাঁচ বছরের জন্য কারাগারে ঢুকলো অশেষ। এবার আর রাজব নয়—তাই খাওয়া-শোওয়ার উপকরণের বাছল্য নেই—শয্যা ছি দুর্গন্ধ কবল, পরিবেশ ছোট প্যাট আর কোর্তা, আহার্য ক্ষুদ সে পুইডাঁটার ঝাঁট, কাজ—ডাল ভাজা, হাপর টানা। জীবনের অধ্যায়ও একদিন শেষ হল—বাইরে এসে গাঁড়াল অশেষ—বি যুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার আগেই আবার গ্রেপ্তার—বেশে মহাসমর—নিরাপত্তা বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

এমনি করে বিভিন্ন রকম বন্দনদশার মধ্যে কখন যে কেটে ও জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় ন-নশটা বছর—টেরও পেল না অশেষ কত রকম পরিস্থিতি, কত রকম পরিবেশ, কখনও প্রাচীরযে প্রাঙ্গণে অব্যাহ বিচরণ, কখনও স্বগৃহে আবার কখনও অন্ত কে গ্রামে অন্তরীণ, আবার কখনও বা মোটা দোহার গন্যেয়ে ফল-ফল



করেন। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ শুধু খবরের কাগজ মাধ্যমে। কি পরিবর্তন এসে দেশে তার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতাই রইল না তার। তারপর একদিন বণকোলাহল স্তিমিত হয়ে এসে—ভারতের আকাশে-বাতাসে বাজলো স্বাধীনতার ডৈবরী স্বর—তারই মাঝে একদিন জেলের সৌধকপাট উন্মুক্ত হল—অশেষ এসে ঝাঁড়াল বাইরে—মুক্ত আকাশতলে। একবার পিছন ঘিরে তাকা—বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার এতদিনের পরিচিত ছোট জগৎ—কারাগার আর সামনে অনন্ত অপরিচয়ের সমুদ্র—কালের ছাওয়ায় পাণ্টেছে সব কিছু—যে উদ্যম চকল যুগের সঙ্গে ছিল তার আশ্রণের মিতালি এ যুগের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নেই। অগণিত মানুষ চলেছে শ্রোতের মত আপন আপন কাজে—তারের কেউ চেনে না অশেষকে—বিপ্লবীদের “বলেটকে।” কানে বাজল মায়ের কণ্ঠস্বর—“দেশের লোক তোব নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে।”

সে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল শ্রীমন্তদার গভীর স্বরে—“ভারতের শহীদ মানুষ বলে কত সম্মান করবে, পূজা করবে। এই তো আমাদের পূর্বস্বার রে।”

—মায়ের পক্ষে এ ভুল করা হয়তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শ্রীমন্তদা? তিনি কত দূর্বতবিষয় দেখে জ্ঞান পাততেন, তিনি কি করে এ ভুল করলেন? সম্মান?—চট্টাং হাসি পেল অশেষের। কে চেনে তাদের? ক’জন জানে শ্রীমন্ত চক্রবর্তীর নাম? রজন মিত্রের নাম ক’জন শুনেছে? ক’জন খবর রাখে রজনব অসমসাহসিকতার, তীক্ষ্ণবুদ্ধির?—চম্বিশ বছর বয়সে বার জীবন শেষ হয়ে গেল! ক’জন মনে রেখেছে শীর্ণ শ্রীমন্তদার যোগপাণ্ডুর মুখখানা?

জনশ্রোতে গা ভালাল অশেষ।

তারপর? আরও কি জিজ্ঞাসা আছে? পাঠক, তোমার সন্তস্ত কাজের ভীড় থেকে একবার চোখ তুলে জানতে কি তুমি চাইবে কোথায় গেল সেই অশেষ? উজ্জল সন্তানব্রতের ভবিষ্যৎ দলিত বখিত করে যে গেয়েছিল স্বাধীনতার গান উদাত্ত কণ্ঠে? সে কি শুধু শ্রোতের টানে ভেসে গেল, নাকি পেল কোথাও তার, আশ্রয়, শান্তিময় গেহ? শুধু অশেষ কেন? তার মত কত অসং

ছেলে ‘জীবন-হৃত্যু পারের হৃত্যু’ করেছিল—তারের ক’জনকে ছাড়া তোমার মনে আছে?

অধঃসমাপ্ত ছবিটার পাশে পেনসিলটা রেখে চেয়ারের শিরে তেলান দিয়ে বসলেন জনৈক পোষ্টার আর বিজ্ঞাপন আর্টিস্ট—হাস্ত দৃষ্টিতে সামনের খোলা ছোট জানলাটা দিয়ে তাকালেন বাইরে। চৈত্র মাস—বিকেল হয়ে আসছে। মাথার ওপর করণেটের ঢালটা অসম্ভব তেতে আছে—উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ছোট অন্ধকার ঘরখানা। বাইরেও দৃষ্টি প্রসারিত করা শক্ত—বড় বাড়ী, উঁচু চিমনী, কালো সর্পিলা ধোঁরা—প্রতি পদেই দৃষ্টি বেন ধোঁট খায়। তবু এর ঝাঁক দিয়ে, ওর পাশ দিয়ে, তার মাথা দিয়ে কোন রকমে অগ্রসর হতে পারলে চোখে পড়ে এক টুকরো আকাশ—ও। ভূবস্ত্র পৃথিবীর আলোর লালে লাস হয়ে গেছে একেবারে। আজকের এই লাল আকাশ মনে পড়িয়ে দেয় আর এক যুগের কথা। সে যুগেও এমনি লাল হয়ে উঠেছিল আকাশ—রক্তবরা লাল। কিন্তু চট্টাং এ পরিবেশে আসার সার্থকতা কি? একটু সময় করে নিয়ে অশেষকে খুঁজতে বেরিয়েছি কি আমরা? কিন্তু কোথায় অশেষ? কোথায় বাথা বতন—মাষ্টারদার উত্তর পুরুষ—বালার অগ্নিযুগের বিপ্লবী? ঐ অধঃসমাপ্ত ছবিটার দিকে তাকালে এক কোণে দেখা যাবে বটে ছোট করে সঠি করা আছে—অশেষ যুগোপাধায়। তবে কি কিশোর অশেষ যে হাতে অসখ্য বৈপ্লবিক ইন্সতার অঁকত, সেই হাতেই শ্রোত অশেষ অঁকছেন সিনেমা, ওষুধ আর কুড়ের বিজ্ঞাপন—অল্পজলের সংস্থান করতে? কিন্তু নামের মিলট কি সব? চেতরায় কি কোন সাদৃশ্য আছে? বিপ্লবী অশেষের বলিষ্ঠ হাতের পেশীগুলোর, লেশমাত্রও কি অবশিষ্ট আছে, বিজ্ঞাপন আর্টিস্ট অশেষের শিরায়হল হাতের ঝাঁক? কিশোর অশেষের একমাথা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কালো চুলের এক গাঁহাও কি মিলবে না এই অকালবৃদ্ধ মানুষটার অল্প ক’গাছা পাকা চুলের মাঝে? তবে? তবু সন্তস্ত গরমিলের মধ্যে একটা মিল চোখে পড়ে—ঐ যে রক্তাভ আকাশের পানে নিবদ্ধ ছুটি চোখ—ওরা যে সেই কিশোর অশেষের চোখ—তেমনি বিশাল, গভীর—তেমনি স্বপ্নালু! হসিও স্বপ্নটা ভেঙ্গে গেছে অনেক দিন। শুধু ঐচ্ছল্য এসেছে কমে—পড়েছে একটা ক্লান্ত আলস্তের আয়রণ।

শেষ

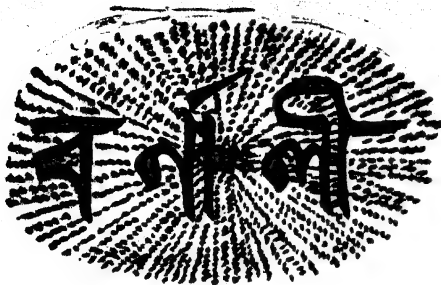
## ভালবাসার গোপন কথা

(Blake-এর ‘Love’s Secret’ কবিতার অনুবাদ)

ভালবাসা নীরব মধুর নেটক’ তাহার কোনট ভাষা,  
বা ভাষা যেমন বয় নীরবে তেমনি তাহার বাণী-আস।  
নিজের প্রকাশ নিজেই করে কথা নিয়ে বলাট মিছে,  
কথার ভিড়ে হারায় সে যে কথাতারাব ধায় সে পিছে।  
দ্বন্দ্ব আমার উজ্জ্বল করে ভালবাসার কথা বহু,  
বলেছিলাম শ্রদ্ধায় আমার বারে বারে মনের মত।

প্রিয়া আমার কাঁপল বাবকে কিসের ভয়ে সেই ত জানে,  
শুধু জানি রইল না সে চল কোথায় আপন টানে।  
চট্টাং দেখি পথিক সে এক এল বিজ্ঞান পথটি বেয়ে,  
যেমন আসে বিজ্ঞান বাতাস নীরব মধুর পরশ ছেয়ে।  
কোন কথাই বলে নি সে ভালবাসা চাওয়া-পাওয়ার,  
তবু তাহার নীরব ছোঁয়ার চল ভেসে শ্রিয়া আমার।

অনুবাদ : বীরেন্দ্রকুমার দাস



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

মূলোখা দাশগুপ্তা

মৌরী নিজেই ভাবছিল, এবার না নামলেই নয়। যে সফটচট্টু বাধা হয়েছিল, সেটুকু কাটিয়ে ওঠা সহজ হতো নতুন বা অমিতা সঙ্গে থাকলেই। তবু উঠে পড়িয়েছিল সে। এমন সময় এসেছে বাবা।

বাবার কাছে মেয়ের এ অসুস্থস্বাস্থি কিছুমাত্র বিস্ময়ের ছিল না। মেয়েষ হতাব তিনি জানেন। নতুন পরিচর যে সে সহ্য করে না, করলেও সে পরিচর যে তার নতুনের গভী ছাড়িয়ে এসেতে চায় না; আর না এসোনা পর্যন্ত দেখা পাওয়া যে তার কঠিন—এ তিনি জানেন। কিন্তু কতবার এই হতাবের প্রসঙ্গ যতীন বাবু আত্ম দিলেন না। ডাকটা দিলেন এসে তিনি আদেশের সুরে। অবশি একবারে নিষাদ নয়। সঙ্গে কিছুটা অমনদের বেশও দিলেন বিশিয়ে—মেটোতে কাজ হয়। না যদি আসে কি করতে পারবেন, কি করতে পারবেন মেয়ে যদি তার আসেন হাত না করে? কিছুই না। যদিও বাপ-মায় অবস্থাটা প্রায় সর্বত্রই কতকটা এই রকম, তবু যতীন বাবুর ক্ষেত্রটা কিছু আলাদা। পিতার প্রাণ্য অনেক পাওয়া তিনি হারিয়েছেন নিজ লোবে।

আজও মৌরী বাবাকে লেবে দাঁত দিয়ে টোট চলে ধরলো। যদি আর একটু আসে ও নেবে যেতো, তবে বাবার এ আদালত জোড়কে দেখতে হতো না। কিন্তু এর ভেতর কি লোবেই আছে কিছু?

আছে। কেউ এসে তো ওকে ডাকা ছেড়েই দিয়েছেন বাবা।

আজ কেন এসেন—কেন না এসে পারলেন না?

ওর আজকের অসুস্থস্বাস্থি আর বোজের অসুস্থস্বাস্থিটা কি এক?

এক নয়, এক নয়। জানে মৌরী বোজের সঙ্গে আজ মিলাদো

চলে না। পাঁচ জনের ভেতর একজন সে, গিয়ে যদি না বসে, কিছুই বাধ-আসে না। যদি বা বায়, মূল্য তার ধরার ভেতর নয়। কিন্তু আজ যে ওর উপস্থিতিটাই অতিথি আপ্যায়নের স্টেট অফ, ওই যে আজ অতিথিকে খুশী করার প্রধান উপকরণ। আর ঠিক এই জন্ত—এই জন্তই বাবাকে মেয়ে দাঁত দিয়ে টোট ধরতে বসলো মৌরী—যদি আর একটু আসে ও নেবে যেতো।

এ ছাড়াও কারণ আছে। মেয়েকে ভালো পাত্রে বিয়ে দেবার ইচ্ছা বাপ-মায়ের স্বাভাবিক ইচ্ছা। কিন্তু বাবার হুঁচকির ভেতর যে আসে। মৌরী এই অকস্মিকের মধ্যেও হতকর

আনন্দের আসে। নয়; ও জানে প্রচণ্ড লোভ যিশে আছে তার ভেতর। মেয়ের কটা বাড়ী কটা বাড়ী হলো, সে আঁচলের চাবি ডান দিক বা বাঁ দিক করে কত টাকা নাড়াচাড়া করবে, বাবার দৃষ্টি সে সব ছাড়িয়ে চলে গেছে রাজ্যের রাজকোষের দিকে। যে ঘরে যেখানে তিনি বিয়ে দিচ্ছেন সেখান থেকে রাজস্বাভার ঘুরে পথ নয়—অপেক্ষা ওর রঙনা হবার। তার পর? তার পর তো তবু চল্লিশ হাজার হুগুটি শিখে নেওয়া আর পাখার পিঠে গিনি মোহর তোলা—গুঠের চাকা লুটে আনা। এমন কি বরা পড়লেও হার্ডিনাকে ছুটতে হবে না মুচির খোঁজে—বাড়-গদান সব ঠিক বাহুগায় তো থাকবেই, হয়তো মিলে যাবে শিরোপাও।

কিন্তু তাকে সংশোধন করার শক্তি তো ওর নেই। নীরবে মৌরী নেবে এলো নাচে। চুকলো গিয়ে বাবার ঘরে। ওর দিকে তাকিয়ে অমিতা বুঁদ গিয়ে একটু হাসলো। মজু জানালো, বাপতত্ব। হুকনেই ভীষণ বাধ। একুশি সবাই এসে পড়লো বলে। একজন গ্রাসে গ্রাসে জল ঢালে বরফের টুকরো কেল আর একজন চটপট হাতে টেবিলে সাতার ডিস-সেট।

অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে বসলো মৌরী। নিজেকে নিতানিয়েন খাবার ঘরটা যেন নিজেই চিনে উঠতে পারছে না সে। কালো অম-ধরা শিকের জানালায় বুলছে সাধা লেনের পুরল। দিনের বেলা হলে বার চেহারাটা দেখতে হতো বস্তীর মেয়ের গায়ে মূল্যবান পোষাক কোলার মতো। কিন্তু হাতের অন্ধকারে দেখাচ্ছে তবু পরাগুলসোই। মাসের সৎসারখা বার্মিস-ওঠা সেরাজটা ঢাকা হয়েছে আলি-নেটে। তার ওপর রয়েছে ফুলদানিতে নানা রং-এর মগতমী ফুল। কলদানিতে ফল নানা দেশী বিদেশী। টেবিলে মূল্যবান বিলিতি তিনার সেট আর কঠিগ্রাসের গ্রাস। এক কথায়, সেসে-নেটে ফুল-কল বিলিতি তিনার সেটে কঠিগ্রাসের গায়ে ঠিকরানো হাজার পাঁচতায়ের আলোতে কলদানে ঘরটার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো, ও যেন উপভাস বর্ণিত উনকিল শতাব্দীর ইলগের কোন ডাইনিং রুমে এসে পড়িয়েছে।

—তোর জন্ত আর কি করতে পারি আমার?

যেহে মূল্যবান বা কিছু সব ছোট পিসির বাঁড়ীথেকে আনা। বা নেই, তা দেখানোর লজ্জার মূখ কালো হয়ে উঠতে চায় মৌরীর। বলে—আর দরকার নেই। এখনিহেই অনেক বেশী করে কেলছিল।

—তবে এবার আমারের ছুটি। পত্রিকপনের জার তোহ—এঁ? সজে সজে মাথা নেড়ে সমর্থন জানালো অমিতাও—হী তাই তাই—কেন?

স্বপ্ননকে নিয়ে চুকলো এসে সবাই বাবার ঘরে। বিস্ময়ের দরজার মুখেই পড়িয়ে পড়ছিল মৌরী, সবে গিয়ে দাঁড়ালো সে জানালার কাছে। আর ও নিজে না তাকিয়েও বুঝলো চোখ টেনে বসবার সময় বেশ স্পষ্ট ভাবেই ওর দিকে একবার তাকালো স্বপ্নন।

মাস-মাসের ছোঁরাছুরি বাঁচির পিসি। পড়িয়ে বসলেন দরজার কাছে। ছোট পিসি গিয়ে দাঁড়ালেন স্বপ্ননের পাশে গভীর ভাবিতা চালে। কোমর বাঁড়ীর আঁচল ছাড়িয়ে পোলাউ আর কই-কিল হাতে এসে দাঁড়ালো অমিতা, মজু। দাঁড়াই কলত

হাস্যাত্মক হেসি ধরে পাড়িয়ে কোঁচালের সঙ্গে দেখতে লাগলো  
স্বপ্ননিকে। অভ্যাসিত অথবা না উত্তম, তা কববার কষ্টপাথর  
হলো হাটুর বাড়ীর ব্যবহারটা। বিশেষ করে বাড়ীর কর্তার  
হুখের চেহারা। বতীন বাবু দিকে একবার ভাকালেই ও  
বুঝতে পারে অভিধি ধনী নঃ মিথনী। ব্যক্তি, অব্যক্তি না  
অভিব্যক্তি। হুপুনের আরোহণে ও তেমন ধরে উঠতে পারেনি,  
এখন বাধা নাড়ছিল মনে মনে—দিসমিধির বর মন্ত কেউ। বোমাক  
হর বাবু, যদি কানাইলালের সাক্ষেবের চাইতেও বড় কেউ হয়।

খাওয়া চলতে থাকে, কখনো একথা সে-কথা, কখনো অমিতা  
মহু কিছই না দেওয়ার অল্পযোগ, বাবা পিসিমাদের আরো একটু  
দেওয়ার পীড়ানুভূতি, বাহুরদেবের তার নিজের ডিসটার প্রতি স্বপ্ননিকের  
বুড়ি আকর্ষণ করে পরিমাণ দেখিয়ে তাকে উৎসাহিত করার ভেতর  
দিয়ে। অমিতার অন্ত হাসি কথার ভেতর দিয়েও মাকে মাকেই ধরা  
পড়ে যায় ওর মনের মেঘ। জরদেব আঙু ঠিক সময় এলো না—  
এক টেবিলে খেতে বসলো না। সমস্ত দিনের পরিমিত বোধ ও  
এখনকার জটিল পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মৌরী সামঞ্জস্য করে উঠতে পারে না  
স্বপ্ননিকের মাকখানকার ব্যবহারটা। সবার মাথার উপর দিয়ে  
বুড়িটাকে ছড়িয়ে দিয়ে জানালার ফলে পাড়িয়ে থাকে সে। পরদাগুলো  
কখনো মুহু বাতাসে লোলে, কখনো জোর বাতাসে ওড়ে। কিছু  
বির-কিরে বুড়ি মাথার-মুখে এসে পড়ে যায় লায়ম লাগিয়ে।

—এই দিদি! ধর ধর ঝুঁপির। গেল হাতটা পুড়ে।

চমকে উঠে এগিয়ে এলো মৌরী আর ওর হাতে থালাটা তুলে  
দিয়ে পাখীর ডানা বাড়ীর মতো কাছতে লাগলো মল্ল ওর হাতটা—  
সেহে, একঝোড়েই পুড়ে সেহে হাতটা।

অমিতা হেসে উঠলো বিল-বিল করে। শুটো তো বরফ-ঠাণ্ডা  
খিঁচির থালা।

কোমরে জড়ানো জাঁচল খুলে মুখে হাওয়া দেয় মল্ল আর  
ওর দিকে একবার তিরিক বুড়িতে তাকিয়ে নিজেকে সহজ করে  
কেনে মৌরী। বাবা মিষ্ট কেনে না জানে, তবু প্রথমে  
দিয়ে পাড়ালো সে বতীন বাবুই কাছে। সরেই বুড়িতে বাবা  
কর্তার দিকে ভাকালেন—আমি কি মিষ্ট বাই না!

মিষ্ট তিনি ধান কিন্তু হাতের বেলা নয়। মিষ্ট সেখান তার  
কানাই-জিরা লাক হুকিত করে।

বাঙা হয়ে সেসে আর যে কিছুতেই টেবিলে বসে থাকতে পারেন  
না, সে-কথারি জানিয়ে অস্বস্তি নিয়ে উঠে পড়লেন বতীন বাবু।  
আর স্বপ্ননিকের কাছে এসে মৌরী পাড়তেই দেহের উপর হাত ঢাকা  
লিল স্বপ্ননিক।

এগিয়ে এলো অমিতা—এ কি, মিষ্ট কেনে না?

—আমি মিষ্ট বাইনে।

—জা হর না। আমাদের ঘরে প্রথম মিষ্টহাতে এগিয়ে  
এসেও ও খিঁচির দিতে পারেন না।

নীচের হাজাড়া ডিমের উপর থেকে সরিয়ে নিল স্বপ্ননিক।

অমিতার বাহু দু' করতাই হঠাৎ পিসিমার চলে সেলেন ধর  
হতে। হঠাৎ পিছু হটে ফিরছিল মৌরী, তবু এগিয়ে এসে স্বপ্ননিকের  
সঙ্গে মিষ্ট দিতে হলো তাকে।

কখনো কখনো কখনো... নিজের ডানা এখন মিষ্ট দিলো অমিতা

স্বপ্ননিককে। বললো—আর বেজোর চলবে না। একটা তুলে নিয়ে,  
ডিসটা ট্রেসে সরিয়ে রাখতে দেখে অমিতা ভরে বললো—খেলেন  
না তো?

—পারছি নে।

—আমি যে আরো কত পারি—কিন্তু লজ্জা করছে। মাথা  
চুলকার বাহ।

চটছিল মৌরী অমিতার উপর। বাহুরদেবকে দেখা হলো  
থালি বেধে চলে গেলো সে। ওর বিরক্তি বুঝতে বাকী  
রইলো না অমিতা মল্লুর। হাসলো ওগা পরস্পরের দিকে  
তাকিয়ে।

স্বপ্ননিকের হাতে তোরাল তুলে দিচ্ছিল অমিতা—হঠাৎ তারে  
ঘরে এসে ঢুকলো জরদেব। ফরসা জামা-কাপড় তার ছিটে বুড়িতে  
ভেজা। কালো ঘন চুল আরো চকচকে দেখাচ্ছে কলসে জ্বিক  
ওঠার। ক্রমাল দিয়ে বাড়-মাথা-মুখ মুছতে মুছতে বাপ চাইলো  
স্বপ্ননিকের কাছে। মল্লুর দিকে তাকিয়ে বললো—ঠিক সময়ে এসেছি  
—তোদের খাওয়া হয়নি তো? বা কিসে পেয়েছে!

চোট চেপে দাঁড়িয়ে থাকা অমিতার মুখ দেখলে কে বলবে একতলা  
সে এতো হেসেছে, এতো কথা বলেছে।

অমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো স্বপ্ননিক। বললো—  
ক'টার সময় বাড়ী ফিরলে জ্বাদের মুখের হাসি মিলার না?

হেসে উঠলো জরদেব। গাড়ীর মুখে জবাব দিলো অমিতা  
—জ্বাদের মুখের হাসিটা মূল্যবান মনে হলে অপরের কাছ  
থেকে সেটা ভেদে নিতে হবে না। আর তা না হলে শত্রু  
শিখিয়েও লাভ নেই। চলুন। স্বপ্ননিককে অল্পস্বপ্ন করতে বলাই  
ভজিতে ডেকে বেরিয়ে গেল অমিতা।

খিঁচির বার টেবিল ঠৈরী হলো। অমিতা আত্ম আনন্দ  
খেটেছে। তাকে বসিয়ে, ছোট পিসিকে ডেকে, মৌরীকে  
আপ্যায়নের ভজিতে চেয়ার এগিয়ে দিলে, কানাইলালকে হাতে  
হাতে সাহায্য করে, পিসিমাকে খাইয়ে ছোট পিসির কলসে  
হবার সময় টিকিন কেজীরায় ভর্তি মিষ্ট বাড়ীর অন্ত পাড়িয়ে  
তুলে দিয়ে—এমন কি আবার বুড়ি নামলে যে ঠাণ্ডাটা পড়বে ভাঙে—  
একটা চামর গোছের কিছু দরকার হবে, কের গিয়ে সেটা স্বপ্ননিকের  
বিছানার বেধে এসে মল্ল একঝোরে তাক লাগিয়ে বিল-  
সবায়। অমিতা গলা ছড়িয়ে বরলো মল্লুর। অনেক কতবার  
ভাই ভোমাকে।

ওরা দু'জন বখন শোবার ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হলো তখন  
হাত একটা বেজে গেছে।

ঘরে ঢুকে চোবো পত্রিকাপাঠরত জরদেবের দিকে ফিরিয়ে  
ভাকালো না অমিতা। যদিও ও জানে এ রাতে পত্রিকার পাঠের  
চোখ পেতে বসে থাকটা ওরই পথ চেয়ে বসে থাকা। ঘুরে এসে  
বুঝিয়ে থাকতে দেখলে সব অপরাধ কমা করলেও এ অপরাধটা  
কমা করে না অমিতা—অন্তত সে হাতটা বুঝা করে দেয়ই সে।  
আজ রাতে অনেক হয়ে গেছে। আঙু জরদেব বসে থাকবে একটা  
আশা করেনি সে। যে জড় বসেছিল জরদেব তা হলো—অমিতা  
অর্থাৎ খুসী হলো।

সেখা আলনার কাছে চলে গিয়ে শাওরী পাশের দরজা পর্যন্ত

ঢালে অমিতা—এক দিন জয়দেবের সঙ্গে রাগায়াগি হওয়াতে মৌরীদেব ঘরে ঢলে গিয়েছিল সে। মল্ল বলেছিল ক'দিন?

অনেক দিন। দেখবে আমার প্রয়োজন হয় কিনা।

কথাটা শুনে মল্লের জন্ম মৌরী বই-নিষিদ্ধ দৃষ্টি তুলে ওর দিকে তাকিয়ে আবার বই-এ মন দিয়েছিল। সে দৃষ্টির অর্থ না বুঝতে পারার বতো বোকা অমিতা নয়। কলোজে-পড়া মেয়ে সে-ও। কিন্তু মৌরীর অনেক কথা অনেক ভাবই গায়ে মাখে না সে। প্রয়োজনের কথা বলেছ তো হয়েছে কি। জগৎটাই তো প্রয়োজনের পেছনে ছুটে চলেছে। শত বৃত্তির দিকে তাকিয়ে থাকে, গাছ আলোর দিকে বাহু মেলে দেয়, বীজ মাটি খোঁজে—প্রয়োজন বলে। চন্দ্র-সূর্য্য ফুল-কল-জল; মানুষের প্রতিটি সম্পর্ক—জড় আর জীবজগতের যত চাওয়া কোনটা অপ্রয়োজনের? শুয়ে পড়লো সে। সে পাওয়া অপূর্ণ। ও জানে উপাধানের উপর কি ভাবে খোলা হাতটা রাখলে, খোঁপাটা কতটা এলিয়ে দিলে, পা'র দিকের শাড়ী কতটা তোলা থাকলে, ফরসা বাড়-শিঠি বাহুর কতটা লালশাড়ীর কাঁকে কাঁকে সেবা গেলে আকর্ষণের শক্তি জোরালো হয়। ও জানে, কি ভাবে সৌন্দর্য্য দিয়ে পুরুষকে মুগ্ধ করতে হয় আর সে জানা প্রয়োগ করতে সক্ষমও বোধ করে না একটুও। যুদ্ধ-বিগ্রহ হিংসা-বেষ পুরুষ রূপবতীর জন্ম বৃত্ত করেছে, গুণবতীর আকর্ষণে কি কেউ তাদের তা করতে শুনেছে কোন দিন? ইতিহাসের পাতার তো দূরের কথা, আজও পুরুষের হাতের স্ত্রী সাহিত্যের পাতার কই অমিতা তো রূপবতীর পায়ের মাথা কোটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পার না? গুণের কথা যে তারা এক-অর্ধ না লেখে তা অবশিষ্ট নয়—সে শুধু নিজের মান রক্ষার জন্য। পড়ে আর দেখে ও হিরনিচর হয়েছে বৃত্ত দস্তুর কথাই বলুক, মেয়েদের গুণগত অমুৎকর্ষতার প্রতি বৃত্ত বিজ্ঞপবাণই বর্ষণ করুক—রূপের চাইতে বৃত্ত পুরুষের কাছে কিছু নেই। এর চাইতে খাতির তারা আর কিছুকে করে না। এ ছাড়া তারা আর কিছু চায় না। থাকলেও পীড়া অমুভব করে,—পীড়ন করে। মৌরীর এ কথাটা সে কিনা আগন্তিতে স্বীকার করে, খনার জিহ্বা কাটা বাবার ভেতর ঐতিহাসিক সত্য না থাক আছে পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক সত্য। আর তাদের চাওয়া দিয়ে তৈরী বলেই মেয়েরা গুণের ধরে জানের ঘরে আজও এমন দেউলে। সমস্ত দিনের অস্বীকারের পর এখন যে স্বীকৃতি স্বামীর কাছে সে পায়, সমস্ত দিনের অস্বাভাবের পর যে মান তার এখন মিলবে, সমস্ত দিনের পরাজয়ের পর যে জয় তার এখন তা কিসের? ওপ কি নেই ওর?

জলস ভাবে পাশ ফিরল অমিতা। শাড়ীর অঁচল উড়িয়ে নিল পাখার ছাওয়া। ঘুমিয়ে পড়া অমিতার কোন দায় নেই তা ঠিক করে নেবার। শব্দ কানে এলো জয়দেবের হাতের কাগজ ভাঁজ হবার—এখন যদি বিমকিম বৃত্তি আবার নামতো।

শোবার জন্য তৈরী হচ্ছিল মৌরীও। এ ব্যাপারটার বিলাসী সে। একটি শিখ অভাবসে আর একটি শিখ শাড়ী—দীর্ঘ দিনের অভাস ওর। অমুদ্রা অভাস্য নয় বরং অবস্থা অতিরিক্ত অভাস্যই ভবু হয়ে গেছে। সমস্ত দিনের লণ ফিল গজ কাপড়ের বোঝা নামিয়ে খালি শরীরে শুশু নান্ন করবে মূর্ত্তা নয়র লিক জড়িয়ে শোয়া—এ বৈরিক আচার।

কাপড় বদলে সেই আদাম উপভোগ করতে করতে বিছানার উপর বা চুল বাঁধছিল সে, মল্লকে হুকতে দেখে বললো—হলো রাজক্য পরিদর্শন?

হাত ছুটো পেছনের দিকে নিয়ে হাতের তালুর উপর শরীরে ভার রেখে খাটে বসলো মল্ল। বললো—পিসিমা বলেন, হিমালয়ে উপর ঋষি তপস্বীরা সব যোগাসনে বসে তপস্তা করছেন আর মাংস মাংস বলে উঠছেন 'বস্তি-বস্তি'। আমরা ভালো মন্দ যে কথাটা বলি যদি তাঁদের সেই স্বস্তিবাক্য তার উপর এসে পড়ে, তবে তা কয়ে যায়। ধর যদি তোর এই আমার রাজক্য পরিদর্শনে বেকবাক্যতার উপর ঋষিদের সেই 'বস্তি' পড়ে গিয়ে থাকে?

—তবে তুই রাজা হবি।

—হঠাৎ হঠাৎ তোরা যে আমার জীবনের কি ভবিষ্যৎ সত্যগুলো বলে ফেলিস, নিজেরাও জানিসনে। কিন্তু রাজা তো আর আজ-কাল হওয়া যায় না—মন্ত্রী।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ে ঢোখ বুজে শব্দ করলো মৌরী, হুঁ।

—আচ্ছা; রাজ্য থাকবে, প্রজা থাকবে, মন্ত্রী থাকবে, থাকবে সেনা আর সেনাপতি—সবই যদি থাকবে তো রাজা বেচারীরা সোষ করেছিল কি?

—হুঁ।

—অকর্ম্ম সুকর্ম্ম বাই হতো, হতো তো মন্ত্রীদেরই পরামর্শে।

—হুঁ।

—বুঝি দিদি, এ মন্ত্রীদের চাপকা বুদ্ধির চাল—রাজ্য নথল করবার কৌশল। রাজাদের তাড়িয়ে রাজ্য আর সিংহাসন নথল করেছে ওরা।

—শোহাই তোর মল্ল। মাথা ধরেছে এ্যাসপ্রো খেয়েছি।

—নে বাপু ঘুমো। উঠে বসে একমাথা জট চুলের, ভেতর গায়ের জোরে চিক্কী চালাতে চালাতে গুন্ গুন্ করে উঠল মল্ল—

'সকলি তোমারি ইচ্ছা

ইচ্ছামরী তারা তুমি,

তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা

লোকে বলে করি, আমি'—

—তুই কি পাগল হলি? রাত ছুটোর সময় 'সকলি তোমারি ইচ্ছা' গাইতে বসলি।

—তাইতো। বৃত্তি খেমে গেছে। তোর বিছানার এক চান্দর চানের আলো, বাতাসে হাবু-হানার মিষ্ট গন্ধ—নির্বাচনটা ঠিক হয়নি। 'মন, বলে চিনি চিনি' এটা গাইবো?

—মল্ল, সত্যি বলছি ভীষণ মাথা ধরেছে। অল্পনর করলো মৌরী।

কিন্তু বিছানার শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসতে চাইলো না মল্লর। এ-পাশ ও-পাশ করলো অনেককণ। তারপর কেমন বেনে একটা বুকচাপা অস্বস্তি ভাব একেবারে ছটকটিয়ে তুললো ওকে। ওঠা করলো সহ করতে অনেককণ কিন্তু পারলো না। ঘুমিয়ে পড়েছিল মৌরী। মল্লর ভাকে ঘুমতারা লাল ঢোষ মেলে উঠে, করলো মৌরী বিছানার উপর। কলো—কি রে?

—একটা মাত্রা মাত্রা মাত্রা...

দেখুন! অন্ধকটী সানলাইট  
সাবানেই এসব কাজ  
হয়েছে!

অতিরিক্ত ফেণার দরুণই  
এ সম্ভব হয়



সানলাইট  
সাবান

জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

৪: ২৫২-২৫৩-২৫৪



উৎকর্ষিত ভাবে উঠে বাতি জ্বলে গিয়ে পাঁড়ালো মৌরী মঞ্জুর কাছে—কেন কি হয়েছে ?

—ভালো লাগছে না।

মৌরী দেখলো, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে মঞ্জুর। মুখটার ঢেলে দেওয়া হয়েছে ঘেন একরাশ কালী। চোঁট ছুটো একেবারে সাদা। তাড়াতাড়ি জল এনে মঞ্জুর মুখে মাখার জলের হাত বুলোতে লাগলো মৌরী। বললো—এতো কাজ করা অভ্যাস আছে নাকি যে সজ্জ হবে! বাড়িবাড়ি করতে গেলে এমন হয়।

হাত ছুটো বৃকের ওপর রেখে চোখ বুজে পড়ে থাকে মঞ্জু। মৌরী ঠাণ্ডা ভেজা হাতটা ওর চুলের ভেতর আঙ্গুল চালিয়ে চালিয়ে বুলোয়। বলে ইস, আঙুন বেরুচ্ছে মাথা থেকে। বেশ কতটা সময় এভাবে কাটিলে তারপর জিজ্ঞাসা করে মৌরী, ভালো লাগছে একটু ?

—একটুও না।

আরো কিছুক্ষণ কাটলো এই ভাবে। পড়ে রইলো মঞ্জু চোখ বুজে। শরীরের ভেতর শরৎপক্ষে মিত্রপক্ষে যে যুদ্ধটা চলছে ঘেন তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে, সময় নিচ্ছে শান্তি স্থাপনের। তারপর ঘেন সেও অংশ গ্রহণ করলো সগ্রামে। ছুটে গিয়ে বেশিরের ওপর মুখটা বাড়িয়ে ধরলো—তারপর কি পেট-নিংড়ানো বমি। কলের মুখটা চেপে ধরে বন্ধি সামলায় মঞ্জু আর মৌরী হাত বুলোর ওর পিঠে। এমনি হলো আরো ঘন ঘন তিন-চার বার। ভীত কণ্ঠে বললো মঞ্জু—কলেরা-টলেরা মতো কিছু নয়তো রে ?

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো মৌরীর। এতক্ষণ সে জেবেছে, মিনের, অসহ্য গরম, ঝাল তেল মশলার গরম ঝাল, অভ্যাস অভ্যস্ত কাজ—সব মিলে এটা হয়েছে। এবার ভয়ে সর্বশরীর মোচড় দিয়ে কি ঘেন একটা গলা পর্যন্ত উঠে এসে মৌরীরও। সত্যি বদি ভাই হয়। কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুঃ। রাতের নির্জন পথটা ভেসে উঠলো চোখের উপর—কোথার ট্যাক্সি। একটা কোন তাও পর্যন্ত নেই কোন চেনা বাড়ীতে। দোকানপাট সব বন্ধ—বন্ধ পোষ্ট অফিসের পাবলিক ফোন। আকাশ প্রান্তর টানা বিদ্যুৎ বলকের মতো মুহূর্তে বলকে গেলো কথাগুলো মৌরীকে কাঁপিয়ে। মুখে বললো—হাঃ। কিছু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল টেবিলটার কাছে সময় দেখতে। ‘অস্বস্থ-বিস্বস্থ মাছুবে আগে তো ভোরটাকেই ডাকে। কিন্তু ডাকলেই তো আর সে আসে না—এখনও ভোর হবার বাকী আছে। মঞ্জুর মাখার হাত বুলোতে বুলোতে বললো মৌরী—বুঝ পাগল; ওতে কি শুধু বমি হয়? ভাবিসনে। আমি একুণি আসছি।

বারান্দা দিয়ে হাঁটা মিল মৌরী। এখানে ওখানে জমে আছে বৃষ্টির জল। চাঁদের আলো পড়ে সে জল কোথাও চকচক করছে, কোথাও ঘরে আছে সে জল পুরো চাঁদটাকে। টবের ফুল গাছের ছায়া-তলোকে বারান্দার মেঝের উপর দেখাচ্ছে নিপুণ শিল্পীর হাতের জাঁক ছবির মতো। জল চাঁদ আলো ছবি—উৎকর্ষিত পদক্ষেপে সব বাড়ির ঢালো মৌরী।

ছোড়দার দরজা খোলা কেন? নিশ্চয়ই তুলে গেছে বন্ধ করতে। ভালোই হলো—বাঁহুসেবের ঘরে গিয়ে ঢুকলো মৌরী।

দরজা খোলা হাত। কিছু দরজার সামনেই

পড়লো হতভম্বের মতো পাঁড়িরে। খোলা দরজার কাছে বেজে চোয়াল বসে আছে সুদর্শন। হাতে জলন্ত সিগারেট!

উঠে পাঁড়ালো সুদর্শনও। আশ্চর্য্য কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—কি ব্যাপার? তারপর ওর হতভম্ব ভাব দেখে তুললো ক্রম কৃষ্ণ করে। বললো—আমি যে এখানে, সেটা জানেন বলেই আমি করছি।

জানেন কিন্তু তুলে গিয়েছিল—উৎকর্ষায় উৎসেগে একেবারে তুলে গিয়েছিল মৌরী—সুদর্শন, সুদর্শন ডাক্তার, সে এখানে সে ছোড়দার ঘরে! তাকে ডাকতে ট্যাক্সি দরকার হবে ন কোন লাগবে না। আনন্দে ও যে আবেল তাবোল কথা কি বললো না সে ও অতি সন্তুষ্ট বলে। শুধু একটা হাত দিয়ে আ একটা হাত চেপে ধরলো। বললো—একটু ভাঙ্গা গলায়ই বললো—মঞ্জু হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বমি করেছে বার পাঁচ ছা তাই ডাকতে এসেছিলাম ছোড়দাকে।

—ছোড়দাকে! সে কি ডাক্তার? হাতের সিগারেটটা বাই ছুড়ে ফেলে দিয়ে পাঁজারী গায়ে চাপালে সুদর্শন! তারপর জামা হাত ছুটোকে ঠেলে উশর দিকে তুলে দিতে দিতে বললো—চলুন।

সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে এবার সহজ স্বরে বললো মৌরী—ছোড়দাকে—

বাধা দিলো সুদর্শন। বললো—ডাকবেন ছোড়দাকে কি দরকার। প্রয়োজন না হলে কেন থামকা বাড়ীতুচ্ছ লোক বাস্তু করে তুলবেন। আগে দেখিই না আমি। কিন্তু মৌরী থমকানো ভাব লক্ষ্য করে পড়লো পাঁড়িয়ে। চাঁদের আলো ভেতর দিয়ে একটা স্থির দৃষ্টি ফেললো মৌরীর মুখের উপর। তারপ হাসলো একটু। বললো আচ্ছা পাঁড়াছি। আপনি আপন ছোড়দা বড়ল বাকে হয় ডেকে নিয়ে আসুন গিয়ে।

লাল হয়ে উঠলো মৌরীর মুখ। ‘আরুন’ বলে পা চালাতে সে নিজেদের ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকে একটু সময় মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে পাঁড়ি রইলো সুদর্শন। তারপর বসে হাত বাড়িয়ে নিজের হাতে টে নিল মঞ্জুর হাতটা। একবার তাকিয়ে একটু হেসে চোখ বন্ধ করত মঞ্জু।

সুদর্শন রোগী দেখে। শিরের পাঁড়িয়ে মৌরী সুদর্শনের দে দেখে। কখনো তাকায় তার হাতের দিকে, কখনো তাকায় বুকে দিকে। লক্ষ্য করে সুদর্শনের মুখের চেহারা। সেখানে কে চিন্তার ছায়া পড়ে কি না।

সুদর্শন নাড়ী দেখলো। লম্বা লম্বা আঙুলে শাড়ী কাঁপতে উপর দিয়েই টিপে দেখলো পেটটা। বুক দেখার বন্ধ নেই—হাত মঞ্জুর বাঁ দিককার বৃকে রেখে হাতের চাপে পথ্য করতে লাগে জলশাপনের মাত্রা। মঞ্জুর নিখোঁস ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জল লাগলো সুদর্শনের হাতের মূল্যবান হীরেটা। মৌরী ওর নিচে বৃকের ধক্ ধক্ শব্দটা ঘেন কানে গুনতে পেতে লাগলো। ফেরালো সে মঞ্জুর বৃকের ওপর রাখা সুদর্শনের দীর্ঘ বলিষ্ঠ হাতের উপর থেকে। আর একক্ষে ওর হাত-পা অবশ করে দিয়ে য পড়লো, তবু হাত শাড়ীর জাঁক ওর গার জড়ানো। মঞ্জুর আঁচ



ধর্মকান্দো বুকাটার উপর আড়াআড়ি ভাবে হাত চাপা দিল মৌরী।

সেখা শেষ করে চেয়ার ঠেলে উঠে ঈড়িয়ে সুদর্শন জানালো—  
কিছুই নেই ভয় পাওয়ার। ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে,  
ওষুধ দিচ্ছি। বেরিয়ে গেল সে।

মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আগে একটা কামা গায়ে চাপালো মৌরী।  
ভারপর নিরুদ্বেগ মন নিয়ে গিয়ে বসলো মঞ্জুর শিরে। 'ওষুধ  
দিচ্ছি' বলে যে ভাবে বেরিয়ে গেল সুদর্শন ও বুঝলো ওষুধ তার  
কাছেই আছে।

কিরে এসে নিজে হাতে ওষুধ খাওয়ালো মঞ্জুরে সুদর্শন। কপাল  
ঘাঘ কানের পাশ জল দিয়ে দিল বেশ করে ঝুইয়ে। ভিজ-বাওয়া  
বালিশটা বদল করে দিল মৌরীর খাট থেকে বালিশ তুলে নিয়ে।  
চোখ তুলে খুঁজে দেখলো ঘরের সুইসবোর্ডটা কোথায়। পাখার  
স্পীডটা দিলো বাড়িয়ে। তারপর আবার চেয়ার টেনে মঞ্জুর হাতের  
নাড়ীতে তিন আঙ্গুলের টিপ রেখে বসলো।

ঠার ঈড়িয়ে মৌরী। কিন্তু সুদর্শন না চাইলো তার কাছে  
কোন সাহায্য না কইলো তার সঙ্গে কোন কথা, না তাকালো একবার  
তার দিকে। মিনিট দু'-তিন পর উঠে ঈড়িয়ে বসলো—আর  
দরকার হবে না। একুশি ঘুমিয়ে পড়বে। বলেই চলে বাচ্ছিল  
হঠাৎ দরজার মুখে ঘুরে ঈড়িয়ে বসলো—কাল সকালে চলে যাবে।  
আপনি নিশ্চয়ই শুধন আসবেন না। বিদায় সম্ভাষণটা এখানেই  
জানিয়ে বাচ্ছি, নমস্কার!

আবার নিজেকে ভালো লাগিয়ে গেলো সুদর্শন। আর ভালো  
লাগিয়ে দিলে বাওয়াটা দিয়ে বাওয়ার চাইতেও বেশী নিয়ে বাওয়া।  
ওর মনটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল সুদর্শন একেবারে তার ঘর  
পর্যন্ত। আর তার বেতের চেয়ার টেনে বসে, তার সিগারেট ধরানো  
তার চোখ ছোট করে ধোঁয়া ছেড়ে চলার সঙ্গী হয়ে যে মৌরী আছে  
এ কথা জানতে পারলে সুদর্শনের পক্ষে শান্ত ভাবে সিগারেটের  
ধোঁয়া ছেড়ে চলা হয়তো সম্ভব হতো না।

শেষ রাতের আঁহা অন্ধকারের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দরজা  
বন্ধ করে ঘুরে ঈড়িয়ে বিমিত হয়ে গেল মৌরী। রোগা চোখ  
হুইমিতে ভরে মঞ্জুর তাকিয়ে আছে ওরই দিকে। ঘুমোঁস নি?

—ডাক্তার 'ঘুমিয়ে পড়েছে' না 'ঘুমিয়ে পড়বে' কোনটা বলে  
গেলেন?

ঘুমের ওষুধ দিয়েছে সুদর্শন। পড়বে বলে গেলেও পড়াটা  
ঠিকের রাখতে পারছিল না মঞ্জুর। হাত পা আসছিল অবশ হয়ে।  
চোখের পাতা দুটো হয়ে উঠছিল শীশের মতো ভারী। তবু ঘুমিয়ে  
পড়তে ইচ্ছে করছিল না ওর। সেবে উঠে ভাবি ভালো লাগছিল।  
ভালো লাগছিল শেষ রাতের হাওয়া আর ফুলের ভেসে আসা  
গন্ধ। ভালো লাগছিল, শাড়ীর কচিকলাপাতা রঙের মতো

ভালো লাগার নয়ম হয়ে আসা মৌরীর বুখটা। ও জোর করে  
চোখ খুলে রাখছিল, কথা বলছিল। বললো আহা, অশুখটা  
যদি আমার না হয়ে তোর হতো। ডাক্তার রোগী দেখে কি  
আনন্দটাই না পেতেন?

—আচ্ছা তোর জন্তই না এই মাত্র ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে  
নিরে এলাম।

—তা আমি কি করবো অশুখ সেবে গেলো? যত্নে হাসার  
মতো হাসলো মঞ্জুর আবার অশুখ করবো—কিন্তু আর পারলো  
না, চোখের পাতা দুটো বেন নিজ খেকেই এক হয়ে গেল ওর।  
বাতি নিবিয়ে দিল মৌরী।

পরের দিন। সুদর্শনের ট্যান্ডি ছেড়ে দিতেই সামনে গাঁড়ানো  
রাখুকে প্রচণ্ড ভাবে ধমকে উঠলেন যতীন বাবু—উজ্জ্বল, পীত  
বের করে ঈড়িয়ে দেখছিল কি?

করকরে একটা দশ টাকার নোট বকশিশ দিয়ে সেছে ওকে  
সুদর্শন। চালে চললে মেজাজে কানাইলালের সাহেবের চাইতে বড়  
দরের মনে হচ্ছিল রাখুর সুদর্শনকে। এ বাড়ীরই তো জামাই  
কানাইলালের সাহেব। একটা আন্তো টাকা কোন দিন ওর ভাগ্যে  
বকশিশ মেলেনি। হাউই সাট আর ডিলে পাঞ্জামা পরিয়ে মনে মনে  
প্রায় নিজেকে দিমিদির সঙ্গে লম্বা রঙনা করিয়ে দিয়েছে আর সেই  
খুসীই মুখে ফুটে উঠেছে—চমকে উঠলো রাখু অবধা হৃদয়বাহরে।  
কাঁদো-কাঁদো মুখে চলে গেল সে ভেতরে।

বুঝলো সবাই—জয়দেব বাসুদেব অমিতা। তারাও চলে গেল  
একে একে। যতীন বাবু পারচারী করতে লাগলেন এদিক ওদিক।  
রাতে ডাকতে গিয়ে মেয়ের মুখের যে চেহারা দেখেছিলেন লজ্জার  
মাথা খেয়ে আর তাকে ডাকতে যেতে পারেননি তিনি। কিন্তু এতো-  
গুলো লোকের ভেতর এ বুড়ীটা কাক হলো না।

হয়েছিল। সবার হয়েছিল। পিসিমা প্যারেন নাই যে কারনে  
যতীন বাবু প্যারেন নাই। আর সবাই এসেছিল কিংব।

ওষুধের ঘুম। অর্চনত হয়ে ঘুমোচ্ছিল মঞ্জুর। কেলে উঠে  
বখন তুললো, রেগে বসলো—বাড়াবাড়ির একটা মাত্রা আছে।

—সে মাত্রা সবাই ছাড়াচ্ছে বলেই আমি ভারসাম্য রক্ষা করছি।

—সোহাই দিদি থাম। যা তোকে কি মাত্রাটানাটাই হাতে-  
খড়ির সময় শিখিয়েছিলেন।

—ঈ, মাত্রাবোধটাই সৌন্দর্যবোধের প্রথম এক প্রধান অঙ্গ।

আর কি বলতে পারে ও? ও কি বলতে পারে, চুলের তেতর  
হাত চালাতে চালাতে শেষ রাতের অশ্রুট আলোর এক আকাশভায়া  
পেছনে রেখে সুদর্শন যে বিদায় সম্ভাষণ ওকে জানিয়ে গেছে সে  
ছবিটার উপর দিনের চড়া ছবি ও চাপাতে চায় না। যে সুইচ  
কাল রাতে বাঁধা হয়েছে চায় না তাতে হাত হেঁরাতে—যদি ছিঁড়ে  
যায়। [কনক]

### কল্পযোগ কি?

"সর্বকর্ত্তে হরির সেবা—জীব-জন্তুর মতোও হরির সেবা যদি কেউ করে, আর যদি সে যান চায় না, বশ চায় না,  
হয়বার পর বর্গ চায় না, বানের সেবা করছে তাদের কাছ থেকে উলটে কোনও উপকার চায় না, একশ জায়ে যদি  
সেবা করে, তাহলে তার বর্থাৎ নিকাশ কর্ত্ত, অবাস্তব কর্ত্ত করা হয়। এইরূপ নিকাশ কর্ত্ত করলে তার বিশেষ  
কর্ত্তব্য হয়। এই কর্ত্তব্যও ইহর লাভের একটি পথ।"

—শ্রীজীবকৃত্যসেব



মুমনি মিত্র

২০

আচ্ছা বলতো রাজা—  
ধর্ম-জীবনে  
প্রতীক-পুজারী কারা নন ?  
“Superstition  
Is a great enemy of man,  
But  
Bigotry is worse.

Why does a Christian  
Go to church ?  
Why is the Cross holy ?  
Why is the face  
Turned towards the sky  
In prayer ?  
Why are there  
So many images  
In the Catholic Church ?  
Why are there  
So many images  
In the minds of the Protestants  
When they pray ?

My brethren,  
We can no more  
Think about anything  
Without a mental image,

Than we can live  
Without breathing.”

২১

ঈশ্বর নিরাকার মুখে বললেও  
আমরা সবাই  
ধর্ম-জীবনটাতে  
প্রতীকের সাহায্য চাই।  
‘হিন্দু হিঙ্গেন’ বেটা সজ্ঞানে করে  
মুখেরা করে না-জেনেই !  
খৃষ্টান, মুসলিম, ইহুদী বা বৌদ্ধই হোক,  
ইরাণী বা পারসীক,  
সকলেই প্রতীকোপাসক।

ইহুদীর মন্দিরে থাকে কেন ‘আর্ক’ ?  
এক জোড়া ডানাওলা দেবদূত আর  
‘ঈশ্বরাদেশ’ কেন রক্ষিত তাতে ?  
খৃষ্টান কেন তাতে বাইবেল রাখে ?  
ক্যাথলিক-পাহী বা গ্রীক-খৃষ্টান,  
বীতর মূর্তিটাকে  
সম্বন্ধে কেন আঁকড়ান ?  
প্রোটেষ্ট্যান্টও কেন  
‘সর্বব্যাপী’টিকে  
ব্যক্তিবিশেষরূপে চান ?  
কেন চার্চ ‘সেক্রেড’ ?  
বাইবেল কেন পুজো খান ?  
আজও কেন এশিয়ায়  
পাঁচ হাত মাটি খুঁড়ে  
সোনার বুদ্ধদের পান ?

পার্সী বা ইরাণীর  
আগুনের পুজো করে কেন ?  
মুসলমানই বা কেন  
নামাজের সময়েতে  
তীর্থ ‘কাবা’র দিকে চান ?  
‘কাবা’র ও-মসজিদে  
‘কুক্ষাধারে’ কেন

১। “কৃষ্ণাঙ্গের মাহুকের শত্রু বটে, কিন্তু তার চেয়েও ‘সাম্প্রতিক’  
শত্রু হচ্ছে—সঙ্কীর্ণতা। আচ্ছা, যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপীই হন, তা’হলে  
খৃষ্টান চার্চে বান কেন ? কেন তাঁরা ‘ক্রস’কে এত পবিত্র মনে  
করেন ? প্রার্থনার সময় কি জন্মে তাঁরা আকাশের দিকে তাকান ?  
ক্যাথলিকদের বর্ষমসিকে এত মূর্তি স্থান পেলে কেন ? প্রার্থনা কালে  
প্রোটেষ্ট্যান্টদের মনে এত ভাবমরী মূর্তির আকর্ষণীয় হয় কেন ? তাই,  
বিনা নিষেধে যেমন আমাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব, সেই রকম  
মূর্তিবিশেষের সাহায্য বিনা আমাদের পক্ষে কোনো কিছু চিন্তা  
করাটাই সম্ভব নয়।”

—The Chicago Addresses. (page 14)



মুসলমানেরা চুই খান ?  
'জিন্‌জিন্‌' থেকে কেন  
এক খিট জল তুলে  
পাপ থেকে নিষ্কৃতি চান ?  
জন্মের নত হোরে  
ফকীরের কবরেতে  
কেন তবে প্রাণীপ আলান ?

অতএব মূর্খ 'brethren',  
'It is vain  
To preach  
Against the use of symbols  
And  
Why should we  
Preach against them ?—  
We are all born idolaters,  
And idolatry is good,  
Because  
It is in the nature of man.'<sup>২</sup>

তাই দেখি আজ,  
আধুনিক ইউরোপী  
উগ্র প্রোটেষ্ট্যান্ট, ধারা  
প্রতীকের বিরুদ্ধে  
সর্বদা দাগেন কামান,  
ধর্ম-জীবনে তাঁরা  
'অগাস্‌ট' ও 'কোম্‌তে'র  
সাক্ষাৎ চালা বোনে বান্ !  
বধর্ম-বিচ্যুত  
'অজ্ঞেয়বাদী' তাঁরা,  
সর্বদা 'এথিক্‌' আঁড়ান্ !

২২

তাই বোলে বোলুছিনা—যতোদিন পায়ে  
মূর্তির ছায়াতলে ক'রে ঘুম মারো,  
প'ড়ে থাকো প্রতীকের অলসায়তনে,  
'চট্টবৈষ্ণব' ঐ মস্তিষ্ক ছাড়া ।

"It is very good  
To be born in a church,  
But it is very bad  
To die in a church.

২। "প্রতীকের বিরুদ্ধে প্রচার করা বুঝা আর কেনই বা তা'  
কোথায় ? আমরা সবাই আলস্য মূর্তিপূজারী, আর মূর্তি-পূজা  
কল্যাণকর, কেন না এটা মানুষের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে ।"  
—Bhakti or Devotion. (Complete works, vol II,  
page 39)

It is very good  
To be born  
Within the limits  
Of some certain forms  
That help  
The little plant of spirituality,  
But  
If a man dies  
Within the bounds  
Of these forms,  
It shows  
That he has not grown,  
That  
There has been  
No development  
Of the soul."<sup>৩</sup>

২৩

ছোটো দল প্রতীকের উপাসক নন্,  
পরমহংস আর যারা নরাধম ।  
এ-দুয়ের মাঝখানে আর সকলের  
প্রতীকের প্রয়োজন আছে বেশি-কম ।  
পরমহংস,—তিনি প্রতীকের পার ।  
ছাদে উঠে প্রয়োজন নেই সিঁড়িটার ।  
ছাদে যে চায় না যেতে চায় না সে সিঁড়ি,  
মূর্তি চায় না তাই মূর্খ, গোয়ার ।  
"Two sorts of persons  
Never require any image—  
The human animal  
Who never thinks of any religion,  
And the perfected being  
Who has passed  
Through these stages.

Between these two points  
All of us require  
Some sort of ideal,  
Outside and inside."<sup>৪</sup>

৩। "চারে জন্মানো ভালো কিন্তু সেখানে মরাটা অত্যন্ত  
খারাপ । কোনো বিশেষ বিশেষ মূর্তি—যারা আধ্যাত্মিকতার চারা-  
গাছটাকে জীবন ধারণে সাহায্য করে—তাদের মধ্যে জন্ম নেওয়া  
ভালো, কিন্তু তাদের বন্ধনের মধ্যে যদি মৃত্যু হয়, তা'হলে মৃত্যুতে  
হবে সে বান্ধনি, তার আত্মার কোনো উন্নতিই হয়নি ।"

—Realisation and its methods ( page 83 )

৪। "হ' থাকের লোকেরা কখনোই প্রতিমা-পূজা করেনা—  
এক চোখে নরাধম, যারা ধর্ম সবকে একেবারেই উল্লাসী, আর  
হোচ্ছেন বিজ্ঞানী—এই সব অবস্থাসমূহকে ধারা পেরিয়ে এসেছেন ।  
এই ছোটো থাকের মাঝখানে আমরা যারা আছি, তাদের সকলেরই  
কোনো না কোনো আদর্শ চাই, তা সে বাইরেই হোক আর মনেই  
হোক ।"

—Addresses on Bhakti-Yoga. (Complete works,  
vol IV, page 45 )

২৪

পরমহংস আর পাবও ছাড়া  
প্রতীকের শত্রুতা কোরে থাকে বার,  
তাদের দেখতে হবে করুণার চোখে ;  
মুখ, বাচাল আর অসত্য তারা ।

বতদিন হৃদয়েতে বাচ্ছনা মন,  
জড়ের ওপরে টান রয়েছে বধন,  
অপরের সাহায্য চাই বতোদিন,  
ততোদিন প্রতীকের আছে প্রয়োজন ।

বতোই বলোনা কেন—‘তিনি নিরাকার,’  
‘সর্বব্যাপী’ আর ‘অসীম-অপার,’  
ওটা হোলো বড়োদের গালাগালি শুনে  
ছেলেবো যেমন বলে—‘পাজী-নছার ।’

মানেই বোঝোনা তার, তবু বলা চাই ;  
ইচ্ছেটা—বাতারাতি ঢালা হোয়ে বাই ।  
ধর্ম কি ব্যাক্যির বাট-চতড়ি ?  
অমৃত্তিহীন হুটো শুকনো কথাই ?

বুদ্ধির বোল-চাল কলেজেই কাটে,  
বিকোরনা আধ্যাত্মিকতার হাটে ।  
বিক্ষেপে হোতে পারে ‘মাস্টার এভারেষ্ট’,  
হয়তো বামন তুমি নিজেকে জানাতে ।

‘বিধাতা সর্বব্যাপী’ বলাটাই সার,  
ব্যাপ্তির কতোটুকু ধারণা তোমার ?  
বতোই বলোনা মুখে তবলার বোল,  
সেবোল হাতেতে আনা দুহুহ ব্যাপার !

আচ্ছা, ভাবোতো দেখি অসীমের কথা ;  
এখনি পরখ করে অসীম মূঢ়তা ।  
অসীম বোলতে তুমি বোঝোনা কিছুই,  
কিবা বা বোঝো সেটা তার উপটোটা ।

অসীম বোলতে তুমি ভাবো খুব জোর  
হুনীল আকাশ আর সবুজ সাগর ।  
আকাশ ও সমুদ্র—হুটোই প্রতীক,  
তবে ওরা ঢোকে কেন মনের ভেতর ?

তাও তাকে তোমার ঐ দুইসীমার  
সীমায়িত কোরে নিয়ে তবে ভাষা বার ।  
বোধাতীত অসীমকে ভাবতে গেলেই  
অসীম সসীম হন বোধের সীমার ।

একসেরা-বাটতে কি বেশি দুখ ধরে ?  
হুঁসের ধরাতে গেলে পাঁচসের পড়ে ।  
মন বা বুদ্ধি বলো, একসেরা-বাট ;  
কমজ দুখ ধরো আদম উভয় ।

অতএব অসীমকে জেনে বা না-জেনে  
সীমায়িত করো তাকে বুদ্ধির ‘ক্রেমে’ ।  
বুদ্ধিটা কোনোদিনই অনন্ত নয়,  
কিছুটা ছুটেই ব্যাটা মরে যেমেখেমে ।

বাই হোক, এখানে সে-প্রসঙ্গ থাক,  
কেন ওরা আসে মনে তাই ভাবা যাক ।  
অসীমের প্রশ্নকে কেন আসে ঐ  
আকাশ ও সাগরের জোড়া ফটোগ্রাফ ?

প্রতীকের মাধ্যমে কেন তাকে চাও ?  
সাগরের সাহায্য কেন নিতে বাও ?  
ও-হুটোকে মন থেকে বাদ দিলে কেন  
থাকেনাকো অসীমের কোনো চিন্তাও ?

মনেতে বিশেষ কোনো ভাব আসে বেই,  
অমনি প্রতীক আসে সেই নিমেষেই ।  
কিবা প্রতীক দেখে মনে পড়ে বার  
একটা বিশেষ ভাব, ভাবি সেইটেই ।

পূরীতে বেড়াতে গিরে সমুদ্র দেখে  
অসীমের চিন্তাটা ওঠে মন থেকে,  
কিবা অনন্তের প্রশ্ন হলো  
সমুদ্র ছুটে আসে সেই পূরী থেকে ।

অতএব কেউ যদি নিজেকে ভাবে  
প্রতীকের মাধ্যমে অসীমকে ভাবে,  
‘কাবার পাখরে’ আর ‘ক্রমশে’তেই হোক,  
সসীমেই অসীমের গন্ধটা পাবে ।

‘নিরাকার ব্রহ্মের’ মোক্তার তাই  
অসীমকে চান ঝাঁর প্রতীক ছাড়াই,  
এখন প্রশ্ন এই—তারা কাকে চান ?  
ব্রহ্মকে সত্যি, না প্রতিষ্ঠাটাই ?

বোলুন সত্যি কোরে তাঁরা কাকে চান ?  
সত্যকে সত্যি, না নিজেকে নাম ?  
প্রথমেই প্রার্থীরা দুখরতাহীন,  
খিত্যের প্রার্থীই তর্ক বাধান ।

হিন্দুতো বোলছেন প্রতীকটা জোর,  
প্রতীকের মাধ্যমে ‘ব্রহ্ম’কে চেয়ো ।  
প্রতীকের উপাসনা বোলে কিছু নেই,  
‘ব্রহ্ম’ই উপাস্ত, ‘ব্রহ্ম’ই ধ্যেয় । ৫

৫। ‘প্রতীকোপাসনা’র অর্থ কি ? প্রতীক শব্দের  
হোচ্ছে—বাইরের সিকে বাওয়া, আর প্রতীকোপাসনার  
ও শব্দের পরিবর্তে এমন এক বস্তু উপাসনা, বা একাংশে ।  
অনেকাংশে ‘ব্রহ্মের’ খুব সন্নিহিত, কিন্তু ব্রহ্ম নয় । ভগবান বা  
তাঁর ব্রহ্মহুত-ভাবে বোলেছেন—‘অত্রাণি ব্রহ্মহুতাহুতসহা

সবই তো ব্রহ্ম, তবু সেই সত্যকে  
সবচেয়ে ভাখার আগে ভাখে একটাকে।  
প্রতীক পূজার মানে আর কিছু নয়,  
ব্রহ্মদৃষ্টি দিয়ে তা'খা একটাকে।

এ-ভাবে ব্রহ্মবোধ জেগে বাবে যেই,  
তখন আর প্রতীকের প্রয়োজন নেই।  
ব্রহ্মদৃষ্টি দিয়ে দেখবে তখন  
ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সব কিছুতেই।

প্রতীকোপাসনা বলে।" (ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৫ম  
সূত্রের রামানুজভাষ্য।) ভগবান শঙ্করাচার্য বোলছেন—“মনে  
ব্রহ্মত্বোপাসিতত্যাধ্যাত্মম্। অথাহিনৈবতমাকোশো ব্রহ্মেতি। তথা  
আসিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ। স যো নামব্রহ্মত্বোপাস্তে ইতোবমাদিষু  
প্রতীকোপাসনেন্ স শব্দঃ।” অর্থাৎ “মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কোরবে,  
এটা আধ্যাত্মিক, আকাশ ব্রহ্ম—এটা আধিদৈবিক। (মন আধ্যাত্মিক  
ও আকাশ বাহ প্রতীক—এই উভয়কেই ব্রহ্মের বিনিময়ে উপাসনা  
কোরতে হবে।) এইরূপ, আসিত্যই ব্রহ্ম, এই আদেশ। ‘যিনি  
নামকে ব্রহ্ম মনে করেন’—সেই সব স্থলে প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে  
শব্দর উপস্থিত হয়।”—(ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৪র্থ সূত্রের  
শঙ্করভাষ্য।)

প্রতীকোপাসনার ফলটা কে জানে? প্রতীক, না ব্রহ্ম?  
শঙ্করাচার্য বোলছেন—“আদিত্যাধ্যাপাসনেন্হি ব্রহ্মৈব দাভতি।  
ঈদৃশ্য চাত্র ব্রহ্ম উপাস্তব্য প্রতীকেষু তদদৃষ্টাধ্যারোপণ প্রতিমাদিষু  
ইব বিক্কাণীনাম্।” অর্থাৎ “আদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রহ্মই জানে,  
কারণ তিনি সকলের অধ্যক্ষ। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু আদি দৃষ্টি  
আরোপ কোরতে হয়, সেইরকম প্রতীকেও ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপ কোরতে  
হয়, অতরাং এখানে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হচ্ছে  
বুঝতে হবে।”—(ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৫ম সূত্রের  
শঙ্করভাষ্য।)

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীকোপাসনা প্রসঙ্গে বোলছেন,—  
“One thing, therefore, has to be carefully borne  
in mind. If, as it may happen in some cases, the  
highly philosophic ideal, the supreme Brahman,  
is dragged down by Pratika-worship to the level  
of the Pratika, and the Pratika itself is taken to be  
the Atman of the worshipper, or his Antaryamin,  
the worshipper gets entirely misled, as no  
Pratika can really be the Atman of the wor-  
shipper. But where Brahman Himself is the  
object of worship, and the Pratika stands only as  
a substitute or a suggestion there of, that is to  
say, where, through the Pratika the Omnipresent  
Brahman is worshipped—the pratika itself being  
idealised into the cause of all, the Brahman—  
the worship is positively beneficial; nay, it is  
absolutely necessary for all mankind, until they  
have all got beyond the primary or preparatory  
state of the mind in regard to worsoip.”  
—Worship of substitutes and images. (Bhakti-

Vol. 1, page 55.)

বিতীয়মহিত সেই মহাসত্যর  
কেউ যদি কোনোদিন এক হোয়ে যায়,  
তখন পূজার কথা ওঠেনাকো আর।  
কে কাকে চাইবে বলে, কে থাকে যে চায়?

পূজাদিতে অন্ততঃ দু'জন তো চাই?  
এক হোলে ওঠেনাকো পূজা কথাটাই।  
তোমার ও ব্রহ্মের ভেদ মুছে গেলে,  
ধাতা-ধোয় এক হোলে, তুমি তো একাই।

২৫

এ হেন ব্রহ্মবোধ হোয়ে থাকে যার,  
সেই শুধু পৃথিবীতে প্রতীকের পার।  
নিজের ও ব্রহ্মের সীমা মুছে দিয়ে  
ব্রহ্মসত্ততেজে তোলে হংকার।

তখন সে গর্জায়—থাবা কার পাতে,  
আমি ছাড়া আর কিছু নাই যদি থাকে?  
প্রতীক বা প্রতিমার এইটুকু দাম,  
আমাতো জাগিয়ে তায় এই ‘আমি’টাকে।

যা কিছু শক্তি—সে তো নয় প্রতিমার,  
অনন্ত শক্তির আমিই আধার।  
শক্তিটা থাকেনাকো ‘পান্টিং ব্যাল’,  
যতাই মার্ক্‌ ঘুঁষি তাতে ‘বক্সার’।

প্রতীক প্রতিমা বলে, তারা সকলে  
আদ্বৈত ব্যারামের ‘পান্টিং থলে’।  
খুঁট, বুকসেব—সকলেই তাই,  
তারা যে মহান—সে তো আমি বোলি বোলে।

“Christa and Buddhas  
Are  
Simply occasions  
Upon which  
To objectify  
Our own inner powers.  
We really  
Answer our own prayers.”

অন্তএব বলে হারা গোড়া খুঁটান—  
খুঁটই পৃথিবীকে কোরেছেন ত্রাণ,  
তারা আর বাইহোক, মহাস্বা নয়,  
মানুষের শক্তিকে করে অপমান।

“It is blasphemy  
To think

৬। “খুঁট ও বুদ্ধেরা শুধু বাইরের অবলম্বন। আমাদের  
আভ্যন্তরীণ শক্তিসকলকে এই সব অবলম্বনে আমরা আরোপ কোরে  
থাকি হাড়। আসলে আমরাই আমাদের প্রাণনার জবাব দিই।”  
—Inspired Talks (page 167)

That  
If Jesus had never been born,  
Humanity  
Would not have been saved.  
It is horrible  
To thus forget  
The divinity in human nature,  
A divinity  
That must come out.”<sup>৭</sup>

তবনি সে গর্জায়—চাইবোটা কাকে,  
আমি ছাড়া আর কিছু নাই যদি থাকে ?  
খুঁই বুদ্ধ বলো—একজোড়া ডেউ  
‘আমি’ রূপ উত্তাল সমুদ্রতটে ।

“Never forget  
The glory of human nature.  
We are the greatest God  
That ever was  
Or ever will be.  
Christs and Buddhas  
Are but waves  
On the boundless ocean  
Which I am.”<sup>৮</sup>

বুদ্ধ বা খৃষ্টের এইটুকু দাম,  
ঈশ্বরের কেন্দ্রে কোরে হই পালায়ান ।  
আমার ভেতরে যদি শক্তি না-থাকে,  
বুদ্ধের সাধ্য কি আমার জাগান্ ।

২৬

তাও যদি হয়, তবে সেটা কিছু কম ?  
প্রতীক-পূজোটা তাই নরকো অধম ।  
মুগ্ধ ব্রহ্মটাকে জাগাতে গেলেই  
সকলেরই প্রতীকের আছে প্রয়োজন ।

তাই যিনি ব্রহ্মতে হোয়েছেন লীন,  
প্রতীকেরও প্রতি তাঁর প্রজ্ঞা অসীম ।  
এম-এ-পাশ-মাষ্টার ‘ইনক্যান্ট ফ্রান্স’  
বলেন না—A-B-C-D মূল্যবাহীন ।

৭। “বীজ যদি না জন্মাতেন, তবে মানুষজাতটার উদ্ভাবই  
প্রতীক—এরকম মনে করা দারুণ মানসিকতা । মানুষের স্বভাবে  
যে দেবত্ব অন্তর্নিহিত রয়েছে, তাকে এভাবে তুলে ধাওয়াটা অতি  
মারাত্মক কথা । ঐ দেবত্ব কোনো না কোনো সময়ে প্রকাশিত  
হবেই হবে ।”—Inspired Talks (page 167).

৮। “মানুষের স্বভাবে যে মহত্ব রয়েছে—তাকে কখনো  
তুলোনা । ভূত বা জীবিতের আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর কেউ  
হবনি, কখনো হবেনও না । আরিহ সেই অনন্ত সমুদ্র—খুঁই ও  
বুদ্ধের ভাঙা কলস—” —Inspired Talks (page 167).

তাই তিনি একথাও বোলে বান এসে—  
প্রতীক-পূজোও ঐ একই উদ্দেশ্যে,  
সকলেই একদিন ব্রহ্মকে পাবে,  
কেউ আগে, কেউ পরে, কেউ সব-পরে ।

“The range of idols  
Is  
From wood and stone  
To Jesus and Buddha,  
But  
We must have idols.”<sup>৯</sup>

ব্রহ্ম-বিশুদ্ধতা এসে গ্যাছে যাব,  
আর কি সে অস্ত্রকে করে খিঁকার ?  
বাচ্চারা সাধু ভাবে জোকোবদেরও,  
জোচ্ছুরি-বুড়ি যে মনে নেই তার ।

চরম ব্রহ্মজ্ঞানে মন্দির নেই,  
মন্দির বড়ো জোর কন্ম ভালোতেই ।  
খালোর অভাব নয় ঘনান্দকার,  
তফাৎটা কন্ম আলো বেশি আলোতেই ।

“This is  
One of the great points  
To be remembered,  
That  
Those who worship God  
Through ceremonials  
And forms  
However crude  
We may think them,  
Are not in error.  
It is the journey  
From truth to truth,  
From lower truth  
To higher truth.

Darkness is less light ;  
Evil is less good ;  
Impurity is less purity.”<sup>১০</sup> [ ক্রমশঃ ]

৯। “কাঁঠ পাথরের পূজা থেকে শুরু করে বীজ-বুদ্ধের পূজা  
পর্যন্ত সবই প্রতিমা-পূজা, কিন্তু মৃত্তিকে আমাদের আকর্ষণ  
হবে ।”

—Inspired Talks (page 72)

১০। “এটা বিশেষ কোরে মনে রাখতে হবে—যারা নানারকম  
ক্রিয়াকাণ্ড কোরে ভগবানের পূজা করে, আমরা তাদের ব্রহ্মতাই  
অনুশ্রাব্য মনে করি না কেন, তারা আসলে ভ্রান্ত নয় । কারণ,  
মানুষ নিরন্তর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে আত্মোন্নতি কোরে থাকে ।  
অন্ধকারে যোগ্যতম ব্রহ্মত্ব হবে—কন্ম আলো ; মল বোধিত—কন্ম  
ভালো ; অপবিত্রতা বোধিত—অন্ত পবিত্রতা ।”

**সবাই  
জামেন -**

চটপট  
বিলি করা হয় বলে  
রুচক বও চা  
এত ভাড়া থাকে

... আর ইষ্টায়  
২,১০,০০,০০০ পয়সাকেট  
রুচক বও চা  
তৈরী হয়



... আর প্রতি পয়সাকেট  
রুচক বও চায়ে  
অনেক বেশী কাপ  
ভালো চা তৈরী  
করা যায়

**এই জামাই**

**অন্য যে কোন মার্কা**

**চায়ের চেয়ে**

**রুচক বও**

**চা**

**কেনী লাগে খাব !**



রুচক বও ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



## রাধা-চরিত্রের বিবর্তন

### শ্রীমতী শঙ্করী বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈষ্ণব কবিতার প্রধান উপজীব্য শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক

এক অনুরূপ প্রেমকাহিনী এবং তাঁদের যুগজীবনের বিচিত্র দীপা। সমুদ্রগামী নদীর তুবাকসমাক্ষর উৎসুখ হতে তার চরম পরিণতি মহাসমুদ্রে আত্মসমর্পণ পর্যন্ত যেমন উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন, এই তিনটি ধারা দেখা যায়, ঠিক অমুরূপ ভাবে বৈষ্ণব কবিতার নারিকা শ্রীরাধাচরিত্রেও নায়ক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম দর্শন হতে তাঁর সঙ্গে একান্ত হওয়া পর্যন্ত তিনটি ক্রম দেখা যায়। শ্রীরাধার চরিত্রে মুখ্য, মধ্য এবং প্রাগলভ্য—এই তিনটি ধারার ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয়েছে যথাক্রমে পূর্বরাগ, অভিসার, মান, মিলন, আক্ষেপানুসারাগ, প্রেমবৈচিত্র্য, মাধুর এবং ভাবসম্মিলন বিষয়ক পদগুলির মধ্য দিয়ে।

কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ রাধার অন্তরে প্রলাপ বয়ে এনেছে। এর পর থেকে রাধার চিত্র এক স্থানেই স্থির হয়ে নেই। তাঁর চিত্র গতিশীল—অন্তরের অন্তরিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রথম প্রথম রাধা কেবলমাত্র কৃষ্ণের দর্শনেই নিজেকে পরম স্তবী মনে করতেন কিন্তু তাতেও সে মনের কাঁক ভরে ওঠে না—মন আরও নিবিড় আরও গভীর ভাবে পেতে চায় তার প্রিয়জনকে। প্রেমের ধনই হয়ত এই। তাই কেলে অঙ্গের পরশেই রাধার অন্তরের দাবী মেটে না—তাঁর তৃষ্ণাও হৃদয় হাহাকার করে বলে—নাও, আরো নাও। সেইজন্য অবশেষে দেখা যায়, রাধা তাঁর সমস্ত স্বেচ্ছাচ কাটিয়ে, সমাজ-সংসারের বাধা অতিক্রম করে এই “আরো কিছু”র সন্ধানে অভিযাত্রা যাত্রার পদক্ষেপ করেছেন।

যে পূর্বরাগ কৃষ্ণের নামরূপ প্রবেশেই রাধার মনে সঞ্চারিত হয়েছে তা ক্রমশঃ সাক্ষাৎ বা চিত্র দর্শনের মধ্য দিয়ে গভীরতা লাভ করেছে। রাধার গৃহকণ্ঠে মন নেই—এখন তিনি :

ঘরের বাহিরে দণ্ডে পত যায় তিলে তিলে আইসে যায়  
বন উটাইন নিশ্বাস সখন কদম্ব কান্দনে চায় ।

রাধার জীবনে কৃষ্ণের অপরিহার্যতা যে কত গভীর, তা তখনতে ঠাঁর একটি উক্তিতে :

হাথক দরপণ মাথক ফুল ।  
নয়নক অঙ্গন মুখক তাকুল ।  
হৃদয়ক যুগমদ গীমক হার ।  
দেহক সরবল গেহক সার ।  
পাখীক পাখ মীনক পানি ।  
জীবক জীবন হাম এঁছে জানি ।

কিন্তু এত নিবিড় নৈকট্য অমুভব করেও কৃষ্ণের বিরটি রহস্তের ঠাঁর বুঝতে পারেন না। তাঁর পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে না পে রাধার অন্তরে মাঝে মাঝে এক চাক্ষু্য জ্বলে ওঠে। এখন তাঁর আ অন্তে স্তবী নয়, কারণ তিনি জানেন—ভূমিব স্তবম্। মিলে আকাঙ্ক্ষা নত তাঁর হয়ে উঠছে, দেহজ কামনা ততই লুপ্ত : দেহাতীত বাসনার অরূপলোকে রাধার মন যাত্রা করেছে। ও তাঁর সাধনা দেহকে অবলম্বন করে দেহাতীত, ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় : ইন্দ্রিয়াতীত।

রাধা জানেন যে বত দিন তাঁর মধ্যে অহাবোধ জাগ্রত থাক তত দিন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পূর্ণ মিলনের সম্ভাবনা নেই। তাই যি একদিন আপন যৌবনধ্বংস, সমাজ সংসার, কলমর্মব্যাদা সবই পরিত্য করে অভিসারে যাত্রা করলেন। আকাশে মেঘের ঘনঘোর ঝ মাঝে মাঝে বিদ্যুতের বলক আর বজ্রপাত—কর্মমাজ, কটকট অতি দীর্ঘ পথ—কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারল না। তাঁর পা কামনা-বাসনার সীমা মুছে গিয়ে দেখা দিয়েছে আত্মার বিস্তৃতি—তাই পথের কোন কষ্টেই তিনি কাতরা নন। কারণ তিনি ইতিপূর্বেই ঘরের কোণে বসে সাধনা করেছেন :

কটক গাড়ি কমলসম পদতল  
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি  
গাগরি বারি ঢারি করি গীছল  
চলতহি অঙ্গুলি চাপি—

যাতে তাঁর এই অভিযাত্রা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। রাধার এই অতি লোকান্তরতার স্পর্শ লাভ করেছে। এর কারণস্বরূপ কবিতা ভাবায় বলা যায় :

তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে, আনন্দের নব নব পর্যায় পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে  
নিত্য পুষ্প নিত্য চন্দ্রলোকে ।  
নিতাই সে একা। সে-ই একান্ত বিরহী  
সে অভিযাত্রিকা তারই জয় ।  
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে ।  
সেও ত নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ ।  
সে যে বাজার বাঈ । প্রতীকার বাঈ  
স্বয় তাঁর এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে  
বাহিন্তের আচ্ছাদন আর অভিযাত্রিকার চলা  
পদে পদে মিলেছে একতানে ।  
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছলে  
সমুদ্র হলেছে আচ্ছাদনের সুরে ।

কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার প্রত্যহ সাক্ষাৎ হোতে লাগল—রাধা আ তবে সেই বিবাহুত পান করতে লাগলেন। কৃষ্ণের প্রেম তির্যক

রূপে আত্মদান করলেন কিন্তু পিপাসার নিবৃত্তি হোল না।  
তাই রাধা দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলে বলেন :

কত মধু বামিনী                      রতস গৌরারহু  
না বুধন কৈছন কেল।  
লাখ লাখ যুগ                      হিয়ে হিয়ে রাখহু  
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

কিন্তু রাধার প্রেম-অভিমানের এখানেই শেষ নয়, বরং আরম্ভ। কারণ, “অহেরিব’গতিঃ প্রেয়ঃ স্বভাবো কুটীলা ভবেৎ।” এই প্রেম ভক্তির জানা রস, বিচিত্র বিভঙ্গ। তাই কৃষ্ণ বধন রাধার কুঞ্জে না এসে অপর কুঞ্জে যান, তখন দেখি রাধার অভিমানিনী রূপ। অমৃতপু কৃষ্ণ এসে রাধার পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করেছেন কিন্তু রাধা তাঁর তাঁর অভিমান বশতঃ তিরস্কার করে কৃষ্ণকে বিনায় দিয়েছেন অথচ পরমুহুর্তেই তিনি কৃষ্ণবিরহে কাতরা। তিনি জানেন যে কৃষ্ণ বহুবল্লভ কিন্তু তবুও তাঁর হৃদয় মানে না, তিনি একাই কৃষ্ণের সান্নিধ্যকে নিবিড় করে উপভোগ করতে চান। মিলনের মধ্যেও রাধা বিরহের স্তর ওনতে পান। কৃষ্ণকে হারাবার ভয়ে তাঁর অন্তর এক অজানা ব্যথার ভরে থাকে। কৃষ্ণের দেখা না পেলে রাধার কাছে ক্ষণমাত্রকে যুগ বলে মনে হয়, আবার মিলনের পর স্নেহ হয় : যা পেলাম ত’ কি সত্য? যে প্রেমের স্তম্ভ অসাধ্য সাধন তিনি করেছেন, আজ পর্যন্ত তার স্বরূপ ত’ তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন না অথচ এই প্রেমেরই দারুণ শ্রোতাবলে রাধা তাঁর ব্যক্তির তটস্থি থেকে স্থলিত হয়ে অসহায় শৈবালের মত মহানদীর সিকি এগিয়ে চলেছেন। তাঁর এই ব্যাধা সীমা থেকে অসীমের প্রতিই ব্যাধা। এর মধ্যে স্থিতি নেই, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। কৃষ্ণকে পেয়েও না পাওয়ার বেদনা যে কত গভীর! রাধার কাতর উক্তির মধ্য দিয়ে তারই অভিব্যক্তি দেখা যায় :

স্বথের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিছু  
অনলে পুড়িয়া গেল।  
অমিরা সাগরে লিনান করিতে  
সকলি গরল ভেল।

রাশ’সরিরের পরিবর্তমান ধারাটি লক্ষ্যীয়। কৃষ্ণের ব্যক্তিরের স’ খার আত্মবোধ ধূলিলুপ্তিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর হৃদয়ে আ’ ব্যর্থতা। কৃষ্ণের অধিষ্ঠান এবং কৃষ্ণের সঙ্গে নিবিড় একা’ হয়ে উঠেছে। তাই রাধা বলেন :

ধুঁ কি আর বলিব আমি  
সুন মরণ জনমে জনমে  
গণনাথ হৈও তুমি।

এত দিন হৃদয়ের তরঙ্গাঘাতে তাঁর চিত্ত আশোষিত হয়ে কতবিকৃত হয়েছে। নানা দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন যে ঐক্যপ্রাপ্তিই চরম প্রাপ্তি। তিনি বলেন :

ঐতল বলিয়া শরণ লইছ  
ও দুটি কমল পায়।

এখানে রাধা প্রগলভা—মুগ্ধা নন। জীবনের বিভিন্ন ব্যা-  
প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর বশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। তাই  
দেখা যায়, রাধার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। তাঁর সমস্ত স্বাধীন

চাওয়া-পাওয়া দূরীভূত হয়ে গিয়েছে। নানা অশান্তির পর শান্তি  
সমুদ্রে অবগাহন করে শান্ত রাধা বলেন :

ধুঁ তুমি সে আমার প্রাণ।  
সেই মন আমি                      তোমারে সঁপেছি  
কুলশীল জাতি মান।

আজ রাধা-কৃষ্ণকে “সো বহুবল্লভ কাম” জেনেও দুঃখ করেন না—  
তাঁর সাধনা সৈন্ত সাধনা থেকে অসৈন্ত সাধনার উপনীত হতে চলেছে।  
পূর্বে মিলনের মধ্যেও বিরহের যে আভাস তিনি পেরেছিলেন, তা  
সত্যতা লাভ করল সেদিন, যেদিন অজুহৎ এসে কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে  
গেলেন। কৃষ্ণ বিনা রাধার জীবন-জগৎ শূন্যতার ভরে উঠল। তাঁর  
অন্তর কৃষ্ণের বিরহে হাহাকার করে উঠল :

শুন ভেল মন্দির শুন ভেল নগরী।  
শুন ভেল দশ দিশ শুন ভেল সগরি।

তাঁর পূর্বের চাপা ক্রন্দন আজ এক মহাক্রন্দনে পরিণত হয়েছে।  
যে কৃষ্ণকে লাভ করে রাধার একদিন মনের অবধি ছিল না, তৃপ্তির  
সীমা ছিল না, সেই কৃষ্ণকে হারিয়ে তাঁর বেদনা অসীম শূন্যতার  
পর্যাবসিত হয়েছে। বর্বার বাহিপাতের সঙ্গে রাধার মন তাই  
গেয়ে চলেছে :

এ সখি হামার হৃথের নাহি ওর।

এ তারা বান্দর                      মাই ভানর  
শুভ মন্দির মোর।

কৃষ্ণ হরত আবার এক দিন কিরে আসবেন কিন্তু রাধার ভাঙে কি  
লাভ? কারণ যদি :

অহুং তপন ভাপে যদি জারব  
কি করব বারিণ মেহে।  
এ নব বৌদন বিরহে গোঁড়ায়  
কি করব সো পিয়া লেহে।

বিরহের দশ দশা রাধার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠল—কিন্তু এই ছালা  
তাকে বেশী দিন গহিতে হোল না—কৃষ্ণ অবশেষে পুনরায় প্রত্যাগর্তন  
করলেন। এবার তাঁদের যে মিলন ঘটল, তা হৃদ-গৌরীর মিলন  
অপেক্ষাও নিবিড় এবং গভীর। কৃষ্ণের আসময়বাঁধা তখন রাধা  
বললেন :

পিয়া যব আওব এ মধু গেছে  
ময়ল যতছ’ করব নিজ মেহে।  
বেদি করব হাম আপান অঙ্গমে  
বাঁড়ু করব তাহে চিকুর বিহানে।

কারণ তিনি জানেন যে সাধকের দেহই মঙ্গল আচারের স্থান—“The  
humanbody is the highest temple of God।” এখন  
কোন্সের কৃজন, ভ্রমের মধুর ওজন, বৃহৎ ময়ল বা চন্দ্রের স্নিগ্ধ  
কিরণে তাঁর অন্তর বিরহানলে ছলে ওঠে না—তিনি জানেন অধীর  
হয়ে বলেন :

সোই কোকিল অব                      লাখ লাখ ডাকউ  
লাখ উয় কক চলা।  
পাচ বাণ অব                      লাখ বাণ হোই  
ময়ল পয়ল বহু মলা।  
কৃষ্ণের সঙ্গে এই মহাবিশল—জীববিশ্বদেয় রাধার আর

আশঙ্কা নেই। তাঁর এটী আত্মনিবেদন আর কিছুই নয়—“সীমা হতে চার অসীমের মাঝে হারা” এই সংসার কণ্ঠহারী এবং অসার জেনে বাধা তাই চিরস্থায়ী শাশ্বত কৃষ্ণের পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করেছেন—এমন কি, নিজের দেহের উপর সমস্ত দাবী ত্যাগ করে তিনি কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রার্থনা করছেন :

মাধব বহুত মিনতি করি তোয় ।

সেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলু

দয়া করি ছোড়বি মোয় ।

সর্বশেষ স্তরে এসে বাধার উপলব্ধি হয়েছে—সোহং নম—কৃত্তমসি—কৃষ্ণই সেই পরমপুরুষ। এখানেই তাঁর বৈত সাধনা অর্ন্ত সাধনার সর্ব শেষ সোপানে গিয়ে উপনীত হয়েছে।

বাধার পরিভাষনা শুরু হয়েছে পাথে পাথে। মান আবেগ মিলন বিরহের নিত্যালীলার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্র ক্রমেই বিকশিত হোয়ে উঠেছে। তাঁর মুখা, মধ্যা এবং প্রাগলভ্য রূপের মধ্যেও কত চিত্র—কৃষ্ণের রূপদর্শনে ও গুণপ্রবণে স্বপ্নের যে আকস্মিকতার উদ্বোধন, নিখিল রসামৃতের আনন্দসমুদ্রে তাঁর ধ্যানমগ্নতা—এই ভাবেই সমগ্র বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে নানা চিত্র-বিচিত্রের মাধ্যমে বাধার চরিত্র উজ্জল হতে উজ্জলতর হয়ে উঠেছে।

অসীম হতে বিচ্ছিন্ন বাধার অসীমের প্রতি যে সীমাতীন পিপাসা রয়েছে, তার একমাত্র নিযুক্তি অসীমেই। পার্শ্বত্যাগ নদী বধন তার নামরূপ হারিয়ে মহাসমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন নদী আর নদী থাকে না, সমুদ্রে পরিণত হয়। নদীর সমস্ত সত্তার বিশ্রাণ ঘটে সমুদ্রের বিরাট সত্তার মধ্যে। এই মিশ্রণে বিধ নেই—লাহে একষ। বাধা এবং কৃষ্ণের মিলন—সীমা এবং অসীমেরই মিলন। কারণ কৃষ্ণ যে অসীম এবং অনন্তব্যাপ্ত প্রতীক। বাধা কেবল তাঁর চলায় মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্তি খুঁজে পাননি—তিনি আপন সত্তাকে বসিন কৃষ্ণের মহাসত্তার বিলুপ্ত করে দিতে পারলেন, সেদিনই এল তাঁর মুখ, তাঁর শান্তি, তাঁর তৃপ্তি। এই প্রসঙ্গে মরমোহা সাধকের যে উজ্জ্বল কণ্ঠের এক ব্যাপক, তার পরিচর নতুন করে পাওয়া গেল :—

“In this highest stage the soul is united to God without means, it sinks into the vast darkness of the God head.

## কাল আসছে

[ একটি জনপ্রিয় ইংরাজী সঙ্গীতের অর্থবাণ ]

### শমিতা গুপ্ত

গুণো মোর প্রিয় দিন হবে অকালীন

‘কালকের’ নেই দেয়ী ;

নতুন তপন আনিবে রোমন ধারা

আভাস জাগিয়ে তায়ি ।

ও রাঙা অথরে হাসি নাহি দেখা দেবে,

তা ও স্বপ্নো নয়নে নাহি বলকিবে আশা,

রাধা আমি যে জেনেছি গুণো মর প্রিয়জন

যোথ রহিলে না, কাল জন ভাঙ্গাবাদা ।

দিন হল শেষ ‘কালকের’ হল শুরু

সামনের দিন সকাল রয়েছে অজানা

তোমার স্পর্শ সহজেই মোরে বলে

ভালোবাসা তব শুধুই মিথ্যা হলনা ।

চিরদিন শুধু তোমারেই ভালোবাসিব

বত দিন তারা আকাশেতে দেবে আলো

প্রতিদিন শুধু এই আশা লয়ে থাকিব

একদিন তুমি সত্যি বাসিবে ভালো ।

## তুচ্ছ

### দীপালী বিশ্বাস

স্নান বিকালের ঠাণ্ডা হয়ে আসা উত্তাপ কেমন যেন লুটিয়ে পড়েছে খোলা জানালার কাচের সাসির গায়ে, ঘরের সিমেন্ট-ওটা মেজেতে, এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা বিছানার চাদরে আর পুরানো বৃষ্টিভেজা দেয়ালটার কোণে—যেখানে ক’দিনের অবিরাম বর্ষণে ভাঙ্গা ছাদ দিয়ে জল পড়ে পড়ে ধুয়ে গিয়েছে ময়লাগুলো। বৃষ্টির জল ঘরের মাঝখানে টেনে-আনা খাটখানার ওপর অলস মৌনতার বসে আছি আমি। নিষিদ্ধ হয়ে দেখছি আমার মনটাকে। ব্যাকুল বিজ্ঞানে সে বেরিয়ে গেল স্ব-ইচ্ছায় আর তারই আকুলতা যেন আমি দেখছি। দেখছি আর ভাবছি।

কত কাজ—অনেক হিসাব-নিকাশ লিখতে হবে, অনেক রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে, আবার অনেক কাজ হিসাব-নিকাশ একটু কালির আঁচড়ের অপেক্ষায় জমে আছে। অফিসের সঙ্গেই আমার ঘর—অফিসকে তাই দিতে হয়েছে অনেক গুল্লর মুহূর্ত। সারাদিনের অনেক চিন্তা, সন্ধ্যারাতের অনেক প্রসন্নতা হারিয়ে যায় অতর্কিতে কাজের প্রয়োজনে। মনে নিতে হয় সে কোলাহল। কিন্তু সহসা এক একটা দিন আসে, যেদিন অকারণ ব্যথার ভরে গুঁঠে সারা অন্তর—সেদিন আর মনে নেওয়ার দিন নয় এমনই করে আকুল মনকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকি শুধু।

আজ তাই হয়েছে। ওই তো দেখছি আমি আমারই মনটাকে—কেমন করে বারে বারেই অসহায় আত্মদানে উড়ে পড়ছে ওখানটার। যেখানে আমগাছটার কাচের সবুজ পাতার ওপর দিয়ে জানালার মধ্য দিয়ে ঘরের মাঝখানটার থমকে দাঁড়ান রোদ্দুরটা একটু হঠাৎ বৈরাগ্যের রঙে চিক্চিক করছে। তার ওপাশে পড়ে রয়েছে আমারই এক জোড়া খড়ম, বারে বারে যেন কেঁদে ফিরছে সেই কাঠের নিস্তাণ রূপের কাছে। আর আমি দেখছি, দেখছি আর ভাবছি।

ভাবছি? কই না! ভাবছি না তো? ভাবতে চাই কিন্তু পারছি না। কেন, কেন, কেন?

কীসের শব্দ দরজার? কে? কে যেন পাঁড়িয়ে দরজার ওপাশে—গলাটাকে সহজ করে জিজ্ঞাসা করি, কে? দরজাটা ঠেলে খুলে দিয়ে দাঁড়াল একটা মেয়ে। এসেছে প্রয়োজনের কথা নিয়ে। অজ্ঞানত ভাবে কী যেন বললাম। বলতে বলতে, শুনতে শুনতে এমনই অভ্যাসে পাঁড়িয়েছে যে বেশিদের মতন উত্তর দিয়ে বাই। নিজের অজ্ঞানতায়ই বলি অনেক কাজের কথা। কথা সেবে চলে গেল মেয়েটি। কিন্তু মনটা আজ ঘুরে-ফিরে কেবলি ওই একটুখানি ঝিকঝিকির চার পাশে কেঁদে ফিরছে।



এখন বেলা কত? সাড়ে চারটা হয়ে বোধ হয়। হাতঘড়িটার দিকে তাকাতো উচ্চা করছে না। সমস্ত নান্দুগুলো বেন অবশ হয়ে গিয়েছে। অফিস থেকে এক যুহুর্ন্তের ভক্ত হয়ে এসেছিলাম আর তাতেই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। এ দুর্ঘটনার কথা কাগজে উঠবে না, পাঠকে পড়বে না—কেউ একটু সময় করে বলাবে না—“আগ রে”। আমার অন্তর শুধু জানল, বিধাতার সৌন্দর্যলোকে অসংখ্যের মধ্যে আজ একটি দীপ্তি নিয়ে গেল বড় অসহায়, করুণ ভাবে।

“আসব?” একটা প্রশ্ন ভেসে এল। “এসো”—ভাল করে চোখ মেলে তাকাতো বেন চাই না ঠিক এই যুহুর্ন্তে। তবু কিরে দেখলাম একরাশ কাগজ হাতে ঝাড়িয়ে ওঠে কাজের মানুষ। তাগিদের ওপর তাগিদ দিতে থাকে সে। প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন। না, এখনই তাকে দেখে দিতে হবে ওগুলো—হ্যাঁ এখনই, আজই, এই ক্ষণেই। অভ্যাসে হাতটা বাড়াই। কলমের আঁচড়ে নামের একটা মিছিল এলোমেলো হয়ে বয়ে চলতে লাগল। সে পালা শেষ হোল। হায় রে শুধু ভুলের দায়িত্ব নিয়ে নিজেকে চব্বিশ ঘণ্টার একটা প্রয়োজনচক্রে বেঁধে দিয়েছি—সেই অবিরাম একটানা চক্রে ঘুরে চলেছি আমি।

সেই ছককাটা একঘেরে সময়ের মধ্যে হঠাৎ বেন একটা অপরিচিত যুহুর্ন্ত এসে সব ভোলপাড় করে দিল। আচ্ছা যে—ওই তো, কতটুকুই বা প্রশ্ন, কিন্তু কী ব্যাকুল ভঙ্গি ছিল তার বঁচার।

মনটা গুন্‌গুন্ করে কিংগছে। কেবলই সেই সারাসিনের অকারণে বাড়ানো কাজের কথায় ভরে উঠছে। নিত্যদিনের মতন আজও ভোরে কুঁজোটা থেকে জল নিতে ঘেরে হঠাৎই চোখ পড়েছিল ওটার ওপর। কোথা থেকে এল কি জানি। দেয়ালের ঘোলা রংয়ের ওপর বসে একটা প্রজাপতি। গিরিমাটির লালচে আভা আর তারই হালকা গভীর রক্তের মিশ্রণে সূক্ষ্ম পাখা ছুটি অদ্ভুত সূক্ষ্ম। ভোরবেলার প্রসঙ্গ আলোর স্নিগ্ধ এক সৌন্দর্যের ছবি। রূপস্বস্তির নিপুণতার এক অগ্নান উদাহরণ। কী জানি কি খেয়াল হোল—একটু ধরতে ইচ্ছা কোবল। দক্ষিণের বারান্দার পাশ গাছগুলির ঝাঁক দিয়ে আসা বাতাসের দোলার কাঁপন ধরেছিল তার মেলে দেওয়া হালকা পাখায়। আনন্দের একটু স্পর্শ, আশ্চর্য্য সূক্ষ্মের একটু আমেজের সোভ ভোরবেলার শান্ত মনটাকে পেয়ে বসেছিল। তাই হাত বাড়িয়েছিলাম।

উঃ, ভাবতেই কেমন জানি অবাক লাগে। মনটা ভাবছে, ওই

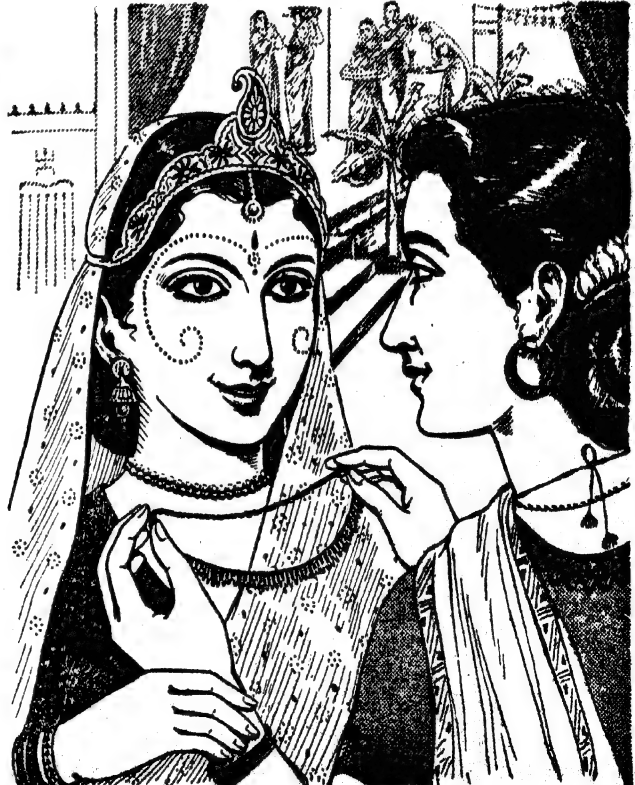
## মনের কথা

“এমন সূক্ষ্ম গহনা কোথায় গড়ালে?”

“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়েছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের কুচিহ্ন, সন্তোষ ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।”

# মুখার্জী জুয়েলার্স

শ্রী মনোর গহনা নির্মাণ ও রত্ন-ভাস্করী  
বহুবাজার ঘাটের, কলিকাতা-১২



তো দেখছি আমি ও কাঁদছে, টপ টপ করে—জল নয় তার বাথার বৈরাগী রং ধরে পড়ছে মাটির সঙ্গে লেপটে-বাওয়া ডানা ছুটির ওপরে। তখন কি জানতাম, এমন করে বাক্যে বাঁচিয়ে তুলতে চাই-ই, এমনি করেই এক অসতর্ক মুহূর্তে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে বিলুপ্ত করে দেব? এ কি নিয়তির পরিহাস! ও বেন সায়াদিন অপেক্ষা করেছে এই পরিহাসটুকুকে আরও মর্মান্তিক করার জন্য।

কি বলছিলাম বেন? হাত বাড়িয়েছিলাম, নয়? স্পর্শ একটু করতেই ছুটফুট করে উঠে ওটা নেতিয়ে পড়লো ক এমন বেন। আলতো করে ধরে জলের কুঁজোটার কাছে ছেড়ে দিতেই উড়ে যেয়ে বসলো সোটার গারে। আর আশ্চর্য! সোন্দর্যের বেন হাট বসলো। কুঁজোটার বাঁদামাটি রঙ্গের সঙ্গে তার দুই-বাঁদা গেকরা মাটির ঝিক-ঝিকি বেন সৃষ্টি তারের এক স্রবম বন্ধার তুলস। এ জগতের সঙ্গে কই আমার তো কোন সম্পর্ক নেই? আমি তো হিসাব-জগতের মানুষ। খাতাপত্রের কাল কালি আর মাঝে মাঝে মোটা মোটা লাল লাইন দেখাই আমার অভ্যাস—সেই রঙ্গই আমার বুদ্ধি অভ্যাস, কিন্তু এই মুহূর্তের মায়ার আজ আমার বোধ বেন একটা ঝান্ডা খেল। অনেককণ, হ্যাঁ অনেককণ সেই স্নিগ্ধতা আমি প্রাণ মন ভরে পান করেছিলাম। যতকণ না বেলা উঠেছে, ঘরের কাজ করে যে মেয়েটি সে এসে না ডেকেছে ততকণ আজ আমার মনটার শূন্য হয়ে আসা পাঠ মেসো ধরেছিলাম ওই আনন্দ পানে। সচেতন হয়ে উঠে সাবধান করেছিলাম সেয়েটকে, ওটা বেন না নাড়াচাড়া হয়, থাক ওখানে।

তার পর ব্যস্ত ছিলাম অল্প দিনের মতই নানা কাজে। কিন্তু বখনই অবসর পেয়েছি একটু পাড়িয়ে দেখছি সে দৃষ্ট, বস দেখছি তত দৃষ্ট হয়েছি। দুঃখ হয় তারলে, ওই তো মনটা ছুটফুট করতে বেলান, ভাবছে আমি যদি শিল্পী হতাম। রঙে রেখায় ধরে সাবধান সেই ছবিটি—বা চেতন মনের স্তর থেকে বিদায় নেবে একদিন।

কিন্তু হার রে নিয়তি। বিকালে হঠাৎ খুব জরুরি তাগিদে ক্রান্ত পক্ষে এসেই চাবিটা নিয়ে ফিরে বাছিলাম অকসি, হঠাৎ সেই এক কালি বোমের ঝর্ণ দেহের ওপর কী বেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। ভাল করে দেখেই চমকে গেলাম। খড়ের তলার নিশপক্ষে শেষ হয়ে গেল সোন্দর্যের একটা শিখির-বিলু। একটু শব্দ না, একটু প্রতিবাদ না। নিশপক্ষ, মহাশ, শান্তি।

উঃ, আর ভাবতে পারছি না। ওই তো একেবারে মিশে গিয়েছে সিমেন্টের কর্কশ মেঝেতে। মনে হচ্ছে, কে বেন ওখানে, ওই মেঝেতে একে মেঝেছে একটা রঙ্গের ছবি-প্রজাপতি। একটু বিকৃত হয়নি, একটু স্নান হয়নি, একটুও পরিবর্তন হয়নি।

কাঠের সিঁড়িতে ওনতে পাখি পায়ের শব্দ। ক্রমেই জোরে আসছে শব্দটা। বোধ হয় পাঁচটা বেজে গিয়েছে, তাই কর্মীরা চলেছে নিজের কার্যগার।

কিন্তু আমার মন? সে তো ওই কেবলই অসহায়ের মতন তার সেই ছবি-বেহটার চার পাশে ওনওনিরে কিয়ছে। ভাবছে—পরম আসরে বাক্য ধরে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম, সে এমনই করে কোঁড়ক

অহটা বড় বুঝে পড়লো আজ। অহকার করেছিলাম ওই দৃষ্ট প্রাণটিকে ধরে রাখার, লোভ হয়েছিল রং সরে, ঘুরে ফিরে সে দৃষ্ট দেখার। তাই বোধ হয় এমনই করে শিক্ষা হোল। কোন সাধনাই বেন খুঁজে পাচ্ছি না এই অনিচ্ছাকৃত নিষ্ঠুর দৃষ্টতির। মিঠে আলোর ঝিরঝিরে বাতাসে ভোরের বেলা যে হরের তার বেঁধেছিলাম তা এমনই করে ব্যথার মীড় টেনে ছিঁড়ে গেল কেন?

হার রে নিয়তি। আমিই শেষ করে মুছে দিলাম সেই করুণ স্মরণকে, বাক্যে প্রাণপণে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম তাকেই বিসর্জন দিলাম ব্যথার সমুদ্রে।

কিন্তু এও তো সেই অহকারের কথা। আমি কে? কী বা আমার কয়তা? মনে পড়লো সেই ইচ্ছা-সমর্পণের বাণী—“হুয়া হুবা কেশ হুদিস্তিতেন বখা নিযুক্তোহমি তখা কয়ামি।”

মনটা কখন চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। ওনওনানি বন্ধ করে স্থির স্তব্ধ হয়েছ। হঠাৎ সচেতন হয়ে দেখল আবছা হয়ে এসেছে জায়গাটা। বোমের সোনাটুকু কখন মুছে গিয়েছে আর সেই ছবিও আবছা অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছে। বাইরে বারান্দার খামে খামে শোনা বাজে পায়রার ডানা ঝটপট, ফিরে এসেছে ওরা ওদের নোড়ে, নিশ্চিন্ত আরাবের পক্ষাচারে। জানলার বাইরে আকাশের মেঘলা নীল রং আর সেই আমগাছটার ঘন কালো আভাস ধীরে ধীরে এক অপকণের রাজস্রবাবের দুয়ার উন্মুক্ত কয়ছে।

হারিয়ে রাখে কি সংসারের শত সহস্র লক্ষ প্রয়োজনের পাকে কেবা জীবনের মাঝখানে আজকের এই পাওয়া আনন্দটুকু আর তা হারানোর বেদনা? হয়তো বা ভুলেই বাব! ভুলে বাব? না, তা হয় না—

“অল্প মনে চলি পথে

তুলিনে কি ফুল, তুলিনে কি তারা?

তবুও তাহার

প্রাণের নিঃশ্বাসবায়ু করে স্রবস্থ

ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেব স্রব।”

জীবনের হৃদয় বন্ধুর চলার পথে ওই মনটা বখনই কাঁড়াল হয়ে উঠবে তখনই আজকের দিনটি যে অসুস্থতকর বেধে গেল তাই সেবে আবার নতুন আলো, নতুন আশা, নব উদীপনা। এই তুচ্ছ একটি মুহূর্ত বিবৃত হয়ে রইলো আমার জীবনে, অস্তরের অন্তরতম লোকের মণিকোঠার।

সায়াদিনের শত কাজ পড়ে রয়েছে। মনটাকে কিরিয়ে এনে উঠে পাড়ি এবার। সন্ধ্যার্পাথের শব্দ মিলিয়ে গেল, রেণটুকুও গেল প্রায়। স্নান দেখে আর ফিরে পাওয়া শান্ত আর্ষিট মন নিয়ে উঠলাম—আর নয়।

তবুও ঘরের বাইরে পা দিয়ে আবার তাকালাম সেই অলিখিত ঘণ্টনার দিকে—না, কিছুই আর দেখা বাজে না। না দেখা থাক, তবুও এ কথিকার স্মৃতিতে রইলো তার রঙীন স্বপ্ন। সে আছে,

## বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

দিদিমার ডাকে চমকে ওঠে সুমিতা। কত বেলা হয়েছে!

সোনালী রোদের ঝিলমিল ওর বকের পালকের মত শাদা বিছানার চাদরে।—বেন ওর নিকে চেয়ে কৌতূহলের হাসছে বাসন্তী প্রভাত।

—তোমার গীটারের মাঠার অনেককণ এসেছেন মিতা, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

দিদিমার মুখের পানে একবার সলজ্জ দৃষ্টিপাত করে; বলে সুমিতা,—এই যে, এখনি আসছি দিদিমা!

কাল রাতের স্বপ্নের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন দেখতে পায় না সে মুখমণ্ডলে!

মাঠার মশাইয়ের নির্দেশমত গীটারের বুক সুরের খেলা জাগায় সুমিতা, কিন্তু সে আজ বড় অসুমনা।

মাত্র এক দিনের ব্যবধানে! কিন্তু মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট ভূকম্পন ওর মনের সকল বস্তুগুলোকে ধরে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়ে গেছে! সে আজ নিজের সম্বন্ধে যেন বড় বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে।

হোটমাসী কই? সে তো এলো না আজ গীটার শিখতে?

কানে এলো দিদিমার কঠর-...জ, রুবি, রুবি! মাঠার মশাই কতকণ বসে থাকবেন?...—বেয়ারা, বেয়ারা,...জারে দিদিমণি কাঁহা!—কি? বাহার গিয়া?—এবারে তাঁর কঠরর সপ্তমে চড়লো,—বলি এই সাত সকালে কোথায় চরতে গেছেন তিনি? কিছু বলে গেছেন কি? ও! আমি যে একটা মাছধ বাড়ীতে আছি, সে কথা বুঝি আজকাল আর কারুর মনে থাকে না? বাড়ীতে দেখছি বেছটাগিতার বড় বইতে সুর করেছে!

অনিল চোখ রগড়াতে রগড়াতে হটনাস্থলে এসে পাড়িয়ে বললো,—কি হয়েছে মা? এত টোচাচ্ছে কেন?

—হয়েছে আমার মাথা আর হুতু! বলি দল বেঁধে সব আমার পেছনে লেগেছে কেন, বলতে পারো?

—তোমার হোট ডগিনী এই সাত সকালে গেলেন কোথায়?—কোন সঙ্গি রোজগার করতে?

—সঙ্গি রোজগার করা জ্ঞাত সহজ ব্যাপার নয় মা!—তবে, কাল রুবি একটা পানের টিউনানীর কথা বলছিলো,—আমার মনে হয়...হয়তো সেখানেই গেছে।

—এতও কপালে ছিলো? আমার পেটের মেয়ে করবে টিউনানী!—কেন আমি কি ভিকিরি? ওর বাপ কি কিছু রেখে বান দি? যে ওকে পেটের ভাত হোটাতে হবে টিউনানী করে?

সুমিতা গীটার খামিরে বলে,—মামা এই পর্যন্ত থাক মাঠার মশাই!

সে উঠে আসে বাইরের বাগানদার!

অনিল সহান্তে বলেছে তখন—জ্ঞাত রাগ করছো কেন মা? তুমিই তো কাল বললে; বাবা তেমন কিছু রেখে বান দি! কাজ করলে আজকালকার দিনে মোটেই মান খরচা হয় না। বার যেমন বিস্তে, সেইটুকু কাজে লাগিয়ে বাবলবী হবার চেষ্টা করলে পরিণামে একটা স্বপ্ন লাভ অবশ্যই হয়, আমিও তো ক'জারগার চাকরির দরখাস্ত করেছি, দেখো না, খুব শীগগির একটা বোপাড হয়ে যাবে। পরের পরসায় বড়মানুষী করার চেষ্টে, নিজের উপাধানের মূণ-ভাতের সম্মান অনেক বেশী মা!

এবারে মামা দেবীর চোখে জল আসে। দুক কণ্টে বললেন তিনি—কাল রাগের মাখার কখন কি বে বলেছি, সেইটেই সত্যি হল তোমাদের কাছে? আর এত কাল তোমাদের মুখের জন্তে যে রক্ত-মাংস জল করলাম, সে সব এতই মিথ্যে হয়ে গেছে যে কোনো কিছু করার আগে আমাদের একটা মতামত নেবারও প্রয়োজন মনে কর না তোমারা?

বেশ ভালো কথা—আমিও দেখে নেব, তোমাদের পৌড় কতখানি। অতই সোজা যদি হতো উপাধানের পথট, তাহলে দেশে বেকার বলে আর কোনো পদার্থ থাকতো না; লবাই রাতারাতি কাজের মাছধ হয়ে উঠতো!

ভুল বুঝা না মা! কাল রাগের মাখার সব কথা ফল আমাদের ভালোই করেছে, চোখ খুলে দিয়েছে মা! আমি কখনো দেখো, এর ফল ভালোই হবে।

আর শোনার বৈধী ছিলো না মায়ের; পদক্ষেপে বৈধী করলেন করে, নিজের ঘরে চলে গেলেন তিনি। রানিহুধ বলে সুমিতা, তোমরা সবাই মিলে কি আরস্ত করছো হোটামাসী? হোটামাসী নিয়ে তোকে আর মাথা বামাতে হবে না মিছু! তাহলে তুমি ভালো খবর দিতে পারি, আগে কি খাওয়াবি বল?

—কি খাবে তাই বলো? ডিমের চাউ চাউ, মোগলাই পরোটা? কমলার পুজি? রসগোলার মালাই; কান্দীরি হুগনী, লাহোরী বালুসাই, পাঞ্জাবী পায়েস। বলা আরো কিছু?

আর নয়, আর নয়, বাবা, খেতেই চেষ্টেছি, তা বলে কাঁদি তো যাচ্ছি না!

এই যে, মে। লগুন থেকে চিটি এসেছে তোর। একখানি সুদৃঢ় নীলাভ খাম সুমিতার হাতে দিলো অনিল।

চিঠিখানা নিতে গিয়ে হোটামাসীর মুখের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিপাত করে মিতা। দেখতে পায়, ওর চোখে, টোচের কাঁকে, চাপা হাসি খেলছে। নিটোল কপোল হুটি ওর পাকা টোমারের মত হুটুং বস্তুমণ্ডল হয়ে ওঠে, কানের পাশে বাড়ির ওপর, হুহু জ্বলন্ত জ্বলন্ত করে।

এর নাম কি পূলক শিহরণ? জেনে পায় না।

নিজের ঘরে, হুক-হুক বকে প্রবেশ করে সুমিতা। সোকার-কপার বসলো পাখাটা জ্বারে চালিয়ে দিয়ে। বাসখানি লেজা বাহ ফল। ওর পূলক ভাবে অবনত চোখ হুটি থেকে দেখে পলক পলক

‘স্বামী! ওহ দায়ীনা!’ তার চিঠি! গত রাত্রেই তো তার সারা মন-প্রাণ চাইছিলো সুস্বাদু, ওর আঁতরণ কি সেই সুস্বাদু সাগরপারে পৌঁছেছিলো? ওনতে পেরেছিলো সে? তাই পাঠিয়েছে। তার স্নেহমিত্র অন্তর্দ্বন্দ্বী?

সকল লে চিঠিখানি খাম থেকে বার করে পড়তে থাকে হুমিতা।

‘কি কহছে এখন মিতা? সর্বজন অবাধ্য মনটা ছুটে চলেছে জোয়ার পাশে। কিছুতেই যে তাকে পাঠ্যবিষয়ে নিবৃত্ত করতে পারছি না। ওনতে পাচ্ছি তোমার গীটারের স্বরমুচ্ছনা! তোমার গীটারের স্বর যেন ছড়ানো এখানকার আকাশে-বাতাসে।

অন্যো পরিজন আর অন্যান্য পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে বেশি হর বেশ কিছু দিন সময় লাগবে।

মন খারাপ করে থেকে না লস্কীটি! দিদিমা, মাসী, মাঝা, তুমি বিজ্ঞ—সব ভালো তো? তোমার খরগোশ আর পাখীগুলো? নিরাপদে আছে তো?

শরীর আমার ভালোই আছে, আমার জন্তে তুমি কিছুমাত্র জেবো না।

টেলিগ্রামে পৌঁছোনো খবর, কাকা নিশ্চয়ই জানিয়েছেন তোমাদের? তারপর নিজেকে একটু স্থিতি করে নিয়ে, তোমাকে আরও থাকে চিঠি লিখতে বসেছি। বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা। কত-কত বার লুকিয়ে চোখের জল ঝাঁচলে মুছেছো মিতা? না রশ্মী, মনকে হির করে, মাজ তিনটে বছরের ব্যবধান, আর পর সারা জীবন থাকবো তোমার পাশে—আর একটা দিনও ত্যাগ করবো না তোমাকে ছেড়ে।

খুব ভালোভাবেই জবাব চাই কিছু। তোমার হাতের স্পর্শ-লাগা আমার কাছে। এ-বে এই সুস্বাদু সাগর-পারে, আত্মপরিজনহীন দেশে, আমার কলহের সাধনা। তাই তার জন্তে চলেবে আমার আতুল অন্তর। আমার অন্তরীন স্নেহ-অবরূপ পাঠ্যলম্ব মিতা।

ইতি—দায়ীনা

—কি যে মিতা, ওখানো বসে আছিস, কলহ নেই তোর? তার চিঠি যে? হৃদয়ভিরে ঘরে প্রবেশ করে করবী। বুধে-চোখে স্নানির ছাঁপ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

—স্বামী, মা-নে—দায়ীনা’র চিঠি। কেমন ভড়িরে বার হুমিতার ঘরের ভাষা। আঁবিরে হোপ লাগে গালে।

—ও, তাই বুঝি! তাই তোকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে, খুশীর আলোর কলহল করছে বুখানা।

—জা, একটু আছে! দিদিমা ওনতে পাবেন যে! তার পর করবীর গলাটা এক হাতে ভড়িরে ঘরে বলে হুমিতা—আমার ওপর রাগ করো তো ছোট মাসী? কিন্তু কিবাস করে, তোমাকে কেনে বেড়াতে বাবায় ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিলো না। তবে আমার বাবু—

ওকে বাধা দিয়ে বলে করবী—দূর পাগলী, রাগ করবো কেন? আমি কি তোর বডিগার্ড নাকি যে যখন বোঝানো বাবী, সঙ্গে সঙ্গে আঁবাকেও চোঁড়োতে হবে? খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে করবী, হুমিতাও বেশি করে ওষ হাসিতে।

—খুশি এসবের বাসে কি, জানতে চাই আমি। দিদিমার ওজনমীর তরুণের চমকে ওঠে ওরা হ’জন। বেঁধাতির আঁকালের

মত, খরখরে অন্ধকার বুধে ওদের সামনে আঁবিকূর্তা হলেন মায়ার দেবী।

—কি জানতে চাইছে মা? আমার টিউসানীর কথা? আগে কিছু ঠিক ছিলো না, তাই বলিনি। আজই সকালে পেলাম চাকরীটা কি না। জীহুর্গা মিলের প্রোব্রাইটার ধনপতি ক্ষেত্রীর মেয়েকে বাংলা গান শেখাতে হবে। গীটারও শিখবে। কাল কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আজ গিয়েছিলোম সেখানে। এসেছে আরো অনেকে, তবে আমার বরাতেরই লেগে গেলা চাকরীটা। মাইনে ভালোই, এখন একশো করে দেবে, পরে বোগ্যতা বুকে বাড়াবে।

—বাঃ, চমৎকার! বাতালী ছেড়ে এবার তুঁড়িঙালা মাদোয়ারীর দরজার ধর্গা দাওগে, লজ্জা হলো না ও-কথা আমার শোনাতে? সমাজে আর বুধ দেখাবার পথ রাখলে না আমার! এতও ছিলো এ শোড়া বরাত! চোখে জাঁকাল চাপা দেন মায়ার দেবী।

—তুল করছো মা! বুধ লুকিয়ে রাখবার মত কোনো ব্যাপার ঘটেনি এতে। শিক্ষাদান করার কাজে, লজ্জার চেয়ে গৌরবের মাত্রাই বেশী, এই আমার ধারণা। আর বোড়ো পাতার মত এলোমেলো জীবন বাপন করার মাঝেই বা আছে কোন সার্থকতা? তবু কাজের মধ্যে থাকলে জীবনের একটা পথনির্দেশ পাওয়া যায়। কথা বলতে বলতে এগিয়ে বার করবী মায়ের নিকে। হ’ হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ঘরে বলে—তুমি খুব ভালো মনে আমার সম্মতি দাও মা গো! তা না হলে আমার কিছুই হবে না। তোমার দুঃখ দিতে আমি পারবো না, তবে একটা বাসনা জেগেছিলো মনে, সুযোগও মিললো কিছু তোমার মত না গেলে সব পণ হয়ে বাবে।

—না, বাধা আমি আর কাউকে দেবো না। সকলকারই ভালো-মন্দ বোঝবার ব্যেস হরছে, যে বার পথ বেছে নেবার শক্তিরও অভাব নেই, তখন আমি কেন মাথপথে বাধার সৃষ্টি করি? করবীর হাত হাড়িয়ে অবসর পদক্ষেপে ককু তাগ করলেন তিনি।

খোলা চিঠিখানি হাতে নিয়ে নিশ্চল ভাবে বসেছিলো হুমিতা। মনে এলোমেলো প্রশ্ন। ছোট মাসী চাকরী করবে? কেন? রাতারাতি সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে। কেমন সব এলোমেলো। বিষয়ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে, তুমি হঠাৎ চাকরী করতে গেলে কেন ছোট মাসী? আর দিদিমাও যেন আজ বড় বেশী উত্তেজিত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। আমার মনে হয়, এমন কোনো ক্রটি আমার নিক থেকে ঘটছে, বার জন্তে এই সব গোলমালের সৃষ্টি হচ্ছে। আমার বক্ত ধারণা লাগছে ছোট মাসী; তুমি আমাকে খুলে বলো কারণটা।

—আরে না, না, একেবারে কিছুটা ঘটেনি। জীবনটা বড় একঘেরে লাগছিলো, হয় দিনরাত বাড়ীতে বসে থাকা, নয় বাইরে হৈ-হুজোড় করা, লেখাপড়ার তো বলাই নেই। কত দিন আর ভালো লাগে এ-সব? তাই একটা নতুন জীবনের স্বাদ গ্রহণ করবার চেষ্টার আছি, এই হলো ব্যাপার। আর মায়ের কথা? বত দিন না তাঁর এই রূপী বিহবী কনিষ্ঠা স্মারীর জন্তে কোনো এক রাক্ষুসে প্রথমমাত্রা নিয়ে না আসবেন, ঠিক তত দিন ওঁর মেলাজও অমনি হাই টেম্পার হয়ে থাকবে। তাই তো বলি, আমাকে হুকুম দাও না, তোমার পৌর-পলেশ ছোট আমাইকে তার গর্ভ থেকে চুনের খুঁটি ধা

দিক্ছি : সেবি ঠর পেলাদি কস্তর মালা বলন হয় কি না। দুজনই হেসে উঠলো। বাক বাজে কথা। হ্যাঁ রে, সন্ধ্যা কি লিখেছে ? ভালো আছে তো ? জবাব দরবী।

—পড়েই দেখো না, সন্ধ্যা হাসি হেসে সন্ধ্যার চিঠিটা কবরীর হাতে কেনে দিয়ে ছুটে পালায় সন্ধ্যা।

ধনপতি ফেরির বাড়িতে বায় করবী গান শোনাতে। সন্ধ্যা বায় অলকাপুরীতে নৃত্য-গীতের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে। আর অনিল বায় ধনপতি ফেরির ঠুঙিতে। ফেরির নতুন বই বসন্তসেনাতে নায়কের পাট শোনেছে সে, নাথিক। শুকতার। একেবারে প্রথমেই নায়কের "ভূমিকাটি অবশ্য অলকাপুরীর মাসীমার স্থাপনশে পেয়েছে অনিল।

—ওর ইটালিয়ান টাইপের মুখাকৃতি আর চটপটে চলন, বলন, অল্প সময়ের মধ্যেই মাসীমার অন্তরকে জয় করে নিতে সমর্থ হয়েছিলো।

মাসীমার স্নানকরে পড়লে সে ছেলেমেয়ের উন্নতির পথ, কুমুমাস্তীর্ণ এ রকম একটা জনরব আছে। শুকতার, আরো কয়েকটি অভিজাত ঘরের ছেলেমেয়ে এর অলঙ্কারমাণ। অনিলের বেলারও সে প্রবাদ

বাফটি নিফল হয়নি। মাস তিনেক ধরে সন্ধ্যারও শিকার পরিমাণে চলেছে মাসীমার হাতে।

—নাচের পঠন আছে তোমার, শিকারও কিছু আছে, তবে বড় সেকলে ধরণ। ভাণ-ব্যক্তনাইনি। নাচের ভালের সঙ্গে চাই অবদান ইলিত। পারের ছন্দে করুণার কৃষ্টিয়ে ফুলতে হবে অন্তরের আবেদন। তবেই সেই নাচ হবে উচ্চস্তরের আর্ট।

অলকাপুরীর সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে সন্ধ্যাকে পাশে বসিয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন মাসীমা। নিবিড়চিত্তে মূল্যবান শিকারগুলো গ্রহণ করেছিলো সন্ধ্যা।

ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে বিভিন্ন আলপনা। কুমুমাস্তীর্ণ নানা রং-এর বেশী-বিলান্তি পুষ্পগুচ্ছ। অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমার কটো-তার মাঝে মাঝে। আরো অনেক শিকারীর ভিত্তি সে কক্ষে। নাচের সহজ শব্দ হলো অর্কষ্টার সঙ্গে।

শুকতারার বসন্তসেনার বিশেষ নৃত্যকলা প্রথমে অবগত হলো। বসন্তসেনার সঙ্গে নাচের অংশ গ্রহণ করলো, সর্বাঙ্গব্যবহারী আরো পনেরোটি মেয়ে। চোখধাঁধানো নিগুন লাইটের তলায়, হাফা রং-এর নাইলনের হুস্ত শাড়ী, জরির কাঁচলি, পাভলা ডকনা, আর ফুলের অলঙ্কারে সজ্জিতা বসন্তসেনা আর তার সখীদের নৃত্যের ছন্দে ছন্দে প্রবাহিত হলো বিভিন্ন শাস্ত্রভঙ্গ।

— কিন্তু —

কিছুটা বিয়েস করিয়া কতকটা সস্তা মূল্যে বিক্রয় করা জাহাজ—এক কোর জিরিষ বিয়ল। কতকটা সময়ে এইরূপ আপাতমরোহর, কতকটা বিকৃত সস্তা জিরিষেরই বাজারে প্রাচুর্য দেখা যায়। আমাদের চিত্তাকর্ষক কলারিপুণ্যের উচ্চ আদর্শকে এই আপাতমরোহরের মোহ হাতে কোর সমরে আচ্ছন্ন না করে, তৎপ্রতি সতর্ক চুটি রাখিবার দৃঢ় সম্বন্ধ আমাদের আছে।

সত্যিকারের ভাল জিরিষের সমাদরের কোরদির অভাব ঘটে না। তাই আমাদের নির্ধিত অলঙ্কার সমূহের সৌষ্টব সাধনে এই আদর্শই আমরা অনুসরণ করি।

এস, সরকার এণ্ড কোং



একবদ

অলঙ্কার চিত্রকলা  
এলোরার ভাস্কর্য  
আগ্রার ভাস্কর্য  
আর  
এস, সরকারের  
গহনা—

এস, সরকার এণ্ড কোং

ফোন-৩৪-৩১৪০, প্রুজেন-কুমারী মণিকার, গ্রাম-গিনিয়াট

১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২  
২০৮, রাসবিহারী এডিনিউ-কলিকাতা-১২

বিষয়-বিশুদ্ধ চিত্ত গুণের পানে জেবেছিলো সুমিতা ! আঙুলে  
তার হৃৎ স্পর্শিত লক্ষ্য করে, গর্জের হাসি হাসছিলেন মাসীমা ।

চুপি চুপি বললেন ওকে—এদের চেরেও অপূর্ণ করে গড়ে তুলবে  
তোমার মিতা ! গানের গলাটিও তোমার ভারি মিষ্টি, তবে উচ্চারণ  
চাই আরেকটু বিশুদ্ধ, আর ছোট ছোট পিটকিরিগুলো আরেকটু স্পষ্ট  
আর শ্রুতলা হওয়া চাই ।

খুব ঈগগির তৈরী হতে হবে তোমার । খানিক আগে তোমার  
সঙ্গে ধীর পরিচয় করিয়ে দিলাম ? ঐ যে, বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার  
হয়ে কিরেছে অনিলকুমার ? ওর বাড়ীতে হবে একটা বড় রকমের  
পার্টি !

অভিজাত সমাজের গণ্যমান্ত পুরুষ আর মহিলারা আসবেন  
সেখানে । সেদিন ওখানে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার ভার মিসেস  
বাহু আমায় ওপরেই দিয়েছেন কি না, তোমার নাচ হবে সেদিনের  
প্রোড্রামের প্রধান আকর্ষণ ।

কেমন বেন রোমান্স লাগে মাসীমার কথায়, সুমিতার অন্তরে !  
পাখানের বৃকে বেন লাগে এদের দোলা । সলজ্জ হাসি ফুটে  
ওঠে ওর সোলাপ পাণ্ডির মতো ওষ্ঠপ্রান্তে । খঞ্জন পাখীর মত  
সুন্দর প্রাণ হুটি পলকাবেশে নত হয়ে আসে !

সোলাপ হুটি খায় সে সৌন্দর্য্যবাহা সেহন করছিলো অসীম  
হালকার । মাসীমা মাঝে দু'চার দিন এসেছেন সুমিতার  
সঙ্গে, তবে প্রত্যাহ আসা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে । অভাব  
হিসেবের সব দায়িত্ব তো একা তাঁকেই বহন করতে হয় ।  
সমাজে অসীমকেই রাজ্য সন্মার সুমিতার সঙ্গে আসতে হয় ।  
আজ কয়েকটি বিশেষ ধরণের নৃত্যের মহড়া হবে শুনে এসেছেন  
সুমিতা । ঈগগিরী ও মাননীরা অতিথিদের সঙ্গে নির্দিষ্ট আসন  
জুড়ে করে, গল্প জমিয়েছেন মিসেস বাহুর সঙ্গে । মন কিছু  
চলছে মনে হলে না । অল্পশোনার কাঁটাগুলো যন্ত্রণা দিচ্ছে  
হৃদয়ের মাঝে । মেরেদের উন্নত শিক্ষালাভের কি চমৎকার  
জরুরী ! হুতীয়া মেয়েটা এসব ছেড়ে গেলে কি না গানের  
মাসীমারী করতে ? যদি আসতো এখানে হলপ করে বলতে  
পারতেন তিনি, সুশাস্ত্র একটি নিশ্চয়ই বোগাড় হতো এখানে ।

আহা, কি সব চাঁদের টুকরোর মত ছেলের মল খোরাকেরা করছে  
এখানে ! ওদের হালচাল দেখলে যে কেউ মায়াবী করতে পারবে  
যে এরা সব পাঁচ, দশ হাজারী মাসিক আয় করণেওলা যবের ছেলে ।

কি দুর্ভাগিণী না হয়েছিলো সেদিন তাঁর ; মেয়েকে করলেন  
অবধা তিরস্কার । সেই কৃতকর্মের ফলস্রোত করা ছাড়া উপায় কি  
এখন ?

হাক, ছেলেটা তবু একটা হিরোর পার্টই পেরেছে । উজ্জ্বল  
কবচে জ্বালা কথা !

হালচলছে তিনি দেখতে লাগলেন, সুসজ্জিত হালক্যালানের  
একখানি বাড়ী, অসীমের মত প্রকাণ্ড একখানা সাধা বৃক গাড়ী ।  
বাক্যে কয়েক লক্ষ টাকা ! ব্যস, এর বেশী আর কিছু চান  
না তিনি ।

কত লোক আসছে তাঁর বাড়ীতে, ছেলের গর্জনপ্রার্থী হয়ে,  
কিন্তু সেখা তারা পায় না, অত সহজে কি আর সেখা  
সেলে ? সময় কোথা তার ? বড় বড় বিল কোম্পানীর সঙ্গে

চলেছে কনট্রাক্ট । দিন-রাত এ ইন্ডিও থেকে ও ইন্ডিওতে  
ছুটোছুটি । নাওয়া খাওয়ার সময় পায় না বাছা । তার পর  
নিজের ইন্ডিও, নিজের কোম্পানী অসম্ভব নয় । ব্যাখার ক্ষতটার  
ওপর সাহসনার প্রলেপ দেন মাসীমা দেবী ।

চলল পায়ে এগিয়ে চলেছে সময়ের হুহুর্ভঙলো । কেটে গেছে  
আরো কয়েকটি মাস ।

সুমিতার সমস্ত সত্তাগুলো ভেঙে-চূরে, নতুন হাঁচে ঢেলে গঠন  
করতে লেগেছেন অলকাপুরীর মাসীমা ।

সে আর আগেকার ভীক, লাজনন্দী, স্বল্পভাবিণী সুমিতা নয় ;—  
তার অন্তরে বেন শতাব্দীর নিম্নার জড়তা কাটির জেগে উঠেছে এক  
প্রাণচকলা নারী !

শুধু একাদেশীর অসম্পূর্ণ চকলা আজ হান্তে, লাতে, চকলতার,  
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রে বিকাশিতা হয়েছে !

সুখাম ছিলো জীবনে তার ধীর, স্থির, পঙ্কিল, কামনাহীন,  
শেতকমলধরুণ । সেবতার চরণে উৎসাহীকৃত পবিত্র নির্দ্বালাধরুণ !  
তার নিজস্ব সঙ্গ মনে আনে আধ্যাত্মিক ভাবের সুস্থ অমৃভূতি—  
নিব্য পরম !

জাগে না নারীর চকলাতা । সোনার কাঠির স্পর্শে নারীর  
কামনাময় ঈশ্বরগুলোকে সে বেন করে দেয় নিম্নাত্তর ! শুধু জাগিয়ে  
রাখে এক অতি মানবীর সত্যকে, শুধু প্রেমের হোমানল-শিখাকে !

অসীম ঠিক তার বিপরীত ! সে বেন একটি দুর্বল বড় ;  
দাবানল ! বেন অলঙ্কার বিশ্ববিরসের প্রতীক ! সুমিতার মনে  
ছড়িয়ে দিয়েছে তপ্তলাভা । সৃষ্টি করেছে প্রবল স্খাঘাত । দুর্বল  
বাঁকুনি দিয়ে ভেঙে চূরমার করে দিয়েছে তার স্বপ্নসৌধখানি ।

তার মানবীর ব্যক্তিবৈবাহুনিবার আকর্ষণে সুমিতার জীবনে  
জেগে উঠেছে এক শাশ্বত কামনাময়ী নারী ! সে শুধু কল্পনার  
সৌন্দর্য্য পানে আর তৃপ্ত হয় না, সে এখন পরিপূর্ণ বাস্তববাদী !  
জন্যকে দেখবার, উপভোগ্য করবার জন্ত লাভ করেছে সে এক নতুন  
দৃষ্টিভঙ্গী ।

গুন্-গুন্ করে গানের কণি একটি ভাঁজতে ভাঁজতে সুমিতা টেনে  
নিয়ে বসলো তার চিঠির কাগজের অসুস্থ প্যাডখানি । স্ত্রলমের  
তৃতীয় চিঠিখানি এসেছে, দিন সাতেক হয়ে গেলো, ক'দিন  
নাড়ের বিহাসালে বড় ব্যস্ত থাকার জবাব লেখার সময় পায়নি !

আজ আর না লিখলেই নয় । আজ আর কোনো কাজ নয়  
শুধু-শুধু স্ত্রলমের উদ্দেশে ছড়িয়ে দেবে তার নতুন ভাবপূর্ণ অন্তরের  
আবেগভরা পুলকসীতি । পরম অল্পদাগ ভরে লিখতে শুরু করলো সে ।  
—‘মাসীমা’ !

এবারের চিঠিতে পাঠাচ্ছি কত নতুন খবর ! বহন তোমার  
অল্পদায়িত্বের বেননার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল মনটা—সেই সময়ে  
সেলায় মনের অবসন্নতা দূর করবার একটি চমৎকার উপায় ।

অলকাপুরীর নাম তুমি শুনেছো কি না জানি না, সেখানে  
নির্মিত নাট্যরঙ্গের সাধনার আত্মনিয়োগ করেছে !

এবারে কিছু পদ্যকীর্তি আর সেওয়া হ'ল না—কি জানি কে  
পড়ার মোটে মন বসে না ! রূপ করছো না তো ?

মাঝে মাঝে মনটা যে কত উত্তলা হয় তোমার জন্তে, সে যত্না তো লিখে জানাবার নয়।

কত দিন যে দেখিনি তোমার, তুমি তোমার কবিতা, আশ্রয় লাসে,—এত দিন তোমাকে ছুড়ে এখনও কেমন করে আমি বেঁচে আছি, লামীলা’।”

বাইরের বারান্দায় মৃ-মৃ জুতোর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো অসীমের অর্থৈর্ষ্য কণ্ঠস্বর।

—মিতা! প্রস্তুত আছো তো? সময় কিছু বেশী নেই।

অর্ধসমাপ্ত চিঠিখানি প্যাডের ভেতর লুকিয়ে ফেলে মিতা।

—এ কি এখানেও বলে আছো? দুটায় যে মিসেস বাহুর বাড়ীতে পাঠি! তোমার জন্তে অপেক্ষা করছেন মাসীমা! তুলে গেছো নাকি সব? মোটো দুটো দিন দেখা হয়নি, এতেই এত ভুল, না জানি হুঁমাস দেখা না হলে তুমি কি করবে? হয়তো চিন্তেই পারবে না!

আজ সারা দিন সন্ধ্যামের কথাই ভেবেছে সে। তার চিন্তা সত্যই ওকে ভুলিয়ে দিয়েছিলো অজ্ঞাত প্রয়োজনীয়। অপ্ৰায়জনীয় সব ব্যাপারকে! সে যে সস্ত্র করছিলো আজকের মনোমম সন্ধ্যাটি সন্ধ্যামের খাদ্যে ভরিয়ে দেবে—

—শরীরটা কেমন ভালো ঠেকছে না, আজকের প্রোগ্রামে আমাকে বাদ দেওয়া যায় না? যত্নস্বরে বলে মিতা।

—কি আশ্চর্য! তাই আবার হয় না কি? তুমি যে এখন অলকাপুরীর সেরা মেয়ে গো! আজকের প্রোগ্রামের লাইফ যে তুমি। শরীর খারাপ? ও-সব কিছু না—নাও ওঠো, ওঠো,—

—ওর হুই হাত চেপে ধরে অসীম, নিজের লোহার সীঁড়ালীর মত কঠিন হুই হাত। তারপর এক ঝাঁকুনি দিয়ে ওকে নামিয়ে পিঁড় করিয়ে দেয় মেঝের ওপর।

কেমন শির-শির করে স্মৃতির সর্বাঙ্গ। বিম্ব বিম্ব করে মাথাটা। সম্মোহিত বোবীর মত, ভীতিপূর্ণ বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি মেলে ঢেয়ে থাকে অসীমের শাপিত ছুরির কলার মত চক্চকে চোখের পানে।

—হাঃ! হাঃ! হাঃ! উল্লাসের হাসিতে সারা দেহটি কাঁপিয়ে বললো অসীম।—কি দেখছো অমন করে? বাও, তৈরী হয়ে নাও

বীগণির! তখনও হুই মনোর প্রবল বন্দ চলছে স্মৃতির অন্তরে। সভ্যতার পাশিণ করা, সামাজিক মন ওকে ডেকে নিয়ে চললো পাশের ঘরে বেশ পরিবর্তন করবার জন্তে।

—আর অন্তরের গভীর অন্তরে অবচেতন মনটা বেন হায়, হায়, করে উঠলো, কোন অজানা আশঙ্কার আবছায়া দর্শন কোরে। একটা নিগূঢ় বেমনার নিশ্চেষ্টে গুমরে কঁপে উঠলো সে।

ধানিক বাসেই বেশ পরিবর্তন করে কিরে এতটা স্মৃতি।

—ওয়াগার ফুল!!! কি অপূর্ণ মানিয়েছে তোমার লাল শাটীতে। এবার গলার আর হাতে পরো কিছু লাল অভরণ।

নত দৃষ্টিতে একটু চিন্তা করে বললো স্মৃতি—চূণির গহনার সেট। আমার দিদিমার সিলুকে আছে, তিনি এখন বাড়ী নেই, তবে লাল জেড পাথরের গয়না আছে, ওতে বহি চলে।

—আলবৎ চলেবে! বিধাতার প্রেষ্ঠ দান মনোহরকর রূপ তোমার—এর ওপর অতি সামান্য অভরণও অসামান্য হয়ে উঠবে।

আজ আর স্মৃতি লাল হয়ে ওঠে না, ক’মাস ধরে অবিরাম রূপের স্ততিবাণ শুনেছে সে, ওটা এখন সরে গেছে।

ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে লাল জেড পাথরের অতি জ্বর গহনার সেটটি বার করে পরলো সে।

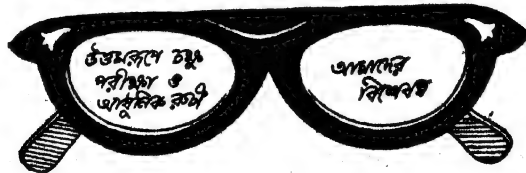
মধুর স্মৃতির মৃদু শিহরণ এক বলক পূবালী বাতাসের মত হেঁরা দিয়ে গেলো ওর সর্বাঙ্গে। বছর ছুরেক আগে ঐ অলসে লাল পাথরের গহনার সেটটি, দার্জিলিং থেকে এনে ওকে উপহার দিয়েছিলো স্বদাম।

—অলকাপুরীতে যখন ওরা পৌঁছালো, তখন হুই বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি।

—অর্থৈর্ষ্যভারে ছুটে এসে গাড়ীতে উঠে পড়েন মাসীমা।

ইস, এত লেট তোমাদের? সেখানে ঠেক সাঙ্গানো এতদো বাকি, শিল্পীরা কে এলো না এলো, আরো কত প্রয়োজন থাকতে পারে, সব গেলো এলোমেলো হয়ে। টাইমের হুকে পা ফেল চলেবার অভ্যাস করো তোমরা, তা না হলে আন্তর্জাতিক বিহু সমাজে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে অস্ববিধা ভোগ করবে।

[ক্রমশঃ]

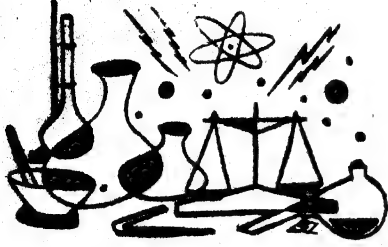


ক্যালকাটা অপাটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ

ফোন • ৩৫ - ১৭১৭ প্রতিষ্ঠাতা: ডাঃ কার্তিক চন্দ্র বসু প্রবর্ত  
গ্রাম - ক্যালকাতা • ৪৫নং আলবার্ট স্ট্রীট • কলিকাতা - ৯



# বিজ্ঞানবার্তা



পাক্ষর মিত্র

আবজ্ঞানার মূল্য বিষয়ে অনেক আলোচনাই আপনাদ্বারা

কেনেছেন। একজনের কাছে বা আবজ্ঞানা—আর একজনের

কাছে হয়তো তা নয়। আজকে যাকে আবজ্ঞানা গণ্য করে আমরা

কেনে দিচ্ছি, আগামী কাল তা থেকেই মানবসভ্যতার অগ্রগতির

সহায়ক কোন বস্তু আবিস্কার হতে পারে। যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানেই

ভ্রাতাদের বস্তু সমূহের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু অনাবশ্যক বস্তু

আবজ্ঞানাবসরপ জন্মে যায়, এদের অপসারণ অথবা উপযুক্ত ব্যবহারের

জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকেই বঞ্চিত চিন্তা করতে হয়। সহরের মধ্যে

একে কেনে দেওয়া যায় না, তাহলে নাগরিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হতে পারে

আর সহরের বাইরে পাঠানও এক বিরাট সমস্যা। পরমাণু শক্তি

ব্যবহারের-মুখে এই সমস্যা আরো প্রকট হয়ে উঠবে; তাই বিজ্ঞানী

মুহুরে খুবই চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। পরমাণু চুল্লী ব্যবহারের পর যে

তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানা পাওয়া যাবে তাকে কি করে অপসারণ করা

যাবে? এই আবজ্ঞানা সহরের মধ্যে রাখাও নিরাপদ নয় আবার

সহরের বাইরে ফেলাও বিপজ্জনক। এই আবজ্ঞানা থেকে সর্বদাই

মহাদায়ক রশ্মিসমূহ নির্গত হবে, যা জীব অথবা উদ্ভিদসমূহের পক্ষে

খুবই ক্ষতিকারক। এই আবজ্ঞানা নিয়ে মাত্রয় করবে কি?—

পৃথিবীর কোন অঙ্গলই একে পরিভ্রাণ্য করা নিরাপদ নয়।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা নানা পরামর্শ দিচ্ছেন।

কেউ বলছেন, একে ককট্রের এক বিরাট বাজের মধ্যে পুরে,

চারদিক বন্ধ করে সমুদ্রের গভীরতম অঞ্চলে ফেলে দেওয়া হোক,

কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন, না এতে খুব সুবিধা হবে না,—

দুর্ঘটনায় যদি কোন রকমে বাজ একবার ভেঙ্গে যায় তাহলে সমুদ্র

তেজস্ক্রিয় রশ্মির দ্বারা বিপন্ন হবে। তাহলে করা হবে কি?

এই সব বিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিচ্ছেন, তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানা সমূহকে

রকটে করে মহাপ্রান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। একবার যদি এজের

পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া যায় তাহলে

পৃথিবী এর দায়বদ্ধ হতে পারে। এরা মহাপ্রান্তে বর্ণেচ্ছতাবে ঘুরে

ঝেঁড়াক, পৃথিবীর মাছুবকে বিরক্ত না করলেই হোল।

বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার জন ককট্রফট এই বিষয়ে

অন্ত ভাবে চিন্তা করছেন। তাঁর চিন্তা, অজ্ঞান বহু আবজ্ঞানার মতো

পরমাণু চুল্লীর এই আবজ্ঞানাকেই বা কাজে লাগান যাবে না কেন?

শিল্পবিজ্ঞান ক্ষেত্রে এই আবজ্ঞানাকে উপযুক্ত কাজে লাগান গেলে

মানব-সভ্য বঞ্চিত উপভুক্ত হবে। বিজ্ঞানী ককট্রফট, বৈজ্ঞানিক

ব্রিটিশ কনফারেন্সে এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন।

সং ১৯৫১ সাল থেকেই আমেরিকার ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

পদার্থ-বিজ্ঞানীরা পরমাণু চুল্লীর তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানা সমূহকে কাজে

লাগাবার জন্য গবেষণা করছেন, ককট্রফটের বক্তৃতায় এই প্রণীত

গবেষণার গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বিজ্ঞানী

ককট্রফট জানান, এই তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানার ব্যবহারে প্রাকৃতিক শিল্পে

এক বিরাট পরিবর্তন আসবে; প্রাকৃতিক সূর্যের মধ্যে পলিইথিলিনের

চাহিদা পৃথিবীতে খুবই বেশী, এর দাম যাবে অনেক কম।

তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানা থেকে যে গ্যাসীয় শিল্প নির্গত হয় তার সহায়তার

ইথিলিনকে দলবদ্ধ করে অতি সহজেই পলিইথিলিন উৎপাদন করা

সম্ভব। স্যার জন ককট্রফট হিসাব করে দেখান যে, ইথিলিন থেকে

প্রায় এক টন পলিইথিলিন প্রস্তুত করার জন্য মাত্র ১০০ কুরী

তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োজন হয়। আগামী ৮ বছরে কেবলমাত্র ষোল

ক্রিটনেই প্রায় ২ টন তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানা জড় হবে; ২ টন

তেজস্ক্রিয় আবজ্ঞানা কোটি কোটি কুরী সরবরাহ করতে সক্ষম,

তাহলে চিন্তা করে দেখুন, এই শক্তি প্রাকৃতিক উৎপাদন শিল্পে কি বিরাট

পরিবর্তন আনতে পারবে!

কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শিল্পেই নয়, বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে,

তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহের উপস্থিতি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর এই রশ্মিসমূহের বিশেষ প্রভাব

আছে। বিদ্যুৎশক্তি ও আলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তন আনতে

পারে, তাই এর থেকে স্পষ্ট হয়েছে বিজ্ঞানের দু'টি প্রশংসা।

একটি ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি এবং অপরটি ফটোকেমিস্ট্রি। আজকের

দিনে তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব পরিলক্ষিত এবং তার ব্যবহারিক দিক

উন্মুক্ত হওয়ার, বিজ্ঞানের আর একটি নতুন প্রশংসার স্পষ্ট হয়েছ, —

তার নাম রেডিওকেমিস্ট্রি। এই বিভাগে নিত্য ঘটেছে নতুন

আবিষ্কার। বিজ্ঞানের এই বিভাগের সহায়তায়ই শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই

পরমাণু চুল্লীর ভিতর বাতাস থেকে সার প্রস্তুত করা হবে। বাতাসকে

চুকিয়ে দেওয়া হবে পরমাণু চুল্লী 'এটমিক পাইলের' মধ্যে, বিচ্ছুরিত

তেজস্ক্রিয় রশ্মি থেকে প্রাপ্ত অপব্যাপ্ত শক্তি, — রাসায়নিক শক্তিতে

পরিবর্তিত হয়ে বাতাসের নাইট্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের ঘটাতে

মিলন। পাওয়া যাবে নাইট্রিক অক্সাইড, এর থেকেই প্রস্তুত করা

হবে বিভিন্ন নাইট্রেট। এই 'নাইট্রেট সারে'র তেজস্ক্রিয়তা খুবই কম,

নিরাপদে জমিতে ব্যবহার করা চলে।

বাই হোক, আবার পরমাণু চুল্লীর আবজ্ঞানার ব্যবহারের কথা

কিছু আসা থাক। কেবলমাত্র শিল্পক্ষেত্রে নয়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রেও এর ব্যবহারের চোটা স্পষ্ট হয়েছে। সম্রাতি ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা

ক্যান্সারের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় রশ্মির উৎস হিসাবে পরমাণু চুল্লীর

আবজ্ঞানা ব্যবহার করে সফল পেরেছেন। ক্যান্সারল্যাভের উইগ্লেস

ওয়ার্ডার্স ব্যবহৃত পরমাণু চুল্লীর আবজ্ঞানা, লণ্ডনের রয়েল মার্শফিল্ড

হাসপাতালের চিকিৎসকেরা একটি বিশেষ ধরনের বস্ত্রে স্থাপন

করে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করছেন। অনেক

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীই আশা করেন, জরুর ভবিষ্যতে এই তেজস্ক্রিয়

আবজ্ঞানার সহায়তার দ্বারা খুব দ্রুত সারের সঙ্গে বৃদ্ধ করতে

পারবে।



পঞ্চম শিক্ষকে আবার কলম খাষাচ্ছিলেন। কিন্তু বাকী সেখান সময়েই কাগজগুলা দিয়ে পেল সকলবোনের খবর কাগজ। প্রথম পাঠ্য বড় বড় হেড লাইন—সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব কল্পনা করা যায় না। এই সাফল্য বিজ্ঞান সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে এক অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী। মানুষের বহু যুগের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার সার্থক রূপ। জানতাম, এই বৎসরই আমেরিকা এবং রাশিয়া মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টা করবে—কিন্তু তার সাফল্য সম্বন্ধে কেহই নিঃসন্দেহ ছিলেন না। আমেরিকার বিজ্ঞানী মহলের প্রচেষ্টার কিছু সন্বাদ আমরা প্যাঙ্কিলাম, কিন্তু রাশিয়া ছিলো একেবারেই নীরব। নীরব বিজ্ঞানীমহলই সর্বপ্রথম মহাশূন্য জয়ের দ্বারে আঘাত করলেন। বিস্তারিত সন্বাদ পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করবো, এবার কেবল সফল বিজ্ঞানী দলকে বিজ্ঞান সভ্যতার ইতিহাসে তাঁদের অতৃতপূর্ব কীর্তি স্থাপনের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

### কার্ল ফ্রেডারিক গাউস

সর্বকালের অন্ততম শ্রেষ্ঠ গণিতবিজ্ঞানী জোহান কার্ল ফ্রেডারিক গাউস ১৭৭৭ সালের ৩০শে এপ্রিল ব্রানসউইকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন অভ্যস্ত দরিদ্র শ্রমজীবী—সসারের আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তিনি অত্যন্ত কম বয়সেই গাউসকে বোজ্ঞাকারের জন্য কোন কর্মপ্রতিষ্ঠানে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গাউসের মা ছিলেন একেবারে অল্প প্রকৃতির মহিলা—তাঁর আশা, গাউস লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। প্রকৃতপক্ষে মার চেষ্টাই মাত্র সাত বছর বয়সে ছোট গাউস স্কুলে যোগদান করবার সুযোগ পান।

দশ বছর বয়সের সময় গাউস অঙ্কের ক্লাসে উঠলেন। অঙ্কের প্রথম দিনেই তিনি মাষ্টার মহাশয়কে একটি অঙ্ক করার মাধ্যমে চমৎকৃত করেছিলেন। ঘটনাটা তাহলে বলি শুধু, মাষ্টার মহাশয় এসে বেঠোঁ একটা বিরাট এরিথমেটিক্যাল প্রোগ্রেশনের অঙ্ক দিয়ে জাঁকিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন। হস্তসব আর কি, ছেলেরা চেষ্টা করুক আর তার মধ্যে আমি একটু জিরিয়ে নিই। বিরাট ঐ অঙ্কের পাঁচদার পড়ে ছেলেরা তো মাথা খাচরা হবার অবস্থা। হঠাৎ গাউস উঠে এসে প্রেটটা মাষ্টার মহাশয়ের টেবিলে রেখে তাঁকে বিরক্ত করলো! ব্যাপার কি?—মাষ্টার মহাশয় স্নেহ দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন।—প্রেটের উপর কেবল অঙ্কের উদ্ভটটা লেখা রয়েছে। শক্ত অঙ্কটা একেবারে মনে মনেই করেছে গাউস—কোন কিছুই সাহায্য না নিয়ে। মাষ্টার মহাশয় বুঝলেন, এ ছেলে সহজ ছেলে নয়; এর মধ্যে বিরাট প্রতিভা লুকিয়ে আছে। নিজের পরশার গাউসকে তিনি অঙ্কের বই আর খাতা কিনে দিলেন, প্রাথমিক গণিতের সীমানা পায় হতে গাউসের বেশী দিন লাগলো না। স্কুলের সমস্ত শিক্ষকেরাই গাউসের শিক্ষালভ করার এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। স্কুলের শিক্ষক বারটেলসের গণিতের প্রতি গভীর অধ্যয়ন ছিল—তিনি এবার গাউসের সঙ্গে একত্রে গণিতচর্চা করতে আরম্ভ করলেন। গণিত-বিজ্ঞানের চর্চায় গাউসের অসাধারণ

ক্ষমতার কথা ব্রানসউইকের ডিউকের কানে উঠলো, তিনি জ্ঞানী আর গভীর ব্যক্তির প্রতিভার একজন মন্তব্যদা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রতিভাশালী যালক গাউসের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা শুনে তিনি নিজে তার শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। মায়ের অল্পপ্রেরণা স্বল করে, ডিউকের শুভেচ্ছা ও কুপার গাউসের শিক্ষার্থী জীবন এগিয়ে চললো। ১৭৯২ সালে ম্যাটি কুলসন পাঠ করে তিনি ভর্তি হলেন কলেজে, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময় তিনি উচ্চ গাউসগণিত বিষয়ে মৌলিক গবেষণা শুরু করেন। ১৭৯৯ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে মেমট্রেট বিদ্যালয় থেকে তিনি গণিতবিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি লাভ করলেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সেই “Disquisitiones Arithmetical (Arithmetical Researches)” নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করে বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ ভাবে পরিচিত হলেন। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর ব্যাখ্যা—অনেক সমালোচকের মতে এই পুস্তকখানিই তাঁর গবেষণা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন।

ব্রানসউইকের ডিউক কার্ল উইলহেম ফার্ডিনান্ড এই বিজ্ঞানীর আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করার জন্য একটি ভাতার ব্যবস্থা করে দিলেন। গাউস এবার অ্যাস্ট্রোনমিসি, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক্স প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণায় মনোযোগ দিলেন, তখন কর্মক বিজ্ঞানী গ্রহাণুগুণের একটি ক্ষুদ্র অংশ আবিষ্কার করে তাকে নাম দিয়েছেন ‘সিরাস’। আবিষ্কারের মতে ‘সিরাস’ আর একটি গ্রহ। কিন্তু আবিষ্কারের পর্বেই সিরাস গেল হারিয়ে, তার কক্ষপথ নির্ণয় করতে না পারলে ‘সিরাস’কে আর পাওয়া যাবে না, কেবলমাত্র হিসাব করে এর কক্ষপথ নির্ণয় করা অতি কঠিন কাজ। গাউস একে সম্বল করলেন, অজস্র হিসাব-নিকাশ করে আবিষ্কার করলেন ‘সিরাসের’ কক্ষপথ। অবশেষে সিরাসকে গাউস-নির্দিষ্ট পথে পাওয়া গেল। বিজ্ঞানী গাউসের অবদান গণিত-বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে—গুরুত্ব বিজ্ঞানীমহলে তাঁকে প্রিন্স অব ম্যাথমেটিক্স আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

নেপোলিয়ন বধন জার্মানী আক্রমণ করেন, তখন গাউস ছিলেন গৌটিনজেন অবজারভেটরীর পরিচালক। গাউস রাজরোষে পড়লেন এক তাকে ২০০০ ফ্রাঙ্ক জরিমানা করা হলো। কবানী বিজ্ঞানী ল্যাপালাসের কুপায় তিনি এই বিপদ থেকে রক্ষা পান।

গাউস ১৯০৫ সালে এক সহপাঠিনীকে বিবাহ করেন, প্রথম পুত্রের পরলোক গমনের পর শিশু-সন্তানদের রক্ষাবেক্ষণের জন্য তাঁকে আবার বিবাহ করতে হয়। সাহিত্য ও ভাবার প্রতি তাঁর আগ্রহ অল্পবয়সে ছিল, অনেকগুলি ভাষা তিনি জানতেন, এমন কি এক সময় সঙ্কটও আরম্ভ করতে চেষ্টা শুরু করেছিলেন। প্রিন্স অফ ম্যাথমেটিক্স গাউস, জীবনে কতো যে সন্ধান লাভ করেছিলেন তাঁর শেষ নেই—সমগ্র দুনিয়ার গণিত-বিজ্ঞানীমহল তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করে গিয়েছিল। গণিত-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁকে আর্কিমিডিস এবং নিউটনের সঙ্গে এক আসন দেওয়া হয়। ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী পরলোক গমন করেন।

# খেলা খেলা

আই.এফ.এ শীস্তের খেলা এখনও শেষ হয়নি। এমন এক অবস্থার এসে ঝাড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত শীস্তের খেলা শেষ হবে কি না সে বিষয়ে বেশ সন্দেহ আছে।

এবারের শীস্তের ফাইনালে এক দিকে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব উঠেছে এবং অপর দিকে মহামেডান স্পোর্টিং ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব পেমিকাইনালে উঠে বসে আছে।

ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডান দলের খেলার নির্দিষ্ট দিন ঘাড়া হওয়া সম্ভবও খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি—তারও নানান কারণ আছে। এক দিকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করে তোলার জন্য সংগ্রাম—যার সেইজন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনার পুলিশ দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন না এবং বিনা পুলিশে কোন গুরুত্বপূর্ণ খেলা সম্ভব হবে না বলেই খেলা বন্ধ আছে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, আবার কলকাতা মাঠে খেলার দ্বারা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে আরম্ভ হয়েছে। এবারের শীস্তের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার মহামেডান স্পোর্টিং ও জর্জটেলিগ্রাফ দলের খেলার। কিন্তু এ অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দর্শক বা সমর্থকরা একটুও দায়ী নন। প্রথম এবং প্রধানরূপে দায়ী করা যায় রেকারীকে এবং তারপর কারেক জুন খেলোয়াড়কে।

ইতিপূর্বে কলকাতা মাঠের কুটিল নিয়মে নানান রকম উদ্ভ্রমণ ঘটনা ঘটে গেছে। দিনের আলোর দ্বাৰে তীব্র তত্ত্বনহ, পুলিশের সম্মুখে রেকারীকে প্রহার, সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন দেখে পুলিশকে কাঁড়নে গ্যাস ও লাঠি চালাতে হয়েছে। কিন্তু গত ১৪ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা সমস্ত ঘটনাকে তুলন করে দিয়ে কলকাতার ঘটনার কলঙ্কের মোটা কাপির রেখা টেনে দিয়েছে।

সেমিনের খেলার মাত্র মিনিট দু'-তিন বাকি এমন সময় খেলোয়াড়দের মধ্যে হাতাহাতি সংগ্রাম। মহামেডান দলের একজন খেলোয়াড় টেলিগ্রাফ দলের একজন খেলোয়াড়ের উপর অহেতুক আক্রমণ করেন, অপর দিকে অপর একজন টেলিগ্রাফ দলের খেলোয়াড় মহামেডান দলের খেলোয়াড়ের ব্যবহারের পাণ্ডা জবাব দেন। শেষ পর্যন্ত দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়। এ সময়ে রেকারী নিষ্কণ হয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি সাধারণ ফাউল করার জন্যে খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁর মত রেকারী এ সময়ে প্রথমে নিষ্কণ হয়েছিলেন। তারপর হাতাহাতি থেকে লাখালাখি পর্যন্ত পৌছবার সময় তিনি পুলিশ ডাকেন। ইতিপূর্বে মহামেডান ও হাওড়া ইউনিয়ন দলের খেলায় মহামেডান দলের একজন খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে কুসংহিত অজ্ঞান হয়ে অথচ রেকারী কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। অবশ্য এ ব্যাপারে আই.এফ.এ কর্তৃপক্ষ দোষী খেলোয়াড়কে দুদিনের জন্য 'সাসপেন্ড' করেছিলেন। রেকারীর নানান কুসংহিত এবং বহুবার অনেক খেলোয়াড়ই অনেক

আই.এফ.এ তথা সেই খেলোয়াড় যে ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত সেখান থেকে যেমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, তেমন রেকারীর তুলে খেলা পরিচালনার জন্য আই.এফ.এ কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, ইতিপূর্বে এমন অনেক ঘটনা ঘটে গেছে যার বিরুদ্ধে খুব গুরুতর শাস্তি অবলম্বন করা উচিত ছিল কিন্তু আই.এফ.এ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাই বলুন আর পক্ষপাতিত্বই বলুন, যার জন্যে তেমন কোন শাস্তি অবলম্বন করেন নি।

জর্জ টেলিগ্রাফ ও মহামেডান দলের খেলা দোষ-ত্রুটি নিয়ে জর্জ টেলিগ্রাফ দলের সম্পাদকের কাছ থেকে আই.এফ.এ কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদপত্র গ্রহণ করেন। তারপর, আধ ঘণ্টা সময় অতিক্রম হয়ে গেছে বলে আইনের দোহাই দেওয়া হয়েছে। আধ ঘণ্টা সময় অতিক্রম হওয়ার জন্যে টেলিগ্রাফ দলের সম্পাদক যে কারণ দেখিয়েছিলেন, তা আই.এফ.এ কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় নি। অথচ চ্যারিটি ম্যাচের খেলা অসম্মানিত ভাবে শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত সময় খেলানোর কোন নজির ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি। অথচ অতিরিক্ত সময় খেলার জন্যে টেলিগ্রাফ দলের বখেট আপত্তি ছিল। এখন প্রশ্ন হল, সত্যিই বুকে আইনের দোহাই পাড়া আর কত দিন চলেবে? আইন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত মনে করি।

বর্তমান পর্যন্ত কয়েকটি স্বার্থের অবদান না ঘটবে, তত দিন পর্যন্ত বাংলার খেলাধুলার কোন রকম উন্নতি আশা করা যায় না। অথচ দেশে 'স্পোর্টস বিল' পাশ হয়েছে কিন্তু তা এখনও কেন কার্যকরী হচ্ছে না, তার কোন সঠিক কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

## একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভি সোসাইটির ৩৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এবারে রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুরঙ্গ' নৃত্য-নাট্যটি অভিনয় করেছেন, ৫ প্রতি বছরেই এরা প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এরূপ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এবারে 'ঋতুরঙ্গ' দর্শকদের অধিক আনন্দ দিলে সঁতারের যে সমস্ত কৌশল বেহুলা, কালিরামদেব যে নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছিল, এবারে কিন্তু ঠিক ততটা পায়নি। তবে ঋতুরঙ্গের বড়ঋতুর বর্ণনা, প্রকৃতির বিচিত্রলীলা বাংলার শ্রেষ্ঠ কথক বীরেন্দ্রনাথ জন্মের দুখ থেকে ও রবীন্দ্র-সংগীতের মাধ্যমে যে কাব্যময় রূপটি সৃষ্ট উঠেছিল, তা সভ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। এদের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে আন্তরিক বক্তব্য জানাচ্ছি।

সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রসেবীদের কুটিল প্রতিযোগিতার 'প্রকৃ সনকর কাশের' কাইতাল খেলার 'জনসেবক' পত্রিকা 'স্বাধীনতা'কে ১— গোলে পরাজিত করেছে।

'ভডউইল মিশনে' আমেরিকান জিন জুন টেনিস খেলোয়া

পরের দিন ইন্ডিয়েনসন খেলা খেলেন। তাঁদের খেলার নৈশুশ্য আছে, মায়ের চটক আছে কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁরা ঠিক 'গুডউইল মিশনে' খেলার উপযুক্ত বলে মনে হয় না। তাঁরা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যে ক্রীড়ামোদী মাত্রই দুঃখিত। তাঁরা শিষ্টাচার মেনে চলেন নি।

### সাঁতার

আজাদ হিন্দ, বাগে সম্প্রতি অচ্যুতিত জাণানাল সুইমিং এসোসিয়েশনের তিন দিনব্যাপী সাঁতার প্রতিযোগিতার তিনটি বিঘে নতুন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া আরও সাত জন সাঁতার বাগার পুরানো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।

নতুন ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী ২০০ মিটার বুক-সাঁতারে পঞ্চদশবর্ষীয় ফুলছারি বেনু জালুকদার ২ মিঃ ৪৩'৪ সেঃ অতিক্রম করেছেন। ইতিপূর্বে সার্ভিস দলের সাঁতারক সামসের খাঁর রেকর্ড ছিল ৩মি ০'৪ সেঃ। মেয়েদের ১০০ মিটার টিন-সাঁতারে বোমাইয়ের ডলি নাজিরকে পরাজিত করেছেন সন্ধ্যা চন্দ্র। সময় ১মিঃ ৩০'৪ সেঃ। বুক-সাঁতারে ডলি নাজির তার পুরানো রেকর্ড ১মিঃ ৩৭'৬ সেঃ পরিবর্তে ১মিঃ ৩৭ সেঃ অতিক্রম করেছেন। পি. কে. ঠাকুরের ডাইভিং যেমন দর্শকদের আনন্দ দান করেন তেমনই ৮ বছরের বালক শ্রীকান্ত দত্ত সুলতান ডাইভিং দেখিয়ে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছে। জীমান কাতি জাণানাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সভা।

## রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

রক্তচক্ষু "STOP"

লালবাজার স্ট্রীট ও ডালহাউসি ইন্ড—

ঠিক মোড়েই এক কানা দৈত্য

তার এক চোখ রাঙিয়ে বলল—“থামো”।

অমনি খেয়ে গেল ট্রাম তার বৃকের বড়বড়ানি তুলে,

হিস হিস করে গর্জাতে লাগল ধাড়ী আর বাচ্চা বাস,

নীরবে ঝিমিয়ে পড়া রোগীর মতন প্রাইভেট কারগুলি

ছিন্ন হ'য়ে গেল।

তাদের বৃকে-বাড়ে-কোলে ছিল যে মাহুঘের জনতা

তারিও ছিন্ন হ'য়ে গেল পরম নিরুৎসাহ হ'য়ে—

হুলল না তাদের কানের হুল আর মাকড়ি,

ফাইল ফিতে আর পাগড়ি

ফাঁট আর শাড়ী, ধুতি আর পাঞ্জামা—

কেউ বার করল বই—কেউ বা চিঠি

যেন অনন্তকাল ধরে ঐ রক্তচক্ষু 'Stop'

তার চোখ রাঙিয়ে বলবে থামো।

আহা—বসি সত্যিই বলতে পারতো—“থামো,

চিরকাল এমন ভাবে ব'লো না

এমনি উচ্ছ্বাসে জীবনকে শিবে ফাইলের চাপে,

এমন করে চোখের ছাতি নিবিয়ে দিলো না

বৈদ্যুতিক বাতির কড়া আলোর তলে

চ'লো না এমন ক'রে বৃত্তির চাপে প্রবৃত্তিকে মেয়ে।”

কিন্তু ও তা বলবে না—ঐ একচোখো দৈত্য

মাথায় ওর সোহার টুপি—

ও কি ক'রে সেখবে উপরের নীলাকাশকে

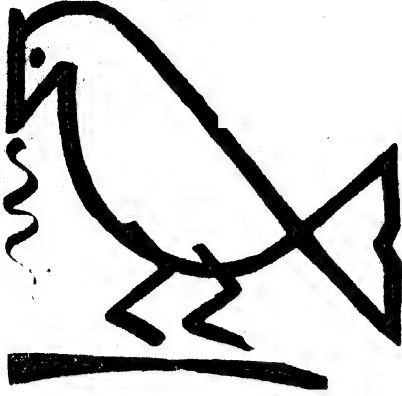
কি ক'রে সেখবে পিছন কিয়ে লালদীঘির জলে সুধাভের সোনাকে,

কি ক'রেই বা জনরে অন্ধকারে—কুকপকে—

বড়ি-বরের নিষিদ্ধ রাজের শাসন

সব সময় চোখ রাঙানো—“থামো”।

## ছোটদের আসর



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ব্যাংকাকাশিতে হুগারি হানির। অপরূপ তার শিল্প দেখালে দেখালে, দরজার অলিন্দে গবাকো। মনোরম উত্থান ফলের গাছে ফুলের গাছে আলো-ছায়ার। সেখানে এক সন্ধ্যা। শাঙ্কবি-পর্য শান্তিপূরে শ্রুতি-পর্য সন্ধ্যা। বললেন, জানো—কেবলি জানো। পৃথিবীতে জানবার জিনিষের অন্ত নেই।

মীরা তো জানতেই চায়। ব'লে গেল তাঁর সামনে।

জানো গ্যালিলিও প্রথম আবিষ্কার করেন পৃথিবীর চারি পাশে পৃথিবী আর অস্ত্র গ্রহের ঘূর্ণন। পণ্ডিতরা পুরোহিতরা প্রতিবাদ করলো। এমন অশাস্ত্রীয় মিথ্যে কথা বলতে আছে নাকি! যোমের বিচারসভার গ্যালিলিওকে বীকার করতে হল পৃথিবী ঘুরছে না। যেমন একজন ছুগোল শিক্ষক বলেছিলেন—পৃথিবী ঘোরে না। ঘুরলে তোরা আবার বাড়ে পড়ন্তিসু, আমি তোদের বাড়ে পড়ন্তুর। ফুল ইলস্পেট্টর বাইরে পীড়িরে ওনছিল্লা। বললে—পৃথিবী ঘোরে না? এ সব কি শেবাচ্ছেন? পৃথিবী ঘোরে না?

বাটার বললে, ঘোরে। দশ টাকার ঘোরে না। মাইনে দাসে দশ টাকা, তাতে পৃথিবী ঘোরানোর কথা দেখানো যায় না। দশ টাকার চুপকামের ইরিজি whitewash হয় না limewash হয়।

তার মাইনে বাড়লো।

গ্যালিলিও পিসা শহরে একটা বোলানো বাতির সোলানি লক্ষ্য

করছিলেন। নিজের নাড়, গতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন এখিকে কতক্ষণ থাকে, ওখিকে কতক্ষণ থাকে। ভাইনে যতটা ওঠে, বাঁয়ে ততটা ওঠে। এই থেকে আবিষ্কার হল যড়ির পেতুলাম। সময়কে বাঁধ হল। গ্যালিলিও যখন মারা মেলেন তখন আর একটি বৈজ্ঞানিকের জন্ম হল, আপেল পড়া দেখে যিনি ভাবতে বসেছিলেন, আপেল আকাশে উড়লো না, পাশে গেল না, মাটিতে পড়লো কেন? বেরোল—মাধ্যাকর্ষণ। সেই নিউটন এত অন্তমনস্ক ছিলেন, যে এক ভ্রমলোককে নেমস্তম্ভ করে খাওয়ানোর কথা ভুলেই গেলেন। সে লোকটা অপেক্ষা করে করে বেগে নিজের পাওয়াতো খেলেই, নিউটনের ডিশও শেষ করলো। নিউটন খাবার ঘরে এসে বললেন, আমি জেবেছিলুম এখনো খাইনি। ডিশ দেখে মনে পড়লো আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

কী মজার লোক! মীরা বলে।

আরো জানো—ক্রাফ্টিস বেকন খুব উঁচু ধরণের লেখক ছিলেন। তাঁর পদসংখ্যাটা এত বেশী ছিলো যে, তিনি নাটক লিখতেন নিজের নামে নয়—কারণ সে যুগে নাটক লেখাটা হালকা ধরণের কাজ ব'লে লোকে মনে করত। লোকে বলে, সেই সব নাটক সেক্সপীয়ারের নামে চ'লে গেছে। যে কোনো দিনই লেখাপড়া শিখলো না, থিয়েটারের ঘোড়ার সহিস হয়ে কাটালো, সেই সেক্সপীয়ার কখনো এমন পণ্ডিতী ভাষা শিখতে পারে?

আরো জানো ফ্যারাডে ইলেক্ট্রিক লাইট আবিষ্কার করলেন, তাঁর সহকারী হামক্ৰি ডেভি করলাখনির আলো বার করে হলেন 'স্মার'। আর ইটালীর গ্যালভানি যে তার বার করলেন তার নাম গালভানাইজড।

আরো জানো—পৃথিবীর সব চেয়ে বিখ্যাত ছবি হচ্ছে মোনা লিসা। এঁকেছেন লিওনার্দো ড ভিন্সি। একটি রূপসী মেয়ের মুখে চাপা হাসি। সে রকমটি আজো অবধি কেউ ফোটাতে পারলো না। যে মেয়েটি এই ছবির মডেল হয়েছিলো—সে একজন অফিসারের কুতীর পক্ষের স্ত্রী। অনেকক্ষণ থাকতে হত বলে একদল লোক তাকে বাজনা শোনাতো, তবে ছবি আঁকা হত, যে ছবি অমর।

তুমু জেসেই ষাও, কত কি ভাববার। সেই সব কথা আবার অন্তরের জানাও। জান বাড়ুক।

আচ্ছা, লোকে আপনাকে ঠাকুর বলে কেন? আপনি ত মরণশীল বাঁচব? মীরা প্রশ্ন করে।

ব'লে তাদের তৃপ্তি হয়, তাই বলে।

যেমন থোকাকে থোকান বলে মায়ের আনন্দ। আমাকে বাবুস বললেও আমি চটব না, যেমন থোকাকে ভূত বললেও সে চটে না। মনটা রাখতে হবে হুনিয়ার থোকনের মতন।

দিনে একবার তুমি স্থির হয়ে কোথাও বসবে। একবার তাঁকে ডাকবে ষাকে তুমি ভগবান মনে করো—তিনি কৃষ্ণই হোন, রামকৃষ্ণই হোন। মনে বল পাবে। যদি কোনো পরমা বাঁচতে

# রত্নবেদী

তাই কাজে কিংবা কোনো দুঃখীর কাজে লাগবে। এর নাম ইষ্টবৃত্তি। এ বৃত্তিতে তোমার মঙ্গল হবে।

স্বামনগরের রাজার বাড়ী সাধারণকে দেখতে দেওয়া হয়। কেন হয়? হয় এইজন্তে যে বাড়ী দেখতেও লোকে এ পারে আসবে। নৌকোওলা কিছু পাবে, এ মিকের জিনিসপত্র বিক্রি হবে, ঠাকুরসেবা পুরসা পাবে, নইলে এ ব্যাসকাশীতে লোকে আসবে কেন? বয়োদায় রাজপ্রাসাদও খোঁসা হয় সাধারণের কাছে। নইলে কি দুঃখে লোকে বরোদার মতন জায়গায় নাওবে? সব কাজেই একটা উদ্দেশ্য থাকে। বিনা উদ্দেশ্যে ভগবানও কিছু করেন না। তিনিও তাঁর দৃষ্টিক বুদ্ধিময় মঙ্গলময় দেখতে চান। যদি শিশুর মতন তাঁর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারো, তাইলে তুমি যা চাও তাই পাবে।

সে তো ভাবতেই পারি না।

সন্ন্যাসী হাসলেন। বসলেন, খালি তোমার জানবার চেষ্টা করতে হবে, পৃথিবীতে এত জিনিস জানবার আছে, এক জীবনে জেনে শেষ করা যায় না।

আপনি তো কত জানেন!

জানতে জানতে জানোয়ার হ'য়ে গেছি।

সন্ন্যাসী বলে চলেন—খালি পড়ে যাও, যেখানে যা পড়বার পাবে ছাড়বে না। হঠাৎ তোমার চোখে কোনো প্রবন্ধ বা অমণকাহিনী বা উপন্যাস এমন পড়ে যাবে যা শেষ ক'রে তোমার মনে হবে, এটা যদি না পড়তে পেতে, তোমার জীবন বুধা হ'য়ে যেত। পাবে অনেক জ্ঞান, অশেষ উৎসাহ, অনেক সাধনা, অনেক প্রেরণা। বিশেষ ক'রে বড়ো বড়ো লোকের কাহিনী পড়লে অনেক শিক্ষা পাবে। যেমন ধরো—উমেশচন্দ্র বল্লভাধ্যায়ের কথা। বিস্ময় গিয়ে তিনি ব্যারিষ্টার হ'য়েছিলেন ব'লে পৈত্রিক বাড়ী তাঁকে ছাড়তে হয়েছিলো। সাহেবপাড়ায় তিনি বাসা নিয়েছিলেন। আর হয়েছিলেন মস্ত বড়ো ব্যারিষ্টার। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি তিনি। তখন তিনি উমেশচন্দ্র নন, ডব্লিউ সি যানার্জী কিন্তু মাঘের কাছে উমেশ। বোজ মণিকতলা স্ট্রীটে জুড়িগাড়ী চড়ে তিনি আসতেন, তখন মোটর আসেনি এদেশে। সেই গাড়ী দূরে রেখে পায়ে হেঁটে নিজের বাড়ীর দরজায় এসে ডাকতেন 'মা'। মা সদরে এসে দাঁড়ালে তিনি প্রণাম করতেন। মা বলেন, তোর গাড়ী র'য়েছে, পায়ে হেঁটে আসিস কেন বাবা? ছেলে বলে, তোমার সামনে আসব গাড়ী ঠাকিয়ে চাল দেখিয়ে? যাচ্ছে তো আমার একটাই মাথা! অত সাহস হবে কি ক'রে? সেই বাস্তার নাম এখন তাঁর নামে। কিন্তু ক'জন মনে রাখে সেই কৃত্তী মাতুলজ্ঞ ছেলের কথা? ক'জন মনেতে চায়?

মীরার গুনে গুনে ক্লান্তি আসে না। আরো তন্তুতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সজের লোকেরা তাড়া দেয়। তাদের সকলের এসব কথা পোনার আগ্রহ নেই। বোঝে কথা বলেই মনে করে সব। তারা ভাবে, জেনে কি হবে? জেনে কিছু লাভ আছে?

স্বরমা সেদিন বাড়িছিলো এক বড়োলোকের বাড়ীতে সেলাই দেখাতে। মীরা এসে পড়লো। ওকেও সঙ্গে নিলো। চৌখাবার চৌখুরীদের বাড়ী। কি প্রকাণ্ড বাড়ী! কি সাহেবী কারাগার!

বেকসাহেব নর, ননদরা মেসসাহেব। তারা ইংরেজীতে আর হিন্দীতে কথা বলে। বাংলা বলে না। ডুরে কাপড়পরা বোটি ব্লাউস বিভিন্ন 'কাট' শিকতে লাগলো। আর এমিক এমিক চেয়ে নিজের ডুরের কথা বলতে লাগলো। বাড়ীর বড়ো ছেলের বো ও, কিন্তু তার অস্থব হলো কেউ দেখে না। বোঝে কটি আর বেগুনভাড়া খায়। তাই কত দিন ওর ননদরা খেয়ে বসে থাকে। ওকে উপাস করে থাকতে হয়। মীরা ভাবে এর নাম বড়োলোক! এর নাম এত টাকা! বাড়ীর প্রথম বো যেখানে এত কষ্ট পাচ্ছে সেখানে শান্তকী ননদ মেসসাহেবী করে বেড়ায় কি করে? বাহুব এতোই অমাল্লব হয়?

ননদরা এলো। তাদের কথা কি মিটি! মীরাকে জড়িয়ে ধরে বললে—ই কোন্ হৈ? কিংবা লাভলি। মুখটা ভারী মিটি তো! কি থানা দিতে পারি তোমার বোলা।

কিছু খাব না মীরা বলে।

কেনো? সাহেববাড়ীর থানা বলে ভর হোচ্ছে?

মীরার ইচ্ছে হল বলে, এবু চেয়ে বড়ো সাহেববাড়ী আমি দেখে এসেছি। সে কলকাতার সাহেববাড়ী, এ তো হাজার হলেও কাশীর সাহেববাড়ী, যেখানে সাহেবিয়ানা বোনান। ভালো হোটেল নেই, ভালো জাব নেই—খুবে কিছু কিছু বলে না। গেরো মেয়ে সেক্ষেই চুপ করে বসে থাকে।

চৌখাবার এই প্রকাণ্ড বাড়ী, তার চারদ্বারে প্রকাণ্ড বাগান, এখানে কাশী শহরের আরতির বটামনি আসে কিন্তু ধূপধূনার গন্ধ আসে না। এত বড়ো ভাণ্ডে এ প্রাসাদ বেন বোনান! স্বাধীন ভারত এ লোকডোলা বেন বোনান!

বাধা সেদিন এক নতুন কথা বললো—আমরা দু'শো বছরের পরাবীন নই, পরাবীন অনেক আগে থেকে। হিন্দুজাতির যদি এক হয়ে থাকতে পারত, তাহলে হিন্দুস্থান তাদেরই থাকত, বারা এখানকার আদিম অধিবাসী। কবি বলেছেন—

সে ভাব থাকিত যদি,

পার হ'য়ে সিদ্ধনদী

আসিত কি পারিত বন?

তুর্কী, মোগল, পার্শান বাইরের লোক। এদেশে বতহিন তারা রাজত্ব করেছে, ভারতীরেবা—বাদের নাম মুসলমানবাই মিরেছিলো 'হিন্দু' তারা প্রজাই ছিল। সিরাজুদ্দৌলার আমল পর্যন্ত প্রজাই ছিল, রাজা নর। স্রুতগা সিরাজুদ্দৌলার রাজত্ব বাঙার নাম বাংলার স্বাধীনতা বাঙার নর। বাঙালী ঐতিহাসিক বাঙালী নাট্যকাররা কি করে এমন বাজে কথা লিখতে পারলো শুধে অবাক হতে হয়। শিবরা, রাজপুত্ররা, বারাগিরা, বাঙালীরা বিব্রোহ করেছে কাদের বিরুদ্ধে? গুরুগোবিন্দ সিং, বাজীরাও, প্রতাপসিংহা বে পরাবীনতা থেকে বৃত্তির জন্তে লড়াই করেছিলেন, তাকে অস্বীকার করব কি করে? আমাদের মাতৃভাষাকে প্রজা করতে শিখিয়ে গেছে—ইংরেজ বার্ষম্যান, ইংরেজ কেরী। ইংরেজের আমলেই উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী পৃথিবী-বিখ্যাত লোকদের জন্ম হয়েছে; যা কোনো শতাব্দীতে হয়নি। মুসলমান আমলে তো নয়ই। ইংরেজ আমলের শিখিরে গেছে কথার স্বাম, স্তবলারে সপ্তম্ভা, পঞ্চম্ভকে প্রজা, মেয়েদের লম্বাম। ইংরেজ দেখিয়ে

বজ্র থাকতে হয়, কি ভাবে জীবন ভোগ করতে হয়। ইয়েজের গুণ আমরা কিছুই নিলাম না, শুধু গালাগালিই নিলাম। বিবেকানন্দ বার বার বলে গেছেন—ইয়েজের ভালোটা নে। ওদের কাছে অনেক শেখবার আছে। এক একজন ইয়েজ প্রায় দেবতাদের কাছাকাছি।

তোমার ভক্তির আতিশয্য বে দেখছি বাবা দা'!

ভক্তি হবে না? আমার কাকা হাইকোর্টের রেজিষ্টার কলেট সাহেবের গল্প করেন। বিয়ে থা করেন নি। নিশেখ দান করেন। কে কোথায় গরীব কেরাণী আছে, চুপি চুপি এসে পাঁড়ালেই হ'ল। কুড়ি পঞ্চাশ একশো। কাকা একবার কি মামলার সেরী হ'তে কলেট সাহেবকে কড়া চিঠি লিখেছিলেন। তারপর একদিন নিজের দরকারে কাছে বেতে কলেট সাহেব সব ভুলে গিয়ে কাকার উপকার করলেন। পারবে কোন বাঙালী এ কাজ করতে? ধারণার আনতে পারবে? ইয়েজ আমলে কলেট সাহেব 'জরহিন্দ' শুনে কুত্রিম রাগ দেখাতেন। নিজেই বাবার সময়ে বলে গেলেন 'জরহিন্দ'। কত লোক যে তাঁর কাছে উপকৃত হয়েছিলো বলবার নয়। কিন্তু চলে বাবার সময়ে তারাই দেখা অবধি করলো না। তিনি মনে করতেন, সমস্ত অকসে তাঁর ছেলেরা কাজ করছে। কেউ কণ্ঠাঙ্করের সঙ্গে মারামারি ক'রে ট্রাম ডিশপায় আটকে আছে, খবর পেয়ে তিনি নিজের মোটরে গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। অথচ সামান্য একজন কেরাণী সে। এর নাম ইয়েজ। একজন সাধারণ ইয়েজের সমান সাধারণ ভারতবাসী নয়—অসাধারণ ধারী, তাঁরাই। ইয়েজের সাহস, ইয়েজের সত্যতা—নেতাজীর, শ্রীঅরবিন্দের, তিলকের, দাদাভাই নৌরজীর। মহামানব বিভাসাগরের, বিবেকানন্দের, রবীন্দ্রনাথের। সাধারণ কোনো লোকের মধ্যে ইয়েজের গুণ দেখতে পাবে না। ইয়েজ এত বড়ো।

সেই ইয়েজ দেশের ছেলেরের জেলে দিয়েছে, কীসীকাঠে লটকেছে।

জা পেরেছে এ দেশী গোরেন্দা এ দেশী পুলিশের জন্তে। তারা যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করত, করতে পারত কোনো সাহেব তাদের কোনো দিন? এ দেশী গোরেন্দা, এ দেশী পুলিশ শুধু নেতাজীর বাগ্মীর সময়ে জেনেও চূপ ক'রেছিলো, তাই ইয়েজ পারলো না তাঁর পথ আটকাতে। ইয়েজ রাজ্যের দেশী পুলিশ সেই প্রথম ভালো কাজ করেছে। কতকটা বিবেকের তাড়নার, কতকটা প্রাণের ভয়ে। সেদিনকার সি আই ডি-রা স্বাধীনতা সেরী ক'রে দিয়েছিলো। নেতাজী বাবের বলতেন, ইয়েজের সুখের।

দেশ জো স্বাধীন হবে গেছে বাবা দা, এখন তোমার কি কাজ?

আমরা স্লাম বাংলা মাদের দারল ছেলে। কবিতার বাবের বলা হয়—দুর্দ্বন্দ্ব দুর্দ্বন্দ্ব। কবি বলেছেন—

দুর্দ্বন্দ্বেরে রক্ষা করো,

দুর্দ্বন্দ্বেরে হানো—

আমরা সেই দেশের।

আমরা শিকার সম্পূর্ণ হয়, সাহসে অটুট থাকব। আমাদের কাজ বিপত্তির হাতে। কখন কোথায় আমাদের দরকার হয়, কে জানে? মোট আর বৈকল্যের শাস্তির ময়ূর সর্পকর্তার মূর্ত আছে—সেই বধন শান্ত। অশান্তি বধন আসবে তখন কালীমা—

নিরে পাঁড়াতে হবে। তখন শিবাজীর ভাগোরা বাগ্মী—সাঁপ পাতাকা—হয় হয় মহাভেদ। রাজপুত্রের আজ কি কোনো স পাঁড়ার ব্যর্থ, হলুদীঘাটের বুদ্ধ মেবার পাহাড়ের বুদ্ধ ব্যাধ করছে। কান্দীর, বোধপুর, বিকানীর খেঁক ব্যাধ কারবার করতে আ হাওড়ার পোলের এপার খেঁক কলকাতার তিন ভাগ আকাশ—হেঁ বাঙীতে ছেয়ে ফেললে—তারো মাড়োয়ারী। রাজপুতানার রাজ কই? রাজস্থানের কাহিনী যে ইয়েজ টড লিখে গেল, সে-সব কারবারেই চাপা পড়বে? পাঞ্জাবীদের মধ্যে শেখ লাল লজপত ব তাঁর পর কারা? হয় ট্যান্ডিগো নয় বড় চাকুরে দামোদর ভ্যাণি কারখানার। সাহস বীরত্ব মারামারি জাগিয়ে রেখেছে বাঙা আমি উত্তর-পশ্চিমের সেই বাঙালী, এখানে লাঠি না চালালে খ বায় না। কালই বেহারী গরলা আর মুহলমান তাঁতীদের ছ' হুখো বগড়া করতে হয়েছে লাঠি চালিয়ে, এখানকার জনক বাঙালীর। আমাদেরই জিত হয়েছে। কারণ আমরা এই বায় বার আঙড়াই—

আমি ভয় করব না ভয় করব না।

হু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।

তরীখানা বাইতে গেলে

মাঝে মাঝে ঢুকান মেলে,

তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে

কারাকাটি বরব না।

ওরা এসব কবির বাগ্মী জানে না। ওরা শোনেনি—

এ হুত্যাগ দেশ হ'তে হে মঙ্গলমর,

দূর ক'রে দাও তুমি সর্গ ছ'ছ ভয়।

আমাদের মতন পদে পদে আর কেউ বলতে পারে না—তো ইচ্ছা হউক পূর্ণ মঙ্গলমর বামী।

বাখার দিকে ছেয়ে ছেয়ে নীরার প্রভা জাগে। এই ছিগছিগে ঢেহাঙ্গা, মনে হয় এক চড়ে কাং হয়ে বাবে, কিং সাহস মনে?

আর কী লাঠি চালানোর কৌশল। দেখেছে সে—বিদ্যুতের লাঠি চলে গর হাতে।

আর ছুরি একটা আছে, বোতাম টিপে দিলে পেটের মধ্যে ঢে চলে যায় এদিক থেকে ওদিক। ঐ ছুরিতে নাকি কত বলা লোক খুন হয়েছে।

নীচ থাকেন মহারাজ। পরবর্তি বছর বরসে আড়াইঘণি তাঁজেন। তিনি বললেন—বীরবাদী, আপ, হিন্দী কেও বোলজী হ্যার?

বাধা জবাব দিলে, হিন্দী কি আবার একটা ভাষা?

মহারাজ বলেন, সে কি বাবুজী, সুরদাস, তলসীদাস, বীর কবীরের ভাষা, ভাষা নয়?

এইটে আপনার ভুল ধারণা মহারাজ! সুরদাসের গান ব্রজ ভাষার, বীরবাদীরের রাজস্থানীতে, তুলসীদাসের কোশলী অবোধীতে, আর কশাউরের ছেলে কবীরের গান খিচুড়ি ভাষা মিরাজি চণ্ডি ভাষা, অম্বুলি আর অবোধী মিশিয়ে। কোনটা হিন্দী বলা যায় না। হিন্দী একে গৌরব করবার কিছু ও

হিন্দী শিপতে হল, আসে লিলডেন তুল দিতে হবে। বাঁধা হল পুন্ডিল, সড়ক হল দ্রীলিল, কাগজ পুন্ডিল, কিতাব দ্রীলিল, পুন্ডিল, দাড়ি, গৌক দ্রীলিল। অতুত! আসল হিন্দী আসল বালায় মতন—বালা দেশকা হুন্দর তাঁয়া ব্রশ কবনেমে হুন্দর পুন্ডিকিত হোতা হায়। শান্তিনিকেতনকা আন্তকুন্ডমে কবীজ রবীন্দ্রনাথকা সভাবিবেশন শরদীয় হো রহা।

মহাহাজ হাসতে থাকেন।

এতই জানবার আছে পৃথিবীতে। মীরার মনে হয়।

সৈনিক ওয়া এলাহাবাদ গেল, তোরে মোটরে চড়ে। কাশীর বিখ্যাত ল্যাণ্ডা আমারে বাগান, সবুজ দুখে চোখ ভরে যায়। বাঁধা বললে, সবুজের দিকে নীলের দিকে বতই চরে থাকবে—চোখ ভালো থাকবে।

মনে পড়লো মীরার নীল সবুজের দিকে চরে তার বৃষ্টি তাই জত ভালো লাগত।

আর প্রভাতের প্রথম কিরণ আলুট্টাভায়োলেটে ভর্তি, শরীরের পক্ষে উপকারী। সকালের সোনালী রোদ নির্দেহ নীল আকাশে ভেসে বাওয়া। সাদা মেঘ—বেখানে বাস খামচে সেখানে বনে বনে পাখীর, ডাক, চড়া গ্র্যাণ্ডট্রাক বোড পীচ ঢালা চক্কে—কী হুন্দর লাগে সব ভুলে শুধু চরে থাকতে!

লাল সাদা অনেকগুলো বকবকে ব্রীজ পার হ'য়ে এলাহাবাদ শহর ছাড়িয়ে গিয়ে প্রয়াগ ঘাট—নৌকার ক'রে অনেকটা গিয়ে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম—নীল জল সাদা জল মিশ খাচ্ছে না, দুটো নদীর মারধান অঞ্চল ডুব-জল নেই—চারিধারে ধু ধু করছে চড়া মাখমেলা-কুড়মেলা বসে, পুরানো দুর্গ অক্ষর বট, হু হু হাওয়া।

পূণ্য হয় না ব'লে স্বাস্থ্যের উপকার হয় বললে কে আস্ত এখানে? এই মাইলের পর মাইল বিজুত নদী আর নদীর চরে আসত কি হাজার হাজার বাতী? এমন অপূর্ণ দৃষ্টের মহিমা যে বোঝে, সেও আসত না। জানত না।

কোন প্রাচীন কাল থেকে দেশের মূল-মুখিরা মানুষকে কোঁশলে ভালো ভালো জায়গার টেনে আরবার ফলী করেছেন।

আর সাধারণ মানুষ বাড়ীভাগ জমিভাগ নিয়ে দলাদলি মারামারি করেছে এই ভেবে যে চিরদিন তায় থাকবে। কোথায় চলে গেছে সব, কার জমি কে ভোগ করছে, কার বাড়ী কবে ভেঙে গেছে, কিন্তু মানুষের হিসাবকুটিল হাসি আর চক্কাট বশপব্দার ভেসে এসেছে, শান্তি নেই, কোথাও শান্তি নেই।

দেশ থেকে দেশে এই ছুটে বেড়ানোর মধ্যে ভগবানের যে ইচ্ছিত, ছোটো মোটোর তাই ঘরবার ঠোঁট দেখে হুটুই নেমতা হযত মিটি মিটি হাসেন। একদিন ঝড়ের রাতে সবুজের তীরে বাকে তিনি পৃথিবীতে এনেছেন তার ভবিষ্যৎ ভেবে।

তাই অল্পকট উৎসবের ওর উৎসাহের সীমা নেই। ভিড়? হোকগে ভিড়। ও বাবেই। স্বেচ্ছাসেবকা হিমসিম খেয়ে বাচ্ছে, পাওয়ার ঘেসে উঠছে, মেয়ে-পুরুষ কে কোথায় ছিটকে পাড়ছে, এই সিঁড়িতে ওঠে, আবার নীচে নামে—ডাইনে বাও, বাঁয়ে ফেরা, বিধনাথের রাজবেশ কী হুন্দর চোখ ছুটি! অল্পপূর্ণি মিঠাইয়ের মন্দির খেয়ে খেয়ে সাজানো, সোজলার জালের মধ্যে সোনার বিবট দৃষ্টি, আর কিছের না।

এসেছে মেয়েকে দেখতে? তোমার মেয়ের জাত নেই। শশাঙ্কের শিবকে বিয়ে করেছে ব'লে কেউ তার হাতে খাবে না। ভূমি লুকিয়ে থাকে। মা এসে দেখলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে তাঁর বাবা। বাড়ীতে বাবে না? না মা জোর তো জাত নেই। কেউ তো হাতে খায় না শুনেছি।

এই কথা? মহাদেবকে বললেন—বর্ষের সেবতাসের নেমন্তন্ন করে, আমি ভাত খাওয়াব। নেমন্তন্ন করে কে তেত্রিশকাটি সেবতাকে? নারদ পায়ে তার তেঁকির এরোগেনে চ'ড়ে। কথার বলে 'নারদের নেমন্তন্ন।' ত্রিভুবন এসে হাজির।, সবাই হুঁপু ক'রে অন্ন নিলে, শেবটা নারদও ব'লে গেল।

হিমালয় বেরিয়ে এসে বললে, তবে না কি আমার মেয়ের জাত নেই?

অল্পকট, অল্পের পাহাড়, হ'য়ে গেছে অল্পকাট হুখে হুখে। সাদা ভারতবর্ষ এসে হাজির বারানসীতে। ভিড় দেখে সেবতারা স'রে পাড়ছেন।

টেলিগ্রাম এলো কলকাতা থেকে—এবার তোমার আসতে হ'বে, নইলে টাকা পাঠানো বন্ধ হবে।

হুটু আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিলো খাঁচার পাখী। আবার গিয়ে বেনিশাক্কে বন্দী হবে?

যেতে হবে সেই অশ্রদ্ধা অবজার মধ্যে? অল্পপূর্ণি কাশীতে নিত্য উৎসব ফেসে রেখে মেকী সভাতার কলকাতার? বেখানে রাঘব প্রাণ খুলে সত্যি কথা বলে না? সেধানকার সোকেয়া ভাবে—

কাল হল কলি।

কলির মতন চলি।

বাঁধা বললে, যেতে বসন লিখেছে, ভক্ষন যেতে হবে। হাল-চাল দেখে এসো গুধানকার। নইলে তেঁমার পথ আবি ঠিক ক'রে রেখেছি।

পড়ে থাকবে মালবীরা ব্রীজের নীচে উত্তমসহিনী গঙ্গা, ঘাটের পর ঘাট, মন্দিরের পর মন্দির, মালবীজীর জিবিভালার, টাঙ্গা আর এক্সার টুনটুন, কেরিওয়ালিনীদের মিঠি কথা—কুল, কল, ধূপ, চন্দন হর হর ঘোম ঘোম?

মীরা ভাবে, আমরা বলতে পারি না, লোককা লোকম ভাষির মনের কথা টেনে আনেন তাঁদের কলমের মুখে—পশ্চিমের আকাশ সোনার সোনার ভরা, তার নীচে মন্দিরর কোরল, রিকসের মিলিয়ে আসা আলোর মিলিয়ে বাচ্ছে, নীল পক্ষ রূপের মতন দেখায়, ট্রেনের কামরার আলো জলে—চোখের আঁড়ালে চ'লে যায় কাশী, আসে মোগলসরাইয়ের মঠ, আসে অন্ধকার, আবার আলো—ঐশ্বর্য—কাশীর খেলনা কিনে কেরিওয়ালার প্র্যাকটিক ভ'রে—মন কেমন করে—ভীষণ মন কেমন করে। কোনো কাহণীর জন্তে যে মানুষের মন কেমন করে, কে তা জানত? কাঁধির পিপিলা কলেন—করে।

কাশীর সান্নি পুতুলগুলো তিনি ব্রীজ থেকে গঙ্গায় ফেসে দিয়ে এসেছেন। কাশীর ঘাট নিয়ে যেতে নেই, সোয়া চুরি করা হয়।

[কবিতা]



## ডাকঘরের ইতিবৃত্ত

ক্রীষ্ণাণ্ডকুমার গুপ্ত

আজ তোমরা দুয়ের বছর সঙ্গে অনায়াসে আলাপ করতে পারো।

চিঠিপত্রের সাহায্যে, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন এই সহজ কাজটি ছিল পরম দুঃসাধ্য। আদিম যুগে—মাহুঘ যখন চিঠিপত্র লিখতে শেখেনি, তখন অপরকে কোন সাহায্য দিতে হলে এমন কোন বস্তু পাঠাতে হত যার সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত হতে পারে। বহু শতাব্দী অভিজ্ঞত হবার পরও এই প্রতীক (symbols) ব্যবহারের রীতি মাহুঘ ছাড়তে পারেনি। কিন্তু সভ্যতার ক্রমান্বিতের সঙ্গে সে এই প্রতীক খোঁসাই করতে শিখলে পাথর, কাঠ ও হাড়ের উপর। আরও কিছুকাল গত হলে সে বস্তুর সাহায্যে এই প্রতীক আঁকতে শুরু করলে পশুর চামড়া, গাছের ছাল ও পাতার উপর। এ থেকে সৃষ্টি হল চিত্রলিখনের—বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে মাহুঘের মনের বিভিন্ন কামনা ও অনুভূতি অভিব্যক্ত হতে লাগল।

পত্রলিখনের পদ্ধতি যদিও আবিস্কৃত হয় খৃষ্টের জন্মের বহু শত বৎসর পূর্বে, তবু একথা ঠিকই যে, খৃষ্টপূর্ব বর্ষ শতাব্দীর পূর্বে পত্র প্রেরণের কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা কল্পিত হয়নি। পত্র প্রেরণের প্রয়োজন হলে কুতোয় সাহায্য নেওয়া হত আর বাকের কুতোয় অভাব ভাবের পক্ষে বহুবাক্যের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গভীর ছিল না। খৃষ্টপূর্ব বর্ষ শতাব্দীতে পারস্যেরাই সর্বপ্রথম ডাকের প্রবর্তন করে। পত্র লেখা হত মাটি, পাথর বা কোন বাতুর উপর, আর এই পত্র পাঠানো হত অথারোহী কর্মচারীর সাহায্যে। এর জন্মে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ষাঁটি ছিল আর প্রত্যেক ষাঁটিতেই অথারোহী থাকত মোতায়ন।

ঐতিহাসিকরা বলেন, ব্যাবিলনেও এই ধরণের ডাকের ব্যবস্থা ছিল খৃষ্টপূর্ব ৫৮০ অব্দে। কিন্তু উভয় দেশেই ডাক ব্যবস্থার হত কেবলমাত্র সরকারী কাজে। এর পর অনেক কাল ডাক-ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। তবে যে সব অঞ্চলে ঘোড়ার পিঠে বাতায়ানত করা অসম্ভব সেখানে ঘোড়ার পরিবর্তে উটের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। ডাক ব্যবস্থার উন্নয়নসাধ্য উন্নতি ঘটে রোমান সম্রাটদের আমলে। সম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে যোগাযোগ দৃঢ় করার জন্য রাজ-কর্মচারীরা ডাকের উৎকর্ষ সাধনে মনোবাসী হন। পাঁচমৈক বা প্যাপিরাসে লেখা চিঠিপত্র সম্রাজ্যের সর্বত্র বাস্তবায়ক পায়রা, বোড়া ও জাহাজের সাহায্যে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ডাকের এই সুবিধা ছিল জনসাধারণের অনবিগম্য, তাদের তখনও নির্ভর করতে হত কীকদাস বা দুয়ের বাড়ী পর্যটকের উপর।

এর পর ডাকের উন্নতির চেষ্টা করেন ক্রিস্টের সম্রাট শাল্মেন। রোমান সম্রাটদের মত তিনিও—বাড়সওয়ার নিযুক্ত করেন ডাক বহনের জন্য।

মধ্যযুগে ইয়োরোপের নানা দেশে ডাকের প্রচলন হয় বটে, কিন্তু ক্রম হ্রাস আর কোন দেশেই জনসাধারণ এই ডাক ব্যবহার করতে পারত না। ক্রমশে ডাক সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু ডাকে চিঠি পাঠানো ছিল এক ব্যয়সাধ্য যে অবিস্থাণ্ড লোকই এই ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারত না।

১৬শ শতাব্দীতে ইয়োরোপের প্রায় সকল দেশেই ডাকের

প্রবর্তন হয় আর এই সময় জনসাধারণও ডাক ব্যবহারের সুযোগ পায়। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয় এবং ডাকঘরও প্রতিষ্ঠিত হয় নানান স্থানে। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফ্রান্সে চিঠি রেজিষ্টারী করার রীতি প্রচলিত হয় এবং ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে এক আত্মনাস্থগিক ডাকের প্রতিষ্ঠা হয় প্যারিসে। শহরের প্রধান প্রধান স্থানে ডাকবাংল রাখার ব্যবস্থা হয় এবং ডাকটিকিটও প্রচলিত হয়।

ডাক ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জন করে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে যখন লন্ডনে পেনি পোস্টের প্রচলন হয়। পেনি বার, অল্প মাত্রে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা হওয়ায় লোকের চিঠি লেখার আগ্রহ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, সমগ্র ইংলণ্ডের ডাকঘরগুলিতে বত কর্মচারী ছিল তার চাইতেও বেশী কর্মচারী নিযুক্ত করতে হয় কেবলমাত্র লন্ডনের ডাকঘরে। ডাকের এই জনপ্রিয়তার ফলে কিছুকাল পরেই ডাকের কর্তৃত্ব গভর্ণমেন্টের অধীনে চলে যায়।

কিন্তু ডাকের সুব্যবস্থা হলেও সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাকের গতি ছিল অতি মৃদু, খটায় চার মাইলের বেশী তার বাবার শক্তি ছিল না। কাজেই ডাকের গতি বৃদ্ধি করার জন্য শেখা অথারোহী বাস্তবায়ক নিযুক্ত হয় আর এই ব্যবস্থার ফলে ডাকের সমাদর উত্তরোত্তর বাড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে হেঁজকোটের প্রবর্তনের সঙ্গে ডাকের গতি অনেকটা বাড়ল বটে, কিন্তু ডাকবিভাগের কর্তারী পুরানো পদ্ধতি ত্যাগ করে এই নতুন ব্যবস্থার সুযোগ নিতে আগ্রহ দেখালেন না। পূর্বের মত তারা হরকরার সাহায্যেই চিঠি পাঠাতে লাগলেন। ফলে জনসাধারণ আইন অমান্য করে হেঁজকোট চিঠি পাঠাতে লাগল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ডাক পাঠাবার জন্য ইংলণ্ডের সর্বত্র নিয়মিত কোচ সার্ভিসের ব্যবস্থা হল আর এই বৎসরই ইয়োরোপের অন্যান্য দেশও ইংলণ্ডের পদ্ধতি অনুসরণ করলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুস্তক ও সাধারণপত্রের প্রচার বৃদ্ধির ফলে শিকার বিস্তার ঘটে, ফলে জনসাধারণের লেখার আকাঙ্ক্ষা ও শক্তিও বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন টীমার ও রেলগাড়ির প্রবর্তন হয় তখন ডাকের ব্যবহার আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পায়।

ইয়োরোপে যখন ডাক বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তখন আমেরিকাতো ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন শুরু হয়। আমেরিকার ডাকের প্রথম প্রচলন হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। প্রথম উপনিবেশিকের দল এখানে আসার পর কিছুকাল পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। একই উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রামে চিঠিপত্র পাঠাবার জন্য বেতনভোগী হরকরা ছিল, কিন্তু দূরবর্তী স্থানে চিঠি পাঠাতে হলে বাকি বা পর্যটকের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ইংলণ্ডে চিঠি পাঠাতে হলে জাহাজের কাপ্তানের হাতে চিঠি জিরা করে দিতে হত।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের গভর্ণর লাজলস উপনিবেশগুলিতে ডাক ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন। নিউইয়র্ক ও বোরনোর মধ্যে মাসে একবার বাতে চিঠি বিলি হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

লিনি কর্তৃক প্রদত্ত হয়।



আগিস খোলা হয় দেশী ও বিদেশী ডাক পরিচালিত করার জন্ত। এই সময় ডাক পাঠানো হয় হরকরার সাহায্যে আর এই সব হরকরার বেশীর ভাগই ছিল বেড ইণ্ডিয়ান।

ডাকের ইতিহাসে আমেরিকার এক নবযুগের সূত্রপাত হয় ১৬১২ খৃষ্টাব্দে যখন টমাস নীল উত্তর আমেরিকায় মেল সার্ভিস স্থাপনের অল্পমতি পান। বিভিন্ন উপনিবেশের ডাকের জন্ত দেয় চাঁদার পরিমাণ নির্দিষ্ট হল। নীল এক ইংলণ্ডের ডাক-বিভাগের কর্তারা অ্যাঙ্কন হামিলটন নামে এক ভ্রমলোককে আমেরিকার পোষ্টমাস্টার জেনারেলের পদে বহাল করলেন। অবিকাশ উপনিবেশের জন্যই সাপ্তাহিক ডাকের ব্যবস্থা হল আর ডাক পৌছতে বাত্রে বিলম্ব না হয় তার জন্ত অঝারোহী ডাকবাহক নিযুক্ত হল। ডাকের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ডাক-পরিচালনার স্বত্ব ইংলও কিনে নিলে।

তখন আমেরিকায় ডাকবাহকের কাজ ছিল অত্যন্ত বিপদমূল। রাষ্ট্রা-রাষ্ট্র বা ছিল শীতকালে তা বরফে ও বৃষ্টিতে হুগম হয়ে উঠত। পথে দস্যুর ভয় ছিল। সেতু ছিল কম, বেশীর ভাগ নদীই নীচের পার হতে হত। কাজেই চিঠিপত্র পৌছতে সময় লাগত খুব বেশী, কখনও বা চিঠিপত্র পথেই নষ্ট হয়ে যেত।

এ সমস্ত অসুবিধার জন্ত ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস নিজস্ব একটি ডাক-বিভাগ স্থাপনের সঙ্কল্প করলেন আর ফলমাত্ত থেকে সাভানা পর্যন্ত অনেকগুলি ডাকঘর তৈরী হল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকার ডাক বহনের কাজে সকল রকমের যানই নিয়োজিত হল। ক্যানো, ষ্টেজকোচ, ট্রাণ্ডোবট, রেলগাড়ী—যেখানে যেটার সুবিধা সেইটারই ব্যবহার নির্দিষ্ট হল। তবে এতেও জনসাধারণের অসুবিধা একেবারে দূর হল না। ইয়োরোপের অঙ্কুরণে আমেরিকান্তেও তখন চিঠির পাতা গুণিত করে মাণ্ডল ধার্য হত, উজ্জন বাই হোক না কেন। আর মাণ্ডলও ছিল খুব বেশী। স্বল্পবিশেষের সামর্থ্যের বাটরে। ত্রিশ মাইল বাসের মধ্যে চিঠি পাঠাতে হলে মাণ্ডল দিতে হত দশ সেট। অনেক আন্দোলনের ফলে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট এক আইন জারি করে মাণ্ডলের হার কমিয়ে দিলেন।

আমাদের দেশে ডাকের প্রচলন হয় বহুকাল পূর্বে। হিন্দু রাজাদের আমলে বেতনভোগী বাহীরাহক ছিল। কপোতের সাহায্যে কখনও কখনও দূরবর্তী অঞ্চলে পত্রাদি পাঠানো হত। সম্রাট অশোক রাজ্যশাসনের সুবিধার জন্ত ডাকের উন্নতির সাধন করেছিলেন বলে শোনা যায়। মুসলমান আমলে সম্রাট শের শাহের সময় ডাকের সঙ্কার হয়। শের শাহও বোড়ার ডাকের প্রবর্তন করেছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তবে ইংরেজ আমলেই ডাক যে এদেশে জনপ্রিয় হয়েছে একথা নিসন্দেহ। লর্ড ডালহৌসির সময় ডাকবিভাগের আমল সঙ্কার হয়। ডাকটিকিটের প্রচলন হওয়ায় জনসাধারণ অল্প ব্যয়ে সর্বোদর প্রেরণের সুযোগ লাভ করে। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আজ যে ডাকের কত সুবিধা হয়েছে তা বলা নিম্নোক্ত। ডোমরা জানো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল পরে

থেকে বিমান ডাক বাছে দেশ-বিদেশে। ইরানী, এসেশের বিভিন্ন শহরের মধ্যেও বিমানে ডাক বিলির ব্যবস্থা হয়েছে। এখন আর বোম্বাই-এর চিঠির জন্ত দীর্ঘ তিন দিন অপেক্ষা করতে হয় না, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিঠি হাতে এসে পৌছয়।

## গল্প হলেও সত্যি

### চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস

কিছু দিন আগের কথা বলছি। ইংরেজ রাজ্য তখন আমাদের দেশে পুর্নোদয় চলছে। দেশ শাসনের নামে ওরা যেমন শোষণ করছিল, তেমনি আমাদের দেশের অনেক জমিদার ও প্রজাদের ওপর অকণ্ঠা অভ্যাস করছিলেন।

খুলনা জেলার অন্তর্গত জমিদার রায়সাহেব কালী বাবুও এমন একজন ছিলেন। সামান্য একটু মনোমালিন্যের জন্ত তাঁর স্ত্রীকে পর্যন্ত খুন করে ফেলেন তিনি। তার কিছুদিন পর নিষ্ঠুর ভাবে তাঁর সাত জন পত্নী প্রজাকে ওলোবিত্ত করে হত্যা করলেন। 'একতাই বল' এই ভেবে গ্রামের সবাই মিলে আদালতে মামলা দায়ের করলেন কালী বাবুর বিরুদ্ধে। বছর ছয়কে মামলা চলার পর আদালত রায় দিল। পোনা গেল কালী বাবুর কীসির হুকুম হয়েছে। কালী বাবুর বাবা তখন জীবিত। পুত্রের কীসি হবে তখন মহাচিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু সে চিন্তা মাত্র দু'তিন দিন স্থায়ী হল। কালী বাবুর বাবা হাজার দশকে টাকা নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। গেলেন এক খ্যাতিমান ব্যারিষ্টারের কাছে। তাঁর পরামর্শানুযায়ী কালী বাবুর বাবা আপীল করলেন। অতঃপর ব্যারিষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে চুক্তি করলেন তিনি। চুক্তিতে ঠিক হ'ল কালী বাবুর প্রাণদণ্ড রদ করতে পারলে কালী বাবুর সমপরিমাণ ওজনের রোপ্যমুদ্রা ব্যারিষ্টার মশাইকে দেওয়া হবে। আর তা'না পারলে ব্যারিষ্টার মশাই এক কপর্দকও গ্রহণ করবেন না।

শেষ বাবে কোর্ট যখন রায় দিল, তখন দেখা গেল, কালী বাবু মোটেই দোষী নন। এক টাকা জরিমানাও দিতে হল না তাঁকে। কালী বাবুর বাবা ব্যারিষ্টার মশাইয়ের কৃত্তিমের জন্তে পূর্ণ-চুক্তি অনুযায়ী কালী বাবুর সমপরিমাণ রোপ্যমুদ্রা দিয়ে দিলেন। কিন্তু অন্তর্য ভাবে কালী বাবুকে বিচান হয়েছে। এইজন্ত ব্যারিষ্টার মশাই প্রাণ্য সমস্ত জ্বল স্থানীয় হাসপাতালে দান করে দিলেন। কে জানে এই সাধু ও দানশীল ব্যারিষ্টার? ইনি হচ্ছেন আমাদের পূজনীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আমরা চিরকাল পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে শ্রদ্ধা করে চলব। তাঁর স্মরণ হবে আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরব পাথর।

## বুদ্ধগয়া

### বিলাইকৃষ্ণ সরকার

বিগত বছরে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে ভগবান বুদ্ধের ২৫০০ তম মহাপরিনির্বাণ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। বছরের গোড়া থেকেই এ উৎসব শুরু হয়েছিল আর তার উদ্‌যাপন হলো বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এই বিশেষ বছরে তাই বুদ্ধদেবের উদ্‌যাপন হয়ে আমরা ক'জন ঠিক ক'কলায় বুদ্ধগয়া দর্শনে যাব। হিন্দু ও

সেইসময়ের অতীতের তাঁর এই হৃদয়। আমরা তখন হাজারীবাগ রোডে সাময়িক আশ্রয় নিয়েছি। সেখানে থেকেই একদিন সকালে খাওয়ার হাওরা দেবে রওনা হওয়া গেল গয়া প্যাসেজারে। হাজারীবাগ রোড থেকে গয়া বেস্ট্রন নর। ২ ঘণ্টা, ২১ মিনিট পথ। আমরা চার জন বন্ধু মিলে বেশ আরামেই দেখতে দেখতে চললাম। রাস্তার বেতে বেতে তিনটি টানেল ও বাহুরার জল পড়লো। হুবারে নিবিড় বন, মাঝখান দিয়ে ঐশ বাছে। বেশ লাগছিল। আরও অনেকগুলো ট্রেন বেরলো অজ্ঞানির জন্তে বিখ্যাত—পার হয়ে আমরা বন গয়া পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় দুটো। ট্রেন থেকে নেমেই আমরা গেলাম বাসটোয়ে। কিন্তু বাস পাওয়া গেল না, সন্ধান বাস ছেড়ে চলে গিয়েছে। সুতরাং একটা টাক্সাওয়ালায় সঙ্গে কথা হেল। সে তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে বুদ্ধগয়া হুরিরে আনবে। কারণ হাতে সময় খুব কম। টাক্সার ড্রাইভারই টাক্সাওয়ালা ঘোড়ার চাবুক লাগাল। ঘোড়ার হাড়জিরজিরে চেহারা হলে কি হবে! ছুটতে লাগল একেবারে রেসের ঘোড়ার মত। টাক্সাওয়ালাও ছিল বেশ আনন্দে পোক। রাস্তার বেতে বেতে নানান গল্প করতে লাগলো। গয়া থেকে বুদ্ধগয়া। স্থল পিচঢালা পথ। কল্ল নদীর ধারে ধারে প্রায় ৭ মাইল। ইতিহাস-বিক্ষিপ্ত কল্ল নদী। এরই তীরে ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধ লাভ হয়েছিল। এরই তীরে গয়ায় বিষ্ণুমন্দিরে হিন্দুরা পিতৃতর্পণ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে। আমাদের ৪ মিক দিয়ে বয়ে চলেছে কল্ল নদী। ডান দিকে ক্ষেত-খামার আর মাঠ। রাস্তার দুপাশে গাছের সারি। আমরা তাইই ছায়ার ছায়ায় চলেছি। বেলা প্রায় চারটার সময় আমরা বোলপুরে অর্থাৎ বুদ্ধগয়ার পৌঁছলাম। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল মন্দিরের বিরাট চূড়া। ওপরের মিকটা ক্রমশঃ ছুঁচলো হয়ে গিয়েছে। এই সময় সরকারের তরফ থেকে মন্দিরের সন্ধান ও সেরাসতের কাজ হচ্ছিল।

টাক্সা থেকে নেমে আমাদের থানিকটা উঁচু জায়গার উপরে হোল। তারপর বাঁদিকে বাঁকতেই দেখা গেল বুদ্ধদেবের বিশাল মন্দির। একটা বড় পুষ্করিণীর মত নীচু জায়গার মন্দিরটির অবস্থিতি। এক পাশের সিঁড়ি দিয়ে আমরা নীচে নামলাম। জায়গাটিতে সুন্দরভাবে বাগান করা ও চমৎকার সাজান। আমরা এগিয়ে চললাম। ডানদিকেই বিরাট কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির মাথা তুলে পাইড়ের রয়েছে। জুতো খুলে মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে হয়। মন্দিরের মূল অঙ্কনকে উঁচু পাথরের বৌদর ওপর ভগবান বুদ্ধের প্রকাণ্ড মূর্তি। বোলাসনে ভূমিশার্শ হুজুর উপস্থিতি। মূর্তির রূপ অনেকটা কাঁচা সোনার মত। এই বুদ্ধমূর্তি বহুবার অপসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সোনা বার, পূর্বে আরো যে সব বুদ্ধমূর্তি ছিল—সে সবই নষ্টপর্ণিভিত ছিল। বুদ্ধদেবের সেই বহিরাবস্থিত মূর্তি নষ্ট ও প্রণাশ করে আমরা বইয়ে এলাম। বহিরাবস্থার কাছে একটি টেমিলে মতান্তর লেখার খাতা রয়েছে। আমরা সেই খাতার পাতার লিখলাম—“বুদ্ধ শরণ্য গচ্ছামি।”

এর পর ওপরে অর্থাৎ বিতলে উঠলাম। বিতলের চাঁতালের চার কোণে মধ্যযুগের অলঙ্কার চারটি স্তম্ভাকার মণির রয়েছে। নানান ভাস্কর্যে ভরা। প্রত্যেকটি চূড়ায় এবং মন্দিরের দেওয়ালের গারে গারে বড় বড় আকৃতির মধ্যে যে কত অলঙ্কার ছড় ছড় বুদ্ধমূর্তি

রয়েছে যে তার হিসেব নেই। মাঝখানের চূড়াটি প্রায় ১৮-ফিট উঁচু। মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণ পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১০-ফিট আর উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৬ ফিট বিস্তৃত।

মন্দিরের পশ্চিম দিকে পরম পবিত্র অশ্বখ গাছ বোধিসত্ত্ব। এই বোধিবৃক্ষের তলেই গৌতম বুদ্ধ লাভ করেন। বিশ্বের মানব-কল্যাণের জন্তে সত্য উপলব্ধি এই ভ্রমুসেই হয়েছিল। উত্তরকালে ভগবান বুদ্ধ এই প্রাঙ্গণতেই সত্য, অহিংসা, সত্যের কথা প্রচার করে গেছেন। মানুষকে দুঃখ-কষ্ট, ব্যাধি-মুহুর হাত থেকে মহানির্বাণের সন্ধান দিয়ে গেছেন। এই বৃক্ষটি যদিও সেই আদি-বৃক্ষ নয়—তার বংশধর। তবু আমরা তার করেকটি পবিত্র পত্র জতি সযত্ন সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম।

মূল মন্দিরের পূর্বদিকে প্রাঙ্গণের মধ্যেই তারাসেবী ও পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্তি আছে। আমরা সে সব দর্শন করে মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গেলাম। সেখানে একটি পুষ্করিণী আছে। এর নাম মুচকুল হ্রদ। গল্প আছে যে, এই হ্রদের কাছে বসে এক সময় বুদ্ধদেব বন ধ্যান করছেন—তখন প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সেই সময় নাগরাজ মুচকুল ঠিক বায়ুকের মত বুদ্ধদেবের দেহে নিজ কণা বিস্তার করে প্রভুকে আচ্ছাদিত করে রাখে ও ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে বুদ্ধদেবকে রক্ষা করে।

বুদ্ধদেবের মন্দির পরিক্রম করে আমরা রাস্তার বের হয়ে এলাম। পাশেই তিব্বতীয় বৌদ্ধ মঠ, চৈনিক বিহার ও বিড়লার মন্দির প্রভৃতি আমরা এসবও ঘুরে দেখলাম। ক্রমশঃ বেলা পড়ে আসছে। অন্ধগামী সূর্যের শেষ রশ্মি পড়েছে বুদ্ধমন্দিরের চূড়ায়। আমরা এবার ফিরে বাবো। বতাই ঘুরে বাই পিছন ফিরে বার বার দেখি—বুদ্ধদেবের পুণ্যমন্দির তার শীর্ষ উঁচু করে পাইড়ের রয়েছে। যেন হিসার উন্নত পৃথিবীতে মুক্তির বাণী বিবোধিত করতে বিরাজ করছে করুণায়ন শাস্ত্র সোমাকে অন্তরে ধারণ করে। আমরা সে দিনের শেষ বেলায় আবার যরণ করলাম অমৃত মন্ত্র—“বুদ্ধ শরণ্য গচ্ছামি।”

## হাই জাম্প

### হাল ক্রিস্টিান অ্যাণ্ডারসন

তিন বন্ধু। মাছি, ফড়ি আর ব্যাঙ। খুব ভাল তিন জনে।

তিন জনে নিজেদের ভেতর বললে—“এসো না ভাই, আমরা একটা হাই জাম্পের প্রতিযোগিতা করি। দেখা বাক কে বেশী লাফাতে পারে।”

সবাই বললে—“তা বেশ। তা বেশ।”

সারা দুনিয়াতে খবর চলে গেল মাছি, ফড়ি আর ব্যাঙ হাই জাম্প দেবে। ভোমরা সবাই এসো—দেখো। এমন সুযোগ কেউ হারিও না।

সমস্ত কিছু তোলোড়ো করতে করতে এসো সত্যিকারের লাফানোর দিন।

দেশের রাজা এসেছেন প্রতিযোগিতার সভাপতিত্ব করতে—এইটু দিনে।

হৈ-হৈ-বৈ-বৈ ব্যাপার।

সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন প্রোভোসের—“সব চেয়ে উঁচুতে যে লাফাতে পারবে তার সঙ্গে আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবো।”

এই কথা না শুনে মাছি, ফড়ি আর ব্যাড তো আনন্দে পলস। আনন্দে ভেসে বাবার জোপাড়। রাজা তাঁর বক্তৃতা শেষ করে সিংহাসনে বসলেন।

প্রথমে মাছি এলো। রাজা ও দর্শকদের নমস্কার করলো। করবেই তো—ও যে খানদানি। মাছির বেশ নরম হতাব। মাছির ভেতর কোন চপলতা নেই।

মাছির পর এলো ফড়ি। ফড়ি তো ফড়ি-ই। নামও যেমন কাজও তেমন। ট্যাং-ট্যাং করতে করতে এলো। নমস্কারও করলো না। বাই হোক, ফড়ি পরেছিল ডাবী সুন্দর সবুজ রঙের পোষাক। সুন্দর মানিরেছিল কিন্তু তাকে। সবুজ রঙটা ফড়ি থু-ব ভালবাসে। তা ছাড়া ও রঙটা ওদের “ফ্যামিলি কলার”।

এবারে এলো ব্যাড মশায়। থপ, থপ করে সভার মাঝে এলো। মুখে কথা নেই। শুধু ডাব-ডাব করে একিকে দেখছে, ওদিকে দেখছে। রাজা মশায় বললেন—“প্রতিযোগীরা সবাই উপস্থিত। আর বাজ্ঞে কাজে সময় নষ্ট না করে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেওয়া বাকী।”

রাজা মশায়ের কথা মতো হাই জাম্প শুরু হোল।

প্রথমে লাফালো মাছি। মাছি এতো উঁচুতে লাফালে যে কেউ তাকে দেখতেই পেলো না যে সে কত উঁচুতে উঠেছে। হাওয়ার সঙ্গে মাছি মিশে গেছে। অতএব মাছি বাতিল হয়ে গেল।

এবারে এলো ফড়িরের পালা। ফড়ি লাফালে। লাফালে তো লাফালে একেবারে রাজার মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। রাজা তো রেগেই আশুন। লোক-লক্করবা ফড়িকে এই মার তো এই মারে। রাজা মশায় এগিয়ে এসে তো ফড়িকে লোক লক্করদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। ফড়ি কানড়ে কানড়ে সভা থেকে বেরিয়ে গেল। কপাল ভাল যে প্রাপ্ত মরেনি।

বাকী। এবারে এসেন ব্যাড মশায়। ব্যাড মশায় এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। মুখে বা সরে না। ব্যাড মশায় তো একেই দেখতে কেমন বোকা-বোকা। তারপর এই সব ব্যাপার দেখে আরো কেমন যেন বেশী বোকা হয়ে গেছে। ও মনে মনে বললো—“দরকার নেই বাবা লাফিয়ে। লাফাতে গিয়ে কি

বাপের দেওরা প্রাপ্তি হাবাবো? থাক বাবা, ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরা বাওয়া বাকী। বত সব প্রথমে থাকতে ভুতে কিসেদে ব্যাপার।”

রাজার কুরুর ব্যাডের হাবভাব দেখে বললো—“আমার মনে হয়, ব্যাড কেমন যেন একই ভুক্তকে পেছে, তা ছাড়া শুধু দ্বীপেরটা তেমন বিশেষ ভাল নয় বোধ হয়—” বলেই ছুঁবার হাঁটলো।

কুরুর এই কথা না শুনে ব্যাড তো রেগেই আশুন। “কি, আমার অপমান? পাঁড়াও দেখাচ্ছি”—বলেই ব্যাড মশায় দিলেন পাশ থেকে লাফ। লাফ দিয়ে তো ব্যাড মশায় পড়লো রাজকুমারীর কোলের ওপর। রাজকুমারী বসেছিল রাজার পাশের সিংহাসনে।

ব্যাড মশায়কে মেয়ের কোলে না দেখে রাজামশায় বললেন—“পৃথিবীতে আমার মেয়ের থেকে কোন উঁচু জিনিষ বা বস্তু নেই। তাই যে আমার মেয়ের মাথা পৃথিবী লাফাতে পেরেছে সেই এই প্রতিযোগিতার প্রথম হয়েছে বলে আমি মনে করি। বুদ্ধিমান ছাড়া এই জিনিষ কেউ জানে না। তাই আমি ব্যাডের বুদ্ধির প্রশংসা করছি। ব্যাড সত্যিই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ।”

রাজা শেষকালে নিজের কথা মতো ব্যাডের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

মাছি বললে ফড়িকে—“দেখ, ভাই, আমি সবচেয়ে উঁচুতে উঠেও প্রথম হতে পারলাম না। সবই কপাল ভাই, সবই কপাল। আমি পাতলা আর ছিপছিপে কেউ দেখতেই পেলো না যে, আমি কত উঁচুতে উঠছি। জগতে আজকাল নিবৃত্তিতারই জয়। বোকাদেরই রাজ্য।”

এই দুঃখের ছায়ায় মাছি পরবাস্তি বিভাগে চাকরী নিয়ে বিদেশে চলে গেল। পরে শোনা গেল যে মাছিকে বিদেশীরা মেয়ে ফেলোছে।

ফড়িও তাই ভাবছে—“কি অদ্ভুত এই জগত!” আর মনে মনে মাছির কথাগুলোই আঙড়াতে লাগলো—“হ্যাঁ এই পৃথিবীতে সোঁবর গণেশদেবই জয়-জয়কার! এই পৃথিবীটা নিবৃত্তি মাসপিওদের জন্তে।” তারপর সে গাইতে লাগলো তার বিখ্যাত বেননা-বিবুর গান—কিটিং—কিটিং—কিটিং—কিটিং।

ফড়িরের কাছ থেকেই আমরা জানতে পেরছি এই মহাসত্যকে। কিন্তু আমার ছোট বন্ধুর জ্ঞানে রাখো, ছাপার লক্ষ্যে যদিও পড়ছো এই মহাসত্যকে, তবুও ভেবে না যে সব সময়ই এই ব্যাপার সত্যি।

অনুবাদক—দেবশীল চট্টোপাধ্যায়

## ● মাসিক বন্ধুভাষ্য বর্তমান মূল্য ৫

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)	
বার্ষিক রেজি. ডাক	২৪
বাৎসরিক	১২
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজি. ডাক	
(ভারতীয় মুদ্রায়)	২
চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাপন মণিঅর্জার কুপন বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।	

ভারতবর্ষে	
ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সভাক	১৫
বাৎসরিক সভাক	৭।০
প্রতি সংখ্যা ১।০	
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাক	১।০
(পাকিস্তানে)	
বার্ষিক সভাক রেজিষ্ট্রী ধরত সহ	২১
বাৎসরিক	১০।০
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা	১।০



[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

টানের অন্তবিগ্রব শেষ হবার পর বখন নতুন সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হোলো টি লিং-এর তখন উনিশ বছর বয়স, কে চে শিয়াং-এর চকির। তদিনে ওদের মা বাবা দুজনেই মারা গেছেন। চে শিয়াং একটা বড়ো চাকরি করতো কুওমিনটাং সরকারে। নানকিং-এর নাম বদলে হোলো পিকিং। চিয়াং সরকারের বিপক্ষ বারা সবাই চলে এলো কমমোসার। সেই সঙ্গে গেল চে শিয়াং আর টি লিং। টি লিং থেকে বেতে চেয়েছিলো। চে শিয়াং রাজী হয়নি।

কিছু কমমোসার এসে চে শিয়াং বেশী দিন চাকরি করেনি। সেখান থেকে সরগন হয়ে ব্যাংককে এসে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা শুরু করলো। সেখানেও থাকলো না বেশী দিন। ব্যাংক থেকে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুন, তারপর এখন কলকাতায়।

“এ ভাবে আর ভালো লাগে না,” টি লিং বললো দিলীপকে, “আমার কাজ শুধু দাদার সংসার গুছিয়ে রাখা আর দাদার সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক বাদের তাদের কারো কারো সঙ্গে একটা সামাজিকতার বোসাবোগ বজায় রাখা।”

“কাজকে বিবে করে নিজের একটা সংসার পাভলেই পারতে,” দিলীপ বললো।

“চে শিয়াং সেটা চায় না।”

“চিয়েন চাং-এর সঙ্গে তোমার যে সাধাধাখি, সেটা যদি জানতে পারো?”

“চিয়েন চাং-এর ক্ষতি হবে তাতে। আমার অবস্থা কিছু বলবে না।”

বহলবার সকাল থেকেই কি রকম একটা অস্বাভাবিকি বোধ করছিলো দিলীপ। কি একটা যেন কাজের ভার আছে তার উপর। অথচ মনে পড়ছে না কিছুতেই।

বিকেলবেলা হঠাৎ মনে পড়লো।

টি লিং তাকে বলেছিলো চিয়েন চাংকে যে করেই হোক বহলবার সন্ধ্যাবেলা তার সঙ্গে সঙ্গে রাখতে। চে শিয়াং-এর সঙ্গে কোথায় যেন বাবার কথা আছে তার—সেটা যেন সত্য হতে দেখা না হয় কিছুতেই।

দিলীপ তক্ষুণি চলে এলো ওয়াংদের বাড়ি।

যেবে ঢুকতেই জেনীর সঙ্গে দেখা। মুখ তার শুকনো।

“চিয়েন চাং কোথায়,” দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

“কি ব্যাপার বলো তো,” জেনী জিজ্ঞেস করলো।

“কেন?”

“ঘণ্টাখানেক আগে একবার আহ-কিম এসে খোঁজ করলো চিয়েন চাং কোথায়। কিছুক্ষণ আগে এসে খোঁজ করলো চে শিয়াং। এখন তুমি। সবাই হঠাৎ তার ভক্তে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন?”

“আমি এমনি খোঁজ করছিলাম,” দিলীপ সহজ হবার চেষ্টা করে বললো। “ওর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি। তাই ভাবলাম, আজ সন্ধ্যাবেলা ওর সঙ্গে একটু আড্ডা দেবো। সে কোথায়?”

জেনী একটু চুপ করে রইলো। তার পর জিজ্ঞেস করলো, “আচ্ছা, ব্যাপারটা কি বলো তো?”

“কিসের ব্যাপার?”

“চিয়েন চাং সেদিন রাত্তিরে বাড়ি ফিরে এসে টি লিং-এর খুব নিজে করলো। বললো, মেয়েটা নাকি ভালো নয়। ওর অনেক ব্যাপার সে জানতে পেরেছে। ওর সঙ্গে নাকি ভাব অনেকেরই, তবে কারো সঙ্গে খুব বেশী দিন নয়। ওর কথা শুনে মনে হোলো, টি লিং-এর কোনো ব্যবহারে সে মনে আঘাত পেয়েছে। ও টি লিংকে তো ভালোবাসতো খুব।”

দিলীপ একটু অবাক হোলো। তার পর হাসলো খুব। হেসে বললো, “আচ্ছা পাগল! কি ব্যাপার জানো? সেদিন চে শিয়াং আমাকে ওদের বাড়ি বেতে বলেছিলো মনে আছে তো? গিয়ে দেখি, চে শিয়াং নেই, আমার বসতে বলে গেছে, বাড়িতে শুধু টি লিং একা। টি লিং-এর সঙ্গে বসে বখন গল্প করছি, এমন সময় চিয়েন চাং এসে উপস্থিত। সে-ও বোধ হয় আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করতে চেয়েছিলো কিছুক্ষণ। কিন্তু টি লিং তাকে বসতে বললো না। তাকে চলে আসতে হোলো। তাই বোধ হয় রাগ করেছে তার উপর।”

“তুমি ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে গল্প করেছো, না?” জেনী জিজ্ঞেস করলো।

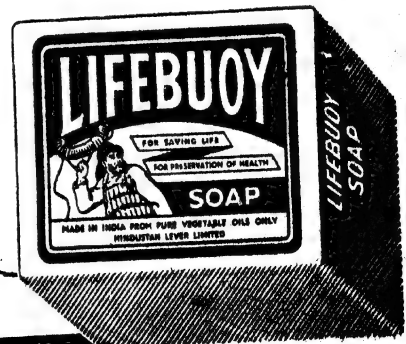
# যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময়

## লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন!



শিশুদের পক্ষে ময়লা হওয়া খুবই স্বাভাবিক কিন্তু বেশিক্ষণ ময়লা অবস্থায় থাকা তাদের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। কারণ, ময়লায় রোগের বীজাণু থাকে যার থেকে স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি হতে পারে।

লাইফবয় সাবান ময়লা-জনিত বীজাণু ধুয়ে সাক্ষ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন।



“এ রকম একটা কিছু আমি জ্ঞাত করছিলাম। কারণ, চিরেন চাং আমার কাছে যানিকরণ তোমার নিক্ষেপ করেছিলো। সে বলছিলো, ‘তুমিও নাকি লোক ভালো নও আর এটা-ওটা-সেটা।’

দিলীপ হাসলো।

স্নান হাঙ্গি হাসলো জেনীও। বললো, “তোমার ভো আমি তিনি দিলীপ। এসব যে কে চে শিখা-এর ফলি, সে আমি যানিকটা বুঝতে পারছি।”

দিলীপ জেনীর হাত ধরলো, বললো, “জেনী।”

“কি?”

“তুমি আমার বিশ্বাস করো?”

“বিশ্বাস না করলে কি এত কথা বলতাম?” জেনী জিজ্ঞেস করলো।

“জি স্যি সেদিন আমার কি বলছিলো, জানতে চাও?”

“না।”

“তুমি শোমো। জানলে তুমিও খুশি হবে, চিরেন চাং-ও খুশি হবে। তবে এখন কাউকে কিছু বোঝো না। জি স্যি বলছিলো সে চিরেন চাং-কেই বিয়ে করবে, কিন্তু এখন সে কথা কাউকে জানতে দিতে চায় না। কারণ কে চে শিখা স্নানলে ভীষণ রাগ করবে, এমন কি, সে চিরেন চাং-এর কতিও করবার চেষ্টা করতে পারে।”

জেনী একটু অবাক হলো। বললো, “এত কথা তো জানতাম না। চে শিখা-এর সঙ্গে দাদার যে মাখামাখি, তাতে দাদার কতি হতে পারে সে আমরাও বুঝতে পারছিলাম, আহ-কিমও সেদিন বলছিলো। তবে জি স্যি যে দাদাকে এত ভালোবাসে সে কথা তো জানতে পারিনি কোনো দিন?”

“আজ চিরেন চাং-এর কোথায় বেন বাওয়ার কথা আছে কে চে শিখা-এর সঙ্গে। জি স্যি আমার পাঠিয়েছে, আমি বেন তার আগেই চিরেন চাংকে নিয়ে লজ কোথাও গিয়ে বসি, বাতে চে শিখা এসে চিরেন চাংকে না পায়।”

জেনী একটু অবাক হয়ে তাকালো দিলীপের দিকে। বললো, “ও, সে জন্তেই চে শিখা এসে দাদার খোঁজ করছিলো?”

“চিরেন চাং কোথায়?”

জেনী একটু চুপ করে থেকে বললো, “দাদা একটু কলকাতার বাইরে গেছে। বলছে এখন কাউকে কিছু না বলতে।”

“কলকাতার বাইরে গেছে?” দিলীপ অবাক হলো, কবে গেছে?”

“কাল সকাল বেলা।”

“কোথায় গেছে?”

“তা তো বলে দায় নি। তুমি একটা স্ট্রটকল আর ল্যান্ডল্যান্ড গিয়ে গেছে।”

“কবে ফিরবে?”

“তা তো বলে দায় নি। মনে হোলো কয়েক দিন দেরী হবে। তা নইলে পরম স্টট সবগুলো নিয়ে বেতো না।”

দিলীপ চুপ করে বসে রইলো। জেবে পেলো না কি করবে—এখানে বসে জেনীর সঙ্গে গল্প করবে, না জেনীকে নিয়ে বেরোবে, কিংবা একবার দেখা করে আসবে জি স্যি-এর সঙ্গে।

এলো আঙে আঙে। বাইরে একটি গাড়ি এসে থামলো। একটু পরে ঘরে এসে ঢুকলো কে চে শিখা।

দিলীপ আর জেনীকে একসঙ্গে একলা ঘরে দেখে তার মুখে যে রকম তার মুটে উঠবে বলে এরা আশা করছিলো, সে রকম কিছু দেখা গেল না চে শিখা-এর মুখে।

তাকে দেখে মনে হোলো সে বেন খুব দাঁত, খুব উৎকণ্ঠিত। সে জিজ্ঞেস করলো, “চিরেন চাং কোথায়?”

“মেরিয়েছে,” জেনী বললো।

“কখন ফিরবে?”

“জিছু বলে দায় নি তো?”

“কোথায় গেছে জানো?”

“না, জানি না।”

চে শিখা টোট কামড়ে কি বেন ডারলো।

“এক কাপ চা দেবে,” জেনী জিজ্ঞেস করলো।

“না। আমার বসবার সময় নেই,” চে শিখা উত্তর দিলো, “চিরেন চাং যদি ছুটা ঘরো ফেরে তো বোলো আমি তার জন্তে অপেক্ষা করবো, সে বেন এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। কোথায় দেখা করতে হবে সে জানে।”

“আর যদি ছুটা রম্ভে না করে?”

“তা হলে—তা হলে—,” ভুরু ভুরু করে চে শিখা একটু ডারলো, জেবে বললো, “তা হলে আজ আর আমার সঙ্গে দেখা করে নয়কার নেই। আমিই এসে ওর সঙ্গে দেখা করবো কাল কিংবা পরশু।”

চে শিখা চলে বাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ হুঁজনেই। তারপর দিলীপ হঠাৎ বললো, “জেনী, তাবহি আর বেশী দিন অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।”

জেনী বুঝতে পারলো না। চোখ তুলে তাকালো দিলীপের দিকে।

দিলীপ বলে গেল, “সামনে হপ্তার যদি দিন ঠিক করতে চাই তোমার বাবা কি আপত্তি করবেন?”

“কিসের দিন?” জেনী জিজ্ঞেস করলো।

“বিয়ের দিন। হ্যারেল রেজিষ্ট্রারের অফিসে গিয়ে ব্যবস্থা করে আসতে হবে তো।”

জেনী তার ঘোর থেকে উঠে এসে দিলীপের চেয়ারের হাতলের উপর বসলো। বসে দিলীপের কাঁধে হাত রেখে বললো, “দিলীপ, তুমি সত্যিই এত সিরিয়াস?”

“সিরিয়াস না তো কি ছেলেখো?”

“দিলীপ, ভালো করে জেবে দেখ—আমার বিয়ে না করে হয়তো তোমাদের নিজের জাতের মেয়ে বিয়ে করলে অনেক সুখী হয়ে তুমি।”

“না জেনী, তোমার ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না, আর কাউকে বিয়ে করবোও না। অবধি তুমি যদি না চাও।”

“না, না, দিলীপ, ও কথা বোলো না, তুমি তো জানো, আখিও তোমার ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না।”

“তা হলে সামনের হপ্তার গিয়ে বিয়েটা সেবে আসি।”

হবে।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, "দিলীপ, আমার জর করছে।"

"কেন?" দিলীপ হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"না, হাসি নয়। জে শিয়াকে তুমি ঢেনো না।"

"তার সঙ্গে কি সম্পর্ক?"

"সে আমার বিয়ে করতে চায়, জানো তো?"

"কি হয়েছে তাতে?"

"সে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করে?"

দিলীপ হাসতে শুরু করলো। বললো, "আমার কি ক্ষতি করবে সে?"

জেনী আর কিছু বললো না।

দিলীপ বাড়ি দেখলো। তার পর উঠে পড়লো।

"কোথার বাছো?" জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"একবার টি সিংএর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"কেন?"

"তাকে একবার জানিয়ে দেওয়া দরকার যে চিয়েন চাং কলকাতায় নেই। স্বতন্ত্রা সে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারে।"

টি সিং বাইরের ঘরে বসেছিলো চুপচাপ। দিলীপকে দেখে কোন কথা বললো না। হাত দিয়ে শুধু চেয়ার দেখিয়ে দিলো। দিলীপ চেয়ার টেনে বসতে জামার ভিতর থেকে একটি চিঠি বার করে দিলো দিলীপের হাতে।

"কার চিঠি?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"পড়ে দেখ।"

চিঠি ইয়েজিতে লেখা। দিলীপ দেখলো, চিঠির নিচে চিয়েন চাং-এর সই।

ডায়ের টি সিং—সে লিখেছে—তুমি বধন এ চিঠি পাবে, আমি ততক্ষণ বয়ে পৌঁছে গেছি। আমি সেদিন রাতে তোমার একথাই জানাতে গিয়েছিলাম যে আমার পাসপোর্ট আর ভিসা হয়ে গেছে। একটা চাকরীর ব্যবস্থাও হয়ে গেছে নিউইয়র্কে। টাকাকড়ি বা বোগাড় করার দরকার ছিলো, তা-ও হয়ে গেছে। আমি জানাতে গিয়েছিলাম তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে—না কি আমি আগে চলে যাবো, তুমি পরে আসবে। তোমার বাড়ি গিয়ে তোমার কাছ থেকে যা ব্যবহার পেলাম তাতে মনে হোলো জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন আর নেই। সেদিন একজন লোকের সঙ্গে আলোচনা হলো সে ব্যাকক থেকে এসেছে, তোমাদের ঢেনে, তার কাছ থেকে তোমার কথা অনেক শুনলাম। তাই ডাকলাম তোমার কাছ থেকে কিছু আশা না করাই ভালো। তুমি তোমার মতো সখে থাকো। আমি আমার নতুন জীবন শুরু করি বিশেষ গিয়ে। যত্ন থেকে প্রেন ঘরে আমেরিকার বাড়ি। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।—চিয়েন চাং।

দিলীপ চোখ তুলে দেখলো টি সিংএর চোখ জলে ভাসছে।

যেই ডাকে চিঠি এসেছিলো টি সিং এর কাছ সেই ডাকে বুড়ো



নিম্নিত

নিম্ন

ব্যবহার করুন!

বাধ্যকাল থেকে নিম টুথ পেট ব্যবহার করলে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাঁত ও মাড়ি অটুট থাকে।

নিম টুথ পেট—এ নিমের সহজাত সকল গুণাকরী সন্নিবিষ্ট তো আছেই, তাছাড়া আধুনিক দন্ত-বিজ্ঞানসম্মত জেট উপকরণগুলির সঙ্গে এর মধ্যে ক্রোরোফিলও আছে। ইহা দন্তক্ষয়কারী জীবাণু নাশ করে, মুখের হৃগন্ধ দূর করে ও হাস-প্রকাশ নির্মল ও সুরভিত করে।

অস্বাস্ধ্য টুথ পেট অপেক্ষা দাঁত ও মাড়ির উৎকর্ষ সাধক অধিকতর গুণাবলী সমন্বিত নিম টুথ পেট নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ।



নি ক্যালকাতা কেমিক্যাল কোং লি., কলিকাতা-২১



বুড়ো ওয়াং প্রথমে মনে মনে একবার চিঠিটা পড়ে নিলো। জেনী, মিনি আর হুং চাং একটু দূরে পাঁছিরে বসে চুপ করে। চিঠি পড়ে ওয়াং হুং-তিন মিনিট চোখ বুজে চুপ করে বসে বসে রইলো। তার পর হেসে-হাস্যের কাছ থেকে খুব নিচু গলায় চিরেন চাং-এর চিঠি পড়ে জানা গেল।

মিনি হুং করে বসে বসে নির্বিকার ভাবে। জেনীর চোখ জলে ভরে উঠলো। একটু খুশি-খুশি দেখালো হুং চাংকে। “জীবনের এই দীর্ঘা,” ওয়াং বললো, “হেসে-হাস্যেরা ছড়িয়ে পড়বে বেশ-বিসে, নতুন করে নতুন পরিবারের গোড়া পত্তন করবে। ওয়াংয়ের খুঁজে পাবে হাফাও, ফুকিয়েনে, হুং-এ। ওয়াংয়ের পাঁবে ব্যাকক, সাইগন, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুরে, খুঁজে পাবে জাকাতার রেজুনে। এ ভাবে ছড়াতে ছড়াতে আমরা এসেছি কলকাতায়। এবার একজন চললো আমেরিকায়। সে সুখী হোক, দেশী বা বিদেশী বাকি খুশি বিয়ে করে ওয়াংয়ের কণ্ঠ বিস্তার করুক। ওয়াং পূর্ব-পুরুষদের আদার কল্যাণ হোক।”

একটু চুপ করে বসে বসে ওয়াং। তার পর বললো, “যে যেখানে খুশি থাক, আমি একটুও হুংখিত হবে না। আমি শুধু চাই যে আমার হেসে-হাস্যের অস্তিত্ব একজন ফুকিয়েনে কিয়ে থাক।” আবার চকু নিম্নাঙ্গিত করলো বুড়ো ওয়াং। জেনী, মিনি, হুং চাং আঙে আঙে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বাইরে এসে হুং চাং বললো, “চিরেন চাং আমেরিকা যাচ্ছে, ভালোই হলো। আমিও থাকবো না। রোজী বলছে তার ইণ্ডিয়া ভালো লাগে না, সে তার হোম ইন্ডিয়াতে চলে যাবে। আমিও চলে যাবো তার সঙ্গে।”

মিনি গম্ভীর ভাবে বললো, “রোজী তো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। ওর হোম ইণ্ডিয়া। সে ইন্ডিয়াতে গিয়ে কি করবে?”

“না, ওর হোম ইন্ডিয়াতে, ওর পূর্বপুরুষ সেখান থেকে এসেছে এসেছে, ওদেশে ওর অনেক আত্মীয়-বন্ধন আছে।”

মিনি বললো, “আমি কিন্তু ফুকিয়েনে চলে যাবো। জাহ-কিমও যাবে। আমাদের মধ্যে তাই কথা হয়ে আছে।”

“সবাই বার বেখানে খুশি যাবে,” জেনী চোখের জল মুছে বললো, “কিন্তু চিরেন চাং বহি ভোমাদের মতো এত খুশি মনে বেতে পারতো, আমার হুং করার কিছু থাকতো না। সে কিন্তু অনেক হুংখি নিয়ে এসেছে ছেড়ে গেল।”

মিনি আর হুং চাং চুপ করে বসে।

জেনী আঙে আঙে বলে গেল, “যে যেখানে খুশি যাবে, আমি কিন্তু কলকাতা ছেড়ে এক পাও নড়ছি না। এদেশে শেষ পর্যন্ত আমি আছি আর বুড়ো ওয়াং আছে।”

দিলীপ একদিন জেনীকে বলেছিলো, “তোমার বোন মিনি বহি জাহ-কিমকে বিয়ে করে চীনে ফিরে যাবে, ওদের সঙ্গে তোমার বাবাকেও পাঠিয়ে দিতে পারো।”

“কেন?”

“হুং চাং এখানে থাকবে না, তুমি আর আমি যিলে যে সময় পাড়বো সেটা চায়না টাউনে নিচরই নয়—বুড়ো ওয়াং-এর কি এখানে একা-একা ভালো লাগবে?”

তখন জেনী একটু জান হেসেছিলো, বলেছিলো, “বাবা কলকাতা ছেড়ে নড়বে না।”

“কেন?”

“সে অনেক কথা। ফেং-হুং-মি এর নাম তখনো?”

“ফেং হুং মি? হ্যাঁ জাহ-জাহ একদিন বলেছিলো কিছু কিছু। এককালে তো সে ছিলো চায়না টাউনের রাজা—”

“হ্যাঁ। সে-ই প্রথম বাবাকে কলকাতার নিয়ে আসে। সে আঠারোশো হিরানকুই সালের কথা।”

বুড়ো ওয়াং জমেছিলো ফুকিয়েনে, তাদের পৈত্রিক ধাম-বাড়িতে। সে সময় তাদের অবস্থা মোটামুটি বহল, কিন্তু সে একটু বুড়ো হতে না হতেই বাপ মারা গেল, খুড়োরা জমাজমি বা ছিলো হাত করে বাড়ি থেকে বার করে দিলো ওয়াংকে।

ফেং-হুং-মি বহন ওয়াংকে প্রথম দেখলো তখন তার বয়স কুড়ি কি একশ। জাহাংওর কুখ্যাত পাড়ার গুণাধি করে বেড়ায়।

ফেং-হুং-মি-এর মাথার উপর তখনো চীন সরকার পুরস্কার ঘোষণা করে নি। দক্ষিণ-চীন-সমুদ্রের বলরে বলরে সে তখনো বহল ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। তার জাহাং আছে কয়েকটি, সমুদ্রে জাকাতি করে বেড়ায়। থবরটা সরকারী ভাবে কারো জানা নেই, এমন জানে সবাই। তাই ভর করে, সমীহ করে ফেং-হুং-মিকে। সিঙ্গাপুর, রেজুন, কলকাতার চায়না টাউনগুলোতে তার অপ্রতিহত প্রতাপ, বিশেষ করে কলকাতায়।

জাহাংও-এর এক জুয়ার আড্ডার ওয়াং ফেং-হুং-মি-এর এক জুয়ারকে ধরে ঠাণ্ডালো। অস্ত্র লোকদের হাতে হরতো তক্ষুণি ছুরি খেতো ওয়াং, কিন্তু সেদিন ফেং-হুং-মি স্বরু সেখানে উপস্থিত ছিলো বলে সে বেচে গেল। সেই বাঁচিয়ে দিলো তাকে, কারণ একটু অবাক হয়েছিলো সে। ফেং-হুং-মি-এর জুয়ারকে ধরে ঠাণ্ডায় জাহাংও-এ এমন সাহস কার? তাকে ডেকে হুঁচর কথা জিজ্ঞেস করতেই জানলো সে ফুকিয়েনের ওয়াং।

ফেং-হুং-মি চিন্তো অস্ত্র এক ওয়াংকে।

জিজ্ঞেস করলো, “অনুক ওয়াং তোমার কে হয়?”

“আমার বাবা।”

“তোমার বাবা?” অবাক হলো ফেং-হুং-মি। তার হাতে হুং-লি তোমার মা?

“হ্যাঁ।”

“আরে এতজন বালো নি কেন? তুমি জানো হুং-লি'র বোন তাই-লি আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী?”

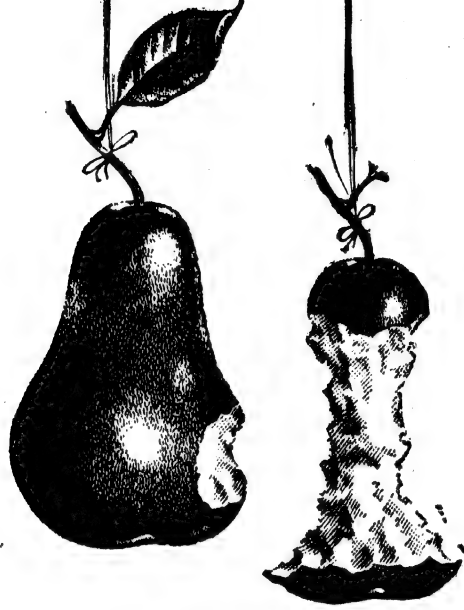
“হ্যাঁ—”

“তবে চুপ করে আছে কেন? তুমি আমার নিকট-আত্মীয়।”

“আমার আরো নিকট-আত্মীয় আমার কাকারা,” ওয়াং উত্তর দিলো, “ওদের কাছ থেকে বা ব্যবহার পেয়েছি, তার পর খে আমি আত্মীয় দেখলে ভর পাই।”

ফেং-হুং-মি তাকিয়ে দেখলো ওয়াং-এর দিকে। তারপর সে হুঁ করে ফের ফেরালো।





## দেখে পরখ-আর দেখে পরখ...

জীৱক জিনিষ কীচহে বা বাইৰে থেকে দেখে পরখ করতে গেলে ঠিকার সম্ভাবনাই বেশি। যেমন ধরুন ফল। বাইরে থেকে দেখে মনে হোল বেশ সরেস, কাটার পর দেখা গেল তেতরে পোকাকর খাওয়া। সেই ক্ষেত্রে ফল কেনার সময় দেখে পরখ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু সাবান বা অন্যান্য মোড়কের জিনিষ পরখ করা যায় কি করে? এর একটি নিশ্চিত উপায় বুদ্ধিমান মোকানদারদের জানা আছে— তাঁরা দেখেন জিনিষটির নামটি পুরোপুরি বিবাস-যোগ্য কিনা এবং সেটি এমন মার্কার জিনিষ কিনা যা তাঁরা ব্যবহার করেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন।

প্রায় ১০ বছর ধরে জনসাধারণ হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষগুলির ওপর আস্থা বান কাশ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এই জিনিষগুলির গুণাগুণের কোন তারতম্য হয়নি। এই জিনিষগুলির ওপর তাঁদের আস্থার আর একটি কারণ, এগুলি বাজারে ছাড়বার আগে আমরা পরখ করে তবেই ছাড়ি।

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী আমাদের সব জিনিষের ওপর—কাচা

মাল থেকে তৈরী হওয়া পর্যন্ত, আমরা পরীক্ষা চালাই। এ ধরনের পরীক্ষা চলে প্রতি সপ্তাহে সংখ্যায় ১২০০। আমরা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিই যে এ জিনিষগুলি সব রকম আবহাওয়াতেই চালান এবং মজুন করা যাবে। আমাদের পরীক্ষাগারে 'কৃত্রিম আবহাওয়া' সৃষ্টি করে আমরা দেখে নিই যে বিভিন্ন আবহাওয়াতে এ জিনিষগুলি কেমন থাকে। আপনারা বাড়ীতে এ জিনিষগুলি যে রকম ব্যবহার করে পরখ করেন, আমরাও ঠিক সেইভাবে এইগুলি পরখ করে দেখে নিই। আমাদের তৈরী জিনিষগুলির মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে—লাইফবার সাবান, ভালভা বনস্পতি, গিবস, এস আর চুপশেট অর্থাৎ সবগুলিই আপনাদের পরিচিত জিনিষ। এই জিনিষগুলির এত সুবাস কাশ এই জিনিষগুলি বিবাস-যোগ্য। কতন পরীক্ষা চালানোর পর বাজারে ছাড়ি হয় বলেই এগুলি সর্ব-সাধারণের এত বিবাস অর্জন করতে পেরেছে।



দেশের সেবার হিন্দুস্থান লিভার

ALL-535220

বললো, "দেখ বৎস, হাতের সব আঙুল সমান নয়, উইলো পাছের সব পাটা সমান নয়, তেমনি সব মানুষ সমান নয়। আমি যে তোমার সত্যিকারের হিতৈষী আত্মীয় সেটা বুঝবার সুযোগ দিতে দাবী আছি তোমার। তুমি আমার সঙ্গে কলকাতার যাবে?"

...ওয়া কে-হং-মিং'এর সঙ্গে কলকাতার চলে এলো। 'সেটা আঠারো শো ছিয়ানকুই সাপে, তার বয়েস তখন কুড়ি।

সেই অল্প বয়েসেই সে ফেং-হং-মিং-এর ডান হাত হরে উঠলো।

আমি কোকনের চোরা ব্যবসা, ডাক্তারি ও গুন্ডামি রাহাজানি, এমন কোনো হুকাজ নেই বা ওয়া করতে না!

এই পর্বত বলে জেনী 'খামলো। তাকালো দিলীপের মুখের দিকে। তারপর বললো, "দিলীপ, এই আমার বাবার আসল পরিচর।"

দিলীপ জেনীর মুখের দিকে তাকিয়ে খুব সহজ হাসি হাসলো।

"এসব অনেক দিন আগেকার কথা," জেনী বলে গেল, "অনেকেরই মনে নেই, আমরাও আর কাজকে বলি না। কিন্তু আমার মনে হোলো তোমার বলা দরকার। তুমি আমার বিয়ে করতে চাও, সুতরাং আমরা কি, সে কথা তোমার ভালো ভাবেই জেনে নেওয়া দরকার। একথা শুনে তুমি যদি তোমার মত পাণ্টে ফেল, আমি একটুও হুংরিষ্ট হবো না।"

দিলীপ হাসলো। বললো, "জেনী, পঞ্চাশ বছর আগে তোমার বাবা কি ছিলেন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি জানি বুড়ো ওয়াকেকে, সে খুব ভালো লোক। আমি জানি ছুই মেরে জেনীকে, সেও খুব ভালো।"

জেনীর ছোটো ছোটো চোখ দুটো জলে ভরে এলো, মাথা নিচু করলো সে।

"তারপর?" জিজ্ঞেস করলো দিলীপ।

"আমাদের সবচেয়ে আরো কিছু জানতে চাও বুঝি?"

"না, না, সে ভাবে আমি কিছু জানতে চাই না," দিলীপ বললো, "আমার পর শুনে ভালো লাগে। বিশেষ করে এ ধরনের বোমাঙ্কর পদ। তোমার বাবা কলকাতার এসে ফেং-হং-মিং-এর ডান হাত হরে উঠলেন। তারপর?"

ফেং-হং-মিং-কে যদি বলা হয় চায়না টাউনের রাজা, বিবি আমেলিয়ার মেরে রেবেকা বিবিকে বলা যেতো চায়না টাউনের রাণী। রূপের জৌলুসে তার বিবি আমেলিয়ার মতোই। তার খ্যাতি কলকাতার নানাজাতের অভিজাত মণ্ডকবর্গের মধ্যে বিস্তৃত। বিবি আমেলিয়া লেনে রেবেকা বিবির বৈঠকখানার পারের বুলো দিতো না, এমন রাজা, মহারাজা, নবাব, জমিদার পাওরা যেতো না সে-সময়।

সে-সময় আপোপো অনেক বাড়ি ছিলো তার নিজেরই, তাতে থাকতো শুধু নানা রকম মেয়ে, বাগের খুঁজে-পোতে দিয়ে আসতো, অনেক সময় ধরে নিয়ে আসতো ফেং-হং-মিং-এর দল, নিয়ে আসতো

বাংলার বাইরে থেকে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বন্দর থেকে। আর এসবকে কেন্দ্র করেই রেবেকা বিবি আর ফেং-হং-মিং-এর মানা রকম অসামাজিক, অনৈতিক, বেআইনী ব্যবসা। কিন্তু কেউ তাদের কিছু বলতে সাহস করতো না। ইয়েরেজের আইন, ইয়েরেজের পুলিশ চুকতো না এ অঞ্চলে। এরাই ছিলো এ অঞ্চলের আইন। আর রেবেকা বিবির পৃষ্ঠপোষক ছিলো অনেক ইয়েরেজ রাজপুত্র। পরে বজার যুদ্ধের সময় ফেং-হং-মিং ইয়েরেজের সাহায্য করেছিলো বলে তাকেও ষাঁটতো না ইয়েরেজ সরকার।

এদের মধ্যে এসে ওয়া বেশ ভালোই ছিলো। অভাব নেই হুঁচকানা নেই। এ অঞ্চলের এক জুতো ব্যবসারীর মেরেকে বিচে করে সে সঙ্গারও পেতেছিলো।

উনিশ শো চব্বিশে তার ছেলে চিয়েন চাং-এর জন্ম হোলো।

তার পরের বছরে ওয়া-এর জীবনের একটি নতুন পরিচ্ছেদ স্থা হোলো।

ওয়া ফেং-হং-মিং-এর সঙ্গে কলকাতার এসেছিলো আঠারো শো ছিয়ানকুই সাপে। তার বছর হু'রেক পরে ফেং-হং-মিং-এর ওয়া রেবেকা-বিবির একটি মেয়ে হোলো।

মেয়েটিকে চোখের সামনেই বুড়ো হতে দেখেছে ওয়া। মেয়েটি বাবো বছর বয়েস হতে না হতে রেবেকা-বিবি তাকে লক্ষ্যে পাঠি দিলো নিজের এক আত্মীয়র কাছে।

ওয়া শুনলো যে রেবেকা-বিবি মেয়েকে এ রকম পরিবেশের মা রাখতে চায় না। তাই তাকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে সে পড়া-শুনা করবে, গান-বাজনা শিখবে—বিশেষ ক গানে তার ভীষণ ঠোক।

রেবেকা-বিবি প্রায়ই লক্ষ্যে গিয়ে মেয়ের কাছে কিছুদিন কাটি আসতো। আর মাঝে মাঝে যেতো ফেং-হং-মিং।

তারপর মেয়েটিকে ওয়া অনেক দিন দেখেনি। কি তার চাতাও জানতো না।

ফেং-হং-মিং উনিশ শো বিশ সাপে একবার ফুলালামপুর একটা কাজের উপলক্ষে গিয়েছিল, সেখান থেকে আর ফিরলো না একদিন সকালবেলা তার লাশ পাওয়া গিয়েছিলো এক কুখ্য অঞ্চলের হাত্তার ঘরে। কারা তাকে ভুলী করে মেরে যে রেখেছিলো।

তারপর রেবেকা-বিবিও আর কলকাতার থাকে নি। সে। গেল লক্ষ্যে মেরের কাছে। এখানকার বা কিছু দেখাশোনা কর সবই করতো ওয়া।

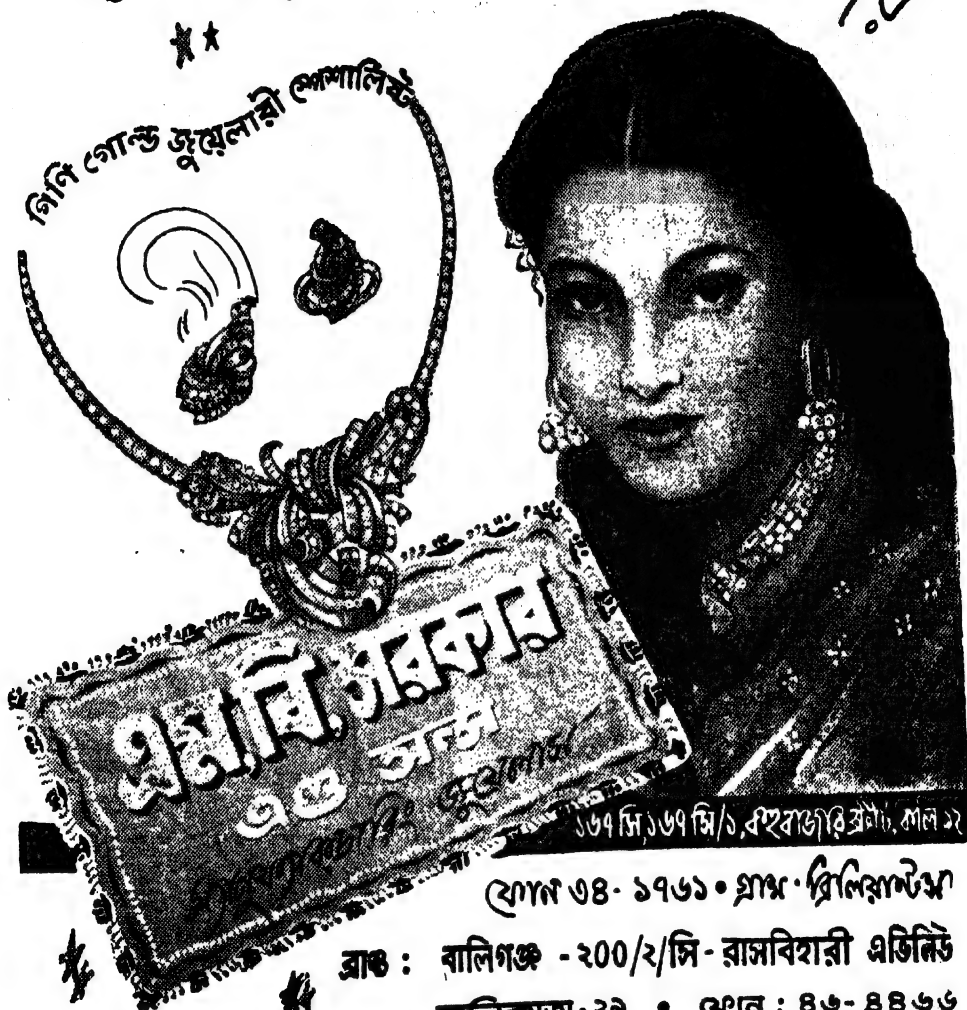
বছর পাঁচেক পরে, চিয়েন চাং-এর বখন আট ন'মাস ব রেবেকা-বিবি কলকাতার ফিরে এলো। তখন তার বয়েস পা পেরিয়ে গেছে।

সঙ্গে নিয়ে এসেছে মেয়েকেও। সেই বাবো বছরের মেরের ও ছাফিন-সাতাশ বয়েস। আঙনের মতো রূপ। আর অমৃত গা গলা। নামও নিয়েছে নতুন বাঁচের—জুলেখা বাই।

রেবেকা-বিবি ওয়াকে তাকিয়ে জেনে কলসো, "এবার তে এক দেখাশোনা করতে হবে।"

xx  
ଭୌତିକତ୍ତ୍ୱ, ଗିର୍ଭତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆସ୍ତିତ୍ତ୍ୱ

जिनि गोल्ड डूयलारी खालिहं



১৬৭ মি ১৬৭ মি/১, ৪২৮৫০ ব্রিষ্টিশ, মাল ২২

কোন ৩৪. ১৭৬১ • গ্রাম • প্রিন্সিপালিটি

ব্রাঞ্চ : বালিগঞ্জ - ২০০/২/সি-রাজবিহারী এডমিট  
কলিকাতা-২৯ • ফোন : ৪৬-৪৪৬৬

କାଳିକାତା-୨୧ • ଫୋନ : ୫୬-୫୫୬୬

ব্রাহ্ম - ডচামশোমপুর

ଘୋଡ଼ା : ଡାହାଣପୁର - ୫୫୮

শ্রী ১২৪ পূর্ণিমা বিলম্ব ১২৪.১২৪/১ বহুজাতার স্কোট-কলিকাতা-১২ (কলিকাতা) (কলিকাতা)



নীলকণ্ঠ

মাতাশ

প্রথম দিন ত্যাগি থেকে ফিরে মঞ্জরী মনে মনে হিসেব করলে।

টাকার নয়; কাজের! আসল কিম্বে অভিনয়ের চেয়ে, বা জাকে-ভালো করতে হবে, তা হল ডিরেক্টর আর প্রোডিউসরের সঙ্গে প্রেমের অভিনয়। সেটা মঞ্জরী পারবে।

কড় পরিচালকের বজা দিতে হবে এমন থেকেই। প্রথম ত্যাগি এর দিনে তার চেয়ে প্রয়োজনীয় আলাশ হয়েছে; সবচেয়ে প্রয়োজনীয় লোকের সঙ্গে; ঐক্য দল। ঐক্য দল তার কিগারের প্রশংসা করে বলেছেন তালিম দেওয়া দরকার। তালিম দেবার জন্তে মঞ্জরী একদিন তাকে আসতে বলেছে। আরেকটি কাজ আছে পরন্তু। প্রথমদিন প্রোডিউসার আসতে পারে নি। পরবর্ত্তিন আসবে। তার সঙ্গে গাড়ীতে বেরবে মঞ্জরী চা খেতে।

সেই পরন্তু এসো আজ এই মাত্র। অন্ধকার হয়ে এসেছে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট। আঁধা অন্ধকার। লম্বা লম্বা ছায়া ফেলো, বলিও সন্ধ্যা আসিছে মল মল করে তবুও দুঃসময় নয় আজ; ভাসোয় মই বেয়ে জীবনে সাফল্যের চূড়ার উর্ধ্বার প্রথম বাণে আজ পা সেবে মঞ্জরী। তার প্রথম পা এগিলে সেবে। আজ মঞ্জরীর সুসময়।

রাখালবাবুর গাড়ী এসো এলো। প্রোডিউসার বসে থাকবে খবরতলার একটা লোটে তার জন্তে; প্রোডিউসারকে মেঝাজে রাখতে পারলে একশো পঁচাত্তর টাকা মাইনের চালিয়ে নিতে আটকাবে না একটুও।

চাঁবি দিয়ে আলমারী খুলে বিলিতি পাউডরের একটি বাস

হুই হাতে চালিয়ে সেরে নিলে অর্ধসমাপ্ত প্রসাধন, তারপর গাড়ীতে রাখাল দলের পাশে এসে উঠল মঞ্জরী। রাখাল দল যেতে যেতে শুধু বললেন, এই তোমার চাল মঞ্জরী। গাড়ী এসে বেখানে থামলো সেটা একটি বিরাট বাড়ী। তাইই দৌতলার একটা ঘরে মঞ্জরীকে বসিয়ে রাখালবাবু ভেতরে গেলেন।

এই আমাদের নোতুন ফিতোইন মঞ্জরী। পদাঠী রাখাল দল থাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে মঞ্জরী হতটা থমকালো, এই মুহূর্ত্তে এখানে বাজ পড়লেও সে হতবিস্মল হত না অত বেশি। কিন্তু থাকে দেখে মজার মত সাদা হয়ে গেল মঞ্জরীর মুখ মুহূর্ত্তের জন্তে, সে কিন্তু একটুও বিচলিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

মিষ্ট হেসে প্রোডিউসার রতনচাঁদ শুধু বললে : নমস্কার মঞ্জরী দেবী!

প্রথম যে কথা মঞ্জরীর মনে হলো তা আর কিছু নয় শুধু এই : রতনচাঁদকে চোঁবাচ্চার ফেলে দেওয়ার শোধ এবার সে সেবে। কিন্তু রতনচাঁদ জ্বলোক। রতনচাঁদ ব্যবসাদার। সে ওসব কিছুই করলে না। শুধু বললে : তারপর দিদির কি খবর? কেঁপে উঠলো মঞ্জরী দেবী মনে মনে; মুখে বললে, ভালো নয়। কেনো? রতনচাঁদ তাহলে অবাক হতে জানে। কেন, তাও জানেন না। মঞ্জরীর কাছে আস্তে সাহস বাড়ছে। ওঃ ওসব বাত ছেড়ে দাও মঞ্জরী, ও তোমার দিদি ভুলেই গেছে। আবার হামিও ভুলে যাবো। নাও চা খাও দেখি এখন। চা দিয়ে গেল বেজারা। এলিক এসে বোস না। চা খেতে খেতে শুনলো মঞ্জরী। কিন্তু মঞ্জরী গেলো না; বরং রতনচাঁদ এসে বোসলো। বসেই বাড়ীর কথা শুধাতে লাগলো; কোথায় থাকে মঞ্জরী, কে কে আছে তার। কটা ঘর নিয়ে থাকে সে, প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিল বটে মঞ্জরী, তারপরই বুঝলে। রতনচাঁদ আরেকটা চোরাকুঁহির খুঁজছে; মালপতর সরিয়ে রাখবার জন্তে। মঞ্জরী হাসলো। চোর জানে না সে গাঁটকাটার জিম্মার জিনিষ রাখতে চাইছে। রতনচাঁদ হাসলো। গাঁটকাটা ধরতে পারেনি যে চোরের নজর সব সময় বোঁচকার দিকেই। আঁটটা যে মঞ্জরী ছাড়া আর কেউ সরাতে পারে না, বেলারাগীকে ফোঁচোর বললেও, রতনচাঁদ জানে তা। চোর কে, রতনচাঁদ বেলারাগীর কথা মোটেই শুনেই বুঝেছে; কিন্তু তখনও মাথার বজ্র গরম আর শরীর ছিলো সেই পরিমাণ ঠাণ্ডা। ভাবনাকে কাজে গড়িয়ে নিতে একটু দেবী করেছিলো মাড়বার তনয় আর গাঁটকাটা এসেছিলো ঠিক তখনই। বহুৎ আছা বলেছিলো রতনচাঁদ মেপাখোর নাহিকাকে যেমন করে নাকি বলে ওঠে গান বিলাসী খোঁতার বাউল ওস্তা বখন তাঁদের খেলা দেখার। যেমন করে মঞ্জরী শক দিয়েছিলো বা রতনচাঁদকে। 'খেলোয়াড় আছে', মনে মনে সেলায় করেছিলো রতনচাঁদ, হুনিশ করেছিলো অনেকবার। তবে ওস্তাদেরও ওস্তা আছে, ঠাকুরেরও ঠাকুর। হুসে আসলে তুলে নেবে দাম, মা খোঁদাখার খেলারও শুধু। কিন্তু একুনি নয়। আগে হুদগীটা এব মোটা হোক তার পর একদিন জুং মত পেঁচির পেঁচিরে কাটা বা মনের আরামে, হাতের গুঁথে।

রতনচাঁদ বাড়ী নামিয়ে দিলে গেল বখন তখন মঞ্জরীর বাড়ী দরজার, একটি কি দুটি ঘরে তখনও, হতশা পখিক সে যে আ বলবার অপেক্ষার গাড়িরে। ওপরের ঘরে মঞ্জরীকে জড়িয়ে ধরে বল

ধব্ব? মঞ্জরী এ প্রশ্ন কেন যে করলে, সে তা জানে না। রাগ পড়লেই আবার আসবে; রতনচাঁপ আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে না। যদি তাহলে এখনও নিশ্চিঞ্চি আছে। মঞ্জরী আর কিছু বললে না; কিন্তু বেলারাগী জিজ্ঞেস করলে কোথায় ছিলি এক্ষণ?

গিরেজিলাস কাজে, রাস্তার সেখা হুলু বাবুর সঙ্গে, ঘেরী করে দিলে। মঞ্জরী মিথ্যে কথা বলে, না ভেবেই। দুজনেই চুপ করে গেল হঠাৎ। মঞ্জরীর মা এসে বললেন, কি তোরা চুপচাপ বসে কেন, যা।

মঞ্জরীর কানে সে কথা গেল না। সে ভাবলে দ্বিদিটা কিন্তু বোকা। বেলারাগীর কানে কোন কোন কথা গেল না। সে ভাবতে লাগল: মঞ্জরীটা কি মিছে কথা বলে আজকাল। হুলু বাবু আজ দিন করেক হোল বেলারাগীর কাছে বেতে আরম্ভ করেছে: বেলারাগীকে হুলু বাবু কালই বলেছে: না মঞ্জরীর মুখ সে এ জীবনে আর দেখবে না।

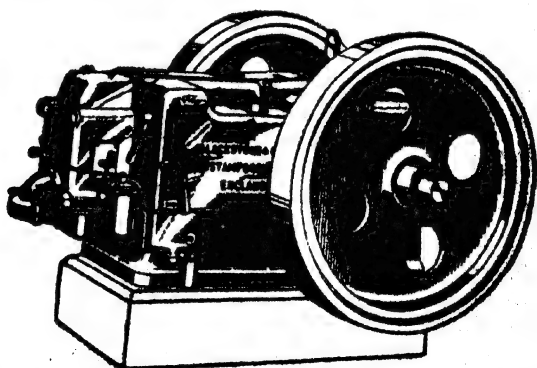
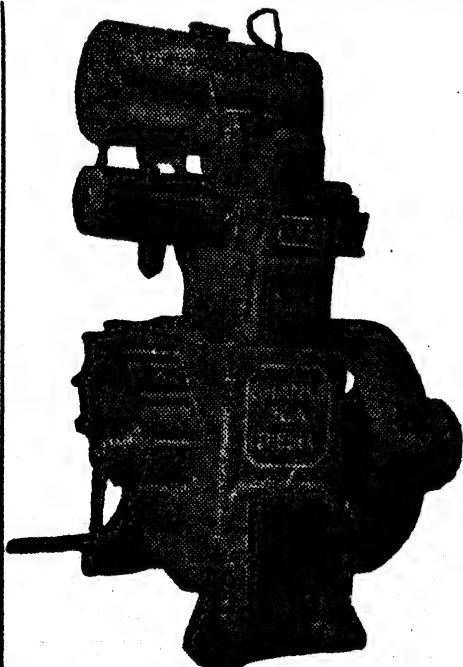
### আটান

প্রথম ছবি বাজারে বেকলো, সে-ছবি তেমন দূতের হলো না; কিন্তু সবাই একবাক্যে স্বীকার কোয়ল মঞ্জরী বলে এই নতুন মেয়েটার হবে। সেদিন বারা হালকা ভাবে বলেছিলো কথাটা তার। আজ সবাই আঙুল কামড়াচ্ছে; হলো ত' বটেই; তবে এতদূর হলো যে সেদিন বারা পিঠ চাপড়িয়েছিলো আজ তারা সবাই মঞ্জরীর কুপাপ্রার্থী; এতটা নিশ্চয়ই তারা চায় নি। এতটা হবে জানলে

তারা কিছুই চাইতো না; চাইতো আরম্ভেই মঞ্জরীকে দাবিয়ে দিতে; প্রথম দূত হতো স্বনিকটা পতন।

প্রথম ছবি মুক্তি পাবার পূর্ব মঞ্জরী প্রশংসা পেলে বটে; কিন্তু কাজ পেলো না। কাগজে তার ছবি ছাপা হলো বটে; কিন্তু নতুন কোনও কণ্ঠস্বী সই হলো না; প্রশংসায় মন ভরে: মাল্লবের পেট ভরে না। মঞ্জরী শঙ্কিত হলো। ইতিমধ্যে সে উঠে এসেছে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান পাড়ায়; মা আছে পুরানো বাড়ীতে। তুধু ছবির ওপর ভরসা করে এসেছে বললে মঞ্জরী মিথ্যে বলবে; কিন্তু তুধু লোকের ওপর নির্ভর করেও মঞ্জরী আর বসে নেই। সে লোক সামাজিক বড়লোক হলও; ছবি তার চাই-ই। মাল্লবের হকের ঝান পেলো গল্প-ছাপল-মোহ মাঝা বাঘের বা হর, সমাজের সর্ব দৃশ্য জ্বরের মেয়েমাছুষ বখন ছবির নায়িকা হয় তখন তারও হয় তাই। বহু লোকের ডাক আসে তার জীবনে; এক লোকের কাছে আর বাঁধা থাকতে চায় না সে; আর এ-ডাক তুধু উপভোগের হুল আহ্বান নয়; এর পেছনে আছে মেয়েমাছুষের দেহের অন্তিত, শিল্পীর অভিরেখ প্রেতি অভিনন্দনের স্পর্শ। ছবিতে নায়বার পরই মঞ্জরীর মনে হয়েছে, হয়ত দেহ-বেগাতিই তার নির্মম নিয়তি নয়।

এরই মধ্যে প্রথম ছবির নায়ক এসেছে হুপুর্ বেলায় তার নতুন বাড়ীতে। এমন সময় দরজার টুক-টুক করে আওয়াজ করেছে কে? এমন সময়ে কে হতে পারে? ধড়াস করে উঠেছে মঞ্জরীর বুক। দরজা খুলে যাকে দেখেছে তাকে দেখে অনেকক্ষণ কথা সরে নি মঞ্জরীর



অর চাই, গ্রাণ চাই, কুটার শিল্প ও কৃষিকার্য দেশের অর ও গ্রাণ এবং আপনি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে নিল, সিট্রার, ব্রাকটোন ডিজেল ইঞ্জিন, সিট্রার পাম্পিং সেট, ডাঙ্কন্ ডিজেল ইঞ্জিন, ডাঙ্কন্ পাম্পিং সেট বিলাতে প্রস্তুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

এজেন্টস্:—

**এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং**

১৩৮ নং ক্যানিং স্ট্রিট, বিতল কলিকাতা—১

ফোন ১-২২-৫২৭৫

বিঃ দ্রঃ—ঈম ইঞ্জিন, বরদার, ইলেক্ট্রিক মোটর, জারদানো, পাম্প ট্রাকটর ও কলকারখানায় ব্যবহার্য সরঞ্জাম বিক্রয়ের লক্ষ প্রস্তুত থাকে।

হুখে। তার দরজার দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ দত্ত, বার একটা কথার crowd scene-এর মধ্যে হতে পারে লক্ষ-লক্ষ টাকার ছবির নায়িকা। মঞ্জরী চুপ করে গেলেও ভেতরে সে বসেছিলো, তার প্রথম ছবির নায়ক সে কিন্তু চুপ করে থাকে নি; চোঁটেরে জিঙ্গেস করেছে শ্রীকৃষ্ণ দত্তকে? 'সুত্র' না কি?

ধাৰ্য্যেছের শ্রীকৃষ্ণ দত্ত; লজ্জার পড়েছেন। কিন্তু বহুতকাল মাত্র। অভিনেতা চরিত্রে তিনি এককাল চলেছেন; অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করবার জন্তে তাঁর চেয়ে তৈরী কে? ভিতরে হুকে, নাকে ফমাল চাশা দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছেন; অস্ত্র কিছু ভাববেন না; এ মেয়েটি বড় দুখী, আমার দেখে মনে হয়েছিলো, এর হবে। তাই, একটু তালিম-টালিম দিয়ে দিলে যদি উন্নতি করতে পারে, তারই জন্তে আসা।

উঠ পড়েছিলো ছবির নায়ক; বাবার আগে বলেছিলো: তাই দিন সুত্র, তালিমই দিন, আমি এখন চলি।

'সুত্র' শুধু তালিমই দিলেন না; 'সুত্র' ভয়লোক; কাজও মিলেন। মস্ত বড়ো কাজ। উপনায়িকার। কিন্তু 'সুত্র'-এর আশীর্বাদ পেলে নায়িকার চেয়ে উপনায়িকারই বাজি মারবার আসা বেশী; মঞ্জরী স্বপ্ন দেখতে লাগলো।

শ্রীকৃষ্ণ দত্তর ছবির নাম কালিদাস। মঞ্জরী তাতে যে ভূমিকাটি পেলে সে হচ্ছে কালিদাসের inspiration অনুসৃত। মঞ্জরীর অভিনেত্রী জীবনের সর্বোত্তম সুযোগ। সেই সুযোগ প্রায় নিজে থেকে পায়ে হেঁটে এল মঞ্জরীর দরজায়। এক এল আকর্ষণ ক্রম। সবাই অবাক হল। ঈর্ষান্বিত হল মঞ্জরীর সৌভাগ্যে। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করল না। এর আগেও বহুবার আনকোরা মেয়েকে প্রথম নিয়ে একটি ছবিতেই রাতারাতি তাকে ষ্টার বানিয়ে তোলায় পকির দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই প্রথম নয়। মাটি থেকে মাত্র পাঁচটি আঙুলের সাহায্যে যেমন মৃতি গড়ে তোলে কেঁটনগরের পুতুল-শিল্পীরা। দেখে অবাক হতে হয়। ধরতে সময় নেয় অনেকক্ষণ, এ মাটির মৃতি না প্রাণের পুতলী:

কিছু মঞ্জরী মাটি নয়; মেয়েমানুষ। যেমন তেমন মাটি থেকেই তেমন তেমন শিল্পী বানিয়ে তোলে মৃতি। তাদের হাতে পুতুল থেকে জন্ম নেয় প্রথম। কিছু মানুষকে শিল্পী করতে শুধু প্রেতাই সব দায়িত্ব বে, বার ভেতর থেকে নবজন্ম হবে শিল্পের তারও তাগিদ থাকা চাই সৃষ্টির। একা সৃষ্টির এই বেদনা যে নিজের বুকে বয়ে বয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে পায় সুবিপুল আনন্দ সেই শিল্পী। এই বেদনার সঙ্গে কোনও বন্ধারই ফুলনা অনুভব। রক্তক্ষক দায়িত্ব অথবা অগ্নিবর্ষ ক্রোধ এ দুয়েরই নিদাক্ষণ বন্ধ। সৃষ্টির বেদনা? সে দুর্বল। দুর্বল। এ পৃথিবীতে একমাত্র মানুষের মহিমার বেদনার সঙ্গেই তার বা কিছু মিল। সন্তান ভূমিট হবার পূর্বসূর্য পর্বত মাড়ুদগরের বে হাহাকার সেই হচ্ছে শিল্পীর কলন। সৃষ্টি হচ্ছে শিল্পীর সন্তান। এক সন্তান জন্মের পর প্রতিবারই প্রতিজ্ঞা,—আর নয়। এ বয়শা, এই বেদনা, এই হাহাকার, এই কান্না সেমে দেখরা,—আর নয়। আর প্রতিবারই

প্রতিজ্ঞা ভগ্নেই প্রতিজ্ঞা—মৃতি। শিল্পীরও তাই। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় মৃতি। কিন্তু মৃতি নয়। আবার নবজন্ম সৃষ্টির জন্ত প্রস্তুতি মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ দত্তর কাছে গিয়ে মঞ্জরীর সত্যি সত্যি নবজন্ম হল। আরেক পৃথিবীতে পৌঁছল মঞ্জরী। অভিনয়ের নতুন অর্থ সেখানে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, ফল হয়ে দেখা দেয়। সে পৃথিবীতে পদাৰ্পণের আগে পর্বত মঞ্জরীর মনে অভিনয় সবচেয়ে অশেষ ধারণা ছিল, কলের পুতুলের মত কেবলমাত্র পৃথিবীর কথা প্রাণহীন আউড়ে বাওয়া। সে জানত এতেই বৃথা হয়। মাত্র এইটুকুই তার কাছে সবাই চায়। এক তাই শক্ত মনে হয় নি অভিনেত্রী জীবন, অসম্ভব মনে হয় নি ফিল্মে যে করা। সেই স্বপ্নের ভূমি পায়ে তলা থেকে সরে গেল শ্রীকৃষ্ণ দত্তর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। দাঁড়ানো মাত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত হাসলেন। মঞ্জরীকে সেই হাসিই বলে দিল যে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পর্বত এখনও শেখেনি সে।

হাসলেন, কিন্তু নরকক্ষন করলেন না শ্রীকৃষ্ণ। বরং মঞ্জরী যে অভিনয় সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ, এতে বরং খুসীই হলেন। দড়কচড়া মেয়ে বাওয়ার চেয়ে কাঁচাই ভালো। নরম মাটিকেই গড়ে শিটে নেওয়া যায়। শক্ত মাটি ভেঙ্গে তাকে আবার নরম করে নিয়ে গড়ায় মেহনত অনেক বেশী। মঞ্জরী পোষায় না। মঞ্জরীকে শ্রীকৃষ্ণ দত্ত মন্ত্র দিলেন। অভিনয়ের ইষ্টমন্ত্র।

সেই ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে নবজন্ম হল মঞ্জরীর। শ্রীকৃষ্ণ দত্ত বললেন, অভিনয়শিল্পী ব্যক্তিগত জীবনে কি, মহীরসী মহিলা অথবা কলঙ্কিনী কুলটা সে প্রশ্ন মানুষের, জীবনদেবতার নয়। এমন কি শিল্পী পুরুষ না মহিলা, এ জিজ্ঞাসাও অবাস্তব। শিল্পীর কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, দেশ নেই। সে শিল্পী,—এই তার একমাত্র পরিচয়। শিল্পী হিসেবে সে সার্থক কি না তাই হচ্ছে তার চরম বিচার। মানুষ হিসাবে সে কি তা নিয়ে বার মাথা ব্যথা তার নাম সমাজ, শিল্প নয়।

মঞ্জরীর ভয় ছিল সে অশিক্ষিত। তাকে অস্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। বললেন, লেখাপড়া করে লোকে পণ্ডিত হয়, শ্রষ্টা হয় না। পণ্ডিত হবার জন্ত চাই প্রতিজ্ঞা। শ্রষ্টা হবার জন্ত প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা করতে হয়। প্রতিজ্ঞা নিয়ে জন্মতে হয়। বার সৃষ্টি করবার জন্ত জন্মায় তার সৃষ্টি করেই ধারাস। সেই সৃষ্টির জন্মে অর্থের আভরণ পরানোর জন্মই প্রয়োজন হয় পণ্ডিতের। সৃষ্টি জন্ত শিল্পী, ব্যাখ্যার জন্ত পণ্ডিত। এক জনের প্রেরণা যা আরেকজনের বিচার। অভিনয় কেমন করে করতে হয় সে সব যে বই গেছে সে সব জানে শুধু অভিনয় করতে জানে না। অভিনয় করে সে কেমন করে অভিনয় করে তা হস্ত জ্ঞানে কিছু অভিনয় সেই করে।

শ্রীকৃষ্ণ দত্ত আরও বলেছিলেন। বলেছিলেন মঞ্জরী ব অভিনয় করছে না ইন্ডিয়ান ক্রোরে তখনও সে অভিনয় করে জাগরণে এক নিজস্ব, জীবনের প্রতিটি বহুত্রে যে অভিনয় ক না সে নয় অভিনেত্রী। অভিনয় শুধু ধারণার নয়, ধ্যানের ব লক্ষ্যের চোখ থেকে যেমন সব করে গিয়ে জেগেছিল শুধু প আশুত্ম জীব হোঁড়ার বহুত্রে তেমন অভিনেত্রীকে শুধু। বিবৃত হলোই চলে না, তাকে আশুবিবৃতও হতে হবে।

আত্মবিবর্তন হলো যজ্ঞরী। অতীতবিশুদ্ধ হল সে। কুহ  
গেল ভবিষ্যৎ। বর্তমান বিশুদ্ধ হল, অতীতবিরহীন। সত্তা বিসর্জিত।  
তুণ্ড জেগে রইল অতীত চরিত্রের রূপকল্প। চলে গেল কালিদাসের  
কালে। উজ্জয়িনীর ধারপ্রান্তে উজ্জীবিত হল যজ্ঞরী। সে যে  
পতিতা, সে যে পেটের দারে অভিনয় করতে এসেছে তা ভুলে বেতে  
তার না হল ভয়, না হল সেরী। তুণ্ড তাই নয়। ব্যাভি, অর্থ,

নিশ্চিন্ততা, নির্ভরতা কিছুকি কথা রইল না তার মনে। মনে রইল না  
সে যজ্ঞরী। মনে হল না তুণ্ড, প্রত্যয় হল সে অনন্য। পৃথিবীর  
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবির প্রেরণা। যজ্ঞরী নয়। কালিদাসের সে  
কবিতা। গানের, আলোর, আনন্দের প্রসূতিত যজ্ঞরী! যত্ন হল।  
কৃতকৃতার্থ হল। সার্থক হল।

[ ক্রমশঃ ]

## একটি গ্রীসীয় পাত্রের প্রশস্তি

জন কীটস্

[ John Keats-এর Ode on a Grecian Urn কবিতার অনুবাদ ]

আজো তুমি নিরুবেগ বিজ্ঞানের বধু—অচুখিতা,  
স্বকৃত্তা ও বিলম্বিত সময়ের পালিত সম্ভান,  
জানো গ্রাম্য জীবনের ইতিবৃত্ত, পুশিত কথার, তচিস্মিতা,  
ব্যাখ্যা করে, আমাদের কবিতার চেয়ে বার মিষ্টতর মান :  
তোমার আকৃতি ঘিরে পড়লো এ কাহিনী কার !  
দেবতার, অথবা কি মানুষের, কিংবা উভয়ের,  
সুন্দরী টেম্পীতে কিংবা আর্কেডীয় উপত্যকার ?  
এ কোন মানুষ এরা অথবা দেবতা ? কুমারীরা অনিচ্ছুক ? আর  
কী উচ্চায় পদাধারণ ? কী প্রচেষ্টা এ-পলায়নের ?  
কেমন বাঁশি ও একতারার বাজে ? কী তীব্রতা আনন্দ-বস্তার ?

ক্রান্ত সন্ধ্যার লর মধুর, কিন্তু বা ক্রান্ত নয়  
আরো সুমধুর : তবে কোমল বাঁশির বেজে যাও ;  
কানের তৃপ্তিতে নয়, অহুতবে আরো প্রেমময়  
শব্দহীন গান গেয়ে আত্মকে ভাগাও  
ভক্তভলে সুন্দর যুবক, ছেড়ে গিতে পারো না তুমি তো  
তোমার সন্ধ্যা, ওই গাছেরাও নয় হবে না তো কোনো দিন ;  
কখনো পাবে না তুমি চুবনের সুযোগ তো সাহসী প্রণয়ী,  
যদিও জয়ের কাছাকাছি—তবু, হয়ে না হুঃখিত ;  
বিবর্ধ হবে না সে তো, যদিও তোমার ভাগ্য রয়ে বাবে নীন,  
তুমি চিরকাল প্রেম নিয়ে বাবে, আর সেও রয়ে রূপময়ী।

আহা সুখী, সুখী সেই শাখাখণ্ড ! বাগের পাভার  
করে না, এবে বাবা কোনো দিন বসন্তকে দেয় না বিদায় ;  
আর সুখী সঙ্গত-নাগর্য স্নানিহারী,  
চিরদিন বাঁশি বার নৃতন-নৃতন গান গায় ;  
আরো সুখী সে প্রেমিক ! আরো কী সুখের প্রেম তার !  
বা চির সতেজ উষ্ণ চির তুলনের,  
অনন্ত আগ্রহ নিয়ে বা রয়ে অল্পান ;  
বহুউর্বে মানুষের সেই কামনার—  
বা আনে সুভাষ হৃৎ তৃপ্তি-স্নানি চের,  
উত্তপ্ত লগাট আর বিতক রসনা—অবদান।

বলি উপহার দিতে কারা এরা আসে ?  
পল্লব-আকৃতি কোন বৌতে যে তুমি পুরোধাত্ত,  
নিরে চলে গো-বংশারে, সে কারা তুলেছে নীলাকাশ,  
বেশদ-মহুগ দেহপার্শ্ব মাগে বিভূষিত তার ?  
কোন ক্ষুদ্র নগর—নদীর তীরে অথবা কি সাগর কিনারে,  
অথবা পর্বতশীর্ষে নির্মিত শাস্তির দুর্গ নিয়ে,  
আজ এই জনতার থেকে রিক্ত এমন পবিত্র এই জোরে ?  
আর ক্ষুদ্র হে শহর, তোমার সবিশুলি রয়ে একেবারে  
নিশ্চর, এবং কেউ বলবে না ঘরে ঘিরে গিরে  
কেন তুমি জনহীন, বাঁধা কোন নিয়মের জোরে।

গ্রীসীয় পঠন ! আহা সুন্দর আকৃতি ! হস্তিপ্র  
যর্গের মানব-মানবী সুসজ্জিত,  
আগাধ্য শাখার, আর পায়ের তলার গুণ বন ;  
তুচ্ছ তুমি করে ভ্রান্ত আমাদের—আকুল চিন্তার নিরঞ্জিত  
অনাগি অনন্তকাল যেমন বিভ্রান্ত করে ; শান্ত গ্রাম্যকথা।  
পুরাতন যুগ এই বংশ লসে করে দিলে কত  
তখনো থাকবে তুমি অশীতার আরেক হুঃখিত জনতার।  
মানুষের বন্ধ হয়ে, বাগের বলবে তুমি তবু  
“সৌন্দর্যই সত্য, আর সত্যই সৌন্দর্য”—নিশ্চয়তা  
এ সবই বা জানো এ পৃথিবীতে, এবং বা তোমার জানার।

অনুবাদ—সৌন্দর্য সুখাপাতার

# মিসেস ডার্স

সন্তোষকুমার চট্টাচার্য্য

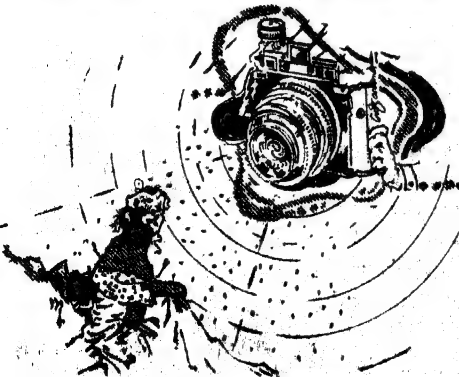
মিসেস ডার্স জাতে হাঙ্গেরীয়ান কিন্তু আমেরিকান নাগরিকত্ব লাভ করে এখন আবার বাস করতে এসেছে এডিনবরায়। শিল্পী—ছবি আঁকে ভালই। এডিনবরায় প্রথম যখন বাই তখনই আলাপ হয় মেলসন মহামেটের নীচে। একটু আলো পেতেই ক্যামেরা ধুলে ছবি তুলছিলাম—ক্যামেরার মধ্য দিয়ে চোখে পড়ে তার দেহবন্দরী। মাটিতে পা ছাড়িয়ে বসে কি যেন আঁকছে। আমি কোঁড়হলের বেশে এগিয়ে বাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—ভারী সুনন্দর। তুলির টানে ধরা পড়েছে। পেছন ফিরে তাকায় ডার্স। নিজে থেকেই আলাপ শুরু করে হাসতে হাসতে। বোধ হয় বিদেশিনী, তাই সঙ্কোচের বালাই নেই।

তদনন্তি, বাবার জীবন নিয়েই পথ চলেছে মিসেস ডার্স। আত্মীয়বন্ধন, বন্ধুবান্ধব কেউই বিশেষ নেই। থাকার মধ্যে আছে প্রচুর অর্থ আর শিল্পী হবার অসম্মুখ। বিয়ে হয়েছিল ফিল্ডেলেকিয়ায়, কিন্তু হনিমুন থেকেই পালিয়ে আসে মিঃ ডার্সের কুৎসিত আকাঙ্ক্ষার ভর এড়াতে। স্থলীর্ণ দশ বছর চলে গেছে। পরিশ্রম পূর্ণ্য নেই—বিবাহ বিচ্ছেদও হয়নি। মিঃ ডার্স যে অল্পমত জীবনের মধ্য দিয়ে পাণেয় সংগ্রহ করে চলেছে—সে খবরও অজানা নেই। কিন্তু সৌন্দর্য-সন্ধানী চোখ তার আকাশের দিকেই দৃষ্টি করিয়ে আছে—নীরব ভাব বিনিময়ের শেষে ভাবার ভিত্তিতে ভালবাসার সোপান গড়ার আশায়।

বাড়ীর জানালা দিয়ে উঁচু কিং আর্থার সীটটা চোখে পড়ে। ঘরের মধ্যে ছবির পর ছবি—অচেনাকে চেতনা সেবার আশ্রয় প্রচেষ্টা।

মিসেস ডার্স প্রশ্ন করে—তুমি কি সব কিছু মনে করতে পার?

তাকিয়েছিলাম তারই আঁকা এক ছবির দিকে। অর্থ হৃদ্যোধ্য।



এক নয়শতাব্দির ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে এক টুকরো মেঘ—বিরাট আকার ধারণ করার প্রয়াস। দূরে এক ছোট্ট পাখী উড়ে চলে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে। পাশের কাছে দুই কুতুরে এক টুকরো হাড় নিয়ে খেলা করছে।

প্রশ্ন শুনে বাড় ফেরাই। উত্তর দিই—পারি যেটা মনে রাখতে চাই।

—আর তুলে যাওয়ার ব্যাপার?

—ঠিক তাই যেটা তুলে যেতে চাই সেটাই তুলে বাই।

—যাঙ্গরের বেশোতেও।

—সেটা তো আরও সহজ।

—ঠিক বলেছ। কিন্তু সেই সহজ ব্যাপারটাকে এত বছরেও আরম্ভ করে উঠতে পারলাম না। অনেক সময় ইচ্ছে হয়েছে সোয় জানালা বন্ধ করে আঁককারের মধ্যে চুপ করে বসে থাকব। না থাকবে কোন শব্দ—না কোন কোলাহল। সেখব তার মধ্যে কি সৌন্দর্য আছে।

কথার মোড় কিরিয়ে দিই অন্য কথায়।

—এখানে কত দিন আছে?

—তারিখ নিয়ে চলার অভ্যাস নেই তবে মোটামুটি এক বছর।

—যে আশা নিয়ে এসেছিলে তা নিশ্চয়ই মিটেছে?

—তোমার কি মনে হয়।

—আমার মনে হয় এডিনবরা তোমায় নিরাশ করেনি।

—এক যুগুন্দের জন্মও নয়। এমন কি জেনারেল পোট্টাকিসের সামনে নিশ্চল মাংসলোলুপ মাছের আর সেই সঙ্গে মেয়েদের ব্যবসার দরাকরীর দৃশ্যও নয়। জান আমি ভালবাসি—বিচ্ছিন্ন জীবন, আঁকাবাকা কাঁটা ভরা পথ, লাল মেঘ, শীতের বড়।

পূর্বান দিনের এক ঘটনার কথা বলে।

নিউজালিসে থাকার সময় ঘটে।

সমুদ্রের ধারে ছবি আঁকতে আঁকতে হাতি হয়ে গিয়েছিল। তবু ভঁটার ইচ্ছা ছিল না। বদলাকেই তুলি বৃকে নিয়ে শুয়েছিল বালির ওপর। পরনে ছিল স্বচ্ছ এক সাধারণ শোবার—শুধু সভ্যতার আইনকে কীকী দেওয়ার জন্য।

পাশে একজন এসে পড়ায়—

সিগারেটের আগুন শেষ হয়ে গিয়েছিল—তাই খোঁজ করছিল কাঠির।

নিরাশলাই তুলে দেয় তার হাতে...

হাত চেপে ধরে—আগছাতকের হাতের চাপে কিসের বেন বারকতা।

এ যে সেই চিরন্তন ইচ্ছিত।

মিসেস ডার্স হাসতে হাসতে বলে—থাক আর পতাকা শক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে না। আনন্দ তাতে বড় একক হয়ে পড়ে। লোকটার চলার পথে থমক এনে দেয় কথার চাবুক।

—আনন্দের ভাগী আমাকেও করে নাও।

এ রকম অভ্যর্থনা লোকটার জীবনে কোন দিনই আসেনি—সাহস তাই নিয়ে এসেছিল এর পর। চারিদিকে আর কেউ নেই—সাক্ষাৎকণ্ড মেলা না। ডার্স অগ্রসর হয়—অবশ্য তখন কুমারী...

এই কলি বালুর বৃকেই শোপিঙপাত হয়—



কল্পবান দের চুবনের ছোঁয়ার...

নারী বলে—কল্পবান তো আমারই দেওয়া উচিত। কিনা আমন্ত্রণেই এই সুখী করার জন্ত।

সঙ্গে করে বাড়ী পৌঁছে দিতে চায়।

উত্তর আসে—না, মনের আনন্দ এখনও এ জায়গাটাকে ঘিরে আছে। এর মধ্যে এখান থেকে যাবার ইচ্ছা নেই।

চলে যায় সে—যাবার আগে হাতে গুঁজে দিতে চায় অপমানের চিহ্ন, ফলারের কাগজ।

গ্রহণ করে না। শুধু বলে—যদি মনে রাখতে চাও তবু খোঁজ দেখ। মাতৃ পালন করার সময় আমার নেই। তখন দিও তোমারই আনা প্রাণকে।

কাহিনীর শেষে মিসেস ডায়ান্স' উঠে টেবিলের ধারে যায়।

বলে—সাদাধরণ সোফের ধারণা, জীবনে সুখ শান্তি পাওয়া ডায়ান্সের কথা। আমি তা বিশ্বাস করি না। এটা অবশ্য সত্য যে সুখ জিনিষটা কীভাবে কাদের খেলনার মত, যেটা নিজে খেলা করে পুরুষ-নারী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে। দু'জনের দৃষ্টি যদি একই দিকে না থাকে বা দু'জনের আকর্ষণ যদি সমান না হয় তবে সেটা কোন অসতর্ক মুহূর্তে নাচে পড়ে ভেঙ্গে চূরমা হতে পারে। তাই বলে ডায়ান্স ওপর হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে সুখ আর আসবেই না কোন দিন। অন্তর্য অনাচার বাই বলুক অন্তরা, সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকলে পথ চলতে হবে ঠিক মাতালের মত। মাতাল হবার আনন্দই যে একেবারে আলাদা। এত উগ্র ভাবে পরিচুত হয় সব কিছু সে অনেক সময় অমূল্য করার শক্তি পর্যন্ত হার হারিয়ে। স্বপ্ন সুখ মনকে তৃপ্ত তো করেই না বরং কুণ্ঠা বাড়ায়! আনন্দ যৌক্তিক ব্যবহৃত জিনিষ নয়—আনন্দমানে এর ভীততা না থাকলে এই ব্যবধানকে বাঁচিয়ে রাখবে কে? আর সেজন্তই ভাগ্য অতৃপ্তিকে চাপা দিতে পারে না।

মিসেস ডায়ান্স-এর অনেক শিল্পই প্রকাশিত হয় পত্রিকা ও

কপজে। বেশ সুনামও আছে শিল্প-জগতে। তার গুণগ্রাহী দলের অভাব নেই। তারা বাণ্য মানে না—ভীড় করে প্রায়ই তার বাড়ীতে, যদিও তার দেখা পাওয়া ভার। অনেকেই আসে শিল্পীর সৌন্দর্য দেখতে তার বেশভূষার অসলয় ব্যবহারের কীক দিয়ে আর অনেক আসে শিল্পীর সত্যকার মর্যাদা দিতে। ভিন্ন পথ হলেও জইকমে জায়গা পেওয়া যায় না। যাত্রা দু-একজন নীচের তলা থেকে তার অঙ্কনশালায় প্রবেশের অধুমতি পায়। বাড়ীতে দেখা পোনার জন্ত আছে ডিক-মোজ রাজ্যে চলে যায় খাওয়া দাওয়ার পর।

সেদিনও চলে গেল বথাসময়ে। আমার গিয়ে বসি আঙনের ধারে। রেডিও অতি যুদ্ধয়ে গানের ছুর তুলিয়ে চলে।

আমি প্রের করি—শিল্প সম্বন্ধে তোমার

—শিল্প আমার মতে ষামখেয়াল মাত্র। সমাজে এর কি দল সেটা তোমারই জান বেশি—শিল্পী বহুক্ষেত্রেই সমাজের কথা ভেবে কিছু সৃষ্টি করে না। নয় এক মেয়ের বিশেষ ভলীমা শিল্প হতে পারে কিন্তু সমাজের কথা ভাবলে কখনই সে শিল্প সৃষ্টি হত না। সমাজের নিয়মমাকিক চলাফেরা করা তার স্বভাব নয়। শিল্পী মাক্রাই অনাচারী গোপনে গোপনে—কথাটা তোমাদের কিন্তু অসত্য নয় কিন্তু কেন জান? শিল্প শিল্পীর জীবনের একটা বড় অংশ অধিকার করে থাকে, স্বপ্ন দেখে সে শিল্পেরই নানান বর্ণ দিয়ে। স্বপ্ন সে শিল্পের গণ্ডী ছেড়ে বাইরে আসে, তা সে বহু সামান্য সময়ের জন্তও হোক না, সে চায় সব শিপাসা মেটাতে। অথচ সাধারণ আনন্দ আর তুফা মেটাতে পারে না। আনন্দও তাই বহু ক্ষেত্রেই বিকৃত অথবা অসাধারণ হয়ে পড়ে। আনন্দের সময়টুকু সে কখনই সমাজের মধ্যে ব্যয় করতে চায় না।

নীচের দরজা থেকে কলি বেলের আওয়াজ আমারই টেনে আসে বাস্তবতার মাঝে। মিসেস ডায়ান্স' চলে যায়। আমি চোখ বন্ধ করে তার কথার অর্থ বোঝার চেষ্টা করি।

মনে হয় কত যুগ পার হয়ে যায়—তবু তার দেখা নেই।

ভোর কথা ভাবছি, কানে ভেসে আসে চাঁৎকার—

—আমি আজ থাকবই থাকব।

পরক্ষণেই মিসেস ডায়ান্স-এর অমুরোধ—তোমার কোন দিন তো কেবাইনি, তবে আজ আমার কথা রাখবে না কেন?

—আমি এখানে আসি তোমার কথা রাখব বলে নয়।

—তবু।

—তুমি বাবে, না, তোমার জোর করে নিয়ে যেতে হবে।

অহির ভাবে উঠে পড়ি। এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি—আবার চুনতে পাই মিসেস ডায়ান্স' এর কঠোর—তোমার সঙ্গে জোর করে আমি পারব না আর তুমি কোন কিছু বুঝবেও না। একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি।



রাজেশ্বরী শিল্পী মাসিক

ফোন-৩৩-৩৮৫২ • ১০১, নতুনজাওয়ার স্ট্রিট • বনবিহার-১২ •

করেন বেলে আসে আমার কাছে।

হাত ধরে কখন—তুমি আমার সঙ্গে কি ভাবছ জানি না কিন্তু অন্ততঃ একটাখানেকের জন্য আমার কথা কর। আমি এসে তোমার সব কিছু বলব। এটুকু দয়া আমার কর।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার চলে যায়।

আমি কয়েকটা বই টেনে নিয়ে সময় কাটাবার চেষ্টা করি।

কোন এক বই থেকে একটা কাগজ মসিাতে পড়ে যায়। কোতুলক বলে পড়ে বেশি—

“জিও মিসেস ডার্মাস্,”

তোমার কথাগুলো খোঁজ নিয়ে জানতে পারছি মিসেস ম্যাকমীলান কখনো ভুলেছে কিন্তু তাহলেও তোমার ভয় নেই। আমি ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেছি এবং ডাক্তারের উপদেশ মত চললে বাচ্চার সঙ্গে এই বীজ সংক্রামিত হবার কোন কারণই থাকবে না। তার ওপর ম্যাকমীলান পরিবারে তোমার মেয়ে যে ভালভাবেই মানুষ হবে সে আশ্বাসও আমি দিতে পারি। বাই হোক এ বিষয়ে তোমার মতামত শোনার অপেক্ষার বইলাম।”

আমেরিকা থেকে চিঠিটা এসেছে গত মাসে, হয় তো এর উত্তরও এত দিনে চলে গেছে বখাছানে।

মিসেস ডার্মাস্-এর জীবনের আর একটা দিক বীরে বীরে প্রকাশ হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পরিবার হরে এল রাতের অতিথির আগমনোদ্যত। শিল্পীর শিল্প-জীবন ভুলে তার অন্তরূপ দেখার চেষ্টা করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইচ্ছা করেই ‘বইটা’ ধুলে রেখে দিই পাশে আর তার ওপর চাপা দিই চিঠিটা।

দুসবার ভাষা করলেও শেষে ঘুমিয়েই পড়ি।

কয়লা ডাক্তার শেষে ঘুম ভাঙে—মিসেস ডার্মাস্ হাঁটু গেড়ে বসে আঙুল টিক করছিল।

আমি পা টেনে নিয়ে বসতেই বলে তোমার ঠাণ্ডার রাখার জন্য ভয়ানক লজ্জিত। কিন্তু নিজেও ভো করেকটা টুকরো কয়লা দিতে পারতে।

বলি আমার তেমন শীত করছে না।

—সত্যি হবেও না। আমি এই মাত্র ঘান কয়লায় বলেই হরতো আমার এত শীত বেশ হচ্ছে।

বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করি, এত রাতে ঘান করলে।

বেশি পাশ থেকে বই ও চিঠিটা অচ্ছিন্নিত হয়েছে।

মিসেস ডার্মাস্ বলে চল পোষে চল। আমার আর দুসবার ইচ্ছা নেই। বতরূপ পারি তোমার সঙ্গে রহণ করা বাবে।

দুসখায় ইচ্ছা আমারও টিক ছিল না। তাই পোষার করেই স্নান করে মিসেস ডার্মাস্ তার বাড়ি গেলি।

বাড়ীকে ভাগ করে চলে আসলেও আমিই দুসবার ডাক ভুলতে পারিনি। বড়ই শিল্প নিয়ে সাধনা করি সেহেতু জরীতে সময় সময় শিল্পন আসে আর ওখন শিল্প নিয়ে অনেক ভুলিরে রাখা সম্ভব নয়। প্রয়োজন হয় নবনবীর সাময়িক জানক প্রচেষ্টা।

লোকটা আছে কিন্তু মনন হারিয়ে গলে গিরে সীমাক্রমে পারি না বা হায়ে বেশি করছে চাই না। সকলোময় মনন করছেন তাই নিজের বেদন দেওয়া। আসিবে এল উল্লাসটাই না হয় জিহ্বা

মনোরঞ্জন দ্বারা নিজেকে বন্ধ বন্ধ করত। বিপদ হতো অনেক সময়ই। কয়েক বার বাতায়নতের পশ কেউ কেউ আসত দাবী নিয়ে আমার প্রয়োজনেরও বাইরে। না চাইলেও তাদের সম্ভাব্য বিধানে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হত—জুয়ে, কিংবা লোকলজ্জার হাৎ এড়াতে। এই দাবীর হাত এড়ানোর জন্য বহুবারই আমার হাৎ পরিবর্তন করতে হয়েছে। এমনকি অর্থ দিয়ে পুরণের চেষ্টাও করা করিনি।

প্রশ্ন করি এভাবে জীবনটাকে ছেঁদ না করে আবার বিয়ে করা না কেন?

—বহু বার ভেবেছি সে কথা কিন্তু আটকে গেছি সন্তানের কথা ভেবে। মাতৃষ চাইনি কোন দিনই আর মায়ের স্নেহটা সবটাই গো শিল্পের দিকে। আর পোপন করার কিছু নেই—তুমি চিঠিটা পড়েছ এই মিলনের বিষময় ফল আমি বোধ করব কি ভাবে। তাই আশ্রয়ে ওদের পালন করা ভিন্ন উপায় থাকে না। মিসেস নাম থাকায় কত হাসপাতালে স্থান পেতে অসুবিধা হয় না কেবল ভাবনা হয় বৎ সময় আসে সেই শিশুর শিক্ষার। অনেকেই আশ্রম থেকে এসব শিশুদের পোষা হিসাবে নেয় কিন্তু দায়িত্ব এড়ানো জন্য সেখানে আমার সন্তানকে ছেড়ে দিতে পারি না প্রথমবারে আমার এক শিক্ষা হয়। চমৎকার হুটকুটে ছেলে—আমারি এক চেনা বান্ধবী তাকে নেওয়ার জন্য আমার অনুরোধ করে। রাজী হলাম সহজেই। অথচ একবছরের মধ্যেই ছেলে দারা যায়। ডাক্তারী রিপোর্টে জানলাম সহজ মৃত্যু ন সেটা। নিজের দুর্বলতা না থাকলে সেই ধনীসের বিলুপ্তই কে করতাম।

ভারপর থেকে স্থির করেছি, না জেনে শুনে আর কখন কাউকে দেব না।

বিয়ের মধ্য দিয়ে কোন সন্তান হলে এইভাবে তাকে বিলা পেওয়ার আইনের দিক দিয়ে অনেক বিপদ আছে। তার ও ও যে বললাম চিরন্তন এ কামনা আমার নেই অথচ ঘামিতে দাবীর কাছে মনের বিরুদ্ধেও আমার অনেক কিছু মেনে নিতে হবে।

এসব কথা জানার পর আমার ঘৃণা করবে জানি—দেশে কি বাবে হৃৎশব্দের মত দৃষ্টি নিয়ে। তোমরা আইন বাঁচিয়ে চাছিলেও ভয়ে কিংবা আইন রচায় আদর্শে। তোমরা আমায় হৃৎকে সম্মান দিলেও—শিল্পীর সমাদর কর না সব সময়। আম অবশ্য স্নেহে ক্ষোভ করি না তবে এইটুকু প্রার্থনা—যদি ভুলে বাও তবে মনে রাখ, সমাজের বাইরে থাকতে চাই বসেই সমাজে দীর্ঘ-নীতি আমাদের বেঁধে রাখতে পারে না।

কম্বার উত্তর না দিরে শুয়ে থাকি। অন্ধকারে দেখতে পাই তার মুখ। আমেরগিরির গহবরের মধ্যকার লাজ্জার মধ্যে—জালায়রী দুখারপী গলিত হাতের সঙ্গেও অমূল্য সম্পদ খানে বিজ্ঞানের ঘন থাকা চাই।

মিসেস ডার্মাস্-এর কথা বন্ধ হয় না।

—সত্যিই এডিনবারা এবার হাউতে হবে। হুৎ অজ্ঞানের ভয়। তার লোকটা হুৎ হুৎ করে আমায় নিয়ে যা

# ଆଲୋକଚିତ୍ର

ତିନି ମଞ୍ଜୀ

—ଆର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧୁ



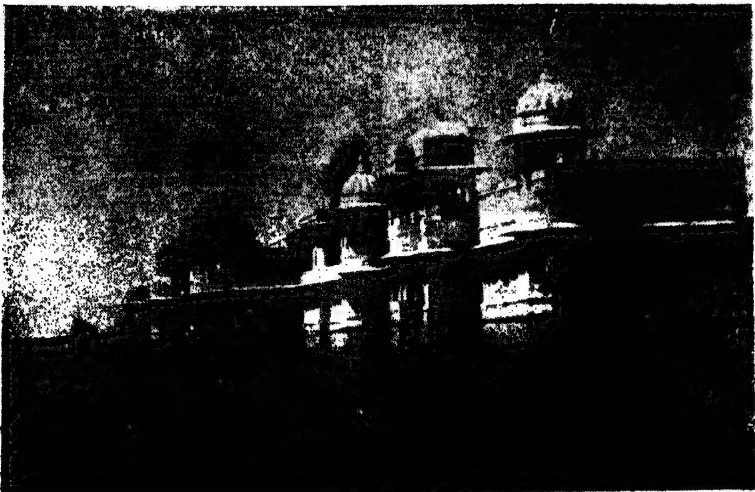
ଦଳମାମଳ (ବିବୁଧପୁର)

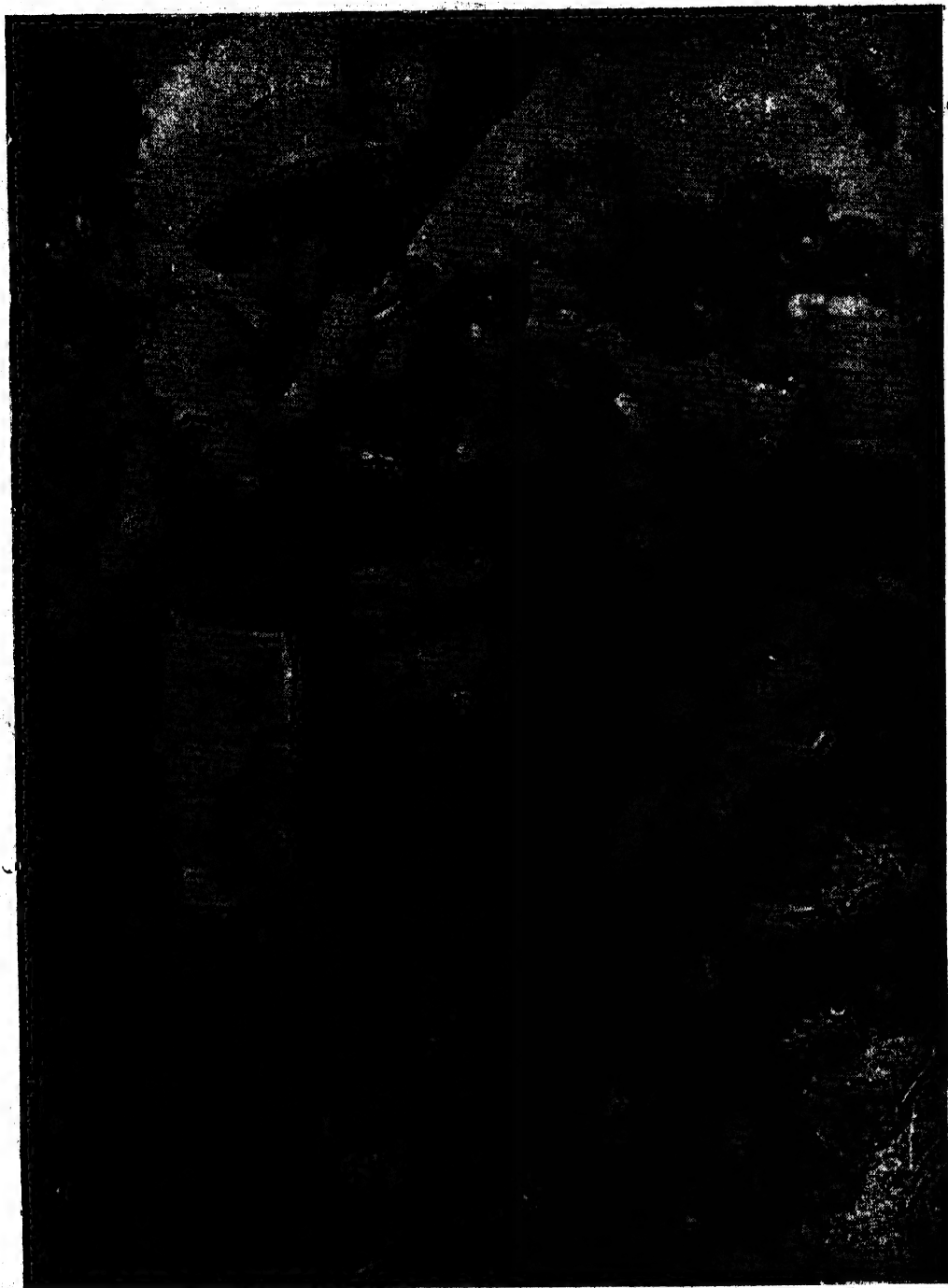
—ଅନୁଶୀଳା ଦେବୀ

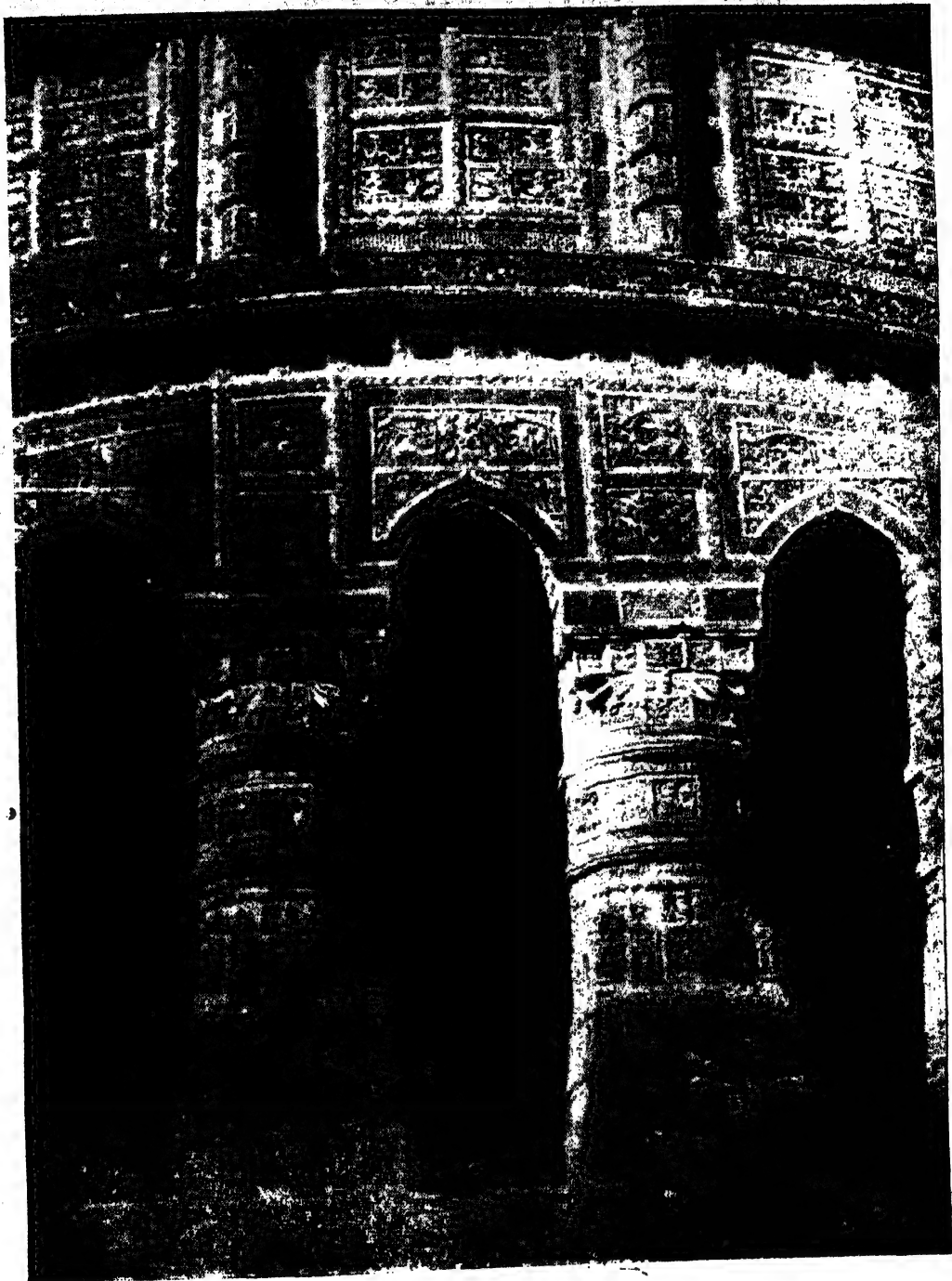


ଲେକ (ଉଦୟପୁର)

—ଅମିତୋକନ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ

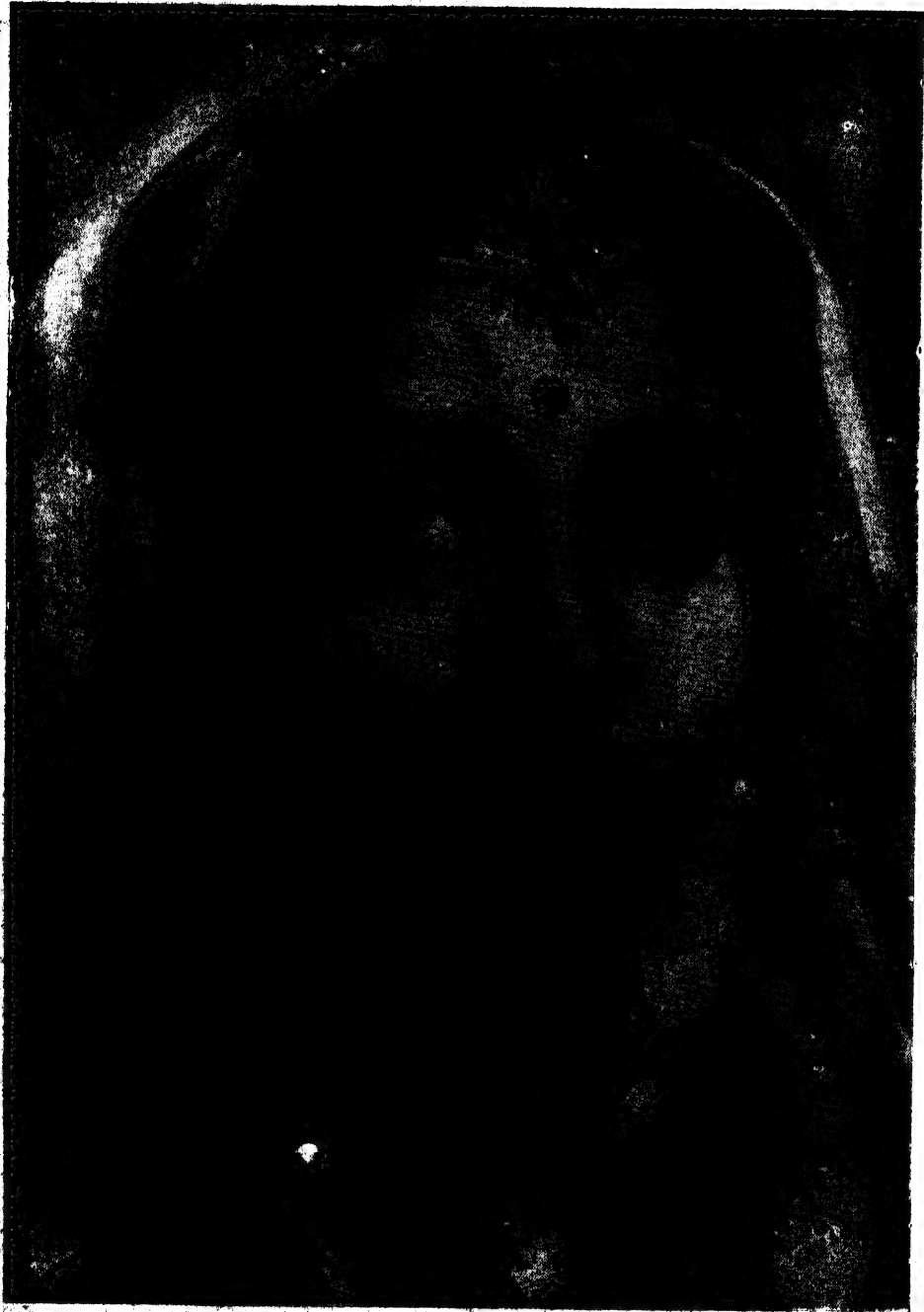






କୋଡ଼ ବାଟା ( ବିନ୍ଦୁପୁର )

—କୁଳଦୀନାଥ ମିଶ୍ର



पृष्ठ १८

— बहिर्जल

( १८१८ )

ধাক্কা দি না শেষে একদিন তার ঘরের কথাও বলে। বিয়ে করতে প্রস্তুত আছে তাও স্বীকার করে। অথচ কত ছোট, বয়েসে এমন কি মনের দিক থেকেও। শেষে একদিন স্বার্থের জন্য তাকে নিয়ে আসি বাড়ীতে। আমায় পায় প্রথম। চকল হয়ে ওঠে অথচ আমার প্রয়োজন গেছে মিটে। তার আবেদন প্রতি বাতাইত অগ্রাহ্য হতে দেখে ভুল পথ ধরে। দেখি তাকে অল্প জায়াগায় জন্তু ভাবে। ফেরাবার মত প্রলোভন আমার নেই। এখন হয়ে পড়েছে ঐম্যদ্বন্দ্ব। নারীই ওর কাছে খেলনা। প্রেমের মধ্যাদার কথা তুলে গেছে একেবারেই। আজও এসেছিল ও উম্মত্ততা নিয়ে। সেখানে নীতিকথায় দাঙ্গা হবে না জেনেই তাড়াতাড়ি পারিনি। অথচ নিবেদনের পর কি প্রশান্ত উদার মৃতি! এখন যদি দেব ভাবতেই পারবে না কয়েক ঘণ্টা আগে সে এমন ভাবে মনুষ্যত্ব তুলে পত্তর মত কামময় হয়ে উঠেছিল।

বাধা দি—তোমার বিছানায় শুয়ে রইল আলেক আর তুমি এখানে।

—তুমি ভাবছ কি ভাববে ঘুম ভেঙ্গে আমায় দেখতে না পোলে। দৈনিক সম্পর্ক শুধু যেখানে সেখানে ওসব ভাবনা আসবে কি করে। ভয় নেই, ঘুম ভাঙ্গলে আপনাকে থেকেই আলেক চলে যাবে বাইরে। তা সে যত রাগেই হোক না কেন। পাড়ে থাকবে কাগজে লেখা ছুটা কথা—ধন্যবাদ প্রিয়।

—একটা কথার সত্যি জবাব দেবে।

—জানা থাকলে নিশ্চয়ই দেব।

—কখনও কাউকে ভালবেসেছ?

—হ্যাঁ, আমার শিল্পকে।

—মাতুলবের মধ্যে?

—ঠিক জানি নেই, তবে আলেকের জন্য কিছুটা চিন্তা করি। বড় দুর্বল চিত্ত, কাজকে অবলম্বন না পোলে পথ চলার ক্ষমতা নেই ওর।

—ওটা ভালবাসা নয়, সহানুভূতি। ভালবাসা থাকলে তার অবিধাসের কোন কাজ করতে পারতে না তুমি।

—তাই যদি বল তবে স্বীকার করব মাতুলকে ভালবাসিনি কোন দিনই।

—শেখ জীবনের অবলম্বন কি হবে?

—কেন শিল্প।

—পারবে শেখ জীবন পর্যন্ত তুলি ধরতে?

—শিল্প সৃষ্টি করার শক্তি শেষ হলেই কি শিল্পীর মরণ হয়? শিল্পজগত থেকে সে বিসর্জিত নিতে পারবে কিন্তু তবু তার মান করার কিছু আছে সাধনার ঐশ্বর্য দিয়ে। অবশ্য সে বাঁচার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তবু মরণে আমার বড় ভয় বতস্পর্শ না সে মরণ আসে সৌন্দর্যময়ী হয়ে। অপেক্ষা করে থাকব সেই শিল্পের জন্ত।

সারা রাত ধরেই হয়তো মিসেস ডায়ার্স কথা বলে গেছে। আমি শুনেতে পাইনি সব। কথা শেষ হবার অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছি।



উৎসবের দিনে



ক. হোডের

মুবাঙ্গিত  
প্রমাধীন মাছাঙ্গী

ক. হোড এন্ড কোং

কলিকাতা-১৪



## ভাঙুর গান খ্রীষ্টানরাগোপাল ঘোষ

ভাঙুর গান আর খেঁচুর গান পশ্চিম-বাংলায় বহু প্রচলিত লোক-সঙ্গীত। এই দুই প্রকার গানকেই লোকসঙ্গীতে একটি ভাবেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু ভাঙুর গান যেন একান্তই বীরভূমি জনপদের নিজস্ব। পূর্ববাংলার জারিগান—শারিগানের মত এই ভাঙুর গানেরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণতঃ ভাদ্র মাসের প্রথম হ'তে শুরু করে সারা ভাদ্র মাসই এ গান চলে থাকে। "ভাঙু মা"-এর পূজাকে উপলক্ষ করে এ অঞ্চলের বাগদী-হাড়ী-ডোম প্রভৃতি নিরস্ত্র শ্রেণীর লোকেরা ভাঙু মায়ের পুতুলারূপে প্রতিমাকে সঙ্গে নিয়ে লোকদের দরজায় দরজায় এ গান করে থাকে। সঙ্গে মর্ন্তকীবেশী একজন পুরুষ থাকে। সে যখন নাচে তখনই বিশেষ বিশেষ সুরে এই ভাঙুগান পাওয়া হয়।

এই ভাঙুমা কে বা কোথা হ'তে এই 'ভাঙু মা'র পূজার প্রচলন হ'ল এ নিয়ে গবেষণার অন্ত নাট। বিখ্যাত গ্রন্থ "Hasting's Encyclopaedia of Religion & Ethics" এর "Bagdi" শীর্ষক প্রবন্ধে আছে :—

"They also parade the Effigy of a female saint named Bhadu who is said to have been daughter of the Raja of Puchet and who died a virgin for the good of the people. Her worship consists of songs and wild dances in which men and women and children take part.—( vide Vol 11 p p 328. )

উদ্ধৃত বিবরণ থেকে আমরা পাই ভাঙু Puchet-এর রাজার কন্যা; যিনি লোকের মঙ্গলের জন্য আত্মবীণ কুমারী ছিলেন। এর সঙ্গে ভাঙু সম্পর্কীয় প্রচলিত গল্পেরও কিছু মিল আছে। প্রচলিত গল্পে আছে—মানভূমের রাজার একমাত্র কন্যা ভাঙুমণি। কিন্তু রাজার মনে অশুভ নাই। কন্যা কৃষ্ণপ্রসবে মাতোয়ারা। বিয়ে করতে চায় না। এই ভাবে কুমারী অবস্থায়ই অকালে তার মৃত্যু হয়। রাজা কন্যাকে পাগল হ'য়ে বান। পরে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে কন্যার মৃত্যুকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য অগ্নিশ্রম নিরস্ত্রশ্রেণীর লোকদের মধ্যে ভাঙুর পূজার প্রচলন কুজেন।

প্রচলিত ভাঙুগানেও এই মানভূমের রাজার উল্লেখ আছে। গানের মধ্যে আছে :—

"এল ভাঙু কোথা হ'তে, কে পারে ভাই সন্ধান দিতে।

তুনেহিলাম মানভূমেতে রাজবাড়ীতে জন্ম হয়।"

আরও একটা গানে আছে :—

"ভাঙু আমার রাজার মেয়ে, পণ ছিল যে করবে না বিয়ে."

ইত্যাদি।

এইটাই ভাঙুর উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রচলিত মতবাদ। আরও একটা কারণে এই মতবাদটি পুষ্টি হ'য়েছে। মানভূমের আদিবাসী "ওরাও"দের মধ্যে ভাঙুপূজার অল্পরূপ এক উৎসব দেখা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, বীরভূমির এই লোকগীতির উৎস সন্ধান বাংলার প্রত্যন্তপ্রদেশে বহু মানভূম পর্য্যন্ত বাঙালি প্রযোজন নাই।

বীরভূম এবং বীরভূমের সীমান্তবর্তী বর্ধমানের অংশবিশেষেই ভাঙুগান সম্বন্ধিক প্রচলিত। সততঃ পশ্চিমবাংলার এই অঞ্চলেই ভাঙুর গানের উৎপত্তি অসম্ভব নয়। পশ্চিমবাংলার প্রায় মাসের মধ্যেই ধাতুযোগাঙ্গের সমাপ্তি ঘটে। ভাদ্র মাসে বাগদী-হাড়ী প্রভৃতি শ্রেণীর কৃষি-শ্রমিকদের প্রচুর অবসর। বর্বার জাতি অপনোদন-প্ররাসী এই কৃষি-শ্রমিকেরাই ভাঙুপূজা তথা ভাঙুগানের সৃষ্টি ও প্রচলন করেছে "ভাঙু মা" বৈদিক বা পৌরাণিক দেবতা শ্রেণীতে পড়ে না। এমন কি, মঙ্গলকাব্যের যুগেও ভাঙুর কোন ধারণা ছিল ব'লে মনে হয় না। যদিও ভাঙুগানকে কোন কোন অঞ্চলে ভাঙু-মঙ্গল ব'লে উল্লেখ করা হয়। ভাদ্র মাসকে চারটি কথার বলে "ভাঙুর" মাস। এই "ভাঙুর" মাসে এই উৎসব হয় বলেই একে বলা হয় ভাঙুর গান বা ভাঙুর গান। সারা ভাদ্র মাস গান ও উৎসবের শেষে সার্কান্ডির সিন বখারীতি অধিবাসের পর বিসর্জন হয়। এই বিসর্জন উৎসবের আবার বৈশিষ্ট্য আছে। একসঙ্গে অনেকগুলি ভাঙুর গানের দল একস্থানে মিলিত হয়। তাদের মধ্যে সেখানে কবিগান, তরঙ্গার মত গানের পাঠ্য চলে। উপস্থিত শ্রোতা সাধারণ উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টের বিচার করে।

ওরাওদের মধ্যে অল্পরূপ উৎসবের প্রচলন দেখিরাই ভাঙুগান মানভূমের সৃষ্টি ব'লে মনে করবার কারণ নাই। ওরাওরাও বাগদী-হাড়ীদের মত অনগ্রসর নিরস্ত্র শ্রেণীর জাতি। কাজেই বাংলার এই ভাঙু উৎসবের দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।



চলিত প্রবাদগল্গ যেকেই ভাড়াগানের কবিরা গান লিখেছেন  
ক' Hastings সাহেব সেই সমস্ত প্রবাদ ও গান থেকেই তাঁর  
এককের উপাধান সংগ্রহ ক'রে থাকবেন। যাই হোক, ভাড়াগানের  
মাসিকতা নিয়ে বর্তমান রচনার কলবর বুদ্ধি অব্যাহত।

বাংলার লোকসঙ্গীতের এই শীর্ষধারাটি কিন্তু আজও  
প্রবহমান। প্রত্যেক বছরেই কিছু কিছু নতুন গান গুরুর গানের  
দারকে পুষ্ট করে। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাড়াগানের  
বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন হয়। গুরুর বাগদী-হাড়ী প্রভৃতি শ্রেণী  
নানাবিধে অনগ্রসর ছিল, তখন ভাড়াগানও একটি বিশেষ ভঙ্গিতে  
রচিত ও গীত হত। বৈচিত্র্যহীনভাবে একই গান বছরের পর বছর  
একই সুরে চ'লে আসত। যেমন :—

(১) চল্ ভাড়া চল্, মাগে এল জল্,

জামাকাপড় ভিজ্ গাল্...।

(২) “আমার ভাড়া, সোনার বাহু, হাতে সোনার গহনা।”

(৩) “ভাড়া যাবে কলকা-আ-তা-আ।” ইত্যাদি।

কিন্তু স্বাধীনতার যুগে নিম্নশ্রেণীর সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাড়া-  
গানেরও পরিবর্তন এসেছে। এই যুগের ভাড়াগানের মধ্যে এই শ্রেণীর  
লোকদের সাম্প্রতিক সচেতনতা ও সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে তাদের  
পরিচয়ের কথা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে এইরূপ কয়েকটি ভাড়া  
গান আলোচনা করা হচ্ছে।

৪৭ সালে স্বাধীনতার সঙ্গে বাংলামারের অঙ্গচ্ছেদ ঘটল। এটা  
ভাড়ার গানের শিল্পিসমাজ ঠিকমত গ্রহণ করতে পারল না। এই  
দুঃখ-খেদের কথা ফুটে উঠল তাদের ভাড়াগানে :—

“দুখের কথা বলব কারে ওগো ভাড়া।

সোনার বাংলা ভাগ করিল কোন হতভাগা।

মুসলমানরা পাকিস্তানে, তাড়াল ভাই ডিসিগাণে,

বাস্তহারা কেঁদে সারা, দুখের নাই মা সীমা।

এই বাস্তহারাদের দুঃখে ভাড়াগানের কবিরা বিচলিত হ'য়েছিল।  
নিজের বাস্তবতা থেকে উৎখাত হ'য়ে লক-লক বাস্তহারা ভাই বখন  
অসহায় নিরাশ্রয় ভাবে কলকাতার পথে পথে, হাওড়া শিয়ালদ'র  
প্লাটফরমে এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কক্ষচ্যুত নরকের মত ছুটে  
বেড়াচ্ছিল তখন তাদের প্রতি কার না করুণা জেগেছিল? তাদের  
বেদনার সুর ভাড়ারগানেও ছুড়ে ছুড়ে উৎসর্গিত হ'য়েছে :—

“(ভাড়া) বাংলাদেশের কাজাল ছেলে

রয় কত উপবাসে।

পরনেতে নাইক টেনা

মরে কত আপশোবে।

পেট ভরে সব পায় না খেতে

বাস করে এই বাংলাদেশে।

(ঝা) তাদের বিনালোবে মারতে আসে

প্রবল প্রতাপ পুলিশে।”

আরও আছে :—

“কত কত অপণিত বাস্তহারার দল।

খালিপেট পথে পথে কেলেছে চোখের জল।”

সরকারী পুনর্বাসন নীতিরও কঠোর সমালোচনা পাওয়া যায়।

বাস্তহারাদের পরিহাসের সুগমিকল্পিত প্রহসন। সরকারের উপর  
বিশ্বাস হারিয়ে ভাড়া-এর শরণ নিয়ে বলা হ'য়েছে :—

“ভাড়া তুমি মন্ত্রী হ'য়ে কর পুনর্বাসন।”

এখনকার মন্ত্রীদের মত

তাদের ক'র না নির্বাসন।

এর পরেই এল স্বাধীনতার দ্বিতীয় অভিশাপ “লোভি” বা “কর্ডন”  
প্রথা। পল্লী অঞ্চলে জনমন বিক্ষুব্ধ হ'ল। আর সেই বিক্ষোভ  
এসে সাড়া দিল ভাড়ার গানে :—

“আয় মা ভাড়া, আয় মা ঘরে হেরে তোরে প্রাণ জুড়াই।

বা ছিল খান দেশের সরকার

“লোভি”তে সব করলে উজাড়

কি খেয়ে যে বছর যাবে, মনে হ'ল ভাবনা তাই।

দেশের লোকের যখন এই অবস্থা তখনই কলকাতার ট্রাম  
কোম্পানী ভাড়া বাড়াল। সে কথা পল্লীর লোকদেরও অবিস্মৃত  
রইল না। কলকাতার “এক পর্যা-আন্দোলন” এ সহায়ত্ব  
দেখিয়ে ভাড়া গানের সুরেও এই অহেতুক মুনাফার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ  
ধ্বনিত হ'ল :—

“কলকাতাতে ট্রামের ভাড়া,

বাড়িয়ে দিলে ভরার।

লাগিয়ে লোঠা,

লাঠিপেটা,

কতই যে খুন ঘটল হার।”

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা  
খুবই স্বাভা-  
বিক, কেননা  
সবাই জানেন  
ডোয়ার্কিনের  
১৮৭৫ সাল  
থেকে দীর্ঘ-  
দিনের অভি-  
জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন বছরের প্রয়োজন উন্নয়ন ক'রে নৃত্য-তালিকার  
লভ দিয়ার।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এন্সল্যান্ডেড ইন্সট, কলিকাতা-১

বাংলা মায়ের বাঁহা ছেলে শ্রামাঙ্গদের রহস্যজনক অপ্রত্যাশিত ইচ্ছা স্বাধীনতার বাংলার এক বিশেষ ঘটনা। সারা ভারত যখন শ্রামাঙ্গদের শোক মুহূর্ত, বাংলার নিয়ন্ত্রণে এই শিল্পীদের বুকও তখন এ বেদনা বেজেছিল নিদারুণ ভাবে। তাদের কাছেও এটা ছিল অপ্রত্যাশিত :—

“কে সাধিল ভাঁহু সাথে বাদ  
সাধ ক’রে কাশ্মীর ঘরে  
এল না শ্রামাঙ্গসাদ।

বল ভাঁহু কেমন ক’রে  
মায়ের প্রাণে ধৈর্য ধরে...।

গোরা-অভিমান আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিদেশী-কবলিত গোরা প্রতীকিক ভাবতত্ত্বের আলোচনায় তখন ভারতের আকাশ-বাতাস চকল। দেশমাতা নেতাদের নেতৃত্বে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকের দল গোরা প্রবেশ করছে। বাংলার ঘরের ছেলে “চাকুদা” (ত্রিদিব চৌধুরী, এম. পি.) তখন গোরা প্রবেশ করতে কুতসঙ্কল্প। সে কথা পরীক্ষার কানে কানে প্রচারিত হল। মনে মনে শুভপ্রচেষ্টা অভিনবিত হ’ল। ভাঁহুগানের কথাশিল্পী লিখলেন :—

“গোরা চল, গোরা চল,  
চল ভাঁহু গোরা।  
জাতীয় পতাকা হাতে  
চল ভাঁহু গোরা।  
তুমি যদি না যাবে মা!  
ভারতের মান রবে না।  
হ’য়ে ভারত ললনা (ভাঁহু)

যাবে কি মান খোঁওয়া।  
চল ভাঁহু গোরা।”

জাফলিক দুঃখ-দুর্দশার কথাও ভাঁহুর গানে ফুটে ওঠে। সেচ-পরিষ্করণের মাছেরে সুখস্ববিধার সঙ্গে দুঃখও এসেছে। নতুন পরিষ্করণের অসং বিভাগীয়-কর্মচারীদের কর্মশৈথিল্যে লোকের নানা দুঃখ ফুটেছে। সময়মত জল না দেওয়া, অর্থের বিনিময়ে কুপারানে পক্ষপাতিত্ব এবং সময়ে অতিরিক্ত জল সরবরাহের সোবে শত শত লোকের ঘর বাড়ী মাঠ ফসল ভেসে গিয়েছে। অসং এই কর্মচারীদের সোবে সরকার পল্লীর জনগণের কাছে অগ্নির হ’তে চলেছে। এই সব উল্লেখ সাম্প্রতিক ভাঁহুগানে দেখা যায় :—

“কে ক্যানল আনলে ভাঁহু দেশে গো?  
ও মা যেসানলোয়ের জলের তোড়ি  
ঘর-বাড়ী যার ভেসে গো।

খাল কেটে কুমার আনা  
হ্যান্ডিন মা ছিল জানা  
এ যে খাল কেটে মা কি এনেছে  
দেখে বাও মা এসে গো।

যার আছে ভাঁহু টাকা কড়ি  
সেই জল পার তাড়াতাড়ি  
“জলবিক্রয় বাবু” নীহু ছেলে  
উঁহু গিলে, জল দেয় না যেসে গো।

ট্যাসকো দিরে ক্যানল বাবু  
ধমক খাই মা ঠেসে গো,  
তবু সময়মত কেতে দিতে  
আমরা জল পাই না শেষে গো।  
কে ক্যানল আনলে ভাঁহু দেশে গো।”

জাবিগান সারিগান ও অন্তান্ত পরীক্ষাতির মত ভাঁহুর গানেও রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব এসে পড়েছে। ভাঁহুগণি যেন কৃষ্ণবিরহিণী রাধা। কৃষ্ণপ্রেমমূলক অনেক ভাঁহুগান প্রচলিত আছে। বাহলা ভরে করেকটির অংশবিশেষ উল্লেখ করছি :—

- (১) “সোহাগিনী ভাঁহুমাণ, শ্রামগরবের গরবিনী,  
প্রেমভরঙ্গের তরঙ্গিনী চিন্তামণি যে।  
ছিল ভাঁহু বিন্দাবনে, গোপনে নিকুঞ্জ বনে,  
মনে পড়ল এত দিনে তাই এস ফিরে।”
- (২) “ভাঁহু আমার রাজনন্দিনী, কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী।
- (৩) “(ও সে) ভূলায় রূপে কালোসোনা  
অজানা তার কিছু নয়।”
- (৪) “তুমি যে প্রেমতরঙ্গিনী,  
কৃষ্ণভাবে-ভাবিনী, ওগো ভাঁহুমাণ।”

এই সমস্ত নানা দিক আলোচনা করলে বাংলার পরীক্ষাতির সঙ্গে ভাঁহুগানের নিবিড় যোগটি ধরা পড়ে। নিয়ন্ত্রণের লোকদের মধ্যে প্রচলিত বলে ভাঁহুগানের কথাতে কিছুটা অলীকতা লেগে থাকে, অগুট হাতের লেখা বলে স্থানে স্থানে হুলস্থলন ঘটে। কিন্তু বিশেষ সুরে গাইবার সময় সে হুলস্থলন কানে বাজে না। ভাঁহুগানের কবির প্রাচীন যুগের চারণদের মত গানের মধ্যে দিয়ে অশিক্ষিত সস্ত্রায়কে বেশ সবুজ সজাগ ক’রে দেয়। এমিক দিয়ে তাদের দান কম নয়। ’৪২ এর আলোচনায় সময় রচিত করেকটি গানের উল্লেখ না ক’রলে বোধ হয় প্রবন্ধের অজহানি ঘটবে। দেশনেতাগণ তখন বিদেশী শাসকের কার্যকর। তখন ভাঁহুর গান বার হ’ল :—

“হায় কি মনুন্ শাসন এসে ভারতে।  
বিনাবোষে হায় পুলিশে আসে গুলী ঢালাতে ॥  
কারাগারে বন্দীরা সব হায় কি কষ্টে কাটে দিন;  
অনশনে দিনে দিনে হয় যে তাদের তত্ত্ব দীপ।

কারাগারে বন্দীর প্রাণে দাঁও হে ভাঁহু শান্তিবারি  
ক’সবধ ধ্বংস কর প্রকাশ হও স্বরূপেতে ॥”

সুখের কথা, লোকসঙ্গীতের এই ধারাটি সভ্যতার চোরাহালিতে আজও হারিয়ে যায় নাই। বছর বছর ভাঁহুর আগমন ঘটছে, সাধা ভাঁহুমাণ পূজা পাওয়ার পর আবার বছরের মত তার বিস্ময়ন হচ্ছে। বাওয়ার সময় পরীক্ষাতি ভাঁহুগণিকে বার বার বলে দিচ্ছে :—

“এসো ভাঁহু বছর বছর সোনার বাংলায়।  
ক’রে আবার বসন্ত কে হাঁড়তে রায় ভোমার সব।

## আমার কথা (৩৩)

## ঐশ্বর্য্যাক্ষ পাল

ভারতবর্ষের মহিমাযিত্তা রূপ বহুলাংশে প্রতিভাত হয়েছে সঙ্গীতের মাধ্যমে, আবার ভারতীয় সঙ্গীতও নানাভাবে পুষ্ট হয়েছে তার লোকসঙ্গীতের কলাপে। আজকের দিনের নগর-সঙ্গীতের তুলনার এর অবলম্বন ও ঐতিহ্য আরও বিরাট। কবে যে এর জন্ম হয়েছিল তার তারিখ খুঁজে বার করতে ইতিহাস আজও অপারগ। ভারতের সেই স্ববর্ণমণ্ডিত দিনগুলিতে এসের প্রভাব ছিল অনতিক্রম্য। নরনারীর জীবনে মাথানো ছিল সেদিন সঙ্গীতের একটি মধুর প্রলেপ।

সেই স্বর্ণযুগেই বাঙলার কবি কবিকল্প মুকুন্দরামের লেখনী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল চণ্ডীমঙ্গল। প্রত্যেক বাঙালীর পরমাব্যর্থ গ্রন্থ। সেদিনকার সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করল সঙ্গীতজ্ঞদের কলাপে। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল-এর কাহিনী বাঙলার ঘরে ঘরে পৃথিতিত হ'ল 'চণ্ডীর গান' নামে। এর গায়কদের মধ্যে আজকের দিনে একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ ঐশ্বর্য্যাক্ষ পাল।

বর্ধমানের বাণীগঞ্জবাজার অঞ্চলের স্বর্গীয় রাজনারায়ণ পালের পৌত্র ও গায়ী রামকৃষ্ণ পালের পুত্র ঐশ্বর্য্যাক্ষ পাল ১২১৪ সালের শ্রাবণ মাসে (১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করলেন। জন্মসময়ই সঙ্গীতের আবেষ্টনীর মধ্যে। ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছেন শিশু-পিতামহের মধ্যে সঙ্গীতের চর্চা। হুকে-বাঁধা বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ঘরে রাখতে পারল না শ্যামকৃষ্ণক; কাজ চালানোর মত বিজ্ঞা আয়ত্তে আনলেন শ্যামকৃষ্ণ। তার পরেই সঙ্গীতে করলেন পুরোপুরি ভাবে আত্মনিবেশ। সেই জীবন আজও অস্বাভাবিক। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন, বাহ্যিকের বালাই নেই, নেই আত্ম-নিবাসের প্রচেষ্টা। খাঁটি বাঙলা দেশের জীবনধারা। প্রথমে বাবার সম্প্রদায়ে গান গেয়ে এসেছেন, বর্তমানে নিজেই সেই সম্প্রদায়ের প্রধানের পদে সমাসীন। ঐরামপুরের ক্ষেত্রমোহন সাহা'র মেলা ছাড়া কলকাতার পূজ্যপাদ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, বটকৃষ্ণ পাল, চক্ৰবর্ত্তীর ললিতমোহন সিংহরায় প্রভৃতি আরও অনেকের গৃহেই গান শুনিয়েছেন শ্যামকৃষ্ণ। তা ছাড়া বর্ত্তমানে প্রত্যেকটি দেবীপূজার প্রথম নটি দিন অত্যন্ত অপূরণীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের প্রাসাদে (১২ এসনকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলকাতা-৬) তাঁর পৌত্র মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহনের পূর্ণপোষার—সম্প্রদায় শ্যামকৃষ্ণ গান শুনিতে থাকেন।

চণ্ডীর গান প্রসঙ্গে শ্যামকৃষ্ণের কাছে বা জানা গেল, মোটামুটি তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র চণ্ডীমঙ্গল গীত হতে প্রায় এক মাস সময় লাগে। চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথির সমগ্রাংশ মুকুন্দরামের রচনা, তবে গানের সময় বিভিন্ন গায়ক নিজস্বের স্ববিধে অল্পবরী বিভিন্ন সলোপ হোপ করে দিয়েছেন—এই সলোপগুলি মুকুন্দরামের নয়। চণ্ডীমঙ্গল

বসিকথণ্ড। প্রথম খণ্ডে সতী ও তাঁর দেহত্যাগের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে কালকেতু ও ফুলবার কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে চিত্রিত আছে, শ্রীমন্ত সনাগরের কাহিনী।

সত্যোত্তীর্ণ শ্যামকৃষ্ণক বলি—তোমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বল, আজম্বার হার মধ্যে ডুবে রইলে আজ একাত্তরে পা দিয়ে সে সম্বন্ধে কি অভিজ্ঞতা তুমি সক্ষম করলে?—“খুব খারাপ বাবু, খুব খারাপ—কি আর বলব, আপনারা সবই তো দেখছেন—এ সব গানের এখন আর কদর নেই বাবু, এখন আর কদর নেই—আমাদের ছেলেবেলায় কি দিনই সব দেখেছি বাবু, এই সব বাড়ীতে শুধন কি সমারোহের সঙ্গে গান গেয়ে গেছি। আমবা তো এখন বোকা হয়ে বেঁচে আছি।”

ভারতে অবাক লাগে যে, একটি মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন, অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে কি আকাশ-পাতাল ওলোট-পালোট! ঠিকই বলেছেন শ্যামকৃষ্ণ—নতুন যুগের নতুন টেট আসছে দুধার বেগে—বিগত যুগের খিতিয়ে পড়া জলপ্রোতের কোন আবেগনই তাকে টলাতে পারবে না। কিন্তু তবু—তবু বা পুরোনো বা প্রাচীন তা কখনই আজকের দিনে আর অবলুপ্ত হতে পারে না—তা বেঁচে থাকবে সঙ্কুচিত ইতিহাসের জোরে। সোকের মুখে হয়তো আর পোনা বাবে না কিন্তু মনের দেওরালে কান পাতলে নিশ্চয় পোনা বাবে তার ভিতরে স্নানিত হচ্ছে সেই “ফুলবা বললেন...”



ROY COUSIN & CO.  
4, DALHOUSIE SQUARE  
CALCUTTA-1

Sole Agents for  
COVENTRY WATCHES  
Official Agents for  
OMEGA & TISSOT WATCHES



## পারিবারিক বাজেটের প্রশ্ন

‘স্বাধীন কৃষা ঘৃণা পিবে’ বলে যেমন একটি কথা আছে, তেমনি ‘আর বুঝে ব্যয় কর’—এইটিও একটি মন্ত্র দাবী। প্রথমতঃ

সমাজ ব্যবস্থার কারণেই আমাদের জীবনযাত্রা অনিশ্চিত এবং অনিশ্চিত বলেই বাজেটের অর্থায়ন হিসাব করে দিন চলার প্রয়োজন উঠে। এর বিপক্ষেও যে কঠিন যুক্তি দেখান হয় না, এমন নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে বাজেট বা আয়ব্যয়কের ধার ধারেন না, এখনও সমাজে এমন লোক বা পরিবারের সংখ্যাই বেশী।

বিশেষতঃ কিছু পারিবারিক বাজেট প্রসঙ্গটি নিয়ে রীতিমত গবেষণা চলেছে চিত্তাশীল মহলে। সম্প্রতি এ সম্পর্কে এমন কি জনমত আহ্বান করা হয়েছিল সংবাদপত্র মাধ্যমে। তাতে দেখা গেছে—এটি দশটি পরিবারের মধ্যে ছয়টি পরিবারেই আগে থেকে আয়ব্যয়কারী ব্যয়ের কোন বাজেট থাকে না কিংবা সাধারণ ভাবে জমা-খরচটা পর্যাপ্ত রাখবার ব্যবস্থা নেই। দশটির ভেতর মাত্র তিনটি পরিবার বাজেট করে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করেন এবং অবশিষ্ট একটি পরিবার চেষ্টা করেও বাজেট রেখে চলতে পারেন না।

এখন প্রশ্ন—উপরের তিনটি প্রশ্নের মধ্যে কোনটি ঠিক অর্থায়ন আদর্শ পরিবারের সজ্জা দাবী করতে পারে কারা? পারিবারিক বাজেট রাখা কি আসলে ভাল, না এই ব্যবস্থা বা পদ্ধতিতে মানুষ উপরই শুধু চাপ পড়ে এবং সময়ই অপচয় হয়? পক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা করা হয়ে থাকে, সেগুলো একে একে এই ভাবে বলা যায়।

পারিবারিক বাজেটের পক্ষে প্রথম যুক্তি—এতে অবস্থা বা প্রয়োজনানুসৃত ব্যয়ের হাত থেকে বাঁচা যায় এবং মানুষকে ইচ্ছা করে তোলে মিতব্যয়ী, সর্বাঙ্গব্যবহারী বা অর্থসঞ্চয়ী থাকবার জরুরী দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এইটি একটি প্রকৃত ব্যস্থা। একে ভাল প্রমাণিত করার চেষ্টার অংশ পক্ষ যুক্তি দেখান—পারিবারিক বাজেট করে চললেই আশাহত মিতব্যয়ী হওয়া যায় না। পরন্তু আর বুঝে ব্যাখ্যা ব্যয় করতে অভ্যস্ত নয়, ধরনের বাজেট করা তাদের পক্ষে একদম অসম্ভব। আর ব্যাখ্যা আর অর্থপাত্রে ব্যয় করতে বন্ধপরিকর, বাজেট বন্ধ না করেও তাদের চলে। আসলে জীবনযাত্রা নির্বাহে যে জিনিসটি চাই, সে হচ্ছে ইচ্ছা-শক্তি, সংযম ও সাধারণ জ্ঞান (কমনসেন্স)।

বাজেট রেখে চলার সমর্থনে দ্বিতীয় যুক্তি—এই ব্যবস্থার বড়রকম খরচের দায় নেটা লম্বায়ে আসতে পারে বা আসবে, সেটা

নজরে থাকে এবং তার জন্য আবশ্যিক প্রস্তুতিরও সুযোগ হয়। আরও সোজা ভাষায় বলা চলে, অতিরিক্ত ব্যয়ের টাকাকটা আলাদা করে রাখা যায় এতে আগে থেকেই এক পরে প্রয়োজনের মুহুর্তে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা বা অসুবিধার পড়তে হয় না। এইখানেও বিজ্ঞানবাদীরা যুক্তিসঙ্গত বলবেন—বাস্তবিকতা-সর্বত্র বর্তমানকে অস্বীকার করে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে নিয়েই বাজেটের যতকিছু ব্যয়গরি। অথচ কার্যক্ষেত্রে অর্থায়ন জরুরী অবস্থা সত্যি এসে গেলে বাজেটের অর্থ ধরে কোন কাজ হয় না, পরন্তু অন্ততঃ তখনকার মত বাজেট নির্বন্ধ বলেই গণ্য হয়।

দ্বিতীয় যুক্তি—সুপরিচালিত ও সুচিন্তিত ভাবে বাজেট তৈরী হলে আর্থিক বিরোধ, উৎসর্গ ও অনিশ্চয়তা হ্রাস পায় কিংবা আসে থাকে না। নিজের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্পর্কে নিজে সব সময় সম্যক সচেতন থাকা যায়, সুতরাং চলবার জন্য অত্যধিক মাথা ঘামাবার প্রয়োজন এতে প্রায় থাকে না। প্রতিপক্ষের কঠোর তৎপরতা যুক্তি শোনা যাবে—বাজেট করে চলতে গেলেই বরং উৎসর্গ ও অপারাজিত সারাক্ষণ মন জুড়ে থাকে, হিসাবের খুঁটিনাটির বাইরে যে যে স্বস্তির সুযোগ এতটুকু যেন উঠতে নেই। এমন কি, এই অবস্থিত রীতি অনুসরণের ফলে পরিবারের লোকজনদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয় এবং মনের অমিলও দেখা দেয়। কারণ খরচের ব্যাপারে প্রত্যেকেরই হাত-পা থাকে কঠিনভাবে বাঁধা।

চতুর্থ যুক্তি বা বাজেটের সমর্থনে উপস্থিত করা হয়—এই রীতি বা ব্যবস্থার জটিল উপায়ে অবস্থা অর্থব্যয় নিরোধ হতে পারে। প্রথমতঃ, এতে অজিত অর্থের কোথার অপচয় হচ্ছে, সেইটি ধরবার সুযোগ হয় এক তখন সেই ছিন্নপ্রাণ রুদ্ধও করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, আগে থেকে নির্দিষ্ট খাতে অর্থ-ব্যয়াদ থাকার ইচ্ছার তাগিদে হঠাৎ কিছু ক্রয় করতে বাওয়া কঠিন হয়। এই যুক্তি দ্বারা মনেতে চায় না, তাদের বক্তব্য—বাজেট রাখতে যে যে স্থ করেও ইচ্ছা মাত্র কোন পণ্য বা আসবাব ক্রয়ের সুযোগ থাকে না। পক্ষান্তরে উল্লেখ্য সব সময়ই একটা পরিকল্পনা করে কেনা-কাটার দাবী থাকে এক ধরা-বাঁধা সুস্থের ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণ ভাবে দিনাতিপাত করতে হয়। অথচ আগে না জেবে বন্ধন তখন একটা কিছু খরচ করার মাধ্যমে তৃপ্তি ও আনন্দ সবচেয়ে বেশী।

পারিবারিক বাজেটের পক্ষে পঞ্চম যুক্তি—বাজেট করে চলবার অভ্যাস করলে উপভোগের জন্য কোন কোন জিনিস সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সেইটি আপনি বাছাই হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই পদ্ধতি চাহিদা মেটাবার জন্য পূর্বে থেকেই অর্থ আলাদা করে

আর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় প্রাথমিক: এর মারকতাই।  
পক্ষদের কণ্ঠে অমনি যুক্তি উঠে—প্রয়োজনের বাইরে ক্রয় করার  
সই যে সব সময় আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়, এ কথা ঠিক নয়।  
কৃতপক্ষে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকার দরুণই বেশীর ভাগ  
হলে গোলযোগের উত্তর হয়ে থাকে। অধিকাংশ লোকই  
। কষ্ট পায়, সে টাকা পরসী নেই বলেই, পারিবারিক বাজেটের  
যে কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ না করার দরুণই  
।

বাজেট ব্যবহার অল্পকালে বর্ধিত যুক্তি যেটি প্রদর্শন করা হয়  
—এই পদ্ধতি অনুসরণে তদ্রূপদের পক্ষে টাকা-পয়সার সঠিক  
মূল্য উপসর্গের সুবিধা হয়—এই নিয়ে সহসা ছিনিমিনি খেলতে  
লাহস হয় না। ব্যয়ের খাত নিয়ন্ত্রণের জন্ত এইটি সংসার  
জীবনের অন্ততঃ প্রথম ধাপে অবগত চাই। আর্থিক  
সমস্যাগুলোকে কোন না কোন ভাবে মিটিবার রাস্তা এই থেকে  
পাওয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত্তে জীবনপথে এগিয়ে যাওয়া  
চলে। প্রতিপক্ষের পুরিষ্ঠার যুক্তি—বাধ্যতামূলক বাজেটে টাকা-পয়সা  
নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ বন্ধ হলেও তরুণ মনে  
এর প্রতিক্রিয়া অজ্ঞ ভাবে না হয়ে পারে না। জীবনারম্ভেই  
তাদের দৃষ্টি ও লক্ষ্য এতে অনিবার্যরূপে সীমিত হয়ে পড়ে  
এবং চূড়ান্ত সাফল্যের জন্ত উত্তম ও অধ্যবসায় বড়লাগে হ্রাস  
পেয়ে যায়।

বপক্ষে আরও একটি (সপ্তম) দৃঢ় যুক্তি দেখান হয়—  
পারিবারিক বাজেট বা আয়-ব্যয়ক রাখলে নিজের সবল কথা:  
কি আছে না আছে কিংবা ব্যক্তি, সংসার স পরিবারের দায়-দেন,  
সত্যি কত, এটিই স্পষ্টভাবে বুঝবার ও জানবার অবকাশ  
মিলে। সেক্ষেত্রে অর্থ হারা চালিত হওয়ার কারণ থাকে না,  
বরং অর্থের উপর নিজেরই স্বাভাবিক কর্তৃত্ব এসে যায় পুরোমাত্রায়।  
এর বিপক্ষেও সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি হাজির করা হয়ে থাকে—আলোচ্য  
ব্যবস্থায় পাতার পর পাতা হিসাবের অঙ্কে ভর্তি করা হয় বটে কিন্তু  
আমলে মৈনন্দিন বায় যা হ'বার হয়েই যায়, বাজেটের উপর নির্ভর  
করে সচবাচর এ চলে না। আর হিসাবের প্রকটিকেই যদি বড়  
করে দেখবার প্রয়োজন হয়, তা হলে খরচের যুহুস্তেই অন্নায়াসে  
সেইটি করা যায়।

পারিবারিক বাজেটের পক্ষে-বিপক্ষে এটিই রাখার প্রয়োজন  
—অপ্রয়োজন সম্পর্কে আরও নানা যুক্তিরই অবতারণা করা যেতে  
পারে। কিন্তু এই থেকে কোন একটি স্থিতি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান  
কিংবা এক কথায় সাংগঠিত প্রস্তার উত্তর দেওয়া স্বভাবতই কঠিন।  
এইটুকু মাত্র আবারও বলা চলে—বর্তমান সমাজকাঠামোতে আর  
যেখানে সীমাবদ্ধ এবং ব্যয়বাহের যেখানে শেষ নেই, সেখানে হিসেবী  
হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি? বাজেটই বলা হোক কি জমা-খরচই  
বলা হোক—একটা কিছু নথি রেখে চললে সাধারণ পরিবারের পক্ষে  
মঙ্গলেরই সম্ভাবনা।

# স্বাভাবিক!

আপনার সর্দি  
বিপজ্জনক হ'তে পারে!

গুরুতর আকার ধারণ করার  
পূর্বেই—এই উত্তম শক্তিশালী  
মালিশটি দিয়ে সর্দির যন্ত্রণা দূর করুন।  
হ'ভাবে সর্দি দূর করে

১ ইহা নাকের  
মধ্য দিয়ে  
কাজ করে  
ভিকস ভেপোরাবের  
শক্তি শালী গন্ধ  
আপনি ঘাসের সঙ্গে  
গ্রহণ করে গলায়  
ও নাকের সর্দির  
যন্ত্রণা দূর করতে  
পারেন।

২ ইহা ত্বকের  
ভিতর দিয়ে  
কাজ করে—  
ভিকস ভেপো-  
রাব মালিশ করলে  
ইহা ত্বকের ভিতর  
দিয়ে প্রবেশ করে  
আপনার বৃক্কের  
সর্দির ব্যথা দূর  
করে।

**ভিকস**  
ভেপোরাব

রক: গলা ও পিঠে মালিশ করুন!



327A-B

## ভারতে গোলমরিচের উৎপাদন

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গোলমরিচ প্রধানতঃ একটি মশলা হিসাবেই গণ্য, কিন্তু সাধারণতঃ মশলায় যেমন উপকারিতা বলতে কিছু নেই, গোলমরিচটা ঠিক সে পথেই পড়ে না। ত্রাবাণ্ডেশের বিচারে গোলমরিচের একটি স্থান নির্দিষ্ট করতে এবং কতকগুলো ক্ষেত্রে এইটি সত্ত্বা উপকারী। সেক্ষেত্রে দেশীয় ঔষধাদির প্রকরণে এর ব্যবহার দেখা যায় এবং অল্প সব মশলায় তুলনায় এটা দামীও বটে।

গোলমরিচের উৎপাদনের দিক থেকে আভিকার ভারত কিন্তু মোটেই পিছিয়ে নয়। পরন্তু এই পণ্য উৎপাদনে বিশেষ ভারতের স্থান এখন দ্বিতীয়। বর্তমান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী গোলমরিচ উৎপন্ন হয় ইন্দোনেশিয়ার, সম্প্রতি ভারতের গোলমরিচ ফলন সম্পর্কে একটি সরকারী হিসাব পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যায়, বিগত বর্ষে অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালে এখানে উৎপন্ন গোলমরিচের পরিমাণ হচ্ছে ৩২ হাজার টন। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরেও (১৯৫৫-৫৬ সাল) প্রায় একই পরিমাণ গোলমরিচ উৎপাদিত হয়। তিন বছর আগে ১৯৫৪-৫৫ সালে উৎপাদনের হার অপেক্ষাকৃত কম ছিল। প্রসঙ্গ সরকারী হিসাবে জানা যায়— উক্ত আর্থিক বৎসরে সমগ্র ভারতে মোট ফলন হয়েছিল ২৬ হাজার টন। অপর দিকে ভারতের মধ্যে সর্বাধিক গোলমরিচ উৎপন্ন হয় কেয়লা রাজ্যে।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা চলে—ভারতে যে পরিমাণ গোলমরিচ হয়ে থাকে, তার সবটাই এখানে ব্যবহৃত হয় না। দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে মোট ব্যয় হয় ৮ হাজার টন গোলমরিচ। বাকী বোটা থেকে যায়, তা প্রতি বছরই বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। এটা খাতও ভারত সরকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকেন অনেক। বিগত বর্ষে (১৯৫৬-৫৭ সাল) এখান থেকে মোট ১৪৮০ টন গোলমরিচ রপ্তানী করা হয়েছে। সরকারী হিসাব থেকে এ-ও জানা যায়—১৯৫৫-৫৬ সাল এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে রপ্তানীকৃত ভারতীয় এই পণ্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩,১২৭ ও ১৪,৭৭৮ টন।

ভারত থেকে সাধারণতঃ গোলমরিচ রপ্তানী হয়ে যায় জেকোন্ডাজাকিয়া, পোলাও, বুলগেরিয়া, রুম্যানিয়া, পূর্ব-জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই কয়টি দেশে ১১ হাজার টন গোলমরিচ প্রেরিত হয়েছে এবং মূল্য বাবল পাওয়া গেছে ৩০ লক্ষ টাকা। তদ্ব্যতীত জেকোন্ডাজাকিয়া নিয়েছে ৫১৭ টন এবং পোলাও ২১৫ টন। বছর কয়েক হ'ল সোভিয়েট ইউনিয়নও ভারত থেকে গোলমরিচ আমদানী শুরু করেছে। সেখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে এই পণ্যটি প্রেরিত হয়েছে ৩,১৫০ টন। ১৯৫৬-৫৭ সাল অর্থাৎ বিগত বর্ষেও রুশিয়াতে রপ্তানী হয়ে গেছে প্রায় গোলমরিচ।

ভারত গোলমরিচ উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে আরও বেশীরকম। বেসরকারী প্রচেষ্টা ছাড়াও সরকারী দৃষ্টি এই দিকে লেগেতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৬ হাজার টন গোলমরিচ ফলন

সরকারী উচ্চম পাশাপাশি চলে এই লক্ষ্য পূরণ হবে, এইটুকু অনায়াসে বলতে পারা যায়।

## নোট মুদ্রণে বুটেন

কারেকী বা ব্যাঙ্ক নোট মুদ্রণ ব্যাপারে ব্রিটিশ অবদান কখনই অস্বীকার করা চলে না। বিশ্বের বহু স্বাধীন দেশে আজও বুটেন থেকে রকমারী নোট ছাপা হয়ে যায়। যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটিশ মুদ্রাপ্রেক্ষী কতকগুলো রাষ্ট্র অবশ্য নিজস্ব তত্ত্বাবধানেই নোট তৈরী করেছে, কিন্তু তাতেও নোট মুদ্রণে বুটেন যে মান ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে, সেটি কেউ প্রায় অতিক্রম করতে পারেনি।

নোট ছাপিয়ে দেবার জন্য তিনটি বৃহৎ ব্রিটিশ মুদ্রণ-সংস্থা (সিকিউরিটি প্রিন্টার্স) বিশ্বের নানা দেশ থেকে অর্ডার গ্রহণ করে থাকেন। এই মুদ্রাসংস্থাদের নাম যথাক্রমে—ব্রাডবেরী উইলকিনসন, ওয়াটারহাল এন্ড সন্স এবং গুলা-রিউ। গত বৎসর প্রথমোক্ত ফার্মটি (ব্রাডবেরী উইলকিনসন) একমাত্র পায়ত্তের দেশজাত ব্যাঙ্কের নিকট থেকেই ৪ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের নোট মুদ্রণের অর্ডার পেয়েছিল। বহুবূর জানা যায়, এই মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের তৈরী কারেকী নোট আজ চালু রয়েছে প্রায় ২৫টি দেশে। বলতে কি, প্রতি বছরই এর নিউ ম্যালডাল কারখানার লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ্ক নোট বহুসংখ্যক মুদ্রিত হয় এবং সেখান থেকে ঐগুলো অর্ডার অনুযায়ী এক একটি দেশে রপ্তানী হয়ে যায়।

ব্রিটিশ কার্ফসমূহে বিভিন্ন ধাপে নানা বিশেষজ্ঞের হাত ছুঁয়ে অর্ডারী নোট সত্য তৈরী হয়। কোথাও ত্রুটি জল ছাপের কাজ হল, কোথাও হল ডিজাইন অনুসারে রঙের কাজ, আবার কোথাও বা হল নোটের উপরকার লেখাগুলোর কারিগরী। শেষ অবধি ছিল গ্রেট তৈরী করে উত্তর দিকে মুদ্রণ সম্পন্ন হলে নোটের উপর ক্রমিক নম্বর দেবার পালা আসে। যারো আরও একটি কাজ হয়ে যায় এবং সেটি হচ্ছে নোট প্রচারের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির অধিকল স্বাক্ষর মুদ্রণ। নির্দিষ্ট কাগজের লম্বা শীটে অসংখ্য নোট একটি সঙ্গে ছাপা হয় এবং সবশেষে কাজ হল সেগুলো ঠিক ভাবে কাটা ও নোটের বিভিন্ন মূল্যমান অনুযায়ী তাড়া বেঁধে দেওয়া। এর পর এক একটি প্যাকেট শীলমোহর করে যে ব্যাঙ্কের অর্ডারী নোট, সেখানে বখানিরমুখে পাঠিয়ে দেওয়া।

মুদ্রনা থেকে পূর্ণাঙ্গ নোট তৈরী হয়ে যায় হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতি স্তরেই চলে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ। কোথাও সত্ত্বা কোন ত্রুটি-ত্রুটি বা মুদ্রণ-বিজ্ঞাত হয়ে পড়লো কি না, এইটি তন্ন তন্ন করে না দেখলেই নয়। ব্রাডবেরী উইলকিনসন নামীয় ফার্মটিতে এই পরীক্ষা কারেই নিযুক্ত আছে বহু তত্ত্বাবী সমেত প্রায় এক সহস্র কর্মী। সবুহু নোট মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানটি থেকে শুধু কারেকী নোট বা ব্যাঙ্ক নোটই নয়, ডাকটিকিট, চেক, বণ্ড, শেয়ার সার্টিফিকেট, রাজস্ব টিকিট, পাসপোর্ট, মোটর লাইসেন্স প্রভৃতিও মুদ্রিত হয়ে অহরহ বাইরে রপ্তানী হয়ে থাকে। বুটেনবাসীরা সেক্ষেত্রে গর্বসহকারে এই লাবীটি করতে ছাড়ো না—আমরা জানি

সাহিত্য

তথ্য অধ্যাপনা

# মীনা কুমারী তাঁর স্বকের যত্ন নে

লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে “এটি এত  
সম্পূর্ণ রকম শুভ্র এবং বিশুদ্ধ!” তিনি বলেন

বিযোগান্ত করণ ছবির বিখ্যাত অভিনেত্রী  
মীনাকুমারী আজ ভারতে সর্বাধিক জন-  
প্রিয় চিত্র তারকাদের অন্ততম।  
তিনি কিন্তু শুধু কুশলী অভিনেত্রীই নন,  
তাঁর চেহারাও অত্যন্ত সুন্দর—শুটিংয়ের  
সময় গরম আর্কল্যাংশের তাত্ত্ব তাঁর  
চক থাকে মন্থন ও শাবণাময়! অবশ্য  
শাবণের বহু নেওয়ার একটি গোপন  
উপায় তাঁর জানা আছে। “আমি  
সর্বদা বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট  
সাবান ব্যবহার করি। এটি একটি  
অপূর্ব মোলায়েম, সুগন্ধী সাবান।”  
নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। আপনি  
দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে আপনার  
চক কত সতেজ, কত সুন্দর হয়ে  
উঠছে!



কমাল  
আমরোহীর “শাকীকা”  
চিত্রের তারকা



লাক্স টয়লেট সাবান  
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য সাবান





# সাহিত্য পরিচয়



সর্বভারত লেখক-সম্মেলনের সম্ভাবনা

সংবাদপত্রে অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, সম্মতি এক সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনের উদ্যোগ ও আয়োজন চলেছে।

আমাদের দেশবাসীর মধ্যে সাহিত্য-রসপিপাসদের কাছে এই আয়োজনের উদ্দেশ্য আনন্দদায়ক সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও ভাষার লড়াই চলেছে। এমন কি এই স্বল্প হস্তারক্তি ও খুনাখুনির পর্যায়ে নেমেছে। তত্বপরি দিল্লী-সরকারের নেক-নজরের অল্প পক্ষপাতিত্বে এক প্রদেশ অল্প প্রদেশের প্রতি হিংসা প্রকাশ করছে। কংগ্রেস হাই কমান্ডের সৃষ্টি হিন্দী-মতিভাবের বিষমর ফল প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বেজব্র বিভিন্ন প্রদেশবাসীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির আত্মবিকাশের পথ অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমাদের মাতৃভাষা আমাদের ভুলে যেতে হবে—কেন না হিন্দী নাকি কম্পানিসারি, ভারতের অবিকাশ প্রদেশেই। যদিও হালে শ্রীমহর্ষি অম্বা—হিন্দী-আন্দোলনের জগৎ বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ আকৃতি বধন এই, তখন ভারতীয় সাহিত্যিক সম্মেলনের প্রাক-বোধগায় আমরা উল্লসিত হবো, অধিক কথা কি? বাই হোক পাঠক-পাঠিকা মরণ রাখবেন, আমাদের দেশে ‘সম্মেলন’ শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, আমাদের জনগণের সঙ্গে যে-যে বিষয়ের কোন যোগাযোগ নেই, সেই-সেই গুরু-গম্ভীর ও দুর্ভোগ্য বিষয়ের সম্মেলন হওয়াই যেন এক প্রচলিত রীতি।

কিছুকাল আগেও শ্রীমতের মরণমুখে কলকাতায় নানাবিধ ‘সিরিয়াস’ সম্মেলনের পাকপাকি বন্দোবস্ত ছিল। ধর্মচক্রের মহামণ্ডল, উজ্জ্বল সঙ্গীতের আমীরী জলসা, প্রগতিপন্থীদের সৌধীন সমাবেশ, ক্লাব ও অকিস কর্তৃত্বারী ইউনিয়নের বার্ষিক হজাতির, প্রভৃতি অচ্ছতীন যদিও সম্মেলনের নামেই চলে যায়। শোনা যায়, কোন কোন সম্মেলন আবার ‘কোড ডোর’ অর্থে রক্তধারককে হয় নাকি এই কলকাতায়।

তবুও আমরা আশা পোষণ করবো সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন সার্থক হোক। কেন না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ-বিবাদের কাণ্ডে হয়তো আমরা ভুলে গেছি, ভারতীয় সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পীদের মধ্যে সেযুগে যেন এক অবিচ্ছিন্ন একা ও মৈত্রী ছিল—বর্তমানে সেটি অস্বাভাবিক পুরোপুরি হারিয়েছে। দেশের আর বিদেশের দল-বেলদের একটা ‘জিরেই’ প্রভাব তখন দেশের মনীষীদের প্রতি বর্ষায়নি। আদ্যের দিনের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পমাত্রকেই পুঙ্খ নাক্ত পুঙ্খ হতে হবে। একটা কোন কাণ্ডে নাম না লেখার

প্রতিভা আর বিকশিত হবে না। কিন্তু আমরা হয়তো মানতে চাইবো না, মহান আদর্শের পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে আসল সৃষ্টিকার্য ব্যাহত হচ্ছে অনেকের। রাজনীতির সঙ্গে তালে তাল রাখতে রাখতে মূর বেতালা হয়ে পড়ে—আমাদের কানেই বা শুধু বাজে না। এখানে উল্লেখ করলে অস্তায় হবে না, রাজনীতির রাজরোগে ভুগে ভুগে বহু শিল্পী ও সাহিত্যিক অকালমৃত্যু বরণ করেছেন দেশে-বিদেশে।

আমাদের সাহিত্যেও রাজনীতিপ্রিয়তা আছে। নীলদর্পণ, পথের দাবী সৃষ্টি হয়েছিল সত্যিকার দেশাত্মবোধের তাগিদে। কিন্তু আমরা যদি বিদেশ থেকে এই দেশাত্মবোধকে আমদানী করতে চাই এবং তাকে পণ্য করে ব্যবসা করে বসতে চাই, জাতীয়তাবাদী পাঠকগোষ্ঠী যেনে নেবেন কি? তত্বপরি রাজনীতির উৎকর্ষের ফলস্বরূপ পরস্পরের মধ্যে বিভাগ আর বিরোধের প্রাচীর-রচনা তো অবশ্যই পরিণাম। সর্বোপরি লাভ বলা যায়, সরকারী কুপাদান, যদি লাভ করা যায়। বৃত্তি, পুরস্কার, স্বর্ণপদক আর উপাধিভূষণের নিশ্চিত ব্যবস্থা জানবেন। সাহিত্যিক শিল্পী আর বৈজ্ঞানিকদের এখন তাই লাভ কিছু নেই, প্রলোভন নানাপ্রকার। স্তবরা আমাদের দেশের বধন এই অবস্থা বা দুর্বস্থা, তবুও একটি সর্বভারতীয় লেখক-সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি প্রচারে সতিাই’ বিম্বিত না হয়ে পারা যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন এই—আন্তঃপ্রাদেশিক সাহিত্যক্ষেত্রের ক’জন সাহিত্যিক আছেন—বীরা জয়ধ্বজা ধরে সম্মেলনে হাজিরা দেবেন! আমাদের সকল প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে কতকগুলি ভাষা সাহিত্যসৃষ্টিযোগ্য তাও বিবেচ্য। সংস্কৃতভাষার সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র আছে এক মাত্র বাঙলা ভাষার। একারণেই বাঙলা সাহিত্যে আজ নয়, অনেক আগেই বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে ভাষার মাহাত্ম্যে। তাই আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী ভাষা ধারা এখনও বৈরাগ্যবিক পদ্ধতিতে রচিত করতে পারলেন না তাঁরা সাহিত্যের দরবারে প্রতিনিধিত্ব করবেন কোন্ লজ্জায়?

তবুও আমরা বলি, পতেক বাধা, হাজার দলাদলি আর ‘নির্দয় পক্ষপাতিত্বের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন হোক এই কলকাতার বৃক। আমাদের সেই আগের দিনের প্রীতির শুভসম্পর্কে আবার আমরা মরণ করি সকল দলাদলির উদ্ভে থেকে। ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে অশান্তির জাল যদি ছিন্ন হয় পরস্পরের ভাব-বিনিময়, এর চেয়ে আনন্দের আর কি থাকতে পারে। এই সম্মেলনের



# উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক বই

## সাহিত্য পাঠের ভূমিকা

যু অধ্যাপনার ক্ষেত্রেই নয় সাহিত্য সৃষ্টি, প্রবন্ধ রচনা, টাচার ক্ষেত্রেও সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রতিভা সর্বজনবিদিত। কিন্তু গ্রন্থটি তাঁর আলোচনা ও সমালোচনার প্রতিভার ছাপ করছে। সাহিত্য জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এক তাই নয়, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, নীতি প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর যোগ অবিচ্ছেদ্য এবং সেই জন্তেই সকল কালের সাহিত্যের স্বভাবতই যে এদের ছাপও পড়তে বাধ্য এই ভিত্তিতে ষষ্ঠশ্রেণীর আলোচনা রূপলাভ করেছে। সুবোধচন্দ্রের মূল্যবান লোচনা পাঠ করে আগ্রহাধিত ও রসগ্রাহী ব্যক্তিমাজেই আনন্দ করবেন। বিশ্বভারতী, ৬৩, দারবানানথ ঠাকুর সেন, কাতা-৭ থেকে প্রকাশ করেছেন ঐশ্বর্যলিপিহারী সেন। দাম ৫ আনা মাত্র।

## সেবিয়েতের দেশে দেশে

বাঙলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী রচনার একটি বিশেষ স্থান আছে। আমাদের দেশে বিশ্বের পর্যটক আজ নেই, কিন্তু দেশী ও বিদেশী সঙ্কতি বশনের কৃপায় ইদানীং অনেক গুণীজনই বিদেশগামী হাছেন এবং করে এসেই সবিস্তার ফতোয়া ভারী করছেন। নিজ নিজ দৃষ্টিতে বিদেশকে বর্ণনা করছেন, কিছু বা পক্ষপাতিত্বে। কিন্তু সত্যিকার সাহিত্যিকের লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত অধুনা এক প্রকার হুলভ বলা চলে। লেখকের সোজনমতা আর সুলেখকের বর্ণনাবিভূত্বের বহির্বিধ পার্থক্য। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও নাট্যকার মনোজ বসুর লেখার সোবোজ্ঞ গুণগণা সুপ্রচুর! তাঁর রচিত 'সেবিয়েতের দেশে দেশে'র সঙ্গে বহুমতীর পাঠক-পাঠিকার অপরিচয় নেই। এই বৃত্তান্ত সম্প্রতি সুন্দর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এই রচনা প্রকাশার্থে বহন নির্বাচন করেছি তখন অধিক প্রশংসা অবতীর্ণ করতে পারি। কিন্তু বিশেষতঃ মনোজ বসুর রচনা আমরা পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিয়েছি বিবিধ কারণে। তিনি সুসাহিত্যিক। তাঁর রচনা আকর্ষকতায় ভরপুর। ছলনা কাকে বলে তিনি জানেন না। আবার কৃতজ্ঞতার কিকর্তব্য হারিয়ে অতি-প্রশংসার মুখরও হন না। অধিকন্তু তাঁর বাচনভঙ্গীর সরলতায় ও লেখার মূল্যবানায় ভ্রমণ-কাহিনীকে সত্যিকার সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেন। মনোজ বসুর লেখা পাঠে বেন দেশে লেখার দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায়। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি। অসংখ্য আলোকচিত্র বইটির অঙ্গতম আকর্ষণ। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা-১২। মূল্য ছয় টাকা।

## বাঙলা সাহিত্যে নাটকের ধারা

বাঙলা সাহিত্যের দরবারে একটি বিশেষ আসন অধিকার করে আছে নাটক। কাব্য, প্রবন্ধ, ছোট গল্পের মত দীর্ঘকাল ধরে নাটকও বাঙলা সাহিত্যকে গৃহীত করে আসছে যথেষ্ট পরিমাণে। বহু খ্যাতিমান নাট্যকার মহাকাব্যের সন্ধান পর্যন্ত পেয়ে গেছেন জাতির কাছে। বহু সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক গ্রন্থে অভিনয়ের উত্তম পাণ্ডা বার। আলোচ্য গ্রন্থটিতে

নাটক পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হয়েছে নাট্যোৎসাহী এক নাট্যাঙ্গরঙ্গী যাত্রাই এই গ্রন্থ পাঠে পরিতৃপ্তি ও জ্ঞান দুইই লাভ করবেন। এই জাতীয় সং এবং জ্ঞানপ্রসূ গ্রন্থ উপলব্ধ দেওয়ার জন্য লেখক ধন্যবাদের দাবী করতে পারেন। দীর্ঘ গ্রন্থটিতে লেখকের নির্ভা ও পরিচয়ের সুস্পষ্ট ছাপ পড়তে বার। একটি আটত্রিশ পাতার দীর্ঘতম সমালোচনা লিখেছেন ডক্টর ঐকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক অধ্যাপক বৈজনাথ শীল। মহাজাতি প্রকাশক, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট থেকে প্রকাশ করেছেন ঐশ্বর্যলিপিহারী বসু। দাম আট টাকা মাত্র।

## তারা তিন জন

বাঙলা দেশের সুখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র সেনের নাম কারো অজানা নয়। তাঁর 'শতাব্দী' অনেকেরই চিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর কয়েকটি ছোট ছোট গল্পের সংকলন। বালক ও কিশোরদের উপযোগী মোট বারোটি গল্প। গল্পগুলি নিজস্বতায় সমৃদ্ধ। রমেশচন্দ্রের দরদ ও অল্পভূতিতে কয়েকটি গল্প জীবন্ত হয়ে উঠছে। তিতু হাকিম, বিন্সি, আকিসের কাপড়, সাদা ঘোড়া, রাজার জমদীন, তারা তিন জন প্রমুখ গল্পগুলি পাঠক-চিত্ত আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস রাখা যায়। প্রমুখ-কুহন লাইব্রেরী, ৫ শ্রামাচরণ দে স্ট্রিট থেকে প্রকাশ করেছেন এম. চক্রবর্তী। দাম হ'টাকা মাত্র।

## রাত্রি

সাহিত্যিক আত্ম চর্যাপাধ্যায়ের খ্যাতি একদিন পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। বর্তমানে তাঁর এই উপন্যাসটি প্রকাশ লাভ করেছে। মূল্য চরিত্র 'তমসী'। হুঁটি বিপরীত জীবনধারার সম্মুখীন সে। হামী সমীরণ রাজনৈতিক কর্মী। ধুমকেতুর মত তাদের সঙ্গারে আবিস্কৃত হয় পুন্ডর, অনেক কিছুই সে চায়, আবার দেবদত্তের মত সেই সঙ্গারেই এসে পড়ে অজ্ঞান। এই 'চরিত্রগুলি সৃষ্টভাবে রূপায়িত হয়েছে লেখকের প্রতিভায়। প্রতিটি চরিত্রের ভিত্তরকার কথা নিজেই বের করেছেন লেখক। ভিন্নধর্মী চরিত্রগুলির সম্মেলনে কাহিনীর গতি মনোরম হয়ে উঠছে। ঐকানী পাবলিশিং হাউস, ৬৫ সীতারাম বোম স্ট্রিট থেকে প্রকাশ করেছে ঐশ্বর্যলিপিহারী বসু। দাম চার টাকা আট আনা মাত্র।

## রাজনীতি

রাধানাথ সিং লেখার জগতে নবাগত হলো তাঁর রচনার উৎকর্ষতা এবং গভীরতা যথেষ্ট পরিমাণে প্রশংসার দাবী করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের প্রারম্ভিক এবং চিন্তাগর্ভী ছোট ছোট কয়েকটি প্রবন্ধ ও রম্যরচনা স্থান পেয়েছে উপন্যাসে গ্রন্থটিতে। সমাজ, রাজ্যের জীবনে যে বহুবিধ উপলব্ধি পতন হুঁচকি হয় তা যে এমনই হয় না তাঁর শিল্পমণ্ড থেকে একটি পটভূমিকা, এই পটভূমিকাতোই রচনাগুলি রচিত। ছাত্রশক্তি রচনার মধ্যে কয়েকটি রচনা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করে যে রচয়িতার চিন্তাধারা অসার নয়। ৫ বর্ষকাল বোম, পো: বেঙ্গল হ'ট, হাওড়া থেকে প্রকাশ করেছে ঐশ্বর্যলিপিহারী বসু। দাম ৮ টাকা মাত্র।

### চঠবোগ প্রণালী

মানুষের স্বাস্থ্য বোশাগান দ্বারা কি ভাবে গড়ে তোলা যায় সে বিষয় আলোচনা আজ বীতিমত ব্যাপকতা লাভ করেছে। এ দেশে কেন বিশেষের বহু সাহিত্যিকই আজ এই আলোচনার অংশ গ্রহণ করছেন। চঠবোগের চর্চা ভারতে নতুন নয়, বহু প্রাচীন গ্রন্থ তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। স্বাস্থ্য গঠনের প্রধান সহায়ক এই বিত্তা সম্বন্ধে আগ্রহবিত্ত ব্যক্তি অনেকই আছেন তাঁদের কৌতুহল নিবারণে এই গ্রন্থ সক্ষম হবে। চঠবোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন এই গ্রন্থের মুখ্য আকর্ষণ। কয়েকটি চিত্রও এর শোভাবর্ধন করেছে। এই সংগ্রহের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি। লেখক কালীমোহন দেবশর্মা। তারাগাঁদ দাস দ্ব্যাপ্ত সন, ৮২ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করেছেন ঐক্যবিনাথ দাস। দাম তিন টাকা আট আনা মাত্র।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি সংগ্রহ (কিশোরদের উপযোগী) আমাদের চক্ষুগত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলি লেখনীর প্রথরতার, প্রাজ্ঞ বর্ণনাগুণে, সহজভাবে মূল বক্তব্য প্রকৃষ্টি করার ক্ষমতা পাঠকচিত্তে করে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থগুলি—(১) প্রকৃষ্টবর্ণন বহু-বায়ের ইউরোপের গান্ধী ডাঃ হ্যালবার্ট হুইটজার (প্রকাশিকা ঐক্যবী গায়ত্রী বসু, শৈবলিনী কুটার, সম্ভাব্যপুত্র, কলকাতা—৩২, দাম ১'৫০ ন, প, ) (২) শ্রুতি দাসের ছোটদের ভিক্টর হিউগো (প্রকাশক অক্ষয়কান্তি পাল, নবভারতী, ৬ রমানাথ মন্ডলবার ষ্ট্রীট, দাম এক টাকা চার আনা) এবং (৩) কৃষ্ণময় ভট্টাচার্যের কিশোর (প্রকাশক কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য ও লেখক, রামকৃষ্ণ প্রকাশনী, ৩৬ আমহার্ট ষ্ট্রীট, দাম দেড় টাকা মাত্র)

এই প্রসঙ্গে দুটি শিশুসাহিত্য গ্রন্থের নামোল্লেখ করি। এদের মূল উদ্দেশ্য বিশেষ। এই দুইখানি গ্রন্থও রচনা কুশলতার সমুজ্জ্বল।

শিশুমনে এরা সহজেই প্রভাব বিস্তার করবে কল্পনাপ্রণালী ভাব বর্ণনার কল্যাণে। এই গ্রন্থ দুটি—(১) বিজ্ঞানবাদের নিরাশা ঘরে। রচনা—সুপ্রসাদ ওয়াইল্ডার, অনুবাদ—হিমাকুমার ঘোষ। প্রকাশক বতীপ্রনাথ দাস, পরিচয় পাবলিশার্স, ১৭০-এ পাঞ্চ ষ্ট্রীট দাম—এক টাকা আট আনা মাত্র এবং (২) ক্রমশঃদেশের উপকথা। রচনা—আলেজেই তলস্তয় অনুবাদ—লীনা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—সেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ইষ্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী, ৬৪-এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

### গ্যান্টিবায়োটিক

(বিশ্ববিজ্ঞান-সংগ্রহ)

সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা বহুদিন ধরেই পরিচালিত হচ্ছে। সাহিত্যের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা ও বিজ্ঞানের মধ্যে সাহিত্যের প্রসার এদের মূল্য লক্ষ্য। এই সমন্বয়কারদের মধ্যে বর্তমানে বিজ্ঞান-সাহিত্যকার বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ অনায়াসে করা যায়। নানা প্রকার ব্যাধি প্রাণিদেহে যখন বিপর্যস্ত করে তুলছিল সেই সময় বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ লেখা দিয়েছিল গ্যান্টিবায়োটিক। স্বভাবতই সেই সম্পর্কে মানব সাধারণের আগ্রহ জাগবে। এই গ্রন্থে সেই সকল আগ্রহ প্রশমিত হবে। এতে গ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার তার উৎস, তার প্রক্রিয়া, তার ইতিহাস সমূহ সুনিপুণভাবে বর্ণনা করে গেছেন বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর শক্তিশালী রচনা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যুগপৎ সমন্বয়ে অদ্বৈতমাত্র পাঠক-পাঠিকার কল্যাণসাধন করবে বলে আশা করা যায়। বিশ্বভারতী, ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর সেন, কলকাতা—৭ থেকে প্রকাশ করেছেন ঐগুণিলবিহারী সেন। দাম আট আনা মাত্র।

## সিগারেট

### মৈত্রেরী দস্ত-চৌধুরী

তুমি হাহ নিয়ে বৃকে,  
তুমি নিয়ে আসনের প্রচণ্ড প্রলাহ,  
তুমি নিয়ে হৃদে লাল আঙনে বেধায় তুমি হলো;  
কালামরী কোন ভাষা বলে,  
পূজীকৃত ঘোঁষায় ঘোঁষায়।  
তোমার ভেতরে তুমি হাহ,  
তুমি এনে দাও প্রাণে

অন্তঃস্থ নেশার প্রবাহ।  
জীবনের স্বপ্নসর জুটে-চলো প্রবীণ নেশার,  
সমস্ত চেতনা ঘিরে নামে এক রকীম আবেল,  
তুমি তার কতটুকু জাহ?  
কতটুকু তুমি রেশ?  
'একই'র বৃকে জাহ হৃদে প্রদানের জাহ

আদর্শ পথ্য,  
পানীয় ও খাদ্য



লিলি  
বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ  
এবং  
স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত  
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

# জন্মদিনে

ঐদিলীপকুমার রায়

দ্বি-ত্রিশ বৎসর আন্ত পূর্ণ জন্মদিনে ।  
সখা-সখী-গুণী-ভক্ত শুভার্থী সকলে  
জানায় সাদর সজ্জাধন হাসিমুখে :  
“কিরিয়া কিরিয়া যেন আসে এই দিন  
বর্ষে বর্ষে ল'য়ে তাঁর শুভ আশীর্বাদ ।”

জন্মদিন আসে কিহে মেহের উৎসবে,  
আনন্দের সমোথনে বহু-বান্ধবীর,  
দাক্ষিণ্যের দানে তব হে দাতা বরন,  
আরো যেন সৌন্দর্য-গভীর ছন্দে—আরো  
স্নিহুতার কমনীর, প্রত্যয়ে নির্মল—  
প্রাণের বহুর পথ করিয়া মন্থণ—  
তোমারি আশীর্বে । বর্ষ পরে বর্ষ বার  
অতুচ্চে—দিনে দিনে আনি' নব নব  
আশ্চর্য উপলব্ধির অকুর সম্ভার  
কতু স্রুখে, হৃদয়ে কতু । দিনে দিনে পাই  
সজ্জ তব নিত্যসাধী !—কখনো আঁধারে  
আশাভর বেদনার, কখনো আলোকে  
সুগন্ধ মঞ্জুল চেতনার মন্ত্রণে ।  
কখনো নিরাশা পথে নামে নব আশা,  
কখনো উজ্জল লগ্নে যনার বাদল,  
প্রতি ছন্দে তব তব অলঙ্কার করণা  
প্রাণের প্রত্যেক তটে আসে ঢেউ তুলে ।

জীবনে আমরা চিনি প্রাপ্তির দক্ষিণা  
জন্ম-উত্তমর্গ মন প্রতি অহুতবে  
দিনান্তে পূর্ণা করে লাভ-কৃতি তার ।  
কৃপণ কুসীদজীবী প্রতি পাতে কেনে  
অরু—কোথা কি পেয়েছে দিন-আবর্তনে  
কোন মূল্য বিনিময়ে । সেখেনে দেখে না  
আমাদের অরু নেত্র—প্রের্ত দান তব  
আসে অচিহ্নিত পথে । জীবন-সেবতা !  
নহে মর্ত্য স্বভাব তো স্বভাব-তোমার ।  
তোমার দানের সুর হৃদ-ইন্দ্রজাল  
উষরে পদ্ম-দোল হুলায় পলকে,  
আমায় পামাণ-ভাঙা নিবৃত্তির নিম্নে,  
কাঁটার কুস্থমবাণী, নিশীথে অহুনা,  
নিরুৎসাহ-বাঁধ দেয় ভাসারে সহসা  
অনির্ণের উদ্ধাসের আনন্দ-দ্রাবনে,

পরাভব-ভালে আঁকি' নব জয়চাঁকা,  
কতিবুকে অক্ষতির উদ্ভাসি' আভাস !

এক হাতে হানি' নখ আঘাত তোমার  
অন্ত হাতে দাও বর আশার অতীত !  
শৈশবেই মাতৃহারা করি' এসেছিলে  
পিতারূপে—একাধারে জনক-জননী,  
তর্কসাধী, উপদেষ্টা, শাসক, বান্ধব ।  
যৌবনে সংসার স্রুথ হ'তে ছিন্ন করি'  
স্রুত প্রবাসে এলে ধরি' গুরুরূপ,  
পিতারও অধিক স্নেহে করিয়া লালন  
দিলে অভিনব জন্ম—দীক্ষা ইষ্টনামে :  
সংশয়ে দেখায়ে পথ, পরম দিশারি,  
তিমিরাক্ষ নয়ন করিলে উন্মীলন  
গাহি ঘুম-জাগানিয়া অলোক সঙ্গীত ।  
সহসা আরাধ্য গুরু—তিরোধান্নে যবে  
নিরাশার অঙ্গুষ্ঠারে পুছিলাম : “কোথা  
আশা তার গুরু যার নাই আব ?” এলে  
দিতে দীপ্ততার দিশা দেবদূতরূপে :  
( অপকূপ লীলা । ) শিবা হ'য়ে দিলে দেখা,  
দিন পরে দিন দিলে “পরম প্রসাদ”  
সমাধির মাধ্যমে তাহার ! তবু যবে  
ভাসা হাল, ছেঁড়া পাল মজ্জমান—হ'ল  
দ্রবন্ত খটিকা মন্ত্রশাস্ত ববে তব :  
শাস্তির বন্দর দিশা মিলিল অকূলে !  
শিবারূপে চেয়েছিল যে শরণ—নিল  
কাণ্ডারীর রূপ যেন তোমার ইজিতে !  
অস্বহীন সেবা-ভক্তি অবদানে তার  
শিখাল ভক্তির মর্ম, চাহি' উপদেশ  
বিনম্র প্রাণে—দিল দীক্ষা দীনতার ।  
একান্ত নিষ্ঠার তার, গুরুরূপে যেন,  
দেখাল সে—নিষ্ঠা বিনা পরমপ্রাপ্তির  
মিলে না মিলে না দিশা । দিনে দিনে নাথ,  
নর নব ইন্দ্রজাল উদ্ভাসিয়া তার  
সমাধি-মাধ্যমে তুমি গাহিলে : “কুপাল  
প্রীতি কুপাখ্যারে করণার রহে ঘেরি,  
নিত্য নব পরীকার প্রাণের মনের  
স্রুত-স্রুতি-উদ্বোধন তরে দেয় তারে  
স্রুত-স্রুতি-উদ্বোধন ।” বাচা ছিলে

জনজন্ম—চাকুরীর অধারে বাড়িল  
নব অমৃতের রঙে—অপের জন্মভিত্ত  
ভরসার বাণী হ'য়ে জন্মিলক তার  
মন্ত্রমান গীতিগুচ্ছে । “অঘটন-যুগ  
গত চিরতরে”—নহে সত্য এ ঘটনা,  
এ কথা করিলে তুমি যোষণা আপনি,  
জাগালে প্রত্যয় নব অপার লীলার  
তোমার হে কারুণিক, গাহিয়া তোমার  
বৃন্দাবন—মুরলীর মূর্ত্যুনাথ বেন :  
“যে চায় অন্তরে শিশু পরম শরণে,  
প্রতি বাধা হ'বে তার সহায় জীবনে,  
অভিশাপ হবে বর, আশ্বাস জাগাবে  
অন্তর্জ্যোতি, মরুপথ হাশিবে কুন্তলে ।”

কৃতকর্কবিলাস মাঝে তুলি যে আমার  
এ-বাণী তোমার তাই বৃষি মেঘছার  
প্রত্যয়ের নীলাকাশে কণে কণে ? বৃষি  
তাই আসে অকর্কিতে ঘাত-প্রতিঘাত,  
মিলন মন্দিরে নামে বিরহের ছায়া,  
শঙ্খধ্বনি মাঝে শঙ্কা দেয় হান। কাটে  
নৃত্যে তাল, গতি ক্ষুণ্ণ হয় বাধা বাঁধে,  
মন্দির মুহূর্তে আসে শোভিত-সংঘাত,  
অবেলায় নামে সন্ধ্যা, বিজয়ে বিভ্রম !  
কেন তুল হয় বার বার—দেখিয়াও  
দেখি না তো, শুনিয়াও চাই না শুনিতে !  
মন সাধে বাদ হবে প্রাণ দিতে চায়,  
কেন যে—জানি না আজো ! কতটুকু জানি  
জীবন-নাট্যের তব শেবাক্ষের বাণী  
হে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মহানাট্যকার !

আমি শুধু জানি বন্ধু, বা আমি পেয়েছি  
পথের পাথেরূপে কুপার তোমার :  
পেয়েছি প্রত্যয় তুমি আছে এ জগতে,  
জেনেছি—আমার গানে তুমিই চাহিছ  
ঝংকারিতে আপনার অসীম আকৃতি ।  
জল আছে তাই জাগে জলের শিশুপাশ ;  
অমৃত তৃষ্ণাকে তাই করেছি বরণ  
লজ্জিতে অমৃত-উৎস, সরল নির্ভরে  
বিলু করে আবাহন সিদ্ধুরে হৃদয়ে ।

জানি তাই—তুমি আছে যেহিরা আমারে  
বৃকের নিঃশাস রূপে প্রাণের বণ্ডলে,  
সন্ধ্যাত নুয়ের রূপে জন্মের পুন্ডলে,  
চরণ ঠমকরূপে পথের চলায়,  
আলোছায়া-রূপে জীবনের তীর্থপথে ।  
কল্পনা প্রতিমা তব অন্তর হৃদয়ে  
ছড়ায় কিরণ তার আনন্দ-প্রাণে ।  
তারি সে আলোকে দেখি—তুমি আছে প্রতি  
সংগঠন সঙ্কায়ণে স্বদেশে বিদেশে ।  
তোমারি দুটির বরদানে হেরি নাথ  
অগ্নান চাহনি তব প্রতি পরিচিত  
নয়নের রেহালোকে । বেধা বত গান  
গুঠ বেজে—আনে বহি' তোমারি ঝংকার  
অন্তরাল হ'তে বায়ে ঝরাও অঝোরে  
হে চিরপ্রাণের উৎস ! প্রাণের স্পন্দনে,  
শক্তির গৌরবে বিরহের বেদনায়,  
মিলনের বাসনুতো, হাসির উল্লাসে,  
অশ্রুর ব্যাধাহরণে ! অশ্রুজল চিন্তায়—  
প্রতি ক্ষুরেণই হেরি তোমারি বিকাশ,  
প্রতি কণ্ঠে তব গান জাগে, প্রতি বৃকে  
তুমিই বৃনছ স্বপ্ন পুষ্পিতে জাগরে  
প্রেমের কমলরূপে ।

বত দিন বার  
কয় কতি তুলি বন্ধু, তোমারি বাঁশির  
বৃন্দাবন-মুখী ডাকে । শুনেছে তোমার  
সে আহ্বান একবার যে পথিক সে কি  
পারে আর দিতে সাড়া উছলি সোনার  
হরিশের মায়ানুতো ? সে যে নাথ, তার  
জেনেছে জীবনে : প্রতি দুঃখ ব্যাধা মাঝে  
কল্পনার বাঁশি তব বাজে হৃদয়ের  
মধুবনে ; জানে যে সে—তারি মধুরিমা  
প্রিয়জন কলকণ্ঠে হয় অনূদিত ।  
তুমি করে অলক্ষ্যে যে-সন্ধ্যায়ণ, তারি  
ঝংকার তাহার। তোলে—কত ব্যাধামাঝে  
ঝরায়ে সাধনা, কত আনন্দ-উৎসবে  
শ্রদ্ধা-স্নেহ-প্রীতি সুরে মধু মূর্ত্যুনাথ ।  
তুমি বাজো প্রতি নরমে কর্ণে—এ সন্ত্যরে  
সে যে জানে, তাই দেখে আবির্ভাব তব ;

দীপা প্লো



মীনাক্ষ

আরো ৪টি নামকণী  
• ব্র-মাইট সেট ..  
• ট্যানকাম পাউডার  
• কেল পাউডার  
• ক্রমকর ।

কতু প্রীতিভী উষা কপোল-সিন্ধুরে  
সলজ্জ অভায়, কতু বসন্ত পঞ্চমী  
প্রভাতী হোলি খেলার, প্রাপের বসোচ্ছ্বাসে,  
কতু মধ্যাহ্নের দীপ্যমান অমৃত্যুধানে,  
কতু সন্ধ্যা মরণের নিষঙ্গ চিতায়,  
কতু লক্ষ নক্ষত্রের আয়তি-লগনে  
দৃষ্ট যবে পরিপূর্ণ স্বৰ্ণমৌল মাঝে  
লবে এক অনির্বচনীর ধ্যানদিশা  
কৃতান্তলিখকনায় ।  
আজ জন্মদিনে  
এ প্রার্থনা প্রেরণে : চেতনা আমার  
তরুণ্য বেন অনন্তের প্রেমে তব  
নীলাবর পানে মেলে প্রতি শাখা তার,  
জাগরে স্বপনে হুখে হুখে, নিবেদিতা  
প্রতি বিকশন সস্তাবনা—বারা রাজে  
আকোটা কুঁড়ির রূপে, আধজাগা আলো  
সিহরুরূপে, আধ-পাওয়া অন্তর্লীন  
স্বগন্ধ-সঞ্চেত-রূপে : বা কিছু আমার  
আপন বলিয়া জানি—পারি বহু বেন  
সঁপিতে চরণে তব সম্পূর্ণ প্রণামে,  
বত ভাবাইনি কৃতজ্ঞতা রাজে মনে  
লভি তব বরাডয়—করণার দান  
পূর্ণিমা বিকাশ তার জীবন-সন্ধ্যায়  
পারি বেন সাধিতে তোমার অভিসেকে  
প্রব্রহ্মীন সর্বহীন সর্বনিবেদনে ।  
জাহ্নলে লক্ষ্যের মুখে চলি বরজ,

কাঁটাবনে অন্ধকারে হেরিয়া কলীর  
মণির আলোকে পথ—সর্ববাধা দলি' ।  
প্রসাদে তোমার নিত্য হে মহামুগ্ধব !  
বে-অনন্ড-অভীপ্সার প্রথম প্রদীপ  
ঝেলেছিলে তব স্নিগ্ধ জাশিস শিখায়  
আমার শৈশব প্রাণাধারে বেন তার  
কৃতজ্ঞ আরতি পারি রাখিতে জ্বালায়ে  
আমার প্রতিটি দীপে : বেন পারি নাথ  
আমার প্রতিটি আশাভঙ্গ বেদনারে  
দহিয়া রূপান্তরিতে সমবেদনার  
তাপ বত করি' আলো পারি সঞ্চারিতে  
শকুনির উদাসীন সবার মঙ্গলে—  
আনন্দে নিরতিমান, গৌরবে গভীর ।  
আজ জন্মদিনে বহু জাগে এ প্রার্থনা  
উচ্ছল অন্তরে : আমি দাস, তুমি প্রভু  
এ কথা স্মরণে বেন থাকে নিত্য-বত  
ভক্তির প্রণাম পাই—বেন মনে রাখি  
সে অর্ঘ্য আমার নাই লেশ অধিকার :  
অস্তুর মন্দিরে অভিমান পুরোহিত  
কোনো ছলে বেন নাথ, না করে হরণ  
দেবোদ্ভিষ্ট উপচার । বত বিশ্ব-বাধা  
আসে তীর্থ-পাথে দিনে দিনে—করে বেন  
লক্ষ্য-স্পৃহা গাঢ়তর—নির্মল নিটোল  
প্রণতির অঙ্গীকারে অকুঠ জন্মান  
অহৈতুকী প্রেমোচ্ছল আত্মসমর্পণে ।

পূর্ণা, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৫৭

## ছুটির গান

অমৃতা দেবী

প্রান্তরে মন ছুটেছে আজ প্রান্তরে  
গান জেগেছে, জেগেছে গান অন্তরে  
ব্যথার বকুল কী বলেছে তাই ভেবে  
বল না হৃদয় আজকে তোমার কী দেবে ।

গান জেগেছে, জেগেছে গান অন্তরে  
স্বর্ঘস্থী হাওয়ার গোলায় বুক ভাঙে  
প্রান্তরে মন ছুটেছে আজ প্রান্তরে  
সরমপ্রিয় কোন্ সে বধূ হুখ রাঙে ।

প্রান্তরে মন ছুটেছে আজ প্রান্তরে  
আমার হৃদয় কোন্ হুরে আজ আধাসে  
গান জেগেছে, জেগেছে গান অন্তরে  
কায় পরশে আঁখিতে সে কোন্ বিশ্বাসে ।

মাগিক বস্তু—খাশিন

খাশিন  
মূল কারণ হইবে  
কফ



**সিরোলিন**  
খান



নিরাপদ  
পারিবারিক  
ওষুধ

সিরোলিন কেবল যে খাশি  
'খাশিয়ে দেয়' তা নয়—  
খাশির মূল কারণ হইবে—  
জীবাণুওষিক্তও লক্ষ্য করে।

এক মাত্র ডিষ্ট্রিবিউটর—  
ডকটরাল জিমেটিক

# রঙ্গ পট



## অভয়ের বিয়ে

প্রাগৈল্লল চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনাতোই দ্বিতীয়বার দেখা দিল অভয়ের বিয়ে। এক জ্যাঠামশাইয়ের এক ভাবা মার্কি ভাইপো অভয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম-এস-সি পাশ করে কিন্তু মাছুব হয় না, জ্যাঠামশাইয়ের অতিরিক্ত সাবধানতায় সে শুধু বই-খাতাই চিনেছে, বহির্জগত সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর সেই বখন সসারের মালিক হল তখন তো তুমার অবস্থা। জ্যাঠামশাই তাঁর পেছান্না মার্কি ভাইপোর জন্তে বড়কজা মায়াকে গাড়ী নির্বাচিত করে গেলেন। মায়ার শিক্ষিতা, আলোকপ্রাপ্তা—তার সংস্পর্শে এসে অভয়কে রীতিমত বিব্রত ও



লজ্জিত হতে হয়—মায়ার পাণিপ্রার্থী অভয়। এই চক্রের মধ্যে দিয়ে মায়ার ও তার পিসতুতো বোন সরমার কল্যাণে জড়তা ঘোচে অভয়ের ও পরে অভয়ের সঙ্গেই মায়ার বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়। —উত্তর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত শুধু ঐচ্ছিকারই নন, একজন অভিজ্ঞ আইনবিদও, (অর্থাৎ যুক্তি নিয়ে বাদেব আহোত্র কারবার) তাঁর হাত দিয়ে এরকম যুক্তিহীন অন্তঃসারশূন্য এবং অদ্ভুত কাহিনী কি করে বেরোল তা বোঝাই যায় না। অভয়কে হাতাশান্দ করতে গিয়ে লেখক নিজেকেই যে আগাগোড়া হাতাশান্দ করে গেছেন এটা কি তিনি বুঝতে পারেন নি! জ্যাঠামশাইয়ের আদরে অভয় লোকের সঙ্গে মেশে না তাঁর চোখে-চোখেই থাকে—বেশ তো, বাস্তবজগতে এর বহু উদাহরণ আছে এ কথা স্বীকার করা যায় না, কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে ছেলেরা লাভুক হয় ও-রকম বীর হয় না, যরকুনো হয় ঠিকই কিন্তু ওই রকম উল্লুং হয় কি? তার হাজার গুণ স্মৃতি-পরা বন্ধুকে সে দেখছে আর নিজে ওই রকম সত্তের মত স্মৃতি পরে হুম্মান সাজছে—এ কি বিশ্বাসযোগ্য? অভয় নিজেও যথেষ্ট ধনী, তার বাড়ী প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ—কাস্তিবাবুর বাড়ীর প্রাচুর্য দেখে ভড়কানো তার পক্ষে শোভা পায় না। বৌ ট্যান্ডির কি তখন প্রচলন ছিল? লজ্জাতে যে সব পথের ছবি তোলা হয়েছে—বাস্তাগুলি কাঁকা কেন? উত্তর প্রদেশের রাজধানীর রাজপথে লোক চলাচল নেই। মায়ার ও সরমার তো দেখছি বাড়ীর মধ্যেও বেশ দামী জরুরি সাদী পরেই ঘুরে বেড়ায়। আর একটি অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল অভয়ের বাড়ী। বাইরে থেকে মনে হয় এ যেন একটি হানাবাড়ী—ভাড়া, জীর্ণ অথচ ভিতরে চাকচিক্যের বস্ত্রাধারা—থকথকে, তকতকে, সাজানো, গোছানো এ কি ডিটেকটিভ গল্প না কি? কাস্তিবাবুর মত একজন বিচক্ষণ লোক অভয় বলল বলেই বখাসবর্ষ বন্ধ দিয়ে বসলেন? কিন্তু সরমার চরিত্রটি আদর্শ বলে ধরে নিতে পারে, সরমার ত্যাগ সম্বন্ধে প্রশংসা।

অভিনয়ে উত্তমকুমার যে পরিমাণ ছেলেমানুষী করেছেন তার জন্তে তাঁকে আমরা বিশেষভাবে দায়ী করব না,—চরিত্রটি যেভাবে বর্ণিত আছে তিনি সেই রূপটি সেই ভাবেই হৃদয়ে তুলেছেন শুধু—একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব যে তাঁর এখনকার অভিনয়-প্রতিভা শুধু বাংলাদেশ কেন সারা ভারতের গর্বের বস্তু। বিকাশ রায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অত্যন্ত স্বল্পগ্রাহী ও স্বন্দর হয়েছে। প্রণতি ঘোষের অভিনয় সবচেয়ে এবং সাবলীল। ছবি বিশ্বাস জহর গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ এবং শোভা সেন শক্তির পরিচর্যই দিয়েছেন। অন্ত্যস্ত্রাণে আছেন—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হরেন, তুলসী চক্র, প্রীতি মজুমদার, বীরাজ দাস, শঙ্কু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন হুম্মার দাশগুপ্ত, আলোক-চিত্রে বিত্ত চক্রবর্তী এবং স্বরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়।

## ওগো শুভ

উপরোক্ত ছবিটি সবচেয়ে কোন কিছু বলার আগে সব্বাশ্রয় জানাই এর কাহিনীকার সম্প্রতি পরলোকগত সাহিত্যিক সাংবাদিক পাঁচগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে—বীর কাহিনী অবলম্বন করে এম, কে, জির এই বর্তমান প্রেক্ষিতী রূপলাভ করল—তাঁর আকস্মিক



। তাঁর প্রতি লক্ষ্য জানাতে পারলেন না—মহোৎসবোদের চমৎকার  
রণ! আপিসের বড়বাবু মনোহর দ্রী লক্ষিতাকে নিয়ে বেশ  
আপিসে মহিলা-সহকর্মী মানসীকে সে বোনেই চোখে দেখে—  
। পৌছে দেহ নিজের বাড়িতে—ললিতার বহন কথাটা ওঠে  
কম ভাবে। অশান্তির সূত্রপাত ললিতাও ঐ আপিসে ঢোকে  
টপদে সমাসীনা হয়ে। তারপর নানারকম হাতকর ঘটনার  
দিয়ে পুনর্মিলন এবং মানসীর সঙ্গে শুভমিলন ঘটে আপিসের  
নক বোস মশায়ের স্থালকের। এই স্থালকটিকে দেখতে পাচ্ছি  
নীপতির আপিসে সে একরকম বেশরোয়া হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে।  
। দিচ্ছে, টেবিলে শুয়ে পড়ছে, গানের স্বর বাজছে, ভগিনীপতিরই  
ক আর বাবারই হোক, কোন আপিসের মধ্যে এ জিনিষ  
নো সম্ভব? নিমন্ত্রিত অতিথিদের সর্ববতর মধ্যে সিদ্ধি  
ওয়ানোয় কৌতুক থাকতে পারে।

ভয়তা বা শালীনতা থাকে না  
বে—হয় না কি—তা বলছি না  
—হয় নিশ্চয়ই হয়—হয় কোথায়—  
এ একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বহলে কিছ  
ধানে ব্যাপক নিমন্ত্রণ সেখানে  
বিশেষ করে কোন শিক্ষিত সমাজে  
এ জিনিষ অসম্ভব। যে চিঠি নিয়ে  
ললিতা লঙ্কাকাণ্ড বাধালে সেটাই বা  
কি করে হয়? ললিতার মত মেয়ে  
সে তার স্বামীর হাতের লেখা চেনে  
না—একবার সে ঋতিয়ে দেখবে না  
যে কার হাতের লেখা দেখে সে ঐ  
লঙ্কাকাণ্ড বাধাচ্ছে? সবার শেষে  
মনোহর-ললিতা স্বামিনী বলেই যখন  
বোস মশায়ের সামনে পরিচিত হয়ে  
গেল তখনও ঐমতী বহু সন্মোহের  
চোখেই স্বামীকে দেখে এসেছেন—  
এটা না হলেই ভালো হোত। তখনও  
ঐ সন্মোহের চোখে দেখে আসায় একটু  
রসহানি ঘটে না কি? অভিনয়ক্ষে  
প্রায় সব শিল্পীই স্বনিপুণ ভাবে স্ব স্ব  
চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে  
জহর গাঙ্গুলী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়,  
অম্বপকুমার, অতুলকুমার, ভাষ্ক  
বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর দাস, তুলসী  
চক্রবর্তী, শ্যাম লাভা, নবরূপ হালদার,  
অজিত চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যো-  
পাধ্যায়, ডাঃ হরেন, মঞ্জু দে, শোভা  
সেন, পদ্মা দেবী জয়ন্তী সেন, বাণী  
গাঙ্গুলী, স্মৃতিতা বন্দ্যোপাধ্যায়,  
মণিকা ঘোষ, ছবি দাস, শুক্লা দাস,  
ইয়া চক্রবর্তী প্রভৃতি শিল্পীরা অভিনয়

গল্পোপাধায়; সঙ্গীত ও ক্যামেরার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে  
অনিল বাগচী ও তপ্ত।

### আমি বড় ছব

বেশ কিছুকাল বাদে চলচ্চিত্র জগতে দেখা দিলেন শৈলজ্ঞানন্দ।  
বাঙলার সাহিত্য ক্ষেত্রে শৈলজ্ঞানন্দের অবদানের বিরাট স্বাক্ষর  
নতুন করে বলার কিছু নেই—চিত্রজগতও নানাভাবে একদিন  
পুষ্ট হয়েছে তাঁর কল্যাণে। শৈলজ্ঞানন্দই বোধ করি প্রথমজন যিনি  
চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাঙলাদেশের আভ্যন্তরীণ রূপকে ফুটিয়ে  
তোলেন সর্বসাধারণের সামনে। বাঙলা দেশের, ভিতর বাড়ীর  
থবরাখবর বোধ হয় তাঁর আগের আর কোন পরিচালকের কাছ  
থেকে পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া বিচিত্র চরিত্র-সৃষ্টিতে এবং



অভিনব সলাপ বোজনায় তাঁর কুশলতা সর্বজনবিদিত। তাঁর পরিচালিত বর্তমান ছবিটির কাহিনী রচনায় তাঁর আবেগাশ্রয়ী মনই ধরা পড়েছে। 'আমি বড় হব'র ভিত্তি-প্রস্তরই খোদিত হয়েছো আবেগ ও আদর্শকে কেন্দ্র করে। দয়াময় সু-উপাঙ্গনে অক্ষম, কখনো মেয়ের বিয়ে, কখনো ছেলের পৈতে এই জাতীয় ভীষণতা দিয়ে সে উপার্জন করে—তার বড় ছেলে দেবনাথ বিধবা জালিকার কাছে থেকে সত্যিকারের মাছবের মতই মাছব হচ্ছে, দয়াময় তাকে কেড়ে নিতে চায়—জালিকা ঐ বাপের কাছে কিছুতেই তাকে দিতে চায় না। ছেলে রাণীগঞ্জে এক ব্যবসায়ীর বাড়ীতে থেকে পরীক্ষা দেয়—সেখানে সে যথেষ্ট অবাক হয়ে ওঠে তারপর যাত প্রতিষেধাতপূর্ণ নানা ঘটনার পর দেবনাথের সঙ্গে ব্যবসায়ী-কস্তা অমলার স্তম্ভ-মিলন এবং সকলের সঙ্গে সকলেরই আনন্দময় মিলন ও মধুর পরিসমাপ্তি। ছবিটিতে দেখলুম পথের প্রাণাঙ্গই বেশী, অনেক কিছু ঘটনা পথেই ঘটেছে কিন্তু আশ্চর্য লাগল পথগুলিকে কীকা কীকা দেখে, পশ্চাৎপটভূমি যে কৃত্রিম তা সহজে ধরা যায়। একটা কথা বলব যে ছবিটি সর্বজন-উপভোগ্য ঠিকই এবং দর্শক সাধারণকে আনন্দও দেয় যথেষ্ট কিন্তু জন্ম বলব যে ছবিটি এখনকার দিনের উপযোগী নয়, এ ছবি বঙ্গবন্ধু দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় অন্ততঃ পনেরো বছর পিছিয়ে আছে।

অভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন বংশী অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষ অভিনেতাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই আসন সংগ্রহ করে নিয়েছেন কালী বন্দ্যো—দয়াময়ের চরিত্র তাঁকে সেই আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করল। অপর সবেদনশীল অভিনয়ে দর্শকমন আকৃষ্ট করে তোলেন শোভা সেন। জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় পরম জলরপ্রাণী এবং মনকে নাড়া দিয়ে যায়। বিজু এবং হাতির আমরা প্রশংসাই করব এবং সেই সঙ্গে দু'জনকেই বদ্বয় নিজেদের অভিনয় প্রতিভা আরও উন্নত করে তুলতে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাধর বসু, গৌর শী, বীরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সয়ম্বালা দেবী, অর্পণা দেবী, বহুকাল পরে শেকালিকা দেবী নৈপুণ্যের পরিচয়ই দিয়েছেন। এ ছাড়া অভিনয়শ্রেণী আছে জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ছবি মুখোপাধ্যায়, গোবুল মুখোপাধ্যায়, মনি শ্রীমানী, জামল, বাবুদা প্রভৃতি। ছবির পুস্তিকাটি যিনি সম্পাদনা করেছেন তাঁর উৎসাহে যদি যে ইচ্ছাতে অনেক শিল্পীই নামোদ্রেক নেই। যেমন বীরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেখর চট্টোপাধ্যায়, গোবুল মুখোপাধ্যায়, ছবি মুখোপাধ্যায়-অনবধানতা কমা করা যায় না, সমগ্র বইটিতে শিল্পীর নামটাই পড়ে গেল, এ কি? ভবিষ্যতে এ বিষয়ে এদের সজাগ থা অমরোহ করি।

## রূপপট প্রসঙ্গে

১৩৬২ সালের বঙ্গমতীর পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয় প্রাচ্যে সাত্তালের উপস্থাপন। নাম যার 'পুষ্পধনু'। পুষ্পধনু বর্ষ শ্রীশীল মজুমদারের পরিচালনায় চিত্রায়িত হচ্ছে। এতে রূপ দি উত্তমকুমার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, ভাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষকর্তী মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ এবং নবাগতা মিস বা প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রঞ্জন সরকার। \* পৌরাণিক ছবি পরিচালনায় ফণী বর্ষার খ্যাতি সুবিদিত। বর ইনি 'দাতা কণ' নামক একটি পৌরাণিক ছবির পরিচালনা ব্যাপৃত। বীরেন দেব ক্যামেরায় ধরা পড়বেন কমল মিত্র, মুখোপাধ্যায়, মোহন ঘোষাল, অসীমকুমার, অরুণপ্রকাশ, ভট্টাচার্য, গঙ্গাধর বসু, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ তিলক, মলিনা দেবী, দীপ্তি রায়, ঘোষ, অর্পণা দেবী ও নবাগতা অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিল্পিবর্গ। \* \* \* 'বিদ্যাত' ছবিটি পরিচালনা করছেন মুখোপাধ্যায়। এর চরিত্রগুলি ফুটে উঠছে পাহাড়ী সাত্তাল, বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অসিতবরণ, অশীষকুমার, চট্টোপাধ্যায় এবং তপতী ঘোষের অভিনয়ে। \* \* \* মুখোপাধ্যায় পরিচালনা করেছেন 'জয়তিথি' ছবিখানি। এই আলোকচিত্রের দায়িত্বভার সম্পন্ন করেছেন বীরেন দে। এতে বাবে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সাত্তাল, বসন্ত চৌধুরী, অরুণ প্রেমচাঁদ বসু, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, লাহা, শ্রীমান্ বিজু, শ্রীমান্ বাবুদা, মলিনা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, মলিকা ঘোষ, রাজল নিতাননীকে। একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা বাবে বিপিন \* \* \* খগেন রায়ের রচিত ও পরিচালিত 'ঘিটক' ছবিটিতে করছেন পাহাড়ী সাত্তাল, রবীন মজুমদার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সত্য বসু, রেণু এক কাছেরি ওহ ও আরো অনেকে।

... এসবই গ্রহণপট ...

এই সংখ্যায় প্রকাশিত ছবির মনোমগ্ন-বৃত্তির আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। আলোকচিত্র শ্রীশ্রীমতী

দিয়ে ছবিটি পড়ুন।



বিক্রয়ের পর থেকে  
এ-পৰ্যন্ত  
এঁকে ৭,৩০০ বাক্স  
স্বাস্থ্য করতে  
হয়েছে

প্রত্যেক গৃহিণীই জানেন,  
বনস্পতির সারা খেতে স্বাস্থ্য, শক্তি  
যোগায় অধিক এতে খরচা কম পড়ে।

ঘরকার স্বাস্থ্য বড় ও স্নায়ুদের বনস্পতির প্রতি অসীম  
কৃতজ্ঞতা, কেননা বনস্পতির জন্যেই তারা কম খরচায়  
পুষ্টিকর খাবার রাখতে পারেন।

বাড়ীর গিরীষ দায়িত্ব—সুঁবেলা, সন্ধ্যার পরিকার  
স্বাস্থ্য, আবার ছোট ছেলেরাও খেলাধুলো দেওয়া—সবই  
তাকে করতে হয়। সন্ধ্যায় এভাবে খেতেও সবাইকে হাসিমুখে  
আমদার বন্ধ করতে হয় তার প্রচুর কর্মশক্তির দরকার।

প্রত্যেক গিরীষই পরম বন্ধু

গৃহিণীরা জানেন যে দৈনিক খাবার থেকেই তারা বেশির  
ভাগ কর্মশক্তি পান। তাই তারা প্রচুর পরিমাণে স্নেহপদার্থ  
দিয়ে ঘরের খাবার তৈরীর বিকে নজর রাখেন। কেননা

স্নেহপদার্থ ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' হজমে সহায়তা করে, রক্ত  
ও অস্থি-বিস্থ কাঠে বেঁধতে গেলনা এবং সত্যিকার কর্মশক্তি  
যোগায়। গিরীষা অমেকেই বনস্পতি দিয়ে স্বাস্থ্য পকপাতি।  
তারা জানেন, বনস্পতি ঝিঙা ও পুষ্টিকর এবং এর প্রতি আউন্সে  
১০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'এ' রয়েছে। এতে খরচা  
কম। পরস্পর সাজায় হয় বলে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর জিনিস  
খাওয়ার সুযোগও পাওয়া যায়। এভাবেই বনস্পতি গিরীষের  
পরমবন্ধু বলে পরিচিত—যার আগলিও সেইভাবেই সবরকম  
স্বাস্থ্যসাহায্য এই ঝিঙা উদ্ভিদে স্নেহ ব্যবহার করেন।

বনস্পতি

গৃহিণীদের পরম বন্ধু

প্রচারক : বনস্পতি বায়োস্ক্যানার্স এসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া



রাম-মশালের জোরালো আলোয় বজ্ররার ছাদ উদ্ভাসিত হয়ে  
আছে। চলন্ত বজ্ররা, দ্রুতগতিতে উত্তরণপথে এগিয়ে চলেছে।

কথা বলে আনন্দকুমারী । চোখের পলক ভোলে না । আঁখি-  
যেন নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ ।

কোন ন্যাসকাগ্রে নবক।  
কালীশঙ্কর মুহু হাসলেন। বললেন,—ত্যাগ আর দে  
বল্যবুদ্ধ আর কি!

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো জাননাকুমারী। বললে,—তবে  
কোন ভয়ের কারণ নাই।

কৌতূহলের সঙ্গে কুমারবাহাদুর বললেন,—কেন? তুঁ  
হিন্দুও নয়, বৌদ্ধও নয়?

অগ্রতিভ হুরে চৌধুরাণী বলে,—না না, পরিহাস করবেন  
বৃদ্ধক! হাসেন সে। ককেক হৃহত খেমে থাকে। তারশ  
—জামার পিতাকে হুই দজেই মানে। তিনি নাকি পক্ষপা  
হুই মতেরই পূজা করেন।

বজ্রার গতি উত্তরোত্তর যেন বেগময় হয়। হাল টানার  
ধ্বনি আরও যেন ঘন ঘন শোনা যায়। দড়ির বাঁধন আর হা  
ঘাঘবিতে কাঁচ-কাঁচ শব্দ ভাসে গঙ্গার বুকে।

কালীশঙ্কর হ' দিকের তার সেখতে থাকেন চোখ ফিরিয়ে  
 কালো আকাশে বিরাট তারের মত তামস-তারের এখানে  
 ছাড়া ছাড়া অম্লকুণ্ডলছে। তপস্তার হোমানল ঝলছে  
 হস্তো মাঝে মাঝে বাতাসে স্তূতাহতির গন্ধ আসছে।  
 কঠোর তীব্র সৌরভ আসছে। মঙ্গলকলের আশায় পূজাবজ্র  
 সাধক আর সাধিকার সিঁকিলাত করছে।

—জ্যোতীশশাস্ত্র বিচক্ষণ মানুষ, তাই তাঁর পরমতত্ত্ববিজ্ঞত কালীশঙ্কর বললেন তাঁর থেকে চোখ ফিরিয়ে। বললেন, দেশে বদাচার: পারম্পর্য্য বিধায়তে।

জানকীমারী বললে,—ভিক্ষু আর সন্ন্যাসী দলে দলে  
ভাগ্য করছে। পুঁথি পাচার করছে তিক্ততে না কোথায়।

—মাঝারবে আমি অশরিত্তি । কুমারবাহুর বল  
 স্নেহে । বগলেন,—আমার প্রতি যদি কোণ পড়ে বোধতা  
 কেন না আমার ঘোর শাস্ত । শক্তিতত্ত্বের পূজা করি, উপ  
 করছি ।

করোছি।  
 আনন্দকুমারী আনন্দ দুটি তুলসো। সগর্বে ও সহজে  
 এই চৌদ্দাশী আপনার সহচরী থাকতে বৌদ্ধান্ত্রিকরা তা  
 হবে না।

খানিক ভাবালু চোখে তাকিয়ে থাকেন কানিশকর।  
বললেন,—আগেই বাস্তব ব্যবহার করে কি বোদ্ধরা?

তাছিলের ইহ হাসি হাসলো জাননকুমারী। হাসি

কালীশঙ্করের দৃষ্টি পঙ্কজ এক তীরে প্রসারিত। তিনি বেন  
সর্বিশেষ চিন্তাময়। চক্ষু উন্মুক্ত, কিন্তু বেন দৃষ্টিশক্তিহীন। তীরে  
ঘন বনাঞ্চল, দিনমানেও অঁধার দেখায়। মনে হয় বেন অন্ধকারের  
প্রাচীর, সদন্তে দাঁড়িয়ে আছে শত্রুর পথ আগলে। কুমারবাহাদুর  
হয়তো ভবিষ্যতের ভাবনায় ডুবে আছেন। রাজকুমারী বিদ্যাবাসিনী  
কি তবে চিরজয়ের মত স্বামিগৃহ ত্যাগ করবে! অসহায়ের মত  
একা-একা দিন কাটাবে! শয্যা একাকিনী হবে!

—কুমারবাহাদুর, গড়মান্দারনে এখন রক্তারস্কি চলেছে, তা কি জানেন?

জানেন।  
বরাহকে আজুল জড়াতে জড়াতে হঠাৎ যেন কথা বললে  
জানকুমারী। একবার লজ্জাজবা কোথ ফুলে তাকালে ভীত দৃষ্টিতে।  
বললে, —দান্দ্যরণে খুনোখনি চলছে।

বলে,—দান্দারণে খুঁদাখান চলেছে।  
 ধীরে ধীরে আসাননিড়িতে বসলেন কাশীশঙ্কর। সোনালী  
 জরিরার তাকিয়া তুলে নিলেন কোলে। কপালে কয়েকটি স্নগপ্রকাশ  
 রেখা ফুটলো তাঁর। কিঞ্চিৎ রিস্তরের সঙ্গে বললেন,—হী চৌধুরাণী,  
 আমার ভা অজ্ঞাত নয়। আমি জানি। খানিক থেমে আবার  
 বললেন,—সমগ্র বঙ্গদেশেই এই রক্তপাত চলছে। ব্রাহ্মণবর্গ যৌদ্ধ-  
 নদের নাম লুপ্ত করতে চায়।

তত্ত্বকে নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট। বুদ্ধের নাম লুপ্ত করিতে চায়।  
 ঈশ্বর হাস্যোৎপাদনকারী। জ্ঞান হাতির সঙ্গে নিম্নলিখিত  
 বলালে, কেবল ভ্রাঙ্কন নয়, হিন্দুধর্মেরই বুদ্ধের নামে ক্রিপ্ত হয়।  
 প্রথম দেখাযাই শুধু ধরে।

বাক্যের অর্থ এই যে—  
 বাক্যের অর্থ এই যে—  
 বাক্যের অর্থ এই যে—

—আমার সঠিক জানা নাই কুমারবাহাদুর ! তবে বেশ কিছু

—आचार्य महोदय जीना जीने १९४७ में आचार्य जीना जीने १९४७ में आचार्य जीना जीने १९४७ में

—তবে আমি ভীত নই। কান্দীশঙ্কর চক্ৰে বললেন।  
বললেন,—আমার কাছে আরোয়ান্ন আছে। আমি একাই শতক  
আক্রমণকারীকে পরাস্ত করতে পারি।

প্রতিকূল প্রবাহে বজ্রবার গতি মধ্যে মধ্যে বাহত হয়। মাঝির  
দল যেন হিমমিম খায় হাল টেনে টেনে, তবুও ধামে না। লক্ষ্যে  
না পৌঁছে তারা যেন ক্ষান্ত হবে না।

মনের দগ্ধাপনে আতঙ্ক জাগে থেকে থেকে। আনন্দকুমারী  
শিউরে শিউরে ওঠে। ম্যাগেটকে মনে পড়ে যখন তখন। কি  
চূড়ান্ত দুঃসাহস তার! তার উদ্দেশ্য অসং, ম্যাগেট নারীমাসলোভী।  
চৌধুরাণী এক অব্যাহতের ইচ্ছা—অনলে নিজেকে বিসর্জন দিতে চায়  
না। এখন মনে পড়ল লক্ষ্যায় অধোবদন হয় আনন্দকুমারী।  
ভয়াত জোখে চেয়ে থাকে। ম্যাগেটকে এখন কাছে পাওয়া যায় তো  
চৌধুরাণী সমুচিত শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু কোথায় ম্যাগেট! সে  
এখন নাগালের বাইরে চলে গেছে।

পবিত্র গঙ্গাধারায় আশ্রিতা, তবুও যেন মনের কলুষ-কালি ধৌত  
হয় না। আনন্দকুমারী এক সুপ্ত হালায় ঝলতে থাকে ক্রশ ক্রশে।  
মনে মনে ভাবে, এই দেহ দগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আর দোষগ্রস্ত  
হবে না।

—তুমি কোথায় যাবে চৌধুরাণী? সাগ্রহে শুধোলেন কুমার-  
বাহাদুর। বললেন,—তুমি কি স্বপ্নে বেতে চাও? সেখানে  
কি আশ্রয় মিলবে?

—ঈশ্বর জানেন কুমারবাহাদুর! হতাশ হয়ে বললে চৌধুরাণী।  
বললে,—আমার অপরাধ কি তাই বদন। আমি তো তখন  
নিরুপায়। ম্যাগেটকে প্রতিবেদন করি, সে সামর্থ্য কোথায়।

—আমি বৃদ্ধি অহমানে, তোমার অবস্থাটা কল্পনা করতে পারি!  
হেসে হেসে কান্দীশঙ্কর বললেন। বললেন,—তোমার শিতামাতা  
কি তোমার জন্ত তাঁদের স্বাক্ষর ত্যাগ করতে পারবেন।

—জানি না কুমারবাহাদুর। তবে আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমি  
চৌধুরী-গৃহের কৃপাপ্রার্থী নই। চৌধুরাণী দীপ্তকণ্ঠে কথা বলে যেন।  
বলে,—মান্দারগে আমার এক পরিচিত ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি নিশ্চয়ই  
দয়া করবেন। তাঁর চরণে টাই দেবেন।

—কে সেই ভাগ্যবান? কান্দীশঙ্কর বললেন জিজ্ঞাস্য হয়ে।

—তিনি অবশ্যই একজন সজ্ঞ! উদার মনোবৃত্তির মানুষ।

—হী সজ্ঞন, তবে জানি না যেখানে কি তাঁর অভিল্য। তাঁর  
মতের পরিবর্তন হবে কি না তাও জানি না।

কি যেন বলতে চাইছেন কুমারবাহাদুর, অথচ মুখ ফুটে বলতে  
পারছেন না। ইতস্ততঃ বোধ করছেন হয়তো। তবুও বললেন,—  
চৌধুরাণী, তুমি যদি আমাদের সহ স্ত্রীভুক্ত হও, ক্ষতি কি! বিদ্যা  
আর তুমি একত্রে থাকতে পারো এই সহোদরার মত।

—আপনার প্রস্তাব খুবই স্বরবর। এ জন্ত কোটি কোটি ধন্যবাদ  
জানাই। আনন্দকুমারী কেমন মনে কাতর হয়ে বললে। বললে,—  
তবে অন্তরে সসারের গলগ্রহ হতে চাই না আমি। আমার জন্ত  
অশান্তির আগুন জ্বলবে না কি! আপনাদের পুরনারীরা আমাকে  
কি চক্রে দেখবেন কে জানে!

কান্দীশঙ্কর মিহিকণ্ঠে বললেন,—তোমার ইচ্ছিত জন

মান্দারগের অকুট আভাস দেখা দেয় আনন্দকুমারীর মুখে।  
হতাশার দীর্ঘশ্বাস কেলো সে। বললে,—তবে আর উপায় কি!  
মান্দারগে আমাকে তিক্তবৃত্তিতে থাকতে হবে। ভিখারীকে  
সকলেই কৃপা করবে।

মুখে কথা বোগায় না কুমারবাহাদুরের। তিনি নিরুপ বসে  
থাকেন। গভীর চিন্তায় মগ্ন যেন তিনি। বজ্রবার আলো-উজ্জ্বল  
ছায়ে এক নৈশক বিরাজ করে। চৌধুরাণী আনন্দ জোখে আঁচলের  
পাক দেয় আঁচলে। পাক দেয় আর খুলে ফেলে। তার জোখে  
ঘূমের আবেশ ফুটেছে। সান্ত্বিত আর বিনিময়র অভ্যস্ত।

পূর্ণিমা আসন্ন, তাই রাত্রির আকাশে গ্রহাণুপুঞ্জের হুড়াহুড়ি।  
বৃষ্টিগন্ত সোনালী ছায়াপথ সৃষ্টি হয়েছে। কান্দীশঙ্কর উচ্চতাপে  
দেখেন, নীরব সাক্ষীর মত স্থাতিত আকাশ-তারি, মিটি-মিটি  
দেখছে যেন। আর হাসছে কৈশে কৈশে। মধ্যরাতের ঠাণ্ডা বাতাস  
বইছে উড়, উড়। আনন্দকুমারীর কপালে কল্ক-কুল্ল খেকে থেকে  
চকল হয় নির্দল হাওয়ায়।

সর্দার-মাঝির হঠাৎ কথায় চৌধুরাণী যেন একবার চমকে উঠলো।  
আনন্দ জোখ তুললো।

মাঝি হঠাৎ সরবে বললে,—রাজামশায়, বজ্রার গলা ছেড়ে  
আমাদের নরীতে বাঁবে ভোবের আগুই।

প্রসন্ন হাসি হাসলেন কুমারবাহাদুর। সহাস্তে বললেন,—  
সর্দারজী, তুমিই এখন আমাদের রক্ষাকর্তী। সমুচিত পুরস্কার দেবো  
তোমাকে।

মাঝি বললে,—হুঁদুও ঘুমিয়ে লেন রাজামশায়। রাত ফুরতে  
বিলম্ব আছে এখনও।

কান্দীশঙ্কর বললেন,—আমার চক্রে থেকে নিজা দেবী পলারন  
করেছেন। নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না যে। বিদ্যাবাসিনীকে দেখতে  
না পাওয়া পর্যন্ত স্থির হতে পারি না।

সঙ্গাজ চাউনি তুললো আনন্দকুমারী। আঁচল ত্যাগ করে  
বললে চুপি চুপি,—বিদ্যার জন্ত বৃথা চিন্তিত হবেন না, আমি  
বতকণ আছি। আমার সাহায্যে বিদ্যাকে পাওয়া যাবে জানবেন।

বুকে যেন বল পান কান্দীশঙ্কর। মনে সাহস। বললেন,—  
তবে হুঁদুও নিজা ভোগ করা যাক। ধানিক খেয়ে জাবার বললেন,  
—আনন্দকুমারী, তুমি তোমার নিশ্চিত লব্যায় বাও, আমি হাসেই  
থাকি। প্রহরী হই তোমার।

—আপনি যেমন বললেন তাই হোক।  
কথা বলতে বলতে হীরে হীরে উঠে পাড়ালো চৌধুরাণী।  
কেমন যেন বিদগ্ধ-ক্রোধে কুমারবাহাদুরকে দেখলো করক  
বুহুঁত। বললে,—আপনি তবে বিজ্ঞান করেন, আমি নীচে বাই।

—হী হী, বিজ্ঞানের প্রয়োজন আমাদের উভয়ের। কান্দীশঙ্কর  
সানন্দে বললেন। বললেন,—নির্ভয়ে নিজা বেও তুমি, বিধা নাই কিছু।

—প্রথম কুমারবাহাদুর! মৌখিক প্রণতি জানিয়ে নিখি  
বেয়ে বজ্রবার পাটাতনে নামতে থাকে আনন্দকুমারী। একবার  
জোখ ফিরিয়ে দেখে নিখি ককে প্রবেশ করলো সে। কান্দীশঙ্কর

জড়পুতুলের মত চূপচাপ বঁসে থাকেন কুমারবাহাদুর। আনন্দ গুরু নাই, খেয়াল হয় না বেন। তাঁর মনে হয়, চৌধুরাণী এখনও বেন পূর্বক বঁসে আছে নতদৃষ্টিতে। অদ্ভুত হয়েছে সে, চোখের আড়ালে গেছে—তবুও বেন চোখে ভাসছে তার দেহ-অবয়ব। কর্ণকণ্ঠের ভাসছে তার মধুরিষ্ঠ কথার স্বর। মদিরার নেশার মত কুমারের চোখে বেন রূপের নেশা ধরে।

রাত্রি সার্থি-কিপ্রহর। নদীর দুই তীরে বিল্লী ডাকছে অবিরাম। এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে দৃষ্টি বার চৌধুরাণীর। বিব্রিত হিরনেজে কক্ষমধ্যস্থিত দীপালোকের প্রতিচ্ছায়া ফুটে ওঠে। সেই কক্ষে রাশি রাশি অল্প। তীর, তরবারি, খড়গ, জল, বর্শা, বর্ধ, ঢাল আর শৃংখল। কয়েকটি গুরু কক্ষের এক কোণে সঞ্চিত।

অস্ত্রের আড়ৎ বেন। ক্রীণ দীপালোকে চাকচিক্য খেলে লৌহসারে। আপন ধারে হাসছে তারা।

সেই টলটলারমান। বজ্রার বেগ দ্রুত। আনন্দকুমারী আর কুমারী ঝাঁড়াতে পারে না, শব্দ আর আশ্রয় গ্রহণ করে। শব্দ আর পাশে রূপার জলপাত্র। পানের ডিবা। গন্ধসার। চৌধুরাণী তার শরীরে বেন ব্যাধা অদ্ভুত করে, অনভ্যাস জল-নাঁতারের অঙ্গ-সকলানে। কক্ষ সে একা, পুরুষ-চোখের চাউনি নেই এখানে। লজ্জা নেই। বড়-বড়ার শেষে শান্ত-প্রকৃতির মত সে এখন। ম্যালেট বেন বড় বইয়ে দিয়ে গেছে। অশান্তির তৃকান। চৌধুরাণীর ভবিষ্যৎক বিপর ক'রেছে সে। মান্দারণে কিরে মুখ দেখাবে সে কি লজ্জার! কোথার টাই হয় কে জানে, ঘরে না পথে।

ভ্রমু অন্ধর দুটি দ্বারা নামসো আনন্দের আঁখিপ্রাণ্ড থেকে। অতি দৃষ্ণে বেন চোখ কেটে জল বরসো সহসা। কিন্তু, এক বিধাতা জানেন, চিলের মত হেঁ। মেয়ে ম্যালেটই ডাকে হরণ ক'রেছিল। সে নিরুপার, অসহায়ের মত আত্মদান ক'রেছে। হয়তো বা বহুতরুর।

বজ্রা হুলে হুলে উঠলো কার বেন পদাঘাতে। কে হয়তো চলাকোলা করছে বেন একদিকের পাটাতনে। কুমারবাহাদুরকে একা পেরে জগমোহন লেটলে ছাদে উঠেছে।

নিমীত-নদীর জল থেকে চোখ কিসলেন কানীশঙ্কর। বললেন,—কে?

—আপনার দাস কুমারবাহাদুর। জগমোহন একটু বেন চাপা স্বরে লাড়া দেয়।

—কিছু বক্তব্য আছে? কানীশঙ্কর কিঞ্চিৎ ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

—হী, কথা আছে হজুর! জগমোহন বঁসে পড়লো কনাসের এক কিনারায়। কুমারের একখানি পা টেলে দেয়। বলে,—পদসেবা করি কুমারবাহাদুর।

অনিচ্ছার সঙ্গে বেন কানীশঙ্কর বলেন,—জলাকোলা নাই, শরীর-বস্ত্র বিকল হ'তে চায়। প্রতিসমূহে কেমন বেন বেদনা অদ্ভুত করে।

হুই সন্ধ্যা হাঁড়ের পেশনে কুমারের পদসেবা করত থাকে জগমোহন। পা টিপে দেয় সমুদরে। হাত ঢালার আর কথা বলে,—হজুর, আমাদের ঘরে উজাড় না হওয়া ভক চৌধুরীর মেয়েকে বেন রেখে না গেল। এই মেয়েটা সবই জান।

হিরবুদ্ধিশালিনী। সেও আমাকে এক প্রকার কথা দিয়েছে, বিদ্যাকে রক্ষা করবে বিপদ থেকে।

—কথা দিয়েছে মেয়েটা? আরেক বার তথ্য জগমোহন, সহাস্তে।

কুমারবাহাদুর বললেন,—হী, কথা দিয়েছে। তবে চৌধুরীকর্তৃত্ব বিপরগ্রস্ত। সেও বাতৈ হকা পায় তজ্জ্ঞত আমিও সফট হবো।

—সদাঙ্গপতিদের অমাত্র করা বাবে কি! জগমোহন সন্দেহের স্বরে বলে। হাত ঢালার আর কথা বলে। বললে,—চৌধুরীর মেয়েকে ঘরে বসি না নেয়।

—দেখা যাক। কানীশঙ্কর কথার মধ্যপথে বেন থামলেন। তারপর কি ভেবে আবার বললেন হুহাসির সঙ্গে,—আনন্দকুমারীর মনের মাম্বব আছে মান্দারণে, কথার কথার জেনেছি আমি। তনেছি সেটা একটা টুলো পণ্ডিত। জ্ঞাতে ভ্রান্ত।

—তবে আমার চিন্তা নাই আমার। জগমোহন চিন্তিত হয়ে থাকে বেন। বলে,—আমি ঠাওরেছি মেয়েটাকে হয়তো আপনিই—

—ছি ছি! তোমার বুদ্ধিমত্তি লুপ্ত হয়েছে না কি? কুমারবাহাদুর দ্রৈব চোখ পাকিয়ে বললেন। বললেন,—আমি বিবাহিত, যোগ্যপত্নী আছে আমার সঙ্গারে। অস্ত নারীতে আসক্ত হওয়ার কোন কারণ নাই আমার। এমন কথা শোনামাত্র আমার গৃহিণী মহাশ্বেতা হয়তো দেহত্যাগ করবেন।

—তা বটে। তা বটে। জগমোহন বললে কিসকিস কথা। বললে,—তবে হজুর, মেয়েটার চোখে আমি লোভ দেখতে পেরেছি। আমরা জেতে ছোট হ'তে পারি, চোখের দৃষ্টিতো হজুর ছোট নয়। আপনায় প্রতি চৌধুরীর মেয়ের—

হুহুমন হাসলেন কানীশঙ্কর। বললেন,—চূপ! চূপ! বাতাসে কথা ভাসে। কি কথা কার কাণে বার কে বলতে পারে।

কিসকিসিয়ে বললে জগমোহন, পদসেবার ক্ষেত্র বিব্রত হয়ে। বললে,—সত্য বলুন কুমারবাহাদুর, আমার অজ্ঞান মিথ্যা কি না? আবার হাসলেন কুমারবাহাদুর। অকুট, অল্প হাসি। বললেন,—চৌধুরীকর্তৃত্বকে আমিও পরীক্ষা করেছি; তার মন জেনেছি। মেয়েটার প্রকৃতি সরল, বভাব কিঞ্চিৎ চঞ্চল।

জগমোহন কথা বলতে ইতস্ততঃ করে। বলে,—হজুর, আপনি কি চৌধুরীর মেয়েকে আপনার চরণে টাই দেবেন?

এপাশে ওপাশে মাথা দুটির কানীশঙ্কর বললেন,—না, না। জোয়ার ধারণা ঠিক নয়। আনন্দকুমারী আমাদের সহ মান্দারণে বাবে। ভ্রমঃপর আমাদের করণীয় কিছু নাই। তার ভাগ্যে বা থাকে তাই হবে।

বস্তির খাস ফেললো জগমোহন। চিন্তারুক্তির প্রসঙ্গটা ফুটলো মুখে। তার শরীরের হুমত পেশীসমূহ বেন জেগে উঠতে থাকে। বক বিদ্যারিত হয় ক্ষণে ক্ষণে। আর কোন কথা বলে না, পদসেবার কাজে লাগে দৃষ্টিচিন্তে।

কুমারবাহাদুরের চোখে নিজার আবেশ। আর বেন জেগে বঁসে থাকতে পারেন না। তাঁর বিশাল চোখ দুটি বুদ্ধিত হয় বীরে বীরে। তদ্রাজ্যিক্ত কুমারের মুখে কথা শোনা বার মিহি হয়ে। কানীশঙ্কর বললেন,—যদি নিজার হই, সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই ভ্রাতাকে

—যেমন হুহুম হবে হুহুম। জগমোহনের গলায়  
সেই মর্দন করতে করতে বললে।

হুম-কড়ানো সুরে কানীশকর বললেন,—সে কী শক্তি  
দিনে দিনে অগ্রগতি হচ্ছে না কি! টুকরো আবার সেহে  
যেন হাত বুলাও তুমি। দলাই মলাই করবে যেম, তা মর।

পরাজয়ের হাসি হাসলো জগমোহন। জল,—সে কি কথা  
হুহুম! আমার সেহে বত শক্তি আছে সেই কারেই তো সেবা  
করছি।

কানীশকর বললেন,—তবুও আমার যে হয় না কেন?  
বোঝাই যায় না।

—মার্জনা করেন কুমারবাহাদুর, আর আর শক্তি নাই।  
জগমোহন সলজ্জায় বললে। বললে,—আমার সেহে সোহার তুল্য  
হুহুম।

হয়তো নিলার ভূবে গেছেন কানীশ। তবুও হেসে হেসে  
কথা বললেন হুম-কড়ানো সুরে। বলল,—শরীরচর্চা ত্যাগ  
করি নাই আমি। সপ্তাহে ক'টা দিন এখনও মল্লভূমিতে বাই।  
ক'টা পালোয়ানের সহ লড়াই করিতে হা।

—আমি তা জানি কুমারবাহাদুর। জগমোহন পরন্তু ভঙ্গিতে  
বললে,—আপনার দেহের গঠন দেখলেই হা হা।

লর্ডেস জগমোহনের কথা কানে যায় কিনা যায়। কানীশকরের  
নাসিকা গজ্ঞাতে থাকে সহসা। তিনি গভীর নিদ্রায় ভূবে যান  
কণিকের মধ্যে।

নীচের কক্ষে একজনের চোখে কি কিছুতেই ঘুম আসে না।  
সে আনন্দকুমারী। হৃদয়েননিভ শব্দে তার চৌধুরী তবুও জেগে  
থাকে। জোৎস্না-ধবল আকাশে জেগে থাকা থাকে। বজ্রবার  
জানলা উন্মুক্ত। পীড়ী-মাঝিকের হাল টানার শব্দটা যেন প্রকট হয়ে  
কানে বাজে। দড়ি আর বাঁশের সংঘর্ষে কীট কীট শব্দ।

আনন্দকুমারী বিপদমুক্ত, তবুও মাঝে  
মাঝে তার বক্ষ হুহুম হুহুম করে। জগজগত  
হিমশীতল হয়। সমাজের ভয়, সমাজগতির  
বোঝাই আর শান্তি-শাসন, আত্মজনের  
কটুত্ব—চৌধুরীর চোখের চাউনি যি হয়ে  
থাকে আকাশে। আশঙ্কার থি-থিক  
আঙন বলে যেন বক্ষমাঝে। ভর রে করে  
—বসি সমাজ স্থান না দেয়। অধি-পরীকার  
বাচিরে নিক সমাজ, সেই ভাল হয়। চৌধুরী  
রাজী আছে। আপত্তি জানাবে না এখনও।  
চক্রাক্ত আশঙ্কের প্রতি গলে মনে  
বিস্তৃত হয় আনন্দকুমারী। তার প্রতি কি  
এক জাতক্রোধে প্রতিহিংসা এরূপে প্লাহ  
জাপে যেন মনে।

বজ্রবার গতিবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-  
কুমারীর বক্ষশ্পন্দনও যেন প্রতর হ'তে  
থাকে। হৃদয়স্তা নিদ্রাকে প্রাস করে।

দৈনিক ক্রান্তিতে তবু নিশ্চুপ সে। স্বরবোগের পর যেমন সে  
থিমিরে থাকে।

মাঝি আর মাল্লারের হেঁড়া হেঁড়া কথা, ভলে ভালচালনা  
হুপাহুপ শব্দ, দুই তীরভূমিতে স্থিতির ডাকাডাকি—গভীর রাতি  
জ্যোৎস্নালোকিত রূপ দেখেও ভীত হয় যেন আনন্দকুমারী।

নাসিকা গজ্ঞনের ক্ষণকাল পরেই জগমোহন কুমারবাহাদুরের  
পদসেবায় বিবর্ত হয়। পাছে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয় সেজন্য পা  
টিপে টিপে ছাদ থেকে নীচে নামলো সে। কৌতূহলের বশে একবার  
সন্ধানী-চোখে দেখলো বজ্রবার কক্ষমাঝে। আলিঙ্গিত লীপালোকে  
দেখলো যে, শুভ্র শব্দায় কে যেন রাশি রাশি শ্বেতপুষ্প ঢেলেছে।  
শব্দায় শরানা চৌধুরী যেন এক স্থির-শোভা। দেখতে দেখতে  
জগমোহনের মত কঠিন মাংসও চোখ ঘিরাতে পারে না। জানপুঞ্জ  
বিমূহের মত স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে।

আনন্দকুমারী নিদ্রা বায়নি। নিম্নলিখিত চক্রে গাঢ় চিত্তের কি  
যেন ভাবছে। গভীর বাস্তব মত তার চিত্তরাশিও মস্তিকে ফলীকৃত  
হ'তে থাকে। বিনিদ্রায়ও মূদিত চক্রে নিজের অবস্থা চিন্তা করে  
হয়তো। বুকে হয়তো তার আংন জ্বলেছে। ভয় আর ভাবনার  
সর্কাক্স রোমান্সিত হয়ে আছে।

সিঁড়ির ধাপে বসে পড়লো জগমোহন। ঘুমে তার চকু আর  
মুক্ত থাকতে চায় না। তার দৃষ্টিতে ঘুটে উঠছে অলংকারিক বিল  
বসতির গড়-মাংশরণ। হু' কুল প্রাণিত ধরনোতা আমোদন নদীর  
তীরে বারেন্দ্রসিঙ্হের দুর্গতোষণ দণ্ডায়মান। দুর্গের পাদমূল নদীর  
গর্ভে নিমজ্জিত। কিন্তু দুর্গ না কি জনশূন্য—পাত আর পাকীর  
আবাসে পরিণত। দুর্গ-প্রাচীরে বট আর অশ্বথের চারা, বহু আগাছার  
আস্তরণ। দুর্গতোষণ ভয় হওয়ায় দুর্গের রূপ যেন আরও ভীতিপ্র  
ণেয়। পরিত্যক্ত বাস্তবসমূহে শৃগাল আর কুকুরের আত্মনা।

ফোন  
৩৪-৫০০২



সবকিছু সম্মত  
সুন্দর ভালকরাব

এক মাত্র  
জিনি সোনার  
নিখুঁত গহনা  
প্রস্তুতকরন

**জুয়েলাস**

**কে.এল.সিংহ এণ্ড সন্স**

১৬৭ বি বহু বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২



কিন্তু বাস্কার-বাসিনী বিদ্যাবাসিনী যেন ভুলেপড়ল।

বে-শেষে মনুষ্যের বাস দিনে দিনে বৃদ্ধ হ'তে চলছে, সেখানে রাজকুমারী পরম নিশ্চিন্তার কালটিপাতা করেছেন। তিনি যেন হিঁসে পতকে পরোয়া করেন না, সর্প-বিষকে ভয় করেন না, দ্রবুত দ্রব্যানবকেও মানেন না।

তিনিও জাগরুক। তাঁরও চোখে ঘুমের চিহ্ন নেই। জাহাজ্যমান ব্যক্তির আলো তাঁর দুই পাশে। সমুখেও একটি বাতি জ্বলছে।

ঘুম নামে না চোখে; তাই রাজকুমারী লিখনকার্যে ব্যাপ্ত। তাঁর হাতে লেখনী। একাগ্রচিত্তে বিদ্যাবাসিনী শাস্ত্রপুঁথি নকল করছেন পাতার পর পাতা। শুভ্র তুলট কাগজ ক্ষণক্ষণে কৃষ্ণকালির আঁধারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

জলন্ত ব্যক্তির আপশাপে কীটপতঙ্গের জটলা। অগ্নিধ্বং হ'তে গার উড়ন্ত কীট। আগুনের দাহিকার আঁধ-বিসঞ্জন দিতে চায়।

—রাজকুমারী।

নিঃশব্দ রাত্রির মৌনতা সহসা ভঙ্গ হয়। কিন্তু রাজকুমারী একাগ্র মনোনিবেশ টুটলো না। বিদ্যাবাসিনী পূর্ববৎ লিখনকার্যেই রত থাকেন।

আজ্ঞানকারী পুনরায় ধীরকণ্ঠে ডাকলো,—রাজকুমারী!

এই গহন রাতে এই ভগ্নপূর্বীতে কোন প্রেতাঙ্ক বাতীত কে দার কথা বলবে! তাও পুরুষকণ্ঠের সন্ত্রস্ত আহ্বান।

বিদ্যাবাসিনী ধারণা করেন হয়তো পাঠানপ্রহরী প্রহরার কাজে দাঁড় হয়ে অন্যের এসেছে; কিছু বক্তব্য আছে তার। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের কার্যক্রিয়াকে অব্যাহত করেন। পাঠানের কণ্ঠস্বর কি এতই দ্রুতিন্দ্রিয়। পাঠানের কথার স্রব কর্ণকণ্ঠে যেন গন্ধভিনিক্ষিপ্ত।

রাজকুমারী তিলমাত্র বিচলিত হন না। লেখনীও থামে না। দিও মনে মনে আশঙ্কিত হতে থাকেন। পরিচাটিকা অজ্ঞ ঘরে তার নিঃসামগ্রী।

আবার ডাক শোনা যায়।—রাজকুমারী!

—কে? বিদ্যাবাসিনী চোখের প্রসারিত দৃষ্টি ফিরিয়ে বিদ্যাবাসিনী লেনেন,—কে তুমি? পরিচর না জানা পর্যন্ত সাড়া দিতে পারি না।

ককের ব্যক্তির অস্পষ্ট কে যেন, কথা বলছে অপ্রতিষ্ঠিত হয়ে। দাবার তার কথা শোনা যায়। সে বলে,—রাজকুমারী, আমি রাজকুমারী!

—রাজকুমারী! অস্পষ্ট এই নামটি সন্ধ্যায় উচ্চারণ করেন বিদ্যাবাসিনী। মদ্যপানপ্রেরণে লেখনী স্থাপিত ক'রে পরিধের বস্ত্র বিস্তৃত করেন উদ্ভাসে। কেমন যেন সলজ্জার আসন ত্যাগ করলেন। পায়ের শুষ্ঠন টেনে উঠে দাঁড়াবেন। মুহূর্ত্তে বললেন—আপনি এই রসময় কেন আবার কষ্ট করলেন? কোন বিশেষের আশঙ্কা আছে কি?

—হী, তা আছে বৈ কি। চন্দ্রকান্ত অন্ধকারেই থাকেন, কথা লেন। আশ্ব-প্রকাশ করেন না আলোর আভাষ। বললেন,—

উনলাস, বাউলার সবাকের সমীপে একজন বৃত্তকে পাঠিয়েছেন।

চন্দ্রকান্ত হয়তো পথপ্রদে প্রান্ত। ধানিক খেমে আবার বললেন,— তাঁর কল্লভারবের ভয়বশে আপনাদের ও আমার নামও যুক্ত করেছেন।

—আমার দুর্ভাগ্য আর কি!

অবিস্তৃত গল্প ঠিকঠাক করতে করতে কথা বললেন রাজকুমারী, বিষয় কণ্ঠে। বললেন,—আমার অপরাধ কি তাই শুনি?

—তা আমার অজ্ঞাত। চন্দ্রকান্ত ধীরে ধীরে বললেন। অন্ধকার থেকেই বললেন,—মিথ্যা অভিযোগ লিখনে হরয়ে কেতোয়ালে। নগরবন্ধক শুনা যায় হিন্দুবিধবী, তজ্জন্তই ভয়। বর্তমানে নগরবন্ধকের কার্যে একজন যুগলকে নিযুক্ত করেছেন বঙ্গের নবাব।

—আমি তো নিরুপায়। বললেন রাজকুমারী, কীপা-কীপা হয়ে। বললেন,—যাই হোক, এখন রক্ষা পাওয়ার কি উপায় তাই বলুন। আশ্চর্য্যচর্য্য কি রেহাই পাওয়া যাবে?

চন্দ্রকান্ত আর কথা বলেন না। দয়-দালানে দাঁড়িয়ে থাকেন অপরাধীর মত।

রাজকুমারী বললেন,—আপনি ককে প্রবেশ করুন। আমার জন্মবোধে মিথ্যাব কিছু নাই।

—বিনা অমুমতিতে কক-প্রবেশে সাহসী হই না। চন্দ্রকান্ত ক্রান্ত হয়ে বললেন। কথার শেষে দ্বারে দেখা দিলেন। রাজকুমারী আড়নয়নে দেখলেন, ব্রাহ্মণ সত্যি পথপ্রান্ত। ভয়ের আবেগ তার মুখাবরণে। চোখে চিন্তাকুল চাউনি।

শুষ্ঠন ঈষৎ টেনে কথা বলেন বিদ্যাবাসিনী। বললেন,—বা সত্য তা কি মিথ্যা হয়? ভিত্তিহীন অভিযোগের মূল্য কি?

—নগরবন্ধক সন্ধান নয়। যে কোন অভিযোগ আমাদের ব্যতিব্যস্ত করতে পারে। বিশেষ ঠেলেতে পারে। তাই বত আপনাকে আমার। কথা বলতে বলতে চন্দ্রকান্তের দাঁস কঁক হই যেন।

বোঁবন টলমল করছে। সৌন্দর্য্য প্রভাপ্রাচুর্য্যে প্রদীপ্ত হুঁত রাজকুমারী। বসিও অবহেলা ও অনাসক্তিতে বিদ্যাবাসিনীর ক্রম বর্তমানে কিঞ্চিৎ স্থান। চূর্ণ অলকগুচ্ছ আবৃত রাজকুমারী মুখখানি চন্দ্রকান্তের নজরে পড়ে না। কি যেন লজ্জার বিদ্যাবাসিনী অলকগুচ্ছ বঙ্গপরে নামিয়ে দিলেন।

—আমার মুহূর্ত্ত মললেন। বগতঃ কবলেন রাজকুমারী, সকাচরে।—বুঝা বিভ্রমের আর সছ হয় না। অকারণে সোবারোপ আমার প্রতি কেন?

—কিন্তু কতব্য রাজকুমারী? চন্দ্রকান্ত মুহূর্ত্তে উত্তরলেন। আমি বলি এই গ্রাম ত্যাগ করাট উচিত।

—বিচারবোধ নাই আর আমার। মুচুড়া ছাড়া গতি দেখি না। কথা বলতে বলতে বিদ্যাবাসিনী আঁখিপ্ৰান্ত আঁচলে মুহূর্ত্তে। বললেন,—সপ্তগ্রামে এই সকল ভিত্তিহীন সুরাধ দায় জে আপনাদের অজ্ঞ থাকবে না। তিনি আর রক্ষা রাখবেন না।

চোখাচোখি হ'তেই ইশারার ডাকলেন চন্দ্রকান্ত। হুঁশে যেন তার জন্মবোধের ভক্তিয়া। তাঁর আজ্ঞান-ইচ্ছাতে সত্যি প্রবেশ।



বিশ্বদক্ষেপে অগ্রসর হলে রাজকর্তার পক্ষে কোন সম্ভাবিত ভাবাবেগ।

চন্দ্রকান্ত দুঃখের হাসি মনে বেন। রাজমারী কহে আসতেই সম্রাট ইন্দিক-বিদেহে মনে। তারপর বিদ্যাবাসিনীর একখানি নথর-পত্র নিঃসরণ করিলেন। কিস-কিস বললেন—আমার আইস। তার কথার পরিচায়িকা যদি জাগ্রত হয়।

—কোথায় যাবো? আবেগে কণ্ঠে জলন রক্তকণ্ঠ। বললেন,—মরণের পথে কি?

কণি হাসির সঙ্গে চন্দ্রকান্ত হন,—না এখানে বাতির আলো, পার্শ্বকক্ষ অন্ধকার।

কথা বলতে বলতে ব্রাহ্মণ আবার প্রবেশ করলেন। রাজকুমারীও বন্দিনীর মত তাঁকে বন্দন করলেন। ব্রাহ্মণ আবার বললেন,—উবার আলো ফুটুক, তারি হয় কোঁঠির কণি যাবে।

বিদ্যাবাসিনীর আশ্রয়স্থান বৈশাখী পথে। দুঃখের কথা হারিয়েছেন। চন্দ্রকান্তের করচাপে হাত পিঁহত থাকে।

কুম্বাসে ও ভয়ে ভয়ে রাজকুমারী—আজি ভীতা হই, পরিচায়িকা যদি সহ

চন্দ্রকান্তের আকর্ষণ বেন চাঁদের মতই। তিনি রাজকর্তার অহ হাতও নিজ হাতে ধারণ করলেন। চুপি চুপি বললেন,—আমার দুঃসাহস মাঝনীর। শত বিপদেও কেন বে আমার মানসচক্রে প্রবেশ মানি না কি জানি! অসবয় আজ আমার মনকে অধিকার করেছে।

রাজকুমারী বিদ্যাবাসিনী বেন নীরব নিম্পন্দ। হুক হুক বন্ধ, ঘন ঘন শ্বাসপতন হয় সম্রাটের। জয়-জয়ান্তরের সংসারে একবার ইচ্ছা হয়, এই কক্ষ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; এই দুঃখের। পদচারণার সচেত হন রাজকুমারী, কিন্তু তাঁর গতি বাধা পায়। দিব্যজ্ঞান লুপ্ত হলেও অজ্ঞতবে বোঝেন, তিনি বেন কায় বাহুপাশে আবদ্ধ।

বৈশাখী-রাতের এলোমেলো মন্ত-বাতাস চলেছে বাইরে, শনশনিরে। রাজির নিজকর্তার আমোদবের প্রবাহধ্বনি ভেসে আসছে। ওলাভিখির চন্দ্রকর্ণে নদী বেন আজ উচ্চগামী। চাঁদের দিকে মাথা তুলছে জলকল্লোল। প্রগলভার খিল-খিল হাসির মত জলের ধারা সম্মুখে এগিয়ে চলেছে।

হুজির আশায় বিদ্যাবাসিনী আরেকবার বেন উন্মুখ হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাহুবন্ধন কত বে কঠোর! বুধা চেঁচায় কান্ড হয়ে একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজকুমারী। অহমানে বুঝলেন, হুজি নেই। পুরুষের কাছে নারীর হুজি কোথায়? [ক্রমশঃ]

### গৃহকল্যাণ ও সামসারিক দুঃখ-কষ্ট

হুজির বেন নিতান্ত নৈসর্গিক তাহা বলিতে পারা যায় না, তাহার ইচ্ছা পরিব্রাজ্য পাওয়াও সহজ কথ্য নহে। সম্রাটের আশ্রয় প্রাপ্তিও সম্পন্ন হয় না; পরিবারের মধ্যে কেহ বা ভাল, কেহ বা মন্দ। ভাল-মন্দে দুঃখের রূপ মিল হয় না; মন্দে মন্দে দুঃখ মিল হয় না। কখনও কখনও গুণবানদিগেরও পদস্পর্শ দ্বারা উপহাসিত হয়। বেহেতু, গুণ নানা প্রকার, কেহ বা এক গুণের দ্বারা পক্ষপাতী হইয়া অন্য গুণের সংপন্নোক্তি যের করে, কেহ অন্যবিধি গুণের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠে। তখন গুণবানদিগের পদস্পর্শ একা থাকিবার সম্ভাবনা কি? বাহা হউক, দলব শ্রদ্ধা-মাতা সম্মান ও সমাদরের উপভুক্ত, তাঁহাদিগের গারও হইয়া থাকে। যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া জ্ঞানভূষণ পথে গমন করেন, তাঁহাকে কেহ কখনও দুঃখ বা অনাদর করে না।

সামসারিক অনেক প্রকার দুঃখ ও কষ্ট আছে। কতকগুলি প্রকৃত অর্থীন। ভৃত্যের উপর বিশ্বাস করিয়া সকল কার্যের সেন, ভৃত্য বাহা করে তাহাই হয়। কতকগুলি লোককে ধনবান হইতে ইচ্ছা থাকে উপর নির্ভর করিয়া কালক্ষেপ করিতে হইলে তাহারা সেই জ্ঞান-কুটুম্বকে সঙ্কট করিতেও পারেন না, কষ্ট ও কষ্ট করিতেও তাঁহাদিগের সাহস হয় না। এমন অনেক স্বামী জন তাঁহারা কেবল হুকুম খাটিহিতে চাহেন, এমন অনেক পত্নী জন তাঁহারা স্বামীর একটি কথাও গ্রাহ করেন না। এই ভ্রমও লোকের লোকের মন করা যায়, কিন্তু ভাল করা সহজ কথ্য নয়। একদম দুঃখিত ও সন্তোষ অনেক স্বামী হইতে পারে না, কিন্তু একদম দুঃখিতামে ও পাশে অসেকেই অনুভবী ও বিবর দুঃখবাহন হইতে পারে।—তামসিকত্ব তর্কবত অনুভূতি জনসন প্রণীত স্তম্ভনিক হইলে এই হইতে। এই প্রকারে প্রকাশিত হয় ২৫এ ভাষ্য:

# হেমন্তি খরগুড়া

স্পেনসার হুত্র দত্ত

যা কখনও কোর না, পণ করেছিলাম, তাই করতে হোল।

বিয়ে নয়—চাকরী। আমাদের দেশের আইবুড়ো ছেলেরা পণ করে বিয়ে কোর না। কিন্তু লগুনে এসে পণ করে বললাম যে চাকরী কোর না। কিন্তু চাকরী করতে হোল। নতুন আর কি? পণ করি সকলে। পণ ভাঙিও সকলে।

ভারত সরকারের ট্রেনিং তত্ত্ববিলে যাচিতি। বিলিতে টাকা আনিতে যথেষ্ট হাঙ্গামা দেখা দিল। ভাবলাম—ভালট হোল। দেশের টাকা তো অনেক খরচ করলাম। এবারে কিছু উপার্জন করি।

বারিষ্টারী পড়ছিলাম—হানে 'বার' করছিলাম। টাইপটা জানা ছিল। কাজ পেলাম অতি সহজেই। এত সহজে কিন্তু এদেশে সকলের কাজ জোটে না।

বিলিতি অক্লি। এর আগে কিছু ইংরেজের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু তা ত দানা ধাঁধনি। ভাবলাম হয়তো নতুন কিছু অভিজ্ঞতা হবে। কিন্তু এক মাস কাজ হবার পরও কোন অভিজ্ঞতাটি হোল না। আলাপ হোল না বিশেষ। ইংরেজ জাত বড় 'কোত্ত'।

'সামার' এসে গেল—বহু প্রত্যাশিত 'সামার'। এরা যেমন ক্রিসমাসের জল দিন গোণে, হেমন্তি দিন গোণে 'সামার-হলিডে'র জল। হু' সপ্তাহ লগ্না হুটি। এরা তখন সকলে বেরিয়ে পড়বে। আর কোথাও না বাক লগুনের কাজকাছি, আইল অফ ওয়াইটে বাবেই, যেমন কোলকাতার লোকেরা পুজোর ছুটিতে মধুপুর বেড়াতে যায়। যে ব্লকে কাজ করতাম, সেই ব্লকেই অল্প এক ঘরে সামার হলিডে'র জল লোকভাব হওয়ায় আমার কাজ বসল হোল। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে।

সেসলি খারগুড়ের সঙ্গে এখানেই আলাপ। আমাদের ঘরটা



বেশ বড়। ছ'টা বড় বড় টেবল পা। আর সেই ঘরেরই অন্য কোণে পার্টিসান দেওয়া ছোট্ট গায় সুইচ-বোর্ড। সেসলি টেলিফোন অপারেটর। ঘরের এক প্রান্তে টাইপরাইটার নিয়ে কাজ করে বাই। অল্প সোমালোচনা মাঝে মাঝে তুনি। মাঝে মাঝে তুনি না। ওয়া করে। কাজের স্বীকে কখনও গল্প করে, হাসিঠাট্টা করে। আতিথি যোগ দিই না, সেসলিও দেয় না। এইখানেই আমাদের ঘর মিল।

এ ঘরে আমার প্রথম দিনই—এর একটু আগে আমার মনি ডাকলো, বললাম, কা ব্যাপার?

তোমাকে লাক আওয়ারে বকটা সুইচবোর্ডে বসতে হবে—যখন মি: খারগুড় থাকবে না।

কিন্তু আমি যে টেলিফোনের বখি না, ভয়ে ভয়ে বললাম ও খুব সোজা ব্যাপার। এক মি: খারগুড় বখিরে দেবে—আর এ কাজ তোমারই, এ ঘরে ট্রিগি থাকে এটা তার কাজ।

কোনও মতামত প্রকাশ করি। কারণ লাভ নেই তাকে কাজের এসঙ্গে খারগুড়ের সঙ্গে প হোল। এক প্রথম আল অবাংক হলাম—ওর কথা শুনেমোখক আলাপের পরই সে বললে—তোমার উচ্চারণ ভুলোয়া যায় তুমি বিদেশি ক'টিনেজের কোথার তোমার বা নিজের গায়ের রু-এর টি তাকালাম। ভাবলাম বাসকতাই না তো? এ আবার কে রসিকতা? কিন্তু হঠাৎ কোলিকি নজর পড়লো।

লাঠি। এ দেশের অল্প বা কার অল্প—তার ব্যবহার ক এই সাধা লাঠিই তাদের চিনিয়ে। বুঝলাম—সেসলি আর ওর প্রেমের উজ্জের বললাম—আ দেশের লোক—ভারতীয়।

সেসলি আর কিছু প্রশ্ন না। আমাকে কাজ বুঝে লাগলো। কিছুই বুঝলাম না এক সেটা আমার সাথে ওর সাথে। ভাল করে কাজ তুই পারলো না। একটু সাধা-লাঠি হাতে নিয়ে ম্যাক বেরিয়ে গেল। আমি সুইচবোর্ডে। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্লকের লোক জেতে আমাদের ঘরে।

কৈ-চৈ—সকলরই এক টেলিফোন বিভ্রাট। ৫ মিনিট লাইন চরে পাচ্ছে—কে মিনিট্টী অফ হেলথ জরুরী আলোচনা করছিল—হুতার লাইন কাটা গেছে এ সময়ের চেয়ারে বসে থাকা ইন্ডের মিস ক্রিডেনবার্গ উঠে ব মি: বোস নতুন লোক। আশ্রয়—সকলে হাসতে চলে গেল। আমি বসে লাগলাম। একটু পরেই আসতে আমি সেলাম লাক খে

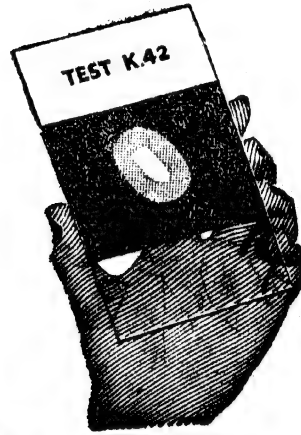
ই

সেসলির চোখের কোকিরতা নেই। বয়সও করা যায় না। ওর সন্মোলাপ করার আদ্র ছিল না। কিন্তু আলাপ হলো। আমার 'অক্লিসিয়াল' পাকা চাকুরেদের চেয়ে সপ্তাহে বকটা বেশী। আমার ক নয়—এ অল্প সোম খেবেশপতি প্রতিদিন পনের টি থাকতে হয়। সেসলিও বাই সময়ে। টেলিফোন

# দেখুন



দস্তক্কর নিবারণে  
বিশেষ  
প্রতিরোধক !



## কলিনস সুপার-হোয়াইট টুথপেস্ট

আপন হাঁসির চমক অটুট রাখে

- গবেষণাগারে ঘের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কলিনস সুপার-হোয়াইট (সাদা দস্তক্করী জীবাত্ম (কালো অংশ) প্রতিরোধের প্রাচীর (সাদারকে পুস্ট আবরণ) গড়ে তোলে।

পেপারমিট-গকীটল আবাদ।



শ্রদ্ধা করুন,  
ধরবার কত

কলি কলিনসে পুস্ট আবরণ

প্রয়োজন হোল। হুটি আমার সওয়া পাঁচে। তাবলার লাক আওয়ারের পরে 'বসের' বহুমুখী নিয়ে রাখবে। কিন্তু কপাল লোবে লাক আওয়ারের পরে 'বস' আর ঘরে এলো না। পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের আর সকলে বেরিয়ে যায়। সামার-টাইম। বড়ির কাটা এক ঝট্টা এগিয়ে দেওয়া হয়েছে বাস্তব অফিসের বাবু বা বতস্বর সম্ভব সুরের আলো পায়। এরা এক হুহুর্ত ঘরে থাকে না। চকের নিমিষে নগর মথুরা। আমিও প্রায় এসের সঙ্গে সঙ্গেই 'চায়ারিও' বলে বেরিয়ে এলাম। তার পরদিন সকালে সেসলি আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে বললে—ভাল হয়েছে, তুমি মিঃ কার্ণার আসার আগে এসেছ।

কেন, বস' কি কোনও কিছু রেখে গেছে? বললাম।

তুমি গতকাল বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ কার্ণার ঘরে এসে তোমার খোঁজ করে। আমি বলেছি তোমার বাড়ীতে একজন অস্থত। এই 'কল' শেষে তুমি চলে গেছ। আজ সেটা ম্যাসেজ কোর।

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি—মিঃ গার্ড, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বললাম। 'ভাটসু' জল রাইট, ভাটসু জল রাইট' সেসলি দু'বার বললে। কাজ ছিলো না মৌলিন খুব বেশী। আন্তে আন্তে টাইপ করছিলাম। কিন্তু ভাবছিলাম অল্প কথা। সেসলির কথা। ঘরের পশ্চিম কোণে কাচের পাটিশান করা ওর বসার জায়গা। কাচের মধ্যে দিয়ে তাকে দেখা যায়। সোমালী চুল সাধারণ তুলনার একটু বড়ই। অজিত। কলারটা আয়তন। প্রাচীরে অতি সাধারণ। কিন্তু ভাবলাম—না সেসলি অতি সাধারণ ইয়েজ নয়। নয়দ আছে ওর। নয়তো কি দরকার ছিল ওর আমার জন্য মিসেসে বসার? আমার ভারতীয় প্রবৃত্তি আমাকে ওর প্রাচীর কৃতজ্ঞ করালে।

এর পর প্রতিদিনই পাঁচটার সময় বখন আর সকলে চলে যেত তখন আমি উঠে আসতাম—আমার জায়গা ছেড়ে সেসলির পাটিশান দওয়া জায়গার পাশে একটা ছোট আয়না ঝুলান আছে। কেপ-কিন্স করার সময়ে ওর সঙ্গে আলাপ করতাম। ওর কবে চোখ রাপ হয়েছে—এটা উত্তরাধিকার স্বত্ব পাওয়া কি না এই সব। দলিও আমাকে প্রশ্ন করতো। ভারতবর্ষ সবচেয়ে মানুষী প্রশ্ন। নের মিনিট মাত্র আমাদের সময়। কি আর বেশী আলোচনা হবে? ছাড়া—সব দিন সময়ও হোত না। আজ হয়েছে আমি ব্যস্ত, বলে সলি।

ইয়েজের সবচেয়ে একটা কথা শুনেছিলাম—'ইক ইউ ক্যান ক মি আইস ইট ইক জল রাইট' আমার ঘর যে আলোচনার প' ছিল আমার অভ্যাসেরই সে ঘরক গুলে গিয়েছিল। আন্তে তে আমি এসের একজন হয়ে গেলাম। কাজের অবসরে যে চৌকি আলোচনা হোত আমি তাতে বোগ দিতাম। কিন্তু সেসলি সমাজ ছাড়া হয়ে বইলো। মাঝে মাঝে দেখতাম—কখন যে ওর পা ছেড়ে গেছে জানি না। 'হুইচবোর্ডের' কাটাগুলো বায়ে বায়ে তিত করে করে ঘরের লোকদের সচেতন করতো। আমাদের মধ্যে। তখন উঠে আসতো 'হুইচবোর্ড'—আমি সেসলি সবচেয়ে সন্তুষ্ট।

অবাক কাণ্ড, ও যে কখন ঘর ছেড়ে গেছে কেউ জানি না।

এক পা—বহুদূর পা নয়। হুইচবোর্ডের দরজা নিশেবে,

নয়দূর তখনকার কলারটা এক-কক দিলে আমি সন্তুষ্ট হইতাম।

দ্রীঘ শেষ হয়ে আসছে। আমাত্যাকরীর মেয়াদও ফুরিয়ে আসছে। একদিন হঠাৎ অফিসে 'ইসায়েলের' সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ইসাবেল আমার বন্ধু হিম্মতিন্দেখারের শ্যানিস বান্ধবী। তবে লগুনে অনেক বছর ধরে থেকে প্রায় ইংরেজি হয়ে গেছে।

তুমি এখানে? আমি প্রশ্ন করলাম।

আমিও তোমাকে একই প্রশ্ন করত, বাজিলাম—ইসাবেল বললে। অবশ্য সেসলি আমাদের ব'লেল যে ওদের ঘরে একজন ভারতীয় এসেছে। আমি কিন্তু তখন জামাম না যে সে হচ্ছে তুমি।

তুমি বাকি এখানে কাজ কর, জিরফরলাম।

হ্যাঁ আমি নর্থ ব্রুকে টাইপ পুস্তকালয় করি। সেসলি আমাদের কাছে প্রায় আসে। আচ্ছা চলি—

ইসাবেল চলে গেল। সেদিন বিকেলে আমি সেসলিকে ইসাবেলের সঙ্গে দেখা করলাম।

হ্যাঁ আমি ওদের ঘরে বাই মিঃ হাউস। সেসলি বললে। আমি বড় নিঃসঙ্গ। আমার কথা কেউই হবে না। এমন কি এই ঘরেই বা আলোচনা হয়—আমি তার বাইরেপড়ে থাকি।

লজ্জিত হলাম। সত্যিই তো—এ ঘরে আমাদের আলোচনার কোনও দিনই সেসলিকে দেখিনি বেশী দিতে। আমার মিসেসের নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তবু ব্যাপারটা সহজ করার জন্য বললাম—ঘরে কি-ই বা আলোচনা হয় বলে। কে আর হতে বিশেষ বোগ দেয়। আর তাছাড়া তোমার কাজ জনসাধারণের সঙ্গে। জনসাধারণকে তুমি অফিস সবচেয়ে প্রথম খবর দাও। তোমার এই বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ সব সময়ে ব্যস্ত থাকা কাজ নিয়ে কিছু আলোচনার বোগ দেওয়ার সম্ভব নয়।

জানি মিঃ বোস, আমি বাইরের লোকের সঙ্গে 'ফার্ট' লিখি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন আমার এক নিঃসঙ্গ তা তোমরা বুঝবে না। তোমাদের সঙ্গে দুটো কথা বলার আমার কি আনন্দ—তা তোমরা জানতেও চাও না। আমার চোখ রাপ—সিনেমা দেখা চলে না। থিয়েটারে ভাল সীটে বসার আমার সম্ভব নেই, ইচ্ছে মত খাবার উপায়ও নেই আমার—জার্নালেটিস কলী আমি। তার ওপরে আমাকে সাধাভিত্তিক সফর করতে হয়—আমার কথা না বলাই ভালো।


সেসলি এর বেশী সেদিন আমাকে কিছু বলেনি। কিন্তু আমি আমার আচরণে লজ্জিত হলাম। এই সেকটা আমার সবচেয়ে জেবে একদিন—মনিবের কাছে মিশে, বলেছে। লখচ এর কথা আমি কোন দিন ভেবে দেখিনি। তাববার চেষ্টাও করিনি। আজ ওর কথা ভাবলাম। আমাদের ঘরে থেকে ঘর-ছাড়া সেসলি হয়তো কিছু পরিবর্তনের জন্য ইসাবেলের টাইপ-পুস্তকালয় বার। সেখানে হয়তো সহস্রাধিকতাসম্পন্ন ওরা কোনও প্রশ্ন করে। আমি নিজেও তো ওকে অফিসের পরে কোনও কফি-কর্ণারের একদিন ভাকতে পারতাম। কিন্তু আমিও ডাকিনি। আজ আর ডাকা চলে না। বড় সেরী হয়ে গেছে।

এর পরের দিন বেলা সাড়ে এগারোটার সময় দেখলাম সেসলি নিঃশব্দে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুঝলাম, ও ইসাবেলের টাইপ পুস্তকালয় হঠাৎ ওর অস্থায়ীভাবে আধিকার করলে মিস কিউমবার্ণ।

কান্তবিন্দিত, কণ্ঠে চীৎকার করে বললাম—মিঃ হাউস ইক অফিস



বীরা আশ্রমের মতো উৎসবদিনের একটি উপহার...

জেনারেল-একো রেডিও   
২০০ থেকে

সাতদিনের মধ্যে আপনার জেনারেল-একো রেডিও উপকারিতা নিয়ে নিয়ে নেওয়া হবে। এখানে ছ'টি হৃদয় হৃদয় জাশনাল-একো মডেল দেওয়া হল। আরো অনেক বরফ মডেল আছে — আজই জাশনাল-একো ডীলারের কাছে দেখে আসুন।



মডেল বি-১০৩ : ৬ কাল্প  
৩০০ টি  
৩ কাল্প  
১০০ টি



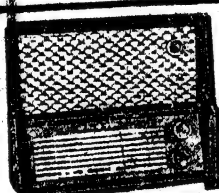
বি-১০৩ : ৬ কাল্প  
৩০০ টি  
৩ কাল্প  
১০০ টি



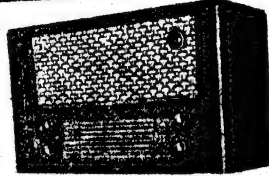
মডেল বি-১১২ : ৬ কাল্প  
৩০০ টি  
৩ কাল্প  
১০০ টি



মডেল  
৩০০ টি  
৩ কাল্প  
১০০ টি



মডেল  
৩০০ টি  
৩ কাল্প  
১০০ টি



মডেল  
৩০০ টি  
৩ কাল্প  
১০০ টি

জেনারেল-একো রেডিও  
২০০ থেকে



জেনারেল রেডিও এণ্ড অ্যান্ডারেল  
প্রাইভেট লিমিটেড

৩ মাদ্রাস ট্রাট, কলিকাতা ১০। অপেরা হাউস,  
বোম্বাই ১। ১/১৮ ব্রিটিশ রোড, মাদ্রাস। ৩৩/১৯  
শিল্পার সুবিনী, পাক রোড, বালুগোলা।  
কলোদী, চান্দী, কক, দিল্লী।

জাশনাল-একো আপনাকে দেওয়া  
বাক্যের মধ্যে ব্যাখ্যা আ

হোল। খারওড়কে নিয়ে আর চলে না। গড় সপ্তাহে হ' মিন কাষাই করেছে—তারপর হয়ত সব ছেড়ে চলে যাওয়া এদের চাকরীতে রাখা যায়। কেন যে এদের বেছে বেছে জানি না—

মিস ফ্রিডেনবার্গও মন্তব্য করলে—জানি না বাপু। ও বেন সর্বদাই কিম্বিরে আছে। কথা বলবে একঘেয়ে সুরে, আমার 'কাজিন' তো জমাৎ। সে অনেক হাসি-খুসী। 'লাইফ'ক 'এনজয়' করাও একটা 'আর্ট'।

মি: জনসন বললে—আমি জানি ও কোথায় যায়। নর্থব্রুকস টাইপিং মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে—এই কীকি দিয়েই ইংরেজ জাতটা দুহুতে বসেছে—

সেসলি এর মধ্যে ফিরে এসেছিল। মি: কার্ণার তাকে বললে ন তার জানান না দিয়ে কোথাও যাওয়া উচিত নয়। 'সুইচবোর্ডে' মি: কল আসে—আর বাইরের লোক যদি লাড়া না পায় তাহলে অফিসের বদনাম। সেসলি কোনও কথা না বলে চেয়ারে বসলো।

আজ আমি এদের জন্মস্থানটা সম্বন্ধে ভাবলাম। কিন্তু এত ভাবলাম যে, এদের মহামত অমৌজিক কি না। সেসলি সম্বন্ধে এরা সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পায়ে—কিন্তু সেসলির নিয়মিত অসুস্থিস্থিতি এদের কাজের অসুবিধা করায়। সেসলি যদি কোনও দিন না আসে তাহলে এসেই একজনকে 'সুইচবোর্ডে' বসতে হবে—আর সে কাজ খুব উপভোগ্য নয়। হয়তো দু'-একদিন এ কাজ করা চলে। কিন্তু তার বেশী নয়। জন্ম দিয়ে বিচার করলে এ সবের প্রশ্ন আসে না। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে এ প্রশ্ন আসবেই। ইংরেজ জাত জন্মর বোকে—বান্ধবী—প্রিয়—বন্ধু। আর কারুর নয়। সবচেয়ে বড় কথা হোল এ দেশ বোনের জন্ত—বাহ্যের জন্ত—উপভোগের জন্ত—। ব্যাং শিফ্রির আছে তাদের জন্ত এরা গাঁড়াবে না—তাদের জন্ত নিজেদের বঞ্চিত করবে না। তাদের কথা বাস্তব ভাবে না—ভাবে সম্বন্ধে ট্রেট। সেসলির জন্ত যদি এরা নিয়মিত অসুস্থি নিয়ে না চায় তাহলে এদের দোষ নেওয়া চলে না।

ছুটি হোলে গেল। আমার হ'জনে হললাম। আর একলে তত্ত্বাবধি জানিয়ে বিদায় নিয়েছে। আজ সেসলি আমার টেবলে এসে—তনলে এদের কথা। আমি কি ইসকুলের ছেলে যে এখন বাইরে বাব হাত তুলে অসুস্থি চাইবে।

টিক সেইরকম গাঁড়ালো নাকি ?

হ্যাঁ ব্যাপারটা টিক সেই রকমই গাঁড়ালো। কিন্তু কিছুই বলার নেই।

তিন হপ্তাহ বাদে আমার হপ্তিতে। তখন বিশ্রাম পাব পদের দিনের যতো। কিন্তু জানো—এই করেই বছর আগেও আমি হপ্তিদের জন্ত একটা ব্যস্ত হতাম না। তখন অফিসে অনেক আনন্দে ছিলাম। এই ঘরে তখন কার্ণার থাকতো না—থাকতো 'বিজন'। কাজের দ্বারা যে গল্প হয়—আমিও বেশ দিতাম তখন। আমার তো বিশেষ বন্ধু-বান্ধব নেই, তাই অফিসের এই আলোচনার ঘণ্টে আনন্দ পেতাম।

তোমার বাড়ীতে কি কেউ নেই যে তোমার সঙ্গে হ' গল্প কথা বলে ?

না মি: বোস, আমার মত লোকের সঙ্গে হ' গল্প কথা

আলাপ থাকে। যা নেই অনেক দিন। বাবা পঞ্চাশ বছর বয়সে আমার দি়ে ক'রেছে। আমার বৌও রাখে না। আমিও রাধি না। কখন রাধার সময় বসে। দেখছো তো কি ভাড়াভাড়ি মিন কাটে এসেছে। তবে আমার বৌজ নেই আমার এক বোন। তার খুব ইচ্ছা যে আমি তার সঙ্গে থাকি কর্তৃত্বালে। কিন্তু তার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি তার সঙ্গে কেন বোঝা হই ?

টিক কথা। আমরা বক্তৃতা কর্মকর্তা ততদিনই কাজ করা উচিত। তোমার মতের সঙ্গে আমি একমত—বললাম।

পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে। হাত-মুখ ধোবার জন্ত উঠলাম ক্লিক ক্লিক করে 'সুইচবোর্ডের' কীটটা আঘাত করতে শুরু কালে অসময়ে। খারওড় সেমিকে বসে হোল টেবল ছেড়ে। এই কুড়ি মিনিট কোন কলই আসেনি। প্রথম কল হলো অসময়ে—পাঁচটা কুড়িতে। জনল্যাম ও বলছে, মে কেমার ঘট না—

## তিন

সমস্যাটা তাহলে বড় হয় গাঁড়ালো—আমার মনে হয় অফিসের এমিকে নজর দেওয়া উচিত। কত দিন আর এমনি করে চালাই। পার্সোন ডিপার্টমেন্টকে একটা কিছু করতেই হবে—মি: কার্ণার বললে।

'সুইচবোর্ড' আর 'সুইচবোর্ড'—জনসন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

'সুইচবোর্ড' মিস ফ্রিডেনবার্গ বলে। সে প্রশ্ন করলো—খারওড় এখন কেমন আছে। জ্ঞান আজ কি ?

আমি কি চসপিটালে এ খবর নেব ?

না খবর নিয়ে কি হবে ? 'হেমারেজ' বার ইচ্ছা তার সম্বন্ধে কেন ঘন ঘন খবর নেওয়া—

চুপ করে বসে তনছি। দু'দিন আগে সেসলি অফিস থেকেই ছুটি নিয়ে হাসপাতালে গার 'চেক আপের' জন্ত। প্রত্যেক দু'মাস অন্তর এ চেক-আপ করতে, এবারের সময় হয়নি। কিন্তু শরীর ভাল না, থাকার দক্ষণ খাণ্ডে থেকেই ছুটি নিয়ে চলে গেল। এ বিষয়ে এ বেশ বড় ভাল মন্তব্য না ক'রেই ছুটি দেবে। সেসলি হাসপাতাল থেকে চেক-আপ করতে গিয়ে আর ফেরেনি। ব্রেন-হেমারেজ হচ্ছিল।

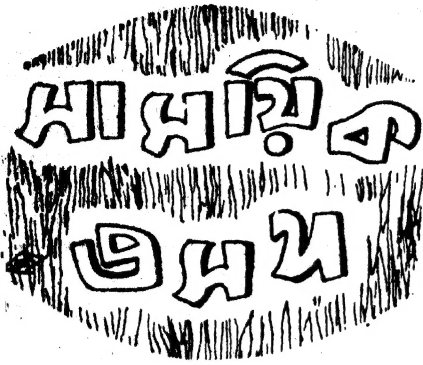
আমার ঠাকুমা কিন্তু যেন হেমারেজের পরে অনেক দিন বেঁচে ছিল। শুধু এক অঙ্গ পড়ে বার মিস ফ্রিডেনবার্গ 'সুইচবোর্ড' থেকে হঠাৎ বললে।

আমার শাউড়ীরও কিন্তু তাই, মি: জনসন বললে আমার বউ সব সময়ে একসাইটেড, তাকে বড় বলি কে শোনে কার কথা। কে জানে একটা কিছু না হয়।

সেসলি চুপচাপ কেটে গেল। বিশেষ আলোচনা হলো না। এর পরের দিন আমার টেবলের সামনে মি: কার্ণার বসে একটা কপি ম্যাটার দিচ্ছিলো তখন মিস ফ্রিডেনবার্গ খবর দিলো। আগের দিন সন্ধ্যা সাড়টার সেসলি মারা গেছে। পাখের টেবলে জনসন আর ফ্রেড জনসন হালিডে গ্যান ক'রছিল। মন্তব্য করলে—'পুত্র







### গৃহ-সমস্যা

“কলিকাতায় গৃহ-সমস্যা যে কত জটিল হইয়া উঠিয়াছে, ইম্প্রভেবল ট্রাষ্টের ২৪টি ফ্ল্যাটের জঙ্গ দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহের ভীড় হইতেই তাহা সহজে উপলব্ধি করা চলে। ২৪টি মাত্র ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হইবে। কিন্তু দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহের জঙ্গ গত ২১শে ও ২৪শে অক্টোবর সি আই টি অফিসের সমুখের কয়েক হাজার দরদারী লাইন দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে সারা রাতও নাকি লাইনে দাঁড়াইয়া ছিলেন দরখাস্তের ফর্ম পাইবার আশায়। ইম্প্রভেবল ট্রাষ্টের উত্তোষে ইমানী কিছু কিছু বাড়ী ভেদারী হইতেছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এখনও তাহা নিতান্তই অল্প। অমিকদের জঙ্গ গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সরকারী ভরফ হইতে এ পর্যন্ত বতরু উত্তোষ দেখা গিয়াছে, বরষা আয়বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজের জঙ্গ গৃহনির্মাণ এখনও তাহা দেখা যায় নাই। গৃহ-সমস্যা আজও জটিল থাকিবার ইহাই অন্ততম কারণ।” —দৈনিক বনুমতী

### মধ্যশিক্ষা পর্বদের স্বেচ্ছাচার

“তুলগুলি খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্বদ হইতে স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ যে সাফুল্যটি পাইলেন তাহাতে নিম্নে দেওয়া হইয়াছে:—“১৯৫৮ সালে স্কুলের সেসান এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে আরম্ভ হইবে। সুতরাং এ বৎসরের বার্ষিক পরীক্ষা ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে লইয়াই চলিবে। মার্চের শেষে পরীক্ষার ফল বাহির হইবে।” অক্টোবরের শেষে সাফুল্য পাইয়া স্কুলের পরিচালকগণ কিরূপে উল্লিখিত ব্যবস্থা কার্যে প্রবর্তন করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। এতদিনের প্রচলিত রীতি অনুসারে নবেম্বরের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষাসমূহ সমাপ্ত হইয়া যায়, বড়দিনের ছুটির পূর্বেই কল যোগা করা হয়। প্রাথমিক সেশন দেওয়া হয়। পরীক্ষার জঙ্গ প্রস্তুতি ছাপাইতে হয়। পূজার ছুটির মধ্যেই এই কাজগুলি শেষ করিয়া রাখা হয় এক সপ্তাহ খুলিবার কয়েক দিন পূর্বেই পরীক্ষা আরম্ভ করা হয়। মধ্যশিক্ষা পর্বদ এতদিন যখন এ বিবেচনা স্কুলসমূহের নিকট কোন নির্দেশ দেন নাই, তখন স্কুলসমূহ নিশ্চয়ই প্রচলিত ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইল। সকল স্কুল বা অনেক স্কুলই বিশেষ পড়িয়া বাইরের পড়িয়া আমসার আশা। তাহা ছাড়া ছাত্রদের দিক হইতেও অনেক অনিশ্চয়তা দিক আছে। বিশেষতঃ বঙ্গের প্রাথমিক পরীক্ষার

এক বৎসরের পড়া তাহাদের শেষ হইয়া গিয়াছে এখন তাহাদের মার্চ মাস পর্বদ বসাইয়া রাখিলে আরও তিন মাসের বেশী সময় তাহাদিগকে পূর্বভ্রমের বোঝা বহিয়া চলিতে হইবে। ইহাতে ছাত্র, শিক্ষক, পরিচালক, অভিভাবক সকলে অসুবিধা ভোগ করিবে। মধ্যশিক্ষা পর্বদ যে পরিবর্তন বাইতে চাহিতেছেন, সে পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে অন্ততঃ এক বৎসর পূর্বে তাহার নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল।” —জনদবাজার পত্রিকা।

### ভারত সরকারের ভিক্ষাবৃত্তি

“বেরূপ অবস্থার মধ্যে ভারত সরকার এর শিল্পপতিগণ কর্তৃক সংগ্রহের জঙ্গ অভিযান শুরু করিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ পরিণতি অনিবার্য। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, এই ধরণের আর্থিক লেনদেন নির্ভর করে ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটা সম্ভাব্যজনক ধারণার উপর। ঋণ গ্রহণকারী নির্দিষ্ট কিস্তি মত টাকা শোধ দিতে পারিবে কি না, কিংবা মূলধন নিরাপদ থাকিবে কি না, সে সম্পর্কে উত্তমবর্ণের মনে বিশ্লেষণ দিখা-সম্ভোচনের উদ্দেশ্যে হইলে তাহারা পিছাইয়া যায়। ব্যক্তিগতভাবে কেহ ঋণপ্রার্থী হইলে মহাজন যে বরফ মতকতা অবলম্বন করেন, কোন জাতি ঋণপ্রার্থী হইলেও তাহার ব্যক্তিগত ঘটনা। এই সহজ, সত্য কথাটা অরণ থাকিলে বিশেষ হইতে কর্তৃক ও মূলধন সংগ্রহের চেষ্টায় নৈরাশ্রের কারণটা বুঝিতে পারা যাইবে। অর্থের অভাবে ভারতের বৈদেশিক অবস্থা বাস্তবিকই যদি টলায়মান হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিদেশীরা কর্তৃক দিবে কি ভরসা? তাহারা তো দয়া ধর্ম করিতে বসে নাই! ঋণ গ্রহণকারীর যোগ্যতা নির্ভর করে বৈদেশিক ভিত্তি দৃঢ় করিয়া তুলিবার উপর। এই ব্যাপারে ক্রমাগত গাফিলতীর দ্বারা ভারত সরকারই পরিকল্পনার চরিত্র্য বিপর্যয় করিয়া তুলিয়াছেন। কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা বাজার দর নিয়ন্ত্রণ ও আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জাতি গঠনের কাজে লগ্নির জঙ্গ বাধ্যবাধকতা বলবৎ করিলে বৈদেশিক ভিত্তি দৃঢ় হইয়া উঠিত। আর ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা সম্পর্কে বিদেশী লগ্নীকারীদের মনে দৃঢ়তা ও তদন্তপাতে বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু ক্রমাগত অবহেলা দ্বারা সরকার সে সুযোগ নষ্ট করিয়াছেন। এখনও তাহাদের পক্ষে নীতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের জঙ্গ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন আছে সত্য। কিন্তু উহা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নির্ভর করে বৈদেশিক বিনিয়োগ সৃষ্টি করিয়া তুলিবার এক দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ ও সঞ্চয় সম্ব্যবহারের উপর। এই উদ্দেশ্যে জাতির দর্শনশক্তি নিয়োগ না করিলে রাজ কাঁছনি পাহিয়া কিংবা প্রজ্ঞা হুম্বি দিয়া বিদেশীদিগের সহযোগিতা লাভ করা অসম্ভব।” —যুগান্তর।

### পি, ডব্লিউ ডি'র কৃপা

“সংবাদ পাওয়া যায় যে, পি, ডব্লিউ, ডি নাকি স্থানীয় কণ্ঠ-স্তম্ভগণকে কাজ দিতে খুব আগ্রহী নহেন। পি, ডব্লিউ, ডি'র কাজ তেঁতার আফান দ্বারা বটন করা হয়। নিরুন্মোদ তেঁতার গ্রহণ করাই রীতি। সংবাদে প্রকাশ, ক্ষেত্র বিশেষে নিরুন্মোদ তেঁতার ও নাকি অগ্রাহ্য করা হয়। তেঁতার গ্রহণ বিবেচ্যে





বিশ্বমিন মুক্ত

কালে

**WIP**

বিস্কুট

কিছরের বিচার করেন

যে সকলোই পছন্দ করেন

সমস্ত

কালে

বিস্কুট

লেবোরেট কোম্পানী  
কলিকতা-১



খিনেরারকট

ঘেরী

পেটিটবারো

নাইস

কলোজ

টেস্টা

ডেন্টা

ক্রাইমক্র্যাকার

কয়েন

স্পোর্ট

জিঞ্জারবার্ট

হাউসহোল্ড

সল্‌জি

বার্ভেলক্রীম

কাকেনয়ের

চকোলটেক্রীম

বেবীক্রীম

সপ্ট ক্র্যাকার

প্রভুতি

আরও অনেক



